অমৃত

ত্রৈমাসিক সূচীপত্র

১১শ বর্ষ : ১ম খণ্ড

১ম সংখ্যা—১৩শ সংখ্যা

শুক্রবার : ২৩শে বৈশাখ, ১৩৭৮—শুক্রবার : ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৭৮

Friday 7th May 1971 — Friday—30th July 1971

৮

॥ ব ॥

॥ ম ॥

॥ য ॥

॥ র ॥

॥ ল ॥

॥ শ ॥

NIRODH

লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন, নিরাপদে জন্মনিরোধের সহজ উপায়.
মনিহারী দোকান, ওষুধের দোকান, মুদীর দোকানে,

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫·০০	টাকা ৩০·০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১২·৫০	টাকা ১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬·২৫	টাকা ৮·০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১১শ বর্ষ
১ম খণ্ড

৭ম সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday 18th June, 1971 শুক্রবার, ৩রা আষাঢ়, ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীসমীরকুমার গুপ্ত

এক নজরে

একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ :

রাজ্যসভায় সম্প্রতি যে 'মেডিকাল টারমিনেশন অফ প্রেগনেন্সি বিল (১৯৬৯)' পাশ হয়ে গেল সেটি শতাব্দীকালের পুরানো, অতি কঠোর ও বর্তমানকালের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিহীন একটি আইনের কঠিন নাগপাশ শিথিল করার কাজে বিশেষ সহায়ক হবে। এখনো পর্যন্ত যে আইন প্রচলিত আছে এদেশে তাতে একমাত্র মায়ের জীবনরক্ষার প্রয়োজনে ছাড়া আর কোন কারণে গর্ভপাত ঘটানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এবং অন্য কোন কারণে গর্ভপাত করা হলে মা ও গর্ভপাতকারী উভয়েই কঠোর দন্ডে দন্ডিত হবেন। আইনের এই কঠোরতার জন্যই গর্ভপাত এদেশে একটি অতি গোপন ও অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী ডঃ চন্দ্রশেখরের মতে এদেশে প্রতি বছর ৬৫ লক্ষ গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই তা ঘটানো হয় হাতুড়ে ও অর্ধ-শিক্ষিত ডাক্তারদের দিয়ে। ফলে বহু নারীর অকালমৃত্যু হয় এবং অনেকে বেঁচে থাকে নানা ব্যাধি ও যন্ত্রণা নিয়ে। তিনি বলেন, আইন অনুকূল হলে এমনটা কখনও হতে পারতো না।

নতুন যে আইন রাজ্যসভায় অনুমোদিত হল তাতে অনেকগুলি কারণে আইনসঙ্গত গর্ভপাতের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, দৈহিক স্বাস্থ্য ছাড়াও মানসিক স্বাস্থ্য বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কাতেও যে কোন নারী গর্ভপাতের দাবি জানাতে পারবে। তাছাড়া ধর্ষণের ফলে কোন নারী যদি অন্তঃসত্ত্বা হয় বা এমন আশংকা দেখা দেয় যে ভূমিষ্ঠ শিশু বিকলাঙ্গ হতে পারে, তবে সেক্ষেত্রেও গর্ভপাত আইনসংগত হবে। কিন্তু প্রস্তাবিত আইনের যে অনুচ্ছেদটি সবচেয়ে উদার ও যুক্তিসম্মত তা হ'ল জন্ম নিয়ন্ত্রণে ইচ্ছুক দম্পতির ইচ্ছাক্রমে অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের অবসান। জন্ম নিয়ন্ত্রণকল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতি যখন শতকরা শত ভাগ নিশ্চিত নয় তখন জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যর্থতার ফলে সৃষ্ট ভ্রূণ বিনাশের অধিকার অবশ্যই আইনসঙ্গত হওয়া উচিত। প্রস্তাবিত আইনে এই অধ্যায়টি সংযুক্ত হওয়ার ফল হবে সুদূরপ্রসারী। এতে শুধু যে অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের দায় থেকে বহু নারী অব্যাহতি পাবে তাই নয়, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কাজেও তা বিশেষ সহায়ক হবে।

কিন্তু এ আইনের এক্তিয়ার শুধু সরকারী হাসপাতাল-গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে আইনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। কারণ প্রয়োজন যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের, সেখানে সরকারী হাসপাতালগুলি কয়েক হাজারের বেশি মানুষের কাজে লাগতে পারবে না। সুতরাং যে দাবি আইনসঙ্গত তার প্রতিকারের দায়িত্ব সরকারী বে-সরকারী সব চিকিৎসকের উপর ন্যস্ত থাকা উচিত এবং সরকারী বে-সরকারী সব হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে তার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

আট কোটি লোক গৃহহীন :

ভারতের শহরগুলিতে ফুটপাথে বা গাড়িবারান্দার নীচে, স্টেশনের প্লাটফর্মে বা পার্কের বেঞ্চে রাত্রি-যাপন করে এমন লোকের সংখ্যা এক কোটির কাছাকাছি। আর গ্রাম ভারতে যাদের মাথায় কোন ছাউনি নেই এমন লোকের সংখ্যা সাত কোটির কিছু বেশি। সারা ভারতে সব গৃহহীনের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হ'লে কত বাসস্থানের প্রয়োজন হবে তার হিসাব নির্ধারণের দায়িত্ব চতুর্থ যোজনার পক্ষ থেকে যে সমীক্ষক দলের উপর ন্যস্ত হয়েছিল তাঁরাই ঐ গৃহহীনদের বিশাল তালিকাটি চতুর্থ যোজনার কর্মকর্তাদের বিচার-বিবেচনার জন্য প্রস্তুত করেছেন। সমীক্ষক দল একথাও জানিয়েছেন যে, প্রকৃত গৃহহীনের সংখ্যা আরও অনেক বেশি, কারণ যোজনা-নির্দিষ্ট সংজ্ঞা অনুসারে মাটির চার দেওয়ালের উপর একটি আচ্ছাদন থাকলেই তাকে পাঁচজনের বাসোপযোগী একটি গৃহ বলে ধরা হয়েছে, সে কুটির জীর্ণ, বিধ্বস্ত যাই হ'ক। তাই ঠিকমতো হিসাব করলে দেখা যাবে, গোটা জাপান বা ইন্দোনেশিয়ায় যত লোকের বাস, আমাদের তত লোক রাত কাটায় তারাভরা আকাশতলে, এই সব পেয়েছির দেশে।

সমীক্ষক দল বলেছেন, নিরাশ্রয়দের ন্যূনতম আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হ'লে অন্তত ৮৩ লক্ষ ৭০ হাজার গৃহ চতুর্থ যোজনাকালে গড়ে তুলতে হবে যার জন্য ব্যয় হবে প্রায় ৩৩,০০০ কোটি টাকা। বলা বাহুল্য, ঐ টাকার ধারে কাছেও পরিকল্পনাকারদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং, চতুর্থ যোজনার শেষে কিছু নতুন কলকারখানা গড়ে উঠলেও, আজকের নিরাশ্রয় যারা তারা সেদিন আজকের মতোই নিরাশ্রয় থাকবে, শুধু তাদের সংখ্যা সুনিশ্চিতভাবে দশ কোটি অতিক্রম ক'রে যাবে।

একটি মানবিক উদ্যোগ :

তামিলনাড়ু সরকার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এক করুণানিধির ৪৪তম জন্মদিনে একটি মহৎ মানবিক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। রাজ্যে যে ষাট হাজার ভিক্ষুক আছে তাদের সকলকে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ওরা জুন মাদ্রাজে স্টেট বেগার ফান্ডের উদ্বোধন করা হয়। ঐ তহবিলে যে টাকা উঠবে লটারি, ডোনেশন ইত্যাদির মাধ্যমে তা দিয়ে ঐ হতভাগ্য সমাজ পরিত্যক্তদের জন্য বাসস্থান ও কয়েকটি ছোট ও মাঝারি ধরনের শিল্প গড়ে উঠবে যাতে সব সুস্থ ও সক্ষম ভিক্ষুককে কাজ দেওয়া হবে। ভিক্ষুকদের মধ্যে যে হাজার ছয়েক কুষ্ঠরোগী আছে তাদের পুনর্বাসন ও চিকিৎসার জন্য গড়ে তোলা হ'বে ছয়টি স্বতন্ত্র শিবির।

সারা ভারতে কংগ্রেসের বাইরে ডি-এম-কে একমাত্র রাজনৈতিক দল যারা একক শক্তিতে একটি রাজ্যে ক্ষমতাসীন হয় ও পরবর্তী নির্বাচনে আরও বেশি ভোট ও অধিক সংখ্যক আসন লাভ ক'রে তাদের প্রশাসনিক সাফল্য ও জনপ্রিয়তার সংশয়াতীত প্রমাণ দেয়। ডি-এম-কে দলের এই সাফল্যের মূলে রয়েছে তাদের মানবিক চেতনা। তাঁরা প্রথম তামিল ভাষীদের হৃদয় জয় করেন হিন্দির জেহাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে। তারপর সারা তামিলনাড়ু জুড়ে যখন চলেছে খাদ্য সংকট সেই সময় সারা রাজ্যে মাথাপিছু এক টাকায় এক পাই চাল (কিলোর কিছু বেশি) সরবরাহের এক প্রায়-অসম্ভব প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁরা নির্বাচনে অবতীর্ণ হন এবং নির্বাচনে জয়ী হয়ে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। তারপর ডি-এম-কে'র পাঁচ বছরের শাসনে তামিলনাড়ু শুধু যে খাদ্য সংকটমুক্ত হয়েছে তাই নয়, হয়েছে খাদ্যে উদ্বৃত্ত রাজ্য। ভারত-পথিক স্বামী বিবেকানন্দ বঙ্গসন্তান হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জন্য বাঙালি যা করেছে তার শতগুণ করেছে ডি-এম-কে শাসনাধীন তামিলনাড়ু। আজ তাঁদেরই কল্যাণময় প্রয়াসে স্বামীজির স্মৃতিস্নাত কুমারিকা অন্তরীপ হয়েছে সারা ভারতের নবীন তীর্থ। এতে যেমন তামিলনাড়ুর মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনই লক্ষ লক্ষ পর্যটকের আগমনে, মন্দির নির্মাণে তামিলনাড়ুর ব্যয় করা প্রতিটি রৌপ্য-মুদ্রা স্বর্ণমুদ্রা হয়ে রাজ তহবিলে ফিরে যাচ্ছে। এবার তাঁরা তামিলনাড়ুকে ভিক্ষুক-মুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছেন, আইন বলে ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ করে নয়, ঐ অর্ধ-লক্ষাধিক সমাজ-পরিত্যক্তকে সমাজজীবনে সুপ্রতিষ্ঠ করে।

প্রত্যক্ষদর্শী

মানবিক ও রাজনৈতিক সমস্যা

বাংলাদেশ থেকে বন্যার স্রোতের মতো শরণার্থী আগমন এখনও অব্যাহত। পশ্চিমবাংলায় এরা সীমান্ত জেলাগুলো ভরে দেবার ফলে শুধু শরণার্থীই নয়, স্থানীয় অধিবাসীদেরও দেখা দিয়েছে সমূহ বিপদ। মহামারীর আকারে শরণার্থীদের মধ্যে কলেরা দেখা দিয়েছে। এত ব্যাপক ও গুরুতর হয়ে উঠেছে এই সমস্যা যে শুধু রাজ্য সরকার কেন, একা ভারত সরকারের পক্ষেও তার সুষ্ঠু সমাধান করা অসম্ভব। আমরা গোড়া থেকেই বলে আসছি যে, বাংলাদেশের শরণার্থীদের সমস্যা সম্পূর্ণ একটি রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা। যেভাবে নাৎসী জার্মানী থেকে বিতাড়িত শরণার্থীদের কিংবা প্যালেস্টাইনের শরণার্থীদের আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় আশ্রয় ও পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল, পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর আক্রমণে গৃহচ্যুত এই পঞ্চাশ লক্ষ শরণার্থীর আশ্রয় ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহেরই গ্রহণ করা কর্তব্য।

এই শরণার্থীরা প্রাণভয়ে পলায়ন করে এখানে চলে এসেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ভারতের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। এবং আমরা যেন তাতেই সন্তুষ্ট আছি। কিন্তু এতগুলো লোককে মানুষের মতো বাঁচতে দিতে হলে যে সঙ্গতি থাকা দরকার দরিদ্র ও নিজের সমস্যায় জর্জরিত ভারতের তা এখন নেই। এই কারণেই শরণার্থীদের বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। ইয়োরোপের কোনো দেশ থেকে যদি এর এক-শতাংশ লোকও রাজনৈতিক কারণে গৃহচ্যুত হত তাহলে তুমুল কাণ্ড বাধত। বাংলাদেশের বা এশিয়ার মানুষের প্রাণের দাম এতই কম যে, তাদের জন্য শুধু অশ্রুপাত করা ছাড়া বিশ্ববিবেক আর বেশি বিচলিত হয় না। নতুবা আড়াই মাস ধরে বাংলাদেশে যে তাণ্ডব চলছে তার অবসান ঘটাতে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিসমূহ এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ আরও তৎপর হত।

বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সার এলেক ডগলাস হিউম সম্প্রতি হাউস অব কমনসে বলেছেন যে, পূর্ববাংলায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে অবিলম্বে সেখানে অসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। ইয়াহিয়া খান কার শক্তিতে বাঙালি নিধন করছেন? এই শক্তি জুগিয়েছে প্রধানত সামরিক জোটবন্ধ দেশগুলো। তারা ইচ্ছা করলেই ইয়াহিয়া খানের কব্জি চেপে ধরতে পারত। বাংলাদেশের মানুষের দুর্ভাগ্য, তার স্বাধীনতার কণ্ঠরোধের সময়ে যে আর্ত চিৎকার ধ্বনিত হয়েছিল তা এই স্বাধীনতার পূজারী গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে বিচলিত করতে পারেনি। যদি পারত তাহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা আজ অন্য খাতে প্রবাহিত হত।

বাংলাদেশে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না হলে এই বিপুলসংখ্যক শরণার্থীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই। বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি না দিলে এ বিষয়ে কোনো রাজনৈতিক মীমাংসাও হবে না। তা ছাড়া বাংলাদেশের অবিসম্বাদী নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গীচক্র মুক্তি না দিলে রাজনৈতিক মীমাংসার আশা সুদূরপরাহত। এই পরিস্থিতিতে পাকেচক্রে ভারতকেই এই রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুভার বহন করতে হচ্ছে। বিশ্বের কাছে ভারত এর জন্য আবেদন জানিয়েছেন। ত্রাণসামগ্রী আসছে সত্য কথা। কিন্তু শুধু ত্রাণসামগ্রী দিয়েই যেন বিশ্বের বিবেক ঘুমন্ত হয়ে না থাকে। এই শরণার্থীরা বাংলাদেশের নাগরিক। তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিঃস্ব অবস্থায় ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানকে কেন বাধ্য করা হবে না এদের ফিরিয়ে নিতে এবং এদের সমস্ত দায়িত্ব বহন করতে। এর আগে বহুবার ভারত শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু এবারের ঘটনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পাকিস্তান আজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন। তার পূর্ব অংশ মানসিক দিক দিয়ে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। সামরিক শক্তি দিয়ে একে যতই দাবিয়ে রাখার চেষ্টা হোক না কেন পাকিস্তান আর কোনোদিন পূর্ববাংলাকে কলোনিরূপে পাবে না। আজ হোক কাল হোক বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করবে।

যতদিন পূর্ণ বিজয়লাভ না হচ্ছে ততদিন মুক্তিসংগ্রামীদের সর্বপ্রকার নৈতিক, রাজনৈতিক এবং বৈষয়িক সাহায্য দেওয়া আমাদের স্বার্থেই প্রয়োজন। কারণ এই মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের সঙ্গে শরণার্থীদের প্রত্যাগমনের প্রশ্ন জড়িত। শরণার্থীরা অনেক দুঃখ পেয়ে এই সীমান্তে এসেছেন। রোগে,পথশ্রমে ও অন্যান্য কারণে অনেকের মৃত্যুও হয়েছে। এদের কোথায় পাঠানো হবে এ নিয়ে কর্তৃপক্ষ প্রথমে দ্বিধার ভাব দেখিয়েছিলেন। এদের স্বস্থানে ফিরে যাবার পথ প্রশস্ত করতে হবে— এই মনোভাব থেকে যদি ভারত সরকার বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনার বিচার করেন তাহলেই শরণার্থীদের পুনর্বাসনের প্রশ্নটিও অন্যভাবে দেখা সম্ভব। নতুবা পাকিস্তানের জঙ্গীচক্রেরই লাভ। ওরা একদিকে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক আন্দোলনও স্তব্ধ করবে, অন্যদিকে সংখ্যালঘুদেরও বিতাড়িত করবে। এত বড় রাজনৈতিক রাহাজানি যদি ভারত চুপ করে সহ্য করে তাহলে পরিণামে তা আমাদেরই বিপদ ডেকে আনবে। সুতরাং শরণার্থী সমস্যাকে যেন আমরা মানবিক এবং রাজনৈতিক দুই দিক থেকেই বিচার করে তার সমাধানে অগ্রসর হই।

মাস-তিনেকের মধ্যে পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে যে কোনো গুণগত পরিবর্তন ঘটেনি, বিধানসভার তিনটি কেন্দ্রে নির্বাচনের ফল সেই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কলকাতার যে-ক'টি এলাকা সবচেয়ে উপদ্রুত তার তালিকায় জোড়াবাগানের স্থান গোড়ার দিকে। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রচার অনুযায়ী যদি এই এলাকায় কংগ্রেসী সমাজবিরোধী ও পুলিশের অত্যাচারে লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেও থাকেন, তবে তার ফলে তাঁরা কিন্তু শাসক কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে রায় দেননি। নিহত এম এল এ-র স্ত্রীই যে এই কেন্দ্রে শাসক কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন, এই 'সেণ্টিমেণ্টে' নির্বাচনের ফলকে কতোটা প্রভাবিত করেছে তা সঠিকভাবে বলা মুস্কিল। তবে শ্রীমতী ইলা রায়ের সাফল্যের কারণ নিশ্চয়ই শুধু এই 'সেণ্টিমেণ্ট' নয়।

অনেক উপনির্বাচনেই নিহত বা মৃত এম এল এ বা এম পি-র স্ত্রীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। কেউ কেউ সফল হয়েছেন, কিন্তু সকলেই হননি। গত বছর বোম্বাইয়ে প্যারেল কেন্দ্রে উপনির্বাচনে অন্যতম প্রার্থী ছিলেন গুণ্ডাদের হাতে নিহত সি পি আই নেতা কৃষ্ণ দেশাইয়ের স্ত্রী। কিন্তু শিবসেনার 'রাজনৈতিক' আবেদনের কাছে স্বামী-শোকাতুরা বিধবার আবেদন তেমন যুৎ করতে পারেনি। বোম্বাইয়ের চেয়ে কলকাতায় রাজনৈতিক চেতনা কম, এমন অপবাদ এই মহানগরীর অতিবড় শত্রুও আজ পর্যন্ত দেয়নি। সুতরাং ইলা রায়ের সাফল্যের পিছনে শুধু ভোটদাতাদের ভাবাবেগ কাজ করেছে, এমন কথা বলা চলে না। তাঁর স্বামীর চেয়ে দু'গুণ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়ে তিনি এ-কথাই আবার প্রমাণ করেছেন যে, স্বাধীনতার পর এই রাজ্যে রাজনৈতিক প্রভাবের যে-ছকটা চালু ছিল ১৯৭১ সালে সেটা অচল হয়ে গেছে।

এর আগে আমরা দেখেছি কলকাতা ও শহরতলীতেই বামপন্থী চেতনার জাগরণ এবং বামপন্থী শক্তির সাফল্য। কিন্তু এই রাজ্যের ষষ্ঠ সাধারণ নির্বাচনে দেখা গেল শাসক কংগ্রেসের সাফল্যের মূলে কলকাতার অবদান মোটেই কম নয়। বামপন্থীরা, বিশেষত মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি নিশ্চয়ই ভোটদাতাদের এই 'স্খলনে' আশঙ্কিত, কিন্তু জোড়াবাগান উপনির্বাচনের ফল এই স্রোতের মোড় ফেরাতে পারেনি। নির্বাচনের মাত্র পাঁচ দিন আগে পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে সি পি এম এই কলকাতাতেই হরতাল ডেকেছিল, কিন্তু সেই রাজনৈতিক লড়াই জোড়াবাগানের ৩১ হাজার ভোটদাতার মনে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

কলকাতায় মানুষের অভাব-অভিযোগ কিছু কম নয়, মার্কসবাদীরা যাকে শাসক-গোষ্ঠীর আক্রমণ বলে থাকেন, তা-ও যে এই মহানগরীতে নেই তা নয়, তবু কলকাতার ২২টির মধ্যে ১৬টি আসন কংগ্রেসের দখলে গেল কী করে, তা মার্কসবাদীরা ভেবে দেখতে পারেন। ১০ মার্চ নির্বাচনের পরই অবশ্য এই চিন্তা তাঁদের মধ্যে দেখা দিয়েছে কিন্তু এখনও তাঁরা যে এ-বিষয়ে বিশেষ কিছু করতে পারেননি, জোড়াবাগানের ফলাফল তারই ইঙ্গিতবাহী।

কিন্তু বিধানসভার ২৮০টির মধ্যে কলকাতার ভাগে মাত্র ২৩টি আসন (শ্যামপুকুর সহ) বাকি কেন্দ্র ছড়িয়ে আছে শহরতলী মফস্বল শহর ও গ্রামে। সুতরাং কলকাতার সব ক'টি আসনও যদি কংগ্রেস ও তার সহযোগীদের দখলে আসে তবে প্রেস্টিজ হয়ত লাভ হবে, কিন্তু রাজ্যের ক্ষমতা দখলে তেমন সুবিধে হবে না—যদি না কলকাতার বাইরে কিছু করা সম্ভব হয়। কলকাতা যদি মার্কসবাদীদের উদ্বেগের কারণ হয়ে থাকে তবে মহানগরীর বাইরে বিস্তীর্ণ এলাকাও কংগ্রেস ও সহযোগীদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দমদম ও উখড়ায় মার্কবাদীরা একথা আবার প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, কলকাতার বাইরে তাঁদের শক্তির কোনো ইতর-বিশেষ হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি উখড়ায় লক্ষ্মণ বাগদীর ভোটের ব্যবধান ১৯৬৯ সালের তুলনায় কয়েক শ বেড়ে গেছে। মোট ভোট যখন কয়েক শ' বেশি পড়েছে তখন ভোটের ব্যবধান বাড়াটাও হয়ত আশ্চর্য নয়, কিন্তু যেটা তাৎপর্যপূর্ণ তা হল দু' বছর আগে শ্রীবাগদী যখন জয়ী হয়েছিলেন তখন তাঁর পিছনে ছিল যুক্তফ্রন্টের ১৪ দলের সমর্থন। এবারে সেই ১৪ দলের অনেকেই কংগ্রেস-প্রার্থী হারাধন মণ্ডলকে সমর্থন করেছে। তবু সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রীবাগদীর পক্ষেই ভোট পড়েছে বেশি।

দমদমে অবশ্য ছবিটা একটু অন্যরকম। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া সেখানে তরুণ সেনগুপ্তের ভোটের ব্যবধান প্রায় ছ' হাজার কমিয়ে এনেছে। ভোট যে ১৯৬১ সালের তুলনায় কম পড়েছে এটাই এর পূর্ণ ব্যাখ্যা নয়। কারণ ভোট কম পড়া সত্ত্বেও বিদ্যুৎ বসু ১৯৬৯ সালের কংগ্রেস প্রার্থীর চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন। কিন্তু তবু একথাও সত্যি যে, গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের সবকটি দলের সমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও বিদ্যুৎ বসু সি-পি-এমকে কাবু করতে পারেন নি। প্রসঙ্গতঃ ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস প্রার্থী বীরেন্দ্রপ্রসাদ গুহ তরুণবাবুর কাছে হেরেছিলেন বিদ্যুৎবাবুর চেয়ে কম ভোটের ব্যবধানে, যদিও তখন ঐ কেন্দ্রে তরুণবাবুই ছিলেন একমাত্র বামপন্থী প্রার্থী।

তিনটি কেন্দ্রের নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণ করে সুতরাং একথা বলা চলে যে ১০ মার্চের নির্বাচন যদি পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক পোলারাইজেশনের সূচনা করে থাকে, জুন মাসে সেই ধারাই অব্যাহত। তবু ছবিটা কিন্তু হুবহু এক নয়। তার কারণ, মার্চে কংগ্রেসের সাফল্য এসেছিল একক শক্তির ভিত্তিতে। জোড়াবাগানে এবার শাসক কংগ্রেস জিতেছে। মার্চেও তারা জিতেছিল। কিন্তু দমদম ও উখড়ায় কোয়ালিশনের অন্যান্য দলের সাহায্যও তাকে জয়মাল্য এনে দিতে পারে নি। অথচ মার্কসবাদীরা ১৯৬৯ সালের কয়েকটি সহযোগী দলের সাহায্যে বঞ্চিত হয়েও দমদম ও উখড়ায় আসন দুটি হারায় নি। এবং এটাও কোনো গোপন রহস্য নয় যে সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের শক্তির আদি, অন্ত ও মধ্যের প্রায় সবটুকুই সি-পি এমেরই শক্তি।

নির্বাচনের ফল সম্পর্কে এই প্রশ্নটিই আজ গভীরভাবে বিবেচিত হচ্ছে, কারণ এটা আপাতত পরিষ্কার যে মার্কসবাদীরা দুটি আসন পাওয়া সত্ত্বেও বিধানসভায় সরকার ও বিরোধী পক্ষের শক্তির বিশেষ তারতম্য ঘটছে না। এই বিধানসভার প্রথম অধিবেশনের আগেই নেপাল রায় নিহত হন। সুতরাং শ্রীমতী রায়ের ভোটটি সরকার পক্ষের শক্তিতে নতুন সংযোজন। তরুণ সেনগুপ্ত ও লক্ষ্মণ বাগদী বিরোধী পক্ষে বাড়তি দুটি ভোট জোগাবেন বটে, কিন্তু বিধানসভায় গত অধিবেশনে বিরোধী পক্ষের যে শক্তি ছিল ইতিমধ্যে তা থেকে একটি ভোট বাদ পড়েছে কারণ গোলাম ইয়াজদানি এখন নিরাপত্তা আইনে বন্দী। অর্থাৎ ভোটাভুটির সময় সরকার পক্ষের জয়ের পথে কোনো বাধা নেই—অবশ্য যদি না এর মধ্যে কোনা বড় রকমের রাজনৈতিক ওলোট-পালট ঘটে যায়।

বাংলা কংগ্রেসের প্রত্যাশিত ভাঙন এই প্রসঙ্গে অবশ্যই যথেষ্ট [illegible]

জোগাচ্ছে। সুশীল ধাড়ার পক্ষে আরো দুজন এম-এল-এই হয়ত শেষ পর্যন্ত থাকছেন কারণ সুশীলবাবু স্পীকার ও রাজ্যপালের কাছে যে চিঠি দিয়েছেন, তাতে বাণেশ্বর পাত্র ও বঙ্কিম মাইতিরও স্বাক্ষর রয়েছে। সুশীলবাবু এখনও কোয়ালিশন সরকারকে সমর্থনের প্রশ্নে কোনো উচ্চবাচ্য করেননি, অবশ্য তিনি বিরোধী পক্ষে বসবেন এমন কথাও এখনও বলেননি।

তিনি যখন অজয়বাবুর মতো দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগীর সঙ্গে বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে পেরেছেন, তখন অজয়বাবুকে মুস্কিলে ফেলার জন্য তিনি সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। অজয়বাবুর ওপর সুশীলবাবুর উষ্মার অন্যতম কারণ, অজয়বাবু সি-পি-আই-এর কথায় সুশীলবাবুর মতো পুরানো সহযোগীকেও আমল দিতে চাননি। তাঁর ইচ্ছে ছিল বাংলা কংগ্রেস থেকে অন্তত দুজন মন্ত্রী নেওয়া হোক। দ্বিতীয় মন্ত্রী হতেন স্বভাবতই সুশীলবাবু নিজে। কিন্তু এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যদিও কংগ্রেসেরও একাংশ ছিলেন, তবু প্রধান আপত্তি আসে সি-পি-আই-এর তরফ থেকে। অজয়বাবু সেই আপত্তি মেনে নেন। সি-পি-আই এখন খোলাখুলিই বলছেন যে, মন্ত্রী হতে না পেরে হতাশার বশেই সুশীলবাবু বাংলা কংগ্রেসকে দু টুকরো করেছেন।

কিন্তু সুশীলবাবু যদি কোয়ালিশন সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেও নেন তবু তিনি মার্কসবাদীদের সঙ্গে হাত মেলাবেন, এ-কথা সুশীলবাবুকে যাঁরা জানেন তাঁরা মানতে চান না। সুশীলবাবুর কম্যুনিষ্ট-বিরোধিতা সুবিদিত। মার্কসবাদীরা অবশ্যই সুশীলবাবু বঙ্কিম মাইতি ও বাণেশ্বর পাত্রের সহযোগিতা চাইবেন, কিন্তু সুশীলবাবু তাঁদের বাধিত করতে চাইবেন কি? আরও একটা কথা, ঐ তিনজন বিধান সভায় সরকারের বিপক্ষে ভোট দিলেও কিন্তু এখনই সরকারের পতন ঘটবে না, ভোটের ব্যবধান আরো সংকীর্ণ হবে এই যা। ফলে সরকার পক্ষের হুইপদের আরো দৌড়োদৌড়ি করতে হবে বটে, কিন্তু সবাই হাজির থাকলে ভয়ের কিছু থাকবে না।

তার চেয়ে সুশীলবাবুর পক্ষে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার আশাই অনেক যুক্তিযুক্ত হবে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। কারণ সুশীলবাবুর দল থেকে একজনকে মন্ত্রী করা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। সাতজন এম-এল-এ'র দল যদি তিনটি মন্ত্রিপদ পেতে পারে তবে তিনজন এম-এল-এ'র মধ্যে থেকে একজনকে মন্ত্রী করতে অন্ততঃ ঐকিক নিয়মে বাধে না। এ-নিয়ে বিরোধীপক্ষও যে বিশেষ কিছু বলতে পারবেন তা নয়। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় একজন এম-এল-এ বিশিষ্ট দল থেকেই শুধু মন্ত্রী করা হয় নি, ফ্রন্টের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও যে-দলের কোনো এম-এল-এ নেই সে দলের থেকেও মন্ত্রী করতে কোনো অসুবিধে হয় নি। যে-কোনো আঁতাত টিঁকিয়ে রাখতেই কিছু দাম দিতে হয়।

এ-ব্যাপারে মার্কসবাদীদের কিছু বলার না-থাকলেও তাঁরা কিন্তু অজয়বাবুর বিরুদ্ধে আক্রমণকে এবার আরো ঝাঁঝালো করে তুলবেন। বেইমানীর অভিযোগ ছাড়াও সি পি এম ইদানীং অজয়বাবুর বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রধান লাইন হিসেবে পাঁচ জন এম-এল-এ'র নেতা—এই বিশেষণ ব্যবহার করছিল। এখন যদি অজয়বাবুর বাংলা কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় দুই এবং তাঁর মধ্যে একজন হন মুখ্যমন্ত্রী, তবে সি পি এমের আক্রমণের সুবিধে হয় বৈকি।

* * *

দমদম ও উখরায় জয়ের পর সি পি এম যে অজয় মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করেছে তার ওপর এমন কিছু গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু এই নির্বাচনের ফলে যদি পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক জীবনে পোলারাইজেশনের চেহারাই স্পষ্ট হয়ে উঠে থাকে তবে এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্নও রাজনৈতিক মহলে দেখা দিয়েছে।

সি পি এমের রাজনৈতিক লাইন নিয়ে যদি এখনও পর্যন্ত দলের মধ্যে কোনো সন্দেহ থেকে থাকে, তবে ৬ জুনের নির্বাচনের পর তা অনেকটা হয়ত দূর হবে। কংগ্রেসই এই রাজ্যে প্রধান শত্রু, ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের পর এই শ্লোগান হয়ত সি পি এমের কোনো কোনো মহলে এবং অন্যান্য বামপন্থী দলের মধ্যে সন্দেহের সঞ্চার করেছিল। প্রমোদ দাশগুপ্ত এই সেদিন তমলুকে বলেছেন, 'আমাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মূল্যায়ন সঠিক ছিল। যে-আসনগুলি আমরা হারিয়েছি, সেগুলি না হারালে কি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হত না? প্রমোদবাবুর প্রশ্নটির উত্তর কি হবে সে কথা বাদ দিলেও, পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁর দলের মূল্যায়ন নিয়ে বিতর্ক এখন অনেকটা কমতে পারে এটা ঠিক।

নিজস্ব রাজনৈতিক লাইনের প্রতি এই আস্থায় মার্কসবাদীরা অন্যান্য বামপন্থীদের সঙ্গে আপসের জন্যে সম্ভবত আরো কম সচেষ্ট হবেন। অবশ্যই কংগ্রেস থেকে যাতে একটি দল বা একটি এম-এল-একেও সরিয়ে আনা যায় সে-জন্যে তাঁরা চেষ্টার কসুর করবেন না। আগামী নির্বাচনের আগে তাঁরা আরো দু-একটি দলকে অবশ্যই সঙ্গে পেতে চাইবেন, তবে সেই আঁতাত সম্ভবত সি পি এমের শর্তেই হতে হবে। যদি তাতে অন্য কোনো দলকে না পাওয়া যায় তখন সি পি এম বর্তমান সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের নিশান নিয়েই লড়বে।

কিন্তু এখন যে-সব দল সি-পি-এমের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ কংগ্রেসের পক্ষে রয়েছে তারা কি আগামী নির্বাচনের আগে তাদের মত পরিবর্তন করবে? গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের মিলিত শক্তি তিনটি কেন্দ্রে নির্বাচনে কোয়ালিশনের প্রার্থীদের বিশেষ সাহায্য করতে না পারলেও সি পি আই বা ফরওয়ার্ড ব্লক তাতে এতটা উদ্বিগ্ন হয় নি যে কোয়ালিশন ত্যাগের কথা ভাবতে সুরু করেছে। সি-পি-আই ১ জুন তারিখে জেলায় জেলায় গণ-দিবস পালন বা কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের তীব্র সমালোচনা করে জঙ্গী চেহারা বজায় রাখার চেষ্টা করলেও কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগের নীতি ত্যাগ করে নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সি পি আইয়ের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এখনও এই ধারণা যে সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা ব্যাপকতর করা যায় নি বলেই পশ্চিম বাংলায় সি পি আইয়ের বা আট পার্টি জোটের বিপর্যয় ঘটেছে। প্রমোদ দাশগুপ্তের কথাবার্তা থেকে মনে হচ্ছে যে, সি পি আইয়ের বাজেট-বিরোধিতার মধ্যে তিনি কিছুটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু সি পি এমের পক্ষে খুব বেশী আশা করার মতো এখনও কিছু ঘটেছে কি।

—দেবদত্ত

১১।৬।৭১

দেশে বিদেশে

পেট্রাপোলে বাংলাদেশের শরণার্থীবৃন্দ

পাকিস্তান কি সুপরিকল্পিতভাবে ভারতের বিরুদ্ধে জীবাণু যুদ্ধ চালাচ্ছে? বাংলাদেশ থেকে যেসব হতভাগ্য, হৃত-সর্বস্ব আশ্রয়প্রার্থী মারাত্মক কলেরা রোগ নিয়ে ভারতে প্রবেশ করছে তারা কি নিজেদের অজ্ঞাতসারেই পাকিস্তানের এই অঘোষিত জীবাণু যুদ্ধের হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হচ্ছে?

ভারতবর্ষের লোকসভায় অন্তত দুই-জন সদস্য এই প্রশ্ন তোলার প্রয়োজনবোধ করেছেন। যদিও স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীউমাশংকর দীক্ষিত এই সন্দেহ অমূলক বলে অভিহিত করেছেন তাহলেও কতকগুলি কারণে এই ধরনের একটা সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী কে কে দাস নয়াদিল্লীতে সংবাদিকদের যে খবর দিয়েছেন তাতে এটা প্রামাণ্যভাবে জানা গেছে যে, এই আশ্রয়প্রার্থীরা বাংলাদেশ থেকেই কলেরার সংক্রমণ নিয়ে আসছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, আশ্রয়প্রার্থীরা যে ধরনের কলেরা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে তার নাম কলেরা-বিশেষজ্ঞদের ভাষায় 'ক্লাসিক্যাল বা এশিয়াটিক', এই ধরনের কলেরা পূর্ব-বঙ্গেই প্রচলিত আর ভারতবর্ষে দেখা যায় 'এল টোর' ধরনের কলেরা।

দিল্লীর খবরের কাগজে এই মর্মে একটি চাঞ্চল্যকর খবর বেরিয়েছিল যে, এই 'এশিয়াটিক' কলেরা অত্যন্ত মারাত্মক ধরনের। এই রোগে ধরলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগী মারা যেতে পারে। আরও বলা হয়েছিল যে, 'এল টোর' কলেরার তুলনায় এই কলেরায় মৃত্যুর হার অনেক বেশী—আক্রান্তদের অর্ধেককেই মৃত্যুবরণ করতে হয়। ঐ সংবাদে আরও আশংকা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, এই কলেরা রোগ পশ্চিমবঙ্গ থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

দিল্লীতে দেশী ও বিদেশী সাংবাদিক-দের ডেকে স্বাস্থ্য বিভাগের সেক্রেটারী শ্রী কে কে দাস অবশ্য এই আশংকার নিরসন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এখন পর্যন্ত এই কলেরা রোগে মৃত্যুর হার ১৩ শতাংশের কাছাকাছি রয়েছে, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে, তিনি স্বীকার করেন যে, 'এল টোর' কলেরার তুলনায় 'এশিয়াটিক' কলেরার মারাত্মক আকার ধারণ করার সম্ভাবনা কিছু বেশী, যদিও মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার পর দুই রোগেই মৃত্যুর হার এক।

এই কলেরা রোগের আক্রমণের বিস্তারের সম্ভাবনায় যে ইতিমধ্যে বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে এই সংস্থার যুগ্ম ডিরেক্টর-জেনারেল পিয়ের ডোরোলের একটি বিবৃতিতে। তিনি বলেছেন, কলকাতা হল এশিয়ার 'বড় রাস্তার মোড়'। একবার যদি এই শহরে কলেরা ছড়ায় তাহলে সারা এশিয়ায় তার বিস্তার ঘটবে।

সন্দেহের আরও কারণ আছে। গত মাসের শেষ দিকে মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত টাঙ্গন ও পুনর্ভবা নদীতে মরা মাছের ঝাঁক দেখা যাচ্ছিল। মালদহ জেলার রতুয়া এলাকায় একটি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সে নাকি পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে যে, পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী তাকে ও অন্য কয়েকজনকে ভারতীয় এলাকার মধ্যে জলাশয়গুলিতে বিষ মেশাবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিল। নদীয়া জেলার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট এস কে গুহ মজুমদার জানিয়েছেন যে, জল দূষিত করার চেষ্টার অভিযোগে ঐ জেলায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একজনকে করিমপুরে একটি পুকুরের ধার থেকে ধরা হয়েছে। তার পকেটে কীটনাশক পদার্থ পাওয়া গেছে। অবশ্য এই কীটনাশক তাকে কেউ জলের সঙ্গে মেশাতে দেখে নি। দ্বিতীয় যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার কাছে রঙ্গীন তরল পদার্থে পূর্ণ একটি বোতল পাওয়া গেছে। আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য যখন একটি টিউবওয়েল বসান হচ্ছিল তখন সে নাকি তার মধ্যে ঐ তরল পদার্থ ফেলবার চেষ্টা করছিল। ঐ তরল পদার্থটির রাসায়নিক পরীক্ষা এখন চলছে।

আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে কলেরা রোগের এই বিস্তার পাকিস্তান কর্তৃক ভারতের বিরুদ্ধে জীবাণু আক্রমণের ফল হোক বা না হোক, জীবাণু যুদ্ধের প্রতিরক্ষার উপকরণ ইতিমধ্যে এই ব্যাপারে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করছে। আশ্রয়প্রার্থীদের কলেরার টীকা দেওয়ার জন্য যেসব 'জেট ইনজেকটর' ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলি আসলে জীবাণু যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবেই তৈরী করা হয়েছিল। এগুলির সাহায্যে সিরিঞ্জ ও ছুঁচ ছাড়াই উচ্চ চাপে চামড়ার ভিতর দিয়ে টীকার বীজ ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। সিরিঞ্জ ও ছুঁচের তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি (ঘণ্টায় হাজার খানেক লোককে) এই 'জেট ইনজেকটর' দিয়ে টীকা দেওয়া যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী ক্যাম্পগুলিতে কলেরা রোগ ছড়িয়ে পড়ার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর বৃটেন থেকে এই সব 'জেট ইনজেকটর'-এরই কয়েকটি পাঠান হয়েছে।

ঢাকায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা ('সিয়াটো') কর্তৃক পরিচালিত একটি কলেরা গবেষণা প্রতিষ্ঠান আছে। জীবাণু যুদ্ধের সঙ্গে ঐ প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়। 'সিয়াটো'র সদস্য হিসাবে

ইসলামাবাদ কি এই প্রতিষ্ঠানের কোন সাহায্য পাচ্ছে?

ইসলামাবাদের শাসকরা অবশ্য তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় কলেরা মহামারীর সংবাদকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই মহামারীর মোকাবিলা করার জন্য ভারত সরকার জেনিভায় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার দপ্তরে জরুরী সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। ভারত সরকারের এই আবেদন সম্পর্কে পাকিস্তানের বক্তব্য হল: 'স্রেফ প্রোপাগাণ্ডা'। অবশ্য পাকিস্তানের এই কথায় কোন কাজ হয় নি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক রেডক্রস, 'অকসফ্যাম' ও অন্যান্য বৃটিশ দাতব্য প্রতিষ্ঠান টীকার বীজ, স্যালাইন, ওষুধপত্র প্রভৃতি পাঠাচ্ছেন। আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন ও অস্ট্রেলিয়া পরিবহণ বিমান পাঠাচ্ছে। নয়াদিল্লীতে একজন সরকারী মুখপাত্র অবশ্য বলেছেন, এখন পর্যন্ত ভারতে যে সাহায্য এসে পৌঁছেছে তার পরিমাণ ভারতীয় মুখপাত্রের মতে 'খুবই সামান্য।' গত বছর পূর্ববঙ্গে যখন ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক বান হয়েছিল তখন তিন সপ্তাহের মধ্যে বিদেশ থেকে ৮ কোটি ডলার মূল্যের সাহায্য পাঠান হয়েছিল, আর এবার এখন পর্যন্ত শরণার্থীদের ত্রাণের জন্য সব মিলিয়ে 'প্রতিশ্রুতি' পাওয়া গেছে ২ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার পরিমাণ।

ইতিমধ্যে 'নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকার ভাষায় মানুষের 'মৃতদেহ রোদে পচছে।' সরকারী হিসাবে, ৯ জুন অপরাহ্ন পর্যন্ত ২৪০৫জন শরণার্থী কলেরায় মারা গেছেন এবং ১৮১৩৫জন আক্রান্ত হয়েছেন। এটা শুধু যেসব শরণার্থী ক্যাম্পে আছেন তাঁদের হিসাব। ক্যাম্পের বাইরে যাঁরা আছেন, তাঁদের হিসাব কোথাও নেই। বেসরকারী হিসাবে কলেরায় যাঁরা মারা গেছেন তাঁদের সংখ্যা পাঁচ হাজারের কম হবে না।

বাংলা দেশ সমস্যার গুরুত্ব বুঝিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রকে এবিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনে রাজী করাবার জন্য ভারতের কয়েকজন প্রতিনিধি যখন দেশের বাইরে ঘুরছেন তখন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে মেঘালয় ও আসামে ছুটে যেতে হয়েছে আশ্রয়প্রার্থী সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য এসব অঞ্চলের জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করতে। বেসরকারীভাবে সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড সফর করে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং রুশ, জার্মাণ ও বৃটিশ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমেরিকায় পেঁৗছেছেন। শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী করণ সিং গেছেন চেকোশ্লোভাকিয়ায়। পুনর্বাসন মন্ত্রী আর কে খাদিলকর জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিদের বিবেক জাগাবার চেষ্টা করছেন। এইসব চেষ্টার একমাত্র বাস্তব ফল এখন পর্যন্ত: স্বরণ সিংয়ের মস্কো সফরের শেষে একটি ভারত-সোভিয়েট যুক্ত বিবৃতি প্রচার করে পাকিস্তানকে বলা হয়েছে, 'পূর্ব পাকিস্তান' থেকে আশ্রয়প্রার্থীদের আগমন বন্ধ করার জন্য তারা যেন অবিলম্বে সেখানে ব্যবস্থা অবলম্বন করে এবং আশ্রয়প্রার্থীরা যাতে শান্তিতে ও নিরাপদে তাদের নিজের নিজের ঘরে ফিরে যেতে পারে তার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

বাংলা দেশ থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ পাকিস্থানকে সৃষ্টি করতে হবে, ভারতের এই বক্তব্য সোভিয়েট রাশিয়ার দ্বারা সমর্থিত হল এবং এই ব্যাপারে রাশিয়া হয়ত পাকিস্থানকে চাপ দেবে, মাত্র এইটুকু ফল আপাতত দেখা যাচ্ছে।

এদিকে ভারতবর্ষের কয়েকটি রাজ্যের সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে বাংলাদেশের আশ্রয় প্রার্থীদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব দেখা যেতে আরম্ভ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় এসে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলে এই রাজ্য থেকে আশ্রয়প্রার্থীদের একাংশকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, তারপর থেকেই বিভিন্ন রাজ্য এই আশ্রয়প্রার্থীদের অবাঞ্ছিত অতিথি হিসাবে দেখতে লাগল।

এই বিরূপতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ পাওয়া গেল ওড়িশায়। আগে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে ময়ূরভঞ্জ জেলার দুটি ক্যাম্পে ওড়িশা সরকার ১১ হাজার আশ্রয়প্রার্থী পরিবারকে স্থান দিতে সম্মত হয়েছেন। কিন্তু কলকাতায় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে রাজ্যে একদল লোক বলতে শুরু করলেন, বাংলাদেশ সরকারকে ভারত সরকার যতক্ষণ স্বীকৃতি না দিচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁরা এতগুলি 'বিদেশী'কে রাজ্যের মধ্যে জায়গা দিতে
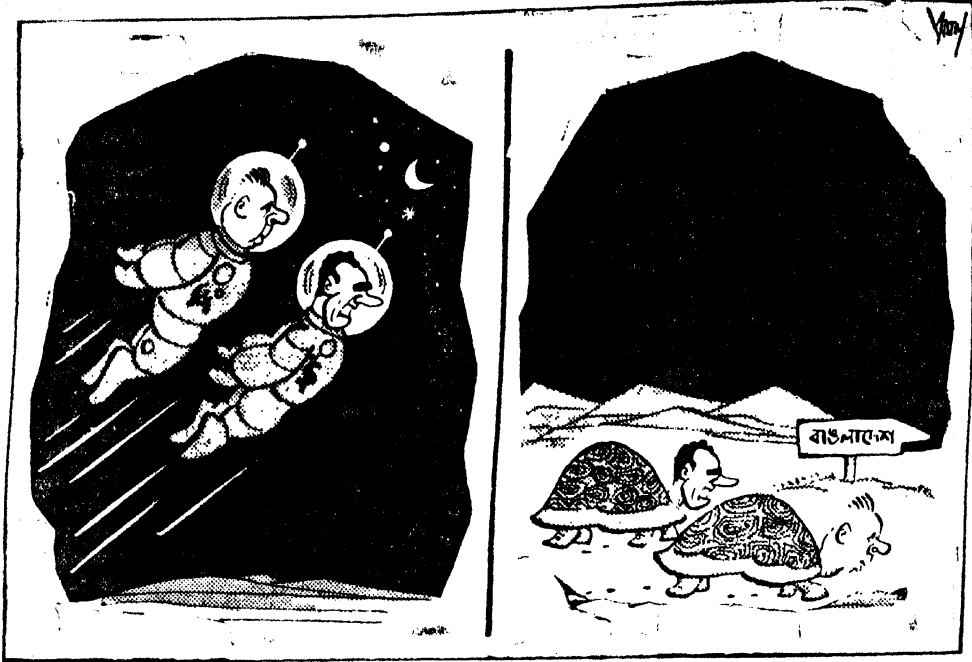
পারবেন না। এরপর ওড়িশার কোয়ালিশন সরকারের শরিক দলগুলির নেতারা এক বৈঠকে মিলিত হয়ে সাফ কথায় বলে দিলেন ওড়িশা একজনও শরণার্থীকে জায়গা দেবে না। কারণ—(১) ওড়িশায় জায়গা দেওয়ার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী, পুনর্বাসনমন্ত্রী অথবা পুনর্বাসন দপ্তরের সেক্রেটারি কেউই রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করেন নি। পুনর্বাসন দপ্তরের একজন অফিসার কিছুদিন আগে যখন ভুবনেশ্বরে এসেছিলেন তখন ওড়িশা সরকার তাঁকে মৌখিক আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ঐ রাজ্যে ১১ হাজার পরিবারকে রাখা যেতে পারে। কি সর্তে তাদের স্থান দেওয়া হবে, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার, কার দায়িত্ব কতটুকু থাকবে সেসব বিষয় পরিষ্কার না করেই কেন্দ্রীয় সরকার ওড়িশায় শরণার্থীদের পাঠাবার কথা ঘোষণা করে দিলেন, এতে ওড়িশা সরকারের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখান হল। (২) ময়ূরভঞ্জ জেলা আদিবাসী-প্রধান। যেখানে আশ্রয়প্রার্থীদের পাঠাবার প্রস্তাব হয়েছে সেই অঞ্চল থেকে নির্বাচিত ঝাড়খণ্ড দলভুক্ত এম-এল-এ পরামর্শ দিয়েছেন যে, সেখানে আশ্রয়প্রার্থীদের স্থান দিলে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে গোলযোগ বাধতে পারে। (৩) ঐ অঞ্চলে এমনিতেই নকশাল-পন্থীদের উৎপাত রয়েছে। তার উপর আইন ও শৃঙ্খলার সমস্যা বাড়ান ঠিক হবে না। (৪) এই খরাপীড়িত অঞ্চলে এতগুলি লোককে আনলে আনাজপত্রের দাম বেড়ে যাবে।

আসামের একজন এম-পি লোকসভায় বলেছেন যে, আশ্রয়প্রার্থীরা আসাম ও মেঘালয়ে জোর করে জমি দখল করছে এবং গ্রামে গ্রামে তারা "মড়কের মতো" ছড়িয়ে পড়ছে। সদস্যদের আপত্তিতে যদিও ঐ এম-পি 'মড়কের মতো' কথাগুলি বাদ দিতে বাধ্য হয়েছেন তাহলেও তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

মেঘালয়ের খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড় জেলায় আশ্রয়প্রার্থী আগমনের প্রতিবাদে ঐ জেলায়ও হরতাল পালন করা হয়েছে। কিছু খাসি তরুণ এই আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করছেন বলে খবর আছে। কারও বাড়ীতে আশ্রয়প্রার্থী আছেন কিনা খুঁজে বের করার জন্য তরুণেরা বাড়ী বাড়ী তল্লাসী করছে। এমনকি মড়া পোড়াবার জন্যও নাকি আশ্রয়প্রার্থীদের লাকড়ি সংগ্রহ করতে দেওয়া হচ্ছে না। স্থানীয় লোকদের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে কিছুসংখ্যক আশ্রয়প্রার্থী ইতিমধ্যে পূর্ববঙ্গে ফিরে যাচ্ছে বলে প্রকাশ।

জনসঙ্ঘের নেতা বলরাজ মাধোক বলেছেন যে, আশ্রয়প্রার্থীদের সরিয়ে আনলে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ভাল হবে না।

এই অবস্থার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী দু-দিনের সফরে আসাম ও মেঘালয়ে গেছেন। তাঁর মন্ত্রীরা যখন বিদেশী রাষ্ট্রপতিদের কানে জল ঢোকাবার চেষ্টা করছেন তখন প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর নিজের দেশবাসীদের একাংশকেই বোঝাবার দায়িত্ব নিতে হচ্ছে।

•

সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক জর্জ ফার্ণাণ্ডেজের ঘোষণার পর প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি ও সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির সংযুক্তি যতটা আসন্ন মনে হচ্ছিল এখন আর ততটা মনে হচ্ছে না। ৪ জুন তারিখে ফার্ণাণ্ডেজ ঘোষণা করলেন যে, দুই পার্টি এক হয়ে "সোস্যালিস্ট পার্টি" গঠনের সিদ্ধান্ত করেছে। তিনি বললেন 'আমরা ভাষা, বর্ণ ও মূল-সংক্রান্ত নীতির ব্যাপারে একমত হতে পেরেছি।' এখন শুধু চুক্তিতে স্বাক্ষর দেওয়াই বাকী। ফার্ণাণ্ডেজের কথায় অন্তত তাই মনে হয়েছিল।

কিন্তু ফার্ণাণ্ডেজের এই বিবৃতির দুদিন পরেই বাগড়া তুললেন এস-এস-পির সভাপতি কর্পূরী ঠাকুর।

তিনি বললেন যে, সংযুক্তির আগে পি-এস-পিকে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলের যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। পরের দিন আর এক এস-এস-পি নেতা রাজনারায়ণ আরও স্পষ্ট করে বললেন, পি-এস-পি কংগ্রেস বিরোধিতার লক্ষণ মেনে না নিলে এবং যে কোন ভাবেই ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভাকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্য মেনে না নিলে সংযুক্ত হতে পারে না। শুধু তাই নয়, রাজনারায়ণ আরও বললেন যে, এস-এস-পির হয়ে যাঁরা পি এস-পি'র নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন তাঁরা অনধিকার চর্চা করেছেন।

মনে হচ্ছে, এস-এস-পির ভিতরে রাজনারায়ণ, কর্পূরী ঠাকুর প্রভৃতির অনুগামীরা সহজে এই সংযুক্তি হতে দেবেন না। ইতিমধ্যে জর্জ ফার্ণাণ্ডেজের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে উত্তর প্রদেশে রাজনারায়ণের অনুগামীরা একটি সম্মেলনে মিলিত হচ্ছেন।

১১-৬-৭১ —পুণ্ডরীক

মুখোশ ।।

সুশীলকুমার গুপ্ত

সবাই মুখোশ পরা, কেউ আমরা কাউকে চিনি না।
যেদিকে তাকাই শুধু মুখোশের সারি
চোখে পড়ে।
কারখানা কলে
তৈরী হয় ছোট বড় নকশা-কাটা অজস্র মুখোশ।
অফিস রেস্তোরাঁ পার্কে সবাই মশগুল
মুখোশের সুস্বাদু চর্চায়।
কিন্তু কেউ ভেবেও দেখে না
কি ভাবে আমরা
এত কাছে থেকে তবু ক্রমাগত দূরে
সরে যাচ্ছি।
মুখোশের নীচে
কেবলই ঢাকার চেষ্টা চলে
তীক্ষ্ণ দাঁত, হিংস্র চোখ, ক্রূর বক্র কপালের রেখা;
সেই সঙ্গে পড়ে যায় চাপা
যেখানে যেটুকু বেঁচে আছে
সরল অমল স্নিগ্ধ মুখের আকাশ।

কিন্তু চারিধারে
আশ্চর্য উদার মুক্ত প্রকৃতির মুখ
অনুরাগে আনত উজ্জ্বল;
মেঘে রোদে তৃণে গুল্মে মাঠে বনে পাহাড়ে সাগরে
তার কণ্ঠে রাত্রিদিন বাজে :
'সমস্ত মুখোশ ছিঁড়ে অবারিত প্রেমে পরস্পর
এস কাছে, আরও, আরও কাছে।
তা না হ'লে এই সভ্যতার
ভয়ংকর অন্তিম অঙ্কের
বিশেষ বিলম্ব নেই আর।'

আছো মর্মলেখ জুড়ে ।।

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

আছো মর্মলেখ জুড়ে, যেমন আদলহারা গ্রীবা
নুয়ে পড়ে, বাতাসেও কথোপকথন থাকে স্ফুট;
নয়তো তেমনই এক স্নিগ্ধ দেশকাল
রয়ে যায় কুসুমসঙ্কাশ,
হতে পারে, যে-রকম হয়েছিলো আগে—
সকলের হাতে হাত নিরুপম নৌকাবিলাস।

আজো স্মৃতি; তবু সেই স্মৃতির পিছনে এক তাল
স্থবির পিণ্ড কি, নাকি চন্দ্রসূর্য জাগে সুমহান;
স্বপ্নে কিছু কথা ছিলো, ব্যাকাহারা স্বপ্নেরই অনাথ
দ্যাখে তার ঘরবাড়ি—কতো না জানালা—রাঙা টালি
স্বপ্ন নয়—এ-রকম সত্যও অদ্ভুত,
তেইশ বছর জুড়ে ছিলো তাই
দীর্ঘ চোরাবালি!

—

আজ ঠিক পড়ে ধরা, বুকের ভিতর কবে ছিলে পদ্মদুয়ারী,
ঐ না মুখশ্রী তার ভাসে?
ভেসেছিলো বহুকাল আগে—
এমনই সজল শ্যাম নীরব চাহনি দিয়ে ছাওয়া!
আজকের তূর্যনিনাদে—
ফিরে ফিরে তারই হাত ধরি আজ বারুদ-বাতাসে।

অবশেষে

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শিবপুরের স্টীমারঘাট। রেলিঙে ঠেসান দিয়ে মুখোমুখি হয়ে পাঁচজনে আছে দাঁড়িয়ে—ঘোঁৎনা, ত্রিলোচন, রাজেন, গোরাচাঁদ, কে-গুপ্ত। গণশার জন্য অপেক্ষা করছে। ত্রিলোচনের মেয়ের অন্নপ্রাশন। ঠিক হয়েছে, যে যা দেবে দিক, কিন্তু পছন্দটা থাকবে গণশার হাতে, যাতে অন্তত পোশাকের দিকটায় রঙে-স্টাইলে একটা সামঞ্জস্য থাকে। গণশার ছেলের অন্নপ্রাশনে রুচি নিয়ে নাকি পুঁটুরাণী একটু নাক সিঁটকেছিল, বিশেষ করে কে-গুপ্তর দেওয়া জাঙিয়াটায়। মেটে রঙের, আর, একটু আঁট-আঁট। একটু নাকি হেসেই বলেছিল—'দিব্যি ছাপরেয়ে-ছাপরেয়েটি হয়েছে।'

এবার সবাই তটস্থ হয়ে আছে। পুঁটুরাণী আবার সেদিন ঘটা করে ত্রিলোচনের শ্বশুরের সঙ্গে 'গঙ্গাজল' পাতাল, সবাই জমজমাট খেয়ে এল।

গণশা একটা বিড়ি হাতে করে নেমে এল। মুখটা একটু গম্ভীর, কে আগে ঢুকবে যেন ঠিক করতে না পেরে চুপ করে

> পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটতে-ঘাঁটতে হঠাৎ এই বিস্মৃত কাহিনীটুকু হাতে ঠেকল, কেন যে যথাসময়ে আত্মপ্রকাশ করে নি, আজ মনে নেই। আজ সেই সোনার শিবপুর নেই, বুঝছি। তবু ভাবলাম গণশা-ঘোঁৎনাদের লীলা-কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকে কেন? তাই অসময় হলেও।

গণশা তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে বিড়িটার একটা টান দিয়ে পেছন দিকে ফেলে আছে, ঘোঁৎনা বলল—'দেরী করলি কেন? তক্তাঘাটের স্টীমারটা ছেড়ে দিতে হোল।'

দিল, হাত দুটো বুকের ওপর জড়ো করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল—'দ-দ্দরকার নেই পারে গিয়ে।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেছে মুখটা, বললও কারুর দিকে না চেয়ে। ত্রিলোচন প্রশ্ন করল—'তা হোলটা কি বলবি তো?'

'কিছু কে-ক্কেনাটেনা হবে না। পুঁটু-চাবি আটকে রেখেছে।'

গোরাচাঁদ বলল—'তোর এবার একটু কড়া হওয়া দরকার; ক' বছর তো হয়ে গেল।'

গণশা একটু আড়চোখে চাইল, বলল—'মা-ম্মামা-মামিকে বলগে যানা, পারিস তো. আদরে-আদরে মা-ম্মাথায় তুলে রেখেছে।'

আবার একটু চুপচাপ, এবার যেন সমস্যাটার গুরুত্বেই। ঘোঁৎনার দৃষ্টিটা কে-গুপ্তর ওপর গিয়ে পড়ল। সে মুখটা একটু নামিয়ে নিয়ে আবার তার দিকে চেয়ে তুলতেই বলল—'আপনার সেই পালোয়ানি জাঙিয়া কাল করেছে মশাই। ত্রিকে বলছিল সেদিন পরাতে গিয়ে নাকি ফেঁসেও গেছে...'

'ছেলেটা এদিকে একটু বেশ যেন...'

ভয়ে-কুণ্ঠায় আরম্ভ করেছে কে-গুপ্ত, ঘোঁৎনা থাবা দিয়ে থামিয়ে দিল—'আর

খুঁড়তে হবে না মশাই। আঁট জাঙিয়ার খাতিরে কারুর ছেলেপুলে খেয়াল-খুশিমত বাড়তে পাবে না! যত্তো সব!...'

'একে তো অমন একটা খ্যাট ম্যাটি হতে বসেছে মাঝখান থেকে।' — গোরাচাঁদ কথাটা বলে মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

গণশা সেই রকম নির্লিপ্তভাবেই দাঁড়িয়ে আছে সামনের দিকে চেয়ে, দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে ঘোৎনার মুখের ওপর ফেলে বলল—'তোরা থামবি, না, নিজের-নিজের গ-গবেষণা চালাতে থাকবি?'

'থামলাম।'—ঘোৎনাও একটু কড়া চোখেই উত্তর দিল। বলল—'কিন্তু ব্যাপারটা কি বলবি তো খুলে, না, শুধু ন্যাজে খেলাতে থাকবি? চাবি আটকাবার মতলবটা কি পুঁটুরাণীর?'

'ঐ রাজুকে সুদো। ভা-ভ্‌ভালো মানুষের মতন আকাশের চি-চ্চিল গুনছে!'

কবি রাজেন কল্পলোকেই থাকে বেশীক্ষণ, একটু যেন চমকেই ঘুরে চেয়ে বলল—'বাঃ, আমি কি করলাম। আমায় মিছিমিছি টানা কেন এর মধ্যে?'

'মি-ম্মিছিমিছি টানা? কেন, কে-গুপ্ত সেই বউ নিয়ে ঘর করছে না? কত কাট-খড় পুড়িয়ে জোগাড় করা, বাবুর ফিনফিনে আহাম্মির ক-ক্কবিতার সঙ্গে মিলল না, ব্যস, নাকচ! ট-ট্টনসিল কাটিয়ে বেচারীর একটু চর্বি-মাংস হবে না! আবার বলে...'

'সে তো ডাক্তার রজার্সের স্লিমিং প্রসেসে এখন এত ছিপছিপে হয়ে গেছে যে ছাপরার জলেও শরীরে আর ফ্যাট ধরাতে পারছে না। এখন আবার...'

কে-গুপ্ত উল্টোদিকে ত্রিলোচনকে দেখে থেমে গেল। সে স্থিরভাবে শুনতে শুনতে হাত জোড় করে বলল—'একবার নয়, এই নিয়ে পঞ্চাশবার শোনা হোল মশাই!'

গণশা একটু আড়ে চেয়ে নিয়ে নিজের কথা ধরেই বলে চলল—'আবার বলে আমি কি করেছি! উঠতে-বসতে আজকাল ঐ কথা পুঁটুর মুখে—নি-ন্নিজেদের একটা-একটা করে হয়ে গেল, নিশ্চিন্দি। একটা মানুষ যে ওদিকে ছু-ছু-চ্ছুঁড়ার ডাঁই জড়ো করে হা-হুতোশ করে বেড়াচ্ছে—আর কারুর মাথাব্যথা নেই! আত্মসারের দল! কি-ক্কিছু দিতে হবে না তোমাদের—পরবে না তোমাদের দেওয়া কিছু 'গঙ্গাজল'-এর ছেলে!...হ্যাঁ, অমন ক্ষ্যাঁ-ই দেখছিস কি ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে? সব্বাইকে মজিয়েছিস। আবার বি-বিরহের পদ্য লিখে শোনাস। লজ্জা করে না! পে-প্পেলি কোথায় যে বি-বি—বিদ...'

খুব চটেছে, পদে-পদে আটকে যাচ্ছে কথা; ঘোৎনা নরম কণ্ঠেই একটু জোর দিয়ে বলল—'তা থাম, চটলেই চলবে? একবার গাঁথল না বলে যে গাঁথবেই না এমন তো কথা নয়। করবে না, একথা তো বলছে না। বিয়ের ফুল ফোটে নি বেচারির...'

—দুজনকেই ঠাণ্ডা করার ভঙ্গিতে।

ত্রিলোচন সিগারেটের বাক্সটা বের করে একটা গণশাকে দিয়ে বলল—'নে, ধরা।' একটা নিজে ধরিয়ে কাঠিটা ফেলে দিয়ে বলল—'পুঁটুরাণী চটেছে বলেই যে দেওয়া-থোওয়া বন্ধ করতে হবে এমন কি কথা আছে? সে আমি বউকে বলে মানিয়ে নোব'খন। গণশার বাকসর চাবি আটকেছে, আমাদের তো রয়েছে পয়সা। তবে, হ্যাঁ, আবার একটু উঠে-পড়ে লাগতে হবে আমাদের,, রাজু তো গররাজি নয়...'

'আর বেকালে এখনও পদ্য লিখে যাচ্ছেন—তখন—তখন—বুঝতে হবে...'

—কে-গুপ্ত শুরু করেছিল, ঘোৎনা একটু কড়া চোখেই চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল—'হ্যাঁ, বলুন, তখন কি বুঝতে হবে সবাইকে।'

কে-গুপ্ত একটু থতমত খেয়ে গিয়ে বলল—'তখন বুঝতে হবে—মানে, বুঝতে

'হ্যাঁ, বলুন।'—স্থির দৃষ্টিতেই চেয়ে রইল ঘোৎনা। কে-গুপ্ত বোধহয় উপযুক্ত ভাষার অভাবেই বলে ফেলল—'তখন বুঝতে হবে—মানে, বুঝতে হবে, রস মরে নি এখনও।'

কার দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ হোল।

অত লক্ষ্য করে নি কেউ, লোক উঠে আসতে দেখল বোটানিক্যাল গার্ডেনের লাণ্ট ট্রিপটা এসে জেটিতে লেগেছে; সবাই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে গেল।

অবশেষে

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শিবপুরের স্টীমারঘাট। রেলিঙে ঠেসান দিয়ে মুখোমুখি হয়ে পাঁচজনে আছে দাঁড়িয়ে—ঘোঁৎনা, ত্রিলোচন, রাজেন, গোরাচাঁদ, কে-গুপ্ত। গণশার জন্য অপেক্ষা করছে। ত্রিলোচনের মেয়ের অন্নপ্রাশন। ঠিক হয়েছে, যে যা দেবে দিক, কিন্তু পছন্দটা থাকবে গণশার হাতে, যাতে অন্তত পোশাকের দিকটায় রঙে-স্টাইলে একটা সামঞ্জস্য থাকে। গণশার ছেলের অন্নপ্রাশনে রুচি নিয়ে নাকি পুঁটুরাণী একটু নাক সিঁটকোচ্ছিল, বিশেষ করে কে-গুপ্তর দেওয়া জাঙিয়াটায়। মেটে রঙের, আর, একটু আঁট-আঁট। একটু নাকি হেসেই বলেছিল—'দিব্যি ছাপরেয়ে-ছাপরেয়েটি হয়েছে।'

এবার সবাই তটস্থ হয়ে আছে। পুঁটুরাণী আবার সেদিন ঘটা করে ত্রিলোচনের অডরের সঙ্গে 'গঙ্গাজল' পাতাল, সবাই জলযোগ খেয়ে এল।

গণশা একটা বিড়ি হাতে করে নেমে এল। মুখটা একটু গম্ভীর, কে আগে ঢুকবে যেন ঠিক করতে না পেরে চুপ করে

> পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটতে-ঘাঁটতে হঠাৎ এই বিস্মৃত কাহিনীটুকু হাতে ঠেকল, কেন যে যথাসময়ে আত্মপ্রকাশ করে নি, আজ মনে নেই। আজ সেই সোনার শিবপুর নেই, বুঝছি। তবু ভাবলাম গণশা-ঘোঁৎনাদের লীলা-কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকে কেন? তাই অসময় হলেও।

গণশা তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে বিড়ি-টায় একটা টান দিয়ে পেছন দিকে ফেলে আছে, ঘোঁৎনা বলল—'দেরী করলি কেন? তক্তাঘাটের স্টীমারটা ছেড়ে দিতে হোল।'

দিল, হাত দুটো বুকের ওপর জড়ো করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল—'দ-দদরকার নেই পারে গিয়ে।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেছে মুখটা, বললও কারুর দিকে না চেয়ে। ত্রিলোচন প্রশ্ন করল—'তা হোলটা কি বলবি তো?'

'কিছু কে-কেনাটেনা হবে না। পুঁটু-চাঁব আটকে রেখেছে।'

গোরাচাঁদ বলল—'তোর এবার একটু কড়া হওয়া দরকার; ক' বছর তো হয়ে গেল।'

গণশা একটু আড়চোখে চাইল, বলল—'মা-স্মামা-মামিকে বলগে যানা, পারিস তো, আদরে-আদরে মা-স্মাথায় তুলে রেখেছে।'

আবার একটু চুপচাপ, এবার যেন সমস্যাটার গুরুত্বেই। ঘোঁৎনার দৃষ্টিটা কে-গুপ্তর ওপর গিয়ে পড়ল। সে মুখটা একটু নামিয়ে নিয়ে আবার তার দিকে চেয়ে তুলতেই বলল—'আপনার সেই পালোয়ানি জাঙিয়া কাল করেছে মশাই। ঝিকে বলছিল সেদিন পরাতে গিয়ে নাকি ফেঁসেও গেছে...'

'ছেলেটা এদিকে একটু বেশ যেন...'

ভয়ে-কুণ্ঠায় আরম্ভ করেছে কে-গুপ্ত, ঘোঁৎনা থাবা দিয়ে থামিয়ে দিল—'আর

খুঁড়তে হবে না মশাই। আট্ জাণ্ডিয়ার খাতিরে কারুর ছেলেপুলে খেয়াল-খুশিমত বাড়তে পাবে না! যত্তো সব!...'

'একে তো অমন একটা খ্যাঁট মাটি হতে বসেছে মাঝখান থেকে।' — গোরাচাঁদ কথাটা বলে মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

গণশা সেই রকম নির্লিপ্তভাবেই দাঁড়িয়ে আছে সামনের দিকে চেয়ে, দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে ঘোংনার মুখের ওপর ফেলে বলল—'তোরা থামবি, না, নিজের-নিজের গ-গবেষণা চালাতে থাকবি?'

'থামলাম।'—ঘোংনাও একটু কড়া চোখেই উত্তর দিল। বলল—'কিন্তু ব্যাপারটা কি বলবি তো খুলে, না, শুধু ল্যাজে খেলাতে থাকবি? চাবি আটকাবার মতলবটা কি পুঁটুরাণীর?'

'ঐ রাজুকে সুদো। ভা-ভ্‌ভালো মানুষের মতন আকাশের চি-চ্চিল গুনছে!'

কবি রাজেন কল্পলোকেই থাকে বেশীক্ষণ, একটু যেন চমকেই ঘুরে চেয়ে বলল—'বাঃ. আমি কি করলাম!. আমায় মিছিমিছি টানা কেন এর মধ্যে?'

'মি-ম্মিছিমিছি টানা? কেন, কে-গুপ্ত সেই বউ নিয়ে ঘর করছে না? কত কাট-খড় পুড়িয়ে জোগাড় করা, বাবুর ফিনফিনে আহাম্মরি ক-ক্কবিতার সঙ্গে মিলল না, ব্যস. নাকচ! ট-ট্টনসিল কাটিয়ে বেচারীর একটু চর্বি-মাংস হবে না! আবার বলে...'

'সে তো ডাক্তার রজার্সের স্লিমিং প্রসেসে এখন এত ছিপছিপে হয়ে গেছে যে ছাপরার জলেও শরীরে আর ফ্যাট ধরাতে পারছে না। এখন আবার...'

কে-গুপ্ত উল্টোদিকে ত্রিলোচনকে দেখে থেমে গেল। সে স্থিরভাবে শুনতে শুনতে হাত জোড় করে বলল—'একবার নয়. এই নিয়ে পঞ্চাশবার শোনা হোল মশাই!'

গণশা একটু আড়ে চেয়ে নিয়ে নিজের কথা ধরেই বলে চলল—'আবার বলে আমি কি করেছি! উঠতে-বসতে আজকাল ঐ কথা পুঁটুর মুখে—নি-ন্নিজেদের একটা-একটা করে হয়ে গেল. নিশ্চিন্দি। একটা মানুষ যে ওদিকে ছু-ছু-চ্ছুড়ার ডাঁই জড়ো করে হা-হুতোশ করে বেড়াচ্ছে—আর কারুর মাথাব্যথা নেই! আত্মসারের দল! কি-ক্কিছু দিতে হবে না তোমাদের—পরবে না তোমাদের দেওয়া কিছু 'গঙ্গাজল'-এর ছেলে!...হ্যাঁ. কেই-ই. দেখছিস কি ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে? সব্বাইকে মজিয়েছিস। আবার বি-বিরহের পদ্য লিখে শোনাস। লজ্জা করে না! পে-প্পেটি কোথায় যে বি-বি—বিদ...'

খুব চটেছে. পদে-পদে আটকে যাচ্ছে কথা; ঘোংনা নরম কণ্ঠেই একটু জোর দিয়ে বলল—'তা থাম. চটলেই চলবে? একবার গাঁথল না বলে যে গাঁথবেই না এমন তো কথা নয়। করবে না. একথা তো বলছে না। বিয়ের ফুল ফোটে নি বেচারির...'

—দুজনকেই ঠাণ্ডা করার ভঙ্গিতে।

ত্রিলোচন সিগারেটের বাক্সটা বের করে একটা গণশাকে দিয়ে বলল—'নে. ধরা।' একটা নিজে ধরিয়ে কাঠিটা ফেলে দিয়ে বলল—'পুঁটুরাণী চটেছে বলেই যে দেওয়া-থোওয়া বন্ধ করতে হবে এমন কি কথা আছে? সে আমি বউকে বলে মানিয়ে নোব'খন। গণশার বাকসর চাবি আটকেছে, আমাদের তো রয়েছে পয়সা। তবে, হ্যাঁ, আবার একটু উঠে-পড়ে লাগতে হবে আমাদের,, রাজু তো গররাজি নয়...'

'আর যেকালে এখনও পদ্য লিখে যাচ্ছেন—তখন—তখন—বুঝতে হবে...'

—কে-গুপ্ত শুরু করেছিল, ঘোংনা একটু কড়া চোখেই চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল—'হ্যাঁ, বলুন, তখন কি বুঝতে হবে সবাইকে।'

কে-গুপ্ত একটু থতমত খেয়ে গিয়ে বলল—'তখন বুঝতে হবে—মানে, বুঝতে 'হ্যাঁ, বলুন।'—স্থির দৃষ্টিতেই চেয়ে রইল ঘোংনা। কে-গুপ্ত বোধহয় উপযুক্ত ভাবার অভাবেই বলে ফেলল—'তখন বুঝতে হবে—মানে, বুঝতে হবে, রস মরে নি এখনও।'

কার দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ হোল।

অত লক্ষ্য করে নি কেউ, লোক উঠে আসতে দেখল বোটানিক্যাল গার্ডেনের লাস্ট ট্রিপটা এসে জেটিতে লেগেছে; সবাই ভিড়ের মধ্যে গিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে গেল।

(২)

দিন চারক পরের কথা।

অন্নপ্রাশন বেশ ভালোভাবেই হয়ে গেছে। গোরাচাঁদের পেটটা বিগড়েছিল ক'দিন থেকে, ত্রিলোচন আর গণশা খবর নিতে গেছে, ঐদিকেই বাড়ি দুজনের। রাজেন, ঘোঁৎনা আর কে-গুপ্ত ধর্মতলার পশ্চিমে 'সাঁঝের-আটচালা'র পোতাটায় অপেক্ষা করছে। রাজেনের হাতে তার কবিতার মোটা খাতাটা। একটা পদ্য কে-গুপ্তকে শোনাতে আরম্ভ করেছিল—ওরাই দুজনে আগে এসেছে—ঘোঁৎনা এসে পড়ায় খাতাটা মুড়ে, পদ্যর পাতাটায় আঙুল গুঁজে বসে আছে। কারুর মুখে কথা নেই।

গণশা আর ত্রিলোচন পা টানতে-টানতে এসে উপস্থিত হোল। ঘোঁৎনা প্রশ্ন করল—'কেমন দেখলি?'

গণশাকেই। সে উত্তর না দিতে ত্রিলোচন—'সামলেছে খানিকটা।' — বলে শুরু করেছে, গণশা ঘুরে হাত চালিয়ে বলল—'ও যাবে, এই লিখিয়ে যে আমার কাছে। কে-কেউ আটকাতে পারবে না। সামলেছিল একটু, এখন জিদ ধরেছে যদু ঘটকের মায়ের শ্রাদ্ধে খেতে যাবে। শুনেছে ব-বর্ধমান থেকে কারিগর আসছে সীতা-ভোগ-মিহিদানা করবার জন্যে।'

গোরাচাঁদের ভবিষ্যতের চিন্তায় আবার খানিকটা নীরবে কাটল। তারপর গণশাই একটু গা-ঝাড়া দিয়ে বলল—'যাক, যে যাবে বলে প-প্পণ করেছে তার কথা ভাবা স্রেফ সময় নষ্ট। রাজেনের পাত্রী নিয়ে তি-ত্রিলু কি মতলব বের করেছে শোন্।...বল ত্রিলে।'

শোনবার প্রস্তুতিতে পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরাল।

ত্রিলোচন বেশ একটু গুছিয়েই আরম্ভ করল—'ভেবে দেখলাম আমাদের ন্যায়রত্ন-মশাই যে বলেন, ন চ দৈবাৎ পরং বলম—তা কথাটা খুব খাঁটি। সব রকম করে তো দেখা গেল—একটু হব-হব হোলও তো (কে-গুপ্তর দিকে কটাক্ষ হেনে) কার জিনিস কে ভোগ করছে। কিছু একটা দোষ হয়েছে বলেই তো। তাহলে অত আকুলি-বিকুলি না করে ঠাকুর-দেবতাকেই নামিয়ে আনলে কেমন হয়? ভাবছি, কিছু আসছে না মাথায়, তারপর কাল জ্যাঠাইমা এসে মাথার আলাই-চণ্ডীর ফুল ঠেকাতে ধাঁ করে খুলে গেল মাথটা।—এই তো হয়েছে!'

'বিয়ের ফুল?' — আগ্রহ চাপতে না পেরে কে-গুপ্ত প্রশ্ন করে উঠল।

ত্রিলোচন বলা ছেড়ে দিয়ে ওর মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে প্রশ্ন করল—"আমার মাথায় আবার কবে বিয়ের ফুল ঠেকিয়ে কী উপকারটা করবেন জ্যাঠাইমা একবার ভেবে দেখেছেন?'

আর একটু চেয়ে রইল। ঘোঁৎনা বলল—'তুই বলে যা, ও ঐ রকম তুলবেই সওয়াল মাঝে-মাঝে!'

ত্রিলোচন আর একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আরম্ভ করল—'ফুলটার একটা ইতিহাস আছে, তাইতেই আইডিয়াটুকু আমার মাথায় এল। বাকসাড়ার একটা জঙ্গুলে পোড়ো বাড়ির উঠোনে—কাঁচা, নরম উঠোনে, মনে রাখতে হবে—কিছুদিন হোল একটি নাকি কালোপাথরের মূর্তি মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। উঠেছে তো উঠেছে, এমন কত উঠেছে, কে তার খবর রাখে?—তারপর একদিন সকালবেলায় এক কাণ্ড! —একটি আধ-বুড়ি মেয়ে, কাঁচাপাকা চুলে রগরগে সিঁদুর, ভিজে কস্তাপেড়ে গরদের শাড়ি, দুলতে দুলতে, মাথা চালতে চালতে এসে উপস্থিত—বনবাদাড়, কাঁটাবিছুটি হুঁস নেই—মুখে—'মা তুই চিরদিন স্বপ্ন দিয়ে ফাঁকি দিলি, আজ দিলে আর ঘরে ফিরব না।' আসছে নাকি সেই ঘুসুড়ি থেকে, গঙ্গায় চান করে—মনে রাখতে হবে, কোথায় বাকসাড়া আর কোথায় সেই সালকে পেরিয়ে ঘুসুড়ি! সঙ্গে একটি বেশ বড় দলের সঙ্গে এক হাবাকান্ত গোছের বুড়ো, তার বর। বেশ বড় ভিড়—জোয়ারের মুখের কুটোকাটির মতন কেবল জড়োই হয়ে গেছে তো—ভাঙা দোরজানলা টপকে কিলবিল করে সব ভেতরে এসে পড়ছে, খুঁজতেও শুরু করেছে—বুড়ি, যেন তার নখদর্পণে, লাফিয়ে গিয়ে একটা ভাঙা তুলসীতলায় কামিনী ঝাড়ের নীচে ঝাঁপিয়ে প'ড়েই—'এই তো মা এসে গেছিস!' ব'লেই একেবারে অচৈতন্য।"

"দেবী মূর্তি?" ঘোঁৎনা প্রশ্ন করল।

ত্রিলোচন বলল—"তা কেউ বলতে পারছে না ঠিক ক'রে, তবে বুড়িকে নাকি দেবী বলেই স্বপ্ন দিয়েছেন। বুড়ি তাই ধরে আছে, অন্য কেউ নিজের মত চালাতে চাইছে না। চাইছে না কিম্বা সাহসই করছে ন, যাই বল। ল্যাপামোছা একটা হাত-খানেকের কালো পাথরের মূর্তি, বুক পর্যন্ত ঠেলে উঠেছে, চাপে মাটিটা চারিদিকে একটু একটু করে চিড় খেয়ে গেছে।

মাস দুয়ের আগেকার কথা। নাক-চোখ-মুখ কিছু নেই কিন্তু এখন সেই ঠাকুরের কী বোলবোলান্ত দেখে এস। যে যা কামনা করছে যেন হাতে হাতে পেয়ে যাচ্ছে। দেশ-বিদেশ থেকে লোক আসছে, বাড়িতে ঠাঁই হয় না। সে বাড়িরও ভোল ফিরিয়ে দিয়েছে বুড়ি। নাকি শ্বশুরের সম্পত্তি, মোকদ্দমা চলছিল, এখন কোথায় মোকদ্দমা, কোথায় কি।...বিড়িটা দে।"

গণশার কাছ থেকে বিড়িটা চেয়ে নিয়ে টানতে আরম্ভ করল চুপ করে। রাজেন প্রশ্ন করল—"ফুল আর আছে তোর জ্যাঠাইমার কাছে?"

ত্রিলোচন দুটো টান দিয়ে বিড়িটা ফেলে দিয়ে একটু ভারিক্কে হয়ে বলল—"থাকেই তো তাতে কী এমন রাজ্য করে দেবে শুনি?"

বেখাপ্পা উত্তরে সবাই একটু হকচকিয়ে গেছে, ত্রিলোচন বলে চলল—"যে ভেতরের কথা জানে তার কাছে ও ল্যাপামোছা ঠাকুরের মুরোদ আর কতটুকু? ত্রিলের কাছে তো আর বুজরুকি খাটবে না। আমি সন্ধান নিয়ে নিয়ে ঘুসুড়িতে গিয়ে বুড়ির বাড়িতে হানা দিয়েছি...। কিছু খরচ হোল। বুড়ির এক ঝাউণ্ডুলে নাতি—এই চোদ্দ-পনেরো বছরের, লায়েক হওয়ার বয়েস হয়েছে—একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে এক পেট খাওয়াতে হোল, তিনটে টাকা লম্বা হয়ে গেল। তা হোক্, একটা এলেম তো জানা গেল; কাজে লাগবে। অবিশ্যি সবার যদি মত হয়..."

"এলেমটা কি?" —প্রশ্ন করল ঘোঁৎনা।

"খুব সিম্‌পল্; সের চারেক ভিজে ছোলা। ভিজে মানে, মাটির নিচে পুঁতে তার ওপর ঠাকুর বসিয়ে জল ঢেলে যাও। আঁকাড়, তা থেকে গাছ, ঠাকুরকে চচ্চাড়িয়ে..."

"তুলে দেবে মাটি থেকে। অমন ভারি পাথর একটা!" —কে গুপ্ত অবাক হয়ে শুনছিল, আর সংযম রাখতে না পেরে প্রশ্ন করে উঠল।

গণশা একটু বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে বলল—'এক মণ দে-দেড় মণের শিবঠাকুর ঠেলে তুলছে মশাই, তার এ তো চাঁ-চ্চাঁচাছোলা একটা দেড় বিঘতের মূর্তি। কো-কোথায় আছেন আপনি?"

ঘোঁৎনা প্রশ্ন করল—"তা আমাদের এখন করতে হবে কি? এই রকম একটা ঠাকুর ঠেলে তুলতে হবে? কিন্তু যেমন শুনলাম, এ তো রোজগারের পন্থা একটা। তা রাজেনের তো টাকার অভাবে বিয়ে হচ্ছে না এমন নয়। টাকাকড়ি, দোতলা বাড়ি, ঘাটবাঁধানো পুকুর—সব রয়েছে, যার জন্যে আমরা যেকালে 'হা-টাকা হা-টাকা' করে বেড়াচ্ছি ও দিব্যি খোসমেজাজে পদ্য লিখে খাতা বোঝাই করছে। মেয়ে পছন্দ হচ্ছে না, বিয়ে হচ্ছে না, এই তো সারকথা, এর মধ্যে ভুঁইফোড় ঠাকুর-দেবতা আসে কোত্থেকে মাথায় আসছে না তো আমার।"

একটু সমালোচনার মন নিয়ে দেখবার চেষ্টা করে ব্যাপারগুলো। গণশার পরে ওরই স্বাধীন মতামতের সঙ্গে মুরুব্বি-য়ানার ভাব থাকে। ত্রিলোচনের হাত থেকে বিড়িটা নিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল।

ত্রিলোচনও যেন বাজে প্রশ্নের উত্তরের দিকে না গিয়ে নিজের কথা ধরেই বলে চলল—"যে যা কামনা করছে পুরিয়ে যাচ্ছেন বটে, তবে জ্যাঠাইমার মুখে একদিন শুনলাম, মাকে বলছিল, বাঁজা মেয়েকে সন্তান দিতে ওঁর নাকি জুড়ি নেই। মেয়েদের কোল আলো করেন বলেই স্বপ্ন দিয়ে 'আলাইচণ্ডী' নাম নিয়েছেন। তাই থেকে আমার মাথায় মতলবটা আরও জাঁকিয়ে বসল, তাহলে এই তো হয়েছে! বিয়ে হবে তারপরে তো বাঁজা, কি, কোল আলো। আমি ঠিক করেছি ঐ ঠাকুরের আড়াআড়ি এমন এক ঠাকুর ভিজে ছোলার চাড়া দিয়ে তুলতে হবে যে আবার বিয়ে দিতে এক নম্বর। হুহু ক'রে নামডাক বেরিয়ে যাবে।"

"গেল। তারপর?" ঘোঁৎনাই প্রশ্ন করল। রাজেন কি ভেবে কবিতার খাতাটা বুকপেটের কাছাকাছি চেপে ধরল।

সেবারে "পাকাদেখার" নাকালের পর কে-গুপ্তর ত্রিলোচনের প্ল্যান সম্বন্ধে একটা আতঙ্কের ভাব আছে, অনেকগুলো প্রশ্নই বাদ দিয়েছে, এবার ঘোঁৎনার আনুকূল্য পেয়ে বলল—"অন্যে না বুঝুক, আমরা তো বুঝছি রিয়েল ঠাকুর নয়, বুজরুকি, সে-ঠাকুর আবার কি ক'রে..."

ঘোঁৎনা ঘুরে বলল—"একটু চুপ করে থেকে ওকে বলতে দেবেন মশাই?"

ত্রিলোচন বলল—"ঠাকুর রিয়েল্ কি বুজরুক তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা কি? রাজেনের জন্যে মেয়ে পছন্দ করা নিয়ে বিষয়। কত আর বাড়ি বাড়ি ঘুরে জানলা দিয়ে নজর চালিয়ে বেড়াবে—মার খাওয়ার ব্যবস্থা, কতবার তো দেখা গেল। তার চেয়ে কুমারী মেয়েদের এক জায়গায় একট্টা করো। বললাম না?—আমাদের ভুঁইফোঁড় ঠাকুর হবেন বিয়ে দিতে এক্স্পার্ট, বিশেষ ক'রে মেয়েদের, মেয়েদের নিয়েই তো সব সমস্যা।"

চুপ করল; কেউ যদি কোন প্রশ্ন করে তো সেইভাবে উত্তর দেওয়ার সতর্কভঙ্গি নিয়ে। কে, গুপ্ত মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

কেউ না করায় নিজেই বলল—"কথা উঠবে, না হয় একট্টা করলে কতকগুলো আইবুড়ো মেয়ে—একে তো সবাই নাও আসতে পারে, মা-পিসিরাই ফুল নিয়ে মানৎ করে যাবে। তুমি মেয়েকে নিয়ে এসে মাকে দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া বেশি কাজের এইটুকুই বলতে পার, কম্পাল্সারি করতে গেলে একটু কানাকানি উঠে শেষ পর্যন্ত প্ল্যান ভেস্তে গেলেও আশ্চর্য হব না..."

"তা বৈকি, সবাই তো পুরুষ আমরা।"

রাজেন মন্তব্যটা করতে ত্রিলোচন সিধা হয়ে উঠে তাকে প্রশ্ন করল—"কে বললে সবাই পুরুষ? আমায় বলতে শুনেছিস?"

সবাই আবার একটু হকচাকিয়ে গেল। এক গণশা ছাড়া, সবটুকু জানে বলে। একটু অধৈর্যভাবে বলল—"ওকে শেষ করতে দে না। একজন তো শুনেছে, লা-ম্নাগসই মনে হয়েছে তার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে। না ভালো লাগে, বাতিল করে দিবি; তাতে হয়েছেটা কি?"

ত্রিলোচন শান্তভাবেই বলে চলল—"পুরুষ থাকবে মাত্র দুজন। এক, পুরুত, পুজোগুলো নিয়ে উচ্ছুগ্যু ক'রে দেওয়ার জন্যে। কে-গুপ্ত ...আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি। খবরদার চুল ছেঁটে এক সাইজ কদমছাঁট করে ফেলুন, মাঝখানে একটা টিকি রেখে। এবার পরচুলায় শানাবে না। দিনেরবেলার ব্যাপার, মেয়ে নিয়ে কেউ রাত্তিরে আসবে না। ঠাকুর বুজরুকের সঙ্গে পুরুত বুজরুক চলবে না..."

"বউ..." কে-গুপ্ত শুরু করতে চটে উঠল ত্রিলোচন—

"বউ তো এই বললেন, বাড়াবাড়ি স্লিমিং সারাতে ছাপরায় গেছে। আর এ তো কায়েমী ব্যবস্থা নয়।"

"আসতে আসতে আবার বউয়ের মনের মতনটি হয়ে বসবেন, দুঃখু কিসের?"

—রাজেন একটু বাঁকাচোখে চেয়ে বলল, কী যেন একটা ভেতরের আক্রোশ। কে-গুপ্ত সবার ওপর থেকে এ্যাপীলের দৃষ্টি বুলিয়ে সহজ হয়ে বসবার চেষ্টা করতে লাগল।

ত্রিলোচন বলল—"আর থাকব আমি, খেরোর খাতা লেখবার জন্যে।"

'খেরোর খাতা!' —ঘোঁৎনা মুখ তুলে চাইল। প্রশ্ন করল—"খেরোর খাতায় কি হবে?"

"মেয়ের—মানে, পাত্রীর নাম, ধাম, গোত্র, রাশি, গণ—সব নিয়ে রাখতে হবে না? তারপর অভিভাবকদের পরিচয়, মেয়ে হোক্, পুরুষ হোক্। শ্রীমান রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাবাজীবনের সঙ্গে শ্রীমতী সুধারাণী দত্তর তো উদ্বাহবন্ধন হতে পারে না। ওদিকে রাশিচক্রও ঠিক রইল।"

প্ল্যানটা যতই বুৎসই মনে হয়ে আসছে, ঘোঁৎনার ততই খারাপ লাগছে, তবে সে প্রকাশ না করে সহজভাবেই প্রশ্ন করল—"যদি জিজ্ঞেস করে এত বাড়াবাড়ি কিসের জন্যে, ভড়কে যায় যদি?"

"বাঃ, মেয়ের জন্যে বিশেষ ক'রে পুজো করতে হবে না রাত্তিরে? এলুম, দুটো ফুল নিয়ে গেলুম, মাথায় ঠেকালুম, বিয়ে হয়ে গেল—ছেলেখেলা নাকি মেয়ের নাড়ি-নক্ষত্র না জানালে সেই বিশেষ পুজো—ন্যায়রত্ন মশাইকে পেলাম না বাড়িতে, নামটা জেনে নিতে হবে পুজোটার—জানি, এখন পেটে আসছে মুখে আসছে না—কী সে দিব্যি..."

পেট থেকে কথাটা মুখে টেনে তোলবার জন্যে, চোখ কপালে তুলেছে, ওর গালভরা 'উদ্বাহবন্ধন' কথাটা শোনবার ফলেই হোক্, বা নিরুপায় হয়ে পৌরোহিত্যের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করবার জন্যেই হোক্, কে-গুপ্ত জুগিয়ে দিল—"সপিন্ডিকরণ।"

একেবারে ফেটে পড়ল ঘোঁৎনা তার ওপর—'সপিন্ডীকরণ শ্রাদ্ধে হয় মশাই! —আপনার পিন্ডি চটকাবার সময়। খবরদার আপনি বড় বড় গালভরা কথার দিকে যাবেন না। সেবার 'পাকা দেখায়' 'পদপ্রক্ষালন' বলে ভট্চার্যিগিরি ফলাতে গিয়ে আপনাকে কালিয়া-পোলাওয়ের সামনে বসে চোখের জল মুছতে মুছতে পেঁপে, শাঁকালু চিবুতে হয়েছিল, তবু দেখছি শিক্ষা হয়নি আপনার। আপনার বাংলা না পোষায় ভোজপুরী ধরুন, খবরদার সংস্কৃতর দিক মাড়াবেন না! ...সপিন্ডীকরণ! নিকুচি করেছে এমন পুরুতের!"

রাগটা কেউ একজনের ওপর ঝাড়তে পেরে সুর একেবারে নামিয়ে এনে অভিমানের টোনেই বলল—"বেশ তো, বুঝলাম। তা, আমাদের যখন কিছু পার্টই নেই এর মধ্যে তখন অত মাথাব্যথা কিসের?"

"পার্ট নেই মানে!" —বিস্মিত দৃষ্টি তুলে চাইল ত্রিলোচন। বলল—"আসোল পার্ট তো তোদেরই—তোর, গণশার আর গোরাচাঁদের। তোদের কারুর বোন, কারুর ভাইঝি, কারুর মেয়ে—মেক্-আপে একটু ভ্যারিয়েশন ক'রে নিতে হবে চেহারা—লেগেছে মন্তর, পেয়ে গেছিস মায়ের কৃপা—প্রায় রোজ আসছিস কেউ না কেউ পুজো নিয়ে—কোনদিন দুজনে, কোনদিন তিনজনেও—কেউ কাউকে চিনিস না—এ ওর কাছে মায়ের কৃপার গল্প শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছিস, চোখের জল ফেলছিস, ভক্তিতে গদগদ হয়ে বসে আছিস মায়ের সামনে—কে এল, কিরকমটা এল,

আধ-বোজা চোখে নজর রেখে যাচ্ছিস। ওদিকে আমি নাম গোত্র সব খেরোয় টুকে যাচ্ছি। কিরকম হবে? অবশ্য, ভেবে দ্যাখো, আজই কিছু এয়োচণ্ডী ঠেলে উঠছেন না। হ্যাঁ, আইবুড়ো মেয়েদের এয়ো করে দিচ্ছেন বলে এয়োচণ্ডীই নাম রাখব ঠিক করেছি।"

সবাই চুপ করে রইল, খুঁৎ তেমন তো কিছু দেখা যাচ্ছে না। রাজেন প্রশ্ন করে উঠল—"আর আমি? কৈ, আমার কথা তো বললি নে? আমিই দেখতে পাবনা?"

ত্রিলোচন ঘাড়টা একটু হেলিয়ে ওর দিকে চেয়ে বলল—"আজ্ঞে না, আপনাকে একেবারেই স্টেজের বাইরে থাকতে হবে। বিলকুল। চোখের সুখ মেটাবার জন্যে আপনি ঘন ঘন যাওয়া-আসা করলেন, তারপর বিয়ের কথা উঠলে চিনে ফেলে, সব কথা ফাঁস হয়ে গিয়ে তারা যদি হাতের সুখ মেটাতে চায়, তখন?...একটু ভেবে নিয়ে কথা বললে কোন গোল থাকে না।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল রাজেনের নাক দিয়ে। ওদের একত্র হতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, 'সাঝের-আটচালায় একজন দু-জন করে লোক জমতে আরম্ভ করেছে, ওরা উঠে পড়ল। স্টীমার ঘাটে যেতে যেতে বাকি সব কথা ঠিক করে ফেলবে।

(৩)

হাওড়া-শিবপুর এলাকার মধ্যে হবে না। সেরকম জঙ্গুলে, পোড়া জায়গা নেই। তা ছাড়া পালে-পার্বণে ভলাণ্টিয়ারি, স্কুল কলেজে এ্যামেচার শো প্রভৃতির জন্য ওদের দলটা সুপরিচিত, এ-ধরণের একটা ব্যাপার নিয়ে পড়ায় বিপদ আছে। অথচ লোকালয় থেকে খুব দূরে একেবারে পরিত্যক্ত জায়গা হলেও চলবে না। মানুষের গতায়াত খানিকটা থাকা চাই, মানুষ নিয়েই যখন কারবার, এ ছাড়া খুব বেশি দূরে গিয়ে ও-ধরণের একটা আড্ডা বেশিদিন ধরে রাখায় অসুবিধাও আছে।

প্রায় সপ্তাহ খানেক ঘোরাঘুরির পর পাওয়া গেল একটা জায়গা। বোটানিক্যাল গার্ডেনের বাইরে দিয়ে, ওদিকে গেস্ট-কীনের ইনজিনিয়ারিং কারখানা ডাইনে রেখে যে রাস্তাটা আন্দুল-মৌড়ির দিকে চলে গেছে, সেটা থেকে নেমে বাঁয়ে বেশ খানিকটা ভেতরের দিকে। উত্তরে, খানিকটা সরে একটা খুব হালকা বসতির লোকালয়। বাড়ি অধিকাংশই গোলপাতা, টালি বা লোহার চাদরের, কোঠা হোল তো একতলাই। ডোবা আর নারকেল-

সুপুরি বাগানের ফাঁকে মাত্র খানদুয়েক দোতলা বাড়ি নজরে পড়ে।

জায়গা দেখে বেড়াচ্ছে দুজন করে, পছন্দসই মনে হলে তখন আবার সবাই মিলে দেখে নিচ্ছে, যতটা উদ্দেশ্যবিহীনের মতো চেহারা করে পারছে। এটা যখন দেখতে আসে, তখন সন্ধ্যা প্রায় খানিকটা নেমে এসেছে। প্রায় সব গৃহস্থবাড়ি থেকেই শাঁখের আওয়াজ উঠল, সহরে যেটা একরকম লোপ পেয়ে এসেছে। আর, দূরের দোতলা বাড়ি দুটোর মধ্যে একটায় বেশ কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে আরতির আওয়াজও উঠল।

ওরা ফিরে আসছিল, দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু শুনলও দাঁড়িয়ে থেকে। এক সময় গণশা বলল—"বেশ জায়গাটা বের করেছিস গোরে তোরা, ধ-ধর্মভাব আছে। চা-চ্চার ফেলা পুকুরের মতন বেশ হবে।

আবিষ্কারটা গোরাচাঁদ আর ঘোঁতনার, ঘোঁতনা কি একটা কারণে উপস্থিত হতে পারেনি।

গোরাচাঁদ যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করল প্রশংসাটুকু, বলল—'সার্টিফিকেট তো দিলি ধর্মভাব রয়েছে বলে, তবে আসল বস্তু কিরকম রয়েছে সেইটেই তো ভাববার।

"আপনি কুমারী মেয়ের কথা বলছেন নিশ্চয়? —কে-গুপ্ত চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে কতকটা নিরুৎসাহভাবে প্রশ্ন করল, বলল—'তা সত্যি, এ যেমন জায়গা, এখানে মনের মতন কুমারী মেয়ে...আপনি কি বলেন রাজেনবাবু ?'

রাজেন যেন একটু বিষণ্ণ মনেই দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল জায়গাটা, তবে সেটা ওর কবি-দৃষ্টি, কী যেন একটা প্রত্যাশা নিয়ে ঘুরছে। একটু ভাব-দ্রব কণ্ঠেই বলল—'দেখুকই না চেষ্টা করে দিনকতক।'

গোরাচাঁদ একটু উৎসাহের সঙ্গে প্রশ্ন করল—'তুই মনে করিস যে মিলতে পারে?'

একটু অমায়িক হাসি টেনে আনল ঠোঁটে রাজেন, বলল—'কোন শ্যাওলা পুকুরে যে সোনার কমল ফুটে থাকতে পারে ভাই!'

'ঐ শুনুন।—একটু রুক্ষভাবেই চাইল গোরাচাঁদ কে-গুপ্তের পানে, বলল—ঐ শুনুন, যার মাথাব্যথা নেই বোঝে কোথায় তার ওষুধ।'

ত্রিলোচন বলল—'অ ভিন্ন, ঐ পাড়া-টুকুর ভরসাতেই তো আসা নয়। এ মুখ থেকে সে-মুখ, তা থেকে আরও পাঁচজন, এই করে খবরটা চারিয়ে পড়ে চারিদিকে থেকে লোক জুটতে আরম্ভ করবে, তখন তো ভিড় ঠেকানোই দায় হয়ে উঠবে।...ঐ ঘোঁতনও আসছে।...ঘোঁতনই না?

ঘোঁতন আসছে উত্তরে ঐ বসতিটার দিক থেকে, শরু পথ ধরে, মাঝে মাঝে পেছনে, পাশে যেন সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে। কাছে এসে ত্রিলোচনের হাত থেকে বিড়িটা নিয়ে টান দিয়েছে, গোরাচাঁদ প্রশ্ন করল—'এদিক থেকে যে?'

ঘোঁৎনা বলল—'চারিদিক থেকে ভালো করে দেখে নিতে হবে না জায়গাটা?'

ত্রিলোচন বলল—'কিরকম দেখলি? কে-গুপ্তের মতে, যেরকম জায়গা তাতে পছন্দসই কুমারী মেয়ে পাওয়ার কোনই চান্স নেই।'

ঘোঁৎনা একবার কে-গুপ্তের মুখের দিকে চাইল, তারপর তাকে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন বোধে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—'আমি ঢুকেছি একেবারে সেই গার্ডেনের গেটের পাশ দিয়ে, যে রাস্তাটা বাউন্ডারি-ওয়ালের ধারে ধারে চলে এসেছে। সেটা ছেড়ে আরও ডাইনে ঢুকে ঢুকে পড়ছি। ওদিকটা বেশ ভালো পাড়া, ক্রমেই জমে উঠছে, ভদ্রলোকের বাড়িও নতুন নতুন উঠছে, শিবপুরের দিকে তো জায়গা পাচ্ছে না লোকে। বাড়ি বাড়ি ঢুকে দেখা যায় না, তবে কুমারী মেয়ের কমতি তো দেখলাম না, অবিশ্যি, কি জাত, কি গোত্র সে আলাদা কথা। এ গলি সেগলি ঘুরে আসতে আসতে স্কুলের ছুটির সময়ও হয়ে এল—যথেষ্ট মেয়ে, এন্তার। মাঝে মাঝে টী স্টল খাবারের দোকান দেখলে সেখানেও সেঁদিয়ে যাচ্ছি, নজর বাইরে, তা খাবারের দোকানেও দেখলাম কুমারী মেয়ে, খাবার নিতে এসেছে, গুটি তিনেক রাজুর সঙ্গে ম্যাচও করে, তবে ঐ জাতি-গোত্র তো জিজ্ঞেস করা যায় না। তারপর সন্ধ্যের দিকে সামনের এই পাড়াটায় ঢুকে একেবারে...

বিড়িটায় একটা লম্বা টান দিয়ে মুখটা তুলে খুব সরু করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। সবাই উৎকর্ণ হয়ে শুনছে, ত্রিলোচন প্রশ্ন করল—'হ্যাঁ, একেবারে?...'

'ঐ কাঁসর-ঘণ্টা বাজছিল, শুনেছিস?' ঘোঁৎনা প্রশ্ন করল।

'শুনলাম বৈকি।'—এক সঙ্গে জনতিনেক বলে উঠল। গণশা একটু আলাদা করে বলল—'গে-গেল টোক কানে।'

ত্রিলোচন বলল—'কুমারীতে কুমারীতে ছয়লাপ একেবারে।'

সবাই ঘেঁষে এল, গণশাও একটু ঘুরে দাঁড়াল। ঘোঁৎনা বলল—'অবিশ্যি সব রকম মানুষ রয়েছে—মেয়ে, পুরুষ, সব বয়েসের, তবে আমার নজর শুধু বিয়ের যুগ্যি মেয়েদের কপালের দিক, তা অন্তত ছ-সাতটির দেখলাম সাদা সিঁথে। তবে, ঐ যেমন বললাম...'

'বুঝেছি, নাম-গোত্র কি করে জানবি।' —ত্রিলোচন শেষ করল ওর কথা, বলল—'তবু অনেক দূর তো এগিয়েছিস—এক দিনেই...'

'এইখানেই থেমে গেছে নাকি ঘোঁৎনা?' —ঘোঁতনই একটু ভারিক্কে হয়ে বলল।

গণশা একটু অসহিষ্ণুভাবেই বলল—একটু বে-বেশ খোলসা করে বলবি, না, দ-দর বাড়াতে থাকবি?'

ঘোঁৎনা একটু অপ্রতিভ হয়ে গিয়েই বলল—'দেখছিলাম সবার বুদ্ধির দৌড়টা। ...ওদের গৃহদেবতা মদনমোহন, তার নিত্য আরতি। বেশ ভিড়, বাড়ি ছাড়া পাড়ারও অনেকে এসেছে। মাঝখানে আধবোজা চোখে দাঁড়িয়ে আছি। তা, ছ-সাতটি রাজেনের যুগ্যি কুমারীর মধ্যে যদি গুটি-তিনেকও ঐ বাড়ির হয় তো রাজেনের তো পোয়াবারো...'

'মানে?'—গোরাচাঁদ রাজেন এক সঙ্গে প্রশ্ন করে উঠল।

ঘোঁৎনা বলল—'বাদার বাড়ি, বেশ বড় পরিবারই মনে হোল। নাও, আসল বাধা। সেল গিলে, সেটা তো গেল।'

রাজেনের বুকে যে নিঃশ্বাসটা আটকে ছিল সেটা সশব্দে এল বেরিয়ে।

প্লট যতই এগিয়ে যাচ্ছে, কে-গুপ্ত ততই অস্বস্তি বোধ করছে ভেতরে ভেতরে, দেখল তো অনেক, বলল—'তাহলে একজন ঘটক বা ঘটকিনী এনগেজ করে দিলে হয় না? এত হ্যাঙ্গামা তাহলে হয় না করতে।'

কথাটা খুবই যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু তখন সবার রোমান্স আর অ্যাডভেঞ্চারের নেশা লেগে গেছে, অনেকদিন হয়ওনি, তার ওপর জমেও এসেছে বেশ, ঘোঁৎনা উগ্রভাবে প্রশ্ন করল—'আপনি হ্যাঙ্গাম কাকে বলতে চাইছেন?'

খাবা খেয়ে খেয়ে কে-গুপ্ত এক এক সময় মরিয়া হয়ে ওঠে, বলল, 'কেন, এই ডোবা পুকুরে ঠাকুর বের করা—জঙ্গলে এসে।'

ঘোঁৎনাও সেইভাবে চেয়ে, এবার একটু ব্যঙ্গের ভাব ফুটিয়ে বলল—'তাহলে তখন তিনু যে বলল—নচ দৈবাৎ...কি যেন, তার মানেটা আপনি একেবারেই বোঝেন নি, অথচ পুরুতগিরি করতে চলেছেন! আপনি দয়া করে মুখ বুজে শুধু দেখে যান মশাই, টুকবেন না।'

'গণশা যখন রয়েছে।'—ত্রিলোচন ওকে সমর্থন করল।

অত খেয়াল হয়নি। সন্ধ্যা বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে, দূরে কাছে কয়েকটা শৃগালও ডেকে উঠল। গল্প করতে করতে ওরা শরু মেঠো পথ ধরে বেরিয়ে এসে আন্দুল রোডে পড়ল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

[illegible] বসু

দেখতে সুন্দর হলে মেয়ে পুরুষ সহজেই অনেক কাজ হাসিল করতে পারেন—এমন কথা অনেকে বলেন, হয়তো সেকথা তর্কাতিত্ত কিম্বা তর্কাতীত। তবে হাতের লেখা সুন্দর হলে লিখিত রচনা পড়তে পাঠক কসুর করবেন না—একথা ঠিক। সুন্দর হস্তলিপি তাই শিল্পচর্চার মতই বস্তু বিশেষ। অনেক নামী লেখকের লেখকপূর্ব জীবনের ঘটনা এমন আছে যে স্রেফ হাতের লেখার জন্যেই সম্পাদক মশাই তাঁর লেখাটি ছেঁড়া কাগজ ফেলার ঝুড়িতে না ফেলে পড়ে ফেলেন এবং সসম্মানে তা পত্রস্থ করেন।

দেশ স্বাধীন হবার বেশ কয়েক বছর আগেকার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। দৈনিক যুগান্তর কাগজে দেখা গেল যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাংলা সাহিত্যের দুটি খাতা একই ছাত্রের লেখা বলে প্রধান পরীক্ষকের মনে হয়েছে; কিন্তু খাতা দুটি দু জায়গা থেকে এসেছে, একটি কোলকাতার কাছের, অন্যটি চট্টগ্রামের কোনো স্কুল সেন্টারের। ঐ দুটি খাতায় লিখিত হস্তাক্ষরের ছাঁদ এক, টান এক, বর্ণের আয়তন পরিমাণ সমান, হস্তলিপিঘটিত যে রূপশিল্প গড়ে ওঠে— সার্বিকভাবে তাও এক, হুবহু একরকমের। এমনই আশ্চর্য ও বিচিত্র কান্ড যে সংবাদপত্রের সেটি পরিবেশনযোগ্য খবর হয়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য এই দুটি খাতাতে রবীন্দ্র হস্তাক্ষরলিপির সার্থক অনুকরণ ছিল।

হাতের লেখার সৌন্দর্য আছে বৈকি! এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এক স্কুল। আজকাল বইয়ের মলাটেও সুন্দর হস্তলিপির রূপ দেখতে পাওয়া যায়, আর বহুক্ষেত্রেই তা নয়নবিমোহন, শোভনদৃশ্য। সিনেমা দেখতে গিয়েও আমরা বাংলা ছবির টাইটেল্স দেখে সুন্দর হস্তলিপির বাহ্যিক সৌন্দর্য আরো বেশী করে উপলব্ধি করে থাকি। শিল্পী সব সময় নতুন কায়দায় হস্তলিপির কৌশল ও কুশলতা প্রকাশ করে থাকেন। হস্তলিপিতেও শিল্পচাতুর্যের প্রকাশ হামেসা ঘটে থাকে।

হস্তলিপি কিন্তু অনেকদিন থেকেই আর্টের রাজ্যের এলাকাভুক্ত ভূখন্ড বিশেষ। ইংরাজীতে সেই ভূখণ্ডের নাম হচ্ছে ক্যালিগ্রাফি (Calligraphy)।

ক্যালিগ্রাফি অবশ্য খুবই বাহারে শিল্প, অক্ষরের বিভিন্নতা, ছাঁদের ধরণ আর গড়নের রকমফের, নতুন কায়দায় অক্ষরগুলিতে নব নব ছন্দোব্যঞ্জনার আরোপ করার কৌশল—এই সবই হলো হস্তলিপি চর্চার প্রাণবস্তু।

তাজমহলের ভাস্কর্য পৃথিবীর সপ্ত-আশ্চর্যের একটি, কিন্তু তাজমহলের গায়ে গোটা পবিত্র কোরাণ খোদিত আছে, এবং সুন্দর ছাঁদে তা রূপিত। সমগ্র কোরাণের বাণী তাজমহলের গায়ে লিখিত এবং লেখার ছাঁদটিও সুন্দর, শুধু এই কথাটাই আমি বলতে চাইছি না, এই লিপি-রূপণের সবচেয়ে বাহাদুরি হলো যে কোন দূরত্ব থেকেই এই খোদিত হস্তলিপির দিকে তাকানো যাক, অক্ষরের ছাঁদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের হেরফের ঘটবে না, অর্থাৎ সমান সাইজের অক্ষরই দেখা যাবে। কাছে দাঁড়িয়ে দেখলে যতবড় বা যতটুকু পরিসরের অক্ষর মনে হবে, দূরে থেকে দেখলেও অক্ষরের আয়তন ও পরিসর কমবে না, সমান দেখাবে। হস্তলিপির এ বাহাদুরি লিপি-কুশলতার এক আশ্চর্য নিদর্শন, ক্যালিগ্রাফি-আর্টের রাজ্যে এ এক মস্ত অহংকারের বিষয়।

ঐশ্লামিক সাহিত্যে ক্যালিগ্রাফির অনেক সুন্দর নিদর্শন মিলবে। কারণ—বোধহয় কোরাণে চিত্রলিপির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আরবী হরফও এমন আঁকাবাঁকা এবং সতানে, সৌন্দর্যারোপের পক্ষে এই অক্ষরমালার একটা সহজেই উপযোগিতা আছে—স্বীকার করতে হবে। একবর্ণের সংগে অন্যবর্ণের যোগসাধনের যে টান—তা এমনই স্বাভাবিকভাবে সুন্দর হয়ে জড়িয়ে যায়—কম প্রতিভার অধিকারী শিল্পীও সামান্য কল্পনার সাহায্যে এই অক্ষরমালায় অতি
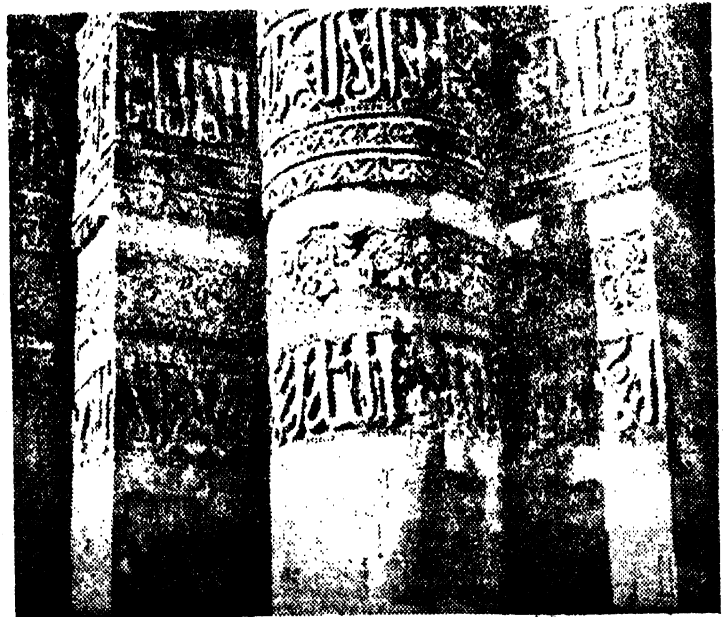
স্তম্ভগাত্রে হস্তলিপি নিদর্শন

কুতুবমিনারের গায়ে হস্তলিপির নিদর্শন
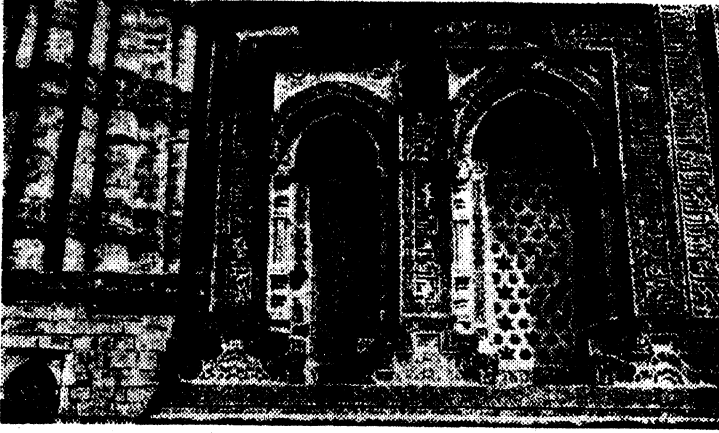
সহজে বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য আরোপ করতে পারেন; এই লিপিমালাকে যে-কোনরকম ছাঁদে ঢালতে খুব বেশী বেগ পেতে হয় না। অতি প্রাচীন থেকেই আরবী হরফের সুন্দর রূপণ চলে আসছে, বোধহয় প্রাচীন বাগদাদ শহরের দক্ষিণে কুফা শহরে আরবী অক্ষরমালা নিয়ে সজ্জা ও রূপদানের মাধ্যমে লেখার কাজ সুরু হয়ে থাকবে—তাই ক্যালিগ্রাফির প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে সর্বত্র (Cubic) অথবা kufie ছাঁদের উল্লেখ করা হয়।

কুফিক ছাঁদের বৈশিষ্ট্য হলো অক্ষরের টান যেমন লম্বালম্বি, তেমনই বক্র বা কুটিল, কিছুটা কোণাকুণিও। নবম শতাব্দীতে খোদিত যেসব কুফিক ছাঁদের লিপির সাক্ষাৎ মিলেছে—তাতে দেখা গেছে যে কুফিক ক্রমেই একবর্ণের সংগে অন্যবর্ণের যোগসাধনের ব্যাপারটাতে লম্বভাব বর্জন করে কোণাকুণি সংযোগের কায়দাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই ধরণটা আরো দু-তিনশো বছর চলে। পরে অবশ্য কোরাণের পুঁথি লেখা হয় যে ধরণে, সেই ধারার চল হলো। সে ধারার নাম নাসখ, Naskh এই ধারার বৈশিষ্ট্য হলো অক্ষর ছাঁদ অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন, এবং কৌণিকভাবের তীব্রতা কমিয়ে ঈষৎ বক্রতা আমদানি। তাই একবর্ণ থেকে অন্যবর্ণের যাতায়াতে গোল রেখা আর দেখা গেল না। নবম শতাব্দীর শেষদিকে এবং দশম শতাব্দীর পূর্বার্ধে আবু আলি মহম্মদ (৮৮৫—৯৩৯ খৃঃ) যিনি 'ইবন মুক্লা' বলেই বেশী খ্যাত—এই নাসখ রূপের শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক। ইনি আরও পাঁচরকমের লিপিচ্ছন্দের আবিষ্কারক, সেগুলির নাম হলো মহাকক, রৈহন, থানথ, তৌকি এবং রিক্কা। এই পাঁচটি এবং নাসখ—এই দু রকমের হস্তলিপির ধরণকে প্রাচীন ক্যালিগ্রাফির ইতিহাসে 'ছটি কলম' (Six Pens) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। নাসখ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো এই যে হরফের মধ্যে কোথায় সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে—লিপির ছাঁদে তাকে আবিষ্কার করা হয়েছে। আর 'ইবন তুকলাই' হচ্ছেন এই ব্যাপারের প্রথম আবিষ্কারক।

এরপর ঐশ্লামিক ক্যালিগ্রাফিতে যাঁর বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে হয়—তিনি হলেন জামালুদ্দিন ইয়াকত অল মুস্তাসিমি। ইনি শুধু নাসখ পদ্ধতিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেননি, রৈহন এবং থালথ পদ্ধতিরও বিশেষ উন্নতি ঘটিয়েছিলেন।

পারস্যে অবশ্য আরবী হরফে খোদিত করার মধ্যে কিছুটা নতুনত্ব দেখা গেল, ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই এই পরিবর্তন চোখে পড়লো। পারস্যবাসীরা হস্তাক্ষর রচনার যে নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করলেন—তার নাম তলিক পদ্ধতি; তৌকি আর রিকা পদ্ধতির মিল ঘটিয়েই এই তলিক রীতি, এই রীতিতে ডানদিক থেকে বাঁদিকের রেখাগুলি আড়াআড়িভাবে শুধু শায়িত করা হয়। বহুদিন ধরে তলিক পদ্ধতির ক্যালিগ্রাফি পারস্য দেশে চলে, আর পঞ্চদশ শতকের খাজা তাজ-ই-সালমানির নামও এই পদ্ধতির সংগে বিখ্যাত হয়ে আছে।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ বরাবর নাসখ আর তলিক পদ্ধতি দুটি মিলে গিয়ে হলো 'নাস্তলিক' পদ্ধতির ক্যালিগ্রাফি। নাস্তলিক পদ্ধতির লিপিকে অনেকেই সর্বাংগসুন্দর বলেছেন, এর ছাঁদটি বর্তুলাকার বটে, কিন্তু বর্ণে বর্ণে যে যোগ—তা ঈষৎ গোল, অথচ মসৃণ ও নমনীয়ভাবে রেখা টানা, আর অক্ষরগুলিকে ডিমের আকৃতিতে রূপদান করা হয়েছে। এই ছাঁদের রেখাগুলো বাঁকা তলোয়ারের মতো উদ্ধত, সুরু থেকে শেষের-দিকে রেখা অপেক্ষাকৃত স্থূল হয়ে গেছে, আর মাঝামাঝি জায়গায় একটুখানি বাঁক।

এই নাস্তলিক পদ্ধতি আবার পরে বাস্তলিক পদ্ধতিতে বদলে গেল। তৈমুর লঙের সমকালের তাব্রিজ শহরের মির আলি নামে জনৈক হস্তলিপিবিশারদ এই বাস্তলিক প্রণালীর আবিষ্কর্তা। এছাড়া গুলজার, লারজা, মনসুর, ঘুবর, সোফিয়া, তুখরা প্রভৃতি পদ্ধতির কথাও আজকাল শোনা যাচ্ছে। এসব পদ্ধতির কোনোটায় হরফ হয়তো পুরো লেখা হয় না, কোনো পদ্ধতিতে ওপরের দিকে মোটা করে নিম্নাংশ খুব সরু নিবে লেখা হয়ে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো কম্পিত হাতে তুলি বা কলমের টান দিয়ে বর্ণগুলি সজ্জিত করা হয়েছে।

ভারতবর্ষে মুশ্লিম ক্যালিগ্রাফির নিদর্শন কিন্তু তাঁদের রাজ্য শাসনের পত্তন-কাল থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবর ত' নিজেই একজন বড় হস্তলিপিরসিক ছিলেন; এঁর
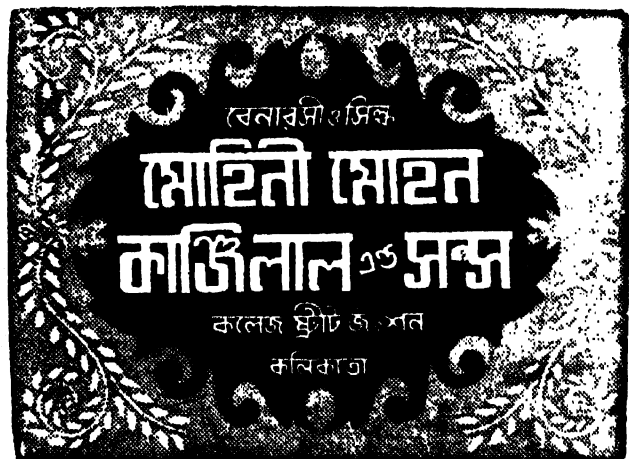
একটা নিজস্ব পদ্ধতি ছিল, সেই ধরণের নাম 'বাবরি' পদ্ধতি। হুমায়ুন পারস্যে বন্দীজীবন কাটিয়ে যখন ফিরে আসেন, তখন তিনি তাঁর সংগে প্রচুর হস্তলিপি-শিল্পী ও বিশারদ নিয়ে আসেন, এবং হস্তলিপির চর্চাও এদেশে সুরু হয়, মসজিদ ও মুকবুরার গায়ে লিপি খোদিত হতে থাকে। আকবরের আমলে হস্তলিপি-শিল্পীদের ত' রীতিমত পুরস্কৃত করা হতো। বিখ্যাত হস্তলিপিকার মীর আবদুল্লা তিরমিজি আকবর কর্তৃক প্রশংসিত এবং পুরস্কৃত হন। তাঁর হস্তলিপিশিল্প আজও আমরা জয়পুরে এলাহাবাদে খসরুবাগে দেখে থাকি, অবশ্য তাঁর ধরণটি নাস্তলিক পদ্ধতির অনুসরণ। জাহাঙ্গীর, শাজাহান, ঔরংজীব— সকলেই হস্তলিপিরসিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এঁদের নানা ছাঁদের হাতের লেখা দিল্লীর লালকেল্লার মিউ-জিয়ামে, বিভিন্ন মসজিদে, কতুবমিনারে— সর্বত্র আজো বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। শাজাহানের রাজত্বকালে মহম্মদ মুরাদ কাশ্মিরী, সরাফুদ্দিন আবদুল্লা এবং কিফায়ৎ খাঁ প্রভৃতি বিখ্যাত হস্তলিপি-শিল্পীরা ভারতবর্ষে ছিলেন। তাজমহলের পূত কোরাণবাণী রূপায়ণের কৃতিত্ব এঁদের কারুর কিনা স্পষ্ট করে জানা যায়নি। এই সময়ে কি এর সামান্য কিছু পরে আবদুর রসিদ দৈলামি পারস্য থেকে ভারতে আসেন এবং কিছুদিন দারা শিকোর হস্তলিপি শিল্পের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইনি ঔরংজীবদুহিতা জেবুন্নিসারও শিক্ষক ছিলেন; জেবুন্নিসাকে তিনি নাস্তলিক পদ্ধতির ক্যালিগ্রাফি শিক্ষা দিতেন। ভারত-বর্ষের জাতীয় মিউজিয়মে আবদুর রসিদ দৈলামির কাজের নিদর্শন রয়েছে।
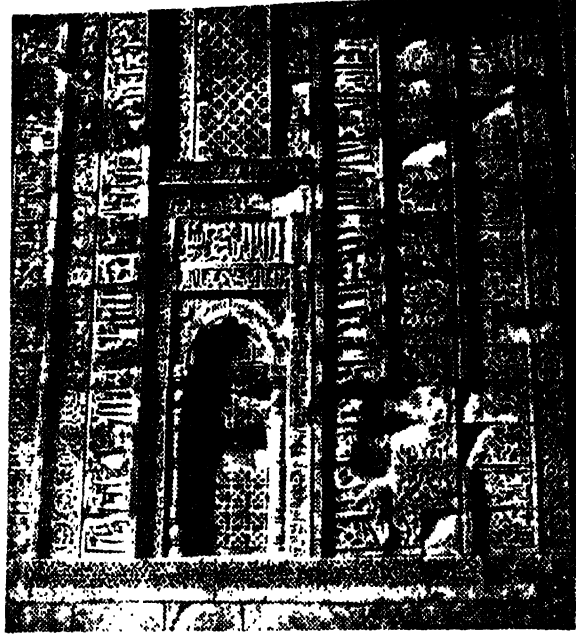
আলতামাস কবরের গায়ে আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ হস্তলিপি

হায়দ্রাবাদে নিজাম আমলেও ক্যালি-গ্রাফির চর্চা ছিল। বর্তমান ভারতে ক্যালিগ্রাফির চল তেমন নেই; তবু উর্দু লেখকদের মধ্যে হাতের লেখার ছাঁদে একটা সৌন্দর্য এখনো নেই নেই করেও বিকেলের পড়ন্ত রোদের মতো নিস্তেজ আভা নিয়ে টিঁকে আছে।

বাংলা অক্ষরমালা দিয়ে কোনরকম রূপসজ্জা যে একেবারে অচল—এমন কথা বলি না। তবু বাংলা হরফ লেখায় সুন্দর ও বিশিষ্ট ছাঁদের বহুধা রূপ গড়ে ওঠেনি।

এক রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরের ধারা নকল করার প্রবণতা থেকে একটা রূপ মোটামুটি জন্ম নিয়েছে, তাকে রাবীন্দ্রিক পদ্ধতি বলা যায়, কিন্তু কিউবিক (Cubic) আর্টের পদ্ধতিতেও বাংলা লিপিকে যে সাজানো চলে না এমন নয়—আর্টিস্টরা, বিশেষ করে যাঁরা কমার্শিয়াল আর্টের চর্চা করেন—তাঁরা কল্পনা ও প্রতিভার দৌলতে নিশ্চয়ই নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারেন। কিন্তু করে কে আর করেই বা ঐহিক ও পারমার্থিক লাভ কি?

ঘোষণা করা সত্ত্বেও বাংলাভাষা পশ্চিম-বঙ্গে সরকারী মর্যাদা আজো পায়নি, (শিক্ষাদপ্তরে বোধহয় এবার ঈষৎ মর্যাদা-লাভ ঘটতে পারে)। তার ওপর বাংলা হরফের ছাঁদ নিয়ে ও তার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে সৌন্দর্য কোথায় লুকিয়ে আছে, কেমন করে কি ধরণে রূপ দিলে সেই গুপ্ত সৌন্দর্য সুপ্ত শ্রীকে ফুটিয়ে তোলা যাবে— সে বিষয়ে গবেষণা করার ব্যাপারে অর্থ এবং উৎসাহ ব্যয় করবেন কে? একটা বইয়ের কভারে দশ-বারোটা বর্ণ-ব্যবহারে কি ক্যালি-গ্রাফির কোনো পদ্ধতি-চরিত্রকে পূর্ণতাদান করা যায়? নিশ্চয়ই না। তাই বাংলা ক্যালি-গ্রাফির কথা আজো অভাবনীয় নয়, অচিন্তনীয়ই থেকে গেছে।

এই হস্তলিপির মৌলিকতা লক্ষণীয়

দুটি জীবন: দুটি প্রতিভা

পুলকেশ দে সরকার

রবীন্দ্রনাথের জন্ম বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫-এ বৈশাখ; ইংরাজী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে। (১)

কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ; (২) ইংরাজী হিসাব মতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের মে-জুন মাসে।

রবীন্দ্রনাথ ইংরাজী ঊনবিংশ শতাব্দীর ৩৯ বছর পরিব্যাপ্ত; নজরুল মাত্র এক বছর।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম শহরে; "সেকেলে কলকাতায়।" (৩) নজরুলের জন্ম গ্রামে: আসানসোলের চুরুলিয়া গ্রামে।

দু'জনের জন্মকালের ব্যবধান ৩৮ বছরের। অর্থাৎ, অনায়াসেই বলা যায় নজরুল বয়সে রবীন্দ্রনাথের পুত্রসম। রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়েছিল ২২ বছর বয়সেই। নজরুলের জন্মের ১৬ বছর আগে। তাঁর প্রথম সন্তান মাধুরীলতা বা বেলার জন্ম নজরুলের জন্মের ১৩ বছর আগে। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র সমীন্দ্রনাথের জন্ম ১৩০১ সালে। নজরুলের জন্ম হয়েছে তারও ৫ বছর পরে।

দেবেন্দ্রনাথের ১৫টি সন্তানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চতুর্দশ; ছেলেদের মধ্যে অষ্টম। দেবেন্দ্রনাথের বিয়ে হয়েছিল ১২ বছর বয়সে; পত্নী সারদা দেবীর বয়স ছিল ছয় কি সাত। (৪)

কাজী নজরুলের পিতা ফকির আহম্মদের সাত ছেলে, দুই মেয়ে। মায়ের নাম জাহেদা খাতুন।

রবীন্দ্রনাথের যখন ৪৪ বছর বয়স তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়; নজরুলের যখন মাত্র ৮ বছর বয়স তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ হয় ১৪ বছর বয়সে; নজরুলের মাতৃবিয়োগ হয় ২৯ বছর বয়সে।

পিতৃ পরিচয়

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর যথাক্রমে ৬ বছর ও ৪৬ বছর পরিব্যাপ্ত 'প্রিন্স দ্বারকানাথ' বললেই ঠাকুর পরিবারের অনেকখানি বলা হয়ে যায়। বলা হ'য়ে যায় সম্ভবতঃ ভট্টপল্লী-বিক্রমপুরী পণ্ডিত-কুল-ধৃতকেশ বঙ্গদেশের কথা। বাঙালী-সমাজ ইঙ্গ-বঙ্গ কোরক থেকে এক নবরূপ ধারণ করছে। তাঁর জন্মের এক বছর আগে ১৭৯৩-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়েছে। তিনি ইংরাজ বণিকদের সংস্পর্শে এসেছেন; জমিদার হয়েছেন, ব্যবসায়ের চেষ্টা করেছেন, দু'বার বিলাত যান এবং বলা বাহুল্য বহু কুসংস্কার বা প্রচলিত রাখার অযোগ্য বিধি বর্জনে অগ্রণী ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর বেশীরভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর ৫ বছর পরিব্যাপ্ত (১৮১৭—১৯০৫)। তিনি স্বয়ং বাঙালী সমাজের একটি কাল এবং পরিবর্তনশীল কাল। তাঁহার যৌবনকাল পিতার ধনগৌরবে পরিপূর্ণ। "পিতার ধনৈশ্বর্যের আবিলতা তাঁহাকে সম্পূর্ণ অমলিন রাখিতে পারে নাই। ...আঠারো হইতে একুশ বৎসর বয়স পর্যন্ত কয় বৎসর দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে বিলাসিতার জীবন।... পিতামহী অলকা দেবীর মৃত্যুতে তাঁহার জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়।" (৫)

সংস্কৃত শিখে শাস্ত্রপাঠ এবং ঐ সঙ্গে ইউরোপীয় দর্শন পড়ায় আগ্রহ জন্মাল। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের 'সাধারণ জ্ঞানোন্নতি' সভার সদস্য হবার পর থেকে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মত বিশ্বাস বিপ্লবমুখী হল। রামমোহন রায়কে তিনি দেখেছিলেন। ভাইদের নিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, প্রতিমা প্রণাম করবেন না। ধর্ম বিষয় আলোচনা-সভা 'সর্বতত্ত্বদীপিকা'র সদস্য হলেন। এ সভার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গৌড়ীয় ভাষা ও স্বদেশী বিদ্যার আলোচনা। স্থির হয়েছিল : 'বঙ্গভাষা ভিন্ন এ-সভাতে কোনো ভাষায় কথোপকথন হইবে না'। (৬)

উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের ওপর এর কি অসামান্য প্রভাব পড়েছিল রবীন্দ্রানুরাগীমাত্রেই তা জানেন এবং বঙ্গভাষা-নিষ্ঠার জন্য রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তি সম্পর্কেও এমন কটূক্তি হয়েছিল যে, তিনি ইংরাজী ভাল জানেন না বলেই বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর এই অনুরাগ।

দেবেন্দ্রনাথ ২২ বছর বয়সে 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা' স্থাপন করেন; দ্বিতীয় অধিবেশনে সভার নাম হয় 'তত্ত্ববোধিনী'। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করেন, তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করে। তাঁরই অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনীর প্রথম সম্পাদক হন অক্ষয়কুমার দত্ত। পাছে অব্রাহ্মণ কেউ শুনে ফেলে এজন্য রামমোহনের কালে ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরে বেদপাঠ হ'ত না, দেবেন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে বেদপাঠের প্রবর্তন করেন। ২৬ বছর বয়সে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে মন দেন। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর অপৌত্তলিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন। "ইহা ব্যক্তিগত বিদ্রোহ নহে, ইহা সামাজিক বিপ্লব"। (৭)

দেবেন্দ্রনাথের ৪১ বছর বয়সে ২০ বছরের কেশবচন্দ্র এলেন তাঁর সঙ্গে; ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হল; তিনি বাংলায়, কেশবচন্দ্র ইংরাজীতে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং বেদিতে বসলেন। দ্বিতীয়া কন্যাকে 'অপৌত্তলিক' বিয়ে দিলেন। তারপর কতগুলো আচার-আচরণ নিয়ে বিরোধ দেখা দিল কেশবচন্দ্রের সঙ্গেই। তারপর একদা মর্মাহত দেবেন্দ্রনাথ পরিব্রাজকের জীবন যাপন করতে লাগলেন। ৮৮ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ, কাজী নজরুলের এক দীর্ঘ বংশ ও পিতৃ-পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় যেটুকু পরিচয় দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, "কবির পিতৃবংশের ধারাবাহিক কাব্যসাধনার এবং নানা সংগুণের পরিচয় পাওয়া যায়। কবির পূর্বপুরুষগণ পাটনায় বাস করতেন: সম্রাট শাহ আলমের সময় চুরুলিয়ায় এসে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁরা বাদশার সরকারে চাকুরী করতেন।

"ফকির আহম্মদ সাহেব সুপুরুষ ও স্বাস্থ্যবান ছিলেন। পার্শী ও বাংলা কাব্যে তাঁর গভীর রুচি ছিল। তাঁর এন্তেকাল হয় ১৩১৪ সালের ৭ই চৈত্র।" (৮)

শৈশব পরিবেশ

একমাত্র বাংলা ভাষায় দুই পিতৃদেবেরই অনুরাগ ছাড়া দুটি জীবনের শৈশব পরিবেশে কোন মিল নেই। প্রিন্স দ্বারকানাথের কার-ঠাকুর কোম্পানীতে তালা পড়লেও দেবেন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথকে অতল দারিদ্র্যে ডুবে যেতে হয়নি। পক্ষান্তরে, কাজী নজরুলের পিতৃবিয়োগের পর "কাজী পরিবার অশেষ অভাব ও দুঃখের মধ্যে পড়ে।" (৯) অকস্মাৎ [illegible]

---

(১) রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
(২) কাজী নজরুল, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়
(৩) ছেলেবেলা, রবীন্দ্রনাথ
(৪) রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(৫) রবীন্দ্রজীবনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
(৬) রবীন্দ্রজীবনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(৭) রবীন্দ্রজীবনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
(৮) কাজী নজরুল, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়
(৯) — ঐ —

করার জন্যই কিনা জানি না নজরুলের এক নাম ছিল দুঃক্ষুমিয়া। পরে নজরুল কবি-খ্যাতি লাভ করলেও দুঃক্ষুমিয়াই তাঁর জীবনে অবিচ্ছেদ্য সত্য হয়ে আছে।

এ দুটি জীবনের আবির্ভাব-কাল ও শৈশবকালেও কোন মিল নেই। ঠাকুর-পরিবার থেকে রবীন্দ্রনাথ একটা প্রবল প্লাবনের মতো বাঙালী সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে বিস্তারিত হলেও তাঁর পূর্ব-সূরীরাও মহীরূহ ছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশ দত্ত, দীনবন্ধু, মাইকেল, অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর প্রমুখের কর্ষিত উর্বর ক্ষেত্রেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। সমাজেও বর্ণাশ্রমী প্রাধান্য বহুলাংশে ভেঙে পড়েছে। সিপাহী বিদ্রোহকালের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের মোহমুক্ত এক নবতর বিদ্রোহী তারুণ্যের বিকাশ ঘটছে; ইংরাজ ও পাশ্চাত্যের জট ছাড়িয়ে সম্মুখ সংগ্রামের জন্য নবনায়কেরা প্রস্তুত হচ্ছেন ঘরে ঘরে; প্রিন্স দ্বারকানাথের কালের সাহেব-বাঙালীর কার-ঠাকুর কোম্পানী সমবায়ী ভাবও অতিবাহিত; ইংরাজ-শাসক সাম্রাজ্যবাদী দম্ভে সম্পূর্ণ অসহযোগী বিদেশী হয়ে গেছে। তবুও রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আপাতঃ-উদার বৈদেশিক আবহাওয়া ছিল; ছিল বৃটিশ ও ভারতীয় মেধার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেঘসঞ্চারের কাল: রবীন্দ্রনাথের মেজ দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ভারতীয় আই-সি-এস হয়ে সেকালে যেমন চমক লাগিয়েছিলেন তেমনি ভীতি সঞ্চার করেছিলেন ইংরাজ বুদ্ধিজীবীদের চিত্তে। তারপর থেকে আই-সি-এস পদে ভারতীয়দের বঞ্চিত করবার অনেক কারচুপি হয়েছে। অথবা, এককথায় রবীন্দ্রনাথের জন্মকাল ছিল একাধারে পাশ্চাত্য সভ্যতা আত্মস্থ করা, জীর্ণ করা ও প্রাচ্য সভ্যতার গৌরবে উদ্ভাসিত হওয়া। পায়জামা আচকান চোগা চাপকান তাজ পাগড়ি জাজিম ফরাস মছলন্দ তাকিয়া আলবোলা ফরসীর মধ্যেই এসেছে টেবিল চেয়ার সোফা অর্গান ফ্লুট এবং "সত্যেন্দ্রনাথ যেদিন খোলা ফিটন গাড়িতে স্ত্রীকে লইয়া জোড়াসাঁকোর বাড়ি হইতে বাহির হইলেন, আর যেদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী ঘোড়ায় চড়িয়া গড়ের মাঠে বেড়াইতে গেলেন, সেদিন ঘরে বাহিরে যে ছি ছি রব উঠিয়াছিল, তাহার রেশ মিটিতে বহুকাল লাগে।" (১০)

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর 'ছেলেবেলা'-য় লিখেছেন :—

"আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। শহরে শ্যাকরাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়ছড় করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটর গাড়ি। তখন কাজের এত বেশি হাঁসফাঁসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে পান চিবোতে চিবোতে, কেউ বা পাল্কি চড়ে কেউ বা ভাগের গাড়িতে। যাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা-আঁকা চামড়ার আধ-ঘোমটাওয়ালা; কোচবাক্সে কোচম্যান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে, দুই দুই সইস থাকত পিছনে, কোমরে চামর বাঁধা, হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে চলতি মানুষকে। মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আসা ছিল দরজা-বন্ধ পাল্কির হাঁপ-ধরানো অন্ধকারে, গাড়ী চড়তে ছিল ভারী লজ্জা। রোদ-বৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না। কোন মেয়ের গায়ে সেমিজ পায়ে জুতো দেখলে সেটাকে বলত মেম-সাহেবি; তার মানে, লজ্জা-শরমের মাথা খাওয়া। কোনো মেয়ে যদি হঠাৎ পড়ত পর-পুরুষের সামনে, ফস করে তার ঘোমটা নামত নাকের ডগা পেরিয়ে, জিভ কেটে চট করে দাঁড়াত সে পিঠ ফিরিয়ে। ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ, তেমনি বাইরে বেরোবার পাল্কিতেও; বড়োমানুষদের ঝি-বউদের পাল্কির উপরে আরও একটা ঢাকা চাপা থাকত মোটা ঘটাটোপের। দেখতে হত যেন চলতি গোরস্থান। পাশে পাশে চলত পিতলে-বাঁধানো লাঠি হাতে দরোয়ানজি। ওদের কাজ ছিল দেউড়িতে বসে বাড়ি আগলানো, দাড়ি চোমড়ানো, ব্যাঙ্কে টাকা আর কুটুমবাড়িতে মেয়েদের পৌঁছিয়ে দেওয়া, আর পার্বণের দিনে গিন্নিকে বন্ধ পাল্কিসুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা। দরজায় ফেরিওয়ালা আসত বাক্স সাজিয়ে, তাতে শিউনন্দনেরও কিছু মুনাফা থাকত...

'তখন শহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি; কেরোসিনের আলো পরে যখন এল তার তেজ দেখে আমরা অবাক। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে ফরাস এসে জ্বালিয়ে যেত রেড়ির তেলের আলো। আমাদের পড়বার ঘরে জ্বলত দুই সলতের একটা সেজ।' (১১)

ইত্যাদি। মাস্টারমশায় পড়াতে আসতেন। 'তখন আমাদের বাড়ি-ভরা ছিল লোক, আপন-পর কত তার ঠিকানা নেই; নানা মহলের চাকর-দাসীর নানা দিকে হৈ-হৈ ডাক।

'সামনের উঠোন দিয়ে প্যারীদাসী ধামা কাঁখে বাজার করে নিয়ে আসছে তরি-তরকারি; দুখন বেহারা বাঁখ কাঁধে গঙ্গার জল আনছে; বাড়ির ভিতরে চলেছে তাঁতিনি নতুন ফ্যাশান-পেড়ে শাড়ির সওদা করতে; মাইনে-করা যে দিনু স্যাকরা গলির পাশের ঘরে বসে হাপর ফোঁস ফোঁস করে বাড়ির ফর্মাশ খাটত সে আসছে খাতাঞ্চি-খানায় কানে-পালকের কলম-গোঁজা কৈলাস মুখুজ্যের কাছে, পাওনার দাবি জানাতে; উঠোনে বসে টং টং আওয়াজে পুরোনো লেপের তুলো ধুনছে ধুনুরি। বাইরে কানা-পালোয়ানের সঙ্গে মুকুন্দলাল দারোয়ান লুটোপুটি করতে করতে কুস্তির প্যাঁচ কষছে...[illegible] বসে আছে বরাদ্দ ভিক্ষার আশা করে।' ইত্যাদি। (১২)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমাদের উপসংহারের আগে সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যে—

'জানিয়ে রাখি, আমাদের চাল ছিল গরিবের মতো। গাড়ি-ঘোড়ার বালাই ছিল না বললেই হয়। বাইরে কোণের তেঁতুল-গাছের তলায় ছিল চালাঘরে একটা পাল্কিগাড়ি আর একটা বুড়ো ঘোড়া।... যখন ব্রজেশ্বরের ফর্দ এড়িয়ে জলপানের বরাদ্দ হল পাঁউরুটি আর কলাপাতা মোড়া মাখন, মনে হল, আকাশ যেন হাতে নাগাল পাওয়া গেল।' (১৩)

কাজী নজরুলের ছেলেবেলার এমন সুন্দর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না; নিজে লিখতে পারেননি কিছুই, মুজফ্‌ফর আহমেদ যা লিখেছেন তা শ্রুতিনির্ভর এবং পরবর্তী জীবনের। শৈলজানন্দের স্মৃতিকথায় অনেক উপকরণ আছে 'ছেলেবেলা' নেই। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনীও প্রধানতঃ শ্রুতিনির্ভর। কিন্তু নজরুল-জীবনে যেটি নিঃসংশয় এবং তর্কাতীত, তা আজন্ম দারিদ্র্য; এক অবিচ্ছিন্ন বিয়োগান্ত কৃপানির্ভর বৈষয়িক জীবন। সুস্থ থাকলে কি হত এমন গবেষণাও আজ নিরর্থক। এক অশান্ত প্রতিভাকে প্রতিকূল পরিবেশের অজগর কঠিন আলিঙ্গনে নিস্তব্ধ করে দিয়েছে যেন।

'এগারো বছর বয়সে কবি নজরুল 'লেটোর' দলে প্রবেশ করেন সামান্য রোজগারের জন্য।

'গ্রামের মক্তবে এক বছর মাস্টারি করার পর চিরচঞ্চল নজরুল নূতনের সন্ধানে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। এদিকে সংসারের অভাবও খুব তীব্র হয়ে ওঠে। কবি নজরুল গ্রাম থেকে পালিয়ে এসে আসানসোলে এক রুটির দোকানে আট টাকা মাইনেতে চাকুরী নেন। রুটির দোকানে তাঁকে রীতিমত চাকরের কাজ করতে হত। মালিক তাঁর ওপর যথেষ্ট অত্যাচার করত, খাটাতো, তাঁকে লিখতে পড়তে গান গাইতে দিত না।' (১৪)

এক মুসলমান দারোগা এই বালকভৃত্যকে করুণা-পরবশ হয়ে নিয়ে যান ময়মনসিংহে, গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দেন, এক বছর পর ফিরে এসে রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজস্কুলে ভর্তি হন। তিন বছর পড়েন। তারপর একদিন যুদ্ধের দামামা বাজল ইউরোপে এবং প্রতিধ্বনি-তরঙ্গ এসে লাগল বাংলাদেশেও।

'তখন ইংরেজ-জার্মানিতে প্রথম লড়াই লেগেছে। আমরা দুজনে ম্যাট্রিক ক্লাশে উঠে

(১০) রবীন্দ্রজীবনীতে উদ্ধৃত [illegible]

(১১) ছেলেবেলা, রবীন্দ্রনাথ

(১২) ঐ

(১৩) ছেলেবেলা, রবীন্দ্ররচনা

(১৪) কাজী নজরুল, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়

প্রিটেন্ট দিচ্ছি। শহরে গাঁয়ে চলেছে তখন সৈন্য যোগাড়ের তোড়জোড়।' (১৫)

অর্থাৎ, কাজী নজরুলের 'ছেলেবেলা' আর নেই। তিনি যুদ্ধে সেনাদলে নাম লিখিয়ে চলে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায়—'ছাদের ঘরে এল পিয়ানো। আর এল এ-কালের বার্নিশ-করা বউবাজারের আসবাব।...

'এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা।

'জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গিতে ঝমাঝম সুর তৈরি করে যেতেন; আমাকে রাখতেন পাশে। তখন তখনই সেই ছুটে চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।

'দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রুপোর রেকাবিতে বেলফুলের গোড়ে-মালা ভিজে রুমালে, পিরিচে এক গ্লাস বরফ-দেওয়া জল, আর বাটাতে ছাঁচিপান।

'বউঠাকরুন গা ধুয়ে, চুল বেঁধে, তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা; বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়া সুরের গান।...সূর্য-ডোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত আমার গান।' (১৬)

এগারো বছর বয়সে বীরভূম-চুরুলিয়া অঞ্চলে যে-লেটোর দল গ্রাম্যগাথা গেয়ে সকলের মনোরঞ্জন করত, তাতে নজরুল প্রথমে গান করতেন, পরে গানের শিক্ষকতা ও নেতৃত্ব করেন। 'নিজে সময়োপযোগী গান, প্রহসন, যাত্রা, নাটক লিখে গ্রামে গ্রামে দল নিয়ে গিয়েও অভিনয় করেছেন। সাধারণ লোকের মনোরঞ্জন করে লিখবার উন্মেষ লেটোর দলে এসেই।' (১৭)

কাব্য-সুধা-সঞ্চয়

'মনে আছে'—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ছেলেবেলায় 'ছাত্রবৃত্তির নিচের ক্লাসে যখন পড়ি, সুপারিণ্টেনডেণ্ট গোবিন্দবাবু গুজব শুনলেন যে, আমি কবিতা লিখি। আমাকে ফরমাশ করলেন লিখতে, ভাবলেন নর্মাল স্কুলের নাম উঠবে জ্বলজ্বলিয়ে। লিখতে হল, শোনাতেও হল ক্লাসের ছেলে-দের, শুনতে হল যে, এ-লেখাটা নিশ্চয় চুরি।...

'মনে পড়ে, পয়ারে ত্রিপদীতে মিলিয়ে একবার একটা কবিতা বানিয়েছিলাম;... অক্ষয়বাবু তাঁর আত্মীয়দের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এই কবিতা শুনিয়ে বেড়ালেন। আত্মীয়েরা বললেন—ছেলেটির লেখবার হাত আছে।

'জ্যোতিদাদার কবি খাওয়ার সরঞ্জাম হত সকালে। সেই সময় পড়ে শোনাতেন তাঁর কোনো একটা নতুন নাটকের প্রথম খসড়া। তার মধ্যে কখন কখনও কিছু জুড়ে দেবার জন্যে আমাকেও ডাক পড়ত আমার অত্যন্ত কাঁচা হাতের লাইনের জন্যে।' (১৮)

রবীন্দ্রনাথের ষোলো বছর আরম্ভের মুখেই দেখা দিয়েছে 'ভারতী'।...আমার মত ছেলে...সেও সেই বৈঠকে জায়গা জুড়ে বসল...আর তারই মধ্যে আমি লিখে বসলুম এক গল্প...।

'সতের বছরে পড়লুম যখন, 'ভারতী'র সম্পাদকি বৈঠক থেকে আমাকে সরে যেতে হল।

'এই সময়ে আমার বিলেত যাওয়া ঠিক হয়েছে।' (১৯)

'সতেরো বছর বয়সে নজরুল...১৩২৩ সালে (১৯১৬) উনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালী পল্টনে যোগ দিলেন।...করাচীতে গিয়ে নজরুল বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে প্যারেড ও অস্ত্রশিক্ষায় মনসংযোগ দিলেন।

'কাঠখোট্টা সৈন্যদলে থেকেও কবি সাহিত্য-সাধনা ছাড়েননি।'...কবি তাঁর 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' গ্রন্থের মুখবন্ধে লেখেন—

'আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি।...সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলবী থাকতেন। একদিন তিনি দিওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শুনে আমি এমন মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেই দিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি। তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি।

'করাচী ব্যারাকে থাকবার সময়েই 'রিক্তের বেদন' বইখানি লেখা হয়। প্যারেড শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কাব্যচর্চা, ফার্সিভাষা শিক্ষা, কবিতা, গান, গল্পলেখা, গান গাওয়া সমানে চালাতেন।

'করাচীতে থাকাকালীন যেসব কবিতা ও গান লিখতেন এবং হাফিজের অনুবাদ করতেন, সেসব লেখা মাঝে মাঝে বাংলা-দেশের কাগজে পাঠাতেন, কিন্তু তা প্রকাশ হত না।' (২০)

নজরুল করাচী থেকে হাফিজের গানের একটি অনুবাদ পাঠিয়েছিলেন 'সবুজ পত্র'-এ। সম্পাদক লেখাটি প্রত্যা-খ্যান করেন। সহ-সম্পাদক শ্রীপবিত্র গঙ্গো-পাধ্যায় লেখাটি চারুবাবুকে দিয়ে 'প্রবাসী'-তে প্রকাশ করেন। নজরুল বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির হয়ে তাঁদের পত্রিকায় লেখা পাঠাতে থাকেন।

নজরুল সৈন্যদলে তিন বছর ছিলেন। কলকাতায় ফিরে এলে মজাফ্ফর আহ-মেদের বাড়ীতে লেখা 'বিদ্রোহী' কবিতাটি বেরোয় 'মোসলেম ভারত" মাসিক পত্রিকায়। একটি সরকারী কাজে নিয়োগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অসহযোগ আন্দো-লনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন।

'বিলেত গেলেম, ব্যারিস্টর হইনি। জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মত ধাক্কা পাইনি। নিজের মধ্যে নিয়েছি পূর্ব-পশ্চিমের হাত-মেলানো। আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।' (২১)

জ্ঞানাঙ্কুর

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতি-তে লিখেছেন : 'ছেলেবেলায় আমার একটা মস্ত সুযোগ এই ছিল যে, বাড়িতে দিন-রাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বহিত।...

'আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

'এপর্যন্ত যাহাকিছু লিখিয়াছিলাম তাহার প্রচার আপনা-আপনির মধ্যেই বদ্ধ ছিল। এমন সময় জ্ঞানাঙ্কুর নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে শুরু করিয়াছিলেন।' (২২)

এসম্পর্কে রবীন্দ্র-জীবনীকার লিখেছেন : 'জ্ঞানাঙ্কুর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে মন্তব্য করিয়াছেন, পত্রিকাখানি সেরূপ অকিঞ্চিৎকর ছিল না বলিয়া আমাদের ধারণা। রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল' কাব্য যে-মাসে প্রথম বাহির হইল, সে মাসের লেখক শ্রেণীর মধ্যে...ছিলেন...দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কালীবর বেদান্তবাগীশ, রজনীকান্ত গুপ্ত, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রয়ে। সুতরাং বালক-কবি বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষী-দের সহিত এই পত্রিকা-মঞ্চে একাসন লাভ করিয়াছিলেন। (২৩)

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র তেরো।

কবি নজরুলের যখন তেরো বছর বয়স তখন তিনি ময়মনসিংহের দরিরামপুরে স্কুলের ছাত্র হিসেবে পরীক্ষাকালে বাংলা প্রশ্নের উত্তর কবিতায় লেখেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে স্কুল-পালানোর কথা লিখেছেন। "দাদারা মাঝে মাঝে এক-আধবার চেষ্টা করিয়া আমার আশা একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। একদিন

---

(১৫) কাজী নজরুল-এ [illegible] উদ্ধৃতি

(১৬) ছেলেবেলা, রবীন্দ্রনাথ

(১৭) কাজী নজরুল, প্রাণতোষ চট্টো-[illegible]

(১৮) ছেলেবেলা, রবীন্দ্রনাথ

(১৯) ছেলেবেলা, রবীন্দ্রনাথ

(২০) কাজী নজরুল, প্রাণতোষ চট্টো-[illegible]

(২১) ছেলেবেলা, রবীন্দ্রনাথ

(২২) জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ

(২৩) রবীন্দ্রজীবনী, প্রভাতকুমার মুখো-[illegible]

বড়দিদি কহিলেন, 'আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম, বড়ো হইলে রবি মানুষের মতো হইবে, কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল।' (২৪)

কিন্তু ঘরের পড়া রবীন্দ্রনাথকে টেনে রেখেছিল, কেন্দ্রাশ্রিত প্রকৃতি দিয়েছিল।

"আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বাড়িতে আমাদের শিক্ষক ছিলেন। ......আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া খানিকটা ম্যাক্‌বেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন।......

"রামসর্বস্ব পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি আমাদের সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার ছিল। অনিচ্ছুক ছাত্রকে ব্যাকরণ শিখাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় ভঙ্গ দিয়া তিনি আমাকে অর্থ করিয়া শকুন্তলা পড়াইতেন। তিনি একদিন আমাকে ম্যাক্‌বেথের তর্জমা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শুনাইতে হইবে বলিয়া আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গেলেন। তখন তাঁহার কাছে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বসিয়াছিলেন। পুস্তকেভরা তাঁহার ঘরের মধ্যে ঢুকিতে আমার বুক দুরদুর করিতেছিল; তাঁহার মুখচ্ছবি দেখিয়া যে আমার সাহস বৃদ্ধি হইল তাহা বলিতে পারি না। ইহার পূর্বে বিদ্যাসাগরের মতো শ্রোতা আমি তো পাই নাই; অতএব এখান হইতে খ্যাতি পাইবার লোভটা মনের মধ্যে প্রবল ছিল। বোধকরি কিছু উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিলাম।" (২৫)

(২৪) জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ

(২৫) জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ

অন্তর্মুখীন বনাম বহির্মুখীন

অশেষ সুলভ্য গ্রন্থ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক-নক্ষত্রের বিপুল আকাশ এবং স্বদেশিয়ানার সংরক্ষণশীলতা রবীন্দ্রনাথের জীবনে মাধ্যাকর্ষণের কাজ করেছিল; শেষবে স্কুল-পালানো ছেলে সুরুচির দীর্ঘায়ু ও বিশ্বমানব দৃষ্টি নিয়েও কেন্দ্রচ্যুত হবার দুর্ভাগ্যপীড়িত হননি। কবি নজরুল সংগতখ্যাতি কুড়িয়েছেন বরমাল্যও পেয়েছেন প্রচুর, কিন্তু সে যেন নোঙরহীন ইউলিসিসের নৌকার মতো কোথাও সুস্থির কেন্দ্র গড়তে পারেনি। দারিদ্র্যের দুঃসহ তাড়ণা তাঁকে বৈষয়িকের সংযম লাভের অবকাশ দেয়নি। সরকারী চাকুরী প্রত্যাখ্যান করে গেছেন জেলে, যেচে নিয়েছেন চারণ-জীবন, তাতে সুনামের জলরেখা এঁকেছেন মহাকাল অনেক, কিন্তু ধ্যানস্থ থাকবার আসন বা আশ্রম জোটেনি তাঁর। একেবারেই স্রোতের ফুল।

পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের জীবন যেন রীতিবদ্ধ, নিয়মিত, পদ্ধতিগত। আত্মচিন্তার দুশ্চিন্তামুক্ত (রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নায়কেরাও তাই) রবীন্দ্রসত্তা সযত্নলালিত সাহিত্য সংস্কৃতির নির্মল জলাধারে অবাধ সঞ্চরণ করেছে। নজরুলের জীবনে এমনটি ঘটেনি।

রবীন্দ্রনাথের যখন ২০।২১ বছর বয়স, তখন সন্ধ্যাসংগীত বেরিয়েছে। এসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেনঃ—

> সন্ধ্যাসংগীতের জন্ম হইলে পর সূতিকাগৃহে উচ্চস্বরে শাঁখ বাজে নাই বটে কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যে তাহাকে আদর করিয়া লয় নাই, তাহা নহে।......রমেশ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহসভার দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়াছিলেন; রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে-মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, 'এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য। রমেশ, তুমি সন্ধ্যাসংগীত পড়িয়াছ?' তিনি বলিলেন, 'না'। তখন বঙ্কিমবাবু সন্ধ্যা-সংগীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।" (২৬)

রবীন্দ্রনাথের সার্থক সফল জীবনে অসংখ্য অনুকূল পরিবেশের দৃষ্টান্ত আছে যা এই মহীরুহের মূল সিঞ্চিত করেছে। ঐ বহুর একটি সুবিদিত দৃষ্টান্ত স্বয়ং পিতৃদেবের অতুলনীয় পৃষ্ঠপোষকতা

'একবার মাঘোৎসবে সকালে ও বিকালে আমি অনেকগুলি গান করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা গান—'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।

"পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতিদাদার ডাক পড়িল। হারমোনিয়ামে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সব কটি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল।

"গান গাওয়া শেষ হইলে তখন তিনি বলিলেন, 'দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা

(২৬) জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ

[illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible], তবে [illegible] তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকে সে-কাজ করিতে হইবে।' এই বলিয়া একখানি পাঁচ-শ টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।' (২৭)

পরবর্তী জীবনে নোবেল প্রাইজের যে বিশ্বজনীন মূল্যই হোক, এর চাইতে তা বড় নয়।

নজরুলও জীবনে স্বীকৃতি পেয়েছেন; কিন্তু তাঁর পারিবারিক পরিবেশে ছিল না জ্যোতিদাদা, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ সহোদর, সর্বচূড়ায় স্বয়ং পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ। শ্রীকণ্ঠবাবু থেকে সুরু করে যদু ভট্ট, গৃহ-শিক্ষক পণ্ডিতমণ্ডলী, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আশীষধারা নজরুলের জীবনে এসে পড়েনি। ভিন্ন এক পরিবেশে—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশে—পথ কেটে তিনি ছিটকে পড়েছেন সেনাদলে যেখানে কঠিন-নিগড় শৃঙ্খলা বা নিমানুবর্তিতা থাকতে পারে মহত্তর ভাবনার সংযম স্ফুরিত হতে পারে না। মেধাকে যে সাধনায় জগতোত্তীর্ণ (subliniate) করা যায় করাচীর গলজালাইন ব্যারাক সে সাধনা-পীঠ হতে পারে না। সেনাদল থেকে মুক্তি পাবার পর নজরুল তেমনি আবার ছিটকে পড়েছেন কারাগারে। কারান্তরাল কারও কারও জীবনে (তিলক, শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজী) সত্যালোক বিকীর্ণ করেছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু গান্ধীজীর পরি-কল্পনাহীন অসহযোগ আন্দোলনের হিড়িক সৃষ্টিশীল মেধাকে লোকোত্তীর্ণ করবার সহায়ক একেবারেই নয়। অথচ নজরুলের প্রতিভা কালপুরুষের প্রতিভা মাত্র নয়, নিছক চারণের, নিতান্ত সমকালীন, মাত্র নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নজরুলের প্রতিভায় এই চিরভাস্বরতা দেখতে পেয়েছিলেন বলেই তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন—

> আয় চ'লে আয়রে ধূমকেতু,
> আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু
> দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
> উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।
> অলক্ষণের তিলকরেখা
> রাতের ভালে হোক্ না লেখা
> জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
> আছে যারা অর্ধচেতন।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও ১৯০৫-এর রাখী-বন্ধনে মেতে উঠেছিলেন এবং তাঁর স্বদেশী-গানের ঝুলি সে-সময়ই তিনি বাংলাদেশকে উপহার দিয়েছেন, চারণের ভূমিকাও পালন করেছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক সংরক্ষণশীলতা ছিল যা তাঁকে ফেনিল উন্মত্ততা থেকে আবার কেন্দ্র-বিন্দুতে নিয়ে আসতে পারত—চাঁদে স্পেশ-সিপ পাঠিয়ে আবার তাকে মর্তে ফিরিয়ে আনতে আমরা যেমন বিস্মিত হই। গোটা ব্যাপারটার নিয়ন্ত্রণ থাকে মানুষ বৈজ্ঞানিক বা গাণিতিকদের হাতে। নজরুলের শৈশব-কৈশোর-তারুণ্যে, ঐ হিসেবের অভাব ছিল এবং তাই পরবর্তীজীবনে প্রাধান্য পেয়েছে। অতবড় শক্তি আপনা-আপনি ক্ষয়িত হয়ে গেছে, বাহ্যপ্রকৃতিতে তা প্রক্ষিপ্ত না হয়ে আপনার মধ্যেই তা আবর্তিত হয়েছে।
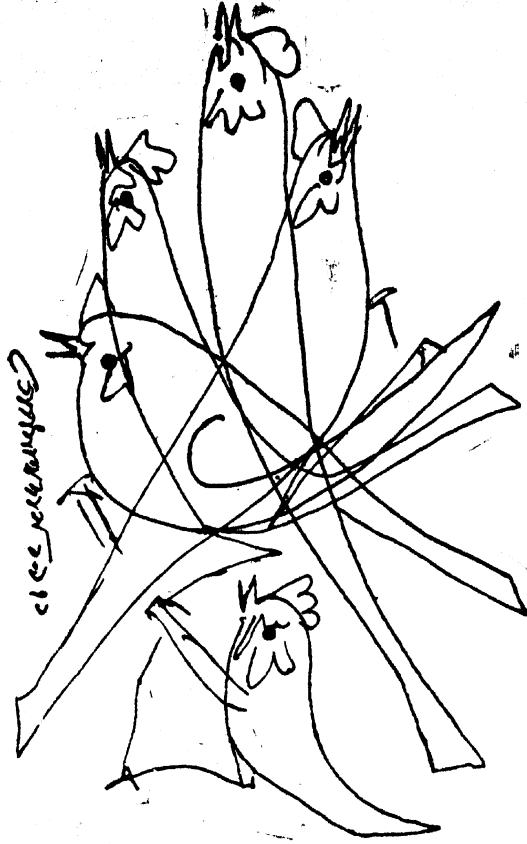
'বিদ্রোহী' কবিতার নজরুল যে সর্ব-জনীন কবি-খ্যাতি লাভ করেছেন তার ৯৯ শতাংশ পলিটিকাল; আমাদের জীবনে তা উন্মাদনা এনেছে এবং উন্মাদনা কালের রেখা মাত্র, কালাতীত কালোত্তীর্ণ নয়। ১৯০৫-এর উন্মদনা বাঙালী জীবনে সবটাই সার্থক হয়নি, ব্যর্থও হয়েছে অনেকখানি, সুতরাং স্পেশসিপটা ছেড়ে দিয়ে বাস্তব মাটিকে স্থায়ী নির্ভরতার ভিত্তিভূমি বলে মেনে না নিলে উৎক্ষিপ্ত বস্তুটা মহাশূন্যে বিলীন বা ক্ষয় হয়েই যাবে। ১৯০৫ এর উন্মাদনাকে উত্তীর্ণ হয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বভূমিতে ফিরে এসেছিলেন ব'লে, সেই উন্মাদনার জের কেন টেনে চলেন নি বলে, সেকালে তিনি অশান্ত রাজনৈতিকদের সমালোচনার পাত্র হয়ে-ছিলেন। কিন্তু স্বার্থান্ধ রাজনীতি প্রতিভাকে চিরকাল সমাদর করে না, সময় আসে যখন সে প্রতিভা তাদের কৃপার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়; রাজনীতি তথ্যতত্তৌথের দিকে এগোয়, প্রতিভা পথপ্রান্তে পড়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ জদি-না স্বাবলম্বী হতে এবং সমুদ্রকন্যার সর্বনাশা বাঁশীই শুনতে থাকতেন, তবে, কে জানে, জমিদারীর নোঙর সত্ত্বেও রবীন্দ্রপ্রতিভাকে নজরুল প্রতিভার মত উঞ্ছবৃত্তির উমেদার হ'তে হ'ত না? রবীন্দ্রনাথের পরিমিতিবোধ তাঁকে রক্ষা করেছে, সুস্থ দীর্ঘায়ু দিয়েছে।

নজরুল রাজনীতিকদের স্বীকৃতি হিসেবে 'সোনার কলম' ও উপহার পেয়ে-ছিলেন, কিন্তু নজরুল তো পারেন নি নজরুল রচনাবলীর স্বর্ণখনি সৃষ্টি করতে। যে অসামান্য দারিদ্র্য ও হতাশার মধ্যে এই বিদ্রোহী কবিকে যুঝতে হয়েছে এবং পয়সার জন্য তাঁর সৃষ্টিকে সহজ পণ্যের মত বিকোতে হয়েছে তা আমাদের পক্ষেও এক দুরপনেয় কলঙ্ক। আজ ঐ নির্বাক, মৃত্যুর চাইতেও নির্মম জীবন্ত সমাধিকে নিয়ে কি উৎসব করে বাংলাভাষা সম্পর্কে মমতাহীন বাঙালীরা? ঐ অসাধারণ প্রতিভা আপন তে আপনি ক্ষয়িত নিস্তব্ধ হ'তে না দেবার দায়িত্ব ছিল যাদের তারা তা পালন করেনি। নজরুলের নামে দুটো একটা চ্যারিটি শোতে আমিও গেছি; সেগুলো উঞ্ছবৃত্তির পিচ্ছল-পথে গড়িয়ে দেওয়া ছাড়া তার কোনই কাজে লাগেনি। নিষ্ক্রিয়দেহকে আগলে রেখে আফশোষ করার মধ্যে প্রচুর বিলাস আছে, পৌরুষ নেই, কারুণ্য আছে তেজ নেই। এবং এই কারণেই গোটা বাঙালী জাতটাই আজ বিশ্বের করুণার পাত্র। অথচ শত শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠাতা এই বাঙালী জাতির মধ্যে অসামান্য প্রতিভা কিছু কম জন্মায়নি। বাঙালীই শুধু তাদের চেনে না। জানে না।

---

(২৭) জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ

বহুবিচিত্র ককতো

জাঁ ককতো সব রকম কাজেই হাত দিয়েছেন—প্রায় সবই—আর একই সঙ্গে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য কাণ্ড যে তিনি যখন যা করেছেন তা ভালভাবেই করেছেন, শুধু ভঙ্গীসর্বস্ব কর্ম নয় তার মধ্যে শক্তিমত্তা ও গভীরতার পরিচয় ছড়ান।

জাঁ ককতো একদা লিখেছিলেন—পনের বছর বয়স থেকে আমি কখনও এক মিনিটের জন্য কাজ থামাই নি। ১৮৮৯ খৃঃ থেকে ১৯৬৩ খৃঃ এই চুয়াত্তর বছরের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি এই উক্তি করেছিলেন। বিংশ শতকের মনীষীদের মধ্যে ককতোর মধ্যে কি যেন একটা বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে যা অন্যের মধ্যে অনুপস্থিত। ককতোর সাহিত্যিক লগ-বুকে অনেক রকম কর্মের ফিরিস্তি—নাটক রচনা, ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন, কবিতা-উপন্যাস লেখা, ছায়াছবি তৈরী করা, প্রবন্ধ রচনা, ছবি আঁকা, ভাস্কর্যে মনোযোগ, মঞ্চ সজ্জাকার, গীতিকার, নৃত্য-প্রযোজনা মঞ্চে ও বাইরে অভিনয় করা ইত্যাদি কি না করেছেন। কবি হিসাবে ককতো সদাসর্বদা নতুন মাধ্যমের অন্বেষণে ব্যস্ত, ব্যালে, মুখোশ ও মিউজিক হল নিয়ে মাতামাতি করেছেন। ককতোর পরিবেশ এবং তাঁর কর্ম প্রায় ফ্যানটাসির সমতুল। প্যালেস রয়্যালের ফ্ল্যাট বাড়ীর বাসায় ককতোর কামরায় একটা প্রকাণ্ড ব্ল্যাক বোর্ড ঝোলান—তার গায়ে সমস্ত দিনের কর্ম-পরিকল্পনা লেখা। কিছুকাল আগে 'দি ঈগল হ্যাজ টু হ্যানডস' নামক নাটকটি যখন লণ্ডনে মঞ্চস্থ হয় তখন লণ্ডনের বিদগ্ধ সমাজ বিস্ময়ে হতবাক।

তবে ককতোর অনেক গ্রন্থ আজো ইংরাজীতে অনূদিত হয় নি তার মধ্যে 'লে ব্যুয়েফ সুর লে টয়' (নাটক), 'লে পটোমাক' (উপন্যাস), এবং 'লে প্রিন্স ফ্রিভোলে' (ছড়া) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অথচ কি না করেছেন ককতো। শুধু উল্লেখ করলেই দেখা যাবে ককতো সে কাজটা এক সময় করেছেন। ককতো পোস্টার এঁকেছেন, চীনা মাটির বাসনের গায়ে অলংকরণ, পর্দার কাপড়ে ছবি এঁকেছেন, অভিনয়ে ব্যবহার্য গহনাপত্র এমন কি নেক-টাই পর্যন্ত অলংকৃত করেছেন। সব রকম পদার্থ নিয়ে কাজ করেছেন। একবার ক্রিসমাস কার্ড বানিয়েছিলেন।

ককতোর এই বহু বিচিত্র জীবন সম্পর্কে আমাদের দেশের মানুষ খুব বেশী হয়ত পরিচিত নন। এই বিস্ময়কর মানুষের সম্প্রতি দুখানি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। একটি জীবনী অপরটি আত্মজীবনী।

ফ্রানসিস স্টিগ মুলার ইতিপূর্বে ফ্লবেয়ার, মোপাসাঁ, এপোলিনেয়র প্রভৃতির জীবনী রচনা করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে-ছেন। 'ককতোর জীবনকথা বোধহয় তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি'। ককতোর বর্ণাঢ্য জীবনের কথার সঙ্গে তিনি তাঁর সমকালীন জগতের কথাও বলেছেন আর সেই সঙ্গে ককতোর রচনাবলীর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণও করেছেন।

ককতোর আত্মজীবনী সংকলন করেছেন রবার্ট ফেলপস, তিনি ককতোর রচনাবলী এবং তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে নানা কথা সংগ্রহ করে লিখেছেন 'প্রোফেশনাল সিক্রেটস : অ্যান অটো-বায়োগ্রাফী অব জাঁ ককতো।' এই গ্রন্থটি ফরাসী ভাষা থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন রিচার্ড হাওয়ার্ড।

বিষয়বস্তু বিচারে বলা যায় দুটি গ্রন্থ দুই বিপরীত দিকের ছবি। ফেলপস তাঁর গ্রন্থের মাল-মশলা সাজিয়েছেন মুখ্যত আত্মস্মৃতি থেকে অপর দিকে স্টিগ মুলার নির্ভর করেছেন কাহিনী এবং বন্ধু ও সম-কালীন মানুষের মুখনিঃসৃত ঘটনা ও রটনার ওপর।

ককতোর একটি উক্তি প্রায়ই উদ্ধৃত হয়ে থাকে—

"I am a lie that always tells the truth—"

ককতোর এই লাইনটিই স্টীগ মুলারের গ্রন্থটির মূলসূত্র।

স্টীগ মুলার তাঁর সংগৃহীত ঘটনা-গুলি একের পর এক সাজিয়েছেন, মোজাইকের টুকরো যেমন করে সাজান হয় সেই পদ্ধতিতে, ফলে হরেক রকম রঙের সমাবেশ ঘটেছে হরেক রকম কর্মের বেপারী জাঁ ককতোর জীবন কথায়।

উভয় গ্রন্থেই পাঠযোগ্য অজস্র মাল-মশলার সমাবেশ ঘটেছে। তবে সংলগ্নতা এবং ধারাবাহিকত্বের দিক থেকে স্টীগ মুলারের গ্রন্থটিই সুসংবদ্ধ। ফেলপাসের সংকলনটি তা নয়, ককতো যেভাবে আপনাকে দেখেছেন তার প্রকাশও সেই ভঙ্গীতে ঘটেছে।

ককতো পৌরাণিকত্ব প্রেমিক এবং পুরাণমগ্ন মানুষ, ফলে তাঁর জীবনী-গ্রন্থের মালমশলাও পুরাণ বৃত্তান্তের সঙ্গে বিজড়িত। আত্মজীবনী থেকে সত্য যে অনুপস্থিত তা নয় তবে সুনির্বাচিত ভঙ্গীতে সত্যকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার প্রয়োগও ঘটেছে সুবিধা মাফিক রীতিতে।

ককতো আরেক অরফিউস, তিনি নিজের দেহের শোনিতে কলম ডুবিয়ে কবিতা লেখেন কিন্তু সেই ককতো যখন নিজের কথা লিখতে বসেন তখন তিনি নিজের গতিবেগ প্রতিরোধ করতে অসমর্থ।

আসল কথা সত্যের অনেক রূপ, একটি সত্যের পিছনে প্রচ্ছন্ন আছে আরো অনেক সত্য, একটি তথ্যের পিছনে অনেক তথ্য। যে শিল্পীর জীবনধারা এত বিচিত্র যাঁর মানসিকতার ব্যাপ্তি এত বিরাট তার অন্তরের গভীরেও আছে বৈচিত্র্যময় স্তর।

সব জড়িয়ে একটি মানুষ, যে মানুষ অসাধারণ, যে মানুষ বিচিত্র, যে মানুষ বর্ণময়। পরিপ্রেক্ষিত ও ক্লান্তিহীন কর্ম-ধারার জন্যই ককতো চরিত্র এতখানি আগ্রহ জাগায় পাঠকচিত্তে। এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশ পর্যন্ত পাঠযোগ্য। কিম্বা বলা যায় অবশ্য পাঠ্য।

টেকসাস শহরের ভডিভিল অভিনেতা বারবেটের সঙ্গে ককতোর কথাবার্তার যে বিবরণ আছে তার মধ্যে একটি উপন্যাসের উপাদান লুকিয়ে আছে।

ফেলপসের গ্রন্থটির চেয়ে অবশ্য স্টীগ মুলারের জীবনী অনেক তথ্যপূর্ণ এবং বিশ্লেষণ ধর্মী।

সমালোচনার সীমিত পরিসরে এই গ্রন্থের পৃষ্ঠায় অনেক খ্যাতনামা মহা-মনীষীদের যে সব প্রেমলীলা, কেচ্ছা প্রভৃতির রসাল বিবরণ দেওয়া আছে তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। ককতোর সঙ্গে যাঁদের যোগাযোগ ছিল তাঁদের নিয়ে অনেক গল্প গুজব আর সেই সঙ্গে একটি জটিল জীবনের অনেক আলো-অন্ধকারময় দিকের পরিচয় আছে। তবে জলটুকু বাদ দিয়ে হাঁস যেমন ক্ষীর-টুকু গ্রহণ করে সেইভাবে পাঠকও অনেক সত্যের সন্ধান পাবেন।

উনিশ শতকের একজন প্রখ্যাত চিত্ত-বিনোদক অভিনেতা ছিলেন ফ্রেগোলী, এই জাতীয় অভিনেতার নাম 'কুইক চেঞ্জ

আর্টিস্ট'। এ'রা অতি দ্রুত সাজ-পোশাক পাল্টে নতুন চরিত্রের অভিনয় দেখাতেন। ফ্রেগোলীর সঙ্গে থাকত ৩৭০টি পেণ্টরা, ৮০০ পোশাক আর ৩০০ টন মঞ্চোপযোগী মাল-মশলা। মরিস রোসটাণ্ড এক জায়গায় ককতোকে ফ্রেগোলীর সমতুল বলেছেন।

তবে ফ্রেগোলী হলেও ককতো মুখ্যত কবি। যে লেখক সর্বদা কবির অদৃশ্য সত্তার কথা বলে থাকেন তিনি কিন্তু সদা-দৃশ্যমান।

ককতো নিজের সমাধি-ফলকের পরিকল্পনাও করেছিলেন। একটি লেপার কলোনীর বাসিন্দারা মিলি-লি ফোরের যে অবহেলিত গির্জাটি ব্যবহার করত এই সমাধি সেই গির্জার চিত্রে অলংকৃত। ককতোকে সেখানেই সমাধিস্থ করা হয়।

জীবনকথা রচনাও যে একটি শিল্পকর্ম তার পরিচয় স্টীগ মুলারের রচনায় পাওয়া যাবে. তিনি অনেক জায়গায় ককতোকে নতুন করে গড়েছেন. নতুনরূপে এ'কেছেন এবং সেই নতুন মূর্তি পাঠকমনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মহৎ শিল্পীর জীবনী যেন জীবন সমুদ্রে আলোকবর্তিকা। স্টীগ মুলারের এই জীবনকথা এক বিচিত্র মানুষের বিচিত্রতম কাহিনী।

—অভয়ংকর

---

(1) COCTEAU: By FRANCIS STEEGMULLER; ATLANTIC MONTHLY : LITTLE BROWN : 12-50 Dollars;
(2) PROFESSIONAL SECRETS : AN AUTO BIOGRAPHY OF JEAN COCTEAU compiled by Robert Phelps : FARRAR STRAUSS & GIROUX: 8-50 dollars;

বিবেকানন্দের স্বপ্ন : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচারের শিবানন্দ হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসু সেবাব্রত ও স্বামী অখণ্ডানন্দ বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন। তিনি বলেন—স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন ছিল নারায়ণজ্ঞানে দরিদ্র সেবা, তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও তাদের উন্নয়ন। রাজপুতানায় অবস্থানকালে স্বামী অখণ্ডানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলেন। সেই চিঠিতে স্বামীজি লিখেছিলেন—আমাদের কথা হল মূর্খ দেব ভবঃ দরিদ্র দেব ভবঃ—শাস্ত্রে আছে পিতৃদেব ভবঃ মাতৃদেব ভবঃ এই কথাটি ঘুরিয়ে বলেছিলেন বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের দরিদ্রজন সেবার স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল স্বামী অখণ্ডানন্দের সেবাধর্মের অনুশীলনে। মানুষের প্রতি ভালোবাসা ছিল স্বামী অখণ্ডানন্দের সেবাধর্মের অনুশীলনে। মানুষের প্রতি ভালোবাসা ছিল স্বামী অখণ্ডানন্দের হৃদয়ের সহজাত প্রবৃত্তি, রাজপুতানায় গোলা নামক একটি সম্প্রদায় ক্রীতদাসের মত জীবনযাপন করত। রাজন্যবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করেন এবং সেবার দ্বারা তাঁদের হৃদয় জয় করেন। স্বামী অভেদানন্দ ও নির্মলানন্দ সেইকালে অখণ্ডানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে মন্তব্য করেন—স্বামী অখণ্ডানন্দ সর্বদাই বিদ্রোহী জনসাধারণের সমর্থন করতেন। ১৮৯৭ খৃঃ তিনি 'অনাথ আশ্রম' স্থাপন করে বিবেকানন্দের স্বপ্ন সার্থক করেন। অধ্যাপক বসুর বক্তৃতাটি প্রচুর মূল্যবান তথ্যে সমৃদ্ধ হওয়ায় বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়।

সিনিয়াভস্কীর মুক্তি :

বিশ্বস্ত সূত্রে একটি সংবাদ সংস্থা জানতে পেরেছেন পাঁচ বছর আগে সোভিয়েত লেখক আঁদ্রে সিনিয়াভস্কীকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নিন্দা করার অভিযোগে সাত বছরের জন্য 'লেবার ক্যাম্পে' নির্বাসিত করা হয়। সম্প্রতি উত্তম আচরণের জন্য দণ্ডহ্রাস করে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। অবশ্য সোভিয়েত লেখক সমিতি বা কোনো সরকারী মহল এই সংবাদ এখনও সমর্থন করেন নি।

রাশিয়ায় প্রাচ্য বিদ্যার পাণ্ডুলিপি : সোভিয়েত তাজাকিস্তানে প্রাচ্যদেশীয় পাণ্ডুলিপির এক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এই তালিকায় সতের শতক থেকে বিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত ভারতীয়, ইরানীয় ও আরবী বিদ্যাচর্চার পরিচায়ক চারশতখানি পাণ্ডুলিপির বিবরণ আছে। তাজিক প্রজাতন্ত্রের বিজ্ঞান আকাদমির প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ক সংস্থার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহশালার অধিকর্তা আবদুলে গনি মিরজাইয়েভ জানিয়েছেন যে এই সংগ্রহশালায় ৭০০০ প্রাচ্য বিদ্যাচর্চা সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি আছে। ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের লোকসাহিত্যের বিভাগে তাজিক গবেষকবৃন্দ গবেষণারত রয়েছেন।

ফরাসী সাহচর্যে ভারতবিদ্যাচর্চা : পণ্ডিচেরীতে ইনস্টিট্যুট ফ্রাঁসে দ'ইনডোলজিক নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৫৫ খৃঃ স্থাপিত হয় এবং শিল্প, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তামিল ভাষার গ্রন্থাবলী নিয়ে চর্চা চলছে। এই ভারতবিদ্যা বিষয়ক ফরাসী প্রতিষ্ঠানে মুখ্যতঃ তামিল এবং কিছু কম পরিমাণে বাংলা এবং রাজস্থানী (হিন্দি) ভাষাচর্চা হয়ে থাকে। ডাঃ জাঁ ফিলিওজাত এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও অধিকর্তা। ভারতবিদ্যার সঙ্গে ফরাসী চর্চার একটা সুযোগ পাওয়া যায় এই প্রতিষ্ঠানে।

লাভ স্টোরী : রাশিয়ার লিটারেরি তুর নায়া গেজেটায় জনপ্রিয় উপন্যাস 'লাভ স্টোরী'র (অমৃতে আলোচিত) চিত্ররূপ সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে :

'অর্থনৈতিক নৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকটের এই কালে ইলেকসন শ্লোগানের মত এক আদিম গ্রন্থ মার্কিনিদের উপহার দিয়েছেন এরিক সেগ্যাল। এই উপন্যাসটি বৃদ্ধা-রমনীর সুখের দিনের স্মৃতির স্বপ্নের মত রোমান্টিক।......মার্কিনীরা এই উপন্যাস পড়ছে আর কাঁদছে, এ এক আশ্চর্য কাণ্ড। কারণ গড়পড়তা হারে মার্কিনীদের কাছে বই পড়া একটা প্রিয় ব্যসন নয়, তারা বই পড়ার চাইতে টেলিভিসন দেখতে বা টাকা কামাতেই বেশী ভালোবাসে।' এই রসিকতা সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কবির সম্মান : ডঃ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে ন্যুইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেণ্ট 'ইউনিভার্সিটি প্রোফেসার' নিযুক্ত করেন। অধ্যাপনার ক্ষেত্রে যাঁরা সর্বোচ্চ স্তরে পেণছেছেন ,তাঁরা এই সম্মানের অধিকারী হন।

পরলোকে বাঙালী লেখক : কনেকটিকটের নরওয়াকস্থ বাসভবনে ভারতীয় লেখক কুমার ঘোষাল ৭১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ভারত ও আফ্রিকা প্রসঙ্গে তিনি একজন সুদক্ষ বক্তা ছিলেন। তাঁর 'দি পিপল অব ইণ্ডিয়া' (১৯৪৪) এবং 'পিপল অ্যাণ্ড কলোনীজ' (১৯৪৮) গ্রন্থদুটি উচ্চ প্রশংসিত। ১৯৬১-তে তিনি ভারতভ্রমণে এসে নেহরুজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীযুক্ত কুমার ঘোষাল কলিকাতার অধিবাসী ছিলেন।

ওফেলিয়াকে। অসিতকুমার ভট্টাচার্য। এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা—১২। দাম : তিন টাকা।

অসিতকুমার ভট্টাচার্য তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বাতাবরণ'-এ এখন থেকে প্রায় দশ বছর আগেই শক্তির স্বাক্ষর রেখেছিলেন। ওই বড় আকারের সমুদ্রিত বইটির অনেক কবিতাই তখন আমার ভাল লেগেছিল। অসিতকুমার মেজাজের দিক থেকে একালের আধুনিক কবিদের অন্যতম এবং পূর্বোক্ত গ্রন্থের মত বর্তমান কাব্যগ্রন্থেও তিনি নিজস্ব এমন একটি ঈষৎ বিষণ্ণ সুর সৃষ্টি করতে পেরেছেন যা কাব্যপাঠককে আকর্ষণ করে। তাঁর বেশীর ভাগ কবিতা স্পষ্টতই আবেগপ্রধান এবং

বাংলা কবিতার প্রবহমান ঐতিহ্যের সংলগ্ন বলা যেতে পারে। তাঁর কবিতা সাবলীল ও প্রাঞ্জল, ক্রুদ্ধ দশকের ক্রোধ বা ক্ষোভ তাঁকে প্রভাবিত করলেও তার প্রকাশে আঙ্গিকের কোন ব্যতিক্রম নেই। তৎসত্ত্বেও কবিমন সর্বত্র সজাগ এবং প্রকৃতিতে ও জীবনে বিচিত্র বিষয়ের সন্ধানী। অল্প কথায় মাঝে মাঝে ছবি ফোটাতে পারেন বলেই তাঁর কবিতার সুর কাব্য পাঠকের অনুভবে সঞ্চারিত হয়। 'ওফেলিয়াকে' কাব্যগ্রন্থের 'ক্লান্তিই আমার সঙ্গী' কবিতাটি উদাহরণত উল্লেখযোগ্য। একালের নিঃসঙ্গতা-বোধ, আদর্শের শূন্যতা এবং বঞ্চনার বিষাদে অসিতকুমারের বোধ ও অনুভূতির জগৎও বিষাদান্ত। কবির অনুভবের জগতে চারিপাশে অনড় ছায়ারা বাঁচে না, মরে না। শুধু এলোমেলো সময়ের কারা ঘিরে থাকে।' এবং অন্যত্র 'ওরে অন্ধ, অবিবেকী বেগ/সমুদ্রের চূর্ণ ফেনা, মাথা কোটা, সৈকতে প্রহত/পারি না, পারি না আর; শুধু ক্ষত, শুধু রক্তক্ষত/আমাকে বিস্মৃতি দাও, পিতা তুমি, কোথায় ঈশ্বর?' এক নিমেষেই কবির আন্তরিক অনুভবের সঙ্গে কাব্য পাঠকের চৈতন্যকে সংযুক্ত করে।

অসিতকুমার শক্তিমান কবি বলেই তাঁর কাছে কাব্য-পাঠকের প্রত্যাশা সম্ভবত বেশী। আঙ্গিকের দিক থেকে তেমন কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বর্তমান গ্রন্থে দেখা যায় না। সে-কারণেই সন্ধানী কাব্য-পাঠকের মনে হতে পারে 'ওফেলিয়াকে' কবির প্রথম কবিতা বইয়েরই পরিপূরক কাব্যগ্রন্থ। অসিতকুমার সচেতন ও অভিজ্ঞ কবি; পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে তাঁর কবিকৃতীর নতুনতর পর্যায়ের সঙ্গে একালের কাব্যপাঠক পরিচিত হবার সুযোগ পাবে আশা করা যায়। বর্তমান কাব্যগ্রন্থের অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ তৃপ্তিকর।

সকলের দেশবন্ধু (জীবনকথা)—মঞ্জু দত্তগুপ্ত। বাক সাহিত্য (প্রা) লিমিটেড। কলিকাতা-৯। দাম ঃ সাত টাকা মাত্র।

দেশবন্ধু বাঙালীর কাছে এক অতি প্রিয় নাম। তিনি বাঙালীর অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। সাতচল্লিশ বছর আগে দার্জিলিঙে দেশবন্ধুর দেহাবসান ঘটে। তারপর ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনেক পট পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু এই অবিস্মরণীয় পুরুষ স্বীয় দীপ্তিতে আজো বাঙালীর চিত্তমন্দিরে উদ্ভাসিত হয়ে আছেন। দেশবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য জীবনচরিত প্রকাশিত হয়েছে। দেশবন্ধু জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে যেসব আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে তার অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য। ডঃ মঞ্জু দত্তগুপ্ত প্রণীত 'সকলের দেশবন্ধু' এমনই এক অভিনন্দনযোগ্য গ্রন্থ। ডঃ দত্তগুপ্ত উনিশ শতকের বাংলা, দেশবন্ধু পরিবারের কথা, সারস্বত সাধনায় দেশবন্ধু, কল্লোলমুখরিত দেশবন্ধু জীবনের গৌরবময় দিনগুলি অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে বিধৃত করেছেন। ডঃ মঞ্জু দত্তগুপ্ত দেশবন্ধুর সমসাময়িক কালের তথ্যাবলী সংগ্রহ করে গ্রন্থটিকে একদিকে যেমন তথ্য-সমৃদ্ধ করেছেন তেমনই আবার অতিশয় সরস ভঙ্গীতে সেই তথ্যাবলী পরিবেশন করে অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। লোকমাতা বাসন্তী দেবীর স্নেহধন্যা লেখিকার সমস্ত প্রয়াস জয়যুক্ত হয়েছে। তাঁর এই গ্রন্থে তথ্যের সঙ্গে শ্রদ্ধা মিশ্রিত হওয়ায় গ্রন্থটির মূল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকাটি গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। এই সুমুদ্রিত গ্রন্থে অনেকগুলি ছবি সংযোজন করা হয়েছে। ডঃ মঞ্জু দত্তগুপ্ত যেভাবে 'দেশবন্ধুর জীবনকথা' পরিবেশন করেছেন সেই ভঙ্গীতে বিগত যুগের আরো কয়েকজন স্মরণীয় বাঙালীর জীবনকথা রচনা করলে বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ হবে।

নৃত্যের তালে তালে—ইসাডোরা ডানকান। (সংক্ষেপিত অনুবাদ ঃ সরিৎশেখর মজুমদার)। প্রকাশক ঃ রূপা; কলকাতা, এলাহাবাদ, বোম্বাই, দিল্লী। দাম—আট টাকা।

ইসাডোরা ডানকানের 'মাই লাইফ' ত্রিশের দশকের এক চাঞ্চল্য সৃষ্টিকর গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সর্বত্র সাড়া পড়ে যায়, তার প্রধান কারণ অবশ্য নর্তকী ইসাডোরার খ্যাতি এবং অখ্যাতি। 'মাই লাইফে'র আরেকটি সংক্ষেপিত বঙ্গানুবাদ 'আমার জীবন' নামে প্রকাশিত হয়েছে প্রায় ত্রিশ বছর আগে এবং অনুবাদ করেছিলেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র। সেই গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। সরিৎশেখর মজুমদার সুপণ্ডিত এবং ইতিপূর্বে কয়েকখানি বিদেশী গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। ইসাডোরার এই সুবিখ্যাত জীবন কাহিনী অনুবাদেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তবে কিছু বিদেশী শব্দের যথাযথ বঙ্গীকরণ হয় নি যথা ঃ গেইসা স্থলে গায়সা, এলিওনারা দুজের স্থলে ইলিনোরা ডিউস, তুইলেরিসের স্থলে তুলারি —ইত্যাদি। মূল গ্রন্থের সংক্ষেপিত অনুবাদে কাহিনী অংশ অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে। গ্রন্থটির মুদ্রণ পারিপাট্য মনোরম।

জাদু (গল্প)—প্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। মহাশ্বেতা, ৮ নরসিং দত্ত রোড, হাওড়া-১। মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি উনিশ শ আটাশ থেকে উনিশ শ উনসত্তরের মধ্যবর্তীকালে লিখিত মোট নয়টি ভিন্ন স্বাদের গল্পের সংকলন। লেখক শ্রীপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় সাধু এবং চলিত উভয় রীতির গদ্যেই গল্পগুলি রচনা করেছেন। যারা গল্পের শেষে চমক ভালবাসেন তারা এ গ্রন্থ পড়ে আনন্দ পাবেন। ছোটখাটো প্রেম-বিরহ, দুঃখ, আশা-হতাশা এ গ্রন্থের গল্পগুলিতে ছড়িয়ে আছে। প্রতিদিনের সাধারণ কথাকে সহজ ও স্মিতভাবে বলতে লেখক অভ্যস্ত।

সঙ্কলন ও পত্র-পত্রিকা

সাহিত্য ও সংস্কৃতি (মাঘ-চৈত্র)— সম্পাদক সঞ্জীবকুমার বসু। চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদ। ১০ হেস্টিংস স্ট্রীট। কলকাতা-১। দাম দেড় টাকা।

প্রবন্ধ-সাহিত্য ও সংস্কৃতির এই সংখ্যাটিতে লিখেছেন জগদীশনারায়ণ সরকার (আচার্য যদুনাথের ইতিহাস দর্শন), জগন্নাথ চক্রবর্তী (মেঘনাদবধ কাব্যের পঞ্চম সর্গ), হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ('ফাল্গুনী' নাটকের নাটকীয়তা)। কমলাক্ষ সরস্বতী এবং জগন্নাথ চক্রবর্তী দেশী ও বিদেশী সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই ধরনের পত্রিকার বহুল প্রচার না থাকা সত্ত্বেও, এর নিয়মিত প্রকাশ এবং সুসম্পাদনায় সম্পাদকের দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধের পরিচয় মেলে।

শিলীন্দ্র (সপ্তম সঙ্কলন)—সম্পাদক ঃ কনাদ গঙ্গোপাধ্যায়, অমল মুখোপাধ্যায় এবং প্রণবকুমার চক্রবর্তী। ১০এ বাঘাযতীন রোড, কলকাতা—৩৬। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

শিলীন্দ্রের বর্তমান সংখ্যাটি গল্প, কবিতা এবং একটি একাঙ্কিকায় সমৃদ্ধ। লিখেছেন আনন্দ বাগচী, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, বিমল কর, রঞ্জিৎ রায়চৌধুরী, ভিয়াদ আলি, রবীন সুর এবং আরো কয়েকজন।

পান্ডুলিপি (প্রথম সংখ্যা)— সম্পাদক ঃ দেবদাস ভট্টাচার্য। ৫।১ডি টি এন চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা-৫০। দাম ষাট পয়সা।

প্রথম সংখ্যাতেই পত্রিকাটির রচনা-নির্বাচনে সুরুচির পরিচয় মেলে। লিখেছেন—অভ্র ঘোষ, দীপেন্দু চক্রবর্তী, দেবদাস ভট্টাচার্য, শ্যামসুন্দর দত্ত, অভিজিৎ সরকার, শুভঙ্কর ঘোষ, সুভাষ ঘোষ এবং আরো অনেকে।

রূপসী বাংলা (পাক্ষিক)—সম্পাদক ঃ দেবাশীষ গৌতম। ৫বি, মুখার্জিপাড়া লেন, কলকাতা—২৬। ২৫ পয়সা।

তরুণ লেখক-লেখিকাদের চিন্তা-ভাবনা গল্প, কবিতা আলোচনার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। লিখেছেন ঃ তাপস চক্রবর্তী, অবিজ্যোতি দেব, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর দাশগুপ্ত, উষা ভট্টাচার্য, প্রভাত দাস, সত্যানন্দ গুহ, অজয় রাউত, অনিলকুমার চক্রবর্তী, নির্মলেন্দু গৌতম ও প্রকাশ গুপ্ত।

প্রাপ্তি স্বীকার

দেয়ালা (১ম বর্ষ ১০ সংখ্যা)—সম্পাদক ঃ শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়। ১৯/৪ ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট। কলকাতা-২৬।

কিন্তু (মে ৭১) সম্পাদক ঃ পরিতোষকান্তি পাল এবং স্বপনকুমার প্রামাণিক। ১১৮ এম বি রোড। নিমতা। কলকাতা-৪৯। দাম ঃ পঁচিশ পয়সা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কানাই বলাই এর দোষ দেওয়া যায় না। একে অন্ধকার, তাতে হট্টগোল, তায় আবার তারা জরাকে চেনে না এমন অবস্থায় ইচ্ছা থাকলেও জরাকে আবিষ্কার সম্ভব ছিল না।

সত্যাই সম্ভব ছিল না। দলবল যখন যদুরমণীদের আক্রমণ করছিল তখন খট্যাস ও জরা কিছু দূরে অন্ধকারের মধ্যে একখানা পাথরের উপরে উপবিষ্ট ছিল।

খট্যাস বলল, রাজা তুমি যে গেলে না!

জরা বলল, বলো তো যাই।

না দরকার নাই ওরা এখনি ফিরে আসবে।

তারপরে দুজনেই নীরব হল। খট্যাস ভাবছিল মেয়েদের নিয়ে এলে আজ রাতেই রাজধানীর দিকে ফিরতে হবে, দু'চার দিনের মধ্যেই জল নেমে যাবে যদি না ইতিমধ্যেই নেমে গিয়ে থাকে। তার বহুদিনের বাঞ্ছা নতুন রাজ্যপ্রতিষ্ঠা, যে রাজ্যে পুরাতন সামাজিক সংস্কার ও মানুষে মানুষে উচ্চাবচতা থাকবে না। সমস্তই স্থির ছিল, অভাব ছিল রাজার, এতদিনে সে রাজাও মিলেছে, এখন কেবল সদলবলে ফিরে যাওয়ার অপেক্ষা।

জরার চিন্তাস্রোত অন্য খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল, বস্তুত তাকে স্রোত বলাই উচিত নয়—সে যেন চিন্তার মস্ত একটা বিল, তাতে জল আছে, গতি নাই, তল আছে কূল নাই, ঘন শৈবালদামে পদে-পদে পথ প্রতিহত, নাবিকের ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে নৌকা সেখানে বাতাসের খেয়ালে চলে। সে যেন একটা প্রকৃতির অরাজকতা। চিন্তার অরাজকতায় পতিত জরা।

সেদিনের সেই ঘটনা, বাসুদেবের মৃত্যুকে শব্দে উচ্চারণ করে না সে, বলে সেদিনের সেই ঘটনা। তারপর থেকে অতর্কিত অসম্ভব অপ্রত্যাশিত ঘটনার ধাক্কা তাকে বিহ্বল বিমূঢ় করে ফেলেছে। জরা এখন জরাগ্রস্ত। দেহ তেমনি সবল পুষ্ট আছে চিন্তায় জরাগ্রস্ত। যতই ঘুড়ি ওড়ার সুতো ছিঁড়ে গিয়ে ঘুড়ি চলে যায় কোন শূন্যে। কতবার মৃত্যুর কথা ভেবেছে, খট্যাসের চোখে চোখে আছে, মৃত্যুর পথ বন্ধ। আহা যদি কেউ তাকে গলাটিপে মেরে ফেলে দিত। জরতীই সুখী। জরতীর কথা মনে পড়তেই দু চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো, সেই জলের ধারায় সমস্ত বুক সারা শরীর জুড়িয়ে গেল। কে বলে চোখের জল উত্তপ্ত।

এমন সময়ে মল্লিকা এসে উপস্থিত, বলল, সর্দার বড় বিপদ যে হল।

খট্যাস শুধালো, কেন, কি হয়েছে?

তোমার দলের লোকেরা মেয়েগুলোকে নিয়ে যার যেদিকে চোখ যায় চলে গিয়েছে।

নির্বিকারভাবে খট্যাস বললো, তাতে ক্ষতি কি হয়েছে?

ওরা কি আর ফিরবে?

খিদে মিটে গেলেই ফিরবে, অনেককাল উপোসী আছে কিনা।

তারপরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, উপায় থাকলে একটাকে নিয়ে আমিও অন্ধকারে গা-ঢাকা দিতাম কিন্তু ভগাশালা যে গোড়ায় মেরে রেখেছে।

সর্দার, ভগবানকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করা ভালো নয়।

কেন ভালো নয়, ভগবানের সঙ্গে যে আমার ঠাট্টা-তামাশার সম্পর্ক। কতজনে তাকে কতরূপে ভজনা করে, আমি করছি শ্যালকরূপে। এই বলে হাসির করাতে অন্ধকারের আবলুস কাঠকে চিরতে লাগলো।

এ হাসি আগে শোনেনি মল্লিকা, তার সমস্ত অস্তিত্ব শিউরে উঠলো, তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়লো, একটি মুহূর্ত নষ্ট করবার উপায় নেই তার।

কোথায় গেল রম্ভা! সে যে পালায়নি, কোন পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। কিন্তু কোথায় সে? সমস্ত অন্ধকার প্রান্তর শত শত নর-নারী মিথুনে ভরে গিয়েছে, কেউ বা একটু ঝোপের বা একখণ্ড পাথরের আড়াল খুঁজে নিয়েছে, কারো বা তারও প্রয়োজন হয়নি। এ এক বিচিত্র দৃশ্য।

একটা মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে সন্ধান করতে লাগলো। হঠাৎ আলোর চমকেও কারো সম্বিৎ হল না। মল্লিকারও যেন সম্বিৎ নাই, তার দৃষ্টি লক্ষ্যসন্ধানী। অবশেষে অনেক সন্ধানের পরে একখণ্ড পাথরের আড়ালে রম্ভাকে দেখতে পেলো। পুরুষের গায়ে মশালের ছ্যাঁক দিতেই বাপ্ বাপ্ করে পালালো, লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে মুখোমুখী হল রম্ভা ও মল্লিকা।

তুমি আমার পুরুষটাকে তাড়িয়ে দিলে কেন?

কোলের মানুষ কেড়ে নিলে কেমন লাগে তারই একটু স্বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে—ধীরভাবে উত্তর দিল মল্লিকা।

একদিকে আহত ব্যাঘ্র অন্যদিকে নির্বিকার শিকারী।।

আমি কে জানো?

জানি বইকি, রাজবাড়ীর কুলটা বধূ।

গর্জন করে উঠল রম্ভা, কুলটা!

আর কি বলে তা তো জানিনে।

তুমিও তো গোঁসাইঠাকরুন নও তবে হঠাৎ কেন? আমার যা খুশি করবো, বলে রম্ভা।

সত্যি কথাই বলেছ, আমি গোঁসাইঠাকুরুনও নই আর আমার এ কাজ হঠাৎও নয়। আমার কোলের পুরুষ একদিন কেড়ে নিয়েছিলি আজ তারই প্রতিশোধ দিলাম।

তোমার কোলের মানুষ! ভেবে পায় না রম্ভা, তোমার কোলের মানুষ। তারপর

বলে ওঠে, দেখি দেখি একবার আলোটা তুলে ধরো তো।

মল্লিকা মশাল তুলে ধরলো। আলোর পূর্ণ প্রতিফলন হল দুজনের মুখের উপরে। এবারে রত্নার স্মৃতি আলোড়িত হয়ে পরিচয় উদ্ঘাটিত হল। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ধিক্কারে ঘৃণায় অবজ্ঞায় লাঞ্ছনায় মিলিয়ে বলে উঠল—তাই বলো এ যে আমাদের মল্লিকে।

অনুরূপ রসের মিশ্রণে মল্লিকা বলে উঠলো, হাঁ গো হাঁ রত্নো।

রত্না সবলে ঝাপ দিয়ে এসে পড়লো মল্লিকার উপর, হাতের মশাল ফেলে দিয়ে রত্নাকে প্রাণপণ শক্তিতে জড়িয়ে ধরলো মল্লিকা। দুজনে মাটিতে পড়ে গেল।

পরদিন প্রাতে দেখতে পাওয়া গেল সহস্রধা ক্ষতবিক্ষত দগ্ধ পিষ্ট ক্লিষ্ট দুটি নারীদেহের মাংসপিন্ড পরস্পরের বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আছে। নারী করুণাময়ী।

পরদিন সকালে দলের লোক ফিরবে আশায় খট্যাস অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলো, কেউ ফেরে না দেখে খুঁজতে বার হল। বেশিদূর যেতে হল না, কাছা-কাছিতেই সকলে ছিল, অনেকেই গত রাত্রের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে, অনেকে রাতের সঙ্গিনীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে নিযুক্ত। যে-সর্দারকে আগে তারা বাঘের মত ভয় করতো আজ তাকে দেখেও দেখল না, সর্দার ডাকলে অনেকেই উত্তর দিল না, অনেকে যে উত্তর দিল তা আরও নৈরাশ্যকর।

খট্যাস বলল, নরক অনেক তো হল এবার দাসীদের নিয়ে রাজধানীতে ফিরবার উদ্যোগ করো।

নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে নরক উত্তর দিল, রসো ঠাকুর, আগে ভালো করে রাজ-রাণী বুঝেনি তারপরে রাজধানীর কথা ভাববো।

মসা, অসুর, অঙ্কুশ, পাতক প্রভৃতি প্রধান সকলেরই উত্তর প্রায় এই ধরনের—কেউ নবলব্ধ ঐশ্বর্য ছেড়ে অন্যত্র যেতে রাজি নয়। খট্যাস বিস্মিত হয়ে ভাবলো কি আশ্চর্য এক রাত্রির মধ্যে তার সন্ত্রাসকর প্রভাব মন্ত্রবলে লুপ্ত হয়ে গেল। কিসের মন্ত্র? খট্যাস যদি স্বাভাবিক মানুষ হতো বুঝতে পারতো যে-মন্ত্রে চরাচরে প্রাণ-প্রবাহ স্পন্দিত হচ্ছে এ সেই মন্ত্র, যে-মন্ত্র সব মন্ত্রের উপরে। মসা তার প্রধান চেলা বলে দিল, এ রস গ্রহণের ক্ষমতা থাকলে তুমিও আমাদের মতো উত্তর দিতে। যাই হোক, তোমার রাজ্য তুমি স্থাপন করো গে আমরা চললাম যেদিকে চোখ যায়। তারপরে দেখল সত্য সত্যই সকলে, জোড়ে জোড়ে যার যেদিকে ইচ্ছা চলে গেল। হতাশ হয়ে ফিরে এসে জরার পাশে পাথরখানার উপরে বসতেই জরা বলে উঠল। সর্দার ঐ যে ওখানে রানীটা মরে পড়ে আছে। বলাই গিয়েছে বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবতে লাগলো।

তার মনে পড়ছিল প্রভুদয়ালের সেই সতর্কবাণী, কিঞ্জল্ক পল্বলে বড়জোর চাঁদের ছায়া পড়তে পারে, জোয়ার-ভাঁটা খেলাতে গেলে চাই সমুদ্রের বিস্তার। তারপরে ব্যাখ্যা করে বলেছিল, তোমার অনুচরেরা ব্যক্তিগত অভিযোগের তাড়নায় এসেছে, এরা বিদ্রোহীর ধাতুতে গঠিত নয়।

কেন, এইসব ব্যক্তিগত অভিযোগের যোগফল কি বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে পারে না!

খট্যাসের মনে পড়লো প্রভুদয়াল বলে-ছিল, তা যদি সম্ভব হতো তবে পাঁচশো লোকের চক্ষু একত্র করলে সহস্র ক্রোর দিব্য-দৃষ্টি লাভ হতো, পাঁচশো লোকের বাহুতে কার্তবীর্যার্জুনের বলাধান হতো। না, কিঞ্জল্ক তা হয় না। তুমি পল্বলকে সমুদ্র মনে করে মনে মনে তাতে নৌবহর ভাসাচ্ছ।

খট্যাস দেখল প্রভুদয়ালের কথাই সত্য হল, একটা মেয়েমানুষ পেতেই সকলে ব্যক্তি-গত অভিযোগ ভুলে গেল। তার মুখ দিয়ে অজ্ঞাতসারে বেরিয়ে গেল হা ভগবান!

নিজের কথায় নিজে চমকে উঠে ভাবলো এ কি সর্বনাশ, আমারও দেখছি পতন হয়েছে, শেষে কি না আমার মুখ দিয়ে বের হল ঐ শব্দটা। অবশেষে তার মনে হল না এ তার সচেতন চিন্তার ফল নয় বহু পূর্বজন্মের যে-সব সংস্কার তার মজ্জায় মধ্যে জমে রয়েছে তারই একটা অতর্কিত প্রকাশ।

জরা আবার বলে উঠল, সর্দার রানীটা যে মরলো।

কোন সাড়া পেল না। তাই আবার বলল, রাজধানীতে ফিরবার কি হল।

এবারে সাড়া পেলো, দুদিন অপেক্ষা করো, সবাই ফিরবো।

কিন্তু দুদিন অপেক্ষা করবার সময় পাওয়া গেল না, সেই মুহূর্তে দূরে মাঠের অপর প্রান্তে অশ্বক্ষুরধ্বনি উঠলো, অনেক-গুলি অশ্ব। খট্যাস তাকাতেই দেখতে পেলো একদল সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সারিবদ্ধভাবে দ্রুত এগিয়ে আসছে, সে বুঝলো এরা যাই হোক মিত্র নয়। জরা আর একবার তার গতপ্রাণ রাণীকে দেখতে গিয়েছিল সত্যই মৃত কিনা সেই সুযোগে খট্যাস সরে পড়ে নিকটবর্তী এক বিশাল মহীরুহের পত্রপুঞ্জের আড়ালে আত্মগোপন করে ব্যাপার কি দাঁড়ায় পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। ততক্ষণে অশ্বারোহী দল কাছে এসে পড়েছে।

খট্যাস দেখতে পেলো এরা আর যাই-হোক গত রাতের গাঁওয়ার আভীর দস্যু নয়; এরা সুশিক্ষিত, সুসজ্জিত, বর্ম-চর্ম-উষ্ণীষ ও ধনু তূণীর বল্লমে মণ্ডিত সেনানী। এমন চেহারার লোক আগে তার চোখে পড়ে নি। কিঙ্কস্কের যদি দিব্যদৃষ্টি থাকতো তবে দেখতে পারতো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে নিয়মিত প্রবাহে যে-সব বিদেশী আততায়ী এদেশে প্রবেশ করেছে এই মুষ্টিমেয় অশ্বারোহী তাদেরই প্রথম অগ্রবর্তী দল। লুণ্ঠন এদের উদ্দেশ্য, পরবর্তীকালে যারা আসবে তাদের উদ্দেশ্য নতুন রাজ্যস্থাপন।

খট্যাস দেখলো আততায়ীরা ঘোড়া থেকে নেমে তার অনুচরদের মধ্যে যে কয়েকজনকে হাতের কাছে পেলে বিনা ভূমিকায় তাদের বেঁধে নিয়ে ঘোড়ার পিঠের উপরে ফেলল, বন্দীদের মধ্যে কয়েকজন মেয়েও ছিল। যখন তারা ফিরতে উদ্যত দেখতে পেলো জরাকে, অমনি তাকেও বেঁধে নিয়ে ঘাড়ার পিঠে ফেলল। সে একবার নিরুদ্দেশের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করলো, সর্দার আমাকে যে বন্দী করে। খট্যাস মনে মনে বলল, রাজা হতে গেলে মাঝে মাঝে বন্দী হতে হয়। তারপরে প্রত্যেকে নিজ নিজ অশ্বে উঠে, প্রত্যেক অশ্বেই দু-একজন বন্দী, ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে পিঠে চাবুক মারলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। খট্যাস বুঝলো এক পরিচ্ছেদের সমাপ্তি। ঘটলো। তবে কিনা আপনি বেঁচে থাকলে সম্ভাবনার মধ্যে সমস্তই থাকলো। ভাবাবেগে প্রাণ বিসর্জন বীরের ধর্ম হতে পারে, তবে সে নির্বোধ বীর। খট্যাস আর যাই হোক নির্বোধ নয়।

(১৪)

কত কান্তার প্রান্তর নদনদী ছোট-বড় জনপদ পার হয়ে চলেছে তারা। দিনান্তে কোন নিরাপদ স্থানে বিশ্রাম আবার যাত্রা প্রাতঃকালে। কখনো খাদ্য ঝলসানো ভুট্টা, কখনো বাজরার রুটি, কখনো জুটলে আধ-পোড়া মাংস—আততায়ীও বন্দী সকলেরই ঐ খাদ্য। স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়ে বন্দীর সংখ্যা একশর উপরে।

এমনভাবে কয়েক দিন চলবার পরে একটা বড় জনপদে পৌঁছে আততায়ীরা গোটা কুড়ি পঁচিশ উট কিনে ফেলল, এবারে বন্দীদের চার-পাঁচজনকে চড়িয়ে দিল এক-একটা উটে, দু-পাশে চলল অশ্বারোহী। বন্দীদের বুঝিয়ে দিল পালাতে চেষ্টা করলে বেশি দূরে যেতে হবে না, দেখেছ তো হাতে তীর-ধনুক। বন্দীদের হাত বাঁধা, পায়ে অবশ্য বাঁধন দেওয়া হয় নি।

জরার রাজবেশ আততায়ীরা কেড়ে নিয়েছিল তবে গলার কৌস্তুভ মণিটা তাদের চোখে পড়ে নি, আগেই সেটা কাপড়ের খুঁটে বেঁধে ফেলেছিল সে। সে দেখতে পেতো, দেখে আশ্চর্য হতো যে অন্য বন্দীদের মুখে বেশ প্রসন্ন ভাব, মনে কোন কষ্ট আছে বোধ হয় না। ঘটনাচক্রে তার উটের পিঠে নরক অসুর পাতক নামে তিন প্রধান বন্দী। তাদের কাছে শুনেছিল যে, মঘা পলাতক। সর্দারের খোঁজ তারা জানে না, বোধ করি সে-ও পালিয়েছে।

জরা শুধালো, আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে?

ওদের একজন বলল, অনেকবার শুধিয়েছি।

কি উত্তর দিল?

এই দেখ বলে গায়ে চাবুকের দাগ দেখিয়ে দিল নরক।

ও বাবা! এরা দেখছি কথা শুধোলে মারে।

শুধু তাই নয় কথায় কথায় মারে—অতএব ভাই ওদের সঙ্গে কথা বলবার চেষ্ট করো না।

জরা পরামর্শ গ্রহণ করে, কথা বলে না, না আততায়ীদের সঙ্গে না সাথীদের সঙ্গে, আপন মনে চুপ করে থাকে। কথা বলছিল তো এক রকম ছিল এখন কথা বন্ধ হতেই মনটা চলে গেল ভিতরে যেখানে চলছে অন্তহীন কেনর মালাজপ। কেন সে হঠাৎ হরিণ ভ্রমে বাসুদেবকে মারতে গেল, এমন তো কখনো হয় নি। যখন মানুষ মেরেছে জেনে শুনেই মেরেছে আর তাতে না অনুভব করেছে গ্লানি না দিয়েছে কেউ ধিক্কার। বাসুদেবকে হত্যার পরেই জরতীকে হত্যা, তখন তার মনের অবস্থা এমন হয়েছিল যে যাকে সম্মুখে পেতো মেরে ফেলতে পারতো। হঠাৎ ভূমিকম্প হতে গেল কেন, চাঁদে গ্রহণ লাগলো কেন, তারা খসে খসে পড়তে লাগলো কেন, তার পোষা জন্তুগুলোর ক্ষেপে উঠে তাকে তাড়া করলে কেন আর সর্বোপরি পড়তে গেল কেন খট্যাসের হাতে। তারপর থেকে তো আর এক মুহূর্ত শান্ত হয়ে বসবার সুযোগ পায় নি। এসব কেন কেন কেন? কে দেবে এই অসংখ্য কেনর উত্তর।

এই রকম চিন্তার মালা জপ করতে করতে হঠাৎ উটগুলো থামে, নামবার আদেশ হয়, সম্মুখে বিস্তৃত জলাশয়, স্নানপানের জন্য সকলে নামে। তারপরে মেলে খান দুই বাজরার রুটি। জরা ভাবে রুটিগুলো এমন পুড়ে যায় কেন, এমন শক্ত কেন? জরতী যে রুটি তৈরি করতো সে তো কখনো পুড়তো না, আর কেমন নরম। না বেশ সুখে ছিল জরতী আর সে। মরলো মুখের দোষে, বাসুদেবকে ভগবান আর জরাকে পাপী বলতে গেল কেন? ভগবান না ছাই, আর মানুষমারা কেন জন্মে পাপ! বেশ হয়েছে মরেছে। রুটিগুলোতে জিব ছিঁড়ে যায় আর সে রুটি মুখের মধ্যে ননীর মতো গলে যেতো। ও বলতো বাজরার আটা এক প্রহর আগে জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। বলেছিল মানুষের মন আর আটা এক রকম, জল দিয়ে বশ করে নিতে হয়—গায়ের জোরে কিছু হয় না। ওঃ আমার গুরু-ঠাকরুণ আর কি, দুখানা নরম রুটি খাওয়াবেন তাতে আবার কত উপদেশ। বেশ হয়েছে, বেটি মরেছে। বাপরে একি রুটি, এ যেন পাথরের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি। আবার চলবার হুকুম হয়।

অবশেষে পক্ষকাল পরে তারা এসে পৌঁছয় এক মস্ত নগরে, নাম শুনলো তক্ষশিলা। কত বড় নগর। রাস্তাগুলো কেমন চওড়া, বাড়ীগুলো কেমন উঁচু। আর লোকের কি ভিড়। আর লোকগুলোই বা কত বিচিত্র ধরনের। কারো গায়ের রং কটা, কারো তুষারের মতো শাদা, কারো হলুদের আভা মেশানো, কারো তামাটে, কারো লালচে গৌর। কারো চুল খাটো আর খাড়া-খাড়া, কারো চুল বেণীবদ্ধ, কারো মাথা ন্যাড়া। কারো চোখ ছোট, কারো নাক চ্যাপ্টা, কারো গালের হাড় উঁচু। আর পোষাকেরই বা কত বৈচিত্র্য। উট থেকে তাদের নামিয়ে প্রাচীরঘেরা এক চত্বরে নিয়ে গিয়ে বিশ্রামের জন্য ছেড়ে দিল, পালাবার উপায় নেই, সমস্তটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

পরদিন সকালবেলায় তারা সকলে সারিবদ্ধভাবে নীত হল, এক সারিতে পুরুষ, আর এক সারিতে মেয়েরা। অনেক অলি-গলি পার হয়ে হাটখোলার মতো এক প্রশস্ত জায়গায় এসে পৌঁছল। জরা দেখল যে হাটখোলা বটে তবে দোকানপাট নেই, তার বদলে রাস্তার দু-পাশে ছোট ছোট মাটির বেদী। সেই বেদীগুলোতে তারা সবাই বসলো, এখানেও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে দুই সারি। জরার এক পাশে নরক অন্য পাশে অসুর। জরা শুধালো, এখানে আনলো কেন আমাদের, কি হবে?

নরক বলল, কেনাবেচা হবে।

জরা বুঝতে না পেরে বলল, কি কেনাবেচা?

আরে গাঁওয়ার আমরা কেনাবেচা হব। তাও নাকি হয়।

কেন হবে না। নিত্য হচ্ছে, আর তাও যদি বিশ্বাস না হয় এখনি দেখতে পাবে।

কি করে জানলে?

নরক বলল, ভাই অসুর, এ লোকটা সেই কিছুই জানে না। আর জানবেই বা কি করে? বনে বনে জন্তু-জানোয়ার মেরে বেড়ায় সংসারের হালচাল জানবে কেমন করে।

অসুর বলল, বুঝিয়ে দাও না।

নরক বলল, ওরে গাঁওয়ার শোন, আমি তো এই নিয়ে তিনবার কেনাবেচা হতে যাচ্ছি, শেষবার সর্দার আমাকে আর অসুরকে কিনেছিল পুরুষ-পত্তনের হাট থেকে, তাইতেই তো অ্যাবকার দিয়ে পৌঁছলাম।

বলো কি! তা তোমাদের বাড়ী কোথায়? শুধায় জরা।

কেমন করে জানবো। পাঁচ বছর থেকে হস্তান্তর হচ্ছি।

তোমরা দুজনেই?

হ্যাঁ, আর সাথে ছিল মধ্যা-ভাই। সে যে কোথায় গেল কে জানে।

অসুর বলল, বোধ হয় সেদিনের লড়াইয়ে মরেছে।

মরেছে না বেঁচেছে।

জরা শুধালো, দুবার কি করে কেনাবেচা হলে, কে কিনলো, কত দাম দিয়ে কিনলো বলো না ভাই।

আচ্ছা তবে শোনো—বলে আরম্ভ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুরু করবার আগেই তাদের বর্তমান প্রভুরা, সেই আততায়ীর দল চীৎকার করে বলে উঠলো, সব চুপ করে থাকো। নড়াচড়া করো না, খদ্দের আসছে।

জরা দেখতে পেলো দুই দিকে দীর্ঘ দুই সারি নরপণ্য— একদিকে পুরুষ, বিপরীতে স্ত্রী, রাজবাড়ীর সেই বউ-ঝি। সারির অপর প্রান্তে দূরে একদল লোক, তারা মাঝখানের পথ দিয়ে দুই সারি নিরীক্ষণ করতে করতে এগিয়ে আসছে।

এই বৃহৎ বাজারের অল্প অংশই জরার চোখে পড়েছিল, সব চোখে পড়লে দেখতে পেতো নানা বয়সের পণ্য, দু-দশ জন নয়, শতশত। চালান যখন বেশি আসে তখন হাজার হাজার হয়। চালানের কম-বেশি অনুসারে দামে তেজি-মন্দি ঘটে। আজ চালান তেমন বেশি নয় তাই দাম চড়া।

এই পণ্যের মধ্যে পাঁচ ছয় বছরের শিশু থেকে প্রৌঢ় বৃদ্ধ অবধি সব বয়সের নরনারী আছে। শিশু ও বালকদের দাম কম। অনেক দিন খাইয়ে-পরিয়ে তাদের মানুষ করে তুলতে হবে কিনা, বৃদ্ধদেরও নামমাত্র মূল্য। যুবক-যুবতীদের চড়া দাম, স্বাস্থ্য ও রূপ ভেদে দাম আরও চড়া হয়ে থাকে। আজ রাজবাড়ীর মেয়েরা রূপে আলো করে বসে আছে, খুব দাঁও মারবে মালিকেরা।

ও কি করছে ভাই? ওরা কি বুনো নাকি? ছিঃ ছিঃ।

নরক বলল, আজ কিনবে তা একটু দেখেশুনে কিনবে না?

তাই বলে রাজবাড়ীর বউদের, তাও আবার এক হাট লোকের মধ্যে।

শোন কথা একবার। ভগবান সৃষ্টি করেছেন স্ত্রী-পুরুষ, রাজা গরীব সৃষ্টি মানুষের। রাজবাড়ীর বউ আর গরীবের বউয়ে ভেদ করলে চলবে কেন?

এসব অলুক্ষণে কথা শিখলে কোথায়?

সর্দারের কাছে, তুমিও শিখতে, তবে কিনা মাঝখান থেকে সব গোলমাল হয়ে গেল।

রাজবাড়ীর বউরা কোন কাজে লাগবে? ওরা কি কখনো কাজ করেছে।

ভয় কি ভাই জরা, সকলের যোগ্য কাজ সৃষ্টি করে রেখেছেন ভগবান।

এমন সময় কয়েকজন সম্পন্ন চেহারার লোক এদিকে এসে পড়লো। একজন সুবেশ সুপুরুষ যুবক জরার কাছে এসে দাঁড়িয়ে শুধালো, এই বুনো তুই কি কাজ করতে পারিস।

সে উত্তর দেবার আগেই তার পিছনে যে মালিক দাঁড়িয়ে ছিল সে বলে উঠলো, ও সব কাজ জানে কর্তা, ঘোড়ায় চড়া, শিকার করা, মায় চুরি ডাকাতি।

ওকে বলতে দাও, তুমি থামো, বলল, ক্রেতাব্যক্তি।

শিকার করতে পারিস। কি শিকার?

জরা বলল, বাঘ ভালুক বরা সমস্ত।

বাপরে, মস্ত বীর যে! আচ্ছা ঐ যে হাঁসটা উড়ে যাচ্ছে ওটাকে মারতে পারিস।

সোৎসাহে জরা বলল, খুব।

আচ্ছা মার, দেখি।

তীর-ধনুক দাও।

সঙ্গে সঙ্গে একজন তীর-ধনুক এনে দিল। একবার পরীক্ষা করে নিয়ে তীর ছুঁড়লো জরা, তার আগেই হাঁসটা আরও দূরে গিয়ে পড়েছিল কিন্তু হলে কি হয় জরার অব্যর্থ তীর পেটে গিয়ে বিঁধলো আর মুহূর্ত মাত্র শূন্যে স্থির হয়ে থেকে দুই পাখার ভারসাম্য রক্ষাহেতু ধীরে ধীরে মাটির দিকে নামতে লাগলো এবং কয়েক লহমার মধ্যে বাজারের প্রান্তে একটা গাছের পড়ে বেঁধে রইলো।

বাহবা, বাহবা বাহাদুর বটে।

একজন ভাল তীরন্দাজের দরকার হয়ে পড়েছে আমার। কত দাম চাও হে?

আদর দেখে দর বাড়িয়ে দিয়ে মালিক বলল, আজ্ঞে কর্তা দশ মাষা আশা করি।

মাষা মাষকলাই পরিমাণ স্বর্ণ।

দশ মাষা তার হাতে গুনে দিয়ে ক্রেতা জরার উদ্দেশ্যে বলল, চল। এখন তুই আমার দেহরক্ষী। কিন্তু খবরদার পালাতে চেষ্টা করো না, তাহলে দেখবে তীর-ধনুকে আমার হাতটাও কম সই নয়।

জরা একবার করুণভাবে সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে নূতন মালিকের পিছু পিছু রওনা হল।

নরক বলল, জরার মালিককে দয়ালু বলেই তো মনে হচ্ছে।

অসুর বললো মালিকরা তো দয়ালু হয়, গোলমাল বাধায় অতিরিক্ত দয়ালু হয়ে মালিকের বউগুলো। আমার বড় দুর্দশার মূলে আমার সেই মালিকের বউ—

সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, নরক বাধা দিয়ে বলল, ওসব পুরানো গল্প থাক! ঐ দ্যাখো জরা কেমন ঘোড়ায় চেপেছে। বাঃ বাঃ! ওতো পাকা ঘোড়সোয়ার দেখছি।

আরে এসব গুণ না দেখেই কি সর্দার রাজা করেছিল।

তারপরে সখেদে বলল, কি হল সর্দারের কে জানে।

আর যাই হোক, মরবার লোক সে নয়। ও আবার দল গড়ে তুলবে দেখো।

ওদের মধ্যে যতক্ষণ এইসব কথা হচ্ছিল নূতন প্রভুর পিছনে পিছনে জরা তক্ষশিলা ছাড়িয়ে পাহাড়ের পথ ধরেছে। পাহাড়ের গা বেয়ে সঙ্কীর্ণ পথ পাশাপাশি দুটো ঘোড়াতেও সব জায়গায় যেতে পারে না। ক্রমে উঁচুতে উঠতে উঠতে অবশেষে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছল, সেখানে পাথরের প্রাচীর-ঘেরা একটি নগর। দিনের বেলায় সিংহদ্বার খোলা থাকে, এখন খোলাই ছিল, প্রভুকে অনুসরণ করে জরা নগরে প্রবেশ করলো।

প্রভু বললো, এই আমার রাজধানী, এই নগরের নাম খপরে।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

সব ক্লান্তি দূর হয় যার গানে : অনুপ ঘোষাল

—মণ্টুমাসী তো আজো দেখা হলে বলেন, তোরা আর কি গান গাস, গাইত বটে তোদের মা—কি গলা ছিল? মা আর মাসী দুজনে পাটনা গার্লস স্কুলে একই ক্লাসে পড়তেন। দাদামশাই ছিলেন পাটনায় পি, এম, জি অফিসের বড়বাবু। সেই সুবাদে মা'রা ছিলেন একপুরুষে প্রবাসী।

তা পাটনায় থাকতেই যা-কিছু গানের চর্চা ছিল। ওখানে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কাছে মা গান শিখতেন। কিন্তু বিয়ের পর আর গান বাজনার সুযোগ বেশী পান নি। প্রবাসজীবনের খোলামেলা পরিবেশ থেকে শ্বশুরবাড়ীর বাঁধাবাঁধির মধ্যে পড়ে আর তাল রাখতে পারেন নি মা। নট দ্যাট, বাবা লাইক করতেন না; বরং উল্টো। কিন্তু বাবা পছন্দ করলে কি হবে, তখন দেশে গাঁয়ে ওস্তাদী গানটান শেখার এত স্কোপই বা কোথায়?

সেই স্কোপ পেলেন লাবণ্য দেবী কলকাতায় এসে। পার্টিশনের কয়েক মাস আগে অনুপের বাবা অমূল্যচন্দ্র ঘোষাল দেশ-গাঁয়ের পাট চুকিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। ফরিদপুরের মাদারীপুর সাব-ডিভিশন ছয়গাঁও অনুপদের দেশ। গাঁয়ের স্কুলে শিক্ষকতা করতেন অমূল্যবাবু। জায়গা-জমি ছিল কিছু। ভালভাবেই চলে যেত। কিন্তু কলকাতায় এসে যেন অকূল-সমুদ্রে পড়লেন। অনেক কষ্টে ঘোরাঘুরি করে কালীঘাটে একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই জুটল তো কাজ নেই কোন। পাঁচ পাঁচটা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। অনুপ তখন তো দুধের শিশু—ছেচল্লিশ সালে জন্মেছে অনুপ।

অবশেষে কলকাতা করপোরেশনের ইলেকশন ডিপার্টমেণ্টে একটা কাজ পেলেন অমূল্যবাবু। চাকুরীর ব্যাপারটা পাকাপাকি হতে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে উঠে পড়ে লাগলেন। আর ঠিক তখুনি নিজের সারাজীবনের অপূর্ণ সাধ মেটানোর একটা সুযোগ পেলেন লাবণ্য দেবী। ছেলে-মেয়ে প্রত্যেকেরই গানের গলা ছিল। বড় মেয়ে গীতাকে গান শেখানোর জন্য সতীশ সরকার মশাইকে ঠিক করলেন।

—আমার বয়স তখন চার কি বড়জোর পাঁচ। বড়দি রোজ গান শিখতেন মাণ্টার-মশাই-এর কাছে। আমি পাশে বসে থাকতাম। বসে থাকতাম মানে কি, হাঁ করে গান শুনতাম। তাই নিয়ে তো মাণ্টারমশাই একদিন ঠাট্টা করেই বললেন, তুই হা কইরা থাকস ক্যান? মশা ঢুকব গালে।

—এতদিন যে হাঁ করে গালে মশা ঢোকাই নি তারই প্রমাণ দিলাম সেদিনই দিদির শেখা একটা মীরার ভজন শুনিয়ে দিয়ে—'ভগবান তুহুঁ মম জীবন মরণ কা সাথী।' শুনে মাণ্টারমশাই অবাক হয়ে গিয়ে-ছিলেন—খুশীও হয়েছিলেন খুব। আমাকে কোলের ওপর টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিলেন, অইব, তর

সাহেব। তারপর থেকে দিদির সঙ্গে আমাকেও উনি গান শেখাতেন।

—দিদির গান শেখা কিন্তু এগোল না বেশীদূর। ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরতে না ধরতেই বিয়ে হয়ে গেল। বড়দারও ন্যাক ছিল। সংসারের চাপে উনি তো সুযোগই পেলেননা তেমন। মেজদির আবার গানের থেকেপড়া-শোনার দিকেই বেশী ঝোঁক। ফলে পড়ে রইলাম শুধু আমরা দুজন—ছোড়দি আর আমি। নমিতা আর আমি খুব বাচ্চা বয়সেই রেডিওর শিশুমহলে নাম লিখিয়েছিলাম। ইন্দিরাদি আমাদের খুবই ভালবাসতেন।

—ভালবাসতেন মঞ্জুমাসীও। তখন মানিক মামারা (সত্যজিৎ রায়) থাকতেন লেক টেম্পল রোডে। একদিন মাসী (বিজয়া রায়) আমাদের দু ভাই বোনকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের বাসায় গান গাওয়ানোর জন্য। অনেকেই সেদিন উপস্থিত ছিলেন ঐ আসরে। আমার গান শুনে কনক পিসীমা (কনক দাস, অধ্যক্ষা, গীতবিতান) খুব খুশী হয়ে মাকে বলেছিলেন, ওকে গান শেখাও। ওর হবে।

হবে তো—কিন্তু কে শেখাবেন? তাঁর পারিশ্রমিকই বা কত? সে টাকাই বা আসবে কোথেকে? সব ছেলেমেয়ে স্কুলে কলেজে পড়ছে। তাদের খরচ চালিয়ে অনুপের একার জন্য গানের শিক্ষক রাখা অমূল্যবাবুর পক্ষে সেদিন আদৌ সম্ভব ছিল না। অবস্থার খবর কিছু কিছু রাখতেন কনক পিসীমা। তাই উনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে অনুপকে নিয়ে গিয়ে সুখেন্দু গোস্বামীর হাতে তুলে দিলেন।

—এসব চুয়ান্ন সালের কথা। তখন আমার বয়স আট। আজ প্রায় সতেরো বছর ধরে মাস্টারমশাই-এর কাছে গান শিখছি। কোনদিন একটি পয়সাও আমাকে এর জন্য দিতে হয় নি। আর যদি কিছু মাত্র আমি শিখে থাকি, তাহলে সবই ও'র দয়ায়। আমার মাস্টারমশাই-এর মত লোক আর হয় না।

গানের তালিমের সঙ্গে সঙ্গে লেখা-পড়ার আয়োজনও এতদিনে শুরু হয়ে গেছে। ষাট সালে চেতলা স্কুল থেকে সেকেন্ড ডিভিশনে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে আশুতোষ কলেজে ভর্তি হোল অনুপ প্রি-ইউনিভার্সিটি সায়েন্সে। পরের বছর প্রি-ইউ কমপ্লিট করে ফ্যাকাল্টি পাল্টে অনার্স নিল ইকনমিকসে। ইন দা মিন টাইম ও'দের বাড়ীর অবস্থাও পাল্টেছে অনেকটা। দাদা চাকরী করছেন। সংসারের বোঝা হাল্কা হতে অমূল্যবাবু তাঁর স্বল্প সঞ্চয়ের পুঁজি ভেঙ্গে বার্ষট্টিতে একটা ছোট্ট একতলা তুললেন বেহালাতে। অনুপরা বোল বছরের ভাড়া বাড়ী ছেড়ে উঠে গেল নিজে-দের বাসায়, বেহালা-সোদপুরের মতিলাল গুপ্ত রোডে।

—আমাদের বাড়ীর পাশেই থাকেন শহীদ দীনেশ গুপ্তের বড় ভাই ডক্টর পৃথ্বীশ গুপ্ত। ডাক্তারবাবুই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন।

—তখন মাস্টারমশাই-এর অনুমতি নিয়ে সবে একটা দুটো কম্পিটিশনে নাম দিতে শুরু করেছি। জীবনে প্রথম পুরস্কার আমি পেয়েছি যুগান্তরের 'সব পেয়েছির আসর'-এর প্রতিযোগিতায়। খেয়াল, ভজন ও রাগপ্রধান তিনটেতেই আমি ফার্স্ট হয়ে-ছিলাম। বার্ষট্টিতে যখন আশুতোষ কলেজে বি, এ ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, সেবারই পশ্চিম-বঙ্গ যুব উৎসবে সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় জয়েন করে আমি বাউলে হই প্রথম, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে দ্বিতীয়।

রোগের সব কটা লক্ষণ মিলে যাচ্ছিল দেখে ডাক্তারবাবু প্রেসক্রাইব করলেন—অনুপকে ধরাবাধা পথে বি, এ; এম, এ পড়িয়ে লাভ নেই, ওকে বরং রবীন্দ্র-ভারতীতে ভর্তি করে দিন। গানটা মন দিয়ে শিখুক। আখেরে ফল পাবে। বাবা, মারও তাই ইচ্ছে ছিল। ফলে চৌষট্টিতে ইকনমিকসে সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে পাশ করতে বাবা বললেন, যদি ইচ্ছে হয় তো তুমি রবীন্দ্র-ভারতীতে ভর্তি হতে পার।

টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবার। তবুও রিস্ক নিতে পেছ-পা হন নি অমূল্য-বাবু। সে কথাই সেদিন টালিগঞ্জের লেক-পল্লীর ভাড়াবাড়ীর বসার ঘরে মুখোমুখি বসে আমায় বললেন—ওর দাদার ইচ্ছে ছিল অনুপ এম, এটা ইকনমিকসেই কমপ্লিট করুক। তা আমি বললাম, পড়েশুনে তো সেই কেরাণীগিরিই করবে, তার চেয়ে যদি ভেতরে ক্ষমতা থাকে তো তার একটা যাচাই হয়ে যাক না।

বাবা-মার আশীর্বাদ ব্যর্থ হয় নি। রবীন্দ্র-ভারতীতে সঙ্গীতে এম, এ পড়তে পড়তেই জাতীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়ে দু'বছরের জন্য আড়াই শো টাকার সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের স্কলারশিপ জুটিয়ে নেন অনুপ। ও'র দিদি নমিতাও ঐ স্কলারসিপ পেয়েছিলেন একই সময়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের জন্য। এর মধ্যে পঁয়ষট্টিতে 'সুরসাগর হিমাংশু সঙ্গীত সম্মেলনে' সব বিভাগ মিলিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন অনুপ। পরের বছর 'রবীন স্মৃতি সঙ্গীত প্রতি-যোগিতাতে'ও উনিই হয়েছেন চ্যাম্পিয়ন। ঐ বছরই কোর্স কমপ্লিট করে সঙ্গীত-ভারতী টাইটেলটাও পকেটস্থ করেছেন অনুপ। গীতবিতানের ফাইন্যাল পরীক্ষায় ক্লাসিক্যালে ফার্স্ট হয়ে পেয়েছেন 'করুণাকিশোর কর গোল্ড মেডাল।'

বিভিন্ন কম্পিটিশনে, সম্মেলনে ও অনুষ্ঠানে যোগদানের প্রয়োজনেই চৌষট্টি সাল থেকে বেঙ্গল মিউজিক কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল মণীন্দ্র চক্রবর্তী'র কাছে অনুপ নজরুল গীতি ও পুরোনো বাংলা গান শিখতে শুরু করেন। দু'বছর বাদে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুদ্ধভাবে শেখার তাগিদেই গেছেন দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে।

—আর এই রবীন্দ্র-সংগীতের সুবাদেই জীবনে প্রথম চান্স পেয়েছি রেকর্ড করার। আমার অনেক আগেই ছোড়দির নাম হয়েছে। এইচ-এম-ভি'র 'বাল্মীকি প্রতিভা' 'বর্ষামংগলের' কোরাসে গলা মেলাবার সুযোগ ও'র আগেই এসেছিল। দিদির কাছেই আমার নাম শুনে সন্তোষ সেন-গুপ্ত আমায় ডেকে পাঠান। আর তার ফলেই ছেষট্টিতে 'বর্ষামংগলের' এল পি-তে আমারো একটি গান রেকর্ডেড হয়—কোথা যে উধাও হোল মোর প্রাণ উদাসী।'

—এ বছরই দিদি প্রথম চান্স পেল সিনেমায় প্লে-ব্যাক করার। মানিক মামার 'চিড়িয়াখানা' ছবিতে 'ভালোবাসার তুমি কি জানো' গানটি দিদিরই গাওয়া। চিড়িয়া-খানা' শেষ করে মানিকমামা তখন 'গুপী-বাবা'য় হাত দিয়েছেন। কথা ছিল, ছবির সবকটি গানই গাইবেন কিশোরকুমার। কিন্তু ঠিক কি কারণে বলতে পারব না, কিশোর-কুমার আসতে পারলেন না। এদিকে টেকিং-

এর জেষ্ঠ এগিয়ে এসেছে। মানিকমামা তখন নতুন গায়ক খুঁজছেন।
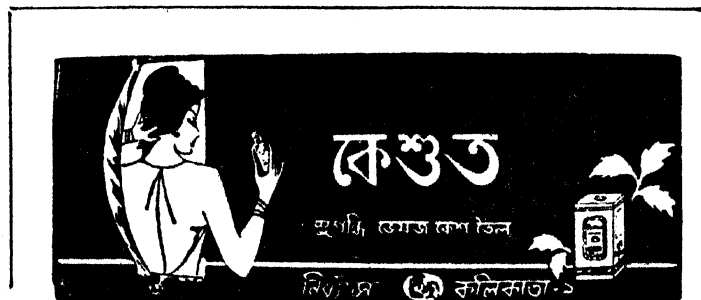
—বোধহয় দিদির মুখেই আমার কথা শুনেছিলেন। তাছাড়া মঞ্জুমাসীও নিশ্চয় বলেছিলেন। একদিন মাসী আমাকে ডেকে পাঠালেন। ঘণ্টাখানেক ধরে ক্ল্যাসিক্যাল, ফোক, সাউথ ইন্ডিয়ান নানা গান শুনলেন মানিক মামা। শুনলেন কিন্তু কিছু বললেন না। পরে মঞ্জুমাসীর কাছে শুনেছি, উনি নাকি বলেছিলেন,—গলাটা ভাল, আদৌ চাপা নয়।

—কিছুদিন বাদেই আবার ডাক পড়ল। এবার মানিকমামা অনেকক্ষণ ধরে গোটা গল্পটা আমায় শোনালেন, বুঝিয়েও দিলেন। তারপর নিজে পিয়ানো বাজিয়ে ছবির সব ক'টি গান গেয়ে শোনালেন। এখানেই আপনাকে বলে রাখি, সত্যজিৎ রায়ের গানের গলাও অসামান্য।

—ঐদিনই উনি আমাকে দুটি গান শিখিয়ে দিলেন—'ভূতের রাজা দিল বর' ও 'মহারাজা! তোমারে সেলাম' নয়—'ওরে বাবা দেখো চেয়ে'... না, 'ভূতের রাজা দিল বর' ও 'আমাদের পাই বড়মন্ত্রী মশাই।'

—পর পর চার-পাঁচদিন মামার বাসাতে রিহার্সাল হোল। তারপর দুদিন ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে অর্কেস্ট্রার সঙ্গে রিহার্সাল দিলাম। সাতষট্টির শুরুতেই জীবনের প্রথম প্লে-ব্যাক করলাম—'ভূতের রাজা দিল বর।'

—জবর জবর বর। প্রথম বরেই দেশ শুদ্ধ লোকের মন জয় করে নিল অনুপ। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর প্রত্যেকটি গান সুপার হিট। মোট আটটি গান ছিল ছবিটিতে। আটটিই গেয়েছেন অনুপ। খোঁজ নিয়ে জেনেছি এপর্যন্ত নাকি 'গুপী-বাঘা'-র চল্লিশ হাজার ডিস্ক বিক্রী হয়েছে। এদেশের ফিল্মী-গানের ইতিহাসে এত বড় সাফল্য সম্ভবত এত অল্প বয়সে আর কোন গায়কের কপালে জোটেনি।

'গুপীবাবা' রিলিজ করবার আগেই ডাক এল তপনবাবুর কাছ থেকে। 'সাগিনা মাহাতো'র গাইতে হবে। সাফল্যের পুনরাবৃত্তি। 'ছোটিসি পঞ্ছী ছোট্ট ঠোঁটে রে'—এই গানটির জন্য গত বছর বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিস্ট এসোসিয়েশনের নির্বাচনে সেরা প্লে-ব্যাক, সিঙ্গারের (পুরুষ কণ্ঠ) সম্মান লাভ করেছেন অনুপ। আজ পর্যন্ত এই গানটির নাকি দশ হাজার ডিস্ক বিক্রী হয়েছে।

'গুপীবাবা' ও 'সাগিনা মাহাতো'—মাত্র দুটি ছবিতে গান গেয়েই অনুপ সিনেমায় পাকাপাকি ভাবে প্লে-ব্যাক করার সুযোগ আদায় করে নিয়েছেন। এ বছরের জুন মাস পর্যন্ত ও আরো দশটি ছবিতে গান গেয়েছেন। এর মধ্যে রিলিজ করেছে—শান্তি, মহাকবি কৃত্তিবাস, রূপসী ও নিমন্ত্রণ।

সিনেমার আশ্চর্য সাফল্যের পথ বেয়েই এসেছে রেকর্ড করার সুযোগ। ছেষট্টিতে বর্ষামঙ্গলের এল-পিতে একটি গান গেয়েছিলেন অনুপ। গত বছর এইচ এম ভি'র নিজস্ব দুটো রেকর্ডও করেছেন। একটি নজরুল গীতি ও অপরটি পুজোর রেকর্ড।

সিকসটি সেভেনে মিউজিকে এম-এ পাশ করার পর থেকেই অনুপের ইচ্ছা রিসার্চ করার। সাবজেক্টও মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছেন—'বাংলা গানের ক্রমোন্নয়নে মার্গ সঙ্গীতের প্রভাব।' পিরিয়ড ঠিক করেছেন রামনিধি গুপ্ত থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত। কিছু কাজও ইতিমধ্যে এগিয়ে রেখেছেন। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস নিয়ে ছাত্রাবস্থায় ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে প্রায় খান তিনেক জাবদা খাতা ভরিয়েও ফেলেছিলেন। কিন্তু তারপর আর এগোয়নি কিছুই। এগোবে কি? যে সব বই দরকার, তা যেমন পাওয়া দুষ্কর তেমনি দুষ্কর উপযুক্ত গাইড পাওয়া। যতই দিন যাচ্ছে ততই হতাশ হয়ে পড়ছেন অনুপ।

বেহালার বাসায় গান বাজনায় খুবই অসুবিধা হচ্ছিল, তাই কলকাতার ছেলের মুখ চেয়েই বাবা মা নিজেদের বাসা ছেড়ে টালিগঞ্জ রেল ব্রীজের গায়ে বাড়ী ভাড়া নিয়ে উঠে এসেছেন বছরখানেক আগে। সেই বাড়ীতে বসেই কথাবার্তা হচ্ছিল। আলোচনার শেষ দিকটা কেন সমস্যার ভারে প্লাইট পর্দীয় হয়ে উঠেছিলো। রঙীন পর্দার আড়ালে বসার ঘরে আমরা মুখোমুখি ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠছিলাম। হঠাৎ হারমোনিয়মটা টেনে নিয়ে চড়া গলায় সমস্ত বিষণ্ণতার পর্দা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়ে অনুপ গেয়ে উঠলেন—'আর তো চিন্তা নাই রে...'

আধুনিক, নজরুল, রবীন্দ্র, গীত, গজল ক্ল্যাসিক্যাল—নবীন যুবা কাশীনাথের গলায় স্বতঃস্ফূর্ত অক্লেশে খেলে যাচ্ছে। মুহূর্তে সব চিন্তা যেন সত্যিই দূরে সরে গেল। গানে গানে ভরে উঠল ঘর-দোর। পাশে বসে ছোড়দি নমিতা ঘোষাল। দুয়ারে কপাটের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মা লাবণ্য দেবী।

ঈষৎ ঘোমটা টানা। মায়ের দু-চোখে বোধহয় তৃপ্তির নিটোল মুক্তোদানা সেদিন আমি ঝলসে উঠতে দেখেছি। চোখ বুজে একের পর এক গান গেয়ে চলেছেন অনুপ। অনুকরণের কোন কৃত্রিমতা বা অশিক্ষার কোন দুর্বিসহ ভার যে গলাকে আদৌ বিপন্ন করেনি, সেই অসামান্য সুরের আভাস সেদিন মন-প্রাণ ভরে অনুভব করার চেষ্টা করেছি। বাইরে জ্যৈষ্ঠের খর রৌদ্র ছিল। তবু মনে হচ্ছিল অঝোর ধারে ঘরের ভেতরে নেমেছে বুঝি শ্রাবণের বাদল। খুব ক্লান্ত অবসন্ন মানুষও মুহূর্তে সতেজ সজীব হয়ে উঠতে পারে যদি—অনুপের অনুপম সুরের সান্নিধ্যে আসে কখনো।

—স[illegible]
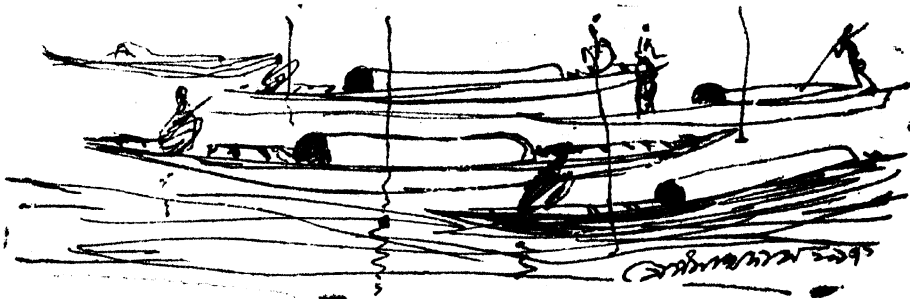
ইংরেজী উপন্যাসে বাঙালী

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় অনেক উপন্যাস লেখা হয়েছে। বস্তুত, এই উপমহাদেশকে কেন্দ্র করে এত উপন্যাস লেখা হয়েছে যে তার সঠিক ফিরিস্তি দেওয়াও দুষ্কর। কিন্তু এ জাতীয় উপন্যাসের মধ্যে খুব কমই কালজয়ী হতে পেরেছে। অধিকাংশ উপন্যাসই কিছুদিন বাজার মাৎ করে তারপর বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে গেছে। এখন এগুলির অধিকাংশই প্রত্ন-তাত্ত্বিক কৌতূহলের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। অবশ্য আমাদের দেশের কতিপয় গবেষক ছাত্র এই উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে মাঝে মাঝে গবেষণা করে থাকেন। আবার ঐতিহাসিক এবং রাজনীতিবিদেরাও কেউ কেউ কখনো কখনো এই উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে থাকেন। এসব সত্ত্বেও কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের যুগে এই উপমহাদেশ ভারতবর্ষ কত ঔপন্যাসিককে তাঁদের উপন্যাস লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

এধরনের উপন্যাসগুলির অকালমৃত্যুর অনেক কারণ আছে। প্রথমত, এসব উপন্যাসগুলির রচয়িতাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল নিতান্ত সংকীর্ণ, তাই তাঁরা তাঁদের উপন্যাসের পটভূমিকে অনেকটা স্বেচ্ছা-কৃতভাবেই বড় একতরফা করে ফেলে-ছিলেন। আবার ভারতীয় চরিত্র সম্বন্ধে তাঁদের বড় একটা কৌতূহল ছিল না। ভারতে পরবাসী স্বজনদের সম্বন্ধেই তাঁদের বিশেষ আগ্রহ ছিল। অবশ্য উপন্যাসের প্রয়োজনের খাতিরে কখনো কখনো তাঁদের ভারতীয় চরিত্রের আমদানী করতে হয়েছিল। সহানুভূতি দিয়ে তাঁদের বোঝার কথা তো দূরে থাক, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা ভারতীয় চরিত্রের বিকৃত রূপ পরিবেশন করতেন। কেবল পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিমা-ঞ্চলের ভারতীয়দের এবং সামান্য কয়েকজন মুসলমান সম্প্রদায়ের চরিত্রের প্রতি আগ্রহ ও কচিৎ কোন ক্ষেত্রে সহানুভূতি তাঁরা অবশ্য দেখিয়েছেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি এসব ঔপন্যাসিকদের মনে শ্রদ্ধার ভাব ছিল, কিন্তু হিন্দুধর্ম ও হিন্দুধর্মাবলম্বীদের প্রতি তাঁদের ছিল তীব্র বিদ্বেষ। তাই তাঁদের কলমে যেসব হিন্দু চরিত্রের অবতারণা ঘটেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, তাঁদেরকে আমরা কদাকার, কদাচারী, লোভী ও অর্থগৃধ্নুরূপেই দেখতে পাই। কিন্তু হিন্দুধর্মাবলম্বী বিভিন্ন প্রদেশের লোকে-দের মধ্যে তাঁরা বাঙালী চরিত্রকেই সবচেয়ে বেশী হাস্যাস্পদ করে পরিবেশন করেছেন। এর কারণ অনুধাবন করা খুব একটা অসুবিধেজনক ব্যাপার নয়, কিন্তু সে কথা পরে।

এধরনের উপন্যাসগুলিকে কালানু-ক্রমিকভাবে একটু সাজিয়ে নিয়ে ঔপন্যাসিকদের বাঙালী চরিত্র কীর্তন আলোচনা করাই সম্ভবত যুক্তিযুক্ত হবে। সময়ের হিসেবে দেখলে প্রথমেই নাম করতে হয় টমাস অ্যানস্টে গুথরী রচিত উপন্যাস 'বাবু হরিবংশ জ্যাবারজী'র কথা। এই 'জ্যাবারজী' যে 'ব্যানার্জী' পদবীরই অপভ্রংশ, তা কল্পনা করে নিতে অসুবিধে হয় না। এই পদবীকে বিকৃত করার ঘটনা থেকেও আমরা লেখকের মানসিকতা ও উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আন্দাজ করতে পারি। অবশ্য উপন্যাসের নায়কের চরিত্রকে অনেকটা কার্টুনের মতই ব্যবহার করা হয়েছে, বাস্তবের সঙ্গে এর কোন রকম সংস্রব প্রায় নেই বললেই চলে।

দিলীপ চক্রবর্তী

সে জন্যে এই উপন্যাসটির সামগ্রিক আলোচনা না করে এতে বর্ণিত দু একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করাই বোধহয় যথেষ্ট।

ঔপন্যাসিক গুথরী হরিবংশবাবুর যৌবনকালের ঘটনার উল্লেখ করেছেন। হরিবাবু ইংলণ্ডের কোন এক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষালাভের জন্যে গিয়েছেন। একদিন কয়েকজন বন্ধুবান্ধবসহ তিনি এক বন্য অঞ্চলে পাখী শিকার করতে গেলেন। বন্ধুবান্ধবরা গল্প প্রসঙ্গে জানালো যে স্কটল্যাণ্ডের এই অঞ্চলটাতে বন্য পাখীরা ভয়ঙ্কর হয় আর তারা প্রায়ই লোকেদের আক্রমণ করে থাকে।

একথা শুনে হরিবাবুর মাথা খারাপ হবার জোগাড় হল। তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে বললেন—একি কথারে বাবা! আমি একটা পাখীর সঙ্গে লড়াই করে হয়তো নিজেকে বাঁচাতে পারি, কিন্তু তার সাংগো-পাংগোরা যদি এক সঙ্গে উড়ে এসে আমার নাকমুখ খুবলে নেয় তাহলেই তো আমি গেছি!

হরিবাবুর ভাগ্য ভাল যে এরকম মারাত্মক কোন ঘটনা ঘটেনি।

আরেকটি ঘটনার উল্লেখও এখানে করা যেতে পারে।

হরিবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে একজন ভারত প্রত্যাগত প্রৌঢ় ভদ্রলোকের। তিনি কর্মজীবনে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে হরিবাবু মন্তব্য করলেন যে বাঙালী জাতটা অফিসার হিসাবে খুবই যোগ্য এবং কর্মঠ। দেশে ফিরে তিনিও সিভিল সার্ভিসেই যোগ দেবেন, সে কথাও তিনি জানালেন। প্রবীণ ইংরেজ ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন যে একজন বাঙালী ডেপুটি কমিশনার, গিরিশচন্দ্র দে'র কথা তিনি জানেন যিনি পাঞ্জাব সীমান্তের এক জেলার শাসক ছিলেন। একবার সেখানকার এক উপজাতি বিদ্রোহ করায় তিনি খুবই সাহসিকতার সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করে-ছিলেন। কিপলিং তাঁর একটি গল্পে এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন, একথাও তিনি বললেন।

একথার উত্তরে হরিবাবু বললেন যে, এই ধরনের বিপদের সম্মুখীন হলে তিনিও গিরিশবাবু প্রদর্শিত পন্থাই অবলম্বন করবেন। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে তিনি একথাও জানালেন যে বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতবর্ষে বাঙালী জাতিই অগ্রগণ্য, তারা সমগ্র দেশ শাসন করতে পারে। কিন্তু তাদের পিছনে সর্বদাই বিশাল ইংরেজ সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন। তা না হলে, শিখ, রাজপুত, মারাঠারা তাদের পিঁপড়ের মত টিপে মেরে ফেলবে।

উপর্যুক্ত আলোচনাটি লিপিবদ্ধ করার পিছনে ঔপন্যাসিক গুথরীর যে মানসিকতা কাজ করেছে তা আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। তিনি হরিবাবুর মুখের কথা দিয়েই তার চরিত্রকে কালিমা-লিপ্ত করতে চেয়েছেন।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারক ভদ্রলোক রুডিয়ার্ড কিপলিঙের যে গল্পটির প্রসঙ্গ তুলেছেন, সে সম্বন্ধেও একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে সেরে নেওয়া যেতে পারে। গল্পটির নাম 'হেড অফ দী ডিস্ট্রিক্ট।' মহামান্য ভায়সরয় বাহাদুর একজন বাঙালী অফিসারকে পাঞ্জাবের সীমান্ত অঞ্চলে একটি জেলায় জেলা-শাসকের পদে নিযুক্ত করেছেন। এ অঞ্চলটি উপজাতিদের উপদ্রবের কেন্দ্রস্থল। অফিসার ভদ্রলোকের অযোগ্যতার দরুন এখানে গোলমাল অত্যধিক বেড়ে যায়। তখন প্রাণের ভয়ে তিনি নিরাপদ স্থানে পলায়ন করেন। অতঃপর তিনি এ ব্যাপারের সমস্ত দায়িত্বের জন্য দোষারোপ করেন তাঁর সহকারী বৃটিশ অফিসারের উপর। কিপলিঙও বাঙালী চরিত্রকে কলঙ্কিত করার জন্যে কেবলমাত্র আলোচ্য ভদ্রলোককে ভীরুতার অপবাদ দিয়েই ক্ষান্ত হননি,—তাঁকে বিশ্বাসহন্তা ও মিথ্যাবাদী [illegible] চিত্রিত করেছেন।

গুথরী তাঁর 'এ বেয়ার্ড ফ্রম বেঙ্গল' নামক উপন্যাসে আরেকটি বাঙালী চরিত্রের আমদানী করেছেন। তার নাম চন্দ্রবিন্দাবন ঘোষ। এ চরিত্রটিতেও ভীরুতার ও মিথ্যে অহমিকার কথা লেখক বর্ণনা করেছেন। পুনরুক্তির দোষ এড়াবার জন্যে এ চরিত্রের আলোচনা থেকে বিরত থাকলাম।

এবার আমরা কিপলিঙের বহু আলোচিত উপন্যাস 'কীমের' বাঙালী চরিত্র হরিবাবুর কথা বলতে পারি। হরিবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ। চন্দননগরে তাঁর যাওয়া-আসা থাকায় তিনি মোটামুটি ফ্রেঞ্চ ভাষা শিখেছিলেন। অবশ্য প্রয়োজনের সময়ে তাঁর এই ভাষাজ্ঞান বিশেষ কাজে আসেনি, তাই আক্ষেপের সুরে তিনি বলেছেন, চন্দননগর কলকাতার কাছাকাছি হওয়ায় তাঁর কীই বা লাভ হয়েছে, কেননা তিনি একজন ফরাসী এবং একজন রাশিয়ানের মধ্যে ফ্রেঞ্চ ভাষায় দ্রুত কথাবার্তার এক বর্ণও বুঝতে পারেননি।

কিপলিঙ হরিবাবুকে ধূর্ত শৃগালের মত চিত্রিত করেছেন। একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে ইংরেজী ভাষায় লিখিত উপন্যাসে বাঙালী চরিত্রগুলির মধ্যে হরিবাবুই একমাত্র পূর্ণাবয়ব চরিত্র। তাঁর চরিত্রকে বিকৃত করা হয়েছে সন্দেহ নেই, তাঁর নিজের ভীরুতার কথা তিনি নিজ মুখেই বারবার বলেছেন, তিনি তাঁর বিদ্যার আর যোগ্যতার বড়াই করেছেন বারবার। কিন্তু এসব সত্ত্বেও লেখক তাঁর সাহস, কৌশল আর কষ্টসহিষ্ণুতার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন।

উপন্যাসের নায়ক কীম-এর সঙ্গে বৃটিশ সেক্রেট সার্ভিসের কর্মী হরিবাবুর সাক্ষাৎ হয়েছে লখনৌএ। এই প্রথম সাক্ষাৎ অবশ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। দুজনের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হিমালয়ের এক পার্বত্য অঞ্চলে। একজন ফরাসী এবং একজন রুশ সেক্রেট এজেণ্টের কাছ থেকে কয়েকটি জরুরী দলিলপত্র আদায় করার উদ্দেশ্যে এই দুর্গম অঞ্চলে তিনি এসেছেন, তাঁর টেকের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। চাকরী তো তাঁকে বাঁচাতেই হবে। যুবক কীমকে তাঁর সহকারী হিসাবে কাজ করতে হবে।

হরিবাবু কীমকে বলেছেন যে এধরনের বিপজ্জনক কাজের জন্যে বেশ লম্বাচওড়া একজন লোককে নিয়োগ করা উচিত ছিল। কীম জানতে চেয়েছে যে হরিবাবু প্রাণ-হারানোর কথা ভেবেছেন কিনা।

হরিবাবুর উত্তর : দ্যাখো কীম, আমি হলাম হার্বার্ট স্পেন্সারের একনিষ্ঠ ভক্ত। মৃত্যুর মত তুচ্ছ জিনিসকে আমি মোটেই ডরাই না। তবে কথা হচ্ছে কি, ওই ভয়ংকর লোক দুটি আমাকে ধরে পিটুনি দিতে পারে। আমি আসলে সেই ভয়েই কাতর হচ্ছি।

'অফিসিয়াল ডেকরাম' সম্বন্ধে হরিবাবু খুবই সচেতন। তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কী হবে, কীম সে কথা জানতে চাইলে হরিবাবু তাকে সব কথা খুলে বলেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন যে 'অফিসিয়ালি' এসব গোপন তথ্য কীমকে জানাবার কথা নয়, তাই তিনি 'আনঅফিসিয়ালি' এ কথাগুলি বলেছেন।

তাঁর নিজের ভীরু স্বভাবের কথা হরিবাবু যখন সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন, সে সময়ে কীম পরিহাসের সুরে বলেছে যে ভগবান খরগোস সৃষ্টি করেছেন আর সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালী জাতটাকেও সৃষ্টি করেছেন। এ উক্তির প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, একথা শোনার পর হরিবাবু ডারুইনের সৃষ্টিতত্ত্বের সাড়ম্বর ব্যাখ্যা করে তাঁর পাণ্ডিত্য জাহির করার চেষ্টা করেছেন।

অবশ্য লেখক হরিবাবুর অসীম কষ্ট-সহিষ্ণুতার কথা উল্লেখ করেছেন এবং নিতান্ত অকিপলিঙ-সুলভ ভঙ্গীতে একথাও বলেছেন যে দশজন বৃটিশের মধ্যে ন' জনই, হরিবাবুর মত কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করতে সক্ষম হতেন না। অবশেষে হরিবাবুর কৌশলে এবং কীমের বাহুবলে তাদের যৌথ প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। অন্যান্য বৃটিশ ঔপন্যাসিকদের হাতে যেমন হয়েছে, ঠিক সেরকমভাবেই কিপলিঙের উপন্যাসেও হরিবাবু একটি কমিক চরিত্রে পর্যবসিত হয়েছেন, তবুও কিন্তু তাঁর চরিত্রের কয়েকটি বিশিষ্ট উপাদান পাঠকদের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। বইটি চলচ্চিত্রেও রূপান্তরিত হয়েছে।

কিপলিঙের উপন্যাসের পরে এবার ফস্টারের বহু আলোচিত এবং বহু প্রশংসিত উপন্যাস 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া'র প্রসঙ্গ আনা যেতে পারে। অবশ্য সবাই জানেন যে এ উপন্যাসের দুটি প্রধান ভারতীয় চরিত্রের (ডাক্তার আজীজ ও প্রফেসার গডবোলে) মধ্যে একটিও বাঙালী চরিত্র নয়। তবুও উপন্যাসের বিস্তৃত পট-ভূমিকায় কয়েকবার বাঙালী চরিত্রেরও আবির্ভাব হয়েছে। এই আবির্ভাব খুবই ক্ষণস্থায়ী হওয়ার দরুন তাঁদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করা ঔপন্যাসিকদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তবুও এই উপন্যাসে বর্ণিত বাঙালী চরিত্রের কথা এখানে সংক্ষেপে বলে নেওয়া যেতে পারে।

জেলাশাসক যুবক ইংরেজ অফিসার রোনী। তাঁর মা মিসেস মুর এবং তাঁর সম্ভাব্য ভাবী স্ত্রী মিস কোয়েস্টেড ভারতে এসেছেন বেড়াতে। তাঁদের দুজনেরই ভারতকে জানবার, ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করার প্রচুর ইচ্ছে। এ ব্যাপারে বিদেশী অফিসার মহল এবং তাঁদের পত্নীরা দুজনকেই নিরুৎসাহ করার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের আগ্রহ কম হয়নি। অগত্যা মিস্টার টারটনের গৃহে একটি পার্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানেই তাঁদের আগ্রহ মেটাবার চেষ্টা করা হবে। ভারতীয় অভ্যাগতরা নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই এসে পৌঁছেছেন। তাঁরা টেনিশ খেলার মাঠের এক প্রান্তে জড়ো হয়েছেন। দুপক্ষের মাঝে বিরাট ব্যবধান। অবশ্য যে সব ইংরেজরা অনেকদিন থেকে ভারতে আছেন তাঁরা ভালভাবেই জানেন যে এই ব্যবধান থাকাই স্বাভাবিক এবং যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ইংলণ্ড থেকে সদ্যআগত মিসেস মুর এবং মিস কোয়েস্টেড যুক্তি মানতে রাজী নন কিছুতেই।

মিসেস মুর প্রথমে তাঁর ভাঙা-ভাঙা উর্দুতে আলাপের চেষ্টা করলেন। কিন্তু মিসেস ভট্টাচার্য নাম্নী ভদ্রমহিলা জানালেন যে তাঁরা মোটামুটি ইংরেজী বলতে জানেন। মিস কোয়েস্টেড একথা জানতে পেরে উৎফুল্ল হলেন—এবার বোধহয় পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হবে।

কিন্তু না—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দুস্তর বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হল না। পার্টি ভেঙে গেল। অসফল পার্টি। বিদায়ের প্রাক্‌মুহূর্তে মিসেস ভট্টাচার্যকে (যাঁর চেহারা তাঁর বেশ ভাল লেগেছিল) জিগেস করলেন যে আগামী কোন একদিন তিনি তাঁর বাড়ীতে বেড়াতে যেতে পারেন কিনা।

মিসেস ভট্টাচার্য সানন্দে রাজী হলেন। দিন ও সময়ের কথা উঠলে তিনি জানালেন যে যে কোনদিন, যে কোন সময়ে তিনি আসতে পারেন। কিন্তু আবার পরমুহূর্তেই নার্ভাস হয়ে পড়ে শ্রীমতী ভট্টাচার্য জানালেন যে আগামীকাল তাঁরা কলকাতা যাবেন। তাঁর পতিদেবের সঙ্গে বাংলায় এক দ্রুত আলোচনার পর নেমন্তন্ন বহালই থাকল, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন একটু বেখাপ্পা ও বিসদৃশ হয়ে দাঁড়াল। কোথাও যেন একটা সুর কেটে গেল। বোঝা গেল যে এই দুদলের মধ্য হৃদ্যতা কোনক্রমেই সম্ভবপর হয়ে উঠবে না।

আরেকজন বাঙালীর কথাও ফস্টার উল্লেখ করেছেন। ভদ্রলোক একজন ম্যাজিস্ট্রেট। ডাক্তার আজীজের বিচার হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। তিনি নাকি মিস কোয়েস্টেডের শ্লীলতা-হানির চেষ্টা করেছিলেন। এই ব্যাপার নিয়ে সারা শহরে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। এখন বিচারকক্ষেও প্রচণ্ড উত্তেজনার ভাব রয়েছে।

মিস কোয়েস্টেড অসুস্থ। তাই তাঁকে একটা বসবার জায়গা দেওয়া হয়েছে। তার পাশে বেশ কয়েকজন শ্বেতকায় নরনারী তাদের বসবার জায়গা করে নিয়েছে। আসামীপক্ষের উকিল পরিহাসের সুরে বললেন যে শরীর খারাপ হওয়াটা কেবল-মাত্র শ্বেতকায় সম্প্রদায়ের একচেটিয়া নয়। বস্তুত, তাঁর ক্লায়েণ্টও অসুস্থ। তাঁকে বসবার জায়গা দেওয়া হবে কিনা, সে কথা তিনি জানতে চাইলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার দাস তাকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন। কিন্তু তার পরে যখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল এ ব্যাপারে যে শুধু মিস কোয়েস্টেডই নন, অনেকেই তাঁর ধারেপাশে আসন গেড়ে বসছে, তখন মিস্টার দাস তাঁর নিরপেক্ষতার নিদর্শন-স্বরূপ সবাইকেই ডায়াস থেকে নেমে যেতে বললেন। অবশ্য একথা বলার সময় তিনি নথিপত্র দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে রাখবার অক্ষম চেষ্টায় নিরত ছিলেন।

তার এই সাহসিকতার রোগী খুবই খুশী। স্থান কাল পাত্র সব ভুলে গিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল—ওয়েলডান দাস, ওয়েলডান।

ফস্টারের এই গ্রন্থখানিও বাংলায় শ্রীহিরণকুমার সান্যাল 'পরিচয়' পত্রিকায় এক সময় অনুবাদ করেন।

এভাবে বিংশ শতাব্দীর তিন দশকে প্রকাশিত কয়েকটি উপন্যাসের কথা। প্রথমেই এডমণ্ড ক্যান্ডলার রচিত একটি উপন্যাসের উল্লেখ করা যেতে পারে। এর নাম শ্রীরামা' দ্বিতীয় উপন্যাস গর্ডন ক্যাসারলি রচিত 'দ্য এলিফ্যাণ্ট গড।' প্রথম উপন্যাসটির নায়ক স্বামী, একজন বাঙালী পুরোহিত। সে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শত্রু। পাঞ্জাবে এসেছে সে পাঞ্জাবীদের মধ্যে বৃটিশবিদ্বেষের বীজ বপন করার উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয় উপন্যাসটি বাঙালী জাতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারে পরিপূর্ণ।

উপন্যাসের নায়কের নাম ভারমণ্ট। সে কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছে যে বেশ

কিছুসংখ্যক বাঙালী, বাঙলাদেশ থেকে ভুটানে চলে আসছে। ভুটানের দুর্গম অঞ্চলে তো শ্রমবিমুখ বাঙালীদের যাবার কথা নয়। নিশ্চয়ই কোথাও কোন গণ্ডগোল আছে। খোঁজখবর নেওয়ার পর ডারমট জানতে পারল যে ইংরেজী শিক্ষাপদ্ধতিতে উচ্চশিক্ষিত চনরবর্তী (বলা বাহুল্য, চক্রবর্তীর সহজবোধ্য বিকৃতি) এই অঞ্চলে এক গূঢ় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সে ভুটানের জনসাধারণকে বিদ্রোহে উস্কানী দিচ্ছে। ডারমট আরো দেখতে পেল যে চনরবর্তী যে টী এস্টেটে কাজ করে সেখানে সে অনেক বাঙালী যুবককে কুলীর কাজে বহাল করেছে। ডারমট বুঝতে পারল যে ব্যাপার খুবেই গুরুতর, কারণ সে ভাল করেই জানে যে 'সমগ্র ভারতবর্ষে বাঙালীরাই হচ্ছে সবচেয়ে চরমপন্থী, অবিশ্বাসী ও ইংরেজ বিদ্বেষী জাত।'

ইংরেজীতে লেখা ভারত সম্বন্ধীয় উপন্যাস সম্বন্ধে সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে ভারতের রাজনৈতিক জাগরণের কিংবা সামাজিক উত্থান সম্বন্ধে কোন আলোচনা এসব উপন্যাসে আমরা পাই না। কথাটি মিথ্যে নয়। অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের কথা না হয় বাদই দিলাম। ফর্স্টার এবং অরওয়েলের মতো শক্তিধর ঔপন্যাসিকেরাও তাঁদের উপন্যাসে এই বিষয়বস্তুগুলির উল্লেখ একেবারেই করেননি।

কিন্তু ক্যান্ডলার ও ক্যাসাবলির উপর্যুক্ত উপন্যাস দুটি পড়লে আমরা বুঝতে পারি যে বাংলার বিপ্লববাদ সম্বন্ধে তাঁরা অবহিত ছিলেন। অবশ্য স্বাভাবিক কারণেই এই বিপ্লববাদ তাঁদের মনে বাঙালীবিদ্বেষ আরো দৃঢ় করে তুলেছিল। সবশেষে আমরা ঔপন্যাসিক এডওয়ার্ড টমসনের নামোল্লেখ করতে পারি। একমাত্র তাঁর রচনাতেই বাঙালী চরিত্রের প্রশস্তি কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুত, তাঁর উপন্যাস পড়লে বাঙালীচিত্তের অহমিকাবোধে একটা সুড়সুড়ির ভাব হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়। টমসন ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশার চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী ও নেহরু প্রমুখ ভারতীয় মনীষীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমেও যোগাযোগ ছিল। বাংলা ভাষা সম্বন্ধেও তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই তাঁর গ্রন্থে এই অভিনবত্ব খুব বিস্ময়জনক হয়তো নয়।

তাঁর বহুপঠিত উপন্যাস 'এ্যান ইণ্ডিয়ান ডে'তে তিনি লিখেছেন যে প্রত্যেক বাঙালী জন্ম থেকেই নার্স এবং দয়া তাদের স্বভাবজাত। উপন্যাসের আরেক স্থানে তিনি বাঙালীদের স্বভাবকবি বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর 'এ্যান এণ্ড অফ দী আওয়ার' উপন্যাসে একটি উল্লেখযোগ্য বাঙালী চরিত্র আছে—তাঁর নাম কমলাকান্ত নিয়োগী। তিনি একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি উচ্চশিক্ষিত এবং বিশেষ কর্মদক্ষ। তাঁর ব্যবহার অমায়িক। তাঁর উপরওয়ালা, বিভাগীয় কমিশনার, শ্রীদেওঘরিয়া একজন মারাত্মক লোক। শ্রীনিয়োগী বৃটিশ শাসকদের বিশেষ অনুগত। কিন্তু তাঁর এই আনুগত্য তাঁর কোন কাজে আসেনি। শ্রীদেওঘরিয়ার আনুগত্যে এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও তিনি বৃটিশ শাসকদের প্রিয় পাত্র। নিয়োগীর সঙ্গে তাঁর মতান্তর ঘটায় দেওঘরিয়া তাঁকে এমন এক খারাপ জায়গায় বদলী করে দিলেন যেখানে ম্যালেরিয়া কিংবা অন্য কোন কালব্যাধির হাতে তাঁর অকালপ্রাপ্তি ঘটবে। এই হল তাঁর আনুগত্য আর যোগ্যতার পুরস্কার!

ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের কলমে বাঙালী চরিত্রের বিকৃতির কথা পড়তে গিয়ে একটা প্রশ্ন আমাদের মনে জাগা স্বাভাবিক—তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে বাঙালীদের এরকমভাবে চিত্রিত করেছেন কেন? অনেক সমালোচক এই প্রশ্নটি তুলেছেন এবং এর উত্তর দেবারও চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ সমালোচকের বক্তব্য অনেকটা এরকম। বৃটিশ ঔপন্যাসিকদের নিজেদের সম্বন্ধে এক 'ইমেজ' ছিল। তাঁরা মনে করতেন যে ভারতবর্ষে তাঁরা এসেছেন বলবুদ্ধি দিয়ে দেশের শান্তিরক্ষার জন্যে। তাঁরা নিজেদের ভারতবর্ষের 'সেভিয়ার' বলে মনে করতেই ভালবাসতেন। এই ধারণার জন্যেই ভারতের যে সব অঞ্চলে বৃটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি, যেখানে বৃটিশ জাতির বলবীর্য প্রদর্শন করার প্রয়োজন ছিল, সেসব অঞ্চলের কথাই তাঁরা লিখেছেন। আবার, এই বিশাল উপমহাদেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যে যাঁদের বলবীর্য উল্লেখযোগ্য, (যেমন পাঞ্জাবী, মারাঠি ও অন্যান্য পার্বত্য উপজাতি) তাঁদের সম্বন্ধেই বৃটিশ ঔপন্যাসিকেরা আগ্রহবোধ করেছেন, তাঁদেরকেই উপন্যাসের বিষয়বস্তু করেছেন। এসব ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের বৃটিশ সাম্রাজ্যবিরোধীরূপেই বর্ণনা করেছেন, তবুও তাঁদের বাহুবলের সশ্রদ্ধ বর্ণনা করতে দ্বিধাবোধ করেননি। এর ফলে অপ্রত্যক্ষরূপে নিজেদেরও বড়াই করার সুযোগ ঘটেছে, কারণ, এই বলশালী উপজাতিদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র বৃটিশ জাতিরই আছে, এরকম একটা মনোভাব প্রকাশ করার সুযোগ তাঁদের ঘটেছে।

এ ছাড়াও আরেকটা কথা আছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বাঙালীই প্রথমত এবং প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছিল। মনে হয়, তাদের এই বৈশিষ্ট্য বৃটিশ জনসাধারণ খুব একটা ভাল চোখে দেখেননি। বৃটিশ ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের পাঠকমানসের এই বিদ্বেষের ভাবটার কথা ভালভাবেই জানতেন। তাই তাঁদের উপন্যাসে পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্যে এমন বাঙালী চরিত্রের আমদানী করেছেন, যা পাঠকের মনে সুড়সুড়ি দিয়ে তাদের সহজেই হাসাতে পারে।

কয়েক বছর আগে 'এনকাউন্টার' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী লিখেছিলেন যে, ঔপন্যাসিক ফর্স্টার, যে সব ভারতীয় চরিত্র সৃষ্টি করেছেন এবং যাদের চারিত্র্যদৌর্বল্যের কথা উল্লেখ করে বৃটিশ জাতির দয়া ও সহানুভূতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছেন, তাদের কোনক্রমেই তৎকালীন ভারতীয় সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র বলে অভিহিত করা যায় না। বস্তুত, সে সময়ের ভারতীয় মনীষীবৃন্দ য়ুরোপীয় যে কোন জাতির মনীষীদের সমকক্ষ ছিলেন।

শ্রীচৌধুরীর এই মন্তব্যের সত্যতা অনস্বীকার্য। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ভারতে যে সব মহামনীষীর আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বাংলাদেশের অধিবাসী। কিন্তু বৃটিশ ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের কথা উল্লেখ করা তো দূরে থাক, সমগ্র বাঙালী জাতটাকেই হেয় জ্ঞান করেছেন। বোঝা যায় যে, এ ব্যাপারের পিছনে যে মানসিকতা কাজ করেছে, তা হচ্ছে এক গভীর ও দুমূর্লে হীনমন্যতা। আজকালকার এই ভাঙাচোরার বাংলাদেশে এসব কথা উল্লেখ করলে হয়তো মনে হতে পারে যে, অহেতুক আত্মশ্লাঘা লাভের জন্যেই হয়ত এসব কথা লেখা হচ্ছে। কিন্তু তা সত্য নয়।

যে সব উপন্যাসে প্রকৃত তথ্যকে এরকম নির্লজ্জভাবে বিকৃত করা হয়েছে, তা পড়ার দরকারই বা কি—এরকম একটা প্রশ্ন আমাদের মনে আসতে পারে। আমার মনে হয় এ ধরনের উপন্যাসগুলি মিলিতভাবে এমন একটা আয়নার মত, যার দিকে তাকালে আমাদের চরিত্রের স্খলন-পতনগুলিই খুবে বড় আকারে প্রতিফলিত হয়। তাই এগুলি আমাদের আত্মসমালোচনায় সুযোগ করে দেয়। আমার মনে হয় যে, এতে দোষের কিছু নেই। এ ছাড়াও আরেকটি কথা আছে। আমাদের জাতিগত দুর্বলতার মধ্যে একটি প্রধান দোষ এই যে, আমরা নিজেদের দোষগুলির কথা ভেবে হাসতে জানি না। সময় সুযোগ থাকলে এই উপন্যাসগুলির মধ্যে দু-একটি পড়ে হয়ত আমরা নিজেদের কথা ভেবে নিজেরাই হাসবার শিক্ষা পেতে পারব। এসব উপন্যাসের অধিকাংশই অনেক দিন আগেকার লেখা—তখনকার দিনের যে সব সমস্যা পাঠকদের ভাবিয়ে তুলত, যেমন, বৃটিশ জাতির আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি। আজ এ সবই অনেক দিনকার বাসি সমস্যা হয়ে পড়েছে। তাই নিস্পৃহ ও নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে এ উপন্যাসগুলি এখন হয়তো পড়া সম্ভব। আর সেরকমভাবে পড়লে এ উপন্যাসগুলির বাঙালী চরিত্র আমাদের হয়তো আমোদ এবং আনন্দই দেবে।

জাহারফ!! বেসিল জাহারফ!!

একটি বিদ্যুৎপ্রভ নাম। এ নাম এমন একজন মানুষের যাঁর তুল্য ধনীর সংখ্যা এ দুনিয়ায় তদানিন্তন সময়ে বুঝি হাতে গোনা যেত। সর্বাধিক রহস্যময় এ মানুষটি তাবং বিশ্বে এক সময় সর্বাধিক ঘৃণিত ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন।

এই লোকটিকে যে কেউ হত্যা করতে সক্ষম হবে তাকে এক লক্ষ ডলার প্রদান করা হবে, এই ধরণের একটি ঢালাও পুরস্কার ঘোষিত ছিল একদা। অজস্র পুঁথি পুস্তক লিখিত হয়েছে এঁর সম্পর্কে। এ মানুষটি ছিলেন তখন আন্ত-র্জাতিক সন্দিগ্ধতা এবং জাতীয় ঘৃণার এক বিস্ময়কর প্রতীকস্বরূপ।

উৎকট দারিদ্রের মধ্যে জন্ম নিয়ে ইনি অবশেষে এ জীবনেই আজগুবী অঙ্কের অর্থসম্পদ আহরণে সমর্থ হয়েছিলেন। এই বিপুল অর্থ কীভাবে উপার্জিত হয়েছিল? হয়েছিল, গোলা-বারুদ, মেসিনগান, কামান ও নানাবিধ উগ্র বিস্ফোরক দ্রব্যাদি বিক্রয়ের মাধ্যমে। জাহারফের একটি জীবনী গ্রন্থের শুরু এইভাবে :

'লক্ষ কোটি মানুষের কবরস্থান হবে এঁর স্মৃতিস্তম্ভ আর তাদের অন্তিম আর্তনাদ হবে এঁর সমাধী বেদীর উৎকর্ণ-লিপি।'

পঁচিশ বছর বয়সে জাহারফ চাকুরী গ্রহণ করেন। সেটা হল কমিশনসহ সপ্তাহে ২৫ ডলারের মাইনেতে গোলা-বারুদ বিক্রি করার এক চাকুরী। গ্রীস দেশে বাস করতেন তখন। সে বয়সেই তাঁর এই জ্ঞান-টুকু জন্মেছিল যে এই 'মাল'-এর চাহিদা সৃষ্টি করতে পারলে তবেই এই ব্যবসা জম-জমাট হয়ে উঠবে।

অতএব কালবিলম্ব না করে তিনি গ্রীকবাসীদের মনে অচিরে ভীতি জাগিয়ে তুললেন। তাদের বোঝালেন, গ্রীসদেশের চরম দুর্দিন সমুপস্থিত। তারা নাকি রক্ত-পিপাসু শত্রুদলের দ্বারা প্রায় বেষ্টিত হয়ে পড়েছে। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে, অর্থাৎ স্বর্গসম পিতৃভূমিকে রক্ষা করবার একমাত্র পথ হল অবিলম্বে অস্ত্র-বলে বলীয়ান হওয়া অর্থাৎ অবিলম্বে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করা। এতেই কাজ হল। সত্যি সত্যিই সারা গ্রীস দেশে উত্তেজনার বন্যা বয়ে গেল। আজ থেকে অর্ধ শতাব্দী কালের চেয়েও বেশীদিনের ঘটনা এটি। ব্যাণ্ডে ব্যাণ্ডে জাতীয় সংগীত বাজতে লাগল যত্রতত্র। প্রাসাদ শীর্ষে শীর্ষে জাতীয় পতাকা আন্দোলিত হতে শুরু করল। জনসভার নেতৃবৃন্দ গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বোধিত করে তুলতে লাগলো স্বদেশবাসীদের। প্রচুর সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে

ফেলল গ্রীসদেশ। জাহারফের কাছ থেকে ঘাটতি প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করল। এমন কি একটি সাবমেরিনও কিনে ফেলল। বিশ্বের সর্বপ্রথম নির্মিত জঙ্গী ডুবো জাহাজের অন্যতম সেটা।

কমিশনস্বরূপ কয়েক কোটি ডলার বাগিয়ে নিয়ে জাহারফ অবশেষে গ্রীসদেশ ত্যাগ করে তুরস্কে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে হিতৈষির অভিনয়ে তুর্কীদের বোঝালেন, তোমরা করছ কি? এখনও চুপচাপ বসে আছ? চোখ মেলে দেখো গ্রীকেরা কি করছে এবং করেছে। তারা তোমাদের এ পৃথিবী থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জঘন্য ষড়যন্ত্র করছে, ভয়ংকর কূট ফন্দি আঁটছে। তোমরা আর চোখ বুজে থেকো না, বন্ধুগণ। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। এবং জাগরণের পর...

অতএব শঙ্কিত তুর্কীরা দু-দুটি সাবমেরিণ কিনলো ওঁর মারফত। পুরোপুরি অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। জাহারফের পোষ মাস। জয়যাত্রারম্ভ। এ এমন ব্যবসা যার সৌজন্যে তিনি তিরিশ কোটি ডলার উপার্জনে সক্ষম হয়েছিলেন ভবিষ্যৎ কালে। এবং বলা বাহুল্য এই অর্থের পুরোটাই বুঝি ছিল নররক্তে চোবানো।

পাক্কা পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে জাহারফ দেশেদেশে ঘৃণা ও বিদ্বেষ উদ্রেক করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। জাতিতে-জাতিতে বিদ্বেষকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলেছিলেন এ মানুষটা। দেশেদেশে শত্রুতা বাড়িয়ে যুদ্ধের আবহাওয়া উসকে দিচ্ছিলেন।

রুশ-জাপান যুদ্ধে উভয় পক্ষের কাছেই রণসম্ভার বিক্রয় করেছিলেন জাহারফ। স্পেন-মার্কীন লড়াইয়ে তিনি স্পেনকে বুলেট রাইফেল বেচেছেন। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় তাঁর মালিকানায় অস্ত্র বারুদ উৎপাদক কারখানাসমূহে যুগপৎ ছিল জার্মানী, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইতালী প্রভৃতি দেশে। এই পথে তাঁর বিপুল অর্থ সম্পদ সঞ্চিত হতে থাকল কল্পনাতীত দ্রুত গতিতে, আজগুবী এক অঙ্কের পরিধিতে।

অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে জাহারফ বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে, সাংঘাতিক গোপনীয়তার সঙ্গে নিজ কার্য হাসিলের উদ্দেশ্যে ইয়োরোপের প্রতিটি দেশের যুদ্ধ দপ্তরে দপ্তরে আনাগোনা করে ফিরেছেন।

কথিত আছে, ইনি এমন দুজন কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন যারা দেখতে হুবহু তাঁরই মত। ফিল্ম ভাষায় ডাবল-এর কাজ করত এরা। এদের প্রধান কাজ ছিল বিভিন্ন স্থানে সাধারণ্যে দেখা দেওয়া। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, একজন হয়ত গেল বার্লিন, অপরজন গেল মন্টিকার্লোতে। দুজায়গায় স্থানীয় সংবাদপত্রাদিতে যখন তাদের উপস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট বের হচ্ছে, ঠিক সে সময়ে আসল জাহারফ হয়ত তখন চুপিসারে তার কোন গোপন বাণিজ্য সারবার উদ্দেশ্যে অপর কোন নগরীতে বিচরণ করে ফিরছেন। জ্ঞাতসারে তিনি কখনোই ফটো তোলার জন্য ক্যামেরার সম্মুখীন হতেন না। এবং কখনো কাউকে ইন্টারভিউও দিতেন না। আরেকটি ব্যাপারও ছিল বড় অদ্ভুত। তিনি তাঁর বিরুদ্ধে স্তূপাকার ভূরি ভূরি নিন্দাবাণী বা ধিক্কারধ্বনি প্রভৃতির ব্যাপারে কখনো আত্মপক্ষ সমর্থন করতেন না বা বিশ্লেষণ করতেন না, অথবা প্রতি-আক্রমণ করতেন না বা কোন প্রকার উত্তর-প্রত্যুত্তরের ধারে কাছেও কদাপি যেতেন না। নিরবে, নিঃশব্দে নিজকর্ম হাসিল করে যেতেন এই অভাবনীয় কর্মবীর।

সুন্দরাকৃতি, দীর্ঘকায়, স্মার্ট এক ছাব্বিশ বছরের যুবা যখন বেসিল জাহারফ, সে সময় তিনি আকণ্ঠ প্রেমে পড়লেন এক সপ্তদশী রূপসী কন্যার।

প্যারিস থেকে এথেন্স যাবার পথে ট্রেনের মধ্যে আলাপ হল মেয়েটির সাথে। সঙ্গে সঙ্গেই জাহারফ তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে বসলেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্য, মেয়েটি বিবাহিতা। ওর দ্বিগুণ বয়সী স্বামী ছিলেন স্পেন দেশীয় জনৈক ডিউক। এর উপর মেয়েটির ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী তার কাছে ডাইভোর্স নিষিদ্ধ। কাজে কাজেই সূত্রপাত হল এক বিস্ময়কর ব্যাপারের। অবিশ্বাস্য ধরণের এক প্রতীক্ষা করে রইলেন জাহারফ মেয়েটির জন্য। কত-দিন জানতে চান? প্রায় পঞ্চাশ বছর। অবশেষে এই দীর্ঘকাল অন্তে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মেয়েটির স্বামী ডিউক মহাশয় এক পাগলাগারদে দেহরক্ষা করেন।

আর ১৯২৪ শে জাহারফের সঙ্গে তাঁর বহুপ্রতীক্ষিত দয়িতা সেই মেয়েটির সঙ্গে শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হয়। সে সময় কনের বয়েস কিঞ্চিদধিক ৬৫ আর বরের বয়স তখন পাক্কা ৭৪ বছর।

এর দু বছর বাদে পত্নীর মৃত্যু ঘটে। মহিলাটি জাহারফের প্রেমিকা ছিল ৪৮ বছর আর স্ত্রী ছিল মাত্র আঠারো মাস।

শেষ বয়েসটা আমৃত্যু গ্রীষ্মাবকাশ কাটিয়ে গেছেন প্যারিসের নিকটবর্তী একটি স্থানে নয়নাভিরাম এক প্রাসাদোপম অট্টালিকায়। অথচ তাঁর জন্ম হয়েছিল সুদূর তুরস্কের যে কুঁড়ে ঘরে তার কিন্তু কোন জানালাও ছিল না। শৈশবে দারিদ্র্যের জন্য তাঁকে নোংরা মেঝেতে নিদ্রা যেতে হয়েছে। শীত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য পায়ে ছেঁড়া কম্বল জড়াতে হয়েছে। তাছাড়া প্রায়ই তাঁকে অনাহারে কাল কাটাতে হয়েছে।

বছর পাঁচেক মাত্র তাঁর বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিল। অথচ শুনলে অবাক লাগে তিনি একটি দুটি নয় পুরোপুরি চৌদ্দটি ভাষায় অনর্গল কথা বলে যেতে পারতেন। অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় একদা তাঁকে 'ডকটর অব সিভিল ল' উপাধীতে ভূষিত করে।

তিনি যখন সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডে পদার্পণ করেন তখন চৌর্যাপরাধে তাকে কারাগারে প্রবেশ করতে হয়। এরই তিরিশ বছর বাদে ইংলন্ডেশ্বর তাঁকে নাইটহুড উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে একদা ইয়োরোপের এই রহস্যময় পুরুষ প্যারিসের প্রখ্যাত চিড়িয়াখানার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন অকস্মাৎ একটা দৃশ্য দেখে তিনি খুবই শক পেলেন।

দেখলেন, ওখানকার বানরকুল খোস পাঁচড়ায় ভুগছে আর ভুগছে অল্পাহারজনিত অপুষ্টিতে। আরও দেখলেন সেখানকার সবচেয়ে নামকরা সিংহটি দুরারোগ্য বাত-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে। চারদিকের পারি-পার্শ্বিক অবস্থাও নিদারুণ শোচনীয়। তৎক্ষণাৎ ম্যানেজারকে ডেকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করলেন। ম্যানেজার কল্পনায়ও বুঝতে পারে নি যে তার সঙ্গে কথা বলছে বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তিটি। তাই সে তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিল যে এই সব জন্তু-জানোয়ারদের উপযুক্ত যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণাদির জন্য প্রয়োজন কম পক্ষে পাঁচ লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক মুদ্রার। সে অর্থ চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের হাতে নেই। জাহারফ সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, বেশ, ঐ পরিমাণ অর্থের যদি প্রয়োজনবোধ করেন আপনারা, আমি এখুনি তা দিয়ে দিচ্ছি—একথা বলে তিনি এক লক্ষ ডলারের একটি চেক লিখে ম্যানেজারের হাতে তুলে দিলেন।

যাঁর বিক্রিত বুলেটে দশ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে সেই মানুষ কিছু জীবহিতে অর্থাৎ কয়েকটি জন্তু জানোয়ারের হিতার্থে লক্ষ ডলারের এক চেক অনায়াসে প্রদান করলেন। নিয়তির অদ্ভুত পরিহাস আর কাকে বলে।

চেকে স্বাক্ষরের পাঠোদ্ধার করতে অক্ষম উক্ত ম্যানেজার ভাবলে, এই অপরিচিত আগন্তুক ভদ্রলোক বোধ করি তার সঙ্গে একটা হাল্কা রসিকতা করে গেলেন। তাই সে উক্ত চেকটাকে আর পাঁচটা বাজে কাগজের ভীড়ে ফেলে রেখে দিল এবং এক সময় সেটার কথা বেমালুম বিস্মৃতও হল।

বেশ কয়মাস বাদে সে ঐ চেকটা তার এক বন্ধুকে হাস্যচ্ছলে দেখায়। বন্ধুর কথা শুনে মুহূর্তে কিন্তু তার মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে সেখানে ফুটে ওঠে পরম বিস্ময়।

অ্যাঁ! বলো কি! এ স্বাক্ষর তাহলে ফরাসী দেশের মধ্যে সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি জাহারফের?

বেসিল জাহারফ পঁচাশি বছর বয়সে দেহরক্ষা করেন। নিঃসঙ্গ, করুণ, ভগ্নস্বাস্থ্য এক স্থবিরাবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। শেষ বয়েসে হুইল চেয়ারে বসে বসে ভৃত্যের সাহায্যে ঘুরতে হতো। সে সময় তাঁর জীবনের পরম নেশা ছিল অনবদ্য গোলাপ গাছে ভরা একটি বাগান দেখাশোনা করা।

পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি তাঁর ডাইরী লিখে গেছেন। তা দিয়ে তেত্রিশটি গ্রন্থ প্রস্তুত হয়েছে। শোনা যায় তাঁর শেষ আদেশ ছিল যে মৃত্যুর সাথে সাথেই তাঁর গুপ্ত রিপোর্টাদি যেন সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে ফেলা হয়।

পয়লা আষাঢ়ে

মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

"আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" বর্ষার কী শোভা প্রত্যক্ষ করেছিলেন মহাকবি কালিদাস, তা কেবল তিনিই জানতেন, আর হয়ত জানত সেকালের উজ্জয়িনী। আরো একজন ভিন্নভাবে জেনেছিল, সে হচ্ছে 'মেঘদূত'-এর সেই বিরহী যক্ষ।

পাহাড়ের সানুদেশ আশ্লেষ করে থাকত সেদিনে ঘনকৃষ্ণ মেঘের দল, খেয়াল খুশিমত তারা নাকি কবির চক্ষুর সামনে বপ্র-ক্রীড়া করে বেড়াত, কখনও যূথবন্ধ মাতঙ্গদলের মতো পাড়ি দিত আকাশ, উচ্ছলা ললনার মতো মুহুর্মুহুঃ চকিতচপল তাঁর কটাক্ষ হানত বিজুরি, কেউ বেরুত অভিসারে, কেউ একলা একলা বসে বসে হাপরের মতো নিশ্বাস ফেলত, ইত্যাদি, ইত্যাদি—অন্তত এই ধরনেরই সব ব্যাপার-ট্যাপার ঘটত বলে আমরা পুঁথিপত্তরে পেয়ে থাকি।

কিন্তু একালে? এই—মানে, ধরুন, বিংশ শতকে?

আপনারা হয়ত বলতে পারেন—বর্ষার শোভা, সে তো একটু চোখ তুলে তাকালেই দেখা যায়; আর ও চোখ তোলাতুলিরই বা কী আছে, মহাকবি কালিদাসের আমলে যে কালো মেঘ-বাজ-বিদ্যুৎ-বৃষ্টি, আকবর বাদশার আমলেও তাই, লর্ড ক্লাইবের কালেও একই ব্যাপার, আজ ১৩৭৮ বাংলা সালের জমানায়ও সে-জিনিসের কোনও ব্যত্যয় নেই। ও তো চোখ বুজেও বলে দেয়া যায়।

সিগারেটের মুখাগ্নি সংস্কারসাধন করে পয়লা সুখটানটি দিয়ে নাকে-মুখে ধূমোদগীরণ করতে করতে সুখময় রায় দিলে, "সে শোভার—রাজা বিক্রমাদিত্যের আমলের উজ্জয়িনীর কিংবা অন্যান্য জায়গার সেই বর্ষার শোভার—অভিজ্ঞতা বা কল্পনা এই বিংশ শতাব্দীর কলকাতায় বসে সম্ভব নয়।"

কেন? হেতু? কারণ?

"থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি"।

অর্থাৎ?

"অর্থ তো খুব সোজা। স্থান-কাল-পাত্র তিনটেই বদলে গেছে। পয়লা আষাঢ়ের তদানীন্তন চেহারাটাও গেছে পাল্টে।"

পরিবর্তন হলেও বস্তুটার তো বিলোপ ঘটেনি—আষাঢ়ের মাস পয়লা আজও তো হয়! এবং 'ট্র্যাডিশন' বা ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য বলে একটা কথাও তো চালু আছে! সোজা কথায়, আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের চরিত্রসূচক এমন কিছু কিছু অভিজ্ঞান তো থাকার কথা, যা সেকালেও ছিল একালেও আছে!

"সে ট্র্যাডিশনের নামান্তর হল রোমন্থন অথবা চর্বিত-চর্বণ।"—সুখময় সিগারেটের লম্বমান ছাইটা ঝেড়ে ফেলে বললে, "নতুনত্বও কিছু দেখি না, সাবেক চেহারাটা তো কবেই বায়ুভূত হয়ে গেছে। সমস্তটা ঘেঁটেঘুঁটে তালগোল পাকিয়ে একটা মণ্ড হয়ে গেছে। এখন বিক্রমাদিত্যের যুগের সে ট্র্যাডিশন খুঁজতে গেলে জাবরই কাটতে হবে কেবল।"

তাহলে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে বর্ষার রূপটা কী দাঁড়াল?

"বুঝ গুণী যে জান সন্ধান। বুঝতে চাইলেই বুঝতে পারবে।" সুখময় সিগারেটের ধোঁয়া আর কথার কারসাজিতে মিলিয়ে একটা হেঁয়ালির সৃষ্টি করে তুললে, যার রহস্যভেদ করে বিন্দুবিসর্গ বোধোদয় আমার হল না। তারপর জামাকাপড় ঝেড়েঝুড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "চলি ভাই এখন, কাজ আছে একটু।" সুখময় সিগারেটের শেষ অংশটাকে পায়ে মাড়িয়ে নিবিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল দেয়ালের গায়ের একটা তারিখ।—হ্যাঁ, ঐ তারিখটা আজকেরই। পয়লা আষাঢ়। আষাঢ়স্য প্রথম দিবস।

সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা নেই। কবি হিসেবে কালিদাসের নামটা শুনেছি, 'মেঘদূত' বলে ভদ্রলোক একটা দুঃখের কাব্য লিখেছিলেন জানি, তার গল্পটা বাংলায় পড়েছি, পড়ে অবিশ্যি মন্দ লাগে নি—এইমাত্র।

শোনা আছে, পয়লা আষাঢ়ে যে বর্ষাকাল পড়ল, সেটি নাকি বিরহ ও বিরহীদের জন্যে মার্কামারা ঋতু। হতে পারে। তবে এ সম্পর্কে 'ফার্স্টহ্যাণ্ড' মতামত দিতে পারছিনে কেননা যাঁর-বিহনে বিরহ নামক অনুভূতিটির উদ্রেক ঘটে, তিনি গৃহে অথবা হৃদয়ে এযাবৎ পদার্পণ করেননিই মোটে—অতএব মিলনেরই যেখানে বাকি, বিরহের প্রশ্ন সেখানে ওঠেই না। তবে হ্যাঁ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলেও বিরহ ব্যাপারটা একটু একটু যেন বুঝি-বুঝি বলে মনে হয় এককে সময়। (সেটা বোধ হয় অল্পবয়স থেকে ডেঁপোর মত নাটক নভেল আর প্রেমের কবিতা পড়বার ফল, সাধে কি আর বয়োবৃদ্ধেরা এই নিয়ে অত টিকটিক করেন!)

সে যাই হোক, এককে সময়ে মনটা চুলবুল করে, কেন বুঝতে পারিনে হিয়াটা উদাস-উদাস ঠেকে, বিশেষ করে বর্ষাকালে যখন ঝড়জলের জন্যে ঘরে বন্ধ থাকতে হয় একলা অথচ বই পড়তে বা পেশেন্স খেলতে ভাল লাগে না। একেই হয়ত বিরহের ভাব বলে—অনেকবার অনেক জায়গায় কেতাবেও পড়েছি, বর্ষাকালটা বিরহের আর অভিসারের ঋতু, এসময়টায় দম্পতিদের তো বটেই, প্রেমিক-প্রেমিকাদেরও নাকি একলা থাকতে হলে প্রাণ আনচান করে ওঠে।

আর তখনই সমবেদনা জাগে কালিদাসের যক্ষ-বেচারার জন্যে। মনে হয়, ও আর আমি ভাই-ভাই। ও-বেচারার বউ থেকেও নেই আপাতত, এই আষাঢ় মাসে হা-পিত্যেশে শুকিয়ে মরছে তাই—আর আমার তো মূলেই হাভাত—অথচ বিরহবোধ দুজনকারই অস্তি। ভাই যক্ষ, তোমার সমব্যথী সমান্বক হবার যোগ্যতা আমার ও আমার মত আইবুড়োদের নেই কি? কাজেই হাতে হাত মেলাও দোস্ত!

সকালে সাড়ে-সাতটার আগে কোনদিনই ঘুম ভাঙে না আমার। গতরাত্রে দেখে শুয়েছিলুম, আকাশ সাফ, মেঘের কোন চিহ্ন নেই, গরম প্রচুর। তারপর সারা রাত অঘোরে ঘুমিয়েছি বৈদ্যুতিক পাখা চালিয়ে দিয়ে—কোন সাড়ই ছিল না। যথারীতি যথাসময়ে ঘুম ভেঙেই তাৎক্ষণিক জাড়্যমায় মনে হল, এখন সবে ভোর, সূর্যিমামার দেখা দেবার বারো একটু যেন দেরি আছে। অতএব নিদ্রালস চোখের পাতা দুটোকে বন্ধ রেখেই পাশ ফিরে আরেক দফা ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলুম, কিন্তু ঘুম আর এল না। অতঃপর ভাল করে চোখ খুলে দেখি, যেটাকে ভোরের আবছা আলো বলে প্রথমে মনে হচ্ছিল সেটা আসলে মেঘলা আকাশের আঁধার। জানালার বাইরে যতটুকু দেখা যায়, "নবমেঘভারে গগন আবৃত"। ঘড়িতে প্রায় আটটা বাজে। ঘরের মেঝেয় খোলা জানালা দিয়ে ঢোকা প্রচুর জল, জানালার কোল ভিজে। বোঝা গেল, রাত্তিরের মধ্যেই কখন মেঘোদয় হয়েছে এবং আমার অজ্ঞাতেই সে-মেঘ পৃথিবীর ওপর জলনিষেক করে গেছে। রেশটা রয়েছে এখনো।

ছোট ভাই রবিঠাকুর আওড়াতে আওড়াতে ঘরে ঢুকল—"ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।"

"তার মানে?" আমি উঠে বসতে বসতে বললুম। 'হঠাৎ কবিতার বেগ যে!'

"মানে?—থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ থৈ!" ভায়া খৈ ফোটাতে লাগল গলায়, দুপাশে দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে যে জিনিসটা করতে গেল সেটা দাঁড়াল নৃত্যমুদ্রার একটা ক্যারিকেচারে। তারপর বললে, "শয়নাধার থেকে অবতরণ করে রাস্তার দিকে তাকাও! কী দেখছ? জলে থৈ থৈ করছে। কালীঘাট-টালিগঞ্জ-বালিগঞ্জের ট্রাম ভোর থেকেই বন্ধ। এক হাঁটু জল। ওঃ, রাত্তিরে যা বৃষ্টিই গেছে—কেন টের পাওনি নাকি কিছু?...এই তো, মেঝেতেও তো একগাদা জল—"

কথাটা যথার্থ। কিছুই টের পাইনি। ঘুমন্ত।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মনে হল, কলকাতাটাই জলে ভাসছে। কাদাগোলা মোকিলা-ভাস কালচে জলে ঢেউ উঠছে অনবরত রাস্তায়। ঐ নোংরা জল ভেঙে ভেঙে একটু বাদেই অফিসে বেরুতে হবে ভেবে গা ঘিন ঘিন করে উঠল যেন। তাছাড়া

ট্রাম বন্ধ মানেই তো—বিশেষ করে অফিস টাইমে—বাসের অবস্থা আতঙ্কজনক। ঘুম থেকে উঠেই মনটা খিঁচড়ে গেল যেন।

বাহবা বাহবা। কলকাতার বর্ষা—কিবা তার শোভা!

নিকাশ নেই, অতএব প্রবহমান জলরাশির বিকাশটা মর্মন্তুদ। শহরে পয়ঃপ্রণালীর গলা সামান্য বৃষ্টিতেই আবেগে বুজে আসে (আহা, কী ভাবপ্রবণ। বাঙালীর শহরেরই পয়ঃপ্রণালী তো, কণ্ঠ রুদ্ধ হতে সময় লাগে না)—ফুটে ওঠে সেই আবেগে রাজপথে জনপথে জলের স্রোত, জনে জনে পায়ে ধরে অনুরোধ জানায়, 'এ অবরুদ্ধ দশা থেকে মুক্তি দাও।' কিন্তু হায়, হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে বা ট্রাউজার গুটিয়ে জলযাত্রা করি তো আমরা সকলেই—কেরাণী, দোকানী, পৌর-পিতা, সবাই—কিন্তু পায়ে-পায়ে-জড়িয়ে ধরা ঐ জলরাশির সে ভাষা ক'জন বুঝি আমরা!

নিরপেক্ষ বিচারে, শহরের পৌর-পিতাদের কিন্তু এজন্যে বরং ধন্যবাদই প্রাপ্য। এতবড় একটা শহরের বুকে বসে পল্লীগ্রামের মত নদীপ্রবাহের দৃশ্য দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন যাঁরা, অবশ্যই তাঁরা প্রাতঃ-স্মরণীয়। সেই নদীতে বিহার করবার উপযোগী যথেষ্ট নৌকোর ব্যবস্থাটুকু করে দিলেই ষোলকলা পূর্ণ হত। তা সেও এমন কিছু একটা অবাস্তব প্রস্তাব নয়। নিন্দুকেরাই শুধু বলে, তাঁরা নাকি ইচ্ছে করেই শহরের পয়ঃপ্রণালীর একটা সুব্যবস্থা করেন না। আমাদের পাড়ার হাঁদুকোখুড়ো যেমন বলেন, "কলকেতা শহরে ব্যাঙে প্রস্রাব করলেই রাস্তায় এক হাঁটু।"—পাগলে আর বুড়োতে কী না বলে! ছেড়ে দিন ওকথা। এমন শহর কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি—।

বর্ষার এ অভিজ্ঞতা কবি কালিদাসের নিশ্চয় ছিল না। এবং সে-কারণে বেঁচে গেছেন ভদ্রলোক, 'মেঘদূত' জাতীয় উৎকৃষ্ট সামগ্রী লিখে যেতে পেরেছেন, "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে কদম্বোদকাক্লিষ্ট-জানুং সন্তরণমানং মনুষ্যং" ইত্যাদি-গোছের লেখা লিখতে হয়নি তাঁকে।

আষাঢ়ের বর্ষণে যখন রাজপথ নদীপথে পরিণত হয়, এক ধরনের রাজালস্য পেয়ে বসে আমায়। বাহিরে বারি যবে ঝরিছে ঝরঝর বিজুরি ঘন ঘন চমকায়, তখন মনে হয় আমিই বা কে, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মহান অধিপতিই বা কে। চাকরি এবং ওপর-ওয়ালার ভাবনাকে 'গোলী মেরে' দিতে ইচ্ছে হয়। কল্পনার চোখে কলকাতাটাকে বানিয়ে দিই ভেনিস শহর, ধরে নিই সামনের ওই জলপথের বুকে ভাসছে অনেক অনেক গণ্ডোলা, আর তারই একটিতে বসে ভেসে বেড়াচ্ছি আমি, অবশ্যই একা নয়, কোন কাজ নেই, কোন ব্যস্ততা নেই…। কিংবা হয়ত বসে রয়েছি কাশ্মীরের কোন বোট-হাউসে ডাল নতুবা উলার হ্রদের ওপরে, ট্রামে-বাসে বাদুড়ঝোলা নেই, সময়ে হাজিরা দেওয়া নেই, মনিজয়োজ্জগারের মাথাব্যথা নেই…

অথবা কল্পনার পাখায় ভর না করে স্বচ্ছ বাস্তব-দৃষ্টিতেই দেখি, মোটরগাড়ি-গুলো স্টীমার-লঞ্চের মত চাকার ঘায়ে দুপাশে দুই জলচক্রের সৃষ্টি করে রাস্তার জমা জলে ঢেউ তুলে চলেছে, আধুনিকা ললনাদের ফাঁপানো-ফ্যাশান আকাশের বৃষ্টি এবং পথের জলরাশির যুগ্ম ষড়যন্ত্রের ফলে চুপসে গিয়ে গলে গিয়ে ন্যাতাজোবড়া ও জবুথবু করে তুলেছে তাদের মাঝরাস্তায়… ইচ্ছে জাগে 'ফ্রেঞ্চ লীভ' নিয়ে গ্যাট হয়ে বাড়িতে বসে ঘন্টায় ঘন্টায় চা ধ্বংসাই এবং কলার পাত পেড়ে গরম গরম খিচুড়ির সংগে ডিমভাজা আর ইলিশ মাছ…

খিচুড়ি, ডিমভাজা আর 'ফ্রেঞ্চ লীভ' ম্যানেজ করা যায়, কিন্তু ঠেক খেতে হয় ইলিশে এসে। প্রথমতঃ, ইলিশে আগেকার সে স্বাদ আজ আর নেই, ইলিশ খাচ্ছি কি পার্শে খাচ্ছি টের পাওয়া দায়—দ্বিতীয়তঃ, একটা মাঝারি মাপের ইলিশের সম্মান দক্ষিণা দিতে গেলেও বৈদ্যুতিক 'শক' খাবেন আপনি। 'ইলশেগুঁড়ি ইলিশমাছের ডিম"—বর্ষাকালের সঙ্গে এই মৎস্যবিশেষের বিশেষ সম্পর্ক, অন্তত এযাবৎ তাই ছিল; কিন্তু অধুনা বর্ষাকাল, ইলিশ ও আমরা (মানুষ) এই ত্র্যহ-স্পর্শের ফলে শেষোক্ত শ্রেণীর কপালে ঘোড়ার ডিম। হায় ইলিশ!

…আচ্ছা, সে-আমলের বিরহী-বিরহিনীরা কীভাবে বর্ষাকে আবাহন জানাত? এটা ঠিক যে, চাল-ডাল-নুন-তেল-কাপড়ের চিন্তায় তাদের সর্বদা উত্যক্ত থাকতে হত না, কাজেই তারা হৃদয় প্রভৃতি নিয়ে কারবার (অবৈতনিক) করবার যথেষ্ট অবসর পেতে পারত। যেসব সুন্দরীরা সন্ধ্যা কি রাতের অন্ধকারে বৃষ্টিতে ভিজেই অভিসারে বেরুত, একালের প্রেমিকদের মত হাঁটুনাগাল নোংরা জল ভেঙে ভেঙে এবং বাসের মাত্রাছাড়া ভিড়ে (ট্রাম নেই, কারণ সামান্যতম জলেই শহরের ট্রাম চলাচল বন্ধ হয়ে যায়) পিষ্ট হতে হতে প্রিয় সম্মিলনে যাবার দুর্ভোগ তাদের নিশ্চয়ই ভুগতে হত না। তা ছাড়া পথেঘাটে 'রাউডি' গুণ্ডা কিংবা দুশ্চরিত্র লোকের পাল্লায় অথবা নিরিবিলি নিকুঞ্জে বেরসিক পুলিশের বেয়াড়া জিজ্ঞাসাবাদের জেরায় পড়বার এতটা ভয় তখন ছিল না। সেকালের মানুষগুলো এ যুগের মানুষের তুলনায় একটু অন্যরকম ছিল নিঃসন্দেহে।

বিশেষ স্থানকাল-পাত্রে কবি কালিদাস বর্ষার একরূপ দেখেছিলেন, দেখেছিলেন মেঘের এক রূপ। আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে, তাহলে আমিও তাৎক্ষণিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই বর্ষা বর্ষণ প্রেম প্রেয়সী এদের দেখতুম। কিন্তু হায়, আমি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রাণী, সেদিনের ঠিক সেই চোখ পাব কোথায়? যুগের নিয়মেই হয়ত আমাকে চাইতে হবে বর্ষার দিকে সুকান্ত ভট্টাচার্যের চোখ নিয়ে, যে-চোখ পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে পোড়া রুটির সাদৃশ্য আবিষ্কার করে। কিংবা হয়ত দেখতে হবে 'হাংরি জেনা-রেশন'এর চোখ দিয়ে।

হে মহাকবি কালিদাস, ভাগ্যিস্ তুমি এ যুগের মানুষ হও নি! তুমি যদি জন্ম নিতে আমাদের এই কালে, তাহলে তুমি কালিদাস না হয়ে হতে 'ক্রুদ্ধ' বা 'ক্ষুধিত' কোন লেখক।

বোশেখ-জষ্টির দারুণ অগ্নিবাণের পর তাতা-পোড়া মানুষের চাতক-আশা : আষাঢ়ে যথারীতি জল নামবে। শহরের মানুষও তাই চায়, আর গ্রামের মাটি-চষা মানুষেরা তো আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছেই। আহা হোক, হোক—মাটি আর মানুষ একটু ঠাণ্ডা হয়ে বাঁচুক। খরা, রোদ্দুর আর ক্রম-মূল্যবৃদ্ধির উত্তাপে আজকের মানুষ তো তপ্ত খোলায় ফুটন্ত খৈ—মাথায় ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা যাকে বলে। বৃষ্টির জলে যদি তা খানিকটেও ঠাণ্ডা হয় তো মানুষের অনেক উপকার, অনেক স্বস্তি!

"আচ্ছা পয়লা আষাঢ়ের দিন কি বৃষ্টি হবে? 'হাওয়া-অফিস' কী বলেন? দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ সম্পর্কে ও'দের বাণী কী?"

'ওদের কথা বাদ দাও। ও'রা যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, ঘটে সাধারণতই ঠিক তার উল্টোটা। 'মনসুন' সম্পর্কে একবার বলেন, ঠিক ক'রে বলা যাচ্ছে না। আবার বললেন হয়তো—সাত দিন দেরি। কখনো বা বললেন, বাংলাদেশ থেকে ওটা এখন পাঁচশো মাইল দূরে—কার্যতঃ হয়ত দেখা গেল, ঠিক তার পরের দিনেই হুড়মুড় ক'রে বর্ষা তথা 'মনসুন' নেমে গেল।"

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে বর্ষার প্রথম পদক্ষেপ বস্তুতঃ কবিপ্রসিদ্ধিই—ওটা যে প্রতি বছরে ঘটবেই তার কোনো মানে আদতে নেই, দু'চার দিনের এদিক-ওদিক সাধারণতই হয়ে থাকে। তবু আমরা ধরে নিই, অলিখিত এ রীতি অনুসারে আষাঢ় মাসের প্রথম দিনটিতে আকাশ ঘোর ক'রে কিছু বৃষ্টি হবে, যেমন লোকপ্রসিদ্ধি আছে জন্মাষ্টমীর দিনটিতে যখনই হোক একটু বৃষ্টি হবে।

সেকালের যক্ষরা একালে অন্যরকম হয়ে গেছে। যক্ষপ্রিয়ারাও। কবি কালিদাসরা হয়ে গেছেন খবরের কাগজের গদ্যময় রিপোর্ট। রাজা বিক্রমাদিত্যরা এখন নিছক গল্পলোকের অধিবাসী। —তবু কামনা করি, আষাঢ়ের প্রথম দিবসটি এযুগেও যতটা সম্ভব সরস আর মধুর হয়েই দেখা দিক বছরে বছরে…বিশেষতঃ বাঙালীর কাছে।

'দেখছি না, ভাবছি।'
'কী?'
'ভাবছি তুমি রাজী হবে কিনা।'
'কিসে?'

'আমার সঙ্গে যেতে। ইসাবেলা এখানে আর নয়। সামান্য একটা হীরের বাক্সর জন্যে আমাদের সবার জীবন বিপন্ন করা মূর্খতা।'

'কি করতে চাও?'

'থাক সব। চলো আমরা পালাই। কালকেই।'

'কালকের কথা কাল ভাবব। আজ আর কোনো ভাবনা নয়?' আচিনের লোমশবুকে অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে করতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইসাবেলা।

হেঁট হয় আচিন। মাতাল করা সেই সৌরভটা যেন আরো উগ্র। শুধু চুল নয়, ইসাবেলার সমস্ত দেহেও সেই সুগন্ধ। কস্তুরীকেও বুঝি হার মানায়।

'কোনো ভাবনা নয়?' শুধোয় আচিন। আলতো হাত রাখে রাত্রিবস্ত্রের বোতামে।

'না, না', কাঁধে মাথা রাখে ইসাবেলা। মুক্তো দাঁতের মৃদু দংশনে শিউরে ওঠে আচিনের অংগ।

পর-পর দুটি বোতাম খোলার পর আচিন বলে—'এরপর?'

হাত বাড়িয়ে বেডল্যাম্প নিভিয়ে দেয় ইসাবেলা।

*

শ্রান্ত আচিনের ঠোঁটের কাছে পানপাত্র তুলে ধরে ইসাবেলা—'নাও।'

এক চুমুকে পাত্র নিশ্শেষিত করে নামিয়ে রাখে আচিন—'কাল সকালেই তাহলে বলছো?'

'হ্যাঁ। দিগন্ত চাহনি ইসাবেলার। 'আজ ঘুমোও। গুড নাইট।'

*

একতলার ঘরে ধড়াচুড়ো পরে বসেছিল চাণক্য চাকলাদার। নেমে এল ইসাবেলা। পরণে কালো সোয়েটার, স্ল্যাক, রবার সু।

'ওষুধ দিয়েছো?' চাণক্যর প্রশ্ন।

'হ্যাঁ। ডবলডোজ। কাল আটটার আগে ঘুম ভাঙবে না।' ইসাবেলা গম্ভীর। 'বেচারী। কিছুতেই বোঝে না, ঘর বাঁধবার জন্যে আমি নয়।'

'তাই এছাড়া আর পথ ছিল না। চাণক্যও গম্ভীর। 'সামনে বিপদ। মনে যার দুর্বলতা, সে পেছনেই থাকুক।'

'জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছো?'

'সব তৈরী। বাকস বোঝাই। 'লালজী, কিংনাংপো—এরাও কাল অবাক হবে যখন দেখবে আমরা নেই।'

'হোক। এ কাজে এরা বোমার সামিল। কাজ হাসিল করা নিয়ে কথা। ওরা চলুক ওদের পথে—আমরা চলি আমাদের পথে।'

(১০)

নয়াদিল্লী। 'হান্টার'-এর সদর দপ্তর। সর্দার বন্দুক সিং পায়চারী করছেন তাঁর অফিস কক্ষে। প্রতি পদক্ষেপে অশান্ত উদ্বেগ প্রকাশ পাচ্ছে। ঘন ঘন দাড়ি চুমরোচ্ছেন।

দাড়ির ওপর সর্দারজীর অসীম মমতা। অযথা দাড়ির ওপর অত্যাচার তিনি বরদাস্ত করেন না। সুড় সুড় করলেও তিনি কদাচিৎ দাড়ি স্পর্শ করেন।

সেই সর্দারজীই দাড়ি চুমরোচ্ছেন নির্মমভাবে। এতজোর দাড়ি টানছেন যে সমূলে উৎপাটন করতে পারলেই যেন স্বস্তি পান।

কারণ আছে। আজ এগারোদিন হল ছাঁচি বেতের মত সেই লিকলিকে লোকটা লম্বা দিয়েছে। টুসটুসে মেয়েটাও হাওয়া হয়েছে।

শুধু পিটান দিলেও একটা কথা ছিল। ঘন্টায় ঘন্টায় যে সব খবর আসছে, তা আরো মারাত্মক। যোড়ে ঘুরছে ওরা। চাণক্য চাকলাদার আর ইসাবেলা। বাটাভিয়া থেকে গিয়েছে বাঞ্জার মাসিন। এ্যাম্বকলাল খবর পেয়ে দৌড়েছে সেখানে। গিয়ে দেখেছে পাখী উড়েছে।

তারপরেই মানিকজোড়কে দেখা গিয়েছে সিঙ্গাপুরে অপরাধী মহলের পীর পয়গম্বরের ঘাঁটিতে মন্ডা-মিঠাই সাঁটাচ্ছে। তল্পিতল্পা গুটিয়ে তৎক্ষণাৎ সেখানেও হানা দিয়েছে এ্যাম্বকলাল। গিয়ে দেখে দিব্বি নিকানো পোঁছানো আস্তা। কিংস দ্বীপে রওনা হয়েছে চাণক্য আর ইসাবেলা।

সন্ধান সুলুখ করে জানা গেল কিংস-দ্বীপেও নীচের মহলের চাঁইবুড়োদের সঙ্গে হলাহলি করেছে চাণক্য। দৌড়েছে এ্যাম্বকলাল। ঘুষঘাষ দিয়ে ঠিকানা যাও বা বার করা গেল, চাণক্য ইসাবেলাকে পাওয়া গেল না। দুজনেই নাকি পোর্ট-ব্লেয়ারে গিয়েছে।

অগত্যা তল্পিতল্পা নিয়ে সেখানেও হাজিরা দিয়েছে এ্যাম্বকলাল। গিয়ে দেখে ভোঁ-ভাঁ। অশরীরীর মত যেন উড়ে গিয়েছে ওরা দুজন। গেছে আকিয়াবে। পুরোনো সাকরেদদের ডাক দিয়েছে রিটায়ার্ড ওস্তাদ। সলাপরামর্শ হয়েছে। কিন্তু এ্যাম্বকলাল লোক-লস্কর নিয়ে হাজির হবার আগেই চম্পট দিয়েছে কক্সবাজারে।

ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, সিপাহি-সান্ত্রী সংগ্রহ করছে চাণক্য। হাঙ্গাম-হুজ্জতের জন্যে তৈরী হচ্ছে। আদাড়ে-পাদাড়ে ঘুরে জোটাচ্ছে পুরোনো স্যাঙাত-দের। ডাকাবুকোদের অন্ধিসন্ধি যার নখদর্পণে তার এহেন চাল-চলন তো ভাল কথা নয়। তবে কি পনেরো কোটি টাকার হীরের লোভে স্বমূর্তি ধারণ করেছে চাণক্য চাকলাদার?

তাই যদি হয়, সর্বনাশের কথা সন্দেহ নেই। লুঠেরাজের অন্ধ্রে-রন্ধ্রে যার অবাধ গতিবিধি সে লোক নিজেই যদি প্রতারক হয়ে যায়, তাহলে দাড়ি উৎপাটন ছাড়া আর কি করতে পারে সর্দার বন্দুক সিং?

এ্যাম্বকলালও বুঝি হাঁপিয়ে উঠেছে চাণক্যর সঙ্গে দৌড়-প্রতিযোগিতায়। হালে পানি পাচ্ছে না। কি গুখুরির কাজই হয়েছে হার্মাদ দুটোকে দলে নিয়ে।

গোদের ওপর বিষফোড়া হল এই মাসা দাউদ। হীরের বাকস গস্ত করার কোনো আয়োজন দেখা যাচ্ছে না তার দিক দিয়ে। কক্সবাজারে তার আধুনিক বজরা ভাসছে ঠিকই, কিন্তু পালের গোদা যেন বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছে। কোনদিক দিয়ে যে ছোঁ মারবে, তা কল্পনাও করা যাচ্ছে না।

সুতরাং সর্দার বন্দুক সিংয়ের উৎকন্ঠার অবধি নেই। দাড়ির ওপর অত্যাচারেরও সীমা নেই।

●

সর্দারজী যখন দাড়ির ওপর ঝাল ঝাড়তে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে কক্সবাজারে আর এক দৃশ্য অভিনীত হচ্ছিল।

চারিদিকে কাঠের রেলিং দেওয়া একটা দোতলা বাড়ি। বাড়ি ঘিরে বাগান। কাঠের বাড়ির আগাগোড়া সাদা রঙ করা। বাগানেও যত ফুল, তার অধিকাংশ সাদা।

গৃহকর্তা নিজেও শুভ্র। মাথার চুল ধবধবে সাদা। পরিষ্কার দাড়ি-গোঁফ কামানো গৌর মুখ। পরণে সাদা পায়জামা ও পাঞ্জাবী। পায়ে সাদা চম্পল। অংগ ঘিরে সদাই ভুর ভুর করে আতরের খোশবাই। মুখে মিষ্টি হাসিটি লেগেই আছে।

কক্সবাজারের খ্যাতনামা জহুরী আবদুল সামাদকে এই বেশেই সবাই দেখে জহর-প্যালেসে অথবা বাজার-হাটে। সাদাসিদে মানুষটি। সর্বজনপ্রিয়। বয়স প্রায় সত্তর। কিন্তু দেখে ষাটের অধিক মনে হয় না।

জহুরী আবদুল সামাদের আর একটি রূপ আছে। তা ক্রমশ প্রকাশ্য।

সেদিন এই নিরিবিলি শ্বেত-কুঞ্জে প্রবেশ করল ডিগডিগে চাণক্য আর রূপসী ইসাবেলা।

চাণক্যর পরণে ক্রুশকাটায় বোনা মেরুন রঙের টি-সার্ট আর জ্যাকেট। জেব্রা-প্যাটার্ণ ট্রাউজার্স। ইসাবেলার পরণেও একই বর্ণের প্রায় একই বেশ। পায়ের চিম পর্যন্ত উঁচু ফিতে বাঁধা চামড়ার বুট। রবার-সোল।

দুজনেরই মুখ খুশী উজ্জ্বল। হাসি প্রাণবন্ত।

খবর পেয়ে দীর্ঘ ঋজু দেহ নিয়ে নেমে এলেন আবদুল সামাদ। সৌম্যমুখে অনাবিল হাসি দিয়ে স্বাগতম জানালেন। প্রাথমিক দু-চারটে কথার পর সোজা কাজের কথায় এল চাণক্য।

বলল—'একটা হীরে বোম্বাই থাক্‌ পাচার করতে চাই।'

'কত হীরে?' আবদুল সামাদ স্মিত মুখে প্রশ্ন করেন।

'মোট দাম পনেরো কোটি টাকা। ইণ্ডিয়ান কারেন্সি।'

'বিসমিল্লা!' রূপোর পীলসুজের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন জহুরী।

'রাজী?'

'নারাজ নই। হীরে কোথায়? আনছে কে? আপনি?'

হাসল চাণক্য—'বোকার মত প্রশ্ন করবেন না। জেরা আমি পছন্দ করি না জানেন তো।'

পীলসুজের ওপর থেকে চোখ নড়ল না জহুরীর। অম্লান রইল মিষ্টি হাসিটুকু।

'খদ্দের আছে?'

'আছে। অন্য রাষ্ট্র, গভর্ণমেন্টের নাম এখন বলব না। সে-দেশে হীরে দরকার। পেমেন্ট ডলারে হবে। 'মাঝখানে আপনি থাকবেন?' বলে চাণক্য।

'বিশ পার্সেন্ট দেবেন।'

'শতকরা কুড়ি! অসম্ভব! আমার নিজের খরচ আছে!'

'বেশ পনেরো দিন।'

'অত পারবো না। ঝুঁকি অনেক। তার ওপর মাসা দাউদ পেছনে লেগেছে। ওর নাকের ডগা দিয়ে হীরে আনা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। হিকমত দরকার। তার সেলামী আছে।'

'মাসা দাউদও আছে এতে,' পীলসুজের ওপর থেকে অনামিকার ফিরোজা আংটির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল আবদুল সামাদের—'সুলুক সন্ধান আমার। তার অজুরা আছে তো। ওর কমে হবে না।'

সেকেন্ড কয়েক চেয়ে রইল চাণক্য। তারপর উঠে পড়ল—'তাহলে চলি। দেখবেন, যেন পাঁচকান না হয় কথাটা।'

'তোবা, তোবা। তাও কি হয়,' উঠে দাঁড়ালেন জহুরী। 'কথা রাখতে পারলাম না। গোস্তাকি মাপ করবেন।'

●

রাস্তায় বেরিয়ে ভাড়া করা পন্টিয়াকের স্টীয়ারিং ধরল চাণক্য। পাশে ইসাবেলা। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। তারপর ইসাবেলা বলে—'কি মনে হয় তোমার? আবদুল সামাদ সত্যিই খবর পাঠাবে মাসা দাউদকে?'

"বোম্বাবুগীকে হাতে রেখে এখন লাভ কি?'

'মানে বুঝলাম না।'

'আবদুল সামাদ থানডারকে চৌথ দিত আত্মরক্ষার জন্যে। এখন আমি দল গুটিয়েছি। এসেছে মাসা দাউদ। চৌথ এখন সে পায়। তাছাড়া, মাসা দাউদের গাঁটরিতে হাত দিয়ে কিরিচ-মার খাবার সাধ নেই আবদুল সামাদের। আরও আছে, জহুরীর শত্রুকে মাসা দাউদ নিকেশ করবে—অকারণে আমি রক্তপাতের পক্ষপাতী নই। সুতরাং মর্দারামকেই তোয়াজ করবে আবদুল সামাদ।'

'খবর কখন যাবে বলে মনে হয়?'

'ঝট করে কাজ করা আবদুল সামাদের স্বভাব বিরুদ্ধ। খবর যাবে আজ রাতে অথবা কাল সকালে। ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত।'

কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকা গেল না।

*

সোজা হোটেলে গিয়েছিল দুজনে। খেয়েদেয়ে আবার পন্টিয়াকে উঠেছিল। চাকা গড়াতেই পেছনের সিট থেকে উঠে দাঁড়াল যেন একটা কালো দাঁড়কাক। হাতে রিভলবার। নলচেটা চাণক্যর ঘাড়ে ঠেকিয়ে দাঁড়কাক-চেহারায় বৃংহিত ধ্বনি করে বলল আততায়ী—'যেদিকে বলব, ঠিক সেইদিকে চালাবেন।'

ইসাবেলা ঘাড় না ফিরিয়ে বলল—'যদি না চালাই?'

'রিভলবারে সাইলেন্সার ফিট করা। আওয়াজ হবে না। সাধের খুলিটা শুধু চুরমার হবে,' দাঁড়কাকের রসবোধ দেখে বুঝি সন্তুষ্টই হল চাণক্য। অযথা বাক্যব্যয় না করে স্টীয়ারিং ঘুরিয়ে চলল দাঁড়কাকের হুকুম মত। এগলি সেগলি ঘুরে একটা মামুলি বাড়ির সা[illegible] তাড়না।

বৃংহিত [illegible] রক্ত—[illegible] পেছনে মা[illegible] [illegible] সাবধান।'

মিস্টার এবং ম্যাডাম[illegible] পিছু [illegible] কৃষ্ণকায় লে[illegible] রিভ[illegible] উঁচিয়ে [illegible] বাড়ির উঠোনে[illegible] নিচের তলায় এক[illegible] ঠেলে সারি [illegible] [illegible]।

চাণক্যর বিরক্ত কণ্ঠ শোনা গেল সবার আগে— 'যাচ্চলে, পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দিলেন?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ত্র্যম্বকলাল আর আচিন। ইসাবেলার দিকে শীতল চাহনি নিক্ষেপ করে আচিন বলল—'ছিঃ, আমার সঙ্গেও শঠতা?'

'উপায় ছিল না। পঙ্গুর গিরি-লঙ্ঘন সম্ভব ছিল না।' ইসাবেলার কণ্ঠ ঈষৎ কঠিন।

'মামুলি রাস্তায় মাসা দাউদের সঙ্গে টক্কর দেওয়া যায় না। আমরা তাই অন্য ফন্দী এঁটেছিলাম। হওয়া ভাতে কাঠি দিলে তোমরা,' ইসাবেলা নির্মম।

'অত চোখ রাঙানোর কি আছে?' ত্র্যম্বকলাল বলে ওঠে। 'আপনারাই আমাদের ফেলে পালালেন, আবার কথাও শোনাচ্ছেন!'

'শোনাচ্ছি. কারণ দায়টা আমার,' চাণক্য গম্ভীর গলায় বললে—'হনুমানের লড়াই

দেখেছেন? গোটা দলকে না ভিড়িয়ে আমি সেই হনুমানের লড়াইয়ের আয়োজন করছিলাম। টক্কর লাগতো শুধু আমার সঙ্গে মাসা দাউদের।'

'মাথা খারাপ হয়েছে আপনার। নির্ঘাৎ মারা পড়বেন। কক্সবাজারের হাঙরের পেটে যাওয়ার সাধ হয়েছে দেখছি।'

'আজ্ঞে না', ইসাবেলা বলে তৎক্ষণাৎ—'এই নিয়েই হাড় পেকেছে আমাদের। এ ঝুঁকি এর আগেও নিয়েছি।'

'কন্দীটা কি শুনতে পারি?'

'নিশ্চয় পারেন। মাসা দাউদের কানে খবর পাঠানো হয়ে গেছে। আমরা দুজনে যে হীরের বাক্স লুঠ করার ষড়যন্ত্র করছি, তা এতক্ষণে পালের গোদার কানে চলে গেছে। ধরা দেওয়ার জন্যে সময় কাটাচ্ছি, এমন সময়ে আপনার হবুচন্দ্রটি দিল সব ভণ্ডুল করে। কে এটি?'

'কক্সবাজারে আমাদের এজেন্ট।'

'বেঁচে গেল এই যাত্রা। আমরা ভেবেছিলাম মাসা দাউদের এজেন্ট। নইলে এতক্ষণে গঙ্গাযাত্রা হয়ে যেত।' ঠাণ্ডাগলায় বলল চাণক্য। 'আপনার নাম আগে বললে অনেক আগেই হাড় খুলে নিতাম,' বলতে বলতে তাড়াহুড়ো না করে পেছন ফিরল চাণক্য। কুক্কার লোকটার কাঁধের হাড়ে ছোট্ট রদ্দা মারতেই খসে পড়ল রিভলবার—কিন্তু মাটি স্পর্শ করার আগেই লুফে নিল চাণক্য।

আচিন মুখ অন্ধকার করে বলল—'এত লঙ্কাকাণ্ড হত না যদি আগেভাগে জানাতেন।'

'তাহলে আর বেরোনো হত না,' ইসাবেলা যেন দশবাই চণ্ডী।

'এখন উপায়?' ত্র্যম্বকলাল কাষ্ঠ হেসে বলে।

চাণক্য কোনো জবাব দিল না। তালঢ্যাঙা বপুটাকে অষ্টাবক্র মূর্তির মত বেঁকিয়ে চুরিয়ে স্থাপন করল একটা শূন্য চেয়ারে।

●

পরের দিন সকাল।

ব্যাজার মুখে হোটেলে ফিরে এসেছিল চাণক্য আর ইসাবেলা। রাতেও কোনো ঘটনা ঘটেনি।

জানলা থেকে দেখা যায় কক্সবাজারের বন্দর। হালফিল জাহাজ থেকে শুরু করে দু-চারটে চীনে জাঙ্কও ভাসছে। মাছধরা নৌকোগুলোর পালের বাহার দেখবার মত।

চাণক্যর চোখে শক্তিশালী বাইনাকুলার। জার্মান দূরবীন। ঈশানীতনু বজ্রশিখার মতই ঋজু।

দূরবীনের কাচে ভাসছে একটা ছবি। আধুনিক বজরার ছবি। ইংরেজীতে যার নাম 'ইঅট'। ধবধবে সাদা রঙ। গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'ব্লু হোয়েল।' নীল তিমি।

ডেকে মিঠে রোদ্দুরে ঘোরাফেরা করছে কয়েকটা মূর্তি। ডেকচেয়ারে বসে কেউ কেউ। চোখে কালো গগলস।

রেলিংয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে একটি মহিলা। বিশাল আকৃতি। পরণে ঢিলা হাতা সার্ট আর স্ল্যাক। দুটোরই রঙ লাল।

'ইসা।'

'কি বলছ?' খাটে উবুড় হয়ে শুয়ে ম্যাগাজিন ওলটাতে ওলটাতে বলে ইসাবেলা।

'মিসেস ফ্যানটমাসকে মনে পড়ে?'

হেসে ফেলল ইসাবেলা—'তা পড়ে বইকি। কোথায় সে?'

'মাসা দাউদের বজরায়।'

উঠে এল ইসাবেলা। চোখে দূরবীন লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

বলল—'মিসেস ফ্যানটমাসই বটে। রনটাকেও দেখতে পাচ্ছি। মাংচুও রয়েছে। পুরো দলটাকেই তৈরি রেখেছে মাসা দাউদ। কিন্তু পালের গোদাটি কোথায়?'

চাণক্যর জবাব মুখ থেকে খসবার আগেই ঝনঝন করে বাজল টেলিফোন। ত্র্যম্বকলালের উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল তারের অপর প্রান্তে।

'চাকলাদার? সর্দারজীর মেসেজ পেলাম এখুনি। উনি আর দেরি করতে চাইছেন না। খিদিরপুর থেকে হীরে সমেত জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে।...হ্যাঁ...হ্যাঁ...নির্দিষ্ট দিনের আগেই ছেড়েছে...কারণ? ...সর্দারজীর বিশ্বাস, এর ফলে শত্রুপক্ষ ঘাবড়ে যাবে... তৈরি হবার সময় পাবে না।'

সব শুনে চাণক্য শুধু বলল—'সর্দারজীকে আপনি জানিয়ে দিন ওরা তৈরি হয়েই ওৎ পেতে রয়েছে কক্সবাজারে।'

(১৪)

চাণক্য যে-মুহূর্তে রিসিভার নামিয়ে রাখল, ঠিক তখনি কক্সবাজারে ভাসমান একটি জাহাজের সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করল মাংচু। মর্কট মুখে দুশ্চিন্তার রেখা।

চৈনিক টেবিলের ওপর দুহাত রেখে বসেছিল মাসা দাউদ। মাংচু ঢুকতেই মড়ার চোখ নিবদ্ধ হল সেদিকে।

'কি খবর?'

'কোয়াংসি'র পা ভেঙে গিয়েছে।'

চেয়ে রইল চোখের বরফ খণ্ড—'কি করে?'

'গ্যাংওয়ে থেকে পড়ে গিয়ে। ডবল ফ্র্যাকচার। এক মাসের ধাক্কা।'

মাসা দাউদ নিরুত্তর। মড়ার চোখ অচঞ্চল।

মাংচু বলল—'আর বেশি দেরিও নেই। কলকাতার এজেন্ট এই মাত্র রেডিও মেসেজ পাঠাল। ওরা জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে।'

মাসা দাউদ তখনও নীরব। বরফ চাহনি পলকহীন।

মাংচু অধৈর্য হয়, 'বস, কিছু একটা করতেই হবে। আশি লাখ এর মধ্যেই খরচ হয়েছে। এখন পেছোনো যায় না। সবটাই জলে যাবে।'

'কোয়াংসি'র বদলি কেউ নেই। ও কাজ আর কেউ করতে পারবে না,' এতক্ষণ পরে বলল মাসা দাউদ।

'জানি। কিন্তু বদলি জোটাতেই হবে।'

'বাজার থেকে?' মাসা দাউদের থাবড়া মুখে ভর্ৎসনা। 'কোটি কোটি টাকার হীরের কারবারে বাইরের লোককে ডাকব?'

'তাহলে কি আশি লাখ জলে দেব? স্কাউণ্ড্রেল কোয়াংসির জন্যে—'

কথা শেষ হল না। মুখ বাড়াল রনটা—'আবদুল সামাদ লোক পাঠিয়েছে। জরুরী চিঠি আছে।'

'পাঠিয়ে দাও।'

এক মিনিট পরেই কোট-প্যান্ট পরা একটি সুদর্শন তরুণ ঘরে প্রবেশ করল। বুক পকেট থেকে বেরুলো একটা ফটোগ্রাফ। মাসা দাউদের আলোকচিত্র। ছবির চেহারার সঙ্গে আসল চেহারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মিলিয়ে নিল হুঁশিয়ার তরুণ। তারপর পাশপকেট থেকে গালা আঁটা লেফাপা বার করে রাখল টেবিলে।

লোমশ হাতে লেফাপা ছিঁড়ল মাসা দাউদ। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সাঙ্গ হল চিঠি পড়া। ঠাণ্ডাগলায় বলল বার্তাবাহককে—'ঠিক আছে। খবর পাঠাচ্ছি।'

বিদায় হল সুবেশ তরুণ। ছোট্ট করে বলল মাসা দাউদ—'কোয়াংসির বদলি পাওয়া গেছে।'

(ক্রমশঃ)

পুরুলিয়া—পলাশ ও মহুয়ার দেশ—রুক্ষ-কঠোর কঙ্কর মাটির দেশ— ছোট-বড় পাহাড় ও টিলার দেশ। অসংখ্য কালো আদিবাসী মানুষ—দুঃখে পোড়-খাওয়া মানুষ—সভ্যতার আলোকবঞ্চিত মানুষ এই দেশের অসমতল পোড়ামাটি রঙের মাঠে-প্রান্তরে ঘর বেঁধে আছে,—পাথুরে মাটির সঙ্গে লড়াই করে অনেক ক্ষেত্রেই তাকে বশ মানিয়েছে; তৈরী করেছে ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম ও সমাজ। এই পুরুলিয়ার গ্রামের ছায়ায় প্রায় দু বছর আমি কাটিয়েছি। খুব কাছ থেকে গ্রামীণ মানুষদের প্রাত্যাহিক জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করেছি। তাদের আনন্দ-বেদনায় উদ্বেলিত হয়েছি। আমাকে তারা পর ভাবে নি কখনো। কত অন্তরঙ্গ মুহূর্তে তাদের মনের কপাট আমার কাছে খুলেছে। বলেছে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, ভালোবাসার কথা—সর্বোপরি তাদের দুঃখের কথা। হ্যাঁ, দুঃখের কথাই। দুঃখ-দারিদ্র্যই এই আদিবাসী মানুষজনদের জীবনের নিত্যসঙ্গী। দেশ স্বাধীন হবার অনেক পরেও এদের অবস্থার উন্নতি ঘটেনি এতটুকু। এখনো এরা উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে পারিশ্রমিক প্রায় যৎসামান্য। অনেক যত্নে ও পরিশ্রমে কাঁকুড়ে মাটির বুকে যে ফসল ফলায় তার অধিকাংশই তুলে দিতে হয় মহাজনদের গোলায়। নবনির্মিত সরকারী বা বে-সরকারী বিলাসভবনগুলির প্রত্যেকটি ইঁটে এদের হাতের স্পর্শ ও গায়ের ঘাম লেগে থাকলেও স্যাঁত-সেঁতে ভাঙা ঝুপড়ির মধ্যে হাঁস-মুরগীর মত জীবনযাপনই এদের বরাদ্দ। বরাকর রোড বা রাঁচী রোডের মত কালো চওড়া পিচের রাস্তা শহর থেকে বেরিয়ে ঢেউ খেলানো মাঠ ভেঙে ছুট লাগালেও গ্রামের মানুষদের বাড়ীর পথে এখনো একহাঁটু কাদা ও ধুলো। পুরুলিয়া, আদ্রা, রঘুনাথপুর বা মানবাজারের মত শহর অঞ্চলে বিজলী বাতির ঝকমকে আলো জ্বললেও আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের রাত এখনো গভীর অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে কুণ্ঠিত। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের মত উন্নত মানের অভিজাত স্কুল বোঙাবাড়ী গ্রামে স্থাপিত হলেও গরীব আদিবাসী পরিবারের ছেলেদের কাছে ও Protected Place (না, Palace) মাত্র! সুতরাং সভ্যতার নানাবিধ উপকরণ আদিবাসীদের চারদিকে ছড়ানো থাকলেও সেগুলির উপভোগ থেকে তারা বঞ্চিত। তবু ভোগের জীবন - সভ্যতার জীবন - আলোর জীবন তাদের হাতছানি দেয়। পেট ভরে ভালো খেয়ে, দামী পোশাক পরে আর গাড়ীতে চড়ে বাঁচার মত বাঁচতে তাদেরও ইচ্ছে করে। মুষ্টিমেয় তথাকথিত সভ্য ও ভদ্র মানুষদের ঐশ্বর্য ও আভিজাত্যের আলো তাদের চোখ ধাঁধায়। এতে করে তাদের বাস্তব জীবনের দুঃখ ও যন্ত্রণার অন্ধকারের রূপটা অধিকতর গভীর হয়। তাদের মনের মধ্যে হতাশার ঢেউ জাগে। ইচ্ছাপূরণের ব্যর্থতাজনিত চাপা কান্না বুকে বন্দী থেকে হাজার হাতুড়ির ঘা মারে।

গ্রামের এই মানুষগুলির মনের মধ্যে দুঃখ যন্ত্রণার এই অনুভূতি যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তার সন্ধান আমরা—তথাকথিত সভ্য মানুষেরা রাখি না। কারণ ওদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ভোটের সময় ছাড়া অন্য সময় বড় একটা ঘটে না। আমাদের 'ইনটেলেকচুয়াল' নেতারা সাধারণভাবে সমগ্র পৃথিবীর শোষিত জনগণ সম্বন্ধে দু-চারটে শ্লোগান রচনা করে ও জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েই তাঁদের কর্তব্য সারেন। নিজের নিজের দেশ-গাঁয়ের বা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের অবহেলিত মানুষদের বিশেষ বিশেষ সুবিধে অসুবিধের কথা নিখুঁতভাবে তাঁরা বড় একটা তুলে ধরেন

অমিয় দত্ত

না। (এর কারণ, বোধ হয় সব নেতারাই মনে মনে আন্তর্জাতিক—কেউই প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক নন!) ফলে গ্রাম বাংলার খেটে খাওয়া অজ্ঞ ও অশিক্ষিত মানুষদের মনের কথা অধিকাংশ সময়ে তাদের মনেই থেকে যায়। কিন্তু পুরুলিয়ার আদিবাসী মানুষগুলি বোধ হয় এর ব্যতিক্রম। তারা তাদের সমগ্র জীবনের ছবিকে অন্তত একটা জিনিশের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে;—তা হোল টুসুগান। আমার দু বছরের পুরুলিয়া-জীবনে একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি যে, এই সীমান্ত বাংলার সাধারণ মানুষদের আলো-অন্ধকারময় জীবনের রূপ—তাদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না—তাদের সফলতা বিফলতা—তাদের কর্মময়তা ও অলসতা—তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং প্রগতি অভিমুখিনতা ইত্যাদি টুসু-গানের মধ্যে যেমন স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে এমনটা আর কিছুতে হয় নি। টুসুগানের কথা-বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হতে পারলেই পুরুলিয়ার গাঁ-মাটি-মানুষকে যেন অনেকখানি জানা ও চেনা হয়ে যায়।

অনেকেই আশ্চর্য হয়েছেন নিশ্চয়ই। ভাবছেন—টুসুগান তো লৌকিক দেবী টুসুকে নিয়েই রচিত। এ তো নিছক ধর্মীয় ব্যাপার। অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি থেকে পৌষের সংক্রান্তি পর্যন্ত যে টুসু পুজো হয় সেই উপলক্ষেই টুসুগান গাওয়া হয়ে থাকে। আপনাদের এই ভাবনা অনেকখানিই সত্য—সবটা নয়। পুরুলিয়া যাওয়ার আগে আমারও টুসুগান সম্পর্কে এই ধারণাই ছিল। দুটো পৌষ পুরুলিয়ায় কাটিয়ে এই ধারণার অনেকটা বদলেছে। জেনেছি, টুসুগান মানেই কেবল টুসুকে নিয়ে লেখা গান নয়। যে কোন বিষয়বস্তু অবলম্বনে এ গান রচিত হয়ে থাকে। পৌরাণিক, লৌকিক, ঐতিহাসিক—সবকিছুই এই গানের বিষয়বস্তু হতে পারে। তবে বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে রচিত হলেও এক জায়গায় এদের মিল—তা হোল বিশেষ ধরনের লোকগীতির একটানা সুরে। এই গান কবি-গানের মতই মুখে মুখে বাঁধা হয় টুসু-পরব উপলক্ষ্যে। এর স্রষ্টা আদিবাসী সাধারণ নরনারী। এক অঞ্চলের গান মুখে মুখেই ছড়িয়ে পড়ে অন্য অঞ্চলে। অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি থেকে পৌষের সংক্রান্তি—টুসুর আবাহন থেকে বিসর্জন পর্যন্তই এই গান রচিত ও গীত হয়। বছরের বাকি সময়টা যেন টুসুগানের আত্মগোপনের কাল। তখন হাজার অনুরোধেও কেউ এ গান বড় একটা বানায় না বা শোনায় না। অথচ গোটা পৌষ মাস ধরে প্রায় প্রত্যেকটি আদিবাসীর কণ্ঠে এই গান আপন আবেগে স্পন্দিত হয়ে ঝঙ্কার তোলে। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা না থাকায় চলমান জীবনের যে কোন জিনিশকে অবলম্বন করেই যে কোন ছেলে-মেয়ের মুখে টুসুগানের সুর গুনগুনিয়ে ওঠে। এর কথা তাই পুরনো হয়ে যায় না কখনো। গানের বিষয় যে কত বিচিত্র হতে পারে তার কিছু আভাস পূর্বেই দিয়েছি। আমি যত টুসুগান সংগ্রহ করেছি তার বেশির ভাগের মধ্যেই পুরুলিয়ার গ্রামীণ মানুষদের জীবনের অন্ধকার ছায়া পড়েছে। জীবনের অনেকখানিই তাদের দুঃখ-দারিদ্র্যের অন্ধকারে আবৃত বলেই বোধ হয় এমনটা ঘটেছে। বাস্তব জীবনের বিষাদময় যন্ত্রণাই মধুরতম সঙ্গীত হয়ে বেজেছে। এখন সে পরিচয়ই নেওয়া যাক।

।। দুই ।।

পিতা-মাতা মাত্রেই সন্তানের প্রতি স্নেহ-প্রবণ। বাবা-মা শহুরে হোন বা গেঁয়ো হোন—অভিজাত হোন বা অনভিজাত হোন—সাধুই হোন বা অসাধুই হোন, আপন ছেলেমেয়েদের ভালোবাসার ক্ষেত্রে কিন্তু সকলেই সমান। বিশেষ করে কোলের ছেলেকে আদর-যত্ন করা—তাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রেখে মানুষ করার অন্তরঙ্গ ইচ্ছা পিতামাতা সকল সময়ে সর্বাবস্থায় হৃদয়ের সঙ্গোপনে পোষণ করেন। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও অনেক সময় উপায় থাকে না। কোন পরিবারের আর্থিক কাঠামো যদি নড়বড়ে হয়—'নুন আনতে যদি তাদের পান্তা ফুরায়'—তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই মনের আশা তাদের মনেই থেকে যায়। পুরুলিয়ার দারিদ্র্য-পীড়িত আদিবাসীদের পরিবারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটে।

দিনান্তের রোজগারে পেটের ভাত যোগাতেই তাদের প্রাণান্ত হয়। ছোট ছেলেকে নতুন 'খাটুলি' (দোলনা জাতীয় জিনিশ) কিনে শোয়ানোর সাধ তাই অপূর্ণ থেকে যায়। আর মেয়ের হাতে শংখ-ধবল চুড়ি পরানোর ইচ্ছাও বাস্তবে পরিণত হয় না কখনো। ব্যক্তি-জীবনের এই সমস্ত আশাহত আকাঙ্ক্ষা প্রায়শই টুসুসংগীতের রূপ নিয়েছে। তারই দু-একটি নিদর্শন :

(১) পুরুল্যাতে ১। দেখে আলম ২।
ছেলেশুয়া খাটুলি।
মনে করি নিব নিব, গাঁঠে নাই মা
আধুলি।।

(২) পুরুল্যাতে দেখে আলম ডালায়
ডালায় দুধ-বালা।
হাতে আমার নাইরে কড়ি ক্যামনে দিব
দুধ-বালা।।

এই সরল ও দুঃখী মানুষগুলির বাসনার দৃষ্টি বহু দূরদেশে প্রসারিত নয়। তারা বিলিতী বস্তু তো দূরের কথা— কলকাতা, বোম্বে বা দিল্লীর দ্রব্যের কথাও ভাবতে পারে না। তাদের কাছে পুরুলিয়াই অনেক বড় শহর ; আর আশে-পাশের ধানবাদ, ঝড়িয়া বা রাণীগঞ্জের মত কয়লাখনি অঞ্চল-গুলিও। তাদের বাসনার সামগ্রী—তাদের সাধ বা স্বপ্ন সেজন্য এই সব শহরকে ঘিরেই দানা বেঁধে উঠেছে। মেয়ে শ্বশুর-বাড়ী যাবার আগে তাই মুর্শিদাবাদের সিল্ক বা বেনারসের বেনারসী দাবি করে না। সে চেয়ে বসে ধানবাদের ধানীরঙ পাড়ের শাড়ী আর পুরুলিয়ার মাকড়ী। দাবি খুবই সামান্য। কিন্তু গরীবের ঘরের মেয়ের মনে এই আশাই হোল চূড়ান্ত। একটি টুসুগানে তারই প্রকাশ :

ও মা, আমি ধানবাদ যাব
ধানপাড়া শাড়ী লিব।
পুরুল্যার চেন মাকুড়ী পরে
শ্বশুর ঘর যাব ॥

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় মেয়েকে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী পাঠাতেই হয়। পুরুলিয়ার আদিবাসী সমাজেও এর ব্যতিক্রম নেই। পিতামাতার হৃদয়ে কন্যার বিচ্ছেদ-বেদনা তাই গভীর হয়েই বাজে। অনেক কষ্ট সয়ে যে মেয়েকে মানুষ করেন তাঁরা—যে মেয়ে তাঁদের দুঃখের সান্ত্বনা, অন্ধকারের আলো—তাকেই একদিন বিদায় দিতে হয়। বাপ-মায়ের কাছে এর চেয়ে যন্ত্রণার আর কি থাকতে পারে। এমনই যন্ত্রণার অনুভূতি গান হয়ে বেজেছে :

টুসু আমার বড় আদুরে—
তোকে ডাকি কত সাদরে।
সারাদিন তো পেটের জন্যে
খাটি গো পরের ঘরে
সন্ধ্যার কালে টুসু বলে
আমি ডাকি তোরে সাদরে।
টুসু আমার সাধের বাছা
দেখে দুঃখ যায় দূরে
দুঃখী মায়ের একলা বাছা,
তোরে ছাড়ি গো কেমন করে।

১, পুরুশুলিয়া ; ২, এলাম

কত জ্বালা সহ্য করে
করেছি বড় তোরে
আর রাখিতে নারি তোরে
যাবি গো পরের ঘরে।
শ্বশুরবাড়ী যাবে টুসু,
আমি থাকবো গো কেমন করে ॥

সমতুল্য আর একটি গান :
বল টুসুধন দিব তোর বিহা
চাঁদের মত বর আসেছে
দেখলে গো জুড়ায় হিয়া।
শ্বশুরবাড়ী যাবে টুসু,
ভাবি গালে হাত দিয়া,
টুসুধনকে বিদায় করব
চাঁদ-বসা-লুলক ৩। দিয়া।
টুসু আমার কোল পুছার ধন,
না দেখলে ফাটে হিয়া
একার টুসু চলে যাবে
সবাইকে ফাঁকি দিয়া।

এখানে লক্ষ্যণীয়, টুসু বলে যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে সে ঘরেরই মেয়ে—দেবতা নয়। টুসুগানের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই 'টুসু' বলতে ছোট মেয়েকে বোঝানো হয়েছে। এই মেয়েই যখন বড় হয় তখন তার বিয়ের কথা মা-বাবাকে ভাবতে হয়। মেয়ে অরক্ষণীয়া থাকলে পাঁচলোকে পাঁচ কথা বলে। বিশেষ-করে সমাজ যখন দরিদ্র ও অনুন্নত হয় তখন সেই সমাজের মানুষদের জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধ শিথিল হয়ে পড়ে। জীবন অনেক ক্ষেত্রেই আদর্শহীন হয়। লোকে তখন আদর্শ-ভ্রষ্ট চরিত্রের সমালোচনা করে। জীবনের এই অন্ধকার ছবিও টুসুগানে ফুটেছে। যেমন :

লোকে বলে ও টুসুর মা দেনা
টুসুর বিহা গো।
টুসু তোদের লোকে ঘরে রাত
ঘুমায়ে যাছে গো।

আনলোকের ঘরে মেয়ে রাত কাটায়। মায়ের কাছে এটা ভয়ের এবং ভাবনার। বাপ-ভাই-এর কাছে এটা লজ্জার ও বেদনার। মা তাই মেয়েকে সতর্ক করে দিয়ে শাসান :

দেখো টুসু না যাও ফেঁসে—
ও তোর ভাই-বাপ যাবে আশি হাতের
কুয়াতে।

অর্থাৎ কেলেংকারী একটা কিছু ঘটলে গভীর কুয়ায় ঝাঁপ দিয়ে বাবা ও ভাই আত্মহত্যা করবে। আদুরে ও জেদী মেয়ে একথায় কর্ণপাত করে না। সে তেজের সংগে জবাব দেয় : টুসু বলে বেশ করিছি
করব না তো কি বটে।

কিন্তু তারপর ? তারপর অভিমানী মেয়ে নিজেই আত্মহত্যা করে বসে :

মুখের কথা মুখে রহিল—কালী বলে
মরিল টুসু এইবারে।

অন্য একটি গানে দাম্পত্য জীবনের তিক্ত কলহের ছবি অসংস্কৃত ভাষায় পেয়েছি। ভাত রাঁধতে গিয়ে স্ত্রী ভাত গলিয়ে ফেলেছে। স্বামী তাকে কটু ভাষায় তীব্র ভর্ৎসনা করে তার বাপের বাড়ী চলে যেতে বলছে :

৩, চন্দ্রাকৃতি নোলক ; ৪, কনিষ্ঠতম

টুসুর মায়ে ভাত রাঁধেছে ভাত
করেছে গিলা৫
টুসুর বাপে বলে—শালি
ঘরলে৬ ও তুই বাইরা গো৭।
যা শালি যা, ও তুই
বাপের ঘরকে যা—
ও তোর গিলা ভাত কে খাবেক যা।
যা শালি যা, ও তুই বাপের ঘরকে যা।

সত্যি বলতে কি, বিবাহোত্তর জীবনে অশান্তির সংসারে অতিষ্ঠ মেয়েদের কাছে বাপের বাড়ীই হল সান্ত্বনার স্থল ও আপদের আশ্রয়। অনেক মধুর স্বপ্ন ও আশা নিয়ে শ্বশুরঘর করতে আসে মেয়েরা। কিন্তু কজনের জীবনে সেই স্বপ্ন ও সাধ সফল হয় ? বিশেষ করে যে সমাজের মানুষেরা চির অবহেলিত—যাদের জীবন-ধারণের মান খুব নিচু—তাদের সংসারে সুখ-শান্তির আলো জ্বলে উঠতে না উঠতেই নিভে যায়। কেবল মেয়েদের ওপর জোরজুলুমের মাত্রাটাই একটু বেশি হয়। সে জোরজুলুম করার অধিকারী হল স্বামী ও শাশুড়ী, ননদ ও ভাসুর। বাংলা-দেশে গৃহবধূর ওপর শাশুড়ী-ননদের অত্যাচারের কাহিনী নতুন কিছু নয়। টুসুগানের মধ্যে এই পুরনো কথাই করুণ সুরে ঝংকৃত হয়েছে :

ওমা আমি রহিতে নারি,
নারি গো পরের ঘরে
পরের মা কি বেদন জানে,
জ্বালাই দেয় আমার প্রাণে।

বিয়ের পরেও মেয়ে সুখী নয়। শ্বশুর-বাড়ীতে তার বিরুদ্ধে সব সময়েই চক্রান্ত চলে। শাশুড়ী ও ভাসুর ধরে মারে। মেয়ের দেহে-মনে তাই অনন্ত যন্ত্রণা। এর চেয়ে বাপের বাড়ীতে না খেতে পেয়ে মরাও ভালো। এই যন্ত্রণাময় লজ্জার কথা একটি গানে অন্তর্বেদনার রূপ পেয়েছে :

বাপের ঘরে ভেলি৮ মরাই
শ্বশুর ঘরে কুচাঁড়ি৯
আর যাব না শ্বশুরবাড়ী
ধরে মারে শাশুড়ী।
শাশুড়ীয়ে ধরে মারে শ্বশুর
কিছু বলে না—

ভাসুর হয়ে জুতা মারছে
লজ্জাতে প্রাণ বাঁচে না।

জোর-জুলুমে ননদিনী রায়বাঘিনীও কম যায় না। মায়ের জোরেই মেয়ে জোরী। বউ-এর মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। শাশুড়ীর মৃত্যুর পর ননদিনীকে জব্দ করার কথা সে ভাবে :

এই পাহাড়ে ঐ পাহাড়ে
ননদিনী হাঁক পাড়ে।
থামলো ননদ ভাঙবো গরব
যেদিন না তোর মা মরে।

শ্বশুরবাড়ীতে যত অবহেলিত, অত্যা-চারিত ও অসহাই হোক না কেন বাপের বাড়ীতে কিন্তু ঐ মেয়েরই কত না আদর। মা ও শাশুড়ীর কাছে বিবাহিতা যে কোন

৫, গলা (অধিক সেদ্ধ) ; ৬, ঘর থেকে ; ৭, বেরিয়ে যা ;

নারীর অস্তিত্ব-স্বরূপ যে ভিন্নধর্মী —দুজনের দৃষ্টিতে তার মূল্য যে আলাদা আলাদা, সেই কথাই একটি টুসু-গানের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে :

আমরা মায়ের তিনটি বিটি১০
তিনটি সনার১১ মাদুলি,
মা-বাপের দুলালী আমরা—
শাশুড়ীর চোখের বালি।

কয়েকটি টুসুগানের মধ্যে সাধারণভাবে পুরুলিয়ার মানুষদের দারিদ্র্যের ছবি ফুটেছে। মৌসুমী বায়ুনির্ভর এই জেলা। কোন বছর বৃষ্টি না হলে ফসল ফলে না। মানুষকে চরম দুর্দশার সম্মুখীন হ'তে হয়। এমনই কোন এক অনাবৃষ্টির বছরে রচিত হয়েছে সম্ভবত নিচের গানটি :

আসছে বছর বাঁচবি কেমনে—
হুলে শেষ হল বহাল১২ ধানে।
বছর বছর অনাবৃষ্টি, মানুষ
বাঁচে বল কেমনে
বৃষ্টি বিনা ফসল হয়না
শুন সবে এক মনে।।
ভেবেছিলাম ফসল হবে, রোপন
করেছি আষাঢ়-শ্রাবণে।
আশা মোদের বিফল হল
ধান মরিল আশ্বিনে।।
কিছু পাবার আশা ছিল
শিলাবৃষ্টি তার সনে।
ধানের দফারফা শেষ করেছে
কিছুই পাবে না কতক জনে।।
(এ বছর) রিলিফ আর জি আরের
গমে বাঁচিছে অনেকজনে।
আসছে বছর কি হবে
তাই ভাব সবে একমনে।।

অন্য একটি গানে ক্ষুধিতের কান্না, অসহায় জীবনের যন্ত্রণা ও মহাজনের হাতে মানবাত্মার লাঞ্ছনার ছবি কালো অক্ষরের মধ্যে ফুটেছে :

সন ১৩৬২ সালে—মানুষের ভোকে১৩
জীবন যায় চলে,—
ও রাজা, কোন দেশের জোনার বুট
মানভূমের খাওয়ালে।
ভোকের জ্বালায় সবে চোখ গেল রসাতলে।।
মহাজনের ঘরে গেলে বলে,
পড়রে আগে পা-তলে।
পেটের জ্বালায় পড়ে থাকি
জবাব দেয় সন্ধ্যাকালে।।
তারা ঘরে বসে বুদ্ধি করে
সিং-ঘুরা১৪ খাসি পেলে।
না হেক দিয়াই যাবেক দু-দুশ মণ
খত কাগজটা আনিলে।।
হেম পরীক্ষিতে বলে
যা আছে মোদের কপালে।
ভোকের জালায় চলতে নারি
ও ভাই ধর টুসু সকলে।।

টুসু গানে যে পুরুলিয়ার বঞ্চিত-দুর্ভিক্ষ সাধারণ মানুষের প্রাণের সামগ্রী শেষের দুটি লাইনই তার উজ্জ্বল প্রমাণ। শত দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও—ক্ষুধা-তৃষ্ণার দুর্বলতার মধ্যেও টুসু গানের সুর তাদের কণ্ঠে গুনগুনিয়ে ওঠে—টুসুগানকে তারা ভোলে না। পুরুলিয়ার আদিবাসী সম্প্রদায়ের দুঃখ-রৌদ্রতপ্ত জীবনের স্বস্তি ও সান্ত্বনা হল এই টুসুগান। তাই জীবনের দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোককেও টুসুগানের বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে দেখি। কয়লাখনির ভেতরের অসুস্থ পরিবেশে দরিদ্র শ্রমিক যে রোগাক্রান্ত হয় এই তথ্যটিও টুসুগানের বিষয়ীভূত হয়েছে :

চল টুসু চল খেলতে যাব রাণীগঞ্জের বটতলা।
খেলতে খেলতে দেখায়ে আনবো
কয়লা খাদের জলতুলা।।
কয়লা খাদের ময়লা জলে
ঝিমঝিম মাথা দুঃখা১৫।
কাকড় খেয়ে কফ করেছে
ডাক্তার এনে হাত দেখা।।

ডাক্তার এসে দেখে-শুনে নিশ্চয়ই ওষুধ-পথ্যের বিধান দেন। কিন্তু গরীব রুগ্ন মানুষদের পথ্য জলসাবুর চেয়ে উন্নত ধরনের বস্তু আর কি হতে পারে? অথচ মুখে রোচে না জলসাবু। মানুষের জিভের জল তো আর সামর্থ্যের দোহাই মানে না। পুষ্টিকর সুস্বাদু পথ্যের কথা ভাবতে গরীব রুগীর আর বাধা কোথায়? ডাক্তারবাবুর কাছে তাই অসুস্থ মানষের কাতর আবেদন :

ওরে ওরে ডাক্তারবাবু আর খবো না জলসাবু
সর্দিতে ধরেছে মাথা এনে দাও কমলালেবু।

টুসুসঙ্গীতের মধ্যে দুঃখের কথা যেমন আছে তেমনি সেই দুঃখের কারণ অনুসন্ধান এবং জাতীয় আত্ম-সমালোচনাও স্থান পেয়েছে। একটি গানে পাচ্ছি :

মোদের ভূমি মানভূমেতে
চাষে হয় জীবন ধারণ
চাকুরীতে ভাত না হবে
চাষেই হয় মোদের জীবন।
আজ আমাদের দুখ কেন রে
শুন ও ভাই চাষীগণ—
আমরা অলস কুঁড়ে, সব হয়েছি
চাষে কারো নাইরে মন।

এ-বিষয়ে অন্য একটি গান :

কি রং উঠেছে হে দেশে—
দেশের লোক ভাসিছে বিলাসে।
প্রতি বছর অন্ন কষ্ট হচ্ছে দেশে দেশে
তবু দেশের লোক সমস্ত দিন
কাটছে রে ১৬ বসে বসে।
কর্মের প্রতি অবহেলা করেছি
সব নিজ দোষে,
তাই দিনে দিনে বিলাসিতা
বাড়ছে রে ভেসে ভেসে।
দেশের লোক আজ এত সুখী
হয়েছে সব অলসে,
এবার পায়ে হাঁটা বন্ধ করে,
চড়ছে রে ট্রেনে বাসে।

এই শ্রমবিমুখ অলস মানুষগুলির মনের মধ্যে চাষের ও কর্মের উদ্দীপনা এবং প্রাণের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চারিত করার জন্যে টুসুগানের মাধ্যমে সঙ্গীতস্রষ্টা তাদের উদ্দেশ্যে তাই হাঁক দিয়েছেন :

ওহে ও চাষীগণ, চাষে তোরা
ঢালিস নিজ মন
চাষেই মোদের অন্ন যোগায়
করি রে জীবনধারণ।
আমরা হই যে চাষীর ছেলে,
চাষেই হয় শরীর গঠন
দেখ মোদের চাষ ছাড়া ভাই
কি আছে অমূল্য রতন
দুই মাসের শ্রমেতে মোরা
বারো মাস করি ভোজন।

।। তিন ।।

অবজ্ঞা-অনাদরের অন্ধকারের মধ্যে পুরুলিয়ার অক্ষরজ্ঞানহীন অসংখ্য মানুষ বসবাস করলেও তাদের মন ও চোখ দুটো কিন্তু খোলা রয়েছে। যুগজীবনের আলোড়ন তেমনভাবে উপলব্ধি করতে না পারলেও যুগের চিন্তা ও চেতনার সঙ্গে কিছু পরিমাণে পরিচয় তাদের ঘটেছে। সেই পরিচয়ের অভিজ্ঞতাকে টুসুগানের আকারে দিয়ে সর্বসাধারণ্যে আরো ব্যাপকভাবে ও বিস্তৃততররূপে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে। গ্রাম-পুরুলিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ—আবালবৃদ্ধ-বণিতা দেশ, রাজনীতি ও প্রগতি সম্পর্কে এইভাবেই বছরের পর বছর ক্রমশ অধিক মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠছে। কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিই :

।। দেশপ্রেমিকতা ।।

জয় বল জয় ভারত জননী
মোদের ভারত তীর্থভূমি।
যার মাটিরই শস্য জোরে
সোনার ভারত নাম ধরে
সেই মাটিরই ভাগ্য জোরে
ডাকছি গো গরব করে।
তোর মাটিতে কবিগুরু জন্মিলে আলো করে

৮, ভালো, ৯, কুচক্রান্ত, ১০, কন্যা, ১১, সোনার, ১২, আমন্যো।

১৩ ক্ষুধার, ১৪ বাঁকানো সিং, ১৫ ব্যথা-বেদনা।

নীর কত গো তোর মাটিতে
জীবন হারায় অকালে।

।। রাজনৈতিক সচেতনতা ।।

দেশ স্বাধীন হোল—
শাসকের অনাচারে প্রাণ গেল।
১৯৪৭ সালে ভারতে স্বরাজ এল,
দেশে দেশে জাগল সাড়া
জন স্বরাজ না মিল।
স্বাধীনতার সংগ্রামেতে যারা গো লড়েছিল,
তারা সবে গান্ধীবাদী
কংগ্রেসে নাম লিখালো।
গণভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইল
মহাত্মাজী স্বর্গে গেল
কংগ্রেসে উঁই লাগিল।
জন স্বরাজে কোটা কন্ট্রোল—
কাপড় ও চিনি হল
টাকা দিয়ে চাল না মিলে
অনাহারে প্রাণ গেল।

।। প্রগতিমুখিণতা ।।

পড়রে তোরা বেসিক ইস্কুলে
হেথায় বোকা ছেলের জ্ঞান খুলে।
বেসিক শিক্ষার চিন্তাধারায়
গান্ধীজী তাহার মূলে
কর্ম বিনা শিক্ষা মোদের শিক্ষা হবে বিফলে।
বেসিক শিক্ষার এমনি ধারা
ভুল না কোন ছলে
পড়ার শেষে চাকরী বিনা
কর্ম করেও পেট চলে।

(এই টুসু গানটি—'ভালো করে পড়গা ইস্কুলে—নইলে কষ্ট পাবি শেষ কালে'—ইত্যাদি বহুল প্রচলিত বাউল সঙ্গীতটির কথা ও সুরকে মনে পড়িয়ে দেয়)।

।। সাজ-সজ্জায় আধুনিকতা ।।

কত রঙীন শাড়ী উঠেছে দেশে

তোরা কিনে লে গো পৌষ মাসে।
রঙীন রঙীন শাড়ী কত
আসছে গো ট্রেনে বাসে
বড় বড় দোকানী সব
বিকছে গো বসে বসে।
বাছে বাছে[17] কিন গো শাড়ী,
গায়ে যেন ঠিক মিশে
হেলে দুলে চলবি গো তুই
লোকে যেন না হাঁসে।

।। প্রকৃতি-চিন্তা ।।

বন রাখা ভাই হল বিষম দায়—
বনের কাঠ-পাত সব উজড় হয়ে যায়।
দেশের যত বন ছিল
আজ হয়ে গেল নষ্ট-প্রায়
বনে যে সব গাছ ছিল
তাই ছিল বনের শোভাটায়।
বাংলা দেশের বনের দশা
পড়েছে আজ শেষ সীমায়
মহুয়া আর শালের শোভা
আর কি মোরা ফিরে পায়।

কি নেই টুসু গানের মধ্যে? সব আছে—সব। গোটা পৌষ জুড়ে পুরুলিয়ার পথ-ঘাট, অরণ্য-পর্বত, লোকালয়-প্রান্তর যে টুসু সঙ্গীতে মুখর হয়ে ওঠে কান পাতলে তারই মধ্যে সীমান্ত বাংলার অধিবাসীদের প্রাণ-স্পন্দন শোনা যায়, — আবিষ্কার করা যায় তাদের গোটা জীবনের ইতিহাস। টুসু-গান যে কেবল বেদনাহত, বঞ্চিত, ব্যর্থ ও বিড়ম্বিত জীবনের বিষন্ন বিলাপই হয়ে উঠেছে তা নয়। এর মধ্যে প্রেমের রোমান্টিকতাও রঙীন ফুলঝুরির মত কথার ফুলকি হয়ে ফুটেছে। পাহাড়ী নদী ও অরণ্য-প্রকৃতির রমণীয় পরিবেশে প্রেমিক-প্রেমিকা মিলন-বাসর রচনা করতে চেয়েছে :

সিলাই ঘাটে দিবে দরশন
কোথায় আছ ওহে প্রাণধন।
সিলাই নদীর বাঁকে বাঁকে
শোভা পায় শালেরি বন
আমি তুমি দুজনারি মিলনেরি শুভক্ষণ।

কখনো লোক-লজ্জার খাতিরে প্রেমিক-প্রেমিকাকে মনের অনেক সাধ গোপন রাখতে হয়েছে :

সিলাই নদী যাবে সজনী—
আমি হেরবো তোমার মুখখানি।
সড়কের ধারে ধারে দু পাশে দোকান দানি
সন্দেশ খাওয়া রইল বাকি,
কে হবে জান-চিনা[18]।
চোখে-চোখে দেখাদেখি হাঁসি-হাঁসি মুখখানি
মিষ্টি দিয়া পানের খিলি
লে গো কিনে দুখানি।
সঙ্গের সঙ্গিনী কত ছিল তাহা না জানি
বাড়ী ফিরে যাবার বেলা দুজনে টানাটানি।

আবার কখনো বা নায়িকার মান-অভিমান ও প্রেমে উদাসীনতা নায়ককে প্রশ্নাতুর করেছে :

কেন ধনী কর গন্ডগোল—
তুমি কি লিবে আমারে বল।
সারা দিলি[19] শাড়ী দিলি
আর দিলি ভাই পায়ের মল,
নাকেতে লুলুক দিলি
দুলেছে কানের কুন্ডল
কেন ধনী কর গন্ডগোল।

ভালোবেসে সই পাতানোর সুখের সংবাদও একটি গানে পেয়েছি :
ওমা আমি ফুল পাতাব
ফুলকে আমি কি দিব
বাগান যাব পয়সা পাব
ফুলকে ফুলান তেল দিব।

এছাড়া প্রসন্ন কৌতুক উচ্ছ্বাস—যা আদিবাসী রঙ্গিনী নারীদের চরিত্রের অন্তর্গত উপাদান—মাণিক্যের দীপ্তি নিয়ে অনেক গানেই ঝিকিয়ে উঠেছে। পান কিনতে গিয়ে দোকানীর উন্নাসিক অহংকৃত মনোভাব দেখে মেয়েদের মনে সরস কৌতুকের বান ডেকেছে। একসঙ্গে সুর তুলে তারা গেয়ে উঠেছে :

চকবাজারে গোলদারী দোকান—
তোমা লেয়ে পয়সা দেয়ে পান,
চকবাজারে গোলদারী দোকান।

তারপরেই দোকানীর মিথ্যে অহংকারকে ব্যঙ্গের ছুরি চালিয়ে টুকরো-টুকরো করে দিয়েছে তারা :

তুই নাকিরে বড় দোকানী—
তোর দোকানে নাই মিলেরে
এলাচ, লবং দারচিনি
তুই নাকিরে বড় দোকানী।

পুরুলিয়ার সরল আদিবাসীদের চরিত্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য হল পারি-পার্শ্বিকতা সম্পর্কে তাদের সদা-জাগ্রত কৌতূহল। সব কিছুই চোখ মেলে তারা দেখে। যে কোন বিষয়কে নিয়েই গান বেঁধে ফেলে। ছড়ুরা স্টেশনের (আদ্রা থেকে পুরুলিয়া গেলে পুরুলিয়ার আগের স্টেশন) গায়ে সাময়িক সামরিক বিমানঘাটি নির্মিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। এখানে উড়ো-জাহাজ নামতে দেখে গ্রামের লোক অবাক হল আর সঙ্গে-সঙ্গে গানও রচনা করে ফেলল :

ধন্য ধন্য ধন্য কোম্পানী
তোর বুদ্ধিকে সাবাস করি।
কত কত উড়াগাড়ী উড়ে ওগো আকাশে
সে গাড়ী নামিল বায়ে'
ছড়রারে যে অফিসে।

সার্কাস দেখেও তারা অবাক মেনে গান রচনা করে :
সারকেসটা দেখতে চমৎকার—
টাকা লাগুক মেলাই যারে যার।
গোলের ভিতর ঘুরছে গাড়ী
ঘুরছে রে ভাই চারিধার।।

এইভাবেই বাংলাদেশের এই সীমান্ত-বাসীদের জীবন টুসুগানের দর্পণে প্রতি-বিম্বিত হয়েছে। সুখের চেয়ে দুঃখের—আনন্দের চেয়ে যন্ত্রণার ভাগটা বেশী বলে টুসুগানে এদের জীবনের কালো রূপের প্রতিফলনই আগে চোখে পড়ে। এই অসহ্য অনাদরের অন্ধকার জীবন থেকে উত্তীর্ণ হবার স্বপ্ন এরাও দেখে। তাই অনেক সাধ নিয়ে আলো জ্বালানোর গানও গায় :

কুলকুহেলী বড়ই অন্ধকার—
আমরা টানাই দিব
বিজলী বাতির সরু তার।

কিন্তু সব স্বপ্ন কি আর সত্য হয়? সব সাধ কি মেটে? ঝকঝকে চকচকে ডিজেল রেল তো কতদিন থেকেই পুরু-লিয়ার বুক বেয়ে হাওড়া আসছে। কিন্তু সাধ থাকা সত্ত্বেও পুরুলিয়ার সব মানুষ কি এই গাড়ী চড়ে সভ্যতা-স্বর্গ কলকাতার অন্যতম প্রধান ফটক হাওড়া স্টেশনে এক-বারের জন্যেও এসে পৌঁছতে পেরেছে? তা যদি পারতো তাহলে নিশ্চয়ই হতাশার দীর্ঘশ্বাসে পূর্ণ ব্যর্থতার বেদনা এমন করে একটি টুসুগানে করুণ সুর-মূর্ছনা তুলতো না :

আদ্রা-কলা ডিজেলগাড়ী রেল চলে গেল—
হায়, আমার হাবড়া যাবার সাধ ছিল!

১৬, কাটাচ্ছে।
১৭, বেছে বেছে।
১৮ জানা-চেনা ; ১৯ দিলাম

দ্বিতীয় পর্ব : দিগ্বিজয়ের পথে জার্মাণী

প্রথম অধ্যায়

পোল্যান্ড বিদ্যুৎগতি আক্রমণ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম বলি

ইউরোপে নরমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ঊষালগ্নে হিটলারী সৈন্যবাহিনী পোল্যাণ্ডের সীমা অতিক্রম এবং স্বাধীন পোল রাজ্য আক্রমণ করিল। পৃথিবীতে সেই প্রথম আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধের বিস্ময় শুরু হইল। বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে সেই চাঞ্চল্যকর সংবাদ ওয়ারশ হইতে লণ্ডন হইয়া কলিকাতা নগরীতে পৌঁছিল। জনসাধারণ তখনও ইহার দূরপ্রসারী ব্যাপকতা বুঝিতে পারিল না।

বলা বাহুল্য যে, অতর্কিতে এই আক্রমণ শুরু হইল। কোনওপ্রকার 'চরম-পত্র' দেওয়া বা পূর্বাহ্নে সতর্ক করিয়া দেওয়ার কোন নৈতিক দায়িত্ব নাৎসী নায়ক অনুভব করিলেন না। বোমারুর দ্বারা আক্রান্ত এবং বিধ্বস্ত শহরের অসামরিক পোলিশ জনগণ জানিতেও পারিল না যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। সকাল সাড়ে ১০টার সময় লণ্ডনস্থিত পোলিশ রাজদূত বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানাইলেন যে, জার্মান সৈন্যেরা পোলিশ সীমানা চারিস্থান দিয়া অতিক্রম করিয়াছে।

এদিকে হিটলার সমস্ত দোষ ইঙ্গ-ফরাসী ও পোলিশ গভর্নমেণ্টের উপর চাপাইতে চাহিলেন। পোল রাজ্য আক্রমণের পর হিটলার ১লা সেপ্টেম্বর রাইখস্টাগে (জার্মান পার্লামেণ্ট) এক বক্তৃতায় বলিলেন, "ভার্সাই সন্ধির হুকুমনামা যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে উহারই যন্ত্রণার পেষণে আমরা মাসের পর মাস পিষ্ট ছিলাম—এই সমস্যা এক্ষণে আমাদের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ডানজিগ ও করিডোর আগেও জার্মানীর ছিল, এখনও উহা জার্মানীর।"

পোলেরা জার্মানদের উপর অযথা অত্যাচার করিতেছিল, এই অভিযোগ করিয়া তিনি বলেন যে, তথাপি তিনি আপোষ-মীমাংসার চেষ্টায় ছিলেন। গত দুইদিন আমি সারাক্ষণ অপেক্ষায় ছিলাম, দেখি পোলিশ গভর্নমেণ্ট কোন প্রতিনিধি পাঠানো সুবিধাজনক বলিয়া মনে করেন কিনা। কিন্তু গতকল্য রাত্রি পর্যন্ত কোন প্রতিনিধিই আসিল না.........যদি জার্মান গভর্নমেণ্ট এবং উহার নেতাকে এই ধরনের আচরণ সহ্য করিতে হয়, তবে, রাজনীতির পৃষ্ঠা হইতে জার্মানীর নাম মুছিয়া ফেলাই ভালো। কিন্তু আমার ধৈর্য এবং শান্তির জন্য আমার গভীর দরদকে যদি দুর্বলতা, এমনকি কাপুরুষতা মনে করা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আমাকে ভুল বুঝা হইবে। সুতরাং গতকল্য রাত্রে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে জানাইয়া দিয়াছি যে, এরূপ অবস্থায় পোলিশ গভর্নমেণ্ট আপোষ আলোচনার জন্য আন্তরিক ইচ্ছুক বলিয়া আমি মনে করি না।'

পশ্চিমের রাষ্ট্রপুঞ্জ যে কোন ঘোষণাই দিক না কেন, তাতে হিটলারের মতে আর ইতস্ততঃ করিবার সময় নাই। জার্মানী পশ্চিম দিকে কিছুই চাহিতেছে না এবং ফ্রান্সের সঙ্গে তার সীমানা চূড়ান্ত বলিয়াই মনে করে।' ১৯১৪ সালের পুনরাবৃত্তি যাহাতে না ঘটে, তজ্জন্য তিনি সোভিয়েটের প্রতি চুক্তিকে অভিনন্দন জানান এবং প্রতিশ্রুতি দেন।

স্ত্রীলোক ও শিশুদের বিরুদ্ধে আমি কোন যুদ্ধ করিব না। আমি আমার বিমানবহরকে কেবলমাত্র সামরিক লক্ষ্য-বস্তুর উপর আক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখিবার জন্য হুকুম দিয়াছি। কিন্তু যদি শত্রুপক্ষ মনে করে যে, সে ইহার সুযোগ লইয়া যে কোন উপায়ে লড়াই চালাইতে পারে, তাহলে উপযুক্ত জবাবই সে পাইবে—যে জবাবের ফলে সে কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাইবে না। আজ রাত্রে এই প্রথম পোলিশ সৈন্যরা আমাদের রাজ্যের উপর গুলী ছুঁড়িয়াছে। সুতরাং ভোরবেলা ৫-৪৫ মিনিট হইতে আমরা গুলীর বদলে গুলী এবং বোমার বদলে বোমা বর্ষণ করিতেছি।'

'আমি কোন জার্মানকে এমন কোন কষ্ট সহ্য করিতে বলিব না, যাহা ব্যক্তিগত-ভাবে আমি নিজে সহ্য করিব না। এখন হইতে আমার সমগ্র জীবন আরও বেশী করিয়া জার্মান জনগণের জন্য উৎসর্গীকৃত হইল। এখন হইতে আমি জার্মান রাষ্ট্রের প্রথম সৈন্য। আমি আবার সেই কোটটি পরিধান করিয়াছি, যাহা আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং পবিত্র ছিল। যতক্ষণ না পূর্ণ জয়লাভ হয়, ততক্ষণ এই কোট আমি খুলিব না, অথবা ফলাফল দেখিবার জন্য আমি বাঁচিয়া থাকিব না।'*

হিটলারের কোন্ প্রতিশ্রুতি ভবিষ্যতে পালিত হইয়াছে, তাহা ইতিহাসের পাঠকেরাই বিচার করিবেন। কিন্তু আপাতত এই বক্তৃতায় দেখা যাইতেছে যে, হিটলারের দৃঢ়বিশ্বাস '১৯১৮ সালের নভেম্বরের আর পুনরাবৃত্তি হইবে না' এবং এই যুদ্ধে যদি তাঁর মৃত্যু ঘটে, তবে, 'কমরেড গোয়েরিং' এবং তারপর 'কমরেড হেস' তাঁর স্থলাভিষিক্ত হইবেন—জার্মান জনগণ যেন তাঁদের প্রতিও 'অন্ধ আনুগত্য ও বশ্যতা' দেখান, এই মর্মে তিনি ঘোষণা করেন। 'পোল্যাণ্ডের পাগলামির অবসানের জন্য' তিনি জার্মান সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যেও এক ঘোষণাবাণী প্রচার করেন।

৩রা সেপ্টেম্বর বৃটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জবাবে হিটলার এক বেতার বক্তৃতায় বলেন যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য রক্ষার নাম করিয়া বহু শতাব্দী যাবৎ ইংলণ্ড পৃথিবী জয়ের উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় জন-গণকে আত্মরক্ষায় উপায়হীন করিয়া রাখার এক নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুসরণ করিতেছে এবং যে কোন ছুতায় আক্রমণ চালাইতেছে। যে ইউরোপীয় রাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক বলিয়া মনে হয়, তাকেই ধ্বংস করা হইতেছে। ইংলণ্ড পর পর স্পেনীয়, ওলন্দাজ ও ফরাসীর মত পৃথিবীর সর্ব-বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে এবং এক্ষণে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ (ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধে বিজয়ী জার্মানীর উদ্যোগ) হইতে জার্মানীর বিরুদ্ধে লাগিয়াছে। জাতীয় সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃত্বে যেই জার্মানী ভার্সাই সন্ধির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতেছে অমনি বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে বেষ্টননীতি শুরু করিয়াছে।......

সুতরাং হিটলার অটুট সঙ্কল্প লইয়া যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইলেন। পৃথিবীব্যাপী আবেদনও তাঁকে নিরস্ত করিতে পারিল না। ২৪শে আগষ্ট মহামান্য পোপ ও মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং ২৩শে আগষ্ট বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, লাক্সেমবুর্গ, নরওয়ে, ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশের রাজারা বা রাষ্ট্রপ্রধানেরা হিটলারের নিকট এক ঐকান্তিক আবেদন জানাইলেন যুদ্ধ পরিহার ও শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য।

---

* How Hitler Made War' — Page 29-31

জার্মান সামরিক শক্তি রণতাণ্ডবে মাতিয়া উঠিল। পুরা ৫টি আর্মি বা সৈন্যবাহিনী পোল্যাণ্ড আক্রমণে যোগ দিল। তৃতীয়, চতুর্থ, অষ্টম, দশম এবং চতুর্দশ—এই পাঁচটি বাহিনী প্রধানত পোল্যাণ্ডের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে, এই দুই অংশে দুইটি 'আর্মি-গ্রুপে' বিভক্ত হইয়া পূর্ব-পরিকল্পিত নিখুঁত নক্সা অনুযায়ী অভিযান আরম্ভ করিল। এই সৈন্যশক্তির মোট সংখ্যা ছিল ৪৫টি পদাতিক ডিভিসন, ৫টি প্যাঞ্জার ডিভিসন, ৪টি হাল্কা যান্ত্রিক ডিভিসন, ৬টি মোটরায়িত পদাতিক ডিভিসন এবং ২,৩০০ রণবিমানসহ দুইটি পুরা বিমান-বহর—এই মোট ৬০ ডিভিসন সৈন্য ও বিমান নিযুক্ত হইল।* কিন্তু পরে মজুত সৈন্যের সহায়তায় জার্মানীর এই সংখ্যা ৭০ ডিভিসন পর্যন্ত দাঁড়াইয়াছিল।

পোলিশ বিমানঘাঁটিগুলির উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের মধ্য দিয়া জার্মান আক্রমণের উদ্বোধন হইল। বিমানক্ষেত্রগুলি নষ্ট হইয়া গেল এবং সেই সঙ্গে পোলিশ বিমানবহরের এক-পঞ্চমাংশ ধ্বংস হইল। সুতরাং অবিলম্বেই আকাশের উপর জার্মান বিমানশক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। জার্মানীর তুলনায় পোল্যাণ্ডের বিমানশক্তি ছিল সামান্য—মাত্র ৫ শত হইতে ৬ শতের মধ্যে এবং শুরুতেই ১৯টি বিমানক্ষেত্র ধ্বংস হওয়ায় পোলিশ বিমানবহর কার্যত অকেজো হইয়া গেল। উপযুক্ত বিমানঘাঁটি ও বিমান সংখ্যায় যেমন অভাব হইল, তেমনই পেট্রোলের অভাবেও গুরুতর অসুবিধা দেখা দিল। সুতরাং জার্মান বিমানবহর প্রায় বিনা বাধায় সংহারকার্য চালাইয়া যাইতে লাগিল। আক্রমণকারী সৈন্যদলের সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য তারা রেলপথ, পশ্চাদ্দিকের সেনানী শিবির, আশ্রয়প্রার্থী দল, খোলা গ্রাম এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করিতে লাগিল। পোলিশ রণক্ষেত্রের পিছনে তারা নিদারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিল, সৈন্য সমাবেশ, সরবরাহ ব্যবস্থা এবং সমস্ত প্রকার চলাচলের উপর তারা বিভ্রাট ডাকিয়া আনিল। ইহা ছাড়া তারা গোলন্দাজদের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে লাগিল এবং যেখানে যেখানে প্রতিরোধের লক্ষণ তারা দেখিতে পাইল, সেখানেই তারা যান্ত্রিক সৈন্যদিগকে সতর্ক করিয়া দিতে লাগিল এবং এভাবে তাদের রক্ষা ও পাহারার কার্যেও প্রভূত সহায়তা করিল।*

পোল্যাণ্ডের পতন সম্ভাবনা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। কেন? —কেবল কি জার্মান সামরিক শক্তির অতুলনীয় শ্রেষ্ঠতার জন্য? —সেই শ্রেষ্ঠতা তো অনস্বীকার্য বটেই, কিন্তু পোল্যাণ্ডের রাজনীতি ও রাষ্ট্রগঠনের মধ্যেই তার দ্রুত পরাজয়ের বীজ নিহিত ছিল। মার্শাল পিলসুদস্কি যে ডিকটেটারি শাসন চালাইয়াছিলেন, তা যেমন জনসাধারণের কল্যাণবিরোধী ছিল, তেমনই তাঁর উত্তরাধিকারিগণ সাম্যবাদ বিরোধী, গণতন্ত্রবিরোধী এবং আত্মস্বার্থপরায়ণ ভূম্যধিকারী ও কায়েমী স্বার্থের বাহকগণের পক্ষপাতী এক আত্মঘাতী নীতি অনুসরণ করিতেছিলেন। পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে কর্নেল বেক (১৯৩২-৩৯) এবং স্বরাষ্ট্র ও সামরিক ব্যাপারে মার্শাল স্মিগলি-রিজ পোল্যাণ্ডকে পূর্ব ইউরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন ও রণনীতিতে একান্ত অসহায় করিয়া ফেলিল। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে জার্মানীর সহিত পোল্যাণ্ডের একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু জার্মানী সেই চুক্তির আড়াল ধরিয়াই তার রণসজ্জা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। পোল্যাণ্ড ইহাতে সতর্ক হইল না, এমন কি, পশ্চিমে ফ্রান্স এবং পূর্বদিকে চেকোশ্লোভাকিয়া ও সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত একযোগে আত্মরক্ষার চুক্তি অনুসরণ করিলে, পোল্যাণ্ড যে ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তার নেতারা সেই অপরিহার্য প্রশ্ন সম্পর্কেও সচেতন হইলেন না। বরং পোল্যাণ্ড বিপরীত পথ ধরিয়া চলিল। মিউনিক চুক্তির দ্বারা চেকোশ্লোভাকিয়া যখন জার্মানীর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল, তখন পোল্যাণ্ড আসন্ন বিপদ ও জার্মান অভিসন্ধির বিষয়ে সাবধান না হইয়া চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিল। ফলে দক্ষিণ পোল্যাণ্ড জার্মান রণনীতির গ্রাসে পড়িল। তারপর আগস্ট মাসে ইঙ্গ-ফরাসী-রুশ সামরিক চুক্তি আলোচনার সময় পোল্যাণ্ড সোভিয়েট রাশিয়ার প্রস্তাবিত 'গ্যারাণ্টি'তে অস্বীকৃত হইল এবং সাম্যবাদভীত পোলিশ গভর্নমেণ্ট দেশরক্ষার্থে লালফৌজের আগমন বরদাস্ত করিতে রাজী হইলেন না। সুতরাং পোল্যাণ্ড সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। বৃটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে এই অবস্থায় কোন সাহায্য দান যে সম্ভব নহে, এই সাধারণ বুদ্ধির কথাটি পর্যন্ত পোলিশ নেতারা খেয়াল করিলেন না। তাঁরা ইঙ্গ-ফরাসীর গ্যারাণ্টিদানকেই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিলেন এবং আশা করিলেন যে, সমুদ্রপথে ও আকাশপথে তাঁরা প্রভূত সাহায্য পাইবেন। আর বৃটেন ও ফ্রান্সের ভ্রান্তবুদ্ধি এবং জার্মান সমরশক্তি সম্পর্কে অজ্ঞ নেতারা, এমন কি জেনারেল গ্যামেলাঁ পর্যন্ত প্রচার করিলেন যে পোলিশ বাহিনী চমৎকার, পোল্যাণ্ডের আত্মরক্ষার শক্তিও যথেষ্ট।

অবশ্য পোল্যাণ্ডের জনসংখ্যা নিতান্ত তুচ্ছ ছিল না—সাড়ে তিন কোটি এবং উহার সৈন্যদল ছিল ইউরোপের মধ্যে পঞ্চম সর্ববৃহৎ।* কিন্তু জার্মান আক্রমণের সময় এই সৈন্যদল সমাবেশের সুযোগ পর্যন্ত তারা পায় নাই। ১লা সেপ্টেম্বর পোলিশ আর্মি ৪০ হইতে ৪৫ ডিভিসন সৈন্য লইয়া গঠিত ছিল, কিন্তু এগুলির মধ্যে অনেক ডিভিসনই পুরাপুরি রণশক্তি অনুযায়ী গঠিত ছিল না। পদাতিক ডিভিসনগুলি ছাড়া ১০টি অশ্বারোহী ব্রিগেড এবং ১টি মাত্র যান্ত্রিক ব্রিগেড ছিল। পোল্যাণ্ড শ্রমশিল্পে উন্নত ছিল না এবং রণবিদ্যার আধুনিকতার অভাব ছিল। সুতরাং গোলা-গুলী, অস্ত্রসজ্জা ও যান্ত্রিকতায় এগুলির দৈন্য ছিল অসাধারণ। সুতরাং পোলিশ সৈন্যের পূর্ণতর সমাবেশ ঘটিলে জার্মানীর হাতে কেবলমাত্র বন্দীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত।

যুদ্ধারম্ভের সময় পোল্যাণ্ডের রণনৈতিক সমাবেশও মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং ম্যাক্সভার্নার ইহাকে নেপোলিয়নের যুগের সেকেলে রোমাণ্টিক ধারণা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা আধুনিক রণধর্ম এবং জার্মানীর শ্রেষ্ঠতর শক্তির একান্ত অনুপযুক্ত ছিল। রিজ-স্মিগলির নেতৃত্বে পোলিশ সেনাপতিরা পশ্চিম পোল্যাণ্ডকে জার্মানীর বিরুদ্ধে তাদের রণক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং তার 'ব্যাপক মহড়া ও বৃহৎ এলাকাব্যাপী পাল্টা আক্রমণের' তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া চলিলেন এবং আত্মরক্ষার জন্য দুর্গায়িত এলাকার প্রয়োজন বোধ করিলেন না।

কোরিডোর, পোজেন বা পোজনান এবং উত্তর সাইলেশিয়া—এই পশ্চিম অংশই ছিল পোল্যাণ্ডের রণনৈতিক সমাবেশের স্থান। কিন্তু এগুলি ছিল একান্তরূপে জার্মানীর সীমান্তলগ্ন, ভূমি অত্যন্ত সমতল এবং পাহাড়, নদী ও নিবিড় অরণ্য বা প্রাকৃতিক বিঘ্নশূন্য। জনবসতি ছিল এখানে সর্বাধিক, পোল্যাণ্ডের প্রায় অর্ধেক লোক এখানে বাস করিত এবং শ্রমশিল্পের এলাকাগুলিও ছিল এই পশ্চিমাংশে। অর্থাৎ জার্মানীর থাবার মুঠির মধ্যে এই উৎকৃষ্ট এলাকা ছিল, যাহা পোল নেতারা 'বিনাযুদ্ধে ছাড়িয়া দেওয়া' বুদ্ধিমানের কার্য বলিয়া মনে করিলেন না। সুতরাং পোলিশ সৈন্যের সমাবেশ ঘটিল জার্মান সীমান্তের নিকট—পোজেন হইল এই সমাবেশের মর্মকেন্দ্র, আর সমাবেশ ঘটিল ওয়ারশ'র উত্তরে এবং কোরিডোরের সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তী এলাকায়। অর্থাৎ বুদ্ধিমান পোলিশ রণনীতিবিদরা তাঁদের সৈন্যদিগকে এমনভাবে আগাইয়া দিলেন, যাতে জার্মানরা এক থাবাতেই তাদের গ্রাস করিতে পারে! কিন্তু ইহার চেয়ে যদি তাঁরা ভিশ্চুলা, বুগ ও সান নদী এলাকা ধরিয়া বহুদূরে পিছনে সরিয়া গিয়া আত্মরক্ষার সারি গড়িয়া তুলিতেন, তাহলে প্রাকৃতিক বিঘ্নের স্বাভাবিক আড়াল হইতে তাঁরা অন্তত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল

* 'Battle for the World' — by Max Werner

* 'The Second Great War' — Vol. 4 Page 1503.

* 'The World at War' — published by the Infantry Journal, U.S.A. Page 38.

প্রতিরোধ চালাইতে পারিতেন। ইহার বদলে স্মিগলি-রিজ পোল সৈন্যদিগকে হাল্কাভাবে ছড়াইয়া দিলেন, পিছনে তেমন কোন মজুত সৈন্যও রাহল না। সুতরাং হতভাগ্য পোল সৈন্যেরা একবারে জার্মানীর কামানের মুখে পড়িয়া গেল।

আর জার্মানীর পরিকল্পনা ছিল নিখুঁত, এবং পূর্বসঙ্কল্পিত। আগের অধ্যায়ে বর্ণিত শ্বেত নক্সাই তার প্রমাণ। ২৩শে আগস্ট বা রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখের মধ্যেই জার্মানী তার সমস্ত বাহিনী গোপনে সমাবেশকালে পোলিশ সীমান্তে এবং আঘাতের জন্য সর্বপ্রকারে প্রস্তুত হইয়া রাহল। এদিকে ৩০শে আগস্টের আগে পোল সৈন্যেরা ব্যাপক সমাবেশের হুকুম পাইল না। কারণ তখনও পোলিশ গভর্নমেণ্ট ইঙ্গ-ফরাসীর মারফৎ জার্মানীর সঙ্গে আপোষ আলোচনার আশার মধ্যে ছিলেন, যদিও রাশিয়ার বন্ধুত্ব অস্বীকার করা হইল। ফলে, সৈন্য সমাবেশে দেরী হইয়া গেল এবং ১লা সেপ্টেম্বর জার্মান আক্রমণের পর দেখা গেল যে, মাত্র ৬ ডিভিসন পোলিশ সৈন্য রহিয়াছে রণস্থলে আর মাত্র ১৭ ডিভিসনকে পুরোপুরি সমাবেশ করা হইয়াছে। তারপর ক্রমাগত বোমাবর্ষণে ট্রেন, যানবাহন, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভ্রাট এবং অন্যান্য বহুপ্রকার কারণ একত্র হইয়া পোলিশ বাহিনীর পূর্ণ প্রস্তুতি ও যুদ্ধ-যাত্রায় অত্যধিক বিলম্ব হইয়া গেল।

জার্মানীর সর্বপ্রধান সেনাপতি জেনারেল ভন ব্রাউসিৎস চমৎকার সুযোগ পাইলেন। তিনি সমগ্র পোলিশ বাহিনীকে পর পর কতকগুলি বেষ্টন কৌশল অনুসরণ করিয়া চূর্ণ করিবার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। সমগ্র জার্মান বাহিনী দুইটি গ্রুপে বিভক্ত ছিল পোলিশ-জার্মান সীমানার রণনৈতিক অবস্থান অনুসারে দুই দিক হইতে বৃহৎ বেষ্টনী সৃষ্টির জন্য। খাতায়পত্রে পোলিশ সমর-কর্তারাও ৫টি আর্মির সমাবেশ পরিকল্পনা করিলেন, যথা ক্রাকাউ, লজ, পোজনান, পোমোরজ ও মডলিন বাহিনীসমূহ। আর জার্মানী সংস্থাপন করিল উত্তরদিকে ভন বোকের অধীনে দুইটি আর্মি-গ্রুপ—পূর্ব প্রুশিয়ায় ভন কুচারের বাহিনী, তারা পোলিশ মডলিন বাহিনীর এবং আরও পূর্বদিকে ন্যারিউ নদী বাহিনীর (পোলিশ) মুখোমুখি দাঁড়াইল। পোমেরানিয়ায় ভন ক্রুজের বাহিনী পোলিশ-পোমেরেজ বাহিনীর সম্মুখীন হইল। ইহা ছাড়া ডানজিগ এবং ভিনা বন্দরের দিকেও কিছু পোলিশ সৈন্য ছিল। দক্ষিণে ভন রুণ্ডস্টেডের গ্রুপ ৩টি বাহিনী লইয়া গঠিত ছিল। ভন রাইকনাউয়ের সৈন্যরা ছিল মধ্যস্থলে, তাঁর বামদিকে ছিল ব্লাস্কোভিৎসের সৈন্যেরা—ইহাদের মুখোমুখি ছিল পোলিশদের লজ বাহিনী (নামে মাত্র বাহিনী, কিন্তু সংখ্যাশক্তি ৪ ডিভিসন মাত্র, আর ২টি অশ্বারোহী ব্রিগেড)। ভন রাইকেনাউয়ের দক্ষিণে উত্তর সাইলেশিয়ায় এবং শ্লোভাকিয়ায় ছিল ভন লিস্টের বাহিনী—ইহাদের মুখোমুখি ছিল পোলিশদের ক্রাকাউদের সৈন্যদল।

পোলিশদের তুলনায় জার্মানীর সৈন্য-সংখ্যা এবং রণনৈতিক অবস্থানই যে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল, এমন নহে। প্রধান সেনাপতি ভন ব্রাউসিৎসের আর একটা সুবিধা ছিল এই যে, তিনি মোটামুটিভাবে উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটি আর্মি-গ্রুপ পরিচালনা করিতেছিলেন। অপরপক্ষে পোলিশ প্রধান সেনাপতি ৫টি পৃথক আর্মিকে পরিচালনার দায়িত্ব লইয়াছিলেন। কিন্তু এই পরি-চালনা ব্যাহত হইল উৎকৃষ্ট যোগাযোগের অভাবে, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ লাইন এবং বেতার শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং শেষ পর্যন্ত পোলিশ হাইকম্যাণ্ড সমস্ত যোগসূত্র হারাইয়া ফেলিলেন। *

পর-পর কতকগুলি মহড়ার চালে বেষ্টন করিয়া সমগ্র পোলিশ বাহিনীকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য লইয়া জার্মান সামরিক নক্সা অত্যন্ত দক্ষতার সহিত তৈয়ার এবং অনুসৃত হইয়াছিল। ওয়ারশ'র পশ্চিম দিকে পোজেন বা পোজেনান এলাকায় এবং করিডোরের দিকে পোলিশ সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছিল সবচেয়ে বেশী—এই সৈন্যদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়া সংহার করাই ছিল জার্মান সেনাপতির অন্যতম বিশেষ লক্ষ্য। জার্মান পোলিশ সীমানা হইতে বুগ নদী পর্যন্ত গড়পড়তা ৩০০ মাইল গভীরতায় এই আক্রমণ ও রণক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবার পরি-কল্পনা ছিল।

চারিটি পর্যায়ে এই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল। প্রথম পর্যায়ে ছিল ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, যাহাকে বলা যাইতে পারে সীমান্ত সংগ্রাম। এই যুদ্ধে পোলিশ সৈন্যদের সীমান্তে আত্মরক্ষার সমস্ত ঘাঁটি, বিশেষত বার্থা নদী (Warthia) বরাবর সমগ্র অবস্থান চূর্ণ হইয়া গেল। জার্মান 'গতিশীল সৈন্যেরা' ভারী ও হাল্কা যান্ত্রিক ডিভিসনগুলি তৎক্ষণাৎ রণক্রিয়ায় মত্ত হইল, পদাতিক ও বিমান বহরের সহযোগিতায় এবং পোলিশ সৈন্যদের সংহতি ভাঙ্গিয়া তাহা-দিগকে পিছনে ঠেলিয়া দিতে লাগিল এবং গভীরতর কীলকাবন্ধ করিবার জন্য রাস্তা খুলিয়া দিল। এই অবস্থাতেই পোলিশ করিডোরের সৈন্যেরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং জেনারেল ভন ক্রুজের অধীন পোমে-রানিয়ার চতুর্থ জার্মান বাহিনীর মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইল।

৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ১০ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল, উহাকে দ্বিতীয় পর্যায় বলা যাইতে পারে। এই পর্যায়ে পোলিশ রণাঙ্গনের মধ্যে বহু দিক দিয়া ভাঙ্গন ধরিল, তাদের রণক্ষেত্র টুকরো-টুকরো হইয়া খণ্ড রণাঙ্গনে পরিণত হইল এবং একটির সঙ্গে অপরটির কোন যোগ রহিল না এবং পোলিশ বাহিনী-গুলিও পরস্পরের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। প্রধানত দক্ষিণ দিক হইতে প্রবলতর জার্মান বাহিনীর আক্রমণে পোলিশ সৈন্যেরা বেষ্টিত হইয়া পড়িল। জেনারেল ব্লাস্কোভিৎস, যিনি ৮নং জার্মান বাহিনী লইয়া মধ্য রণাঙ্গনে ছিলেন, তিনি পোজেনের (পোলিশ সাইলেশিয়ার অন্তর্গত) পোল বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। আর দক্ষিণ দিকে জেনারেল রাইকেনাউ গ্যালিসিয়া হইতে পোলিশ সাইলেশিয়ান বাহিনীর সংযোগ নষ্ট করিলেন। আরও দক্ষিণে (শ্লোভাকিয়া-পোল্যাণ্ডের সীমান্ত) জেনারেল ভন লিস্ট গ্যালিসিয়ার পোল সৈন্যদিগকে উত্তর দিকে পশ্চাদপসরণ করিয়া সাইলেশিয়ান পোল বাহিনীর সহিত মিলিত হইবার পথ বন্ধ করিলেন। সর্বত্র জার্মান গতিশীল সৈন্যেরা রণক্ষেত্রের বহু দূরে প্রবেশ করিল এবং জেনারেল রেইনহার্ডের অধীন যান্ত্রিক সৈন্যেরা (৮নং বাহিনীর) ৯ই সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ওয়ারশ'র শহরতলীতে পৌঁছিল। ঐ দিনই জেনারেল হোয়েপনারের প্যাঞ্জার সৈন্যেরা ১০নং বাহিনীর শাখারূপে র‍্যাডমের দক্ষিণ-পশ্চিমে স্যাণ্ডোমিয়ার্জের নিকট মধ্য ভিশ্চুলার নদীতীরে উপস্থিত হইল এবং ১৪নং বাহিনীর যান্ত্রিক সৈন্যেরা গ্যালিসিয়ার সান নদীর দিকে অগ্রসর হইল।

অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেকটি পোলিশ বাহিনীই এভাবে ১০ দিনের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে সংযোগসূত্র হারাইয়া ফেলিল এবং ইতিমধ্যে জার্মান বাহিনী পোল্যাণ্ডের ১২৫ হইতে ১৭৫ মাইলের মধ্যে অগ্রসর হইল। জার্মানীর বিখ্যাত বেষ্টন কৌশলের মহড়া যেন ছবির মত ফুটিয়া উঠিল। পূর্ব প্রুশিয়া হইতে ৩নং জার্মান বাহিনী ওয়ারশ'র উত্তর-পূর্বে হাজির হইল। ওয়ারশ'র পশ্চিমে সমগ্র পোল রণক্ষেত্র বেষ্টিত হইল। ওয়ারশ'র ও পোজেনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে কাটনুর নিকট বাজুরা নদীর ধার দিয়ে সমগ্র পোল রণাঙ্গন উত্তর ও দক্ষিণ হইতে বেষ্টিত হইল এবং ১০ সেপ্টেম্বর দেখা গেল যে, পোল সৈন্যেরা যেন একটা প্রকাণ্ড থলির মধ্যে আটকা পড়িয়াছে এবং জার্মানরা সেই থলির মুখে ক্রমশ ফাঁস আটকাইতেছে। দক্ষিণ দিকে ব্রেস্ট লিটোভস্ক-ওয়ারশ'-লুবলিন—এই ত্রিভুজাকৃতি অঞ্চলও বেষ্টিত হইতেছিল।

এদিকে জার্মান বিমানবহর পোল সৈন্য সমাবেশ, যোগাযোগ, বিমানশক্তি, রেলপথ, সৈন্য ছাউনী, শিবির ইত্যাদির উপর প্রচণ্ড ভাবে বোমা মারিয়া সমস্ত কিছুর মধ্যে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা ডাকিয়া আনিল এবং পোলিশ বাহিনীর পক্ষে কোন সঙ্ঘবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত পশ্চাদপসরণের আর সম্ভা-বনা রহিল না। দক্ষিণ দিকে ভিশ্চুল ও সান নদী ধরিয়া তারা যে নূতন আত্মরক্ষার লাইন গড়িয়া তুলিবে, এমন উপায়ও রহিল না। ১১ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৮ই সেপ্টেম্বর এই অভিনব যুদ্ধের তৃতীয় পর্যায় শেষ হইল এবং জার্মানরা চূড়ান্ত জয়লাভ

* The Second Great War Vol. II.

করিল। ১৮ই সেপ্টেম্বরের পর এই যুদ্ধের চতুর্থ বা উপসংহার পর্যায় বলা যাইতে পারে। ওয়ারশ' মডলিন ইত্যাদি কয়েকটি বড় শহরে আত্মরক্ষার যে সমস্ত 'পকেট' সৃষ্টি হইয়াছিল, জার্মানরা ঐগুলি নিশ্চিহ্ন করিতে লাগিল।

জার্মান সৈন্যেরা সুশৃঙ্খলার সহিত পোল্যাণ্ডের সংহার কার্যে অগ্রসর হইতে-ছিল। ওয়ারশ'র পশ্চিমে ভিশ্চুলা নদীর বাঁকে তিনটি জার্মান বাহিনীর সৈন্যেরা একযোগে রণক্রিয়া চালাইয়াছে এবং এখানে পোলিশ কোরিডোর বাহিনী, পোজেন বাহিনী এবং সাইলেশিয়ান বাহিনীর কতকাংশ—পুরা ৯ ডিভিসন এবং আরও ১০ ডিভিসনের কিছু 'খুচরা সৈন্য' বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছিল। এখানে পোলিশ সৈন্যেরা অসাধারণ সাহসের সঙ্গে লড়িয়া-ছিল এবং জার্মান ব্যূহ ভেদ করিতে গিয়া তারা কোন কোন অংশে আক্রমণের ভূমিকাও লইয়াছিল। এখানে প্রভূত বিমান-শক্তির সহায়তায় জার্মানরা তাদের কাবু করে, কিন্তু তাতেও সপ্তাহখানেক লাগিয়াছিল। অবশ্য ইহার পর পোলিশ বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয় এবং ১ লক্ষ ৭০ হাজার পোল সৈন্য ধরা পড়ে। র‍্যাডমে ১০নং জার্মান বাহিনী ৫ ডিভিসন পোল সৈন্যকে ঘেরাও করে এবং ৬০ হাজার পোল সৈন্য বন্দী হয়। দক্ষিণ পোল্যাণ্ডে ১৪নং জার্মান বাহিনী আরও ৬০ হাজার পোল সৈন্যকে বন্দী করে। এই সময় উত্তর-পূর্ব দিক হইতে ৩নং জার্মান বাহিনী ওয়ারশ ও মডলিন ঘেরাও করে। ১৭ই সেপ্টেম্বর পূর্ব প্রুশিয়া ও দক্ষিণ পোল্যাণ্ড হইতে দুইটি জার্মান সাঁড়াশীর চাপ দুইটি বিশাল বাহুর মত ব্রেস্টের ৪০ মাইল দক্ষিণে বুগ নদীর তীরে আসিয়া মিলিত হয় এবং বাকি পোলিশ সৈন্যেরা পরিত্রাণের পথ না পাইয়া এই ফাঁদে ধরা পড়ে।

মোট কথা জার্মান সৈন্যেরা পর পর কতকগুলি অভূতপূর্ব বেষ্টনকৌশল অনুসরণ করে এবং অধিকাংশ পোলিশ সৈন্যকেই সাঁড়াশীর চাপে ফেলিয়া পিষ্ট করে। মানচিত্রের দিকে তাকাইলে বুঝা যাইবে এই বৃহত্তম সাঁড়াশীর চাপ উত্তর ও দক্ষিণ হইতে কিভাবে গোটা পোল্যাণ্ডকে বুগ নদী পর্যন্ত গ্রাস করিয়াছিল এবং প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জেনারেল গুডেরিয়ানের অধীন যান্ত্রিক সৈন্যেরা পোমেরানিয়ার (কোরিডোরের সীমান্তবর্তী) চতুর্থ বাহিনীর শাখারূপে কোরিডোর বিদ্ধ করিয়া এবং পূর্ব প্রুশিয়া পার হইয়া চলিয়া যায়। তারপর ৩৯নং জার্মান বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া তারা অগ্রসর হইতে থাকে এবং এই যুদ্ধের সর্ববৃহৎ বেষ্টন কৌশল অনুসরণ করিয়া তারা খ্যারিভ নদী পার হইয়া ক্রমে দক্ষিণাভিমুখী অগ্রসর হইয়া ব্রেস্টলিটো-ভস্কে গিয়া হাজির হয়। দুই সপ্তাহে তারা ৩৫০ হইতে ৪০০ মাইল পর্যন্ত অতিক্রম করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই অদ্ভুত গতিবেগ পোলিশ রণক্ষেত্রে প্রথম অনুসৃত হইল। কিন্তু লণ্ডন বা প্যারিস, কোথাও ইহার মূল্য উপলব্ধি হইল না এবং আমাদের কলিকাতা বা নয়াদিল্লীতে ইহা কোন রেখাপাতও করিল না।

ওয়ারশ'র পতন

কার্যত ১৮ দিনের মধ্যেই পোল্যাণ্ডের যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। কিন্তু রাজধানী ওয়ারশ'র তখনও আনুষ্ঠানিক পতনে কিছুটা বিলম্ব ছিল এবং যদিও জার্মান বাহিনীর সমর শক্তির সহিত পোলিশ বাহিনীর কোন দিক দিয়াই তুলনা ছিল না, তথাপি অসম্ভব বিঘ্ন ও বিপদের মধ্যে পড়িয়াও পোল সৈন্যেরা রাজধানী রক্ষায় যথেষ্ট বীরত্ব ও সাহস দেখাইয়াছে। অন্যান্য রণক্ষেত্রেও তাদের বীরত্ব কম ছিল না, কিন্তু তাহা ছিল দানবের তুলনায় মানবের সাহস দেখাইবার মত।

১৬ই সেপ্টেম্বর একজন জার্মান প্রতিনিধি ওয়ারশ'তে আসিয়া চরমপত্র পেশ করিলেন এবং ১২ ঘণ্টার মধ্যে আত্ম-সমর্পণের দাবী জানাইলেন। জার্মান কর্তৃপক্ষ জানাইলেন যে, যদি এই চরমপত্র অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে শহর ধ্বংস ও লোকক্ষয় হইলে একমাত্র পোলিশ সেনাপতিরাই ইহার জন্য দায়ী হইবেন। তবে ওয়ারশ' নগরী ত্যাগ করিবার জন্য তাঁরা অসামরিক জনগণকে ১২ ঘণ্টা সময় দিতে প্রস্তুত আছেন।

এই চরমপত্রের মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবা মাত্র জার্মানরা শহরের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে নগরী চতুর্দিকে বেষ্টিত হইয়া পড়িল এবং অধিকতর বাধাদান বৃথা বলিয়া অনুভূত হইল। তখন ২৭শে সেপ্টেম্বর ওয়ারশ বিনাসর্তে জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল।

৫ই অকটোবর তারিখ দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের প্রথম বিজেতা হিটলার বার্লিন হইতে বিমানযোগে সগর্বে ওয়ারশ পৌঁছিলেন এবং কাইটেল ও ব্রাউখিৎস প্রমুখ সমরনায়কগণ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাইলেন।

৬ই অকটোবর তারিখ হিটলার রাইখস্টাগে এক বক্তৃতায় বলিলেন যে, পোল্যাণ্ডের যুদ্ধে জার্মানীর মোট হতাহত হইয়াছে ৪৪ হাজার। * নিঃসন্দেহে ইহা অল্পমূল্যে বৃহৎ জয়লাভ। পোল্যাণ্ডের সরকারী ও সমরনেতারা দেশ-ত্যাগ করিয়া রুমানিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ইত্যাদি দেশের আশ্রয় লইলেন। কিন্তু স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য পোল জন-সাধারণের লড়াই থামিল না। জার্মানীর সংহারলীলা সত্ত্বেও (অসংখ্য ইহুদী ও পোল নাগরিক প্রাণ হারাইয়াছে) তারা গুপ্ত আন্দোলন ও গুপ্ত প্রতিরোধের কৌশল অনুসরণ করিতে লাগিল।

পোল্যাণ্ড বাটোয়ারা

কিন্তু পোল্যাণ্ডের শোচনীয় নাটকের এখানেই শেষ নহে। ইহার আর একটি অধ্যায়ও ছিল, যাহা পরবর্তীকালে বৃহৎ ইতিহাসের সৃষ্টি করিয়াছে।

পোল্যাণ্ডে জার্মান যুদ্ধ শেষ হইবার আগেই ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখ সোভিয়েট রাশিয়ার লাল ফৌজ পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করিল এবং বিনা বাধায় অগ্রসর হইল। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে, পোলিশ রাজধানী ও পোল রাষ্ট্রের আর অস্তিত্ব নাই এবং অনতিবিলম্বেই এমন অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে, যাহা দ্বারা সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিপদ সম্ভব। সুতরাং রাশিয়ার পক্ষে আর নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব নহে। এ জন্যই রুশ সৈন্য-দিগকে পোল্যাণ্ডের সীমা অতিক্রম করিতে এবং পশ্চিম উক্রাইন ও পশ্চিম হোয়াইট রাশিয়ার অধিবাসীদের জীবন ও সম্পত্তি নির্বিঘ্ন করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

অবশ্য রাশিয়ার এই ঘোষণা এবং কার্য সেই সময় 'মিত্রপক্ষীয়' মহলে যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। কারণ রুশ-জার্মান চুক্তির গোপন সর্ত তখন জানা ছিল না। এইজন্যই জার্মানী রাশিয়ার এই আকস্মিক আচরণে বিস্মিত হইল না, বরং নিঃশব্দে উহা মানিয়া লইল। ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখ জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে পোল্যাণ্ড বাটোয়ারা সম্পন্ন হইল। পোল্যাণ্ডের ইতিহাসে এই চতুর্থবার পোল্যাণ্ড বিভক্ত হইল। ১৯১৯ সালের কার্জন লাইন অনুযায়ীই এই বিভাগ সম্পন্ন হইল এবং ইহা পূর্বে জারের রাশিয়ারই অন্তর্গত ছিল। পূর্ব পোল্যাণ্ডের অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল হোয়াইট রাশিয়ান, উক্রাইনীয়ান ইত্যাদি। ৩রা নভেম্বর এক গণভোটের দ্বারা জার্মানীর সহিত 'আপোষলব্ধ' ১ কোটি ২০ লক্ষ বাসিন্দাপূর্ণ ৭৫ হাজার বর্গ-মাইল পরিমিত পূর্ব পোল্যাণ্ড সোভি-য়েটের অন্তর্ভুক্ত হইল। বাকি অংশ গেল জার্মানীর দখলে। পূর্বদিকে জার্মান রাজ্য বিস্তারের গতিরোধ এবং হিটলারের

---

* The Second Great War — Vol. I Page 145.

বিরুদ্ধে অগ্রবর্তী ঘাঁটি ও 'রণনৈতিক সীমানা' লাভই ছিল পোল্যান্ড বাঁটোয়ারার পিছনে সোভিয়েট রাশিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য।

কিন্তু বিশুদ্ধ নীতি ও আদর্শের দিক দিয়ে পুঁথিগত বিচারে রাশিয়ার এই কার্য নিশ্চয়ই বিতর্কের সৃষ্টি করিতে পারে। কারণ আন্তর্জাতিক আইনে সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পোল্যান্ড স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল এবং জার্মানী ও রাশিয়াসহ সকল শক্তিবর্গেরই ইহার সঙ্গে চুক্তি, সন্ধি ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। ১৯৩৯ সালের ইউরোপীয় রাজনীতির ঘূর্ণীপাকে জার্মানী ও রাশিয়া পরস্পরের বৈরিতা চাপা দিয়া যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করিল, উহার মধ্যে পোল্যান্ড বাঁটোয়ারা এবং বালটিক রাজ্য সম্পর্কে (একমাত্র লিথুয়ানিয়া ছাড়া) গোপন সর্ত ছিল—একথা গ্রন্থের প্রথম পর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই গোপন সর্ত কেবল যে, রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষরের সময়েই স্থির হইয়াছিল, এমন নহে। প্রায় উহার চারি মাস আগে হইতেই বার্লিন ও মস্কোর মধ্যে পোল্যান্ড বাঁটোয়ারার সম্ভাবনা সম্পর্কে শলাপরামর্শ চলিতে-ছিল। ফরাসী গভর্নমেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশ যে, ১৯৩৯ সালের ২২শে মে তারিখ বার্লিনের ফরাসী রাজদূত মঃ কলোন্দ্রে লিখিয়াছিলেন—

> ".... But in the view of the German Minister for Foreign Affairs the Polish State can not fundamentally have a durable character. Sooner or later it must disappear, partitioned once more between Germany and Russia .... the idea of such a partition is intimately bound with that of a re-approachment between Berlin and Moscow." *

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পোল্যাণ্ডের ভাগ্য বহু পূর্বেই দুইটি বৃহৎ শক্তির মধ্যে নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। রণপণ্ডিত ম্যাক্সভার্নারও তাঁর পুস্তকে ('Battle for the World' —পৃষ্ঠা ৪৯) উল্লেখ করিয়াছেন যে রাশিয়াকে দলে টানিবার জন্য হিটলার পোল্যাণ্ডের অর্ধেক রাশিয়াকে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের কথা আরও স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে ১৯৩৯ সালের ২৪শে অকটোবর ডানজিগে প্রদত্ত রিবেনট্রপের এক বক্তৃতায়। তিনি বলিয়াছিলেন,

> "Russian troops moved forward on the entire front and occupied Polish territory upto the line of demarcation which we had previously agreed upon with Russia.

অর্থাৎ রাশিয়ার সহিত জার্মানীর পূর্বনির্ধারিত সীমানার রেখা অনুসারেই রুশসৈন্যেরা পোলিশ রাজ্যের এলাকা দখল করিয়াছিল। সুতরাং এক হিসেবে উহা

কার্জন লাইন নহে, 'রিবেনট্রপ-মলোটোভ লাইন' বলা যাইতে পারে। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন জার্মানী কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হইবার পর হিটলার সোভিয়েটের বিরুদ্ধে অভিযোগপূর্ণ যে বক্তৃতা দেন, উহাতেও তিনি রাশিয়ার সহিত পোল্যান্ড সম্পর্কে 'একটি বিশেষ চুক্তির' কথা উল্লেখ করেন এবং তাতে জার্মানী ও রাশিয়া কর্তৃক পোল্যান্ড বাঁটোয়ারারই ইঙ্গিত ছিল। *

কাজেই বিশুদ্ধ নীতির দিক দিয়ে ব্যাপারটা সমালোচনা উদ্রেক করিতে পারে বৈকি! আর 'লন্ডনপ্রবাসী' পোলিশ গভর্নমেণ্ট তো সোভিয়েট বিদ্বেষবশত এই উপলক্ষে প্রভূত প্রচারকার্য চালাইলেন। কিন্তু জার্মানীর সামরিক অভিসন্ধি, নাৎসী রাজ্য লিপ্সার মত্ততা এবং হিটলারী আসল উদ্দেশ্যের বাস্তবতার বিচারে রাশিয়ার পক্ষেও এই গোপন চুক্তি ও পারস্পরিক স্বীকৃত বাঁটোয়ারার সুযোগে আত্মরক্ষার জন্য অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

যদিও পোল্যাণ্ড বিভাগের মধ্য দিয়া রাশিয়ার এই রণনৈতিক চাল অনেকেই তখন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তথাপি ইতালীর ডিকটেটর মুসোলিনীর দৃষ্টি ইহা এড়াইতে পারে নাই। তিনি কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই এই সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা ভবিষ্যদ্বাণীর মত ফলিয়াছিল।

হিটলারী কার্যের ফলে রাশিয়া পোল্যাণ্ডে হস্তক্ষেপ করায় ২৫শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) মুসোলিনী মন্তব্য করেন,

> "It is good thing to make use of small person to kill a large one, but it is a mistake to make use of a large one to liquidate a small one.

'একজন ছোটকে দিয়া বড়কে হত্যা করা ভালো, কিন্তু একজন বড়কে দিয়া ছোটকে সংহার করা অত্যন্ত ভুল।' তারপর মুসোলিনীর মনোভাব সম্পর্কে আরও বলা হইয়াছে যে,

> 'He is more than ever convinced that Hitler will regret the day he brought the Russians into the heart of Europe.'

'আগের চেয়েও মুসোলিনীর এক্ষণে নিশ্চিত বিশ্বাস এই হইয়াছে যে, একদা হিটলার সেই দিনটির জন্য আপশোষ করিবেন, যেদিন তিনি রুশদিগকে ইউ-রোপের মর্মকেন্দ্রে ডেকে এনেছিলেন।'*

ক্রমশঃ

---

* 'লন্ডন টাইমস' ও 'স্টেটসম্যান'—তারিখ ২৩।১।৪০

The Great Challenge — by Louis Fisher, Page 31.

* Hutchinson's 'Quarterly Record of the War — Vol. 7. Page 137.

*Ciano's Diary — Page 158

মেলায় যাবার রাস্তা

মায়া বসু

আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যখন এক এক করে পার্কের সবকটা বাচ্চা ছেলে-মেয়ের দল বাড়ি ফিরে গেল, সন্ধ্যাবেলার ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ-ভরা আকাশে একটা একটা করে অনেক তারা ফুটে উঠল, পার্কের রূপসী ঝাঁকড়া গাছগুলোর শাখাপ্রশাখার ওপর সারাদিন সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়ে সদ্যফিরেআসা পাখিদের পাখা-ঝাপটানি আর কিচিরমিচির শোনা গেল, তখন যশোদা অসহিষ্ণু হয়ে আরো একবার চেঁচিয়ে উঠল, 'খোকনবাবু, এবার বাড়ি চল।'

তিলক তখন দোলনায় দুলছিল না। বলও খেলছিল না। মা আর বাবার হাত ধরে বাড়ি ফিরে যাওয়া তার বন্ধু রঞ্জুর দিকে অন্যমনস্কের মত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। রঞ্জুর দুপাশে দুজন। রঞ্জুর দুখানা হাত ওর মা আর বাবার হাতে ধরা। রঞ্জুর কি কথায় ওঁরা দুজনে খুব হেসে হেসে কি যেন বলাবলি করছিলেন। দুরন্ত হাওয়ায় রঞ্জুর চোখেমুখে চুল উড়ে ওকে দারুণ বিব্রত করে তুলেছিল। ওর মা একটু দাঁড়িয়ে হাত দিয়েই ওর চুলগুলো পরিপাটি করে ঠিক ঠাক করে দিলেন। যশোদার কথা শুনে সেই দিকে তাকিয়ে থাকা তিলক তার দৃষ্টি না ফিরিয়েই একগুঁয়ে ছেলের মত চোটপাট করে উঠল, 'না—আমি এখন বাড়ি যাব না।'

'তাহলে তুমি থাক. আমি একলাই বাড়ি চললাম। একগাদা কাজ পড়ে আছে বলে আমার—'

তিলক যশোদার কথায় কান দিল না। কেননা ও ভাল করেই জানে ওকে পার্কে একা রেখে যশোদা কোন মতেই বাড়ি

ফিরতে পারবে না। ও বাড়িতে ওর মত কাজই পড়ে থাক না কেন।

যশোদা ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে এতক্ষণ যার সঙ্গে বকবক করছিল, সেই পাচার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, 'দেখলে তো দিদি, কী রকম জিদি ছেলে? সমস্তটা দিন রাত্তির ওই দুরন্ত ছেলের সব ঝক্কি আমাকে সামলাতে হয়। সব ছেলেপুলে বাড়ি ফিরে গেল, তবু এ ছেলে বাড়ি ফিরে যেতে চায় না, এ কেমন ধারা ছেলে, বল দিকিনি?'

'তা ওর আর দোষ কি বল? যেমন তোমাদের বাড়ির ছিরিছাঁদ, তেমনটাই তো হবে গো। কোন সুখে ঘরে ফিরে যেতে চাইবে, তাই বল? অমন সোনার চাঁদের মত ছেলে, তার কপালে কী হেনস্থা আহারে। যেমন বাপ তেমনি মায়ের ছিরি।'

পাচার মায়ের কথায় যশোদার উৎসাহ আরো খানিকটা বেড়ে গেল। 'যা বলেছ দিদি। যেমন অবুঝ মা, তেমনি বাবা। এক-জন পুব তো আর একজন পশ্চিম। দেখা হলেই দুজনে যেন দুটি ফোঁস কেউটে। এ যত বিষ ঢালে, ও ও তত। যন্তন্না হয়েছে এখন আমার ওই ছেলে নিয়ে। ওইযে কথায় বলে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু-খড়ের প্রাণ যায়। দুজনে ঝগড়া করে মরছেন ওই ছেলে নিয়ে, আর আমার প্রাণ—আঃ কী হচ্ছে খোকন? এখুনি আমার কাপড়খানা ছিঁড়ে যাচ্ছিল।'

'বেশ করব তোমার কাপড় ছিঁড়ে দেব।'

তিলক শাড়ির আঁচল ছেড়ে দিয়ে এক হ্যাঁচকা-টানে যশোদাকে পড়ার মায়ের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে আনলো। 'তখন থেকে বলছি বাড়ি চল, তা না, খালি ওই বুড়োটার সঙ্গে গল্প আর গল্প। এক্ষুনি বাড়ি চল বলছি—'

পা টিপে টিপে তিলক দোতলায় উঠে এলো। অন্য ছেলেদের মত সশব্দে চচীৎকারে মা-মা বলে ডাকতে ডাকতে নয়. সভয়ে সন্তর্পণে। বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ও তাদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিল। 'মা এসেছেন খোকন, তুমি ওপরে যাও। আমি দেখি ঠাকুর মুখপোড়া চা-টা করছে কিনা।' এই কথা বলেই যশোদা রান্নাঘরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন ইচ্ছে না থাকলেও দু-হাত দিয়ে কান চেপে ধরে থাকলেও ওদের কথাবার্তা তিলকের কানে যাবেই। মানুষেরা রেগে গেলে কেন যে এত জোরে জোরে এত বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা বলে!

হাওয়ায় পর্দাটা দুলছিল নড়ছিল। তারি ফাঁক দিয়ে ঘরের জোরালো আলোক-ছটায় ওদের দুজনাকে দেখা যাচ্ছিল। ভবেন আর প্রতিভা মুখোমুখি দুটো সোফায় বসেছিল। প্রতিভার কালো চোখের তারায় জ্বলন্ত আগুনের শিখা দপদপ করছিল। ভবেনের শক্ত চোয়ালে কঠিন মুখে তারি প্রতিচ্ছায়া।

একজনের ক্ষমাহীন ঘৃণা অপর জনের চরমতম বিতৃষ্ণার সোচ্চার প্রকাশ ওদের চোখেমুখের অভিব্যক্তিতে। কণ্ঠস্বরে।

এই মুহূর্তে, যখন ওরা জানে বাড়িতে তিলক নেই, ওদের চক্ষুলজ্জার শেষ আবরণটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সমাজ নয়, সংসার নয়, ঘর নয়, ওরা যেন এই জিরো আওয়ারে এক সুগভীর অরণ্যের মধ্যে, দুটি হিংস্র প্রাণীর মত আদিম প্রতিহিংসা-পরায়ণ মনোভাব নিয়ে, দুজনে দুজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তাদের নখে-দাঁতে শান দিচ্ছে।

ওদের অনেকদিনকার নিঃশব্দ, অসহ্য অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে এখন ওদের দু-পক্ষেরই বিস্ফোরণের পালা চলছে।

জ্বলন্ত সিগারেটটাকে নিষ্ঠুরভাবে অ্যাসট্রেতে পিষে ফেলতে ফেলতে ভবেন তার কথা শেষ করল, 'মনে রেখ সেপারে-শনের এক বছর সময় প্রায় শেষ হয়ে এল। আর মাত্র কটা দিন বাকী।'

'সেকথা আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। হিসেব আমিও রাখি। এ কটা দিন শেষ হলেই আদালতে ডিভোর্সের ডিক্রি চূড়ান্ত হবে। একথা আমার উকীলও আমায় বলেছেন।' প্রতিভার কণ্ঠস্বরেও আগুনের উত্তাপ।

'তোমার উকীল? আ। তোমার সেই পরম হিতৈষী পরামর্শদাতা, রাত নটা-বারোটার সিনেমার সঙ্গী, হোটেলের সঙ্গী প্রবীর দত্তের প্রাণের বন্ধু নরেন উকীল!'

দপদপে চোখ দুটো প্রজ্বলন্ত হয়ে ওঠে। প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত ভুরু দুটো কুঁচকে কপালে কয়েকটা কুটিল রেখা ফুটিয়ে এক রকম চিৎকার করেই প্রতিভা বলে ওঠে 'কী বলতে চাও তুমি? এ কথার মানে?'

'মানে?'

রাগ আর উত্তেজনার পরিবর্তে ভবেনের মুখে কেমন একটা নোংরা হাসির আভাস ফুটে ওঠে। 'এই অতি সাধারণ কথাটার মানে বুঝতে তোমার কষ্ট হচ্ছে প্রতিভা। যাক গে শোনো : এইটুকু শুধু তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই, আমার ছেলে তিলক আমার কাছেই থাকবে।'

'না, তুলতুল আমার কাছেই থাকবে।' মোটা কাঠের গুঁড়ির ভেতর দিয়ে করাত চালানোর মত ঘর ঘরে কর্কশ গলা প্রতিভার। 'আমার ছেলে আমার কাছে, আইনমাফিক মায়ের কাছেই থাকবে। আর একটা কথা শুনে রাখ, মাধবী বিশ্বাসের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা শুধু আমার উকীলই নয়, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবেরা সবাই জানে।'

'তাই নাকি? তবে তুমিও শুনে রাখ প্রতিভা, প্রবীর দত্তের ব্যাপারটাও আর চাপা নেই। ঘরে-বাইরে কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত করেছ তোমরা। তোমার মত একটা নোংরা স্বভাবের স্ত্রীলোকের কাছে আমার একমাত্র ছেলেকে আমি মানুষ হতে দিতে পারব না। তিলকের পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। আইনে বলে মা মাতাল চরিত্রহীন ইরেসপন-সিবল হলে ছেলেকে তার বাপের দায়িত্বেই রাখা হয়। তিলক আমার কাস্টোডিতেই থাকবে।'

কিছুক্ষণ আগেই ভবেনের মুখে যে নোংরা হাসিটা ফুটে উঠেছিল, প্রতিভার মুখে এখন অবিকল তারই নকল। 'চমৎকার! কিন্তু আমি যদি বলি তুলতুল তোমার ছেলে নয়? অন্য কারুর ছেলে? তাহলে?'

'বিশ্বাস করব না। কেননা—' ফের আর একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রচণ্ড টান দিল ভবেন।

তুলতুল কাঠ হয়ে দরজায় দাঁড়িয়েছিল। তুলতুল ভাবছিল, এই মুহূর্তে এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও উধাও হয়ে চলে যাওয়া যায় না?

পর্দাটা সরিয়ে ঘরে ঢোকবার জন্যে হাতখানা বাড়িয়েও ও পর্দা সরাল না। ওর কান্না পাচ্ছিল। মা-বাবার ঝগড়াঝাটির মর্মার্থ বোঝবার মত বয়স বুদ্ধি অথবা ক্ষমতা ওর না থাকলেও ও এটুকু ঠিকই বুঝতে পারছিল, সেই পুরোনো ঝগড়াটাই চলছে এদের, যেটা তাকে কেন্দ্র করেই সাধারণত বেশ কিছুকাল ধরে চলে আসছে। তিলক কার কাছে থাকবে? কোথায় থাকবে? তার মায়ের কাছে না তার বাবার কাছে?

মায়ের জেদ, মায়ের ইচ্ছে, তার কাছে। বাপের জেদ, বাপের ইচ্ছে, তার কাছে।

অথচ ওর তিনজন একসঙ্গে থাকবে না। যেমন আগে ছিল। তিলক তার মা আর বাবা। মায়ের মুখে বাবার মুখে সুখশান্তির হাসি। তুলতুল হবার বছর দুয়েক পর মা একটা চাকরি পেয়েছিল। অশান্তির সূত্রপাত তারপর থেকেই।

তখনো ওরা দুজনে তুলতুলকে চোখে হারাতো। তিলকের একটু অসুখ হলে অস্থির হয়ে উঠত। তুলতুলকে ভালবাসার আদর করার একটা ভয়ংকর রেষারেষি তখন থেকেই ছিল দুজনের মধ্যে। বাবা আদর করে ডাকতো তিলক মা তুলতুল। তুলতুল ছাড়া তুলতুলের সুখশান্তি ছাড়া ওদের দুজনের জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্যই আর ছিল না।

আস্তে আস্তে কী থেকে কী হয়ে গেল। মা-বাবা দুজনেই বদলে গেল। হাসি-খুশীর বদলে ওরা দিনরাত ঝগড়া করতে শুরু করল।

তারপর একদিন মা এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। তুলতুলকে ছেড়ে চলে গেল। যাবার আগে চোখের জল মুছতে মুছতে যশোদার হাত ধরে বলে গেল, উপায় থাকলে আমার তুলতুলকে আমি নিয়েই যেতাম। কিন্তু তার কোন উপায় নেই। সারাটা দিন আমি চাকরি করতে বাইরে থাকব। মেয়েদের হোস্টেলেই এখন থাকতে হবে। কে ওকে দেখবে? তুই পুরোনো লোক, তুই ওকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিস, তুই ওকে দেখিস যশোদা। তুই আছিস বলেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ওখানে থাকতে পারব। সেপারেশনের বছরটা কেটে গেলে আদালতে চূড়ান্ত দরখাস্ত দেব। আমাদের ঝগড়া মেটেনি, মেটবার নয়। আমাদের ছাড়াছাড়ি পাকা হয়ে গেলেই, আদালত মঞ্জুর করলেই, আমি ফ্ল্যাট ভাড়া নেব। তোকে আর তুলতুলকে নিয়ে চলে যাব। যে কটা মাস দেরী আছে, ওকে মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব।

প্রায় এক বছর এমনভাবেই চলছে। প্রতিভার তুলতুল আর ভবেনের তিলককে নিয়ে টাগ অফ ওয়ার। ভবেনের আড়ালে

প্রতিভা তুলতুলকে প্রাণপণে শেখাচ্ছে, জজবাবুর সামনে সে যেন বলে সে তার মায়ের কাছেই থাকবে। বাবাকে সে চায় না।

আবার ভবেনও ঠিক তার উল্টো কথা বোঝাচ্ছে ওকে। তিলক যেন আদালতে এই কথা বলে, বাবা তাকে বেশী ভালবাসে, যত্ন করে। তিলক যেন বলে সে তার বাবার কাছেই থাকতে চায়। মাকে সে চায় না।

ভাগাভাগি?

না ভাগাভাগি চলবে না। সম্পূর্ণভাবে ছেলের দখল চাই। এ তো শুধু স্নেহ ভালবাসা মায়ামমতার কথা নয়। এটা অধিকারবোধের প্রশ্ন। জেদ আর রেষারেষির ব্যাপার। মান অপমানের ব্যাপার।

স্বামী-স্ত্রীর এই প্রচণ্ড মনোমালিন্যের কুৎসিত কলহের মধ্যে, দোটানার মধ্যে তিলক একটা পলকা পেণ্ডুলামের মত দুলছে। তিলক কোথায় থাকবে, কার কাছে থাকবে? মা না বাবার কাছে? এদিক না ওদিক? ওদিক না এদিক?

প্রচণ্ড দুঃখে অভিমানে অসহায় ছেলেটার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, মা চুপ কর, বাবা চুপ কর। তোমরা দুজনেই মন্দ, দুজনেই খারাপ। আমি তোমাদের কারু কাছেই থাকতে চাই না। আমি চলে যাব। তোমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাব। ওই তো পাশের বাড়িতে মিঠুদের ঘরে আলো জ্বলছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার মত ছোট্ট মিঠুকে কাছে বসিয়ে তার মা-বাপ পড়াচ্ছেন গল্প করছেন। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না ওদের? তোমরা রঞ্জুকেও তো চেন। তার মা-বাবা রোজ তার হাত ধরে পার্কে আসেন। রঞ্জু খেলা করে, তাঁরা দুজনে বসে বসে গল্প করেন। সন্ধ্যেবেলা রঞ্জুর খেলা শেষ হলে তার হাত ধরে তাঁরা বাড়ি ফিরে যান। বুলবুল মুনমুন এদের মা-বাবারা কত ভাল। এঁরা ঝগড়া করেন না। ছোট্ট ছেলেকে ফেলে এদের কারু মা বাড়ি ছেড়ে চলে যায় না। তোমরা কেন ওঁদের মত হলে না? তোমরা কেন বোঝ না, তোমাদের কত নিন্দে করে লোকেরা? ঠাকুর যশোদা পচার মা পল্টুর মা—এরা তোমাদের আড়ালে তোমাদের নামে কত বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা বলে। তিলকের বুকের মধ্যে মনের মধ্যে কেমন কেমন করে। গলা আটকে যায়। চোখে জল আসে। ওদের সামনে মাথা উঁচু করে চোখ তুলে দাঁড়াতে কিংবা কথা বলতে লজ্জা। হয় তিলকের। কেন তোমরা এমন কর? কেন কেন তোমরা দুজনে একসঙ্গে ভাল হয়ে আগেকার মত থাকতে পার না? মা, তুমি কেন আমাকে ফেলে চলে গেলে? রাত্তিরবেলা একলা বিছানায় শুয়ে আমার যে ভারী বিচ্ছিরি লাগে—ভয় করে!

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে উপচে-পড়া চোখের জল মুছতে মুছতে তেমনই নিঃশব্দ পায়ে তিলক পাশের ঘরে চলে গেল। জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল পাশের বাড়ির আলোকিত ঘরখানার মধ্যে, যেখানে মিঠু তার বাবার কাছে ক্লাসের পড়া পড়ছে। আর তার মা পাশে বসে কী একটা সেলাই করছেন, বোধহয় মিঠুরই জামাটামা কিছু।

কিছুক্ষণ পরে প্রতিভা ঘরে ঢুকল।

ব্যাগ থেকে ছেলের জন্যে আনা লজেন্স টফি রুমাল মোজা, ছোট খাট দু-একটা খেলনার প্যাকেট বার করে তিলকের হাতে তুলে দিল। ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল, 'আমার সোনা আমার মানিক? তোকে ছেড়ে থাকতে আমার কী কষ্টই যে হয়, তুই কেমন করে বুঝবি? হ্যাঁরে তুলতুল, আমার জন্যে তোর মন কেমন করে না সোনা?'

তুলতুল ঘাড় নাড়ল। 'হ্যাঁ।'

'তুমি যশোদার কাছে লক্ষ্মীসোনা হয়ে চান করছো, খাচ্ছ তো মানিক?'

'হ্যাঁ।' এবারও তুলতুলের সংক্ষিপ্ত উত্তর?

'দুধ খাবার সময় দুষ্টুমি করছো না তো বাবা?'

'না।'

প্রতিভা ওর গালের ওপর নিজের গাল রাখল। 'লক্ষ্মীছেলে! আর কটা দিন পরেই আমি আমার সাতরাজার ধন মানিক আমার তুলতুলকে আমার কাছে নিয়ে যাব। খুব ভাল ইস্কুলে ভর্তি করে দেব। কেমন সোনা?'

তুলতুল মায়ের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে চুপ করে পড়ে রইল।

প্রতিভা ছেলেকে নিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসল।

আগে এই ঘরে, এই ডবল বেডের বিছানায় প্রতিভা আর ভবেন শুতো। তারপর তুলতুল হল। তাকে মাঝখানে রেখে দুজনে দুদিকে। তারপর প্রতিভা এই বিছানা, এই ঘর-সংসার, সব ফেলে অন্য জায়গায় চলে গেল, স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না বলে। ভবেনের প্রেসার বাড়ল। স্লিপিং পিল না খেলে ঘুম হয় না বলে সে পাশের ঘরে তার শোবার ব্যবস্থা করে নিল। এখন এই প্রকাণ্ড খাটের মস্তবড় বিছনাটায় তিলক একলা শোয়। মেঝেতে যশোদা।

ছেলের কানের কাছে মুখ নিয়ে ষড়যন্ত্র করার মত ফিস ফিস গলায় প্রতিভা বলতে লাগল, 'তুলতুল, তুই কাকে বেশী ভালবাসিস বাবা? তোর মাকেই নিশ্চয়। কেন বাসিস না বল? আমি তোর মা, ভালছেলেরা তাদের মাকেই বেশী ভালবাসে। তুই তো আমার ভাল-ছেলে সোনা?'

দাঁতের চাপে চকোলেটটা গুঁড়িয়ে গেল। গলার কাছে আটকে গেল খানিকটা। তিলকের ছোট্ট শরীরটা মায়ের আলিঙ্গনের মধ্যে শক্ত হয়ে উঠল।

মায়ের আদরের এই ভূমিকার অর্থ ওর জানা হয়ে গেছে। ও আরো জানে, ওর মা এর পর ওকে আর কি কি সব কথা বলবে।

'তোর বাবা, তোর কাছে আমার নামে যা-তা নিন্দে করে, না রে তুলতুল?'

'না বলে না।' তুলতুল মায়ের কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সরে বসল।

প্রতিভা একটু হতাশ হল। 'বলে না আবার। নিশ্চয় বলে। ওকে আর আমি চিনি না? তুই না বললেও আমি জানি কী বলে ও। বলে, তিলক, তোর মা খারাপ। তোর মায়ের কাছে খবরদার তুই যাসনি। জজসাহেব জিজ্ঞাসা করলেই তুই স্পষ্ট বলবি, মায়ের কাছে নয়, আমি আমার বাবার কাছেই থাকব! তোর বাপ তোকে এই সব কথাই শেখাচ্ছে। বোঝাচ্ছে।'

স্নেহ নয়, ভালবাসা-মায়া-মমতা-ব্যাকুলতা— কিচ্ছু নয় কিচ্ছু নয়, তিলক তার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হৃদয়ের কোন গভীর স্পর্শই যেন খুঁজে পেল না সেখানে। একদিন তুলতুলকে যে মা প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে ভালবাসতো, সেই পুরোনো মা কোথায় হারিয়ে গেছে। তিলকের মনে হল, তিলক তার ছেলে বলে নয়, তিলককে ভালবাসে বলেও নয়, তার মা যেন শুধু তার বাবার ওপর চরম প্রতিশোধ নেবার জন্যে, তাদের এই দাম্পত্য যুদ্ধে তাকে পরাজিত করে জয়ী হবার জন্যেই তিলককে তার বাবার কাছ থেকে সরিয়ে নিজের কাছে রাখতে চায়।

বাবা রোজ তাকে এসব কথা বলে না। কিন্তু যেদিন যেদিন ওর মা ওকে দেখতে আসে সেদিন বাবা বলবেই। বাবার মনের ছাইচাপা আগুনটাকে তিলকের মা এসে যেন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ভাল করে জ্বালিয়ে দিয়ে যায়।

কে জানে ভবেন আর প্রতিভার এ কী নিষ্ঠুর খেলা?

সব ভালবাসা যখন ফুরিয়ে যায়, সব বিশ্বাস যখন মরে যায়, সব মায়া মমতা যখন শেষ হয়ে যায়, তখন আর কী বাকী থাকে?

বাকী থাকে শুধু ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা।

সেই পুঞ্জীভূত ঘৃণা আর বিতৃষ্ণাটাকে হাতিয়ার করে প্রতিদ্বন্দ্বীর বুকে চরম আঘাত হানবার জন্যেই বুঝি সুসভ্য সমাজের মানুষেরা মরিয়া হয়ে ওঠে?

তাই প্রতিভা বাড়ি থেকে চলে যাবার পর ভবেন তিলকের ঘরে ঢুকতেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে তিলকের মনে হল, এখানে নয়, ওখানেও নয়—অন্য কোথাও, সে যেখানেই হোক, যতদূরেই হোক, এই ঘরবাড়ি ছেড়ে মাকে ছেড়ে বাবাকে ছেড়ে অন্য কোনখানে কি চলে যাওয়া যায় না?

'মা তোমার কাছে এতক্ষন কী বলে গেল তিলক?'

ছেলের হাত থেকে তার মায়ের কিনে দেওয়া 'নার্সারী রাইমের', ভারী সুন্দর ছড়া

তার ছবির বইখানা টেনে নিয়ে টেবিলের ওপর ফেলে ঈষৎ রক্তাভ চোখের দৃষ্টি তিলকের চোখের ওপর রেখে প্রশ্ন করল ভবেন।

বিভ্রান্তভাবে তিলক বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অসহায়ভাবে। বাবার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে—সেই গন্ধটা ওর নাকে এসে লাগল। সেই বিচ্ছিরি ওষুধটা খেয়েছে বাবা। যেটা খাওয়া নিয়ে মায়ের সঙ্গে বাবার প্রায়ই ঝগড়া হত। কথাকাটাকাটি হত।

'আমি জানি প্রতিভা কী বলেছে। কিন্তু তুমি যখন এখন বড় হয়েছ। যে মা তার ছেলের মুখের দিকে না তাকিয়ে নিজের জেদ বজায় রাখতে তেজ দেখিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় কোন ছেলেই তেমন আত্মসর্বস্ব স্বার্থপর নিষ্ঠুর মাকে কখনো ভালবাসতে পারে না। তিলক, তুমি কি তোমার ওই মায়ের কাছে যেতে চাও? তার কাছে থাকতে চাও?'

মাত্র পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ে আর কয়েক মাস বয়সের অসহায় দিশাহারা ভাক্তবিরক্ত-চিত্ত শিশুটির কান্না পাচ্ছিল। চিৎকার করে ওর বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, বাবা মা, আমি আর পারছি না। তোমরা দুজনে আমাকে রেহাই দাও। লালবাড়ির সেই ছেলেটা বাস চাপা পড়ে মরে গিয়েছিল, সেই ছেলেটার মত আমিও একদিন ইচ্ছে করে বাসের তলায় চাপা পড়ব। চাপা পড়ে মরে যাব—মরে যাব—মরে যাব—

'আমি জানি তুমি ওর কাছে যেতে চাও না।' ভবেন এবার আদর করে তিলকের মাথায় পিঠে হাত বোলাতে লাগল। 'তুমি আমার সোনা ছেলে, আমার একমাত্র বংশধর। আমার এই এত বড় বাড়ি, ব্যাঙ্কে জমা টাকাকড়ি শেয়ার সব কিছুই তোর খোকন। তুই আমাকে ছেড়ে যাসনি। তোকে আমি ওর হাতে তুলে দিতে কিছুতেই পারব না।' আদর করতে করতে ভবেন, সত্যি সত্যি, এক্ষুনি যেন তিলক তার মায়ের কাছে চলে যাচ্ছে এই ভয়ে, শক্ত মুঠোয় ওর নরম কচি হাতখানা চেপে ধরল।

তিলক কাঠের পুতুলের মত বসে রইল।

'আর কিছুদিন বাদেই তোকে জজসাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তিনি খুব ভাল মানুষ, খুব দয়ালু। তুই মুখ ফুটে যা বলবি, উনি নিশ্চয় তাই করবেন। খোকন, তুই স্পষ্ট বলবি, তুই তোর মায়ের কাছে থাকতে চাস না। তোর মা আবার হয়তো বিয়ে করবে। তখন তোর কী দশা হবে বল? সেই লোকটা তোকে কিছুতেই ভালবাসতে পারবে না। আর তুইও কি তাকে বাবা বলে ডাকতে পারবি? পারবি না। তোর মা এখন তোকে ভুলিয়ে নিজের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে হাজারটা মিথ্যে কথা বলবে। কিন্তু তিলক, তুই তোর মায়ের কথা বিশ্বাস করিস নি বাবা। আমি জানি, ডিভোর্সের ডিক্রি পেলেই ও সেই রবীন দত্ত বলে স্কাউনড্রেলটাকে বিয়ে করবেই—ওদের হাতে আমি তোকে ছেড়ে দিতে পারব না পারব না, পারব না।

সেদিন অনেক রাত্রে বৃষ্টি পড়ছিল।

জানলায়, দরজায় দেয়ালে এলোমেলো হাওয়ার ঝাপটা প্রচন্ড শব্দ তুলছিল। সেই শব্দে তিলকের ঘুম ভেঙে গেল।

ম্লান নীলাভ নাইট ল্যাম্পের আলোয় ঘরের দেয়ালে ও কয়েকটা ছায়া দেখতে পেল। মাঝে মাঝে মেঘের গুরু গর্জন, উত্তর দিকবার খোলা জানালায় চমকে ওঠা বিদ্যুৎ—স্নেহহীন মমতাহীন এতবড় সাদা বিছানাটায় ও একা—সব মিলিয়ে একটা অশরীরী ভয় ওকে অদৃশ্য দুহাত দিয়ে নিষ্পিষ্ট করতে চাইল। কিছুক্ষণ আগেকার গভীর ঘুমের ঘোরের মধ্যেই। সভয়ে মা-মা বলে চিৎকার করে হাত বাড়াতে গিয়েই ওর আচ্ছন্ন ভাব কেটে গেল। ভুল ভেঙে গেল। প্রায় বছর খানেক মা এই বিছানায় তিলকের কাছে, শোয় না। তিলক ভয় পেলে তাকে জড়িয়েও ধরে না।

তিলকের ইচ্ছে হল একবার বাবা গো বাবা আমার কাছে শোবে এসো বলে চেঁচিয়ে ওঠে! কিন্তু ডাকলেও সাড়া মিলবে না। বাবার ঘরের দরজা বন্ধ। বাইরে ঝোড়ো বাতাস বৃষ্টি মেঘের গর্জন সব মিলিয়ে তুমুল শব্দ। আর তা ছাড়াও বাবা সন্ধ্যেবেলায় সেই বিচ্ছিরি গন্ধওলা ওষুধটা খেয়ে, রাত্তিরবেলা খেয়ে উঠে ঘুমের বড়ি খেয়ে এখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এঘর থেকে গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও বাবার ঘুম ভাঙবে না।

কড় কড় কড়াৎ। গুম্ গুম গুরু গুরু গুম গুম—

মেঘের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে খুব কাছেই কোথাও বাজ পড়ল। আতঙ্কে তিলক চিৎকার করে উঠল 'যশোদাদিদি—এই যশোদাদিদি—আমার ভয় পাচ্ছে—'

তিলকের ভীত আর্ত চিৎকারে কোন ফল হল না।

মেঝের ওপর মাদুর কাঁথা বিছিয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে থাক, যশোদার ঘুম ভাঙল না।

তিলকের ইচ্ছে হল, এই এতবড় বিছানটা থেকে নেমে ও মেঝেতে যশোদার কোলের কাছে ওকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ে। কিন্তু ভয়ে ওর নড়বার শক্তি ছিল না, আর তার ওপর চোখ খুলে যশোদার দিকে তাকিয়ে যশোদার কাছে গিয়ে শোবার মত প্রবৃত্তি আর ওর রইল না।

বাড়ির পেছনের ঝাকড়া নিমগাছটার একটা ডাল সশব্দে ভেঙে পড়ল। কতকগুলো প্যাঁচা শকুন আরও কি কি সব পাখির সম্মিলিত চিৎকার ধারাবর্ষণ, মেঘগর্জন আর হাওয়ার শব্দ একাকার হয়ে তিলকের বুকের মধ্যে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। ওর মনে হল কারা যেন, কাঁদছে, নালিশ জানাচ্ছে। এই আকস্মিক দুর্যোগের জন্যে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

এই বাজ পড়া, মেঘের ডাক—আর বৃষ্টি শাসানো—গভীর রাতে একলা বিছানায় শুয়ে ভীষণ-ভীষণ-ভীষণ ভয় করতে লাগল তিলকের। সেই ভয় আর একাকীত্বের একটা সকরুণ যন্ত্রণায় ওর ছোট্ট শরীরটা কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। পাশবালিশটাকে আঁকড়ে ধরে, প্রাণপণে দুচোখ বন্ধ করে ও ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রইল।

ক্রমে ক্রমে রাত বাড়তে লাগল।

আস্তে আস্তে ঝোড়ো বাতাসের উদ্দাম গতি সংযত হল। মেঘের গুরু গুরু, বৃষ্টি পতনের শব্দও থেমে গেল।

এক সময় তিলকের চোখের জলও ফুরিয়ে গেল। ভয়ও কমে গেল।

কিন্তু তবু ওর দুচোখে ঘুম এলো না।

মা, বাবা, বাড়ির পেছনের বড় বড় গাছ, আগাছা জঙ্গল ভর্তি বাগান পার্ক ফুল পাখি তারা প্রজাপতি কড়িং শালবন মিঠু রঞ্জু পুতুল বুবু তাদের মা বাবাদের কথা মনে পড়তে লাগল ওর।

হঠাৎ মনে পড়ল পানাপুকুরটার কথা। যার অর্ধেক কচুরি পানা অর্ধেক টলটলে জল। বৃষ্টিপড়ার পর সেটা নিশ্চয় এখন টইটুম্বুর হয়ে গেছে।

পুকুরটার ওপর এক ভয়ঙ্কর আকর্ষণ তুলতুলের। ওদের বাড়ি থেকে খুব বেশী নয়। উঁচু সদর রাস্তা থেকে নীচে নাবাল জমিতে। মাঠের মধ্যে। অনেকে সর্টকাট করবার জন্য পুকুর ধারের রাস্তা দিয়ে চলে যায় হাটে বাজারে এখানে ওখানে। তবে সন্ধ্যের পর বেশী লোকজন চলে না। অন্ধকারে কয়েকটা ভাঙ্গা চোরা পুরোনো কবর আছে পুকুরটার পশ্চিম পাড়ে। চারধারেই বড় বড় গাছ গাছালিতে ভর্তি। রাজ্যের আগাছা বুনো ঘাসের জঙ্গল। পা ফেলাই দায়। মাঝখানে সরু একটু পথ, চোখে পড়ে কি না পড়ে।

ওদিকে ওর একলা যাওয়া বারণ।

বিশেষ করে বর্ষাকালে।

মাঝে মাঝে যশোদা কি ঠাকুরের সঙ্গে যায়। সেদিনও ঠাকুরের হাত ধরে সকাল বেলায় গিয়েছিল। দেখে এসেছিল, পুকুরটা জলে ভর্তি হয়ে গেছে। কানায় কানায়। আর দু একবার বৃষ্টি হলেই পুকুরের জল রাস্তায় উপচে পড়বে। মাঠ ঘাট একাকার। সরু পথটুকু জলের তলায় হারিয়ে যাবে।

তখন আর এ পথে চলা যাবে না।

তখন এই মেঠো পথ ছেড়ে লোকজনেরা উঁচু সদর রাস্তায় হাঁটবে।

'পুকুরটা এখন নিশ্চয় বৃষ্টির জলে ভর্তি হয়ে গেছে' এই কথাটা মনে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে তিলকের আর একটা উল্লেখযোগ্য কথা মনে পড়ল। এই পুকুরের ধার দিয়েই সেই মেলায় যাবার রাস্তাটা চলে গেছে। যশোদাদিদি সে রাস্তা দিয়ে ওকে সেই অসম্ভব সুন্দর খেলনা পুতুলে লোকজনে জমজমাট মেলাটায় নিয়ে গিয়েছিল।

মাস কয়েক আগেকার কথা।

একদিন পার্কে যাবার সময় হঠাৎ তিলক জেদ ধরল, 'যশোদা দিদি, পুকুর দেখব। আমায় নিয়ে চল না।'

যশোদা দুচোখ কপালে তুলে গালে হাত দিয়ে রীতিমত আতঙ্কিত গলায় বলেছিল, 'ও মা গো! এ ছেলে বলে কি! আজ না অমাবস্যি? অমাবস্যি তিথির ভর সন্ধের কবরখানার পাশে যেতে আছে কখনো? অমন বায়না কোরনি বাছা।'

'কেন? গেলে কী হয়?'

'কী হয়?' যশোদা চোখ কু'চকে মুখখানাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করেছিল। 'কী হয় শুনলে বাবু তুমি ভয় পাবে। তোমার মা আমারে পই পই করে বারণ করে গেছে। তার ছেলের কাছে যেন আমি ভূত-পেত্নী বেমভোদাত্যি মামদোর গপ্পো না বলি। তা আমার কী দায় বাছা বল, এসব অলুক্ষুনে গপ্পো বলার।'

'কেন গল্প বললে কী হয়।' তিলকের জেদ সমান।

'বাবারে বাবা। এ ছেলের খালি কী হয় কী হয়। মা বলেছিলেন, ভূত-পেত্নীর গপ্পো ছোট ছেলেদের শুনতে নেই। শুনলে তারা ভীতু হয়ে যায়। বুঝলে খোকন।'

'আমি ভয় পাই না। যশোদাদিদি, তুমি আমাকে পুকুরধারে নিয়ে চল। তোমাকে আমি অ্যাত্তোটা চকোলেট দেব।'

তিলকের অনুনয়-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে যশোদার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। আহা রে! এমন চাঁদের মত ছেলে লোকে ত তপস্যা করে কেলে পায় না গো। কেমন করে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে এমন ছেলেকে ফেলে চলে গেল এর মা? লেখাপড়া জানা চাকরে মেয়েদের মনের ভাব বোঝা বড় দায়। ওদের মনে অপমান জ্ঞানটা বড্ড বেশী। অত লেখাপড়া যদি না শিখতো, ভাল মাইনের চাকরিটা যদি না পেত, তবে দেখা যেত কত ধানে কত চাল। দুম করে ঘর-সংসার ফেলে গিন্নি কোন চুলোয় যেত দেখি? এখানেই পড়ে থাকতে হত ঘর-সংসার ছেলে আঁকড়ে।

তিলকের মুখের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর সবকটা লেখাপড়া জানা চাকরে মেয়েদের ওপর ঘেন্না ধরে গেল যশোদার। নিজের ছেলেপুলে হয়নি, অল্প বয়সেই বিধবা হয়েছিল। কিন্তু বোনঝিটাকে মানুষ করেছিল। ভালই বিয়ে হয়েছে তার। জামাই কাজ করে কোন একটা প্লাস্টিকের কারখানায়। তাদের বড় মেয়েটাকে তারা স্কুলে দিয়েছে। যশোদা মনে মনে স্থির করল, বোনঝিকে একখানা চিঠি লিখে দেবে। মেয়েটাকে বেশীদূর অবধি যেন লেখাপড়া না শেখায় তার মা-বাবা। তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেয়।

মুখ্যসুখ্য যশোদা অতশত বোঝে না। এইটুকু বোঝে, মা হয়ে ছেলের মনে কষ্ট দিতে নেই। ছেলেটার মা থেকেও নেই। বাপ আর কতটুকু সময় দেখে? সমস্ত দিন অফিস। তারপর এক-একদিন অনেক রাত করে ফেরে। বাড়িতে থাকলেই বা কি? মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকে। মনে সুখ-শান্তি না থাকলে মা হারা ছেলেটা দিন-রাত একা-একা থাকে। কষ্ট পায়। লুকিয়ে কাঁদেও। ওর মা-বাবা আদালত-উকীল মামলা-মোকদ্দমায় তালেই আছে। ছেলের মনের খবর নেবার মত মনও বোধহয় ওদের আর নেই।

ধারে কাছে কেউ নেই। তবু যশোদা চাপা গলায় বলল, 'খোকন তোমাকে পার্কে যাবার সময় পুকুরটা দেখিয়ে নে যাবখন। আর কারুরে যদি না বল তবে তোমারে একটা খুব ভাল যায়গায় নে যাব। বিকেলে পার্কে যাবার নাম করে একটু বেলাবেলি বাড়ী থেকে বেরুব দুজনে। তারপর সন্ধ্যে উৎরে গেলি ফিরে আসব। খবন্দার খোকন, ঠাকুর মুখপোড়ারে বল না যেন। ও মা কি বাবুরে বলে দিলি মুশকিল হয়ে যাবে। তোমারেও বকবে আমারে তো একেবারে খেয়ে ফেলবে।'

'ঠাকুরটা খুব খারাপ, ওকে আমি কিছু বলব না। যশোদাদিদি বল না কোন জায়গায় আমাকে নিয়ে যাবে? কবে নিয়ে যাবে? আজ? কাল?' অশান্ত কৌতূহলে তিলক যশোদার শাড়ির আঁচল চেপে ধরল।

'আজ না খোকন, কাল। ওই পুকুর ধারের রাস্তা পেরিয়ে বড় মাঠটা পেরিয়ে অনেকটা হাঁটতে হবে। তারপরও অনেকটা পথ। গ্রামের নাম নরেন্দরপুর। কিন্তু তুমি হাঁটতে পারবে তো? উ'হু, পারবে না। আচ্ছা একটা রেসকা গাড়িই না হয় নেব অখন ওই মোড়ের রাস্তা থেকে। কতই আর নেবে বল? একটা গোটা টাকাই নিক। না হয় আরো আট আনা। তার বেশী তো আর নয়?

'আমার কাছে টাকা আছে। একটা দুটো তিনটে চারটে। আমি তোমায় টাকা দেব। যশোদাদিদি, বল না আমাকে, সে জায়গাটা কোথায়?'

অসহিষ্ণু তিলকের ছটফটানি দেখে সস্নেহে হাসল যশোদা, 'মেলায় খ নে। যখন যখন বারব্রত পার্বণ হয়, তখুনি সেখানে মেলা বসে। একটা পেরকাণ্ড বটগাছ আছে। তার তলাতে বুড়োশিবের মন্দির। পত্যেক মাসের সংক্রান্তির দিনও সেখানে মেলা বসে। বউরুপীরা সাজের খেলা দেখায়। ছোটদের বড়দের জন্যি নাগরদোলা ঘোরে। কত পাখি কত গাছপালা বিকিকির হয়। ধামা কুলো চুপড়ী থেকে সুরু করে কড়া হাঁড়ি হাতা-খুন্তি বঁটি কাটারী—যা চাও তুমি, তাই পাবে। আমার বোনঝিটা কবে থেকে বলেছিল, মাসি আমার জন্যি তুমি একটা নারকেল কুরানী এনো মেলা থেকে। তা যাওয়া আর হয়ে ওঠে কই বল? রাতদিন তোমারে সামলাতেই আমার প্রাণ যায়। কাল পচার মা নেত্য মোহিনী ওরা সবাই যাবে। তাই ভাবতিছি আমিও যাব। তা তুমি যদি কাউরে বলে-টলে না দাও তো তোমারেও নে যেতে পারি।'

'বলছি না, কাউকে বলব না? খালি খালি তোমার এক কথা। তুমি যে সেদিন দুপুরবেলা আমাকে একলা বাড়িতে রেখে তোমার বোনঝির বাড়ি গিয়েছিলে, আমি কি সেকথা কাউকে বলেছি? যে কথা বলতে বারণ করে দাও, সেকথা কি আমি বলি? তুমি ঠিক ঠিক কালকে আমাকে সেই মেলায় নিয়ে যাবে, কেমন যশোদা-দিদি?

যশোদা তার কথা রেখেছিল।

ঝোপঝুপাড়ি ভরা বুনো ঘাস আগাছায় জঙ্গল ভরা সরু পথটা পেরিয়ে, পুকুরধার দিয়ে মস্ত বড় মাঠ পেরিয়ে অনেক দূর হে'টে এক সময় ওরা মেলায় গিয়ে পেশছেছিল। মস্ত বড় বটগাছটা দেখে তিলক অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারি তলায় শিবমন্দিরের ঠাকুরকে প্রণাম করেছিল। মন্দিরের চত্বরে ছাই-ভস্ম মাখা, রুদ্রাক্ষের মালা গলায় কজন সাধুকে দেখে বিস্মিত হয়েছিল। একটু ভয়ও পেয়েছিল।

মেলায় কত মানুষ! ছোট ছেলেমেয়ের দল, মাঝারি, বুড়ো-বুড়ির দল কত মানুষই এসেছিল। নাগরদোলাগুলো বন-বন করে ঘুরছিল। মেরী গো রাউণ্ডে বাচ্চারা বন-বন করে পাক খাচ্ছিল। তিলকের মত, তিলকের চেয়ে ছোট, বড় কত ছেলেমেয়ে হাসি-খুশীর পুতুল হয়ে রং-বেরং-এর জামা-জুতো পরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এটা-ওটা কিনছিল। তেলে-ভাজা পাঁপড় ভাজা জিলিপি কিনে খাচ্ছিল তাদের মা-বাবা সঙ্গি-সাথীর সঙ্গে।

তিলকও যশোদার হাত ধরে মনের আনন্দে মেলার মধ্যে ঘুরে ঘুরে সব দেখে দেখে বেড়াচ্ছিল। যশোদা ওকে গরম গরম বেগুনি জিলিপি আর পাঁপড়ভাজা কিনে দিয়েছিল। কী সুন্দর জায়গা! কী ভালই না লাগছিল তিলকের। বাড়ি ফিরে আসতে ইচ্ছে করছিল না। তার ইচ্ছে হচ্ছিল, যে ছেলেটা মস্ত বড় জালের খাঁচা ভর্তি করে মেলায় পাখি বিক্রি করতে এসেছিল তার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূরে সেই বনের মধ্যে চলে যায়।

'বাড়ি চল খোকনবাবু, বাড়ি চল। রাত হয়ে যাচ্ছে।' যশোদার অনবরত তাগাদায় আর বকাবকিতে কান দিচ্ছিল না তিলক।

কখনো ওকে বকছিল, কখনো বা অনুনয়-বিনয় কাকুতি-মিনতি করছিল।

তারপর এক রকম জোর করেই ওকে বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছিল।

তিলকের হঠাৎ মনে পড়ল কাল না পরশু না কি তার পরের দিন রথ। সেই সুন্দর মন্দিরটার চারদিকে আবার মেলা বসবে। লোকজন আলো গাছপালা পাখির মেলা। সাধু-সন্ন্যাসীর দল। নাগরদোলা মেরী গো রাউন্ড। খেলনা পুতুলের দোকান। কত রকম খাবার আর তেলে-ভাজার দোকান। তার মত কত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। কত হাসি কত আনন্দ। তিলক-দের এই বাড়িটা খুব বিচ্ছিরি। এখানে হাসি নেই গল্প নেই। শুধু ঝগড়া আর ঝগড়া। একদণ্ডও এ বাড়ি থাকতে আর ভাল লাগে না তিলকের। যদি উপায় থাকত, তিলক প্রত্যেক দিন ওই মেলায় গিয়ে বসে থাকত।

এতক্ষণে তিলকের মন শান্ত। ভয় নেই ভাবনা নেই। এখন তার মন জুড়ে মেলায় যাবার চিন্তা।

যশোদা কবে তাকে মেলায় নিয়ে যাবে, কেই কথাটা চিন্তা করতে করতে তিলক অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ল।

কটা দিন বাদে যশোদা যখন তিলককে সাজিয়ে নিয়ে মেলায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল ঠিক সেই সময় প্রতিভা বাড়ি ঢুকল।

আর আশ্চর্য! আজ আর মাকে দেখে এতটুকু আনন্দ হল না তিলকের। এতটুকু হাসি ফুটল না ওর মুখে।

বরং অদ্ভুত একটা বিতৃষ্ণায় ওর সমস্ত মনটা বিষিয়ে উঠল। ইচ্ছে হল মাকে চিৎকার করে বলে, তুমি চলে যাও। যেখানে ছিলে, সেখানেই থাকো গে যাও। তুমি এলে এখন আর আমার একটুও ভাল লাগে না। এখন বাবা অফিস থেকে আসবে। তোমরা দুজনে সেই পুরোনো ঝগড়া, যা শুনে শুনে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি, তোমাদের ওপর আমার সবটুকু ভালবাসা মুছে যাচ্ছে, সেই ঝগড়া শুরু করবে তোমরা। আমাকে নিয়ে তোমাদের সেই দড়ি টানাটানি খেলা। তার চেয়ে আমাকে কেটে দু-টুকরো করে তোমরা দুজনে নিলেই তো পার মা! আমিও বাঁচি। তোমরাও বাঁচ। তোমাদের ঝগড়াও মেটে।

সেই পুরোনো দিনগুলোর পুনরাবৃত্তি। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর। ছেলে ঠিকমত পড়ছে কিনা খাচ্ছে কিনা, বেড়াচ্ছে কিনা সব খোঁজ নেওয়া। ছেলের জন্য কিনে আনা দু-একটা টুকিটাকি জিনিস চকোলেট লজেন্স টফি। লেবু কি আপেল। পড়ার বই কি খেলনা।

আর তার পরই সেই আসল কথা টেনে আনা।

'তুলতুল, মনে আছে তো, জজবাবুর কাছে কি বলতে হবে?'

কিছু মনে না থাকলেও তুলতুল ঘাড় নাড়ল, কলের পুতুলের মত। 'সব মনে আছে।'

ছেলের গোমড়া নিরানন্দ মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতিভার সন্দেহ হল। 'বল তো কি বলবি?'

তিলক চুপ।

'সব ভুলে গেছিস? তা তো ভুলে যাবিই। বাপের কাছ থেকে তালিম পেয়ে পেয়ে কি আর মায়ের কথা মনে থাকে কখনো?'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল তিলক।

আবার সেই এক কথা। সেই তীক্ষ্ণধার তলোয়ারের ঝিকিমিকি প্রাণান্তকর খেলা। তিলকের ইচ্ছে হল মায়ের মুখের ওপর চিৎকার করে বলে ওঠে, ভাল লাগে না, ভাল লাগে না আমার তোমাদের ওই সব কথা শুনতে। তোমাকে দেখতেও আমার ইচ্ছে করে না। কেন তুমি আজ এলে? তুমি চলে যাও—আমি মেলায় যাব। সেখানে তুমিও নেই। বাবাও নেই। ঝগড়াঝাঁটিও নেই।

প্রতিভা ছেলের অন্ধকার থমথমে মুখ দেখে কি ভাবল কে জানে। গলাটা নরম করে ওর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে কোমল কণ্ঠে বলল, 'তুলতুল, সোনা আমার, মানিক আমার, আমি তোকে যা বলি, তোর ভালর জন্যেই বলি। তুই ভাবছিস আমার কাছে না গিয়ে তুই তোর বাবার কাছে, এখানে খুব ভাল থাকবি? মোটেও না। দুদিন বাদে তোর সৎমা এসে হাজির হবে। এই বাড়ি, এই ঘর-সংসার সব দখল করে বসবে। তখন তোর কী দুর্দশা হবে জানিস? তুই ছোট ছেলে, তোর অত বুদ্ধি নেই...'

মায়ের একটানা বাক্যস্রোতের মধ্যে দিশাহারার মত ভেসে যেতে যেতেও তিলকের মনে পড়ল তার বাবার কথা। সেদিনও ঠিক এই ধরনের কথাগুলো বাবা বলেছিল না? তোর মা তোকে ভালবাসবে? দেখবে? কিছুতেই না। তোর মা আবার একটা বিয়ে করবেই। তখন তোর কী দশা হবে বল? সেই লোকটা তোকে কিছুতেই ভালবাসতে পারবে না। আর তুই? তুইও তাকে বাবা বলে ডাকতে পারবি তিলক? পারবি না। তোর মা এখন তোকে ভুলিয়ে নিজের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে তোর কাছে হাজারটা মিথ্যে কথা বলবে। কিন্তু তিলক, তুই তোর মায়ের কথা বিশ্বাস করিসনি বাবা। সামান্য কারণে যে মা তার ছেলেকে ফেলে রেখে চলে যায়—

'বাঃ চমৎকার। আসতে না আসতেই বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই ছেলেটাকে তালিম দেওয়া শুরু হয়ে গেছে দেখছি!'

প্রতিভা আর তিলক দুজনে একসঙ্গে চমকে উঠে ফিরে তাকাল, দরজায় অবেন। ওর সন্দিগ্ধ চোখেমুখে বিদ্রূপের বিদ্বেষের কুটিল ছায়া।

'আমি আর কতটুকু তালিম দিতে পারি?'

তিলককে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সমস্ত শরীরে শাণিত তলোয়ারের ক্ষিপ্রতা তীক্ষ্ণতা নিয়ে অবেনের মুখোমুখি উঠে দাঁড়াল প্রতিভা।

'কতটুকু সময় আর আমি ওকে কাছে পাই? তালিম যা দেবার শিক্ষা যা দেবার, সে তো তুমি এই বছরখানেক ধরেই ওকে ভাল করেই এবেলা ওবেলা দিচ্ছ। তা না হলে নিজের মার সঙ্গে ভাল করে দুটো কথাও বলে না? জবাব দেয় না? আমি এলে খুশীও হয় না? ও তো এমন ছিল না। এই এক বছর ধরে, আমি চলে যাবার পর তুমিই আমার ছেলেটাকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছ।'

'আমি ওকে নষ্ট করিনি। বরং এই এক বছর তোমার কাছ থেকে দূরে ছিল বলেই ও নষ্ট হতে পারেনি। ও মাকে ভাল করেই চিনতে পেরেছে। সেই জন্যেই তোমার সাহচর্য সান্নিধ্য আর ও চায় না। দয়া করে ওকে তুমি রেহাই দাও। পাখি পড়া করে শেখালেও আর তোমার কোন লাভ হবে না। তোমার কাছে ও যাবে না। তোমার মত হীন চরিত্রের একটা স্ত্রীলোককে মা বলে ডাকতেও ওর ঘেন্না করবে।'

'আমার চরিত্র খারাপ! আমাকে মা বলে ডাকতে ওর ঘেন্না করবে। আর তুমি? গঙ্গা জলে ধোয়া তুলসীপাতা! স্বর্গ থেকে নেমে এসেছ? লজ্জা করে না একথা বলতে? আজ না হয় ও ছোট আছে, জ্ঞানবুদ্ধি হয়নি, কিন্তু কদিন পরেই মাধবী বিশ্বাসের সঙ্গে তোমার মধুর সম্পর্কের মানে ও ভাল করেই বুঝতে পারবে। আর বুঝতে পেরে তোমাকে একটা স্বর্গের দেবতা বলে ফুলচন্দন দিয়ে নিশ্চয় পুজো করবে না।'

কথা নয়তো, যেন কতকগুলো তীক্ষ্ণ পাথরের টুকরো প্রতিভা অবেনের মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল।

'ফুলচন্দন দিয়ে আমাকে ঠাকুর পুজো না করুক, ছেলেরা তাদের বাবাকে যেমন ভালবাসে, তেমন করেই তিলক আমাকে ভালবাসবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। একটা বাইরের লোককে বাবা বলে ডাকতে ও রাজী হবে না।'

প্রতিভার পিঙ্গল চোখের তারা ঘৃণার আগুনে ঝলসে উঠল, 'বেশ তো সেকথা ওর মুখ থেকেই শুনি। ওকেই জিজ্ঞাসা করা যাক সামনা সামনি। তুলতুল, এই তুলতুল—,

বিহ্বল বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে একবার মা আর একবার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে-থাকা তিলকের হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে দুজনের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে প্রতিভা ধারালো গলায় ধমকে উঠল, 'বল, তুই সত্যি করে বল, আমাকে মা বলে ডাকতে তোর ঘেন্না হয়? তুই আমার কাছে থাকতে চাস না? আমাকে তুই ভালবাসিস না? বল, ওই মিথ্যেবাদী লোকটার সামনে আমার গা ছুঁয়ে বল ওর কথা সত্যি না মিথ্যে?'

যত জোরে ওকে কাছে টেনেছিল প্রতিভা, তার চেয়ে অনেক বেশী জোরে হ্যাঁচকা টান মেরে মায়ের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তীক্ষ্ন গলায় চেঁচিয়ে উঠল তিলক, 'না—না—না, আমি তোমাদের কাউকে ভালবাসি না—তোমাকেও না বাবাকেও না। আমি তোমাদের কারু কাছে থাকব না। তোমরা দুজনেই খারাপ—খুব খারাপ।'

পর মুহূর্তে ঝড়ের মত তিলক স্তম্ভিত হতচকিত বিমূঢ় দুটি নরনারীকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে রেখে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল।

* • *

ফোঁপাতে ফোঁপাতে, দু-হাতে চোখের জল মুছতে মুছতে তিলক শোবার ঘরের জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। ঝাপসা চোখে তাকাল আকাশের দিকে।

সেখানে ছেঁড়া ছেঁড়া কালো মেঘ আস্তে আস্তে এক হয়ে যাচ্ছে। এখনি বৃষ্টি আসবে। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। থেকে থেকে গুর গুর গুম গুম শব্দে মেঘ ডাকছে। হাওয়ায় ঝড়ের বেগ।

আর সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওঘরে ফের সুরু হয়েছে সেই নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব। কে হারবে কে জিতবে, তারি নির্মম প্রতিযোগিতা। তবে এবার ওদের গলার স্বর কেমন যেন। অন্য রকমের। তেমন জোর নেই। যেন ওরা যে খেলা খেলতে বসেছিল, সে খেলায় ওরা দুজনেই হেরে গেছে। দুজনেই এখন ভুগতে বসেছে। ভবেনের বড় আদরের তিলক, প্রতিভার ভালবাসার ধন তুলতুল ওদের দুজনের সঙ্গেই যেন চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ওরা দুজনে কল্পনাও করতে পারছে না এতদিন ধরে এত শেখানো পড়ানোর পরও একটা ছ'বছরের বাচ্চা ছেলে ওদের মুখের ওপরে কেমন করে এত বড় একটা ভয়ংকর অপমানের কথা বলতে পারল।

নির্জন ঘরে দাঁড়িয়ে তিলকের মনে হল, ঘর নয়, ও যেন একটা অন্ধকার নির্জন মাঠের মধ্যে একলা দাঁড়িয়ে আছে। ওর কেউ নেই। কোথাও যাবার জায়গা নেই।

মাথার মধ্যে কেমন করে উঠল তিলকের।

হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত রুগীর মত দাঁতে দাঁত চেপে দু-হাত মুঠো করে ও বলতে চাইল, থাকব না থাকব না থাকব না। চলে যাব— চলে যাব—চলে যাব। এই বিচ্ছিরি পচাগলা বাড়ি ছেড়ে খুব বিচ্ছিরি খুব খারাপ মা-বাবাকে ছেড়ে আমি অন্য কোথাও পালিয়ে যাব। আর কখনো এখানে ফিরে আসব না।

কথাটা বিড় বিড় করে উচ্চারণ করায় সঙ্গে সঙ্গেই তিলক মন স্থির করে ফেলল। মেলায় গিয়ে নাকি ভিড়ের মধ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হারিয়ে যায়। যশোদা বলছিল। এমন নাকি অনেক হয়েছে। ভাল ভাল ছোট ছোট ছেলেদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। মেলা দেখতে গিয়ে নাকি তার মাঝেই হারিয়ে যায়। বাড়ি ফিরে আসে না।

কে জানে তারা বোধহয় ইচ্ছে করেই হারিয়ে যায়!

কে জানে তারা বোধহয় তিলকের মত এমন কষ্টের মধ্যে যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। বাড়িতে থাকতে না পেরে তারা মেলায় গিয়ে, যেখানে খুশী, যার সঙ্গে খুশী, চলে গেছে। পালিয়ে গেছে।

তিলক মনস্থির করল। মেলাতেই চলে যাবে ও। সেখানে গিয়ে ও হারিয়ে যাবে। সেই বহুরূপীটার পেছনে পেছনে অথবা সেই পাখিওলাটার সঙ্গে সঙ্গে এদেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাবে। অথবা সেই সাধুদের সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে হিমালয় পাহাড়ে। যশোদা বলছিল, মস্তবড় সাধুসন্ন্যেসী ও'রা। হিমালয় পাহাড়ের গুহায় বসে বসে তপিস্যি করেন। খুব সুন্দর জায়গা।

ওঘরে দুজনে দুজনের ওপর দোষারোপ করছিল এতক্ষণ। তিলক কার দোষে কার শিক্ষায় এমন অসভ্য হয়ে গেছে, তাই নিয়ে জোর তর্কাতর্কি চলছিল। বোধহয় তারি মীমাংসা করার জন্যে দুজনেই ছেলেকে ডাকল।

ভবেন ডাকল, 'তিলক এ ঘরে শুনে যাও।'
প্রতিভা ডাকল, 'তুলতুল এ ঘরে এসো। শিগ্‌গির এ ঘরে এসো বলছি।'

তিলক দিশাহারার মত ও ঘরের দিকে তাকাল। তারপর খোলা দরজা দিয়ে ছুটে নেমে গেল বাড়ির বাইরে।

পেছনে আবার দুজনের ডাক ভেসে এলো, 'তিলক—তুলতুল—এদিকে এসো। বড় অবাধ্য হয়েছ তুমি।'

বৃষ্টি সুরু হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াও। এই সমস্ত শব্দের সঙ্গে ভবেন আর প্রতিভার মিলিত কণ্ঠস্বর—এক হয়ে মিলিয়ে গিয়ে একটা বুক কাঁপানো হাড় কাঁপানো ভয় তিলককে অন্ধকারের মধ্যে তাড়িয়ে নিয়ে চলল।

সেই ভয়ঙ্কর—মর্মান্তিক মুহূর্তে ও ভুলে গেল যশোদার কথা। বর্ষাকাল পড়ে গেছে গো খোকনবাবু, মাঠের মাঝ দিয়ে আলকাপ রাস্তা দে আজ আর মেলায় যাওয়া যাবেনি। পচার মা বলছিল বিষ্টির জল জমে আছে। তা না হয় একটু বেশী হাঁটতে হবে, আমরা আজ সদর রাস্তা দিয়েই যাবখনি।'

সেই সোজা মানুষজন চলে যাওয়া, গাড়ি চলে যাওয়া সদর রাস্তা ছেড়ে ও অশ্বের মত ছুটতে লাগল পুকুর ধারের সেই মেঠো পথ দিয়ে। যে চেনা পথটা দিয়ে ও কিছুদিন আগেই যশোদার সঙ্গে সেই সুন্দর মেলাটায় গিয়েছিল। যেখানে অনেক হাসি-খুশী মানুষজন। ম্যাজিক নাগরদোলা—খেলা খাবারের দোকান।

পাখিওয়ালা, বাঁশীওয়ালা, বহুরূপী প্রকাণ্ড বটগাছটা, তারি তলায় শিবমন্দিরের চত্বরে বসে-থাকা ছাইভস্ম মাখা সাধু-সন্ন্যাসী, খেলনা পুতুলের, তেলেভাজার খাবারের দোকান, লাল নীল হলদে সবুজ নানা রংয়ের জামাপরা তিলকের মত ছোট ছোট হাসিখুশি ছেলেমেয়ের দল—তাদের বাবা-মায়েরা—

যেখানে আজ অনেক লোক বাজনা বাজিয়ে জগন্নাথের রথ টানবে। জয় জগন্নাথের জয় এই কথা চিৎকার করে বলে। দড়ি ধরে ধরে।

বৃষ্টির ফোঁটার অবিশ্রান্ত পতনে বৃত্তাকারে কাঁপতে থাকা পুকুরটার জলে হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আলোড়ন উঠল।

গোটাকতক বড় বড় ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ল।

একটা দমবন্ধ হয়ে আসা আর্ত চিৎকার বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল, যশোদা দি দি ই—ই—ই...

কিন্তু সেই অসহায় করুণ কাতর শিশুকণ্ঠের আর্তনাদ কারু কানে পৌঁছল না।

দ্বিতীয় ঋতুর প্রবল বর্ষণের ঝোড়ো হাওয়ার শব্দের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাওয়া সেই অস্ফুট হাহাকারটুকু অন্ধকার আকাশময়, অন্ধকার প্রান্তরময় ছড়িয়ে পড়ল।

বর্ষার জলে সতেজ হয়ে বেড়ে ওঠা বুনো ঘাস, আগাছার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মেলায় যাবার সরু মেঠো পথটা টইটুম্বুর পুকুরটার উপচে-ওঠা কূল ছাপানো জলের তলায় একেবারে হারিয়ে গিয়েছিল।

মন্মথদেব রায়

।।গোবিন্দ দাস।।

আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে এক সন্ধ্যায় াচ্ছিলাম বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। ানবাহনের চাপ অত্যধিক থাকায় আমাদের াসটা থামল। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে ল এক বাউল গানের সুর। কী সুন্দর লা! আমার ঔৎসুক্য এ ব্যাপারে বেশী। াই বাস থেকে নেমে পড়ে ঐ গানের ুরকে অনুসরণ করে গিয়ে দেখি ঘরোয়া িবেশে এক বাউল সম্প্রদায় গান াইছে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান ুনছিলাম। দলের একজনের গলা এত ুন্দর যে গান শুনতে শুনতে আমি ন্ময় হয়ে গেলাম। ঐদিনের অনুষ্ঠান খন শেষ হলো তখন রাত প্রায় ন'টা। ন্ময়তা ভাঙলে আমি এগিয়ে গেলাম ুরেলা কন্ঠের অধিকারী ঐ গায়কের াছে। গিয়ে জানতে পারলাম যে তিনি ঐ লের নেতা। নাম বললেন গোবিন্দ দাস। ন্ম মেদিনীপুর জেলার গমুখপোতা ামে। বর্তমান বয়েস ৪৬ বছর।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা, াপনার নিশ্চয়ই কোন গুরু আছেন?' ত্তরে গোবিন্দবাবু বললেন, 'আমার ুরুর নাম 'কালাচাঁদ অধিকারী। আমার খন ১৪।১৫ বছর বয়েস। একদিন ামাদের গ্রামে এক তরজা গানের াসরে আমি গান শুনতে যাই। ' আসরেই গুরুদেবের সঙ্গে আমার েখা ও পরিচয়। আমি গাইতে পারি ুনে তিনি আমায় গান গাইতে বলেন। ামি তখন তাঁর সামনে গান গাইলাম। তিনি আমার কন্ঠস্বর শুনে মুগ্ধ হয়েই ামার দীক্ষা দেন। ঐ দিনটি আমার ীবনের স্মরণীয় দিন।' গুরুর প্রতি াবিন্দ দাসের কী অপরিসীম শ্রদ্ধা! থা প্রসঙ্গে আমি আবার ওর অতীত তিহাস জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, ামার বয়েস যখন ২২ বছর তখন বাউল ঙ্গীত সাধনায় পুরোপুরি মেতে উঠি। ধু সাধনা-ই করে চলেছি, কিন্তু েখলাম শুধু গান গেয়ে সংসার চালানো ম্ভব নয়। কারণ আমার সংসারে রয়েছে াছেন আমার স্ত্রী, এক পুত্র ও এক ন্যা। আমি চাকরীর সন্ধানে বেরুতে বাধ্য হই। ১৯৪৫ সালে আমি কাজের সন্ধানে প্রথম কলকাতায় আসি এবং এক কার্ডবোর্ডের কারখানায় দিনমজুরের কাজে যোগ দিই। কিন্তু ঐ কাজে মন বসলো না, তাই ২।৩ বছর পরে ঐ কাজ ছেড়ে এক বাল্‌তি তৈরীর কারখানায় কাজ নিলাম। কিন্তু বছর দুই কাজ করে দেখলাম যে চাকরী আমার জন্যে নয়। আমার ভিতরের শিল্পী যেন বিদ্রোহ করতে আরম্ভ করলো; আমি আর ঐ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছিলাম না। আবার চাকরী ছাড়লাম। এবার কিন্তু বাউল গায়ক হিসেবে যোগ দিলাম এক বিখ্যাত যাত্রা দলে। সত্যম্বর অপেরাতেও কিছুদিন ছিলাম। কিন্তু কোন কিছুতেই যেন আমার শিল্পীমন সায় দিতে পারছিল না,—স্বাধীন হয়ে কাজ করার ক্ষমতা যেন শেষ হয়ে আসছিল।'

এই পর্যন্ত বলে শিল্পী যেন কোন দূরে চলে গেলেন—দেখলাম ব্যথাভরা এক সুন্দর মুখ। শিল্পী ধ্যানস্থ যেন। আমি তাঁকে আবার প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, আপনি কী ধরনের গান করেন? —সবই কি প্রাচীন গান?' শিল্পীর যেন ধ্যান ভঙ্গ হল। তিনি বললেন, 'মুখ্যতঃ, আমি বাউল শিল্পী। তবে অন্যান্য লোক-সঙ্গীতও আমি জানি গেয়েও থাকি। আমি অধিকাংশ সময়ই স্বরচিত গান গেয়ে থাকি; আবার প্রাচীন গানও গাই।' আর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'আজ যে সব গান আপনি শুনলেন তার সব কটাই আমার নিজের রচনা।'

গোবিন্দ দাস রচিত কয়েকটি গানের নমুনা দিচ্ছি। গুনীজনরা বুঝতে পারবেন কী আছে এই গানের মধ্যে। প্রথম যে গানটি আমি উদ্ধৃত করছি তা হলো একটি ভক্তিগীতি। এ গানের অন্তর্নিহিত ভাব অতি মূল্যবান:—

পড় বাবা টিয়া পাখী,
তার কত দিবি ফাঁকি,
বাকি আছে আর কতদিন—
মরণ মার্জ্জার পিছে,
ঊর্দ্ধে সর্প পশ্চাতে নীচে,
আয়ুষ্কাল ক্রমে হয় ক্ষীণ—।...ইত্যাদি।

গোবিন্দ দাস

এবার আমি গোবিন্দবাবুর একটি স্বরচিত বাউল সঙ্গীতের নমুনা দিচ্ছি। এই রচনায় শিল্পীর স্বকীয়তা প্রমাণে নিশ্চয়ই সহায়তা করবে:—

মন রসনায় সে রস কভু মন ত পাবে না,
সে যে কৃষ্ণ রসে সাগর ভরা
আজব কারখানা।
ধরাতে আসল ধরলা নকল,
সবই তোমার হবে বিফল,
জান পিছে আছে ঢেঁকির মুষল
সে তোমায় ছাড়বে না।।
...ইত্যাদি

এবার আমি শিল্পী রচিত এক উল্টা বাউলের নমুনা দিচ্ছি। আমরা তো কত রকম বাউল, উল্টা বাউল শুনি। কিন্তু শিল্পীর এই রচনা নিশ্চয়ই বলিষ্ঠ বলে প্রমাণিত হবে:—

আমি বৈরাগীর ছোট ভাই—
একাদশী ভালবাসি,
লুকিয়ে লুকিয়ে মাংস খাই।
আমি স্নান করতে গেলে জলে,
নজর রাখি কাঁকড়ার খালে,
দু' চারটে যা হয় পেলে,
অমনি টিকিতে জড়াই।।
...ইত্যাদি

এই রকম আরও অনেক গানই শিল্পী রচনা করেছেন যার ভাব, ভাষা বা রচনা শৈলী অন্যান্য রচয়িতা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নয়।

তাঁর জীবিকা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় শিল্পী জানালেন যে তিনি এই কলকাতা শহরেই এক বাউল সম্প্রদায় গড়েছেন। যখন যেখান থেকেই আমন্ত্রণ আসে গান গাইবার সেখানেই যান। গোবিন্দ দাস কিন্তু তাঁর দেশেই থাকেন এবং সেখান থেকে এসেই এইসব অনুষ্ঠানে যোগ দেন। দুঃখ করে বলছিলেন যে এছাড়া অন্য কোন আয়ের সংস্থান তাঁর নেই। আর এই থেকে যা আয় হয় তাতে অতি

কষ্টে দিনগুজরানও অসম্ভব হয়ে ওঠে। শিল্পী যেন ভবিষ্যতের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন। এক প্রশ্নের জবাবে শিল্পী বললেন, 'আজকাল প্রায়ই শোনা যায় যে লোকসঙ্গীতের কদর বেড়েছে, বিভিন্ন জলসায় বা বেতারে এর এক বিশিষ্ট স্থান আছে,—কিন্তু কই, আমরা তো সত্যই লোকসঙ্গীতের সাধনা করে চলেছি—তবে আমাদের পেটে দু' বেলা দু' মুঠো ভাত জোটে না কেন? তাহলে যা শোনা যায় সবই ভুয়ো?'

আমি কিন্তু এর সদুত্তর দিতে পারি নি। কি করে দেব? আমরা লোক-সঙ্গীত নিয়ে আজকাল মেতেছি সত্য,—কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী-গুণী শিল্পীর কি দাম দিচ্ছি আমরা? নামী শিল্পী ছাড়া বিভিন্ন জলসায় শ্রোতারা অনামী শিল্পীর গান শুনতেই চান না। অথচ আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি গোবিন্দ দাস যে কোন নামী শিল্পীর থেকে কিছু খারাপ গান করেন না—তবুও তাঁর দু মুঠো অন্ন সংস্থান সহজ হয় না। শুধু গায়ক হিসেবেই নয়, রচয়িতা হিসেবেও তিনি সুবিচারের দাবী করতে পারেন। তাঁর রচিত গান যদি বেতার শিল্পীরা বেতার মাধ্যমে বেতার কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে পরিবেশন করেন বা শিল্পীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেন তবে গোবিন্দ দাসের মত শিল্পী ও রচয়িতাদের কিছু আর্থিক সুরাহা হতে পারে।

।। হেমাঙ্গিনী দাসী ।।

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দাসীর জন্ম পূর্ব পাকিস্তানের বরিশাল জেলার সিন্ধকাঠি গ্রামে। কিন্তু শিশুকাল থেকে বিবাহ-পূর্ব জীবন অর্থাৎ পনের বছর বয়স পর্যন্ত তিনি বিক্রমপুরের (ঢাকা) পাইকপাড়া গ্রামে কাটিয়েছেন।

আমার তখন খুবই কম বয়েস। একদিন আমাদের রাজসাহীর (পূর্ব পাকিস্থান) বাড়ীতে একজন মহিলাকে বাসন মাজতে দেখলাম। প্রথম প্রথম কোন কৌতূহল আমার ছিল না। হঠাৎ একদিন শুনি বাসন মাজার অবসরে গুণ গুণ গানের সুর। আশ্চর্য হলাম। বেশ সুন্দর গলা! শিশুকাল থেকে আমারও গানের দিকে ঝোঁক ছিল। তাই গান শুনলেই আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে যেতাম, আর অবাক হয়ে শুনতাম। মা আমার মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতেন, 'হ্যাঁরে খোকা, কী করছিস কি ওখানে বসে?' আমি কোন উত্তর দিতাম না। অবাক হয়ে শুনতাম শুধু। বেশ কয়েক মাস পর তিনি যেন বুঝতে পারলেন যে আমি বসে থাকি ওঁর গান শোনার জন্যে। একদিন আমায় ডেকে উনি জিজ্ঞেস করতে আমি সব খুলে বললাম। উনি সব শুনলেন, শুনে যেন আমায় ভাল বাসলেন, আপন করে নিলেন, বললেন—'আমাকে উনি গান গেয়ে শোনাবেন। সেই বয়েসে আমার সে কী

হেমাঙ্গিনী দাসী

আনন্দ। কেউ একা বসে আমাকে গান গেয়ে শোনাবে—এ ভাবতেও যে আমার কী মনে হচ্ছিল তা' ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তাঁকে ডাকতাম 'হেমাঙ্গিনী' বলে। দিনের কাজের শেষে মাসী আমাকে অনেক 'ছড়া-গান' শোনাত। ঐ সমস্ত 'ছড়া-গান' যে লোক-সংস্কৃতির রত্ন — বিশেষ তাতে কোনই সন্দেহ নেই। যেমন—

আয় চাঁদ নড়িয়া
ভাত দিমু বাড়িয়া
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।
ধান কুটলে কুঁড়া দিমু
রাঙা সুতার কাপড় দিমু
মাইনকার কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।

একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা মাসী, তুমি যে এত সুন্দর গান গাও, এ তুমি কার কাছে শিখেছ। আর এত ভাল গান যখন গাইতে পার তখন কেনই বা এই বাসন মাজার মত নীচু কাজ করতে এলে?' উত্তরে মাসী বললে, 'তুমি তো বাবা ছেলেমানুষ, তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে-শোন। শিশু-কালেই আমি আমার মায়ের কাছে গান শেখার প্রেরণা পাই। আমার মা ছিলেন পাইকপাড়ার (বিক্রমপুর-ঢাকা) একজন সুপরিচিতা লোকসঙ্গীত শিল্পী। গানের হাতে-খড়ি আমার তাঁর কাছেই।' বলেই তিনি হাত জোড় করে বোধহয় তাঁর পরলোকগতা মায়ের উদ্দেশ্যেই সশ্রদ্ধ প্রণিপাত করলেন। আবার সুরু করলেন—মনে হলো যেন কোন্ জগৎ থেকে ফিরে এলেন 'বেশ চলছিলো সেদিনের সেই দিনগুলো। হঠাৎ কয়েক দিনের অসুস্থতায় আমার স্বামী মারা গেলেন। একা হলেও হয়ত যা হোক করে চালিয়ে নিতাম। কিন্তু আমার যে একটা পাঁচ বছরের মেয়ে ছিল বাবা! আমি তো মহামুশকিলে পড়ে গেলাম। অন্নের সংস্থান করতে হবে—শিশুর মুখে কিছু দিতে হবে। ভিক্ষে করা পোষায় না। তাই মায়ের কাছে শেখা গানকে সম্বল করে কোন রকমে অভাব অনটনের মধ্যে দিন কাটাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমি কয়েক বছর পরে মেয়ের বিয়ে দিলাম। এখন ত বাবা আমি ঝাড়া হাত-পা। আর বিশেষ ভাবনা নেই। ভিক্ষে করাকে আমি ঘৃণা করি। তাই খেটে খাব বলেই এই তোমাদের বাড়ীতে চাকরী নিলাম। আর বেশ কেটেও তো যাচ্ছে।' এই কথা বলার শেষে তিনি যেন তাঁর অতীত দিনে ডুব দিলেন। কতক্ষণ যে কেটে গেছে তা তাঁর খেয়াল ছিল না।

আমি আর একদিন মাসীকে বললাম, 'মাসী তুমি এমন গান জান যাতে আদর্শ আছে, ভাব আছে?' মাসী বললে 'কি জানি বাবা, অতশত জানি নে, আমি তো মুখ্যু মানুষ। তা একটা গান গাইছি—ভালো লাগলে বলো কিন্তু, হ্যাঁ।' মাসী তাঁর সুরেলা, সুমধুর কণ্ঠে গাইলেন—

খোকা ঘুমাইলো পাড়া জুড়াইলো
বর্গী আইলো দ্যাশে
বুলবুলিতে ধান খাইচে,
খাজনা দিমু কিসে।
খোকা আমার বড় হইব
মায়ের আশীষ মাথায় লইব
প্রতাপ রাজার সাহস দিয়া
খেদাইব বর্গী গো।

আর একদিন আমায় তিনি আর একটি ছড়ার গান শোনালেন। ছড়ার গানে সাধারণতঃ ভাবের ঐক্য বা পারম্পর্য থাকে না বলা হয় সে কথা যে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তা আমার হেমা মাসী রচিত পূর্বোল্লেখিত দুটি ছড়ার গান এবং পরের গানটি পড়লেই বুঝতে পারা যায়। আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় গান দুটিতে মহান আদর্শ ও বীরগাথাও আছে। যেমন—

খুকু আমাগো রাণী হইব
সবাই তারে বড় কইব
কৌয়র রাণীর মত হইব
মস্ত সে এক বীর।
খুকু আমাগো রাখব মান
দ্যাশের তরে দিব পরাণ
কৌয়র রাণীর মত হইব
মস্ত সে এক বীর।।

আমার মাসী তো লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু ইতিহাস বা আমাদের দেশের রাজ-রাজড়াদের বিষয় যে তিনি বেশ কিছু জানতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর ঐ সমস্ত ছড়া গান রচনার মধ্য দিয়ে। আমাদের বাড়ীতে বছর সাতেক কাজ করার পর আমি আর একদিন ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা মাসী, তুমি এ-সব লিখলে কি করে?' উনি বললেন 'আমি তো নিজের মনে যা এসেছে তাই গেয়েছি। তোমাদের মত আমি তো ভাষা জানি নে। এ গান তো আমি মুখে মুখেই বেঁধেছি। ছোটকালে ঠাকুমার (ঠাকুরমা) কাছে ঐ কৌয়র রাণী, প্রতাপাদিত্য এঁদের গল্প শুনেছিলাম—তাই এখন তাঁদের নিয়েই গান বাঁধলাম। কি গো, ভাল হয় নি?' আমি তো অবাক, পুঁথিগত বিদ্যে ওঁর নেই বটে, কিন্তু সত্যিই কি উনি লেখাপড়া না জানা মনে হয়? উনি বলেছিলেন,

দান বাবা, কৌরব রাণীর মত বীর যদি আমাদের প্রতি ঘরেই থাকত তবে আমাদের দেশের এ হাল হতো না। তোমরা তো ত পড়েছ, বল না, সত্যি কিনা?' কী াকুল জিজ্ঞাসা!

আমাদের বাড়ীতে বছর দশেক কাজ রার পর যখন দেশ স্বাধীন হলো তখন উনি আমাদের সঙ্গে কলকাতায় না এসে খানেই থেকে গেলেন। কিছুদিন আগে বর শুনেছি উনি এখন মুর্শিদাবাদের রেমপুরে আছেন। জীবিকার কোন সহজ থ পেয়েছেন কিনা জানিনা।

।।বীরেন দাস।।

কলেজ স্কোয়ারে ছুটির দিনের একটি বেলা। রাস্তাঘাটের ভিড় হাল্কা হলেও লেজ স্কোয়ারের দীঘির পাড়ের ভিড় ন্তু কমে নি।

দীঘির চার পাশের একটি বেঞ্চিও লি নেই। মাঠের এখানে-ওখানে ছেলে-ড়া-মেয়েদের গল্পগুজব। কোনখানে গা না পেয়ে আমি ঘেরা রেলিং-এর কীর্ণ স্থানটিতে বসবার একটু জায়গা র নিলাম।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে এল। অন্য-স্ক হয়ে কি যেন ভাবছিলাম এমন সময় ন এলো ঘুঙুরের শব্দ ও খমকের ওয়াজ। তারপর শোনা গেল বাউল নর কয়েকটি পংক্তি—

গোর প্রেয়সী দেখলাম তোর
নিমাই সন্ন্যাসী
যাচ্ছে পথে কড়ুয়া হাতে
তিন দিনকার উপবাসী !!

চমৎকার কণ্ঠস্বর শিল্পীর — যেমনি জ তেমনি সুরেলা। সন্ধ্যার কালো-য় দীঘির এপার থেকে ওপারে পীকে ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। । অন্ধকারের আবছায়াতে এইটুকু লাম যে, কিছু লোকজন জমায়েত ছে শিল্পীটির গান শুনবার জন্য।

গান শেষ হলে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের া-জনে সবারই কাছে দু-চার পয়সা ভিক্ষে তেই শ্রোতৃবৃন্দের ভিড় ক্রমশই হাল্কা এলো। যে কজনের কাছ থেকে সাহায্য পেলেন তাই নিয়েই এই বাউল শিল্পীটি বিদায় নিচ্ছিলেন। এমন সময় আমি তার কাছে গিয়ে তার হাতে একটি টাকা দিলাম। টাকাটি পেয়ে শিল্পী আমাকে প্রণাম করে বললেন, 'ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।'

শিল্পীকে ডেকে নিয়ে এলাম একটু নিরিবিলিতে দীঘির পাড়ে। গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম তাই শিল্পীকে জানবার ও তাঁর গান আরো শুনবার বাসনা হল। তাই দীঘির পাড় বসিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম 'কর্তার নাম কী, দেশ ছিল কোথায়' উত্তরে শিল্পী বললেন, 'বাবু, আমার নাম বীরেন দাস, লোকে বীরেন বাউল বলেই ডাকে। দেশ ছিল বাবু

বীরেন দাস

দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে। পেটের দায়ে কইলকাত্তায় এইসেছি—গান শুনিয়ে বাবুদের কাছ থেইকে দু-চার পইসা পাব বইল্যে। কিন্তু সে গুড়েও বালি বাবু। দু-বেলার খাওয়ার জোটানই দায় হইছে।' তাঁর এই কথাগুলো আমাকে আনমনা করে তুলছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শিল্পীর হাত দুটো ধরে অনুরোধ করলাম কয়েকটি গান শোনাতে। বীরেন দাস আমার অনুরোধ রাখলেন। চমৎকার একটি বাউল গান শোনালেন—

সে দ্যাশের কথারে মন ভুলে গিয়েছে
উর্ধপদে হেটমুণ্ড সে দেশে
মন বাস কইর‍্যাছে।
বিন্দুরূপে মস্তকে ছিলে
ফল ভারে গর্ভবাসে প্রবেশ করিলে
শুক্রে শোণিতে মিশে
তাইতে আকার ধরেছ
ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমেতে
পঞ্চ মাসে পঞ্চ আত্মা বৈদিক দেহেতে
সপ্ত মাসে গুরুর কাছে
মহামন্ত্র লাভ কইরেছ।।

বীরেন দাসকে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম বাউল ও দেহতত্ত্ব গান ছাড়াও তিনি উত্তর বাংলার প্রসিদ্ধ লোকগীতি ভাওয়াইয়া গানও জানেন। তাই আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না, তাঁকে একটি ভাওয়াইয়া গান শোনাতে অনুরোধ করলাম। শিল্পী তন্ময় হয়ে গান ধরলেন—

ওরে জীবন,
ছাড়িয়া না যাস মোরে।
ওরে জীবন ছাড়িয়া গেলে
আদর করবে কে রে।
ভাই বল ভাতিজা বল রে সম্পত্তির ভাগী
আগে করবে ধনের আশা পিছে করবে গতি।
ও জীবন রে কাঁচা বাঁশে খাটি পালঙ্করে
শুকনা পাটার দড়ি
দুজনাতে কান্দে করে
নিয়ে শ্মশান ঘাটে বাড়ি
চিত্রগুপ্তের খাতা নিয়ারে
বেড়ায় বাড়ি বাড়ি

আমার বিশেষ অনুরোধে আমাকে নিমাই সন্ন্যাসের একটি সুন্দর গান শোনালেন—

সোনার মানুষ উদয় হল প্রাণ সজনী
মানুষ ক্ষ্যানে হাসে ক্ষ্যানে কান্দে
ঠিক যেন অন্তর্যামী।
সোনার মানুষ কৌপীন পরা
নদীয়ায় পাইল ধরা
আবার জ্ঞান চক্ষেতে ঝলক মারে,
ঠিক যেন অন্তর্যামী।।...

অঙ্গনা

সন্তানের কল্যাণে

শিশুদের ঘিরেই সকলের স্বপ্ন দেখা। তাই ওদের জীবনকে প্ল্যানিমত্ত করে সবাই গড়ে তুলতে চায়। শিশুর অভাব-অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শুনে আবার তা ঠিক-ঠিক মেটান চাই। নাহলে শিশুচিত্তে বিক্ষোভ জমা হবে। তার প্রতিক্রিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে বিষময় হয়ে দেখা দেয়। শিশুর সম্পর্কে মা-বাবা এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাই সমধিক।

শিশুদের গুরুত্ব যথাযথ প্রতিফলনের জন্য দেশে পালন করা হয় শিশু দিবস। আমাদের দেশে স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্মদিবসকে পালন করা হত শিশু দিবসরূপে। জওহরলাল ছিলেন শিশুদের অত্যন্ত প্রিয়। শিশুরা তাঁকে ভালবেসে ডাকতো চাচা নেহরু। আর তিনিও শিশুসুলভ হৃদয় নিয়ে ওদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিশু সংস্থাও এই দিনটিকে শিশু দিবসরূপে চিহ্নিত করেছিল।

শিশুদের কল্যাণের জন্য এমনি ব্যাকুলতা দেশে-দেশে। এই ব্যাকুলতা নিয়ে আজ থেকে ১৯ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাস নাগাদ বিভিন্ন দেশের মহিলারা সমবেত হলেন। তাঁদের সকলের একই চিন্তা কিভাবে দেশে-দেশে শিশুদের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীকে আরো বিস্তৃত করা যায়। নানা আলোচনা হলো। শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলায় কেউ-কেউ নতুন পরিকল্পনা পেশ করলেন। শেষে ঠিক হলো যে, ১লা জুন বিশেষভাবে শিশুদের জন্য দিন হিসাবে নির্দিষ্ট হলো। সারা বিশ্বে শিশুদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলায় ব্যাপারে সকলের অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হবে। তারপর নতুন কার্যক্রম নিয়ে আবার শুরু হবে এগিয়ে চলা—শিশুচিত্তে যাতে ক্ষোভের অবকাশ না থাকে।

সেদিন থেকে শুরু করে প্রতি বছর সোভিয়েত রাশিয়া ১লা জুনকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে চলে। শিশুদের জন্য সেদেশ সারা বছরে কতটা কি করতে পেরেছে তা যেমন প্রকাশ করে তেমনি আগামী দিনে শিশুদের জন্য কি কি পরিকল্পনা আছে তা সবাইকে জানিয়ে দেয়। মোট কথা, শিশুর সুস্থ এবং বলিষ্ঠ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলায় সেদেশ কাউকে নিস্পৃহ দর্শক করে রাখতে চায় না। বরং সবাই শিশু-মঙ্গলের এই কর্মসূচীকে প্রাণপণে সফল করতে এগিয়ে আসুক এটাই সেদেশের কাম্য।

শিশুর জন্মকে আমরা শাঁখ বাজিয়ে স্বাগত জানাই। জীবনের একটি আনন্দঘন মুহূর্তকে আমরা এমনিভাবে প্রকাশ করে থাকি। অন্য দেশে হয়তো শাঁখ বাজানোর রেওয়াজ নেই কিন্তু শিশু জন্মের উল্লাস সব দেশেই সমান। শিশুর জন্ম যেমন আনন্দের তেমনি দায়িত্বেরও। সন্তান আমাদের ভূষিত করে পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বের সম্মানে। এর বদলে সে আশা করে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। দায়িত্বের কথা ভেবে শিউরে উঠলে চলবে না। বরং সন্তান আসার আগে থেকেই এই দায়িত্বের কথা ভেবে রাখা উচিত সকলের। সন্তান হওয়ায় যে আনন্দ সেই আনন্দকে অম্লান রেখেই সন্তানপালনের সুকঠোর দায়িত্বটুকুও পালন করতে হবে। তাদের পৌঁছে দিতে হবে সমৃদ্ধ জীবনের পথে। রুশ দেশে এ দায়িত্বপালনে রাষ্ট্র এবং পরিবার গ্রহণ করে যৌথ ভূমিকা।

শিশুর প্রথম কথা হলো স্বাস্থ্য। শরীর যদি ঠিকভাবে না গড়ে ওঠে তবে ভবিষ্যৎ তার কাছে মূল্যহীন। শিশুর স্বাস্থ্যের গোড়ার কথা লুকিয়ে রয়েছে মায়ের মধ্যে। তাই মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে প্রধান কর্তব্য। রুশদেশে শিশু এবং মায়ের সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়। এজন্য ডাক্তার এবং সেবা-শুশ্রূষার বিরাট সমাবেশ। যাতে গোড়ায় গলদ না থেকে যায়। শিশু জন্মের পূর্বে থেকেই এ-সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। তারপর স্কুলে পাঠানোর পূর্বে পর্যন্ত নিয়মিত 'চেক আপ'।

প্রতিটি স্কুলেও এ সম্পর্কে যথাযোগ্য নজর দেওয়া হয়। ডাক্তার এবং নার্সরা সেখানে সবসময় শিশুদের নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এজন্য মা-বাবার কোন অতিরিক্ত খরচ কিছু নেই। সবটুকু দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এমন কি মা-বাবার স্বাস্থ্য পরিচর্যারও। সুবিধা শুধু এইটুকুই নয়। মা যখন কাজ করতে যায় তখন শিশু থাকে কোন নার্সারী অথবা কিন্ডারগার্টেনে। সেখানে তার পরিচর্যার জন্য রয়েছে স্পেশালিস্টরা। মা নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে পারে। অথচ আমাদের দেশে কর্মী-মায়ের কতো ভাবনা ছেলেমেয়ে নিয়ে। তাদের বাড়িতে রেখে মা যেমন কাজে মন দিতে পারে না তেমনি তাদের মানুষ করতে পারে না। এ-ভাবনার হাত থেকে আজও এ-দেশের কর্মী মায়েদের রেহাই নেই।

স্কুলে পাঠাবার আগে শিশুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তত্ত্বাবধানের যে ব্যবস্থা আছে সারা রুশদেশে তা খুবই জনপ্রিয়। প্রায় অধিকাংশ পরিবারই এখানে নিয়মিত শিশুকে পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে যায়। এজন্য কিছু খরচ অবশ্য হয়। মোট খরচের এক ভাগ বহন করতে হয় মা-বাবাকে এবং তিন ভাগ বহন করে রাষ্ট্র। কম করেও প্রায় নয় মিলিয়ন শিশু এসব কেন্দ্রে পরীক্ষিত হয়।

এছাড়া শিশুস্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য বিস্তর ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিবছর ওদের গরমের ছুটিতে পাঠানো হয় শিশুদের ক্যাম্পে। এবং এ-সকল ক্যাম্প প্রায়ই সমুদ্রতীরবর্তী। কিছু কিছু শিশুকে স্যানিটোরিয়ামেও পাঠানো হয়। আবার কেউ কেউ মা-বাবার সঙ্গে ছুটি কাটাতে চলে যায় গ্রামের বাড়িতে। এভাবে ছুটি কাটাতে যায় প্রায় ১৬ মিলিয়ন শিশু। এ-হিসেব কিন্তু গতবছরের।

রুশদেশের সব শিশুরাই স্কুলে যায়। ইদানীং শিক্ষাক্রমের কিছুটা বদল করা হয়েছে। আগে সকলের জন্য ছিল আট বছরের কোর্স। এখন তা বাড়িয়ে করা হয়েছে দশ বছরের কোর্স। এই কোর্স বাধ্যতামূলক। তারপর ঠিক হবে কে কি করবে। শিক্ষার জন্য সুবন্দোবস্তের অভাব নেই। তিন হাজার বাড়ি এবং প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বন্দোবস্ত আছে ইয়ং পায়োনিয়ারদের জন্য। আটশো কেন্দ্র আছে ইয়ং টেকনিশিয়ানদের জন্য। শিশুদের সঠিক বিকাশের জন্য কোন কিছুরই অভাব রাখা হয় নি। গান-বাজনার জন্য রয়েছে দু-হাজার কেন্দ্র। একশো সতেরোটি থিয়েটার রয়েছে অভিনয়ে শিশুদের সুযোগ দেবার জন্যে। খেলাধূলায় সুযোগ পেয়ে শিশুরা যাতে নিজেদের ঠিক-মতো গড়ে তুলতে পারে সে জন্য দু-হাজার স্পোর্টস সেন্টার তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

এতো গেল রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের কথা। এরপরও শিশুদের জন্য বিরাট ব্যবস্থা রয়েছে। ওদের মা-বাবা যেখানে কাজ করে সেইসব কল-কারখানাও শিশুদের জন্য দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছে। শিশুদের এখানে রেখে মা দিব্যি কাজ করতে পারে। টিফিন বা লাঞ্চের সুযোগে মা এবং শিশুর মধ্যে ক্ষণিক মিলনও ঘটে। তারপর ছুটির ঘন্টা বাজলে মা শিশুকে কাঁধে ফেলে হাসতে হাসতে বাড়ির পথ ধরে। এ ব্যবস্থা একেবারে কচি বাচ্চাদের জন্য। বাড়ন্ত শিশুদের জন্য অনেক কারখানায় কিন্ডারগার্টেন এবং নার্সারীর ব্যবস্থা আছে। চিলড্রেন্স পায়োনিয়ার ক্যাম্প আছে ওদের দেহ-মনকে সুস্থ রাখার জন্য। স্পোর্টস স্কুল, লাইব্রেরী এবং ছবি সেন্টার নিয়ে এর পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা এখানে গড়ে ওঠে।

শিশুদের মানসিক গড়নের জন্য রয়েছে শিশুমনের উপযোগী খবরের কাগজ এবং অসংখ্য ম্যাগাজিন। রেডিও এবং টেলিভিসনেও ওদের জন্য থাকে বিশেষ অনুষ্ঠান। এক খবরে জানা গেছে যে, চিলড্রেন্স পাবলিশিং হাউস একাই শিশুদের জন্য বছরে ৭০০ বই প্রকাশ করে। এর প্রচার-সংখ্যা মোট একশো মিলিয়ন। এ থেকেই বুঝতে পারা যায় পড়াশোনায় শিশুদের উৎসাহ কত।

দেশ এবং দেশবাসী শিশুদের গড়ে তোলায় কাজে সমর্পিতপ্রাণ। এ জন্য কোন কিছুর ত্রুটি রাখা হয় না। বড়রা তাই হিংসে করে বলেন, শিশুরাই হলো আমাদের দেশে ভাগ্যবান। আবার যদি কোনক্রমে ওই বয়েসটা ফিরে পাওয়া যেতো।

—প্রমীলা

প্রবীণ শিল্পীর প্রথম অনুষ্ঠান : গত বার চক্রবেড়িয়া রোডে সুরদাস সঙ্গীত মলন আয়োজিত মাসিক অধিবেশনে লীজীবন সোমের সেতার বাদন তিকালের সঙ্গীত জগতের এক খযোগ্য ঘটনা। কারণ, নবীন প্রতিভার তপ্রদ অনুষ্ঠান খুব দুর্লভ নয়। কিন্তু কারের পাণ্ডিত্য, সুগভীর অনুশীলন র্ত সাধক শিল্পীর বাজনা শোনার জ্ঞতা দুর্লভ।

শ্রীসোম প্রথমে 'ইমন' রাগে আলাপ, রাগে গৎ বাজিয়ে শোনান। 'ইমন' র সুবিস্তৃত আলাপের প্রতিটি অঙ্গ বশ্লেষিত, স্বরসমন্বয়, খণ্ডমীড়, আশ, ও কৃন্তনে শ্রুতির শুদ্ধতা ও রাগের সুন্দর রূপ লক্ষ্য করবার মত। জোড়ে লয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাজের কের কাজ ও ভঙ্গি খুব একটা শোনা না। এই নতুনত্বেই সভায় উপস্থিত জনের বিশেষ করে কুমার বীরেন্দ্র-ার রায়চৌধুরী, শিশিরকণা ধর-রী ও অপর্ণা চক্রবর্তী প্রমুখ ীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় শিল্পী নন্দিত হন। বোলের কাজে ঢাকার ন সেতারীর বাজ, লক্ষ্ণৌ ঘরানার ছাড়া প্রতিটি ডা ও রা-র সঙ্গে বীণ বাদের ঢঙের টোকা আওয়াজের মধ্যে র্য বৈচিত্র্য এনেছে। পরিবেশনার র আলাউদ্দিন ঘরানোর বাদনশৈলীতে বিস্তৃত হওয়ায় গায়কী ও তন্ত্রকার র সমন্বয় রাগের নানা 'ডাইমেনশন'-প্রতি ইঙ্গিত করে। এ আসরে যন্ত্র-ীদের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় ছিল এই পরিপ্রেক্ষিতেই এ অনুষ্ঠানের বিশেষ মূল্য আছে।

তের অঙ্গে মাসিদখানি এবং রেজাখানি গতেই শিল্পীর নিজস্ব ভাবকল্পনার ছিল। তানেও রকমারী নমুনার অভাব না। ধ্রুপদ ও খেয়াল অঙ্গের পর গৈতিক প্রথায় ঠুংরী না বাজিয়ে বাজালেন 'টপ্পা' অঙ্গের 'সিন্ধু', া ধরনের ধাঁচেই। এ ধরনের সাবেকী অকাল প্রায় উঠেই গেছে। সেইজন্যই ত ভাল লাগল তাঁর জমজমা সমৃদ্ধ নের কাজ?

সমালোচনায় এইটুকুই বলা যায়, অঙ্গের তুলনায় 'ঝালা' অঙ্গ একটু রী চয়ন মেওয়াজের অভাবে। তবে অভাব পূরণ করতে বিস্তারের বিস্তার বাদ্যরাজ। এঁর সঙ্গে গা তবলাসঙ্গত করে ... সুনাম ... সুখ্যাত তবলিয়া ... বসু।

একক রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসরে

ও'রা দুইজনা।

রবীন্দ্রসদনে 'নৈবেদ্য' নিবেদিত একক **রবীন্দ্রসঙ্গীতের** আসরের শিল্পী ছিলেন **যথাক্রমে** অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মিত্র। একজন তরুণ এবং খ্যাতির মধ্যগগনে, অপরজন হলেন সঙ্গীতসাধিকা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা সৃষ্টিকারীদের মধ্যে অন্যতমা পুরোধাস্থানীয়া। এহেন আসরের আকর্ষণ স্বভাবতই অবিসংবাদিত।

অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় একক সঙ্গীত আসর-এর সূচনা ঘটালেন ধ্রুপদী অঙ্গের রবীন্দ্রসঙ্গীত 'হে মহাপ্রাণ' দিয়ে। ধ্রুপদী মেজাজের ধ্যানগম্ভীর পটভূমিকায় ভক্তিভাবের এই গানটি যেন পূজা-আরাধনা-উপাসনার পবিত্র পরিমন্ডল রচনা করে। এর পরই 'ডাকো মোরে আজি এ নিশীথে' গানটি দিয়ে পরজ রাগের কোমলতায় মনকে ভিজিয়ে দিয়েই আবার গোধূলির পথে উদাস করে দিলেন মূলতানের ছোঁয়া লাগা 'বুঝি বেলা যায়' গেয়ে। এই উদাসী হাওয়ার পথে ভাসতে না ভাসতেই আমাদের তিনি কীর্তন ছন্দের দোলায় দুলিয়ে দিয়ে ('আমি যখন ছিলাম অন্ধ') ফিরিয়ে নিয়ে এলেন আপনাকে হারানো চিররোমান্সের রাজ্যে ('আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়') তারপরই কবির নির্মল কৌতুক-রসে ('গেল গেল' এবং 'স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে') অভিষিক্ত করে পৌঁছে দিলেন চিররহস্যের সন্ধান ব্যাকুলতায়—'আঁধার রাতে একলা পাগল' উদারকণ্ঠের ক্রমবিলীয়মান রেশ মনের মধ্যে যেন তার অনপনেয় ছাপ রেখে যায়।

অশোকতরু সৃষ্ট এই সুরের রেশকে অনাহত রেখেও ভাববৈচিত্র্যে শ্রোতাদের মনকে শেষ অবধি আবিষ্ট রেখে **সুচিত্রা মিত্র** আর একবার স্মরণ করিয়ে দিলেন তিনি কত বড় শিল্পী আর কি অদ্ভুত পরিমিতি বোধসম্পন্না।

দাবদগ্ধ জ্যৈষ্ঠের মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বোধহয় ইনি ধরলেন 'নাই রস নাই'—রিক্তমনের রসব্যাকুলতার করুণ আর্তি প্রতিটি ছত্রে মীড় সর্বোপরি দৃপ্ত গায়কীতে কি প্রাণবন্ত। তাঁর নির্বাচিত গানগুলি মূলতঃ ছিল ভক্তি ভাবাশ্রিত। এই ভক্তির প্রকাশেই যে কত বৈচিত্র্য রস সেই সত্যটিই জানা গেল নানান ভাব ও ছন্দের গানে। 'আমার ভুবন ত আজ হোলো কাঙাল'—এ রিক্ত হৃদয়ের কান্না আবার 'লিখন তোমার'—এ ভক্তিমতীর আশাবাদী হৃদয়ের আবেগ মনকে অভিভূত না করে পারে না। 'ওহে জীবন-বল্লভ'তে সাধন দুর্লভের সঙ্গে নীরব মিলনের আকুতি-উচ্ছল ছন্দ চোখের জলের জোয়ারে ভাসিয়ে যখন 'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ' পূজাবেদী সাজানো সাঙ্গ হোলো—মনে হোলো যেন আত্মনিবেদিতার আহুতির আর অন্ত নেই। এই অন্তহীন আলোর অনির্বাণ দীপ্তি দিয়ে শ্রোতাদের অন্তর উদ্ভাসিত করবার অধিকারিণী বলেই না তিনি রসিকমহলের চিরবরেণ্যা শিল্পী।

'সৌরভ'-এর উৎসবে : ল্যান্সডাউন রোডের নিজস্ব মঞ্চে প্রখ্যাত সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান 'সৌরভ'-এর বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী উৎসবের দুটি সন্ধ্যা এবার যে জমে উঠতে দেরী হয়নি তার কারণ উৎসবের অন্তরালের আন্তরিকতা। এ উৎসবের উদ্যোক্তা হলেন 'সৌরভের' শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। মাত্র এক বছরে একটা প্রতিষ্ঠানের এই প্রতিষ্ঠা, এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের হাস্যমধুর সম্পর্ক বড় একটা চোখে পড়ে না। এর জন্যে সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠান পরিচালিকা শ্রীমতী নমিতা চট্টোপাধ্যায়ের।

প্রথমেই অদ্রিজা মুখোপাধ্যায় পরি-কল্পিত নতুন মঞ্চ দর্শকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর করলেন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দ। জয়পুরী কারুকার্যশোভিত ছোট্ট মঞ্চটির শিল্পস্রষ্টী সত্যিই প্রশংসা করবার মত। এরপর উদ্বোধনী সঙ্গীত গেয়ে শোনান ছাত্রছাত্রী-বৃন্দ সমেত বন্দনা সিংহ।

সভাপতির ভাষণে শ্রীঅমৃতলাল চাণ্ডানী স্বল্পকালের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের প্রভূত উন্নতির জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে পরি-চালিকাকে অভিনন্দন জানালেন। সৌরভ-এর সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ সমবেত অতিথিবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ জানান।

সঙ্গীতানুষ্ঠান সূচনা ঘটে শ্রীমতী ঊষা কয়বেকরের সুন্দর একটি ভজন গান দিয়ে। নমিতা চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় গুজরাটি লোকসঙ্গীত উপভোগ্য ও সুন্দর। সমান আনন্দ দিয়েছে শিশুশিল্পীদের লোকনৃত্য। এ ছাড়া অনুষ্ঠান তালিকায় ছিল ছাত্রছাত্রীদের সমবেত গীটার বাদন, জেলে নৃত্য এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত। আর ছোট্ট মেয়ে শর্মিলা দেশাই-এর কণ্ঠে ছোট্ট একটি রাগসঙ্গীতই কি কম উপভোগ্য!

উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত : দ্বিতীয় দিন উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের আসরে শুরু বলরাম পাঠকের সেতার বাদন দিয়ে। ইনি বাজালেন 'যোগকোষ'। পাঠকজীর বাঁহাতের সূক্ষ্ম মীড় ও কৃন্তন ও সুরেলা টিপে রাগমাধুর্য ঘনীভূত হতে দেরী হয়নি। এঁর সঙ্গে সুযোগ্য তবলাসঙ্গত করেন মহাপুরুষ মিশ্র।

চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তবলাসঙ্গতে সর্বশেষ অনুষ্ঠানে 'গৌড়মল্লার' গেয়ে শোনান প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। দরাজকণ্ঠে ও আন্তরিকতার প্রসাদে প্রসূনবাবুর অনুষ্ঠান রসোত্তীর্ণ। একটি ঠুংরী গেয়ে ইনি অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।

—চিত্রাঙ্গদা

চিত্র-সমালোচনা

বিজয়া ইণ্টারন্যাশনালের ঘর ঘর কি কাহিনী

অস্থিরতা এখন চারদিকেই। নৈরাজ্যের হাওয়ায় বিধ্বস্ত আমাদের সমাজ। জীবন। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও তার ঢেউ। আদর্শহীনতার জোয়ার। ভারতীয় সিনেমাতেও সাধারণভাবেই লক্ষ্যহীনতা। দেউলিয়া ভাবনার প্রকাশ। অন্তঃসার শূন্যতা-বিলাসী। মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রযোজক-পরিচালককে বাদ দিলে বেশির ভাগই থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড়েই মশগুল। অভিযাত্রা তাঁদের অর্থহীনতায়। এ'দের মধ্যে না-পাওয়া যায় যেমন সিনেমা-শিল্পের উন্নততর কলাকৌশল, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তেমনি জীবনবোধের গভীরতা।

শ্রীবি নাগি রেড্ডি চলচ্চিত্র জগতে বর্তমানে একটি আলোচিত নাম। বিশিষ্ট একজন প্রযোজক। সম্প্রতি দেখানো হচ্ছে তাঁর ঘর ঘর কি কহানী। তিনটি পরিবারের চিত্র। স্বতন্ত্র মেজাজের। কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিবারের সঙ্গে বাকি দুটি সম্পর্কিত। ঘর ঘর কি কহানী আসলে একালের মধ্যবিত্ত সমাজের পারিবারিক চিত্র। জীবনের ছবি। সুস্থতার চলমান আলেখ্য। সহজ, সরল। উন্নত মানের। নির্ভীকও কিছুটা।

না হোক অনিন্দ্য-সুন্দর, তবু ঘর ঘর কি কহানী প্রযোজক-পরিচালক অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনন্দনযোগ্য। কেন্দ্রীয় চরিত্রকে ঘিরে বর্তমানে ধসে যাওয়া পারিবারিক জীবনে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এ ছবিতে তা সকলেরই প্রশংসা কুড়োবে। আর আদর্শ-প্রতিষ্ঠা কখনোই আরোপিত হয়নি। তাই শংকরনাথরূপী বলরাজ সাহনী কাহিনীর শেষেও কেমন যেন ঘুরে ফিরে বেড়ায় মনের মধ্যে। একালের আদর্শহীনতার সাম্রাজ্যে এই সৃষ্টি সত্যিই এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বিবেকবান শংকরনাথ এ সময়ের অন্ধকারের শিকার, গৃহ-কর্তাদের সান্ত্বনার আশ্রয়। শংকরনাথের স্ত্রীর ভূমিকায় নিরূপা রায় বলিষ্ঠ। মায়ের আদুরে এক চালিয়াৎ বিচ্ছু ছেলের অভিনয়ে জুনিয়ার মেহমুদ যথার্থই অপূর্ব! মহেশকুমার, মাস্টার রিপল, সোনিয়া জাগিরদার, শশিকলা, রাকেশ, ভারতীর অভিনয় চরিত্রানুগ। ওমপ্রকাশ আনন্দদায়ক।

ফটোগ্রাফি থেকে শুরু করে কলা-কৌশলের সমস্ত বিভাগের কাজই পরিচ্ছন্ন। একটি পরিচ্ছন্ন, সুস্থ, সুন্দর, ভিন্ন স্বাদের পারিবারিক ছবি উপহার দেওয়ায় আরেকবার অভিনন্দন জানাই ঘর ঘর কি কহানীর ও প্রযোজক ও পরিচালককে।

এ-সপ্তাহে মুক্তিপ্রাপ্ত ধনিয় মেয়ে ছবিতে জয়া ভাদুড়ী। পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

মঞ্চাভিনয়

মিনার্ভা থিয়েটার কর্মীসংসদের বলিষ্ঠ প্রযোজনা 'প্রবাহ' :

বুকভরে ভালবাসা, আর স্নেহ প্রীতি, মায়া-মমতাঘেরা ছোট্ট একটি ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল বিপ্লবীদের গুপ্ত এক আস্তানায়। কিন্তু বিপ্লবী নায়কের চোখে তখন অন্য আগুনের শিহরণ, বুকে তার রক্তাক্ত সংগ্রামের সমুদ্র। সে বলল, 'অলস মধ্যাহ্নে আমি তোমার চুড়ির আওয়াজ শুনি না, শুনি আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ।' ও বলল ঘর বাঁধার মত অফুরন্ত নিটোল অবসর ওদের নেই, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে ওরা শুধু জীবন-মরণের খেলায় মেতেছে।

অভিভূত হয়ে শুনেছিলাম প্রচন্ড এক নাটামুহূর্তে বিপ্লবীদের সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা। মুহূর্তটি গড়ে উঠেছিল মিনার্ভা থিয়েটার কর্মীসংসদ প্রযোজিত 'প্রবাহ' নাটককে কেন্দ্র করে। প্রথমেই বলে রাখি সুপ্রযোজিত এই নাটকে অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হওয়ার মত অনেক শৈল্পিক মুহূর্ত আছে, যা মিনার্ভায় অভিনীত অনেক মঞ্চসফল নাটকের ঐতিহ্যকে পরিপূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রেখেছে এবং কোথাও-কোথাও প্রয়োগ পরিকল্পনায় স্বাতন্ত্র্যের দীপ্তি এনেছে।

তিরিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম ও ব্যাপকতর আন্দোলন, তারই প্রেক্ষাপটে গড়ে তোলা হয়েছে 'প্রবাহ' নাটকের আবর্তকে। নাটকটির মধ্যে আন্দ

...কি কোন কাহিনী নেই, কিন্তু এই ...ব নাটকের বক্তব্য ও পরিবেশনাকে ...ও নীরস করে তুলতে পারে নি। ...ন্ন সময়ে বিপ্লবের প্রতিধ্বনি ও তার ...থ্য ইতিহাসের কথা উদাত্তকণ্ঠে বলে ...ন সূত্রধার। আর তারই সঙ্গে তাল ...য়ে এগিয়ে চলেছে সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ ...ম। নাটক শেষ হয়েছে একটি দৃপ্ত ...—অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে ...র আন্দোলনের প্রবাহ চলবে এগিয়ে ...ন না লক্ষ্যে পৌঁছান যায়।

...প্রবাহ' নাটকটিতে হয়তো প্রত্যক্ষভাবেই ...নীতির কথা আছে, কিন্তু সেই 'ইজম' ...বগকে কোথাও এতটুকু ব্যাহত করার ...পরিবেশ তৈরী করে নি। তার কারণ ...বীর চরিত্রগুলো শুধু বিপ্লবের শক্ত ...কথাই বলে নি, সোচ্চারে সংগ্রামের ...বলতে গিয়ে মাঝে-মাঝে নীরবে ...নিজেদের মনের কাছে বলেছে ...প্রীতি, ভালবাসা আর দুর্বলতার ...এই দুই মানসিকতার সুষ্ঠু ...হই এসেছে এই চরিত্রগুলোর ...তা আর মানবিকত্ব। তাই তো দেখি ...পীয়ন ক্লাব' আক্রমণের পূর্বমুহূর্তে ...নেতা ভাবছে—এই ক্লাবে এই মুহূর্তে ...অনেকেই আছেন, যাঁরা কাল ভোরেই ...পথে পা বাড়াবেন; হয়তো এঁদের ...কারও জন্য অপেক্ষা করছে কোন ...না। কঠিন, হৃদয়হীন সংকল্প ...র আগে হৃদয়ের দুর্বলতার কয়েকটি ...র সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ার জন্য ...চরিত্রগুলো যেমন মানবিক হয়ে ...তেমনি সামগ্রিকভাবে নাট্য সৃষ্টি ...'প্রবাহ' বেশ কিছু তাৎপর্যের ...দিয়েছে। এর জন্য নাট্যকার অমিতাভ ...নিঃসন্দেহে সাধুবাদ পাবেন। ...রচনায়ও তাঁর মুন্সিয়ানা প্রশংসার ...রাখে।

...র আসল প্রযোজনা কল্পনার ...এ ব্যাপারে যে দুজন প্রথমেই ...সূক্ষ্ম শিল্পবোধের জন্য নাট্যানু...র অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দাবী করতে ...তাঁরা হলেন ইন্দ্রজিৎ সেন ও সুজিত ...নাটকটিকে নতুন রীতিতে পরি-...ব্যাপারে তাঁদের নিঃসীম আন্ত-...ও অবিচল নিষ্ঠা নিঃসন্দেহে ...প্রযোজনাটিকে এক উজ্জ্বল ...চিহ্নিত করেছে।

...র বিভিন্ন দিককেই ব্যবহার করা ...নাটকীয় ঘটনাকে মুখর ও শৈল্পিক ...জন্য। বিপ্লবী রজতের তিরিশ ...একটি ঘর, আর সত্তর দশকের ...জেলখানার গারদকে প্রায় একই সঙ্গে ...জায়গায় দেখান হয়েছে এবং রজতদের ...লাপ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই ...র বাইরে ও ভিতরে কথোপকথন-...ও ছেড়ে মঞ্চের নীচের দিকে নেমে ...এক আশ্চর্য মঞ্চকৌশল। তাছাড়া ...ন্টারের ওপরে প্রচণ্ডতম অত্যা-...শোকে মঞ্চের পিছনে অদ্ভুতভাবে ...মার অন্ধকারের সমন্বয়ে জীবন্ত

করে তোলা হয়েছে। তেমনি শৈল্পিক পরিমিতিবোধ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটি ছোট্ট কক্ষের শুধুমাত্র একটি জানালা দিয়ে বিচারকের রায় দেওয়া, আর ঠিক তার পাশে ছোট্ট দুটি জানলা দিয়ে অপেক্ষমান জনতার প্রতিবাদধ্বনিতে। সমস্ত আভাসই এসেছে, অথচ মঞ্চের ওপর জাঁকজমকপূর্ণ কোন কোর্টের দৃশ্য করতে হয় নি। ইউ-রোপীয়ান ক্লাবের চার ধারের পরিবেশটা আশ্চর্য নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বিশেষ করে আলোর ছোঁয়ায়। ক্লাবের পিছনের দিকে রেললাইন, তার ও রেল-গাড়ী চলে-যাওয়া প্রভৃতি প্রতিটি জিনিসই হয়েছে একেবারে স্পষ্ট। ট্রেন চলে গেছে, তার শব্দ, তলার চাকাগুলোকে পর্যন্ত দেখা গেছে; চলমান ট্রেনের এই নিখুঁত প্রকাশ খুব বেশী চোখে পড়ে না। এ ব্যাপারে আলোকসম্পাত আর ধ্বনি নিয়ন্ত্রণে অসাধারণ শৈল্পিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে-ছেন মিনার্ভার শিল্পীগোষ্ঠী। আবহ-

সঙ্গীত-পরিকল্পনাও উচ্চাঙ্গের হয়েছে। তবে নাটকের কোন এক মুহূর্তে দেশাত্মবোধক একটি গানের ব্যবহার বোধ হয় সঙ্গতভাবেই করা যেতো।

তিরিশের দশক অধ্যায়ে অভিনয়ের ব্যাপারে যাঁর নৈপুণ্যের কথা সবার আগে উল্লেখ করা প্রয়োজন তিনি হলেন ইন্সপেক্টর হারান সোমের চরিত্রাভিনেতা হিমাংশু দাস। অদ্ভুত হাল্কাভাবে চরিত্রটির নির্দয়তাকে তিনি মঞ্চের আলোয় পরিস্ফুট করে তুলেছেন। 'ভুবন মাস্টার' ও 'সঞ্জীব চৌধুরী'র ভূমিকায়ও ইন্দ্রজিৎ সেন ও সুজিত গুপ্ত অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করতে পেরেছেন। একটি নীরব, সংবেদনশীল চরিত্র 'আলো', আশা সেনের অভিনয়ে প্রাণ পায়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, এই বিশেষ চরিত্রটির আরো একটু ব্যাপ্তি পাওয়া উচিত ছিল। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন মিহির দাশগুপ্ত (আজিজুল), সুনীল চ্যাটার্জি (রজত), সন্তোষ ভট্টাচার্য (নলিনী), দুলাল মিত্র (মুস্তান), সচ্চিদানন্দ মুখার্জি (সত্যব্রত), রমেন সাহা (নীলকান্তবাবু), দেবাংশু ভট্টাচার্য (মনীমাধববাবু), দিলীপ ব্যানার্জি (রজতের বাবা), প্রমোদ দে (ডি-এস-পি), আরতি ঘোষ (রজতের মা)।

সত্তরের দশক অধ্যায়ে বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন অমল চক্রবর্তী (সৌমিত্র), কৃষ্ণা ভট্টাচার্য (সৌমিত্রের মা), পান্না ভট্টাচার্য, প্রশান্ত রায়, অশোক চক্রবর্তী, অশোক দাশগুপ্ত।

সবশেষে বলি, মিনার্ভা থিয়েটারে পরিবেশিত বলিষ্ঠ বক্তব্যপ্রধান নাটকের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে বেশ কিছু উৎসাহী তরুণ যে দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁদের সর্বতোভাবে সাহায্য করা নাট্যানুরাগীদের উচিত। একটি কথা তো দ্বিধাহীনভাবে সত্য যে, 'প্রবাহ' একটি সুপ্রযোজিত বলিষ্ঠ নাটক। একথা স্মরণে রেখে বা এই মন্তব্যের সত্যাসত্য যাচাই করার জন্যই মিনার্ভা থিয়েটারের প্রতিটি দর্শক আসন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠা প্রয়োজন। এতে বাংলার নাট্য-ঐতিহ্যই সমৃদ্ধতর হবে।

রবীন্দ্রসদনে 'শাপমোচন'

রবীন্দ্রসদনে গেল শনিবার ৫ই জুন সন্ধ্যায় সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচন' সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। সব শিল্পীই নিজ নিজ ভূমিকায় উচ্চমান বজায় রাখেন। বনানী ঘোষের গান মনে রাখবার মত। ধীরেন বসু উদাত্ত-মধুর কণ্ঠে গান গেয়ে প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

অরুণেশ্বরের ভূমিকায় শক্তি নাগ এর নৃত্যে তাঁর সুনাম বজায় রেখেছেন। আরতি মজুমদার কমলিকার ভূমিকায় কথাকলি ও ভরতনাট্যমের সুষম পরিবেশন দর্শকদের মন হরণ করেন। নরেশকুমার, অলকানন্দ চাকলাদার এবং সুমিত্রা মিত্রের নৃত্যের মান প্রশংসনীয়, উল্লেখযোগ্য। নৃত্য-নাট্যের কিছু অংশে কেমন যেন শ্লথ। তাহলেও বনানী ঘোষের গান ও আরতি মজুমদারের নৃত্য অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। গণেশ সিংহের সুযোগ্য পরিচালনা ও প্রযোজনায় অনুষ্ঠানটি সামগ্রিকভাবে রসোত্তীর্ণ এবং উপভোগ্য হয়েছিল।

'সুন্দরম' পরিবেশিত 'খাঁচা'র পুনরাভিনয় : সুন্দরমের শিল্পীরা তাঁদের মঞ্চসফল নাটক 'খাঁচা'র পুনরাভিনয়ের আয়োজন করেছেন আগামী ২৫শে জুন সন্ধ্যায় মুক্ত-অঙ্গনের মঞ্চে। নাট্যকার পার্থপ্রতিম চৌধুরীই নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন। আলোকসম্পাত, মঞ্চসজ্জা আর ধ্বনিনিয়ন্ত্রণে আছেন অমল রায়, সুরেন চক্রবর্তী, ও হিমাদ্রি ভট্টাচার্য।

বিশ বছর আগে : রায়গঞ্জ হাসপাতাল স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা সম্প্রতি স্থানীয় ইনস্টিটিউট হলে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'বিশ বছর আগে' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করলেন। নাটকটির কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে নৈপুণ্যের পরিচয় রাখেন মোহনচন্দ্র খাঁ, সুনীল সিদ্ধান্ত, সদানন্দ কারক, কানন বিশ্বাস, শ্যামলী মাঝি, শোভা মুখোপাধ্যায়।

বিবিধ সংবাদ

'ধনিয়া মেয়ে'র শুভমুক্তি

আজ থেকে শ্রীপ্রোডাকসন্সের ধনিয়া মেয়ে দেখানো হচ্ছে উত্তরা, উজ্জ্বলা, পূরবী, পদ্মশ্রী অশোকা, শ্যামাশ্রী প্রভৃতি বিভিন্ন চিত্রগৃহে। চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত এছবির মধ্যবয়সী নায়ক এক সময় ছিলেন নামী-দামী ফুটবল খেলোয়াড়। বয়সের ভারে খেলা ছেড়ে দিয়েছেন অনেক দিন আগেই, কিন্তু ছাড়তে পারেন নি তাঁর জাত-খেলোয়াড়ি মনোভাব। উত্তমকুমার অভিনয় করছেন এই নায়কের ভূমিকায়। এরই সঙ্গে মিশে গেছে আর এক ডানপিটে মেয়ের কাহিনী। মনসার কাহিনী। এই ভূমিকায় দেখা যাবে জয়া ভাদুড়ীকে। অন্যান্য শিল্পীর মধ্যে রয়েছেন সাবিত্রী, পার্থ, জহর, তরুণ, তপেন, রবি, অনুভা। সুরে রয়েছেন নচিকেতা ঘোষ। পরিচালক হলেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।

হাতী মেরে সাথী

এম-এ থিরুমুগম পরিচালিত এবং লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল সুরারোপিত দেবর ফিল্মস-এর [illegible] রঙীন ছবি হাতী মেরে সাথী মুক্তি পাচ্ছে প্যারাডাইস, রিগ্যাল, [illegible], [illegible], [illegible], মৃণালিনী প্রভৃতি চিত্রগৃহে। অভিনয়ে আছেন রাজেশ খান্না, তনুজা, [illegible] সুজিতকুমার, জুনিয়র মেহমুদ এবং [illegible] অনেকে।

'তরুণ সংঘের' রবীন্দ্র জয়ন্তী

বেহালা, [illegible] 'তরুণ সংঘের' শিশু সভ্যেরা রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে, ২৫শে বৈশাখ সন্ধ্যায়, আবৃত্তি প্রতিযোগীতার আয়োজন করে। সভাপতি ছিলেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার এবং বিচারক ছিলেন শ্রী[illegible] চক্রবর্তী। উদ্বোধন সঙ্গীত গান [illegible] চ্যাটার্জি। আবৃত্তি প্রতিযোগিতা শিশু ও কিশোরদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও আনন্দের সঞ্চার করে। আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নরূপ : 'ক' বিভাগে প্রথম রজত ভট্টাচার্য, দ্বিতীয়—মিন্টু চৌধুরী। 'খ' বিভাগের প্রথম—টিংকু ভট্টাচার্য, দ্বিতীয়—পার্থ গাঙ্গুলী, তৃতীয়—মেনী দাস। 'গ' বিভাগে প্রথম প্রহ্লাদ দাস, দ্বিতীয়—কল্যাণ দাস ও তৃতীয়—মঙ্গল চ্যাটার্জি।

'বিসর্জন' ও 'কালের যাত্রা' মঞ্চাভিনয়

রসপুর (হাওড়া) বহুমুখী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ গত ২৭শে মে রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অতি সাফল্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' ও 'কালের যাত্রা' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করেন। নাটক দুটির প্রয়োগ পরিকল্পনা ও নির্দেশনা প্রশংসনীয়। নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন নিমাই মান্না ও সুনীল মিত্র। মঞ্চস্থাপত্যে ছিলেন শীতল নন্দ।

খেলার কথা

একদিন অন্য আসরে

অজয় বসু

ব্রিগেডিয়ার আর বি চোপরা এবং জনাব এ সিদ্দিকি দুনিয়ার সবাইকে গলফ খেলা শেখাবেন বলে উঠে-পড়ে লেগেছেন। কিন্তু হাতের কাছে তেমন আগ্রহী শিক্ষার্থী কই। তাই বুঝি আমাদের মতো গলফে-আনাড়ি জনকয়েক সাংবাদিককে ধরে নিয়ে গেলেন গলফ খেলার বড় মাঠেই।

অবসৃত ব্রিগেডিয়ার ভারতীয় গলফ ইউনিয়নের সভাপতি। আর তরুণ সিদ্দিকি ওই সংস্থারই কর্মনিষ্ঠ সম্পাদক। পদের পরিচয় থেকেই বোঝা যায় যে, এদেশে গলফের ভবিষ্যৎ ঘিরে ভাবনার কতোবড় বোঝা ও'দের কাঁধে এসে চেপেছে। সে বোঝার ভার যে ঠিক কতোটা তা অন্যে বুঝুক বা না বুঝুক তাতে ও'দের কিই বা আসে যায়! দায়িত্বের সেই গুরুভার বোঝাটি ও'রা কিন্তু স্বেচ্ছায় নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে রাজী রয়েছেন।

ব্রিগেডিয়ারের ধারণা, চেষ্টা করলে অনেককেই গলফের মাঠে টেনে আনা যায়। আজ হয়তো গলফের আবেদন আমাদের দেশে মুষ্টিমেয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় এই আবেদন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ব্রিগেডিয়ারের বিশ্বাস, একদিন ক্রিকেট, টেনিসও ছিল নামমাত্র কজনের খেলা, কিন্তু আজ ক্রিকেট-টেনিসের আকর্ষণ আগের অনুপাতে অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়েছে। ও'র ধারণা আমাদের ধারণায় রূপান্তরিত করতে ব্রিগেডিয়ার জাপানের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বল্লেন, প্রাক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে জাপানে গলফ খেলোয়াড়ের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েকশ'। কিন্তু আজ সে দেশে লাখে লাখে মানুষ গলফ স্টিক হাতে নিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জাপানে যতো লোক গলফ খেলে একমাত্র আমেরিকা ছাড়া ততো খেলোয়াড় পৃথিবীর আর কোথায়ও নেই। জাপান তো এশীয় খন্ডেরই একটি অঞ্চল। জাপানে যদি গলফ খেলার আদর কদর চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে থাকে তাহলে ভারতেই বা তা বাড়বে না কেন?

গলফের প্রতি ব্রিগেডিয়ারের অনুরাগ, গলফের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর গভীর প্রত্যয় এবং গলফ ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে তাঁর দায়িত্বের কথা স্মরণ রেখে ও'র প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইনি। কিন্তু ওই প্রশ্নের একটি সঠিক জবাব খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল না। আমেরিকা, জাপান বা এগিয়ে যাওয়া আরও কটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শক্ত বনেদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আর আমরা জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই হিমসিম খাচ্ছি। গলফ খেলতে হলে, মানে খেলার মতো খেলতে যে আর্থিক [illegible] দরকার ভারতীয় জনজীবনে তার অস্তিত্ব কোথায়! গলফের একটি বল যোগাড় করতেই নটি টাকা বেরিয়ে যায় আর বিধিসম্মত পদ্ধতিতে গলফ খেলতে হলে একটি বলেও কাজ হয় না, দরকার পড়ে গুটিকয়েক বলের। মাঝমাঠে খানা-ডোবায় বা গজিয়ে ওঠা বড় বড় ঘাসের জঙ্গলে একটি বল আত্মগোপন করলে সেটিকে খুঁজে পেতে যে উদ্ধার করে আনে তার নাম 'ক্যাডি' (বল-বয়?)। খেলতে খেলতে একজনের নানান ধরনের হাতিয়ারের (গলফ স্টিক, ক্রিকেটে যেমন ব্যাট, টেনিসে যেমন র‍্যাকেট) প্রয়োজন ঘটে। কখনো উঁচু করে বল তুলতে হয় কখনো বাঁক ফিরিয়ে, কখনো কোণাকুনি আবার কখনো বা বল ঠেলতে হয় গড়িয়ে। রকমারি মার মারার জন্যে হরেক রকম হাতিয়ার। ডজন দেড়েক স্টিক বস্তায় বেঁধে সেগুলি বহন করে চলে যে সে ওই 'ক্যাডি'ই। খেলোয়াড়ের অনুগমনে যে মেহনত করে তাকেও প্রতিদিন কিছু দিতে হয়। তাছাড়া এক বস্তা স্টিক কিনতেই তো হাজার খানেক কাঞ্চন মুদ্রা উপুড়হস্ত করতে হয়। এতো খরচ কটি লোক করতে পারে? যারা পারে তারাই আজ গলফ খেলছে। ভবিষ্যতেও খেলবে। তাই গলফ কোনোদিনই ফুটবলের মতো জনক্রীড়ার ভূমিকা নিতে পারবে না। তবে এ খেলার জনপ্রিয়তা বাড়বে না, একজনের দেখাদেখি আরও দশজনে এসে গলফ মাঠের ধারে জমায়েৎ হবেন না এমন গোঁড়া মত আঁকড়ে ধরে কূপমন্ডূক সেজে থাকাও বোধহয় ঠিক নয়। কারণ, ভারতীয় গলফ ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পর গত পনেরো বছরে ভারতে গলফ খেলার প্রসার অনেকটা বেড়েছে। বছর পনেরো আগে সারা ভারত চষে বেড়ালেও শ'খানেক খেলোয়াড়ের দেখা মিলতো কিনা সন্দেহ। আজ হাত বাড়ালেই হাজার পাঁচেক খেলোয়াড়কে, মায় বেশ কিছুসংখ্যক মহিলাকেও পাওয়া যাবে। অনেক ব্যবসায়ী সংস্থার প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতেই অধুনা গলফের বড় আসরও বসছে, যে সব আসরে বিশ্বের প্রথম সারির পেশাদারেরাও এসে যোগ দিচ্ছেন। জনকয়েক ভারতীয় ইতিমধ্যে গলফে তাঁদের হাত ভালভাবেই পাকাতে পেরেছেন। একজনের নাম (বিলু শেঠি) তো এখনই মনে পড়ছে। শেঠি বিশ্বের প্রধানতম অপেশাদার প্রতিযোগিতায় (আইজেনহাওয়ার কাপ) যোগ দিয়ে বিশ্বের ষষ্ঠ শ্রেষ্ঠের স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন। শুনেছি, বিলু শেঠির পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে সমান তালে যুঝতে পারেন এমন কজন খেলোয়াড়ও ভারতে আছেন।
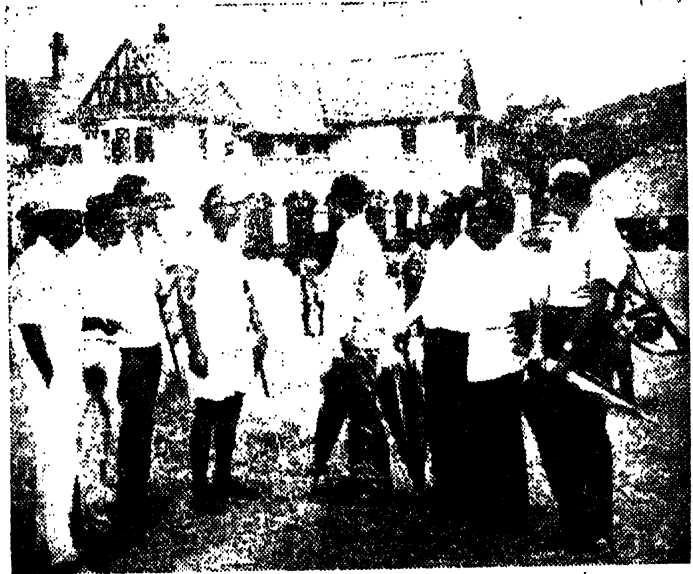
রয়াল ক্যালকাটা গলফ ক্লাবের সীমানায় ভারতীয় গলফ ইউনিয়নের সভাপতি ব্রিগেডিয়ার আর বি চোপরা সাংবাদিকদের সঙ্গে গলফের বিষয় আলোচনা করছেন। [illegible]

তাঁরা খেলেন। নাম পান, সেই সঙ্গে মজাও। এই মজাই হলো গলফের আসল ঐশ্বর্য। কথাটি সব খেলার ক্ষেত্রেই খাটে। মজাদার উপকরণ যদি খুঁজে না পাওয়া যেতো তাহলে কেউ কি কোনোদিন মাঠমুখো হতে চাইতো? মজার টানেই মানুষ মাঠে নেমেছে। তারপর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মেজাজে মাঠের চরিত্র বদলেছে এবং শেষ পর্যন্ত পেশাদারী ব্যবস্থায় সেই পরিবর্তন হয়েছে সুনিশ্চিত। কবে এক স্কটিশ রাখাল (ভিন্ন-মতে ওলন্দাজ) গরু চরাতে চরাতে গাছের ডাল ভেঙে কাঠের বল বানিয়ে ডালে-বলে ঠুকঠাক করতে করতে যে মজায় মজেছিল সেই মজার অন্বেষণেই উত্তরকাল সুবিস্তৃত গলফ কোর্সে এখনও হাঁটাহাঁটি করছে। সেদিনে ও আজকে তফাৎ এই যে, আজ নিয়মের বাঁধনে খেলাটি সুনিয়ন্ত্রিত এবং আজ যাঁরা খেলেন তাঁরা নাম পান, কাপ মেডেল, এমন কি আর্থিক পুরস্কারও। এবং অবশ্যই পান মজা, যা পেয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক আমলের ওই রাখাল ছেলেটিও। হোক না গলফ মুষ্টিমেয়ের খেলা তবু তো অনুষ্ঠানটি মজাদার। সব খেলার মূলে যা আছে, গলফেও তাই রয়েছে—মজা।

কেমন মজা? জানতে চান? চলুন না একদিন গলফ কোর্সে। সনির্বন্ধ অনুরোধ ব্রিগেডিয়ার আর সিন্দিকির। এড়াতে পারলাম না। গিয়ে হাজির হলাম টালিগঞ্জের রয়াল ক্যালকাটা গলফ ক্লাবের মাঠে আমরা। আমরা মানে কলকাতার জনকয়েক ক্রীড়া সাংবাদিক।

রয়ালের সীমানা টালিগঞ্জে। টালিগঞ্জের ঘোড়দৌড়ের মাঠের পূর্বদিকে। ট্রাম লাইন ধরে দক্ষিণমুখে এগোলে মাঠটি নজরেই পড়বে না। বাঁদিকে বেঁকে অলিগলি ডিঙিয়ে হঠাৎ রয়ালের মাঠের মুখোমুখি হতেই অবাক বনে যেতে হয়। সামনে সুবিস্তীর্ণ মাঠ, সারা অঙ্গেই তাজা ঘাস। যতোদূরে দৃষ্টি চলে শুধু সবুজেরই সমারোহ, স্নিগ্ধ শ্যামলিমা। চোখ আপনাতেই জুড়িয়ে যায়। ইচ্ছে করেই জমির বেশির ভাগ উঁচু-নীচু করে রাখা হয়েছে। এই জমির অসমান চ্যালেঞ্জ ডিঙিয়ে খেলোয়াড়দের আরও ঘন ঘাসে মোড়া একটি সমান জমিতে গিয়ে পৌঁছতে হয়। সমান জমিটাই হলো লক্ষ্যের শেষ, পরিভাষায় জয়গাটিকে বলা হয় 'গ্রীণ'। গ্রীণই বটে, যেন গাঢ় সবুজ মোড়া একখণ্ড কার্পেট। কার্পেটের মাঝখানে একটি গর্ত। ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে বল এনে স্টিকের এক টোকায় বলটিকে গর্তে ফেলতে পারলেই কেল্লা ফতে! গর্তে বল ফেলার আগে খেলোয়াড়দের খানা খন্দ, ডোবা, জঙ্গল, উঁচু-নীচু জমি পেরিয়ে আসতে হয়। অনেকটা পথ, কোথায়ও ৩৫২ গজ, কোথায়ও বা ৪৮০ গজ। মাপ করা দূরত্ব। পুরো মাঠে এমন আঠারোটি গর্ত আছে। যেখান থেকে খেলা শুরু সেই অঞ্চলের নাম 'টি', মাঝের পথকে বলে 'ফেয়ারওয়ে'। 'টি', থেকে প্রথম গর্তে এবং এক গর্ত থেকে আর এক গর্তে যেতে ক'বার ছড়ি চালাতে হবে সে সম্পর্কে নিয়মের নির্দেশ আছে। মোট ৬৮৭৬ গজে ছড়ানো আঠারোটি গর্ত ছুঁতে বিধিমতে ৭৩ দান স্টিক চালানোর নিয়ম। যিনি নির্দিষ্ট দানের চেয়ে বেশিবার স্টিক ব্যবহার করেন আনুপাতিক হিসেবে তাঁর নম্বর কাটা যায়। সবচেয়ে কমবার স্টিক চালিয়ে যিনি আঠারোটি গর্তে বল ফেলতে পারেন জেতেন তিনিই।

৬৮৭৬ গজ পথ হেঁটে হেঁটেই শেষ করতে হয়। গলফারদের পরোক্ষ ব্যায়াম এইটুকুই। দৌড়ঝাঁপের কোনো প্রয়োজন নেই। কাজেই বেশি বয়স পর্যন্ত গলফ খেলাও যায়। তবে রোদ, বৃষ্টি, জল-ঝড় কোনো কিছুতেই গলফ খেলা বন্ধ করে দেওয়া হয় না, সব রকম আবহাওয়াতেই খেলা চলতে থাকে। তাই পথের বাধার চেয়ে আবহাওয়ার অন্তরায়টিই অনেক সময় খেলোয়াড়দের কাছে বড় হয়ে ওঠে। দুঃসহ গরমের দিনে চাঁদি ফাটা রোদের নীচে খোলা মাঠে হাজার হাজার গজ হেঁটে অতিক্রম করা, খেলায় মনঃসংযোগ রাখা, চ্যালেঞ্জের মুখে ঠাণ্ডা মাথায় কায়দা মাফিক মার মারা—সবেতেই অভ্যস্ত ওই গলফ খেলোয়াড়েরা।

আমাদের অবশ্য এ সব ঝামেলা পোয়াতে হয় নি। চ্যালেঞ্জ তো ছিলই না। স্টিকে-বলে করতে গিয়ে আমাদের আনাড়ির হাত অনেকবারই তো অলিগাই হয়ে গেল। কতোবার বলের বদলে মাটিতে গিয়েই যে হাতের স্টিক ধাক্কা খেয়েছে তাই বা কে জানে। প্রথম প্রথম ওই রকমই নাকি হয়। অন্ততঃ ব্রিগেডিয়ার আর সিন্দিকি তো আমাদের তাই বলেই সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তবে যখন দেখলাম রয়ালের এক পাকা খেলোয়াড় বল ঠেঙাতে গিয়ে দু-দুবার ফসকালেন, স্টিক ঘোরালেন সজোরে, ঘাসের চাপড়া উঠলো কিন্তু বলটি এক ইঞ্চি এধার-ওধার করলো না, তখন বুঝলাম যে নিজেদের অক্ষমতায় আমাদের মতো আনাড়িদেরও লজ্জা পাবার বোধহয় কিছু নেই।

সকাল নটা থেকে বেলা সাড়ে বারোটা—পাক্কা সাড়ে তিন ঘণ্টা রয়ালের গলফ কোর্স চক্কর দিতে দিতেই কেটে গেল। কোথা দিয়ে সময় কাটলো তা তো বুঝতেই পারলাম না। বুঝবো কি করে? মন তখন নতুন খেলার মজায় মজেছে। কিন্তু তাই বা বলি কি করে। পুরানো খেলোয়াড় যাঁরা তাঁদেরও তো ক্লান্তি নেই। ব্রিগেডিয়ার, সিন্দিকি, গলফ-শিখিয়ে পৃথিরাজ সেন এবং আশপাশের আরও কজন পুরুষ ও মহিলা, রয়ালে যাঁদের যাতায়াত নিয়মিত। সবাই তো স্টিক হাতে ঘুরে ফিরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খোলা মাঠে কাটিয়ে দিচ্ছেন। দিনটি ছিল জল-ঝড়ের, জলের চেয়ে ঝড়ের মাতনই বেশি। ঘুরতে ঘুরতে সবাই ভিজলেন। আমরাও কাক-ভেজা। জামা-কাপড় গোল্লায় গেল, জলের ছিটে তীরের মতো চোখে মুখে বিঁধতে লাগলো। তবু কি উৎসাহে কামাই আছে? ব্রিগেডিয়ারের একটি ফুসফুস সীল করা। শরীরের ওই অবস্থা নিয়েও তিনি চক্কর দিলেন সমানে। আমাদের না হয় নতুন নেশা। কিন্তু ওঁর? কে জানে, নেশা পুরানো হলেই বোধহয় জমে ভাল!

রয়াল ক্যালকাটা গলফ কোর্সের আয়তন পৌনে তিনশ একর হবে। সারা মাঠ জুড়ে ঘাসের পুরু গালিচা পেতে রাখতে খরচ কতো পড়ে জানি না। কিন্তু খরচ ছাড়া আরও অনেক সমস্যা আছে। অন্য জগতের মানুষদের, বিশেষতঃ রাজনীতিকদের নজর পড়েছে রয়ালের খোলা জমির ওপর। রাজনীতিকদের দৃষ্টির ছোবল এড়িয়ে কতোদিন রয়ালের গলফ মাঠ স্বমহিমায় থাকতে পারবে কে জানে! তবে আশপাশের বেশ কজন 'ক্যাডি' হিসেবে গলফ মাঠে কাজ করেন বলেই রাজনীতিক উস্কানি এখনও কোনো আন্দোলনের চেহারা নিতে পারে নি। যেদিন সে চেহারা নেবে সেদিন রাজনীতিক প্যাঁচ প্রয়োগের চাপে রয়ালের গলফ মাঠেরও নাভিশ্বাস যে উঠবে তাতে কোনো সন্দেহই নেই। রাজনীতিকদের নজর এড়াতে পারে নি বলেই ক্রিকেট উদ্যান ইডেন আজ ফুটবল মাঠে রূপান্তরিত হতে চলেছে। সে দৃষ্টি থেকে গলফ মাঠের মুক্তি যদি না মেলে তাহলে রাজনীতিক জবর দখলের কল্যাণে রয়ালের কোর্সে কি যে ঘটতে পারে তা কে জানে!

রয়ালের সদস্যদের মাসে চল্লিশ টাকা, বছরে ৪৮০ টাকা চাঁদা দিতে হয়। ব্রিগেডিয়ার আর সিন্দিকির ধারণা সদস্য সংখ্যা বাড়লে চাঁদার হারও কমে যাবে। কিন্তু সে তো ভবিষ্যতের কথা। বর্তমানে বার্ষিক ৪৮০ টাকা চাঁদা দিয়ে, খেলার সাজ-সরঞ্জাম যোগাড়ে হাজার খানেক কি তারও বেশি টাকা খরচ করে এবং আরও কিছু আনুসঙ্গিক ব্যয় বহন করে এদেশে কজন গলফ খেলার শখ নিয়মিত মেটাতে পারেন? গলফ যে এদেশে কেন জনপ্রিয় হতে পারছে না, তার মূল কারণ দেশবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থা। কিন্তু রূঢ় সত্যটা আর সেদিন ব্রিগেডিয়ার চোপরা ও সিন্দিকির মুখের ওপর শুনিয়ে দিতে পারি নি। দরকার কি, ও'দের বিশ্বাসে ঘা দেওয়ার? ও'রা গলফকে ভালবেসে গলফের প্রসারে নিষ্ঠাভরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দেখাই যাক সে চেষ্টার কাজ কতো দূরে এগোয়। আমরা একদিনের শিক্ষানবীশ, আদার ব্যাপারী। কাজ নেই, আমাদের জাহাজের খবরদারীতে।

খেলাধূলা

দর্শক

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (জুন ৭—১২) কলকাতার বিভিন্ন মাঠে আই এফ এ পরিচালিত প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার যে ১৭টি খেলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ফলাফল ঃ জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে ১৬টি খেলায় এবং একটি খেলা ড্র।

আলোচ্য সপ্তাহে কলকাতার মাঠের তিন প্রধান দল—ইস্টবেঙ্গল (গত বছরের চ্যাম্পিয়ান), মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং তাদের খেলায় পুরো পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান দুটো করে ম্যাচ খেলেছে, অপরদিকে মহমেডান স্পোর্টিং খেলেছে একটা। বর্তমানে লীগ তালিকায় তাদের পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে ঃ মোহনবাগানের ৬টা খেলায় ১২ পয়েন্ট, মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ৭টা খেলায় ১২ পয়েন্ট এবং ইস্টবেঙ্গলের ৫টা খেলায় ১০ পয়েন্ট। পোর্ট কমিশনার্স ৭টা খেলায় ১২ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তিন প্রধানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। তাছাড়া তারা ৭—০ গোলে কুমারটুলীকে পরাজিত করে এ মরসুমে সর্বাধিক গোল দেওয়ার রেকর্ড করেছে।

•

আলোচ্য সপ্তাহের খেলায় এই তিনজন খেলোয়াড় 'হ্যাটট্রিক' করেছেন—পোর্ট কমিশনার্স দলের তপন দাস (বিপক্ষে কুমারটুলী), মোহনবাগানের প্রণব গাঙ্গুলী (বিপক্ষে টালীগঞ্জ অগ্রগামী) এবং রাজস্থানের অমিয় ভট্টাচার্য (বিপক্ষে বালী প্রতিভা)। ১৯৭১ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় প্রথম 'হ্যাটট্রিক' করার গৌরব লাভ করেন পোর্ট কমিশনার্স দলের তপন দাস। তাঁর 'হ্যাটট্রিক' করার দিনেই মোহনবাগানের প্রণব গাঙ্গুলী 'হ্যাটট্রিক' করেন, মাত্র কয়েক মিনিট ব্যবধানে।

ইংল্যান্ড সফর তালিকা

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ১৯৭১ সালের ইংল্যান্ড সফর তালিকা নীচে দেওয়া হল।

খেলার তারিখ	বিপক্ষে
জুন ২৩-২৫	মিডলসেক্স
" ২৬-২৯	এসেক্স
" ৩০- ২ জুলাই	ডি এইচ রবিন্স
জুলাই ৩- ৬	কেন্ট
" ৭- ৯	লিসেস্টারসায়ার
" ১০-১৩	ওয়ারউইকসায়ার
" ১৪-১৬	গ্লামর্গান
" ১৭-২০	হ্যাম্পসায়ার
" ২৮-৩০	মাইনর কাউণ্টিজ
" ৩১-১ আগস্ট	সারে
আগস্ট ১১-১৩	ইয়র্কসায়ার
" ১৪-১৭	নটিংহামসায়ার
" ২৫-২৭	সাসেক্স
" ২৮-৩০	সামারসেট
সেপ্টেম্বর ১-৩	ওরসেস্টারসায়ার

টেস্ট ম্যাচ

১ম টেস্ট (লর্ডস) ঃ জুলাই ২২-২৭
২য় টেস্ট (ওল্ড ট্রাফোর্ড) ঃ আগস্ট ৫-১০
৩য় টেস্ট (ওভাল) ঃ আগস্ট ১৯-২৪

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মহমেডান স্পোর্টিং বনাম হাওড়া ইউনিয়ন দলের খেলার একটি দৃশ্য। হাওড়া ইউনিয়নের গোলরক্ষক বলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মহমেডান স্পোর্টিং দলের বিমান লাহিড়ীকে গোল দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন। খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং ২-০ গোলে জয়ী হয়।

ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান

এজবাস্টনে আয়োজিত ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। ইংল্যান্ডের খুব কপাল ভাল যে, বৃষ্টির ফলেই তারা পরাজয় থেকে এ-যাত্রা রক্ষা পেয়েছে।

পাকিস্তান টসে জয়ী হয়ে ব্যাটিংয়ের দান প্রথম নেয়। প্রথম দিনের খেলায় পাকিস্তান প্রথম ইনিংসের মাত্র একটা উই-কেট খুইয়ে ২৭০ রান সংগ্রহ করেছিল। ২য় উইকেটের জুটিতে ২০২ রান তুলে জাহির আব্বাস (নট আউট ১৫৯ রান) এবং মুস্তাক মহম্মদ (নট আউট ৭২ রান) অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তানের ১ম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৬০২ (৭ উইকেটে)। জাহির আব্বাস ২৭৪ এবং মুস্তাক মহম্মদ ১০০ রান করে আউট হন। তারা ২য় উই-কেটের জুটিতে দলের ২৯১ রান তুলে-ছিলেন। জাহির আব্বাসের ২৭৪ রান, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সরকারী টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় পাকিস্তান খেলোয়াড়দের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের নতুন রেকর্ড। পূর্ব রেকর্ড ছিল ঃ ১৮৭ রান (হানিফ মহম্মদ, লর্ডস, ১৯৬৭)

তৃতীয় দিনে পাকিস্তান মাত্র এক ওভার বল খেলে তাদের ৬০৮ রানের মাথায় (৭ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। আসিফ ইকবালকে তাঁর শতরান পূর্ণ করতে দেওয়ার উদ্দে-শ্যেই পাকিস্তান তৃতীয় দিনে ব্যাট করতে নেমেছিল। দ্বিতীয় দিনে ইকবাল ৯৮

স্থান করে অপরাজিত ছিলেন এবং তৃতীয় দিনেও তিনি অপরাজিত থাকেন ১০৪ রান করে।

তৃতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ইংল্যান্ড তাদের ১ম ইনিংসের ৭টা উইকেট খুইয়ে ৩২০ রান সংগ্রহ করেছিল—ইংল্যান্ড তখনও পাকিস্তানের ১ম ইনিংসের ৬০৮ রানের থেকে ২৮৮ রানের পিছনে ছিল। অপর দিকে ফলো-অন থেকে ছাড়ান পেতে ইংল্যান্ডের আরও ৮৯ রানের প্রয়োজন ছিল। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ১২৭ রানের মাথায় ৫ম এবং ১৪৮ রানের মাথায় ষষ্ঠ উইকেট পড়ে যায়। অ্যামেস নট ১১৪ রান করে নট আউট থাকেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে না খেললে দলের অবস্থা আরও খারাপ দাঁড়াতো।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস ৩৫৩ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ২৫৫ রানের পিছনে পড়ে 'ফলো-অন' করতে বাধ্য হয়। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ১৮৪ (৩ উইকেটে)। খেলার এই অবস্থায় ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে ইংল্যান্ডের আরও ৭১ রানের দরকার ছিল। হাতে জমা ছিল ৭টা উইকেট।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে বৃষ্টির জন্যে পুরো সময় খেলা হয়নি—মাত্র ৫৪ মিনিট। ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংসের ২২৯ রানের মাথায় (৫ উইকেটে) খেলাটি পরিত্যক্ত হয়। লকহার্স্ট ১০৮ রান করে অপরাজিত থাকেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান : ৬০৮ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। জাহির আব্বাস ২৭৪, আসিফ ইকবাল ১০৪ এবং মুস্তাফ মহম্মদ ১০০ রান। ইলিংওয়ার্থ ৭৩ রানে ৩ এবং ডি' ওলিভিয়েরা ৭৮ রানে ৩ উইকেট)।

ইংল্যান্ড : ৩৫৩ রান (নট ১১৬ এবং ডি' ওলিভিয়েরা ৭৩ রান। আসিফ মাসুদ ১১১ রানে ৫ এবং পার্ভেজ ৪৬ রানে ৩ উইকেট) ও ২২৯ রান (৫ উইকেটে। লকহার্স্ট নট আউট ১০৮ রান)।

বছর	প্রথম শ্রেণীর খেলার ফলাফল				সমস্ত খেলার ফলাফল			
	খেলা	জয়	ড্র	হার	খেলা	জয়	ড্র	হার
১৯১১	১৪	২	২	১০	২৩	৬	২	১৫
১৯৩২	২৬	৯	৯	৮	৩৬	১৩	১৪	৯
১৯৩৬	২৮	৪	১২	১২	৩১	৫	১৩	১৩
১৯৪৬	২৯	১১	১৪	৪	৩৩	১৩	১৬	৪
১৯৫২	২৯	৪	২০	৫	৩৪	৬	২৩	৫
১৯৫৯	৩৩	৬	১৬	১১	৩৫	৭	১৭	১১
১৯৬৭	১৮	২	৯	৭	১৯	২	১০	৭
মোট :	১৭৭	৩৮	৮২	৫৭	২১১	৫২	৯৫	৬৪

অধিনায়ক : ১৯১১ পাতিয়ালার মহারাজা, ১৯৩২ পোরবন্দরের মহারাজা, ১৯৩৬ ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা, ১৯৪৬ পতৌদির নবাব (ইফতিকার আলী), ১৯৫২ বিজয় হাজারে, ১৯৫৯ ডি কে গাইকোয়াড়, ১৯৬৭ পতৌদির নবাব (মনসুর আলী)।

দ্রষ্টব্য : ১৯১১ সালের সফর বে-সরকারী। পরবর্তী সফরগুলি সরকারী। ইংল্যান্ড সফরে ভারতবর্ষ ১৭টি কাউন্টি ক্রিকেট দল, ইংল্যান্ড, অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত ইংল্যান্ড, ওয়ারউইকসায়ার এবং ইয়র্কসায়ার দলের বিপক্ষে জয়লাভ করতে পারেনি।

ফ্রেঞ্চ টেনিস প্রতিযোগিতা

আন্তর্জাতিক টেনিস মহলে যে চারটি টেনিস প্রতিযোগিতা প্রধান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে তাদের মধ্যে ফ্রেঞ্চ টেনিস প্রতিযোগিতা অন্যতম। ১৯৭১ সালের ফ্রেঞ্চ টেনিস প্রতিযোগিতার চেকোস্লোভাকিয়ার কোডেস পুরুষদের সিঙ্গলস এবং অস্ট্রেলিয়ার ১৯ বছরের অশ্বেতকায়া মহিলা খেলোয়াড় কুমারী গুলাগং মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছেন।

উত্তর

গত ৫ম সংখ্যায় (জুন ৪, ১৯৭১) প্রকাশিত 'স্পোর্টস কুইজ'-এর উত্তর :

(১) ফুটবল, ভলিবল এবং বাস্কেটবল খেলা ছাড়াও বলের ব্যবহার আছে ফিল্ড হকি, আইস হকি, ফিল্ড হ্যান্ডবল, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, টেবল টেনিস, পোলো, ওয়াটার পোলো, রাগবি, বিলিয়ার্ডস, স্নুকার, পুলবল, সোটোবল, গলফ প্রভৃতি খেলায়।

(২) ১৯২৪ সালে অলিম্পিক লং জাম্পে প্রথম স্থান লাভের সূত্রে উইলিয়াম ডে হার্ট হাবার্ড (আমেরিকা) নিগ্রোদের মধ্যে সর্বপ্রথম স্বর্ণপদক জয়ের গৌরব লাভ করেন।

(৩) ১৯৬০ সালের ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান সংখ্যা সমান (৭৩৭) দাঁড়ায়। সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এই রকম 'টাই' ম্যাচের নজির দ্বিতীয় নেই।

(৪) ববি রিগস, ১৯৩৯ সালে।

(৫) নিগ্রোদের মধ্যে হেভীওয়েট বিভাগের মুষ্টিযুদ্ধে সর্বপ্রথম বিশ্ব খেতাব লাভ করেন জ্যাক জনসন (আমেরিকা), ১৯০৮ সালে।

(৬) ব্রেক কথার ব্যবহার—বক্সিং, স্নুকার, বিলিয়ার্ড এবং ক্রিকেট খেলায়।

চিঠিপত্র

ভরদ্বাজ বংশ প্রসঙ্গে

১৩ই জ্যৈষ্ঠের 'অমৃত'-এ শ্রীসলিল-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্ঞানগর্ভ 'আলোচনা' পড়ে প্রীত ও আনন্দিত হলাম। তিনি যেভাবে ভরত পাখি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন তাতে তাঁর অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ। সলিলবাবুর মনের কিছু সন্দেহ ও সংশয় দূর করার জন্যে নিবেদন করছি।

আমাদের দেশে কোনও কবি, কি পুরাকালে কি আধুনিক যুগে, মাঠে-ঘাটে ঘুরে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে কি কবিতা লিখেছেন? আমার তো মনে হয় না। পল্লী প্রকৃতির কাছে বা মাঝে গিয়ে ঘরে বা নৌকায় বসেই তাঁরা অপূর্ব কাব্য সৃষ্টি করেছেন। সে কারণে ভরত পাখির দেখা পান নি। ভরতরা দোয়েল পাপিয়া কোকিলের মতো ঘরোয়া পাখিও নয়। থাকে লোকালয় থেকে একটু দূরে উন্মুক্ত আকাশের তলায় কোনও দিগন্ত-ব্যাপী প্রান্তর বা ধান কাটার পর পড়ে থাকা ধান জমিতে যার কাছে বিল বা নদী আছে। ইংলন্ডে 'মেডো' বলে একটি কথা আছে, সেই 'মেডো'র সঙ্গে ভারতের প্রকৃতির কবিদের পরিচয় কম। তাই ভরতপাখির দেখা তাঁরা পান নি। তার গান কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নি। বিলিতি স্কাইলার্কের চেয়ে আমাদের ভরত পাখি কণ্ঠ সম্পদে কিছুটা নিকৃষ্ট হলেও ভারতীয় সাহিত্যে কাব্যের উপেক্ষিতা হয়ে থাকার কারণ নেই।

ভোজনরসিকদের রসনাতৃপ্তি ঘটেছে না জেনে। এর জ্ঞাতি ব্যাঘ্রাটি গণের (কালান-ড্রেলা) বগেরীর (শর্ট টোড লার্ক) সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্য এত নিকট যে অভিজ্ঞ লোক ছাড়া তফাৎ ধরা খুবই শক্ত। বগেরীর ঝাঁকে দু' চারটে ভরত ধরা পড়লেও বগেরী বলে চলে যায়।

আমাদের ভারুই বা ভরতের সঙ্গে বিলিতি স্কাইলার্কের গানে তফাৎ আছে বই কি। কানে শুনি নি। অধীত বিদ্যায় জেনেছি। বেশ কিছুটা মিল আছে বলেই একে বিলাতের লোকেরা নামকরণ করেছিল—স্মল স্কাইলার্ক, ইস্টার্ন স্কাইলার্ক।

স্কাইলার্ক ইংলন্ডের সাধারণ পল্লী-গ্রামের একটি পাখি। ওই পরিবেশে স্কাই-লার্ক হয়তো মুরগীরও আগে উঠে গান শুরু করে। ডিকেন্স, ল্যাম্ব ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ প্রমুখ যখন গান শুনেছেন এবং লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের কাব্যে সাহিত্যে নিবন্ধে সেই যুগের সে-পরিবেশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আজও ইংলন্ডে আছে [illegible] না [illegible] আগে স্কাইলার্ক ডাকে কিনা।

বিলাতে কুকু ডাকে কুক্-উ, দুটো নোট। ভারতীয় কুকু ডাকে—'কুক্-উ কুক্-উ'। চারটে নোট। এই ভারতীয় কুকু'র বাংলা নাম—বৌ কথা কও। কোকিলের ইংরেজি কোয়েল।

ভরতপাখির পিছনের নখর লম্বায় বেশ বড়ো এবং সোজা। একথাটা আমার নিবন্ধে বলেছি। নিশ্চয়ই স্থানাভাবে ভরত-পাখির ছবি 'অমৃত'-এ ছাপা হয় নি। হলে এই বৈশিষ্ট্য সলিলবাবু নিশ্চয়ই দেখতে পেতেন।

গান শুনব বলে ভারদ্বাজ বংশের অন্যান্য গণের পাখি আগিন (সিংগিং বুশলার্ক) ও চন্ডুল-এর (ক্রেস্টেড লার্ক) সঙ্গে ভরতপাখিও পুষেছিলাম। বন্দী-দশায় অন্যান্যদের মতো গান এরা মোটেই শোনায় নি। আসমানে না উড়লে এদের গানের গলা বন্ধ হয়ে যায় বলেই আমার বিশ্বাস। শামা পাখি কাব্যে উপেক্ষিতা নয়, কিন্তু কজন কবি প্রকৃতির মাঝে দেখেছেন? একজনও নয়। শামা গভীর জঙ্গলের পাখি। লোকে দাম দিয়ে কিনে খাঁচায় পুষে গান শোনে। কিন্তু কাব্যে দোয়েলের পাশে শামা নামের ছড়াছড়ি।

স্ক্র্যাপ বা ফিল্ড বুক-এ প্রথম যে পাখিকে প্রকৃতির মাঝে যে অবস্থায় দেখেছি তাই লিপিবদ্ধ করা ছিল। এই প্রবন্ধ বা অন্যান্য যা কিছু লিখেছি তাতে প্রথম অভিজ্ঞতাটার কথাই আছে। সেদিন ওই সকালে শেলীর কবিতাটাই ওদের ওড়া দেখে এবং গান শুনে মনে এসেছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতাটি ভারদ্বাজ বংশটি লেখার সময় মনে এসেছিল, বাস্তবতার জন্যে মনে হয়েছিল শেলীর বদলে ওটাই দিই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিই নি ওই পরিবেশ ওই ছবি তখনকার মনকে ধরে রাখার জন্যে।

অজয় হোম
কলকাতা-১৭

[এই প্রসঙ্গে আর কোনো আলোচনা প্রকাশ করা হবে না। —অ-স)

উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্যের উপাদান প্রসঙ্গে

অমৃতের (৩০ বৈশাখ ১৩৭৮) চিঠি-পত্র বিভাগে শ্রীসুনীল পালের চিঠি পড়লাম। তিনি লিখেছেন—'জব্বলপুর থেকে জনৈক পত্রলেখক জানিয়েছেন, তাঁর সংগ্রহেও উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, ধাঁধা, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদি আছে। জানি না, তিনিও চারুবাবুর গ্রন্থখানি দেখেছেন কিনা।' তদুত্তরে জানাই, 'জনৈক পত্র লেখক' হচ্ছেন সুপ্রবীণ লোক-গীতি-সংগ্রাহক এবং সমালোচক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ। শ্রীদাশ তাঁর পত্রে সেই সব আকর গ্রন্থের উল্লেখ করেছিলেন, যাতে উত্তর-বঙ্গের শুধু লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে সম্যক্ জানা যায়। তিনি সেখানে উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, নৃতত্ত্ব বা সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক কোনও আকর গ্রন্থের উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেন নি।'

শ্রীঅমরজিৎ চক্রবর্তীর প্রবন্ধ দুটি সম্বন্ধে অনেক চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। তাতে প্রশ্ন উঠেছে—ছড়া সংগ্রহে ভুল আছে, রাজবংশীদের মধ্য থেকে কেন ছড়া সংগ্রহ করা হলো, উত্তরবঙ্গের লোক-সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ ব্যাপারে শ্রীচক্রবর্তী একক কৃতিত্বের অধিকারী কিনা, ইত্যাদি। আলোচনা যেভাবে চলেছে তাতে পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে। এ জন্যে লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ সম্বন্ধে মূলকথার আলোচনা করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ সম্বন্ধে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ ৩০ বৎসর পূর্বে 'যুগান্তর' পত্রিকায় (২৭শে আশ্বিন, ১৩৪৫) লিখেছিলেন—

'অতি আধুনিককালে এইসব লোক-সঙ্গীত সংগ্রহের দিকে একটা প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছে। এই লোক-সাহিত্য সংগ্রহ কার্য অতি দায়িত্বপূর্ণ। এই লোকসঙ্গীত-গুলির ভিতরই প্রাচীন ভাষার ধারা, প্রাচীন প্রকাশভঙ্গীর ধারা, প্রাচীন রচনা-কৌশল প্রণালী অন্তর্নিহিত আছে। সুতরাং বাংলা ভাষার ইতিহাস লোক-সাহিত্যের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। লোকসঙ্গীত সংগ্রহের ভিতরই যদি কোনও ভুল বা গলদ রহিয়া যায়, তাহা হইলে ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসেও ভুল থাকিয়া যাইবে। সুতরাং লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ অতি নির্ভুল ও খাঁটি হওয়া একান্ত প্রয়োজন। লোক-সাহিত্য সংগ্রহের দায়িত্বভার প্রাচীন সংস্কৃতি ধারার উপর বিশ্বাসপর ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের উপর ন্যস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লোক-সাহিত্যের সংগ্রহগুলি বিশ্বাসযোগ্য ও প্রমাণযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইবার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সংগ্রহগুলির সহিত বিশেষভাবে উল্লিখিত হওয়া বিধেয়—(১) সঙ্গীতগুলি কোন্ অঞ্চলে প্রচলিত আছে; (২) যাহার নিকট হইতে সংগৃহীত, তাহার নাম, ঠিকানা, বয়স, শিক্ষিত না অশিক্ষিত ও ব্যবসা; (৩) সঙ্গীতগুলি সম্বন্ধে কোনও লোক-শ্রুতি আছে কিনা।'

লোকসঙ্গীতের সংগ্রহ সম্বন্ধে শ্রীদাশ সম্প্রতি 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে (১৫ই ফাল্গুন, ১৩৭৫) লিখেছেন—

'নগরীতে এবং শহরে লোকসঙ্গীতের নামে যে সকল পল্লী-গীতি অনুষ্ঠিত হয়, অধিকাংশ স্থলেই সেগুলি বিকৃত, কৃত্রিম, ভেজাল। এইসব পল্লী-গীতির মধ্যে খাঁটি লোক-সঙ্গীতের সুর ও ভাষা থাকে না। শহরাঞ্চলে প্রচারিত তথাকথিত পল্লী-গীতির মধ্যে লোকসঙ্গীতের সেই স্বতঃস্ফূর্ত সুর ও ভাষার প্রকাশ পায় না। শহর-মার্কা লোকসঙ্গীতে গ্রামের কৃষক, শ্রমিকের কথা থাকলেও, তাতে পাওয়া যায় শুধু ব্যর্থ প্রেমিকের হতাশা। এই ধরনের পল্লী-গীতির [illegible]

কিছু রেশ থাকলেও সবটাই একটা পোশাকী ব্যাপারের মত। এগুলি একঘেয়ে গান। এতে পল্লী প্রাণতার কোনও ছোঁয়াচ নেই। ...লোকসংগীতের সংগ্রহ সময়ে একটি বিষয়ের প্রতি সজাগ থাকা দরকার। বর্তমানকালে যান্ত্রিক সভ্যতা গ্রামের দিকে ছুটেছে, যন্ত্র শিল্পের প্রভাব গ্রামে প্রসার লাভ করছে। তার ফলে, প্রাচীন লোক-সংগীত অবহেলিত হচ্ছে, কিন্তু সেই স্থানে এক নতুন পল্লী-সংগীতের সৃষ্টি হচ্ছে, যাতে থাকে রেল, জাহাজ, উড়ো-জাহাজ, কলকারখানা, শহরে বাবু ও বিবিদের কাহিনী। এই আধুনিক পল্লী-সংগীত বর্তমানকালের অল্প শিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত পল্লী-কবিদের রচনা, যাতে পাওয় যায় হাস্যকৌতুক বা ব্যঙ্গ রচনা। এই নতুন পল্লী সংগীতের সুরে ও ভাষয় না আছে নাগরিক সংগীতের সুর ও বাণী, না আছে গ্রামীণ লোকসংগীতের সুর ও ভবা। এক কথায়, এই নতুন পল্লী-সংগীত না নগরের, না গ্রামের। এটি হচ্ছে একটি মিশ্র সংগীত ও সাহিত্যের ধারা---যার জন্ম পরিবর্তনের যুগেই সম্ভব---যেমনটি হয়েছিল সংস্কৃত সাহিত্যের পরে এবং আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের উৎপত্তির আগে, যাকে বলা হতো প্রাকৃত সাহিত্য। এই আধুনিক পল্লী-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নেই---যান্ত্রিক সংস্কৃতির চাপে এটি নাগরিক সাহিত্যের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। গ্রামে গিয়ে কোনও সংগ্রাহক যদি এই নতুন পল্লী-সংগীত সংগ্রহ করে লোকসংগীত হিসেবে সংগ্রহণ করেন, তবে তা ঠিক হবে না।'

সুতরাং আমরা বলতে পারি, শ্রীচক্রবর্তী মহাশয় উত্তরবঙ্গের যন্ত্র শিল্প প্রসারে বিমুখ গ্রাম অঞ্চলের শিক্ষায় অনগ্রসর রাজবংশীদের মধ্য থেকে লোকসংগীত সংগ্রহ করে ভালই করেছেন।

প্রকাশকের অভাবে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশের কোনও গ্রন্থ মুদ্রিত না হলেও, উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত সংগ্রহ ক্ষেত্রে তাঁর সুদীর্ঘ ৩৫।৩৬ বৎসরের অক্লান্ত প্রচেষ্টা সাফল্য ও প্রশংসার দাবী রাখে। কাজেই এখানে শ্রীদাশের লোক-গীতি সংগ্রহ ও গবেষণা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। শ্রীদাস আদিতে রাজসাহী জেলার লোক ছিলেন। বর্তমানে তিনি পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গংগারামপুর অঞ্চলের লোক। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বংলা সাহিত্যের এম-এ। তিনি ভারত সরকারের কাজ উপলক্ষে এক্ষণে জব্বলপুরে বসবাস করছেন। তিনি ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৩ খৃঃ পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার বহু জেলার গ্রাম অঞ্চল পদব্রজে ঘুরে ঘুরে লোকসংগীত সংগ্রহ করেছেন। এখন পর্যন্ত তাঁর প্রায় দেড় শতটি লোক-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা-প্রবন্ধ কলকাতার বিখ্যাত সংবাদ-পত্রগুলিতে ও সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীদাশ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এই গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে কলকাতার সংবাদপত্র ও সাহিত্য পত্রিকাগুলি তাঁকে সতত উৎসাহ ও অকুন্ঠ সহযোগিতা দিয়েছেন। তিনি 'বাংলার লোক-সংস্কৃতি' শীর্ষকে একখানি বিরাট পান্ডুলিপির রচনা সমাপ্ত করেছেন—এতে থাকবে তিনটি খন্ড, (১) বংলার লোক-সংস্কৃতি; (২) বাউল সাধনা ও বাউল সংগীত এবং (৩) উত্তর বঙ্গের লোকসংগীত। এতে উত্তর বঙ্গের গ্রাম অঞ্চল হতে সংগৃহীত অজস্র বাউল গান ও লোকসংগীত স্থান পাবে। তাছাড়া, বাংলা তথা ভারতবর্ষের লোক-সাহিত্য, লোক-নৃত্য, লোক-উৎসব, লোক-শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পন্থায় তুলনামূলক বিচার করা হয়েছে। পান্ডুলিপিটি এক্ষণে প্রকাশের অপেক্ষায়।

পরিশেষে বিশেষভাবে উল্লেখ করি, অমৃত পত্রিকার কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই বাংলার লোক-সংগীত ও লোক-সংস্কৃতি সম্বন্ধে রচনা প্রকাশ করে গ্রাম-বাংলার মানুষের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

সৌম্যেন্দু দাস
জি, সি, এফ্ এস্টেট
জব্বলপুর।

'স্বয়ম্বরা' ও কুষ্ঠ রোগ

সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকার বিগত ২ বৈশাখ, ১৩৭৮ সংখ্যা প্রকাশিত শ্রীরমেন গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'স্বয়ম্বরা' গল্পটির বক্তব্যের মধ্যে একটা হতাশার হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে, যেটা হয়তো সাহিত্যের বিচারে খুবই মুন্সীয়ানার পরিচায়ক, কিন্তু মানবিকতার মাপকাঠিতে খুবই নিন্দার্হ। গল্পের মাধ্যমে মূল সত্যটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে, এ-ধরনের একটি বিশেষ ব্যাধি সম্পর্কে আখ্যান রচনা মানবিকতা বিরোধী বলেই বিবেচিত হওয়া উচিত। আগেভাগেই বলে রাখা ভাল; সাহিত্য সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার বক্তব্য শুধুমাত্র গল্পটির মূল বিষয়টি অর্থাৎ উল্লিখিত ব্যাধিটি সম্পর্কে। এই ধরনের কোনো একটি গল্প যে অন্যের 'পরে, বিশেষ করে কুষ্ঠ আক্রান্তদের উপরে কতটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, সে দিকটা লেখক খতিয়ে দেখতে হয়তো চেষ্টা করেননি। তাই তিনি তাঁর সৃষ্ট কালিন্দির মুখ দিয়ে বলিয়েছেনঃ 'একটুন, একটুন, ভইরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরবেক। যার যেমন পাপ তার ততদিন ভোগ।'

লেখক যদি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতেন, তাহলে কুষ্ঠ ব্যাধির কারণ হিসেবে 'পাপের দোহাই' দিতে পারতেন না। জাতির জীবন থেকে শতাব্দীর যে অন্ধ কুসংস্কার দূর করতে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা আর সমাজকর্মীরা দিনরাত্রি শ্রম দান করে চলেছেন, সেই 'কুসংস্কারটাকেই' লেখক কিভাবে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হলেন, সেটাই সবচেয়ে বিস্ময়ের। বিশেষ করে যে কুষ্ঠ ব্যাধির জীবাণু বহুদিন থেকেই অণুবীক্ষণের চোখে ধরা পড়েছে, সেই ব্যাধিটাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে গণ্য করা মানবিকতার বিচারে অপরাধ।

লেখক কেন এভাবে মিথ্যের বেসাতি করে নমিতাকে সুখী করতে চেয়েছেন, সেটা বোঝা বুদ্ধির অগম্য। কারণ যেখানে কুষ্ঠ ব্যাধিটা চিকিৎসায় সম্পূর্ণ নিরাময় করা মোটেই অসাধ্য নয়, এমনকি গলিত কুষ্ঠ আক্রান্তকেও নিরাময়ের পথে টেনে আনা সম্ভব; শল্য চিকিৎসা এবং অঙ্গ সঞ্চারণ ব্যায়াম প্রক্রিয়ায় বিকৃত অংশ পর্যন্ত ভাল করে তোলা যায়, সেক্ষেত্রে তার কোনো আভাস পর্যন্ত না দিয়ে লেখক গল্পের মাধ্যমে এ-ধরনের ব্যাধি আক্রান্ত অন্যান্যদের মনে অহেতুক ভীতি সঞ্চার করতে সাহায্যই করেছেন।

পরিশেষে তাই বক্তব্য, লেখক যেন পরবর্তী কোনো গল্পে কুষ্ঠ ব্যাধিটির আসল রূপ, প্রকৃতি এবং তার নিরাময়ের পথ নির্দেশ দেন। এই ব্যাধি সম্পর্কে আসল নির্ভরশীল খুঁটিনাটি তথ্য জানতে ইচ্ছুক হলে, লেখক খানিকটা পরিশ্রম করে স্কুল অফ ট্রপিকেল মেডিসিনের কুষ্ঠ গবেষণা বিভাগ পরিদর্শন করতে পারেন।
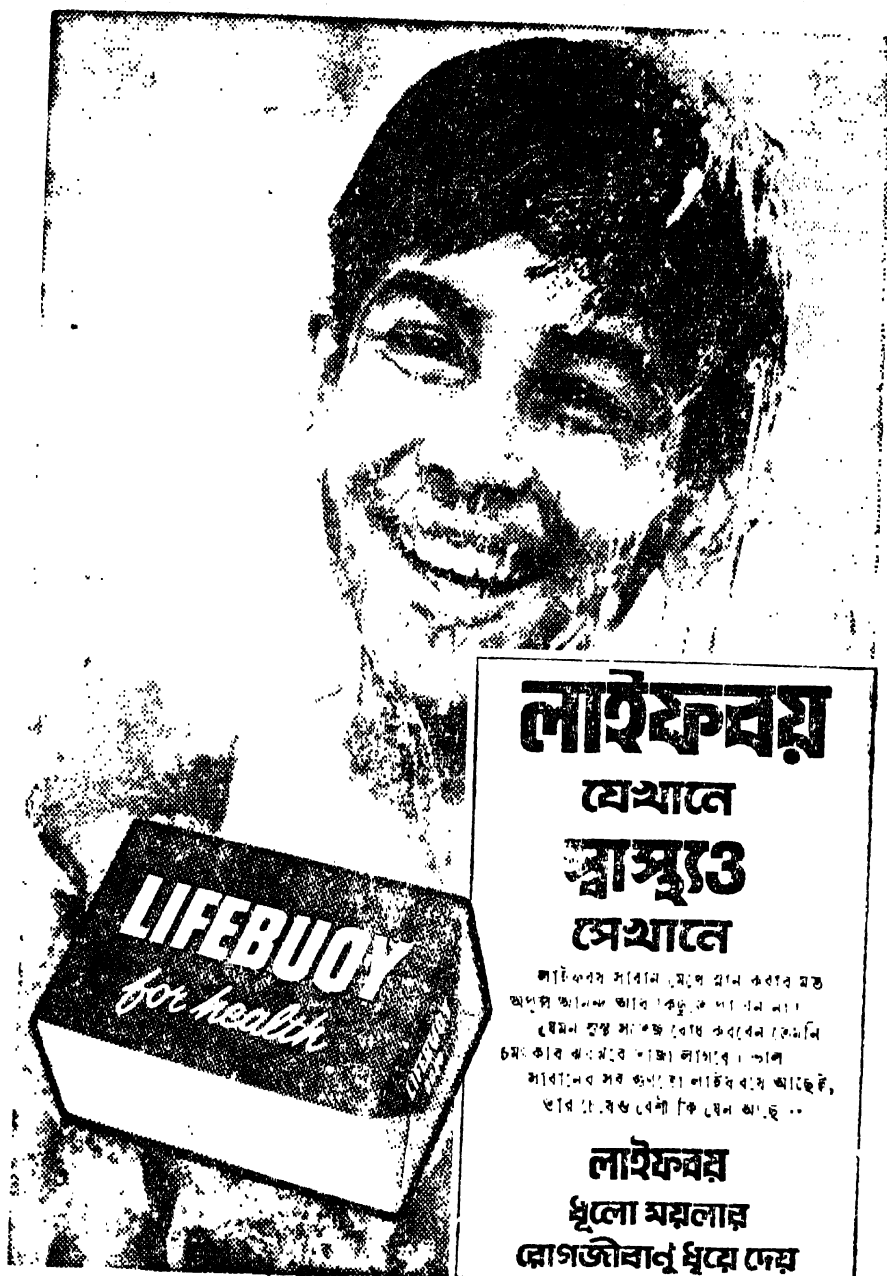
নন্দিতা ঘোষ
কলকাতা-৩৭

বিহু প্রসঙ্গে

গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮ প্রকাশিত অমৃত পত্রিকাতে শ্রদ্ধেয় লেখক হেমাঙ্গ বিশ্বাস মহাশয়ের লেখা 'আসামের জাতীয় উৎসব "বিহু" নামক একটি লেখা পড়লাম। সেখানে এক জায়গায় দেখলাম "১৮৩২ খৃঃ রবার্ট ব্রুস চীনদেশের চা-গাছের প্রতিরূপ আসামের চা-গাছ আবিষ্কার করেন" - এই ঘটনা কতদূরে সত্য তা বলা মুশকিল। R. D. Marrison এর লেখা Tea, Ukers এর লেখা All about tea এবং History of the growth and development of tea industry by the Indians of Jalpaiguri থেকে পড়লে দেখতে পাওয়া যায় যে এই বিষয়ে বিভিন্ন লেখক তাঁদের বিভিন্ন মত রেখে গেছেন। এক জায়গায় লেখা আছে ১৮২৩ খৃঃ ভারতে প্রথম চা আবিষ্কার হয়। কিন্তু অপর এক জায়গায় পাওয়া গেছে যে আসামেরই আদিবাসী "মণিরাম দেওয়ানই" প্রথম চা আবিষ্কার করেন। আসামের আদিবাসীরা বহু প্রাচীন আমল থেকেই চায়ের পাতা রসুন দিয়ে খেতে অভ্যস্ত। মণিরাম দেওয়ানই নাকি সেই চায়ের চারা দেন মেজর ব্রুসকে। কিন্তু "এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিয়াতে মণিরামের কোন নামের উল্লেখ নাই

সুনীলকুমার নিয়োগী,
ডি, এস, অফিস (ই, রেল)
আসানসোল

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

লাইফবয়
যেখানে
স্বাস্থ্যও
সেখানে
LIFEBUOY
for health
লাইফবয়
ধূলো ময়লার
রোগজীবাণু ধুয়ে দেয়
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

১১শ বর্ষ
১ম খণ্ড

৮ম সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 25th June, 1971 শুক্রবার—১০ই আষাঢ়, ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীগণেশ পাইন

এক নজরে

দণ্ডবিধির সংস্কার ঃ

ভারতীয় দণ্ডবিধিকে যুগোপযোগী করার জন্য নানা পরিবর্তন ও পরিবর্জনের সুপারিশ করেছেন, ঐ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত ল কমিশন। প্রচলিত দণ্ডবিধির ধারা-উপধারা ও শব্দের ব্যাখা বিশ্লেষণে বিভিন্ন হাইকোর্ট যেসব পরস্পরবিরোধী ভাষ্য দিয়েছেন তার মধ্যে সঙ্গতি এনে তাঁরা সব দণ্ডবিধির একটা সুস্পষ্ট অর্থ ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন অপরাধের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে সংবিধান স্বীকৃত মৌল অধিকার ও সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন রায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। যার ফলে একদা যেসব কার্যকলাপকে সহজেই রাষ্ট্র-বিরোধী ষড়যন্ত্র অ্যাখ্যা দিয়ে দমন করা যেত প্রস্তাবিত দণ্ড-বিধি অনুসারে সেটা আর সম্ভব হবে না। তারপর একই অপ-রাধের গুরুত্বের তারতম্য অনুসারে যে অগণিত ধারা-উপধারা ও শাস্তির বিধান আছে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে তারও অপরাধ-বিজ্ঞানের আধুনিক তত্ত্বানুসারে সরলীকরণের চেষ্টা হয়েছে। এর ফলে ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রথম ছয়টি অধ্যায়ের ১২০টি ধারা হ্রাস পেয়ে মাত্র ৩৩টিতে দাঁড়াবে।

আবার সরলীকরণ ও যুগোপযোগীকরণের জন্য যেমন দণ্ডবিধি সংক্ষিপ্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে তেমনই বর্তমান কালের সমাজচিন্তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে এমন বহু কর্তব্য-চ্যুতি ও অবহেলাকে অপরাধ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার জন্য এতদিন কোন শাস্তির বিধান ছিল না। জনসাধারণের সেবায় ও স্বার্থরক্ষায় নিযুক্ত কোন কর্মচারী যদি কোন আইন-সঙ্গত কারণ ছাড়াই কর্তব্যে অবহেলা করেন এবং তার ফলে যদি কোন ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হয় বা স্বার্থ গুরুতরভাবে ক্ষুন্ন হয় তবে ঐ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আনতে পারবেন। ল কমিশনের এই প্রস্তাবিত সংযোজন অবশ্যই যুগোপযোগী। বর্তমান ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা-উপধারা ও ভাষ্যপুষ্ট হয়ে মহাভারতের আকার ধারণ করলেও ব্যক্তির সামাজিক কর্তব্য পালনের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে তার নীরবতা ও অনুল্লেখ বিস্ময়কর। রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তির শুধু পাওয়ারই অধিকার থাকবে এবং বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির কোন কর্তব্য থাকবে না আজকের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় এ নীতি সম্পূর্ণ অচল।

আত্মহত্যার চেষ্টাকে দণ্ডনীয় অপরাধের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সুপারিশ করে কমিশন আর একটি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে যে কোন দাবী আদায়ের জন্য আত্ম-হননের হুমকীকে দণ্ডনীয় অপরাধের তালিকাভুক্ত করতে বলে কমিশন আর একটি সমুচিত কাজ করেছেন। কমিশন গর্ভপাত সম্পর্কিত আইনের বিধি-নিষেধ শিথিল করারও সুপারিশ করে-ছেন। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে সমাজ জীবনের পরিবর্তন যখন সুনির্দিষ্ট রূপ নেয় তখন সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী আইন-গুলিরও সেই মত সংস্কার হওয়া দরকার। যদি তা না হয় তবে সেক্ষেত্রে আইনগুলি তার উদ্দেশ্যেরই পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।

অস্ট্রেলিয়ায় লোকসমস্যা ঃ

ভারতের চেয়ে আয়তনে আড়াই গুণ বড় অস্ট্রেলিয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ৭৪ লক্ষ যা এখন শুধু বৃহত্তর কলকাতারই লোকসংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানী আক্রমণ থেকে প্রায় ভাগ্যগুণে অব্যাহতি পাওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ার কর্মকর্তারা উপলব্ধি করেন যে, ঐ মহাদেশোপম রাষ্ট্রটির জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য দ্রুত লোক বৃদ্ধি হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে-সঙ্গেও অস্ট্রেলিয়ায় লোকাভাব অনুভূত হতে থাকে। সেকারণে বিগত চব্বিশ বছরে অস্ট্রেলিয়ায় মোট তেত্রিশ লক্ষ লোক গ্রহণ করা হয়, যার ফলে গত বছরে অস্ট্রেলিয়ায় আনীত ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ। অস্ট্রেলিয়ায় আনীত ঐ লোকেদের প্রায় সবাই ছিল ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ, শুধু ভারতের লাখ-খানেক এংলো-ইণ্ডিয়ান ইংরেজী জানার সুযোগে সেখানে অভিবাসনের সুযোগ পায়। শুধু দক্ষ শ্রমিক ও বিভিন্ন কাজে বিশেষজ্ঞদেরই অস্ট্রেলিয়া গ্রহণ করে।

কিন্তু অস্ট্রেলিয়া আর ঐভাবে লোক নিতে রাজী নয়। কারণ অভিবাসন ও স্বাভাবিক লোকবৃদ্ধির জন্য অস্ট্রেলিয়ায় এখন যে বছরে ২·২৫ শতাংশ হারে লোক বাড়ছে সেটা অস্ট্রেলিয়ার অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুকূল নয়। ঐ বর্ধিত লোক-সংখ্যার জন্য প্রতি বছর অস্ট্রেলিয়াকে বাসগৃহ, স্কুল ভবন, পথঘাট নির্মাণ ও অন্যান্য প্রয়োজনে ১০০ কোটি অস্ট্রেলিয়ান ডলার ব্যয় করতে হচ্ছে। সুতরাং আর নয়, যারা এসেছে তাদের নিয়েই অস্ট্রেলিয়া তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রস্তুত করুক—এই প্রস্তাব দিয়েছেন সে রাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদরা।

ভারতবাসীর কাছে এসব সংবাদ সত্যই উপভোগ্য। কারণ ক্যাপ্টেন কুকের অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের পর বিগত আড়াই-শ বছরে অস্ট্রেলিয়ার যে লোকবৃদ্ধি হয়েছে সেটা বর্তমানে ভারতের বাৎসরিক লোকবৃদ্ধির হার, যদিও ভারত আয়তনে অস্ট্রেলিয়ার দুই-পঞ্চমাংশ মাত্র। আর চব্বিশ বছরে অস্ট্রেলিয়ায় যত বহিরাগত প্রবেশ করেছে, চব্বিশ দিনে ইয়াহিয়ার মুদগরে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতে লোক প্রবেশ করেছে তার চেয়ে বেশী। আর সেই ছিন্নমূল সর্বস্বান্ত মানুষগুলির কাছে কোন প্রতিদানের প্রত্যাশা না রেখেই ভারত তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে।

তাসের ঘর ঃ

ভারতের রাজ্যে রাজ্যে মন্ত্রিসভার ভাঙা-গড়ার খেলা অব্যাহত আছে। জুন মাসের গোড়ায় শ্রীভোলা পাশোয়ানের নেতৃত্বে বিহারে যে মন্ত্রিসভা হয় তার অস্তিত্ব জুনের শেষ পর্যন্ত থাকবে কিনা তা নিয়ে জুনের মাঝামাঝি সময়েই সন্দেহ দেখা দেয়, কারণ যেসব দল ও উপদল একজোট হয়ে শ্রীকর্পুরী ঠাকুরের ১৬৩ দিন স্থায়ী মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়ে শ্রীপাশোয়ানকে মন্ত্রিসভা গঠনের শক্তি যুগিয়েছিল তাঁদের অনেকেই পক্ষকাল অতিক্রান্ত না হতেই বেসুরো কথা বলতে আরম্ভ করে। তবে শ্রীপাশোয়ানের সেজন্য উদ্বেগবোধ করার কিছু নেই। কারণ তিনি ইতিপূর্বে আরও যে দুটি মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন সে দুটি টিঁকেছিল যথাক্রমে এক মাস ও এক সপ্তাহ। সুতরাং ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর নবম ও '৬৯-এর মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর পঞ্চম মন্ত্রিসভাটি যদি একইভাবে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয় তবে শ্রীপাশোয়ান তার জন্য কিইবা করতে পারেন?

ওদিকে ওড়িশা বিধানসভার বিরোধীনেতা শ্রীবিনায়ক আচার্য কদিন আগে প্রায় গীতার শ্রীকৃষ্ণের মত বলেছেন, ওড়িশার বর্তমান মন্ত্রিসভার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে, তার পতন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র।

শ্রীপ্রকাশসিং বাদল গত বছরের মার্চ মাসে পাঞ্জাবের শাসন দায়িত্ব হাতে নিয়েছিলেন। তারপর বিগত ষোল মাসে নানা দল-উপদলের সঙ্গে নানাভাবে 'পারমিউটেশন কম্বিনেশন' করে ও সমর্থকদের প্রায় অর্ধেককে মন্ত্রীর তখতে বসিয়েও শেষরক্ষা করতে পারলেন না।

১৭।৬।৭১

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

পরীক্ষা প্রহসন

আমাদের পরীক্ষা-পদ্ধতি নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে লিখেছেন একাধিকবার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিষয় নিয়েই তো তাঁর বিখ্যাত 'তোতাকাহিনী'র অবতারণা। সেই বিশ্ববিদ্যালয় এখন আর একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ নয়। সাত-সাতটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আওতায় লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী প্রতি বৎসর পরীক্ষার্থী। ছাত্র বাড়ছে, যুগ পালটাচ্ছে। কিন্তু আমাদের স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পঠনপাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। যেটুকু বা হয়েছে তা সামান্য। তার ফলে প্রতি বৎসরই পরীক্ষার মরশুমে সকলের শিরঃপীড়া। ভালয় ভালয় পরীক্ষা হয়ে গেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন সকলে। যাতে পরীক্ষা নির্বিঘ্নে হয় তার জন্য ডাক পড়ে সিপাইসান্ত্রীর। শুধু পরীক্ষার্থীদের জন্যই এই সতর্কতা একথা মনে করলে ভুল হবে। পরীক্ষার্থীদের হাত থেকে ইনভিজিলেটরদের রক্ষা, পরীক্ষাকেন্দ্রের আসবাবপত্রাদির নিরাপত্তাও এই সতর্কতার অন্যতম কারণ।

এত সব কড়া ব্যবস্থা সত্ত্বেও পরীক্ষার পবিত্রতা কতখানি রক্ষিত হয় সে সম্পর্কে সকলেরই সন্দেহ। একদিকে কিছু ভ্রান্তমতি তরুণ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে নস্যাৎ করার জন্য নানারকম কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। অপরদিকে এই ঘুণে-ধরা শিক্ষা-কাঠামোর মারফৎ যেনতেন প্রকারে একটি ডিগ্রীর ছাপ পাবার জন্য পরীক্ষার হলে অসদুপায়েরও অন্ত নেই। ফলে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মতোই তার পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতিও এক প্রকাণ্ড প্রহসনে পরিণত হয়েছে। শুধু অল্পবয়স্ক, চপলমতি স্কুলের ছেলেরাই যে পরীক্ষা পাশের এই সহজ পথ অবলম্বন করেছে তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী পরীক্ষাতেও একই অনাচার আজ দুষ্ট ক্ষতের মতো শিক্ষাসত্রে প্রবেশ করেছে।

গত বৎসর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-বি, বি-এস পরীক্ষায় দুর্নীতির আশ্রয় নেবার অভিযোগে উক্ত ডিগ্রী বাতিল করার সুপারিশ করেছিলেন ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল। শতাব্দীর ঐতিহ্যমণ্ডিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় কী ধরনের দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে তার চিত্র যদি উদ্ঘাটিত হয়, তাহলে এক্ষেত্রেও ডিগ্রী বাতিলের সুপারিশই করতে হবে। দোষ শুধু পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরাই করেনি, এই রোগ ভারতের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছে। গত সপ্তাহে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পরীক্ষার পরীক্ষার্থীরা প্রকাশ্যে এমন অসদুপায় অবলম্বন করে যে, অধ্যাপকরা বিষয়টি সিণ্ডিকেটের গোচরে এনে পরীক্ষা বাতিলের সুপারিশ করেছেন। গত বৎসরও কোনো কোনো বিষয়ের পরীক্ষায় এমনি দুর্নীতির অভিযোগ শোনা গিয়েছিল। এবার ব্যাপারটা এতই ব্যাপক ও বিসদৃশ হয়েছে যে, কোনো বিবেকবান শিক্ষাব্রতীই এই পরীক্ষা প্রহসন বরদাস্ত করতে পারেননি। তাই তাঁরা সিণ্ডিকেটের দ্বারস্থ হয়েছেন। জানি না সিণ্ডিকেট এসম্পর্কে কী ব্যবস্থা নেবেন। তবে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, বর্তমান পরীক্ষাপদ্ধতি ছাত্রদের মেধা বা স্মৃতিশক্তি বিচারের পক্ষে অনুপযুক্ত।

এই শিক্ষাব্যবস্থা বা শিক্ষানিয়ামকদের প্রতি পরীক্ষার্থীদের কোনো শ্রদ্ধা নেই। ডিগ্রীসর্বস্ব যে শিক্ষা তার প্রতি আগ্রহ ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ ডিগ্রী দিয়ে চাকুরীর গ্যারাণ্টি পাওয়া যায়। সেই গ্যারাণ্টি আজ নেই। শিক্ষাব্রতীরা আগে ছিলেন সমাজের শ্রদ্ধেয়। তাঁদের কাঞ্চনকৌলীন্য ছিল না, কিন্তু বিদ্বান বলে তাঁদের মাথায় করে রাখা হত। আজকাল শিক্ষাব্রতীরা সেই শ্রদ্ধা আগেকার মতো আর আকর্ষণ করতে পারেন না। আর পাঁচটা জীবিকার মতোই শিক্ষকতা একটি জীবিকায় পর্যবসিত। রাষ্ট্রনিয়ন্তারাও শিক্ষার প্রতি তেমন নজর দেবার অবসর পান না। শিক্ষামন্ত্রণালয়ে যত মন্ত্রী বদল হয় তেমন আর কোনো মন্ত্রণালয়ে হয় না। অর্থদপ্তর বা স্বরাষ্ট্রদপ্তরের জন্য মন্ত্রীমহলে কাড়াকাড়ি ও মনকষাকষি। শিক্ষাদপ্তরের জন্য তো তেমন মাথাব্যথা দেখা যায় না। সুতরাং পরীক্ষার হলে যে ব্যাপক টোকাটুকি, বই দেখে লেখা এবং প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায় তার জন্য শুধুমাত্র ছাত্রদের দায়ী করে কোনো লাভ নেই। বিদ্যার মন্দির বলে যাকে আমরা সসম্ভ্রমে এতদিন বিশিষ্ট স্থান দিয়ে এসেছি, তার ভিতরে অনাচার প্রবেশ করেছে। যে তরুণদের নিয়ে আগামী দিনের সমাজ গড়ে উঠবে এবং যাদের শিক্ষাদানের ভার এই স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর সেগুলো নিজেরাই শুধু কর্তব্যভ্রষ্ট হয়নি, তরুণ শিক্ষার্থীদেরও এক উদ্দেশ্যহীন শিক্ষাব্যবস্থার গোলকধাঁধায় ঢুকিয়ে দিশেহারা করে দিচ্ছে। তার পরিণতিতেই চলছে সমস্ত রকম শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। শিক্ষার পবিত্রতা হচ্ছে বিনষ্ট। শিক্ষাব্যবস্থা যদি জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি মিলিয়ে তরুণসমাজের সামনে কোনো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে আনতে পারত, তাহলে আজ শিক্ষার মন্দিরে এই দুর্নীতি প্রবেশ করতে পারত না। এই কলংকের ভাগ আমাদের সকলকেই নিতে হবে। শিক্ষা-কমিশন মোটা মোটা সুপারিশ পেশ করেই নিজেদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হন। সেই সুপারিশ যদি কার্যকর করা না হয়, তাহলে যতই দিন যাবে শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা ততই বাড়বে। বিপুল জনসংখ্যার দেশে শিক্ষা কী রকম হওয়া উচিত এবং জীবিকার বাস্তব সুযোগের সঙ্গে তার কী সামঞ্জস্য থাকা উচিত—এই সরল ও মৌলিক প্রশ্নটি যতদিন শিক্ষানিয়ামকরা ভেবে না দেখবেন ততদিন এই ছাত্রদ্রোহ এবং পরীক্ষায় অনাচার বন্ধ হবার কোনো পথ দেখি না।

এই লেখা যখন আপনারা পড়বেন তার কয়েক দিন পরেই, অর্থাৎ ২৮ জুন, পশ্চিম বাংলা বিধানসভার বাজেট বৈঠক সুরু হওয়ার কথা। তার আগেই কি এই রাজ্যের রাজনীতিতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে যাবে?

এই মুখরোচক জল্পনার কারণ প্রধানত দুটি। এক, বাংলাদেশের শরণার্থীদের বিপুল বোঝা এবং দুই, ক্ষমতাসীন গণ-তান্ত্রিক কোয়ালিশনের কয়েকটি আভ্যন্তর সমস্যা।

এ-কথা এখন সকলেই বোঝেন যে, কড়া বিবৃতি বা সদিচ্ছা, কোনোটার দ্বারাই শরণার্থী সমস্যার মীমাংসা হবে না। যতই শরণার্থীর স্রোত বাড়ছে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বিদেশ যাত্রার ধুমও ততই বাড়ছে। তাঁদের সফরে বিদেশী রাষ্ট্রগুলি বড় জোর এই সমস্যার গুরুত্ব বুঝে আমাদের আরো কিছু টাকা, গুঁড়ো দুধ বা কলেরার ভ্যাক-সিন্ পাঠাতে পারে। কিন্তু পাকিস্থানকে ধমক দেওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী সাতো আমাদের সিদ্ধার্থ রায় বা প্রেসিডেন্ট নিক-সন্ স্বরণ সিংয়ের জন্যে শুধু অপেক্ষা করে আছেন—এটা কূটনৈতিক জগতের বাল-খিল্যেরাও বিশ্বাস করে না।

সুতরাং আমাদের মন্ত্রিকুল স্বদেশে ফিরে আসার পরই শরণার্থী সমস্যা হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে না। শরণার্থীরা ছ' মাসের মধ্যে দেশে ফিরবেন, এই আশার ছলনায় ভুলে যে বেশি দিন থাকা যাবে না প্রধানমন্ত্রীর নানা পরস্পর-বিরোধী উক্তি থেকেও তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আজ যদি তিনি বলেন বাংলাদেশে রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া পথ নেই, তবে কাল তিনি বলছেন রাজ-নৈতিক সমাধানের আশা দুরপরাহত।

অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেটে শরণার্থী ত্রাণের জন্যে ৬০ কোটি বরাদ্দ করে নিশ্চিন্ত হয়ে-ছেন, কিন্তু তিনিও এ-কথা জানেন যে খুব কম হলেও বছরের শেষে এর বহু গুণ বেশি খরচা হয়ে যাবে। পাঁচসালা পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যে এ-বছর ২৫০ কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে বলে সরকার খুবই আত্মতৃপ্ত। কিন্তু শরণার্থী ত্রাণে ঐ সব টাকা তো লেগে যাবেই, আরও অনেক বেশি লাগবে। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৬৫ সালে পাকিস্থানের সঙ্গে লড়াইয়ে আমাদের খরচ হয়েছিল ৫০ কোটি টাকার মতো।)

অর্থাৎ, শরণার্থীদের সামলাতে সব নতুন উন্নয়ন প্রকল্প বানচাল হবে। কিন্তু তাতেও শুধু ত্রাণের ব্যবস্থাই হবে, পুনর্বাসনের নয়। সরকার যতই অন্য রকম আশা করুন না কেন, বাংলাদেশে স্বাধীন সরকার স্থাপিত হলেও অনেক শরণার্থীই যে আর সেখানে ফিরবেন না, তা যে-কোনো শিবিরে তাঁদের সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যায়। সুতরাং পুনর্বাসনের কথা সরকারকে ভাবতে হবেই।

কিন্তু সমস্যা তো শুধু টাকার নয়, আসল সমস্যা সংগঠনের। এদেশে প্রশাসন ব্যবস্থা এমনিতেই সব কিছু সামলাতে পারে না। আর পশ্চিম বাংলায় গত চার-পাঁচ বছরে প্রশাসনের কতোটুকু অবশিষ্ট আছে তা জানবার জন্যে তদন্ত কমিশন নিয়োগের দরকার নেই। সেই ভেঙে-পড়া প্রশাসনের পক্ষে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের ত্রাণের ব্যবস্থা করা যে কী সংকটকর ব্যাপার তা কি বলে বোঝাতে হবে? আর এই প্রশাসন যদি তার সাধ্য-মতো সব শক্তিই নিয়োগ করে শরণার্থীদের ত্রাণে (আটটি জেলায় যা এখন করতে হচ্ছে), তবে রাজ্যের অন্যান্য সমস্যার সামাল দেবে কে? এবং ঈশ্বর জানেন, পশ্চিম বাংলায় অন্য যা কিছুর অভাবই থাক, সমস্যার কোনো অভাব নেই।

অর্থাৎ সোজা কথায় পশ্চিম বাংলা আজ বিপন্ন, সেই সঙ্গে আসাম, ত্রিপুরা, এবং মেঘালয়ও। এই সবকটি রাজ্যেই পাকিস্থানী গোলাগুলী এসে পড়েছে, ভারতীয় নাগরিক নিহত হয়েছেন। এখনও যে বড় রকমের কোনো সংঘর্ষ বাধেনি, তার কারণ ভারতের সংযম। তা ছাড়া শরণার্থীর স্রোতও ইয়াহিয়া খানের এক ধরণের পরোক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়া কিছু নয়। কারণ এর দ্বারা পূর্বে ভারতের আভ্যন্তর শান্তি আজ ভেঙে পড়তে চলেছে।

এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতি (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা) যদি মনে করেন পূর্বে ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণার সময় এসেছে তবে তিনি তা ঘোষণা করতে পারেন। এ-সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে সংসদে আলো-চনার প্রয়োজন নেই, যদিও ঘোষণাটি দু' মাসের মধ্যে সংসদে অনুমোদিত হওয়া দরকার। রাষ্ট্রপতির এই ঘোষণা যুক্তিযুক্ত কিনা তা পরখ করার জন্যে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ারও কোনো পথ আমাদের সংবিধানে নেই। আর বাইরের আক্রমণ বা ভেতরের গোলযোগ ঘটলে তবেই যে এই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা যায় তাও নয়। ঐ ধরনের কোনো আশংকা আছে বলে মনে করলেও রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন।

এই ধরনের জরুরী অবস্থা আর রাষ্ট্র-পতির শাসন কিন্তু এক কথা নয়। রাষ্ট্র-পতির শাসনের সময় বিধানসভা বাতিল করা হয় বা সাময়িকভাবে 'জীবন্মৃত' অবস্থায় রাখা হয়। রাজ্যে কোনো লোকায়ত্ত সরকারও থাকে না। রাষ্ট্রপতির নামে কাজ চালান রাজ্যপাল। কিন্তু জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে বিধানসভাও বাতিল হয় না, রাজ্য সরকারও বহাল থাকে। তবে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে কী সুবিধে হয়? সুবিধে এই যে, সাধারণত যে-সব বিষয়ে আইন রচনার এক্তিয়ার রাজ্য সরকারের, জরুরী অবস্থার সময় কেন্দ্রীয় সরকারও (অর্থাৎ পার্লামেন্ট) সেই সব বিষয়ে আইন রচনা করতে পারেন। সাধা-রণত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কী কী বিষয়ে নির্দেশ দিতে পারেন তার বিধান দেওয়া আছে সংবিধানের ২৫৬ ও ২৫৭ অনুচ্ছেদে। কিন্তু জরুরী অবস্থার সময় কেন্দ্রীয় সরকার যে-কোনো বিষয়ে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিতে পারেন এবং রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন না করেও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের সামগ্রিক দায়িত্ব ভার নিতে পারেন।

*

জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়া বা না হওয়ার সঙ্গে সুতরাং পশ্চিম বাংলা বিধান সভার বাজেট বৈঠক হওয়া বা না-হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলেও বিধানসভার বৈঠক হতে পারবে। আমরা আগের এক 'পটভূমিতে' বলেছিলাম যে, এই অধিবেশনে বাজেট গৃহীত হতেই হবে। মার্চ মাসে পার্লামেন্টে যে 'ভোট অন একাউন্ট বাজেট' গৃহীত হয়েছে তাতে জুলাই পর্যন্ত খরচ চালাবার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে পুরোদস্তুর বাজেট যদি বিধানসভায় কোনো কারণে গৃহীত না হয়, তা হলে আগস্ট থেকে সব সরকারী কাজকর্ম অচল হয়ে পড়বে। তখন আবার পার্লামেন্টেই পুরোদস্তুর বাজেট পাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৯৭০-৭১ সালের বাজেট নিয়ে এই অবস্থা হয়েছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকার যথা-রীতি মার্চে বিধানসভায় বাজেট পেশ করলেন। ফ্রন্টের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সেই বাজেট পাশের পক্ষে কোনো বাধাও ছিল না। কিন্তু ততদিনে ফ্রন্টের নাভি-শ্বাস উঠেছে। সরকার বাজেট পেশ করলে কী হবে, বাইরে তখন ফ্রন্টের নানা দলের মধ্যে তরজার লড়াইয়ে কান পাতা দায়। ফলে বিধনাসভায় বাজেট বরাদ্দের আলো-চনার সময় সব মন্ত্রীর দেখা পাওয়া [illegible]

না। মন্ত্রীরা বলতে লাগলেন, এই সরকার ক'দিন আছে তারই ঠিক নেই, তাঁরা আর বাজেট নিয়ে মাথা ঘামাতে যান কেন? শেষে ঐ বিধানসভার অধিবেশন চলতে থাকার সময়েই অজয়বাবু রাজ্যপালের কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন। বিধানসভাও যথাকালে সাসপেন্ড করা হল, আর তাড়াহুড়ো করে বাজেট পাশ করানো হল পার্লামেন্টে।

এবারে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারও কি অনুরূপ সংকটের সম্মুখীন? কোয়ালিশনের ভাগীদারদের মধ্যে আজ সমস্যা একাধিক, কিন্তু এখনও এই কথা বলার সময় এসেছে কি যে এই সরকার পতনের মুখে? আসলে এই সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যৎসামান্য বলেই জল্পনাও সুরু হয় সামান্যতম প্ররোচনায়।

তার মানে এই নয় যে, কোয়ালিশনের সব সমস্যাকে চোখ বুজে উড়িয়ে দিতে পারা যায়। উদ্বেগের সুরু কলকাতা মেট্রোপলিটান ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন অথরিটির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। ঐ অথরিটিতে বিধানসভার সদস্যদের জন্যে সাতটি আসন নির্দিষ্ট আছে। বিধানসভার সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী সরকার পক্ষ আশা করেছিলেন যে, তাঁরা অন্তত পাঁচটি আসন পাবেন, নিদেন পক্ষে চারটি তো বটেই। কিন্তু দেখা গেল তাঁরা তিনটির বেশি পেলেন না, সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টই পেলেন চারটি। আর এই ফলাফল যে কোয়ালিশনে ভাঙনেরই লক্ষণ, একথা ঘোষণা করতে প্রমোদ দাশগুপ্ত একটুও সময় নষ্ট করলেন না।

ভাঙনের লক্ষণ হোক বা না-হোক, সরকার পক্ষের হুইপ কোয়ালিশন এম-এল-এরা অমান্য করেছেন কিনা তাই নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অন্তত হুইপ নিয়ে যে কিছু ভুল বোঝাবুঝি ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এইভাবেই কি তাঁরা বিধানসভায় বিরোধী পক্ষের চ্যালেঞ্জের জবাব দেবেন?

তার আগেই অবশ্য বাংলা-কংগ্রেসের ভাঙন রাজনৈতিক মহলে অনেক আলোচনার খোরাক জুগিয়েছে। সেই আলোচনার এখনও শেষ হয়নি। কারণ অজয়বাবু ও সুশীল ধাড়ার প্রকাশ্য খেউড় বেশ জমে উঠলেও সুশীলবাবু এখনও জানাননি তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর আস্তিনের তলা থেকে কোন চূড়ান্ত প্রস্তাব বার করবেন.. আর সুশীলবাবুকে মন্ত্রিসভায় নেওয়া সম্পর্কেও কোয়ালিশনের ভাগীদাররা এখনও মতিস্থির করতে পারেননি।

এরই সঙ্গে সঙ্গে এসেছে এস এস পি ও পি-এস-পির মিলনের প্রস্তাব। কারো পৌষ মাস হলে যেমন কারো সর্বনাশ হওয়া সম্ভব, তেমনই কোনো মিলনের প্রস্তাবের উল্টো পিঠে বিচ্ছেদের কথাও হয়ত লুকানো থাকে। তাই সমাজতন্ত্রীরা একটি বড় দলের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়ার জন্যে সচেষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেরল, বিহারও পশ্চিম বাংলা সরকারের সংকটের প্রশ্নও দেখা দিয়েছে। এই তিন সরকারই চলছে শাসক কংগ্রেসের সক্রিয় সহযোগে। বিহারে ও পশ্চিম বাংলায় শাসক কংগ্রেস মন্ত্রিসভাতেই রয়েছে, যদিও কেরলে তারা সরকারকে সমর্থন করছে শুধু বাইরে থেকে। পি এস পিও তিনটি সরকারেই শরিক। এদিকে এস-এস-পি সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছে যে, দু' দলের মধ্যে যদি মিলন হতে হয়, তবে পি-এস-পি'কে কংগ্রেসের সঙ্গে বাঁধন ছিঁড়তে হবে। কারণ কংগ্রেস-বিরোধিতার বর্ম পরেই নতুন বৃহত্তর সমাজতন্ত্রী দল দেশের রাজনীতির আসরে নামবেন।

সমাজতান্ত্রিক ঐক্য নিশ্চয়ই খুব ভালো জিনিস। ধূমপান ত্যাগ করা সম্পর্কে মার্ক টোয়েন যা বলেছিলেন, তার অনুকরণে বলা যায়, সমাজতন্ত্রী দলগুলির মিলন খুবই সোজা, কারণ আগেও তো অনেকবার এই মিলন হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক নানা দলের ভাঙা-গড়ার ইতিহাস যাঁরাই জানেন তাঁরা এই সর্বশেষ মিলন উদ্যোগে যদি কিছুটা কৌতুক বোধ করেন তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই, যদিও এস এস পি বা পি এস পি নিশ্চয়ই এ-বিষয়ে খুবই আন্তরিক চেষ্টা চালাচ্ছেন।

কিন্তু হায়, সমাজতান্ত্রিক ঐক্যের আদর্শ মহান বলে সরকারী ক্ষমতার আকর্ষণ তো আর তুচ্ছ নয়। তাই পি এস পি'র সর্বভারতীয় নেতারা যদিও কংগ্রেস-বিরোধিতার তিলক কপালে পরে রাজনারায়ণ-কর্পূরী ঠাকুর-জর্জ ফার্ণান্ডেজ সমীপে হাজির হতে রাজী, কেরল, বিহার ও পশ্চিম বাংলার পি-এস-পিও কি সেই পথে যাবে? বিহার বিধানসভায় পি এস পি সদস্য সংখ্যা বারো। তাঁদের সমর্থনের ওপর ভোলা পাশোয়ান মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব ঠিক নির্ভর করছে না। কারণ তাঁদের বাদ দিলেও প্রগতিশীল বিধায়ক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকে। তবু কিন্তু ঐ বারোজনের দশজন বলছেন, তাঁরা প্রগতিশীল বিধায়ক দল থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করবেন না। কেরলে যে শেষ পর্যন্ত কী হবে বলা যায় না। যদিও অচ্যুত মেনন মন্ত্রিসভায় পি এস পি'র প্রতিনিধি বলেছেন যে তিনি পদত্যাগ করতে রাজী আছেন, তবু পি-এস-পি রাজ্য কমিটি এখনও পাকা সিদ্ধান্ত নেন নি। কেরলে পি এস পি যদি মন্ত্রিসভা ত্যাগ করে তবে কিন্তু অচ্যুত মেনন মুশকিলে পড়বেন। তখন কি মন্ত্রিসভাকে টিঁকিয়ে রাখার জন্যে শেষ পর্যন্ত কেরল কংগ্রেসের শরণ নিতে হবে?

পশ্চিম বাংলা বিধানসভায় পি এস পির সদস্য সংখ্যা দুই। তাঁরা হলেন অনিলকুমার মান্না ও প্রবোধ সিংহ। শেষোক্তজন গত মে মাসে মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করেন। পি এস পি নামের দাবিদার আর এক সদস্য ও মন্ত্রীও আছেন--সুধীর দাস। তিনি অবশ্য সরকারী পি এস পি'র অন্তর্গত নন।

শ্রীমান্না ও শ্রীসিংহ দু'জনেই জানিয়েছেন তাঁরা মন্ত্রিসভার প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করছেন না। অজয়বাবু ও বিজয়বাবু তাই খানিকটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি পি এস পি'র কেন্দ্রীয় নেতারা কংগ্রেস-বিরোধিতার ওপর জোর দেন তবে পশ্চিম বাংলায় পি এস পি কী করবে? কেন্দ্রীয় নির্দেশ মানবে, না এখানে রাজ্যস্তরে পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখবে? এই প্রশ্ন এখন রাজনৈতিক মহলে আলোচিত হচ্ছে। অবশ্য এস-এস-পিকে নিয়ে কোনো ভাবনা নেই, কারণ পশ্চিম বাংলা বিধানসভায় সরকারী এস এস পি'র কোনো সদস্য নেই। খাদ্যমন্ত্রী কাশীকান্ত মৈত্র এস এস পি'র এক দলছুট অংশের নেতা।

কিন্তু বাংলা-কংগ্রেস বা পি-এস-পি'র চেয়ে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের ভবিষ্যতের পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে কোয়ালিশনের বড় শরিক শাসক কংগ্রেসের মনোভাব। এই সরকারের কীর্তিকলাপে শাসক কংগ্রেসের একাংশ, বিশেষত যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ নেতারা যে বিশেষ খুশি নন একথা আজ আর গোপন নেই। সুব্রত মুখোপাধ্যায় তো প্রকাশ্যেই এই সরকারকে 'কেরাণীদের সরকার' বলেছেন। তাঁরা চান, এই বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন। তাঁদের আশা, নতুন নির্বাচনে কংগ্রেসের শক্তি আরো বাড়বে।

গত নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্যের পিছনে যুব-কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের কর্মীদের অবদান কম নয়। ভবিষ্যৎ নির্বাচনেও তাঁদের বিরাট ভূমিকা থাকবে। সুতরাং তাঁদের নেতাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা বর্ষীয়ান নেতাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কংগ্রেস সংগঠনকে জোরদার করার জন্যেও তাঁদের দাবি ইতিমধ্যে বেশ জোরালো হয়ে উঠেছে। কিন্তু তবু এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কিনা সন্দেহ। কারণ, বিধানসভা ভাঙার প্রস্তাব তোলার আগে শাসক কংগ্রেস অন্তত কোয়ালিশনের অন্যান্য বড় শরিকের মত জানতে চাইবে। এ-ব্যাপারে দিল্লীর মনোভাবের প্রশ্নটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

১৮।৬।৭২　　—দেবব্রত

দেশে বিদেশে

মৈনুল হক চৌধুরী ফিরে এসেছেন, স্বরণ সিং ও সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ছুটোছুটি করছেন, আরও গণ্ডাখানেক মন্ত্রী রওনা হলেন বলে। বিশ্ববিবেক জাগানোর জন্য ভারতের সরকারী মহলের চেষ্টার ত্রুটি নেই। কিন্তু, মোটের উপর বলতে গেলে, বাংলাদেশ পরিস্থিতি যেখানে ছিল সেখানেই আছে। বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটু "আহা, উহু", ভারতের উপর আশ্রয় প্রার্থীদের যে চাপ পড়েছে তার জন্য কিছু সাহায্য ব্যস, তার বেশী আর কিছু নয়। অন্ততঃ প্রকাশ্যে নয়। (একমাত্র ব্যতিক্রম সোভিয়েট রাশিয়া। সেদেশের নেতারা প্রকাশ্যেই দাবী করেছেন, বাংলাদেশ প্রশ্নের রাজনৈতিক সমাধান চাই।)

ভারতবর্ষ বিশ্বের রাষ্ট্রগুলিকে ও রাষ্ট্রসংঘকে বোঝাবার চেষ্টা করছে :— (১) আশ্রয়প্রার্থীরা যাতে ফিরে যেতে পারেন পাকিস্তানকে তার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য বাধ্য করতে হবে। (প্রতিক্রিয়া :—'আশা করি, পাকিস্তান সেই পরিবেশ সৃষ্টি করবে।') (২) মিলিটারি বুটের তলায় দাবিয়ে বাংলাদেশ প্রশ্নের মীমাংসা হবে না, সেজন্য রাজনৈতিক সমাধান চাই। ('সে তো ওদের ঘরোয়া ব্যাপার, আমরা কি করতে পারি।') (৩) পাকিস্তানের জঙ্গী সরকার যা করছেন তাতে বিশ্বশান্তি ব্যাহত হতে পারে। ('আমরা আশা করি, ভারত ও পাকিস্তান দুই পক্ষই এই ব্যাপারে সংযম অবলম্বন করবে।') (৪) ভারতের মতো দরিদ্র দেশ আশ্রয়প্রার্থীদের এত বড় বোঝাবহন করতে পারে না। সারা পৃথিবীকেই সাহায্য করতে হবে, ভারত শুধু সারা পৃথিবীর হয়ে আশ্রয়প্রার্থীদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এত বড় ত্রাণ সংগঠন তো আর গড়ে তোলা হয় নি।')

ভারত সরকারের চোখে সারা পৃথিবী যেমন এত বড় একটা গণহত্যার ঘটনা ('ডেইলি মিরর', পত্রিকার মতে, হিটলারের পর এত বড় গণহত্যা আর কেউ করে নি।) সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্থ, ভারতের পার্লামেন্টের বহু সদস্যের দৃষ্টিতে ভারত সরকারও দ্বিধাগ্রস্থ অথবা তাঁদের নীতিতে অস্পষ্টতা রয়েছে। তাঁরা যেসব প্রশ্ন তুললেন সেগুলির মধ্যে কয়েকটি হল :— (১) স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না কেন? (নয়াদিল্লীর প্রতিক্রিয়া :—'এখনও সময় হয়নি') (২) রাজনৈতিক সমাধান বলতে আপনারা কি বোঝেন? (শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী :—ভারতবর্ষের মতে, রাজনৈতিক সমাধানের অর্থ হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর যেসব আওয়ামী লীগ

রাইটার্স বিল্ডিংস-এ গত ১০ই জুন এক অনুষ্ঠানে গোল্ডেন টোব্যাকো কোং লিঃ'র পক্ষে সহকারী ম্যানেজার শ্রীপি কে চ্যাটার্জি বাঙলা দেশ মুক্তি সহায়ক সংগ্রাম সমিতির সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জির নিকট বাঙলা দেশের মুক্তি সংগ্রামী ও দুঃস্থদের জন্য তিন লক্ষ পানামা সিগারেট উপহার দেন। দাতা কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সহকর্মী সাম্প্রতিক নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে চুক্তি। তাঁরা কি চান সেটা তাঁরাই ঠিক করবেন) (৪) ইতিমধ্যে ভারত সরকারের চেষ্টার এমন কি সুফল ফলেছে যার ভিত্তিতে তাঁরা আশা করতে পারছেন যে, এই আশ্রয়প্রার্থীরা ছয় মাস পরে দেশে ফিরে যাবেন? ('আমি নিশ্চিত যে, সমস্ত বিশ্বশক্তি যদি আগে থেকে চাপ দিত তাহলে মীমাংসা সম্ভব হত। এখন সেই সম্ভাবনা আরও দূরবর্তী বলে মনে হচ্ছে তা হলেও, শ্রীমতী গান্ধী বলেন, 'আমি তাঁদের ফিরে পাঠিয়ে দিতে কৃতসঙ্কল্প।')

সত্যি কথা বলতে গেলে, বৃটিশ হাউস অব কমন্সের ১২০জন সদস্য (শ্রমিক দলের মোট সদস্যসংখ্যার অর্ধেক) সেখানে উত্থাপনের জন্য যে, প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন তার বক্তব্য নয়াদিল্লীর বক্তব্যের চেয়ে অনেক সাহসিকতাপূর্ণ ও অনেক বেশী স্পষ্ট। প্রস্তাবটির খসড়ায় বলা হয়েছে 'পরিস্থিতি বিবেচনা করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের স্বস্তি সংসদের বৈঠক আহ্বান করতে হবে। এই পরিস্থিতিকে আন্তর্জাতিক শান্তির পক্ষে ব্যাঘাত হিসাবে এবং গণহত্যা নিরোধ চুক্তির অপলাপ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। রাষ্ট্রসংঘের তদারকিতে শৃঙ্খলা যতক্ষণ না ফিরে আসছে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের অভিব্যক্তির মাধ্যম হিসাবে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে।' এই খসড়া প্রস্তাবে স্পষ্ট করে আরও বলা হয়েছে, 'পাকিস্তান পূর্ববঙ্গে শাসন চালাবার সমস্ত অধিকার হারিয়েছে।'

ইতিমধ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শরণার্থী সংক্রান্ত হাই কমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খাঁ পাকিস্তান ও ভারতে সফর করে গেলেন। ভারত থেকে শরণার্থীরা ফিরে আসছেন, এটা দেখাবার জন্য পাকিস্তান সরকার পূর্ববঙ্গে যেসব 'অভ্যর্থনা শিবির' খুলেছেন সেগুলির কয়েকটি তাঁকে দেখান হয়েছে। এই সব 'অভ্যর্থনা শিবির' ঘুরে এসে তিনি চব্বিশ পরগণা জেলার কয়েকটি সীমান্তবর্তী ক্যাম্পে গিয়ে একথা বোঝাবার

চেষ্টা করেন যে, শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছেন এবং শরণার্থীরাও ফিরে যেতে আরম্ভ করেছেন। পরে অবশ্য তিনি সংশোধন করে বলেছেন যে, পূর্ববঙ্গের অভ্যর্থনা শিবিরগুলি পরিদর্শনের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকার তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন, একথাই তিনি বলতে চেয়েছেন। ভূতপূর্ব আগা খাঁর পুত্র ও বর্তমান আগা খাঁর কাকা প্রিন্স সদরুদ্দিনের সঙ্গে পাকিস্তানের ঘনিষ্ট যোগ রয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর অনেক টাকা খাটছে। তাঁর একজন বড় অংশীদার হচ্ছেন আয়ুব-তনয় গহর। শুধু পশ্চিম পাকিস্তানেই নয়, বিদেশেও সদরুদ্দিন ও গহর একসঙ্গে মিলে টাকা খাটাচ্ছেন। বিলাতের গার্ডিয়ান পত্রিকার খবর হল, প্রিন্স সদরুদ্দিনের কাছে রয়েছে পাকিস্তানের পাশপোর্ট। তাছাড়া, ভারতবর্ষের সীমান্ত অঞ্চলে তিনি যে সংক্ষিপ্ত সফর করেছেন তা থেকে তাঁর পক্ষে আশ্রয়প্রার্থী সমস্যার খুব সামান্যই ধারণা করা সম্ভব। টাইমস্ পত্রিকার পিটার হ্যাজেলহার্স্ট লিখেছেন, 'যেসব সাংবাদিক আশ্রয়প্রার্থী শিবির ও সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে ঘুরেছেন তাঁরা এবিষয়ে স্থিরনিশ্চয় যে বনগাঁ অঞ্চলে সংক্ষিপ্ত সফর সেরে প্রিন্স সদরুদ্দিন আশ্রয়প্রার্থী সমস্যাটা যে কত বড় তার সম্পূর্ণ ধারণা করতে পারেন নি।'

সুতরাং প্রিন্স সদরুদ্দিনের এই সফর থেকে ভারতের আশা করার বিশেষ কিছু নেই। তবে, যেটুকু বোঝা গেল তা হল এই যে, তাঁর দপ্তর শরণার্থীদের ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা তদারক করার জন্য ঢাকায় একটি অফিস খুলবেন।

*

গত ২৫ মে তারিখে শাসক কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ডের বৈঠকে স্থির হয় যে, বিহার ও পাঞ্জাবের মন্ত্রিসভাকে হঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সবকিছু ঘড়ির কাঁটার মতো ঠিকঠাক চলছিল। ১ জুন তারিখে বিহার বিধানসভার অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে কর্পূরী ঠাকুর মন্ত্রিসভা বিদায় নিলেন। পরে সেখানে শাসক কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে প্রগতিশীল বিধায়ক দলের মন্ত্রিসভা গঠিত হল। বিহারের পর পাঞ্জাবের পালা এল। সেখানে প্রকাশ সিং বাদলের অকালী মন্ত্রিসভাকে উৎখাত করার আয়োজন চলতে লাগল। অকালী দলের ভিতর থেকেই রব উঠতে লাগল, দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রীদের সরাতে হবে, বাদলের জায়গায় অন্য কাউকে নেতা করতে হবে, মন্ত্রীর সংখ্যা কমাতে হবে ইত্যাদি। মন্ত্রী ত্রিলোচন সিং রিয়াসিত পদত্যাগ করলেন, এস এস পি সদস্য রূপলাল শেঠী মন্ত্রিসভা থেকে তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার ক'রে নিলেন এবং এককালের বিদ্রোহী অকালী ও পরে অকালী দলের পার্লামেন্টারি বোর্ডের সভাপতি গুরনাম সিংয়ের সঙ্গে দূতের মারফৎ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কি কথাবার্তাও নাকি পাকা হয়ে গেল। শাসক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ শঙ্করদয়াল শর্মা নিজে চণ্ডীগড়ে শিবির গড়লেন মন্ত্রিসভা উৎখাত অভিযানের তদারকি করতে। সবই হিসাব মতো হল। এমন কি যথা সময়ে, বিধানসভা যেদিন বসার কথা তার আগের দিন, বাদল মন্ত্রিসভা ইস্তফা দিলেন। কিন্তু বিদায় নিয়ে যাওয়ার আগে তিনি শাসক কংগ্রেসের বাড়াভাতে ছাই দিয়ে গেলেন। তিনি বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য রাজ্যপালকে পরামর্শ দিলেন এবং রাজ্যপাল সেই পরামর্শ গ্রহণ করলেন। ফলে, বাদল বিদায় নিলেন বটে, কিন্তু শাসক কংগ্রেস বা তার সমর্থিত মন্ত্রিসভা তাঁর জায়গা নিতে পারলেন না।

লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর শাসক কংগ্রেস যে কয়টি রাজ্যের উপর নজর দিয়েছিল সেগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে তারা ক্ষমতায় ফিরে আসতে পেরেছে, মহীশূর ও গুজরাট থেকে প্রতিপক্ষদের হঠাতে পারলেও নিজেরা ফিরে আসতে পারেনি। মহীশূর ও গুজরাটের রাজ্যপালরা তবু শাসক কংগ্রেসকে সুযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু পাঞ্জাবের রাজ্যপাল ডাঃ দাদাসাহেব চিন্তামণি পাভাতে কোনও সুযোগ না দিয়ে, কারও জন্য অপেক্ষা না করে, কেন্দ্রের সঙ্গে কোন রকম পরামর্শ না করে সংবিধানের ১৭৪ (খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিধানসভা ভেঙ্গে দিয়েছেন।

রাজ্যপালদের মধ্যে ডাঃ পাভাতে একজন ভিন্ন জাতের মানুষ। তিনি হতাশ রাজনীতিক, অবসরপ্রাপ্ত বড় আমলা, বিচারপতি অথবা সৈনিক নন। গণিতের অধ্যাপক, ডি পি আই, উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি শিক্ষাবিদ হিসাবেই জীবনের দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন। রাজ্যপাল হিসাবে তিনি যেমন নজীর ছাড়া তেমনি মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সেই মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী বিধানসভা ভেঙ্গে দিয়ে তিনি নজীর-ছাড়া কাজ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

১৩ জুন দুপুর বেলায় সর্দার গুরনাম সিং ও আর কয়েকজন চণ্ডীগড়ের রাজভবনে গিয়েছিলেন রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে। সর্দার গুরনাম সিং সহ ১৮জন এম এল এ অকালী দল থেকে বেরিয়ে এসে একটি পাল্টা অকালী দল গঠন করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে ছয়জন মন্ত্রীও আছেন, এই কথাটা জানাবার জন্য তাঁরা রাজভবনে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা শুনলেন, রাজ্যপালের সঙ্গে এখন দেখা হবে না, কারণ তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছেন। তাঁদের বিকাল সাড়ে চারটার সময় আসতে বলা হল। অগত্যা রাজ্যপালের সেক্রেটারীর কাছে তাঁদের বক্তব্য বলে গুরনাম সিং ও তাঁর অনুগামীরা ফিরে এলেন। তারপর বিকাল সাড়ে চারটার সময় তাঁরা যখন আবার রাজভবনে গেলেন তখন তাঁদের

লা হল, তখন আর কিছু করার নেই, কারণ রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন।

রাজ্যপাল পাভাতের এই সিদ্ধান্তে কোন কোন মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পাঞ্জাবের শাসক কংগ্রেসের বিধানসভা দল ডাঃ পাভাতের 'অগণতান্ত্রিক ও সংবিধান-বিরোধী কাজের জন্য' তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবী করেছেন। গুরনাম সিং রাষ্ট্রপতির কাছে পত্র লিখে দাবী করেছেন, রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেওয়া হোক। পাঞ্জাব বিধানসভায় শাসক কংগ্রেস দলের নেতা হরিন্দর সিং রাষ্ট্রপতিকে লিখেছেন, রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগসাজসে কাজ করেছেন। বিধানসভার স্পীকার দরবারা সিংও রাজ্যপালের কাছে পত্র লিখে তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

রাজ্যপাল ডাঃ পাভাতে রাষ্ট্রপতির কাছে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন তাতে তিনি তাঁর নিজের সিদ্ধান্তের সমর্থনে বলেছেন যে, কিছু এম-এল-এ-র আনুগত্য হরদম বদলায়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলই তাঁদের সাহায্য গ্রহণ করতে পারে এবং তাতে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যেখানে রাজনৈতিক দরকষাকষি চলতে পারে। রাজ্যপালের মতে এই পরিস্থিতি চলতে দেওয়া হলে সেটা সুস্থ গণতান্ত্রিক প্রথা গড়ে ওঠার সহায়ক হত না, রাজ্যের জনসাধারণকে একটা পরিচ্ছন্নতর প্রশাসন দেওয়ারও সহায়ক হত না।

রাজ্যপালের এই রিপোর্ট যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটি ও সম্পূর্ণ মন্ত্রিসভার সামনে বিবেচনার জন্য এল, তখন প্রশ্ন উঠল, রাজ্যপালের বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেওয়া হবে কিনা। আলোচনায় স্থির হল, যদিও রাজ্যপাল 'অযথা তাড়াহুড়া' করে এই সিদ্ধান্ত করেছেন এবং আইন ও সংবিধানের দিক থেকে তাঁর এই সিদ্ধান্ত বাতিল করা যদি বা সম্ভবপর হয়, তাহলেও তা করলে কেন্দ্রের উপর রাজনৈতিক অভিসন্ধি আরোপ করা হতে পারে। মন্ত্রিসভা স্থির করলেন যে, রাজ্যপাল ইতিমধ্যে যা করেছেন, তাতে তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করা ছাড়া অন্য পথ থাকছে না।

১৫ জুন তারিখে রাষ্ট্রপতি শ্রীভিভি গিরি মাদ্রাজ সফর থেকে রাজধানীতে ফিরে আসার অব্যবহিত পরেই ঘোষণায় স্বাক্ষর করলেন এবং এই চতুর্থবারের জন্য পাঞ্জাব রাষ্ট্রপতির শাসনের অধীনে এল।

রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হওয়ার পরও পাঞ্জাবের শাসক কংগ্রেস মহল রাজ্যপালের বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়ে যাবেন বলে মনে হচ্ছে। পাঞ্জাবের শাসক কংগ্রেস দলের সভাপতি জৈল সিংহের নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে নির্বাচনের আগে পাঞ্জাবের রাজ্যপালকে সরিয়ে নেওয়ার দাবী জানিয়েছেন; কেননা তাঁদের মতে বর্তমান রাজ্যপালের হাতে শাসনভার থাকলে অকালী দলেরই সুবিধা হবে।

১৮-৬-৭১

মা আমার বাংলাদেশ ॥

তরুণ সান্যাল

মাচা না পেণ্টরার তলে
পড়েছিল লাঙল-না-বল্লমের ফলা,
ঐ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শত পাকে
স্বচ্ছল দিনের শেষ চিহ্নটুকু আঁকড়ে ধরে
ঘাটের পইঠায় বসে অশ্রুর আভাসে
মা আমার বাংলাদেশ
কেমন ঝকঝকে করে ঘসে তুলছে তাকে,
জলের চিকন ছোঁয়া
হাওয়ার দমকায় দোলে দণ্ডকলসের ফুল
গন্ধভাদালের ঘন ঘাসে।

শান্ত দিঘি, ভাঙা ঘাট,
মা আমার বাংলাদেশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফলা মাজে।
মধ্যদিন, রৌদ্র কাঁপে আমের গুটিতে, মণিবন্ধে নাচে কাচচুড়ি
চোরা ঢেউয়ে ছলছলাৎ ঘাট,
একেকটি দিনের দুঃখ মর্মরিত গাছের শাখায়,
কচি কলাপাতে দীর্ঘ শুয়ে আছে
নালতে শাক, ওগুগর চালের ভাত, মৌরলা মাছের ঝোল,
বাড়ির গাইয়ের দুধ, এমনই স্বরাট

শ্মশানে অনেক ছাই, শূন্য ভিটা,
ইঁদুরের মাটি, সদ্য খরিসখোলস, উইঢিবি,
গোরুর গাড়ির চাকা তেলহীন যন্ত্রণায়
গ্রামজোড়া গোরস্থান আহ্নিক গতিতে
ঘুরে যায়,
কোমল মাটির খুরি উচ্ছ্বসিত শোণিতে ঐ
অভিমন্যুদেহ কোলে সুভদ্রা না সমস্ত পৃথিবী
সদ্যজাত বাছুরের টলমল দাঁড়ানো দেখে
স্নেহার্দ্র সে বিশালাক্ষী,
প্রতিরক্ষা তীক্ষ্ণ শিঙে, গম্ভীর হাম্বায়

মা আমার বাংলাদেশ
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাদ-ময়লা মোছে তারই
ও-কি মরচে জ্বলে যাওয়া অঙ্গারকুসুম
খর খঙ্গে ঝকমকার, ওকি
খরশান শুদ্ধ তরবারি।।।

বর্ষা আতর ॥

প্রতিমা সেনগুপ্ত

'মঠঠি' নাকি বর্ষার আতর।—
এ বর্ষাও আতরের।
তাই অনুভূতিটা প্রথম বৃষ্টির গন্ধে
পনের বছরের ঝাঁঝাল উত্তেজক;
প্রাণের বেসুরো বাতাসে উন্মাদ
চমকিত।

এই বয়সে আমার ঘুড়িটাও উল্টো দিকে উড়তে চায়
প্রাণহরা ঐ প্রেমিকের স্পর্শ নাকে নিলে।
হাওয়াতে ওর তপ্ত ঠোঁটের স্পর্শ;
উদ্দাম উচ্ছল মাতাল একাকার ক্যানভাসে
আমি এরপর কি দেখব জানো কি?
কি সমাপ্তি ওর সম্পূর্ণতায়?
আমি মাঝরাস্তায় এগিয়ে এসে পিছন ফিরে আছি,
এবার কি উল্টো ট্রেনের টিকিট কাটব?

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৪)

কার্যক্ষেত্রে নেমে কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হতে হোল।

প্রথমত বেশ একটি যোড়েল গোছের ব্যবস্থা স্ত্রীলোক দরকার। ভদ্রঘরের পাওয়া যাবে না, বাঞ্ছনীয়ও নয়। দু-জন হলেই ভালো, তবে কাজের আর বিশ্বাসী এক-জনকে পেলে সে আর একজনকে জোগাড় করে আনতে পারবে। আবার দুজনের কেউই পুরোপুরি ভেতরকার কথা জানলে

চলবে না, অথচ লুকুনো হচ্ছে টের পেলেও তাদের অকুণ্ঠ সহায়তা পাওয়া যাবে না। ভাসাভাসা খানিকটা জানিয়ে দিতে হবেই।

দ্বিতীয় সমস্যা, অত দূরে থেকে রোজ এসে জল ঢালা। দিনে চলবে না। জল ঢালার পরও মাটি ঠেলে ঠাকুরের বেরুতে বেশ কিছুদিন লাগবে। কে-গুপ্ত বলে-ছিল ঠাকুর খানিকটা উঠেছেন দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা বেদি করে চালা তুলে দেওয়ার কথা। কারুর পছন্দ হয় নি। প্রথমত প্রস্তাবটা কে-গুপ্তর। দ্বিতীয়ত মাটি খুঁড়ে একটু একটু করে ওঠাই যেন ঠাকুরদের সনাতন পদ্ধতি, নৈলে কৌলিন্য থাকে না।

মাথা ঘামাতে লাগল সবাই। ইতিমধ্যে সবাই গোঁফ দাড়ি কামানো ছেড়ে ছিল। বাড়ুক, তারপর ভূমিকা অনুযায়ী মেক-আপ করে নেবে—রেখে, কিম্বা ছেঁটে, কিম্বা নির্মূল করে দিয়ে।

ভাবছে, যাওয়া আসা করছে, তারপর একদিন ঘোঁৎনা পল্লীটার দিক থেকে এসে জানাল সে প্রথম দুটো ব্যাপারেরই কিনারা করে ফেলেছে—

আশ্চর্য মেয়েছেলে বামনদাসী। ও-বাড়ির কেউ নয়, জেতেও মনে হোল সদগোপ, ঠিক যে ও-বাড়ির চাকরানি তাও নয়, কিন্তু হেন কাজ নেই যাতে বামনদাসী নেই। আরতির তো এক পুজোটা ছাড়া জোগাড়যন্ত্র থেকে নিয়ে সব কিছুই যেন তারই জিম্মায়, ইস্তক-হাতে হাতে বাতাসা বিলানো পর্যন্ত। বাড়ির ভেতরেও বোলবোলাও খুব। চরকির মতো ঘুরছে একে ফরমাস করে, ওকে ধমক; এর পিসি ওর দিদি, তার বৌদিদি—এলাহি কাণ্ড এক! পাড়ার সবার ওপরও ঐরকম দাপট। আরতির সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোঁৎনা যেমন দেখল। থাকে প্রায় আরতি পর্যন্ত তারপর বেশ বড় করে এক মুঠো বাতাসা আর প্রসাদী পেঁড়া আঁচলে বেঁধে কাঁধে ফেলে হনহন করে বেরিয়ে যায়।...'দিদি আর একটু বসে যাবেন?' '...না বোন, উপায় নেই।'...'পিসি!' ...'ওরে, পিছু ডাকিস নে মা, এবার তোরা সামলে নে।'

কোন কাজেরই ছুতো। পাড়ার কারুর। পাড়াটা যেন হাতের তেলোয় ধরে আছে বামনদাসী!

কদিন থেকে মাথায় ঘুরছিল ঘোঁৎনার, বাতাসা নেওয়ার সময় একটা সম্বন্ধও পাতিয়ে ফেলেছে।

আজ যখন যাচ্ছে, পিছু নিল ঘোঁৎনা, অবশ্য দূরে দূরে থেকে। বেশ খানিকটা গিয়ে একেবারে জায়গায় এসে একটু পা চালিয়ে কাছে এসে পড়ে ডাকল—'বামনপিসি।'

ঘুরে দাঁড়াল—কে? আমায় ডাকছ?

ঘোঁৎনা এগিয়ে গেল, পায়ে হাত দিয়ে কপালে হাতটা ঠেকিয়ে —একটা ভুল নাম আর ঠিকানা-পরিচয় ঠিক করাই ছিল—জানাল, বড় বিপদে পড়ে তার কাছে এসেছে। বুড়িদিদিমা স্বপ্ন দেখেছে এই পাড়ার ঐ পোড়া বাগানবাড়িটার কাছাকাছি কোথায় মাটির নীচে কোন এক ঠাকুর পোঁতা পড়ে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছেন, বেরুতে চান। ঘোঁৎনারা কয়েকজন মিলে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছে জায়গাটা। যাবেই পেয়ে, কিন্তু মুশকিল হয়েছে, বেরুলে একটু দেখাশোনা আগলানো দরকার। কিন্তু ওরা যেখানে থাকে—সেই রামরাজাতলায়—সেখান থেকে তো উপস্থিত সেটা অসম্ভব। এর পর অবিশ্যি মায়ের মন্দিরও হবে, সব হবে, ওরাই করবে ব্যবস্থা কিন্তু মোহাড়াটা সামলাবার জন্যে একজন লোক চাই, বেশ একজন বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক ঠাকরুও নিজে মোয়ে কিনা, স্বপ্ন দিয়েছেন আমায় এয়োচণ্ডী বলে ডাকবি।

ঠার চেয়ে থেকে শুনে গেল বামনদাসী জিজ্ঞেস করল—তা বেছে বেছে আদাড়ে জংগলে কেন? ঘোঁতন জানাল—দিদিমাও সেকথা স্বপ্নে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ঠাকুর বললেন আগে নাকি এ জায়গাটা একটা পীঠস্থান ছিল, যার জন্যে এতল্লাটে এখনও ধর্মভাবটা লেগে রয়েছে। ঘোঁতন দেখছেও তো কদিন থেকে। এখন পিসিকে দায়টুকু নিতেই হবে তুলে।

খটকা মিটিয়ে নেওয়ার জন্যে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করল বামনদাসী। ঘোঁতন তোয়েরই ছিল, খুট খুট করে জবাব দিয়ে যেতে নিমরাজি গোছের হয়ে বলল—তা বেরুন ঠাকুর, তখন দেখা যাবে। ঘোঁতনের টোপ ঠিক করাই ছিল, সংগে সংগে ফাংনা ভাসিয়ে গেঁথে ফেলল। একটা দশ টাকার নোট এগিয়ে ধরে বলল, ঠাকুর আর এক ফ্যাসাদ করে বসেছেন বামনপিসি, ওঁদের মনমেজাজ তো বোঝা যায় না, প্রত্যাদেশ হয়েছে জায়গাটা ঠিক হলে রোজ এক কলসী করে গঙ্গাজল ঢালতে হবে নেয়ে উঠে। তার খরচ আছে তো......

কে-গুপ্ত একটু শুকনো মুখে প্রশ্ন করল-রাজি হয়ে গেল?'

'আর না হয়ে পারে মশাই?'—বক্র-দৃষ্টিতে চেয়ে উত্তর করল ঘোঁতন। বলল—শুধু বললে মাটির কলসী করে অত দূর থেকে জল আনা চলবে নাতো, একটা পেতলের ঘড়া চাই: ছোটখাট হলেও চলবে, তবে তাও টাকা কুড়ির কমে হবে না। বাকিটা কাল এনে দোব বলে এসেছি। রাজেন আপাততঃ এটাকাটা বের কর;—তারপর কিছু কিছু করে সবাই তুলে ফেলতে হবে সবটা।'

রাজেন বলল—'এ দশটার দায়িত্ব না হয় রাজেনই নিলে।'

ত্রিলোচন ঘোঁতনের দিকে চোখ টিপে চেয়ে ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসল।

(৫)

দিন দশেক পরের কথা।

এর মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। তার একটা মোটামুটি বিবরণ প্রধান নায়ক যিনি তাঁর মুখ থেকেই শোনা ভালো; ধকোলটা তাঁর ওপর দিয়েই তো গেল।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ পেরিয়ে গিয়ে বেশ খানিকটা রাত্রিই হয়েছে। রাজেনদের বাড়ির বৈঠকখানার ফরাশে বসে গণশার মামা গোলোক চাটুজ্জে আর পুঁটরাণীর ঠাকুর-দাদা ভুবন মুকুজ্জে দাবা খেলছিলেন পাশে রাজেনের কাকা রামজয় বাঁ-হাতে হুঁকো নিয়ে বসে দেখছেন। একটা খেলা শেষ হলে ভুবন মুখুজ্জে রামজয়ের হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে গোলোক চাটুজ্জেকে উদ্দেশ করে বল-লেন—'হ্যাঁ. একটা কথা কদিন থেকে দাদাকে বলব বলব ভাবছি, তা মনেই থাকে না। একটা জিনিস দাদা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানিনা —নাৎজামাইয়ের দলের সবকটা একসংগে খেউড়ি হওয়া ছেড়ে দিয়েছে। সেদিন সন্ধ্যায় ওপার থেকে আসতে আসতে সবকটাকে ষষ্টীমায়ঘাটে ভিড়ের মধ্যে দেখলাম কিনা। ব্যাপার ভাবতে পারেন?'

গোলোক চাটুজ্জে বাঁহাতে দাড়ি আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললেন—'দেখেছি। এঁচেছে আবার কিছু একটা। নাও পাতো, আর একদান হোক।'

নিজের দিকটা সাজাতে সাজাতে রাম-জয়কে বললেন— 'রাজুবাবাজীর বিয়েটা এবার দিয়ে দাও হে রামজয়। ঐটে যতদিন সোঁদা থাকবে, অশান্তি যাবে না।'

রামজয় কি উত্তর দিতে যাবেন, এমন সময় একজন ভদ্রলোক যেন চারিদিকটা একটু মেলাতে মেলাতে বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হলেন, তারপর বাড়িটাও একবার ওপর-নীচে মিলিয়ে নিয়ে রকে উঠে পড়ে প্রশ্ন করলেন—এটা কি রামজয় সেনগুপ্ত-মশাইয়ের বাড়ি—'

তিনজনেই একটু চকিত হয়ে চাইলেন। গোলোক চাটুজ্জের সামনাসামনি পড়ে, উত্তর দিলেন—'হাঁ; আপনার কোথা থেকে আসা হচ্ছে?'

ভদ্রলোক কালো বেঁটে, টেপা নাকের নীচে সুস্পষ্ট বর্তুল গোঁফ; একটু স্থূলাঙ্গ, গায়ে একটা পিরান, তার নীচের তিনটে বোতাম খোলা, কেশবহুল ভুঁড়ির খানিকটা দেখা যাচ্ছে; হাতে বেশ গাটতোলা একটা মোটা লাঠি।

কথায় সরাসরি উত্তর না দিয়ে, উঠে গিয়ে লাঠিটা চৌকাঠে ঠেস দিয়ে রেখে ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালেন, ছকটার দিকে একটু সতৃষ্ণ-দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—

—'বাঃ, দাবা চলে নাকি এখানে?'

'আছে নাকি শখ? তাহলে...ভুবন মুখুজ্জে উত্তর করলেন।

ভদ্রলোক তাঁরই পাশে বসতে বসতে বললেন—'না, জিনিসটা উঠে যাচ্ছে কিনা দেশ থেকে। তাই বলছি। ছিল শখ; ছিল কেন বলি, আছেও, তা যা দিনকাল পড়েছে দাদা—আর বিশেষ করে যা এক সমিস্যে নিয়ে পড়েছি, যার জন্যে হাঁপাতে হাঁপাতে আসা।...এটাই তাহলে রামজয় বাবুর বাড়ি? তা, কর্তা'

ভুবন মুকুজ্জে রামজয়কে দেখিয়ে বললেন—'এই ইনি। আমরা না হয় বাইরে যাব একটু?'

'না, না, না, কিছু দরকার নেই। একটা ধন্দো মিটিয়ে নেওয়ার, এখুনি হয়ে যাচ্ছে, বসুন আপনারা। দাবাটাও যখন সামনে পেয়েছি দাদা, অনেকদিন পরে..."

—বলতে বলতে একখানি একসারসাইজ বুকের ছেঁড়া পাতা পকেট থেকে বের করে ভাজ খুলে রামজয়ের হাতে দিলেন। পাতাটা আগ্রহভাবে পড়তে পড়তেই তাঁর ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠল, মুখটাও গেল শুকিয়ে। শেষ করে উনি গোলোক চাটুজ্জের হাতে এগিয়ে দিলেন। তাঁরাও পড়তে পড়তে মুখে একটা বিমূঢ়ভাব ফুটে উঠল; একবার আগন্তুকের পানে চেয়ে নিয়ে কাগজটা ভুবন মুখুজ্জেকে এগিয়ে দিয়ে হেঁট হয়ে দাড়ি আঁচড়াতে লাগলেন। কাগজটায় লেখা রয়েছে—

লিখিতং অত্র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তস্য কার্যঞ্চাগে—

আমি শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পিতা শশধর সেনগুপ্ত, হাল সাকিম শিবপুর, ১৭ নম্বর রতিকান্ত সেনগুপ্ত লেন, সজ্ঞানে এবং বহাল তবিয়তে এই মুচ-লেখাপত্র দিতেছি যে আমি অদ্য হইতে মাস তিনেকের মধ্যে যজ্ঞেশ্বর রায়ের কন্যা শ্রীরসময় সেন মহাশয়ের ভাগিনেয়ী শ্রীমতী আদরিণী রায়কে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। অন্যথায় আমার সম্বন্ধে উক্ত শ্রীরসময় সেন মহাশয় সর্বপ্রকার আইনসংগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অধিকারী থাকিবেন।

ইতি— শ

শেষ হলে তিনজনেই পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছেন, ভদ্রলোক বাইরে বাইরে গম্ভীর হলেও, গোঁফের জঙ্গলে কোথায় যেন একটু কৌতুক-হাসি আটকে

রেখেছিলেন, একেবারে এমনভাবে হো-হো করে হেসে উঠলেন যে স্থূল শরীরটা দুলে দুলে উঠল। কাগজটার জন্যে হাতটা বাড়িয়ে ধরেছিলেন, সেটা নিয়ে ফাংফাং করে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললেন—'কিছু না, কনিষ্ঠের বেয়াদাপিটুকু মাফ করতে হবে দাদা। তারপরে আপনাদের দয়া আর ভগবানের সেরকম ইচ্ছে হলে...'

গোলোক চাটুজ্জে বললেন—'একটু খুলে বলুন, আমাদের এই চর্চাই এতক্ষণ হচ্ছিল।...তামাক চলে বোধ হয় ?......বেশ। ওরে ছিলিমটা পালটে দিয়ে যা!...হ্যাঁ, তারপর ?'

'সংক্ষেপেই আপাতত বলি' দাদা, ভগবান যোগাযোগ ঘটান। এখন এ কাহিনী তা আর শেষ হবে না।'—হাসতে হাসতে আরম্ভ করলেন—'অধীনের নাম ঐ মুচেলেকাতেই দেখলেন। বোটানিক্যাল গার্ডেনের দক্ষিণে একটা কুঁড়ে নিয়ে আছি, পাঁচ পুরুষের বসবাস। বাড়িতে গৃহদেবতা মদনমোহন, তাঁর একটু ভোগারতির ব্যবস্থা আছে, পাড়ার পাঁচজনে আসে, একটু ভীড়ই হয়, অনেক ঠাকুর। বামনদাসী বলে একটি সদগোপের মেয়ে আমাদের অনুগত, নিত্যসেবার আয়োজনে থাকে। পরশু আরতি হয়ে গেলে আমায় ওপরতলায় একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে যা বললে তাতে বেশ একটু ভাবিয়ে তুললে দাদা; আমাদের ওদিকটা একটু জঙ্গুলে, লোক কম, এমনি বেশ একটু সাবধানেই থাকতে হয়। বামনদাসী বললে—কদিন থেকে আরতির সময় একটি বছর তেইশ, চব্বিশের ছেলে এসে দাঁড়াচ্ছে। ও অতটা খেয়াল করেনি, তারপর, যেদিনকার কথা তার হপ্তাখানেক আগে আরতির পর ও বাড়ি যাচ্ছে, খানিকটা গেছে, ছেলেটি পেছন থেকে ডাকলে বামনাপিস বলে। থেমে যেতে সে এক উদ্ভুটে গল্প! ওর দিদিমাকে নাকি এইখানে কোন এক ঠাকুর উঠবেন বলে স্বপ্ন দিয়েছেন, আপাতত রোজ সেখানে এক ঘড়া করে গঙ্গাজল ঢালতে হবে, তারপর ঠাকুর মাটি ফুঁড়ে বেরুলে বামনদাসীকেই দেখাশোনা করতে হবে। মেলা আইবুড়ো মেয়ে চারিদিকে জমেছে, ঠাকুর নাকি তাদের হিল্লে করবার জন্যে মাটি ফুঁড়ে উঠছেন।

এতদিন বামনদাসী আমায় কথাটা বলেনি তার কারণ ছেলেটার দৌড় দেখছিল, এদিকে নজরে নজরে রাখছিল বেশ আকিঞ্চন দেখিয়ে। এর পর কাল ছেলেটি জানিয়ে গেছে জায়গাটার ঠিক সন্ধান পাওয়া গেছে, আজ সন্ধ্যার পর ওরা চুপি চুপি এসে একটু পরিষ্কার করে ঠিক ওঠবার জায়গাটিতে একটা হাত-দুয়েকের কঞ্চি পুঁতে রাখবে, বামনদাসী বেশ নিরিবিলি দেখে কাল থেকে যেন একঘড়া করে গঙ্গাজল ঢেলে দেয়। ঠাকুর না বেরুনো পর্যন্ত যেন জানাজানি না হতে পারে। ওখানে মিত্তিরদের একটা হানাদো বাগানবাড়ি আছে, তার ভাঙ্গা চৌহদ্দি-পাঁচিলের বাইরে; এদিকে জঙ্গল ওদিকে পাঁচিল। ওদিকের কাহিনী এই দাদা।

সন্ধ্যের আগেই আমি দুজন লোক নিয়ে [illegible] দিয়ে উঠলাম উল্টোদিক দিয়ে। কিছু হাতিয়ারও নিয়ে দাদা, মিছে কথা বলব না—জায়গাটা খারাপ, তাছাড়া কি ধরনের লোক ঠিক জানাও নেই, ভাবলাম একটু সাবধান থাকাই ভাল। সন্ধ্যে হয়ে আসতে আমরা গুটিগুটি গিয়ে দেয়ালের পেছনে ঘাপটি মেরে বসলাম। এই মিনিট কুড়িক। নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রয়েছি। দুটি ছোকরা চারিদিকে নজর ফেলতে ফেলতে এসে পৌঁছাল, একজনের বেশ ঢলঢলে চেহারা, মাথায় লম্বা চুল, হাতে একটা মোটা খাতা, অন্যটির হাতে একটা শাবল। এদিক-ওদিক দেখে টুপ করে ঝোঁপের আড়াল হয়ে গেল। আমি দেয়ালের এদিকে ঝোঁপের আড়াল থেকে নজর রেখে যাচ্ছি। এর পরই আরও দুজন, দুদিক থেকে। একজনের হাতে গামছায় জড়ানো কি একটা, অন্যটির হাতে থলে, মনে হোল যেন একটু ভারিই। দম বন্ধ করে বসে আছি, এরপর আর একজন। তবে, ওরা চারজনে যেমন ঝোঁপের ভেতরে ঢুকে পড়েছে, এ যেন আরও পা টিপে টিপে আদুল রোডের দিক থেকে এসে একটা মোটা জেয়ল গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন আর কারুর পথ চেয়ে। এক বিচিত্র কাণ্ড, এমনটি কখন দেখিনি দাদা? এর পর অনেকখানি সময় গেল, যেন যার আসবার কথা এসে পড়ছে না বলে এরাও যা করবার শুরু করতে পারছে না। ... দিন দাদা, সাজিয়ে আনালেন আমার জন্যে, ছোটভাইয়ের কথা ভুলে নিজেই টেনে যাচ্ছেন।'

নকুলে মানুষে বলে মনে হয়। হেসে কথাটা বলে গোটা তিনেক টান দিয়েই হো-হো করে হেসে উঠলেন। এঁরা বিস্মিত হয়ে কিছু প্রশ্ন করবার আগেই নিজেই বলে উঠলেন—'ছেলেবেলায় ল্যাবেঞ্চুশ কখনও শেষ পর্যন্ত চুষে শেষ করতে পারতেন দাদা? আমি তো পারতাম না, এখনও পরখ করে দেখেছি, পারি না, কুট করে কামড় দিয়ে বসি। কথাটা এইজন্যে বলছি কী যে রোগ, শেষরক্ষা করতে পারি না কোন কাজেই, কেমন যেন ধৈর্য হারিয়ে বসি। ওদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে, এই চারজনের মধ্যে যেই একজন চাপা গলায় বলেছে—'তাহলে শুরু করেই দিই আয়!' —আমি আর থাকতে না পেরে—কে! কোন হ্যায়!'—বলে এদিক থেকে উঠলাম ঠেলে—তারপরে—ওফ্! —সে ছোকরাও গাছের আড়াল ছেড়ে এগিয়ে আসছিল—পাঁচজনে একেবারে পড়ি-তো মরি করে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুট —ওফ্—সে দৃশ্য যদি দেখতেন দাদা!...'

আগুন ছিটকে পড়ার ভয়ে হুঁকোটা পাশে রেখে দুলে দুলে হাসি। অবস্থাটা অনুমান করে এঁরাও কমবেশ করে যোগ দিয়েছেন ভুবন মুকুজ্জে তারই মাঝে বললেন—'যেন আঁচ পাচ্ছি একটু। কিন্তু হাওয়াই হয়ে গেল সব তো মুচলেকাটা এল কোত্থেকে ?'

রসময় হাসি চাপতে চাপতে বললেন—'দুজনকে আটকে ফেলি দাদা। ঝোঁপের ভেতরের একজন—এই রাজেন বলে ছেলেটি —নিরীহই বলে মনে হোল, তারপর নিরীহ হলে যেমন হয়; অপরটির নাম বললে, গোরাচাঁদ। একটু বেশি মোটা, কাপড় প্রায় খুলে গেছে, আমার একজন লোক গিয়ে ধরে ফেললে। একটু যেন বেশি ভীরু, তাইতে ধমক দিতে আর পুলিশের ভয় দেখাতে কথাটাও বেরিয়ে গেল। অবিশ্যি, যতটা পারলে রেখে-ঢেকে বলবারই চেষ্টা করলে, তবে তার মধ্যেই টের পাওয়া গেল, রাজেন বাবাজীর বিয়ের জন্যেই নাকি এই স্বপ্নাদেশের ব্যবস্থা। ...দাঁড়ান দাদা, কী যে কাণ্ড!'

—হুঁকোটা টেনে নিয়ে, চাপা হাসির মধ্যে গোটাকতক টান দিয়ে ভুবন মুখুজ্জের দিকে বাড়িয়ে বললেন—'পরিচয়টাও ভালো করে নিয়ে নিয়েছি দাদা, তারপর—তারপর —ওটুকু আমার একটু দুষ্টুবুদ্ধি। একটি ভাগনী আছে বিয়ের যুগ্যি—বললাম, নরানাং মাতুলক্রমের মত নারীনামেরও মাতুলের মতন চেহারা হয়, সুতরাং লুকিয়ে ফল নেই যে আমার ভাগনীরও মুখ-চোখ-রং-কাঠামো আমার মতনই হবে—বিয়ে দিতে পারছি না, যখন হাতের মধ্যে পেয়ে গেছি, মুচলেকা দিয়ে তাকেই বিয়ে করতে হবে, নয়তো থানা-পুলিশ। শুনেই তো চক্ষু চড়কগাছ দাদা! মামার মুখ থেকে আর নজর সরাতে পারে না—কিন্তু তখন আর ছাড়ছে কে ?...'

বাঁ হাতে পেট চেপে দুলে দুলে হাসতে লাগলেন।

রামজয় বললেন—'আনলেন না কেন ধরে ? আমি আজই ঝুলিয়ে দিতাম—হ্যাঁ, ঐ মেয়ে—মেয়েই তো একটা। আর দিনক্ষণ দেখতে যেতাম ?'

—হাসির ছোঁয়াচ মাঝে মাঝে লাগছে, তবে ভেতরে ভেতরে উত্তপ্তই হয়ে উঠেছেন।

গোলোক চাটুজ্জে হুঁকোটা নিজের হাতে নিয়েছেন, বললেন—'ও মন্দ বলনি। ঐ একটার কোনরকমে হয়ে গেলে কাজে-কর্মে মন বসানো যায় সব কটার। শিবপুর যেন তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে!'

রামজয় ঘুঁটিগুলো নিয়ে আস্তে আস্তে লুফছিলেন, কী যেন বলতে চান, একটু গম্ভীর হয়েই। হঠাৎ আবার হেসে উঠে বললেন—'কিন্তু আমার কাহিনী যে এখনও শেষ হয়নি। তাকে পাব কোথায় যে ধরে নিয়ে আসব দাদা ?'

চুপ করে গিয়ে একটা উদ্গত হাসি চেপে দিয়ে শুরু করলেন—হ্যাঁ, খলিফা ছেলে বলতে হয় মশাই, তারিফ না করে পারা যায় না! আমার বৈঠকখানাটা বাড়ি থেকে একটু তফাতে। নিয়ে গিয়ে সেইখানে বসিয়ে এইসব করছি, হবু জামাই আর তার বন্ধু নেতিয়ে পড়েছে মিষ্টি আনিয়ে, ওরই মধ্যে একটু তোয়াজ দিয়ে চাঙ্গা করবার চেষ্টা করছি, বোঝাচ্ছি—যে করেই হোক একটা সম্বন্ধ যখন দাঁড়াতেই যাচ্ছে একটু মিষ্টিমুখ করুক, বন্ধুটি—সেই

গোরাচাঁদ তুলেও নিয়েছে একটা রাজভোগ, এমন সময় হঠাৎ—'তোরা এইখানে!!'

কানে যেতেই ঘুরে দেখি দোরের কাছে তেসরা একজন, দলের মধ্যে এর আগে দেখিনি। ঐ বয়সীই, হয়তো একটু বড় হবে, আর বেশ এক্সারসাইজ করা চেহারা। ভাবগতিক সম্পূর্ণ অন্যরকম দাদা। আমায় কোন কথা নয়, একেবারে ওদের ওপর ফেটে পড়ল—'বেশ হয়েছে! তোরা রাসুমামাকে ভাঁওতা দিতে গেলি কি বলে? আর যাকে যা বলেছিস, বলেছিস, কিন্তু ওঁকে। দিব্যি হয়েছে!'

একটু আটকে আটকে যায় কথা। আমি একেবারে ভ্যাবাচাকা মেরে গিয়ে হাঁ করে রয়েছি, ওদের ধমকটুকু দিয়ে একেবারে শান্ত হয়ে গিয়ে আমার দিকে চেয়ে খুব নরম আওয়াজে বললে—'একবার উঠবেন মামা দয়া করে?'

খেলা বয়েসকালে আমিও অনেক খেলেছি দাদা, কিন্তু স্বীকার না করে উপায় নেই, রকমসকম দেখে একেবারে যেন বোবা বনে গেছি। ওদের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে উঠতে যাচ্ছি, ওই বলল—'নিশ্চিন্দি থাকুন, সাধ্যি নেই উঠতে, আমি রয়েছি কি করতে?'

বাইরে বেশ খানিকটা তফাতে নিয়ে গিয়ে তোৎলামির মধ্যে যা বললে তাতে বুদ্ধিটুকুর যা বাকি ছিল একেবারে লোপ পেয়ে গেল। মাটি ফুঁড়ে ঠাকুর বেরুনো একেবারে সাজানো কথা, আসল ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার জন্যে। ভেতরকার ব্যাপারটা হচ্ছে গুপ্তধন। স্বপ্নটপ্নও বানানো, এক বৈরিগী তান্ত্রিক সাধুর বাৎলানো। জেনেও গেছে সবাই জায়গাটা আজ তাই শাবল নিয়ে খুঁড়তে এসেছিল।

মাথায় চক্কর লেগে গেছে দাদা। ঠিক লোভ নয়—তবে একেবারে নয়ই বা বলি কি করে? আমাতে তো আর আমি নেই। দেখাতে নিয়ে গেল দাদা—শুনেছি কাঁচ-পোকা যেমন করে আরশোলাকে টেনে নিয়ে যায় তেমনি করেই। ওরা দুজনে সেইভাবেই বসে শুধু যাওয়ার সময় ঘুরে একটু চোখ পাকিয়ে বলে গেল—খবরদার উঠবিনি আর আমার লোক দুটোকে একেবারে এ-তল্লাট থেকে সরিয়ে দিতে বললে, একেবারে কেউ জানবে না। যেতে যেতে শুধু আর একটি কথা—'আমাদের মেহনৎটা কিন্তু মনে রাখতে হবে মামা। ছ'জন আছি একেবারে যেন বঞ্চিত না হই।

কবে যে মামা হয়েছি জানিনে দাদা। একবার হুঁকোটা একটু বাড়াতে হবে। মোক্ষম কথাটা বলবার আগে একটু দম না করে নিলে চলবে না।'

গোঁফের জঙ্গলে হাসি জমে উঠেছে হুঁকোটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—

'আর আছেও অল্প। নিয়ে গেল সঙ্গে করে টেনেই বলতে হয় সাড়ে তো থাকতে দেয়নি। তারপর পায় সেইখানটায় আর একটা টিকরে ভাঙা পাঁচিলের ধারে এসে বললে—'এপারে নয় মামা, ঐখানটায়!''

তার চেয়ে থেকে শুনে গেল বাসনা দাসী

NITAI GHOSH

হাসি চাপা দুষ্কর হয়ে উঠছে, বললেন—'যা গুণ করে ফেলেছে দাদা, আমারও মনে হচ্ছে একটু আত্মীয়তা দেখাই। 'কোনখানটা ভাগনে?' —বলে গলা তুলে এক পা এগিয়ে গেছি, পেছন থেকে কোমরের নীচে হাত দিয়ে তুলেই এক রামধাক্কা—'ঐ ঐখানটায় মামা, ঘ—ঘড়ঘড়ায় ভরা মোহর!!'... ভাঙা পাঁচিল টপকে একেবারে চাপ বনবাদাড়ের ওপর!...'

চারজনেই একেবারে ডাক ছেড়ে হেসে উঠেছেন, তারই মধ্যে গোলোক চাটুজ্জে দাড়ি মুঠিয়ে বললেন—'আগেই বুঝেছি ঐ আবাগের ব্যাটা এই ধরনের একটা কিছু মতলব বের করবে। এসে নিশ্চয় দেখলেন ঘর শূন্য: ঘুরে ইসারা করে গেল যে!...... এ ফ্যাসাদ শেষ করে দাও রামজয়। ঐ যে বললাম, এটাকে না গেঁথে ফেললে কোনটারই কাজে মন বসাতে পারা যাবে না। আর তো 'বয়েসাদি' হয়ে গেল সবার, বাচ্ছাকাচ্ছাও হতে আরম্ভ হয়েছে...'

তামাক পাড়তে লাগল। দাদাও চলল চারজনে মিলে [illegible] সেদিনকার আসরে [illegible] ছলকে ছলকে উঠতে লাগল

বেশি [illegible] কথা। বিয়ের কথাবার্তা সেইদিন দাবার আসরেই পাকা হয়ে গিয়েছিল, আর বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত মনে করলে না কেউ।

পটুরানীর ঠাকুরদাদা ভুবন মুখুজ্জে একটু বেশি রহস্যপ্রিয়, সম্বন্ধটাও গণেশের সুবাদে পরিহাসের, তাঁর প্রস্তাব ছিল, রাজেনকে কিম্বা দলের কাউকেই বাসরের আগে মেয়েকে দেখতে দেওয়া হবে না। ওঁর ভাষায়—'যেমন কর্ম', কাটাক ভাঁওতায় পড়ে ধুকপুকুনির মধ্যে ততদিন।'

আনাচে-কানাচে ঘোরাঘুরি করে উৎপাত লাগাবেই বলে ওর মাসির বাড়ি একেবারে চাকদায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল মেয়েকে।

ভাঁওতাই। একেবারে বাসরঘরে এদের পাঁচজনকেও নেমন্তন্ন করে ঘোমটা তুলে দেখাল মেয়েরা—

না, আদরিণী মাতুলের ধারেকাছে দিয়েও যায়নি। নাকটা অল্প একটু হয়তো চাপা, কিন্তু বেশ টিকোলই, ঘোরালো মুখখানিতে দিব্যি মানানসই। রং হয়তো ততটা মাজা নয়, কিন্তু বেশ বাহারের। শুধু হাসিটি যেন মামার।

মামার গোঁফের-বনের সেই ঝিকিমিকে কৌতুক-হাসিটুকু ভাগনীর পাৎলা ঠোঁটের ওপর যেন আধফোটা একটি [illegible] মতোই আছে লুটিয়ে।

তাহলে আদরিণীও কি [illegible] গিয়ে দাঁড়াবে?

সি এম ডি এ কি করেছেন, করছেন ও করবেন

অজিত চক্রবর্তী

সেই ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দটা আমার কানে এখনও বাজছে। তিনশ বছর আগেকার ভুড়ুক ভুড়ুক। কিন্তু কলকাতার ইতিহাসের সুরু যে ওখানেই।

শেয়ালদা-বৌবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়েছেন কখনও? ভাবতে পারেন ঐ কালো 'পিচপিচে' চত্বরে একদা একটা বিরাট পিপুল গাছ ছিল?

তিনশ বছর আগে বৈঠকখানা বাজারের সেই বিরাট গাছের নিচে বিরাট আড্ডা বসত। রীতিমত সাহেবি আড্ডা। জব চার্ণক সাহেব তাঁর দেশোয়ালি আর নেটিভ সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে আড্ডা জমাতেন। সারা কলকাতা যখন গরমে ঘামত, ওঁরা তখন পিপুল গাছের মিষ্টি ছায়ায় ঠান্ডা আড্ডা জমাতেন। ঐতিহাসিক এই আড্ডার একমাত্র উপাদান ছিল বিশুদ্ধ বঙ্গদেশীয় হুকা। ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের কাজ করত। ওখানেই, সুগন্ধ তামাকের ঢিলেঢালা আমেজ নিয়ে, ওঁরা ভবিষ্যতের এক মহানগরীর জল্পনা-কল্পনা চালাতেন।

১৬৬৮—ইংরেজ কলকাতা-গোবিন্দপুর-সুতানটির জমিদার; ১৭০২—কলকাতার দুর্গশিখরে ব্রিটিশ পতাকা; ১৭৫৮—গোবিন্দপুরের জঙ্গল পরিষ্কার নতুন দুর্গের ভিত্তি। ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যাবে এইভাবেই অত্যন্ত মন্থরগতিতে ভাগীরথীর পূর্বতীরে চোখ মেলে তাকিয়েছে নতুন এক মহানগরী, উদিত হয়েছে নতুন এক যুগ।

ফোর্ট উইলিয়ম জায়গা বদল করেছে, 'দি গ্রীন' অথবা 'দি পার্ক' নাম নিয়েছে ডালহৌসি স্কোয়ার সেন্ট অ্যান-এর চার্চ সাইক্লোনে উড়ে গেলে রাইটার্স বিল্ডিং মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

তাম্রলিপ্তের পর সপ্তগ্রাম, সপ্তগ্রামের পর হুগলি, হুগলির পর কলকাতা। ভারতের মানচিত্রে বাংলাদেশের তারকা সব সময়েই ধ্রুবতারার মত জ্বল জ্বল করছে।

আজকের কলকাতার তরুণ নাগরিকেরা কি বিশ্বাস করবেন যে, তাঁদের এই পচা-গলা শহরই প্রায় সকল বিষয়ে ভারতের পথপ্রদর্শক? বিশ্বাস করবেন কি এই দুঃস্বপ্ন নগরীর ইতিহাসই বহুলাংশে সারা ভারতের ইতিহাস? ইতিহাস এখনও এই সাক্ষ্যই দেয় যে, কলকাতাই সারা ভারতের চিন্তাভূমি, ভাবভূমি, কর্মভূমি, শিল্পভূমি, বাণিজ্য-ভূমি—বলতে গেলে সব কিছু।

কিন্তু সেই কলকাতা কি আর আছে? কলকাতা সেই কলকাতাই আছে, কিন্তু যার জন্যে, যাকে ঘিরে এই কলকাতা, সেই বাংলাদেশ দু-দুবার বিভক্ত হয়েছে। ইতিহাসে এমন দুর্ভাগ্য আর কোন নগরীকে বইতে হয়েছে। ১৯০৫-এর ধাক্কা যদি প্রচন্ড ধাক্কা হয়, ১৯৪৭-এরটা হল যাকে বলে রামধাক্কা।

প্রথম পার্টিশন শেষ পর্যন্ত ভেস্তে গেছল, 'সেটেলড ফ্যাক্ট' বেমালুম 'আন-সেটেলড' হয়ে যায়, কিন্তু সেজন্যে কলকাতাকে, বলতে পারেন, শহীদ হতে হয়। ব্রিটিশ ভারতের প্রথম মহানগরী, রাজধানী কলকাতা তখন থেকে শুধুমাত্র বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির রাজধানী। বড়লাট বিদায়

টালির নালা

নিলে তাঁর প্রাসাদ দখল করলেন ছোট-লাটরা। তখন থেকে কলকাতাকে 'ছোট' করার চেষ্টা চলছে, কিন্তু সে কি সম্ভব?

দ্বিতীয় পার্টিশনের পর র‍্যাডক্লিফের সকল বাঁধ ভেঙে জলস্রোতের মত যে জনস্রোত এসেছে, তা এখনও আসছে—এ আসার বুঝি শেষ নেই। জিন্না, লিয়াকৎ আলি, আইয়ুব, ইয়াহিয়া—সুদূর পশ্চিম পাকিস্তানের যিনিই অধীশ্বর হয়েছেন, তিনিই কলকাতার সমস্যাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

ভারতবর্ষে যে সামান্য সংখ্যক ইংরেজ এসেছিলেন, বিশেষ করে তাঁদের প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছিল কলকাতা। লন্ডনপ্রবাসী ইংরেজ কলকাতাকে একটা বিকল্প লন্ডন করতে চেয়েছিলেন। টেমস নদীর ধারে লন্ডন আর হুগলীর পাশে কলকাতা। আদি কলকাতা একান্তভাবে সাহেবদের কলকাতাই। চিৎপুর-শ্যামবাজার-বাজার, ভবানীপুর-কালিঘাট-চেৎলা কিংবা উল্টাডাঙ্গা-নারকেলডাঙ্গা-বেলেঘাটা সেদিনও কলকাতার বাইরে ছিল। ওইসব অঞ্চলের বৃদ্ধেরা কিছুদিন আগেও মধ্যকলকাতাকে শুধুমাত্র 'কলকাতা' বলতেন।

তাই আদি কলকাতা রীতিমত ছোট। প্রথম পরিকল্পনা সেই হিসেবেই। জল, ড্রেন, রাস্তা—সব কিছুর পরিকল্পনাই অতীতের সামান্য সংখ্যক জনসংখ্যাকে ঘিরে।

কিন্তু পার্টিশনের পর কলকাতা কোন সংখ্যারই ধার ধারেনি। শুধু সীমান্তের ওপার থেকেই মানুষ আসেন নি, ভাগাহত মানুষ এসেছেন ব্রহ্মদেশ, সিংহল, ব্রিটেন—এবং ভারতের অন্য সব রাজ্য থেকেও। কেউ এসেছেন বিতাড়িত হয়ে, নিরুপায় হয়ে, আর কেউ এসেছেন জীবিকার সন্ধানে।

কলকাতা তাই রবারের মত বেড়েই চলেছে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম—সবদিক দিয়েই বাড়ছে। বাড়ছে, শুধু বাড়ছে। হালফিলের কলকাতা শুধু অতীতের সংক্ষিপ্ত অথবা সম্প্রসারিত কলকাতা কর্পোরেশন এলাকা নয়। এ কলকাতার গোড়াটা আগের মত ছোট হতে পারে, কিন্তু ডালপালা বেড়েই চলেছে।

বেড়েছে দিল্লী এবং বোম্বে শহরও। একটার জায়গায় দিল্লীতে এখন দুটো কর্পোরেশন। বোম্বে কর্পোরেশনের আয়তন তিনগুণ হয়েছে। কিন্তু কলকাতার সঙ্গে কেউ পাল্লা দিতে পারবে না। কলকাতা কর্পোরেশনের আয়তন বেড়েই চলেছে, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিকে কর্পোরেশনের কৌলিন্য দেওয়া হয়েছে—কলকাতার পরিধি আরও বড়, অনেক বড়।

সমস্যাটি সর্বপ্রথম বুঝতে পেরেছিলেন পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়। শুধু কলকাতা নয়, বৃহত্তর কলকাতার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের কথা মনে রেখে তিনি একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। তখন থেকে বৃহত্তর কলকাতার প্রশাসনিক নামকরণ হল ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান এরিয়া, পরে, মেট্রোপোলিটান জেলা।

কলকাতা মেট্রোপলিটান জেলা এলাকা
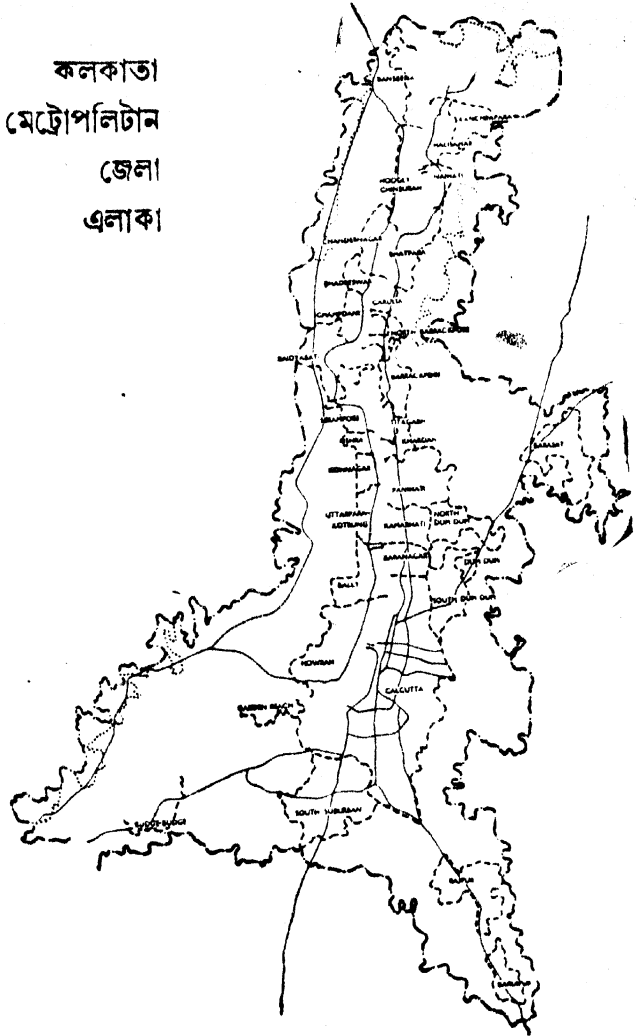
৪১০ বর্গমাইল বিস্তৃত এই এলাকার জনসংখ্যা ৮৫ লক্ষ—এই আদমসুমারিতে হয়ত এক কোটি হবে। এর মধ্যে আছে কলকাতা ও হাওড়ার কর্পোরেশন এলাকা, ৩৩টি মিউনিসিপ্যালিটি এবং ৩৭টি মিউনিসিপাল-বহির্ভূত নগর এলাকা। হুগলীর দুই তীরে দক্ষিণ থেকে উত্তরে বারুইপুর থেকে কাঁচরাপাড়া এবং হাওড়া থেকে বাঁশবেড়িয়া।

এই মেট্রোপোলিটান জেলার কেন্দ্র বিন্দু কলকাতা কর্পোরেশন। বিস্তৃতি ৩০ বর্গমাইল, জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার অর্ধেক। ডঃ রায় তাঁর সংগঠনের নাম দিয়েছিলেন সি এম পি ও— ক্যালকাটা মেট্রোপোলিটান প্ল্যানিং অর্গানিজেশন। পরিবহন, পানীয় জল সরবরাহ, জল নিষ্কাশন, গৃহ প্রভৃতি সম্পর্কে এই সংগঠন দীর্ঘদিন গবেষণা করার পর অনেকগুলি প্রামাণ্য পরিকল্পনা রচনা করেন।

কিন্তু বিধানচন্দ্রের পরই সব অন্ধকার। দু দুটো লড়াই এবং রাজ্যের অস্থায়ী রাজনীতি সেই অন্ধকারকে আরও ঘনীভূত করে তোলে। সি এম পি ওর দু দুটো অফিস ডঃ রায় শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত করে গেছলেন। কাজের অভাবে পরে অফিসাররা সেখানে বেতনের জন্য দিন গুণতেন আর কর্মচারীরা অফিসের ভিতরেই সভা করে সময়ে-অসময়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়তেন।

কাজ না করার একমাত্র ওজুহাত ছিল অর্থাভাব। এই ওজুহাত যে ঠিক নয়, তা প্রমাণ করার জন্য একজন মানুষের প্রয়োজন ছিল। অনেক দেরিতে হলেও তেমন একজনকে কলকাতা পেয়ে গেল।

ইতিমধ্যে বৃহত্তর কলকাতায় পানীয় জলের হাহাকার পড়ে গেল, রাজ্য-নায়কেরা হাড়ে-হাড়ে বুঝলেন যে, পয়ঃপ্রণালীর যে ব্যবস্থা আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় [illegible] আবর্জনার [illegible]

জমে থাকা নিত্যকার ঘটনায় পরিণত হল, চলন্ত ট্রাম-বাসগুলো ছাগল-ভেড়ার খোঁয়াড়কেও ছাপিয়ে গেল, রাজপথের দুঃসহ ট্রাফিক জ্যামকে দুর্বিসহ করে তুলল পার্টির পর পার্টির মিছিলের পর মিছিলে। বিকেলে মুক্ত হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেবার জন্যে কোন পার্কে কিংবা মনকে চাঙ্গা করার জন্যে থিয়েটার-বায়স্কোপে যাবার কথা লোকে ভুলে গেল। ওসবের সংখ্যাও নামমাত্র। ভদ্রভাবে যাঁরা জীবনযাপন করেন তাঁদের তুলনায় ফুটপাথ আর বস্তি বাসিন্দাদের সংখ্যা প্রচন্ডভাবে বেড়ে যেতে চলল।

বিপদের পর বিপদ। একটি দলের স্থলে চোদ্দটি দল একযোগে দেশ শাসনের দায়িত্ব নিলেন। পরের জন্যে কিছু করার চেয়ে নিজের কোলে ঝোল টানার দিকেই তাঁদের ঝোঁক দেখা গেল বেশি। কলকাতার এই অন্ধকারের বছরগুলিতে সংখ্যা বাড়ল শুধু দুটি বস্তুর—জনসংখ্যা আর রাজনৈতিক দল। ফলে সমস্যা আরও বেড়ে গেল।

এই সময়ে শিল্পে মন্দা দেখা দিল, অনেক কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেল—ফলে হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হলেন। শ্রমিক আন্দোলনও হঠকারী পথ নিল, মালিকদের ঘেরাও করে, কিছু ধ্বংসাত্মক কাজ করে মালিকদের 'কালো হাত'কেই শক্ত করা হল।

প্রফুল্ল সেন মন্ত্রিসভা, প্রথম যুক্তফ্রন্ট, ধর্মবীরের রাজত্ব, তারপর দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট—ডুবন্ত কলকাতার কথা কেউ ভাবলেন বলে বোঝা গেল না। মনে হল কলকাতার মৃত্যু অনিবার্য, কোন ডাক্তার তাকে বাঁচাতে পারবেন না।

কলকাতার ভাগ্য বলতে হবে যে, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের পর রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান তাঁর মুখ্য উপদেষ্টা হিসেবে শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষকে নিয়োগ করেছিলেন। কলকাতার পোর্ট কমিশনার্সের প্রাক্তন চেয়ারম্যান কলকাতার সমস্যা সম্পর্কে ভালভাবেই ওয়াকেফহাল ছিলেন। রাজের খুনোখুনির রাজনীতিও তাঁর দৃষ্টিকে ঘোলাটে করতে পারে নি। মুখ্যত তাঁর চেষ্টাতেই ধাওয়ান সরকার কলকাতার সমস্যাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হল যে, এই রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে, হতাশার ভাবকে সরিয়ে ফেলতে হলে, বন্ধ কল-কারখানাকে চালু করতে হলে, সর্বাগ্রে কলকাতার সমস্যার সমাধানের কথা ভাবতে হবে।

সি এম পি ও বাড়িতে অনেক পরিশ্রমের পর রচিত যে স্কীমগুলোতে ধুলো জমে ছিল, সেগুলোতে আবার হাত পড়ল। যে স্কীমগুলোতে হাত দেওয়া হবে ঠিক হল দেখা গেল তার জন্যে এখনই দেড়শত কোটি টাকা দরকার। বাকি কাজটা পঞ্চম পরিকল্পনার জন্য মুলতুবী রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

এই কাজ করার জন্যই গঠিত হল সি এম ডি এ—ক্যালকাটা মেট্রোপোলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। সি এম পি ও আর সি এম ডি এর মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, সি এম ডি এ প্রকল্প রচনার সঙ্গে সেই প্রকল্পকে রূপ দিতেও পারবে। নিজে কাজ না করলে এই সংগঠন অন্য কোন সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করবে। কাজটা শেষ করার এবং বিভিন্ন কাজ ও এজেন্সির মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব সি এম ডি এর। কলকাতা মেট্রোপোলিটান এলাকার মধ্যে উন্নয়নের যে কোন কাজই হোক না কেন, সি-এম-ডি-এ পুরোপুরি অথবা আংশিক অর্থ সাহায্য দিলে, কাজের সবটাই তাঁরা করবেন অথবা অন্য কোন সংস্থাকে দিয়ে করিয়ে নেবেন। দায়িত্বটা, শেষ বিচারে, সি-এম-ডি-এর উপরই বর্তাবে। জবাবদিহি তাকেই করতে হবে।

এ রকম একটা বিধানের দরকার ছিল, নইলে অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হতে পারত। কলকাতা কর্পোরেশন, হাওড়া কর্পোরেশন, কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট, রাজ্য সরকারের সেচ-পূর্ত-স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভাগ—এও প্রায় চোদ্দ শরিকের ব্যাপার। এর মধ্যে একটি সংগঠনকে সর্বাধিক ক্ষমতা এবং পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া কাজের পক্ষে সহায়কই হয়েছে।

কলকাতা মেট্রোপোলিটান এলাকার জন্যে বিভিন্ন প্রকল্পকে রূপদান এবং আর্থিক সাহায্য যোগানোর জন্যেই এই বিধিবদ্ধ সংগঠনটি গঠন করা হয়েছে। ১৯৭০, ১৭ নম্বর কেন্দ্রীয় আইন—এই সংগঠনটি গঠিত হল ঘোষণা করে। ১১ই জুন, ১৯৭০, পশ্চিম বাংলার জন্য গঠিত সংসদীয় উপদেষ্টা পর্ষৎ কিছু অদল-বদল ঘটিয়ে সি-এম-ডি-এ বিলটির অনুমোদন করেন। রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভের পর ৭০-এর ১৬ই জুলাই আইনটি গেজেটে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী এক ঘোষণা অনুযায়ী ২১শে আগস্ট, ১৯৭০, থেকে আইনটি [illegible]

হাওড়া স্টেশনের কাছে সাবওয়ের কাজ হচ্ছে
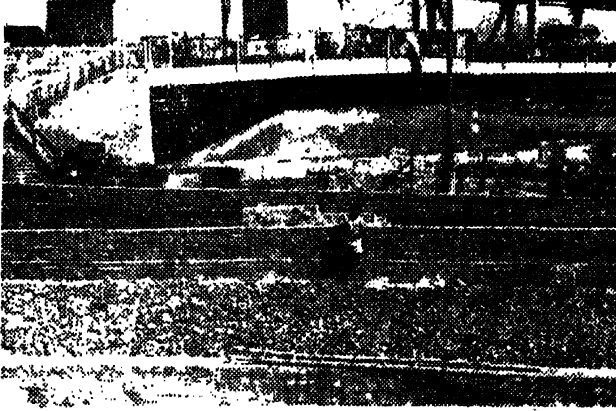
অনুসারে রাজ্য সরকার ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ সি-এম-ডি-এ গঠন করেন।

ঐ দিনক্ষণগুলো ঝালিয়ে নেবার হেতু আছে। এপ্রিল মাসে কার্যভার গ্রহণ করার পর শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষের পুরো চারটি মাস লেগেছে সি. এম. ডি. এ গঠন করতে। অনেক বাধার মধ্যে সবচেয়ে বড় বাধা মনে হয়েছিল কলকাতা কর্পোরেশন এবং তার তখনকার মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর। প্রশাসনিক বাধাও ছিল। সব কিছু পেরিয়ে কাজে হাত দেওয়াটা কখনই সহজ মনে হয়নি।

১৫০ কোটি টাকা সংগ্রহও সহজ ছিল না। চতুর্থ পরিকল্পনার অর্থবরাদ্দ থেকে কলকাতা প্রকল্পের জন্য ৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়; বাকি ১০৬ কোটি টাকার জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। দিল্লীর অধীশ্বররা আগ্রহী হলেও তাঁদের আমলাদের রাজী করানো সহজ কাজ ছিল না। পণ্য প্রবেশ কর চালু করতে একদিকে ধনী ব্যবসায়ী মহল, অন্যদিকে বামপন্থী মহলের বিরোধিতা অতিক্রম করতে হয়।

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কাজ শুরু করাতে পেরেছিলেন সি-এম-ডি-এ'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান। প্রধান যে চারটি প্রকল্পে হাত দেওয়া হয় তা হল : (ক) কলকাতা মেট্রোপোলিটান জেলার মূল উন্নয়ন প্রকল্প, ১৯৬৬-৮৬, (খ) জল সরবরাহ, ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ও জলনিকাশী ব্যবস্থা সংক্রান্ত মাস্টার প্ল্যান ১৯৬৬-২০০০, (গ) যানবাহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রকল্প '৬৬-'৮৬ এবং (ঘ) হাওড়া এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প '৬৬-'৮৬।

এই কর্মসূচীর মুখ্য উদ্দেশ্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার আশু সমাধান। যেমন অপর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ, অকিঞ্চিৎকর জলনিকাশী ব্যবস্থা, ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি স্বাস্থ্যবিধির ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অভাব, যানবাহন ও যাতায়াতী ব্যবস্থার চূড়ান্ত অব্যবস্থা, বস্তির সংখ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতি।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে নিম্নলিখিত খাতে অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে (লক্ষ টাকায়) :

জল সরবরাহ—২৮৮০·৯৭
ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ও জলনিকাশী—২৮৯৩·৫৮
যাতায়াত ও যানবাহন—৩১৪২·৬৫
আবর্জনা পরিষ্কার—২৬০·৭৭
বস্তি উন্নয়ন— ১০০০·০০ (ভারত সরকারের ৮ কোটি টাকার অনুদানসহ)
বস্তি দখল, পরিষ্কার ও উন্নয়ন— ৯৯৮·৯৬
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বসবাস ও কাজের উপযোগী বাড়ি নির্মাণ— ৩১·৮৫
কোনা, কল্যাণী প্রভৃতি নতুন এলাকার উন্নয়ন—১৩৬০·০০
হাসপাতালের সুযোগ-সুবিধা ও প্রাথমিক শিক্ষাসমেত অন্যান্য প্রকল্প— ১৬৬২·৩৪
নিম্ন আয়ের শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের জন্য গৃহনির্মাণ— ৬০০·০০
বিশেষ প্রকল্প— ৯২৮·০০

ইতিমধ্যে কিছু কাজ হয়েছে যা সি-এম-ডি-এর সংগঠন আরও কিছু জোরদার হলে কলকাতার নাগরিকেরা জানতে পারতেন। কলকাতার ভগ্ন বুকে আশার সৃষ্টি করতে হলে কতটুকু কাজ হয়েছে তা সকলকে জানান দরকার। সম্প্রতি এই কাজটির উপর তেমন জোর দেওয়া হচ্ছে না। বাংলার বাইরের কাগজগুলিতে বিজ্ঞাপন দিয়ে যে প্রচার অভিযান শুরু হয়েছিল, তা হঠাৎ যেন বন্ধ হয়ে গেছে। সি-এম-ডি-এর কোন পাবলিসিটি অফিসার নেই।

অথচ একথা সত্য যে সি-এম-ডি-এর জন্যই '৭১ জুন থেকে প্রায় দ্বিগুণ জল পাওয়া যাবে। এমার্জেন্সি ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমের প্রথম পর্বের কাজ প্রায় শেষ। ১৬টি পৌরসভা এলাকার আড়াই লাখ মানুষ পর্যাপ্ত পানীয় জল পাবেন। গার্ডেনরীচ, হালিশহর, ভাটপাড়া এবং বেহালার জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজও প্রায় শেষ। ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ও জল নিকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে ২৭টি এবং আবর্জনা পরিষ্কারের জন্য দুটি পরিকল্পনানুযায়ী কাজ চলছে।

এদিকে হাওড়া স্টেশন এলাকার উন্নয়ন-সূচীর অর্ধেকটা হয়ে গেছে। যশোর রোড থেকে ভি-আই-পি রোডের সংযোগরক্ষাকারী রাস্তাটির নির্মাণকার্য প্রায় শেষ। চেতলা সেতুর কাজ পুর্ণোদ্যমে চলছে। হাওড়া ব্রিজ অ্যাপ্রোচ থেকে জি, টি, রোড বাই-পাস-এর কাজের অর্ধেকটা হয়ে গেছে। ট্রামের রাস্তা পালটেছে, নতুন একশতটি স্টেট বাস রাস্তায় নেমেছে। ফুটপাথ ছোট করে রাস্তাকে বড় করার কাজ চলছে।

সি-এম-ডি-এর নতুন চেয়ারম্যান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়। তাঁর পক্ষে রাজ্যের উন্নয়নমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিং নাহার প্রথম সুযোগেই দিল্লীতে গিয়ে আরও অর্থসাহায্য চেয়েছেন। চতুর্থ পরিকল্পনাকালকে তিনি ৯২টি স্কীম ও ১৫০ কোটি টাকার মধ্যে বেঁধে রাখতে চান না। তিনি বাড়তি পঞ্চাশ কোটি টাকার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফিরে এসেছেন।

হুগলী নদীর উপর দ্বিতীয় সেতু, প্রস্তাবিত ভূগর্ভস্থ অথবা চক্র রেল, হলদিয়া বন্দর উন্নয়ন—এই প্রকল্পগুলি সি-এম-ডি-এর আওতার বাইরে। এগুলিকে রূপ দেবার দায়িত্ব সরাসরি কেন্দ্র নিজের হাতে নিয়েছেন।

অতএব টাকার অভাব হবে না। কাজের প্রয়োজন আছে, সুযোগও আছে। কিন্তু যাঁদের উপর কাজ শেষ করার দায়িত্ব তাঁরা কলকাতার দুঃখী মানুষের নিরাশ করবেন না তো?

হাওড়ার পিলখানা বস্তি

উন্নয়নের ভাগীদার সি আই টি

উন্নয়ন, পরিকল্পনা এবং পরিকল্পিত উন্নয়ন—প্রতিটি শব্দ আজ আমাদের কাছে অতিপরিচিত হলেও এদের সুফল অনেক সময় আমাদের ভোগ করা সম্ভব হয় না। কারণ সামঞ্জস্যের অভাব। মানুষের মস্তিষ্কে দু'টি অংশ যেমন আছে সুষ্ঠু পরিকল্পনারও তেমনি দু'টি অংশ আছে। মানুষের ব্রেনে প্রথমটিকে বলা হয় থিংকিং সেল আর দ্বিতীয়টিকে মোটর পোরসান অর্থাৎ চিন্তাকে কার্যকরী করাবার জন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করানই এই দ্বিতীয় অংশের কাজ।

বর্তমান যুগে মানবসভ্যতার উন্নতির সঙ্গে তার সমস্যাও বেড়ে চলেছে। মোটর-গাড়ীর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে কার্বন মনোক্সাইড নামক বিষাক্ত গ্যাস থেকে রক্ষা পাবার সমস্যা দেখা দিয়েছে। শহর বা বসতি বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিচ্ছে বৃষ্টির অভাব। তাই চাই গ্রীন বেল্ট বা বন মহোৎসব। এ সবই পরিকল্পনার আওতায় পড়ে। কিন্তু পরিকল্পনা করা যত সহজ তাকে কার্যকরী করাটা অনেক কঠিন। এর জন্য চাই অর্থ, চাই উপযুক্ত দক্ষ [illegible] এবং জনসচেতনতা।

কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট যেদিন সেন্ট্রাল এ্যাভিন্যু প্লান করেছিল সেদিন জনসাধারণ ও সংবাদপত্র বিরূপ আলোচনায় সোচ্চার হয়ে বলেছিল—এত ব্যয়ে এতবড় রাস্তার প্রয়োজন কি? কলকাতার জন্য এতবড় রাস্তার প্রয়োজন কোনদিন হবে না। আজ সকাল দশটা ও বিকেলে সেন্ট্রাল এ্যাভিন্যুর দিকে তাকালে সমস্ত রাস্তাটা মনে হয় যেন গাড়ী দিয়ে মোড়া। আজকের প্রয়োজন সেন্ট্রাল এ্যাভেন্যুর চেয়েও বড় রাস্তার।

অরুণ ভট্টাচার্য

প্রথম যেদিন সি আই টি বা কলকাতা উন্নয়ন সংস্থার সৃষ্টি হল সেদিন কিন্তু সরকার এর জন্য অর্থ সরবরাহ করতে পারেন নি। শুধু উন্নয়নের ফতোয়া দিয়েই নিজের কাজ শেষ করেছিলেন। বলা হয়েছিল যে সি আই টি হবে সেল্ফ ফাইনান্সিং অর্থাৎ উন্নয়নের ব্যয় তাকেই তুলে নিতে হবে। তাই ক্ষতিপূরণের টাকা তাকে চড়া দামে জমি বিক্রী করে তুলতে হ'ত। উন্নয়নের ব্যয় আসত ট্যাক্সি বাড়িয়ে ও জমির দাম থেকে। এর ফলে উন্নত জমিতে সাধারণ মধ্যবিত্তের জায়গা হয় নি। একমাত্র ধনী সম্প্রদায় সি আই টি প্ল্যানে বাড়ী করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যান্য উন্নত দেশের সমস্যা হল যে ধনীরা শহরের বাইরে চলে যাচ্ছে আর গরীবরা এসে শহর জাঁকিয়ে তুলছে। কলকাতার সমস্যা ঠিক উল্টো। গরীব যারা তারা ডানকুনি, ভদ্রেশ্বর, বজবজ আর ডায়মণ্ডহারবার থেকে আসছে সময় ও অর্থ ব্যয় করে আর যাদের গাড়ী আছে এবং সহজে আসা সম্ভবপর তারা কাজে আসছেন ক্যামাক স্ট্রীট, পার্কস্ট্রীট, বালিগঞ্জ বা নিউ আলিপুর থেকে।

কথাগুলি অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও ঠিক অপ্রাসঙ্গিক নয়। আমেরিকা, বৃটেন ও ইউরোপে আজ "সবার্বিয়া" উন্নত হচ্ছে, কিন্তু শহরগুলি ভরে যাচ্ছে মধ্যবিত্তে। কলকাতায় ঠিক বিপরীত। বস্তিবাসীদের উন্নতির জন্য নতুন বাড়ী হল, কিন্তু সেখানে বস্তিবাসীরা যেতে পারল না গেল অন্য লোক। তারা সরে গেল দূরে আর এক বস্তিতে। এ সবের খানিকটা মুসকিলআসান হত যদি সি আই টি তার অর্থ সরকারের কাছ থেকে পেত। তা হলে ভারত ওয়েলফেয়ার স্টেট হবার দাবী রাখত।

এবারে আসা যাক সি এম ডি এ বা কলিকাতা মেট্রোপলিটন উন্নয়ন সংস্থার

কথায়। আগেই বলেছি ব্রেন সেলের কথা। সি এম ডি এ হল সেই থিনকিং সেলের একটা অংশ—আর একটা অংশ হল সি এম পি ও বা কলিকাতা মেট্রোপলিটন পরিকল্পনা সংস্থা। এরা এতদিন পরিকল্পনা করেছেন, কিন্তু তাকে কাজে রূপায়িত করার দায়িত্ব এদের ছিল না। আজ সি এম ডি এ হল ব্রেনট্রাস্ট। প্রায় ৪০০ বর্গমাইল এলাকায় ২৬টি পৌরসংস্থার উন্নয়নের ভার এই সি এম ডি এ গ্রহণ করেছে। এর অন্তর্ভুক্ত ১৪টি সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা, অর্থ সংস্থান ও পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব সি এম ডি এর। কিন্তু সি এম ডি এ কোন-ক্ষেত্রেই এদের ওপরে খবরদারি করবে না। অর্থ সংগ্রহ ও সহযোগিতা করে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা ও পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কো-অর্ডিনেশনের ভার আজ সি এম ডি এর। তাই কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট তাদের নিজস্ব কাজ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়িত করে চলবেন আগের মতই—পার্থক্য এই যে এবারে তারা প্রাথমিক কাজের জন্য বিভিন্ন খাতে সি এম ডি এর কাছে হাত পাততে পারে।

বর্তমান বৎসরে কলিকাতার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সি এম ডি এ প্রায় ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছে। এই টাকা ব্যয় হবে বর্ধিত উন্নয়নে, পানীয় জল ও রাস্তাঘাটের জন্য। জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতিতে এবং সর্বোপরি যে সমস্ত দুঃস্থ পৌরসংস্থা আছে তাদের

হাওড়ায় ময়লা জল নিষ্কাশনের জন্য প্রথম ড্রেন ব্যবস্থার কাজ চলেছে
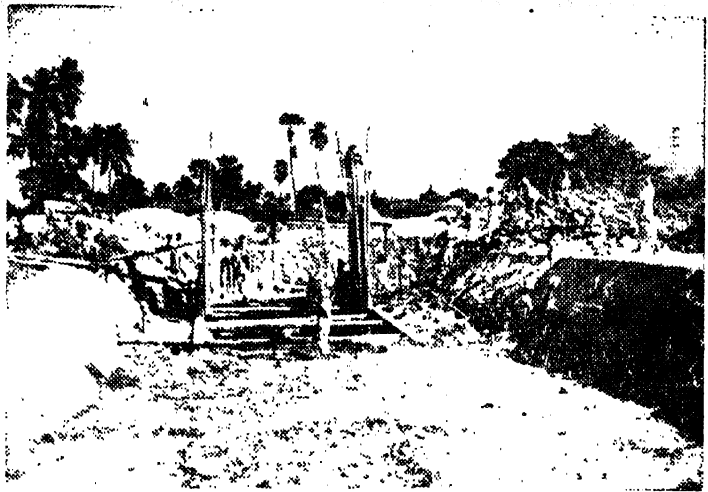
রাস্তাঘাট ও জলের সুব্যবস্থার জন্য। এছাড়াও আছে হাসপাতাল, ভ্রাম্যমাণ ডিসপেন্সারি ও জনস্বাস্থ্যমূলক কাজ।

আজকের দিনে উন্নতির অর্থ হবে সামগ্রিক উন্নয়ন—বসবাস, জল, আলো-হাওয়া এবং জনস্বাস্থ্য। এর যে কোনওটিকে বাদ দিলেই শহরের অবস্থা অচল হয়ে যাবে। তার ওপরে আছে জনগণের জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা। সি এম ডি এ টাকা পান পশ্চিম-বঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রের কাছ থেকে। এই টাকা আবার আসে বিভিন্ন দপ্তর থেকে। পূর্বে জনস্বাস্থ্যমূলক বা বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা-গুলির পক্ষে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে এই বরাদ্দ আদায় করতে হিমসিম খেতে হত। বহুক্ষেত্রে কাজ অচল হয়ে পড়ত। উদাহরণ হিসাবে দেখান যায় বরানগর-কামারহাটি পৌরসংস্থার জল সরবরাহ ব্যবস্থা। ১৯৫২ সালে ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যবস্থা হয়েছিল। দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের ওপরে। উনিশ বছর হয়ে গেল আজও কিন্তু বরানগর-কামারহাটি পৌর এলাকার সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ জলাভাবে কষ্ট পাচ্ছে।

আজকে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হল যে সমস্ত পরিকল্পনা-সংস্থা বা তাদের পরি-কল্পনাকে কার্যকরী করার যে সমস্ত সংস্থা-গুলি আছে তাদের পুনরুজ্জীবিত করা—সে অর্থ দিয়ে হোক বা অন্যান্য সহযোগিতার মাধ্যমেই হোক।

সি এম ডি এ, সি এম ডবলিউ এস এ বা কলিকাতা মেট্রোপলিটন ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেসন সংস্থা, সি আই টি, কলিকাতা কর্পোরেশন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি কার্যকরী করা যায় তবে হয়ত আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই কলিকাতার চেহারার কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে নতুন শহর তৈরীর চেয়ে পুরোন শহরকে নতুন করার ব্যয় প্রায় দশগুণ। বহু সমৃদ্ধি-শালী দেশ এই কাজে হিমশিম খাচ্ছে, কিন্তু এছাড়া উপায়ও নেই। এখন প্রশ্ন হল যত তাড়াতাড়ি অর্থ আসছে তত শীঘ্র উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি তা ব্যয় করতে সক্ষম হবে কি? গত বছর ১৯ কোটি টাকার মাত্র ১৫ কোটি ব্যয় হয়েছে তার মধ্যে প্রতিটি পৌরসংস্থা ৫ লক্ষ টাকা করে পেয়েছে রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য। যদি এই টাকা সময়মত ব্যয় করা সম্ভবপর হয় তবে হয়ত অবস্থার কিছুটা উন্নতি হতে পারে—মৃত শহরে আবার জীবনের আশ্বাস দেখা দিতে পারে।

কৃষ্ণপুরে ॥ ভাংগড় খাল কাটার কাজ

কলকাতা: জল গ্যাস বিদ্যুৎ

ক্রমবর্ধমান জনবসতির সঙ্গে তাল রেখে কলকাতাবাসীদের নিত্য-প্রয়োজনের তিনটি প্রতিষ্ঠান সর্বদাই কর্মমুখর। জীবনের মত প্রয়োজনীয় জল, রান্নার জন্য গ্যাস আর যে কোন আধুনিকতার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ-এর চাহিদা কলকাতা তথা বৃহত্তর কলকাতার অধিবাসীদের কাছে গত কয়েক বছর ধরে বেড়েই চলেছে। এশিয়া ভূখণ্ডে এই শহর জনসংখ্যা ও কর্মচাঞ্চল্যে ইতিমধ্যেই বিশ্ববাসীর কাছে অন্যতম আশ্চর্যের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। নু্যইয়র্ক, টোকিও, লণ্ডন কিংবা লসএঞ্জেলেস, পৃথিবীর সবচেয়ে জন-বহুল ও কর্মচঞ্চল এই শহরগুলি থেকে যখন কেউ কলকাতায় আসেন তখন তাঁদের আর বিস্ময়ের শেষ থাকে না। কলকাতা প্ল্যানড সিটি নয়—ইতিহাসের প্রয়োজনে এই শহরের পত্তন ; সময়ের সীমানা ধরে ধরে তার উত্তরণ, উন্নয়ণ এবং উজ্জীবন। পশ্চিমী শহরের অতিবাস্তবতার সঙ্গে আধুনিকতার মিলন ঘটিয়ে পৃথিবীর মানুষকে আকর্ষণের কোন উজ্জ্বল চটক নেই কলকাতার ; কিন্তু কলকাতার আছে স্বাভাবিক সৌন্দর্য, প্রাচীনতা ও আধুনিকতার সমন্বয়, পূর্ব এবং পশ্চিমের মিলিত রাখীবন্ধন। কলকাতার আপাত আশ্চর্যরূপ দেখে নু্যইয়র্ক থেকে আসা এক তরুণী আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন : ওয়েল, হাউ দি সিটি ওয়ার্ক হিয়ার? আমি বলেছিলাম : বাই ইটস ওন ইনার প্রসেস। কথাটা আশ্চর্য মনে হলেও আশ্চর্য হবার নয়। নিজেকে চালানোর কলকাতার নিজস্ব একটি পদ্ধতি আছে। আর সে পদ্ধতি এ শহরের একান্তভাবেই আপনার কথাটা যদি বিশ্বাস্য না হয় তাহলে আপনি নিজেই কল্পনা করুন না, নগরীর অজস্র দুর্বিপাকের মধ্যেও প্রায় প্রত্যেক দিন পরিশ্রুত জল কেমন করে পান আপনার বাড়িতে। শ্রম-সংকট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বৈদেশিক মুদ্রার স্বল্পতা, মাটির নিচের পাইপ-লাইনের মেরামত, পলতা ও টালার ট্যাঙ্কের পরিশ্রুত জল আটক রাখার অনিশ্চয়তা—সবই তো আছে। তা সত্ত্বেও রোজ ভোরবেলার যখন আপনার ঘুম ভেঙে যায় এবং দীর্ঘদিনের অভ্যাসমত ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে আপনি যখন কলঘরে যান তখন ট্যাপ

শ্যামাপ্রসাদ সরকার

ঘোরাতেই কি ঝিরঝিরে জলের ঝরনা আপনাকে ভিজিয়ে দেয় না? মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে আত্মীয়-বন্ধুদের কফির টেবিলে নিমন্ত্রণ জানিয়ে আপনার গৃহিনী যখন রান্নাঘরে যান তখন আপ্যায়নের জন্য তো রান্নাঘরে একমাত্র গ্যাসই প্রস্তুত। আর রাতের অন্ধকার থেকে বাঁচার জন্য বিদ্যুৎ তো আপনার চাই-ই চাই।

চাহিদা বাড়ছেই

কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতার প্রয়োজনে জল, গ্যাস, বিদ্যুতের চাহিদা কতখানি সম্প্রতি তার একটি সমীক্ষা করা হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে গত দশ বছরের প্রত্যেক বছরেই এই তিনটি সামগ্রীর প্রয়োজন বাড়ছেই। অধিক জল-সরবরাহের জন্য কলকাতা কর্পোরেশনকে শুধুমাত্র অধিক শ্রমিকই নিয়োগ করতে হচ্ছে না, তার সঙ্গে বিশেষজ্ঞ, কলাকুশলী, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ব্যবস্থাও রাখতে হচ্ছে। পলতা পাম্পিং স্টেশন থেকে ১৯৬৩—৬৪ সালে দৈনিক ৮ কোটি ২০ লক্ষ গ্যালন পরিশ্রুত জল সরবরাহ করা হতো। ১৯৬৭—৬৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়াল ১০ কোটি গ্যালন। তাতেও শহরবাসীর চাহিদা মেটানো যাচ্ছে না। দৈনিক অতিরিক্ত ৪ কোটি গ্যালন পরিশ্রুত জল সরবরাহের বিশেষ পরিকল্পনাও শীঘ্রই কলকাতা কর্পোরেশন চালু করছে।

কলকাতা কর্পোরেশনের গৃহীত একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, উত্তর কলকাতায় ১৯৬৩—৬৪ সালে ২৫৭৯১টি বাড়িতে জল সরবরাহ করতে হতো। মধ্য-কলকাতায় ঐ বছরে ১৭৪১৫টি বাড়িতে, চৌরঙ্গী-ডালহৌসী এলাকায় ১৩৪৫৫টি বাড়িতে, দক্ষিণ কলকাতায় ২৭০৩২টি বাড়িতে, কাশীপুরে ৭০৮৯টি বাড়িতে, মানিকতলায় ৭৬৮০টি বাড়িতে ও টালিগঞ্জে ১৯৮৫টি বাড়িতে কর্পোরেশনকে নিয়মিত জল সরবরাহ করতে হত। ১৯৬৪-৬৫ সালে উত্তর কলকলকাতায় ২৫৯৬১টি বাড়িতে, মধ্য কলকাতায় ১৭৫৭৮টি বাড়িতে, চৌরঙ্গী-ডালহৌসী এলাকায় ১৩৬৫১টি বাড়িতে, দক্ষিণ কলকাতায় ২৭৩৪৬টি বাড়িতে, কাশীপুরে ৭৩২৯টি বাড়িতে, মানিকতলায় ৭৮৭৬টি বাড়িতে ও টালীগঞ্জে ২৪৬৬টি বাড়িতে জল সরবরাহ করতে হয়। ১৯৬৫—৬৬ সালে আর একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। এবারে উত্তর কলকাতায় ২৬১৮৩টি বাড়িতে, মধ্য কলকাতায় ১৭৭৫৫টি বাড়িতে, চৌরঙ্গী-ডালহৌসী এলাকায় ১৩৮৯৩টি বাড়িতে, দক্ষিণ কলকাতায় ২৭৭২৩টি বাড়িতে, কাশীপুরে ৭৫৫৩টি বাড়িতে, মাণিকতলার ৩০৭১টি বাড়িতে ও টালীগঞ্জে ২৯৮৪টি বাড়িতে জল সরবরাহ করতে হয়। ১৯৬৬—৬৭ সালে উত্তর কলকাতার ২৬৫৬৩, মধ্য-কলকাতায় ১৮০৪৯, চৌরঙ্গী-ডালহৌসী এলাকায় ১৪৮৬৬, দক্ষিণ কলকাতায় ২৮৫১৫, কাশীপুরে ৭৯৫২, মাণিকতলায় ৩৪২০ ও টালীগঞ্জে ৩৯৬২টি বাড়িতে জল সরবরাহ করে কর্পোরেশন। ১৯৬৭-৬৮ সালে উত্তর কলকাতায় ২৬৭৭৯, মধ্য-কলকাতায় ১৮১৪৭, চৌরঙ্গী-ডালহৌসী এলাকায় ১৫০৮৯, দক্ষিণ কলকাতায় ২২৮১৬, কাশীপুরে ৮১৭৬, মানিকতলায় ৩৬৩৬ ও টালীগঞ্জে ৪৪৬৪টি বাড়ি কর্পোরেশনের জল সরবরাহের আওতায় পড়ে। সর্বশেষ বিবরণ ১৯৬৮—৬৯ সালের। তাতে দেখা যাচ্ছে ২৬১৯০টি বাড়ি উত্তর কলকাতায়,

[illegible] কাজ চলেছে,
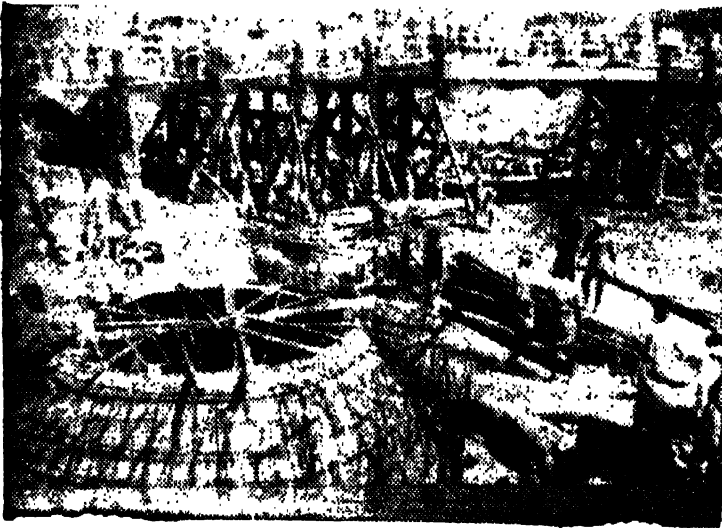
১৮২৩৯টি বাড়ি মধ্য-কলকাতায় ১৫৩০০টি বাড়ি চৌরঙ্গী-ডালহৌসী এলাকায়, ২৯১৪০টি বাড়ি দক্ষিণ কলকাতায়, ৮৩৯৭টি বাড়ি কাশীপুরে, ৩৯১৫টি বাড়ি মানিকতলায় ও ৫৬৬৪টি বাড়ি টালীগঞ্জে নিয়মিত কর্পোরেশনের কাছ থেকে জল নিয়ে থাকে।

উক্ত সমীক্ষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে জলের চাহিদা কলকাতায় ক্রমশ বাড়ছেই। উত্তর অথবা দক্ষিণ, পূর্ব অথবা পশ্চিম শহরের যে প্রান্তেই বাস করুক মানুষ—জল তাঁদের চাইই চাই। তাই আজ যে পরিমাণ জল সরবরাহ কর্পোরেশনের কাছে বিপুল বলে মনে হচ্ছে জনসংখ্যার চাপে আগামী পাঁচ বছরে তা হয়তো কমপক্ষে পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাবে। এই অবস্থাকে মোকাবিলা করার জন্য আগে থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরিশ্রুত জল রিজার্ভ রাখার জন্য আরও ট্যাঙ্ক, মোটা পাইপলাইন এবং সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থাও বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

গ্যাস

শুধুমাত্র কলকাতা শহরে ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানী ১৯৬৩ সালে ৭২৫২টি বাড়িতে গ্যাস সরবরাহ করতেন। ১৯৬৪ সালে ৪২৭৫টি বাড়ি, ১৯৬৫ সালে ৯২৩১টি বাড়ি, ১৯৬৬ সালে ৯৮৭১টি বাড়ি, ১৯৬৭ সালে ১১৪০৫টি বাড়ি, ১৯৬৮ সালে ১২৯৮৩টি বাড়ি, ১৯৬৯ সালে ১৪,১১৩টি বাড়ি ও ১৯৭০ সালে ১৫০৯৮টি বাড়ি, উক্ত গ্যাস কোম্পানির নিয়মিত গ্যাস সরবরাহের আওতায় পড়েছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে ১৯৬৩—৬৪ সালে ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি ৫৪৫১১৮৫ থারমাল ইউনিট, ১৯৬৪—৬৫ সালে ৬৮৫৪৯৬৭ থারমাল ইউনিট, ১৯৬৫—৬৬ সালে ৭৮৫৮১১১ থারমাল ইউনিট, ১৯৬৬—৬৭ সালে ৮০৪২৭৩৫ থারমাল ইউনিট, ১৯৬৭-৬৮ সালে ৭৭২০০০০ থারমাল ইউনিট, ১৯৬৮—৬৯ সালে ৮০৬৬০০০ থারমাল ইউনিট ও ১৯৬৯—৭০ সালে ৮১৩৯৫০০ থারমাল ইউনিট গ্যাস বিক্রী করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৬৮—৬৯ সালে বিক্রীর পরিমাণ প্রায় দশ লক্ষ টাকা বেড়ে যায়।। পরের বছরেও ঐ অবস্থা বজায় থাকে।

বৃহত্তর কলকাতায় গ্যাস সরবরাহের একটি প্রকল্প তৃতীয় পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় খরচের পরিমাণ ছিল ১৩০ লক্ষ টাকা। বৃহত্তর কলকাতার ৭০০০ গৃহে অতিরিক্ত গ্যাসের লাইন বসানো ও ৯৬ কিলোমিটার গ্যাস মেইনের বিস্তৃতিই ছিল ঐ প্রকল্পের লক্ষ্য। ঐ প্রকল্পের নির্দিষ্ট অর্থের শতকরা ৭৫ ভাগ ইতিমধ্যেই ব্যয়িত হয়েছে। চতুর্থ প্রকল্পের মধ্যে এটি কার্যকরী হবে।

বিদ্যুৎ

১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত কত লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ কলকাতাবাসীদের কাছে বিক্রী করা হয়েছে কলকাতায় ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন তার একটি সমীক্ষা করেছেন। ১৯৭০ সালের রিপোর্টে এ সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে ১৯৬১ সালে কর্পোরেশন ১৯৫৫০ লক্ষ ইউনিট, ১৯৬২ সালে ২০৪৯০ লক্ষ ইউনিট, ১৯৬৩ সালে ২৩২৮০ লক্ষ ইউনিট, ১৯৬৪ সালে ২৫২৫০ লক্ষ ইউনিট, ১৯৬৫ সালে ২৫৩৩০ লক্ষ ইউনিট, ১৯৬৬ সালে ২৬৩৩০ লক্ষ ইউনিট, ১৯৬৭ সালে ২৫-২০০ লক্ষ ইউনিট, ১৯৬৮ সালে ২৫০১০ লক্ষ ইউনিট, ১৯৬৯ সালে ২৫৬৫০ লক্ষ ইউনিট ও ১৯৭০ সালে ২৫৬৮০ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ শহরবাসীদের কাছে বিক্রী করা হয়েছে। বর্তমান চাহিদা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু নানা বাধা-নিষেধের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাও কর্পোরেশনের সীমিত। তা সত্ত্বেও শহরবাসীদের মধ্যে বিদ্যুৎ ব্যবহারের আগ্রহ আগের তুলনায় স্বভাবতই বেড়ে গেছে, এটা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

কলকাতা শহরের পানীয় জল সরবরাহ আলোচনা করতে হলে উনিশ শতকের থেকেই শুরু করতে হয়। যদিও এর আগে ইডেন গার্ডেনের কাছে পাম্প বসিয়ে খোলা নালায় বাগবাজার অঞ্চল পর্যন্ত জল পাঠাবার প্রচেষ্টার কথা নথীপত্রে বিদ্যমান। উনিশ শতকের শেষে মুর বেটমান নামধারী এক বিশেষ সংস্থা বর্তমানের পানীয় জল সরবরাহ করার খসড়াটি তৈরি করেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী এটি নির্মিত হয়। এইখানে বলে রাখা দরকার যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শেষ করা হলেও কতগুলি প্রস্তাবিত ব্যবস্থা কার্যকরী হয় নি। এগুলি কোনদিন কাজে লাগানো হয়েছিল কি না এবং ব্যবহৃত হয়ে থাকলে কবে এবং কেন বাতিল করে দেওয়া হয় তার সঠিক বিবরণ, প্রয়োজনীয় হলেও, কলকাতা পৌর সংস্থার নথিপত্র থেকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

কলকাতা জল সরবরাহের উৎপত্তি এবং প্রস্তুতির স্থান নির্বাচিত হয় পলতায়—কলকাতা রাজভবনের সিংহদ্বার থেকে প্রায় ষোল মাইল দূরে। হুগলী নদীর উজানে।

প্রিয় গুহ ও মণি দাস

টালিগঞ্জ জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ চলেছে

প্রশ্ন হতে পারে যে কাছাকাছি এত জায়গা থাকতে কেন এত দূরে জল সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপিত হোলো। উত্তরে বলা যায় কলকাতা মহানগরী যদিও তখন নগরীমাত্রই ছিল, তবু যাঁরা পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন তাঁরা বুঝেছিলেন যে সম্ভাব্য ভবিষ্যতে জোয়ার-ভাটার প্রাকৃতিক খেলায় হুগলী নদীর লবণাধিক্যের পরিমাণ পলতা পর্যন্ত বিপর্যয় সীমারেখা অতিক্রম করবে না। আজ কিন্তু সত্যিই এই লবণাধিক্যের সীমারেখা কলকাতা পেরিয়ে পলতার প্রান্ত-দেশ ছুঁই ছুঁই করে আছে। আশার কথা এই যে ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনার কাজ শেষ হলে এই সীমারেখা আবার বহুদূর সরে যাবে—সমুদ্রের কোলে।

প্রকৃতির বিবর্তনে গত দুশো বছরে দুর্ভাগ্যবশত গঙ্গার প্রধান ধারা পদ্মার দিকে প্রবাহিত হওয়ায় জলঙ্গী ও ভাগিরথী শাখা এবং যার নাম হুগলী, ক্রমশই শীর্ণ এবং ক্ষীণ প্রবাহ ক্ষীণতর হতে লাগল, তার ফলে সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার জের প্রায় পলতা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে শহরের জল সরবরাহের লবণাধিক্য ক্রমশ উর্ধ্বতম সীমারেখা ছাড়িয়ে যেতে লাগল এবং জলের স্বাদেরও বিপর্যয় ঘটবার উপক্রম করল। বলা বাহুল্য যে শুধু জিহ্বার স্বাদ-বিস্বাদই একমাত্র মাপকাঠি নয়; স্বাস্থ্য রক্ষায় ও বিপজ্জনক অবস্থার উপক্রম হল। প্রতি বৎসরই মার্চ মাস থেকে মে-জুন মাস পর্যন্ত কলিকাতা পৌর সংস্থা চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন।

অপর দিকে কলকাতার জল সরবরাহের একটা বড় অংশ হল তার প্রাথমিক পরিশ্রুতিকরণ। হুগলীর পলিমাটিসহ অপরিশ্রুত জলকে পাম্প করে এনে ফেলা হয় ছোট ছোট অগভীর পুকুরে। সেখানে ফিটকিরীর সঙ্গে মিশিয়ে ওই পলিমাটিকে থিতানো হয়—তারপর তাকে এক বিরাট জলাশয়ে সংরক্ষণের জন্য পাঠান হয়। এই থিতানো পলি বছরের পর বছরের অবহেলায় ভরে গিয়ে শেষে ওই পুকুর-গুলিকে গোচারণ ভূমিতে পর্যবসিত করেছে এবং বৃহৎ জলাশয়টিকেও বিপর্যস্ত করে তুলেছে। ব্যয়সাধ্য যান্ত্রিক মাধ্যমে এই প্রাথমিক পরিশ্রুতি নির্বাহ করা যায়। এই পুরনো বন্দোবস্তের যে অনেক সহজ কার্যকারিতা এবং ব্যয়-সঙ্কুলানের সুবিধা আছে সেগুলিকে অস্বীকার করা যায় না।

এই পরিস্থিতি এড়াবার জন্য ১৯৫৬ খৃঃ পৌর ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ একটা ছোট পরিকল্পনা রচনা করেন। পৌর অনু-মোদনসহ সরকারের কাছে মঞ্জুরীর জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। পরিকল্পনায় ঐ জমে থাকা পলিমাটি কেটে ছোট পুকুর-গুলির বাঁধের উচ্চতা বাড়ান এবং পারিপার্শ্বিক জমির উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা ছিল। যে সমস্ত পরিশ্রুতি-কারী বালুকা স্তরগুলি জলের অভাবে পরিমিত শোধিত জল দিতে পরছিল না তার উন্নতি সাধনের ব্যবস্থাও ছিল। সরকারী কাজের স্বাভাবিক পরিণতি

হিসাবে স্বায়ত্তশাসন বিভাগের কোন অন্ধকারে সে হয়ত আজ বিরাজ করছে এবং জাগ্রত চেতনার অভাবে সে হয়ত বিস্মৃত।
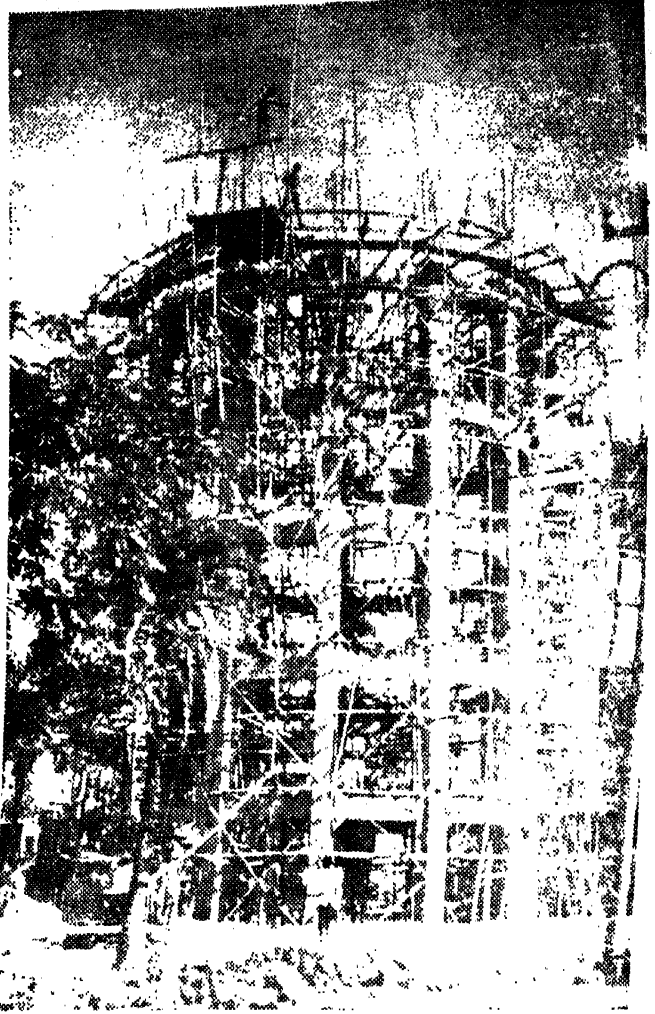
হুগলী নদী থেকে জল সরবরাহের 'উৎপত্তি' এই পলতায়, নদীর জল, ছোট ছোট পুকুরে জলের পলিমাটি জমা করে বৃহৎ জলাশয়ে গিয়ে পড়ে। সেই জল তার পর পরিশোধনাগারে যায় এবং সর্বশেষে শোধিত জলাধারে রক্ষিত হয়। এই সংরক্ষিত জল আরও বীজাণুমুক্ত করার জন্য ক্লোরিন প্রয়োগ করা হয়। সম্প্রতিকালে পরিশোধন ব্যবস্থার বহুল উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং প্রাচীন পদ্ধতির পরিশ্রুতিকারী বালুকা স্তর বদলে আজ যান্ত্রিক পরিশ্রুতি এত দ্রুত উপায়ে হয় যে, সময়ের সংক্ষেপ বিস্ময়কর। পুরনো পরিশ্রুতি যে দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ছিল আজ তার বদলে অনেক দ্রুততর উপায়ে বালুকা পরিশোধন উপায়ে আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাসহ এক-চতুর্থাংশেরও কম সময়ে জল পরিশ্রুত করে দেয়। আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাগুলি ব্যতিরেকেই ১৯৫০—৫৪ খৃঃ দ্রুততর বালুকা পরিশোধন ব্যবস্থা চালু করা হয় এবং পরে ১৯৬০—১৯৭০ খৃঃ আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাসহ এক নতুন অংশ তৈরী হয়েছে। শেষোক্তটি নানা কারণে আজও সম্পূর্ণ হয় নি। যদিও কিয়দংশ ব্যবহার্য হয়েছে। সমস্ত ব্যবস্থা পরিণত হলে এক সুষ্ঠু পরিচালনায় পলতায় আজ ষোল কোটি ষাট লক্ষ গ্যালন জল দৈনিক পরিবেশন করতে পারে। মোটামুটি এর প্রায় অর্ধেক আমরা আজ পাই। এটা অবশ্য বলা দরকার যে, কাগজের হিসাবের এবং কাজের হিসাবের সামঞ্জস্য চিরকালই দ্বন্দ্বসঙ্কুল কিন্তু তা সত্ত্বেও কোথাও তাদের সংহতি অনস্বীকার্য এবং সেটা অর্ধেক নয়। আরও অনেক বক্তব্য এতে বলবার আছে এবং সেগুলির উপর পরবর্তী উল্লেখ অবশ্য-বিচার্য।

এই সব কারণে যখন চাহিদার অনুপাতে পরিশ্রুত জল অঙ্কের সঙ্গে তাল রেখে গরমিল হয়ে দাঁড়াল—আর এদিকে চল্লিশের দশকে জনসংখ্যার বিস্ফোরণে শহর বিপর্যস্ত হয়ে উঠল, তখন গভীর ও অগভীর নলকূপের প্রয়োজন হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষ। কলকাতার বহু জায়গায় ওই নলকূপ বসিয়ে সামান্য জলাভাব মেটাবার প্রচেষ্টা হয়ত খানিকটা ফলপ্রদ হল। গভীর নলকূপের জল পাম্পের সাহায্যে শহরের জল সরবরাহের যে পয়ঃপ্রণালী বা পাইপ আছে তাতে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয়া হয় এবং নিজের চাপে তা এগিয়ে বা ছড়িয়ে যেতে থাকে। অগভীর নলকূপের জল কিন্তু আবার পরিপূর্ণ করে বিভিন্নভাবে আহরণ করতে হয়। এখানে প্রশ্ন আছে যে, গভীর বা অগভীর নলকূপ দিয়ে কলকাতার মত বিরাট শহরকে জল সরবরাহ করা সম্ভব কি না? এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ সংস্থা, যথা বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়ন পরিকল্পনা সংস্থা যা সংক্ষেপে সি এম পি ওর মত প্রণিধানযোগ্য।...যত যাই হোক, আসলে কিন্তু কলকাতার জল সরবরাহের মুখ্য উৎস হল হুগলী নদী অর্থাৎ সমস্ত 'উৎপত্তি' বিচার-বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞদের মতে পানীয় জল সরবরাহের প্রধান উৎপত্তি হবে হুগলী নদী।

এই বিশেষজ্ঞরা আবার বলেছেন, '...ভূগর্ভস্থ জলাশয় সাময়িক প্রয়োজন এবং স্বাভাবিক ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হলে বিশেষ কারণে অতিরিক্ত প্রয়োজন মেটাবার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে এবং তাও কোন-কোন ক্ষেত্রে এবং স্থানবিশেষে।' এই অগভীর এবং গভীর নলকূপের ব্যয়-বরাদ্দ নিয়ে পৌরসভায় যে অশোভন টানা-হ্যাঁচড়া চলে প্রতি বছর তা যত সত্বর বন্ধ হয় ততই মঙ্গল এবং অপচয়ের অবসান ঘটে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে সমস্ত ব্যবস্থা পলতায় কার্যকরী আছে বা প্রায়-সমাপ্ত অবস্থায় রয়েছে তা প্রতিদিন ১৬,৬০,০০,০০০ গ্যালন বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত এবং যথেষ্ট। সি এম পি ওর প্রথম পর্যায়ের এই পরিকল্পনা। আশা করা যায় যে সি এম পি ও'র প্রস্তাবিত উন্নতি অনেক বেশী আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে করা হবে এবং সেই জন্য পরিশ্রুতিকারী বালুকা স্তরের প্রাত্যহিক পরিশোধিত জলের উৎপাদন ছেষট্টি লক্ষ গ্যালন থেকে আটাশী লক্ষ গ্যালনে ধার্য করা হয়েছে। এ জিনিসটি কিন্তু পূর্বেও পৌর সংস্থা অনুমোদনের জন্য স্বায়ত্তশাসন বিভাগে পাঠিয়েছে। —যাই হোক, কোন বিতর্কের সৃষ্টি না করে এবং পুরাতনের জের না টেনেও যদি সমস্ত শক্তি ও প্রয়াস নিয়োগ করা যায় এবং অসমাপ্ত বা প্রায়-সমাপ্ত কাজগুলি ত্বরান্বিত করা হয় তাহলে কলকাতায় প্রতি বৎসরের 'জল-দুর্ভিক্ষ' পৌর-পিতাদের দুশ্চিন্তা অনেকাংশে লাঘব হবে।

'উৎপত্তি' ও 'প্রস্তুতি' আলোচনার পর 'বিস্তৃতি' সম্বন্ধে সংক্ষেপে যেটুকু উপস্থাপনা করা যেতে পারে তার মধ্যে মূলত প্রয়োজন এবং প্রাপ্তির সামঞ্জস্যই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই সামঞ্জস্য বিধানে জলের চাপ, নলের ব্যাস এবং জলবহনের ক্ষমতা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। যদি পলতা থেকে পাম্পের সাহায্যে সোজা জল সরবরাহ করা হত তাহলে উত্তর কলকাতা, — অর্থাৎ পাম্পের নিকটতর জায়গাগুলিতে অত্যধিক চাপের ফলে এত বেশী পরিমাণে জল পাওয়া যেত যে, মধ্য এবং দক্ষিণ কলকাতায় জলাভাব দেখা দিত। বর্তমান ব্যবস্থায়ও যে এই রকম বিভেদ অনুভূত হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু তার কারণ অন্য। এই সব আলোচনা করার আগে এটা হৃদয়ঙ্গম করা দরকার যে, বিস্তৃতি পর্বের কেন্দ্রস্থলে জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়, কেননা প্রাতে ও সন্ধ্যায় যখন জলের প্রয়োজন অত্যধিক হয় বা যে যে সময়ে জলের চাহিদা উচ্চতম পর্যায়ে ওঠে তখন ঘাটতি মেটাবার জন্য অতিরিক্ত জলের ভাণ্ডার যদি তৈরী না থাকে তাহলে সেই সময়ে অভাব দেখা দেবে,—কারণ জলের পরিশোধন এবং তার প্রবাহ সমবেগে ছাড়া করা অমিতব্যয়িতা বলে উচ্চতম পর্যায়ের প্রয়োজনের পক্ষে সঞ্চয় অবশ্যবিধেয়।

কলকাতা শহরের বিস্তৃতি কেন্দ্রের ব্যবস্থা আলোচনার পূর্বে বিচার্য যে একটি কেন্দ্রীভূত সরবরাহ ব্যবস্থা কি সমীচীন? বিচার করলে স্বতই প্রতীয়মান হবে যে সেই রকম অবস্থায় স্বভাবতই অঞ্চলবিশেষে আধিক্য এবং অভাব দৈর্ঘ্যজনিত চাপের তারতম্যে ঘটতে বাধ্য এবং এর প্রতিষেধক উপায় কেবলমাত্র বিকেন্দ্রীকৃত জলাধার এবং পাম্প। এইরূপ ব্যবস্থাই মূরে ও বেটম্যান কল্পনায় অন্তর্নিহিত ছিল। প্রমাণ হিসাবে ওয়েলিংটন স্কোয়ার এবং হ্যালিডে স্কোয়ার (অধুনা মহম্মদ আলী পার্ক) এই উভয়ের তলে রক্ষিত জলাশয় আজও দেখা যেতে পারে। এইগুলি এখন পরিত্যক্ত কিন্তু সামান্য মেরামতে ব্যবহার্য। বিকেন্দ্রীকৃত এইরূপ আরও জলাশয়ের স্থাপনা অঞ্চলগত সরবরাহের বৈষম্য অনেকাংশে উপশম করতে পারে। নতুন পাম্প এবং পয়ঃপ্রণালীর সুবন্দোবস্ত ও বিন্যাস অবশ্য কর্তব্য।

পলতা থেকে টালা পর্যন্ত পাম্পের সাহায্যে বৃহদাকার ইস্পাত এবং ঢালাই

লোহার নলের মাধ্যমে জল টালার চারটি জলাধারে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা ছিল। জলের প্রয়োজন বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পলতার উৎপত্তি ও প্রস্তুতি ব্যবস্থা নতুন পাম্প ও নল এবং নতুন আনুষঙ্গিক-সহ বালুকা পরিশোধনের সাহায্যে ক্রমশ বাড়ান হয়েছে। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য করে টালাতে নতুন পাম্প ও জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য জলাধার তৈরী প্রায় শেষ। বর্তমানে এইগুলিকে সমাপ্তির পর্যায়ভুক্ত বলে ধরে নিলে সর্বসমেত তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ গ্যালন সংরক্ষণের ব্যবস্থা পূর্ণ হবে। এতে সি এম পি ও'র সুপারিশ অনুযায়ী এক কোটি ছেষট্টি লক্ষ প্রাত্যহিক জল সরবরাহের ব্যবস্থা এবং এই বিশুদ্ধ জল সংরক্ষণ বিশ্বের সাধারণ প্রয়োজনের মাপ-কাঠিতে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, পুরোনো পরিশ্রুতি-কারী বালুকা স্তরের উন্নতি সাধনের পর ছয় কোটি ষাট লক্ষ থেকে আট কোটি আশী লক্ষ গ্যালন জল দিতে পারবে কিনা তা বিশেষজ্ঞদের বিচার্য। তবে এই সমস্ত নবতম প্রণালী প্রয়োগের উপর আস্থা রেখে প্রথম পর্যায়ের ষোল কোটি ষাট লক্ষ দৈনিক সরবরাহের জন্য জল পাওয়া যাবে বলে নির্ভর করতে হবে।

সেকালের চিন্তাধারায় কলকাতার প্রসার এটাই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, ভবিষ্যতের বসতি এলাকার বিস্তৃতি, কলকাতার ডক অঞ্চল ও খিদিরপুরে এবং ডায়মণ্ডহারবার রোডের দিকে হতে পারে এবং দক্ষিণে বালিগঞ্জের দিকে। কস্তুত তাই ঘটেছিল, কিন্তু দেশ ভাগ এবং রাষ্ট্র-বিপ্লবের আবির্ভাবে শরণাগতের ভিড় টালিগঞ্জ, যাদবপুর এবং কসবা অঞ্চলকেও টেনে এনেছে। উনিশ শতকের শেষে এটা অবশ্যই কল্পনাতীত ছিল। এই পরি-প্রেক্ষিতে কলকাতাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। ইংরাজীতে একে বলা হয়েছিল জোন :

প্রথম—উত্তর কলকাতা, এর জলাধার ছিল টালায়। দ্বিতীয়—বড়বাজার ও মধ্য কলকাতা, এর জলাধার ছিল মহম্মদ আলী পার্কে। তৃতীয় — সেকালের চৌরঙ্গীর সাহেবপাড়া, পার্ক সার্কাস ইত্যাদি, এর জলাধার ছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এবং চতুর্থ—ভবানীপুর এবং ভবিষ্যতে খিদির-পুর, বালিগঞ্জ প্রভৃতির সম্প্রসারিত এলাকা লী রোড জলাধার।

এই চারটি ভাগের জন্য জলাধারের অবস্থান ও পরিকল্পনায় করা হয়েছিল এবং তিনটি আজও রয়েছে। চতুর্থটি যা লী রোড বা রিজার্ভয়ার রোডের জলাধারটি আজ আর নাই এবং কলকাতার দক্ষিণাঞ্চল তখন এত অধ্যুষিত হয় নি। তবে তার বৃহদাকারের নল বা পাইপ আজও বিদ্যমান। এই বন্দোবস্তের সবই পরিত্যক্ত হয়েছে আজ এই চার ভাগের জন্য চারটি আঞ্চলিক বৃহদাকার সরবরাহ নল বা পয়ঃ-প্রণালী বিদ্যমান, যারা টালার উন্নত জলাধার থেকে সোজা জলবাহী হয়ে, অঞ্চলে-অঞ্চলে প্রবেশ করে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে বিকেন্দ্রীকৃত জলাধার ও সরবরাহে তুলনামূলকভাবে অনেক বিতর্ক আছে, কিন্তু আজকের কলকাতা এবং পরিদৃশ্যমান ভবিষ্যতে তার বিস্তৃতি বিচার করে এর সঙ্গত সমাধান করবার সময় এসেছে। আজ নতুন শহরের বিস্তীর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত সাবধানী বিচারের প্রয়োজন কারণ তা না হলে যে অসম জল-বন্টনের দায় উপস্থিত হবে অদূরভবিষ্যতে তা ক্ষয়কারী এবং দুঃখময় এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শেষ পর্যায়ে এই বৃহৎ নগরীর জল সরবরাহের শিরা-উপশিরা অর্থাৎ যে নল ও পয়ঃপ্রণালীর জটিল বিস্তার রয়েছে তার সম্বন্ধে কিছু না জানলে অসম্পূর্ণতার দোষদুষ্ট থাকবে এই আলোচনা। কারও অবিদিত নেই যে, অল্প কিছুদিন আগে বিধান সরণীর প্রান্তে বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী ফেটে গিয়ে শহরের প্রায় সমস্ত অংশের জল সরবরাহ ব্যাহত হয়েছিল এবং মাঝে-মাঝেই এরকম বিপদের মোকাবিলা করতে হয়। এর প্রতিবিধান হিসাবে টুকরা লোহার পাত পাইপে বা নলের উপর গলিত জোড় বা ওয়েলডিং করা হয় কিম্বা সিমেন্ট ইত্যাদির দ্বারা জমান পাথরের আস্তরণ দেওয়া হয়। এতে কিন্তু ঐ অংশে প্রায় নতুন পাইপের পঞ্চাশ শতাংশ খরচ হয়ে যায়। নলের এই বিপর্যয় ঘটে মরচে থেকে। সময়, জল, অম্লজান, ভূপৃষ্ঠের তড়িৎপ্রবাহ, ইত্যাদি বহুমুখী এবং বহুবিধ কারণে এই ক্ষয়কারী অবস্থা লোহা এবং অন্যান্য ধাতুর বেলায় ঘটে। এই সব কারণ এবং তার প্রতিষেধকগুলি সবিশেষ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন,—নতুবা কোনদিন এর থেকে সমূহ বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। প্রায় ত্রিশ বছর আগে প্রাক্তন চীফ ইঞ্জিনীয়ার বি এন দে মহাশয় এ সম্বন্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে গেছেন। আজও এর কোন ব্যাপক প্রতিরোধমূলক সক্রিয় ব্যবস্থা হয় নি বললেই চলে। আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ অধ্যাপক ও পণ্ডিতের অভাব নেই, শুধু প্রচেষ্টার প্রয়োজন। বর্তমানে যা হচ্ছে তা বাউলের আলখাল্লার মত তালি দিতে-দিতে এবং মেরামতির খরচায় একটা নতুন আলখাল্লা কেনার সামিল হয়ে দাঁড়াবে। উপরন্তু কখন যে কোথায় তালি আর মেরামতের প্রয়োজন হবে সেই আশঙ্কা সব সময় পৌর কর্তৃপক্ষকে বিনিদ্র রজনী যাপন করাবে। এটা প্রস্তাব নয়—নিবেদন মাত্র, কর্তৃপক্ষের দরবারে।

কর্পোরেশন বনাম সি এম ডি এ

ললিত ভড়

কলকাতা শহরকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য তৈরী হয়েছে সি এম ডি এ। বৃহত্তর কলকাতার বিভিন্ন উন্নয়ন-প্রকল্পকে সার্থক রূপ দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা দিচ্ছেন। কলকাতা কর্পোরেশনও এই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ইতিমধ্যে পেয়েছেন ৩ কোটি ৮২ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। ১৯৭০-৭১ সাল থেকে চার বছরের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কলকাতা কর্পোরেশনের নামে মোট বরাদ্দ আছে ১৮ কোটি টাকা।

কিন্তু সি এম ডি-এর সংগে কলকাতা কর্পোরেশনের বিরোধ সুরু হয় গোড়া থেকেই। সি এম ডি এ গঠন করে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে বলে কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলাররা প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। গত ২৫শে আগস্ট সি এম ডি এ আইন বাতিল করবার দাবি করে কলকাতা কর্পোরেশনের সাপ্তাহিক অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তদানীন্তন মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর ঐ প্রস্তাবটি তুলে সি এম ডি-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলবার আহ্বান নাগরিকদের কাছে জানান। রাজ্য সরকার মেয়রকে সি এম ডি এতে মনোনীত সদস্য করতে চান। মেয়র শ্রীশূর ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

কলকাতা কর্পোরেশনে যুক্তফ্রন্ট আমল ছাড়াও কংগ্রেসী শাসনের সময়েও স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়াজ উঠেছিল। সি এম পি ও এবং ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন অথারিটি গঠনের সময়েও কর্পোরেশনে ঐ একই প্রতিবাদের আওয়াজ ওঠে। যুগ যুগ ধরে কর্পোরেশনের ভিতরে ঐরূপ প্রতিবাদের আলোড়ন হয়েছে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তক। ১৮৯৯ সালে ম্যাকেঞ্জি আইনের প্রতিবাদে রাষ্ট্রগুরুর নেতৃত্বে ৩০ জন পৌর পিতা পদত্যাগ করেন।

বর্তমান মেয়র শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত এবং ডেপুটি মেয়র শ্রীপান্নালাল দাসের কণ্ঠে সেই একই সুর। নূতন মেয়র শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত মনে করেন সি এম ডি এ থাকার কোন দরকার নেই। কলকাতা কর্পোরেশনের উন্নয়নমূলক কাজ করবার ক্ষমতা আছে। অর্থ পেলে কলকাতা কর্পোরেশন সি এম ডি-এর চেয়ে ভালো কাজ করতে পারে। তিনি এক দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন : কলকাতা কর্পোরেশন বস্তিতে পায়খানার ছাদ পাকা করছেন। আর সি এম ডি এ করছেন অ্যাসবেসটাসের ছাদ।

কলকাতা কর্পোরেশনে সি এম ডি এর কাছ থেকে মোট পেয়েছেন ৩ কোটি ৮২ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। কলকাতা কর্পোরেশন বছর শেষে মার্চ মাসের মধ্যে সি এম ডি এর কাছ থেকে পেয়েছেন অধিকাংশ টাকা। তাই কলকাতা কর্পোরেশনের গত বছরের বরাদ্দের টাকার কাজ সুরু করতে দেরী হয়েছে। কর্পোরেশন এখন পর্যন্ত খরচ করেছেন ৫৪ লক্ষ টাকা, কিন্তু প্রাপ্ত অর্থের শতকরা ৯০ ভাগ কাজের টেণ্ডার ডাকা হয়েছে গত ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে। ৬৫টি বস্তি উন্নয়নের কাজে কর্পোরেশন হাত দিয়েছেন। দু-বছরে কর্পোরেশন ১৫৪টি বস্তির উন্নয়ন করবেন। পানীয় জল সরবরাহের প্রকল্প কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। রাস্তাঘাট মেরামত হচ্ছে।

দু-বছর বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ সি এম ডি এ দেড় কোটি টাকা এবং রাস্তাঘাট মেরামত বাবদ ১৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। এই দুই প্রকল্পের টাকা সি এম ডি এ দান হিসেবে কর্পোরেশনকে দিয়েছেন। কর্পোরেশন ইতিমধ্য সি এম ডি এর কাছ থেকে বস্তি উন্নয়ন এবং রাস্তাঘাট মেরামত প্রকল্প বাবদ পেয়েছেন যথাক্রমে ৬৫ লক্ষ এবং ৫০ লক্ষ টাকা।

অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের টাকা কি সর্তে কর্পোরেশন পাবেন সে সম্পর্কে সি এম ডি এ এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেন নি।

কলকাতা কর্পোরেশন বস্তি ও রাস্তাঘাট মেরামত প্রকল্প ছাড়া জল সরবরাহ বৃদ্ধি ও জরাজীর্ণ পাইপ মেরামত বাবদ ১ কোটি টাকা, পয়ঃপ্রণালী উন্নয়ন বাবদ ৭৬ লক্ষ টাকা, আবর্জনা পরিকল্পনা বাবদ ৭৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা, স্কুল বাড়ী তৈরী বাবদ ২ লক্ষ টাকা, বড় টিউবওয়েল বসান বাবদ ১৪ লক্ষ ৫৫ হাজার এবং শহরে প্রস্রাবাগার তৈরীর জন্য দেড় লক্ষ টাকা পেয়েছেন।

বাতিল করবার প্রস্তাব নিলেও সি এম ডি এর কাছ থেকে কর্পোরেশন টাকা নিচ্ছেন।

[illegible] পার্ক সার্কাসের কাছে বস্তি উন্নয়নের কাজ চলছে [illegible]

ট্রামে-বাসে ঝুলতে হয় বলে অনেকেই আত্মীয়বাড়ী যাওয়া বন্ধ করেছেন। নেহাৎ দায়ে না পড়লে আজকাল কেউ ট্রামে-বাসে চড়তে চান না। কলকাতাবাসীর কথা ছেড়েই দিলাম। ওটা না হয় তাঁদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত। মফঃস্বলের বহু ব্যক্তি আজকাল কলকাতায় আসতে চান না ট্রাম-বাসের কথা ভেবে।

কলকাতা শহরে যে হারে লোকসংখ্যা বাড়ছে তার এক-দশমাংশও বাড়ছে না ট্রাম-বাসের সংখ্যা।

বাসের কথাই ধরা যাক। গত পনর বছরে কলকাতা সরকারি বাসে নতুন বাসের সংযোজন হয় নি। সেই পুরোনো বাস দিয়ে কোনোরকমে চালান হচ্ছে। উপরন্তু বছরে আড়াই কোটি টাকা লোকসান দিচ্ছে স্টেট বাস। নতুন বাস কেনার ক্ষমতা নেই স্টেট বাস সংস্থার। তারা এখন সি-এম-ডি এর কাছে ধর্ণা দিয়েছে।

কলকাতায় লোকসংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজন প্রতিদিন ১১০০টি বাসের। তাদের আছেও ১১০০টি বাস। কিন্তু এই এগারশটি বাসের মধ্যে বসে আছে অ-কেজো হয়ে তিনশটি বাস। সেগুলো মেরামতের ব্যবস্থারও আর্থিক ক্ষমতা নেই। বাকি থাকে আটশ বাস। সেই আটশ বাসের মধ্যে আড়াইশ বাস বেকার হয়ে বসে রয়েছে। সাজ-সরঞ্জামের অভাবে মেরামত হচ্ছে না। হাতে রইল সাড়ে পাঁচশ বাস। তার মধ্যে প্রতিদিন দেড়শটি বাস বিকল হয়ে যায়। সুতরাং এগারশ বাসের মধ্যে দৈনিক চলাচল করে মাত্র চারশ-সাড়ে চারশ বাস। বাদুড় ঝোলার এটাই অন্যতম কারণ।

দিলীপ মালাকার

ট্রামের অবস্থাও তথৈবচ। গত বিশ বছরে ট্রাম কোম্পানী কোনো নতুন গাড়ী চালু করেন নি। হয়নি কোনো সংস্কার। অনেককাল আগে দৈনিক চালু গাড়ীর সংখ্যা ছিল ৪১৫টি। বর্তমানে চালু গাড়ীর সংখ্যা মাত্র ৩৩০টি। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে গাড়ীর সংখ্যা বাড়ে নি বরং কমেছে।

নতুন গাড়ী না কিনেই ট্রাম কোম্পানীর ঘাটতি প্রতি মাসে [illegible] লাখ টাকা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ট্রাম কোম্পানী পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে। তার পরেও ট্রামের কোনো উন্নতি হয়নি। কলকাতায় ট্রামের যা অবস্থা ছিল তাই আছে।

যে শহরে যাট লাখ লোকের বাস সে শহরে দুখানা ট্রাম ও চারখানা বাস দিয়ে চলে না। চাই অন্য ব্যবস্থা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকার গত পঁচিশ বছর ধরে সে সমস্যা সমাধানের জন্যে অনেক কমিটি, অনেক প্রতিজ্ঞা, অনেক বিশেষজ্ঞ দিয়ে অনেক আশার বাণী শুনিয়েছেন। কলকাতা পরিবহণে চক্র রেল হবে না ভূগর্ভ রেল হবে তাই নিয়ে কত গবেষণা। বর্তমান সি-এম-ডি-এর একটি প্রধান কাজ কিন্তু এই পরিবহণ সমস্যা সমাধানের।

নির্বাচনের আগে প্রত্যেকবারই ভারত সরকারের রেলমন্ত্রীরা কলকাতায় এসে আশার বাণী দিয়ে যান। ভূগর্ভ রেল হল বলে। এবং হলেই কলকাতাবাসীর সব কষ্টের অবসান হবে। এই ধাপ্পাবাজি চলছে গত বিশ বছর ধরে। যতক্ষণ পর্যন্ত না কলকাতাবাসী ভূগর্ভ রেল বা

[illegible] ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের নতুন বাস নির্মিত হচ্ছে [illegible]

চক্র রেলে না চড়ছেন ততক্ষণ কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না।

ভারত সরকার কলকাতায় পাতাল রেল নির্মাণের জন্যে ৪৪ কোটি টাকা দেবেন প্রথম কিস্তিতে। পরে আরও একশ কোটি টাকা দেবেন বলে জানিয়েছেন।

কলকাতায় পাতাল রেল পরিকল্পনা আজকের নয়। বৃটিশ আমলে ১৯২১ সালে কলকাতায় পাতাল রেল নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্যারিসের পাতাল রেলপথ কোম্পানীর কাছে মতামত চাওয়া হয়েছিল। তারপর আবার ১৯৪৫ সালে। তখনও সবকিছুই খাতাপত্রে আবদ্ধ থাকে। তারপর ১৯৪৯ সালে তৎকালীন মুখ্য-মন্ত্রী ডাঃ বিধান রায় ফরাসী বিশেষজ্ঞদের আনিয়ে কলকাতায় পাতাল রেল নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু টাকার অভাবে সব চাপা থাকে।

কলকাতায় পাতাল রেল হওয়া উচিত, না চক্র রেল, তাই নিয়ে বহু অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়েছিল। তার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিচ্ছি।

১৯৪৭ সালে জিনওয়ালা কমিটির রিপোর্ট যার নাম দেওয়া হয় ক্যালকাটা টারমিনাল ফেসিলিটিস কমিটি। জিন-ওয়ালা ছিলেন অবিভক্ত বাংলার ট্রান্সপোর্ট কমিশনার। জিনওয়ালা কমিটি জানান যে, বাষ্পচালিত ট্রেন চলবে দশ মাইল পথে, দমদম থেকে ইডেন গার্ডেনে পোর্ট কমি-শনারের রেললাইনের ওপরে। এবং খরচ পড়বে সাড়ে ছ কোটি টাকা।

১৯৪৯ সালে ফরাসী বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পাতাল [illegible] কাজ [illegible]

১৯৫৩ সালে স্যার এস এন রায় কমিটি জানান যে দমদম থেকে মাজেরহাট পর্যন্ত সাধারণ রেলপথ নির্মাণের খরচ পড়বে চার কোটি টাকা।

১৯৫৬ সালে সারাঙ্গপানী কমিটি বলেন বিদ্যুৎচালিত অর্ধ চক্রাকার রেল-পথের খরচ পড়বে সবশুদ্ধ সাত কোটি টাকা।

১৯৬৪ সালে সি এম পি ও এক আমেরিকান এঞ্জিনিয়ার ডঃ ফ্রীলিংসকে ডেকে আনেন। তিনি বলেন পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ ঝুলন্ত রেলপথ নির্মাণ করতে হবে এবং তার জন্যে ব্যয় হবে আঠাশ কোটি টাকা।

১৯৬৬ সালে এলেন লণ্ডন ট্রান্স-পোর্টের ডঃ পি গ্যারবাট। তিনি অনু-সন্ধান করে জানান উত্তর-দক্ষিণ লাইন হওয়া উচিত ঝুলন্ত রেলপথ আর পূর্ব-পশ্চিমে হওয়া উচিত পাতাল রেলপথ। এর জন্যে ব্যয় ধরা হয় তিয়াত্তর কোটি টাকা।

১৯৬৭ সালে প্রকাশ করে সি এম পি ও তাদের রিপোর্ট, এতে বলা হয় অর্ধ-চক্রাকার রেলের সঙ্গে পাতাল রেলপথও থাকা উচিত। বার মাইল ঝুলন্ত রেল-পথের জন্য ব্যয় ধরা হয় তেতাল্লিশ কোটি টাকা। পাতাল রেলপথের প্রতি মাইলের জন্যে খরচ ধরা হয় আট কোটি টাকা করে।

১৯৬৮ সালে আসেন ফিনল্যান্ডের ডঃ রেনো ক্যাস্ট্রেন। তিনি জানান ঝুলন্ত ও পাতাল দুই রেলপথই থাকা উচিত।

১৯৬৯ সালে নিযুক্ত হয় কেন্দ্র [illegible] প্ল্যানিং কমিশনের মেট্রো-পলিটান ট্রান্সপোর্ট টিম। এদের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। এদের হিসাবে অর্ধচক্রাকারে নয় মাইল পথে ঝুলন্ত রেলপথ নির্মাণে ব্যয় হতে পারে উনত্রিশ কোটি টাকা।

সর্বশেষ সংস্থাটি গঠন করেছে কেন্দ্র সরকারের রেলমন্ত্রক ১৯৬৯ সালের অগাস্ট মাসে। এটির নাম মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়ে)। এর কাজ শুরু হয়েছে ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাসে। এঁরা অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এঁদের মতে খানিকটা হবে ঝুলন্ত আর বাকিটা পাতাল রেলপথ।

এঁদের হিসেবে মাইল প্রতি ঝুলন্ত রেলপথে খরচ হবে তিন কোটি টাকা। বিশেষজ্ঞদের মতে পাতাল রেলে মাইল প্রতি খরচ হবে আট থেকে দশ কোটি টাকা।

কলকাতায় পাতাল রেলপথ নির্মাণে বিদেশীদের সাহায্য নেওয়া হবে কিনা তাই নিয়ে বহু আলোচনা হয়। শেষ পর্যন্ত গত বছরে একদল রুশ বিশেষজ্ঞ কলকাতায় এসেছিলেন এবং তাঁরা তিন-মাস থেকে একটা রিপোর্টও দিয়ে গেছেন। শোনা যাচ্ছে যদি কোনোদিন পাতাল রেল-পথ হয় তাহলে রুশ এঞ্জিনিয়ার ও যন্ত্র-পাতি সোভিয়েট সরকার দেবেন। ১৫ মাইল পাতাল রেলপথ নির্মাণে খরচ হবে দেড়শ কোটি টাকা। এই টাকাটা মাকি সি এম ডি এ মারফৎ ভারত সরকার দেবেন।

কলকাতাবাসী আজ তাই সি এম ডি-এর মুখের দিকে তাকিয়ে, [illegible] তাঁদের স্বপ্ন, স্বপ্নই [illegible]

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সুখ দুঃখ দুটি ভাই

'আমরা সাধারণতঃ যাকে কমেডি বলি তার থেকেই ট্রাজেডির জন্ম'—এ-কথা বলেছেন ওয়ালটার কার তাঁর 'ট্রাজেডি অ্যান্ড কমেডি' নামক সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থে। সুখ এবং দুঃখ অভিন্ন। উভয়ে প্রায় হরিহরাত্মা। চন্ডীদাস বলেছেন—'শুন বিনোদিনী, সুখ-দুঃখ দুটি ভাই।/ সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি দুঃখ যায় তাঁর ঠাঁই।।' সুখ ও দুঃখ দুটি সহোদরের মত পরস্পর অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে। ওয়ালটার কারের মতে—'তেমনই কমেডি যখন তার উদ্ভবের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন আর তার স্বাধীন সত্তা থাকে না। কমেডি আর ট্রাজেডি তখন একাত্ম; সুতরাং আচার ও আকৃতিতে ওরা তখন ট্রাজেডি।'

এই আইডিয়া যে নতুন নয় তা বলা বাহুল্য। এরিস্টোফানিসের সঙ্গে পানোন্মত্ত এক আলাপাচারে সুরাজড়িত কণ্ঠে স্বয়ং সোক্রেটিস একবার এই জাতীয় উক্তি করেছিলেন। বিরাট পানপাত্র পূর্ণ করে পরিবেশন করার পর এরিস্টো ডেমস—যিনি মাত্র অর্ধ-জাগরিত ছিলেন এবং আলোচনার পূর্বাংশটুকু কানে শোনেননি—শুনতে পেলেন, সোক্রেটিস তাঁর অন্য দুজন সঙ্গীকে চাপ দিয়ে বলছেন কমেডি এবং ট্রাজেডি একই বস্তু, যে ট্রাজেডির ক্ষেত্রে প্রকৃত শিল্পী, কমেডির ক্ষেত্রেও সে অনুরূপ প্রতিভার পরিচয় দেবে।

এই গ্রন্থের লেখক ওয়ালটার কার কমেডির প্রতি তাঁর অসীম অনুরাগের কথা স্বীকার করে বলেছেন—'কমিক চাপ আমার মনে যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন আমি কাঁদি।' তিনি কমেডি-বিষয়ক গ্রন্থ লিখতে বসে বলেছেন—'এই গ্রন্থটি কমেডি-বিষয়ক হবে, কিন্তু তা হল না, কারণ নেহাৎ অনাহুতের মত ট্রাজেডি এসে হাজির এবং তাকে পথ ছেড়ে দিতেই হবে।'

কার বলছেন ট্রাজেডি এবং কমেডির সূক্ষ্ম বিভাজন একটা 'একাডেমিক ফিকশান' বা পাণ্ডিত গালগল্প, এই বিভাজন ব্যবস্থা কাজের সুবিধার জন্য করা হয়েছে। সুখের পাশে দুঃখ যেমন সদাই হাজির তেমনই ট্রাজেডি ছাড়া কমেডির অস্তিত্ব নেই বলা যায়। বর্তমানে রঙ্গমঞ্চে এই অবস্থাটা দেখা যায়। তবে [illegible] মিলেমিশে যাওয়ার প্রবণতাটাই বেশী। ওয়ালটার কার এর পর বলছেন—

> "I found myself forced, in the end, either to try to come at comedy through tragedy or to stand silently before this perpetual ambiguity".

ওয়ালটার কার বলছেন—কমেডির অন্তর্নিহিত কিছু একটা বস্তু তেমন 'ফানি' বা মজার নয়, আদৌ মজার নয়। কার-এর এই যুক্তির চাপে পড়ে স্বীকার করতে বাধ্য হই ট্রাজেডির অভ্যন্তরস্থ কিছু একটা বস্তু তেমন সিরিয়স নয়, গভীর ও গম্ভীর যতটুকু হওয়া প্রয়োজন ছিল ততটা গম্ভীর নয়, কেমন একটা বিশ্ব জাগতিক পরিহাস জড়িয়ে আছে। অ্যামেচার এবং প্রোফেসন্যালের পার্থক্য-বিষয়ক গ্রুচো মার্কসের একটি কথা উদ্ধৃত করেছেন ওয়ালটার কার। গ্রুচো বলছেন—

> "An amateur thinks it's funny, If you dress a man up as an old lady, put him in a wheel chair and give the wheel chair a push that sends it spinning toward a stone wall."

কমেডি 'চার্লিস আণ্টের' একটি অংশের ইঙ্গিত এর মধ্যে পাওয়া যায়।

প্রোফেসন্যালের কাছে কোন বস্তুটি 'ফানি' বা মজাদার? গ্রুচো এর উত্তরে বলেছেন প্রোফেসন্যাল শিল্পীর জন্য একটি প্রকৃত বৃদ্ধা রমণী প্রয়োজন—

> "for a pro : it's got to be a real old lady. The best comedy makes no waivers. It is so. And it is harsh"

অনেকের মতে ট্রাজেডির ক্রমাবনতি ঘটছে বা মৃত্যু হয়েছে। এবং এই মৃত্যু ঘটেছে তিন শতাব্দী আগে—কিন্তু তাহলে তার পূর্ণ জীবনের কথা ঘোষণা করা যায়, কমেডির ক্ষেত্রে যা ঘটছে তার নিরিখেই এই ঘোষণা সম্ভব। কমেডির ক্ষেত্রে কি ঘটেছে সে বিষয়ে মন্তব্য—'ধীরে ধীরে সব কালো হয়ে গেছে, আমাদের কাছে যা অপরিচিত মনে হয় এমন এক বিষ উদ্‌গীরণ করছে। বাক্‌প্রতিমা এবং কটু-কাটব্যের মধ্যে এক ভীষণ অসহিষ্ণুতার ছাপ সুস্পষ্ট। এ যেন একটা প্রকৃত উন্মত্ততায় আমাদের অংশগ্রহণে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। যেন কমেডির অভ্যন্তরীণ বিষাদময়তা যা আগে তৃষ্ণা বর্ধন করেছে এবং পরে ভ্রষ্ট করেছে, সেই বিষাদময়তা শেষপর্যন্ত কমেডিকে গ্রাস করেছে। একেবারে দেয়ালের ধারে ঠেলে দিয়েছে।'

এই বক্তব্য বোধগম্য করানোর জন্য কার ট্রাজেডি ও কমেডির উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের ধারা বিচার করেছেন। প্রাচীন গ্রীস, রেনেসাঁসের যুগ, এবং নিও-ক্লাসিকের কালে ট্রাজেডির যে পাণ্ডিত সংজ্ঞা ছিল তা বিশ্লেষণ করেছেন। সেকস্‌পীয়র এবং মলিয়ের থেকে চেখভ এবং পিরানদেল্লোর কমেডি; বেকেট থেকে অসবোর্ণ পর্যন্ত বিচার করে তিনি বলেছেন ট্রাজেডির পুনর্জন্মের গর্ভবেদনা বোধহয় এইভাবেই শুরু হয়েছে।

আদিম ধর্ম-রীতি, আত্মদান, বেদনা এবং বিদূষণ প্রবৃত্তির থেকেই নাটকীয় সম্ভাবনার গর্ভ থেকে ট্রাজেডি এবং কমেডির উদ্ভব ঘটেছে। গ্রীক এবং ক্রিশ্চান নাটকের মধ্যে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে একথা কার স্বীকার করেন না। তিনি বলেছেন—

> "Agony, death and transfiguration make up the compulsive rhythm of the only Universe we know."

এ হল ট্রাজেডির কথা, আর প্যারডি বা অনুকৃতির যমজ সহোদর হল কমেডি।

যেসব গ্রীক কমেডি ও ট্রাজেডির এখনও অস্তিত্ব আছে তা বিচার করে তিনি প্রশ্ন করেছেন কমেডির মিলনান্তক সমাপ্তি এবং ট্রাজেডির বিয়োগান্ত সমাপ্তি প্রসঙ্গে। এই পবিত্র ধারণার কারণ কি এ-প্রশ্ন তাঁর মনে জেগেছে। এই চ্যালেঞ্জ এমন কিছু নতুন নয়, এর পূর্বেও এই কথা উঠেছে, তবে কার-এর ওকালতির মধ্যে বলিষ্ঠ যুক্তি বর্তমান।

তিনি দেখিয়েছেন এরিস্টটল ট্রাজেডির মিলনান্তক ও বিয়োগান্ত উভয়বিধ সমাপ্তি স্বীকার করেছেন। লেখক বলেছেন—কমেডির সমাপ্তিতে হতাশা থেকে যেতে পারে যেমন 'টেমপেস্ট' নাটকে হয়েছে। ট্রাজেডি অনেক সময় ব্যক্তিবিশেষকে প্রতিষ্ঠিত করে, যেমন এণ্টিগোনের ক্ষেত্রে ঘটেছে :

> "Numberless are the world's wonders, but none more wonderful than man......"

কিংবা 'হ্যামলেট' নাটকে—

"What a piece of work is man! How noble in reason! How infinite in faculties!"

অথচ এরিস্টফেনিস কমেডিতে লিখতে পারেন—

Come now, let us consider the generations of man. Compound of dust and clay, Strengthless, tentative, passing away as leaves in autumn........"

এই ত মানুষ শরৎকালের বৃক্ষপত্রের মত ঝরে পড়ে যায়। কার বলছেন—ট্রাজেডি মানুষকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখে, কমেডি মানুষের জন্য দুঃখ অনুভব করে।

ট্রাজেডিতে আশা আছে, আর কমেডির সেখানেই উদ্ভব যেখানে আছে হতাশা। তথাপি মানুষ নিজের নানাবিধ ত্রুটি এবং শারীরিক দুর্বলতার হাতে বন্দী হয়েও কোনোরকমে ঠিক কাটিয়ে দেয়। আহার্য এবং পানীয়ের দাসত্ব স্বীকার করে, কামনা বাসনার হাতের ক্রীড়নক হয়ে মানুষ কোনোরকমে ভারসাম্য বজায় রাখে। তবে ট্রাজেডির বিষয়বস্তুর প্যারডি বা অনুকৃতি করেও কমেডি নিরন্তর তার অস্তিত্বটুকু আমাদের মনে করিয়ে দেয়। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখে, কারণ সে নিজে পরিস্থিতির দ্বারা শৃংখলিত।

—অভয়ঙ্কর

TRAGEDY & COMEDY — By Walter Kerr : Published by Simon & Schuster : N, York. Price : 5.95 dollars. only.

সাহিত্যের খবর

সাগর পারে রবীন্দ্রনাথ: ব্রিটেন থেকে প্রকাশিত সাহিত্য পত্র 'সাগর পারে' আয়োজিত রবীন্দ্র সন্ধ্যা লন্ডনের গান্ধী হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার প্রধানা অতিথি ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধা অভিনেত্রী ডেম সিবিল থর্নডাইক। ডেম সিবিল থর্নডাইক গীতাঞ্জলি থেকে 'দিস ইজ মাই প্রেয়ার টু দি মাই লর্ড', স্ট্রাইক এ্যাট দি পেনুরী ইন মাই হার্ট' আবৃত্তি করেন। কবির একটি আবক্ষমূর্তিতে পুষ্পস্তবক দান করে তিনি কবির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। নীলাদ্রি ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন। চেক তরুণী ভেরা দ্রুপোকোভা ও লন্ডন ইউনিভার্সিটির ডাঃ বোলটন কবির উদ্দেশ্যে রচিত স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এই সভায় রাজেশ্বরী দত্ত একটি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করার সময় হিরন্ময় ভট্টাচার্য জানান যে 'সাগর পারে' পত্রিকাটি প্রকাশের এক বছর পূর্ণ হল।

সংখ্যালঘু মাতৃভাষা: পাটনার বাঙালী সমিতি 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনাচক্রের আয়োজন করেন। প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী পণ্ডিত হরনাথ মিশ্র সভাপতির ভাষণে সরকারী শৈথিল্যের তীব্র নিন্দা করেন। সরকারী কর্মচারীরা বিহারকে এক ভাষাভাষী রাজ্য হিসাবে চালাবার অপচেষ্টা করছেন। 'সার্চলাইট' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুভাষচন্দ্র সরকার বলেন, সংবিধানে প্রদত্ত রক্ষাকবচ কোনো রাজ্যেই সংখ্যালঘুদের সুবিধার্থে প্রযুক্ত হয় না। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফরাসী ভাষার অধ্যাপক ডঃ আখতার ওরারভি বলেন—বিভেদ কন্টকিত ভারতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একদিন হিন্দী স্বীকৃতি পাবে, কিন্তু তা গলাটিপে চাপানো যাবে না। এই আলোচনা সভায় উর্দুর স্বপক্ষে বেগম কামরুন্নিসা, মৈথিলি-ভাষার স্বপক্ষে ডঃ বাসুকীনাথ সাঁওতালী-ভাষার স্বপক্ষে শ্রীশোরেন এবং ওড়িয়া ভাষার স্বপক্ষে শ্রীত্রৈলোক্যনাথ হোতা অংশ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর প্রতিনিধিগণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সি ভি রাও-এর সম্বর্ধনা: গোরক্ষপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ও প্রখ্যাত হিন্দী কবি ও সমালোচক সি ভি রাও সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের অধ্যাপক কল্যাণমল লোধা তাঁর বাসভবনে এই উপলক্ষ্যে একটি মনোজ্ঞ সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। এই সভায় ভ্রমরমল সিংঘী, শিবকুমার যোশী, ত্যাগরাজন, অন্নদাশঙ্কর রায়, লীলা রায়, মনোজ বসু, ভবানী মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সভায় আধুনিক সমাজে লেখকের সমস্যা এবং শ্রীযুক্ত সি ভি রাও-এর সাহিত্য-কর্ম বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা চলে।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে: বিগত ১ আষাঢ় শ্রীযুক্তা ইলা পাল চৌধুরীর কলিকাতাস্থ বাসভবনে 'সাহিত্য-তীর্থ' আয়োজিত এক সভায় সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মেঘদূত ও রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে একটি হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন। সভায় বনফুল, দীনেশ দাস, কুমারেশ ঘোষ, বাণী রায়, রাজ্যেশ্বর মিত্র প্রভৃতি কবিতা পাঠ করেন। এই সভায় সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সহশিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেন।

অবনীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী: আগামী জন্মাষ্টমী তিথিতে রবীন্দ্র সদনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের জন্মশত বার্ষিকীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান যথাযোগ্য আড়ম্বরে পালিত হবে। অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিদানে যাঁরা আগ্রহী তাঁরা বিস্তারিত তথ্যের জন্য শ্রীমতী ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর ৪, এলগিন রোডস্থ ভবনের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

বিদ্যাপতি সরণী: কলকাতার মৈথিলী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে কলকাতা কর্পোরেশনের কাছে কলিকাতার একটি রাজপথের নাম 'বিদ্যাপতি সরণী' করা হোক এই প্রস্তাব দিয়েছেন।

ছবির কথা—অহিভূষণ মালিক: প্রকাশক কলা মন্দির, ২৮।১বি, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম ৬-০০ টাকা।

ছবি আঁকার মত ছবি দেখাও শিখাতে হয়। কিন্তু শেখার সুযোগ সবসময় পাওয়া যায় না। ছোটদের জন্যে এই সুযোগের ব্যবস্থা করেছেন শ্রীঅহিভূষণ মালিক। একখানি ছোট বইয়ের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট সহজবোধ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে ছবি দেখা এবং ছবির ইতিহাস গল্পের মত সাজিয়ে বলে গিয়েছেন। পড়তে একটুও কষ্ট হয় না। রং, চিত্র রচনা একালের শিল্পী ও দর্শক ইত্যাদি প্রবন্ধের মাধ্যমে ছবি তৈরী ও দেখার বৈশিষ্ট্য কোথায় তা পরিষ্কারভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে তিনি ভারতীয় শিল্পের

ঋড়ংগ, চীনা জাপানী চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য, ইউরোপের রেনেসাঁস থেকে আধুনিক শিল্প-কলার বিবর্তন অবধি সবই খুব অল্প পরিসরের মধ্যে যতটা সম্ভব পরিষ্কার ও সহজবোধ্য করে উপস্থিত করেছেন। অবশ্য এত ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে সর্বাকছু ভালো-করে বুঝিয়ে বলা সম্ভব হয় না। তবে বই পড়ার উদ্দেশ্য যদি কোন বিষয়ে কৌতূহল জাগানো হয় তাহলে সে উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সফল হয়েছে। নয় পৃষ্ঠা ছবি সম্বলিত বইটি নিঃসন্দেহে ছোটদের ভাল লাগবে। আরো সুন্দর লাগবে শিল্পী নীরদ মজুমদারের আঁকা বহুবর্ণের প্রচ্ছদপট।

উত্তররামচরিত (উপন্যাস) অবধূত। দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ। ৫৭ সি, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ১২—দাম পাঁচ টাকা।

অবধূত বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে একজন প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ লেখক। তাঁর 'উত্তররামচরিত' ঔপন্যাসিক পূর্ব সুনামকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। অধ্যাপক ভবভূতি ঘোষাল এম-এ, ডি-ফিল-এর আকস্মিক নিখোঁজ হওয়া নিয়ে কাহিনীর সূত্র। এই রাতের কলকাতার এক রোমহর্ষক কাহিনীর জটিলতার মধ্যে নানা ঘটনার সূত্র ধরে রত্না, ঋভুদি, গার্গী, সামন্তমশাই, হর্ষ, সাজাহান, পরাগকেশর মিত্র ইত্যাদি জটিল চরিত্র সমবেত হয়েছে। কাহিনীটির রুদ্ধ-শ্বাস পরিভ্রমণের জন্যই 'উত্তররামচরিত' সর্বস্তরের পাঠকদের রসিকচিত্ত ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে। কাহিনীর চমক সৃষ্টিতে লেখক যথেষ্ট শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ পরিকল্পনা উচ্চাঙ্গের।

ভাবনায় সাম্প্রতিক শব্দগুলি (কাব্যগ্রন্থ)—তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্ণব প্রকাশনী, পূর্ব পুটিয়ারী, ২৪-পরগণা। দাম আড়াই টাকা।

কবি শ্রীতপন বন্দ্যোপাধ্যায় তরুণ কবি এবং কাব্যের বক্তব্যে ও মেজাজে আধুনিক নিঃসন্দেহে। এঁর আধুনিকতা রূঢ় বাস্তব জীবন-সমস্যায় নয়, জীবন, প্রেম, আশা-নিরাশার কয়েকটি রোমান্টিক অভীপ্সায়। 'বেঁচে-থাকার স্বপ্নময় নীছক প্রতিশ্রুতি নিয়ে' এ কবি হৃদয় আলোকিত করতে চান প্রদীপ জ্বালিয়ে। প্রকৃতিকে নিঃশ্বাসের সংগে মিশিয়ে এক গোপন ভয়ের কথা ব্যক্ত করতে চান তার কাছে। কখনো বা কবি ঘোষণা করেন—'দুঃখের পথ নিয়ে চলে যাই আরো দূরে উদার দক্ষিণে।' বিষয়ে গোপন-তম ব্যক্তিক অনুভূতিই প্রধান বলেই কবির চিত্রকল্প তার উপযোগী মনোরম, প্রীতিময়। রচনার কালে কবি অত্যন্ত নিষ্ঠা-বান, সচেতন ও আন্তরিক।

পার্টিগার্ল—(উপন্যাস) সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ। ৫৭সি, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম ছয় টাকা।

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে রাজনীতি আশ্রয় করে যে সমস্ত বাংলা উপন্যাস রচিত হয়েছে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী কালে রচিত এই ধারার উপন্যাসে তার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তিত রূপ থাকতে বাধ্য। কারণ আজকের রাজনীতি, বিশেষত বাংলা-দেশে, দলগত সংকীর্ণতায় বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত। রাজনীতি চেতনায় দেশের সমস্ত মানুষেরই সুস্থ, পবিত্র এবং মৌল অধিকার ; কিন্তু তা যখনি সংকীর্ণ দলগত সীমায় রূপ পায়, তখনি বিভ্রান্তি দেখা দেয়।

এই বিভ্রান্তির মধ্যে রচিত 'পার্টিগার্ল' উপন্যাসটি নতুন ধারার রাজনৈতিক উপ-ন্যাসে সার্থক সংযোজন। ঐ উপন্যাসের চরিত্রগুলি—রীণা, বীণা, ভাই টুটুল, রীণার শেষ প্রেমিক হীরেনবাবু, অমলেন্দু সেন, ইলা, সুবোধ ইত্যাদি, এক-একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে ঘুরছে। এদের সঙ্গে নকুলমামা, রীনার অপর এক প্রেমিক অনিন্দ্য, শোভন-বাবু, সুরমাদি ইত্যাদি চরিত্র কাহিনী ও ঘটনায় জটিলতা সৃষ্টি করেছে। প্রধানত যুক্তিনির্ভর ও তত্ত্বধর্মী রাজনৈতিক উপ-ন্যাস 'পার্টিগার্ল'; লেখকের ভাষা সহজ সরল, অনাড়ম্বর। বর্তমানজটিল বিভ্রান্তি-মূলক রাজনৈতিক পরিবেশে 'পার্টিগার্ল' উপন্যাসটি যে কোন সহৃদয় পাঠককে নিঃসন্দেহে নতুন রসের আস্বাদ দেবে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

চিকিৎসক সমাজ ('জয় বাংলা' বিশেষ সংখ্যা, ১৩৭৮)—সম্পাদক ঃ ডাঃ অমল ঘোষ হাজরা। ১৫১, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলকাতা ঃ ৩৪। এক টাকা।

অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ু-র্বেদীয়, ইউনানি ও পশু-চিকিৎসকদের বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংবাদের মাসিকপত্রটি একাধিক কারণে ইতিমধ্যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। এদেশের আপাতবিরোধী বিভিন্ন চিকিৎসাশাস্ত্রের ভিন্নমুখী ধারা, মত ও পথকে একই আধারে বিধৃত করা অবশ্যই প্রশংসনীয় উদ্যম। এই বিশেষ সংখ্যায় 'বাংলাদেশ'-এর ওপর কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখেছেন বনফুল, ডাঃ গোরাচাঁদ নন্দী, ডাঃ কার্তিকচন্দ্র সেনগুপ্ত, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সত্যবাদী, ডাঃ বিশ্বনাথ রায় প্রমুখ। চিকিৎসাশাস্ত্রের নানা দিক ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন অভিজ্ঞরা। সম্পাদক ও সহযোগীরা পত্রিকা সম্পাদনে মুন্সিয়ানার পরিচয় রেখেছেন।

বাংলা সাহিত্যপত্র (বাংলাদেশ সংখ্যা, ১৩৭৮)—সম্পাদক ঃ উমাশংকর বন্দ্যো-পাধ্যায়। ২৬, বাবুপাড়া রোড, ভাট-পাড়া, ২৪ পরগণা। চল্লিশ পয়সা।

সাহিত্যপত্রের বিশেষ সংখ্যায় 'বাংলা-দেশ'-এর ওপর কবিতা লিখেছেন উভয় বঙ্গের কবিকুল। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শান্তিকুমার ঘোষ, জগন্নাথ চক্রবর্তী, তারাপদ রায়, তুলসী মুখোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন, নির্মলেন্দু গুণ, শামসুর রহমান প্রমুখেরা।

দরবারী (সাহিত্য পত্রিকা, চৈত্র, ১৩৭৭)—সম্পাদক ঃ কল্যাণ চক্রবর্তী। ৩০ লেনিন সরণি, কলকাতা ঃ ১৩। এক টাকা।

গল্প, কবিতা, আলোচনার সংকলন। কবিতাই বেশি, অনুবাদ কবিতাও আছে। গল্পকার এবং কবি সম্পর্কীয় আলোচনা দুটি উল্লেখ্য।

স্বরান্তর (বৈশাখ, ১৩৭৮)—সম্পাদক ঃ অমল রায়চৌধুরী। ২, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা ঃ ১২। এক টাকা।

মুখ্যত ছোটগল্পই উপজীব্য এই মাসিক পত্রিকাটির। দীর্ঘ অদর্শনের পর নতুন করে চালু হল তরুণ কথাকারদের কাহিনী নিয়ে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন বরেন গংগো-পাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য গুহ প্রমুখ।

অন্যদিন (বসন্ত সংখ্যা)—সম্পাদক ঃ শিশির ভট্টাচার্য। ৫৮।১২৮ লেক গার্ডেনস। কলকাতা—৪৫। দাম—এক টাকা।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্যে অন্যদিনের বসন্ত সংখ্যা নিবেদিত। পত্রিকাটি সুসম্পাদিত এবং সুমুদ্রিত। এপার বাংলা এবং ওপার বাংলার কবি ছাড়াও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্যে ভারতের অন্যান্য ভাষার কবিতাও স্থান পেয়েছে। এদিক থেকে এই পত্রিকাটি বিশিষ্ট। যে সব কবির কবিতা এতে স্থান পেয়েছে তাদের মধ্যে আছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, দিনেশ দাস, জীবনানন্দ দাস, অন্নদাশংকর রায়, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জগন্নাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কবিরুল ইসলাম, সুশীল রায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, মৃণাল বসুচৌধুরী, সাধনা মুখো-পাধ্যায়, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সৈয়দ আলী আহসান, নির্মলেন্দু গুণ, আলী মাহমুদ, দাউদ হায়দার, আনোয়ার পাশা, প্রভাকর মাচওয়ে, অমৃতা প্রীতম, ক্যায়ফি আজমী, প্রীতিশ নন্দী, গোপাল ভৌমিক, শান্তিকুমার ঘোষ, রবীন সুর এবং আরো অনেকে। মুদ্রিত কবিতাগুলি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে।

প্রাণের প্রদীপ (ত্রৈমাসিকপত্র, ১৯৭১)—সম্পাদক ঃ মদন চৌধুরী। আরামবাগ, (সদরঘাট), হুগলী। ৬০ পয়সা।

গল্প কবিতা প্রবন্ধ-আলোচনায় সমৃদ্ধ। মফস্বল থেকে প্রকাশিত, সাহিত্যপিপাসু-দের প্রশংসনীয় উদ্যম।

এবং নৈকট্য (সাহিত্য পত্রিকা)—সম্পাদক ঃ অচিন্ত্যকুমার সাঁতরা। ১২।১, হেমেন্দ্র-সেন স্ট্রীট, কলকাতা ঃ ৬। ৩০ পয়সা।

নবীন-প্রবীণদের নানা ধরনের রচনা নিয়ে সাময়িক সাহিত্যে প্রথম পদার্পণ করল।

(তৃতীয় খণ্ড)

(১)

সংসারে দুঃখের মতো শিক্ষক বুঝি আর নাই। দুর্ভাগ্য রত্নাকর দস্যুর মতো অতর্কিতে লাঠি মেরে ধরাশায়ী করে ফেলে। আর দুঃখ ষণ্ডমার্ক মুনি কানটি ধরে পাঠশালায় নিয়ে বসায়, তারপরে সুরু হয় দুঃখের জীর্ণ পাঠদান। পাঠশালা ছাড়বার অনেক পরে কানমলার স্মৃতি যত ম্লান হয়ে আসে উজ্জ্বলতর হয়ে দেখা দিতে থাকে দুঃখের রত্নগুলো। এ পাঠশালায় কারো চল্লিশ বছর কাটে কারো চারদিন। রাজপুত্র সিদ্ধার্থের চারদিনের পাঠেই তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয়েছিল। জরা এ পাঠশালায় ভর্তি হয়েছে বাসুদেবকে হত্যা করবার পরে। এই সেদিন মাত্র তার হাতেখড়ি, এখনো অনেক পাঠ বাকি।

জরায় সারাদিন এক রকম কাটে, দীর্ঘ রাত্রি আর কাটতে চায় না। যখন বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতো নিদ্রার সাধনা করতে হয়নি যথা সময়ে আপনি দেখা দিত, আজ বিলাসব্যসনের মধ্যে সাধ্যসাধনা করেও তার দেখা পাওয়া ভার। নিদ্রা কখনো সাধ্বী পত্নীর মতো স্বয়মাগতা, কখনো অভি-মানিনী উপপত্নীর মতো সাধনার অতীত। রাতে সুখশয্যায় এপাশ-ওপাশ করতে-করতে কত কথাই না মনে পড়ে। দিনেরবেলায় এসব বৃথা চিন্তা করবার অবসর তার কোথায়, সে আর এক জীবন, জরা তখন আর এক লোক।

জরার বর্তমান প্রভুর নাম সুমন্তরাজ, যে তাকে তক্ষশিলার ক্রীতদাসের বাজার থেকে কিনে এনেছিল। কখনো সকালের দিকে, কখনো দুপুরে আহারান্তে তিনি বেরিয়ে পড়েন জরাকে সঙ্গে নিয়ে। আগে সঙ্গে দশ-বারোজন অনুচর থাকতো, এখন একা জরাই যথেষ্ট বলেন সুমন্তরাজ। সুমন্তরাজের যোদ্ধৃবেশ, অস্ত্রের মধ্যে তূণীর ধনুক ও অসি। ঘোড়াটি তেজী আর শাদা, সুমন্তরাজের রঙটাও গৌর। জরার পোষাক-পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্র অনু-রূপ তবে তত মূল্যবান নয়। তার ঘোড়াটি মিশকালো, জরার গায়ের সঙ্গে বেশ মিলে যায়। যেদিন তিনি জরাকে মাত্র সঙ্গী করে বের হতে উদ্যত হলেন সভাসদরা বলল, মহারাজ একেবারে একাকী চললেন।

সুমন্তরাজ বললেন, একা কোথায়, সঙ্গে জরা আছে, একাই ও একশ।

নবাগত জরার প্রতি রাজঅনুগ্রহে হাড়ে চটে গেল, বটে, বেটা উড়ে এসে জুড়ে বসলো।

তারা দুজনে প্রাসাদের চত্বর থেকে বের হয়ে রাজপথে পড়ছে সেই সময়ে প্রাসাদের অলিন্দ থেকে রাজার সঙ্গে জরাকে দেখে রাণী সীমন্তনী নবাগতা পরিচারিকাকে শুধালেন, মহারাজার সঙ্গে ঐ লোকটা যেন নতুন, কে চিনিস নাকি।

নবাগতা কি বলা উচিত স্থির করতে না পেরে বলল, রাণীমা, আমি নতুন লোক, এখানকার সকলকে তো চিনি না।

সমীন্তনী বললেন, এখানকার সকলকেই তো চিনি, এখানকার লোক বলে তো মনে হয় না।

পরিচারিকা উত্তর না দেওয়ায় প্রসঙ্গটা আপাতত এখানেই শেষ হয়ে গেল। রাণী দেখতে পেলেন সানুচর সুমন্তরাজ নগরের উত্তর সিংহদ্বার দিয়ে বের হয়ে প্রাচীরের আড়ালে অন্তর্হিত হলেন।

সুমন্তরাজ একটা বড় রাজাগজা কিছু নয়। তবে সভাসদগণের কল্যাণে সকলেই রাজচক্রবর্তীর সম্রাট এবং সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর। সুমন্তরাজ আসলে একটি দুর্গাধিপতি। ঐ দুর্গের বাইরে তার রাজ্য বলে কিছু নেই; নেই আবার আছেও। তার ধনুর্নিক্ষিপ্ত তীর যতদূরে যায় তত দূর তার রাজ্যের সীমানা। সেই জন্যে জরার শরনিক্ষেপপটুতায় খুশি হয়ে তাকে অনেক দাম দিয়ে কিনে নিয়েছিলেন।

তক্ষশিলার উত্তরে ও পশ্চিমে পার্বত্য প্রদেশ। প্রত্যেক পাহাড়ের চূড়ায় দুর্গ ও দুর্গাধিপতি, তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই আছে। রাজকোষে অর্থাভাব দেখা দিলে পার্শ্ববর্তী দুর্গ আক্রমণ করে লুণ্ঠন করে নিয়ে আসা হয়—এই হচ্ছে তাদের রাজগীর রহস্য। সুমন্তরাজের মতো অন্যান্য দুর্গাধিপতিও বার হয়, প্রত্যেকে অপরের রন্ধ্র সন্ধান করে ফেরে। পাহাড়ের নীচে উপত্যকায় গম অড়হর প্রভৃতি শস্যের চাষ। চাষীরা ফসলের অর্ধাংশ রাজধানীতে এনে জমা করে দিয়ে যায়—অন্য রাজার আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার মূল্য স্বরূপ।

সুমন্তরাজ ও জরা দুজনে আগুপিছু চলছে, পথ পাহাড় কাটা, পাক খেয়ে খেয়ে নতুন নতুন দৃশ্য উদঘাটিত হচ্ছে, দূরে দূরে পাহাড়ের মাথায় মাঝে মাঝে প্রাচীরঘেরা নগর। জরা পাহাড় দেখেছে বটে, যেমন লাটু পাহাড়, যেমন রৈবতক পাহাড়, তবে সে-সব পাহাড়ে এখানকার পাহাড়ে অনেক প্রভেদ। তার দেখা ও দুটো পাহাড় যেন পৃথিবীর তোৎলা মুখের কথা, হঠাৎ এসে পড়ে আবার সমতল হয়ে গিয়েছে। আর এখানকার পাহাড় আদি-অন্তহীন, যতদূরে দেখা যায় তরঙ্গের পরে তরঙ্গ, অনুল্লঙ্ঘ্য-হীন দুর্ধর্ষ দুর্জয়, এ যেন গ্রীষ্মকালের দুপুরে, যেদিকেই তাকিয়ে দেখতে পাওয়া যায় না। পথে একটা মোড় ঘুরতেই অদূরে গিরিশিখরে একটা প্রাচীরঘেরা নগর, নগরটা যেন পাহাড়ের চূড়ায় ঝুলে রয়েছে, এদিককার সবগুলো নগরই এই রকম।

সুমন্তরাজ বলল, জরা, ঐ নগরটার নাম নরেন্দ্রনগর, এখানকার সুমন্ত [illegible]

নামে। ওখানকার রাজা নরেন্দ্ররাজ। আমার নামে আমার রাজধানী সুমন্তনগর।

জরা শুধায়, মহারাজ, (মনে মনে ভাবে কয়েকদিন আগেও লোকে তাকে মহারাজা বলতো এখন সে আবার অন্যকে ঐ নামে ডাকছে) ঐ নগরে কখনো গিয়েছেন!

যাইনি তবে অনেকদিন থেকে যাওয়ার ইচ্ছা আছে।

বাধা কি? শুধায় জরা।

সুমন্তরাজ বলে, নগরের সিংহদ্বার যথেষ্ট প্রশস্ত নয়।

বুঝতে পারে না জরা, অবাক হয়ে তাকায়।

বুঝতে পারলে না। নরেন্দ্রনগরের প্রাচীর ধূলিসাৎ করে দিলে তবে আমার প্রবেশের যোগ্য দ্বার তৈরি হবে।

জরা বোঝে যে রাজারা সাধারণ লোকের মত দরজা দিয়ে ঢোকে না, প্রাচীর ভেঙে ঢোকে।

সুমন্তরাজ বলে, নরেন্দ্রনারায়ণ সাক্ষাৎ কলি, এমন প্রজাপীড়ক রাজা কম দেখা যায়। দুর্যোধনের মতো বেটা হাঁটু ভেঙে পড়ে থাকে তবে উচিত সাজা হয়।

জরা বোঝে ইতিমধ্যেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাহিনী এই এতদূরে এসে পৌঁছেছে। বলে, তবে অন্য সমস্ত রাজা মিলে তাকে পরাস্ত করে না কেন?

মেলাবে কে বলো। কৌরবদের বিরুদ্ধে সমস্ত রাজন্যগণকে মিলিয়ে ছিলেন বাসুদেব, তিনি যদি দয়া করে দেখা দেন তবে উপায় হতে পারে।

অতর্কিতে সুগভীর খাদের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে জরা। বোঝে যে বাসুদেবের দেহান্তের সংবাদ এখনো এসে পৌঁছয়নি। জরা ভাবে কিছু বলা উচিত, কিন্তু কি বলতে কি বলবে হয়তো পা ফস্কে খাদে গিয়ে পড়বে।

তাকে কথা বলবার অবকাশ দেয় না সুমন্তরাজ বলে, এক একবার ভাবি আমার

মিত্র রাজাদের নিয়ে বাসুদেবের পায়ে গিয়ে পড়ি, বলি যে প্রভু, এখানে এসে আর একটা কুরুক্ষেত্র ঘটিয়ে দুরাত্মাদের দণ্ড দাও।

এ কি নরকযন্ত্রণা জরার!

হাঁ হে, তুমি তো সেদিন বলেছিলে যে তোমার বাড়ী দ্বারকার দিকে।

জেরার মুখে জরা বলেছিল বটে, বলবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু আর কোন দেশের নাম না জানায় ঐ নামটাই উচ্চারণ করে ফেলেছিল।

কখনো দেখেছ মহাপুরুষকে।

এমন লোককে এমন প্রশ্ন। জরা বলে, মহারাজ, আমরা সামান্য লোক।

আরে, সামান্যদের মিলিয়ে পাক দিয়ে রজ্জু তৈরি করাই তো অসামান্যের কাজ। অনেকদিন থেকে ইচ্ছা আছে একবার তাঁকে দর্শন করবার। ভালই হল, তুমি এসেছ এবারে তোমাকে পথপ্রদর্শক করে ওখানে যাবো। কি হে, সঙ্গে যাবে তো, দুজনেরই ভগবদ্দর্শন হবে। ঐ দেখো দেখো

এই বলে অনূর্ধ্ব আকাশে উড্ডীয়মান একটা পাখির দিকে ইঙ্গিত করলো।

দেখেছ?

জরা বেঁচে গেল শোচনীয় প্রসঙ্গ থেকে, বলল, হাঁ মহারাজ।

ওটাকে মেরে নামাতে পারো।

ওটা তো কারো পোষা পায়রা বলে হচ্ছে।

পোষা যদি হয় তবে নরেন্দ্রনগরেরই হবে, হয়তো বা স্বয়ং নরেন্দ্রনারায়ণেরই। চমৎকার, মারো।

কিন্তু মহারাজ, ওটা উড়ছে ঠিক নগরের উপরে, পড়লে পড়বে নগরের মধ্যে।

সে তো আরও চমৎকার হবে। একেবারে রাজার কোলের উপর ফেলাতে পারো তবে তো বুঝি। পাষণ্ডটা গতবারে আমার প্রজাদের একশ বিঘা গম কেটে নিয়ে গিয়েছিল। তুমি ভাবছ আমি থাকতে এমন হল কি করে? আরে আমি থাকলে কি পারতো। আমি গিয়েছিলাম গান্ধার রাজ্যের পাহাড়ে শিকারে। ফিরে এসে দেখি নগরের বাজারে প্রজারা মাথা চাপড়ে কাঁদছে। নাও, নামিয়ে ফেলো পাখিটাকে।

জরা তাক করে তীর ছুঁড়লো, পাখিটা পেটে বিদ্ধ হয়ে ছোট এক টুকরো পাথরের মতো পড়লো নগরের মধ্যে।

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রাজবাড়ীর প্রশস্ত আঙিনায় পোষা পায়রাগুলোকে গমের দানা ছড়িয়ে দিয়ে খাওয়াচ্ছিলেন। এমন সময়ে বিদ্ধশর পায়রাটা এসে পড়লো একেবারে তার পায়ের কাছে। নরেন্দ্রনারায়ণ চমকে উঠল। তারপরে চমকের ভাব কাটলে বলে উঠল, একি, এ যে আমার পোষা পায়রা! মারলো কে?

সভাসদরা অনেকেই বলে উঠলো, তাই তো কার এমন সাহস যে মহারাজার পোষা পায়রার গায়ে হাত তোলে।

কেউ বলল, এ অমার্জনীয় অপরাধ।

কেউ বলল, কার ঘাড়ে কটা মাথা।

কেউ কেউ বলল, এর বিহিত ব্যবস্থা না হলে দেশে টেকা ভার হবে, আজ পায়রা গেল কালকে মানুষের মাথা যেতে কতক্ষণ।

সেনাপতির তলব পড়লো। সে এসে নিরীক্ষণ করে বলল, মহারাজ, এ পাকা তীরন্দাজের কাজ। এ অঞ্চলে এমন তীরন্দাজ আছে বলে আমার জানা নেই।

রাজা ইসারায় সুমন্তনগর দেখিয়ে বলল, ওদিকে?

আগে তো ছিল না, তবে যদি নতুন এসে থাকে।

সভাসদে ও সেনাপতিতে বিবাদ চিরন্তন। সেনাপতির কথা শুনে একজন সভাসদ বলে উঠল, একি গাছ নাকি যে রাতারাতি গজিয়ে উঠবে।

সভাসদের মাথার দিকে তাকিয়ে সেনাপতি বলল, তেমন তেমন সার পেলে রাতারাতি গজায় বইকি।

তারপরে রাজার দিকে তাকিয়ে বলল, মহারাজ, সুমন্তপুরের সৈন্যদের বিদ্যার দৌড় জানা আছে—বসে আছে এমন পাখী মারতে পারে না, আর এ তো উড়ন্ত পাখী, তাও আবার মেরেছে বহুদূর থেকে।

তবে হঠাৎ এমন তীরন্দাজ এলো কোথা থেকে।

আমার মনে হয় তক্ষশিলায় বাজার থেকে নতুন কোন লোক কিনে আনা হয়েছে।

আমিও তো সেদিন দুটোকে কিনে এনেছি, ডাকো তাদের।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজন ক্রীতদাস এসে দাঁড়ায়। নরেন্দ্রনারায়ণ তাদের দেখে বলে ওঠে, বাঃ একেবারে যুগল মূর্তি। তা নাম কি গো? কানাই-বলাই না কৃষ্ণার্জুন?

ওদের মধ্যে একজন বলে, আজ্ঞে আমার নাম নরক ওর নাম অসুর।

বাঃ বাঃ দুয়ে মিলে নরকাসুর, একেবারে দ্বন্দ্বসমাস। তা নাম দুটি কি বাপ-মায়ে রেখেছিল না পথে কুড়িয়ে পেয়েছিলে?

অসুর বলে, মহারাজ, একরকম তাই।

আচ্ছা, তোমাদের নামের ইতিহাসে আমার প্রয়োজন নাই। কি কাজ করছ এখানে?

আজ্ঞে পাহাড়ের নীচে থেকে পাথর কেটে মাথায় করে গড়ের মধ্যে নিয়ে আসি।

বেশ, তা খেতে দেয় তো। এরা আবার ঘোরতর চোর, আমার ঘোড়ার দানা চুরি করে খেয়ে খেয়ে দেখো না এক-একজন কেমন ফুলে উঠেছে—এই বলে তাকালো সভাসদদের দিকে।

এবারে নরক মুখ খুলল, বলল, মহারাজ, মানুষে ঘোড়ায় মিলে গড়ে ওজন ঠিক আছে।

বেশ বলেছ। তোমার নাম নরক নয়। তা এই নারকীয় উক্তিটি মনে রাখবার মতো। এবারে কাজের কথায় আসা যাক—ঐ পাখীটা দেখছ!

দুজনে এক সঙ্গে বলল, পাখীর পেটে তীর বেঁধে রয়েছে।

ঐ তীরটার কথাই জিজ্ঞাসা করছি। উড়ন্ত পাখীকে তীর মেরে নামাতে পারে এমন কেউ আমার সৈন্যদলে নাই। আমার

একটা পাঁঠা বেঁধে দিলেও তারা মারতে পারে না। সুমন্তরাজের সৈন্যদলের বিদ্যার দৌড়টাও আমার জানা আছে। এখন কথা হচ্ছে ওখানে এমন কেউ নতুন লোক এসেছে যে এই কাণ্ডটি করেছে। তক্ষশিলার বাজার থেকে যেদিন তোমাদের কিনে আনি সুমন্ত-রাজও সেখানে গিয়েছিল। আদৌ কিনেছিল কিনা, কটাকে কিনেছিল জানি না। তোমরা তো এক বাজারেই এসেছিলে বলতে পারো কিছু।

নরক ও অসুর দুজনের মধ্যে নীচু স্বরে স্বগতোক্তি করে নিয়ে বলল, মহারাজ, যদি ছুটি দেন তবে ওখানে গিয়ে খোঁজ-খবর করতে পারি। মনে হচ্ছে এ চেনা লোকের কাণ্ড।

নরেন্দ্রনারায়ণ তাদের কথা শুনে হেসে উঠে বলল, তোমরা আমাকে কত বড় গর্দভ ঠাউরেছ। ছুটি দি আর তোমরা ছুটে চলে যাও দেশের দিকে।

নরক বলল, মহারাজ, আর যেদিকেই ছুটে যাই দেশের দিকে কখনো যাবো না।

কেন বাপু, ধনেখারাপি করেছ নাকি।

সেটা তো সামান্য কথা মহারাজ, মোটে দু-চারটি, আর কিছু করতে পারলে লোকে বীরপুরুষ বলতো। তা নয় আমাদের দেশ আগাগোড়া সমুদ্রের জলে ডুবে গিয়েছে।

আপদ গিয়েছে। এখন বলো, তীর যে মেরেছে তাকে চিনতে পারলে কিনা।

মহারাজ, সুমন্তপুরের রাজা জরা বলে একটা লোককে কিনেছিল এ তার কাণ্ড মনে হয়। তীর-ধনুকে তার মতো হাতসই আর কারো দেখিনি।

এবারে নরেন্দ্রনারায়ণ সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বলল, দেখলে আমার অনুমান সত্য কিনা।

সেনাপতি এক সময় সভাসদ ছিল, বলল, মহারাজের অনুমান কবে মিথ্যা হয়েছে।

যাও তুমি সৈন্যদের তৈরী করে নাও। সুমন্তপুরের গড়ের একখানি পাথর আস্ত রাখবো না। এতবড় আস্পর্ধা, আমার পোষা পাখী হত্যা, আবার তাও কিনা পড়লো একেবারে আমার সম্মুখে। কূট-বুদ্ধিতে এ যে শকুনিকে ছাড়িয়ে যায়—তার মতোই অবস্থা হবে। যাও। আর দেখো, এ দুটো যেন না পালায়। এরা আস্ত বাস্তুঘুঘু, সুযোগ পেলেই পালাবে, একটু নজর রেখো।

এই বলে পাখীটাকে হাতে নিয়ে বিষম মনে দাঁড়িয়ে রইলো। নরেন্দ্রনারায়ণের পাখী-প্রীতি সত্যই অনুকরণযোগ্য আদর্শ; একটা পাখীর মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য শত শত মানুষ মেরে ফেলতে কুণ্ঠা বোধ করে না। বুনো পায়রা হলে অবশ্য আপত্তি ছিল না, তীর-ধনুকের লক্ষ্যরূপেই তো বিধাতা ওদের সৃষ্টি করেছেন।

॥ ২ ॥

দুঃখের পাঠশালার পণ্ডিতমশাই মাঝে-মাঝে দুপুরের খাওয়ার ঘুমে ঢুলে পড়েন, লম্বা বেতগাছা তাঁর হাত থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে যায় তখন পোড়োদের মহা স্ফূর্তি; চুপিসাড়ে সকলে বাইরে গিয়ে আমবাগানে হুটোপাটি সুরু করে দেয়। আবার কখনো কখনো বা আসে দীর্ঘ নাতিদীর্ঘ অন-ধ্যায়ের পালা, তখন স্ফূর্তিটা এমন একটানা হয় পাঠশালার ভীতিকর অভিজ্ঞতাকে নিতান্ত মায়া বলে মনে হয়, মনে হয় এই আনন্দ-টাই বুঝি ছাত্রজীবনের নিত্যরূপ।

জরার এখন সেই অবস্থা চলছে। বাসুদেবকে শরাহত করার পরেই আরম্ভ হয়েছিল দুঃখের পাঠশালার জীবন; গুরু-মশায় চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল অন্য সব পোড়োদের সঙ্গে। জরা ভেবেছিল জীবনটা এইভাবেই যাবে। এমন সময়ে অভাবিতের ইঙ্গিতে এলো অন-ধ্যায়ের কাল, রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলো। অশনে-বসনে-ব্যসনে যখন সে রাজানুগৃহীত হয়ে উঠলো স্বভাবতই মনে করলো পাঠশালা, গুরুমশায়, পাঠশালার অভিজ্ঞতা একটা ক্ষণিক দুঃস্বপ্ন। সেই সঙ্গে আরও একটা পরিবর্তন ঘটলো। খট্যাসের উপদেশ ও মন্তব্য হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল তার মনে। কী এমন অপরাধ করেছে সে বাসুদেবকে হত্যা করে। ধরো বাসুদেব যদি সত্যই দেবতা হন (তা কখনোই সম্ভব নয়। মানুষ আবার দেবতা হবে কি করে?) তাতেই বা ক্ষতি কি! যদুবংশ ধ্বংসে তিনিও তো যোগ দিয়ে-ছিলেন, অনেক যাদব বীরকে স্বহস্তে বধ করেছেন, তাতে যদি দোষ না হয়ে থাকে তবে জরার ক্ষেত্রেই বা দোষ হবে কেন? এইভাবেই যদি যদুবংশের নাশ বিধিলিপি হয় তবে সে-ও না কোন বিধিনির্দিষ্ট কাজ করেছে। সে নিজেও তো যাদব, বাসুদেবের বৈমাত্র-ভাই। বরঞ্চ এতদিন যে একটা দুঃখের বিভ্রান্তির মধ্যে থেকে অকারণে পীড়িত হয়েছে সে কথা মনে হতেই সে হাসলো, হাসিটা বোধকরি একটু সশব্দে হয়ে থাকবে।

অত হাসি হচ্ছে কেন? হাসবার এমন কি পেলে?

চমকে ওঠে জরা। ঘর অন্ধকার, কাউকে দেখতে পায় না, ভয়ে ভয়ে শুধোয়, তুমি কে?

অত জোরে কথা বলো না। এখন আর কি চিনতে পারবে, এখন রাজার পেয়ারের লোক। একদিন ছিল যখন দরজা খুলে দিতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হলে রাগ করে ফিরে চলে যেতে।

চেনা-চেনা গলা তবু বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না জরার, সে যে অনেক দূরের মানুষ। এখানে আসবে কি করে?

জরা বলে, দাঁড়াও বাতিটা জ্বালি।

অমন কাজটি করো না, দুজনেই মরবো তাহলে।

অন্ধকার ঘর, অনেক রাত, একটা ঘুল-ঘুলি দিয়ে গোটা দুই তারা উঁকি মারছে, যে শীতল বাতাস ভোরের নিশানা দেয় এখনো তা জাগেনি।

তুমি যে-ই হও এত রাতে এলে কেন?

দিনে আসবার উপায় থাকলে দিনেই আসতাম, আর তাছাড়া কি জানো, কোন কোন লোক আছে রাতেই যাদের যাতায়াত।

সে তো চোর, বলে জরা।

কেন মনোচোর হ'তে বাধা কি?

হঠাৎ সম্বিৎ হয় জরার, বলে ওঠে, ওহো বুঝেছি মদিরা।

তবু ভালো যে কাউকে দিয়ে সনাক্ত করাতে হয় নি। হাঁ মদিরাই বটে।

তুমি এখানে এলে কেমন করে?

তুমি যে-ভাবে এসেছ, বলে মদিরা। আমাকে তো তক্ষশিলার রাজার থেকে কিনে এনেছে।

তবে আমাকেও তাই।

জরা বলে, গোড়া থেকে খুলে বলো।

এতই যদি আগ্রহ তবে শোনো। এই বলে আরম্ভ করে মদিরা। এখানে মনে করিয়ে দেওয়া আবশ্যক যে মদিরা যাদব রাজ-ধানীর বারাঙ্গনা পল্লীর সেই মেয়েমানুষ বাসুদেবকে হত্যার পরে যার ঘরে গিয়ে

জরা আশ্রয় নিয়েছিল আর জরাকে নারী-বেশ পরিয়ে বনের দিকে পালাতে পরামর্শ দিয়েছিল যে মেয়েটি।

মদিরা বলে, বড় বাহিন এসে বলল, যদুবংশীয়েরা ইন্দ্রপ্রস্থ যাত্রা করলেই সমস্ত রাজধানী সমুদ্রের জলে ডুবে যাবে। শুনে আমরা তো ভয়ে মরি। যাদের গাঁয়ে বাড়ী-ঘর ছিল তারা সেখানে চলে গেল। আমাদের কয়েকজনের ও বালাই অনেকদিন নাই—বড় বাহিনেরও ছিলনা। তার পরামর্শ অনুসারে স্থির করলাম যে আমরা যদুবংশীয়দের সঙ্গে যাত্রা করবো, তারপরে যা থাকে কপালে।

তারপরে নিজের মনেই বলে ওঠে, সেটা ঠিক জরাকে নয়, কপালে এতও ছিল।

তারপরে কি হল বলো।

তারপরে তো জানই, মারামারি কাটা-কাটি। যদুবংশের মেয়েদের অনেককে লুটে নিয়ে গেল ডাকাতে। আমাকেও হাত ধরে টেনেছিল, পালিয়ে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে লুকোলাম। ভোরের আলো হতেই দেখি ওমা সেই ঝোপটার আড়ালেই আমাদের মল্লিকা আর রাজ-বাড়ীর বউ রত্না ম'রে পড়ে রয়েছে।

কে মারলো তাদের।

নিজেরাই মারামারি করে মরেছে।

হঠাৎ!

হঠাৎ নয়, কারণ আছে সে না হয় পরে শুনো। তারপরে দিনের বেলায় একদল ঘোড়-সোয়ার এসে চোরের উপরে বাট-পাড়ি করে আমাদের কেড়ে নিয়ে চলল। কয়েকদিন পরে এলাম তক্ষশিলার বাজারে। সুমন্তরাজ কিনে নিয়ে এসে রাণীমাকে উপহার দিলেন। তাই না বলে উঠেছিলাম এতও ছিল কপালে। কিন্তু জরা, তুমি এখানে আসলে কেমন করে?

রাজধানী ডুবে যাওয়ার পরে আমরা যদুবংশীয়দের পিছনে পিছনে রওনা হয়েছিলাম।

তোমরা বলতে কারা?

আমরা অনেকে তাদের তুমি চিনবে না, তবে আমরা সকলেই খট্যাস সর্দারের দল।

কি সর্বনাশ, তুমি কি খট্যাসের হাতে পড়েছ নাকি?

পড়েছিলাম, তবে এখন তো এখান-কার মহারাজার অনুচর।

জরা, এইমাত্র আমার কপালের কথা তুলেছিলাম এখন ভাবছি তোমার মতো কপাল যেন পরমশত্রুরও না হয়।

কেন?

কেন! দফায় দফায় শুনতে চাও! স্বয়ং ভগবান বাসুদেবকে হত্যা করলে; তারপরে স্বয়ং কাল খট্যাসের দলে ভিড়লে; এখন আবার পড়েছ সুমন্ত-রাজের কবলে।

কেন মদিরা, মহারাজ তো আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন।

আরে তাতেই তো মরেছ। জরা, তোমার সম্মুখে আসন্ন বিপদ, সেই কথা জানা-তেই আজ গোপনে এসেছি।

বিপদ কেন হ'তে যাবে। ক'দিন আগে মহারাজাকে খুব খুশী করে দিয়েছি। নরেন্দ্রনগরের রাজার একটা পোষা পায়রা উড়ছিল সেটাকে মেরে নামিয়ে দিয়েছি নরেন্দ্রনগরের মধ্যে।

মদিরা বলে ওঠে, তবে তো বিপদের সংখ্যা আরও বাড়িয়েছ দেখছি। যাই হোক, সে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হবে উলুখড় তো মরবার জন্যেই আছে সে কথা আর নূতন করে কি ভাববো।

তবে আর কি বিপদ?

বিপদ একটা নয়, দুই দিক থেকে।

কিছুই তো বুঝতে পারছি না মদিরা।

কোনদিন কী বুঝতে পেরেছ। একে আলাভোলা মানুষ তায় মদ-ভাঙে ভোর। চোখ-কান খোলা থাকলে দেরী হতো না।

যদি তা জানো তবে খুলে বলো না কেন?

তবে শোন, তুমি একই সঙ্গে মহা-রাজার পারিষদদের চোখে এবং স্বয়ং মহা-রাণীর চোখে পড়েছ।

জরা বলে ওঠে, এই কথা! তবে শোনো, মহারাজার পারিষদদের কাউকে চিনি না আর মহারাণীকে চক্ষেও দেখিনি।

তুমি না দেখো তিনি দেখেছেন।

কি করে দেখেছেন।

তুমি সদা সর্বদা মহারাজার সঙ্গে ঘুরছ, শিকারে বের হচ্ছ, রাজ্যের সবাই দেখছে আর মহারাণী দেখবেন না!

বেশ তো দেখলেন, ক্ষতি কি।

হতাশ হয়ে মদিরা বলে ওঠে, এই বোকা মানুষটাকে নিয়ে আমি কি করবো। চোখে দেখা আর চোখে পড়ায় তফাৎ জানে না।

আরে আমিও তো তাই ভাবছি, চোখে না পড়লে আর চোখে দেখবে কি ক'রে?

নাঃ এমন বোকাও তো দেখিনি।

এবার জরা বলল, আচ্ছা ওটা না হয় পরে বুঝবো। পরিষদদের ব্যাপারটা আগে বুঝিয়ে দাও।

সেটা তেমন জটিল নয়, তোমার প্রতি মহারাজের অনুগ্রহ দেখে তারা তোমার উপর হাড়ে চটে গিয়েছে। তোমাকে খুন করবার মতলব করছে।

তুমি জানলে কি ক'রে?

চোখ-কান খোলা রেখে চললে অনেককিছুই জানতে পারা যায়। বিশেষ তারা তো জানে না তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, সহজেই অনেক কথার টুকরো আমার কানে ভেসে আসে।

পরিষদদের মনের কথা তো বুঝলাম, মহারাণীও কি খুন করতে চান না কি?

না, তিনি যা করতে চান জানতে পারলে মহারাজা তোমাকে খুন করবেন।

জরা বলে উঠল, এতক্ষণে বুঝলাম।

তবু ভালো যে মুখের কথাতেই বুঝেছ, হাতে কলমে বুঝিয়ে দেওয়ার দর-কার হয় নি।

জরা মদিরাকে টেনে কোলের মধ্যে নিল।

মদিরা বলল, এখন তুমি মহারাণীর পেয়ারের লোক, আমার মতো দাসী-বাঁদীতে কি আর মন ভরবে।

সোনার পাত্রেই হোক আর মাটির ভাঁড়েই হোক মদ সমান নেশা ধরায়।

আরে জরার মুখেও যে কথা ফুটেছে, বলে মদিরা চুমো খায় তার গালে।

বিদায় নেবার সময়ে মদিরা বলে, যা বলছি মনে রেখো, তোমার আমার যে পরিচয় আছে যেন প্রকাশ না পায় তাতে দুজনেরই বিপদ। এখন আমি মহারাণীর বিশ্বাসভাজন অনুচরী, এর পরে হয়তো তাঁর দূতী হ'য়ে আসতে হবে, পুরানো লোককে দিয়ে সব সময়ে এসব কাজ হয় না। চোখ-কান খুলে রাখবে। নাও এখন ঘুমোও —এই বলে তার গালে চুমো খেয়ে বিদায় হয়ে যায়।

জরার ঘুম আসে না। (ক্রমশঃ)

বাঙালী জাতি ভোজন-বিলাসী বলে তার একটা সুনাম বা দুর্নাম ছিল, এখনো আছে। আমাদের দেশে কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে যেখানে বহুজন নিমন্ত্রিত হতেন সেখানে ভূরিভোজী ব্যক্তির একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা ছিল। এ যুগে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে সে মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু একেবারে লুপ্ত হয়নি। মনস্বী এরিস্টটল মানুষের সংজ্ঞা দিয়েছেন

Man is rational animal

অর্থাৎ মানুষ বুদ্ধিসম্পন্ন জীব। এ যুগে এরিস্টটলের সংজ্ঞাটি ভিন্ন অর্থে সত্য। এই সংজ্ঞার অর্থ হচ্ছে—

Man is an animal that lives on ration.

অর্থাৎ, মানুষ হচ্ছে একমাত্র জীব যার খাদ্যের পরিমাণ সরকারী ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দেখা যায়, এরিস্টটলের অদ্ভুত দিব্যদৃষ্টি ছিল। তাঁর জন্মের প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে, সব মানুষ rational বা বুদ্ধিসম্পন্ন কি না, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও সকলেরই যে খাদ্য-পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হবে রাষ্ট্রের দ্বারা, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এখন নিমন্ত্রণাদিতেও অভ্যাগত, অনাহূত, রবাহূত কারোই ভূরিভোজনের তেমন সুযোগ হয় না।

বাঙালী যে ভোজন-রসিক, তার প্রমাণ রয়েছে তার সাহিত্যে। এ সাহিত্য চর্যাপদ থেকে আরম্ভ করে অন্তত ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও কারো কারো রচনায় বাঙালীর এই রসনা-লোলুপতার নিদর্শন মেলে। কমলাকান্তের ভাষায় বলতে হয়, কাব্য-রসে ও গব্যরসে বাঙালীর সমান আসক্তি। এই প্রসঙ্গে তার দু' একটি চলতি বুলি যেমন—'চক্ষু ছানাবড়া' লক্ষ্যণীয়। মনীষী চন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'সংযম-শিক্ষা' গ্রন্থে 'আহারে সংযম-শিক্ষা' নামক প্রবন্ধে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র থেকে দুটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মুকুন্দরামের কাব্য রচিত হয়েছিল ষোড়শ শতকে, আর ভারতচন্দ্রের কাব্য রচিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতকে। লেখক দেখিয়েছেন, মুকুন্দরাম 'খুল্লনার রন্ধনের' যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে আহার্য দ্রব্যের প্রাচুর্য আছে কিন্তু আহারে বিলাসিতার তেমন নিদর্শন নেই। ভারতচন্দ্রের সময়ে বাঙালীর রন্ধনশালায় মোগল যুগের 'পোলাও-কোর্মা-কোপ্তা-কাবাব' প্রবেশ করেছে, তাই 'মজুমদার-পত্নীর রন্ধনে' শুধু আহার্যের উপকরণ-বাহুল্যই নয়, বিলাসিতারও প্রমাণ আছে। ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

'বাচার করিয়া ঝোল, খয়রার ভাজা।
অমৃতে অধিক বলে অমৃতের রাজা।।
বড়া কিছু, সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম।
গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম'।।
'মাছের ডিমের বড়া, মৃতে দেয় ডাক'।।
প্রভৃতি

বাংলা সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই জানেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিতকার তাঁর ভোজন-বিলাসের বর্ণনা দিতে কোনো কার্পণ্য করেন নি। ঈশ্বর গুপ্তের 'তপসে মাছ', 'পাঁটা', 'আনারস' প্রভৃতি কবিতার হাস্যরস সেকালের বাঙালীর ন্যায় এ কালের বাঙালীরও উপভোগ্য। একালের কান্ত-কবি রজনীকান্ত সেনের 'ঔদরিক' কবিতাটি ('যদি কুমড়োর মত চালে ধরে রোতো পানতুয়া শত শত' ইত্যাদি) যখন কীর্তনের সুরে গান করা হয়, তখন ভোজন-রসিক বাঙালী কিছু কালের জন্যে যেন পুত্র-শোকও ভুলে যায়।

কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের দৃষ্টিতে 'রান্নার জগৎ' ও 'কাব্যের জগৎ' ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। রন্ধনশালায় যার অনুপ্রবেশ ঘটে, কাব্যের জগতে তা হয় অপাংক্তেয়,—এটাই ছিল ভারতের প্রাচীন কবিদের এবং আধুনিক কালের বিশ্ব-বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস। তাই বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতীয় ভোজন-বিলাসের কোনো নিদর্শন নেই। এমন কি, পৃথিবীর বৃহত্তম মহাকাব্য মহাভারতের রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাসও দ্রৌপদীর রন্ধনের কোনো বিশদ বিবরণ দেননি। এখন প্রশ্ন এই : ভারতের যে সমস্ত কবি আদিরসের সৃষ্টিতে কোনো কার্পণ্যই করেন নি, তাঁরা চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি নানাবিধ আহার্য ও পানীয়ের বর্ণনা দিতে কুণ্ঠিত হলেন কেন? আমার মনে হয়, এর একটা গূঢ় কারণ আছে। আমরা যাকে কাম বা প্রাকৃত রতি বলি, তা শুধু দেহের সীমার ভেতরেই বদ্ধ নয়, শিল্পীর সৌন্দর্যসৃষ্টির ও কবির কাব্যসাধনার উৎস হচ্ছে এই কাম, শুধু তাই নয়, এই কামের যখন ঊর্ধ্বগতি হয়, তখন তা ভগবৎপ্রেমে বা 'অপ্রাকৃত রসের আস্বাদনে' পরিণতি লাভ করতে পারে। কিন্তু রসনা-লোলুপতাকে কখনো ঊর্ধ্বমুখী করা যায় না। বৃদ্ধ বয়সে অনেক সময় প্রাকৃতিক কারণেই মানুষের 'কাম' হীনবল হয়ে পড়ে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রসনা-লোলুপতা হ্রাস পায় না, বরঞ্চ বার্ধক্যে অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ ও শ্রুতিশক্তি দুর্বল হলেও ভোজনের লালসা বেড়েই যায়। প্রাকৃতিক কারণেই বৃদ্ধদের ভেতর তিনটি দোষ প্রকট হয়—বাচালতা, অসহিষ্ণুতা ও রসনালোলুপতা। আবার কোনো কোনো বৃদ্ধ মিতাহারী, কিন্তু তাঁরা যৌবনের নিজেদের দিনগুলোর কথা বিস্মৃত হয়ে তরুণদেরও স্বল্পাহারের পরামর্শ দেন। এই জন্যে প্রাচীন নীতি-শাস্ত্রকারের উপদেশ হচ্ছে—সব বিষয়ে বৃদ্ধের বচন মান্য করবে, কিন্তু ভোজনের ক্ষেত্রে নয়।

পৃথিবীতে যাঁরা মনস্বী বলে খ্যাত হয়েছেন, তাঁদের ভেতরেও বহুভোজীর সংখ্যা নিতান্ত বিরল নয়। রাজা রামমোহন সম্পর্কে এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, তিনি প্রতিদিন বারো সের নির্জলা দুগ্ধ পান করতেন, আর একটা মাঝারি রকমের পাঁটার মাংস একা খেতে পারতেন। বাংলার অন্যতম বরেণ্য পুরুষ স্যর আশুতোষের ভোজন-বিলাসের কথা এখনো অনেকের স্মৃতি থেকে লুপ্ত হয়নি। জার্মান দার্শনিক মানব-বিদ্বেষী সোপেন হাওয়ার ভূরিভোজন করতেন। তিনি নাকি একদিন হোটেলে বসে খাচ্ছিলেন, আর এক ব্যক্তি তাঁর আহারের প্রাচুর্য দেখে অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়েছিলেন। তখন ক্ষুব্ধ সোপেন-হাওয়ার বলে উঠলেন—'মূর্খ, যদি তুমি মনে করো, আমি তোমার চাইতে আটগুণ বেশী আহার্য গ্রহণ করি, তা হলে একথাও জেনে রেখো যে, আমার মেধাশক্তিও তোমার চাইতে আটগুণ প্রখর।'

শোনা যায়, এককালে পূর্ববঙ্গে কৈলাস নামে এক বহুভোজী ব্যক্তি ছিলেন। আধমণ চালের অন্ন একাই আত্মসাৎ করে তিনি 'আধমণী কৈলাস' নামে খ্যাত হয়েছিলেন। আহারের মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ানো যায়, আবার কমানোও যায়, মানুষ তার অভিজ্ঞতা থেকে এই সত্য আবিষ্কার করেছে। 'আহার' কথাটির অর্থ অবশ্য খুব ব্যাপক, আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা আহরণ করি, তার নাম আহার। কাজেই আহার বলতে বোঝায় রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ। আবার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই আমরা ভোজন করে থাকি। আমরা যখন অপরের ভোজন দর্শন করি বা উৎসব উপলক্ষ্যে যখন

আমরা অতিথি-অভ্যাগতের মধ্যে নানা ভোজ্য পরিবেশন করি এবং 'ভুজ্যতাং দীয়তাং' ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হয়, তখন আমরা দৃষ্টির দ্বারা ভোজন করি। যখন আমরা কারো কাছে নানা সুস্বাদু ও উপাদেয় ভোজ্যদ্রব্যের বর্ণনা শুনি বা রসনার রুচিকর বিচিত্র চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় সামগ্রী আমাদের আলোচনার বিষয় হয়, তখন আমরা কর্ণের দ্বারা ভোজন করি। আবার ঘ্রাণের দ্বারা পূর্ণ ভোজন না হলেও অর্ধ ভোজন যে হয়ে থাকে, সে কথা সকলেরই জানা আছে। আমরা রসনায় সাহায্যে মধুর, অম্ল, লবণ প্রভৃতি রসের আস্বাদন করে থাকি। আবার শুধু স্পর্শের দ্বারাও যে ভোজন-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়ে থাকে, সে কথা যাঁরা মিষ্টান্ন তৈয়ার করেন বা নিমন্ত্রণাদিতে খাদ্য দ্রব্য পরিবেশন করেন, তাঁরা ভালো ভাবেই জানেন।

শাস্ত্রে ভূরিভোজীদের অশেষ দোষ কীর্তিত হলেও তাদের ভেতর বহু ক্ষেত্রে একটি গুণ লক্ষ্য করা যায়। যাঁরা ভূরিভোজী তাঁরা যেমন খেতে ভালোবাসেন, তেমনি অপরকে খাওয়াতেও ভালবাসেন। যারা কৃপণ, তারা যেমন নিজেকে সুষম খাদ্য থেকে বা নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী থেকে বঞ্চিত করে, তেমনি আত্মীয়স্বজন অতিথি-অভ্যাগতকেও বঞ্চিত করে। আমি এমন ব্যক্তির কথা জানি যিনি যৌবনে ছিলেন ভোজন-বিলাসী, কিন্তু পরিণত

বয়সে রোগজীর্ণ দেহে রসনাকে সংযত করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই অবস্থায় তিনি আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবকে ভূরিভোজনের দ্বারা আপ্যায়িত করে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করতেন।

ভূরিভোজীরা প্রায়ই নিমন্ত্রণ-প্রিয় হয়ে থাকেন। যিনি নিমন্ত্রণে প্রচুর ভোজন করান, তাঁর প্রশংসা-গানে জনসাধারণ মুখরিত হয়ে ওঠে। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে—

'Fools give feasts, wise men take them'

মূর্খেরা ভোজের আয়োজন করে আর বুদ্ধিমানেরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে। এর অনুরূপ কোনো প্রবাদ বাংলা ভাষায় নেই। কারণ, এ ধরনের চিন্তা বাঙালীর ঐতিহ্য-বিরোধী। তবে বাংলায় একটি প্রবচন প্রচলিত আছে—'ঠগের বাড়ীর নেমন্তন্ন, না আঁচালে বিশ্বাস নেই।'

বাংলার ঐতিহ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি অকৃপণ, ক্ষিপ্রকারী ও ভোজনকর্তার অভিপ্রায়-জ্ঞানে নিপুণ, তিনিই ভালো পরিবেশনকর্তা হতে পারেন। পরিবেশনের বিধি হচ্ছে—

'হাঁ হাঁ দদ্যাৎ হুঁ হুঁ দদ্যাৎ দদ্যাচ্চ করতাড়নে।
শিরসশ্চালনে দদ্যাৎ ন দদ্যাৎ ব্যাঘ্র-ঝম্ফনে

যে 'হাঁ হাঁ' করে বা যে 'হুঁ হুঁ' করে, যে হাত নেড়ে নিষেধ করে, যে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়, এদের সবাইকে খাদ্য পরিবেশন করবে, শুধু যে ব্যক্তি ব্যাঘ্রের মতো ঝম্ফ প্রদান করে, তাকে ভোজ্য দ্রব্য পরিবেশন করবে না।

সকলেই জানেন, লজ্জা শুধু নারীর ভূষণ নয়, পুরুষেরও ভূষণ। কিন্তু ভোজনকালে লজ্জা মানুষের পক্ষে ভূষণ না হয়ে দূষণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই শাস্ত্রকর্তা বলছেন, খেতে বসে কখনো লজ্জা করবে না। ভূরিভোজীরা কখনো এই শাস্ত্রবচন লঙ্ঘন করেন না। তাঁরা জানেন, যারা নিজেকে স্বল্পাহারী ও সভ্য বলে প্রতিপন্ন করতে চায়, তাদের মতো মূর্খ আর নেই।

একজন ভূরিভোজী মানুষকে একাদশীর উপবাস করতে দেখেছি। উপবাস অর্থাৎ খাদ্য-তালিকার পরিবর্তন, যেমন —এক দিস্তা লুচি; এক সের সন্দেশ, এক সের রসগোল্লা, প্রচুর পরিমাণে ক্ষীর, দধি ও নানাবিধ ফলমূল। এ কি উপবাস না উপহাস?

এবার দেখা যাক বহুভোজনের বিপক্ষে নানা শাস্ত্রে কি বলা হয়েছে। প্রথমে স্মৃতিশাস্ত্রকার ভগবান মনুর কথাই ধরা যাক। মনু মহারাজ বলেছেন—

'অনারোগ্যমনায়ুষ্যম্ অস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনম্।
অপুণ্যং লোক-বিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জয়েৎ'।।

অতিভোজন আরোগ্যের বিঘ্নকারক, আয়ুর হানিকারক, স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক, পুণ্যের ক্ষয়-কারক ও লোকে নিন্দনীয়, তাই অতিভোজন পরিহার করবে।

ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

'নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি'

যারা বেশী খায়, তাদের চিত্ত স্থির হয় না।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে বলা হয়েছে—

'জিতং সর্বম্ জিতে রসে'

একমাত্র রসনাকে যাঁরা জয় করতে পারেন, তাঁরা সকল ইন্দ্রিয়কেই জয় করেন।

আমাদের দেশে একটি চমৎকার প্রবচন আছে, সেটি ইংরেজি 'আইরনি' অলঙ্কারের চমৎকার দৃষ্টান্ত। সেটি হচ্ছে—

'বেশী খাবি তো অল্প খা,
অল্প খাবি তো বেশী খা'।

যদি বেশী দিন খেতে চাও, অর্থাৎ দীর্ঘজীবী হতে চাও, তা হলে অল্প খাও অর্থাৎ মিতভোজী হও, আর যদি অল্প দিন খেতে চাও অর্থাৎ অল্পায়ু হতে চাও, তাহলে অমিতাহারী বা ভূরিভোজী হও।

আজকাল আমরা অনেক রকমের সমাজ-বিরোধীর কথা শুনতে পাই। কিন্তু বহুভোজীকে কেউ সমাজবিরোধী বলে না। যারা বেশী মাত্রায় খেয়ে তা জীর্ণ করতে পারে অথবা যারা বাজি রেখে খায়, তারা কারো মনে বিস্ময় বা কৌতূহল জাগায়, আবার কারো বা মনে ঈর্ষা জাগায়। আমাদের শাস্ত্রে কিন্তু বহুভোজী বা ভূরিভোজী ব্যক্তিকেও সমাজবিরোধী ও তস্কর বলা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—'যতটা পরিমাণ খাদ্যে দেহধারী জীবের উদরপূর্তি হয়, সেই পরিমাণ খাদ্যেই তার অধিকার, যে তার চাইতে বেশী আত্মসাৎ করে, সে চোর, তাই সে দণ্ডার্হ'।

তাই বহুভোজী দুরকমের অপরাধে অপরাধী, প্রথমত সে সমাজবিরোধী, কারণ, সে বহুজনকে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে, দ্বিতীয়ত, সে লোভের বশীভূত। বহুভোজনের অপরাধে ভীমসেনকে নরক-দর্শন করতে হয়েছিল। মহাভারতে বলা হয়েছে, যে পাপাত্মা পরিবার-পরিজনকে বঞ্চিত করে কোনো সুস্বাদু দ্রব্য স্বয়ং ভোজন করে, সে নরকগামী হয়। ভগবদ্‌গীতায়ও বলা হয়েছে—'যে পাপাচারী ব্যক্তিরা শুধু নিজের জন্যে অন্ন রন্ধন করে, তারা পাপই ভোজন করে'। (এই উক্তিটি ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রের প্রতিধ্বনি।) মাধব কর তাঁর প্রসিদ্ধ 'নিদান' গ্রন্থে বলেছেন—

'যারা অজিতেন্দ্রিয়, পশুর মতো যারা অপরিমিত আহার করে, তারাই অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হয়, আর এই অজীর্ণই হচ্ছে সকল ব্যাধির মূল।

যারা শাস্ত্রজ্ঞ ও মিতভোজী, তাদের অজীর্ণ রোগ হয় না। যারা মূঢ়, অজিতেন্দ্রিয় ও রসনালোলুপ, তারাই এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়'।

নীতিশাস্ত্রকার বলেন — 'অজীর্ণে ভোজনং বিষম্', অর্থাৎ অজীর্ণে ভোজন বিষতুল্য। অজীর্ণে ভোজন করাকে এক কথায় বলে অধ্যশন। এই অধ্যশনই সকল রোগের মূল। কিন্তু যাঁরা সত্যিই ভূরিভোজী বলে খ্যাতি লাভ করেন, তাঁদের অগ্নিবল প্রবল বলে প্রায়ই তাঁদের অজীর্ণে ভুগতে হয় না। এইখানেই তাঁদের বাহাদুরি।

মহামতি চরক বলেন, যাঁরা দীর্ঘায়ু হতে চান, তাঁরা পাকস্থলীর অর্ধেক খাদ্যের দ্বারা ও এক-চতুর্থাংশ জলের দ্বারা পূর্ণ করবেন, আর এক-চতুর্থাংশ বায়ু-চলাচলের জন্যে শূন্য রাখবেন। কয়জন ভূরিভোজী এই উপদেশ পালন করতে সম্মত হবেন, জানিনে।

তবে শাস্ত্রে বহুভোজনের যতই নিন্দা থাক, তার হয়তো একটা ব্যতিক্রমও আছে। যারা ভূরিদাতা, তাদের ভূরিভোজনের অধিকার আছে। ভূরিভোজনে রাম-শ্যামের অধিকার না থাকলেও রামমোহনের অধিকার ছিল। কারণ, তিনি ধর্মসংস্কার ও সমাজের কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ স্থাপনের জন্যে আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি তাঁর অকৃপণ দানের দ্বারা দেশবাসীকে শ্রেয়ের পথের নির্দেশ দিতে চেয়েছিলেন। যাঁরা ভূরিদাতা, তাঁরা যদি ভূরিভোজী হন, তাতে ক্ষতি কি? তাঁরা হয়তো দশজনের খাদ্য একা গ্রহণ করেন, কিন্তু যা গ্রহণ করেন, তার চাইতে অনেক বেশী পরিমাণে সম্পদ দেশ ও জাতিকে দান করেন। মহাকবি কালিদাসের ভাষায় বলতে হয়—'সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুম্ আদত্তে হি রসং রবিঃ'। সূর্য পৃথিবী থেকে রস গ্রহণ করে সত্য, কিন্তু যা গ্রহণ করে, তার চাইতে সহস্রগুণ বর্ষণ করে পৃথিবীকে শ্যামল ও উর্বর করে তোলে। [illegible]

চাণক্য চাকলাদারের বিচিত্র কীর্তিকথা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'কে?' সহর্ষে বলে মাংচু।

'চাণক্য চাকলাদার। ইসাবেলাকে নিয়ে দ ছিনিয়ে নিতে চায় হীরের বাক্স।'

'থানডার!'

'হ্যাঁ। থানডার। এক্সপার্ট কারিগর। ফায়াংসিকে শিখিয়ে দিতে পারে কলকব্জার কারিকুরি!'

*

সূর্যদেব তখন মধ্যগগনে।

চাণক্য পর্দার ফাঁকে চোখ রেখে বলল—'ওরা এখনও ওৎ পেতে।'

হাই তুলল ইসাবেলা—'কোনো মানে হয়। আমরা বসে আছি ধরা দেওয়ার জন্যে। আর ওরা বসে আছে ধরবার জন্যে। কাঁহাতক আর বসে থাকা যায়।'

হাসল চাণক্য। সকাল থেকেই গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। বড় গাড়ি। ওল্ডস-মোবিল বলেই মনে হয়। স্টীয়ারিংয়ে বসে ল্যাংলা-গড়পো একটা লোক। মাথায় ভল্লুকের চামড়ার টুপী। গায়ে বাঘছালের জ্যাকেট। একটা চোখ কানা। এরই নাম রনটা। পিয়ানোর তারে ফাঁস দিতে ওস্তাদ। ঠগীদের মতই হাতের কায়দা।

পাশে বসে বৃষস্কন্ধ মিসেস ফ্যানটমাস। মুগুর চেহারা। পেঁচিমুখে চুইংগাম চিবুচ্ছেই। যেন একটা জ্যান্ত ডবলডেকার।

পেছনের আসনে আরো দুজন তেড়েল টাইপের ষণ্ডা। তার মধ্যে একজনের সঙ্গে লোমশ গরিলার সাদৃশ্য আছে। যেন একটা চলন্ত 'ক্লাউবন'।

অদ্রীশ বর্ধন

এরা মাসাদাউদের অনুচর ও অনুচরী। উদ্দেশ্য চাণক্য ও ইসাবেলাকে ওস্তাদের দরবারে হাজির করা। কিন্তু রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছে হোটেলে ঢুকে হামলা করার বাসনা কারো নেই।

চাণক্য তাই বলল—'ওরা চায় আমরা রাস্তায় বেরোই। সেখান থেকেই তুলবে। দেখা যাক।'

ফোন বেজে উঠল। আবদুল সামাদের মধুক্ষরা অমায়িক ভাষণ শোনা গেল তারের অপর প্রান্তে—'থানডার নাকি, দামদস্তুর পরে হবে। আমি রাজী।...না না...কম পার্সেন্টে পোষায় না ঠিকই...কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধ...চলে আসুন...হ্যাঁ...হ্যাঁ...আমি বাড়ি আছি।'

রিসিভার রেখে ঘুরে দাঁড়াল চাণক্য। ঠোঁটে নিগূঢ় হাসি—'আবদুল আমায় রাস্তায় নামাতে চাইছে। চলো।'

খাটে শুয়েছিল ইসাবেলা। উঠে দাঁড়াল। রক্তনখী আঙুলে একে একে খুলে ফেলল হাউসকোটের বোতাম। এবার শুধু কাঁচুলি। অনাড়ম্বর চাহনি ইসাবেলার। চাণক্যর সামনে তার লজ্জা নেই। অভিযানের পূর্বমুহূর্তে চাণক্যর সামনে অনাবৃত হাওয়ার অর্থ শরীরের ত্রুটি-বিচ্যুতি ওস্তাদ-চোখে পরখ করিয়ে নেওয়া। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে চাণক্য। নির্বিকার চোখে যেন হাতিয়ারের ধার যাচাই করে নেয়। খুঁত থাকলে মেরামতের দিকে নজর দেয়।

তাই নির্দ্বিধায় ব্র্যাসারি খুলে ফেলে দিল ইসাবেলা। সুটকেস খুলে আর একটা ব্র্যাসারি এগিয়ে দিল চাণক্য।

কিছুক্ষণ পরেই তৈরী হয়ে নেমে এল দুজনে। পরণে গতকালের সেই পোশাক। ক্রুশ কাঁটায় বোনা মেরুন রঙের টি-সার্ট আর জ্যাকেট। জেব্রা প্যাটার্ণ ট্রাউজার্স। ইসাবেলার বেশবাসও প্রায় তাই। পাছা-কামড়ানো স্ল্যাক। পায়ের ডিম পর্যন্ত ফিতে বাঁধা চামড়ার বুট। রবার-সোল।

উঠোনে পন্টিয়াক দাঁড়িয়েছিল। দুজনে সামনে বসল। উইন্ড স্ক্রীনকে লক্ষ্য করে ইসাবেলা বলল—'আচিন, আবদুল সামাদ ডাক দিয়েছে। তুমি তৈরী?'

"আলবাৎ।' কথাটা শোনা গেল পেছনের সিটের তলা থেকে। কালো চাদর মুড়ে প্রায়-অদৃশ্য আচিন কিন্তু তখনো দৃশ্যমান হল না।

'গাড়িতে কেউ উঁকি-ঝুঁকি মেরেছে?'

'না।'

গর্জে উঠল পন্টিয়াক।

*

কক্সবাজার পেছনে রইল কিছুক্ষণের মধ্যেই। শহরতলীর যে অঞ্চলে আবদুল সামাদের সুদৃশ্য বাংলোবাড়ি, তা এখনো কয়েক মাইল দূরে।

কিন্তু তার আগেই ঘটল ঘটনাটা। সিনেমার দৃশ্যও বুঝি এমন রোমাঞ্চকর নয়।

দু পাশে ক্ষেত। ধুলো উড়িয়ে ছুটছে পন্টিয়াক। ভিউফাইন্ডারে দেখা যাচ্ছে, পেছনের ওল্ডসমোবিলের গতি রয়েছে অব্যাহত।

সহসা গতি বৃদ্ধি পেল ওল্ডসমোবিলের। অবিচল রইল চাণক্য। ব্যবধান যখন মাত্র পঞ্চাশ গজের, তখন আচমকা ডান পা চেপে বসল এক্সিলেটরে। গুলবাঘের মত লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল পন্টিয়াক। শুরু হল দৌড় প্রতিযোগিতা।

পেছনের সিটে মাথা নিচু করে শুয়েছিল আচিন। বলল—'রেঞ্জের মধ্যে পেয়েও ওরা গুলি করল না। তার মানে আপনাদের জ্যান্ত চাই।'

'তা না হলে সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি জমবে কি করে।'

দূরে একটা বাঁক দেখা গেল। দু পাশে সারি-সারি খড়ের গাদা।

শান্ত কণ্ঠে বলল চাণক্য—'এইবার। আচিন সামলাকে।'

বাঁকের মধ্যে সমান বেগে ঢুকে পড়ল পন্টিয়াক। তীব্র শব্দে চাকা ঘসড়ে গেল পাথুরে জমির ওপর দিয়ে। রাস্তাটা আবার বেঁকেছে বেশ খানিকটা দূরে। সেখানেও রাস্তার দু ধারে খড়ের গাদা।

পন্টিয়াক দ্বিতীয় বাঁকেও মোড় নিল। পরমুহূর্তেই ডান দিকের পরিখা আর খড়ের স্তূপ ঘেঁসে ব্রেক কষল। বেশ কয়েক-গজ খড়ের স্তূপ ছিন্নভিন্ন করে এগিয়ে গেল গাড়ি। হাওয়ায় উড়তে লাগল ছেঁড়া খড়। গাড়ি কাৎ হয়ে পড়ল এক দিকে।

ইসাবেলা মাঝ রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আচিন আর চাণক্য দুদিক থেকে ঠেলে মারল পন্টিয়াককে। মিলিত ধাক্কায় গাড়ি উল্টে পড়ল পরিখা আর খড়ের গাদায়।

গণ্ডারফাড়িংয়ের মত ঠ্যাং ফেলে ইসাবেলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল চাণক্য। চোখে চোখ রেখে বলল—'আবার দেখা হবে।' সঙ্গে-সঙ্গে হাত উঠল শূন্যে। ইঞ্চি চারেক দূরে থেকে ডান কনুই দুরমুশের মত আছড়ে পড়ল ইসা-বেলার কানের পেছনে। ঘাড় মুচড়ে লুটিয়ে পড়ল ইসাবেলা। চাণক্য ধরল না।' আছড়ে না পড়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল। মুখ থুবড়ে পড়ল ইসাবেলা। গাল ছড়ে রক্ত রেখা দেখা দিল।

গা শিরশির করে আচিনের। চাণক্য বলেছিল, আমি অ্যামেচার নই। কথাটার তাৎপর্য এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম হয় আচিনের।

চাণক্য সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এগিয়ে দিয়েছে থুৎনি। দ্বিরুক্তি করল না আচিন। দেহের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করল বজ্রমুষ্টিতে। এক ঘুসিতেই অজ্ঞান করতে হবে চাণক্যকে। সময় খুব কম।

চাণক্যর চোখে সেই শব্দহীন অট্টহাসি। দেরী দেখে যেন ঠাট্টা করছে আচিনকে। মাথায় রক্ত চড়ে গেল আচিনের। মোক্ষম ঘুসি হানল থুৎনিতে।

লুটিয়ে পড়েছে চাণক্য। ওদিকে বাঁকের মাথায় ধুলোর ঝড় দেখা যাচ্ছে। ওল্ডসমোবিল এসে গেল বলে।

পরিখা টপকে খড়ের গাদায় পাঁচ ফুট শরীরটাকে লুকোতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড লেগেছিল আচিনের। বাঁক ঘুরে আবির্ভূত হল ওল্ডসমোবিল। রাস্তার ওপর লুণ্ঠিত দুটি দেহর অদূরে এসে স্তব্ধ হল চক্রাবর্ত।

দু দিকের দরজা খুলে প্রথমে নামল বাঘছালের জ্যাকেটধারী রনটা। এক চোখে উল্লাস। পাশে মিসেস ফ্যানটমাস। ছোল-দাঁতী মুখে নোংরা হাসি। পেছনে সেই লোমশ গোরিলার মত 'ঝাউবন' স্যাঙাৎ এবং আর একজন সাগরেদ। হাতে রিভল-বার।

কলাগাছের মত পা ফাঁক করে ইসা-বেলার সামনে দাঁড়াল মুগুর-মেয়েটা। হেঁট হল। চোখের পাতা টেনে মণি দেখল। পরক্ষণেই হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে প্রচণ্ড চড় মারল ইসাবেলার গালে।

চড়াং করে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত চিড়-বিড়িয়ে উঠল আচিনের। রিভলবারের বাঁট চেপে ধরেই ছেড়ে দিল। রাগের মাথায় খ্যান না ভণ্ডুল হয়।

রনটা একচোখে তাকিয়েছিল চাণক্যর দিকে। বুটের ডগা দিয়ে বার কয়েক চোয়ালে গুঁতো মেরে দেখার পর তলপেটে একবার লাথিও মারল। কিন্তু নড়ল না চাণক্য।

উৎকপালী মেয়েটা শাঁকালুর মত দাঁত বার করে হাসছে। রাগে পিত্তি জ্বলে গেল আচিনের। তারপরেই দেখল এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য।

মিসেস ফ্যানটমাস একাই বগলদাবা করল দুজনকে। দু বগলে অচেতন দেহ দুটো নিয়ে ফিরে গেল মোটরে। গর্জে উঠল ইঞ্জিন। কক্সবাজারের দিকে উধাও হল ওল্ডসমোবিল।

খড় ঝাড়তে-ঝাড়তে নেমে এল আচিন। অ্যাডভেঞ্চার তার রক্তে। কিন্তু সিংহের গুহায় এভাবে নির্বিকার-প্রবেশ তার কল্পনাতেও আসে না।

কথায় বলে, জঙলা কভু পোষ মানে না, মন সদা তার কেওড়া বনে। চাণক্য আর ইসাবেলাও হয়েছে তাই।

পদব্রজে কক্সবাজার রওনা হয় আচিন।

॥ ১৫ ॥

জাহাজের কেবিন।

জাপানী লাল গালার মস্ত টেবিলে কনুই রেখে বসে মাসাদাউদ। বহু নারকীয় কাণ্ডর হোতা পিশাচশ্রেষ্ঠ মাসাদাউদ। বলিরেখা-আঁকা তুমাখো মুখ নির্বিকার। তির্যক চক্ষুর বরফ-চাহনি নিবদ্ধ চাণক্য আর ইসাবেলার ওপর। টেবিলের পাশেই ওরা দাঁড়িয়ে। হাতে হাত-কড়া।

পোর্টহোলের নিচে দাঁড়িয়ে সেই লোমশ 'ঝাউবন' সাগরেদটি। বিকশিত দন্তপংক্তিতে বিকট উল্লাস। দরজা আগলে অটোমেটিক নাড়াচাড়া করছে কানা রনটা। বাঘছাল জ্যাকেট আর ভালুকে টুপী নেহাতই বেমানান এ কেবিনে। মুষ্টিং দেহি টেরা-কোটা দানবের মূর্তিটাই বরং মানিয়েছে। কেননা দু পাশে দাঁড়িয়ে মিসেস ফ্যানটমাস আর মাংচু। মুগুর-মেয়ে আর মর্কট-পুরুষ। দুজনেরই কুৎকুতে চোখে কৌতুহল।

মাসাদাউদের সামনে টেবিলে সাজান কয়েকটি বস্তু। এক প্যাকেট সিগারেট, লাইটার, দুটি লাউডগা-প্যাটার্ণ ছুরি,
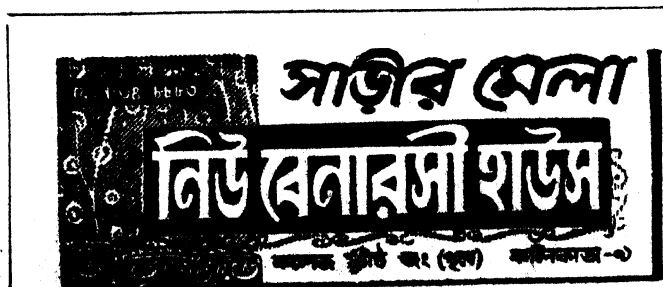
লিপস্টিক, চিরুনি, রুমাল, ভ্যানিটি ব্যাগ, কোল্ট-৩২ রিভলবার।

আসামী পর্যবেক্ষণ সমাপন হলে টেবিলের জিনিসগুলির দিকে মড়ার চোখ নিক্ষেপ করল মাসাদাউদ। একটা সিগারেট দু টুকরো করে তামাক ঝরিয়ে দেখল। নিরীহ তামাক। নিশ্চিন্ত হয়ে প্যাকেটটা নিক্ষেপ করল চাণক্যর দিকে। হাতকড়াবদ্ধ হাতেই লুফে নিল চাণক্য।

ব্রোঞ্জ-মুখে বেপরোয়া হেসে বলল—'ধন্যবাদ। লাইটারটা পেলে ভাল হয়—পেট ফুলে গেল।'

'এখানে নয়', ঠাণ্ডা গলা মাসাদাউদের। 'পরে।'

লিপস্টিকটা টেনে বার করল মাসাদাউদ। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বন্ধ করল। ছুঁড়ে দিল ইসাবেলার দিকে। চিরুনি আর রুমালও ফেরৎ গেল এইভাবে।

'রন্টো।'

'ইয়েস, বস।'

'বডি সার্চ হয়েছে?'

হ্যাঁ। কিছু নেই।'

'আবার কর। আমার সামনে।'

কানা রন্টোর এক চোখে ফুটে ওঠে অপরিসীম উৎসাহ। রিভলবার খাপে গুঁজে এগিয়ে আসে। প্রথমে চাণক্য। বুক থাবড়ে পিঠে হাত বুলিয়েও নতুন কিছু পাওয়া গেল না। বগলের নিচও শূন্য। সন্ধানী হাত নেমে এল কোমরে। সেখান থেকে দু পা—উরুসন্ধি থেকে পায়ের গোছ পর্যন্ত। টেনে খোলা হল চামড়ার বুট। তলায় রবারের শুকতলা। ওপরের চামড়ার সাজের সঙ্গে গালিয়ে লাগান। ছুঁচ লুকোনোরও জায়গা নেই।

চাণক্যর পর ইসাবেলা। একইভাবে কাঁধ গলা বুক কোমর উরুসন্ধি হয়ে হাত নেমে এল পায়ের বুটে। কিছু নেই। ইসাবেলা রন্টোর মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে রইল অন্য দিকে। ভাবখানা যেন গায়ের ওপর কেঁচো ঘুরছে।

মুখভঙ্গী করে ফলাফল জানায় রনটো। বাস্তবিকই নিরস্ত্র দুই মহারথী। বিলক্ষণ উল্লসিতও হয়। এহেন অসহায় অবস্থায় থানডার-ইসাবেলাকে পাওয়া যাবে—এ যেন কল্পনার অতীত। বাহাদুর বটে মাসাদাউদের প্ল্যান!

আধবোজা মড়ার চোখ আবার নিরীক্ষণ করছিল চাণক্যকে।

বলল—'মিসেস ফ্যানটমাসের হাত নিশপিশ করছে খুন করার জন্যে।'

'কাকে?' ইসাবেলার প্রশ্ন।

'তোমাকে আর তোমার ডিগডিগে গরুটাকে।'

'অপরাধ?'

'আমার পথ মাড়ানো।'

'কিভাবে শুনি?'

'হীরের বাক্স।' বাক-সংযমী মাসাদাউদ অযথা বাক্যব্যয় একদম পছন্দ করে না। চোখের সূচাগ্র মণিকা দুটি দেখে কেবল বোঝা গেল বিলক্ষণ উত্তেজিত হয়েছে পিশাচগুরু।

'অ।' এই প্রথম কথা বলল চাণক্য। চোখে কৌতুক। কণ্ঠে পরিহাস। সেটা আগে জানাতে হয়। হ্যাঁচাঘেঁচি আমারও ভাল লাগে না।'

'হীরে লোপাটের প্ল্যান কি হয়েছিল?' মাসাদাউদের প্রশ্ন।

চাণক্য নিরুত্তর। ঠোঁটে উদ্ধত হাসি।

ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়াল মাসাদাউদ। আচমকা ডান হাতের উল্টো দিক দিয়ে চপেটাঘাত করল চাণক্যর গালে। এতটুকু টলল না লিকপিকে মূর্তি। অম্লান রইল মুখের হাসি।

বাক-সংযমী মাসাদাউদ এবার অন্য পথ ধরল। একই ওজনের সিধে হাতের চড় মারল ইসাবেলার গালে। পাঁচ আঙুলের ছাপ ফুটে উঠল ছড়ে-যাওয়া গালের ওপর।

পৈশাচিক উল্লাস অনুভব করে রন্টো। কানাক চোখে উপসী হাঙরের ক্ষুধা। ভাগ্যিস গার্ড় থেকে ছিটকে পড়েছিল গোলগাপ্পা মেয়েটা। নইলে তো হাতের সুখ করা যেত না।

ইসাবেলার গালের চড়ে অন্তরে বিচলিত হয়নি চাণক্য। এগুলো তার হিসেবের মধ্যেই ধরা আছে। সহজে মুখ খোলা ঠিক হবে না। তবে এখন সময় হয়েছে।

মুখের হাসি সরিয়ে নিল চাণক্য। কঠিন করল ব্রোঞ্জ-মুখ—'থাক, আর বীরত্ব দেখাতে হবে না। বাটাভিয়ায় বোরোবুদুর ব্যাংক থেকে হীরের বাক্স সরাতাম আমি।'

খট্টাসের অট্টহাসি শোনা গেল। মর্কট মাংচু হাসছে। মাসাদাউদের মড়ার চোখ সেদিকে ফিরতেই খট্টাসের কণ্ঠরোধ হল যেন।

উরু কণ্ঠে বলে চাণক্য—'হাসির কি হল?'

জবাব দিল মাসাদাউদ—'বোরোবুদুর ব্যাংকে হীরে আর পৌঁছোতো না।'

'কী?'

'তার আগেই হীরে আসছে আমার খপ্পোরে।'

'কিভাবে?'

এ প্রশ্নের আর জবাব দিল না মাসাদাউদ। শুধোলো—'অক্সি-অ্যাসিটিলিন চর্চ নাড়াচাড়া করার অভ্যেস তো অনেকদিনের, তাই না?'

'সিন্দুক খুলতে হবে?'

'সিন্দুকের চাইতেও বড় জিনিস। অসম্ভব নয়—কেমন?'

নিরুত্তর রইল চাণক্য। মাসাদাউদও দাওয়াই দিল। ধীরেসুস্থে রামরদ্দা ঝাড়ল ইসাবেলার ঘাড়ে। পড়তে পড়তে সামলে নিল ইসাবেলা। ঘৃণা ঝরে পড়ল আগুন-চোখে।

মড়ার চোখ স্থির। বরফ-চাহনিও নির্বিকার—'রাজী?'

'রাজী।' মুখঅন্তরে সম্মতি জানায় চাণক্য।

মাংচু।'

'ইয়েস, বস?'

'থানডারকে নিচে নিয়ে যাও। ট্রেনিং এখুনি শুরু হোক। ওদের জাহাজ কক্স-বাজারে পৌঁছোনোর আগেই পোক্ত হতে হবে। চাবুক হাতে রেখো। বেশি বেচাল দেখলে মিসেস ফ্যানটমাসের হাতে ছেড়ে দিও।'

*

কেবিনে ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিল ইসাবেলা।

ধকল কম যায় নি। তাই ঘুমও হল গাঢ়। নিদ্রাভঙ্গ হল খট্টাসের অট্টহাসিতে।

নির্জন কেবিনে একা দাঁড়িয়ে মাংচু। নরবানরের মত খর্বকায় চেহারায় লালসা যেন ঝরে ঝরে পড়ছে।

বোঝে ইসাবেলা। 'স্লিপিং বিউটি' সাধকের সাধনাও ভঙ্গ করে। মাংচু তো নর-কীট। লুব্ধ চোখের কামনা যেন লেহন করে যায় সর্বঅঙ্গ।

এ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার মন্ত্র-গুপ্তি অজানা নয় ইসাবেলার। এককালে হার্মাদ-রানী ছিল সে। রূপ শুধু ঐশ্বর্য নয়, হাতিয়ারও বটে। হার্মাদ-রানীর হাতিয়ার।

মাংচুর মন নরম করতে তাই বেশিক্ষণ গেল না। কালসাপের মত যাদের চরিত্র, নাগিনীকন্যাকেই তারা চায়। ইসাবেলা সেই কন্যা। বিষধরা। কিন্তু কি দুরন্ত আকর্ষণ। এ কন্যাকে আলিঙ্গন করা আর ভুজঙ্গিনীকে চুম্বন করার মধ্যে তফাৎ নেই কোনো। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষাই তো মাংচুদের জীবন-দর্শন। তাছাড়া চাণক্য-ইসাবেলার যুগ্ম অভিযানে ইসাবেলার অন্যতম ভূমিকাই হল দেহদান। বিনিময়ে নেয় প্রতিদান।

তাই মর্কট-মানুষটার তপ্ত নিঃশ্বাসে মোটেই বিচলিত হয় না ইসাবেলা। ফিকে হাসি দিয়ে আরো মাতাল করে দেয় মাংচুকে। পরক্ষণেই অধর বুঝি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় দাঁতালো পশুর আক্রমণে—নখরাঘাতে জর্জরিত হয় তনু।

* * *

তৃপ্ত মাংচু অবশ্য প্রতিদান দিয়েছিল।

হাতের হাতকড়া না খুলেই ইসাবেলাকে নিয়ে গিয়েছিল রেলিংয়ের পাশে। নিচে জাহাজের খোল। চৌকোণা জায়গায় চলছে এক আশ্চর্য মহড়া।

অনেকেই দাঁড়িয়ে সেখানে। মাসাদাউদ, রন্টো, চাণক্য ছাড়াও বিস্তর পুরুষ। সকলেই কর্মব্যস্ত। একটা পিপেতে বসে সিগারেট টানছে সেই সচল হিমাচল—মিসেস ফ্যানটমাস।

চতুষ্কোণ জায়গাটার ঠিক মাঝে একটা বিচিত্র বস্তু। জিনিসটার বর্ণনা দেওয়া মুস্কিল। মনে হয় যেন একটা বিরাট উড়ন-চাকতি। স্কাইং-সসারের মত গড়ন। কিন্তু স্কাইং নয়—এ হল ডাইভিং-সসার। জলতলে

যথেচ্ছাবিচরণের ক্ষুদে সাবমেরিণ। গো... কার পিরিচ যেন।

ডাইভিং-সসারের ঠিক মাথায় একটা মস্ত ঘণ্টা। গির্জের ঘণ্টা যেরকম হয়—অবিকল তাই। তবে উপুড় করা নয়—উল্টোনো। ফাঁদালো মুখটা রয়েছে ওপর দিকে। বিশাল ঘণ্টা। কিনারা ঘিরে পুরু রবারের আস্তরণ।

ঘণ্টার সরু দিকটা ডাইভিং-সসারের মাথায় লাগানো। সেখানে একটা হ্যাচ। অর্থাৎ ডালার মত গোলাকার প্রবেশ-পথ। কলকাতার রাস্তার ড্রেন-পিটের মত। হ্যাচ খুলে ডাইভিং সসারে ঢুকতে হয়।

এলাহি কান্ডকারখানা দেখে চক্ষু চড়কগাছ হবার উপক্রম হয়েছিল ইসাবেলার। বিস্তর প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছিল মাংচুকে। মাংচু নির্বোধ নয়। নিরাপদ প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছিল। বাদবাকি প্রশ্ন যেন শুনতেও পায়নি।

মাসাদাউদ নিঃসন্দেহে রাজসিক আয়োজন করেছে। ঐ যে ডাইভিং সসার—যার গড়ন উড়ন্ত পিরিচের মত (অথবা উড়ন্ত চাটুও বলা যায়) অথচ গোপন জল-বিহারে যার জুড়ি নেই—সেই বিচিত্র জল-যানের প্রকৃত উদ্দেশ্য রহস্যপূর্ণ। সরকারী চোখে অবশ্য ডুবো-যানের ক্রিয়াকলাপ বিলক্ষণ নির্দোষ। একটি আমেরিকান ফিল্ম-কোম্পানী ডুবোযানকে পাঠিয়েছে কক্স-বাজারের সাগরতলে মুক্তোক্ষেতের দৃশ্য তোলার জন্যে। সরকারী নথিপত্রে অন্তত তাই লেখা। সুতরাং কারো আপত্তি নেই ডুবোযানের যথেচ্ছ বিহারে।

প্রকৃত রহস্য জানে কেবল মাসাদাউদ আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা। কেননা, ক্ষুদে সাব-মেরিণের মালিক আর কেউ নয়—স্বয়ং মাসা-দাউদ। আমেরিকান ফিল্ম কোম্পানীর অন্তরাল-অধিপতিও মাসাদাউদ। সারা পৃথিবীতে বহু কারবারের বেনামী মালিক এই মাসাদাউদ।

ডুবোযানে দামী দামী ক্যামেরা বসানো আছে ঠিকই। এছাড়াও আছে, এমন সব হাতিয়ার আর আধুনিক কলকব্জা যা ছবি তোলার কাজে লাগে না—লাগে মুক্তাক্ষেত লুট করার জন্যে।

মুক্তাক্ষেত লুন্ঠন ছাড়াও কাজ আছে ডুবোযানের। ডুবন্ত সোনা তোলা, সাগর-তলের সীমাহীন ধনসম্পদ দরকার মত তুলে আনা এবং ক্ষুদে টর্পেডো হেনে ছোটখাট জাহাজডুবি করা—এসব কাজেই পোক্ত এই জলচর যন্ত্র।

ডুবোযানের ঘাড়ে এখন নতুন কাজ চেপেছে। অভিনব অভিযান। হীরের বাক্স লুঠ হবে জাহাজের তলা কেটে। জাহাজের ওপরে কেউ টের পাবে না।

জাহাজের ওপরে যখন হীরেরক্ষকরা মাসা দাউদের সন্ধানে অতন্দ্র—ঠিক তখনি জাহাজের তলা কেটে লুঠ হবে হীরের বাক্স।

ডুবোযানের মাথায় ঐ যে উল্টে বসানো পেল্লায় ঘণ্টা—জাহাজ কাটা হবে ঐ ঘণ্টার মধ্যে বসেই। ডুবোযান ঘণ্টাসমেত প্রথমে ডুব দেবে। জেট ইঞ্জিন চালিয়ে পৌঁছোবে হীরেবাহক জাহাজের তলায়। জাহাজ তখন কিছুক্ষণের জন্যে দাঁড়াবে কক্সবাজারের বন্দরে। কখন দাঁড়াবে—সে সময় পৌঁছে গেছে মাসাদাউদের কাছে।

ঘণ্টার ফাঁদাল মুখটা ধীরে ধীরে চেপে বসবে জাহাজের চ্যাটালো তলায়। রবারের আস্তরণের জন্যে সুবিধেই হবে—কোনো শব্দ হবে না। নতুন জলের প্রবেশও বন্ধ হবে।

তারপর ডুবোযানের পাম্প চালু হয়ে যাবে। দেখতে দেখতে ঘণ্টার ভেতরের আটক জল বাইরে বেরিয়ে যাবে। জলশূন্য হবে ঘণ্টার গহ্বর। জল নেমে গিয়ে বায়ুশূন্য হওয়ার ফলে ঘণ্টা আরো চেপে বসবে জাহাজের তলায়। তারপর?

তারপরেই শুরু হবে চাণক্য চাকলাদারের কেরামতি। অক্সিঅ্যাসিটিলিন টর্চ নিয়ে সে হ্যাচ খুলে উঠে আসবে ঘণ্টার মধ্যে। লোহার পাত কেটে প্রবেশ করবে হীরের কুঠরিতে।

ইসাবেলা প্রশ্ন করেছিল, অতবড় জাহাজের ঠিক কোনখানে হীরের বাক্স আছে, তা চাণক্য জানবে কি করে?

খট্টাস হাসি হেসেছিল মাংচু। মাসা-দাউদ দূরদর্শী পুরুষ। সে ব্যবস্থাও হয়েছে। হীরের বাক্স আছে স্ট্রং-রুমে। অন্যান্য মূল্যবান জিনিসও আছে সে কুঠরিতে। লম্বা-চওড়ায় চার ফুট একটা প্যাকিং কেসও আছে স্ট্রং-রুমে। কলকাতার এক কিউরিও কারবারী প্যাকিংকেসটা পাঠাচ্ছে বাটাভিয়ায়। বাক্সর মধ্যে আছে পোর্সিলেনের দুষ্প্রাপ্য লোহান মূর্তি।

অন্তত কাগজপত্রে তাই লেখা। কেননা, কলকাতার কারবারী আসলে মাসাদাউদ স্বয়ং। লোহান মূর্তির উদরে লুকোনো আছে একটা রেডিও ট্রান্সমিটার। ডুবোযান জাহাজের তলায় গিয়ে রেডিও মারফৎ এই ট্রান্সমিটার চালু করবে। তৎক্ষণাৎ বিশেষ তরঙ্গে খবর আসতে থাকবে ট্রান্সমিটার থেকে। অটোমেটিক যন্ত্র জানিয়ে দেবে তার অবস্থান জাহাজের ঠিক কোথায়। ডুবো-যানের রেডিও সেই বিপ-বিপ ধ্বনি শুনে পৌঁছোবে প্যাকিং কেসের তলায়।

তাও কি হয়? কপট বিস্ময়ের ভান দেখিয়েছিল ইসাবেলা। লোহান মূর্তি সমেত সংবাদপ্রেরক যন্ত্রটা স্ট্রংরুমে নাও থাকতে পারে তো? অতবড় জাহাজের অন্য কোথাও থাকলে?

আবার খট্টাস হাসি হেসেছিল মাংচু। স্ট্রংরুমের কোথায় কি আছে, তার পুরো নক্সা পৌঁছে গেছে মাসাদাউদের হাতে। টাকায় সব হয়। বিশেষ করে কলকাতায়।

তা না হয় হল; কিন্তু পরে তো পুলিশের টনক নড়বে? ইন্টারপোল, মানে, আন্তর্জাতিক পুলিশে বহু ঘুঘু আছে। তারা ডুবোযানের হদিশ ধরে মাসা দাউদকে শুদ্ধু টেনে তুলবে। তখন? প্রশ্ন করেছে ইসাবেলা।

আলতামুখী ইসাবেলার অধর চুম্বন করে মাংচু জানিয়েছে, অত সহজ নয়। হলি-উডের ফিল্ম কোম্পানীটি আসলে একটা ডকুমেন্টারী ফিল্ম কোম্পানী। তারা রেঙ্গুনের একটা ইউনিটকে ভাড়া দিয়েছে ডুবোযান। ঘণ্টা লাগানো হয়েছে তারপরে। এ খবর আর কেউ জানে না।

কাম ফতে হবার পর ডুবোযানের কাজ ফুরোবে। তখন আচমকা একটা দুর্ঘটনা ঘটবে। ডুবোযান চিরতরে তলিয়ে যাবে। পরের দিন খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হবে সে সংবাদ। আন্তর্জাতিক পুলিশ কোন হদিশই পাবে না। সবাই জানবে ছবি তুলতে-তুলতে সলিল সমাধি ঘটেছে হলিউডের ডকুমেন্টারী ফিল্ম কোম্পানীর ডাইভিং সসারের।

ছবি তোলার সেই ইউনিট? তারাও উবে যাবে। ভূয়ো কোম্পানীর কোন চিহ্নও থাকবে না। পুলিশ ধরবে কাকে?

তাই জোর মহড়া চলছে চাণক্যকে নিয়ে। হীরে নিয়ে যাত্রী-জাহাজকে বন্দরে ভিড়তেই হবে। 'মেল' থাকুক না থাকুক—নিয়ম রক্ষে করতে হবে।

বড়জোর তিরিশ মিনিট স্থির হয়ে ভাসবে জাহাজ।

আর, এই তিরিশ মিনিটের মধ্যেই হীরে সাফাইয়ের খেল দেখাতে হবে চাণক্যকে।

ব্যর্থ হলে গর্দান যাবে দুজনেরই।

(ক্রমশঃ)

অবক্ষয় শেষ কথা নয়ঃ তরুণ মজুমদার

শখ নয়, গ্ল্যামার নয়, টাকা কামানোর ধান্ধাও নয়, শুধু মনে হয়েছিল ভেতরের বিশ্বাস-টিশ্বাসের কথা সবচেয়ে সহজে লোকজনের সামনে কোন পথে তুলে ধরা যাবে। তাই আঠারো বছর বয়সে ধরাবাঁধা জীবনের সব লোভ অস্বীকার করে একদিন ছেলেটি তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি আর্ট ফর্মকে জীবনচর্চার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিল। বাইশ বছর বাদে আজ যদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করা যায়ঃ সমস্ত যৌবনের বিনিময়ে কি পেলেন? মানুষটি অক্লেশে হাসতে হাসতে জবাব দেবেন জানি, পাওয়া না পাওয়াটা বড় কথা নয়, কতটুকু নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারলাম, সেটাই আমার কাছে সব। এদেশে নিজেকে মেলে ধরতে চায় ক'জন? সবাই তো দেখি নিজের অবস্থাকে লুকিয়ে রাখতেই ব্যস্ত। জীবন, বক্তব্য, বিশ্বাস ইত্যাদি ব্যাপারগুলো অধিকাংশের কাছেই শব্দ মাত্র। তার চেয়ে অনেক অর্থবহ গাড়ি, বাড়ী, ফ্রীজ, রেডিওগ্রাম, জায়গা-জমি।

—অথচ দেখুন আর একটুখানি কম স্বার্থপর যদি আমরা হতাম বা অপরকে কিছুটা সম্মান দিতে পারতাম তাহলে আজ দেশটার এই হাল দাঁড়াতো না। চারদিকে দেখুন, অবক্ষয় অবক্ষয় রব তুলে পাড়া মাথায় করা হচ্ছে। কিন্তু কেন এই অবক্ষয়?

—কেউ কি তার কারণ অনুসন্ধান করছেন? বকস-অফিস ফর্মুলায় ছবির পর ছবি উঠছে, কিন্তু মূলে যাচ্ছেন কে? বেশির ভাগই তো বাড়ি ছুঁয়েই সন্তুষ্ট।

একটা সিগারেট ধরাতে থামলেন তনুবাবু। টলিউডে তরুণ মজুমদার নামটির চেয়ে অনেক বেশী পরিচিত ঐ চার অক্ষরের শব্দটি—তনুবাবু। এক ডাকে সবাই চেনে। পশ্চিমবঙ্গের সফলতম চিত্রপরিচালকদের অন্যতম হয়েও কিন্তু আদৌ তৃপ্ত নন মানুষটি। দশ-দশখানা ছবি করার পরও বলছেন, না আজো সব কথা বলে উঠতে পারিনি।

—আমার ধারণা কি জানেন, ঐ বেকারী-টেকারীর ব্যাপারগুলো সবই ওপরের। হ্যাঁ কাজ-কর্ম না পেলে ফ্রাসট্রেশন আসে বৈকি। তবে ওটাই সব নয়। আসলে আমরা, যারা বড়, তারাই ওদের উপযুক্ত সম্মান দিইনি। বয়স চায় সম্মান। তখন যে কোন উপায়ে অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই ওদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

তাহলে আজো কেন আপনি 'বালিকা বধূ' বা 'নিমন্ত্রণ'-এর মত ছবি করছেন? কেন আজকের জীবন নিয়ে আপনি ছবি তুলছেন না?

—তার কারণ দুটি—হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন তনুবাবু—এক, আমি মনে করি না যে অবক্ষয়ই শেষ কথা। বরং উল্টোটাই মনে হয়। এ যেন একটা গল্পের মাঝামাঝি অবস্থা। আপনি আমি কি কোন গল্পের মাঝখানটা পড়েই কনক্লুশনে পৌঁছোই? আর দ্বিতীয়ত, এখনো আমার দেখা শেষ হয়নি। যেদিন ফিল করব যে এই সব এলোমেলো ব্যাপারগুলোর জট আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, সেদিন নিশ্চয়ই ছবি করব। তার আগে নয়।

—খোলাখুলি বলি মশাই, প্ল্যান করে ফর্মুলা-ছবি করা আমার ধাতে পোষায় না। ভেতরের আবেগেই আমি ছবি করি। একদিন ফিল করেছিলাম যে ফিল্মের মধ্য দিয়েই নিজের কথা ভালভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারব, সে জন্যই পরিচিত পথ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম।

আপনার সেই ফিলিং-এর উৎস কি তনুবাবু? কেন হঠাৎ সব ছেড়ে-ছুঁড়ে ফিল্ম লাইনে চলে এলেন?—আলাপ-আলোচনার ফাঁকে সুযোগ পেয়ে সরাসরি ওঁর সামনে প্রশ্ন দুটি রাখলাম।

এতক্ষণ থিয়োরেটিক্যাল আলোচনা চলছিল। স্বচ্ছন্দে প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন তনুবাবু। হঠাৎ ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে যেন একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। ছবির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারলেই যেন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন করে ওঁর সম্বন্ধে যেটুকু জেনেছি তা হল, দেশ ওর 'বাংলাদেশে।' ফরিদপুরের মাদারীপুর সাব-ডিভিশনে গয়ঘর গ্রামে। জন্মেছেন বগুড়া টাউনে। বাবা আজীবন গান্ধীবাদী, বিপ্লবী বীরেন্দ্রকুমার খাসনবিশ যৌবনেই দেশ ছাড়া। জীবনের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে বৃটিশের জেলে। জেলের বাইরে এসে কিছুদিন বীরেনবাবু 'বগুড়া ব্যাঙ্কিং অ্যান্ড ট্রেডিং করপোরেশন লিমিটেডের' ম্যানেজিং ডিরেকটর হিসাবে কাজ করেছেন। দেশ-বিভাগে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। সাতচল্লিশে দেশ ছেড়ে কলকাতায় গ্যালিফ স্ট্রীটে ভাই-এর বাসায় উঠলেন বীরেনবাবু স্ত্রী ও ছোট ছেলের হাত ধরে।

তার অনেক আগেই বড় ছেলে তরুণ কলকাতায় চলে এসেছিলেন। পঁয়তাল্লিশে বগুড়া করোনেশন ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন তরুণ। আজ আর এগজাকটলি মনে নেই ওঁর যে ম্যাট্রিকে থারটিনথ না ফোরটিনথ হয়েছিলেন। তবে এটা মনে আছে যে বাবার ইচ্ছাতেই খাসনবিশ টাইটেলের বদলে ম্যাট্রিকের ফরম ফিল আপ করার সময় মজুমদার উপাধিটা বসিয়েছিলেন। ওদের আসল উপাধি 'দে'।

কলকাতায় এসে সেন্ট পলস কলেজে আই-এস-সি কোর্সে ভর্তি হন; ম্যাট্রিকে অঙ্কে খুব কম পেয়েছিলেন, তাই সবাই

কলেজ আর্টস পড়তে। —কিন্তু আমার গেল রোখ চেপে। ভর্তি হলাম সায়েন্সে। ফার্স্ট ডিভিসনেই পাশ করলাম। কেমিষ্ট্রির রেজাল্টটা কিন্তু ভাল হল না। আর বোধহয় সেই কারণেই স্কটিশে ভর্তি হলাম কেমিষ্ট্রিতে অনার্স নিয়ে।

—ইন দা মিন টাইম বাবা, মা ভাই সবাই চলে এলেন কলকাতায়। তাই আমিও হোস্টেল ছেড়ে ওদের সঙ্গে গিয়ে উঠলাম কাকার বাসায়। পড়াশোনা রেগুলারলি করছিলাম। মাঝে মধ্যে সময় পেলেই সিনেমা দেখতাম। পার্টিকুলারলি ডি কে বি (দেবকীকুমার বসু) বা পি সি বির (প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া) ছবি হলে তো কোন কথাই নেই। দেবকীবাবুর 'বিদ্যাপতি', 'কবি', 'রত্নদীপ', প্রমথেশ বড়ুয়ার 'অধিকার' ও 'রজত-জয়ন্তী' তখন খুব ভাল লেগেছিল। অ্যাকচুয়ালি পি সি বি মেড মি কনশাস অ্যাবাউট দ্য এগজিস্টান্স অব দিস ফর্ম। ও'র ছবি দেখে মনে হয়েছিল তাই তো এই ফর্মটার তো অনেক পারিসিটি আছে। আমি তখন একটা দোলাচল অবস্থার মধ্যে—কি করি, কি করি? এমনি সময় একটা ঘটনায় আমার ফিউচার কোর্স নির্ধারিত হয়ে গেল।

—৪৯ সাল। সামনে বি-এস-সি পরীক্ষা। প্রিপারেশন ভালই ছিল। হঠাৎ বসন্ত হওয়ায় আর পরীক্ষা দেওয়া গেল না। আর একবার যখন দেওয়াই হল না, তখন আর দ্বিতীয়বার বসার ইচ্ছা হোল না। ঠিক করলাম ফিল্মেই জয়েন করব।

—আমার এক মামা ফিল্ম ব্যবসার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত। ও'র একটা সুপারিশপত্র নিয়ে একদিন সোজা চলে গেলাম পার্ক সার্কাসে রূপশ্রী স্টুডিয়োতে। ক্যামেরার কাজ শিখব। অবজারভার হিসাবে চার-পাঁচ দিন স্টুডিয়োতে ঘোরাঘুরিও করলাম। কিন্তু সিনে টেকনিসিয়ানস অ্যাসোসিয়েশন বাদ সাধলেন। তাই আমার অবজারভার হিসেবে কাজ শেখা আর হোল না।

—ঠিক করলাম কিছুতেই লাইন ছাড়ব না। কিন্তু করি কি? তখন ফিল্ম পাবলিসিটির একটি সংস্থা 'অনুশীলন এজেন্সি'তে পাবলিসিটি অ্যাসিস্টান্ট হিসেবে জয়েন করলাম।

—'অনুশীলন' কাননদেবীর ছবির পাবলিসিটির কাজ করতেন। তখন ওদের থ্রুতেই আমি হরিদাস ভট্টাচার্যের অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে আবার লাইনে ফিরে এলাম। আর হরিদাসবাবুর ইউনিটে এসেই পরিচিত হলাম শচীন মুখার্জী ও দিলীপ মুখার্জীর সঙ্গে। পরে আমরা তিনজনে মিলেই গড়েছিলাম 'যাত্রিক' গোষ্ঠী। হরিদাসবাবুর আন্ডারে শচীনবাবু ছিলেন ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, দিলীপবাবু সেকেন্ড আর আমি থার্ড।

—ছুয়ান্ন থেকে আটান্ন, এই পাঁচ বছরে হরিদাসবাবুর ছবিতে কাজ করেছি আমি—নববিধান, দেবত্র, আশা, আঁধারে আলো, রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত।

—'রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত' ছবিটা করার সময়ই আলাপ হোল উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেনের সঙ্গে। ও'রাই আমাদের বার বার বলতে লাগলেন—এবার আপনারা একটা ছবি করুন না। সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিলেন। ও'দের প্রতিশ্রুতি সম্বল করে মিতালী ফিল্মসের সাহায্যের ভরসায় শেষ পর্যন্ত আমরা তিন অ্যাসিস্ট্যান্ট মিলে ছবি পরিচালনার দায়িত্ব নিলাম। 'যাত্রিক'—গোষ্ঠীর নামটা আমারই দেওয়া। ঠিক কিছু ভেবে চিন্তে নাম দিইনি। নামকরণের সময় সম্ভবত 'অগ্রদূত', 'অগ্রগামী' নাম দুটি আমাদের ইনফ্লুয়েন্স করেছিল।

—উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন—এ দুজনের কাছে আমরা আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। ও'রা সেদিন যেভাবে আমাদের সাহায্য করেছিলেন, তার কোন তুলনা হয় না। তখন ও'রা খ্যাতির শীর্ষে। ও'দের একটা ডেট পেলে যে কোন প্রোডিউসার বা ডিরেকটর বর্তে যেতেন। অথচ আমাদের কোন ঝামেলা পোহাতে হয়নি। ফিফটি নাইনে আমাদের প্রথম ছবি রিলিজ করল—'চাওয়া-পাওয়া'। প্রথম ছবিই হিট। সিলভার জুবিলী হোল।
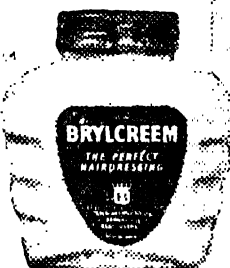
—পরের বছর আমরা করলাম—'স্মৃতিটুকু থাক।' এ ছবিও হিট। আবার সিলভার জুবিলী।

—নেকস্ট ইয়ার আমাদের তৃতীয় ছবি রিলিজ করল—'কাঁচের স্বর্গ।' এতদিন স্ক্রিপটিংয়ের ব্যাপারে আমরা বাইরের লোকের ওপরই নির্ভর করেছি। 'কাঁচের স্বর্গের' স্ক্রিপট আমাদেরই করা। কিন্তু যতই আমরা আত্মনির্ভর হতে শুরু করলাম ততই আমাদের নিজেদের ভেতরে অসুবিধা দেখা দিতে লাগল। আফটার অল শিল্পের ব্যাপারে বহুজন জড়িত থাকলেই কমপ্রোমাইজ করতে হয়। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে।

—'পলাতক' করার সময়ই আমরা নিজেরাই ফিল করলাম—আর না, একসঙ্গে ছবি করার দিন ফুরিয়েছে। আমরা কেউই নিজেদের ভেতরের কথাগুলো জোরের সঙ্গে ছবিতে তুলে ধরতে পারছি না। তাই গোটা দেশ যখন 'কাঁচের স্বর্গ' আর 'পলাতকের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ, ব্যবসায়িক দিক থেকে দুটো ছবিই যখন চূড়ান্ত সফল, ঠিক তখুনি 'যাত্রিক' ভেঙ্গে গেল।

—যাত্রিক থেকে বেরিয়ে আসার পর গত ছ বছরে বাংলা হিন্দী মিলিয়ে মোট ছখানা ছবি আমি করেছি—'আলোর পিপাসা', 'একটুকু বাসা', 'বালিকা বধূ', 'রাহগীর' (পলাতকের হিন্দী), 'কুহেলি' ও 'নিমন্ত্রণ।' চেন খালি না থাকার আগে শেষ হওয়া সত্ত্বেও কুহেলি এতদিন রিলিজ পায়নি। তবে শীগগিরই রিলিজ পাচ্ছে। নিমন্ত্রণ পরে উঠলেও আগেই রিলিজ পেয়েছে।

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ শেষ হতেই আবার কয়েকটা প্রশ্ন রাখলাম তনুবাবুর কাছে—

প্রঃ ফিল্মে বিশেষ কোন বক্তব্য আপনি রাখতে পছন্দ করেন কি?

উঃ নিশ্চয়ই। যে ভ্যালুগুলোকে আমি ব্যক্তিগত জীবনে দাম দিই, আমার ছবিতেও তারা রিফ্লেকটেড হোক তাই আমি চাই। নইলে শুধু ছবির জন্য ছবি করে লাভ কি। আফটার অল সিনেমা তো একটা পাওয়ারফুল মিডিয়াম যার সাহায্যে জনমত গঠন করা যায়। তবে কি জানেন, এ পথে ঝামেলা বিস্তর। একজন লেখক কাগজ-কলম সম্বল করেই স্বচ্ছন্দে এগোতে পারেন। আমরা পারি না। তার কারণ ফাইনান্স একটা বিরাট ফ্যাকটর। যে ভদ্রলোক কয়েক মাসের মধ্যে কয়েক লক্ষ টাকা ঢালতে এসেছেন তার কাছে আমরা অন্তত আমি নিজেকে মরালি কমিটেড মনে করি। তাছাড়া একজন সাহিত্যিকের আর একটা বড় অ্যাড-ভানটেজ থাকে—তার পাঠক সকলেই অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন। ছবিতে তার প্রয়োজন নেই। তাই আমাদের সর্বদাই লোয়েস্ট আর হাইয়েস্ট আই কিউ এর গ সা গু কষতে হয়। ফলে অনেক কথাই অতি সরলীকরণের ফলে হারিয়ে যায়। তবু আমি এই চেষ্টাটুকু অন্তত করি যাতে দর্শকের রুচি আর না নেমে যায়।

প্রঃ ছবি তৈরীর ব্যাপারে আপনি কি কারুর প্রভাব নিজের পরে অনুভব করেন?

উঃ কনশাসলি সর্বদাই অপরের প্রভাব এড়ানোর চেষ্টা করি। কিন্তু সত্যজিৎ রায়কে অস্বীকার করে এগোনোর কি উপায় আছে? আদতে বাংলা ফিল্মে ছবি কি ভাষায় কথা বলবে সে পথটা তো উনিই দেখিয়েছেন। বিদেশী মহাজনদের মধ্যে ত্রুফো আর বুনুয়েলের কাজ আমাকে ভীষণ ভাবে ভাবায়। অনেক সময় এ'দের কাজটাজ দেখে নিজের ওপরই প্রচণ্ড রাগ হয়। কি ছেলেমানুষী করছি। অন্তত এই তিনজনের কাছে আমার ঋণ চিরকালের।

প্রঃ আপনি কিভাবে একটা ছবি তোলেন?

উঃ গোড়াতেই গল্প বেছে নিই। সেই গল্পই বাছি যাতে নিজের বিশ্বাসের কথা প্রতিফলিত হয়। আর এ ব্যাপারে আমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। ধর্মতলা স্ট্রীট আমাকে ডিকটেট করে না।

গল্প বাছাইয়ের ব্যাপারটা মিটে গেলে স্ক্রিপটিংয়ে মন দিই। অনেকেই শুনেছি চার-পাঁচ দিনে স্ক্রিপট করে ফেলতে পারেন। কেউ কেউ তো শুনি রাতারাতি ব্যাপারটা সেরে ফেলেন। আমার সময় লাগে। স্ক্রিপট রেডি করে সুটিং স্ক্রিপটে হাত দিই। যদি কখনো মনে হয় যে পরে কোন জায়গার ভিসুয়ালাইজেশন ভুলে যেতে পারি, তাহলে চিত্রনাট্যের পাশেই স্কেচ করে রাখি (প্রসঙ্গত তনুবাবু ছবি মন্দ আঁকেন না)। তারপর বসি আমার সহকারীদের সঙ্গে ছবিটার সমস্ত দিক খুঁটিয়ে বিচার করবার জন্য। তারপর মিউজিক ডিরেকটরের সঙ্গে বসতে হয়। এভাবে প্রিপারেশনেই কেটে যায় প্রায় চার মাস।

তারপর সুটিং শুরু হলে গোটা ছবি গড়ে মাস চারেকের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। বাকী কাজ অর্থাৎ এডিটিং, রি-রেকর্ডিং ইত্যাদি ব্যাপারে আরো মাস দুই লাগে। অর্থাৎ একটা ছবি শেষ করতে আমার প্রায় দশ মাস লেগে যায়। আর এখানেই বলে রাখি আমি কখনো একটার বেশী ছবি একসঙ্গে করি না।

তনুবাবু, আর একটি মাত্র প্রশ্ন আপনাকে আমি করব—বাংলা ফিল্মের আর্থিক অবস্থা কি করলে, আপনি মনে করেন, ফিরতে পারে?

শত প্রশ্নেও পাওয়ারফুল লেন্স জোড়ার আড়ালে ঝকঝকে যে দুটি চোখ কখনো নিষ্প্রভ মনে হয়নি, এবার দেখলাম সেখানে গাঢ় অন্ধকার। শ্যামবর্ণ, মাঝারি ধরণের মানুষটি প্রতিটি প্রশ্নের জবাব খুব চটপট দিচ্ছিলেন এতক্ষণ, এবার ওঁর ঠোঁট-জোড়া সময় নিল খুলতেঃ আমরা আজ যেখানে পৌঁছেছি সেখান থেকে নিষ্কৃতির কোন পথই আমি দেখতে পাচ্ছি না। একে মার্কেট এত ছোট, তায় হিন্দীর ধাক্কা—বাংলা ছবির পয়সা উঠবে কোথ থেকে? তবু যদি রাজ্য সরকার অ্যামিউজমেন্ট ট্যাকসের চাপটা একটু কমাতেন। মাইশোরে গভর্ণ-মেন্ট বলে দিয়েছেন লোক্যাল কানাড়া ভাল ছবিকে তাঁরা সাবসিডাইজ করবেন। শুনেছি হায়দ্রাবাদে তেলেগু ছবিকেও এভাবে সাহায্য করা হচ্ছে। মহারাষ্ট্রে কমপালসারি স্ক্রিনিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে। আমাদের সরকার কি এর কোনটাই করতে পারেন না? বাংলা ছবি বিদেশ থেকে সম্মানের ডালি বয়ে আনবে, সেই ছবিকে যদি আমরাই না বাঁচিয়ে রাখি তো বাঁচাবে কে? মনে রাখবেন, দেড় যুগ আগে গড়ে বছরে পঞ্চাশ, পঞ্চান্নটা ছবি রিলিজ করত—এখন সেখানে বড়জোর বিশটা ছবি রিলিজ পায়। ভবিষ্যতে হয়তো এই সংখ্যা আরো কমে যাবে। তখন এই ইনডাসট্রিতে জড়িত হাজার হাজার টেক-নিসিয়ানরা যাবেন কোথায়? শাকের ওপর বোঝার আঁটির মত এই নব বেকারদের দায় সেদিন সরকার বইতে পারবেন তো? তাই এখুনি সরকারকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। ট্যাকস রিলিফ চাই। চাই কমপালসারি স্ক্রিনিং। সেই সঙ্গে সরকারকে অনুরোধ করব চিত্রপ্রদর্শনের গোটা ব্যাপারটাকে ন্যাশানালাইজ করতে। আর তা যদি সরকার করতে পারেন তাহলে মুমূর্ষু বাংলা ফিল্ম ইনডাসট্রি বাঁচলেও বাঁচতে পারে।

—রাজীবেন্দু

ছেলেবেলায় জটিলেশ্বরবাবুকে তার বাবা বলতেন, দ্যাখো জটি, আমার ত বয়স হোল। কবে আছি, কবে নেই জানি না। তবে যেখানেই থাকি না কেন, তোমাকে বড় হতেই হবে। আমার চেয়েও বড়। আর তার জন্য রয়েছে আমার এতবড় বিজনেস। তোমার বড় হবার রাস্তা।

জটিলেশ্বরবাবু অবাক হয়ে তাকাতেন তার দিকে। জিজ্ঞেস করতেন, কিন্তু কি করে বড় হব বাবা।

অম্বিকাবাবু ভ্রূ কুঁচকে বলতেন, কেন এ ত খুবই সোজা। তবে হ্যাঁ ধৈর্য ধরতে হবে। ধৈর্য ধরে এই কঠিন পরীক্ষায় এগুতে হবে। তবেই সাকসেস আসবে। শুধু মনে রাখবে তোমাকে বড় হতেই হবে। আর তাই প্রতিটি মুদ্রা ব্যয় করবার আগে তোমাকে ভাবতে হবে তুমি ওটা ঠিক কাজে লাগাচ্ছ কিনা। অর্থাৎ অর্থকে ভালো করে চিনতে শিখবে। মানি, স্টার্লিং, ডলার, রুবল এসব থাকবে তোমার হাতের মুঠোয়। অর্থ না হলে তোমায় চিনবে না যে কেউ—।

এসব জটিলেশ্বরবাবুর ছেলেবেলার কথা। জটিলেশ্বরবাবু তখন সবে কলেজ-লাইফ ডিঙিয়েছেন। আর তার বাবা সে-সময় থেকেই হাতে-কলমে ছেলেকে সব শেখাতে আরম্ভ করেছিলেন। মাঝে মাঝে ছেলেকে কাছে ডেকে বলতেন অম্বিকাবাবু, আনন্দ-স্ফূর্তি করতে চাও কর। তোমাদের মত ইয়ং এইজ-এ আমরাও আনন্দ করেছি। কিন্তু মনে রেখো আনন্দে ডুবে গিয়ে বড় হবার কথা ভুলে যেও না।

তা জটিলেশ্বরবাবু বাবার স্বপ্ন স্বার্থক করে তুলেছেন। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। শুধু প্রতিষ্ঠিতই নয়। নাম-যশ দু'হাতে কুড়িয়েছেন। নতুন নতুন উপাধি পেয়েছেন। আর দুহাতে অর্থ লুটেছেন। রাশি রাশি অর্থ। কত যে, তার হিসেবও বুঝি নেই ঠিক। এক নজরে বলতে পারবেন না তিনি। শুধু দু' হাতে অর্থ কুড়িয়েছেন আর মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স করে তুলছেন। অর্থ কুড়োতে কুড়োতেই তার জীবনের ছাপান্নটা বছর কেটে গেছে। কানের গোড়ায়, মাথার পেছনের চুলে রীতিমত সাদা রং ধরেছে, অথচ তার খেয়াল নেই। সেই কবে এক শীতের রাতে 'স্ট্রোক' হয়ে বাবা মারা গেছেন, তাও তার ঠিক মনে পড়ে না। শুধু অর্থের নেশাতেই দিনগুলো তার হু-হু করে কেটে গেছে।

আর ভাবতে পারলেন না জটিলেশ্বর-বাবু। ভোলা এসে খবর দিল, বাবু, আপনাকে বাগানে সবাই খুঁজছে।

চমকে উঠলেন স্যার জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। আরে তাইত। কখন যেন ছটা বেজে গেছে, তার খেয়াল নেই। অথচ আজ যে তার ফিফ্‌টি-সিক্‌থ্‌স্‌ বার্থ-ডে। সন্ধ্যে ছটায় ককটেল পার্টি। কিন্তু তিনি নিজেই বেহিসেবী হয়ে পড়েছেন। ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়লেন জটিলেশ্বরবাবু।

ততক্ষণে বেয়ারা চলে গেছে। জটিলেশ্বর-বাবু মিনিটের মধ্যেই তৈরী হয়ে নিয়ে ব্যালকনি থেকে দেখলেন, ওরা সবাই এসে গেছে।—মিঃ সমাজপতি, মিসেস পাকড়াশী, মিঃ ঘুটঘুটিয়া, মিঃ আগরওয়ালা, মিঃ আয়ার, মিসেস চোপরা, মিসেস মালিয়া ইত্যাদি আরো অনেকে। কিন্তু বীরেন কই? বীরেন ত এল না? অথচ বারবার তিনি এত করে বলে দিলেন।

ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেলেন জটিলেশ্বরবাবু।

বেশ রাত হয়ে গেছে। ককটেল পার্টি থেকে সবাই একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। শূন্য বাগানটার চারদিকে শেষবারের মত তাকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেন জটিলেশ্বরবাবু।

ভ্যাপসা গরমের রাত। মাঝে মাঝে ব্যালকনিতে মৃদু বাতাস বইছিল। টাইয়ের নটটা আলগা করে দিয়ে একটা চুরুট ধরিয়ে বেশ আরাম করে সোফায় গা এলিয়ে দিলেন তিনি।

আস্তে আস্তে চুরুটে কয়েকটা টান দিতেই হঠাৎ আবার বীরেনের কথা মনে পড়ল। আশ্চর্য! সবাই এল। কিন্তু বীরেন একবার এল না। তবে কি ও ভুলে গেল। —নাঃ তা ত হবার কথা নয়। তিনি ত ওকে গতকাল বারবার বলেছিলেন আসতে।

তা তখন প্রায় সন্ধ্যেই হবে। সবে সারাদিনের পরে রোদের তাপে ঝলসে যাওয়া শহরটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। গাড়ীতে পেছনে বসে জানলা দিয়ে শহরটাকে দেখতে দেখতে ফিরছিলেন জটিলেশ্বরবাবু। হঠাৎ ধর্মতলার মোড়ে এসে রেড সিগন্যালের জন্য মৃদু শব্দ তুলে দাঁড়িয়ে পড়েছিল গাড়িটা। আর ঠিক তখনই বাইরে ফুটপাতের দিকে তাকিয়ে একটু চমকে উঠেছিলেন তিনি। কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে না? গলাটা একটু বাড়িয়ে ভালো করে তাকাতেই কলেজ লাইফের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বীরেনকে চিনতে পারলেন।

পরণে ধুতি-পাঞ্জাবি। ডান হাতটা কোমরে রেখে বাঁহাতে সিগারেট টানতে টানতে একটা ঝোলা ব্যাগ কাঁধে নিয়ে রাস্তা পার হবার জন্য বীরেন তখনো দাঁড়িয়েছিল। সহসা মনটা খুব খুশী হয়ে উঠল জটিলেশ্বরবাবুর।—আঃ কতদিন পরে এক-জন ছেলেবেলার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল।

ড্রাইভার বীর সিংকে গাড়ী পার্ক করতে বলেই একটু পরে তিনি নেমে পড়লেন। পায়ে পায়ে হেঁটে গিয়ে বীরেনের তন্ময়তা ভাঙ্গালেন—হ্যালো, বীরেন না? কেমন আছিস?

একটু চমকে উঠে সামনে ভালো করে তাকাতেই জটিলেশ্বরবাবুকে চিনতে পারল বীরেন। আরে জটি তুই। কি খবর বল?

হাসলেন জটিলেশ্বর। বললেন, এই ত আছি। তা তুই কি করছিস আজকাল? কোথায় আছিস?

মৃদু হেসে বীরেন বলল, এতদিন দিনাজপুরে এক কলেজে প্রফেসারি করতুম। এখন কলকাতায় আছি।

জটিলেশ্বর বলে ওঠে, বাঃ ভালই আছিস তাহলে। তা চল না বসে একটু কথা বলা যাক উফ্‌, কত বছর পরে দেখা হল বলত!

জটিলেশ্বরকে দেখে বীরেনও কম খুশী হয় নি। আবার অবাকও হয়েছিল যে এত বছর পরে জটিলেশ্বরের মত নামী ব্যক্তিও কবেকার বন্ধুত্বটাকে মনে রেখেছে। খুব ভাল লাগছিল বীরেনের। কতবছর পরে তবু একজন ঘনিষ্ঠ পুরোনো বন্ধুর দেখা পেল। ও, জটি, পূর্ণেন্দু, শ্যামল— আহ্‌ কলেজ-লাইফের সেই দিনগুলো ছিল কি রোমাঞ্চকর। সত্যি, আজ ভাবতেও অবাক লাগে ওর সেইসব দিনগুলো কেমন করে হারিয়ে গেল।

ফিরপোর বারান্দায় মুখোমুখি এসে বসল দুজনে। বীরেনের মনে তখন ভাসছিল কলেজ লাইফের মধুর দৃশ্যগুলো। ভরা আনন্দে ও বলল, আচ্ছা জটি, তোর মনে আছে সেই একবার শ্যামল বাজী রেখে এম জি এস-এর মত গম্ভীর প্রফেসরকেও কি হাসিয়েছিল।

—সত্যি, শ্যামলটা না? মৃদু হাসে জটিলেশ্বর।

—আচ্ছা, শ্যামলের সঙ্গে দেখা হয়? বীরেন জিজ্ঞেস করে।

—নুনা, সবাই যে যার কোথায় যে সরে পড়ল, কে জানে!

বীরেনের মুখে খেলা করছিল গাঢ় সন্ধ্যের আলো। ফিরপোর ব্যালকনি দিয়ে ময়দানের উপরের খইয়ের মত তারাফোটা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল বীরেন।

জটিলেশ্বর শুধোল, তুই কলকাতায় কোথায় আছিস?

বীরেন বলল, সাউথের দিকে—ঢাকুরিয়ায়। একদিন সময় করে আয় না?... আচ্ছা জটি, তুই বিয়ে করেছিস নিশ্চয়ই—

হঠাৎ আনমনা হয়ে গেল জটিলেশ্বর। আস্তে আস্তে বলল, নারে এখনো সময় হয়েই উঠল না?...তুই?

হাসল বীরেন। বলল, হ্যাঁ রে আমি এক ঘোরতর সংসারী। আমার ছেলে এবার স্কলারশিপ নিয়ে জার্মাণী গেল আর মেয়ে এবার এম-এ দেবে।

—তুই ত বেশ ভালই আছিস দেখছি।

—তা মন্দ নয়। ভালই লাগছে। বীরেন মৃদু মৃদু হাসে।

ধীরে ধীরে রাত বাড়তে থাকে। হাতের কব্জিতে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বীরেন জটিলেশ্বরের দিকে তাকায়। জটিলেশ্বর বলল, কাল সন্ধেয় বাড়ীতে একটা ছোট্ট পার্টি দিচ্ছি বীরেন। আমার ফিফটি-সিক্স বার্থ-ডে। তুই কিন্তু অবশ্যই আসবি। ঠিক সন্ধে ছটায়। আসবি ত?

—যেতেই হবে!

—হোয়াট। জটিলেশ্বর মৃদু ধমকে উঠল বীরেনকে, এতদিন পরে দেখা। আর তুই আমার বাড়ীতে আসবি না। না না তুই আসবি—য়ু মাষ্ট কাম।

—আচ্ছা আচ্ছা নিশ্চয়ই যাব আমি।

কখন যেন চুরুটটা নিভে গেছে। ভাবতে ভাবতে এতক্ষণ আনমনা হয়ে গিয়েছিলেন জটিলেশ্বরবাবু। চুরুটটা আবার ধরিয়ে টানতে লাগলেন। ভাবলেন, এত করে তিনি বললেন, তবুও বীরেন এল না! কি জানি কিছু হয়েছে কিনা। নাঃ—কালই একবার কলেজে গিয়ে ও'র খোঁজ করবেন।

অনেক রাত হয়ে গেছে। এতবড় বাড়ীটায় কোন সাড়াশব্দ নেই। ভোলা বোধ হয় নীচেই ব্যস্ত। আস্তে আস্তে উঠলেন জটিলেশ্বরবাবু। পোশাক ছেড়ে টয়লেটে গিয়ে ভাল করে ঘাড়ে মাথায় ঠাণ্ডা জল দিয়ে স্লিপিং ড্রেস পরে বেরিয়ে এলেন। তারপর বিছানায় আধশোয়া হয়ে দুটো স্লিপিং পিল খেয়ে আস্তে আস্তে ক্লান্তিতে চোখ বুজলেন।

পরেরদিন দুপুরবেলাই বেরিয়ে পড়লেন তিনি। কলেজে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলেন বীরেন অসুস্থ। কলেজে আসে নি। হঠাৎ বীরেনের আবার কি হল? জটিলেশ্বর-বাবু একটু চিন্তা করে কলেজ থেকে ওর অ্যাড্রেসটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

বীরেন অসুস্থ। হয়ত এখন ওর স্ত্রী ওর দেখাশুনা করছে। সময়মত ওষুধ দিচ্ছে, ফলের রস বা হর্লিকস খাওয়াচ্ছে আবার কখনোও বা মাথায় চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে। নাঃ বীরেন বেশ সুখেই আছে। অথচ জটিলেশ্বরবাবু? জীবনের ছাপ্পান্ন বছরে এসেও তিনি সংসারী হতে পারলেন না। এতবড় জীবনটা তার শুধু অর্থের নেশাতেই কেটে গেল।

মনে পড়ল জটিলেশ্বরবাবুর, কলেজ লাইফে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবেই কেয়ার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। কি করে পরিচয় হয়েছিল তা আজ আর ঠিক মনে পড়ে না তার। কেউ জানতেও পারেনি। তবে আস্তে আস্তে কেমন যেন একটা অন্যমনস্ক হয়ে বসে-

ছিল তাকে। দু'চোখে তখন তার যৌবনের রঙীন চশমা। তাই দেখামাত্রই কেমন যেন একটা ভাললাগায় পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। মনটা তখন তার এক বিশুদ্ধ আলোয় ভরে গিয়েছিল। ভেবেছিলেন, এমন মুহূর্তটি সব মানুষের জীবনেই আসে না কেন, তবে ত সবাই কেমন সুন্দর হয়ে ওঠে।

সেই ভাললাগা আস্তে আস্তে গাঢ় হয়ে উঠেছিল। জীবনটাকে তার রোমাণ্টকর বলেই মনে হয়েছিল। অনেক শীতের নরম দুপুরে, অনেক বিকেলের সোনালী আলোয়, অনেক ঝলমলে শান্ত সন্ধ্যায় তিনি কেয়ার সংগে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আর এভাবেই কেয়াকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। কেয়া ছাড়া সেদিনগুলোতে নিজেকে তিনি ভাবতেও পারতেন না।

অম্বিকাবাবু লক্ষ্য করেছিলেন ছেলের পরিবর্তনটা। তবু কিছু বলেন নি। কিন্তু একদিন রেড রোড ধরে ফেরবার সময় তিনি দেখেছিলেন ছেলে তার একটি মেয়েবন্ধুর সংগে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে হাসতে হাসতে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা তার চোখে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। সেদিন বাড়ী ফিরে অনেকক্ষণ চিন্তা করেছিলেন। তারপর পরেরদিনই ছেলেকে ডেকেছিলেন—শোন.—

তা জটিলেশ্বর তখন সবে কলেজে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে, বাবার ডাকে একটু দাঁড়াল। অম্বিকাবাবু ওর মুখোমুখি তাকিয়ে বলেছিলেন, কাল গাড়ী নিয়ে কলেজে যাও নি?

—না, মানে এক বন্ধুর সংগে—ইতস্ততঃ করতে লাগল জটিলেশ্বর।

—তা বন্ধুর সংগে গিয়েছিলে, গাড়ী নিতে কি অসুবিধে হয়েছিল। ওভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো—! তা বন্ধুটি কে? তোমার সংগে পড়ে বুঝি?

ধরা পড়ে গেছে বুঝতে পেরে চুপ করে রইল জটিলেশ্বর। কিন্তু অম্বিকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করতেই আস্তে আস্তে বলে ফেলল, না আমরা একসংগে পড়ি না। ওর অন্য কলেজ।

উকিলের মত জেরা করে বসেছিলেন অম্বিকাবাবু, তার নাম কি?

মাথা নীচু করে খুব নীচু স্বরে বলল জটিলেশ্বর, কেয়া।

আর কোন ভূমিকা না করেই হঠাৎ অম্বিকাবাবু খুব মোলায়েমকণ্ঠে ছেলেকে বললেন, তাকে একবার নিয়ে এস ত? একবার কথা বলে নোব আমি।

ভুলই বুঝতে পেরেছিল সেদিন জটিলেশ্বর। ভেবেছিল, বাবা হয়ত কেয়াকে মনে মনে পছন্দ করেছেন। তাই সেদিনই কেয়াকে বলেছিল, তোমাকে একবার আমাদের বাড়ীতে যেতে হবে কিন্তু।

গ্রীবা বেঁকিয়ে চঞ্চল চোখে জিজ্ঞেস করেছিল কেয়া, কেন বল ত? ইনভিটেশন্?

না মানে—কেয়ার দিকে হেসে তাকিয়ে উত্তর দিয়েছিল জটিলেশ্বর, তোমাকে একবার আমার বাবা বাড়ীতে নিয়ে যেতে বলেছেন। তোমার সংগে কথা বলবেন।

—ওরে বাব্বাঃ। হঠাৎ ভয় পেয়ে গিয়েছিল কেয়া।—তোমার বাবার সামনে আমি যেতে পারব না। যা নার্ভাস হয়ে পড়ি আমি।

আরে না—না কোন ভয় নেই। আশ্বাস দিয়েছিল জটিলেশ্বর, বাবা আমাদের দু'জনের সম্পর্কের ব্যাপার নিয়ে হয়ত কিছু বলবেন। হয়ত তোমাকে—

তা যা ভেবেছিল জটিলেশ্বর তা নয়। অম্বিকাবাবু কেয়াকে বসিয়ে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। এবং শেষপর্যন্ত বলে দিয়েছিলেন, সবই ত শুনলে তুমি। শুধু আমার একটা রিকোয়েস্ট তুমি ওর সংগে মিশো না। ওকে অনেক বড় হতে হবে। ডোণ্ট ডিসটার্ব হিম।

ঐ কথাই ছিল যথেষ্ট। আর বসে থাকেনি কেয়া। মাথা নীচু করেই বেরিয়ে আসতে হয়েছিল তাকে। আর জটিলেশ্বর! মনে মনে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠলেও বাবার সামনে কিছু বলে উঠতে পারে নি।

সেই শেষ। আর কেয়ার সংগে কোনদিন দেখা হয়নি। প্রথম প্রথম খোঁজ নিয়েছিলেন, কিন্তু কেয়ার দেখা পাননি। অনেক গোপন দুঃখ এসে জড়িয়ে ছিল তার মনে, অনেক স্মৃতির রোমন্থনে অনেক গভীর রাতে কান্না এসেছিল তার। কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে কবে থেকে যে কেয়ার মুখটাই তার মনের পর্দা থেকে মুছে গেল আজ আর তা মনে পড়ে না জটিলেশ্বরবাবুর। সেদিনগুলো যে কিভাবে কেটে গেছে তাও ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না তিনি।

তারপর থেকে বাবার সংগে সংগে থেকে অন্যরকম হয়ে গিয়েছিলেন জটিলেশ্বরবাবু। অর্থ কুড়োবার নেশায় পেয়ে বসেছিল তাকে। জীবনের মূল্যবোধকে অর্থের অংকে ফেলে ঢেলে সাজিয়েছিলেন।

আজকাল মাঝে মাঝেই মনে হয় তিনি বোধহয় জীবনের হিসেবনিকেশেই এক মস্ত ভুল করে বসে আছেন। এক একসময় এতবড় বাড়ীটায় তিনি হাঁফিয়ে উঠেন। কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয় তাঁর। বড়ই নিঃসংগ লাগে। দিনের আলোয় তবু কেটে যায় অফিসের কর্মব্যস্ততার মধ্যে। কিন্তু নিশুতি রাতটা? কিছুতেই কাটতে চায় না তার। তার উপর যদি একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারতেন! তার মালটিপারপাস বিজনেসের খুঁটিনাটি চিন্তা তাঁকে অস্থির করে তোলে। মাঝে মাঝে অকারণেই দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে ওঠেন। শেষপর্যন্ত রোজই শ্লিপিং পিল খেয়েই ঘুমোতে হয়।

একটা গলির মুখে এসে গাড়িটা থেমে গেল। গলির ভেতরে আর যায় না। অথচ বীরেনের বাড়ী অ্যাড্রেসানুযায়ী আর একটু ভেতরে। ড্রাইভার বীর সিংকে অপেক্ষা করতে বলে গাড়ী থেকে নামলেন, জটিলেশ্বর বাবু।

সরু গলি। দু'ধারে নর্দমা থেকে পচা নোংরা তুলে রেখেছে কর্পোরেশনের কুলীরা। মাছি ভনভন করছে, অসংখ্য মশা। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে কোনরকমে জুতো বাঁচিয়ে এগিয়ে গেলেন জটিলেশ্বরবাবু।

গলিটার শেষপ্রান্তে করোগেটের শেডের চাল দেয়া ছোট্ট একতলা পুরোন বাড়ীটার গায়ে লেটারবক্স ঝুলানো। তার গায়ে কবেকার রং দিয়ে লেখা বাড়ীর অ্যাড্রেস। একটু ভাল করে মিলিয়ে নিয়ে কড়া নাড়লেন তিনি।

একটু পরে দরজা খুলে যেতেই হঠাৎ ভূত দেখার মতই চমকে উঠলেন জটিলেশ্বরবাবু। ফেলে আসা দিনের অনেক জটিলতার মধ্য থেকেও সেই মুখটি অনায়াসেই ভেসে উঠল তাঁর মনে। হুবহু সেই মুখ, সেই চোখ, এমনকি চিবুকের উপর সেই তিলটি পর্যন্ত এক। হঠাৎ মুখ ফসকে তার বেরিয়ে এল, একি তুমি?

দরজা খুলে সামনে জটিলেশ্বরবাবুকে দেখে কেয়াও ঠিক চিনতে পেরেছিল। আর সহসা সেই মুহূর্তে কেমন একটা অচেনা ভয়ে বুকটা ঢিপঢিপ করছিল। আবার এতবছর পরে হঠাৎ ওকে দেখে একটু অবাকও হয়েছিল। জটিলেশ্বরবাবুর প্রশ্নে মৃদু হেসে বলল, কেন অবাক হলে!

—না মানে—ফিসফিস করে বললেন জটিলেশ্বরবাবু, এখানে তোমাকে এতবছর পরে দেখব বলে ত ভাবিনি, তাই অবাক হয়ে গেছি। বীরেন আমার—

—বন্ধু! মুখের কথাটি কেড়ে নিয়েই জবাব দিল কেয়া, আমি জানি, ওর মুখে তোমার অনেক প্রশংসা শুনেছি।

—ওঃ! ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেললেন জটিলেশ্বরবাবু। কেয়া দরজার পাশে একটু সরে গিয়ে বলল, ভেতরে এসো।

ছোট্ট একচিলতে ঘর। নিখুঁত পরিপাটি করে সাজানো। সমস্ত ঘরটার চারদিকেই কেমন একটা লক্ষ্মী লক্ষ্মী ভাব। দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়।

আস্তে আস্তে বীরেনের কাছে গিয়ে বসলেন জটিলেশ্বরবাবু। ওর চুলের গোড়ায় কপালের উপর হাত রেখে বললেন, এখন কেমন আছিস বীরেন?

—কে? অস্ফুটকন্ঠে জিজ্ঞেস করেই চোখ খুলল বীরেন। তারপর ওকে দেখে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, ও জটি তুই? আমি ত ভাবতেই পারছি না যে তুই আমার বাড়ীতে?

—তুই ত আমার ওখানে গেলি না। ভাবলাম, কি জানি, কি হল? তাই—

—গতকাল থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছি। জ্বরটা এখনো কমেনি। সারা বুকে বেশ ব্যথা। ডাক্তার বলছে, সর্দি বসে গেছে।

—হ্যাঁ, এটা ওয়েদার চেঞ্জিংয়ের টাইম ত?

ইতিমধ্যে কেয়া চা এনে জটিলেশ্বরের সামনে রাখলে। চোখ তুলে একবার কেয়াকে দেখলেন জটিলেশ্বর। বীরেন ওর সংগে কেয়ার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, কই কল্যাণীকে দেখছি না কেয়া। ফেরেনি বোধহয়?

—না, এইমাত্র ফিরেছে, কেয়া উত্তর দিল।

বীরেন বলল, এদিকে দ্যাখ না সামনের ফিফটিনথ্‌ মেয়ের বিয়ে। সব ঠিক হয়ে আছে। অথচ—

কল্যাণী ঘরে ঢুকতেই বীরেন ডাকল, কনি এদিকে একবার আয় ত মা! এই যে জটি, আমার মেয়ে কল্যাণী। এবার ইংলিশে এম-এ দেবে। ওরই বিয়ে। ছেলেটি খুব ভালো। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অফিসার।

কল্যাণী মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। কেয়া বলল, কই কনি, ওঁকে প্রণাম করো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ প্রণাম কর মা—বীরেন আস্তে আস্তে বলে উঠল, ইনি তোর জটিলেশ্বরকাকু।

—থাক্‌, থাক্‌—দুহাতে তুলে ধরলেন জটিলেশ্বরবাবু। বললেন, উইশ ইংয়ার লঙ্‌ লাইফ এ্যান্ড ব্রাইট ফিউচার কল্যাণী। তা তোমার ত বিয়ে। কই, এই বুড়োকে ত একবার ইনভাইট্‌ করলে না মা?

লাজুকমুখে ছোট্ট করে হাসল কল্যাণী। বলল, বারে কেন করব না! আর সেদিন বসে বসে বাপীর মুখে আপনার অনেক গল্প শুনলাম। আপনাকে আবার ইনভাইট করতে হবে কেন?

কল্যাণীর কথায় হেসে উঠলেন জটিলেশ্বরবাবু। বললেন, নাঃ তোর মেয়েটি খুব চালাক বীরেন।

কথায় কথায় বিকেল হয়ে আসে। জটিলেশ্বরবাবু উঠে পড়েন। সদর দরজার কাছাকাছি আসতেই পেছন থেকে কেয়া ডাকে, শোন—

ফিস্‌ফিস্‌ করে তারপরে বলে, কাগজে প্রায়ই তোমার নাম দেখি। অনেক বড় হয়েছ তুমি, বড় বড় উপাধি পেয়েছ। তোমার বাবা যা চেয়েছিলেন তার চেয়েও অনেক বড় হয়েছ। অথচ সংসারী হও নি কেন?

মলিন হেসে কেয়ার দিকে তাকালেন জটিলেশ্বরবাবু। বললেন, জান কেয়া, সময়ের স্রোতের সংগে পাল্লা দিয়ে এতগুলো বছর শুধু ভেসেই এসেছি। দুপাশে ডাঙগার দিকে তাকিয়ে আশ্রয়ের কথা একবারও মনে হয়নি। ভাসতে ভাসতে ছাপ্পান্নর ঘাটে এসে আজ হঠাৎ তাকিয়ে কেন জানি অবাক হয়ে দেখলাম, জনশূন্য ঘাট। কেমন নিঃঝুম। কেউ অপেক্ষা করে নেই। মনটা সহসা বড় খারাপ হয়ে গেল। অনুভব করলাম, কি যেন একটা হারিয়ে গেছে আমার। আর তা ফিরে পাব না।

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কেয়া। সামনের দীর্ঘ মানুষটাকে ওর নিঃসঙ্গ বলেই মনে হল।

বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন জটিলেশ্বরবাবু। হঠাৎ খেয়াল হতেই আস্তে আস্তে কেয়ার সামনে দিয়ে চলে গেলেন। পেছনে তখনো তাকিয়ে রইল কেয়া।

সে রাতে আর কিছুতেই ঘুম এল না জটিলেশ্বরবাবুর। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুধু যন্ত্রণায় ছটফট করলেন। তারপর গভীররাতে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। ফ্রিজ থেকে এক গ্লাস জল নিলেন। তারপর ড্রয়ার থেকে স্লিপিং পিলের শিশিটা বার করে একের পর এক খেয়ে চললেন।

রাত তখনো বেশ ঘন। ফর্সা হতে দেরী আছে। আকাশের গায়ে ফুটফুটে খইয়ের মত তারা। রাস্তার ডাস্টবিনের পাশে কুকুরের ক্ষীণ চীৎকার শোনা যাচ্ছে। আর বহুদূর থেকে ভেসে আসছে কোন্‌ বিয়েবাড়ীর অস্পষ্ট সানাইয়ের সুর।

সালিয়ুতের সঙ্গে সয়ুজ-১১ জোড়-বাঁধার আগে
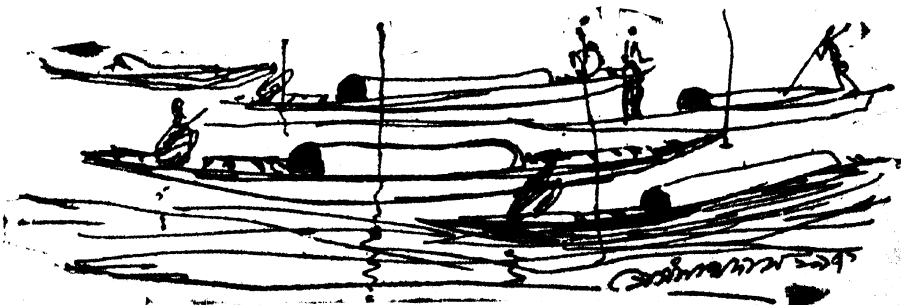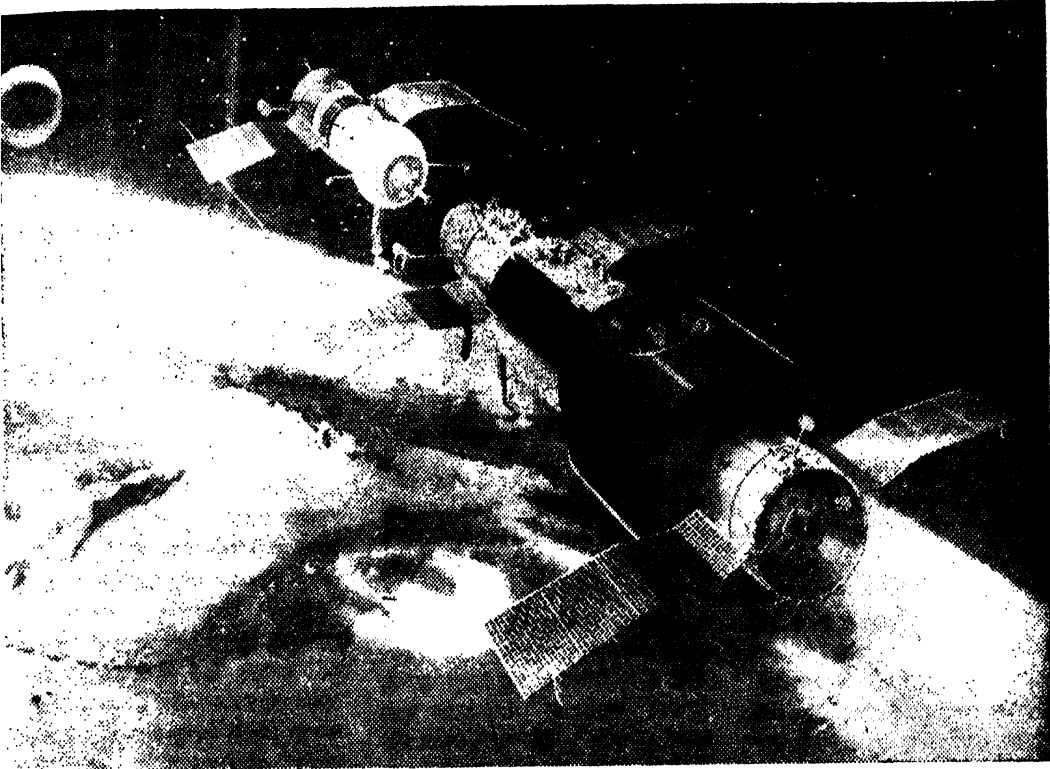
সালিয়ুৎ ও সয়ুজের জোড়-বাঁধায় আশ্চর্য এক ভবিষ্যতের সূচনা

টোরিসেলিকে যদি কেউ প্রশ্ন করত, আপনার এই ভ্যাকুয়াম মনুষ্যজাতির কোন্ উপকারে লাগবে? আর টোরিসেলি যদি জবাব দিতেন, আমার এই ভ্যাকুয়াম থেকেই পাওয়ার ইঞ্জিন ও টেলিভিশনের সূত্রপাত, তাহলে সেদিন কেউ সেকথা বুঝতে পারত না। সালিয়ুতের সঙ্গে সয়ুজের জোড়-বাঁধা এবং সয়ুজের মহাকাশচারীর সালিয়ুতে গিয়ে আস্তানা নেওয়ার ঘটনার তাৎপর্যও আজকের দিনে তেমনি আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। এই ছোট্ট ঘটনার মধ্যেই বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ এক ভবিষ্যতের, এমনকি সম্পূর্ণ নতুন এক যুগের সূত্রপাত হল বলা চলে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা তোলার আগে টোরিসেলির ভ্যাকুয়াম কথাটা স্পষ্ট করে নিই।

টোরিসেলির ভ্যাকুয়াম

ইতালীয় পদার্থবিজ্ঞানী ই টোরিসেলি (১৬০৮-১৬৪৭) ছিলেন গ্যালিলিওর ছাত্র। ১৬৪৩ [illegible] একটি অভিনব পরীক্ষাকার্যের সাহায্যে আমাদের মাথার ওপরকার বাতাসের ওজন মেপেছিলেন। প্রকাণ্ড একটি কাঁচের নলের একদিক ছিল বন্ধ, একদিক খোলা। নলটি জলে ভর্তি ছিল। বন্ধ দিকটি ওপরে রেখে নলটি ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল একটি জলভরা পাত্রের মধ্যে। দেখা গেল, পাত্রের জলের উপরিতল থেকে নলের জলের উচ্চতা দাঁড়াচ্ছে প্রায় ১০ মিটার। তার ওপরের অংশে নলটি ফাঁকা বা শূন্য (নলের ওপরের মুখ বন্ধ, কাজেই বাতাসও ঢুকতে পারেনি, অর্থাৎ প্রকৃত অর্থেই শূন্য)। নলের ওপরের অংশের এই শূন্যতাকে বলা হল টোরিসেলির শূন্যতা বা ভ্যাকুয়াম। এই যে খাড়া নলটির মধ্যে দশ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে জল ধরা রইল, এ থেকেই মাথার ওপরকার বাতাসের ওজন সম্পর্কে একটা মাপ পাওয়া যাচ্ছে। এখানে মনে রাখা দরকার, বাতাসের যে ওজন আছে, এ খবর কিন্তু আগেই জানা ছিল। টোরি-[illegible] এই ওজনের একটা মাপ নেবার ব্যবস্থা। আমরা সবাই জানি এই পরীক্ষাকার্যের ভিত্তিতে যে যন্ত্রটি তৈরি হয়েছে তার নাম ব্যারোমিটার বা বায়ুমানযন্ত্র। এই যন্ত্রে কিন্তু নলের মধ্যে জল থাকে না, থাকে পারদ, যা জলের চেয়ে সাড়ে তের গুণ বেশি ভারী। তার মানে নলটির এবারে আর দশ মিটার লম্বা হবার প্রয়োজন নেই, তার চেয়ে সাড়ে তের ভাগ কম হলেও চলে। জলের বদলে পারদ ব্যবহার করতে দেখা গেল পাত্রের পারদের উপরিতল থেকে (পাত্রটিও এবারে জলের নয়, পারদের) নলের মধ্যে পারদের উচ্চতা মাত্র ৭৬ সেন্টিমিটার। আরো একটি কথা, পৃথিবীর মাটি ছাড়িয়ে যতোই উঁচুতে ওঠা যায়, ততোই মাথার ওপরকার বাতাস হালকা হতে থাকে, ততোই তার ওজন কমে। ফলে পারদের উচ্চতাও কমতে বাধ্য। হিমালয়ের চূড়োয় বাতাসের ওজন এতই কম যে পারদের উচ্চতা হয়ে দাঁড়ায় ২৮ সেন্টিমিটার, ১০ কিলোমিটার

মার্কিন বিজ্ঞানীদের 'স্কাইল্যাব'—কক্ষপরিক্রমারত কারখানা
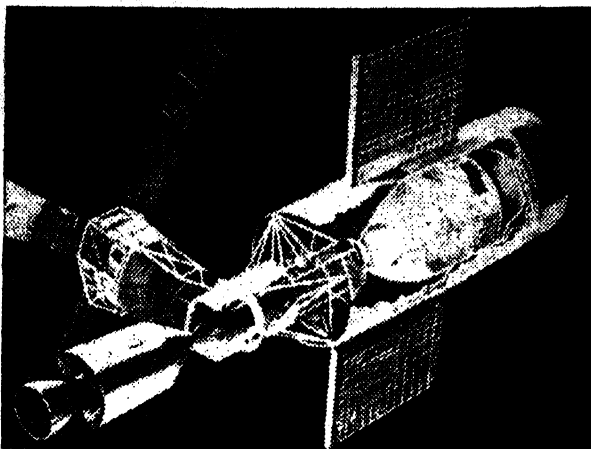
উঁচুতে মাত্র ১২ সেণ্টিমিটার। জেনে রাখা ভালো, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মোট ওজন : একের পরে পনেরোটি শূন্য বসালে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায়, তাকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে যতো হয়, ততো টন, অর্থাৎ পঞ্চাশ কোটি কোটি টন। ভূপৃষ্ঠের প্রতি বর্গ-সেণ্টিমিটারে হিসেব করলে এই ওজন দাঁড়ায় এক কিলোগ্রাম। যাই হোক, বাতাসের এই প্রচণ্ড ওজন আছে বলেই নলের মধ্যে দশ মিটার উঁচু পর্যন্ত জল ধরে রাখা চলে। তাহলে তো এ থেকে নিচে থেকে ওপরে জল টেনে তোলারও একটা উপায় পাওয়া যাচ্ছে। এই উপায়টিরই নাম ভ্যাকুয়াম পাম্প। নলের মধ্যে যান্ত্রিক উপায়ে শূন্যতা বা ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি করার একটা ব্যবস্থা করতে হয়, তাহলেই যে-জলের মধ্যে নলটি ডোবানো রয়েছে সেই জল নলের ভিতর দিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করে। সাধারণ একটা হাতলের সাহায্যে ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি করেও এমনিভাবে দশ মিটার পর্যন্ত জল টেনে তোলা সম্ভব।

টোরিসেলি যদি সেদিন বলতেন, তাঁর এই ভ্যাকুয়াম পাম্প থেকেই পাওয়ার ইঞ্জিন ও টেলিভিশনের উৎপত্তি, তাহলে কথাটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হত কি?

সালিয়ুতের সঙ্গে সয়ুজের জোড়-বাঁধার মধ্যেও এমনি এক আশ্চর্য ভবিষ্যতের সূচনা হয়েছে।

মহাশূন্যের আস্তানা

সালিয়ুতকে বলা হচ্ছে স্পেস স্টেশন। স্পেস থেকে বোঝা যাচ্ছে এটির অবস্থান পৃথিবীর মাটিতে নয়, মহাশূন্যে। স্টেশন থেকে বোঝা যাচ্ছে এটি একটি আস্তানাও বটে। অর্থাৎ, মহাশূন্যের আস্তানা। অর্থাৎ এখানে এমন একটি আয়োজন রাখা হয়েছে যে মানুষ এসে এখানে কিছুদিন কাটিয়ে যেতে পারবে। [illegible] শুধু আস্তানাটি [illegible] মানুষের আসার ও যাওয়ার ব্যাপারেও নিশ্চয়তা থাকা চাই। এ কারণেই সালিয়ুতের সঙ্গে সয়ুজের জোড়-বাঁধা সফল হচ্ছে কিনা তার ওপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে। কেননা ঠিক-ভাবে জোড় বাঁধতে পারলে তবেই সয়ুজের মানুষযাত্রী আস্তানা নিতে পারে সালি-য়ুতের স্পেস স্টেশনে। নইলে পৃথক পৃথক-ভাবে সালিয়ুতের মতো একটি স্পেস স্টেশন আকাশে তুলে দেওয়া যা সয়ুজের মতো একটি ব্যোমযান পৃথিবীর কক্ষপথে ছুটে দেওয়ানো অন্তত এই ১৯৭১ সালে কিছু-মাত্র শক্ত ব্যাপার ছিল না।

তাই জোড়-বাঁধার ব্যাপারটির এতখানি গুরুত্ব। অবশ্যই শুধু জোড়-বাঁধার নয়, জোড়-খোলারও। আস্তানায় প্রবেশের জন্যে জোড়-বাঁধা, আস্তানা ছেড়ে আসার জন্যে জোড়-খোলা।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, দুটির মধ্যে জোড়-বাঁধার কথা বলা হচ্ছে তার কোনোটিই স্থির নয়। যেমন সালিয়ুত তেমনি সয়ুজ দুই-ই সেকেণ্ডে আট কিলো-মিটার বেগে পৃথিবীর কক্ষপথে পাক খাচ্ছে। এমনি প্রচণ্ড বেগে ধাবমান দুটি যানকে ক্রমশ কাছাকাছি আনা, তারপরে আলতো-ভাবে গায়ে গায়ে লাগানো বড়ো সহজ কথা নয়। এজন্যে যানদুটিকে গোড়ায় খুবই কাছাকাছি কক্ষে উঠিয়ে আনা চাই। তার-পরে চাই কক্ষের ক্রমান্বয় পরিবর্তন সাধনের একটি আয়োজন। একাজটি করা হয় সংশোধক ইঞ্জিনটি চালু করে। ইঞ্জিন চালু করার জন্যে চাই জ্বালানী। কক্ষে পরিক্রমা-রত একটি যানে জ্বালানী মজুদ রাখাটা সবসময়েই বড়ো রকমের একটি সমস্যা। মজুদের পরিমাণও হয়ে থাকে সামান্য। অথচ কক্ষপথে পরিক্রমারত [illegible] পরিমাণ সংশোধনের জন্যেও বিরাট পরি-মাণ জ্বালানী খরচ করতে হয়। [illegible] কক্ষপথের তলটি যদি বদলাতে হয় (ধরা যাক ত্রিশ ডিগ্রী বদলাতে হচ্ছে) তাহলে জ্বালানীর পরিমাণ হওয়া দরকার যানের ওজনের দ্বিগুণ। দুটি যানকে একই কক্ষে ও একই বেগে নিয়ে আসার পরেও সমস্যা থেকে যায় গায়ে গায়ে লাগানোর। এই কাজটি করার জন্যেও অতি-উন্নত একটি আয়োজন থাকা দরকার।

সালিয়ুতকে আকাশে তোলা হয়েছিল গত ১৯ এপ্রিল তারিখে। সালিয়ুতে আছে কয়েকটি বিভাগ, একটি থেকে অপরটি সম্পূর্ণ পৃথক। আর আছে বিরাট যান্ত্রিক আয়োজন—নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে, যোগা-যোগ স্থাপনের জন্যে, শক্তি সরবরাহের জন্যে, জীবনরক্ষার ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্যে। আর অবশ্যই আছে ইঞ্জিন ও মজুদ জ্বালানী—কক্ষপথ সংশোধনের জন্যে।

এই আয়োজনটি এপ্রিল মাস থেকেই কক্ষপথে পরিক্রমারত ছিল। সেই এপ্রিল মাসেই সয়ুজ-১০ দিয়ে চেষ্টা শুরু হয়ে-ছিল, আর মাত্র গত ৭ই জুন তারিখে সয়ুজ-১১ ব্যোমযানের যাত্রীরা এই আস্তানার ভিতরে গিয়ে ঢুকেছেন। পঁচিশ টন ওজনের এই আস্তানাটিতে আছে রেফ্রিজারেটার রক্ষিত জল ও খাদ্য ও জীবন-ধারণের অন্যান্য সমস্ত আয়োজন। মানুষের আগমনে এতদিনে স-মনুষ্য স্পেস-স্টেশন সৃষ্টি করার প্রয়াস সফল হল, শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানের এক আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন আজ সার্থক হল।

বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎ

মহাশূন্যের এলাকাটি দখলে আসার পরে বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ একটি ভবিষ্যৎ মুখারিত হতে চলেছে প্রধানত উৎপাদনের ক্ষেত্রে।

মহাকর্ষের পরিবেশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভ্যাকুয়াম, তাপমাত্রা, চাপ, বিকীরণ ও সর্বোপরি ভরশূন্যতার এমন এক বিশেষ অবস্থা যা ভূপৃষ্ঠে পাওয়া যায় না। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে মহাশূন্যে উৎপাদন শুরু করার কথা ভাবতে শুরু করেছেন সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা। সোভিয়েত স্পেস-স্টেশন সালিয়ুতে কোনো কিছুর উৎপাদন শুরু করার পরিকল্পনা অবশ্য নেই। সালিয়ুতের সমস্ত যান্ত্রিক আয়োজনই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ চালাবার জন্যে। তবে মহাশূন্যে উৎপাদন শুরু করার দিকে সালিয়ুত বড়ো রকমের পদক্ষেপ নিশ্চয়ই। মার্কিন বিজ্ঞানীরা ভিন-ভিনবার চাঁদে পাড়ি দিয়েছেন, তবে পৃথিবীর আকাশে একটি স্পেস-স্টেশন নির্মাণ [illegible]

গিয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁদের কাজ শুরু হবে ১৯৭২ সালে, তাঁরা আকাশে ভুলবেন ছোট্ট একটি কারখানা—স্কাইল্যাব।

মহাশূন্যে যাঁরা উৎপাদন শুরু করতে চলেছেন তাঁদের কাছে সবচেয়ে সুবিধের ব্যাপার হচ্ছে মহাশূন্যের ভরশূন্যতা—ইংরেজিতে যাকে বলা হয় জিরো-গ্র্যাভিটি বা শূন্য-অভিকর্ষ। ভরশূন্যতা সৃষ্টি হয় কখন? ফ্রী-ফল বা অবাধ অবতরণের অবস্থায়। একটি লোক স্প্রিং-বোর্ড থেকে জলে ঝাঁপ দিচ্ছে, স্প্রিং-বোর্ড ছাড়ার মুহূর্ত থেকে জলে এসে পড়ার মুহূর্ত পর্যন্ত তার অবাধ অবতরণ—এই সময়টুকুতে তার ভরশূন্য অবস্থা। বাধা না পাওয়া পর্যন্ত ভর বা ওজন সৃষ্টি হয় না। আমাদের ওজন আছে কারণ পৃথিবীর উপরিতলে বাধা পেয়ে আমরা আটকে গিয়েছি, বাধা না থাকলে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আমরা অবাধে অবতরণ করতাম। পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহগুলো পৃথিবীর চারদিকে বিশেষ বিশেষ কক্ষে পরিক্রমা করছে, একটু ভাবলেই বোঝা যাবে এগুলো রয়েছে অবাধ অবতরণের অবস্থায়। প্রচণ্ড একটি ছুট আছে বলে উপগ্রহগুলো পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয় না, তার বদলে কক্ষ-পরিক্রমা করে চলে। কিন্তু অবস্থাটি অবাধ অবতরণের, তার মানে ভরশূন্যতার।

ভূপৃষ্ঠের কোনো কারখানায় ভরশূন্যতার অবস্থা সৃষ্টি করা একেবারে যে অসম্ভব তা নয়। করা হয়েও থাকে। কিন্তু তা অতি অল্প সময়ের জন্যে। সেজন্যে উৎপাদনের বিশেষ একটি পর্যায়ে অবাধ অবতরণের ক্ষণস্থায়ী একটি অবস্থা সৃষ্টি করা হয়। তাও সমগ্র উৎপাদনে নয়, উৎপাদনের বিশেষ একটি অংশে। উৎপাদনের সমগ্র অংশ জুড়ে সমগ্র কাল ধরে যদি ভরশূন্যতার অবস্থা সৃষ্টি করতে হয়, তাহলে পৃথিবীর কক্ষপথে যাওয়া ছাড়া গতি নেই—অর্থাৎ গোটা কারখানাটিই স্থাপন করতে হয় মহাশূন্যে। এটা যে একটা কল্পনার ব্যাপার নয়, সালিয়ুত ও সয়ুজের জোড়-বাঁধায় তারই ঘোষণা শোনা গেল।

ভরশূন্য অবস্থার একটি প্রধান সুবিধে তরল পদার্থও সেখানে নিজস্ব অধিকারেই আচরণ করতে পারে। তরল পদার্থ সম্পর্কে ভূপৃষ্ঠে আমাদের অভিজ্ঞতা, তরল পদার্থ ধরে রাখবার জন্যে সবসময়েই একটি পাত্র চাই। তার ওপরে পৃথিবীর অভিকর্ষ থাকার দরুণ তরল পদার্থের সঙ্গে তরল পদার্থের, তরল পদার্থের সঙ্গে কঠিন পদার্থের ও গ্যাসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্লাবন সঞ্চলন ইত্যাদি নানা ধরনের ব্যাপার ঘটতেই থাকে। ভরশূন্যতার অবস্থায় এ ধরনের কোনো সমস্যাই নেই। তরল পদার্থ সেখানে পাত্র বা আধার ছাড়াই অবস্থান করতে পারে। আরো কথা আছে। ভূপৃষ্ঠে অভিকর্ষ থাকার দরুন, খুব ছোট আকারে দেখলে, অণুর সঙ্গে অণুর ক্রিয়ার এঁটে-থাকা লেগে-থাকা ইত্যাদি ধরনের শক্তিগুলো অনেক সময়ে ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু ভরশূন্যতার অবস্থায় খুব বড়ো আকারে দেখলেও এগুলো রীতিমতো ধর্তব্য শক্তি। ভূপৃষ্ঠের মানুষ হিসেবে আমাদের এতকালের অনেক ধারণাই মহাশূন্যে গিয়ে পালটাতে হবে।

মার্কিন বিজ্ঞানীরা মস্ত মস্ত তালিকা প্রকাশ করেছেন যা থেকে বোঝা যাচ্ছে মহাশূন্যের উৎপাদন-ব্যবস্থা চালু হয়ে গেলে তার কতখানি সুবিধে। বিশেষ করে ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'প্রসেসিং' বা প্রক্রিয়ণ, তার জন্যে প্রয়োজনীয় নিখুঁত অবস্থাটি তৈরি হতে পারে একমাত্র ভরশূন্যতার অবস্থাতেই—অর্থাৎ মহাশূন্যে। অন্যান্য উৎপাদনও—যথা মেলটিং, কাসটিং ইত্যাদি—ভরশূন্যতার অবস্থায় অনেক ভালোভাবে ও অনেক কম খরচে সম্পন্ন হতে পারবে—বিজ্ঞানীদের তাই ধারণা।

অর্থাৎ, পৃথিবীর অভিকর্ষে বাঁধা পড়ে থাকা জীব হিসেবে এতদিন আমরা যা-কিছু ভাবতে শিখেছি, বুঝতে শিখেছি, করতে শিখেছি—তা থেকে বেরিয়ে আসার দিন আগত। শুরু হতে চলেছে স্পেস-যুগ। সেখানে সবই অন্য রকম, সবই অসামান্য। টোরিসেলির ভ্যাকুয়ামের মতো সালিয়ুত ও সয়ুজের জোড়-বাঁধাতেও আশ্চর্য এক ভবিষ্যতের সূচনা হল।

—অয়স্কান্ত
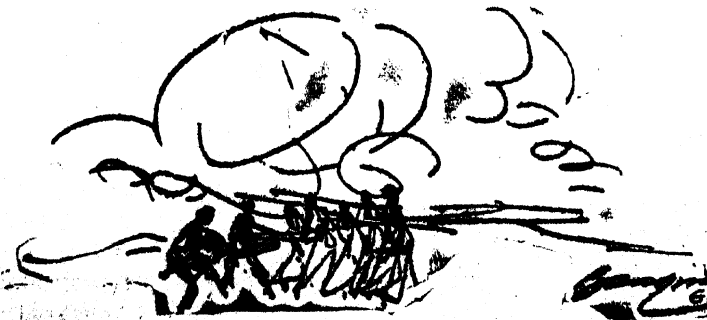
কবি ভানুভক্ত আচার্য

সম্প্রতি দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে নেপালী কবি আচার্য ভানুভক্তের ১৫৩তম জন্মজয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হল। সর্বশ্রেষ্ঠ নেপালী কবি হিসেবে প্রখ্যাত না হলেও, ভানুভক্তের পরিচিতি স্বল্প নয়।

বর্তমানে নেপাল ও নেপালী ভাষার প্রসার বেড়েছে, কিন্তু কিছুকাল আগেও নেপাল স্বল্পপরিচিত গুহান্ধকার রাজ্য ছিল। বিশ্বের একমাত্র হিন্দুরাজ্য নেপাল স্বীয় সংস্কার ও সংস্কৃতি নিয়ে অন্ধকারেই কালযাপন করছিল। ছোট্ট একটি দেশ অথচ ভাষা, উপভাষা ও উপজাতি অধ্যুষিত এই দেশটির কথা কেউ মনে রাখত না। শুধুমাত্র যুদ্ধের সময় মনে পড়ত গোর্খা সৈনাদের কথা। পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধে সামরিক তৎপরতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে তারা।

১৯৪৭ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করায় নেপালবাসী উল্লসিত হয়। তারাও ঐ সময় রাণাশাহীর নিগড়মুক্ত হয়।

নেপালী ভাষায় সর্বপ্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮২০ খৃস্টাব্দে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আরবী ও পার্সিক ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক জে. এ. এটন (J.A.Ayton) প্রথম নেপালী ব্যাকরণ রচনা করেন। এরপর দীর্ঘদিন বিরতি। তারপরই আমরা পাই ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত নেপালী ভাষায় রচিত রামায়ণের বালকাণ্ড। এর একটি খণ্ড লণ্ডনে বৃটিশ লাইব্রেরীতে পাঠান হয়েছিল। অতঃপর ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে মতিরাম ভট্ট, কবি ভানুভক্তের পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ প্রকাশ করেন।

ভানুভক্ত আচার্য প্রথম নেপালী কবি, যিনি সাধারণ মানুষের উপযোগী, সহজ, সরল ভাষায় কবিতা লেখেন। ভানুভক্তের আগেও একাধিক নেপালী কবি কাব্যরচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই সংস্কৃত ভাষায় লিখেছেন। প্রসঙ্গতঃ বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্বের কথা আমাদের মনে পড়ে। বিদ্বদ্‌সমাজে বাংলাভাষাও অনাদৃত ছিল।

প্রধানতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায় ও পুরোহিত সমাজের জন্যে সংস্কৃতে সাহিত্য রচিত হত। এখনো কাঠমাণ্ডুর বীর পাঠাগারে ১০৭৬ বিক্রম সম্বতে রচিত প্রচুর সংস্কৃত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সযত্নে রক্ষিত আছে। সংস্কৃত ভাষা চর্চার জন্যে স্বভাবতঃই নেপালী ভাষার কোন উন্নতি হয়নি। নেপালী ভাষায় কবিতা বা গ্রন্থরচনা অসম্মানজনক মনে করতেন তৎকালীন সংস্কৃত পণ্ডিত ও শিক্ষিত সমাজ।

সেজন্যে নেপালী ভাষার প্রথম কবি ও আধুনিক নেপালী ভাষার জনক হিসেবে কবি ভানুভক্ত পূজিত হন। মহারাজা পৃথ্বীনারায়ণ শাহ ছোট ছোট নেপালী রাষ্ট্রগুলিকে এক অখণ্ড শাসনতন্ত্রের অধীনে এনেছিলেন, তেমনি ভানুভক্ত সমস্ত নেপালী-ভাষীর উপযোগী একটি সাধারণ নেপালী-ভাষা সৃষ্টি করেন। এর আগে বিভিন্ন অঞ্চলে নানা উপভাষা প্রচলিত ছিল। অতঃপর ভানুভক্তের রামায়ণ পড়বার জন্যে সকলেই খাস ভাষা নেপালী শিখতে আরম্ভ করে। ক্রমশঃ এই নেপালী ভাষাই নেপালে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

১৯১৪ খৃস্টাব্দে নেপালের তানাহু জেলার রমঘা গ্রামে কবি ভানুভক্তের জন্ম। এই সময়েই ইংরেজদের সঙ্গে নেপালের যুদ্ধ

হরেন ঘোষ

বাধে। ভানুভক্তের পিতা ধনঞ্জয় আচার্য সরকারী কর্মচারী ছিলেন। নানাস্থানে ঘুরতে হতো তাঁকে, সেজন্য ভানুভক্ত তার পিতামহ শ্রীকৃষ্ণ আচার্যের কাছেই থাকতেন। ইনি স্বনামধন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। ছোট থেকেই ভানুভক্ত সংস্কৃত চর্চা করেন এবং তখন থেকেই তার সাহিত্য-প্রীতি জন্মায়। ধর্মপ্রাণ বালক ভানুভক্ত একা একা বনে-জঙ্গলে ঝর্ণার ধারে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসতেন। একদিন এইভাবে এক অরণ্যে ভ্রমণের সময় তিনি এক গোয়ালার দেখা পান। সে ঘাস কাটছিল। কথা প্রসঙ্গে সে বলল, আমি খুব গরীব ঘাসুড়ে তবু যদি কিছু টাকা জমাতে পারি, গাঁয়ের লোকের জন্যে একটি কুয়ো তৈরি করে দেব। তাহলে আমার মৃত্যুর পরও লোকে আমার নাম মনে রাখবে।

ভানুভক্তের জীবনে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। তিনি ভাবলেন, আমিই কি এমন কিছু করতে পারি না, যাতে আমার মৃত্যুর পরও লোকে আমায় মনে রাখতে পারে। সেদিনই তিনি রামায়ণ অনুবাদে হাত দেন।

বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদক হিসেবে কবি কৃত্তিবাস ও কবি তুলসীদাস বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যের যে বিপুল উপকার সাধন করেছেন, কবি ভানুভক্তও নেপালীভাষীদের সেই উপকার করেছেন। ভানুভক্তের রচনাও মূল রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, কৃত্তিবাসের রচনার মতই ভাবানুবাদ।

১৮৪১ খৃস্টাব্দে ভানুভক্ত রামায়ণের বালকাণ্ড অনুবাদ সমাপ্ত করেন। ১৮৫০ খৃস্টাব্দে তিনি রাজকার্য পেলেন। কিন্তু রাজকার্যের বিষয়ে তিনি নিস্পৃহ তিনি কিভাবে মন দিয়ে সরকারী কাজ করবেন! স্বভাবতঃই তিনি অধিকাংশ সময় দর্শন চিন্তায় অতিবাহিত করতেন এবং নিজেকে যোগ্য প্রতিপন্ন করতে পারেন নি। সঠিকভাবে তিনি কোন হিসেবপত্র রাখতে পারতেন না। অবশেষে তাঁকে শাস্তি পেতে হল। কাঠমাণ্ডুর কুমারীচকে পাঁচ মাস বন্দী জীবন যাপন করতে হল তাঁকে। এই সময়টুকু তাঁর কাছে বিধাতার আশীর্বাদের মত। একাকী নির্জনে নিবিষ্টমনে চিন্তা করার অবকাশ পেলেন। এখানে বসে তিনি অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ও সুন্দরকাণ্ডের অনুবাদ শেষ করেন। এর পরের বছর ১৮৫৩তে যুদ্ধকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড রচনা শেষ করেন।

রামায়ণ তাঁর মৌলিক রচনা নয়। একাধিক চূর্ণ কবিতা ও কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ

তিনি রচনা করেন। ভক্তমালা, বধূশিক্ষা ও প্রশ্নোত্তরী তাঁর মৌলিক কাব্যগ্রন্থ। একজন নেপালী পণ্ডিত ভক্তমালার সংস্কৃত রূপ্দান করেন। বধূশিক্ষা রচনার একটি ছোট ইতিহাস আছে। তিনি এক রাত্রের জন্যে তাঁর এক বন্ধু তারাপতির বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি দেখেন তাঁর বন্ধুর স্ত্রী, শাশুড়ির সংগে বিশ্রীভাবে ঝগড়া করছেন। এতে মনে ব্যথা পান তিনি। সারা রাত জেগে তিনি তেত্রিশটি উপদেশমূলক কবিতা লেখেন। শাশুড়ির সংগে বধূর ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত, এই কবিতার বিষয়বস্তু ছিল।

ভানুভক্ত মৃত্যুশয্যায় রামগীতার অনুবাদ মুখে মুখে বলে যান এবং তার একমাত্র পুত্র রমানাথ লিখে যান। স্বভাবকবি ভানুভক্ত যে কোন বিষয় যে কোন মুহূর্তে ছন্দবদ্ধ কবিতায় অনায়াসে প্রকাশ করতে পারতেন। তার রচনায় ব্যংগ, কৌতুক, হাস্যরসের নিদর্শনও প্রচুর। আদালতের দরখাস্ত বা যে কোন চিঠিপত্র তিনি কবিতায় লেখাই পছন্দ করতেন।

নেপালী সাহিত্যের অন্ধকার যুগে ভানুভক্তের আবির্ভাব প্রভাতের সূর্যোদয়ের মত। ঘন অন্ধকার দূর করে স্নিগ্ধ আলোকধারায় তিনি নেপালী ভাষাকে স্নান করালেন। অল্প দিনেই তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হল। প্রতি ঘরে ঘরে ভানুভক্তের কবিতা পঠিত হতে থাকল। গরীব কৃষক, মুটে-মজুর, গোয়ালার বাড়িতে তাঁর যেমন সমাদর তেমনি ধনীর গৃহে, শিক্ষিত-শ্রেণীর আসরে। বিবাহোৎসবেও তাঁর কবিতা সমাদৃত হল। অল্প দিনেই তিনি অসীম জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

কিন্তু এক দশক পরই ভানুভক্তের নাম ভুলে গেল জনসাধারণ। যদিও তাঁর কবিতা লোকের মুখে মুখে ফিরত। এক বিবাহোৎসবে এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের মুখে রামায়ণগান শুনে এক যুবক আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি এই কাব্যরচয়িতা সম্পর্কে এবং তাঁর অন্যান্য রচনা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ আরম্ভ করেন। তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি সমগ্র রামায়ণ আবিষ্কার করেন। এবং কবির অন্য রচনাও সংগ্রহ করেন। এই যুবকের নাম মতিরাম ভট্ট। ভানুভক্ত সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে মতিরামকে বাদ দেওয়া যাবে না। মতিরাম ১৮২৩ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সংস্কৃত, পারাশিক ও ইংরাজী সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এনট্রান্স পাশ করেন। প্রথম নেপালী সংবাদপত্র 'গোরখা ভারত জীবন' ইনিই সম্পাদনা করেন। ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে কাশীতে এই সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।
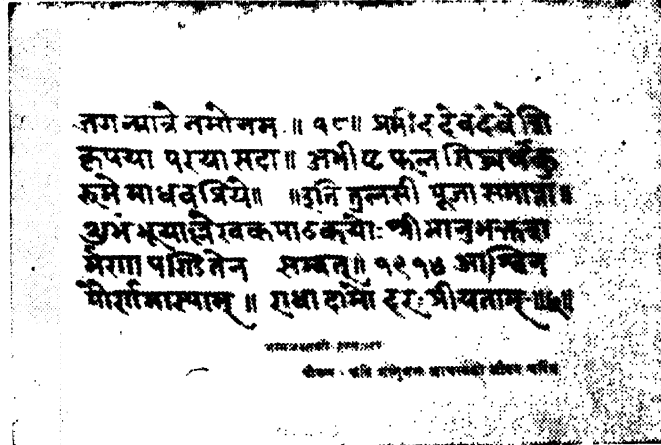
১৮৮৪ খৃস্টাব্দে মতিরাম ভানুভক্তের রামায়ণের বালকাণ্ড প্রকাশ করেন এবং ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ প্রকাশ করেন। মতিরাম ভট্ট ভানুভক্তের জীবনী ও রচনা প্রকাশ করে আধুনিক নেপালী ভাষার জনক ভক্তকবি ভানুভক্তকে নেপাল ও অন্যত্র পরিচিত করান। ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে ভানুভক্ত পরলোকগমন করেন।

ভানুভক্তের মৃত্যুর সত্তর বছর পর দার্জিলিং-এর অধিবাসিবৃন্দ আদি নেপালী কবির স্মৃতি রক্ষাকল্পে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এর আগে নেপাল সরকার কবি ভানুভক্ত সম্পর্কে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। এই স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর, দার্জিলিংবাসীর আগ্রহ দেখার পর তারা ভানুভক্তকে স্বীকৃতি দেন। অতঃপর দার্জিলিংবাসীরা দার্জিলিং শহরের ম্যালের মনোরম উদ্যানে ভানুভক্তের একটি প্রস্তরমূর্তি স্থাপন করে কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করেন।

ভানুভক্তের হস্তাক্ষর

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের উত্তরের গ্যালারিতে বেশ ভীড়। সেই ভীড়ের মধ্যে মায়ের কোল থেকে একটি শিশু থেকে থেকে খালি হাত বাড়াচ্ছে। একসংগে এতগুলি সুন্দর পুতুল সে দেখেনি। প্রত্যেকটাই তার চাই। ভারতবর্ষের নানা দেশের নানারকম অধিবাসীর মূর্তি এই পুতুলের প্রদর্শনীতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। বাংলাদেশের পূজার্থিণী রমণী, রাজস্থানের বিচিত্র ভরণা রূপসী, লখনৌ-এর কার্পেটবয়নরত বৃদ্ধ, পাঞ্জাবের ভাংগড়া নাচ, দক্ষিণ ভারত, বাংলাদেশ ও আরো নানান দেশের বর-বধূ, কাশ্মীরী রমণী, ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী ইত্যাদি নানা জাতের মানবের বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য বসনভূষণে সজ্জিত রূপ এখানে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল।

শ্রীমতী মুখার্জি গৃহস্থঘরের বধূ। কয়েক বছর আগে সখের খাতিরে পুতুল গড়ায় হাত দেন। প্রথম পুতুল ছিল ডিমের খোলা আর বোতল দিয়ে তৈরি এক মেমসাহেবের মূর্তি। তারপর শুধু বোতলের ওপর কিছু চুলদাড়ি লাগিয়ে লুংগি পরিয়ে এক মুসলমান চাষীর মূর্তি তৈরি করেন। তারপর ক্রমে তিনি কাপড়ের পুতুল তৈরিতে মন দেন। পুতুল তৈরীর বহু সমস্যা তাঁকে নিজেকেই সমাধান করতে হয়েছে। যাই হোক, এগুলি ক্রমে ক্রমে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বদেশে এবং বিদেশেও বিক্রি হয়। বর্তমানে তিনি পুতুল তৈরি শিক্ষার একটি কেন্দ্রও খুলেছেন।

শ্রীমতী মুখার্জির পুতুলের মুখগুলি কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরি। বাকী সবটুকুই কাপড়ের। পোশাক-আসাক নিখুঁত করবার জন্যে তিনি অনেকখানি সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করে থাকেন। তাই এদের উজ্জ্বলতা এবং বর্ণসুষমা সুন্দর। তবে চোখ-মুখের তুলির টানের দিকে আরো একটু নজর দেওয়া যেতে পারে। প্রদর্শনীতে কয়েকটি বড় মাপের জাপানী পুতুল ছিল, সেগুলির নকশা আঁকার তুলিকর্ম লক্ষ্য করার মত। তবে বাঙালী ঘরের গৃহস্থবধূ নিজের চেষ্টায় যতদূর অগ্রসর হয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

•

মন্বন্তরে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু অসাধারণ মানুষ তারই মধ্যে ইতিহাসের ইংগিত খুঁজে বার করতে যায়। তাই স্রষ্টা ও শিল্পীরা চূড়ান্ত বিপদেও নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকেন না। স্পেনে নেপোলিয়নের আক্রমণের সময় অই গয়া যুদ্ধের সর্বনাশা রূপের বিখ্যাত সিরিজ তৈরী করেন। পরবর্তী যুগে দমিয়ে তাঁর বাস্তুহারাদের প্রায় অশরীরী মূর্তিগুলি লিথোগ্রাফে ফুটিয়ে তোলেন। দেলাক্রোয়ার সিও

পুতুল প্রদর্শনীতে শিশু দর্শক

নগরের হত্যাকান্ড, ছবিতে [illegible] দমননীতির চন্ডরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। বর্তমান যুগে পিকাসোর গোর্নিকাও এই জাতেরই ছবি। দেশ যখন সর্বনাশের মুখে শিল্পীরা তখন পেছিয়ে থাকেন না। বাংলাদেশ থেকে আগত কিছু চিত্রশিল্পীও [illegible] কিছু শিল্প সৃষ্টি করবেন বলে জানা যায়। গত ১৭ই জুন সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ে বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতির উদ্যোগে একটি ঘরোয়া বৈঠকে স্থির হয় যে একমাস কি দেড় মাসের মধ্যে কলকাতায় এই শিল্পীরা বাংলাদেশের অবস্থার ওপর একটি চিত্র প্রদর্শনী করবেন। এ'দের মধ্যে আপাততঃ আছেন কামরুল হাসান, দেবদাস চক্রবর্তী, সাহাবুদ্দিন, কাজী গেয়াস, মুস্তাফা মানোয়ার, স্বপন চৌধুরী, কাজী আসাফুজ্জমান, খোকনকুমার ঘোষ ও আবদুল বারেক আলভী। অধ্যক্ষ শ্রীচিন্তামণি কর, সোসাইটি অব কন্টেম্পরারী আর্টিষ্টরা, ক্যালকাটা পেন্টার্স ও ক্যানভাস শিল্পীগোষ্ঠী এই সব শিল্পীদের কাজ-কর্মের সুযোগ-সুবিধা করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এই প্রদর্শনীর পরে এপার বাংলার শিল্পীরাও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন বলে স্থির হয়। আশা করি এ'দের প্রচেষ্টা [illegible] সহানুভূতি [illegible]। —[illegible]

নয়ানজুলি

পরিতোষ মজুমদার

এতোক্ষণ তবু বৃষ্টিটা রয়ে সয়ে পড়ছিল। এবারে যেন আরো চেপে এলো। পরশু রাত থেকে সেই যে একনাগাড়ে ঝরে চলেছে, এতোটুকু যদি থামবার নাম করে। বৃষ্টি মানেই সারাটাদিন ঘরের ভেতর বন্দী হয়ে থাকা। যে দু' চারটে পয়সা ঘোরা-ঘুরি করলে ঘরে আসে তা'ও বন্ধ। মনটা খিঁচড়ে ওঠে।

বিছানা ছেড়ে উঠে জানালার পাটটা খুলে হাত বার করে বৃষ্টির ছাঁটটা পরখ করতে চেষ্টা করে তুলসী। বেশ বড়ো বড়ো ফোঁটা। সারাটা রাত ধরে টিনের চালের ওপর চিড়বিড়ানি শব্দ হয়েছে। ঘুম হওয়া দূরে থাক, কাল বেরোবে কি করে এই আশঙ্কাতেই সারাটা রাত স্বস্তি পায় নি। আর না বেরিয়েও যে উপায় নেই। ঘরে বসে থাকলে এতোকষ্টে তৈরী করা মালগুলো নষ্ট হবে। লাভ দূরে থাক, আসল ঘরে তুলতে পারলেও এখন বাঁচোয়া। যা অবস্থা।

আকাশটা এখনো কালো। ঘন ঘন হাওয়া দিচ্ছে। সুতরাং ওবেলাতেও যে বৃষ্টি ধরবে, তার আশা কম। অকাল বর্ষা। এক-বার নামলে আর রক্ষে নেই। প্রাণ খুলে গালাগাল করতে ইচ্ছে করে তুলসীর। জানালার পাটটা বন্ধ করে দেয়। বৃষ্টির ছাঁটটা ঘর পর্যন্ত আসছে। এমনিতেই টিনের ফাঁক দিয়ে এসে মেজেটা ভিজিয়ে দিয়েছে। সমস্ত রাত বিছানাটা এপাশে-ওপাশে টানা-টানি করতে হয়েছে। ঝুলনের আর কি। মানুষটা যে সেই দোকান বন্ধ করে এসে চাদর মুড়িসুড়ি দিয়ে বিছানায় পড়েছে—এই জল-ঝড় কিছুতেই যদি এতোটুকু হুঁশ থাকে! জ্বালা তো হয়েছে ওর। জানালার পাট বন্ধ করার শব্দে বোজা চোখদুটো খুলে তুলসীকে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঝুলন বলে,—কিরে, বৃষ্টি ধরলো?

—আর ধরেছে? আজো সারাদিন জ্বালাবে দেখছি।

—আকাশটা আচ্ছা বর্ষণ শুরু করেছে, তারচেয়ে আয় জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকি।

এমনিতেই ঘুম থেকে উঠে বৃষ্টি দেখে মনটা খিঁচড়ে ছিলো তুলসীর। ওর কথায় আরো তেতো হয়ে ওঠে। মুখিয়ে ওঠে তুলসী,—লেপ্টে নিয়ে শুয়ে থাকলেই বুঝি পেট চলবে? কাল তো দু' পয়সার ব্যবসা করো নি! আজ বেরোতে না পারলে পেটে ছাইপাঁশ কি ঢালবে শুনি?

—এই বৃষ্টিতে জন্তু-জানোয়ার বারান্দা ছাড়ে না তা' দোকানে মানুষ আসবে কোত্থেকে? ঝুলন পাশ ফিরে শোয়।

তুলসী এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খোলে। দরজার পাশে রাখা বালতিটা ছাদের টিনের ওপরের বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ে ভর্তি হয়ে রয়েছে। সেই বালতি থেকে আঁজলা করে জল নিয়ে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দেয়। আর কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিতে পারলে মন্দ হতো না। কিন্তু মনটা খুঁতখুঁত করে। বিস্রস্ত শাড়ীটা গোছগাছ করে। বৃষ্টিতে উঠোনে বেশ জল জমেছে। এমনিতেই উঠোনটা পিছল। সামনে দোকান বলে আড়াল পড়ায় উঠোনের ফালিটায় রোদ পড়তে পায় না। ঝুলনের ইচ্ছে ছিলো দোকানের পেছনের দিকের টিনের সঙ্গে ঘরের আগবাড়ানো টিনটাকে আরো কয়েকটা টিন এনে জুড়ে দেবে। তা'হলে উঠোনটার একটা আব্রু হয়ে যেতো। কিন্তু টাকা-পয়সার কথা ভেবেই আর এগোয় নি। ঘরটা তুলতে গিয়েই যে পরিমাণে ধারকর্জ হয়েছে, আজ বছর দেড়েক ঘরে তোলেও সবটা শুধে উঠতে পারে নি। তবু

তুলসী ঘরে দু' চার পয়সা আনে বলে রক্ষে। নইলে......

সাধারণতঃ অন্যান্য দিন তুলসী ঘুম থেকে উঠে দোকানে এসে ঝাঁটটাট দিয়ে পরিষ্কার করে উনোনে আগুন দিয়ে তবে ঘরে এসে ঝুলনকে ডাকে। ঝুলন উঠে মুখ-টুখ ধুয়ে নিতে উনোন ধরে যায়। চায়ের দোকানের খদ্দের সকালেই বেশী। ঘুমের খোয়ারি ভাঙাতে অনেকেই ঝুলনের দোকানের পার্মানেন্ট খদ্দের।

বৃষ্টির মধ্যেই উঠোনটা পেরিয়ে এসে দোকানঘরের পেছনের দিকের দরজার শিকলটা খোলে তুলসী। রাত্রে দোকান বন্ধ করার সময় সামনের ঝাঁপটা ফেলে দিয়ে পিছনের দিকের দরজাটায় শিকল তুলে দেয় ঝুলন। তালাটালার বালাই নেই। আর তালা দিয়ে রাখবার মতো আছেটাই বা কি! ক্যাশ তো দিনের রোজগার দিনেই শেষ। যা দু' একটা এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িকুড়ি, বাসন-পত্তর—তা' নিলেও কারোর মজুরীতে পোষাবে না।

দরজা খুলে নিয়মরক্ষা করতে দরজার সামনেটায় ঝাঁটাটা একটু বুলিয়ে নিয়ে কোণের দিকে ছুঁড়ে দেয় তুলসী। উনোনটা পরিষ্কার করতে ইচ্ছে করে না। যখন বেরোনোই যাবে না, তখন বেলা হলে ধীরে ধীরে করলেই হবে। কোনরকমে কয়েকটা কাঠের টুকরো এদিকওদিক থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে উনোনে দেয়। টিন চুঁইয়ে জল পড়ে কাঠের টুকরোগুলো সব ভিজে গেছে। তাই আগুনের চেয়ে ধোঁয়া হচ্ছে বেশী। দোকানের চারপাশে তাকায় তুলসী। কেমন যেন একটা ভ্যাপসা গন্ধ। অনেকদিনের ইচ্ছে তুলসীর রোজগার বাড়লে ধারকর্জগুলো মিটিয়ে ফেলে দোকানটাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে স্টেশনের সামনের শম্ভুর দোকানের মতো করবে। চায়ের দোকান তুলে দিয়ে রকমারী স্টোর্স। বিয়ের পর শ্বশুরের টাকায় শম্ভু দোকানের ভোল একেবারে পাল্টে দিয়েছে।

তারকেশ্বর লোকালটা স্টেশনের ইয়ার্ডের আগে দাঁড়িয়ে লাইন ক্লিয়ার না পেয়ে একটানা সিটি দিয়ে চলেছে। এর-পরেই ব্যাণ্ডেল ল্যোকাল আসবে। তারকেশ্বর ল্যোকালটা পাশ করে গেলেই রোজ তুলসী রাত জেগে তৈরীকরা লজেন্সভর্তি সাইড্ ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বেলুড় স্টেশন থেকে ধরে ব্যাণ্ডেল ল্যোকালটা। ডাউনের। ডাউনের সেই ল্যোকাল ধরে আসে হাওড়া স্টেশনে। তারপর হাওড়া থেকে বিভিন্ন ল্যোকাল ধরে ব্যাণ্ডেল, লোকনাথ, বর্ধমান, ঘুসুরী, জনাই—কতো জায়গায় যে ঘুরতে হয়। শুধু দুপুরের দিকে এক ফাঁকফোকরে বেলুড় স্টেশনে নেমে কিছু মুখে গুঁজে আবার আপ অথবা ডাউনের ল্যোকাল ধরে। কোন কোনদিন তারও সময় হয়ে ওঠে না। ভালো বিক্রী-বাট্টার সম্ভাবনা দেখতে পেলে ট্রেন থেকে নামেই না তুলসী। খাওয়াদাওয়া তো যখন ইচ্ছে করা যাবে, কিন্তু একটা খদ্দের হাত-ছাড়া হলে সে খদ্দের তো আর ফিরবে না। প্রথমদিকে কম কষ্ট হয়েছে! একে তো মেয়ে-ছেলে। লজ্জায় এবং ভয়ে মাস্থানেক একটা কাটতে হয়েছে। তারওপর ট্রেনে যারা ফেরি করে তাদের মধ্যে মেয়েছেলে তুলসী-ই প্রথম। বুটপালিশওয়ালা থেকে শুরু করে গন্ধতেল, মলম বিক্রীওয়ালা পর্যন্ত পেছনে লেগেছে। তার ওপর কামুক পুরুষগুলোর চোখের ঠাহর, ইচ্ছে করে গায়ে ধাক্কা, জিনিস কেনার নাম করে দাঁড় করিয়ে ওকেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখা তো আছেই। অবশ্য হালচাল রপ্ত করে নিতে তুলসীরও বেশী সময় লাগে নি। আর লাগবেই বা কেন? জন্ম থেকে অনেক ঘাটের জল খাওয়া মেয়ে। বহু আস্তাকুড় ঘেঁটে তবে না আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই প্রয়োজনবোধে নিজের লোলুপ বুক দেখিয়েও অনেক কিপ্টে খদ্দেরকে পকেট খুলিয়েছে। অল্প কদিনেই শিখে নিয়েছে কী করে টিকিট-চেকারদের ফাঁকি দিতে হয়, অথবা সন্তুষ্ট রাখতে হয়; নিয়মিত খদ্দেরকে হাতে রাখা এবং অনিচ্ছুক খদ্দেরকে শিকার করার পদ্ধতি। সবটা ভাবলে আজ হাসি পায়। প্রথমদিকে ও কতো বোকাই না ছিলো। একে মেয়ে, তায় ভরাযুবতী; তাই অন্যান্যরা ওকে লাইন থেকে সরাতে উঠেপড়ে লেগে-ছিলো। স্টেশনের পাশের লোহার কার-খানার দিনমজুরগুলো দোকানে বসে যেমন ইউনিয়ন নিয়ে গজল্লা করে, তেমনি ট্রেনে ট্রেনে যারা জিনিস ফেরি করে তাদেরও নাকি ইউনিয়ন আছে। জোট বাঁধা। ওর বিক্রি বেশী হওয়া মানেই আরেক জনের বিক্রিতে ঘাটতি পড়া। বিশেষ করে পেছনে লেগেছিলো গন্ধ-তেল বিক্রীকরা লোকটা। ওর পেছনে বুট-পালিশওয়ালা থেকে শুরু করে ভিখারীর দল পর্যন্ত লাগিয়েও যখন সুবিধে করতে পারে নি, তখন আড়ালে-আড়ালে একদিন ওকে একা পেয়ে বিয়ে করার প্রস্তাবও দিয়েছিলো। তুলসীর বুঝতে কষ্ট হয়নি যে সেই বিয়ে করার প্রস্তাবের পেছনেও লোকটার মতলব আছে। এমনিতে লাইন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হঠাতে না পেরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বন্দী করার ইচ্ছে। লোকটা হয়তো ভাবতেও পারে নি যে তুলসী অন্য একজনের বিয়ে-করা বৌ। এখনো খদ্দেররা কেউ জানে না। জানতে পারলে অর্ধেক খদ্দেরে ভাটা পড়ে যাবে না! যুবতী মেয়ে ভেবে যে চোখে ওকে দেখে পুরুষগুলো, কারোর বৌ জানতে পারলে কি আর সেই চোখে দেখবে! সেই কারণে তুলসী ভদ্রঘরের মেয়েদের মতো ইচ্ছে করলেও সিঁদুর দেয় না। পেট আগে না সিঁদুর। সিঁদুর দেয় না বলে তো আর ঝুলন তার পাওনা-গন্ডা ছাড়ে না। বরং রোজ রাত্রেই ন্যায্য পাওনার চেয়ে কিছু বেশীই সুদে-আসলে তুলে নেয়। তুলসীও বাধা দেয় না। সত্যি তো, ঝুলন ছিলো বলে খারাপ হোক, ভালো হোক একটা ঘাটে নিজেকে বাঁধতে পেরেছে; নইলে ওর মতো মেয়ে কোথায় ভেসে যেতো কে জানে! হয়তো শেষপর্যন্ত একটা বিশেষ পল্লীতে ঠাঁই নিতে হতো। তবু এখানে এক-জনের বিয়েকরা বৌ। ইচ্ছে করলেই তো ফেলে দিতে পারবে না। এই মুহূর্তে তুলসীর মনটা ঝুলনের ওপর সহানুভূতিতে ভরে ওঠে। মানুষটা অশিক্ষিত: খোঁড়া। তবু হৃদয়টা তো বড়ো! একদিন তুলসীকে বলেছিলো.—তুলসী, আমাকে ঘৃণা করিস না তো মনে মনে?

—কেন? তুলসী অবাক হয়েছিল।

—আমি খোঁড়া; লেখাপড়াও শিখি নি।

—তাতে কি হয়েছে? লেখাপড়াশেখা ভদ্দরলোক তো কম দেখলাম না।

সত্যি তো, ওদের দোকান ছেড়ে একটু এগিয়ে গেলেই সাঁপুই পাড়া। লেখাপড়া-জানা অফিসে কাজকরা ভদ্দরলোক কি ওখানে কম। সেই লোকগুলোকে তো তুলসী সামনে থেকেই দেখেছে। ওকে দোকানে একা পেলেই ছুঁকছুঁক করে। সেদিক থেকে ঝুলন অনেক ভালো। মাথায় রক্ত চড়ে গেলে যেমন মুখের আগল রাখে না, যা মুখে আসে তাই বলে; তেমনি মন ভালো থাকলে ভালোও বাসে। আদর করে। স্টেশনের প্ল্যাটফরমে নাকি ওর জন্ম। বাপ কে তা' ঝুলন জানে না। ওর মাও বোধহয় সঠিক জানতো না। বাপের কথা উঠলেই ঝুলন খিস্তি-খেউড় করে,—কোন শালা বাপ কে জানে! আর মা? সেও তো ওকে পেট থেকে খালাস করে দিয়েই হাওয়া। ভাবলেও কষ্ট হয়। সেই ছোট্ট-বেলায় ওয়াগান-ভাঙা চাল কুড়োতে গিয়ে পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের চাকার তলায় বাঁ পাটা হাঁটুর নীচ থেকে কাটা পড়ে গিয়েছিলো। হাসপাতালে পড়েছিলো বেশ কিছুদিন। তারপর সুস্থ হয়ে উঠলে হাসপাতাল কর্তৃ-পক্ষই ক্র্যাচদুটো দিয়েছিলো। সেই ক্র্যাচে ভর দিয়ে ট্রেনে ট্রেনে ভিক্ষে করে বেড়িয়েছে। সেই ভিক্ষের পয়সা থেকে কিছু কিছু জমিয়ে বেলুড় স্টেশনের গায়ে চায়ের দোকানটা দিয়েছে। নড়বড়ে হলেও সংসারটা তো চালিয়ে যাচ্ছে কোনরকমে।

এতোক্ষণ ভিজে কাঠগুলো থেকে গল-গল করে কাঁচা ধোঁয়া বেরোচ্ছিলো এক-নাগাড়ে। এখন আগুন ধরেছে। দোকানঘরের কোণের জলের ড্রামটার থেকে মগে করে কিছুটা জল নিয়ে কেটলিতে ঢেলে কেটলিটা উনোনের ওপর বসিয়ে দেয়।

নিজের কথা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে তুলসীর। তবু তো ঝুলন মাকে চিনতো। তুলসী তো মা-বাপ কাউকেই দেখে নি। শহরতলীর এক অনাথ আশ্রম থেকে পেট-ভরে খেতে না পাওয়ায় হঠাৎ একদিন ঝুপ করে পালিয়েছিলো। কিন্তু পথে বেরিয়েই বা কোথায় যাবে? বেশ কিছুদিন এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়িয়েছে। ক্ষিদে পেলে কলের জল খেয়েছে আর ফুটপাথে শুয়েছে। তাই পেশাদারী ভিখারীগুলো ওর পেছনে কম লাগেনি। একদিন ওকে হাওড়া স্টেশনের এক কোণে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঝুলন এগিয়ে এসেছিলো,—কিরে ছুকরি, কোথায় থাকিস?

তুলসী কি উত্তর দেবে? ওকে চুপ করে থাকতে দেখে ঝুলন-ই আবার জিজ্ঞাসা করেছিলো, আমার সঙ্গে যাবি? চায়ের দোকানে কাজ করবি, তার বদলে দু' বেলা খেতে পাবি। তুলসী এককথাতেই রাজী। না হয়ে উপায়ই বা কী? পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে তবু তো অনেক ভালো।

ও রাজী হওয়াতে ঝুলন ওকে সঙ্গে করে বেলুড় স্টেশনে এসে নেমেছিলো।

পরের দিন সকালে দোকানে ঢুকে ওকে দেখে ঝুলনের দিকে তাকিয়ে শংকর, মদন, শিবদাস ধীরে ধীরে হেসেছিলো,—কিরে বাবা, মাইরি আমাদের ঝুলন যে চায়ের দোকানটাকে একেবারে পার্ক স্ট্রীটের হোটেল বানিয়ে ফেললো। লেডীজ দিয়ে সার্ভ করাবে!

তারপর পেছনের দিকের দেওয়ালে সাঁটা একটা হিন্দী ছবির বিজ্ঞাপনে নৃত্যরতা নায়িকাকে দেখিয়ে বলেছিলো,—তা' বেশ বাবা বেশ। এই চীজ আমদানী করে হবে শুনি!

ওদের কথাবার্তা তুলসী বুঝতে না পারলেও ঝুলন ওদের ধরণধারণে হেসে ফেলেছিলো। তারপর বলেছিলো,—ঠাট্টা করছিস? তা শালা হাওড়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করছিল, ভাবলাম একটা পেট নিয়ে আর কতো দৌড়োদৌড়ি করি, তাই নিয়ে এলাম।

—বেশ করেছিস মাইরি। এইবার জমবে ভালো।

খদ্দের জমলে ঝুলন চা করে দিলে সেগুলো এগিয়ে দেওয়া; এঁটো গ্লাসগুলো টেবিলের ওপর থেকে তুলে নেওয়া, বাসন-পত্র ধোয়া, দোকানঘরটা ঝাঁট দেওয়া। আর রাত্রে ঝুলন দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিলে ঘরের পেছনের বেঞ্চিতে কুকুরকুণ্ডলী হয়ে শুয়ে পড়া। মন্দ লাগে নি তুলসীর। আর [illegible]

বেলা হলে এক এক করে ডেইলী প্যাসে-ঞ্জারদের বেলুড় স্টেশন থেকে ট্রেন ধরিয়ে দিয়ে এসে রিক্সাগুলো রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে দোকানে এসে জুটতো মদন, শিবদাস, শংকর আর এখন স্টেশনের পাশে যে ফ্যাসানের দোকান করেছে সেই শম্ভু। তক্তাগুলোয় কোন রকমে পায়া লাগিয়ে জোড়াতালিদেওয়া বেঞ্চ আর টেবিলের ওপর আসর জমাতো। এক কাপ চা নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা তিন পাত্তি খেলা। হৈ-চৈ; তর্ক। শেষ পর্যন্ত রোজই খেলা শেষ হতো হাতাহাতি মারামারিতে। প্রত্যহই একই নাটকের পুনরাবৃত্তি।

সন্ধ্যের পর অবশ্য সাঁপুইপাড়া আর রেললাইনের ওপারের ধর্মতলা রোডের কিছু ভদ্রলোকের ছেলে আসতো। তাদের আলাপ-আলোচনার কিছুই বুঝতো না তুলসী। ভদ্দরলোকের ছেলেগুলো ফিট-ফাট হলে কি হবে, ঝুলন তাদের পছন্দ করতো না। ছেলেগুলো চলে গেলেই মুখ-খিস্তি করতো,—বাবুদের জামাপ্যান্টে মাড়া দেওয়া হলে কি হবে, এদিকে তো পকেট গড়ের মাঠ। তিন ঘন্টায় শালারা একটা চায়ের আর একটা চারমিনারের অর্ডার দেবে। তা-ও খাবে তিনজনে ভাগা-ভাগি করে। তবু যদি এক'টা পয়সাও পকেটে থাকে। আজ ধার, কাল ধার, পরশুও পয়সা দেবার নাম নেই। দোকানে ঢোকার আগে যতো-বাবুদের পয়সার কথা মনে থাকে না।

প্রথম প্রথম তুলসীর বেশ মজাই লাগতো, সব ব্যাপারগুলোই যেন ওর কাছে রহস্যময় ঠেকতো।

দিনগুলো এক গতিতেই বয়ে চলে-ছিল মাসে। আর মাসের পরমায়ু ক্ষয় হচ্ছিল বছরে। ওর কাজের এদিক-ওদিক হলে অবশ্য ঝুলন বেজায় রাগ করতো; যা মুখে আসতো তাই বলতো। তবু তুলসীর লোকটাকে মন্দ লাগতো না। আর যাই হোক, খেতে-পরতে তো দিচ্ছে। এ সংসারে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এ জিনিস দুটোই বা দেয় কে। তার ওপর মানুষটা পঙ্গু। ক্র্যাচ ছাড়া এতোটুকু নড়াচড়া করতে পারে না। স্বভাবতঃই একটা সহানুভূতিও ঝুলনের ওপর পড়ে গিয়েছিল। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের সাথে দেহেরও বাড়-বৃদ্ধি ও বদল হচ্ছিলো। তুলসীর চেয়েও দেহের সেই বদল বেশী লক্ষ্য করতো দোকানের খদ্দেরগুলো। বিশেষ করে সকালে যারা তিন পাত্তি খেলতো, তারাই বেশী ভাব জমাতে চেষ্টা করতো ওর সঙ্গে। রাস্তায় বেরোলে ওকে শুনিয়ে পাশ দিয়ে রিক্সা চালিয়ে যেতে যেতে পরস্পর বলাবলি করতো,—ঝুলনের কপাল দেখেছিস মাইরি। কোন্ আস্তাকুঁড় থেকে তুলে নিয়ে এসেছে, কিন্তু দিনে দিনে ছুকরির রূপ বেখড়ক খোলতাই হচ্ছে।

তুলসী শুনেও শুনতো না। উপায় তো নেই। মাঝে মাঝে সহ্য করতে না পেরে [illegible] উঠতো।

একদিন তো রক্তারক্তি হয়ে যেতো। ভাগ্যিস্ তুলসী দোকানে ছিল। মদনকে চা দেবার সময় মদন ওর হাত ধরে টেনে-ছিল। মদনটাকে বরাবরই ওর ভালো লাগতো না। রাস্তায় একা পেলেই রিক্সাটা নিয়ে এসে গা ঘেঁষে দাঁড় করাবে। তারপর—। ওকে হাত ধরে টানতেই ঝুলন দেখে ফেলেছিল।

—শালা ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখোনি—বলে পাশ থেকে ক্র্যাচটা তুলে নিয়ে আর এটু হলেই সোজা মদনের মাথায় বসিয়ে দিতো। তুলসী সময় মতো খুব জোর ধরে ফেলেছিল। নইলে কী যে হতো কে জানে।

সেদিনই দুপুরবেলায় তুলসীকে দোকানে বসিয়ে ক্র্যাচদুটো নিয়ে ঝুলন হাওড়া হাটে গিয়েছিল। বিকেলবেলায় রঙীন একটা তাঁতের শাড়ী কিনে এনে ওর হাতে দিয়ে বলেছিল—তুলসী তোর জন্য নিয়ে এলাম।

খুশীতে বেশ কিছুক্ষণ তুলসী কোন কথাই বলতে পারে নি। শাড়ীটা বুকে চেপে ধরে থেকেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার-বার দেখেছে। দোকানের সামনে দিয়ে সকাল-বিকেলে বুকের দু-পাশে বেণী ঝুলিয়ে মেয়েগুলো এই রকম শাড়ী পড়েই স্কুল-কলেজে আসে যায়। দূর থেকে তাদের দেখেছে। ইচ্ছেও করেছে সেই রকম শাড়ী পড়ার। কিন্তু পর মুহূর্তে নিজেই সে ইচ্ছেকে কঠোর হাতে দমন করেছে। উপায় তো নেই। কিন্তু আজ? এক সময় যত্ন করে শাড়ীটাকে ভাঙ্গা টিনের বাক্সে তুলে রেখেছে।

রোজকার মতো সেদিনও বাসনপত্র ধুয়ে-মুছে শুয়ে পড়েছিল তুলসী। সারাটা দিন একটানা পরিশ্রম গেছে। তার ওপর সন্ধ্যের পর শাড়ীটা হঠাৎ পাওয়ায় মনটাও খুশী। তাঁতের শাড়ী হলে কি হবে, রংটা চমৎকার। এতো খাটুনির পর মনটা খুশী থাকায় খুব তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়ে-ছিলো তুলসী। ঝুলন দোকানের বেঞ্চ-গুলোকে জড়ো করে এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে শোয়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপন দেখছিল তুলসী। হঠাৎ ঘুমটা চটকে যায়। চোখ খুলে দেখে ঝুলন; পাশে ক্র্যাচটা

রেখে দু হাতে ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরেছে। ক্র্যাচ দুটো হঠাৎ পাশ থেকে মেজেতে পড়ে যায়। সেই শব্দে যেন চেতনা ফেরে তুলসীর।

এক সময় ওকে ছেড়ে দেওয়ালে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায় ঝুলন। ঝুঁকে পড়ে মাটি থেকে ক্র্যাচ দুটো তুলে নেয়। অন্ধকারে তুলসী ঝুলনকে স্পষ্ট দেখতে পায় না। তবু অনুভব করে ঝুলন দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিশ্চুপে। তারপর ধীরে ধীরে ক্র্যাচদুটোয় ভর দিয়ে জড়োকরা বেঞ্চ-গুলোর ওপর পাতা নিজের বিছানাটার দিকে চলে যায়।

ঝুলন কী ভেবেছে তুলসী জানে না। কিন্তু নিজের ভেতরে জীবনে এই প্রথম অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ অনুভব করেছে। অনেক পুরুষের কামনার সামনাসামনি হলেও জীবনে কখনো কোন পুরুষের এতো নিবিড় সান্নিধ্যে আর আসে নি। দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু যেন নতুন আর এক জীবনের স্বাদ পায়। বুকটা ভরে ওঠে।

রোজকার মতো ঘুম থেকে উঠে ঝুলন ডেকেছে, তুলসী। তবে সে ডাকের সুর এবং স্বাদ সবই যেন আগের চেয়ে অনেক আলাদা। অনেক বেশী মিষ্টি।

রোজের মতোই তুলসী উত্তর দিয়েছে —কী বলছো?

—আজ সকালে আর দোকান খুলবো না রে। তুই বরং চটপট স্নান সেরে শাড়ীটা পড়ে নে।

ঝুলনের কথাবার্তার ধরনে তুলসী একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছে, —কেন?

ঝুলন ছোট্ট করে উত্তর দিয়েছে,—দর-কার আছে। তুলসী আর কথা বাড়ায় নি। স্নান করে চুল বেঁধেছে। গতকালের আনা নতুন শাড়ীটা পড়েছে। তারপর বেড়ার গায়ে গোজা ভাঙ্গা আয়নাটায় নিজেকে দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেছে। জীবনের এদিকটার রূপ ওর নিজের কাছেই এতো-দিন অজ্ঞাত ছিল। ঝুলনও স্নান করে নিয়ে হাটের থেকে আনা নতুন ধুতি-পাঞ্জাবি পরে তুলসীকে বলেছে,—চল।

দোকানের বাইরে বেরিয়ে রিক্সা করে বি টি রোডে এসে বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়েছে। বাস ধরে দক্ষিণেশ্বরে গেছে। মন্দিরের সামনে গিয়ে সিঁদুরের প্যাকেট থেকে সিঁদুর বার করে ওর সিঁথিতে পরিয়ে দিয়ে ঝুলন বলেছে,—আজ থেকে আমরা স্বামী-স্ত্রী হলাম তুলসী, কেমন।

ঘটনার আকস্মিকতায় কেমন যেন অভিভূত হয়ে গিয়েছিল তুলসী। বেশ কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারে নি। চুপ করে থেকেছে। শেষে ঝুলন-ই বলেছে,—কি রে? ও রকম করে তাকিয়ে আছিস্ কেন? আমাকে পছন্দ হয় নি বুঝি?

তবু তুলসী কোন কথা বলতে পারেনি। তারপর এক সময় সম্বিত ফিরতে এগিয়ে এসে ঝুলনকে প্রণাম করেছে।

ওদের দোকানের সামনের গলির সাহা-বাড়ীর মেয়েটার কদিন আগে বিয়ে হলো। তুলসী যতোটা সম্ভব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। দরজার ওপর সকাল থেকে নহ-বৎ বসেছে। লোকজনের হাঁকডাক, ব্যস্ত-সমস্ত আনাগোনা — তুলসীর মনে ওর অজ্ঞাতেই কেমন যেন একটা বিষণ্ণতার ছোঁয়া মাখিয়ে দিয়েছিল। উপলব্ধিটা পরি-পূর্ণভাবে করতে না পারলেও মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সাহা-বাড়ীর মেয়েটাকে কিছুদিন আগে পর্যন্ত সাধারণ মিলের শাড়ী পড়ে বইখাতা বুকে চেপে বেলুড় স্টেশনে যেতে আসতে দেখেছে।

বুকের দুপাশে দুটো বেণী ঝুলোনো। অত্যন্ত সাদামাটা চেহারা। সেই মেয়েটাকেই পরদিন নববধূ সজ্জায় কি সুন্দরই না দেখাচ্ছিল। সিঁথিতে সিঁদুর; পরণে বেনারসী। কদিন আগে দেখা অতি সাধা-রণ সাহা-বাড়ীর মেয়েটা যেন রাতারাতি বদলে গেছে। মনের গোপন কোণে হঠাৎ যেন একটা ইচ্ছের সাপ কিলবিলিয়ে উঠে-ছিল তুলসীর। আজকে ঠিক এই মুহূর্তে নিজেকে পরিপূর্ণ বলে মনে হয়।

ঝুলনের ডাকে সংবিত ফেরে তুলসীর। ঘুম ভেঙ্গে চায়ের জন্য মানুষটা উস্‌খুস্ করছে। বৃষ্টিটা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো চেপে এসেছে। ওর অনামনস্কতায় কেটলির জলটা অনেকক্ষণ ধরে ফুটছে। শাড়ীর আঁচল দিয়ে ধরে তাড়াতাড়ি কেটলিটা উনোনের ওপর থেকে নামায় তুলসী। চায়ের পাতা ভিজোয়। তারপর দু-কাপ চা ছেঁকে নিয়ে এঘরে আসে।

বৃষ্টিতে পরণের শাড়ীটা ভিজে একে-বারে সপ্‌সপ্ করছে। চেপে লেপ্টে গেছে শরীরের সঙ্গে।

চায়ের কাপটা এনে তুলসী ঝুলনের সামনে নামায়। কাপটা সামনে টেনে নিয়ে চুমুক দিয়ে ঝুলন তারিয়ে তারিয়ে ওকে দেখতে থাকে।

—কি অমন করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছো?

—তোকে তুলসী।

—কথাবার্তার কি ছিরিছাঁদ দেখ না আমি নতুন নাকি?

—কে বললো তুই নতুন নস?

—থাক্, ভদ্দরলোকেদের মতো আর বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলতে হবে না। চা-টা খেয়ে নিয়ে আমায় উদ্ধার করো দেখি। বেরোন যখন হবে না, তখন ঘরের কাজগুলো অন্ততঃ সেরে ফেলি।

ঝুলন চা খেতে খেতে একমনে দেখে তুলসীকে। তুলসী জানালার দিকে মুখ করে বসে চা খাচ্ছে। নরম গ্রীবা। চুলগুলো এলোমেলো। পরণের শাড়ীটা ভিজে গায়ে বসে গেছে। যেন তুলসী নয়—অন্য এক-জন।

চায়ের কাপটা শেষ করে পাশে সরিয়ে রাখে ঝুলন। তারপর হাত বাড়িয়ে তুলসীকে কাছে টানে। ওর শরীরটাকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। তুলসী আপত্তি করে না। কেন করবে? হোক্ না মানুষটা পঙ্গু, তবু এই মানুষটাই তো ওকে অনেক সাগর পেরিয়ে নিশ্চিন্ততার উপকূলে এনে দাঁড় করিয়েছে। উপলব্ধির এক নতুন জগতের সুখ-সাগরে তুলসী যেন রূপোলী মাছের মতো খেলা করে বেড়াতে থাকে।

রান্না আরো সহজ হোক
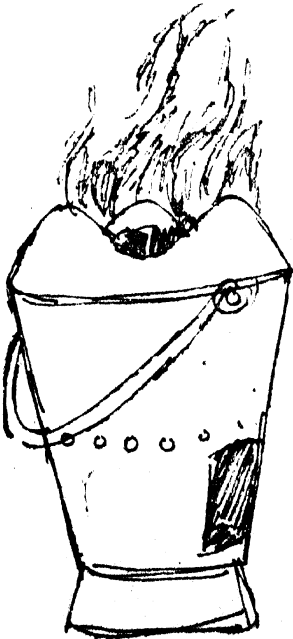
রান্নাবান্নার সঙ্গে আমাদের সহজাত সম্পর্ক। এবং সহজও বটে। এমন কদাচিৎ দেখা যায়। রকমারি রান্নায় আমাদের টেক্কা দেবার মতো প্রতিভা খুব কমই আছে। শাক-শুক্তো-ঘণ্ট থেকে শুরু করে মাছ-মাংস-কালিয়া-পোলাও রান্নায় আমাদের সমান পারদর্শিতা। যার যেমন প্রয়োজন তার জন্য তেমনি রান্না। ঝাল-ঝোল-অম্বলে পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলতে তুলতে সবাই পিঁড়ি ছেড়ে ওঠে। এমনি আমাদের রান্নার মাহাত্ম্য। এতে যেন যাদু লুকিয়ে আছে। পাত থেকে শুরু করে হাতটা পর্যন্ত চেটে-পুটে সাফ করতে হয়। না হলে কিরকম অতৃপ্ত থেকে যায়। সেই বিদেশ থেকে ফেরা ভদ্রলোকের কথাই ধরা যাক না। অনেকদিন প্রবাসে ছিলেন। সেখ্ধ তার টিনের খাবার খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গিয়েছে। বন্ধুবান্ধব খাওয়ার নেমন্তন্ন করলেই তিনি আগেভাগে বলে রাখেন পুরোপুরি দিশী খাবার অর্থাৎ শাক-শুক্তো-ঘণ্ট আর ঝাল-ঝোল-অম্বলের ব্যবস্থা রাখতে। এর বেশি আর কোন দাবী তাঁর নেই। দেশে ফেরার সুযোগ নিয়ে জিভের স্বাদটা বদলে নেওয়াও তাঁর উদ্দেশ্য।

আমাদের একটা বদনাম আছে যে, সারাদিন রান্নাঘরেই কেটে যায়। এটা নিছক বদনাম নয়। বাস্তবেও তাই। আসল ব্যাপারটা হলো যে, আমরা রান্না করতে জানি। আর অল্প রান্নায় কখনো সন্তুষ্ট নই। মনের মতো দিন গুজরান করে রান্না করবো। তাই রান্না করা যেমন আমাদের প্রিয় তেমনি রান্নাঘরও। একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য।

আমাদের হেঁসেলে রাঁধুনি বামুনের প্রবেশাধিকার জুটেছে হালে। এতোদিন এই পদটি দখল করেছিলেন বামুনদিদি। রান্না-বান্নার দায়িত্ব সবই ছিল তাঁরই উপর। বামুনদিদি থাকলেও বাড়ির গিন্নী কিন্তু সব কাজের মধ্যেও রান্নাবান্নার খোঁজ-খবরটা ঠিকই রাখতেন। এই দায়িত্বটা পুরোপুরি অপরের হাতে ছেড়ে দেওয়া চলে না। তিনি যেমন খোঁজ-খবর নিতেন আবার বুঝিয়ে দিতেন কি কি রান্না করতে হবে এবং কোনটার সংগে কোনটা বনবে ভাল। এ তো গেল বাড়ির কথা। তখনকার দিনে গাঁয়ের সেরা সেরা রাঁধিয়েদের কাজেকর্মে যজ্ঞি-বাড়িতে ডাক পড়তো। বিবাহ উৎসবাদির রান্না একা হাতে তাঁরাই করতেন। পুরুষ

রাঁধিয়ের সঙ্গে তখন কারো প্রায় পরিচয় ছিল না। শহরে ইদানীং জাতের বালাই নেই—যা হোক একটা রাঁধিয়ে হলেই হল। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এখনও বামুনদিদিদের কদর আছে। কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। তখন গেরস্থের জীবন ছিল মোটামুটি সহজ এবং স্বচ্ছল। আর্থিক টানাপোড়েনে সেদিন এত বেশি ভুগতে হতো না। তাই মনের মতো রান্না করা যেতো। মেয়েরা সেদিন যেমন রাঁধতে চাইতো তেমনি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে পুরুষেরা ছিলো খুবই উৎসাহী। উভয়পক্ষের আগ্রহে সেদিন আমাদের রান্নাবান্নার এক মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছিল।

রান্নায় সেই উৎকর্ষ আর আমাদের নেই তা নয়। কিন্তু দিনকালের পরিবর্তন ঘটেছে। আজকে সংসার চালানো দশ দায়। ডানে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। সুতরাং অত তরিবৎ করে রান্নার সুযোগও নেই। সংস্থান না থাকলে রান্নার অভ্যাস বদলানো ছাড়া কোন উপায় নেই। বাধ্য হয়েই রান্নার অভ্যাসও আমাদের কাছ থেকে বিদেয় নেয়।

প্রচণ্ড আর্থিক টানাপোড়েনে আজ ঘরের মেয়েকে কিছু রোজগারের চেষ্টা দেখতে হয়। স্বামীর পাশাপাশি তাই দশটা পাঁচটা অফিস করতে হয়। ছেলেপুলের একান্ত আবশ্যিক তত্ত্বাবধানই মায়ের দ্বারা করা হয়ে ওঠে না। একইভাবে দুবেলা দুটো মুখে গোঁজা ছাড়া রান্নাবান্নার বাদ-বাকি চিন্তা তাকে শিকেয় তুলে রাখতে হয়। সারাদিন খাটা-খাটনির পর আর রান্নাঘরে ঢুকতেই ইচ্ছে করে না। যার সামর্থ্য আছে লোক (আগে ছিল বামুন-ঠাকুর এখন হয়েছে 'কমবাইন্ড হ্যান্ড' একাধারে চাকর-বামুন দুই-ই) রেখে দায়িত্ব হালকা করে। আর যার নেই তাকে হাঁড়ি ঠেলতে হয়। এর ফলে যেটা হয় তার সবটাই দায়সারা। রান্নার অভ্যাস এর ফলে আস্তে আস্তে গুটিয়ে আসে।

সময় কম। কম সময়েই রান্না করতে হবে। এই চিন্তা অবশ্য অনেকদিন থেকেই চলছে। এমনিতে আমাদের রান্নার যে পদ্ধতি তাতে সময় খুব বেশি লেগে যায়। দু বেলা এভাবে চললে মহিলা অফিস কর্মিণীদের জেরবার হবার উপক্রম। তাই সহজ এবং কম সময়ে রান্নার ঝামেলা মেটানোয় সবাই আগ্রহী।

এ ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে আমাদের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে স্টোভ এবং কুকার। উনুনে রান্না চাপিয়ে প্রায় সর্বক্ষণ সেখানে বসে থাকতে হয়। স্টোভে সুবিধা কিছুটা আরো বেশি। এজন্য রান্নাঘরে ছোটাছুটি করতে হয় না। স্টোভ ধরিয়ে ভাত বা ডাল চাপিয়ে সময়মতো নামিয়ে নিলেই চলে। উনুনে যেমন আগুন লাগার আশংকা আছে স্টোভের ক্ষেত্রে আশংকাটা আরো বেশি। এখানে বিপদের পরিণাম খুবই গুরুতর হতে পারে। তবে সবকিছুই নির্ভর করে সতর্কতা এবং অসতর্কতার উপর। এই বিপদ এড়াবার জন্যেই যেন এগিয়ে এসেছে কেরোসিন কুকার। পুরাতন পদ্ধতিতে পলতের সাহায্যে জ্বলে। এতে স্টোভের মতোই কাজ হয়। সময় সংক্ষেপ হয় বটে কিন্তু বসে বসে পাহারা দিতে হয় ঠিকই।

প্রেসার কুকার এদিক থেকে খুবই সহায়ক। অনেকের ধারণা যে, প্রেসার কুকার কেবল মাংসই রান্নার জন্য, কিন্তু তা ঠিক নয়। এতে ভাত-ডাল-মাংস একসঙ্গে রান্না করা চলে। সর্বক্ষণ বসে থাকার কোন দরকার নেই। নির্দিষ্ট সময়মতো নামিয়ে নিতে হবে। সময় খুব কম লাগে। পনেরো কি কুড়ি মিনিটের মধ্যে মাংস রান্না সমাপ্ত। রান্নাবান্নার জন্যে দিনে মোট বায় ঘণ্টাখানেকেরও কম। তবে একটা কথা আছে, খুব বড়ো পরিবারের রান্না প্রেসার কুকারে সম্ভব নয়। সেজন্যে উনুন আর কড়ার বন্দোবস্ত রাখতেই হবে। এরকম বড়ো পরিবারে সময়সাপেক্ষ রান্না মাংসের জন্য প্রেসার কুকারের সাহায্য নিলে সুবিধা হয়। তবে ছোট পরিবারের পক্ষে প্রেসার কুকার খুবই সহায়ক। আর যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকুরিয়া তাদের তো কথাই নেই। একবার প্রেসার কুকার চাপিয়ে দিলেই হলো।

কেউ কেউ অভিযোগ করেন যে, প্রেসার কুকারের রান্নায় কাঁচা তেলের গন্ধ ছাড়ে। এই অভিযোগের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে আর একটু বেশি খাটতে হবে। ডাল প্রেসার কুকার থেকে নামিয়ে নেওয়ার পর ডালটা কড়াতে সম্বরা দিয়ে নিতে হবে। মাংসের বেলায় এই দোষ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা আছে। শুধু সময়মতো একটা বার খুলে দিতে হবে। তেলের গন্ধ ছাড়লেও প্রেসার কুকারের রান্না কিন্তু স্বাস্থ্যকর। আমাদের এমনি প্রচলিত রান্নায় প্রচুর খাদ্য-প্রাণ নষ্ট হয়। এখানে সে সুযোগ নেই। এমন কি ভাতের ফেনও গালতে হয় না। এই একটা বড়ো অপচয়ের হাত থেকে আমরা বেঁচে যাই। স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী এটাকেই নাকি আসল খাদ্যপ্রাণ।

সময় সংক্ষেপ হবে। খাদ্যপ্রাণ বাঁচবে। শরীর সুস্থ থাকবে। সময়ের আরো বেশি সদ্ব্যবহারের জন্য রান্নার সময় সংকুচিত করার প্রচেষ্টায় আমরা অনেকখানি সফল হয়েছি। সবদিক থেকেই এতে সুবিধা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই সহজাত গুণটিও পাচ্ছে। রান্নাবান্না করার ধকল পোয়াতে অনেকেই এখন নারাজ। এ'দের সংখ্যা বাড়বে। তখন হয়তো রান্নার সহজতর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবে। তখন কোন প্রবাসী এসে জিভ বদলের আশায় আর বলবেন না শাক-শুক্ত-ঘণ্ট বা ঝাল-ঝোল-অম্বল খাওয়ানোর কথা। কোন মধুসূদন আসন পিঁড়ি হয়ে খেতে বসে আরো একটু মোচার ঘণ্ট চাইবেন না। আর আমরাও ভুলে যাবো থালা থেকে হাত অব্দি চেটে-পুটে পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলে খাওয়া শেষ করা।

আবার বিশ্বপরিক্রমা

ব্রিটিশ মহিলা পাইলট মিস শীলা স্কট দুই ইঞ্জিনওয়ালা একটি হালকা এরো-প্লেন নিয়ে আবার বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছেন। প্রথমবার তিনি বিশ্বভ্রমণে বের হন ১৯৬৬ সালে। একা। সেবার তিনি চৌত্রিশ হাজার মাইল আকাশপথে দিয়ে বেড়ান। মাঝে মাঝে বিরতি অবশ্যই ছিল। কিছুক্ষণের জন্য দমদম বিমানবন্দরেও নেমেছিলেন। এটাই হলো এ পর্যন্ত দীর্ঘ-তম আকাশপথ পরিক্রমার একক রেকর্ড। এবার তিনি বিমানে আবার বিশ্বপরিক্রমায় বেরিয়েছেন। চৌত্রিশ হাজার মাইল আকাশ-পথ ভ্রমণ এবারও তাঁর লক্ষ্য। তবে এ-যাত্রার একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ও'র যাত্রা এবার দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। লন্ডন থেকে তিনি যাবেন নাইরোবি। পথে দু-এক জায়গায় থামবেন। তারপর নাইরোবিতে কয়েক দিন কাটিয়ে ফিরে আসবেন লন্ডনে। তারপর শুরু হবে তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের যাত্রা। এ পর্যায়ে তিনি বিশ্বের অনেক জায়গা ছুঁয়ে ভারতের মাদ্রাজে আসবেন। সর্বশেষ অবতরণস্থল হলো এথেন্স। এখান থেকেই তিনি দেশে ফিরবেন।

তাঁর এই ভ্রমণে বিশ্বের বিজ্ঞানীরাও খুবই আগ্রহী। দুটি পর্যায়ে তিনি সময় নেবেন পাঁচ সপ্তাহ। এসময় আমেরিকান এবং দক্ষিণ ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা তাঁকে ঘিরে এক পরীক্ষাকার্য চালাবেন। হয়তো এর ফলে ভবিষ্যৎ মহাকাশ অভিযানের কোন সূত্র পাওয়া গেলেও যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই মিস স্কটের এরোপ্লেনে নানা যন্ত্রপাতি রাখা হয়েছে। এসব যন্ত্র-পাতিতে ধরা পড়বে শারীরিক এবং মান-সিক প্রতিক্রিয়া। একই সঙ্গে আকাশের আবহাওয়া সম্বন্ধে নানা তথ্যও এই যন্ত্রে ধরা পড়বে। প্রয়োজনে তিনি আলাস্কার গ্রাউন্ড স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারবেন।

এককালের অভিনেত্রী মিস স্কট অভি-নয় ছেড়েছেন এই ঘুরে বেড়ানোর নেশায়। এরোপ্লেন নিয়ে আকাশপথে পাড়ি দিতে যে আনন্দ তিনি পান তার কাছে আর সবই নগণ্য। দ্বিতীয়বার বিশ্বপরিক্রমায় বেরো-নোর আগেই তিনি রেকর্ড করেছেন নব্বইটি। এবং সবই বিশ্বরেকর্ড।

—প্রমীলা

তখনও চারটে বাজতে মিনিট পনেরো দেরি ছিল। কিন্তু শ্যামলের তর সইছিল না। সে জানে এখন হাসপাতালে তাকে রোগী দেখতে দেবে না। ভিজিটিং আওয়ার্স সুরু হবে চারটে থেকে। তবু যে সে আগে চলে এসেছে তার একটা কারণ আছে। নইলে সে তো অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গেও আসতে পারত। তার একা আসার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

অনেকদিন ধরে সে মনে মনে ভেবেছে যে সে ঠিক চারটে বাজতে না বাজতেই হাসপাতালে চলে আসবে। তারপর সোজা সেই ফিমেল ওয়ার্ডে ঢুকে যাবে যেখানে দীপিকা একা শুয়ে আছে। মাত্র দশ মিনিট সময় তার প্রয়োজন। এই সামান্য সময়টুকু পেলেই তার চলবে। দীপিকার সঙ্গে নিভৃতে দুটি-একটি কথা বলা, অসুস্থ দীপিকার কপালে হাত রাখা—শুধু এইটুকুই শ্যামল চায়। কিন্তু একদিন দুদিন করে পনেরো দিন হয়ে গেল। শ্যামল কোন দিনই তার এই পরিকল্পনাকে সফল করতে পারেনি। যদি বন্ধু-বান্ধবীদের মধ্যে কেউ তাকে দীপিকার সঙ্গে একা দেখে ফেলে তাহলে কী ভাববে—এই চিন্তাই তাকে বেশি বিব্রত করেছে। [illegible] অথচ পরে সে ভেবে দেখেছে যে তাকে দীপিকার রোগশয্যার পাশে একা দেখলে কেউ কিছু মনে করবে না। এমনও তো হতে পারে যে সে সবার আগে এসে পড়েছে। এতে মনে করবার কী আছে? কিন্তু অন্যদের মনে করবার কোন কারণ না থাকলেও শ্যামলের আছে। রোগিনী যদি দীপিকা না হয়ে অন্য কোন বান্ধবী হত তাহলে শ্যামলও তাকে একা একা দেখতে যাওয়ার কোন সংকোচ বোধ করত না। কিন্তু দীপিকা স্বয়ং অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার খুব অসুবিধে হয়েছে। কারণ দীপিকা এবং তাকে জড়িয়ে ইতোমধ্যে কলেজের বন্ধু-বান্ধবীরা ঠাট্টা-তামাসা করতে শুরু করেছে। এ ধরনের রটনার জন্য শ্যামল নিজেই দায়ী। কারণ দীপিকার প্রতি তার দুর্বলতাব কাহিনী সে যতই গোপন করতে চাক না কেন তার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবী জেনে গেছে। কিন্তু দীপিকার তার প্রতি কোন দুর্বলতা আছে কিনা আজও তা জানা যায়নি।

শ্যামল তাই ঠিক করেছিল, এবার যেমন [illegible] হোক দীপিকার মনের আসল খবরটা [illegible] খবর জানবার জন্য অপেক্ষা করতে পারে? কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর ভিড়ে দীপিকাকে একা পাবার জো নেই। তা ছাড়া দীপিকাব সঙ্গে আজ পর্যন্ত কোনদিনই সে নিভৃতে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পায়নি। দীপিকাকে মুখ ফুটে সে কথা বলবার সাহসই তার হয়নি। দীপিকাদের বাড়িতেও তার যাওয়ার বিশেষ সুযোগ হয়নি। একদিন বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে গিয়েছিল এইমাত্র। এই সামান্য পরিচয়ের সূত্র ধরে তাদের বাড়িতে যাওয়া শ্যামলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং তাকে বাধ্য হয়েই তার মনের ইচ্ছাকে দমন করে রাখতে হয়েছিল। তারপর দীপিকা যখন অপারেশনের জন্য এই হাসপাতালে ভর্তি হল তখন সে মনে মনে এই ভেবে আনন্দিত হয়েছিল যে এবারে তার পক্ষে দীপিকার সঙ্গে একা একা দেখা করা অসম্ভব হবে না। এবার সে তার প্রতি দীপিকার প্রকৃত মনোভাব ভালো করে বুঝতে পারবে।

কিন্তু বাধা তো শুধু বাইরের নয়, বাধা ভিতরেরও। আজ পনেরো দিন হোল দীপিকা এখানে এসেছে। এই পনেরো দিন ধরে রোজই শ্যামল মনে মনে পরিকল্পনা

করেছে। কিন্তু কিছুতেই সে দীপিকার সঙ্গে একা একা দেখা করতে পারেনি। বাইরে বাধা কিছু নেই। যত বাধা তার মনে। দীপিকা যদি তাকে একা আসতে দেখে কিছু সন্দেহ করে—এই চিন্তাই তাকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছে। যদি সে বলে, একি! আপনি একা কেন? আর সব কোথায়?' তাহলে সে কী উত্তর দেবে? সে কি বলবে, ওরা সব আসছে। আমি একটা বিশেষ প্রয়োজনে আগে এসেছি? না, তার পক্ষে তা বলা সম্ভব নয়।

শ্যামল বড় গেট দিয়ে ভিতরের দিকে তাকাল। এমার্জেন্সী ওয়ার্ডের সামনে ভিড় নেই। দূর থেকেও সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক লেখাটা তার নজরে পড়ছিল। ইচ্ছে করলে সে ভিতরে ঢুকে পায়চারি করতে পারে। কিন্তু সে ভিতরে ঢুকল না। কিন্তু হাত-ঘড়িটার দিকে সে তীক্ষ্ণ নজর রাখল। আজ যেমন করে হোক তাকে সকলের আগে দীপিকাদের ওয়ার্ডে ঢুকতে হবে। কারণ দীপিকার অপারেশন আজ কালের মধ্যে হয়ে যাবে। এরপর সে আর বেশী দিন হাসপাতালে থাকবে না। সুতরাং দীপিকাকে এ-রকম একা পাওয়ার সুযোগও আর পাওয়া যাবে না।

হাত-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল শ্যামল চারটে বাজতে তখনও মিনিট পাঁচেক বাকি। উহু! ঘড়ির কাঁটাগুলো কী আস্তে আস্তে চলে। যখন সময় তাড়াতাড়ি ফুরোবার প্রয়োজন হয় তখনই তা আস্তে আস্তে শেষ হয়। পাঁচ মিনিট সময় যেন অনন্তকাল বলে মনে হচ্ছে।

দীপিকার জন্য কিছু ফল কিনে নেবে নাকি? শ্যামল গেটের সামনে ফলওয়ালাকে দেখে কিছুক্ষণ ভাবল। দুটো টাকা তার পকেটে আছে। এ দিয়ে অবশ্য কিছু ফল কেনা যায়। কিন্তু সে ফলের ঠোঙা হাতে নিয়ে দীপিকাকে দেখতে যাচ্ছে ভাবতেই সে লজ্জা পেল। না, তা সে পারবে না। ব্যাপারটা যেন কিরকম বুড়োদের মত হয়ে যাবে। তাছাড়া দীপিকার আত্মীয়-স্বজন ব্যাপারটা কী ভাবে নেবেন কে জানে! শ্যামল শুনেছে তাদের আর্থিক অবস্থা নাকি খুবই ভালো। দীপিকার বাবা কোন একটা কোম্পানীর ম্যানেজার। দাদাদের মধ্যে কেউ ডাক্তার কেউ ইনজিনীয়ার, কেউ বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্ট। সুতরাং তাঁদের বাড়ির মেয়েকে ফল দেওয়া তাঁদের পছন্দ নাও হতে পারে। শ্যামলের সহপাঠী সমরেশ একবার বলেছিল, ওর ভাইরা রোজ জামা-প্যান্ট বদলায়। তোমার আমার মত এক জামা-কাপড়ে সাতদিন চালায় না।

শ্যামল সেদিন কথাটা শুনে কষ্ট পেয়েছিল। নিজের দারিদ্র্যের জন্য লজ্জাও পেয়েছিল। কিন্তু তবু সমরেশের কথায় সে তো সাবধান হতে পারেনি। বরং দীপিকার আকর্ষণ এর পর থেকে তার [illegible] আরও তীব্র [illegible] উঠেছে।

কলেজের কত মেয়ের সঙ্গেই তো তার পরিচয় হয়েছে। কিন্তু সবাইকে কি দীপিকার মত ভালো লাগে? তার ক্লাশের রত্না, নীরা, জয়ন্তীর সঙ্গে তার এত ঘনিষ্ঠ পরিচয়। কিন্তু তাদের মধ্যে কাউকে কি বিশেষভাবে ভালো লাগে? প্রথম দিন দীপিকাকে দেখেই তার মনে যে অনুভূতি হয়েছিল তা আর কাউকে দেখে হোল না কেন? আরও কত মেয়েই তো ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। কিন্তু তাদের কারোর গানই দীপিকার গানের মত ভালো লাগে না কেন? অথচ দীপিকার গান গাওয়ার পিছনে কোন সযত্ন প্রয়াস নেই। তার যা কিছু কৃতিত্ব সবই অশিক্ষিতপটুত্ব। তবু দক্ষিণীতে-গান-শেখা জয়ন্তীর থেকে দীপিকার গানই শ্যামলের বেশি ভালো লাগে।

কলেজে কত মেয়েই তো সাজ-গোজ করে আসে। কিন্তু কই তাদের সাজ-গোজ তো শ্যামলের খুব ভালো লাগ না। বরং সাদা সিল্কের শাড়ী-ব্লাউজে দীপিকাকে চমৎকার মানায়। কখনও কখনও দীপিকা যে রঙীন শাড়ী পরে না তা নয়। কলেজে ফাংশন থাকলে দীপিকার গানের প্রোগ্রামও অবশ্যই থাকে। সেদিন সেও কম সাজে না। কিন্তু তার সাজ-গোজ কখনও শ্যামলের চোখে দৃষ্টিকটু বলে মনে হয়নি। এমন কি দীপিকা যেদিন নিতান্ত আটপৌরে শাড়ী পরে আসে সেদিনও তাকে অপরূপা বলে মনে হয়।

চারটে বাজার ঠিক সঙ্গে সঙ্গে শ্যামল গেট দিয়ে হাসপাতালের ভিতরে ঢুকে পড়ল। না, আজ সে কোনক্রমেই দেরি করবে না। জীবনে সুযোগ বড় একটা আসে না। সুতরাং এই সুযোগের সে নিশ্চয়ই সদ্ব্যবহার করবে। হাসপাতালের মেইন গেট দিয়ে ঢুকে সে এগিয়ে চলল। তখনও দর্শনার্থীদের ভিড় হয়নি। সবে দু-একজন করে লোক আসতে শুরু করেছে। ডানদিক দিয়ে যে সিঁড়িটা উঠে গেছে সেটার মাথার দিকে তাকিয়ে শ্যামল দেখল বেশ একটা ছোটখাটো ভিড় হয়েছে। হয়তো কোন বিখ্যাত ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে এসেছেন। তাঁর অনুরাগীরা খবর পেয়েই ছুটে এসেছে। এমার্জেন্সী ওয়ার্ডটা বাঁ পাশে রেখে শ্যামল ধীরে ধীরে দীপিকা-দের ওয়ার্ডের দিকে এগোল।

হাসপাতালের ভিতর ঢুকলেই শ্যামলের কিরকম একটা বিচিত্র অনুভূতি হয়। চার-পাশে ইট রঙের বাড়ি। রাস্তাগুলো পিচে বাঁধানো। বেশি চওড়া নয়, লম্বাও নয়। রাস্তার পাশে রেলিঙ দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট বাগান। ঘন সবুজ ঘাসে ভরা। কোথাও সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে আছে গাছে। কেউ ছিঁড়ছে না। কিছুটা দূরে একটা বাড়ির তিনতলার দিকে তার দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল। ওটাও বোধ হয় ফিমেল ওয়ার্ড। ব্যালকনির রেলিঙে শাড়ী-সায়া মেলে দেওয়া আছে। একটি মেয়ে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার বয়সের [illegible]

দূর থেকে মেয়েটিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এই দুপুরের নির্জনতায় ব্যালকনির এক কোণে দাঁড়ানো মেয়েটিকে তার খুব বিষণ্ণ বলে মনে হচ্ছিল। হয়তো তারও দীপিকার মত অপারেশন হবে। কিম্বা হয়তো এমন রোগ যার জন্য অপারেশনের দরকারই নেই। শ্যামল বেশিক্ষণ সেই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না। তার মন খারাপ হয়ে গেল।

একজন নার্স শ্যামলের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল। হাসপাতালে এই নার্সদের দেখলে তার বেশ ভালো লাগে। চারপাশে সারি সারি ইট রঙের পাঁচিল আর তার মধ্যে ধপধপে সাদা ইউনিফর্ম পরে নার্সরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের পায়ের জুতো থেকে শব্দ উঠছে খট খট খট খট। শ্যামল কিছুদিন একটা কোচিং-এ পড়িয়েছিল। সেখানে দু-তিনটি নার্স পড়তে আসত। তারা কেউ সেভেন কেউ এইট পর্যন্ত পড়ে আর স্কুলে পড়তে পারেনি। শ্যামল ওদের বাংলা পড়াত।

মেয়েগুলো লেখাপড়ায় খুব মনোযোগী ছিল। শ্যামল তাদের পড়াত আর ভাবত, এই মেয়েগুলোই বিকেলে আবার ইউনি-ফর্ম পরে অন্য রকম হয়ে যাবে। তখন তাদের আর তৃপ্তি বেলা ছবি বলে ডাকা যাবে না। তখন তাদের সিস্টার বলে ডাকতে হবে। কোন রোগী বলবে, সিস্টার এদিকে। কেউ বলবে, সিস্টার একটু শুনুন না—। তখন তারা জুতোর খট্ খট্ আওয়াজ তুলে একবার এ-রোগী আর একবার ও রোগীর কাছে ছুটে যাবে। একে ইনজেকশন দিচ্ছে, ওকে ওষুধ খাওয়াচ্ছে। ওর টেম্পারাচার নিচ্ছে। রোগীর শিয়রের কাছে চার্টে লিখে রাখছে। আবার বড় ডাক্তার এলে সর্বদা তার ভয়ে তটস্থ থাকছে। তার মুখের কথাটি যাতে না পড়তে পারে তার জন্য সদাসতর্ক। অথচ দেখ এখন তাদের সম্পূর্ণ অন্যরূপ। এখন তাদের পরনে সাদা ইউনিফর্ম নেই। পায়ে খট্ খট্ শব্দ তোলা জুতো নেই। এখন তারা শ্যামলের ক্লাশের আর পাঁচটি ছাত্রীর মতই পড়া শুনছে। হয়তো একজনও পাশ করবে না, কিন্তু পাশ করার আগ্রহ অপরিসীম। কারণ, তাহলে চাকরিতে উন্নতি হবে। নার্সদের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছে শ্যামল। নার্সের পোষাকে ওদের যত সুন্দর দেখায় সাধারণ বেশে তা দেখায় না। তবে অধিকাংশ নার্সেরই স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

শ্যামলের ছাত্রীদের মধ্যে চামেলী নামে একটি মেয়ে ছিল। সেও নার্সের চাকরি করত। ওর গায়ের রঙটা ছিল কালো। কিন্তু চোখদুটি ছিল বেশ টানা-টানা। আর সারা শরীরে কিরকম যেন একটা লাবণ্য-মাখানো ছিল। চামেলী প্রায়ই কোচিং-এ আসত না। তার না আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলত, কাল [illegible] পর্যন্ত ডিউটি [illegible]

মাস্টারমশাই। পড়ব কখন? ওর কথা শুনে অন্যান্য মেয়েরা মুখ টিপে হাসত। শ্যামল ভাবত কে জানে চামেলী সত্যি কথা বলছে কিনা। তার কিরকম যেন সন্দেহ হত। অনেকদিন বাদে সে চামেলীকে একদিন এসপ্লানেডে একটি সুবেশ যুবকের সঙ্গে ঘুরতে দেখেছিল। তার সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা জ্বলজ্বল করছিল। তখন সে কোচিং ছেড়ে দিয়েছে। তার আর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি।

শ্যামল এখন লম্বা টিনের ঢাকা-দেওয়া রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। এর আগেও যখন এই ঢাকা-পথ দিয়ে সে গেছে, তখনই তার জানতে ইচ্ছে করেছে রাস্তাটাকে এভাবে ঢাকা হয়েছে কেন? কিন্তু তার মনের কৌতূহল মনেই থেকে গেছে। আজও সে আসল কারণ জানতে পারেনি।

ক্যান্টিনটা ডান পাশে রেখে শ্যামল এগিয়ে গেল। সমস্ত হাসপাতালে একমাত্র এই ক্যান্টিনটা ব্যতিক্রম। আর সব জায়গায় চুপচাপ। শান্ত পরিবেশ। চেঁচিয়ে কথা বলতে সংকোচ হয়। কিন্তু এখানে তা নেই। সব সময় হাসি-গান-চিৎকারে গম্ গম্ করছে। শ্যামলের নাকে একটা ভালো রান্নার গন্ধও ভেসে এল।

ঢাকা-পথটা পার হয়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াতেই শ্যামল ধাঁধায় পড়ল। দীপিকাদের ওয়ার্ডে অনেক ঘুরে যেতে হয়। কোন্ পথ দিয়ে গেলে সুবিধে হবে তা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। তাছাড়া দীপিকাদের ওয়ার্ডের মত আরও ওয়ার্ড থাকায় সে ঠিক করতে পারছিল না কোন্ পথে যেতে হবে। এর আগে সে রোজই বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে এসেছে। সুতরাং তাকে আর একা খুঁজে নিতে হয়নি। কিন্তু এবার সে একা এসেছে। শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে-চিন্তে শ্যামল একটা পথ ধরে এগুতে লাগল।

দীপিকার রোগটা কিন্তু খুব অদ্ভুত। ওর কাঁধের কাছে একটা হাড় বেড়ে গেছে। অপারেশন করে সেই হাড়ের কিছুটা বাদ দিতে হবে। মানুষের রোগের আর শেষ নেই। এরকম অসুখও হয়। এর জন্য আবার অপারেশন। বাইরে থেকে দীপিকাকে দেখে কি বোঝবার উপায় ছিল যে তার কাঁধের হাড় বেড়ে গেছে। কি করে বোঝা যাবে? অথচ দীপিকার নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হচ্ছিল। নইলে সে অপারেশন করতে আসবে কেন? আর দীপিকা অপারেশনের জন্য হাসপাতালে আসায় শ্যামলের তো সুবিধাই হয়েছে। এই যে সে দীপিকার সঙ্গে একান্তে দেখা করবার জন্য যাচ্ছে দীপিকা হাসপাতালে না এলে তার পক্ষে কি তা সম্ভব হত?

শ্যামল শেষ পর্যন্ত দীপিকার ওয়ার্ডের সামনে এসে দাঁড়াল। রাস্তা থেকে দোতলায় উঠে যাবার সিঁড়িটা দেখা যাচ্ছে। এক-তলাতেও কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে উঠতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য শ্যামলের পা দুটো কেঁপে গেল। বুকটা ঢিপ ঢিপ করে উঠল। তার নিজেকে কি রকম যেন নার্ভাস নার্ভাস বলে মনে হতে লাগল। দীপিকার সঙ্গে একা একা দেখা করতে আসবার কথা ভাবলেই যে-রকম আড়ষ্টতা তাকে ঘিরে ধরত এখন তাই তাকে আক্রমণ করল। সে দু-তিন মিনিট দোতলার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ দোতলার সিঁড়ি দিয়ে একজন বয়স্কা নার্সকে নামতে দেখে সে সব ভয় জড়তা দূরে ঠেলে ফেলে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। কে জানে যদি এই নার্সটি তাকে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে, আপনি এখানে এরকমভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? —তাহলে সে কী উত্তর দেবে? তাছাড়া তার হাতে সময় বেশি নেই। দীপিকার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবীরা এখনই আসতে শুরু করবে। তখন তার ব পরিকল্পনাই ভেস্তে যাবে।

দোতলায় উঠে শ্যামল লম্বা করিডোর দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। একটা অদ্ভুত চেনা গন্ধ তার নাকে এসে লাগল। গন্ধটা কিসের তা সে সঠিক বলতে পারে না। তবে বেশ ঝাঁজালো। অনেক বছর আগে যখন শ্যামলের বয়স দশ কি এগারো তখন একবার তার মায়ের অপারেশন হয়েছিল। সেই সময় শ্যামল প্রথম গন্ধটা পায়। তারপর অনেক বছর বাদে দীপিকাকে দেখবার জন্য হাসপাতালে প্রথম দিন পা দিতেই সে আবার গন্ধটা পায়। বোধ হয় কোন ওষুধের গন্ধ। কিন্তু বেশ উগ্র।

দীপিকার বেডটা করিডোরের ঠিক পাশেই, একটা দরজার কাছে। ঠিক কোন্ দরজাটার কাছে তা সে ঠাহর করতে পারল না। সব দরজাই তো এক রকম। সে ভেবেছিল করিডোর থেকেই দীপিকাকে দেখতে পাবে। কিন্তু প্রত্যেকটি দরজার কাছের দরজাগুলোর দিকে তাকিয়েও সে দীপিকাকে দেখতে পেল না। শ্যামল ভাবল, তার ওয়ার্ড ভুল হয়নি তো? কিন্তু না, তার ভুল হবে কি করে? দীপিকাদের ঘরে এক বুড়িকে সে এর আগেও অনেকবার দেখেছে। আজও সে তাকে দেখতে পেল। সুতরাং তার ভুল হয়নি। ঠিক যে জায়গায় দীপিকার বেডটা থাকবার কথা সেখানে একটা ছোট-খাটো ভিড় দেখে এর আগে সে দাঁড়ায়নি। কারণ তার ধারণা দীপিকার বেডের কাছে ভিড় হবার কোন কারণই নেই। কিন্তু এবার সে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে আসতেই প্রথমে দীপিকার বাবাকে দেখতে পেল। এর আগে ভদ্রলোককে মাত্র একবার এই হাসপাতালে শ্যামল দেখেছিল। সুতরাং প্রথমে সে তাঁকে ঠিক চিনতে পারেনি। দীপিকার বাবার আশে-পাশে দু-তিনজন বিভিন্ন বয়সের ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের মুখ দেখে শ্যামলের বুঝতে অসুবিধে হোল না যে এঁরাই দীপিকার দাদা। দীপিকার দাদাদের সঙ্গে শ্যামলের এর আগে কোন দিন দেখা হয়নি। তাই আলাপ-পরিচয়ও নেই। শ্যামল ধীরে ধীরে সবার পিছনে এসে দাঁড়াল। দীপিকার বেডের দিকে তাকিয়ে দেখল সে অচৈতন্যের মত পড়ে আছে। দীপিকার পায়ের কাছে তার বড়দিদি বসে আছেন। আর শিয়রে তার মা বসে আছেন। তাহলে দীপিকার অপারেশন হয়ে গেছে? এই প্রশ্নটাই শ্যামলের মনে বার বার উঁকি দিল। একবার সে ভাবল, তার আর এখানে থাকা এখন ভালো দেখায় না। যে উদ্দেশ্যে তার এত তাড়াতাড়ি আসা তাই সিদ্ধ হল না। সুতরাং তার আর এখানে থাকার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে সে চলেও যেতে পারল না। সবার পিছনে দাঁড়িয়ে দীপিকার দিকে তাকিয়ে রইল। বোঝা যাচ্ছে, ওর অপারেশন হয়ে গেছে। যে অপারেশনকে খুব সামান্য মনে হয়েছিল দেখা যাচ্ছে তা মোটেই সামান্য নয়। দীপিকা যে এ-রকম কাহিল হয়ে পড়বে তা সে ভাবতেও পারেনি। এখন দীপিকাকে বারো-তেরো বছরের বালিকার মত মনে হচ্ছে। কে বলবে এ মেয়ে বি-এ পড়ে? মাথার বেণী দুটো বালিশের দুপাশে শিথিলভাবে পড়ে আছে। চুলগুলো রুক্ষ। মনে হয় অনেকদিন তেল পড়েনি। চোখের চশমাটি না থাকায় মুখটা আরও ছোট দেখাচ্ছে। দুটো হাত শাদা চাদরের উপর এলিয়ে পড়ে আছে। দীপিকার স্বাস্থ্য কোন দিনই ভালো না। কিন্তু এখন তাকে আরও রোগা দেখাচ্ছে। দীপিকার মুখের দিকে তাকিয়ে শ্যামলের খুব কষ্ট হচ্ছিল। চোখ দুটো বোঝা। সমস্ত শরীরটা সাদা চাদরে ঢাকা। শ্যামল অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল। দীপিকার মা একবার চোখ তুলে শ্যামলকে দেখলেন। কিন্তু কোন কথা বললেন না। ওর বড়দিদি ইশারায় শ্যামলকে তাঁর পাশে ডাকলেন। শ্যামল তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দীপিকার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে একমাত্র তাঁকেই শ্যামল চেনে। একবার দীপিকার সঙ্গে সে আর বরুণ তাঁর বেহালার বাড়িতে গিয়েছিল। তিনি লাভ ম্যারেজ

করেছেন। অসবর্ণে বিবাহ। তাই দীপিকাদের বাড়ির সংগে এখন তাঁর বিশেষ যোগাযোগ নেই। এসব কথা দীপিকাই একদিন তাকে বলেছিল।

দীপিকার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শ্যামলের কয়েক মাস আগের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। কলেজের ছেলে-মেয়েরা বাল্মীকি-প্রতিভা অভিনয় করবে। রোজ কলেজের ক্লাশের পর সমরেশের ঘরে রিহার্সাল হোত। সমরেশ তখন একা-একটা ঘর নিয়ে থাকত। রোজই তার ঘরে রিহার্সাল শেষ হতে সন্ধ্যে পার হয়ে যেত। দীপিকাকেও রোজ রিহার্সালের জন্য অনেক-ক্ষণ থাকতে হোত। তার বাড়ি ছিল কলকাতা থেকে কিছুটা দূরে। সমরেশের ঘর থেকে তার বাস টার্মিনাসটা বেশ কিছুটা দূরেই ছিল। কি যে ভীতু দীপিকা। রোজ রিহার্সালের পর তাকে বাস-স্টপে পেশছে দিতে হোত। আর এ কাজের ভার কি করে যেন শ্যামলের উপরেই ইর্য়েছিল। শ্যামলেরও অবশ্য এ দায়িত্ব পালন করতে খুব খারাপ লাগত না। কিন্তু সে ভান করত যেন সে নিতান্ত অনিচ্ছায় কাজটা করছে। মাঝে-মাঝে দীপিকাকে এই নিয়ে সে ঠাট্টা করত, আপনি তো খুব সাহসী মেয়ে। এই দশ মিনিটের পথ একা একা যেতে পারেন না? কলকাতার রাজপথে হাঁটতেও আপনার ভয় করে?

দীপিকা বলত, কে বলেছে ভয় করে? আমি তো একাই যেতে চাই। সমরেশবাবু তো জোর করে কাউকে না কাউকে সংগে দিয়ে দেবেন। কিছুতেই আমাকে একা ছাড়বেন না।

শ্যামল অভিমান করে বলত ও। তাহলে আপনার কোন সংগীর প্রয়োজন নেই। ঠিক আছে। তাহলে আপনি একাই চলে যান।

দীপিকা ঠোঁট দিয়ে হাসি চেপে বলত, বেশ। তাই যাচ্ছি।

তারপর শ্যামল যখন কৌতুক করে উল্টো দিকে [illegible] করত তখন দীপিকা তার জামার পিছন ধরে আলতো টান দিয়ে বলত, এই [illegible] কী হচ্ছে?

শ্যামল তখনও কৃত্রিম গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলত, কেন আপনার তো কোন সংগীর প্রয়োজন নেই। আপনি তো একাই যেতে পারবেন বলেছেন।

দীপিকা [illegible]। বলত [illegible] সংগে থাকলেও যা না থাকলেও [illegible]।

শ্যামল বলত [illegible] দেখাবেন [illegible]।

[illegible]

[illegible]

তাড় চলুন। অনেক রাত হয়ে গেছে।

এরপর শ্যামল আর না বলতে পারত না। দীপিকার পাশা-পাশি আবার হাঁটতে শুরু করত।

এইভাবে একদিন নয় দুদিন নয় প্রায় এক মাস রোজ সে দীপিকাকে বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত পেশছে দিয়ে এসেছে।

আরও একটা দিনের কথা শ্যামলের মনে পড়ল। দীপিকা তখন হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গেছে। নবমীর দিন হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি নিয়ে দীপিকা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তাদের সংগে ঠাকুর দেখেছে। বসন্ত কেবিনে আড্ডা দিয়েছে। সেদিন দীপিকা প্রায় তিন ঘণ্টা তাদের সংগে ছিল। সেদিন দীপিকাকে অনেকক্ষণ সে কাছে কাছে পেয়েছিল। সংগে অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবীরা থাকলেও একমাত্র সেই দীপিকার উপস্থিতিটা রক্তে রক্তে অনুভব করেছিল। অন্যদের কথা ভেবে সেদিন শ্যামলকে তার মনের আবেগ মনেই চেপে রাখতে হয়েছিল। দীপিকার সংগে সে একটাও কথা বলতে পারেনি। কিন্তু দীপিকার উপস্থিতিটা তার কাছে অসীম সৌভাগ্য বলে মনে হয়েছিল। শ্যামলের জীবনে যে কটি শুভদিন এসেছে তার মধ্যে সেই দিনটি নিঃসন্দেহে একটি।

খুব বেশি দিনের তো কথা নয়। দিন আট-দশ আগের কথা। অথচ সেদিনের কথা ভাবলে শ্যামলের আজও মন খারাপ হয়ে যায়। সেদিনের কথা মনে করলে আজকের ধপধপে শাদা বিছানায় শোয়া নিঃসাড় নিশ্চেতন দীপিকাকে যেন চেনা যায় না।

কিছুক্ষণ পর কাঁধের কাছে কার হাতের স্পর্শ পেয়ে শ্যামল মুখ ফিরিয়ে তাকাল। দেখল, বরুণ দাঁড়িয়ে আছে পিছনে। সে তাকে ইশারায় বাইরে ডাকল।

বরুণের পিছন পিছন করিডোরে এসে শ্যামল অনেককে দেখতে পেল। জয়তী, রত্না সমরেশ সবাই দাঁড়িয়ে আছে।

শ্যামলকে দেখে জয়তী শুধাল, কি, কখন এলেন?

শ্যামল ঢোক গিলে বলল কিছুক্ষণ আগে। তারপর এতক্ষণ মনে যে প্রশ্নটা জাগছিল এবার সেটা আর চেপে রাখতে পারল না। সে বরুণের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, দীপিকার অপারেশন কবে হয়েছে?

—আজ সকালে। কেন, তুমি জানতে না? কাল আসনি?

শ্যামলের মুখ দিয়ে আস্তে 'না' শব্দটা বেরিয়ে এল।

একটু পরেই শ্যামল আবার জিজ্ঞাসা করল সকালে [illegible] অপারেশন [illegible]

[illegible]

[illegible]

বাসে আমি এসেছিলাম। দীপিকা এত

নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। কাল বারবার আমাকে আসতে বলেছিল।

বরুণের কথা শুনে শ্যামলের ম[illegible] কিছুটা ঈর্ষা হোল। রাগও হোল। ত[illegible] মনে হোল, বরুণের চেয়ে সৌভাগ্যবান বো[illegible] হয় কেউ নেই। নইলে দীপিকার অপ[illegible] রেশনের সময় তাকেই বা সে বারবার আসত[illegible] বলবে কেন? নিজের উপর রাগও হো[illegible] তার। কাল তার এমন কী জরুরী কা[illegible] ছিল যার জন্য সে আসতে পারেনি? কা[illegible] না হয় টিউশনি না গেলেই হোত তাহলে দীপিকা হয়তো তাকে[illegible] আসতে বলত। মুহূর্তে সমস্ত বন্ধ[illegible] বান্ধবীর উপর তার কিরকম একটা রা[illegible] হোল। দীপিকার অপারেশনের খবর [illegible] তারা তাকে জানাতে পারত না? দীপিকা[illegible] অপারেশনের জন্য সে যে কতটা চিন্তি[illegible] তা এরা কি অনুমান করতে পারে না?

শ্যামলকে চুপ করে থাকতে দেখে[illegible] বোধহয় জয়তী বলল, চিন্তার কোন কারণ নেই। দীপিকা এক সপ্তাহের মধ্যেই ছুটি পেয়ে যাবে।

জয়তী নিঃসন্দেহে সুখবর দিল। কিন্তু শ্যামলের কাছে এটা কি সত্যিই সুখবর? সে মনে মনে ভাবল, আর এক সপ্তাহের মধ্যে দীপিকা হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে যাবে। তারপর আবার কলেজ। আবার সেই ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে কদাচিৎ কখনো দেখা হবে। বড়জোর সমরেশের ঘরে কোন বিশেষ উপলক্ষ্যে একত্র জমা হবে। হয়তো দীপিকার গান শোনাও হবে। কিন্তু এর মধ্যে দীপিকাকে একা পাবার উপায় নেই। দীপিকাকে তার যে অনেক কথা বলার ছিল। কিন্তু সে কীভাবে তার কথা দীপিকাকে বলবে?

—চলুন, ভিতরে যাই। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? সমরেশ বলল।

—হ্যাঁ, সেই ভালো। রত্না কথাটা বলে দীপিকার বেডের দিকে এগিয়ে গেল।

শ্যামল কিছুক্ষণ করিডোরে একা দাঁড়িয়ে রইল। সে কী করবে ভেবে পেল না। তার মনের মধ্যে যে প্রশ্নটা তোলপাড় করছে তার কোন উত্তর নেই। সে করি-ডোরের রেলিংয়ের উপর ভর দিয়ে কিছু-ক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল শরতের ঘন-নীল আকাশের বুকে হাল্কা সাদা সাদা মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে। দু-একটা পাখি নীড়ে ফিরে যাচ্ছে অপরাহ্নের রোদও ম্লান হয়ে এসেছে।

একটু পরে দীপিকার বাবা বরুণকে ডেকে বাইরে নিয়ে এলেন। তারপর দীপিকার বাবা ও দাদারা বরুণের সংগে কি সব কথাবার্তা বলতে লাগলেন। বরুণ দীপিকাদের পরিবারে খুবই পরিচিত। তাদের গোষ্ঠীর প্রায় প্রতিটি মেয়ের

বাড়িতেই তার অবাধ গতি। এই জন্য বন্ধুদের মধ্যে তাকে নিয়ে প্রায়ই ঠাট্টা-তামাসা হয়।

শ্যামল বাধ্য হয়েই আবার দীপিকার বেডের পাশে এসে দাঁড়াল। তাকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে ওরা কী ভাববে কে জানে?

দীপিকা সেই একইভাবে শুয়ে আছে। দীপিকার মা বড়দিদি উঠে দাঁড়িয়েছেন। সম্ভবতঃ ওঁরা এখন যাবেন। জয়তী দীপিকার শিয়রের কাছে বসে ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

শ্যামলের এ-দৃশ্য দেখতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। সে দীপিকার দিকে তাকাতে পারছিল না। দীপিকার অপারেশন হয়তো মারাত্মক নয়, হয়তো দু-একদিন পরে সে ভালো হয়ে হাসপাতাল থেকে ছুটি পাবে। কিন্তু এখন দীপিকাকে যে অবস্থায় সে দেখছে, তা তার মোটেই ভালো লাগছে না। সে দৃষ্টিটা দীপিকার বেড থেকে সরিয়ে অন্যান্য বেডগুলোর দিকে নিক্ষেপ করল। কোণের দিকে একটি তরুণী বধূ শুয়ে আছে। তার বেডের একপাশে এক জন ভদ্রলোক বসে ঝুঁকে পড়ে কি সব কথা বলছেন। মনে হয় ওরা স্বামী-স্ত্রী। আর কেউ রোগিনীটির ধারেকাছে নেই। দীপিকার ঠিক পাশের বেডে একজন মাঝবয়সী স্ত্রীলোক অনেকদিন ধরে আছেন। দীপিকার মুখেই সে শুনেছে যে ভদ্রমহিলার স্বামী-আত্মীয় সবাই আছে কিন্তু কেউ তাঁকে দেখতে আসে না। দু-তিনটি বেডের পরে একটি বেড খালি পড়ে আছে। ওই বেডে একজন বিধবা ভদ্রমহিলা ছিলেন। তাঁর পেটে অপারেশন হয়। তাতেই তিনি মারা যান। এখন তাঁর বেডটা ফাঁকা পড়ে আছে। দীপিকাকে দেখতে এসে শ্যামল তাঁকে কয়েকবার দেখেছে। এখন তাঁর বেডটার দিকে তাকিয়ে শ্যামলের একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল।

হঠাৎ একটি নার্স দীপিকার বেডের দিকে এগিয়ে এসে বলল, দেখি আপনারা একটু সরে যান। পেশেন্টের কাছে ভিড় করবেন না।

অনিবার্য কারণে বর্তমান সংখ্যায় শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস' প্রকাশিত হল না। আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

শ্যামল বাইরে বেরিয়ে এল। তার আর ওখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না। সে রঞ্জনকে সামনে পেয়ে বলল, চলি।

সমরেশ বলল, দাঁড়াও, আমরাও যাবো।

শ্যামল বলল, একটা জরুরি কাজ আছে। থাকতে পারছি না।

রঞ্জা শুধোল, কাল আসছেন?

শ্যামল বলল, আসবো।

করিডোরের একধারে বরুণ তখনও দীপিকার বাবার সঙ্গে কিসব কথা বলছিল। দীপিকার মা-দাদাও ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বোধহয় দীপিকার চিকিৎসা-সংক্রান্ত কোন কথা হচ্ছে। শ্যামল একবার ভাবল বরুণকে বলে যাবে নাকি। তারপর ভাবল, না, থাক। বরুণকে এখন ডিসটার্ব করা উচিত নয়। দীপিকার বড়দিদিকে দেখে সে তাঁর কাছে গিয়ে বলল, চলি।

তিনিও যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। শ্যামলকে বললেন, আচ্ছা, এসো। ও ভালো হয়ে উঠলে একদিন আমাদের বাড়িতে যেও।

শ্যামল বলল, নিশ্চয়ই যাবে।

বেশি কথা হোল না। সকলের মুখেই একটা দুশ্চিন্তার ছায়া। শ্যামল করিডোর ধরে এগিয়ে চলল। তারপর সেই লম্বা সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল। সে ভাবল, অন্যদিন যাবার সময় সে দীপিকাকে বলে যায়। আজ বলে আসা হোল না। অন্যদিন দীপিকা করিডোরে দাঁড়িয়ে দূর থেকে হাত নেড়ে তাকে বিদায় জানাত। যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে দেখা যেত ততক্ষণ সে করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকত। আজ আর কেউ করিডোরে দাঁড়িয়ে তাকে হাত নেড়ে বিদায় জানাবে না। আজ যে সে একান্তে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য চারটে বাজবার বেশ কিছু আগেই হাসপাতালে এসেছিল—একথা বোধহয় দীপিকা কোন-দিনই জানতে পারবে না। হঠাৎ শ্যামলের মনে হোল, যে-কথা দীপিকাকে বলবার জন্য সে আজ এসেছিল তা বোধহয় কোনদিনই বলা হবে না।

সমস্ত আকাশ তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে।

স্ত্রী-শিক্ষার উষালগ্নে

মায় মুখে শুনেছি যে, তাঁর লেখাপড়া করা দেখে তাঁর ঠাকুমা নাকি বলতেন, যে সব মেয়েরা পুঁথি পড়ে তাদের হাতের জল অশুচি। আর যে সব মেয়েরা লেখাপড়া করে না বাংলা দেশে তার এখনো অনেক আছে, নইলে শিক্ষিতের হার এ পর্যায়ে থাকে কী করে? তাদের হাতের জল সম্পর্কে আমরা আজ কি ভাবি সে কথা না বলাই ভালো। প্রায় একশো বছরের মধ্যে মেয়েদের শিক্ষার যে ইতিহাস তৈরী হয়েছে তা রীতিমত নাটকীয়।

মহিলা বিদ্যালয়ের সূচনা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই। কিন্তু স্কুল গড়া আর ছাত্রী পাওয়া দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। রেভারেন্ড লং পাতিপুকুরে স্কুল খুললেন; কিন্তু মেয়েরা সেখানে পড়তে যেতে চাইতো না। কারণ, গোঁড়া হিন্দু সমাজ থেকে প্রচার করে হয়েছিল যারা লেখাপড়া করবে তারা 'রাঁঢ়' অর্থাৎ বিধবা হবে। অমন দুর্ভাগ্য স্বেচ্ছায় ডেকে আনবে কোন্ মেয়ে। ফলে বৈধব্যের ভয়ে কেউ আর স্কুলে লেখাপড়া করতেই সাহস পেতো না।

কিন্তু গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার এগিয়ে এলেন সাহসের সঙ্গে। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক'—অর্থাৎ পুরাতন ও ইদানীন্তন ও বিদেশীয় স্ত্রী-লোকের শিক্ষার দৃষ্টান্ত' নামে একখানি বই লিখে ফেললেন তিনি। উদ্দেশ্য স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষে জনমত গঠন করা। যদি লেখাপড়া শিখলে 'ইংরেজী বিবিরা' বিধবা না হন তবে হিন্দু মেয়েরাই বা 'রাঁঢ়' হবে কেন? নানা-ভাবে স্ত্রী-শিক্ষার সমর্থনে তাঁরা যুক্তির অবতারণা করতে লাগলেন। কিন্তু সমাজের জগদ্দল পাথর এত সহজেই নড়তে চাইলো না।

কলকাতায় বেথুন (বীটন) বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করলেন স্বনামধন্য ড্রিংকওয়াটার বীটন। কিন্তু ফল? 'বামা বোধিনী' পত্রিকার একটি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে—'আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, এদেশের সর্বপ্রধান বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে এক্ষণে ৩০টি মাত্র ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে। এই বিদ্যালয়ে যেরূপ সুন্দর অট্টালিকা এবং ইহার শিক্ষা ইত্যাদি কার্যে যেরূপ প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে বঙ্গদেশের মধ্যে এরূপ বালিকা বিদ্যালয় আর নাই।' ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় ক্ষুন্ন হইয়া লিখল—'এই বিদ্যালয় ১৯ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে এই সময়ে গভর্ণমেণ্ট ইহার শিক্ষা কার্যের জন্য এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সাত শত ছিয়াত্তর টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এরূপ বিপুল অর্থব্যয় হইয়া যখন শুধু ত্রিশটি মাত্র সাত আট বৎসর বয়স্ক বালিকার সামান্য শিক্ষা লাভ হইতেছে, তখন ইহাতে অর্থ কেবল অপচয়ই হইতেছে বলিতে হইবে।'

সত্যিই বিপুল অর্থ ব্যয় হচ্ছিল সন্দেহ নেই। তবু ইংরেজরাও হাল ছাড়লেন না। তাঁরা আরো বিদ্যালয় খুলে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের বিপুলতর আয়োজন করতে লাগলেন। শিক্ষার দায়িত্ব রইলো প্রধানত ইংরেজ মহিলাদের হাতে। কারণ পুরুষের কাছে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা কল্পনাতীত।

আশা দেবী

অন্য দিকে দেশী শিক্ষয়িত্রীও দুর্লভ। সুতরাং ইংরেজ মেয়েরাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরি-চালনা করতে লাগলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রী আকর্ষণ করবার জন্য মেয়েদের বিনা পয়সায় গাড়ীর ব্যবস্থা, শাড়ী দেওয়া, অবৈতনিক পাঠ, প্রচুর পরিমাণে উপহার—সব ব্যবস্থাই ছিল। তবু ছাত্রী আসতে চাইতো না। একটি স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত বিদ্যালয়ের রিপোর্টে একটি চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়। একটি বিদ্যালয়ে চারটি ছাত্রী তার মধ্যে তিনটি উত্তীর্ণ। তারা তাদের যোগ্যতা অনুসারে পুরস্কার পাচ্ছে। এখনকার মেয়েরা এই পুরস্কারের বিবরণ শুনলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেকালে জন্মগ্রহণ করতে চাইবেন। প্রথমটির জন্য সোনার নেকলেস, খেলনা এবং মিষ্টান্ন; দ্বিতীয়টির সোনার বালা, খেলনা এবং মিষ্টান্ন—তৃতীয়টি হয়তো ওই রকমই পুরস্কার পেয়েছিলেন। যিনি প্রথম হয়ে-ছিলেন তাঁর সম্পর্কে চমকপ্রদ একটি তথ্যে জানা যায় যে তার চোখে এক জোড়া চশমাও আছে। এবং বীটন সাহেবের স্ত্রী এই অসামান্য বিদুষীকে সহস্তে পুরস্কৃত করতে পারলেন না বলে তাঁর একটি ফটো তুলে অতি অবশ্য তাঁকে বিলেতে পাঠাতে অনুরোধ করেছেন। বিবরণে মনে হয় মহিলা হয়তো বর্ষীয়সী, কিংবা কড়া বিদ্যানুরাগের জন্য চশমা নিতে হয়েছে। যখন মেয়েরা কেউই বিদ্যালয়ে যেতে নারাজ তখন একজনের ফার্স্টবুক পড়ার ফটো তোলা যোগ্যতা বৈকি?

ইংরেজরা মেয়েদের শুধু শিক্ষার ব্যবস্থা করেই নিরস্ত হননি, তাঁরা তাদের অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে একটি হিতকর কর্তব্য করেছেন: 'আমরা আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি, এতদ্দেশীয় ভদ্রমহিলাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র রেলওয়ে শকট রাখার প্রস্তাব অবধারিত হইয়াছে। আশা করি স্ত্রীলোকদের লজ্জা সম্ভ্রম রক্ষার্থে যত প্রকার উপায় থাকা আবশ্যক, তাহা সকলই উহাতে থাকিবে। ভদ্রমহিলা ভিন্ন কোন ইতর স্ত্রীলোক ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।... এই সব মহিলা শকটে ইউরোপীয় মহিলা প্রহরী থাকিবেন। সেই মহিলারা নির্দিষ্ট ষ্টেশনে নামিয়াই যানাদি প্রাপ্ত হইবেন তাহারও ব্যবস্থা রেলওয়ে কোম্পানি করিবেন। ষ্টেশনে তাহা-দিগের নিমিত্ত নিরাপদ গৃহ রাখিলেও আরো ভালো হয়'—মনে রাখা দরকার—তখনকার 'রেলওয়ে শকটে' কোনো অভিভাবক নিজের আবক্ষ অবগুণ্ঠনবতী সচল 'লাগেজ'টিকে অন্য কামরায় তুলে দেওয়ার কথা ভাবতেও পারতেন না। অতএব 'জেনানা গাড়ীতে' চেপে তাঁরাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দেখাতে পারতেন, যাঁরা লেখাপড়া শিখে, চোখে চশমা পরে অন্ধকার থেকে আলোকে এসেছেন। এই আলোকিতারাই পরোক্ষভাবে 'ভদ্রমহিলা' নামে চিহ্নিত হয়েছেন।

স্বভাবতই মনে হতে পারে এত সব সাধু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কেন ইংরেজরা স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে আশানুরূপ ফল পাচ্ছিলেন না। তার কারণও ছিল। বাইরে থেকে তাঁরা শিক্ষা প্রচার ইত্যাদি ব্যাপারে চেষ্টা করলেও প্রথম থেকে হিন্দু-মুসলিম ধর্মের নিন্দা এবং পরমপিতা যীশুকে ভজনা করার উপদেশ এমন নির্লজ্জভাবে প্রচার করতেন যে স্বভাবত জনমনে বিরূপতার সৃষ্টি হতো। শুধু তাই নয়, শিক্ষা প্রচারের ছুতো করে তাঁরা মেয়েদের খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করবার চেষ্টা করতেন। সাফল্যও যে লাভ করতেন না তা নয়। রাজপুরুষদের শুভেচ্ছা থাকলেও মিশনারীরা ধর্মের ব্যাপারেই উৎসাহিত ছিলেন বেশী মাত্রায়। বাইরের এই স্ত্রীশিক্ষা এবং জনকল্যাণের মুখোশ অনেকটাই খুলে পড়লো যখন তাঁরা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ভারতীয় ধর্মের স্পষ্ট নিন্দা আর বাঙালীদের পদে পদে ঘৃণা করতে আরম্ভ করলেন। ১৮১৮ সালে যেদিন প্রথম ছাপার অক্ষরে 'দিগদর্শন' নামে পত্রিকা প্রকাশিত হলো সেদিনই 'বিসুবিয়াস' পর্বতের কথা বলতে গিয়ে অসতর্ক মুহূর্তে তাঁরা বলে ফেললেন 'মুঙ্গেরের নিকট সীতাকুণ্ডে ও হিন্দুস্থানের অন্য অন্য স্থানে উষ্ণ জল নির্গত হয় তাহার কারণ এই সেখানকার মৃত্তিকা আগ্নেয় বস্তুতে সম্পূর্ণ। এই এই স্থান হিন্দুরা অতি তীর্থ বলিয়া মনে করে কিন্তু ইউরোপের মধ্যে এই মত অনেক পর্বত আছে যেখান হইতে দিবারাত্র অগ্নি

...ধর্ম নির্গত হয়...শুধু তাহারা সেই ...ানকে তীর্থ মনে করে না।'

মিশনারীদের স্বমূর্তি প্রকাশ পেলো ...ারো স্পষ্টভাবে। 'জ্যোতিরিঙ্গণ' নামে ...রা একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন—সুন্দর ...গজ, চমৎকার ছাপা। তার ওপর লেখা ...লো 'স্ত্রীলোক ও বালকদিগের জন্য'—এতে ...চিত্র ভাবে ভঙ্গিতে 'সত্য ধর্মের জয়গান ...তো।' বীরাঙ্গণা উপাখ্যান নামে আলাদা-...বেও অহল্যা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, মন্দোদরী, ...য়ন্তী, সীতা ইত্যাদির কাহিনী এতে ...ার করা হয়েছে। এবং প্রতিটি কাহিনীর ...বেই একটি করে নীতিবাক্য যোজনা করা ...য়েছে। সীতা কাহিনীর শেষের সিদ্ধান্ত ...ক্যটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ এবং চমৎকার। ...ক্ত কাহিনীর বিবরণ পাঠ করিয়া কে না ...ীকার করিবেন যে বহু বিবাহ রামচন্দ্রের ...কারণ বনবাস প্রভৃতি নানা অনর্থের মূল ...রণ, যদি দশরথ বহুবিবাহ রূপ মহৎ দোষে ...াষী না হইতেন, তবে কী সীতার এত ...র্দশা হইত, না রাজা দশরথ আপনিই ...কালে কালগ্রাসে পতিত হইতেন; বর্তমানে ...ালীণ্য দূরীভূত হয় নাই, ইহা অতি ...জ্জার বিষয়।'

'বাঙালী বালিকা—কুসুম কলিকা'—...িরার টুকরা', 'ক্ষীরের পুতুল', 'সোনার ...তমা', 'লাবণ্যের ছবি' বলে আদর করে ...যে বলা হয়েছে যদি তোমরা প্রকৃত সুখ ...ন্তি চাও তবে—'পরম ধরম করহ আশ্রয়

অগতির গতি যীশু দয়াময়'—

...ন্দুদের সব কিছুই খারাপ; তারা ...ৌত্তলিক, তারা যন্ত্র পুজো করে' কিন্তু ...দ তারা এ সব ছেড়ে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে ...ব আর কোন কথা নেই। তৎক্ষণাৎ তারা ...ভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ...কবারে সাহেব।

'সিবিল সার্ভিসে যদি হবে অ্যাপিয়ার
ধুঁয়ার জাহাজে তবে চড়িবে এবার।
পাশ করে কোট পরে ফিরে এলে দেশে
বোনার্জি সাহেব বলি পরিচয় শেষে।'

...ন্তু এত প্রলোভন সত্ত্বেও তাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রে ...আশানুরূপ ফল পাচ্ছিলেন না এমন কি যথার্থ শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বীটন বালিকা বিদ্যালয়কেও যে দীর্ঘদিন এর ফল ভোগ করতে হয়েছে, তা আমরা আগেই দেখেছি। 'কিন্তু এত করিয়াও মিশনারী পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়গুলি জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার কারণ ইহাদের স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের প্রচেষ্টা যে অবিমিশ্র সদিচ্ছাপ্রসূত ছিল না, খৃষ্ট ধর্ম প্রচারই যে মুখ্য লক্ষ্য ছিল, তাহা ধরা পড়িতে বিলম্ব হয় নাই। সুতরাং উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে একমাত্র দরিদ্রঘরের—অনেক স্থলে নিম্ন বর্ণের ছাড়া কোন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা যোগদান করেন নাই। প্রকৃত পক্ষে সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে পাঠাইবার আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। এই বাধা সর্ব প্রথম দূর করেন সরকারী শিক্ষা সংসদের সভাপতি, ভারত হিতৈষী ড্রিংকওয়াটার বীটন (বেথুন)। তিনি রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালংকার প্রমুখ দেশের কয়েকজন সুসন্তানের সহায়তায় ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ৭ই মে কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয় (বর্তমানে বেথুন কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেন।' (যোগেশচন্দ্র বাগল)

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকরে' একে অভিনন্দিত করেছিলেন 'কামিণীগণ পুরুষ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে, বরং স্থিরতা ও ধৈর্য প্রভৃতি গুণে শ্রেষ্ঠা হইতে পারে। অতএব তাহারা বিদ্যাশালিনী হইলে সাংসারিক লোকযাত্রা নির্বাহসূত্রে অতিশয় মঙ্গল হইবেক। পুরুষেরা সর্বদা সুনীতির আবর্তে ভ্রমণ করিতে পারিবেন; তাহাদের স্বাভাবিক যে শক্তি আছে বিদ্যার অভাবের জন্য তাহা স্ফূর্ত হইতে পারেনা। চালনা হইলে ওই শক্তি যে কত উজ্জ্বল হয় তাহা বলা যায় না, পাঠকবর্গের স্মরণ আছে আমরা সবাই বৈশাখ শনিশ্চর বাসরীয় প্রভাকরে "দৈবশক্তি" শিরোভূষণ প্রদান পূর্বক নবমবর্ষীয়া এক হিন্দু বালিকার বিরচিত কয়েকটি কবিতা প্রকাশ করিয়া ছিলাম। সেই কবিতা যিনিই পাঠ করিয়াছেন তিনিই চমৎকৃত হইয়াছেন।......তিনিই অঙ্গনাগণকে এখনি বিদ্যা-প্রদান করা কর্তব্য বলিয়া তৎক্ষণাৎ মনে মনে উদ্যোগী হইয়াছেন। বিজ্ঞমহাশয়েরা এতদ্দ্বারা অতি সহজেই স্ত্রীজাতির বিদ্যানুশীলনের কর্তব্য জানিতে পারিবেন। ঈশ্বর গুপ্তের 'এক বেথুন' এসে শেষ করেছে বলে স্ত্রী-শিক্ষা সংক্রান্ত বিখ্যাত বিদ্রূপ নিতান্তই সাংবাদিকতা, তাঁর 'বাউলচাঁদী সুরের" গানে—আর যা - ই থাক, তাঁর মনের কথা ছিল না, স্ত্রী-শিক্ষার পোষকতাই তিনি করেছিলেন।

মেয়েরা ধীরে ধীরে বিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে লাগলেন। উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদিত বামাবোধিনীতে একটি সুন্দর ছবি আছে কোনো আলোকপ্রাপ্তা মেয়ের। বিবরণে বলা হয়েছে মেয়েটি নাকি অসাধারণ বিদুষী। বিয়ের রাতে সে তার স্বামীর বিদ্যার গভীরতা পরীক্ষা করবার জন্য তাকে 'সরস্বতী' শব্দটি বানান করতে বলেছিল; কিন্তু স্বামী বানানটি ভুল বলায় তার নিজের জীবন সম্পর্কে ধিক্কার জন্মেছে। বাপের কাছে সে খেদ করে বলেছে, 'এমন মূর্খের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আমার জীবনই নষ্ট করে দিলে।'

ঈশ্বর গুপ্ত হয়তো সাংবাদিকতাই করেছিলেন, কিন্তু শিক্ষিতা মেয়েদের সম্পর্কে আক্রমণ বহুদিন পর্যন্ত বাঙালী পাঠকদের কাছে অতি রুচিকর ব্যাপার ছিল। সেই সব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উদাহরণ তুলতে গেলে 'মহাভারত' হয়ে যাবে। এমনকি দ্বিজেন্দ্রলালও অকারণ কৌতুকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি—'আমরা কটি নবকুঞ্জকামিনী'। কিন্তু একবার যখন বাঁধ ভাঙল জলোচ্ছ্বাস আর ঠেকানো গেল না। ইতিহাস তার নিজের পথ নিল।

একদিন এমন ছিল যখন মেয়েদের স্কুলে আনবার জন্য গাড়ী, টাকা, উপহার প্রভৃতি দিয়েও তাদের স্কুলে ভর্তি করা সম্ভব হতো না—আর আজ কলেজে মেয়েদের ভর্তির জন্য 'সীট' বাড়াবার জন্য তারা আন্দোলন করছে—এটা ভাবতেই অবাক লাগে।

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

(১) ঘুঁটের মালা রূপ পেল ফুলের মালায়

পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়কে অজস্র ধন্যবাদ, পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাজর্জর সমাজের মানুষকে তিনি প্রাণ খোলসা করে হাসিয়েছেন, দেদার হাসিয়েছেন শ্রী প্রোডাকশন্স নিবেদিত 'ধন্যি মেয়ে'র মাধ্যমে। বাস্তব জীবনে লাঠি বা বন্দুক উঁচিয়ে অবাধ্য যুবককে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে যখন কোনো তরুণীর জীবনকে কলঙ্কমুক্ত করা হয়, তখন ঘটনাটিতে রোমাঞ্চের সঙ্গে বেশ কিছুটা ভীতিপূর্ণ গাম্ভীর্য মিশ্রিত থাকে। কিন্তু 'ধন্যি মেয়ে'তে হাড়ভাঙ্গা গ্রামের জমিদার গোবর্ধন চৌধুরী তাঁর চোখের সামনে তাঁর গ্রামের ফুটবল টীমকে শীল্ড টুর্ণামেণ্টের ফাইনালে কলকাতা দলের কাছ থেকে বারো-বারোটি গোল খেতে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে যখন কলকাতা দলের গোলদাতা, সেণ্টার ফরওয়ার্ড বগলাকে শায়েস্তা করবার অভিপ্রায়ে বন্দুক উঁচিয়ে নিজের ডানপিটে ভাগ্নী মনসার সঙ্গে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিলেন এবং শুভ দৃষ্টির সময়ে বন্দুকের নলের ডগা দিয়ে মালাবদলের মালা তুলে ধরলেন, তখন দর্শকদের সঙ্গে আমরাও একেবারে হেসে কুটিকুটি হয়েছি।

—কিন্তু আর এগোবার আগে সংক্ষেপে কাহিনীটি বলে নেওয়া প্রয়োজন। একদিকে হাড়ভাঙ্গা গ্রামের জমিদার গোবর্ধন চৌধুরীর অনাদরে পালিত, ডানপিটে, মুখরা, গেছো মেয়ে মনসা। অথচ [illegible] কলকাতার ধনী ব্যবসায়ী, ফুটবলভক্ত, কাঠ-গোঁয়ার কালীগতি দত্তর আদুরে, বিবাহযোগ্য ভাই, ফুটবলের সার্থক সেণ্টার ফরওয়ার্ড বগলা। কালীগতি ও তাঁর স্ত্রী স্নেহময়ী—দুজনেই বগলার বিবাহের জন্যে ব্যস্ত; কিন্তু যোগ্য পাত্রী সম্বন্ধে ওঁরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। এ-হেন অবস্থায় কালীগতি—যাঁর দেবতা হচ্ছেন শিব ভাদুড়ী, বিজয় ভাদুড়ী, গোষ্ঠ পাল—সেই কালীগতি পৃষ্ঠপোষিত দলের হয়ে বগলা হাড়ভাঙ্গায় শীল্ড টুর্ণামেণ্টের ফাইনাল খেলতে এসে হাফ-টাইমের আগে একখানি গোল খাবার পরে মনসার কাছ থেকে একখানি ঘুঁটের মেডেল পেয়ে যথেষ্ট অপমানিত বোধ করল এবং প্রতিশোধস্বরূপ খেলার দ্বিতীয়ার্ধে যখন পর পর বারোখানি গোল করে বসল খেলার মাঝে বিপরীত পক্ষ দ্বারা বেজায় জখম হবার পরেও, তখন বেগতিক দেখে গোবর্ধন ওরফে গোবর চৌধুরী সদলবলে মাঠে ঢুকে পড়ে শুধু খেলাই পণ্ড করে দিলেন না, নিজের পার্শ্বচরের পরামর্শে সেই রাত্রেই কলকাতা দলকে জব্দ করবার অভিপ্রায়ে বগলার সঙ্গে মনসার বিয়ে দিয়ে দিলেন জোরজবরদস্তি করে। যে-বগলা বারোখানি গোল দেবার পরে মনসার গলায় বারোখানি ঘুঁটের মালা দিয়েছিল, সেই বগলাকে সেই মনসার গলায় দোলাতে হল ফুলের মালা। অদৃষ্টের ফের কাকে বলে! খেলায় জেতা চুলোয় গেল, ভাই বিয়ে করে বৌ নিয়ে ফিরছে শুনে কালীগতি একেবারে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে ফটক আগলে দাঁড়ালেন ভাইকে বৌসমেত বাড়ী ঢুকতে দেবেন না পণ করে। ভাই ঢুকতে পেল না বটে, কিন্তু বধূবেশিনী মনসাকে তিনি রুখতে পারলেন না—সে জোর করেই বাড়ীতে ঢুকে এল। স্নেহভুখারী মনসার অকুতোভয় ও সারল্য স্নেহময়ীকে মুগ্ধ করল; ভাসুরকে বশ করবার জন্যে তিনি নতুন বৌকে দিয়ে নানারকম ব্যঞ্জনও রাঁধালেন এবং ভাসুরের মুখে তার প্রশংসাও শোনা গেল। তবু কাঠ-গোঁয়ার কালীগতি এই হঠাৎ-বিবাহকে নাকচ করবার জন্যে মামলার কাগজে মনসার সই নিলেন, যে-সই মনসা স্বেচ্ছায় করল ভাসুর তাকে গ্রহণ করতে পারছেন না দেখে। মনসা বাপের বাড়ী ফিরে যাবার সময়ে ভাসুরকে কথা দিয়ে গেল, ফুটবলের রি-প্লেতে তাঁরই দল জিতে যাতে শীল্ডবিজয়ী হয়, সে-ব্যবস্থা সে করবে। —সে সত্যিই তার কথা রাখবার জন্যে বুদ্ধি খাটিয়ে ভাড়া-করা নামজাদা খেলোয়াড়দের ফেরৎ পাঠিয়ে কলকাতার দলকে শীল্ড জিতিয়েও দিয়েছিল এবং সেজন্যে মামা-মামীর কাছ থেকে প্রায় চোরের মারও খেয়েছিল. কিন্তু কালীগতি তাঁর বন্দুকের জোরে বলপূর্বক বাড়ী চড়াও হয়ে মনসাকে প্রায় আধমরা অবস্থা থেকে শুধু উদ্ধারই করেনি. তিনি তাঁর দলের জেতা শীল্ডকে গোবর্ধন ওরফে গোবরের কাছে সমর্পণ করে তার বদলে মনসাকে তাঁর ভ্রাতৃবধূরূপে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে তাকে নিয়ে সদলবলে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। ধন্যি মেয়ে এই মনসা!

এ ভি এম-এর ম্যায় সুন্দর হুঁ চিত্রে মেহমুদ, বিশ্বজিৎ এবং লীনা চন্দ্রভারকার

অসম্ভাব্যতা নিয়ে মাথা ঘামায় না; হাসির ছবির একমাত্র শর্ত হচ্ছে, তা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হবে এবং অব্যর্থভাবে হাসির খোরাক যোগাবে। এই শর্ত পুরোপুরিভাবে পালিত হয়েছে 'ধন্যি মেয়ে' ছবি দ্বারা। চিত্রনাট্যকার-পরিচালক শ্রীমুখোপাধ্যায় এই হাসির সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দর্শক-কৌতূহলকেও শুধু বজায়ই রাখেন নি, উত্তরোত্তর বর্ধিত করতেও সমর্থ হয়েছেন। সাফল্যপূর্ণভাবে হাসির ছবি সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজে অবলীলাক্রমে কৃতিত্ব প্রকাশ করে শ্রীমুখোপাধ্যায় নিজেকে বাংলার চলচ্চিত্র রাজ্যে একান্ত দুর্লভ হাসির ছবির দক্ষ পরিচালকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

হাসির ছবিতে অভিনয় করছি, এইটি মনে রেখে কালীগতি দত্তের চরিত্রটিকে বিশেষ ধরনের রূপসজ্জা ও বিশেষ ধরনের ভঙ্গীর মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন উত্তমকুমার, বাচনেও তিনি হয়েছেন যথেষ্ট সোচ্চার ও দ্রুত। চরিত্রাভিনেতা রূপে এই-ই সম্ভবত তাঁর প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং সার্থকও বটে। ধন্যি মেয়ে মনসার ভূমিকায় পুণা ফিল্ম ইন্সটিটিউটের পাশ-করা ও নামকরা ছাত্রী জয়া ভাদুড়ী বাংলা চলচ্চিত্রে এই দ্বিতীয়বার দেখা দিলেন (প্রথম ছবি 'জননী'; অবশ্য তারও আগে তাঁকে দেখা গিয়েছিল 'মহানগর'-এ নিতান্ত বালিকা বয়সে)। এই ছবিতে শ্রীমতী ভাদুড়ীর অভিনয় হয়েছে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। স্নেহময়ীর ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাবভঙ্গী-সহ জীবন্ত অভিনয় করেছেন। গোবর্ধন-রূপে জহর রায় দর্শকমনমাতানো অভিনয় করেছেন। অসামান্য চরিত্রাভিনেতা চিন্ময় রায় এ-ছবিতে উকিলবেশে দেখা দিয়ে তাঁর অভিনয়প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এছাড়া উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন : রবি ঘোষ (পুরোহিত-রেফারী), পার্থ মুখোপাধ্যায় (বগলা), সুনীল দাশগুপ্ত (বোবাজী), শ্যাম লাহা (গুরুদেব), তপেন চট্টোপাধ্যায় (কালীগতির শ্যালক), সুখেন দাস (ন্যাড়া-ঘোষক), অনুভা ঘোষ (গোবর্ধনের স্ত্রী), হরিধন মুখোপাধ্যায় (গোবর্ধনের পার্শ্বচর), তরুণকুমার ইত্যাদি।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি মধ্যমান রক্ষিত হয়েছে। উত্তমকুমারের বাচন এ-ছবিতে দ্রুত ও উচ্চগ্রামের। সেই-জন্যে শব্দানুলেখনে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল ওঁর বাচনের প্রতিটি কথাকে শ্রুতিগ্রাহ্য করার প্রতি, যা সর্বত্র হয়নি। সম্পাদক ছবির বহু জায়গাতেই কলকাতা ও হাড়ভাঙ্গার দৃশ্যে ইন্টারকাট করেছেন এবং বেশ ছোট ছোট শট দিয়ে। ... সম্পাদনা করার ... মিল না সর্বত্র।

সুসজ্জিত। বিশেষ করে আরতি মুখোপাধ্যায় গীত 'যা যা বেহায়া পাখী' শুনতে চমৎকার। কিন্তু 'মাঝে মনটা রেখে এলি' গানের সুর পরিস্থিতি অনুযায়ী উপযুক্ত নয়।

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'ধন্যি মেয়ে' অসাধারণ উপভোগ্য হাসির ছবি।

(২) মানুষের বন্ধুরূপে হাতী

মাদ্রাজের দেবর ফিল্মস্ নিবেদিত 'হাতী মেরে সাথী' ছবিতে হাতীকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষের সহায়ক, উপকারী বন্ধু হিসেবে যে-সব কাজ করতে দেখা গেছে, বাস্তব জীবনে তার সবটাই সম্ভাব্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সিনেমার পর্দার ওপর হাতীর প্রতিটি কাজই যে প্রচুর উত্তেজনাপূর্ণ উপভোগ্যতার সৃষ্টি করতালি তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

দ্রুত ধাবমান মোটরগাড়ী পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষকাণ্ডে ধাক্কা খাবার ফলে বালক রাজু যখন মোটর থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন আহত সংজ্ঞাহীন বালককে আক্রমণোদ্যত চিতাবাঘের কবল হতে রক্ষা করবার জন্যে যে-হাতীটি দ্রুতপদে এগিয়ে এসেছিল এবং চিতাকে লড়াইয়ে পরাস্ত করে ওর জীবন রক্ষা করেছিল, সেই 'রামু' হাতীটি তার আর তিনটি সঙ্গীসহ ওর অনুগমন করে ওর প্রাসাদে এসে হাজির হয়েছিল। ধনীগৃহে আশ্রয় পেয়ে ওদের কাটছিল ভালোই। বালক-রাজু ওদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে খেলতে যুবক হয়ে উঠল এবং দৈবক্রমে ঐ বলের মারফতই ধনীকন্যা তনুর সঙ্গে পরিচয় গড়ে উঠল। পরিচয় যখন প্রেমে রূপান্তরিত হল, তখন হঠাৎ একদিন ঋণের দায়ে রাজু গৃহ-সম্পত্তিহীন হয়ে দারিদ্র্যকে বরণ করতে বাধ্য হল। কিন্তু এ-অবস্থাতেও প্রচুর

ক্যালকাটা পিপলস্ আর্ট থিয়েটার অভিনীত চেকভের **সী গাল** নাটকের ছায়া অবলম্বনে **আকাশ বিহঙ্গী** নাটকের একটি দৃশ্যে পরিচালক নায়ক অসিত বসু এবং অপর্ণা সেন। নাটকটি থিয়েটার সেন্টারে মঞ্চস্থ হয়। ফটো : অমৃত

অর্থের বিনিময়ে হাতীগুলিকে বিক্রয় করতে সম্মত হল না। রাজুর অবস্থা বিপর্যয় ঘটেছে জেনে তনুর বাপ রাজুকে তনুর অসাক্ষাতে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। তখন রাজু হাতী চারটিকে নিয়ে পথে পথে ঘুরতে লাগল নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করে। রাজু যখন পথে মোট বয়ে উপার্জনের চেষ্টা করছে, তখন দৈবাৎ তনুর সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ হল। তনু প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করে পিতৃগৃহ থেকে বিদায় নিয়ে রাজুর সঙ্গ নিল। [illegible] একদিন পথে বানর খেলা দেখে নিজেদের চার হাতীর খেলা দেখা[illegible] এবং শিগগিরই [illegible] অধিকারী [illegible] [illegible]

দিলেন। তনুর কোলে যখন ছেলে এল, তখন তাকেও রাজুর প্রিয় হাতী 'রামু' দোলনায় দোল দিতে থাকল। কিন্তু যেদিন তনু শুনল, একটি হাতী ক্ষেপে গিয়ে তারই মাহুতের বালকপুত্রকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, সেদিন থেকে তনুর মন 'রামু'র প্রতি বিরূপ হয়ে গেল। এই বিরূপতা শেষপর্যন্ত কিভাবে কাটল 'রামু' নিজের জীবন দিয়ে কেমন করে তার প্রিয় প্রভুকে রক্ষা করল, তাই নিয়েই ছবির শেষ উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্যগুলি রচিত।

স্বীকার করতেই হবে [illegible] হাতী [illegible] সাথী ছবিতে দর্শকদের দৃষ্টিকে [illegible] [illegible]

বা বিষধর সাপের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্যে 'রামু'র দরজা ভেঙে ঢুকে সাপকে শুঁড়ে করে তুলে নেওয়া এবং শেষপর্যন্ত পদদলিত করা, রাজুর অনিষ্টকারীর পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে পর্যুদস্ত করা, তনুকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তার দরজায় ধর্ণা দেওয়া প্রভৃতি ছবির বহু উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার নায়ক হচ্ছে 'রামু' ও তার তিন সহচর। তার সঙ্গে দর্শকদের আনন্দ দেয় চারটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ও চারটি সিংহ-সিংহিনী।

এদের পরে নাম করব ছবির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় রাজেশ খান্না ও তনুজার —যাঁরা ছবির পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী সু-অভিনয় করেছেন। এবং এঁদের সঙ্গে আছেন অভি ভট্টাচার্য, রণধীর, কে এন সিং, দেবর, ডেভিড, সুজিতকুমার, ছোট মেহমুদ ও বেবী টিঙ্কু।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। পরিচালক এম এ থিরুমুগম নিজেই ছবির সম্পাদনা করেছেন। প্রযোজক স্যান্ডো এম এম এ চিনাপ্পা দেবর ছবির কাহিনী রচনার ক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক কথা ভুলে গেছেন এবং সেটি হচ্ছে, যে-হাতী বনের মধ্যে বালক-রাজুকে রক্ষা করল বোধ করি, স্বাভাবিক স্নেহবশে, সেই হাতী ও তার তিন সঙ্গী বল খেলা এবং অপরাপর বহুবিধ কসরৎ শিক্ষা করল কোথা থেকে, তা অবশ্যই জানানো দরকার ছিল। আনন্দ বক্সী রচিত ছবির ছ'খানি গানের মধ্যে কিশোরকুমার গীত 'চল চল মেরে সাথী, ও মেরে হাতী', 'মেহেরবানো, কদরদানো, দোস্তো, প্যারো' এবং কিশোরকুমার ও লতা মঙ্গেশকার 'ধক ধক ধক কৈসে চলতি হ্যায় গাড়ী' ও 'শুনে যা আ ঠাণ্ডি হাওয়া'—গান চারখানি বোধ করি ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

দেবর ফিল্মস নিবেদিত 'হাতী মেরে সাথী'—বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণী এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধা, সকল শ্রেণীর দর্শককেই খুশী করবে হাতী, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতির সঙ্গে রাজেশ খান্না, তনুজার উপস্থিতি ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ক্রিয়াকলাপের জন্যে।

মঞ্চাভিনয়

রাইফেল :

গেল **২৮** মে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে সাউথ ইস্টার্ণ রেলওয়ের 'রূপারোপে'র সদস্যগণ কর্তৃক উৎপল দত্তের 'রাইফেল' নাটকটি অভিনীত হয়। নাটকটি মূলত যাত্রাভিনয়ের উপযোগী করে রচিত। কিন্তু একে মঞ্চোপযোগী করে উপস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছেন এই নাটকের পরিচালক ইন্দ্র রায়। তাঁর আন্তরিক নিষ্ঠা ও যত্নে নাটকটি একান্ত জীবন্ত ও বাস্তব হয়ে উঠেছিল। নাটকটির সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় দিক সদস্যদের [illegible] অভিনয়। [illegible] একটি

সঙ্গে সর্বাঙ্গসুন্দর একটি নাটক পরিবেশন করতে পারে, তা ভাবাই যায় না। অভিনয়ের দিক দিয়ে যাঁকে প্রথমে মনে পড়ে, তিনি হলেন রহমৎরূপী মিহির গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর অভিনয়দক্ষতা সমস্ত দর্শককে বিমোহিত করেছিল। এ'র পরে যাঁদের মনে পড়ে, তাঁরা হলেন কল্যাণরূপী আদিত্যদেব চট্টোপাধ্যায় ও যুগলরূপী রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের কুশলী অভিনয়ে নাটকটি সর্বক্ষণ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল।

সুঅভিনীত এই নাটকটিতে উল্লেখযোগ্য চরিত্রচিত্রণের জন্যে আর যাঁরা চিহ্নিত হবেন, তাঁরা হলেন জীবন ঘটক, ইন্দ্র নাগ, রবি রায়চোধুরী, গৌরীশঙ্কর, কৃষ্ণকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, রমা গুহ, ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য, সুশীল ঘোষ, দীপা হালদার, সুরেশ দাশ এবং অবনী চট্টোপাধ্যায়।

পি এ্যান্ড টি রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'প্রচ্ছন্ন মহিমা'—পি এ্যান্ড টি রিক্রিয়েশন কলকাতা টেলিফোনস (বাগবাজার ইউনিট) সম্প্রতি বনফুলের 'প্রচ্ছন্ন মহিমা'র নাট্যরূপে পরিবেশন করলেন বিশ্বরূপার মঞ্চে। নাট্যরূপে অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছেন রতনকুমার ঘোষ। বাস্তব জীবনরসসমৃদ্ধ এই নাটকটিকে মঞ্চের আলোয় প্রাণবন্ত করে তোলার ব্যাপারে যাঁর নিষ্ঠা ও শিল্পবোধ সবচেয়ে বেশী কাজ করেছে, তিনি হলেন নির্দেশক বিশু চট্টোপাধ্যায়।

অভিনয়ের ব্যাপারে প্রথমেই নাম করতে হয় অজিতকুমার চট্টোপাধ্যায় (কবি) ও অনুপাভ চক্রবর্তীর (ব্রজ)। এ'দের দুজনের চরিত্রচিত্রণে ছিল স্বচ্ছন্দ প্রাণের বিকাশ। মদনমোহন চক্রবর্তীর 'শীতল মহারাজ'ও একটি বলিষ্ঠ সৃষ্টি হোতে পেরেছে। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন অনন্ত মিত্র, বনুন ঘোষ, প্রবীর মল্লিক, শিবানী ভট্টাচার্য, [illegible] প্রভাস

বিলেতফেরৎ / অপর্ণা সেন এবং পরিচালক চিদানন্দ দাশগুপ্ত। ফটো : অমৃত

চক্রবর্তী, মুকুল দত্ত, তারক দে, শচীকান্ত মুখার্জি, লালবিহারী ঘোষ, শম্ভু নন্দী, রণেন্দ্র মিত্র, বিশ্বনাথ রায়, সুধেন্দুবিকাশ দাশগুপ্ত, গোপীনাথ ঘোষ, কানাই মণ্ডল, মঞ্জুশ্রী রায়চোধুরী, দীপা হালদার।

'নয়া জমানা'

সম্প্রতি শিল্পনগরী চিত্তরঞ্জনের পরিচিত নাট্যগোষ্ঠী নাট্যরূপার শিল্পীরা ওখানকার রবীন্দ্রমঞ্চে উৎপল দত্তের অনূদিত নাটক 'নয়া জমানা' অভিনয় করলেন। এই সুঅভিনীত নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন গিরিজা দত্ত। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন সমরেশ সরকার, অমরেশ সান্যাল, মনোজ দত্ত, নির্মল দত্ত, কানন নাগ, সুনীল পাল, ক্ষীরোদ বিশ্বাস, কমল ভট্টাচার্য, চিত্ত গাঙ্গুলী, সুদীপ ভট্টাচার্য, সন্তু মুখার্জি, গিরিজা দত্ত, মায়া ঘোষ, চৈতালী চ্যাটার্জি, মঞ্জুশ্রী রায়চোধুরী।

দুই মহল

ভিলাই স্টীল প্ল্যান্ট কলকাতা রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা সম্প্রতি সাফল্যের সঙ্গে 'দুই মহল' নাটকটি পরিবেশন করলেন। শংকর রায় নির্দেশিত এই নাটকের কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অংশ নেন শৈলেন মিত্র, নির্মল চক্রবর্তী, প্রতিমা পাল, অসিত চক্রবর্তী, মাধব বোস, লক্ষ্মী দাস, শংকর রায়, মঞ্জুশ্রী সেনগুপ্ত, ভোলা সেন ও রাধিকা মুখার্জি।

ক্যারিট মোরেন রিক্রিয়েশন ক্লাব

ক্যারিট মোরেন রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা তাঁদের দ্বাদশ বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সম্প্রতি 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে 'সাহেব বিবি গোলাম' নাটকটি পরিবেশন করলেন। নাটকটির বিশেষ কয়েকটি চরিত্রে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন বাসন্তী চ্যাটার্জি (পটেশ্বরী), গোবিন্দ ব্যানার্জি (ছোটবাবু), বারীন মুখার্জি (ভূতনাথ), মন্মথ দত্ত (ঘড়িবাবু), মুকুল ব্যানার্জি (বংশী)।

স্বীকৃতি

কিছুদিন আগে কাঁচরাপাড়া মিউনিসিপাল এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের

সুধীর পাল, শংকর মুখার্জি, রবি সিংহ, মুরারী পাত্র, শম্ভু অধিকারী, পিণাকী দত্ত, রবীন দাস, হারু মহান্তি, সনৎ মুখার্জি, বাবলী রায়, অনিমা মজুমদার, দীপালি নাগ, রেখা ভট্টাচার্য, আরতি দত্ত।

বৈকালিকের 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' নাটকের পুনরাভিনয়

'বৈকালিকে'র শিল্পীরা তাঁদের মঞ্চসফল নাটক 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'র পুনরাভিনয়ের আয়োজন করেছেন কলামন্দির মিনিয়েচার হলে আগামী ২৬শে জুন সন্ধ্যা ৬-৩০টায়। নাটকের কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অংশ নেবেন অভিজিৎ, শঙ্কর দত্তরায়, দিলীপ রায় বিশ্বাস, স্বর্ণকমল বসু, সমীর দাশগুপ্ত, সুভাষ উকীল, কল্যাণ ব্যানার্জী, সিদ্ধার্থ বসু, অশোক দাস, শর্মিষ্ঠা ঘোষ ও দিলীপ মৌলিক। নাট্যনির্দেশনা ও সংগীত পরিচালনায় আছেন দিলীপ মৌলিক ও দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

জুলজিক্যাল সার্ভের ফেরারী ফৌজ

সম্প্রতি জুলজিক্যাল সার্ভে রিক্রিয়েশান ক্লাবের সভ্যাশিল্পীরা অভিনয় করলেন উৎপল দত্তের বিপ্লবী নাটক 'ফেরারী ফৌজ' রঙ্গনা মঞ্চে। বহু চরিত্র, বহু নাটকীয়তায় ভরা উত্তরতিরিশের বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা এই নাটক বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে মঞ্চস্থ হল। নাট্য পরিচালক বিশু নিয়োগী আলো ও সঙ্গীতের সুসম ব্যবহারে এবং অভিনয়ে দলগত সংহতি সাধনে যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন চরিত্রে বিশেষ দক্ষতার ছাপ রাখেন সুজিত চক্রবর্তী, মাখন বিশ্বাস, প্রিয় দাসগুপ্ত, রাঘব ভট্টাচার্য, গণেশ পাল, রঘু ভট্টাচার্য, শুভেন্দু সাহা, তারাপদ ভট্টাচার্য, সন্তোষ দাস, জীতেন দত্ত, দীপেন চন্দ্র, স্বপন রায় শুভেন্দু ভট্টাচার্য, সুকুমার ব্যানার্জী মনোজ সেনগুপ্ত, শ্রীমতী পাইন, জ্যোৎস্না নিয়োগী, চন্দ্রা মুখার্জি প্রমুখ।

জীবন সৈকতে

রাধারাণী পিকচার্সের পঞ্চম নিবেদন কার্তিক বর্মণ প্রযোজিত স্বদেশ সরকার পরিচালিত 'জীবন-সৈকতে' (মূল কাহিনীঃ তীর্থ চট্টোপাধ্যায়) ছবির কাজ শুরু হচ্ছে অনতিবিলম্বে। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় - অপর্ণা সেন। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন ঃ সুধীন দাশগুপ্ত।

স্টুডিও থেকে

চিত্রশিল্পের কিছু কর্মীদের সমবায়িক প্রয়াস টেকনিসিয়ান ওন প্রোডাকসন্সের প্রথম চিত্র অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত 'মেঘের পরে মেঘ'-এর অন্তর্দৃশ্য গ্রহণের কাজ টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে সমাপ্তির পথে।

বিভিন্ন চরিত্রে আছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলী, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, অলক সরকার, বিনোদ বুলচান্দনী, কণিকা মজুমদার, শিবানী বসু, জয়শ্রী রায় (অতিথি), নীতা চট্টোপাধ্যায় ও যূঁই বন্দ্যোপাধ্যায়।

চা-বাগানের ওপর মনস্তত্ত্বমূলক এই রহস্য কাহিনীর এক বিরাট অংশের চিত্রগ্রহণের কাজ আসচে অকটোবরে দার্জিলিং-এর কাছাকাছি এক চা-বাগানে এ দৃশ্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রগ্রহণের কাজও সমাপ্ত হবে।

সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় নেপথ্য কন্ঠদান করেছেন শ্যামল মিত্র, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, বনশ্রী সেনগুপ্ত ও বাচ্চু রহমান।

বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বে আছেন প্রধান যন্ত্রকুশলী অজিত দাস, চিত্রগ্রহণে সুনীল চক্রবর্তী, শিল্পনির্দেশনায় অমিতাভ বর্ধন, সম্পাদনায় অনিল সরকার, রূপসজ্জায় অনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ব্যবস্থাপনায় সুধীর বসু।

এ-ভি-এম-এর 'ম্যয় সুন্দর হুঁ'র শুভমুক্তি

এ-ভি-এম-এর আধুনিকতম ইস্টম্যানকলারে তোলা ছবি 'ম্যয় সুন্দর হুঁ' আজ, শুক্রবার, ২৫ জুন শহরের রাক্সি, বসুশ্রী, বীণা, পূর্ণশ্রী, নাজ এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। ছবিটি বোম্বাইয়ে ন' হপ্তা ধরে সাফল্যের সঙ্গে প্রদর্শিত হচ্ছে এবং জনসাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেতা মেহমুদের সঙ্গে বিশ্বজিৎ ও লীনা চন্দ্রভারকর ছবিটির প্রধান চরিত্রে আছেন। এবং এঁদের সঙ্গে রয়েছেন সুলোচনা চট্টোপাধ্যায়, ডেভিড, অরুণা ইরাণী ও শবনাম। ছবিটি পরিচালনা করেছেন কৃষ্ণ পাঞ্জু এবং এতে সুরযোজনা করেছেন শঙ্কর জয়কিষণ।

এই সপ্তাহেই 'প্যার কী কহানী'

আজ শুক্রবার, ২৫ জুন সুন্দরলাল নাহাটা নিবেদিত ও রবি নাগাইচ পরিচালিত মাদ্রাজের বিজয়লক্ষ্মী পিকচার্স-এর ইস্টম্যানকলার চিত্র 'প্যার কী কহানী'

নায়িকার ভূমিকায়/শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেন। পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

অমিতাভ বচ্চন, অনিল ধাওয়ান, ফরিদা জালাল, প্রেম চোপরা প্রভৃতি। রাহুল দেববর্মণ ছবিটির সঙ্গীতপরিচালনা করেছেন।

'জীবনজিজ্ঞাসা'র চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত

বি, এম, ডি মুভীজ-এর 'জীবন-জিজ্ঞাসা'র চিত্রগ্রহণ কাজ পরিচালক পীযূষ বসুর অধীনে শেষ হয়েছে। 'বি, এম, ডি মুভী ইউনিট রচিত এই কাহিনীনির্ভর চিত্রটিতে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া, মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনন্দা দাশগুপ্ত, সুলতা চৌধুরী, চন্দ্রাবতী, তরুণকুমার, গীতা দে প্রভৃতি। ছবিটিতে সুরযোজনা করেছেন শ্যামল মিত্র। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স ছবিটির পরিবেশক।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে আশা দেবী

মঞ্চ ও চিত্র-জগতের বহু-পরিচিত আশা দেবী কিছুকাল রোগভোগের পরে সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। কর্মী ও সহশিল্পীদের মধ্যে 'আশাবুড়ী' নামে সমধিক পরিচিত এই অভিনেত্রীটি নিজ কেউ কোনোদিন তরুণী বা যৌবনাবস্থায় দেখেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তাঁকে আমরা অন্তত তিরিশ বছর ধরে ঐ 'আশা বুড়ী' নামেই জানতুম এবং কি ছবি বা কি মঞ্চ-নাটক, যাতেই তিনি অংশগ্রহণ করতেন, তাতেই হয় ঠাকুরমা-দিদিমা আর নয়ত বৃদ্ধা দাসী-পরিচারিকার ভূমিকাতেই তাঁকে দেখা যেত। কিন্তু যতটুকুই অভিনয় করুন না কেন, কি মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের পরিচালক এবং কি দর্শক, কাউকেই তিনি ব্যর্থ অভিনয় দ্বারা হতাশ করেননি। এবং এ বড়ো কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

রাজ্যসভায় চলচ্চিত্রকুশলী ও কর্মীসংক্রান্ত বিল

রাজ্যসভার পি-এস-পি সদস্য এন-জি গোরে ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের প্রযোজনা, পরিবেশনা ও প্রদর্শনী বিভাগের সকল কর্মীর (সংখ্যায় যাঁরা দু' লক্ষেরও অধিক) আর্থিক অবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতিবিধানের জন্যে একটি বে-সরকারী বিল আনয়ন করেছেন। বিলটির আনুপূর্বিক বিবরণ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা অগ্রহান্বিত।

অরুণাভ স্মৃতি সংঘ

চালনায় 'অরুণ.ভ সঙ্গীত সংস্কৃতি' পরিবেশিত 'আমার দেশের মাটি' সংগীতালেখ্যটি উপভোগ্য। দীপক রচিত এবং সুরারোপিত ওপার বাংলার মুক্তি-সংগ্রামীদের উপর গানটি হৃদয়গ্রাহী শুধু নয় প্রেরণা যোগায়। একক সঙ্গীত, আবৃত্তি এবং যন্ত্রসঙ্গীত প্রভৃতিতে অংশ নেন দীপক মজুমদার, সুন্দিশ্বর মিত্র, শিখা মজুমদার, প্রণতি, ডল, ক্ষমা, হাসি, দীপ্তি বসু, দীপালি, শৈলেন, নিতাই, সুতপা, অসিত, শিবনাথ এবং মূকাভিনেতা অমিতাভ মজুমদার। কবিগুরুর 'বিনি পয়সার ভোজ' নাটকটিতে অভিনয় করেন ননী নাথ, প্রদীপ মজুমদার, সুপ্রিয় মিত্র, নীরোদ নাথ, সুনীল, সমীর এবং গোতম।

শিমুলতলায় রবীন্দ্র জয়ন্তী

এবারও শিমুলতলায় 'সুরধনী ধামে' রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। প্রদীপ ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। নৃত্য, গীত ও আবৃত্তি মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অংশ গ্রহণ করেন, প্রদীপ ঘোষ, তপন ভট্টাচার্য, অমল বোস, রথীন পাল, সলিল দাস, কমল ব্যানার্জি, অমর পাল, মাস্টার বাপী, শুক্লা ও বাবুল বড়াল। সত্যরঞ্জন বড়াল ও শুক্লা ঘোষের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

ক্লান্তিতীর্থের বার্ষিক উৎসব

'ক্লান্তিতীর্থ'র তৃতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি প্রতাপ মেমোরিয়াল মঞ্চে সুসম্পন্ন হয়। উৎসব অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয় দু'দিন ধরে।

দাবী ঃ পরিচালনায় কনক মুখোপাধ্যায়। মৌসুমী ও সমিত ভঞ্জ। ফটো ঃ অমৃত

শিশুশিল্পী শ্রীমান সুরজিৎ দের কণ্ঠ-সঙ্গীত দিয়ে উৎসব-অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে। এবারের অনুষ্ঠানে শিশুশিল্পীদের দিয়ে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের কাহিনী অবলম্বনে 'বুদ্ধু ভুতুম' রূপকথার নৃত্য-নাট্যটি বেশ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছিল। অভিনয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন মৈত্রেয়ী দত্ত, মালা গোস্বামী, গার্গী দত্ত, পান্নালী বোস, চন্দ্রা সেনগুপ্ত। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন প্রতিভা ভট্টাচার্য, রাতুলা চক্রবর্তী, ললিতা বিশ্বাস, চন্দনা ব্যানার্জি, শম্পা ঘোষ, নূপুর পালচৌধুরী, মনোময়ী বিশ্বাস, ঝুমা মুখার্জি, লালী রায়চৌধুরী, শীলা পাল, মিলি মুখার্জি, ছন্দা সেনগুপ্ত, সোনালী পালচৌধুরী, আরতি মুখার্জি, শ্রাবণী পালচৌধুরী, নন্দা সেনগুপ্ত, শিখা পাল ও দীপ্তি ঘোষ। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে মঞ্চস্থ হল "চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্য। সঙ্গীত এবং নৃত্যে সংস্থার সভ্য-সভ্যারা মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন। প্রশংসা কুড়িয়েছেন শেফালি ঘোষ। ছবি ঘোষ ও প্রতিমা ভট্টাচার্য দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছিলেন। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন ঃ রূপা মুখার্জি, প্রতিভা ভট্টাচার্য, পম্পা দে, দীপ্তি ঘোষ, অসীমা সরদার, নন্দা সেন। সঙ্গীতাংশে ছিলেন নবগোপাল চক্রবর্তী, অন্নপূর্ণা দত্ত, বিজলী দাসগুপ্ত, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীপেন দত্ত। সমগ্র অনুষ্ঠানের নৃত্য পরিচালক ছিলেন শ্রীগৌরীপদ মজুমদার।

বেহালা বীণাপাণি সঙ্গীত সমাজ ও নাট্যসংস্থা

বেহালার এই সংস্থাটি বহুদিনের। ১৮৮৭ সালে এর প্রতিষ্ঠা। সংস্থার কার্যধারা অব্যাহতভাবে বজায় আছে। সম্প্রতি নিম্নলিখিতদের নিয়ে ১৯৭১-৭২ সালের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে। সভাপতি ঃ ক্ষীরোদ গঙ্গোপাধ্যায়, সহঃ সভাপতি ঃ মৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জি, সম্পাদক ঃ বিশ্বনাথ পাল, এছাড়া আছেন মাণিক গাঙ্গুলী, সুপ্রকাশ ব্যানার্জি, প্রকাশ চ্যাটার্জি, অতুল চক্রবর্তী, অরবিন্দ বানার্জি, প্রবোধ ব্যানার্জি ও হারাধন চ্যাটার্জি, সুনীল ভট্টাচার্য এবং নাট্য-উপদেষ্টা ঃ শ্রীসুধাংশু দাসগুপ্ত।

গীতিমাল্যের "নজরুল বন্দনা"

গত ১৩ই জুন রবিবার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডে নজরুল জয়ন্তী সুষ্ঠুভাবে পালন করেন গীতিমাল্য সংস্থা। নজরুল গীতির মাধ্যমে সংগীতালেখ্য 'নজরুল বন্দনা" পরিবেশন করলেন সংস্থার শিল্পিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে একক সঙ্গীতে বিমল মিত্র, অভিজিত মজুমদার, রীণা চৌধুরী ও তপন ঘোষের গান শ্রোতাদের সহর্ষ সাধুবাদ পান। সম্মেলক সঙ্গীতের প্রত্যেকটি গান সুগীত। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন সঞ্জীব শঙ্কর, সোমেশ চৌধুরী, বাণী সমাদ্দার, কৃষ্ণা পাল, রত্না ঘোষ, মালা কুমার, মিতা বিশ্বাস, গৌর কর ও রাজকুমার দে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিমল মিত্র।

যাদুকর দি গ্রেট সুশীল

বিভিন্ন ইন্দ্রজাল প্রদর্শনের মাধ্যমে সেরা দক্ষতা অর্জন করেছেন, যাদুকর দি গ্রেট সুশীল। যাদুকর মাত্রেরই লক্ষ্য নতুন বিস্ময়ের সৃষ্টি করা এবং সেই সঙ্গে অভিনব কৌশলের মাধ্যমে তা এমনভাবে পরিবেশন করা যার প্রয়োগ নৈপুণ্যের অসাধারণত্ব দর্শকদের চমকিত করে। যাদুকর দি গ্রেট সুশীলের ইন্দ্রজাল বিদ্যার লক্ষ্য এই দিকে। ইতিমধ্যে ইনি বোম্বাই,

মাদ্রাজ, নাগপুর, বিহার, উড়িষ্যা, মণিপুর, ত্রিপুরা, নাগাভূমি, আসাম সফর করেছেন। আগামী মাসে আবার আসাম ও নাগাভূমি সফরে বের হচ্ছেন।

বিখ্যাত অভিনেত্রী হেলেনা ভাইগেলের স্মৃতি সভা : ভারত গণতান্ত্রিক জার্মানি মৈত্রী সমিতি ও জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের কলিকাতাস্থ কনসুলেটের যুক্ত উদ্যোগে মৈত্রী সমিতির হলে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত অভিনেত্রী হেলেনা ভাইগেলের স্মৃতি সভায় জি ডি আরের কলিকাতাস্থ ভাইস কনসাল শ্রীএইচ ডি সিমার বলেন, হেলেনা ভাইগেল শুধু মাত্র একজন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ছিলেন না, বের্টোল্ট ব্রেখটের পরিচিতি লাভের পর তিনি জার্মানির নাট্য আন্দোলনের এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন এবং জার্মানির ফ্যাসিবাদী আক্রমণের মধ্যে থেকেও সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির ভাবাদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যান জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। শিল্পী হিসাবে তিনি প্রেরণা লাভ করেছেন তাঁর স্বামী বের্টোল্ট ব্রেখটের কাছে। তিনি নিজে স্বীকার করেছেন, বের্টোল্ট ব্রেখটের মত মহান নাট্যকার খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। শ্রীসিমার আরো বলেন, গত মহাযুদ্ধের পরে হেলেনা ভাইগেল তাঁর স্বামী বের্টোল্ট ব্রেখটের সঙ্গে তাঁদের নির্বাসনের দিনগুলো শেষ করে স্বভাবতই কমিউনিস্ট হিসাবে ফিরে আসেন খণ্ডিত জার্মানির সেই অংশে যেখানে ফ্যাসিবাদকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূলে করে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন ঘোষ। 'নান্দিকার' নাট্যসংস্থার পরিচালক ও অভিনেতা শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যাঁরা ছবি আঁকেন বা সাহিত্য লেখেন তাঁরা পরবর্তীকালেও বেঁচে থাকেন তাঁদের সাহিত্য ও শিল্পকর্মের মধ্যে। কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু যাঁরা মঞ্চে অভিনয় করেন তাঁদের সেই মঞ্চের অভিনয় পরবর্তীকালের মানুষের কাছে কিছুই সঠিক লিপিবন্ধ থাকে না। তাঁদের সম্পর্কে কিছু টুকরো টুকরো স্মৃতি, কিছু লেখা, কিছু জনশ্রুতি থাকলেও থাকতে পারে। তাই বিশিষ্ট অভিনেত্রী হেলেনা ভাইগেল যখন আজকে আমাদের মধ্যে নেই, তাঁর অভিনয়ও যখন আজ আমাদের দেখবার বাইরে তখন শিল্পী হিসাবে মঞ্চের অভিনয় শিল্পীদের কিছুই না থাকার দুঃখ অনুভব করি। কিন্তু হেলেনা ভাইগেলের মত শিল্পীরা বেঁচে থাকবেন তাদের চিন্তা কর্ম আমাদের এই কালকে সমৃদ্ধ করে বলে। 'নান্দিকার' নাট্যসংস্থার অন্যতম অভিনেতা শ্রীরুদ্র সেনগুপ্ত বলেন, হেলেনা ভাইগেল ছিলেন একজন সংগ্রামী শিল্পী ও অভিনেত্রী। তাঁর জীবনের সমস্ত অভিনয় ছিল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শকে গড়ে তুলবার জন্য। আজকে দেশে দেশে সংগ্রাম চলছে তখন শিল্পী হিসাবে হেলেনা ভাইগেলের আদর্শ আমাকে প্রেরণা দেয়। ব্রেখট রচিত কয়েকটি কবিতার বাংলা আবৃত্তি করেন শ্রীঅসিত সরকার। 'নান্দিকার' নাট্যসংস্থার শিল্পীরা ব্রেখট রচিত 'তিন পয়সার পালা'র কয়েকটি বাংলা গান পরিবেশন করেন। এই সভায় সমাবেশও হয়েছিল বড় রকমের।

মেঘের পরে অম/অনিল চট্টোপাধ্যায় ও যূঁই বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচালনা : অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

'অ্যান অব দি থাউজ্যান্ড ডেজ'/ রিচার্ড বার্টন ও জেনেভিভ বুজোল্ড

'উদীচী'র রবীন্দ্র জন্মোৎসব

গত ২৫শে বৈশাখ রবিবার সন্ধ্যায় উক্ত সংস্থার শিল্পিবৃন্দ তাঁদের শিক্ষায়তন ভবনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ১১০ তম জন্মজয়ন্তী একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলেন। বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীরা দুখানি করে সময়োপযোগী রবীন্দ্রসঙ্গীত সমবেতভাবে পরিবেশন করেন। একক সঙ্গীতে ছিলেন শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন সিংহ ও ঋতা ভড়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শৈলেন ভড়।

'চৈতালী'র মঞ্চাভিনয়

ডি-ভি-সি বোকারোর 'চৈতালী' সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ বোকারো ক্লাবের প্রযোজনায় বোকারো ক্লাবে শ্রীগোপাল দে-র পরিচালনায় মিস ইলা সরকারের অত্যাধুনিক একাঙ্ক নাটক "এ্যাই তো ব্যাপার" সম্প্রতি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন : দেবু দত্ত, স্বপন রায়চৌধুরী, মদন রায়, নারায়ণ মজুমদার, দিবাকর দত্ত, স্বপন চক্রবর্তী, স্বপন দাস, জীবন দাস এবং গোপাল দে (নেপালদা)।

খেলাধুলা

দর্শক

উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা

পুরস্কার হাতে ১৯৭১ সালের ফ্রেঞ্চ টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব বিজয়ী চেকোশ্লোভাকিয়ার তরুণ খেলোয়াড় জান কোডেস

গত ২১শে জুন লণ্ডনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের উইম্বলেডন শহরতলীতে ৮৫তম উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। স্থান মাহাত্ম্যে অল-ইংল্যাণ্ড টেনিস প্রতিযোগিতা সারা পৃথিবীতে উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা নামেই সমধিক পরিচিত। এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা অল-ইংল্যাণ্ড টেনিস ক্লাব। মাত্র পুরুষদের সিঙ্গলস খেলা নিয়ে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয় ১৮৭৭ সালে। ১৮৭৯ সালে পুরুষদের ডাবলস, ১৮৮৪ সালে মহিলাদের সিঙ্গলস এবং ১৯১৩ সালে মহিলাদের ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস খেলা প্রতিযোগিতায় প্রথম তালিকাভুক্ত হয়। ১৯২২ সালে প্রতিযোগিতায় চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড প্রথা উঠে যায়। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের যোগ্যতা বিচার করে নামের ক্রমপর্যায় তালিকা প্রকাশ সুরু হয়েছে ১৯২৪ সালে। মহান ঐতিহ্য, জাকজমকপূর্ণ পরিবেশ, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সমান তাল রেখে খেলার ব্যবস্থাপনা এবং পৃথিবীর চারদিকের খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের যোগদান—এই সব বৈশিষ্ট্যের দরুণই উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা সারা পৃথিবীর টেনিস খেলোয়াড়দের সামনে এবং আন্তর্জাতিক টেনিস আসরে যে ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছে তার তুলনা বিরল। উইম্বলেডন টেনিস খেলার আসর খেলোয়াড়দের কাছে এক মহান তীর্থক্ষেত্র এবং এখানের খেতাব জয় বিশ্ব খেতাব লাভের সমতুল্য।

১৯৭১ সালের প্রতিযোগিতায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের যোগ্যতা বিচার করে নীচের ক্রমপর্যায় তালিকাটি সরকারীভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

পুরুষদের সিঙ্গলস খেলায় বাছাই তালিকায় যে ৮ জন খেলোয়াড় স্থান পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ৩ জন, আমেরিকার ৩ জন, রুমানিয়ার ১ জন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ১ জন খেলোয়াড় আছেন। এই তালিকায় শীর্ষ স্থান পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ন্যাটা পেশাদার খেলোয়াড় রড লেভার। এই নিয়ে লেভার উপর্যুপরি চারবার বাছাই তালিকায় প্রথম স্থান পেলেন। রড লেভার ইতিপূর্বে মোট চারবার উইম্বলেডন সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছেন—অপেশাদার খেলোয়াড় জীবনে ২ বার (১৯৬১ ও ১৯৬২) এবং পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে ২ বার (১৯৬৮ ও ১৯৬৯)। তাছাড়া একই বছরে অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ, উইম্বলেডন এবং আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সূত্রে দুর্লভ গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম খেতাব লাভ করেছেন দু'বার (১৯৬২ এবং ১৯৬৯ সালে)। এখানে উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত মাত্র এই চারজন খেলোয়াড় মোট ৫ বার এই দুর্লভ গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম খেতাব জয়ী হয়েছেন—১৯৩৮ সালে ডোনাল্ড বাজ (আমেরিকা), ১৯৫৩ সালে কুমারী মৌরীন ক্যাথেরিন কনোলী (আমেরিকা), ১৯৬২ ও ১৯৬৯ সালে রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) এবং ১৯৭০ সালে শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া)।

১৯৭০ সালের প্রতিযোগিতায় রড লেভার পুরুষদের সিঙ্গলস খেলার ৪র্থ রাউণ্ডে অপ্রত্যাশিতভাবে ১৬নং বাছাই খেলোয়াড় রোজার টেলরের (বৃটেন) কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

খেলার বাছাই তালিকায় ২য় স্থান পেয়েছেন গত বছরের সিঙ্গলস খেতাব বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার জন নিউকম্ব। গত চার বছরে (১৯৬৭—৭০) জন নিউকম্ব তিনবার ফাইনালে খেলে খেতাব জয় করেছেন ২ বার (১৯৬৭ ও ১৯৭০)।

মেয়েদের সিঙ্গলস খেলার বাছাই তালিকায় যে ৮ জন স্থান পেয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন আমেরিকার ৩ জন, অস্ট্রেলিয়ার ২ জন, ফ্রান্স, বৃটেন এবং পশ্চিম জার্মানীর ১ জন করে খেলোয়াড়। তালিকার শীর্ষস্থানে আছেন গত বছরের সিঙ্গলস খেতাব বিজয়িনী শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট। তিনি ইতিপূর্বে সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন ৩ বার (১৯৬৩, ১৯৬৫ এবং ১৯৭০ সালে) এবং গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব ১ বার (১৯৭০ সালে)। এবারের প্রতিযোগিতায় যদি কোন অঘটন না ঘটে তাহলে সিঙ্গলস ফাইনালে গত বছরের মতই শ্রীমতী কোর্ট খেলবেন তাঁর পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী ২নং বাছাই আমেরিকার শ্রীমতী বিলি জিন কিংয়ের সঙ্গে। উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী কোর্টের তুলনায় শ্রীমতী কিংয়ের সাফল্য অনেক বেশী গৌরবের। গত বছরের খেলা নিয়ে শ্রীমতী কিং উপর্যুপরি ৫ বার সিঙ্গলস খেলার ফাইনালে খেলে উপর্যুপরি ৩ বার (১৯৬৬—৬৮) খেতাব জয়ী হয়েছেন। যুদ্ধোত্তর কালের (১৯৪৬—৭০) ২৫ বছরের প্রতিযোগিতায় কোন পুরুষ খেলোয়াড় উপর্যুপরি ৩ বার সিঙ্গলস খেতাব পাননি এবং এই সময়ে মেয়েদের মধ্যে শ্রীমতী কিং ছাড়া উপর্যুপরি ৩ বার সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন আমেরিকার লুই ব্রাউ (১৯৪৮—৫০) এবং কুমারী মোরীণ কনোলী (১৯৫২—৫৪)। তাছাড়া শ্রীমতী বিলি জিন কিং ১৯৬৭ সালের প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস, ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে দুর্লভ ত্রিমুকুট সম্মানও লাভ করেছেন। শ্রীমতী কোর্ট এবং শ্রীমতী কিংয়ের ১৯৭০ সালের ফাইনাল খেলাটি প্রতিযোগিতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁদের এই ফাইনাল খেলা ২ ঘণ্টা ২৭ মিনিট সময়ে শেষ হয়। সময়ের দিক থেকে তাঁদের এই খেলা যুদ্ধোত্তর কালের ২৫ বছরের (১৯৪৬—৭০) প্রতিযোগিতায় মেয়েদের দীর্ঘতম ফাইনাল খেলা। তাছাড়া প্রথম সেটে যে ২৬টি গেম খেলা হয়েছিল তা এই সময়ে (১৯৪৬—৭০) মেয়েদের দীর্ঘতম প্রথম সেটের খেলা।

পুরুষদের ডাবলস খেলার তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছেন গত বছরের বিজয়ী জুটি জন নিউকম্ব এবং টনি রোচ (অস্ট্রেলিয়া)। এই জুটিই গত ৬ বছরে মোট ৪ বার পুরুষদের ডাবলস খেতাব লাভ করেছেন।

মহিলাদের ডাবলস খেলার তালিকায় প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে গত বছরের বিজয়ী জুটি আমেরিকার শ্রীমতী বিলি

রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া)

ক্যাসলসকে। এই জুটি ইতিপূর্বে ডাবলস খেতাব পেয়েছেন ৩ বার (১৯৬৭, ১৯৬৮ ও ১৯৭০)।

মিকসড ডাবলস খেলার তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছেন শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া) এবং মার্টিন রিসেন (আমেরিকা)। গত বছরের বিজয়ী জুটি কুমারী রোজমেরী ক্যাসলস (আমেরিকা) এবং ইলি নাসতাসেকে (রুমানিয়া) ২য় স্থান দেওয়া হয়েছে।

নামের ক্রমপর্যায় তালিকা

পুরুষদের সিঙ্গলস : (১) রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া), (২) জন নিউকম্ব (অস্ট্রেলিয়া, গত বছরের বিজয়ী), (৩) কেন রোজওয়াল (অস্ট্রেলিয়া), (৪) স্টান স্মিথ (আমেরিকা), (৫) আর্থার অ্যাস (আমেরিকা), (৬) ক্লিফ রিচে (আমেরিকা), (৭) ইলি নাসতাসে (রুমানিয়া) এবং (৮) ক্লিফ ড্রিসডেল (দঃ আফ্রিকা)।

মহিলাদের সিঙ্গলস : (১) শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া, গত বছরের বিজয়িনী), (২) শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা), (৩) ইভোনে গুলাগং (অস্ট্রেলিয়া), (৪) কুমারী রোজমেরী ক্যাসলস (আমেরিকা), (৫) ভার্জিনিয়া ওয়েড (বৃটেন), (৬) ন্যান্সি রিচে-গান্টার (আমেরিকা), (৭) ফ্রাঁসোয়াজ ডুর (ফ্রান্স) এবং (৮) হেলগা মাসথফ (পশ্চিম জার্মানী)।

পুরুষদের ডাবলস : (১) জন নিউকম্ব এবং টনি রোচ (অস্ট্রেলিয়া, গত বছরের বিজয়ী), (২) কেন রোজওয়াল এবং ফ্রেড স্টোলে (অস্ট্রেলিয়া), (৩) বব হিউইট এবং ফ্রিউ ম্যাকমিলন (দঃ আফ্রিকা) এবং (৪) ইলি নাসতাসে এবং টিরিয়াক (রুমানিয়া)।

মহিলাদের ডাবলস : (১) শ্রীমতী বিলি জিন কিং এবং কুমারী রোজমেরী ক্যাসলস (আমেরিকা, গত বছরের বিজয়িনী), (২) ইভোনে গুলাগং (অস্ট্রেলিয়া), (৩) জুডি ডালটন (অস্ট্রেলিয়া) এবং কুমারী ভার্জিনিয়া ওয়েড (বৃটেন), এবং (৪) গেল চাফ্রু এবং কুমারী ডুর (ফ্রান্স)।

মিকসড ডাবলস : (১) শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া) এবং মার্টিন রিসেন (আমেরিকা), (২) কুমারী রোজমেরী ক্যাসলস (আমেরিকা) এবং ইলি নাসতাসে (রুমানিয়া)- গত বছরের বিজয়ী জুটি, (৩) শ্রীমতী বিলি জিন কিং এবং ওয়েন ডেভিডসন (আমেরিকা) এবং (৪) শ্রীমতী জুডি ডালটন (অস্ট্রেলিয়া) এবং ফ্রিউ ম্যাকমিলন (দঃ আফ্রিকা)।

১৯৭১ সালের প্রতিযোগিতায় এই তিনজন ভারতীয় খেলোয়াড় খেলবেন—জয়দীপ মুখার্জি, প্রেমজিৎ লাল এবং আনন্দ অমৃতরাজ। ১৯ বছরের অমৃতরাজ প্রাথমিক পর্যায়ে খেলে মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছেন। অপরদিকে জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎ লাল সরাসরি মূল প্রতিযোগিতায় স্থান পেয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য, ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে এই প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম খেলার গৌরব লাভ করেন ঘাস মহম্মদ (১৯৩৯ সালে)। তিনি সেই বছরের চ্যাম্পিয়ান ববি রিগসের কাছে হেরে যান। রমানাথন কৃষ্ণান ছাড়া অপর কোন ভারতীয় খেলোয়াড় সেমি-ফাইনালে খেলেননি। কৃষ্ণান উপর্যুপরি দু-বার (১৯৬০ ও ১৯৬১) সেমি-ফাইনালে খেলেছিলেন। কৃষ্ণান ১৯৬০ সালের সেমি-ফাইনালে নিয়েল ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া) এবং ১৯৬১ সালের সেমি-ফাইনালে রড লেভারের (অস্ট্রেলিয়া) কাছে হেরেছিলেন। তাঁর এই পরাজয় অগৌরবের হয়নি এই কারণে যে, নিয়েল ফ্রেজার ১৯৬০ সালে এবং রড লেভার ১৯৬১ সালে খেতাব জয়ী হয়েছিলেন।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (জুন ১৪—১৯) কলকাতার বিভিন্ন মাঠে আই এফ এ পরিচালিত প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার যে ১৫টি খেলা হয় তার সংক্ষিপ্ত ফলাফল : জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি ১৩টি খেলায় এবং ড্র ২টি।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল দল আলোচ্য সপ্তাহে তিনটি ম্যাচ খেলে পুরো ৬ পয়েণ্ট সংগ্রহ করেছে। বর্তমানে লীগ তালিকায় ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং এবং পোর্ট কমিশনার্স দলের পয়েণ্ট এই রকম দাঁড়িয়েছে : ইস্টবেঙ্গলের ৮টা খেলে ১৬ পয়েণ্ট, মোহনবাগানের ৭টা খেলায় ১৪ পয়েণ্ট, মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ৮টা খেলায় ১৪ পয়েণ্ট এবং পোর্ট কমিশনার্স দলের ৯টা খেলায় ১৪ পয়েণ্ট। পোর্ট দল আলোচ্য সপ্তাহে খিদিরপুর দলের কাছে ০—৩ গোলে পরাজিত হয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ান-

পূর্ণাবতার প্রসঙ্গে

যখন জানলাম, অমৃতে যশস্বী লেখক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর উপন্যাস "পূর্ণাবতার" প্রকাশিত হবে, তখন পরবর্তী সংখ্যা অমৃতের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। 'পূর্ণাবতার' নামটির মধ্যে নতুনত্ব দেখলাম ও নামটি আমাকে আকর্ষণ করল। উপন্যাসটি পড়ার শুরুতেই নতুন রসের ভাবধারা অনুভব করলাম ও পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ অন্যধরণের গল্প মনে হলো। অনেকদিন পর শিকারের গল্প দেখে ভাল লাগল। শিকারের মধ্যে জরা যখন দেখল সে মানুষ শিকার করেছে তখন কিন্তু উপন্যাসটি আমার মনকে নাড়া দেয় এবং ঔৎসুক্যের সঙ্গে পড়লাম। জরা ও জরতীর কথোপকথনের মধ্যে জরার ভয় ও ও জরতীর আশ্বাসবাণী উপন্যাসটিতে সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে।

চতুর্থ সংখ্যায় লেখক জরার অট্টহাসির মধ্যে ও সঙ্গীতের ভিতর বুঝিয়ে দিয়েছেন "ডুব দিয়ে রসের সাগরে. কেউ ভাসে কেউ ডুবে মরে গো"। লেখকের লেখনীর মাধ্যমে আর এক অংশে সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে যে জরা হরিণ শিকার করতে গিয়ে ভুলবশত মানুষ শিকার করেছে। তখন তার কি ব্যাকুলতা উন্মোলিত হয়েছে জরতীর সঙ্গে কথোপকথনে। জরা চিন্তা করল

"কালস্রোতে ভেসে যায়,
জীবন যৌবন ধনমান

সেই সঙ্গে মনে পড়ল Byron এর The River কবিতার দুটি ছন্দ—
"Man may come and man may go but I go on for ever"
It is the similarity between the Eastern antd Western writings.

অমৃতে এই ধরণের উপন্যাস প্রকাশের জন্য লেখককে আমার অশেষ ধন্যবাদ ও সেই সঙ্গে অমৃত সম্পাদককে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার লেখনী এবারের মত বন্ধ করলাম।

নন্দিতা ভট্টাচার্য
মতিনগর, শিলং-৩, আসাম।

(১)

শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর কৈফিয়ৎ এর (২০শে জ্যৈষ্ঠ) উপর কিছু বলতে চাই।

মহাভারতের যুগে ভারতীয়েরা জানতেন যে, কৃষ্ণার্জুন এক অভিন্নহৃদয়, অভিন্ন আত্মা। দ্বারকার অধিবাসীদের তো কথাই নেই তারা তো ইন্দ্রপ্রস্থ ও দ্বারকাকে এপাড়া-ওপাড়া বলে ভাবতেন। যাদব ও পান্ডবেরা পরস্পরকে পরমাত্মীয় ভাবতেন। তাই কৃষ্ণের মৃত্যুর পর কৃষ্ণের আত্মীয়রা দারুককে অর্জুনের কাছে কৃষ্ণের মৃত্যু সংবাদ পাঠিয়ে, কৃষ্ণের প্রাণাধিক সখা অর্জুনের অপেক্ষায় না থেকে কৃষ্ণের মড়া দাহ করে দিলেন? ভাবতে অবাক লাগে! বাসুদেবের মড়া অর্জুনের অপেক্ষায় না থাকাই পরমাশ্চর্য।

বিশী মশায়, আরও এক জায়গায় লিখেছেন, "গুজেরাট থেকে দিল্লী বহুদূরে। যাতায়াতে অনেক সময় লাগে। এতকাল মৃতদহ অবিকৃত থাকে না। সেকালে বরফ দিয়ে ও অন্যান্য কৃত্রিম উপায়ে মৃতদেহ অবিকৃত রাখবার ব্যবস্থা ছিল না।"

আমরা রামায়ণে পাই, রাম যখন বনবাসে গেলেন, সারথীর মুখের সমাচার শুনে রাজা দশরথ মূর্ছা গেলেন এবং সেই মূর্ছা আর ভাঙ্গল না। লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে বনবাসী হওয়ায় এবং অযোধ্যায় তখন দশরথের মড়া দাহ করার এবং অন্যান্য সামাজিক কাজ করার কেউ ছিল না। কারণ ভরত ও শত্রুঘ্ন তাদের মামা-বাড়ীতে ছিলেন। ভরতকে খবর দিতে দূত গেল, রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ এই নির্দেশ দিলেন,—

"রাজাকে রাখহ করি তৈলের ভিতর
ভরত করিবে দাহ আসিয়া সত্বর।"

অক্লান্তভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে পাঁচদিন পরে দূত ভরতের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল,—

"আইলাম তোমাকে লইতে সর্বজন
ভরত ঝটিতি দেশেতে করহ আগমন।।"

তাছাড়া আমরা জানি যে অর্জুনের অতি দ্রুতগামী রথ ছিল (কপিধ্বজ)। অতি অল্প সময়ে দ্বারকায় গিয়ে পৌঁছতে পারতো।

তরুণ সরকার,
শিলিগুড়ি।

লেখকের বক্তব্য

পূর্ণাবতার প্রসঙ্গে শ্রীনন্দিতা ভট্টাচার্য লেখককে যে প্রশংসা করেছেন সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তবে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন জরা চিন্তা করলো, "কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।" এরকম কথা সে চিন্তা করেছিল কিনা জানি না, তবে এ কবিতা উচ্চারণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর যে ইংরিজী কোটেশনটি তিনি দিয়েছেন, সেটি রামায়ণের নয় টেনিসনের। আর তার নামটাও The River নয় The Brook

প্রমথনাথ বিশী
কলকাতা—৪৫

(২)

শ্রীতরুণ সরকার শ্রীকৃষ্ণের অন্ত্যেষ্টি সৎকার সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার উত্তর ২০শে জ্যৈষ্ঠর অমৃতে লিখেছি। এ এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে আশা ক যে কোন কোন গৌণ ঘটনায় লেখকে কিঞ্চিৎ রদবদল করিবার অধিকার আছে।

প্রমথনাথ বিশী
কলকাতা—৪৫

মহিলা—আই এ এস

এবারের ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটি সার্ভিস (আই, এ, এস)-এর ফলাফ বাঙালী মেয়েদের সাফল্য অনেক তরুণী উদ্বুদ্ধ করবে। আই, এ, এস, এবং আ এফ, এস (ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভি পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেল প্রথম দ জনের মধ্যে চারজনই মেয়ে। এবং আ জবর খবর আই, এফ, এস, এ প্রথম হয়েছে একটি মেয়ে, নাম শ্রীমতী বীণা দত্ত। তি আই, এ, এস-এ হয়েছেন দ্বিতীয়। আ এ, এস-এ প্রথম হয়েছেন শ্রীশিবশঙ্কর মুখার্জি। তাঁকে আমার আন্তরি অভিনন্দন।

গতবারে আই এ এস-এ প্রথম এব দ্বিতীয় হয়েছিলেন পাটনারই দুই মেয়ে শ্রীমতী অনুরাধা মজুমদার এবং শ্রীমতী লক্ষ্মী চক্রবর্তী। শ্রীমতী লক্ষ্মী আমাদে এখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে গেলেন। বুদ্ধিমতী স্মার্ট। ইংরাজী সাহিত্যের লেক চারার ছিলেন। তার পূর্বে ট্রেনিং নি গেলেন শ্রীমতী রাধা সিংহ। তিনি পাটনার মেয়ে। এবং তাঁর দিদি শ্রীমতী কৃষ্ণা সিংহও আই এ এস, বর্তমা ডেপুটি সেক্রেটারি। সার্থক এস ডি ছিলেন। এবারে বোধহয় ডি এম হবেন। যে সমস্ত মেয়েরা এখানে আসেন এব আমাদের এখানে পড়াশোনা কর দেখেছি তাঁদের অপরিসীম অধ্যবসায় ইংরাজী জ্ঞান প্রবল। এবং সর্বোপরি পা করায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এবারে যেসব মেয়ে আই এ এ হয়েছেন, তাঁদের নাম শ্রীমতী বীণা দত্ত পর নবরেখা সিংহ, সংযুক্তা সিংহ, গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্তী কিজিপন্ড, নীরা নন্দা, রেণুকা রাঘবন, জয়শ্রী মুখার্জি মীনা গুপ্ত, ভি চন্দ্রলেখা, লিজি জর্জ দীপা জৈন, মালা সিংহ, নীরা ত্যাগী চারুশীলা সোহনী। এঁদের মধ্যে নীরা ত্যাগী এবং চারুশীলা সোহনী শুধু আ এ এস-এ এবং বাকি সকলেই আই এ এ এবং আই এফ এস দুটিতেই নির্বাচিত হয়েছেন।

অজিত বিশ্বাস
অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং স্কুল
রাজভবন, রাঁচি।

১১শ বর্ষ

১ম খণ্ড

৯ম সংখ্যা

মূল্য

৫০ পয়সা

Friday, 2 July, 1971 শুক্রবার—১৭ই আষাঢ়, ১৩৭৮ **50 Paise**

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীমানব বড়ুয়া

হিন্দীর হুঙ্কার ঃ

কোন অনুরোধ বা বিকল্প ব্যবস্থাসহ প্রশাসনিক সুপারিশ নয়, একেবারে সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট ভাষায় হুমকিসহ হিন্দিতে হুকুম। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী আদেশ দিয়েছেন, রাজ্য সরকারের সব কাজকর্ম এখন থেকে চলবে শুধু হিন্দি ভাষায়। এর কোন ব্যতিক্রম তিনি বরদাস্ত করবেন না। কোন সরকারি কর্মচারী যদি হিন্দি ছাড়া অন্য কোন ভাষায় লেখেন, বলেন বা সার্কুলার জারি করেন, তবে তাঁকে সে কাজের জন্য শাস্তি পেতে হবে। কেন্দ্রের সঙ্গেও উত্তরপ্রদেশ সরকার শুধু হিন্দিতে যোগাযোগ রক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

হিন্দির এই জবরদস্তি যে শেষপর্যন্ত হিন্দিরই সর্বাধিক ক্ষতি করে, এটা হিন্দিপ্রেমীরা জানেন না বলেই তাঁরা বারবার হঠাৎ হুঙ্কার ছেড়ে কাজ হাঁসিলের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। আর তার ফলে হিন্দির স্বার্থ ও মর্যাদা যত না ক্ষুণ্ণ হয়, তার চেয়ে জাতীয় সংহতির ভাবাদর্শ ক্ষুণ্ণ হয় অনেক বেশি। হিন্দি উত্তরপ্রদেশের অধিকাংশ লোকের কথ্যভাষা, শুধু এই যুক্তিতেই যদি হিন্দি সে রাজ্য থেকে অপর সব ভাষাকে নির্বাসিত করার অধিকার পায়, তাহলে ত একই যুক্তিতে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ছাড়া, ওড়িশায় উড়িয়া ছাড়া বা অন্ধ্র-তামিলনাড়ু-মহীশূর-কেরলে তেলুগু তামিল-কানাড়া-মালয়লম ছাড়া আর কোন ভাষা অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার পায় না। আর তারাও যদি শুধু স্বভাষায় কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে এ ভারতের হবে কি? ভাষার ব্যাপারে অসহিষ্ণুতা যে গোটা দেশটাকে কোন্ অবস্থায় নিয়ে এসেছে তার আভাষ আর একটি সাম্প্রতিক ঘটনা থেকে পাওয়া যায়। শাসক কংগ্রেসের যুব সংগঠনগুলির একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন কদিন আগে ইন্দোরে আহূত হয়েছিল। সম্মেলন চলার কথা ছিল তিনদিন। কিন্তু হিন্দি ও অহিন্দিভাষীদের মধ্যে প্রচন্ড বিরোধ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ফলে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সম্মেলন ভেঙে যায়। কোন্ ভাষায় সম্মেলনের কাজ চলবে— এ প্রশ্নের মীমাংসায় কিছুতেই একমত হতে পারলেন না একই রাজনৈতিক দলের যুব-কর্মীরা। পরবর্তীকালে এই যুবকর্মীরা যখন দেশের নেতা হয়ে শাসনকার্য হাতে নেবেন, তখন এ আত্মঘাতী বিরোধ কোন্ রূপ নেবে, তা আজ কল্পনা করতেও ভয় হয়।

অনুন্নতির সীমা ঃ

বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলিকে তালিকাভুক্ত করার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষ থেকে ১৮ জন বিশেষজ্ঞ নিয়ে 'কমিটি ফর ডেভলপমেন্ট প্ল্যানিং' নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নের পথে কি কি অন্তরায় এবং তা অপসারণের কাজে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কতটা সহায়ক হতে পারে, তা নিরূপণের জন্যই রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে এই সমীক্ষার ব্যবস্থা।

কোনো রাষ্ট্র অনুন্নত কি না তা নির্ধারণের মাপকাঠি হিসাবে কমিটি তিনটি শর্ত স্থির করেন, সেগুলি হল—(১) মাথাপিছু বাৎসরিক আয় অন্তত একশ ডলার, অর্থাৎ ৭৫০ টাকা; (২) জাতীয় উৎপাদনে শিল্পজাত পণ্যের ভাগ অন্তত ১০ শতাংশ; ও (৩) পনেরো বছরের বেশি বয়সের লোকেদের মধ্যে সাক্ষরের সংখ্যা অন্তত ২০ শতাংশ। কদিন আগে কমিটির যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, পৃথিবীর পঁচিশটি দেশ উল্লেখিত তিনটি শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছে যার মধ্যে আছে আফগানিস্তান, ভুটান, নেপাল, সিকিম প্রমুখ ভারতের নিকটতম প্রতিবেশীগুলি, আর লাওস, ইয়েমেন, মালদ্বীপ, পশ্চিম সামোয়া প্রভৃতি আরও কয়েকটি দেশ। ভারত ও ইন্দোনেশিয়া কোনরকমে পাশ মার্ক পেয়ে বেরিয়ে গেলেও কমিটি বলেছেন, ঐ জনবহুল দেশ দুটির দারিদ্র্য অনুন্নত দেশগুলিরই মতো। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমীক্ষকদল আর একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, ভারত ও তার প্রতিবেশী দেশগুলি উন্নতির সোপানের কোন নিচের ধাপে এখনও পড়ে আছে।

রক্ষণশীল ইতালী ঃ

ক্যাথলিক ইতালিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ বরাবরই জঘন্য পাপ বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে এবং মহামান্য পোপের প্রত্যক্ষ রক্ষণাধীন ইতালির কোন সরকার কখনও বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনসঙ্গত করার প্রস্তাব সমর্থন করেনি। শুধু মাত্র ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের অধীনে থাকাকালে ইতালিতে স্বল্পকালের জন্য (১৭৯৫ থেকে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত) বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনসঙ্গত হয়েছিল, কিন্তু নেপোলিয়নের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে আইনেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। তারপর বিগত ৯২ বছরে ১২টি বিবাহ-বিচ্ছেদ ইতালির পার্লামেন্টে অগ্রাহ্য হয়। পরিশেষে পাঁচ বছর ধরে তর্কযুদ্ধ চলার পর গত বছরের শেষে ইতালির পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে ত্রয়োদশ বিবাহ-বিচ্ছেদ বিলটি গৃহীত হয় এবং রাষ্ট্রপ্রধানের স্বাক্ষরলাভের পর এই বছরের শুরুতে তা আইনে পরিণত হয়।

কিন্তু পোপ পল ও ইতালির রক্ষণশীল জনগণ ঐ আইনকে কখনোই স্বীকার করে নেননি। এবং আইনটি পাশ হওয়ার পর থেকেই তাঁরা তার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ও রেফারেন্ডামের দাবি জানাতে গণস্বাক্ষর অভিযান শুরু করেন। ইতালির সংবিধান অনুসারে, ভোটাধিকারপ্রাপ্ত পাঁচ লক্ষ নরনারী কোন আইন সম্পর্কে জনমত (রেফারেন্ডাম) গ্রহণের দাবি জানালে সরকার সেই মতো ব্যবস্থা করতে বাধ্য। এক সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, রক্ষণশীলরা মাত্র তিন মাসের মধ্যে ১৩ লক্ষ ৭০ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে আইনটির সমর্থকদের অবাক করে দিয়েছেন। প্রয়োজনীয় সংখ্যার প্রায় তিনগুণ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে পোপের অনুগামীরা গত ১৯শে জুন 'সুপ্রীম কোর্ট অফ এপীল'-এর কাছে তাঁদের মহাসনন্দ পেশ করেন। সুতরাং, ইতিমধ্যে অভাবিতপূর্ব কিছু না ঘটলে ইতালি সরকারকে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের সমর্থনে জনমত যাচাইর জন্য অনতিবিলম্বে গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে, আর তাকে কেন্দ্র করে ইতালির জনজীবনে আসবে এক প্রচন্ড আলোড়ন। চার্চ ও চার্চ-বিরোধীদের বিরোধ যদি শেষপর্যন্ত ইতালিকে গৃহযুদ্ধের মুখে ঠেলে দেয়, তবে সেটাও খুব বিস্ময়ের ব্যাপার হবে না।

একটি সংবাদ ঃ

ব্যাঙ্ককের এক চিকিৎসক বলেছেন, আবহাওয়ার প্রতিকূলতার জন্যই এশিয়ার অধিকাংশ নরনারীর দাম্পত্যজীবন সুখের হয় না। তাঁর মতে, ৭৭ ডিগ্রি ফারেনহিট (২৫ সেন্টিগ্রেড) হল প্রেমের অনুকূল আদর্শ আবহাওয়া। সিঙ্গাপুরের একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক অবশ্য এর উপর মন্তব্য করে বলেছেন, বায়ু-অনুকূলন যদি এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়, তবে এশিয়ার তিন-চতুর্থাংশ লোককেই দাম্পত্যজীবনের সুখ থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

শান্তির ছলনা

বাংলাদেশে একটা রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য বৃহৎশক্তিবর্গকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে নানামহল থেকেই চেষ্টা চলছে। পশ্চিমের প্রভাবশালী সংবাদপত্রসমূহ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গোড়া থেকেই বলে আসছেন যে, পাকিস্তান তার সেনাবাহিনী দিয়ে বাংলাদেশে গণহত্যা সাধনের পর সেখানে থাকবার কোনো নৈতিক অধিকার তার নেই। কিন্তু বৃহৎ শক্তিবর্গের সরকারী হাবভাব খুবই ছলনাময়। তারা মুখে বাঙালীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে কার্পণ্য করে না, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ইসলামাবাদের প্রতি তাদের হৃদয়ের টান এখনও অটুট।

ভারত সরকার সম্ভবত মনে করছেন যে, বিশ্ববিবেক জাগ্রত করতে পারলে বাংলাদেশে একটা রাজনৈতিক মীমাংসা সম্ভব এবং তাহলেই যাট লক্ষ শরণার্থীকে তাদের দেশে ফিরে পাঠানো যাবে। তাই ভারত সরকারের মন্ত্রীরা দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাংলাদেশের প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহকে অবহিত করার জন্য। বিদেশী রাষ্ট্রসমূহ বাংলাদেশের প্রকৃত ঘটনা জানে না, এ ধারণা ঠিক নয়। তারা ঠিকই জানে যে, পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী গত ২৫শে মার্চ রাত্রি থেকে বাংলাদেশে সামরিক সন্ত্রাস কায়েম করেছে। লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে তারা হত্যা করেছে এবং লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে, অধিকাংশই সংখ্যালঘু, নিঃস্ব অবস্থায় পাঠিয়ে দিয়েছে ভারতে। বহু বিশিষ্ট জনপ্রতিনিধি স্বচক্ষে এই শরণার্থীদের দেখে গেছেন। রাষ্ট্রসংঘের শরণার্থী-কমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খানও সব নিজের চোখে দেখে গেছেন, পাকিস্তানী সৈন্যরা কী অমানুষিক অত্যাচার করছে বাঙালীদের ওপর। সুতরাং ভারতের মন্ত্রীরা বিদেশে গিয়ে নতুন করে কী আর বোঝাবেন? এখন বোঝানোর চেয়েও বড় কাজ হল বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে যে সামরিক অভিযান চলছে তার প্রতিবিধান করা।

পশ্চিমী শক্তিসমূহ ইচ্ছা করলে এতদিনে বাংলাদেশে গণহত্যা, সংখ্যালঘু উচ্ছেদ এবং সামরিক সন্ত্রাস বন্ধ করতে পারত। কারণ, পাকিস্তান তাদের বন্ধু। গত ২৩ বৎসর ধরে পশ্চিমী শক্তিরাই অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পাকিস্তানকে মজবুত করেছে। তাদের ধারণা ছিল যে, ভারতের মতিগতি খারাপ। সুতরাং পাকিস্তানকে দিয়েই এশিয়ায় কমিউনিজমকে ঠেকানো যাবে। কিন্তু সেই অস্ত্র দিয়ে পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হয়নি তাদেরই অংশ বলে কথিত পূর্ববাংলার ওপর চালিয়েছে এক বর্বর আক্রমণ। বৃটেন ও আমেরিকা যদি সত্যই এই বাঙালী হত্যার বিরুদ্ধে দাঁড়াত তাহলে ইয়াহিয়ার বাহিনীর পরাক্রম একদিনেই স্তব্ধ করে দেওয়া যেত। তারা তা না করে নানারকম স্তোকবাক্যে বিশ্বের জনমতকে শান্ত রাখার চেষ্টা করেছে। অন্যদিকে আমেরিকা থেকে জাহাজ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো হচ্ছে পাকিস্তানে। এই অস্ত্র ঘাতক ইয়াহিয়ার হাতই শক্ত করবে। এর পরও যদি আমরা আশা করে থাকি যে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য বিশ্বের শক্তিবর্গ উদগ্রীব তাহলে আমরা ভুলই করব। শান্তির ছলনায় বারবার আমরা বিভ্রান্ত হয়েছি। এবারেও যেন তা না হই।

রাজনৈতিক মীমাংসা হবে কার সঙ্গে? বাংলাদেশের অবিসম্বাদী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই হলেন রাজনৈতিক আলোচনার জন্য জনগণের আস্থাভাজন প্রকৃত ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। একমাত্র তাঁরাই বলতে পারেন বাংলাদেশে কোন ভিত্তিতে রাজনৈতিক মীমাংসা হতে পারে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ব্যাপক গণহত্যার পর বাংলাদেশে ইয়াহিয়া এবং তার অনুচরদের পা রাখবার আর জায়গা হবে না। বাংলাদেশের স্বাধীন সার্বভৌম সরকারের স্বীকৃতিই হল যে কোনো রাজনৈতিক মীমাংসার প্রথম শর্ত। এই ব্যাপারে জনগণতন্ত্রী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিরাই হলেন প্রকৃত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যাঁরা কথা বলবেন। ভারতের পক্ষ থেকে আমরা বিশ্বজনমতকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করা এবং শরণার্থীদের প্রতি সুবিচার। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন তার উদ্দেশ্য হল পাকিস্তানের ধ্বংসস্তূপের ওপর জয়বাংলার পতাকা ওড়ানো। রক্ত, অশ্রু ও সর্বস্ব ত্যাগের বিনিময়েই তা সম্ভব হবে। বৃহৎ শক্তিবর্গের কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণে যে শান্তির ছলনা সৃষ্টি হয়েছে তার দ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যোদ্ধা অথবা শরণার্থীভার প্রপীড়িত ভারতের কোনো উপকার হবে না।

শেষের দিকে ঘটনাগুলি বেশ দ্রুত ঘটে গেল। পশ্চিমবাংলার কোয়ালিশন সরকারের সংকটের কারণ 'পটভূমি'র পাঠকদের অজানা নয়, তবু শত দিনের পরমায়ু পূর্ণ হওয়ার আগে ২৫ জুন রাত্রেই যে এই রাজ্যের ষষ্ঠ বিধানসভার জীবনদীপ নিবে যাবে, এটা রাজনৈতিক মহলের সকলেও বুঝতে পারেননি।

উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয়সিং নাহারের দিল্লী সফরকে উপলক্ষ করেই নানা জল্পনা পল্লবিত হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু বিজয়বাবু যখন দিল্লী যান, তখন সম্ভবতঃ তিনিও জানতেন না যে বাজেট অধিবেশনের আগেই বিধানসভা বাতিল হয়ে যাবে। কারণ তার আগেই তিনি কোনোরকমে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাকে টিঁকিয়ে রাখার জন্যে ঝাড়খন্ড দলের দু'জনকে উপমন্ত্রী করতে রাজী হন। এ-ব্যাপারে সব আলাপ-আলোচনা তিনিই করেন। মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবু এ-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতেন না বা জানার চেষ্টা করেননি, কারণ তার আগেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দেওয়ার কথা চিন্তা করতে শুরু করেন। বিধানসভায় যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের দরকার না থাকত, তবে বিজয়বাবু ঝাড়খণ্ড দলকে দলে টানার এত চেষ্টা করতেন না। সকলেই জানেন, ঝাড়খন্ড দল বাংলা, বিহার, ওড়িশার কিছু এলাকা নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গড়তে চায়। এ-দাবি তারা শেষপর্যন্ত ছাড়তে চায়নি। কংগ্রেসের একাংশ চেয়েছিল যে, ঝাড়খন্ডকে দলে নিতে হলে সম্পূর্ণ নিঃশর্তেই নিতে হবে। ফলে এইভাবে যেন-তেন-প্রকারেণ মন্ত্রিসভা টিঁকিয়ে রাখার জন্যে কংগ্রেসের নেতাদের একাংশের চেষ্টার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মধ্যেই বিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে।

অবশ্য বাংলা কংগ্রেস দু'ভাগ না হলে এখনই হয়ত মন্ত্রিসভাকে এই সংকটে পড়তে হত না। সুশীল ধাড়া অজয়বাবুর পদত্যাগের শর্তে মন্ত্রিসভাকে সমর্থনের যে-প্রতিশ্রুতি দেন, তাও কংগ্রেসের নেতাদের অনেকের পছন্দ হয়নি। কারণ অজয়বাবুকে সরিয়ে কংগ্রেসেরই কাউকে ঐ পদে বসানোর পক্ষে অনেক অসুবিধে ছিল। তাছাড়া, সুশীলবাবু শেষপর্যন্ত ঝেড়ে কাশেননি। কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন, কিন্তু শেষের দিকে প্রায় শারীরিকভাবেই তিনি ধরা দিতে চাননি। বিজয়বাবুর সঙ্গে বৈঠকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ কলকাতার বাইরে চলে গেছেন। কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা সম্বন্ধে শেষপর্যন্ত তাঁর গোষ্ঠীর মনোভাব কী হবে, তা তিনি ২৭ জুন পাকাপাকি জানাবেন বলেছিলেন, অর্থাৎ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনিশ্চয়তাটা তিনি জীইয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। অবশ্য সুশীলবাবুর দল মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে গেলেও সরকারের পতন ঘটত না, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আরো ক্ষীণ হয়ে দাঁড়াত। ঐভাবে সরু তারের ওপর দিয়ে হেঁটে কোনো সরকারের পক্ষেই কোনো কাজ করা সম্ভব নয়।

১৯৬৭ সাল থেকে এই রাজ্যে যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কায়েম হয়েছে তার পিছনে বাংলা কংগ্রেসের অবদান কিন্তু কম নয়। অজয়বাবু কংগ্রেস ছেড়ে এসে বাংলা কংগ্রেস না গড়লে ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস সংখ্যালঘিষ্ঠও হত না, যুক্তফ্রন্টও গড়ে উঠত না। আবার অজয়বাবুই ঐ বছরের অক্টোবরে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভাঙবার জন্যে তৈরী হয়েও শেষপর্যন্ত পিছিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু নভেম্বর মাসে প্রথম যুক্তফ্রন্ট যখন সত্যিই ভাঙল, তখন তার মূলেও ছিল হুমায়ুন কবির-অজয় মুখার্জি বিবাদকে কেন্দ্র করে বাংলা কংগ্রেসে ভাঙন। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টও যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও তের মাসের বেশি টিঁকতে পারেনি, তারও কারণ অজয়বাবু তথা বাংলা কংগ্রেস সি পি এম-এর সঙ্গে একত্রে আর সরকার চালাতে চাননি। এবারের গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারও এমনিতেই দীর্ঘ দিন টিঁকত না, কিন্তু তার মৃত্যুকে কিছুটা ত্বরান্বিত করল অজয়বাবু ও সুশীল ধাড়ার বিবাদ। বাংলা কংগ্রেস আর কোনোদিনই হয়ত এই রাজ্যের রাজনৈতিক মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করতে পারবে না, কিন্তু গত চার বছরের ভাঙা-গড়া টাল-মাটালের মূলে এই আঞ্চলিক দলটির অবদান মোটেই লঘু করে দেখা যাবে না।

•

তবু বাংলা কংগ্রেসে ভাঙনের ধাক্কাও কোয়ালিশন সরকার হয়ত কাটিয়ে উঠতে পারত, যদি না ইতিমধ্যে কোয়ালিশনের বড় তরফ কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছত। যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ বেশ কিছু দিন ধরেই এই সরকারের পদত্যাগ চাইছিলেন। তাঁরা বলে আসছিলেন যে, এইভাবে সরকারের টিঁকে থাকা অর্থহীন। কারণ সরকার কিছুই করতে পারছেন না। আইন-শৃঙ্খলার অবস্থার উন্নতি হয়নি। বেকার সমস্যার সুরাহার কোনও পথও দেখা যাচ্ছে না। মাঝ থেকে শুধু কংগ্রেসের নাম খারাপ হচ্ছে। সুতরাং কংগ্রেস সরকার ত্যাগ করুক। বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হোক, হোক আবার নির্বাচন। যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের ধারণা, আবার নির্বাচনে কংগ্রেস আরো ভালো ফল দেখাতে পারবে।

এই চাপটা ছিলই, হয়ত এই চাপ সত্ত্বেও বাজেট অধিবেশনটা পার করিয়ে দেওয়া যেত, যদি না ইতিমধ্যে যুব কংগ্রেস নেতা নারায়ণ কর তাঁর বাড়ির মধ্যে বসে আততায়ীর হাতে প্রাণ হারাতেন। আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে সরকার যে কিছুই করতে পারেনি, এই হত্যাকাণ্ড তারই একটা বড় প্রমাণ বলে যুব কংগ্রেস ঘোষণা করল। সেই সঙ্গে এই চরমপত্রও দিল যে, তিন দিনের মধ্যে, অর্থাৎ বাজেট অধিবেশনের আগেই মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হবে।

যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের বক্তব্যকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত, তা নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যেই মতভেদ ছিল। এক দল তাদের ততটা আমল দিতে না চাইলেও, অপর দল ঠিকই জানেন যে, তাদের উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কারণ, পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসের ভাগ্য পরিবর্তনের অন্যতম কারণ যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের সহযোগিতা। শুধু তাই নয়, এই দুই সংস্থার নির্দেশ মোটামুটি মেনে চলবে বিধানসভায় এমন সদস্যের সংখ্যা অন্ততঃ কুড়িজন। সুতরাং তারা যদি ইচ্ছে করে সরকারকে বিপদে ফেলা তাদের পক্ষে কঠিন নয়।

কিন্তু যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের চাপ ছাড়াও কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্বিরোধের আরো প্রকাশ দেখা যাচ্ছিল। একই লোক মন্ত্রী এবং সংগঠনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকতে পারবে না— কংগ্রেসের এই নীতি নিয়ে মতবিরোধ চলছিল। বিজয়সিং নাহারকে অনেকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, আপনি কংগ্রেস সভাপতির পদ ছেড়ে দিন, উপমুখ্যমন্ত্রীর পদটাই রাখুন। কিন্তু বিজয়বাবুকে তখন তাঁর সহযোগীদের অনেকে বোঝান যে, এই সরকার কত দিন থাকে ঠিক নেই, সুতরাং উপমুখ্যমন্ত্রীর পদও স্থায়ী নয়। আর যদি সরকার থাকেও, তবু সভাপতির পদ ছেড়ে দিলেও বিজয়বাবু হয়ত উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ বেশি দিন রাখতে পারবেন না।

পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস নেতারা দু' পদেই আপাততঃ থাকতে পারবেন বলে

কংগ্রেস সভাপতি যে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা অবশ্য এখন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল। কারণ সরকারই এখন থাকছে না। তবে তার মানে এই নয় যে, এই প্রশ্ন আপাততঃ চাপা পড়ে গেল। যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের নেতারা কংগ্রেস সংগঠনকে ঢেলে সাজাতে চান এবং এ-ব্যাপারে অনেক বর্ষীয়ান নেতার প্রতিই তাঁদের বিশেষ মায়া-মমতা নেই। নির্বাচন যখন আসন্ন, তখন কংগ্রেস সংগঠনকে জোরদার করার দাবি বাড়বে, কমবে না।

তবে এর চেয়েও গুরুতর বিরোধ দেখা দেয় খোদ কংগ্রেস পরিষদীয় দলের মধ্যেই। কংগ্রেসী এম এল এ-দের মধ্যে মতপার্থক্যের সবচেয়ে নাটকীয় প্রকাশ ঘটে বিজয়বাবুর দিল্লী যাওয়াকে কেন্দ্র করেই। পরিষদীয় দলের সম্পাদক বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানান যে, বিজয়বাবুর বক্তব্যকে যেন পরিষদীয় দলের বক্তব্য বলে মেনে নেওয়া না হয়। কারণ দিল্লী যাওয়ার আগে বিজয়বাবু পরিষদীয় দলের সঙ্গে কোনো আলোচনা করেননি।

কিন্তু বিনয়বাবুর টেলিগ্রামে আরো গুরুতর অভিযোগ ছিল। তিনি কয়েকজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনেন। এমনকি স্বয়ং উপ-মুখ্যমন্ত্রীকেও তিনি ছাড়েননি।

•

দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিজয়বাবুর আলোচনা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আভ্যন্তরীণ বিষয়ক কমিটিতে আলোচনা, সিদ্ধার্থ রায়ের বাড়িতে পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসী এম পি-দের আলোচনা— এ-সবই দ্রুত ঘটে যায়। কেন্দ্রীয় নেতারা মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, এই ধরনের অনিশ্চয়তার মধ্যে সরকার চলতে পারে না। বিশেষতঃ পশ্চিমবাংলার আইন-শৃঙ্খলা ও বাংলাদেশের শরণার্থীর সমস্যার কথা মনে রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিধানসভায় কোয়ালিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকতে বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার পথই শ্রেয় বলে মনে করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকতে থাকতেই যদি মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ করেন, তবে রাজ্যপালও তা মেনে নিতে বাধ্য থাকেন। বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার পর যদি বিধানসভায় সরকার পক্ষের পরাজয় ঘটত, তবে অন্ততঃ নিয়ম রক্ষার খাতিরেও মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিকে সরকার গঠন সম্পর্কে আলোচনার জন্যে ডাকতে হত। অবশ্য বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার পরে জ্যোতি বসু বলেছেন যে, এই সিদ্ধান্তের আগে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ছিল। বিরোধী পক্ষের নেতা হিসেবে এটা তাঁকে বলতেও হবে। কিন্তু তিনিও জানেন যে, সরকারের যতক্ষণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে ততক্ষণ বিধানসভা ভঙ্গার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশই চূড়ান্ত। জ্যোতিবাবু অবশ্য শুক্রবার রাতে দাবি করেছেন যে, মন্ত্রিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। কিন্তু সেটাও অনেকটা বলার জন্যেই বলা। কারণ শুক্রবার সকাল পর্যন্ত মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা বলেননি যে, মন্ত্রিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। বিধানসভার সেক্রেটারিয়েট বা রাজ্যপালের কাছেও এমন প্রমাণ নেই যে, অনেক সদস্য কোয়ালিশন সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

তাছাড়া জ্যোতিবাবুকে রাজ্যপাল ডাকলেও তিনি সম্ভবতঃ ১৪১ জন সদস্যের সমর্থন জোগাড় করতে পারতেন না। বিধানসভায় ভোটাভুটির ফল থেকে দেখা যায় যে, বিরোধী পক্ষের সঙ্গে সরকারের শক্তির তফাৎ ছিল নয়। কিন্তু সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার ও আর এস পি সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিলেও তারা মার্কসবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এখনই সরকার গঠনে এগিয়ে আসত কিনা বলা যায় না। অবশ্য এস ইউ সির ছ'জন ও আর এস পি-র তিনজনের সমর্থন পেলেও সরকার গঠনের জন্যে জ্যোতিবাবুকে ছোটখাটো কয়েকটি দলের সমর্থন পাবার চেষ্টা করতে হত। সে-কাজে সফল হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা হত যৎসামান্য এবং সরকার টিঁকিয়ে রাখার জন্যে ছোটখাটো দলের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করতে হত। তাতে আর যাই হোক, অন্ততঃ রাজনৈতিক স্থিরতা আসত না। এই দরকষাকষির সময় আয়ারাম-গয়ারামের দলই কাজ গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেত। আর এইভাবে সরকার গঠন করা উচিত কি-না, সে-বিষয়ে খোদ সি পি এম-এর মধ্যেই যে সকলে একমত ছিলেন তা নয়। বিধানসভা ভেঙে দেওয়ায় সি পি এম ক্ষমতায় আসতে পারল না ঠিকই, কিন্তু প্রতিক্রিয়ার কোয়ালিশন সরকারও' যে রইল না, তাতে সি পি এম অবশ্যই খুশি। কারণ রাষ্ট্রপতির শাসন অন্ততঃ বিপক্ষ দলের শাসনের চেয়ে অনেক ভালো।

•

কিন্তু রাষ্ট্রপতির শাসনও কি এবার শান্তিস্বরূপ ধাওয়ানই চালাবেন? সত্যি কথা বলতে কি, ধাওয়ানজীকে কেন্দ্রীয় আইন কমিশনের চেয়ারম্যান করা হচ্ছে, এই খবর রটে যাওয়াও পশ্চিমবাংলায় রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের জল্পনা শুরু হওয়ার অন্যতম কারণ। গতবারের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একাংশ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, পশ্চিমবাংলার শাসনভার যদি কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতেই হয়, তবে ধাওয়ানজীকে দিয়ে কাজ চলবে না। সেই প্রসঙ্গেই কেরলের রাজ্যপাল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রাক্তন সচিব বিশ্বনাথনের নাম ওঠে।

যুক্তফ্রন্টের শাসনের শেষের দিকেই ধাওয়ানজীকে পশ্চিমবাংলা থেকে সরাবার দাবি ওঠে। রাষ্ট্রপতির শাসনের আমলেও তাঁর অপসারণের সম্ভাবনা দেখা দেয়। তখনও বিশ্বনাথনকেই কলকাতায় আনার কথা শোনা যায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেল যে, ধাওয়ানজী রয়েই গেলেন। অর্থাৎ দিল্লীতে তাঁর খুঁটির জোর নিতান্ত কম নয়।

এবারে কী হবে, এখনও বলা যায় না। ধাওয়ানজী বলছেন, তিনি থাকবেন। এদিকে তাঁর বদলীর গুজবও সমান জোরদার। কিন্তু ধাওয়ানজীর সময় গতবারে প্রশাসনের যে কোনো উন্নতিই হয়নি, তা সবাই জানেন। বরং রাজ্যপাল ও প্রধান উপদেষ্টার দুটো সমান্তরাল প্রশাসন ব্যবস্থা চালু ছিল। তাতে রাজ্যের কোনো মঙ্গল হয়নি। রাষ্ট্রপতির শাসনের যদি পশ্চিমবাংলার অবস্থার কোনো উন্নতি ঘটাতে হয়, তবে প্রশাসন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল একজন রাজ্যপালই দরকার।

ধাওয়ানজী একবার বলেছিলেন, তাঁর নিজেকে মাঝে মাঝে 'আজব দেশে অ্যালিস' বলে মনে হয়। যে-কাজ তিনি কোনো দিন করবেন ভাবেননি, সেই কাজের ভারই তাঁর ওপর এসে পড়েছে। ছিলেন আইনজীবী, হয়ে গেলেন বিচারপতি। ছিলেন বিচারপতি, হলেন রাষ্ট্রদূত। তারপর রাজ্যপাল। ধাওয়ানজী সম্ভবতঃ বিনয়বশতঃই কথাগুলো বলেছিলেন, কিন্তু একটি কথা এই স্বীকারোক্তির মধ্যে উহ্য ছিল। কোন্ গোপন রহস্যের দ্বারা তিনি তর তর করে এতদূরে পেঁছিলেন তা তিনি বলেননি। আইন কমিশনের সভাপতি হলে তাঁর গুণের উপযুক্ত ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যেত, কিন্তু নিজেকে 'আজব দেশে অ্যালিস' মনে হওয়ার মধ্যেও বোধহয় এক ধরনের সুখ আছে।

২৬।৬।৭১ —দেবদত্ত

"খোকন, আমার খোকন", চাষীর মেয়ে পদ্মা কান্নায় ভেঙে পড়ে মাটি থেকে অনেক উঁচুতে রুশ "এ এন ১২" বিমানে। খুলনা থেকে ভারতে পালিয়ে আসার পথে স্বামী তার নিরুদ্দেশ; তবু বুক বেঁধে পদ্মা ভারতে এসেছিল খোকনকে বুকে নিয়ে। কিন্তু মানায় যাবার পথে মাঝআকাশে খোকনও পদ্মার বুক থেকে সরে যায়। রেখে যায় বুকভরা কান্না।

ফটো : দিলীপ ঘোষ

দেশে বিদেশে

একবার একজন সংবাদপত্র প্রতিনিধি ন সরকারের একজন মুখপাত্রকে নাকি করেছিলেন, "আজকের নিউইয়র্ক সে যা বেরিয়েছে তার চেয়ে বেশী কিছু দিতে পারবেন কি?" সরকারী াত্রটি নাকি জবাব দিয়েছিলেন, "হা . আমরা কোথা থেকে খবর পাই বলে ার ধারণা?"

এছেন "নিউইয়র্ক টাইমস" পত্রিকা হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন। তাঁরা খবর ছন, আমেরিকার নিকসন সরকার মুখে স্তান সরকারকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ কথা বললেও গোপনে গোপনে মাবাদ এখনও আমেরিকা থেকে সমর- র পাচ্ছে। পত্রিকাটির খবর হল, পদ্মা একটি পাকিস্তানী জাহাজ ২২ জন খ আমেরিকান সমরসম্ভার নিয়ে নিউ-ইয়র্ক থেকে পাকিস্তান অভিমুখে রওনা হওয়ার উদ্যোগ করছিল। এই সমরসম্ভারের মধ্যে আছে আটটি বিমান, প্যারাসুট এবং "বিমান ও সামরিক যানবাহনের জন্য লক্ষ লক্ষ পাউন্ড, যন্ত্রাংশ।" শুধু তাই নয়, এর আগে গত ৮ মে তারিখে "সুন্দরবন" নামে আর একটি পাকিস্তানী জাহাজ আমেরিকান যুদ্ধোপকরণ নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে করাচী অভিমুখে রওনা হয়ে গেছে।

এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়া মাত্র স্বাভাবিকভাবেই দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে পাকিস্তানী হামলা আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই আমেরিকার সরকারী মুখপাত্ররা বারবার বলে আসছেন, পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করা বা সাহায্য দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এখন কি তাহলে ধরে নিতে হবে, পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া বন্ধ করার কথাটা একটা বিরাট ধাপ্পা মাত্র, আসলে আমেরিকা এখনও পাকিস্তানকে গোপনে মদৎ দিয়ে যাচ্ছে, যদিও সে জানে ইয়াহিয়া সরকারকে যে সাহায্য দেওয়া হবে সেটা আসলে বাংলাদেশের মানুষকে দাবিয়ে রাখার কাজেই লাগান হবে? পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিংকে মিষ্টি কথায় তুষ্ট করে বিদায় দিয়ে আর প্রায় একই সময়ে পাকিস্তানী জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করে মার্কিণ সরকার কি দুমুখো নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন?

যেদিন "নিউইয়র্ক টাইমস"-এর খবর বেরোল সেদিনই ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর বিদেশ সফর শেষ করে ফিরে এলেন। নয়া-দিল্লী বিমান বন্দরে এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বললেন, "নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদ যদি সত্য হয় তাহলে বুঝতে হবে, বারবার, বিশেষ করে গত মার্চ মাসে পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক অভিযানের পর আমাদের যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে সেই আশ্বাস লঙ্ঘন করা হয়েছে।"

ইয়াহিয়া চক্রকে সমরোপকরণ যুগিয়ে যাওয়ার এই সংবাদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা দপ্তরের মুখপাত্ররা হিমসিম খেয়েছেন। প্রতিরক্ষা দপ্তরের একজন প্রতিনিধিকে পাশে নিয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র চার্লস রে সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি ঐ দুটি পাকিস্তানী জাহাজে সামরিক উপকরণ চালান দেওয়ার কথা অস্বীকার করেন নি, এর কতকগুলি

সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন মাত্র। তিনি বলেনঃ—(১) আমেরিকান সওদাগরী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে রসদ কেনার জন্য যেসব লাইসেন্স দেওয়া হয় সেই ধরনের লাইসেন্সের বলেই পাকিস্থান এই সব রসদ সংগ্রহ করে থাকতে পারে। ২৫ মার্চ থেকে পাকিস্তানকে এই লাইসেন্স দেওয়াও বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তার আগে যেসব লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে তার বলেই পাকিস্তান এই সব জিনিস সংগ্রহ করে থাকতে পারে। এই লাইসেন্সের মেয়াদ এক বছরের। (২) কতকগুলি জিনিসের জন্য লাইসেন্সও লাগে না। ঐ দুটি জাহাজে এই ধরনের লাইসেন্স-বহির্ভূত রসদও থাকতে পারে। (৩) এমনও হতে পারে যে, বিদেশে সমরোপকরণ বিক্রির কার্যসূচী অনুযায়ী পাকিস্তান সরকারকে যে সমরসম্ভার বিক্রি করা হয়েছিল তার কিছু অংশ ২৫ মার্চের আগেই পাকিস্তানের হাতে এসেছে এবং এখন সেটাই ডকে এসে পৌঁছেছে।

পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র আবার আশ্বাস দেন যে, পাকিস্তানকে অস্ত্র দেওয়ার প্রশ্নটি গত ২৫ মার্চের পর থেকে পর্যালোচনা করে দেখা হচ্ছে এবং এই পর্যালোচনা সাপেক্ষে বিদেশে সমরসম্ভার বিক্রির কর্মসূচী অনুযায়ী পাকিস্তানকে যুদ্ধোপকরণ পাঠান প্রতিরক্ষা দপ্তর বন্ধ রেখেছেন। বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান থেকে সমরোপকরণ নিয়ন্ত্রণ তালিকার অন্তর্ভুক্ত উপকরণ কেনার জন্য যে লাইসেন্স দেওয়া হয় পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সেটাও বন্ধ রাখা হয়েছে।

'সুন্দরবন' ও 'পদ্মা' করাচীতে পৌঁছবার আগেই পথের মধ্যে জাহাজ দুটিকে আটক করা হবে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ব্রে বলেছেন, এমন কোন পরিকল্পনা নেই।

*

সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান কর্পূরী ঠাকুর, প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান এন জি গোরে, ঐ দুই পার্টির সাধারণ সম্পাদক, যথাক্রমে জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ ও প্রেম ভাসিন দুই পার্টির সংযুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন. ঐ দুই পার্টির কার্যনির্বাহক সমিতিও চুক্তিটি অনুমোদন করেছেন। এখন শুধু দুই পার্টির জাতীয় সম্মেলনে ঐ চুক্তি অনুমোদনের অপেক্ষা। আশা করা যাচ্ছে তার পর এই দুই সমাজতন্ত্রী দলের মিলনে 'সোস্যালিস্ট পার্টি' নামে সম্মিলিত দলটি জন্মগ্রহণ করবে।

চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, এই পার্টিকে একটি "সংগ্রামী গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী দল" হিসাবে গড়ে তোলা হবে। আরও বলা হয়েছে যে, এই মিলিত দল যুক্তফ্রন্ট রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং শাসক কংগ্রেস ও অন্যান্য অ-সমাজতান্ত্রিক দলের সরকারকে উৎখাত করবে। দুই পার্টির সংযুক্তির চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, শাসক কংগ্রেস হচ্ছে স্থিতস্বার্থ ও পুঁজিবাদের পার্টি", জনসংঘ "সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক শক্তি" সি পি এম "আমাদের গণতান্ত্রিক জীবনধারার পক্ষে গভীর বিপদস্বরূপ" এবং সি পি আই "এখনও তাদের বৈদেশিক আনুগত্য ত্যাগ করে নি এবং তারা সোভিয়েট ইউনিয়নের তল্পীবাহক।"

ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অনৈক্য দূর করে তাকে ঐক্যবদ্ধ করার এই চেষ্টা নূতন নয়। প্রকৃতপক্ষে, এদেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস বারবার শুধু যোগবিয়োগের ইতিহাস। এই আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল প্রাকস্বাধীনতার যুগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভিতরে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর ১৯৫২ সালের মে মাসে পাঁচমারির সম্মেলনে স্থির হল, কিষাণ মজদুর প্রজা পার্টির সঙ্গে সোস্যালিস্ট পার্টির সংযুক্তি ঘটান হবে। এই দুই পার্টির মিলনে জন্ম হল প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি। এর তিন বছরের মধ্যেই প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির ভিতরে ঐক্যের সঙ্কট দেখা দিল। ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু জয়প্রকাশ নারায়ণকে আমন্ত্রণ জানালেন কংগ্রেস ও পি-এস-পি'র মধ্যে সহযোগিতার উপায় খুঁজে বার করার উদ্দেশ্যে আলোচনা করার জন্য। এই আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়ার প্রশ্নে পি-এস-পিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল। কংগ্রেসের সঙ্গে যাঁরা সহযোগিতা করতে উৎসুক হলেন তাঁদের নেতা হলেন অশোক মেহতা আর যাঁরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন তাঁদের নেতৃত্ব দিলেন ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া। ১৯৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে আবাদী সম্মেলনে কংগ্রেস "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজকে" তাদের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করল তখন পি-এস-পির দুই অংশের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব তীব্রতর আকার ধারণ করল। ১৯৫৫ সাল শেষ হওয়ার আগেই পি-এস-পি ভেঙে দুটুকরো হয়ে গেল। ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া তাঁর অনুগামীদের নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে গড়লেন দি সোস্যালিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া। নয় বছর পি-এস-পি ও সোস্যালিস্ট পার্টি নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছিল। ১৯৬৪ সালে কংগ্রেস সভাপতি কামরাজ সমাজতন্ত্রীদের কংগ্রেসে ফিরে আসবার আহ্বান জানালে অশোক মেহতা কংগ্রেসে যোগ দিলেন এবং পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু কিছু পি-এস-পি সদস্য কংগ্রেসে যোগ দিলেন। বারাণসী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ বছরই পি-এস-পি ও এস-পি মিলিত হয়ে সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি বা এস-এস-পি গঠন করল।

কিন্তু দুই সমাজতন্ত্রী দলকে এক করার এই চেষ্টা এক বছরের মধ্যেই ব্যর্থ হয়ে গেল। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে পুরানো পি-এস-পির অধিকাংশ সদস্য এস-এস-পি ছেড়ে চলে এলেন।

এবারকার এই দ্বিতীয় ঐক্য প্রয়াস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে পি-এস-পির সাধারণ সম্পাদক প্রেম ভাসিন বলেছেন যে, এবার বারাণসীর পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেওয়া হবে না। কিন্তু কাজটা যে সহজ হবে না তা প্রথম থেকেই বোঝা যাচ্ছে। এস-এস-পির যে অংশটা গোড়ায় এই সংযুক্তি প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কর্পূরী ঠাকুর ও রাজনারায়ণের মতো পার্টির প্রথম সারির নেতারাও ছিলেন। শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যেসব দল বিহারে কর্পূরী ঠাকুরের মন্ত্রিসভাকে হটিয়েছে এবং তার জায়গায় প্রগতিশীল বিধায়ক দলের মন্ত্রিসভা গঠন করেছে তাদের মধ্যে পি-এস-পিও ছিল। এই ক্ষোভ কর্পূরী ভুলতে পারেন নি। সেইজন্য পি-এস-পিকে অবিলম্বে সমস্ত কোয়ালিশন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, এই পূর্বসর্ত আদায় করে নেওয়ার জন্য তিনি চাপ দিচ্ছিলেন। আর রাজনারায়ণ বাগড়া দিচ্ছিলেন পরলোকগত সমাজতন্ত্রী নেতা ডাঃ লোহিয়ার "কংগ্রেস বিরোধিতাবাদ" নীতির দোহাই তুলে। ডাঃ লোহিয়া কংগ্রেসকে হঠাবার জন্য দক্ষিণ-বামনির্বিশেষে যে কোন দলের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী ছিলেন। রাজনারায়ণ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসকে কাবু করার জন্য যে কোন দলের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। রাজনারায়ণ ও কর্পূরী ঠাকুর উভয়েই যদি পি-এস-পি-এস এস-পি মিলনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে যেতে থাকতেন তাহলে হয়তো এই ঐক্যের উদ্যোগীদের অসুবিধায় পড়তে হত। কিন্তু রাজনারায়ণ শেষ পর্যন্ত একা পড়ে গেলেন। পি-এস-পির তরফে যাঁরা ঐক্যের আলোচনা করছিলেন তাঁরা বিভিন্ন রাজ্যে কোয়ালিশন থেকে বেরিয়ে আসার সর্ত মেনে নিলেন। তার ফলে কর্পূরী ঠাকুর সন্তুষ্ট হলেন। আর আপত্তি করা বৃথা বুঝে রাজনারায়ণও শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলেন।

দুই দলের নেতারা যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে, মূল রাজনৈতিক প্রশ্নে দুই দলই কিছু কিছু আপোষ করেছে। এস-এস-পি "ইন্দিরাকে হঠাবার জন্য শয়তানের সঙ্গেও হাত মেলানোর" শ্লোগান বাতিল করেছে, অন্যদিকে পি-এস-পিও সি-পি-এমকে রুখবার জন্য প্রয়োজন হলে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে একজোট হওয়ার নীতি পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু এই উভয়বিধ বর্জনের যোগফলে যা দাঁড়াল তাতে নতুন সোস্যালিস্ট পার্টি "একলা চল রে' নীতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে গেল।

এতে এস-এস-পির আপাতত বিশেষ অসুবিধা নেই। কেননা, নির্বাচনের সময়কার মহাজোট ভেঙে গেছে এবং এস-এস-পি এখন কেন্দ্রে বা কোন রাজ্যে কোন জোটের মধ্যে নেই। কিন্তু পি-এস-পি বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে ক্ষমতাসীন জোটের শরিক হয়ে রয়েছে। পি-এস-পির জাতীয় নেতারা কি এই তিনটি রাজ্যে তাঁদের রাজ্য ইউনিটকে দিয়ে এই "একলা
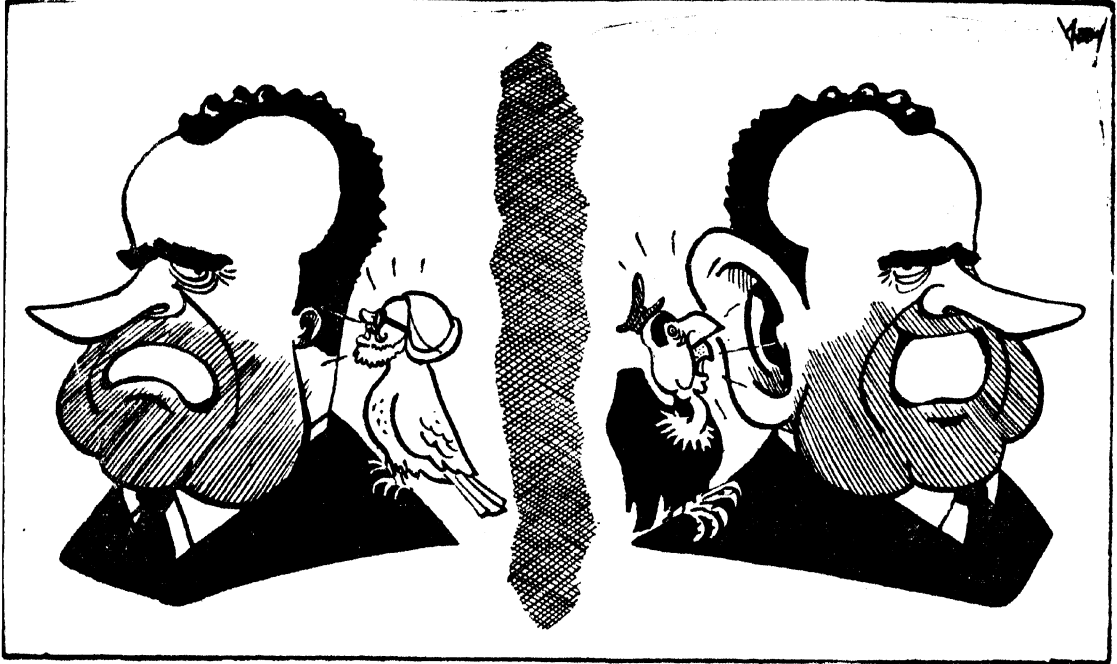
ল রে" নীতি মানিয়ে নিতে পারবেন? করল সম্পর্কে ইতিমধ্যেই প্রশ্নটা উঠেছে। দখানে পি-এস-পি দুই দিনব্যাপী এক ম্মেলনে মিলিত হয়ে সংযুক্তির প্রস্তাব মর্থন করেছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারা লের জাতীয় নেতাদের প্রতি আবেদন ানিয়েছে যে, তাঁরা যেন কেরলের "বাস্তব রিস্থিতি" বিবেচনা করে তাদের উপর মচ্যুত মেনন মন্ত্রিসভার প্রতি সমর্থন *তাহার করে নেওয়ার জন্য চাপ না দেন।* বহারেও এই ব্যাপারে চাপ দিতে গেলে প-এস-পিতে ভাঙ্গন হবে, এমন লক্ষণ *কাশ পাচ্ছে।*

* *

দিল্লীতে শাসক কংগ্রেস দলের পার্লা-ন্টারি পার্টির কার্যনির্বাহক সমিতিকে কটি নতুন ধরনের প্রশ্ন নিয়ে বিব্রত হয়ে ড়তে দেখা গেল। প্রশ্নটি হচ্ছে, শাসক ংগ্রেস মহলে কারও কারও মধ্যে আড়ম্বর-র্ণ জীবনযাপনের যে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে টা সমীচীন কিনা এবং সমীচীন না লে এই ঝোঁক বন্ধ করার জন্য কি করা য়। আলোচনায় স্থির হল যে, যেখানে াক্তন নৃপতিদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে সেখানে শাসক ংগ্রেস নেতাদের "অশোভন বৈভব প্রদর্শনী" হনীয় নয় এবং এটা বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করা দরকার। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ন্দিরা গান্ধীর প্রস্তাব অনুযায়ী নিখিল রত কংগ্রেস কমিটি বিষয়টি নিয়ে ালোচনা করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এই "অশোভন বৈভব প্রদর্শনীর" একটি চাঞ্চল্যকর নমুনা সম্প্রতি প্রকাশ াওয়ায় শাসক কংগ্রেস নেতারা বিষয়টির তি নজর না দিয়ে পারেন নি।

গত ১৭ মে তারিখে মহারাষ্ট্রের আকলুজ শহরে একটি বিয়ের ভোজসভার যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল সেটা রাজসূয় যজ্ঞকে হার মানায়। বিয়ে হচ্ছিল মহারাষ্ট্র বিধানসভার সদস্য শঙ্কররাও মোহিতের ছেলে বিজয় সিং ও মেয়ে রত্নার। শ্রীমোহিতে সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তিনি দুটি সমবায় চিনি কলের পরিচালক (একটি যশোবন্তরাও চ্যবনের *নামে "যশোবন্ত সুগার মিল" বলে* পরিচিত) এবং একটি সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত আছেন। *এহেন ব্যক্তির পরিবারের বিবাহ অনুষ্ঠানে* জাঁক-জমক হবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু ১৭ মে তারিখে আকলুজে যে কাণ্ড হয়েছে সেরকম কান্ড আগেকার দিনের রাজ-রাজড়ার পরিবারের বিবাহ অনুষ্ঠানে ভিন্ন যে হতে পারে তা কল্পনাই করা যায় না। এই ভোজসভায় এক লক্ষ লোক যোগ দিয়েছিলন, না, দেড় লক্ষ লোক পাতা পেড়ে-ছিলেন সেটা ঠিক বলা যাচ্ছে না, তবে দেড় লাখের বেশী লোক হয়ে থাকলে আশ্চর্যের কিছু নেই। এই বিয়ের রান্নায় ২৭ হাজার টাকা দামের ঘি, দুই হাজার কিলো আলু ও এক হাজার কিলো বেগুন লেগেছিল। ১২ ফুট ব্যাসের চারটি কড়াতে হালুয়া, ঐ ধরনের আরও নয়টি কড়াতে আমটি (মশলা দেওয়া ডাল) ও তরকারি রান্না হয়েছিল। ছয়টি পৃথক পৃথক খাওয়াবার জায়গা করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি খাওয়ার জায়গার সঙ্গে পাকশালার টেলি-ফোন যোগাযোগ ছিল। ট্রেলার লাগান গাড়ী করে পাকশালা থেকে ভোজ্যদ্রব্য নিয়ে আসার ব্যবস্থা ছিল।

এই বিয়েতে যেসব উপহার দেওয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে ছিল একটি অ্যাম্বাসেডর, একটি ফিয়াট ও একটি জীপ গাড়ী, একাধিক স্টীলের আলমারি, দুটি রেফ্রিজারেটর ও পাঁচশটি সোনার আংটি (কোনটির ওজন ১০ গ্রামের কম নয়)।

শোলাপুর থেকে অতিথিদের নিয়ে আসার জন্য ৭০০ বাস ও ট্রাক রাখা হয়েছিল। বোম্বাই, পুণা, শোলাপুর প্রভৃতি *শহর থেকে ১১টি ব্যান্ড পার্টি আনা হয়ে-*ছিল। রোশনাইয়ের জন্য হাজার পাঁচেক টিউব লাইট ও লাখ দেড়েক বাল্ব ব্যবহার করা হয়েছিল। আলোকিত তোরণের সংখ্যা ছিল ৫২। এই রোশনাইয়ে বিদ্যুৎ যোগানোর জন্য আশেপাশে সমস্ত এলাকায় বিজলী সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছিল। কতকগুলি পুকুর থেকে বরফজল নিয়ে আসার জন্য নতুন পাইপ বসান হয়েছিল। এই এলাহি ব্যাপার সংগঠন করার জন্য ২৭টি কমিটি গঠন করা হয়েছিল, কমিটি-গুলির কাজ পুস্তিকার আকারে ছাপিয়ে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল এবং ঐ অঞ্চলের প্রায় সমস্ত সমবায় কর্মীকে এই সব ব্যবস্থার তদারকিতে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

এই উপলক্ষে হাতীর মিছিল বার করারও কথা উঠেছিল, কিন্তু সমাজতন্ত্রের আদর্শের সঙ্গে বেমানান বলে প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়।

যাঁরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে-ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চ্যবন ও কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআন্নাসাহেব সিন্ধেও ছিলেন।

২৫।৬।৭১ —পুণ্ডরীক

বিশ্বাস করি

বনফুল

তোমরা বিশ্বাস কর না? আমি করি।
বিশ্বাস করি সেই চরম ধর্মাধিকরণকে
নিত্যসজাগ ন্যায়নিষ্ঠ সেই বিচারককে
যাঁর নির্ভুল বিচারের দণ্ডাজ্ঞা
কালের কষ্টিপাথরে ঝলমলিয়ে উঠেছে চিরকাল
অবিনশ্বর সুবর্ণকান্তিতে।
কোথায় সে ধর্মাধিকরণ? কোথায় সেই বিচারক?
জানি না, চোখে দেখি নি,
কিন্তু বিশ্বাস করি তাদের অমোঘ অস্তিত্বে।

অদ্ভুত নিয়ম সে ধর্মাধিকরণের।
শমন দিয়ে ডাকতে হয় না সেখানে আসামীদের।
অদৃশ্য শৃঙ্খলের অনিবার্য আকর্ষণে
নিজেরাই এসে হাজির হয় তারা।
এসে আস্ফালন করে তাদের রাক্ষস-মূর্তি,
বিস্ফারিত করে তাদের ঘূর্ণিত লোচন।
তাদের বক্র কুটিল নখ চঞ্চুতে
আর রক্তাক্ত দন্তের বীভৎসায়
প্রকাশ পায় তাদের স্বরূপ।

সেখানে ফরিয়াদী স্বয়ং ভগবান।
তিনি বলেন না কিছু,
দেখিয়ে দেন শুধু।

অসংখ্য ঘর পুড়ছে,
নির্মম গুলি চলছে নিরস্ত্র জনতার উপর,
ধর্ষিত হচ্ছে নারীর দল,
মায়ের বুক থেকে শিশু ছিনিয়ে হত্যা চলছে,
আর চলছে লুণ্ঠন—লুণ্ঠন—লুণ্ঠন—
আর তার সঙ্গে মিথ্যা প্রচারের হাস্যকর তাণ্ডব।
শকুনদের দেখিয়ে বলছে
ওরা শকুন নয়, বুলবুল। দোয়েল।

বিচারক দণ্ড দেন।
সে দণ্ডের ভাষা বাক্যাতীত।
শূন্যে থেকে নিক্ষিপ্ত হয় বজ্রের হুহুঙ্কৃত ভর্ৎসনা,
মুষলধারে নেমে আসে তুমুল বর্ষণের অভিশাপ,
ভূমিকম্পে ফেটে যায় চতুর্দিক,
ডুবে যায় সব সমুদ্রের ঘূর্ণিবাত্যার উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে,
উড়ে যায় সব ঝঞ্ঝার প্রবল ফুৎকারে।
সমস্ত দম্ভ, সমস্ত আস্ফালন, সমস্ত লম্ফঝম্ফ
থেমে যায়, ভেঙে যায়, গুঁড়িয়ে যায়।

এ বজ্র, এ বর্ষণ, এ জলোচ্ছ্বাস
এ ভূমিকম্প, এ ঝঞ্ঝা
আমরা চর্মচক্ষে দেখতে পাই না।
অনেক দিন পরে ইতিহাসের মহাশ্মশানে দেখি
চেঙ্গিস, তৈমুর, নাদির শাহদের
এটিলা, আলেকজাণ্ডার
সীজার আর জারের দলকে,
নেপোলিয়ন, হিটলার
মুসোলিনী, তোজোদের ...।
কারো করোটি,
কারো পঞ্জরাস্থি
কারো আঙুল
কারো নখের টুকরো পড়ে আছে শুধু।
কিছুদিন পরে এও থাকবে না।
তোমরা বিশ্বাস কর না এসব?
আমি করি।

অন্ধ্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে কিছুদিন ধকে ঘোরাঘুরি করছিলুম। ভ্রমণে পা আর ন দুই হাঁটে। সঙ্গী থাকলে বেড়িয়ে ড়ানো চলে, গল্প-গুজবে সময় কাটে, ক্তু সঠিক ভ্রমণ মার খায়। বন-জঙ্গলের কে যখন শিকারীদের সঙ্গী হই, তখন তাই উদ্দীপনা পাই।

কিন্তু প্রকৃত ভ্রমণে আমি একা। আমার ধ্যে আমি—সেই আমার সঙ্গী। সে রিব্রজ্যার সহচর।

পূর্বঘাট পর্বতমালার এক এক স্থলে ক একটি নাম। কিন্তু অত নামে আমার রকার নেই। আমার ভ্রমণ ছিল সেই ঞ্চলটায় যেখানে ভেলিকোণ্ডা আর পাল-কাণ্ডা,—এই দুই পাহাড়ের শ্রেণী দক্ষিণে সে একত্র মিলেছে। 'কোণ্ডা' মানে পাহাড় লে রাখা ভাল। এর আগে পেরিয়ে সেছি নাগরী পাহাড়ের ধার—যেটার র্বসীমান্তে এক বিশাল হ্রদ—অনেকটা ল্কার মতো। কিন্তু যতই দেখি, আর্যা-র্তের পাহাড়ের সেই সজীবতা ও সজলতা নই কোথাও এদিকে। অমন যে রুক্ষ রাবল্লি তারও কোথাও কোথাও শ্যামলের শোভা ও সরসতা আছে—যেমন ধরো থম্ভারের ওদিকটায়। কিন্তু এদিকে কিছু নেই। কাঁটালতা আর পাথরের স্তূপ,—গুল্মলতার আশেপাশে বড়জোর দুচারটে গাছপালা—বাদবাকি সবটাই পাথরের জটলা। চারিদিকে যেন রুক্ষস্বভাব বর্বরতার পরিচয়।

আমি ওই সুবিশাল হ্রদকে ডানদিকে রেখে উত্তর-পশ্চিমে 'কালহস্তী' নামক এক জনপদে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। এটা চিত্তুর জেলার উত্তরাংশ। অদূরে পাহাড়ের ঠিক নিচে 'স্বর্ণমুখী' নদী, এবং তারই প্রান্তে একটি শিবমন্দির। পটভূমির সঙ্গে মানিয়ে গেছে আর দুটি মন্দির দুটি পাহাড়ের চূড়ায়।

নদী যেন ভুলেই গিয়েছিলুম। সামান্য জলের ধারা কোথাও কোথাও যে নেই তা নয়। কিন্তু নদীর জন্ম হবে কোথা থেকে? উত্তর ভারতের সেই উত্তুঙ্গ শিখরশ্রেণী কই, সেই চিরতুষারের সাম্রাজ্য কোথায়? সুতরাং এ ভূভাগে এখান-ওখান থেকে পাঁচ-সাত-দশটা ক্ষীণধারা মিলে মোটামুটি একটি নদী তৈরি হয়।

রৌদ্র প্রখরতর হচ্ছে দাক্ষিণাত্যে। শীত বলে কিছু নেই দক্ষিণাপথে। অক্টোবর-নভেম্বরে গুমোটের মধ্যে স্যাঁতসেঁতে বর্ষা, ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে ইলেকট্রিক পাখা ছাড়া কেউ হোটেলের ঘর নেয় না। ফেব্রুয়ারী-মার্চ গরম, এপ্রিল খুব গরম, মে-জুন ভয়ানক গরম—তারপর আসে গরম জলের বর্ষা! দাক্ষিণাত্যের বর্ষায় সারাদিন এবং দিনের-পর-দিন ও রাত বর্ষায় হাবুডুবু খেলেও ঠাণ্ডার অসুখ করে না।

কালহস্তী থেকে রেনিগুণ্টা। এও একটি বড় জনপদ। এদিকে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সরকারি উদ্যোগ চোখে পড়ে। কিন্তু মন্দ কি, হোক্ না রৌদ্র প্রখর, দেখতে দেখতে আরও বাইশ চব্বিশ মাইল চলে এলুম। কথা বলছিনে,—কা'র সঙ্গেই বা বলব। দেশ গাঁ ত' মোটামুটি জানি, যানবাহন ত ধরাই থাকে,—সুতরাং এ অনেকটা নিজের মনেই ভেসে যাওয়া। চোখ থাকে বাইরে, কথা বলি নিজের সঙ্গে।

এককালে তীর্থস্থানকে উপলক্ষ্য ক'রে ভ্রমণে বেরোবার রীতি প্রচলিত ছিল। সেই কারণে ভ্রমণ মানেই ছিল তীর্থভ্রমণ। সে-রীতি এখন নেই। আমাদের শিশুকালে ভাটপাড়ার সেই বৃদ্ধা গুরুমাকে দেখতুম, প্রায় প্রতিবছর তিনি বেরিয়ে পড়তেন তীর্থভ্রমণে। কলকাতার বহু স্থলে তাঁর শিষ্য ও শিষ্যা ছিল। বাইরে গিয়েও তাঁর শিষ্যসেবক জুটে যেত। কখনও শ্রীক্ষেত্র,

কখনও কামাখ্যা, কখনও চন্দ্রনাথ, কখনও রামেশ্বর, কখনও বা গয়া-কাশী-বৃন্দাবন। পায়ে হাঁটতেন বেশি, কখনও নৌকা,—নৌকায় যেতেন যখন-তখন এবং নৌকা ছাড়া তিনি কাশী যাননি,—নৈলে বদ্যিনাথ, পাগলা কালী, তারকেশ্বর—এরা ছিল সব হাতের পাঁচ। আমরা তাঁকে দেখতুম তাঁর আনাগোনার পথে। তিনি ঝুলি-পুঁটলি খুলে বসলে আমি সেগুলোর মধ্যে এক-প্রকার বিদেশ-বিভূঁয়ের বন্য গন্ধ পেতুম। সেই গন্ধে পাওয়া যেত ঘরছাড়া কি একটা অজানা পথের সন্ধান। গুরুমার বয়স যখন সত্তর পেরিয়ে গেছে আমি তখন নিতান্তই নাবালক শিশু। তাঁর চওড়া হাতের কব্জি, চওড়া মুখের চোয়ালের হাড় এবং বড় বড় দুখানা পা। তাঁর ঝোলার মধ্যে থাকত মালা-জপের পুঁটলি, একরাশি কড়ি, চন্দন কাঠ, কবিরাজি বড়ি, রুদ্রাক্ষের মালা, তিলক মাটি, পাটকরা কাঁথা, টিনের কৌটোয় মিশি ও মাজন। আরও কত কি। তামার ঘটি, পাথরবাটি ও ছোট কালো পাথরের রেকাবি, ছোট্ট একখানা পাটকরা বঁটি। দুটো পুঁটলির সব মিলিয়ে ওজন সের পনেরো। আমি তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতুম। তাঁর গায়ের রং গঙ্গাবর্ণ, চোখ কালো নয়—যেন নীলের ছায়া। তাঁর মিষ্টমধুর স্নেহ কারোকে কাছে টানত না—যেন নির্বিকার ও নির্মোহ। সে যেন ছিল মিশনারি সাহেবের ভালোবাসা।

পুরনো বালিধসা ঘরে রেড়ির তেলের আলো যখন জ্বলত মিটমিটে, গুরুমার মুখে তাঁর সর্বশেষ ভ্রমণকাহিনী সবাই মিলে শুনতুম। কবে তাঁকে কেউটে সাপ তাড়া করেছিল, কবে কোথায় তিনি পড়েছিলেন খ্যাপা শিয়ালের হাতে, গঙ্গা-সাগরের জঙ্গলে কবে মাঝরাত্রে কাছাকাছি বাঘ ডেকে যাচ্ছিল, পদ্মা পার হতে গিয়ে মাঝনদীতে কবে ঝড়-তুফান উঠেছিল কালো আকাশের মেঘের ডাকে—সে সব কাহিনী শুনতে শুনতে আমার রক্তের মধ্যে বন্ধন-শৃঙ্খলের ঝঙ্কার ঝনঝন করত। এই দরিদ্র ঘরের সজ্জার ভিতর থেকে যেন উৎপীড়িত আমার আত্মা ছুটে চলে যেত অরণ্যে পর্বতে সমুদ্রে নদীপথে এবং বিদেশের বিভিন্ন আকাশপথে। মনে হ'ত জীবনের প্রথম পাঠ যেন তুলে নিচ্ছি!

দেখতে দেখতে এসে পৌঁছলুম তিরুপতি শহরে।

এতবড় একটা শহর সৃষ্টি হয়েছে দাতব্যের উপর—এটি ঔৎসুক্য আনে। এটি সর্বপ্রকারে নির্মাণ করেছেন 'দেবস্থানম্ ট্রাস্ট'। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার এ শহরে বিশেষ হাত দেননি। অবাক হতে হয় দেবস্থানমের ক্রিয়াকলাপ দেখে। ইস্কুল, কলেজ, ইঞ্জিনীয়ারিং, বিভিন্ন অর্থকরী শিল্পপ্রতিষ্ঠান, পৌরকর্মাদি, মেয়েদের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র, বড় বড় হাসপাতাল ও প্রসূতি সদন, কৃষি কলেজ,—যা কিছু দেবস্থানমের। বিশাল এক একটা কৃষিক্ষেত্র, বড় বড় গোশালা, শাকসব্জির বড় বড় খামার, বড় বড় ধানের কল,—চারিদিকে সমাজকল্যাণ কর্মের বিপুল আয়োজন। সম্প্রতি একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলছে। মোটর-বাস রুটটি পর্যন্ত দেবস্থানমের। কয়েক লক্ষ কর্মী দেবস্থানমের বেতনভোগী। এদেশে হরতাল, ইউনিয়ন, ঘেরাও, দলগত বিরোধ, ধ্বংসাত্মক রাজনীতি, সর্বনাশা সমাজ-বিদ্বেষ—এসব এখনও কিছু নেই। অদূরে গোবিন্দরাজস্বামীর বিরাট প্রস্তরমন্দির, তারই উপযুক্ত প্রবেশপথের গোপুরম। আর কিছুদূরে এগিয়ে গেলে লক্ষ্মীর মন্দির।

প্রখর রৌদ্র এবং আমার হাতের বোঝা আমাকে স্থির থাকতে দিল না। এখন ফাল্গুন মাস, কিন্তু এ যেন বাঙলার জ্যৈষ্ঠের দুপুর। আমি গিয়ে উঠলুম তিরুমালার বাসে। তিরুমালা বা মালাই এখান থেকে পাহাড়ের পথে মাত্র চোদ্দ মাইল। অর্থাৎ তিরুপতির বাজারের উপরে পাহাড়পথ নেমে এসেছে। একেবারে হাতের কাছে।

ওইটুকু পথ, কিন্তু প্রত্যেক গাড়ির উপরে কনট্রোল ব্যবস্থা নিখুঁত। কেউ দাঁড়িয়ে যাবে না, কেউ পাদানিতে ঝুলবে না। যতগুলি সীট, ঠিক ততগুলি যাত্রী। হৃষিকেশ থেকে যেমন নরেন্দ্রনগরের পথ, যেমন আবু পাহাড় থেকে আবু রোড, যেমন শিমলা থেকে নারকান্ডা। ওইটুকু পথ যেমন প্রশস্ত, তেমন পিচঢালা মসৃণ ও চিক্কন। হেঁটে গেলে জিগ্‌জ্যাগ-পথে মাইল ছয়েক চড়াইপথ, বাসে চোদ্দ মাইল। কতটুকুই বা উঁচু, হয়ত বা হাজার চারেক ফুট। চারিদিকের পাহাড়ে কেমন যেন প্রাগৈতিহাসিক পরিবেশ। নিচের দিকটায় সামান্য সবুজের শোভা, একটু উপর দিকে উঠলেই স্বভাবের রুক্ষতা। মাঝে মাঝে কাঁটাগুল্মের ঝোপঝাড়, মাঝে মাঝে একটু-আধটু ঝিরঝিরে জলের ধারা—যেগুলো এক এক স্থলে জলের 'পুল' তৈরি করেছে। কোথাও নিভৃত বীথিকায় ডালপালা ছেয়ে কুঞ্জবনের আস্বাদ এনেছে।

দেখতে দেখতে উপরদিকের বাতাস কতকটা শীতল হয়ে এল। মোটরবাস যেখানে এসে দাঁড়াল, সেটি পাহাড়ের কোলে এক অতি বিস্তীর্ণ উপত্যকা। দূর-দূরান্তর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে যায়। এটি এক প্রসিদ্ধ মন্দিরকেন্দ্রিক শহর। একদিকে সারি সারি

আধুনিক ধরনের একতলা পাকাবাড়ি—প্রায় একই ডিজাইনে তৈরি। অপরদিকে বিশাল প্রাসাদোপম কয়েকটি অট্টালিকা। এরপর থেকে এক একটি বাগানবাড়ি। সামনে কয়েকটি দোকান ও হোটেল। বাস-স্ট্যান্ডের কাছে মস্ত জনবহুল আপিস। এখানে মাত্র তিন টাকা জমা দিলে তোমাকে একরাত্রির জন্য একটি শোবার ঘর আসবাবপত্র সমেত,—একটি রান্নাঘর ও একটি বড় স্নানাগার—ওরা দিয়ে যাবে। তার সংগে ইলেকট্রিক আলো থাকবে। এত স্বল্পমূল্যে ইদানীং ভারতের অন্য কোথাও এ ধরণের ঘর মিলবে মনে হয় না। শুধু শয়নকক্ষ নয়, একটি বসবার ঘরও তার সংলগ্ন। চারিদিকে অনাবৃত অবকাশ।

এ-সব ঘরবাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ করে চৌকিদারের দল। তাদের ওপর খোঁজখবর রাখে কর্মচারিরা। কর্মচারিদের কাজের হিসাব নেন ম্যানেজার। ম্যানেজারদের মাথার উপর কর্তৃপক্ষ। ঘুষ নেই, লাল ফিতা নেই। উমেদারি বা ঘোঁটপাকানো নেই। পথের ওপারে বড় বড় অট্টালিকাগুলিকে বলা হয় 'চৌউলট্রি' অর্থাৎ উর্দু ভাষায় সরাইখানা,—তীর্থযাত্রীর বিরামস্থল। বড় বড় তীর্থস্থানে ত্রিরাত্রি বাস করতে হয়। একালের সুবিধার জন্য করা হয়েছে অন্তত একরাত্রি। যারা কাজ-কারবারি, ব্যবসায়ী, চাকুরে, ছাত্র বা অধ্যাপক, রাজনীতিক চাঁদা আদায়ে যারা পারদর্শী, যারা পিকনিক পার্টি, যারা হুজুগে—তারা আসে কয়েকঘন্টার জন্য। এরপরে রইল তীর্থযাত্রী—তারা হাজারে হাজারে এবং কাতারে কাতারে। এখানকার যিনি উপাস্য দেবতা, যিনি তিরুমালার অধিপতি, তিনি সর্বপালক বিষ্ণু, তিনি এখানে হয়েছেন ভেঙ্কটেশ্বরস্বামী। 'স্বামী' শব্দটি দাক্ষিণাত্যে খুবই পরিচিত। যেমন রামেশ্বরমে শ্রীরামনাথস্বামী, কাঞ্চিতে যেমন শ্রীবরদারাজস্বামী, ত্রিবন্দরমে যেমন শ্রীপদ্মনাভস্বামী। প্রাচীন ইতিহাসের তিনজন মহাপুরুষ—তিনজনই ধর্মদর্শনের প্রচারক—তাঁরা সমগ্র দাক্ষিণাত্যের মনোজগতের অধিপতি। তাঁদের মধ্যে প্রথম এবং সর্বপ্রধান হলেন আচার্য শঙ্কর, দ্বিতীয় আচার্য রামানুজ, তৃতীয় আচার্য মাধব। অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ। সেই একই কথা সর্বত্র। ভিন্ন নামে সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, অন্নপূর্ণা।

নিচের দিকে তিরুপতি, পাহাড়ের পরে তিরুমালাই। ত্রি বা তিরু সর্বত্র। তিরুচি, তিরুচেন্দুর, ত্রিচুড়, তিরুনেলভেলি, ত্রিবন্দরম্, তিরুবাদি, তিরুবান্নামালাই, — আরো অনেক আছে, মনে পড়ছে না। আমাদের সংগে এদের পরিচয় কম। ভাষা ও লোকাচারে আমরা বিচ্ছিন্ন—সেজন্য সামাজিক লেন-দেন ঘটেনি, বৈবাহিক সম্পর্ক সম্ভব হয়নি। ইংরেজ আমলের আগে কেউ দাক্ষিণাত্যের মানচিত্র দেখেনি, চার-চারটে অতি সমৃদ্ধ ভাষার খোঁজ করেনি কেউ। তারা হল তামিল আর তেলেগু, কানাড়ি আর মালেয়ালম। কানাড়ি আর মালেয়ালমের বিপুল সাহিত্যের ভান্ডার কেরালা ও মহীশূরে ভ্রমণকালে যদি না দেখে আসতুম আমার ভ্রমণ থাকত অপূর্ণ। তামিল আর তেলেগু কাছাকাছি বাস করে। তাদের ঐশ্বর্য এখন সর্বভারতে অনেকটা পরিচিত।

এটুকু পরিচয়ও ঘটত না, যদি ইংরেজরা 'কালচারাল কংকোয়েস্ট' না করত। ইংরেজি ভাষা আছে বলেই দক্ষিণকে কাছে পেয়েছি। রাজস্থান গুজরাট পাঞ্জাব কাশ্মীর উত্তরপ্রদেশ আসাম—এরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকত দাক্ষিণাত্যের থেকে—ইংরেজি যদি না থাকত। ওই ইংরেজি ধরেই দাক্ষিণাত্য যুক্ত থাকতে চায় বৃহত্তর ভারতের সংগে। উত্তর ভারত হিন্দি ঢোকাতে গিয়েছিল দাক্ষিণাত্যে, পশ্চিম পাকিস্তান উর্দু ঢোকাতে গিয়েছিল পূর্ববংগে—ফলাফল পরিণত হয়েছিল হলাহলে।

কপালের ঘাম শুকিয়েছিল পাহাড়ি উপত্যকার ঠান্ডা হাওয়ায়। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। আমি একা থাকতে চাই, কেউ না দোসর থাকে আমার। একা থাকলেই দেখতে পাই সর্বত্র আমি। পথে পাথরে জনপদে লোকযাত্রায় জনতার প্রতি ব্যক্তির মধ্যে সেই আমি। ঘরে বাইরে নালা নর্দমায় মন্দিরে বিগ্রহে—সেই একা আমি। আমার দোসর নেই!

চারিদিকে দেখছি মুন্ডিতমস্তক। প্রাদেশিক ভাষায় যাকে বলে নেড়া-নেড়ি। 'প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা, মরগে পাপী যথাতথা।' এ যেন সেই দক্ষিণের প্রয়াগ। কার্তিকী পূর্ণিমায় কাশীর দশাশ্বমেধঘাটে দাঁড়িয়ে দেখো, অগণ্য স্নানার্থীর নেড়া মাথা। বুঝতে বাকি থাকে না ওরা প্রয়াগ ফেরৎ। হুগলীতে তারকেশ্বরের চুল, বর্ধমানে পাগলা কালীর বালা, চিত্রকূট পাহাড়ের পায়স, কামাখ্যার নোয়া, শ্রীক্ষেত্রের লালছাড়, বদ্যিনাথের বিরখন্ডি, গয়ার গদাধরের পাদপদ্মে ফল, ঘোষপাড়ার সতীমায়ের সিঁদুর—এবং আরও আছে, কটাই বা মনে রাখি। এক এক তীর্থে এক এক বৈচিত্র্য।

তিরুমালাইয়ের মানৎ করেছ,—ফল পাবেই পাবে। তবে যদি পারো চুল দিয়ে যাও। নিঃসন্তান সন্তান পাবে, স্বামী নিরুদ্দেশ,—খুঁজে পাবে তাকে, মাইনে বাড়বে, লটারির টাকা পাবে, উকীল জজ হবে, বাণিজ্যে লক্ষ্মী বসবে, হারাধনকে ফিরে পাবে, দুশ্চরিত্র সৎ হবে, প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় পাস করবে, মামলায় জিতবে, পক্ষাঘাত ভাল হবে, ক্যানসার রোগ সারবে, শত্রুর হাত থেকে নিরাপদে থাকবে,—এবং আর যা কিছু চাও। যদি পারো চুল দিয়ে যাও।

এখান থেকে বছরে এক কোটি টাকারও বেশি চুল বিক্রি হয়। তার প্রধান খদ্দের আমেরিকা। বিদেশী মুদ্রা অনেক আসে।

ক্যানটিনের অট্টালিকার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। লাউঞ্জের সংগেই রিসেপশন। যা খাবে তার দাম দিয়ে দোতলার সেই মস্ত ডাইনিং হলে গিয়ে ওঠো। কাউন্টারে টিকিট দিয়ে খাবার নাও। ডাল ভাত রুটি পরটা তরকারি পাঁপর মোহনভোগ ইদলি সম্বর দোসা রসম্—আরো অনেক। যা খুশি চেয়ে নাও। দই পাবে, ঘোল পাবে। পাবে না মোগলাই পোলাও, পাবে না টার্কি তন্দুরে তৈরি, পাবে না কালিমুদ্দির হাতে তৈরি, কাবাব-কোপ্তা, চাচার কাটলেট, চাইনীজ চিকেন রোস্ট, বিলেতী বেকন, রাশিয়ান সাসলিক বা সোসিসকি। মাছ, মাংস, মুরগি, মদ? —নারায়ণ, নারায়ণ! পেঁয়াজ?—নারায়ণ নারায়ণ! তবে হ্যাঁ, উৎকৃষ্ট ও রুচিদায়ক রসম্-এর স্বাদে পাওয়া যায় রসুনের সুদূর আভাস। মহাকবিকে একটু উলটিয়ে বলি, সে যে মধুর কতদূর, তখনই খেয়ে কি তুমি বোঝনি ঠাকুর?

খাওয়ার মধ্যে পাই জাতি ও সম্প্রদায়কে, ভাষার মধ্যে পাই চিত্তের ঐশ্বর্যকে, পোষাকের মধ্যে পাই রুচিকে। সকলের পরনে দাক্ষিণী লুঙ্গী আর হাফ-শার্ট। লুঙ্গীর নিচে পাৎলা হাফপ্যান্ট। অধিকাংশ লোক লুঙ্গীর ঝুলটা তলা থেকে তুলে কোমরে গেরো দিয়ে বাঁধে—যাতে পায়ে হাওয়া লাগে। কুলি-মজুর, পানওলা কফিওলা, ছাত্র, অধ্যাপক, উকীল ব্যারিস্টার ডক্তার ইঞ্জিনীয়ার—ওই পোষাকে সব এক। বড় বড় ব্যাংকে, বিমানঘাটিতে, রেল স্টেশনে, সরকারি আপিসে—ওই একই কথা। গেরোটা খুলে দিলে মুহূর্তে ভদ্র হওয়া যায়। কোটপ্যান্টপরা উচ্চবর্ণ জনসমাজ নেই তা নয়, কিন্তু গরম দেশে শরীরের উপর বিভিন্ন বাঁধন ওদের সয় না। হাইকোর্টের জজ সামনে দাঁড়ালেন। মাথার পিছনে মস্ত চুলের গুচ্ছ বাঁধা, কপালে ও খালি গায়ে চন্দনলেপ, কাঁধে উড়ুনি, পরণে বেগুনি-পাড় লুঙ্গী, লুঙ্গীর নিচে লেংটি কিংবা জাঙ্গিয়া, পায়ে চটি। হাইকোর্টের জজ!

বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝখানে যে বেড়া, তার উপরে ওরা বসে নেই। ওরা পরম বিশ্বাসের উপরে দাঁড়িয়ে। ওরা বরং ভাঙবে কিন্তু মচকাবে না। হাইকোর্টের জজ বিশ্বাস করেন, মানতের ফল ফলবেই। আধুনিক বিজ্ঞান কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র পরম শ্রদ্ধার সংগে বিশ্বাস করে, মাথা ন্যাড়া করে যাওয়া তার মিথ্যা হবে না। কুমারী মেয়ে মাথার চুল কামিয়ে বিশ্বাস করে তার পতি হবে শিবচরিত্র, দেবসেনাপতি কার্তিকের মতো রূপবান হবে এবং সত্যবানের মতো প্রেমিক হবে। রাজনীতিক নেতা বিশ্বাস করেন শ্রীশ্রীভেঙ্কটেশ্বরকে পূজা করে গেলে নির্বাচনে জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী!

কে? — ছমছমে সন্ধ্যায় থমকিয়ে দাঁড়ালুম,—হুয়ারিউ?

কালো লম্বা মুন্ডিতমস্তক এক বয়স্ক যুবক হাসিমুখে সামনে দাঁড়িয়ে। পরিষ্কার

বাঙলায় প্রশ্ন করল, আপনি বাঙালী?

হ্যাঁ।—একটু খতিয়ে বললুম,—আপনাকে ঠিক—

আমি মাইশোরের। যুবকটি বলল, অনেকক্ষণ থেকে আপনাকে দেখছি। একটু আলাপ করতে ইচ্ছে হ'ল। সরকারি কাজে আমি সাত বছর পশ্চিমবঙ্গে আর আসামে কাটিয়েছি। বাঙলা শিখেছি সেইখানে।

কথায় কথায় ভদ্রলোকটির সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গেল। উনি এখানে আসেন বছরে একবার। ও'র মানৎ ফলেছে, একটি ছেলে হয়েছে! গত বছর থেকে ও'র পদোন্নতি ঘটেছে, ও'র মায়ের বিশ বছরের বাতের ব্যামো সেরেছে। পরিশেষে ও'র বোনের বিবাহ স্থির হয়ে গেছে।

এ সবই শ্রীভেঙ্কটেশ্বরস্বামীর কৃপায়। ও'র কৃপা না হলে এতদূর আসব কেমন ক'রে? ও'র কথা বললে বড়সাহেব হাসিমুখে ছুটি মঞ্জুর করেন। আমাদের জীবনের মূলে উনিই বসে আছেন! উনি আছেন তাই ত আমরা আছি! ও'র সেবাতেই ত জীবনধারণ।

আমি যেন বাকরুদ্ধ অবস্থায় এই প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মচারীটির কথাগুলি আভভূতের মতো আধঘণ্টা ধরে শুনে যাচ্ছিলুম। অবশেষে ভদ্রলোক আমাকে যেন উচিত মতো শিক্ষা দিয়ে একসময়ে চলে গেলেন। দেখতে পাচ্ছিলুম এখনো মোটর বাস আসছে একখানার পর একখানা। হুড় হুড় করে নামছে মেয়েপুরুষ। এ যেন পঙ্গপাল—এর বিরাম নেই। সকল বয়সের সকল শ্রেণীর। শুনলাম যেদিন সবচেয়ে কম, সেদিনও পঞ্চাশ হাজার। কেউ পড়ে থাকে না পথঘাটে, সব ঘরে ওঠে। থাকার জায়গা অজস্র, অসুখ বিসুখের কোনও হিড়িক নেই, ভিক্ষে করে না কেউ, ঝগড়া বিতর্ক নেই কোথাও, স্বার্থের কোথাও সংঘাত নেই। কালীঘাটে কালীপুজো আর মহাষ্টমীর ভিড় দেখেছি, প্রয়াগের কুম্ভ দেখেছি, কাশীতে অন্নকূট, বদরিকাশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন, রুক্মিণী-দ্বারকার রাসপূর্ণিমা, বাবা বৈদ্যনাথের শিবরাত্রি, বৃন্দাবনের চতুর্মাস্য, অমরনাথের যাত্রীসমারোহ, দেখেছি একে একে। কিন্তু এ দেখিনি আগে। এক লাখ লোক—আশেপাশে কোথায় যেন গা ঢাকা দিয়ে রইল। এ ইতিহাস প্রত্যহের। সকালের যাত্রী দুপুরে, দুপুরের যাত্রী সন্ধ্যায় সন্ধ্যার যাত্রী পর প্রভাতে—এইভাবে আসে আর চলে যায়। কিন্তু সকল সময় দাঁড়িয়ে থাকে ষাট-সত্তর হাজার লোক।

ক্যান্টিন ছাড়িয়ে গেলে ঢাল পথে সামনেই মন্দির। আশেপাশে বহু প্রাইভেট মোটর দাঁড়িয়ে। সামনেই মস্ত প্রবেশপথের কয়েকটা সিঁড়ি। এখান থেকেই কিউ দিতে হয়। মনে করেছিলুম সন্ধ্যার পর ভিড় থাকবে না। ভিড় নয়, লাইন। লাইন মানেই কিউ। আমরা পিপীলিকাশ্রেণীর কাছে 'কিউ' দেওয়া শিখেছি। পিঁপড়েরা কখনও কিউ ভাঙে না। কেউ ভেঙে দিলে আবার সেই কিউ ধরে। এখানে প্রথম সিঁড়ি থেকেই কিউ ধরলুম। সন্ধ্যা এখন ৭টা পনেরো।

ধর্মাকিরে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। এক পা এক পা এগোচ্ছে। কোনদিক দিয়ে কোথায় এগোচ্ছি জানার দরকার নেই। শুধু কিউ ধরে যাচ্ছি। রেলিং দিয়ে বাঁধা পথ,—যেমন রেল স্টেশনের থার্ড ক্লাস টিকিট কেনার ঝকমারি। সেখানে বিরক্ত হয়ে পিছলিয়ে চ'লে যেতে পারো, কিন্তু এখানে ধ'রে থাকতেই হবে। এবার তুমি মহাপাতক বিকুর ফাঁদে পা দিয়েছ। আর তোমার মুক্তি নেই, সোজা মোক্ষলাভ। না, আমার মনের কথা কেউ শুনছে না।

চারিদিকের অবরোধের মধ্যে এক এক পা ক'রে এগিয়ে আমি মোক্ষলাভের দিকে যাচ্ছিলুম!

না, ধৈর্য থাকা দরকার। ছিপ হাতে নিয়ে অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে জলের ধারে বসে থাকতে হয়, তবে ফাৎনা নড়ে। বকপাখিকে ধার্মিকের ভূমিকা নিতে হয়েছে মাছের লোভে। সিদ্ধার্থ ছয় বছর চোখ বুজে বসেছিলেন বুদ্ধত্বলাভের জন্য, একশ' বছর ধৈর্য ধরেছিলেন শ্রীমতী। না, ধৈর্য থাকা দরকার।

হাইকোর্টের জজ!

ভেঙ্কটেশ্বরস্বামীর ফাঁদে পা দিয়েছ।—পালাবার উপায় নেই।—এমন সরু রেলিং বাঁধা পথ! কিউ ধ'রে তোমাকে এগোতেই হবে। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় যেভাবেই যাও—এগোতেই হবে! যদি ওই সুদীর্ঘ সর্পিল এবং জিগজ্যাগের কিউ ছেড়ে পালাবার চেষ্টা পাও,—পারবে না! যদি ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, যদি চিৎকার করে বলো, ভেঙ্কটেশ্বরকে মানি না, বেদ-বেদান্ত-ধর্ম-ঈশ্বর-ইহকাল-পরকাল-তন্ত্রমন্ত্র — কোনও কিছু মানি না, আমি ধর্মদ্বেষী, ঈশ্বরবিদ্বেষী, আমি নাস্তিক,—আমাকে মুক্তি দাও, পালাবার পথ দাও—তবু তুমি বেরোতে পারবে না! ওই কিউ তোমাকে

সব দেওয়ালের গায়ে রঙীন চিত্রাবলী। যত আছে পুরাণের গল্প, যত রকমের দৈবকীর্তি, যত রূপকথা তেলেগুর, যত কাহিনী গণেশের আর শ্রীদুর্গার,—এ যেন বিরাট এক চিত্রশালা দেখতে দেখতে চলেছে হাজার হাজার মেয়েপুরুষ। এসব ছবি তোমাকে ভুলিয়ে রাখছে পাছে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তারিফ করতে করতে এগোও, সময় কাটবে। আলো জ্বলছে কক্ষের পর কক্ষে,

—একই কক্ষে তিন-চারটে পিঁপড়ের সারি।

এতক্ষণ পরে হঠাৎ সচেতন হলুম। এরা কারা? এই যাদের পিছনে পিছনে চলেছি, আর যারা আসছে আমার পিছনে পিছনে? গুজরাটি, মারাঠি, তৈলঙ্গি, কন্নাড়ি, তামিল, কেরেলি,—সকল সম্প্রদায়। ইতর সমাজ নয়। সুবেশ, সুসজ্জা, সৌজন্যশীল ভদ্র শ্রেণীর নরনারী। হাজার হাজার নেড়ামাথা একসঙ্গে এমন ক'রে দেখিনি। অগণিত সংখ্যক স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী—অধিকাংশ নেড়া। বাড়ির গিন্নি, সদ্য বিবাহিত দম্পতি, স্বাস্থ্যবতী সুকুমারী, প্রবীন বয়সের মহিলা ও পুরুষ, বড় বড় সরকারি কর্মচারী, কলেজের অধ্যাপিকা,—অনেকেই নেড়া। শান্ত, শ্রদ্ধাশীল, ভক্তিমান, হাস্যোজ্জ্বল, — সেই জনতাকে দেখলে টনক নড়ে। এ যেন অল্প পরিসরের মধ্যে বৃহত্তর দাক্ষিণাত্যকে দেখতে পাওয়া। এ সেই তারা, যারা আজও বিশ্বাসে অটল, ভক্তিতে শুচিশুদ্ধ, দেব-দ্বিজে শ্রদ্ধাবান। একই সুরে, একই লক্ষ্যে একই ভাবনায় সব বাঁধা। ওই হাজার হাজার কাতারের মধ্যে আমি যেন একা। আমি চটুল, সংশয়াচ্ছন্ন, বিশ্বাসের ওপর আমার নির্ভরতা নেই, অবিশ্বাসবাদের ওপরেও আমার জোর নেই—শুধু যুক্তিবাদের জটিলতার মধ্যে আমি কিলবিল করছি। আমার ভাবাশ্রয় নেই, আমার ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, আমার সূচাগ্র চৈতন্যবিন্দু মহাকাশের ভিতর দিয়ে সূর্যবিম্ব পিছনে ফেলে অগ্নিদেবতার দিকে ধাবিত হচ্ছে না! আমি নিরুপায় অসহায় নিরাবলম্ব!

এরপর রেলিং ধরে যেতে যেতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে উচ্চবেদীর মতো আর একটা রেলিংঘেরা নাটমন্দির। স্বর্ণমণ্ডিত নানা বৃহৎ মূর্তি, রৌপ্যমণ্ডিত বিভিন্ন আসবাবপত্র। সেখানে সর্বদিকে সোনা-রূপো আর জড়োয়ার ছড়াছড়ি। এ যেন যক্ষপুরী, স্বর্ণলঙ্কা। চারিদিকে তাকিয়ে এই বিপুল সম্পদ লক্ষ্য করে আমার সর্বভারতীয় মন কুঁকড়িয়ে আবার বাঙালী হয়ে এল। একি অন্যায়? এত সোনারুপো জড়োয়া জহরৎ পুষে রাখা কেন? এগুলো বিকিয়ে কত কাজ কারবার, কত ইনডাস্ট্রি গ'ড়ে তোলা যেতো, কত বেকারের কাজ জুটতো, কত গরীব পরিবার খেয়ে-প'রে বাঁচত! কিন্তু এসব ত' সস্তা শ্লোগান! ভারতীয় মন আমার ইচ্ছার অপেক্ষা রাখেনি। সে নিজের পথ ধরে হাজার হাজার বছর পেরিয়ে চলে এসেছে। অধ্যাত্মবাদকে কেন্দ্র ক'রে সে সঞ্চয় করেছে, সেই সঞ্চয়ের স্তূপ নৈবেদ্যস্বরূপ উৎসর্গ করেছে তার প্রাণের দেবতাকে। অহঙ্কার নেই বলেই সম্পদ হয়ে উঠেছে ঐশ্বর্য। একদা সোভিয়েট ইউনিয়নে দেখেছিলুম একটি সম্পদ সংগ্রহশালা। ক্যাথারিন-দি-গ্রেট, পীটার-দি-গ্রেট থেকে আরম্ভ ক'রে দ্বিতীয় জার নিকলাস পর্যন্ত যত হীরামুক্তা মণি মাণিক্যের সম্ভার সেই লৌহকক্ষে সংগৃহীত রয়েছে। সে-দৃশ্য দর্শককে সত্যিই বিস্ময়াহত করে। কত হাজার কোটি টাকা তাদের বর্তমান বাজার-মূল্য হতে পারে, অনুমান করা কঠিন। কিন্তু সেই কুবেরের ভাণ্ডার অধ্যাত্মবাদের দ্বারা অভিষিক্ত নয়!

অলিগলি চত্বর বেদী সংকীর্ণ-প্রশস্ত —সব রকম পথ কিউ ধ'রে পার হয়ে অবশেষে এসে পৌঁছলুম মূল মন্দিরের দরজায়। সোজা পথে হাঁটলে এই পথটুকু আসতে লাগত মিনিট তিনেক, কিউ ধ'রে আসতে লাগল দেড়ঘন্টা। এখন পৌণে ন'টা। কিউ চলবে রাত দশটা পর্যন্ত।

মূলমন্দির আগাগোড়া স্বর্ণময়। সমস্তই সোনা যেদিকে তাকাও। অদূরে মণিকোঠায় শ্রীবিষ্ণুর মূর্তি, ভিতরটা প্রায় অবরুদ্ধ, ধূপে ও দীপে, ফুলে ও চন্দনে—সমস্তটাই আচ্ছন্ন। এই মূর্তি একদিনে যারা দু'বার দর্শন করতে পেরেছে, তাদের সৌভাগ্য অন্যের ঈর্ষার বস্তু। আমার মনে হ'ল আমি নির্বোধের মতো মিনিট খানেক চেয়ে রয়েছি বিষ্ণুমূর্তির প্রতি। আমার মনে নেই ওটা এক মিনিট না একটুকরো অনন্তকাল! আমি শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করলুম, না তিনি আমাকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ ক'রে নিলেন—ঠিক বুঝতে পারলুম না। এবার ভিড়ের ভিতর থেকে বেরোবার পালা। এখন না আছে কিউ, না বা আগল। শ্রীবিষ্ণু এতক্ষণ পরে মুক্তির মধ্যে ছেড়ে দিলেন।

একস্থলে থমকিয়ে দাঁড়ালুম। সামনে ছয় ফুট উঁচু এক বিরাট ক্যাম্বিসের কলস, সেটা বাঁধা রয়েছে লোহার শিকলে। তার দুপাশে দুজন রাইফেলধারী সেপাই। ওই কলসের মধ্যে একে একে সবাই ফেলে যাচ্ছে টাকার নোট, সোনার অলঙ্কার, কেউ হীরের আংটি, কেউ খুচরো মুদ্রা, কেউ গিনি, কেউবা মুক্তার মালা। একটু অবাকই হলুম। এ ধরণের এমন বৃহৎ কলস কই আগে দেখিনি, তাও আবার অতি মজবুদ ক্যাম্বিসের। চার-পাঁচটা পূর্ণবয়স্ক মানুষ এর মধ্যে অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে। কেউ দেখতে পাচ্ছে না ভিতরে কি পরিমাণ জমেছে, শুধু হাত উঁচু করে ভিতরে প্রণামী ফেলে চলে যাও। শুনলুম মন্দিরের গেট বন্ধ হবার পর মধ্যরাত্রে এই কলস রোজ উপুড় করা হয়।

সেখান থেকে সরে গিয়ে নাটমন্দিরের পিছনে এলুম। এখানে দেবস্থানম্ ট্রাস্টের জনকয়েক বিশিষ্ট কর্মচারি কথাবার্তা বলছেন এবং তাঁদেরকে ঘিরে রয়েছে কয়েকজন সশস্ত্র দেহরক্ষী। ওঁদেরই একজনের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমি সবিনয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করলুম। সেগুলি মন্দিরের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে। শুনলুম ১৯৬৫ সালে লালবাহাদুর শাস্ত্রী চাঁদা চাইতে এলে এঁরা ১০ কেজি সোনা তাঁর হাতে দেন। সেটি নাকি যুদ্ধের চাঁদা। পরিশেষে একটি প্রশ্নের জবাবে তাঁরা বললেন, ওই কলসের মধ্যে দৈনিক প্রণামীর কালেকশন হয় কমবেশি নগদ দেড়লক্ষ টাকা!

নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলুম। গলাটা শুকিয়ে উঠেছিল। বলে কি, দৈনিক দেড়লক্ষ! কিছুদূর এসে ফিরে-ফিরে তাকাচ্ছিলুম পিছনে। মূল মন্দিরের চূড়া ও গম্বুজ সমস্তটাই নিরেট পাকা সোনা। চারিদিকের আলোয় সেটি ঝলমল করছিল।

ধরো, ব্যবস্থাটা যদি উলটিয়ে যায় একালে। ভারতের বড় বড় নামজাদা মন্দিরগুলি প্রচুর বিত্তশালী। একালে বিড়লাগোষ্ঠির অসংখ্য ধনবান মন্দির, কানপুরে যুগিলাল কমলাপতের মন্দির, কাশীর শিবালয়ের নতুন বিরাট মন্দির—এগুলি ছাড়া যত আছে ভারতের প্রাচীন মন্দির—কালীঘাট, পুরী, কামাখ্যা, রামেশ্বরম, কন্যাকুমারী, পদ্মনাভস্বামী, দ্বারকা, বদরিনাথ, অযোধ্যা, বৈদ্যনাথ—এবং আরো কত—এরা যদি সর্বপূজ্য হয়ে দরিদ্র থাকত, আর দেশের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ বিত্তশালী হয়ে উঠত—তবে কেমন হতো? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপযুক্ত অন্ন জোটেনি। কিন্তু তিনি জগৎপূজ্য! রাজকুমার সিদ্ধার্থ হয়েছিলেন সর্বহারা, যীশুখৃষ্ট অতি দরিদ্রের সন্তান,—ওঁরা জগৎপূজ্য!

প্রভাতকালে পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম নিচের দিকে দিকদিগন্তব্যাপী সমতলের শোভা। দূরে দেখা যাচ্ছে সেই স্বর্ণমুখীর সোনালি ধারা, তার এদিকে গোবিন্দরাজস্বামী ও লক্ষ্মীর মন্দির। আরও দূরে দেখা যায় চন্দ্রগিরির সেই বিশাল দুর্গ। আমি ঠিক কোনদিকে এবার অগ্রসর হব এখনো ঠিক করিনি।
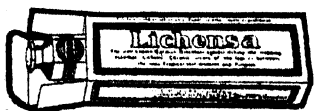
(ক্রমশঃ)

বাঙলা হেটো বই হেটো ছড়া

প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে, ভারতের যে-কোন জায়গায় বিশেষ কোন ঘটনা ঘটলে, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সেই ঘটনা নিয়ে ছোট্ট আকারের ছড়ার বই বের হোত। এই ধরনের বই সবচেয়ে বেশী ছাপা হোত কলকাতার উত্তর অঞ্চলে। অবশ্য ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা উপলক্ষে অনেকগুলি চটি বই ঢাকা থেকে বেরিয়েছিল। সাধারণতঃ কেলেঙ্কারি বা লজ্জাজনক ব্যাপার ছিল ছড়ার প্রধান বিষয়। এইসব বই কোন দোকানে পাওয়া যেত না। পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন থাকত না। বিজ্ঞাপন ছাপা হোত এই জাতীয় বই-এর মধ্যে। সেকালের একটি হেটো বই-এর (স্বদেশী চাবুক, শশিভূষণ দাস, ৯ম পর্ব) মলাটে আর একটি হেটো বই-এর ছাপা বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত হল :- 'স্বর্গের সিঁড়ি। নূতন স্বদেশী পুস্তক, স্বরাজ স্বর্গলাভ করিবার যথার্থ সিঁড়িস্বরূপ। মূল্য প্রত্যেক সংখ্যা দুই পয়সা।' ফেরিওয়ালারা এইসব বই হাটে-বাজারে, ইস্টেশনে এবং অলি-গলি ঘুরে বিক্রি করত। হাটুরে ফেরিওয়ালারা ছড়া কেটে সমাজের হাটহদ্দ প্রকাশ করত। যাকে বলে হাটের মধ্যে হাঁড়িভাঙ্গা। অনেকে এইসব ছড়ার বইকে বটতলার ছড়াও বলতেন। অবশ্য একটা কারণও এর আছে। চিৎপুর অঞ্চলের প্রকাশক অর্থাৎ যেখানকার প্রকাশনী কার্যালয় বটতলার বই বিক্রেতা বলে বহুদিন যাবৎ পরিচিত। চিৎপুর অঞ্চল থেকেও হেটো বই, হেটো ছড়া ছাপা হোত। সে কারণেই অনেকে ওই বইগুলিকে বটতলার ছড়াও বলতেন।

যখন আমাদের দেশে ছাপাখানা ছিল না, তখন পণ্ডিতেরা, টোল-চতুষ্পাঠীর ছাত্ররা এবং চিকিৎসকেরা হাতে লেখা পুঁথির সাহায্যে নানা বিদ্যার চর্চা করতেন। সেই সময় পুঁথির বড় আদর ছিল। বিদগ্ধ পণ্ডিতের মূল্যবান রচনা হাতে লিখে রাখা হোত যত্ন করে। সেইসব পুঁথি আবার অনেকে নকল করে রাখতেন। এক শ্রেণীর লোকের জীবিকাই ছিল পুঁথি নকল করা। সেই সময় অবশ্য ভাল লেখাই শুধু নকল করে রাখা হোত। কিন্তু ছাপাখানা আসবার পর সস্তা দামের বই-এ বাজার ছেয়ে গেল। অনেকে এই সুযোগে বহু বাজে বই ছাপিয়ে হাটে-বাজারে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কলকাতার অলিতে-গলিতে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের ফলে বাংলা হেটো বই ও হেটো ছড়া প্রচারিত হল বিপুলভাবে।

অধিকাংশ হেটো বই ও হেটো ছড়া অখ্যাতনামা লেখক ও কবিদের রচনা। হেটো ছড়ার কবিরা রচনাকালে সেকালের কবিওয়ালা সুলভ বাক-ভঙ্গিমা প্রকাশ করেছেন বেশীর ভাগ সময়। অনেকে মধ্যযুগের কাব্যের রীতি অনুসরণ করে প্রথমে দেব-দেবীর মহিমা ব্যক্ত করেছেন। কয়েকটি বই-এ সেকালের কবিওয়ালা-সুলভ শ্লেষ, অনুপ্রাস দেখা যায়। লেখার মধ্যে গাম্ভীর্যের অভাব। অনেকে স্থূলেতম আদিরসের বাড়াবাড়ি করেছেন। কয়েকটি হেটো ছড়ার বই-এ লেখক হাস্যরস সৃষ্টি করতে গিয়ে নোংরা রুচির পরিচয় দিয়েছেন। হয়তো এই জাতীয় হেটো ছড়ার কাব্যিক মূল্য বেশী নেই। কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সমাজের নানা অনাচারের বিরুদ্ধে, অভিনব উপায়ে প্রতি-

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাদস্বরূপ সেকালে এক শ্রেণীর কবি, প্রকাশক, এবং ফেরিওয়ালা সম্মিলিতভাবে যে অন্যায়ের প্রতিকারের চেষ্টা করেছিলেন, তার প্রমাণ এগুলি। এই কারণে হেটো বই, হেটো ছড়াগুলির বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ব্যঙ্গমূলক রচনা হিসাবে বিশিষ্ট মূল্য আছে।

অধিকাংশ বই-এর ভাষা সরল। অখ্যাতনামা কবিদের কবিত্বশক্তি নিতান্ত মন্দ ছিল না। সব মিলিয়ে চটি বইগুলি এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে হৃদয়গ্রাহী হোত। অনেকে আদালতের চাঞ্চল্যকর মামলার নথিপত্র বাংলায় অনুবাদ করে চটি বই ছাপিয়েছিলেন। কোন কোন প্রকাশক সংবাদপত্রে প্রকাশিত চমকানো সংবাদ পুনর্মুদ্রিত করে হেটো বই বার করেছিলেন (যেমন কল্কি অবতারের মোকদ্দমা, মধুসূদন চৌধুরী)। সেকালে এক শ্রেণীর অল্প পুঁজির ব্যবসায়ীদের উৎসাহে এই ধরনের হেটো বই প্রচুর ছাপা হোত। যেখানে কদর্য রুচি তাঁদের চোখে ধরা পড়তো, সেখানেই অখ্যাতনামা কবিরা ছড়ার মালা গেঁথেছিলেন। একদিকে সত্যনিষ্ঠ মানুষের জয়গান, অপরদিকে স্বার্থান্ধ, লোভী ও ক্ষমতাপরায়ণ মানুষের চক্রান্তের কথা পাঠকের সামনে তুলে ধরতেন। যেমন পেনেল প্রসঙ্গ (১৯০১ সনের নোয়াখালির মোকদ্দমা মহাত্মা পেনেলের বিচার, আবদুর রশিদ খাঁ কর্তৃক অনূদিত, সেরাজল আহাম্মদ চৌধুরী দ্বারা প্রকাশিত)। সেকালে ইংরেজ বিচারপতি পেনেলকে নিয়ে এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। বিভিন্ন সংবাদপত্রে ওই সময় প্রায় প্রতিদিন পেনেল সাহেবের সংবাদ বেরোত। পেনেল সাহেবকে নিয়ে কয়েকটি হেটো বই ও ছড়ার বই লেখা হয়।

কলকাতার ছোটখাট ছাপাখানা থেকে বাংলা বই ছাপাতে বেশী খরচ পড়ত না। প্রকাশকরা সুলভে বই ছাপিয়ে অল্প দামে বিক্রি করতেন। সস্তা বইগুলিকে বটতলার বই বলা হত। বটতলার অধিকাংশ বই ফেরিওয়ালা মারফৎ বিক্রি হোত। সেকালে ফেরিওয়ালারা বই নিয়ে পথে পথে ঘুরত। ফেরিওয়ালারা সুর করে বলত, চাই—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী, জয়দেব, অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, হাতেমতাই, তুতিনামা, ঊষাহরণ, সারদামঙ্গল, লক্ষ্মীচরিত্র, চাণক্যশ্লোক, শ্রীমতী রাধার সহস্রনাম ইত্যাদি। সেই সঙ্গে হাঁক উঠত—চাই ভোটরঙ্গ, ভাওয়ালের ষড়যন্ত্র, লক্ষ্মীর পাঁচালি, শ্রীকৃষ্ণের শতনাম, গোপালভাঁড়, বিয়েবাড়ির ছড়া, কালিদাসের হেঁয়ালি।

লং সাহেব সেকালের বাংলা বই প্রসঙ্গে লিখেছেন

(Selections from the Records of the Bengal Government. Returns relating to Publications in the Bengali Language in 1857 by the Rev. J. Long. Calcutta, 1857. Page XIV.), "Few Bengali books are sold in European shops. A person may be twenty years in Calcutta, and yet scarcely know that any Bengali books are printed by Bengalies themselves. He must visit the native part of the town and the Chitpoor road, their Pater Noster Row, to gain any information on this point. The Native presses are generally in by-lanes with little outside to attract, yet they ply a busy trade. Of late several educated natives have opened shops for the sale of Bengali works, and we know the case of one man who realizes Rupees 500 per month profit but the usual mode of sale is by HAWKERS, of whom there are more than 200 in connection with the Calcutta presses. (Many of them sell books during 8 months in the year and devote the rainy season to the cultivation of their fields). These men may be seen going through the native part of Cal-

cutta and the adjacent towns with a pyramid of books on their head. They buy the books themselves at wholesale price, and often sell them at a distance at double the price which brings them in probably 6 or 8 Rupees monthly, though we know of one man who realizes by book hawking more than 100 Rupees monthly. This system is an example to Europeans. The Natives find the best advertisement for a Bengali book is a living agent who shows the book itself. Various valuable Bengali works have been printed which have rotted on a bookseller's shelves, simply, because the agency of hawkers was not brought in to action."

জনৈক হেটো বই-হেটো ছড়ার ফেরিওয়ালার কাছে শুনেছি, প্রকাশকদের ...ছ থেকে তাঁরা একশ' ছড়ার বই একটাকা ...কে দু-টাকায় কিনে প্রতি বই বিক্রি ...তেন এক আনা দু আনায়। সেকালে ...টো ছড়ার ক্রেতা যথেষ্ট ছিল। এক ...ং জনমন্ডলীকে এই ছড়ার বই ক্ষণিক ...স্যরসে পরিতৃপ্ত করত। ক্ষুদ্র চটি ...গুলিকে সাধারণ মানুষ তুচ্ছ জ্ঞান করত না। সেকালে জনসাধারণের মনে দাগ কাটতো। একটি হেটো বই-এর (কোৎকা বা কলির মহাভারত, ১ম পর্ব, শিশিরকুমার সেন) ভেতরে বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, "কোৎকা ২য় পর্ব ১২ হাজার ছাপা হইল। কোৎকা বিক্রয়ে হকারগণের প্রচুর লাভ বেজায় সুবিধা। হকারদের নাম রেজেষ্টারী হইতেছে। রেজেষ্টারী করা হকার ছাড়া অপর কাহাকেও দেওয়া হইবে না।"

সেকালে আর একটি হেটো বই (স্বদেশীচাবুক, শশিভূষণ দাস, ১ম পর্ব) যথেষ্ট নাম করেছিল। বই-এর বিজ্ঞাপনে প্রচার করা হয়েছিল, "ইহার পাইকারী দর—একত্র ৬ খানা বা তদাধিক লইলে শতকরা ২০৲ টাকা কমিশন। এককালীন একশত খানি 'চাবুক' লইলে ৬৲ টাকায় পাইবেন।"

এই হেটো বই-এর একটি বিজ্ঞাপনে ছিল, "......ইহা আপামর হিন্দু-মুসলমানের জাতীয় জীবনের মহাভারত। আশা করি, ইহা বঙ্গদেশে সর্ব জাতীয় ঘরে ঘরে বিদ্যমান থাকিবে। চাবুক কোন প্রকার বিদ্রোহসূচক পুস্তিকা নহে। জাতীয় মঙ্গল সাধনের জন্য অলস দুর্বল কর্তব্যজ্ঞান শূন্য দেশবাসীর প্রতি তীব্র কষাঘাত। মরণাপন্ন দেশবাসীকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কিঞ্চিৎ উত্তেজক ঔষধ মাত্র.........."

লেখক জানিয়েছিলেন, "চাবুক এক সপ্তাহে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইতেছে, চাবুকের পাইকারী দর একশত—ডাক মাসুল সহ ৬৲ টাকা, ৫০ খানি—৩৲ টাকা।"

হেটো বই-হেটো ছড়া বহু বিষয়ে লেখা হোত। বিষয়ানুযায়ী ভাগ করে দেখা যায়—সমসামায়িক ঘটনা, নীতিতত্ত্ব, দেব-দেবী মাহাত্ম্য, স্বদেশপ্রেম এবং আখ্যানমূলক। বহু হেটো বই-এ থাকত গল্প এবং ভ্রমণকাহিনী। বিশেষ করে সমসামায়িক ঘটনাবলীর পটভূমিকায় রচিত ছড়ার জন্য বইগুলির এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে যথেষ্ট আদর ছিল। বই হাস্যপরিহাস মিশ্রিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে লেখা। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এইসব ছড়ার কোন মূল্যায়ন হয়নি। কোন পত্র-পত্রিকায়ও হেটো বই, হেটো ছড়া নিয়ে আলোচনা হয়নি। এমনকি বর্তমানে দশ-বিশটি গ্রন্থাগার খোঁজ করলে মাত্র কয়েকটি হয়তো হেটো বই-এর খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেকালে অসংখ্য বাংলা হেটো বই-হেটো ছড়া ছাপা হয়েছিল। কিন্তু সেসব বিভিন্ন ধরনের অধিকাংশ বই এখন আর পাওয়া যায় না। তার প্রধান কারণ এইসব বই সাধারণত যত্ন করে রাখা হয়নি। সেকালে এই ধরনের বহু বইতে লেখকের নাম কিম্বা প্রকাশকের নাম, ছাপাখানার ঠিকানা থাকত না। এমন অনেক বই বেরিয়েছিল, যার মধ্যে সেদিনের বহু নামকরা এবং ক্ষমতাশালী ধনী ব্যক্তি, যাদের সমাজের প্রতি মঙ্গলবোধ ছিল না, এমন সব লোকের নাম-ধাম উল্লেখ করে ছড়া লেখা হয়েছিল। সেইসব ব্যক্তিদের গোপন কথা দশের কানে পৌঁছিয়ে দেওয়াই ছিল হেটো ছড়ার উদ্দেশ্য। যেসব কথা সংবাদপত্রে লিখতে সাংবাদিকরা দ্বিধা করতেন, সেইসব কথা লিখে তিরস্কার করতে হেটো ছড়ার কবিরা সংকোচবোধ করতেন না। এই কারণেই সেকালে যারা ডুবে ডুবে জল খেত, সমাজে সমাজপতি সেজে এবং গোপনে নানা পাপ কাজে লিপ্ত থাকতো, এমন সব জাঁদরেল জীবেরা হেটো ছড়াকে সত্যি ভয় করতো।

হেটো বই ও হেটো ছড়া বর্তমানে যে একেবারে ছাপা বন্ধ হয়ে গেছে তা নয়। সম্প্রতিকালেও এই ধরনের চটি বই মাঝে মাঝে এক শ্রেণীর ফেরিওয়ালাদের হাতে দেখা যায়। কিন্তু ইদানীংকালের হেটো ছড়ার মধ্যে সেকালের কবিদের মত লেখার মুন্সীয়ানা নেই।

দেশের খাদ্য-সমস্যা প্রসঙ্গে ছড়ার একটি বই-এ আছে—

'চাকরি চাও যাও সৈন্য দলে
নয়ত কর চাষ,
ফ্যানের তলায় আরামে বসা
ছাড় সে অভিলাষ।
বাড়ির পাশের জঙ্গল কাটো
কোদাল ধর হাতে,
কোপাও মাটি, সবজি চাষের
দানা ছড়াও তাতে।'

বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে—

'বৌ জব্দ চলবে না আর
চুলের মুঠো ধরে,
শাশুড়ীদের চোখ রাঙানী
চলবে না আর ঘরে।
হাড় জ্বালানী ননদিনীর
বাক্য বিষবাণ,
কথার কামড় যয় না সহা
বি-রি করা প্রাণ।
স্বামী-শ্বশুরের অত্যাচার
জীবন ভরা জ্বালা,
সহিছে কত আমার দেশে,
অজও হিন্দুবালা।"

দেশের কালোবাজারীদের লক্ষ্য করে ফেরিওয়ালারা ছড়া কাটতো—

"কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে
দেশে হাহাকার তুলে,
আগুন পরে জিনিস বেচে
মায়া মমতা ভুলে।"

একটি ছড়ার বইতে হাসি প্রসঙ্গে জনৈক কবি লিখছেন—

"দাঁত বার হলে হয় না হাসি
দেঁতোর হাসি বলে,
ঠোঁটের কোণে দুষ্ট হাসি
বদমায়েশের দলে।
শিশুর মুখে সরল হাসি
বধুর হাসি চাপা,
বিদূষকের উচ্চ হাসি
আকাশ-বাতাস কাঁপা।"

হেটো বই—হেটো ছড়া বহু বিষয়ে লেখা হয়েছিল, যেমন—বুড়োর বিয়ে, বিবাহ-বিচ্ছেদ, ভাওয়ালের ষড়যন্ত্র, পাকুড় মামলা, ভোটরঙ্গ, পণপ্রথা বিলোপ, গুন্ডামী দমন ইত্যাদি বহু সামাজিক ঘটনা ও সমস্যা নিয়ে ছড়ার বই বেরিয়েছিল।

হেটো বই ও হেটো ছড়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সেকালে এক শ্রেণীর লেখক ও কবি মাঝে মাঝে নতুন স্বাদের উত্তেজনার বই ছাপিয়ে হাটে-বাজারে এসে দাঁড়াতেন। অনেকে নিজের পয়সায় সস্তা দরে বই ছাপাতেন। বহু কবি ও লেখক নিজের লেখা বই ছড়া কেটে, কিংবা চিৎকার করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বিক্রি করতেন। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার বিবরণ তাঁরা সাধ্যমত ছড়ার মাধ্যমে লিখে পাঠকের সামনে তুলে ধরতেন। অনেকের লেখায় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার আবেগ, অনাগতের প্রত্যাশা এবং অতীতের স্মৃতিকথা ছড়ার মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, যাঁরা অহরহ সুখ-দুঃখের কথা

নিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনধারার বিচিত্র চিত্র ছড়ায় গেঁথেছিলেন, তাঁদের অনেকেই আবার পথের চলমান জনস্রোতের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ছড়ার বই বিক্রি করতেন। গায়ে মানে না আপনি মোড়লের মত, হেটো ছড়ার কবি ও লেখকেরা সমাজের নানা বিষয় লেখার জন্য যেন লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাঁদের কেতাবকে কে ভাল বললো, আর কে মন্দ বললো, অথবা বাহবা কুড়াবার কথা সম্ভবত তাঁরা চিন্তা করতেন না।

জনসমাজের কাছে ছড়ার মালা গেঁথে পৌঁছিয়ে দেওয়াই ছিল যেন তাঁদের ব্রত। অনেকের লেখায় বহু ত্রুটি হয়তো ছিল। কিন্তু শ্লেষ ও তির্যক দৃষ্টির মারফত তাঁদের সমাজ সংস্কারের ভূমিকাটি উপেক্ষণীয় নয়।

সেকালের একটি হেটো বই-এর (স্বদেশী চাবুক, শশিভূষণ দাস) মলাটে লেখা হোত—

"মিষ্টি কথায় কাজ হল না
গোল্লায় গেছে দেশ,
'চাবুক' হাতে নিয়েছি তাই
দেখবো এবার শেষ।
বচন দিয়ে বাগ মানে না।
কানে দিয়েছি তুলো,
কিল চড়েতে সাড়া জাগে না
পিঠে বেঁধেছে কুলো।
ভারত জোড়া রেসের খেলা
মারতে হবে বাজি,
লাগাও চাবুক ফিরবে এবার
দেশের যত পাজি।"

বইটির প্রথম পর্বের একটি ব্যঙ্গোক্তি—
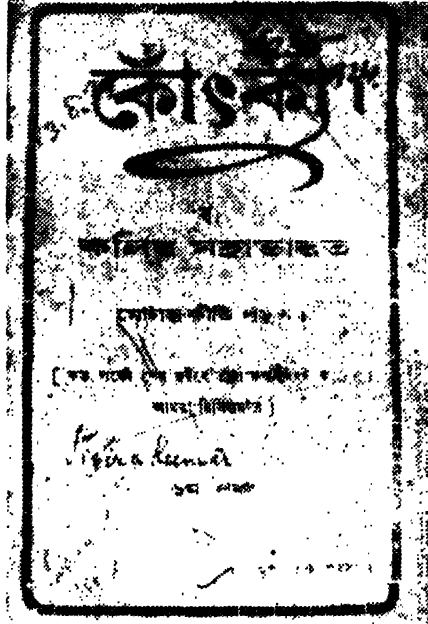
"সাদা বলে কালা
তোমায় বড় ভালবাসি,
তা' নইলে কি বিলেত ছেড়ে
তোমার দেশে আসি?
তোমায় মাথায় হাত বুলিয়ে
কত আরাম পাই,
তোমার মাথায় কাঁটাল ভেঙে
কোষ তুলে তার খাই।
সাগর পারে বাস আমাদের
দেশে আছ ছাই,
হোটেলে থাকি সারা জীবন,
নড়ন চড়ন নাই।
তোমার দেশে বাদশাগিরি—
নিজের দেশে ব্যাঙ্,
তোমার দেশে বসে খাই—
ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ্।
জোঁকের মত কামড়ে থাকি
তোমার দেশের মাটি,
পেট পুরলে সরে পড়ি
আমরা সাহেব খাঁটি।
কালা বলে তোমার গুণ
জানতে নাই বাকি,
তা হলে কি পায়ের তলায়
গোলাম হয়ে থাকি?
তোমার ভাষায় কথা বলি,
তোমার 'খানা' খাই,
তোমার পোশাক পরে আমরা
কত আরাম পাই।
তোমার কেতাব পড়ি আমরা
পুরাণ-কোরাণ ফেলে,
তোমার খেতাব পেলে আমরা
আহ্লাদে যাই গলে।
তোমার মুখের শালা বুলি
মিষ্টি লাগে কানে,
বেরাল চোখের চাউনি
তোমার বক্ষ লাগে-প্রাণে।

ড্যাম রাস্কেল স্টুপিড ফুল
আদর করে বল,
জুতোর তলায় সুখতলা আমরা,
মাড়িয়ে তুমি চল।
তুমি লাথির চোটে পিলে ফাটাও,
ব্যাগ্রে খাটাও কত,
তবু পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ি
কুকুর বেরাল মত।
তুমি ডাকলে আমরা লেজটি নাড়ি
মুখের পানে চেয়ে,
মারলে লাথি গড়ায়ে পড়ি
উলটো বাজি খেয়ে।
তোমার প্রেমের কুত্তা এমন
পাইবে কোথায়?
সাদায় কালায় পিরিতি যেমন
আদায় কাঁচ কলায়।"

এই বইটির 'নরম ও গরম' শীর্ষক লেখা—

নরম—দেখ গরম! অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। বিদেশীর সংগে পারবে কেন?

গরম—না পারি হেরে যাব, তোমাদের ত কোন ক্ষতি হবে না। তোমরা লাট হচ্ছ, মন্ত্রী হচ্ছ, দেশের লোকের ভাল মন্দ কি দেখছ? সুখে থাক তোমরা, আমরা মরতে বসেছি মরবো।

নরম—এতে কেবল দেশের অমংগল হবে।

গরম—দেশের সংবাদ কতটা রাখো—সব যে মরে উজাড় হয়ে গেল?

নরম—রোগে মরছে, বিদেশীরা কি করবে?

গরম—রোগে মরছে না, মরছে—অন্নের অভাবে। মরছে—বস্ত্রের অভাবে। মরছে—সুখ-শান্তির অভাবে। এই ত দেশের মংগল হচ্ছে? যদি মরতেই হল, তবে একবার নড়ে চড়ে মরি।

নরম—তোমরা বিদেশীর কি করবে?

গরম—কিছু করবো না—তবে তোমাদের মত তাদের 'ধামাধরা' হব না। তাদের সংগে কোন সম্পর্ক রাখবো না।

নরম—তাতে বিদেশীর কি ক্ষতি হবে?

গরম—কি ক্ষতি হবে তা তারা বুঝতে পেরেছে, তাই অনেকের মুখ শুকিয়ে অমাবস্যা হয়ে গেছে।

নরম—তোমরা যা বোঝ করগে। আমরা কিন্তু বিদেশীর সংগে সম্বন্ধ ত্যাগ করতে পারবো না।

গরম—বোনের বিয়ে বিদেশীর সংগে দিয়ো—সম্বন্ধটা আরও মোলায়েম হবে।"

'খাঁটি স্বদেশী' শীর্ষক একটি লেখায়—

'একজন নেতা পল্লীগ্রামে যাইয়া প্রচার করিতেছিলেন, ভাই সকল! তোমরা স্বদেশী হও, বিলাতী কাপড় আর পরো না।

একজন শ্রোতা বলিল, মশায়! আমরা দেশী, বিলাতী, দুই জাত কাপড় ছেড়ে চট পরতে আরম্ভ করেছি। এগুলো খাঁটি স্বদেশী।

নেতা—[illegible]

শ্রোতা—সে জন্য দু-বেলা আহার ছেড়ে এক বেলা ধরেছি।

নেতা—রোগ হলে বিলাতী ঔষধ পর্যন্ত আর খেয়ো না।

শ্রোতা—ঔষধ দূরে থাক, আমরা সাগু, মিছরী পর্যন্ত বয়কট করেছি।

নেতা—ছেলেদের ইংরাজী স্কুলে পড়ায়ো না।

শ্রোতা—পাঠশালার গুরুমশাইটির রসদ বন্ধ করে তাড়িয়ে দিয়েছি, ছেলেরা এখন লাঙ্গল ধরেছে।

নেতা—আদালতে মোকর্দমা করো না।

শ্রোতা—জমিদার-মহাজনেরা শমন দিয়েও আদালতে নিয়ে যেতে পারেনি। শেষে বিরক্ত হয়ে গরু-বাছুরগুলো কেড়ে নিয়ে গেছে। অনেকের ঘরের চাল পর্যন্ত কেটে দিয়েছে। তারা এখন খাঁটি স্বদেশী।

সহযোগিতা বর্জনের প্রচার পল্লীগ্রামে আবশ্যক নাই দেখিয়া নেতা শহরে ফিরিয়া গেলেন।"

সেকালের শিক্ষিত বেকারদের লক্ষ্য করে লেখা হয়েছিল 'গোলামখানার গাধা' নামক ছড়া (স্বদেশী চরক, শশিভূষণ দাস, ২য় পর্ব)। ছড়াটির কিছু অংশ—

'গোলামখানার বিদ্যাবাগীশ
বি-এ পাশের দল,
ভেড়ার পালের মত ফেরে
মাড়িয়ে ধরাতল।
ডংকামেরে বেরুলেন যখন
গোলামখানা থেকে,
ভড়কে উঠে পথের লোক
গরম মেজাজ দেখে।
চাপরাস এ'টে চললেন বাবু
চাকরীর উমেদার,
'মধ্যম নারায়ণ' একটি শিশি
পকেটে আছে তাঁর।
সাহেব দেখে সেলাম ঠুকে,
করেন তেল মালিশ পায়,
বলেন, চাকরী একটা দাওগো
গোরা পেট চালান দায়।"

একটি ব্যংগ ছড়া (ঐ, ৪র্থ পর্ব)—
।। বরের মাসী কনের পিসী ।।
"দুনিয়ার মাঝে জানোয়ার এক
দুকূল রেখে চলে,
তারা কখন পশু কখন পাখী
হরবোলা বুলি বলে।
তারা বাঁশবনে পালিয়ে থাকে
দিনকানার মত,
রেতের বেলায় লুকিয়ে খায়,
বুদ্ধি তাদের কত।
জন্মা পশুর দলে মিশে বলে
'তোমার দলে আছি',
পাখীর দলে নইত মোরা
ডাঁশ মশা মাছি।
অ.মরা তোমার মত লেজটি নাড়ি
গোলামখানার দ্বারে,
হুক্কা হুয়া ডাকটি ছাড়ি
দাঁড়িয়ে দীঘির পাড়ে।"

আর একটি ছড়া (ঐ, ৬ষ্ঠ পর্ব)
[illegible]
[illegible] কাণ্ড,
দেখে ব্যাঙের পায় মাথা
লুটায় চন্দ্রবোড়াসাপ।
চক্র ছিল মাথার উপর
ফণা ছিল সোজা,
বিষ দাঁতটি ভেঙ্গে দেছে
কোন দেশের এক ওঝা।
ছোবল দিতে গিয়ে
যাদুর মুখটি হল ভোঁতা,
ছুটে এল কোলা ব্যাঙ
পালিয়ে ছিল কোথা।"

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে বাঙলাদেশের কবিরা বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জন্য বহু গান ও কবিতা লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতলাল বসু, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, রজনীকান্ত প্রভৃতি বাঙলাদেশের খ্যাতনামা কবিরা দেশবাসীকে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জন্য বিভিন্ন সময়ে গান ও কবিতা লিখেছিলেন। হেটো ছড়ার কবিরাও স্বদেশের জন্য কলম ধরেছিলেন।

শোনা যায় এক সময় এই ছড়াটিও বহু গ্রামের মেয়েদের মুখে মুখে ঘুরত—
"চরকা আমার ভাতার পুত
চরকা আমার নাতি,
চরকার দৌলতে আমার
দোরে বাঁধা হাতি।"

সেকালে হেটো ছড়ার কবিরা বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জন্য বহু ছড়া লিখেছিলেন। একটি ছড়ায় (ঐ, ৯ম পর্ব) পাই—
"চালটি এবার মারলে কালা
চরকা চলন হবে,
ম্যাঞ্চেষ্টারের দফা-রফা
ভাবছে গোরা সবে।
ঘরে ঘরে চরকা ঘোরে
উঠছে মধুর তান,
চমকে উঠে বলে গোরা
জ্বলে গেল কান।
মাকু ছোটে খট্ খটাখট্,
তাঁত চলেছে দেশে,
গোরা বলে—ওগো কালা
রুটি মারলে শেষে?"

হেটো ছড়ার কবিরা বহু সামাজিক বিষয় নিয়ে ছড়া লিখেছেন। যেমন কন্যাদায় শীর্ষক একটি ছড়ার (ঐ, ১০ম পর্ব) কিছু অংশ—
"মেয়ের বিয়ে উলু দিয়ে
গিন্নী বাজায় শাঁখ,
কর্তা অমনি লাফিয়ে উঠে
বলেন থাক থাক।
কিসের আমোদ গিন্নী তোমার
সর্বনাশটি হল,
বরের পণে চোদ্দপুরুষের
ভিটে বন্ধক পল।"

পণপ্রথা (ঐ, ১১শ পর্ব) প্রসংগে হেটো ছড়ার কবি লিখেছিলেন—
"ওগো সব ছেলের বাবা!
কে বেচবে ছেলে
এগিয়ে এস এবে,
নদে মেখলা দর দিয়েছে
বিশটি হাজার নেবে।"

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

সবিতার চরিত্র সম্বন্ধে অবশ্য সত্যব্রতর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সরলতার কথা মনে হলেই সত্যব্রত কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে।

সত্যব্রতর দূরসম্পর্কের এক বৌদি এসেছিলেন। খুব ভাব জমিয়ে নিয়েছিলেন সবিতার সঙ্গে। চলে যাবার সময়ে সত্যব্রতকে বললেন, বেশ মজার বৌ পেয়েছ তো ঠাকুরপো।

বলেই ঠোঁট টিপে হাসলেন।

সত্যব্রতর সদাই ভয়—এই বুঝি তার গ্রাম্য বধূটির আচার-আচরণ নিয়ে কেউ কিছু মনে করল।

তাই ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—কেন? মজাটা কিসে দেখলে?

বৌদি স্বভাবসুলভ হাসি হেসে বললেন, বেশ সহজ সরল মন।

সত্যব্রত বুঝি মনে মনে চমকে উঠেছিল।

—কিসে বুঝলেন?

—অনেক কথাই পেট খুলে বলে গেল। তোমার কথাও বাদ গেল না অবশ্য।

—আমার কথা। খুব নিন্দে করল বুঝি?

বৌদি ঠোঁট টিপে আবার একটু হাসলেন।

—তা নিন্দে একটু করেছে বৈকি। তুমি নাকি ভয়ানক অসংযমী। আর সেই অসংযমের খেসারৎ দিতে হয়েছে বেচারিকে একমাস শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থেকে। তোমারও অবশ্য অর্থদন্ড হয়েছে।

বলতে বলতে বৌদিটি জোরে হেসে উঠেছিলেন। আর সত্যব্রতর মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল।

মনে মনে সেদিন সত্যব্রত যত না চটেছিল তার চেয়ে অবাক হয়েছিল বেশি। দাম্পত্যজীবনের এমন একটা গোপন ব্যাপারও বাইরের একজনের কাছে ফাঁস করে দিতে হয়! সবিতার এটা অকৃত্রিম সরলতা, না নিরেট মূর্খামি?

সত্যব্রতর মনে পড়ে গেল আর-এক দিনের কথা।

তখন সবে বিয়ে হয়েছে। শতকরা নিরেনব্বই জন পুরুষের মতো সত্যব্রতও নববধূকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে প্রেম-গদগদ সুরে জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি বিয়ের আগে কাউকে ভালোবেসেছিলে?

প্রশ্ন শুধু এইটুকু হলে কি উত্তর পেত বলা যায় না। কিন্তু সত্যব্রত আরো একটু জোর করেছিল। —সত্যি কথা বোলো কিন্তু।

জিজ্ঞাসা করেছিল বটে, কিন্তু উত্তর কী পাবে জানাই ছিল। সেই চিরপ্রত্যাশিত উত্তরটির মধ্যে যে শান্তি যে আনন্দ—সত্যব্রত উত্তর না পেয়েই চোখ বুজিয়ে তা উপভোগ করবার চেষ্টা করছিল।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ তো উত্তর মেলেনি।

অনেক সাধাসাধনার পর সবিতা সত্যব্রতর বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে অস্ফুট স্বরে বলেছিল—সত্যি কথাই বলব। কিন্তু তুমি রাগ করবে না বলো।

সত্যব্রত তখন একটা প্রচন্ড ধাক্কা খেয়েছে—বিস্ময়ের ধাক্কা! কী এমন সত্য-তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়বে?

তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল—না, রাগ করব না। তুমি বলো।

সবিতা সত্যব্রতর আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে বলেছিল, আমি কখনো মিথ্যে কথা বলতে পারি না। তার ওপর তুমি যখন জিজ্ঞেস করছ তখন বলি—হ্যাঁ, ভালোবাসা হয়েছিল একজনের সঙ্গে।

কোনো মেয়ে যে তার স্বামীর কাছে এমন কথা অকপটে বলতে পারে তা বিশ্বাস করা কঠিন। সত্যব্রতও তাই কথাটা ঠিক বিশ্বাস করল না। বরঞ্চ তার এমন মনে হল যে, হয়তো সবিতা রহস্য করে তার

প্রীতি ভালোবাসার কথাই ইঙ্গিত করছে। কারণ, বিয়ের আগে দুবার সে গিয়েছিল মেয়ে দেখার ছুতো করে।

তাই পরিহাস করে জিজ্ঞেস করেছিল—ভাগ্যবানটি কে জানতে পারি?

—শান্তনুদা।

এ নামটা যে কিছুতেই সত্যব্রতর কোনো ডাকনামেরও এতটুকু কাছাকাছি নয় বুদ্ধিমান সত্যব্রতর তা বুঝতে দেরি হয়নি। কিন্তু চুপ করেও থাকা যায় না। জিজ্ঞেস করলে—কোথায় নিবাস?

—আমাদের ওখানেই।

—ও পাড়াতুতো দাদা।

—ঠাট্টা কোরো না যাও।

—তা বিয়ে করলে না কেন?

সবিতা কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল। হয়তো নিজেকে সামলাচ্ছিল, কিম্বা সেই অতীত কালটাকে হাতড়াচ্ছিল। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল—সেসব অনেক কথা। সব কথা বলা যায় না।

—বলোই-না শুনি।

—রেখাও যে ওকে ভালোবাসত।

—রেখা মানে? তোমার বোন?

—হ্যাঁ। যখন জানতে পারলাম তখনই শান্তনুদার ওপর থেকে মন সরিয়ে নিলাম।

সত্যব্রত এইখানে একটু খোঁচা দিতে ছাড়েনি।

—সরিয়ে নিলাম বললেই অমনি সরিয়ে নেওয়া যায়? গায়ের চাদর নাকি?

—হ্যাঁ গো যায়। মনকে বোঝালাম, ও ছেলেমানুষ। স্নেহের পাত্র। বোনেরই উপযুক্ত। ব্যাস্। মন ঠিক হয়ে গেল।

—তা রেখার সঙ্গে বিয়ে হল না কেন?

—রেখার কথা বোলো না। আমার বোন হলে কি হবে, ও একটা বাজে ধরনের মেয়ে। মনটা বড়ো তরল। আজ এর সঙ্গে ভালোবাসা, কাল ওর সঙ্গে।

—বুঝলাম। কিন্তু তোমাদের ভালোবাসা এইখানেই ইতি?

—তা ছাড়া কি? বোনের সঙ্গে পাল্লা দেব? আমার মরণ নেই?

এরপর আর সত্যব্রতর মুখে কথা যোগায়নি। চুপ করে গিয়েছিল। সবিতাও চুপচাপ। তারপর একসময়ে সবিতা সর্বাঙ্গ দিয়ে সত্যব্রতকে জড়িয়ে আদর-ভেজা গলায় বললে, তুমি রাগ করলে না তো?

এতখানি সত্যকথার জন্যে কোনো পুরুষই প্রস্তুত হয়ে থাকে না। বরঞ্চ এমন সত্যের জন্যে রাগই হয়। তবু সত্যব্রত রাগতে পারে নি। কেননা তখনো তার ধারণা—সবিতা নিখুঁত অভিনয় করছে—তাকে রাগাচ্ছে—পরীক্ষা করছে।

সে তবু অন্ধকারের মধ্যেই একবার মুখটা লক্ষ্য করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অন্ধকারে সাদা দাঁত আর চোখের সাদাটুকু ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি।

—শান্তনুবাবু এখন কোথায়?

আবারও বুঝি পরীক্ষা!

বোকা মেয়েটা নিজেকে একটুও সামলাবার চেষ্টা না করে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল—কলকাতায়। জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন দেশে গিয়েছিলাম, দেখা হয়েছিল। আমার ঠিকানা রেখে দিয়েছে। এখানে আসবে একদিন।

সত্যব্রত ঈষৎ শ্লেষের সুরে বলেছিল—তাঁর ঠিকানা রাখ নি?

সবিতা অন্ধকার মাথা নেড়েছিল।

—সে কি! তুমি দেখা করতে যাবে না?

সবিতা যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

—তাঁরই অবশ্য উচিত ছিল তোমাকে ঠিকানা দেওয়া। যেমন আর কি তুমি দিয়েছিলে। বলে সত্যব্রত কান খাড়া করেছিল। ভেবেছিল অন্তত শেষ কথাটার প্রতিবাদ সবিতা করবে।

কিন্তু সত্যবাদী সবিতা মিথ্যে করেও প্রতিবাদ করল না। চুপ করে রইল।

কলকাতায় বাস হলেও সত্যব্রতর ফ্যামিলিটি যথেষ্ট রক্ষণশীল। আর এই জন্যেই অনেক খোঁজাখুঁজি করে কলকাতা থেকে শত মাইল দূরের একটা ছোট্ট মফঃস্বল শহর থেকে সবিতাকে আনা হয়েছিল। বড়ো শান্ত ধীর স্বভাবের মেয়ে। ঘরের বাইরের চেয়ে ভেতরের দিকেই তার আকর্ষণ বেশি। সত্যব্রতও সবিতার মতো নির্ঝঞ্ঝাট মেয়ে পেয়ে খুশী। কিন্তু একটা শুধু দোষ—বড্ড সরল। অথচ এই নিয়ে তাকে কিছু বলা যায় না। বললেই বড়ো বড়ো চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠবে। ডাগর ডাগর চোখ দুটি জলে টলটল করবে। সে যেন সত্যব্রত কিছুতেই সহ্য করতে পারে না।

আবার যখনই তার অকপট সরলতার প্রমাণবাহী মারাত্মক কোনো ঘটনা আত্মপ্রকাশ করে তখনই সত্যব্রতর মেজাজ যায় চটে। শান্তনুর আসা নিয়ে যে কান্ডটা সবিতা করল সেটা কি শুধুই সরলতা?

শান্তনু একদিন সত্যিই দেখা করতে এসেছিল। দেখা করতে এসেছিল কিন্তু যার জন্যে আসা তার দেখা পায় নি। দেখা করতে দেওয়া হয়নি। বাইরের ঘর থেকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বাবা। তাঁর পা চলে না। প্রতিদিনের মতো কোনোরকমে লাঠিতে ভর করে বাইরের ঘরে বসে কাগজ পড়ছিলেন। হেনকালে শান্তনুর আবির্ভাব।

বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন—কাকে চাই?

শান্তনু বলেছিল—সবিতার সঙ্গে দেখা করব।

বাবা বুড়োমানুষ, একটু সেকেলে। তিনি এরকম দেখাশোনা করা পছন্দ করেন না। তাই হয়তো একটু বিরক্ত হয়ে পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিলেন।

শান্তনুর নিশ্চয় উচিত ছিল একটু বিনীত নম্র হওয়া—বৃদ্ধ যে সবিতার শ্বশুর হতে পারে এমন সহজ অনুমানে একটা প্রণাম করলেও ক্ষতি ছিল না। সে যে সবিতার দেশের ছেলে এটা অন্তত জানানো উচিত ছিল আগেই। সবচেয়ে উচিত হত সবিতার খোঁজ না করে সত্যব্রতর খোঁজ করা। কিন্তু গোঁয়ারটা কিছুই করল না। সেটা তার নির্বুদ্ধিতা না অহঙ্কার কে জানে! সে নাকি শুধু একই কথা বলতে লাগল, সবিতাকে আমার নাম করুন, তাহলে ও ছুটে আসবে।

বুড়ো ব্লাডপ্রেসারের রোগী মানুষটি কিন্তু শান্তনুর কথা শুনতে চাননি। তাঁর কেমন সন্দেহ হয়েছিল। তাই সোজাসুজি দেখা হবে না বলে নিজেই ভেতরে চলে এসেছিলেন।

অভিমানী নায়ক চলে গেলেন। কিন্তু যাবার সময়ে এক কান্ড করে গেলেন। তাঁর নিজের নামঠিকানা লেখা কার্ডের পেছনে সবিতার উদ্দেশ্যে একটা ছোটখাটো চিঠি লিখে গেলেন।

কার্ড ঠিকমতোই সবিতার হাতে পেঁচেছিল। প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারেনি। তারপরেই ছুটে গিয়েছিল নীচে—পর্দা সরিয়ে একেবারে বাইরের ঘরে।

তখন সেখানে কেউ ছিল না।

এসব খবর সত্যব্রত জেনেছে অনেক পরে। বাজারে গিয়েছিল, বাজার করে ফিরে এসে রান্নাঘরে সবিতাকে না দেখে একটু অবাক হয়েছিল। শোবার ঘরে এসে দেখে বিছানায় পড়ে সবিতা ফুলে ফুলে কাঁদছে।

চমকে উঠেছিল সত্যব্রত। সবিতা কাঁদে কেন? সে তো সদাই হাসিখুশী। কথায় কথায় ওর চোখে তো জল ঝরে না। তবে কি দেশ থেকে তার কোনো অশুভ খবর এসেছে?

সত্যব্রত বারে বারে জিজ্ঞেস করল—কী হয়েছে?

শেষে সবিতা নিরুত্তরে হাতের মুঠো থেকে কার্ডখানা বের করে দিল। কার্ডখানা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। হাতের ঘামে লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। অনেক কষ্টে পাঠোদ্ধার করল সত্যব্রত। দেখা করতে এসেছিলাম। অনুমতি মিলল না। চললাম। শান্তনু।

এই ব্যাপার! তা এর জন্যে এত কান্না কেন? ঠিক জিনিসটা সত্যব্রত ধরতে পারল না। তারপর যখন দুঃখে অভিমানে অভিভূত সবিতা চোখের জলে দুই গাল ভিজিয়ে সব ব্যাপারটা বললে সত্যব্রত তখন স্তব্ধ হয়ে গেল। গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সবিতাকে বুঝিয়ে বললে, বাবা বুড়োমানুষ জানই তো একটু কনসারভেটিভ, তার ওপর ব্লাডপ্রেসারের রুগী। কী বলতে কী বলে ফেলেছেন। তুমি বাবার ওপর রাগ কোরোনা।

কিন্তু আশ্চর্য। তবু বাবার ওপর রাগ পড়ে না সবিতার। এ কি সেই সবিতা?

তখন সত্যব্রত একটা অসম্ভব অকল্পনীয় প্রস্তাব দিলে। বললে, তুমিই বরঞ্চ একদিন শান্তনুবাবুর বাড়ি গিয়ে দেখা করে এসো।

সবিতা সে কথায় একটুও খুশী হয়নি। বরঞ্চ ফুঁসে উঠে বলেছিল—ঠাট্টা করছ? আমি পথঘাট চিনি যে যাব?

অর্থাৎ কলকাতার পথঘাট চেনা থাকলে বোধ হয় যেতে আপত্তি ছিল না।

সত্যব্রত তখন কর্তব্যবোধে আর একটা বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছিল। বলেছিল তুমি যদি ইচ্ছে কর তাহলে আমিই না হয় একদিন নিয়ে যাব।

নিয়ে যাওয়া অবশ্য আর হয়ে ওঠেনি। শান্তনুর কথা আর বাড়িতে আলোচনা হয় না। সেও আর দেখা করতে আসেনি।

কিন্তু সবিতার সরলতার কথা উঠলেই সত্যব্রতর এই ঘটনার কথাও মনে পড়ে। এই সরলতা সে কোন দিক দিয়ে বিচার করবে? শান্তনুর সঙ্গে দেখা না হওয়ার দুঃখ তার ফিরে যাওয়ার লজ্জার চেয়ে যদি এতই বেশি হয়ে থাকে তাই কি সেদিন স্বামীর কাছে এমন করে প্রকাশ করা উচিত হয়েছিল?

হ্যাঁ, সেদিন বলেই কথা। নইলে আজকের ঘটনা হলে এর ওপর সত্যব্রত এতটুকুও গুরুত্ব দিত না। আজ সবিতা দুটি সন্তানের জননী। তারা ইস্কুলে পড়ছে। এখন আর সবিতা পর্দানশীন নয়। ছোটো ছেলেটিকে সে-ই ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসে। মাঝে মাঝে একাই বেরোয় কাপড়-চোপড় কেনা-কাটি করতে। দূরে কোথাও যেতে গেলেই মুশকিলে পড়ে। তবু দূরেও তো যেতে হচ্ছে।

এই যে চোখ অপারেশন করে সত্যব্রত হাসপাতালে পড়ে রয়েছে—প্রতিদিন বিকেলে এত দূরে একা একা সবিতাকেই তো আসতে হচ্ছে। সত্যব্রতের সে কী উৎকণ্ঠা! একটু দেরি হলেই ভয়—কী জানি কী হল!

প্রতিদিন যাবার সময়ে সবিতা যখন বলে যায়—আবার কাল আসব, তখন সত্যব্রত নিষেধ করে। বলে, তুমি অমন করে কথা দিয়ে যেয়ো না। হয় তো ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেল, তুমি আসতে পারলে না। এদিকে আমি মরব ভেবে ভেবে। তোমার রোজ আসার দরকার কি? আমি তো ভালোই আছি।

সবিতা হেসে উত্তর দেয়—তুমি বড্ড নার্ভাস হয়ে পড়ছ। এত ভাব কেন? কত মেয়েই তো একা চলাফেরা করছে। সবাই পথে হারাচ্ছে! আর এ রাস্তা তো আমার চেনা হয়ে গেছে।

সত্যব্রত তবু নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। বলেছে—তাছাড়া ট্রামে-বাসে যা ভিড়। ঠিক মতো হ্যান্ডেল ধরতে না পারলে, ব্যালান্স ঠিক রাখতে না পারলে—বা নামবার সময়ে যদি পাটা স্লিপ করে—

সবিতা হেসে ওঠে। সে হাসিতে সত্যব্রতর অমূলক আশংকা চাপা পড়ে যায়।

ভাবনা বাড়িতেও কম না। শ্বাশুড়ির বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয় বেড়েছে। স্বামীর জন্যে ভয় ছেলের জন্যে ভয়, নাতি দুটির জন্যে ভয়। বড় নাতি একা একা ইস্কুলে যায়। বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হলেই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এখন ছেলের চোখ অপারেশন হয়েছে। কোথায় কোন হাস-পাতালে পড়ে আছে। নিজে গিয়ে দেখে আসবেন সে ক্ষমতা নেই। কর্তার তো হাঁটা চলা বন্ধ হয়ে এসেছে। এখন ওই এক বৌমা।

সেও কলকাতার রাস্তাঘাট ভালো চেনে না। তবু রোজ বিকেলে তাকে যেতে হয়। যাবার সময়ে শাশুড়ি বার বার করে বলে দেন—সাবধানে যেয়ো বৌমা। তাড়াতাড়ি ফিরো।

সবিতা আশ্বাস দেয়—কিছু ভাববেন না মা। আমি দেখা করেই চলে আসব।

কিন্তু তাই কি আসা হয়? যে মানুষ প্রতিদিন কাছে কাছে থাকত—কথায় কথায় যার তাকে নইলে চলত না, সেই মানুষটা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে হাস-পাতালে। সেখানে আপনজন বলতে কেউ নেই, কথা বলার কেউ নেই, বই পড়বে তাও নিরুপায়। কতখানি যে নিঃসহায় তা ভাবতে গেলেও সবিতার চোখে জল আসে।

কাজেই দেখা করেই চলে আসব এ আশ্বাস শাশুড়িকে দিলেও কার্যত তা সম্ভব হয় না। হাসপাতালে থাকার শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত সে স্বামীর পাশে বসে থাকে। তারপর চলে আসার সময়ে বলে আসে—আর তিন-চারটে দিন। ব্যাস। তার পরেই বাড়ি নিয়ে যাব।

সবিতা আশ্বাস দেয়—শাশুড়িও বোঝেন। বোঝেন দেখা করেই চলে আসা যায় না। তাই একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকেন। তারপরই শুরু হয় ছটফটানি। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবতে হয় না। সন্ধ্যের আগেই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। কড়া নাড়ার একটা বিশেষ ভঙ্গি সবিতার। খুব আস্তে খুট খুট করে নাড়ে।

এ কদিনে শাশুড়ীর সেই বিশেষ ধ্বনিটুকুও অভ্যাস হয়ে গেছে। শব্দ শুনলেই বুঝতে পারেন—বৌমা ফিরেছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দেন।

—এই যে এসে পড়েছ।

তারপর একটি একটি করে প্রশ্ন ছেলের সম্বন্ধে। কেমন আছে—সারাদিন কি করে—কি খায়—মাদুলি দিয়েছিলাম পরেছে কিনা—সন্দেশ খেয়ে কি বলল।

কিন্তু একদিন বুঝি বিপদ ঘটল।

রোজকার মতো সবিতা একটা প্ল্যাস্টিকের ঝুড়িতে কমলালেবু, আপেল আরও দু-একটা টুকিটাকি জিনিস নিয়ে হাসিমুখে শাশুড়ির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সেদিন বৃহস্পতিবার! শাশুড়ির মনটা হঠাৎ কেমন খচ খচ করে উঠল। সংস্কার কি এত সহজে যায়? তবু সবিতাকে যেতে দিতে হল। জানলায় দাঁড়িয়ে রইলেন—যতদূর দেখা যায়। মনে কেবলই আজ ভয়—কি জানি কি হয়।

বেলা পড়ে এল। সন্ধ্যে হল। কিন্তু সবিতা ফিরল না কেন?

বৃদ্ধার বুকের মধ্যে কেমন করতে লাগল। এদিকে বৃদ্ধ শ্বশুরও ছটফট করছেন। বারে বারে জিজ্ঞেস করছেন—বৌমা ফিরেছে?

শাশুড়ি মাথা নাড়েন। বৃদ্ধ যেন নিজেকে বোঝাবার জন্যেই বলেন—এসে পড়বে এখনি।

—এত দেরি তো হয় না।

—ট্রামে বাসে ওঠা কি এতই সহজ মনে করছ? আমি তো বারে বারে বৌমাকে বলে দিয়েছি—খালি বাস ছাড়া উঠবে না যতই দেরি হোক।

—যদি ওদিকের বাস বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে?

—তাহলে ট্যাক্সি করে আসবে।

—টাকা পাবে কোথায়? দেখলাম তো গুনে গুনে বাস ভাড়াটা নিল।

—বুদ্ধি থাকলে সবই হয়। ট্যাক্সিকে তো আগাম ভাড়া মেটাতে হবে না। বাড়ি এসে টাকা দিয়ে দেবে।

বৃদ্ধা তবু যেন প্রবোধ মানলেন না। চিন্তিত মুখে বললেন, একা মেয়েছেলে ট্যাক্সিতে ওঠাই কি নিরাপদ? কী জানি যতই ভাবছি ততই ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। এতদিন ভালোয় ভালোয় কেটে এই শেষ দিনটিতে—

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। সেই পরিচিত শব্দ।

শাশুড়ি পড়িমরি করে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন।

সবিতা ফিরেছে। কিন্তু—কিন্তু মুখের অবস্থা দেখে থমকে গেলেন। যেন কত বড়ো ঝড় বয়ে গিয়েছে।

চোখে তখনো কেমন ভয়-ভয় চাউনি, মুখে বিবর্ণ হাসি।

—খুব বিপদ গেছে মা।

শাশুড়ি তাড়াতাড়ি বললেন, সত্য ভালোয় আছে তো?

—হ্যাঁ।

—কালই ছেড়ে দেবে তো?

—আজই ছেড়ে দিতে চাইছিল। কিন্তু আমি রাজি হইনি। টাকা-পয়সা তো কাছে ছিল না।

এতক্ষণে শাশুড়ি হাঁফ ছাড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন—তোমার কী বিপদের কথা বলছিলে? নিশ্চয় পথ ভুলেছিলে?

—না মা, ভুল বাসে উঠে পড়েছিলাম। কোথায় গন্ডগোল হচ্ছে আর অমনি যত রাজ্যের বাস ঐ রাস্তা দিয়ে চালাতে আরম্ভ করেছে। আমি বেশ আরাম করে বসে আছি। প্রায় আধঘন্টা পর খেয়াল হল—এ তো চেনা রাস্তা নয়। তখন কনডাকটরকে জিজ্ঞেস করি। বাসের লোক হাঁ হাঁ করে উঠল। বলল এ যে তেত্রিশ নম্বর বাস। সর্বনাশ। তাড়া-তাড়ি নেমে পড়লাম। কিন্তু এ কোথায় এলাম। কিছুই যে চিনি না। চারিদিকে তাকাচ্ছি এমনি সময়ে দেখি একটা কালো রং-এর মোটর আমার পাশে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ালো। আমি তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়াতে যাব কালো চশমা পরা একজন লোক আমায় জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাবেন?

আমি রাস্তার নাম বললাম।

শাশুড়ি চমকে উঠে বললেন—তুমি রাস্তার নাম ফট্ করে বলে দিলে! কী বোকা মেয়ে গা!

—শুনুন না।

তখন গাড়িতে আর একজন চশমা-চোখে লোক ছিল, সে বললে, ওদিকে তো কোনো বাস ট্রাম যাচ্ছে না, আপনি যদি ইচ্ছে করেন তাহলে উঠে আসতে পারেন। পৌঁছে দেব।

বাস চলছে না শুনে আমার তো হয়ে গেছে। এদিকে অজানা-অচেনা দুজন লোকের সঙ্গে যাওয়া—কী করব ভাবছি এমনি সময়ে একটা পুলিশের গাড়ি এসে হাজির। আর সঙ্গে সঙ্গে লোক দুটো হুস করে গাড়ি চালিয়ে উধাও।

পুলিশের একজন অফিসার নেমে এলেন। বললেন, ভাগ্যি ওঠেন নি আপনি ওদের গাড়িতে। ওরা অতি বদমায়েস লোক।

আমার হাত-পা তখন কাঁপছে।

অফিসারটি খুব ভদ্র। আমায় বললেন, কোনো ভয় নেই। আমাদের গাড়িতে উঠুন আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।

ঠিকানা বলে গাড়ি চড়ে বসলাম। যা তা গাড়ি নয় মা, একেবারে সেই কালো রংয়ের জাল দেওয়া পুলিশের ভ্যান। এ জীবনে ও-গাড়িতেও চড়ার সৌভাগ্যও হয়ে গেল।

বলে সবিতা হাসতে লাগল।

শাশুড়ি ধমক দিয়ে বললেন, তুমি হাসছ বৌমা! কত বড়ো বিপদ যে গেল—আজ আমি তখন থেকে ঠিক এমনি একটা ভয় পাচ্ছিলাম। ঠাকুর রক্ষে করেছেন।

বলে দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম জানালেন।

সত্যব্রত হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে মাত্র গতকাল।

সংসারের হাজার সমস্যার মধ্যে এই একটি নিশ্চিন্ত আরামের দিন। বাড়ির সকলের মুখেই তৃপ্তির হাসি। যেন কত বড়ো ফাঁড়া গেল।

একটা ইজিচেয়ারে সত্যব্রত শুয়েছিল। সামনে মা আর সবিতা। মা ছেলের কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হাসপাতালের গল্প শুনছিলেন। এক সময়ে বললেন, বৌমা সেদিন কিরকম বিপদে পড়েছিল শুনেছ তো?

সত্যব্রত চমকে উঠে বললে, কবে? কিছু শুনিনি তো।

মুহূর্তে সবিতার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। চোখের ইশারায় মাকে থামাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু সত্যব্রতকে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। সে প্রসংগটা চাপা দিতে দিল না।

নিরুপায় সবিতা হঠাৎ উঠে পড়ল।

মা হেসে বললেন, তুমিই বলো না ঘটনাটা। বাবাঃ শুনলেও হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়।

সবিতা একথায় কোনো উৎসাহ দেখাল না। তার যেন শাশুড়ির ওপর কেমন রাগ হল। হঠাৎ স্বামীর দিকে ফিরে বললে, তুমি চা খাবে বলছিলে না? যাই চা করি গে।

বলে পালিয়ে বাঁচল।

তিনবার উপরি উপরি চা খাবার পরও আর চা খাবার ইচ্ছে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে সত্যব্রত উচ্চারণ করেছিল কিনা তা স্পষ্ট মনে পড়ল না। তা নিয়ে মাথা ঘামাবারও ইচ্ছে হল না। সে তখন সবিতার বিপদের কাহিনী শোনার জন্য ব্যস্ত। এও স্পষ্ট বুঝতে পারল, সবিতা নিজের কোনো মারাত্মক ভুলের লজ্জা তার কাছে গোপন করার জন্যেই পালিয়ে গেল।

সত্যব্রত উত্তেজনায় ইজিচেয়ারে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলে—কবে হয়েছে ব্যাপারটা?

—এই তো পরশুদিন—তোকে দেখে বাড়ি ফেরবার পথে।...

সবিতা যখন চায়ের পেয়ালা নিয়ে ঘরে ঢুকল (একটু যেন বেশি দেরিতেই ঢুকল) তখন ঘটনার বিবরণ বিস্তৃতভাবে বলা হয়ে গেছে।

সবিতাকে দেখেই সত্যব্রত ব্যস্তবিস্ময়ে বলে উঠল—এত বড়ো ব্যাপারটা আমায় বল নি!

সবিতা গম্ভীর স্বরে বললে, কখন বলব? সবে তো কাল বাড়ি এসেছ।

এই বলে চায়ের পেয়ালাটা এগিয়ে দিল।

এমনি সময়ে পিওন চিঠি দিয়ে গেল।

—কার চিঠি?

বলে তিনজনেই এগিয়ে গেল।

চিঠি সবিতার নামে।

অবাক হয়ে সবিতা খামখানা তুলে নিল। খামটা ছিঁড়তে লাগল আর দুজনের বিস্ময়স্তব্ধ দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ হয়ে রইল।

খামটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে সবিতার কেন যে হাত কাঁপছিল তা ঠিক বোঝা গেল না। তার পর চিঠিখানা পড়তে পড়তে মুখখানা এমন বিবর্ণ হয়ে উঠল যে মনে হল ওর ভেতরে কত বড়ো একটা দুঃসংবাদ রয়েছে।

কিন্তু না, তেমন কোনো দুঃসংবাদ ছিল না। চিঠি লিখেছে শান্তনু। সংক্ষিপ্ত চিঠি।

পরশুদিন বিকেলে হঠাৎ যেন মনে হল তোমাকে দেখলাম ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখছ। নিঃসন্দেহ হতে সময় লেগেছিল। তাই যখন পথে নেমে এলাম তখন তুমি চলে গেছ। আমার বাড়িটা বোধ হয় খুঁজে পাওনি। পার্কটার পূবদিকে দোতলা বাড়ি। আর একদিন নিশ্চয় এসো। চিঠি দিয়ে এসো। অপেক্ষা করব।...

সত্যব্রত জিজ্ঞেস করলে—কার চিঠি?

সবিতা নিঃশব্দে চিঠিখানা এগিয়ে দিল।

চিঠির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই সত্যব্রত বলে উঠল—পথ হারিয়ে শান্তনুবাবুর বাড়ির কাছেই গিয়ে পড়েছিলে। আহা, একটুর জন্যে দেখা হল না। আশ্চর্য, এমন সহানুভূতির উত্তরে সবিতা একটি কথাও বলল না। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে চলে গেল।

সেই রাত্তিরে।—

সত্যব্রতর ঘুম ভেঙে গেল। দেখল সবিতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

অবাক হল। হঠাৎ এত রাত্তিরে এমন করে সবিতা কাঁদে কেন?

সত্যব্রত ধীরে ধীরে সবিতার পিঠে হাত রাখল।

সবিতা যেন এমনি একটি স্পর্শের জন্যে অপেক্ষা করে ছিল। সংগে সংগে সত্যব্রতর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল। তারপর বারে বারে সেই হাতের ওপর মুখ ঘষতে লাগল। চোখের জলে সত্যব্রতর হাতখানা ভিজে গেল।

সবিতার এ আচরণ সত্যব্রতর কাছে অপ্রত্যাশিত। তবু যেন সত্যব্রত একটু একটু করে সব বুঝতে পারল। বুঝতে পারল—সবিতার বুকে তুফান উঠেছে। গভীর অন্তস্তল থেকে বুঝি কোনো অকথিত সত্য আত্মপ্রকাশের জন্যে ছটফট করে উঠেছে। আর একটু প্রশ্রয় পেলেই সবিতার সরল মনখানা খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে। অতিক্রুর কোনো সত্য যা সে এ কদিন প্রাণপণে সাত ছলনার মধ্যে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করেছিল তা বুঝি বাধা ঠেলে বেরিয়ে আসবেই।

কিন্তু নিষ্ঠুর সত্য সহ্য করবার ক্ষমতা বুঝি সত্যব্রতর আজ আর নেই।

তাই সে সবিতার কোনো কথা শুনবে না। ও কিছু বলে ফেলার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়বে। অন্তত ঘুমিয়ে পড়ার ভান করবে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

নরমেধ যজ্ঞ

১৯৪২-এর বসন্তকালে ওয়ার শ-র উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে জার্মানরা একটি নর-মেধ-শিবির তৈরী করেছিল তার নাম ট্রেব-লিংকা'।

এই শিবির স্থাপনের উদ্দেশ্য যত বেশী সম্ভব ইহুদী নিধন, এবং এই নিধন কর্ম যথাসম্ভব দ্রুততা এবং দক্ষতার সংগে সম্পন্ন করতে হবে। ট্রেণ থেকে ইহুদীদের নামিয়ে তাদের কাপড়-চোপড় খুলে নেওয়া হত, মেয়েদের মাথা কামিয়ে দিয়ে তাদের গ্যাসের উনানে ফেলার আগে যাদের দাঁতে সোনা দেওয়া থাকত তাদের সেই দাঁতগুলি থেকে সোনা বের করে নেওয়া হত। মৃতদেহ মাটিতেও পোঁতা হত আবার পরে তুলে নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার ব্যবস্থা ছিল, যাতে কোনো রকম চিহ্ন না থাকে।

এই কাজ করানো হত ইহুদীদের দিয়ে। এই সব ইহুদীদের প্রাণটুকু সাময়িকভাবে রক্ষা পেত, এরা সংখ্যায় প্রায় এক হাজার। যে সব ইহুদী বেশ কর্মঠ এবং কাজে আগ্রহ দেখাতে পারত তাদেরই শুধু এই বিশেষ পৈশাচিক কর্মে লাগানো হত। এই সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের গাণিতিক দিকটা 'ট্রেবলিংকা' নামক গ্রন্থের লেখক জাঁ ফ্রাসোয়া স্টাইনর অসামান্য নৈপুণ্যে প্রকাশ করেছেন।

এক বৎসরের অধিক কাল ধরে ট্রেবলিং-কায় এই নরমেধ যজ্ঞ চলেছে। তার ফলে ট্রেবলিংকার মাটিতে ৭০০,০০০ দেহ (যার ওজন হবে ৩৫,০০০ টন) পোঁতা হয়েছে। এর আকার ৯০,০০০ কিউবিক-ইয়ার্ড। লেখক বলেছেন ৩৫,০০০ টন একটি যুদ্ধ জাহাজের ওজন, আর ৯০,০০০, কিউবিক ইয়ার্ডে ৩০০০ হাজার ফিট উঁচু এবং দশ হাত চওড়া তোরণ বোঝানো হয়েছে।

১৯৪৩-এর আগস্ট মাসের মধ্যে, (অর্থাৎ এই শিবির যখন ধ্বংস করা হয়) প্রায় ৮০০,০০০ নর-নারীকে হত্যা করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এক দিনেই ১৫,০০০ হাজার পর্যন্ত হত্যা হয়েছে।

কুর্ট ফ্রানৎস নামক জনৈক স্টরমট্রুপার কম্যান্ডার ছিলেন এই শিবিরের অধিনায়ক। লোকটির পরিচ্ছদ অতিশয় পরিচ্ছন্ন। তার প্রকৃতি অতিশয় ঠাণ্ডা তবে ভীষণ গম্ভীর। এই লোকটির মাথার চুল বাদামী রঙের, চোখ দুটি ফ্যাকাশে-নীল রঙের। দক্ষতার দিক থেকে লোকটির নৈপুণ্য অসামান্য। স্টাইনার বলছেন লোকটির একমাত্র লক্ষ্য ছিল—

> "to create a system that would run itself without our even having to press a button when we get up in the morning."

শিবিরটির কর্মীদল তিন ভাগে বিভক্ত। জাতিগত বিভেদ অনুসারে শিবিরের এই ভাগ করা হয়েছিল। প্রথমটিতে অভিজাত-গোষ্ঠী, ডাক্তার, দরজী, ব্যাঙ্ক কর্মী প্রভৃতি। মধ্যমশ্রেণীতে প্রায় আটশজন, এদের ওপর ভার ছিল কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখা, নবা-গতদের হিসাব রাখা আর তৃতীয় শ্রেণী ছিল দুশজন, পরে নারী কর্মীও এই দলে রাখা হয়। এদের কাজ ছিল মৃতদেহগুলি একত্রিত করে পোড়ানো।

কুর্ট ফ্রানৎস এদিকে বেশ সৌখীন। তোরণটি সর্বদা সুসজ্জিত রাখার দিকে তার নজর ছিল। ট্রেণ থেকে মালবাহক খালাসী জিনিষপত্র নামিয়ে নিত, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুর কবলে তাদের সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটত।

কুর্ট ফ্রানৎসের মুখশ্রী ছিল সুন্দর। তাই তার আদরের নাম 'লালকা'। সৌন্দর্যের দিকে তার নজর ছিল। তাই যে স্টেশনে এই সব হতভাগাদের নামানো হত সেই স্টেশনটি পত্র-পুষ্পে সজ্জিত রাখার দিকে তার নজর ছিল। যারা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে তাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা নিখুঁত। মৃত্যুপথযাত্রীদের যে ঘরটিতে এনে বসানো হত তার সাজ-সজ্জাও চমৎকার। জানলার গায়ে সুচিত্রিত পরদা ফেলা যাতে সূর্যালোক ঘরে ঢুকে অতিথিদের ক্লেশ বৃদ্ধি না করে। নরপিশাচ ফ্রানৎসের সৌন্দর্য জ্ঞানে অভিভূত না হয়ে থাকা যায় না।

লালকার সব চেয়ে বড় ত্রুটী তার সঙ্গীত-প্রিয়তা। লোকটি গান ভালোবাসত তাই প্রতি রবিবার কোনো কাজকর্ম হতনা। শিবিরের অধিবাসীদের চিত্ত বিনোদনের জন্য এই দিনটিতে নানারকম আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করা হত। গান-বাজনা ও নৃত্যে সেদিন এই মৃত্যুপুরী মুখরিত হয়ে উঠত।

লালকা ইহুদীদের নিয়ে একটা সিমফনি বা ঐকতান গোষ্ঠীর জন্য জরি দেওয়া শাদা পোষাক তৈরী করিয়েছিল এবং রিহার্সেল দেওয়ার জন্য তাদের কাজ থেকে ছুটি দেওয়া হত। মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা এবং একটি ক্যাবারেও করা হয়েছিল। স্টরম ট্রুপার ফ্রানৎস সেইসব আসরে সর্বদা উপস্থিত থাকত এবং হাততালি দিয়ে সবাইকে উৎসাহিত করত।

স্টাইনর বলেছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল ধরে ইহুদী দলন করা হয়েছে কিন্তু সেই নিধনকর্মের পিছনে কোনো পদ্ধতি ছিল না, ছিল শুধু ঘৃণা। এই ট্রেবলিংকায় সুনিপুণ পদ্ধতি ছিল এবং এতটুকু বাধা ছিল না।

কিন্তু এই জাতীয় রবিবাসরীয় উন্মাদনা ইহুদীদের এক নিদারুণ শূন্যতার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলছিল...

> "...it was no longer merely death that threatened them but nothingness...death is natural. But nothingness brings man to the edge of the abyss that was the world before the creation".

ট্রেবলিংকা এক অবিশ্বাস্য বিদ্রোহের কাহিনী। এই শিবিরবাসীরা তলদেশ থেকে উঠে পড়েছে উপরের দিকে। ইহুদীরা গ্রেনেড আর কামান বন্দুক চুরী করে ১৯৪৩-এর ২রা আগস্ট তারিখে অজস্র প্রহরীকে হত্যা করল। এই বিদ্রোহে যে হাজারখানেক ইহুদী যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে প্রায় ৬০০ বন্দী পালাতে পেরেছিল। এই ৬০০ জনের মধ্যে চল্লিশজন (রাশিয়ানরা যখন পোল্যাণ্ডকে মুক্ত করে সেই সময়) ঘটনার এক বছর পরেও বেঁচে ছিল।

স্টাইনারের এই গ্রন্থ ট্রেবলিংকার সেই দুর্ভাগ্য শিবিরবাসীদের বিদ্রোহের অবিশ্বাস্য কাহিনী। মানবিকতার আকৃতি পুনরাবিষ্কারে এরা ব্রতী হয়েছিলেন, যে মানবিকতার পরিমণ্ডল থেকে বিচ্যুত হয়ে এক পৈশাচিক বায়ুশূন্য গহ্বরে তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল সেই অন্ধকূপ থেকে নবজীবনের দিকে তারা এগিয়ে এসেছে।

যে চল্লিশজন দুর্ভাগা শিবিরবাসী শেষ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন তাঁদের সংগে সাক্ষাৎ-

কারের ভিত্তিতে জাঁ-ফ্রাঁসোয়া স্টাইনারের এই গ্রন্থটি লিখিত।

গ্রন্থটি উপন্যাসের আঙ্গিকে রচিত। কল্পিত সংলাপ এবং আত্মকথনের দ্বারা সমগ্র ছবিটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। স্টাইনার প্রশ্ন করেছেন—

"If not a single Jew resists, who will ever want to be a Jew again?"

এই প্রশ্ন আজ আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের মনেও জেগেছে। এখানে ধর্ম নয়, ভাষার ভিত্তিতে এক বর্বর সামরিক শক্তি বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এবং সেই সঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করার নিধন যজ্ঞে ব্রতী হয়েছেন এবং অদম্য সাহসে বাঙ্গালীরা পশ্চিম পাকিস্তানীর পৈশাচিক ধ্বংসলীলা প্রতিরোধ করছেন। 'ট্রেবলিংকা' পাঠ করতে বসে বার বার পূর্ব বাংলার অসহায় মানুষগুলির দুর্দশার কথা মনে জাগছে।

'ট্রেবলিংকা' একটি অসাধারণ গ্রন্থ। গ্রন্থের ভূমিকায় প্রখ্যাত ফরাসী লেখিকা মাদাম সীম দ্য ব্যুভোয়া সেই কথাই বলেছেন।

—অভয়ঙ্কর

TREBLINKA: By JEAN-FRANCOIS STEINER. Translated from French by HELEN WEAVER. Published by SIMON AND SCHUSTER: Price 5.95. Dollars.

শ্রীরামদাস প্রতিভা (সাধক জীবনী—রামকিঙ্কর দাস। 'তারাস মন্দির', রাধাকুঞ্জ, মথুরা। প্রাপ্তিস্থান : মহেশ লাইব্রেরী : ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা : ১২। ৫ টাকা।

অবধূত নিত্যানন্দ ও শচী দুলাল গৌরহরির যোগ্য 'বাহক' ও 'ধারক' বিংশ শতাব্দীর নাম-সংকীর্তন-যজ্ঞের নবউদ্গাতা শ্রীরামদাস বাবাজীর এই জীবনী গ্রন্থটি নানা তথ্যে ও তত্ত্বে পূর্ণ। দেহধারণের শুরু থেকে দেহত্যাগের শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবন ছিল নামময়। সাধক হিসাবে পরিচিতির চেয়ে গায়ক হিসেবেই প্রসিদ্ধি ছিল তাঁর বেশী। অন্তরঙ্গদের সান্নিধ্যে কখনও-কখনও নামগানের আসরে কথাপ্রসঙ্গে আলোচনায় তাঁর লোকলোচনের অন্তরালের সাধক-জীবন উদ্ঘাটিত হত। নামগানের মধ্যে ঈশ্বরারাধনা, সাধনমার্গের প্রণালী, তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের নানান প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সরল সহজ জবাব সেই সব প্রাসঙ্গিক আলোচনায় বাঙময় হয়ে উঠেছিল। তিনি শুধু নামগায়ক নন, সাধকও। বরং বলা যায় একদিক থেকে এদেশের বরণীয় সন্তদের এক স্মরণীয় ব্যতিক্রম। এক আধারে কর্ম এবং ধর্মের এমন সম্মিলন বড় বিরল। ভারতের তথা বাংলার প্রকৃত সংস্কৃতিবাহী লুপ্ত তীর্থগুলির পুনরুদ্ধার, বহু প্রাচীন মৃতপ্রায় জীর্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির পুনঃসংস্কার দ্বারা প্রাণ দান—তাঁর সাধক ও নামময় জীবনের অতুলন কীর্তি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বরাহনগর মালিপাড়ায় অবস্থিত গৌর-পদাঙ্কিত ভূমি ভাগবত আচার্যের পাটবাড়ির দৈন্যদশার কথা একদিন 'অমিয়-নিমাই-চরিত' প্রণেতা মাহাত্মা শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসীর গোচরে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। মহাত্মা শিশিরকুমারের সে খেদবাণী বৃথা যায় নি, শ্রীরামদাস বাবাজীর কানে তা পৌঁছেছিল এবং তিনি আপন কর্মপ্রতিভায় পাটবাড়িকে নবজীবন দান করেছিলেন। 'শ্রীরামদাস প্রতিভা' গ্রন্থখানি এই কর্মী-সাধকের বহু কর্মকাণ্ডের, সাধনায়, 'প্রতিভা' ও 'দানে'র অপূর্ব শুভসম্মিলনের হার্দ্য-কাহিনীতে সমৃদ্ধ। 'প্রশ্নোত্তরে শ্রীলরামদাস' অধ্যায়টিতে বিধৃত হয়েছে সাধন-ভজনের প্রণালী এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু ভক্তমনের নানান প্রশ্ন জিজ্ঞাকর সহজ সরল সদুত্তর। ধর্মানুরাগীদের কাছে এই সাধক জীবনীটি সমাদৃত হবে, সেকথা বলাই বাহুল্য।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রাম (আলোচনা)রওসন মুখতিয়ার ।। দীপায়ন, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা-৯।। দামঃ পাঁচ টাকা।।

পূর্ববাংলা এখন স্বয়ংসম্পূর্ণতার অভিমুখী। নাম নিয়েছে বাংলাদেশ। বুকভরে উচ্চারণ করার মতো একটি নাম। এখন ওখানে চলছে মুক্তির যুদ্ধ—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম—বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন। এই গ্রন্থের লেখক রওসন মুখতিয়ার প্রত্যক্ষভাবে না হলেও সেই আন্দোলনের পরোক্ষ অংশীদার। রম্য-লেখকের মতো দূর থেকে নয়, প্রকৃত সত্যের গভীরে প্রবেশ করে, তিনি এই সংগ্রামের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। এবং তুলে ধরেছেন সমস্ত ঘটনার ধারাবাহিক ইতিহাস ও তাৎপর্য।

তবু রওসন মুখতিয়ার নিছক তথ্যাশ্রয়ী লেখকও নন। তাঁর ভাষা শিল্পসম্মত। পাকিস্তান সৃষ্টির নেপথ্য-ইতিহাস থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের প্রত্যক্ষ ঘটনার বিবরণ তিনি দিয়েছেন অন্তরঙ্গ ভাষায়। মাঝে মাঝে ঘটনাবলী রহস্যোপন্যাসের মতো বিস্ময়কর মনে হয়। অথচ কোথাও তিনি ইতিহাস বিচ্যুত হয়ে একটি শব্দও ব্যবহার করেন নি। একেকটি ঘটনার সাক্ষী হয়ে এসেছেন একেকটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মানুষ—মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ, সুরাবর্দী, লিয়াকৎ আলী, আইয়ুব খাঁ, ইয়াহিয়া খাঁ। রওসন মুখতিয়ার তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেই দেখিয়েছেন, কিভাবে পূর্ববাংলার মানুষ নির্যাতিত হয়েছে, শোষিত হয়েছে এবং মুজিবরের আন্দোলনে সামিল হয়েছে।

ভাষার গুণে বইটি সাধারণ পাঠকের কাছেও সুখপাঠ্য মনে হবে।

আক্রোদিতি—পিয়ের ল্যুই। অনুবাদ—সবিতা সেনগুপ্ত। প্রকাশক : সাহিত্যশ্রী। ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। দাম : সাত টাকা।

পিয়ের লুই ফরাসী সাহিত্যের একটি স্মরণীয় নাম। তিনি বহু ভাষাবিদ ছিলেন, বিশেষত গ্রীক ভাষায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। মাত্র সাতাশ বছর বয়সে তিনি খৃষ্টপূর্বকালের আলেকজান্দ্রিয়ার জীবন-ধারার প্রাচীন রীতির আলোকে 'আক্রোদিতি' রচনা করেন। এই গ্রন্থ রচনার কালে

তিনি অজস্র প্রাচীন পুঁথিপত্র নিয়ে গবেষণা করেন। আফ্রোদিতি এক অসামান্য রূপবতী রমণী। দেবদুর্লভ সৌন্দর্যের অধিকারিণী এই রমণী অবশেষে দেহ-পসারিণী হয়ে সেকালের আলেকজান্দ্রিয়ার সমাজে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রচণ্ড ভোগবাদের কাহিনী 'আফ্রোদিতি' ক্লাসিক রচনার গৌরব অর্জন করেছে। এই গ্রন্থের অজস্র সচিত্র সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ গ্রন্থটিতেও কিছু ছবি থাকলে ভাল হত। সবিতা সেনগুপ্তের আর কোনও অনুবাদ ইতিপূর্বে নজরে পড়ে নি। কিন্তু এই দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদে তিনি যে সংযম ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য। গ্রন্থটি সুমুদ্রিত।

অন্তর্গত নদী (কাব্যগ্রন্থ)—রবীন সুর। স্বপক্ষ প্রকাশন, বরদা ব্রীজ নৈহাটি, ২৪ পরগণা। দাম : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

প্রেম, ভালবাসায় রবীন সুর যন্ত্রণাময় কবি। এবং জীবনচেতনায় নাগরিক। কলকাতা শহর ও তার রাস্তাঘাট সেজন্যেই অন্তরঙ্গভাবে উপস্থিত রয়েছে প্রতিটি কবিতার অনুষঙ্গে। আছে প্রচ্ছন্ন রোমান্টিক আর্তি ও বিষাদ, যার উত্তাপ থেকে একালের কোনো পাঠকই দূরে নন। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়েছে কবির তারুণ্য। অস্তিত্বের সংকটে দাঁড়িয়ে তিনি কখনো কখনো উচ্চারণ করেছেন তীব্রতর সংলাপ।

এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি লেখা হয়েছে ১৯৬০ থেকে ৭০ সালের মধ্যে। অর্থাৎ পুরো এক দশকের নির্বাচিত রচনার সঙ্কলন। ফর্ম, টেকনিকের কায়দাকানুনে পাঠককে চমকে দিতে না পারলেও শব্দের ব্যবহার, চিত্রকল্পের অভিনবত্বে তিনি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী।

বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ পাল।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

শুকসারী (নববর্ষ সংখ্যা ১৩৭৮)—সম্পাদক মিহির আচার্য। ১৭২।৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা—১৪। এক টাকা।

ইদানীং বাংলা ছোটগল্প নিয়ে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং হচ্ছে। ছোট গল্পকে উপজীব্য করে 'শুধু ছোট গল্প' নিয়ে কিছু-কিছু সাময়িক পত্রিকা আজও প্রকাশিত হচ্ছে। সুখ্যাত লেখক মিহির আচার্য সম্পাদনায় পরিচালনায় প্রকাশিত শুকসারী মাসিক পত্রিকাটি এই দিক দিয়ে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বক্তব্যের গভীরতায় বিষয়বস্তু বৈশিষ্ট্যে, পরিশীলিত গল্পের বলিষ্ঠ প্রকাশে এবং স্বাতন্ত্র্যধর্মী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে সাময়িক সাহিত্যে শুকসারী শুধু বিশেষ স্থান করেই নেয় নি, পাঠকদের সপ্রশংস দৃষ্টির আলোয় নন্দিত হয়েছে বারংবার। আলোচ্য নববর্ষ সংখ্যাটি তার দীপ্ত স্বাক্ষর বহন করছে। 'পঞ্চাশের গল্প' লিখেছেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল জানা আর সত্তরের জন্যে কলম ধরেছেন : বিমান চট্টোপাধ্যায়, কুমার মিত্র, পরিমল গুপ্ত, সমরেশ দাশগুপ্ত, বৈতালিক বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি গল্প অনুবাদ করেছেন সিদ্ধার্থ ঘোষ। তরুণ লেখক আবিষ্কারে এবং প্রতিভা বিকাশে শুকসারী প্রশংসনীয় ভূমিকা নিয়েছে এ জন্যে সম্পাদক অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

জীবনানন্দ (ত্রৈমাসিক)—সম্পাদক : পলাশ মিত্র। ২ কালী লেন, কলকাতা—২৬। এক টাকা।

কবিতা বিষয়ক মাসিক সাহিত্যপত্রটির 'কলকাতা' সংখ্যার জন্যে সম্পাদক 'কল্লোলিনী কলকাতা' প্রেমিকদের অজস্র ধন্যবাদে অভিনন্দিত হবেন। এক দিক থেকে এ সংখ্যাটি অভিনব। সংগ্রহপটুতায় সম্পাদক সততা আন্তরিকতা, বিচক্ষণতা ও রূপদৃষ্টির পরিচয় রেখেছেন 'জীবনানন্দে'র প্রতিটি পাতায়। 'কলকাতা'র ওপর লেখা বঙ্গবাণীর অতীতের এবং বর্তমানের যাবতীয় কবিকুলের কাব্যকণিকা এতে স্থান পেয়েছে। লিখেছেন : বিপ্রদাস পিপলাই, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, মির্জা গালিব, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রূপচাঁদ পক্ষী, মধুসূদন দত্ত, বলদেব পালিত, দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুকান্ত ভট্টাচার্য। একালের কবিদের মধ্যে আছেন : বিষ্ণু দে, সমর সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, দিনেশ দাশ, কৃষ্ণ ধর, সুশীল রায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, কল্যাণী দত্ত, মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত, শিবশম্ভু পাল, সন্তোষকুমার অধিকারী প্রমুখ। কিপলিং-এর একটি ইংরেজি কবিতা-কণিকা দিয়ে এই বিশেষ সংখ্যার কথারম্ভ। বত্রিশ পাতার এই চটি বইটি পুস্তকপ্রেমিকদের আকর্ষণীয় হবে আশা করা যায়।

জয় বাংলা (কবিতা সঙ্কলন)—সম্পাদনা : কাশীনাথ ঘোষ। সন্দীপন প্রকাশনী, চাঁপদানী, ঘোষপাড়া, বৈদ্যবাটী, হুগলী। ৫০ পয়সা।

'বাংলা দেশ' সম্পর্কীয় বিভিন্ন লেখকের লেখা কবিতা-সঙ্কলন। মফঃস্বলের পক্ষে প্রশংসনীয় প্রয়াস। এঁদের আন্তরিকতা নিখাদ।

কৃশানু (ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র)—সম্পাদক : দীনেশচন্দ্র সিংহ। ৯৪ বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা—৬। দাম : এক টাকা।

সাহিত্যে অবিচল আস্থা রেখে এদেশে যে সব পত্রিকা সিরিয়াসভাবে বঙ্গবাণীর সেবা করে যাচ্ছে তাদের মধ্যে কৃশানু উল্লেখযোগ্য। পত্রিকাটি খ্যাতনামা এবং প্রতিশ্রুতিবান তরুণদের রচনাসম্ভারে এবং বিষয়বস্তুর পরিচ্ছন্ন বিন্যাসে বিশিষ্ট। আলোচ্য সংখ্যাটি (৩য় বর্ষ : ৩য় সংখ্যা : মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭) তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর। এই সংখ্যায় বিশেষভাবে উল্লেখ্য 'বাংলাদেশ সম্পর্কীয় ক্রোড়পত্রটি'। অন্য রচনাগুলি সুনির্বাচিত এবং উপভোগ্যতার দিক দিয়ে কাঙ্ক্ষিত। এই সংখ্যায় লিখেছেন : আলাউদ্দিন আল আজাদ, তরুণ সান্যাল, দুলাল ঘোষ, রণেন মোদক, দিলীপ সেনগুপ্ত, কানাই পাকড়াশী, শুভ বসু, প্রভাসকান্তি ভদ্র, পিণাকীরঞ্জন গুহ, মদন দাশ, সুহাস চট্টোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন মিত্র, বন্দনা মিত্র, অসীমা চক্রবর্তী, বকুল ঠাকুর, রত্নেশ্বর বর্মণ ও দীনেশচন্দ্র সিংহ।

সাহিত্যসেতু (ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র)—সম্পাদক : শুভেন্দু সেনগুপ্ত। বাঁশবেড়িয়া কুণ্ডু গলি, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী। দাম : ৫০ পয়সা।

পল্লীবাংলা থেকে প্রকাশিত এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির হালে জলুষ যেন আরো বেড়েছে, শুধু প্রচ্ছদ শোভনতায় নয় নানান ধরনের আকর্ষণীয় রচনার সন্নিবেশে। কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, মিনিগল্প ছাড়াও আছে কিশোরদের এবং মহিলাদের জন্যে স্বতন্ত্র বিভাগ। এই দুটি বিভাগকে নানাভাবে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা প্রশংসনীয়। লিখেছেন : শঙ্কর দাশগুপ্ত, সম্রাট সেন, কমল সাহা, নবাগ্র দাশ, মায়া বসু, বিপ্লব সেনগুপ্ত, প্রভাসচন্দ্র পাল, বাসবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

রোশনাই (কিশোর মাসিক পত্রিকা : জয় বাংলা বিশেষ সংখ্যা : বৈশাখ ১৩৭৮)—সম্পাদিকা : গীতা দাশ। এ-১৩২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা—১২। দাম : এক টাকা।

রোশনাই ইতিমধ্যেই বাংলাভাষী কিশোর-কিশোরীদের অন্যতম প্রিয় পত্রিকা হয়ে উঠেছে। 'জয় বাংলা' সংখ্যায় 'বাংলাদেশকে এদেশের কিশোর-কিশোরীদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে সুনির্বাচিত সুলিখিত রচনাগুলির মধ্যে দিয়ে। 'বাংলা দেশের লেখা' লিখেছেন : শেখ মুজিবর রহমান, মহম্মদ সিরাজ, মাহবুব তালুকদার, নিয়ামত হোসেন, সুকুমার বড়ুয়া, সিকানদার আবু জাফর, একেলাস উদ্দীন আহমদ। 'বাংলা দেশ বিষয়ক লেখা'র জন্যে কলম ধরেছেন এদেশের সাহিত্যের সুখ্যাতেরা : খাজিমউদ্দিন আহমেদ, শিবরাম চক্রবর্তী, বীরেন্দ্রলাল ধর, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মনোজিৎ বসু, মণীন্দ্র রায়, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, শ্যামলকুমার চক্রবর্তী, আনন্দ বাগচী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সুশীল রায়, পুষ্প ব্যানার্জি শৈলশেখর মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সরল দে, উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সম্পাদিকা গীতা দাশ এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্যে শুধু কিশোর-কিশোরীদের নয়—তাদের জনক-জননীদেরও অভিনন্দন লাভ করবেন।

অঙ্গদেশের একপ্রান্তে

দুর্গাপুরের পর বাঙলার শ্যামলিমা ক্ষীণ হয়ে আসে। দিগন্ত প্রসারিত ধানের ক্ষেতের আশেপাশে কৃষ্ণচূড়ার সারি কখন শেষ হতে শুরু করে। শুরু হয় শাল কৃষ্ণচূড়ার বন্ধুর প্রান্তর। যে বন্ধুরতার শুরু আসানসোলের কাছে সেটা প্রকট হয় মধুপুরের পর থেকেই। বন্ধুর প্রান্তর ধীরে ধীরে পাহাড়ের গায়ে গিয়ে মিলে যায়। আবছা পাহাড়ের সিলওয়েট প্রত্যক্ষ হয় ধরা ছোঁওয়ার মধ্যে। ঝাঁঝা স্টেশন থেকে যেদিকেই তাকানো যায় সারিবন্ধ পাহাড়। এমনি করে কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায় জমুইতে।

উত্তরে জামালপুর, দক্ষিণে জামুই, পূবে খড়্গপুর (বাঙলাদেশের খড়্গপুর নয়) মধ্যে ত্রিভুজাকৃতি এই পাহাড়শ্রেণীই খড়্গপুর শৈলশ্রেণী। আপনার গন্তব্যস্থান এরই মধ্যে। এটাকে ঘিরে উত্তর দিয়ে গঙ্গার কোল ঘেঁষে ভাগলপুর সাহেবগঞ্জ লুপ লাইন বর্ধমান থেকে বেঁকে শান্তিনিকেতন, পাকুড় ছুঁয়ে ভাগলপুর হয়ে কিউল মিশেছে। মধুপুরে জসিডির মেইন লাইনও কিউলে এসে মিশেছে।

যেটাতে খুশী আসা যায়। লুপ লাইনে এলে কাজরা কিংবা উরেন স্টেশনে আর মেইন লাইনে জমুইতে নেমে পড়ুন। এর পরের রাস্তা দুস্তর কিন্তু দুরন্ত নয়। যদি যানের ব্যবস্থা করতে পারেন গন্তব্যস্থলে এক ঘন্টায় পৌঁছে যাবেন। যদি নিজের পা সম্বল করেন তবে পনেরো মাইল রাস্তা পেরিয়ে যাওয়া আপনার ওপর নির্ভর করবে।

কয়েক বছর আগে এপ্রিলের অনলস্রাবী এক দুরন্ত দুপুরে প্রথম গিয়েছিলাম। তারপর বহুবারই যেতে হয়েছে স্বল্পস্থায়ী সফরে। এর মধ্যে রথ দেখা আর কলা বেচার সমন্বয় করতে পারিনি। কাজের উদ্দেশ্যে যাওয়া। রথ প্রস্তুত থেকেছে দুয়ারে। কাজও শেষ—তারপরই উর্ধশ্বাসে আমাকে নিয়ে উধাও।

ভীমবাঁধ থেকে শুরু করি। মুঙ্গের থেকে যে রাস্তাটা সোজা জমুই এসেছে খড়্গপুর হয়ে সেটার মাঝামাঝি জায়গায় গাংটার মোড়। রাস্তার সফরে গাংটায় এলে আপনার একটু চা খেতে ইচ্ছে করবেই। ড্রাইভারও আঁকাবাঁকা পাহাড়ী রাস্তায় ওঠার আগে একটু নেমে নেবে। আমিও দাঁড়িয়েছিলাম। ছোট্ট চালাঘরের মধ্যে দুখানা বেঞ্চ পাতা—এটাই চা-ঘর। এখানেই আলাপ হল এ অঞ্চলের সর্বপরিচিত বাটলীবাবুর সঙ্গে। খর্বাকৃতি মানুষটি আদুল গা, হাসি-খুশী। শান্তিনিকেতনের সুরেন কর মশাইর অনুজ। ওঁর কাছেই শুনলাম সামনের রাস্তার কাহিনী। পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে-বেঁকে চলেছে রাস্তা—পাহাড়ী এই ধরনের

সুনীল সেন

রাস্তা—দু' ধারের সমতলের মধ্যিখানে একটা পাহাড় পেরিয়ে যাবার সময় ওঠানামার দরুণ 'ঘাট সেকশন' নামে পরিচিত। রাঁচী থেকে চাইবাসা, রাঁচী থেকে রামগড় যাবার পথে এই ধরনের রাস্তা দিয়ে আপনাকে যেতে হয়। খুব সতর্ক সাবধানে গাড়ী চালাতে হয়। মিনিটে মিনিটে রাস্তার দিক পরিবর্তন, অসাবধানী হলে বিপরীত দিক থেকে উল্টোমুখী গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগা বিচিত্র নয়। বাটলীবাবু বললেন, রাস্তার ধারে 'বনবিবির' স্থানে দুটো পয়সা যেন অবশ্যই দিয়ে যাই। খড়্গপুর পাহাড়ের অস্থিসন্ধি

জলপাস্থানে রাখা তারাদেবীর মূর্তি।

আমার জানা। কত অসংখ্যবার যেতে হয়েছে কাঠের ব্যবসার তাগিদে, কখনও শিকারে, কখনও শুধু ঘুরতে। ম্যাপে আর কটা উষ্ণপ্রস্রবন দেখানো আছে। পাহাড়ের প্রতিটি ফাটল থেকে এক একটা ধারা বেরিয়ে এসেছে।' শুনলাম বহুবার উনি প্রস্তাব পাঠিয়েছেন খড়্গপুরের এইসব প্রস্রবনগুলিকে কেন্দ্র করে tourist Centre করার জন্য। 'স্নান করার সুন্দর সুযোগ, জলের therapeutic value, মনোরম দৃশ্য এবং শিকারের এমন সুন্দর জঙ্গল এটা একটা চমৎকার সেন্টার হতে পারে।'

বনবিবির স্থানের কাছাকাছি প্রধান রাস্তা থেকে ছ'মাইল ভেতরে ভীমবাঁধ। পাথরের ফাটল দিয়ে উষ্ণ জলস্রোত বেরিয়ে আসছে। সিমেন্টের বাঁধানো কুন্ড—পাশে একটি বাংলো। জলের ধারা নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর একটা পাহাড়ী ছোট্ট নদীতে—দুই ধারায় মিলে স্নানের উপযোগী উষ্ণতার সৃষ্টি হয়েছে। শোনা যায় উষ্ণ এই জল বহুদিন অবিকৃত থাকে—বহু উপকারিতাও রয়েছে। শতাব্দীখানেক

ঋষ্যশৃঙ্গের মন্দিরের দেয়ালে গাঁথা গণেশ ও তারাদেবীর মূর্তি খোদাই করা পাথর।

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম

আগেও এখান থেকে জল পাঠানো হত কলকাতায়। মুঙ্গেরের ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু খরচ করে নিয়মমাফিক এখানকার জল নেবার ব্যবস্থা ছিল। আঠার শতকের শেষে কম্যান্ডার-ইন-চীফ স্যার রালফ অ্যাবারক্রম্বির সঙ্গে টুইনিং বলে এক ভদ্রলোক (পরে ইনি 'Travels in India a hundred years ago' বলে একখানা বইও লিখেছিলেন) বেড়াতে এসে মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডের জলের গুণাগুণ শুনেছিলেন। জাহাজে আসার সময় কটু জলের স্বাদ ভদ্রলোক ভুলতে পারেননি। সখেদে বলেছিলেন, 'ভগবানের ইচ্ছায় যদি আবার ইংলণ্ডে ফিরি তো যাবার সময় কয়েক ডজন এই জলের বোতল সঙ্গে নিয়ে ফিরব।' ভীমবাঁধের আশেপাশে বাটলীবাবুর কথামত সত্যিই আরও অনেক প্রস্রবন দেখতে পেলাম। এপ্রিলের সেই দাবদাহ—জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ভালই লাগছিল। মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ভেঙে ময়ূরের দল পাখা ঝটপটিয়ে উড়ে যাচ্ছিল—শাল, মহুয়া আর অর্জুন গাছের ফাঁক দিয়ে আলো-ছায়ার জাফরী কাটা পাতা জড়ানো জঙ্গলকে মোহময় লাগছিল। না দেখা, না জানা জঙ্গলের সঙ্গে জড়ানো আশঙ্কা আর সুন্দর এই দৃশ্য—দুই মিলিয়ে এক অদ্ভুত মানসিক শিহরণ।

এরপর জমুই অল্প কিছুটা রাস্তা, ঘিঞ্জি শহর—মল্লেপুর স্টেশনটার এক গায়। জমুই শহর এখান থেকে চার মাইল দূরে। সুন্দর পীচ-ঢালা সোজা রাস্তা চলে গেছে শহরে।

মল্লেপুরের ঘিঞ্জি পল্লীটুকু পেরোতে কয়েক মিনিটই লাগে। এখন থেকে দুটো গাঁয়ের মধ্য দিয়ে কাঁচা রাস্তা রেললাইনের নীচ দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেছে—গভীর থেকে গহনে—দূরে পাহাড়গুলোর দিকে। এই পথে পনেরো মাইল রাস্তাকে আপনার মোটেই সীমাহীন মনে হবে না যদি দুদিকের সৌন্দর্যের স্বাদ নিতে পারেন। ছোট্ট ছোট্ট পাহাড়ী নালা কখনও রাস্তাকে কেটে বয়ে চলেছে—অসংখ্য পাখীর ঝাঁক জিপের শব্দে উড়ে পালাচ্ছে—ভাগ্য থাকলে কখনও রাস্তার মাঝখানে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকা দলছুট একটা-দুটো হরিণও আপনার চোখে পড়তে পারে। ক্রমশঃই পাহাড় কাছে এগিয়ে আসে—ঠিক মনে হবে ঐ পাহাড়ের মধ্যে বসে কেউ রাস্তাটাকে আস্তে আস্তে গুটিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের দিকে।

যেখানে পৌঁছে গেলেন সেখানকার আর এক দৃশ্য। এক চিলতে অপ্রশস্ত উপত্যকা—দুদিকে দেয়ালের মত শৈলশ্রেণী পূব-পশ্চিমে প্রলম্বিত—পশ্চিমে গিয়ে হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে—তারপর দুস্তর সমতল শুধু মাঝে-মধ্যে অনুচ্চ দু-একটা টিলা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। উপত্যকার মধ্য দিয়ে ঢালু জমির ঢাল বেয়ে তিরতির করে পাহাড়ী নদী পশ্চিম দিকে বয়ে চলেছে। এই নদী ধরে আমি পরে গেছি। গরমের সময় ঢালু জমি ছাড়া জলের চিহ্নও থাকে না। এটাই নদী, অন্ততঃ ম্যাপে দেখানো আছে, মরোয়ে নদী কিউল নদীর একটি শাখা। আমি পূর্ববঙ্গের ছেলে। জ্ঞান হওয়া অবধি দেখেছি চতুর্দিকে অথৈ জল। গরমের ছুটিতে মামাবাড়ীর আম-কাঁঠালের বাগান থেকে গন্ধবহ পুবাল বাতাস আমন্ত্রণ নিয়ে আসত। ঘাসী নৌকা ভাড়া করা হত। পাঁচদাঁড়িরা মাথার ঘাম নদীর নোনাজলে মিশিয়ে দাঁড় টেনে যাচ্ছে। সকাল শেষ হয়ে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে আকাশ পুড়িয়ে নিয়ে গ্রীষ্মের দুপুরও গড়িয়ে শেষ হতে চলল। পাঁচ পীরের নাম নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে নদীর এপারে-ওপারের দূরত্ব মনে মনে হিসেব করে পাড়ি লাগাল মাঝি। ধু ধু করে শুধু জল আর জল। ওপারের সীমা শুধু কালো রেখায় আকাশের সাথে মিশে যাওয়া এক সরলরেখায় অনুমান করা যায়। ছইয়ের বাইরে ঘন ঘন মাথা বার করে আমরা উৎকণ্ঠা হয়ে জিজ্ঞেস করতাম আর কত বাকী। হালের মাঝি হয়তো তখন সবে এক হাতে হুঁকা ধরে আয়েস করে টান দিচ্ছে—এত বড় নদী নির্বিঘ্নে পার হয়ে এসে পীরের কাছে মনে মনে কৃতজ্ঞতাও হয়তো জানাচ্ছে। স্মিত হেসে হুঁকো সমেত দিগন্তের দিকে ইঙ্গিত করে বলত—'ঐ যে সামনের ধু ধু তার পরের ধু ধু-র বাঁকে তোমার মামাবাড়ীর খাল।' সত্যি ধু ধু ধু ধু করত—আকাশ আর নদীর সীমানা মিলে-মিশে এক হয়ে গেছে।

নদীর নামে আমার এই স্মৃতিই মনে রয়েছে। কিন্তু সৌন্দর্যের কথা যদি বলেন তবে সৌন্দর্য এরও রয়েছে। পূর্ববঙ্গের নদীগুলি যদি ওরা যৌবনমত্ত যুবতী তবে এখানের এই নদীগুলিও চঞ্চলা, উচ্ছলা, কিশোরী। নদীর নাম মরোয়ে। নামের ইতিহাসটুকু বেশ। শুনলাম জলপাস্থানের বাংলোর দারোয়ান পিয়ারা সিংয়ের কাছে। যে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নদীটি পথ তৈরী করে চলেছে, সেটায় রয়েছে অসংখ্য ময়ূরের পাল। বর্ষার মেঘের ডাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এদের কেকাধ্বনি এই উপত্যকার জঙ্গলকে মাতিয়ে রাখে। ময়ূরের আঞ্চলিক উচ্চারণ 'মোর' থেকেই নদীর নামের উৎপত্তি।

জলপাস্থান থেকে আরও অনেকটা পূবে নদীর উৎপত্তির দিকে ঘন জঙ্গলে ঢাকা উত্তর দিকের পাহাড়ের সানুদেশে পাহাড় কাটা একফালি সমতল—দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে দুশো ফিটের বেশী নয়। প্রবেশ-

পাশেই আড়াআড়ি কোয়ার্টারাইটের একটি দেয়াল এই সমতলকে আড়াল করে রেখেছে। ব্যবহারে এর মধ্যে চলার পথ তৈরী হয়ে গেছে। বাঁদিকে খাত উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত উত্তরাংশে শেষ হয়েছে যেখানে, সেখানে খাড়া পাহাড়ের ঠিক নীচে একটি ছোট্ট মন্দির। মন্দিরের ডানদিকে একটি কুণ্ড—পাঁচটা ধারায় পাহাড়ের ফাটল থেকে অবিরত প্রস্রবন কুণ্ডটিতে ভরে রাখছে। কুণ্ডের নীচ দিয়ে আবার জলধারা বেরিয়ে খাদের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে—শেষ হয়েছে মরোয়ে নদীতে। জাতি এবং ধর্ম বিচারে এই প্রস্রবন নাকি এদিককার উষ্ণ প্রস্রবন-গুলির সমগোত্রীয়। এই মন্দিরই ঋষ্য-শৃঙ্গের মন্দির। বিভান্তক পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ।

অঙ্গদেশের নরপতি লোমপাদের রাজ্যে দ্বাদশ বৎসরব্যাপী অনাবৃষ্টির ফলে দেশ ছারখারে যেতে বসেছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিধান নরপতির দুরাচারজনিত পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল। এর প্রতিকারের একটাই পথ। বিভান্তক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে যদি দেশে আনানো যায়, তবে একমাত্র তাঁর কৃপায় এই অবস্থার অবসান ঘটতে পারে। নরপতি ঢোল সহরৎ করে অনেক উপঢৌকন ঘোষণা করলেন যে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনতে পারবে তাঁর জন্য। তারপরের টুকু বেশ কৌতুকাবহ। সংসারধর্মে এবং মানব-চরিত্রে বিশেষজ্ঞা এক বৃদ্ধার নেতৃত্বে রাজ্যের সুন্দরী রমণীর এক দল চলল এই কাজে।

'ডাকিয়া কহিল তথা বুড়ি একজন
আমি আনি দিব সেই মুনির নন্দন।
স্ত্রী-পুরুষ ভেদ সেই মুনি নাহি জানে
ভুলাইয়া আনিব সেই মুনির নন্দনে।
নৌকা এক সজাইয়া দেহ গো আমারে
ফলফলে বৃক্ষ রোপ তাহার ওপরে।।
চৌদ্দ বৎসরের সেই মুনির মুনির সন্ততি
কৌতুকেতে ভুলাইব যতেক যুবতি।।'

বলাই বাহুল্য আয়োজন সফল হইল।

'মর্ম বুঝ সবে কৃত্তিবাসের সুজনী—
নারীর ছলনে ভুলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।।'

লোমপাদের দেশে অনাবৃষ্টি ঘুচল। ফলে ফুলে শস্যশ্যামলা হল অঙ্গদেশ। ঋষ্য-শৃঙ্গের সেই আশ্রম এখনও তীর্থযাত্রীদের পীঠস্থান। মন্দিরের আকৃতির বিবর্তনের চেহারা স্পষ্ট। চত্বর সিমেণ্ট-বাঁধানো। মন্দির-গাত্রও তাই। পুরাণের প্রতীক হিসেবে কালো পাথরের অসংখ্য মূর্তি মন্দির-গাত্রে প্রোথিত। পাশাপাশি দুটো মন্দিরের একটিতে শিবলিঙ্গ, অপরটিতে তারাদেবীর মূর্তি।

বেশ কৌতুককর সাদৃশ্য মনে পড়ল। শুনেছি মরোয়ের পশ্চিমদিকটায় যেখানে কিউল নদীর সঙ্গে এর সংযোগ হয়েছে সেই দুস্তর সমভূমিতে মাঝে-মধ্যেই অনা-বৃষ্টি প্রকট হয়। অথচ চাষ করার উপযুক্ত জমি সব। তাই এই ছোট্ট নদীটির ওপর এক বাঁধ তৈরী হচ্ছে। আমার এদিকটায় ভ্রমণ এটার উপলক্ষেই। স্বাধীনতা লাভের পরেই প্রথম প্রকল্প দামোদর পরিকল্পনার কাব্যিক বর্ণনা কত পড়েছি। এ-যুগের ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে ভগীরথের তুলনা—গঙ্গার অবতরণের সঙ্গে আধুনিক সেচ-প্রণালীর সাদৃশ্য এবং আধুনিক ব্যাখ্যা ইত্যাদি। মরোয়ের পরিকল্পনায় আর এক রামায়নিক কাহিনীর সাদৃশ্য পেয়ে গেলাম।

অনাবৃষ্টিতে অশুভ ফল দূর করার প্রচেষ্টায় ভাগলপুর সেচ-বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত ঘোষের কথা না বললে অন্যায় হবে। স্থপতি হিসেবে উনি নিশ্চয় স্বক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রতিটি পরিকল্পনায় ও'র রুচির যে পরিচয় পেয়েছি, তা শ্রদ্ধা জানাবার মত। এ-অঞ্চলের আশেপাশে বাদুয়া, চন্দন ইত্যাদি পরিকল্পনাকে রূপ দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন উনি। মন্দার পাহাড়ের কাছে চন্দন। ভাগলপুরের কাছে বাদুয়া প্রতিটি সেচ-পরিকল্পনার সঙ্গে ও'র নিজস্ব রুচি-মাফিক যে সুন্দর বাংলোগুলি উনি তৈরী করেছেন, সেগুলি এক সুন্দর শিল্পী-মনের পরিচয়। মরোয়ের কাছেই জলপা-স্থানের বাংলোটি অপূর্ব। পাহাড়কে আধাআধি কেটে ধাপে ধাপে জলপাস্থানের বাংলোটি অতি সুন্দর এবং ঊষর, পত্র-পুষ্পহীন ন্যাড়া পাহাড়ের মধ্যেও কল্পনা দিয়ে কেমন করে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায়,

জহ্নু মুনির মন্দিরে শিবলিঙ্গ

উরেন স্টেশনের পেছনে পাহাড়ের ওপরে গ্র্যানাইট পাথরের চত্বর

ভার সুন্দর এক নমুনা এটি। সামনেই জলপাস্থানের মন্দির। সামনেই ক্যানাল পাহাড় পেরিয়ে উত্তরদিকের সমভূমির মধ্যে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে।

এই ক্যানেলের উত্তর পাড় ধরে ক্রমাগত পূবে চলতে থাকলে মাইলখানেক পরে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত এক মাটির বাঁধ দেখা যায়। এখানকার পুরনো সেচ-ব্যবস্থার মতে এটিকে একটি বাঁধ বলা উচিত। এইটি সম্বন্ধে স্থানীয় লোকের মধ্যে বেশ মুখরোচক কিংবদন্তী রয়েছে। এই বাঁধটি উত্তরে সোজা সূর্যগড়ের রাস্তা পর্যন্ত চলে গেছে আর দক্ষিণে শেষ হয়েছে মরোয়ের উত্তরদিকের পাহাড়ের গায়—যার পরেই দিগন্ত, বিস্তৃত ধান, গমের ক্ষেত উত্তরে গঙ্গার দ্বারা সীমিত। দৈর্ঘে এই মাটির বাঁধটি প্রায় চার মাইল। কিংবদন্তী আছে যে, ঋষি-আশ্রমে সাধারণত এক সন্ন্যাসী তাঁর প্রতাপশালী শিষ্যকে মনোবাসনা জানিয়েছিলেন পূত-পবিত্র গঙ্গাজলে প্রাত্যাহিক অবগাহনের। গুরুর মনোবাসনা পূর্ণ করার সংকল্প নিয়ে দৈত্যরাজ পরিখা খননের কাজে লেগে যেতেই দেবীর স্বপ্নাদেশ হল যে, এক রাত্রের মধ্যে খননকার্য শেষ করতে পারলেই গঙ্গা তাঁর ধারা পরিবর্তন করে নেবেন। সেই রাত্রে—পরিখা খননের কাজ প্রায় শেষ। বাকি শুধু একফালি পাথুরে পাহাড়ের দেয়াল। এমন সময় রজনী শেষের ঘোষণা করে চতুর্দিকে কুক্কুটের চিৎকার—শ্রান্ত ও ভগ্নোদ্যম দৈত্যরাজের কাজে ছেদ পড়ল। দেবীর ছলনা বুঝতে দেরী হল না। কিন্তু তখন সময় উত্‌রে গেছে। লোকের বিশ্বাস এ-বাঁধ পরিখা থেকে উত্তোলিত মাটির তৈরী। আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করেন এটা পাল রাজ্যের সীমানা সূচিত করত। কিন্তু শুধু এখানেই নয়—এই ধরনের বাঁধ মুঙ্গেরের বহু জায়গায় দেখা যায়।

বর্ষার জল আটকে সেচের সুবিধার জন্য এই ধরনের বাঁধ শুধু মুঙ্গের ছাড়াও মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের কাইমুর অধিত্যকায় প্রচুর দেখা যায়।

বাঁধের রাস্তা ধরে আরও উত্তরে চলতে চলতে ডাইনে-বাঁয়ে দুটো পাথুরে টিলা দূর থেকে নজরে পড়ে। পশ্চিমের টিলাটি বর্তমান উরেন স্টেশনের প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। স্টেশনের গায় লাগানো গাঁয়ের মধ্য দিয়ে প্রায় আধ মাইল দূরে আর একটা গ্রানাইটের টিলা—টিলার চূড়ায় ওঠার পথে বড় বড় চত্বর—দুধারে গ্রানাইটের থাম, দেখলে মনে হয় সুপরিকল্পিত এক নক্‌সা করা পায়ে চলা পথকে চত্বর থেকে চূড়ায় যাবার জন্যই কারুকার্য করা হয়েছে। চত্বর দুটি প্রকৃতির কারুকার্যে ক্ষয়ে মসৃণ হয়ে গেছে।

এই চত্বরের প্রতিটি ইঞ্চি নজর করে দেখুন। দেখতে পাবেন সুন্দর শিল্পকার্য—কোনও ভাস্কর্যের নিদর্শন—ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি, বৌদ্ধস্তূপের প্রতিকৃতি, ফুটন্ত পদ্ম ইত্যাদি বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট-বহুল নিদর্শন। কর্ণেল ওয়াডেলের বর্ণনায় আরও বহু কিছু জানতে পাওয়া যায়। যেমন ধ্যানী বুদ্ধের প্রস্তরমূর্তি, তথাগতের পদচিহ্ন, কুন্তিকার চিহ্ন, যক্ষ বকুলের গায়ের ছাপ ইত্যাদি। অনেক কিছুই এখন নিশ্চিহ্ন। এ-জায়গা সম্বন্ধে হিউয়েন সঙের বর্ণনা আছে। হিরণ্য পর্বতের এই অঞ্চলে তথাগত দৈত্যরাজ বকুলকে ধর্মান্তরিত করেন। কর্ণেল ওয়াডেল চৈনিক পরিব্রাজকের বর্ণনার সঙ্গে এই টিলাটি এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের যে টিলাটি স্থানীয় লোকের কাছে 'লোড়িক কা ঘর' নামে প্রসিদ্ধ, তার সাদৃশ্য বর্ণনা করেছেন। শোনা যায়, কিছুদিন আগেও এখান থেকে বহু পাথরের মূর্তি খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। বহু মূর্তি চুরি হয়ে গেছে। এই পাহাড়গুলো অনাদরে অনেক ক্ষতি সহ্য করেছে। আধুনিকতার যোগান দিতে গিয়ে বহু পাথর ভেঙে নেওয়া হয়েছে। হয়তো মূর্তি কিংবা খোদাই-করা পাথরের চাঙড় কোনও রাস্তার কাজে লাগানো হয়েছে।

মরওয়ে পরিকল্পনার ইঞ্জিনীয়ারদের কাছে শুনেছি দৈত্য বাঁধের কাছাকাছি ক্যানেল কাটার সময় বহু পাথরের মূর্তি নাকি মাটির নীচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর কিছু কিছু এখনও জলপাস্থানের মন্দিরে রয়েছে। সেখানে বুদ্ধমূর্তির সঙ্গে তারাদেবী, সূর্য মূর্তি ইত্যাদির সমন্বয় দেখে মনে হয়, পরবর্তীকালে মহাজান ধর্মের হয়তো একটা চর্চাস্থান ছিল এটা,—ঐতিহাসিকরা সঠিক বলতে পারবেন।

হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় খড়গপুরের এই পর্বতাঞ্চলকে 'হিরণ' বা 'হিরণ্যপর্বত' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। চৈনিক পরিব্রাজক গয়ার উত্তর-পূর্বে গঙ্গার দিকে যাত্রাকালে শস্যশ্যামলা সমতলের সীমানায় ঘনকৃষ্ণবনরাজি শোভিত 'হিরণ্যপর্বতের' সানুদেশে ঘন ধূম্র ও সিকর-কণার পুঞ্জীভূত মেঘরাশির বর্ণনা করেছেন। এখনও এই পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো উষ্ণ প্রস্রবন মুঙ্গের থেকে রাজগীর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। বর্ণনা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যে প্রস্রবনগুলির উষ্ণতার তারতম্য ঘটেছে।

অঙ্গদেশের এই অংশের ইতিহাস আরও বহুমুখী। এখানকার শহরের প্রতিটি ইঁটের গায়ে ইতিহাস লেখা, গ্রামের প্রতিটি পথে ইতিহাসের সাক্ষী। এখানকার আকাশ-বাতাসেও যেন আধুনিকতার ছোঁওয়া বাঁচানোর স্বাভাবিক বিমুখতা।

৩

জরার ঘুম আসে না, তাই চিন্তা আসে। ঘুমে আর চিন্তায় চিরন্তন আড়াআড়ি। মনের মধ্যে এমন একটা প্রসন্নতা অনুভব করতে লাগলো যার অনুরূপ কখনো অনুভূত হয়নি তার জীবনে। শুধু জীবনটা নয়, দেহটাও হাল্কা হয়ে গিয়েছে, মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম যেন নাগপাশের মতো স্খলিত হয়ে পড়ে গিয়েছে. ইচ্ছা করলেই সে যেন অনায়াসে ঐ পাহাড়গুলো এক লাফে ডিঙিয়ে যেতে পারে; পা বাড়ালেই ঐ পূর্ণিমার চাঁদে গিয়ে উপস্থিত হতে তার বাধা নেই। দুটো অদৃশ্য পাখা যেন ধরফড় করছে, উড়লেই হল। তার মনে হল সদ্য লব্ধ রাজানুগ্রহই এর কারণ কিম্বা অনেককাল পরে স্ত্রী-সঙ্গ লাভ বুঝি এর কারণ। সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে দেখবার ক্ষমতা তার নাই, থাকলে বুঝতে পারতো এদুটোর একটাও প্রকৃত কারণ নয়। এতকাল শুনে এসেছে সে একটা চোয়াড় ব্যাধ, নিতান্ত বুনো আর আজ জানল কিনা স্বয়ং রাজরানীর কাম্য পাত্র। এই অপ্রত্যাশিত কাম্যতাই তাকে এক দিব্যসত্তা দিয়েছে. এতকাল যা তার স্থূল আবরণটার মতো লুক্কায়িত ছিল। খনির অমূল্য মণি মাটি-কাদায় আচ্ছন্ন থাকায় সামান্য লোষ্ট্রখন্ড বলে বোধ হচ্ছিল, রানীর প্রসাদে ধুয়ে যেতেই প্রকাশ হয়ে পড়লো তার স্বরূপ। জরা ব্যাধ নয়, চোয়াড় নয়, বুনো নয়, চিরন্তন পুরুষ, চিরন্তন নারীর কাম্য। সে আর শুয়ে থাকতে পারলো না, গবাক্ষের ধারে এসে দাঁড়ালো। কেন এমন করলো জানে না, কখনো এমনভাবে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়নি, চিরটা কাল শুয়েছে কি ঘুমিয়ে পড়েছে, পাতার বিছানা হোক কিম্বা জরতীর পেতে দেওয়া ছেঁড়া কাঁথা হোক। আজ এই প্রথম তার বিনিদ্র রজনী।

তাকিয়ে দেখল আকাশে জ্যোৎস্নায় ফুল ছড়াচ্ছে অজস্র অসংখ্য অগণিত শাদা শাদা ফুলের রাশি; আর চাঁদের ভরা নৌকাটাকে টেনে নিয়ে চলেছে চকোরের একটানা তারস্বরের গুণের টানে; দূর-দূরান্তের পাহাড়গুলো শ্বেতকলাপ মেলে দিয়ে স্থির হয়ে অপেক্ষমান, ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র এখনই শুরু করে দেবে নৃত্য। হঠাৎ তার কানে এলো মধুর করুণ বিহ্বল একটা গানের সুর। এত রাতে কে গান করে? এতো রাগরাগিণী সমন্বিত সঙ্গীত নয়, এ যে হৃদয়ের সমস্ত বেদনা-চোয়ানো মধুর নির্যাস। কার এত ব্যথা! গানের কথাগুলো বুঝতে পারলো না, ভাষাটা তার পরিচিত নয়, কিন্তু সুর! পশুতেও গানের সুর বুঝতে পারে আর জরা পারবে না—সে কি হয়! গানের কথাগুলোর অদৃশ্য শুষ্ক খুঁটি বেয়ে আকাশের পানে উঠে গিয়েছে সুরের আলোকলতা। কিন্তু এত রাতে কে গায়? কার এত ব্যথা? আকাশের চাঁদটাকে সুদ্ধ উন্মনা করে দিয়েছে, চকোরের গুণের টানেও নড়ছে না। কে গায়?

কৌতূহলের তাড়নায় পাশের আর একটা গবাক্ষে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো রাজান্তঃপুরের ছাদের অলিন্দের পাশে তম্বুরার তারে অঙ্গুলি সঞ্চালনরত রাজমহিষী সীমন্তিনী। তন্ময়ভাবে তার চোখ বাইরের দিকে কি মনের মধ্যে বুঝবার উপায় নেই, গান গেয়ে চলেছে দুপুরে রাত্রের বিরহিণী। গায়ক তো আছে, শ্রোতা কই! অবোধ জরা কি করে জানবে গায়ক যখন আপনাকে গান শোনায় তখন বাইরের শ্রোতার প্রয়োজন হয় না; শ্রোতা মনকে বাধা দেয় নদীর স্রোতে প্রস্তরখণ্ডের মতো। মূঢ় জরা সিদ্ধান্ত করলো এ-গান তারই উদ্দেশ্যে। কিন্তু সত্যই কি সে মূঢ়? এ-গান চিরন্তন পুরুষের উদ্দেশে চিরন্তন নারীর। তবে জরার চোখে সে আজ চিরন্তন পুরুষ আর ঐ অদূরে শ্বেতমর্মরের অলিন্দে উপবিষ্টা রাজরানী চিরন্তন নারী। অবস্থাবিশেষে দুটি মাত্র নর-নারীতেই চরাচর পূর্ণ হয়ে যায়—তৃতীয়ের তখন স্থানাভাব। জরা মুগ্ধভাবে সেই গান শুনতে লাগলো, জরা আর পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদটা।

হঠাৎ তার মনে হল একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু কি করবে? যদি মাথার উপরে ছাদটা না থাকতো, তবে পাখা মেলে উড়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না; যদি ঘরের দেয়ালগুলো না থাকতো, তবে দশকুশি ধাপ ফেলে তেপান্তরের দিকে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না; যদি রাজবাড়ীর অন্তঃপুরের পথ জানা থাকতো, তবে গায়িকার সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব ছিল না। তখন তার এমন সম্বিৎহীন অবস্থা যে-সব কথা তার জ্ঞানগম্যের অগোচর কিভাবে তারা মনের মধ্যে এলো জানে না সে। প্রেমে যে অকবিকে কবি করে, মূঢ়কে ভাবুক করে, স্থূলকে সূক্ষ্মগ্রাহী করে, কিভাবে জানবে সে।

হঠাৎ তার নিদারুণ ঘৃণা বোধ হল মদিরার উপরে। যদি উপায় থাকতো তবে তার সদ্যপ্রাপ্ত সংসর্গ সুখটাকে ছিন্ন পরিচ্ছদের মতো খুলে ফেলে দিত অঙ্গ থেকে, না, আরও দুঃখ স্বীকার করতে সে রাজি। গায়ের চামড়াখানা অবধি টেনে তুলে ফেলতে পারে সে। রাজেন্দ্রাণীর যে কাম্য তার দেহ কিনা একটা সামান্য পণ্যমেয়ের সংসর্গে কলুষিত হল। কি করছে ভালো করে বুঝবার আগেই সে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল, পাহাড়ের যে-ঝরনাটায় নিত্য স্নান করতো, সেখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দণ্ডখানেক ধরে স্নান ও অঙ্গ ক্ষালন করে মনটা কতক শান্ত হলে ফিরে

এসে বস্ত্র বদলে মেঝের উপরে শুয়ে পড়লো—ও শয্যায় আর নয়। মুহূর্তে মধ্যে দেহমনে শীতল জরা ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালবেলা জেগে রাতের অভিজ্ঞতাকে স্বপ্ন বলে মনে হল জরার, শেষপর্যন্ত হয়তো সেই সিদ্ধান্তই বহাল থাকতো যদি না ঘরের ভিজে কাপড়গুলো উল্টো সাক্ষী দিত। অনেকক্ষণ সে গালে হাত দিয়ে বসে রইলো, তবে সে বিলাস বেশিক্ষণ করবার উপায় ছিল না, রাজসভাতে যথাসময়ে যাওয়া অপরিহার্য প্রথা। যথোচিত বেশভূষা করতে লেগে গেল।

একটা পাহাড়ের মাথা কেটে সমতল করে নিয়ে সুমন্তনগর গঠিত, এ-অঞ্চলের সমস্তনগর এইভাবেই গঠিত। নগর আগাগোড়া প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত, অবস্থাবিশেষে কোথাও তিনটা সিংহদ্বার, কখনো চারটে। সুমন্তনগরের সিংহদ্বার তিনটা, অন্য দিকটা এমন খাড়া যে সেদিকে দ্বার গঠন সম্ভব নয়। সেদিকটাতেই রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের প্রান্তে যেখানে পাহাড় খাড়া নেমে গিয়েছে উপত্যকায়, সেখানে রাজান্তঃপুর। রাজপ্রাসাদের দুই দিকে ছোট ছোট বাড়ী, প্রধান অমাত্য, সেনাপতি ও রাজার প্রিয় পাত্রগণের বাসস্থান। এরই একটা বাড়ীতে স্থান পেয়েছে জরা। বলা বাহুল্য রাজা ছাড়া আর কেউ খুশি হয়নি (রানী যে হয়েছে কে জানবে)। সবাই জরার উপরে বিরূপ তবে রাজার ভয়ে কেউ কিছু বলতে সাহস করে না। আর সবচেয়ে বিরূপ আহ্নীক ও বাহ্নীক নামে দুইজন পারিষদ, তারা সর্বদা গোপনে গোপনে ছিদ্রান্বেষণে নিযুক্ত।

রাজসভায় প্রবেশ করে অভিবাদনান্তে দাঁড়াতেই সুমন্তরাজ বলে উঠলেন, ওহে জরা, তোমার সেদিনকার পায়রা মারার ফল ফলতে আরম্ভ করেছে।

আহ্নীক ব্যাপারটার কিছুই জানতো না, ভাবলো রাজা অখুশী, তাই বলে উঠল, পায়রা লক্ষ্মীর পাখী মারা অন্যায়।

রাজা বলে উঠলেন, আমিই আদেশ করেছিলাম।

আহ্নীকের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বাহ্নীক বলল, তবে না মারাই অন্যায়।

তোমরা তো আগাগোড়া না শুনেই সিদ্ধান্ত করলে, আগে কি হয়েছিল শুনে নাও—এই বলে তিনি সেদিনকার ঘটনা বিবৃত করে বললেন, শুনলাম নরেন্দ্রনারায়ণ সৈন্য জোগাড় করবার আদেশ করেছেন।

আহ্নীক ও বাহ্নীক সমস্বরে বলে উঠল, নরেন্দ্রনগর আবার লড়াই করবে।

না করতেও পারে, তোমরা আছ জানে কিনা।

রাজরসিকতায় সকলে হেসে উঠল, মায় আহ্নীক-বাহ্নীক অবধি।

এমন সময়ে একজন রাজানুচর এসে বলল, মহারাজ, নরেন্দ্রনগরের লোক এসে আমাদের প্রজাদের খরস্রোতি উপত্যকার গম কাটতে শুরু করে দিয়েছে।

তুমি নিজে দেখেছ?

না মহারাজ, প্রজাদের মুখে শুনে দৌড়ে চলে এলাম।

দৌড়ে এদিকে না এসে ওদিকে গিয়ে দেখে এলেই পারতে ঘটনা সত্য কিনা।

রাজানুচর বলল, মহারাজ, আমার গুরুদেব দীক্ষা দেবার সময়ে বলেছিলেন, বৎস, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কর্ণ শ্রেষ্ঠ, তাই মন্ত্র দেওয়া হয় কানে। কানের সাক্ষ্য কখনো অবিশ্বাস করবে না—এই বলে সে অনুপস্থিত বা অলীক গুরুর উদ্দেশে কপালে হাত ঠেকালো।

আহ্নীক ও বাহ্নীক, তোমরা তো দীক্ষা নাওনি, একবার চোখে দেখে এসো তো ব্যাপারটা কি।

আহ্নীক বললো, অমনি দু-চারজন সৈন্য নিয়ে যাই, তেমন দেখি তো ওদের তাড়িয়ে দিয়ে আসবো।

বাহ্নীক বলল, অমনি জরাকেও নিয়ে যাই, দেখে নিক সুমন্তনগরের লোকে কেমন লড়াই করে।

রাজা বললেন, তোমাদের যেমন আদেশ করলাম তাই করো। আর যদি ভয় পেয়ে থাকো তবে—

দুজনে বিকম্পিত দেহে বলে উঠল, ভয়, ভয় বলতে বলতে প্রস্থান করলো।

কিছুক্ষণ পরে দুজনে ফিরে এসে এক উপন্যাস বানিয়ে আবৃত্তি করলো।

কি রকম কি দেখলে হে, শুধালেন সুমন্তরাজ।

আহ্নীক বলল, মহারাজ, সে এক বিষম কান্ড। আমরা গিয়ে দেখি শ'-দুই লোক গমের গাছ উপড়োচ্ছে। তখন আমি বললাম—

বাহ্নীক বাধা দিয়ে বলল, না মহারাজ, আমি বললাম—

আহ্নীক স্বীকার করে নিয়ে বলল, হাঁ মহারাজ, ও-ই বলল বটে তবে কথাটা আমার মনেও ছিল।

বাহ্নীক বলল, তোমরা গমের ক্ষেতে এসেছ কেন? তারা বলল, ঝড়ে আমাদের এখানে এনে ফেলেছে। তখন আমি শুধোলাম, তা না হয় এনেই ফেলল, যদিচ ঝড়ের কোন চিহ্ন নাই কিন্তু গাছগুলো উপড়োচ্ছ কেন? তখন তারা বলল কি—

আহ্নীক বাধা দিয়ে বলল, তুমি থামো তো, এর পরে তো কথা হল আমার সঙ্গে।

হাঁ তোমার সঙ্গেই হয়েছিল বটে, তা না হয় তুমিই বলো।

রাজা দেখলেন এরা দুটি মানিকজোড়, মুহূর্তে বিরোধ, মুহূর্তে মিলন।

তারা বলল কি মহারাজ, পাছে ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তাই গাছগুলো আঁকড়ে ধরছি, আর যেটা ধরছি সেটাই উপড়ে আসছে।

তখন বাহ্নীক বলল, কিন্তু আঁটি বাঁধছো কেন? এটাই ভাই ভুল হয়ে গিয়েছে।

রাজা দেখেন উতোরে চাপানে এরা বেশ চালাচ্ছে—তখন তোমরা কি করলে?

রাজার কথায় উৎসাহিত হয়ে দুজনে একসঙ্গে বলে উঠল—তখন আমরা দুজনে একসঙ্গে গর্জন করে উঠে বললাম, জানো আমরা মহারাজাধিরাজ সুমন্তরাজের সভাসদ, এখনি তোমাদের গর্দান নেবো।

বলা বাহুল্য, গর্জন বাক্যগুলো সভাগৃহ ধ্বনিত করে গর্জন রবেই উচ্চারণ করলো।

তখন?

তখন আর কি বলবো, মহারাজের নাম শুনবামাত্র তারা একযোগে দৌড়ল নরেন্দ্রনগরের দিকে—আমরাও দৌড়তাম তাদের পিছনে কিন্তু ভাবলাম না আগে মহারাজকে সংবাদটা দেওয়া আবশ্যক। তারপরে না হয় দরকার হলে ওদের পিছু নিলেই হবে।

বাহ্নীক বলল, ভাই ওটা তো আমি বলেছিলাম।
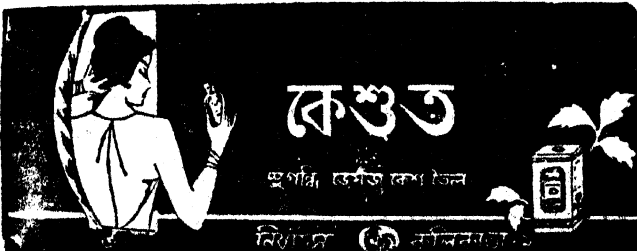
হাঁ, তুমিই বলেছিলে সত্য তবে আমি তো প্রতিবাদ করিনি। মহারাজ, আমাদের কথা সত্য কি মিথ্যা একবার না হয় লোক পাঠিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করুন।

সুমন্তরাজ বললেন, তোমাদের কথা আবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে? কিন্তু গমের আঁটিগুলো কি নিয়ে গিয়েছে?

আহ্লীক বলল, সে সাধ্য কি আর তাদের ছিল?

তবে সেগুলো ওখানেই আছে। লোক পাঠিয়ে দিয়ে আনবার ব্যবস্থা করতে হয়।

বাহ্লীক বলল, সে পন্ডশ্রম করবার প্রয়োজন নেই মহারাজ, আমরা আবার সেগুলো যথাযথ পুঁতে দিয়ে এসেছি।

আহ্লীক বলল, ক্ষেতে যে লোক এসেছিল তার এতটুকু চিহ্ন রাখিনি।

বাঃ বাঃ বেশ করেছ, বীরপুরুষ তোমরা বটে, তোমাদের কি পুরস্কার দেবো ভাবছি।

রাজবাক্যে উৎসাহিত হয়ে দু'জনে যুগপৎ ছুটে গিয়ে প্রণত হয়ে রাজকীয় পদধূলি সংগ্রহ করলো।

রাজা বললেন, ওহে সেনাপতি, এরকম দু'জন বীরপুরুষ থাকতে সৈন্যদল রাখা অনাবশ্যক। কি বলো ?

সেনাপতি ও অন্যান্য পারিষদবর্গ হেসে উঠল।

আহ্লীক ও বাহ্লীক নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করলো। ওরা চতুর, না নির্বোধ? অনেক সময়ে এ-দুয়ের বাহ্য লক্ষণ অভিন্ন।

জরার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই দুর্বোধ্য মনে হচ্ছিল, তাছাড়া আজ তার মনটাও নাকি ছিল অন্যত্র।

রাজা সভাভঙ্গ করবেন ভাবছেন, এমন সময়ে সিংহদ্বারের বাইরে দুন্দুভি বেজে উঠল। আবার কি হল কেউ একজন গিয়ে দেখে এসো তো, বললেন সুমন্তরাজ।

রাজঅনুচর ফিরে এসে জানালো যে নরেন্দ্রনগর থেকে রাজদূত এসেছে, তাকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে কিনা জিজ্ঞাসা করছে দ্বারপাল।

অবশ্যই প্রবেশ করতে দেওয়া হবে, যাও একজন গিয়ে নিয়ে এসো, দেখা যাক কি সংবাদ এনেছে রাজদূত।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নরেন্দ্রনগরের রাজদূত ও একজন নরেন্দ্র নাগরিক সৈন্য এসে অভিবাদন করে দাঁড়ালো।

কি সংবাদ দূত?

সে বিনীতভাবে কুন্ডলীকৃত একখানা ভূর্জপত্র রাজার হাতে দিল। রাজা দেখলেন নরেন্দ্রনগর রাজের পত্র। তিনি পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে তাঁর মুখমন্ডল রক্তিমাভ হয়ে উঠল। পড়া শেষ হলে কিছুক্ষণ তিনি স্তব্ধ হয়ে রইলেন, সভাস্থল সমান স্তব্ধ, অবশেষে তিনি মন্ত্রীর হাতে পত্রখানা দিয়ে বললেন, পড়ো সবাই শুনুক, আগাগোড়া প্রতিটি শব্দ পড়বে, একটি অক্ষরও বাদ দেবে না।

মন্ত্রী পড়তে আরম্ভ করলো, রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনতে লাগলো সকলে, নরেন্দ্রনগরের রাজদূত অবধি, সে জানতো না পত্রে কি আছে।

মন্ত্রী রাজপত্র পাঠ করছে 'সুমন্তনগর অধীশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত সুমন্তরাজ সমীপেষু —সুমন্তপুরের সঙ্গে নরেন্দ্রনগরের কলহ ও বিবাদ বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। ইহার যে শীঘ্র অবসান হইবে এমন সম্ভাবনা নাই। ভবিষ্যতেও উভয় রাজপরিবারের সন্তানসন্ততিক্রমে ইহা চলিবার সম্ভাবনা। যুদ্ধের কি শোচনীয় পরিণাম কুরুক্ষেত্রের মহাহব তাহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে। পান্ডব ও কৌরবের তুলনায় নরেন্দ্রনগর ও সুমন্তপুর সামান্য রাজ্য ইহা বোধ করি সুমন্তরাজ স্বীকার করিবেন। কাজেই যুদ্ধ-বিগ্রহ সর্বথা পরিত্যজ্য। অথচ এ দুই রাজ্যের মধ্যে একটা আশু মীমাংসা বাঞ্ছনীয়। এরকম অবস্থায় এ-পক্ষের প্রস্তাব দুই রাজ্যের স্বার্থের খাতিরে শত-সহস্র নিরপরাধ সৈন্যকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়া প্রকৃত প্রজারঞ্জক রাজার কর্তব্য নয়। কুরু-পান্ডবে যে দ্যূতপণ হইয়াছিল, যুদ্ধের তুলনায় তাহা নির্দোষ। এই দুই রাজ্যের মধ্যে সেরকম ব্যবস্থা করিলে মীমাংসাও হয় আবার লোকক্ষয়ও নিবারিত থাকে। অতএব আসুন আমরা সেই মহদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করি। এ-দ্যূতক্রীড়ায় যে-পক্ষ পরাজিত হইবেন, রাজ্য-রাজধানী প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া সে-পক্ষ প্রব্রজ্যা করিবেন। এখন সমস্যা এ-দ্যূতক্রীড়ায় পণ কি হইবে? বলা বাহুল্য পুরুষের কাছে পত্নীর অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই। অতএব, এ-পক্ষের প্রস্তাব সুমন্তপুরে রাজমহিষী পণ্যা হইবেন। ইহাতে সঙ্কোচের কারণ থাকিতে পারে না, যেহেতু মহামাননীয় পান্ডবগণও দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়ায় মাতিয়াছিলেন। আর এরূপ অনুসরণের প্রমাণস্বরূপ স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন, 'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্ত দেবেতরো জনঃ।' ইহার উপরে আর কি কথা! নরেন্দ্রনগররাজ ও সুমন্তনগররাজ উভয় পক্ষই ভগবান বাসুদেবের পরম ভক্ত। নিশ্চয় মহারাজার স্মরণে আছে কোন পাষণ্ড কর্তৃক বাসুদেব হত্যার সংবাদে উভয় রাজ্যে বিষাদের কি ঢেউ উঠিয়াছিল। উভয় রাজ্যের রাজা-রানী, পরিবারবর্গ ও পারিষদগণ অষ্টপ্রহর উপাস করিয়াছিলেন। কাজেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে অনুসরণ করিবার ভাগবদ্ উপদেশ এক্ষেত্রে এ-পক্ষের প্রস্তাবের প্রমাণ। অবশ্য এ-পক্ষের পত্নীকেও পণ রাখা চলিত, তবে দুঃখের বিষয় এই যে কয়েক বৎসর হইল তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার অভাবে এ-পক্ষ একেবারে নিঃসঙ্গ হয় নাই, শতাধিক সুন্দরী ও যুবতী উপপত্নী নিত্য সংগদান করিয়া থাকে। তাহাদের যে-কোন একজনকে অথবা দশ-বিশজনকে পণ রাখিলেও চলিত। কিন্তু মহারাজা নিশ্চয় স্বীকার করিবেন পত্নী ও উপপত্নীর সমান মূল্য হইতে পারে না। কাজেই এ-পক্ষের প্রস্তাব সুমন্তরাজমহিষী সীমন্তিনী [illegible] পণরূপে রক্ষিতা হইয়া লোকক্ষয়কর যুদ্ধ নিবারণে সাহায্য করিতে নিশ্চিত অস্বীকৃতা হইবেন না। মহারাজা জয়লাভ করিলে সমস্তই তাঁহার থাকিবে, আর লাভের মধ্যে নরেন্দ্রনগরের রাজ্য-রাজধানী ও শতাধিক উপপত্নী পাইবেন। আর যদি দুর্ভাগ্যবশত মহারাজার পরাজয় ঘটে, তবে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন। সে অবস্থায় পত্নী থাকা না থাকা সমান, কারণ শাস্ত্রকারগণের মতে পত্নী সাধন পন্থার অন্তরায়। তবে, মহারাজ, সর্ববিষয়ে কৌরবগণের অনুসরণ করিবার প্রয়োজন নাই। রজঃস্বলা রাজমহিষীকে দ্যূতসভায় নাই আনিলেন। মহারানীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দ্যূতক্রীড়ার দিন ধার্য করিবার স্বাধীনতা মহারাজের থাকিল। আরও বলিয়া রাখি পাষণ্ড দুর্যোধনের মতো দ্যূতজিতা রাজমহিষীকে উরু প্রদর্শনের বাসনা অন্ততঃ সর্বসমক্ষে রাজসভায় এ-পক্ষের নাই। যথোচিত স্থানকালে যথাসময়ে ধীরে-সুস্থে তাহা করিলেই চলিবে। আশা করি মহারাজা স্বাভাবিক ঔদার্যবশতঃ অকারণ

ভুবনেশ্বরের লিংগরাজ মন্দির ফটো : শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়
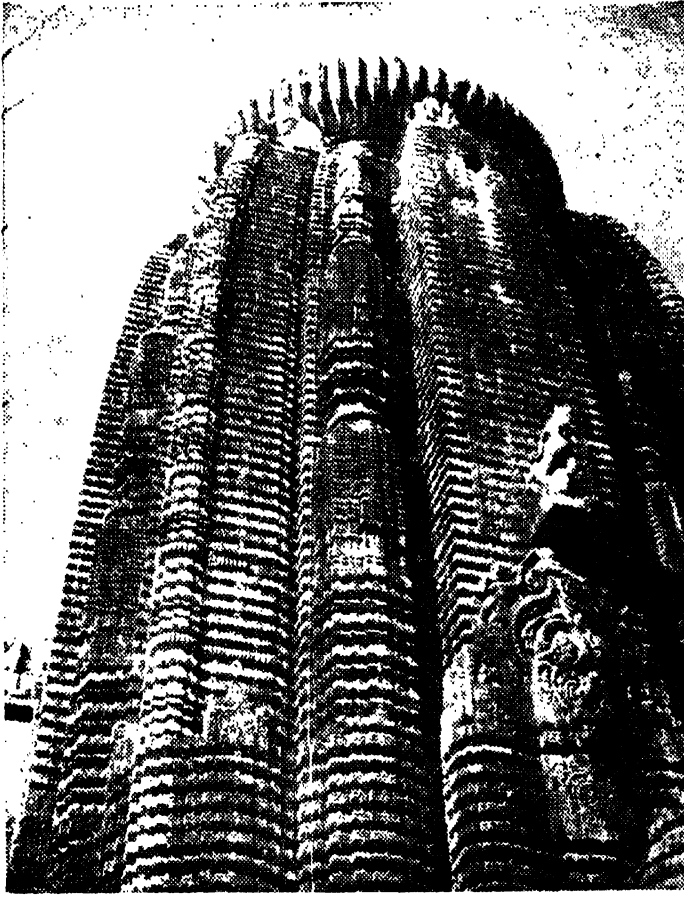
যুদ্ধে লোকক্ষয় নিবারক এই পরামর্শ-পর প্রস্তাবের সমীচীনতা উপলব্ধি করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় সম্মত হইবেন। সুনিবিড় আলিঙ্গন ও সময়োচিত প্রীতি সম্ভাষণাদি অন্তে, ইতি

নরেন্দ্রনগরাধিপতি।"

মন্ত্রী নেহাৎ মন্ত্রী বলেই অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তি বহুতর তিক্ত অভিজ্ঞতা নিত্য গলাধঃকরণজনিত অভ্যাসে যার মন অসাড় হয়ে গিয়েছে বলেই পত্রখানা আগাগোড়া পাঠ করতে সমর্থ হল। পত্র শেষ হয়ে গেল, সভাগৃহ রুদ্ধশ্বাস, উপস্থিত ব্যক্তি-দের শ্বাসপ্রশ্বাস পতনের শব্দও বুঝি শোনা যাচ্ছে না। কে প্রথম কথা বলবে, কি প্রথম কথা বলবে। যখন সবাই হতবুদ্ধি হয়ে চিন্তা করছে, দুই প্রগলভ ব্যক্তি হঠাৎ সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিল।

আহ্লীক ও বাহ্লীক একযোগে চীৎকার করে উঠল, লোকটার শির নাও।

সুমন্তরাজ ইঙ্গিতে তাদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, দূত অবধ্য।

রাজা নিজেই মীমাংসা করে দিলেন, দূত তুমি উত্তর নিয়ে যেতে আদিষ্ট হয়েছ?

বিনীতভাবে সে বলল, হাঁ, মহারাজ।

তোমার উষ্ণীষটি রেখে যেতে হবে, ওতেই আমার উত্তর বুঝবেন নরেন্দ্র-নগরাধিপতি।

তার চেয়ে যে মস্তক রেখে যাওয়া ভালো মহারাজ।

দূত না হলে ত' তাও রেখে যেতে হতো।

মহারাজ, আমার নিবেদন এই যে, স্বহস্তে উষ্ণীষ খুলে দিতে পারবো না।

না, তার প্রয়োজন হবে না। তুমি ঐ দূরে সিংদরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াও, পালাবার চেষ্টা করো না।

দূত যথাদিষ্ট সিংদরজার কাছে গিয়ে রাজসভার দিকে মুখ করে দাঁড়ালো। তখন সুমন্তরাজ জরাকে আদেশ করলেন, তোমার তীর-ধনুক নিয়ে এসো।

জরা তীর-ধনুক নিয়ে প্রস্তুত হল।

এবারে তীর মেরে ওর মাথার উষ্ণীষটা খসিয়ে ফেলো। পারবে তো?

জরা মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করে ধনুকে তীর যোজনা করলো।

রাজদূত চীৎকার করলো, ভাই, উষ্ণীষটার সঙ্গে মাথাটা খসিয়ে ফেলতে পারলে বাসুদেব তোমাকে কৃপা করবেন।

সভাসদদের অনেকেই মনে মনে আশা করছিল আস্ত মানুষটা মারা পড়বে, তাতে এক ঢিলে দুই পাখী মরবে। মানুষ মরে পড়ার আনন্দ আর জরার ব্যর্থতা দুটোই সমান আনন্দকর তাদের পক্ষে।

কিন্তু তেমন কিছুই ঘটলো না। জরা অভ্রান্ত লক্ষ্যে রাজদূতের মাথার পাগড়ি খসিয়ে মাটিতে ফেলে দিল।

সভাসদগণ সুমন্তরাজের জয়ধ্বনি করে উঠল আর নরেন্দ্রনগরের দূত খালি মাথায় মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে সিংদরজা দিয়ে বের হয়ে নরেন্দ্রনগরের দিকে দৌড়ে প্রস্থান করলো। তখন সবাই এসে পুনরায় সভা-গৃহে অধিষ্ঠিত হল, সুমন্তরাজ প্রসন্ন হাস্যে জরাকে পুরস্কৃত করলেন।

সেদিনকার মতো রাজসভা ভঙ্গ হবে এমন সময়ে রানীর অনুচরী মদিরা একখানি সোনার থালায় একটি মুক্তার মালা নিয়ে এসে রাজাকে অভিবাদন করে দণ্ডায়মান হল।

রাজা শুধালেন, কি সংবাদ?

মদিরা বলল, মহারাজ, মহারানী এই মুক্তাহারটি মহারাজার কাছে পাঠিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা যে বীরপুরুষ আজ রানীমার সম্মান রক্ষা করলেন মহারাজ তাঁকে এটি দিয়ে যেন পুরস্কৃত করেন।

রাজা আদেশ করলেন, জরা এগিয়ে এসো।

জরা তাঁর কাছে গিয়ে নতজানু হলে রাজা স্বহস্তে তার কণ্ঠে মালাটি পরিয়ে দিলেন। জরা নত হয়ে অভিবাদন জানালো রাজাকে।

বলা বাহুল্য জরার সম্মানে সভাসদগণ আনন্দিত হওয়ার বদলে তার উপরে অধিকতর বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠলো। আহ্লীক ও বাহ্লীক তো নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, এ আবার বীরত্ব তার আবার পুরস্কার। এ আমরাও পারতাম। রাজারা সবাই একচোখো। যত সব—

রাজা সিংহাসন ত্যাগ করে উঠলেন, উঠবার আগে সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বললেন, যুদ্ধ অনিবার্য, সৈন্যসামন্ত যেন ঠিক থাকে।

সেদিনকার মতো সভা ভঙ্গ হল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মহৎ আদর্শের অনুপ্রেরণায় দেশের যত্রতত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্করণের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতে আরম্ভ করেছে। মহা আদর্শ অনুসরণ করবার লোকের অভাব কখনোই হয় না।

(ক্রমশঃ)

দ্বিতীয় পর্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

নকল যুদ্ধের ফাঁকা আওয়াজ

১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর সকাল ১১-১৫ মিঃ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন লণ্ডন থেকে বেতারযোগে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে গিয়া ক্লান্ত কণ্ঠে (তখন তাঁর বয়স ৭০) বলিলেন :

"This morning the British ambassador in Berlin handed to the German Government a final note that unless we heard from them by 11 O'clock that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received and that consequently this country is at war with Germany.

উপসংহারের দিকে তিনি বলিলেন :

'Now may God bless you all and may He defend the right. For it is evil thing that we shall be fighting against — brute force, bad faith, injustice, oppression and persecution. And against them I am certain that the right will prevail.'

আর ঐদিনই দুপুরবেলা কমন্স সভায় তিনি যে সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা প্রকাশ করিলেন, তাতে সমগ্র ঘটনার এই পরিণতিতে তিনি তাঁর বিষন্ন অনুভূতির কথা স্পষ্টরূপেই জানাইয়া দিলেন :

'It is a sad day for all of us. For none it is sadder than for me. Everything that I worked for, everything that I hoped for, everything that I believed in during my public life has crashed into ruins this morning....

'I cannot tell what part I may be allowed to play myself, but I trust I may live to see the day when Hitlerism has been destroyed and a restored and liberated Europe has been re-established.'

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে গিয়া চেম্বারলেনের কণ্ঠে যে ব্যক্তিগত বিষাদ ও হতাশার সুর ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তা তাঁর পক্ষে আদৌ অস্বাভাবিক ছিল না। কারণ, বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীরূপে হিটলারের সমস্ত সংগ্রামী ও বে-আইনী কার্যকলাপে তিনি সায় দিয়া গিয়াছিলেন এবং সমস্ত প্রকার অনাচার ও অত্যাচার হজম করিলেন এবং শান্তিরক্ষার দোহাই দিয়া ফ্যাসিস্ট শক্তি-বর্গকে তুষ্ট করার জন্য চরম তোষণনীতির পথ ধরিয়াছিলেন। কিন্তু এতেও যখন কুলাইল না, তখন জনমতের চাপে পড়িয়া সেই যুদ্ধের পথেই যাইতে হইল, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত 'সাধনা ও স্বপ্ন' যেন চূর্ণ হইয়া গেল। তাঁর ঘোষণাবাণীর মধ্যে সেই হতাশারই সুর।

কিন্তু তথাপি একথাও অস্বীকার করার উপায় নাই যে, তাঁর এই বক্তৃতার মধ্যে মূলগতভাবে যে মর্মান্তিক সত্যগুলি ছিল হিটলারিজমের বিরুদ্ধে এবং অন্যায়, অত্যাচার ও পশুবলের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম শুরু হইল সেদিন থেকে, তার পরিণতি চেম্বারলেন দেখিয়া যাইতে পারেন নাই বটে, তবে, ইউরোপের শেষ পর্যন্ত মুক্তি ঘটিয়াছিল এবং পুনর্জন্মও হইয়াছিল, কিন্তু চেম্বারলেনের মত সাম্রাজ্যবাদ প্রেমিকদের পথ ধরিয়া নহে।

*

বৃটেনের যুদ্ধ ঘোষণার (ভারতবর্ষসহ সমস্ত সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের পক্ষ থেকে—একমাত্র কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি ডোমিনিয়নগুলি ছাড়া) ছয় ঘন্টা পর প্যারিস থেকে ফ্রান্সও হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে সরকারীভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, কিন্তু বৃটেনের চেয়েও অনেক বেশী অনিচ্ছার সঙ্গে। কারণ, ফ্রান্সের শাসকগোষ্ঠী ও ধনপতি মহলের মনোভাব ছিল—

— 'Rather Hitler than Stalin—!'

অবশ্য চেম্বারলেনের তোষণনীতির বিরুদ্ধে বৃটেনের পার্লামেন্টারি ও সরকারী মহলের এক শক্তিশালী অংশে ক্ষোভ ও অসন্তোষ জমিয়া উঠিতেছিল। সুতরাং শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকে যখন হিটলারের নিকট চরমপত্র পাঠাইবার সিদ্ধান্ত হইল এবং যুদ্ধ ঘোষিত হইল, তখন কিছু অভিনব প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড হ্যালিফাক্স, যিনি তোষণনীতির একজন বড় পাণ্ডা ছিলেন, তিনি পর্যন্ত মন্তব্য করিলেন—'যাক হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেছে, একটা সিদ্ধান্ত তো আমরা নিয়েছি। এরপর আমরা কয়েকজন মিলে ঠাট্টাবিদ্রূপ ও হাস্যকৌতুক করলুম।' আর সরকারবিরোধী দলের পররাষ্ট্রবিষয়ক বক্তা হিউ ড্যালটন সংবাদটা শুনিয়া উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—'খাসা খবর! ভগবানকে ধন্যবাদ!'

কিন্তু চেম্বারলেনের বেতার ভাষণ শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ লণ্ডনের বিমান আক্রমণের সতর্কতাজ্ঞাপক সাইরেন-গুলি বাজিয়া উঠিল এবং হুড়মুড় করিয়া লণ্ডনবাসীরা আশ্রয়স্থলে ঢুকিয়া পড়িতে লাগিলেন। স্বয়ং চার্চিল, যিনি সেই সময় লণ্ডনের একটি ফ্ল্যাটে বাস করিতেন, তিনিও আশ্রয়স্থলের দিকে ছুটিলেন, তবে, সঙ্গে 'এক বোতল ব্রাণ্ডি ও অন্যান্য আরামদায়ক উপযুক্ত মেডিক্যাল দ্রব্যাদি' নিতে ভুলিলেন না। অবশ্য প্রত্যাশিত বিমান আক্রমণ ঘটিল না, ১০ মিনিটের মধ্যেই 'মুক্তির' সাইরেন বাজিয়া উঠিল। কারণ, বিমান আক্রমণের এই সংকেত ছিল মিথ্যা। ১

উপরের এই ছোট্ট ঘটনার সঙ্গে পরবর্তীকালের আট মাসের ঘটনায় বিচিত্র মিল আছে। কারণ, ঐদিন লণ্ডনে বিমান আক্রমণের মিথ্যা সংকেতের মত গোটা পশ্চিম রণাঙ্গনেই পরবর্তী বসন্তকাল পর্যন্ত যুদ্ধের কেবল ফাঁকা আওয়াজ শুনা গেল। কিন্তু আসল যুদ্ধ কিছুই হইল না। এমন কি, যখন সমগ্র জগৎ উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষায় ছিল কিভাবে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গ তাঁদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পোল্যাণ্ডকে রক্ষার জন্য অগ্রসর হন, তখন কিন্তু সবিস্ময়ে দেখা গেল যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও বৃটেনের প্রভূত সৈন্য সমাবেশ সত্ত্বেও একটি গুলীও বর্ষিত হইল না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস—মোট আট মাসকাল সেই বিখ্যাত পশ্চিম রণাঙ্গন এবং রাইন নদীর উভয় তীর স্তব্ধ, ঘুমন্ত ও অলস পড়িয়া রহিল! হিটলারী বিদ্যুৎ-গতি যুদ্ধে পোল্যাণ্ড অতি দ্রুত খতম

---

(১) **Britain and the Second World War — by Henry Pelling. Collins, 1970. P. 12** এই পুস্তকে চার্চিলের যে ব্রান্ডির বোতলের কথা বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তাঁর মদ্যপানের আসক্তি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

হওয়ার পর অক্টোবর মাস থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সুদীর্ঘ দিনগুলি এভাবে কাটিয়া গেল এক অদ্ভুত নকল যুদ্ধের মহড়ায়। এই সময়টাকে চার্চিল বর্ণনা করিয়াছেন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে 'Twilight War (যুদ্ধের প্রদোষকাল?) নামে, কিন্তু পশ্চিমের অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা এটার যে বিদ্রূপাত্মক নাম দিয়াছেন, সেটাই সর্বজনের কাছে পরিচিত—পশ্চিম রণাঙ্গনের এই যুদ্ধের নাম Phoney War বা নকল যুদ্ধ কিম্বা যুদ্ধের ফাঁকা আওয়াজ! বার্লিনের রাস্তায় ঘাটে জার্মানরা ব্লিজক্রিগ বা বিদ্যুৎগতি যুদ্ধের বিপরীত অর্থে এই যুদ্ধকে ঠাট্টা করিয়া বলিত—'Sitzkrieg' বা 'বসে থাকার যুদ্ধ'! অর্থাৎ Sit down war, Bore War, War of words নামে পরিচিত ছিল।

কিন্তু এই অদ্ভুত Phoney war শব্দটি কে প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন? এই বিষয়ে একেবারে নিশ্চিতরূপে কারো নাম করা কঠিন। তবে, যতদূর জানা গিয়াছে মার্কিন মহল থেকেই প্রথমে এই নামকরণ হইয়াছিল। কিন্তু একজন ফরাসী ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক Roland Dorgeles দাবী করিয়াছেন যে, ১৯৩৯ সালের অকটোবর মাসে পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে রিপোর্ট পাঠাইবার সময় তিনি Phoney War শব্দটি প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বৃটিশ রয়েল ইনস্টিটিউটের স্টাফ সদস্যগণ লিখিয়াছেন যে, মার্কিন সেনেটের নামকরা সদস্য উইলিয়াম ই বোরা প্রথম এই শব্দটি 'আবিষ্কার' করিয়াছিলেন এবং তখন থেকেই এই কথাটি চালু হইতে থাকে। (২)

(২) British Foreign Policy During World War II, by V. Trukhanovsky, 1970, P. 33.

চোখের সামনে পোল্যাণ্ড যখন ধ্বংস হইতেছিল তখনও বৃটেন ও ফ্রান্স তাকে রক্ষার জন্য এক পা অগ্রসর হইলেন না। এমন কি, তার পরেও আট মাস ধরিয়া তাঁরা পশ্চিম রণাঙ্গনে নিষ্ক্রিয় রহিলেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে কার্যত সেই সময় পোল্যাণ্ডকে রক্ষা করা কিম্বা জার্মানীকে বাধা দেওয়া কি সম্ভব ছিল? —এর উত্তরে বলা হয় যে, ইঙ্গ-ফরাসীর মিলিত সামরিক শক্তির তুলনায় জার্মানীর শক্তি তখন অনেক দুর্বল ছিল এবং সেই সময় পর্যন্ত ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনী ইউরোপে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ধারণা ছিল। এমন কি, পরবর্তী কালে বড় বড় জার্মান সেনাপতির স্বীকারোক্তিতে দেখা যায় যে, যদি জার্মানীকে পশ্চিম রণাঙ্গনে সাহস করিয়া আক্রমণ ও আঘাত করা হইত, তবে, হয়তো এই মহাযুদ্ধের ইতিহাস অন্যরকম হইত। প্রসিদ্ধ জার্মান সেনানায়ক জেনারেল আলফ্রেড জড্‌ল লিখিয়াছেন যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে ফ্রান্স ও বৃটেনের সম্মিলিত ১১০ ডিভিসন সৈন্য জার্মানীর মাত্র ২৩ ডিভিসন সৈন্যের সম্মুখে একেবারে অলস বসিয়া রহিল। সুতরাং ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ নিবারিত হইতে পারিল না। আর একজন জার্মান সেনাপতি জেনারেল সিগফ্রিড ওয়েস্টফ্যাল লিখিয়াছেন যে, যদি মিত্রশক্তি সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ শুরু করিতেন, তবে, তাঁরা অনায়াসে রাইন নদী তীরে পৌঁছিতে, এমন কি তা অতিক্রম করিতে পারিতেন এবং তাহলে যুদ্ধের গতি ফিরিয়া যাইত। এই প্রসঙ্গে বৃটিশ সামরিক ইতিহাস প্রণেতা জেনারেল জে এফ সি ফুলার লিখিয়াছেন :

"পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সৈন্য-বাহিনী● প্রতিপক্ষের মতে ২৬ ডিভিসন সৈন্যের সম্মুখে ইস্পাত ও কংক্রীটের আশ্রয়ের আড়ালে অলস বসিয়া রহিল, আর তখন তাদেরই একজন সাহসী মিত্রকে (পোল্যাণ্ড) নিষ্ঠুরভাবে সাবাড় করা হইতেছিল!"

শ্রমিক নেতা হিউ ডালটন স্বীকার করিয়াছেন যে, 'পোলদের প্রতি আমাদের (বৃটেনের) আচরণ কোন মতেই সমর্থন করা সম্ভব নয়। কারণ, তাদের আমরা ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাদের মরিতে দিয়াছিলাম এবং তাদের সাহায্যের জন্য আমরা কিছুই করি নাই।'

এমন কি ২৫শে আগস্ট (১৯৩৯) তারিখ যেদিন বৃটেন ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তার আগের দিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত কেনেডি ওয়াশিংটনে এই মর্মে রিপোর্ট দিয়াছিলেন যে, চেম্বারলেন তাঁকে বলিয়াছেন যে, 'যাহোক, পোলদের বাঁচাইতে পারিবেন না!' ৩

৩ পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃঃ ২৮—২৯

এই পরাজিতের মনোভাব এবং যুদ্ধের অনিচ্ছা লইয়া বৃটেনের মত ফ্রান্সও পোল্যাণ্ডকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্সের প্রধান সেনাপতি জেনারেল গেমেলাঁ ২৩শে আগস্ট তারিখ (যখন পোল্যাণ্ডের উপর আক্রমণ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল) মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, দু' বছর বা ১৯৪১-৪২ সালের মধ্যে তিনি কোন আক্রমণাত্মক যুদ্ধ সংগঠন করিতে পারিলেন না এবং তাও সম্ভব হইতে পারে যদি বৃটেন সৈন্য দিয়া এবং আমেরিকা মাল-মশলা দিয়া সাহায্য করে!

অথচ জার্মানীর সমর বাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ জেনারেল কাইটেল এবং অপর সেনাপতি জেনারেল হ্যালডার নুরেমবার্গ আদালতে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, পোল্যাণ্ডের যুদ্ধের সময় পশ্চিম রণাঙ্গনে কিছুই ঘটিল না দেখিয়া তাঁরা খুব অবাক হইয়াছিলেন। কারণ, তাঁরা সর্বদাই ভয়ে ভয়ে ছিলেন যে, ফ্রান্সের শক্তিশালী বাহিনী যদি রাইন নদীর দিকে আক্রমণ করে, তবে, তাদের ঠেকানো যাইবে না এবং তারা জার্মানীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রম-শিল্পের এলাকা রুঢ় অঞ্চল বিপন্ন করিয়া তুলিবে! জার্মানীর তখন আত্মরক্ষার শক্তি সামান্যই ছিল। ৪

আসলে বৃটেনের মত ফ্রান্সেরও তখন যুদ্ধ করার কোন উৎসাহ বা স্পৃহা ছিল না। বরং চার্চিলের মতে এই যুদ্ধ তাঁরা হারাইয়াছিলেন অনেক আগেই—১৯৩৮ সালের মিউনিকে। ১৯৩৬ সালের রাইন-ল্যাণ্ডে এবং তারও আগে যখন হিটলার ভার্সাই সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিলেন!......

কিন্তু পশ্চিম রণাঙ্গনে 'রক্তপাতহীন' এবং অভিনব যুদ্ধের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিলেন হিটলার। তিনি হুকুম দিলেন তাঁর বিনা অনুমতিতে পশ্চিম দিকে যেন কোন আক্রমণ না চালানো হয়। এমন কি একটা প্লেনও যেন উড়িয়া গিয়া বোমা-বর্ষণ না করে। অর্থাৎ ইঙ্গ-ফরাসী পক্ষকে তিনিও যেন সামরিক নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে ঘুমাইয়া রাখিতে চাহিলেন—যদিও নিজে আদৌ নিষ্ক্রিয় ছিলেন না, বরং আক্রমণের পরিকল্পনাগুলি বার বার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। এমন কি আক্রমণের কতকগুলি তারিখও পর পর ঠিক করিয়া আবার পিছাইয়া গেলেন—তখন শীতকাল বা নভেম্বর-ডিসেম্বরের বিশ্রী আবহাওয়ার জন্য। বলা বাহুল্য যে, যে আটমাসকাল নকল যুদ্ধের মহড়ার জন্য সময় পাওয়া গেল, জার্মাণী সেই সময়টার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিল জার্মাণ অর্থনীতিকে পূর্ণভাবরূপে যুদ্ধের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য আর পোল্যাণ্ডের

(৪) উইলিয়াম স্পীয়ার প্রণীত 'দি রাইজ এণ্ড ফল অব দি থার্ড রাইখ' পৃষ্ঠা ৭৬২—৬৩

যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতির পূরণ এবং পশ্চিম রণাংগনে আক্রমণের সর্বাত্মক প্রস্তুতির জন্য।

কিন্তু জার্মাণীর তুলনায় সেই সময় ফরাসী বাহিনীর অধিকতর সামরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাদের ভীরু মানসিকতা এবং আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের প্রতি অত্যধিক ঝোঁক পশ্চিম রণাংগনের "সুবর্ণসুযোগ" (জার্মাণ সেনাপতিদের মতে) হাতছাড়া হইয়া গেল। আক্রমাত্মক যুদ্ধ পরিহারের অন্যতম বিশেষ কারণ ছিল ফ্রান্সের সুবিখ্যাত ম্যাজিনো লাইনের (ইস্পাত ও কংক্রীটের নির্মিত দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী—এই সম্পর্কে পরে আরও আলোচনা করা হইবে) উপর নির্ভরশীলতা। অজস্র কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই অদ্ভুত দুর্গশ্রেণী হিটলার আক্রমণ করিতে সাহস পাইলেন না, এমন একটা ধারণাও চলতি ছিল। অবশ্য ফ্রান্সের এই ম্যাজিনো লাইনের জবাবে জার্মাণীও তাদের পশ্চিম সীমানা সিগ-ফ্রীড্ লাইন তৈয়ার করিয়াছিল—যদিও এই দুর্গশ্রেণী ফ্রান্সের মত উৎকৃষ্ট ও মজবুত ছিল না এবং হিটলার আত্মরক্ষা-মূলক যুদ্ধে বিশ্বাসও করিতেন না। কিন্তু একদিকে ম্যাজিনো লাইন এবং অন্যদিকে সিগফ্রীড্ লাইন—এই দুই লাইনের কংক্রীটের আড়ালে বসিয়া দুই দিকের সৈন্যরাই যেন যুদ্ধের বদলে আড্ডা দিতে লাগিল। কারণ, একটি কামানের গোলাও নিক্ষিপ্ত হইল না। তখন বৃটিশ অভিযাত্রী দলের ফ্রান্সে আগত সৈন্যরাতো ঠাট্টা করিয়া গান বাঁধিলেন—

"We will hang out our washing
on the Siegfried Line —
If the Siegfried Line's still there!"

অর্থাৎ আমরা সীগফ্রিড্ লাইনে আমাদের জামা-কাপড় কেচে মেলে দিব—অবশ্য যদি ততদিন সীগফ্রিড্ লাইন টিকে থাকে।[৫]

[নকল যুদ্ধের অভিনব মহড়ার সময় সেদিনের সংবাদপত্রে এমন একটা মুখরোচক গল্পও প্রচারিত হইয়াছিল যে, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন পশ্চিম রণাংগন পরি-দর্শনে আসিয়া তাঁর বিখ্যাত ছাতাটি ফেলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং পরদিন গোয়েবলসের দপ্তর রেডিও থেকে প্রচার করিল যে, 'চেম্বারলেন সাহেব, আপনার ছাতাটি ফেরৎ নিয়ে যাবেন। আমরা যত্ন করে রেখে দিয়েছি'।

অবশ্য যুদ্ধের কোন ইতিহাসে চেম্বার-লেনের ছাতা শীর্ষক এই গল্পটি চোখে পড়ে নাই, কিন্তু পশ্চিম রণাংগনে যুদ্ধের নাম করিয়া কি হাস্যকর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, বোধহয় সেকথা প্রমাণের জন্যই এই গল্পের সৃষ্টি।]

•

পোল্যান্ড বা পূর্ব দিকে জার্মাণ বাহিনীর বৃহত্তম অংশ যখন ব্যস্ত ছিল, তখন ইংগ-ফরাসী বাহিনী পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ করিলে (যান্ত্রিক যুদ্ধের অপ্রস্তুতি সত্ত্বেও) জার্মানী যে বিপদে পড়িত, একথা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সে সব কিছুই ঘটিল না, তবে কিছু প্রচার-পুস্তিকার বা প্রোপাগান্ডার লড়াই হইয়াছিল। বৃটিশ বিমানগুলি জামানীর উপর কিছু ইস্তাহার বিলি করিয়াছিল এবং জার্মানীর দিক থেকেও ইংগ-ফরাসীর বিরুদ্ধে প্রচুর প্রোপাগান্ডা চালানো হইল। বৃটেনের রাজা ষষ্ঠ জর্জ পর্যন্ত এই তাজ্জব ব্যাপার দেখিয়া ৩রা মার্চ, ১৯৪০ তারিখে তাঁর ডায়েরীতে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ছয় মাস যাবৎ আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি কিন্তু একমাত্র কথার লড়াই ও প্রোপাগান্ডা ছাড়া আর কিছুই ঘটে না।

একথা সত্য যে চেম্বারলেনকে কেন্দ্র করিয়া সেদিন বৃটিশ সরকারী মহলে তোষণকারীর সংখ্যাই বেশী ছিল। তথাপি হিটলারী আচরণে ধৈর্য হারাইয়া স্বয়ং চেম্বারলেনই হঠাৎ ২৯শে মার্চ (১৯৩৯) তারিখ পোল্যান্ডকে গ্যারান্টি দিলেন তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য—যে সংবাদ শুনিয়া হিটলার ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন এবং শ্বেত পাথরের টেবিলের উপর মুষ্টাঘাত করিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন যে, তিনি বৃটিশকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িবেন। (প্রত্যক্ষ-দশী এডমিরাল ক্যানারিকের বর্ণনা থেকে) অবশ্য হিটলার এই 'শিক্ষা' দিয়াছিলেন পোল্যান্ডকে ও বৃটেনকে একই সংগে। অর্থাৎ বৃটিশ প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও পোল্যান্ড বিদ্যুৎগতিতে চুরমার হইয়া গেল। কিন্তু পোল্যান্ডের এই দ্রুত পরাজয়ের পর লন্ডনের এক শ্রেণীর সংবাদপত্র ও রাজ-নৈতিক নেতা জার্মানীর বিরুদ্ধে বৃটেনের যুদ্ধ ঘোষণা সত্ত্বেও পাল্টা সুর গাহিতে সুরু করিলেন। গোঁড়া রক্ষণশীল নেতা আলফ্রেড ডাফ কুপার এবং সাণ্ডে টাইমস পত্রিকা জার্মানীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, এই যুদ্ধ চালাইয়া লাভ নাই, তবে, জার্মানীতে হিটলার ও নাৎসী শাসনের বদলে অন্য কোন দক্ষিণপন্থী শাসনের প্রতিষ্ঠা দিতে হইবে এবং সেই অবস্থায় বৃটেনের সংগে বুঝাপড়া সহজ-তর হইবে। (১৯৩৯ সালের লন্ডনে রাজ-নৈতিক মহলের কোন কোন অংশ সত্যই বিশ্বাস করিতেন যে, বার্লিনের শাসক-মহলে হিটলারের বিরোধী যে মুষ্টিমেয় লোকের একটি গ্রুপ আছে, বিশেষ করে কিছু কিছু অসন্তুষ্ট সেনাপতি আছেন, তাঁদের হাত শক্তিশালী করিয়া ক্ষমতায় আনিতে পারিলে হিটলারের বদলে এই দলের সংগে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে? এই মনোভাবের প্রতিফলন দ্বারা দেখা যায় যে, ১৯৩৯ সালের শরৎকালে দুই পক্ষ থেকেই কিছু কিছু শান্তির টোপ ফেলা হইয়াছিল। এজন্য যুক্তি দেখান হইল যে, বৃটেন ও ফ্রান্স পোল্যান্ড রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল, কিন্তু রাষ্ট্র হিসাবে পোল্যান্ডেরই যখন আর কোন অস্তিত্ব নাই, তখন এই যুদ্ধ চালাইবারও কোন হেতু নাই। সেপ্টেম্বর-অকটোবর মাসগুলিতে এজন্য বৃটেন ও জার্মানীর মধ্যে 'শান্তি' প্রতিষ্ঠার কিছু কিছু চেষ্টা হইয়াছিল এবং এই প্রসংগে বৃটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের এজেন্ট ব্যারণ ডি রপ্ (Ropp) এবং একজন সুইডিশ ব্যবসায়ী Birger Dahlerus' -এর কর্ম-তৎপরতার কথা বিভিন্ন ইতিহাস পুস্তকে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত চেষ্টা সফল হয় নাই। এমন কি এই সময় হিটলারের 'শান্তি প্রস্তাব'ও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। এর কারণ চেম্বারলেনের যুদ্ধ-প্রীতি নয়, এর বিশেষ কারণ শেষ পর্যন্ত হিটলারের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা ও অবি-শ্বাসের মনোভাব। ১৯৩৯ সালের ৮ই অকটোবর তিনি তাঁর ভগ্নীকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—'মুস্কিল কি জানো হিট্-লারের কোন কথাই বিশ্বাস করা যায় না!"[৭]

কিন্তু হিট্লারকে বিশ্বাস করা না গেলেও তাঁর 'মিতা' ও 'বড়দা' মুসো-লিনীকেও কি বিশ্বাস করা যায় না? যদি এই দুঃসময়ে অন্ততঃ ইতালীকেও দলে টানা হয়, তাহলেও বৃটেনের মস্ত লাভ। এজন্য মুসোলিনীকে তোয়াজ করার যথেষ্ট চেষ্টা হইল। স্বয়ং চার্চিল ১লা অক্টোবরের এক রেডিও বক্তৃতায় বলকান অঞ্চলে ইতালীর বিশেষ স্বার্থের কথা স্বীকার করিলেন এবং যুদ্ধের পর ইউরোপের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে ইতালীর অধিকার মানিয়া লওয়া হইবে বলিয়া এক প্রস্তাব দিলেন এবং নভেম্বর মাসে ঘোষণা করিলেন যে, ভূমধ্যসাগরে বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত একত্রে ইতালীরও 'ঐতিহাসিক অংশীদারত্ব' স্বীকার করা হইবে। এর একমাস আগে বৃটিশ সরকার ইতালী কর্তৃক আলবেনিয়া দখলকে 'কার্যতঃ কুটনৈতিক স্বীকৃতি' দিলেন। আর সেই সংগে অনেকগুলি

(৫) The War — by Louis L. Snyder, P. 134.

(৬) British Foreign Policy During World War II, Moscow, P. 33.

৭। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃঃ ৪০

অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাও ইতালীকে দেওয়া হইল।

কিন্তু এই সমস্তই বৃথা গেল। ১৯৪০ মার্চ মাসে পশ্চিম রণাঙ্গনে হিট্‌লারের সংকল্পিত অভিযানের মুখে ফুয়েরার মুসোলিনীর নিকট নিশ্চিত প্রতি-শ্রুতি চাহিলেন যে, ইতালী জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করিবে কিনা? ১৮ই মার্চ ব্রেণীর গিরিবর্ত্মে হিটলার-মুসোলিনীর মধ্যে সাক্ষাৎকারের পর চূড়ান্তরূপে স্থির হইয়া গেল যে, ফ্যাসিস্ট ইতালীও যুদ্ধ যাত্রায় নাৎসী জার্মানীর সঙ্গী হইবে। সুতরাং ইতালীকে দলে টানবার জন্য বৃটেনের লোভনীয় প্রস্তাবগুলি মাঠে মারা গেল।......

এদিকে যুদ্ধ বাধিবার পর চেম্বারলেন তাঁর মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করিলেন এবং শান্তির সময়কার বৃহৎ মন্ত্রিসভার বদলে (প্রথম মহাযুদ্ধে লয়েড জর্জের অনুকরণে) অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্ত্রিসভা কিম্বা ওয়ার্-ক্যাবিনেট গঠন করিলেন। ২৩ জনের বদলে এই যুদ্ধ-মন্ত্রিসভা চেম্বারলেন বাদে মাত্র আটজন সদস্য নিয়া গঠিত হইল এবং এই মন্ত্রিসভার হাতে সমগ্র যুদ্ধ-পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হইল। চেম্বারলেন ছাড়া এই যুদ্ধ-মন্ত্রিসভায় স্থান পাইলেন স্যার জন সাইমন (অর্থমন্ত্রী) ভাইকাউন্ট হ্যালিফ্যাক্স (পররাষ্ট্র মন্ত্রী) স্যার স্যামুয়েল হোর (লর্ড প্রীভি সীল) লর্ড হাঙ্কি (দপ্তরহীন মন্ত্রী) লর্ড চাটফিল্ড (প্রতি-রক্ষা বিভাগীয় সংযোগসাধন মন্ত্রী), উইনস্টোন চার্চিল (নৌবিভাগীয় মন্ত্রী) লেসলি হোর বেলিসা (যুদ্ধমন্ত্রী) এবং স্যার কিংসলি উড্ (বিমানসচিব)। লক্ষ্য করিবার এই যে, এই যুদ্ধমন্ত্রিসভার মধ্যে একমাত্র চার্চিল ও হোর বেলিসা ছাড়া আর বাকী সকলেই ছিলেন চেম্বারলেনের মিউনিক নীতির একনিষ্ঠ সমর্থক। অথচ চার্চিলের জনপ্রিয়তা ছিল বেশী, এজন্য তাঁকে না নিয়েও উপায় ছিল না।৮ কিন্তু চেম্বারলেন চার্চিলকে মন্ত্রিসভার এমন কোন পদ দিতে চাহিলেন না, যে পদের সুযোগ নিয়া তিনি যুদ্ধের সমগ্র রণ-নীতির উপর কর্তৃত্ব খাটাইতে পারেন। অর্থাৎ মিনিস্টার ফর কো-অর্ডিনেশন অব্ ডিফেন্স—এই গুরুত্বপূর্ণ পদটি তিনি দিলেন এডমিরাল লর্ড চ্যাটফিল্ডকে আর চার্চিলকে সেই আগেকার (১৯১১-১৫ সালের অনুরূপ) নৌ-বিভাগেই ঠেলিয়া দিলেন। ৯

সাধারণতঃ যুদ্ধের সংকটে প্রায় সমস্ত দেশের জাতীয় মন্ত্রিসভা বা কোয়ালিশন, অর্থাৎ সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু চেম্বারলেনের তোষণনীতি রক্ষণশীলদের বাইরে যথেষ্ট ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল। এজন্য লেবর এবং লিবারেল কিম্বা শ্রমিক ও উদারনৈতিক উভয় দলই চেম্বারলেনের মন্ত্রিসভায় সদস্যপদ গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু যদিও তাঁরা মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে বিরত রহিলেন, তবু তাঁরা চেম্বারলেনকে সর্বতোভাবে সমর্থন জানাইয়া যাইতে লাগিলেন। যদি এই সমর্থন না ঘটিত, তবে, সেই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা আরও জটিল হইয়া পড়িত। কারণ, চেম্বারলেনের নীতির বিরুদ্ধে রক্ষণ-শীলদের একাংশের মধ্যেও মতবিরোধ ছিল।

যদিও ফ্রান্স সেই সময় বৃটেনের একমাত্র সমর-সঙ্গী ছিল, তবু বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, উভয়ের মধ্যে মনের মিল ছিল না। বরং পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিল। অবশ্য এর কারণ রহিয়াছে ইতিহাসের গভীরে। ইউরোপীয় কূটনীতিক ও শক্তিদ্বন্দ্বের প্রভাব এবং আধিপত্য খাটাইবার চেষ্টায় ফ্রান্স ও বৃটেনের চিরন্তন প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রথম মহাযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও জার্মানী সম্পর্কে ভীতি ইত্যাদি মিলিয়া ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্ককে অত্যন্ত জটিল করিয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর উভয়ের পক্ষ হইতে অনিচ্ছার সঙ্গে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইয়া থাকিলেও এই দুই সমরসঙ্গী পর-স্পরকে সন্দেহের চোখে দেখিতেন। বৃটেনের মনে এই আশংকা ছিল যে, ফ্রান্স জার্মানীর সঙ্গে এক সন্ধি করিয়া ফেলিতে পারে। আর ফ্রান্সের মনে এই সন্দেহ ছিল যে, বৃটেন এই যুদ্ধে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে তার আসল শক্তি নিয়োগ না করিয়া (প্রথম মহা-যুদ্ধে বৃটেনের আসল উদ্বেগ ছিল সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ রক্ষার জন্য, এজন্য মধ্যপ্রাচ্যে যথাসম্ভব বেশী শক্তি সংহত করা হইয়াছিল) অতীতের মতই সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য কৌশল অবলম্বন করিতে পারে। এই মনোভাবের ফলে গোড়ার দিকে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ চালাইবার জন্য ঐক্য ও সংহতি গড়িয়া উঠিল না। জার্মানীর সঙ্গে যাতে পৃথক যুদ্ধবিরতি ও শান্তি চুক্তি সম্পাদিত না হইতে পারে, তেমন প্রতিশ্রুতিমূলক সম্মিলিত ঘোষণাপত্রে (Joint declaration) স্বাক্ষরদানের জন্য বৃটিশ প্রস্তাব সম্পর্কে ফ্রান্সের তদা-নীন্তন প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড দালাদিয়েরের বিশেষ কোন উৎসাহ দেখাইলেন না—১১ই ডিসেম্বর ১৯৩৯। অবশেষে মন্ত্রিসভা থেকে দালাদিয়েরের বিদায় এবং পল রেণোর প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর ফরাসী ও বৃটিশ সরকার ১৯৪০ ২৮শে মার্চ এই মর্মে এক সম্মিলিত ঘোষণায় স্বাক্ষর দিলেন যে, যুদ্ধ চলাকালীন তাঁরা কেউ পরস্পরের সম্মতি ছাড়া জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ-বিরতি বা শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিবেন না।...

পশ্চিম রণাঙ্গনে যখন "ভেজাল যুদ্ধের' বিচিত্র কারবার চলিতেছিল আট মাস ধরিয়া তখন কিন্তু রুশ-ফিনিশ যুদ্ধে (১৯৩৯ নভেম্বর—১৯৪০ মার্চ) সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিণ মহলে উৎসাহের অভাব ছিল না। সুতরাং যুদ্ধের পিছনে রাজনৈতিক মতাদর্শও লক্ষ্য করিবার মত। সেই কাহিনী পরবর্তী অধ্যায়ে।

---

(৮) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক : পৃঃ ৫৮

(৯) Britain and the Second World War — by Henry Pelling, P. 51.

(তৃতীয় পর্ব)

(৪)

দিনের বেলা সবকিছু দেখতে পাই, শুনতে পাই। আশেপাশের দূরের কাছের। পরিচিত-অপরিচিতের। হাসপাতালের ডাক্তার-নার্স-কম্পাউন্ডার-পেসান্টরা দিনের বেলায় আমার চারপাশে ভিড় করে থাকে। চোখের সামনে, মনের পর্দায় ভিড় করে থাকে আরো কত মানুষ। তখন সবাই আমার কাছে। শুধু আমিই আমার থেকে দূরে থাকি।

কিন্তু রাত্রিতে? যখন আমার চারপাশে ভিড় থাকে না, যখন অসংখ্য মানুষের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার কোরাসে আমার মনের সেতারে বেসুরো সুর বাজে না, তখন? নিজেকে দেখতে পাই, নিজের কথা শুনতে পাই। চড়েরগড়ার মাথায় এই সার্কিট হাউসের বারান্দায় একলা একলা বসে থাকি। ঘন্টার পর ঘন্টা। নোয়াপুকুরী, মতনগর দেখতে পাই না। ভালই। বসে বসে ভাবি। নিজের কথা। অতীতের কথা, ভবিষ্যতের কথা। ভাবতে ভাবতে কোন সুদূরে চলে যাই তা নিজেই টের পাই না।

সার্কিট হাউসের বারান্দায়, ড্রইং রুমে অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে। তাই নিয়ম। লোকজন না থাকলেও জ্বলে। আমি বারান্দার আলো অফ করে দিই। অন্ধকারে চুপি চুপি নিজেকে দেখতে ভাল লাগে। ড্রইংরুমে আলো থাকলেও পর্দা টেনে দিই। সে আলো বারান্দার আমার কাছে আসতে পারে না। অনুমতি নেই।

সার্কিট হাউসে লোকজন থাকলে আমি আমার ঘরে চলে যাই। রাতের আবছা আলোয় অপরিচিত পুরুষের কাছাকাছি থাকতে ভয় করে। আশঙ্কা হয়। শুয়ে থাকি, বসে থাকি। কখনও আগে খেয়ে নিই, কখনও পরে। সার্কিট হাউসে অফিসাররা না থাকলে কখনও কখনও এই পাহাড়ের উপর ঘুরে-ফিরে বেড়াই। হাটতে হাটতে হয়ত একটা পাথরের টিপির পর বসি। হয়ত পায়ের কাছ থেকে ঘাস ছিঁড়ে দাঁত দিয়ে হাত দিয়ে কাটি, ছিঁড়ি।

কোন কিছু ঠিক নেই। যা মন চায়, তাই করি। কোন মতে সময়টা কাটিয়ে দিই। কাটাতে হয়। উপায় নেই। আর কোন রাস্তা নেই। গতি নেই। প্রথম প্রথম দু-চারদিন ভালই লাগত। এখন আর ভাল লাগে না। বিশ্রী লাগে। একলা একলা কতক্ষণ, কতদিন ভাল লাগে? আপনজন কেউ কাছে নেই, ঠিকই, কিন্তু একজন পরিচিত, একজন বন্ধুও তো থাকতে পারত। চা খেতে খেতে একটু গল্প করতাম, হাসি-ঠাট্টা করতাম। হয়ত একটু ঘুরে ফিরেও বেড়াতে পারতাম। আরো কত কিছু পারতাম। অন্যান্য ডাক্তারদের মত অফ-ডে'তে কটক যেতে পারতাম। সিনেমা দেখতাম, রেস্তোরায় খেতাম। পরমানন্দ অত্যন্ত ভদ্র, সভ্য। আমাকে সম্মান করে। বেশ লাগে ওকে। কিন্তু ওকে নিয়ে তো অফ-ডে কাটান যায় না। কাটাই না।

দিনের বেলায় নিজের হৃদয়-স্পন্দন শুনতে পাই না। যত সমস্যা এই রাত্রি নিয়ে। দিনের মত রাত্রি সর্বজনীন নয়। এর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। চরিত্র আছে, মাদকতা আছে। দিনের বেলা ফিল্মের গান শোনা যায় কিন্তু রাত্রিতেই সত্যিকার গানের আসর হয়। রাত্রের অন্ধকারে, নিঃস্তব্ধতার মধ্যে শিল্পী সুর পায়, শ্রোতা মন পায়। সুর আর সাধনার মিল দিনের বেলা হতে পারে না। এই রাত্রিতেই সৃষ্টির কারিগর ফুল ফোটান, সাধক সাধনা করেন, মানুষ ভালবাসে। দিনের বেলায় ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিস খোলা থাকে কিন্তু শুভদৃষ্টির রোমাঞ্চ, বাসর-ঘরের আনন্দ, ফুলশয্যার অনুভূতির জন্য রাত্রির প্রয়োজন। আর এই রাত্রিতে আমি সুরহীন, ছন্দহীন জড় পদার্থের মত পড়ে থাকি এই সার্কিট হাউসে।

আমার এই দুঃখের কথা, কষ্টের কথা, কাউকে বলি না। বলতে পারি না। পারব না। চুপ করে বসে থাকি। আপন মনে ভাবি। ভাবতে ভাবতে জ্বালা অনুভব করি। নিঃসঙ্গতার জ্বালা, যৌবনের জ্বালা, ব্যর্থতার জ্বালা। মাঝে মাঝে অসহ্য মনে হয়। গাছপালা, পশুপক্ষী, জীব-জন্তু—সবারই একটা স্বাভাবিক ধর্ম আছে। হিমালয়ের কোলে জন্ম হলেও সমুদ্রের সঙ্গে মিলনের মধ্যেই নদীর সার্থকতা। আমি ডাক্তার হলেও মেয়ে। আমি যুবতী। স্বামীর ভালবাসায়, পুত্র-কন্যার কলরবের মধ্যে নিজেকে বিলীন করলেই আমার আনন্দ। সার্থকতা। স্বামী-পুত্র তো দূরের কথা, একটা বন্ধু পর্যন্ত আমার নেই। দিনের মধ্যে বারো ঘন্টা বোবা হয়ে বসে থাকি। থেকেছি। এই সার্কিট হাউসের বারান্দায় অথবা আমার ঘরে। কিন্তু আর কতকাল?

সার্কিট হাউসে যারা এসেছেন, এক-বেলা বা এক রাত্রির জন্য, তাদের থেকে আমি দূরে থাকি। সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দু-একজন আমাকে দেখেছেন। আমি বুঝতে পেরেছি। ভাল লাগেনি। ভাল লাগে চৌকিদারের ছোট্ট ছেলেটাকে। মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে ও আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমি হাসি, ডাক দিই। ও আসে না। চুপ করেই দাঁড়িয়ে থাকে। বিস্কুট-টফি দিলেও কাছে আসে না। আমাকে নিশ্চয়ই ওর ভাল লাগে না অথবা অদ্ভুত মনে হয়। ওর মার সঙ্গে যে আমার অনেক পার্থক্য। ওর মা স্বামীর সেবা করে পুত্রের তদারক করে। আমি? চাকরি করি। আমি বসে থাকি। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। হয়ত ওর মায়ের মত স্নেহের দৃষ্টিতে তাকাতেও পারি না। আমাকে ওর ভাল লাগবে কেন? ভাল লাগার তো কোন কারণ নেই।

একটা মাস তবু কাটল। আর যেন কাটতে চায় না। হাসপাতালে কাজের চাপ একটু বেশী হলে ভাল হতো। আর এমুও হয়ে সারা সময় হাসপাতালে থাকলেই হয়ত ভাল থাকতাম। ব্যস্ততার মধ্যে ডুবে থাকতাম। রোগীদের চিন্তায় নিজের চিন্তা অনেকটা ভুলতে পারতাম। তাও হলো না। এই এক মাসের মধ্যে মাত্র দুদিন সন্ধ্যার পর আমাকে হাসপাতালে যেতে হয়েছে। একবার একটা লেবার কেসের জন্য প্রায়

সারা রাত হাসপাতালের লেবার রুমে কাটিয়েছিলাম। রাত আড়াইটার পর মাত্র দুজন নার্স নিয়ে সিজারিয়ান করলাম। ঢেংকানলে আসার পর ঐ একটি রাত শুধু অপরের চিন্তায় মশগুল ছিলাম। নিজের চিন্তায় নয়। সে এক স্মরণীয় রাত্রি। আর একদিন কটকে গিয়েছিলাম। জরুরী কেনা-কাটার কাজ ছিল। না গিয়ে উপায় ছিল না বলেই গিয়েছিলাম। তাছাড়া হেলথ ডিপার্টমেন্টের জীপ এক্সরে মেসিনের একটা পার্টস দিয়ে খালি ফেরত যাচ্ছিল বলেই আরো গিয়েছিলাম। 'র‍্যাভেনশ' কলেজের ধারের দোকানগুলো থেকে কেনা-কাটা সেরেই ফিরেছিলাম। দুটো অফ-ডেব সংগে এক-আধ দিনের ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে কত জায়গা বেড়ান যায়। কিন্তু একলা একলা ইচ্ছা করে না। একলা একলা দুঃখ ভোগ করা যায়, আনন্দ উপভোগ সম্ভব নয়। কোনার্কের ঐ মিথুন মূর্তির সামনে আমি নিঃসংগ নির্বাক হয়ে থাকব? কোন অর্থ হয় না। তাই তো এই সার্কিট হাউসের সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ার নিয়ে বসে থাকি। মধ্যবিত্ত সাধারণ বাঙালী হয়ে পাহাড় আর সমুদ্রের প্রতি আমার দারুণ আকর্ষণ। বাংলাদেশে নদী-নালার অভাব নেই কিন্তু আমরা কলকাতায় বাস করে লেকের ধারে বসে কবিত্ব করি, প্রেম করি। ফিল্মের স্যুটিংও হয়। সমুদ্রের কথা ভাবলেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়। সমুদ্রের এত কাছাকাছি এসেও সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি না। পারব না।

আমি এখনও কোয়ার্টার পাইনি। আগের ডাক্তারবাবুর ফ্যামিলী আছে। ওর ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করছে। স্কুল ছাড়ালেই পড়াশুনোর ক্ষতি। উনি আরো কিছুদিন কোয়ার্টার রাখতে চান। আমার মতামত চাওয়া হয়েছিল। আমি আপত্তি করিনি। এখানে তবু মানুষ দেখতে পাই, চৌকিদারের ছোট্ট ছেলেটাকে চকোলেট দিতে পারি, ওর বিস্ময়ভরা চোখ দুটো দেখতে পারি। আলাদা কোয়ার্টারে থাকলে আরো বিচ্ছিন্ন, আরো নিঃসংগ হয়ে পড়ব।

কদিন ধরেই ভাবছি পরমানন্দকে জিজ্ঞাসা করব কিন্তু করিনি। পারিনি। লজ্জা করেছে। ভেবেছি পরমানন্দ যদি কিছু ভাবে। হয়ত কিছু ভাববে না কিন্তু ভাবাটাই স্বাভাবিক। সামনের দিকের কটেজে একজন ভদ্রলোককে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতে, লেখাপড়া করতে দেখি। আমি এই বারান্দায় বসে বসে দেখতে পাই উনি টেবিল লাইটের সামনে বসে অনেক রাত পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। মনে হয় ভদ্রলোক বেশ সিরিয়াস। কাজটিও বোধহয় বেশ দায়িত্বপূর্ণ। বারান্দার বসে বসে যতটুকু দেখতে পাই তাতে মনে হয় বয়স বেশী নয়। আমার বয়সী হবেন। চড়েরগড়ার অন্ধকারের মধ্যে ওকে টেবিল লাইটের আলোয় কাজ করতে দেখলে বেশ লাগে। অনেকবার ভেবেছি পরমানন্দকে জিজ্ঞাসা করব উনি কে? কি করেন? কতদিন থাকবেন?

ভদ্রলোক ঠিক কবে এসেছেন জানতে পারিনি। রোজ হাসপাতাল থেকে ফেরার সময় ঐ কটেজের পাশ দিয়ে আসি কিন্তু খেয়াল করিনি। তাছাড়া ঐ সময় নিশ্চয়ই কটেজের জানলাগুলো বন্ধ থাকে। খোলা জানলার ধারে ভদ্রলোককে কাজ করতে দেখলে একবার না একবার চোখ পড়তই। পড়েনি। উনি নিশ্চয়ই সারাদিন বাইরে বাইরে কাটান। সন্ধ্যার অন্ধকারে কখন আসেন তাও টের পাই না। রাত্রি একটু গভীর হলেই ভদ্রলোককে দেখতে পাই। উনি আলো জেলে কাজ করেন। আমি অন্ধকারে বসে থাকি। আমি ওকে দেখতে পাই। উনি আমাকে দেখতে পান না। আমি অন্ধকারের মানুষ। আমাকে হয়ত কেউই দেখতে পান না। ভালই।

না, না। কেউই যদি আমাকে দেখতে না পায় তাহলে আমি বাঁচব কিভাবে? আমার অতীত দিনের বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষীরা আমাকে দেখছে না, দেখতে চায় না কিন্তু কোন নতুন বন্ধু, নতুন শুভাকাঙ্খী কি আমাকে দেখবে না?

সাড়ে সাতটা-আটটার পরই পরমানন্দ বাড়ী যায়। তারপরই খেয়ে নিই। তবে রোজ নয়। কোন তাগিদ তো নেই। দুপুরের পর হাসপাতাল থেকে এসে খাওয়া-দাওয়া করে রোজই একটু ঘুমিয়ে পড়ি। তাই রাত্রে ঘুম আসতে চায় না। বারান্দায় বসে বসেই দেখতে পাই বাস-স্ট্যান্ডের কর্মচাঞ্চল্য বন্ধ হলো। সার্কিট হাউসের সামনে পায়চারী করতে করতে দেখতে পাই সারা শহরটাও ঘুমের ঘোরে ঢুলে পড়ছে। মাঝে মাঝে সামনের রাস্তা দিয়ে টুং টুং করে ঘন্টা বাজিয়ে সাইকেল রিকসা যাতায়াত করছে। অথবা দু-একটা সাইকেল। রাত একটু বেশী হলে তাও বন্ধ হয়ে যায়। তখন শুধু মাঝে মাঝে মাল-বোঝাই লরী বিকট আওয়াজ করতে করতে ছুটে যায় সম্বলপুরের দিকে।

আমার দুচোখে তখনও ঘুম আসে না। একটু বসি, একটু ঘুরে বেড়াই। আর বার বার দৃষ্টিটা চলে যায় ঐ সামনের কটেজের দিকে। ঐ ভদ্রলোকের কাছে।

বেশ ভাল লাগে দেখতে। এতদিন কাউকে দেখতে পেতাম না। দেখিনি। এখন ঐ কটেজের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অনেক সময় কেটে যায়। আগে আমার শূন্য দৃষ্টি হাহাকার করে ঘুরে বেড়াত এই চড়েরগড়ার অন্ধকার পাহাড়ে। এখন একটা অবলম্বন পেয়েছে।

আমি ওকে দেখি। রোজ। সন্ধ্যায়, রাত্রিতে। কখনও বারান্দায় বসে, কখনও ঐ কটেজের একটু দূরে দিয়ে পায়চারী করতে করতে। জানি না উনি আমাকে দেখেছেন কিনা। মনে হয় দেখেননি। তাহলে নিশ্চয়ই আলাপ করতেন। আমার আলাপ করতে ইচ্ছা করে। ভদ্রলোককে দেখতে বেশ। বেশ শান্ত সমাহিত। চোখে মুখে কোথাও উগ্রতার ছাপ নেই। কোন মালিন্য নেই।

গত কয়েক মাসে আমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগে সুনীলকে দেখলেই কেমন একটা চাঞ্চল্য অনুভব করতাম। সারা শরীরে একটা বিচিত্র শিহরণ বোধ করতাম। ওকে বলতাম না। বললেই আমার দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ত। এখন আর সেই শিহরণ বোধ করি না। দেহের দাবী, রক্ত-মাংসের দাবী আজ চাপা পড়েছে। চাপা দিয়েছি। কিন্তু মনের ক্ষুধা, শূন্যতা বড় বেশী পীড়া দেয়। একলা থাকলেই মনের মধ্যে যন্ত্রণা অনুভব করি। একজন বন্ধু পেলে, একটু হাসতে পারলে, প্রাণ খুলে কথা বলতে পারলে নিশ্চয়ই ঐ অব্যক্ত অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেতাম। কিন্তু ভগবান বোধহয় আমাকে কোন যন্ত্রণার হাত থেকেই রেহাই দেবেন না।

কটেজের আলো নিভে গেলে আমি আমার ঘরে যাই, শুয়ে পড়ি। এপাশ-ওপাশ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ি কিন্তু ঘুমের মধ্যেও ঐ কটেজের ছোট্ট টেবিল লাইটের আলো যেন আমাকে ইসারা করে ডাকে।

(ক্রমশঃ)

চাণক্য চাকলাদারের বিচিত্র কীর্তিকথা

অদ্রীশ বর্ধন

এ কাহিনীর সব চাইতে রোমাঞ্চকর অধ্যায় এইটি। অধ্যায়ের প্রতিটি ছত্রে যে লোমহর্ষক বিবরণ, তা আজগুবী বলেই মনে হয়। কিন্তু তাহলে তো চাণক্য চাকলাদারের গোটা ডাইরীটাকেই অলীক কল্পনা করে নিতে হয়।

•

সমুদ্র। নীল জল দুলছে, নাচছে, ফেণার মুকুট পরে তরঙ্গ ছুটছে।

জাহাজ। প্যাসেঞ্জার শিপ। অন্তত দেখে তাই মনে হয়। ডেকে অলস চরণে বায়ু সেবন করছে অনেকেই। কিন্তু প্রত্যেকেই সজাগ। কোমরে লুকোনো নিকষকালো অটোমেটিক। দূরে কক্সবাজারের বন্দর।

জাহাজের ওপরে ছদ্মবেশী শান্ত্রী। নীচে স্ট্রংরুম। ইস্পাতকক্ষ। বিবিধ মহার্ঘ বস্তুর মধ্যে রয়েছে হীরে বোঝাই বাক্স।

স্ট্রংরুমের তলায় সমুদ্র।

সেখানে ভাসছে মাসা দাউদের ডুবো যান। উল্টোনো ঘন্টার ফাঁদালো মুখ লেগে রয়েছে স্ট্রংরুমের তলায়—ইস্পাত চাদরে। ঘন্টা এখন জলশূন্য। ভেতরে ঠেস দিয়ে বসে চাণক্য চাকলাদার।

চাণক্যর কপালে বেল্টে বাঁধা ইন্সপেক-সন ল্যাম্প। প্রখর বিদ্যুৎবাতি। দাঁতে কামড়ে রেখেছে অ্যাকুয়ালাং মাউথপিস--নাকেও রবার ক্লিপ। অ্যাকুয়ালাংয়ের পেছন থেকে রবার নল চলে গেছে ডুবো যানের

ভেতরে। অক্সিজেন ঐ পথেই আসছে। চাণক্যর এক হাতে অক্সি-অ্যাসিটিলিন টর্চ। আর এক হাতে চাঁচবার ছুরি। জাহাজের খোলের তলা চাঁচছে চাণক্য। ঘন্টার কিনারা যেখানে চেপে বসেছে ধাতুর খোলে—সেইখানকার চাদর চেঁছে শ্যাওলা সাফ করছে। ইঞ্চি আস্টেক জায়গা সাফ করা হল। দ্রুত হাতে আরও তিন দিকে চেঁছে নিল চাণক্য।

আলখাল্লার পকেটে চালান হল ছুরি। দু হাতে বাগিয়ে ধরল লোহা গালানোর টর্চ। দু-পা দিয়ে চেপে রইল হ্যাচের ওপরকার রবারের চাকতিটা। এই চাকতির মধ্য দিয়েই অক্সি-অ্যাসিটিলিন টর্চ আর ওর নিঃশ্বাস-যন্ত্রের অক্সিজেন পাইপ গিয়েছে। সিলিন্ডার রয়েছে ডুবোযানে।

আলখাল্লার আর একটা পকেট থেকে ওয়েল্ডিংয়ের ধাতুর টুকরো বার করল চাণক্য। জ্বলে উঠল অক্সি-অ্যাসিটিলিন টর্চ। তীব্র নীল অগ্নিশিখা নিমেষে স্পর্শ করল জাহাজের খোল আর ঘন্টার কিনারা। টকটকে রাংগা হয়ে উঠল আট ইঞ্চি জায়গা। ধাতু গালিয়ে গালিয়ে ঘন্টার কিনারার সংগে জাহাজের খোল জুড়তে লাগল চাণক্য।

ঘন্টার স্বল্প পরিসরে তীব্র অগ্নিশিখায় ঘেমে নেয়ে উঠল চাণক্য। হাওয়া নেই এতটুকু। ওয়াটার-টাইট ঘন্টা-প্রকোষ্ঠ। তার ওপর এই উত্তাপ। অ্যাকয়ালাংগ না থাকলে দম বন্ধ হয়ে অনেক আগেই পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি ঘটত চাণক্যর।

বিশ মিনিটের মধ্যে কাজ সারতে হবে চাণক্যকে। অভিযানের এইটাই হল প্রথম ও কঠিনতম পর্যায়। লোহার সংগে লোহা-গালিয়ে ঘন্টাকে মজবুতভাবে সেঁটে দিতে হবে স্ট্রংরুমের তলায়। তাই ঘন্টার কিনারা বরাবর চারদিকে চেঁছে নিয়েছে চাণক্য। এখন লোহা গালিয়ে খোলার গায়ে ঘন্টা লাগানোর পালা।

সময় মাত্র বিশ মিনিট। কেন না জাহাজ এখানে দাঁড়াবে মোট তিরিশ মিনিট। দশ মিনিট লেগেছে মাসা দাউদের জাহাজ থেকে এ জাহাজের তলায় আসতে এবং ঘন্টা লাগিয়ে পাম্প চালিয়ে ঘন্টাকে জল-শূন্য করতে।

আসবার সময়ে কোনো অসুবিধে হয়নি চাণক্যর। বরং বিচিত্র শিহরণ অনুভব করেছে প্রতিটি রোমকূপে। মাসা দাউদের সংগঠন যে কি বিপুল, তার প্রমাণ এই ক'দিনেই পাওয়া গিয়েছে। বিস্মিত হয়নি চাণক্য।

মাসা দাউদের নির্দেশে ডবল-হ্যাচ খুলে চাণক্য ডুবো যানের ভেতরে প্রবেশ করেছিল। ওপরের রেলিংয়ে দাঁড়িয়েছিল ইসাবেলা। হাতে হাতকড়া। মুখ ভাব-লেশহীন।

বাকিটুকু চাণক্য দেখেনি। দেখেছিল ইসাবেলা।

মড়ার চোখ মেলে দাঁড়িয়েছিল মাসা দাউদ। চাণক্য এবং তার সঙ্গী সেই 'ঝাউবন সাগরেদ ডাইভিং সসারে প্রবেশ না করা পর্যন্ত কোনো কথা বলে নি।

তারপরেই শোনা গেল ফাইনাল অর্ডার —"স্টার্ট।"

গোঁ গোঁ করে গুমরে উঠল একটা ইঞ্জিন। নাইলন দড়ির প্রান্তে ঝোলানো ডাইভিং সসার ঘাঁটি ছেড়ে ঈষৎ ঊর্ধ্বে উঠে পড়ল। মাত্র কয়েক ইঞ্চি উঠে দুলতে লাগল শূন্যে।

প্রখর বিদ্যুৎবাতিতে ঝকঝক করতে লাগল ডাইভিং সসারের বলয়াকার সবুজ ফাইবার গ্লাস। দুদিকে দুটো প্লেক্সি গ্লাসের মস্ত পোর্টহোল। পেছন দিকে জোড়া পাখনা। পাখনার দুপাশে দুটো মোটা নল, সমকোণে বেঁকানো। এই দুটো ডুবোযানের জেট-নল। এরই ভেতর দিয়ে বেগে নিক্ষিপ্ত হয় পাম্প করা জল—সামনে ঠেলে নিয়ে যায় ডুবোযানকে।

একটা পোর্টহোলে চাণক্যর মুখ দেখা গেল। মাথায় বেল্টে আটকানো ইলেকট্রিক টর্চ।

ঝুলন্ত ডুবোযানের নিচের পাটাতন শূন্য। ভুমোভুমো চারটে কাঠের ওপর বসানো ছিল ডুবো যান। মাসা দাউদের এক স্যাঙাৎ এসে সরিয়ে নিয়ে গেল সেগুলো। ডাইভিং সসার এখন ঝুলছে একটা জলনিরোধক চেম্বারে। কুঠরির ওয়াটার-টাইট দরজাগুলোও বন্ধ হয়ে গেছে। কুঠরির গায়ে বড়বড় পোর্টহোলের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে তখনও নাইলন দড়ির প্রান্তে শূন্যে ঝুলছে ডাইভিং সসার।

কাকে যেন ইসারা করল মাসা দাউদ। লোকটাকে দেখতে পেল ...না ইসাবেলা। কিন্তু পরক্ষণেই জাগ্রত হল একটা নতুন শব্দ।

গুম-গুম-গুম-গুম। গুরু গম্ভীর আওয়াজ। সমস্ত জাহাজ যেন কাঁপছে সেই শব্দে। ডাইভিং সসারের ঠিক নিচে একটা ফাটল দেখা গেল। ইস্পাতের প্লেট দুপাশে সরে যাচ্ছে। পিচ আর শন দিয়ে ফাটলটা আগে বন্ধ ছিল বলে ইসাবেলা বুঝতেও পারে নি সুইচ টিপে ওখানে পথ বার করা যায়।

ইস্পাত-পাত দুপাশে সরে গেছে। কক্স বাজারের কালো তেলাতেলে জল উঠে এসেছে খোলের মধ্যে। কিন্তু বেশি উঠতে পারে নি। জল নিরোধক, বায়ু নিরোধক কুঠরির ভেতরকার বাতাসের চাপেই কিছু উঠেই রুদ্ধ হয়েছে জলের ঊর্ধ্বগতি।

মাসা দাউদের পরবর্তী ইঙ্গিতে নাইলন দড়ি নেমে আসছে। গোঁ গোঁ করছে ইঞ্জিন। ধীরে ধীরে ডাইভিং সসার নেমে পড়ল জলে। প্লেক্সিগ্লাসের পোর্ট হোল ডুবে গেল। জল ছাপিয়ে উঠল চাণক্যর চিবুক-নাক-কপাল ছাড়িয়ে।

কুঠরির চারদিকে বেষ্টন করা সরু প্লাটফর্মে কয়েকজন দৌড়ে উঠে গেল। ঝাঁকুনি দিতেই ডাইভিং সসারের স্টীল বেল্ট-এর ঘাঁটি থেকে খুলে গেল নাইলন দড়ির হুক।

প্রায় সংগে সংগেই জল উঠতে লাগল উল্টোনো ঘন্টার মধ্যে। ডুবোযান থেকেই পাম্প করে জল তুলছে। ঘন্টায় জল ভরে না নিয়ে ডুব দিলে কেলেংকারী হবে। হঠাৎ জলের ধাক্কায় উল্টে যেতে পারে ডুবোযান।

ঘন্টার কানায় কানায় এখন জল। রেডিও-ট্রান্সমিটারের সামনে গিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে মাসা দাউদ। এখন থেকে ডাইভিং সসারের সংগে যোগাযোগসূত্র এই রেডিও।

ডুবছে ডুবোযান। দেখতে দেখতে তেলতেলে কালো জলে ডুবে গেল ঘন্টা সমেত ক্ষুদে সাবমেরিন। জল-আলো হয়ে গেল ডুবোযানের জোরালো সার্চ লাইটে।

স্টীল প্লেট আবার বন্ধ হচ্ছে। গুরু গুরু ধ্বনি আবার শোনা যাচ্ছে। বন্ধ হয়ে গেল ফাটল। ওয়াটার-টাইট দরজা খুলে দৌড়ে গেল লোকজন। শন আর পিচ দিয়ে বন্ধ করতে লাগল ফাটল দিয়ে জল-চুঁয়োনো।

•

এত কাণ্ড অবশ্য চাণক্য দেখেনি। ইসাবেলার মুখে পরে শুনেছিল। জলে নামবার পর হীরে বাহক জাহাজের তলায় এসেছে ডুবোযান। লোহান মূর্তির অটো-মেটিক ট্রান্সমিটার বিপ-বিপ সংকেত পাঠিয়েছে। ডুবোযান সেই সংকেত ধরে এগিয়েছে। পাওয়া গেছে স্ট্রংরুমের তলদেশ।

দশ মিনিট এই সবেই গেছে। হাতে আছে মাত্র বিশ মিনিট। বিশ মিনিট পরেই জাহাজ আবার চলবে। তার আগে যদি ঘন্টাকে খোলের সংগে ওয়েল্ডিং না করা যায়—জলের ধাক্কায় ডুবোযান সমেত ভেসে যাবে ঢেউয়ের সংগে।

এক জাতের মানুষ আছে, ডিসি-প্লিন যাদের রক্তে। বিপদমুহূর্তে এদের মনও ডিসিপ্লিন মেনে চলে। তাড়াহুড়ো করে না। সেই মুহূর্তে যেটি করণীয়—সেই টুকু নিয়ে তন্ময় থাকে।

চাণক্য সেই জাতের মানুষ। তাই প্রাণ সংশয় জেনেও ছটফট করে নি। নার্ভাস হওয়া তো দূরের কথা। দ্রুত হাতে ঘন্টার ইস্পাত বেল্টকে লোহা গালিয়ে লাগিয়েছে জাহাজের খোলে। তারপর খোলের ইস্পাত প্লেট আর ঘন্টার ইস্পাত প্লেটের মধ্যের ফাঁকটুক ভরাট করেছে শন আর প্লাস্টিকের মিকসচার দিয়ে। রবারের চাকতির মধ্যে দিয়ে সেলোফেন নলের মধ্যে ভরা মিকসচার এগিয়ে দিয়ে-ছিল 'ঝাউবন' সাগরেদ। সেই সংগে একটা কাঠের হাতুড়ি। ফাঁকের মধ্যে মিকসচার

ঠেসে হাতুড়ি দিয়ে টাইট করেছে চাণক্য। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শুকিয়ে যাবে মিক্‌সচার। কামড়ে ধরবে ফাঁকটুকু। এক ফোঁটা জলও ঢুকতে পারবে না।

কাজ শেষ। হাঁপাচ্ছে চাণক্য। ঘামছে দরদর করে। ধোঁয়ায় ভরে গেছে ঘণ্টার অভ্যন্তর। অ্যাবয়ালাং-এর মাউথপিস কামড়ে জোরে জোরে শ্বাস নেয় চাণক্য। এলিয়ে পড়ে ঘণ্টার গায়ে। পা মেলবারও জায়গা নেই। কোনো মতে জোড়া লাথি মারে ডবল-হ্যাচে। রবারের চাকতিটা ঠেলে মুখ বাড়ায় 'ঝাউবন' সাগরেদ। কাঠের হাতুড়ি তার সেলোফেনের শূন্য মোড়ক নিয়ে আবার অন্তর্হিত হয়।

নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়েছে। সহসা থরথর করে কেঁপে ওঠে জাহাজের তলদেশ। সেই সঙ্গে ঘণ্টা।

কাঠ হয়ে যায় চাণক্য। জাহাজের সঙ্গে ঘণ্টার জোড় আদৌ মজবুত হয়েছে কিনা—সে পরীক্ষা হবে এইবার। কাঁপুনির ফলে যদি ওয়েল্ডিংয়ে চিড় খায় —তাহলেই সর্বনাশ। জাহাজ চলার সঙ্গে সঙ্গে খসে পড়বে ঘণ্টা সমেত ডুবোযান। পরিসমাপ্তি ঘটবে মাসা দাউদের হীরে লুণ্ঠন পর্বের।

সেই সঙ্গে গর্দান যাবে চাণক্য ও ইসাবেলার।

তাই উদ্বেগে সিঁটিয়ে ওঠে চাণক্য। পরীক্ষার মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছে। জাহাজও নড়ে উঠেছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলির মধ্যে দিয়ে অতিকষ্টে তাকায় চাণক্য। ললাটে ইন্স-পেকসন টর্চও নিষ্প্রভ মনে হয় ধূম্রপুঞ্জের মধ্যে।

না। জোড়ে চিড় খায় নি। ঘণ্টার সঙ্গে স্ট্রংরুমের তলদেশ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। এ জোড় আর ভাঙবে না।

আবার জোড়া পায়ের লাথি মারে চাণক্য ডবল-হ্যাচে। এবার গুনে গুনে তিন-বার। অর্থ—পরীক্ষায় পাশ করেছি। ধোঁয়া সাফ করো।

গুন গুন করে পাম্প চালু হয়ে যায়। জাহাজের ইঞ্জিন চলার শব্দে ঢাকা পড়ে যায় সে শব্দ। ধোঁয়া সাফ হয়ে আসছে। ডুবোযান থেকে পাম্পে গ্যাস টেনে নিয়ে বাইরে ছেড়ে দিচ্ছে 'ঝাউবন' চালক। মানসচক্ষে দেখতে পায় চাণক্য, বুদ্‌বুদ উঠছে চলমান জাহাজের পাশে। কিন্তু কেউ বুঝতেও পারছে না। চলন্ত জাহাজের উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে বুদ-বুদের সারি।

গলায় ঝোলা মাইক মুখের কাছে চাণক্য বলে—'অল ক্লিয়ার।'

অর্থাৎ, 'অপারেশন ডায়মণ্ড'-এর প্রথম পর্ব সমাপ্ত। এতক্ষণে বোধহয় উল্লাসের হুল্লোড়ও শুরু হয়ে গেল হার্মাদ জাহাজে।

ধোঁয়া সাফ হয়ে গেছে। ঘণ্টার অন্ধকারে শুধু জ্বলছে ইন্সপেকশন ল্যাম্প। লিকলিকে দেহটাকে তেউড়ে বেঁকিয়ে ঘণ্টার গায়ে লেপটে রয়েছে চাণক্য। যেন একটা অতিকায় গিরগিটি।

অক্সি অ্যাসিটিলিন টর্চ বাগিয়ে ধরে মানুষ-গিরগিটি। ড্রাগনের জিহ্বার মত নীলচে অগ্নিশিখা স্পর্শ করে স্ট্রংরুমের তলদেশ।

আর বিশ মিনিট...তারপরেই ইস্পাতের গোল চাকতি খসে পড়বে হীরক-কুঠারির মেঝে থেকে!

*

পোর্ট হোল দিয়ে ইসাবেলা দেখল, হীরে-বাহক জাহাজ চলছে। সমান দূরত্বে 'ফলো' করছে মাসাদাউদের এই জাহাজ।

মাংচু বলল—'বস, ওরা যদি স্ট্রংরুমে ঢুকে পড়ে?'

'কেন?' মড়ার চোখ তুলল মাসাদাউদ।

'আমরা ফলো করছি বলে।'

'স্ট্রংরুমে না গিয়ে ওরা এখন দূরবীণ দিয়ে দেখছে আমরা কামান-বন্দুক সাজাচ্ছি কিনা। পোর্টে আগু-পিছু কত জাহাজ যায়—আমরাও একটু পরে খসে পড়ব। তারপর...'

কথাটা শেষ করল মাংচু—'বাটাভিয়া পৌঁছে ওরা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে স্ট্রংরুম খুলবে। দেখবে স্ট্রংরুমের তলায় ফুটো। হীরের বাক্স উধাও।' খট্টাস হাসি গলায় এসেও আটকে যায় মাংচুর। মাসাদাউদ উৎকর্ণ হয়ে শুনছে রেডিও সিগন্যাল।

ভেসে এল চাণক্যর ক্লান্ত কণ্ঠ—'আলিবাবা।'

*

স্ট্রংরুমের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল চাণক্য চাকলাদার।

পায়ের কাছে গোল গর্ত। এবড়ো-খেবড়ো কিনারা। মাইক্রোফোনের তারের গোছা চাণক্যর গলা থেকে নেমে ফুটোর মধ্যে দিয়ে গিয়েছে ডুবোযানে। অক্সি-অ্যাসিটিলিন 'কাটার' নামিয়ে নিয়ে গেছে 'ঝাউবন' সাগরেদ। বদলে হাতে গছিয়েছে তালা কাটবার কয়েকটি যন্ত্র।

স্ট্রংরুমের একদিকের দেওয়াল ঘেঁসে রয়েছে দুটি বাক্স। মাসাদাউদ এই বাক্সরই ফোটোগ্রাফ দেখিয়েছিল আসবার সময়ে। গায়ে ঝুলছে প্যাডলক।

হেঁট হল চাণক্য। তালা ভাঙা তার কাছে ছেলেখেলা। দেখতে দেখতে খসে পড়ল প্যাডলক দুটি। ডালা খুলে আলগা প্যাকিং সরিয়ে নিল চাণক্য। ললাটের টর্চে ঝলমল করে উঠল রাশি-রাশি উজ্জ্বল নুড়ি। হীরে।

বন্ধ হল ডালা। পকেট থেকে বেরুলো দুটো নতুন প্যাডলক। বাক্সে তালা দিয়ে মাইকে বলল চাণক্য—'গোলকুণ্ডা।'

অর্থাৎ, কিস্তিমাৎ। হীরে পাওয়া গিয়েছে।

'ঝাউবন' সাগরেদ উঁকি দিচ্ছে মেঝের ছিদ্র দিয়ে। ডুবোযান থেকে উঠে এসেছে ঘণ্টার ভেতরে। হীরে বোঝাই বাক্সর দিকে তাকিয়ে আছে লোলুপ নয়নে।

টেনে-হিঁচড়ে বাক্স দুটো গর্তর কিনারায় নিয়ে গেল চাণক্য। 'ঝাউবন' মাথায় করে নামিয়ে নিল নিচে। নেমে পড়ল চাণক্য। মুখ বাড়িয়ে শেষবারের মত দেখে নিল কিছু পড়ে রইল কিনা।

ডবল হ্যাচ খোলাই ছিল। আগে নামল 'ঝাউবন'। ওপর থেকে একে-একে দুটি বাক্স নামিয়ে দিল চাণক্য। সবশেষে নামল নিজে।

মাইকে মুখ লাগিয়ে বলল—'কোহিনুর'।

অর্থাৎ, 'অপারেশন ডায়মণ্ড' সফল হয়েছে। হীরের বাক্স নির্বিঘ্নে পৌঁছেছে ডুবোযানের গর্ভে।

'ঝাউবন' ততক্ষণে মাথার ওপরে 'হ্যাচ' আঁটছে। পর-পর দুটি 'হ্যাচ' শক্ত করে বন্ধ করার পর 'কন্ট্রোল' বোর্ডে ঝুঁকে পড়ল। টিপে ধরল একটা বোতাম। ইঞ্জিনের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। পরক্ষণেই শব্দ হল—ঘটাং।

ঘণ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ডুবো-যান। যে স্টীল প্লেটের সঙ্গে লেগে ছিল ডুবোযান আর ঘণ্টা—তা খুলে গেল। হু-হু করে জল ঢুকছে জলের ট্যাঙ্কে—ভারী লোহার মত তলিয়ে যাচ্ছে ডুবোযান। নইলে বিপদ। জাহাজের প্রপেলারের সঙ্গে সংঘর্ষ লাগতে পারে। মাথার ওপর গুম-গুম শব্দ শোনা যাচ্ছে। ইঞ্জিন-গুঞ্জন। জলের মধ্যে দিয়ে মেঘ গর্জনের সে শব্দ আছড়ে পড়ছে ডুবোযানের ওপর। দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল আওয়াজটা।

এবার ফেরার পালা। পেছনেই গুটি-গুটি আসছে মাসাদাউদের জাহাজ। তারই বিবরে আবার প্রবেশ করবে অভিনব ডাইভিং-সসার।

মানস-চক্ষে দেখল চাণক্য—বাটাভিয়ায় নোঙর ফেলেছে হীরেবাহক জাহাজ। খোলা হয়েছে স্ট্রংরুম। মেঝের ফুটো দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গিয়েছে রক্ষীবাহিনীর। ফুটোর নিচে ওয়েল্ডিং-করা ঘণ্টা। ঘণ্টার তলদেশে ওয়াটার-টাইট 'হ্যাচ'। এক ফোঁটা জলও ঢোকে নি।

কিন্তু হীরের বাক্স এরই মধ্যে দিয়ে উধাও হয়েছে। কোথায়? সমুদ্র-তিমিরের হার্মাদ প্রেতদের খপ্পরে?

এ রহস্য রহস্যই থেকে যাবে চাণক্য চাকলাদারের মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত।

*

কিন্তু মুক্তির সম্ভাবনা তিরোহিত হল অচিরেই

মাসাদাউদের রৌদ্রজ্জ্বল রুম। ইসাবেলাও দাঁড়িয়ে সেখানে। হাতে হাত-কড়া।

অন্ধকারে ভেসে এল চাণক্যর কণ্ঠ—'কোহিনুর'।

মাসাদাউদ রুমাল বার করল। কপাল মুছে মড়ার চোখ তুলল ইসাবেলার দিকে—'এবার হীরে বেচবার পালা।'

'মানে?' সেক্স-তারকা ব্রিগিৎ বার্দোর মত মদির কটাক্ষ হানে ইসাবেলা।

মড়ার চোখ কিন্তু অচঞ্চল থাকে—'হীরে বিক্রির প্ল্যান আমি করেছিলাম। তাতে খরচ বেশী পড়ছে। ঝামেলা বেশি। থানডারের প্ল্যানে খরচ কম, ঝামেলা কম।'

'থানডার যদি রাজী না হয়?' ইসাবেলা এবার কিম লোভাক হয়ে গেল। রাঙা রূপ ফেটে পড়ল রক্তিম কপোলে।

রুমাল পকেটে রেখে উঠে দাঁড়াল মাসাদাউদ।

সংক্ষেপে বলল — 'দুটো মাথাই যাবে তাহলে।'

•

হোটেল বারান্দায় দাঁড়িয়ে ত্র্যম্বকলাল। পাশে আচিন।

ত্র্যম্বকলাল কিঞ্চিৎ বিমূঢ়। হাতে দুটি টেলিগ্রাম। পাঠিয়েছে হীরে-বাহক জাহাজের ক্যাপ্টেন।

প্রথম টেলিগ্রাম বলছে, ঘণ্টাখানেক ধরে একটা মাল জাহাজ অনুসরণ করছে তাদের। ডেকে শান্ত্রীরা তৈরী। কামান-বন্দুক সাজানো।

দ্বিতীয় টেলিগ্রাম বলছে, মিছিমিছি ভয় পেয়েছিল ক্যাপ্টেন। ঘণ্টা দুয়েক পেছনে থাকার পর মাল-জাহাজটা এইমাত্র অন্য দিকে চলে গেল।

ভ্রূকুটি করে আচিন বলল—'ইডিয়ট।'

'কে?' চমকে উঠল ত্র্যম্বকলাল।

'ক্যাপ্টেন। মাল জাহাজেই আছে মাসাদাউদ, চাণক্য আর ইসাবেলা। অকারণে কেউ পেছন-পেছন যায় না।'

'ওটা তোমার অনুমান। ঐ তো 'ব্লু-হোয়েল' ভাসছে। ওরা তো ওখানেও থাকতে পারে।'

'বেশ তো, সার্চ করান। এখুনি।'

রিসিভার তুলল ত্র্যম্বকলাল। ঘণ্টা-খানেক পরে খবর এল—'নীল তিমি'র জঠরে সবাই আছে—নেই কেবল যাদের খোঁজা হচ্ছে।

মাথায় [illegible] বসে পড়ল ত্র্যম্বক-লাল।

ছ ঘণ্টা পর।

অকাতরে ঘুমোচ্ছিল চাণক্য চাকলাদার। হাতে হাতকড়া ফিরে এসেছে। এমন সময়ে নরম হাতের ছোঁয়া লাগল কপালে। আপনা হতেই খুলে গেল চোখের পাতা।

ইসাবেলা। হাতে হাতকড়া। তবুও হাত বুলোচ্ছে কপালে। চাণক্যর চোখের কাছে নড়ছে একটা খোলা ক্ষুর।

'একী!' শুধোয় চাণক্য।

'নড়ো না।'

'কেন?'

'দাড়িটা কামিয়ে দিই।'

'ক্ষুর পেলে কোথায়?'

'মাংচু দিয়েছে। ক্ষুর দিতে আপত্তি কি? গাল অথবা নিজের গলা কাটা ছাড়া ক্ষুরের আর কোন কাজ নেই।'

'হাতে হাতকড়া। পারবে?'

চোখ ঘুরিয়ে বলল ইসাবেলা—'ভুলে গেছো মনে হচ্ছে?'

না, ভোলেনি চাণক্য। স্পেনে এক সেলুনে দাড়ি কামানোর কাজ পেয়েছিল ইসাবেলা। সাধারণ সেলুন নয়। সমাজ-শিরোমণিদের গোপন রক্ষিতা-পল্লীর প্রাইভেট সেলুন। মত্ত খরিদ্দারদের সামলাতে হয়েছে হাতে ক্ষুর নিয়ে। শিখেওছে অনেক।

সন্নিকটে বসে সেই ইসাবেলা। অঙ্গে অতি-ক্ষীণ অন্তর্বাস। দেহের উষ্ণতা প্রতিটি রোমকূপে অনুভব করে চাণক্য।

বলে—'ইসা।'

আলতো করে চাণক্যর চোখের পাতা টেনে ধরে ইসাবেলা। অর্থাৎ, সাবধান। ঘরে গোপন মাইক্রোফোন আছে। বেফাঁস কথা বলবে না।

এরকম কয়েকডজন ইসারা-ভাষা নিয়ে অভিযানে নামে চাণক্য-ইসাবেলা। শত্রু-পক্ষের সামনেও অবাধে মনোভাব বিনিময় করে। কেউ ধরতেও পারে না।

হুঁশিয়ার হল চাণক্য। শুরু হল আবোল-তাবোল কথা। ইসাবেলার নতুন প্রণয়ীর খবর কি? ব্রেজিলে এক রকম গাছড়া পাওয়া গিয়েছে। হপ্তায় কয়েকবার খেলেই নাকি কয়েক বছর বন্ধ্যা হয়ে থাকে মেয়েরা। চুলে 'ল্যাকার' দেওয়া ভাল, না খারাপ? ইত্যাদি *

(১৭)

লাল গালার সেই টেবিল। মাসা-দাউদের কেবিন। মুরগীর ঠ্যাং চিবুচ্ছে তুমরোমুখো পালের গোদা।

পোর্টহোলের কাছে দাঁড়িয়ে চুইংগাম কামড়াচ্ছে, মিসেস ফ্যানটমাস। চোখ রয়েছে চৈনিক ফুলদানীর ওপর। অলস চোখে দেখছে তামার ওপর পাথরের কাজ।

ঘরে ঢুকল মাংচু। লোকটার চলন-বলন সবই যেন নর-বানরের মত। ক্ষিপ্র-চরণ, নিঃশব্দ গতি। লাডাক কার্পেটের ওপর দিয়ে যেন হাওয়ায় উড়ে এল।

মড়ার চোখ তুলল মাসাদাউদ—'কি বলছে ওরা?'

'টেপ রেকর্ড হচ্ছে। কাজের কথা কিছু না', জবাব দিল মাংচু।

'হীরে বেচা সম্বন্ধে?'

'ইসাবেলা বুঝিয়ে বলল থানডারকে।'

'রাজী?'

'কোন জবাব দিল না।'

'কি মনে হয় ওদের? গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেশে ছেড়ে দিয়ে আসব?'

'দুজনেরই বিশ্বাস, ছাড়া ওরা পাবেই।'

'আর কি বলছিল?'

'হাবিজাবি অনেক কথা।'

'যেমন?'

'রোমান পোলানস্কির বউকে ডাইনী তাড়া করেছিল কি? সিংগাপুরে বিটলসদের গানের রেকর্ড বাজেয়াপ্ত করে সরকার ভালই করেছে। হিপিদের দর্শন ইসাবেলার ভাল লাগে। কেউ-কেউ যদিও বলে ওরা আসলে গুপ্তচর। অথবা অন্য গ্রহের জীব। শর্মিলা ঠাকুর বেশি সুন্দরী, না সায়রাবানু? লুই-মাল কেন বলেছেন সত্যজিৎ রায়ের চেয়ে মৃণাল সেনের সঙ্গে কথা বলে বেশি আরাম? লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু কি সত্যিই রাজনৈতিক হত্যা?'

'হীরে নিয়ে নতুন কোন কথা বলে নি?' মুরগীর ঠ্যাং চিবুতে ভুলে যায় মাসা-দাউদ।

'না।'

সব চুপ। কিছুক্ষণ পরে মিসেস ফ্যান-টমাস বলল—'ওরা ছাড়া পেলে কিন্তু আমাদের সর্বনাশ।'

আধবোজা চোখে তাকায় মাসাদাউদ। এক কামড় 'চিকেন' পরম তৃপ্তিসহকারে চিবুতে-চিবুতে বলে—'নেভার মাইণ্ড। ওরা ছাড়া পাবে না।'

'সত্যি?' সচল হিমাচলের ছোল-দেঁতো মুখ বিকট উল্লাসে আরো জঘন্য দেখায়।

'মিসেস ফ্যানটমাসের হাতের কব্জায় মরবে বলেই ওরা জন্মেছে।'

(ক্রমশঃ)

---

* এই পরিচ্ছেদের কিছু অংশের জন্যে ত্রিবেণী [illegible] বাণী-রইলাম।*

বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাক্ষেত্র

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ, তথা ভারতবর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের মতন শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব বিরল। তিনি এদেশের প্রথম গ্র্যাজুয়েট; সাহিত্যসম্রাট; ঋষিকল্প; অন্যতম এবং অগ্রগণ্য বিদ্বান ব্যক্তি। তাঁর সমকালে এবং পরবর্তীকালেও তাঁর মতন এমন একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি এদেশে—এই নারায়ণী ধরণীর কালে চোখ খুলে তাকান নি।

তিনি যখন এদেশে আবির্ভূত হলেন তখন পশ্চিমদিগন্তে ডুবছে ভারতের গৌরব উজ্জ্বল দিনমণি—বিরতবোধ করছেন আফগান যুদ্ধে ক্লান্ত, শ্রান্ত বৃটিশ রাজনীতিবিদদের দল, পঞ্চনদের কূলে ঘনায়মান হয়েছে ভাংগনের চিহ্নসমূহ; শতদ্রু ইরাবতী যমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে অবলীলায়। কেবল ভাগীরথী কলস্বরে সচকিত করে দশদিক, ভারতসাগর তীরে বহন করে নিয়ে এলো শুভ সংবাদ—বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিন।

অন্ধকারের উৎস থেকেই উৎসারিত হলো আলো। অশিক্ষিত বাংলাদেশের তিমির ক্ষেত্রে শিক্ষার আলোকক্ষেত্র বিস্তীর্ণ করতে এলেন বঙ্কিম। তিনি যে সেটি করবেন তাঁর পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল সেই দূরশৈশবেই। পাঁচ বৎসর বয়সে হলো তাঁর হাতেখড়ি। গুরু মহাশয় হাতেখড়ি দিয়ে ক, খ, লিখে দিলেন। আর দু'বার তা দেখাতে হলো না, একদিনেই তিনি ক, খ, গ, ঘ, ঙ, অ, আ আরম্ভ করে ফেললেন। অচিরেই শেষ হয়ে গেল বর্ণমালা।...বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্র তবু সেই সাবেক গুরুমশাই-র টোলই, একালের কিণ্ডারগার্টেন বা ঐ ধরণের কোন কিছু নয়। গুরুমশাইর কাছে এই শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই লিখেছেন ঃ—"....................আবার একজন "গুরুমহাশয়" নিযুক্ত হইলেন। আমার ভাগ্যোদয়ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভাগমন। কেননা আমাকে ক, খ, শিখিতে হইবে।" অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাক্ষেত্র যথারীতি বিস্তৃত হলো মেদিনীপুরের এক উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে। অতি শৈশবকালেই তিনি টিড্ সাহেবের এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। আজকের মতন ছাত্রের অভিভাবকের ইচ্ছায় নয়, স্বয়ং প্রধানশিক্ষক মহাশয় মিঃ এফ, টিড সাহেবেরই অনুরোধক্রমে।

বালকবয়সে যেমন একবেলার মধ্যেই তিনি বর্ণপরিচয় আয়ত্ব করে ফেলেছিলেন তেমনি এই স্কুলে ভর্তি হয়েও অসাধারণ মেধার পরিচয় দিতে থাকলেন। বস্তুতঃ লেখাপড়ায় তাঁর ক্ষিপ্রতা ও দ্রুত উন্নতি দেখে শিক্ষককুল বিস্মিত হলেন। কিন্তু একালের মেধাবী ছাত্রের মতন কেবল পাঠ্যপুস্তকের সীমিত পরিধিতেই শিক্ষাক্ষেত্রের দেয়াল গেঁথে তোলেন নি ছাত্র বঙ্কিম। মুক্ত জ্ঞানের অধিকার জন্মেছিল তাঁর সেই বিস্মৃত বালককালেই। তাই তাঁর শিক্ষাক্ষেত্র মাত্র এগার বছর বয়সেই সীমাখণ্ডন করতে পেরেছিল রোলিরাস সাহেবের সমস্ত প্রাচীন ইতিহাস, হিউমের ইংলণ্ডের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ আদ্যন্ত অধ্যয়নে।

তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাক্ষেত্র প্রসারিত হলো দেখি হুগলী কলেজে। এখানেও তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশিত হয়েছে নানাদিকে, নানাভাবে। সেখান থেকে অবশেষে তিনি পড়তে এলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। পড়লেন নানান বিষয়ের সংগে আইন। সর্বত্রই তাঁর ক্ষমতা সাফল্যের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করলো।

কিন্তু এসবই হলো স্কুল কলেজের সীমাবদ্ধতার মধ্যে অর্জিত। এখানে ব্যাপ্তি কোথায় শিক্ষার? বিস্তৃতি কোথায়? যা' থেকে পরবর্তীকালের মননশীল বঙ্কিম গড়ে উঠেছেন?

নেই। আর নেই বলেই নাস্তির কোলেও নিশ্চিন্তে নিদ্রাজীবনে লীন হয়ে যান নি বঙ্কিম।......

হুগলী কলেজে পড়বার সময় তিন বছর কয়েক মাসের মধ্যে নানান কাজে ব্যস্ত থেকেও তিনি ভাটপাড়ার শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের টোলে মাস, ভারবি, নৈষধ প্রভৃতি ও দুরূহ সমগ্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়ে সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে এই সংস্কৃত শিক্ষা তাঁর অশেষ উপকারে লেগেছিল। উত্তরজীবনে তিনি যে গীতা, উত্তররামচরিত ও মহাভারতের সমালোচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন তার পূর্বসূত্র কিন্তু শনৈ শনৈ রচিত হয়েছিল ঐ টোলেরই শিক্ষাক্ষেত্রে।

বিদ্যামন্দিরের সংকীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে কোনদিনই মূর্ছিত হয় নি তাঁর শিক্ষা। তাঁর ছিল বিরাট প্রতিভা আর শিক্ষাক্ষেত্রও ছিল সুদূর-প্রসারিত। তা যদি না হতো তবে বঙ্কিমচন্দ্রও যে হতেন এদেশের আপামর শিক্ষিত জনতার মতন ক্ষুদে এলাকার হিজ-হাইনেস, হতেন ন্যাম্বি প্যাম্বি বাঙালী ভদ্রলোক, বড় চাকরি করা, ইংরেজ রাজবাহাদুরের তোষামোদকারী মেরুদণ্ডহীন মালিকডল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। এ হেন নির্মম নিয়তির কোলে মুহ্যমান এদেশের শিক্ষিত মানুষকে আমরা অনেককাল ধরেই তো দেখে আসছি। কিন্তু বঙ্কিম তাঁর শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যাপ্তি ও প্রসারের প্রসন্ন আশীর্বাদে এমন আড়ষ্ট ও ক্লীব হয়ে যান নি কোনদিনই। আমিতো যতবারই তাঁকে বুঝবার চেষ্টা করেছি, দেখেছি তিনি এমনই আবৃত, সংবৃত, যূথচারী যে তাঁকে আমার কোন সময়ই ভাবতে কষ্ট হয় নি যে তিনি কোনো না কোনো পবিত্র মঠ বা মন্দির থেকেই নির্গত হয়েছেন এক শুভ্রবসন সন্ন্যাসীর মতন; ঋষির মতন।

তার কারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে বঙ্কিম ছিলেন মুক্তমনের অধিকারী। কেবল নিজের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের কৃষক হয়েই শান্তি ছিল না তাঁর। তাই অন্যক্ষেত্রেও বর্গাদারী এবং/অথবা ক্ষেত্রবিশেষে বেগার কর্ষণের খাটুনি খাটতেও আপত্তি দেখিনি কখনো তাঁর।

মহাপুরুষদের শিক্ষাক্ষেত্র কি এক? তাঁদের জন্য অন্ত্যহীন শিক্ষাক্ষেত্র ছড়িয়ে আছে অরুণে, বরুণে; সুনীলে শ্যামলে। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব নিখিলের কোলে। নিসর্গ প্রকৃতির রাজ্যে। তাঁরা ঘরে বাইরে সর্বত্রই তাঁদের শিক্ষা ও জ্ঞানের রাজ্য খুঁজে পান।

এগারো বছর বয়সে কাঁটালপাড়াতে থাকবার পর বঙ্কিম একরকম অভিভাবক শূন্য অবস্থাতেই বাড়ীতে বসবাস করতেন। একমাত্র তাঁর ধর্মনিষ্ঠা জননী ভিন্ন আর কেউই সে বাড়ীতে ছিলেন না। ফলে তিনি প্রায় নিজের ইচ্ছানুযায়ীই কাজ করতেন। শিক্ষাও এগুচ্ছিল এই সময় তাঁর সম্পূর্ণ আপন খেয়ালে। পরিণত বয়সে তাই বঙ্কিম সখেদে বলেছেন—

......"বাপ থাকতেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আরও একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে কিছু শিক্ষা হয় নি; নীতিশিক্ষা কখনও হয়নি। আমি যে লোকের ঘরে সিঁদ দিতে কেন শিখিনি, বলা যায় না।"

এমন সময় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শিক্ষাক্ষেত্রকে খুঁজে পেয়েছিলেন নিসর্গপ্রকৃতিরই অনাবিল অঙ্কে। তিনিই বলেছেন—

"বাল্যে প্রকৃতিদেবীর ক্রোড়ে বসিয়া আমি যে শিক্ষা লাভ করেছি, তাহাই অধিক প্রয়োজনীয় এবং এই শিক্ষাই উত্তরকালে অধিক উপকারে আসিয়াছিল।"

ইংলণ্ডে প্রকৃতিকে শিক্ষকার পদে উত্তীর্ণা করে বরণীয়া করে তুলেছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। তাঁর প্রখ্যাত গীতিকবিতা The Tables Turned এ লিখেছেন তিনি অকপটে—

'And hark!' how blithe the
throstle sings!
He, too, is no mean preacher;
Come forth into the light of things,
Let Nature be your teacher.
She has a world of ready wealth,
Our minds and hearts to bless—
Spontaneous wisdom breathed by
health,
Truth breathed by cheerfulness.

One impulse from a vernal wood
May teach you more of man,
Of moral evil and of good,
Than all the sages can.

Sweet is the lore which nature
brings;
Our meddling intellect
Mis-shapes the beauteous forms
of things:
—We murder to dissect.

Enough of Science and of Art;
Close up these barren leaves;
Come forth, and bring with
you a heart
That watches and receives."

এখানে প্রকৃতিরই হাতে সমস্ত শিক্ষার দায়ভার সমর্পণ করে দিতে চেয়েছেন কবি। সমস্ত বিজ্ঞান ও কলার গ্রন্থরাজী ভরা কেবল শুষ্কপত্রেরই মর্মর। শ্যামল সতেজ জ্ঞান শুধু প্রকৃতির কাছেই পাওয়া যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য প্রকৃতির শিক্ষাক্ষেত্র সম্পর্কে এতটা উচ্ছ্বসিত বক্তব্য রাখেন নি কোথাও। তবু প্রকৃতির সান্ত্বনার গভীরেও যে তিনি তাঁর শিক্ষাক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন প্রায় সময়ই, তাতে কোন সন্দেহই থাকা উচিত নয়। পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন—

"......তিনি বসিয়া নদীর দিকে চাহিয়া থাকিতেন। এখন আর তিনি রহস্যপূর্ণ বালক নহেন, সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হইয়া গাম্ভীর্যশালী প্রবীণের স্বভাব পাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতামহীর গঙ্গাতীরে বাসকালে প্রথম দুই সপ্তাহ কৃষ্ণপক্ষ ও শেষ সপ্তাহ দেবীপক্ষ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই *তিন সপ্তাহকাল প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ভাগীরথীর তীরে বসিতেন; কখনও আকাশে সন্ধ্যাতারা উঠিতেছে—তাহাই দেখিতেন: কখনও বা আকাশে কাস্তের ন্যায় চাঁদ উঠিতেছে (দেবীপক্ষ) তাহাই দেখিতেন।* সঙ্গীগণ তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি দ্বারা তারা গুণিত, দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিত, কিন্তু প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র একমনে ভাগীরথী তীরে সন্ধ্যার সৌন্দর্য দেখিতেন। "

এই দেখা, এই মনসংযোগ শেষ হয়নি তাঁর কোনদিনই। সেই প্রেলিয়ুড কবিতাতে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের যেমন ছিল প্রকৃতির রাজ্যে অসীম বিচরণ বঙ্কিমচন্দ্রও বালককালে তেমনি বিচরণ করে ফিরেছেন। পূর্ণচন্দ্রের লেখাতেই পাই ঃ "তিনি বর্ষাকালে প্রায় সর্বদাই স্কুলের ছুটি হইলে, বাটীতে প্রত্যাগমন না করিয়া বারবার ঐ নৌকাতে খালে প্রবেশ করিতেন।......তাঁহার নৌকা খালে প্রবেশ করিলে তাহার উপরের পাতার ছাদ হইতে অসংখ্য পাখী উড়িত, চীৎকার করিত, আবার বসিত। খালের উভয় পার্শ্বে নিবিড় বন ছিল, তাহাতে নানাপ্রকারের বনফুল ফুটিত। বর্ষার জলে গাছগুলি অর্ধ-নিমজ্জিত, নৌকা প্রবেশ করিবামাত্র উহার জলতাড়নে তাহারা নানাবর্ণের ফুলের সহিত হেলিত, দুলিত, নাচিত। বালক কবি তাহাই দেখিতেন, হাসিতেন; ক্ষণকালের জন্য তাহারা তাঁহার সঙ্গী হইত।'

প্রকৃতির এই শিক্ষাক্ষেত্রের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করেন নি কোনদিনও। প্রসঙ্গক্রমে আর একদিনের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

'তখন তাঁহার বয়স তের কি চৌদ্দ হইবে। একদিন গভীর রাত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সদর বাটীতে আসিয়া তাঁহার নৌকার মাঝিকে ও দ্বারবানকে উঠাইলেন (পূর্বে ইহার বন্দোবস্ত ছিল)। পরে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে নিঃশব্দে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; নীলাকাশে অসংখ্য তারা জ্বলিতেছে, পৃথবী আলোকময়ী নিস্তব্ধ; একটা কুকুর তাঁহাদিগকে দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিতে লাগিল। বালক কবির সেই অন্ধকারময় খালে বিচরণ করিবার উপযোগী সময় বটে। বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসঙ্কোচে নৌকায় উঠিলেন। কিছুদূর ভাগীরথী বাহিয়া গিয়া খালে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে জলোচ্ছ্বাসে খাল পরিপূর্ণ ছিল। প্রায় দুই তিন ঘন্টা পরে বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ী ফিরিলেন।"......

এই খাল বিচরণের অভিজ্ঞতাও অল্পকাল পরে অভিব্যক্তি লাভ করেছে দেখি ললিতা ও মানসের কবিতায় ঃ—"......নীচে তার অন্ধকার, আছে ক্ষুদ্র নদী। / অন্ধকার, *মহাস্তব্ধ, বহে নিরবধি॥"*

নৌকাবিহার, নদীর ঝড়, তরঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের শিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করেছে বারবার। পরবর্তীকালে যখন তিনি উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন তখন তার প্রয়োগ দেখে আমরা এই শিক্ষার ফলিত দিক সম্পর্কে বিস্ময় বোধ করেছি। ঝড়ের মুখে সূর্যমুখীর তাঁর স্বামীকে সতর্করণ, *নগেন্দ্রনাথ কর্তৃক মাঝি রহমতউল্লাকে আদেশদান, রাধারানীর অংশবিশেষে দেবেন্দ্রনারায়ণের উক্তি, চন্দ্রশেখরের প্রতাপ ও শৈবলিনীর সন্তরণ, দেবী চৌধুরানীর* ত্রিস্রোতা নদীর কথা, কপালকুন্ডলায় বসন্তবায়ু-বিক্ষিপ্ত বীচিমালার আন্দোলন ইত্যাদি বাল্য, শৈশব ও যৌবনকালের প্রকৃতি নিকেতনের শিক্ষারই ফলশ্রুতি। তাঁর যাবতীয় রচনার কবিত্বমন্ডিত ভাষা প্রকৃতিরই অনুসঙ্গে গড়ে উঠেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাক্ষেত্র তাছাড়া বিস্তৃতি পেয়েছিল ইতিহাসের ঐশ্বর্যপূর্ণ অরণ্যে। ইতিহাস পাঠে ছিল তাঁর সাতিশয় অনুরাগ। এই অনুরাগ তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত 'কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে লিখিত হয়েছে ঃ 'কাব্যের চেয়েও ইতিহাসেই তাঁহার বেশী আগ্রহ ছিল। ইউরোপের ইতিহাস তিনি খুব পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই ফ্লোরেন্সের মেডিচিদের কথা কহিতেন। রেন্যাসাঁস (Renaissance) যুগের ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং সেই পথ ধরিয়া বাংলারও যাহাতে আবার নবজীবন সঞ্চার হয় তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি বাঙলার একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি 'বাঙালীর উৎপত্তি' সম্বন্ধে সাতটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।'

দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, সীতারাম এবং রাজসিংহ উপন্যাসের ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমি সহসা রচনা করেন নি তিনি। তারও পূর্বে সূত্র আছে। বালককালেই তিনি যে রোলিয়ান্স সাহেবের সমস্ত প্রাচীন ইতিহাস এবং হিউমের ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়ে শেষ করেছিলেন সেকথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

ইতিহাসেরই ঘটনাধারায় স্নাত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীমানস। ইংলন্ডীয় রাজনীতিক দলের পরস্পরবিরোধ, আফগান যুদ্ধ, শিখসমর, ফ্রাঙ্কো প্রুসিয়ান যুদ্ধ, সিপাহী বিদ্রোহ, ইলবার্ট বিল, জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ব্যাপার তাঁর চোখের সামনের সব ঘটনা। এই ঘটনার অরণ্যে সাধারণের মতন গা-ঢাকা দিয়েই শান্তি লাভ করেন নি তিনি। কিংবা থাকেন নি অকম্পিত নির্বিকার দর্শক। এইসব প্রতিটি ঘটনা থেকেই যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ করেছিলেন তিনি। আনন্দমঠে ভাষা দিয়েছেন তিনি এই ইতিহাসের শিক্ষারই এক পরিচ্ছন্ন দিক।

বেদ, উপনিষদ, পুরাণ এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থাদিতে যে শিক্ষাক্ষেত্রকে খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ পেয়েছি তাঁর উত্তরজীবনের লেখা অমূল্য আলোচনা ও প্রবন্ধগ্রন্থরাজি।

শিক্ষাকে আড়ষ্ট করে নয়, আবিল করে নয়, নয় তাকে করে স্বভাবতই সীমিত, যে শিক্ষাক্ষেত্রকে রচিত করতে পারি আমরা আমাদের সংকীর্ণ গৃহকোণ থেকে বিস্তৃত *বিশ্বসীমায় পরিকীর্ণ সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের মতন প্রতিভা মানেই দুর্লভ নয়। গন্ডায় গন্ডায় প্রতিভা পয়দা না হলেও* সাধারণ শিক্ষিত মানুষেরও একটা নিশ্চিত মান বর্তমান থাকে। আসলে আমরা এ্যাকাডেমিক শিক্ষাকেই শিক্ষার মান বলে ভেবে ভুল করে থাকি বারবার। এর ফলে আমরা আমাদের বন্ধমূল কুসংস্কারের কুলুপ এঁটে মোক্ষের পথ হারাই। মনের সংকোচকে মূর্ত করে নিজের গারদ নিজেই আগলে বসে থাকি। আমাদের কাকভূষন্ডী পিতামহ, পিতামহী, বাপের ফাঁকা হিতোপদেশ আমাদের মনের মুক্তি এনে দিতে পারে না তাই। তাই উদ্দাম বসন্ত-বন্যার মুক্তিস্নানেও আমাদের চিত্তশুদ্ধি ঘটে না। জ্বলে না হোমাগ্নি।

তাহলে কি করতে হবে?

বিস্তৃত হতে হবে। বেরিয়ে আসতে হবে দুঃসাহসে ভর করে রাত্রির অন্ধকারে, ঝড়ে জলে বালক বঙ্কিম যেমন এসেছিলেন। হতে পারে তা হাস্যকর, পাগলামি এবং / অথবা নীতিলঙ্ঘনের মতন ঘোরতর অন্যায় কিছু। তবু থাকবে না চেষ্টার কোন ত্রুটি, বিরাম থাকবে না গানে। আর সে গান হয়তো আনন্দেরও হবে না। কন্ঠে হয়তো থাকবে ক্রোধ ও ক্ষোভজনিত কর্কশ প্রদাহ। ভয় ভাঙতেই চেঁচিয়ে হতে হবে সারা। তবুও সত্য একদিন আসন্ন প্রলয়ের প্রখর কোলাহল ছাপিয়ে উঠবে, উঠবেই একক তাঁর বাণী। তিনিই হবেন আমাদের নমস্য। সকল অসঙ্গতি এবং গুরুমশাইয়ের বিচারের মানের অন্যায় থাকা সত্ত্বেও নমস্য।

নরম সবুজ ঘাসের ওপর পা ফেলতে ফেলতে জগদীশ বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। ভোরের হিমেল হাওয়া তাঁর মাথার চুল নিয়ে খেলা করছিল, বাঁ হাত দিয়ে সেই এলোমেলো অবিন্যস্ত চুল অভ্যস্ত কায়দায় অনবরত সামলাচ্ছিলেন জগদীশ। প্রতি পদক্ষেপে শিশিরভেজা ঠাণ্ডা কচি ঘাস তাঁর পা দুটোকে ছুঁয়ে দিচ্ছিল, লম্বা বুনো ঘাসের মধ্যে হাওয়াই চটি সমেত সম্পূর্ণ পা দুটোই ডুবে যাচ্ছিল কখনো-কখনো। কিন্তু আজ আর জগদীশ অন্যান্য দিনের মতো ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ার এই আমেজ, শিশিরসিক্ত ঘাসের কোমল স্পর্শের মাদকতা উপভোগ করতে পারছিলেন না। গতকাল থেকেই তাঁর মেজাজ বেশ অপ্রসন্ন। রিটায়ার করার পর সংসারের যাবতীয় অধিকারগুলি একে একে তাঁর হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে, বেদনাদায়ক হলেও নীরবে তিনি সেসব হজম করে গিয়েছেন, অমোঘ অনিবার্য জেনেই নতুন অবস্থার সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। যতদিন জগদীশ উপার্জন করতে পেরেছেন সংসারে ততদিন তাঁর প্রতাপ ছিল অখণ্ড, প্রতিটি ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত, তাঁর মতামতই ছিল সর্বশেষ কথা। রিটায়ার করার সংগে সংগে তাঁর উপার্জনটি যেমনি বন্ধ হল সংসারে প্রতাপের রাজদণ্ডটিও রোজগেরে ছেলেরা অমনি নিজেদের হাতে তুলে নিল। সংসারে সমস্ত অধিকারগুলি হাতছাড়া হওয়ার পরও দৈনিক কাঁচা বাজারের ভারটি জগদীশের হাতেই ছিল। কর্মহীন অলস অখণ্ড অবসরময় জীবনে ওই কাজটুকু নিয়েই জগদীশ খুশি ছিলেন। বাজার করা নিয়েই সকালে তিনি বেশ খানিকক্ষণ মেতে থাকতেন, পুরো এক ঘণ্টার কমে কোনদিনই জগদীশ বাজার সারতে পারতেন না। সারা দিনে জগদীশের কর্ম বলতে ওই একটি, সারা বাজার ঘুরে দরদাম করে জিনিষ কিনতে জগদীশের ঘাম ছুটে যেত, তবু ওরই মধ্য দিয়ে জগদীশ প্রতিদিন আপন কর্মশক্তিটুকু অনুভব করতেন, থলে বোঝাই বাজার নিয়ে ফেরবার সময় ঘর্মাক্ত পরিশ্রান্ত জগদীশের মুখে

একটি সুখী গৃহস্বামীর উজ্জ্বলতা ফুটে উঠত। সেই বাজার করার কাজটাও আজ থেকে হাতছাড়া হয়ে গেল জগদীশের। গতকাল রাতে শোবার সময় তাঁর স্ত্রী নীহার জানিয়েছে, জগদীশের বাজার ছেলেদের একটুও পছন্দ নয়। থোড়ের সুক্তো, মোচার ঘন্ট, আমড়ার টকে নাকি কোনো ফুড ভ্যালু নেই। আসল খাদ্য হচ্ছে প্রোটিন অথচ জগদীশের বাজার হচ্ছে সাবেকী ধরনের, শাক-সব্জী ইত্যাদি যত রাজ্যের ছাই-ভস্ম বাজার করে আনেন রোজ রোজ। ফলে বউমারা দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং দৈনিক বাজারের ভার আগামীকাল থেকে হাতে নিয়ে নিচ্ছে বড়ছেলে দিব্যেন্দু স্বয়ং।

প্রোটিন না হাতী। শিশিরভেজা ঘাসের ওপর আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ে আপন মনেই ভেংচে উঠলেন জগদীশ কত সব সাহেব-মেম হয়েছেন একেবারে! জগদীশের হাতের বাজার খেয়েই তো মানুষ হলি সব এতকাল। প্রোটিন কি ভিটামিন অত গুণ বিচার করে কোনদিনই বাজার করেননি জগদীশ, কিন্তু শাক-সবজী যেমন কিনেছেন, মরশুমী ফল মাছও তেমনি কিনেছেন। মাঝেমধ্যে মাংস বা ডিমও বাদ যায়নি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব কিছুই খাইয়েছেন। সব জিনিষেরই কিছু না কিছু উপকার আছে, জগদীশ এটাই জানেন। এইভাবেই চিরকাল বাজার করে এসেছেন। কই, এতকাল তো এসব অভিযোগ ওঠেনি, বাজার থেকে যা এনেছি তাই দিয়ে হাঁড়ি সাবাড় করেছিস। হুঁ-হুঁ বাবা, আসল কথা তো তা নয়, ঘাসের ওপর ফের পা ফেলতে ফেলতে জগদীশ নিজের বুদ্ধিকে নিজেই তারিফ করলেন, তোমরা থাকো ডালে ডালে, আমি থাকি পাতায় পাতায়, প্রোটিন ফোটিন ওসব হচ্ছে ছুতো, আসল কথা হল ছেলেরা সন্দেহ করছে তিনি হয়তো রোজের বাজার থেকে পয়সা সরান।

তা বাজারের টাকা থেকে দুটো চারটে পয়সা সরান বৈকি জগদীশ। তাঁর নিজের একটা খরচা আছে তো। যতদিন চাকরী ছিল সিগারেট খেয়েছেন। কম খরচে চালাবার জন্য ইদানীং সিগারেট ছেড়ে বিড়ি ধরেছেন। কাজ-কর্ম নেই বলে বিড়িটা একটু বেশিই লাগে, দিন এক বাণ্ডিলের কমে হয় না। তা সেই বিড়ি দেশলাই, দু-চার কাপ চা এসবের খরচা চালাবার জন্যে বাজারের পয়সা থেকে যৎসামান্য তাঁকে সরাতেই হয়। না সরিয়ে উপায় কি, চাইলে কেউ তো আর তাঁকে দিচ্ছে না। হাত খরচের জন্য দুটো একটা টাকা চাইলেও ছেলেদের মুখে বিরক্তির ভাঁজ ফুটে ওঠে, দিব্যেন্দু তো টাকা চাইলেই বলে, খাওয়া-দাওয়া জলখাবার সবই তো বাড়ীতে হচ্ছে, লণ্ড্রী থেকে জামা-কাপড় ধুয়ে আসছে, জুতো-জামা যখন যা দরকার সবই এনে দেওয়া হচ্ছে, আবার নগদ টাকা কেন চাও বুঝি না!

রিটায়ার করলে মানুষের যেন আর হাত খরচ বলতেও কিছু লাগে না! অথচ ছেলেরা যখন রোজগার করত না, স্কুলে-কলেজে পড়ত তখন জগদীশ প্রত্যেক ছেলেকে আলাদা করে পয়সা দিয়েছেন। জলখাবারের নাম করে পয়সা দিয়েছেন, কিন্তু কলেজে পড়বার সময় তোরা সেই পয়সায় সিনেমা দেখেছিস, রেস্টুরেন্টে চপ-কাটলেট উড়িয়েছিস, সিগারেট ফুঁকেছিস তা কি আর বোঝেননি জগদীশ? বিলক্ষণ বুঝেছেন। কিন্তু তবু দিয়েছেন। ছেলেরা বড় হচ্ছে, হাত খরচ না পেলে তাদের মন খারাপ হয়ে যাবে ভেবে না দিয়ে পারেননি। তিনি ছেলেদের মনের দিকে তাকিয়ে সব সময় চলবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কই ছেলেরা তো তাঁর কি দরকার না দরকার সেকথা একবারও ভাবে না।

আজ কুয়াশা যেন বড় বেশি ঘন, সামনের দিকে তাকিয়ে কুয়াশার ভারী পর্দা ভেদ করে জগদীশ কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না। রোদ ওঠেনি এখনো, কুয়াশার আড়ালে পাখিদের অস্পষ্ট কিচির-মিচির শোনা যাচ্ছে। শিরীষ গাছের গা ঘেঁষে কাঁটা ঝুপরি পার হয়ে জগদীশ হাবুলের চায়ের দোকানের দিকে এগোলেন। হাবুল চায়ের দোকান খুলেছে কিনা গাঢ় কুয়াশার জন্য জগদীশ ঠিক বুঝতে পারছিলেন না।

বেশ চায়ের তেষ্টা পেয়েছে। আগে বিছানায় শুয়ে শুয়েই চা পেতেন, এখন আর সে সুদিন নেই। অবশ্য চাকরি থাকতে এত ভোরে তিনি কোনদিনই উঠতেন না, কলকাতা শহরে ভাড়াটে বাড়ির একতলার অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে বেশ বেলা পর্যন্তই ঘুমোতেন জগদীশ। মর্নিং ওয়াকের বাতিক তাঁর ইদানীং হয়েছে, রিটায়ার করার পর। কেন যে কাক-পক্ষী ডাকবার আগেই ঘুম ভেঙ্গে যায় কে জানে!

উনুনে কেটলী চাপিয়ে উবু হয়ে পাখা দিয়ে হাওয়া করছে হাবুল। বেশ ঘন ধোঁয়া উঠছে উনুন থেকে, তার মানে উনুন এখনো ভাল মতো ধরেনি আর কি! চায়ের জন্য আরো খানিকক্ষন অপেক্ষা করতে হবে ভেবে মনে মনে খেপে উঠলেন জগদীশ। নবাব-পুত্তুর সব, কেন আর একটু আগে ঘুম থেকে উঠতে কি হয়! আলসের জাত তো, এই আলসেমি করেই না গোল্লায় গেল বাঙ্গালী জাতটা!

—কিরে হাবলা, এখন পর্যন্ত উনুন ধরাতে পারলি নে? তোর দ্বারা ব্যবসা হবে, না এই হবে!

ক্রুদ্ধ বিরক্ত জগদীশ বুড়ো আঙুল দেখালেন। হাবুল কোন কথা বলল না, উনুনে জোরে হাওয়া দিতে লাগল।

একপাশে বেঞ্চের ওপর বসে জগদীশ বিড়ি ধরালেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে গেলেন ফের। আজকাল-কার ছেলেদের ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না জগদীশ। তবে এখনকার ছেলেরা যে তাঁর ছেলেদের মতই স্বার্থপর আত্ম-কেন্দ্রিক এটা তিনি বেশ হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন। তিনি রিটায়ার করার পর ছোট মেয়ের বিয়ে হল। অসবর্ণ বিবাহ। তিনি আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু বাড়ী শুদ্ধ সকলে তাঁর আপত্তি অগ্রাহ্য করে কায়স্থের ছেলের সঙ্গেই ইরার বিয়ে দিল। তাঁর স্ত্রী নীহারিকাও ছেলেদের পক্ষ নিয়েছিলেন। অসবর্ণ বিয়েতে তাঁর ছেলেরা যে কেন এক পায়ে রাজী ছিল তা বুঝতে জগদীশের একটুও কষ্ট হয়নি। প্রেমজ বিবাহ, কাজেই একরকম নিখরচায় বোনের বিয়ে হওয়াতে তাঁর ছেলেরা বরং বেশ খুশিই হয়েছিল। পালটি ঘরে বোনের বিয়ে দিতে হলে গাঁটের কড়ি খরচা করতে হত। সেই খরচাটা বাঁচল, ছেলেদের কাছে সেইটেই বড় কথা। বিড়িতে সুখটান দিয়ে জগদীশ ভাবলেন, এসবের জন্য এখন আর হাত কামড়ে কোন লাভ নেই। তিনি নিজেই তো নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছেন। তাঁর চাকরীতে পেন্সন স্কীম ছিল না, রিটায়ার করার সময় প্রভিডেন্ট ফান্ড গ্র্যাচুয়িটি মিলিয়ে হাজার চল্লিশের টাকা পেয়েছিলেন। সারাটা জীবন কলকাতা শহরের এঁদো গলিতে ভাড়াটে বাড়ীতে কাটিয়েছেন। খোলামেলা জায়গায় উদার মুক্ত পরিবেশে ভোরের হাওয়া, উজ্জ্বল ঝকঝকে রোদের লোভ তাঁর আজীবনের। উজ্জ্বল রোদ আর ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ার স্বপ্নকে মুঠোর মধ্যে ধরবার জন্য সম্পূর্ণ টাকাটা খরচ করে জগদীশ শহরতলীতে জমি কিনে বাড়ী করলেন। সব টাকা খরচ করে বাড়ী করতে নীহার তাঁকে বহুবার নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু জগদীশ শোনেননি। ছোট একতলা বাড়ী করলেই চলত, কিন্তু জগদীশ দোতলা বাড়ী হাঁকরালেন। তাঁর তিন ছেলেই তখন চাকরী করছে, জগদীশ নিশ্চিন্তমনে বাড়ীর পেছনে সম্পূর্ণ টাকা ঢেলে দিলেন। সারাটা চাকরীজীবন সাদাসিধে সাধারণভাবে কাটিয়ে চাকরিশেষে জগদীশ যেন আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলকে তাক লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু হাত একেবারে শূন্য হয়ে গেল, নগদ পয়সা বলতে কিছু রইল না। যেমন কর্ম তেমনি ফল। জগদীশ বিড়বিড় করে নিজেকেই ব্যঙ্গ করলেন, খাও, হাওয়া খাও এখন।

—বাবু, চা।

চায়ের গেলাস হাতে হাবুল এসে দাঁড়াতে জগদীশের চমক ভাঙল। হাত বাড়িয়ে গেলাসটা নিয়ে চায়ে চুমুক দিলেন জগদীশ। আজ আর বাজার করতে হবে না। সারাটা সকাল যে আজ কেমন করে কাটাবেন ভেবে ঠিক করতে পারলেন না জগদীশ। দুপুর কাটানোর সমস্যাও অবশ্য কিছু কম না। খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরে বেশ ঘুম পায়, কিন্তু ঘুমোলে আর রক্ষে নেই, সারাটি রাত ঠায় জেগে থাকতে হবে। বুড়ো হলে মানুষের ঘুম কম যায়, সেই-জন্যেই বোধহয়। এই সমস্যা অবশ্য জগদীশের একার নয়, রিটায়ার-করা দীননাথ

আছে, নকুল আছে। আগে অনাদিও ছিল। তখন চারজনে মিলে এই মাঠে শিরীষ গাছের ছায়ায় বসে তাস খেলা হত। টোয়েণ্টি নাইন, কালে ভদ্রে ব্রিজ। অনাদি রাতে একদম ঘুমোতে পারত না। প্রায়ই ঘুমের ওষুধ খেয়ে তবে ঘুমোত। বুড়ো বয়েসেও স্বাস্থ্য-টাস্থ্য মন্দ ছিল না অনাদির। তবু একদিন অনাদি আর ঘুম থেকে উঠল না, রাতে কখন এক সময় হার্ট-ফেল করে বিছানায় মরে থেকেছে অনাদি, কেউ টের পায়নি। অনাদি মারা যাওয়ার পর বেশ কিছুদিন তাসের আসর আর জমেনি। নিষ্কর্মা মানুষ খুঁজে পেতে আনা চাটিখানি কথা নয়। বেশ কিছুদিন বাদে সুবীর নামে এক ছোকরাকে পাওয়া গিয়েছিল। কাঠ বেকার, বছরের পর বছর বসে আছে। সেই ছোঁড়া এলে এখনো দুপুরে মাঝে মাঝে তাসের আসর বসে। তা ছোঁড়া আবার রোজ আসে না। এক-একদিন ডুব দেয়। জিজ্ঞেস করলে বলে, ইন্টারভিউ ছিল। দিনকাল তো শোনা যায় খারাপ, কি করে যে ছোঁড়া এত ইন্টারভিউ পায় কে জানে! বয়সে বড়ো বলে কিন্তু জগদীশদের একটুও রেয়াৎ করে না ছোকরা। দিব্যি তাঁর মতো বাপের বয়েসী মানুষগুলোর কাছ থেকে বিড়ি চেয়ে খায়। জগদীশের তো এক এক সময় মনে হয়, খেলাটেলা কিছু না, তাঁদের কাছ থেকে বিড়িটা চা-টা খাওয়ার জন্যেই ছোঁড়া তাঁদের সংগে ভিড়েছে। দীননাথও ইদানীং দিন তিনেক ধরে আসছে না। কিছু হল না কি আবার? নিঃসন্তান দীননাথের অবশ্য সংসারে ঝামেলা বলতে কিছু নেই। তবু স্ত্রীর কিংবা নিজের শরীরও তো খারাপ-টারাপ হতে পারে। যাক গে, দেখা যাক আজকের দিনটা। যদি না আসে কাল না হয় একবার দীননাথের বাড়ীতে খোঁজ নেবেন জগদীশ।

চায়ের গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে জগদীশ গেলাসটা বেঞ্চির নিচে পায়ের কাছে রাখলেন তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পকেট হাতড়ে পয়সা বের করে হাবুলের হাতে দিলেন। খানিকক্ষণ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন কোনদিকে যাবেন সেইটা ঠিক করবার চেষ্টা করলেন।

কখন একসময় চলতে আরম্ভ করে-ছিলেন ঠিক নেই, খেয়াল হতে দেখলেন অভ্যেসবশে হাঁটতে হাঁটতে তিনি বাজারের মধ্যেই ঢুকে পড়েছেন। শহরতলীর খোলা বাজার, তেমন বেলা হয়নি বলে বাজার এখনো ভালো করে জমেনি। মাছের ওদিকটায় অবশ্য এই সাতসকালেই বেশ ভিড় লেগেছে মনে হচ্ছে।

আজ এই মুহূর্তে থেকে থেকে অনাদির কথাটা মনে আসছে জগদীশের। অনাদির মৃত্যুটা কেন যেন আজ আর স্বভাবিক বলে মনে করতে পারছেন না জগদীশ। আপনা থেকেই অনাদির মৃত্যুর একটা রহস্যময় দিক তাঁর কাছে অনাবৃত হয়ে পড়ছে। তাঁর কেবলি সন্দেহ হচ্ছে, বিপত্নীক অনাদির পুত্রবধূ তাঁর সংগে অকথ্য দুর্ব্যবহার করত, অনাদির মুখ দেখে অবশ্য কিছুই বোঝা যেত না, মুখেও সে কোনদিন কিছু বলেনি, কার দুঃখই বা কে আর অন্যের কাছে মুখ ফুটে বলে, জগদীশের নিজের যন্ত্রণাই কি কিছু কম, কিন্তু সেই যন্ত্রণা অন্যকে টের পেতে দিচ্ছেন কি জগদীশ, অনাদিও হয়তো কোন গভীর বেদনাকে বুকে চেপে শেষে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে একদিন অনেকগুলো ঘুমের ট্যাবলেট একসংগে খেয়ে সমস্ত সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে চলে গেছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জগদীশ সামনের দিকে তাকালেন। এখান থেকেই মাছের বাজারে নকুলের লম্বা চেহারাটা চোখে পড়ছে। হ্যাঁ, পয়লা নম্বরের চালু যদি কাউকে বলতে হয় তো সে হচ্ছে ওই নকুল সমাদ্দার, জগদীশের মতো আস্ত ইডিয়ট নয়। প্রভিডেন্ড ফান্ড গ্র্যাচুয়িটির অতগুলো টাকা পেয়ে জমিও কেনেনি, বাড়ীও করেনি। ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিটে টাকা রেখে বছর বছর সুদ খাচ্ছে। কিছু টাকা আবার লগ্নী করেছে মাছের বাজারে। চড়া সুদে মেছোদের টাকা ধার দেয়। ভাড়া বাড়ীতে থাকে, জমি কেনা কি বাড়ী করার নামও করে না। ঠিক করেছে নকুল, জমি কিনে বাড়ী করে জগদীশের মতো ছেলেদের দয়ার ওপর নিজেকে ছেড়ে দেয়নি সে। আজকের দিনে বাঁচতে গেলে নকুলের মতো বিষয়বুদ্ধি থাকাই দরকার। বাড়ী বিক্রী করে ফের অনেকগুলো টাকার যে মালিক হবেন জগদীশ এখন আর সে উপায় নেই। আইনত বাড়ীর মালিকানা এখন নীহারের, বাড়ী বিক্রীর কথা তুললে নীহার কেঁদে কেটে একসা করবে।

মাছের বাজারে একজন মাছওয়ালার সংগে কথা বলছিল নকুল, জগদীশ তাঁর পিঠে হাত দিতে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। জগদীশের হাতের দিকে ইঙ্গিত করে নকুল বললেন, কি ব্যাপার ব্যাগ নেই দেখছি?

—নাঃ, বিরক্ত মুখে শূন্যের দিকে ডান হাত ছুঁড়লেন জগদীশ, বাজার-ফাজার আর ভাল্লাগে না, ওসব ঝামেলা ছেলেরা পোয়াক এখন।

—তা ভালো। বলে নকুল এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন তারপর হঠাৎ কি মনে পড়ায় ফের বললেন, একটা ভালো খবর আছে, সুবীরের চাকরি হয়েছে।

—তাই না কি? তা বেশ। তবে আমাদের খেলার একজন পার্টনার কমল আবার।

—গোল্লায় যাক তোমার খেলার পার্ট-নার, ছোঁড়াটা তো বাঁচল।

—হ্যাঁ, তা একশোবার।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। কয়েক মুহূর্ত এমনি কাটবার পর জগদীশ নকুলকে চোখের ইসারায় ভিড়ের বাইরে আসতে ইঙ্গিত করলেন। ভিড় থেকে একটু তফাতে এসে গলা নামিয়ে জগদীশ বললেন, শোন, অনাদিকে মনে আছে তোমার?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিলক্ষণ মনে আছে। কিন্তু হঠাৎ আবার অনাদির কথা কেন?

—তোমার কি মনে হয়, অনাদি হার্টফেল করে মরেছে?

—তাইতো জানি আমি।

—ঘোড়ার ডিম, আমার মনে হয় অনাদি আত্মহত্যা করেছে।

—কেন, নকুল অবাক হল, অনাদি আত্ম-হত্যা করতে যাবে কেন?

—কেন? ছেলের বউয়ের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বেশি করে ঘুমের ওষুধ খেয়ে মরেছে। তোমরা যাই বলো, আমি সিওর অনাদি আত্মহত্যা করেছে।

—হঠাৎ তোমার এসব মনে হচ্ছে কেন? সন্দিগ্ধ চোখে নকুল জগদীশের দিকে তাকালেন। গভীর তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে তিনি যেন জগদীশের ভেতরটা পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন।

নকুলের তীব্র সন্ধানী দৃষ্টির সামনে জগদীশ সামান্য উসখুস করে উঠলেন তার-পর বললেন, থাকগে, ছেড়ে দাও এসব, যা হয়েছে চুকেছে, এখন আর ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? বলে জগদীশ একটু ইতস্তত করলেন তারপর আমতা আমতা করে বললেন, গোটা দুই টাকা হবে তোমার কাছে?

মুহূর্তে নকুলের মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল, বেজার মুখে বললেন, গেল আশ্বিনে সাতটা টাকা নিয়েছিলে, এখনো তিন টাকা শোধ দাওনি, ফের টাকা চাইছ কোন মুখে?

—আরে মনে থাকে না ভাই তোমার টাকার কথা। মনে পড়লে কবেই দিয়ে দিতুম তোমার টাকা, তিনটে টাকার জন্যে আর তোমার ট্যাক ট্যাক সহ্য করতুম না।

—রাখো, রাখো, কোত্থেকে দিতে শুনি? নিজের তো রোজগার বলতে কিছু নেই।

নিজের না থাক, ছেলেদের তো আছে।

—হ্যাঃ, আর ফুটুনি কোরো না। ভারি ছেলের রোজগার দেখাচ্ছ! ছেলেরা তো সব কেরানী, তাদের যে মুরোদ কত আমার জানা আছে।

—কেন, সব কেরানী হতে যাবে কেন, জগদীশ ফুঁসে উঠলেন, মেজ ছেলে যে অফিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট সেটা বলছ না কেন? বলতে প্রাণে লাগে বুঝি।

—থাক্, আমাকে আর সুপারিনটেন-ডেন্ট দেখিও না। আমিও তো অফিস ঘেঁটে এলুম সারাজীবন। সুপারিনটেন-ডেন্টেও যা, বড়বাবুও তা। আর বড়বাবু মানে তো বড় কেরানী, আবার কি?

—ছেলে ডাক্তার বলে অত গলা বড় কোরো না নকুল, জগদীশ অনাদিক থেকে আক্রমণ করলেন, আজকাল দিশী ডাক্তারদের যে কত রোজগার সে জানতে আমায় আর

ঝাঁক নেই। যাকগে, দুটো টাকা চেয়েছি, দেবে না সেকথা সাফ সাফ বলে দিলেই তো মিটে যায়।

অভিমানে জগদীশের গলা থমথম করছিল। নকুলের দিকে আর একবারও না তাকিয়ে ক্ষোভে অভিমানে গরগর করতে করতে হন-হন করে হাঁটতে সুরু করলেন জগদীশ।

—শোন শোন, নকুল পেছন থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে এগিয়ে এসে জগদীশকে ধরলেন, রাগ করো কেন, টাকা দেব না বলেছি না-কি?

জগদীশের হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিলেন নকুল। টাকাটা হাতে নিয়ে জগদীশ বললেন, দুপুরে আসছ তো? এক হাত দাবাই খেলব না হয়।

—নাঃ, বিকেলে আসব'খন। ম্যাটিনীতে সিনেমা যাব ভাবছি।

—কি যে বুড়ো বয়সে সিনেমার বাতিক তোমাদের বুঝি না!

উত্তরে নকুল নিঃশব্দে হাসতে থাকেন। নকুলের ফোকলা দাঁত দেখে গায়ের মধ্যে রি-রি করে জগদীশের, অসহ্য লাগে।

হাঁটতে হাঁটতে বাজারের অপর প্রান্তে চলে গেলেন জগদীশ। বেলা সাড়ে দশটা-এগারোটার আগে বাড়ী ঢোকার ইচ্ছে নেই তাঁর। বাইরেই তবু যা-হোক করে সময়টা কাটে। তাঁর ছেলেরা কেরানী বলে নকুলের তাচ্ছিল্য ভরা উক্তিগুলো ফের মনে পড়ল জগদীশের। ক্ষোভে অপমানে কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল তাঁর। অন্যমনস্ক হবার জন্য জগদীশ সারা বাজারটা বার কয়েক পাক খেলেন এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে এটা-ওটা দর করলেন, তারপর ফের হাবুলের দোকানে গিয়ে বেঞ্চের ওপর বসলেন। খদ্দেরদের জন্য হাবুল একখানা খবরের কাগজ রাখে, সেখানা আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লেন। ফের চা খেলেন একবার। গোটা-কয়েক বিড়ি টানলেন। তারপর সূর্য মাথার ওপর বেশ খানিকটা উঠলে তীব্র তেজী রোদের মধ্যে গুটি গুটি বাড়ীর দিকে এগোলেন।

বাড়ীতে ঢুকে একতলার বারান্দায় এসে দিবেন্দুর গলা শুনতে পেয়ে বেশ অবাক হন জগদীশ। এতখানি বেলা হয়েছে, এগারোটা বেজে গেছে সেই কখন, অথচ এখন পর্যন্ত অফিসে বেরোয়নি দিবেন্দু। ব্যাপার কি, অফিসে যাবে না না-কি আজ? ছোট ছেলের গলাও যেন শোনা যাচ্ছে। আর একটু ভালো করে কান পাতলেন জগদীশ। মেজ ছেলে চঞ্চলের গলা শুনতে পেলেন এবার। সারাটা সকাল পায়ে পায়ে ঘোরার জন্য ক্লান্ত লাগছিল জগদীশের, ঘরে ঢুকে তক্তপোষের ওপর বসলেন। সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর কাছে বেশ গোলমেলে ঠেকছিল। আসানসোলে কাজ করে চঞ্চল, সেই বা কোন সময় এল? অফিস সুপারিনটেণ্ডেন্টের পোস্টে কাজ করে এরকম যখন তখন অফিস কামাই করা কি চঞ্চলের উচিত হচ্ছে? মাঝে মাঝে হাসির আওয়াজও কানে আসছে। সেই শব্দ কানে আসাতে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি সে বিষয়ে জগদীশ নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু তিন ছেলে অফিস কামাই করে বাড়ীতে বসে আড্ডা ইয়ার্কি দিচ্ছে কেন জানতে তীব্র কৌতূহল হচ্ছিল জগদীশের। তক্তপোষ ছেড়ে উঠবেন কিনা ভাবছেন এই সময় নীহার ঘরে ঢুকলেন, হাতে একখানা বড় প্লেটের ওপর সন্দেশ রসগোল্লা, আর কিছু নোনতা খাবার। জগদীশ লুব্ধ চোখে খাবারের দিকে তাকালেন। বেশ ক্ষিদে পেয়েছে সেইজন্যই তাঁর জিভে জল এসে যাচ্ছে যেন।

—বাব্বাঃ, ঘুরতেও পারো তুমি, নীহার বললেন, এদিকের খবর শুনেছ?

—কি? খাবারের প্লেটের ওপর থেকে জগদীশ চোখ সরালেন না।

একগাল হেসে নীহার বললেন তোমার ছেলের যে প্রমোশন হয়েছে। যে সে প্রোমোশন নয় একেবারে গেজেটেড অফিসার। নাও, ধরো।

এতক্ষণ পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন জগদীশ, খবরটা শুনে দু-পা তুলে তক্ত-পোষের ওপরই আসনপিঁড়ি হয়ে জমিয়ে বসলেন। খাবারের প্লেটটা হাতে নিয়ে একটা রসগোল্লা মুখে ফেলে বললেন, জল আন শিগগির। আনন্দে, বুঝলে কিনা, আমি বোধহয় হার্ট ফেল করব।

নীহার জল আনতে ছুটলেন। ঢোঁক গিলে অনুপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী নকুলের উদ্দেশে জগদীশ স্বগতোক্তি করলেন এইবার!

নীহার ফিরলে তাঁর হাত থেকে জলের গেলাসটা নিতে নিতে একটা তিক্ত রসিকতা করলেন জগদীশ, তা সুক্তো ঘন্ট যে বাড়ীতে চলে না, সেই সাহেব বাড়ীতে রসগোল্লা সিংগারা কেন? চপ কাটলেট কই?

জগদীশের শ্লেষের মর্মটা বুঝলেন নীহার, মুহূর্তের জন্য তাঁর মুখে একটা কালো ছায়া পড়ল, ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন তুমি যেন কী, এমন আনন্দের দিনেও খোঁচা না দিয়ে কথা বলতে পার না?

অফিস সুপারিনটেণ্ডেন্ট থেকে গেজেটেড অফিসার হয়েছে চঞ্চল, এর চেয়ে আনন্দের, এর চেয়ে গৌরবের আর কি থাকতে পারে জগদীশের জীবনে? কিন্তু সেই আনন্দটা যেন পুরোপুরি উপভোগ করতে পারছিলেন না জগদীশ।

যতক্ষণ পর্যন্ত নকুলকে খবরটা দিতে না পারছেন, ততক্ষণ অব্দি তাঁর আনন্দটা কিছুতেই সম্পূর্ণ হবে না। খবরটা শোনার পর নকুলের কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটা না দেখা পর্যন্ত জগদীশের স্বস্তি নেই। বলবি, কেরানী বলে আর কোনদিন তাচ্ছিল্য করবি জগদীশের ছেলেদের? তোর গুষ্টির মধ্যে গেজেটেড অফিসার কেউ আছে? নকুলকে প্রতিপক্ষ খাড়া করে আপন মনেই আউড়ে চললেন জগদীশ। খবরটা শুনে ওপরে ওপরে নকুল খুশি খুশি ভাব দেখাবে নিশ্চয়ই, লোক-দেখানো দেঁতো হাসিও হাসবে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরবে ঠিক। বুকে যন্ত্রণা অথচ মুখে হাসি, নকুলের এমনি একটা করুণ মূর্তি কল্পনা করে ভারি মজা পেলেন জগদীশ, তারপর অনেকক্ষণ সেই নিষ্ঠুর আনন্দের স্রোতে ভেসে রইলেন।

বুনো ঘাসে ভর্তি জমির এই খণ্ডটুকু রীতিমতো একটা পার্ক হয়ে উঠেছে যেন। এদিকটায় ঘরবাড়ী লোকবসতি কম, বহু-কাল থেকেই খানিকটা জমি এমনি ফাঁকা পড়ে আছে। বিকেলের দিকে আশেপাশের অঞ্চলের মানুষগুলো হাঁফ ছাড়বার জন্যে এই ফাঁকা মাঠে এসে বসে। একধারে অল্প-বয়েসী ছেলেরা ফুটবল খেলে; দলবেঁধে মেয়েরাও আসে। ছেলে-ছোকরাদের তো কথাই নেই। সন্ধের সময় অন্ধকারে যুবক-যুবতীদেরও জোড়ায় জোড়ায় বসে থাকতে দেখা যায়। সব মিলিয়ে এই মাঠে ভিড় মন্দ হয় না। চিনেবাদাম ঝালমুড়ি ঘুগনি-ওয়ালারা আসে। পেতলের হাঁড়ি নিয়ে ভাঁড়ে চা বিক্রী করতেও আসে একজন হিন্দুস্তানী চা-ওয়ালা। শিরীষ গাছের নিচে বসে জগদীশ মাঠে মানুষজনের আসা-যাওয়া হাবভাব লক্ষ্য করছিলেন। ম্যাটিনী শোয়ের পর মাঠে এসে পৌঁছতে নকুলের দেরী হবে জেনেও বেশ খানিকক্ষণ আগে থেকেই জগদীশ এসে গাছের নিচে বসে আছেন। একটা শান্ত বিমল আনন্দে জগদীশের মনটা আজ ভরে আছে। বেশ একটা সতেজ সজীবতা অনুভব করছিলেন তিনি। এমনকি অনেকদিন পর আজ আবার প্রাণভরে সন্ধ্যার আকাশে ঘরে-ফেরা পাখিদের দেখলেন। হিন্দুস্তানী চা-ওয়ালাকে ডেকে ভাঁড়ে চা নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খেলেন। আজ দীননাথ এলে বেশ ভালো হয় ভাবছিলেন জগদীশ, তাহলে একসংগেই খবরটা দেওয়া যায় দু'জনকে।

অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে, নকুল হয়তো এখুনি এসে পড়বে। কিন্তু নকুল এসে পড়লেও, জগদীশ মনে মনে ঠিক করলেন, তক্ষুনি খবরটা ভাঙবেন না তিনি, দীননাথের জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবেন। দীননাথের সঙ্গে অবশ্য জগ-দীশের কোন রেষারেষি নেই। বরং দীন-নাথের জন্য বড় মায়া হয় জগদীশের। বেচারী! নিতান্ত কম মাইনের চাকুরে ছিল দীননাথ, রিটায়ার করার পর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড পেয়েছে যৎসামান্য। জমি কিনে চার কামরার ঘর তুলতেই সব টাকা বেরিয়ে গেছে মানুষটার। তাও পাঁচ ইঞ্চির দেয়াল, টালির ছাদ, টাকায় কুলোয়নি বলে ছাদ ঢালাই করতে পারেনি, দরজা জানালায়

রং করাও এখনো বাকি। স্বামী-স্ত্রী এক-খানা ঘরে থাকে, বাকি তিনখানা ঘর ভাড়া দিয়েছে। ঘরপিছু কুড়ি টাকা, সাকুল্যে ষাট টাকা ভাড়া পায় দীননাথ। ভারি কষ্টে দিন যাচ্ছে ওর, পরিবারের সোনাদানা ভেঙে এখনো কোনোমতে চলছে। পরে যে কি হবে কে জানে! একটা ছেলেপুলেও নেই যে ভবিষ্যতে দীননাথ তার ওপর ভরসা করে বাঁচবে।

অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এই সময় নকুল এগিয়ে এলেন, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। জগদীশের মুখোমুখি ঘাসের ওপর বসে পড়ে আয়েস করে সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নকুল বললেন, যা একখানা বই করেছে না, ফাইন। দেখতে পার, অনেক কিছু বোঝবার জিনিস আছে হে, বুঝলে!

—তুমিই বোঝগে, ওসব ফিচলেমি আমার ভাল্লাগে না।

কাছেই ঝালমুড়ি ঘুগনিওয়ালা হাঁক-ছিল। নকুল ঘুগনিওয়ালাকে ডেকে শাল-পাতার ঠোঙায় ঘুগনি নিলেন, জগদীশকে জিজ্ঞেস করলেন, কি, খাবে নাকি?

—নাঃ, বিরক্তিভরে মুখ ফেরালেন জগদীশ। তারপর পয়সা নিয়ে ঘুগনি-ওয়ালা চলে গেলে বললেন, ওসব ছাইপাঁশ গেলো কেন? ওইজন্যেই তোমার বারোমাস পেটের ব্যারাম লেগে থাকে।

ঘুগনি খেতে খেতে ঝালের জন্য থেকে থেকে হিসিয়ে উঠছিলেন নকুল, জগদীশের কথায় অল্প হেসে বললেন, অত বাছবিচার করে আর কি হবে? আত্মা যা চায় তাই খেয়েনি। দিন তো ফুরিয়ে এল। তা তোমার কত হল?

—কিসের কত?

—আরে বয়েস। তোমার এখন বয়েস কত হল তাই জিজ্ঞেস করছি।

অল্প সময় চুপ করে যেন বয়েসের হিসেব করলেন জগদীশ, বললেন, একষট্টি চলছে।

অবিশ্বাসের হাসি হেসে নকুল বললেন, দুঃ, আমার কাছে বয়েস ভাঁড়াচ্ছ, ভাঁড়াও। চিত্রগুপ্তের খাতায় ঠিক ঠিক সব লেখা আছে কিন্তু। ঠিক টাইমে যমদূত এসে নিয়ে যাবে মনে থাকে যেন।

জগদীশ জ্বলে উঠলেন, আমি কি মিথ্যে বলছি নাকি?

—আহা, রাগো কেন, নকুল জগদীশকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন, তোমার আজ-কাল কি হয়েছে বলতো, একটুতেই রেগে যাও।

—রাগের কথা হলেই মানুষ রাগে, জগদীশ নকুলকে খোঁচা দিলেন, তোমার মতো পেটের রোগে ভুগে ভুগে আমার তো রক্ত ঠান্ডা হয়ে যায়নি।

দুজনের বাদানুবাদ আরো কতক্ষণ চলত কে জানে! এমন সময় দীননাথ এসে হাজির হলেন। ঘাসের ওপর বসে দুজনের দিকে একবার দেখলেন, তারপর নকুলের কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে একটা বিড়ি ধরালেন।

জগদীশ বললেন, কি হে, তুমি যে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠলে একেবারে, পাত্তাই নেই।

—ক'দিন একটু ব্যস্ত ছিলুম।

—তোমার আবার ব্যস্ত কি হে, নিঃসন্তান দীননাথকে একটা খোঁচা দেওয়ার সুযোগ পেয়ে সদ্ব্যবহার করলেন নকুল, তুমি তো যাকে বলে গিয়ে একেবারে ঝাড়া হাত-পা।

ধীর গলায় দীননাথ বললেন, পেন্সনের ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করে এলাম।

—তোমার চাকরিতে আবার পেন্সন কোথায় জগদীশ অবাক হন।

হাত নেড়ে দীননাথ বললেন, না, না, সে পেন্সন নয়। গবরমেণ্ট আজকাল অনাথ বুড়োদের পেন্সন দিচ্ছে জান তো, সেই পেন্সন। টাকা অবশ্য খুব সামান্য।

উৎসাহিত গলায় নকুল বললেন, যাক, একটা কাজের কাজ করেছ তবু। সামান্য টাকা বলছ, তাই বা তোমাকে কে দেয়?

জগদীশ কিছু বললেন না, বলতে পারলেন না। দীননাথের এই সৌভাগ্যে তিনি যেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। ছেলের গেজেটেড অফিসার হওয়ার খবর শোনাবেন বলে সারাটা দিন এত পাঁয়তারা কষলেন, কিন্তু এই মুহূর্তে তা যেন কেমন অর্থহীন অন্তঃসারশূন্য বলে মনে হচ্ছে জগদীশের। সামান্য টাকার সরকারী পেন্সন, কিন্তু জগদীশের মনে হচ্ছে, দীননাথ যেন মস্ত বড়ো কিছু একটা পেয়ে গেছেন এবং সেই পাওয়ার কাছে জগদীশের ছেলের গেজেটেড অফিসার হওয়া কেমন নিষ্প্রভ করুণ এবং অকিঞ্চিৎ-কর। আজ আর ছেলের খবরটা না ভাঙাই ভালো। নিতান্তই বেখাপ্পা বেমানান হবে সেটা। তেমন জমবেও না বোধহয়। নিজের ভেতরেও তেমন একটা জোরালো তাগিদ যেন অনুভব করছেন না জগদীশ।

উৎফুল্ল আমেজী গলায় নকুল বললেন, ওঠো হে সব, ব্যাপারটা একটু সেলিব্রেট করা যাক। হাবুলের দোকানে তিন কাপ ডবল-হাফ চা হোক অন্তত।

নকুল উঠে দাঁড়ালেন। অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারলেন না জগদীশ, দীননাথের চোখদুটো খুশিতেই অমন চকচক করছে কিনা। তিন-তিনটে রোজগেরে ছেলের বাপ জগদীশ নিঃসন্তান দীননাথের প্রতি এই প্রথম এক সূক্ষ্ম ঈর্ষা অনুভব করলেন।

গলা খুসখুস করছিল না, তবু জগদীশ জোরে জোরে বারকয়েক কাশলেন। যেন কেশে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করলেন তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নকুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, চলো।

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার জীবনচর্চা

খড়্গপুর পেরিয়ে আরও পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলে বাংলা দেশের জল-হাওয়ার স্পর্শ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসে। কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গাঙ্গেয় সমভূমিতে যে সমস্ত গাছপালা জন্মায় খড়্গপুর পেরিয়ে গেলে স্বাভাবিক কারণেই আর সেগুলো চোখে পড়ে না। খড়্গপুর অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে পলিমাটির নারকেল সুপুরি গাছের পরিবর্তে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী শাল পিয়ালের গাছ। রুক্ষ কাঁকুরে মাটির এই সমস্ত দীর্ঘদেহী গাছগুলো দেখতে দেখতে মনের মধ্যেও কেমন যেন একটা পরিবর্তন এনে দেয়। গাঙ্গেয় অঞ্চলের পলিমাটির সঙ্গে তখন আর মনের কোন যোগ থাকে না। হাতছানি দিয়ে ডাকে মেঘমদির ময়ুরঝরা বন, ছায়াঘেরা শালবিথীর দীর্ঘ রহস্য।

ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা মেদিনীপুর জেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির আদান-প্রদান, মিলন ও সংঘাত, মিশ্রণ ও সমন্বয় মেদিনীপুরে যেভাবে ঘটেছে বাংলাদেশের অন্য কোথাও বোধহয় তেমন করে হয়নি। অবশ্য তা সম্ভব হয়েছে মেদিনীপুরের ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই।

'বীরভূমের কিছুটা অংশ, বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ এবং মেদিনীপুরের অনেকটা অংশ (প্রধানতঃ উত্তর মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম মহকুমা) হল বাংলাদেশের মধ্যে প্রাকৃতিক বয়সের দিক দিয়ে সবচেয়ে প্রবীণ ও প্রাচীন।'

এই অঞ্চলের একপ্রান্তে প্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বাংলাদেশের আদিম মানুষের বংশধরেরা যেন অপর প্রান্তের নদী-বিধৌত উর্বর অঞ্চলের সভ্যতার উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে আদান-প্রদানের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে। এপার বাংলা এবং ওপার বাংলা, সমভূমি বাংলা এবং সীমান্ত বাংলা এই উভয় বাংলার একই মানুষের সম্বন্ধসূত্র নির্ণয়ের সুযোগ এই অঞ্চলে যেমন আছে তেমন সুযোগ বাংলাদেশের আর কোথাও নেই। খড়্গপুরের পশ্চিম প্রান্ত থেকে আরম্ভ করে সমগ্র ঝাড়গ্রাম মহকুমাই এই মিলন-তীর্থের অন্তর্ভুক্ত।

এই অঞ্চলের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি এবং জীবনযাত্রা গাঙ্গেয় উপকূল-বিধৌত বাংলাদেশের আচার-আচরণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বলা না গেলেও অনেকাংশে পৃথক সে কথা সহজেই বলা চলে। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের শতকরা ৯৫ জন দরিদ্র কৃষিজীবী। কোনক্রমে কায়ক্লেশে এরা জীবিকা নির্বাহ করে। উপেক্ষিত এই অঞ্চলে এখনো কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। তাই নাগরিক জীবনের সাথে এদের যোগাযোগ অতিশয় ক্ষীণ। প্রয়োজনের তুলনায় কলেজের সংখ্যা বাদই দিলাম, স্কুলের সংখ্যাও অতিশয় নগণ্য। তাই শিক্ষিতের হারও অতি অল্প।

সীমান্ত বাংলার যে অঞ্চল সম্বন্ধে বলতে চাই, সেই ঝাড়গ্রাম মহকুমাতে এ পর্যন্ত কলেজের সংখ্যা তিনটি। একটি পলিটেকনিক এবং একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ইদানীং সরকারের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে। যা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য।

আগেই বলেছি এ অঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষিজীবী। এরা কৃষিজীবী হলেও এদের অনেকেরই নিজের কোন জমি নেই। নিজেদের লাঙল নিয়ে অপরের জমি এরা ভাগে চাষ করে। ভাগে যে ফসল পায় তাতে অনাহারে অর্ধাহারে কোনক্রমে এদের দিন কাটে।

বিনয় মাহাতো

এই অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই অঞ্চলে প্রধানতঃ মাহাতো, ভূমিজ, সাঁওতাল এবং প্রায় প্রতি গ্রামে দু-একঘর ধোপা, নাপিত, কামার, কুমোর প্রভৃতির বাস। তবে মাহাতো জাতির প্রাধান্য থাকায় সাঁওতাল বাদ দিয়ে, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি উপজাতিগুলো এদের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সাঁওতালরা অবশ্য এখনো তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছে। মাহাতোরা সংঘবদ্ধভাবে বাস করতে ভালোবাসে। এই অঞ্চলের গ্রামগুলোর সমীক্ষা নিলে সহজেই বোঝা যাবে প্রায় অধিকাংশ গ্রামে মাহাতোদের প্রাধান্য। এবং মাহাতো গ্রামের প্রায় প্রতি গ্রামেই একঘর কর্মকার, একঘর নাপিত, একঘর ধোপা প্রভৃতি দেখা যায়। এর থেকে সহজেই অনুমান করা চলে যে, এককালে গ্রামটি পুরোপুরি মাহাতো অধ্যুষিতই ছিল, আর তাদের নিজেরই প্রয়োজনে, ধোপা, নাপিত, কামার প্রভৃতিকে গাঁয়ে বসতি স্থাপনের সুযোগ দিয়েছে। এই সমস্ত কামার, ধোপা, নাপিত প্রভৃতিকে দিয়ে এরা পালার বিনিময়ে কাজ করায় না। এদের সঙ্গে একটা বাৎসরিক চুক্তি থাকে যে সারা বছর এরা ওদের প্রয়োজনীয় কাজ করে যাবে এবং বিনিময়ে বছরের শেষে একটা বিশেষ পরিমাণ ধান পাবে। এমনিভাবেই এই সমস্ত পরিবারগুলোর জীবনযাত্রা নির্বাহিত হয়। তাই উপজীবিকা-নির্ভর এই সমস্ত পরিবারের নিজস্ব জমি-জমা না থাকলেও সংসারনির্বাহে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না।

মাহাতোরা বাঙালী কী না সে বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনার অবকাশ আছে। সম্ভবতঃ বিহারের মানভূম অঞ্চলে এদের পূর্বপুরুষের বাস ছিল। জীবিকার সন্ধানে এরা ক্রমশঃ উর্বরমাটির দেশ বাংলাদেশের দিকে যাত্রা শুরু করে। মাহাতোদের ভাষার সঙ্গে তাই হিন্দি ভাষার অনেকাংশে মিল দেখা যায়। তারা যে উপভাষা ব্যবহার করে তা কীভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান রূপ নিয়েছে, তা ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার বিষয়। তাই সে সম্বন্ধে শিথিলভাবে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

এই অঞ্চলের অধিবাসীরা গরীব হলেও, অর্ধাশনে, অনশনে কায়ক্লেশে জীবন-যাপন করলেও ক্লান্ত, হতাশাপূর্ণ জীবনে তারা দুঃখ ভুলে থাকার চেষ্টা করে। তাই বারোমাসে তাদের ঘরে তের পার্বণ। এই পার্বণের অর্থাৎ উৎসবের দিনগুলোতে তারা প্রাত্যহিক জীবনের গ্লানি ভুলে থাকার চেষ্টা করে। হাঁড়িয়া বা মহুয়ার মদ খেয়ে আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠে এই অঞ্চলের নারী-পুরুষ। এই অঞ্চলের পার্বনের মধ্যে বর্ষা ঋতুরই প্রাধান্য। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের প্রকৃতিও এই সময় কেমন যেন মুখর হয়ে ওঠে, সজীব হয়ে ওঠে। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা শালগাছগুলো নূতন পত্র-পল্লবে সবুজ হয়ে ওঠে। চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। শুধু সবুজের মেলা। শালগাছের গোড়ায় গোড়ায় দেখা যায় নূতন, চারা গাছের উদ্গম। তখন এ অঞ্চলের নারী-পুরুষ প্রকৃতির সবুজ রূপে স্নিগ্ধ হয়ে মনের উল্লাসে গেয়ে ওঠে,—

> শাল গাছে শাল পংড়া
> কদম গাছে কলি রে,
> বঁধার গায়ে লাল গামছা
> ছুটক দেখে মরি-রে।।

শাল গাছের গোড়ায় গজিয়ে উঠেছে নূতন চারা, কুঁড়ি ধরেছে কদম গাছে। বঁধুর মনে খুশী আর ধরে না। তাই তার গায়ে নূতন লাল গামছা। ধুতি অর্থাৎ

বড় কাপড় কেনার সাধ্য এদের নেই। নাইবা থাকল। তাতে কী আসে যায়। যে বস্ত্রটুকু কিনতে পেরেছে তাতেই প্রতিফলিত হয়েছে তাদের মনের রং। সখার গায়ে লাল গামছা, সখীও কিন্তু কম যান না। তার সাধ এই মুখর বর্ষাদিনে সেও নব-বস্ত্র পরবে। কিন্তু সাধ থাকলেই সব সময় সাধ্যে কুলোবে তার কোন মানে নেই। হাটে গিয়ে নূতন কাপড় কেনার ইচ্ছা থাকলেও সে ইচ্ছেটাকে দমিয়ে রাখতে হয় অতি কষ্টে। নাই বা গেলাম হাটে। গাঁয়ের মধ্যেই তাঁতী ভাই তো আছে। শিল্পী হিসাবে সেই বা কম কি?

কুলাহি মুড়ায় তাঁতীঘর
কাপড় বুনে ছুর্-ছুর্
আরতাইতান বলে দিবি তাঁতীকে
আঁচলে কদমের কলি দিতে।

কুলাহি মুড়ায় অর্থাৎ গ্রামের প্রান্তে তাঁতীর বাস. সেও কম দক্ষ শিল্পী নয়। ছুর্ ছুর্ কাপড় বোনে। অর্থাৎ কাপড় বোনায় সে সুদক্ষ শিল্পী। ব্যস্ত মানুষ, কাজের মানুষ। তাই পছন্দসই কাপড়ের ফরমাস দিতে গিয়ে তার সংগে প্রায়ই দেখা হয় না। অগত্যা তাঁতী বৌকেই বলে আসতে হয়,—সে যেন তাঁতীকে মনে করিয়ে দেয়, ও যেন আঁচলে কদমের কলি দিতে কোনক্রমেই ভুল না করে।

বর্ষাকাল। গ্রীষ্মকালে যে বুনো ঝোপগুলো কোনক্রমে অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল, সেগুলোই বর্ষার প্রারম্ভে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ঝোপের আড়ালে পাশের মানুষকেও সহজে দেখা যায় না। বনের ধারেই গ্রাম। শিয়াল, হুড়ার তাই শিকারের লোভে, গ্রীষ্মকালে মানুষের সতর্ক চোখকে ফাঁকি দিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকতে না পারলেও বর্ষাকালে তাদের কোন অসুবিধাই হয় না। গ্রামীন কবির *গানে সীমান্ত বাংলার এই চিত্র সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে.—*

আষাঢ় শরাবণ মাসে
সাঁঝে সকালে শিয়াল আসে গো
সাঁঝে সকালে শিয়াল আসে।

এই শিয়ালের হাত থেকে পোষা মুরগীগুলোকে রক্ষা করার জন্য তাদের সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় এই বর্ষাকালে।

বর্ষাকাল চাষের সময়। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রায় সকলকেই এই সময়ে চাষের কাজে ব্যাপৃত থাকতে হয়। এ সময় ভালো ফসলের আশায় এরা গ্রাম্য দেবতার পুজো করে। তারপর শুরু করে চাষের কাজ। প্রতি গ্রামেই একটি দেবতা আছেন। এই দেবতা গরাম দেবতা। ভাষা-তাত্ত্বিক বিচারে গ্রাম শব্দের অপভ্রংশ হয় গেরাম। কিন্তু এই অঞ্চলের কোথাও গেরাম দেবতা বলতে শুনিনি। যদিও কোন কোন লোক-সাহিত্যের আলোচক তাঁদের আলোচনায় এই দেবতাকে গেরাম-দেবতা বলেই অভিহিত করেছেন। এই গরাম দেবতার পুজোর প্রস্তুতি চলে চৈত্র মাস থেকে। সাধারণতঃ চৈত্র মাসের কোন নির্দিষ্ট দিনে গ্রামবাসীরা গ্রামের শীতলা মন্দিরে বা মোড়লের বাড়ীতে বা অন্য কোন জায়গায় মিলিত হয়ে তাদের আঁতড়া ঘোচাবার দিন স্থির করে নেয়। আঁতড়া শব্দটি ঠিক কোন শব্দ থেকে এসেছে বোঝা যায় না। [(অন্তর আঁতর—আঁতরা (তুচ্ছার্থে)—আঁতড়া?)

সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা?)]

ঐদিন গ্রামের প্রতিটি বাড়ীতে বলে দেওয়া থাকে যে, তাদের বাড়ীর পুরোনো জঞ্জাল, অর্থাৎ ভাঙা কুলো, ঝাঁটা ঝুড়ি, প্রভৃতি তাঁরা যেন রয়েই বাড়ীর বাইরে রেখে দেয়। এই সমস্ত জঞ্জাল গাঁয়ের একদল যুবক প্রতি বাড়ী থেকে সংগ্রহ করে গ্রাম থেকে দূরে (অন্তর) কোন নির্জন জায়গায় ফেলে দেওয়ার জন্য চলে যায়। এই আঁতড়া ঘোচানোয় অর্থাৎ জঞ্জাল মুক্তিতে প্রায় প্রতিটি বাড়ীর একজন প্রতিনিধি থাকে। সাধারণতঃ যুবক এবং কিশোরেরাই এই দায়িত্ব পালন করে থাকে। এই যুবক এবং কিশোরদের দল সূর্যোদয়ের আগেই প্রতিটি বাড়ীর জঞ্জাল সংগ্রহ করে গ্রাম থেকে দূরে কোন নির্জন জায়গায় সেগুলো ফেলে দেয়। ফেলে দেওয়ার পরই কিন্তু তারা বাড়ী ফেরে না। সেখানে তারা এই জঞ্জালের দেবতার পুজো করে। এই দেবতার পুজোয় সাধারণতঃ দেবতার উদ্দেশ্যে মুরগী পাঁঠা প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়ে থাকে। যে সব যুবকেরা আঁতড়া ঘোচাতে আসে তারা আসার সময় প্রতিটি বাড়ী থেকে কিছু চাল, ডাল, নুন, প্রভৃতিও প্রথা অনুসারে নিয়ে আসে। এবং পুজোর শেষে এই চাল ডাল রান্না করে এবং প্রসাদী মাংসের সংগে ভোজন করে। এটা অনেকটা বন-ভোজনের মত। তারপর সূর্য অস্ত গেলে তারা ঘরে ফিরে আসে। এই আঁতড়া ঘোচানো না হলে অর্থাৎ জঞ্জাল মুক্ত না হলে গরাম দেবতার পুজো করা যায় না। অর্থাৎ পুজোর আগে গ্রামটিকে পরিচ্ছন্ন করে নেওয়া চাই। *এই গরাম দেবতার পুজোর নির্দিষ্ট কোন তিথি নেই। চাষের কাজ আরম্ভ হওয়ার কিছুদিন আগে বৃষ্টির দেবতার কাছে কৃষি কাজের উপযোগী বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়। এই পুজোর আগে ধান রোয়ার কাজ আরম্ভ করা যায় না। এই গরাম দেবতার পুজো আষাঢ় মাসে অনুষ্ঠিত হয় বলে একে আষাঢ়ী পুজোও বলা হয়ে থাকে। এই পুজোতে মুরগী পাঁঠা প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। লোক-সাহিত্যের কোন কোন আলোচক এই পুজোতে ফলও বলি দেওয়া হয় বলে উল্লেখ করেছেন। এই গরাম পুজো অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় আমি গরাম থানে উপস্থিত থেকেছি বহুবার। কিন্তু ফল বলি দিতে কোথাও দেখিনি। এই পুজোতে প্রতিটি বাড়ী থেকে থালায় নৈবেদ্য সাজিয়ে একজন করে গরাম থানে যায়। অবশ্য অনেকের যেতে কোন বাধা নেই। প্রতিটি পরিবার তাদের নৈবেদ্যের সংগে সংগে এই দেবতার উদ্দেশ্যে মাটির তৈরী হাতী ও ঘোড়া নিবেদন করে। তাদের বিশ্বাস এই ঘোড়ায় চড়ে দেবতা গ্রামের সমস্ত কৃষি-অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। এবং কৃষকেরা যাতে ভালো ফসল পায় তার দেখাশোনা করেন। এই গরাম দেবতার পুজো ছাড়া যেমন কৃষি-কাজ আরম্ভ করা হয় না, তেমনি ক্ষেতের ফসল পেকে উঠলে এই দেবতার পুজো ছাড়া সে ফসল ঘরেও তোলা যায় না। নূতন ধানের আতপ চাল এবং কাঁচা দুধে দেবতার পুজো করে দেবতার নির্দেশ নিয়ে তবেই ক্ষেতের ফসল কাটা আরম্ভ হয়।*

গরাম দেবতার পুজোর পর চাষের কাজ যখন শেষ হয়ে যায়, এই অঞ্চলের অধিবাসীরা তখন আবার উৎসবে মুখর হয়ে ওঠেন। সাধারণতঃ ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই ক্ষেতের কাজ শেষ হয়ে যায়। তখন শরতের নির্মল আকাশ। ধানের ক্ষেতে সবুজের সমারোহ। প্রকৃতির স্নিগ্ধ শ্যামল রূপ। প্রকৃতির সন্তান এই অঞ্চলের অধিবাসীরাও প্রকৃতির এই রূপকে বন্দনা করে তাদের হৃদয়ের আকুতি দিয়ে। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে কুমারী মেয়েরা যাওয়া গানের মাধ্যমে শস্য উৎসব পালন করে। এই উৎসব শুক্লপক্ষের প্রথম দিন থেকে আরম্ভ করে একাদশী তিথি পর্যন্ত পালিত হয়ে থাকে। কুমারী মেয়েরা একাদশীর ৩।৫ কিংবা ৭ দিন পূর্বে প্রকলিত হয়ে একটি ডালার মধ্যে বালি দিয়ে ঐ অঞ্চলে যে সমস্ত শস্য জন্মায় সেই সমস্ত শস্যবীজ কাঁচা হলুদে বাঁভিয়ে ঐ ডালার মধ্যে চারা দেয়। এবং একাদশী তিথি পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় সমস্ত কুমারী মেয়েরা ঐ ডালাটিকে মাঝখানে রেখে নৃত্যগীত সহকারে নবাঙ্কুর চারা গাছগুলোর বন্দনা করে। তারপর একাদশী তিথিতে আসে তাদের পুণ্য করম ঠাকুরের ব্রত উদযাপনের দিন।

করম পুজোর আগেরদিন অর্থাৎ ভাদ্র-*মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে পাড়ার প্রতিটি বাড়ীতে পিঠে তৈরীর রেওয়াজ আছে। সেদিন রাত্রে গ্রামের কিশোর-কিশোরীরা ঐ পিঠে খেয়ে সকাল সকাল ঘুমোতে যায়। তারপর একাদশী তিথির পুণ্য লগ্নে ভোরবেলায় ঐ সমস্ত কিশোর-কিশোরী গ্রামের বিশেষ কোন জায়গায় মিলিত হয়ে ঐ পুজোর জন্য ফুল সংগ্রহে বনে যায়। এইদিনে সারাদিন তারা উপবাস পালন করে। এমনকি জল পর্যন্ত গ্রহণ করে না, তারপর দিনের শেষে সূর্য অস্ত গেলে পুজোর জন্য সংগৃহীত ফুল এবং ফল নিয়ে তারা ঘরে ফেরে। ঐ সমস্ত ফুল ফল তুলসীতলায় রেখে, তারা গ্রামের পুকুরে স্নান করতে যায়। সারাদিনের উপবাস-ক্লান্ত কিশোরেরা ঐ সময় বন থেকে তাদেরই সংগৃহীত দাঁতন মুখে দাঁত মাজতে মাজতে স্নান করতে যায়। ঐদিন হলুদ মেখে স্নান করার রীতি প্রচলিত। তারপর স্নানের শেষে ঘরে ফেরার সময় তারা মুঠো ভরে পুকুর ধারের ক্ষেত*,

থেকে নিয়ে আসে নূতন ধান গাছের সবুজ প্যাতা, করম ঠাকুরের পদতলে অঞ্জলি দিতে।

তারপর ঘরে ফিরে তাদের সারাদিনের সংগৃহীত ফুল থালায় সাজিয়ে, তারা সূর্যাস্তের পর যে বাড়ীতে করম গাছের ডাল পোঁতা হয়েছে, সেখানে সেই করম-ডালের তলায় সবাই গিয়ে সমবেত হয়। কিশোর-কিশোরী প্রত্যেকের নৈবেদ্যের থালাতে থাকে একটি করে সবুজ এবং সুপুষ্ট কাঁকুড়। এই কাঁকুড়টি হল পুত্রের প্রতীক। ভবিষ্যৎ জীবনে তাদের প্রত্যেকের এই কাঁকুড়ের মত পুত্র হবে তরা। সকলে করমঠাকুরের কাছে এই প্রার্থনা জানায়। এই কাঁকুড়ের মত পুত্র হবে তারা সকলে মোড়লের বাড়ীতেই পোঁতা হয়ে থাকে। লোক-সাহিত্যের কোন কোন আলোচক এই করম গাছকে কদম গাছ মনে করে বিভ্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু করম গাছ এবং কদম গাছ এক নয়। এই করম পূজার ব্রত উদযাপন কারীদের বলা হয় পার্বতী। কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে সকলকেই পার্বতী বলা হয়ে থাকে। এর থেকে অনুমান করা চলে প্রথমে এই করমপূজার ব্রত কুমারীদের দ্বারাই উদযাপিত হত। পার্বতী যেমন শিবের জন্য কঠোর ব্রত পালন করেছিলেন, তেমনি এই পল্লী-অঞ্চলের কুমারীগণও উপযুক্ত বর এবং সুপুত্রের (কার্তিকের মত —কাঁকুড় যার প্রতীক) প্রত্যাশায় এই ব্রত উদযাপন করে। কিন্তু এই ব্রত পরবর্তী-কালে কেবলমাত্র কুমারীদের মধ্যেই সীমা-বদ্ধ থাকেনি। সীমান্ত বাংলার মানুষে এই ব্রতের পুণ্য অর্জনে কিশোরী কন্যাদের সংগে কিশোর পুত্রদেরও উৎসাহিত করেছে। এই ব্রতের পুণ্যে যদি কন্যারা উপযুক্ত স্বামী-পুত্র লাভ করতে পারে তবে পুত্রেরাই বা কেন উপযুক্ত বধূ এবং পুত্রের জন্য এই ব্রত উদযাপন করবে না? এই প্রশ্ন তাদের মনে জেগেছে। এবং কন্যাদের সংগে সংগে পুত্রদেরও এই ব্রত উদযাপনে উৎ-সাহিত করেছে।

পার্বতীরা মোড়লের বাড়ীতে করম-তলায় পৌঁছানোর আগেই সেখানে করম ঠাকুরের পূজার জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত উপস্থিত থাকেন। তিন গল্পর মাধ্যমে এই ব্রত উদযাপনের গুণাগুণ পার্বতীদের ব্যাখ্যা করেন, এবং ঐ ব্রত থেকে ভ্রষ্ট হলে তার যে আর দুঃখের অবধি থাকে না, সেকথাও গল্পের মাধ্যমে পার্বতীদের জানিয়ে দেন।

কর্মু এবং ধর্মু দুই ভাই ছিল। কর্মু সঠিক ভাবে করম ঠাকুরের ব্রত উদযাপন করেছিল, তাই তার সুখের অন্ত ছিল না। [illegible]

গুপ্তিপাড়া বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির

ফটো ঃ বিষ্টু দত্ত
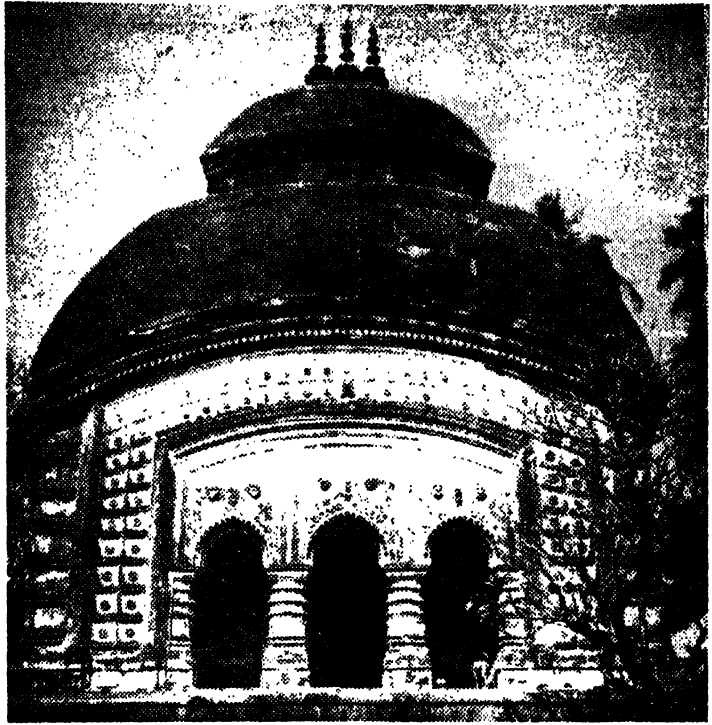
পারেনি বলে তার দুঃখের অবধি ছিল না। ধর্মু ব্রতের সব নিয়মই প্রায় ঠিক ঠিক পালন করেছিল, কিন্তু ব্রত ভংগের নিয়ম সে ঠিকভাবে পালন করতে পারেনি। তাই তার জীবনে নেমে এসেছিল করমঠাকুরের রুদ্র রোষ। ব্রত ভংগ করতে হয় পান্তা ভাত খেয়ে। কিন্তু ধর্মু ব্রত ভংগ করেছিল পান্তাভাতের পরিবর্তে গরম ভাত খেয়ে। তাই তার করম কপাল বাম হয়ে-ছিল, এবং পরিণামে অশেষ দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল। তাই পুরোহিতমশাই পার্বতীদের সতর্ক করে দেন তারা যেন কেউ ভুলক্রমেও গরম ভাতে পান্না না করে। এই খাদ্য গ্রহণ করে ব্রতভংগকে বলা হয় পান্না।

তারপর পুরোহিত মশায়ের গল্প বলা শেষ হলে পার্বতীরা যে যার ঘরে ফিরে যায়। তাদের প্রদীপের আলোয় গাঁয়ের কুলি রাস্তা ক্ষণিকের জন্য ঝলমল করে ওঠে। সীমান্ত বাংলার নারী-পুরুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

ভাইজরে করমঠাকুর ঘরে দুয়ারে
কাইলরে করমঠাকুর শাঁখ নদী পারে।

সেদিন সবাই করমঠাকুরের আত্মীয়তা অনুভব করে, কিন্তু পরদিনই যে করমঠাকুর আবার তাদের ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাবেন, সেই বিয়োগ-ব্যথাও তারা ভুলতে পারে না। শাঁখনদী কতদূর কেউ জানে না। শাঁখনদী এখানে দূরত্বের প্রতীক।

পল্লীকবি রচিত এই গানের মধ্যে যেন ধ্বনিত হয়ে ওঠে বিজয়ার করুণ রাগিণী। তাদের প্রিয় ঠাকুরকে আরও কিছুক্ষণ কাছে পাওয়ার আকুতি। এ যেন নবমী নিশির করুণ আর্তনাদ, 'না পোহাও আর নবমীর নিশি' কিংবা পদাবলীর সেই অমৃত পদ, 'যোগিনী চরণ সাধন করহু, বান্ধহু যামিনী নাথে'।

পরের দিন প্রভাতে কিশোরীর দল তাদের যাওয়া অর্থাৎ অঙ্কুরিত শস্য-বীজকে ঘিরে নৃত্য করতে থাকে। কুমারী মেয়েদের এই নাচ দেখতে এবং গান শুনতে গাঁয়ের বৃদ্ধরা এসে জড়ো হয়। তাদেরকে উৎসাহিত করে। তাদের ভাবী পতিগৃহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্রমে বেলা বেড়ে উঠলে তাদের দেওয়া সেই হলুদ চারাগাছগুলো ডালা থেকে তুলে নিয়ে তারা ঘরে ফিরে। এবং সেগুলো তারা ধানের গোলায় ভক্তি-সহকারে রেখে দেয়। তাদের বিশ্বাস পরের বছর শস্যের ভারে ধানের গোলা ভরে উঠবে।

করমপুজার পরদিন অর্থাৎ দ্বাদশীর দিন এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ উৎসব ইঁদ পরব অনুষ্ঠিত হয়। সীমান্ত বাংলার নারীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে,—

বারমাসে তের পরব
ভাদর মাসে ইঁদ
চল দেউরা বাহিরাই যাব
ইঁদ [illegible]

বিদেশী চিকিৎসকের চোখে সেকালের বাঙালী

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকের বাঙালী সমাজ সম্বন্ধে সেকালের সংবাদপত্রে নানা লেখকের এবং কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় অনেক তথ্য জানা যায়। বাংলার নবশিক্ষিত ও কৃতী সন্তানদের কার্যকলাপ, দেশের নানা সমাজ সংস্কারের কাহিনী, 'বাবু'দের দান, উৎসব ও ব্যসন—এসব বিষয়ে বহু সংবাদ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকদের বিচারে যাদের সামাজিক প্রয়োজন বা নিউজ ভ্যালু আছে, সেই সব বিষয়ে এঁদের লেখা সীমাবদ্ধ থাকতো। চিকিৎসকের দৃষ্টিভঙ্গী—বিশেষতঃ বিদেশীয়দের—সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাঙালীদের আচার-ব্যবহার, স্বাস্থ্য, রোগ ও তার চিকিৎসা ইত্যাদি যে সব বিষয় সাধারণতঃ সেকালের দেশীয় লেখকরা বর্ণনার উপযুক্ত বলে মনে করতেন না, সেগুলিই চিকিৎসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ জন্য ইংরাজ ডাক্তার উইলিয়ম টোয়াইনিং-এর লেখা উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের সূচনায় বাঙালীদের বিবরণ চিত্তাকর্ষক হওয়া স্বাভাবিক।

ডাক্তার টোয়াইনিং ১৮২৪ থেকে ১৮৩৫ পর্যন্ত কলকাতার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসক ছিলেন। এছাড়া তিনি খিদিরপুর অনাথ আশ্রমের ও কলকাতার জেলের ডাক্তার পদেও নিযুক্ত ছিলেন। স্থানীয় ইউরোপীয় ও বিত্তবান বাঙালী সমাজে তাঁর চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতি ছিল। এজন্য তাঁর সেকালের নানাজাতীয় কলকাতাবাসীদের সাধারণ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বহু বিষয় জানার সুযোগ হয়। ডাক্তার টোয়াইনিং-এর লেখা বাংলাদেশের রোগ বিষয়ের পুস্তক Chinical observations on the diseases of Bengal vols I & II, দ্বিতীয় সংস্করণ কলকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে ১৮৩৫ অব্দে ছাপা হয়। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের পর, ওই কলেজের স্নাতকদের এই বই উপহার দেওয়া হত।

স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে ডাঃ টোয়াইনিং খুবই সচেতন ছিলেন। তাঁর মতে বাঙালীদের জীবনযাত্রার অনেক অভ্যাস—মিতাহার ও সাধারণতঃ মদ্যপান না করা—যেগুলি এ-দেশের আবহাওয়ার পক্ষে বেশী উপযুক্ত—এখনকার ইউরোপীয়দের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে ভাল। ইংরাজেরা সেকালে অত্যধিক মাংসাহার ও মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল। টোয়াইনিং নিজে মদ্যপান করতেন না এবং তাঁর মত ছিল যে, ইউরোপীয়রা যদি এ-দেশে আসার পর অন্ততঃ ২ বৎসর মদ্যপানে বিরত থাকেন, তবে তাঁদের স্বাস্থ্য অনেক ভাল থাকা সম্ভব।

সেকালে ধারণা ছিল যে স্থানীয় আবহাওয়ার প্রভাবে ইউরোপীয় ও দেশীয়দের নানা রোগ হয়। এজন্য বাংলাদেশের জলবায়ু ও নানা রোগের উপর এর প্রভাব, সেকালের চিকিৎসকের অনুশীলনের বিষয় ছিল। ডাক্তার টোয়াইনিং বাংলাদেশে তিনটি স্পষ্ট রকমের ঋতু আছে বলে বিশ্বাস করতেন—১লা মার্চ থেকে ১লা জুন শুষ্ক গ্রীষ্মকাল, ১লা জুন থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত বর্ষা ও নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঠাণ্ডা আবহাওয়ার (cold weather) সময়।

দেশীয়রা গ্রীষ্মকালে সম্ভব হলে বেশী শারীরিক পরিশ্রম করতো না, খাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে দিত এবং কয়েক রকমের ফল ও ঠাণ্ডা পানীয় ব্যবহার করতো। এছাড়া নালতা পাতা ভেজানো জল সকালে পান করতো—এতে নাকি শরীর ঠাণ্ডা রাখে, ভাল হজম হয় ও দৌর্বল্য নাশ করে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে। ভাদ্র মাস অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বলে বিশ্বাস ছিল এবং এ মাসে বিদেশযাত্রা, নূতন ব্যবসায় আরম্ভ, বিবাহ এবং আত্মীয়গৃহে যাওয়া—সব নিষিদ্ধ ছিল।

প্রতাপচন্দ্র সেনগুপ্ত

টোয়াইনিং-এর ধারণা হয় যে, বহু যুগের অভিজ্ঞতার ফলে এইসব সংস্কারের সৃষ্টি—কারণ এ-মাসের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় কোনও রকম দুশ্চিন্তা, শ্রমসাধ্য কাজ, ইত্যাদি না করাই উচিত। গ্রীষ্মকালে জ্বর, সন্ন্যাস রোগ, উন্মাদ রোগ বেশী হত। ফুসফুসের রোগ ও হাঁপানী গ্রীষ্মের আরম্ভে দেখা যেত। মে মাসে কলেরা রোগ, বর্ষাকালে 'রেমিটেন্ট' জ্বর, রক্ত আমাশয় ও প্লীহার রোগ, শীতকালে আমাশয়, লিভারের রোগ ও স্ফোটক, সর্দিকাশী, বাত, আর শীতের শেষে হাম ও বসন্ত রোগের প্রকোপ দেখা যেত।

কলকাতায় তখন ভারতের নানা প্রদেশের লোক বাস করতো। বাঙালীরা বেশীর ভাগই রাজপুতদের মতন বলিষ্ঠ ছিল না। তবে অনেক বাঙালী পরিবারের লোকেরা দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ ও শক্ত গড়নের ছিলেন। তাঁর মতে বাঙালীরা সুশ্রী জাতের মানুষ। এদের ককেশিয়ান ধরনের মাথার গড়ন ও মুখমণ্ডল। চেহারায় বাঙালীরা বুদ্ধিমান ও নম্র স্বভাবের বলে বোঝা যেত। অনেকের চেহারায় স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ও আত্মমর্যাদা সূচিত হত।

বাঙালীদের ঢিলেঢালা পোশাক তিনি স্বাস্থ্যসম্মত মনে করতেন। রোজ ২৫—৩০ হাজার লোক গঙ্গাস্নান করে ভিজা কাপড়ে অনেক সময়ে ২-৩ মাইল দূরে বাড়ী ফিরে যেত—এবং এভাবে ভিজা কাপড় গায়ে শুকানো সত্ত্বেও অসুস্থ হতো না। এটা তাঁর খুব আশ্চর্য বোধ হত। স্নানের সময়ে শরীরে তেল মাখা, সম্ভবতঃ চর্মের স্বাস্থ্য ভাল রাখে বলে তাঁর ধারণা হয়েছিল। বাঙালীরা অনেকেই দিনে একাধিকবার স্নান করতো। কিন্তু এদেশীয়দের জ্বর হওয়া মাত্র স্নান বন্ধ করা এবং অনেক সময়ে প্রায় জলস্পর্শ না করা—এই অভ্যাস তাঁর কাছে অদ্ভুত বোধ হত। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মুসলমান সৈন্যের উক্তি 'গোসল-ই-সিহ্হৎ-করদম' অর্থাৎ অসুখ সেরে যাওয়ার পর আমি স্নান করেছি—একথার উল্লেখ করেছেন।

সেকালে দেশীয়দের চিকিৎসা বৈদ্য, হাকিম বা হাতুড়েদের হাতে ন্যস্ত ছিল। পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা অল্প সংখ্যক বাঙালীর কাজে লাগতো।* বৈদ্য ও হাকিমদের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে ডাঃ টোয়াইনিং-এর যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। কিছু দেশীয় ঔষধ তিনি ও অপর ইংরাজ ডাক্তারেরা ব্যবহার করতেন—বিশেষতঃ দেশীয়দের চিকিৎসায়। যেমন—ম্যালেরিয়া জাতীয় জ্বরে গুলঞ্চ ও চিরেতার পাঁচন দেওয়া হত। নিমের পাঁচনও ব্যবহৃত হত। বৈদ্যদের চিকিৎসায় যেসব ঔষধ ব্যবহার হত, তার কয়েকটার তিনি তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন। এক প্রকার সাংঘাতিক জ্বরে—হাকিমরা যাকে 'বিগড়' বলতেন—বিষবড়ি ব্যবহারের কথা তিনি জানতেন। এই বড়িতে কোনও উত্তেজক বিষাক্ত জিনিস থাকতো যার ফলে সমস্ত শরীর গরম, চোখ লাল, নাড়ী সবল ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হওয়ার কথা তিনি লিখেছেন। এ রকম হলে রোগীর সর্বাঙ্গে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেওয়া হত এবং রোগীকে ঠাণ্ডা জিনিস খেতে বা পান করতে দেওয়ার

---

*দেশীয় লোকের চিকিৎসার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতায় হাসপাতাল স্থাপনের প্রস্তাব করেন ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে। দেশীয়দের প্রথম হাসপাতাল—চাঁদনী হাসপাতালে প্রথম বৎসরে মোট ২১৬ জন রোগীর চিকিৎসা হয়। এই সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮০৫-৬ সালে ৪৩০৮ রোগীতে দাঁড়ায়, এর মধ্যে ১২৮৬ জনকে বসন্তের টিকা দেওয়া হয়। সাধারণতঃ এ-হাসপাতালে নানা রকমের আঘাতপ্রাপ্ত রোগীদের ('পুলিশ কেস' ধরনের) আনা হত। এছাড়া অল্পসংখ্যক টিউমার, ক্যানসার, যৌনব্যাধি, জ্বর, রক্তামাশয় ও প্লীহার রোগের চিকিৎসা এ সময়ে হয়েছিল।

নিয়ম ছিল। তবে এ চিকিৎসায় অল্প লোকই বাঁচত। যাঁরা বেঁচে যেতো তাদের স্বাস্থ্য চিরকালের জন্য খারাপ হয়ে থাকতো। হ্যাকিমরা'এ বড়ি ব্যবহার করতেন না। সূচিকা ভরণের কথা ডাঃ টোয়াইনিং জানতেন। বৈদ্যেরা বহু উপকরণ মিশিয়ে ঔষধ তৈরী করতেন—এই ধারণায় যে সবগুলির মিশ্রণে কোনও একরকম ফল হবে। সূতিকা রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত একটি ঔষধ তৈরী করার নিয়ম ডাঃ টোয়াইনিং-এর কাছে পাঠান হয়। এতে ৩০টি উপকরণের নাম আছে এবং তার সঙ্গে সিদ্ধির পাতা মিশিয়ে এই চূর্ণ তৈয়ার করা হত। এর চেয়েও নাকি ভাল ওষুধ ছিল ডাহুক (Dawk) পাখীর সুরুয়া।

কলেরা বা বিসূচিকা রোগ বাঙালীদের অল্প সময়ের মধ্যেই Collapse -এর কারণ হত। পেটের গোলমাল ও বমির সূচনায় আফিমের নির্যাস ও সুরাসার দিলে অনেক ক্ষেত্রে মারাত্মক কলেরা হত না বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। এই চিকিৎসা তিনি বাঙালীদের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতেন। রক্ত আমাশয় তিনি নিজস্ব প্রেসক্রিপশন—ইপিকাক, ব্লু-পিল ও জেনশিয়ান—দিয়ে চিকিৎসা করতেন। বাঙালী রোগীদের এই চিকিৎসা ও অপর একটি মৃদু জোলাপ পুরাতন আমাশয়ের চিকিৎসায় খুবই পছন্দ ছিল।

লিভার পাকা (Liver abscess) বাঙালীদের মধ্যে তিনি দেখেন নাই, যদিও এই মারাত্মক রোগ ইউরোপীয়দের মধ্যে যথেষ্ট দেখা যেত।

কয়েকটা রোগ তিনি কেবল মাত্র বাঙালী বা ভারতীয়দের মধ্যে দেখতে পেতেন। ইউরোপীয়দের সেকালে এসব রোগ হত না। শূল বেদনা, হাত-পা জ্বালা, নাশা বা নাকরো, এবং একরকম পালাজ্বর (খুব সম্ভবতঃ ফাইলেরিয়া রোগের জন্য)—এসব দেশীয়দের মধ্যেই দেখা যেত। বসন্ত রোগ দেশীয়দের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক হত। টিকা ও দেশী টিকার প্রচলন ছিল, তবে জনসাধারণ এসবের ব্যবহারে উদাসীন ছিল। হাম রোগ বিলাতের তুলনায় যথেষ্ট কম বিপজ্জনক হত—যদিও হামের পর পেটের গোলমাল ও ঘুসঘুসে জ্বর অনেক সময়ে দেখা যেত।

সেকালে প্রভূত রক্তমোক্ষণ করা ও জোঁক লাগান নানা রোগের ডাক্তারী চিকিৎসার অঙ্গ ছিল। সাহেবদের ক্ষেত্রে ১-২ পাউন্ড রক্ত একবারে শিরা থেকে নিষ্কাশন করা হত—বাঙালীদের ৬-৮ আউন্স রক্তমোক্ষণ যথেষ্ট বলে ডাঃ টোয়াইনিং-এর মত।

বাঙালী প্রসূতিদের সম্বন্ধে যেসব ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, সেগুলি ডাঃ টোয়াইনিং-এর কাছে অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে হত। আগুনের সাহায্যে গরম করা, মাত্র একটি দরজাযুক্ত আঁতুড়ঘর খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে তাঁর ধারণা হয়েছিল। সাধারণতঃ স্বাভাবিক অবস্থায় প্রসবে বিশেষ বিপদ হত না। তবে শিশুর অস্বাভাবিক অবস্থান হলে, দাইএরা বিশেষ কিছু করতে পারতো না—এদের নানা উদ্ভট প্রচেষ্টা শিশু এবং অনেক সময় মায়েরও মৃত্যুর কারণ হত। জ্বর ও ধনুষ্টংকার প্রায়ই হত এবং সেক্ষেত্রে মৃত্যু অনেক সময়েই অনিবার্য ছিল। অল্পবয়স্কা, স্বাস্থ্যবতী প্রসূতি, জ্বরে ও গরম ঘরে জল বর্জিত অবস্থায় ও ঠাণ্ডা তাড়ানর জন্য মৃগনাভী জাতীয় ঔষধের ফলে অজ্ঞান—এরকম রোগী দেখতে ডাঃ টোয়াইনিংকে যেতে হত। এসব ক্ষেত্রে মৃত্যু প্রায় অবধারিত ছিল। এটাই ডাক্তারের আশ্চর্য বোধ হত যে এই জ্বর ও ধনুষ্টংকার আরো বেশী ক্ষেত্রে হত না।

দরিদ্র বাঙালীরা সাধারণতঃ ধনুষ্টংকার ভূত-প্রেতের জন্য ঘটতো বলে বিশ্বাস করতো এবং নানা মাদুলী ও ওই জাতীয় জিনিস ব্যবহার করতো।

দুই মাস বয়সের শিশুদের তেল মাখিয়ে দিনে অন্ততঃ এক ঘণ্টা রোদে রাখা—এই নিয়ম ডাঃ টোয়াইনিং-এর খুবই আশ্চর্য বোধ হত। তাঁর মনে হয়েছিল যে, এই জন্যই বোধ হয় ছেলেরা বড় হয়ে যথেষ্ট রোদ সহ্য করার ক্ষমতা লাভ করে। দাঁত ওঠার সময় ইউরোপীয় শিশুদের নানা কষ্টকর অসুখ হত, এসব বাঙালী শিশুদের মধ্যে খুবই কম দেখা যেত। বাঙালী ছোট বালকবালিকারা বিশেষ জামা-কাপড় পরতো না। এদের ৭-৯ বৎসর বয়সে দুধের দাঁত পড়ে স্থায়ী দাঁত উঠতো। সে সময়ে এর রোগা ও লম্বায় বড় হত। ১৪-১৫ বৎসর বয়সে এদের অনেককে দুর্বল ও রোগা হতে দেখা যেত। বুকের গড়নে অস্বাভাবিকতা (যেটা খুব সম্ভবতঃ Rickets রোগের জন্য হত বলে মনে হয়) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যেত।

সেকালে বাংলাদেশে নানারকমের জ্বর হত। বৎসরের প্রায় সব মাসেই এদেশীয়দের মধ্যে জ্বর দেখা যেত, তবে বর্ষা ও শীতকালেই এর প্রাদুর্ভাব ছিল খুব বেশী। ইউরোপীয়দের তুলনায় দেশীয়দের জ্বর কম বিপজ্জনক ছিল। যেসব অস্বাস্থ্যকর জায়গায় ম্যালেরিয়ার অত্যধিক প্রকোপ ছিল—সেখানে জ্বরে বহু লোক মারা যেত। অন্যত্র, বেশীর ভাগ রোগী উপবাস, অল্প পানীয় ও সামান্য চিকিৎসায় পাচন খেয়ে ভাল হয়ে উঠতো। অপর ক্ষেত্রে কুইনাইন প্রথম থেকেই দেওয়া দরকার হত।

টাইফয়েড জ্বরের নাম বা কারণ সেকালে জানা ছিল না। তবুও ডাঃ টোয়াইনিং-এর বর্ণনা থেকে বাঙালীদের এই রোগ হত বলে বোঝা যায়। ইউরোপীয়দের এ জ্বর অত্যন্ত মারাত্মক হত। দেশীয়দের টাইফয়েড জ্বর হয় বলে অনেক ইংরাজ চিকিৎসক প্রায় ১৯ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতেন না।

এ-দেশীয়দের স্বাস্থ্য বিষয়ে ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যথেষ্ট বেশী মনোযোগ দেওয়া উচিত—যাতে এদের শরীর সুস্থ থাকে এবং নানা রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা হয়—এটা ডাঃ টোয়াইনিং-এর দৃঢ় অভিমত ছিল।

জেনারেল হাসপাতালের ডাক্তার টোয়াইনিং-এর মৃত্যুর (১৮৩৫) পর ১৩৫ বৎসর কেটে গেছে। চিকিৎসা শাস্ত্রে ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে অসাধারণ অগ্রগতি ঘটেছে এবং আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা দেশের অধিকাংশ লোকের সহজলভ্য হয়েছে। কিন্তু অন্ধ কুসংস্কার ১৪০ বৎসর পূর্বের মত এখনও যথেষ্ট আছে। স্কুলের ছাত্রদের স্বাস্থ্যবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সে পুস্তকস্থা বিদ্যা। অস্বাস্থ্যকর আঁতুড়ঘর ও অশিক্ষিত দাইএর হাতে এখনও বহু প্রসূতির জীবন বিপন্ন হয়। বাঙালীদের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য এবং অপরিচ্ছন্নতা এখনও বহু লোকের স্বাস্থ্য ও প্রাণহানির কারণ। বিজ্ঞানের প্রভাবে সেকালের রোগ এখন প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে বা সহজেই নিরাময় হয়। কিন্তু সামান্য পরিচ্ছন্নতা বা যত্নে যেসব রোগ নিবারিত হয়, সেগুলি এখনও যথেষ্ট দেখা যায়। গত ১০০ বৎসরে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি সত্ত্বেও এদেশবাসীর কুসংস্কার ও অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস পরিহার করা বিশেষ সম্ভব হয় নাই। এটাই আমাদের ব্যর্থতা ও দুর্ভাগ্য।
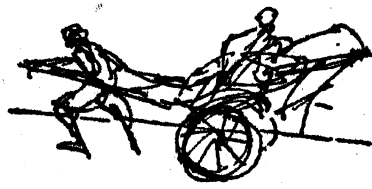
বৃত্তায়ত

আমি আর পারি না! একটা ব্যবস্থা যদি না করে তাহলে যেদিকে দু-চোখ যায় চলে যাব। পাড়ায় কান রাখা যাচ্ছে না। তোর বাপ অসুখে আজ। তোদের জন্য লোকের কাছে মুখ দেখানোর জো নেই। ভগবান এতোও ছিল আমার কপালে! হা ঈশ্বর কেন আমার মরণ হয় না।—মেজো-মেয়ে সুস্মিতাকে উদ্দেশ্য করে সুরবালা বিক্ষোভ জানাচ্ছিল স্বামীর বিরুদ্ধে। আসলে এর মূলে রয়েছে ছোট মেয়ে সুস্মিতা। ওকে নিয়েই বাড়িতে যত অশান্তি। অশান্তির বীজ বাড়িতে অনেক দিন থেকেই দানা বেঁধেছে। সেই দানা এখন বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষের মনেই ছড়িয়ে পড়েছে।

ছোট ছেলেটা আজ কদিন থেকে নিখোঁজ। সেদিন খেয়েদেয়ে স্কুলে যাওয়ার নাম করে সেই যে বেরিয়েছে, আজও কোন খবর পাওয়া যায় নি। সুকুমারবাবু সেই থেকে গুম মেরে বসে আছেন। সুরবালা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে সাহস করে কিছু বলতে পারেন নি। সুরবালা জানেন মলয় তার কত আদরের। মলয়কে নিয়ে স্বামীর ভবিষ্যৎ স্বপ্নের ছবিগুলি তিনিও দেখেছেন। তাই স্বামীর নীরব ব্যথার মধ্যে তাকে আর বার বার মলয়ের খোঁজ করার জন্যে ব্যতিব্যস্ত করতে চান নি।

ছোটবেলা থেকেই মলয় ছিল শান্ত প্রকৃতির। সুকুমারবাবু সমস্ত দুঃখের মধ্যে ছোট ছেলেটার দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনা পেতেন। কেন না মলয় আর সব ছেলে-মেয়ের মধ্যে লেখাপড়ায় দারুণ ভাল ছিল। প্রত্যেক বছর স্কুলে সে বৃত্তি পেয়ে আসছে ভালো রেজাল্ট করার জন্যে। সুকুমারবাবু স্ত্রীকে প্রায়ই বলতেন, দেখো তোমার এই ছোটটিই আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে। আমাদের দুঃখ দূর করবে। সুরবালা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হাসি হাসতেন।

এবারই হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দেবে মলয়। সবারই আশা ছিল মলয় পরীক্ষায় স্ট্যাণ্ড করবে। ওর নিখোঁজে সবার মনের মধ্যেই বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়েছে। সুরবালা নানা লোকের নানা কানঘুষো শুনে শুনে চুপচাপ ছিলেন। সুকুমারবাবুর তো কথাই নেই। সকালবেলা সেই যে অফিসে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যান, বাড়ি ফেরার তাগাদ যেন আর তেমন করে পান না আজকাল।

ছেলের জন্যে সুরবালার মনে শান্তি নেই কদিন থেকে। কোথায় কি ভাবে আছে! ঠিক মতো খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে কিনা—! তার মধ্যে ছোট মেয়ে সুস্মিতা সুরবালাকে আরো অস্থির করে তুলেছে। পাড়ার কান

পাত্তা যাচ্ছে না। মেয়ের কিছুতেই ঘরে মন টিকে না। পারলে সারাদিনই বাইরে বাইরে কাটাতে চায়। পড়াশোনাও নেই এখন। গতবছর স্কুলফাইনাল পাশ না করতে পারায় বাধ্য হয়েই পড়াশোনার ইতি টানতে হয়েছে। স্বামীকে এ নিয়ে সুরবালা পীড়ন করতে চায় নি। সুকুমারবাবু অবশ্য বলেছিলেন, না, আর একবার চেষ্টা করে দেখুক। সুরবালাই বেঁকে বসলেন। দরকার নেই। শুধু শুধু টাকাগুলি জলে দিয়ে লাভ কী। পাশ করার হলে এবারই হতো। সরস্বতীকে বিশ্রাম দিলে ওর কোনো ক্ষতি হবে না।

সত্যিই সুস্মিতার কোনো ক্ষতি আপাততঃ হয় নি। এতদিন যেন হাঁপিয়ে উঠছিল সে। এভাবে পড়াশোনা হয়! একই ঘরে খাওয়া-শোওয়া। লোক এলে ঘরে বসার জায়গা দেওয়া যায় না। অনেক দিন থেকেই বাড়ির প্রতি একটা ক্ষোভ সুস্মিতার মনে বাসা বেঁধেছিল। সে তার বন্ধুদের বাড়িতে আনতে পারতো না। বন্ধুদের কোথায় বসতে দেবে? এই সঙ্কোচ তাকে সব সময় পীড়া দিত। বন্ধুরা বাড়িতে আসতে চাইলে নানা অজুহাতে তাদের ঠেকিয়ে রাখতো। সব রাগটা গিয়ে পড়তো বাড়ির লোকের উপর। মার উপরই রাগটা বেশি। কেন না সুরবালাই তাকে বেশি শাসনে রাখতেন। এই শাসনের বিরুদ্ধে সব সময় একটা বিদ্রোহ করার ইচ্ছে হত। সুযোগ পেলেই কথায় কথায় মার মুখের উপর ঝগড়া শুরু করে দিত। মুখে কোনো কথাই আটকাতো না তখন। চীৎকার করে বলতো, বেশ করবো। একশবার আমি রাত করে বাড়ি ফিরবো। ঘরে থেকে করবো কি? এ ঘরে মানুষ থাকে। কোন লোভে সারাদিন ঘরে বসে থাকবো। এক ডাঁটা-চচ্চড়ি ছাড়া তো কোনো দিন ভালো জিনিস মুখে তুলতে দাও নি। আমাকে তুমি পেয়েছো কি। আমার যা খুশি তাই করবো। একশবার বাইরে আড্ডা দেব। তাতে কার কি!

আজকেও সুরবালার সঙ্গে এ নিয়ে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। হঠাৎ মার চোখের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে সুস্মিতা ছুটে বাথরুমে চলে যায়। যেন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সুরবালা মেয়ের দিকে তাকিয়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। ভাবতে কি রকম কষ্ট অনুভব করেন। ভাবতে চেষ্টা করেন এ তাঁরই নিজের মেয়ে কিনা! অনেক বয়স্কা মনে হয় সুস্মিতাকে। মনে হয় রাতারাতি সেই ভীতু মেয়েটা কি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। সুরবালার মুখে কোনো কথাই আসে না। নিশ্চল হয়ে রান্নাঘরের দরজায় হেলান দিয়ে বসে পড়েন।

সুমিতা পাশের বাড়িতে কিছু পুরানো জামা-কাপড় সেলাই করতে গেছে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল। ও-বেলা কি রান্না হবে ভেবে পাচ্ছিলেন না সুরবালা। নানা রকম ভাবনাগুলি ঘুরে ফিরে আসছিল। সুমিতার অনেক বয়স হয়ে যাচ্ছে। হাত-পা শুকিয়ে কি রকম শুকনো শুকনো মনে হয়।

দিন দিন শরীর ভেঙে পড়ছে। অথচ বিয়ে দেওয়ার কোনো রকম সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। বড়ছেলেটার একটা চাকরি হলে অনেকটা সুরাহা হয়ে যেতো। না হয় আরো একটু কষ্ট করে সুমিতার বিয়ের একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা হত। ছেলের কথা মনে পড়তেই সুরবালার কান্না পেয়ে গেল। ছোটছেলেটা কোথায় কি করছে কে জানে। একটা অজানা আশঙ্কায় সুরবালার মনটা হু-হু করে উঠলো—চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হল। হঠাৎ সুস্মিতার চীৎকারে চমকে উঠলেন। মা আমার ছাপা শাড়িটা কোথায়? মেয়ের গলা শুনে সুরবালার ইচ্ছে হল তরকারি কাটার বটিটাকে ছুঁড়ে মারে। ষাঁড়ের মতো গলা করছিস কেন অলক্ষ্মী কোথাকার। তুই কি আমার কুলমান কিছু রাখবি না। আমার শাড়ি কোথায়? এখন শাড়ি দিয়ে কি করবি। বেরুবো। বেরুবি! এই মাত্র তো ফিরলি। আমার এক জায়গায় নেমন্তন্ন আছে। শাড়ি কোথায় বলছো না যে। সুমিতা পড়ে গেছে। তোমার লক্ষ্মী-মেয়ে। আমি একশ দিন বলেছি না আমার শাড়িতে যেন হাত না দেয়। বেরুবো কি পরে। কোথায় তোর নেমন্তন্ন। আমার বন্ধুর বাড়িতে। কবিতাদের বাড়ি? না। তবে। অন্য আর এক জায়গায়। তুমি চিনবে না। মেজদি কখন ফিরবে। এখনই। সুস্মিতা বাথরুম থেকে ফিরে প্রসাধন সারছিল। সুরবালা মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কি ভেবে বলে ফেললেন, তোমার ওখানে যাওয়া হবে না। গরম তেলে জল পড়ার মতো মার দিকে ছিটকে পড়লো সুস্মিতার চোখ। যাওয়া হবে না মানে! আমার জন্য সবাই বসে থাকবে। আমি কথা দিয়েছি।

কথা দিয়েছো তো হয়েছে কি! তুমি যা খুশি তাই করে বেড়াবে। আমরা কি কেউ নেই নাকি? দিন দিন তোমার অধঃপতন বেড়েই চলেছে। তুমি ভেবেছো তোমার এই স্বাধীনতা আমাকে সব সময় বরদাস্ত করতে হবে। এই বেলেল্লাপনা চলবে না এখানে থেকে। তুমি যা খুশি তাই করবে যেখানে খুশি যাবে যার তার সঙ্গে আড্ডা দেবে রাত-বেরাত বাড়ি ফিরবে। ভেবেছো টা কি? তুমি না মেয়ে। তোমার জন্য পাড়ায় মুখ দেখতে পারি না আমি। কোথায় যাবে আমি জানি না, জানো তো বেশ করো। আমি যাবেই। সুরবালা মেয়ের জবাব শুনে স্তম্ভিত হলেন। একবার মনে হলো ছুটে গিয়ে মেয়ের গলাটা টিপে ধরেন। আয়নায় মুখ রেখে সুস্মিতা জবাব দিচ্ছিল। পেছন থেকে সুরবালা আয়নায় মেয়ের মুখটুকু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। এখন যদি বাড়ি থেকে বের হও, তাহলে এ বাড়ির দরজা তোমার জন্য বন্ধ থাকবে বলে দিলাম। বলেই সুরবালা রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। সুস্মিতা একবার পিছন ফিরে তাকালো। প্রসাধন এখনো শেষ হয় নি। এমনিতেই দেরি হয়। আজকে ইচ্ছে করেই দেরি করছে সে। যদি সুমিতা এর মধ্যে এসে পড়ে। কিন্তু মার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হওয়ার পর সুস্মিতার আর দেরি করতে ইচ্ছে হল না। এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়তে পারলে ভালো হয়। কিন্তু সুস্মিতাকে অপেক্ষা করতেই হল। ছাড়া ব্লাউজটার উপর দৃষ্টি দিতেই মনে হল এটা পরে বাইরে এখন যাওয়া হবে না। পেছনের দুটো বোতাম আসার পথে বাসে ভিড়ের ঘষায় ছিঁড়ে গেছে। শাড়ি দিয়ে কোনো রকমে পিঠটা ঢেকে ঘরে ফিরেছে। বোতাম না লাগালে আর বের হওয়া যাচ্ছে না। যে টিনের ছোট বাক্সটাতে সুমিতার সুঁচ-সুতো পুরোনো বোতাম থাকে সেটা খুঁজতে গিয়েও ব্যর্থ হলো সে। সুমিতা সেলাই করার জন্যে সঙ্গে নিয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে অস্থির হয়ে পায়চারি করতে থাকে সুস্মিতা। ছটার মধ্যে যেতে হবে। সবাই অপেক্ষা করবে। না

গেলেই নয়। সুবিমল ঠিক রাগ করবে। ওকে রাগিয়ে লাভ নেই। সামনের সপ্তাহে মেট্রোর নতুন বইটা দেখা হবে না তাহলে। তাছাড়া অর্চনাও কথা শোনাবে। মেজদি এত দেরি করছে কেন! ঘরময় ছট-ফট করতে থাকে সুস্মিতা।

একটা ব্লাউজের জন্য তাকে ভাবতে হচ্ছে। বোতামগুলোও ছেঁড়ার সময় পেল না। বোতাম না ছিঁড়লে এই জামা-কাপড়েই বের হয়ে যাওয়া যেতো। অন্য ব্লাউজগুলি পরে বাইরে যাওয়া যায় না। ঘরে পরতে পরতেই রং চটে গেছে। অর্চনার কথা মনে পড়ে যায়। এক একদিন এক এক-রকম ডিজাইনের ব্লাউজ পরে আসে। আমি যদি ওর মতো বড়লোকের মেয়ে হতুম। আমি রোজ রোজ নতুন নতুন ব্লাউজ পরতুম। সেদিন নতুন বাটিকের শাড়িটা পরে ওকে দারুণ মানিয়েছিল। একদিন পরে দেখলে হতো আমাকে কেমন দেখায়। অর্চনা তো নিজেই আমাকে বলেছিলো—তোকেও দারুণ মানাবে এটা পরলে। অথচ অর্চনা একদিনও বলেনি আমার শাড়িটা তুই পর না একদিন। কতদিন ইচ্ছে হয়েছে বলি দে না তোর বাটিকের শাড়িটা একদিন পরে দেখি। পারিনি। ওকে ভীষণ হিংসে করতে ইচ্ছে করে। ও যদি আমাদের সংসারে জন্মাতো। এবং আমি ওদের ঘরে জন্মাতুম। কেমন হত! ওর বাবাও তো আমার বাবার মতো গরীব হতে পারতো। আমি যদি ওর মতো বড়লোকের মেয়ে হতুম, আমার শাড়ি আমি ঠিক ওকে পরতে দিতুম।

মেজদি আর দিন পেল না সেলাই করার! আসছে না কেন। ছটা বাজতে চললো। অস্থির হয়ে পায়চারি করতে থাকে। ঘরের কোণে কুঁজো থেকে ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে ফেললো সে। ছাপা ব্লাউজটাকে হঠাৎ খাট থেকে তুলে আলনায় ছুঁড়ে দেয়। ব্লাউজটা আলনার হাতলে বাধা পেয়ে মেঝেতে পড়ে যায়। সুস্মিতার আর ইচ্ছে হয় না ব্লাউজটাকে আলনায় তুলে রাখার। আয়নার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল সে। হঠাৎ সুস্মিতা নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো যেন। বীভৎস মনে হল নিজের মুখটাকে। চোখের কোণে কালি পড়েছে কেন। এতদিন তো একবারও লক্ষ্য করে নি। কিছুক্ষণ আগে প্রসাধন করা সত্ত্বেও চোখের কালি ঢাকা পড়েনি। মেজদিও তো কোনো সময় আমাকে কিছু বলেনি। নিশ্চয় মনে মনে মেজদি রাগ করে আছে। আমার বন্ধুদের বরাবর হিংসে করেছে মেজদি। সুবিমলের কথা একদিন বলেছিলাম মেজদিকে। মেজদি চোখ বড় বড় করে আমাকে শাসিয়েছিল। মাকে বলে দেবে বলে ভয় দেখিয়েছিল। জানি মেজদি মনে মনে আমাকে ঈর্ষা করে। আমার উপর প্রতিশোধ নিতে চায় মেজদি। মেজদি আর সাধনদার কথা বাবাকে আমিই বলে দিয়েছিলাম। মনে আছে বাবা সেদিন রাত্রি-বেলা মেজদির চুলের মুঠি ধরে খুব মেরে-ছিল। সাধনদাকে আমি কোনোদিনও পছন্দ করতুম না। বড়লোকের ছেলে বলে নয়। যেদিন সুবর্ণা আমার কাছে এসে বললো জানিস আজ সাধনদাকে আর লতিকাদিকে দেখলাম সিনেমা হল থেকে বেরুতে। লতিকাদিকে পাড়ায় কেউ ভালো মেয়ে বলে জানতো না। আমি খবরটা মেজদিকে বলতেই আমাকে ঠাস করে গালে একটা কষে চড় মেরেছিল মেজদি। অমনি আমিও রাগের মাথায় বাবাকে বলে দিয়েছিলাম। সেদিন থেকেই মেজদি আমাকে আর বিশ্বাস করে না। আমার কোনো কিছুতেই আগ্রহ প্রকাশ করে না। মার কাছে মেজদি ধীরে ধীরে ভালো হয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে আমি মার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলাম!

আমিও প্রতিশোধ নিচ্ছি। আমার পরীক্ষা দেওয়া মাই তো বন্ধ করেছিল। বাবা তো রাজীই ছিলেন। পড়াশোনা বন্ধ হওয়াতে পুরো বেকার হয়ে গেলাম। সারা-দিন ঘরে বসে কাহাতক পারা যায়। ঘরে থাকা মানেই মার খ্যাচখ্যাচানি শোনা। তার চেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ওদের পয়সায় সিনেমা দেখে সময় কাটানো অনেক বেশি আনন্দের। সুবিমল প্রায়ই আমাকে রেস্তরাঁয় খাওয়ায়। পেটভরা থাকলেও কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভয়ে বাড়ি ফিরে খেতে হয়। দারুণ কষ্ট হলে চুপচাপ থাকতাম। কিন্তু খেতে ইচ্ছে করছে না বলে দায়সারা করে অল্প খেয়ে নিতুম। পাছে মেজদি মাকে বলে দেয় এ ভয়ে কোনো কথাই আর বলতাম না। সুবিমল যে আমার জন্মদিনে শাড়ি দিতে চেয়েছিল সে কথাও মেজদিকে জানাইনি। ওর দেওয়া শাড়ি বাড়িতে নিয়ে এলে মাকে নিৰ্ঘাৎ জবাব-দিহি দিতে হত। সেটা আমার পক্ষে ম্যানেজ করা সম্ভব ছিল না। তাই সুবিমলের কাছ থেকে শাড়ি নিতে সাহস করিনি। ও অবশ্য আমাকে অনেক উপস্থিত বুদ্ধি তৈরী করে দিয়েছিল। কিন্তু বাসায় সেগুলোর কোনোটিই কায়দা মতো লাগাতে পারবো এরকম শক্তি আমার ছিল না।

ওর দেওয়া শাড়িটা থাকলে মার মুখের উপর জবাব দিয়ে এখনই চলে যেতাম। দাদাটারও চাকরি হলো না। দাদা বলে-ছিল প্রথম মাসের টাকা পেয়েই আমাকে একজোড়া শাড়ি এনে দেবে। দাদার চাকরি হলে আমার পড়াশোনাও বন্ধ হতো না। প্রীতি এবার কলেজে পড়ছে। আমিও ওর সঙ্গে কলেজে পড়তাম। দারুণ ভালো মেয়ে প্রীতি। দাদাকে ও নিশ্চয় ভালো-বাসে। ওর হাবভাব দেখে স্পষ্টই বোঝা যায়। দাদার সঙ্গে ওর বিয়ে হলে দারুণ হয়। বড়লোকের মেয়ে হয়েও একটু অহংকার নেই। প্রীতি ক'দিন থেকে কেন যেন আমাকে এড়িয়ে চলছে। মার মুখে প্রীতির প্রশংসা সব সময় লেগেই আছে। আমি নাকি ওর নখের যোগ্য নই। মা বলে ওকে দেখেও তোর লজ্জা হওয়া উচিত। মাঝে মাঝে প্রীতিকে ঈর্ষা করতে ইচ্ছে হত। দারুণ রাগ হত। মনে হত মার সঙ্গে ওর পরিচয় না করালেই ভালো হত। অথচ আমি জানি প্রীতিকে ঈর্ষা করা যায় না। মার উপর রাগ দেখাতে গিয়ে প্রীতির উপরই অবিচার করা হতো। এখন আর প্রীতির প্রতি আমার কোনো ক্ষোভ নেই। মার গালা-গালি হজম হয়ে গেছে। যার জন্য ওর উপর রাগ করার কোনো মানেই হয় না।

অর্চনাদের পার্টি নিশ্চয় এতোক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। এখনো মেজদি এলে চলে যাওয়া যেতো। হঠাৎ সুস্মিতার চারুবালার কথাটা মনে পড়ে যায়। 'বাড়ি থেকে বেরুলে এ বাড়ির দরজা বন্ধ থাকবে।' মার কথা মনে পড়তেই সুস্মিতার কেমন যেন হাসি পেল। আচ্ছা আমি যদি সত্যি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই। সত্যিই কি মা আর আমাকে বাড়ি ঢুকতে দেবে না। অর্চনাদের বাড়িতে রাতটা কাটিয়ে মাকে একটু মজা দেখালে হত। বাবা নিশ্চয় বেশি ভাবতেন। মার সঙ্গে এ নিয়ে হয়তো বাবার ভীষণ ঝগড়া হয়ে যেতো। এমনিতেই মার সঙ্গে বাবার আজকাল খিটিমিটি লেগেই আছে। বাবাও পারতপক্ষে সকাল সকাল বাড়ি ফেরেন না। মা তো এরকম ছিল না। সত্যিই কি মা একা সংসারের সব ভাবনা ভাবে। মলাশের নিখোঁজে এমনিতে মার ভাবনার শেষ ছিল না। মেজদির জন্যে বাবার চেয়ে মারই বেশি দুর্ভাবনা। দাদার চাকরি হওয়ার জন্য কত জায়গায় ঠাকুরের কাছে মানত করেছে। তবুও কিছু হলো না। বাবা বেশ কিছুদিন দৌড়ঝাঁপ করে এখন চুপচাপ আছেন। কোনো উপরওয়ালাও আমাদের মুরুব্বি নেই।

আমি যদি ছেলে হতুম তাহলে যে করেই হোক একটা সুরাহা করতে পারতুম। বাবাকে এত কষ্ট করতে দিতুম না। দরকার হলে ডাকাতিই করতুম। মেজদিকে ভালো ভাবে বিয়ে দেওয়া যেতো। মাকেও এত খ্যাঁচাখ্যাঁচির মধ্যে থাকতে হতো না। দাদার জন্য চেষ্টা করা যেতো। সুস্মিতার হঠাৎ হাসি পেলো। দূর : কি সব ভাবছি পাগলের মতো। খাটে শুয়ে শুয়ে সব ভাবছিল সুস্মিতা। অন্ধকার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ঘরে আলো জ্বালা হয়নি। হঠাৎ সুমিতা ঘরে ঢুকে সুস্মিতাকে দেখে চমকে ওঠে। কিরে তুই অন্ধকারে কি করছিস। বেরোস নি। অন্য যে কোনোদিন হলে সুমিতার এই ব্যঙ্গ কিছুতেই হজম করতো না সে। কিছু না বলে শুধু সুমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো — না। সুমিতা শাড়ি ছাড়ছিল। হঠাৎ সুস্মিতা বললে, মেজদি ছাদে যাবি? চল না, অনেককাল ছাদে যাই নি। না। বাড়িওয়ালা পছন্দ করে না। পছন্দ করে না তো কি হয়েছে। ভাড়া যখন দিই ছাদ আমাদেরও। চল। সুস্মিতা মেজদিকে নিয়ে অন্ধকার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে উপরে উঠতে লাগলো।

প্রথম যুগে মালয়ী সাহিত্য ছিল সংস্কৃতভাষা ও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য আদর্শে পুষ্ট। এই সংযোগের সেতু ছিলেন পথভ্রষ্ট একজন ভারতীয় রাজকুমার, যিনি মালয়ের তীরভূমিতে পেঁৗছে অজানা দেশের নাম দিয়েছিলেন 'সিংহপুরা' যা আজকের 'সিংগাপুর'। তিনি ওদেশের সিংহাসনে বসলে দু দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পত্তন হয়। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা মশলার সঙ্গে নিয়ে যায় রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী। সে সব কাহিনীকে কেন্দ্র করে প্রাচীন মালয়ী সাহিত্য গড়ে ওঠে। মালয়ের লোকপ্রিয় নৃত্যনাট্য 'ওয়াড়ু ওরাড়ু' ও 'ওয়াড়ু কুলিত'-এর প্রেরণা রামায়ণ, মহাভারত। এছাড়া পৌরাণিক কাহিনী, 'জাতক' ও কথাসারিত সাগরের প্রভাবও একাধিক রচনায় পাওয়া যায়।

চোদ্দ শতক থেকে মালয়ে ব্রাহ্মী ও পূর্বনাগরী লিপির স্থান নেয় আরবী লিপি। মালয়ীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর আরবী প্রভাবে সাহিত্যের রূপান্তর ঘটে। মুসলমানরা বিজয়ী হলে মালয়ে সামন্ত যুগের সূত্রপাত হয়। সামন্তদের ঘরে কোর্ট-সাহিত্য গড়ে ওঠে। ইসলাম বা পার্সিয়ানদের প্রভাবে লেখা হয় ইতিহাস, ঐশ্লামিক থিয়োলজি ও রহস্যবাদ। এসব ছাড়া প্রচুর লোকসাহিত্যও পাওয়া যায়।

মালয়ী সাহিত্যে প্রথম আধুনিকতার পদধ্বনি শোনা যায় আবদুল্লা বিন আবদুল কাদের মুন্সীর রচনায়। তাঁকে তাই আধুনিক সাহিত্যের জনক বলা হয়। ইনি আরব-তামিল পিতামাতার সন্তান। জন্মস্থান, মলাক্কা—হিন্দু সংস্কৃতির পীঠস্থান। শৈশব থেকেই আরবী, তামিল, মালয়ী ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। জীবিকা ছিল শিক্ষকতা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, নতুনত্বের প্রতি আকর্ষণ তাঁকে লেখক হতে সাহায্য করেছিল এবং ইউরোপীয় সংসর্গে এসে তিনি নিজ সমাজের সমালোচনা করতে সাহসী হয়েছিলেন। নতুন বিষয়বস্তু—অর্থাৎ যা নিজের চারপাশে দেখেছিলেন তাই নিয়ে নতুন স্টাইলে আপন অভিজ্ঞতার রঙে রাঙিয়ে তিনি সবার জন্য লিখে গেছেন। তাঁর রচিত 'হিকায়েৎ আবদুল্লা' আত্মজীবনীর চেয়েও কিছু বেশি। জীবনীর চেয়ে তিনি সমসাময়িক ঘটনার কথাই বেশি বলেছেন। এ জন্য এটিকে খানিকটা ইতিহাসও বলা যায়। তিনিই প্রথম 'আমি' দিয়ে লিখেছেন, বিষয় নির্বাচনে স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন, প্রয়োজনমত নিজের মতামত ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হন নি এবং তৎকালীন সুলতানদের সমালোচনা করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। তিনি ভারতীয় 'পঞ্চতন্ত্র' অনুবাদ করেছেন যার নাম 'হিকায়েৎ খালিলাহ দন দামিনা'।

উনিশ শতকের শেষ তিন দশকে ছোট ছোট কাহিনীযুক্ত কাব্যের উৎপত্তি হয়। এইসব কাহিনীর বেশির ভাগ আরব, তামিল ও ইংরেজী ভাষা থেকে অনূদিত। যেমন ঈশপের গল্প বা আরব রজনী।

ইতিমধ্যে ভাষার পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। যেমন আরবী তেমনি ইংরাজী ভাষাও লেখার জন্য ব্যবহৃত হত। আবার দেশজ ভাষাও অবাঞ্ছিত ছিল না। এইভাবে মালয়ী ভাষার রূপান্তর ও শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে; যা আজকের দিনে পরিপূর্ণ রূপ নিয়েছে।

এই সময়ে ১৮৮৮ খৃঃ জোহরে ভাষাকে যথার্থ রূপ দিতে একটি সংস্থা গড়ে ওঠে। এই ধরনের সংস্থা প্রথম, যদিও তা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। তবে স্বল্পস্থায়ীকালে এই সংস্থা কিছু মালয়ী শব্দ উপহার দেয়; যেমন—তিয়াহায়া (সেক্রেটারি), পাজকা (আয়স), কারজা রায়ো (সমাজসেবক) ইত্যাদি।

১৮৭৬ খৃঃ সিঙ্গাপুর থেকে প্রথম মালয়ী ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ হয়। নাম—'জাভি পরানাকান'। সঙ্গে সঙ্গে আরো

মানসী মুখোপাধ্যায়

পত্রিকার উদয় হয়। বুদ্ধিজীবীরা বা সাহিত্যভাবাপন্ন পত্রিকা পরিচালক বা লেখকরা হয় আরব, নয় ভারতীয় বংশধর। মালয়ী বুদ্ধিজীবীরা ১৯২৭ খৃঃ 'কেশাতুয়ান মালয়ু' নামে একটি আধা রাজনৈতিক পার্টি গঠন করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে যে পত্রিকার লীডারশিপ নিজেরা করায়ত্ত করবেন।

মালয়ী পত্রিকার উদয় বিলম্বে হলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার [illegible] ভূমিকা অবশ্য স্বীকার্য। সম্পাদনার ক্ষেত্রে মহম্মদ ইউনুস বিন হামিদের নাম অবিস্মরণীয়। এঁকে মালয়ী জর্নালিজমের জনক বলা হয়। 'উতুশান মালয়ু' ও 'লেম্বাগা মালয়ু' পত্রিকাদ্বয় তরুণ লেখকদের সাহিত্য শিক্ষণের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। তৃতীয় দশকের এই ধরনের লেখকদের মধ্যে আবদুল রহিম কাজারের নাম উল্লেখনীয়।

বিশ শতক মালয়ের রেনেশাঁর যুগ। তার আগে অবশ্য মালয়ী সাহিত্যে ইন্দোনেশিয়ার প্রভাব জানা প্রয়োজন, যা যুদ্ধপূর্ব ও যুদ্ধ পরবর্তীকালে মালয়ী সাহিত্যে যুগান্ত এনে দিয়েছে।

মালয় ও ইন্দোনেশিয়া এক ধর্ম এক ভাষার দ্বারা পরিপুষ্ট হলেও সংস্কৃতির দিক দিয়ে দুজনের মাঝে আশমান জমীন তফাৎ। মালয়ের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ঐশ্লামিক, তাই সে রক্ষণশীলপন্থী; ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হলেও, আধুনিকতা সম্বন্ধে একটা দ্বিধাগ্রস্ত সংকোচের ভাব। ভাষায় আরবীয় শব্দের প্রাধান্য। ইন্দোনেশিয়া ধর্মে ইসলাম হলেও, সংস্কৃতিতে হিন্দু এবং তার ভাষায় সংস্কৃতের ছড়াছড়ি। ডাচদের সংস্পর্শে থেকে আধুনিকতাকে স্বাগত জানাতে তার দ্বিধা হয় নি; তার সাহিত্য যুগের সঙ্গে তাল রেখে কদম কদম এগিয়ে গেছে এবং 'বালাই পুস্তকা' যার সাহায্যে নতুন নতুন লেখকের উদয় সহজ হয়েছে।

তিরিশ দশক থেকে জাপানী আক্রমণ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ান সাহিত্যের আরো এক ধাপ অগ্রগতি দেখতে পাওয়া যায়। একদল তরুণ লেখক বালাই পুস্তকা-র সৃষ্টি করে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে চাইছিলেন যার সম্পর্ক হবে জাতীয়তাবাদীর খুব নিকট এবং জাতীয় অনুপ্রেরণার যোগ্য। ফলে 'ভুজঙ্গ বারু' (তরুণ সাহিত্যিক) পত্রিকা ১৯৩৩ খৃঃ জন্মলাভ করে।

ভুজঙ্গ বারু প্রথমে ছিল ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির পত্রিকা এবং এ সব বিষয়ে প্রেরণা দানই ছিল তার উদ্দেশ্য। এইসব তরুণ সাহিত্যিক শুধু নভেল নয় নাটক, প্রবন্ধ, সমালোচনা সাহিত্যও গড়ে তোলেন। শেষে এটি ইন্দোনেশিয়ায় যুগান্তকারী নতুন প্রেরণা যোগাবার দায়িত্ব নেয় এবং নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টি করে যে সংস্কৃতি ইন্দোনেশিয়াকে একতাবদ্ধ করবে। তাঁরা এই উদ্দেশ্যে মালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেন। এসব বিষয়ে সুলতান তাগদির আলীসাশন ছিলেন প্রধান ব্যক্তি।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র যখন সাহিত্যের, সংস্কৃতির আধুনিক পথে বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে তখন মালয়ীদের মনোজগতে সাড়া জাগতে বাধ্য। তারাও নতুন চলার পথে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গী হলেন এবং যুদ্ধোত্তর মালয়েশিয়ার কথাসাহিত্যের অঙ্কুর বপন করলেন, যা পরবর্তীকালে মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

এই সময়ে মালয়ী ভাষায় প্রথম দুটি উপন্যাস লেখা হয়। প্রথমটির লেখক একজন ইন্দোনেশীয়। নাম মেরারি সিরেগার। বই—'আজাব ডান সংসারা'। যদিও এ বই নতুন ধরনের তবু গল্প বলার কায়দা পুরনো। কাহিনী হল, এক জোড়া প্রণয়-প্রণয়িনীর বিবাহ-সমস্যা। প্রণয়ীর বাবার 'শ্রেণী' বিশ্বাসের জন্য তারা বিয়ে করতে চেয়েও নিরাশ হয়। লেখক

এই কাহিনীর দ্বারা শহর ও গ্রাম-সমাজের যে নৈরাশ্যজনক অবস্থা তার সম্বন্ধে সাধারণের চোখ খুলে দিয়েছেন এবং এমন এক বিষয় নিয়ে প্রথম লিখলেন যা মালয়ী ভাষায় ছিলই না।

দ্বিতীয় লেখক, সৈয়দ শেখ অলহাডি। বই—'হিক্যায়েৎ ফরীদা হানুম'। কাহিনীর বিষয় হল, একজন বিপথগামী লোক বন্ধুর সাহায্যে কিভাবে সুপথগামী হল ও তার স্ত্রী-পুত্রের কাছে ফিরে এলো। এই লেখক নিজে ধর্মসংস্কারক হওয়ায় স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও তাদের সামাজিক স্বীকৃতির প্রতি জোর দিয়েছেন।

মানুষের অসহায় অবস্থা ও সামাজিক সমস্যা এই দুই লেখকদ্বয় তুলে ধরেছিলেন তা পরবর্তী লেখকদের প্রেরণা দিয়েছে ও উৎসাহিত করেছে। ফলে মালয়ী সাহিত্য থেকে হুরী পরী অমানবীয় চরিত্র উধাও হয়েছে এবং লোকগাথার স্থান নিয়েছে বাস্তবধর্মী আধুনিক উপন্যাস।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গি মালয়ী সাহিত্যে শুধু প্রাণ সঞ্চারই করে নি, তার সমাজজীবনেও স্পন্দন এনে দিয়েছে এমন কি ধর্ম বিষয়েও মানুষ নতুনভাবে ভাবতে চেষ্টা করেছে। দুহাতে এ সময়ে ইংরাজী সাহিত্য থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

মালয়ের প্রত্যেক বড় শহরে প্রেস ছিল, সেখান থেকে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ হত। এইসব পত্র-পত্রিকায় খুব জোরাল কণ্ঠে না হলেও প্রথম জাতীয়তা উন্মেষের বিষয় নিয়ে লেখা শুরু হয় এবং এ প্রচেষ্টার প্রথম লেখক হলেন ঈসাক হাজী মুহম্মদ ও আবদুল্লা শেখ। মুহম্মদের বক্তব্য হল মালয়কে স্বাধীন হতে হলে অন্যান্য জাতির সঙ্গে তাকেও সর্বশক্তি দিয়ে ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। একমাত্র ইনিই তার লেখায় বৃটিশ ও মালয়ের অভিজাত বংশীয়দের সমালোচনা করেছেন। মালয়ীদের একতাবদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়ে একটি গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন একতাবদ্ধ মালয়ী যুবকদের দ্বারা কিভাবে একটি জঙ্গল আবাদী জমিতে পরিণত হয়েছে।

আরো দুজন উল্লেখযোগ্য লেখক, যাদের নাম 'জাবা'—সর্বাধুনিক মালয়ী সাহিত্য-পত্রিকায় পাই তারা হলেন, আহমেদ বিন মুহম্মদ আলী ও মনসুর বিন আবদুল কাদের। প্রথম জন অনুবাদ সাহিত্য ও অ্যাডভেঞ্চারধর্মী রচনার জন্য বিখ্যাত। দ্বিতীয় জন একাধিক নভেল লিখেছেন—যার বিষয়বস্তু হল কাহিনীর মারফৎ প্রচ্ছন্নভাবে কমিউনিজম প্রচার। এর লেখার ধরন হল হিউমার জাতীয়। ইনি মালয়ে একাধিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

মালয়ে আগে যত পত্রিকা ছিল ১৯২৫—৪২ খৃঃ অর্থাৎ জাপানী আক্রমণের সময়ে তাদের সংখ্যা বেড়ে হয় চার গুণ। মানের দিক থেকেও আরও উন্নত হয়। এইসব পত্রিকায় প্রচুর ছোট গল্প, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং মালয়ী শব্দ সৃষ্টির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে মালয়ে দুটি সংস্থা গড়ে ওঠে। শব্দ তৈরী ছাড়াও এই দুটি সংস্থা মালয়ী সাহিত্যকে উৎসাহ দেওয়া, রাজনৈতিক সামাজিক ও রীতিনীতির পরিবর্তনেরও চেষ্টা করে। এই সময়ে মালয়ী কাব্যে পুরনো যুগের ছাপ থাকলেও কিছু কিছু নতুন চিন্তাধারার স্বাক্ষরযুক্ত রচনার সন্ধান মেলে।

জাপানী অধিকৃত মালয়ের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনে সাহিত্যের প্রকাশ ছিল সামান্যই। যে কটি পত্র-পত্রিকা এ সময়ে প্রচলিত ছিল, তারা জাপানীদের হাতের পুতুল হয়ে জাপানী প্রচার-পত্রিকায় কাজ করে।

কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের পর মালয়ে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। ইন্দোনেশিয়ার বিদ্রোহ মালয়ের ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে এবং তারা জাতীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বৃটিশের কলোনিয়্যাল প্ল্যানের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে বিরোধিতা করেন। এ ছিল তাদের বাঁচার যুদ্ধ।

আপন শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তারা অনুভব করলেন যে আধুনিক প্রয়োজন মেটাতে তাদের ভাষা যথেষ্ট নয়। তারা দেখলেন প্রায় একই ভাষা ইন্দোনেশিয়ায় শুধু প্রয়োজনই মেটাচ্ছে না উপরন্তু তার দ্বারা আধুনিক সাহিত্যও রচিত হচ্ছে। ফলে তরুণ লেখকরা বিশেষ করে সাংবাদিকরা উদারতার সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার ভাষা, ইডিয়ম, স্টাইল সব নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পশ্চাৎপদ হলেন না।

কাব্যে ক্রমশঃ ইন্দোনেশিয়ার প্রভাব স্পষ্ট হতে থাকে। ইন্দোনেশিয়ার কবি, বিশেষ করে 'আংকাতান—৪৫' গোষ্ঠীর কবিদের মালয়ী তরুণ কবিরা আগ্রহের সঙ্গে অনুসরণ করে যান এবং পত্র-পত্রিকায় উত্তেজনাপূর্ণ কবিতা প্রকাশ হতে থাকে। যেমন ইন্দোনেশিয়ার কবি মুহাম্মদ ইয়ামিন তার প্রিয় মাতৃভূমির ওপর কবিতা লিখেছিলেন তেমনি উদীয়মান মালয়ী তরুণ কবিরা দেশপ্রেম, স্বাধীনতা ও সামাজিক অবিচারের ওপর লিখতে থাকেন।

আধুনিক কবিদের মধ্যে কবি মাসুরী এস, এন-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি কাব্যে নতুন বিষয়বস্তুর সঙ্গে নিজের মতামতও ব্যক্ত করেছেন।

যুদ্ধোত্তরকালে সবচেয়ে কৃতীমান লেখক হলেন, 'আমেদ লতিফ'। এ হল এর পেননেম। ইনি অনেক বই লিখেছেন যা সমাজের অবনতির বাস্তব রূপ তুলে ধরেছে। তিনি যেমন তার লেখায় সমাজের অবিচার দেখিয়েছেন তেমনি তার নভেলে বেডরুম বা হোটেল বা সমুদ্রতীরে তরুণ-তরুণী নিয়ে দৃশ্য থাকবেই। তাই কিছু সমালোচক তার সাহিত্যকে অশালীন বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু উপরোক্ত কারণের জন্য তার বই তরুণদের মধ্যে খুব বিক্রী হয়। তার স্টাইল দোষমুক্ত নয়, তবে বক্তব্য হৃদয়গ্রাহী। তার নভেল 'ওয়েট্রেস'—এ তিনি বলেছেন, মেয়েরা অসুখী বিবাহের জন্য ওয়েট্রেস হতে বাধ্য। 'ছবি' গ্রন্থে মেয়েদের অতি আধুনিকতাভাবাপন্ন হওয়ার বিপদের কথা বলেছেন। 'চুপরিয়া'-তে তিনি এক অবিশ্বাসিনী যুবতী স্ত্রীর কথা লিখেছেন যে বৃদ্ধ স্বামী নিয়ে সুখী নয়। ধর্মীয় গোঁড়ামির ফল, দায়িত্বহীন স্বামীর নিষ্ঠুর ব্যবহার, সামাজিক অনাচার ও তরুণ-তরুণীর ব্যবহারে শিথিলতা এইসব তার কাহিনীর বিষয়বস্তু। তিনি তার লেখায় হিন্দুস্থানী শব্দও ব্যবহার করেছেন।

উপন্যাস ছাড়া আমেদ ছোট গল্পও লিখেছেন।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন ঈসাক হাজী মুহম্মদ। ইনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে বামপন্থী। নিজের লেখায় ইনি নিজেকে বহুবার তুলে ধরেছেন। এর লেখার স্টাইল ব্যঙ্গপূর্ণ। "পুত্র গুণং তাহান" উপন্যাসে ইনি দ্বিতীয় যুদ্ধের আগে মালয়ের বিভিন্ন রাজ্যের অবস্থা তুলে ধরেছেন এবং অভিজাত বংশীয়দের অসাধুতা ও ক্ষমতালিপ্সার জন্য আক্রমণ করেছেন আর ইংরেজদের তিরস্কৃত করেছেন। 'মাতু মাতু সুকারলা' গ্রন্থে নিজেই একটি প্রধান চরিত্রের রূপ নিয়েছেন। নিজের সম্পর্কেই যেন তিনি বলছেন—"আমি তার জীবনের লক্ষ্যপথ সম্পূর্ণ বুঝি না। তিনি ক্রমান্বয়ে কাজ করে চলেছেন। তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হতে পারতেন বা একজন মন্ত্রী......"

সমকালীন জীবন ধারায় যাদের চরিত্র পারিপার্শ্বিক চাপের মাঝে গড়ে উঠেছে তাদের কথা দরদের সঙ্গে লিখেছেন। 'বুডো বিচো'-তে লেখক একজন উৎসর্গ প্রাণ যুবকের চরিত্র এঁকেছেন, যিনি সমানে মানুষ ও সমাজের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছেন।

ঈসাকের লেখা পড়ে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তার উদ্দেশ্য হল সাহিত্যের মাধ্যমে জনজাগরণ। কিন্তু সাহিত্য প্রচারের হাতিয়ার হওয়ায় আর্ট হিসেবে সমালোচকদের মতে, তার সাহিত্য নিকৃষ্ট। কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যেমন কোন শিল্পচাতুর্য নেই, তেমনি চরিত্রগুলি যেন তার হাতের ক্রীড়নক। তাহলেও তার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে পাঠককে প্রভাবিত করেছেন।

আর একজন সমসাময়িক লেখক হলেন হারুন বিন মুহম্মদ আমীন বা হারুন বিন সৈদ। এর প্রথম বই একটি হতাশাব্যঞ্জক প্রেম কাহিনী। যুদ্ধের পর ইনি বোর্ণিওকে পটভূমিকা করে একাধিক উপন্যাস লিখেছেন। ছোট গল্পের সংগ্রহ '১২ চরিতা পেনডেক' নামে প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি ইনি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন, যাতে জাতীয় অনুভূতি পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। একে অনুসরণ করে পরে মালয়ে একাধিক ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা হয়েছে।

এই তিনজন লেখক যুদ্ধ-পূর্বকাল থেকেই লিখছেন। নবীন লেখকদের মধ্যে বেশির ভাগ ছোট গল্প লিখে হাত পাকাচ্ছেন; অল্প কয়েকজনমাত্র উপন্যাস লিখছেন। এদের অনেকে সাংবাদিক।

আধুনিক মালয়েশিয়ার সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তব্য অসমাপ্ত থাকবে, যদি না "আংকাতান সাস্ত্রায়ান নিমাপুলো—৫০" (১৯৫০ খৃঃ গঠিত লেখক সংস্থা সম্বন্ধে কিছু না বলা হয়। এ যুগের অতি আধুনিক তরুণ

শিল্পী ঃ　　—বি কে রায়
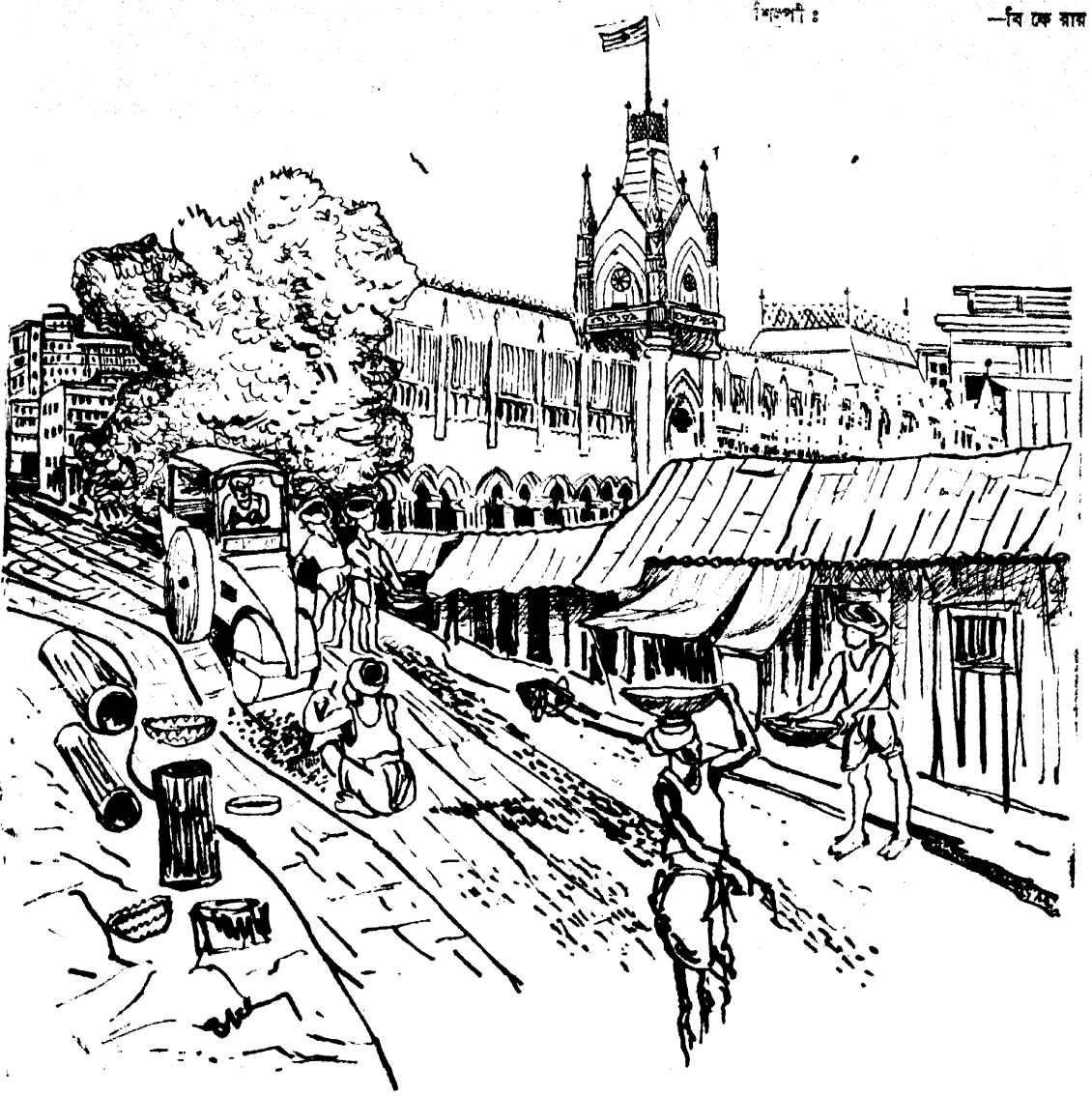
মালয়ী লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক হল এই সংস্থা। বিক্ষিপ্ত তরুণ লেখকদের সংঘবদ্ধ করে সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠা অর্জনের পথকে সুগম করাই এই সংস্থা গঠনের উদ্দেশ্যে। এই সংস্থার নেতারা সব আধুনিক মালয়েশিয়ান সাহিত্যের স্বীকৃত লেখক যেমন—কেরিস মাস (আসল নাম হল কামালউদ্দীন), অসমান আওয়া, আসরফ। এরা তিনজন বিখ্যাত মালয়েশিয়ার পত্রিকা 'উতুসান মালয়ু'-র সম্পাদকীয় দপ্তরে কাজ করেন।

ইন্দোনেশিয়ার আধুনিক সাহিত্যের ভাষার দ্বারা এরা প্রভাবিত এবং এদের রচনায় এবং ভাবণে ইন্দোনেশিয়ার ভাব প্রতিধ্বনিত।

ইন্দোনেশিয়া প্রীতি পুরনো সাহিত্যিকদের নিকট বিরক্তিকর। তারা একটি স্বতন্ত্র সংস্থা গঠন করেছেন—যার নাম "লম্বাগো বাহাসা"। এই সঙ্ঘের লক্ষ্য হল মালয়ী ভাষার ব্যাকরণের মৌলিকত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা। দুটি সংস্থার বাহ্যিক বিরোধ থাকলেও একই উদ্দেশ্যে অন্তঃসলিলারূপে বয়ে চলেছে মালয়েশিয়ান ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিকীকরণ।

উপরোক্ত দুটি সংস্থা ছাড়াও, ঐ একই উদ্দেশ্যে 'মলয়ী সাহিত্য সঙ্ঘ' গঠিত হয়েছে বিভিন্ন স্থানে। চেষ্টা চলছে এইসব সংস্থাকে একত্র করে সাহিত্য সম্মেলন করা। এইসব প্রচেষ্টায় ইন্দোনেশিয়ার সংগে সংযোগ রেখে চলা হচ্ছে। যখনি মালয়েশিয়া বা ইন্দোনেশিয়ায় সাহিত্য সম্মেলন হয় দুই দেশই নিজেদের উপস্থিতির দ্বারা তা সার্থক করে তোলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সম্মেলন মালয়েশিয়ায় হয়ে গেছে—তৃতীয় সাহিত্য সম্মেলন, ১৯৫৬ খৃঃ। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সিঙ্গাপুরে। উদ্দেশ্য ছিল মালয়েশিয়ান ভাষা ও সাহিত্যের যোগ্য ভূমিকা কি হবে স্থির করা ও স্বাধীন মালয়েশিয়ার মালয়ী ভাষা রাষ্ট্রভাষা বলে সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা। আধুনিক মালয়েশিয়ান সাহিত্য তার অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। যদিও সে পথ অতি দীর্ঘ, কারণ তার সাহিত্যের বাজার এখনো বিরাট হয়ে ওঠে নি বিশেষ করে উপন্যাসের বাজার। তবে নিরাশ হবার কারণ নেই যে-হেতু তাদের সামনে রয়েছে উষ্ণ আশার উজ্জ্বল আলো।

বৃহৎ বঙ্গে বৃক্ষপূজার বৃত্তান্ত

সমরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "বনবাণী" কাব্য-গ্রন্থের "বৃক্ষ-বন্দনা" শীর্ষক কবিতায় শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন বৃক্ষের উদ্দেশ্য :—

অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে
সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে,
তুমি বৃক্ষ, আদি-প্রাণ

*

তব প্রাণে প্রাণবান,
তব স্নেহচ্ছায়ায় শীতল,
তব তেজে তেজীয়ান,
সজ্জিত তোমার মাল্যে
যে মানব তারি দূত হয়ে—
শ্যামের বাঁশির তানে মুগ্ধ কবি আমি
অর্পিলাম তোমায় প্রণামী।"

শুধু আমাদের দেশে নয়, সমগ্র বিশ্বের লোকায়ত ধর্মের ইতিহাসে বৃক্ষ-পূজা গ্রহণ করেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এটা নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই ঘটেছে, কারণ আদিম যুগে ভূ-পৃষ্ঠের অধিকাংশ ভাগ আবৃত্ত ছিল ঘন অরণ্যে। আমাদের ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম ছিল না। 'চৈতালী' কাব্য-গ্রন্থের 'তপোবন' শীর্ষক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ধ্যানদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে প্রাচীন ভারতের অরণ্যময় রূপটি :—

'মনশ্চক্ষে হেরি যবে ভারত প্রাচীন—
পূরব পশ্চিম হতে উত্তর দক্ষিণ
মহারণ্য দেখা দেয় মহাচ্ছায়া লয়ে।'

অবশ্য ভূতাত্ত্বিক কারণে এই অরণ্যময়তার চিরদিনই ঘটেছে আঞ্চলিক তারতম্য। বাংলা নদী-মাতৃক দেশ হওয়ায় অরণ্যের গভীরত্ব এখানে ছিল কিছু বেশী মাত্রায়। বঙ্গ অবশ্য তখন ভঙ্গ হয়নি পূর্ব পাকিস্থান আর পশ্চিমবাংলায়, উপরন্তু এর আয়তনের অন্তর্গত ছিল বর্তমান বিহার ও উড়িষ্যার অনেকখানি ভূ-ভাগ। 'সুন্দরবন' নামে খ্যাত গভীর বনানী তখন ঢেকে রেখেছিল এই অখণ্ড বাংলার দক্ষিণ ও পূর্বদিকের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, আর পশ্চিমাংশের বৃহৎ এলাকা জুড়ে ছিল গহন শালবন। আর্য-আগমনের (আনুমানিক ১৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ) পূর্বে এইসব অরণ্যময় অঞ্চলে বাস করতো যেসব নিষাদ, কিরাত শবর, পুলিন্দ, কোল, ভিল্ল প্রভৃতি নামধেয় অনার্যরা তারাই বাংলার আদিম অধিবাসী। এদের ধর্ম-সংস্কৃতিই বাংলার মৌলিক সংস্কৃতি।

বৃক্ষ আদিম মানুষকে জুগিয়েছে ক্ষুধায় ফল-মূল, আধি-ব্যাধিতে উপশম-কারী ওষধি, বন্যা ও বন্য-জন্তুর কবল থেকে করেছে রক্ষা, আর তার স্নেহচ্ছায়ায় দিয়েছে মাথা গোঁজবার স্থান। কবি যথার্থই বলেছেন :—

শ্যামল সুন্দর সৌম্য, হে অরণ্যভূমি,
মানবের পুরাতন বাসগৃহ তুমি।

*

তুমি দাও ছায়াখানি, দাও ফুল মালা,
দাও বস্ত্র, দাও শয্যা......,
('বন'—চৈতালী)।

এ-হেন খাদ্য ও আশ্রয়দাত্রী বৃক্ষকে 'ওগো মানবের বন্ধু' বলে সম্বোধন তাই আদৌ অসঙ্গত বা অহেতুক বলা যায় না। আর তাকে সকৃতজ্ঞচিত্তে পূজা করবার প্রবৃত্তি তাই আদিম মানুষের পক্ষে নিতান্ত স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক বলেই গণ্য হবার যোগ্য।

তাছাড়া আদিম মানুষ এই জগতের সব-কিছুকেই প্রাণময় বলে ভাবতো,—উদ্ভিদ জগতও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তার ধারণায় সব বস্তুই ছিল তারই অনুরূপ আত্মা-বিশিষ্ট এবং সেই দৃষ্টিতেই সে বৃক্ষকেও দেখতো। বৃক্ষকে এই দৃষ্টি-ভঙ্গীতে দেখার ফলেই অনেক আদিম জাতি বা কৌম বৃক্ষবিশেষকে তাদের কুলচিহ্ন (totem) রূপে কল্পনা করে তার পূজো করতো। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন বৃক্ষকে তারা পূর্বপুরুষের আত্মার অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র বলে ধারণা করে তার আরাধনা করতো। তারা অন্তরে দৃঢ় ধারণা পোষণ করতো যে এইসব বৃক্ষ তাদের সব রকম বিপদ-আপদ, আধি-ব্যাধি ও অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবে, ভূত-প্রেত-পিশাচ আদি অপদেবতার উপদ্রব থেকে আগলে রাখবে, এমনকি বহিরাগত শত্রু বা বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর আক্রমণকে করবে প্রতিহত।

একদিকে বৃক্ষের এই অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস এবং অপরদিকে জীবন-ধারণের অপরিহার্য অবদানসমূহ যোগানোর জন্যে কৃতজ্ঞতাবোধ,—এই দ্বিবিধ হেতুই নিহিত রয়েছে বৃক্ষপূজা উৎপত্তির মূলে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের লৌকিক ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে বৃক্ষ-পূজা তাই অধিকার করে আছে বিশিষ্ট একটি স্থান।

প্রাচীন গ্রীস ও ইতালীতে বৃক্ষ-পূজার প্রভূত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রোম নগরীর কোলাহলমুখর প্রাণ-কেন্দ্র ফোরাম (Forum) -এ রোমিউলাস (Romulus) এর পবিত্র ডুম্বুর জাতীয় গাছটি বহুকাল ধরে পূজিত হয়ে এসেছিল এবং এটির শুষ্কতা বা বিবর্ণতার সামান্যতম লক্ষণও সমস্ত শহরে আতঙ্কের বিভীষিকা বিস্তার করতো। প্লুটার্ক (Plutarch) -এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে প্যালেস্টাইন পাহাড়ের সানুদেশে একটি বহুকালের পুরানো বন্য-চেরী বা কর্নেল (Carnel) গাছ ছিল। রোমবাসীরা এই গাছটিকে অতিশয় পবিত্র জ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। যদি কোন পথচারী কদাচ এই গাছটিকে বিবর্ণ হয়ে নুয়ে পড়তে দেখতেন তাহলে তিনি আতঙ্ক-বিহ্বল হয়ে এমন সোরগোল তুলতেন যে চতুর্দিক থেকে লোক বালতি বালতি জল নিয়ে ছুটে আসতো এর গোড়ায় ঢালবার জন্যে,—ঠিক যেমন করে লোকে ছুটে আসে আগুন নেভাবার জন্যে। বৃক্ষকে যে প্রাচীনকালে কতখানি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভয় করা হত তার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। Sir James Fraser এর "The Golden Bough' নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায় এটি। তিনি বলেছেন যে প্রাচীন জার্মানরা বৃক্ষকে এতদূর পবিত্র জ্ঞান করতেন যে বৃক্ষত্বক ছেদনকারীর অত্যন্ত নির্মম শাস্তির ব্যবস্থা ছিল তৎকালীন জার্মানদেশীয় আইনে। এহেন অপরাধকারীর নাভিদেশ কেটে বৃক্ষের সেই ত্বকহীন অংশের ওপর শক্ত করে বসিয়ে দেওয়া হত আর তারপর তার অন্ত্রনালীগুলো তার ওপর দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে দেবার জন্যে সেই হতভাগ্যকে গাছটির চতুর্দিকে বার বার ঘোরানো হত। Fraser সাহেব লিখছেন—

"The intention of the punishment clearly was to replace the dead bark by a living substitute taken from the culprit".

—অর্থাৎ পরিষ্কার বোঝা যায় যে এই শাস্তির উদ্দেশ্য ছিল গাছের অপসৃত ত্বক অপরাধীর দেহের অংশবিশেষ দিয়ে পরিপূরণ করা।

আমাদের দেশেও আদিকাল থেকে নানা বৃক্ষ গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি পেয়ে এসেছে। মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পা থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি পোড়ামাটির ফলকে খোদিত চিত্রে বৃক্ষপূজার সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখা যায়। এমনই একটি ফলকে দেখা যায় এক ভক্ত নতজানু হয়ে এক বৃক্ষদেবতাকে অর্চনা করছে। উত্তর মুসুরীর উপত্যকায় অবস্থিত অতিকায় শিমুল গাছটির আত্মা বহুকালাবধি অলৌকিক জ্ঞানের অধিকারী বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। পাঞ্জাবের কাঙ্গড়া পর্বতের অধিবাসীদের মধ্যে একটি প্রাচীন দেবদারু গাছের কাছে প্রতি বৎসর একটি কুমারীকে বলি দেবার প্রথা প্রচলিত ছিল। ফ্রেজার (Fraser) সাহেব লিখছেন—

"The tree was cut down not very many years ago".

—অর্থাৎ গাছটি কাটা হয় খুব বেশীদিন

আগে নয়। নারিকেল, বট, অশ্বত্থ, শাল, করম, সেওড়া, তুলসী, মনসা প্রভৃতি গাছ তো আদিকাল থেকেই পবিত্র জ্ঞানে পূজিত হয়ে আসছে এদেশে। এইসব গাছের অঙ্গহানি বা ক্ষতিসাধন নিতান্ত পাপকর্ম বলে বিশ্বাস করা হয়, বিশেষ করে রক্ষণশীল পল্লী অঞ্চলে এবং এই বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের যুগেও বজায় আছে এই বিশ্বাসের ঐতিহ্য।

বাংলাদেশে অদ্যাবধি প্রচলিত কয়েকটি উল্লেখ্য বৃক্ষপূজার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আলোকপাত করবে প্রসঙ্গটির ওপর।

এ বিষয় গুরুত্বের দিক দিয়ে বোধ হয় প্রথম স্থান অধিকারের উপযুক্ত হল ইঁদপূজা। 'ইঁদ' শব্দটি 'ইন্দ্রধ্বজ' শব্দের অপভ্রংশ। ইঁদপূজাকে ইঁদ পরবও বলা হয়। ইঁদপূজা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় প্রচলিত আছে। বর্তমানে সবচেয়ে আড়ম্বর ও জাঁকজমক সহকারে এই পূজা হয় মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে আর বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর রাজবাড়ীতে। এই দুটি অঞ্চলে হাজার হাজার আদিবাসী সাঁওতাল যোগ দেয় এই ইঁদ পরবে, নাচগানে মুখরিত করে তোলে ইঁদকুড়ি প্রাঙ্গণ।

ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় এই উৎসব। বিষ্ণুপুরে পয়লা ভাদ্র রাজা অথবা মহাপাত্র ফৌজদার সঙ্গে নিয়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে যান শালবনে। তাঁরা দুটি শালগাছ নির্বাচন করে দেন, ফৌজদার সে দুটিকে অস্ত্রাঘাতে ধরাশায়ী করেন। বর্তমানে অবশ্য ফৌজদার আর নিজে কাটেন না, শুধু তরবারি স্পর্শ করে দেন গাছ দুটিতে এবং তারপর কাঠুরিয়া কাটে কুঠার দিয়ে। তারপর ডালপালা ছেঁটে পরিস্কার করে সে দুটি নিয়ে যাওয়া হয় ইঁদকুড়ির মাঠে। সেখানে পাশাপাশি সে দুটিকে পুঁতে তাদের সর্বাঙ্গে নোতুন কাপড় জড়ানো হয়, বড়টির মাথায় দেওয়া হয় একটি বাঁশের কুড়ির হাতা। পুরোহিত এই সূত্রধারী গাছটিকে দেবরাজ ইন্দ্রের ধ্বজা বলে প্রচার করেন। এর তলদেশে নির্মাণ করা হয় একটি বেদী এবং তার ওপর ঘট স্থাপনা করে পূজা করা হয় এই ইন্দ্রধ্বজ বা ইঁদের। পূজা অনুষ্ঠিত হয় বৈদিক ও লোকায়ত আচারের মিশ্রিত রীতিতে। এখানকার সাঁওতাল আদিবাসীরা ইঁদকুড়ির চারিদিকে সমবেত হয়ে ঢাকঢোল মাদল সহকারে নৃত্যগীত দ্বারা মুখরিত করে তোলে পূজাপ্রাঙ্গণ।

ঝাড়গ্রামেও ইন্দ্রধ্বজ উৎসব বা ইঁদ পরব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এখানকার রাজবংশের এটি প্রধান উৎসব। এখানে ইঁদকুড়ির ময়দানে একটি দীর্ঘ শালগাছ পুঁতে তার মাথায় স্থাপন করা হয় নোতুন-কাপড়ে ঢাকা একটি বাঁশের ঝুড়ির হাতা। হাতাটিকে বলা হয় 'ইন্দ্রছত্র', এবং তার উদ্দেশ্যে বর্ষণ করা হয় খই, দই ইত্যাদি। এখানেও পূজায় অংশগ্রহণকারী সাঁওতাল প্রজাদের নৃত্যগীত বাদ্যে অনুরণিত হয়ে ওঠে ইঁদকুড়ির ময়দান।

মানভূমের পঞ্চকোটের রাজারাও এককালে সাড়ম্বরে এই ইন্দ্রধ্বজ পূজা করতেন।

ধ্বজ-উৎসবের প্রচলন হয় অতি প্রাচীনকালে, সেই সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে। এর উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক যে-সব কাহিনী বা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তার মধ্যে প্রধান একটির উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না এখানে। অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে বিষ্ণু তাঁকে রত্নযুক্ত এক দিব্যধ্বজ প্রদান করেন। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এই ধ্বজটির সাহায্যেই ইন্দ্র অসুর-দলনে সমর্থ হন। তদবধি এই ধ্বজ বিজয়-সূচক প্রতীকরূপে পরিগণিত হয় এবং মর্তের রাজারা এর অনুকরণে অপর রাজ্য জয়ের পর প্রকাশ্য স্থানে ইন্দ্রধ্বজ স্থাপনের প্রথা প্রচলন করেন।

এই ইন্দ্রধ্বজ বা ইঁদপূজা যে এইসব অঞ্চলের অরণ্য অধ্যুষিত অধিবাসীদের বৃক্ষপূজার পরিবর্তিত রূপ তা একটু বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে অনুধাবন করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। এইসব এলাকার সামন্ত রাজারা বহিরাগত। এঁদের অধিকাংশই উত্তর ভারতের অধিবাসী এবং বৈদিক হিন্দু ধর্মের ধারক ও বাহক। এঁরা এইসব স্থানে এসে এখানকার অনার্য অধিবাসীদের পরাজিত করে আপন আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এতদঞ্চলের আরণ্যক অধিবাসীদের লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতি তাঁরা ধ্বংস করতে পারেন নি, বাধ্য হয়েছেন তার সঙ্গে আপোষ করতে। মেদিনীপুর থেকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত বিস্তৃত শালগাছের জঙ্গলের গভীরতা আজ কমে গেলেও তা প্রাচীন মল্লভূমের বনময় রূপের আভাষ দেবার পক্ষে যথেষ্ট। বিষ্ণুপুরের প্রাচীন নাম—"বন-বিষ্ণুপুর"ও এই আরণ্যক রূপের ইঙ্গিতবহ। এখানকার সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্য আদিবাসীরা এই শালবনেই বাস করতো এবং নিজ নিজ এলাকার বড় বড় শালগাছকে ভক্তিভরে পূজা করতো। তাদের সেই বৃক্ষপূজার ঐতিহ্যই সুস্পষ্টরূপে নিহিত রয়েছে ইন্দ্রধ্বজ বা ইঁদপূজার মধ্যে। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সাঁওতালদের এই উৎসবে সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যাপারটিও প্রমাণ করে যে আসলে এটা তাদেরই উৎসব। এই অনার্য বৃক্ষপূজাই আর্য সংস্কৃতি প্রভাবে রূপান্তরিত হয়েছে ইন্দ্রধ্বজ উৎসবে। এও যেন সেই পৌরাণিক দেবাসুর দ্বন্দ্বের অনুরূপ এক বৃত্তান্ত। আর্য-সংস্কৃতির প্রতিভূ রাজপুত্রেরা পরাজিত করলেন অনার্য বনবাসী সাঁওতালদের। আর বিজয়চিহ্ন স্বরূপ ছত্র স্থাপিত হল শালবৃক্ষের মাথায়। 'ছত্র' চিরদিনই প্রভুত্বের প্রতীক। এইভাবে অনার্য সাঁওতালদের আদিম বৃক্ষপূজা পরিণত হল পৌরাণিক ইন্দ্রধ্বজ পূজায়। আর্য-অনার্য সংস্কৃতি সমন্বয়ের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই ইন্দ্রধ্বজ উৎসব বা ইঁদপরব।

বৃক্ষপূজার অদ্যাপি প্রচলিত দৃষ্টান্তের মধ্যে এর পরেই উল্লেখযোগ্য হল 'করম-পূজা'। এটিও ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং এই উৎসবেরও প্রধান কেন্দ্র হল সীমান্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার আদিবাসী পল্লীতে। এই পূজার উপাস্য হল করমগাছের দুটি শাখা। শাখা দুটি কেটে আনা হয় বনের মধ্যে থেকে এবং এই শাখা-কর্তন অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয় বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে। গ্রাম থেকে গীতবাদ্য সহকারে একটি শোভাযাত্রা যায় বনের মধ্যে, এর পুরোভাগে থাকে কুঠার-হস্তে এক কিশোর, তাকে অনুসরণ করে চার পাঁচটি কিশোরী গায়িকা, আর পশ্চাৎভাগে থাকে বাজনাদারেরা। বনের গভীরে গিয়ে একটি করমগাছ নির্বাচন করে তাকে বিনীত প্রার্থনা জানায় তারা পূজার উদ্দেশ্যে তার দুটি শাখা ছেদন করবার অনুমতি দেবার জন্যে। এরপর কিশোরীরা নির্বাচিত শাখা দুটিকে বরণ করে তার গায়ে জড়িয়ে দেয় লাল বা হলদে সুতো এবং লেপে দেয় একটু সিঁদুর। এবার কিশোর তার কুঠার দিয়ে শাখা দুটি ছেদন করে এবং তার নিম্নাংশে জড়িয়ে দেয় লাল গামছা। তারপর সবাই মিলে তেমনি শোভাযাত্রা করে সেই শাখা দুটিকে বহন করে নিয়ে আসে তাদের পল্লীর আখড়া প্রাঙ্গণে। এটি গ্রামগত পূজা, গ্রামবাসীদের প্রতিভূ হিসাবে গ্রামপতি 'মাহাতো' ও 'পাহান' (পুরোহিত) পূর্বেই করমপূজার সব ব্যবস্থা করে রাখেন এখানে। পাহানের সহকারী পূজারী ('পূজার') আখড়া প্রাঙ্গণে নব-নির্মিত বেদীতে প্রোথিত করেন শাখা দুটি এবং তার পরেই গ্রামের কিশোরীরা প্রত্যেকে একটি করে ছোট ঝুড়ি এনে রাখে এই বেদীর পাশে। এই ঝুড়িগুলোতে থাকে সদ্য-অঙ্কুরিত পঞ্চশস্য এবং এর নাম হল 'জাওয়াডালি'। সন্তানবতী মেয়েরা আনে একটি করে ছোট টুকরী যার মধ্যে থাকে সিঁদুর-মাখানো শশা একটি করে। এই শশাগুলো হল তাদের সন্তানের প্রতীক। রাত্রের প্রথম প্রহরে আরম্ভ হয় পূজা। মাহাতো, পাহান ও পূজার শুরু করেন এই পূজা আর তাতে যোগদান করেন গ্রামবাসী ভক্তরা সমবেতভাবে। তারা শস্য-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে ও অমঙ্গলকারী অপদেবতার হাত থেকে তাদের রক্ষা করবার জন্যে 'করম রাজা' বা 'করম গোঁসাই'এর কাছে প্রার্থনা জানায় নৃত্যগীত ও ব্রতকথার মাধ্যমে। ব্রতকথায় করমপূজার উৎপত্তির উপাখ্যান বিবৃত করা হয়। পাহান একটি ফুল নিয়ে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করেন গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উদ্দেশ্যে, তারপর পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করেন করমশাখা দুটির পাদমূলে। সমবেত ভক্তরাও পাহানের হাত থেকে একটি করে ফুল নিয়ে নিবেদন করেন করমশাখাদ্বয়ের উদ্দেশ্যে। এরপর নাচ আরম্ভ হয়, বলির জীব সাধারণতঃ

ছাগ ও পায়রা। পূজান্তে করমশাখা দুটি বিসর্জন দেওয়া হয় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

করমপূজার অনুরূপ বৃক্ষশাখা পূজা দিনাজপুর ও রংপুরেও দেখা যায়। সেখানে 'মানকুমার' পূজায় দুটি কাঁচা বাঁশের খণ্ড দেবতার প্রতীকরূপে পূজিত হয়। রাজশাহী জেলায় 'মহারাজ' বা ক্ষেত্রপালের বিশেষ পূজায় দুটি বৃক্ষশাখা পূজার অপরিহার্য অঙ্গরূপে গণ্য হয়। ময়মনসিংহ জেলার কোন কোন পল্লীতে দুটি সেওড়া গাছ পূজিত হয় বনদুর্গার প্রতীকরূপে।

ইন্দপরব ও করমপূজা বা তদনুরূপ বৃক্ষশাখা পূজা বাংলার অনার্য আদিবাসীদের বৃক্ষপূজার অভ্রান্ত নিদর্শন। এই ধরনের পূজা-উৎসব স্মরণ করিয়ে দেয় ইংল্যান্ড ও ইওরোপের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত প্রাচীন May-Pole বা মে-দণ্ড উৎসবের কথা। বসন্ত সমাগমে সাধারণতঃ মে মাসের প্রথম দিনে, গ্রামবাসীরা বনের মধ্যে গিয়ে কেটে আনতো একটি বিরাট বৃক্ষ আর তার দীর্ঘ কাণ্ডটিকে গ্রামের মধ্যস্থলে উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রোথিত করে সেটিকে সজ্জিত করতো ফুল-লতা-পাতা দিয়ে। তারপর সেটিকে ঘিরে শুরু হত গ্রামবাসীদের নৃত্যগীত-মুখরিত আনন্দ-উৎসব। আবার বন থেকে বৃক্ষশাখা বা পল্লব ছেদন করে এনে তা প্রতি গৃহের সম্মুখ দ্বারে বেঁধে দেবার রীতিও প্রচলিত ছিল। এখনও ইংল্যান্ড ও ইওরোপের কোন কোন দেশের সুদূর পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত আছে মে-বৃক্ষ উৎসবের এই প্রথা। কোথাও আবার প্রতি গৃহের সম্মুখে একটি করে মে-বৃক্ষ রোপণের রীতিও আছে। আবার উৎসবের মে-বৃক্ষটি শোভাযাত্রা সহকারে পল্লীবাসীদের দ্বারে দ্বারে নিয়ে গিয়ে ভিক্ষা করার প্রথাও প্রচলিত আছে। প্রখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী ও পুরাতাত্ত্বিক Mannhardt বলেছেন এই সম্পর্কে

> "We may conclude that these begging processions with May-tree or May-boughs from door to door had everywhere originally a serious and, so to speak, sacramental significance. People really believed that the god of growth was present unseen in the bough: by the procession he was brought to each house to bestow his blessing".

সাম্প্রতিককালে বৃক্ষপূজার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। 'ঢেলাইচন্ডী'রূপে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রয়েল এশিয়াটি সোসাইটির (Royal Asiatic Socity) মুখপত্রে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে একটি প্রবন্ধে নৈহাটির পল্লী অঞ্চলে একটি খেজুর গাছকে 'ঢেলাইচন্ডী' বিশ্বাসে পূজিত হবার বিস্ময়কর বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। পূজার উপচার বলতে শুধু একখন্ড ঢেলা। এই ঢেলা থেকেই 'ঢেলাইচন্ডী' নামের উৎপত্তি। এই বৃত্তান্তের বিবরণ ২৪ পরগণা জেলা গেজেটে প্রকাশ করেন O' Mally সাহেব—

> "A curious form of survival of tree worship which is still practised in the district, under the name of Dhela, Chandi, was discovered a few years ago by Mahamahopadhaya Hara Prasad Sastri".

উল্লিখিত পল্লীটির নাম 'গোয়াল ফটক',—নৈহাটি ষ্টেশন থেকে মাইল দুই দূরে অবস্থিত। এখানে মাঝিপাড়ার রাস্তায় এখনও 'ঢেলাইচন্ডী' আছে,—কিন্তু খেজুর গাছটি নেই। তার পরিবর্তে পূজিত হচ্ছে অন্য গাছ।

শুধু ঐ একটি স্থানেই নয়,—ঐ অঞ্চলের হালিশহর, কাঁচরাপাড়া ইত্যাদি গ্রামের বহু পথের ধারে দেখা যায় বিশেষ কোন খেজুর, তেঁতুল বা অন্য গাছ পূজিত হবার দৃশ্য। নৈবেদ্য হিসাবে সাধারণতঃ একখন্ড ঢেলা ছুঁড়ে দিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে চলে যায় পথচারীরা। আবার কেউ কেউ দুধ, দৈ, পায়স বা ফল-মূল নিবেদন করেন বৃক্ষদেবতার উদ্দেশ্যে।

বজবজের কাছে "বাখড়াহাট" পল্লীর বড়কাছাড়ীতে লৌকিক দেবতার থানে শনি-মঙ্গলবার বৃক্ষপূজা হয়। কোন বিগ্রহ নেই, পুরোহিতেরও প্রয়োজন হয় না। পল্লীবাসীরা নিজেরাই ভক্তিভরে পূজা করেন এবং কখনও কখনও নৈবেদ্য হিসাবে মদ মাংসও নিবেদন করেন।

বৃক্ষপূজার উৎপত্তি হয়েছিল সেই-দিনে যখন মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক ছিল নিবিড় ও অন্তরঙ্গ,—যখন সে বাস করতো বৃক্ষের দাক্ষিণ্যে ও আশ্রয়ে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরণ্যক জীবনের পরিবর্তে মানুষ বেছে নিল নাগরিক জীবন। কিন্তু, একজন ইংরেজ মনীষী যথার্থই বলেছেন,— 'Custom die hard'; অর্থাৎ একবার যে-প্রথা প্রচলিত হয়েছে তা বিলুপ্ত হতে চায় না, পরিবর্তিত পরিবেশে তা অর্থহীন হয়ে গেলেও না। তাই দেখি নানা রূপান্তরিত আকারে আদিম যুগের বৃক্ষপূজা আজও সভ্যসমাজে চলে আসছে। এই প্রসঙ্গে "বাঙ্গালীর ইতিহাস" গ্রন্থে ডক্টর নীহার-রঞ্জন রায়ের উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য।.........

'ভারতীয় আদিবাসীরা, অন্যান্য দেশের অনেক আদিবাসীর মত, বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফল, ফুল, পশু, পক্ষী, বিশেষ বিশেষ স্থান ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া পূজা করিত; এখনও খাসিয়া, মুন্ডা, সাঁওতাল, রাজবংশী, বুনো, শবর ইত্যাদি কৌমের লোকেরা তাহাই করিয়া থাকে। বাংলাদেশে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজের মেয়েদের মধ্যে, বিশেষত পাড়াগাঁয়ে, গাছ-পূজা এখনও বহুল প্রচলিত, বিশেষভাবে তুলসী গাছ, সেওড়া গাছ ও বটগাছ। অনেক পূজায় ও ব্রতোৎসবে গাছের একটা ডাল আনিয়া পুঁতিয়া দেওয়া হয়—এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-স্বীকৃত দেবদেবীর সঙ্গে সেই গাছটিরও পূজা হয়। আমাদের সমস্ত শুভানুষ্ঠানে যে আম্রপল্লবের ঘটের প্রয়োজন হয়, যে-কলাবৌর পূজা হয় অনেক ব্রতে যে ধানের ছড়ার প্রয়োজন হয়, এ সমস্ত সেই আদিবাসীদের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের এবং বিশ্বাস ও ধারণার স্মৃতি বহন করে।' শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুও তাঁর রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থে "কলাবৌ" সম্বন্ধে বলেছেন— "শারদীয়া দুর্গোৎসবে 'নবপত্রিকা' পূজা হয় অঙ্গ হিসাবে। কোন কোন মনীষী মনে করেন, আদিমকালের বৃক্ষপূজা কালক্রমে দুর্গাপূজায় রূপান্তরিত হয়েছে বা কোন এককালে বৃক্ষপূজার সঙ্গে দুর্গাপূজা মিশ্রিত হয়েছে। এখন বৃক্ষদেবতা গৌণ ও দুর্গাদেবী মুখ্য বলে পরিগণিত হলেও বৃক্ষদেবতারা লুপ্ত হয়নি, আদিম যুগের বিভিন্ন কৌমের উপাস্য বৃক্ষগুলি—অপরাজিতা লতার বন্ধনে এক হয়েছেন ও রূপদানের প্রবৃত্তি থেকে কোন এককালে নব পত্রিকা শাড়ী পরে 'কলাবৌ' হয়েছেন। বলা বাহুল্য উল্লিখিত আদিম যুগের বিভিন্ন কৌমের উপাস্য বৃক্ষগুলি হল—ধান্য, মান, রম্ভা, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম ও অশোক। এই নয়টি বৃক্ষের সমাহারই হল নব পত্রিকা।

মানুষের মন যে মূলতঃ কতখানি রক্ষণশীল কোন এক প্রথার আবহমান অন্ধ অনুসরণ তা' প্রমাণ করে। মহামতি কার্লাইল (Carlyle) যথার্থই বলেছেন "Custom doth make dotards of us all"

অর্থাৎ চিরাচরিত প্রথা আমাদের ভীমরথী-গ্রস্ত করে তোলে। আজকের সভ্য-সমাজে অনার্য-সংস্কৃতি-সৃষ্ট বৃক্ষপূজার অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে এ-উক্তির যাথার্থ্য।

জলসা

ঠুংরীর একক আসর : 'সৌরভ' সংস্থা নিবেদিত শ্রীসুনীল বসুর একক ঠুংরীর আসর সাম্প্রতিক সঙ্গীত-আসরের এক স্মরণীয় অনুষ্ঠান। সুনীল বসু উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতসমাজে একটি শ্রদ্ধেয় নাম—শুধুমাত্র শিল্পী হিসাবেই নয়। 'গিরিজাবাবুর প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। াবেকী তালিম, জীবনব্যাপী সংগীত সাধনা, সর্বোপরি সঙ্গীতের প্রতি প্রকৃত অনুরাগের ফলশ্রুতিস্বরূপ গড়ে ওঠা নজস্ব সঙ্গীত-ভাবনা, এতগুলি দুর্লভ স্তুর সমন্বয়ই শিল্পী ও তাঁর অনুষ্ঠানকে এমন আকর্ষণীয় করে তোলে। শ্রোতাদের ারিতে ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর শল্পীদের অনেকেই। শিল্পী ও সঙ্গীত-বদ্ কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ানপ্রকাশ ঘোষ, বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কমলাকান্তজী (কচিবাবু) আর বহু গুণী সঙ্গীতরসিক। শিল্পীকে শ্রোতাদের াছে নতুন করে পরিচিত করার দায়িত্ব হণ করেন স্বয়ং চিন্ময় লাহিড়ী। এই পলক্ষ্যে ঠুংরীর ওপর তাঁর সরল ভাষ্য তঃস্ফূর্ত ছন্দে উদ্বেলিত দু' এক কলি ান সহযোগে আসরকে শুধু জমিয়েই োলেনি, আসল রসোৎসবের জন্য শ্রোতৃ-ন্তকে যেন প্রস্তুত করে নিল। এ হেন রিবেশে গান জমিয়ে তোলা সুনীলবাবুর ত ওয়াকিবহাল শিল্পীর পক্ষে কঠিন য়। ঠুংরী গানের নিজস্ব একটি চরিত্র াছে যা কাশ্মীর অথবা পাঞ্জাবী গজল বং অন্যান্য উচ্চাঙ্গ লঘু-সঙ্গীতের থেকে ম্পূর্ণ পৃথক।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মত ঠুংরীরও 'বাঢ়ত্' বং বিস্তার আছে। তবে তা দ্রুতগামী নয় লম্বিতছন্দী। তাছাড়া ঠুংরী হোলো াবপ্রধান গান, আঙ্গিকের সমারোহের য়ে ভাববিস্তারের গহনসঞ্চারীত্বই যার ধান অঙ্গ। কাজেই শিল্পী যদি গানের ষয়বস্তুর সঙ্গে একাত্ম না হন তবে ংরীতে রসসৃষ্টি করা সম্ভব নয়। ঠুংরী-স্টাদের মধ্যে লক্ষ্ণৌর সনদ পিয়া, কদর য়া, বোল-বানানা, লচ্ক ও রাগমিশ্রণের পর জোর দিয়েছিলেন এই কারণেই। ংরী হোলো মূলত প্রেমসঙ্গীত এবং সঙ্গীতের সঙ্গে বৈষ্ণব সাহিত্যের অতি বিড় সম্পর্ক। কারণ রাধাকৃষ্ণের প্রণয়, রহ, মিলনার্তি ও সোহাগ-কলহই এর লম্বন বিভাব। ঠুংরীর উপরোক্ত প্রতিটি শিষ্ট্য সম্বন্ধে সুনীলবাবুর সচেতনতা তরের অতলে প্রবাহিত বলেই হয়ত, র গাওয়া প্রতিটি গান এমন অপূর্ব ামূর্তি লাভ করেছে। এখানে 'সচেতনতা' থাটিতে যেন বিভ্রম সৃষ্টি না ঘটে। প্রতিটি ঙ্গে কৌশল প্রদর্শন করে পাণ্ডিত্য াহির করার 'সচেতনতা' সঙ্গীতকে প্রাণহীন করে—আবার গভীরের ডুবুরী হয়ে প্রতিটি অনুভাবের মধ্যে গভীরভাবে বাঁচার 'সচেতনতা' পরিবেশিত গানকে জীবন্ত করে তোলে। উপযুক্ত শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা এই 'সচেতনতা'র অধিকারী হতে পেরেছেন বলেই শিল্পীর গানে মুহূর্তের জন্যও রসবিচ্যুতি ঘটেনি।

সুবিখ্যাত 'ক্যায়সে বাজাও মুরলীধর' দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করে শ্রীবসু খানদানী চালের ঠুংরীর সেই নিত্যনতুন চিরপুরাতন রূপটি মেলে ধরলেন, তারপর বিষয় বৈভবকে মেলে ধরলেন কখনও 'হিয়া নাহি মানে'র মিলনপ্রয়াসী আর্তিতে, কখনও বিরহব্যাকুল চিত্তের বাঁধনভাঙা কান্না 'দেখে বিনে নেহি আওত'—এরপর 'হামসে ন বোলো রাজা'র মধুর বিনতির পথ বেয়ে প্রেমকৌতুকের কাব্যসন্দের সমাপ্তিতে পৌঁছল 'জিয়ামে লাগি আন্‌বান্'।

বয়সের ছোঁওয়া দেহে এবং কিছুটা কণ্ঠতটে পৌঁছলেও তাঁর অনুপম প্রকাশ-ভঙ্গি, পেলব সূক্ষ্মতাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। সেইজন্যই কি প্রথম থেকে শেষ অবধি শ্রোতা ও শিল্পীর পারস্পরিক হৃদয়সংবেদ্যতা-জাত আনন্দস্রোত এমন অকৃপণ ধারায় প্রবাহিত ছিল? শিল্পীর গাইবার আনন্দকে অনেকখানিই উদ্দীপ্ত করেছে পণ্ডিত ভি জি যোগ ও মহম্মদ সগীরুদ্দিনের বেহালা ও সারেঙ্গীতে।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে 'সৌরভ'-এর ছাত্রী শ্রীমতী তনিমা ঠাকুর গীত 'পূরিয়া কল্যাণ' ও ঠুংরী উপস্থিত সুধীবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। প্রতিষ্ঠানের গুরুবৃত্তির শিক্ষাপদ্ধতি এবং গায়িকার সহজাত প্রতিভা উভয় কারণেই এ অনুষ্ঠানের সার্থকতা।

একটি মহৎ প্রতিষ্ঠানের জন্ম

সঙ্গীতশাস্ত্রী কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে দুঃস্থ কলাকারগণের সাহায্যপ্রদানার্থে সম্প্রতি **'সংবিদ্যাভারতী'** নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সভাপতি শ্রীরায়চৌধুরী, সহ-সভাপতি কৃষ্ণকালী ভট্টাচার্য, এবং সম্পাদক পণ্ডিত হৃষিকেশ শাস্ত্রী।

কয়েক সপ্তাহ আগে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন উৎসবে পৌরোহিত্য করেন শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী। প্রধান অতিথি-রূপে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ অরুণ শীল। এ সভার উদ্বোধনকারী সঙ্গীতজগতের অন্যতম পুরোধা শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈদিক মন্ত্রপাঠে সভার মঙ্গলাচারণ করলেন কৃষ্ণকালী ভট্টাচার্য। এর পর সম্পাদক শ্রীশাস্ত্রী উপস্থিত সুধীবৃন্দের কাছে সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে এইরকম ব্যাপক পরিকল্পনায় সরকারের সহায়তার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ভাষণ থেকে জানা গেল—এই প্রতিষ্ঠানের দুটি শাখার প্রতিষ্ঠাই তাঁদের অভিপ্রায়। উত্তর কলকাতার শাখা শ্রীশাস্ত্রীর পরিচালনাধীনে এবং দক্ষিণ কলকাতার শাখা বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে শ্রীরায়চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়েছে। প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রী—আর্থিক অসুবিধার কারণে যাঁরা উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং অভাবগ্রস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা—যাঁদের বহু সাধনালব্ধ বিদ্যা অর্থাভাবে অপচিত হয়ে যাচ্ছে তাঁদের সর্বপ্রকারে সহায়তা-সহযোগিতা-সুযোগ দেওয়াই এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। এখানে শুধুমাত্র উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতই নয়, কীর্তন, বাউল, টপ্পা, ভাটিয়ালী, লোকসঙ্গীত ইত্যাদি সবরকম বাংলাগানের চর্চা হচ্ছে।

সঙ্গীতানুষ্ঠান শুরু হয় শ্রীমতী বাসন্তী বাগচী ও রীণা রায়চৌধুরীর কণ্ঠের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি দিয়ে। রবীন্দ্রভারতীর প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী মীরা চট্টোপাধ্যায় 'পূরিয়া ধানেশ্রী' রাগে সেতার বাজিয়ে শোনান। সেতারেই বালক-শিল্পী শ্রীমান তীর্থঙ্কর মুখোপাধ্যায় পরিবেশিত 'ইমন' রাগে প্রতিভার স্বাক্ষর আমাদের আনন্দ দিয়েছে। শ্রীবীরেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরীর শিষ্য রামকৃষ্ণ কোলে সহ-কণ্ঠসঙ্গীতে আদ বসন্ত রাগে আলাপ ও ধামার গৌড়হার বাণীর উজ্জ্বল সম্ভাবনার প্রতি আলোকপাত করেন। সঙ্গতে ছিলেন মৃদঙ্গাচার্য শ্রীপ্রতাপনারায়ণ মিত্র। শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তবলা-সঙ্গতে শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়ের খেয়ালের অনুষ্ঠানও উপভোগ্য হয়। উত্তর ভারতের প্রথিতনামা বেহালাবাদিকা শ্রীমতী শিশির-কণা ধরচৌধুরী আর একবার তাঁর উন্নতমান বাদনশৈলীর স্বাক্ষর রাখলেন ভূপকল্যাণ রাগ পরিবেশনায়। এঁর সঙ্গে তবলাসঙ্গতে ছিলেন শ্রীবনমালী চক্রবর্তী। কণ্ঠসঙ্গীতের এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খেয়াল। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় পাতিয়ালা ঘরানার গায়কীর এক মনোজ্ঞ নিদর্শন রেখেছেন 'দরবারী কানাড়া' রাগের তান ও বিস্তারে। শিল্পীর সঙ্গে তবলা বাজান তাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

সর্বশেষ অনুষ্ঠানে যন্ত্রাচার্য শ্রীরাধিকা-মোহন মিত্রের সুযোগ্য শিষ্য হরিবল্লভ দাস সরোদ বাজিয়ে শোনালেন 'জয়জয়ন্তী' রাগে। দ্বারভাঙ্গা ও সেনীঘরানার সুন্দর সমন্বয়ে ইনি শ্রোতাদের তারিফ আদায় করে নিয়েছেন।

'সুরসঞ্চয়নে'র 'সাগরিকা' : সুর-সঞ্চয়নের পক্ষ হতে বাবুল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত 'সাগরিকা' এক উপভোগ্য অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা' কবিতা অবলম্বনে রচিত এই নৃত্যনাট্যের নৃত্যরূপ রচনা করেন অসিত চট্টোপাধ্যায়। কবিগুরু জাভা, সুমাত্রা, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশ ভ্রমণকালে ওখানের শিল্পকৃতিতে ভারতীয় প্রভাব দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং এই মুগ্ধতাই তাঁকে শান্তিনিকেতনী নৃত্যধারায় জাভা-নৃত্যের ছোঁয়া লাগিয়ে এ নৃত্য [illegible] গিকে বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ সৃষ্টি করতে অনুপ্রেরিত

করে। কাহিনীর নৃত্যরচনাকালে অসিত চট্টোপাধ্যায় সম্ভবত সেই কথা স্মরণ করেই বক্তব্য রূপায়ণে ভাবানুত্যকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে ভোলেন নি। ভরতপুত্ররূপী শিবশঙ্করমের নৃত্যাভিনয়কুশলতা সম্বন্ধে বলার কিছু নেই, তবে নায়ক হতে হলে তাঁকে 'ফিগার' সম্বন্ধে আরো সচেতন হতে হবে। সাগরিকা চরিত্রে পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায় সুন্দর।

এ অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল, ভারতপুত্র ও সাগরিকার ভূমিকায় দেবব্রত বিশ্বাস ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান। টেপরেকর্ডিং-এর ত্রুটিতে দুই জনপ্রিয় শিল্পীর কোন গানই প্রাণভরে উপভোগ করা গেল না। তবু বলব সঙ্গীতের তুলনায় নৃত্যাংশ দুর্বল। ভাস্কর মিত্রের সঙ্গীত-পরিচালনা প্রশংসনীয়। সুনির্বাচিত গান দিয়ে কাহিনীকে সুন্দরভাবে মেলে ধরার কৃতিত্ব প্রাপ্য দেবব্রত বিশ্বাস, সুকৃতি চক্রবর্তী ও ভাস্কর মিত্রের। কনিষ্ক সেনের আলোকপাত ও পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়ের সজ্জাপরিকল্পনা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

স্মরণীয় সন্ধ্যা

গেল ২৪ মে সোমবার সন্ধ্যায় বিশিষ্ট শ্রোতাদের উপস্থিতিতে বিড়লা অ্যাকাডেমি অব আর্ট এণ্ড কালচার প্রেক্ষাগৃহে মৈনুদ্দিন ডাগর মেমোরিয়াল কমিটি কর্তৃক স্বর্গত ওস্তাদ নাসির আমিনুদ্দিন ডাগরের ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট শ্রোতাদের মধ্যে জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী জ্ঞান ঘোষ, পাহাড়ী সান্যাল ও রবি ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। ওস্তাদ নাসির আমিনুদ্দিন ডাগরের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত গীতার বিশ্বরূপ দর্শন যোগে শ্রী ও মালকোষ রাগে দুটি শ্লোক দ্বারা অনুষ্ঠানের শুরু হয়।

শিল্পী অপর্ণা চক্রবর্তী ধ্রুপদী আলাপ ও বিস্তারের মধ্য দিয়ে বেহাগ রাগে শ্রোতাদের তৃপ্ত করতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় শিল্পী ভারতবিখ্যাত বীণকার জীয়া মহিউদ্দিন ডাগর পুরিয়া কল্যাণ রাগ বাজিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। তাঁর বাদনভঙ্গী ডাগর ঘরানার সূক্ষ্ম ও বিশুদ্ধ রতসঞ্জাত। শেষে তিনি প্রাচীন আর্যঋষিদের শান্ত সামগীতির কিছু রূপ বীণায় বাজিয়ে শোনান। এরপর ঝাঁসির বিখ্যাত পাখোয়াজবাদক রাজা ছত্রপতি সিং অপূর্ব কলাকৌশলের দ্বারা একক অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের তৃপ্ত করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে স্বর্গত ওস্তাদের প্রিয়তম শিষ্য ও ডাগর ভ্রাতৃদ্বয়ের যুগল গীত ধ্রুপদ ও বেহালায় সার্থক সংগত করেছেন ভারতবিখ্যাত বেহালা বাদক পন্ডিত ভি, জি, যোগ। ডাগর ভ্রাতৃদ্বয় মালকোষ রাগের অনুপম সোপান অতিক্রম করে ধ্রুপদের অসীম গগনে আরোহণ, অপূর্ব দ্যুতিতে আলোকিত।

শঙ্করস্কোপের প্রদর্শনী চলছে, চলবে

অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এ যখন বিশ্ববিশ্রুত শিল্পী উদয়শঙ্কর সৃষ্ট 'শঙ্করস্কোপ' প্রথম মুক্তি পায়, তখন দর্শকমহল শ্রীশঙ্করের এই নবতম সৃষ্টি দেখে বিস্মিত এবং অভিভূত হয়েছিল। দিনের পর দিন অ্যাকাডেমী ভবনে তাঁরা সমবেত হয়ে এই অভিনব 'শঙ্করস্কোপ'কে অভিনন্দিত করেছেন। যখন পূর্ব চুক্তি অনুসারে এর প্রদর্শনী ওখানে বন্ধ করে দিতে হয়, তখন দর্শকমহলে ক্ষোভের সীমা ছিল না। প্রযোজক রঞ্জিতমল কাংকারিয়া দর্শক চাহিদার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে প্রথম সুযোগেই 'মহাজাতি সদন'কে 'শঙ্করস্কোপ'-এর দ্বিতীয়বার প্রদর্শনীর জন্যে নির্বাচিত করেন। উত্তর ও মধ্য কলকাতার অধিবাসীদের সুবিধার দিকে নজর রেখেই তিনি 'মহাজাতি সদন'কে বেছে নিয়েছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে 'শঙ্কর-স্কোপ'-এর প্রদর্শনী প্রথমে ২৩ জুন পর্যন্ত চলবে বলে ঘোষিত হয়। কিন্তু দর্শকদের আগ্রহাতিশয্যে এর প্রদর্শনীকাল আবার ২৫ জুন থেকে শুরু হবে এবং কয়েক সপ্তাহ চলবে।

ক্যালকাটা মিউজিক এ্যান্ড আর্ট সেন্টারের অনুষ্ঠান : ক্যালকাটা মিউজিক এণ্ড আর্ট সেন্টারের শিল্পীরা সম্প্রতি এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন সঙ্গীতালয়ে। অনুষ্ঠানে কণ্ঠসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন কল্পনা সাহা রায়, দেবী দাস, মণিদীপা দাস, কল্যাণী চ্যাটার্জি, আইভি পাল, মধুমিতা সেনগুপ্ত, দেবযানী দাস, রীণা সাহা, দীপ্তি রায়, ডলি ঘোষ, গৌতম রায় প্রভৃতি। গীটারে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর বাজিয়ে শোনান বাণী চ্যাটার্জি, কল্যাণী রায়, স্বপ্না বিশ্বাস, রীণা দে, বীণা নায়ক। নৃত্যের আসরে অংশ নেন সর্বাণী পুরকায়স্থ, রেশমী চৌধুরী, সোমা নায়ক, সঙ্গীতা দাস, চুমকী দে, বৈশালী রায়, সীমা মুখার্জি, পুতুলা নন্দী প্রভৃতি। বীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি 'খাম্বাজ' রাগে এস্রাজ বাজিয়ে শোনান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পুলিনবিহারী চক্রবর্তী।

সি এল টির বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস

অবনমহলে সি এল টির বিংশতিতম জন্মদিবসে পৌরোহিত্য করেন শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সি এল টির জন্মলগ্ন থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে নাতিদীর্ঘ সুন্দর ভাষণে তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানকর্মীদের অন্তরে বড় স্বপ্ন না থাকলে এমন স্বপ্নভরা শিশু-মহল রচনা সম্ভব হোতো না। আজ সি এল টির চত্বর সারা বছর শিশুকণ্ঠের কাকলীতে আনন্দমুখর হয়ে থাকে। মনে পড়লেও হাসি পায় আমাদের সময়ে নাচ-গানে যোগ দেবার অপরাধে শিশুদের শাস্তি দেওয়া হোতো। অনাবিল আনন্দের উৎসে এমন এক শিশু রাজমহল সৃষ্টির জন্য প্রতিষ্ঠানকর্তারা সারা দেশের কৃতজ্ঞতা-ভাজন। শ্রী এন এন বোস প্রতিষ্ঠানস্রষ্টা ও কর্তাদের আশীর্বাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে একটি বাণী পাঠান। তিনদিনব্যাপী সুদীর্ঘ উৎসবে চারশো শিশু (এদের মধ্যে ডিপ্লোমাধারীও ছিলেন) অংশ গ্রহণ করেন। এবং এই তিনদিনের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে নতুন ছড়াসহ নৃত্যনাট্য 'আণ্ডার দি সী', 'সং অফ ইণ্ডিয়া" এবং 'বুড়ো এ্যাংলো' মঞ্চস্থ হয়। বালকদল 'নয়নচাঁদ' নামে একটি নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেন। মোটের ওপর উপভোগ্যতার দিক দিয়ে সি এল টির আয়োজন সর্বাঙ্গসুন্দর ও অভিনব।

—চিত্রাঙ্গদা

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

এ সাইলেন্ট রেভোলিউশান চিত্রে চন্দ্রমালা শ্রীবাস্তব এবং বেবী বিম্নী

(১) নামে সুন্দর, কাজেও সুন্দর

সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, প্রতিটি যুবা পুরুষই—সে যেমনই দেখতে হোক না কেন—চায়, কোনো-না কোনো নারী যেন তাকে ভালোবাসে বা অন্তত ভালোবাসার চোখে দেখে। তাই মাদ্রাজের এ-ভি-এম প্রোডাকসন্স-এর সাম্প্রতিক নিবেদন, কৃষ্ণন পঞ্জু পরিচালিত **ইস্টম্যান কলার** চিত্র "ম্যায় সুন্দর হুঁ"-ছবিতে দেখা যায়, গরীব বিধবার আদরের দুলাল সুন্দর—যে নামে সুন্দর হলেও চেহারার দিক দিয়ে আসলে সুন্দর নয় সে—যখন রসরাজ হোটেলে বয়ের কাজ করতে করতে সহসা আবিষ্কার করে যে, হোটেল মালিকের সুন্দরী কন্যা রাধা তাকে বিশেষ করে পছন্দ করে এবং এই আবিষ্কারের সমর্থনে সে রাধার নিজ মুখ থেকে কয়েক-বারই শুনতে পায়, আমি তোমার সরলতাকে পছন্দ করি (যে-কথাকে একটু ঘুরিয়ে দেখলে মনে হতে পারে, আমি তোমার সরলতায় মুগ্ধ), তখন সে মনে মনে এই কথা চিন্তা করে আনন্দ পায়, মাত্র গুটি তিনেক দাঁত বেরিয়ে থাকা সত্ত্বেও মা যে বলেন, আমি ভালোই দেখতে, আমি সোনার চাঁদ ছেলে, সেটা নেহাৎ কথার কথা নয়, ঐ তো আমার মালিকের সুন্দরী মেয়ে রাধা, সেও তো আমাকে পছন্দ করে, আমাকে ভালোবাসে। বাল্যবন্ধু অমরের সঙ্গে যখন তার হঠাৎ দেখা হয়ে যায় এবং সে মাত্র হোটেল-বয় হওয়া সত্ত্বেও সে ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে, তখন নানা কথার মধ্যে সুন্দর অমরকে তার এই গোপন প্রেমের কথা খুলে বলে। অমর ঠিক তখনি যাচ্ছিল রাধার সঙ্গে তার নিজের বিবাহের কথাবার্তা পাকা করতে। সুন্দরের মুখ চেয়ে সে নিরস্ত হল। তার মনে হল, রাধা নিশ্চয়ই গোপনে সুন্দরকে ভালোবাসে; সে হয়ত তার বাবাকে খোলাখুলি ব্যাপারটা বলতে পারছে না। কিন্তু পরে যখন সে রাধার মুখ থেকে প্রকৃত তথ্য জানতে পারল, বুঝতে পারল যে, বন্ধু সুন্দর রাধার পছন্দ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে বসে আছে, তখন অমর রাধাকে পরামর্শ দিল, সুন্দর যতদিন না নিজের জীবনে সাফল্য অর্জন করছে, ততদিন ওকে স্বপ্নের মধ্যে থাকতে দাও। চিত্রাভিনেতা-রূপে সুন্দর যখন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রাধাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করল এবং রাধা সুন্দর সম্পর্কে তার আসল মনোভাব ব্যক্ত করে ওর স্বপ্নের সৌধকে ভেঙে [illegible] সুন্দর প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করে নিজেকে কিভাবে সামলে নিল এবং পৃথিবীতে তার একমাত্র আরাধ্য জননীর আকস্মিক মৃত্যুর পরে সে নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাকে কিভাবে জনকল্যাণে নিয়োজিত করল, তাই নিয়েই ছবির শেষ উত্তেজক ও ভাবসমৃদ্ধ দৃশ্যগুলি গড়ে উঠেছে।

মেহমুদের বহুমুখী নাট্য-নৈপুণ্য প্রকাশের চমৎকার বাহনরূপেই 'ম্যায় সুন্দর হুঁ' কাহিনীটি রচিত। অমর চরিত্রটি ছবির রোমান্টিক নায়ক হলেও আসল নায়ক হচ্ছে সুন্দর। যে-ভূমিকাটিতে আছে হাসি-কান্নার অপূর্ব সংমিশ্রণ, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব, ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থকে তুচ্ছজ্ঞান করে পরার্থপরতায় জীবন উৎসর্গ করবার প্রেরণা। 'সুন্দর'-এর চরিত্র চিত্রণ মেহমুদের নটজীবনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি বলে চিহ্নিত হবে। হাসি কৌতুকের স্বভাবসিদ্ধ অভিনয় ছাড়াও মেহমুদ এই 'সুন্দর'-এর ভূমিকাতে বন্ধুপ্রীতি, মাতৃ-ভক্তি, নিরুচ্চার প্রেমের পুলকিত অনুভূতি, কুদর্শন আখ্যায় বিক্ষুব্ধ ভাব, প্রেম প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় মর্মাহতের ভাব ও পরে সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করে হৃদয়ে শান্তির প্রতিষ্ঠা এবং সবশেষে মায়ের মৃত্যুতে শোক ও পরার্থপরতার উদার প্রকাশ—এক কথায় অভিনয়-প্রতিভার সর্বমুখীনতাকে আশ্চর্য দরদ দিয়ে প্রকাশিত করেছেন মেহমুদ। নায়িকা রাধার ভূমিকায় লীনা চন্দ্রভারকরকে একটি মোমের পুতুলের মতো সুন্দর বলে মনে হয়েছে; অবশ্য চরিত্রের অভিব্যক্তিগুলি তিনি প্রকাশ করেছেন কিছুটা আড়ষ্টভাবে। রোমান্টিক চরিত্র অমর বেশে বিশ্বজিৎকে মানিয়েছে যেমন, তেমনই কাহিনীর দাবিকে তিনি মিটিয়েছেন যথাযথভাবে। অন্যান্য ভূমিকায় অরুণা ইরাণী, সুলোচনা, ডেভিড, মুকরী, অসীমকুমার প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসনীয়। রাধার ভবিষ্যতের স্বপ্নময় দৃশ্যগুলি ছবিকে অযথা জাঁক-জমকসম্পন্ন করে তুলেছে। হোটেল নিউ রসরাজের সুন্দরীদের সমবেত নৃত্য রীতিমত চিত্তাকর্ষক। ছবির ছ'খানি গানের মধ্যে কাহিনীর স্টুডিও দৃশ্যগুলির অন্যতম ছবির প্লে-ব্যাকের জন্যে মাইক্রো-ফোনের সামনে স্বয়ং কিশোরকুমারের নিজ কণ্ঠে গাওয়া 'নাচ মেরী জান পাথাপাত' নিশ্চয়ই সবচেয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করবে। 'দো মস্তানে দো দীওয়ানে', 'মুঝকো ঠন্ড রহী হায়' গান দু'খানিও যথেষ্ট উপভোগ্য।

মেহমুদের অভিনয়দীপ্ত এ-ভি-এম প্রোডাকসন্স-এর নবতম চিত্র 'ম্যায় সুন্দর হুঁ' দর্শকমহলে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

(২) পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি তথ্যচিত্র প্রচেষ্টা

ন্যু ওয়েভ ফিল্মস্ এন্টারপ্রাইজ নামে একটি সংস্থা প্রায় ১,৬০০ ফুট দীর্ঘ একটি তথ্যচিত্রের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য দূরী-করণে জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি দর্শকদের সামনে তুলে ধরবার প্রয়াস পেয়েছেন। বাপ-মায়ের বড়ো ছেলে তার অনেকগুলি ভাই-বোনকে বাঁচিয়ে রাখার গুরুভার বহন করতে গিয়ে নিজের প্রিয়তমার সঙ্গে বিবাহসূত্রে মিলিত হতে পারে নি—এই বক্তব্যটি **'এ সাইলেন্ট রেভোলিউশান'** নামে ছোট্ট হিন্দী ছবিটির মারফৎ রাখতে গিয়ে পরিচালক দিলীপ বন্দোপাধ্যায় বহু জনতার দৃশ্য, প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট চন্ডী লাহিড়ী অঙ্কিত বহু রেখাচিত্র, জন্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বহু বিজ্ঞাপনচিত্র ও ভ্রমণদৃশ্য ছাড়াও দ্রুত গতিশীল ক্যামেরায় ধরা এমন সব দৃশ্য ব্যবহার করেছেন যা উগ্র আধুনিক চলচ্চিত্র রীতির পরিচায়ক হলেও তাঁর

বক্তব্যের পক্ষে যথেষ্ট প্রয়োজনীয় নয় বলেই মনে হতে পারে।

যারা স্বামী-স্ত্রীর সুখী জীবন-যাপনে একদা বঞ্চিত হয়েছে, তারা চলার পথে হঠাৎ যেদিন মুখোমুখি দাঁড়াল, সেদিন শঙ্কর অকৃতদার থাকলেও নীতার পরণে ছিল বৈধব্যের বাস এবং তার কোল জুড়ে ছিল একটি মিষ্টি ছেলে—গঙ্গা। একটি রেস্তোরাঁয় বসে দুজনের স্মৃতিচারণের মধ্যেই ওদের মিলনের অন্তরায়ের কারণটি বিধৃত হয়েছে। অথচ চলচ্চিত্রে এই বর্ণনামূলক রীতিটি বর্জনীয় বলেই জানা আছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ ও সুখী পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত বক্তব্য বেশীর ভাগই উপদেশপূর্ণ বক্তৃতার আকারে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ফলে প্রচুর চিত্রকল্পের ব্যবহার দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ছবিটির প্রচারধর্মী রূপটিই বেশী করে প্রতিভাত।

ছবির আরম্ভভাগেই একটি অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়, যেখানে আবহসংগীত-বিশিষ্ট ছোট ছোট দৃশ্যের মাঝে আবহসংগীতবিহীন, সম্পূর্ণ নিঃশব্দ এক একটি পরিচয়লিপি (ক্রেডিট টাইটেল) স্থান পেয়েছে। বক্তব্যটিকে পেশ করবার জন্যে সম্পাদক যেভাবে দৃশ্যগুলিকে সাজিয়েছেন, তার বৈচিত্র্য দর্শকচিত্তে প্রবল প্রতিক্রিয়া বা ইম্প্যাক্টের সৃষ্টি করে, এ-কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু চিত্রনাট্যটিও যদি সঙ্গে সঙ্গে বর্ণনাত্মক না হয়ে ক্রিয়াশীল বা অ্যাকশনপ্রধান হত, তাহলে এই বৈচিত্র্য অধিকতর অর্থবহ হত। ছবির উল্লেখ্য আবহ-সঙ্গীত ও চিত্রগ্রহণের কৃতিত্ব প্রবীর মজুমদার ও তপন গুহঠাকুরতার। ছবিতে শঙ্কর, নীতা ও গঙ্গার ভূমিকায় যথাক্রমে অবতরণ করেছেন শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রমালা শ্রীবাস্তব ও বেবী বিন্নী। ছবিটির প্রযোজনা করেছেন বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

স্টুডিও থেকে

'কুহেলি'র মুক্তি আসন্ন।

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর ভারতীচিত্র প্রযোজিত এবং তরুণ মজুমদার নিবেদিত রুদ্ধশ্বাস রহস্যচিত্র 'কুহেলি'র মুক্তি আসন্ন। রাধা, পূর্ণ ও অন্যান্য বহু চিত্রগৃহে ছবিটি পরবর্তী আকর্ষণ হিসেবে নির্ধারিত।

বাংলা ছায়াছবিতে রহস্যের ছায়াপাত খুবই কম। সেদিক থেকে বীরেন দাসের 'বৌ-রানী' কাহিনী অবলম্বনে 'অভিমন্যু' পরিচালিত এ ছবিটি এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেবে। জঙ্গল-ঘেরা পাহাড়ী উপত্যকায় নির্জন এক পাষাণপুরীর পটভূমিতে এই কাহিনীর বিস্তার। দিনের আলো নিভে গেলে প্রতি রাতেই সেখানে নেমে আসে বিভীষিকার ছায়া। অতৃপ্ত বাসনার হিসেব মেটাতে যে রহস্যময়ী অন্ধকারের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে বারবার সেখানে যাতায়াত করে—সেকি তার অশরীরী আত্মা?

মূল ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সন্ধ্যা রায় ও বিশ্বজিৎ। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন সুমিতা সান্যাল, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, ছায়া দেবী, সত্য বন্দ্যোঃ, শেখর চট্টোঃ, উৎপল দত্ত, তরুণ রায়, চুমকী ও অন্যান্য। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে ছবির গানগুলি গেয়েছেন লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্বয়ং। ছবিটি পিয়ালী পিকচার্সের পরিবেশনায় মুক্তি পাবে।

।। অগ্রদূত-এর পরবর্তী চিত্রোপহার : 'সোনার খাঁচা'র চিত্রগ্রহণ শুরু ।।

'ছদ্মবেশীর' চিত্রগ্রহণ শেষ করেই অগ্রদূত গোষ্ঠী তাঁদের পরবর্তী চিত্রোপহার সরকার ফিল্মস্-এর 'সোনার খাঁচা'-র চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন গেল সোমবার ২১ জুন থেকে স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ স্টুডিওতে।

উদ্দাম জনপ্রিয়তা ও সম্পদের সোনার খাঁচায় আবদ্ধ এক সঙ্গীত-শিল্পীর জীবন যন্ত্রণার চিত্ররূপ হচ্ছে 'সোনার খাঁচা'। কাহিনী ও সঙ্গীতের দায়িত্বে আছেন—বীরেশ্বর সরকার এবং চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মিহির সেন।

বিভিন্ন চরিত্রে এ পর্যন্ত যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন : উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন, নির্মলকুমার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোঃ, রবীন মজুমদার, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি। ছবিটি

বিখ্যাত সোভিয়েত চিত্র-পরিচালক ইশান কারিমভ (বাম দিকে) এবং মুখতার আগামিরজায়েভ (মধ্যে) নতুন ছবি লাইট অ্যান্ড স্যাডোস নিয়ে আলোচনারত

পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন—চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ প্রাইভেট লিঃ।

চলচ্চিত্রের প্রথম প্রয়াস বিমল করের 'পূর্ণ-অপূর্ণ' :—গত পঁচিশে বৈশাখ একটি মনোজ্ঞ ও রুচিপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-সন্ধ্যা উদ্‌যাপন করে নবগঠিত চিত্র নির্মাণ সংস্থা 'চলচ্চিত্র'। এই বিশিষ্ট পরিবেশে 'চলচ্চিত্র' তাঁদের প্রথম প্রয়াসের শুভমহরৎ পালন করেন বাগবাজার স্ট্রীটের নিরঞ্জন সাউন্ড স্টুডিও কক্ষে। প্রখ্যাত কথাশিল্পী বিমল কর প্রণীত 'পূর্ণ-অপূর্ণ' উপন্যাসটির চলচ্চিত্রায়ণ তাঁদের প্রথম অভিলাষ। প্রধান দুই নায়ক চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মলকুমার এবং নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন 'উর্বশী' পুরস্কার অলংকৃত শিল্পী মাধবী চক্রবর্তী। এই কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনা ও নির্দেশনার দায়িত্বে আছেন শ্যামল ঘোষ এবং অন্যান্য কলাকুশলীদের মধ্যে রয়েছেন সঙ্গীত-পরিচালনায় সুকুমার মিত্র, গীত রচনায় অমিতাভ নাহা, শিল্প নির্দেশনায় বরুণ চন্দ্রগুপ্ত, শব্দগ্রহণে হিমাদ্রি ভট্টাচার্য এবং চিত্রগ্রহণে শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অভ্যাগতদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক বিমল কর, চিত্র পরিচালক বিমল ভৌমিক ও পূর্ণেন্দু পত্রী, পরিবেশক রাধা-মাধব মল্লিক এবং কুশীলবদের মধ্যে অন্যতম মাধবী চক্রবর্তী ও নির্মলকুমার। আমন্ত্রিত-দের সাদর আপ্যায়ন জানান এই চিত্রের প্রযোজক রামপ্রসাদ দাশ।

মঞ্চাভিনয়

অভিনেত্রী সংঘ প্রযোজিত 'অন্ধযুগ' : বাংলার প্রাণরসের সংগে জড়ানো অমর মহাভারতের এক চেনা কাহিনী, চেনা চরিত্রের মেলা, পরিচিত ঘটনা আর সংঘাতের আবর্ত। ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, সঞ্জয়, অশ্বত্থামা সব কটি মানসিকতা নিয়েই আমাদের কাছে নিবিড়ভাবে পরিচিত। এই পরিচিতি আবার সুগভীর উপলব্ধির আলোয় নতুন করে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলো 'অন্ধযুগ' নাটকটির মধ্যে। শ্রীধরমবীর ভারতীর এই নাটকটিকে কয়েকদিন আগে অভিনেত্রী সংঘের শিল্পীরা বেশ সাফল্যের সংগে পরিবেশন করলেন স্টার' রঙ্গমঞ্চে। শ্রীভারতীর এই নাটকটিকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন প্রণতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই দশকের নাট্যচর্চার বিশিষ্ট ধারাকে স্মরণ রেখে 'অন্ধযুগে'র প্রযোজনার যৌক্তিকতা নিয়ে হয়তো কিছু প্রশ্ন উঠতে পারে; কিন্তু গভীর চিন্তায় ডুব দিলে নাটকটির সমকালীন মূল্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হোতে পারে বলে মনে হয়। প্রথমে এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য যে মহাভারতের মধ্যে জাতির যে যুগসঞ্চিত সংস্কৃতি, জীবনধারা, ধর্মের মধ্যে যে আধুনিক মানবীয় মূল্যবোধ, সংশয় ও বিচ্ছিন্নতাবোধ লুকিয়ে আছে, তাকে [illegible]ের আলোয় তুলে ধরা একটা গৌরবদীপ্ত প্রয়াস। তা ছাড়া নাটকটির মুখর সংঘাতের

তরুণ মজুমদারের কুহেলী-তে সন্মিতা সান্যাল

সঙ্গে একাত্ম হয়ে যখন দেখেছি ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, যুযুৎসু, গান্ধারী, সঞ্জয়, অশ্বত্থামার অনুভূতি লোকে একটা কালো অন্ধকারের মতো মেঘ জমাট বেঁধে আছে; যখন দেখেছি ওঁরা সবাই ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, ওঁদের চোখে অশ্রুর রেখা, তখন তো আমাদের মনে হয়েছে যে একই ব্যর্থতা আর মানসিকতার তীব্র যন্ত্রণার তমিস্রায় আমরাও গুমরে গুমরে কাঁদছি। আমরা কাঁদছি, কিন্তু ফুরিয়ে যাচ্ছি না। হৃদয়ের সবটুকু স্বপ্নের বুকে বেঁধে নিয়ে আশা করছি এই অন্ধযুগের অবসান হবে, পূব আকাশের বুকে নতুন যুগের সূর্য উঠবেই। মহাভারতের, চেনা কাহিনীর মধ্য দিয়ে কি 'অন্ধযুগ' নাটকটি এই চিরন্তন সত্যের দিকে ইঙ্গিত দেয় নি? এছাড়া সংস্কৃতি ও শিল্পের আন্দোলনে ঐতিহ্যমন্ডিত ক্লাসিকাল সৃষ্টির দিকে নতুনতর আলোকসম্পাত আলোড়নের গভীরতাকে আরো ব্যাপ্ত করে, আরো অর্থময় করে তোলে। 'অভিনেত্রী সংঘে'র শিল্পীরা 'অন্ধযুগ' নাটকটি প্রযোজনা করে শিল্পসংস্কৃতির বিশিষ্ট অধ্যায়ে দায়িত্ববোধের এক প্রদীপ্ত ও শৈল্পিক স্বাক্ষর রাখলেন।

এবারে আমি নাটকটির প্রয়োগ-পরিকল্পনার কথায় প্রথমেই বলি মঞ্চ-সজ্জায় খুব ঘনঘটা বা আড়ম্বর না করে অল্প কয়েকটি সাজেসনেই পরিবেশটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মঞ্চের দু'পাশে প্রচন্ডরকম দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী দুই প্রহরীকে রেখে রাজকীয় গাম্ভীর্যে আনা হয়েছে যথেষ্ট দ্যোতনা। মঞ্চের পিছনের পর্দায় আলোর সাহায্যে অনেক গতিময়তা আনারও চেষ্টা করা হয়েছে। এ সব ব্যাপারে নির্দেশক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট সাধুবাদ পাবেন। কিন্তু যে নেপথ্য কণ্ঠে নাটকীয় কাহিনী ও মর্মসত্যের উদ্ঘাটন করা হয়েছে, তা খুব বেশী উদ্দীপ্ত, বলিষ্ঠ ও মাঝে মাঝে প্রশান্ত হোতে পারেনি। নাটকটির মধ্যে নেপথ্য কণ্ঠের যখন একটা বিরাট ভূমিকা আছে, তখন এদিকে আরো একটু দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল বলে মনে করি। আর একটি কথা। কৃষ্ণের কণ্ঠই যেখানে সোচ্চার, সেখানে পিছনের পর্দায় কৃষ্ণের মূর্তি দেখানোর বোধ হয় অতিরিক্ত কোন সার্থকতা ছিল না।

প্রয়োগপরিকল্পনার দু'একটি শৈথিল্য কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ঢেকে গেছে শিল্পীদের প্রাণবন্ত অভিনয়ের স্পর্শে। যাঁর চরিত্র-চিত্রণ মনকে বিশেষভাবে আপ্লুত করেছে, তিনি হোলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। 'অশ্বত্থমা' চরিত্রে অদ্ভুত সুন্দর তাঁকে মানিয়েছিল। প্রতিহিংসা আর যন্ত্রণার মুহূর্তে তাঁর অভিনয় সত্যি ভোলা যায় না। এই ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি প্রমাণ করলেন যে চলচ্চিত্রের মতো মঞ্চেও তিনি সমান দক্ষতা দেখাতে পারেন। শান্ত, পেলব 'ধৃতরাষ্ট্র' চরিত্রে একটি আশ্চর্য সুন্দর প্রশান্তি আনেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। 'গান্ধারী'র ভূমিকায় নীলিমা দাসের কয়েকটি অভিব্যক্তি উজ্জ্বল চরিত্র-চিত্রণেরই স্বাক্ষর বহন করেছে। শৈলেন মুখার্জীর বিদুর'ও হয়েছে শান্ত ও সংহত, কিন্তু নির্মল ঘোষের 'সঞ্জয়' সবসময় স্বাভাবিকতার সীমা স্পর্শ করতে পারে নি। আহত সৈনিকের নিঃসীম যন্ত্রণাকে কি অসাধারণ ক্ষমতার সঙ্গে মঞ্চে মুখর করে তুলেছেন অনুপকুমার, কোন সংলাপই তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়নি, শুধু অভি-ব্যক্তিতেই তিনি অনুভূতিকে ছুঁয়েছেন।

অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন অশোক মিত্র (প্রহরী-১ম), লোকনাথ চন্দ্র (প্রহরী-২য়), রমেশ মুখোপাধ্যায় (জ্যোতিষী ও জরা), শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায় (কৃপাচার্য), সতীন্দ্র ভট্টাচার্য (যুধিষ্ঠির), শোভন লাহিড়ী (যুযুৎসু), জগৎ মিত্র (কৃতবর্মা)।

অপরাধীকে ভালো হবার সুযোগ দাও

'বিশপসে ক্যান্ডলস্টিক'-এর চোর খিদের জবালায় রুটি চুরি করবার অপরাধে জেলে গিয়ে শেষ দাগী চোরে পরিণত হয়েছিল। সাজা দেবার সময়ে বিচারক বিবেচনা করে দেখেন নি, কোন্ বিশেষ অবস্থায় পড়ে লোকটি রুটি চুরি করেছিল এবং সেই বিশেষ অবস্থার জন্যে দায়িত্ব কার বা কাদের। আজই বা আমাদের মধ্যে কে কোথায় জানতে চায়, কোনো লোক কোন্ বিশেষ অবস্থায় পড়ে তার জীবনের প্রথম অপরাধটি করল এবং সেই বিশেষ অবস্থার জন্যে আসল দায়িত্ব কার বা কাদের—সামাজিক বা রাষ্ট্রিক ব্যবস্থারই বা এ-বিষয়ে দায়িত্ব কি পর্যন্ত।

—কিন্তু সম্প্রতি রঙমহলে অভিনীত আশাপূর্ণা দেবী রচিত 'উত্তরণ'-এর সুলক্ষণা দেবী যে-রাতে চিতলী তাঁর বাড়ীতে চুরি করতে এসে ধরা পড়ে গিয়েছিল এবং বাড়ীর আর-আর সবাই তাকে যার-পর-নাই লাঞ্ছিত করবার পরে পুলিশে দেওয়া সম্পর্কে একমত হয়েছিল, সেই রাতেই অত্যন্ত ঠান্ডা মাথা নিয়ে বুঝেছিলেন চিতলী কোনো গুরুতর অবস্থায় পড়ে এ ধরনের অপরাধ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল এবং সেই কারণে তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাব নিয়ে তাকে সৎভাবে জীবন যাপনের সুযোগ দেওয়া উচিত। সুলক্ষণাদেবী যে ভুল করেন নি সেকথা ক্রমে তাঁর দুই ছেলে কৌস্তভ ও কৌশিক এবং মেয়ে সুদক্ষিণা সানন্দে স্বীকার করে নিলেও তাঁর চিররুগ্না পুত্রবধূ অপর্ণা চিতলী বা চৈতালীকে স্বচ্ছন্দ চিত্তে গ্রহণ করতে পারে নি। চৈতালীর মতো শিক্ষিতা, স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী তরুণীর উপস্থিতি তার স্বামী কৌস্তভের চিত্তবিকার ঘটাবে, এ-সম্বন্ধে তার সন্দেহ ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। চিররুগ্না স্ত্রীর দ্বারা অতিষ্ঠ-জীবন কৌস্তভের পক্ষে চৈতালীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাব থেকে ধীরে ধীরে তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিকও ছিল না। কিন্তু চৈতালীর ভদ্র মার্জিত মন কৌস্তভের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া থেকে বলিষ্ঠচিত্ত কৌশিকের আকর্ষণকে বেশী করে অনুভব করেছিল এবং যদিও কৌশিকের সঙ্গে কোনোও রকম প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠাকে সে ন্যায়ত পরিহার করে চলছিল, কিন্তু মনে মনে সকলের অজ্ঞাতে সে তাকে হৃদয়-দেবতার আসনে বসিয়েছিল। চৈতালীর প্রতি কৌশিকের প্রেমকে সুলক্ষণা দেবীর আভিজাত্য জ্ঞান কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে নি। এর ওপর যখন আবার অপর্ণার চুড়ী চুরির মিথ্যা দায়ে চৈতালী অভিযুক্ত হল, তখন সমস্ত দেখে শুনে এবং সুদক্ষিণা দেবীর তার প্রতি বিরূপ মনোভাবে ব্যথিত হয়ে চৈতালী গোপনে তার স্বপ্নের স্বর্গ-রাজ্য ত্যাগ করে চলে গেল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত চুড়ী হারানোর যথার্থ তথ্য অবগত হওয়ার পরে এবং নিজের আভিজাত্যজ্ঞান প্রকৃত বিচার-বুদ্ধির পরিচায়ক নয়, এ-বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে সুলক্ষণা দেবী চৈতালীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন তাকে পুত্রবধূর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে।

চৈতালীর বাবা শচীন মজুমদার অসৎ সংসর্গে মিশে নিম্ন শ্রেণীর গুন্ডার সামিল হয়ে পড়েছিল ও তার পাল্লায় পড়ে মাসীমার বাড়ীর ভদ্র পরিবেশ থেকে বিচ্যুত চৈতালী চোরা কারবারের সহায়ক হয়ে উঠেছিল এবং যখন চোরাই মালের ভাগ-বাটরা নিয়ে ঝগড়া হওয়ার ফলে শচীন গুরুতরভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে যেতে বাধ্য হয়, তখন পিতার চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চৈতালীকে বেরিয়ে পড়তে হয়—এই অধ্যায়টি একটিমাত্র দৃশ্যের মধ্যে সীমিত করা হয়েছে। এই একটিমাত্র দৃশ্য চৈতালীর চরিত্র বিশ্লেষণের পক্ষে কিছুটা প্রয়োজনীয় হলেও একান্ত বিশ্বস্তরূপে উপস্থাপিত হতে পেরেছে কিনা, সে-বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ আছে এবং নাটকের অন্যান্য অংশের তুলনায় এই দৃশ্যটি যেন প্রক্ষিপ্ত, খাপছাড়া, ভিন্ন সুরের। চোদ্দটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ 'উত্তরণ'-এর নাট্যরূপের বারোটি দৃশ্যই সুলক্ষণা দেবীর গৃহ-সংক্রান্ত। আবার শেষ দৃশ্যটি একটি বস্তী অভ্যন্তরে—অনেকটা শচীন ও তার ভাগীদারদের দৃশ্যের সামিল। যদিও শেষ দৃশ্যের সুর স্বাভাবিকভাবেই পূর্বের দৃশ্যের অনুসারী এবং দর্শক-অভিপ্রেত পরিণতির পথে চূড়ান্তভাবে এগিয়ে গিয়েছে।

শিল্পীদের মধ্যে প্রথমেই যিনি আমাদের দৃষ্টিকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছেন, তিনি হচ্ছেন সরযূ দেবী। বহুদিন এমন ব্যক্তিত্বপূর্ণ, অসামান্য দরদী অভিনয় দেখি নি: অথচ কি আশ্চর্যভাবে বাস্তব! এর পরে আসেন চৈতালী ওরফে চিতলীর ভূমিকাভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। হাল্কা কৌতুকের ঢংয়ে এবং মর্মস্পর্শী গুরুগম্ভীর ভাবের—উভয়বিধ অভিনয়েই তাঁর সমান কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। অবাক করেছেন অবাঙালী অভিনেতা সর্বেন্দ্র কৌশিকের অনুভূতিকোমল ভূমিকায় অত্যন্ত সাবলীল অভিনয় করে। কৌস্তভের কঠিন ভূমিকাটিতে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছেন অমরনাথ মুখোপাধ্যায়। চরিত্রটিকে তিনি ঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছেন। সুদক্ষিণার চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন রত্না ঘোষাল। চিররুগ্না অপর্ণার চরিত্রটির বিচিত্র মনোভাবকে ব্যক্ত করেছেন ইন্দিরা দে। এ-ছাড়া জহর রায় (শচীন), মৃণাল মুখোপাধ্যায় (বংশী), হরিধন মুখোপাধ্যায় (নিতাই), আরতি চক্রবর্তী (গোষ্ঠর মা), সন্তোষ ঘোষাল (বরেন), কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (লাট্টু সিং), অজিত চট্টোপাধ্যায় (ইয়াসিন) প্রভৃতি স্ব স্ব ভূমিকায় উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন। রঙমহলের 'উত্তরণ' একটি উপভোগ্য আদর্শবাদী নাটক।

মিনার্ভা থিয়েটার কর্মী সংসদের বলিষ্ঠ প্রযোজনা 'প্রবাহ':

বুকভরে ভালোবাসা, আর স্নেহ, প্রীতি, মায়া মমতাঘেরা ছোট্ট একটি ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো বিপ্লবীদের গুপ্ত এক আস্তানায়। কিন্তু বিপ্লবী নায়কের চোখে তখন অন্য আগুনের শিহরণ, বুকে তার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সমুদ্র। সে বললো, 'অলস মধ্যাহ্নে আমি তোমার চুড়ির আওয়াজ শুনি না, শুনি আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ'। ও বললো ঘর বাঁধার মতো অফুরন্ত নিটোল অবসর ওদের নেই, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে ওরা শুধু জীবন-মরণের খেলায় মেতেছে।

অভিভূত হয়ে শুনেছিলাম প্রচণ্ড এক নাট্যমুহূর্তে বিপ্লবীদের সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা। মুহূর্তটি গড়ে উঠেছিল মিনার্ভা থিয়েটার কর্মী সংসদ প্রযোজিত 'প্রবাহ' নাটককে কেন্দ্র করে। প্রথমেই বলে রাখি সুপ্রযোজিত এই নাটকে অনেক বিস্ময়ে অভিভূত হওয়ার মতো অনেক শৈল্পিক মুহূর্ত আছে, যা মিনার্ভায় অভিনীত অনেক মঞ্চসফল নাটকের ঐতিহ্যকে পরিপূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রেখেছে এবং কোথাও কোথাও প্রয়োগপরিকল্পনায় স্বাতন্ত্র্যের দীপ্তি এনেছে।

তিরিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম ও ব্যাপকতর আন্দোলন, তারই প্রেক্ষাপটে গড়ে তোলা হয়েছে 'প্রবাহ' নাটকের আবর্তকে। নাটকটির মধ্যে আনুপূর্বিক কোন কাহিনী নেই, কিন্তু এই অভাব নাটকের বক্তব্য ও পরিবেশনাকে মন্থর ও নীরস করে তুলতে পারেনি। বিভিন্ন সময়ে বিপ্লবের প্রতিধ্বনি ও তার নেপথ্য ইতিহাসের কথা উদাত্তকণ্ঠে বলে গেছেন সূত্রধার। আর তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রাম। নাটক শেষ হয়েছে একটি দৃপ্ত সপথে—অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে তীব্রতর আন্দোলনের প্রবাহ চলবে এগিয়ে যতোদিন না লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।

'প্রবাহ' নাটকটিতে হয়তো প্রত্যক্ষভাবেই রাজনীতির কথা আছে, কিন্তু সেই 'ইজম' নাট্যবেগকে কোথাও এতটুকু ব্যাহত করার মতো পরিবেশ তৈরী করেনি। তার কারণ বিপ্লবীদের চরিত্রগুলো শুধু বিপ্লবের শুষ্ক

কঠিন কথাই বলেনি, সোচ্চারে সংগ্রামের কথা বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে নীরবে নিভৃতে নিজেদের মনের কাছে বলেছে স্নেহ, প্রীতি, ভালোবাসা আর দুর্বলতার কথা। এই দুই মাসিকতার সুষ্ঠু সমন্বয়েই এসেছে এই চরিত্রগুলোর বাস্তবতা আর মানবিকতা। তাইতো দেখি 'ইউরোপীয়ন ক্লাব' আক্রমণের পূর্বমুহূর্তে দলের নেতা ভেবেছে—এই ক্লাবে এই মুহূর্তে হয়তো অনেকেই আছেন, যাঁরা কাল ভোরেই দেশের পথে পা বাড়াবেন, হয়তো এ'দের মধ্যে কারো জন্য অপেক্ষা করছে কোন নীলনয়না। কঠিন, হৃদয়হীন সঙ্কল্প পালনের আগে হৃদয়ের দুর্বলতার রেটি মুহূর্তের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ার জন্য নাটকীয় চরিত্রগুলো যেমন মানবিক হয়ে উঠেছে, তেমনি সামগ্রিকভাবে নাট্যসৃষ্টি হিসেবে 'প্রবাহ' বেশ কিছু তাৎপর্যের সন্ধান দিয়েছে। এর জন্য নাট্যকার অমিতাভ গুপ্ত নিঃসন্দেহে সাধুবাদ পাবেন। সংলাপ-রচনায়ও তাঁর মুন্সিয়ানা প্রশংসার দাবী রাখে।

এবার আমি প্রয়োগপরিকল্পনার কথায়। এ ব্যাপারে যে দু'জন প্রথমেই তাঁদের সূক্ষ্ম শিল্পবোধের জন্য নাট্যানুরাগীদের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দাবী করতে পারেন, তাঁরা হোলেন ইন্দ্রজিৎ সেন ও সুজিত গুপ্ত। নাটকটিকে নতুন রীতিতে পরিবেশনার ব্যাপারে তাঁদের নিঃসীম আন্তরিকতা ও অবিচল নিষ্ঠা নিঃসন্দেহে সামগ্রিক প্রযোজনাটিকে এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছে।

রূপারোপের 'রাইফেল' : সম্প্রতি সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের 'রূপারোপে'র শিল্পীরা উৎপল দত্তের 'রাইফেল' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে রঙমহলের মঞ্চে পরিবেশন করেন। নাটকটির সুষ্ঠু প্রযোজনার জন্য যিনি সর্বপ্রথম প্রশংসার দাবী রাখেন তিনি হোলেন নির্দেশক শ্রীইন্দ্র রায়। স্বাতন্ত্র্য-দীপ্ত চরিত্রচিত্রণে দক্ষতার পরিচয় রাখেন মিহির গঙ্গোপাধ্যায় (রহমৎ), আদিত্য চট্টোপাধ্যায় (কল্যাণ), রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (যুগল), জীবনকৃষ্ণ ঘটক (ইনগ্রাম)। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন ইন্দ্র নাগ, গৌরীশঙ্কর, রমা গুহ, কৃষ্ণকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য, সুরেশ দাস, অবনী চট্টোপাধ্যায়, দীপা হালদার ও সুশীল ঘোষ।

ময়ূরমহল : গৌরীবাড়ি বিধান সঙ্ঘের শিল্পীরা কয়েকদিন আগে নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'ময়ূরমহল' নাটকটি 'রঙমহল' মঞ্চে পরিবেশন করে নাট্যানুরাগীদের মুগ্ধ করেছেন। শ্রীদিলীপ দাশগুপ্তের সুষ্ঠু পরিচালনায় এই নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন দিলীপ দাশগুপ্ত, গীতা দে, সুবীর বসু, দিলীপ রায়, সুশীল সেনাপতি, কল্যাণ মুখার্জি, গোকুল চক্রবর্তী, নগেন সাধুখাঁ, অনীশ দেব, সুদীপ্ত বসু, অমর রায়, অসিত গুহ, হারাধন দত্ত, প্রবীর পোদ্দার, সম্রাজ্ঞ মণ্ডল, মমতা গাঙ্গুলী ও রেবা দে।

কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই ক্যাশ বিভাগের নাটক নতুন অবতারে-র একটি দৃশ্যে রণেন বসু এবং ভূপতি সরকার।

কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই রবীন্দ্র জন্মোৎসব সমিতি :—গত ১১ জুন কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই রবীন্দ্র জন্মোৎসব সমিতি কবিগুরুর দশমোত্তর শততম জন্ম-বার্ষিকী পালন করেন। অনুষ্ঠানে শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের প্রাণস্পর্শী রবীন্দ্র সংগীত ও আন্তঃ অফিস রবীন্দ্র নাট্য প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ দল ক্যাশ ডিপাঃ রিক্রিয়েশন ক্লাব তাঁদের পুরস্কারপ্রাপ্ত নাটক 'নূতন অবতার' সকলের মন জয় করে। এই সংস্থার শিল্পীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও শ্রীরমেন চৌধুরীর সুনির্দেশনা গুণে সুঅভিনয় হয়েছে। এই বছর আন্তঃ অফিস রবীন্দ্র নাট্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতা শ্রীরণেন বসুর সুন্দর অভিনয় বহু দিন মনে থাকবে। এছাড়া আর সকলের অভিনয় সুন্দর। সর্বশ্রী ভূপতি সরকার আদি চৌধুরী, প্রেমাংশু বসু, দীপক বসু, শান্তিদেব ঘোষ, প্রকৃতি ঘোষ, অলোক দত্ত, অসিত চ্যাটার্জি ও শিবব্রত রায়, মুকুলজ্যোতি, হীরেন মিত্র নাটকটির সাফল্যের অংশীদার।

মুক্তধারার অভিনয় : আগামী ৮ জুলাই 'মুক্তধারা' গোষ্ঠীর শিল্পীরা মুক্তঅঙ্গনে অভিনয় করবেন শ্রী কঙ্ক রচিত 'চিত্রন টা' এবং সুশ্যামল শর্মা রচিত 'নিহত নাইটিংগেল' নাটক দুটি। অভিনয়ের সময় সন্ধ্যা ৬-৩০টা। নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে নিমাই দাস ও সুশ্যামল শর্মা।

বিবিধ সংবাদ

কবিশেখর কালিদাস রায় সম্বর্ধনা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি :—বাণীবিতানের আষাঢ় অধিবেশন উপলক্ষে আগামী ২৫শে আষাঢ় (ইংরেজী ১০ জুলাই ৭১), শনিবার অপরাহ্ণ সাড়ে ৪টায় ১০।১৩ চারুচন্দ্র অ্যাভেনিউস্থিত (টালিগঞ্জ, কলিকাতা—৩৩) 'সন্ধ্যার কুলায়'-এ সঙ্ঘের প্রথম সর্বাধ্যক্ষ এবং বাংলার প্রবীণতম ও সর্বজন-শ্রদ্ধেয় কবি সাহিত্যিক ও গীতিকার কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ের ৮২তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের এক কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে।

প্রযোজক - পরিচালক - নাট্যকার রাসবিহারী সরকার সম্বর্ধিত

গেল ১৩ জুন রবিবার সন্ধ্যায় বীডন স্ট্রীটে আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) ঐতিহ্যমণ্ডিত নাটমন্দিরে আনন্দ মন্দিরের উদ্যোগে এবং ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে এক বর্ণাঢ্য ও মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রখ্যাত নাট্য প্রযোজক-পরিচালক-নাট্যকার রাসবিহারী সরকারকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীসরকারকে মাল্যভূষিত করা হয় এবং একটি সুলিখিত ও সুচিত্রিত অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। এর পর তাঁকে মালা ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন, সরযূ দেবী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ সান্ন্যাল, ভাবীকাল সাহিত্য বাসর, শরীক ও বিশ্বরূপা শিল্পী গোষ্ঠী। যাঁরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে না পেরে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বাণী পাঠান তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডঃ রমা চৌধুরী, নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, ডঃ অজিত ঘোষ, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মন্মথ রায় এবং অখিল নিয়োগী।

শ্রীসরকারের বহুমুখী কর্মকৃতির

উল্লেখ করে তাঁকে অভিনন্দিত করেন দেবনারায়ণ গুপ্ত, ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (ডি, জি), অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুনীল চক্রবর্তী।

সভাপতির ভাষণে ডঃ ভট্টাচার্য বলেন যে, শ্রীসরকার বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাট্যাভিনয়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে যে ব্যাপক ও বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তার তুলনা নেই, বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

শ্রীসরকার তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে বললেন যে, তিনি তাঁর কাজের দ্বারাই যেন নিজেকে এই বিপুল অভিনন্দনের যোগ্য করে তুলতে পারেন।

সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ কেশব দে।

বিহারে রবীন্দ্র জন্মোৎসব :—গত ২৫ বৈশাখ বিহারে পাটনার 'চতুরঙ্গ' পাটনা শাখা 'বাংলা দেশের' নামে উৎসর্গ করে তাঁদের কবিগুরু জয়ন্তী উৎসব। সকালে আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা হয়। রবীন্দ্রনাথের নাট্য চিন্তা এবং বর্তমান সমাজে নাটকের কর্তব্য এই দুটি বিষয়ে দীর্ঘ দু ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা করেন নিরঞ্জন সেন, গুরুচরণ সামন্ত ও চতুরঙ্গর সভ্যসভ্যারা। পাটনার আই এম এ হলের মঞ্চে সন্ধ্যার অনুষ্ঠান শুরু হয় 'বাংলা দেশের' জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে। 'বাংলা দেশের' মেয়ে রাজশাহীর বেতার শিল্পী কুমারী সুদীপ্তার কণ্ঠে এই গান প্রায় ৫ শত দর্শকের চোখ ভিজিয়ে দেয়। কুমারী সুদীপ্তা বর্তমানে পাটনায় এসেছেন তাঁরই আত্মীয়ের বাড়ী যদিও বাবা এখনও নিখোঁজ। গানের পর শুরু হয় 'কাল বৈশাখী' নৃত্যনাট্য। এটি পরিবেশন করেন স্থানীয় 'বৈতালিক গোষ্ঠী।' পরিচালনা করেন তরুণ মিত্র। নাচে-গানে ও আবৃত্তিতে ভরপুর এই নৃত্যনাট্য দর্শকদের খুবই প্রশংসা লাভ করে। সর্বশেষে চতুরঙ্গর সভ্যরা রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রা' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন ফল্গু ঘটকের পরিচালনায়। নাটকটি অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। নাটকে অংশ নিয়েছিলেন রতন সরকার, মণিপ্রকাশ, মলয় কর, সুভাষ সান্যাল, অসীম মিত্র, শ্যামল মিত্র, বরুণ সরকার, সমীর সান্যাল, শ্যামল চক্রবর্তী, সুধীন দাসবর্মা, দেবু দাস, অসীত বাগচী, সুহৃদ ঘোষ, পার্থ দাশগুপ্ত, অপালা দেবী, অনীতা দেবী, কুমারী ইনামীনা ও মিঠুয়া। অলোকসম্পাতে ছিলেন গত বৎসরের লক্ষ্ণৌ পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ পরিচালক দীপঙ্কর দাশগুপ্ত। পাটনার মত জায়গায় এ ধরনের রবীন্দ্র জন্মোৎসব এত সফলভাবে এর আগে কখনও হয় নি।

অভিযাত্রী পাঠাগার : গত ২২ জুন শনিবার আকাদমি অফ ফাইন আর্টস হলে 'অভিযাত্রী পাঠাগারে'র বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হল, এই উপলক্ষে শিল্পীরা সুভাষ সরকারের পরিচালনায় দুটি নাটক মঞ্চস্থ করেন। একটি সুভাষ বসুর 'মিছিল' ও অন্যটি অমিতা রায়ের 'নাম-না-জানা-তারা'। সর্বহারা শিক্ষক, কন্যাদায়-গ্রস্ত কবিরাজ, বেকার যুবক, সখের কবি ও ব্যর্থ প্রেমিক—এদের নিয়েই মিছিল। আজকের সমাজ ব্যবস্থার কথা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এই মিছিলের পুরোভাগ থেকে যাঁরা নিজেদের বক্তব্য শুনিয়ে গেলেন, তাঁরা হলেন মনোজিৎ চ্যাটার্জি, অরুণ সাহা, সুশীল মাইতি, বিমল রাহা ও নির্মল মাইতি। এ'দের সঙ্গে যাঁরা সহযোগিতা করেন তাঁরা হলেন নির্মল দাশ, দেবকুমার মাইতি, কমলচন্দ্র চন্দ্র, জয়ন্ত ব্যানার্জি। সম্মিলিত অভিনয় গুণে নাটকটি দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। নাম-না-জানা তারায় এক অপরিচিত অজানা জগতে এসে অধ্যাপক মিত্রের মনোজগতে এক বিস্ময়ের সূচনা করল। এই অধ্যাপক কখনও আকাশে, কখনো বই-এর পাতায় অধীর হয়ে খুঁজেছে কোন এক অজানা অদেখা তারাকে। আধুনিকা সুন্দরী ভিন্ন জগতের এই অপরিচিতার সংগে এক দিনের ঘনিষ্ঠতার পর অধ্যাপক আর বই-এর পাতায় মন বসাতে পারছেন না। এই নাটকের প্রধান দুটি চরিত্রে সুভাষ সরকার ও গীতা চক্রবর্তীর অভিনয় উল্লেখ-যোগ্য। ছোট চরিত্রে মনোজিৎ চ্যাটার্জি ও অরুণ সাহা ভালই করেছেন। দেবু গাঙ্গুলী, জয়শ্রী মুখার্জি, ছায়া দাস, সত্য-অরুণ ঘোষাল, বিপ্রদাস চ্যাটার্জি ও রঞ্জিৎ রায় মোটামুটি।

ক্যাপিটল রেকর্ডস-এর প্রেসিডেন্ট পদে এইচ-এম-ভি'র মিঃ ভাস্কর মেনন

সম্প্রতি আমেরিকার সুবৃহৎ রেকর্ডিং প্রতিষ্ঠান ক্যাপিটাল রেকর্ডস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান কর্ম-কর্তার পদে মিঃ ভাস্কর মেনন নিযুক্ত

হয়েছেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি আমেরিকাতে এইরূপ একটি সুবিশাল শিল্প প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা হিসাবে কর্মভার গ্রহণ করেছেন।

মিঃ মেনন গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইন্ডিয়া লিঃ-এর চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। কিছু দিন পূর্বে তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদ ত্যাগ করে লন্ডনে ই এম আই ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিসেস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদ গ্রহণ করেন। তবে পূর্বের মত এখনও তিনি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইন্ডিয়া লিমিটেডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত আছেন। আমরা তাঁর এই অভূতপূর্ব সাফল্যে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই।

বাঙ্গালী যাদুকর সম্বর্ধিত

সাত বছর আগে শ্রীতরুণকান্তি ঘোষই সর্বপ্রথম টালা পার্কের ইন্ডাস্ট্রিয়াল একজিবিসনে যোগী যাদুকর মৃণাল রায়ের ম্যাজিক, বিশেষ করে মেমারি টেস্ট-এর খেলা দেখে একটি সার্টিফিকেট দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন। যোগী যাদুকর মৃণাল রায় চার মাসব্যাপী সাংস্কৃতিক সফরে আপন প্রতিভাসৃষ্ট মৌলিক যাদুক্রিয়া প্রদর্শনে জাপানের কলা-রসিকমহলকে মুগ্ধই শুধু করেন নি, সেই সঙ্গে প্রথম বিদেশী যাদুকর, যিনি জাপানের সর্বশ্রেষ্ঠ 'স্যামুরাই' মুকুট লাভ করেছেন। তিনি পুনরায় যাদুবিদ্যা প্রদর্শনে আমন্ত্রিত হয়েছেন—তাইহান, হংকং, এবং আরও বিয়াল্লিশটি শহরে।

জাপানের দর্শককুলকে যাদুবিদ্যার কৌশল দেখিয়ে মুগ্ধ করা বড় সহজ কর্ম নয়। কিন্তু এই কঠিন কাজও শ্রীরায় অনায়াস-দক্ষতায় সম্পন্ন করেছেন—কাব্য, নাট্য ও ম্যাজিকের অপূর্ব সমন্বয় তাঁর 'মায়ামহল' দেখিয়ে।

মাত্র ন বছর বয়সে শ্রীরায় স্বামী স্বরূপানন্দর কাছে যোগ শিক্ষা করেন এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাগিদেই যাদুবিদ্যা সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর এই সাংস্কৃতিক বিজয়কে অভিনন্দিত করার জন্যে কর্পোরেটরিয়াল রিক্রিয়েশন ক্লাব-এর তরফ থেকে হেস্টিংস হাউসে তাঁর সহকর্মীরা গত শুক্রবার এক উৎসবসভার আয়োজন করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন কালেক্টর শ্রীরথীন সেনগুপ্ত।

আকাশবাণী রিক্রিয়েশন ক্লাবের অনুষ্ঠান : বাংলাদেশের জনগণের সাহায্যার্থে সম্প্রতি রঙ্গনা প্রেক্ষাগৃহে এক সাহায্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেন আকাশ-বাণী রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা। সম্পাদকীয় ভাষণে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত অর্থ ইন্ডিয়ান রেডক্রশ সোসাইটিতে দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এদিনের বিচিত্রানুষ্ঠানের অনুষ্ঠান-সূচীতে ছিলেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ সরকার, দিনেন্দ্র চৌধুরী, স্বপন গুপ্ত, অংশুমান রায়, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশ দত্ত ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্রাভিনেত্রী কবরী চৌধুরী।

খেলার কথা

ওদের যাত্রা হোক শুভ

কমল ভট্টাচার্য

ক্রিকেট নিয়ে কথা উঠলেই কথায়-কথায় বার-বার মনে পড়ে যায় সেই স্মরণীয় অধ্যায়। যা কিছুদিন আগে ঘটেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাঠে। বহুবার এই নিয়ে আলোচনা করেও যেন বিষয়টা পুরনো হয় না। ১৯৭১ সালের আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের হালে পানি না পাওয়ার চেহারাটা এত বেশী প্রকট হয়ে পড়েছিল যে, তাদের বিরুদ্ধে ভারতের এই আশাতিরিক্ত সাফল্য ঐতিহাসিক অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বার-বার বলতে এবং লিখতে ইচ্ছে করে তাঁদের কথা, যাঁদের অনলস ক্রীড়া-চাতুর্যের ফলে সম্ভব হল এ সাফল্য। সেই সারদেশাই এবং গাভাসকারদের কথা।

সাফল্য দু-একজনের যোগ্যতায় আসে নি ঠিকই। সফরের সকলেই এ কৃতিত্বের দাবী রাখেন। তবুও তাঁদের মধ্যে কয়েক-জনের কথা আলাদা করে বলার মত। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হলেন সারদেশাই। গাভাসকার তাঁর প্রথম আবির্ভাবেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আসরে এক দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হলেও সারদেশাই-র সাফল্য বোধহয় তাঁর থেকে কোন অংশে কম নয়। টেষ্ট পর্যায়ে প্রথম আবির্ভাবে চার-চারটি শত রান, মোট সাতশোর বেশী রান, বিশ্বরেকর্ড এসব নিশ্চয়ই গাভাস-কারের অসাধারণ কৃতিত্বের নজির—অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে সফরের শুরু থেকেই সারদেশাই যেভাবে তাঁর অনবদ্য ক্রীড়াকুশলতা প্রকাশ করে দলের খেলোয়াড়দের মনে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলেছিলেন, তা যদি সম্ভব না হত তবে শুধু গাভাসকার কেন গোটা দলটির সেদিনের সেই সাফল্যের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছুটা সন্দেহ থেকে যায়।

এর পর যাঁদের কথা আসবেই, তাঁরা হলেন ভারতের তিনজন স্পিনার—বেদী, প্রসন্ন এবং ভেঙ্কটরাঘবন। এই তিন স্পিনারের উপরই নির্ভর করছে আমাদের স্পিন বোলিং শক্তি যা বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্পিন-শক্তি হিসেবে স্বীকৃত। এই তিনজনের মধে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাঠে সব থেকে বেশী সাফল্য অর্জন করেন ভেঙ্কটরাঘবন। বিশেষ করে সফরের শেষ দিকে বেদী এবং প্রসন্নকে বেশ কিছুটা নিষ্প্রভ মনে হলেও ভেঙ্কটের প্রাধান্য ছিল সুস্পষ্ট। প্রথম আবির্ভাবলগ্নে ভেঙ্কট-রাঘবনকে দেখে আমার মত অনেকেই ওঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা প্রকাশ করেছিলেন। গোলাম আমেদের পর ভারতীয় দলে এ ধরনের অফ-স্পিনার চোখে পড়ে নি। কিন্তু পরের দিকে বোলিংয়ের মান ক্রমশই যেন নীচে নামতে থাকে। তাই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের প্রাক্কালে প্রসন্ন বা বেদী সম্পর্কে যতটা ভরসা করেছিলাম ভেঙ্কটরাঘবনের উপর অতটা ভরসা করতে পারি নি। আজ স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই যে, সেদিনের সেই ভুল ধারণার যোগ্য জবাব ভেঙ্কটরাঘবন দিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাঠে।

দলের সাফল্যে সম্পূর্ণ কৃতিত্বের অধিকারী যেমন অধিনায়ক তেমনি দলের ব্যর্থতায় অনেক দোষও এসে পড়ে অধি-নায়কের ঘাড়ে। তাছাড়া যে যে রকম খেলোয়াড় তার সঙ্গে সেইরকম ব্যবহার করে, নিজের ব্যক্তিত্ব এবং সহানুভূতি দিয়ে সকলের মন জয় করে দলের একান্ত প্রয়ো-জনীয় টিম-ওয়ার্ক গড়ে তোলার দায়িত্ব এই অধিনায়কের। সুতরাং নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করা যেতে পারে যে, গত সফরে ভেঙ্কট-রাঘবনের আশাতিরিক্ত সাফল্য এবং সেই অনুপাতে দলীয় সাফল্যের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ভারতের অন্যতম সফল অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকরের প্রাপ্য।

গত সফরে ভারত টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছে। তবু কেন জানি না মন ভরে না। মনের কোণে প্রশ্ন উঁকি দেয়, উত্তরের অপেক্ষায় তাকিয়ে আছি আগামী ইংল্যান্ড সফরের দিকে। শক্তির বিচারে ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজের তুলনায় বেশী শক্তিশালী বলেই কি এ জয় সম্ভব হয়েছে? নাকি ওয়েস্ট ইন্ডিজের চরম ব্যর্থতাই ভারতকে এনে দিয়েছে সাফল্য? শুধু আমি কেন, আজ এ প্রশ্নের সঠিক উত্তরের অপেক্ষায় ইংল্যান্ডের মাঠের দিকে তাকিয়ে আছেন বহু ক্রীড়ানুরাগী।

গত ১৮ই জুন ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংল্যান্ডের পথে পাড়ি দেয়। বর্তমানে ভারতীয় দলটি ইংল্যান্ডে খেলছে। যাওয়ার আগে এই দলটি অনুশীলনের জন্যে মাত্র দু সপ্তাহ সময় পেয়েছিল। যে-কোন সফরের আগে প্রত্যেক দলেরই প্রয়োজন প্রস্তুতির জন্যে কিছু সময়। এই সময়ে দলের খেলোয়াড়দের যে সব দুর্বলতা থাকে তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চলে। সুতরাং প্রস্তুতিপর্বের গুরুত্ব অনেক বেশী। ইংল্যান্ড পাড়ি দেওয়ার আগে ভারতীয় দলের যে সব দুর্বলতা ছিল তার মধ্যে অন্যতম হল ফাস্ট বোলিং-এর বিরুদ্ধে ভীতি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে সত্যিকারের ফাস্ট বোলার না থাকায় গত সফরে ভারতীয় দলকে ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে তেমন একটা লড়াই করতে হয় নি। কিন্তু বর্তমানে ইংল্যান্ড দলে রয়েছেন বর্তমান কালের খ্যাতনামা ফাস্ট বোলাররা। এই সেদিনও যাঁদের বলের দাপটে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হলেন অস্ট্রেলিয়ার বাঘা-বাঘা ব্যাটসম্যানরা, যাঁদের ক্রীড়াচাতুর্যে ইংল্যান্ডের পক্ষে সম্ভব হল 'অ্যাসেজ' পুনরুদ্ধার করা,—সেই জন স্নো, পিটার লেভার, ডেভিড ব্রাউন, এ্যালান ওয়ার্ড রয়েছেন ইংল্যান্ড দলে। সুতরাং এবারের সফরে ভারতীয় দলকে বেশীর ভাগ সময়ই খেলতে হবে ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে। ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলটি কি রকম খেলবে, তার উপরই নির্ভর করছে গোটা ভারতীয় দলটির সাফল্য। এবারের প্রস্তুতিপর্বে ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে দুর্বলতা কাটিয়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ছিল সবথেকে বেশী।

বর্তমানের ইংল্যান্ড সফররত ভারতীয় দলটির বেশীর ভাগ খেলোয়াড়ই ইংল্যান্ডের আবহাওয়া এবং উইকেট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ইংল্যান্ডের উইকেটে অনেকক্ষণ সুইং করান যায়। ঠুকলে খুব সহজেই বল উঁচুতে তোলা যায়। তাছাড়া ইংল্যান্ডের উইকেট সব সময়ই পরিবর্তনশীল। সুতরাং ইংল্যান্ড সফরের আগে ইংল্যান্ড সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, যেমন বিজয় হাজারে, ভিনু মানকাদ, লালা অমরনাথ, ভি এম মার্চেন্ট প্রমুখ অতীত দিনের খ্যাতনামা খেলোয়াড়-দের কাছ থেকে ইংল্যান্ডের উইকেট এবং আবহাওয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করাও ছিল এই প্রস্তুতিপর্বের আর এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ দিক।

'ক্যাচ ধরো ম্যাচ জেতো'। অর্থাৎ ক্যাচ যদি ধরতে পারো তবে ম্যাচ জেতা যাবে। কথাটা বলেছেন, ইংল্যান্ড পাড়ি দেওয়ার প্রাক্কালে বর্তমান সফরের ম্যানেজার-কাম কোচ অতীত দিনের স্বনামধন্য খেলোয়াড় হেমু অধিকারী। ভারতীয় দলের বোলিং শক্তি যেখানে পুরোপুরি নির্ভর স্পিনার-দের ওপোর, সেখানে ক্যাচ ধরতে না পারলে যে ম্যাচ জেতা যাবে না এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। গত সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলটি মোটামুটি ভালো ফিল্ডিং করেছে। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না ক্লোজ ফিল্ডিং-র দুর্বলতার ফলেই এই সফরে বেশ কিছু 'ক্যাচ' আমাদের হাতছাড়া হয়েছে। সুতরাং ফিল্ডিং-র দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার একমাত্র সুযোগ এই প্রস্তুতিপর্বে। অথচ সময় আমরা বেশি পাইনি, হাতে ছিল মাত্র এক-মাসের মতো সময়, তাও নানা কারণে পুরো পুরি কাজে লাগানো গেল না। সুতরাং ভারতীয় দলটির বর্তমান সফরের সাফল্য অনেকাংশে যে বিঘ্নিত হবে একথা বলাই বাহুল্য।

গত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ে যে দুর্বলতা সব থেকে বেশি প্রকট হয়ে উঠেছিলো তা "মিডল অর্ডার ব্যাটিং"-এর দুর্বলতা। মাঝের সারির ব্যাটসম্যানরা যাঁরা গত সফরে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন, সেই দুরানি ও জয়সীমার পরিবর্তে দলে নেওয়া হয়েছে আব্বাস আলি বেগকে। এবারে রণজি ট্রফি ও দলীপ ট্রফি খেলায় বেগ যে ক্রীড়া-কুশলতা দেখিয়েছেন তাতে তাঁর মনোনয়ন যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য। তাছাড়া তাঁর ইংল্যাণ্ডের উইকেট এবং আবহাওয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।

ভারতে সত্যিকারের ফাস্ট বোলার নেই। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ন্যাটা অফ স্পিন বোলার বেদী থাকা সত্ত্বেও দলে লেগ-স্পিনার চন্দ্রশেখরকে নেওয়ার যুক্তি কি? নিশ্চয়ই যুক্তি আছে। ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়া অনুযায়ী ভারতীয় দলটিকে প্রায়ই ভিজে বা আধভিজে উইকেটে খেলতে হতে পারে। এ ধরণের উইকেটে বেদীর 'স্লো' এবং 'ফ্লাইটেড' স্পিনারের থেকে চন্দ্রশেখরের ফাস্ট লেগ-স্পিনার অনেক বেশী কার্যকরী হবে।

এবারের সফরে ম্যানেজার-কাম-কোচ মনোনীত হয়েছেন ভারতের স্বনামধন্য প্রাক্তন ক্রিকেট খেলোয়াড় কর্ণেল হেমু অধিকারী। এর আগে তিনি ভারতের প্রতিনিধি হয়ে ইংল্যাণ্ড সফর করেছেন একাধিকবার। স্কুল ক্রিকেট দলের ম্যানেজার-কাম-কোচ হিসেবে তিনি এই সেদিন ইংল্যাণ্ড ঘুরে এলেন। সুতরাং ম্যানেজার-কাম-কোচ হিসেবে অধিকারীর চেয়ে বেশি যোগ্যতা বোধহয় কারও নেই। তাঁর তত্ত্বাবধানে বর্তমান ভারতীয় দলটি বিশেষভাবে উপকৃত হবে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তবে একথা ভুলে গেলে চলবে না দলগত শক্তির বিচারে ইংল্যাণ্ড আমাদের থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী। পাকিস্থানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ইংল্যাণ্ডের চরম ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত তুলে ইংল্যাণ্ডের শক্তি-বিচার করতে বসলে আমরা ভুল করবো। তাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলা ভারতীয় তরুণ দলটির পক্ষে সহজ হবে না।

খেলাধূলা

দর্শক

ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দল

ঐতিহাসিক লর্ডস মাঠে ভারতীয় ক্রিকেট দল তাদের ১৯৭১ সালের ইংল্যাণ্ড সফরের উদ্বোধনী খেলায় মিডলসেক্স কাউন্টি দলের বিপক্ষে নাটকীয়ভাবে ২ উইকেটে জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ইংল্যাণ্ড সফরের কোন উদ্বোধনী খেলায় ভারতীয় দলের পক্ষে জয়লাভ সম্ভব হয়নি। অনিশ্চিত ফলাফলের জন্যে ক্রিকেট খেলার যে এত নামডাক, আমরা হাতেনাতে তার প্রমাণ পেলাম এই খেলায়। শেষ দিনের প্রথম দিকে মিডলসেক্স দলের অনুকূলে খেলার গতি এমনভাবে ঘুরেছিল যে, ভারতীয় দলের অতি বড় গোঁড়া সমর্থকরাও জয়লাভের আশা ছেড়ে দিয়ে অন্তত খেলা ড্র হওয়ার জন্যে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। দলের দ্বিতীয় ইনিংসের সেই সংকট সময়ে ওয়াদেকার, সোলকার এবং আবিদ আলী পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়ে শেষ পর্যন্ত দলকে জয়যুক্ত করেন।

প্রথমদিনে মিডলসেক্স দলের প্রথম ইনিংস ২৩৩ রানের মাথায় শেষ হয়। তাদের শেষ ৫টা উইকেট মাত্র ২৮ রানে পড়ে যায়। শেষ ৫টা উইকেটের মধ্যে চন্দ্রশেখর ৪টে এবং ভেঙ্কটরাঘবন একটা উইকেট পেয়েছিলেন। ফিল্ডিংয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়দের একাধিক গলতির ফলেই মিডলসেক্স দলের পক্ষে ২৩৩ রান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। মিডলসেক্সের এরিক রাসেল দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৮৪ রান করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত ২৯, ৩৮ এবং ৫০ রানের মাথায় ভারতীয় খেলোয়াড়রা 'ক্যাচ' ফেলে দিলে তিনি শেষ পর্যন্ত ৮৪ রান করে খেলা থেকে বিদায় নেন।

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসের গোড়াপত্তন মোটেই সুবিধার হয়নি। তারা ৩টে উইকেট খুইয়ে প্রথমদিনের খেলায় মাত্র ৪১ রান সংগ্রহ করেছিল।

আবিদ আলী

বিষেণ সিং বেদী

দ্বিতীয়দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ১৬৮ রানের মাথায় শেষ হলে মিডলসেক্স প্রথম ইনিংসে ২৩৩ রান করার সূত্রে ৬৫ রানে এগিয়ে যায়। সপ্তম উইকেটের জুটিতে বিশ্বনাথ এবং আবিদ আলী প্রতি মিনিটে এক রান হিসাবে ৬৬ রান সংগ্রহ করেন। তাঁদের খেলা দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই জুটিই ভারতীয় দলের রান সংখ্যার যা কিছুটা শ্রীবৃদ্ধি করেন। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় টেস্ট খেলোয়াড় জন প্রাইস তাঁর ফাস্ট বোলিংয়ে দু দুবার 'হ্যাট-ট্রিক' করার সম্মান থেকে বঞ্চিত হন। প্রথমবার দলের ২২ রানের মাথায় তাঁর উপর্যুপরি বলে আব্বাস আলী বেগ এবং অজিত ওয়াদেকার আউট হন। দ্বিতীয়বার দলের ১৬৮ রানের মাথায় তাঁর উপর্যুপরি বলে আউট হন কৃষ্ণমূর্তি এবং চন্দ্রশেখর।
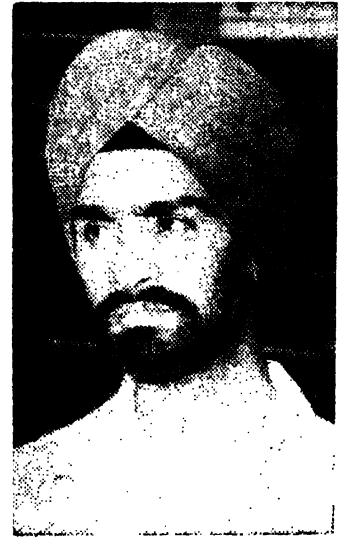
দ্বিতীয়দিনের বাকি সময়ের খেলায় মিডলসেক্স তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ৭টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ৯৯ রান সংগ্রহ করেছিল। ভেঙ্কটরাঘবন এবং বেদীর বোলিংয়ের ভেল্কিতে মিডলসেক্স দলের খেলোয়াড়রা চোখে সর্ষে ক্ষেত দেখেছিলেন। ভেঙ্কটরাঘবন ২৭ রানে ৪টে এবং বেদী ২৪ রানে ৩টে উইকেট পান। মিডলসেক্স দলের ৩২ রানের মাথায় ভেঙ্কটরাঘবন তাঁর উপর্যুপরি বলে দুটো উইকেট পান (ফেদারস্টোন এবং অধিনায়ক ব্রিয়ারলে)।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষদিনে মিডলসেক্স দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ১৩১ রানের মাথায় শেষ হয়। এইদিনের খেলায় বেদী মাত্র ৫ রানের বিনিময়ে ৩টে উইকেট পান। এই খেলায় তিনি মোট উইকেট পান ৬টা ২৯ রানে।

জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৯৭ তুলতে গিয়ে ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথমদিকেই দারুণ ধাক্কা খায়। মাত্র ৩৯ রানের মাথায় তাদের ৪র্থ উইকেট পড়ে যায়। ভারতীয় দলের ২য় ইনিংসের ৩৪ রানের

মাথায় ফাস্ট বোলার জন প্রাইস তার উপর্যুপরি বলে গাভাস্কার এবং সারদেশাইকে আউট করে ভারতীয় দলের মনোবল ভেঙে দেন।

শেষ পর্যন্ত ওয়াদেকার (৩৩ রান), সোলকার (৪১ রান) এবং আবিদ আলী (৬১ রান) পরিত্রাতার সার্থক ভূমিকায় দলকে জয়যুক্ত করেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

মিডলসেক্স: ২৩৩ রান (রাসেল ৮৪ এবং স্মিথ ৫৪ রান। চন্দ্রশেখর ৬৮ রানে ৫, বেদী ৫৩ রানে ৩ এবং ভেঙ্কট-রাঘবন ৪৭ রানে ২ উইকেট)

ও ১৩১ রান: (মারে ২৬ রান। বেদী ২৯ রানে ৬ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ৪১ রানে ৪ উইকেট)

ভারতীয় দল: ১৬৮ রান (বিশ্বনাথ ৬০, আবিদ আলী ২৯ এবং গাভাস্কার ২৫ রান। প্রাইস ৩১ রানে ৪ এবং লাচম্যান ৫৩ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৯৮ রান (৮ উইকেটে। ওয়াদেকার ৩৩, সোলকার ৪১ এবং আবিদ আলী ৬১ রান। প্রাইস ৪৩ রানে ২ এবং জোন্স ৪৩ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান

দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট

লর্ডস মাঠে আয়োজিত ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান দলের দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় যে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হল না তার জন্যে সম্পূর্ণদায়ী দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। পাঁচদিনের খেলায় ১৭ ঘন্টার বেশী সময় বৃষ্টির জন্যে মাঠে মারা গেছে। দ্বিতীয় দিনে মাত্র ২৩ মিনিট খেলা হয়েছিল এবং তৃতীয়দিনে খেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি। ১৯৭১ সালের টেস্ট সিরিজে এই দুই দেশের তিনটি খেলার মধ্যে প্রথম দুটি খেলাই ড্র গেল।

প্রথমদিনে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ১১৮ রান সংগ্রহ করে। বয়কট ৬১ রান এবং লাকহার্স্ট ৪৬ রান করে অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয়দিনে বৃষ্টির জন্যে ২৩ মিনিট খেলা সম্ভব হয়েছিল। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ১৩৩ (১ উইকেটে)। বয়কট (৭২ রান) এবং এডরিচ (১৫ রান) নট আউট থাকেন।

তৃতীয়দিন বৃষ্টির জন্যে খেলা আরম্ভই হয়নি।

চতুর্থদিনে ইংল্যান্ড তাদের ২৪১ রানের মাথায় (২ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। জিওফ বয়কট ১২১ রানে নট আউট থাকেন। টেস্ট খেলায় তাঁর এই দশম সেঞ্চুরী। খেলার বাকি সময়ে পাকিস্তান প্রথম ইনিংসের দশটা উইকেট হাতে জমা রেখে ৪৯ রান সংগ্রহ করেছিল।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষদিনে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ১৪৮ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ১১৭ রান তুলেছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড: ২৪১ রান (২ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। বয়কট নট আউট ১২১ এবং লাকহার্স্ট ৪৬। আলতাফ ৪২ রানে ১ এবং পারভেজ ১৭ রানে ১ উইকেট)

ও ১১৭ রান (কোন উইকেট না পড়ে। আর হাটন নট আউট ৫৮ এবং লাকহার্স্ট নট আউট ৫৩ রান)

পাকিস্তান: ১৪৮ রান (জাহির আব্বাস ৪০ রান। প্রাইস ২৯ রানে ৩, হাটন ৩৬ রানে ২ এবং লেভার ৩৮ রানে ২ উইকেট)

উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৭১ সালের আন্তর্জাতিক উইম্বলেডন তথা অল-ইংল্যান্ড লন টেনিস প্রতিযোগিতা গত ২১শে জুন থেকে সুরু হয়েছে। গত সাত দিনের খেলায় অপ্রত্যাশিত ফলাফলের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য নজির দুটি আছে। গত তিন বছরের পুরুষদের ডাবলস খেতাব বিজয়ী এবং এ বছরের ১নং বাছাই জুটি জন নিউকম্ব এবং টনি রোচ (অস্ট্রেলিয়া) প্রথম রাউন্ডেই অবাছাই জুটি ক্লিফ ড্রিসডেল (দঃ আফ্রিকা) এবং নিকি পিলিকের (যুগোশ্লাভিয়া) কাছে হেরে গেছেন। পুরুষদের সিঙ্গলসের ৫নং বাছাই আমেরিকান নিগ্রো খেলোয়াড় আর্থার অ্যাস তৃতীয় রাউন্ডে তাঁরই স্বদেশবাসী অবাছাই খেলোয়াড় মার্টি রিসেনের কাছে পরাজিত হয়েছেন। ফলে পুরুষ বিভাগে নিগ্রো জাতির পক্ষে প্রথম সিঙ্গলস খেতাব জয়ের আশা এবারও নির্মূল হল। প্রতিযোগিতার অপর কোন নিগ্রো খেলোয়াড় নেই। এখানে উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে আর্থার অ্যাস দুবার পুরুষদের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত খেলেছিলেন।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের বিদায়

প্রতিযোগিতায় ভারতীয় খেলোয়াড়রা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। পুরুষদের সিঙ্গলস খেলার প্রথম রাউন্ডেই জয়দীপ মুখার্জি, প্রেমজিত লাল এবং আনন্দ অমৃতরাজ পরাজিত হন। পুরুষদের ডাবলসের খেলায় জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিতলাল জুটি তৃতীয় রাউন্ড পর্যন্ত খেলেছিলেন। মিক্সড ডাবলসে শ্রীমতী নিরুপমা মানকাদ এবং আনন্দ অমৃতরাজ দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় হেরে যান।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (জুন ২১-২৬) কলকাতার বিভিন্ন মাঠে আই-এফ-এ পরিচালিত প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় যে ১৪টি খেলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ফলাফল দাঁড়ায়: জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি ১১টি খেলায় এবং ড্র ৩টি।

গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাদের জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। আলোচ্য সপ্তাহে তারা দুটো ম্যাচ খেলে চার পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। তারা স্পোর্টিং ইউনিয়নকে ৫-১ গোলে পরাজিত করে। স্পোর্টিং ইউনিয়নের এই গোলই এ মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে প্রথম গোল। কালীঘাটের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গল সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেনি, মাত্র ১-০ গোলে জয়। ইস্টবেঙ্গল দলের নিকট পুরাতন প্রতি-ইস্টবেঙ্গল দলের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান তিনটে খেলায় ছয় পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুগ্মভাবে লীগ তালিকার শীর্ষস্থান দখল করেছে। বর্তমানে লীগ তালিকার মাথার দিকের অবস্থা এই রকম দাঁড়িয়েছে: ইস্টবেঙ্গলের ১০টা খেলায় ২০ পয়েন্ট, মোহনবাগানের ১০টা খেলায় ২০ পয়েন্ট এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ১০টা খেলায় ১৮ পয়েন্ট।

শেষ সংবাদ

লেভারের অপ্রত্যাশিত পরাজয়

কোয়ার্টার ফাইনালে এ বছরের ১নং বাছাই খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার অপ্রত্যাশিতভাবে অবাছাই খেলোয়াড় আমেরিকার টম গরম্যানের হাতে স্ট্রেট সেটে (৯—৭, ৮—৬ ও ৬—৩ গেমে) পরাজিত হয়েছেন।

প্রাচীন ভারতে আমিষ আহার

উক্ত শিরোনামায় সাবিত্রী সেনগুপ্তের প্রবন্ধটি পড়লাম। লেখিকা রামায়ণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বাদ দিয়ে 'প্রাচীন ভারতের আমিষ আহার' লিখেছেন। আমাদের মনে হয় অংশটুকু এখানে থাকলে খুবই ভালো হোত।

কুঁজির কুমন্ত্রণায় শ্রীরামচন্দ্র, সীতা-দেবী ও লক্ষ্মণ জনস্থানে বনবাসী হলেন। সুদুষ্ট রাবণ সীতা হরণ মানসে পরিব্রাজকের ছদ্মবেশে এখানে এসে উপস্থিত হলেন। অতিথিসৎকারিনী সীতা দেবী রাবনচন্দ্রকে বললেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনি এখানে ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন। 'আগমিষ্যতি মে ভর্তা বন্যমাদায় পুষ্কলম্। (শ্লো সং—২৩ সর্গ—৪৭) রুরুগোধাম্বরাহাংশ্চ হত্বাদায়ামিষং বহু।।' মানে—আমার স্বামী বন্যমৃগ, গোসাপ মেরে আরো অনেক রকমের বন্য দ্রব্য আনবেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে শ্রীরামচন্দ্রও হরিণ মাংসের সঙ্গে গোসাপও খেতেন। অর্থাৎ গোসাপের মাংস কেবল পাহাড়ী লোকদেরই নয়, ইন্দুস্বরূপ স্বয়ং শ্রীরাম-চন্দ্রেরও প্রিয় মাংস ছিল।

জীবন নাথ
ঘিং নওগাঁ, আসাম।

জলসা প্রসঙ্গে

গত ২৩ এপ্রিল সংখ্যা 'অমৃতে'র 'জলসা' বিভাগে প্রকাশিত (৯৫৩ পৃষ্ঠা) 'ইকোটোন ডিস্কে নতুন কন্ঠ' শীর্ষক কলমে শ্রীমতী চিত্রাঙ্গদার একটি উক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করছি। শ্রীমতী লিখছেন—'ইকোটোন লেবেলের ৪৫. আর, পি, এম. রেকর্ডে একটি নতুন কন্ঠ শোনা গেল। শিল্পীর নাম সাগর বন্দ্যো-পাধ্যায়।' এই তথ্য কিন্তু ঠিক নয়। আমি যতদূর জানি—এটি শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় রেকর্ড। ইকোটোন রেকর্ড যে বছর প্রথম রেকর্ড করে, সে বছরেই ইনি একটি রেকর্ড করেন। তার দুটি গান যথাক্রমে (১) 'ক্ষতি কি নামটি তোমার' ও (২) 'বন পাপিয়া পিয়া পিয়া'; রেকর্ড নম্বর—ই-সি-টি-১০। এরপর গত পুজোয় (১৩৭৭) তিনি রেকর্ড করেন (১) 'তোমার ঐ অবুঝ চোখের' ও (২) 'রাতের স্বপন বুঝি' গান দুটি, যার রেকর্ড নম্বর ই সি টি—৩০। এই শেষোক্ত গানদুটিরই আলো-চনা শ্রীমতী চিত্রাঙ্গদা করেছেন।

পরিশেষে, শ্রীমতী চিত্রাঙ্গদাকে একটি অনুরোধ করবো। এইচ-এম-ভি, কলাম্বিয়া ও মেগাফোন রেকর্ডে প্রকাশিত গানের সমালোচনা তো সব পত্র-পত্রিকাই করেন! কিন্তু অন্যান্য লেবেল, যেমন হিন্দুস্থান রেকর্ডস, ভারতী রেকর্ড, সেনোলা রেকর্ড, ইকোটোন রেকর্ড, লিভিং সাউন্ড, কোহী-নূর, ইপি গ্রামো প্রভৃতি হ'তে প্রকাশিত রেকর্ডের সমালোচনা করা হয় না বা করলেও তা অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট হয়। শ্রীমতী চিত্রাঙ্গদা যেন এ বিষয়ে একটু বেশী আলোচনা করেন। আমার প্রস্তাব বিষয়ে শ্রীমতী চিত্রাঙ্গদার মতামত 'অমৃতে'র পাতায় দেখলে খুশী হবো।

শান্তিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সগড়াই ঃ বর্ধমান

তন্ত্রবিভূতি ও তন্ত্রবিভূতির মনসামঙ্গল

তন্ত্রবিভূতি প্রসঙ্গে গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে অমৃতে প্রকাশিত শ্রীযুক্তবাবু ফণী পালের প্রস্তাবের উত্তরে ২৭শে জ্যৈষ্ঠ বাবু ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের প্রতিবাদ পত্রখানি পাঠ করে চমকিত হলাম। ডঃ ভট্টাচার্য মহাশয় লিখেছেন, 'আমরা প্রাচীন ও মধ্য-যুগের এমন অনেক কবির নাম জানি, যাঁদের গ্রন্থের সন্ধান পাই না, এই অবস্থায় তাঁদের কেবলমাত্র নামটি জানিবার কোন মূল্য নেই। ময়ূর ভট্টের ধর্মপুরাণ নামক একটি বই ছিল তা আমরা জানিতে পারি, কিন্তু বইটি না পাওয়ার জনাই ময়ূর ভট্টকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কোন স্থান দিতে পারি না।' ময়ূর ভট্ট ও তন্ত্র-বিভূতিকে একই পংক্তিতে ফেলা কি ঠিক হয়েছে? ময়ূর ভট্টের কোন পুঁথির সন্ধান অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি, কাজেই তাঁর নাম বাংলা সাহিত্যে অনুল্লেখিত থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তন্ত্রবিভূতির পুঁথি যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়েছিল তা স্বয়ং ডঃ ভট্টাচার্যও তাঁর পত্রে স্বীকার করেছেন এবং তাঁর পুঁথিখানি যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছিল তাও আমরা জানি। এমন অবস্থায় উক্ত দুই কবিকে একই পংক্তিতে ফেলা যায় কি করে তা বোঝা গেল না।

ডঃ ভট্টাচার্য তাঁর পত্রের অন্যত্র লিখেছেন, 'পুঁথি কেবলমাত্র সংগ্রহ করে নিজের কাছে ঘরে রেখে দিলেই তার আবিষ্কারের গৌরব লাভ করা যায় না।' হরিদাসবাবু কি পুঁথি নিজের ঘরে রেখেছিলেন? হরিদাসবাবু পুঁথি সংগ্রহ করে 'মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতিকে' দিয়েছিলেন। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি প্রাপ্ত প্রাচীন পুঁথিগুলির সংরক্ষণ, প্রচার, বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি সংগৃহীত পুঁথির একটি বিস্তৃত পরিচয় তালিকা প্রকাশ করেছিলেন। তাতে তন্ত্রবিভূতির মনসা গীতের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছিল। দুঃখের বিষয় বর্তমানে আমার কাছে কোন কপি নেই। থাকলে দেখাতে পারতাম। পুঁথির এমন সদ্ব্যবহার করা সত্ত্বেও কি ডঃ ভট্টাচার্য বলবেন হরিদাস পালিত মহাশয় তন্ত্রবিভূতির পুঁথি (মনসার গীত) নিজের ঘরে রেখেছিলেন?

বিদগ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর আলোচনাচক্রে প্রবেশ করার কোন যোগ্যতা আমার নেই, তবুও তদানিন্তন মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির সদস্য ও হরিদাস পালিতের সহকর্মী হিসেবে যথাসত্য উল্লেখ করলাম।

রামরঞ্জন ভট্টাচার্য,
ইংরেজবাজার, মালদহ।

(২)

উপরোক্ত বিষয়ে ফণী পাল মহাশয়ের উক্তির উত্তরে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় লিখেছেন—'পুঁথি কেবলমাত্র সংগ্রহ করে নিজের কাছে ঘরে রেখে দিলেই তার আবিষ্কারকের গৌরবলাভ করা যায় না।' হরিদাস পালিত মহাশয় পুঁথি সংগ্রহ করে নিজের কাছে ঘরে রেখেছিলেন এ তথ্য তিনি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন তা উল্লেখ করেন নি। কিন্তু আমরা জানি হরিদাসবাবু পুঁথি নিজের কাছে ঘরে রাখেন নি। তিনি পুঁথি সংগ্রহ করে 'মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতিতে' দিতেন। আমার বাড়ি থেকেও হরিদাসবাবু একখানি তন্ত্রবিভূতির 'মনসার গীত' সংগ্রহ করে মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতিকে দিয়ে ছিলেন। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি সে পুঁথির (তন্ত্রবিভূতির 'মনসার গীত') প্রাপ্তিস্বীকার করে যে পত্র দিয়েছিলেন তা আজও আমাদের গৃহে সংরক্ষিত আছে। প্রয়োজনবোধে তা দেখান যেতে পারে।

রামহরি মণ্ডল
ব্রাহ্মণনগর, কালিয়াচক
মালদহ।

চাঁদে উপেক্ষিত প্রসঙ্গে

গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে অঙ্কুর সাহার 'চাঁদে উপেক্ষিত' প্রসঙ্গে চিঠিখানা পড়লাম। তিনি 'বিলিয়ন' সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমি জানাতে চাই যে, 'একের পর বারোটা শূন্য' এবং 'একের পর নটা শূন্য' দুটোই শুদ্ধ। শুধু পার্থক্য হলো প্রথমটি আমেরিকায় এবং দ্বিতীয়টি ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত হয়। আমেরিকানরা সব বিষয়ে একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চেষ্টা করে—এটা তারই একটা উদাহরণ।

বিপুল নাথ
গৌহাটি—২০

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১১শ বর্ষ

১ম খণ্ড

১১শ সংখ্যা

মূল্য

৫০ পয়সা

Friday, 16th July 1971 শুক্রবার—৩১শে আষাঢ়, ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : অরূপ গঙ্গোপাধ্যায়

এক নজরে

কলকাতা অশান্ত নগরী?

কলকাতাকে দিল্লীর চেয়ে শান্ত ও নিরাপদ শহর বলে একবার প্রায় বোলতার চাকে ঢিল মেরেছিলেন রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান। রাজ্যপাল বলেছিলেন, এ শহরে মেয়েরা যে একাই ট্যাক্সী চেপে যাওয়া-আসা করতে পারে সেটা রাজধানী দিল্লীতে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। আর শহরের খুনখারাপি সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, এত বড় একটা জনাকীর্ণ শহরে চব্বিশ ঘণ্টায় দু-একটা মানুষ খুন হওয়া খুব অস্বাভাবিক বা উদ্বেগ-জনক কোন ঘটনা নয়। ঘটনাগুলিকে সংবাদপত্রে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হয় বলেই কলকাতা একটা আতঙ্কের শহর বলে প্রচারিত হয়েছে দেশে-বিদেশে, এমন অভিযোগও করেছিলেন রাজ্যপাল। বলা বাহুল্য, রাজ্যপালকে সেদিন ঐ কথাগুলি বলার জন্য তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তখন রাষ্ট্র-পতির শাসন চলছিল পশ্চিমবঙ্গে তাই সব সমালোচনাতেই বলা হয়েছিল, শহরে শান্তি ফিরিয়ে আনার কাজে প্রশাসনিক ব্যর্থতা চাপা দেওয়ার জন্যই রাজ্যপাল কলকাতার অশান্তিকে লঘু করতে চেয়েছেন।

কিন্তু কদিন আগের সংবাদপত্রে ভারতের দুই প্রধান শহর কলকাতা ও বোম্বাইর যে বাৎসরিক হত্যাকাণ্ডের খতিয়ান প্রকাশিত হয় তাতে রাজ্যপালের উক্তির সত্যতাই বেশী প্রতিপন্ন হয়েছে। ঐ হিসাবে দেখা যায়, গত ক'বছরেই কলকাতার চেয়ে বোম্বাই শহরে খুন হয়েছে কয়েক গুণ বেশী। যেমন ১৯৬৬—কলকাতা ৪১, বোম্বাই ১২৬; ১৯৬৭—কলকাতা ৫৭, বোম্বাই ১৫৩; ১৯৬৮—কলকাতা ৫৬, বোম্বাই ১২৫; ১৯৬৯—কলকাতা ৬৭, বোম্বাই ১৬৫। ১৯৭০ সালে বোম্বাইতে কত খুন হয়েছে তার হিসাব পাওয়া যায় নি। কিন্তু কলকাতায় যে, ঐ বছরে ১৫৭ জন খুন হয়েছে সেটা সর্বকালের রেকর্ড। গত বছরেই কলকাতা সবচেয়ে অশান্ত ছিল তবু দেখা যাচ্ছে, তার আগের বছরে বোম্বাই শহরে তারচেয়ে বেশী মানুষ খুন হয়েছে। অথচ খুন-খারাপির জন্য কলকাতা শান্তিকামী মানুষের বাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে, এ প্রচার বোধহয় বোম্বাইর কাগজগুলিতেই করা হয়েছে সবচেয়ে বেশী।

কলকাতা শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যাঁদের, তাঁরা ১৯৭০ সালকে কলকাতার সবচেয়ে কাল বছর 'ব্ল্যাকেস্ট ইয়ার' বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে দাবী জানিয়েছেন, বিশ্বের অন্যান্য বৃহৎ ও জনাকীর্ণ শহরগুলির তুলনায় কল-কাতায় খুন ও অন্যান্য গুরুতর অপরাধের সংখ্যা বেশ কম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য১৯৭১ সালের লোক-গণনার হিসাবে প্রকাশ, কলকাতা পৌর এলাকায় প্রতি বর্গমাইলে ৩০,৪৯৭ জনের বাস। এ যে অনেকটা ডঃ ক্যালহাউনের খাঁচায় বন্দী ইঁদুরকুলের মত অবস্থা (যার কথা গত সপ্তাহে বলা হয়েছে), তাতে আর সন্দেহ কি?

হিপিরা আসছে!

প্রতি বছর গ্রীষ্মে ওরা একটা নতুন দেশের, নতুন শহরে জড়ো হয়। গত বছর জড়ো হয়েছিল আমস্টার্ডামে, এবার ওদের লক্ষ্য কোপেনহাগেন। তাই ডেনমার্ক সরকারের ঘুম নেই, সীমান্তরক্ষীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সব সীমান্তে যেন নিশ্ছিদ্র অতন্দ্র প্রহরার ব্যবস্থা রাখা হয়। নইলে পঙ্গপালের মত ওরা ঢুকে নিঃশেষে লেহন করে যাবে ডেনমার্কের সব রস আর তার বিনিময়ে দিয়ে যাবে রোগ, দুরন্ত নেশা ও জঘন্য ব্যাভিচার। পর্যটকদের সাদর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা আছে ইউ-রোপের দেশে-দেশে, কিন্তু ঐ কপর্দকশূন্য সমাজ-পরিত্যক্ত হিপিদের ওদের বড় ভয়। তাদের সঙ্গিনীরাই ওদের একমাত্র পণ্য যার বিনিময়ে তারা আহার্য ও নেশার সামগ্রী সংগ্রহ করে, আর ঐ থেকেই দেশময় ছড়িয়ে পড়ে নানা দুরারোগ্য কঠিন ব্যাধি। হিপিরা যখন একটি শহর লক্ষ্য করে পৃথিবীর সব দিক থেকে ছুটে আসে, তখন তারা সংখ্যায় কত হয় তা কেউ বলতে পারে না। কোন হিসাবে বলে দশ হাজার, কোন হিসাবে এক লক্ষ।

ডেনমার্ক হিপিদের লক্ষ্য হওয়ার নানা কারণ। ঐ রাজ্যে সম্প্রতি অশ্লীলতা আইন সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত হওয়ায় সেখানে যে কোন ধরনের নগ্ন চিত্র বা অশ্লীল রচনা এখন প্রকাশ্যে বিক্রি হতে পারে। সিনেমায়, টেলিভিশনে যেসব ছবি দেখান হয় তারচেয়ে উপভোগ্য বস্তু হিপিদের কাছে আর কিছুই নেই। তারপর গাঁজা, আফিং, চরস প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ডেনমার্কে নিষিদ্ধ হলেও, পুলিশকে বলা আছে, নিজ ব্যবহারের জন্য অল্প-স্বল্প মাদক দ্রব্য কারও কাছে পাওয়া গেলে তাকে যেন হয়রান করা না হয়।

বিস্মৃত ললনাদের অনুযোগ :

তারা যা বলেছে, তা শুধু চোখের জল, সে নহে প্রার্থনা। কারণ কোন প্রতিদানের প্রত্যাশা না রেখেই তারা আত্মনিবেদনের পথ বেছে নিয়েছিল। কিন্তু তাই বলেই কি সমাজ ও রাষ্ট্রও তাদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকবে? এই প্রশ্ন তোলা হয়েছে বৃটেনের আড়াই লক্ষ 'বিস্মৃত ললনা', নিঃসঙ্গ নারীদের সংস্থা 'ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর দি সিঙ্গল উয়োম্যান অ্যান্ড হার ডিপেন্ডেন্টস'-এর পক্ষ থেকে।

সত্যই ওদের নীরব নিঃশর্ত সেবার, নিঃশেষে আত্মনিবেদনের কোন তুলনা নেই। সাধারণত ওরা পরিবারের ছোট মেয়ে এবং এক্ষেত্রে সেইটাই স্বাভাবিক। কারণ ওরা যখন বড় হয় তখন দেখতে পায়, বাড়ির আর সব ছেলে-মেয়ে যে যার সংসার নিয়ে অন্যত্র চলে গেছে। পড়ে আছে শুধু বৃদ্ধ বাবা-মা, সেই সঙ্গে হয়ত দু-একটা বিকলাঙ্গ ভাই-বোনও। সে অবস্থায় তারা আর যেতে পারে না। ফলে হয় পড়াশুনা সাঙ্গ করেই, নয়ত মাঝপথে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তাদের পারিবারিক সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হয়। আর সে সেবা যে কি সেবা তা কোন রকম প্রতি-বাদের ঝুঁকি না নিয়েই বলা যায় যে, এদেশের মেয়েরা কল্পনাও করতে পারবে না। তারা হয় একাধারে পরিবারের অভিভাবিকা, গৃহ-চিকিৎসক, সেবিকা ও পরিচারিকা, যার ফলে তাদের বহি-র্জীবনের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করতে হয়। জীবিকা, জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিবাহ, সান্ধ্যপ্রমোদ—সব চিরতরে ত্যাগ করে তারা সেবায় আত্মনিবেদন করে। তারপর যেদিন তাদের পিতা-মাতারা গতায়ু হন সেদিন তাদেরও আর কিছু করার থাকে না। কারণ তাদেরও জীবনসন্ধ্যা তখন ঘনিয়ে এসেছে।

রাষ্ট্রের কাছে ঐ নিঃসঙ্গ নারীদের নিবেদন, তাদের অনু-কূলে বার্ধক্যভাতা ও পেন্সনের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলির কিছুটা রদ-বদল করা হক। দুর্দিনের জন্য যারা গোড়ার দিকের চাকরিজীবনের বা পরিবারের আয় থেকে কিছু কিছু সঞ্চিত করে রাখে, তারা নিঃস্বদের জন্য রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত হয়। আবার পরিবারের সেবায় আত্মনিয়োগের জন্য মাঝ পথে চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ায় পুরো বার্ধক্যভাতাও পায় না। কাউন্সিল হিসাব করে দেখিয়েছে যে, তার সদস্যদের অর্ধেকেরও বেশী জন বিভিন্ন আইনের প্রতিবন্ধকতার জন্য সপ্তাহে পাঁচ থেকে পনেরো পাউন্ড কম পায়, এবং এক-চতুর্থাংশ সদস্যের বঞ্চনার ভাগ আরও বেশী। ফলে আজ বৃটেনের ঐ আড়াই লক্ষ মেয়ের অধিকাংশকেই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। তাই কাউন্সিলের নিবেদন, অবিলম্বে এই অবাঞ্ছিত অবস্থার প্রতিকার করা হ'ক।

৮।৭।৭১ —প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

শান্তির সন্ধানে

গত সপ্তাহে রাইটার্স বিল্ডিং-এ পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সর্বদলীয় প্রতিনিধিদের বৈঠক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হিংসা-বিদীর্ণ এই রাজ্যে শান্তি স্থাপনের যে-প্রচেষ্টা করেছেন তা নিশ্চিতই অভিনন্দনযোগ্য। পশ্চিমবাংলা আজ সব দিক দিয়ে অসুখী। তার ক্ষতবিক্ষত দেহ থেকে রক্ত ঝরছে অনবরত। একটা সন্ত্রাসের আবহাওয়া গ্রাস করে রেখেছে রাজ্যের অধিবাসীদের। প্রতিদিন খায় মানুষের রক্তে বাংলার মাটি রঞ্জিত হয়ে ওঠে। কেন এই মৃত্যু, কী তার উদ্দেশ্য তা রাজনৈতিক চুল-চেরা বিতর্কে ধরা পড়েনি। কোন কোন অপশক্তি এই নরঘাতী রাজনীতির জন্য দায়ী তা নিয়েও কত মতভেদ। অথচ মানুষ নিহত হচ্ছে এবং সকল দলের, সকল শ্রেণীর মানুষই হচ্ছে এই গুপ্তঘাতকদের শিকার। এত বড় একটা নির্মম সত্যকে উপেক্ষা করা চরম আত্মপ্রবঞ্চনা। আমরা দেখেছি প্রকাশ্য দিনের আলোয় জনবহুল রাজপথে নিহত হলেন সকলের প্রিয়, শ্রদ্ধাভাজন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ হেমন্তকুমার বসু। দেখলাম নৃশংসভাবে নিহত হতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীগোপালচন্দ্র সেনকে। বাড়ির সামনে আততায়ীর গুলীতে প্রাণ দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী কে এল রায়। এছাড়া অগণিত রাজনৈতিক কর্মী, নেতা এবং যুবক পশ্চিমবঙ্গে খুনের রাজনীতির শিকার হয়েছেন এবং এখনও হচ্ছেন।

রাজ্য প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে এই রক্তস্রোত বন্ধ করতে। অপরাধীদের কিনারা হচ্ছে না। দিনের পর দিন চলছে হত্যার তাণ্ডব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীরায় তাঁর কার্যভার গ্রহণ করে প্রথমেই এই অশান্ত রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা চাইলেন। তাঁর আমন্ত্রণে অন্তত এই প্রথম পশ্চিমবাংলার বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলো একসঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হতে সম্মত হল--এটাও একটা কম কৃতিত্ব নয়। অবশ্য এই বৈঠকে কার্যকর কোনো উপায় উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়নি। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান হিংসা ও হত্যার রাজনীতির বিশ্লেষণ নিয়ে সিদ্ধার্থবাবুর বক্তব্যের সঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুর স্পষ্ট মতভেদ বৈঠকের গোড়াতেই দেখা গেল। এই মতভেদ যে হবে তা অপ্রত্যাশিত ছিল না। তাহলেও বৈঠক ভেঙে যায়নি এবং মতভেদ সত্ত্বেও রাজ্যের বৃহত্তম দলসহ অন্যান্য সকল দল একসঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছে, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ এতে নিশ্চিতই কিছুটা আশান্বিত। এই আশাকে কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নেতাদের।

সিদ্ধার্থবাবুও বলেছেন যে, এটা হল ক্ষুদ্র পদক্ষেপ মাত্র, বৃহৎ লাফ নয়। গত কয়েক বৎসর ধরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যে অবিশ্বাস ও সংশয় দেখা দিয়েছে তাতে শাসকদলের সঙ্গে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল কোনো বিষয়ে সহজে সহযোগিতায় রাজী হবে এটা আশা করা খানিকটা দুরাশা বৈকি। তবু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সন্ত্রস্ত জনসাধারণের চাপেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই রক্তক্ষয়ী রাজনীতি বন্ধ করার জন্য সচেষ্ট হতে বাধ্য হচ্ছে। প্রাথমিক বৈঠকে কোনো সুস্পষ্ট কর্মপন্থার সন্ধান পাওয়া যায়নি সত্য। কিন্তু বৈঠক ব্যর্থও হয়নি। ১৯ জুলাই আবার বৈঠক হবার কথা। সেই বৈঠকে আরও বেশি সংখ্যক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের আহ্বান করা হবে। পর্যায়ক্রমে এই আলোচনা ও মতবিনিময়ের রাজনৈতিক সার্থকতা অস্বীকার করা যায় না।

পশ্চিমবাংলার বর্তমান পরিস্থিতিতে একটা সুস্থ রাজনৈতিক আবহাওয়ার প্রত্যাবর্তন ছাড়া মানুষের মনে স্বস্তি আনবার অন্য কোনো পথ নেই। পারস্পরিক দোষারোপের দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হবে না। এখন পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রপতির শাসনাধীন। প্রশাসনিক দুর্বলতার জন্য যদি পশ্চিমবাংলার শান্তি স্থাপন ব্যর্থ হয়ে থাকে, তবে তা দূর করবার সময় হল এই। পুলিশী ব্যর্থতার কথা তো সর্বজনবিদিত। যার ফলে কয়েকটি জেলায় সন্ত্রাস দমনের জন্য মিলিটারি নামানো হয়েছে। একদিকে যেমন সরকারী ব্যবস্থাকে বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী কঠোর করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি রাজনৈতিক দলসহ সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় পশ্চিমবাংলা থেকে এই সন্ত্রাসের মূলোচ্ছেদ করতে হবে। এর জন্য সকল রাজনৈতিক দলকেই অপরের ওপর দোষারোপের পথ ছেড়ে আত্মসমালোচনা বা আত্মসমীক্ষার পথ বেছে নিতে হবে। ইতিমধ্যেই বহু অমূল্য প্রাণ নষ্ট হয়েছে। পশ্চিমবাংলার যুবশক্তি দিগভ্রান্ত, সাধারণ মানুষ হতাশাগ্রস্ত, প্রশাসন অনিশ্চয়তায় দোদুল্যমান। শ্রীরায়ের প্রথম কাজই হবে এই হতবুদ্ধিকর অবস্থা থেকে দেশকে মুক্তি দেওয়া। সেই পথেই তিনি প্রাথমিক পদক্ষেপ করেছেন সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করে। আমরা আশা করি, সাধারণ মানুষের মনকে ভয়মুক্ত করতে এই প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য সকল দলের সহযোগিতা পাওয়া যাবে। এবং সরকার আন্তরিকভাবেই সেই সহযোগিতা গ্রহণ করবেন।

রাষ্ট্রপতির শাসন তো পশ্চিমবাংলায় এই প্রথম নয়, এইবার নিয়ে বারবার তিনবার। প্রথম দু'বার সকলেরই নজর ছিল রাজভবনের দিকে। কারণ রাজ্যপালই ছিলেন সব ক্ষমতার উৎস। এবার কিন্তু সকলের দৃষ্টি রাইটার্স বিল্ডিংসের দিকে। না, আমলাদের ক্ষমতা বাড়লো বলে নয়। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ঐ বাড়িতে বসছেন বলে।

১৯৬৭ সাল থেকে এই রাজ্য রাজনৈতিক স্থিরতার মুখ দেখেনি। চারচারটে মন্ত্রিসভা এসেছে, গেছে। তাই এর ফাঁকে ফাঁকে যখন রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হয়, তখন অনেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। অন্ততঃ ১৯৬৮ ও ১৯৭০ সালে ফেলেছিলেন। আশা ছিল এই যে, রাজ্যপাল কঠোর হাতে শাসন চালাবেন। পশ্চিমবাংলা স্থিরতার মুখ দেখবে। আর স্থিরতাই তো উন্নয়নের পয়লা নম্বর সিঁড়ি।

১৯৭১ সালেও কি পশ্চিমবাংলার মানুষ রাষ্ট্রপতির শাসন সম্পর্কে সেই ধারণাই পোষণ করছে? রাজ্যপালের শাসন সম্পর্কে আমাদের কি এখনও অনেক আশা রয়েছে? বলতেই হবে, নেই। দিল্লীও সে-কথা এবার বুঝেছে। কারণ, গত দু'বারের রাষ্ট্রপতির শাসন প্রায় কোনো উপকারেই আসেনি। এবারে পশ্চিমবাংলার হাজার সমস্যার বোঝার ওপর আবার শাকের আঁটি—শরণার্থী সমস্যা। প্রধানমন্ত্রী তাই একজন মন্ত্রীকে আলাদা করে নিয়োগও করলেন এই রাজ্যের দেখা শোনা করার জন্যে। সিদ্ধার্থ রায়ের নিয়োগ সম্পর্কে যে-বিতর্কই থাকুক না কেন, এটা পশ্চিমবাংলা সম্বন্ধে দিল্লীর আন্তরিকতার প্রমাণ হিসেবেই ধরে নেওয়া যাক আপাততঃ।

কিন্তু শুধু আন্তরিকতা দিয়ে তো আর সমস্যা সামলানো যায় না। চাই বিশেষ উদ্যোগ। দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে যে-সমস্যা তিলে তিলে গড়ে উঠেছে তা রাতারাতি সামলানো যায় না। তাছাড়া, কিছু বিচ্ছিন্ন চেষ্টার দ্বারাও বিশেষ কাজ হবে না। আসলে দরকার, পশ্চিমবাংলা সম্পর্কে দিল্লীর মনোভাবের পরিবর্তন। সিদ্ধার্থবাবু যদি শুধু সেইটুকুই ঘটিয়ে দিয়ে যেতে পারেন তবে পশ্চিমবাংলার মানুষ তাঁকে চিরকাল মনে রাখবে।

বড় প্রশ্ন প্রথমেই না তুলে হাতের কাছে যে-উদাহরণটা রয়েছে তার কথাই ধরা যাক। সিদ্ধার্থবাবু নিজেই বলেছেন, হলদিয়ার কাজ ঠিকমতো হলে বছরখানেকের মধ্যে লক্ষ লোকের চাকরি হতে পারে। কথাটার মধ্যে কোনো ভুল নেই। হলদিয়ার সম্ভাবনা অফুরন্ত। আর একমাত্র হলদিয়াই এখন এই রাজ্যের সামনে আশার আলো।

ডাঃ বিধান রায়ের আমলে অনেক স্বপ্ন দেখা হয়েছিল দুর্গাপুরকে নিয়ে। কোনো কোনো শিশু খানিকটা বেড়ে তারপর যেমন আর বাড়ে না—দুর্গাপুরের অবস্থা এখন অনেকটা তাই। দুর্গাপুর নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখা হল, কিন্তু সেই স্বপ্ন যাতে বাস্তবে রূপায়িত হয়, তার সব ব্যবস্থা করা হল না। কল-কারখানা স্থাপনের জন্যে যে-সব জিনিসের দরকার, তার ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করতে পারলেন না। অন্যান্য রাজ্য শিল্পপতিদের আকৃষ্ট করার জন্যে কতো কী সুবিধে দিতে শুরু করলে—সস্তায় জমি থেকে জল, বিদ্যুৎ পর্যন্ত। পশ্চিমবাংলা নিজের অভিমানে খাড়া হয়ে বসে রইল, কোনো বিশেষ সুবিধেই দিলে না। তার সংগে সংগে দুর্গাপুরের কুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল শ্রমিক অসন্তোষের জন্যে। সবচেয়ে বড় আশা ছিল, বাঙালির চাকরির, সেটাও তেমন পূরণ হল না। কেন্দ্রীয় সংস্থায় অবাঙালি অফিসারদের প্রাধান্যের সংগে সংগে অবাঙালি চাকুরের সংখ্যাও বেড়ে গেল। কিন্তু বাঙালি অফিসাররা সংকীর্ণতার অপবাদ এড়াতে বাঙালিদের বেশি সুযোগ দিতে তেমন উৎসাহী হলেন না। দুর্গাপুর গিয়ে পড়ল একটা দুষ্টচক্রের মধ্যে। শ্রমিক অসন্তোষের অজুহাতে কল-কারখানা বাড়তে পারছে না, আবার কল-কারখানা বাড়ছে না বলেই অসন্তোষও বাড়ছে।

কলকাতার পর দুর্গাপুর, দুর্গাপুরের পর হলদিয়া। হলদিয়ার ভাগ্যে কী আছে? শেষপর্যন্ত যাই থাকুক না কেন, অন্ততঃ এর প্রথম উদ্যোগটা দিল্লীর কাছ থেকেই আসতে হবে। হলদিয়াকে কেন্দ্র করে যে নানা বে-সরকারী শিল্প গড়ে উঠতে পারে না, তা নয়। কিন্তু ঐসব শিল্প যার ওপর নির্ভর করবে তা রূপায়ণ করার দায়িত্ব দিল্লীর। কারণ হলদিয়ায় যেসব মূল শিল্প স্থাপনের কথা উঠেছে, সে-সম্বন্ধে কিছু করার এক্তিয়ার রাজ্য সরকার বা বে-সরকারী ব্যবসায়ীদের নেই। তৈল শোধনাগার, সার কারখানা, জাহাজ তৈরির কারখানা, সোডা অ্যাশ কারখানা— এ-সবের কোনোটাই কেন্দ্রীয় উদ্যোগ ছাড়া হবে না।

সিদ্ধার্থবাবু যদি হলদিয়ায় এক বছরের মধ্যে লাখখানেক লোকের কাজের ব্যবস্থা করতে চান, তবে প্রথমেই তাঁকে খোঁজ করতে হবে, হলদিয়া সম্পর্কে দিল্লী থেকে যত বড় বড় কথা শোনা গেছে সেই তুলনায় কাজ তেমন কিছুই এগোয়নি কেন? পেট্রল-ভিত্তিক রাসায়নিক শিল্প-সমাবেশের কথা অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছে, কিন্তু তার মধ্যে একমাত্র, তৈল শোধনাগার ছাড়া আর কিছুর কাজই শুরু হয়নি। আর সেই তৈল শোধনাগারের কাজও চলছে ঢিমে-তেতালায়। পেট্রলিয়াম ও কেমিক্যালস্ মন্ত্রণালয়ের শেষতম রিপোর্ট দেখলে সিদ্ধার্থবাবু জানতে পারবেন যে, ১৯৭৩ সালের মধ্যে শোধনাগারের মাত্র দুটি অংশের কাজ শেষ হবে। পুরোটা শেষ হতে কতো সময় লাগবে কে জানে?

সার কারখানার অবস্থা আরো চমৎকার। কয়েক মাস আগে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার এক কর্তা কলকাতায় বললেন যে, হলদিয়ায় সার কারখানার জন্যে জমি সংগ্রহ হয়ে গেছে, প্রাথমিক কাজকর্মও শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু গত মাসে লোকসভায় একজন মন্ত্রী জানালেন যে, জমি সংগ্রহ হয়েছে কিনা তা তিনি ঠিক জানেন না। কয়েকজন সদস্য তখন মন্ত্রীমশায়কে চেপে ধরলেন, তাঁরা শুনেছেন, জমি সংগ্রহ হয়ে গেছে, মন্ত্রীমশায় ঠিক করে বলুন। তখন মন্ত্রী মশায় আমতা-আমতা করে বললেন, আচ্ছা, তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন!

তৈল শোধনাগারকে ঘিরে সার কারখানা ছাড়া আরো অনেক কল-কারখানা গড়ে উঠতে পারে। গুজরাটের কোয়ালিতে যে শোধনাগার তৈরি হচ্ছে তাকে কেন্দ্র করে কোন ধরনের শিল্প প্রসার সম্ভব তার প্রোজেক্ট-রিপোর্ট তৈরির জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার ইণ্ডিয়ান পেট্রো-কেমিক্যাল কর্পোরেশনকে দায়িত্ব দিয়েছেন। আরো কয়েকটি রাজ্যে অনুরূপ কাজের ভার ঐ কর্পোরেশনকে দেওয়া হয়েছে। অথচ, বাদ পড়েছে হলদিয়া।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, এই বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পেট্রলিয়াম ও কেমিক্যালস দপ্তরের ভার ছিল একজন বাঙালী মন্ত্রীরই ওপর। কিন্তু ডঃ ত্রিগুণা সেনের চেষ্টা [illegible]

হলদিয়ার নানা প্রকল্প অনুমোদনের ব্যাপারে তিনি উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। ডঃ সেন যখন ঐ দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন তখন তাঁর দপ্তরের সচিবও বেশ কিছু সময় ধরে ছিলেন একজন বাঙালী। তাঁদেরই আমলে এমন ব্যাপারও ঘটে গেছে যে, দিল্লী থেকে হলদিয়ায় কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজে যে-সব কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে তার মধ্যে বাঙালীদের বিশেষ স্থান হয় নি।

সিদ্ধার্থশঙ্কর আর ডঃ ত্রিগুণা সেনের অবস্থার মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ আছে। সিদ্ধার্থশঙ্কর পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা। তা ছাড়া তাঁর পিছনে রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সুদৃঢ় সমর্থন। তার ওপর তিনি সচিব হিসেবে পেয়েছেন টি স্বামীনাথনের মতো ঝানু আমলাকে। স্বামীনাথন আবার কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটেরও সচিব। সুতরাং সিদ্ধার্থশঙ্করের সুবিধে অনেক। তিনি কীভাবে সেই সুবিধেকে কাজে লাগান সেটাই এখন দেখবার বিষয়।

*

পশ্চিমবাংলা যে দিল্লীর নেকনজরে বঞ্চিত, হলদিয়াই অবশ্য তার একমাত্র প্রমাণ নয়। ধরতে গেলে, গলদ একেবারে গোড়াতেই। দিল্লীতে যাঁরা সারা দেশের জন্যে যোজনা তৈরি করেন তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে, পশ্চিমবাংলা শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্য, সুতরাং এখানে শিল্প প্রসারের আর দরকার নেই। তাই আমাদের পাঁচসালা পরিকল্পনায় এই রাজ্যের জন্যে মাথা পিছু বরাদ্দ ক্রমশই কমতির দিকে যাচ্ছে। প্রথম পরিকল্পনায় এই রাজ্যের জন্যে বরাদ্দ হয়েছিল ১৫৪ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঐ অঙ্ক কমে দাঁড়াল ১৪৫ কোটি টাকায়। কিন্তু অন্যদিকে মহারাষ্ট্র বা গুজরাটের জন্যে বরাদ্দের অঙ্ক বাড়তে লাগল। আর এখন যে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজ চলছে তাতে পশ্চিমবাংলার মোট বরাদ্দ ৩২৩ কোটি টাকা। আর মহারাষ্ট্রের কত জানেন? প্রায় ৯০০ কোটি টাকার কাছাকাছি। ১৯৫১ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনা এবং তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনার মোট বরাদ্দও যদি ধরা যায় তবে দেখা যাবে, পশ্চিমবাংলায় মাথা পিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২৪৩ টাকা। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে ঐ অঙ্ক যথাক্রমে ৩০০, ৩৪৬, ২৫৪ ও ৩৯৫ টাকা। চতুর্থ পরিকল্পনাতেও অবস্থার কোনো তারতম্য হয় নি। পশ্চিমবাংলার মানুষের মাথা পিছু যেখানে জুটেছে ৭৯ টাকা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, কেরলের অঙ্ক সেখানে ১৭৮, ১৮৮, ২০৬, ১৩৬, ১৩৩ টাকা।

অথচ দিল্লী থেকে প্রায়ই শোনা যায়, পশ্চিমবাংলার সমস্যা বিশেষ সমস্যা এবং 'জাতীয়' সমস্যা। কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, একদিকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য এবং অন্যদিকে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে ব্যর্থতা পশ্চিমবাংলার বর্তমান সঙ্কটের মূলে।

উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে বাঙালীদের বিরুদ্ধে দিল্লী ও অন্যান্য রাজ্য থেকে নানা অপবাদ ছড়ানো হয়েছে। বাঙালী উদ্বাস্তুরা নাকি পশ্চিমবাংলা ছেড়ে নড়তে চায় নি, তারা নাকি সরকারী টাকা নষ্ট করেছে, তাই তাদের (এবং পশ্চিমবাংলার) এই দুর্গতি। অথচ, পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের দেখুন তো, তারা কেমন সব সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে, গুছিয়ে বসে গেছে। এই প্রচারের পিছনে কিন্তু একটি সত্যকে চাপা দেওয়া হয়েছে। বাঙালী উদ্বাস্তুদের অপবাদ দেওয়ার সময় কখনোই এই কথা বলা হয় নি যে, পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুরা তাদের পাকিস্তানে পরিত্যক্ত সম্পত্তির জন্যে কোটি কোটি ক্ষতিপূরণ হিসেবে পেয়েছে, কিন্তু বাঙালী উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে সে-রকম কোনো ব্যবস্থাই করা হয় নি। আর এই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাই পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সাফল্যের প্রধান কারণ। মুসলমানদের ভারতে ফেলে যাওয়া সম্পত্তির মধ্যে ষাট লক্ষ একর জমি, গ্রাম এলাকায় সাত লক্ষ বাড়ি, শহর এলাকায় দু লক্ষ সাতাশি হাজার বাড়ি ও দোকান ক্ষতিপূরণের 'পুলে' জমা হয়। এইসব সম্পত্তির দাম কত কোটি টাকা সহজেই অনুমান করা চলে। তার ওপর সরকার আরো ৬৫ কোটি টাকা দিয়ে নতুন বাড়ি ও দোকানঘর তৈরি করেন এবং তাও ঐ 'পুলে' জমা হয়। তারপর এই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এর ওপর আরো ২০৫ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার খরচ করেন পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে। কিন্তু বাঙালী উদ্বাস্তুদের যখনই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা উঠেছে তখনই নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির অজুহাত দেওয়া হয়েছে। ঐ চুক্তিতে বলা ছিল, বাঙালী উদ্বাস্তুরা ইচ্ছে করলেই পূর্ববাংলায় গিয়ে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ফিরে পেতে পারবেন। হায়রে, দুরাশা! পাকিস্তান যেন এই চুক্তি মেনেছে! ক'জন বাঙালী উদ্বাস্তু পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল করতে পূর্ববাংলায় গেছেন?

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের পুরোনো প্রসঙ্গটা আবার বিশেষ করে মনে পড়ছে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের প্রসঙ্গে। ভারত সরকার যা-ই ভাবুন, এদের অনেকেই আর স্বদেশে ফিরে যাবে না। সুতরাং তাদের পুনর্বাসনের কথা উঠবেই। সরকার এবার কী ভাবে এই সমস্যা সামলান, সেটাই লক্ষ্য করে দেখার মতো। তার ওপর পশ্চিমবাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করবে।

*

উদাহরণ আরো বাড়ানো যায়। বিভিন্ন সরকারী অর্থ প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা ধার পাওয়ার ব্যাপারেও পশ্চিমবাংলা বঞ্চিত হয়েছে। কল-কারখানার কাঁচামাল এমনভাবে সরবরাহ করা হয়েছে যাতে এই রাজ্যের শিল্পই মার খেয়েছে। হাওড়ার মতো শিল্প-নগরীর যে আজ নাভিশ্বাস উঠেছে তার অন্যতম প্রধান কারণ কাঁচামালের অভাব। ভারত সরকার ইস্পাত আর কয়লার দাম সারা দেশে সমান হারে বেঁধে দিয়েছেন। এতে পশ্চিমবাংলা অসুবিধেয় পড়েছে, এইভাবে দাম না বেঁধে দিলে সস্তায় ইস্পাত বা কয়লা পাওয়া যেত। কারণ কয়লা ও ইস্পাত এই রাজ্যের মধ্যে বা কাছাকাছি এলাকায় পাওয়া যায়। অথচ সারা দেশে তুলোর দাম এক হারে বাঁধা হয় নি। তাতে পশ্চিমবাংলা অসুবিধেয় পড়েছে। কারণ বেশির ভাগ তুলোই এই রাজ্যে আসে দূর থেকে। ফলে এই রাজ্যের জীর্ণ কাপড়ের কলগুলি প্রায় উঠে যাবার দাখিল। আবার, তামিলনাড়ু বা মহারাষ্ট্রে কোনো কাপড়ের কল বিপদে পড়লে কেন্দ্রীয় বস্ত্রকল কর্পোরেশন তার দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এসেছে, কিন্তু পশ্চিমবাংলার একটি বিপন্ন কাপড়ের কলের ভারও ঐ কর্পোরেশন নেয়নি, যদিও এখানে অর্ধেকের বেশি কাপড়ের কলের দরজায় তালা ঝুলেছে।

উদাহরণ আর বাড়িয়ে লাভ নেই। এ থেকেই বোঝা যাবে যে, কেন্দ্রের প্রতি পশ্চিমবাংলার মানুষের যদি কোনো অভিযোগ থাকে তবে তা অমূলক নয়। ঐ বৈষম্য বিপজ্জনক তো বটেই, কিন্তু সিদ্ধার্থশঙ্কর (এবং তাঁর মারফৎ শ্রীমতী গান্ধীকে) আরো একটা বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হবে। কেন্দ্রের এই মনোভাবের রাজনৈতিক সুযোগ নেওয়া শুরু হয়েছে এবং এ-ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি। পশ্চিমবাংলার প্রতি কেন্দ্রের এই বৈষম্যই ঐ দলকে 'পশ্চিমবাংলা দিল্লীর কলোনি'—এই ধুয়া তুলতে বিশেষ সাহায্য করেছে। মার্কসবাদীরা কেন্দ্র-বিরোধী প্রচারের এই লাইন এখন পাল্টাবেন না। সত্যি কথা বলতে কি, গত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে সি পি এমের রাজনৈতিক অস্তিত্বই এখন পশ্চিমবাংলার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। লোকসভায় বৃহত্তম বিরোধী দল সি পি এম, কিন্তু তার পঁচিশটির মধ্যে কুড়িটি আসনই এসেছে পশ্চিমবাংলা থেকে। সারা দেশে সি পি এমের সদস্য সংখ্যা লাখ খানেক, তার মধ্যে পশ্চিমবাংলাতেই ত্রিশ হাজারের বেশি। সুতরাং, সর্বভারতীয় সাম্যবাদী দল হয়েও আঞ্চলিক দাবিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সুবিধে ও সুযোগ, দুইই রয়েছে। এখন পশ্চিমবাংলার প্রতি দিল্লীর নীতির যদি পরিবর্তন না-ঘটে তবে আখেরে লাভ মার্কসবাদীদেরই।

মার্কসবাদীরা কি সেই সুযোগ বেশি করে পাবেন, না সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় চাকা উল্টো দিকে ঘোরাতে পারবেন?

১০-৭-৭১ —দেবদত্ত

দেশে বিদেশে

ডাঃ হেনরি কিসিংগার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউসের একজন অত্যন্ত কাছের মানুষ হিসাবে পরিচিত। সরকারী-ভাবে তাঁর পদ হচ্ছে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা। নিছক আইন বা সংবিধানের দিক দিয়ে এই পদের তেমন গুরুত্ব নেই। মন্ত্রিসভার সদস্যদের যে বিধিবদ্ধ ক্ষমতা রয়েছে তা তাঁর নেই। কিন্তু তিনি যে প্রেসিডেন্টের একজন কাছের মানুষ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও প্রাক্তন অধ্যাপক ডাঃ কিসিংগারের যে সুযোগ রয়েছে প্রেসিডেন্টের কানে কথা তোলার আমেরিকার আর কোন উচ্চ পদাধিকারীরই ততটা সুযোগ নেই। যদিও জন্মসূত্রে তিনি আমেরিকান নন। (ইহুদী বংশজাত ডাঃ কিসিংগার ১৯৩৮ সালে জার্মানী থেকে পালিয়ে এসেছিলেন) তাহলেও তিনি কেনেডি ও জনসনের আমলে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে একটি বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এখনও করে যাচ্ছেন।

এহেন ডাঃ কিসিংগার নয়াদিল্লীতে এলেন এমন এক সময়ে যখন পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র পাঠানর সংবাদে ভারতবর্ষে গভীর উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে এবং বাংলাদেশ প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আসল নীতি কি সে বিষয়ে গভীর সংশয় দেখা দিয়েছে। দিল্লীতে ডাঃ কিসিংগার যে বিরূপ সম্বর্ধনা লাভ করেছেন ইদানীংকালে ভারতবর্ষের রাজধানীতে ওয়াশিংটনের আর কোন প্রতিনিধি ততখানি বিরূপ সম্বর্ধনার সম্মুখীন হন নি। বিমান বন্দরে তাঁর জন্য কাল পতাকা, পচা ডিম ও পচা সব্জী নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা অপেক্ষা করছিলেন। সংসদের বিভিন্ন দলের বিশজন সদস্য মার্কিন দূতাবাসের সামনে গিয়ে 'কিসিংগার ফিরে যাও' বলে ধ্বনি দিয়ে এসেছেন।

ডাঃ কিসিংগার দিল্লীতে যেসব আলোচনা করেছেন তার মধ্যে স্বভাবতই পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র যোগাবার প্রসঙ্গটি প্রাধান্য পেয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন প্রভৃতির সঙ্গে প্রেসিডেন্ট নিকসনের এই প্রতিনিধির যেসব আলোচনা হয়েছে সেগুলির বিবরণ প্রকাশ করা হয়নি। ডাঃ কিসিংগার নিজেও সাংবাদিকদের কাছে মুখ খোলেন নি। কিন্তু পর্যবেক্ষকরা যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছেন তাতে প্রকাশ যে, পাকিস্তানকে আমেরিকান যুদ্ধোপকরণ যোগান সম্পূর্ণ বন্ধ করার ব্যাপারে কোন প্রতিশ্রুতি দেন নি। তিনি শুধু এইটুকু স্বীকার করেছেন যে, ২৫ মার্চ তারিখের পর পাকিস্তানে মার্কিণ অস্ত্র পাঠাবার ব্যাপারে সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করতে গিয়ে আমলারা 'বিভ্রাট' বাধিয়েছেন। ডাঃ কিসিংগার মারণাস্ত্র ও অন্য ধরনের যুদ্ধোপকরণের মধ্যে পার্থক্য দেখাবারও চেষ্টা করেছেন বলে প্রকাশ। ভারত সরকারের তরফ থেকে ডাঃ কিসিংগারকে নাকি একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মার্কিন সরকারের উচিত বাস্তব

পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নটি বিচার করা। প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, সমস্ত সমরোপকরণ, সেগুলি মারণাস্ত্র হোক বা না হোক, তার যন্ত্রাংশ এখন পাকিস্তান সরকার ব্যবহার করবেন বাংলাদেশের মানুষকে দাবিয়ে রাখার জন্য। সেকথা বিবেচনা করেই পাকিস্তানে মার্কিন সমরসম্ভার পাঠান সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দিল্লীতে ডাঃ কিসিংগারের যে আলোচনাই হয়ে থাক তার দ্বারা পাকিস্তান সম্পর্কে আমেরিকার নীতির, বিশেষ করে ইসলামাবাদকে মার্কিন অস্ত্র পাঠাবার নীতির কোন ইতরবিশেষ হবে বলে মনে হয় না। ব্যাপারটা যে নিছক আমেরিকান আমলাদের কারসাজি নয় সেকথাও এবার ফাঁস হয়ে গেছে আমেরিকান সিনেটর ফ্রাঙ্ক চার্চের একটি বিবৃতিতে এবং 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার একটি সংবাদে। ডাঃ হেনরী কিসিংগার যেদিন দিল্লীতে বসে এদেশের মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন সেদিনই ওয়াশিংটনে সিনেটের এক সভায় ডেমোক্র্যাটিক দলের সিনেটর চার্চ বলেছেন যে, অফিসারদের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে প্রেসিডেন্ট নিকসন স্বয়ং পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র যোগান চালু রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি খবর দিয়েছেন যে, পাকিস্তানকে যেসব যুদ্ধোপকরণ পাঠান হবে বলে ইতিমধ্যে ঠিক হয়ে গেছে সেগুলির মোট মূল্য সাড়ে তিন কোটি ডলার অর্থাৎ ২৬ কোটি টাকার বেশী। (এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে, আমেরিকান প্রতিরক্ষা দপ্তর যেসব উদ্বৃত্ত উপকরণ বিক্রি করেন সেগুলির দাম বাজার দরের চেয়ে অনেক কম ধরা হয়।)

'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর সংবাদেও এই সাড়ে তিন কোটি ডলার অঙ্কটি উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ সংবাদে আরও বলা হয়েছে যে, আমেরিকা থেকে অস্ত্র সংগ্রহের যেসব লাইসেন্স পাকিস্তান এখনও ব্যবহার করে নি সেগুলির একটি তালিকা তৈরি করে কিছুদিন আগে মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগ ও প্রতিরক্ষা বিভাগ প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠিয়েছিলেন। ঐ দুটি বিভাগ এইসব বাকেয়া লাইসেন্স বাতিল করারও সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু, নিউইয়র্ক টাইমস বলছেন, প্রেসিডেন্ট নিকসনই যুদ্ধোপকরণের চালান অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন।

ইসলামাবাদও এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর খুশী। বৃটিশ হাইকমিশনারকে ডেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বৃটিশ সরকারের মুখপাত্ররা পাকিস্তান সম্পর্কে যা বলছেন এবং বৃটিশ সংবাদপত্র ও টেলিভিশনকে যে প্রচার চালাতে দিচ্ছেন তাতে পাকিস্তান সরকার অতিশয় অসন্তুষ্ট। করাচীর একটি সংবাদপত্রে বলা হয়েছে যে, বৃটেনের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক এখন ভাঙ্গনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। অপরপক্ষে, ইসলামাবাদে পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন আর সমালোচনার পাত্র নয় এবং এদেশের মানুষ এখন আর বিশ্বাস করে না যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে বিভক্ত করতে চায়।'

পাকিস্তানী পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র সোল্লাসে একথাও ঘোষণা করলেন যে, আমেরিকা তাঁদের আশ্বাস দিয়েছে যে,

আমেরিকায় পুরানো লাইসেন্সের বলে কেনা যে চার বা পাঁচ জাহাজ বোঝাই যন্ত্রাংশ ও গোলাবারুদ পাকিস্তানে এসে পৌঁছবার কথা আছে সেগুলি বন্ধ করা হবে না।

যেদিন ইসলামাবাদ থেকে এই ঘোষণা করা হল তার পরের দিনই ডাঃ হেনরি কিসিঙ্গার ইসলামাবাদে এসে উপস্থিত হলেন সে দেশের জল্লাদ সরকারের নেতাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য।

পাকিস্তানের আমেরিকান কূটনীতিজ্ঞরা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান মারফৎ জানিয়েছেন যে, পূর্ববঙ্গের মানুষের ত্রাণ বাবদ কিছু সাহায্য পাঠিয়ে ও অস্ত্রের চালান পাঠাবার অনুমতি দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ববঙ্গ সঙ্কটের নিরসন সম্পর্কে পাকিস্তানের সঙ্গে 'নিভৃত সংলাপ' চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। অর্থাৎ সেই কথা—'শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে গো।' ডাঃ কিসিঙ্গার হচ্ছেন একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারী যিনি বাংলাদেশে ইয়াহিয়া বাহিনীর আক্রমণের পর পাকিস্তানে এলেন। আমেরিকার সোহাগের বহর বোঝা গেছে, এবার তার শাসনের দৌড় কতদূর তার আন্দাজ পাওয়া যাবে ডাঃ কিসিঙ্গারের পাকিস্তান সফরের ফলাফল দেখে।

*

ইয়াহিয়া খাঁর পাকিস্তান যে চীন থেকে অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছিল সেটা আগেই জানা ছিল। আমেরিকার অস্ত্রভাণ্ডারও যে তার জন্য খোলা রয়েছে সে কথাও গোপন রইল না। কিন্তু আমেরিকা ও চীন ছাড়া অন্য কোন দেশ থেকেও কি পাকিস্তান অস্ত্র পাচ্ছে? প্রশ্নটা লোকসভায় উঠেছিল।

প্রশ্নটা ওঠার আশু কারণ হচ্ছে, বিশেষ করে সোভিয়েট রাশিয়া ও ফ্রান্স সম্পর্কে সেরকম খবর ছিল। একটি খবর এই যে, সামান্য পরিমাণ সোভিয়েট অস্ত্র, সম্ভবত ১৯৬৭ সালে যেসব সাজসরঞ্জাম পাঠান হয়েছিল তার যন্ত্রাংশ, সোভিয়েট রাশিয়া থেকে পাকিস্তানে এসে পৌঁছচ্ছে, এই ধরনের একটা সংবাদের সত্যতা পাকিস্তান সরকার যাচাই করে দেখছেন। আর একটি খবর ছিল এই যে, ফ্রান্সের মার্সাই, তুলোঁ প্রভৃতি বন্দরে সম্প্রতি পাকিস্তানী জাহাজের বড় বেশী আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এইসব জাহাজে কি ধরনের মাল বোঝাই করা হচ্ছে সে বিষয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষ কিছু বলতে চাইছেন না। এমনকি জাহাজগুলির গতিবিধি সম্পর্কেও গোপনতা অবলম্বন করা হচ্ছে। 'এস এস চেনাব' নামে একটি পাকিস্তানী জাহাজ মার্সাই বন্দর ছেড়ে সমুদ্রবক্ষে একটি দুর্ঘটনায় পড়েছিল। এমনকি সেই খবরও করাচী কর্তৃপক্ষ চেপে গিয়েছিলেন।

লোকসভায় পি-এস-পি সদস্য শ্রী এম আর দণ্ডবতে যখন এই বিষয়ে প্রশ্ন তুললেন তখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং বললেন যে, ভারতবর্ষস্থিত সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত পেগভ জানিয়েছেন, বাংলাদেশে সামরিক হামলা আরম্ভ হওয়ার পর পাকিস্তানকে সোভিয়েট অস্ত্র দেওয়ার সংবাদ 'ভুল'। তাহলেও ২৫ মার্চ তারিখের আগে রাশিয়া থেকে পাঠান সরঞ্জাম ঐ তারিখের পর পাকিস্তানে পৌঁছে থাকতে পারে, এমন সম্ভাবনা তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। স্বরণ সিং আরও বলেন যে, ফরাসী সরকার পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করার জন্য নূতন কোন চুক্তি করেন নি বলে তো আগেই জানিয়েছিলেন, তার উপর আবার একথাও জানিয়েছেন যে, পুরানো চুক্তি অনুযায়ীও ফ্রান্স এখন আর পাকিস্তানে অস্ত্র পাঠাচ্ছে না। তবু যখন পাকিস্তানে ফরাসী অস্ত্র আসার খবর পাওয়া যাচ্ছে তখন ভারত সরকার সে বিষয়ে ফ্রান্সের কাছে খোঁজখবর নিচ্ছেন।

পাকিস্তান সম্প্রতি ইরান ও তুরস্কের কাছ থেকেও প্রচুর অস্ত্র সংগ্রহ করেছে, লোকসভায় এই খবর জানিয়ে স্বরণ সিং আরও বলেছেন যে, ভারত পাকিস্তানকে

অস্ত্র যোগাবার বিরোধী, সেই অস্ত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে আসছে অথবা পুঁজিবাদী দেশ থেকে আসছে তাতে কিছু আসে যায় না।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বিবৃতিতে সামান্যতম ভুল ধারণাও যাতে দেখা দিতে না পারে সেজন্য রাশিয়ানরা অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়েছেন। এই বিবৃতির পরদিনই নয়াদিল্লীস্থিত সোভিয়েট দূতাবাস থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, শুধু সম্প্রতিই নয়, বহু আগে থেকেই সোভিয়েট রাশিয়া পাকিস্তানকে অস্ত্র দেয় নি।

*

পর পর কতকগুলি ঘটনার ধাক্কায় শাসক কংগ্রেস নেতাদের ও সরকারী পদাধিকারীদের বিলাসবহুল জীবনযাপনের প্রশ্নটি আবার বড় হয়ে উঠেছে। তামিলনাড়ু থেকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকরুণানিধি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, মাদ্রাজের বর্তমান বিশাল রাজভবনটি ছেড়ে দিয়ে রাজ্যপালকে অন্য একটি ক্ষুদ্রতর গৃহে স্থান দেওয়া হোক। রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে শাসক কংগ্রেস নেতাদের পরিবারে বিয়ে উপলক্ষে রাজকীয় আড়ম্বর ও অপচয়ের খবর পাওয়া গেল। তারপর লোকসভার স্বতন্ত্র সদস্য শ্রী এম কে [illegible] জানিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা যে বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা পান সেগুলি যদি একজন সাধারণ মানুষকে প্রচলিত ট্যাক্স দিয়ে ভোগ করতে হত তাহলে তাঁকে মাসে এক লাখ টাকার উপর রোজগার করতে হত।

খবর এই যে, শাসক কংগ্রেস দলের কিছু সদস্য দলের মধ্যে প্রসঙ্গটি উত্থাপনের চেষ্টা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী শাসক কংগ্রেস দলের অন্তর্ভুক্ত মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লেখা পত্রে বিষয়টি উত্থাপন করায় এইসব সদস্য উৎসাহিত হয়েছেন।

এই উপলক্ষে সম্প্রতি দিল্লীতে যেসব আলোচনা হয়েছে তাতে কতকগুলি চমকপ্রদ তথ্য জানা গেছে। যেমন, একজন প্রাক্তন প্রবীণ ও রুচিবান মন্ত্রী তাঁর বাংলোতে নীল ভেলভেট দিয়ে সোফা ঢাকতে গিয়ে তার সঙ্গে ম্যাচিং-করা কার্পেট ও দেওয়ালের ডিসটেম্পার বাবদ সরকারকে ৭০ হাজার টাকা খরচ করিয়েছিলেন। একজন প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অফিসের ঘর সাজাতে খরচ হয়েছিল ৭৫ হাজার টাকা। তিনি যখন অন্য দপ্তরে গেলেন তখন তাঁর নূতন দপ্তর সাজাতে [illegible] টাকা। একজন মন্ত্রীর গলা ব্যথা হয়েছিল। শুধু অসুখটা পরীক্ষার বাবদ সরকারী তহবিল থেকে ১২০০ টাকার বিল মেটাতে হয়েছিল। আর একজন মন্ত্রী তাঁর অফিস ঘরের টেবিলটির পায়া পিতলের হোক বলে ফরমায়েস করেছিলেন। আর একজন সরকারকে দিয়ে দোয়াতদানি সমেত একটি টেবিল প্যাড কিনিয়েছিলেন পাঁচশত টাকা দামে।

অথচ, জওহরলাল নেহরুর সময়কার নজীর আছে যে, খরচ বাঁচাবার জন্য তিনি 'তিন মূর্তি' ভবনে পুরানো পর্দার কাপড়কে সোফার ঢাকনা হিসাবে ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং অফিসাররা অযথা কার্পেট বদল করতে চাইলে তাতে বাধা দিয়েছিলেন।

সমালোচকদের মুখ চেয়ে শ্রীমতী গান্ধীও নাকি ঠিক করেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এখন তিনি যে বাড়ীতে থাকেন সেখানেই থাকবেন। মাঝখানে একবার কথা উঠেছিল, প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান সরকারী বাসভবনটি যেহেতু প্রয়োজনের তুলনায় ছোট সেহেতু নূতন একটি বাড়ী তৈরি করা হোক।

[illegible] —পুণ্ডরীক

বদ্ধ জলাশয় ॥ সার্থক রায়

জলের গভীরে আলো শুয়ে আছে একান্ত নিস্তেজ
জড়িয়ে ধরেছে কাদা, পঙ্ক।

চারিদিকে ভাঙা কাচ ঝিনুক ভাঁড়ের টুকরো
ভাঙা চুড়ি, আয়না চিরুনি, খণ্ডিত মার্বেল পাথর
এলোমেলো বিভিন্ন চুলের জট, থ্যাতলানো খোঁপা,
যেন বিপর্যস্ত যুগে ত্রস্ত মানুষেরা।

এর মধ্যে হেঁটে যায় ধয়েরি রঙিন সাপ...
কোনোদিকে জল বেরুতে পারে না,
স্থির হয়ে

কালো জল রোদের উত্তাপে সারাদিন ওঠানামা করে।
আকাশে তারার চোখে
শুধু দূরের রাত্রির স্বপ্ন দেখে।।

কী আপ কী ডাউন ॥

রুদ্রেন্দু সরকার

একটি ট্রেন
আপ কিংবা ডাউন ঠিক মনে নেই।
হাতের মুঠোয় করে সময়ের গতি
নিঃশব্দে থামিয়ে দিল,
গুটি কয় ইচ্ছের কুঁড়ি ঢুলে পড়ল লাইনের ধারে।
ও আমাকে বলেছিল, আমাকে অবুঝ করে দেবে।
ও আমাকে বলেছিল, আমাকে আবার সবুজ করে দেবে।

কিন্তু হায়, কী অদৃষ্টলিপি হাওয়ায় মিশে যায়!
ডানা ভাঙা পাখিটাও প্লেনের মতোই,
দূর দূরান্তে পাড়ি দিতে চায়।

আমি ভাবি, ও তো
সবই শেষ করে দিল।
আমি ভাবি, ও-ই
প্রথম পালিয়ে গেল।
কিন্তু আমি ইচ্ছে নিয়ে পালাই কোথায়?

আমার মনের ইচ্ছে
আমার পায়ের মোটা চামড়ার ইচ্ছে—
আমায় হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে
রেললাইন পার করে দেবে।।

নিমফুল ॥ সাধনা মুখোপাধ্যায়

আহা কোন নিমগাছে
কাঠের কোষেতে বন্দী এতখানি যৌবন আছে
কেউ জানতো না,
আজকে চৈত্রের শেষে আবিষ্কৃত সে গোপন সোনা
নির্দ্বিধায় মেলে দিল
ডালে ডালে ফুলের ঝালর শাদা ঝুরি।
নিমফুল কে জানতো তুমি হারেমের উদিপুরী!
বসন্ত-বিপ্লবে ছিঁড়ে ফেলে বোরখা পুরোনো
নিজেকে বিলিয়ে দেবে
হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে
হাজার হাজার ফুল রুপোর গুঁড়োয়!]

পাকিস্থানের সংবিধান একটি ব্যর্থতার ইতিহাস

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

অবিভক্ত ভারতবর্ষের দুই অংশ একই সঙ্গে স্বাধীন হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর তিন বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ভারতের সংবিধান চালু হয়েছে এবং দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও সেই সংবিধান অনুযায়ী ভারতের পাঁচটি নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সরকার ও অসংখ্য রাজ্য সরকার গঠিত হয়েছে।

কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এক শতাব্দীর চতুর্থাংশ কেটে গেলেও আজ পর্যন্ত তার সংবিধান তৈরী হয় নি এবং অকূল দরিয়ায় একটা কম্পাসহীন নৌকার মত পাকিস্তানের রাষ্ট্রতরণী অনিশ্চয়তার সমুদ্রে ভেসে চলেছে।

পাকিস্তানের সংবিধান রচনার ব্যর্থ চেষ্টার দীর্ঘ ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এই ব্যর্থতার একটি বড় কারণ হল, পশ্চিম পাকিস্তানের স্থিতস্বার্থের প্রতিনিধিরা প্রথমাবধিই পাকিস্তানের পূর্ব অংশের মানুষদের ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করে নেন নি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই সেদেশের প্রথম সংবিধান পরিষদ গঠিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন অনুসারে। পাকিস্তানের সংবিধান-এর মূল নীতিগুলি কি হবে তার একটা খসড়া তৈরী করতেই কেটে গেল প্রায় দুই বছর। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খাঁ একটি প্রস্তাবের আকারে এই মূল নীতিগুলির খসড়া সংবিধান পরিষদে উপস্থিত করলেন। প্রস্তাবের প্রধান বক্তব্যগুলি ছিল :—(১) আল্লাহ্ হলেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তবে পাকিস্তানের মানুষ কোরান ও সুন্নাহ্-র নির্দেশ অনুযায়ী সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। (২) পাকিস্তান একটি যুক্তরাষ্ট্র হবে। (৩) ইসলামের দ্বারা নির্দেশিত গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সমতা, সহিষ্ণুতা ও সামাজিক ন্যায়-বিচারের নীতিগুলি পুরাপুরি মেনে চলা হবে। (৪) জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে রাষ্ট্র তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করবে। (৫) সংখ্যালঘুদের অধিকার ও তাঁদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থসমূহ রক্ষা করা হবে এবং নিজেদের ধর্ম অবলম্বন করে থাকার ও অনুশীলন করার স্বাধীনতা থাকবে। (৬) পাকিস্তানের সকল নাগরিকের জন্য সমান মৌলিক অধিকার স্বীকার করা হবে এবং সেই অধিকারগুলি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৭) অনগ্রসর ও অনুন্নত শ্রেণীসমূহের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণ করা হবে। (৮) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকবে।

সংবিধান পরিষদের অধিবেশনে যেদিন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খাঁর এই প্রস্তাব গৃহীত হয় সেদিনই পরিষদের ২৫ জন সদস্যকে নিয়ে গঠন করা হল একটি 'বেসিক প্রিন্সিপলস কমিটি' বা মূলনীতি কমিটি। এই কমিটির কাজ ছিল লিয়াকৎ আলির প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সংবিধানের একটি কাঠামো তৈরী করা। ২৫ জন সদস্যের এই মূলনীতি কমিটির সভাপতি ছিলেন সংবিধান পরিষদের সভাপতি তমিজুদ্দিন খাঁ এবং সহ-সভাপতি ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খাঁ। কমিটি গঠনই করা হয়েছিল এমনভাবে যাতে তার মধ্যে শাসক দল মুশিলম লীগের সমর্থকদের ও পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের প্রাধান্য থাকে।

১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি সংবিধান পরিষদে এই মূলনীতি কমিটির অন্তর্বর্তী রিপোর্ট পেশ করেন।

১৯৪৯ সালে লিয়াকৎ আলি খাঁর প্রস্তাব এবং ১৯৫০ সালে মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট, দুটিই পাকিস্তানের জনসাধারণের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের ও তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল।

লিয়াকৎ আলির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি এসেছিল দুদিক থেকে :—সংখ্যালঘুদের তরফ থেকে এবং সংবিধান পরিষদের প্রগতিশীল বিরোধী সদস্যদের তরফ থেকে। সংখ্যালঘুদের মুখপাত্র হিসাবে পূর্ববঙ্গের কংগ্রেস সদস্যরা বলেন, ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে মিশিয়ে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ বিপন্ন করা হচ্ছে। অন্য দিকে, সংবিধান পরিষদে বিরোধী পক্ষের নেতা ও আজাদ পাকিস্তান পার্টির প্রধান মিঞা ইফ্‌তিকারুদ্দিনের সমালোচনার মূল কথা ছিল, প্রস্তাবে সামাজিক পরিবর্তনের কোন নির্দেশ নেই এবং জনগণের মৌলিক স্বাধীনতার কোন গ্যারান্টি নেই।

লিয়াকৎ আলি খাঁর প্রস্তাবের তুলনায় অনেক তীব্রতর বিরোধের সম্মুখীন হল ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত মূলনীতি কমিটির অন্তর্বর্তী রিপোর্ট আর এই বিরোধিতা এল প্রধানত পূর্ববঙ্গ থেকে। পূর্ববঙ্গের মানুষ এই রিপোর্ট সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করল।

পূর্ববঙ্গের এই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গত কারণ ছিল। কেননা, পূর্ববঙ্গের মানুষ এর অনেক আগেই উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করা সত্ত্বেও এবং স্বয়ং কায়েদে-আজম মহম্মদ আলি জিন্না তাঁদের দিয়ে এটা মানিয়ে নিতে ব্যর্থ হলেও মূল নীতি কমিটির অন্তর্বর্তী রিপোর্টে ঘোষণা করা হল, উর্দুই হবে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা। আর একটি আপত্তিকর ব্যবস্থার দ্বারা সারা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের তাঁদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল। প্রস্তাব করা হল যে, কেন্দ্রীয় আইনসভার উর্ধ্বতম পরিষদে পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিদের জন্য যতগুলি আসন থাকবে, পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু, পাঞ্জাব, বাহাওয়ালপুর, বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, এই কয়টি প্রদেশের প্রত্যেকটির জন্য ঐ একই সংখ্যক আসন থাকে। আইন-সভার নিম্নতম পরিষদে অবশ্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গের জন্য বেশী আসনই নির্দিষ্ট করে রাখা হল। কায়দা করা হল এই যে, যেসব দেশের সংবিধানে আইন-সভার উর্ধ্বতন কক্ষে অঙ্গরাজ্যগুলির প্রত্যেকটির জন্য সমান সংখ্যক আসন রাখা হয় সেসব দেশের মত পাকিস্তানের মন্ত্রিসভার ক্ষেত্রে কিন্তু বলা হল না যে, এই মন্ত্রিসভাকে শুধুমাত্র জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত নিম্নতম পরিষদের আস্থাভাজন হতে হবে; বরং কমিটি বলল যে, মন্ত্রিসভাকে আইনসভার উভয় পরিষদের সদস্যদের আস্থাভাজন হতে হবে। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের ভোটের জোরে পূর্ববঙ্গকে দাবিয়ে রাখার ব্যবস্থা হল। পূর্ববঙ্গ এই অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্রোধে ফেটে পড়ল। মূলনীতি কমিটির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ঢাকায় একটি কমিটি গঠন করা হল। এই কমিটি অন্য একটি সংবিধানের খসড়া তৈরী করল। এই বিকল্প সংবিধানের খসড়ায় পূর্ববঙ্গকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব করা হল।

মূলনীতি কমিটির অন্তর্বর্তী রিপোর্টের বিরুদ্ধে ভিন্ন আর এক দিক থেকেও চাপ আসতে লাগল। পাকিস্তানের মোল্লা-মৌলবীরা বলতে থাকলেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামের অনুশাসন অনুযায়ী চলবে, এই কথাটা আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা দরকার। পাকি-

স্তানের ৩৩ জন বিশিষ্ট উলেমা করাচীতে এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে একটি পাল্টা সংবিধানের খসড়া তৈরী করতে লাগলেন।

লিয়াকৎ আলি খাঁ যখন দেখতে পেলেন যে, পূর্ববঙ্গ থেকে নির্বাচিত তাঁর নিজের দল অর্থাৎ মুস্লিম লীগের সদস্যরাও পূর্ববঙ্গকে 'পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত করা চলবে না' বলে আওয়াজ তুলছেন তখন তিনি একটা আপোষ মীমাংসার সূত্র সন্ধান করতে আরম্ভ করলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধন করতেও স্বীকৃত হলেন। অপরপক্ষে, উলেমাদের প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়ার জন্য তাঁরা যে দাবী জানিয়েছিলেন সেই দাবী লিয়াকৎ আলি খাঁ সরাসরি অগ্রাহ্য করলেন। দক্ষিণপন্থী গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য লিয়াকৎকে মূল্য দিতে হল প্রাণ দিয়ে। একজন ভাড়াটিয়া ঘাতক তাঁকে খুন করল।

লিয়াকৎ আলি খাঁর মৃত্যুর পর পাকিস্তানের গবর্নর-জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হলেন। মূলনীতি কমিটির একটি সংশোধিত রিপোর্ট তিনি সংবিধান পরিষদের সামনে উপস্থিত করলেন ১৯৫২ সালের ২২ ডিসেম্বর তারিখে। পূর্ববঙ্গবাসীদের সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর এই খসড়ায় বলা হল যে, কেন্দ্রীয় আইনসভার দুই কক্ষেই সদস্যদের অর্ধেক নির্বাচিত হবেন পূর্ববঙ্গ থেকে আর বাকী অর্ধেক আসন পশ্চিম পাকিস্তানের নয়টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বণ্টন করা হবে। উলেমাদের সন্তুষ্ট করার জন্য ঘোষণা করা হল :—(১) পাকিস্তানের সরকারী নাম হবে 'পাকিস্তানের ইসলামী প্রজাতন্ত্র' (২) এই রাষ্ট্রের প্রধানকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে। (মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের প্রথম খসড়ায় এই ধরনের কোন সর্তের উল্লেখ ছিল না।) (৩) প্রদেশ ও কেন্দ্রে আইনগুলির সঙ্গে শরিয়তের বিধানের সঙ্গতি থাকছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য উলেমাদের একটি পরিষদ গঠন করা হবে। প্রত্যেকটি প্রস্তাবিত আইন এই উলেমা পরিষদের পরীক্ষার জন্য পাঠান হবে।

কিন্তু নাজিমুদ্দিনের প্রস্তাব কোন পক্ষকেই সন্তুষ্ট করতে পারল না। পূর্ববঙ্গবাসীরা সন্তুষ্ট হল না; কেননা, সমগ্র পাকিস্তানে তারা যে সংখ্যাগুরু সেই সত্যটিকে আইনসভার প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি দেওয়া হল না। তাছাড়া, এই প্রস্তাবে প্রদেশগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রায় পুরোপুরি অস্বীকার করা হল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করার যেসব ব্যবস্থা ছিল সেগুলি প্রায় হুবহু এই প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করা হল। অন্য দিকে, খাজা নাজিমুদ্দিনের এই প্রস্তাব মোল্লা-মৌলবীদেরও অসন্তুষ্ট করল। তাঁদের অসন্তোষের প্রধান কারণ হল, প্রস্তাবিত উলেমা পরিষদকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয় নি।

পাকিস্তানকে শরিয়তী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য যেসব কট্টর মোল্লা-মৌলবী কোমর বেঁধেছিলেন তাঁরা এবার উঠে-পড়ে লাগলেন। এঁদের মুখপাত্র হল দুটি দল—জামাৎ-এ-ইসলামী ও অহ্‌র পার্টি এরা একদিকে উলেমা পরিষদকে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করল এবং অন্যদিকে পাকিস্তানের আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করল। তাদের মতে, যেহেতু আহমদিয়ারা হজরৎ মহম্মদকে শেষ নবী বলে স্বীকার করে না সেহেতু তারা খাঁটি মুসলমান নয়। পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহম্মদ জাফরুল্লা খাঁ একজন আহমদিয়া। জামাৎ-এ-ইসলামী ও অহ্‌র দল দাবী করতে থাকল যে, আহমদিয়াদের সরকারীভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে ঘোষণা করতে হবে এবং জাফরুল্লা খাঁ সমেত সকলকেই সরকারী চাকরী থেকে সরাতে হবে। এই আহমদিয়া-বিরোধী অভিযান ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক আহমদিয়া-বিরোধী দাঙ্গায় পরিণত হয়েছিল। এই দাঙ্গা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে খাজা নাজিমুদ্দিনের পতন ডেকে আনল। গবর্নর-জেনারেল গোলাম মহম্মদ তাঁকে বরখাস্ত করে পূর্ববঙ্গ থেকে আর একজনকে—বগুড়ার মহম্মদ আলিকে প্রধানমন্ত্রী করে নিয়ে এলেন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় পাকিস্তানের দুই অংশের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ যে বিতর্ক চলছিল তার একটা মীমাংসার পথে বগুড়ার মহম্মদ আলি কিছু দূর অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। তিনি যে ফরমুলা দিলেন তাতে কেন্দ্রীয় আইনসভার নিম্নতম কক্ষে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে এবং দুই কক্ষ মিলিয়ে পূর্ববঙ্গের সদস্য সংখ্যা ও পশ্চিম পাকিস্তানের সবগুলি প্রদেশের মিলিত সদস্যসংখ্যা সমান-সমান হবে। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খাঁ নুন ও পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন এই ফরমুলা মেনে নিয়ে চুক্তিতে সইও করলেন।

কিন্তু এরই মধ্যে পূর্ববঙ্গ আইনসভার নির্বাচনের সময় এসে গেল। তার আগেই পূর্ববঙ্গে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটেছে যাতে বোঝা যাচ্ছিল যে, মুস্লিম লীগের দিন শেষ হয়ে আসছে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী তারিখে বাংলা ভাষার দাবীতে বাঙালী তরুণেরা প্রাণ দিয়েছেন, হাসান শহীদ সুরাবর্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ (গোড়ায় নাম ছিল জিন্না আওয়ামী মুস্লিম লীগ), ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিক পার্টি গঠিত হয়েছে এবং দুই নেতার উদ্যোগে মুস্লিম লীগের বিরোধী দলগুলি একটি যুক্তফ্রন্টের ভিতর জোট বেঁধেছে।

১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গের নির্বাচন পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসকে একটা সংকটের সন্ধিক্ষণে এনে দাঁড় করাল। যে মুস্লিম লীগ পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল সেই লীগ যে ঐ দেশের পূর্বাংশে এই সাত বছরের মধ্যে মানুষের মন থেকে মুছে গেছে তার প্রমাণ হয়ে গেল ঐ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। ২৩৭টি মুস্লিম আসনের মধ্যে ২২৩টিই পেলেন যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরা। যাঁরা হারলেন তাঁদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনও ছিলেন। ৭২টি অমুসলমান আসনের মধ্যে ৬৮টিতে নির্বাচিত হলেন যুক্তফ্রন্টের শরিক অথবা সমর্থক দলগুলির প্রার্থীরা।

নির্বাচনের এই ফলাফল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক ও রাজনীতিকদের বিচলিত করল। তাঁরা বুঝলেন, যুক্তফ্রন্টের এই জয়ের অর্থ বাঙালী জাতীয়তাবাদের জয়, পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য ও শোষণের বিরুদ্ধে, বাংলা ভাষার অবমাননার বিরুদ্ধে, বাঙালীদের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। তাঁরা একথাও বুঝতে ভুল করলেন না যে, যুক্তফ্রন্টের এই জয় গোটা পাকিস্তানেই মুস্লিম লীগের বিদায়ের সঙ্কেত।

বিচলিত পাকিস্তানী রাষ্ট্রনায়করা একদিকে বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে আপোষের চেষ্টা করতে থাকলেন, অন্যদিকে বাঙালী-অবাঙালী উত্তেজনা সৃষ্টি করে এই আন্দোলনকে বিপথগামী করার ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকলেন। তাঁদের ঐ প্রথম চেষ্টায় একটি ফল হল : বাংলা ভাষার স্বীকৃতি। পূর্ববঙ্গের নির্বাচনের এক মাসের মধ্যে সংবিধান পরিষদ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে বাংলা ও উর্দু, উভয়কেই পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হিসাবে ঘোষণা করলেন। আর, পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের ষড়যন্ত্রের ফল হল চন্দ্রঘোনা পেপার মিলে ও নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা।

এর পর দ্রুত ঘটনাপ্রবাহের ভিতর দিয়ে পাঁচ মাসের মধ্যে পূর্ববঙ্গ বিধানসভা ও পাকিস্তানের সংবিধান পরিষদ, দুই-ই ভেঙ্গে দেওয়া হল, পূর্ববঙ্গে ফজলুল হকের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত হলেন এবং পাকিস্তানের সংবিধান চালু করার চেষ্টা আর একবার ব্যর্থ হয়ে গেল। পূর্ব বাংলার বাঙালীদের প্রতিবাদে সন্ত্রস্ত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা আজ যেমন পাকিস্তানের অখণ্ডতার আওয়াজ তুলছেন সেদিনও তেমনি ফজলুল হক পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করতে চাইছেন, এই অজুহাতে তাঁর সরকারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং নির্বাচিত বিধানসভাকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল।

এদিকে, সংবিধান পরিষদের সদস্যরা আর এক কাণ্ড করে বসলেন যাতে তাঁদেরও আয়ু ফুরিয়ে এল। সাত বছরের পুরানো এই সংবিধান পরিষদ দেশের জনমতের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করছে কিনা

সে প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছিল এবং এই পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে নূতন নির্বাচন করার দাবী তোলা হচ্ছিল। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে পরিষদের সদস্যরা তাড়াহুড়া করে দুটি বিল পাশ করিয়ে নিলেন যেগুলির দ্বারা গবর্নর-জেনারেলের ক্ষমতা হ্রাস করে পরিষদের নিজের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া হল এবং পূর্ববঙ্গের কয়েকজন সদস্যের সদস্যপদ হারাবার আইনগত সম্ভাবনা রোধ করা হল। এই বিল দুটি পাশ করার পর সংবিধান পরিষদ পাঁচ সপ্তাহের জন্য অধিবেশন মুলতুবী রাখলেন। তার আগে অবশ্য তাঁরা আরও একটি কাজ করলেন। তাঁরা মূল-নীতি কমিটির সংশোধিত রিপোর্টটি গ্রহণ করলেন এবং ১৯৫৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর নূতন সংবিধান গ্রহণের তারিখ নির্দিষ্ট করলেন। ২৫ ডিসেম্বর হচ্ছে কায়েদে-আজম মহম্মদ আলি জিন্নার জন্মদিন।

কিন্তু ইতিহাসের এমনই বিধান যে, পাকিস্তানের সেই প্রতিশ্রুত সংবিধানের জন্ম দেওয়ার আগেই সংবিধান পরিষদের আয়ু ফুরোল। স্বাভাবিক কারণে অবশ্য তাঁদের আয়ু ফুরোয় নি, ফুরিয়েছিল গবর্নর-জেনারেল গোলাম মহম্মদের আদেশে। গবর্নর-জেনারেলের ক্ষমতা খর্ব করে সংবিধান পরিষদ যে বিল পাশ করেছিলেন গোলাম মহম্মদ স্বভাবতই তাকে ভাল চোখে দেখেন নি। এই ক্ষমতার লড়াইয়ে সংবিধান পরিষদের হার হল। এইভাবে, পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান পরিষদ তাঁদের সাত বছর দুই মাস চোদ্দ দিনের সঙ্কটময় জীবন কাটিয়ে গবর্নর-জেনারেলের আদেশে বিদায় হয়ে গেলেন। আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে মিথ্যা হয়ে গেল ঐ দেশের সংবিধান রচনার জন্য তখন পর্যন্ত যতটুকু কাজ হয়েছিল তার সবটাই।

এই সময়েই পাকিস্তানের দুজন ভবিষ্যৎ ভাগ্যপুরুষ ঐ দেশের রাজনীতির মঞ্চে প্রবেশ করলেন। তাঁদের একজন হলেন ইস্কান্দার মির্জা। তিনি তখন ছিলেন পূর্ববঙ্গের গবর্নর। আর একজন হলেন জেনারেল আয়ুব খাঁ। সে সময়ে তিনি পাকিস্তানের স্থল সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। গবর্নর জেনারেলের নির্দেশে প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলি এই দুজনকে মন্ত্রিসভায় নিয়ে এলেন।

পাকিস্তানের সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে এর পর গবর্নর-জেনারেল গোলাম মহম্মদ অন্য পথ ধরার চেষ্টা করলেন। নির্বাচনের ঝুঁকি ও ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে তিনি সংবিধান সম্মেলন আহ্বান করে ঐ সম্মেলনের মাধ্যমে সংবিধান প্রস্তুত করতে চাইলেন। কিন্তু আদালতের ভয়ে তিনি সেটা করতে পারলেন না। কেননা, ইতিমধ্যে বিলুপ্ত প্রথম সংবিধান পরিষদের সভাপতি তমিজুদ্দিন খাঁ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি তাঁর রায়ে গবর্নর-জেনারেল কর্তৃক সংবিধান পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়ার আদেশ বহাল রাখলেন; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে গবর্নর-জেনারেলকে পরামর্শ দিলেন যে, সংবিধান পরিষদের কাজ সংবিধান সম্মেলন দিয়ে সারার আশা তিনি যেন ত্যাগ করেন। অগত্যা, ১৯৫৫ সালের মে মাসে গবর্নর-জেনারেল গোলাম মহম্মদ নূতন সংবিধান পরিষদ গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করলেন।

ইতিমধ্যে, পাঞ্জাবী স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলির পৃথক অস্তিত্ব লোপ করে 'এক ইউনিট' চালু করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বাহাওয়ালপুর প্রভৃতি স্থান থেকে তীব্র আপত্তি এসেছিল। কিন্তু ছলে-বলে-কৌশলে 'এক ইউনিট' চাপিয়ে দেওয়া হল।

'এক ইউনিট'-এর হাত ধরেই এল 'প্যারিটি' বা সমতার নীতি। পশ্চিম পাকিস্তানের যতগুলি আসন, পূর্ব পাকিস্তানেরও ততগুলি। প্রথম সংবিধান পরিষদের ৭৬টি আসনের মধ্যে ৪৪টি ছিল পূর্ববঙ্গের সদস্যদের। আর গোলাম মহম্মদ যে ফরমুলা দিলেন তাতে বলা হল, সংবিধান পরিষদের ৮০ জন সদস্য পশ্চিম ও পূর্ব থেকে আধা-আধি ভাগে আসবেন। এই ৮০ জনের মধ্যে ৭২ জন পরোক্ষ নির্বাচনের দ্বারা নির্বাচিত হবেন, তাঁদের ভোট দেবেন প্রদেশের বিধানসভাগুলির সদস্যরা। প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যগুলি ও উপ-জাতীয় আসনের জন্য সংরক্ষিত আটটি আসন কিভাবে পূর্ণ করা হবে সেটা স্থির করার ভার নূতন পরিষদের উপরই ছেড়ে দেওয়া হল।

নূতন সংবিধান পরিষদের নির্বাচনে মুস্লিম লীগের দারুণ বিপর্যয় ঘটল। ৮০টি আসনের মধ্যে তারা পেল মাত্র ২৫টি। (প্রথম সংবিধান পরিষদে মুস্লিম লীগের আসনসংখ্যা ছিল ৬৪)। কেন্দ্রীয় সরকারের সদস্যদের অর্ধাংশ সংবিধান পরিষদে তাঁদের আসন হারালেন। পূর্ববঙ্গ থেকে একমাত্র প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মহম্মদ আলি ছাড়া মুস্লিম লীগের আর কোন সদস্যই নির্বাচিত হয়ে এলেন না।

প্রথম সংবিধান পরিষদের তুলনায় দ্বিতীয় সংবিধান পরিষদ অনেক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সংবিধান রচনার কাজ এগিয়ে নিয়ে গেলেন মাস ছয়েকের মধ্যে ১৩টি অধ্যায় ও ২৩৪টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এই সংবিধান গৃহীত হল। ১৯৫৬ সালের ২ মার্চ তারিখে সংবিধান গভর্ণর—জেনারেলের অনুমোদন লাভ করল। সে সময়ে গভর্ণর-জেনারেলের পদে ছিলেন ইস্কান্দার মির্জা। তিন দিন বাদে ইস্কান্দরই হলেন নতুন সংবিধান অনুযায়ী পাকিস্তানের ঐশ্লামিক প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট।

'ঐশ্লামিক প্রজাতন্ত্র' কথাটা পাকিস্তানের এই সংবিধানের মাধ্যেই স্থান পেয়েছিল। এই সংবিধানে আগেকার অন্যান্য প্রস্তাবের প্রায় সবগুলি আপত্তিকর বৈশিষ্ট্যই বজায় রাখা হল। যেমন, (১) জাতীয় পরিষদ অর্থাৎ পার্লামেন্টের ৩০০ আসন 'প্যারিটি'র নীতি অনুযায়ী পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে আধা-আধি ভাগ করে পূর্ববঙ্গের জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে অস্বীকার করা হল। (২) পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের পদটি অমুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল, দেশের আইন-কানুন সব যাতে কোরান ও সুন্নাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী হয় সেজন্য প্রত্যেকটি আইন বড় বড় মোল্লা ও উলেমাদের একটি বিশেষ কমিটির দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হল এবং একটি অনুচ্ছেদে বলা হল, পাকিস্তান 'মুসলিম দেশগুলির সঙ্গে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবে।' (৩) কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রেসিডেন্টের হাতে বিপুল ক্ষমতা ন্যস্ত করে প্রদেশগুলির স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার কার্যত অস্বীকার করা হল। (৪) যদিও সার্বজনীন ভোটের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হল তাহলেও মুসলমান ও অমুসলমানদের জন্য যুক্ত নির্বাচনপ্রথা থাকবে অথবা পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা হবে সে বিষয়ে সংবিধানে কিছু না বলে বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্তের ভার পার্লামেন্টের উপর ছেড়ে দেওয়া হল। অর্থাৎ পার্লামেন্টে যখন যাঁদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা থাকবে তাঁদের ইচ্ছামতই যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা অথবা পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুযোগ রাখা হল।

একটি বিষয়ে অবশ্য এই সংবিধান বাঙালীদের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করল। সেটা হল এই যে, উর্দুর সঙ্গে বাংলাভাষাকেও পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হল।

পাকিস্তানের নির্বাচনব্যবস্থা যৌথ অথবা পৃথক হবে, এই প্রশ্ন যখন প্রাদেশিক বিধানসভাগুলির সামনে এল, তখন পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভা এই বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন। পশ্চিম পাকিস্তান বিধানসভা পৃথক নির্বাচনব্যবস্থার পক্ষে মত প্রকাশ করলেন আর পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভা চাইলেন যুক্ত নির্বাচনব্যবস্থা। জাতীয় সংসদ দুইজনেরই কথা রাখলেন। ব্যবস্থা দেওয়া হল : পশ্চিম পাকিস্তানে পৃথক নির্বাচনব্যবস্থায় আর পূর্ব পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচনব্যবস্থায় ভোট নেওয়া হবে!

একদিকে যখন পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সংবিধানের দৃঢ়ভিত্তির উপর দাঁড় করাবার এই চেষ্টা চলছে অন্য দিকে তখন দেশের রাজনীতি দ্রুত একটা সংকটের দিকে এগিয়ে চলেছে। মুসলিম লীগ দুর্বল হয়ে পড়ায় এবং অন্য কোন একটি দল তার স্থান অধিকার করতে না পারায় পশ্চিম পাকিস্তানে ও কেন্দ্রে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। ৩১ মাসের মধ্যে করাচীতে তিন বার সরকার বদল হল। চৌধুরী মহম্মদ আলি গেলেন, সুরাবর্দী এলেন, সুরাবর্দী গেলে চুন্দ্রীগড় এলেন, চুন্দ্রীগড় গেলে মালিক ফিরোজ খাঁ নুন এলেন। রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিল পূর্ববঙ্গেও। সেখানে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল এবং ফ্রন্টের শরিক দলগুলি নিজেদের মধ্যে রেষারেষিতে প্রবৃত্ত হল। ১৯৫৬ সালের মার্চ থেকে ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে সেখানে ছয়টি সরকার গঠিত হল। এই ছয়টির মধ্যে একটি টিঁকে ছিল মাত্র চার ঘন্টা!

গবর্ণর গোলাম মহম্মদ যখন ইস্কান্দার মির্জা ও আয়ুব খাঁকে ক্ষমতায় এনে বসান তখন থেকেই এই দুজনকে ঘিরে পাকিস্তানের সামরিক ও আমলা চক্র একজোট হয়ে একটা পাল্টা রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে দানা বাঁধছিল। দেশের ঘনায়মান রাজনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে এই জোট আঘাত হানলেন ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর। প্রেসিডেন্ট মির্জা এক কলমের খোঁচায় সংবিধান বাতিল করে দিলেন, কেন্দ্র ও প্রদেশের আইনসভাগুলি ভেঙে দিলেন, সমস্ত রাজনৈতিক দল তুলে দিলেন, সামরিক আইন জারী করলেন এবং সেই সামরিক আইনের মুখ্য প্রশাসক হিসাবে নিয়ে এলেন আয়ুব খাঁকে। ২০ দিনের মধ্যে মির্জাসাহেব নিজে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে আয়ুব খাঁর হাতে সব ক্ষমতা তুলে দিয়ে সপরিবারে দেশত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হলেন।

পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধানও এই ভাবে ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতার লড়াইয়ের শিকার হল।

পাকিস্তানের ইতিহাসের ভাগ্যবিধাতা নগ্ন জঙ্গী ডিক্টেটর ফিল্ড-মার্শাল আয়ুব খাঁর হাত দিয়ে সেদেশের জন্য যে তৃতীয় সংবিধান উপহার দিলেন সেটি একটি আজব চীজ। পৃথিবীর কোন দেশেই এমন একটি সংবিধানের নজীর খুঁজে পাওয়া ভার। প্রথমত, এই সংবিধান নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত হয় নি। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক গঠিত একটি সংবিধান কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এই সংবিধান তৈরি হল। দ্বিতীয়ত, জনসাধারণকে সরাসরি ভোটে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করার অধিকার না দিয়ে "বনিয়াদী গণতন্ত্র" নামে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হল। তৃতীয়ত, এই সংবিধানে প্রেসিডেন্ট - পরিচালিত ও মন্ত্রিসভাপরিচালিত সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলির অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটান হল। সাধারণ নিয়ম এই যে, প্রেসিডেন্ট যেসব দেশের সরকারী ক্ষমতা পরিচালনা করেন (যেমন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে) সেসব দেশে প্রেসিডেন্ট প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত হন। আর যেসব দেশে সরকার পরিচালনার ক্ষমতা মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত থাকে (যেমন ভারতবর্ষে) সেসব দেশে প্রেসিডেন্ট পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। আয়ুবের সংবিধানে প্রেসিডেন্টকে সর্বময় ক্ষমতা দেওয়া হল; কিন্তু বলা হল যে, তিনি নির্বাচিত হবেন ৮০ হাজার (পরে এই সংখ্যা বাড়িয়ে ১ লক্ষ ২০ হাজার করা হয়েছিল) "বনিয়াদী গণতন্ত্রী"র দ্বারা।

আয়ুবের এই সংবিধানে অবশ্য অন্তত একটি বিষয়ে সাহসের পরিচয় দেওয়া হল। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে যেমন পরিষ্কার করে বলা হয়েছিল যে, দেশের প্রত্যেকটি আইনের সঙ্গে কোরানের ও সুন্নাহর সঙ্গতি থাকতে হবে আয়ুবের সংবিধানে তেমন কোন সর্ত ছিল না।

১৯৬২ সালে ১ মার্চ আয়ুব খাঁ তাঁর এই সংবিধান প্রকাশ করলেন।

১৯৬৫ সালে এই সংবিধান অনুযায়ী আয়ুব খাঁ পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। জঙ্গী ডিক্টেটর গণতন্ত্রের পোশাক পরলেন এবং একনায়কতন্ত্রকেই সাংবিধানিক গণতন্ত্ররূপে জাহির করতে সমর্থ হলেন।

কিন্তু ১৯৬৭ সাল থেকেই পাকিস্তানের দুই অংশে এই ভুয়া গণতান্ত্রিক সংবিধান বদলে প্রকৃত গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত সংবিধান চালু করার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হল। পূর্ব বাঙলায় আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল মুসলীম লীগ জামাৎ - ই ইসলামী, নিজাম-ই-ইসলামী ও ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট নিয়ে গঠিত পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক মুভমেন্ট ও পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলি ভুট্টোর নবগঠিত পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতৃত্বে সার্বজনীন ভোটাধিকার, প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও পার্লামেন্টারি সরকারের দাবীতে আওয়াজ উঠল। এর সঙ্গে যুক্ত হল আওয়ামী লীগের নিজস্ব আন্দোলন যার আওয়াজ ছিল :— প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার চাই, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে 'প্যারিটি'র নীতির অবসান চাই, 'প্রত্যেকের একটি ভোট" নীতি অনুযায়ী জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব চাই।

এই আন্দোলনে ছাত্ররা একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করল। আয়ুব খাঁ তাঁর জঙ্গী ক্ষমতা নিয়েও পরিস্থিতি সামলাতে পারলেন না। এদিকে, সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করে পুত্র গওহর আয়ুব ও অন্যান্য আশ্রিত ব্যক্তিদের কোটি কোটি টাকা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ আসতে লাগল আয়ুবের বিরুদ্ধে।

বেগতিক দেখে আয়ুব ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আর এক জঙ্গী জেনারেল, তাঁর নিজের প্রিয়পাত্র ও তাঁরই মতো পাঠানসন্তান জেনারেল আগা মোহম্মদ ইয়াহিয়া খাঁর হাতে ক্ষমতা তুলে দিলেন। সংবিধানের দ্বারা বিধিবদ্ধ একটি সরকারের মারফৎ পাকিস্তানের জনগণের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার আশা আর একবার জঙ্গী শাসনের বুটের তলায় চাপা পড়ল।

দুবছর পরে সেই ২৫ মার্চ ফিরে এল। ইয়াহিয়া খাঁর ক্ষমতাগ্রহণের দ্বিতীয় বার্ষিকী। পাকিস্তানের প্রথম প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পর নির্বাচিত জাতীয় সংসদের দ্বারা দেশের সংবিধান প্রণয়নের আশা যখন আর একবার জেগে উঠেছে তখনই সেই আশা ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনীর কামান, বন্দুক ট্যাঙ্ক ও বিমানের আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু এবার শুধু পাকিস্তানের সংবিধান রচনার আশাই মরল না, মরল খোদ পাকিস্তানই।

গত ২৮ জুনের বেতার ঘোষণায় জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ সংবিধান রচনার জন্য তাঁর নূতন পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই পরিকল্পনা পাকিস্তান সংবিধানের প্রয়াসকে আবার একেবার কেঁচে গণ্ডূষের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এ যেন সাপ-মইয়ের খেলা। কখনও শেষ পর্যন্ত পৌঁছান যাচ্ছে না। ইয়াহিয়া খাঁ হুকুম দিয়েছেন, এবার সংবিধান রচনার কাজ সংবিধান পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে না, এই কাজ করবেন তাঁর নিজের বাছাই—করা বিশেষজ্ঞরা। তাঁর এই পরিকল্পনা পূর্ববঙ্গের মানুষরা তো মেনে নেবেন-ই না, এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের জনাব ভুট্টো ও অন্যান্য নেতারাও মেনে নেবেন কিনা বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।

পালাবদল

শক্তিপদ রাজগুরু

লাল রংটা আমার চোখকে কেমন কষ্ট দেয়। বিশেষ করে ক্যাটক্যাটে লাল রং হলে তো কথাই নেই। মনে হয় সব একটা নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য আর নীরব যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠেছে। বন্ধুরা বলে এটা একটা স্নায়বিক দৌর্বল্য। হয়তো তাদের কথাই সত্যি। তবু ম্যাড়ম্যাড়ে লাল রং-এর কামরায় ঢুকে মনে হল যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। রেল কর্তৃপক্ষের এও একটা খামখেয়ালী, নইলে করিডর কোচের টু ক্যুপগুলোকে এত রং থাকতে ক্যাটকেটে লাল রং-এর করে কেন? ফোর বার্থ-এর ক্যুপ, গদিগুলোও লাল—দেওয়ালের কাঠগুলোরও সেই রং। পড়ন্ত বৈকালের একফালি ক্লান্ত রোদ-এর আভায় আরও প্রকট হয়ে উঠেছে রংটা।

চেকার সাহেব বলেন, দরজাটা বন্ধ করে দেন, নইলে এখুনি বিদ্যার্থীর দল স্রেফ খাতা হাতে উঠে জ্বালাতন করবে।

—বিদ্যার্থীর দল এখানেও আছে?

সমস্তিপুর থেকে ফিরছি। গিয়েছিলাম আরও দূরে, নেপাল থেকে ফেরার পথে সমস্তিপুর হয়ে আসছি। তবু রাতটা ঘুমুতে পারবো এই সান্ত্বনা নিয়েই এই ক্যুপের একটা সিট যোগাড় করতে হয়েছে। চেকার ভদ্রলোক বলেন, এখন সব চুপচাপ বসে আছে ফার্স্টক্লাশ জুড়ে, গাড়ি ছাড়লে ওদের প্রতাপ সুরু হবে।

অর্থাৎ বিদ্যার্থীরাও জ্ঞান দেবার জন্য সর্বত্রই মাথা তুলেছে। তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্যই দরজাটা লক করে বসে আছি। ওই লাল রং খুপরীর মধ্যে। পাখা দুটো শন্ শন্ শব্দে ঘুরছে—মাঝে মাঝে দু'একজন দরজায় ধাক্কা দিয়ে যায়—ওই বিদ্যার্থীরাই বোধহয়। দরজা খোলা না পেয়ে ফিরে যায়। হয়তো এর শোধ পরে নেবে।

গাড়ি ছাড়বার সময় হয়ে আসছে। মনে মনে একটু আশ্বস্ত হই—একাই এই কামরাটা দখল করে যাবো। ট্রেনের কামরায় মানুষগুলো অনেক ছোট ছোট বোধহয়। নইলে এইটুকু জায়গায় ওরা যাতায়াত করে কি ভাবে? কলরব করে, নিজেদের সাতকাহন কথা নিয়ে কচ কচ করে আর যখন তখন টিফিন বাসকেট খুলে গণ্ডেপিণ্ডে গেলে আর গায়ে পড়ে আলাপ করতে আসে অনেকে। যেন কতোদিনের চেনা। হঠাৎ পথে যেতে যেতে খুব সামাজিক আর পরোপকারীও হয়ে ওঠে কেউ কেউ। অনেকে আমার পথে বের হয়ে পরম দার্শনিক না হয় রাজনীতিবিদ হয়ে যান। এক কথায় মানুষগুলো কমবেশী ছোট না হয় বড় হয়ে যায়। বিকৃতিই বলা যায় একে।

সেসব যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাবো বলে বোধ হচ্ছে। গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা বাজছে। এইবার গার্ড সাহেব ঝুঁকে পড়ে নীল নিশান নাড়বে, বাঁশী বাজাবে, গাড়ি ছাড়ার কথা মনে হলেই এসব কথাগুলো মনে হয়। আর ড্রাইভারও হুইসেল-এর তারটা ধরে টানবে।

হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে কারা উঠছে। অস্ফুট উত্তেজিত কথার শব্দগুলো এগিয়ে আসে। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে কারা ঢুকছে, বোধহয় বিদ্যার্থীর দল, না হয় দেরী করে আসা কোন প্যাসেঞ্জার। কিছু লোক আছে যারা সবতাতেই দেরী করে, কেমন যেন বেপরোয়া ভাব তাদের। আমার সব সারা হলে তবে অন্যের সময় হতে হবে। এই লেট যারা করে—তাদের অনেক সময় স্বার্থপর বলেই মনে হয়।

সবচেয়ে বেশী বিরক্ত হই ওরা এসে আমার লক করা দরজাতেই ধাক্কা দিচ্ছে।

আর ধাক্কাটা বেশ ব্যস্ত হয়েই দিচ্ছে বলে বোধ হল। দরজাটা খুলে দিতেই ওরা হুড়মুড়িয়ে ভিতরে ঢুকে কোনদিকে না চেয়ে র‍্যাকের উপর সুটকেশ, একটা হোলডল তুলে টিফিন বাসকেটটা নীচে ঠেলে দিয়ে কুলিকে

পয়সা মিটোবার সময় দু'চারটে বিকৃত হিন্দী বলে টলে একটা ঝড় তুলে দিল। এতক্ষণ বেশ শান্তিতেই ছিলাম, সেটার দফারফা হয়ে গেল।

গাড়িটা চলতে সুরু করেছে। নিজে গিয়ে দরজাটা লক করে দিলাম। কারণ এর মধ্যে দুচার জন দাঁড়ি গোঁফওয়ালা দশাসই বিদ্যার্থী, অর্থাৎ বিনা টিকিটে ফার্স্ট ক্লাশের জবরদখলকারী যাত্রীর দল বোধহয় কোন ভদ্রমহিলাকে দেখেই এদিকের কুপেটার সম্বন্ধে একটু আগ্রহী হয়ে উঠেছে। ওরা চিনাবাদাম চিবুচ্ছে—কেউবা পার্টিশান-এর কাঠ ঠুকে গানা সুরু করেছে। আর এক সঙ্গে হৈ হৈ করে মত্ত উল্লাসে চীৎকার করছে।

আমরা তিনটি প্রাণী কেমন নিঃসঙ্গ বোধ করছি।

ভদ্রলোক বাইরের দিকে চেয়েছিল জানলার বাইরে। বোধহয় বন্ধুবান্ধবরা সি অফ করতে এসেছিলেন, তাদের হাত নেড়ে সাড়া দিতে গেছলেন। ফিরে এদিকে চাইতেই অবাক হই।

—কল্যাণ না?

কল্যাণও চমকে উঠেছে—তুই! এদিকে কোথায় এসেছিলি?

কল্যাণ এসে এপাশে আমার বার্থটায় বসে শুধোয় অনেক কথা। কারণ আজকের এই দেখাটাও ঘটেছে দুজনের মধ্যে অনেকদিন পর। তাই এতদিনের জমে থাকা অনেক প্রশ্ন আর খবরগুলো ঠেলে উঠেছে।

কল্যাণ বলে চলেছে—কলেজের দিনগুলোই ভালো ছিল, ভাবনা চিন্তা নেই। অবশ্য এখন তো খুব নাম-ডাক তোর, কাগজে বইপত্রে ম্যাগাজিনে অনেক লেখাই পড়ি। তুই তবু বেশ আছিস—আর বুঝলি একঘেয়ে জীবনের যোয়াল টেনে হাঁপিয়ে উঠেছি।

কল্যাণের মুখচোখে ক্লান্তির ছায়া, ওকে কলেজের পড়া শেষ হবার পরও দেখেছি। খেলাধুলোয় সে ছিল অন্যতম পাণ্ডা। নিজেও ভালো ব্যাট করতো। চোখেমুখে স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য। আর ওর সেই সুন্দর স্বাস্থ্যটায় কেমন ভাঙ্গন ধরেছে। ফর্সা সুন্দর চেহারা ছিল ওর—আমরা কলেজে ওকে বলতাম রাজপুত্তুর। বলি, অনেক বদলে গেছিস তুই। স্বাস্থ্যও তেমন নেই—ওপাশের মহিলাটি চুপ করে আমাদের কথা শুনছিল। কল্যাণও এতদিন পর দেখা হতে যেন কি একটা অবলম্বন পেয়েছে এই ভেবেই সব ভুলে আমার সঙ্গে কথাই বলে চলেছে। ওই শরীর খারাপের কথা শুনে মেয়েটি কি দরদভরা চাহনিতে চাইল আমার দিকে। ওরও যেন অনেক অনুযোগ রয়েছে কল্যাণের এই শরীরের প্রতি অযত্ন করার জন্যই। ওই চাহনিতে লুকিয়ে আছে কি উৎকণ্ঠা আর ব্যাকুলতা সেটা আমারও দৃষ্টি এড়ায়নি। মেয়েটি বলে,

—কথাটা আপনার বন্ধুকে বলুন, শরীরেরও যত্ন নিতে হয়। মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠস্বর, ওর গলার স্বরে একটা মাধুর্য আছে, তার সঙ্গে ব্যাকুল ভাবনার ছায়া পড়ে তাকে আরও সুন্দর করে তুলেছে। কল্যাণ হাসল। সেইই পরিচয় করিয়ে দেয়।

—শীলা রায়। এখানকার রেল অফিসে কাজ করেন। শীলা, আমার বন্ধু—

বন্ধুবান্ধবদের দেওয়া কতকগুলো অপবাদ আমার আছে, অর্থাৎ উনি অমুক—তমুক ইত্যাদি, যেগুলো নেহাৎ বন্ধুকৃত্য বলেই ওরা করে থাকেন, আমার সেগুলো ভালো লাগে না। তাই নিজেই আমার নামটা জানিয়ে দিই।

ভদ্রমহিলা তবু যেন কিছুটা পরিচয় পেয়েছেন—তাই একটু কৌতূহলী চোখে আমাকে দেখছেন। ক্রমশঃ সেই কৌতূহলটা সহজ হয়ে আসে। দুহাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বলে,

—দেখা হয়ে ভালোই হল, খুব ভালো হল। ব্যাপারটা বুঝলাম না যে কেন হঠাৎ ওরা দুজন বিশেষ করে এই অপরিচিত মেয়েটিও খুশী হল। সে গলা নামিয়ে কি বলছে কল্যাণকে। কল্যাণও কি জবাব দিতে মেয়েটি লজ্জা বোধ করে মৃদু আপত্তি তুলছে।

এটা ওদের দুজনের নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার। জীবনের এই অদেখা স্বপ্নজগৎ সম্বন্ধে আমার নিজস্ব কোন ধারণা নেই। তবু এই হাসির আভাষ, চোখের সলজ্জ চাহনি মেয়েটির মনের নীরব কামনাকে সোচ্চার করে তুলেছে। কল্যাণকে কেন্দ্র করে তার এই স্বপ্নজগতের পরিচয় আমার কাছেও অজানা নেই।

অন্ধকারে গাড়িটা ছুটে চলেছে—দিনের আলো মুছে মুছে আকাশ জুড়ে অন্ধকার নেমেছে—গ্রাম জনপদ আর দু-চারটে নির্জন ঝাঁকড়া আঁধারজড়ানো আমগাছের জটলা পার হয়ে গাড়িটা চলেছে কোন দূর পথে, তারাগুলো জ্বলছে—ভীরু চাহনি মেলে। ওই শীলার চোখের তারাগুলোয় তেমনি আশার দীপ্তি ফুটে উঠেছে।

ব্যাগ খুলে একটা ছাপানো চিঠি বের করে সেই-ই এগিয়ে দেয়— বাড়ি গিয়ে নেমন্তন্ন করাই রীতি—

হাসলাম—বাড়ি আমার নেই। হোটেলেই পড়ে থাকি।

শীলা আমার দিকে চাইল। মেয়েদের চোখের এই চাহনি আমি জানি। ওরা বোধহয় আমার জন্যও একটু অনুকম্পা বোধ করে—কারণ আমার নাকি একটু আশ্রয় নেই, আপনজনও নেই।

একক—নিঃস্ব একটি মানুষের জন্য ওদের মমতা ঝড়ে পড়ে। আর তার তুলনায় ওরা নিজেদের ভাগ্যবান-ভাগ্যবতী বলে ভেবে মনে মনে কিছুটা আনন্দও পায়।

শীলা কুণ্ঠিত স্বরে কার্ডখানা হাতে দিয়ে বলে।—আপনাকে পরশু সন্ধ্যায় আসতেই হবে। ওরও বন্ধু—আমারও দাবী তাই আছে আপনাকে নিমন্ত্রণ করার।

কল্যাণকে নিয়েই ওর সব স্বপ্ন। ওরা দুজনে ঘর বাঁধছে। ওর সুন্দর ফর্সা নিটোল মুখখানা কি লজ্জায় আর আনন্দে টসটসে হয়ে উঠেছে। কথা দিই—যাবো।

এর মধ্যে শীলা টিফিন বাস্কেট থেকে টোস্ট কলা বের করেছে, ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে এগিয়ে দেয়।

—নিন।

একটু কুণ্ঠিত হই—আবার এসব কেন?

শীলা শোনায়—রাতের খাবারও সঙ্গে হয়েছে। ওই রেলওয়ে ক্যাটারিং-এর খুপরী কাটা চৌকো ট্রেতে করে কাঙগালী বিদায়ের মত দুমুঠো ভাত—ছ্যার-ছোরে ডাল আর লাউ-এর সবজী—পাঁপড় সেঁকা খেতে পারবেন না।

পথে বের হয়ে অপরের ঘাড়ের উপর দিয়ে এসব চালানো বিশ্রী ঠেকে।

তাই বলি, তুমি আবার এসব হাঙ্গামা করবে কেন? পথের পরিচয়, তবু শীলাকে ভালো লাগে। সহজেই আপন করে নিতে জানে ও। মিষ্টি স্বভাব। শীলা বলে—

—আপনার জন্যে তো নোতুন করে কিছু করতে হবে না। জানেন—ও বলে আমি নাকি একদম বাজে রান্না করি। আজ খেয়ে কিন্তু বলতে হবে—

—সর্বনাশ, আমাকে আবার রায় দিতে হবে নাকি?

শীলা হাসছে আমার কথায়। মিষ্টি ওর হাসিটুকু। মনে হয় অনেক কষ্টে মানুষ হয়েছে। জীবনের দুঃখ বেদনাটাকেই দেখেছে বড় করে। আর সেই বেদনা যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখেছে ওই কল্যাণকে কেন্দ্র করে।

কল্যাণ কিন্তু কেমন যেন এড়িয়ে চলেছে, মনে হয় আমার কাছে কল্যাণ তার এই দুর্বলতার কথা প্রকাশ করতে চায়নি।

কিন্তু তার খুশীর খবর শীলা প্রকাশ না করে পারেনি, তার মনের আনন্দ আর তৃপ্তির স্বাদ সে আমাকেও পেতে দিয়েছে।

—এখানে কতোদিন আছো? শুধোলাম শীলাকে।

কল্যাণও রেলে কাজ করে, ওর পোস্টিং এখন দ্বারভাঙগায়।

আগে যখন সমস্তিপুরে ছিল তখনই দুজনের পরিচয় নিবিড়তর হয়ে ওঠে।

শীলা বলে—তা বছর পাঁচেক হবে। এইখানেই প্রথম এ্যাপয়েন্টমেন্ট আমার, উনি তখন সমস্তিপুর রেল ক্লাবে জমিয়ে বসেছেন।

শীলা বলে চলেছে—মাকে নিয়ে বাংলার বাইরে প্রথম এলাম। মামা বাধা দিয়েছিল, মায়েরও মত ছিল না। কিন্তু মামার গলগ্রহ হয়ে কতোদিন থাকবো? তাই চাকরীটা নিলাম।

কল্পনা করতে পারি—অজানা একটি মেয়ে প্রথম এইখানে এসে নানা অসুবিধায় পড়েছে। বিদেশ বিভুঁই জায়গা। বাজার-হাট করা—দোকান পশারে যাওয়াও সমস্যা। নোতুন পরিবেশে এসে মেয়েটি দিশাহারা হয়ে যায়।

শীলা বলে—উনিই সে সময় যথেষ্ট করেছিলেন। উনি না থাকলে আমাকে বোধহয় চাকরীতে রেজিগনেশন দিয়ে আবার বেকার নিরাশ্রয় হয়ে কলকাতায় মামার ওখানেই ফিরতে হতো।

শীলার মুখচোখে কৃতজ্ঞতার ছায়া ফুটে ওঠে। শান্ত সুন্দর মেয়েটি। তাই বোধহয় কল্যাণের আরও কাছে এসেছিল। তার মধ্যে আবিষ্কার করেছিল নির্জন নিঃসঙ্গ একটি মানুষকে যে বাংলা দেশ থেকে দূরে এই নির্বাসন মেনে নিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

ট্রেণের এই কোচের মধ্যে এতক্ষণ যেন কলরব উঠেছিল। বিদ্যার্থীর দল বস্তা বস্তা চাল তুলছিল, আবার নেমেও যাচ্ছিল কোন ষ্টেশনে।

বারৌনী জংশন আসতে ওরা অনেকেই নেমে গেছে বিদ্যাভ্যাস-এর পর্ব আজকের মত চুকিয়ে দিয়ে। তাই শান্তি নেমেছে কামরায়। ষ্টেশনের নিওন লাইট-এর ঝকমাক তোলা প্লাটফরমের ওদিকে মিটার গেজের কোন এক্সপ্রেস ট্রেণ দাঁড়িয়ে আছে। আসামের দিকে যাচ্ছে ওটা। ঠাস বোঝাই ওই গাড়িটা যেন দম নিচ্ছে। আমাদের গাড়িটা ষ্টেশন থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলে, বারৌনীর অয়েল রিফাইনারীর আলোগুলো অন্ধকারে ঝকমক করে। সামনে গঙ্গার বিস্তীর্ণ জলধারার বুকে চাঁদের আলোর তুফান নেমেছে, মুঠো মুঠো ঝকঝকে জলকণা ছিটিয়ে পড়ছে ঢেউ এর মাথায়।

শীলা খাবার আয়োজন করে নিপুণ হাতে। এক ধরণের মেয়েদের দেখেছি যারা অপরের সেবা-যত্ন করতে পেলে খুশী হয়। এরা নিজের জন্য বিশেষ চিন্তিত নয় অপ-রের জন্য বেশী ব্যস্ত। শীলা যেন কতো-দিনের চেনা।

—নিন।

প্লাস্টিকের প্লেটে-এ লুচি আলুর তরকারী, পটল ভাজা আর কালাকাঁদ সাজিয়ে দিয়েছে। কল্যাণও ওপাশে বসে চুপ করে খেয়ে চলেছে।

—দাদা, আর দুটো লুচি দিই? তর-কারী! শীলা আবদার জানায়।

—না-না। আপত্তি জানাই। শীলা নিজেই বলে—ওই তো খাবার, এতে কি পেট ভরে? তোমাকে দিই একটা কালাকাঁদ?

তার আগে আমার পাতেও দুটো সন্দেশ দিয়ে দিয়েছে। বাধা দেবার চেষ্টা করি—কতো খাবো?

—কতো না খাচ্ছেন? মাছ টাছ নেই। বুঝলেন, মাছটা এখানে ভালো পাওয়া যায়। নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে আনলাম না। যদি জানতাম আপনার দেখা পাবো তাহলে—

—আনতে! ওরে বাবাঃ। নাজেহাল করে ছাড়বে দেখছি।

কল্যাণ বলে—ওর সঙ্গে পারা দায়।

শীলার চোখের তারায় দুষ্টুমিভরা হাসির ঝলক উল্সে ওঠে—খুব জ্বালাই তোমাকে, না? তুমিই কোনো কথা শোন না। বলুনতো দাদা, যদি ওকে বলি ঠাণ্ডা লাগিয়ো না, উনি ইচ্ছে করে ঠাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর বাধাবেন। ওষুধ খেতেও মন নেই; বলুন, ও রইল দ্বারভাঙ্গায় আমি

কতো দৌড়বো সেখানে কাজ ফেলে? ও কি শান্তি দেয় আমায়? আবার উল্টে আপনাকে লাগানো হচ্ছে—আমি ওকে জ্বালাই।

শীলার কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে ওঠে। কল্যাণ হাসবার চেষ্টা করে। শীলার মনের গভীরে এই উৎকণ্ঠা আমার দৃষ্টি এড়ায় না। মনে হয় শীলার এই স্বীকৃতিতে কোথাও কৃত্রিমতা নেই। কল্যাণকে বলি—এ তোমার অন্যায় কল্যাণ। ওর কথাও এবার ভাবতে হবে।

শীলা খুশি হয়—সেই কথাটাই বোঝান ওকে। আপনি তো অনেক দেখেছেন, লেখকদের মনস্তাত্বিকও হতে হয়, ওর মনের খবর যেন এতদিনেও জানলাম না। মাঝেমাঝে মনে হয় কোথায় যেন উনি খুশী নন। এড়াতে চান। আর আমারই যতো জ্বালা—

ওদের ব্যক্তিগত এই মান-অভিমানের মধ্যে আমিও জড়িয়ে পড়েছি। ভালো লাগে এইটুকু, এ যেন জীবনের একটি স্বপ্নের প্রকাশ। বহু বর্ণে এ বিচিত্র আলো-ছায়ার আলো আঁধারিতে এই চেতনা রহস্যময়। শীলার জীবনের সেই কামনার সুর মনকে নাড়া দেয় গভীর সমবেদনায়। ওকে অস্বীকার করতে পারি না। একজনের জন্য এই আর্তিকে ভালবাসাই বলবো আমি।

পথ-চলতি জীবনে এর সন্ধান পেয়েছি—যা মনকে গভীর একটি তৃপ্তিতে ভরে দেয়। কল্যাণ এতদিন লক্ষ্যভ্রষ্টের মত ঘুরেছে। আজ তবু ঘর বেঁধে শান্তি পাক সে।

কল্যাণ খেলাধুলোর জন্যই চাকরী পেয়েছিল। ওর আশা ছিল ভারতের মধ্যে নামকরা খেলোয়াড় হবে। তার জন্য অনেক সাধনা আর ত্যাগ ও স্বীকার করেছিল। কিন্তু সব চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছল সে। তাকেও ভুলে গেছলাম।

আজ মনে হয় ব্যর্থ শূন্য জীবনে অন্ততঃ এক জায়গায় কল্যাণ সার্থক হয়েছে। তবু শীলার মত মেয়েকে নিয়ে সে সুখী হবে। ওদের সেই সুন্দর দিনগুলোর কল্পনা করে তৃপ্ত হই।

যেখানে আমার কোন স্বার্থ নেই—সেখানেও খুশী হতে পারে মন। কারণ জীবনের সুন্দরতম প্রকাশ দেখলে সকলেই খুশী হয়. নাই বা হ'ল তা আমার নিজের জীবনে সত্য, তবু সেই আশ্বাসের অস্তিত্ব আছে এখনও এই কঠিন পৃথিবীতে, এই কথাটি জেনে খুশী হই।

কিন্তু বেদনা যে এখানে আরও ব্যাপক আরও কঠিন এবং সামগ্রিক তা জানতাম না। আলোর পাশেই থাকে অন্ধকার। আলোর স্বপ্ন যদি সত্য—অন্ধকারের অস্তিত্বও মিথ্যা নয়। এই দুয়ের মাঝে মানুষ তার জীবন-এর বোঝা বয়ে চলেছে। এ পথের শেষ নেই, এ চলার শ্রান্তি নেই। তবু চলতে হবে তাকে। আশ্বাস-সান্ত্বনা ওসব ব্যর্থ হয়ে যায়, কোন পাওয়ার অধিকারও তার নেই। সে ওই চির-অন্ধকারে নির্বাসিত। আলোর ফেরার পথ তার জানা নেই।

রাত হয়ে গেছে। আঁকাবাঁকা জঙ্গল ছাড়িয়ে ট্রেণটা চলেছে কলকাতার দিকে। ক্যাপের আলোটা নিভিয়ে নাইট ল্যাম্প জেবলে দিয়েছি। নীলাভ অস্পষ্ট আলো লাল ক্যাপের রং-এর সঙ্গে মিশে আঁধারকে ঘনতর করে তুলেছে। শীলা সব গোছগাছ করে শুয়ে পড়েছে। ওদিককার আপার বার্থে আমার চাদরটা পেতে বালিশ দিয়ে সেই-ই বিছানা করে দিয়েছে।

কয়েক ঘণ্টার পরিচয়—মনে হয় ও যেন আমার কতো আপনজন। অ-কারণেই ফুলুর কথা মনে পড়ে। আমার ছোট বোন। অমনি দেখতে, আর দুহাতে কায করতো। পড়াশোনাতেও ছিল চৌকস। আমার জীবনেও ছিল একটি কেন্দ্র-বিন্দু। হঠাৎ ফুলুও চলে গেল। অনেকদিন আগেকার কথা—তবু আজ এই অন্ধকারে তারাজ্বলা রাতে অচেনা অজানা পথের ধারে তাকে মনে পড়ে—মনে হয় আমিও নিঃসঙ্গ হয়ে গেছি।

হঠাৎ ফুলুকেই দেখেছি ওই শীলার মধ্যে। ও সুখী হোক।

এরমধ্যে ওর নিজের অনেক পরিকল্পনার কথাই বলেছে শীলা। বিয়ের পর কলকাতাতেই পোস্টিং হবে তার, আর কল্যাণকেও সে নিয়ে আসবে তার মামারই কলেজে। ইকনমিক্সে এম-এ, ওখানের রেলওয়ে স্কুলে পড়ে পড়ে পচবে কেন? ও চাকরী ছেড়ে দিয়ে ওরা কলকাতায় বাস করবে।

সহরতলীতে একটা ছোট্ট বাড়ি নেবে, শীলা বলে।

—আপনিও কথাটা বলবেন ওকে। জানেন বড় একগুঁয়ে ও। মানুষটা যেন একেবারে লাগাম ছেঁড়া—

হাসি ওর কথায়। জানাই,

—এবার ঠিক ধাতস্থ হয়ে যাবে।

শীলা হাসল, সলজ্জ মিষ্টি একটু হাসি। কল্যাণও শুনেছিল কথাটা।

শীলা ঘুমিয়ে পড়েছে। সারাদিন খাটাখাটুনি গেছে। আর ওর মনে এখন প্রগাঢ় প্রশান্তি রয়েছে তাই ঘুম নামে।

করিডরে দাঁড়িয়ে আছি, কল্যাণকে দেখে চাইলাম। ওর মুখে-চোখে একটা থমথমে ভাব। শীলার মনের খুশির ঔজ্জ্বল্যের কোন ছায়া তার মুখে নেই।

কল্যাণ এগিয়ে আসে।

ওপাশে কালো সীমাপ্রচীরের মত পাহাড়ের রেখা দেখা যায়, তারাগুলো জ্বলছে—নির্জন নিঃসঙ্গ অন্ধকারে ট্রেণটা চলেছে পথহারা যাত্রীর মত।

কল্যাণ কি যেন বলতে চায়। ওর চোখে-মুখে বেদনার আভাষ। অন্ধকারের বুকে কি যন্ত্রণার আর্তি ওর কণ্ঠস্বরে। বলে সে,

—সব মিথ্যে হয়ে যাবে সমীর। ও জানে না—বারবার বলবার চেষ্টা করেছি, নিষেধ করেছি ওকে। তবু ও কোন কথাই শুনবে না।

ওর দিকে চাইলাম। কল্যাণ বলে,

আমি টিবিতে ভুগছি অনেকদিন। সেরে উঠেছিলাম—কিন্তু ডাক্তার বলেছে আবার রিলাপ্স করেছে।

কথাটা শুনে চমকে উঠি। কল্যাণ অসুস্থ—মারাত্মক রকম অসুস্থ, ওর বুকটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে বোধহয়। তবুও সে বিয়ে করতে চলেছে। শীলার মত সুন্দর ভদ্র-মিষ্টি একটি মেয়ের ভবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। এই কল্যাণকে ক্ষমা করতে পারি না। শীলার জন্য বেদনা বোধ করি। কল্যাণ একটা ঠগ—প্রতারক। সে ওই নিরপরাধ মেয়েটাকে ঠকাতে এতটুকু দ্বিধা করে নি। তবু শুধাই তাকে।

—শীলা এসব কথা জানে?

কল্যাণও আমার দিকে চেয়ে থাকে ও বোধহয় দেখেছে আমার মুখ-চোখে নিদারুণ ঘৃণার ছায়া। ওর এই ঘটা করে বিয়ে করার সাধ একটি মেয়েকে তার সব স্বপ্ন নিয়ে ব্যর্থ হয়ে যাবার পথে ঠেলে দেওয়ার লোভ-

লালসা কোনটাকে সমর্থন করতে পারি নি আমি। তাই ওই প্রশ্ন করেছি।

রাতের অতল অন্ধকারে ট্রেণটা ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে। মনে হয় এইবার যেন হুড়মুড়িয়ে পড়বে—চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আমরা সবাই মুখ বুজে তেমনি এক সর্বনাশের প্রতীক্ষা করছি। লালচে ম্যাগনেট পার্টিশান দেওয়ালগুলো রাতের আলোয় কেমন বিভৎস্য নিষ্ঠুর একটা ছবিকেই বারবার মনে করিয়ে দেয়।

কল্যাণ জবাব দিল—ও জানে যে আমি এক্স টি-বি পেসেন্ট। এককালে ওই রোগ আমার হয়েছিল। পরে সেরে উঠেছি।

—তারপর আবার সেই রোগে পড়েছো তা জানে না? শুধোই তীক্ষ্ণকণ্ঠে কল্যাণকে।

কল্যাণের মুখে-চোখে কি মলিন হতাশার ছায়া। ও প্রথম থেকেই এড়িয়ে চলছিল আমাকে—শীলাকেও। শীলাই আমাকে জানাতে চেয়েছিল তার জীবনের এই চরম সৌভাগ্যের কথা। এতদিন ধরে নিঃসঙ্গ একটি মেয়ে চেয়েছিল কাউকে ভালোবেসে ধন্য হতে পূর্ণ হতে।

আজ সেই প্রতীক্ষিত মুহূর্ত এসেছে তার জীবনে—এই পরম আনন্দের সংবাদ দিয়েছে আমায় আপনজন ভেবে। কিন্তু শীলা জানে না যে মাটিতে সে ঘর বাঁধার স্বপ্নে এতো আনন্দিত হয়েছে—সেটা মাটি নয়, চোরাবালি, সে ঘর যে-কোন মুহূর্তে অতলে তলিয়ে যাবে।

কূপের ভিতর ম্লান নীল আলোর আভা পড়েছে শীলার সুন্দর ঘুম-ঘুম ভরা মুখখানায়। ও বোধহয় স্বপ্ন দেখছে—তার জীবনের পূর্ণতার স্বপ্ন। একটি ছোট বাড়ি—দুজনে ঘর বাঁধবে। সে আর কল্যাণ! তার নিঃশেষ সেবা আর ভালোবাসা দিয়ে ওরা দুজনের শূন্য জীবন পূর্ণ করে তুলবে।

কল্যাণও হয়তো একদিন সেই আশা নিয়েই এগিয়েছিল। আজ তার বেদনাকে আমি বুঝিনি। শীলার কথাই ভেবেছি—ভেবেছি তার দুর্ভাগ্যের কথা। কল্যাণ পকেট থেকে খামখানা বের করে এগিয়ে দিল। ধরা-গলায় বলে,—কথাটা জানাবার চেষ্টা করেও পারিনি। ও নিজেই বিয়ের দিন ঠিক করে ওর মাকে জানিয়েছে। কলকাতায় চলেছে সেই জন্যই। আর আমি! পড়ে দেখো সমী, আমার সেই দিন কোথায় আমন্ত্রণ রয়েছে।

লেডি লিনলিথগো স্যানাটোরিয়াম কসৌলি থেকে ওর সিটের ব্যবস্থা করে চলে যাবার জন্য নির্দেশ দিয়েছে সেখানকার কর্তৃপক্ষ।

একদিকে জীবনের পরম শুভ-লগ্ন—অন্যদিকে ওই রোগজীর্ণ পরিবেশে অসুস্থ রুগ্ন একটি মানুষের হারিয়ে যাবার নির্দেশ। এই বেদনার মুখোমুখি হয়ে আমিও স্তব্ধ—নির্বাক হয়ে গেছি। কল্যাণ হাসছে। নিষ্ঠুর পরিহাস ঘিরে রয়েছে ওর জীবনকে; সবকিছুর সন্ধান পেয়েও—তাকে গ্রহণ করার সাধ্য তার নেই। কল্যাণ বলে—আমিও ভেবেছি সমী, শীলা দুঃখ পাবে—হয়তো ঘৃণা করবে, অবিশ্বাস করবে আমায়। কিন্তু এ ছাড়া আমার পথ নেই। হয়তো আর ফিরবো না—তবুও চাইবো শীলার এই মিথ্যা স্বপ্ন দেখার শেষ হোক। নিজের স্বার্থে ওর মতো মেয়ের সর্বনাশ করা পাপ।

এই কল্যাণকে নোতুন করে চিনছি। ও ভিতরে গিয়ে সুটকেশটা সাবধানে বের করে করিডোর নিয়ে এসে দাঁড়ালো। রাত তখন অনেক। ট্রেণটা বোধহয় জসিডির কাছে এসেছে। থামবে দু-চার মিনিটের জন্য।

—কল্যাণ!

ও হাসলো—বাধা দিও না সমী, আমি এইখানেই নেমে 'আপের' ট্রেনে কশৌলির দিকে চলে যাচ্ছি। শীলা তোমাকেও শ্রদ্ধা করে—আমার অবস্থার কথ সব জানিয়ে ওকে চিঠিও দিয়ে গেলাম। তুমিও বলো।

ধরা গলায় জানায় সে। তুমি না উঠলেও আমাকে এই পথই নিতে হতো। তবু অনেকদিন পর দেখা হল, মনে হল বাঁচার দিন আর নেই, তাই একটু সময়ের জন্য সারাজীবনকে ভালো লাগলো সমী। শীলাকেও। কিন্তু—

পয়েণ্টের মুখে শব্দ তুলে ট্রেনখানা দাপাতে দাপাতে প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ালো। জনহীনপ্রায় ষ্টেশন, দু'একটা ঘুমজড়ানো মুখ নিরাসক্ত চাহনিতে ধাবমান জীবনস্রোতের দিকে যেন চেয়ে আছে।

কল্যাণ-এর শক্ত মাংসবিহীন হাতটার নিবিড় স্পর্শ আমার হাতে, কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে প্লাটফর্মে নেমে সে হারিয়ে গেল। ডাকতে গিয়েও পারলাম না। ওকে ফেরানো যাবে না—তা জানতাম। শীলার দিকে চেয়ে থাকি, নিজেকেই দোষী মনে হয় এই নাটকীয় ব্যাপারটার জন্য। ওদের এই বেদনাময় জীবনের একটি নিষ্ঠুর আঘাতের মাঝে আমিও হঠাৎ যেন একটা প্রতিপক্ষ হয়ে গেলাম।

খেয়াল হয় ট্রেনটা চলছে। কল্যাণ নেই—সে আর আসবে না। হয়তো শীলার সঙ্গেও তার শেষ দেখা। কারণ ওর দুটো লাংস্‌ই জখম হয়ে গেছে। সুস্থ হবারও আশা নেই।

শীলা ঘুমের ঘোরে কি যেন বিড় বিড় করে বলছে। ওর ঘুমজড়ানো মুখে জেগে উঠেছে একটি প্রশান্তি। ও জানে না জীবনের এই কঠিন বাস্তবকে, হয়তো তারই আঘাতে শিউরে উঠবে অসহায় ওই মেয়েটি।

সেই দৃশ্যটাকে জোর দিয়ে ভাবতে পারি না। ওর এই সর্বনাশের জন্য আমিই যেন দায়ী। ও ভাববে, কল্যাণকে আমিই সব শুনে নিরস্ত করেছি এই বিয়ে করার ব্যাপারে। হয়তো আরও কিছু ভাববে!

আমার সামনে কালো অন্ধকার শুধু জমাট বেঁধে রয়েছে।

....

—থান! হাত গুটিয়ে রইলেন যে দাদা!

কলকলিয়ে ওঠে শীলা। আজ ওকে দেখে মনে পড়ে আমার বোন ফুলুর কথা। ঠিক অমনি সুন্দর আর বড় বড় টানা টানা ছিল তার চোখ দুটো, শীলা ওপাশে দামাল খোকাকে সামলাবার চেষ্টা করে!

—বাইরে যেও না।

পরক্ষণেই ওর স্বামীকে অনুযোগ করে।

—কিছুই খাচ্ছো না তুমি। পৌঁছবে সেই সকালে—গাড়িতে না খেলে ঠকবে কিন্তু। দাদা—দুটো কালাকাঁদ দিই? সমস্তিপুরের কালাকাঁদ খুব ফেমাস্।

ঘটনার অনেক মিল আছে সেই পাঁচ বছর আগেকার এমনি একটি রাতের ঘটনার সঙ্গে। পাঁচ বছর পর হঠাৎ দ্বারভাঙায় এসেছিলাম। সাহিত্য-সভা করে ফিরছি সেই ট্রেনেই।

আজ শীলাকে দেখে চিনেছিলাম। মুখ-চোখে পূর্ণতার শ্রী। বিয়ে-থা করে আজ সুখী হয়েছে। স্বামী—ওই খোকন নিয়ে কলকাতা চলেছে।

—ওমা! আপনি? সহজ হৃদ্যতাপূর্ণ কণ্ঠে ওর সাড়া ওঠে। এগিয়ে এসে প্রণাম করে কলকণ্ঠে স্বামী বেচারাকে ডেকে এনে পরিচয় করিয়ে দেয়।

—আমার দাদা!

ওর নোতুন সংসারের দিকে চেয়ে থাকি। শীলা সুখী হয়েছে। ট্রেনখানা চলেছে। শীলার সংসারের কথা শুনেছি। ওরা ফুলুর মতই। মনে পড়ে একজনের কথা, সে আর ফেরেনি। কল্যাণ কসৌলিতেই মারা গেছে কয়েক বছর আগে। তবু মনে হয়, এমনি রাতের ঘুমঢাকা অন্ধকারে সে একদিন শীলার জীবন থেকে সরে গেছল। হারিয়ে গেছল। আর ফেরেনি।

আমিও সেই বেদনার মুহূর্তকে আজ স্মরণ করি। ভালো লাগে আজ কল্যাণের কথা ভাবতে। শীলাকে সে ভালোবেসেছিল।

অঞ্জলি চৌধুরী

পৃথিবীর ইতিহাসে চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের একটি সুষম সামঞ্জস্য খুব অল্পই দেখা যায়। এই সমন্বয় যে এক পূর্ণাঙ্গ স্থাপত্য সৃষ্টি করতে পারে তাই অজন্তাতে অতি সুন্দরভাবে সুরোপিত হয়েছে—হ্যাভেল সাহেবের অজন্তার এই অনুভূতি গাইড ভদ্রলোক টেনে টেনে বিশ্লেষণ করে চলেছেন। বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি। যেন শুনতে পাচ্ছি অতীতের সেই মুনি-ঋষিদের স্তোত্রপাঠ।

টর্চের আলোটা ঠিকরে গিয়ে পড়লো 'পদ্মপাণি' বোধিসত্ত্বের মুখটিতে। আবার সেই স্বর শুনলাম—অজন্তার সর্বোৎকৃষ্ট ছবি। মাননীয় দর্শকবৃন্দ আমার কথা শুনুন'। উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইলাম, শ্রবণেন্দ্রিয়কে আরও তীক্ষ্ণ করে সজাগ প্রহরীর মত সতর্ক হয়ে উঠলাম। একবার জোরে বলে উঠলাম, 'আবার বলুন'।

সব স্তব্ধ। এবার গাইড ভদ্রলোকের নির্দেশে লাইটম্যান বৈদ্যুতিক আলোটা ঘুরিয়ে সমস্ত ছবিটার মধ্যে ফেললো। ছবিটা চক্‌চক্‌ করে উঠলো, বোধিসত্ত্বের ঠোঁটটা যেন নড়ে উঠলো। আর নড়ে উঠলো আমাদের পথপ্রদর্শকের কণ্ঠস্বর "বোধিসত্ত্ব অর্থ বুদ্ধত্বের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অবস্থা।" অসীম আগ্রহ নিয়ে শুনেছি। কতদূরে থেকে সব ছুটে গিয়েছি অতীতের সেই অনামী শিল্পীদের হাতেগড়া মানস দেব-দেবীদের প্রত্যক্ষ করতে। আবার চুপচাপ।

মনে পড়লো সুভাষ, কমল, গৌরী, সুমিতা আগের রাত্রে কত জল্পনা-কল্পনাই না করেছিল। পরদিন ভোরে বাস ছাড়ার প্রায় ঘন্টা দেড়েক আগে আমরা সকলে গিয়েই হাজির হয়েছিলাম টার্মিনাসে।

'ছবিখানির শোভায় গুহামন্দিরটি সম্পূর্ণ আলোকিত'—মৃদু হাসিতে ভরে গেল গাইডের মুখটি। প্রত্যক্ষ করলাম বোধিসত্ত্বের মণিখোচিত সোনার মুকুট সন্নিবিষ্টত শিল্পীর দক্ষতা। শিল্পী এখানে হালকা হলুদ রং-এর সার্থক প্রয়োগ করে সমস্ত ছবিটার মধ্যে অপূর্ব এক স্নিগ্ধতা এনেছেন। অর্ধনিমীলিত চোখের দৃষ্টি, নাক, মুখ, ঠোঁট ও চিবুকের গড়নে এক রমণীয় স্বর্গীয়ভাব ব্যক্ত হয়েছে। সমস্ত মূর্তিটির মধ্যে অলঙ্কারের বাহুল্য নেই উপরন্তু কাঁধের মণিময় উপবীত ও কণ্ঠের হারের অবস্থানে তাঁর পবিত্র দেহের শোভা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। ডান হাতে পদ্মফুল এমন আলতোভাবে ধরা যে হাতখানিও পদ্মের মত পেলবতায় পূর্ণ। বোধিসত্ত্বের মূর্তির সহকারী মূর্তি তুলনায় অনেক ছোট। পটভূমিকার স্নিগ্ধ হালকা সবুজ রং-এ সমস্ত ছবিটিতে এক সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বের অবনত দৃষ্টি জগতের দুঃখে, বেদনায়, করুণায় বিগলিত ও গভীর চিন্তায় মগ্ন। এই মূর্তিটি শিল্পশাস্ত্রের সকল অনুশাসন (পঙ্কতুন্ডাকৃতিং, সিংহকটি বালকদলী-কাণ্ডম্) প্রভৃতি মেনেই তৈরী করা হয়েছে। পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব অজন্তার শাশ্বত লেখনীর চরম প্রকাশ। কি রং-এ, কি রেখা-বিন্যাসে, কি চিত্রসজ্জায়, কি ঐশ্বরিকভাবের প্রেরণায়—এই রকম ছবির তুলনা জগতে আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ।

একটু এগিয়ে গিয়ে প্রবেশপথের ঠিক উল্টোদিকে ছোট একটি কামরার মধ্যে দেখলাম বিরাট আকারের বুদ্ধমূর্তির বসার ভঙ্গি পদ্মাসন। ভাস্কর্যের এত সুন্দর নিদর্শন অজন্তায় আমার আর বিশেষ নজরে পড়ে নি। প্রথাগত রীতিতে মাথায় কুঞ্চিত কেশদাম। মস্তকের পশ্চাতে জ্যোতিচক্র বা প্রভামণ্ডল। জ্যোতিচক্রের দুপাশে উড়ন্ত মূর্তি দুটির হাতে মালা। বুদ্ধমূর্তির দুপাশে চামরধারী দুটি মূর্তি রয়েছে। মূর্তিটির বেদিকগাত্রে পাঁচজন পুরুষমূর্তি (কাশ্যপ ব্রাহ্মণ), একজন নারী ও শিশু, ঠিক মাঝখানে চক্র (ধর্মচক্র) ও তার পাশে দুটি হরিণ। বেদিকার মূর্তিগুলি দেখলে সারনাথের মৃগদাব উদ্যানে বুদ্ধদেবের সর্বপ্রথম ধর্ম-প্রচারের কাহিনীটি মনে পড়ে। বিভিন্ন স্থান থেকে আলো ফেলে মূর্তিটির ঠোঁটের শান্ত, সমাহিত, চিন্তাক্লিষ্ট ও মৃদুহাস্য প্রভৃতি ভাবের ব্যঞ্জনা অতিসুন্দরভাবে রূপায়িত করে শিল্পীরা শুধু নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যান নি, রেখে গেছেন ভবিষ্যতের মানুষের অপার্থিব চিরন্তন আনন্দের সঞ্চয়।

একে একে কয়েকটি প্যানেল দেখে মাঝামাঝি জায়গায় আসতেই গাইড টর্চের আলোটা ছুঁড়ে মারলেন পিলারের ওপরে চারিটি-দেহের-একটি-মাথা বিশিষ্ট হরিণের দিকে। সিলিং-এ আলো ঘুরিয়ে দেখালেন দুর্দান্ত দুটি ছাগল প্রবলবেগে যেন আমাদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কি জীবন্ত! কি রং-এর ব্যঞ্জনা, কি অঙ্কনবিদ্যার সূক্ষ্মতা—সে বুঝি চোখে দেখা ছাড়া ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না।

এতক্ষণ ঘুরে-ফিরে ১নং গুহামন্দিরটি থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। এক ঝলক সোনালী আলোয় চোখ দুটো যেন ধাঁধিয়ে গেল। গাইড বললেন, 'এবার আমরা যাব ২নং গুহায়।' উঁচুতে দূরে হাত বাড়িয়ে দেখালেন রেলিং-এ ঝুঁকে থাকা একদল অজন্তা অভিযাত্রী দলকে। মনে পড়লো আমরাও আসার সময় এমনি ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়ে শুনেছিলাম 'এবার আমাদের বাস

সিলিং-এর অলংকরণ

ঘুরে ঘুরে ঐ গুহাগুলোর সামনে যাবে। এখান থেকেই দেখে প্রথম অজন্তা গুহাগুলি আবিষ্কার করা হয়েছে।'

অজন্তার আবিষ্কার নিয়ে সুন্দর একটা ঐতিহাসিক সত্যতা আছে। ঔরংজেবের সৈন্যরা দাক্ষিণাত্য জয়ের পর ফেরার পথে এই গুহাগুলির কাছে বিশ্রাম করেছিল। ১৮০৩ খৃঃ লর্ড ওয়েলেসলীর সৈন্যরা আসাহী যুদ্ধের পর বিশ্রামের জন্য অজন্তা শহরে তাঁবু গেড়েছিল। এরপর ১৮১৯ খৃঃ কয়েকজন সামরিক অফিসার মাদ্রাজ থেকে শিকার করতে এসে এই জংগলে পথ হারিয়ে ফেলেন এবং বনের জন্তুদের ভয়ে রাত্রিতে যে কোন একটি গুহাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরদিন গুহাগুলির শিল্পকর্মে মুগ্ধ হয়ে উইলিয়াম এরিস্কিন নামক একজন অফিসার মাদ্রাজ সরকারকে জানান। জেমস ফার্গুসন, ডাক্তার গ্রিফিথ প্রমুখ শিল্পরসিক ও সমালোচকদের উৎসাহ এবং চেষ্টায় অজন্তা পৃথিবীর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। পরে নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, সমর গুপ্ত প্রমুখ শিল্পীদের দিয়ে অজন্তার চিত্রের অনেক প্রতিলিপি করা হয়েছে।

অজন্তার গুহাগুলি চৈত্যগুহা ও বিহার এই দু'ভাগে বিভক্ত। অজন্তাগুহার শিল্পকার্যগুলি দেখে সাধারণতঃ তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। ৯ ও ১০নং গুহা" গুলি প্রথম পর্যায়ের ও সম্ভবতঃ অন্ধ্র-রাজাদের সময় হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ের ১৬, ১৭ ও ১৯নং গুহার ছবিগুলি বাকাটক ও গুপ্তরাজত্বকালে তৈরী হয়েছিল। তৃতীয় বা সর্বশেষ পর্যায়ের ১ ও ২নং গুহার ছবিগুলি গুপ্তোত্তর যুগে চালুক্য রাজত্বের সময় তৈরী হয়েছিল। এর মধ্যে ৯ ও ১০নং সবচেয়ে পুরানো গুহা ও ১ ও ২নং গুহা সবচেয়ে পরে নির্মিত হয়েছিল।

অজন্তার ছবিগুলি খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক থেকে শুরু করে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতক পর্যন্ত আঁকা হয়েছিল। সুদীর্ঘ বছর ধরে যদিও ছবিগুলি আঁকা হয়েছিল, তবুও ছবি আঁকার কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে হয় নি। মাঝে মাঝে স্থগিত থাকার পরে আবার শিল্পকার্য শুরু হয়েছে।

এই গুহাগুলিতে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীরা সম্ভবতঃ উপাসনা ও বসবাসের জন্য ছবি আঁকার কাজ শুরু করেন। গুহাগুলি অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি ইন্দ্রিয়াদ্রি পাহাড়ে, ওয়াঘরা নদীর উপরেই এক মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। ৮, ৯, ১০, ১২ এবং ১৩নং গুহাগুলি হীনযান ও অন্যান্য গুহাগুলিতে মহাযান সম্প্রদায়ের প্রভাব পড়েছে। অজন্তার বর্তমানে ৩১টি গুহা আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে ৯, ১০, ১৬, ১৭ ও ১, ২নং গুহার কিছু কিছু ছবি অবিকৃত অবস্থায় আছে। অন্যান্য গুহার অধিকাংশ ছবিগুলিই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে অজন্তার ছবিগুলি ফ্রেস্কো আবার কেউ কেউ বলেন, ম্যুরাল পদ্ধতিতে আঁকা হয়েছে।

'এবার আসুন ২নং গুহায়'। সদলবলে গাইডের পিছন পিছন হাজির হলাম ২নং গুহায়। গুহাটিতে নানারকম জাতক কাহিনী প্যানেলের পর প্যানেলে সজ্জিত। ঐ গুহার 'পাঞ্চিকা ও হারিতি'র ভাস্কর্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জানা যায় রাক্ষসী হারিতি রাজগৃহের শিশুদের হত্যা করে বিশেষ উৎপাত শুরু করেছিল। বুদ্ধদেব তাকে শিক্ষা দেবার জন্য তার সবচেয়ে প্রিয় সন্তানটিকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তাতে হারিতি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে বুদ্ধকে আক্রমণ করতে যায় ও পরে বুদ্ধের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। বুদ্ধ তখন তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে, তার আর আহারের কোন অসুবিধা হবে না. সর্বত্রই তাকে আহার্য দেওয়া হবে। এই প্রথা অনুসারে হারিতি ও পাঞ্চিকার মূর্তি বারান্দায় ও ভোজনকক্ষে সাধারণতঃ নির্মিত করা হত। চৈনিক পরিব্রাজক ইত্‌সিঙও এই ঘটনাটিকে উল্লেখ করেছেন।

প্যানেলটিতে পাঁচশো সন্তানের জননী হারিতি সর্বকনিষ্ঠ পুত্রটিকে নিজের ক্রোড়ের ওপর স্থাপন করেছে। ভাস্কর্যটির বেদিতে আরও কয়েকজন পুত্রকে অতি মজাদারভাবে শিল্পী পরিবেশন করেছেন। ডানদিকে গুরু একটি লাঠি নিয়ে বসেছেন এবং সামনের তিনজন ছাত্র অতি মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করছে। পরে দুটি ছেলে বক্সিং-এ ব্যস্ত, ও সর্বশেষে পাঁচটি ছেলে দুটি ভেড়াকে নিয়ে লড়াইয়ে ব্যস্ত। বাস্তব-জগতের শেষের বেঞ্চের দুষ্টু ছেলেদের একটি জাগতিক চিত্ররচনায় শিল্পী যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সর্বোপরি সিলিং-এর অলংকরণ আমাদের এক অদ্ভুত-পূর্ব আনন্দ দিল। এই অলংকরণগুলি কোথায়ও শংখ ও পদ্মলতার কেয়ারী, নাম না জানা ফুল-লতা, হাঁস, সাদা বকের সারি, শুকপাখী, কিন্নর-কিন্নরীদের সংগীতচর্চা, নানাভংগীতে পুরুষ ও নারীমূর্তি দিয়ে অলংকৃত। বিশিষ্ট শিল্প সমালোচক ডাঃ এস

সিঁথিকির মতে অজন্তার সিলিংগুলি সুন্দর ও জটিল অলঙ্করণের বিস্ময়কর নিদর্শন। এই সমস্ত চিত্রাঙ্কনের অপূর্ব সৌন্দর্য ভারতীয় শিল্পীর বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর।

তবু ১নং গুহায় অজন্তার শিল্প-শৈলীর যতটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয় (অবশ্য গুহার কিছু অংশ বাদে), ২নং গুহায় অজন্তার চিত্রশৈলীর অকল্পনীয় অবনতি দেখে বিস্মিত হতে হয়। ছবি-গুলিতে না আছে রং-এর বৈচিত্র্য, না আছে ভাব-আবেগের ব্যাকুলতা, না আছে চিত্রের কথা বলার ক্ষমতা—প্রায় সবই হয়ে গেছে নিষ্প্রভ, প্রাণহীন।

২নং গুহা থেকে গাইডের পিছু পিছু একবার নীচে, একবার ওপরে সিঁড়ি ডিঙিয়ে এসে পৌঁছে গেলাম ৯নং গুহায়। ৯নং ও ১০নং গুহা দুটি খুব সম্ভবতঃ সর্বপ্রাচীন ও খৃষ্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে নির্মিত হয়েছিল। শ্রীযুক্ত সি শিবরামমূর্তি তাঁর 'অমরাবতী স্কাল্পচার্স ইন দা মাদ্রাজ গভর্ণমেন্ট মিউজিয়ম' (মাদ্রাজ, ১৯৪২) বইয়ে পাশাপাশি রেখাচিত্র সাজিয়ে পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন বসনভূষণ মুকুট, পাগড়ী, অঙ্গভঙ্গী, শরীরের গড়ন, ভাবভঙ্গীতে অজন্তার ছবির সঙ্গে, বিশেষ করে নারীদের, সাঁচি, ভারুত, অমরাবতীর ভাস্কর্যের আশ্চর্য মিল। পণ্ডিতেরা বলেন, "এই দুটি গুহার ছবিই সবচেয়ে প্রাচীন, অর্থাৎ খৃষ্টীয় প্রথম শতকের।" ('ভারতের চিত্রকলা'—অশোক মিত্র, ৩১ পৃষ্ঠা)। এই গুহা দুটি খৃষ্টান গির্জার মত অ্যাপসাইডেল অ্যাণ্ড। এই গুহা দুটিকে প্রথম যুগের পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। মূর্তিগুলির মাথা বড় ও সেই অনুপাতে দেহ ছোট ও চ্যাপটা। মুখের মধ্যে কোনরকম ভাবের প্রকাশ নেই। মূর্তিগুলি আড়ষ্ঠ। একটির সঙ্গে আরেকটির অঙ্গাঙ্গি-সম্পর্ক বিরল এবং মানুষের সঙ্গে ঘরবাড়ী-গুলির আকারের বিশেষ সামঞ্জস্য নেই। অজন্তার প্রথমদিকের অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ের শিল্পীরা ইণ্ডিয়ান রেড্, ফিকা সবুজ, গেঁড়িমাটি, সাদা ও কালো রং দিয়েই তাঁদের চিত্ররচনার কাজ চালিয়ে নিয়েছেন।

এরপর সকলের সঙ্গে আমিও গিয়ে হাজির হয়েছিলাম একে একে ১৬ ও ১৭নং গুহায়। দ্বিতীয় যুগের সর্বোত্তম চিত্র ১৬ ও ১৭নং গুহায় পাওয়া যায়। এ সময়কার ছবিতে লেপিসলেজুলি ব্লু ও অন্যান্য নানাবিধ রং-এ ও রেখায় ছবিগুলি বর্ণাঢ্য ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো। এই সময়েই রাজা-রাজাদের বিলাস-বহুল জীবন, যুদ্ধযাত্রা, নৃত্যগীত প্রভৃতির চিত্র পাওয়া যায়। ধর্মীয় চিত্র ছাড়া এই সমস্ত স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার বর্ণনা করতে গিয়ে শিল্পীরা যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। সরু-মোটা করে তুলির টোন-টানে শিল্পীরা আলো-ছায়ার ভাব-ফোটানোর দক্ষতা দেখিয়েছেন। 'মুমূর্ষু রাজকুমারী' ছবিটিতে রাজকুমারীর মুখের অভিব্যক্তি, শোকে মুহ্যমান পরিচারিকা ও অন্যান্য সকলের গভীর উদ্বেগ, বিষাদ ও কারুণ্যের ভাব এত সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার আর বুঝি তুলনা খুব অল্পই মেলে। ছবিটি যেমন মর্মস্পর্শী তেমনি প্রাণপূর্ণ। দুর্ভাগ্য-বশতঃ ১৬নং গুহার অনেক ছবি পুনর্বার সংস্করণ করতে গিয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

১৭নং গুহায় মাতা ও পুত্রের ভগবান বুদ্ধের কাছে আশ্রয়প্রার্থী ছবিখানি অনবদ্য। মাতার আত্মসমর্পণের ভঙ্গি, পুত্র রাহুলের সরলতা ও বিরাট বুদ্ধের ব্যক্তিত্ব-পূর্ণ ভঙ্গি, ছবিখানিকে সুষমা ও সৌন্দর্যে

ভরে দিয়েছে। গুহাটির দ্বারদেশে সপ্তম মানুষী বুদ্ধের প্যানেল ও অন্যান্য দেওয়ালে ছদ্দন্ত জাতক, মহাকপি জাতক, হংস জাতক, শিবি জাতক, রুরু জাতক প্রভৃতি কাহিনী দিয়ে অতি মনোরমভাবে সজ্জিত।

১৯নং গুহাটির সামনে দাঁড়ালে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। এই মন্দিরটির প্রবেশপথের উপরিভাগে অশ্বক্ষুরাকৃতি বা পদ্মের পাপড়ির মত চৈত্য-জানলাটি এই গুহার সমস্ত স্থাপত্যকে ভারসাম্য দান করেছে। চৈত্য-জানালার উপরে, নীচে ও দুপাশে যে সব ভাস্কর্য আছে তা গুহাটির প্রবেশপথকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। চৈত্য-গৃহের সম্মুখভাগ সুন্দর বুদ্ধমূর্তি, প্রস্ফুটিত পদ্ম ও ঢেউ খেলানো রেখাবন্ধনী দিয়ে অলঙ্কৃত। গুহাটির ভিতরে স্তূপের মধ্যে বুদ্ধমূর্তিটি দণ্ডায়মান।

২৬নং গুহার 'ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ' ও 'মারের প্রলোভন ও অভ্যাগত'—এই ছবি দুটি দর্শকের মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

অজন্তাশিল্পের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সিংহলসহ বৃহত্তর ভারতে অজন্তার দান অনস্বীকার্য। সিংহলের সিগিরিয়া ফ্রেস্কোয় অজন্তার অনুকরণ বিশেষভাবে দেখা যায়।

অজন্তার প্রতিটি ছবিই যেন কথা কয়ে ওঠা ছবি। সে যুগের কাপড়-চোপড়, অলঙ্কার, কেশরচনা, আসবাবপত্র, রাজসভা, রাজ অন্তঃপুর, রাজা-রাণী, দাসদাসী, দোকান-পসার, যানবাহন প্রভৃতি সব কিছু জিনিসের ওপর শিল্পীরা আলোকপাত করেছেন। বিশেষ করে বর্তমান যুগের নারীদের কেশবিন্যাসে অজন্তার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কি বুদ্ধ, কি জাতক কাহিনী, কি সামাজিক, কি রাজ-নৈতিক চিত্র—সর্বত্রই শিল্পীর তুলি ছন্দোময় ও প্রাণবন্ত। এক কথায় অজন্তা বিশ্বের বিস্ময়।

অজন্তা গুহার বাহিরের দৃশ্য

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

চল্লিশোত্তর রবিবাসর

১৩৪৩ সালের তেসরা শ্রাবণ ছিল রবিবার। সেদিন সকাল থেকেই আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি নেমেছে। সেদিন অপরাহ্নে অশ্বিনী দত্ত রোডে শরৎচন্দ্রের আহ্বানে রবিবাসরের পাক্ষিক বৈঠক বসবে। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় জোড়াসাঁকোয়। হঠাৎ স্থির হল রবীন্দ্রনাথকে এই সভায় আমন্ত্রণ করা হোক। একটু ইতঃস্তত করে শরৎচন্দ্র কবিকে ফোন করলেন, 'যদি দয়া করে এসে মধ্যমণি হয়ে বসেন, তাহলে আমরা কৃতার্থ হই।'

উত্তরে কবি জানালেন—যেতে আমার অনাগ্রহ নেই।

সভার যাঁরা সদস্য তাঁরা একে একে এসে হাজির। শরৎচন্দ্রের আমন্ত্রণে ঝড়, জল উপেক্ষা করে সবাই এসেছেন। আর সভাগৃহে প্রবেশমাত্র সকলেই জানতে পারলেন এখনই কবি আসছেন। সর্বাধ্যক্ষ জলধর সেন ত' আনন্দে আত্মহারা। রবীন্দ্রনাথ আসছেন অতএব আজ আর আনুষ্ঠানিক গল্প কবিতা প্রবন্ধ পাঠ নয় কোনো কিছু নয়। আজ শুধু কবি বলবেন আর সবাই তাই শুনবো।

শরৎচন্দ্রের মোটরে কবি ঠিক সময়ে সভায় এসে উপস্থিত হলেন। মুখে মৃদু হাসি। গাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে সর্বজনের দাদা—জলধরদাদা। তিনিই হাত ধরে কবিকে নামালেন। কবি তাঁকে দেখে মধুর কণ্ঠে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলেন—'এই যে জলধরদাদা! আপনিও এখানে আছেন?'

শরৎচন্দ্র বললেন—'দাদাকে থাকতেই হবে, উনি যে আমাদের রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ।' কবিকে ঘরে এনে চেয়ারে বসিয়ে মাল্যভূষিত করা হল। শরৎচন্দ্র এই মালা আগে থেকে আনিয়ে রেখেছিলেন। সেদিন গানে গল্পে সভা মাতিয়ে রাখলেন বিচিত্রা সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আর রবীন্দ্রনাথ বললেন—

'আজ আমি তোমাদের রবিবাসরের এই অধিবেশনে উপস্থিত হবার আহ্বান পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি, প্রীতিলাভ করেছি। তোমাদের দেখে যেমন মুগ্ধ হয়েছি, তেমনি তোমাদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পেয়েছি এই রবিবাসরের মধ্য দিয়ে। আমার সম্বন্ধে বরাবর দুর্লভতার একটা অভিযোগ চলে এসেছে। তার বিরুদ্ধে আমার যা-কিছু বলবার আছে তা বলছি।'

সুদীর্ঘ সেই ভাষণ। তিনি বলেছিলেন 'আমার খ্যাতি যখন দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েনি, পৃথিবীর নানা দেশের সঙ্গে যখন আমার কোন কারবার ছিল না, খ্যাতির বিড়ম্বনা ছিল না, তখনও আমি দশজনের সম্মুখে, লোক-সমাজের কাছে ধরা দিতে পারিনি।'

তারপর তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এই কুণ্ঠার কারণ সম্বন্ধে। অপূর্ব সেই ভাষণ! মনে আছে আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনেছিলাম। অনেক মূল্যবান উপদেশ ছিল, অনেক চিন্তার খোরাক ছিল। এই ভাষণটি রবিবাসরের (প্রফুল্লকুমার স্মৃতি-গ্রন্থের) প্রথম খণ্ডে এবং সন্তোষকুমার দে-র 'রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে সম্পূর্ণ পাওয়া যাবে।

এই রবিবাসর। এক ঐতিহ্যময় সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান। অথচ এর কোনো বিশেষ আইন-কানুন নেই, নেই কোনো ঢক্কানিনাদ। মাত্র পঞ্চাশজনের মধ্যে সীমিত এর সদস্য সংখ্যা। আজ বিয়াল্লিশ বছরকাল ধরে এই সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান সগৌরবে নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে বেঁচে আছে। দীর্ঘকালের ব্যবধানে কত কি ঘটে গেল, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন, যুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশ-বিভাগ, স্বাধীনতা, ছিন্নমূলের আগমন এবং স্বাধীনতা-উত্তর অস্থিরতা। এই সবের মধ্যে 'রবিবাসর' তার অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছে এটা পরম বিস্ময়।

'রবিবাসর' সদস্যদের রচনাসম্ভারে পরিপুষ্ট 'রবিবাসর' নামক স্মারকগ্রন্থের তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে প্রফুল্লকুমার সরকারের স্মৃতিরঞ্জিত হয়ে। প্রফুল্লকুমার সরকার রবিবাসরের একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। আজ থেকে ত্রিশ-চল্লিশ বছর পূর্বে ট্রামে-বাসে চড়ে কলিকাতা শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন প্রান্তে তিনি রবিবাসরের অধিবেশনে যোগ দিতেন। রবিবাসরের এক সভায় পঠিত তাঁর 'কবন্ধ' নামক একটি সরস রচনা মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে আবিষ্কৃত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

রবিবাসরের প্রথম খণ্ডটি সম্পাদনা করেছেন সর্বাধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডটি সম্পাদনা করেছেন সর্বাধ্যক্ষ নরেন্দ্র দেব, এবং তিনটি খণ্ডের সহকারী সম্পাদক শ্রীসন্তোষকুমার দে। সুন্দর শোভন সচিত্র সংস্করণ।

এই খণ্ডগুলিতে অনেক মূল্যবান রচনা সংযোজিত হয়েছে, সেই সঙ্গে আছে অনেক দুষ্প্রাপ্য পুরাতন ছবি। ১৯৩৯-এর একটি গ্রুপ ফটোগ্রাফে দেখা গেল রয়েছেন—গিরীন্দ্রশেখর বসু, জলধর সেন, হেমেন্দ্রলাল রায়, নরেন্দ্র দেব, মনোজ বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রফুল্লকুমার সরকার, সুনির্মল বসু, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, নরেন্দ্রনাথ বসু, ভবানী মুখোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতি। উনচল্লিশ বছর পূর্বে অনুষ্ঠিত জলধর সম্বর্ধনার চিত্র। আজ অনেকেই নেই, যাঁরা আছেন তাঁরা বার্ধক্যে উপনীত।

আরেকটি ছবিও বিশেষ মূল্যবান। এই ছবিটি ১৩৪১ সালের এক বিশেষ অধিবেশনের গ্রুপ ফটো। দমদমে প্রবোধচন্দ্র পালের 'তুলসী মঞ্জরী' নামক প্রমোদ উদ্যানে অনুষ্ঠিত সভার ছবি। যাঁদের আকৃতি চেনা যায় তার মধ্যে আছেন—জলধর সেন, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি দে, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, বিজন ভট্টাচার্য, রমেশচন্দ্র সেন, ভবানী মুখোপাধ্যায়, মন্মথনাথ সান্যাল, অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, শচীন সেন, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন্দ্রলাল ঘোষ, তিনকড়ি দত্ত প্রভৃতি প্রায় শতাধিক বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী ও সাংবাদিক।

এছাড়া কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনাচিত্র, শান্তিনিকেতনে উদয়ন ভবনে রবিবাসরের সভায় ভাষণরত রবীন্দ্রনাথ, এবং রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং জলধর সেন প্রভৃতির গ্রুপ ফটোগুলির ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়।

সাম্প্রতিক অনুষ্ঠিত অন্যান্য অনেক অধিবেশনের গ্রুপ ফটো এবং জলধর সেনের কার্টুন চিত্র, প্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র গুপ্ত, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, নরেন্দ্রনাথ বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির চিত্রাবলীও এই গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। এই গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রবীন্দ্রনাথের গান', শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি নজরুল ইসলাম', অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের 'বাংলার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান', অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শিল্পরসিকের স্মৃতিতে রবিবাসর', অচিন্ত্যকুমারের 'রবিবাসরের কথা', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ছাপ', বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের 'শব্দে ও প্রবচনে প্রাণী নাম', অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'সংস্কৃতি', স্যর যদুনাথ

সকারের 'বাদশাহী বিচার পদ্ধতি' প্রভৃতি রচনাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় তিনশতাধিক সুনির্বাচিত রচনার প্রত্যেকটির উল্লেখ সম্ভব নয়, তাই মাত্র কয়েকটি বিশিষ্ট রচনার উল্লেখ করা গেল।

দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, পরশুরাম, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, যদুনাথ সরকার, গিরীন্দ্রশেখর বসু, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শরৎ পণ্ডিত, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র, অপূর্বকুমার চন্দ, সজনীকান্ত দাস, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, মনোজ বসু, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, চিন্তামণি কর, শৈলজা মুখোপাধ্যায়, গুরুসদয় দত্ত, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নিবারণচন্দ্র ঘোষ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনির্মল বসু প্রভৃতি সাহিত্যিক ও শিল্পিবৃন্দ রবিবাসরের বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করেছেন বা এক সময় সদস্যরূপে সংযুক্ত ছিলেন। যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সব নামাবলী এক অবিস্মরণীয় ঐশ্বর্য। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রিত রবিবাসরীয় সভার বিবরণ সেই সময়ের প্রবাসী, বিচিত্রা, পুষ্পপাত্র প্রভৃতি পত্রিকায় এবং রবিবাসরের রবীন্দ্রনাথ নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই অধিবেশনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে শান্তিনিকেতন আশ্রম সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা, উদ্যোগ ও কর্মপদ্ধতির বিষয় বিস্তারিতভাবে বলেন। ঠিক এই ধরনের কথা তিনি আর কখনও বলেননি।

শান্তিনিকেতনে রবিবাসরের চল্লিশজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ রসিকতা করে বলেছিলেন—'আমার ঘরে আজ চল্লিশজন দস্যু হানা দিয়েছে।' সেদিন অতিথি আপ্যায়নে কবি যে আয়োজন করেছিলেন তা অভাবনীয়।

এই গ্রন্থে নরেন্দ্র দেব 'রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ' নামক এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি লিখেছেন—শান্তিনিকেতনের রবিবাসর প্রসঙ্গে—

'কবির ভাষণের পর সাহিত্যের নানা বিষয় নিয়ে কবিগুরুর সঙ্গে আলোচনা হল। নামের আগে নিজেকে 'শ্রী'মণ্ডিত করা উচিত কিনা। পত্র লেখবার সময় গুরুজন, বয়োজ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠদের একালে কি পাঠ লেখা যথোপযুক্ত হয়, কতকগুলি ইংরাজী শব্দের অনুবাদে আমরা 'বাধ্যতামূলক', 'ক্লাস্টি' প্রভৃতি কতকগুলি কদর্য কথা ব্যবহার করি, এগুলি সমীচীন কিনা, বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাগুলির বাংলা পরিভাষা যা চালানো হচ্ছে, সেগুলি সঙ্গত কিনা—ইত্যাদি নানা আলোচনা ও তার মাঝে হাস্য-পরিহাসও আসরটিকে জমিয়ে তুলেছিল।'

এই কয়েকটি কথায় শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত অধিবেশনের লোভনীয় পরিচয় পাওয়া যায়।

সেকালের একটি অধিবেশনের ছবি এঁকেছেন অচিন্ত্যকুমার তাঁর স্মৃতিচারণে—'ভাবতে অবাক লাগে, কোন এক স্বপ্নময় অতীতে, আমাদের গিরিশ গিরীশের বাড়িতে রবিবাসরের আসর বসেছিল। স্বয়ং তীর্থপতি জলধরদা উপস্থিত ছিলেন—শস্য ফলাতে পারে অথচ আপাত-ঊষর কোন মাঠের উপরে সেই মেঘবর্ষণ না করেছে—আর তাঁকে ঘিরে আমরা সেকালের অতি আধুনিকেরা বসেছিলাম আপনজনের মত—প্রেমেন (মিত্র), প্রবোধ (সান্যাল), মনোজ (বসু), ভবানী (মুখোপাধ্যায়), আর হেম বাগচী। পুরোনো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়/ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায়!'

স্মরণীয় অতীত ধরা পড়েছে এই তিনখণ্ড রবিবাসরের পৃষ্ঠায়। সেদিনের মত আজো রবিবাসর প্রাণপ্রাচুর্যে চঞ্চল। একালের পঞ্চাশজন সদস্যদের তালিকায় চোখ ফেললে দেখা যায় ক্ষয়িষ্ণু—বাঙালীদের সমাজে আজো যাঁরা বরণীয় ও শ্রদ্ধেয় এমন অনেক মানুষ এই একটি প্রতিষ্ঠানের ছত্রছায়ায় সমবেত হয়েছেন। পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে মহিলা সদস্যও কয়েকজন আছেন। এই মহিলা সদস্য নেওয়া হবে কি হবে না এই নিয়ে বেশ গুরুতর আলোচনা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এ-বিষয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। সে আর এক কাহিনী।

বিয়াল্লিশ বছরের একটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠান বাঙালীমাত্রেরই গৌরব। রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন—রবিবাসরের এক সভায়—

'যতদিন তোমাদের এই 'রবিবাসর' বেঁচে থাকবে, ততদিন তোমরা এর ভিতর দিয়ে দেশের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করবে, উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়ে দেবে। কাকেও নিরাশ হতে দেবে না—অলস হতে দেবে না, দেশের কাজকে ও সমাজের কল্যাণকে বড় করে লোকে দেখতে পারে এমন একটি প্রেরণা তোমরা সমাজের বুকে, দেশের বুকে ছড়িয়ে দেবে। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের যেমন একটা উত্তেজনা থাকে, সেটা যেমন সত্য, তেমনই আর একটা সজীব আন্দোলন চিরন্তনভাবে বেঁচে থাকে, সেটা হচ্ছে সাহিত্য।'

রবীন্দ্রনাথের এই উপদেশ রবিবাসরের সদস্যগণ সর্বদা স্মরণে রেখেছেন বলেই জানি। সাহিত্য চিরন্তন, সাহিত্য সজীব আন্দোলন। এর উত্তেজনা সত্য।

তিনখণ্ডে সুমুদ্রিত 'রবিবাসর' স্মারক গ্রন্থের জন্য রবিবাসরের বর্তমান সম্পাদক সন্তোষকুমার দে-কে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই। তিনি চল্লিশ বছরের সাহিত্য সমাবেশের এক মূল্যবান দলিল প্রকাশের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের সামাজিক দিকটির একটি সুন্দর আলেখ্য ধরে রাখলেন।

—অভয়ঙ্কর

রবিবাসর—(প্রফুল্লকুমার স্মৃতি গ্রন্থমালা) ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড। সম্পাদক (১ম খণ্ড) ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক ২য় ও ৩য় খণ্ড—নরেন্দ্র দেব। সহকারী সম্পাদক—সন্তোষকুমার দে। প্রকাশক—বেঙ্গল বুকস, ৭, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য—প্রতি খণ্ড পাঁচ টাকা।।

ইয়েভতুসেংকোর নভশ্চর প্রশস্তি।।

সোভিয়েত কবি ইয়েভগিনি ইয়েভতুসেংকোকে নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল কিছুদিন আগে। তাঁর প্রতি কর্তৃপক্ষের সুনজর নেই তাই ইদানীং তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল না। সম্প্রতি তিনজন রুশ নভশ্চরের মৃত্যুতে তিনি যে শোকগাথা রচনা করেছেন, তা 'প্রাভদা'য় প্রকাশিত হয়েছে। ইয়েভতুসেংকোর কবিতার শেষাংশ—

'সংযোগ ছিন্ন একথা নহেক সত্য—
আমাদের মাতৃভূমি আর তোমাদের মাঝে,
রয়ে গেল চিরন্তন দুই-মুখী সেতু।।'

নূরজাহানের আত্মকথা ঃ সুধাকণ্ঠী নূরজাহান নট ও প্রযোজক এজাজ দুরানীকে বিবাহ করে পশ্চিম পাকিস্তানে অবসর জীবনযাপন করছেন। সম্প্রতি স্বামীকে তালাক দেওয়ার তোড়জোড় করছেন নূরজাহান আর সেই সঙ্গে লিখছেন আত্মকথা। করাচীর সাপ্তাহিক পত্র 'করদার' এই আত্মজীবনীর প্রকাশ-স্বত্বের জন্য ১০,০০০ হাজার টাকা আগাম দিয়েছেন—গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে লেখিকা শতকরা তেত্রিশ ভাগ লভ্যাংশ পাবেন। বাংলাদেশে 'বিনোদিনী'র আত্মকথা সাহিত্যিক মর্যাদালাভ করেছে। এ-যুগের অভিনেত্রীরা যাঁরা অবসর নিয়েছেন বা নিচ্ছেন, তাঁরাও এদিকে মনোযোগ দিলে সর্বদিক থেকে লাভ হবে।

জোড়হাট সাহিত্য-সভা : আসামের বিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য জোড়হাট সাহিত্যসভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে বলেন, যে-জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি এবং সাহিত্য আছে তার ক্ষয় নেই। সভার পূর্বে বিদায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত নীলমণি ফুকান এক বিরাট জনতার সামনে সাহিত্যসভার নিজস্ব পতাকা উত্তোলন করেন।

অধ্যাপক ডিম্বেশ্বর শর্মা অসমীয়া সাহিত্যে পদ্মনাথ গোহাইন বরুআর অবদান বিষয়ে এক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। পদ্মনাথ গোহাইনের দুহিতা শান্তিপ্রভা বোর বরুআ এবং শশীচন্দ্র বোর বোরুআ এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। অসমীয়া সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান জোড়হাট সাহিত্য-সভা, সুতরাং এই অধিবেশনটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বঙ্কিমতর্পণ : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে একটি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস এই সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তি বিষয়ে এক জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন।

কবি সম্বর্ধনা : পানিহাটি 'চটুগ্রহে' সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত এক সভায় কবি শান্তশীল দাশকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই সম্বর্ধনাসভায় পৌরোহিত্য করেন ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র এবং প্রধান অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত সমালোচক নারায়ণ চৌধুরী। সভায় উপস্থিত সুধীবৃন্দ কবির জীবন ও কর্ম বিষয়ে প্রশস্তি দান করেন।

এ-বছরের কমলা দেবী নাট্য পুরস্কার : ভারতীয় নাট্য সংঘ প্রতি বছর কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়ের সম্মানে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর নাটক বিচার করে নাট্যকারকে প্রতি বছর পুরস্কার দেওয়া হয়। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫০০০ টাকা। এই বছর পুরস্কার দেওয়া হল কান্নাড়া ভাষার নাট্যকার গিরীশ করনাদকে, তাঁর 'হয়বাদন' নামক নাটকের জন্য। নাটকটি বেতাল পঞ্চবিংশতির কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত। গত বছর এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল মারাঠী নাট্যকার শ্রীবিজয় তেন্ডুলকারকে। বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর যেসব নাটক এই বছর বিচার করা হয়েছে তার মধ্যে উৎপল দত্তের নাটক 'সূর্যশিকার' এবং বাদল সরকার রচিত নাটক 'এবং ইন্দ্রজিৎ'ও ছিল। বাংলাদেশে কোনো নাট্য পুরস্কারের প্রচলন হয়নি। মন্মথ রায়কে একটি বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করেছিলেন 'উল্টোরথ' পত্রিকার কর্তৃপক্ষগণ ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের বাৎসরিক সাহিত্যবাসরে অনুষ্ঠিত সভায়।

সিমফনি (কবিতা সঙ্কলন)—সুকুমার ঘোষ সম্পাদিত। প্রকাশক : জোনাকি। ৬৫।৫ই বাগবাজার স্ট্রীট, কলকাতা—৩। পাঁচ টাকা।

পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ এবং বিদেশী মহৎ শিল্পীদের বিখ্যাত চিত্রাবলী অনুকরণে অঙ্কিত অজস্র রেখাচিত্র সজ্জিত প্রেমবিষয়ক বিদেশী কবিতা সঙ্কলন—'সিমফনি' বাংলা প্রকাশনের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। উপহার দেওয়ার যোগ্য সুলভ মূল্যে প্রাপ্তব্য এই কাব্যগ্রন্থটি যে সাধারণের সমাদর লাভ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়, স্পেনীয়, ইংরেজী, মার্কিন, নিগ্রো, রুশ, চীনা, জাপানী, সুইডিশ, স্লাভ, গ্রীক, হিব্রু, লাতিন, ফরাসী, মিসরীয় ও আরবী ভাষার প্রেমের কবিতাবলীর ইংরাজী অনুবাদ বা মূল ভাষা থেকে এই সব কবিতাবলী যাঁরা অনুবাদ করেছেন তাঁরা বাংলা সাহিত্যের প্রবীণ ও নবীন কবিবৃন্দ, যথা, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরুণ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, লোকনাথ ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। সিমফনি কথাটির অর্থ—ঐকতান। আকাশবাণীর ভাষায় বাদ্যবৃন্দ। গ্রন্থটির নামকরণ বঙ্গ ভাষায় হলে শোভন হত এবং 'বিদেশী প্রেমের কবিতা না লিখে প্রেমের বিদেশী কবিতা বলা উচিত ছিল। এই সঙ্কলনের সম্পাদক নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য এবং আশা করি তিনি অদূরভবিষ্যতে এই জাতীয় কবিতা সঙ্কলনে ব্রতী হবেন। বিখ্যাত চিত্রাবলীর রেখাঙ্কন করেছেন সম্ভবত শচীন রায়, তাঁর কৃতিত্বও কম নয়, তবে মূল চিত্রগুলির শিল্পীদের নাম ইংরাজীতে প্রতিটি ছবির গায়ে না লিখে আলাদা সূচীতে উল্লেখ থাকলে ভাল দেখাত।

ভূপেন্দ্রনাথ—সুনীলকুমার ঘোষ সম্পাদিত। মদনমোহন লাইব্রেরী ও সাধারণ পাঠাগার। ৯৬, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৬। দাম আট টাকা।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন চরমপন্থী বিপ্লবী। তাঁর বিরাট পান্ডিত্য ও দার্শনিকতা ছিল বিস্ময়ের। এই সমাজ সংস্কারক ও ঐতিহাসিক দেশের স্বাধীনতা ও স্বদেশবাসীর সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনায় সুদীর্ঘকাল সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর মত নির্ভীক ও পক্ষপাতশূন্য রাজনীতিবিদ ভারতীয় রাজনীতিতে খুবই বিরলদৃষ্ট। একালের বহু বামপন্থী রাজনৈতিক নেতার শিক্ষা ঘটেছে তাঁরই কাছে। বহু পত্রপত্রিকায় এখনও ভূপেন্দ্রনাথের অসংখ্য রচনা ছড়িয়ে আছে। এইসব আলোচনার মূল্য অসীম। তাঁর ইংরেজি ও বাঙলা রচনা থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন মদনমোহন লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ। সম্পাদনা করেছেন সুনীলকুমার ঘোষ। 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস', 'উড়িষ্যার অপ্রকাশিত বৈপ্লবিক ইতিহাস', 'ডায়ালেকটিক্স অফ ল্যান্ড-ইকনমিকস অফ ইন্ডিয়া' এবং আরো কিছু মূল্যবান আলোচনা সঙ্কলিত হয়েছে।

সঙ্কলন ও পত্র-পত্রিকা

শতরূপা (মাঘ-চৈত্র)—সম্পাদক নির্মলকুমার খাঁ। ১৪ মাকড়দহ রোড। কদমতলা। হাওড়া—১। দাম দেড় টাকা।

শতরূপার বর্তমান সংখ্যাটি যদুনাথ সরকার সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ নারায়ণ সরকার, অমলেশ ত্রিপাঠী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, সুশীল রায়, সুধাংশুমোহন বন্দোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল, ছায়া ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে। তাছাড়া আছে যদুনাথ সরকারের বংশ-তালিকা এবং গ্রন্থাবলী তালিকা। প্রচ্ছদে আছে আচার্য যদুনাথের অপ্রকাশিত পত্রের প্রতিলিপি।

Czechoslovakia National Day Celebration 1971 : Indo-Czechoslovak Cultural Society, West Bengal.

চেকোশ্লোভাকিয়ার জাতীয় দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত এই স্মারক গ্রন্থে বহু মূল্যবান আলোচনা সঙ্কলিত হয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনের কথা সংক্ষিপ্ত হলেও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দানের চেষ্টা করেছেন আলোচকরা।

(৬)

দু'তিন রাত মদিরা আসেনি জরার শয্যা কক্ষে, জরা অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে থেকে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়েছে, ভেবে পায়নি কেন মদিরা আসছে না। সেদিনও অনেকক্ষণ জেগে থাকবার পরে কেবলই ঘুমিয়ে পড়েছিল এমন সময়ে ঠেলাঠেলিতে জেগে উঠল, শুধালো, কে মদিরা নাকি?

মদিরা বলল, এর মধ্যেই ভুলে গেলে, তবু তো এখনো রাণীর সংগে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়নি।

জরা সাগ্রহে বলল, এ কয় রাত তোমার জন্যে জেগে কাটিয়েছি, আসনি কেন?

মদিরা বলল, থাকি রাজার অন্তঃপুরে, ইচ্ছা করলেই কি রাতের বেলায় বেরিয়ে আসা সম্ভব?

রাণীকে দিয়েছিলে সেই হারটা?

তুমি পাগল হলে জরা। তোমাকে তো আগেই বলেছি যে, বাসুদেবের কৌস্তুভ-মণির কথা সর্বজনবিদিত। যখন রাণী জিজ্ঞাসা করবেন এ হার পেলে কোথায়--কি উত্তর দেব বলো তো?

তবে নিয়ে গেলে কেন?

সাবধানে রাখবার জন্যে। তাছাড়া এখানে থাকলে লোকের চোখে পড়তে কতক্ষণ? আর বেহাত হলেই বা সামলায় কে?

তবে কি রাণীকে দেবে না?

দেব সময় বুঝে।

সময় বলতে কি বোঝায়?

বোঝায় এই যে, যখন দেখবো তোমার প্রতি রাণীর আসক্তি এত প্রবল হয়েছে যে, আর জিজ্ঞাসা করবার মত অবস্থা নাই তখন।

কি করে বুঝবে?

বোঝা যায় জরা, বোঝা যায়। কি করে প্রথম বুঝেছিলাম যে, তুমি আমার উপরে আসক্ত। যার কাছেই যাও না কেন ফিরে আসতেই হবে আমার কাছে। আগে রাণীর অবস্থা সেই রকমটি হোক। ওসব বোঝা যে আমাদের ব্যবসায়ের অঙ্গ।

মদিরা যাই বলুক না কেন, যতই বুঝুক না কেন, এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছিল। সংসারে সর্বজ্ঞ বলে কেউ নেই। রাজার দেহরক্ষীরূপে জরাকে প্রথম দেখে মদিরাকে রাণী শুধিয়েছিল লোকটা কে? তারপরে তার সম্বন্ধে আরও দু-একবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। তার সেই কৌতূহলকে প্রণয়ের প্রথম সূচনা মনে করেছিল মদিরা। কাম ব্যবসায়িনীর চোখ একদিকে যত সজাগ অন্যদিকে তত অন্ধ। নর-নারীর মধ্যে একটি বিশেষ সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছুই তারা ধারণা করতে পারে নি। সেই ধারণার বশেই জরাকে জানিয়েছিল রাণীর প্রণয়ের কথা। তাতে দেখল উল্টো ফল হল—জরার মন মদিরার স্থল থেকে সরে গেল রাণীর স্থলে। তবে আরও দু-চার দিনের মধ্যে মদিরার ভুল ভাঙলো, প্রণয় বৃদ্ধির কোন লক্ষণ দেখা গেল না রাণীর মনে। তবে যে সেদিন কণ্ঠহার পুরস্কারস্বরূপ পাঠিয়েছিল সেটা রাজকীয় রীতি। মদিরা নিশ্চিন্ত হল, তবে কথাটা ভাঙলো না জরার কাছে, আশাভঙ্গে ক্ষেপে যেতে পারে। আরও ভাবলো, ঐ ভাঁওতা দিয়ে লোকটাকে বানর নাচানো যক না কেন? মেয়েরা পুরুষকে অকারণ আশার হাতছানি দিয়ে নাচাতে বড় আনন্দ পায়।

এমন সময়ে কৌস্তুভমণির হারটা বার করলো জরা। এটা আগে দেখে নি মদিরা, এই পর্যন্ত জানতো যে, ঘটনাক্রমে বাসু-দেবকে হত্যা করে ফেলেছে সে। এখন হারটা হস্তগত করে নিয়ে ভাবলো, বেশ হল, বোকাটা হাতে রইলো। রাণীকে দেওয়া যে সম্ভব নয়, দিলে যে জরা আর তার দুজনেরই মহাসংকট বুঝলো, যদিচ জরাকে বোঝাল সময় হলেই রাণীর গলায় দুলিয়ে দেবে। জরা সেই আশাতেই আছে, থাকুক, বিধাতা যদি তাকে নির্বোধ করে গড়ে থাকেন সে দায় কি মদিরার?

সম্প্রতি মদিরা একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলো, জরা যেন ক্রমেই তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে, কাছে এলে দূরে সরে যায়, রাজপুরীতে দেখা হলে আগের মত তেমন করে আর চোখে ভাষা চমকে ওঠে না, ঠোঁট কেমন যেন শক্ত। এসব তো ভাল নয়। মদিরার বুঝতে দেরী হল না যে, রাণীর প্রণয়ের আশাতেই দাসীর প্রতি অনাগ্রহ। মদিরা প্রেম-ব্যবসায়িনী হলেও জরাকে সত্যই ভালবাসতো, সে ভালবাসা আবার গাঢ়তর হয়েছিল এই বিদেশে। মহাসমুদ্রে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডে উপবিষ্ট মহাশত্রুদ্বয়ও মহামিত্রে পরিণত হয়, বিদেশে দুই প্রণয়ী যে নিকটতর হবে এই তো স্বাভাবিক। কিন্তু তার উল্টো হতে চলল। গোড়ায় সে দোষ মদিরার, রাণীর প্রণয় সম্বন্ধে ভুল খবর দিয়েছিল। কৌতূহলকে প্রণয় বলে বর্ণনা করেছিল। তারপর বানর নাচানোর অভিপ্রায়ে নিত্যনূতন মিথ্যা সংবাদ দিয়ে যেত। ফল হল এই যে, এখন মদিরাই নাচতে শুরু করলো, সে নাচ আর যাই হোক অনাদর নয়। সে স্থির করলো দাঁড়াও বোকা এর প্রতিষেধকও আমার জানা আছে। সেই ঔষধ নিয়েই আজ এসেছিল।

জরা, বড়ই বিপদ হল দেখছি।

আবার কি বিপদ মদিরা, এখন তুমি রাণীর অনুগৃহীতা।

তাই তো ছিলাম, এখন বুঝি রাজারও অনুগৃহীতা হতে হয়।

কিছুই বুঝতে পারলো না জরা, শুধালো, সে আবার কি রকম।

রকম বড় ভাল নয়। রাজার বুঝি চোখ পড়েছে আমার দিকে।

কেন বলো তো।

মদিরা দেখল লোকটা একেবারে নিরেট। বলল, পুরুষের চোখ যখন নারীর দিকে পড়ে তখন আবার কেন জিজ্ঞাসা করতে হয়।

রাজা হয়তো তোমাকে অনুগ্রহ করেন।

মদিরা বলে, তার চেয়েও বেশী, আমাকে অনুগৃহীতা করতে চান।

রাণী জানেন।

এখনো জানেন না তবে ক্রমে জানবেন।

রাজা মুখে কিছু বলেছেন?

মুখে যে বলেছেন, চোখে বলেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশী। প্রেমের যুগলদূত মানুষের চোখ দুটো।

তবু মুখে তো কিছু বলবেন।

বলবেন বইকি। একদিন আড়ালে পেয়ে বলেছিলেন, মদিরা তুমি খুব সুন্দর।

আর কিছু?

বলেছিলেন, তোমাকে দেখলে নেশা ধরে যায়।

রাণী টের পান না।

কেমন করে পাবেন? রাণীর সম্মুখে তিনি অন্যলোক, আমাকে দেখেও দেখেন না, চিনেও চেনেন না।

তুমি কিছু বলেছ?

কী বলবো, আমি তো ভয়ে মরি।

কেন?

কেন কি। রাণী শুনলে কি করবেন আর—

থামলে কেন আর কি?

তুমি শুনলে কি ভাববে!

হুঁ! আর কিছু বলে না জরা চুপ করে থাকে।

মদিরা বুঝলো ওষুধ ধরতে শুরু করেছে, এই সময়ে আর দু-এক মাত্রা দেওয়া দরকার। বলল, আজ সন্ধ্যায় নিরিবিলিতে পেয়ে বললেন, মদিরে, আজ মাঝ রাতে আমার উপবন বাটিকায় যেয়ো।

চাপা গর্জন করে উঠে জরা, বলে গিয়েছিলে?.

যাচ্ছি, ভাবলাম যাওয়ার পথে একবার তোমাকে জানিয়ে যাই, বিপদ-আপদ হলে—

তার মুখের কথা শেষ হতে পারলো না, জরা লাফিয়ে উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। কখনো যেতে পারবে না।

আমার কি যেতে সাধ, কিন্তু রাজার আদেশ যে।

রাজা নয় তোমার গুপ্তপ্রণয়ী।

জরা রাগ করো না, তুমিও তো গুপ্ত-প্রণয় চালাচ্ছ রাণীর সঙ্গে অন্তত মনে-মনে।

সে আরেক কথা, বলল জরা।

মদিরা মনে মনে ভাবলো পুরুষ বিচিত্র জীব, গাছেরও খাবে, তলারও কুড়োবে। পারলে রাণীর সঙ্গে প্রণয় করে আবার আমাকেও হাতছাড়া করতে রাজি নয়। মুখে বলল, পাগলামি করো না জরা। রাজা জানতে পারলে তোমার আমার দুজনেরই গর্দান যাবে।

জরা বলল, তুমিও দেখছি যদুবংশের বউগুলোর মতো হলে।

কিছু প্রভেদ আছে।

কি প্রভেদ শুনি।

ওদের ওটা বনভোজন, আর আমাদের নিত্যকার ভোজন।

তবে যাও বনভোজন করো গিয়ে, বলে দরজা খুলে মদিরাকে ঠেলে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, আর আমার কাছে মুখ দেখিয়ো না।

বাইরে এসে মদিরা হাসিতে ভেঙে পড়লো। একে তে ওষুধ করেছে সেই আনন্দে, তার উপরে বোকাটার মন এখনো সম্পূর্ণ বিরূপ হয় নি সেই আনন্দে। উল্লাসে বিজয়ে আত্মগৌরবে সমস্ত দেহ তরঙ্গিত করে নিজ কক্ষে এসে শয়ন করলো মদিরা। গবাক্ষ-পথে চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার মুখে। গবাক্ষটা আরও একটু খুলে দিল সে। চাঁদ হাসছে।

গবাক্ষপথে চাঁদের আলো এসে পড়েছে জরার মুখে। সে চাঁদ কত যুগের কান্নায় মলিন। উঠে গবাক্ষটা বন্ধ করে দিল জরা। চাঁদ কাঁদছে। একই চাঁদ অবস্থা ভেদে হাসে কাঁদে।

জরার ঘুম এলো না, সে গবাক্ষ-পথে আকাশে চাঁদের সংক্রমণ দেখতে দেখতে ভাবছিল। ভাবছিল স্ত্রীলোকজাতটাই অসার। শেষে কিনা মদিরা রাজার সেবাদাসী হয়ে তার বাগানবাড়িতে যেতে শুরু করলো। অথচ তার একবারও মনে পড়লো না যে মদিরা সতীসাধ্বী নয়, সরাসরি পণ্যানারী। একথা জরার চেয়ে বেশী আর কে জানে। মদিরা যদি আজ রাম শ্যাম যদু মধুকে ঘরে আশ্রয় না দিয়ে সুমন্তনগরের রাজাকে ঘরে আমন্ত্রণ করে কিম্বা রাজার বাগানবাড়িতে আমন্ত্রিত হয় তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না. এসব অতি সহজ কথা কিন্তু মানুষের মন সময়বিশেষে এমনই একবগ্গা যে আশে-পাশের প্রশস্ত পথ-গুলো দেখতে পায় না সমুখের সংকীর্ণ জটিল পথটা ছাড়া। সে মদিরাকে দোষ দিচ্ছে অথচ মদিরার কথার উপরে বিশ্বাস করেই রাণী সীমন্তিনীকে প্রণয়িনীরূপে পাওয়ার আকাঙ্খা করেছিল। সতী-শিরোমণি সীমন্তিনী রাজপত্নী রাজ-প্রেয়সী, তার পক্ষে জরার মতো একটা বিদেশী চোয়াড়কে প্রণয়ীরূপে পাওয়ার ইচ্ছা যে একেবারেই অসম্ভব একথা বুঝবার মতো বুদ্ধি হতভাগ্য জরার ছিল না। মদিরা তাকে ঐ মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে নাচিয়েছিল, সেও নেচেছিল। জরার এই আকাঙ্ক্ষা যদি দোষাবহ না হয়ে থাকে (অন্তত জরার চোখে তাই) তবে মদিরার মতো একটা মেয়ে রাজার ইঙ্গিতে বাগান-বাড়িতে গিয়ে যে নিজেকে ধন্য মনে করবে তা অসম্ভব মনে করলে চলবে কেন। অথচ জরার একথাটাও মিথ্যা। সুমন্তরাজের রাণী ছাড়া অন্য কোন নারীর প্রতি আসক্তি ছিল না, তিনি যে পত্নীগতপ্রাণ একথা রাজ্যের সবাই জানতো। অনেকে এতটা পত্নীপ্রাণতাকে রাজার পক্ষে বাড়াবাড়ি মনে করতো। সে যাই হোক রাজা ও রাণী দুজনেই নিষ্কলুষ কিন্তু মূর্খ জরাকে খেলাবার জন্যে তাদেরই দুজনকে ব্যবহার করেছিল মদিরা, মদিরার অভিসন্ধি নিষ্ফল হয় নি।

মানুষের সুখ-দুঃখ যতই তীব্র হোক অনুভূতির শিখর বেশীক্ষণ স্থায়ী থাকে না। জরার দুঃখ ক্রমে স্তিমিত হয়ে এলো, অবশেষে সে ঘুমিয়ে পড়লো। যে চাঁদের কৌতুক অঙ্গুলি মদিরাকে জাগিয়ে রেখে-ছিল সেই চাঁদেরই সান্ত্বনা অঙ্গুলি ঘুম পাড়িয়ে দিল জরাকে। এমনিভাবে দু-তিন রাত ঘুমে জাগরণে গেল। জরা ভেবেছিল যে, ইতিমধ্যে মদিরার দেখা পাওয়া যাবে। সে বিস্মিত হয়ে গেল যে, রাতের বেলায় দূরে যাক দিনের বেলাতেও মদিরার দেখা মেলে নি। এদিকে রাজবাড়ির লোকে জানতো না যে, তাদের মধ্যে পূর্বপরিচয় আছে। কাজেই কারও কাছে মদিরার সন্ধান করতে সাহস হয় নি, বিশেষ সে যখন বর্তমানে রাজার প্রণয়িনী। সে ভেবে পায় না তার ক্রোধের প্রধান লক্ষ্য কে, রাজা না মদিরা, না সীমন্তিনী। তার ধারণা হলো এই তিনজনে জড়িয়েই তার ক্রোধের লক্ষ্য। সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারতো ক্রোধের লক্ষ্য তার আত্মম্ভরিতা। দ্বারকায় থাকতে মদিরার সঙ্গে তার একটু অতিরিক্ত রকম ঘনিষ্ঠতা ছিল, বিদেশে এসে সেই ক্ষীণ সূত্রটা দৃঢ়তর হয়েছিল। তার ধারণা হয়েছিল সেই দৃঢ় সূত্রে মদিরা চিরকাল তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকবে আর অবশেষে সে কিনা গেল রাজার বাগান-বাড়িতে। ক্রমে তার মনের অবস্থা এমন হলো যে, সুযোগ পেলে এক বাণে তিন-জনকে বিদ্ধ করে ফেলে সমস্ত জ্বালার অবসান ঘটায়। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল যুদ্ধ আসন্ন দেখে রাজা বিশেষ করে তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, এখন থেকে জরা যেন সতর্ক হয়ে চলে। কারণ দেহ-রক্ষী হিসেবে তার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। রাজার এই আদেশ মনে পড়ায় সে খুব একচোট হেসে নিল। দেহরক্ষীই বটে! দেহরক্ষার কাজ উপযুক্তভাবেই সে করবে।

দিনের বেলায় রাজসভায় সে যথাস্থানে নীরবে উপস্থিত থাকে, তবে চোখ কান দুই তার এখন সজাগ। সে দেখতে পায় রাজপুরী নিত্যনূতন সৈন্যসমাগমে পূর্ণতর হয়ে উঠছে; প্রাকারে উঠলে চোখে পড়ে উপত্যকায় যে সব চাষীর বাড়ীঘর তারা ঘর-বাড়ী ছেড়ে কতক রাজপুরীতে চলে আসছে, কতক দূরতর গ্রামের দিকে চলতে শুরু করেছে। আর রাজার পাশে সর্বদা থাকে বলে অনেক খবর তার কানে আসে। নরেন্দ্রনগরে কত সৈন্য সংগ্রহ হলো, তারা কবে নাগাদ আক্রমণ করতে পারে সমস্তই জানতে পায় জরা। ইতিমধ্যে একদিন বিকেলবেলায় অবসরক্ষণে লোকের কাছে সন্ধান করতে করতে রাজার বাগানবাড়ির দিকে গিয়েছিল। সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখল যে ছোট্ট একটা ব্যাপার। রাজার যোগ্য তো নয়ই, কোন সাধারণ নাগরিকও সে তাকে আপন বাগানবাড়ি বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছা করবে না। তাছাড়া দেখে মনে হলো বাড়িটা দীর্ঘকাল বন্ধ রয়েছে, দরজা-জানলায় মাকড়সা জাল বুনেছে। ভাবল একি! রাতের বেলায় যদি মদিরাকে নিয়ে রাজা এখানে আসে তবে কি তিনের

বেলার মধ্যে মাকড়সা সমস্ত দরজা জানলায় জাল বুনে ফেলে। কিছুই স্থির করতে না পরে মানুষ অনেক সময়ে যেমন অসম্ভব-টাকেই একমাত্র উপায় মনে করে থাকে জরাও তেমনি করলো। ভাবল, এখানে লুকিয়ে থাকা যাক। রাতের বেলায় যখন ওরা আসবে দুজনকে এক বাণে বিদ্ধ করে তাদের আলিঙ্গনটাকে চিরস্থায়ী করে দিলেই উচিত দণ্ড হবে। অনেকক্ষণ সে একটা গাছের গুঁড়ির উপরে গালে হাত দিয়ে বসে রইলো। আরও কতক্ষণ এমন-ভাবে থাকতো জানি না হঠাৎ রাজবাড়ির দিক থেকে তূরী ভেরী দুন্দুভি একসঙ্গে বেজে উঠে তাকে সজাগ করে দিল। আক্রমণ আসন্ন মনে কনে ছুটলো সে রাজ-বাড়ির দিকে। সেখানে পৌঁছে শুনলো আক্রমণ নয়, তবে আক্রমণের সময়ই যাতে সবাইকে সজাগ পাওয়া যায় তারই জন্য এই মহড়া। তখন রাত হয়ে এসেছে। আহারান্তে সে নিজের কক্ষে এসে প্রবেশ করলো।

জরা কেবলই শুয়েছে এমন সময়ে দরজায় কে টোকা মারলো। জরা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে দেখল সম্মুখে মদিরা। ব্যঙ্গস্বরে বলে উঠল, 'কি গো রাজরাণী পথ ভুলে নাকি?'

মদিরা বলল, আমাকে ছোট করে দেখো না জরা। রাজার উপপত্নী পত্নীর চেয়েও আদরের।

জরা গর্জন করে উঠল, একথা বলতে লজ্জা করলো না?

অন্ধকারে লজ্জার স্থান কোথায়?

সেদিন চাঁদ আকাশে অনেক উপরে উঠে যাওয়ায় ভিতরে আলো এসে পড়ে নি, ঘরটা অন্ধকার ছিল বটে।

তবে না হয় আলো জেবলে একবার রাজরাণীর মুখখানা দেখি, এই বলে সে বাতি জ্বাললো। বাতি জ্বলবামাত্র ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল মদিরা।

কেন নেভালে কেন?

মদিরা বলল, রাজপ্রেয়সীর মুখে লজ্জার চিহ্ন দেখতে না পেলেও রাজার আদরের চিহ্ন দেখতে পেতে। সেটা অলংকারের চেয়েও আদরের বস্তু, সকলকে দেখাতে নেই।

জরা অধিকতর ক্রোধে গর্জন করে বলল, জানো ইচ্ছে করলে এখনই তোমাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারি।

নির্বিকার কণ্ঠে মদিরা বললো, তা আর জানি না, তুমি স্বয়ং বাসুদেবকে মেরেছো, আমি তো সামান্য জীব।

তুমি সামান্য জীব! এত বড় রাজার সেবাদাসী। তুমি সামান্য হলে তো সংসারে অসামান্য কেউ থাকে না।

থাকে বৈকি! স্বয়ং বাসুদেবের ভক্ত থাকেন। রাজা ও রাণী বাসুদেবের পরম ভক্ত। তোমার কীর্তি প্রকাশ করলে এখনই কি দণ্ড হবে বুঝতে পারো?

আমি যে মেরেছি তার প্রমাণ কি?

প্রমাণ রাজপ্রেয়সীর বাক্য আর সেই বাসুদেবের কণ্ঠহার কৌস্তুভমণি।

ওঃ শয়তানী! এই মতলব করে তুমি সেটাকে হস্তগত করে রেখেছো।

তবে কি তুমি ভেবেছিলে ওটা আমি রাণীকে তোমার হয়ে উপহার দেব।

ক্ষণকালের জন্য দুজনেই নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপরে জরা শুধালো, রাজার বাগানবাড়িটা তো তেমন সুরম্য অট্টালিকা নয়, ওখানে কি তোমার মতো সুন্দরীকে মানায়?

সেটা দেখে আসা হয়েছে বুঝি? তবে খুলে বলি শোন। সত্যি আমাকে মানায় না, তাই রাজা আর আমাকে বাগানবাড়িতে না নিয়ে গিয়ে খাস রাজবাড়িতেই উপভোগ করেন।

জরা বিস্ময়ে শুধালো, রাণী জানেন?

আরে মূর্খ! রাজবাড়িতে তো একটা মাত্র ঘর নয়, কত কক্ষ, কত অলিন্দ, কত বলভি আছে, কত দেহলি আছে। একটা মেয়ের সঙ্গে রাত কাটাবার জন্যে তার যে কোন একটা ব্যবহার করলেই হলো, রানী জানবেন কি করে।

বটে! বলে গর্জন করে জরা লাফিয়ে তার হাত ধরতে গেল।

মদিরা চট করে সরে দরজার বাহিরে এসে বললো, তোমার এত বড়ো আস্পর্দা যে, রাজপ্রেয়সীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করতে চাও। এমনভাবে চললে কদিন তোমার মাথাটা থাকবে ভাবছি, এই বলে হাসিতে ও কটাক্ষে বিদ্যুৎক্ষরণ করে অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হলো। জরা কিছুক্ষণ জড়বৎ দাঁড়িয়ে থেকে শয্যায় এসে বসে পড়লো।

মদিরা স্বস্থানে যেতে যেতে ভাবলো, মুখটার উপরে ওষুধ ধরেছে। এবারে কাজ আদায় করা সহজ হবে।

মদিরার সমস্তটাই অভিনয়। রাজ-প্রেয়সী হওয়া জরার প্রতি রাণীর অনুরাগ সমস্তই বানানো কথা। অভিনয়টাই ওর এমন সহজ হয়ে পড়েছে যে, কখন সত্য কথা বলে, কখন মুখস্তকরা ভূমিকা বলে তা কেউ বুঝতে পারে না, অনেক সময় ওর নিজেরই ধাঁধা লাগে। ওর আসল উদ্দেশ্য জরার সহায়তায় জরাকে নিয়ে রাজ-পুরী পরিত্যাগ করে পলায়ন। পালাবে অবশ্য দেশে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই তবে এ কাজ তো একক মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সঙ্গী আবশ্যক। এ কাজে জরা আদর্শ সঙ্গী, দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসী এবং নির্বোধ। কিন্তু প্রস্তাবটা ওকে খুলে বলতে সাহস হয় নি। জরা এখন রাজ-ভোগে এবং রাজপ্রসাদে এমনি বিহ্বল যে, মদিরার প্রস্তাব তার পক্ষে অসম্ভব নয়। কি করে জরাকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করা যায় অনেক দিন ভেবেছে মদিরা। অবশেষে স্থির করেছে যে, দ্বারকার পুরাতন পরিচয়, প্রেমের গাঢ়তা দিয়ে তাকে এমনি সবশে আনবে যে, বশংবদ জরার দ্বিরুক্তি করার উপায় থাকবে না। প্রেমব্যবসায়িনী মদিরা ভালভাবেই জানে যে, পুরুষের প্রেমকে জাগ্রত করতে হলে প্রতিদ্বন্দ্বীর আবশ্যক হয়। সে প্রতিদ্বন্দ্বী বাস্তবে না মিললে কাল্পনিক প্রতিদ্বন্দ্বীতেও চলে। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী আধা-বাস্তব, আধা-কল্পনা। রাজা বাস্তব তবে তার সঙ্গে জরার সম্পর্ক সম্পূর্ণ কল্পনা। আর রাজা এমনই অসম প্রতিদ্বন্দ্বী যে, জরার সাধ্য নেই তাদের সম্পর্ক নিয়ে টুঁ শব্দটি করে। সমস্ত ব্যাপারটা নীরবে তাকে গুমে গুমে সহ্য করতে হবে। সেই অন্তর্দাহ যখন চরমে উঠবে, তখন এসে উপস্থিত হয়ে আরেক দফা উল্টো প্রেমাভিনয় করে মূঢ়কে কব্জা-গত করে নেবে আর দুজনে সেই রাত্রেই রাজপুরী পরিত্যাগ করে প্রস্থান করবে। রাজার খাস দেহরক্ষীর পক্ষে নগরের সমস্ত দ্বার দিবারাত্রি অবারিত। মদিরা স্থির করলো লড়াই বেঁধে উঠবার আগেই আগামীকাল রাত্রেই দুজনে পালাবে।

সে স্থির করলো বটে, কিন্তু স্থির করবার আসল মালিক ঘটনাচক্র। সেই চাকা মদিরা যখন নিজের অনুকূলে ঘোরাবার চেষ্টা করছিল, নিয়তির বিধানে হঠাৎ সে প্রতিকূলে আবর্তিত হয়ে অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটিয়ে দিল।

(৭)

সকলেই বুঝতে পারলো যে, সুমন্ত-পুর ও নারেন্দ্রনগরের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠেছে। সুমন্তপুরের সাধারণ লোকে এমন কি ছোটখাট দোকানীরা পর্যন্ত বোঁচকা-বুঁচকি মাথায় নিয়ে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে নগর ছেড়ে চললো, সকলেরই মুখে এক কথা, ভাগো গাঁও মে চলো। এ হচ্ছে ভারতের চিরাচরিত নীতি, যখনই কোন স্থানে লড়াই শুরু হতে চলেছে যে পেরেছে আর না পেরেছে সকলেই ভাগো গাঁও মে চলো নীতি অনুসারে প্রস্থান করেছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে আশে-পাশের সমস্ত প্রজাসাধারণ ভাগো গাঁও মে চলো করেছে। সেই আলেক-জান্ডারের আক্রমণ থেকে শুরু করে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত এই নীতি অনুসরণ করতে ভুল করে নি, এখনও করলো না, সুমন্ত-পুর ছেড়ে সবাই যে যেখানে পারে পালাতে শুরু করলো।

একদিকে যেমন লোক পালাতে শুরু করলো, তেমনি আবার আসতে শুরু করলো নূতন লোক—এরা সাময়িকভাবে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বনকারী। রাজার বেতন-ভুক সৈন্য সামান্য তবে যুদ্ধকালে সৈন্যের কখনো অভাব হত না। সৈন্যের অভাবে যুদ্ধে পরাজয় অল্পই ঘটে থাকে। সারা বছর যারা খেতি বা মজুরী ক'রে যুদ্ধের আওয়াজ পাওয়ামাত্র মাথায় পাগড়ি বেঁধে ঢাল সড়কি নিয়ে এসে উপস্থিত হলো, বেতন লুঠ-তরাজের মাল। আর নিতান্তই পালাতে না পেরে যদি মারাই যায় তবে যে সোজা স্বর্গে চলে যাবে, যুদ্ধবাজ-শাস্ত্রীরা এইরূপ পাঁতি দিয়েছেন। কাজেই এখন নরেন্দ্রপুরের অবস্থা হলো অনেকটা চৌবাচ্চার জলের সমস্যার মতো, দুই নালা দিয়ে জল বেরুচ্ছে আর দুই নালা দিয়ে প্রবেশ করছে, হরণে-পূরণে সমান।

মদিরা জানতো যে এই রকমটি হবে, কারণ মহাপ্লাবনের আশঙ্কায় রাজধানী ছেড়ে লোকে গাঁও মে চলো করেছিল। তাছাড়া এ নীতিটা ভারতীয় রক্তের মধ্যে বিধাতা যেন সংক্রামিত করে দিয়েছেন। মদিরা স্থির করেছিল যে, এই মওকায় জরাকে সঙ্গী করে গাঁও মে চলো করবে। অর্থাৎ আপাতত সুমন্তপুর ছেড়ে যাবে তক্ষশীলায় এবং তারপরে চেষ্টা করবে দ্বারকায় ফিরে যেতে। অবশ্য এ কয়দিন কথায় ও ব্যবহারে তার মনটা বিরক্ত করে দিয়েছে সত্য, কিন্তু ছলনাময়ী মদিরা জানে যে, মেয়েদের কাছে পুরুষ ক্রীড়াকন্দুক, একটু কৌশল অবলম্বন করলে যথেচ্ছ লোফালুফি করা চলে। কৌশলের অভাব কখনো ঘটে নি মদিরার। কিন্তু কোথায় সে গোঁয়ারটা।

গোঁয়ার তাতে সন্দেহ নেই। যুদ্ধের আভাসে জরা খুশি হয়ে উঠেছিল, রক্তপাতের লোভ তার রক্তের মধ্যে। এতদিন লুকিয়ে-চুরিয়ে মানুষ মেরেছে, এবারে রাজার হুকুমে প্রকাশ্যে মানুষ মারা। বীরত্বের পরকাষ্ঠা আর কাকে বলে। যদিচ তার মনটা রাজার উপরে প্রসন্ন ছিল না, তবু যুদ্ধের আয়োজন অপ্রসন্ন মনকে অনেক পরিমাণে প্রসন্ন না করলেও অনুগত করে তুললো। সে মনে মনে স্থির করলো যুদ্ধে জয়-পরাজয় যাই হোক মদিরাকে উপযুক্ত সাজা দিয়ে, রাজা তার শাসনের অনেক ঊর্ধ্বে, যেদিকে দু চোখ যায় চলে যাবে, এ রাজ্যে আর নয়। সৈন্যদলের প্রধানরা যেখানে শলা-পরামর্শ করছে তারই কাছাকাছি রইলো সে, তাদের কথা দেখে বুঝতে পারলো আগামীকাল অতিপ্রত্যুষে সুমন্তপুর আক্রান্ত হওয়ার আশংকা। গুপ্তচরেরা নরেন্দ্রনগরে গিয়ে যুদ্ধের আয়োজন যে অবস্থায় দেখে এসেছে তাতে তার আগে আক্রমণ সম্ভব নয়। কাজেই সুমন্তপুরের রাজা ও সৈন্যপ্রধানগণ সেইভাবেই প্রস্তুত হতে লাগলেন। এদিকে মদিরা ঘরে-বাইরে জরার সন্ধান করছে, জরা যেখানে মদিরার যাওয়ার উপায় ছিল না সে জায়গায়।

মধ্যাহ্ন থেকে অপরাহ্ন গড়িয়ে ক্রমে সন্ধ্যা ক্রমে রাত্রিতে পরিণত হলো, নরেন্দ্রপুর ও সুমন্তনগরের আকাশ ভরে গেল কৌতূহলী তারার দলে, মাঝখানে আসর জমিয়ে খণ্ডিত চাঁদ। চাঁদের আলো এমন নিস্তেজ যে, মানুষ দেখা যায় অথচ চেনা যায় না, অস্ত্র চালানো যায় তবে তার পরিণাম বুঝতে পারা যায় না, হাত খুব সই থাকলে বাণ দিয়ে লক্ষ্যবিদ্ধ করা অসম্ভব নয়। জরার কর্তব্য গোড়া থেকেই নির্দিষ্ট ছিল, রাজার মহল ঘিরে যে প্রাকার সেখানে তাকে পাহারা দিয়ে সারা রাত জাগতে হবে। ধনুর্বাণ এবং অসি ও বর্মে সজ্জিত হয়ে প্রাকারের উপর টহল দিচ্ছে সে উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূব থেকে পশ্চিমে, তার সংক্রমণের আর অন্ত নেই। সুমন্তপুরের উত্তর-পশ্চিমে নরেন্দ্রনগর, সেদিকটায় সতর্ক দৃষ্টি রাখবার আদেশ ছিল তার উপরে। আক্রমণের আভাসমাত্র পেলে তূর্যধ্বনি করবে, একটি তূরী তার কোমরে ঝোলান ছিল। কিন্তু না কোথাও কিছু নাই, গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে না, প্রহরান্তে যামঘোষ তারাও আজ যেন নিস্তব্ধ কেবল খণ্ড চাঁদ গাছপালা বাড়ি-ঘরে ছায়া দীর্ঘতর করতে করতে পায়ে-পায়ে পশ্চিমের দিকে চলেছে। এমন সময়ে সমস্ত নৈশ নীরবতাকে বহুধাবিভক্ত করে রাজবাড়ি দেউলকে দ্বিপ্রহর বাধলো। সেই শব্দ থামবামাত্র রাজপ্রাসাদের উচ্চতম চূড়ার কোন গর্ত থেকে কালপেঁচা বিকট রবে ডেকে উঠল, কাঁটা দিয়ে উঠলো সমস্ত নীরবতার অঙ্গে। কোথা থেকে কালপেঁচা ডাকলো দেখবার উদ্দেশ্যে কৌতূহলী জরার চোখ পড়লো রাজার অন্দরমহলের ত্রিতলের অলিন্দে। অলিন্দটা অট্টালিকার একেবারে শেষ প্রান্তে, জরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে তার দূরত্ব দূরতম। জরা দেখতে পেল সেই আলো-আঁধারির মধ্যে বিশাল উন্নতদেহী এক পুরুষ পিছন ফিরে দণ্ডায়মান, বুঝতে পারলো স্বয়ং সুমন্তরাজ। তার ঠিক সম্মুখে আর একজন কেউ দণ্ডায়মান, দুজনে মুখোমুখি, তার বেশী বুঝবার উপায় ছিল না। কে সেই নারী এই উদ্বেগে জরার সমস্ত রক্ত বুকের মধ্যে চনবন করে উঠলো। নিশ্চয় মদিরা।

নিশ্চয় মদিরা নয়, রাণী সীমন্তিনী। রাজা ও রাণী নিদারুণ যুদ্ধের প্রাক্কালে পরস্পরের কাছে বিদায় গ্রহণ করছে।

রাজা বলছে, সীমন্তী কালকে যুদ্ধ বড় নিদারুণ হবে বলে আশংকা।

আশংকা কেন মহারাজ? যুদ্ধ কবে নিঃশংক আর শঙ্কার কথা তা কখনো আপনার মুখে শুনিনি।

সত্যি সীমন্তী আমি কখনো শঙ্কিত হই নি, এবারে কেন যে শংকাতুর বোধ করছি জানিনে।

রাণী বললেন, নরেন্দ্রনগরের সঙ্গেই তো কতবার লড়াই হয়েছে, সকল বারেই পরাজয় ঘটেছে তাদের.

যুদ্ধ যে নিদারুণ হবে সেটাও একটা কারণ। বারে বারে যে হারে একবার জিতবার জন্যে তো সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে, তাছাড়া কি জানো এর আগে যতবার লড়াই হয়েছে, প্রজাদের সুবিধা-অসুবিধা ছিল তার প্রেরণা।

রাণী শুধালেন এবারে?

এবারে প্রেরণা নরেন্দ্ররাজের আত্মাভিমান। তার শখের পোষা পায়রা আমার অনুচরের বাণে বিদ্ধ হয়ে সভাসদদের সম্মুখে ঠিক তার পায়ের গোড়ায় এসে পড়েছে—এ সহ্য করতে পারে কয়জন রাজা?

রাণী বললেন, সত্যি মহারাজ রাজারা অদ্ভুত জীব।

সুমন্তরাজ আদরে তার চিবুক স্পর্শ করে বললেন, রাণীরা নয় কি?

না মহারাজ, এ বিষয়ে রাজাদের জিত। তারা একটা পোষা পায়রার প্রাণের জন্যে শত শত প্রজাকে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

সুমন্তরাজ স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, একটা পোষা পায়রার প্রাণের মূল্য কি কম? শোননি কি যে পুরাকালে শিবিরাজা একটি পাখীর বিনিময়ে বুকের মাংস কেটে দিয়েছিলেন।

তিনি নিজের বুকের মাংস কেটে দিয়েছিলেন, নিরীহ প্রজাদের বুকের মাংসে থাবা বসান নি।

রাজা একথার উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থেকে রাণীর কপোল স্পর্শ করে বললেন, এখন এসব কথা থাক। রাত্রিশেষ হয়ে এলো, এবারে প্রসন্নমনে আমাকে বিদায় দাও।

বিদায় কেন মহারাজ? কত বার তো যুদ্ধে গিয়েছেন। বিদায় শব্দটা তো আপনার মুখ দিয়ে বের হয় নি।

রাজা বললেন, আগেই তো বলেছি এবারে যুদ্ধ বড় নিদারুণ হবে, কে বাঁচবে, কে ফিরবে না কেমন করে বলবো?

মহারাজ আপনি কি ভাবেন আপনার বিপদ হলে তার পরেও আমি বেঁচে থাকবো?

রাজা মৃদু হাস্যে বললেন, তুমিও কি যুদ্ধে যাবে নাকি?

না মহারাজ; বিবাহের আগে আমাদের রাজজ্যোতিষী আমার পিতাকে শুনিয়েছিলেন যে, আপনার কন্যা স্বয়ংমৃতা হবেন। শুনে পিতা তাঁকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিয়েছিলেন।

আমি তার সাক্ষাৎ পেলে আর এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিতাম।

রাজা সীমন্তিনীকে বাহুপাশে আকৃষ্ট করে চুম্বন করবার জন্যে মুখ নীচু করলেন, রাণী সাগ্রহে সানন্দে ওষ্ঠাধর এগিয়ে দিলেন। কিন্তু দুজনের ওষ্ঠাধরের মধ্যে যখন কেশমাত্র ব্যবধান ঠিক সেই সময়ে পিছন থেকে এক নিদারুণ শর এসে দুজনাকে বিদ্ধ করলো, মৃত্যুর স্পর্শে ঘুচে গেল সেই কেশমাত্র ব্যবধান। সমস্বরে বিদ্ধ রাজা-রাণীর দেহ একবার মাত্র বিচলিত হয়ে ভূপতিত হলো। মৃত্যুতে তাদের শেষ আলিঙ্গন চিরন্তন হয়ে থাকলো।

(৮)

ভোর রাত্রে সুমন্তপুর আক্রান্ত হল। সুমন্তপুর অবশ্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে দেখা গেল যে, অপ্রস্তুতের চরম। সুমন্তরাজ কোথায়, সকলেরই মুখে এ

প্রশ্ন: সেনাপতি, মন্ত্রী প্রভৃতি প্রধানগণ কেউ জানেন না সুমন্তরাজ কোথায় গেলেন। মোট কথা এই যে, তিনি অনুপস্থিত। এদেশে রাজা আহত, নিহত বা নিরুদ্দিষ্ট হলে যুদ্ধ তখনই শেষ হয়ে যায়। সৈন্য দল তখনই ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারে চলে যায় আর প্রজাসাধারণ তো যুদ্ধের আভাস পাওয়া মাত্র 'গাঁও মে চলো' নীতি অনুসরণ করেছে। কাজেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কি?

বন্দী পুরুরাজ যখন সেকেন্দার শাহের শিবিরে নীত হয়েছিলেন, সৈন্য ও প্রজাদের মধ্যে একজনও তাঁর অনুকূলে একটি অঙ্গুলি উত্তোলন করে নি। আর ভগ্নউরু দুর্যোধন যখন দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত ছিল, কোথায় ছিল তার প্রজাসাধারণ। যুগে যুগে এদেশে হিন্দু, পাঠান, মোগল ইংরেজ রাজত্ব করেছে এ নীতির ব্যতিক্রম হয় নি, এখনও হল না।

রাজ্যের প্রধানদের কেউ ভাবল রাজা ও রাণী নিরুদ্দিষ্ট, কেউ ভাবল তাঁরা পালিয়েছেন, আবার কারো বা ধারণা হল রাতের বেলায় তাঁরা শত্রু কর্তৃক নিহত হয়েছেন। কারো এ বুদ্ধি হল না যে, একবার অন্দরমহলে ঢুকে দেখে আসি কি হয়েছে, সকলেই পালাবার তালে আছে। রাজাই যখন নেই তখন আর কার জন্য যুদ্ধ করা। যিনি রাজা হন তাঁকেই খাজনা দিতে হবে এবং তিনিই রাজোচিত

পীড়ন করবেন, কাজেই ভাল-মন্দ বাছাই চেষ্টা নিরর্থক।

ওদিকে নরেন্দ্রনগরের সৈন্যবাহিনী প্রাচীর লঙ্ঘন করে পুরীর মধ্যে ঢুকল, ঢুকে সিংহদরজাগুলি খুলে দিল। তখন আর জনস্রোত প্রবেশে বাধা থাকল না, ওরা দেখল যুদ্ধ বলে কিছু হচ্ছে না, সবাই পালাবার তালে আছে। কাজেই তারা তলোয়ার কোষবদ্ধ ও ঢাল পিঠে ন্যস্ত করে আঙরাখার মধ্যে থেকে থলি বের করল। প্রত্যেক সৈন্যের হাতে একটি থলি। এই থলির টানেই তাদের যুদ্ধে আসা, ভাল-মন্দ, ছোট-বড় যার যা চোখে পড়ল ওই থলিতে ভরল। মাঝে-মাঝে লুটের মালের ভাগাভাগি নিয়ে দুজনে মারামারি হয় আবার তখনই মিটে যায়, দেখতে দেখতে থলি ভরে ওঠে। তখন সুমন্তপুরের পলায়নপর সৈনিকদের কাছ থেকে থলি কেড়ে নেয়। তারাও লুটের আশায় থলি সংগ্রহ করে রেখেছিল। এই-ভাবে অপরাহ্ণ পর্যন্ত একতরফা লুট চলল, সুমন্তপুরে শুধুই এখন নরেন্দ্র-নগরের সৈন্যবাহিনী।

পাঠকের বোধ করি আহ্লীক ও বাহ্লীককে মনে আছে। নরেন্দ্রনগরের প্রধান সেনাপতি তাদেরকে বলে দিয়েছিল যে, তারা নরেন্দ্রনগরের অনুকূলে গুপ্তচর-বৃত্তি করেছে তাদের যেন সমাদর করে নিয়ে আসা হয়। সমাদরের আভাষ পাওয়া মাত্র তারা দুইজনে পায়ে কাপড় জড়িয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। বলল, ভাই, তোমাদের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে পা দুটোর হেনস্তা হয়েছে। নরেন্দ্রনগর-রাজকে অভি-বাদন করতে যাওয়ার তো ইচ্ছা কিন্তু যাই কি করে।

প্রধান সেনাপতি বলল, এর জন্য আর ভাবনা কি, তোমাদের রথে চাপিয়ে নিয়ে যাব।

ওরা বলল, সেনাপতি মহারাজ, দুই-একবার রাজার সঙ্গে রথে চেপেছিলাম, দেখলাম মাথাটা বড্ড ঘোরে। তবে বুঝি আর নরেন্দ্রনগর-রাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না।

সেনাপতি বলল, রথে না চাপো, ঝাঁড়ি তো আছে।

তখন তার হুকুমে দুজন বলবান সৈন্য দুটো ঝাঁড়ি নিয়ে এসে উপস্থিত হল, আহ্লীক ও বাহ্লীক ঝাঁড়ি দুটোয় সমা-সীন হয়ে মাথায় চড়ে চলল নরেন্দ্রনগরের দিকে। মাঝখানে এক জায়গায় জলপানের উদ্দেশ্যে সৈন্যরা যেই ঝাঁড়ি দুটো নামিয়ে পাহাড়ী ঝর্ণার খোঁজে একটু দূরে গিয়েছে অমনি আহ্লীক ও বাহ্লীক ঝাঁড়ি থেকে নেমে নিরুদ্দিষ্ট হল। সৈন্য দুজন ফিরে এসে দেখল কোথাও কেউ নেই। তখন তারা নরেন্দ্রনগরে ফিরে গিয়ে এক উপন্যাস রচনা করে জানাল যে, হঠাৎ এক দল সুমন্তপুরের সৈন্য এসে তাদের কেড়ে নিয়ে গেল। ওরা দুজন খুব লড়েছিল। কিন্তু হলে কি হয়, অন্য দিকে প্রায় শ' দুই লোক। এই বলে লুটের মাল কাড়া-কাড়ি করবার সময় দুজনে গায়ে যে চোট পেয়েছিল সে দাগগুলি দেখিয়ে দিল।

জরার কি হল? গত রাত্রে সেই মারাত্মক শরনিক্ষেপের পরে মনে এক প্রকার স্বস্তি অনুভব করেছিল, ভেবেছিল যে, অপরাধীর যথোচিত দণ্ড দেওয়া হল। তখন সে ঘরে ফিরে এসে সৈনিকের পরিচ্ছদ খুলে একটু জিরিয়ে নেবার আশায় বিছানায় শোবামাত্র গত কয়েক রাত্রের অনিদ্রার ক্ষতিপূরণের তাগিদে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ তার জাগরণ ঘটল প্রচণ্ড এক চপেটাঘাতে। চোখ খুলে দেখে, জন-দুই শত্রুপক্ষের সৈন্য তলোয়ার উঁচিয়ে দণ্ডায়মান।

একজন সৈনিক জিজ্ঞাসা করল, এই বেটা, ঘুমোচ্ছিস কেন?

জরা কিছু উত্তর খুঁজে না পেয়ে, রাতের বেলা তো লোকে ঘুমিয়েই থাকে।

তখন সৈন্যদের আর একজন বলল, তবে এখন ওঠ। অনেক বেলা হয়েছে।

সৈন্যদের মধ্যে একজন তার গলায় রাণীর প্রদত্ত সেই মুক্তোর মালাটি দেখতে পেয়ে এ যে বানরের গলায় মুক্তোর মালা বলে সজোরে টান দিল। অনেকগুলো মুক্তো তার হাতে এল, বাকীগুলো মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল, ওরা যখন সেই মুক্তোগুলি কুড়োচ্ছে, জরা পালিয়ে চলে এলো বাইরের চত্বরে। দেখল, যুদ্ধ অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন লুটের মাল ভাগাভাগির পালা। সে স্থির করল এখানে থেকে আর লাভ নেই। এখন পালান উচিত। এই উদ্দেশ্যে পূব দিকের সিংহদরজার দিকে যাচ্ছে, এমন সময় শুনতে পেল, পিছন থেকে কে একজন বলছে, ধর, ধর, ওকে পাকড়াও। জরা পিছন ফিরে দেখল, নরেন্দ্রনগরের সেই রাজদূত যার পাগড়ী সে উড়িয়ে দিয়েছিল।

জরা বলল, আমাকে ধরছ কেন? আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করি নি।

বটে, পাগড়ীটা উড়িয়ে দিয়েছিল কে? মাথাটাও তো উড়িয়ে দিতে পারতাম। তাহলে আর ধরবার হুকুম দিতাম না নিশ্চয়।

ইতিমধ্যে জন-কয়েক সৈন্য এসে জরাকে বেঁধে ফেলেছে। রাজদূত বলল, একে মেরো না, একেবারে মহারাজের পায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করে দেবে। এ সেই তীরন্দাজ, মহারাজের পোষা পায়রা মেরেছিল যে।

জরা বন্দী হয়ে নরেন্দ্রনগরে নীত হল।

সুমন্তপুর আক্রান্ত হওয়া মাত্র মদিরা অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে জরার সন্ধান আরম্ভ করেছিল। না, কোথাও জরা নেই। তার ইচ্ছে ছিল বিপদের সম্মুখে জরা তার পরামর্শ শুনবে এবং দুজনে একত্র পালাবে। কিন্তু জরার বদলে সে একেবারে পড়ল গিয়ে নরেন্দ্রনগরের প্রধান সেনাপতির সম্মুখে। তার আদেশে দুজন সৈন্য গিয়ে মদিরাকে দাঁড় করাল। সেনাপতি জানালেন লুটের মাল হিসাবে সে তার ভাগে পড়েছে। একজন বিশ্বস্ত অনুচরের সঙ্গে তাকে তক্ষশীলার বাজারে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

ভারতের উত্তর-পশ্চিমে দাস ক্রয়-বিক্রয়ের সর্ববৃহৎ বাজার তক্ষশীলা। ভারতের বাইরে ও ভারতের মধ্যে নানা দেশ থেকে বিক্রয়ার্থ নরনারী এখানে আনীত হয়। লুটের মালরূপে একবার সে এখানে এসেছিল, আবার এলো। মথুরার এক বণিক তাকে কিনে নিয়ে স্বদেশে প্রস্থান করলো। তখনো মদিরার কাছে ছিল সেই কৌস্তুভমণির হার।

রাত্রি সমাগত হলে নিস্তব্ধ নির্জন সুমন্তপুরে কেবল আহত, শৃগাল ও নৈশ পক্ষীর চিৎকার। কয়েক প্রহরের মধ্যে একটা সমৃদ্ধ রাজপুরী যে এমন শ্রীহীন হয়ে পড়তে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। আকাশে খণ্ড চাঁদ ও তারার জ্যোতি ছাড়া কোথাও একবিন্দু আলোকরশ্মি নেই। সকালবেলায় যে স্থান জনবহুল নগরী ছিল, এখন তা প্রেতপুরী। প্রেত-পুরীও বোধ করি এমন ভয়াবহ নয়। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের এই যে, এই সর্বাঙ্গীন ওলোট-পালোটের মধ্যে রাজা ও রাণীর কি হল এ প্রশ্ন কারো মনে দেখা দিল না। কালেই প্রাণভয়ে ভীত, সকলেই পলায়নপর, সে খোঁজ করে রাজা-রাণীর! হয় তাঁরা নিরুদ্দিষ্ট নয় নিহত, নয় আহত এবং হৃতরাজ্য যে সন্দেহ নেই। তাঁদের কাছ থেকে ত আর প্রসাদ পাওয়া যাবে না। অতএব কেন তাঁদের সন্ধান করা।

অন্দরমহলে তেতালার ছাদে জরার শরে বিদ্ধ রাজা-রাণীর দেহ তেমনি অসাড়-ভাবে পড়েছিল। এতক্ষণ যুদ্ধের হলাহল ছিল তাই আমিষলোভী পশু-পাখীরা সেদিকে অগ্রসর হয় নি। এখন সন্ধ্যাবেলা সমস্ত কোলাহল শান্ত হতেই, নিশাচর মাংসভুক পাখী ও শিবা কুকুর প্রভৃতি মাংসভুক পশু সন্তর্পণে সেখানে এসে সমবেত হল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। রাজা-রাণীর দেহের কাছে এগোবার সাহস তাদের হল না। সুমন্তপুরের ভূগর্ভস্থ বিবর থেকে কখন সকলের অজ্ঞাতসারে বেরিয়ে এসেছে সুমন্তপুরের বাস্তুসাপ। কত তার বয়স কেউ জানে না। কেউ তাকে দেখে নি। তবে সবাই জানে যে, সুমন্তপুরের গড় রক্ষা করে সেই বাস্তুদেবতা আছেন। পৌষ সংক্রান্তিতে ঘটা করে তাঁর পুজো দেওয়া হয়। এখন সেই মহাসর্প বিবর পরিত্যাগ করে বেরিয়ে এসে ফণা বিস্তারে রাজছত্র উন্মোচিত করে রক্ষা করছে সেই মৃতদেহ দুটি। পশুপাখী কার সাধ্য সেদিকে এগোবে।

(ক্রমশঃ)

প্যারাডকস !

—অমিতাভ ভট্টাচার্য

'প্রফ ফ্রম ইন্ডিয়া ইজ ভিজিটিং পি এস ইউ', 'ভিজিটিং প্রফেসর রি-অ্যাপয়েনটেড', 'প্রফেসর ফ্রম ইন্ডিয়া টিচেস অ্যাট পেন স্টেট', 'ভট্টাচার্য ডিসটিংগুইশড প্রফেসর'—এ সমস্তই বিদেশী কাগজের নিউজ ব্যানার। এদেশে আমরা খোঁজই রাখি না যে বিদেশে আমাদেরই ঘরের লোক দেশের জন্য কি সম্মান অর্জন করছে। মাঝে মাঝে নোবেল পুরস্কার তালিকায় বা নামী বিদেশী পত্র-পত্রিকায় যখন খোরানা বা চন্দ্রশেখর, রায় বা ভট্টাচার্যের কথা বেরোয় তখন আহ্লাদে দুহাত তুলে নাচতে নাচতে প্রথমেই যে কাজটা করি তাহল, ওদের খ্যাতির মূল কারণ বিস্মরণ।

এই ধরুন না কেন আমাদের 'ভট্টাচার্য ডিসটিংগুইশড প্রফেসর'-এর কথা। তাঁকে কে চিনত? কেই বা করত খাতির? ভাগ্যিস চৌষট্টি সালে বার্মিংহামে 'মেশিন টুল ডিজাইন অ্যান্ড রিসার্চ কনফারেন্সে' পেপার পড়তে গিয়েছিলেন উনি। পেপার শুনে আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক অ্যালফ্রেড স্মিড শুধু একটি কথাই বলেছিলেন—অমিতাভ তুমি চলে এস স্টেটসে।

জবাবে অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেছিলেন, তা কি করে সম্ভব? দেশ ছেড়ে থাকতে পারব না।

তাহলে যখনই তুমি সময় পাবে জানিও, আমার ল্যাবরেটরীর দরজা তোমার জন্য চিরদিনই খোলা থাকবে—!

আজো খোলা আছে। অধ্যাপক স্মিড এই তো সেদিন রিটায়ার করলেন। পেন ইউনিভার্সিটি সেই পদ, সেই গুরু দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আমাদের অধ্যাপককে আহ্বান জানিয়েছিলেন। আহবান শুধু পেন ইউনিভার্সিটি কেন, পশ্চিমের সব বাঘা বাঘা ইউনিভার্সিটির কাছথেকে এসেছে বার বার। এমন কি দিল্লীর কর্তারাও বহু রিকোয়েস্ট করেছেন—আপনি আসুন, কোন ন্যাশন্যাল ল্যাবরেটরীর ডিরেকটরের পদ গ্রহণ করুন। অফার এসেছিল এদেশেরই আর একটি নামকরা ইঞ্জিনীয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে—দু হাজারের ওপর মাইনে দেব। আপনি প্রোডাকশন ইঞ্জিনীয়ারিং-এর বিভাগীয় প্রধানের পদ গ্রহণ করুন।

অফারের বহর দেখে যেন ভুল না করি মানুষটা বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। বরং ঠিক তার উল্টো। আগামী নভেম্বরে চল্লিশ পুরো করে একচল্লিশে পা দেবেন অধ্যাপক। অথচ এই বয়সে সব প্রলোভন অস্বীকার করে পুরোনো মাস্টারমশাইর আদেশ মাথায় করে শহর কলকাতার পূব-দক্ষিণে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের হাতে গড়া গবেষণাগারে একমনে কাজ করে যাচ্ছেন।

প্রায়ই ডাক আসে—বিদেশ থেকে। হয় ইটালী নয় ফ্রান্স, নয় ইংলণ্ড কি বেল-জিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া কি পোল্যান্ড বা রুমানিয়া। রাশিয়া, আমেরিকা তো আছেই। ওঁর বই তুরিণ, মিলান, রোমের ছাত্ররা নিজেদের মাতৃভাষায় পড়ছে। পড়ছে আমেরিকার তাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। আর এদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর কোর্স আছে, অধ্যাপক জি সেন ও অধ্যাপক এ ভট্টাচার্যের তিনখানা আর শুধু অধ্যাপক ভট্টাচার্যের দুখানা বই শিরোধার্য।

শুধু কি বই পাঠ্য? ভারতবর্ষে প্রায় সব ইউনিভার্সিটিতে এ বিষয়টির পঠন-পাঠনের কাজ আজ কারা চালাচ্ছেন? তাঁরা তো বলতে গেলে সবাই প্রায় অধ্যাপক ভট্টাচার্যের ছাত্র।

এত অল্প বয়সে এতখানি অ্যাচিভমেন্ট, শুধু অবিশ্বাস্যই নয় অসম্ভবও মনে হয়। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবেড়িয়ার সন্তানটি আজ সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুলেছেন। বাবা রাজেন ভট্টাচার্য ছিলেন মুনসেফ। মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে রাজশাহী থেকে কলকাতায় ট্রপিক্যালে একটা

চামড়ার রোগ সারাতে এসে যখন হঠাৎ মারা যান, তখন মা লীলাদেবী ছোট ছোট দুটি ছেলে আর তিনটি মেয়েকে নিয়ে অকূল পাথারে পড়েছিলেন। বোনের দুর্ভাগ্যের খবর পেয়ে তক্ষুনি বড় ভাই কলকাতা সরকারী আর্ট কলেজের অধ্যাপক অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ('কল্লোল যুগ' বইটিতে এ'র পরিচয় মিলবে—ছদ্মনাম, আলফা বিটা') নিজে গিয়ে ও'দের নিয়ে এলেন।

—আমি মামা বাড়ীতেই মানুষ। বাবাকে হারিয়েছি সেই কোন ছেলেবেলায়। মাও পড়লেন অসুস্থ হয়ে। গত ছাব্বিশ বছর ধরে মা আমার শয্যাশায়ী। মামা, মামী আমার মা-বাবার মত। ও'রা সেদিন না দেখলে কোথায় যে ভেসে যেতাম।

—প'য়তাল্লিশ সালে ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে আই এস-সি কোর্সে ভর্তি হলাম সেন্ট-জেভিয়ার্সে। মা'র ইচ্ছে ছিল ইঞ্জিনীয়ার হই। শুনেছি বাবারও নাকি ইচ্ছে ছিল যে ইঞ্জিনীয়ার হবেন। কিন্তু দাদামশাই তাঁকে জোর করে বি-সি-এস দিইয়ে মুনসেফিতে ঢুকিয়েছিলেন। আমার ইচ্ছে ছিল অংকে অনার্স নিয়ে পড়বার। সেজন্য আই-এস-সি পাশ করে দিন কয়েক বংগবাসীতে ছোটা-ছুটিও করেছিলাম। কিন্তু মা তা হতে দিলেন না। যাদবপুরেই ভর্তি হতে হোল—মেকানিক্যালে।

—উনপঞ্চাশ কি পঞ্চাশ সাল। গোপাল সেন, আমাদের মাস্টারমশাই আমেরিকা থেকে ফিরে এসে একটা নতুন কোর্স চালু করলেন—প্রোডাকশন ইঞ্জিনীয়ারিং। স্যার নিজে ছিলেন মিশিগান ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক বোস্টন-এর ছাত্র। তখন এদেশে পাকজেকটটার গুরুত্ব খুব কম লোকেই বুঝতে পেরেছিলেন। স্যার কিন্তু জানতেন যে খুব শীগগিরই বিষয়টি কদর পাবে। ফলে একান্ন সালে আমরা যখন পাশ করে বেরোলাম তখন গোটা ভারতবর্ষে আমরাই এই কোর্সের প্রথম ব্যাচ।

—পাশ করতে না করতেই চাকরীতে ঢুকতে হোল। দুটো বছর এ কারখানায় ও কারখানায় শিক্ষানবিশী করেই কেটেছে। তেপ্পান্নোতে শিবপুর বি-ই কলেজে একটা চান্স পেলাম। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টে ইনস্ট্রাকটর।

—কাজের ফাঁকে ফাঁকে এম-ই পড়তে শুরু করলাম, শিবপুরে। ছাপ্পান্ন সালে এম-ই পাশ করলাম।

সে বছর সব বিষয়ের এম-ই পরীক্ষায় প্রথম হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোনার মেডেল পুরস্কার পান শ্রীভট্টাচার্য। ইতি-মধ্যে পদোন্নতি হয়েছে। ছিলেন ইনস্ট্রাকটর, হলেন অ্যাসোসিয়েট লেকচারার। দু বছর ঐ পদে ছিলেন। সাতান্নতে হলেন পুরো-পুরি লেকচারার। পরের বছর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টি-সি-এম স্কলারশিপ নিয়ে এক বছরের কড়ারে এম-এস পড়তে গেলেন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এম-এস পাশ করে ফিরে এসে শিব-পুরে আর এক ধাপ প্রোমোশন পেলেন—অ্যাসোসিয়েটেড অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। একষট্টিতে হলেন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার। অধ্যাপক ভট্টাচার্যই ইঞ্জিনীয়ারিং-এ প্রথম পি আর এস। ঐ বছর বি-ই কলেজ অধ্যাপক ভট্টাচার্যকে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে নিযুক্ত করল।

পরের বছর প্রাক্তন মাস্টারমশাই ও গুরু অধ্যাপক গোপাল সেনের আণ্ডারে কাজ করে ডক্টরেট ডিগ্রী পেলেন অধ্যাপক ভট্টাচার্য। মেকানিক্যালে গোটা ভারতে উনিই প্রথম ডকটরেট।

এরই দু বছর বাদে ঘটল বার্মিংহামের সেই ঘটনা। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মতে যা কিনা তার জীবনের টার্ণিং পয়েন্ট। বার্মিং-হাম থেকে দেশে ফিরতেই ডকটর ত্রিগুণা সেন ডেকে পাঠালেন। তুমি চলে এস আমাদের ইউনিভার্সিটিতে। প্রফেসর অব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং হিসাবে জয়েন কর। সেই সংগে শপগুলোর দায়িত্বও নাও।

ডকটর সেন যখন আমায় এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে জয়েন করতে বলছেন, তার আগেই আমার কাছে রুরকীর মোটা অফার এসে গেছে। সে কথাই তাঁকে বললাম। শুনলেন। তারপর খুব সংক্ষেপে বললেন, তুমি টাকা চাও, না অর্ধেক মাইনেয় নিজের মা'কে সেবা করতে চাও?

এর কি জবাব দেব বলুন। তক্ষুনি জয়েন করলাম। করলাম তার কারণ একটিই—আমার মাস্টারমশাই, গোপাল সেন। উনিই অ্যাকচুয়ালি আমায় যাদবপুরে নিয়ে এসেছিলেন। জানতেন, আমার সারা জীবনের একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষার কথা। তাহলে নিজের মনোমত একটা গবেষণাগার গড়ে তুলব, যার কাজ দেশে বিদেশে সর্বত্র খাতির পাবে, সম্মান পাবে। বিদেশের ডিগ্রী নিয়ে এসে এদেশে লোকে মান, যশ, খ্যাতি লাভ করে। আমি চেয়েছি—খাঁটি স্বদেশী স্কুল বানাতে—যার প্রোডাক্ট পৃথিবীর যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে সমানে পাল্লা দেবে।

কিছুটা করতেও পেরেছি। ল্যাবরে-টরির জন্য যখন যা সাহায্য চেয়েছি তখুনি ধার করে হোক কর্জ করে হোক মাস্টার-মশাই আমাকে জুগিয়ে গেছেন। কোনদিন না বলেননি। জানতেও দেননি কোথা থেকে এসব আসছে। আর তার ফলেই মাত্র চার বছরের মধ্যে নতুন নতুন নানা কোর্স চালু করতে পেরেছি, যা কিনা ভারতবর্ষের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা পায় না। আর সেজন্যেই সারা ভারত ঝেঁটিয়ে ছাত্ররা এসে জড়ো হয়েছে যাদবপুরে।

কিন্তু কেন? কারণ শিল্পায়নের পথে ভারত যতই এগুবে ততই যে বিষয়ের গবেষণা সবচেয়ে জরুরী হয়ে উঠবে তা হোল এই প্রোডাকশন ইঞ্জিনীয়ারিং। যে মেসিনগুলো কলে কারখানায় আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বা বিলাস দ্রব্য দিন-রাত তৈরী করে চলেছে, সেই সব মেসিন বানানোর মেসিনই হোল এই বিদ্যার গোড়ার কথা। উদাহরণ দেওয়া যাক, সিমেন্ট কলে সিমেন্ট বানানো হয়। আজ যে মেসিনে সিমেন্ট তৈরী হচ্ছে, কাল তাই হয়ে পড়ে অবসোলিট। নতুন মেসিন এসে তার স্থান জুড়ে বসে। নতুন মেসিন আরো কম খরচে বেশী প্রোডাকশন দেয় বলেই তো তার এত চাহিদা। এখন এই নতুন মেসিনের সূতিকাগারই হোল প্রোডাকশন ইঞ্জিনীয়ারিং-এর গবেষণাগার। এই গবেষণা-গারেই জন্ম নেয় ভাবীকালের মেসিন, যে মেসিন মুষ্টিমেয়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পারে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী।

লক্ষ কোটি মানুষের চাহিদার রণক্ষেত্রে প্রোডাকশন ইঞ্জিনীয়ারিং বিশাল এক ব্যূহ রচনা করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে যাতে চাহিদা আর যোগানের সামঞ্জস্য একদিন ঘটানো সম্ভব হয়। আর এই বিশাল ব্যূহের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হল মেসিন টুল। শক্তি ও সম্পদের সদ্ব্যবহার করে যাতে অপটিমাম প্রোডাকশন স্তরে পৌঁছোনো যায়। তারই চেষ্টা চালাচ্ছেন এই বিজ্ঞানীরা।

জিজ্ঞাসা করলাম ডকটর ভট্টা-চার্যকে—আজ পর্যন্ত কি কি নতুন মেসিন বা পুরোনো মেসিনের উন্নয়ন আপনার গবেষণাগারে সম্ভব হয়েছে?

—আপনার প্রশ্নটির উত্তর দুভাবে দেবো, মৃদু হেসে জবাব দিলেন অধ্যাপক। পেনসিলভ্যানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি গবেষণাগারে প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে কাজ করে একটি নতুন টুল মেটিরিয়াল আমি আবিষ্কার করেছি—'ট্যান্টালাম নাই-ট্রাইট ও জার্কোনিয়াম ডাইবোরাইট।' এর সাহায্যে রকেটের নাক গড়া আজ সহজ হয়ে উঠেছে। তাছাড়া ওদেশের গবেষণাগারে কাজ করে এমন সব ড্রিল বানানোর মেটিরিয়াল আবিষ্কার করেছি যার ফলে বর্তমানে প্রচলিত ড্রিলের তুলনায় অনেক কম খরচে ও খুব সহজে কাটাছাঁটা করা সম্ভব হয়ে উঠেছে। এ তো গেল বিদেশের কথা। স্বদেশে, নিজের গবেষণাগারে আমারই ছাত্রদের নিয়ে যেসব কাজ করেছি তারই একটা দুটোর কথা বলছি শুনুন। 'ইলেকেট্রা ডিসচার্জ মেসিন' দিয়ে অতি শক্ত ধাতুকেও ড্রিল করা যায়, ডাই করা যায়, ইচ্ছেমত শেপ দেওয়া চলে। এ মেসিন এদেশে তৈরী হয় না। আমরা ইম্পোর্ট করি। এক একটার দাম ত্রিশ-চল্লিশ হাজার থেকে দেড়-দু লাখ পর্যন্ত। সেই মেসিন আমরা যাদবপুরে বানিয়েছি।

বানিয়েছি 'মপেড।' সাইকেলের সংগে লাগিয়ে দিলে আর প্যাডেল করতে হবে না। এক গ্যালনে আড়াইশো মাইল হেসে-খেলে যাওয়া যাবে। এটাও আমার ছাত্ররাই বানিয়েছে।

কিন্তু বানিয়ে হবে কি? কে করবে কদর? যেসব মেসিন আমাদেরই ছাত্ররা অনায়াসে বানাতে পারে, যে সব ডিজাইন আমরাই করে দিতে পারি, তার জন্য আমাদের সরকার ও ব্যবসায়ীরা বিদেশে ধরণা দিচ্ছেন। ফরেন কোলাবরেশনের নাম করে ওরা যে ডিজাইন এদেশে চালান দিচ্ছে তা বহুদিন ওদের নিজেদের দেশেই বাতিল হয়ে গেছে।

—সন্ধিৎসু

দ্বিতীয় পর্ব
দিগ্বিজয়ের পথে জার্মানী
চতুর্থ অধ্যায়
ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখল

১৯৪০ সালের বসন্তকাল আসিল এবং ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানী কর্তৃক অতি দ্রুত পোল্যান্ড জয়ের পর সাত মাস অতিক্রান্ত হইতে চলিল। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে ইউরোপীয় রণাঙ্গন কার্যত নিঃশব্দ ছিল, মিত্রপক্ষ জার্মানীর বিরুদ্ধে হাতে-কলমে কোন যুদ্ধ চালাইলেন না। ইঙ্গ-ফরাসী রণনীতি অলস ও নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিল। একমাত্র রাশিয়ার সহিত ফিনল্যান্ডের যুদ্ধ ছাড়া ইউরোপের স্থল-পথে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

ইতিমধ্যে হিটলার 'শান্তিপ্রিয়' হইয়া উঠিলেন। পোল্যান্ডকে নিজের কুক্ষিগত করিবার পর ৬ই অক্টোবর তিনি রাইখস্টাগে ইউরোপের অবস্থা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক জগতের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতা দিলেন এবং বিশেষভাবে ইঙ্গ-ফরাসীর উদ্দেশ্যে বলি-লেন, 'পশ্চিমে যুদ্ধের দরকার কি?—পোল্যান্ডের পুনরুজ্জীবনের জন্য? ভার্সাই সন্ধিজাত পোল্যান্ড আর কখনও দাঁড়াইবে না। একটি নূতন পোলিশ রাষ্ট্র গঠন কিম্বা সেই দেশের চেহারা কিরূপ হইবে, এই সমস্ত সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা পশ্চিমের যুদ্ধের দ্বারা সম্ভব নহে, উহা একমাত্র সম্ভব হইতে পারে এক দিকে রাশিয়া এবং অন্য দিকে জার্মানী কর্তৃক।...যুদ্ধের আবশ্যকই বা কি? জার্মানী কি ইংলন্ডের উপর এমন কোন দাবী করিয়াছে, যাহা দ্বারা বৃটিশ সাম্রাজ্যকে কোনও ভাবে ভয় দেখান হইয়াছে কিম্বা উহার অস্তিত্ব বিপন্ন করা হইয়াছে?'

অতঃপর হিটলার বলেন যে, রুশ-জার্মান সীমানার পশ্চিমে 'ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা'র দিক হইতে বাঁচিবার মত জায়গা (living space) পাইলেই জার্মানী খুশী। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন জাতির সমস্যাও ইহার মধ্যে পড়ে। হিটলারের মতে ভার্সাই সন্ধি মত, সুতরাং সেই সন্ধি অনুযায়ী নূতন করিয়া কোন কিছু পরিবর্তনের দাবী উঠে না—একমাত্র জার্মান রাষ্ট্রের আগেকার উপনিবেশগুলি ছাড়া। কিন্তু এই উপ-নিবেশের সমস্যাও হিটলার আপোষের দ্বারাই মীমাংসা করিতে রাজী আছেন, কোন বলপ্রয়োগের দ্বারা নহে। হিটলার আর যুদ্ধ, লোকক্ষয় ও রক্তপাত চাহেন না, এমন কি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অস্ত্র-হ্রাসেও প্রস্তুত আছেন।*

কিন্তু হিটলারের এই শান্তি বাণীর প্রতি কেহ কোন বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। ১০ই অক্টোবর ফ্রান্সের প্রধান-মন্ত্রী দালাদিয়ের এবং ১২ই অকটোবর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন হিটলারের শান্তি প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করিলেন। তাঁরা বলিলেন যে, ১৯৩৫, ১৯৩৬ ও ১৯৩৮ সালে হিটলার ইহার চেয়েও অধিক প্রতিশ্রুতিপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছেন। কিন্তু এই পর্যন্ত সমস্ত প্রতিশ্রুতি তিনি ভঙ্গ করিয়াছেন এবং অপরের রাজ্য গ্রাস করিয়া-ছেন। এক্ষণে জোরপূর্বক পোল্যান্ড দখল করার পর আবার সেই একই শান্তির বাণী উচ্চারিত হইতেছে। যদি ইহা স্বীকার করিতে হয়, তবে হিটলার কর্তৃক পররাজ্য আক্রমণও অনুমোদন করিতে হয়। কিন্তু ফ্রান্স ও বৃটেন, কেহই আর হিটলারকে বিশ্বাস করিতে পারেন না।

আমেরিকার সরকারী মহলও হিটলারের বক্তৃতার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করিলেন না। পররাষ্ট্র সচিব কার্ডেলহাল মন্তব্য করিলেন যে, তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে, হিটলারের বক্তৃতা শুনিবার মত সময় পান নাই। আর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মন্তব্য করিলেন যে, তিনি হিটলারের বক্তৃতা শুনিবেন বলিয়া রেডিও খুলিয়া বসিয়াছিলেন, কিন্তু এমন সময় কয়েক ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসায় তিনি রেডিও বন্ধ করিয়া দিয়া-ছিলেন।*

হিটলারের শান্তির প্রস্তাব ব্যর্থ হইল বটে, কিন্তু মিত্রপক্ষের তরফ হইতে কোন যুদ্ধযাত্রাও ঘটিল না। যুদ্ধরত পোল্যান্ডের সঙ্কটের সময় ইঙ্গ-ফরাসী পশ্চিম দিকে আক্রমণ করিয়া কোন দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিতে পারিলেন না। মাসের-পর-মাস এভাবে চলিতে লাগিল এবং উভয় পক্ষের রেডিও, সংবাদপত্র ইত্যাদি হাস্যকর প্রচারকার্য চালাইতে লাগিল। আমেরিকা এজন্য ঠাট্টা করিয়া বলিল যে, "Phony War" চলিতেছে। আর এক দল বলিলেন যে, জার্মান 'ব্লিজক্রিগের' বদলে ইঙ্গ-ফরাসীর 'সিজক্রিগ' অর্থাৎ বিদ্যুৎ-গতি যুদ্ধের বদলে শম্বুকগতি লড়াই চলিতেছে। একটি বিখ্যাত জার্মান উপন্যাসের অনুকরণে এই সময় 'All quite in the Western Front'—এই তথ্য বিদ্রূপের সঙ্গে প্রচারিত হইল। গোয়েরিং ঠাট্টা করিয়া বলিলেন যে, বৃটেনের লক্ষ্য হইতেছে 'We shall fight to the last Frenchman' অর্থাৎ ফরাসীর শেষ রক্তবিন্দু দিয়া ইংরাজ লড়াই করিবে!

কিন্তু ইউরোপের মাটিতে কোন যুদ্ধ না চলিয়া থাকিলেও ১৯৩৯-৪০-এর শীতকালে সমুদ্রপথে জার্মানীর আক্রমণ খুব তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। জার্মানীর টর্পেডো, চুম্বক মাইন (নূতন আবিষ্কৃত) ও 'পকেট যুদ্ধজাহাজগুলি' বৃটিশ নৌ-শক্তি ও পণ্যবাহী জাহাজগুলির বিরুদ্ধে হানা দিতে লাগিল। জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষ যে অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালাইতে-ছিলেন এবং যাহার জন্য অবরোধ ঘোষিত হইয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিবার জন্যই জার্মানী জলপথের এই আক্রমণ চালাইতেছিল। কিন্তু শীতের শেষে ১৯৪০ সালের বসন্ত-কালে ইহাও মন্দীভূত হইয়া গেল। এভাবে এপ্রিল মাস আসিয়া পড়িল। সেই সময়ের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বর্তমান গ্রন্থকার 'যুগান্তর' পত্রিকায় যে সমস্ত মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, বিস্ময়কর কথা এই যে, তার পরদিনই ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রান্ত হইয়াছিল!

১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসের আরম্ভে বর্তমান গ্রন্থকার লিখিয়াছিলেন, 'ইউ-রোপীয় যুদ্ধের ৭ মাস চলিয়া গেল, কিন্তু এখনও মিত্রশক্তি ও জার্মানীর মধ্যে স্থল-পথে কোন যুদ্ধ হয় নাই। তথাপি এই ৭ মাসকাল আমরা অনবরত 'এই লাগে' 'এই লাগে' শুনিয়া আসিতেছি। এক এক ঋতুর পরিবর্তনে সামরিক কর্তাদের মত পরিবর্তনের গুজব শুনিয়াছি। শরৎকাল গিয়াছে, শীতও গিয়াছে এবং বসন্তকালও চলিয়া গেল। এক্ষণে গ্রীষ্মের মুখে কি ইউরোপে প্রচন্ড সংগ্রাম বাধিবে?...বিগত শীতকালে জার্মানীর সমুদ্রপথ অবরোধের সংগ্রাম খুব তীব্র হইয়াছিল এবং সেই সময় জার্মান টর্পেডো ও চুম্বক মাইনের উৎপাতও খুব প্রবল ছিল। ইদানীং টর্পেডো ও মাইনের উৎপাত মন্দীভূত হইয়াছে। সহজ বাঙ্গালায় যাহাকে 'দম লওয়া' বলে, জার্মানী সম্ভবতঃ কতকটা সেই অবস্থায় পড়িয়াছে।

"বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন স্বীকার করিয়াছেন যে, জার্মানীর

* 'The Second Great War' —Sir Jhon Hammerton Page 151, vol I. Maj-General Sir Charles Gwyzu.

* পূর্বোধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৫৪।

বিরুদ্ধে যে অবরোধ অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। ইদানীং এই প্রথার মধ্যে কতগুলি ছিদ্র আবিষ্কার হইয়াছে। বিশেষ ভাবে নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কের বাণিজ্য জার্মাণীর দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য হিটলারী গভর্ণমেণ্ট অনেক চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই সমস্ত দেশের পণ্য যাহাতে বেলজিয়ম, হল্যান্ড প্রভৃতি নিরপেক্ষ দেশের বন্দর ঘুরিয়া নিজেদের দেশে পৌঁছিতে পারে, তেমন আয়োজনও তাঁহারা করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি বলকান অঞ্চলের কাঁচামালের দিকেও জার্মানী মনঃসংযোগ করিয়াছে। যদি জার্মানী উত্তর ইউরোপের নরওয়ে সুইডেন হইতে সুরু করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বুলগেরিয়া পর্যন্ত সমস্ত দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য হাত করিয়া ফেলিতে পারে, তবে মিত্রশক্তিদ্বয়ের অবরোধ প্রথা কতটুকু কার্যকরী হইবে?...জার্মানীকে এই দিক দিয়া কাবু করিবার জন্য সম্প্রতি বৃটেন ও ফ্রান্স ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।...সংক্ষেপে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, নরওয়ে, সুইডেন, আইসল্যান্ড, বেলজিয়ম, হল্যান্ড ও ডেনমার্কের সহিত বৃটিশ গভর্নমেণ্ট সামরিক বাণিজ্য চুক্তি পাকা করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ফরাসী গভর্নমেণ্ট বৃটেনের সহযোগিতায় সুইজারল্যান্ড, স্পেন, গ্রীস ও তুরস্কের সহিত জরুরী বাণিজ্যচুক্তি করিতেছেন। তৃতীয়তঃ রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া ও বুলগেরিয়া প্রভৃতি বলকান অঞ্চলের প্রত্যেকটি রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের চুক্তি করা হইতেছে। চতুর্থতঃ এই সমস্ত দেশের সহিত কারবার চালাইবার জন্য লর্ড সুইনটনের সভাপতিত্বে 'দি ইংলিশ কমার্শিয়াল কর্পোরেশন' নামে একটি ব্যবসায়ী সংঘ গঠন করা হইয়াছে। এই কর্পোরেশনের সমস্ত মূলধন জোগাইতেছেন বৃটিশ সরকার। যে সমস্ত দেশের সহিত বৃটেন 'সামরিক বাণিজ্য' চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে এই সর্ত করা হইয়াছে যে তাঁরা জার্মানীতে সামরিক পণ্য রপ্তানী করিতে পারিবেন না কিংবা সেই সমস্ত পণ্য অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইবে।...এই সমস্ত ছাড়াও বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আর একটি কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁরা বলিতেছেন যে, যে সমস্ত দেশ জার্মানীর সহিত বাণিজ্য করিবে, সেই সমস্ত দেশকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্য হইতে বঞ্চিত করা হইবে। অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা ইতিমধ্যেই এই সম্পর্কে বৃটেনের সহিত সহযোগিতা করিতেছেন। এই বিশাল অর্থনৈতিক বয়কটের প্ল্যান কার্যকরী করিবার জন্য বৃটিশ নৌ-বিভাগ উত্তর সমুদ্র হইতে সুরু করিয়া বহু দূরবর্তী প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সর্বত্র জার্মান পণ্যবাহী জাহাজের সন্ধান করিতেছে। নরওয়ে ও সুইডেনের সমুদ্রপথে যেমন কড়া পাহারা চলিতেছে, তেমনই প্রশান্ত মহাসাগরের পথে ভ্লাডিভোস্টক বন্দর হইয়া যে সমস্ত পণ্য জার্মানীতে রপ্তানীর সম্ভাবনা, সেই সমস্ত পণ্যবাহী জাহাজও আটক করা হইতেছে।...'*

'এই অর্থনৈতিক সংঘাতের প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপের সামরিক গতি কোন্ পথে প্রবাহিত হইতে পারে'—সেই সম্বন্ধে নূতন প্রবন্ধ লিখিবার আগেই জার্মানী কর্তৃক ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রান্ত হইল।

নরওয়ে ও ডেনমার্ক আক্রমণ

উত্তর সমুদ্রের পথ ধরিয়া জার্মানী ১৯৪০ সালের ৯ই এপ্রিল ভোরবেলা অতি অকস্মাৎ এক চমকপ্রদ নৌ-অভিযানে বাহির হইল। আবার 'যুগান্তরে'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করা যাউকঃ—

'ইউরোপের মানচিত্রের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে উত্তর সমুদ্র যেন একটা হ্রদের মতন—উহার তিন দিকে নরওয়ে, ডেনমার্ক, জার্মানী, হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও ইংলণ্ড এবং নরওয়ে ও স্কটল্যাণ্ডের প্রায় মাঝামাঝি সেটল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ। ডেনমার্কের উত্তর প্রান্ত ও নরওয়ের দক্ষিণ প্রান্তের মধ্যবর্তী স্কাগারেক, আরও নীচের দিকে নামিলে ক্যাটেগাট—অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং গভীর আবর্তপূর্ণ জলপথ। ভ্রমণকারীরা এই বিপজ্জনক জলপথের অনেক রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিয়াছেন। কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ, সংকীর্ণতম প্রণালী, জলে ডুবানো অদৃশ্য পাহাড় এবং পুরানো শহরের অলিগলির মত কত বাঁকাচোরা জলপথ এই জায়গাটি জুড়িয়া রহিয়াছে। নরওয়ের উত্তর প্রান্ত আরও রোমাঞ্চকর, সেখান হইতে মেরু সমুদ্রের সুরু, জনমানবহীন বরফবিস্তীর্ণ পৃথিবীর যেন জীবজগতের বাহিরে যাত্রা! কিন্ত নরওয়ের সূর্যোদয় বা মেরুজ্যোতির মহিমার জন্য আজিকার সংবাদপত্র ব্যস্ত নহে উত্তর সমুদ্রকে কেন্দ্র করিয়া যে রক্তগঙ্গার সুরু, সমস্ত পৃথিবীতে তাহা লইয়া তোলপাড়। ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধেও উত্তর-সাগর নৌ-নাট্যের চমৎকার আসর ছিল। বৃটেনের গ্রান্ড ফ্লীট বা 'বৃহত্তম নৌবহর' সেখানে পাহারায় রত ছিল। আজিকার মত সেদিনও জার্মানীর বিরুদ্ধে ব্লকেড বা অবরোধ ঘোষিত হইয়াছিল। বৃটেনের তুলনায় জার্মানীর নৌশক্তি প্রবল নহে সেদিনও ছিল না এবং আজও নয়। সুতরাং জার্মান নৌ-বিভাগ বারম্বার সম্মুখ যুদ্ধ এড়াইয়া চলিতেছিল। তথাপি একদা অপরাহ্ণ বেলা Grand Fleet এর পাল্লায় জার্মান নৌ-বহরকে পড়িতে হইয়াছিল, ইংরাজ নৌ-সেনানী এডমিরাল জেলিকো এবং জার্মান নৌ-সেনানী এডমিরাল শীয়ার পরস্পরের মুখোমুখী হইয়াছিলেন। জাটল্যাণ্ডের সেই বিখ্যাত যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে কে হারিয়াছিল বা কে জিতিয়াছিল, তাহা লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিস্তর মতবিরোধ আছে। কয়েক ঘণ্টা বিষম যুদ্ধের পর জার্মান নৌবহর পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসে এবং নিজেদের মাইন-ঘেরা এলাকার মধ্যে আশ্রয় লয়। সমরবিদগণ বলেন যে, বৃটিশ নৌবহর জার্মান জাহাজগুলিকে অনুসরণ না করিয়া বুদ্ধিমানের কার্য করিয়াছিল। কারণ, মাইনের জালে পড়িতে হইত। আজও সেই উত্তর সমুদ্রে যুদ্ধের নাটক জমিয়াছে এবং বৃটিশ নৌ-বিভাগ ঘোষণা করিতেছেন যে, ১০ই এপ্রিল ভোরবেলা নার্ভিকের অনতিদূরে বৃটিশ ডেস্ট্রয়ারসমূহ শত্রুকে আক্রমণ করে, কিন্তু প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। 'হাণ্টার' ডুবিয়াছে, 'হার্ডি' চড়ায় আটকাইয়া গিয়াছে এবং বাকি ডেস্ট্রয়ারখানা সরিয়া পড়িয়াছে। অবশ্য জার্মানীরও কিছু ক্ষতি হইয়াছে, তবে সঠিক বিবরণ এখনও জানা যায় নাই। সুতরাং উত্তর সমুদ্রের উদ্বোধন পর্বটা মন্দ হয় নাই।'

হঠাৎ এই সংঘর্ষটা উগ্র হইল কেন? পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মিত্রপক্ষ জার্মানীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালাইবার জন্য সমুদ্রপথের অবরোধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু ল্যাপল্যাণ্ডের খনি হইতে সুইডেনের লৌহধাতু রেলপথে নার্ভিক বন্দর হইয়া এবং নরওয়ের সমুদ্রপথ ধরিয়া জার্মানীতে সরবরাহ হইতেছিল। বৃটেন এবং ফ্রান্স নরওয়ে ও সুইডেনের নিকট ইহাতে আপত্তি জানায়। কিন্তু কোন ফল না হওয়ায় মিত্রপক্ষ শেষ পর্যন্ত ৮ই এপ্রিল সকাল ৬টার সময় নরওয়ের পশ্চিম উপকূলের অদূরে তিনটি এলাকায় মাইন পাতেন। কার্যটা আন্তর্জাতিক আইনের বিচারে যে বিধিসম্মত ছিল না, এ-কথা মিঃ চার্চিল (তখন নৌ-বিভাগীয় বড়কর্তা) ১১ই এপ্রিল তারিখ তাঁহার পার্লামেণ্টারি বক্তৃতায় প্রকারান্তরে স্বীকার করেন। অথচ ইঙ্গ-ফরাসীর পক্ষে মুস্কিল ছিল এই যে, জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে গেলে এই ধরনের কোন প্রতিরোধাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন ছাড়াও গতি ছিল না। কিন্তু জার্মানী অকস্মাৎ ঝড়ের বেগে নরওয়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সমস্ত আইনগত তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটাইয়া দিল। মিত্রপক্ষের জাহাজগুলি মাইন পাতিয়া আর ফিরিয়া আসিবার সুযোগ পাইল না। ২৪ ঘণ্টা পার হইবার আগেই জার্মান সৈন্য ও নৌ-সৈন্যেরা ৯ই এপ্রিল ভোরবেলা ঈষৎ আলো-অন্ধকারে নরওয়ের তীরবর্তী বার্জেন, ট্রণ্ডহাইম, স্টাভেঞ্জার, ক্রিশ্চিয়ানস্যাণ্ড, এমনকি দূরবর্তী নার্ভিক বন্দরে পর্যন্ত হানা দিল এবং অবতরণ করিল। এত অতর্কিতে এবং অদ্ভুত দ্রুততার সঙ্গে তারা নরওয়ের সমুদ্রতীর এবং বহু দূরবর্তী বন্দরগুলিতে হানা দিল যে, বাহিরের জগতে অনেকে এই

* 'যুগান্তর' সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, এপ্রিল ১৯৪০—সংক্ষেপিত।

সংবাদ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া পর্যন্ত ভাবিতে পারিলেন না।*

প্রকৃতপক্ষে বিগত মহাযুদ্ধের অবরোধের লাঞ্ছনা এড়াইবার জন্য জার্মানী পূর্ব হইতেই এই সমস্ত প্ল্যান পাকা করিয়া রাখিয়াছিল এবং জাহাজগুলি কয়েকদিন আগেই জার্মানী ত্যাগ করিয়া 'শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যতরীর ছদ্মবেশে' নরওয়ের বন্দরঘাটে অপেক্ষা করিতেছিল। নির্দিষ্ট সময়ে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র এই সমস্ত জাহাজ হইতে দলে দলে সশস্ত্র সৈন্য বাহির হইয়া আসে এবং তাহারা অতি দ্রুত সাফল্যের সহিত তীরে অবতরণ করিতে থাকে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ কিছু বাধা দিতে পারেন নাই। অধিকন্তু নাৎসী দলের প্রতি নরওয়েজিয়ানদের মধ্যে যাহারা সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল, তাহারা জার্মানদিগকে সাহায্য করিল।

বন্দরগুলি যখন এভাবে বেদখল হইতেছিল, তখন জার্মান সৈন্য ও যুদ্ধ-জাহাজগুলি নরওয়ের রাজধানী অসলো অভিমুখে অগ্রসর হইল। এই সময় অসলোস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূত মিসেস জে বোরডেন হ্যারিম্যান ৯ই এপ্রিল সকালবেলা ওয়াশিংটনে যে বার্তা পাঠান, তাহা হইতেই সর্বপ্রথম জানা গেল যে, নরওয়ে ও জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছে এবং অসলো খাঁড়িতে ৪ খানি জার্মান যুদ্ধ-জাহাজের উপর গুলী ছোঁড়া হইয়াছে।

শেষ রাত্রি ৩টার সময় জার্মানরা নরওয়েতে অবতরণ আরম্ভ করে এবং ৫টার সময় জার্মান-দূত অসলোতে নরওয়ের পররাষ্ট্রসচিব অধ্যাপক কোটের (Koht) সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এই মর্মে চরমপত্র পেশ করেন যে, নরওয়েকে অবিলম্বে জার্মানীর সামরিক শাসন মানিয়া লইতে হইবে এবং জার্মানরা যে দখলকার্য আরম্ভ করিয়াছে, উহাতে কোন-প্রকার বাধা দেওয়া চলিবে না। ইহার কারণস্বরূপ বলা হয় যে, জার্মান গভর্নমেণ্ট এমন 'সন্দেহাতীত প্রমাণ' পাইয়াছেন যে, বৃটেন ও ফ্রান্স নরওয়ে দখল করার মতলব করিয়াছিল। সুতরাং পূর্বাহ্নেই তাদের মতলব ব্যর্থ করিবার জন্য জার্মানীর পক্ষে এই ব্যবস্থা অবলম্বন ছাড়া উপায় নাই।

নরওয়ে গভর্নমেণ্ট অবশ্য জার্মানদের এই চরমপত্র অগ্রাহ্য করেন এবং বাধা দেওয়ার জন্য সৈন্য সমাবেশের হুকুম দেন। কিন্তু তাতে কোনই ফল হইল না। কারণ, জার্মানরা তখন প্রায় রাজধানীর ফটকে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। বেলা দেড়টার সময় অসলো খাঁড়ির পশ্চিম-দিকস্থ নৌ-ঘাঁটির তিনখানা নরওয়েজিয়ান জাহাজকে এই মর্মে 'সরকারী হুকুম' দেওয়া হয় যে, অগ্রসরমান জার্মান জাহাজ-গুলিকে যেন বাধা দেওয়া না হয়। কিন্তু পরে জানা গিয়াছিল যে, ইহা জাল হুকুমনামা ছিল। অসলোর দিকে অগ্রসর হইবার সঙ্কীর্ণ জলপথে যে সমস্ত মাইন পাতা ছিল, জনৈক বিশ্বাসঘাতক সেগুলির বৈদ্যুতিক সংযোগ বিনষ্ট করিয়া দেয় এবং মাইনগুলিকে অকেজো করিয়া ফেলে। সুতরাং সৈন্যবাহী জার্মান জাহাজগুলির অসলোর উপকণ্ঠে পৌঁছিবার আর কোন বাধা রহিল না। এদিকে আকাশপথে দলে দলে নাৎসী সৈন্য উড়িয়া আসিতে লাগিল এরোপ্লেনযোগে।

মন্দভাগ্য নরওয়েজিয়ান নাগরিকেরা এই আকস্মিক অভিনব অভিযানে হতভম্ব হইয়া গেল এবং তারা কিছু বুঝিয়া উঠিবার পূর্বেই তাদের দেশ জার্মানদের দখলে চলিয়া গেল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নাৎসী সৈন্যরা নিকটবর্তী হইতে লাগিল, কোথাও কোন বাধা তারা পাইল না। বেলা আড়াইটার সময় জার্মানদের অগ্রবর্তী বাহিনী, যাদের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়, তারা শহরের প্রধান সড়কে আসিয়া উপস্থিত হইল। কৌতূহলী জনতা ও উত্তেজিত দর্শকের মধ্য দিয়া তাহাদের রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দিল স্বয়ং নরওয়েজিয়ান পুলিশ! নরওয়ে অভিযানের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ভন ফলকেনহোর্ণ্ট তিন সারি জার্মান সৈন্য লইয়া শোভাযাত্রাসহকারে উপস্থিত হইলেন এবং শহরের পথ দিয়া অগ্রসর হইবার সময়ে নাৎসীবাদী নরওয়েজিয়ানগণ তাঁকে অভিবাদন করিলেন এবং তিনিও হাস্যমুখে প্রত্যভিবাদন জানাইলেন।

উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর এই কাহিনী এবং অবিশ্বাস্য ইহার ঘটনাবলী। জাহাজের ব্যবসায়, মৎস্য শিকার এবং শিল্প ও সাহিত্য লইয়া নরওয়েবাসীরা ভদ্র ও শান্ত জীবন-যাপন করিতেছিল। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা মাত্র ৩০ লক্ষ, দীর্ঘকাল তারা যুদ্ধবিগ্রহ হইতে তফাতে ছিল। যুদ্ধক্ষম সমস্ত লোক একত্র করিলে তাদের সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াইতে পারে বড় জোর ১ লক্ষ ১৪ হাজার। কিন্তু যুদ্ধের জন্য তারা আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং বিভ্রাট বাধিল অতি সহজ। মিঃ লীল্যাণ্ড স্টো নামক জনৈক মার্কিন সাংবাদিক এই অভিনব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন, 'ছোট্ট এবং অবিশ্বাস্য রকমের ক্ষুদ্র এক সৈন্যদল অসলো সহর দখল করে। মাত্র ৬।৭ মিনিটের মধ্যে তারা মার্চ করিয়া চলিয়া গেল। দুই ব্যাটেলিয়ন পুরা সৈন্যও ছিল না—নিশ্চয়ই সবশুদ্ধ দেড় হাজারেরও কম। নরওয়ের ৩ লক্ষ বাসিন্দাপূর্ণ রাজধানী অসলো এই দেড় সহস্রেরও কম সৈন্যের দ্বারা অধিকৃত হইল।' এই প্রসঙ্গে জনৈক গ্রন্থকার মন্তব্য করিতেছেন--

> There was not hiss, ot a Jear, not even a noticable tear in any woman's face. Not a hand or a voice was raised against the invader, surprise ruled :preme".*

'কোথাও কোন ছত্রভঙ্গ হইল না, ঠাট্টা বিদ্রূপের কথাও শুনা গেল না, এমন কি কোন স্ত্রীলোকের চোখেমুখে সামান্য অশ্রুজলের রেখা পর্যন্ত দেখা গেল না। আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে একখানা মাত্র হাতও উঠিল না, কাহারও কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইল না। সর্বত্র বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের চরম মাত্রা উদ্ঘাটিত হইল।'

জার্মানরা স্বচ্ছন্দে রাজধানীর সমস্ত সরকারী ভবন, রেলপথ, বিমানঘাটি এবং মূলকেন্দ্রগুলি দখল করিয়া ফেলিল। যখন এই দখলকার্য চলিতেছিল, তখন সৈন্যদলের সঙ্গে আগত ব্যাণ্ডবাদকের দল দিব্যি বাজনা বাজাইয়া সরলচিত্ত নাগরিকদের মনোহরণ করিতে লাগিল! কিন্তু পরদিন যখন এই মূঢ়তা ও বিহ্বলতা হইতে তারা জাগিল, তখন দেখিল যে, তাদের স্বদেশ বেদখল হইয়া গিয়াছে এবং রাজা হাকন ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গ কোনমতে জীবন লইয়া বৃটেন অভিমুখে পলায়ন করিয়াছেন! আর অসলোতে এক নূতন গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যার নায়ক হইতেছেন মেজর ভিদকুন কুইজলিং—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কুখ্যাত 'পঞ্চম বাহিনীর' প্রধান অধিনায়ক।

কেবল নরওয়ে নহে, সমগ্র পৃথিবী চমকিত হইল জার্মানীর অদ্ভুত সাফল্যে, আর পঞ্চম বাহিনীর সাহায্যপুষ্ট অপ-কৌশলে। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সময় জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সহকারী জেনারেল মেলা এই পঞ্চম বাহিনীর প্রথম নামকরণ করেন। তিনি অহঙ্কার করিয়া বলেন যে, মাদ্রিদ অভিমুখে চারটি ফ্যাসিস্ট বাহিনী অগ্রসর হইতেছে এবং রাজধানীর অভ্যন্তরে সাহায্যের জন্য আর একটি বা পঞ্চম বাহিনী অপেক্ষা করিতেছে। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের এই ঘটনা হইতেই পঞ্চম বাহিনীর উৎপত্তি এবং নরওয়েতে ইহার পূর্ণবিকাশ দেখা গেল কুইজলিং-এর অধিনায়কত্বে। এই নাৎসী নরওয়েজিয়ানগণ এবং জার্মান বাসিন্দারা পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা দখল করিয়া ফেলিল এবং রেডিও ও টেলিফোনযোগে

---

* স্টেটসম্যান' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক মিঃ আর্থর মুর, যিনি ভারতবর্ষের সাংবাদিকদিগের মধ্যে সামরিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, (প্রথম মহাযুদ্ধে পশ্চিম রণাঙ্গনের সামরিক সংবাদদাতা হিসাবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন তিনি করিয়াছিলেন।) তিনি একটি ক্ষুদ্র স্বাক্ষরিত প্রবন্ধে এই ঘটনা অবিশ্বাস করেন এবং বলেন যে, জার্মানী খোলা সমুদ্রের এই দুঃসাহসিক অভিযানে বাহির হওয়ায় শীঘ্রই পরাজিত হইবে। সুতরাং যুদ্ধও শীঘ্রই শেষ হইয়া যাইবে। এখানে একথা উল্লেখ করিলে অশোভন হইবে না যে, বর্তমান গ্রন্থকার 'যুগান্তর' পত্রিকায় এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, জার্মানী বিমানবলের সাহায্যে নরওয়েতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে এবং এই যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হইবে না। এই মতবাদ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল।—১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসের 'যুগান্তর' সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য।

* The Second Great War — vol 2, page 784

সর্বত্র আত্মসমর্পণের জন্য জাল হুকুম প্রচার করিতে লাগিল। ১৯৪০ সাল হইতে পৃথিবীর সর্বত্র দেশদ্রোহিতার জন্য কুইজলিং-এর নাম অমর হইয়া রহিল।

[চার্চিলের ইতিহাস গ্রন্থে দেখা যায় যে, জার্মান নৌবাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ এডমিরাল জন রায়েডার ৩রা অক্টোবর (১৯৩৯) তারিখেই হিটলারকে নরওয়ের ঘাঁটিগুলি দখলের প্রস্তাব ও পরিকল্পনা দিয়েছিলেন এবং নাৎসী পার্টির তত্ত্বজ্ঞ ও বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ রোজেনবার্গ স্কান্ডিনেভিয়ার দেশগুলিকে জার্মানীর 'স্বাভাবিক নেতৃত্বে' একটি বৃহৎ নরডিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য উৎসাহী ছিলেন। এজন্য নরওয়ের প্রাক্তন সমর-সচিব ভিদকুন কুইজলিংয়ের সংগে ওসলোর জার্মান দূতাবাসের মারফৎ যোগাযোগ করা হয়েছিল। ১৪ই ডিসেম্বর কুইজলিং তাঁর সহকারী হেগেলিনের সংগে বার্লিনে আসিলেন এবং রায়েডার তাঁকে হিটলারের কাছে নিয়া গেলেন নরওয়ে রাজনৈতিক আঘাত হানা সম্পর্কে পরামর্শের জন্য। কুইজলিং এক বিস্তৃত প্ল্যান নিয়া হাজির হইলেন। কিন্তু হিটলার গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। সুতরাং তিনি এমন ভান করিলেন যে, তিনি আর বেশী বোঝা ঘাড়ে নিতে চান না, সুতরাং নিরপেক্ষ স্কান্ডিনেভিয়াই তাঁর কাম্য। অথচ রায়েডারের বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, সেই দিনই হিটলার সুপ্রীম কমান্ডকে হুকুম দিলেন নরওয়ে আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হওয়ার জন্য।

অবশ্য সেই সময় এই ভিতরের কাহিনী জানা ছিল না।]

এদিকে একই সংগে ডেনমার্কও জার্মানীর গ্রাসে চলিয়া গেল। দেশটি ক্ষুদ্র, বাসিন্দার সংখ্যা মাত্র ৪০ লক্ষ, তিন দিকে জলদ্বারা বেষ্টিত এবং বাকি অংশ স্থলপথে জার্মানীর সংগে যুক্ত। সুতরাং আক্রমণ করা সহজসাধ্য। ৯ই এপ্রিল ভোররাত্রি সাড়ে ৪টার সময় জার্মান সৈন্যেরা সীমান্ত হইতে ডেনমার্কে প্রবেশ করিল এবং ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে সমগ্র দেশ দখল করিয়া ফেলিল। রাজা ক্রিশ্চিয়ান ও তাঁহার গভর্নমেন্ট 'প্রতিবাদের সংগে' জার্মানীর বশ্যতা স্বীকার করিলেন। অবশ্য না করিয়াও কোন উপায় ছিল না।

রণনীতি ও রণকৌশল

পোল্যান্ডের সমতলভূমির তুলনায় নরওয়ের যুদ্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছিল, এমন কি বিপজ্জনক ছিল। নৌবলে জার্মানী কোন দিনই প্রধান নহে। বৃটেনের সংগে এই দিক দিয়া তাহার তুলনাই হয় না। তথাপি এই দুর্বল নৌশক্তির উপর ভরসা করিয়া জার্মানী এক দুঃসাহসিক সামুদ্রিক অভিযান করিল। ডেনমার্ক হইতে স্কাগারেক ও কাটেগাট প্রণালীর ব্যবধান, উত্তর সমুদ্র ও অতলান্তিক মহাসমুদ্রের তীর, নরওয়ের ১৭০০ মাইল সুদীর্ঘ উপকূল, অধিকাংশ স্থলেই যাহা রুক্ষ খাড়া পাহাড়ের দ্বারা আচ্ছন্ন, তারপর সমুদ্রের অসংখ্য খাঁড়ি, যেগুলি অত্যন্ত বিপজ্জনক গলি ও আবর্ত সৃষ্টি করিয়া ভিতরের দিকে প্রবেশ করিয়াছে, প্রকৃতির এই সমস্ত দুরূহ বাধা জার্মান নৌশক্তিকে অগ্রাহ্য ও অতিক্রম করিতে হইল এবং বাজপাখীর ছোঁ মারিবার মত এক থাবাতেই নরওয়ের সমস্ত বন্দর, বিমানঘাঁটি ও সহর কাড়িয়া লইল। কেবল জলপথ অতিক্রম করাই নহে, তীরে অবতরণ এবং বিভিন্ন ঘাঁটি দখল ও প্রত্যাক্রমণ প্রতিরোধ—সামুদ্রিক অভিযানের পক্ষে এই সমস্ত প্রশ্নই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহা সমতল ভূমির উপর দিয়া ট্যাঙ্ক চালাইয়া যাওয়া নহে। সুতরাং জার্মানীর ক্ষিপ্রতা, সংঘশক্তি, সাহস এবং পূর্বাহ্নে নিখুঁত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিয়া যাইবার বিস্ময়কর শৃঙ্খলাও ভাবিবার মত। অবশ্য নরওয়ের প্রতিরোধ শক্তির অভাব এবং পঞ্চম বাহিনীর সাহায্য মিলিয়া জার্মান সাফল্যকে এত চমকপ্রদ করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার সংগে বৃটিশ তোষণ-নীতির শোচনীয় ব্যর্থতা এবং সুইডেনের নিরপেক্ষতা জার্মান অভিযানকে আরও বেগবান করিয়া তুলিল। নাৎসী সমর-কর্তৃপক্ষের কৃতিত্ব এই যে, তাঁরা এই সমস্ত দুর্বলতা এবং ত্রুটিরই সন্ধান রাখিতেন এবং কখন কিভাবে আঘাত হানিতে হইবে, তাহা জানিতেন। সুতরাং রণনৈতিক পরিকল্পনায়, আঘাতের কৌশলে এবং সময়ের পাল্লায় তাঁরা মিত্রপক্ষকে 'বেকুব' বানাইয়া দিলেন। এই অভিযানের জন্য পূর্ব প্রাশিয়ায় তাঁরা শীতকালে প্রস্তুত হইতেছিলেন।

নরওয়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ৬টি বন্দর—অসলো, ক্রিশ্চিয়ানসুন্ড, স্টাভেঞ্জার, বার্জেন, ট্রন্ডহাইম ও নার্ভিক প্রথম আঘাতেই দখল হইয়া গেল। নরওয়ের গভর্নমেন্ট কোন মতে ছয় ডিভিসন সৈন্য জোগাড় করিয়া বাধা দিতে চাহিলেন। কিন্তু জার্মানী সমুদ্রপথে, বিমানপথে ও স্থলপথে একযোগে এমন ক্ষিপ্রতার সহিত আক্রমণ চালাইল যে, নরওয়েজিয়ান সৈন্যরা ছত্রখান হইয়া গেল। অসলো হইতে তিন ডিভিসন জার্মান পদাতিক বর্শাফলকের মত ছড়াইয়া পড়িল এবং দক্ষিণ নরওয়ে দখল করিল, পশ্চিমতীরের বন্দররক্ষী জার্মাণ সৈন্যদের সংগে সংযোগ স্থাপন করিল এবং উত্তরদিকে পাহাড় অঞ্চলের নরওয়েজিয়ান সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগে আঘাত হানিল। অসলো খাঁড়ি অঞ্চলের নরওয়েজিয়ান সৈন্যরা দুই দিকে বেষ্টিত হইবার ভয়ে পূর্বদিকে সুইডেনের সীমান্তে পলায়ন করিল। পাঁচ হাজার বিমানবাহী সৈন্য ষ্টাভেঞ্জার কাড়িয়া লইল। একমাত্র ক্রিশ্চিয়ানসুন্ডে তারা কিছুটা বাধা পাইল এবং এখানে জার্মানীর সুপরিচিত ক্রুজার 'কার্লশ্রু' তীরবর্তী গোলন্দাজদের আক্রমণে ডুবিয়া গেল। তথাপি একদিনের মধ্যেই জার্মানী 'নরওয়ের রাজা' হইয়া বসিল এবং মাকড়সার মত চতুর্দিকে জাল বুনিয়া বিভিন্ন বন্দর ও ঘাঁটির সংগে সংযোগ বিধান এবং বিমানযোগে সৈন্য ও সরবরাহ আনিতে লাগিল।*

দুর্বলতর নৌবল লইয়া জার্মানী স্বভাবতঃই খোলা সমুদ্রে বৃটিশ নৌশক্তির সহিত পাল্লা লড়িতে ইচ্ছুক ছিল না। কিন্তু বুদ্ধির কৌশলে এখানে সে উদাসীন বৃটিশ নৌশক্তিকে জব্দ করিল। জর্মানী শ্রেষ্ঠতর বিমানশক্তির সমাবেশ করিল—আকাশে, সমুদ্রপথে ও ভূভাগে জার্মান বিমান আধিপত্য বিস্তার করিল এবং নৌবলের দ্বারা যাহা সে সম্ভব করিতে পারিত না, বিমানশক্তি প্রয়োগের দ্বারা তাহাই সে সফল করিল। ৯ই এপ্রিল তারিখ আকাশ হইতে প্রচন্ড বোমা মারিয়া বার্জেন বন্দরের এলাকা হইতে বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজগুলিকে বিতাড়িত ও ঘায়েল করিল। তারপর দক্ষিণ নরওয়ে এবং অসলো খাঁড়ির পক্ষে যে জলপথ প্রাণস্বরূপ সেই বিস্তীর্ণ স্কাগারেক প্রণালীকে এক সপ্তাহের তীব্র লড়াইয়ের পর নিজের দখলে আনিল। এজন্য বিমানবহর, সাবমেরিন ও হাল্কা নৌপোত ব্যবহৃত হইল। কাটেগাট প্রণালী সম্পর্কেও একই কৌশল অনুসৃত হইল এবং এই দুই জলপথ ছিল নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও বালটিক সমুদ্রের প্রবেশের পক্ষে দুর্গদ্বারস্বরূপ। অতি সতর্ক ও সাবধানী বৃটিশ নৌবহর জার্মানীকে বাধা দিয়া ঘায়েল করিবার বদলে নিজেরাই নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে সরিয়া পড়িল। বিমানশক্তির দাপটের নিকট তারা তিষ্ঠিতে পারিল না। বৃটিশ নৌশক্তি পূর্বাহ্নে যেমন কোন দৃঢ়সংকল্প ও আধুনিক যুদ্ধের প্ল্যান লইয়া অগ্রসর হয় নাই, তেমনই নৌযুদ্ধেও বিমানশক্তির কার্যকারিতা কতখানি এই ধারণাও সম্ভবতঃ তাদের ছিল না।

> 'It was the first campaign of the war in which air power successfully challeng[ed] sea power and proved th[at] arial cover was essential to ships operating in coastal water's. •

ইংগ-ফরাসী গভর্নমেন্ট যথারীতি নরওয়েকে সাহায্যদান ও রক্ষার ভরসা দিলেন, যেমন তাঁরা দিয়াছিলেন পোল্যান্ডকে। তবে, পোল্যান্ডকে তাঁরা যেমন একটি কামান বা একটি এরোপ্লেন দিয়াও সহায়তা করিতে পারেন নাই, এক্ষেত্রে অবশ্যই তাঁরা মুখ রক্ষার জন্য কিছু চেষ্টা করিলেন। পশ্চিম উপকূলবর্তী ট্রন্ডহাইম যাহা ছিল দক্ষিণ ও মধ্য নরওয়ের প্রধানতম রেলওয়ে ও যোগাযোগের কেন্দ্র, তাহা দখলের উদ্দেশ্য লইয়া একটি মিত্রপক্ষীয় অভিযাত্রী বাহিনী প্রেরিত হইল। মাত্র ৩০ হাজার সৈন্য লইয়া এই বাহিনী গঠিত ছিল এবং ১৪ই হইতে ২০শে এপ্রিলের (১৯৪০) মধ্যে তারা ট্রন্ডহাইম হইতে ১৫০ মাইল উত্তরে ন্যামসস ও ১০০ মাইল দক্ষিণে আন্দালসনেক নামক দুইটি 'ধীবর পল্লীতে' অবতরণ করিল। ইহাকে অভিযান না বলিয়া পাল্টা-আক্রমণের পরিহাস বলাই

• 'The World At War'— Page 44

* পূর্বোক্ত পুস্তক ,

ভালো। কেন না, জার্মানীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইবার মত কোনপ্রকার সাজসজ্জা, সমরসম্ভার, বিমানবল ও দক্ষতা তাদের ছিল না। বিশেষত সমুদ্র পরবর্তী ইংলেণ্ডের বিমান ঘাঁটি হইতে ইহাদের দূরত্ব ছিল অন্তত ৪০০ মাইল কিম্বা যাতায়াতে ৮০০ মাইল। সুতরাং অবতরণ করিবার মুখেই ইহারা জার্মান বোমারুর হাতে প্রচণ্ড মার খাইল। তারপর ভিতরের দিকে ডম্বান, লিলেহ্যামার ও স্টোরেল অভিমুখে অগ্রসর হইবার সময় তারা অসলো হইতে জার্মানীর ত্রিমুখী আক্রমণ-এর সম্মুখীন হইল এবং নাৎসী বিমানবল ও রণশক্তির নিকট তিষ্ঠিতে না পারিয়া ৩০শে এপ্রিল তারিখ ন্যামসস ও আন্দাল্সনেসসহ সমগ্র মধ্য নরওয়ে হইতে প্রস্থান করিল।

একান্ত উত্তরবর্তী নরওয়ের নার্ভিক বন্দর দখলের জন্য বৃটেন শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিল। ৯টি জার্মান ডেষ্ট্রয়ার এবং কিছু পদাতিক সৈন্য (যাহারা একটি স্টেইটারযোগে গোপনে আসিয়াছিল) লৌহধাতুর এই বন্দরটি দখল করিয়াছিল। ৫টি বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ার পর দিন ইহা আক্রমণ করিল এবং ২টি ডেষ্ট্রয়ার খোয়া গেল। তখন বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ (ব্যাটলসিপ) 'ওয়ারস্পাইট' ৯টি জার্মান ডেষ্ট্রয়ারের উপরেই প্রতিশোধ লইল এবং সমস্তগুলিকে ডুবাইয়া দিল। ইহার পর বৃটিশ সৈন্যেরা নার্ভিকের উত্তরে ট্রমসো এবং দক্ষিণে বোড়োতে অবতরণ করিল। কিন্তু ২৭শে ও ২৮শে মে ট্রণ্ডহাইম হইতে বিমানযোগে প্রেরিত নূতন জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে তারা পারিয়া উঠিল না। বিশেষত তখনও সেখানে গভীর বরফ ছিল। তথাপি ২৯শে মে তারিখ মিত্রসৈন্যেরা নার্ভিক শহর দখল করিল বটে, কিন্তু ১০ই জুন তাহাও পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইল। এভাবে অভিনব নরওয়ে যুদ্ধের উপসংহার ঘটিল এবং মিত্রপক্ষ উত্তর ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইল।

এই যুদ্ধে জার্মানীর সৈন্যবলের ক্ষতি হইল সামান্য—হতাহতের সংখ্যা ৩৫ হাজার হইতে ৫৫ হাজারের মধ্যে। কিন্তু জার্মান নৌবলের প্রভূত ক্ষতি হইল। 'ব্লুচার' নামক ভারী জার্মান ক্রুজার, ২টি হাল্কা ক্রুজার, ১১টি ডেষ্ট্রয়ার ও ৬টি সাবমেরিন নিমজ্জিত হইল এবং আরও কয়েকটি পোত দখল হইল। নরওয়েজিয়ান বাণিজ্যবহরের অন্তত দশ ভাগের নয় ভাগই রক্ষা পাইল এবং যে ১০২৪ খানা পোত তখন সমুদ্রে ছিল, সেগুলি বৃটিশ বন্দরে আশ্রয় লইয়া মিত্রপক্ষীয় নৌবহরকে শক্তিশালী করিল।

বৃটিশ রণনীতির নিন্দা

নরওয়ে অভিযানে মিত্রপক্ষের কেলেঙ্কারী লইয়া চারিদিকে তীব্র সমালোচনার উদ্রেক করিল। মার্কিন ও বৃটিশ পত্রিকাসমূহে জনমতের নিন্দাত্মক ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। এমন কি ৭৮ বৎসরের বৃদ্ধ লয়েড জর্জ (প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৬—১৮ সালে বৃটেনের প্রধান নায়ক) কঠিন তিরস্কারের সুরে বলেন—

> "It is a deplorable tale of incompetence and stupidity. It means that the direction of the war of the Alliss is hopelessly inferior to that of their formidable foes. The nation is equal to any sacrifice, but that they are all helpless to win victories when the supreme direction is not only faulty but feeble and foolish".

"অযোগ্যতা ও নির্বুদ্ধিতার ইহা এক করুণ কাহিনী, ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, মিত্রশক্তির যুদ্ধ পরিচালনা তাহাদের দুর্দমনীয় শত্রুর তুলনায় নিতান্ত দুর্বল। সমগ্র জাতি যখন যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত তখনও তাহারা অসহায় বোধ করিতেছে। কারণ যুদ্ধের চরম নেতৃত্ব কেবল ত্রুটিপূর্ণই নহে, ইহা দুর্বলতার ও মূর্খতায় পরিপূর্ণ।"

আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বিগত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতেও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ শিক্ষালাভ করেন নাই। কারণ, ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে দার্দানেলিসের যুদ্ধে গ্যালিপোলিতেও প্রায় অনুরূপ ব্যাপারই ঘটিয়াছিল। প্রথমত গ্যালিপোলি অভিযান লইয়াই সমর দপ্তরে মতভেদ ঘটে। মিঃ চার্চিল ও এডমিরাল স্যার জন ফিশারের মধ্যে ঝগড়া বাধে—ইহা আদৌ চালান উচিত কিনা তাহা লইয়া। লর্ড কিচেনারের মধ্যস্থতায় একটা আপোষ হইয়াছিল বটে, কিন্তু যখন কার্যত অভিযান শুরু হইল তখন নরওয়ে যুদ্ধের মতই 'জোড়াতালি দিয়া' সৈন্য পাঠান হইল! স্যার আয়ান হ্যামিলটনকে সেনাপতি পদে বরণ করা হইল বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার ষ্টাফ ছাড়াই রওনা হইতে বাধ্য হইলেন। দার্দানেলিস প্রণালীর দুর্গসমূহ, তুর্কী সৈন্যদল ও মানচিত্র ইত্যাদি সম্পর্কেও তিনি 'আধুনিকতম' পুঁথিপত্র জোগাড় করিতে পারিলেন না। তাঁর সহকারিগণ 'গাইড-বুকের' সন্ধানে লণ্ডনের সমস্ত লাইব্রেরী খুঁজিয়া হয়রাণ হইয়াছিলেন। গোলাগুলী, রসদ ও সৈন্যবাহী জাহাজগুলির যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছান সম্পর্কেও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। গোড়ায় যেখানে ঘাঁটি স্থাপনের কথা ছিল উহার পরিবর্তে বরিবা আলেকজেন্দ্রিয়ায় প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছিল। ফলে বিভ্রাট আরও বাড়িয়া গেল। তারপর গ্যালিপোলিতে সৈন্যদলের অবতরণ, অবস্থান ও সন্নিবেশ সম্পর্কেও নানা বিঘ্ন ও অসুবিধা দেখা দিল। * নরওয়ের উপকূলের মতই সেখানেও এমন স্থানে সৈন্য নামাইতে হইয়াছিল যেখানে কোন খাদ্যদ্রব্য, পানীয় জল ইত্যাদির ব্যবস্থা করা অত্যন্ত দুরূহ ছিল, সামরিক উপকরণ সরবরাহেও গোলযোগ ঘটিয়াছিল; অর্থাৎ সহজ কথায় গ্যালিপোলি অভিযানের পরিকল্পনা এবং কার্যক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক ও অব্যবস্থায় পরিপূর্ণ ছিল। সুতরাং ফলাফলও অত্যন্ত মারাত্মক হইল। বহু সহস্র সৈন্যের জীবননাশের পর মিত্রশক্তিকে সেইবার দার্দানেলিস ত্যাগ করিয়া আসিতে হইয়াছিল। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসের নরওয়ে যুদ্ধের কাহিনী ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসের গ্যালিপোলি যুদ্ধকে স্মরণ করাইয়া দিবে। বস্তুত ইতালী হইতে এই পুরাতন দৃষ্টান্ত দিয়া বৃটেনকে বিদ্রূপ করাও হইল এবং ৭ই মে কমন্সসভায় সরকার বিরোধী দলের নেতা মিঃ সি আর এটলি ও স্যার আর্চিবল্ড সিনক্লেয়ার চেম্বারলেন মন্ত্রিসভাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়া বলেন যে, নরওয়ে অভিযানে দীর্ঘ দিনের ট্রেনিং পাওয়া অভিজ্ঞ সৈন্যদল পাঠান হয় নাই, হইয়াছে এক দল 'বালককে', যারা যুদ্ধবিদ্যায় কাঁচা! ভিন্ন আবহাওয়ায় ও বরফ ঝড়ের মধ্যে যে ধরনের কোট ও জুতা সৈন্যদিগকে দেওয়া উচিত ছিল, তাহাও সরবরাহ করা হয় নাই। এক জায়গায় মাত্র দুইটি বিমানবিধ্বংসী কামান তীরে নামানো হইয়াছিল। কামান চালাইবার জন্য কোন ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈন্য পাঠান হয় নাই, কামানের পাল্লা বুঝিবার জন্য ব্যবস্থা করা হয় নাই, এমন জাহাজ পাঠান হইয়াছে যাহার মধ্যে কোন ক্রোনোমিটার বা ব্যারোমিটার কিম্বা আন্তর্জাতিক সাংকেতিক চিহ্নের পুস্তকাবলী (code b[illegible]) দেওয়া হয় নাই। কোনকোন জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, এমন কি রাইফেল পর্যন্ত ছিল না এবং যে খাদ্য সরবরাহ করা হইয়াছিল, তাহাতে অর্ধেকের বেশী লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত না। জাহাজে চিকিৎসার পর্যন্ত ব্যবস্থা ছিল না।

তথাপি মিঃ চেম্বারলেন এই বলিয়া গর্ব অনুভব করিলেন যে, বৃটিশ সৈন্যেরা অতি বীরত্বের সঙ্গে লড়িয়াছে এবং নরওয়ে থেকে প্রস্থানের সময় একটি বৃটিশ সৈন্যও খোয়া যায় নাই।

(ক্রমশঃ)

* 'A History of the World War— by Liddell Hart, 1934.

নির্মম সত্য

দেখি আপনি কেমন আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে দেখতে পারেন। হাতের বাইসেপস ফুলিয়ে পেট ভিতরে টেনে নিয়ে চট করে একবার আপাদমস্তক দেখে নেওয়া নয়-যে চোখে লোকে আপনাকে দেখে সেই ভাবে খোলা চোখে একটার পর একটা ভালমন্দ বিচার করুন।

নিজের কাঁধের দিকে তাকান, আপনার হাতের উপর ও নীচের দিক, আপনার বুক, কোমর, পা দুটো দেখুন। আয়নায় যদি ঠিক অহংকার করার মত তেমন কিছু না পান-আর যদি সারা-দিনে একটা সহজ, সরল, বিনা পরিশ্রমের আইসো-মেট্রিক "ধরে রাখা"র ব্যায়াম করার জন্যে ৫টা মিনিট খরচ করতে রাজী হন, তবে গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আয়নার মধ্যের "আপনি" ও বুলওয়ার্কারের সাহায্যে তৈরী শক্তিশালী, স্বাস্থ্যবান ও পুরুষোচিত "আপনি" এই দুইয়ের মধ্যেকার ফাঁক আমরা ভরাট করতে পারি। বাধা নিষেধের বালাই নেই।

১৬ বা ৬০ যাই আপনার বয়স হোক, যাচ্ছেতাই রকম মোটা বা রোগা হোন, ইতিমধ্যে অনেক ধরণের ব্যায়াম চর্চা করে থাকুন বা বহু বছর ধরে ব্যায়ামের সাথে সম্পর্ক না থাকুক, বুলওয়ার্কার আপনাকে যে সুনির্দিষ্ট সুফলের গ্যারান্টি দিচ্ছে সেটা মাত্র দু সপ্তাহ পরে আপনি আয়নায় দেখতে পারছেন ও ফিতে দিয়ে সত্যি সত্যি মাপতে পারছেন: আর যদি তা না হয়, এক পয়সাও দিচ্ছেননা। সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য আজই কুপন ডাকে দিন। বাধ্যবাধকতা নেই। কোন সেলসম্যান সাথে যোগাযোগ করবেননা।

© Mail Order Sales Pvt. Ltd. 15 Mathew Road, Near Opera House, Bombay 4

বিনামূল্যে

1908 হ্যাঁ, বুলওয়ার্কারের যে পরীক্ষিত ব্যায়ামসূচী শক্তিশালী পুরুষোচিত, স্বাস্থ্যবান দেহের গ্যারান্টি দেয়, তার সম্পূর্ণ বিবরণ আমাকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিন।

নাম ....

ঠিকানা ....

.... বয়স ......

BULLWORKER SERVICE, AN-3
15 Mathew Road, Near Opera House, Bombay 4

অনুগ্রহ করে আমাদের ঠিকানা ইংরাজীতে লিখুন

সুনীলকুমার নাগ

প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে, পরাজিত জার্মাণীতে একজন চিন্তানায়কের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁর নাম অসওয়াল্ড স্পেঙ্গলার (১৮৮০—১৯৩৬)। মানব সভ্যতার উত্থান পতন সম্পর্কে স্পেঙ্গলারের নিজস্ব নূতন চিন্তাধারাকে ইংলন্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদগণ প্রথমে অবজ্ঞাভরে পাশ কাটিয়ে চলতে লাগলেন—যেন ওর মধ্যে আলোচনার যোগ্য কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু পশ্চিমী দুনিয়ার পোড়-খাওয়া, যুদ্ধে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, হৃত-সর্বস্ব শিক্ষিত তরুণ সমাজে স্পেঙ্গলারের চিন্তাধারার ব্যাপক প্রচার সুরু হয়ে গেল। এ অবস্থায় দেখা গেল পশ্চিমী দুনিয়ার চিন্তানায়কগণ স্পেঙ্গলারের বক্তব্যকে একটা পরাজিত জাতির হীনমন্যতার প্রকাশ বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় রত। কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল হলো না। স্পেঙ্গলারের প্রধান গ্রন্থ দি ডিক্লাইন অব দি ওয়েস্ট (১৯১৮) অর্থাৎ প্রতীচ্যের অবক্ষয় প্রকাশের সাত-আট বছরের মধ্যে সমস্ত ইয়োরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে গোটা ইয়োরোপের শিক্ষিত সমাজে অন্যতম প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। স্পেঙ্গলার কেবল যে ইংলন্ড, ফ্রান্স বা আমেরিকার রাজনীতি ও সমাজনীতির সমালোচনা করলেন তাই নয়, জার্মাণীর আগ্রাসী নীতিরও তিনি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করলেন। বস্তুতঃপক্ষে হৃদয়-বৃত্তিবর্জিত নিছক বুদ্ধিবৃত্তির প্ররোচনায় মানুষের সর্বপ্রকার আগ্রাসী পন্থার পরমায়ু যে ফুরিয়ে আসছে, সেই কথাটাই তিনি তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে আলোচনার অন্তে বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করলেন।

আমেরিকার সভ্যতাকে স্পেঙ্গলার পশ্চিম ইয়োরোপীয় সভ্যতারই সম্প্রসারিত রূপ বলে গণ্য করতেন। কাজেই পশ্চিম ইয়োরোপ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের প্রতিটি কথাই যুগপৎ আমেরিকা সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য। সংক্ষেপতঃ স্পেঙ্গলার ঘোষণা করলেন যে, পশ্চিমী সভ্যতার অবক্ষয় কয়েক যুগ পূর্বেই সুরু হয়ে গেছে এবং একবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ এ সভ্যতা প্রত্নতাত্ত্বিকগণের গবেষণার খোরাক জোগাবে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্পেঙ্গলারের বক্তব্য হলোঃ এশিয়ার নানা দেশে পশ্চিমী প্রভাবমুক্ত নূতন নূতন সভ্যতার সৃষ্টি হবে এবং সেই সভ্যতাগুলিরই একটা মিশ্রিত রূপ সারা বিশ্বে প্রাধান্য লাভ করবে।

স্পেঙ্গলারের চিন্তার উৎস ও তার বৈশিষ্ট্য

সাধারণতঃ দেখা যায় সমাজতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসকারগণ অতীত সম্পর্কেই অতিমাত্রায় আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। সভ্যতার আদি রূপ থেকে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের আলোচনার ক্ষেত্র প্রসারিত রাখেন। কিন্তু স্পেঙ্গলার এরও ওপর আর এক ধাপ এগিয়ে ভবিষ্যতের রহস্যঘন শূন্যতার মধ্যেও তাঁর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গেছেন। এটা ছিল তাঁর একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কেবল যে যুক্তি-তর্কের সাহায্যে স্পেঙ্গলার পৃথিবীর সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলতেন তাই নয়, তা হলে সে পদ্ধতি আয়ত্ত করে তাঁর পরবর্তী ইতিহাসবিদগণও তদনুরূপ ভবিষ্যৎদ্রষ্টার আসন লাভ করতে পারতেন। ইতিহাস, শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি যায় স্থাপত্য-বিদ্যা সম্পর্কেও স্পেঙ্গলারের অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রশংসা তাঁর বিরুদ্ধবাদীগণও করে গেছেন। কিন্তু তবুও বলতে হয়, নিছক পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে বোধি-সঞ্জাত এমন একটি প্রজ্ঞার অধিকারী স্পেঙ্গলার হয়েছিলেন যে, অনেকটা যেন মুনি-ঋষিদের মতো তিনি কালের অন্তরালে নিহিত ভবিষ্যৎকে দেখতে পেয়েছিলেন।

ইতিহাসবেত্তাগণকে মোটামুটি দু-ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ যাঁরা মনে করেন যে মানব সভ্যতা এক ও অখন্ড। এই গোষ্ঠী সভ্যতার ক্রমবিকাশে (Theory of social change and evolution) বিশ্বাসী। অপর গোষ্ঠী মনে করেন যে আদিকাল থেকে যতগুলি সভ্যতার উদ্ভব হয়েছে সেগুলি একটি আর একটির ক্রমবিকশিত রূপ নয়, বরং বিচ্ছিন্ন এবং স্থানীয় কারণ ও প্রয়োজনেই তার সৃষ্টি হয়েছে। এই গোষ্ঠী ইতিহাসের গতিতে কালচক্রের (Cyclical Theory of History) প্রভাব লক্ষ্য করে থাকেন। স্পেঙ্গলার এই শেষোক্ত গোষ্ঠীভুক্ত।

সভ্যতার কালচক্রের প্রবক্তা হিসেবে স্পেঙ্গলারের পূর্বেও অবশ্য বিশিষ্ট চিন্তানায়কগণের আবির্ভাব ঘটেছে। এঁদের মধ্যে খাস জার্মাণীতে স্বয়ং গ্যয়টে এবং নীটশে, ফ্রান্সে লে প্লে, ইটালীতে গিনি, আমেরিকায় ব্রুকস অ্যাডামস, ইংলন্ডে ফ্লিন্ডার্স-পেট্রি এবং রাশিয়ায় ড্যানিলেভস্কির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এঁরা সকলেই বিভিন্ন সময়ে তাঁদের বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীর ক্রম-বিকাশবাদের সমালোচনা করে গেছেন। স্পেঙ্গলারের চিন্তা এঁদের সকলের চিন্তাধারার পরিণত রূপ বলা চলে। কালচক্র-বাদের প্রথম প্রবক্তা হিসেবে গণ্য করা হয় ইটালীর গিয়ামবাত্তিসতা ভিকোকে। ভিকো দেহত্যাগ করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৬৬৮-১৭৪৪)। ভিকোই সর্বপ্রথম দর্শন, সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসের প্রয়োজনীয় বিভাগগুলির সাহায্যে একটি সম্পূর্ণ নূতন শাস্ত্র প্রচার করেন। এর নামকরণ করেছিলেন 'মানব-ইতিহাস বিজ্ঞান' (Science of Humanity) জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুমুখী প্রচার ও প্রসার কিভাবে সমগ্রভাবে মানুষের ইতিহাসকে প্রভাবিত করে তার গতিপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে তা অনুধাবন করাই ছিল ভিকোর নূতন বিজ্ঞানের লক্ষ্য। কালচক্রবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না, এ-রকম দার্শনিক, সমাজতত্ত্ব-বিদ এবং ইতিহাসবেত্তাগণের মধ্যেও ভিকোর প্রভাব দেখা যায়। এমন কি হেগেল, মার্কস, হার্বার্ট স্পেন্সার, আর্নল্ড টয়েনবি কিম্বা পিটিরিম সোরোকিনও ভিকোর প্রভাবমুক্ত নন।

তবে স্পেঙ্গলারের কালচক্রবাদের উৎস হিসেবে ভিকোকে গণ্য না করে বরং ড্যানিলেভস্কি এবং অ্যাডামস-এর নাম করা যেতে পারে। কারণ, একে ত ভিকো ও স্পেঙ্গলারের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেকখানি—দেড়শ বছরেরও বেশি, দ্বিতীয়তঃ কালচক্রবাদের বিরোধীগণও ভিকোর চিন্তা থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করেছিলেন। অ্যাডামস স্পেঙ্গলারকে প্রভাবিত করেছিলেন আমেরিকাসহ পশ্চিমী সভ্যতার অবক্ষয়ের ধারণার সূচনায়, আর ড্যানিলেভস্কি তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছেন প্রাচ্যের নবজাগরণের চিন্তার পরিপুষ্টিতে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক নিকোলাই ইয়াকোলেভিচ ড্যানিলেভস্কি দর্শন, রাজনীতি ও ইতিহাস আলোচনার মাধ্যমে যে রুশ জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রচার করেছিলেন এমন কি আজকের রাশিয়া, মার্কসবাদ

আংশিকভাবে গ্রহণ করা সত্ত্বেও ড্যানিলেভস্কির সে প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ড্যানিলেভস্কি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ইয়োরোপ ও রাশিয়াতে (১৮৬৯) বলেছেন : রাশিয়া এবং অন্যান্য স্লাভ দেশগুলির উচিত পশ্চিমকে তাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ না করে নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মূলধন হিসেবে গ্রহণ করে এগিয়ে যাওয়া। এর ফলে তাদের যে অগ্রগতি হবে তা হয়ত তুলনামূলকভাবে পশ্চিমের অপেক্ষা কিছু বা পিছিয়ে-পড়া হবে, কিন্তু তবু সেই অবস্থাটাই কাম্য, কারণ, উন্নতি যে-টুকু হবে তা স্লাভ চরিত্রের নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারী হবে, এবং শেষ পর্যন্ত এইটেই সমগ্রভাবে মানব ইতিহাসের বৈচিত্র্যকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলবে। স্লাভগণের নাড়ীর যোগ প্রাচ্যের সঙ্গে।

ড্যানিলেভস্কির এক যুগ পরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আবির্ভাব ঘটেছিল প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা ও সমাজতত্ত্ববিদ ব্রুকস আ্যাডামস-এর। তাঁর প্রধান গ্রন্থের নাম **দি ল অব সিভিলাইজেশন অ্যান্ড ডিকে** (১৮৯৫)। অ্যাডামস্ ব্যক্তি-মানস তথা সমাজ-মানসে একটা সার্বিক উদ্দেশ্য-পরায়ণতা (Teleology) অনুভব করতেন। এবং বলতেন যে, 'সমাজ সংসারে যা ঘটে তা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই ঘটে থাকে।'

কিন্তু এই অধ্যাত্ম-প্রধান মনোভাব সমাজের বাস্তব অবস্থার পর্যালোচনায় অ্যাডামস্-এর পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে নি। তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলে গেছেন যে, 'সমাজ ব্যবস্থায় যা কিছু পরিবর্তন তা প্রধানতঃ অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। গোটা বিশ্বের সভ্যতায় তিনি একই ধরণের উত্থান-পতনের ঝোঁক লক্ষ্য করেছেন। অসভ্য, বর্বর, আদিম মানুষ ক্রমশঃ সুসভ্য হয়ে ওঠে, এবং তারপর যথেচ্ছ শোষণ, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপ-ব্যবহার ও সমাজের শীর্ষস্থানীয়গণের একদেশদর্শীতার ফলে সামাজিক-সত্তার মূল্যবোধে বিপর্যয় ঘটে এবং অবশেষে সেই বিশেষ সভ্যতা পুনরায় আদিম বর্বর অবস্থায় ফিরে যায়—যখন সর্ব প্রকার রীতি ও নীতির প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে মানুষ পুরোপুরি আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে।

স্পেংগলারের দৃষ্টিতে সভ্যতার গতি-প্রকৃতি

অধিকাংশ পশ্চিমী চিন্তাবিদের লেখায় দেখা যায় ঐতিহাসিক, সামাজিক কিম্বা নিছক ব্যক্তি-মানুষের চরিত্র পর্যালোচনার সময়েও তাঁরা ধরেই নেন যে ইয়োরোপই প্রধানতম আলোচ্য বিষয়। ইতিহাস-বোধকে জলাঞ্জলি দিলেও চক্ষু লজ্জাটাকে যাঁরা একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারেন নি তাঁরা বড় জোর প্রাচীন গ্রীস, মিশর বা ব্যাবিলনকে তাঁদের আলোচনার মধ্যে স্থান দেন। কিন্তু স্পেংগলার এই আংশিক বিচার পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন এবং সত্যানুসন্ধানের পক্ষে এ অবস্থাটা যে আদৌ অনুকূল নয় এ-সত্য তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করতেন। তিনি মনে করতেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ, চীন, আরবদেশ, মেক্সিকো এবং আরও অন্যান্য সভ্যতা যার প্রতিটির উত্থান ও পতনের নিজস্ব বিশিষ্ট স্বতন্ত্র ইতিহাস রয়েছে, এবং প্রাণ-চাঞ্চল্য, সৃজনশীলতা ও আত্মিক শক্তির বহুবিস্তৃত প্রসার ও প্রচারে যেসব কোনো মতেই পশ্চিমী সভ্যতার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—তার আলোচনা না করলে সভ্যতার গতি-প্রকৃতি যথাযথভাবে বোঝা সম্ভব নয়। তাঁর গ্রন্থে এ-কাজ করেছেন বলেই তিনি তাঁর বক্তব্যকে ইতিহাসের ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোপারনিকাসের অনুরূপ নিরপেক্ষ ও সত্যনির্ভর মনে করতেন।

এ প্রসঙ্গে স্পেংগলারের নিজের কথা নিম্নরূপঃ

"I consider my system as the Copernican discovery in the historical sphere in that it admits no sort of privileged position to the classical or the Western culture as against the culture of India, Babylon, China, Egypt the Arabs, Mexico—separate worlds of dynamic beings which in point of mass count for just as much in the general picture as the classical, while frequently surpassing it in point of spiritual greatness and soaring power".

—অ্যাটকিনসন-কৃত অনুবাদ)

ইতিহাসকে 'প্রাচীন-মধ্যযুগীয় ও আধুনিক' এই তিন ভাগে ভাগ করবার প্রচলিত রীতিকে স্পেংগলার অস্বীকার করেছেন। তিনি মনে করতেন যে প্রতিটি সভ্যতা এক একটি জন সমষ্টির নিজস্ব বিশিষ্ট চরিত্র ও প্রয়োজন অনুসারে সৃষ্টি হয়েছিল। একটির থেকে আরেকটি প্রেরণা লাভ করে থাকলেও তার ধরণটা জন-গোষ্ঠীর নিজস্ব চরিত্র অনুযায়ীই হয়ে থাকে। সভ্যতার উত্থান-পতন বহু-লাংশে প্রকৃতি জগতের ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনীয়।

(Every one of them (i.e., the civilizations), an organism born to flourish in a spring and summer and decay and disappear in an autumn and winter of old age)

স্পেংগলার মনে করতেন যে একটি বিশেষ ইতিহাস মূলতঃ একটি জন-গোষ্ঠীরই অন্তর প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ক্রমবিকাশবাদী ইতিহাসকারগণ এই সত্যকে যথাযথভাবে স্বীকার করেন না। ফলে মানুষের ভাবিক সত্তা তাঁদের কাছে প্রকৃত মূল্য লাভে বঞ্চিত হয়। একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সেই মুহূর্তেই জন্ম লাভ ঘটে যখনই কোনো সমাজে কোনো বিরাট ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয় বা কোনো মহান্ হৃদয়ে আত্মোপলব্ধি ঘটে। এই বিরাট ব্যক্তিত্ব তখন অগণিত ব্যক্তির মধ্যে নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধিকে সঞ্চারিত করে একটি বিশিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু শাখায়িত বিকাশে সাহায্য করে।

(A culture is born in the moment when a great soul awakens

out of the proto-spirituality of ever-childish humanity ...... It blooms on the soil of an exactly definable landscape, to which plantwise it remains bound).

যে কোনও সভ্যতা ও সংস্কৃতির পতন ঘটে যখন তার অনন্তর শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। ভাষা, শিল্পকলা, সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার নূতনতর অবদানে কোনও সভ্যতা যখন অক্ষম হয়ে পড়ে।

(It c.i.e., a particular culture) dies when the soul has actualised the full sum of its possibilities in the shape of peoples, languages, dogmas, arts, states, sciences and reverts to the proto-soul.)

সভ্যতার পরমায়ু

বিশ্ব ইতিহাস মন্থন করে স্পেঙ্গলার মোট নয়টি স্বতন্ত্র সভ্যতার কথা বলেছেন। কালানুক্রমিকভাবে এই সভ্যতাগুলি হলো : প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা (খৃঃ পূর্ব ৩৪০০—খৃঃ ১২০৫); প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা (খৃঃ পূর্ব ১৫০০—খৃঃ পূর্ব ১১০০), চীনের প্রাচীন সভ্যতা (খৃঃ পূর্ব ১৩০০—২০০ খৃস্টাব্দ), প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা (খৃঃ পূর্ব ১১০০—খৃঃ পূর্ব ৪০০), প্রাচীন বাইজানটাইন সভ্যতা (৩০০ খৃস্টাব্দ--১১০০ খৃস্টাব্দ), আরবের প্রাচীন সভ্যতা (৩০০ খৃস্টাব্দ থেকে ১২৫০ খৃস্টাব্দ), প্রাচীন আজটেক সভ্যতা (১৩২৫ খৃস্টাব্দ—১৫০০ খৃস্টাব্দ), প্রাচীন আমেরিকার মায়া সভ্যতা (৬০০ খৃস্টাব্দ—১৬০ খৃস্টাব্দ) এবং সর্বশেষ হলো বর্তমান পশ্চিমী সভ্যতা, স্পেঙ্গলারের মতে যার সূত্রপাত হয়েছিল ৯০০ খৃস্টাব্দে এবং ২২১০ খৃস্টাব্দ নাগাদ এই সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হবে।

স্পেঙ্গলার বলেছেন যে, সভ্যতাগুলির উত্থান এবং পতনের রীতিতে একটা মোটামুটি একই ধরনের নিয়মানুবর্তিতা দেখা যায়। অর্থাৎ যেমন অনন্য ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সূচনা হয়, এবং বহুজনের মধ্যে তাঁর ভাবধারা সঞ্চারিত হবার ফলে সেই সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, ঠিক তেমনই, একই ধরনের সঙ্কটের ফলে একটি সভ্যতার বিলুপ্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো কোনও বিশেষ সভ্যতা ও সংস্কৃতির যারা প্রকৃত বাহক অর্থাৎ সাধারণ মানুষ, তাদের মধ্যে ঐ বিশেষ সভ্যতা সম্পর্কে আস্থার অভাব ও নৈরাশ্য।

প্রতীচ্যের মানসিকতায় অসীমের প্রতি একটা দুর্বার আকর্ষণ পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলি থেকে তাকে একটা বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়েছে। উচ্চ শ্রেণীর দর্শন, অভূতপূর্ব বিজ্ঞান, ব্যবহারিক জীবনে নানা বিচিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাকে জটিল করে তুলনায় যে ধারা তা সবই অসীমের প্রতি একটা দুর্বার আকর্ষণের (Faustian yearning for Infinity) প্রতিফলন মাত্র। প্রতীচ্যের জীবন ও চিন্তাধারায় যে সর্বক্ষণের জন্যে একটা অস্থিরতা ও অতৃপ্তির লক্ষণ বিদ্যমান দেখা যায়, তার কারণ, প্রতীচ্যের আধ্যাত্মিক শক্তি নিঃশেষিত।

ইন্দ্রিয়-বৃত্তি বর্জিত আগ্রাসী নীতি : অবক্ষয়ের নিশ্চিত লক্ষণ

কোনও সভ্যতা বা সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত জনগণ যখন তাদের আত্মিক শক্তির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে তখন তাদের ইচ্ছা, অভিরুচি বা পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের জন্যে তারা কায়িক শক্তি ও পাশবিক শক্তির ওপর নির্ভর করতে সুরু করে। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে এর ফলে ক্রমিক আত্মিক শক্তির ক্রমসংকোচন ঘটতে থাকে এবং এক সময় দেখা যায় এ শক্তির কার্যকারিতা আদপেই নেই এবং সেই জনগণ ও তাদের নেতৃস্থানীয়গণ সম্পূর্ণরূপে পাশবিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন।

আত্মিক শক্তিসম্পন্ন একজন যে পরিমাণে অপরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে, পাশবিক শক্তি-নির্ভর একজন ঠিক সেই পরিমাণেই অপরকে তার প্রতি বিমুখ করে তোলে। তাই, আত্মিক শক্তি যখন নিঃশেষিত, অর্থাৎ কোনও বিশেষ সভ্যতা বা সংস্কৃতির যখন সৃজন-প্রতিভা বিলুপ্ত হয় তখনই তার অবক্ষয়ের সূচনা হল বলা চলে। গ্রীক সভ্যতায় আলেকজান্দার একটি সন্ধিক্ষণ বলা চলে। কারণ, আলেকজান্দারের পূর্ববর্তী ইতিহাস গ্রীসের গৌরবময় আত্মিক শক্তির ইতিহাস। কিন্তু আলেকজান্দার থেকে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি যখন সর্বৈব পাশবিক শক্তি-নির্ভর হয়ে পড়লো, তখনই তার অবক্ষয় সূচিত হয়েছিলো।

অনুরূপভাবে বলা চলে প্রতীচ্যের বর্তমান সভ্যতার কথা। এক্ষেত্রে আলেকজান্দারের সমতুল ব্যক্তি হলেন সম্রাট নেপোলিয়ন। যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রতীচ্যে বিগত দু' হাজার বছর ধরেই হয়ে আসছে। কিন্তু নেপোলিয়নের পর থেকে প্রতীচ্যের জীবনে পাশবিক শক্তির যে ব্যাপক প্রসার এবং প্রতিষ্ঠালাভ ঘটেছে এ-কথা অনস্বীকার্য। নেপোলিয়নের পর থেকে প্রতীচ্যের আধ্যাত্মিক প্রগতি একেবারেই রুদ্ধ হয়ে আছে। ফলে, আজকের ইয়োরোপ ও আমেরিকার পক্ষে অস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত কোন অভিলাষ বা পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব নয়।

গ্রীক সভ্যতার পক্ষে যেমন ছিলেন পিথাগোরাস, বর্তমান পশ্চিমী সভ্যতার পক্ষে তেমনই ছিলেন মার্টিন লুথার (১৪৮৩—১৫৪৬)। মার্টিন লুথারের পর থেকে পশ্চিমী দুনিয়া তার আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধানের জন্যে কোনও আধ্যা-

স্থিক উপায় উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়নি। কাজেই, বাস্তব সমাজ জীবনের অর্থনীতি ও রাজনীতি ঘটিত সহস্র পঙ্কিলতাকে গ্রহণযোগ্য পবিত্রতায় উত্তরণের জন্যে তাকে ক্রমাগতই পাশবিক পন্থার আশ্রয় নিতে হয়েছে। ফলে, ব্যবহারিক বিজ্ঞান এবং ধর্ম-দর্শন-নীতিশাস্ত্রের ব্যবধান ক্রমশঃই বেড়ে বেড়ে বর্তমানের অনতিক্রম্য অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

অ্যারিস্টটলের সঙ্গে কান্টের তুলনা করে স্পেঙ্গলার বলেছেন যে, গ্রীক সভ্যতায় অ্যারিস্টটলের মধ্যে যেমন তথ্য ও যুক্তিনির্ভর জ্ঞানের চরম বিকাশ হয়েছিল, বর্তমানের পশ্চিমী সভ্যতার পক্ষে তেমনই ছিলেন জার্মাণীর ইমানুয়েল কান্ট। কান্টের দার্শনিক চিন্তায় তথ্য এবং যুক্তি-নির্ভর জ্ঞানের সমস্ত বিভাগ, বিশেষতঃ তত্ত্বশাস্ত্র (Meta physics) ও নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে যে সামগ্রিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল, তা কান্টের পরে আর কোনো ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে দেখা যায় নি। বৈজ্ঞানিক তথ্য কান্টের সময়ে মানুষ যতটা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল, আজ তদপেক্ষা বহুগুণ বেশী তার আছে, কিন্তু সব কিছুর সমন্বয় সাধনের আত্মিক এবং দার্শনিক যোগ্যতা মানুষ হারিয়ে ফেলেছে বলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রতীচ্যের মানুষকে নিশ্চিতভাবেই ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে পরিচালিত করছে। যে শক্তির সদ্ব্যবহারের ফলে মনুষ্যত্বের নূতনতর মহান বিকাশ সম্ভব হতো, তারই অপপ্রয়োগের ফলে প্রতীচ্য নিজের সমাধি রচনার কাজকে ত্বরান্বিত করতে তৎপর।

গ্রীক সভ্যতার চরম উৎকর্ষের কালে সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক বৈষম্যকে সহনীয় করে তুলবার মানসে সৃষ্টি হয়েছিল দার্শনিক জেনোর সুখ-দুঃখে নির্বিকারবাদ (Stoicism). অনুরূপভাবে, স্পেঙ্গলারের মতে ক্ষয়িষ্ণু পশ্চিমী সভ্যতার একটি অংশ সাম্যবাদের মধ্যে সর্বসমস্যা সমাধানের অবাস্তব দুঃস্বপ্ন দেখছে। এ-সমস্তই পশ্চিমী সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতার সাক্ষ্য বহন করে। এই অন্তঃসারশূন্যতাই তাকে আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার উদগ্র নেশায় মাতিয়েছে এবং অবাঞ্ছিত আত্মপ্রসারের আগ্রাসী প্রচেষ্টার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তার আত্মধ্বংসের অব্যর্থ বীজ।

এর পর সভ্যতা সমুচ্চয়ের আনুপূর্বিক ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পরে স্পেঙ্গলার বলছেন যে, বিংশ শতাব্দীর সুরু থেকে যে ব্যাপক যুদ্ধের আয়োজন ইয়োরোপ-আমেরিকায় হয়ে চলেছে, ছোট-বড়ো, খণ্ড-বিচ্ছিন্ন এবং ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী—একটানা কয়েকটি যুদ্ধের ফলে একবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ প্রতীচ্যের বর্তমান সভ্যতার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

ভবিষ্যৎ

এখন থেকে ৫২ বৎসর পূর্বে স্পেঙ্গলার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মহানগরের জটিল জীবনযাত্রা মানুষের সামাজিক তথা মানসিক অবস্থায় কী নিদারুণ সমস্যার সৃষ্টি করবে। যন্ত্রের ওপর মানুষের ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা; সামাজিক তথা আধ্যাত্মিক অচল অবস্থা নিরসনের নিমিত্ত বহু-বিচিত্র ও পরস্পর-বিরোধী ভাবধারণার উদ্ভব; দিকে দিকে অত্যাচারিত, উৎপীড়িত, অবহেলিত ও শোষিত মানুষের আত্ম-অধিকার প্রতিষ্ঠার অশ্রান্ত সংগ্রাম; সাধারণভাবে মানুষের চরিত্রের সামগ্রিক অধোগতি; জীবনে শ্রেয়র প্রতি যথোচিত মূল্যবোধের অভাব এবং সব কিছু ছাপিয়ে নগদ অর্থ ও প্রভাব প্রসারে সক্ষম বিত্তের জন্যে মানুষের অন্য সমস্ত কিছুকে বিসর্জন দেওয়ার প্রবৃত্তি—প্রতীচ্য সম্পর্কে স্পেঙ্গলারের এ-সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী বিগত অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এবার দেখা যাক এশিয়া সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী কতটা সঠিক হতে চলেছে।

৫২ বৎসর পূর্বে স্পেঙ্গলার যখন তাঁর "দি ডিক্লাইন অব দি ওয়েস্ট"-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন তখন দূর-প্রাচ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের সীমানা থেকে লোহিত সাগর, এবং উত্তরে সাইবেরিয়ার উত্তর সীমানা থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত এশিয়ার বিশাল ভূ-খণ্ডে জাপানই ছিল একমাত্র প্রকৃত স্বাধীন দেশ। আমরা জানি, ভারতবর্ষ সহ এশিয়ার অনেক চিন্তাবিদই জাপানকে এ মহাদেশের শিরোভূষণ জ্ঞানে পূজো করতেন। শিক্ষা, কৃষিকার্য এবং শিল্পোন্নতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে জাপানের উন্নতি এমনকি খাস ইয়োরোপের অনেক দেশের পক্ষেও অবাক-করা পর্যায়ে পৌঁছেছিল নিশ্চয়ই। এশিয়ার প্রায় সমস্ত দেশই জাপানকে আদর্শ হিসেবে গণ্য করতো। কিন্তু সবার না হলেও অধিকাংশের নজর এড়িয়ে গিয়েছিল একটা দিক। তা হলো—ভূগোলের দিক থেকে জাপান এশিয়ার অংশ হলেও প্রকৃত পক্ষে, আত্মিক দিক থেকে জাপান প্রতীচ্যের কার্বন-কপি হয়ে উঠবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল, এবং কার্যতঃ হয়েও ছিল। বলাই বাহুল্য, প্রতীচ্যের অনুকরণে আত্মিক শক্তির সাধনা ত্যাগ করে পাশবিক শক্তি অর্জন এবং আগ্রাসী নীতির মধ্য দিয়ে তার বাস্তব প্রয়োগের যে পশ্চিমী নেশা, জাপান নিজেকে তার কবল থেকেও মুক্ত রাখতে পারে নি। ফলে সে হয়ে উঠেছিল আগ্রাসী। নিকটতম প্রতিবেশী কোরিয়া ও চীনকে আক্রমণের মধ্য দিয়ে তার সুরু হয়েছিল এবং দুটি আণবিক বোমার আঘাতে প্রতীচ্যের কার্বন-কপি স্বাধীন জাপানের শেষ হয়ে গিয়েছে।

বিগত ৫২ বৎসরে সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ড রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বলাই বাহুল্য, সব দেশ ঠিক একই অর্থে স্বাধীন নয়, অর্থাৎ সব দেশ থেকে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব একেবারে নির্মূল হয়ে যায় নি। অর্থনৈতিক সংকট বহু দেশেরই স্বাধীনতাকে প্রতিক্ষণ বিপন্ন করে তুলছে। তার ওপর আছে এশীয় দেশগুলির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, এ জিনিসটি কোন দেশে প্রতীচ্যের অনুকরণে স্বেচ্ছায় অনুসৃত হয়ে থাকে, কোথায়ও বা প্রতীচ্যের কোনও আগ্রাসী দেশের প্ররোচনায় ঘটে থাকে।

রাশিয়ার বৃহত্তর অংশ এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত ও-দেশের শাসক গোষ্ঠী স্বদেশকে সর্বৈব ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করতেন এবং এশীয় অংশকে উপনিবেশ হিসেবে গণ্য করতেন। কিন্তু বিপ্লবের পর থেকে সে-দেশের নতুন শাসক-গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গীতে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। প্রকাশ্যে স্বীকার করা হোক বা না হোক কার্যতঃ দেখা যায় বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার শাসকগণ ড্যানিলেভ্স্কির উপদেশ বা পরামর্শকে প্রকৃতই মূল্যবান বলে মনে করেন। তাই রাশিয়ার এশীয় অংশকে দেশের অন্যান্য অংশের মতোই সমান স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং এ অংশের উন্নতি যা হয়েছে তা বিস্ময়কর।

সিংহল ও ব্রহ্ম সহ ভারতের স্বাধীনতা অর্জন, চীন থেকে সর্বপ্রকার বিদেশী শক্তির অপসারণ, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে সাম্রাজ্যবাদী শাসন লোপ এবং মধ্য-প্রাচ্য ও নিকট প্রাচ্যের দেশগুলি থেকে ইয়োরোপীয় শোষণের বহুলাংশে মুক্তি—বিগত ৫২ বৎসরের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ঘটনা। এ ঘটনাগুলিতে নিঃসন্দেহে এশিয়া সম্পর্কে স্পেঙ্গলারের ভবিষ্যদ্বাণীর যাথার্থ্য সূচিত। তবে ব্যাপক অর্থে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হবে কিনা তা নির্ভর করছে এশিয়ার নেতৃবৃন্দের ওপর, এশিয়ার জনগণের ওপর।

বলাই বাহুল্য, ক্ষয়িষ্ণু প্রতীচ্যকে 'কপি' করতে গেলে নব্য এশীয় সভ্যতা জাপানের মতোই মাঝপথে শেষ হবে। তবে স্পেঙ্গলারের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, পুনরুজ্জীবিত এই এশীয় সভ্যতা পার্থিব সামগ্রীর প্রাচুর্যের সঙ্গে হৃদয়ের ঐশ্বর্যেও সমভাবে বলীয়ান হয়ে নিরাশায় নিমজ্জিত বিশ্ববাসীকে নতুন আলোয় প্রোজ্জ্বল জীবনের পথ দেখাবে।
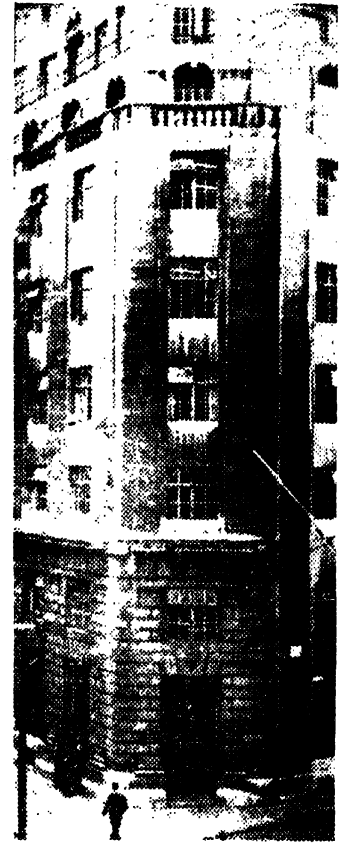
প্রায় শতাধিক বছর আগে দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন একটি তরুণ পথিকৃতের কল্পনা নিয়ে বার্তাবহ পায়রা উড়িয়ে ছিলেন আকাশে। সেদিন হয়তো তাঁরও জানা ছিল না যে, তিনি সেদিন বিশ্বব্যাপী সংবাদ সরবরাহকারী বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান 'রয়টার'-এর ভিত্তি স্থাপন করলেন। বর্তমানে প্রতিটি সভ্যদেশে যেখানেই দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় এবং বেতারে বার্তা প্রচারের ব্যবস্থা আছে, সেখানেই দ্রুতগামী এবং নির্ভরযোগ্য খবরের সঙ্গে 'রয়টার'-এর নাম উল্লেখ থাকবেই। ১৮৫১ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত পল জুলিয়াস রয়টার-এরই আন্তর্জাতিক সংস্থা সেই পারাবত-ডাক থেকে শুরু করে এখন মহাকাশ-উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সারা বিশ্বে সংবাদ পরিবেশন করে চলেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীন এবং এর মালিকানা কমনওয়েলথের।

সারা বিশ্বের পাঁচ শতাধিক শহরে সহস্রাধিক রিপোর্টার এবং এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত জাতীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে লণ্ডনের ফ্লিট স্ট্রীটে রয়টারের হেড কোয়ার্টারে দিনরাত এসে পৌঁছায় সংবাদস্রোত টেলিপ্রিন্টার, টেলিফোন, টেলেক্স, কেব্‌ল-সার্কিট আর রেডিও-মনিটরের মাধ্যমে। সেখানে সাব-এডিটাররাও দিনরাত সেই সংবাদরাশি থেকে যাচাই বাছাই ছাঁটাই ইত্যাদি করে সাজা সার খবরগুলি কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর ১৬৬টি দেশে পাঠিয়ে দেন অতি আধুনিক ক্ষিপ্রতর প্রেরণযন্ত্রের মাধ্যমে। তার পর দিনই খবরের কাগজের হেডলাইনে দেখা দেয় সেই সব সংবাদের শিরোনাম। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের খবরকাগজ অফিস, রেডিও স্টেশন, কমনওয়েলথের চ্যানসেলারি ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউস আর মস্কোর ক্রেমলিনেও রয়েছে রয়টারের টেলিপ্রিন্টার—কাজ করে চলেছে সব সময়।

পল জুলিয়াস রয়টার জার্মানির আচেন শহরে তাঁর পায়রা-ডাক স্থাপন করেছিলেন স্টক-একসচেঞ্জের খবর আর বাজার দর সরবরাহ করবার জন্যে। ১৮৫১ খৃস্টাব্দে লণ্ডনে এসে লোক এবং ছোট ছেলেদের নিয়ে একটি 'লোক-বালক' অফিস স্থাপন করে স্টক-একসচেঞ্জ আর বাজার-দরের সঙ্গে সাধারণ খবর সরবরাহ শুরু করেন। আর এখন সেই প্রতিষ্ঠান সংবাদ প্রেরণের জন্যে তার নিজস্ব লক্ষাধিক মাইলব্যাপী বার্তাবাহী তার-পথ এবং অসংখ্য রেডিও-টেলিটাইপ চ্যানেল নিয়ে [illegible] খবর টাইপ করার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সিডনি, টোকিও, নিউইয়র্ক, মিলান, মস্কো, বার্লিন, বুয়েনস আইরেস-এ তা পড়া যাবে। লণ্ডনের হেড কোয়ার্টারে কোনো খবরের ঝলক এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সে খবরকে ছাপবার উপযোগী করে এক মিনিটের মধ্যে পৃথিবীর প্রধান কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেবার নিয়ম। দূরত্বের কোনো প্রশ্নই নেই তারের ভেতর দিয়ে চলে শব্দ-স্রোত আলোর গতিবেগে পাঁচটি ভাষায়—ইংরাজি ফরাসী, স্পেনীয়, পোর্তুগীজ আর আরবীতে। ১৯৬২ খৃস্টাব্দে টেলস্টার উপগ্রহ মাধ্যমে লণ্ডন ও নিউইয়র্কে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করে নতুন ইতিহাসের সূচনা করেছে রয়টার।

খবর পাঠানোর জন্যে সংবাদবাহী পারাবত থেকে সংবাদ প্রেরক উপগ্রহ ব্যবহারে প্রেরণ ব্যবস্থাকে আধুনিকিকরণ করা হলেও ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে মিত্র শক্তির বাহিনী যখন নরম্যাণ্ডিতে অবতরণ করে তখন একবার আবার সেই পায়রা ব্যবহার করা হয়েছিল খবর আদান-প্রদানের জন্যে। ১২১ বছর আগেকার সেই সংস্থা ধীরে ধীরে এবং ধাপে ধাপে নিজেকে বিস্তারিত এবং সকল দিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবার জন্যে অতি-আধুনিক ইলেকট্রনিক কলা-কৌশল ব্যবহার করছে কেবল সংবাদ আদান-প্রদানের জন্যেই নয়, অফিস সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে এবং তৎপরতার সঙ্গে পরিচালনা করবার জন্যে।

রয়টারের সম্পূর্ণ মালিক হলো ব্রিটেনের সমস্ত জাতীয় ও প্রাদেশিক সংবাদপত্রগুলি, আর দুই কমনওয়েলথ সরিক অসট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড। এর কাজ হলো— কমনওয়েলথ-অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহকে সর্বদা সকল রকম খবর সম্বন্ধে অবহিত করা এবং বিদেশেও সংবাদ সরবরাহ করা। কমনওয়েলথের দেশ এবং অন্যান্য দেশসমূহেও এর কর্মীদল কাজ করে চলেছেন, তাঁদের বলা হয় 'স্ট্রিঙ্গার'। তাছাড়া আছে পুরো এবং আংশিক সময়ের (পার্ট টাইম) রিপোর্টার। তাঁরা প্রত্যহ খবর সংগ্রহ করে পাঠাচ্ছেন লণ্ডনে। এমন কি পৃথিবীর নির্জনতম দ্বীপ ট্রিসটান ডা কানহা, সেখানেও আছেন রয়টারের প্রতিনিধি। ১৯৬১ খৃস্টাব্দে সেখানে যখন ভূমিকম্প ও অগ্নুৎপাত হয়েছিল আগ্নেয়গিরি থেকে, সেখানকার সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পেয়েছিল পৃথিবীর সংবাদপত্রসমূহ অল্প সময়ের মধ্যেই। এই [illegible] অন্যান্য দেশের সংবাদ প্রতিষ্ঠানকেও সাহায্য করে থাকেন। বর্তমানে পৃথিবীর আট হাজারেরও বেশি দৈনিকপত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

প্রেস অ্যাসোসিয়েশন বিল্ডিং

১৯৪১ খৃস্টাব্দ থেকে এই প্রতিষ্ঠান হয়েছে সমবায় সংস্থা বিশেষ—মুনাফা-ভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নয়। সমবায়িক অংশীদার প্রথায় বৃটেন, অসট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের সংবাদপত্রসমূহ প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা করেন। এখান থেকে কোনো ডিভিডেণ্ট দেওয়া হয় না। নিম্নলিখিত সর্তসমূহে অংশীদাররা চুক্তিবদ্ধ এবং তার মধ্যেই রয়েছে প্রতিষ্ঠানের আদর্শ, লক্ষ্য, সততা এবং বিশ্বস্ততার উল্লেখ :

১। রয়টার কখনো কোনো একক স্বার্থগোষ্ঠী বা দলের হাতে যাবে না।

২। এর সততা, স্বনির্ভরতা, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সর্বদা পক্ষপাতমুক্ত থাকবে।

৩। এর কাজ এমনভাবে পরিচালিত হবে যাতে প্রতিষ্ঠানটি ব্রিটিশ ও কমনওয়েলথ অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহে এবং চুক্তিবদ্ধ অন্যান্য দেশগুলিতে পক্ষপাতশূন্য নির্ভরযোগ্য সংবাদ সরবরাহ করতে পারে।

বোর্ড অব ট্রাস্টিস, বোর্ড অব ডিরেক্টরস আর দি রয়টার ম্যানেজমেন্ট (কর্মী-সংঘ) এই নিয়ে রয়টারের পরিচালকমণ্ডলী গঠিত।

—বিজ্ঞানীপ্রিয়

তৃতীয় পর্ব
(৬)

টিউবারিকিউলিসিস বা ফাইলেরিয়া নয়, হয়েছিল প্যারাটাইফয়েড। তবু পুরো দু' সপ্তাহ ভুগতে হলো সাগরবাবুকে। পরমানন্দের সেবা-যত্নের তুলনা হয় না। পরমাত্মীয়কেও ও হার মানিয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ও একাই সবকিছু করত। অন্য কাউকে কিছু করতে হয়নি। হতো না। দিত না। আমাকেও না। দুপুরের পর হাসপাতাল থেকে ফিরে আমার ঘরে না ঢুকেই কটেজে গেছি কিন্তু পরমানন্দ বসতে দেয়নি। বলেছে, যান দিদি, এখন আপনি খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম করুন।

সত্যি আমি খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম করতাম। ঘুমুতাম। ঘুম না এলেও শুয়ে থাকতাম। উঠতে উঠতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যেত। একটু হাত-মুখে জল দিয়ে, সাগরবাবুর বিছানার পাশে চেয়ারটায় বসতাম। বসতাম অনেক রাত পর্যন্ত। উনি ভাল করে ঘুমিয়ে পড়ার পরই আসতাম। তার আগে নয়। কোনদিনই নয়। আমি শুতে যাবার সময় চৌকিদারকে ডেকে দিতাম। ও সারারাত সাগরবাবুর ঘরের দরজায় চেয়ার নিয়ে বসে থাকত।

এই ছিল নিত্যকার নিয়ম। ব্যতিক্রম হয়েছিল বৈকি! পরমানন্দের স্ত্রীর শরীর একদিন হঠাৎ বেশী খারাপ হওয়ায় ও আসতে পারল না। সেদিন আমিও হাস-পাতালে গেলাম না। যেতে পারলাম না। তাছাড়া তখন ওর বেশ বাড়াবাড়ি। অমন একজন সিরিয়াস পেসাণ্টকে একলা ফেলে যাওয়া সমীচীন মনে করিনি। নিজের ঘর-বাড়ী ছেড়ে একলা একলা বিদেশে চাকরি করতে এসে এমন বিপদে তো আমিও পড়তে পারি! আরো ব্যতিক্রম হয়েছিল। এক রাত্রি সাগরবাবুর বিছানার পাশে বসেই আমাকে কাটাতে হয়েছে। সে-রাত্রে আমি নিজেও বেশ নার্ভাস হয়েছিলাম। ভোর হতে না হতেই ডাঃ পটনায়ককে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

স্বপ্নের মত দুটি সপ্তাহ কেটে গেল। সত্যি স্বপ্ন! একলা একলা বেশ ছিলাম। পনের দিন সাগরবাবুর এত কাছাকাছি থেকে মনটাও কেমন যেন বদলে গেছে। রোগের যন্ত্রণায় কখনও উনি চেঁচামেচি করেছেন, কখনও বা আমার হাতদুটো চেপে ধরেছেন। কখনও আমি ওকে বকে ওষুধ খাইয়েছি, কখনও বা ওর মাথায় গায় হাত দিতে দিতে গল্প করে ঘুম পাড়িয়েছি। আরো কত কি হয়েছে! উনি ঘুমিয়ে পড়লে আমি হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়েছি। ওকে দেখেছি। আঙুল দিয়ে আলতো করে ওর কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়েছি। যেদিন দারুণ বৃষ্টি হলো, সেদিন কি কাণ্ডটাই হলো?

দুপুর থেকেই বৃষ্টি শুরু হলো। দারুণ বৃষ্টি। আমি হাসপাতাল থেকে ফেরার সময় ছাতি মাথায় দিয়েও নিজেকে বাঁচাতে পারলাম না। সম্পূর্ণভাবে ভিজে গেলাম। বিকেলবেলার দিকেও বৃষ্টি কমল না। অত বৃষ্টিতে পরমানন্দ বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল।

'দিদি, আমি ভাবছি এখনই বাড়ী যাই।'

'কেন? তোমার স্ত্রীর শরীর আবার খারাপ হলো নাকি?'

'না। এত বৃষ্টিতে ঘরদোরের কি অবস্থা, তাই ভাবছি।' একটু থেমে আবার বলল, নিশ্চয়ই ঘরে জল পড়ছে, তাই ভাবছি চলে যাই।

ওর বাড়ী আমি গেছি। কাঁচা বাড়ী। তাছাড়া শহরের উপকণ্ঠে। এত বৃষ্টিতে ছেলেমেয়েরা ভিজে গেল কিনা, কে জানে? আমি ওক বাধা দিলাম না। পরমানন্দ চলে গেল।

মাথায় ছাতা, গায় চৌকিদারের বিরাট রেন-কোট চাপিয়ে সাগরবাবুর কটেজে গেলাম। তবু পায়ের দিকের শাড়ীটা বেশ ভিজে গেল। ওঁকে ওষুধ খাইয়ে বসতে না বসতেই ভীষণ জোরে বাতাস বইতে শুরু করল। জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে বেশ বৃষ্টির ছাট আসছিল বলে জানলাগুলো বন্ধ করে দিলাম। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এত জোরে বাতাস বইবার জন্য বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। মোটা বেড-কভারটা সাগর-বাবুর গলা পর্যন্ত টেনে দিলাম। পায়ের কাছে শাড়ী ভিজে থাকায় আমারও বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। আঁচলটা ভাল করে গায় জড়িয়ে চেয়ারের পর জড়সড় হয়ে বসলাম। একটু গরম চা খেতে পারলে ভাল হতো। একবার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চৌকি-দারকে ডাকলাম কিন্তু ও কোন জবাব দিল না। নিশ্চয়ই এই বৃষ্টি আর বাতাসের জন্য শুনতে পায়নি। কি করব? আবার চুপ করে চেয়ারে বসে রইলাম।

চন্দ্রেকগড়া পাহাড়ের চারপাশে প্রচুর গাছপালা। এত বৃষ্টি ও বাতাসের জন্য গাছপালাগুলো যেন ভেঙে পড়ছিল। ভীষণ আওয়াজ হচ্ছিল। সাগরবাবু মাঝে মাঝেই চমকে উঠছিলেন। আমি ওঁর মাথায়-গায় হাত দিতেই উনি আবার ঘুমিয়ে পড়ছিলেন। আস্তে আস্তে রাত একটু গভীর হলো। বৃষ্টি কমল না কিন্তু বাতাসের বেগ কমল। একটু স্বস্তিবোধ করলাম। কিন্তু একটু পরেই দারুণ জোরে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। সারা ঘরটা আলোয় ভরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মেঘের গর্জন। শুধু সাগরবাবু বা আমি নয়, সারা ঢেংকানল কেঁপে উঠল। ঐ আওয়াজে উনি ভীষণ ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠলেন। আমি চেয়ার থেকে উঠে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই উনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বাচ্চাদের মত দু'হাত দিয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরলেন। আমি অনেক চেষ্টা করেও ওর হাত ছাড়াতে পারলাম না। কিছুতেই না। বাধ্য হয়েই ওর বিছানায় ওর পাশে বসলাম আর অবোধ শিশুর মত উনি আমার কোমর জড়িয়ে ঘুমিয়ে রইলেন।

অসুস্থ হলে অনেকেই শিশুর মত হয়ে যায়। ভয় পায়, কাঁদে। ডাক্তার-নার্সকে রোগীর এই বিচিত্র খামখেয়ালী-পনার খেলনা হতে হয়। তা হোক। কিন্তু ডাক্তার-নার্স তো শিশু নয়। তারা তো অসুস্থ নয়। রোগীর এইসব খাম-খেয়ালীপনার জন্য ডাক্তার-নার্সের মনে নানারকম প্রতিক্রিয়া হয়। নানারকম অনু-ভূতির সঞ্চার হয়, জন্ম হয়। সব ডাক্তার-নার্সেরই হয়। সে-অনুভূতি কারুর ক্ষণ-স্থায়ী, কারুর দীর্ঘস্থায়ী হয়। আমারও হয়েছিল। সে বিচিত্র অনুভূতি দীর্ঘস্থায়ী হবে কিনা জানি না; তবে এখনও ভুলতে পারিনি। জানি না কবে ভুলব?

সাগরবাবু সুস্থ হয়েছেন। ওষুধ চলছে। কিছুদিন চলবে। বেশী ঘুরাঘুরি করা বন্ধ হলেও এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। এখন টুকটাক যা কিছু করতে হয় তা পরমানন্দই করে। আমাকে কিছু করতে হয় না। করি না। ক'দিন ওর ঘরেও যাইনি। কেন যাব? কি প্রয়োজন? আমার প্রয়োজন তো শেষ হয়েছে।

এই ক'দিন সন্ধ্যার দিকে বারান্দাতেও বসি না। বসলেই সাগরবাবুর কটেজের দিকে দৃষ্টি চলে যায়। বারবার ইচ্ছা করে একটু ঘুরে আসি, দেখে আসি। ঘরের মধ্যেই কাটিয়ে দিলাম ক'টা দিন। ভাল লাগে না। ভীষণ খালি খালি লাগছে। নিঃসঙ্গ লাগছে। মনে হচ্ছে এই পৃথিবীতে যেন আমার আর কোন কাজ নেই। প্রয়োজন নেই। কোন দায়িত্ব, কর্তব্য নেই। আমি যেন ভারশূন্য হয়ে মহাশূন্যে ভাসছি!

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে-ছিলাম। বেশ রাত হয়েছে। ন'টা-সাড়ে ন'টা হবে। হাতের ঘড়িটা হাসপাতাল

থেকে এসেই খুলে রেখেছি। রোজ রাখি। পরের দিন সকালের আগে আর ঘড়ি দেখার দরকার নেই। হয় না। তবে ফাঁকা ব্যাস-স্ট্যাণ্ড দেখেই বুঝতে পারছি ন'টা-সাড়ে ন'টা বাজে। ক'দিন বৃষ্টির পর আজই প্রথম আকাশটা পরিস্কার হয়েছে। একটু ম্লান চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

'আসতে পারি?'

চমকে উঠলাম। ভাবতে পারিনি এই সময় এমন করে কেউ আমার ঘরে আসতে অনুমতি চাইবে। তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম সাগরবাবু। 'আসুন।'

আমি বিছানা থেকে নেমে ওকে চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, বসুন।

সাগরবাবু বসলেন। বুঝলাম উনি একবার আমার দিকে চেয়ে দেখলেন। তারপর জানতে চাইলেন, আপনি শুয়ে-ছিলেন ?

মনে মনে বললাম, এখনই শুয়ে পড়ব? ঘুম আছে নাকি আমার চোখে? একলা একলা এমন করে রাত কাটাবার জ্বালা আপনি বুঝবেন কি করে? ওসব কথা না বলে মুখে একটু শুকনো হাসি ফুটিয়ে বললাম, এত তাড়াতাড়ি আমার ঘুম আসে না।

'তাহলে বিশ্রাম করছিলেন নিশ্চয়ই?'

'বিশ্রাম না করে কি করব? কোন কাজ তো নেই।'

'এ-সময় এসে নিশ্চয়ই আপনাকে বিরক্ত করলাম?'

'আপনার কি তাই মনে হচ্ছে?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'তাহলে আর ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।'

দুজনেই একটু হাসলাম। হাসতে হাসতে একবার দৃষ্টি বিনিময় হলো আমাদের।

ওর রোগমুক্তির পর আমি আর কোন খোঁজখবর নিইনি। তাই জিজ্ঞাসা করলাম, শরীর ভাল আছে তো?

'জ্বর-টর আর হয়নি তবে কাল ভুবনেশ্বরে গিয়ে শরীরটা বেশ খারাপ লাগছিল।'

অবাক হলাম ওর কথা শুনে। 'সেকি? আপনি ভুবনেশ্বরে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে না বেরুতে বারণ করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'তবে?'

'না গিয়ে উপায় ছিল না।'

আমি জানি, জেনেছি উনি প্ল্যানিং কমিশনে চাকরি করেন। ওর টেবিলের ওপর কাগজপত্র দেখে বুঝতে পেরেছি উনি কি ধরনের কাজ করেন। সোশিও-ইকনমিক সার্ভের কাজ ক'দিন বন্ধ থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না, হতে পারে না। সুতরাং ভুবনেশ্বর গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত কারণে।

'আপনার স্ত্রীকে আনতে গিয়েছিলেন বুঝি?'

আমার প্রশ্নে সাগরবাবু যেন অবাক হলেন। 'আমার স্ত্রী?'

'তবে কি আমার স্ত্রী?'

'আমার স্ত্রীকে আবিষ্কার করলেন কবে?'

'অসুস্থতার মধ্যে আপনি কোন কথা বলতে বাকি রেখেছেন?'

সাগরবাবু একটু শুকনো হাসি হাসলেন। একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন, মানসীর কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ'

'মানসীকে আর কোনদিন পাব না।'

'তার মানে?'

'সে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে।'

'বিয়ে হয়ে গেছে বুঝি?'

'না......

'তবে?'

'ও মারা গেছে।'

সাগরবাবু খুব সহজভাবেই কথাটা বললেন, কিন্তু আমি যেন ইলেকট্রিক শক খেলাম। একটু উত্তেজিত হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কবে?

'অনেকদিন আগে। আমার ছাত্র-জীবনের শেষ অধ্যায়ে।'

'কি হয়েছিল?'

'প্লেন অ্যাকসিডেন্ট।'

এ-বিষয়ে বেশী আলোচনা না করাই ভাল, উচিত, কিন্তু তবুও নিজেকে সংযত করতে পারলাম না। 'কোথায়?'

'কলকাতা থেকে শিলচর যাবার সময়।'

কিছুক্ষণ আমি আর কোন প্রশ্ন করতে পারলাম না। চুপ করে সাগরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। উনি মাথা নীচু করে বসেছিলেন। নিশ্চয়ই মানসীর কথা ভাবছিলেন।

'আপনার বাড়ী কি শিলচরে?'

'হ্যাঁ।'

'মাগো ওখানেই আছেন?'

'মাগোও নেই।'

আমি আরো অবাক হলাম। 'বাড়ীতে কে কে আছেন?'

'কেউ নেই।'

'ভাই-বোন?'

মাথা নেড়ে সাগরবাবু বললেন, কেউ নেই।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। আমি জানলা দিয়ে বাইরের পৃথিবী দেখার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। ভাল লাগল না। ইচ্ছা করল না। ঠোঁটটা কামড়াতে কামড়াতে বারবারই সাগরবাবুর দিকে তাকাচ্ছিলাম।

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন সাগরবাবু। 'আপনি মেডিক্যাল কলেজে পড়তেন?'

'হ্যাঁ।'

'মানসীও মেডিক্যাল কলেজে পড়ত।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'নিশ্চয়ই আমার চাইতে সিনিয়র ছিলেন তা নয়ত জানতে পারতাম।'

একটু থেমে আমি প্রশ্ন করলাম, 'খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?'

'না।'

'এত রাত্তির পর্যন্ত না খেয়ে রয়েছেন?'

'হোটেলের ঐ একঘেয়ে খাবার খেতে এত তাড়া কি?'

আমি একটু ভাবলাম। তারপর বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। আমার খাবারও চাপা দেওয়া ছিল। তাড়াতাড়ি উঠে দু'জনের জন্য খাবার সাজিয়ে ডাক দিলাম, 'আসুন, আজ ভাগাভাগি করেই খাওয়া যাক।'

সাগর উঠে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞসা করল, 'অদৃষ্ট ভাগাভাগি করা যায় না?'

খুব মিহি-মিষ্টি গলায় উনি কথাটা বললেন, কিন্তু তাতেই আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল। হাত থেকে মাছের পাত্রটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল আর কি! ভাবতে পারিনি, কল্পনা করতে পারিনি এমন কথা, এমন প্রস্তাব শুনব। পাথরের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওর কথার জবাব দিতে পারলাম না।

সাগর যেন আরো একটু কাছে এগিয়ে এলো। আমি যেন ওর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। খুব ইচ্ছা করছে একবার ওকে দেখি। দু'হাত দিয়ে মুখটা তুলে দেখি। ভাল করে দেখি। একটু আদর করি। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আদর করি। ওকে প্রণাম করি। বলি, সাগর, তোমার হাতে আমাকে তুলে দেবার জন্যই কি ভগবান আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন?

কিছু পারলাম না। অনেকক্ষণ চুপ করে ওর পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'খেতে বসুন।'

সাগর একটিও কথা না বলে চুপটি করে খেতে বসল। আমার পাশে।

খাওয়া-দাওয়া করে চলে গেল। যাবার সময়েও কিছু বলল না। বোধহয় বলতে পারল না। বলার প্রয়োজন বোধ করল না। যা বলেছে, তারপর আর কি বলবে? কিন্তু আমিও কিছু বলতে পারলাম না।

(আগামীবারে সমাপ্য)

॥ ১৮ ॥

বেতার-সংকেত আসছে!

টুং-টাং করে বাজছিল বুলন্ত সুইডিস মিউজিক বল। কিন্তু মিষ্টি বাজনার দিকে কান ছিল না আচিনের। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল টেবিলে রক্ষিত ম্যাডোনার মোরানো মূর্তির পানে।

ত্র্যম্বকলালের চোখে নতুন করে ধরা পড়ল আচিনের ভেতরটা। রুপোর খাপে এতদিন গুপ্ত ছিল যে কুকরি, আচম্বিতে তা যেন খাপমুক্ত হয়েছে। উদ্যত হয়েছে শত্রুর শিরে। বক্র অগ্রভাগে লেলিহ তৃষ্ণা।

আচিন! দুর্ধর্ষ আচিন! মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষার মুহূর্তেই যার স্নায়ু হয় বরফের মত ঠাণ্ডা, গ্র্যানাইটের মত কঠিন!

বেতার-সংকেত আসছে!

পাশের ঘরে তাই নিয়ে হিসেব করছে আর্মড পুলিশের বিশেষজ্ঞরা। ম্যাপ ফেলে মাপছে। ল্যাটিচিউড-লঙ্গিচিউড দেখছে।

আচিন বলল, অসম্ভব ঠাণ্ডা গলায় বলল—'লালজী, থানডার খবর পাঠাচ্ছে। তার মানে, হামলা শুরু করে দিয়েছে।'

'তা তো বটেই।'

'হাতে সময় বেশি নেই। দেরি হলে ওদের জ্যান্ত পাওয়া যাবে না।'

'বুঝলাম।'

ঠিক এই সময়ে হন্তদন্ত হয়ে একজন এক্সপার্ট ঘরে ঢুকল। রাড়-চোয়াড় চেহারা। হাতে ম্যাপ। আঙুল দিয়ে ম্যাপে একটা জায়গা দেখিয়ে ত্র্যম্বকলালকে বলল—'সিগন্যাল আসছে এইখান থেকে।'

হুমড়ি খেয়ে পড়ে ত্র্যম্বকলাল—'এ তো ভারত মহাসাগর। সিগন্যাল কি জলের মধ্যে থেকে আসছে?'

পাশ থেকে সহজ গলায় জবাব দেয় আচিন—'জলের মধ্যে হবে কেন। দুপাশে রয়েছে খৃস্টমাস দ্বীপ আর কিলিং দ্বীপ। এ-অঞ্চলে দ্বীপের যখন অভাব নেই, তখন মাঝামাঝি জায়গাতেও একটা থাকা স্বাভাবিক। আপনি কি বলেন?'

প্রশ্নের জবাব দিল না এক্সপার্ট। অন্তর্হিত হল পাশের ঘরে। ফিরে এল অচিরে। হাতে আর একটা বড় ম্যাপ।

বলল—'ঠিকই ধরেছেন। মাঝামাঝি জায়গায় একটা ক্ষুদে দ্বীপ আছে।

মাইল-দেড়েক লম্বা। মাঝখানে একটা পাহাড়। পাহাড়ে কাঠের প্যাগোডা—প্রায় সাড়ে তিনশ' বছরের পুরোনো। কিছু ফুঙ্গি সেখানে থাকে। আর কেউ না।'

আচিনের ছোট ছোট চোখে প্রবাল রঙ ফুটে ওঠে। থেমে থেমে বলে—'মাসা দাউদ, তার পুরো গ্যাং আর চাণক্য ইসাবেলা এই দ্বীপেই রয়েছে। লালজী, আর্মড ফোর্স জোগাড় করতে কতক্ষণ যাবে?'

'চব্বিশ ঘণ্টা তো বটেই। তাছাড়াও সরকারী মহলেও পারমিশন নিতে হবে। অনেক জটিল ব্যাপার।'

গুলবাঘের মত গরগর করে উঠল আচিন—'পারমিশন নিতে নিতে যে ইসাবেলা থানডার দুজনেই খতম হয়ে যাবে। ঘাঁটি ছেড়ে একবার বেরিয়ে পড়লে মাসা দাউদকেও ধরা যাবে না। সিগন্যাল শুরু করে চাণক্য নিশ্চয় খোঁজ করছে না—ধেঁতানি শুরু করেছে। কতক্ষণ টিঁকে থাকবে যদি আমরা এখুনি না বেরোই? কিন্তু নাংপোর সুপারিশে কাজ হবে?'

কপাল কুঁচকে বোহেমিয়ান কাটা-গ্লাসের সুরাপাত্রর দিকে চেয়ে ছিল ত্র্যম্বকলাল। বিড়বিড় করে বলল অনেকক্ষণ পরে—'একটা উপায় আছে। দেখা যাক কি করতে পারি।'

*

রাত দুটো।

পীতদেহ ফুঙ্গিরাও বুঝি সুষুপ্তি-মগ্ন। ঘুমিয়ে আছে সারা প্যাগোডা। —শান্ত্রীরা বাদে।

কোমরের বেল্ট খুলে উল্টে নিয়ে আবার পরল ইসাবেলা। বেল্টের ভেতরে যে এত কারচুপি ছিল, এবার তা প্রকট হল। নরম চামড়ার একটা রিভলবার হোলস্টার ঝুলতে লাগল ক্ষীণ কটিতে।

হাঁটু গেড়ে বসল চাণক্য। স্বচ্ছন্দে হাঁটুর ওপর প্রথমে বাঁ, পরে ডান পা তুলল ইসাবেলা। বুটের শুকতলা আর চামড়ার সাজের জোড়ঢাকা ওয়াটারপ্রুফ ফিতেটা টেনে তুলে ফেলল চাণক্য।

শুরু হল অভিযান।

পা টিপে টিপে ঘোরানো পাথরের সিঁড়ির প্রথম ধাপে পৌঁছোলো দুজনে। আগে চাণক্য—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনীর ফাঁকে কুকরির ফলা। রাতের অন্ধকারে কৃষ্ণকায় শীর্ণ মূর্তির সেই নিঃশব্দ সঞ্চার দেখলে প্যান্থারের কথাই সবার আগে মনে আসে। এক্স-রে চোখে যেন ফসফরাসের দ্যুতি। মানুষ-নিশাচর। বজ্রকঠিন তনুতে হত্যার সংকল্প।

পেছনেই ইসাবেলা। উন্নত বুক, সরু কোমর আর গুরুনিতম্বে পারদ পিচ্ছিলতা। ডাগর দুই চোখে যেন সুমেরু আর কুমেরুর তুহিনতা।

প্ল্যান স্থির হয়ে গেছে। প্রথমেই হীরের বাক্স হাতাতে হবে। তারপর তীরে গিয়ে লঞ্চ অবরোধ করতে হবে এবং হীরের বাক্স লঞ্চে তুলে সটকান দিতে হবে। বাটাভিয়া যে এখান থেকে বেশি দূরে নয়—সে হিসেব চাণক্যর মাথার মধ্যেই আছে। এ-অঞ্চলের জল এককালে তোলপাড় করেছিল সে। তখন তার নাম ছিল থানডার। দধীচির হাড়ে গড়া বজ্র।

ওপরতলার ঠিক নিচেই একটা লম্বা করিডর। প্যাগোডার প্ল্যান সব তলাতেই এক। করিডরের দুধারে সারি সারি ঘর। বন্ধ।

ঠিক মাঝখানে টুলে বসে একজন মঙ্গোলীয়। কোলের ওপর সাব-মেশিন-গান। হাতিয়ারটাকে এমনভাবে আদর করছে মঙ্গোলীয় যেন হাতিয়ার নয়, কোলে বসে ধিঙ্গী মেয়ে। চুমু খাচ্ছে, হাত বুলোচ্ছে, ফিসফিস করে কি যেন বলছে এবং হাসছে।

ওপরতলার চাইতে এ-করিডর অনেক লম্বা। প্যাগোডার প্যাটার্নই তাই। ফলে চাণক্যের কুকরি আর মঙ্গোলীর হৃদপিণ্ডর মধ্যে ব্যবধান রয়েছে কমসে কম আশি ফুট। এতদূর থেকে কুকরি ছোঁড়া নিরাপদ নয়।

চোখের ইঙ্গিত করল চাণক্য। তৎক্ষণাৎ স্ল্যাকের ঊরু বরাবর দুই খাপ থেকে ইস্পাতের নলদুটো বার করল ইসাবেলা। চাণক্য টুপিঅলা নলটা নিয়ে টুপি খুলে ফেলল। ভেতর থেকে বেরুলো সরু সরু কয়েকটা নলচে। একটার মুখ তীরের মত ছুঁচোলো—পেছনে। বাকি সবগুলির সামনে প্যাঁচ, পেছনে প্যাঁচ।

একে একে প্যাঁচ ঘুরিয়ে নলচেগুলো পর পর লাগিয়ে ফেলল চাণক্য। ইসাবেলার কোমরের বেল্টের গোপন খোপ থেকে বার করল দুটি প্লাস্টিকের পালক। লম্বা নলচের একদম পেছনে খাঁজকাটা সকেটে লাগিয়ে দিল দুটি পালকই। হাতের ওজনে দেখে নিল দুদিক সমান হয়েছে কিনা।

তৈরী হল তীর। এবার ধনুক।

বুড়ো আঙুলের মত মোটা নলটার মাঝের বোতাম আগেই টিপে দিয়েছিল ইসাবেলা। নিমেষে টেলিস্কোপের মত লম্বা হয়ে গিয়েছিল চোঙাটা। মাঝখানের অংশটিই সবচাইতে পুরু—ক্রমশ সরু হয়েছে দুদিকে। তৈলমসৃণ যন্ত্রে এতটুকু শব্দ শোনা গেল না। নিঃশব্দে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে লেগে গেল প্রতিটি অংশ।

সোয়েটারের তলা থেকে একটা লম্বা সুতো বার করল ইসাবেলা। সাধারণ সুতো নয়—ধনুকের গুণ—কুরুশকাঁটায় বুনে লুকোনো ছিল সোয়েটারের তলায়। লম্বা চোঙা বেঁকিয়ে গুণ পরাতে গেল কয়েক সেকেণ্ড।

সমগ্র বিষয়টি সমাধা হতে লাগল বড়জোর তিরিশ সেকেণ্ড।

ধনুকে তীর লাগিয়ে লক্ষ্য স্থির করল চাণক্য। সহসা যেন ভোমরা কেঁদে উঠল—বাতাস শনশনিয়ে উঠল।

মঙ্গোলীয় বসেই রইল টুলে। চিবুক ঝুলে পড়ল বুকে। তার নিচে শুধু দেখা গেল প্লাস্টিকের সাদা পালকদুটি।

নিঃশব্দ চরণে সামনে গিয়ে দাঁড়াল দুজনে। তীরের ফলা হৃদপিণ্ড ভেদ করে কাঠের দেওয়ালে গেঁথে গিয়েছে।

মুঠোর মধ্যে তীরটা চেপে ধরল চাণক্য। পা রাখল মঙ্গোলীয়ের বুকে। সজোরে টান দিয়ে উপড়ে আনল ফলা। মুছে নিয়ে আবার প্যাঁচ ঘুরিয়ে খুলে ফেলল টুকরো অংশগুলো। ধনুকও মুহূর্ত মধ্যে পরিণত হল সিলিণ্ডারে। দুটোই অন্তর্হিত হল ইসাবেলার ঊরু বরাবর খাপে।

সাব-মেশিনগানে হাত দিল না চাণক্য। কুঙ্গার স্টেনগানও ফেলে এসেছে এই কারণে। নিঃশব্দ অভিযানে শব্দহীন হাতিয়ারই প্রয়োজন। সময়ও সংক্ষিপ্ত। শান্ত্রী আসার আগেই কুঙ্গার বদলি কিস্তি মাৎ করতে হবে। যেভাবেই হোক। নইলে সর্বনাশ।

জাহাজ থেকে হীরের বাক্স যে-ঘরে নামানো হয়েছে, ওরা চলেছে সেই হীরের ঘরে। জায়গাটা অপরিচিত নয়। বারান্দা পেরিয়ে তৃতীয় ঘরের মধ্যে দিয়ে পাওয়া গেল একটা খোলা ছাদ। অর্ধচন্দ্রাকার। ডানদিকে এবড়োখেবড়ো পাথুরে দেওয়াল ঊর্ধ্বে আলোকিত বারান্দা। হীরের ঘর।

ইসাবেলার কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে বলল চাণক্য—'দরজা দিয়ে তুমি ঢুকবে, জানলা দিয়ে আমি। সিঁড়ি আর করিডর পেরিয়ে ঘরে পৌঁছোতে তোমার লাগবে তিন মিনিট। ঘরে ঢুকেই আওয়াজ করবে। দেরি কোরো না। রাইট? কঙ্গো আমাকে দাও। যাও।'

নিমেষে অন্ধকারে অপসৃত হল ইসাবেলা। খোলা ছাদটা পেরিয়ে যেতে হবে চাণক্যকে। তারপর পাথুরে দেওয়াল খামচে ওপরে উঠতে হবে। বারান্দায় গুঁড়ি মেরে বসে থাকতে হবে ইসাবেলার প্রতীক্ষায়।

খোলা ছাদ। বিপদ সেইখানেই। কিন্তু দ্বিধা করল না চাণক্য। বেগে দৌড়োলো। শুকতলায় কোনো শব্দ হল না। কিন্তু বাতাসের সামান্য আলোড়নেই সচকিত হল দূরে অন্ধকারে মিশে-থাকা ছায়ামূর্তি।

ছাদের কিনারায় এসে দাঁড়াল লোকটা। মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। কোমরে চামড়ার খাপে রিভলবার।

উল্কাবেগে ধেয়ে-আসা শব্দহীন কৃশ-মূর্তির দিকে বারেক তাকালো ছায়ামূর্তি। বিন্দুমাত্র চমকালো না। ঈষৎ উত্থিত হল ভুরু। ডান হাত উঠে এল শূন্যে। সেই সঙ্গে রিভলবার। ঝানু বদমাস। খুনখারাপিতে পোক্ত হাত।

বিপুল বেগে দৌড়োতে দৌড়োতেই ছায়ামূর্তির আবির্ভাব দেখেছিল চাণক্য। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গিয়েছিল কর্তব্য। হাতে কঙ্গো নেই। কিন্তু যে-মুহূর্তে ছায়ামূর্তি রিভলবারে হাত দিল—সেই মুহূর্তেই শক্তি যেন ফেটে পড়ল চাণক্যর দুই ঊরুতে। লাফ দিল থানডার।

জুডোর এই মার যারা না দেখেছে, তারা কল্পনা করতে পারবে না চকিতে

কিভাবে ছটফটে মানুষ উড়ন্ত মানুষ হয়ে যায়।

জোড়া পা সিধে সামনে উঠে গেল। ছাদের সঙ্গে সমান্তরাল হল ঋজু দেহ। সেই অবস্থাতেই ছায়ামূর্তির দিকে শূন্য-পথে ছিটকে গেল চাণক্য। দু'পা আঁকশির মত আঁকড়ে ধরল কণ্ঠ। পরমুহূর্তে মোচড় দিল একদিকে। মোচড়কে জোরদার করার জন্যে পাক খেল সমস্ত দেহটা। দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে বাড়তি ঝাঁকুনি দিল দেহ-মোচড়ে।

যুগপৎ গলাধাক্কা এবং মোচড়। ডিগবাজী খেয়ে ছাদের বাইরে ছিটকে গেল ছায়ামূর্তি। রিভলবার ঠিকরে পড়ল ছাদে।

কনুইয়ের ওপর অবতীর্ণ হল চাণক্য—ছাদের একদম কিনারায়। মুখ বাড়িয়ে দেখল, তেলতেলে খাড়া পাহাড়ের ওপর দিয়ে পাকসাট খেতে খেতে নেমে যাচ্ছে পথের কাঁটা।

দশ সেকেন্ড নষ্ট হয়েছে! অমূল্য দশটি সেকেন্ড! হাঁচড়-পাঁচড় করে পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল চাণক্য। ধরবার খাঁজ আছে বিস্তর—অসুবিধে হল না।

বারান্দার রেলিং ধরে উঠতে যাবে চাণক্য, এমন সময়ে মন্থর চরণে চৌকাঠ পেরিয়ে এল আর একজন ষণ্ডা। ঢুলু-ঢুলু চোখ। হাই তুলে তুড়ি দিতে গিয়ে থমকে গেল। ঢুলুঢুলু চোখ বিস্ফারিত হল শূন্যে ঝুলন্ত লিকলিকে মানুষটার জ্বলন্ত চাহনি দেখে।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে বোধ করি দু' সেকেন্ড লেগেছিল। অমূল্য দুটি সেকেন্ড। থানডারের বজ্র-মারের আর একটি অবিশ্বাস্য নমুনা দেখা গেল এই দুটি মাত্র সেকেন্ডে।

বিচিত্র কৌশলে নিমেষে 'পীকক' হয়ে গেল চাণক্য। পাকা ব্যায়ামবীরের মতই চোখের পলক ফেলার আগেই হাতের ভরে পা তুলল শূন্যে। রেলিং ছাড়িয়ে গেল জোড়া পা। পরক্ষণেই ধনুকের মত বেঁকে গেল দেহ—রেলিংয়ের ওপর দিয়ে জোড়া পায়ের সবুট লাথি গিয়ে পড়ল লোকটার চোয়ালে।

রিভলবার বার করার আগেই ঘটল ঘটনাটা। তার চাইতেও দ্রুত ঘটল চাণক্যর বারান্দায় উঠে আসা। ধনুক-বক্র দেহ রেলিংয়ে আটকে এক ঝটকায় সিধে হল ও। ট্রাউজার্সের হিপপকেট থেকে কঙ্গো নামক মুগুর এল হাতে এবং ষণ্ডার ব্রহ্মতালুর অস্থি চূর্ণ হল নিমেষে।

জ্যাকেটর কুকরি টেনে নিয়ে এক লাফে চৌকাঠে হাজির হল চাণক্য। একটু আগেই একটা শব্দ শোনা গেছে সেখানে। তার মানে, ইসাবেলার আবির্ভাব ঘটেছে।

ঘরের ওদিকের দরজায় দাঁড়িয়ে ইসাবেলা। চোখে মদির চাহনি। হাতে নেই হাতিয়ার—শুধু একটা লিপস্টিক। ঠোঁটের মোনালিসা হাসিকে অধর-রঞ্জন দিয়ে আরো রঙীন করছে ইসাবেলা।

ঘরের দুজন বোম্বেটের একজন বারান্দায় আসছিল। হুটোপাটির শব্দে সচকিত হয়েছিল নিশ্চয়। হাতের সাব-মেশিনগান উদ্যত ছিল দরজার দিকেই।

ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজার ফ্রেমে আবির্ভূত হল সাত ফুট মানুষটা। চোখে অঙ্গার। হাতে কুকরি। পরমুহূর্তেই দেখা গেল হাত শূন্য। সামনের বোম্বেটের চাহনি চাণক্যর কাঁধের ওপর দিয়ে প্রসারিত—বাম বক্ষে হাড়ের কালো বাঁট-টুকু কেবল দৃশ্যমান। টলমলে দেহটা সটান মুখ থুবড়ে পড়ার আগেই ধরে নিল চাণক্য।

থানডারের হাতের কুকরি যখন শূন্যে ধাবমান, ঠিক সেই মুহূর্তে আর একটি কাণ্ড ঘটল ইসাবেলার হাতে। লিপস্টিকটা সহসা সামনে দিকে তাগ করল। কুচুটে চোখে যে লোকটা টমিগান নিয়ে দেখছিল হাতিয়ারহীন মেয়েটার অভিসার—অকস্মাৎ তার চক্ষু বিস্ফারিত হল। কিন্তু ভয় পেল না। লিপস্টিকের পেছনটা এক পাক ঘুরোতেই পটকা ফাটার মত একটা আওয়াজ হল।

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েই রইল লোকটা। টমিগান খসে পড়ল হাত থেকে। বুকের বাঁদিকে ফুটে উঠল লাল রক্ত। লিপস্টিক-পিস্তলের লক্ষ্য এত কাছ থেকে ব্যর্থ হয় না।

চিত্রার্পিতের মত ঘরের দুই প্রবেশ-পথে দাঁড়িয়ে রইল ওরা—চাণক্য আর ইসাবেলা। দুজনেরই চোখ কেন্দ্রস্থিত টেবিলের ওপর। কান খাড়া। তিনটে দেহ ধরাশায়ী হয়েছে একে-একে। নিস্তব্ধ প্যাগোডায় সেই শব্দটুকুই কম নয়। উৎকর্ণ যদি কোনো প্রহরী তাতে সচকিত হয় তো সে আসুক—অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত ওরা।

দশ সেকেন্ড...বিশ সেকেন্ড...তিরিশ সেকেন্ড। নিথর প্যাগোডা নিথর রইল। ব্যাহত হল না নিস্তরঙ্গ নীরবতা।

টেবিলের ওপরে মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়েছিল ওরা। এত পরিশ্রমের পুরস্কার বসানো সেখানে। ধাতুর বড় বড় দুটি বাক্স। হীরে বোঝাই পেটিকা।

আর, মেঝের দুষ্প্রাপ্য বোখারা গালিচায় লুণ্ঠিত দুটি দেহ। বিগতপ্রাণ। দুজনের একজন মাথা গুঁজে পড়েছে দেওয়ালে ঠেস দেওয়া তাম্রাসনে খোদাই ধর্মচক্রের ওপর।

সহজ গলায় ইসাবেলা বলে—'ঘরে ঢুকে দেখি, দুটোতেই বারান্দার দিকে যাচ্ছে। তাই একটার ভার আমি নিয়ে-ছিলাম।'

'খ্যাঁচড়া পড়েছিল, তাই দেরি হল', ততোধিক সহজ গলায় বলে চাণক্য। 'এক' জন চিকড়ে পাড়ার আগেই যমের বাড়ি গেছে। আর একজনের ব্রহ্মতালু পাউডার হয়েছে। দুজন এখানে। বাইরে আরো আছে। কি করবে?'

'কি করব মানে?'

'মূল প্ল্যান ছিল হীরের বাক্স বয়ে নিয়ে গিয়ে লঞ্চে তোলা। কিন্তু মামা দাউদ এত পাহারা বসিয়েছে, সাহস পাচ্ছি না। বাক্সদুটোও কম ভারী নয়। এক-সঙ্গে দুটো ঘাড়ে নিতে পারব না।'

'লঞ্চে যাওয়া মানে মাইলখানেক তো বটেই। একটা বাক্স রেখে আর একটা নিতে ফিরে আসতে হয়।'

'ঠিক। কিন্তু তার আগেই যদি ধরেল হই?' বলতে বলতে হেঁট হল চাণক্য। বোখারা গালিচায় লুণ্ঠিত গড়ে-গড়ে লোকটার হৃদপিণ্ড থেকে হ্যাঁচকা টানে বার করল কুকরিটা। মুছে নিয়ে রাখল জ্যাকেটের খাপে।

ইসাবেলা বলল—'সময়' কম। কুণ্ডার বদলে যে গার্ড আসবে, সে এসে যদি দেখে পাখী উড়েছে, জানলায় ট্রান্স-মিটার বসানো, শূন্যে বেলুন—তাহলেই গেছি। প্রাণ নিয়ে আর ফিরতে হবে না। হীরে নেওয়া তো দূরের কথা।'

চাণক্য বলে—'তাই অন্য প্ল্যান মাথায় এসেছে।'

'কী?'

'নিচের তলায় রান্নাঘরে একটা কুয়ো আছে না?'

'আছেই তো।'

'হীরের বাক্সদুটো কুয়োয় ফেলে দিয়ে চলো পালাই। ওরা টের পাবে না। কিন্তু আমরা প্রাণে বাঁচলে ফিরে এসে হীরে উদ্ধার করব।'

'মন্দ যুক্তি নয়। তুমি বাক্স নাও—আমি রাস্তা সাফ করছি।'

তৎক্ষণাৎ হেঁট হল চাণক্য। একটা বাক্স নিয়ে রাখল কাঁধে। বেজায় ভারী বাক্স। মেহাৎ লোহার মত মাংসপেশী, নইলে—

সামনে চলেছে ইসাবেলা। আসবার সময়ে গুড়গুড়ে লাশের হোলস্টার থেকে কোল্ট পাইথন অটোমেটিকটা এনেছে। আর এক হাতে কঙ্গো নামক কাষ্ঠ-মুগুর।

বারান্দায় রাবিশ। রাজমিস্ত্রীর সরঞ্জাম। সিঁড়ি। রান্নাঘর।

ম্যাড়মেড়ে আলো জ্বলছে রান্নাঘরে। প্রথমে উঁকি দিল ইসাবেলা। টেবিলে বসে ঝিমুচ্ছে সেই 'ঝাউবন' লোকটা। কোলের ওপর অটোমেটিক রাইফেল।

দোরগোড়া থেকে টেবিল প্রায় পনেরো ফুট। মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করল ইসা-বেলা। তারপরেই মনস্থির করে নিল।

পাঁচ সেকেন্ডও লাগল না পনেরো ফুটের ব্যবধান পেরুতে। 'ঝাউবনে'র সামনে উপস্থিত হল ইসাবেলা। শূন্যে উঠল ডান হাতের মুগুর— কিন্তু ব্রহ্মতালু গুঁড়ো হবার আগেই বাধা পেল।

পাশের তিন ফুট বাই চার ফুট কুঠুরি থেকে সহসা বেরিয়ে এল একজন বন্দুক দুই চক্ষু লাল বিস্ফারিত করে। ... নীরবে আকুতি জানাচ্ছে—মেরো না...মেরো না।

থমকে গিয়েছিল ইসাবেলা। মুখের ওপর অকস্মাৎ ইসাবেলার ছায়া এসে পড়ায় 'ঝাউবনে'র ঝিমুনিও বোধহয় কাটছে। নড়ছে লোকটা। দ্বিধা করল না ইসাবেলা।

নেমে এল মুদ্গর। তবে মারণ-বিন্দুতে নয়—ঘাড়ের স্নায়ুরজ্জুতে। ঝিমুনির মধ্যেই বোধ করি লক্ষ তারা-বাজির ঝলকানি দেখল ঝাউবন। লুটিয়ে পড়ল টেবিলের ওপরেই।

ফুঙ্গি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই ক'দিনের নৃশংসতায় বিপর্যস্ত—তবুও চোখে নীরব মিনতি—মেরো না...ওগো মেরো না...

ফিসফিস করে ইসাবেলা শুধু বলে—'মরেনি। ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি।' বলে হাতের ইঙ্গিতে চাণক্যকে ডাক দিল। আর এক হাতে পকেট থেকে বার করল ঘুম-পাড়ানি আরকে-ভিজানো তুলোর কৌটো। দুটো তুলোর প্যাড নিয়ে ঠেসে দিল ঝাউ-বনের নাসারন্ধ্রে।

চাণক্য কুয়োর পাড়ে পৌঁছে গেছে। উঁকি দিয়ে আগে দেখল বহু নিচের জল। তারপর, বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে নিক্ষেপ করল হীরে-ভরা বাক্স।

কয়েক সেকেণ্ড পরে একটা চাপা জলোচ্ছ্বাস শব্দ উঠে এল ইঁদারা গহ্বর বেয়ে।

ফুঙ্গি দাঁড়িয়ে রইল। ফিরেও তাকাল না ওরা দুজন। লম্বা-লম্বা পা ফেলে ফিরে গেল বাকী বাক্সটা আনতে। নির্বিঘ্নে ফিরে এল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। এ বাক্সটাও নিক্ষিপ্ত হল ইঁদারার কালো জলে।

ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল ফুঙ্গী।

চোখের কাছে চোখ নিয়ে গিয়ে থেমে-থেমে বলল চাণক্য—'এরা খুব কষ্ট দিচ্ছে না?'

ঘাড় কাৎ করে সায় দিল ফুঙ্গি।

'আর কয়েক ঘণ্টা—তারপরেই কষ্টের শেষ। কেমন?'

হাঁ করে চেয়ে রইল তির্যকচক্ষু। করুণ চাহনি।

'ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করব এখুনি। বাক্স দুটো এখানে রেখে গেলাম। কেউ যেন না জানে। মনে থাকবে?'

সবেগে সায় দিল ফুঙ্গি।

আর বাক্যব্যয় করল না চাণক্য। 'ঝাউবনে'র অটোমেটিক রাইফেলটা তুলে নিয়ে এগোল সদর দরজার দিকে। একটা পাল্লা খুলে পা বাড়িয়েছে, এমন সময়ে...

এমন সময়ে নিশীথ রাতের নিথরতা খান-খান হয়ে ভেঙে গেল মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণের শব্দে। সাবমেশিনগান। কাঠের পাল্লার চাকলা উড়ে গেল বুলেটের ঘায়ে।

উল্টো ডিগবাজি খেয়ে নিমেষে ঘরের মাঝে আছড়ে পড়ল চাণক্য। গুলি তার গায়ে লাগে নি।

কিন্তু জখম হয়েছে ইসাবেলা। উরু লাল হয়ে উঠছে রক্তে। বসে পড়েছে মেঝেতে। মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত।

দেওয়ালে গা ঘেঁসে গিয়ে পাল্লা বন্ধ করে দিল চাণক্য। গুঁড়ি মেরে মুখে এসে দাঁড়াল ইসাবেলার পাশে। চোখ জ্বলছে।

'হাঁটতে পারবে?'

'না।' জবাবটা এল দোরগোড়া থেকে। চোখ তুলল চাণক্য।

মিসেস ফ্যানটমাস। পাহাড়ের মত দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে মিসেস ফ্যানটমাস। দুই চোখে ঘৃণা। পুরু ঠোঁটে নোংরা হাসি। ছোলদাঁতে উৎকট লালসা।

সময় কম। ক্ষিপ্র আঘাতই এখন এক-মাত্র রণনীতি। তাই, চোখের পলক ফেল-বার আগেই নিচু হয়ে তুলল চাণক্য মুগ্দর এবং তৎক্ষণাৎ জ্যামুক্ত তীরের মত ছিটকে গেল সচল হিমাচলের দিকে।

দরজার ফ্রেমে এতটুকু নড়ল না বিরাট-কায়া মিসেস ফ্যানটমাস। এমনভাবে চেয়ে রইল যেন মস্ত রগড় হচ্ছে। চাণক্য সামনে পৌঁছেই কণ্গো তুলল ঊর্ধ্বে। কিন্তু নিমেষে নিজেই সশরীরে নিক্ষিপ্ত হল শূন্যে।

অসম্ভব কাণ্ডটা ঘটল এক সেকেণ্ডের কম সময়ের মধ্যে। বাটালীর মত ডান হাতের চাপড় এসে পড়ল চাণক্যর কোমরে—একই সঙ্গে বাঁ হাতের সাঁড়াশীতে ধরা পড়ল চাণক্যর কণ্গোসমেত কব্জি।

চাণক্যর শুধু মনে পড়ে যেন দুটো অসুরমুষ্টি তাকে কুট করে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে দিল ইসাবেলার দিকে। ধরাতলে সশব্দে অবতীর্ণ হল চাণক্য। করোটির ওপর আঘাতের আকস্মিকতায় আচ্ছন্ন হল মস্তিষ্ক।

তাই দেখতে পেল না শাঁকালু দাঁতের বিকট উল্লাস। উদগ্র কামনা যেন চরিতার্থ হতে চলেছে মিসেস ফ্যানটমাসের।

মস্তানী হাসি দেখে গা জ্বলে গেল ইসাবেলার। চাণক্য তখনও নির্জীব। নিজের উরুও গুলিবিদ্ধ। দরজার ওপাশে সাবমেশিনগান। সেই সঙ্গে সোর-গোল। মেশিনগানধারী চেঁচাচ্ছে। নিস্তব্ধ প্যাগোডা দ্বীপের দিকে দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে সেই চিৎকার।

আর দেরী নেই। মাসা দাউদের পুরো দল এবার জাগবে। আসবে। তারপর জ্যান্ত ছাল ছাড়ানো হবে দুজনের।

উরুর যাতনায়, পরিস্থিতির জটিলতায় ইসাবেলার মত ডানপিটে মেয়েরও মাথা বুঝি গুলিয়ে গেল।

তা না হলে কোমরে কোল্ট পাইথন রিভলবার থাকতেও চিরুনি ছুঁড়তে যাবে কেন?

স্ল্যাকের পকেটেই ছিল চিরুনিটা। মাসাদাউদ পরখ করে ফেরৎ দিয়েছিল। এহেন নিরীহ চিরুনিটাকে টিপ করে ছুঁড়ে মারল দোরগোড়ার আধাম্মা মূর্তির দিকে। ভাবখানা, চিরুনি নয়—হাতবোমা।

টুক করে লুফে নিল মিসেস ফ্যান-টমাস। উল্টে-পাল্টে দেখে নিয়ে তৈলহীন চুলে গাঁথল। চেয়ে রইল লুণ্ঠিত চাণক্যর দিকে।

বেচারী মিসেস ফ্যানটমাস!

চিরুনির একটা দাড়া ঈষৎ বেঁকানো দেখেও খটকা লাগে নি মনে। চোখেও পড়ে নি, পকেট থেকে তাড়াতাড়ি চিরুনি টান-বার সময়ে হাতের কায়দায় একটা দাড়া বেঁকিয়ে দিয়েছে ইসাবেলাই।

অর্থাৎ চিরুনি-বোমার ট্রিগার টেনে দিয়েছে ইসাবেলা। সময় মাত্র দশ সেকেণ্ড।

চাণক্যর ঘোর কাটল বিস্ফোরণের শব্দে। চোখের সামনে থেকে যেন ঝাপসা পর্দা সরে যচ্ছে মনে হল। অস্পষ্ট কুয়াশা। কুয়াশার মধ্যে একটা বীভৎস মানবী।

অথবা, এককালে যে মানবী ছিল।

এখন তার করোটির অর্ধেক উধাও। আধখানা খুলি নেই। সাদা ঘিলু, লাল রক্ত ছিটকে পড়েছে মুখের ওপর—দরজার ফ্রেমে। টলছে সেই ভয়ানক মানবী।

ঘোর সম্পূর্ণ কেটে গেল। মাথার বিদ্যুৎ আবার ফিরে এসেছে। চিরুনি-বোমা। ইসাবেলার চিরুনি বোমার ক্ষমতা দেখে চাণক্যর মত ডাকাবুকোও থতমত খেয়ে যায়।

ইসাবেলা ডাকছে। লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল চাণক্য। ঘুমন্ত প্যাগোডার ঘুম ভেঙে গেছে। মাথার ওপর কোথায় গম-গম করে উঠল লাউডস্পীকার। মাসা দাউদের ভয়াল কণ্ঠ—'হুঁশিয়ার। থাণ্ডার আর ইসাবেলা পালিয়েছে।'

কিন্তু পালাবার পথ বন্ধ। ইসাবেলা চলৎশক্তিহীন। মাসা দাউদ সজাগ। এখন উপায়?

মৃত্যু সামনে জেনেও যারা স্বাভাবিক থাকে, চাণক্য চাকলাদার সেই জাতের মানুষ। তাই হঠাৎ বৌদ্ধ শ্রমণের দিকে চোখ পড়তে অবাক না হয়ে পারে না।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বুদ্ধের উপাসক। খুলি-চূর্ণ বিকট অর্ধ-কবন্ধ দেহ দেখে নীল হয়ে গিয়েছিল পীত মুখ। সেই অবস্থাতেই সন্ন্যাসী অঙ্গুলিনির্দেশ করছে পাশের তিন ফুট বাই চার ফুট কুঠারির দিকে। আতঙ্কপাংশু মুখে আকুল আকুতি। কি বলতে চায় ফুঙ্গী?

জিরাফ-ঠ্যাং ফেলে কুঠরিতে ঢোকে চাণক্য। একটা ঘোরান সিঁড়ি। পাথরের। নেমে গেছে নিচের অন্ধকারে।

'কোথায় গেছে সিঁড়ি?' শুধোয় চাণক্য।

ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় ফুঙ্গী।—প্যাগোডার বাইরে।

ফিরে আসে চাণক্য। ইসাবেলাকে অক্লেশে তুলে নেয় কাঁধে। সেই সঙ্গে অটো-মেটিক রাইফেলটা। বাইরের বারান্দায় পদ-শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওরা এল বলে।

সিঁড়ির অন্ধকারে হারিয়ে গেল চাণক্য আর ইসাবেলা।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

নিশীথ চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারাজীবনে অজস্র গান লিখেছেন। গানের সংখ্যা আড়াই হাজারেরও বেশী; অপ্রকাশিত গানগুলো যা এখন প্রকাশিত হচ্ছে, তা মিলিয়ে হয়ত তিন হাজারের কাছে দাঁড়াবে। এখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে যা আলোচনা হয়েছে, তা কোনমতেই সত্যিকারের সাহিত্য বা কাব্যালোচনার পর্যায়ে নয়। অবশ্য কেউ কেউ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁর গানের বাণী নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের গান বলতে গীতাঞ্জলির গানগুলো নিয়ে অবশ্যই স্বদেশে এবং বিদেশে নানা আলোচনা হয়েছে। গীতাঞ্জলির পর্যায়ভুক্ত গানগুলোর কাব্যিক এবং সাহিত্যিক মূল্যায়ন করার একটা প্রচেষ্টা যে হয়েছে তা নয়, তবে তার পরিধি ব্যাপক নয়।

রবীন্দ্র-গানের বাণী নির্ধারণ করা একটা সমস্যার ব্যাপার। গান শুনে ভাল লাগা, আর গানের বাণীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিচার করার মধ্যে নিশ্চয় পার্থক্য আছে। গীতবিতানের অন্তর্ভুক্ত গানগুলোকে পূজা, স্বদেশ, প্রেম, বিচিত্র প্রভৃতি পর্যায়ে বিভক্ত না করে যদি কেবলমাত্র ১,২,৩ সংখ্যা দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হতো, তবে হয়তো আমাদের পক্ষে অধিকাংশ গানের বাণী উপলব্ধি করা দুষ্কর হতো বলেই আমার ধারণা। রবীন্দ্রনাথের অপরিচিত গান শুনলে নির্ধারণ করা শক্ত হবে যে এটা কোন্ পর্যায়ের গান। এমন অনেক গান যা শুনলে মনে হয় এটা প্রেম পর্যায়ের; কিন্তু গীতবিতানে দেখা গেল গানটি পূজাপর্বে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের গানের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো 'তুমি' 'তোমার' 'আমার' 'তব' 'কী' 'মম' ইত্যাদি শব্দগুলোর রহস্য উদ্ধার করা। জনৈক পরিসংখ্যানবিদ ও রবীন্দ্রকাব্যবেত্তা অনুসন্ধান করে বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কী' শব্দটি প্রায় ২১০০০ হাজার বার কাব্যে এবং গানে ব্যবহার করেছেন। গভীর ও তথ্যনিষ্ঠ বিচারে সেই 'কী'-এর অর্থ বিভিন্ন গানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তেমনি তুমি, তোমার, আমার শব্দগুলো হাজার বারের বেশী নিশ্চয় ব্যবহৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানে এবং কবিতায়। বিশেষ করে পূজা ও প্রেম পর্যায়ের কতগুলো গানের শব্দবৈচিত্র্য কিংবা ভাববৈশিষ্ট্যে এত ঘনিষ্ঠ মনে হয়, যা [illegible] শ্রোতা এবং কাব্যপিপাসুদের পক্ষে গানের মূল বাণী নির্ধারণ করা খুবই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। গীতবিতানে সন্নিবেশিত গানগুলো এই শব্দব্যবহারের বৈচিত্র্যে এবং তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ায় নানা অর্থের সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ পূজা ও প্রেমপর্বের গানগুলো তো বটেই। রবীন্দ্রনাথের গানের আরেকটি বৈচিত্র্য হলো, তিনি অনেক কবিতাকে গানে পরিবর্তিত করে তার বাণীর সামান্য অদল-বদল করেছেন। এখানে আরেকটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য থেকে অনেক গানই গীতবিতানের বিভিন্ন পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং এই রকম গানের সংখ্যা মোটেই কম নয়। আমি প্রথম এইরকম গানের কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি। গানগুলো হলো: 'তুমি কোন কাননের ফুল'/'ধরা দিয়েছি গো' / এ শুধু অলস মায়া (কড়ি ও কোমল), আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসি (উৎসর্গ), মরণ রে তুঁহু মম (ভানুসিংহের পদাবলী), দিনের শেষে ঘুমের ঘোরে/ আমার নাইবা হলো ওপারে যাওয়া/ তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার/তুমি এপার ওপার কর কে গো/আমার গোধূলি লগন (খেয়া কাব্য), নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে / যদি এ আমার দুয়ার/সকল গর্ব দূরে করি দিব/ তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে/ অল্প লইয়া থাকি (নৈবেদ্য) তবু মনে রেখ/এমন দিনে তারে বলা যায় (মানসী), আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে/ ওই জানালার কাছে বসে আছে (ছবি ও গান)।

আগেই বলেছি যে, কবি তার অনেক কবিতার ভাষা একটু পরিবর্তন করে অবিস্মরণীয় গানে রূপান্তরিত করেছেন। বিশেষ করে 'সানাই' কাব্যগ্রন্থের বেশ কিছু কবিতা রবীন্দ্রনাথ গানে রূপান্তরিত করে গানগুলোর এক অনির্বচনীয় রূপদান করেছেন। রবীন্দ্র সংগীতের প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধে 'রবীন্দ্রনাথের গানের কবিতা' শীর্ষক আলোচনায় 'সানাই' কাব্যগ্রন্থের যেসব কবিতা গানে পরিবর্তিত হয়েছে, তার যা উদাহরণ দিয়েছেন, সেই গানগুলোর চরণ উদ্ধৃত করছি:—

১। ভালবাসা এসেছিল এমন সে নিঃশব্দে চরণে/তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে। ২। এ ধূসর জীবনের গোধূলি ক্ষীণতার উদাসীন স্মৃতি / মুছে আসা সেই ম্লান হাসিতে রঙ দেয় উজ্জ্বলগীতি; ৩। তুমি গো পঞ্চদশী/শুক্লা নিশার অভিসার পথে চরম তিথির শশী ৪। এসেছিলে তবু আস নাই/তাই জানায়ে গেলে / সম্মুখের পথে পলাতকা।

কবিতা মাত্রই যে গান নয়, তা সত্য। কিন্তু কবিতায় যে ছন্দের দোলা থাকে, তা গানের রেশ সৃষ্টি করে। কবিতা এবং সংগীতের প্রভেদ আলোচনা প্রসঙ্গে কবি 'পঞ্চভূতে' বলছেন 'কবিরা ভাষার সঙ্গে এবং সংগীত নিযুক্ত করিয়াছেন। ... ছন্দ সংগীতের একটা রূপ। কবিতায় সেই ছন্দ এবং ধ্বনি দুই মিলিয়া ভাবকে জীবন্ত করিয়া তোলে, বাহিরের ভাষাকে হৃদয়ের ধন করিয়া তোলে।'

এই সূত্রে আরেকটি কথা বলা বিশেষ বাঞ্ছনীয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘজীবনে বিভিন্ন চিঠিপত্রে এবং বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর কাব্যের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে বেশ স্পষ্ট কথা বলেছেন। কিন্তু কবি তাঁর গানের বাণীবৈচিত্র্য নিয়ে বিশেষ কিছু পরিষ্কার লিখে যান নি। অন্ততঃ রবীন্দ্র-রচনাবলী এবং অন্যান্য জায়গায় তাঁর বিশেষ কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তবে বিভিন্ন সময়ে চিঠিপত্রে স্থানবিশেষে কাব্য এবং গান আলোচনা প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলেছেন। ৪ অক্টোবর ১৯৩৩ সালে শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে কবি লিখছেন, 'কাব্যের একটা বিভাগ আছে, যা গানের সহজাতীয়, সেখানে ভাষা কোন নির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে না, একটা মায়া রচনা করে।' বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের গান এক-জাতীয় কাব্য এবং তাঁর কাব্য অন্যদিক থেকে গানও বলা যেতে পারে। আমি পূর্বের 'সানাই' এবং অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ হতে যেসব গান উদ্ধৃত করেছি, সেটা কবির এই উক্তির সত্যতাকে প্রমাণ করে। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁর গান এবং কাব্য নিয়ে অনেকে বিরূপ সমালোচনা শুরু করেছিলেন। কবি বলেছিলেন যে, তাঁর কাব্য এবং গানের বাণী নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হওয়ায় এই সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। তবে একথা অবশ্যই দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রকাব্য এবং গানের মূল সুর এক। 'কড়ি ও কোমলের' ভূমিকায় কবি বলছেন: 'যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ।' অন্যত্র বলেছেন 'অনেক দিনের রচনাগুলো

যখন একত্র জমা করা যায়, তখন এই ভাবনাটা মনে আসে, তারা নানা বয়সের ও মনের নানা অবস্থার সামগ্রী। শুধু নিজের মনের নয়, চারিদিকের মনের।' এই দুইটি কবি উক্তিকে মনে রেখে তাঁর কাব্য এবং গান আলোচনা করতে অনেক সুবিধা হয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্য এবং গানে এই মৃত্যু এবং জীবনের প্রতি ভালবাসা তাঁর কাব্য-সংগীতময় জগৎকে এক অবিস্মরণীয় মহিমান্বিত দান করেছে। লিরিক কবির কৃতিত্ব সেখানে, যখন তাঁর কাব্য হয়ে ওঠে গান। এত কথা বলার উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের কাব্য এবং গানের অচ্ছেদ্য সম্পর্ককে স্পষ্ট করে তোলা।

আমি গীতবিতানের কতগুলো গান দৃষ্টান্ত হিসাবে উদ্ধৃত করে দেখাব যে, এই গানগুলো শুনে শ্রোতার পক্ষে নির্ধারণ করা মুশকিল হয়—গানগুলো কোন পর্যায়ের কিংবা কোন বাণীবৈচিত্র্য নিয়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। পূজাপর্বের গানগুলোতে যেখানে কবি পরিষ্কারভাবে সখা, প্রভু, তোমালাগি, নাথ প্রভৃতি কথা ব্যবহার করছেন, সে সব গানগুলো বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। শুনলেই বোঝা যায় যে, গানগুলো পূজা-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। যেমন 'আমার আর হবে না দেরি/তুমি কী নাথ দাঁড়িয়ে আছ/প্রভু বলো বলো কবে/ইত্যাদি বিশেষ গানগুলো। সবচেয়ে বেশী অসুবিধা হয় প্রেম-পর্যায়ের কয়েকটি গান নিয়ে। গানের কথা এবং বাণী লক্ষ্য করলে মনে হতে পারে যে, এই কয়টি গান পূজাপর্যায়ে সংযোজিত হলে বোধহয় কোন ক্ষতি হতো না। রসজ্ঞ শ্রোতার পক্ষে যেমন দ্বিধা, তেমনি রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর পক্ষেও গানের বাণী সঠিক উপলব্ধি করে সংগীত পরিবেশন করা বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, রবীন্দ্রসংগীতের গায়কী গানের বাণীর উপরেই অধিক নির্ভরশীল। শিল্পী কীভাবে গানের বাণী উপলব্ধি করতে পেরেছেন সেটাই সবচেয়ে বড়ো কথা।

প্রেম-পর্যায়ের যেসব গান আমার মনে সংশয় এনেছে অর্থাৎ যে গানগুলো পূজা-পর্যায়ে সংযোজিত হলে কোন ক্ষতি হতো না, আমি সেই ধরনের কয়েকটি গান তুলে ধরছি।

প্রেমপর্বের ১৪নং গান হলো—

'যায় নিয়ে যায় আমায় আপন গানের টানে
ঘরছাড়া কোন পথের পানে
নিত্যকালের গোপন কথা, বিশ্বপ্রাণের ব্যাকুলতা
আমার বাঁশি দেয় এনে দেয় আমার কানে'—

এই গানটির কথা এবং বাণীবৈচিত্র্য দেখে মনে হয় যে, গানটি পূজাপর্বে স্থান পেলে ভালো হতো। কারণ 'নিত্যকালের গোপন কথা, বিশ্বপ্রাণের ব্যাকুলতা' এবং 'কোন পথের পানে', কথাটি ইঙ্গিতবাহী। কবি কোন পথের কথা বলছেন, আমাদের তা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। আবার ১৭নং গানটির শেষ চার লাইন হলো—

'বিশ্বের কাজের মাঝে জানি আমি জানি
তুমি শোন মোর গানখানি।
আঁধার মথন করি যবে লও তুলি গ্রহতারা-গুলি
শোন যে নীরব তব নীলাম্বরতলে।'

গানটি যাঁরা বেশী শোনেন নি, তাঁদের পক্ষে ধারণা করা মুশকিল যে, গানটি গীতবিতানের কোন পর্যায়ভুক্ত। মনে হয় পূজা-পর্যায়ের গান, অথচ গীতবিতানে প্রেমপর্বে গানটি সন্নিবেশিত হয়েছে। তেমনি ২৪নং গানটি 'বাঁশি আমি বাজাই নি কি পথের ধারে ধারে' অন্তরা ভাগের কথা হলো—

'আজ যেন কোন শেষের বাণী
শুনি জলে স্থলে
পথের বাঁধন ঘুচিয়ে ফেলো,
এই কথা সেই বলে।'

এই গানটির কথা আগাগোড়া ভাবব্যঞ্জক। বিশেষ করে 'কোন শেষের বাণী' এবং 'এই কথা সেই বলে' কথাগুলোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার সন্ধান পাই নাকি। কারণ উক্ত গানটির শেষ দুই চরণ হলো—

'মিলন ছোঁয়া বিচ্ছেদেরই
অন্তবিহীন ফেরাফেরি—
কাটিয়ে দিয়ে যাও গো নিয়ে
আনগোনার পারে।'

লাইনগুলো কী ব্যঞ্জনাময় তা সহজেই অনুমেয়। মৃত্যুর প্রতি কবির অনুরাগ গানটিতে প্রকাশ পেয়েছে। প্রেমপর্বের ৩০নং গানটি যেমন সুন্দর, তেমনি ভাবপূর্ণ। গানটি হলো—

'সবার সাথে চলতেছিল অজানা এই পথের অন্ধকারে,
কোন সকালের হঠাৎ আলোয় পাশে আমায় দেখতে পেলেম তারে—
এক নিমেষেই রাত্রি হলো ভোর, চিরদিনের ধন যেন সে মোর—
পরিচয়ের অন্ত যেন কোনখানেই নাইকো একেবারে—'

আগেই বলেছি যে, রবীন্দ্রনাথ যেখানে 'তুমি' 'আমায়' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন, তার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। 'অজানা পথের অন্ধকারে' এবং 'চিরদিনের ধন যেন সে মোর' কথাগুলো রবীন্দ্র-সঙ্গীতে পেলেই মনে হয় গানটি বোধহয় পূজাপর্বে রয়েছে, অথচ তা নয়। প্রেম পর্যায়ের ৩৩নং গানটি পূজাপর্বে স্থানান্তরিত হলে হয়ত ভাল হত। গানটি হলো :—

"আমারে করো তোমার বীণা,
লহ গো লহ তুলে।
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে।
কখনো সুখে কখনো দুখে
কাঁদিবে চাহি তোমার মুখে
চরণে পড়ি রবে নীরবে রহিবে যবে ভুলে'

গানটির সুর এবং ভাষার মধ্যে কবির আত্মনিবেদনের ভাব প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই গানটি পূজা পর্যায়ে স্থান পেলে ভাল হত। আবার ৫৭নং গানটি প্রেম পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পূজাপর্বে স্থান পেলে বেমানান হত না। গানটির কথা রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির গানগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য গীতাঞ্জলির গানগুলো পূজা পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত। গানটি হলো :—

বড়ো বেদনার মতো বেজেছ
তুমি হে আমার প্রাণে,
মন যে কেমন করে,
মনে মনে তাহা মনই জানে
তোমারে হৃদয়ে করে আছি নিশিদিন ধরে
চেয়ে থাকি আঁখি ভরে মুখের পানে।"

সবশেষে ৩১৯নং গানটির কথা উল্লেখ করছি। এই গানটিও পূজাপর্বে সন্নিবেশিত হলে ভাল হত। ভাব এবং সুরের বৈচিত্র্যে গানটি ভক্তিরসের উদ্রেক করে। গানটি হচ্ছে :—

"আমার মন চেয়ে রয়
মনে মনে হেরে মাধুরী
নয়ন আমার কাঙাল হয়ে মরে না ঘুরে।

আরো এই রকম দু-একটি গান আছে, যা প্রেমপর্বে অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পূজা পর্যায়ে অনুপ্রবেশ করলে ভালই লাগত।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের ভাব অতিবিচিত্র। তিনি তাঁর জীবনদেবতাকে ভালবেসেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে এবং গানে জীবন-দেবতার প্রতি ঐকান্তিক প্রেমের কথাই প্রকাশ করেছেন। এই জীবনদেবতা কখনও সখা, প্রভু, নাথ কিম্বা ছলনাময়ী নারীরূপে তাঁর গানে এবং কবিতায় আবির্ভূত হয়েছেন। কবি তাঁর জীবনদেবতাকে গানে 'তুমি' 'তোমার' 'তব' এমন কি কবি বলে নানা জায়গায় সম্বোধন করেছেন। কবির প্রেম অমৃত লোক থেকে নেমে এসেছে পৃথিবীতে, মানব-মানবীর মধ্যে এবং প্রকৃতিতে। এই ধনের রসসিঞ্চিত গান গীতবিতানে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু বিপদ হচ্ছে যে, এমন কিছু গান প্রেম পর্যায়ে আছে, যা পূজাপর্বে অন্তর্ভুক্ত হলে রসজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে গান নির্বাচনে অসুবিধা হত না। এই ধরনের গানের উল্লেখ একটু আগেই করেছি।

সবশেষে কয়েকটি কথা বলতে চাই। রবীন্দ্রনাথের গানের ইতিহাস এবং যেসব গান বিভিন্ন কাব্য হতে নেওয়া হয়েছে, সেই সব গানগুলো মূল রচনা হতে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে অনেকের পক্ষে স্থির করা কঠিন হবে যে, কবির কোন গান মূড অনুসারে গীতবিতানের বিভিন্ন পর্যায়ে সংযোজিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গান রচনার পেছনে অনেক গল্প শোনা যায়। আমি যে গানগুলোর উল্লেখ করলাম, তার ইতিহাস কিম্বা ইতিবৃত্ত যাই থাক না কেন, যে কোন রবীন্দ্রসঙ্গীতরসজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে গীতবিতানের এই ধরনের গান শুনে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। অনেক অভিজ্ঞ শিল্পীকে পর্যন্ত একটা বিশেষ গান কোন পর্যায়ে আছে, তা খুঁজে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হতে হয়েছে। এই সব কারণে মনে হয় যে, পূজা এবং প্রেমের গানগুলো পুনঃপরীক্ষা করে গীতবিতানে সংস্কার করলে উত্তরকালে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পী এবং রসজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রভূত উপকৃত হবেন।

চৈত্রের খর রোদে ধুলোর ঘূর্ণি ওড়ে। ফাঁকা রাস্তা দিয়ে বাসটা যবার সময় ইঞ্জিনে অদ্ভুত শব্দ ওঠে। শুকনো মাঠ বিবর্ণ পাতার গাছগুলোর দিকে বেশীক্ষণ তাকানো যায় না। কেমন চোখ জ্বালা করে। এমন দুপুরে বেরোনর জন্য একটা রোদ-চশমা দরকার, মনে মনে ভাবছিল নন্দিতা। এ সময় উড়ন্ত ধুলোবালি থেকে মুখ বাঁচাতে বাঁচাতে বাসে উঠল অনুতোষ। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দেখল ওকে।

—কি খবর। ভ্রূর কম্পনে অনুতোষ কুশল প্রশ্ন করল।

নন্দিতা হাসল, সৌজন্য করে। বসার জায়গা ছিল না। রড ধরে দোদুল্যমান অনুতোষ নন্দিতার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। কপালময় উড়ো চুল ছড়ানো। সামান্য বড় সাজানো দাঁতের সারিতে হাসিটা কেমন ঝকঝকে দেখায়। চেককাটা রুমাল কপালে নাকের ডগায় চশমার ওপরে বোলাল অনুতোষ।

—অসময়ে তুমি এধারে? নন্দিতা মুখ তুলে বলল।

—বোনের বাড়ী এসেছিলাম। দ্বিতীয় শনিবারের ছুটিটা সকাল থেকেই বেশ চব-চোষা দিয়ে শুরু হল আজ। অনুতোষ নিজের রসিকতায় হাসল। নন্দিতাও হাসল। বাইরে হলুদ রোদের দিকে তাকাল। বাড়ী-ঘর গাছ ঘাস নির্জন পুকুর উজ্জ্বল আলোয় থৈ থৈ করছে। দেখে দেখে চোখটা এক মুহূর্ত করকর করে উঠল। সামনে সপ্তাহে মাইনে পেলেই একটা রোদ-চশমা কিনবে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল নন্দিতা।

—তুমি নিশ্চয়ই স্কুল ফেরং? সামান্য ইতস্তত করে বলল অনুতোষ। ওর হাতের বড় সাইজের কালো রং-এর ব্যাগ ও বান্ডিল-করা খাতা দেখে।

—হ্যাঁ, নন্দিতা স্মিত হাসিতে ঘাড় দোলাল।

—এদিকে কোন্ স্কুলে আছো এখন?

একটি প্রায় অখ্যাত মেয়ে-স্কুলের নাম করল নন্দিতা। তবু তো উচ্চমাধ্যমিক। অনুতোষ খুশি হল শুনে। আগে নন্দিতা একটা প্রাইমারি স্কুলে চাকরি করত।

শহরতলী ছেড়ে বাস এখন রাজপথে। নানান রকমের যানবাহনের ক্রমবর্ধমান কোলাহলে বাসের শব্দটা এখন আর অদ্ভুত মনে হয় না। হু হু হাওয়ার সঙ্গে মাঝ বেলার উত্তাপ শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। নন্দিতার কপালে খুচরো রুক্ষ চুল খেলা করে বোহিসেবীর মতন। নন্দিতার ক্লান্ত লাগে। অস্থিমজ্জা স্নায়ুশিরা শিথিল মনে হয়। পাশের আসন থেকে মেয়েটি নেমে যেতেই নন্দিতা চোখ তুলে অনুতোষকে আহ্বান জানাল। অনুতোষও ঝুপ করে বসে পড়ল ওর পাশে।

—অনেক দিন পরে দেখা হল তোমার সঙ্গে। বেশ কয়েক বছর। কি যেন চিন্তা করতে করতে অন্যমনস্ক গলায় বলল অনুতোষ। আঙুলে আঙুলে জড়িয়ে মটমট শব্দ করল কবার।

—অতদিন মনে হচ্ছে না কিন্তু, নন্দিতা হাসিমুখে বলল, মনে হচ্ছে এই সেদিনও দেখেছি তোমায়। আসলে আমরা বোধ হয় কেউই তেমন বদলে যাই নি।

—আমরা কেউই বদলে যাইনি—ওর কথাটাই টেনে টেনে খুব মৃদুস্বরে যেন আবৃত্তি করল অনুতোষ। ওকে হঠাৎ অত্যন্ত দূর মনস্ক মনে হচ্ছিল।

—তারপর, তোমার খবর কি বল। নন্দিতা লঘু হতে চাইল।

—ভাল। অনুতোষ নন্দিতার চোখের দিকে তাকাল। নন্দিতা চোখ ফিরিয়ে নিল। বাসের ইঞ্জিন একটানা ক্লান্ত গর্জন করছে। কখনো থামছে চলা, পরক্ষণেই আবার শুরু করছে। প্রতিবার নতুন মুখ, নতুন চেহারা।

যাত্রী উঠছে নামছে। বেলা পড়ে আসছে। রোদের উজ্জ্বলতা ক্রমশ গাঢ় হলুদে হচ্ছে। ধুলোমাখা হাওয়ার ঝাপটে সারা শরীর মুখ সংক্ষুব্ধ পাণ্ডুর। নন্দিতা বাসের ঝাঁকুনিতে অস্থির শরীর অনুতোষের ছোঁয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইল। অনুতোষ আর কথা বলছিল না। নিজের হাঁটুর ওপরে নখ দিয়ে হিজিবিজি আঁকছিল।

—তোমার বিয়ের খবর শুনেছিলাম। নন্দিতা একটু হৃদ্যতার গলায় গায়ে পড়ে বলার মতই বলল কথাটা। পরক্ষণে তার নিজের ওপর রাগ হল, ভাবল, নিজেকে এরকম খেলো করা ঠিক না। অনুতোষ সম্ভবত কথাটা সহজভাবে নিল। স্মিত হেসে বলল,—

—হ্যাঁ, সে তো বেশ কিছুকাল হল। প্রায় বছর দুয়েক।

নন্দিতার মুখখানা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য নিষ্প্রভ হল, গলার ঠিক নীচেই একটা অতিসূক্ষ্ম কাঁটা-বেঁধার যন্ত্রণা মুহূর্তে জেগে উঠেই মিলিয়ে গেল।

—তোমার কথা আমি জিজ্ঞেস করব না, অনুতোষ মন্তব্য করল, মেয়েদের বিয়ে হয়েছে কিনা সেকথা তার চেহারায় লেখা থাকে, আর সে ভাল আছে কি না তার উত্তর লেখা থাকে তার মুখে।

—কি বলতে চাইছ বুঝতে পারলাম না। নন্দিতার মুখ অনিবার্যভাবে কালো হয়ে আসছিল। নিজেকে দমন করার চেষ্টা করেও পেরে উঠছিল না। এই চলন্ত বাস, অনবরত ঝাঁকুনি, গরম হাওয়া ও ছড়িয়ে থাকা রোদের ক্লান্তি তার মেজাজকে বশে রাখতে দিচ্ছিল না। অথচ তার এগুলো হবার কথা না। অনুতোষকে দেখে তার চঞ্চল হবার কোন কারণ নেই এখন।

—আচ্ছা, এই স্কুলের কাজ ভাল লাগে তোমার? অনুতোষ খুব মৃদু কোমল গলায় প্রশ্ন করল ওকে।

—কেন লাগবে না, নন্দিতা এবার বেশ সহজ প্রত্যয়ের সুরে জবাব দিল, অনেকেই তো করছে এরকম।

—আমার মনে হয় এতে কষ্ট বেশি। অনুতোষ আলোচনা চালিয়ে যেতে চাইল।

নন্দিতা ছোট্ট করে হাসল, একটু থেমে বলল,

—আত্মনির্ভর হতে গেলে এমন কষ্ট তো স্বীকার করতেই হবে।

বাস থেমে দাঁড়িয়েছিল। সম্ভবত দুপুরে বলে অথবা এমনিই মেয়ের ভীড় কম। অনুতোষকে নন্দিতার পাশ থেকে উঠতে হচ্ছিল না। নন্দিতা বলল,

—সামনের স্টপেজ পেরিয়ে গেলেই তার পরেরটায় আমি নামব।

—তুমি আজকাল এখানে থাকো?

—গত জুলাইতে দাদা এদিকে একটা ফ্ল্যাট নিয়েছে। আগের বাসার তুলনায় বেশ ভালই হয়েছে এখন। নন্দিতা ছোট্ট রুমাল নাকের পাশে কপালে বোলাল।

—নন্দিতা। একটু ছাড়া ছাড়া দূরমনস্ক গলায় ডাকল অনুতোষ।

—বল। নন্দিতা সামান্য বিস্ময়ে তাকাল ওর দিকে।

—আরো কয়েকটা স্টপেজ ছাড়িয়ে যদি যাও, আরো খানিকটা পরেই যদি নামো?

—মানে? নন্দিতা ভ্রূ কোঁচকালো।

—ধরো তুমি এখন বাড়ী না গিয়ে সোজা ধর্মতলা চলে গেলে। কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে তারপর আস্তে সুস্থে ফিরলে। অনুতোষ খুব সপ্রতিভ ঋজু গলায় বলতে চাইছিল।

—পাগলামি নাকি? নন্দিতা থরথরে গলায় শব্দ করে হেসে উঠল। আশপাশের দু একজন কৌতুহলে তাকাল ওর দিকে। নন্দিতা গ্রাহ্য করল না, বলল। অতখানি উলটো পথে এগোতে যাব কেন আমি।

অনুতোষ থতিয়ে গেল দুমিনিট। নিজের প্রস্তাবটা নিজের কাছেই অতঃপর অবান্তর মনে হচ্ছিল তার। মুখের রেখায় কপালের ভাঁজে মলিন ছায়া পড়ল ওর। নন্দিতা আড়চোখে দেখল একবার সেদিকে। এতদিন বাদে এত পরিবর্তনের স্তর পেরিয়েও আজো নন্দিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওর মুখের রং বদলে যায়। ভেবে আশ্চর্য হল নন্দিতা। হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেল না।

—কিছু মনে কোর না নন্দিতা তোমার অসুবিধের দিকটা আমি ভেবে দেখিনি। অনুতোষ নম্রস্বরে বলল।

—শুধু অসুবিধের কথাই না। নন্দিতা নীচু গলায় চোখ নামিয়ে বলল, কি লাভ বল, অকারণ, আমাদের দুজনের পক্ষেই, খানিকটা সময়ের অপচয় ছাড়া আর কি হবে।

—আমার কথা বাদ দাও না হয়, অনুতোষ ওর দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু তুমি কি কখনও শখ করেও উলটোপথে হাঁটো না? বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে অকারণ কিছু সময়ের অপব্যয় করো না? অনেকদিন পরে অতি চেনা কাউকে দেখলে খুশি হও না? পুরনো বন্ধুর সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাতে চাওয়াটা এমন কিছু অসঙ্গত নয় নন্দিতা।

নন্দিতার স্টপেজ পেরিয়ে যাচ্ছিল। অনুতোষের অতি সহজ করে বলা কথাগুলো তাকে কেমন অভিভূত করে বসিয়ে রেখেছিল। অনুতোষ সম্বন্ধে তার তো কোন তিক্ত অভিজ্ঞতা নেই। বরং ওর পুরনো দিনের মধুর শালীন সাহচর্যের কথা ভেবে ওর সামনে দিয়ে উঠে চলে যেতে কেমন বাধছিল। সুতরাং পেরিয়ে গেল আরো অনেকগুলি স্টপেজ। অনুতোষ চুপচাপ। ভাবলেশহীন মুখ। শেষে নন্দিতাই ব্যস্ত হয়ে তাড়া দিল,

—কি হল, পৌঁছে গেছি যে!

ঝির ঝিরে হাওয়ায় বিকেলের স্নিগ্ধতা। চারিদিকে কাঁচের মত স্বচ্ছ চকচকে আলো ছড়ানো। ইতস্তত মানুষের চলাফেরা, জটলাবাঁধা হৈ-হল্লা, সুবেশী নরনারী, শিশুদের খেলাধুলোর উদ্দাম। ফুচকা বাদাম আলুকাবলীর মাঝখান দিয়ে নরম ঘাস মাড়িয়ে মাড়িয়ে মন্থর পায়ে উদ্দেশ্যহীন চলছিল ওরা। এ সময় নৈঃশব্দ্য ভেঙে নন্দিতা প্রশ্ন করে উঠল,

—কই তোমার কথা কিছু বললে না তো?

—আমার কথা বলতে কি বোঝাচ্ছ?

—এই তোমার ঘর সংসার আর কি। কেমন আছ, কেমন কাটছে দিন, এইসব।

অনুতোষ দাঁড়িয়ে পড়ে ডান পা'টা ঝেড়ে নিল। একটা কাঁকর চটির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল বোধ হয়।

—এই বিকেল বেলাই কেমন চোখ জড়িয়ে ঘুম আসছে, নন্দিতা।

—তুমি চিরকাল ঘুমকাতুরে। নন্দিতা হেসে ফেলে বলল।

—আজকাল শাড়ীতে মেরুণ রংটা ব্যবহার কর না তুমি?

—না, ওতে বয়সের গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হয়। ভ্রূ কাঁপিয়ে উত্তর দিল নন্দিতা। মনে মনে বলল, আজকাল ও রংটা আর কেউ অর্ডার দিয়ে রাখে না আমার জন্য।

—উঃ, কি আমার বয়স্কা ভদ্রমহিলা! হু হু হাওয়ায় চুল ঝাঁকিয়ে গলা কাঁপিয়ে হেসে উঠল অনুতোষ।

—কেন নয়? একজন স্কুল মিসট্রেসের পক্ষে বয়স্কতাই ভালো।

—তা সত্যি। দিদিমণিদের কাছে আমরা সর্বদাই যেন অবাধ্য চপলমতি সর্বদোষের আধার শিশু মাত্র।

নন্দিতা হাসল। অনুতোষের স্বভাব ছিল ছেলেমানুষের মতন। নন্দিতার ধারণা হচ্ছে,

অনুতোষ এই চার সাড়ে চার বছরে তিলার্ধও বদলায়নি। এবং ওর এই রকম অপরিবর্তিত থাকাটা নন্দিতার বুকে কোথায় অজ্ঞাতে অতি সূক্ষ্মভাবে হুল ফোটাচ্ছিল।

দেখ শুধু কতটা সময় কেটে গেল। বিকেল ফুরিয়ে এল প্রায়। নন্দিতা হাত-ঘড়িটা চোখের সামনে তুলে ব্যস্ত হল।

—অথচ কত অল্পক্ষণ মনে হচ্ছে।

অনুতোষ তিল সুরে বলল, বাড়ী ফিরে গেলে এতক্ষণ কি করতে?

—কি আর, চা সিঙ্গাড়া খেয়ে বিছানায় শুয়ে গড়াতাম।

—সময় কাটতে চাইত না। অনুতোষ গম্ভীর সিদ্ধান্ত নিল।

তোমার মুণ্ডু। নন্দিতা ধমকে উঠল। অন্য দিকে মুখ ফেরাল।

অপরাহ্নের আলো ক্রমশ দ্যুতি হারিয়ে চারিদিকে বিষন্ন ছায়া ছড়াচ্ছিল। দুরন্ত হাওয়ায় গাছের শুকনো পাতা উড়ছিল। নরম কম্পিত ঘাসে নন্দিতার শ্লথগতি পা, সেখানে হাল্কা শাড়ীর পাড় লুটোপুটি করছিল।

—এসো না, আমরা এখানটায় একটু বসি, বেশ নিরিবিলি আছে আপাতত, তাই না? অনুতোষ আহ্বান জানাল।

——না, নন্দিতা ঈষৎ শক্ত গলায় বলল, এতক্ষণ বেশ তো গল্প করে কাটল, এবার ফেরা ভাল।

—আমাকে কি তোমার বাঘ-ভালুক মনে হচ্ছে? এমন করে পালাতে চাইছ? অনুতোষ ঠোঁটের কোণে হাসল, অথবা অন্য কারুর চোখে পড়ে যাবার ভয় আছে?

নন্দিতা কেমন থতিয়ে গেল ওর কথা শুনে। অনুতোষের মন্তব্যে এই মুহূর্তে মনে পড়ল বিজনের কথা। না, এ সময় এই জায়গায় বিজনের এসে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ও শনিবার রাত্রে কলকাতায় এসে পৌঁছয়, আবার সোমবার অন্ধকার ভোরে ট্রেনে চেপে চাকুরীস্থলে চলে যায়। মাঝখানে রবিবার বিকেলটুকু নন্দিতার ওর জন্যে তুলে রাখতে হয় শুধু।

—কি হল, রাগ করলে? অনুতোষ কোমল গলায় বলল, তবে চল, তোমায় গাড়ীতে তুলে দিই। তোমার ধৈর্যের ওপর আর অত্যাচার করতে চাই না।

—না, সেকথা নয়, নন্দিতা ছাড়া ছাড়া আনমনা গলায় বলল, বলছ যখন, একটু বসি না হয়।

হাওয়ার ঝাপটে অস্থির আঁচল সামলে অনুতোষের মুখোমুখি বসে পড়ল নন্দিতা। হেসে ফেলে রহস্য করে বলল,

—তুমি খুব দুঃসাহসী। দেরী করে বাড়ী ফিরলে বউয়ের বকুনি খেতে হবে না?

—না, শ্যামলীর এটা অভ্যাস আছে। আমি একবার বেরোলে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়িয়ে আড্ডা দিয়ে তবে বাড়ী ফিরি।

—ওর নাম শ্যামলী?

—আমার স্ত্রী সম্বন্ধে তোমার খুব কৌতূহল দেখছি। অনুতোষ চোখ ছোট করে ঠাট্টার সুরে বলল, আচ্ছা শোন, ওর নাম শ্যামলী, কিন্তু রঙ ফর্সা, সুশ্রী তবে ছোটখাট চেহারা, সংসারনিপুণা, সেকেন্ড ইয়ারে উঠেই বিয়ে হয়ে যাওয়ায় আর পড়াশোনা হয় নি, বয়স সাড়ে চব্বিশ।

—থামো, অত বকবক করতে বলে নি কেউ।

—দাঁড়াও, ওর দোষগুলো বলে নিই একেবারে। ভীষণ জেদী, অভিমানী, আর আমাকে দারুণ ভালবাসে।

—বাচ্চা আছে নিশ্চয়ই? নন্দিতা প্রসঙ্গটা সরাবার জন্য বলল।

—একটি মেয়ে, এগার মাসের। দারুণ চঞ্চল।

—বাঃ, নন্দিতা হাসল, তাহলে তো তুমি আপাতত প্রচণ্ড রকমের সুখী গৃহস্থ?

—যা বলো। পা ছড়িয়ে আরাম করে বসল অনুতোষ।

ক্রমশ খুব সূক্ষ্ম গতিতে সন্ধ্যার আবছায়া চারিদিকে বিছিয়ে যাচ্ছিল। দূরে-দূরে বিজ্ঞাপনের আলোগুলি কখন জ্বলে উঠে অস্তিত্ব প্রচার শুরু করে দিয়েছে। ইতস্তত গাছের নীচে ছায়া জমছে ঘন হয়ে। শুকনো ঘাসের ওপর হাওয়ায় ছেঁড়া কাগজের টুকরো, শালপাতা ইত্যাদি উড়ে বেড়াচ্ছে। খানিক দূরে কতগুলি কমবয়সী মেয়ের হৈ-হুল্লা করে চলে যাওয়া দেখতে-দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল নন্দিতা। ওর ক্লাশের মেয়েগুলির কথা মনে পড়ল, তারপর বিজনের কথা। বিজন তার মাকে কিছুতেই রাজী করাতে পারছে না নন্দিতার ব্যাপারে। বিজন বলে, মা এত রাগী যে এসব বিষয়ে কোন প্রস্তাব আদৌ তুলতে দিতে চায় না। এসব শুনে নন্দিতার কেমন খেলো লাগে নিজেকে। বিজনের দোটানায় পড়া ছটফটানি দেখে মাঝে-মধ্যে দারুণ হাসি পায়। অথচ বিজনকে বলতে পারে না কিছুই। ওকে বাধাও দিতে পারে না। বস্তুত বিজনের ইচ্ছের ওপর নন্দিতা কোন জোর খাটাতে পারে না। এরকম বাধ্য-বাধকতায় বন্দীর মত অবস্থার জন্য নিজের ওপরই রাগ করে নন্দিতা। আপন আত্মার দহনে কখন কখন জ্বলতে থাকে তার ভেতরটা। যেমন এই মুহূর্তে জ্বলছে নন্দিতা। অনুতোষের ছোট্ট প্রিয় সংসারের গল্প শুনে কিনা কে জানে।

—কি ভাবছ, অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল?

—না, তা নয়, নন্দিতা সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করল, তবে মা হয়ত চিন্তা করবেন। ঐ একটিমাত্র লোকই তো আছে আমার জন্যে চিন্তা করবার। শেষের দিকে ওর গলাটা অজ্ঞাতেই ভারী হয়ে এল এবং তৎক্ষণাৎ নিজেকে তিরস্কৃত করল সে। অনিচ্ছাকৃতভাবে অনুতোষের কাছে নিজের মানসিক দৈন্য প্রকাশ করে ফেলার জন্য।

—দাদা-বউদির কাছেই আছ তো? অনুতোষ ঘরোয়া প্রশ্ন করল।

—হ্যাঁ তা আছি। এবং সেজন্যই চাকরী করে অস্তিত্বটাকে সচল রাখতে হচ্ছে। তুমি কষ্টের কথা বলছিলে না? ওটুকু গায়ে লাগে না। জানো, কখন মনে হয় এই চাকরীটা না থাকলে পরের সংসারে টিঁকে থাকাটা বিড়ম্বনা হয়ে উঠত। নিজেকে দমিয়ে রাখবে ভেবেও আবেগের স্রোতকে ঠেকাতে পারল না নন্দিতা। এমনিতেই একটু অন্তর্মুখী ও। বন্ধুবান্ধব বিশেষ নেই, সেকারণ মনের দিকটা কাউকে খুলে দেখাতেও পারে না। আজকে এতকাল পরে অনুতোষের সঙ্গে দেখা হল। একদা অনুতোষের কাছে ওর কোন কিছুই অব্যক্ত ছিল না। তারপর এত দিন এত ঘটনার উত্থান-পতন হয়েছে। অভ্যাস ও মানসিকতারও পরিবর্তন হয়েছে যথেষ্ট, তবু আজ এই মুহূর্তে অনুতোষকে দূরের ভাবতে পারছে না নন্দিতা। এই ঘনায়মান সন্ধ্যার নির্জন আবছায়ায় ওর কাছে
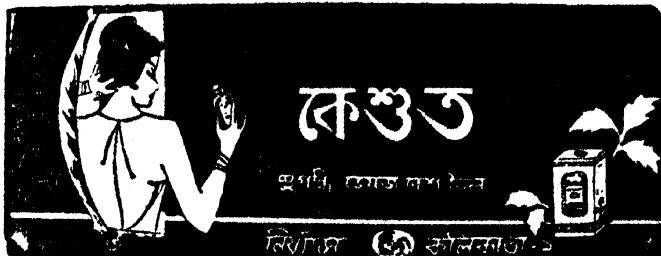
নিজের সমস্ত অপূর্ণতাকে মেলে ধরতে ইচ্ছে করছে।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করব? অনুতোষ ইতস্তত করে খুব মৃদু গলায় বলল। নন্দিতা জানে অনুতোষ কি প্রশ্ন করবে তবু হাল্কা হাওয়ার মত স্বরে বলল,—বল।

—তুমি বিয়ে কর নি কেন?

অস্ফুট আলোয় ওর মুখের দিকে দেখল নন্দিতা। কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। বিয়ের প্রসংগে অনিবার্যভাবে বিজনের কথা মনে পড়ল। বিজন ওকে কথা দিয়ে রেখেছে। অথচ বিজন তার মাকে কিছুতেই রাজী করাতে পারছে না। এরকমভাবে নন্দিতার দিন কোথায় গড়িয়ে যাবে কেউ জানে না।

—উত্তর দিচ্ছ না কেন, নন্দিতা?

এত হুহু হাওয়াতেও নন্দিতার শরীর ঘর্মাক্ত লাগছিল। কানের পাশটায় কেমন ঝাঁঝালো উত্তাপ। মুখ নামিয়ে আঙুলে দিয়ে ঘাসের বুকে বিলি কাটতে-কাটতে খুব সূক্ষ্ম, প্রায় অশ্রুত গলায় বলে উঠল নন্দিতা,—করি নি, মানে হয়ে ওঠে নি।

ওর গলায় কি ছিল, অনুতোষ আর কিছু প্রশ্ন করল না, আঙুলগুলো অনাবশ্যক মটকালো তারপর হাতের তেলোয় মাথা রেখে চিত হয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। বিছিয়ে-আসা অন্ধকারে দূরের মিটমিটে আলোগুলি ক্ষীণ রশ্মি ছড়াচ্ছে। এলোমেলো হাওয়া শরীরের ওপর দমকা লুটোপুটি খেয়ে যাচ্ছে। কাদের উচ্চকিত হাসি ঘন ছায়াকে কাঁপিয়ে দিয়ে দূরে মিলিয়ে গেল। এখানটা নিরিবিলি বলে সম্ভবত ইতস্তত দু-তিনটি করে মানুষের দল আলাপ গুঞ্জন শুরু করেছে, মনে হয় সারা মাঠ জুড়ে ছোট-ছোট ফুলের গুচ্ছ ফুটে উঠেছে। বিজন আবার এমনি নির্জন অন্ধকারে বসে গল্প করা পছন্দ করে না। ওর চরিত্রটা একেবারেই আবেগ আশ্রিত নয়। গতি ছাড়া আর কিছু ও ভালবাসে না। সেজন্য রবিবার সন্ধ্যায় কয়েকটি ঘণ্টা ঝড়ের মত ট্যাক্সিতে ঘোরে ও। জনবহুল রেস্টুরেন্টে খাটো পর্দার আড়ালে অনর্গল বকবক করতে-করতে আকণ্ঠ আহার করে, নন্দিতাকেও খেতে বাধ্য করে। কখনো রোমহর্ষক ইংরেজী ছবির হলে উত্তেজনায় নন্দিতার নরম হাতের আঙুলগুলিকে পিষে ফেলে। বস্তুত নন্দিতা ওর এই রকম ইচ্ছে-তাড়িত, ওপচানো বুদ্বুদ স্বভাবের জন্য মাঝে-মাঝে শঙ্কিত হয়। নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে। নন্দিতাকে ও বিয়ে করবেই, লক্ষ্যকে ও কখনো ব্যর্থ হতে দেয় না, এরকম আশ্বাস নন্দিতাকে বিজন দিয়ে রেখেছে। শুধু নন্দিতাকে নয়, ওর মা দাদা বৌদি সকলকে। অতএব সংসারের সবাই নন্দিতার সেই অনাগত ভবিষ্যতের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছে। সাগ্রহে ও সানন্দে। এবং অনিবার্যভাবে প্রতিমুহূর্তে বিজনের দিকে আরো বেশী করে ঠেলে দিচ্ছে নন্দিতাকে। কথায় কাজে ব্যবহারে, এবং সেই প্রশ্রয়ে বিজন—হঠাৎ উসখুস করে সোজা হয়ে বসল নন্দিতা, কপালের ওপর থেকে উড়ো চুল সরাল, মন থেকে তাড়াতে চাইল আগাতভাবনাগুলিকে।

—নন্দিতা। অনুতোষ গম্ভীর দূরাগত গলায় ডাকল।

—বল। নন্দিতা হাওয়ার স্বরে কণ্ঠ মিলিয়ে দিল।

অনুতোষ সামান্যক্ষণ চুপচাপ রইল। কনুয়ে ভর দিয়ে উঠে সিগারেট ধরিয়ে শুল আবার। তারপর একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে বলল,—তুমি কি আর কাউকে ভালবাসতে পার নি?

একটা নিশ্বাস বুকের মাঝখানে আটকে রাখল নন্দিতা। ওর বিড়ম্বনার জন্য নিজেকে দায়ী করছে অনুতোষ। অথচ সত্যিই এখন আর ওর জন্যে বুকের মধ্যে শূন্যতাবোধ সৃষ্টি হয় কি? একটা অদ্ভুত রহস্যকে নিজের ভেতর হাতড়ে দেখতে চাইল নন্দিতা। অনুতোষের প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে এখন বিজনের প্রসংগ তুলতে হয়। কিন্তু বিজনকে প্রকৃত ভালবাসে কি-না তাই সঠিক বোঝে না নন্দিতা। বস্তুত ভালবাসার ধারণাটাই তার কাছে কেমন ধোঁয়াটে অবাস্তব আর গোলমেলে লাগে। ও শুধু বোঝে বিজনকে তার ভাল লাগা দরকার। বিজনের সবকিছুকেই স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ করা দরকার। কারণ বিজন তাকে, তার পরিবারকে খুশী করার জন্য অকাতর অর্থ ব্যয় করে। দাদার সংসারে যাতে সম্মানের সংগে থাকতে পারে, সেই কারণে নন্দিতাকে কষ্ট করে ভাল একটা স্কুলের চাকরী জোগাড় করে দিয়েছে। এবং তাকে বিয়ে করবার নিশ্চিত আশ্বাস দিয়ে রেখেছে। শুধু তার মায়ের অনুমতিটুকু যা অপেক্ষা।

—এত কি ভাবছ নন্দিতা? অনুতোষ বিষণ্ণ গলায় প্রশ্ন করল। ওর আঙুলগুলি সম্ভবত নন্দিতার আঙুলে স্পর্শ করেই মুহূর্তে সংকুচিত হয়ে সরে গেল।

—কিছু না, নন্দিতা মাথা নেড়ে বলে উঠল।

দুজন ফেরিওলা হেঁকে গেল কাছ দিয়ে। দুটি অল্পবয়সী ছেলে কাছাকাছিই ট্রানজিস্টর খুলে বসেছে। এদের দিকে তির্যক তাকাল দুবার। নন্দিতার ইচ্ছে হল চীৎকার করে বলে, তুমি একদিন আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলে, আমি বলেছিলাম, এক্ষুণি ওসব নয়, পারো তো অপেক্ষা করো। সেই অভিমানে তুমি দূরে সরে গেলে, আর কোনদিন কাছে এলে না। নিজের ভিন্ন পথ তৈরী করে নিলে। আর

একজন, দ্যাখো, শুধুমাত্র আশ্বাসটুকু দিয়েই কি রকম টেনে নিয়েছে আমায়। পাকে পাকে জড়িয়ে নিপুণ দস্যুর মতন আমার সব সম্বল নিঃশেষে লুঠে করে নিচ্ছে। বলতে ইচ্ছে হল, কিন্তু বলল না নন্দিতা। নির্জনের কথা অনুতোষের কাছে বলতে পারল না। শুধু চেয়ে চেয়ে দেখল ওর কত কাছে অনুতোষ, অস্বচ্ছ অন্ধকারে ওর শায়িত শরীরের রেখা, ওর নিজের একদা প্রিয় পরিচিত ভঙ্গি। অথচ অনুতোষ এখন কত দূরে। সুদূরে।

বুকের ভেতর কান্নার ঢেউ জমাট, অথচ অনুতোষের কাছে হারতে ইচ্ছে করছে না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নিজেকে দমন করেছিল নন্দিতা, এসময় অনুতোষ বলে উঠল,—চল নন্দিতা, এবার ওঠা যাক।

তাই ভাল। অনুতোষ এবার তার প্রেম ভালবাসা ও বাৎসল্যের কুলায় ফিরে যাক। ক্ষণিক আবেগের বিলাসিতার খেলা শেষ করে ও অতঃপর প্রিয় উত্তপ্ত-সান্নিধ্যে আশ্রয় নেবে। নরম শিশুকণ্ঠ ওর সমস্ত পুরনো স্মৃতিকে ধুলোর মত ছড়িয়ে দেবে নিজেদের একান্ত সীমানার বাইরে। নন্দিতা একা থাক তার সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব সমস্যা ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার বিড়ম্বনা নিয়ে। শুধু বাড়ী ফেরার আগে পর্যন্ত বুকের জমাট পাথরটাকে ও একবিন্দুও গলতে দেবে না, একটুও না।

সখি সমিতি

শৈলেন কুমার দত্ত

স্বর্ণকুমারী দেবীকে আমরা আজ প্রায় ভুলতে বসেছি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অত্যুগ্র আলোতে তাঁর প্রতিভা যেন ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অথচ বাঙালী মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম উপন্যাস ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে কিছুদিন 'ভারতী'র সম্পাদনাভারও পরিচালনা করেন।

গদ্যে ও পদ্যে স্বচ্ছন্দ গতি ছাড়াও বাঙালী মহিলাদের স্বাধীন চিন্তাবিকাশের জন্যও তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। তাই নারীর ভবিষ্যৎ এবং দেশের হিতের জন্যে নারীর সাহায্য কিভাবে প্রসারিত করা যায় —এই উদ্দেশ্যেই তিনি ১২৯৩ বঙ্গাব্দে সখিসমিতি নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির কর্মপদ্ধতি এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। স্বর্ণকুমারী দেবী নিজেই এই সমিতির সম্পাদিকা হন। সেযুগে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা এবং প্রতিষ্ঠা বড় সহজ ছিল না!

স্বর্ণকুমারী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা সরলা দেবী তাঁর 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থের এক স্থানে লিখেছেন—'মাদাম ব্লভাটস্কির (১৮৩১—৯১) প্রতি শ্রদ্ধায় যখন মান্দ্রাজ মণ্ডলে থিয়সফির দল ভঙ্গ হল, তখন থিয়সফির সূত্রেই যাঁদের সঙ্গে পরিচয় আরম্ভ হয়েছিল, সেইসব মহিলাদের নিয়ে 'সখিসমিতি' নাম দিয়ে মা একটি সমিতি স্থাপন করলেন।' সমিতির সখি-সমিতি নামটি দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

প্রতিষ্ঠার দু' বছর পর সমিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়—'সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের পরস্পর সম্মিলন দ্বারা যাহাতে তাঁহাদের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হয় ও তাঁহারা দেশহিতকর কার্যে যত্নবতী হয়েন, এই অভিপ্রায়ে প্রায় তিন বৎসর হইল—কলিকাতায় সখিসমিতি নামক একটি মহিলা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।'

অল্প সময়ের মধ্যেই সমিতিটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মহারানী স্বর্ণময়ী সমিতিকে ১০২৫ টাকা দান করেন। ধীরে ধীরে জনসমর্থনও বাড়তে থাকে।

সমিতির কর্মধারাও নানাদিকে প্রসারিত হতে থাকে। কুমারী ও বিপন্না বিধবাদের অর্থসাহায্য দিয়ে পড়ানো, তারপর অন্তঃপুরে মহিলাদের জন্য তাঁদের শিক্ষয়িত্রী হিসেবে নিয়োগ করা, মফস্বলে লাঞ্ছিতা-ধর্ষিতা নারীদের জন্য মামলা-মোকদ্দমা চালানো, গ্রামাঞ্চল থেকে শিল্প-সংগ্রহ করে মেলার আয়োজন করা, মেয়েদের জন্য অভিনয় আয়োজন করা—প্রায় সবদিকেই সখিসমিতি একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে ওঠে।

প্রতিষ্ঠার দু' বছর পরে 'ভারতী' ও 'বালকে' (পৌষ ১২৯৫) সমিতির একটি

প্রসন্নময়ী দেবী

স্বর্ণকুমারী দেবী

বিবরণী প্রকাশিত হয়, তাতে সমিতির সমস্ত উদ্দেশ্য বিবৃত করা হয়—

'অসহায় বঙ্গবিধবা ও অনাথা বঙ্গকন্যাগণকে সাহায্য করা এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য।

'আবশ্যক অনুসারে দুই উপায়ে এই সাহায্য দান হইবে। বিধবাই হউন আর কুমারীই হউন যিনি নিরাশ্রিত, যাহার কেহ নাই, বা যাহার অভিভাবকেরা নিতান্ত সঙ্গতিহীন, তাহাদের অভিভাবকদের সম্মতিক্রমে সখিসমিতি কোন কোন স্থানে তাহাদের ভার লইতে প্রস্তুত, কোন কোন স্থলে সাধ্যানুসারে অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

"যে সকল অল্পবয়স্ক অনাথ বিধবা বা কুমারীগণের ভার সখিসমিতি গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করা সখিসমিতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। শিক্ষিত হইয়া যখন এই বালিকাগণ অন্তঃপুরের শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত হইবেন, তখন সমিতি ইহাদিগকে বেতন দান করিবে। ইহা দ্বারা দুইটি কাজ একসঙ্গে সাধিত হইবে। অনাথা ও বিধবা বঙ্গসন্তানগণ হিন্দু ধর্মানুমোদিত পরোপকার কার্যে জীবন দিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিবেন, আর দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের একটি প্রকৃত পথ মুক্ত হইবে।"

কিছুদিন পরে সমিতির একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা হয়। সেকালের প্রতিটি সম্ভ্রান্ত এবং প্রগতিশীলা মহিলা এই সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পত্নী মৃণালিনী দেবী ও দ্বিজেন্দ্রলালের পত্নী সুরবালাও এই

সমিতির কার্যকরী সদস্যা ছিলেন। ১২৯৮ বংগাব্দে সমিতির সখিগণের যে তালিকা প্রস্তুত করা হয় তাতে ছিলেন—

শ্রীমতী স্বর্ণলতা ঘোষ, শ্রীমতী বরদা-সুন্দরী ঘোষ, শ্রীমতী লতিকা রায়, শ্রীমতী মনোমোহিনী দত্ত, শ্রীমতী সৌদামিনী গুপ্তা শ্রীমতী থাকমণি মল্লিক, শ্রীমতী সরলা রায়, শ্রীমতী প্রসন্নতারা গুপ্তা, শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী, শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী, শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাস, শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু, শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী, শ্রীমতী বিধুমুখী রায়, শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী, শ্রীমতী সুরবালা দেবী ও শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী—সম্পাদিকা। মোটামুটিভাবে স্বর্ণকুমারী দেবীই সব দেখাশোনা করতেন, তাঁর এ ব্যাপারে ডান হাত ছিলেন জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরন্ময়ী দেবী।

চাঁদা বা সাহায্য নিয়ে সমিতি চালানোর পর কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য করেন যে, সমিতিকে এভাবে চালানো যাবে না। তখন তাঁরা 'মহিলা শিল্পমেলা' নামে একটি মেলা শুরু করেন। ১২৯৫ বংগাব্দে ১৫ই পৌষ কলকাতা বেথুন স্কুল প্রাঙ্গণে প্রথম মেলার উদ্বোধন হয়। মেলার দ্বার উন্মোচন করেন তদানীন্তন ছোটলাট বেলীর (Bailley) পত্নী লেডী ল্যান্সডাউনও মেলা পরিদর্শন করতে আসেন। মেলার নানা জিনিষের স্টল করা হয়। এই মেলার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, ক্রেতা ও বিক্রেতা সকলেই ছিলেন মহিলা।

এই উপলক্ষ্যে একটি নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করা হয়। অনুরুদ্ধ হয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা' নাটকটি রচনা করেন। মায়ার খেলা নাটকের প্রথম অভিনয় হয় এই মেলাতেই। মায়ার খেলার প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"সখী সমিতির মহিলা শিল্প মেলায় অভিনীত হইবার উপলক্ষ্যে এই গ্রন্থ উক্ত সমিতি কর্তৃক মুদ্রিত হইল। ইহাতে সমস্তই কেবল গান, পাঠোপযোগী কবিতা অতি অল্প। মাননীয়া শ্রীমতী সরলা রায়ের অনুরোধে এই নাট্য রচিত হয় এবং তাঁহাকেই সাদর উপহার স্বরূপে সমর্পণ করিলাম।" গ্রন্থটির উপ-স্বত্বও কবি সমিতিকে দান করেন।

মায়ার খেলা নাটকটি সমিতির জন্য রচিত বলেই সম্ভবত নাটকে বেশিরভাগই

সরলা দেবী

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

নারী চরিত্র এবং যে কয়টি পুরুষ চরিত্র আছে, সেগুলিও এত নিরীহ প্রকৃতির যে নারীরা সহজেই অভিনয় করতে পারবেন। শিল্পমেলায় মায়ার খেলা নাটকে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের সকলেই ছিলেন মহিলা। বাংলাদেশে মহিলাদের মঞ্চাভিনয় সেই প্রথম। সমিতির একজন সখী শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী পরবর্তীকালে এ অভিনয় স্মরণ করে লেখেন—'বেথুনে (কলেজে) প্রথম উদ্ঘাটিত শিল্পমেলায় সেদিন মহিলাগণ কর্তৃক 'মায়ার খেলা' অভিনয় হয়, এবং মেয়েরা পুরুষদের মত সম্মুখে গ্যালারিতে বসিয়া সে অভিনয় দর্শন করেন, সে কি এক নূতন আমোদ সকলে অনুভব করিয়াছিলেন।' (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩)

সমিতির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি এবং উন্নতিকে রক্ষণশীল শ্রেণীর কিছু ব্যক্তি কিন্তু সহ্য করতে পারেন নি। সমিতির নামে তাঁরা নানা অপপ্রচার শুরু করেন। শেষপর্যন্ত ধর্মের দোহাই দিয়ে প্রচার শুরু হয়। এটিও যে ব্রাহ্মসমাজের একটি অংশ এবং সমিতির মূল উদ্দেশ্য যে খিড়কি পথে ধর্মান্তর করানো—এ প্রচার অভিযানও শুরু হয়। সমিতির পক্ষ থেকেও এ নিন্দার প্রতিবাদ করা হয়।

পৌষ ১২৯৫ সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে' সমিতি ঘোষণা করেন—'কেহ কেহ সখিসমিতিকে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের সমিতি বলিতে চাহেন। ইহার অনেক সখী ব্রাহ্ম ইহা অস্বীকার করি না ; কিন্তু হিন্দুসখীরও ইহাতে অভাব নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহার সংগে সাম্প্রদায়িকতার কোন যোগ নাই। দেশের সম্ভ্রান্ত মহিলা মাত্রেই ইহাতে যোগদান করিতে পারেন এবং করিয়াছেন। সখি-সমিতি একটি বৈজ্ঞানিক সম্মিলনী নহে—একটি সামাজিক নিমন্ত্রক সম্মিলনী। ইহার উদ্দেশ্যেই মেলামেশা, গল্পস্বল্প প্রভৃতি নির্দোষ আমোদ প্রমোদের সংগে সংগে জ্ঞানলাভ করা।'

কিন্তু এত করেও সমিতিকে দীর্ঘজীবী করা সম্ভব হল না। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই সমিতি বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হবার পর ১৯০৬ সালে পুরোনো স্মৃতিকে সজীবিত রাখার চেষ্টায় স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরন্ময়ী দেবী আবার বিধবা শিল্পাশ্রম খোলেন। সরলা দেবীর ভাষায় "মাতার কীর্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে সখি-সমিতিকে কালোপযোগী রূপান্তর দেওয়ার প্রচেষ্টায় বিধবা শিল্পাশ্রমের জন্ম।" এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্যে গঠিত হয় সখী-শিল্প-সমিতি। এই প্রতিষ্ঠানটি অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়। স্বর্ণকুমারী দেবীও সভানেত্রী হিসেবে দীর্ঘদিন এই শিল্পাশ্রমের সংগে যুক্ত ছিলেন।...১৯৩১ সালে তিনি তাঁর যাবতীয় পুস্তকের স্বত্ব দান করেন এই সমিতিকে। সখি-সমিতির স্মৃতি হয়তো তিনি সারাজীবনই ভুলতে পারেননি।

সখি-সমিতি আজ আর নেই, ইতিহাসের কোন্ অতল গর্ভে হয়তো বা বিলীন হয়ে গেছে! কিন্তু নারীর শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং প্রগতির যে ধ্বজা সে তুলে গেছে, সেটি আজও অম্লান। সেদিনের সেই বীজই আজ বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়ে চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। সেখানেই তার সফলতা।

অঙ্গনা

সম্প্রতি ভারতীয় মহিলাদের এক প্রতিনিধিদল গিয়েছিলেন সোভিয়েত ভ্রমণে। এখানে তাঁদের কয়েকজন সোভিয়েত মহিলার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

সুখের সন্ধানে

সুখের সংসার গড়তে চায় সবাই। বিশেষভাবে, বিবাহিত জীবনে সুখ-শান্তি প্রত্যাশা সকলের। সংসার করার আর এক উদ্দেশ্যই হলো শান্তির নীড় রচনা করা। সংসার-সমরাঙ্গনে প্রাণপণে যুদ্ধ করার পেছনে এই শান্তির প্রতিশ্রুতিটুকু না থাকলে সবটাই বুঝি নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতো। মানুষ লড়াই করতে পারতো না, লড়াই করার উৎসাহও হারিয়ে ফেলতো। বাইরে অশান্তির তুফানে সারাদিন জ্বলে-পুড়ে মরতে হয়। হাজারো ঝক্কি-ঝামেলায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। তবু ঘরে ফেরার মধ্যে থাকে একটা শান্তির প্রত্যাশা। আর তখন সেটুকু প্রাপ্তি যেন সাহারাকে চেরাপুঞ্জীর একখানা মেঘ ধার দেওয়ার সামিল। কিছু-ক্ষণের জন্য সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়। নতুন উদ্যমে আবার লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। বাইরে অশান্তির ঝাপটা পুইয়ে ঘরে ফিরেও আবার যদি সেই অশান্তির কবলে পড়তে হয় তবে বেঁচে থাকাই একটা সমস্যা হয়ে ওঠে। একে তো দিনকে দিন জীবন জটিল আকার ধারণ করছে। হাজারো সমস্যার তীব্র আক্রমণে সবসময় ব্যতিব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। অবশ্য এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান সম্ভব। ক্রমাগত প্রচেষ্টায় এর বিহিত হয়তো সম্ভব। কিন্তু শান্তির প্রত্যাশায় সবদিক থেকেই যদি বঞ্চিত হওয়া যায় তবে আর লড়াইয়ের স্পৃহা থাকে না। তাছাড়া বাইরের সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াই চালানো যত সহজ পারিবারিক শান্তির জন্য লড়াই চালানো তত নয় এবং সম্ভবও নয়। শান্তি যেখানে প্রত্যাশিত সেখানে লড়াইটাও কেমন বেমানান। তাই লড়াই করে সবকিছু সম্ভব হলেও এখানে সে জিনিসটা তেমন জোরদার নয়। পারিবারিক শান্তি নির্ভর করে পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর। পারস্পরিক বোঝাপড়া যত সহজ হবে পারি-বারিক শান্তিও ততই দৃঢ়মূল এবং স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ হবে।

যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর ভিত্তি করে সুখের সংসার গড়ে উঠতে পারে সেখানেই কিন্তু যত গোলমাল। গোড়ায় গলদ যার তা তাদের ঘরের মতোই যে কোন সময় হুড়মুড়িয়ে পড়তে পারে। বাস্তবে হয়ও তাই। কিছুদিন আগেই এরকম একটা ঘটনার মুখে পড়তে হয়েছিল আমাকে। অনেকদিন পর এক বন্ধুর বাড়িতে গেছি। সেই কবেকার বন্ধু। কলেজে পড়ার পর ছাড়াছাড়ি। মাঝে চলতি রাস্তায় দু-একবার দেখা হয়েছে। দু-এক মিনিট দাঁড়িয়ে কথা-বার্তা হয়েছে। সেখান থেকেই জানতে পেরেছি ও বিয়ে করেছে। এবং আমাদেরই এক সহপাঠীকে। ওদের দুজনকে অনেকদিন এক সঙ্গে দেখেছি। কিন্তু তখনো ভাবিনি যে, ওদের এই পরিচয় পাকাপাকি হবে। খবরটা পেয়ে খুশিই হলাম। কথাও দিলাম যে একদিন ওদের বাড়িতে যাব। ঠিকানার দরকার ছিল না। দুটো বাড়িই আমার চেনা। এবং এখন কোন বাড়িতে যেতে হবে সে তো বলাই বাহুল্য। যাব যাব করে ঠিক সময় হয়ে ওঠে না। ইতিমধ্যে অনেক-দিন কেটে গেছে। একদিন গিয়ে পড়লাম বন্ধুর বাড়িতে। নিচেই খবর পেলাম ওরা দুজনে নেই। এর বেশি খবর জানবার জন্য ওপরে চলে গেলাম। দেখা হলো বন্ধুর শাশুড়ীর সঙ্গে। তিনি তো আমাকে দেখে খুব খুশি। জোর করে বসালেন। নানা কথা জিগ্যেস করলেন। ওদের কথা উঠতেই তিনি কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। পরে কথায় কথায় জানালেন যে, যদিও দুজন দুজনকে অনেকদিন জেনে-শুনেই ওরা বিয়ে করেছিল কিন্তু এখন আর ঠিক বনিবনা হচ্ছে না। একই বাড়িতে ওরা আলাদা থাকছে। এদিকে একটা ছেলে হয়েছে। ভাবলাম, বাচ্চাকে কেন্দ্র করে এবার হয়তো মিটমাট হয়েও যেতে পারে। কিন্তু শাশুড়ির আর্তস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, মিটমাট তো হলোই না উপরন্তু বাচ্চাটা নিয়ে এক সমস্যা। কারণ, ওরা দুজনে আর এক বাড়িতেও থাকতে পারছে না। বৌমা এবার ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে উঠে যাবে। বাচ্চাকে কেউ নিতে চাইছে না। এদিকে আমার পরমায়ুর সলতেও তো কমতির মুখে।

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে তিনি একটু থামলেন। আমার সব ভাবনাচিন্তা ইতিমধ্যে কেমন তালগোল পাকিয়ে গেছে। এলাম বন্ধুর বাড়িতে। হৈ-হৈ করে কাটিয়ে যাব। তা নয়, কেমন বিষাদ ভারাক্রান্ত অবস্থা। কোনরকমে ওঠার চেষ্টা করতেই তিনি বলে উঠলেন, এরকমটা কেন হলো বলতে পার? একি কারো কোন অভিশাপ। আমরাও তো বিয়ের পর এতোদিন ঘর-সংসার করছি কিন্তু কখনো এরকম কিছু তো হয়নি। কথাগুলো কান পেতে শুনলাম। দেবার মতো উত্তর জানা ছিল না। তাই হাসি-খুশির বদলে মলিন মুখ বন্ধুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম।

আজকের দিনের এই এক সমস্যা। বিয়ের পর কিছুদিন যেতে না যেতেই আর বনিবনা হয় না। একজন আর এক-জনকে বরদাস্ত করতে পারে না। অথচ এসব ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের প্রায় অনেকেই হৃদয় ঘটিত বিবাহে আবদ্ধ হয়। ওদের প্রাথমিক পরিচয়-এর ঘোর কাটাতেই অনেক-দিন লেগে যায়। এভাবে এক-একটা অ্যাফেয়ার চলে দীর্ঘদিন। অনেক কেটেও যায়। যে কয়টা টি'কে গেলো সেগুলো স্বাভাবিক পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছায়। কিন্তু স্বল্প পরিচয়ে কোন তরফ থেকেই বিয়ের প্রস্তাব ওঠে না আর উঠলেও তা এক পক্ষ না এক পক্ষ থেকে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। তাই দুজনকেই অপেক্ষা করতে হয়। ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। ততদিনে মন দেওয়া-নেওয়া আর সেই ফাঁকে পরস্পরকে জানা। এমনিভাবে এসে উপস্থিত হয় সেই পরম লগ্ন। ওরা দুজনে এবার সুখের সংসার গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলে।

এতোদিন পর্যন্ত বিয়েটাই ছিল স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু হাওয়া যেদিকে বইছে তাতে এখানে ইতি বলে চুপচাপ থাকার উপায় নেই। বিয়ের পরও এখন তাই ভাবতে হয় যে, সত্যি ওরা সুখের সংসার গড়ে তুলতে পারবে না সব স্বপ্ন দেখা ওদের অকাল মৃত্যু বরণ করে নেবে। এই প্রশ্নটাই বিশেষভাবে ভাবিয়ে তোলে। কারণ, দিন-কালের হালচাল যেভাবে বদলাচ্ছে তাতে বিয়েকে আর স্বাভাবিক পরিণতি বলা চলে না। অবশ্য ঘটনাক্রম নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক। বিয়ের পর পারস্পরিক বোঝা-পড়ার অভাবে স্বতন্ত্র বোধহয় এখনকার স্বাভাবিক পরিণতি। যেখানে এটা প্রায় স্বাভাবিক সুখের সংসার-এর স্বপ্ন দেখা সেখানে বাতুলতা মাত্র।

আমাদের মা-মাসি বা তারও আগে কিন্তু এরকমটা হতো না। যেমন এই বন্ধুর মা বলছিলেন যে ও'দের সময়তো এমনটা হয়নি। সেদিন জীবন ছিল অনেক সহজ এবং স্বচ্ছন্দ। ছেলেমেয়েদের আজকের মতো অবাধ মেলামেশার কোন সুযোগই ছিল না। বিয়ের দায়দায়িত্ব ছিল পুরো-পুরি অভিভাবকদের। সেখানে নিজের জারি-জুড়ি খাটানোর কোন উপায় ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশার সুযোগও ছিল সীমিত। নিশুতি রাত ছাড়া সারাদিনে স্বামী-স্ত্রীর দেখা সাক্ষাৎ খুব কমই হতো। এই অবস্থায় পারস্পরিক বোঝাপড়ার চেয়েও যে জিনিসটা বড়ো ছিল তা হলো স্বামীর উপর স্ত্রীর নির্ভরতা। এছাড়া সেদিন কোন উপায় ছিল না। কারণ, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার তখনো ব্যাপক হয়নি। চাকরি-বাকরির দূরের কথা মেয়েদের রাস্তায় বেরোন ছিল একরকম নিষিদ্ধ। অসূর্যম্পশ্যা এসব মহিলারা কোথা যেতে হলে পালকি করেই চলাফেরা করতেন। আর যাঁদের সে সংগতি ছিল না তাঁরা বুক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে রাস্তা পার হতেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের গঙ্গাচ্চানের সাধ মেটানো হয়েছে পাল্কীশুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে, এমন ঘটনাও ঘটেছে। তাই সেদিন একপক্ষের উপর অপরপক্ষের ছিল অকপট নির্ভরতা। এতে ফল যে সর্বত্র ভাল হয়েছে তা নয় কিন্তু সেদিন সংসারে সুখ ছিল। বাইরেও অশান্তি এতো তীব্র ছিল না। ঘরে বাইরে এমন সুখের জন্য হা-হুতোশ করতে হতো না।

সেদিন তো এখন আর নেই। সকলের সমান অধিকারের যুগ এটা। নারী-পুরুষে কোন ভেদাভেদ নেই, সবাই শিক্ষায় সুযোগ পাচ্ছে। চাকরি-বাকরির পথ আজ নির্বিঘ্ন। কেউ কারো মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে রাজী নয়। এ প্রশ্নটি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে এক বিরাট ভূমিকা নিচ্ছে। এতোদিন ছিল এক-জনের উপর আর একজনের নির্ভরতা। আজ আর তার প্রয়োজন নেই। সবাই নিজেব নিজের রাস্তা খুঁজে নিতে জানে। এই স্বনির্ভর মনোভাব থেকেই সম্ভবত অশান্তির সূত্রপাত। স্বামী-স্ত্রীর তোয়াক্কা করে না এবং স্ত্রী স্বামীর তোয়াক্কা করে না। এমনি একটা সম্পর্ক রাখতে হয় তাই চলছে। কেউ কাউকে বুঝতে চেষ্টা করে না। একে অপরের জন্য একটুও ছাড়তে রাজী নয়। সবাই নিজের নিজের পাওনা গণ্ডা আদায় করতে ব্যস্ত। সেখানে ঘাটতি পড়লেই অশান্তি চড়চড়িয়ে ওঠে। ক্রমে তা হয়ে ওঠে বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার মতো।

তবু ঘর বেঁধে আমরা সুখের প্রত্যাশা করি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রত্যাশিত শান্তির স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। যে বিরাট প্রত্যাশা এবং সোনালি স্বপ্নের তন্দ্রালু পরিবেশে মগ্ন থেকে নীড় রচনা করা হলো তা ভেঙ্গেচুরে খানখান হয়ে যায়। পরিবর্তে থাকে কতগুলো ছুঁচলো কাঁচের টুকরা যা কিনা প্রতি মুহূর্তে পরস্পরকে বিদ্ধ করে। তীব্র যন্ত্রণায় দুজনেই বিদ্ধ হয়। কিন্তু নিষ্কৃতির পথ পায় না। অথচ পথের সন্ধান জানা আছে দু'জনেরই। কেউ ওপথে হাঁটতে রাজী নয়। এছাড়া নিষ্কৃতির কোন পথই নেই।

একদিন ছিল, একান্নবর্তী পরিবারে বাস করা অনেকের পক্ষে অসম্ভবই এমনি চাপ সৃষ্টি হতে হতে একান্নবর্তী পরিবার ক্রমেই ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। সেদিনও প্রশ্ন ছিল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার। কেউ কেউ একান্নবর্তী পরিবারের পক্ষে যুক্তিসহ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁকে হাস্যাস্পদ হতে হয়েছে। অগ্রগামীর দল ঘোষণা করেছেন, বাপ-পিতামহ যা করেছেন চিরকাল তাই মানতে হবে এমন কোন কথা নেই। বিশেষ, দিনকাল বদলাচ্ছে। এরপর সবাই পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে আলাদা আলাদা পরিবার হলো। কিন্তু যে শান্তির আশায় এই পৃথকীকরণ তার তো সন্ধান পাওয়া গেল না। শান্তির বদলে অশান্তিই বাড়লো। এবার যে পরিবারের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার আশংকা। স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না। একত্রে থাকা সম্ভব নয়। আবার ভাঙ্গো। কিন্তু এরকমভাবে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে গিয়ে দাঁড়াবে কোথায়!

এর মূল কারণ হচ্ছে পরিস্পারিক বোঝা-পড়ার অভাব। এজন্যই একদিন একান্নবর্তী পরিবার ভেঙেছে। আর এজন্যই আজ স্বামী-স্ত্রীর সুখের নীড়ে অশান্তি বাসা বাঁধছে। প্রাচীন বৃদ্ধার দল বলেন, দু-চারটে থালা-বাসন একসঙ্গে থাকলে যেমন আওয়াজ হয় দশজনের সংসারেও তেমনি একটু খিটির-মিটির হতেই পারে কিন্তু সেটা এমন কিছু নয়। দশজনের সংসার ক্রমেই অদৃশ্য হচ্ছে। সংসার এখন প্রায়ই দুজনের তাতেই এমন কি খিটিরমিটির হতে পারে যে সুখের সংসারে ঘুণ ধরবে? এজন্য দায়ী হচ্ছে আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে আন্তরিকতার অমিল। সুখ ও শান্তির নীড় গড়ে তোলার জনাই আমাদের শুধু ইচ্ছাই আছে—আন্তরিকতা নেই। এজনাই আমাদের এই ছন্নছাড়া দশায় ভুগতে হয়। এটা বোধ-হয় সভ্যতার অগ্রগতির দীর্ঘশ্বাস। না হলে এরকম কেন হয়? দুজন দুজনকে একান্ত-ভাবে কাছে পাচ্ছি। কিন্তু সরল বিশ্বাসে পরস্পর নির্ভরতার হাত বাড়াতে পারছি না। এদিকে ভালবেসে সুখ ও শান্তির পরিপূর্ণতায় বেঁচে থাকতে চাইছি অথচ সব কিভাবে ভেস্তে যাচ্ছে।

শুধু পারস্পরিক নির্ভরতা নয়, পরস্পরকে সহ্য করার দিনও বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখন আর একে অপরকে সহ্য করতে পারি না। অনেক ক্ষেত্রেই ইচ্ছা এবং অভিরুচির বৈপরীত্য নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠছে। কেউ মানিয়ে চলার চেষ্টা করছি না। যে যার খুশিমতো চলছি। তাই সুখ এবং শান্তির চেয়ে সংঘাতই অনিবার্য রূপ নিচ্ছে।

কিন্তু দিনের যতো পরিবর্তনই হোক না কেন সংসারে শান্তি বজায় রাখায় স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীর দায়িত্ব অনেক বেশি, 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'—একথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে। সংসার করে যদি সুখ-শান্তি না পাওয়া যায় পরস্পরকে না বোঝা যায় তবে সে সংসার অ-সার ও নিরর্থক।

—প্রমীলা

...বাঁচার দাবী স্বাধীন বাঙলা...

সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে পথে বেরোতে কারই বা ভাল লাগে। কিন্তু ঘর যখন জ্বলে যায়, পথে পথে জ্বালা তোলে আলকেউটের দল, তখন সরে দাঁড়াতে হয় বৈকি। কি চেয়েছিলেন এ'রা—এই লক্ষ লক্ষ নরনারী। এই শিশু বৃদ্ধ অসহায় মানুষগুলি। শুধু নিজের দেশে নিজের মাটিতে ভাল করে বাঁচা। শুধু তেইশ বছর আগে স্বাধীনতার সত্যকার স্বাদ পাওয়া। তার জন্য কতই না ত্যাগ প্রতীক্ষা—কত আন্দোলন। বারে বারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দস্যুরা—লাঠির মুখে বুলেটের মুখে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে মানুষের মত বাঁচার দাবী। ওদেরই দেওয়া প্রতিশ্রুতিকে পিষে দিয়েছে বুটের তলায়। বারে বারে জেলখানা ভরে গিয়েছে—রাস্তায় রক্ত ঝরেছে, কিন্তু ছলনার আর শেষ নেই। ওদের শেষ খেল শুরু হোল মার্চের গোড়া থেকে। আলোচনার নামে ষড়যন্ত্র—আর তারপর সেই রক্তে রাঙা ২৫ মার্চ তোপের মুখে ঠাণ্ডা করে দেওয়া মানুষের কণ্ঠস্বরকে। কিন্তু মুর্খেরা জানত না অত্যাচার মনুষ্যত্বকে আরো জোরালো করে তোলে। ওদেরই জ্বালানো আগুন থেকে জন্ম নিল এক নতুন দেশ স্বাধীন বাঙলা।

সীমান্তের এপারে সেই স্বাধীন বাঙলার অসংখ্য নরনারী অধীর প্রতীক্ষায় দিন গুনছে কবে দেশে ফিরবে।

জলসা

ভি বালসারার গৌরবোজ্জ্বল সংগীত-জীবনের বত্রিশ বছর পূর্তি : যন্ত্রসংগীতের জগতে এক বহুমুখী প্রতিভা ভি বালসারা সম্প্রতি তাঁর গৌরবদৃপ্ত সংগীতজীবনের বত্রিশটি বছর পূর্ণ করেছেন। ভারতের চলচ্চিত্র জগতের সংগীতে তাঁর সুদীর্ঘ কর্মবহুল জীবনের ষোলটি বছর বোম্বে এবং বাকি ষোলটি বছর বাংলাদেশেই নিবেদিত।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় তাঁর অর্কেস্ট্রার বহুরকম বিদেশী যন্ত্রে অসাধারণ দক্ষতা ও প্রয়োগকুশলতা পরিলক্ষিত হলেও স্বধর্মে এবং স্ব-যন্ত্রে বালসারা পুরোপুরিই ভারতীয়। সেদিন আলোচনা প্রসঙ্গে ইনি অমৃতের সংগীত প্রতিনিধিকে একটি নতুন তথ্য জ্ঞাপন করেন। বালসারার আগে হার্মোনিয়ম প্রধানতঃ গানের সঙ্গতযন্ত্র রূপেই ব্যবহৃত হোতো এবং উচ্চাঙ্গসংগীত শিল্পীরাও এ যন্ত্রে রাগাবলম্বী বাজনাও শুনিয়েছেন। ভীষ্মদেবজীর 'হারমোনিয়ম' রেকর্ডও ছিল। কিন্তু বালসারাই একমাত্র হারমোনিয়ম-বাদক যাঁর হাতে বিদেশী একর্ডিয়ানের আঙ্গিকশৈলীর ধাঁচে হারমোনিয়ম এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথা জানাতেও ভোলেননি তাঁর সাম্প্রতিক ই পি রেকর্ডে "মেরা নাম জোকার" কথাচিত্রের দুটি গান তিনি হারমোনিয়মেই বাজিয়েছেন। ইলেকট্রনিক যন্ত্রে পারদর্শিতা সত্ত্বেও নিশ্চিত বাণিজ্যিক সাফল্যের মোহ এবং সাধারণ শ্রোতার চিত্তরঞ্জনী চটকদার বাজনার প্রলোভন ত্যাগ করে তিনি একটি "এক্সপেরিমেন্ট" করেছিলেন খাঁটি ভারতীয় যন্ত্রেই হিন্দী গানের সুর ও সংগীত দর্শকচিত্তে আবেদন জানাতে পারে কিনা এবং এ এক্সপেরিমেন্ট যে সার্থক 'মেরা নাম জোকার"-এর বিপুল সমাদরই তার প্রমাণ।"Harmonium is my first love which I started performing in the public stage forty years ago at the age of six on the stage".—হেসে বললেন আপনভোলা শিল্পী।

বোম্বের নানান চিত্রে ('দুলারী'-র দাগার নৃত্য, 'দাস'-এর একটি গানে, "ইয়াদ কিয়া দিলনে কাহা হো তুম" বারসাৎ ও শ্রী ৪২০র) নানা গান ও আবহ-সংগীত একক হারমোনিয়মে বাজিয়ে বালসারা সমালোচকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছেন। এছাড়া "Staccato and Devil Dance" শীর্ষক রেকর্ডে শুধুমাত্র হারমোনিয়ম সৃষ্ট সংগীত রসিকজনচিত্তে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল।

১৯৩৮ থেকে ১৯৫৪-এর বোম্বাই ফিল্মের সুবিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে তিনি যোগ দেন ১৯৩৮-এ মাত্র ষোল বছর বয়সে। প্রথমে সংগীতপরিচালক খাঁ সাহেব মুস্তাক হোসেনের পরিচালনাধীনে বালসারা রঞ্জিত ইস্টার্ণ টকিজের 'বাদল'-এর অন্যতম যন্ত্রশিল্পীরূপে যোগ দেন এবং প্রথমদিনেই দুর্লভ সংগীত প্রতিভার পরিচয় রাখতেই দ্বিতীয় দিনেই সহকারী সংগীত পরিচালকের পদে উন্নীত হন।

বোম্বাইতে বহু খ্যাতিমান সংগীত পরিচালকের অধীনে শিল্পীরূপে বালসারা কাজ করেছেন তাঁরা হলেন : ওস্তাদ ঝান্দি খান, মীর সাহেব, রফি গজনাভী, বসন্ত দেশাই, অনিল বিশ্বাস, বসন্ত নাইডু, রামচন্দ্র পাল, এস এন ত্রিপাঠী, রাম গাঙ্গুলী, অবিনাশ ব্যাস, শ্যামসুন্দর, সি রামচন্দ্র, নৌশাদ, সাজ্জাদ হোসেন, জ্ঞান-প্রকাশ ঘোষ, হুসনালাল ভাগাত্রাম, শঙ্কর-জয়কিষণ, ও পি নায়ার, শচীন দেববর্মন, সলিল চৌধুরী, হেমন্তকুমার, রোশান, পণ্ডিত গোবিন্দরাম, হাঁসরাজ বেল, জি এস কোহিল, শার্দুল কোয়াত্রা, বুলো সি রাণী, এস ভাটকার, সুধীর ফাদকে, সরস্বতী দেবী ও জ্ঞান দত্ত। এছাড়াও সহকারী অর্কেস্ট্রা রচয়িতা হিসাবে তিনি খাঁ সাহেব মুস্তাক হোসেন খান, কে দত্ত, ক্ষেমচাঁদ প্রকাশ, গোলাম হায়দার ও মদনমোহনের সুযোগ্য সহকারী ছিলেন।

বালসারার সংগীত পরিচালনায় প্রচুর হিট্-সং গেয়েছেন রাজকুমারী বাঈ, আমীর বাঈ কর্ণাটকী, খান মস্তানা, জি এম দুরাণী, নূরজাহান, শান্তা আপ্তে, সুরাইয়া, অম্বালার জোহরা জান, পাহাড়ী সান্যাল, শামসাদ বেগম, সুরেন্দ্র, পারুল ঘোষ, উমা দেবী, এস ডি বাতিশ, অশোক-কুমার, নাসীমবানু, লতা মঙ্গেশকার, আশা ভোঁসলে, গীতা দত্ত, মান্না দে, তালাত মামুদ, মুকেশ, রফি, মীনা কাপুর, সি এইচ আত্মা, মহেন্দ্র কাপুর।

সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং এককভাবে সংগীত পরিচালনা করেছেন মিসেস ব্রিজরাণীর কিছু চমকপ্রদ চিত্রে, এস আর রাজ এবং রমেন দেশাইএর চিত্রে, রুশ ও ইংরাজী থেকে হিন্দী ডাবিং-এ, জহুর রাজ (ম্যানাক), জগদীশ পন্থ (মাদামাণ্ট)। ১৯৫২ সালে মিস ধানের সঙ্গে মহেন্দ্র কাপুরই সর্বপ্রথম তাঁর পরিচলনায় "মাদামাণ্ট" চিত্রে কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করেন।

১৯৫৪ থেকে ১৯৭০ অবধি বাংলাদেশে যথাক্রমে রাইচাঁদ বড়াল, ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ পণ্ডিত রবিশঙ্কর, অনিল বাগচী, রবীন চট্টোপাধ্যায়, দুর্গা সেন, সুধীন দাসগুপ্ত, ভূপেন হাজারিকা, কালিপদ সেনগুপ্ত, গোপেন মল্লিক, তিমিরবরণ, কমল দাসগুপ্ত, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ইনি শিল্পী-রূপে এবং অনুপম ঘটক, পঙ্কজ মল্লিক, নচিকেতা ঘোষ, রাজেন সরকার ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালিত চিত্রে আবহ-সংগীতকার রূপে কাজ করেছেন। বালসারা পরিচালিত বাংলা ছবি রাতের অন্ধকারে, বাংলাদেশের উচ্চাঙ্গসংগীতের প্রায় সকল

এ জহর সে জহর নয়, আপার বাঁধন, ঘর, অঙ্গীকার, শুভবিবাহ, মানিক, সূর্যস্নান, ছায়াসূর্য, কাঞ্চনরঙ্গ, পথে হোলো দেখা, ফিরে চল, কালচক্র, কাঞ্চন কন্যা, ও কে? মমতা, পঞ্চতপা। জনপ্রিয় শিল্পীদের মধ্যে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, অপরেশ লাহিড়ী, আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা বসু, শ্যামল মিত্র, আরতি মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় ও রাণু মুখোপাধ্যায় এ'র সুরে গেয়েছেন।

বালসারারই পরিচালিত কাঞ্চনরঙ্গে গান গেয়ে মান্না দে বি এফ জে এ পুরস্কার পেয়েছেন। সর্বপ্রথম কোলকাতার স্টুডিওতে গৃহীত "রাতের অন্ধকারে" কথাচিত্রের একটি আট মিনিটের ডিস্ক বেশ কয়েকটি ভারতীয় ও বিদেশী ভাষা ছাড়া একটি বাংলা গান গেয়েছেন। সর্বপ্রথম বালসারারই পরিচালনায় দশজন শীর্ষস্থানীয় বোম্বের শিল্পী কোলকাতার স্টুডিওতে "পিয়ার" কথাচিত্রে বাংলার শিল্পীদের সঙ্গে অংশ-গ্রহণ করেছেন।

১৯৪০এ ইনি সাংস্কৃতিক সফরে ইরাক, ইরান ও মিশর পরিভ্রমণ করেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ মঞ্চে নৌশাদ, অনিল বাগচী, সি রামচন্দ্র এবং মদনমোহনকে অন্ধ বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে সংগীত পরিচালনায় উপস্থিত করেন একথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। ভি বালসারার অধিকতর অবদানসমৃদ্ধ সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি।

একক অনুষ্ঠানে আগ্রা ঘরানার শিল্পী : দীর্ঘ চার বছর অনুপস্থিতির পর সম্প্রতি কলকাতায় শ্রীমতী ঝর্ণা দত্ত রায় নিবেদিত একটি একক সংগীতের আসরে সু-পরিচিত শিল্পী শ্রীমতী দীপালি নাগ কণ্ঠসংগীতে সংগীতরসিক শ্রোতাদের নতুন করে অভিবাদন জানালেন।

শ্রীমতী নাগ অনুষ্ঠান শুরু করেন 'গৌড়মল্লার' রাগ দিয়ে। স্বল্পস্থায়ী বিস্তার ও তানেও মল্লারের বর্ষাসজল রূপ পরিস্ফুটনে দেরী হয়নি। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ছিল এ'র শুদ্ধ ও কোমল গান্ধারের শাস্ত্রসম্মত প্রয়োগকৌশল। এরপর 'আনন্দী' রাগ পরিবেশনায় আসর জমিয়ে দিয়েই শ্রীমতী নাগ ধরলেন 'গারা কানাড়া', এ রাগটি যন্ত্রসংগীতেই শোনা যায়, কণ্ঠসংগীতেই এর বহুল প্রচলন বড় একটা নেই। রাগমাধুর্য, গায়নশৈলীর স্বচ্ছতা এবং সর্বোপরি শিল্পীর মেজাজ সব মিলিয়ে বিশেষ করে এই রাগবিস্তার অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে ওঠে। 'গারা-কানাড়া'র পর 'দরবারী কানাড়া' দিয়ে ইনি মার্গসংগীতের আসরে ছেদ টানলেন।

সর্বশেষে এবং সকলের অনুরোধে শিল্পী গাইলেন দুটি রাগপ্রধান বাংলা গান তার মধ্যে একটি হোলো তাঁর সুবিখ্যাত গান 'মেঘমেদুর বরষায়' যে গানটির সঙ্গে

শ্রোতাই পরিচিত এবং যে গান গেয়ে দীপালি নাগ সংগীতজগতে একরকম রাতারাতিই বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। দ্বিতীয় গান 'ঘন মেওয়া আষাঢ়ের জলসা'। 'জয়-জয়ন্তী' ও 'মল্লার' রাগাশ্রিত দুটি বাংলা গান এক আনন্দমুখর পরিবেশ রচনা করে। এ আসরের সর্বাঙ্গীণ সার্থকতার একটা বড় অংশ প্রাপ্য শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের। তাঁর হার্মোনিয়ম সংগত শিল্পীর মেজাজকে উদ্দীপ্ত করেছে। শ্রীশ্যামল বসুর তবলা-সংগতও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

সংগীতশিল্পীর রাষ্ট্রীয় বৃত্তি লাভ : এ-বছরই ভারত সরকারের শিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রতিভাময়ী শিল্পী শ্রীমতী বাণী রায়কে হিন্দুস্থানী সংগীতের কণ্ঠশিল্পী হিসাবে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। কলকাতার একাধিক সংগীত সম্মেলনে শ্রীমতী রায়ের উচ্চাঙ্গ ও লঘু— দুইপ্রকার সংগীতই প্রশংসিত হয়েছে।

শ্রীমতী রায় লক্ষ্ণৌর ভাতখণ্ড সংগীত মহাবিদ্যালয় থেকে সংগীতবিশারদ ডিগ্রী এবং ওয়েস্ট বেংগল এডুকেশন বোর্ড থেকে সংগীতের জন্য টিচার্স ট্রেনিং ডিপ্লোমা পেয়েছেন। ইনি আকাশবাণীর (কলকাতা) নিয়মিত শিল্পী এবং একাধিক ছায়াচিত্রে নেপথ্য কণ্ঠদান করেছেন।

উচ্চাঙ্গসংগীতে প্রথম পাঠ নেন প্রথমে কালীপদ দাশ এবং পরে বর্তমানে জ্ঞান-প্রকাশ ঘোষের কাছে। লঘুসংগীতে নিম্নলিখিতদের শিক্ষাধীনে গেয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রবীর মজুমদার, গৌরচন্দ্র বসাক, এবং লক্ষ্মণ হাজরা।

গ্রামোফোন কোম্পানীর নতুন রেকর্ড : সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রামোফোন কোম্পানীর একটি এল পি ও কয়েকটি ই পি রেকর্ড সিরিজ একটি নানারঙা ছোট্ট সুন্দর পুষ্পস্তবকের মতই বর্ণবৈচিত্র্যে ও গন্ধ-মাধুর্যে রসিক-চিত্তহারী হয়ে উঠবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য কবি 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের স্ব-কণ্ঠের আবৃত্তি 'অর্কেস্ট্রা' শ্রীদত্তর বৈদগ্ধ্য-জাত কবিতাগুলিতে আবেগের অভাব নেই। কিন্তু এ আবেগের উদ্দামতা মননশীলতার মার্জিত স্পর্শে সংযত, সংহত, গভীর উৎসুক জীবন-জিজ্ঞাসার সন্ধানী ব্যাকুলতায় প্রাণস্পর্শী, জীবন-বিবিক্ত জীবনের উদার দৃষ্টিভঙ্গির আলোয় উজ্জ্বল। রবীন্দ্রকল্পনার মাধুর্য-সিক্ত হয়েও কবির নিজস্ব জীবনদর্শনের ঋজু স্বচ্ছতায় টলটলে। যে কণ্ঠ আর শোনা যাবে না—অথচ যাঁর অবদান সশ্রদ্ধ স্মরণীয়। হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত টেপ থেকে তাঁরই কণ্ঠের আবৃত্তি সংগ্রহ এবং প্রচার করার জন্য গ্রামোফোন কোম্পানী ধন্যবাদার্হ।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাঙ্ক নাটক 'নানা রং-এর দিন' মঞ্চশিল্পী জীবনের অবশ্যম্ভাবী ট্র্যাজিডির এক অশ্রুসজল রূপ। রুশ নাট্যকার 'আনতোন চেখভ'এর নাট্যানুসৃত—এই ছোট্ট নাটকটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাধারমণ তরফদারের আশ্চর্য অভিনয়-কুশলতায়।

কাজী সব্যসাচীর রঙিন কণ্ঠে অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্তের "হে বন্ধু চোখ চাও" আবৃত্তি তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতায় পরিবেশিত।

একখানি এল পি ডিস্কে শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্তের পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের সংকলন এক আকর্ষণীয় বস্তু। প্রথমেই তালবাদ্যে ও সুরপ্রধান যন্ত্রের সংগীতমুখরতায় বর্ষার পদধ্বনি শোনা গেল। তারপরই জনপ্রিয় শিল্পীদের কণ্ঠে 'বিশ্ববীণারবে' গানটিতে বর্ষার আগমন ঘোষিত হওয়ার পরই আকর্ষণীয় শিল্পীদের এক একজনের গানে বিচিত্র রূপাবেশ। কখনও হেমন্ত মুখো-পাধ্যায়ের কণ্ঠে ' এসোগো জেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানির নিভৃত ব্যাকুল আহ্বান, আবার কণিকা বন্দ্যো-পাধ্যায়ের গহনচারী কণ্ঠের সীমাহীন উদ্বেল সুর 'কি বেদনা মোর সে কি জান' ও 'কোন দূরের মানুষ যেন এলো আজ কাছে'—নীলিমা সেনের গম্ভীর আবেগ মেশানো 'শ্রাবণ গগনে ঘোর ঘনঘটা,' দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের বিষণ্ণতা ছড়ানো 'শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়', সুচিত্রা মিত্রের 'বৃষ্টিশেষের হাওয়ায়' স্পর্শে যেন বিহ্বল। এ ছাড়া তরুণতর শিল্পীদের কণ্ঠেও নানা সুখশ্রাব্য গানের পথ বেয়ে শেষ হোলো সুচিত্রা মিত্রের 'আমার রাত পোহালো' দিয়ে। গানগুলি সংযোজিত হয়েছে কাজী সব্যসাচীর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের সুন্দর কয়েকটি কবিতা দিয়ে। আর এক আকর্ষণ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠের দুটি কবিতা। গুন্থনার কাজে সন্তোষ সেনগুপ্তকে সুযোগ্য সহায়তাদান করেছেন মায়া সেন।

আসাম হাউস রিক্রিয়েশন ক্লাবের রবীন্দ্র-জন্মোৎসব : সম্প্রতি আসাম ভবনে আসাম হাউস রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ১১০তম জন্মোৎসব পালিত হয়।

সূচনায় সমবেত সংগীতে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী দিলীপ দাস, গুরুদাস চট্টো-পাধ্যায়, তপন রায়চৌধুরী, গোপেশ্বর রায়, মায়া বরদলৈ। সংগীত ও আবৃত্তিতে ছিলেন প্রদীপ দাশগুপ্ত, গোপেশ্বর রায়, তপন রায়চৌধুরী, রুবী বর্ধন, দিলীপ দাস, রতন হোড়, সুকুমার দাস, রণজিৎ মিত্র ও কৃষ্ণা বড়ুয়া। অনুষ্ঠানটি সর্বদিক দিয়ে উপভোগ্য হয়েছিল।

সি এল টি অনুষ্ঠিত অবনীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী : সেপ্টেম্বরের শেষে অবন-মহলে অবনীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালিত হবে। অবনীন্দ্র ঠাকুরের রচনা থেকেই যাত্রা ও শিশুকাহিনী মঞ্চস্থ হবে বলে মহলা চলছে এবং অবনমহল প্রেক্ষাগৃহেও উৎসবের উপযোগী সংস্কার চলছে।

এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সকল সংস্থা এবং শিল্পী সাধারণ সম্পাদকের সংগে যোগাযোগ করতে পারেন বলে সি-এল-টির কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছেন।

প্রখ্যাত তবলিয়া শঙ্কর ঘোষের বিদেশ যাত্রা : গত ১৫ই জুন তবলিয়া শঙ্কর ঘোষ আমেরিকা যাত্রা করেছেন। ওখানে আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিকে ঘোষদম্পতি তিন বছর তবলা ও কণ্ঠসংগীত শিক্ষাদান করবেন। এ ছাড়া শ্রীঘোষ ১৯৭২-এর জানুয়ারী থেকে মার্চ অবধি খাঁ সাহেবের সংগে ইউ-এস-এ ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

—চিত্রাঙ্গদা

এপার-ওপার ছবির সেটে অপর্ণা সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ও পরিচালক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।   ফটো : অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

ধনমর্যাদা

ভারতীয় হিন্দুসমাজে এমন দিন ছিল, যখন মানুষ বংশমর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে জীবনপণ করত। কিন্তু ক্রমে ইয়োরোপীয় সভ্যতার বিস্তার লাভের সঙ্গে বংশমর্যাদা ধূলিসাৎ হয়ে তার পরিবর্তে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কাঞ্চনকৌলীন্য। ধনীসন্তান গরীবের মেয়েকে বিবাহ করে ঘরে তুলবে, এ-চিন্তা অর্থবান পিতৃকুল আজও করতে পারেন না। প্রতিশ্রুতিমত বরপণ ঠিক ঠিক গুণে দিতে না পারলে পাত্রকে বরাসন থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা আজও ঘটে। এবং ধনীর ঘরের মেয়ের সঙ্গে দরিদ্র যুবকের প্রেম বা বিপরীতভাবে বড়লোকের ছেলের গরীবের মেয়েকে ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যে যেমন বহু কাহিনী রচিত হয়েছে, চলচ্চিত্রে—বিশেষ করে হিন্দী চলচ্চিত্রেও অগুন্তি কাহিনী চিত্রিত হয়েছে আজ পর্যন্ত। কাজেই সেদিক দিয়ে ললিতকলা মন্দির নিবেদিত এবং অরবিন্দ সেন প্রযোজিত ও পরিচালিত ইস্টম্যান-কলার হিন্দী চিত্র 'মর্যাদা' বিশেষ কোনো নূতনত্বের দাবি করতে পারে না। কিন্তু উপস্থাপনা ও প্রয়োগগুণে ধনী-দরিদ্র বিরোধের এই সনাতন কাহিনীটি আশ্চর্য চিত্তাকর্ষকরূপে মনোলোভা হয়ে উঠেছে। তাই এই হিন্দী ছবি 'মর্যাদা'কে আমাদের মন 'নতুন বোতলে পুরাতন মদের' সঙ্গে এক পর্যায়ে বসাতে চাইছে। ছবির গোড়া থেকে শেষপর্যন্ত যেভাবে দৃশ্যের পর দৃশ্যের মাধ্যমে ঘটনাবৈচিত্র্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দর্শক-কৌতূহলকে উত্তরোত্তর বর্ধিত করে চরম পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে, তাতে কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার সুহৃদ কর এবং প্রযোজক-পরিচালক অরবিন্দ সেনের হিন্দী চলচ্চিত্র নির্মাণ বিষয়ে নির্ভুল অভিজ্ঞতার অকাট্য নিদর্শন পাওয়া যায়।

'মর্যাদা'র মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছে এর অনবদ্য অভিনয়াংশ। মালা সিংহ, রাজকুমার, রাজেশ খান্না ও প্রাণ—এই চারজনই চরম নাটনৈপুণ্য প্রকাশ করে সমগ্র ছবিটিকে এমন একটা চড়া পর্দায় তুলে ধরেছেন, যার নজীর সাম্প্রতিক চিত্রজগতে বিরল। বিশেষ করে রাজকুমার ও দ্বৈত-ভূমিকায় মালা সিংহের আবেদনসৃষ্টিকারী অভিনয়ের তুলনা নেই। অবশ্য এঁদের অভিনয়কে প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী করতে বহুপরোনাস্তি সাহায্য করেছে এঁদের মুখের সংলাপ। ছবির বহু জায়গাতেই রাজকুমারের মুখের সংলাপ প্রেক্ষাগৃহ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করেছে। এই চারজন শিল্পীর পাশে বিপিন গুপ্ত, গুরুনাম সিং, অভিমন্যু শর্মা, জানকী দাস, অসিত সেন, রাজিন্দ্রনাথ, সঞ্জনা, দুলারী, লতা বসু এবং শিশু-তারকা বাবলা বেশ যোগ্যতার সঙ্গে সু-অভিনয় করেছেন। একটি ক্যাবারে দৃশ্যে হেলেন রাজকুমারের সঙ্গে গেয়েছেন ও নেচেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চিত্রগ্রহণের বৈশিষ্ট্যটি প্রথমে নজরে পড়ে। চিত্রশিল্পী এন ডি শ্রীনিবাস রঙের ব্যাপারে আড়ম্বরপূর্ণ চাকচিক্যের মধ্যে না গিয়ে একটা স্বাভাবিক রূপ প্রতিফলিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন এবং এ-বিষয়ে সাফল্যও লাভ করেছেন। শব্দানুলেখনেও সংলাপে স্বাভাবিক গ্রাম বজায় রাখতে গিয়ে কোথাও কোথাও এমনই নিম্নগ্রামে গিয়ে পৌঁছেছে যে, শ্রবণশক্তিকে অত্যন্ত জাগ্রত রাখতে হয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর কাজ করেছেন সম্পাদক শঙ্কর হার্দে। সতেরো রীল দীর্ঘ ছবিতে আশ্চর্য টেম্পো বজায় রাখা নিশ্চয়ই কৃতিত্বের পরিচায়ক। গণেশ বসাকের শিল্পনির্দেশনা কাহিনী উপযোগী ও ত্রুটিহীন। ছবির আর একটি আকর্ষণ হচ্ছে আনন্দ বকসী রচিত এর গানগুলি। কল্যাণজী আনন্দজী দ্বারা সুরারোপিত ও লতা মঙ্গেশকর, মুহম্মদ রফী, মুকেশ ও কিশোরকুমার দ্বারা গীত হয়ে প্রায় প্রতিটি গানই দর্শকউপভোগ্য হয়ে উঠেছে। ওরই মধ্যে কিশোরকুমার গীত 'গুসসা ইতনা হসীন হ্যয়' গান-খানির তুলনা নেই। এছাড়া 'ও লড়কী

দেওরানী', 'এ-অরে-চুপকে সে দিল দে দে', 'দিলকা লেনা দেনা হমনে ছোড়া' প্রভৃতি গানও জনপ্রিয়তার দাবি রাখে।

ললিত কলামন্দিরের নিবেদন, অরবিন্দ সেন পরিচালিত 'মর্যাদা' একটি সার্থক জনপ্রিয় চিত্র।

বাংলাদেশ সম্পর্কিত দুখানি তথ্য ও তথ্যাংশ চিত্র

২৫ মার্চ থেকে পদ্মা নদীর অপর পারে ঢাকা, বরিশাল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শহরসমেত সমগ্র বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা যে-নারকীয় লীলার অবতারণা করেছে, তাতে বিচলিত হয়নি, এমন মানুষ পৃথিবীতে কমই আছে। বর্তমান চলচ্চিত্রজগতের অন্যতম নায়ক-শিল্পী, দানবীর বিশ্বজিতও যে এই নৃশংসতায় অতিমাত্রায় বিচলিত হয়েছেন, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ তিনি রেখেছেন 'দুর্বার গতি পদ্মা' (ইংরাজীতে 'দেয়ার ফ্লোজ পদ্মা মাদার') নামে একটি প্রায় দু' হাজার ফুট দীর্ঘ তথ্যচিত্র নির্মাণ করে। ছবিটির কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার এবং নাট্যকার এবং পরিচালক হচ্ছেন স্বনামধন্য ঋত্বিক ঘটক। ছবির বক্তব্য বেশ পরিষ্কার। পদ্মামাতৃক এই বাংলাদেশ একদা ছিল শান্তির নীড়। সেই শান্তিকে বিঘ্নিত করে সেখানে মৃত্যুর করাল ছায়া নিয়ে এসেছে পাক দুশমনেরা। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষেরা রুখে দাঁড়িয়েছে। একদিন এই রক্তস্নানের অবসান ঘটবে এবং স্বাধীন বাংলায় আবার শান্তি ফিরে আসবে।—এই বক্তব্য রাখতে গিয়ে পরিচালক একদিকে দেখিয়েছেন পদ্মা, জমিতে চাষ দেওয়া বীজ বপন করা, অন্যদিকে পাক-অত্যাচারপীড়িত মানুষের দল, তাদের সেবাকার্য, তাদের সাহায্যের জন্যে বোম্বে ও কলকাতায় আয়োজিত দুটি অনুষ্ঠানের খণ্ড খণ্ড চিত্র, যার মাধ্যমে দেখা গেছে নার্গিস, দিলীপকুমার, শর্মিলা ঠাকুর, রাজেশ খান্না, মান্না দে, হেমন্তকুমার, শচীন দেববর্মণ প্রভৃতি বহু শিল্পীকে। এছাড়া খবরের কাগজ, কিছু অঙ্কিত চিত্রও আছে। আজ বাংলাদেশে রক্ত ঝরছে, এই কথা বোঝবার জন্যে ছবির শেষভাগে আছে লাল পদ্মা, আর বিশ্বজিতের চোখের সামনে ঝরে-পড়া রক্তরেখা। কিন্তু সবটাই কেমন খাপছাড়া, এলোমেলো।—বাস্তবচিত্রেরই প্রতিরূপ হয়তো। বিশ্বজিত নিজে একজন বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা কেন সাজলেন, তা অবশ্য বোঝা গেল না। এবং এই কারণেই ছবিটি তথ্যচিত্র না হয়ে তথ্যাংশ চিত্র হয়েছে।

অপর ছবিটিতে বাংলাদেশের নেতা ও নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটি দেখানো হয়েছে। ছবির মধ্যে পর্যায়ক্রমে কয়েকজন বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁদের মতামত দিয়েছেন।

নান্দীকর

স্টুডিও থেকে

ফরিয়াদ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ফরিয়াদ' কাহিনী অবলম্বনে বিজয় বসুর পরিচালনায় পর্ণা পিকচার্সের 'ফরিয়াদ' চিত্রটি সম্পাদকের টেবিলে শেষ কাট-ছাঁটের ব্যাপার শেষ করে এখন সেন্সর-প্রিণ্ট তৈরীর পর্যায় এসে দাঁড়িয়েছে।

অসামান্যা রূপসী একটি মেয়ে। আত্মসম্মান বাঁচানোর জন্যে নিজের পিতা হয়েও তাকে চরম সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছে তার বাবা। কাপুরুষ স্বামী তাকে বাঁচাতে পারেনি। ছুরি ফেলে টাকা নিয়ে তার মেরুদণ্ডহীন স্বামী সরে গেছে তার জীবন থেকে। নির্যাতনের বিষে জর্জরিত দেহমন নিয়ে ক্যাবারে নর্তকীর পঙ্কিল জীবনযাপনের সামনে ছিল শুধু একটি প্রতীক্ষা, সে তার সন্তান। কিন্তু সেই সন্তানকে সে দেখছে নিষ্ঠুর এক সমাজ-বিরোধীর রূপে অধঃপতনের শেষ সীমায় পেঁাছতে।

অভাগিনী এই রূপসী মহিলার চরিত্রে রূপ দিয়েছেন বাংলা ছায়াচিত্রের অদ্বিতীয়া শিল্পী সুচিত্রা সেন। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন উৎপল দত্ত, পার্থ মুখার্জি, বিকাশ রায়, চন্দ্রাবতী।

বিজয় বসুর সহযোগিতায় চিত্রনাট্য লিখেছেন সমরেশ বসু। সুরযোজনা করেছেন নচিকেতা ঘোষ।

প্রগতি চিত্রমের 'আবিরে রাঙানো'

অমল দত্ত পরিচালিত, প্রগতি চিত্রম প্রযোজিত ও পরিবেশিত ছবি 'আবিরে রাঙানো'র শেষ পর্যায়ের স্যুটিং শুরু হচ্ছে এই মাসে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। সম্পূর্ণ নতুন শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত 'আবিরে
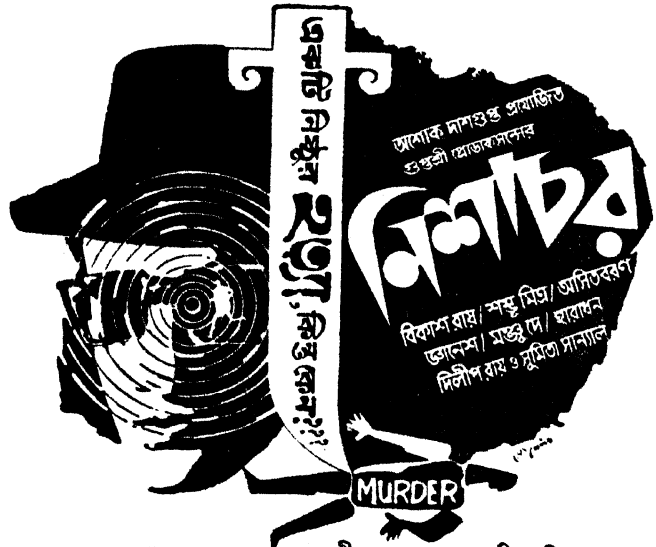
রাঙানো'র কলাকুশলীদের মধ্যে আছেন ক্যামেরাম্যান সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক রমেশ যোশী, শিল্পনির্দেশক গৌর পোদ্দার ও রূপসজ্জায় দুর্গা চট্টোপাধ্যায়। এই ছবির নতুন সুরকার সত্যদেব চট্টোপাধ্যায়। সুরে কণ্ঠ দিয়েছেন যথাক্রমে মান্না দে, পিণ্টু ভট্টাচার্য, সুজাতা, নীলা, ললিতা ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। মধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে এই ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক অমল দত্ত স্বয়ং।

নিশাচর শহরে আসছে

সুপ্তশ্রী প্রোডাকসন নিবেদিত ও অশোক দাশগুপ্ত প্রযোজিত রহস্য-চিত্র 'নিশাচর' শ্রী, প্রাচী ও ইন্দিরা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করছে। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন ভূপেন রায়। সংগীত পরিচালনা ও প্রধান সম্পাদকরূপে আছেন যথাক্রমে কালিপদ সেন ও অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা, শব্দগ্রহণ ও গীত রচনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে ননী দাস, সুনীল সরকার, সুনীল ঘোষ ও শ্যামল গুপ্ত। নেপথ্য কণ্ঠসংগীত শিল্পীঃ শ্যামল মিত্র, আরতি মুখোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র ও মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী।

বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন বিকাশ রায়, শম্ভু মিত্র, দিলীপ রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, অসিতবরণ, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানি, প্রীতি মজুমদার, ধীরাজ দাস, মঞ্জু দে, গীতালি রায় (দত্ত), স্মিতা মজুমদার, লীলাবতী দেবী (করালী) ও সুমিতা সান্যাল। রহস্য-রোমাঞ্চে পরিপূর্ণ

ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছে মন্দিরা ফিল্মস।

'শ্রাবণসন্ধ্যা' ছবির সংগীতগ্রহণ ও নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু

গেল ২৮ জুন ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটরিজে কালীমাতা ফিল্মসের 'শ্রাবণসন্ধ্যা' ছবির কয়েকটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত গানদুটিতে কণ্ঠদান করেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও আরতি মুখোপাধ্যায় এবং মান্না দে। এছাড়া হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্রও এ-ছবিতে নেপথ্য কণ্ঠসংগীত-শিল্পী।

'শ্রাবণসন্ধ্যা'র নিয়মিত চিত্রগ্রহণও শুরু হয়েছে। শেখর চট্টোপাধ্যায় রচিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন 'প্রান্তিক' ছদ্মনামের আড়ালে একদল অভিজ্ঞ কলাকুশলী। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে দীনেন গুপ্ত ও বিশ্বনাথ নায়েক।

ছবিটির মুখ্য নারীচরিত্রে রূপদান করছেন সুচিত্রা সেন। অন্যান্য চরিত্রে শিল্পী শমিত ভঞ্জ ও সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় এবং রবি ঘোষ, জহর রায় শেখর চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, চিন্ময় রায়, নবাগত সুনীলকুমার, কল্যাণ চক্রবর্তী, অপর্ণা দেবী, ইন্দিরা দে, তৃপ্তি দাস, তপতী রমণ এবং আরো অনেকে।

'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ' ছবির মুক্তি আসন্ন

শ্রীকমলা ফিল্মস নিবেদিত ও শ্রীমার আশীর্বাদধন্য 'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ' ছবিটি অরবিন্দ জন্মশতবর্ষে মুক্তিলাভ করছে। ছবিটি উত্তরা, উজ্জ্বলা ও পূরবীতে পরবর্তী আকর্ষণরূপে চিহ্নিত। উমেশ মজুমদার ও পরেশ মজুমদার প্রযোজিত চিত্রটির গ্রন্থনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্ব দীপক গুপ্তের। সংগীত, সম্পাদনা, শিল্পনির্দেশনা, চিত্রগ্রহণে আছেন যথাক্রমে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, রমেশ যোশী, সুনীতি মিত্র ও দীপক দাস। রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক সংগীত ছাড়াও সুনীলবরণের লেখা গানও এই ছবির অন্যতম আকর্ষণ, এছাড়া ভাষ্যকাররূপে আছেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীঅরবিন্দর চরিত্রে রূপদান করেছেন দিলীপ রায়। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে দেখা দেবেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, এন বিশ্বনাথন, শেখর চট্টোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, তমাল লাহিড়ী, দ্বিজু ভাওয়াল, বঙ্কিম ঘোষ, অমরেশ দাশ, মিহির ভট্টাচার্য, গঙ্গা দেবী, গীতা দে, সাধনা রায়চৌধুরী, সুলেখা কুণ্ডু ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। নেপথ্য কণ্ঠে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও আরতি মুখোপাধ্যায়।

ছবিটির পরিবেশক : শ্রীশংকর ফিল্ম একচেঞ্জ।

শিল্পী-সংসদ প্রযোজিত 'বনপলাশির পদাবলী'

শিল্পী-সংসদ প্রযোজিত রমাপদ চৌধুরীর মহান উপন্যাস অবলম্বনে বনপলাশির পদাবলী ছবির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করছেন বাংলা ছবির জনপ্রিয়তম শিল্পী উত্তমকুমার। উত্তমকুমারের পরিচালনা শুধু অন্যতম আকর্ষণ নয়, গত কয়েক দশকে বাংলা চলচ্চিত্রে এই ধরনের বিরাট শিল্পীসমাবেশও দেখা যায়নি।

উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, বিকাশ রায়, জহর রায়, তরুণকুমার, কালীপদ চক্রবর্তী, ভানু চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত ঘোষ, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, গৌর সী, মধু বসু, বিষ্টু দে, জিতেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সীতেশ চক্রবর্তী, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, অজিত মিত্র, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, শিপ্রা মিত্র, কেতকী দত্ত, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, বাসবী নন্দী, শমিতা বিশ্বাস, ইন্দ্রাণী সেন, বিনা রাও, সুচেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দিতা দে, পপ্পু সেন, স্বপনকুমার এবং বিশ্বজিৎ ও মাধবী চক্রবর্তী।

সংগীতও 'বনপলাশির পদাবলীর' অন্যতম আকর্ষণ। সংগীত পরিচালকরূপে আছেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্র। শিল্পনির্দেশনা, চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে রবি চট্টোপাধ্যায়, কানাই দে, কমল গঙ্গোপাধ্যায় এবং কর্মাধ্যক্ষ : পারিজাত বসু।

ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীবিশ্বজিৎ পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

'খুঁজে বেড়াই' মুক্তি প্রতীক্ষায়

পীতালি পিকচার্স নিবেদিত খুঁজে বেড়াই রূপবাণী, ভারতী ও অরুণা প্রেক্ষাগৃহে পরবর্তী আকর্ষণরূপে চিহ্নিত। কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা করেছেন সলিল দত্ত। সংগীত পরিচালনা, চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে রবীন চট্টোপাধ্যায়, বিজয় ঘোষ ও অমিয় মুখোপাধ্যায়। প্রধান তিনটি চরিত্রে রূপদান করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন ও অনিল চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে : বিকাশ রায়, উৎপল দত্ত, দিলীপ রায়, তরুণকুমার, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, সুনীলেশ ভট্টাচার্য, শোভা সেন, জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়, মিস পলিন ও জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটির পরিবেশক এস বি ফিল্মস।

সমাপ্তির মুখে 'ছিন্নপত্র'

কলামন্দির নিবেদিত ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের বহুপঠিত কাহিনী অবলম্বনে ছিন্নপত্র ছবির কাজ এখন শেষ পর্যায়ে। সুখ্যাত যাত্রিক গোষ্ঠী পরিচালিত ছবিটির সংগীত পরিচালনা করেছেন নচিকেতা ঘোষ।

ধুচলো মিল পথ   নবীন নিশ্চল ও অর্চনা

আটাত্তর দিন পরে / সমিত ভঞ্জ এবং জয়া ভাদুড়ী।

মঞ্চাভিনয়

একটি প্রায় 'অসম্ভব' নাটকের অভিনয়

রবীন্দ্রনাথের "সে" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সালের বৈশাখ মাসে (১৯৩৭-এর এপ্রিল)। তারও প্রায় বছর-ছয়েক আগে এই কাহিনীর কোনো কোনো অংশ নবপর্যায় 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত হয়। কিন্তু পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশের তারিখ থেকে তিরিশ-বত্রিশ বছরের মধ্যে এই আজগুবি খামখেয়ালী রচনাটিকে নাটকাকারে গ্রথিত করবার দুঃসাহস কারুর হয়েছে বলে শুনিনি। হঠাৎ কানে এল, **'চতুরঙ্গ'** গোষ্ঠী এই 'সে'-কে নাটকরূপে অভিনয় করছেন। নাট্যরূপ দিয়েছেন অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। 'চতুরঙ্গ' সম্প্রদায়ের ষোলো বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আমরা নাটকটির অভিনয় দেখলুম গেল ৮ জুলাই রবীন্দ্রসদনে।

প্রথমেই বলি, নাটকের সনাতন রূপ আজ পরিবর্তিত হয়েছে। সংলাপ, চরিত্র-চিত্রণ, দৃশ্যাদি, ধ্বনি এবং আলোর খেলার সাহায্যে মঞ্চে চিত্তাকর্ষকভাবে যাকেই উপস্থাপিত করা যায়, তাই আজ নাট্যপদবাচ্য। তাই অজিত গঙ্গোপাধ্যায় প্রদত্ত রূপটিকেও আমার নাটক নামে অভিহিত করব। অবশ্য "সে"-র নিহিতার্থ যদি হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তাহলে সম্ভবে, অসম্ভবে, সংস্কারে, কুসংস্কারে, বাস্তবে, কল্পনায় জড়িয়ে তুমি-আমি ছাড়া বাকি জগতে যে-নাটক নিত্য অভিনীত হচ্ছে, তার থেকে মাত্র মজাদার রূপটিকেই যদি সাধারণ্যে তুলে ধরা হয়, তাহলে তাকে নাটক নাম দিতে দোষ কি?

'চতুরঙ্গ' গোষ্ঠীকে সাধুবাদ জানাই অনবদ্য আঙ্গিকের সাহায্যে এই 'সে'-কে মঞ্চস্থ করবার জন্যে। কিছুটা রূপকধর্মী, ইঙ্গিতমূলক দৃশ্যের সাহায্যে, অসামান্য আলোক প্রক্ষেপের গুণে তাঁরা যে-মঞ্চমায়ার সৃষ্টি করেছেন, তার পক্ষে কোনো প্রশংসাবাণীই যথেষ্ট নয়।

অদ্ভুত অভিনয় করেছেন নাম-ভূমিকায় মিহির চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে যেন একটি ধরাছোঁওয়ার বাইরের অরূপ চরিত্র রূপ পেয়েছে। নির্দেশক বরুণ দাশগুপ্ত চিত্রিত 'কবি' সৌন্দর্যের প্রতীক। তমালি সেনগুপ্ত 'পুপেদিদি'-রূপে অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে অভিনয় করেছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় সুজন সেনগুপ্ত ও সলিল সেন অনবদ্য। অন্যান্য সকলেই অল্পবিস্তর সু-অভিনয় করেছেন।

চতুরঙ্গ নিবেদিত 'সে' একটি অচিন্ত্যপূর্ব প্রযোজনাসমৃদ্ধ নাট্যোপহার।

কড়ি দিয়ে কিনলাম : পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত ও রক্তাক্ত জীবনের একটি অশ্রুজড়ানো দীর্ঘশ্বাস—একটি সকরুণ মর্মভেদী উপলব্ধি—কড়ি দিয়ে জীবন কেনা যায় না। তবু এই চারদেয়ালে ঘেরা মানুষের জীবনে প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা ও স্বপ্নের দোদুল দোলন, চোখের কোনে ঘর বাঁধার অশ্রান্ত আকুলতা। অগণিত মানুষের বিরাট মিছিলের এক নির্বাক যাত্রী দীপংকর দেখেছে তারই চোখের সামনে কতো স্বপ্নের নীড় বিষন্নতায় ম্লান হোল। ভালোবাসার বন্যায় উত্তাল সতী দীপংকরকে কাছে চেয়েও ঠিক কাছে পেলো না; দুটি অন্তর এক হোতে গিয়েও দুটি পথে বেঁকে গেলো। সতীর স্বামী সনাতন আত্মচেতনো মগ্ন হয়ে সতীর যন্ত্রণাকে স্নিগ্ধতায় ভরে দিতে চাইলো, কিন্তু হয়েও যেন তা হোল না। সমাজের কাছ থেকে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ পেয়ে লক্ষ্মীকে হোতে হোল নষ্টা, দাতারবাবুকে ভালোবেসে বিয়ে করে সব কিছু ছাড়তে হোল। ওদের দুজনের অপাপবিদ্ধ সন্তান মানসকে ঘিরে যে স্বপ্নের কথাকলি, তাও গেল চিরকালের মতো স্তব্ধ হয়ে। কিরণের স্বদেশপ্রেম, ক্ষীরদার নিঃশব্দ ভালোবাসা প্রকাশের ভাষা পেলো না। নৃপবিনীত ঘোষালের প্রাচুর্য ও তাকে আকাঙ্ক্ষিত পথে পৌঁছে দিতে পারল না। অশ্রুসিক্ত অনুভূতি নিয়ে সব শেষ হয়ে যাওয়ার সীমাহীন প্রান্তরে এসে দাঁড়ালো দীপঙ্কর। বিমল মিত্রের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাসের এই মর্মান্তিক জীবনসত্যের ছবিটি সেদিন একটি নাট্যরূপে বিধৃত হোতে দেখলাম রবীন্দ্রসদনে। অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের দক্ষিণ পশ্চিম কলকাতা শাখার কর্মীরা।

শ্রীমিত্রের বহুপঠিত এই উপন্যাসটির জীবনসত্যের গভীরতার কথা স্মরণে রেখে এর নাট্যরূপ কিংবা সম্পাদনা সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন বলে মনে করি। মিঃ ঘোষালের চরিত্রটির মধ্যে যে দাপট ও ব্যক্তিত্ব সবার প্রত্যাশিত, তা মাঝে মাঝে প্রায়ই হাল্কা রসিকতায় শিথিল হয়ে গিয়েছে। চাকর পীরালির সঙ্গে সিগারেট নিয়ে অত কথা বলার মধ্যে বেশ খানিকটা

হাসি বা হাস্যরসের উজ্জ্বলতা থাকতে পারে, কিন্তু তাতে চরিত্রটির দীপ্তি ম্লান হয়েছে। সনাতনদের বাড়ীতে সতীর কথা বলার জন্যও তাঁর আসার কোন তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া গেল না। নাটকের শেষের দিকে মিঃ ঘোষাল এসে যখন সতীর কাছে দীপংকরের জীবন নেবার ভয় দেখিয়ে গেলো, তারপর হঠাৎ সতীর ছুটে যাওয়ার আগে দীপংকরের দু' একটি কথা নেপথ্যে শোনালে ভালো হোত এবং সেই সঙ্গে পাশের ঘর থেকে সনাতনের আহ্বান। এ দুয়ের মাঝে সতীর বেরিয়ে যাওয়াটি হোত যুক্তিযুক্ত। সতীর রেলের তলায় আত্মবিসর্জনের পর ইনসপেকটরের সামনে দীপংকরের গভীরতর উপলব্ধি—কড়ি দিয়ে কিছু জীবন কেনা যায় না, মৃত্যুকেই কেনা যায়—ব্যক্ত করার মধ্যেও খুব বেশী গভীরতার ছোঁয়া দেখতে পাইনি। সব শেষে নেপথ্য কণ্ঠ যা কিছু বলেছে, তাতেও নাটকীয় সেই করুণ মুহূর্তটি বোধ হয় ততটা জমাট বেঁধে উঠতে পারেনি। সতীর আত্মবিসর্জনের পর দীপংকর এসে দাঁড়াতো সেই মর্মন্তুদ বিষণ্ণতার প্রান্তরে, দূর থেকে ভেসে আসতো সতীর কণ্ঠস্বর, যার মধ্য দিয়ে মুখর হয়ে উঠতো সেই করুণ আর্তি কড়ি দিয়ে সব কিছু কেনা যায়, কিন্তু জীবনের সুখ শান্তি কেনা যায় না। আমার মনে হয় এই ধরনের সমাপ্তিই ছিল গভীরতার দিক থেকে প্রত্যাশিত।

এবারে আসি প্রয়োগপরিকল্পনার কথায়। নাট্যনির্দেশক শ্রীসুহৃৎ চট্টোপাধ্যায় প্রথম থেকেই এই নাটকের জীবনসত্য এবং শিল্পসত্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই মনে হয়; অন্তত মঞ্চের আলোয় কয়েকটি যন্ত্রণাদগ্ধ মুহূর্তের সৃষ্টি এই সচেতনতার কথাই প্রমাণ করে। তবুও বলবো সতী ও দীপংকরের বিশেষ ক'টি নিবিড় মুহূর্ত-গুলোর কম্পোজিসন আরো নিটোল আবেগে ভরিয়ে তোলা উচিত ছিল। মিঃ ঘোষাল আর নির্মল পালিতের কথাবার্তায় অতো বেশী হাল্কা উপাদান না আনলেই যুক্তিসঙ্গত হোত।

অভিনয়ের ব্যাপারে প্রথমেই যাঁর কথা বলতে হয় তিনি হোলেন শ্রীমতী মীনাক্ষী গোস্বামী। 'সতী'র চরিত্র রূপায়ণে তিনি যে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছেন, তা ভোলা যায় না কিছুতেই। প্রচণ্ড আবেগের মুহূর্তে তিনি কখনো হয়েছেন উদ্ভ্রান্ত, কখনো যন্ত্রণাকে সংহত করেছেন প্রশান্ত আকাশের মতো। তাঁর সংলাপ উচ্চারণের মাধুর্য, তাঁর চরিত্রচিত্রণের আর একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। শ্রীমতী গোস্বামীর যে প্রাণবন্ত অভিনয়, তার নজীর খুব বেশী চোখে পড়ে না, আর তাঁর চরিত্ররূপায়ণের দীপ্তিতেই সেদিনকার নাট্যপ্রযোজনা প্রোজ্জ্বল হোতে পেরেছে। দীপংকর চরিত্রে কিরণময় লাহিড়ী মোটা-মুটি মানিয়ে নিতে পেরেছেন, কিন্তু অনুভূতির অতল গভীরতার মুহূর্তে তিনি শ্রীমতী গোস্বামীর সঙ্গে ছন্দ মেলাতে পারেননি। অতিথিশিল্পী এন বিশ্বনাথনের 'ঘোষাল' হয়েছে একটি স্বচ্ছন্দ চরিত্রসৃষ্টি

এবং হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (অতিথি) 'নির্মল পালিত', হোতে পেরেছে প্রাণোচ্ছল। 'ফোঁটা' চরিত্রে কানন সেনগুপ্ত দর্শককে কেশ কিছু হাসিয়েছেন, কিন্তু শ্রীমতী রেবা চ্যাটার্জির 'লক্ষ্মীদি' মনকে স্পর্শ করতে পারেনি। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব এনেছেন শ্রীমতী বকুল ঘোষ 'নয়নরহিনী' চরিত্রে।

অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন অরজিৎ গুহ (দাতার), সুরজিত ঘোষ, শৈলেন দে, কমল ঘোষ দস্তিদার, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, সুব্রত ঘোষ, মাস্টার দিলীপ রায়, রামানুজ রায় (সনাতন), অতুল চ্যাটার্জি, উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, তপন রায়, প্রণব ঠাকুরতা, মাস্টার দীপংকর গোস্বামী ও শ্রীমতী দীপা মজুমদার।

আলোকসম্পাতে ছিলেন প্রখ্যাত তাপস সেন, তাঁর আলোর চাতুর্যে নিশ্চয়ই অনেক মুহূর্ত প্রাণ পেয়েছে। সতী যে রাত্রে দীপংকরের কাছে এলো এবং পাশের ঘরে শুতে যাবার পর দীপংকরের মানসিক উদ্ভ্রান্ততাকে কি আলোর ব্যঞ্জনায় আরো শৈল্পিক কিংবা অনুভূতিমদির করে তোলা যেতো না? উচ্ছ্বসিত না হোলেও বলতে পারি শেষের দিকে ট্রেন চলার দৃশ্যটি ছিল উচ্চস্তরের।

পত্রিকা সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীদের আগামী নাট্যপ্রযোজনা : পর পর দু' বছরের মতো এবারও অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীরা নাট্য-প্রযোজনায় ব্রতী হয়েছেন। এবারে তাঁদের নাটক হোল নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা'। পরিবেশিত হবে 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে আগামী ১৫ই আগস্ট সকাল ৯টায়। নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীদিলীপ মৌলিক।

বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেবেন সমীর মিত্র, প্রবীর সেন, প্রকাশ ঘোষ, নিশীথ বড়াল, অচ্যুত সিনহা, অর্ণব ঘোষ, দীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন বোস, কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, অপূর্ব চ্যাটার্জি, কমল রায়-চৌধুরী, জগবন্ধু ভাণ্ডারী, অবিনাশ দে, শচীন সেন, সত্য ঘোষ, শ্রীমতী সাইন, শিপ্রা চক্রবর্তী, আরতি ঘোষ, পলিন তপাদার ও দিলীপ মৌলিক।

একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা : শ্রীরামপুর প্রিমরোজ মিউসিকাল এসোসিয়েশনের পরিচালনায় একটি একাঙ্ক নাট্য প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে আগামী ১৫ই আগস্ট। যোগাযোগের ঠিকানা : শ্রীশঙ্করশেখর চন্দ্র, ইণ্ডিয়া জুট কোঃ লিমিটেড, ১১, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলকাতা—১ (ফোন : ২২-১৬৬১)।

বিবিধ সংবাদ

'বাংলাদেশ'-এর শিল্পীরা দল বেঁধেছেন

জানা গেছে এ পর্যন্ত ছা[illegible]-জন শিল্পী ও কলাকুশলী জঙ্গীশাহী ইয়াহিয়ার মরণ-ফাঁদ এড়িয়ে কোনরকমে কলকাতায় এসে উঠেছেন। আবার এঁরা যূথবদ্ধ হচ্ছেন কলকাতায় নতুন শিল্পী-জীবন সুরু করবার জন্যে। এঁরা সম্প্রতি একটি ঘরোয়া আলোচনায় মিলিত হয়েছিলেন। এবং নিজস্ব একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে তুলেছেন—নামঃ 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলী সমিতি'। সভাপতি : জাহির রায়হান, যুগ্ম সহঃ-সভাপতি : কবরী চৌধুরী ও নারায়ণ ঘোষ (মিতা), সম্পাদক : হাসান ইমাম, কোষাধ্যক্ষ : চিত্ত চৌধুরী, কার্যকরী সমিতির সদস্য হচ্ছেন : সুভাষ দত্ত, এম এ খয়ের, জাফর ইকবাল ও রাজু আহমেদ। স্থির হয়েছে সমিতির উদ্যোগ-আয়োজনে কলকাতা, দিল্লী ও বোম্বাইয়ে স্থানীয় শিল্পীদের সহ-যোগিতায় তিনটি বিচিত্র অনুষ্ঠান হবে। বিচিত্রানুষ্ঠানগুলির সংগৃহীত অর্থ বাংলাদেশের শিল্পী ও কলাকুশলীদের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হবে। খবরটি দিয়েছেন প্রযোজক চিত্ত চৌধুরী।

প্রবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

গত ৬ জুন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলাদেশের সাহায্যার্থে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। এই বিচিত্রানুষ্ঠানের টিকিট বিক্রয়লব্ধ টাকা বাংলাদেশের সংগ্রামী ভাইবোনদের সাহায্যার্থে পাঠানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন—পূর্ণেন্দু ঘোষ, সন্দীপ দে, দেবশীষ মিত্র, প্রভাত ব্যানার্জী, শচী সেনগুপ্ত, দীপ্তি ঘোষ, প্রভাতী ব্যানার্জী, শ্রীমতী মিত্র, মিতালী সান্যাল ও ডালিয়া সিনহা। বিচিত্রানুষ্ঠানের পর বিষ্টুপদ দত্ত পরিচালিত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাটক 'বাঘ' অভিনীত হয়। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করেন : বিষ্টুপদ দত্ত, শুভকীর্তি মজুমদার, সুদীপ সিনহা, বীরেন ব্যানার্জী, তপন মিত্র, প্রণব ব্যানার্জী, দেবল দাশগুপ্ত, চন্দ্রশেখর দাশ, কৃষ্ণা সরকার, কেকা ঘোষ ও অজয় চট্টোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানে 'সার্চ লাইট' পত্রিকার সম্পাদক সুভাষচন্দ্র সরকার সভাপতিত্ব করেন। বিষ্টুপদ দত্ত এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

পি সি সরকার (জুনিয়র) : লখনৌ-স্থিত এক পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দুই সপ্তাহব্যাপী যাদুকর শ্রীপ্রদীপচন্দ্র সরকার তাঁর "ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী" চালান। শ্রীসরকার তাঁর এই ম্যাজিক শো থেকে ৫০,০০০,০০ টাকা বাংলাদেশের শরণার্থী তহবিলে দান করার কথা ঘোষণা করেন। তিনি লখনৌয়ের প্রদর্শনী শেষ করে এলাহাবাদ যাত্রা করবেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রায় একঘণ্টাকাল এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে শ্রীসরকার (জুনিয়র)-কে একটি পুষ্পস্তবক উপহার দেন এবং বাংলা দেশ শরণার্থী তহবিলে শ্রীসরকারের ৫০,০০০,০০ টাকা দানের কথা উল্লেখ করে তিনি দেশের প্রতিটি শিল্পীর ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ স্বরূপ বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

অভ্যুদয় সংসদ

অভ্যুদয় সংসদ পরিচালিত ত্রৈ-মাসিক পত্রিকা 'অভ্যুদয়'এর বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সম্প্রতি সংসদ প্রাঙ্গণে দুইদিনব্যাপী এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কবি শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅনল ভৌমিক।

প্রথমদিনের অনুষ্ঠানে আধুনিক ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন মঞ্জুশ্রী রায়, ধূর্জটি মুখার্জী, হরবোলা মণ্টু ভট্টাচার্য শিশুশিল্পী মুনমুন রায় শিখা চক্রবর্তী, দেবযানী ভট্টাচার্য, বাপী রায়, নমিতা সেনগুপ্ত, করবী রায়। তবলা সঙ্গতে অলোক আচার্য ও সমীর বিশ্বাস। দ্বিতীয়দিনের উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে অংশ নেন কালিপদ দাস, মঞ্জুশ্রী রায় এবং নীরা ঘোষ। তবলায় ছিলেন সমর সাহা, নির্মল গাঙ্গুলী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অলোক আচার্য।

প্রবাসী বাঙালীদের অনুষ্ঠান

সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের আয়োজনে সম্প্রতি স্থানীয় বাংলা স্কুলে ভাগলপুরের বাংলা-ভাষীদের অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান "বঙ্গ পূর্ণিমা সম্মেলন" বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সুখ্যাত শিল্পীরা এতে অংশ গ্রহণ করেন। শহরের বিশিষ্ট নাগরিক ডাঃ দিব্যেন্দু[illegible] মুখোপাধ্যায় ও "খেয়া সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ" এর সভাপতি শ্রীঅমলচন্দ্র মিত্র বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে তিনটি গীতিআলেখ্য "বঙ্গ প্রণাম," "রবীন্দ্র বন্দনা" ও "জয় বাংলা" অনুষ্ঠিত হয়।

ঘটনা / পরিচালনা : পীযূষ গাঙ্গুলী। সাহা ফিল্মস নিবেদিত। মাধবী চক্রবর্তী এবং শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

সবশেষে শ্রীরণজিত মুখোপাধ্যায় রচিত "ওসিয়তনামা" একাভিনীত হয়। ভাগলপুর শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সার্থকভাবে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটি প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে আনন্দ-উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল।

সি এন টির বিচিত্রানুষ্ঠান

চিলড্রেন্স নভেল থিয়েটার-এর এপার বাংলার শিশু শিল্পিবৃন্দ ওপার বাংলার শিশুদের সাহায্যার্থে ২০ জুন রবিবার সকাল ৯টায় বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে গীতি আলেখ্য 'আমার সোনার বাংলা' থিয়েটার-শপ বীরেশ্বর বিবেকানন্দ ও মুখোস নাটিকা রূপকথা পরিবেশিত হয়েছে। সংস্থা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, টিকিট বিক্রয়-লব্ধ সমুদয় অর্থই দান করা হবে।

সংগঠনীর বার্ষিক উৎসব : সম্প্রতি দুর্গাপুরের মিশ্র ইস্পাত সংগঠনীর দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়।

সঙ্গীতাংশে অংশগ্রহণ করেন অরুণ দাস, স্বপন গুপ্ত, অনিল দত্ত, ডালিয়া ব্যানার্জি ও কৃষ্ণা রায় এবং সংগঠনীর সভ্যবৃন্দ কর্তৃক শ্রীরতনকুমার ঘোষ রচিত নাটক 'পিতামহদের উদ্দেশ্যে' শ্রীহীরক রায়ের সুষ্ঠু পরিচালনায় ও প্রতিটি শিল্পীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় স্থানীয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে।

শরৎ স্মৃতির বিচিত্রানুষ্ঠান : সম্প্রতি হাওড়া বৈষ্ণবঘাটাতে শরৎ স্মৃতি সঙ্ঘের চতুর্থ বার্ষিকী উৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন গুণী শিল্পীসমাবেশে অনুষ্ঠানটি খুবই স্মরণীয় হয়ে ওঠে।

অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অমল মুখোপাধ্যায়, আশীষ মুখোপাধ্যায়, সলিল মিত্র, সুপ্রকাশ চাকী, শিপ্রা চট্টোপাধ্যায়, পি রাজ প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। আশীষ মুখোপাধ্যায় ও সলিল মিত্রের গান শ্রোতাদের বিশেষ আনন্দ দেয়। সঙ্গীতে সহযোগিতা করেন রত্নেশ্বর রায়। অনুষ্ঠান পরিচালনার কৃতিত্ব তপন চট্টোপাধ্যায়ের।

মঞ্চরথের মহরৎ

সম্প্রতি মঞ্চরথ সংস্থা এক আড়ম্বর-পূর্ণ আসরে দুটি নতুন নাটকের মহরৎ করলেন। এই উদ্যমের আশীর্বাদক ছিলেন চলচ্চিত্র প্রযোজক স্বপন রায়। বসন্ত ভট্টাচার্যের 'ধুলো বালির মাটি' এবং অধ্যাপক অলোক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নিহত অমৃত সন্তান' হচ্ছে এঁদের নতুন নিবেদন। নাটক দুটি জুলাই মাসেই মঞ্চস্থ হবে কলকাতার কোনো এক মঞ্চে। সঙ্গে অমর গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'জীবন যৌবন'ও থাকবে। তিনটি নাটকের নির্দেশক হচ্ছেন ধ্রুব দাস, সুদর্শন ভট্টাচার্য ও স্মৃতিময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

পি সি সরকার (জুনিয়ার)কে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী।

খেলাধূলা

দর্শক

ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দল

১৯৭১ সালের ইংল্যাণ্ড সফরের চতুর্থ খেলায় ভারতীয় ক্রিকেট দল শেষ পর্যন্ত কাউণ্টি ক্রিকেট লীগ চ্যাম্পিয়ান কেণ্ট দলকে জয়লাভে বঞ্চিত করেছে। খেলার ফলাফল অমীমাংসিত। এর জন্যে কৃতিত্বের বড় অংশীদার হলেন বিশ্বনাথ। দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ১১৫ রান তুলে অপরাজিত থাকেন। এখানে উল্লেখ্য উপর্যপোরি খেলায় তাঁর এই দ্বিতীয় সেঞ্চুরী রান।

প্রথম দিনে কেণ্ট দল প্রথম ইনিংসের ৮ উইকেটের বিনিময়ে ৩১৪ রান তুলে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। অপরদিকে খেলার বাকি সময়ে ভারতীয় দল দুটো উইকেট খুইয়ে মাত্র ৩২ রান তুলেছিল। ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক কলিন কাউড্রে কেণ্ট দলে খেলেননি। প্রথম উইকেটের জুটিতে ডেনিস এবং লাকহার্স্ট ১২৫ রান তুলে খেলার ভিত খুবই শক্ত করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ১৬৩ রানের মাথায় শেষ হলে কেণ্ট দল ২৩১ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১৭৬ রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

কেণ্টের অধিনায়ক মাইক ডেনিস ভারতীয় দলকে 'ফলো-অন' থেকে অব্যাহতি দেন। দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের ১০টা উইকেটই হাতে জমা রেখে ৩১ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে ভারতীয় দলের ২৬৪ রানের মাথায় (৭ উইকেটে) খেলাটি শেষ হয়। খেলায় জয়লাভ করতে ভারতীয় দলের ৪০৮ রানের প্রয়োজন ছিল। মানকাদ এবং বিশ্বনাথ ২য় উইকেটের জুটিতে ১৩ রান সংগ্রহ করেছিলেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

কেণ্ট : ৩১৪ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। লাকহার্স্ট ১১৮, জন শেফার্ড ৭৬, ডেনিস ৫৯ এবং নট ৪৯ রান। ভেঙ্কটরাঘবন ৯৩ রানে ৩ এবং বেদী ১০১ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৭৬ রান (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। নিকলস ৫৭ এবং এলহাম ৮৭ রান। ভেঙ্কটরাঘবন ৪৭ রানে ২ উইকেট)

ভারতীয় দল : ১৬৩ রান (বেগ ৫৩ এবং সোলকার নটআউট ৫০ রান। গ্রাহাম ৬০ রানে ৩ এবং শেফার্ড ৩৩ রানে ৪ উইকেট)

ও ২৬৪ রান (৭ উইকেটে। বিশ্বনাথ নট আউট ১১৫ এবং মানকাদ ৫২ রান। গ্রাহাম ৫৭ রানে ২ এবং শেফার্ড ৪১ রানে ২ উইকেট)

সফরের পঞ্চম খেলায় ভারতীয় দল এক ইনিংস ও ৫০ রানে লিস্টার্স কাউণ্টি ক্রিকেট দলকে পরাজিত করেছে। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের এই দ্বিতীয় জয়। চার বছর আগে ১৯৬৭ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে এই লিস্টার্স দলের কাছেই ভারতীয় দল ৭ উইকেটে হেরেছিল।

প্রথম দিনে লিস্টার্স দলের প্রথম ইনিংস ১১৮ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতীয় দল বাকি সময়ে কোন উইকেট না খুইয়ে ১২০ রান তুলেছিল। গাভাস্কার
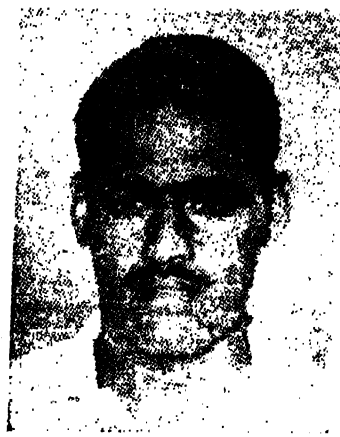
চন্দ্রশেখর

৫৪ রান এবং অধিনায়ক ওয়াদেকার ৩৬ রান করে অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দল তাদের প্রথম ইনিংসের ৪১৬ রানের মাথায় (৭ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ভারতীয় দলের পক্ষে সেঞ্চুরী করেন গাভাস্কার (১৬৫ রান) এবং ওয়াদেকার (১২৬ রান)। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে গাভাস্কার এবং ওয়াদেকার ২৪০ মিনিটে দলের ২৩১ রান তুলে দিয়েছিলেন।

সুনীল গাভাস্কার

ওয়াদেকারের ১২৬ রানে একটা ওভার-বাউণ্ডারী এবং ১৮টা বাউণ্ডারী ছিল। দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে লিস্টার্স দল দ্বিতীয় ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে ৪৭ রান সংগ্রহ করেছিল। তৃতীয় দিনে লাঞ্চের ১০ মিনিট পর লিস্টার্স দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৬৮ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতীয় দল এক ইনিংস ও ৫০ রানে জিতে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

লিস্টার্স দল : ১১৮ রান (ডাডলস্টন ৫১ এবং ইনম্যান ৪১ রান। চন্দ্রশেখর ৬৩ রানে ৫, ভেঙ্কটরাঘবন ৩১ রানে ২ এবং প্রসন্ন ৪২ রানে ২ উইকেট)

ও ১৬৮ রান (বলডারস্টোন ৬৩ রান। চন্দ্রশেখর ৬৪ রানে ৬ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ৩১ রানে ৩ উইকেট)

ভারতীয় দল : ৪১৬ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। গাভাস্কার ১৬৫, ওয়াদেকার ১২৬, মানকাদ নটআউট ৪৩ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ৩৮ রান। ব্রিকেনশ ২৮ রানে ৩ উইকেট)

পয়েণ্টের খতিয়ান রাশিয়া বনাম আমেরিকা

বছর	পুরুষ বিভাগ		মহিলা বিভাগ		মোট পয়েণ্ট	
	আমেরিকা	রাশিয়া	রাশিয়া	আমেরিকা	রাশিয়া	আমেরিকা
১৯৫৮	১২৬	১০৯	৬৩	৪৪	১৭২	১৭০
১৯৫৯	১২৭	১০৮	৬৭	৪০	১৭৫	১৬৭
১৯৬১	১২৪	১১১	৬৮	৩৯	১৭৯	১৬৩
১৯৬২	১২৮	১০৬	৬৬	৪১	১৭২	১৬৯
১৯৬৩	১১৯	১১৪	৭৫	২৮	১৮৯	১৪৭
১৯৬৪	১৩৯	৯৭	৫৯	৪৮	১৫৬	১৮৭
১৯৬৫	১১২	১১৮	৬৩-৫	৪৩-৫	১৮১-৫	১৫৫-৫
১৯৬৯	১২৫	১১০	৬৭	৭০	১৭৭	১৯৫
১৯৭০	১১৪	১২২	৭৮	৫৯	২০০	১৭৩
১৯৭১	১২৬	১১০	৭৬	৬০	[illegible]	[illegible]

স্টকহোমের আন্তর্জাতিক এ্যাথলেটিকসের ৮০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকারী কেনিয়ার রবার্ট ওইকো (২১৩নং) এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী আমেরিকার টম ভ্যান রুডেন (৭৭নং)।

রাশিয়া বনাম আমেরিকা

১৯৭১ সালের রাশিয়া বনাম আমেরিকার ১০ম দ্বৈত অ্যাথলেটিকস অনুষ্ঠানে আমেরিকা ১২৬—১১০ পয়েণ্টে পুরুষ বিভাগে এবং রাশিয়া ৭৬—৬০ পয়েণ্টে মহিলা বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেছে। উভয় দেশেরই মোট পয়েণ্ট ১৮৬। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সমান মোট পয়েণ্ট সংগ্রহের নজির এই প্রথম।

এপর্যন্ত পুরুষ বিভাগে প্রথম স্থান পেয়েছে আমেরিকা ৮ বার এবং রাশিয়া ২ বার। অপরদিকে মহিলা বিভগে শীর্ষস্থান পেয়েছে রাশিয়া ৯ বার এবং আমেরিকা ১ বার। একই বছরের আসরে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে প্রথম স্থান পেয়েছে রাশিয়া ২ বার (১৯৬৫ ও ১৯৭০) এবং আমেরিকা ১ বার (১৯৬৯)। মোট পয়েণ্টের ভিত্তিতে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে রাশিয়া ৭ বার এবং আমেরিকা ২ বার। সমান পয়েণ্টের দরুণ সিরিজ অমীমাংসিত ১ বার (১৯৭১)।

রাশিয়া বনাম আমেরিকার এই দ্বৈত অ্যাথলেটিকস অনুষ্ঠানের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব খুবই বেশী এই কারণে যে, ১৯৫২ সালে অলিম্পিক গেমসে রাশিয়ার প্রথম যোগদানের সময় থেকেই আমেরিকার একটানা প্রাধান্য খর্ব হয়েছে। বিগত পাঁচটি আসরে রাশিয়া ৩ বার এবং আমেরিকা ১ বার বে-সরকারী পদক এবং পয়েণ্ট সংগ্রহের তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছিল। ১৯৫২ সালে রাশিয়া এবং আমেরিকা যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হকি দলের অস্ট্রেলিয়া সফর

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হকি দল কৃপাল সিংয়ের নেতৃত্বে তাদের অস্ট্রেলয়া সফরে এখনও অপরাজেয় আছে। এপর্যন্ত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হকি দলটি ৬টি ম্যাচ খেলেছে। উল্লেখযোগ্য জয়- ভিকটোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিপক্ষে ৯-১ গোলে এবং সম্মিলিত অস্ট্রেলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিপক্ষে ৬-২ গোলে।

ডেভিস কাপ

পশ্চিম জার্মানী এবং রুমানিয়া ইউরোপীয়ান জোনের 'বি' গ্রুপের ফাইনালে উঠেছে। 'বি' গ্রুপের বিজয়ী দেশই ভারতবর্ষের বিপক্ষে ইন্টার জোন সেমি-ফাইনালে খেলবে। গত বছরের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে আমেরিকার কাছে পশ্চিম জার্মানী হেরেছিল। অপরদিকে রুমানিয়া চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে হেরেছিল ১৯৬৯ সালে, আমেরিকার কাছে। ভারতবর্ষ ১৯৬৬ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ১-৪ খেলায় পরাজিত হয়েছিল।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

১৯৭১ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলা শেষ হওয়ার মুখে। লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপের লড়াইয়ে দুই প্রধান এবং পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগানের খেলাটি ১-১ গোলে ড্র গেছে। বর্তমানে মোহনবাগানের ১৩টা খেলায় ২৫ পয়েণ্ট এবং ইস্টবেঙ্গলের ১২টা খেলায় ২৩ পয়েণ্ট দাঁড়িয়েছে। লীগ তালিকার তৃতীয় স্থানে আছে মহমেডান স্পোর্টিং—১২টা খেলায় ২২ পয়েণ্ট। একমাত্র এই দুটি ক্লাব মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল এখনও কোন খেলায় হার স্বীকার করেনি।

কালাপানির দেশে

হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'কালাপানির দেশে' প্রবন্ধটি পড়লাম। আন্দামান সম্বন্ধে তথ্যসম্বলিত প্রবন্ধ আগেও পড়েছি। এই প্রবন্ধে তিনটি তথ্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বিশেষভাবে।

(১) কাঠ সাজান হাতির কথা। মাহুতের ইঙ্গিতে বিরাট বিরাট হাতী শুঁড় ও দাঁতের সাহায্যে বড় বড় গাছের খণ্ডকে লরীর উপরে সাজিয়ে দিচ্ছে। সরকারী কর্মী হিসেবে এইসব হাতীর জন্য বেতন নির্দিষ্ট থাকে; সব জমা থাকে সরকারী তহবিলে। হাতী বৃদ্ধ বয়সে যখন কর্ম থেকে অবসর নিতে বাধ্য হয় তখন সেই জমা টাকা থেকে এদের ভরণ-পোষণ এবং সবরকম ব্যয়নির্বাহ হয়।

(২) 'লোকাল' নামে চিহ্নিত মানব-গোষ্ঠী। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীরা মুক্তি পাবার পরে যারা দেশে না ফিরে ওখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করে; তাদেরই সন্তানসন্ততি সব। তারা জাতিধর্মের পূর্বতন পরিচয় ভুলে গিয়ে অথবা অগ্রাহ্য করে অতীত ইতিহাসবিহীন, ঐতিহ্যবিহীন একটি জাতিতে পরিণত—ইতিহাসের এক বিচিত্র সৃষ্টি।

(৩) আন্দামানের [illegible]দের গুরুতর অভিযোগ — মেইন ল্যাণ্ডের মানুষেরা আন্দামান সম্পর্কে উদাসীন। অভিযোগ অমূলক নয়। আন্দামান দেখবার জন্য কেউ সেখানে বেড়াতে যান এমন প্রায় শোনা যায় না। আমার অগণিত আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে একজন গিয়েছিলেন সরকারী কর্ম উপলক্ষে পঞ্চাশ বৎসর আগে। তাঁর নিকট থেকে আন্দামানের অনেক কথা শুনেছিলাম সেকালে। সাম্প্রতিককালে আমার একজন তরুণ আত্মীয়বন্ধু আন্দামান দেখবার জন্যই ছুটি নিয়ে সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। আন্দামানের বাঙালীদের পক্ষে ভারতবর্ষের লোকদের সহিত সংযোগ সংস্পর্শ রক্ষা করা সহজ নয়; সেজন্য ভারতবর্ষের লোকেরা তাদের প্রতি উদাসীন —এটা তাদের কাছে মর্মান্তিক। 'আমাদের কথা তাঁদের বলবেন—আমাদের কথা বলবেন' তাঁদের এই আকুতি অত্যন্ত লক্ষ্যণীয় এবং প্রণিধানযোগ্য। যাদের সঙ্গে এককালে আমাদের সংযোগ সম্পর্ক ছিল তারা এখনও আমাদের স্মরণ করেন কিনা এই ভাব এই nostalgia মনোজগতের একটি লক্ষ্যণীয় সত্য। এই সম্পর্কে স্মরণ করা যেতে পারে দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' কাব্য। কবি ভার্জিলের পরিচালনায় দান্তে সশরীরে নরক দর্শনে গিয়েছেন। নরকের বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পাপীদের আবাসস্থল এবং কর্মভূমিও। ভার্জিলের সহায়তায় দান্তে স্তর পর্যায়ে সব পর্যটন করে দেখে যাচ্ছেন। সকল স্তরেই দান্তের পরলোকগত অনেক আত্মীয়বন্ধুদের সাক্ষাৎ পেতে লাগলেন। তাঁরা সকলেই দান্তের নিকট থেকে তাঁদের ছেড়ে আসা পৃথিবীর বিশেষত নিজ নিজ দেশের এবং জনগণের সংবাদ জানবার জন্য উৎসুক, সবচেয়ে একথাটুকু জানবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত—আমাদের আত্মীয়-বন্ধুরা কি এখনও আমাদের কথা স্মরণ করেন। কাব্যের কথাটুকু কল্পনার বিষয়। কিন্তু দান্তে তাঁর কবিদৃষ্টিতে মানুষের মনোজগতের সেই চিরন্তন তত্ত্ব—সেই nostalgia প্রকাশ করে তার সূক্ষ্ম কবিদৃষ্টিরই পরিচয় দিয়েছেন।

—সত্যভূষণ সেন,
গৌহাটী-১১, আসাম।

টুশু গানে জনজীবন

'অমৃত'র ৩রা আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅমিয় দত্তর 'টুসুগানে জনজীবন' পড়ে আনন্দ পেলাম। এর জন্যে আপনাকে ও অমিয়বাবুকে ধন্যবাদ। পুরুলিয়ায় আমি তিন বছর ছিলাম। পুরুলিয়ার গ্রামীন মানুষদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য হয়েছে এবং ছৌ নাচ ও টুসুগানে সবিশেষ আনন্দ ও বিস্ময় বোধ করেছি। শ্রীঅমিয় দত্তর রচনায় স্থান পায় নি, এমনকিছু টুসু গানের সংগ্রহ আমি জানাচ্ছি, যদি 'অমৃতে' প্রকাশ করেন বাধিত হব।

১৯৬৬ সালে যখন পুরুলিয়া জেলা 'খরা'র কবলে পড়ল, তখন চাষীরা মনের দুঃখে গাইতে লাগল :

১। মায়া মেঘে আশাতে ভুলাল
খেতের ধান খেতেতেই মরিল। বং
২। যার আছে বহাল চাষ
তার কিছু বা আছে আশ
বাদ চাষা ঝাঁপড়ে মরিল। বং
ওদের বিরহগীতঃ—
১। যার অদর্শনে রইতে নারি ঘরে
যার তরে সদা দুনয়ন ঝরে
ধরায় ধরা যায়গো ভেসে,
নারি সম্বরিতে।
আহা মরি মরি, কি উপায় করি
আমার নারী জনম গেল কাঁদিতে।। বং
আমি ভাবি যারে সেও সে যদি ভাবিত
কি সুখ হইত জীবনেতে।।
২। মনে হলে সকল যায় গো ভুলে
সুখ দুঃখের কথা বলতে নারি খুলে
মনের কথা হিয়ায় গাঁথা
আমার রইল মনসুতে।
আমি বলব মনে করি,
বলিতে না পারি
আমার নারী জনম গেল কাঁদিতে।। বং
৩। রাখালিয়া রিতি কি জানে পিরীতি
আমরা অবলা নারী যুবতী
দিনে দিনে এ জীবন যায় গো কাঁদিতে।
আমি না ভাবিলাম আগে,
প্রেমের অনুরাগে
ঝাঁপ দিলাম প্রেমের সাগরেতে।। বং
আরও তিনটি উল্লেখযোগ্য টুসুগীতঃ—

১। সিঁড়ি সিঁড়ি রোদ উঠেছে,
তুষু এ্যাখন উঠে না
উঠ তুষু, চাতন কর,
হামায় জ্বালা দিয়ঃ
দিয় না দিয় না জ্বালা,
উঠরে রতনধন
কোলে করে নিয়ে যাব,
যুথায় পাব চাঁদমালা

২। কুলগাছে কুইলিনি ডাকে
ডাংগাছে কঠর কাঠা
আমার টুসু ফাঁদ পেতেছে
লাগেছে রাজার বেটা।

৩। "ডবল ডবল পানের খিলি
এত কেনে চুন দিলি
এতদিনের ভালবাসা
আজ কেন জবাব দিলি
ও তুই ভালবাসা রাখতে পারলি কৈ
যেমন উড়ে গেল ধানের খৈ।।"

বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাকসাড়, হাওড়া

স্ত্রীশিক্ষা উষালগ্নে

গত ১০ই আষাঢ় ১৩৭৮ সন প্রকাশিত পত্রিকাতে শ্রদ্ধেয় "আশা দেবী"কৃত লেখাটি পড়লাম। সেখানে দেখলাম ১৮৬১ সাল ৭ই মে বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু "প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়" পড়লে দেখতে পাওয়া যায় (পাতা ২৭৯, ২৮০ এবং ৪০৫) যে ১৭৬০ খৃঃ বিবি হেজেস কর্তৃক (Mrs Hedges) প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি প্রথম বালিকা বিদ্যালয় বলিয়া জানা যায়। এখানে ফরাসী ভাষা ও নৃত্যকলাও শিক্ষা দেওয়া হত। কেরি সাহেবের গ্রন্থে মিসেস পিটের (Mrs Pithis) বিদ্যালয়ই প্রথম বালিকা বিদ্যালয় বলে উল্লিখিত আছে। ইহা ১৮০০ খৃঃ প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের জন্য স্থাপিত হয়েছিল। এছাড়া "ডারেল" নাম্নী (Mrs Durrelli) এক মহিলা ১৭৭৯ খৃঃ শুধু মাত্র স্ত্রীলোকদের জন্য এক স্কুল স্থাপন করেছিলেন। [illegible] যুগে বেথুন বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী 'মদনমোহন তর্কালঙ্কার'-এর দুই কন্যা 'ভুবনমালা' ও 'কুন্দমালার' নাম না করায় প্রবন্ধটির গুরুত্ব কিছুটা ম্লান হয়ে যায়।

সুনীলকুমার নিয়োগী, আসানসোল

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩
হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

det
blue
det
whitens
while it washes
clean

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫·০০	টাকা ৩০·০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১২·৫০	টাকা ১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬·২৫	টাকা ৮·০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১১শ বর্ষ
১ম খণ্ড

১২শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 23rd July 1971 শুক্রবার—৬ই শ্রাবণ ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীনিতাই ঘোষ

এক নজরে

দাম্পত্য কলহে গুরুক্রিয়া ঃ

দাম্পত্য কলহকে যাঁরা অজ-যুদ্ধ বা ঋষির শ্রাদ্ধের মতো সাড়া জাগানো শুরুর হাস্য-লঘু পরিণতি ভেবে নিশ্চিন্ত থাকতে চান তাঁরা ১৯৬৯ সালে ভারতে আত্মহত্যার তালিকাটি পর্যালোচনা করলে অবশ্যই হতবাক হবেন। সম্প্রতি সংসদে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পক্ষ থেকে ১৯৬৯ সালে সারা ভারতে আত্মহত্যার যে সরকারী হিসাব পেশ করা হয় তাতে দেখা যায়, ঐ বছরে যে ৪৩,৬৩৩টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে তার মধ্যে প্রায় আট শতাংশ হ'ল দাম্পত্য কলহের শোচনীয় পরিণতি। মোট ৩,৪৯১জন স্বামী বা স্ত্রী অপর পক্ষের বাক্যবাণ বা পীড়ন সহ্য করতে না পেরে আপন হাতে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। শতকরা হিসাবে এত অধিক আত্মহত্যা আর কোন কারণে হয়নি।

দাম্পত্য কলহের পরেই স্থান নিয়েছে পারিবারিক কলহ। পিতামাতা বা অন্য কোন অভিভাবকের সঙ্গে বিরোধ করে আত্মঘাতী হয়েছে শতকরা সাড়ে সাতজন। একে বিগত ও বর্তমানকালের মারাত্মক বিরোধও বলা যায়, যা আজ সারা বিশ্বের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে পরীক্ষায় ব্যর্থতার জন্য এখনো যে বছরে হাজার দুয়েক ছেলেমেয়ে লজ্জায় দুঃখে বা হতাশায় আত্মহত্যা ক'রে থাকে সেটা অনেকের কাছেই একটা বড় রকমের সংবাদ ব'লে মনে হ'বে। পরীক্ষায় ফেল করার ব্যাপারটা যেযুগে 'আমলাতন্ত্রের স্বৈরাচার' ব'লে মনে করা হয়ে থাকে সেসময়ে এক বছরে ১৯৬৮জন ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষায় ব্যর্থতার জন্য আত্মহত্যায় সত্যই উল্লেখ করার মতো সংবাদ।

১৯৬৯ সালে প্রেমে ব্যর্থতার জন্য আত্মহত্যা করে হৃদয়ের জ্বালা জুড়িয়েছে মোট ১৪৩৯জন। অন্যান্য কারণে আত্মঘাতীর সংখ্যা ছিল মোট ২৩,৭২৫জন। আত্মহত্যার সব ঘটনা সরকারের কাছে ঠিক মতো পোঁছায় না। বহু আত্মহত্যাকে অপঘাত বা আকস্মিক মৃত্যু ব'লে প্রচার করা হয় এবং পারিবারিক মর্যাদার কথা চিন্তা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও তা এক রকম মেনে নেন। এসব দিক বিবেচনা করলে বছরে প্রায় অর্ধলক্ষ মানুষের স্বহস্তে জীবননাশের ঘটনাকে কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না।

যুক্তি সবেরই আছে ঃ

সেদিন রোমে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিলেন ইতালির বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন বিরোধী আন্দোলনের নেতা, ক্যাথলিক আইন অধ্যাপক সিনর গ্যাবরিও লম্বার্ডি। উদ্দেশ্য, বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের বিরুদ্ধে অতি স্বল্পকালের ব্যবধানে যে বিপুল সংখ্যক গণ-স্বাক্ষর (১৩,৭০,১৩৪) সংগৃহীত হয়েছে এবং যেভাবে জনমত সংগঠিত হয়েছে সে বিষয়ে দেশবাসীকে অবহিত রাখা। কেন তাঁরা বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের বিরোধী তাও তাঁরা জানাতে চেয়েছিলেন দেশের "মোহগ্রস্ত" বুদ্ধিজীবী মহলকে। সাংবাদিক সম্মেলনের গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল সিনোরা লিনা মারলিন অধ্যাপক লম্বার্ডির পাশে উপবিষ্ট থাকাতে। ইতালির সর্বজন শ্রদ্ধেয়া ঐ নারী নেত্রীর আন্দোলনের ফলেই ১৯৫৮ সালে ইতালিতে পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ হয়। সিনোরা মারলিন একজন সেনেটরও।

সিনর লম্বার্ডির বক্তব্যের সার কথা হ'ল—যদি বিবাহের [illegible] হও তবে বিবাহ ক'রো না; যদি পরিণয়সূত্রের বন্ধন ভারি ব'লে মনে হয় তবে প্রেম সূত্রেই বাঁধা থাকো চিরকাল; ঐ প্রেমবন্ধনকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়ার কথা রাষ্ট্র না হয় নতুন ক'রে ভাবতে পারে (একটা 'লিগ্যাল কংকুবাইনেজ' জাতীয় আইন পাশ করে)। কিন্তু বিবাহের পবিত্র বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, ধর্মকে অপবিত্র ক'রো না, আর শঙ্কিত ক'রে তুলোনা ইতালির নারীকুলকে।

ইতালির নারীদের সম্মুখে যে ভয়ংকর দিন অপেক্ষা করছে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে অধ্যাপক লম্বার্ডি বলেন, নারীর রূপ-যৌবন ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং পুরুষদের যদি পছন্দমতো স্ত্রী-বদলের সুযোগ রাষ্ট্রই আইন ক'রে সহজলভ্য ক'রে দেয় তবে তাতে ইতালির চল্লিশোর্ধ্বা মায়েরাই বিপন্ন হবেন সবচেয়ে বেশি। এখন থেকে তাঁরা বাড়িতে কোন যুবতী নবাগতা দেখলেই নিজের আশঙ্কিত দুর্দিনের আতঙ্কে শিউরে উঠবেন। এর ফলে ক্রমে ক্রমে নারীরা হয়ে উঠবেন অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ, সংসারের শান্তি হবে লুপ্ত এবং ইতালির সমাজজীবনের নৈতিক মান নেমে যাবে কোন রসাতলে।

অধ্যাপক লম্বার্ডির যুক্তিগুলি অবশ্য সাংবাদিকদের মনে কোনই দাগ কাটতে পারেনি। পরন্তু একজন সাংবাদিক—'এগুলি নয়া ফ্যাসিবাদীদের কথা' ব'লে মন্তব্য করলে অধ্যাপক লম্বার্ডি এত উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে তারপর চিৎকার ও হৈ হট্টগোলে সভার কাজ আর চলা সম্ভব হয়না। কিন্তু সিনর লম্বার্ডির যুক্তিগুলি, বিশেষ ক'রে ইতালির মাতৃজাতি সম্পর্কে তাঁর শঙ্কা-শিহরিত উক্তিগুলি যদি কারও মনে বিন্দুমাত্রও দাগ কাটে তাদের জানা দরকার যে, বিবাহ-বিচ্ছেদের উপায় এতদিন ইতালিতে ছিল না বলেই সেদেশের দশ লক্ষাধিক নরনারী এমনভাবে জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছেন যেটা সমাজ ও আইনের চোখে জঘন্য ব্যভিচার ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বামী বা স্ত্রীকে ত্যাগ করে তাঁরা অন্য পুরুষ বা নারীর সঙ্গে বাস করছেন বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ না ক'রেই। সুতরাং ইতালির নারীজাতির অমর্যাদা যদি কিছু হয়ে থাকে ত তা এতদিনই হয়েছে, একমাত্র বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনই তাদের সে অমর্যাদাকর অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারে। দাম্পত্যজীবন যখন অসহনীয় হয় তখনই মানুষ বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা চিন্তা করে, তার সঙ্গে রূপ-যৌবনের কোন সম্পর্ক নেই। ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানো স্বভাব যাদের তারা অন্য লোক, তাদের অল্পই বিবাহ করে, করলেও সে বিবাহ সুখের হয়না, তাদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যও বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের প্রয়োজন। আর যাঁরা বিবাহ-বিচ্ছেদ করেন তাঁদের ক'জনই বা বৃদ্ধাকে ত্যাগ করেন যুবতীর পাণিপীড়নের উদ্দেশ্যে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এক বিগতযৌবন ডাইভোর্সি নতুন ক'রে ঘর বাঁধছেন আর এক বিগতযৌবনার সঙ্গে। পশ্চিমী দুনিয়ায় ষাটোত্তীর্ণ নরনারীর নতুন ক'রে সংসার পাতার ঘটনা নিতান্তই স্বাভাবিক। ডাইভোর্স যেসব দেশে ব্যাপক-প্রযুক্ত অতি সাধারণ বিধি, সেসব দেশে গেলেও দেখতে পাওয়া যাবে, 'ওল্ড এজ হোম' বা পার্কের নির্জন কোণগুলি গোধূলির ম্লান মুহূর্তেও গুঞ্জরিত হচ্ছে পলিত-কেশ প্রায়-চলচ্ছক্তিহীন অতিবৃদ্ধ দয়িত-দয়িতাদের নিভৃত আলাপনে। অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তবু কথার শেষ নেই। সে মিলনে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে মৃত্যু, আইন নয়।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ সমস্যা ও ভারত

পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা দুনিয়ার দরবারে এমন একটা ইঙ্গিত রাখবার চেষ্টা করছেন যে, বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রাম ও গণ-অভ্যুত্থানের ব্যাপারটা আসলে ভারত-পাকিস্তান সমস্যারই নামান্তর। সুতরাং এ সম্পর্কে ভারতের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ে কথা বলে একটা নিষ্পত্তি করা যায়। পাকিস্তানের সুহৃদ কিছু কিছু দেশ এই অপপ্রচারে রীতিমত বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং যখন বিদেশে গিয়েছিলেন, তখন কোনো কোনো দেশে তাঁকে এ-ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বোঝাপড়া সম্ভব কি না। এ থেকেই বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কে বিদেশীদের ধারণা কত অস্পষ্ট ও ভ্রান্ত। ভারত যেহেতু প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ভারতে এসে আশ্রয় নিচ্ছে সেই কারণে ভারতের সঙ্গে বোঝাপড়া করলেই বিষয়টির সুরাহা হবে বলে তাঁরা মনে করেন।

খুব সরলভাবেই তাঁরা সমস্যার সমাধান করতে চান এবং সেজন্যই পাকিস্তানকে নিন্দা করা বা তাকে সাহায্য বন্ধ করার উৎসাহ অনেক মুরুব্বি দেশেরই তেমন দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের সমস্যায় ভারত জড়িয়ে পড়েছে সেখান থেকে আগত শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়া নিয়ে। এত বৃহৎ একটি গণ-অভ্যুত্থান এবং এমন নৃশংস গণ-হত্যার প্রতিক্রিয়ায় ভারতের মাটি ভীত, সন্ত্রস্ত ও বিতাড়িত শরণার্থীদের দ্বারা ভারাক্রান্ত। মানবিক কারণেই ভারত এই দুর্বহ বোঝা গ্রহণ করেছে। কিন্তু তাই বলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে ভারত সরকার পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যাবে কেন?

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ গত সপ্তাহে ঘোষণা করেছেন যে, সামরিক জয়ই বাংলাদেশ পরিস্থিতির একমাত্র সমাধান। বাংলাদেশের কোনো এক স্থানে জাতীয় পরিষদের ১১০ জন সদস্য ও প্রাদেশিক পরিষদের ২০০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় চূড়ান্ত জয় না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার শপথ গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব তাদেরই হাতে ন্যস্ত। পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা অস্ত্রশক্তি দিয়ে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্মূল করে দেবার যে চেষ্টা করছে তার বিরুদ্ধেই বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রাম। একে ভারত-পাকিস্তান বিরোধ বলে চালানোর পুরানো সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় কোনো ফল হবে না। বোঝাপড়া ইসলামাবাদকে করতে হবে বাংলাদেশের সঙ্গে, বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের সঙ্গে।

আইরিশ পার্লামেন্টের দুজন সদস্য বাংলাদেশ পরিস্থিতি সরেজমিন তদন্ত করে যাবার পর কলকাতায় বলেছিলেন যে, তাঁরা এই ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে রাজী আছেন। এই মধ্যস্থতা নিশ্চিতই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নয়। তাঁরা নিজেরাই পরে বিষয়টি পরিষ্কার করে বলেছেন যে, তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে এই বিরোধের সালিশী হিসেবে কাজ করতে রাজী। কিন্তু কার সঙ্গে সালিশী? বিশ্ব ব্যাঙ্ক মিশনের সদস্যদের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে পূর্ববাংলার ধ্বংসের এক মর্মন্তুদ বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিদেশীরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতেই দেখেছেন। তাঁরাই বলেছেন যে, সমগ্র পূর্ববাংলায় যে-ধ্বংসের চিত্র দেখে এসেছেন তা পারমাণবিক বোমাবর্ষণের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত কোনো এলাকার সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে।

পাকিস্তানী জঙ্গী শাসকরা একটি দখলদারী বাহিনী হিসেবে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে তাদের চণ্ড আক্রমণের দ্বারা। লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহারা, অর্থনীতি বিপর্যস্ত। রাজনৈতিক কর্মীদের বেছে বেছে হত্যা করা হয়েছে। যাঁদের হাতের কাছে পায়নি তাঁদের সম্পত্তি ক্রোক ও বাড়িঘর ধ্বংস করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলার মুক্তিসংগ্রামীরা কার সঙ্গে আপোস আলোচনা করবেন? যাঁরা মধ্যস্থতার কথা ভাবছেন তাঁদের সদিচ্ছার প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে এই কথাই বলা যায় যে, বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার দাবির স্বীকৃতি ছাড়া কোনোরূপ মধ্যস্থতার আলোচনা ফলপ্রসূ হতে পারে না। পাকিস্তান কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দুই পাকিস্তান সৃষ্টি করে গিয়েছিল ভারতকে দুই দিক থেকে সব সময় চাপ দেবার জন্য। গত ২৩ বছর সেই অপকর্মই করেছে পাকিস্তানীরা। বঙ্গবন্ধু মুজিবুরের নেতৃত্বে বাঙালীর চেতনা জাগ্রত হয়ে সেই বিষবৃক্ষ মূল শুদ্ধ উপড়ে ফেলেছে। পাকিস্তানের সমাধি রচিত হয়েছে বাংলাদেশে। বন্দুক বেয়নেট দিয়ে সেই সমাধি হয়তো আরও কিছুদিন পাকিস্তানীরা আগলে রাখবে। কিন্তু বাংলাদেশের নবজন্ম তারা রোধ করতে পারবে না। সেই নবজন্মের স্বীকৃতিই যে কোনো আপোস আলোচনার একমাত্র ভিত্তি। তাদের দুই পক্ষ হবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সার্বভৌম স্বাধীন সরকার। ভারতকে এর মধ্যে জড়ানোর চেষ্টা রাজনৈতিক ছলনামাত্র।

এই বছরই মার্চের নির্বাচনের আগে যা সম্ভব হয়নি, আগামী নির্বাচনের আগে সেই সি-পি-এম বিরোধী ফ্রন্ট কি পশ্চিম বাংলায় গড়ে উঠবে? এখনই স্পষ্ট করে কিছু বলার সময় আসেনি, কারণ এখনও কিছুই জমাট বাঁধে নি, সবই নিতান্ত ভাসা ভাসা। শুধু নেতাদের মধ্যে মাঝে মাঝে আলোচনা, আর কোনো কোনো দলের নেতাদের মনে সি-পি-এমকে একঘরে করার বাসনা।

সি-পি-এম বিরোধী একটি ফ্রন্টের সম্ভাবনা পশ্চিম বাংলার হাওয়ায় ভাসতে সুরু করেছে সেই দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের পর থেকেই। ১৯৬৭ সালের অকটোবরে অজয় মুখোপাধ্যায় যখন প্রথম যুক্তফ্রন্ট ভাঙতে উদ্যত হয়েও পিছিয়ে এসেছিলেন তখন মোটামুটি একটা সমঝোতা হয়েই গিয়েছিল যে তিনি এই রাজ্যে একটি কম্যুনিষ্ট-বিরোধী মন্ত্রিসভা গঠনে নেতৃত্ব দেবেন। ১৯৭০ সালের মার্চে অজয়বাবু যখন দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের মৃত্যুদণ্ডে সই করলেন তখন সেরকম কোনো স্পষ্ট সমঝোতা হয়নি, কিন্তু সি-পি-এম বিরোধী একটা সরকার গঠনের আশা বজায় ছিল জুলাই পর্যন্ত। সেই জন্যেই বিধানসভা তখনও জীইয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সেই আশা তখন পূর্ণ হল না। কারণ তখন যারা আটপার্টি জোট বলে পরিচিত ছিল, তারা মনে-প্রাণে সি-পি-এম বিরোধী হয়েও কংগ্রেস বিরোধিতার অভ্যাস কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বিশেষতঃ সোস্যালিস্ট ইউ-নিটি সেন্টার ও ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসের সংগে সহযোগের দ্বারা নিজেদের বামপন্থী চরিত্রে মসীলেপনে মোটেই উৎসাহী ছিল না।

ইতিমধ্যে ঐ বছরই সেপ্টেম্বরে কেরলে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সেখানে কংগ্রেস সি-পি-আই নির্বাচনী আঁতাত মিনি ফ্রন্টকে সাফল্য এনে দিল। তখনই কথা উঠল, তা হলে পশ্চিম বাংলাতেও কি ঐ ধরনের আঁতাতের সাহায্যে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টিকে কাবু করা সম্ভব? কেরলের রাজনীতির ছায়া এর আগেও পশ্চিম বাংলার ওপর পড়েছে। কেরলে যুক্তফ্রন্টে ভাঙন ছিল এই রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট ভাঙার সূচনা। সেইজন্যেই কথাটা জোরদার করে উঠল। কিন্তু সি-পি-আই তখনও মনস্থির করতে পারেনি। তবু আট পার্টি জোটের অন্যান্য দল, বিশেষতঃ এস-ইউ-সি ও ফরওয়ার্ড ব্লক, জানতে চাইল যে, সি-পি-আই পশ্চিম বাংলাতেও কংগ্রেসের সংগে হাত মেলাবে কিনা। সি-পি-আই নেতারা তাদের আশ্বস্ত করলেন যে, না, তাঁরা তা করবেন না।

অবশ্য সি-পি-আইয়ের মনস্থির করতে বেশি সময় লাগল না। অকটোবরেই জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবে পার্টির রণকৌশল স্পষ্ট হয়ে উঠল। 'কংগ্রেস বিরোধিতার বস্তাপচা নীতি' বিসর্জনের ডাক দিয়ে সি-পি-আই পশ্চিম বাংলায় সি-পি-এম-বিরোধী ফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব করল। প্রথমে আট পার্টি জোটকে ন'-পার্টি জোট করে তোলা হবে বাংলা কংগ্রেসকে দলে টেনে, তারপর সেই ন'-পার্টি জোট কংগ্রেসের সংগে করবে নির্বাচনী সমঝোতা—এইভাবে এগোনোই ছিল সি-পি-আই-এর লক্ষ্য। কিন্তু সে-লক্ষ্যও পূর্ণ হল না।

তার কারণ ছিল একাধিক। প্রথমতঃ আট পার্টি জোটের অনেকেই তখনও কংগ্রেসের সংগে এইভাবে হাত মেলানোতে রাজী ছিল না। বাংলা কংগ্রেসের সকলেই আট পার্টি জোটে ভিড়তে উৎসাহী ছিলেন না। বিশেষতঃ সুশীল ধাড়া সবরকম কম্যুনিষ্টদের সম্পর্কেই ছিলেন সন্দিহান, তা সি-পি-আই মার্কাই হোক, আর সি-পি এম মার্কাই হোক। আট পার্টি জোটের সংগে বাংলা কংগ্রেসের বোঝাপড়া হলে মেদিনীপুরে আসন ভাগাভাগির কী হবে, সে প্রশ্নও ছিল। তা ছাড়া, সি-পি-আই-এর ঐ প্রস্তাব গ্রহণের কিছুদিন পরেই কংগ্রেসের অধিবেশনেও কম্যুনিষ্ট পার্টির সংগে দেশব্যাপী সমঝোতার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল। ঐ সময়েই সি-পি-আই চেয়ারম্যান এস এ ডাঙ্গে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে 'প্রগতিপন্থী কংগ্রেসীদের' কাছে সরাসরি চিঠি লিখে আরো জল ঘোলা করে তুললেন, কারণ অনেক কংগ্রেস নেতাই এটাকে ভালো চোখে দেখলেন না। পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যেও যে সকলে সি-পি-আইয়ের সংগে প্রকাশ্যে আঁতাতে আগ্রহী ছিলেন তাও নয়।

তবে সি-পি-আই-এর উদ্যোগ বানচাল হয়ে গেলেও নির্বাচনের আগে প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা চলেছে সি-পি-এম বিরোধী ফ্রন্ট গড়ে তোলার। আট পার্টি জোটকে সংগে না পেলেও অন্ততঃ কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেসের আঁতাত হতে হতেও শেষ পর্যন্ত হল না। তার মধ্যে একদিকে যেমন দায়ী সুশীল ধাড়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তেমনই অপর দিকে ছাত্র পরিষদ ও যুব-কংগ্রেসের মনোভাব। নির্বাচনে যে বিপর্যয় বাংলা কংগ্রেসের জন্যে অপেক্ষা করেছিল, সুশীলবাবু তার আঁচ তখনও পাননি, তাই তাঁর দাবি ছিল শতাধিক আসনের। শেষ পর্যন্ত যে তিনটি আসন নিয়ে তিনি নাছোড়বান্দা হয়ে উঠেছিলেন, সেই তিনটি আসনেই যে বাংলা কংগ্রেস প্রার্থীদের জমানত জব্দ হয়েছে, একথা সুশীলবাবুর সংগে ঝগড়ার পর অজয়বাবুই জানিয়েছেন। কংগ্রেসের মধ্যে একাংশ বাংলা কংগ্রেসের এই অতিরিক্ত দাবি মেনে নিতে খুব অরাজী ছিলেন না, কিন্তু বেঁকে বসেছিল ছাত্র-পরিষদ যুব-কংগ্রেস। তারা অতগুলি আসন বাংলা কংগ্রেসকে ছাড়তে রাজী ছিল না, কারণ তাদের ধারণা ছিল একা লড়াই করে কংগ্রেস অনেক ভালো ফল দেখাতে পারবে। তাদের ধারণা যে মিথ্যে নয়, নির্বাচনের ফলাফলই তার প্রমাণ।

•

এই পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটবার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, এইসব কথা মনে রাখলে ভবিষ্যতের ছবিটা বুঝতে সুবিধে হয়। এথেকে এটুকু অন্ততঃ বোঝা যাবে যে, পশ্চিম বাংলায় একটি সি-পি-এম-বিরোধী ফ্রন্ট গড়ে তোলার আগে তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠতে হবে : (১) কংগ্রেস এই ফ্রন্ট গড়তে কতোটা আগ্রহী ; (২) সি-পি আই-এর নীতি কী হবে ; এবং (৩) এস-ইউ-সি, ফরওয়ার্ড ব্লক সি-প-এম-বিরোধী-তার জন্যে কংগ্রেস-বিরোধিতা ত্যাগ করবে কিনা।

এস-ইউ-সি'র কথা বাদ দিলে এই সব দলের সামনে এখন একটি পথ রয়েছে—গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনকে জীইয়ে রাখা। সি-পি-এমকে ক্ষমতায় আসতে না-দেওয়ার জন্যেই এই কোয়ালিশন গড়ে উঠেছিল। বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার পরই যাতে এই জোট ভেংগে না যায় তার জন্যে চেষ্টা সুরু হয়েছে গোড়া থেকেই। বিজয় সিং নাহার এই জোট জীইয়ে রাখার জন্যে সংগে সংগেই ডাক দেন, তাঁর সুরে সুর মেলান অজয়বাবুও। সি-পি-আই-এর আগ্রহও চাপা থাকে না, কারণ, কোয়ালিশনের ন্যূনতম কর্মসূচী যাতে রাষ্ট্রপতির শাসনের সময় রূপায়িত হয় তার জন্যে শরিকদের আন্দোলন গড়ে তুলতে ডাক দেয় সি-পি আই। মুসলিম লীগও এই ধরনের জোট বাঁচিয়ে রাখতেই চায়, কারণ এই জোটই তাদের পশ্চিম বাংলার মতো রাজ্যে প্রথম ক্ষমতার স্বাদ পেতে সাহায্য করেছে।

কংগ্রেসের সকলেই কিন্তু আঁতাতের পক্ষপাতী নয়। তার কারণ, তাঁদের একাংশ বিশেষ করে নবীনদের অনেকেই 'একলা চল

রে' নীতিতে বিশ্বাসী। একলা চললেই কংগ্রেসের সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি, কারণ জোড়াতালি দেওয়া ফ্রন্টের ওপর ভোট-দাতাদের অনেকেরই আস্থা নেই। গত নির্বাচনে কংগ্রেস ও সি-পি-এম-এর সাফল্যই তার প্রমাণ। তবে 'একলা চল-রে' নীতি হিসেবে গৃহীত হবে কিনা তা নির্ভর করবে দুটো জিনিসের ওপর। এক, দিল্লী অর্থাৎ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কী চান এবং দুই, সংগঠন হিসেবে কংগ্রেস কতোটা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে। এখনও পর্যন্ত কিন্তু কংগ্রেসের সকলে ঠিক এক কদমে চলতে পারছেন না।

অবশ্য আসন ভাগাভাগির মতো বড় প্রশ্নটাকেও কখনই লঘু করে দেখা উচিত নয়। যে-কোনো জোটের সামনেই এটা বড় প্রশ্ন। সি-পি-এম বিরোধী জোটে কংগ্রেস ক'টি আসন পেয়ে সন্তুষ্ট থাকবে? দশ-বারোটি দলকে নিয়ে জোট গড়লে কংগ্রেসের মতো বড় শরিকেরও শ' খানেকের খুব বেশি আসন পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে অনেকেই চান অন্ততঃ দেড় শ'র বেশি আসন। এই প্রশ্নটার ফয়-সালা না হলেও জোট গড়ার আলোচনা খুব বেশি এগোতে পারবে না।

সি-পি-আই এখনও সি-পি-এম বিরোধী জোট গড়তে খুবই আগ্রহী। কিন্তু পার্টির ভবিষ্যৎ নীতি অক্টোবরের আগে পাকা হবে না। ঐ সময়েই পার্টির কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

মার্চের সাধারণ নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধীর অসাধারণ সাফল্য দেশের রাজনীতির ছকটাকে পাল্টে দিয়েছে। তার আগে লোকসভায় তিনি ছিলেন কয়েকটি বামপন্থী দলের ওপর নির্ভরশীল। সেই দলগুলির মধ্যে সি পি আই ছিল পুরোভাগে। রাষ্ট্রপতি পদে ভি ভি গিরির নির্বাচনের ব্যাপারে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি শ্রীমতী গান্ধীকে সমর্থন করলেও পরে তারা আবার দূরে সরে যায়। ফলে, কেন্দ্রীয় রাজ-নীতিতে সি পি আইয়ের প্রভাব রীতিমত বেড়ে যায়। ভূপেশ গুপ্তই দেশের 'ছায়া প্রধানমন্ত্রী' — এমন বক্রোক্তিও সেই সময় অনেক মহলে শোনা যেতে থাকে।

কিন্তু এই বছর মার্চে সব কিছু পাল্টে যায়। শ্রীমতী গান্ধী দেশের অবিসম্বাদিত নেত্রী হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, আর পরনির্ভরতার বিপদও কেটে যায়। এই পরিবর্তিত অবস্থায় সি পি আইয়ের পথ কি হওয়া উচিত তা নিয়ে দলের নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ, এখন কংগ্রেসের ওপর চাপ দিয়ে তাকে 'প্রগতির পথে' নিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। অভ্যন্তরীণ নিরা-পত্তা আইনই তার সর্বোত্তম প্রমাণ। সি পি আইয়ের বিরোধিতার জন্যে শ্রীমতী গান্ধী গত বছর এই ধরনের আইন লোক-সভায় আনতে সাহস পান নি। কিন্তু এবার আর শ্রীমতী গান্ধীর মধ্যে কোন দ্বিধা নেই, কারণ তিনি জানেন বিরোধী পক্ষ চেঁচামেচির বেশী আর কিছু করতে পারবে না।

বিহারে ভোলা পাসোয়ান মন্ত্রিসভার প্রতি সি পি আই যে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিল, তা কি পার্টির নীতি পরি-বর্তনেরই সূচনা? নাকি এটা একটা বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপ? এই প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলে শোনা যাচ্ছে। সি পি আইয়ের দাবী অনুযায়ী জমির সর্বোচ্চ সীমা ও শহরের সম্পত্তির সীমা নির্ধারণে প্রগতিশীল বিধায়ক দল রাজী হয়েছিল। তাতে ভোলা পাসোয়ানের সংকট কেটে যায়। কিন্তু তারপরেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্রের সম্পর্কে নিযুক্ত তদন্ত কমিটি বাতিলের প্রশ্নকে একটি ইস্যুতে পরিণত করে সি পি আই কংগ্রেস-প্রভাবিত জোট থেকে বেরিয়ে এল। এর ফলে বিধায়ক দল এখনই হয়ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় নি, কিন্তু সরকারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আর এই বিচ্ছেদ ঘটল ঠিক তখনই যখন অচ্যুত মেনন কেরলে কংগ্রেসকে মন্ত্রিসভায় নিয়ে আসার জন্যে তোড়জোড় করছেন। বিহারে সি পি আইয়ের মনোভাব কেরলের রাজনীতিতে কী প্রতিক্রিয়া ঘটায় এবং তার জল সারা দেশেই বা কতদূর গড়ায় সেটা এখন দেখার মত। সি পি আই এখনও পর্যন্ত যে-কোন মূল্যে কংগ্রেসকে সমর্থনে যে রাজী নয়, বিহারের ঘটনা কি তারই প্রমাণ?

তবু পার্টি হিসেবে সি পি আই এখন রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছেই বলা চলে। পার্টি এখন দক্ষিণে গিয়ে কংগ্রেসের অপ্রয়োজনেও তাকে সমর্থন করবে, অথবা বাঁদিকে ফিরে কংগ্রেস-বিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মেলাবে সেটা তাকে তাড়াতাড়িই ঠিক করতে হবে। সি পি আই কোন্ দিকে চলবে, তার ওপর পশ্চিম বাংলার রাজ-নীতি কোন্ দিকে চলবে তা-ও অনেকটাই নির্ভর করবে। অকটোবরে সেই পথের হদিশ মিলবে।

*

এক হিসেবে এস ইউ সি, ফরোয়ার্ড ব্লক ও আর এস পিও এখন রাস্তার মোড়েই দাঁড়িয়ে। গত নির্বাচনে আর এস পি সম্পূর্ণই একলা চলেছিল, তার মাশুলও তাকে দিতে হয়েছিল। নির্বাচনের পরে অবশ্য এই দল বিধানসভায় মোটামুটি মার্কসবাদীদেরই সমর্থন করেছে। ফরোয়ার্ড ব্লক এবং এস ইউ সি কংগ্রেস ও সি পি এম থেকে সমদূরত্বের নীতিরই পক্ষপাতী ছিল, তাই কংগ্রেস-বিরোধী ফ্রন্ট শেষ পর্যন্ত হতে পারে নি। কিন্তু মধ্যপন্থার মাশুল এই দুটি দল তথা সংযুক্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকেও দিতে হয়েছিল। বৃটিশ শ্রমিক নেতা অ্যানিউরিন বিভানই সম্ভবত একবার বলেছিলেন যে, মাঝ রাস্তা দিয়ে চললে গাড়ী চাপা পড়ার সম্ভাবনাই বেশী। গত নির্বাচনে ইউ-এল-ডি-এফ প্রায় গাড়ী চাপাই পড়েছিল।

গত নির্বাচনে এস ইউ সি বা ফরোয়ার্ড ব্লক যদি কংগ্রেস-বিরোধিতার সাবেকী নীতি ত্যাগ করতে না পেরে থাকে তবে এখন কি পারবে? গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকারকে সমর্থন করেছিল ফরোয়ার্ড ব্লক, কিন্তু এখন এই দল বাধাবাধকতা থেকে মুক্তি পেয়ে নতুনভাবে সব জিনিসটা ভেবে দেখতে চায়। সি পি এম সম্বন্ধে অবশ্য দলের সম্পাদক অশোক ঘোষের মনোভাব খুবই স্পষ্ট। তিনি বলেই দিয়েছেন, বাম-পন্থী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে মার্কসবাদীরা বিপজ্জনক। কংগ্রেসকেই তিনি বরং বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দল বলেছেন। কিন্তু তবু ফরোয়ার্ড ব্লক এখনও পাকা কথা দিতে নারাজ।

এস ইউ সি'র আচরণেও দ্বিধা এখনও কাটে নি। ঘোরতর কংগ্রেস-বিরোধী এই দলটির স্থান মতাদর্শের দিক থেকে সি পি এমের বামেই হওয়া উচিত, দক্ষিণে নয়। কিন্তু তবু তার পক্ষে সি পি এমের সঙ্গে চলা যে সম্ভব হচ্ছে না তার কারণ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে সি পি এম সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা। ব্যক্তিগত ব্যাপারও যে এর মধ্যে নেই তা নয়। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় শ্রম দপ্তরের দাবীদার ছিলেন সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সি পি এম শ্রমদপ্তর কিছুতেই ছাড়তে চায় নি। এস ইউ সি এটাকে প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমলে সুবোধবাবুর শ্রমনীতির সমালোচনা বলেই মনে করে-ছিল।

এস ইউ সি'র দ্বিধা আরও স্পষ্ট হয় যখন দেখি এসব সত্ত্বেও এই দল বিধান-সভায় মার্কসবাদীদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। এস ইউ সি কি এই দ্বিধা কাটিয়ে উঠবে? সি পি এম সম্পর্কে যদি এই দল বীতশ্রদ্ধ হয়ে থাকে তবে কি তারা কংগ্রেস-বিরোধিতার নীতি পরিত্যাগ করবে? এস ইউ সি এখন ফরোয়ার্ড ব্লক ও আর এস পি'কে নিয়ে নতুন ফ্রন্ট তৈরীর চেষ্টা শুরু করলেও তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করার বিশেষ কারণ নেই। কারণ, পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে মাঝ-পথটা ক্রমশই বেশী বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

১৬।৭।৭১ —দেব দুত্ত

দেশ বিদেশ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসনের উপদেষ্টা ডাঃ হেনরি কিসিঞ্জার নয়াদিল্লি থেকে প্যারিসে যাওয়ার পথে ইসলামাবাদে নেমেছিলেন। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে কিছু দূরে নাথিয়াগলি নামে একটি নিরিবিলি জায়গায় তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়েছিল। তখন বলা হয়েছিল যে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং সেই কারণে তাঁর প্যারিস যাত্রায় কয়েকদিন দেরীও হয়ে গেছে।

ডাঃ কিসিঞ্জার কি সে সময়ে সত্যই অসুস্থ ছিলেন? অথবা, সম্পূর্ণ গোপনে তিনি যাতে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সারতে পারেন সেজন্য এই 'অসুস্থতা'র খবর ছড়ান হয়েছিল? তিনি কি এই সময়ে চুপে-চাপে আওয়ামী লীগের আইন-বিষয়ক উপদেষ্টা ডাঃ কামাল হোসেনের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশ প্রশ্নের মীমাংসার সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন? অথবা, স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গেই কি তাঁর এই ফাঁকে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল? সংবাদপত্রে এই ধরনের কিছু জল্পনা প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে যে, ৯ থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত যখন ডাঃ কিসিঞ্জারের নাথিয়াগলিতে থাকার কথা সে সময়ে তিনি আসলে ছিলেন পিকিংয়ে। সেখানে কম্যুনিস্ট চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে তিনি প্রায় ২০ ঘণ্টা কাল গোপনে কথাবার্তা বলেছিলেন।

এই গোপন ও নাটকীয় দূতিয়ালিরই চমকপ্রদ পরিণতি :—প্রেসিডেণ্ট নিকসনকে চীন সফরের আমন্ত্রণ এবং প্রেসিডেণ্ট নিকসন কর্তৃক সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এতবড় চাঞ্চল্যকর ও তাৎপর্যময় সংবাদ আর পাওয়া যায় নি।

পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল ও সবচেয়ে ধনবহুল দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জমানো বরফ অবশ্য কিছুকাল আগে থেকেই গলতে শুরু করেছে; কিন্তু চীনের দেওয়ালের ওপার থেকে যে এত তাড়াতাড়ি সাড়া আসবে এবং খোদ আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের জন্য পিকিংয়ে লাল কার্পেট বিছানোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাবে, এটা সম্ভবত অনুমান করা যায় নি।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এই হাওয়া বদল যে ভিতরে ভিতরে ধীরে ধীরে ঘটছে তার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। এটা যে কত বড় হাওয়া বদল সেটা সদ্য অতীতের ইতিহাস স্মরণ করলেই বোঝা যাবে। ১৯৫৭ সালের কথা। সাত বছর আগেই চীনের মূল ভূখণ্ড কম্যুনিস্ট শাসনের অধীনে এসে গেছে। ঐ বছর সানফ্রান্সিস্কোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্রসচিব জন ফস্টার ডালেস একটি বক্তৃতায় বললেন, চীনে কম্যুনিস্ট শাসন 'একটা সাময়িক ঘটনামাত্র, স্থায়ী ব্যাপার কিছু নয়।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'ঐ শাসনের অবসানে যথাসাধ্য সাহায্য করা আমাদের নিজেদের প্রতি, বন্ধুদের প্রতি ও চীনা জনগণের প্রতি আমাদের কর্তব্য।'

অন্যদিকে, চীনের নেতারাও ক্রমাগত 'আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের' বাপান্ত করেছেন। ফরমোজা প্রণালীতে কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে দুই দেশ একাধিকবার বিপজ্জনকভাবে পরস্পরের প্রায় মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। তাইওয়ান প্রশ্ন নিয়েও দুই দেশের বিরোধ ঘনীভূত হয়েছে।

কিন্তু প্রকাশ্যে প্রচণ্ড বাদবিসম্বাদের মধ্য দিয়েও আমেরিকার সঙ্গে চীনের একটা প্রচ্ছন্ন যোগাযোগ ছিল। ষাটের দশকের গোড়াতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বুঝতে পারে যে, চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে 'কম্যুনিস্ট শাসন উৎখাত করার আশা নিতান্তই মিথ্যা। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সানফ্রান্সিস্কো শহরে একটি বক্তৃতায় মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের 'ব্যুরো অব ইণ্টেলিজেন্স অ্যাণ্ড রিসার্চ'-এর সেই সময়কার ডিরেকটর রোজার হিলসম্যান বললেন, 'আমাদের একথা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই যে, চীনে কম্যুনিস্ট শাসনের উচ্ছেদ ঘটবার কোন সম্ভাবনা রয়েছে।' কিন্তু রোজার হিলসম্যানের এই বক্তৃতারও আগে থেকে, এমনকি ডালাসের বক্তৃতারও আগে থেকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে আলোচনা চলেছে। প্রথমে জেনিভাতে ও পরে ওয়ারসতে এইসব আলোচনা নিয়মিতভাবে না হলেও ধারাবাহিকভাবে চলে এসেছে। এইসব আলোচনার বিবরণ সাধারণত গোপন রাখা হলেও এটুকু জানা আছে যে, এইসব আলোচনার ভিতর দিয়ে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে বোঝাপড়ায় আসা ও অন্ততঃ আংশিকভাবে সেই বোঝাপড়াকে কাজে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সম্পাদিত ঐ চুক্তির বলে চীনে আটক ৪০ জন আমেরিকানকে মুক্তি দেওয়ার কথা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে চারজন বাদে আর সকলে মুক্তি পেয়েছিলেন। অবশিষ্ট ঐ চারজনের মুক্তির প্রশ্নেই ১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই ওয়াশিংটন-পিকিং সংলাপ নিষ্ফল হয়ে যায়। সে সময়ে চীন দ্বিপাক্ষিক পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন, পারস্পরিক বাণিজ্য, সাংবাদিক বিনিময় ইত্যাদি যেসব প্রস্তাব দিয়েছিল সেগুলি সবই আমেরিকা অগ্রাহ্য করেছিল—১৯৫৫ সালের চুক্তি পুরোপুরি চালু করার দাবীতে। পরবর্তীকালে এই আলোচনায় প্রতিবন্ধকতা এসেছে চীনের তরফ থেকে। পর্যবেক্ষকদের খবর এই যে, ওয়ারসতে পিকিংয়ের প্রতিনিধি ১৯৫৮ সাল থেকে ক্রমাগত বলে এসেছেন, আমেরিকা 'চীনের ভূখণ্ড' ছেড়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যকার কোন বকেয়া সমস্যার কথা আলোচনাই করা যাবে না, অর্থাৎ ফরমোজার উপর কম্যুনিস্ট চীনের অধিকার মেনে না নেওয়া পর্যন্ত আমেরিকার সঙ্গে দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের কোন সমস্যা আলোচনা করতে চীন অনিচ্ছুক।

যদিও জেনিভা ও ওয়ারসর আলোচনা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি তথাপি প্রমাণ আছে

যে, ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালে চীন ও ফরমোজার মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে উঠলেও ১৯৬১ সালে লাওসের সংকটের সময় ঐ দুই দেশের যোগাযোগ উত্তেজনা প্রশমনে সহায়তা করেছিল। এটা লক্ষণীয় যে, দুই পক্ষ প্রকাশ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে যতই দোষারোপ করুক যোগাযোগের সূত্রটি তারা নষ্ট করতে চায় নি। তারা চায় নি বলেই জেনিভা ও ওয়ারসতে দুই দেশের দূতরা এযাবৎ প্রায় দেড়শ গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছেন।

রিচার্ড নিকসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে চীনের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়েছেন। ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রেসিডেণ্ট নিকসন বলেন, 'চীনের গণ-প্রজাতন্ত্র নিজেরাই নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তারা যখনই এই বিচ্ছেদ কাটিয়ে উঠবে তখনই আমরা তার নেতাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য তৈরি হয়ে আছি।'

চীনের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ইদানীং প্রেসিডেণ্ট নিকসন একজন ভাল মধ্যস্থ পেয়েছেন। তিনি হলেন রুমানিয়ার প্রেসিডেন্ট চৌসেস্কু। নিকসন ও চৌসেস্ক একে অন্যের দেশ সফর করে গেছেন এবং তাঁদের মধ্যে নিভৃত আলোচনাও হয়েছে। আর পূর্ব ইউরোপে রুমানিয়াই একমাত্র কম্যুনিস্ট দেশ যার সঙ্গে চীনের সদ্ভাব আছে। পাকিস্তানের নেতারাও এই ঘটনা-গুলিতে সাহায্য করে থাকতে পারেন।

অন্যদিকে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর ১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি সময় চীন তার আগেকার অন্তর্মুখিতা পরিত্যাগ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ দেখাতে আরম্ভ করে। সেই আগ্রহের সবচেয়ে বড় প্রকাশ ঘটল তার 'পিংপং কূটনীতির' মধ্যে। আমেরিকান টেবিল টেনিস টীমকে চীনে খেলার আমন্ত্রণ জানিয়ে পিকিং সারা পৃথিবীকে চমকিত করে। এরই পর প্রেসিডেণ্ট নিকসন কয়েক দফায় চীনের সঙ্গে আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্য ও সেদেশে মার্কিন নাগরিকদের যাতায়াত সংক্রান্ত বাধানিষেধ শিথিল করার কথা ঘোষণা করেন।

সব শেষে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এল প্রেসিডেন্ট নিকসনের এই ঘোষণাঃ 'মার্কিন প্রেসিডেন্টের চীন সফর করার ইচ্ছা করে কিসিংগারের কাছ থেকে জানতে পেরে চীন আগামী বছর যে মাসের মধ্যে সফর করতে যাওয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং আমি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি।''

আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই নূতন পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে এখন ভারত-বর্ষকেও তার চীনা নীতি পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। এতদিন যাবৎ পিকিং-নয়াদিল্লি সম্পর্ক পিকিং-ওয়াশিংটন সম্পর্কের সমান্তরাল ধারায় চলে এসেছে। এখনও যদি সেই সমান্তরাল ধারা বজায় রাখতে হয় তাহলে ভারতকে চীনের সঙ্গে অধিকতর স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে নয়াদিল্লিতে যে ভারত-মার্কিন বৈঠক হয়েছিল তাতে মার্কিন প্রতিনিধি দল ভারত সরকারকে আমেরিকার চীনা নীতি পরিবর্তন সম্পর্কে যথেষ্ট আভাস দিয়ে গিয়েছিলেন। ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের সে সময়কার রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী বি আর ভগৎ তখন রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে সেকথা জানিয়েছিলেন।

এখন নয়াদিল্লি যদি পিকিংয়ের সঙ্গে সম্পর্কটা স্বাভাবিক করার জন্য উদ্যোগী হয় তাহলে পিকিং থেকে কি সাড়া পাওয়া যাবে? ভারত-চীন সম্পর্কের দিকে নজর রাখা যাঁদের কাজ তাঁরা হাওয়া বোঝার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। হংকং-এ অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সংবাদদাতা যে ককটেল পার্টি দিয়েছিলেন তাতে চীনা সাংবাদিকরা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে মেলামেশা ও হাসি-গল্প করেছিলেন. এটাও লক্ষ্য করে ভারতীয় সাংবাদিকরা তার মানে বোঝার চেষ্টা করেছেন।

চীন থেকে আরও একটি প্রত্যাশিত সংকেতের জন্য পর্যবেক্ষকরা অপেক্ষা করছেন। সেটা হচ্ছে এই যে, চীন এবার 'পিংপং কূটনীতির' খেলায় ভারতকেও জড়াতে পারে। আগামী নভেম্বর মাসে পিকিংয়ে যে আফ্রো-এশিয়া টেবিল টেনিস খেলার আয়োজন করা হয়েছে তাতে যোগ দেওয়ার জন্য ভারতকে আমন্ত্রণ করা হয় কিনা সেদিকে পর্যবেক্ষকরা লক্ষ্য রাখছেন।

ইতিমধ্যে ভারতের পক্ষে একটি বিপজ্জনক সম্ভাবনা হচ্ছে এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অতঃপর এশিয়ায় চীনের নীতিতে কোন বাধা দেবে না। যদি তাই হয় তাহলে ভারতবর্ষ ও পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে পাকিস্তান আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে। পাকিস্তান ও চীনের মিতালি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশ্রয় ভারতকে আরও সমস্যায় ফেলবে এবং পূর্ববঙ্গের মুক্তি-সংগ্রামকে কঠিনতর করে তুলবে।

০

পাকিস্তানকে একই সঙ্গে সোহাগ ও শাসন করতে চেয়েছে আমেরিকা। অস্ত্রের জাহাজভরা সোহাগের নমুনা সারা দুনিয়া দেখেছে। শাসনের দৌড় কতদূর, আশা করা গিয়েছিল, সেটা বোঝা যাবে ডাঃ হেনরি কিসিংগার ইসলামাবাদ থেকে ফেরার পর। দিল্লির রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা খবর দিয়ে-ছিলেন, ইসলামাবাদে যাওয়ার পথে নয়াদিল্লীতে ডাঃ কিসিংগার বলে গেছেন যে, পাকিস্তান সরকারকে দিয়ে বাংলাদেশ সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধান করাবার চেষ্টা তিনি করবেন এবং সেই চেষ্টায় ঠিকমত সাড়া না পেলে তিনি প্রেসিডেন্ট নিকসনকে পাকিস্তান নীতি পুনর্বিবেচনার পরামর্শ দেবেন অর্থাৎ কিনা শাসনে কাজ না হলে তিনি সোহাগের মাত্রা কমাতে বলবেন।
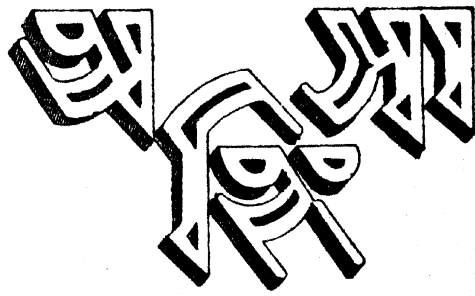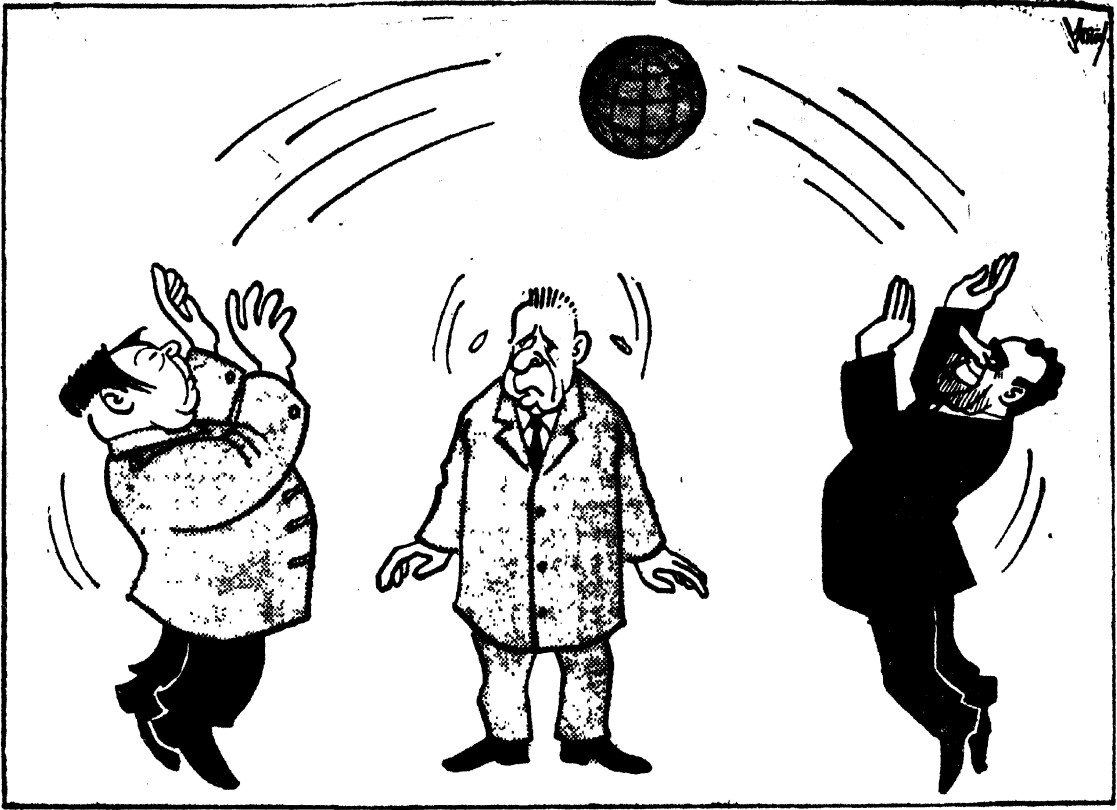
কিন্তু ডাঃ কিসিঙ্গারের এই পাকিস্তান সফরের ফল কি হল? দৃশ্যত, কিছুই না। ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বলেছেন, পূর্ববঙ্গ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আমেরিকা 'উচ্চ পর্যায়ে' পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ডাঃ কিসিঙ্গারের সঙ্গে ইয়াহিয়া খাঁর যে আলোচনা হয়েছে সেটাও এই 'উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা'র মধ্যে পড়ে কিনা অথবা এই সব আলোচনার ফল কি হয়েছে সেবিষয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র কিছুই বলেন নি। অন্যদিকে, একথা স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আগামী আর্থিক বছরে পাকিস্তানকে ১১ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার সাহায্য মঞ্জুর করার জন্য মার্কিণ সরকার আইনসভায় যে প্রস্তাব দিয়েছেন সেই প্রস্তাব তাঁরা প্রত্যাহার করে নেবেন না।

এটা হতে পারে যে, আমেরিকা যখন চীনের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে চলেছে তখন তারা চীনের মিতা পাকিস্তানকে খুব বেশী চটাতে চায় না। আর সেই কারণেই পাকিস্তানের প্রতি আমেরিকার শাসনের চেয়ে সোহাগের মাত্রাটিই বেশী।

ইতিমধ্যে 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা পাকিস্তান সম্পর্কে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধি দলের রিপোর্টটি ফাঁস করে দিয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্ক ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের দশজন অফিসার নিয়ে গঠিত এই প্রতিনিধি দল পূর্ববঙ্গের ১২টি জেলায় ঘুরে স্বচক্ষে সেখানকার অবস্থা দেখে এসে ১১ হাজার শব্দের যে রিপোর্টটি দিয়েছেন তাতে পাকিস্তান সরকারের সমস্ত প্রচার ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। বিশ্বব্যাঙ্কের এশিয়া বিভাগের প্রধান পিটার কারগিলের (জাতিতে বৃটিশ) নেতৃত্বে গঠিত ঐ প্রতিনিধি দল তাঁদের রিপোর্টে পূর্ববঙ্গের বর্তমান অবস্থাকে জাপানে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর দিনের সকালবেলার সঙ্গে, বোমাবিধ্বস্ত জার্মান শহরের সঙ্গে এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের মাই লাই গ্রামে অত্যাচারের কাহিনীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, তাঁরা যেসব শহরে গেছেন সে সব শহরের কোন কোন অংশ ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে আর প্রতিটি জেলায় তাঁরা নিশ্চিহ্ন হয়ে-যাওয়া গ্রামের চেহারা দেখেছেন। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বড়-বড় অনেক সড়ক-সেতু ও রেল-সেতু উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ছোট-ছোট অনেক পুল ও কালভার্ট নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে 'মিলিটারি যে জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। সাধারণভাবে পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ এবং স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়।'

ইয়াহিয়া বাহিনীর উৎপাতে পূর্ববঙ্গের যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণের ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, শুধু মাত্র সরকারী ক্ষতি যা হয়েছে তার পূরণ করতেই ৩৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা খরচ হবে বলে একটা প্রাথমিক হিসাব করা হয়েছে। কিন্তু, প্রতিনিধি দল মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে, এই খরচের অঙ্ক অনেক বেশী হবে।

বিশ্বব্যাঙ্কের এই প্রতিনিধি দলের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, পূর্ববঙ্গে মিলিটারীর সংখ্যা অনেক পরিমাণে না কমালে শান্তির পথে পদক্ষেপ করা আদৌ সম্ভবপর হবে বলে মনে হচ্ছে না। তাঁদের সুপারিশ হল, পাকিস্তানকে উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ রাখা হোক, কেননা এই সাহায্য দিয়ে 'এখন বিশেষ কিছু কাজই হবে না।' তাঁদের মতে, এই সাহায্য আপাতত বছর খানেক বন্ধ রাখা উচিত।

এই রিপোর্ট যাতে প্রকাশ না পায়, এমন কি বিশ্বব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদের হাতেও যাতে না যায় সেজন্য আমেরিকা চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। এখন আমেরিকায়, ও অন্যত্র যাঁরা পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার আন্তর্জাতিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ রাখার চেষ্টা করছেন তাঁদের হাত আরও শক্তিশালী হল।

১৬-৭-৭১ —পুণ্ডরীক

'বুড়ী, ও বুড়ী, ফকাস্ মানে কি শেয়াল?'

'ধ্যেৎ! ফক্স মানে তো শেয়াল।'

'তাহলে ফকাস্ মানে কী?'

'ফকাস্ মানে ... ফকাস্ মানে'... বুড়ী ওরফে গায়ত্রী চৌধুরী, বয়স আট, এদিক ওদিক চায়। একবার এস-ডি-ও-কোয়ার্টারের লম্বা টানা বারান্দার মাথায় পুরু সেগুনের কড়িগুলোর দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করেই সামনের মাঠে নিঃসঙ্গ ঝাড়ালো রোদে ঝকমকে কামিনী গাছটার দিকে চেয়ে থাকে। সেদিকে চেয়েই মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'আচার খাবি?'

'আমাকে কিন্তু বেশী করে দেবে, হ্যাঁ, বলেই অনিন্দ্য চৌধুরী, ডাকনাম টুটুল, বয়স পাঁচ, তার পেছনে পেছনে বারান্দার শেষ প্রান্তে ভাঁড়ার ঘরের দিকে অগ্রসর হয়।

'দ্যাখ দ্যাখ!' টুটুল চেঁচিয়ে ওঠে। বারান্দার কোণে একটা বিশাল ফাটার পাশে কালো ডেঁও পিঁপড়ের সার। সার বেঁধে তারা উঠছে বারান্দার গায়ে সদ্য হলুদে ছোপানো পাঁচিল বেয়ে একটা নিস্ফলা, ঢ্যাঙা পেঁপে গাছের পেছনে কোন গর্তে অথবা ঘাসে ঠিক বোঝা যায় না।

টুটুল থপ্ করে গোটা দুয়েক ডেঁও তুলেই ঠ্যাং ছিঁড়ে ফেলে। পরমুহূর্তেই সেই ন্যাংচানো জীব দুটোর মাথা টিপে ধরে আবার ছেড়ে দেয়।

'ছিঃ ছিঃ! কি নিষ্ঠুর। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে!'

'এক গেলাস জল নিয়ে আয় বুড়ী, ডাক্তারি করব।'

বুড়ী তার ভাইয়ের দিকে একবার তাকায়। পরনে বাড়িতে তৈরী ইজের, হাড়ে মাংসে জড়ানো কালচে বাদামী খালি গা, মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল, এ ভাইটা অন্য ভাইবোনদের চেয়ে তার প্রিয়। একবার ইতস্তত করে বললে, 'তুই দাঁড়া, আমি আসছি।'

সন্তর্পণে পাশের বন্ধ দরজা টানতেই বিরাট ভারী পাল্লাটা কোঁ করে ওঠে। বুড়ীর বুক ছলাৎ করে। পা টিপে টিপে অন্ধকার ঘরে ঢুকেই সে জড়ভরত বনে যায়। মা নড়ছে। পাশে ছোড়া ঘুমোচ্ছে অকাতরে। ঘরের মধ্যে টানা পাখার ঝিরঝিরে ঠান্ডায় ঝিম মেরে থাকে। মা-র নড়া বন্ধ হয়। অন্ধকারেও ফর্সা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল স্বর্ণ-সুন্দরীর চেহারাখানা তার মেয়ে ঠাওর করতে পারে। আবার মৃদু নাক ডাকতে সুরু করেছে। বুড়ী হাল্কা লাফে ঘরখানার শেষে এসেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এবার ভেজানো দরজার পাল্লা খুলতেই আরও বেয়াড়া ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ ওঠে। ভ্রূক্ষেপ না করে বুড়ী বেরিয়ে আসে ভেতরের বারান্দায়। রোদ ঝলমলে উঠোন। চারদিকে অসম্ভব চুপচাপ। উঠোনের এক কোণে বিশাল জামগাছের নীচেই গোয়ালের সামনে ছায়ায় মঙ্গলা গরুটা চোখ বুজে মরার মতো শুয়ে, পা ছড়িয়ে, মাছির উদ্দেশ্যে কখনো কখনো তার ধাবমান ল্যাজেই শুধু জীবন প্রতীয়মান। নানা ঘুমোচ্ছে উঠোনের আর এক প্রান্তে রান্নাঘরের দাওয়ায়, পাশে কৃত্তিবাস রামায়ণের ওপরে রাখা তিন-চার মাস আগে কটক থেকে কেনা চালশে চশমা। বারান্দার প্রান্তে টিনের ভরা টব থেকে এক মগ জল নিয়ে বুড়ী আবার ফেরে, অতি-মাত্রায় সাবধানতার দরুণ শ্যামবাবুর সেলাই করা হলুদ মার্কিনের ফ্রকটার গোটা বুক ভিজে যায়। দরজার পাল্লা খুলবার আগে থমকে দাঁড়ায় বুড়ী। কমলীর মা পাখা চালাতে চালাতে ঘুমোচ্ছে। ঘুমোচ্ছে অকাতরে অথচ তার একখানা হাত ঘরের ভেতরের দড়িটা টেনে যাচ্ছে। ক্রমশঃ আস্তের দিকে যেতে যেতে তার হাতখানা থমকায়। পরমুহূর্তেই পুরাতন গতি সঞ্চারিত হয় তার হাতে। কমলীর বাবা রাত্তিরে, কমলীর মা দিনে। বেতন মাসে চারটাকা, সরকার থেকে বরাদ্দ।

হাতের তেলোতে জল নিয়ে বুড়ী ছিটোয়। চমকে তার তেল-সিঁদুর সিঁথি আর ঠাস চুলভরা মাথাখানা তুলেই কমলীর মা বলে তার সুরেলা হিন্দুস্থানী গলায়, 'মা-কে বলে দেব।' তারপর আবার মাথা ঝুঁকিয়ে পাখার দড়ি নাড়তে নাড়তে ঝিমোতে থাকে।

অন্ধকারে স্বর্ণসুন্দরী পাশ ফেরেন। বুড়ী আবার চট করে দাঁড়িয়ে পড়ে। আরও খানিকটা জল ছলকে তার বুক ভেজায়। দরজার শব্দ সামলিয়ে যখন বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায় বুড়ী তখন চোত-মাসের গরম হাওয়া পাক খাচ্ছে সামনের সারা মাঠে। বারান্দায় টাঙানো ক্যালেন্ডার খড়মড় খড়মড় করে হাওয়ায়।

টুটুল ইতিমধ্যেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ডেঁও পিঁপড়ের বিরুদ্ধে। শত্রু আক্রমণের খবর রটে যাওয়ায় ডেঁও পিঁপড়ের দল ছত্র-ভঙ্গ হয়ে একদল পাঁচিলের দিকে আর একদল বারান্দার কোণে বিশাল ফাটার মধ্যে ফিরে যাচ্ছে। প্রায় বারো-চোদ্দটা ডেঁও সৈনিক সামনে, কয়েকটার পা নড়ছে।

কয়েকটা আধমরা ডেঁও'র গায়ে জল ঢালে টুটুল। মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, 'এখনই উঠে পড়বে দেখিস।'

দুজনে উপুড় হয়ে অনেকক্ষণ পর্য-বেক্ষণ করতে থাকে। বুড়ীর চকচকে কালো গালে টুটুলের চুলগুলো হাওয়ায় সুড়সুড়ি দেয়। বাস্তবিক নেংচে নেংচে উঠে চলতে থাকে ডেঁওগুলো।

'দেখলি দেখলি,' টুটুল হাততালি দিয়ে ওঠে। তারপর হুকুম করে, 'একটা কাগজ দে, দে না।'

লম্বা বারান্দার এমোড় থেকে ওমোড় পর্যন্ত খটখট করছে, কাগজের কুচি নেই। টুটুল উঠে গিয়ে টুল লাগায় দেয়ালে। তারপর বুড়ী কিছু বলবার আগেই ক্যালে-ন্ডারে ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসের পাতা-খানা চড়চড় করে ছিঁড়ে ফেলে।

'কি করলি? কি করলি তুই? এ মাসের পাতাটা ছিঁড়ে ফেললি!' জবাব না দিয়ে টুটুল ন্যাংচানো ডেঁওগুলো তুলে নিয়ে টপাটপ কাগজটার ওপর রাখে। বারান্দার কোণে গিয়ে মেঝেতে নদীর ধারার মতো লম্বা আঁকাবাঁকা গর্ত জলে ভর্তি করে ডেঁওগুলো ছেড়ে দেয় তার ভেতর। সাঁতরে সাঁতরে পিঁপড়েগুলো ওপরে উঠবার চেষ্টা করলেই টোকা দিয়ে আবার জলে ফেলে দেয় সেগুলো।

সেদিকে চেয়ে চেয়ে আবার মৃদু দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে বুড়ী বললে, 'আমি আচার খেতে চললাম।' [illegible] সময় তার লাল [illegible] বেরোয়, সেখানে ওপরের পাটিতে [illegible] পড়ে যাওয়া দুধের দুটো দাঁত [illegible]।

'আমিও যাব,' টুটুল লাফিয়ে ওঠে।

কিন্তু ভাঁড়ার ঘরের গায়ে [illegible] সংলগ্ন পাঁচিলটার কাছে এসেই বুড়ী [illegible]-

দাঁড়ায়। বাইরে খোলা মাঠের দিকে তাকিয়ে তার চোখ চকচক করে উত্তেজনায়। ফিস-ফিস করে বলে, 'চুর্ণী নদীতে যাবি?'

'মা বকবে।'

'জানতেই পারবে না। নে, ওঠ।'

একটা টুল লাগিয়ে পাঁচিলের ওপর উঠে পড়ে বুড়ী। এইসব চটপটে কাজে সে ভাইবোনদের মধ্যে খুব দড়। সে যখন হাত বাড়িয়ে ভাইকে ওপরে টেনে তোলে তখন পাতলা ফিরফিরে বেণীটা গালের পাশে এসে পড়ে। ওপাশে হাঁটু নামাতেই ফোকর। অভ্যস্ত ভঙ্গীতে বুড়ী চট করে নেমে পড়ে। তারপর আলসেতে হাত আঁকড়ানো ঝুলন্ত টুটুলের পা আর কোমর জাপটে নামিয়ে দেয়।

বাইরে ১১০ ডিগ্রি তাপে ঠাঠা মাঠ। কিন্তু পাঁচিলের পাশেই তাদের খাটা পায়খানার মাথায় সারা গায়ে এ'চড়ভর্তি যৌবনসতেজ কাঁঠালের স্নিগ্ধ ছায়া। সেখানে দাঁড়িয়ে টুটুল সেই নিঃসঙ্গ দীপ্ত মধ্যাহ্নের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। অদূরে জেল-খানা। সেখান থেকে পেটা ঘণ্টায় ঢং ঢং করে দুবার আওয়াজ সমস্ত মাঠ, তাদের বাবার সযত্নে লালিত ঘের-দেওয়া বেগুনের ক্ষেত, মাচায় রোদ-পোওয়ানো কুমড়ো, তাদের বাড়ির গা দিয়ে পায়ে চলার পথ আরও নির্জন থমথমে করে তোলে।

'কিরে হাবার মতো দাঁড়িয়ে পড়লি কেন?' বুড়ী তাকে কনুই দিয়ে খোঁচা মারে। তারপর চড়াই পাখির মতো তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাফাতে জেলখানার পাশ দিয়ে যেতে যেতেই আবার থমকে দাঁড়ায়। বুড়ী তার ভাইয়ের হাত ধরে হিড় হিড় করে নামায় পাশের শুকনো নালাটায়।

'রাম! ঐ যে।' বুড়ী আঙুল দিয়ে দেখায় জেলখানার দিকে।

ফর্সা লম্বা গয়া জেলার অধিবাসী রামসুভগ সিং খড়ম পায়ে এদিকের দালানে আসছে। হাতে চকচকে মাজা ঘটি। মধ্যাহ্ন-ভোজন বোধহয় শেষ। দালানের ধারে উবু হয়ে বসে সে মুখ ধোয়, ঘন ঘন কুলকুচো করে। তারপর দাঁড়িয়ে ঠোঁটে না ঠেকিয়ে ঢকঢক করে ঘটি থেকে জলপান করে। দু-তিনবার আওয়াজ করে ঢোক তোলে। একবার তার শক্ত চোয়ালের মাঝখান থেকে দুটি চোখ নিরীক্ষণ করে সামনের বিরাট ছড়ানো নিঃসঙ্গ মধ্যাহ্ন। তারপর খড়মের শব্দ মিলিয়ে যায়।

এবার নালা থেকে উঠেই বুড়ী টুটুলের হাত ধরে দৌড় মারে। এ-রাস্তাটায় নদীর আগ পর্যন্ত গাছপালাগুলো যত্ন বে'টে বে'টে, চারদিকে ঝোপ-ঝাপই বেশী। গরম হাওয়ায় তাদের চিবুক কপাল পুড়ে যায়। রোদে পুড়ে থমথম করে তাদের মুখ। কিন্তু আনন্দে আর উত্তেজনায় চোখ জ্বলে।

'দিদি, দ্যাখ্ দ্যাখ্!'

টুটুল দেখাল। রোদ্দুরে ঝলমল করছে জ্বলন্ত বে'টে কাঁঠালচাঁপা। এই গরম হাওয়া আর রোদ্দুরেও গাছের নীচটা গন্ধে ভুরভুর। অনেকগুলো ঝরা ফুল কুড়ায় বুড়ী তার ফ্রকের কোঁচড়ে। দূরে চুর্ণী নদীর জল চিকচিক করে। দুজনে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে নদীর ধারে একটা ঝোপের ছায়ায় বসে।

চুর্ণীর দুধার নির্জন। বসতি খুব ছাড়াছাড়া। এই ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসেও অনেক বছর আগে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেবতার গ্রাসে' বর্ণিত নদীর পরি-বেশ প্রায় অটুট। একটা কলসী-ভর্তি নৌকো আসছে বাদামী পাল তুলে। কাছে আসতেই তারা টের পায় গুণ টেনে আসছে। এক মুখ দাড়ি আর সবুজ লুঙ্গি পরে ঘামে চকচকে পিঠ ধনুকের মত বাঁকিয়ে মাল্লাটা দড়ি টানতে টানতে তাদের নীচ দিয়ে চলে যায়। বুড়ী বিস্ময়ে চেয়ে থাকে তার পায়ের গুলির দিকে। কতগুলো শিরা জট পাকিয়ে জমে আছে সেখানে।

'আজ সাহেব আসবে আমাদের বাড়ি, জানিস?'

টুটুল সাহেব দেখেনি, অথবা তার মনে পড়ে না দেখেছে কিনা। বলে, 'কেন আসবে?'

'বাঃ! বাবাকে ভালবাসে না!' বুড়ী ঘাড় নাড়িয়ে বলে।

এতক্ষণে তারা খেয়াল করে শিমুলের তুলো ভাসতে ভাসতে হাওয়ায় নামছে। ওপরে তাকিয়ে দেখলে একটা চার-পাঁচতলা লম্বা নীলাভ সাদা শিমুলের গাছে তুলো ফাটছে। সূর্যের আলোয় সেই অসংখ্য উড়ন্ত সাদা রেশমের টুকরো কখনও হাওয়ায় স্থির, কখনও দমকা হাওয়ায় লুটোপুটি খায়।

সেদিকে চেয়ে চেয়ে ছলছল চোখে বুড়ী হঠাৎ বললে, 'বাবার কি কষ্ট।'

টুটুল অবাক হয়ে তাকায় দিদির দিকে। এযাবৎ পারিবারিক ঘটনা সমস্যা সে দিদির মারফতই প্রধানত শুনে আসছে। কাজেই শিমুল তুলোর খেলা থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকায় দিদির দিকে।

'সেইজন্যেই তো সাহেব আসছে। সাহেব তো বাবাকে ভালবাসে।'

সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারে না। গোলমেলে ঠেকে টুটুলের কাছে। বলতে কি বুড়ীর কাছেও ব্যাপারটা দুর্বোধ্য। কিন্তু সে তার দাদার কাছে কিংবা রাঙাদি যখন ছুটিতে কলকাতা থেকে আসে তার কাছ থেকে এই রকম ব্যাপার শুনেছে কয়েকবার। সেই কথাটাই ভাষা দেবার চেষ্টা করে বুড়ী তার বেণী দুলিয়ে দুলিয়ে।

'বাবাকে সব বন্দেমাতরম্ করছে তো', বেশ খানিকটা চিন্তা করে বুড়ী বলে, তারপর চিন্তার গুরুভারে অসহিষ্ণু হয়ে বলে, 'বুঝতে পারছিস কিনা, তুই একটা বোকা!'

এস ডি ও বাংলোর সামনে বিশাল মাঠটার কোণায় একদিকে জেলখানা, উল্টোদিকে কাছারি। কয়েকদিন আগে সন্ধ্যেবেলা যখন তারা ভানের খোলা দিয়ে ফুটবল খেলছিল, তখন রামসুভগ সিং আরও দু-তিনজন কনস্টেবল কোমরে দড়ি দিয়ে কয়েকজন বাঙালী তরুণকে আদালত থেকে নিয়ে আসছিল জেলে। তারা খেলা থামিয়ে অবাক হয়ে শুনেছিল কয়েকজন তরুণের চীৎকার, 'বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম।'

এ সত্ত্বেও টুটুলের হৃদয়ঙ্গম হয় না ব্যাপারটা। কিন্তু তারও চোখ ছলছল করতে থাকে বুড়ীর মতো।

বুড়ী আবার জ্ঞান দেয়, 'বাবার কত কষ্ট তুই তো জানিস না!'

'কষ্ট কেন?'

'রোজ কাছারিতে যায়।'

'যায় কেন?'

'বাঃ, টাকা-পয়সা আনতে হবে না।'

টুটুলের আর ভাল লাগে না এইসব পারিবারিক প্রসঙ্গ। মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'চাই না, টাকা-পয়সা চাই না।'

'বাঃ, কি বোকা!'

'টাকা-পয়সায় কি হয়? চাই না পচা টাকা।'

সেই রোদ্দুরে লাল ঠোঁট ফোলানো পাঁচ বছরের ভাইয়ের দিকে চেয়ে বুড়ীর মায়া হয়। বলে, 'বাঃ, চাল পাবি কি করে? টাকা না হলে চাল পাবি কি করে? ভাত খাবি কি করে?'

টুটুল আর এসব প্রশ্নে বিচলিত না হয়ে এক দৃষ্টিতে যেখানে নদীটা বাঁক খেয়েছে সেদিকে চেয়ে থাকে। আর একটা নৌকো আসছে, খালি নৌকো। ছইয়ের নীচে লোকটা হুঁকো টানছে। কাছে আসতে সে আশ্চর্য হয়ে ঝোপের ধারে বসে থাকা ছেলেমেয়ে দুটিকে লক্ষ্য করে। তারপর আবার জলের দিকে চেয়ে তামাক টানতে থাকে। দূর থেকে জেলখানার পেটা ঘড়িতে তিনটে বাজার আওয়াজ ভেসে আসে।

'ওমা, মা উঠবে এখনই, চল চল।' বুড়ী লাফিয়ে উঠে পড়ে। খানিক দূর এগোতেই জেলখানা আর নদীর মাঝামাঝি জায়গায় পাশের পায়ে চলার পথ ধরে সামনের ঝোপের পেছন থেকে মাঝবয়সী একজন লোক এগিয়ে আসছে। তার গালে দাড়ি, কপালে লাল টিপ। বুড়ী হঠাৎ তার ভাইয়ের হাত ছেড়ে ভোঁ দৌড় দেয়, আর তারস্বরে চেঁচাতে থাকে 'কাপালিক, কাপালিক!'

টুটুল একমুহূর্ত হতভম্ব হয়ে থাকে। লোকটা এগিয়ে আসতে আসতে তার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসে। প্রকাণ্ড ভয়ের আড়ষ্ট-তায় তার হাত-পা চেপে ধরে। কোন্ সুদূর জগৎ থেকে বুড়ীর স্বর ভেসে আসে, 'টুটুল পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়।' হঠাৎ চাবুক-খাওয়া ঘোড়ার মতো টুটুল দৌড়তে থাকে। জেলখানার কাছে এসেই হোঁচট খেয়ে পড়ে। পা ছড়ে যায়। এবারে সে কেঁদে ফেলে। আর বাড়ির কাছাকাছি আসামাত্রই বুড়ী তার অপরাধের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করে। সে আর টুটুল দুজনেই মার পাশে ঘাপটি মেরে শুয়েছিল. আর টুটুলই প্রথমে বারান্দায় পা টিপে টিপে বেরিয়ে যায়। কিন্তু রোদে-পোড়া কান্নায় ভেজা তার ভাইয়ের মুখখানা দেখে তার মা নিশ্চয় এসব

কথা ধর্তব্যে আনবে না। আর তার মায়ের সেই সিংহী মূর্তি কল্পনা করে বড়ী তাড়াতাড়ি তার ভাইয়ের কাছে ছুটে এসে তার হাঁটু থেকে ধুলো ঝেড়ে, চোখ-মুখ ফ্রকের খুঁট তুলে মুছিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে বলে, 'কিছু হয়নি, কিছু হয়নি, কাঁদিস নে।'

কিন্তু টুটুল জেলখানার দেওয়ালের ছায়ায় কিছুক্ষণ ফোঁপায়। বলে, 'তুমি আমাকে ফেলে দিয়ে পালিয়েছিলে, মা-কে বলে দেব।'

'দূরে বোকা! কিছু হয়নি, বলছি না। মা-কে বলবি না, তাহলে কোনদিন চূর্ণী নদীতে নিয়ে যাব না।'

শত্রু-পরিবেষ্টিত অঞ্চল যেভাবে ভয়ে ভয়ে তাকাতে তাকাতে পার হয় লোকে তেমনিভাবে দুজন মাঠ পার হয়ে বাড়ির দিকে এগোতে থাকে। বড়ী ভাবছিল, সে যদি এই মুহূর্তে মাছি আরশোলা টিকটিকি কিংবা ঐরকম কোন নগণ্য সরীসৃপ হয়ে তাদের অন্ধকার শোবার ঘরে সেঁধিয়ে যেতে পারত। স্বর্ণসুন্দরী এই সময় উঠে পড়েন। তাঁর চলা-ফেরা থেকে ঘড়ির কাঁটা মেলানো যায়। এই ঠাঠা রোদ্দুরে মাঠ পার হতে দেখলে নিশ্চয় ঠাস করে চড় মারবে মা। বড়ী প্রায় চড়ের শব্দটা শুনতে পায়। তার সৌভাগ্যে সে নিজেই অবাক হয়। অবলীলাক্রমে বারান্দায় উঠে আসে। পাল্লাটার কোঁ সত্ত্বেও অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়তে ব্যাঘাত হয় না। টানা পাখার ঠান্ডা এক ঝলক হাওয়ায় গা জুড়িয়ে যায়। বেড়ালের নিঃশব্দ গতিতে তাদের নির্দিষ্ট বালিশে ঝুপ করে শুয়ে পড়ে। বড়ী প্রবল আত্মবিশ্বাসে তার একখানা পা চড়িয়ে দেয় মার গায়ে। এতক্ষণ উত্তেজনার পর চট করে ঘুম আসে দুজনের। ঘণ্টাদুয়েক দিবানিদ্রার আরামে টানা টানা হয়ে শোন স্বর্ণসুন্দরী। তাঁর হাতটা চলে পড়ে মাথার কাছে তালপাকিয়ে শোওয়া টুটুলের গায়ে। তারপর নিশ্চিন্তে তাঁর নিজের গোল ফর্সা বাহুর ওপর লাল তিলটা নিরীক্ষণ করেন। এই তিলটার পাশে শোওয়ার জন্যে কোন কোনদিন বড়ী আর টুটুলের মধ্যে মারামারি লেগে যায়। চিৎ হয়ে শুতেই বড়ীর ঘুমন্ত পা গা থেকে গড়িয়ে পড়ে। স্বর্ণসুন্দরী ঘুমন্ত মেয়ের গায়ে হাত বুলোন। ফ্রকটায় হাত পড়তেই মনে পড়ে যায় গোপাল ধোপার কথা। সাহেব আসছে ছ'টায়। ছেলেমেয়েদের একটাও ভাল জামা কাচা নেই। কমলীর মা-কে এখনই পাঠাতে হবে। স্বর্ণসুন্দরী উঠে পড়েন।

২

স্বর্ণসুন্দরীর গর্ব স্বামীর চেয়েও তাঁর বাবা। বিহারের আরা জেলার কালেক্টার অক্ষয়চন্দ্র বসু তাঁর সামনে আদর্শ পুরুষের চিত্রকল্প। তাঁর পাশে ভবনাথ কিঞ্চিৎ জোলো, সংসার-জ্ঞান-অনভিজ্ঞ, এমনকি অদূরদর্শী। বলতে গেলে কি ভবনাথের অসম্ভব কর্মনিষ্ঠা সত্ত্বেও [illegible] খেতো [illegible] তাঁর [illegible] [illegible]।

তিনি টের পান কর্মক্ষেত্রে বাপের নতুন নতুন উদ্ভাবন শক্তি স্বামীর মধ্যে অনুপস্থিত। তাঁর মতে কাজ শুধু করলেই চলে না, কাজ খেলাতে হয়। স্বর্ণসুন্দরী বরাবরই ভেবে আসছেন তিনিই তাঁর স্বামীকে ঠেলে চালাচ্ছেন, সবাইকে খেলিয়ে বেড়াচ্ছেন।

আর এই ধারণা চাপরাশী বলাই তাদের ঠাকুর বা বুড়ীদের নানা অর্থাৎ গোপীনাথ ত্রিপাঠী, জেলা কটক, ভৃত্য ও মালি জগা, জেলের হেড কনস্টেবল রামদুভেগ সিং, এমনকি সার্কেল অফিসার বেবির বাবা, কাছারির পেস্কার সুরেন, বাজারের মুদী বিলাসীপ্রসাদ, টাউন স্কুলের হেডমাস্টার শ্যামবাবু এবং আশেপাশে প্রায় সকলেরই। গত এক বছরে রাণাঘাটে আসার পর থেকেই সবাই মেনে নিয়েছে আসল হাকিম পর্দার অন্তরালে।

কারণ শুধু ১৯৩২ সালেই নয়, যে-কোন কালে এবং যে-কোন দেশেই তো দুরকম লোক দেখা যায়, একদল লোক হুকুম করে আর একদল লোক সেই হুকুম মনেপ্রাণে তামিল করে জীবনের সার্থকতা খোঁজে। ভবনাথের হুকুম করার চাকরী, কিন্তু তিনি পারেন না। বাড়িতে কাউকে এক গেলাস জল গড়িয়ে দেবার হুকুমও কখনো করেননি। বৃটিশ শাসনের যা প্রথাগত লিপিবদ্ধ হুকুম তাই তামিল করে আনন্দ পান। আর স্বর্ণসুন্দরী ঠিক উল্টো। হুকুম না করতে পারলে তাঁর প্রাণ আইঢাই করে। তিনি সবাইকে চরিয়ে নিয়ে বেড়ান—তাঁর ছেলেমেয়েকে, স্বামীকে, বাড়ির ঝি-চাকর-ঠাকুর। এমনকি দেড় মাইল দূরে অবস্থিত সদ্য প্রতিষ্ঠিত নারীমঙ্গল সমিতিতেও তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব সকলের চেয়ে বেশী।

স্বর্ণসুন্দরী বিশাল হাই তোলেন। টুটুলের গোঁজ-করা মাথাটা ভালভাবে এলিয়ে দেন বালিশে। একবার তীক্ষ্ণ চোখে মেয়েকে পর্যবেক্ষণ করে উঠে পড়েন। দেয়াল-ঘড়িতে ঢং করে সাড়ে তিনটে বাজল।

ভেতরের বারান্দায় তাপ কম। তোলা টবের জলে চোখেমুখে ঝাপটা দিতে দিতে হাঁক দেন, 'কমলীর মা, আভি তুরন্ত ধোবিকোঠি যাও। কাপড়া লে আনে বোল। তুরন্ত যাও।'

স্বর্ণসুন্দরীর ধারণা বাপের সঙ্গে বাল্যকালে বিহারের কোন কোন অঞ্চল ঘোরার দরুণ তাঁর হিন্দী ভাষায় দখল যথেষ্ট। সুবিধে পেলেই হিন্দী ব্যবহার করতে ছাড়েন না।

মা-র সাড়া পেয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় গোপীনাথের নিদ্রাভঙ্গ হয়। কর্মঠ ছোটখাটো পেটা গড়ন। রামায়ণ ও চশমা তুলে সেও সান্ধ্য অনুষ্ঠানের জন্যে তৈরী হয়।

'পুর হয়েছে?'

'পুর হইয়াছে কখন পারা! ময়দা বেলিয়া দিন আমি ভাজি।'

১৯২০ সালে হাওড়ায় যখন ভবনাথের তৃতীয় পোস্টিং তখন থেকেই গোপীনাথ ত্রিপাঠী এ পরিবারের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। সেই ছিপছিপে আঠারো-উনিশ বছরের ছোকরা এখন সক্ষম কর্মঠ তিরিশ বছরের যুবক। কিঞ্চিৎ উড়িয়ামিশ্রিত সাধু বাংলায় কথা বলতে সে অভ্যস্ত।

পিঁড়িতে বসে সিঙ্গাড়ার পুর গড়তে-গড়তে স্বর্ণ বলেন, 'ফকাস সাহেবের সঙ্গে আরও এক সাহেব আসছে—ব্র্যাণ্ডি।'

'ব্র্যাণ্ডি সাহেব ভোলায় গিয়াছিল।' কড়া নামাতে-নামাতে গোপীনাথ বলে।

'দূরে। ভোলায় আবার কবে গিয়েছিল?'

'মা! ব্র্যাণ্ডি ভোলায় যায় নাই? সেই স্টীমারঘাটায় আসিয়াছিল। চারদিকে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। আগের রাত্তির আমরা ঠায় বসিয়া আছি। বাহিরে সড়কি, বর্শা, আল্লা হো আকবর! বন্দেমাতরম! আপনি সব ভুলিয়া গিয়াছেন!'

বাস্তবিক সর্বদা এতখানি বর্তমানের মধ্যে নাক ডুবিয়ে থাকেন স্বর্ণসুন্দরী যে, কয়েক বছর আগের ঘটনার খুঁটিনাটি বিস্মরণ হয়। গোপীনাথের কথায় আবার স্মরণে আসে। বলেন, 'তবে আমাদের বাড়ি আসেন নি।'

'সার্কিট হাউসে উঠিয়াছিলেন পায়া! টুটুলের তখন তো ছ মাস। বাইরের বারান্দায় চৌকিটায় থলবল করিত!'

এখন স্পষ্ট ছবিটা ভেসে ওঠে স্বর্ণসুন্দরীর মনে। শীতের রোদ্দুরে মোটা-সোটা ছেলেটাকে তেল মাখিয়ে দিয়েছেন বাইরের চৌকিতে। থপ-থপ করে সে পা দাপাচ্ছে আর বড় মেয়ে পাশে বসে নামতা পড়ার মত দুলতে-দুলতে চেঁচাচ্ছে, 'উইলিয়াম দি কংকারার, উইলিয়াম দি কংকারার' আর ছেলেটাকে সশব্দে চুমু খেয়ে চেঁচাচ্ছে, 'আঃ কি মিষ্টি! মরে যাই!'

চার টাকা সেরের বিশুদ্ধ ঘিয়ের গন্ধে রান্নাঘর ভুর-ভুর করে।

'ফকির এসেছে?'

'কয়লার ঘরে।'

কয়লার ঘরের সংলগ্ন যে ছোট চাতাল সেখানে সাহেবীখানা বানাতে পটু আর এক আর্দালী ফকির মুর্গী কাটছে।

স্বর্ণসুন্দরী সেখানে গিয়ে দেখলেন ছেলে-মেয়েরা সেখানে ঠিক হাজির। টুটুল ছুটে এসে বললে, 'ফকির কেটে দিল, ফকির কেটে দিল। ছটফট-ছটফট, ছটফট-ছটফট। কি গাদা-গাদা রক্ত!'

মায়ের ডান পা জড়িয়ে ঝুলতে থাকে টুটুল।

'টুটুল কি অসভ্য জানো মা, ও একটা ডানা ধরে টানাটানি করছিল।' বুড়ী অভিযোগ করে।

'তোমরা এসব কাটাকাটি দেখতে এলে কেন?'

'আমি কিন্তু মা দুটো কাটলেট খাব'ণ বুড়ী বললে।

'আমি তিনটে', টুটুল বললে সঙ্গে-সঙ্গে।

খিড়কির খোলা দরজা দিয়ে স্বর্ণসুন্দরী দেখতে পান ভবনাথ ফিরছেন কাছারী থেকে। লম্বা-চওড়া ব্যায়াম-মজবুত শক্ত শরীর, কিন্তু মুখের চেহারা অস্বাভাবিক কোমল। প্রসারিত চোখে ঠাণ্ডা গভীর চাহনি, স্ত্রীর ছোট তীক্ষ্ণ চোখের চার পাশে সদ্য নিক্ষেপিত চাহনি থেকে একদম আলাদা। চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের লোকটার বয়স বড়জোর লাগে পঁয়ত্রিশ। কেবল মাথার তালুতে কয়েক বছর হল বিকশিত টাক ছাড়া বয়সের ছাপ ভবনাথের চেহারায় নেই।

সাদা টুইলের হাফশার্ট আর মাখন জিনের প্যান্ট। জিনের কাপড়টা খসখসে পরতে পারেন না, এই একমাত্র শৌখিনতা।

ভবনাথ আসছেন কোনদিকে না তাকিয়ে, পেছনে-পেছনে বলাই থাকি হাফ-শার্ট, হাঁটুর ওপর কাপড়, হাতে একগাদা ফাইল, আর মুখে পেশী সঙ্কোচনেরই কোন দোষে সর্বদা জাগ্রত জমাট হাসি। বকা খেলেও এই হাসি মুখ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না বলাই।

আসতে আসতে একটু বেঁকে বাড়ির প্রায় পেছনে বেড়া-দেওয়া ক্ষেতের ঝাঁপ তুলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ভবনাথ। এই বাগান দেখা তাঁর নিয়মমাফিক। মিনিট পনেরোর মধ্যেই ভেতরের বারান্দায় এসে ঢুকলেন। হাতে একখানা খাম। কিছু না বলে স্ত্রীর হাতে চিঠিটা তুলে দিলেন। ঠিকানায় চোখ পড়তেই চিনলেন স্বর্ণসুন্দরী। ভবনাথের মেজদা বিশ্বনাথ চৌধুরীর লেখা :

ভবনাথ,

তোমার যখন দেশের বাড়ির সঙ্গে যাতায়াত আর বিশেষ নেই এবং তোমার পক্ষে তোমার অংশ তদারক করারও সময় নাই, অতএব আমি স্থির করিয়াছি তোমার অংশ আমি কিনিয়া লইব। পূর্বদিকে তোমার অংশের দোতলা দালান এবং পেছনের এক বিঘে মেঠেল সমেত তোমার সম্পত্তির বর্তমান দাম হইবে (গত বিশ বছরের wear and tear ধরিয়া) পাঁচ হাজার টাকা। এই দাম নির্ধারণে আমাদের জমিদারীর ঘোষবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়াই বলিতেছি। অর্ধেক দাম আড়াই হাজার টাকা সামনের পূজায় এবং বাকী অর্ধেক পরের বছর দিবার ব্যবস্থা করিতেছি। এইরূপ ব্যবস্থা আমাদের সকলের পক্ষেই সুবিধাজনক হইবে। ননর বিবাহ বৈশাখ মাসে। ঐ সময় তোমার একবার পাবনায় আসা বিশেষ প্রয়োজন। অধিক আর কি লিখিব! আশা করি বৌমা ও পুত্রকন্যাসহ কুশলে আছো। —মেজদা

এ তো আগেই জানা ছিল। পাবনার বাড়ি মেজঠাকুরের গর্ভে যাবে। ও টাকাও পাবে না। দুশো তিনশো টাকা হয়তো ঠেকাবে। আর যাই করো, ননর বিয়েতে যেও না। ওবার বড় মেয়েটার বিয়েতে মনে আছে পালাবার পথ পাই না।। এটা দাও। সেটা দাও। সে কি লম্বা ফিরিস্তি। তুমি লিখে দাও, ও সময় তোমার অনেক কাজ, ছুটি পাবে না।......গোপীনাথ, দুটো গরম সিঙ্গাড়া নিয়ে এসো বাবুর জন্যে।'

ফুঁ দিয়ে সিঙ্গাড়া খেতে খেতে ভবনাথ বললেন, 'পাবনার বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কটা এবার পাকাপাকিভাবে চুকল। আর থেকেই বা কি হত। থাকতে পারতাম না। বাবা যাবার পর থেকেই সব ওলোটপালট হয়ে গেল।'

'কলকাতায় যে জমি কিনছিলে সেটার কদ্দুর?'

'হ্যাঁ যাব, সামনের বুধবারে একটা দিন ছুটি নিয়ে যাব। সাউথ ক্যালকাটার ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট জমি বেচছে। জায়গাটা ভাল। তবে দাম খুব। তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার করে কাঠা।'

'সাড়ে তিন হাজার!'

'তাই তো ভাবছি। নামলে তো আর ফেরা যাবে না। তার ওপর সামনের বছর যদি প্রতাপকে বিলেত পাঠাতে হয়। কি থেকে কি হবে বুঝতে পারছি না।'

'ও-সব ঠিক হয়ে যাবে। কলকাতায় এখন জমি না কিনলে আরও দাম বেড়ে যাবে। আর এখনই যদি বাড়ি না বানাও তবে কবে ভোগ করবে?'

'মংলীবেটিকে জাবনা দিয়েছে?' গোয়ালের দিকে চেয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন ভবনাথ।

'ও-সব কথা এখন ভাবতে হবে না। তোমার মংলীর কোন অযত্ন হবে না। তুমি তাহলে মঙ্গলবার কলকাতায় যাও। আর প্রকাশ যখন বাড়িতেই আসছে তখন একটু বল না নিজের সম্বন্ধে। তুমি যেন কেমন! নিজের সম্বন্ধে একটু বলা কওয়া করতে পারো না? নিজের মনে কাজ করে গেলে কেউ পুঁছবে না তোমাকে। দেখো না সুরেন গুহ। তোমার এক বছর আগে পোস্টিং। কি রকম চড় চড় করে বেড়ে উঠছে। বাবা কি বলতেন জানো, সাহেবরা খাতির করে তাদের যারা শুধু এক মনে কাজই করে না, সমানে সমানে টক্কর দিতে পারে।

টুটুল কোথায়?'

'কয়লার ঘরের ওদিকে। ফকির কাটলেট বানাচ্ছে, তাই দেখছে।'

'তাই নাকি! ফকির এসেছে?'

ভবনাথ উঠতে যাচ্ছিলেন স্বর্ণ তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন, 'একটু বোস না। তুমি যেন কেমন! কাজের কথাগুলো গুছিয়ে ভাবতে বলতে পারো না। কাজের কথা বললে উসখুস করো। মংলী জাবনা পাচ্ছে কি না, ফকির ঠিক কাটলেট বানাচ্ছে কি না, এগুলো তোমাকে দেখতে হবে না। এগুলো সব ঠিক হয়ে যাব। দরকার হলে খবরদারি আমি করব, তুমি কেন করবে? বাবা কখনও হুকুম দিয়ে খবরদারি করতেন না। নিজের হুকুমের ওপর এমন বিশ্বাস যে ঠিক তামিল হয়ে যেত।'

তারপর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে থাকেন, 'বাবা সেই সাদা ধবধবে ওয়েলার ঘোড়া হাঁকিয়ে অফিস থেকে ফিরত। মুঙ্গেরের কোর্ট থেকে। ফিরে এসেই ডাকতেন, 'কোচম্যান'। আসবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি গম্ গম্ করত। তার সামনে কারও চেঁচিয়ে কথা বলার জো ছিল না। —আমি ছাড়া। আমাকে এসেই ডাকতেন—স্বামী। তারপর সেদিন আদালতে কি হোল, কোন সাক্ষী কি বলল, তিনি কি রায় দিলেন সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতেন। আর তুমি? তুমি তো একটা জড়ভরত। অফিস থেকে ফিরে এসেই বাগান দেখবে, গরু দেখবে, আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে পড়বে।

'শ্বশুরমশাই আর আমি আলাদা জাতের লোক, তাঁর অনেক কর্মক্ষমতা, আমার অত ক্ষমতা নেই স্বর্ণ।'

স্বামীর এই স্বাভাবিক বিনয় ও শান্ত মেজাজের সামনে স্বর্ণসুন্দরী জানেন তিনি বেশীদূর এঁটে উঠতে পারবেন না। এ-রকম লোকের সঙ্গে তো ঝগড়া করা যায় না। যে কেনে সেও তর্ক না করে তার সঙ্গে তো

বেশীক্ষণ উত্তেজিতভাবে কথা বলা যায় না। আর স্বর্ণসুন্দরীর পছন্দ এই উত্তেজনা। স্বামীর এই শান্ত মূর্তিটিকে শ্রদ্ধা করলেও তাঁর মন তাকিয়ে থাকে তার বাবার মত কোন চরিত্রের দিকে, যে চেঁচিয়ে কথা বলবে, ঠাট্টা মস্করায় এমন কি অন্যকে অন্যায় খোঁচা দিয়েও চারপাশ সরগরম করে তুলবে, যে শুধু চুপ করে মেনে নেবে না, প্রতিবাদ করবে, যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করবে অভিমত, যার সঙ্গে কথা বলে চেঁচিয়ে হেসে চীৎকার করে বাধা পেয়ে একেবারে হাফসে যাওয়া যায় এ-রকম লোকের সঙ্গ কামনায় স্বর্ণসুন্দরীর মন মাঝে মাঝে ব্যাকুল হয়। বড় মেয়ে হেনার বরকে তাই তাঁর ভাল লাগে। হেনার বর মদন মিত্র বিয়ের তিন বছর পর সম্প্রতি জার্মানীতে গিয়েছে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার জন্যে। সে লোকটা যখন শ্বশুরবাড়ি আসত বেশ কদিন জমজমাট লাগত স্বর্ণসুন্দরীর।

স্বামীর বড় বড় ম্লান চোখ দুটোর দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমার কর্মক্ষমতা কম কিসের। অফিস করে' সন্ধ্যেবেলায় ফাইল ক্লিয়ার করো, দরকার হলে রাত জেগে রায় লেখো। কিন্তু তুমি শুধু খেটেই যাও, শুধু খেটেই যাও। একটা সেই কবেকার ঠেটে স্যুট বানিয়েছো, তারপর সাত-আট বছর কেটে গেল।'

'চেনা বামুনের পৈতে লাগে না।'

'খুব লাগে খুব লাগে। আমার বাবার লাগত। শ্বশুরমশাইয়ের লাগত না? বিয়ের পর পাবনা বাড়িতে গিয়ে দেখি নি? গাড়ি বারান্দায় জুড়ি দাঁড়িয়ে। ঝকমকে চোগা-চাপকান। আর্দালীর মাথায় একদিন পাগড়ী না থাকায় কি ধমক! তোমার মত প্যাংনা ছিল না কেউ।'

'হ্যাঁ বাবা খুব সৌখীন ছিলেন।' ভবনাথ স্বপ্নময় চোখে গোয়ালের পাশে পড়ন্ত রোদ্দুরের আলোয় ঝলমল জাম গাছটার পাতাগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে বলেন। তারপর তেমনি আস্তে আস্তে বলেন, 'আর রাগও ছিল প্রচন্ড। যতক্ষণ বাড়িতে থাকতেন হাঁক-ডাকে বাড়ি কাঁপত। আর মা থাকতেন ঠিক নতুন বৌয়ের মতো, একগলা ঘোমটা দিয়ে, রান্নাঘর থেকে ভাঁড়ারে। আবার ভাঁড়ার থেকে রান্নাঘরে। বড়দা নিয়ে আসত মক্কেলদের দেওয়া টাকার তোড়া বৈঠকখানা থেকে। অনেক দিন অর্ধেকের বেশী পৌঁছয় নি মার কাছে। কিন্তু মা কোনদিন তা খুলে দেখেন নি।'

'তুমি কিন্তু ফকাস-কে নিজের সম্বন্ধে একটু বলবে। এখনও যদি ডিস্ট্রিক্ট না পাও তাহলে কবে পাবে। এটা তো কিছু অন্যায় দাবী নয়। এতদিন কাজ করছো, তোমার কাজের সবাই প্রশংসা করে। কিন্তু এভাবে তো চলবে না। বাড়ি তুলবে বলছো ছেলেকে বিলেত পাঠাবে। নিজের ওপরে কষ্ট করে তো সংসার চালানো যায় না।'

ভবনাথ উঠে পড়েন। স্বর্ণ যা বলছেন তার যৌক্তিকতা মনে মনে স্বীকার, করেও তিনি উৎসাহিত বোধ করেন না। এত হাই-ফাই করবার কি আছে? ডিস্ট্রিক্ট তাঁর অ্যান্দিনে পাওয়া উচিত ছিল, তাঁর জুনিয়র কেউ কেউ পেয়েছে বটে। কিন্তু সে রকম ব্যাপার তো জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঘটেই থাকে। তার জন্যে নিজেকে অহেতুক তাড়িয়ে বেড়ানোর তাঁর সময় নেই। আর ভবনাথের এক একবার মনে হয়, সত্যিই তিনি সাহেবদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন না। তাদের কতগুলো জিনিষ তাঁর খুব ভাল লাগে, যেমন অফিসপত্তরে তাদের লেখা কিংবা চিঠি। এমন সংক্ষেপে একেবারে নির্দিষ্ট করে বলার ক্ষমতাটা ফকাস ব্র্যান্ডি এইসব সাহেব খুব রপ্ত করেছে। তারপর কথা দিলে তার মর্যাদা দিতে জানে, তার জন্যে যদি অন্যায় করতে হয় তাতেও পরোয়া করে না। কিন্তু ভবনাথ টের পান এই ধরনের চারিত্রিক গুণাবলীর ভিত্তিতে একাত্মতা বেশী দূর নিয়ে যায় না। ইংরেজ উচ্চপদস্থ অফিসারের ভারত সাম্রাজ্যে যে জীবনধারা বা ওয়ে অফ লাইফ্ সে সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহ থাকার প্রয়োজন। যে প্রয়োজনীয়তার ধাক্কা ভবনাথের ক্ষেত্রে সীমিত। কখনও কখনও ক্লাবে যান বটে, টেনিসও অনেকের চেয়ে ভাল খেলেন, কিন্তু ঠিক 'ক্লাব-মাইণ্ডেড' তিনি নন। খানিকক্ষণ পর তিনি ছটফট করেন। বাড়ি ফিরে গিয়ে কপির বাগানটা দেখলে এতক্ষণে কাজ দিত, এই ধরনের কিংবা হঠাৎ কোন পারিবারিক কর্তব্যের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় উসখুস করেন। ব্র্যান্ডি তো একদিন খোলাখুলি বলেইছিলেন, 'ইউ আর এ গুড অফিসার ভবনাথ, বাট্ এ ডাল কম্পানী।' সবচেয়ে বেটা ভবনাথের অসুবিধে তা হল ইংরেজীতে যাকে বলে 'স্মল টক' তাতে তাঁর পরিপূর্ণ এলার্জি। কাজেই স্বর্ণসুন্দরী এবং ব্র্যান্ডি উভয়েই একমত যে ভবনাথ শুধু খাটতেই জানেন।

উঠোনে নেমে ভবনাথ আস্তে ডাক দিলেন, 'গোপীনাথ, ভাল চা এসেছে?'

গোপীনাথ রান্নাঘর থেকে নেমে এসে বলে, 'সবচেয়ে ভাল দার্জিলিং চা। আড়াই টাকা পাউণ্ড।'

ভবনাথ খুশি হলেন। এই একমাত্র চায়ের সুগন্ধের ব্যাপারে তিনি তাঁর স্বভাববিরুদ্ধভাবেই জেদী। দার্জিলিং চা ছাড়া খান না। আর প্রত্যেকবার প্রথম চুমুক খেয়ে সপ্রশংস মন্তব্য করেন, 'গ্রাণ্ড।' ভাল না লাগলে চায়ের কাপটা ঠেলে সরিয়ে রাখেন।

কয়লার ঘরের কোণ থেকে চমৎকার কাটলেট ভাজার গন্ধ আসছে।

'কটা হল?'

ভবনাথের প্রশ্নে ফকির উঠে দাঁড়াল পিঁড় ছেড়ে। ফর্সা মঙ্গোলীয় মুখে চাপ দাড়ি। ছুঁচলো চোখ চকচক করে। গেঞ্জি আর সবুজ লুঙ্গিটা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ফকির বললে, 'ষোলটা হয়েছে সাহেব।'

'বেশ বেশ। বুড়ী, তুমি টুটুলকে শিখিয়ে দিয়েছো তো, আমি যা তোমাকে বলেছি।'

টুটুল চীৎকার করে ওঠে 'আমি তিনটে খাব বাবা।'

সেদিকে না তাকিয়ে ভবনাথ বারান্দায় ওঠেন। প্যান্টের বোতামগুলো ঠিক আছে কিনা এই বেলা তাঁর দেখে নিতে হবে। ধোপা ব্যাটা বড্ড ফাটাচ্ছে।

ভবনাথের কথায় বুড়ীর কিন্তু মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। যদি একবার ফিরে তাকাতেন, ভবনাথ তাহলে একথাটা ধরা পড়ে যেত যা টুটুলকে সেখানোর কথা ছিল তা শেখানো হয় নি। দুপুরে চূর্ণী পর্ব আর বিকেলে কাটলেট পর্বে কর্তব্যের প্রতিশ্রুতি মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছিল বুড়ীর। এখন তীক্ষ্ণগলায় বললে, 'এদিকে আয় টুটুল। তোকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ ইউর নেম? তুই কি বলবি?'

'আমি বলব—গ্যাট ম্যাট প্যাট ক্যাট।' কাটলেটের গন্ধে টুটুলের মরীয়া ভাব এসে গেছে।

'ধৎ ওসব বলবি না। সাহেবরা আসছে না? ওসব বললে বাবা রেগে যাবে। আর চূর্ণী নদীতে যেতে পারব না। সাহেবরা যখন বলবে তুই বলবি, মাই নেম ইজ...বল, মাই নেম ইজ।...'

'মাই নেম ইজ'

'তারপর নামটা বল'

'তারপর নামটা বল'

'ধেৎ! বল—মাই নেম ইজ অনিন্দ্য চৌধুরী।'

'সাহেবরা জিজ্ঞেসই করবে না।'

ভাইকে বাগ না মানাতে পারার ব্যর্থতায় বুড়ী বলে, 'তোকে আর কোন দিন আচার দেব না।'

'আচ্ছা বলছি বলছি।'

'আর যদি জিজ্ঞেস করে,—হোয়াট ক্লাশ ডু ইউ রিড? —তুই বলবি—আই রিড ইন বেবী ক্লাশ।'

'বেবী মানে?'

'বেবী মানে? বেবী মানে?' প্রবল ব্যর্থতায় বুড়ী ঠাস করে চড় কসিয়ে দেয় টুটুলের গালে।

টুটুল হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে। তারপর দাঁত কিড়মিড় করে তার ছোট ছোট হাত মুঠি করে পা দাপিয়ে দাপিয়ে চীৎকার করে, 'তুই মরণ তুই মরণ...

বুড়ী চটে ওঠে ভাইয়ের কথায়। ফকির সেই জলভর্তি চোখ আর ঈষৎ ফর্সা রক্তাভ গালে চেঁচানো দাপানো ছেলেটার দিকে চেয়ে মিট-মিট করে হাসতে থাকে।

'ছেলেমেয়েরা, জামাকাপড় ছাড়বে এসো।' স্বর্ণসুন্দরী বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে টুটুল দৌড়য় উঠোন দিয়ে।

(ক্রমশঃ)

সুধা বসু

উন্নত স্তরের মানুষের মধ্যে দুটি ভিন্ন সত্তা থাকে ক্রিয়াশীল। একটি ভাবময়, দ্বিতীয়টি কর্মময়। এই দুটি সত্তা যেখানে সমন্বিত রূপে ও সমভাবে জীবন্ত, জাগ্রত ও ক্রিয়াচঞ্চল, সেখানেই মানুষ অসাধারণত্ব লাভ করে। সুউচ্চ ভাব-ভাবনা ও মহৎ আদর্শের প্রেরণা সঞ্জাত কর্ম সর্বদাই সুন্দর, সহনীয় ও কল্যাণকর। যুগে যুগে, দেশ-দেশান্তরে এই জাতীয় মানুষের জন্ম ও কর্মকৃতির ফলেই পৃথিবী মহান সৃষ্টি-সম্ভারে হয়েছে সমৃদ্ধ : জগত ও জীবন হয়েছে রমণীয় ও আনন্দ-সুন্দরের উৎস।

চার্লস ফ্রিয়ার এন্ডরুজ ছিলেন এই জাতীয় একটি মানবাত্মার সার্থক দৃষ্টান্ত। ইংলন্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুসন্তান এন্ডরুজ ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিল সহজাত সৌন্দর্য-বোধ, মানব-প্রীতি ও ধর্মপ্রাণতা। সেবা-পরায়ণতাও ছিল তাঁর স্বভাবের একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য। এই গুণটি তিনি পেয়ে-ছিলেন জন্মসূত্রে তাঁর মায়ের কাছ থেকে। এন্ডরুজের পিতামাতা ছিলেন প্রকৃত খৃস্ট-ধর্মাবলম্বীর উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত। আশৈশব সেই পবিত্র ভাবধারায়ই তাঁর জীবন গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

ছাত্রজীবন শেষ হতেই এন্ডরুজ স্বদেশে শিক্ষকের জীবনবৃত্তি অবলম্বন করেন। সেই অধ্যাপনার দায়িত্ব ভার নিয়েই তাঁর ভারতে আগমন। ভারতবর্ষ ছিল তাঁর কল্পনায় ধৃত স্বপ্ন ও সাধনার পুণ্যভূমি। ভারতের মাটিতে তিনি প্রথম পদার্পণ করেন ১৯০৪ সালে। ভারতবর্ষে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক পদ লাভ করেন তিনি দিল্লীর সেন্ট স্টিফেন্স কলেজে।

১৯১২ সালে ভারতে নয়, লন্ডন শহরে এন্ডরুজের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। সেই দেখা-সাক্ষাৎ এন্ডরুজের স্বাভাবিক সৌন্দর্য-চেতনা, বিশ্বজনীন ভাবধারা ও সাহিত্য প্রতিভাকে পুষ্ট করার আরও অধিকতর অবকাশ এনে দিয়েছিল। কারণ, রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বমানবতার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, যে শিক্ষানীতির প্রবর্তন করে-ছিলেন, শান্তিনিকেতনে যে সুন্দর অমলিন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল রচিত হয়েছিল, এন্ডরুজ তার মধ্যে পেলেন তাঁর ভাবময় ও কর্মময় দুটি সত্তারই পূর্ণ বিকাশের অপূর্ব সুযোগ। তিনি আফ্রিকা ও ফিজী দ্বীপে যে মানবতার মুক্তি সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন, সেই সেবা-ব্রতের সংগেও কবিগুরুর বিশ্বপ্রেমের বাণী ও জনকল্যাণ প্রচেষ্টার অপূর্ব মিল খুঁজে পেলেন। তদ্ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের অদ্বিতীয় কাব্য-প্রতিভা, সুউচ্চ মনীষা ও মনন-সৌকর্য, সুগভীর আধ্যাত্মিকতা এবং অসীম সৌন্দর্যানুভূতি এন্ডরুজকে দিল্লী ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনে এসে অধ্যাপনা কর্মে ব্রতী হতে প্রেরণা দিয়েছিল। তিনি অবিলম্বে শান্তিনিকেতনের তরুশাখা-পল্লবিত আশ্রমিক পরিমণ্ডলের শ্যামল সৌন্দর্য-স্নাত প্রকৃতির কোলে তাঁর সাধন-পীঠ স্থাপনা করে অধ্যাপনা ও সাহিত্য-চর্চা ও জনসেবার ব্রত উদযাপনে করলেন আত্মনিয়োগ।

আর তাঁর মধ্যে যে সৌন্দর্যবোধ ও কবি-মন এতদিন সুপ্তিমগ্ন ছিল তা শান্তিনিকেতনের প্রশান্ত প্রাকৃতিক পরি-বেশের অলৌকিক প্রভাব-স্পর্শে নতুন লীলা চেতনায় হোল উদ্বুদ্ধ। শিক্ষাব্রতী, দার্শ-নিক, সমাজসেবী ও মানবদরদী এন্ডরুজ এবারে আত্মপ্রকাশ করলেন কবি ও শিল্পী-রূপে।

তিনি যখন প্রথম শান্তিনিকেতনে এলেন, তখনও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ইংলন্ডে। তিনি আশ্রমের শিক্ষাপদ্ধতি, ছাত্রদের জীবন-ধারা ও প্রকৃতির সৌন্দর্যলহরী দেখে অতিমাত্রায় মুগ্ধ হন। অতঃপর দিল্লীতে গিয়ে কবিকে একখানি চিঠি লিখে (৮ই মার্চ, ১৯১৩) তাঁর শান্তিনিকেতন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও আনন্দ-বিস্ময় সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছিলেন। সেই চিঠিতে এন্ডরুজ সেখানে স্বহস্তে তাল-বীথিকার যে চিত্রাংকন করেছিলেন তারও চমৎকার বর্ণনা

এন্ডরুজ অংকিত বাঘার বুদ্ধমূর্তি (বিশ্বভারতী কলাভবনের সৌজন্যে)

এন্ডরুজ অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথ (বিশ্বভারতী কলাভবনের সৌজন্যে)

দিয়েছিলেন। সেই বিশেষ অংশের বঙ্গানুবাদ—

"দুটি তালগাছের ফাঁক দিয়ে রঙিন কুয়াশা-জড়ানো নতুন চাঁদ উঁকি দিচ্ছে—কী যে চমৎকার শোভা সেদিন আমি দেখেছি তার বর্ণনা চলে না। তাড়াতাড়ি সেটিকে রঙ দিয়ে আঁকার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। স্কুলে যে ছেলেটি ড্রইং শেখায় তার কাছ থেকে খুব সাধারণ একটি কাগজ জোগাড় করে, আমি ছোট্টো ছেলের রঙের বাক্স নিয়ে সকালবেলা আঁকতে বসে গেলাম। এসব সামান্য জিনিস দিয়ে আঁকা সত্ত্বেও যখন সেই দৃশ্যের ঠিকঠিক ব্যঞ্জনাটি আনা গেল, তখন আর আমার আনন্দের সীমা রইল না। তাই সেই মায়াময় রাত্রির স্মৃতির একটি আলেখ্য আমার কাছে ধরা রয়েছে।"

বাঁধের পাড়ে তালগাছের ছবিটি তিনি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন। সেটি পেয়ে কবিগুরু এন্ডরুজকে একটি চিঠিতে (১৯, আগস্ট, ১৯১৩) লিখেছিলেন—

"I must thank you for the water-colour picture you have sent me of it. It is like a dream — picture that I have in my heart and those palm-trees seem to be standing a tip-toe to catch a glimpse of their lover across the sea".

তালগাছ সম্বন্ধে এন্ডরুজ কেবল ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হননি। একটি কবিতাও লিখেছিলেন। কবিতার শিরোনাম—
"The Palms At Santiniketan".

প্রথম স্তবকটি এই—

"When the last glow of day is dying
For in the still and silent west
The Palm-trees cease their plaintive sighing
And slowly lull themselves to rest".

শান্তিনিকেতনে আগমনের পূর্বে থেকেই এন্ডরুজের মধ্যে একটি কবিমন ও শিল্পীর দৃষ্টি ছিল ক্রিয়াশীল। ওখানকার পরিবেশ প্রভাবে ও রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ লাভ করে তিনি তাঁর শিল্পবোধকে প্রকাশ করলেন আয়াসহীন প্রচেষ্টা ও অপরিণত অথচ স্বচ্ছন্দচারী রূপ কল্পনার মাধ্যমে। তাঁর অংকিত চিত্রনিচয়ের মূল বিশিষ্টতা হোল—নিয়মিত শিক্ষাচর্চাবিহীন তুলি-কলম চালনার সহজ ভঙ্গী। আর বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাব ও রস-সত্তার প্রকাশই প্রধান লক্ষ্য। রঙ-রেখার ভাষাছন্দ ও সুচারু রূপ রচনার কোন প্রশ্ন নেই। স্রষ্টার অন্তহীন আবেগ অনুভূতির স্বরূপে এবং জগৎ ও জীবন-বীক্ষণের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর হয়েছে প্রতিফলন।

তালগাছের ছবি জল-রঙের। সমগ্র পরিবেশ প্রভাব এনেছেন চমৎকার। গাছের পাতার আন্দোলিত রূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অশিক্ষিতপটুত্বের চিহ্ন বহন করেও ছবিটি রস-সঞ্চারে পিছিয়ে পড়েনি।

১৯১২ সালে এন্ডরুজ রবীন্দ্রনাথের একটি বর্ণাঢ্য প্রতিকৃতি রচনা করেন। সেই চিত্রপটে রবীন্দ্রনাথের বাস্তব রূপ খুঁজে পাওয়া যায় না। কবির মুখে ধর্মপ্রাণ শিল্পী এনে দিয়েছেন যীশুখৃস্টের মুখছবি। এন্ডরুজ যে ধ্যানদৃষ্টিতে কবিসত্তার রূপটি দেখেছিলেন তারই প্রতিফলন হয়েছে এই চিত্রপটে। দীনবন্ধুর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ আর এক নতুন রূপে উদ্ভাসিত। মানব-প্রেম ও বিশ্ব-মানবিকতায় তিনি কবিকে যীশুর সংগে একাত্ম করে নিয়েছেন। যীশুখৃস্টের যে করুণ মুখচ্ছবি তাঁর হৃদয়পটে মুদ্রিত ছিল, তাই-ই তিনি আরোপ করেছেন এখানে। এই রূপসৃষ্টি ধ্যানপরায়ণ এন্ডরুজের তৃতীয় নয়নের দৃষ্টিসম্ভূত। তা সত্ত্বেও কবির আত্মস্থ রূপটি আমাদের কাছে অচেনা ও অজানা হয়ে থাকে না।

এই দুখানি বর্ণময় চিত্র ব্যতীত এন্ডরুজের শিল্পৈষণার স্মারক চিহ্ন পাওয়া যায় আরও প্রায় ত্রিশখানি। তার অধিকাংশই কালো কালির রেখাচিত্র ও স্কেচ-ধর্মী। সম্ভবত কলমের আঁখরে অংকিত। তিনি যাত্রা ভ্রমণে গিয়ে বোরোবুদুরেও

অন্যান্য হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরাদি দর্শন করে এই চিত্রাবলী অংকন করেন। কিন্তু সাম্প্রতিক, সেখানে প্রত্যক্ষভাবে অংকিত। বাকি কয়েকটি পরে স্মৃতিচারণার ফলশ্রুতি। এই প্রসংগে আরও কৌতূহলের ও উল্লেখনীয় বিষয় হোল এই যে হোটেল বোরোবুদুরের লেটার-পেপারে তিনি এই ছবিগুলি এ'কে-ছিলেন। তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই চিত্র অংকনের জন্য তাঁর কোন পূর্ব প্রস্তুতি ও আয়োজন ছিল না।

মহনীয় রূপের মন্দির গাত্রে রমণীয় রূপের মূর্তি প্রতিমা দেখার ফলে তাঁর ভাবমুগ্ধ, প্রজ্ঞা পরিণত মানস মুকুরে যে সৌন্দর্যানুভূতির তরংগলীলা প্রতিবিম্বিত হয়েছিল, তারই খণ্ড খণ্ড প্রত্যক্ষ রূপ রঙ ও রেখায় হয়েছে বিধৃত। ইহা রস পরিণতি সঞ্জাত শিল্পায়ন নয়। কোন দার্শনিক তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ও পরিমার্জিত আংগিক শৈলীর সমস্যা নেই এখানে। আত্মকেন্দ্রিক বুদ্ধিবাদ বা উদাত্ত গাম্ভীর্য এবং মহনীয় ভাবচেতনার উন্মেষ হয়নি কোথাও। ইহা অযত্নসিদ্ধ সৃষ্টি-প্রয়াস মাত্র। কিন্তু কয়েকটি রেখা-চিত্রে ঋষির ধ্যানদৃষ্টি ও কবির ভাবতন্ময়তার প্রকাশ লক্ষণীয়। যেমন বুদ্ধের মুখমণ্ডলসমূহ।

ভারতের গুপ্ত যুগীয় বুদ্ধমূর্তির রসনির্যাস ও অংগ-সুষমার বর্তনা ভংগিমা নিয়েই হয়েছিল যাভার বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তির রূপারোপ। ভারতীয় বুদ্ধ-প্রতিমায় সেই অলৌকিক রূপ-লাবণ্য ও অতীন্দ্রিয় সার্বভৌম স্থির দীপ্তির অনেকখানি প্রকাশ দেখা যায় এণ্ডরুজ অংকিত বুদ্ধ-বদনে।

দুর্বল, শিথিল ও ভগ্ন রেখা-সমাহারে রচিত মূর্তিচিত্রেও কিন্তু ভাব-গরিমায় কিছু অভাব পরিলক্ষিত হয় না। স্থাপত্যাংশের রূপরেখায় ও আলঙ্কারিক নক্সার রেখাঙ্কণে বরং কিছু প্রাণশক্তি ও জোরালো ভাব হয়েছে পরিস্ফুট। চণ্ডী মেন্দুতের সিঁড়ি-সোপানের গঠন ও মকরমূর্তি অতি সুন্দর ও সামঞ্জস্যময়। এই মন্দিরের বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি কয়েকটি মাত্র রেখায় অদ্ভুত সুন্দর রূপ করেছে লাভ। স্বল্প আয়োজনে এই জাতীয় ব্যঞ্জনাময় রূপ সৃষ্টিই এণ্ডরুজের ছবির মূল মর্মকথা।

ব্রহ্মার মূর্তিটিও উল্লেখনীয় সৃষ্টি। স্বল্প রেখায় মহত্ত্বর ভাবকল্পনার প্রকাশ হয়েছে এই মূর্তিতে। সমাসীন ধ্যানী বুদ্ধের রেখাচিত্র Impressionistic রচনা। চোখমুখ, হাত কিছুই সুস্পষ্ট ও পূর্ণাবয়ব নয়। শুধু মুদ্রাভঙ্গী ও ধ্যানমগ্নতা অপরিস্ফুট থাকেনি। শৈব মন্দিরের 'ফ্রীজ'-এর মূর্তি-শ্রেণীর রেখাঙ্কন দুর্বল, কিন্তু ভাস্কর্যের মূল ভাবটি প্রস্ফুট হতে বাধা পায়নি।

কীর্তিমুখ-সমন্বিত তোরণ অংকনে সূক্ষ্মাংশের প্রতি লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু তোরণের গড়ন ও কীর্তিমুখের অভিব্যক্তি হয়েছে নিখুঁত ও জীবন্ত। চণ্ডী পাওয়ানের দানব-মূর্তির ভাবাভিব্যক্তিও অতি চমৎকার। মূল স্থাপত্যদেহ এবং আলঙ্কারিক নকসার রেখাচিত্র আংগিক কৌশলে প্রকৃত শিল্পগুণান্বিত নয় ঠিকই, কিন্তু বিষয় গৌরবের আসল ভাবসত্তার সন্ধান যে আদৌ পাওয়া যায় না, তা বলা চলে না। আলঙ্কারিক নকসা রচনায় কোন কোন নিদর্শনে তিনি বেশ খানিকটা decorative ও Space Sense —-এর পরিচয় দিয়েছেন ভালোভাবেই।

যাভার রেখাচিত্রসমূহের সংগে দুই-তিনখানি বর্ণময় চিত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি হোল—রাজলীলা-সনে উপবিষ্ট পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব। হাল্কা জলরঙ-এ অঙ্কিত। দেহরূপ পূর্ণাংগ নয়। এটিকেও Impressionistic বলা যায়। কিন্তু অসম্পূর্ণ অবয়ব কল্পনার মধ্যেও ভাবের প্রকাশ সম্পূর্ণতার পথে গিয়েছে এগিয়ে।

দ্বিতীয় চিত্রখানি জলরঙ-এর দৃশ্যপট। নীল ও সামান্য কালোরঙ-এ রচিত পাহাড়ের রূপ ফুটে উঠেছে অতি অদ্ভুতভাবে। মাঝে মাঝে লাল রঙ-এর টাচ-এ অভিনব সৌন্দর্য ও মহিমার ব্যঞ্জনা দিয়েছে এনে। পশ্চাৎপটে আকাশে রক্তিমছটা একটা দূরা-ভাসের আমেজ এনে, গভীর ভাবদ্যোতনার সঞ্চার করেছে। এই ছবিটি দেখলে ভাবতে ইচ্ছে হয় না যে এণ্ডরুজ চিত্রকলায় শিক্ষা-চর্চাবিহীন নিছক খেয়ালখুশীর শিল্পী ছিলেন। কিন্তু তিনি তাই-ই ছিলেন। যাবতীয় রচনাই আকস্মিক ও আয়োজন-বর্জিত। তবে এ শিল্পচেষ্টা কেন?

এর কারণ মনে হয়—তাঁর সংবেদনশীল মনের অভিব্যক্তির ইহা বিকল্প একটি পন্থা হয়েছিল। তাঁর সহজাত সৌন্দর্যবোধ ও গভীর আবেগ অনুভূতির প্রবাহ তাঁর অচেতন মনের নিগূঢ় কন্দর ভেদ করে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে এই-সকল সৌখীন রূপাঙ্কনে বহু বিস্তারের পথ খুঁজে নিয়েছিল। সুতরাং ইহাকে সাধারণ শিল্পবিচারের মান-দণ্ডে যাচাই না করে এই বলা বোধহয় সংগত যে এই রেখাচিত্ররাজি এণ্ডরুজের বিশেষ মানসপ্রক্রিয়া, অধ্যাত্মচেতনা ও আত্মসত্তার অদ্ভুত, অভিনব ও অচিন্তনীয় প্রতিবিম্বন। আবার প্রকৃত শিল্পগুণান্বিত না হয়েও স্কেচধর্মী চিত্রায়ণও বটে। তাঁর রেখাচিত্রের এই অক্ষম ও অসম্পূর্ণ আলো-চনা তাঁর জন্মশতবার্ষিকী বছরে সেই শিল্পীসত্তার প্রতি ক্ষুদ্র করপুটে শ্রদ্ধার অঞ্জলিমাত্র।

সোভিয়েত কবি আঁদ্রি

বিশিষ্ট সমালোচকদের মতে সোবিয়েত কবি আঁদ্রি ভংনেসেনসকীর 'ওজা' নামক দীর্ঘ কবিতাটি ষাটের দশকে যে-কোনো ভাষায় রচিত বৃহত্তর কবিতাগুলির মধ্যে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিছুকাল পূর্বে হারবার্ট মার্শাল সম্পাদিত কবিতা-সংকলনে আঁদ্রির কবিতার কিছু নির্বাচিত অংশ সংযোজিত হয়েছিল। মূল কবিতাটির সম্পূর্ণ অনুবাদ পাওয়া গেল অকসফোর্ড ইউনিভার্সিটির পেপারব্যাকস সিরিজে আঁদ্রি ভংনেসেনসকীর কবিতাবলীর অনুবাদ 'অ্যানটি ওয়ার্লডস' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

ইভতুসেংকো যেমন অতি দ্রুতলয়ে কবিতা লিখে থাকেন, ভংসনেসকীও তেমনই সেই পথ অনুসরণ করছেন মনে হয়। ওদেশে কবিতা-বুভুক্ষু জনগণের সামনে কবিতা পড়ার রেওয়াজ আছে, যার ফলে কবিদের মনে সবদাই কবিতা শোনাবার আগ্রহ জেগে থাকে, কিন্তু ইভতুসেংকোর সঙ্গে আঁদ্রির পার্থক্য আছে। আঁদ্রির কবিতায় ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠ ভংগী সুস্পষ্ট। এমনকি অনুবাদেও আঁদ্রির কবিতার রস ক্ষুন্ন হয়েছে মনে হয় না। অবশ্য কবিতাগুলি যাঁরা অনুবাদ করেছেন আধুনিক সাহিত্য-জগতে তাঁরা স্বনামধন্য।

সমবেদনা ও সহানুভূতিতে কবির চিত্ত ভরপুর। টেলিফোন বুথে ক্রন্দনরত তরুণী, কিংবা সংগীহীনা রমণীর নিঃসঙ্গ শয্যায় বিনিদ্র নিশা যাপন ইত্যাদিতে তিনি অভিভূত হলেও দ্রুত পট পরিবর্তনে তিনি কুশলী শিল্পী। দৃশ্য, বাকপ্রতিমা ও অনুষঙ্গ রচনায় তিনি অনন্যসাধারণ শক্তির অধিকারী।

'ওজা' কবিতাটির কথাই ধরা যাক, এই কবিতার আংগিক ডায়েরীধর্মী। হোটেলে কুড়িয়ে পাওয়া ডায়েরী। কোনো নির্দিষ্ট চরিত্র নেই, কোনো রকম সুসংবদ্ধ ঘটনাও নেই। ঘটনাবলী চম্পু-ধারায় বিধৃত, কিছু পদ্য কিছু অংশ গদ্য। এক অসার্থক প্রেম-ঘটনাকে ঘিরে অসংলগ্ন ভঙ্গীতে প্রলম্বিত হয়ে আছে। বর্ণনায় আছে আতঙ্কের মুহূর্ত, প্রেমের কামনা ও আবেগ, আবার মাঝে মাঝে ভাঁড়সুলভ উদ্বেগ উৎকণ্ঠার জ্বালা।

'ওজা' মেয়েটি প্রেমের পাত্রী। কিন্তু এই ভালোবাসার বস্তুটির নাম সম্পর্কে কবি নিশ্চিত নন। সে কি ওজা না জয়া? রুশ ভাষায় এই দুটি কথা একই শব্দের রূপান্তরিত আনাগ্রাম। জয়া কথাটির গ্রীক প্রতিশব্দ জো অর্থাৎ জীবন। এই ওজা বা জয়া নিয়তই রূপান্তরিত হওয়ার শংকায় আচ্ছন্ন, সে রূপান্তরিত হবে, বিকৃত হবে ইত্যাদি এবং এই সবই ঘটবে কোনো অতিপ্রাকৃত বিপর্যয়ের ফলে নয়, এই সম্ভাব্য বিপদ আসবে মানবনির্মিত সাইক্লোস্ট্রোন যন্ত্রের মাধ্যমে। যন্ত্রের শক্তি যেমন বীভৎস এবং আতংককর তেমনই আবার হাস্যকর। সাইক্লোস্ট্রোন এমন এক যন্ত্র যা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে তার সেই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি আবার নবভাবে সাজানোর জন্য। কবি লিখছেন—

"They came out transformed. One had an ear screwed to his forehead, with a pole in the middle, like a doctor's mirror "Luck devil" people consoled him "very convenient for key holes ; You can look and hear at the same time."

বৈজ্ঞানিক প্রগতিশীলতার প্রতি সহনশীল ভংগী থাকলেও কবি ড্রিল সার্জেণ্ট গায়টের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ পোষণ করেন —সেই নির্বোধ কসমিক এজেণ্ট বলেছিলেন,—মুহূর্ত তুমি রূপসী, তুমি স্তব্ধ হয়ে থাকো—'

ওজার কবিতাংশ মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়েছে এবং কবির মনোভংগী সেখানে গদ্যে প্রকাশিত। এই গদ্য বলিষ্ঠ এবং নির্মম স্যাটায়ার এবং অতিপ্রাকৃত কমেডির সংমিশ্রণ—

"The speaker stuck his chest out' But his head, like a celluloid doll's, was back to front. "Forward to the art of the Future!" Everybody agreed with him but which way was forward!"

কবি অদৃশ্য সিঁড়ির উপর দিয়ে কারা যেন ইচ্ছে করেই যাতায়াত করছে নিরন্তর, কল্পনা নেত্রে তাই দেখছেন।

পদ্যাংশের মত গদ্য অংশও অতিশয় সংহত। 'ওজা' নামক দীর্ঘ কবিতাটি অনেক দিক থেকে একালের এক চমকপ্রদ

রচনা। নৃত্যপরা নর্তকী ধীরে ধীরে অংগবাস উন্মোচন করছে—

"As one ... slowly peel an orange' নৃত্যপরা নর্তকী আর খোসা ছাড়ানো কমলালেবুর এই তুলনা অতিশয় উপভোগ্য।

যাই হোক পরিশেষে কবি এমন এক জগতের আশ্বাস পেয়েছেন যেখানে সবকিছু ঠিক ঠিক নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে। যা বিকল তা আবার ঠিকমত জোড়া লাগবে। আর সেই নতুন জগতে বিজ্ঞানীরা পরমানন্দে বিচরণ করবেন।

'বীটনিক'স মনোলগ' নামক কবিতায় আঁদ্রি আরেক পা অগ্রসর হয়েছেন। সাইবেরনেটিক রবোট তার স্রষ্টাকে বলছে—

"Give me your wife!
I have a weakness" it says, "for brunettes; I love them at 30 rpm."

ভবিষ্যৎ যুগের এই সব দানব বিষয়ে আঁদ্রির চিত্তে ঘোরতর আতঙ্ক বর্তমান। অতীতের অত্যাচারী পিশাচদের কথা কবির মনে হয়েছে যন্ত্র সম্পর্কে—

"Machines as barbarous as Batu Khan have enslaved us men."

উনিশ শতকের লেখকদের তিনি শ্রদ্ধা করেন। যেমন লারমনটভের কথা স্মরণ করেছেন। সাহিত্যিক বদ খেয়ালের জন্য তাকে দণ্ডিত করা হয়। ককেসাসে সক্রিয়

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সেনানী হিসাবে কাজ করার জন্য তাঁকে পাঠানো হয়। 'জার' এবং 'মণিব্যাগ' জাতীয় অত্যাচারী পিশাচদের প্রতি তাঁর ধিক্কার ফেটে পড়েছে—এরা সর্বকালের নরপিশাচ, এবং অত্যাচারী শাসক। এরা শিল্পী ও লেখকদের যন্ত্রণা দিয়েছে, জ্বালায় উৎপীড়িত করেছে—তার কারণ এই সব মানুষের প্রতিভা এমনই শক্তিশালী যে—

> "...it could knock a crown off its head and shake the seats of power."

কথিত আছে যে, আইভান দি টেরিবেল রেড স্কোয়ারের সেণ্ট বেসিল কেথিড্রালের স্থপতিদের এবং বারমার চোখ উপড়ে নিয়েছিলেন। এইভাবে চোখ উপড়ে নিয়ে শিল্পীকে সমাদর জানানোর বিবরণ আরো পাওয়া যায়। শিল্পী আর এই রকমটি যেন তৈরী করতে না পারেন, তার জন্যই এই মধ্যযুগীয় বর্বর সতর্কতার ব্যবস্থা ছিল। কবি বলছেন—

> "...for an artist true-born revolt is second nature".

পিকাসোকে দেখতে গিয়েছিলেন ফ্রাংকো তার মনে হয়েছে তিনি—

> "Knotting things into centuries'

এর পর আঁদ্রির মনে হয়েছে—পিকাসোর কাছে ফ্রাংকোর পোর্টরেট আঁকার আদেশ এল। পিকাসো বললেন—ফ্রাংকোর পোর্টরেট? তার মুণ্ডটা আমার কাছে নিয়ে এসো, তারপর আঁকব?'

নিগ্রোদের সম্পর্কে কবির সমমর্মিতা অসীম—

> "We Negroes, we poets,
> in whom the planets splash
> lie like sacks full of legends
> and Stars....
> Trample upon us
> and you kick the firmament."

আঁদ্রির আত্মখ্যাত কবিতা 'আই অ্যাম গইয়া' পৃথিবীর নৃশংসতা ও বিপর্যয়ের মাঝে কবি ও শিল্পীর বার বার যে বিজয় ঘটেছে, তারই বলিষ্ঠ ঘোষণা উচ্চারিত—

> "I am the gullet
> of a woman hanged whose
> body like a bell
> tolled over a blank square
> I am Goya"

আর শেষপর্যন্ত বলেছেন—

> "I am Andrei, not just anyone—'

কবি—কবি, তিনি যে সে বা যে কেউ মাত্র নন। তিনি যে মানবদরদী, মানবিক সমস্যায় বিজড়িত।

—অভয়ংকর

ANTIWORLDS : (Poems) by ANDREI VOZNESENSKY : Translated by W H AUDEN Jean Garrigue, Max Hayward, Stanley Kunitz, Stanley Moss, William Jay Smith, Richard Wilbur : (OXFORD PAPER BACKS) OXFORD UNIVERSITY PRESS PRICE : 7s-6d.

সাহিত্যের খবর

কবিশেখর কালিদাস রায় সম্বর্ধনা—কবিশেখর কালিদাস রায় বর্তমান বাংলার প্রবীণতম জনপ্রিয় কবি। তাঁর ৮২তম জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে বাণীবিতান নামক একটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠান কবির 'সন্ধ্যার কুলায়' নামক বাসভবনে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ এই সভায় উপস্থিত হয়ে কবিকে প্রশস্তি ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। কবি আজ বার্ধক্যের ভারে জীর্ণ, তাঁর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, দেহ অশক্ত এবং দৃষ্টিশক্তি-হীন হয়ে পড়েছে। স্বভাবতই এই অভিনন্দন গ্রহণ করে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন—পঞ্জরে পঞ্জরে প্রাণপাখী ঝটপট করছে। বিদায়ের গান গাইছে। বিদায় আসন্ন। তথাপি এই বিদায়লগ্নে যারা পিছু ডাকে তাঁদের ডাককে অস্বীকার করা যায় না, অন্তরে গ্রহণ করতে হয়।

কবির 'নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতাটির কথা প্রায় সকলেই উল্লেখ করেন। কবির অনুরোধে তাঁর কয়েকটি কবিতা এই সভায় আবৃত্তি করা হয়। এই সভায় কয়েকখানি সংগীত পরিবেশিত হয়।

•

লোকশিল্পের নিদর্শন বাংলার পুতুল : ম্যাকসমুলার ভবনে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সভায় আশীষ বসু বাংলার মাটির পুতুল বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বিভিন্ন দেশে লোক-শিল্পীদের হাতে গড়া পুতুলের ক্রমবিকাশের কথা বর্ণনা করেন। নানা বিষয়ের মধ্যে ও পালা-পার্বণ এবং লৌকিক আচারের মাধ্যমে পুতুল শিল্প আজো সজীবত্ব বজায় রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত প্রায় পঞ্চাশটি পুতুলও তিনি এই সভায় প্রদর্শন করেন।

জনপ্রিয় হিন্দী লেখক গুলসন নন্দ : গুলসন নন্দ বর্তমান কালের সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় উপন্যাস লেখক। তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস 'কাটি পতং' (কাটা ঘুড়ি)—এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যে তার এতাবৎ মোট বিক্রীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০০,০০০। ভারতীয় উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা নাকি রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

•

আচার্য ভানুভক্তের জন্ম-জয়ন্তী : নেপালী কবি আচার্য ভানুভক্তের ১৫৭তম জন্ম-জয়ন্তী বিগত ১৩ জুলাই তারিখ দার্জিলিঙের সর্বত্র পালিত হয়েছে। প্রভাত ফেরী দ্বারা অনুষ্ঠান সুরু করা হয় এবং কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। নেপালী সাহিত্য সম্মেলন আয়োজিত টাউন হলে অনুষ্ঠিত মুক্ত সভায় আধুনিক নেপালী ভাষার উন্নয়নে ভানুভক্তের দান বিভিন্ন বক্তা কর্তৃক স্বীকৃত হয়। রামায়ণ গ্রন্থের অনুবাদ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম একথা অনেকে বলেন। কিছুদিন পূর্বে আচার্য ভানুভক্ত প্রসঙ্গে একটি বিস্তারিত আলোচনা 'অমৃতে' প্রকাশিত হয়।

•

বংগীয় বিজ্ঞান পরিষদে রাজশেখর বসু স্মারক বক্তৃতা : খড়গপুর আই আই টি'র অধ্যাপক গগনবিহারী বন্দোপাধ্যায় এই বছরের রাজশেখর বসু স্মারক বক্তৃতা দান করেছেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'সম্বন্ধবাদ সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্ব'। এই বক্তৃতা সভায় সভাপতিত্ব করেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

•

চার্লস ডিকেন্স সেমিনার : চার্লস ডিকেন্সের জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দিল্লীর হংসরাজ কলেজে একটি সারাদিন ব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ডাঃ মুলকরাজ আনন্দ বলেন—চার্লস ডিকেন্স দরিদ্রের জ্বালা এবং যন্ত্রণা তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তোলেন। শ্রীমতী নয়নতারা সায়গল বলেন—ডিকেন্সের রচনার ফলে সরকার-যন্ত্র, শ্রমশিল্পের ব্যাপারে কিছু কিছু সংস্কার সাধনে বাধ্য হন। আশ্রয়হীন অনাথ বালক-বালিকার জীবনে সংস্কার সাধনেরও প্রচেষ্টা হয়। ডিকেন্সের রচনার অনুপ্রেরণায়। সভায় ডিকেন্স বর্ণিত চরিত্রাবলীর একটি চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।
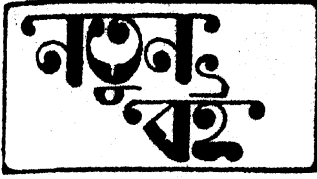
মুর্শিদাবাদের লোকায়ত সংগীত ও সাহিত্য (আলোচনা) : পুলকেন্দু সিংহ। আলফা পাবলিশিং কনসার্ণ। ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯। দাম পাঁচ টাকা।

মুর্শিদাবাদ জেলার লোকসংগীত ও লোক সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন শ্রীপুলকেন্দু সিংহ। পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে লেখক এই জেলার অসংখ্য সাধারণ মানুষ কবিয়াল, ছড়াদার, বাউল, দরবেশ কীর্তনীয়া, পটুয়া, মৃদংগ-বাদক, জারিগানের শিল্পী, ভাদু গানের শিল্পীদের সংগে মিলে আলোচনার উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এদের সংগীত ও সাহিত্যে আজো মেলে সোঁদা মাটির গন্ধ, সহজ, স্বচ্ছন্দ অসংস্কৃত ভাষার সন্ধান। ভূমিকায় গ্রন্থকার বলেছেন: 'গ্রাম গ্রামান্তরে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে তাদের কাছ থেকে শোনা ছড়ায়, পাঁচালীতে মনে হোল তাদের অনেক কথা ছড়ান আছে ছিটান আছে। তাদের মনের কথা জানতে হলে এই ছড়া, ব্রতকথা, পাঁচালী থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। তারা নানাবিধ আর্থিক, সামাজিক ও অন্যান্য সংস্কারের বন্ধনে স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দে যা কোনদিনও প্রকাশ করতে পারে না তা তাদের গুড় গানে, পাঁচালী গানে, পল্লীসংগীতে স্বচ্ছন্দে প্রকাশিত হয়। এখানে তারা নির্ভয় মুক্তকণ্ঠ, মুক্ত হৃদয়। একমাত্র এখানেই তাদের মনের দরজা খোলা। এমনি করে তাঁদের হাঁড়ির খবর নিতে এসে মনের খবর পেয়ে গেলাম।' রাঢ় মুর্শিদাবাদের ব্রতকথা, কীর্তন, ভাঁদুই, বাউল বোলান আঞ্চলিক লোকসংগীতে লোকজীবন, গাজন গানে সমাজচিত্র, জারিগান নিয়ে লেখকের আলোচনাগুলি লোক সংগীত গবেষকদের প্রয়োজন মেটাবে। লেখকের আন্তরিকতার অভাব নেই, কিন্তু বিষয়ের গভীরতর স্তরে তিনি পৌঁছাতে পারেননি। যে মনের খবর লেখক পেয়েছেন তাকে পূর্ণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা উচিত ছিল।

টেমস থেকে তিস্তা (উপন্যাস) — অজিত দত্তগুপ্ত। ১১৭ হাজরা রোড, কলকাতা—২৬। ৬·০০ টাকা।

আর্থার ডবসন-ডরোথী উইলসন, মৃন্ময়, শিউলি, দেবজ্যোতি, ললিতা এদেরই আশা-ভালবাসার কাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পটভূমিকায় আবর্তিত হয়েছে টেমস থেকে তিস্তা অবধি। প্রশংসনীয় প্রয়াস। প্রথম উপন্যাসের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি পরবর্তী লেখায় কাটিয়ে উঠবেন লেখক—এটুকু আশা করা যায়।

স্ত্রী অনেকেই হয়, সহধর্মিণী হয় ক'জন : পেসদ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিবা অ্যান্ড কোং, হাওড়া—১। ৪·৯০।

নামকরণ নজর টানে, বিষয়বস্তুও। 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে' — এই প্রতিপাদ্যকে কিছু গার্হস্থ্যচিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রচেষ্টা অবশ্যই অভিনব এবং প্রশংসনীয়।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

চিত্রাঙ্গদা (বাংলাদেশ সংখ্যা)—সম্পাদক : অজিতমোহন গুপ্ত। ভারত ফটো-টাইপ স্টুডিও। ৭২।১, কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খাঁর নির্যাতনের অসংখ্য আলোকচিত্রশোভিত এই সংখ্যাটি হাতে নিয়ে পাঠক বিস্মিত হবেন। এমন নৃশংসতা ইন্দোচীনে মার্কিন সেনাদের বর্বরতাকেও হার মানায়। দীর্ঘদিনের শোষণ এবং নির্যাতনের অবশেষে বাংলা-দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছে, তারই তথ্য-নিষ্ঠ বিবরণ পাওয়া যাবে 'চিত্রাঙ্গদা'য়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছেন তাজউদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ কামারুজ্জ-মান হোসেন আলী এবং বাংলাদেশ রেডক্রশ সমিতির পক্ষ থেকে আসাবুল হক। গণ-সংগ্রামের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং সাম্প্র-তিক যুদ্ধের ওপর লিখেছেন অনেকেই। পর্যবেক্ষক, নিজস্ব প্রতিনিধি, আসহাব-উল হক, সুধা সেন, ফজলুল হক এবং আরো কয়েকজনের রচনা বিশেষ মূল্যবান। মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবরের দুটি ভাষণের অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। রিৎজে প্রকাশিত ২৫ মার্চ-এর ঘটনার বিবরণ অনুবাদ করেছেন বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়। কয়েকটি কবিতা আছে। বাংলাদেশের পতাকা প্রচ্ছদটিকে যেমন আকর্ষণীয় করেছে, তেমনি পেছনের প্রচ্ছদে বাংলা-দেশের মানচিত্রটিও কম মূল্যবান নয়।

অধুনা সাহিত্য (জ্যৈষ্ঠ : ১৩৭৮)—সম্পাদক : সুধাংকুর মুখোপাধ্যায়। হালিসহর। ২৪ পরগণা।

দুটি গল্প লিখেছেন আশিস ঘোষ এবং সমীরকান্তি বিশ্বাস। যামিনী রায়ের চিত্রকলা প্রসংগে আলোচনা করেছেন প্রীতিভূষণ চাকী। কবিতা লিখেছেন রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, দীপনারায়ণ সাউ, ক্ষিতীশ দেবসিকদার এবং রবীন সুর।

নবাঙ্কুর (ইস্টার সংখ্যা ১৯৭১) সম্পাদক—সুবোধবিকাশ দত্ত। ৬৫।এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। ৩০ পয়সা।

বঙ্গীয় খৃষ্টীয় মণ্ডলীর মুখপত্র নবাঙ্কুর মাসিক পত্রিকাটি এপ্রিল সংখ্যা ইস্টার সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা কথিকা, নাটিকা, রম্য-রচনায় বিশেষ সংখ্যাটিকে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা হয়েছে। এছাড়া আছে কিশোরমহল ও মণ্ডলী সংসদ। খৃষ্ট অনু-রাগীরা পেলে খুশী হবেন।

পার্থসারথি (বৈশাখ '৭৮)—সম্পাদক : প্রীতিকুমার ঘোষ, ৫।এ অক্রুর বোস লেন, কলকাতা—৪। ৪৫ পয়সা।

ধর্ম এবং জাতীয়তাবাদ এ পত্রিকার মুখ্য উপজীব্য। বিবিধ তত্ত্বসম্পর্কীয় প্রবন্ধ যাঁরা পড়তে ভালবাসেন পার্থসারথির এই সংখ্যাটি পেলে খুশি হবেন। প্রতিটি প্রবন্ধই চিন্তার খোরাক যোগাবে। লিখে-ছেন : রুহিদাস সাহা, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, অনিলবরণ রায়, রাধা-চরণ রায়, সুনন্দন ঘোষ ও ভাগবৎ দাস বরাট।

আলেখ্য (ত্রিমাসিকপত্র, এপ্রিল ১৯৭১)। সম্পাদক : ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষাল। ৫০ সন্তোষপুর এভিনিউ। কলকাতা—৩২। এক টাকা।

অধিকাংশ সাময়িক পত্রিকা বহিরঙ্গে যতই আকর্ষণীয় হোক আন্তরঙ্গে বিষয়-বস্তু প্রত্যয়নিষ্ঠ বক্তব্যের অভাবে বৈশিষ্ট্যহীন, শিথিল, অগভীর। কোন-রকমে টি'কে থাকা যেন একমাত্র আদর্শ ও লক্ষ্য। এই অ-সার ঐতিহ্যভ্রষ্ট আদর্শ-লক্ষ্যবিমুক্ত পত্র-পত্রিকার বেনোজলের বন্যায় মধ্যে 'আলেখ্য' এ আশ্চর্য ব্যতিক্রম। মননশীলতার নিরপেক্ষতার নির্ভীকতার ও বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সত্যকার আলেখ্য। সাহিত্য-ভাবনার প্রতিটি দিক আশ্চর্য বাস্তবতার সঙ্গে প্রতিবিম্বিত। বিষয়সূচী বিষয়-বৈচিত্র্য তারই দিকচিহ্ন। সুরজিৎ দাশগুপ্তের 'ইসলাম ও ভারত', যোগেন্দ্র-নাথ সিনহার 'পথের পাঁচালীর বিভূতিবাবু', হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়ের 'বৈষ্ণব সাহিত্যে নায়িকার প্রকারভেদ', সরোজেন্দ্রনাথ রায়ের টলস্টয়ের আর্ট চিন্তা', তীর্থরেণু দাসের 'একারম্যানের সহিত গ্যেটের আলাপন' প্রণবরঞ্জন রায়ের 'ঈশ্বর ও বিদ্যাসাগর' নীরদবরণ চক্রবর্তীর 'বারট্রান্ড রাসেল', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মনুষ্যত্ব কি' প্রভৃতি রচনাগুলি 'সিরিয়স' পাঠকদের বিস্তর চিন্তার খোরাক জোটাবে। 'সাহিত্য পরিক্রমা', 'সংস্কৃতি প্রসঙ্গ', 'সমাজচিন্তা', 'গ্রন্থ-সমালোচনা' শিরোনামে আলোচনা-গুলি সুলিখিত।

প্রাপ্তিস্বীকার

জাগরণী (ত্রৈমাসিক পত্রিকা)। সম্পাদক : দেবকুমার বসু। ৬ ঈশ্বর মিল লেন, কলকাতা—৬। ২৫ পয়সা।

অরণ্য (চতুর্মাসিক পত্রিকা)। সম্পাদিকা রূপালী রায়। ৮।১০৩ বিজয়গড় কলকাতা—৩২। আশী পয়সা।

সম্রাটের খেদ ॥ প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

বৃদ্ধ হচ্ছি, ভাবতে বড় কষ্ট হচ্ছে—হায় বিদূষক!
চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি পার্ষদ সব ডাইনে-বাঁয়ে
হেলছে, আমি বুঝতে পারছি এবং বুঝছে সমস্ত লোক
রাজ্য আমার ভাঙবে এবার ষড়যন্ত্রের কুঠার ঘায়ে।

ইন্দ্রভোগ্য রাজভোগ আর এ-পাকযন্ত্রে হয় না হজম,
সয় যেটুকু, তাও জানি হয় পানপাত্রের আনুকূল্যে
গুণ-কীর্তন যদিও শুনি ভালো বুঝি না রকম-সকম
বন্ধ হবে তোমার মত দু' দশজনা চোখ বুজলে।

একটি গোপন কথা শোনো : ঐ যে চামর-সঞ্চালিনী
গুপ্ত প্রহর যে-নিপুণিকা করতো শীতল, আলিঙ্গনে,
দিনে দিনে শুকিয়ে এলো তারও প্রেমের মন্দাকিনী,
তরুণ সেনাপতির সঙ্গে মত্ত সে প্রেম আলাপনে।

রৌপ্যকেশে এই যে আমার সর্বনাশের চিহ্ন আঁকা
রুখতে পারো এ-পরোয়ানা সৈন্য এনে অক্ষৌহিণী?
রাজকোষ দাও শূন্য করে, দাও বিলিয়ে অঢেল টাকা
তার বদলে না হয় আমি অনাক্রমণ চুক্তি কিনি।

চতুর্বর্গ ফলের সেরা মোক্ষে নেইক আমার মোহ,
সন্তান তো অনেক আমার এবং আছে লক্ষ নাতি,
সবার বিবেচনায় বোধহয় নয় সমুচিত এমন দ্রোহ
খোঁজ করো না, তাদের মধ্যে হতেও পারে কেউ যযাতি!

স্বগতোক্তি ॥ অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়

এই সব দিন গত হলে
ঘাসেদের নরম শরীরে
জ্যোৎস্নার ভিজে আলোয়
আশ্রয় আর কি পাবো?
কোন গর্ভবতী কুঁড়ি
অথবা, লজ্জাবতীর লজ্জা দেখে
শিহরিত আর কি হব?
এই সব দিন গত হলে
পিটিয়ে শক্ত করা মনটা
কোন মুখ দেখে শান্তি
আর কি পাবে?

এই সব দিনে
প্রকৃতির মূক কান্না ভেসে আসে
কোকিলেরা দৈবাৎ শব্দ করে
অবিকল মেসিনের মত
এই সব দিনে
হৃদয়ের বহু নিচে চাপা দেওয়া
সবারই হৃদয়ে ক্ষত।

এই সব দিন গত হলে
আলমারীর কোণে রাখা
সিঁদুর কৌটো খুলে
সিঁথিতে সিঁদুর রাঙিয়ে
ঘষা আয়নায় মুখ দেখে
আমার কথা আগের মত
আর কি কেউ ভাববে?

আত্মনিপীড়ন ॥

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আমি তো জেনেই
গেছি এই খেলা
আত্মনিপীড়ন
সারাটা দিন
ভ্রষ্টবেলা
ধ্বস্ত আলো—
বার বার ফিরে
জ্বলা।

ঝিলি

দেবল দেববর্ম্মা

দরজা খুলে ওকে দেখেই লতিকা ভুরু কোঁচকাল। হাতে একটা রঙচটা, পুরানো সুটকেস নিয়ে সে দাঁড়িয়ে।

মেয়েটি সুশ্রী, চেহারায় চটক আছে। একনজরে ওকে ভদ্রঘরের বলেই মনে হল, পরনে নকশা পাড় হলুদ রঙের তাঁতের শাড়ি। গায়ের রঙ খুব ফর্সা নয়, ঈষৎ চাপা, চোখ দুটি বড়ো না হলেও ভাসা-ভাসা। ডিমালো মুখ। ছোট কপাল। মুখের ডৌলটি বেশ মিষ্টি বলা যায়।

লতিকা ভাবছিল মেয়েটি কে? সাজ-সজ্জা. হাতের সুটকেসের দিকে তাকালে মনে হয় পড়তি অবস্থা। অর্থাৎ পুরানো অসুখের মত দারিদ্র্যে জর্জর। ঘরে অভাব-অনটন। তাই সাত-সকালে সাহায্যের আশায় গেরস্থের দরজায় হাজির। কিম্বা এমনও হতে পারে মেয়েটি কোনো ক্ষুদে কোম্পানীর সেলস-গার্ল অথবা ক্যানভাসার। ধূপকাঠি, নেল পালিশ, আলতার শিশি, কম-দামী স্নো পাউডার বেচে। ওর টিনের সুটকেসটা এই সব মালপত্রে বোঝাই নানা সামগ্রীর মুখকৌতুকে এখনই মুখর হয়ে উঠবে।

ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে লতিকা অপ্রসন্ন মুখে শুধোল,—'আপনার কি চাই বলুন তো?'

মেয়েটি কথায় সহজ, স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি। সে হেসে বলল,—'আমায় আর আপনি বলবেন না দিদি। আমি আপনার চেয়ে বয়সে ছোটই হবো, আমায় তুমি বলবেন।'

গলার নরম সুর, নম্র, বিনীত ভঙ্গি। যা মানুষকে খুশি করে, কিন্তু তবু লতিকার মুখের অপ্রসন্নভাব ছেঁড়া মেঘের মত এদিক সেদিক সরল না। সে তেমনি ভুরু কুঁচকে শুধোল, —'কোথা থেকে আসছ তুমি?'

মেয়েটি তার জামার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একটা বন্ধ করা খাম বের করল। লতিকার হাতে সেটি তুলে দিয়ে বলল,—'আমাকে মাধবীদি পাঠালেন আপনার কাছে। নিউ আলিপুরের মাধবী বসু। আপনার নাকি একজন সর্বক্ষণের লোকের দরকার দিদি—'

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল, লতিকার মনে পড়ল এবার। দিন সাতেক আগে মাধবীর সঙ্গে কলেজ স্ট্রীটে দেখা।

ছেলের জন্য কটা বই কিনবে, তাই অতদূর থেকে বইপাড়ায় আসা। তাকে দেখে মাধবী মুচকি হেসে বলল,—'তোর অবস্থা তো দেখছি সাংঘাতিক। এই শরীরে ঘরের কাজ-কর্ম, স্কুলের চাকরি কেমন করে সামলাচ্ছিস?'

—'সামলাতে হচ্ছে। নইলে উপায় কি বল?' লতিকা জবাব দিল, দুঃখ করে বলল,—'বাড়িতে একটা ঠিকে লোক আছে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ থাকে? সংসারের ঝক্কি-ঝামেলা সব আমার ঘাড়ে, অনেক চেষ্টা করেও সর্বক্ষণের জন্য একটা লোক জোগাড় করতে পারিনি। নইলে হয়ত শরীরটা একটু বিশ্রাম পেত।'

তার অবস্থা দেখে মাধবীর বোধ করি মায়া হল। সহানুভূতি জানিয়ে সে বলল,—'না, না। এই অবস্থায় এত খাটা-খাটনি ভাল নয় রে, তা সর্বক্ষণের জন্য লোক রাখবি তুই?'

—'তেমন লোক আছে তোর সন্ধানে?' লতিকা সাগ্রহে শুধোল।

—'আছে একজন', মাধবী এক মুহূর্ত ভাবল, 'আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে সে কাজ করে, কিন্তু ভদ্রলোক হঠাৎ দিল্লীতে ট্রান্সফার হয়েছেন। এই সপ্তাহেই সেখানে যেতে হবে। সেই মেয়েটি কাজ চায়। তোর পছন্দ হলে রাখতে পারিস।'

—'লোক পাওয়াই যায় না। পছন্দ-অপছন্দের কথা কে তুলছে? শুধু একটা বিষয় জানা দরকার। মেয়েটি বেশ বিশ্বাসী তো? মানে ঘর-দোর সব ওর হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়?'

—'নিশ্চিন্তে,' মাধবী ঘাড় হেলিয়ে জবাব দিল। 'আমার সেই আত্মীয়ের বাড়িতে ওকে আজ বছরখানেক দেখছি। ছুটিছাটায় ওরা স্বামী-স্ত্রী বেড়াতে গেছে। আবার সন্ধ্যের দিকে এখানে-সেখানে ঘুরত ফিরত। তখন তো বাড়ি-ঘর ওরই হেপাজতে। জিনিসপত্র, বাক্স-বিছানা সব ওই আগলাত।'

লতিকা খুশি হয়ে বলল,—'এমনি এক-জন লোকই তো আমি খুঁজছি রে। ও যদি রাজি থাকে, তাহলে তুই ওকে কালই পাঠিয়ে দিস।'

—'উঁহু'। কাল হবে না।' মাধবী মাথা নাড়ল। বলল,—'আমি ওকে কাল ডেকে পাঠাব। এলে পর তোর কথা বলব। মেয়েটি রাজি হলে পাঠিয়ে দেব তোর কাছে, কেমন?'

—'দেখিস, বাড়ি ফিরে আবার সব কথা ভুলে যাস নে যেন,—' বন্ধুর আন্তরিকতায় লতিকা এবার সন্দেহ প্রকাশ করল।

মাধবী হেসে বলল,—'কিচ্ছু ভুলে যাব না। সব আমার মনে থাকবে। তুই নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যা,—বুঝলি?'

তা সত্যি। মাধবী তার কথা রেখেছে। একটি অক্ষরও ভোলেনি। সাতদিনও পেরোয়নি। জলজ্যান্ত একটি কাজের মানুষ লতিকার বাড়ির দরজায় সে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

ওর হাতে কয়েক ছত্রের একটি পত্র। মেয়েটি কাজ করতে রাজি। খাওয়া পরা ছাড়া মাসে তিরিশ টাকা মাইনে চায়। ইচ্ছে করলে লতিকা ওকে এখনই কাজে বহাল করতে পারে।

মনের গুমোট কখন গলে জল। কোঁচকানো ভুরু এখন সহজ, স্বাভাবিক। ঝকঝকে নীল আকাশের মত অন্তরে উপচানো খুশি। লতিকা এবার হেসেই বলল,—'ওকি! তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভিতরে এসো।'

নেহাৎ ছোট ফ্ল্যাট। পাশাপাশি দুখানা ঘর। সামনে একফালি বারান্দা। সেখানে দুখানা চেয়ার, একটা স্টীলের টেবিল পাতা। পায়রার খোপের মত রান্নাঘর, বাথরুম।

নিশীথ ঘরে, এখনও বিছানা ছাড়েনি। ভীষণ আলসে লোক। কখন শয্যা ছেড়ে উঠবে, বাজার-হাট যাবে তা সেই জানে। লতিকা ঘরে পা দিয়ে দেখল খবরের কাগজের পাতায় মুখ গুঁজে নিশীথ নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে।

লতিকা প্রায় নিঃশব্দে ওর পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। মুখের উপর খবরের কাগজের আড়াল বলে নিশীথ ওকে দেখতে পায় নি। দুষ্টুমী করে লতিকা ওর পায়ের তলায় আলতো আঙুলে বুলিয়ে সুড়সুড়ি দিল।

সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজটা ফেলে নিশীথ উঠে বসল।

লতিকা অনুযোগ করে বলল,—'দিন দিন কুঁড়ের বাদশা হয়ে উঠছ। এবার বিছানা থেকে নামো। বাজার-হাট যেতে হবে না?'

নিশীথ মুখে কুঁচকে বলল,—'কটা বেজেছে? বাজার যাওয়ার জন্য এত তাড়া কিসের?'

—'তাড়া আছে। তুমি এবার বিছানা থেকে নামো দিকি। একটা দরকারী কথা বলব।' লতিকা ওর সামনে এসে দাঁড়াল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিছানা ছেড়ে নামল নিশীথ। হাই তুলল, চোখ কচলাল। মাথার চুলে একবার হাত বুলোল। তারপর বউয়ের গলাটা প্রায় জড়িয়ে ধরে বলল,—'কি আদেশ, কহ দেবী।'

লতিকা স্বামীর ঠোঁটের উপর ডান হাতের দুটো আঙুলে প্রায় চেপে ধরল। ফিস ফিস করে বলল,—'চুপ কর। বাইরে লোক দাঁড়িয়ে আছে। কি ভাববে—'

নিশীথ স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে শুধোল,—'কে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে? এত সকালে এল কে?'

—'বলছি এখুনি। একটু ধৈর্য ধরে শোন।' লতিকা এক মুহূর্ত থামল। ফের বলল,—'মাধবী আমাকে একজন সর্বক্ষণের লোক পাঠিয়ে দিয়েছে। ওকে রাখব তো?'

—'দাঁড়াও, দাঁড়াও।' নিশীথ ব্যাপারটা বুঝতে চাইল। 'মাধবী কে? হঠাৎ তোমাকে লোক জোগাড় করে দিল যে।'

—'আহা! মাধবীর কথা তোমাকে বলিনি?' লতিকা স্বামীকে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করল। বলল,—'আমার পুরোনো বন্ধু। সেদিন কলেজ স্ট্রীটে দেখা। ওর সন্ধানে একজন লোক আছে বলেছিল। তাকেই পাঠিয়ে দিয়েছে।'

—'বেশ তো, ওকে তাহলে বহাল করো। তোমার শরীর ভাল নয়। একজন লোক তো খুব দরকার—।'

—'দরকার তো বটেই।' লতিকা আরো কিছু বলবে এমনি একটা ভাব করে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল,—'কত মাইনে নেবে জানো?'

—'কত?'

—'তিরিশ টাকা।'

—'ড্যাম্ চীপ। এর চেয়ে কমে একজন হোল-টাইম কাজের লোক পাওয়া যাবে না।' নিশীথ প্রায় ঘোষণা করল।

—'তাতো বুঝলাম।' লতিকা খাটো গলায় বলল। 'কিন্তু আরো একটা কথা ভাববার আছে। মেয়েটিকে একবার দেখ না তুমি। বেশ ইয়ং, আর দেখতেও মন্দ নয়। সোমত্ত বয়সের এমনি মেয়ে রাখব? ওর হাতে ঘরদোর ছেড়ে দিয়ে যাওয়া কি উচিত হবে?'

—'অত ঠিকুজি-কুষ্ঠি বিচার করে কি লোক রাখা যায়? বেশী খুঁতখুঁত করে লাভ নেই লতিকা—'

—'তাহলে ওকে রেখে দিই।' লতিকা স্বামীর মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মেয়েটি চুপ করে দাঁড়িয়ে। সুটকেসটা নীচে নামিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। দেওয়ালের কোণের ঝুল, বারান্দার এক কোণে জমিয়ে রাখা টুকরো কাগজপত্রের আবর্জনার উপর চোখ বুলোচ্ছে।

লতিকা শুধোল,—'আচ্ছা, তোমার কি নাম বললে না তো?'

—'আমার নাম পারুল ঘোষ। আপনি পারুল বলে ডাকবেন দিদি।'

—'বেশ, তাই ডাকব।' লতিকা হেসে ফেলল। বলল,—'তুমি তাহলে আজ থেকেই শুরু কর। ঘরদোরের অবস্থা দেখছ তো। আমার আর ক্ষমতা নেই পারুল। ঠিকে ঝিকে বলে বলে হয়রান। কি যে ঝাঁটপাট দেয়, দরজার কোণের ঝুলগুলো পর্যন্ত ঝেড়ে না।'

পাশের ঘরেই ওকে থাকতে দিতে হল। নইলে এ বাড়িতে আর জায়গা কোথায়? বাড়তি লোকজন এলে খুব অসুবিধে হবে। কিন্তু উপায় নেই। লতিকার শরীরের যা অবস্থা, ওকে পেয়ে তবু নিশ্চিন্ত। না হলে কদিন পরে দুটো ডাল-ভাত কে ফুটিয়ে দিত কে জানে—।

তবু নিশীথকে সে জানিয়ে রাখল। "পাশের ঘরেই ওকে থাকতে দিলাম, বুঝলে?"

—'দাও। তুমি যা ভাল বোঝ, কর।' নিশীথ অন্যদিকে তাকাল।

লতিকা আর কথা বাড়াল না। নিশীথ এমনি মানুষ। সংসারে সে মাথা গলাতে নারাজ। লতিকা যা করবে তাই। মাস-কাবারে মাইনে পেয়ে, সে স্ত্রীর হাতে টাকাটা তুলে দেয়। এর বেশী সে জানে না। ঘরের ব্যাপারে লতিকাই সর্বেসর্বা। তার ইচ্ছে, মত সে খাটাতে পারে।

তবু লতিকার মনটা খুঁতখুঁত করছিল। ঠিক তাদের শোবার ঘরের পাশেই একটি সোমত্ত মেয়েকে সে থাকতে দিতে চায় নি। ফ্ল্যাট বাড়ি,—পার্টিশন দেওয়ালগুলো ভীষণ পাতলা। এ ঘরে বসে একটু জোরে কথা বললে ও ঘরে শোনা যায়। আর হাসলে তো কথাই নেই। পাশের ঘরের মানুষ ঠিক তা টের পাবে।

দুটো ঘরের মাঝখানে ছোট দরজা। এতকাল সেটা খোলা থাকত। কালে-ভদ্রে লতিকা বন্ধ করেছে। আজ পাশের ঘরে ঢুকে প্রথমেই সেটা ভেজিয়ে দিল। ঘরের চার পাশে একবার চোখ বুলোল লতিকা। অনেক জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। কিছু সে ও ঘরে নিয়ে যাবে। কিছু এখানেই থাকবে। পারুলকে ডেকে বলল, —'এই ঘরে সুটকেসটা রাখ। এখানেই তুমি শোবে'। ফের ভেজানো দরজার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, — 'রাত্তিরে ঘুমোবার আগে খিলটা তুলে দিও, কেমন?'

পারুল সুটকেসটা ঘরের এক কোণে রেখে বলল,—'আমি কাপড়টা পাল্টে নিই দিদি। তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে যাই। আপনা-দের তো আবার আপিস আছে,—সকাল নটায় নিশ্চয় ভাত দিতে হবে।'

ওর ব্যস্তভাব দেখে লতিকা খুশি হল। মেয়েটা কাজের হবে মনে হয়। তাছাড়া বেশ চটপটে আর পরিষ্কার। দেখে-শুনে তো মনে হয়, ও ভদ্রঘরের মেয়ে। অবস্থার ফের। তাই পরের বাড়িতে কাজে ঢুকেছে।

লতিকা হেসে বলল,—'আমি অফিসে যাই না পারুল। স্কুলে পড়াই। আমার অত সকালে ভাত না হলেও চলবে। তবে ওর অফিস আছে। নটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না। তার আগেই ভাতের জন্য তাড়া দেবে দেখো।—'

বারান্দায় এসে লতিকা দেখল নিশীথ মুখ-হাত ধুয়ে তৈরী। থলি হাতে নিয়ে বসে আছে। অন্য দিন বাজার যাবার জন্য স্বামীকে সাতবার তাগাদা দিতে হয়। লতিকা তাই মুচকি হেসে শুধোল,—'কি ব্যাপার, আজ একেবারে গুড-বয়। থলি হাতে বসে আছ যে—'

—'টাকা দাও।' নিশীথ হাত বাড়িয়ে দিল।

ঘরের মধ্যে ঢুকে বাজারের টাকা নিয়ে এল লতিকা। কি কি আনতে হবে মুখে তার একটা ফিরিস্তি দিল। তারপর খাটো গলায় স্বামীর মুখের উপর চোখ রেখে বলল,—'তাড়াতাড়ি এসো। আমি চায়ের জল উনুনে বসিয়ে রাখব।'

নিশীথ বেরোলে পর লতিকা ফের রান্নাঘরে ঢুকল। পারুলকে কাজকর্ম বুঝিয়ে দিতে হবে। তার ভাঁড়ারে কোথায় কি আছে ওকে জানিয়ে রাখা দরকার। নইলে এটা-ওটা দিতে রান্নাঘরে তাকে দশবার ছুটে আসতে হবে।

পারুল উনুন ধরাতে ব্যস্ত ছিল। লতিকার পায়ের শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। বলল,—'ঘুঁটে কিন্তু ফুরিয়ে গেছে দিদি। এবেলা কোনমতে হল। ওবেলায় আনতে হবে।'

—'তাই বুঝি?' লতিকা ঈষৎ ভ্রূ কোঁচকাল। বলল,—'আমি অত খেয়াল করি নি পরুল। ঠিক আছে, স্কুলে যাবার পথে আমি ঘুঁটে-বুড়িকে বলে যাব। দুপুর-বেলায় ও দিয়ে যাবে। তুমি একটু দেখে-শুনে নিও. কেমন?'

পারুল ঘাড় হেলিয়ে ফের কাজকর্ম সারতে লাগল। লতিকা দেখছিল। সত্যি. মেয়েটা কাজের। এক ফাঁকে কখন রান্নাঘরে ঝাঁট দিয়েছে পারুল। জিনিসপত্রগুলি এদিক-ওদিক গুছিয়ে রেখেছে। উনুনে আঁচ দিয়ে নিশ্চয় চায়ের সরঞ্জাম নামাবে।

—'আপনার কথা মাধবীদি আমাকে বলেছেন।' পারুল মুখ না তুলেই বলল।

—'ওমা! কি বলেছে মাধবী?' লতিকা শুধোল।

—'মানে, এই আপনার বাচ্চা-কাচ্চা হবে।'

—'ও. তাই বলো।' লতিকা মুচকি হাসল।

—'এখন ক মাস চলছে দিদি?' পারুল জানতে চাইল।

ন মাস। তাই তো আর খাটতে পারি না।' লতিকা ক্লান্ত গলায় বলল। 'খালি শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। তোমাকে পেয়ে আমার খুব সুবিধে হল পারুল।'

—'ওমা! ন মাস? বলেন কি দিদি? দেখে তো মনেই হয় না।' পারুল লতিকার দেহের উপর ধীরে-ধীরে নজর বুলোল। ফের বলল, 'বাচ্চা খুব ছোট্ট হবে দেখবেন। তবে তার জন্য চিন্তা নেই। সেবার মাধবীদির মেয়ে হল মোটে পাঁচ পাউন্ড। কিন্তু হলে কি হবে? ওষুধে আর বেবী ফুডে সেই মেয়ে এমন পুরন্ত, গোলগাল হয়ে উঠল যে, মায়ের কোলে আর ধরে না।'

বাজার নিয়ে নিশীথ ফিরল। লতিকা টেবিলে বসে খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলোচ্ছিল। নানা ধরনের সব খবর। কলহ-বিবাদ-দুর্ঘটনা। সিনেমা-থিয়েটার-জলসা. আরো কত ফাংশন। নতুন শাড়ির ঝকঝকে বিজ্ঞাপন।

থলিটা নামিয়ে রেখে নিশীথ চেয়ারে বসল। স্ত্রীর মুখোমুখি হল।

লতিকা গলা বাড়িয়ে বলল, — 'কই আমাদের চা দিয়ে যাও পারুল।'

মিনিট চার-পাঁচ পরেই পারুল এল। তার হাতে চায়ের ট্রেতে তিন কাপ চা। প্লেটে টোস্ট-পাউরুটি।

টেবিলের উপর সেগুলি নামিয়ে রাখল পারুল। নিশীথকে চা দিল। লতিকার দিকেও চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। নিজে একটা কাপ নিল। প্লেট থেকে টোস্ট নিতেও ভুলল না।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল পারুল। বলল — 'নিশীথদা, চা কেমন হয়েছে? চিনি কম হয় নি তো?'

ওর মুখে স্বামীর নাম শুনে লতিকা তাকাল।

নিশীথ হেসে বলল,—'চা ভালো হয়েছে চিনি কম হবে কেন?' ফের স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধোল, — 'কি লতিকা. তোমার কেমন লাগছে বলো।'

—'ভালোই তো।' লতিকা আড়চোখে পারুলের মুখের উপর একবার দৃষ্টি বুলোল। তারপর ওকে সরিয়ে দেবার জনাই যেন বলল,—'বাজারের থলিটা এখান থেকে নিয়ে যাও পারুল। মাছটা তাড়াতাড়ি কুটে ফেল। কি তরকারি হবে আমি বলে দেব তোমায়—'

অফিস যাবার আগে নিশীথ বলল,—'পারুল রান্না ভালো করেছে। চচ্চড়িটা বেশ খেতে লাগল।'

—'হ্যাঁ. মেয়েটা কাজের। তবে একটু গায়ে-পড়া ভাব আছে। তোমাকে কেমন নিশীথদা বলে ডাকছে দেখো না। যেন কতদিনের জানা-পরিচয়।'

নিশীথ কোন উত্তর দিল না। স্ত্রীর বিরক্তির কারণ বুঝতে পেরে চুপ করে রইল।

একটু থেমে লতিকা ফের বলল,—'অবশ্য ওর কথাবার্তাই ওই রকম বলে মনে হয়। সকালে মাধবীর কথা হল। তাকেও মাধবীদি বলছিল। এর আগে যে বাড়িতে কাজ করত, সেখানেও কর্তাকে বোধহয় অমুকদা বলে ডাকত।'

নিশীথ শুধোল,—'আচ্ছা পারুলকে তো বিবাহিতা বলে মনে হল। ওর সিঁথিতে সিঁদুর দেখলাম যেন। স্বামী কোথায় কি করে, খোঁজ নিয়েছ কিছু?'

—'উঁহু', লতিকা ঘাড় নাড়ল। স্বামী কি করে, কোথায় থাকে, তা জেনে আমার কি দরকার? ও এসেছে কাজ করতে, ভাল করে কাজ করবে। আমি এই বুঝি—'

মাঝের দরজাটা ভেজান ছিল। ওঘর থেকে খিল তুলে দেয় নি। হাওয়া লেগে সেটা খুলে গেল। এদিকেও একটা ছিট-কিনি আছে। লতিকা দরজার পাল্লা দুটো টেনে ছিটকিনিটা এঁটে দিল। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল,—'এখন এই থাক। পারুলকে বলেছি রাত্তিরে যেন খিল দিয়ে ঘুমোয়।'

—নিশীথ অফিস বেরিয়ে গেলে লতিকা ঠিক গ্রীষ্মদিনের ঝিমিয়ে পড়া লতার মত নির্জীব. চুপচাপ বিছানায় শুয়ে রইল। মাথাটা মাঝে-মাঝে ঘোরে....কেমন ঝিমঝিম করে। ডাক্তার তো প্রায়ই বলে, লো প্রেসার। এই অবস্থায় পরিপূর্ণ বিশ্রাম দরকার। কিন্তু এমন স্কুল তার। হেড মিসট্রেস দু মাসের বেশী ছুটি দিতে কিছুতেই রাজি নয়। সুতরাং আরো কটা দিন স্কুলে যেতে হবে। অথচ উঁচু ক্লাসের মেয়েরা ব্যাপারটা বোঝে। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে। তখন এমন লজ্জা করে লতিকার।

রাত্তিরে শোবার সময় লতিকা বলল,—'ওগো শুনছ। তুমি পারুলের স্বামীর কথা

বলছিলে না। সেকথা ওকে আজ জিজ্ঞেস করেছিলাম।—'

নিশীথ পাশ বালিসটা জড়িয়ে ধরে ওপাশে মুখ ফিরিয়ে শুয়েছিল। স্ত্রীর দিকে না তাকিয়েই শুধোল, — 'কি বলল পারুল?

—'কি আবার বলবে? কথা শুনে এমন হু-হু করে কেঁদে উঠল যে, আমারই কষ্ট হচ্ছিল।'

নিশীথ এবার মুখ ফেরাল। স্ত্রীর গায়ে একটা হাত রেখে বলল,—'হঠাৎ কেঁদে উঠল কেন?'

—'বারে! কাঁদবে না? এমন পোড়া কপাল মেয়েটার। বিয়ের তিন মাস পরেই স্বামী একরকম নিরুদ্দেশ। ভিলাই না কোথায় চাকরি খুঁজতে বেরোল। ব্যস, সেই যাকে বলে নিপাত্তা। আর ফিরে আসে নি। অনেক চেষ্টা-চরিত্র, সম্ভব-অসম্ভব বহু জায়গায় খোঁজ-খবর করেছে পারুল। কিন্তু স্বামীর সন্ধান পায় নি।'

—'তাই নাকি?' নিশীথ মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ভেরী স্যাড কেস।'

লতিকা বড়-বড় চোখ করে কথা বলছিল। 'জানো, ও ভদ্রঘরের মেয়ে। পারুলের বাবা ডায়মণ্ডহারবার কোর্টে মুহুরি ছিলেন। ওরা দুই বোন। পারুলের দিদির নাম চম্পা। ওর বিয়ে হয়েছে বর্ধমানের কাছে রসুলপুরে। তারও অবস্থা নাকি তেমন ভালো নয়। বরের কিছু জমিজমা আছে, এই পর্যন্ত। এদিকে মা-বাপ দুজনেই মারা গেল। মেয়েটার আর দিন চলছিল না। তাই পরের বাড়িতে চাকরি করে দুটো খেতে পাচ্ছে।'

স্ত্রীর মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিশীথ মনে-মনে হাসল। লতিকা এমনি। অথচ আজ সকালে সে পারুলের উপর রীতিমত বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু এখন? পারুলের জন্য তার কষ্ট....কত মায়া, আঁচে বসানো উথলে ওঠা এক পাত্র দুধের মত লতিকা সহানুভূতিতে উচ্ছল।

দিন দশেকের মধ্যে ঘরের রূপটাই বদলে দিল পারুল। কোথাও ধুলো-বালি জমে নেই, নোংরা-আবর্জনা সব পরিষ্কার। দুবেলা ঘর মুছছে। সিলিঙে, দেওয়ালের কোণে আগে ঝুল জমে থাকত। পারুল নিজের হাতে সব দূর করল। জানালা-দরজার পর্দাগুলো কতদিন কাচা হয় নি। মশারি, বালিশের ওয়াড়, মায় বিছানার চাদরগুলো পর্যন্ত ময়লা। পারুল সেগুলি কাচল, নিজে ইস্ত্রি করল। ধবধবে শাদা বালিশের ওয়াড়ে মাথা রেখে নিশীথ বলল,—'সত্যি, পারুলের ক্ষমতা আছে। দু হাতে কত দিক সামলাচ্ছে দেখো।'

ওর কাজকর্মে লতিকাও সন্তুষ্ট। সে বলল, — 'তা ঠিক। ঘরকন্নার কাজে পারুলের জুড়ি নেই। সব দিকে নজর আছে মেয়েটার। ওষুধ খাওয়ার কথা কত দিন মনে থাকে না আমার। কিন্তু পারুলের খেয়াল আছে। আমি ভাত খেয়ে উঠলেই ওষুধের শিশি, চামচে, গেলাস সব এনে হাজির করবে।' দুঃখ করে লতিকা ফের যোগ করল,—'অথচ মেয়েটার কি দুর্ভাগ্য দেখ। ঘর-সংসারে মন ঢেলে দিচ্ছে, এমন সেবাযত্ন করছে। তবু ওই মেয়ের কপালেই ঘর-বর কিছুই সইল না।'

এ বাড়িতে পারুল আসার পর থেকে নিশীথেরই সবচেয়ে বেশী সুবিধে হয়েছে। নটা বাজলেই তাকে অফিসে দৌড়ুতে হয়। বেশী দেরী করলে ট্রাম-বাস সব খড়-বোঝাই গোরুর গাড়ির মত, মানুষজনে ঠাসাঠাসি। শেষ দিকে সে প্রায়ই লেট হচ্ছিল। সংসারের ভারী জোয়ালটা লতিকা ক্লান্ত শরীরে আর টানতে পারছিল না। ভাতে-ভাত, আলু-সেদ্ধ, তাও সময়ে হত না। অথচ পারুল এসে রান্নাঘরে ঢোকার পর থেকেই অন্য ছবি। নটা বাজার অনেক আগেই সে তাগাদা দিয়ে বলে—'নিশীথদা, স্নান-টান হল আপনার? আমার কিন্তু ভাত-তরকারি সব রেডি। আপনি খেতে বসতে পারেন।'

টেবিলে ভাতের থালা, তরি-তরকারি, ঝোলের বাটি সাজিয়ে দেয় পারুল। সব দিন লতিকা সামনে এসে বসতে পারে না। মাথা ঘোরে। তখন পারুলই নিশীথের সামনে এসে বসে। জোর করে এটা-ওটা খাওয়ায়। ভাত ফেলে উঠে যেতে দেয় না। ফের তরকারি কিম্বা আর এক টুকরো মাছ এনে পাতে দেয়। বলে,—'একটি ভাতও ফেলা চলবে না নিশীথদা। সব খেয়ে যেতে হবে আপনাকে।'

শুধু তাই নয়। অফিসে বেরোবার সময় নিশীথ রুমাল খোঁজে। লতিকা বিছানায় শুয়ে থাকে। রুমাল কেন, সংসারের অনেক কিছুরই খবর সে এখন রাখে না। নিশীথের গলা শুনে ওঘর থেকে পারুল দৌড়ে আসে। রুমাল খুঁজে এনে দেয়। ধবধবে পরিষ্কার রুমাল। পারুলের নিজের হাতে কাচা। রুমালটা পকেটে গুঁজে নিশীথ দ্রুত বেরিয়ে পড়ে।

কদিন পরে লতিকা হঠাৎ বলল,— 'শোন একটা কথা তোমাকে বলব ভাবছিলাম।'

নিশীথ বিছানায় শুয়ে হালফিল একটা পত্রিকার পাতায় চোখ বুলোচ্ছিল। সে মুখ না তুলেই শুধোল,—'কি কথা বলবে ভাবছিলে?'

—'এই পারুলের কথা।' লতিকা ফস করে যেন দেশলাইয়ের কাঠিতে আগুন জ্বালাল।

—'পারুলের কথা? কেন কি হল?' নিশীথ ভুরু কোঁচকাল।

—'দেখ, পারুল কিছুতেই দরজায় খিল দিয়ে শোবে না। আমি বলে-বলে হার মেনেছি—'

—'সে আবার কি? কোন দরজায় পারুল খিল দেয় না?'

লতিকা বিরক্ত মুখে বলল, — 'কোন দরজায় আবার? দুটো ঘরের মাঝখানের এই দরজাটায়। ওকে পই-পই করে বলেছি, রাত্তিরে ঘুমোবার আগে যেন খিল দিয়ে শোয়। কিন্তু অদ্ভুত মেয়েমানুষ। কিছুতেই দরজায় খিল লাগাবে না।'

—'তুমি ওকে বুঝিয়ে বলো। ঘরে খিল দিতে অসুবিধে কিসের?—'

—'কি জানি বাপু। ওকে বোঝাতে হয় তুমি চেষ্টা কর। আমি আর মুখ খরচ করতে পারব না। সোমত্ত মেয়েছেলে। ঘরে খিল না দিয়ে শোয় কেমন করে?'

নিশীথ ব্যাপারটা সহজ করতে চেষ্টা করল। 'দরজা তো বন্ধই থাকে। তুমি রোজ রাত্তিরে ছিটকিনি এঁটে দাও না?'

—'তা দিচ্ছি। কিন্তু আমারও তো ভুল-চুক হতে পারে। ঘুমোতে যাওয়ার আগে নিজের দরজায় খিল দেওয়া কি ওর উচিত নয়?' লতিকা এক মুহূর্ত চিন্তা করল। ফের বলল,—'বেশী টিক-টিক করলে আমার দিকে তাকিয়ে ও হাসে। বলে খিল দেবার কথা মনে থাকে না দিদি। তাছাড়া পাশের ঘরে আপনি তো রইলেন। আমার ভয়টা কিসের?'

দিন দুই-তিন পর। অনেক রাত্তিরে পিঠের উপর স্ত্রীর কোমল করস্পর্শ অনুভব করল নিশীথ। না, সোহাগ নয়। লতিকা তাকে জাগাবার চেষ্টা করছে। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে দেখে নিশীথ তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

—'কি ব্যাপার?' সে স্ত্রীকে শুধোল।

—'চুপ।' লতিকা ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে ইঙ্গিতে নিশীথকে কথা বলতে নিষেধ করল। গলা নামিয়ে বলল,—'দেখো, আজ অত বললাম। তবু পারুল খিল না দিয়ে ঘুমোচ্ছে।'

নিছক মেয়েলি কৌতূহল। এই সামান্য ব্যাপারে তাকে ঘুম থেকে টেনে তুলবার কোন মানে হয় না। মনে-মনে খুব বিরক্ত হল নিশীথ। কিন্তু রাত দুপুরে এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বাদানুবাদ করতে ইচ্ছে করল না।

—'নেমে এসো বিছানা থেকে।' লতিকা ফিস-ফিস করে বলল।

স্ত্রীর পিছু-পিছু নিশি-ডাকা মানুষের মত পা ফেলছিল নিশীথ। দরজার ছিটকিনিটা লতিকা প্রায় নিঃশব্দে এবং সন্তর্পণে খুলল। তার কথাই সত্যি। পারুল আজও খিল দেয় নি। দরজা ঠেলতেই আবছা অন্ধকারে ঘরের ভিতরটা প্রায় স্পষ্ট দেখাল। বিছানায় পারুল শুয়ে। ঘুমে অচেতন। দরজা খুলে দুটো মানুষ ঘরে ঢুকেছে তাও সে টের পায় নি।

লতিকা মুখ কুঁচকে বলল,—'কি বেহুঁশ হয়ে ঘুমোয় দেখেছ? রাত দুপুরে কেউ যদি সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে যায়, তাও বোধহয় ওর ঘুম ভাঙবে না।'

নিশীথ তাড়াতাড়ি বলল,—'চুপ, চুপ। অত কথা বলো না। হঠাৎ জেগে উঠে আমাদের দেখলে ও ভাববে কি?'

দিন কয়েক পরে লতিকা ফের বলল, —'জানো, পারুল আবার এক পাগলামি শুরু করেছে।'

—'পাগলামি?' স্ত্রীর কথা শুনে নিশীথ ফিরে তাকাল। 'কি ব্যাপার?'

'—একে পাগলামি ছাড়া আর কি বলতে পারি? পারুল সব কিছুতেই আমার সমান হতে চায়।'

অভিনব অভিযোগ। নিশীথ তাই কৌতূহলী হল। স্ত্রীর মুখের উপর চোখ রেখে বলল,—'ব্যাপারটা খুলে বলো, নইলে কেমন করে বুঝবো?'

—'অত খুলে-টুলে এসব ব্যাপার বলা যায় না। খানিকটা তোমাকে বুঝে নিতে হবে।' ভাববার জন্য একটু সময় নিল লতিকা, ফের বলল,—'খাওয়া-দাওয়া, জামা-কাপড়, সব ব্যাপারেই পারুল আমার সংগে পাল্লা দিতে চায়।'

—'কি রকম?' নিশীথ জানতে চাইল।

—'এই ধরো, রাত্তিরে যদি আমার জন্য দু-টুকরো মাছ রাখি, তাহলে পারুলেরও দু-টুকরো মাছ চাই। সকালে যদি আমি একটা সেদ্ধ ডিম খাই, তাহলে পারুলও তাই খেতে চাইবে। বিকেলে আমি দুটো কলা খাই, পরশুদিন দেখি পারুলও কলা নিয়ে খাচ্ছে। কিছু বললেই মুখ অমনি আষাঢ়ের আকাশ। বলবে 'কেন দিদি? আমার কি এসব খেতে ইচ্ছে করে না?'

—'ভারী মজার ব্যাপার।' নিশীথ হাসতে লাগল।

—'শুধু কি এই?' লতিকা চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'পরশুদিন দুপুরে এক ফিরিওলা এসেছিল। তার কাছ থেকে আমি একটা জামা কিনলাম। লনের ব্লাউজ,—সাড়ে তিন টাকা দাম নিল। সুন্দর গোলাপী রঙটা। আমার খুব পছন্দ। কাল বিকেলে সেই জামাটা পরলাম। ওমা! সন্ধ্যেবেলায় দেখি, পারুলও ঠিক তেমনি গোলাপী রঙের একটা জামা পরে এ-ঘর, ও-ঘর করছে। আমি শুধোলাম, 'এ জামা কোথা থেকে কিনলে পারুল?' ও হেসে বলল—'দোকান থেকে কিনলাম দিদি। রঙটা খুব পছন্দ হ'ল।' একটু থেমে লতিকা আবার বলল,—'এখন আমার কি জ্বালা, বল দিকি। আমি যে জামা গায়ে দেব, যে রঙের কাপড় পরব ও সেই জামা, সেই রঙের কাপড় পরে তোমার সামনে ঘুরবে, বেড়াবে?'

নিশীথ হেসে বলল,—'পারুল দেখছি একবারে ছেলেমানুষ। নইলে এমনি পাগলামি করে—'

—'ছেলেমানুষি নয়, এ হল ওর শয়তানী। দাঁড়াও না, পারুলের পাগলামি আমি বের করছি।' লতিকা দাঁতে দাঁত চিপে কথা বলল। 'নার্সিং হোম থেকে একবার ফিরে আসি। তারপর ওকে আমি ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব। অমন সোমত্ত মেয়েছেলেতে আমার দরকার নেই। আমি একজন বয়স্ক, কাজ-জানা লোক রাখব। তাতে যদি দু-পাঁচ টাকা বেশী দিতে হয়, তাও সইবে।'

সোমবার শেষ রাত্তিরে লতিকার হঠাৎ শরীর খারাপ হল। সমস্ত শরীরে একটা অসোয়াস্তি। যন্ত্রণা, ব্যথা। ভোর হতে আর একটু বাকি ছিল। কিন্তু নিশীথ অপেক্ষা করল না, আবছা অন্ধকারের মধ্যেই মোড় থেকে সে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরল।

গাড়িতে উঠে লতিকা বলল,—'আজই কিন্তু দমদম থেকে পিসীমাকে নিয়ে আসবে। আমাকে ভর্তি করে দিয়ে তুমি চলে যেও, কেমন?' একটু থেমে সে ফের শুধোল,—'পিসীমা তোমার সংগে আসবেন তো?'

—'নিশ্চয় আসবেন।' নিশীথ স্ত্রীকে আশ্বাস দিল। 'সেইরকমই তো বলা আছে। তুমি যে কটা দিন নার্সিং হোমে থাকবে, অন্তত সে কটা দিন পিসীমা এসে বাড়ি-ঘর সামলাবেন।'

—'হ্যাঁ, তাই করো বাপু। ওই শয়তানীকে আমার একটুও বিশ্বাস নেই। ও সব করতে পারে।'

স্ত্রীর চোখের উপর চোখ বুলোল নিশীথ। হেসে বলল,—'ওকে না হোক, তুমি আমাকে বিশ্বাস করো তো?'

—'বিশ্বাস করি বৈকি।' লতিকা চোখ নামিয়ে বলল, 'কিন্তু একটা কথা জানো তো? মুনিদেরও মতিভ্রম হয়।'

নার্সিং হোম থেকে যখন বেরোল নিশীথ, তখন বেলা প্রায় নটা। ব্যথাটা এখন কম। ডাক্তার বলেছেন ফলস্ পেইন হতে পারে। পেশেণ্টকে অবজার্ভেশনে রাখা দরকার।

একটা ট্রাম ধরে সে ডালহৌসীতে এসে নামল। তার পিসতুতো ভাই অশোক কাছেই টার্নবুল কোম্পানীতে কাজ করে। নিশীথ ভাবল খবরটা অশোককে দিয়ে যাবে। কাছাকাছি বাড়িতে নিশ্চয় টেলিফোন আছে। তাদের মারফৎ সে মাকে খবর দিয়ে রাখবে। বিকেলে নিশীথদা তাকে আনতে যাচ্ছে।

সব শুনে অশোক বলল,—'কিন্তু মা তো আজ বাড়িতে নেই নিশীথদা। কেষ্টনগরে তুলসীমাসীর বাড়ি বেড়াতে গেছে। ফিরতে রাত্তির হবে।'

—'তাই নাকি?' নিশীথ ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা করল।

অশোক বলল,—'তোমাকে আর যেতে হবে না, কাল সকালে মাকে আমি নিয়ে বেরোব। তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে অফিস যাব—'

অগত্যা তাই। নিশীথ অফিস থেকে বেরিয়ে বাস স্টপে এসে দাঁড়াল।

বাড়ি ঢুকতেই পারুল শুধোল,—নিশীথদা, দিদি কেমন আছেন?'

—'ভালোই।' ফুলফোর্সে পাখাটা ঘুরিয়ে দিয়ে একটা চেয়ারে বসল নিশীথ। বলল,—'তুমি এক কাপ চা করে আনো দেখি।'

—'না। এতবেলায় আর চা খেতে হবে না।' ছদ্ম শাসনের ভঙ্গিতে তাকাল পারুল। বলল,—'আপনি বসুন। আমি এক গ্লাস নেবুর শরবৎ করে আনছি।'

—'থাক। নেবুর শরবৎ আমার চাই না।' নিশীথ উঠে দাঁড়াল।

—'বাব্বা! কি রাগ আপনার। বসুন, বসুন। আমি এখুনি চা করে আনছি।' পারুল মিষ্টি হাসল।

এই মুহূর্তে ওর গিন্নিপণা ভালো লাগছিল নিশীথের। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। এতক্ষণ উনুনের আঁচে কাজ করছিল বলে মুখখানা ঈষৎ লাল। পারুলের গায়ের রঙ ফরসা নয়, বরং একটু চাপা। কিন্তু সুন্দর গড়ন, চমৎকার মুখশ্রী।

টেবিলে চায়ের কাপ রেখে পারুল শুধোল,—'দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর পিসীমাকে আনতে যাবেন তো নিশীথদা?'

—'না, আজ আর যেতে হবে না।' নিশীথ চায়ের কাপে চুমুক দিল। বলল,—'কাল সকালে পিসীমা নিজে আসবেন। আমার পিসতুতো ভাই অশোক এসে রেখে যাবে।'

চা খেতে খেতে খবরের কাগজের পাতায় ডুব দিল নিশীথ। আজ সকালে কাগজটা দেখা হয়নি। মাঝে মাঝে চোখ তুলে সে পারুলকে দেখছিল। পারুল ছুটোছুটি করে কাজ করছে। উনুনে কি একটা বসাল, তাতে জল ঢালল। ফের নামাল। তাকের উপর থেকে ছোট একটা কৌটো বের করে গরমমশলা অথবা অন্য কিছু ঢেলে নিল। তারপর প্রায় ছুটে ও-ঘর থেকে একটা এনামেলের বাটি নিয়ে এল। অন্যদিন অফিস থাকে, বাড়িতে লতিকা থাকে। পারুলের এই কাজকর্ম, ছুটোছুটি, ব্যস্ত ভঙ্গি নিশীথের তেমন চোখে পড়ে না। আজ সে বারবার তাই ওকে দেখছিল।

রান্নাঘরের কাজকর্ম সেরে পারুল ফের ওর সামনে এসে দাঁড়াল। বলল,—'নিশীথদা, জামা-কাপড় পরে বসে রইলেন যে? আপনার গেঞ্জিটা, রুমালটা ফেলে দিন। ওগুলো কাচতে হবে না?'

দুপুরবেলায় খুব ঘুমোল নিশীথ। অত ভোরে কস্মিনকালে ওঠেনি। তাই বিছানায় পড়তেই গাঢ় নিদ্রা। কখন সে ঘুমোল তাও খেয়াল নেই।

চোখ খুলেই সে পারুলকে দেখতে পেল। লতিকার ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে পারুল চুলে চিরুনি বুলোচ্ছে। ঘুম ভেঙে উঠে মনটা বিগড়ে গেল তার। সত্যি পারুল একটু বাড়াবাড়ি করছে। এর আগে কোনোদিন পারুল এ ঘরে বসে চুল বেঁধেছে বলে তার মনে হল না। অথচ আজ। তার শোবার ঘরে আয়নার সামনে বসে পারুল চুলে চিরুনি বুলোচ্ছে, প্রসাধন

সারছে। লতিকা বলেছিল বটে। পারুল তার সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করেছে। তার সমান হতে চায়। তবে কি স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে গৃহিণীর অধিকারটুকু সে পুরোপুরি দখল করবে?

—'ঘুম ভাঙল নিশীথদা?' পারুল তাকাল। ফের বলল,

—উঃ! কি ঘুম বাবা আপনার। আমি দু-তিনবার ডেকেছি। কিন্তু কোনো সাড়া-শব্দ নেই।' সে ঠোঁট টিপে হাসল।

নিশীথ কোনো উত্তর দিল না। আড়মোড়া ভাঙল। হাই তুলল। তারপর বিছানা থেকে নামল।

পারুল ফের বলল,—'যান, হাত-মুখে জল দিয়ে আসুন। আমি এখুনি আপনার চা করে আনছি।'

মিনিট পাঁচ-সাত পরে চায়ের কাপ নিয়ে সে ফের ঢুকল। শুধোল,—'এখন কিছু খাবেন নিশীথদা?'

—'পাগল! দুপুরে কম খেয়েছি নাকি? আমি এখন আর কিছু খেতে পারব না।'

চা-পান শেষ করে নিশীথ বেরোবার জন্য তৈরি হল। পারুল সামনে এসে বলল,—'তাড়াতাড়ি ফিরবেন কিন্তু নিশীথদা?'

—'কেন? কোনো দরকার আছে নাকি?' সে জানতে চাইল।

পারুল হাসল। ভুরু নাচিয়ে বেশ সুন্দর মুখভঙ্গি করে বলল,—'আজ সারা দুপুর ধরে আমি আপনার জন্যে চপ তৈরি করেছি। সন্ধ্যেবেলায় গরম গরম ভেজে দেব। খাবেন কিন্তু নিশীথদা—'

—'কেন মিছিমিছি ওসব হাঙ্গামা করতে গেলে? রাত্তিরে আমি কখন ফিরব, তার কি ঠিক আছে?' নিশীথ একটু রূঢ়ভাবে বলল।

রাত দশটা নাগাদ ফিরল নিশীথ। নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল। সেখানে আড্ডা, গল্প-গুজব। বাড়ি ফেরার কথা যখন খেয়াল হল, তখন দশটা বাজতে আর দেরি নেই।

ঘরে পা দিতেই দমকা হাওয়ার মত এক নিশ্বাসে বলল পারুল,—'উঃ। এতক্ষণে ফিরলেন নিশীথদা। আমি সন্ধ্যে থেকে ভেবে ভেবে মরি।—'

—'কি এত ভাবছিলে?' নিশীথ সকৌতুকে শুধোল।

—'বারে! ভাবনা বুঝি হতে নেই?' পারুল মুখ ফিরিয়ে একটু দূরে সরে গেল। ফের বলল,—'এত রাত্তির অব্দি একা বাড়িতে থাকতে ভয় করে না আমার?'

মেয়েলি অভিমান। নিশীথ মনে মনে হাসল। দেরি করে বাড়ি ফিরলে লতিকাও এমনি সব কথা বলে। এমনি মুখ আড়াল করে দাঁড়ায়, মুচকি হাসে। আশ্চর্য! পারুল কেন লতিকার মত কথা বলছে? সে চপ খেতে ভালবাসে বলে ছুটির দিনে সারা দুপুর পরিশ্রম করে লতিকা চপ বানাত। তার অনুপস্থিতিতে পারুল কি তবে লতিকা হতে চাইছে?

হঠাৎ ওর শাড়ির দিকে নজর পড়তেই নিশীথ অবাক হল। এ কার কাপড় পরেছে পারুল? নিশীথের মনে খটকা লাগছিল। নিশ্চয় শাড়িটা লতিকার। এত দামী কাপড় পারুল কোথায় পাবে? কেমন করে কিনবে? তাছাড়া লতিকার অঙ্গে এই শাড়িখানা দেখেছে নিশীথ। ঠোঁটের ডগায় একটা প্রশ্ন এলেও সে নিজেকে সংযত করল। কি হবে শুধিয়ে? মিছিমিছি কেলেঙ্কারী। কিন্তু লতিকার শাড়ি-জামা কেন পরেছে পারুল? আর কতখানি সে অগ্রসর হবে? আর কতদূর?

নিশীথ তাকিয়ে দেখল পারুলের মুখে চাপা হাসি। চোখের তারায় কৌতুক,—রহস্যের ইঙ্গিত। সমস্ত ব্যাপারটা আন্দাজ করে পারুল খুব মজা পাচ্ছে। নিশীথের গম্ভীর মুখ, কোঁচকানো ভুরু, কপালে চিন্তার রেখা দেখে সে মনে মনে হাসছে।

তবু অবাক হতে আরো বাকি ছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর শোবার ঘরে ঢুকে ঠিক ভূত দেখার মত চমকে উঠল নিশীথ। ইদানীং লতিকার শরীরে কুলোয় না বলে পারুলই বিছানা করে। মশারি টাঙিয়ে দেয়। কিন্তু আজ একি শয্যা? পাশাপাশি দুটো বালিশ। একটা তার,—অন্যটি লতিকার। কিন্তু লতিকা তো নার্সিং হোমে। সে কথা পারুল জানে। তবে?

সমস্ত শরীর কাঁপছিল নিশীথের। আকণ্ঠ ভয়ের হিম। একটা শীতল স্রোত তার মেরুদন্ড বেয়ে নীচে নামছে, ফের উঠছে। নিশ্চয় ভুল হয়েছে পারুলের। বিছানা করবার সময় তার খেয়াল হয়নি। প্রতিদিনের মত আজও করেছে। ভুলচুক হওয়া স্বাভাবিক। তবু মনকে ঠিক বোঝাতে পারল না নিশীথ। সমস্ত দিনের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলি বারবার তার মনে পড়ছিল। দুপুরে সে ঘুমোচ্ছিল, তখন পারুল তাকে ডেকেছে। সে ঘরে আছে জেনেও পারুল আয়নার সামনে বসে অনায়াসে চুল বাঁধল। প্রসাধন করল। সন্ধ্যেবেলায় লতিকার শাড়ি-জামা পরে সে নিশীথের প্রতীক্ষায় বসেছিল। পারুলের ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি, কৌতুক মেশানো দৃষ্টি, বিছানায় পাশাপাশি দুটি বালিশ।

লতিকার ভূমিকায় পারুলের আর একটি দৃশ্যই তো বাকি।

ঠিক সেই মুহূর্তে পারুল এসে ঘরে ঢুকল। টেবিলের উপর জলের গ্লাস রেখে একটা পোস্টকার্ড ঢাকা দিল। বলল,—'ওমা! চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন যে নিশীথদা। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ুন। অনেক রাত হল না—'

নিশীথ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। আড়চোখে সে তাকিয়ে দেখল, তার আড়ষ্ট, বিব্রত ভঙ্গি দেখে পারুল মুখ টিপে হাসছে।

মাথা তুলে একবার সিলিঙ ফ্যানটার দিকে তাকাল পারুল। বলল, —'ইস্! তাই এত গরম লাগছে। পাখাটা জোর করে দিই নিশীথদা? নইলে ঘুমোবেন কি করে?'

ফুলফোর্সে পাখাটা চালিয়ে দিয়ে পারুল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুইচ অফ করে আলো নিভিয়ে দিল নিশীথ। আবছা অন্ধকার। জানালার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার একটুকরো আলো এসে বিছানায় পড়েছে। নিশীথ ভাবছিল সে কি করবে? সিগারেট কেনার অছিলায় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বে এখন? তারপর রাস্তায় নেমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা দমদম। এত রাত্তিরে পিসীমা তাকে দেখে কি ভাববেন? আর পারুল? কাল সকালে একটা ভীরু পুরুষের দিকে সে কেন দৃষ্টিতে তাকাবে?

ধীরে ধীরে তার দেহটা উত্তপ্ত, হিংস্র হয়ে উঠছিল। অন্তরের নিভৃতে কোথায় যেন একটা জানোয়ার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। দিনের আলোয় জন্তুটাকে সে শাসনে রেখেছিল। অন্ধকারে এখন সেটা ফুঁসছে, গজরাচ্ছে।

বিছানায় উসখুস করছিল নিশীথ। পারুল কোথায়? এত দেরি করছে কেন সে? টুকিটাকি কাজকর্ম সারতে আর কতক্ষণ লাগে? একটু আগে পাশের ঘরে একবার আলো জ্বলে উঠেছিল। ফের সেটা নিভে গেল। তবে কি পারুল লজ্জা পাচ্ছে? শেষ দৃশ্যে লতিকার ভূমিকায় অংশ নিতে সংকোচ হচ্ছে?

মশারি তুলে নিশীথ নীচে নামল। মাঝখানের দরজাটা শুধু ভেজানো। অন্যদিনের মত ছিটকিনি এঁটে বন্ধ করেনি। তবে কি পারুলের ভুল হল? দরজা বন্ধ ভেবে সে নিজের বিছানাতেই শুয়ে পড়েছে?

কপাটের গায়ে চাপ দিল সে। প্রথমে মৃদুভাবে, তারপর জোরে। ছিটকিনি তোলা নেই। একটু ঠেলা দিলেই তো দরজা খুলবার কথা। তবে—?

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেও নিশীথ একবার বিছানার উপর চোখ বুলোল। আশ্চর্য! পাশাপাশি বালিশ দুটো কি শুধু পরিহাস? দুপুরের খাটাখাটুনি, বিকেলের প্রসাধন, সন্ধ্যার সাজসজ্জা সবই কি অর্থহীন?

ধীরে ধীরে কপাটের গা থেকে সে হাত নামিয়ে নিল। দরজাটা বন্ধ। কোনোদিন যা করেনি, আজ তাই হয়েছে। এতদিনে লতিকার কথা রেখেছে পারুল।

ঘুমোবার আগে দরজায় সে খিল তুলে দিয়েছে।

জাতীয় সম্পদের মূলে রয়েছে শ্রমিক-স্বাস্থ্য : বারিদবরণ চট্টোপাধ্যায়

দিন কয়েক আগে কথা হচ্ছিল ডঃ পি, বি, চ্যাটার্জির সঙ্গে। ডঃ চ্যাটার্জি সেণ্ট্রাল অ্যাভিন্যুর ওপর ট্রপিক্যাল স্কুলের উল্টো-দিকে অল ইণ্ডিয়া ইনসটিটিউট অব হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথে ইণ্ডাস-ট্রিয়াল হাইজিন বিভাগের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান। পুরোনাম বারিদবরণ চট্টোপাধ্যায়।

বারিদবাবু নিজে ডাক্তার, বাবাও ছিলেন ডাক্তার। আসাম বেঙ্গল রেলওয়েতে মেডিক্যাল অফিসার বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় গোটা জীবনটাই চাকুরীর সুবাদে পূর্ব-বাংলা আর আসামে কাটিয়েছেন। দেশ যদিও হাওড়া জেলায় বেলুড়ে। বাবা মার সঙ্গে সঙ্গে বারিদবরণ ছোট একটি ভাই ও দিদির সাথে ছেলেবেলায় বহু জায়গায় ঘুরেছেন। শেষ পর্যন্ত স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯৩৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন, তখন বয়স মোটে চোদ্দ। দু বছর বাদে স্কটিশ কলেজ থেকেই আই, এস, সি পাশ করে প্রেসি-ডেন্সীতে ভর্তি হলেন কেমিষ্ট্রি অনার্স নিয়ে। ফরটি ফোরএ (কলকাতায় বোমা পড়ার জন্য তেতাল্লিশ সালে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় নি) বি, এস সি, পাশ করে দুম করে লাইন পাল্টে চলে এলেন ডাক্তারীতে। ভর্তি হলেন মেডিক্যাল কলেজে। উনপঞ্চাশে এম, বি, ডিগ্রী পেলেন। পরের বছরই বিয়ে থা করে চাকুরী জুটিয়ে সংসার ফেঁদে বসলেন। ইচ্ছে ছিল সার্জেন হবেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে সব বদলে গিয়ে আজ শিক্ষকতা করছেন— কি বিষয়ে? না, শিল্প স্বাস্থ্য ও শ্রম-স্বাস্থ্য বিষয়ে।

নাম শুনেই চমক লাগে। তবে কি একজন শ্রমিকের স্বাস্থ্য আপনার আমার মত মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী মানুষের চেয়ে কিছু স্বতন্ত্র যে আলাদা পড়াশোনা বা গবেষণার প্রয়োজন হচ্ছে? না, একজন শ্রমিক ও চাকুরীজীবী একই ধাতুতে গড়া— জ্বর-জ্বারি থেকে যক্ষ্মা, ট্রিটমেণ্ট দুজনেরই এক। তবে পার্থক্য কোথায়?

প্রশ্নটার সরাসরি জবাব না দিয়ে অধ্যাপক চ্যাটার্জি উল্টে আমায় একটা প্রশ্ন করে বসলেন—এটা মানেন তো যে নোট ছাপিয়ে দেশের আর্থিক অবস্থা পাল্টানো যায় না, তার জন্য চাই বেশী উৎপাদন?

—এটা মানতেই হবে। আর যদি মানতেই হয় তো খোঁজ নিয়ে দেখুন, বেশী দূরে নয়, সারা দেশ চুঁড়তে হবে না, এই শহরেরই ভেতরে ও আনাচে কানাচে যে শত শত ফ্যাকটরী আছে সেখানে উৎপাদনের যারা প্রধান যন্ত্রী সেই শ্রমিকরা কিভাবে দিন কাটাচ্ছেন? না, না, আপনাকে খোঁজ নিতে হবে না। আমরাই খোঁজ নিয়েছি। পাবলিক হেলথ ইনসটি-টিউটের ইনডাসট্রিয়াল হাইজিন শাখাটির বয়স আজ প্রায় একুশ। আর গোড়া থেকেই আমি রয়েছি এখানে। সেই সুবাদে খোঁজ-টোজ নিয়ে যা জানতে পেরেছি তা হল আর্থিক অনটন ছাড়াও দু ধরনের ঝামেলা শ্রমিকদের পোয়াতে হয়—(১) যে পেশায় তাঁরা নিযুক্ত থাকেন সেই পেশাগত রোগের শিকার তাঁদের প্রায়ই হতে হয় (২) পারি-পার্শ্বিক অবস্থার দৈন্য তাঁদের নিত্যনতুন রোগের শিকার করে তোলে। কয়েকটা উদাহরণ দিই তাহলেই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

—ধরুন একটা কয়লা খনি। হাজার দেড়হাজার ফুট গভীরে কাজ চলছে। প্রচণ্ড গরম, হাওয়া কম তার ওপর স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়া। ন্যাচারালি এ ধরনের পরিবেশে যে মানুষ দীর্ঘদিন কাজ করবে তার চোখের, বুকের অসুখ হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। প্রায়ই দেখা যায় কয়লা খনির শ্রমিকরা হাঁপানীতে ভুগছেন। একজন হাঁপানীর রোগী, নেহাৎ পেটের দায়ে কাজ করে, কতটুকু কাজ দিতে পারে? এভাবে হাজার হাজার শ্রমিক যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তার ফল কি হবে? টোটাল প্রোডাকসন যাবে কমে।

—অথবা একটা স্টীল ফ্যাকটরী। কোক ওভেন বা ব্লাস্ট ফার্নেসের নিত্যসঙ্গী কার্বন মনোকসাইড গ্যাস। গলা টিপে মানুষ মারলে, কোর্টে তার বিচার হয় কিন্তু এই গ্যাস একটু একটু [illegible] সঙ্গে মিশে যখন শ্রমিকের [illegible]

কারণ হয়, তখন? কোন কোর্টে তার বিচার হবে?

—যে কোন ইনজিনিয়ারিং শিল্পই ধরুন না কেন দেখবেন সেখানে যন্ত্রপাতির কাজের জন্য এক ধরনের কাটিং অয়েল ব্যবহার করা হয়। আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে, যে শ্রমিক দিনের পর দিন ঐ জাতীয় কাটিং অয়েল ব্যবহার করছে, তার বা তাদের মধ্যে চর্মরোগ বেশী হয়।

—বা ধরুন কোন জুট মিল। উইভিং সেকশনে যাবেন, দেখবেন মাকুর কি প্রচণ্ড আওয়াজ। ঐ আওয়াজ বহু শ্রমিকের বধিরতার কারণ।

—বা কোন প্রিণ্টিং প্রেস বা টাইপ ফাউণ্ড্রী। অথবা যে কোন রসায়ন শিল্প। লেড-পয়েজনিং কথাটা নিশ্চয়ই শুনেছেন। ওটা হয় দিনরাত সীসা নিয়ে কাজ করার ফলে। আস্তে আস্তে পেটের গোলমাল, অ্যানিমিয়া দেখা দেয়।

—এরকম হাজারটা এগজাম্পল দিতে পারি, যেখানে শ্রমিকের স্বাস্থ্য তার পেশার জন্যই তিল তিল করে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তাই বলে কি এ সমস্ত ইনডাস্ট্রি আজ বন্ধ করে দিতে হবে? সার্টেনলি নট—তাহলে তো গোটা দেশটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধু দরকার একটুখানি প্রিকশন, দরকার প্রতিকারের ব্যবস্থা গোড়া থেকেই নেওয়া।

—কিভাবে? তাহলে আমাদের এই বিভাগের কাজকর্মের ডিটেলসটা আপনাকে দিই—সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এখানে তিন রকমের কাজ হয়—(১) পঠন-পাঠন, (২) গবেষণা, (৩) সার্ভিস।

পঠন-পাঠন বলতে তো বুঝতেই পারছেন যে, এখানে পড়ানো হয়। আমাদের এই ইনডাস্ট্রিয়াল হাইজিন বিভাগে পাঁচজন শিক্ষক আছেন। আমরা পড়াই তাঁদের, যাঁদের মিনিমাম এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন হল এম, বি, বি, এস, ডিগ্রী। সারা ভারত ঝেঁটিয়ে ছাত্র আসেন পড়তে, এমন কি দেশের বাইরে থেকেও আসেন। তার কারণ শুধু ভারতবর্ষ নয়, গোটা সাউথ-ইস্ট এশিয়া ও মিডল ইস্ট মিলিয়ে এধরনের পড়াশোনার কেন্দ্র এখনো আর কোথাও নেই।

দ্বিতীয় কাজ আমাদের গবেষণা। গবেষণার কথা বলার আগে বরং সার্ভিসের কথাটা একটু বলে নিই। আমাদের এই বিভাগেই একটা মোবাইল মাস চেস্ট একস-রে ইউনিট আছে। দেশ আমাদের অনুন্নত। এই অনুন্নত দেশে শ্রমিকরা যা মাইনে পান তাতে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের ন্যূনতম সংস্থানও হয় কি না সন্দেহ। ফলে যক্ষ্মারোগ তো ঘরে ঘরে লেগেই আছে। তাই যখনই কোন ফ্যাকটরী থেকে ডাক আসে আমাদের একস-রে মোবাইল ইউনিট তখুনি সেখানে হাজিরা দেয়। আমরা চেস্ট-এর ফোটো তুলে জানিয়ে দি কারো যক্ষ্মা হয়েছে কি না? এর জন্য এক পয়সাও কাউকে দিতে হয় না। সমস্ত খরচ বহন করেন কেন্দ্রীয় সরকার। এভাবে গত বিশ বছরে প্রায় সোয়া লাখ ছবি আমরা তুলেছি। তাছাড়া মাঝে মাঝে স্যাম্পেল সার্ভে করি। এক একটা শিল্প বেছে নিয়ে সেখানে শ্রমিকদের মধ্যে যক্ষ্মার প্রকোপ কতখানি সেটা আমরা পরীক্ষা করে দেখি। এ ধরনের সার্ভে আজ পর্যন্ত আমরা যে সব ইনডাস্ট্রিতে করেছি তাহল—জুট, টেকসটাইল, ম্যাচবকস, ফাউণ্ড্রী, ইঞ্জিনিয়ারিং, ট্যানারী, পেট্রো-লিয়াম, পেপার-পাল্প, কেমিক্যাল ইত্যাদি। এই ধরনের সার্ভের কাজেও খুব কম করে হাজার পঞ্চাশেক ছবি তুলেছি আমরা।

এতো গেল শুধু যক্ষ্মার ব্যাপার। নানা ধরনের বিচিত্র সব প্রবলেম আসে আমাদের কাছে। এই তো কিছুদিন আগে শিবপুরের একটা ভারত বিখ্যাত ফ্যাকটরীর মেডিক্যাল অফিসার ছুটে এলেন আমাদের কাছে। কি ব্যাপার? না ফ্যাকটরীর হুইল-প্রেস প্ল্যাণ্টে সত্তর পঁচাত্তর জন লোক কাজ করে। তাঁদের প্রায় পঁচাত্তর ভাগ লোকই ভুগছে চর্মরোগে। কাজ প্রায় বন্ধ হওয়ার যোগাড়। আমরা গেলাম। পর পর কয়েকদিন ধরে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে যা দেখলাম তাহল ঐ প্ল্যাণ্টে শ্রমিকদের এক ধরনের কাটিং অয়েল ব্যবহার করতে হয়। তেলটা ভাল নয়। দ্বিতীয়ত হুইল-প্রেস প্ল্যাণ্টের পাশেই রয়েছে একটা ডি-গ্রিজিং প্ল্যাণ্ট। ইস্পাত প্লেটের গা থেকে যখন গ্রিজ ছাড়ানো হয় তখন বাতাসে ভেসে আসা সূক্ষ্ম তেলের কণা শ্রমিকদের হাতে পায়ে গায়ে লাগে। আমরা তখন সাজেস্ট করলাম—(১) এখুনি ঐ কাটিং অয়েল যা ব্যবহার করছ ওটা পালটাও; (২) শ্রমিকদের হাতে দস্তানা পরানোর ব্যবস্থা কর; (৩) হুইল প্রেস প্ল্যাণ্ট আর ডি-গ্রিজিং প্ল্যাণ্টের মাঝে উঁচু পাঁচিল তুলে দাও যাতে আর গ্রিজের সূক্ষ্ম কণাটনা বাতাসে ভর করে এদিকে না আসতে পারে।

সেই হুইল প্রেস প্ল্যাণ্ট এখন স্বচ্ছন্দে চলছে—চর্মরোগের উৎপাত নেই বললেই চলে। অসুস্থতার জন্য শ্রমিকদের গরহাজিরাও হয়েছে বন্ধ। বেড়েছে উৎপাদন।

এ জাতীয় সার্ভিস প্রায়ই দিতে হয়। আমরা দিইও।

এবার আসুন গবেষণার কথায়। আমাদের এই ইনডাস্ট্রিয়াল হাইজিন বিভাগটির প্রতিষ্ঠার পেছনে এই ইনস্টি-টিউটের প্রাক্তন ডিরেকটর ডঃ জন গ্র্যাণ্ট-এর দান অনস্বীকার্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন এখানকার ডিরেকটর। ভদ্রলোক আমেরিকান। ও'র উদ্যোগেই এই বিভাগটির পত্তন ঘটে। কারণ আর কিছুই নয়—সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ইস্তক বৃটিশ প্রভুরা এদেশে কোনরকম ইনডাস্ট্রিয়াল একসপানশন ভাল চোখে দেখে নি। কিন্তু যুদ্ধের ঠেলায় ওরাও ওদের নীতি পালটাল। পাঁচ হাজার মাইল দূরে থেকে জার্মান সাবমেরিনের হ্যাপা পুইয়ে শিল্পজাত দ্রব্য সাপ্লাই করা চাট্টিখানি কথা নয়। তাই নিরুপায় হয়েই ওরা শিল্প নীতির বন্ধ দরজা একটু ফাঁক করে দিল। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্বত্র নানা ধরনের কলকারখানা গড়ে উঠতে লাগল। ডকটর গ্র্যাণ্ট সব ওয়াচ করছিলেন। ও'র মনে হোল যেভাবে এলোপাতাড়িভাবে ইনডাস-ট্রিয়াল একসপানশান হচ্ছে তার ফলে শীগগিরই শ্রমিক-স্বাস্থ্যের একটা গুরুতর ঝামেলা দেখা দিতে পারে। তার জন্য এখুনি প্রস্তুত হওয়া দরকার। তখন ও'রই উৎসাহে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চ আমাদের এই ইনসটিটিউটে 'ইন-ডাস্ট্রিয়াল হেলথ রিসার্চ' নামে একটা ছোট ইউনিট খুললেন এ বিষয়ে গবেষণা ও প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়ার জন্য। এসব ফরটি সিক্স-সেভেনের কথা।

বছর-চারেকের মধ্যেই সরকার দপ্তরের গুরুত্ব বুঝে পুরোপুরি একটা বিভাগ খুলবার অনুমতি দেন। এবং সেই শুরু থেকে গত বছর পর্যন্ত যিনি এই বিভাগের

হাল ধরেছিলেন, সেই ডঃ এম এন রাও তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন এই গবেষণাগারটিকে। কি সব প্রচণ্ড পায়োনিয়ারিং কাজ এখানে হয়েছে তা বাইরের লোক অনুমানও করতে পারবেন না। আমেরিকায় এনভায়রণমেণ্টাল সায়েন্স বা ইকোলজি আজ অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। যন্ত্র-সভ্যতার কুফল কিভাবে মানুষের জল, বাতাস, মত্ত পরিবেশকে বিষিয়ে দিচ্ছে, তাই নিয়ে সেখানে গবেষকদের গবেষণার অন্ত নেই। ডঃ রাও সেই গবেষণা এখানে শুরু করেছিলেন সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ সালে। কলকারখানার দূষিত জল কিভাবে হুগলী নদীকে বিষাক্ত করে তুলছে এই নিয়ে তখুনি তিনি কাজ শুরু করে দেন।

হাজার হাজার বাস, ট্যাক্সি, লরী, টেম্পো, শত শত কলকারখানা দিনরাত দূষিত বাষ্পে আমাদের প্রাণধারণের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস বাতাসকে দিচ্ছে বিষিয়ে। এই ব্যাপারে আজ থেকে দশ বছর আগে আমাদের গবেষণাগারে রিসার্চ শুরু হয়েছিল। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের কুফল সম্পর্কেও সারা ভারতে প্রথম কাজ শুরু করি আমরাই।

এসব পায়োনিয়ারিং ওয়ার্ক ছাড়াও আরো নানা ধরনের ইনটারেস্টিং কাজ হয়েছে এখানে। একটা উদাহরণ দি, শুনুন। কাজ বুঝে তো লোক নেওয়া উচিত। সেই ব্যাপারটাই এদেশে হয় না। কারণ আমাদের বেশির ভাগ শিল্পপতিরাই এসব ব্যাপারে তেমন খোঁজ রাখেন না। একটা লোককে চাকরী দেওয়ার সময় কোথাও কোথাও মেডিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেটা দেখা যায়, লোকটির স্বাস্থ্য কেমন আছে, সেটুকু জানার জন্য। পরীক্ষায় হয়তো দেখা গেল যে, লোকটির স্বাস্থ্য খুবই ভাল, তাকে ব্লাস্ট ফার্নেসের কাজে নিয়োগও করা হোল। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, যে পরিমাণ কাজ ঐ লোকটির কাছে আশা করা যায়, তার সিকির সিকিও সে দিতে পারছে না। কেন?

কারণ গলদ গোড়াতেই। নেওয়ার আগে যদি ওর দেহের ঘাম পরীক্ষা করে দেখা হোত, তাহলেই ব্যাপারটা ধরা পড়ত। কি রকম? আমাদেরই সহকর্মী ডঃ রমানাথন গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে তিন ধরনের লোক আছে পৃথিবীতে—এক যাদের ঘামের সঙ্গে খুব নুন বেরোয়: দুই, যাদের ঘামে জলের ভাগটাই খুব বেশী; তিন, যাদের ঘামে নুন আর জলের ভাগে সমতা থাকে। এখন প্রথম শ্রেণীর লোকের প্রচণ্ড গরমে যত ঘাম ঝরবে, ততই মাংসপেশীতে টান ধরবে, ফলে তার কাজের ক্ষমতা যাবে কমে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক প্রচণ্ড গরমে অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে, ডিহাইড্রেশনের জন্য। ফলে যেসব কারখানায় টেম্পারেচার স্বাভাবিক কারণেই খুব বেশী হবে, সেখানে যদি ঐ তৃতীয় শ্রেণীর লোক নেওয়া হয়, তাহলে কাজের ব্যাপারে বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা কম।

এছাড়া আরো অনেক গবেষণার কাজ হয়েছে এখানে। কিন্তু কেই বা তাকে কাজে লাগায়, কেই বা শোনে আমাদের কথা?

—কেন ডঃ চ্যাটার্জি? কেন একথা বলছেন? জিজ্ঞাসা করি আমি।

শক্ত ঋজু কাঠামোর মানুষটির মুখে ম্লান হাসি জেগে উঠল। চশমার কাচের আড়ালও ও'র কালো গভীর দুটি চোখের ক্লান্তি ঢেকে রাখতে পারেনি। এক নাগাড়ে ঘণ্টা-তিনেক ধরে আমার নানা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। পাঁচতলা ইনস্টিটিউট ভবনের চারতলায় ও'র ঘর। এই ঘরে পার্টিশন ওয়ালের এধারে দেয়াল জুড়ে বই-এর আলমারী, টেবিলে ছড়ানো শুধু বই আর বই, পাশে জানালার ধারে হাই-টেবিলে নানা যন্ত্রপাতি। সবকিছুর মাঝখানে বসে একটি মানুষ যেন ক্লান্তির ভার অস্বীকার করবার চেষ্টা করছেন—কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হোল আর তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ভেতরের আর্তিকে চেপে রাখা।

আমাদের কাজ ন্যায্য সম্মান পাচ্ছে না। অর্থের অভাবে আজ এক বছর ধরে মোবাইল চেস্ট এক্স-রে ইউনিটটি বিকল হয়ে পড়ে আছে। টাকার অভাবে গবেষণা প্রায় মাথায় উঠতে বসেছে। কাগজে, জার্নালে পড়ি ভারতের অন্যান্য প্রান্তে সি এস আই আরের নানা ইউনিটে কত কাজ হচ্ছে—যেসব কাজ একদিন আমরাই হয়তো শুরু করেছিলাম। আজ চালাতে পারছি না—কারণ, টাকা পাই না, লোক নেই।

কি আর বলব। তাই ম্লান হেসে জবাব দিলাম—ডঃ চ্যাটার্জি, এদেশে এখনো সেই পরিবেশ হয়তো আসেনি—তাই আপনাদের কাজের প্রকৃত মূল্য পাচ্ছেন না। অপেক্ষা করুন, দিন আসছে। যেদিন আপনাদের পরামর্শ ছাড়া কোন শিল্প এক পাও এগুবে না।

—দীপাংশু

দ্বিতীয় পর্ব

দিগ্বিজয়ের পথে জার্মানী

পঞ্চম অধ্যায়

বৃটেনে রাজনৈতিক পরিবর্তন :

বার্লিনে আক্রমণের বিতর্ক

১৯৪০ সালের বসন্তকাল ইউরোপে জীবনের কোন বসন্ত-সৌন্দর্য লইয়া দেখা দিল না, বরং যৌবনের প্রত্যাশা ও আনন্দের মৃত্যু পরোয়ানা লইয়া যেন দেখা দিল। পশ্চিম রণাঙ্গনে তখন যুদ্ধের মহাপ্রলয় আরম্ভ হওয়ার মুখে, আর উত্তর ইউরোপের স্কাণ্ডানেভিয়ান দেশগুলিতে (ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্ক নরওয়ে) তখন যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়াছে এবং নরওয়েতে (বাল্টিক সাগরের মুখ থেকে মেরু সীমানা পর্যন্ত যার দৈর্ঘ্য হাজার মাইল) বৃটেনের অভিযান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। কেবল ব্যর্থ নয়, একটা চরম কেলেঙ্কারিতে পরিণত হইয়াছে। অথচ ১লা এপ্রিল তারিখেই লণ্ডনে এই খবর পৌঁছিয়াছিল যে, নরওয়েতে হিটলারী আক্রমণ আসন্ন। মার্কিন সাংবাদিক-ঐতিহাসিক উইলিয়াম শীরার লিখিয়াছেন যে, সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও বৃটিশ সরকার এটা বিশ্বাস করেন নাই—যদিও ৩রা এপ্রিল সমর-মন্ত্রিসভায় এটা নিয়া আলোচনা পর্যন্ত হইয়াছিল। আর ৪ঠা এপ্রিল তারিখ রক্ষণশীলদের এক সভায় চেম্বারলেন নির্বিকার চিত্তে ঘোষণা করিলেন যে, এই যুদ্ধের আরম্ভের সময়ের চেয়ে এখন তিনি জয় সম্পর্কে 'দশগুণ বেশী বিশ্বাসী' এবং হিটলার বাস ধরিতে পারেন নাই'— Hitler missed the bus.'

এই শেষোক্ত মন্তব্য—'হিটলার বাস ধরিতে পারেন নাই', যুদ্ধের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে এবং তখনকার দিনে সারা পৃথিবীতে এই মন্তব্য নিয়া নানা বিদ্রূপাত্মক আলোচনা শুনা গিয়েছিল। কিন্তু এমন মানসিকতা কেবল চেম্বারলেনের নয়, যুদ্ধবিশারদ চার্চিলের পর্যন্ত ভুল ধারণা হইয়াছিল এবং এর আগের কয়েক মাস বৃটেনে সমরোৎপাদন বৃদ্ধি দেখিয়া চার্চিল হর্ষোৎফুল্লভাবে মন্তব্য করিলেন—'যুদ্ধায়োজনের এই অতিরিক্ত মাসগুলি আমাদের কাছে দৈবানুগ্রহের মত। হের হিটলার ইতিপূর্বেই তাঁর সর্বোত্তম সুযোগ হারাইয়াছেন।'

কিন্তু নরওয়ের যুদ্ধে বিপর্যয়ের পর দেখা গেল হিটলার তো 'বাস ধরিয়াছেন' বটেই, বরং ইঙ্গ-ফরাসীই 'খেয়া পার হইতে পারেন নাই। তখন বৃটেনে (এবং ফ্রান্সেও) রাজনৈতিক ঝড় বহিতে শুরু করিল এবং খাস রক্ষণশীল দলের মধ্যেই যে ক্ষোভ ধূমায়িত হইতে শুরু করিয়াছিল, তা ক্রমশঃ বহ্নিশিখায় পরিণত হইতে লাগিল। কারণ, তাঁরা অনুভব করিলেন যে, চেম্বারলেনের নেতৃত্ব শান্তির সময়েই যদি এত খারাপ হইয়া থাকিতে পারে, তবে যুদ্ধের সময়ে নিশ্চয়ই বিপর্যয়কর হইবে! যাঁরা মিউনিক চুক্তি ও নীতির বিরোধী ছিলেন, কমন্স ও লর্ডস সভার কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য নিয়া তাঁদের একটা 'পর্যবেক্ষণ কমিটি' ছিল। লর্ড স্যালিসবারির মত প্রবীণ ও সম্মানভাজন রক্ষণশীল নেতা এবং লিওপোল্ড আমেরির মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই সময় নেতৃত্ব পরিবর্তনের কথা গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তেজনায় ভারী হইয়া উঠিল। এবং ৭ই মে ১৯৪০ কমন্স সভার অধিবেশনে এই উত্তেজনা সর্বপ্রথম ফাটিয়া পড়িল। রক্ষণশীল দলের যে সমস্ত এম-পি সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়াছিলেন এবং যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নরওয়ের উপকূলে ব্যর্থ অবতরণে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁদের অনেকে এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। লিওপোল্ড আমেরি তাঁদের ক্রুদ্ধ মনোভাবের যে-ভাষা দেখেন, তা স্মরণীয় :

> 'Their indignation was expressedby Leopold Amery, who demanded the formation of a genuine coalition Government and made the most dramatic denunciation of Chambertain repeating Crotwell's address to the Long Parliament. 'You have sat too long here for any good you have been doing. Depart. I say, and let us have done with you. In the name of God, go!' (1).

অর্থাৎ ঈশ্বরের দোহাই, আপনি ভাগুন!— চেম্বারলেনের বিরুদ্ধে এই নাটকীয় আক্রমণ এবং ক্রমওয়েলের প্রসিদ্ধ বক্তৃতার প্রতিধ্বনিতে সভাকক্ষ কাঁপিয়া উঠিল বটে, কিন্তু চেম্বারলেন তখনও তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। কিন্তু পরদিন ৮ই মে কমন্সসভার পুনরধিবেশনে যখন চেম্বারলেন মন্ত্রিসভার প্রতি আস্থা জ্ঞাপনের প্রস্তাব উঠিল, তখন দেখা গেল যে, মাত্র ৮১ জন সদস্য তাঁকে সমর্থন করিয়াছেন, অথচ সাধারণতঃ ২০০ জনের মেজরিটি তিনি পাইয়া থাকেন। এর অর্থ এই যে, কেবল বিরোধী লেবর ও লিবারেলই নয়, তাঁর স্বীয় দলের রক্ষণশীলদের মধ্যেও অন্ততঃ ১০০ জনের বেশী সদস্য তাঁর বিপক্ষে ভোট দিয়াছেন, কিম্বা তাঁকে সমর্থন জানাইতে বিরত রহিয়াছেন। তখন চেম্বারলেন বুঝিলেন যে, তাঁর পদত্যাগ না করিয়া উপায় নাই। তবু তিনি শ্রমিক দলকে বাগে আনিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু ব্যর্থ হইলেন। কিন্তু তাঁর পদত্যাগের পর প্রধানমন্ত্রীর পদে কে বসিবেন?—চার্চিলকে চেম্বারলেন পছন্দ করিতেন না, কারণ, তোষণ-নীতির তিনি তীব্র বিরোধী ছিলেন। সুতরাং এই বিষয়ে যিনি অন্যতম পাণ্ডা ছিলেন, সেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড হ্যালিফ্যাক্সকে গদীতে বসাইবার জন্য চেম্বারলেন চেষ্টা করিলেন যদিও এই প্রস্তাবের কথা শুনিয়া হ্যালিফ্যাক্সের নাকি 'একটা পেট ব্যথা মোচড় দিয়া উঠিয়াছিল!'

he felt a bad stomachache (2)

তবু চেম্বারলেন পররাষ্ট্রদপ্তরের সহকারী সচিব আর ও বাটলারকে বলিলেন হ্যালিফাক্সকে তাঁর মত পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করিতে। কিন্তু বাটলার টেলিফোনে জবাব দিলেন—তাঁর কিছুই করিবার নাই, কারণ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর দাঁত দেখাইতে গিয়াছেন ডেণ্টিস্টের কাছে!

তখন ১০ই মে, ১৯৪০ (ওদিকে পশ্চিম রণাঙ্গনে হিটলারের আক্রমণ শুরু হইয়া গিয়াছে) সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার সময় দেখা গেল একজন বিষণ্ণ ও ভগ্নহৃদয় ব্যক্তি মাথা নীচু করিয়া ১০নং ডাউনিং স্ট্রীট থেকে একটা মোটরগাড়ীতে চড়িলেন এবং সোজা বাকিংহ্যাম প্যালেসে চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি ২০ মিনিট কাটাইলেন এবং তারপরেই ঘোষিত হইল 'দি রাইট অনারেবল' নেভিল চেম্বারলেনের পদত্যাগের সংবাদ এবং সেই সঙ্গে উইনস্টন চার্চিলকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য হিজ

1. British Foreign Policy during world war II V. Trukhanovsky. 1970. P 88.

(২) হেনরি পেলিং প্রণীত 'ব্রিটেন এণ্ড দি সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার', পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫

ম্যাজেস্টির আমন্ত্রণ। কিন্তু রাজা ষষ্ঠ জর্জও চার্চিলকে সুনজরে দেখিতেন না (অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগের ব্যাপারে চার্চিলের পক্ষপাতিত্বের জন্য) বরং তিনি লর্ড হ্যালিফ্যাক্সকেই প্রধান-মন্ত্রীরূপে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। এমনকি স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপসের মত রক্ষণশীল বিরোধী লোকও হ্যালিফ্যাক্সের জন্য ওকালতি করিয়াছিলেন।

নরওয়ে বিপর্যয় উপলক্ষে চার্চিলের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল বটে, কিন্তু অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তখন তাঁর বিরোধী ছিলেন। ওলিভার স্ট্যানলি, স্যামুয়েল হোর প্রভৃতি মন্তব্য করিলেন যে, যে-ব্যক্তির জন্য নরওয়ের এই কেলেঙ্কারি তাঁকেই প্রধান-মন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হইল। বিখ্যাত সমর-বিশেষজ্ঞ লীডেল হার্ট লিখিয়াছিলেন : 'ইতিহাসের এটা প্রকান্ড বিদ্রূপ যে, চার্চিল নরওয়ে উপলক্ষে চরম ক্ষমতালাভের সুযোগ পাইলেন, অথচ নরওয়ের বিপর্যয়ের জন্য তাঁর অবদানই সবচেয়ে বেশী।'

কিন্তু সেদিনের পরিস্থিতিতে যিনি 'ইতিহাসের প্রকান্ড বিদ্রূপ'রূপে নিন্দা-ভাজন হইলেন, সেই চার্চিল মহাযুদ্ধের তীব্রতম সঙ্কট ও ভয়ঙ্কর দুর্দিনে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে কেবল অপরাজেয় জাতীয় নেতার আসনেই অভিষিক্ত হইলেন না, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হিটলার-বিরোধী নেতৃত্বের অন্যতম মহা-নায়করূপেও প্রতিভাত হইলেন। তাঁর স্বদেশপ্রেম, তাঁর সাহস, তাঁর তেজস্বিতা, তাঁর দৃঢ়তা এবং বহু বিষয় সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য এবং সর্বোপরি তাঁর অতুলনীয় বক্তৃতা বৃটেনের মরা গাঙে যেন বান ডাকিয়া আনিল। কোন একক ব্যক্তির নেতৃত্ব কিভাবে একটা জাতিকে অনিবার্য পতন থেকে রক্ষা করিতে পারে, উইনস্টন চার্চিল তার অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত।......

৬৫ বছর বয়সে চার্চিল (জন্ম ৩০শে নভেম্বর, ১৮৭৪) বৃটেনের নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিলেন এবং ১১ই মার্চ তাঁর সমর-মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন পাঁচজন সদস্য লইয়া—প্রধানমন্ত্রী ও দেশরক্ষামন্ত্রীর পদে চার্চিল, চেম্বারলেনও অপেক্ষাকৃত একটি সাধারণ মন্ত্রীপদ গ্রহণ করিলেন—লর্ড প্রেসিডেন্ট অব দি কাউন্সিল, পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড হ্যালিফাক্স, লর্ড প্রীভিসিল সি আর এটলি ও দপ্তরহীন মন্ত্রী আর্থার গ্রীণউড। এছাড়া এ ভি আলেকজান্ডার নৌসচিব, এন্টনি ইডেন সমর-সচিব এবং লর্ড বীভারব্রুক বিমান উৎপাদন দপ্তরের নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন (চার্চিল দ্রুত বিমান উৎপাদনের উপর জোর দিয়া-ছিলেন)। রক্ষণশীল, শ্রমিক ও উদার-নৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়া যুদ্ধ-কালীন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। অবশ্য চেম্বারলেন তখনও রক্ষণ-শীল দলের নেতা ছিলেন, এই পদ থেকে তিনি বিদায় নিলেন ৮ই অক্টোবর ১৯৪০, যখন তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং ৯ই নভেম্বর, ১৯৪০, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তখন চার্চিল রক্ষণশীল দলের পুরোপুরি নেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

একথা বলা বাহুল্য যে, যুদ্ধের সময় চার্চিলের অনেক বক্তৃতা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং সেই সমস্ত বক্তৃতার সুর এখনও যেন অনেক জীবিত ব্যক্তির কানে বাজিতেছে। বৃটেনে প্রধানমন্ত্রীরূপে কমন্সসভায় তাঁর প্রথম বক্তৃতা—১৩ই মে, ১৯৪০, চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে এবং এই বক্তৃতাতেই তিনি ঘোষণা করিলেন :

"I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. You ask, what is our policy? I will say: it is to wage war, by sea, land and air, with all our might and with all the strength that God can give us...... you ask, what is our aim? I can answer in one word: Victory — victory at all costs, victory inspite of all terror, victory, however long and hard the road may be".

চার্চিলের এই বক্তৃতায় 'রক্ত, শ্রম, অশ্রু ও ঘর্মের' প্রতিশ্রুতি সারা পৃথিবীর বহু বক্তার মুখে প্রবাদ-বাক্যের মত বার বার প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। তবে, চার্চিলের এই উদ্দীপনাময় কথাগুলি সম্পূর্ণ মৌলিক নয়। তাঁরও বহু আগে ঊনবিংশ শতকে ইতালীর সুপ্রসিদ্ধ দেশপ্রেমিক যোদ্ধা গ্যারিবল্ডি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই রোম নগরীতে এক বক্তৃতায় তাঁর অনুচর-দের বলিয়াছিলেন :

"I offer neither pay, nor quarter, nor provisions; I offer hunger, thirst, forced marches, battles and death".

আর প্রথম মহাযুদ্ধের ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ অধিনায়ক ক্লেমেন্স Clemenceau বলিয়া-ছিলেন (২০শে নভেম্বর, ১৯১৭) :

"Finally you ask what are my war aims? Gentlemen, they are very simple : victory."

আর ১৯১৮ সালের ৮ই মার্চ তিনি পুনরায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন :

"My formula is the same everywhere Home policy? I wage war. Foreign policy? I wage war. All the time I wage war" (3)

লক্ষ্য করিবার এই যে, তিনজন ইতিহাসখ্যাত নায়কের এই তিনটি বক্তৃতাই যুদ্ধের সঙ্কটে একই সুরে এবং একই ভঙ্গীতে প্রদত্ত।......

এদিকে বৃটিশ মন্ত্রিসভার অনেক আগেই ফরাসী মন্ত্রিসভারও পরিবর্তন ঘটিয়াছিল এবং ফ্রান্সে রাজনৈতিক সঙ্কট বৃটেনের চেয়েও গভীর ছিল এবং সেই সঙ্কট অনেক দিনের। এজন্য কোন ফরাসী মন্ত্রিসভাই দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। চেম্বার-লেনের অনুরূপ দালাদিয়েরের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধেও অসন্তোষ দানা বাঁধিয়া উঠিতে-ছিল এবং ১৯শে মার্চ ১৯৪০ [illegible] নীতি-বিরোধী পল রেণো দালাদিয়েরের পদত্যাগের পর প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ ও মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করিলেন।

*

গত কয়েক মাস ধরিয়া লন্ডনে ও প্যারিসে যখন রাজনৈতিক উঠানামা এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে 'ভেজাল যুদ্ধের' ফাঁকা আওয়াজ চলিতেছিল, তখন কিন্তু বার্লিনে জার্মানীর ভাগ্যবিধাতা নিষ্কর্মা বসিয়া নাই। হিটলার অবিলম্বেই পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণের কথা ভাবিতেছিলেন এবং পোল্যান্ডের অভিজ্ঞতা থেকে যান্ত্রিক বাহিনীগুলির সাজসজ্জা, সমাবেশ ও পরিচালনা সম্পর্কে ভুলত্রুটি সংশোধন ও পুনর্গঠনের জন্য সামরিক নেতাদের তাগিদ দিতেছিলেন। কিন্তু জার্মান-বাহিনীর সেনাপতিমণ্ডলীর মধ্যে এমন একটা গ্রুপ ছিল, যাঁরা হিটলারের পক্ষ-পাতী ছিলেন না এবং এভাবে পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িতেও ইচ্ছুক ছিলেন না। কারণ, তাঁদের ধারণা ছিল ফরাসী সৈন্যবাহিনীর সামরিক শক্তি জার্মানীর চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। সুতরাং জার্মানবাহিনীর আগু বাড়াইয়া আক্রমণ করিতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কার্য হইবে না। বরং আত্মরক্ষার বা ডিফেন্সিভ পলিসি অনুসরণ করিয়া যাওয়াই ভালো। কিন্তু ১০ই অক্টোবর, ১৯৩৯ হিটলার শীর্ষ সামরিক নেতাদের এক বৈঠকে হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও লাক্সেমবুর্গের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎগতি আক্রমণের এক পরিকল্পনার উপর জোর দিলেন। তিনি বলিলেন যে, এমন গতিশীল যুদ্ধ চালাইতে হইবে যাতে জার্মান সৈন্যরা বেলজিয়মের শহর ও জনপদের সারিবন্ধ বাড়ীঘরগুলির মধ্যে হারাইয়া না যায়।...

হিটলারকে নিরস্ত করার উদ্দেশ্যে প্রধান সেনাপতি জেনারেল ব্রাউসিৎস এবং সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল হ্যাল-ডার তখন কতকগুলি টেকনিক্যাল কারণ দেখাইলেন—যেমন, পোল্যান্ড থেকে পশ্চিম রণাঙ্গনে সৈন্যদল পাঠানো, সৈন্যদের যান্ত্রিক পুনর্সজ্জা এবং আসন্ন শীতকালের অনেক দিন পর্যন্ত রণক্রিয়ার অসুবিধা ইত্যাদি। আসলে সেনাপতিদের এই ধরনের আপত্তির পিছনে কিছুটা রাজ-নৈতিক পটভূমিকার প্রভাব ছিল। হিট-লারের বিরোধী যে ক্ষুদ্র সামরিক গোষ্ঠী ছিল, যেমন সেনানীমণ্ডলীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ জেনারেল বেক, রোমের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত হ্যাসেল, গোয়েন্দা বিভাগের জেনারেল অস্টার, অস্ত্রপাতি দপ্তরের জেনারেল টমাস প্রভৃতি সেনানীদের বিশ্বাস ছিল যে, কোনও প্রকারে হিটলারকে অপসারণ করিতে পারিলে বৃটেনের সঙ্গে একটা শান্তিসন্ধি ও আপোষরফা করা সহজতর হইতে পারে। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিক সমস্যায় চেম্বারলেনের সঙ্গে হিটলারের প্রস্তাবিত [illegible] সময় এই সমস্ত সামরিক নেতা [illegible] বিদ্রোহ ঘটাইয়া জোরপূর্বক [illegible]

3) Engl[illegible]h Hist[illegible] 1914 1945 A. J. P. Taylor, Pelican 1970, P. 579

গ্রেপ্তার ও বন্দী করার এক চক্রান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অবস্থা-বৈগুণ্যে সেই চক্রান্ত ফাঁসিয়া গেল। এবারও সামরিক নেতাদের সেই গ্রুপটি সক্রিয় হইয়া উঠিল। কিন্তু কয়েকদিন চুপ-চাপ থাকিবার পর হিটলার অকটোবর মাসের শেষে হুকুম দিলেন যে, ১২ই নভেম্বর পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণ চালাইতে হইবে। তখন প্রধান সেনাপতি ব্রাউসিৎস বিষম বেকায়দায় পড়িলেন। হয় তাঁকে হিটলারের আদেশ অনুসারে আক্রমণ চালাইতে হইবে, নতুবা বিরোধী গোষ্ঠীর চক্রান্তের সঙ্গে হাত মিলাইয়া হিটলারের বিরুদ্ধে 'অভ্যুত্থান' ঘটাইতে হইবে। কিন্তু হিটলার ছিলেন সুপ্রীম কমাণ্ডার, যুদ্ধের দিনে শীর্ষতম নেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটানো কোন দিক দিয়েই যুক্তিসম্মত বা নীতিসম্মত নয়—এই কারণেই ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বরে হিটলারকে অপসারণের চক্রান্তে সামরিক নেতারা বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে সায় দিতে পারেন নাই। এবারও সেই ধরনের সংকটে পড়িয়া জেনারেল ব্রাউসিৎস হিটলারকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করার আশায় ৫ই নভেম্বর, রবিবার হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। কিন্তু সেখানে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হিটলারের কাছে তিনি এমন ধমক ও ধাতানি খাইলেন যে, ব্রাউসিৎসের প্রায় নাড়ী ছাড়িবার জো হইল। তারপর থেকে ব্রাউসিৎস ও হ্যালডার আর হিটলারের বিরুদ্ধে চক্রান্তের ধারকাছ দিয়াও যান নাই। (৩)

কিন্তু এই সময় সেনাপতিদের ভাগ্যক্রমে আবহাওয়ার প্রতিকূল রিপোর্টের জন্য ৭ই নভেম্বর আক্রমণের তারিখ (১২ই নভেম্বর) স্থগিত রাখিতে হইল। তথাপি এই টানাপোড়েনের আবহাওয়ার মধ্যে আর একটা ভয়ানক চমকপ্রদ কান্ড ঘটিল। হিটলার বরাবরই মিউনিকে তাঁর ১৯২৩ সালের 'পুশ' (জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা) উপলক্ষে বার্ষিকী পালন করিয়া থাকেন। এবারও ৮ই নভেম্বর যখন তিনি তাঁর বক্তৃতা সংক্ষেপ করিয়া নির্ধারিত সময়ের কিছু আগেই চলিয়া গিয়াছিলেন; ঠিক সেই মুহূর্তে প্রচন্ড শব্দে হলের মধ্যে বোমা বিস্ফারিত হইল। নাৎসী পার্টির কয়েকজন সদস্য নিহত হইল এবং অনেকে আহত হইল।

কিন্তু এই বোমা বিস্ফোরণ ছিল একটি সাজানো চক্রান্তের ঘটনা। ডাচাউ বন্দী-শালার এথসার নামে একজন দক্ষ ছুতোর মিস্ত্রীকে মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া হিটলারের গোয়েন্দা পুলিশ বা গেস্টাপো এই বোমা ষড়যন্ত্র ঘটাইয়াছিল এবং এর উদ্দেশ্য ছিল হিটলারের মূল্যবান জীবন ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে জনগণকে আরও সচেতন করিয়া তোলা। মিউনিকে বক্তৃতা দেওয়ার পর হিটলার যখন ট্রেনযোগে বার্লিনে ফিরিতেছিলেন, তখন নুরেমবার্গে এই ঘটনার সংবাদ হিটলারের কানে পেশীছিল। তাঁর সেক্রেটারি বলিয়াছেন যে, এই সংবাদ শুনিয়া হিটলারের চোখ উত্তেজনায় জ্বল জ্বল করিয়া উঠিল এবং তিনি তাঁর আসনে হেলান দিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন—'এক্ষণে আমার স্থির বিশ্বাস হইয়াছে যে, আমি যে আগেই বক্তৃতা শেষ করে উঠে পড়েছিলাম, এটা ভাগ্যবিধাতারই ইচ্ছা, অতএব তিনি নিশ্চয়ই আমাকে আমার লক্ষ্য পূরণ করতে দিবেন।'

বলা বাহুল্য যে, এই ঘটনার পুরা সুযোগ গ্রহণ করিল গোয়েবলসের প্রচার-দপ্তর এবং জনসাধারণকে বুঝাইতে চাহিল যে, হিটলারের যুদ্ধযাত্রা ও জার্মানীর নেতৃত্ব সমস্তই ভগবানের বিধান। অন্যথা হিটলার কিভাবে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাইলেন?......

পশ্চিম রণাঙ্গনে হিটলারী আক্রমণের তারিখ বার বার পরিবর্তিত হইতে লাগিল। ধৃত দলিলপত্রে দেখা যায় যে, ১০ই জানুয়ারী (১৯৪০) হিটলার হুকুম দিয়াছিলেন যে, ১৭ই জানুয়ারী সূর্যোদয়ের ঠিক ১৫ মিনিট আগে আক্রমণ শুরু হইবে। কিন্তু তিনদিন পর আবার সেই আক্রমণের তারিখ স্থগিত রহিল এবং ২০শে জানুয়ারী সম্ভবতঃ আক্রমণের চূড়ান্ত তারিখরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। ১০ই জানুয়ারী যেদিন হিটলার হুকুম দিলেন ১৭ই তারিখ আক্রমণ শুরু হইবে, সেদিন মুনস্টার থেকে জার্মান বিমানবাহিনীর একজন অফিসার কলোন অভিমুখে বিমানযোগে যাইতেছিলেন এবং তাঁর হাতব্যাগে (ব্রীফ কেস) পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণের সমস্ত নক্সাটি মায় ম্যাপ পর্যন্ত ছিল। কিন্তু বিমানটি মাঝ-পথে বেলজিয়মের উপর মেঘের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিল। ফলে বিমানটি বেলজিয়মের মাটিতে অবতরণ করিতে বাধ্য হয়। তখন জার্মান বিমান-অফিসারটি —মেজর হেলমুট রেইনবার্জার পাশেই জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া পড়িল সেই গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণের দলিল ও নক্সা ইত্যাদি পোড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন। যখন কাগজপত্রগুলিতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তখন পাহারারত নিকটবর্তী বেলজিয়ান সৈন্যদের দৃষ্টি এই অভিনব 'অগ্নিকান্ডের' দিকে আকৃষ্ট হইল, তারা আসিয়া জার্মান অফিসারকে ঘিরিয়া ধরিল এবং আগুন নিভাইয়া ফেলিল এবং আগুনের হাত থেকে দলিলপত্রের যেটুকু বাঁচিয়াছিল, সেগুলি তারা ছিনাইয়া লইয়া গেল। অবশ্য মেজর রেইনবার্জার ব্রুসেলসের জার্মান দূতাবাসের মারফৎ জার্মান-বিমানবাহিনীর সদর দপ্তরে দুর্ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট দিলেন যে, সব কাগজপত্রই পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছে, আগুনের ফলে সেগুলি নিতান্ত আঙ্গুলের মত ছোট ছোট টুকরায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু হিটলারসহ জার্মান সমর-কর্তারা এই রিপোর্টে আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না, তাঁরা সন্দেহ করিলেন যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণের নক্সা অপর পক্ষের হাতে পড়িয়াছে। সুতরাং ১৩ই জানুয়ারী বেলা ১টার সময় জেনারেল জড্স টেলিফোনযোগে জেনারেল হ্যালডারকে হুকুম দিলেন All movements to stop অর্থাৎ সমস্ত সৈন্য চলাচল বন্ধ রাখিতে হইবে।[৪]

তথাপি ১৫ই এবং ১৭ই জানুয়ারীর ঘটনাবলীতে দেখা যায় যে, বেলজিয়মের জেনারেল স্টাফ সতর্ক হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁরা বিভিন্ন ঘাঁটিতে সৈন্য সমাবেশের তোড়জোর করিতেছেন। আর বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল হেনরিক স্পাক জার্মান রাষ্ট্রদূতকে স্পষ্টই বলিলেন যে, জার্মানী যে বেলজিয়াম আক্রমণের তোড়জোর পাকা করিয়াছিল, সেই দলিলপত্র তাঁদের হাতে ধরা পড়িয়াছে।

যদিও ফরাসী ও বৃটিশ জেনারেল স্টাফকে এই ধৃত দলিলের কপি দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি তাঁদের গবর্ণমেণ্ট সতর্ক হন নাই। কিন্তু এই ঘটনা বা বিমান দুর্ঘটনার পর হিটলার ১৩ই জানুয়ারী তারিখ আক্রমণের তারিখ আবার নিশ্চিত রূপে পিছাইয়া দিলেন এবং বসন্তকালের আগে আর আক্রমণের কথাবার্তা শুনা গেল না। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই বিমান দুর্ঘটনার জন্য পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণের সমগ্র রণনৈতিক পরিকল্পনারও পরিবর্তন ঘটিয়া গেল।......

অবশ্য এপ্রিল মাসের (১৯৪০) গোড়ার দিকে হিটলার এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনার দ্বারা ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখল করিয়া লইলেন এবং ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষকে একেবারে বেকুব বানাইয়া দিলেন। সে-কাহিনী আগের অধ্যায়েই বর্ণনা করা হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

Hiter — Allan Bulloc'k Pelican, 1962, P. 553-57.

(4) Hiter — Allan Bullock, Pelican, 1962, P. 553-57.

(১)

নরেন্দ্রনগর রাজবাড়ীর বিশাল চত্বর লুটের মালে ভর্তি হয়ে গেল। একটা রাজবাড়িতে যেসব মূল্যবান জিনিস থাকা উচিত তার প্রায় সমস্তই আর একটা রাজবাড়িতে এসে পৌঁছেছে, সোনা, রূপো, হীরা, জহরৎ প্রভৃতি ধাতু ও পাথর থেকে আরম্ভ করে তৈজস হাতীর দাঁতে ও নানারকম কাঠের তৈরী শিল্পদ্রব্য; সুতী রেশমী বস্ত্রাদি আছে। অস্ত্রশস্ত্রর মধ্যে ঢাল, তলোয়ার, বর্ম, চর্ম ইত্যাদি। তাছাড়া বাহিরের মহল হাতী, ঘোড়া, উট ও গাভীতে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সকলে বিশিষ্ট আওয়াজ তুলে স্বকীয় অস্তিত্ব জ্ঞাপন করছে। আরেকটা মহল ভরে গিয়েছে বন্দীতে। এইসব বন্দীদের কতক রাখা হবে রাজবাড়িতে সাধারণ মজুর রূপে আর অবশিষ্ট তক্ষশিলার বাজারে পাঠিয়ে দিয়ে বিক্রীত হবে. মুনাফা পৌঁছবে রাজতহবিলে। লুণ্ঠতরাজের এটিই প্রকাশ্য বিবরণ। আর অপ্রকাশ্য অংশের কিছু উদাহরণ আগেই দেখা দিয়েছে। মদিরাকে তক্ষশিলার বাজারে বিক্রয় করে যে মোটা মুনাফা লুটেছিল সেটা প্রধান সেনাপতি আত্মসাৎ করেছিল। আর তাছাড়া ছোট বড় সৈনিক এক বা একাধিক থলি পূর্ণ করে যা নিয়েছে তার হিসেব নরেন্দ্রনগরে পৌঁছয়নি।

ওদিকে সুমন্তপুরে রাজপুরী ও রাজধানী কঙ্কালটি মাত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে। সৈন্যরা চলে যেতেই চারদিকের গাঁওয়ার লোক এসে যা কিছু অবশিষ্ট ছিল লুটে নিয়ে গিয়েছে মায় দরজা-জানলার পাল্লাগুলো অব্দি। এ মূর্তিকে কঙ্কালসার ছাড়া আর কি বলবো জানি না।

অপরপক্ষে নরেন্দ্রনগর রাজপুরী অপ্রত্যাশিত মেদবৃদ্ধিতে এমন স্ফীত হয়ে উঠেছে যে তার মাংসপেশী দেহের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়ে খসে পড়ে আর কি। এক স্থানে হরণ না হলে আর একস্থানে পূরণ হয় না, হরণে পূরণে সংসার মোটের উপরে তাল রক্ষা করে চলেছে।

নরেন্দ্রনগররাজ বলে উঠলেন, সেই বর্বরটা কোথায়?

প্রধান সেনাপতি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, মহারাজ এই যে আপনার পায়ের কাছেই।

রাজা কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন সুগঠিত সুঠাম দেহ, কৃষ্ণবর্ণ এক যুবক অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

রাজা বললেন, লোকটা এমন নির্জীব কেন, মারা যাবে নাকি?

সেনাপতি বলল, এমন আশঙ্কা করবেন না মশাই। ও আসল কলির চর, ভিরকুটি মেরে পড়ে আছে, ছেড়ে দিলেই উঠে পালাবে। তাই না হাত-পা শক্ত করে বেঁধেছি।

রাজা বললেন, কলির চর হোক আর যাই হোক লোকের তো ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে। ওর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে আগে ওকে কিছু খাইয়ে আনো।

রাজার আদেশে উপস্থিত সকলে অবাক হয়ে গেল। তারা ভেবেছিল লোকটার গর্দান যাবে, তার বদলে কিনা বরযাত্রীর সমাদর, ভাবলো রাজাগজার মতিগতি আলাদা।

সেনাপতি সাহস সঞ্চয় করে বলল মহারাজ লোকটার গর্দান নেওয়ার হুকুম হওয়া উচিত।

রাজা হেসে বললেন, সে হুকুম খাওয়ার পরেও হতে পারে, গর্দান গেলে বোধকরি খাওয়া সম্ভব নয়।

রাজার আদেশে, কাজেই জরার বাঁধন খুলে তাকে পানাহারের জন্য অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হল।

ইতিমধ্যে রাজা দাঁড়িয়ে সেনাপতি ও অন্যান্য প্রধানদের মুখে যুদ্ধের বিবরণ শুনতে লাগলেন। সমস্ত শুনে রাজা বললেন, সবই তো বুঝলাম কিন্তু সুমন্তরাজ ও রাণীর সংবাদ কি, তাদের কথা তো তোমরা কিছু বলছো না।

বলবে কি, তারা কেউ রাজারাণীকে চোখে দেখেনি, অথচ কিছু একটা না বললে রাজসম্মান রক্ষিত হয় না তাই প্রধান সেনাপতি বলল মহারাজ, যুদ্ধ সূচনার আগেই তাঁরা গোপন সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে গিয়েছেন।

তোমাদের উচিত ছিল আগে থেকেই সুড়ঙ্গের মুখে লোক রেখে দেওয়া।

কেমন করে জানবো মহারাজ? মহারাজার হয়ে কত লড়াই করেছি, কখনো কোন রাজাকে যুদ্ধের সূচনাতেই পালিয়ে যেতে দেখিনি।

রাজা বললেন, এর পরিণাম কি জানো? যুদ্ধ শেষ হয়েও শেষ হলো না। সুমন্তরাজ যুদ্ধের জের টেনে আবার ফিরে আসবেন।

সে কি কথা মহারাজ, রাজপুরী গেল, রাজধানী গেল, যুদ্ধ করবেন কি নিয়ে?

তুমি বলছো অনেক লড়াই করেছো, কিন্তু লড়াইয়ের কিছুই শেখোনি। যে দেশে রাজার জীবনমরণের উপর যুদ্ধের জয়-পরাজয় হয়ে থাকে সে দেশে পরাজিত রাজা যদি একটা দেওদার গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়ে হাঁক দেয়, অমনি কাতারে কাতারে প্রজা এসে তাকে ঘিরে দাঁড়ায়। জল অত্যন্ত কোমল, কিন্তু সেই জলের ধারাতেই কালক্রমে পাহাড় ভিন্ন হয়ে যায়। এদেশের রাজ্য ব্যবস্থা অত্যন্ত শিথিল বলেই অত্যন্ত দৃঢ়। যাক অনেক লড়াই ফতে করেও যখন এসব কথা বোঝনি এখনও বুঝতে পারবে বলে মনে হয় না।

উপস্থিত সকলে অনুমোদনসূচক মাথা নেড়ে স্বীকার করে নিল মহারাজা যখন বলছেন তখন অবশ্যই বুঝতে পারবো না। রাজার কাছে চিরনাবালক সেজে থাকলে অনেক সুবিধে পাওয়া যায়।

এমন সময়ে দুজন সৈনিক জরাকে নিয়ে প্রবেশ করলো।

কি হে তোমাকে খেতে দিয়েছে না তোমার নাম করে ভাঁড়ার থেকে খাদ্য নিয়ে এসে নিজেরাই খেয়েছে। এরা সব পারে।

জরা জানালো, মহারাজের কৃপায় পানাহারের ত্রুটি হয় নি।

এবারে রাজার সঙ্গে জরার কথোপকথন শুরু হলো।

তুমিই সেদিন আমার পোষা পায়রাটাকে তীর দিয়ে মেরে আমার পায়ের কাছে ফেলেছিলে?

হ্যাঁ মহারাজ, সে অপরাধ স্বীকার করছি। এর আগে কখনো পোষা পশুপাখী মারিনি।

তবে সেদিন কেন মারতে গেলে?

জরা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না।

নরেন্দ্রনগররাজ বুঝলেন যে, সুমন্তপুররাজার হুকুমেই কাজটা করেছিল। প্রভুর উপরে দোষ দিতে চায় না তাই নীরবতা অবলম্বন করেছে। মনে মনে খুশী হলেন। বুঝলেন যে, লোকটা পাথরের কাঙ্করের মধ্যে সোনা, নিষ্কাশিত করে নিতে পারলে খাঁটি রূপে দেখতে পাওয়া যাবে। আপাতত সেই ইচ্ছা স্থগিত রেখে শুধালেন. তীরধনুকে তোমার হাত এমন সই হলো কি করে?

মহারাজ, বাল্যকাল থেকে তীর-ধনুক নিয়ে বনে বনে ঘুরছি। জন্তু-জানোয়ার মারতে মারতে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

জন্তু-জানোয়ার তো মেরেছো স্বীকার করলে, সবাই অমন মেরে থাকে। ওটা তীরন্দাজের স্বভাব। হাতে পড়লে কাউকে না কাউকে মারতে ইচ্ছা করে। কিন্তু বাপু সাচ্চা কথা বলো দেখি সব সেরা জন্তু কটা মেরেছো?

ইঙ্গিতটা বুঝতে না পেরে জরা রাজার দিকে তাকিয়ে রইলো।

বলি কটা মানুষ মেরেছো।

ওই একটি ছোট্ট প্রশ্নে জরার মেরুদণ্ডের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হয়ে গেল। যে কথা আজ মাসখানেক সুমন্তপুরে থাকাকালে রাজভোগের তলে চাপা পড়ে গিয়েছিল হঠাৎ শুষ্ক উত্তরে হাওয়ায় তা বেরিয়ে পড়ে তার অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দেশ করলো জরার দিকে।

জরার মুখ শুকিয়ে গেল। তার গা কাঁপতে লাগল। সে প্রায় অবসন্ন হয়ে বসে পড়বার মতো হলো। রাজা বুঝলেন. লোকটা নিতান্তই শিকারে শিক্ষানবীশী কখনো মানুষ মারেনি, তাই এই ইঙ্গিতে এমন হতবুদ্ধি হয়েছে। আরো বুঝলেন যে লোকটার দীর্ঘ বিশ্রাম আবশ্যক। একজন অনুচরের দিকে তাকিয়ে বললেন. এর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দাও।

সে যখন অনুচরের সঙ্গে যেতে উদ্যত রাজা বললেন : হ্যাঁ হে বাপু, তোমার নামটা কি?

নির্বোধ জরা এতক্ষণ পরে একটা বুদ্ধির কাজ করলো, স্বনামের স্থানে জানালো, মহারাজ আমার নাম রাজা।

নিতান্ত মিথ্যা ও জানায় নি, কারণ খট্টাস তাকে রাজা পদবী দান করেছিল।

রাজা হেসে বললেন, এই দ্যাখো মন্ত্রী, কার কি রকম ভাগ্য। তুমি পঞ্চাশ বছর রাজার পাশে থেকেও মন্ত্রীর বেশি হতে পারলে না, আর আমি কত যুদ্ধ-হাঙ্গামা, কত নররক্তপাত করে তবে রাজা। আর এই নিরীহ লোকটা যে সেরা জন্তু মারার ইঙ্গিতেই কাঁপতে শুরু করেছিল, সে হলো কিনা রাজা। ভাগ্য আর কাকে বলে? যাও রাজা, এখন বিশ্রাম করোগে। এখন এক রাজ্যে দুই রাজা হলো শেষ পর্যন্ত রাণীর ভাগাভাগির ব্যাপারে রাজপণ্ডিতের স্মরণস্থ না হতে হয়।

এই বলে তিনি হেসে উঠলেন, হাসলে রাজার বয়স দশ বিশ বৎসর কমে যায়। হাসলে যার বয়স বেশি বলে মনে হয়, সেই লোককে কেউ যেন কখনো বিশ্বাস না করে।

ওই একটুখানি রাজ-অনুগ্রহ লাভ করলো জরা তাতেই তার কাল হলো। রাজঅনুচরগণ পছন্দ করে না যে, তারা ছাড়া আর কেউ রাজানুগ্রহের ভাগী হয়। তারা মনে মনে স্থির করলো মহারাজার তো শুধু দুটি চোখ আমাদের সকলে মিলে হাজার চোখ, সহস্রাক্ষ বললেও অত্যুক্তি হয় না। মহারাজ তো হুকুম দিয়েই খালাস, তারপরে ও হুকুমের কি অর্থ হয় সে দেখবার ভার আমাদের উপরে। অতএব 'রাজার' রাজগী ভাল করেই চালাবো। জরাকে আহার ও বিশ্রামের নামে সরিয়ে নিয়ে গেল।

আড়ালে নিয়ে গিয়ে তাকে জানালো, দেখো বাপু, আমরা যা দিই তাই খাবে, যা বলি তাই করবে, যেখানে থাকতে বলি সেখানে থাকবে। কোনো সুযোগে এসব কথা যদি রাজার কানে তোল তবে প্রাণ বাঁচাতে পারবে না, এই কথা বেশ করে মনে রেখো। প্রাণে বেঁচে গিয়েছে এই আনন্দে জরা বললো, আপনারাই এখন আমার কাছে রাজা-মহারাজা, আপনাদের ইচ্ছাই আদেশ. আমি দিনান্তে দুটি খেতে পেলেই মনে করবো যথেষ্ট হলো। তারা বললো, এই তো ভালো মানুষের মতো কথা মনে থাকে যেন।

তারপর তাকে নিয়ে গিয়ে কিছু খেতে দিল এবং আহারান্তে একটা ঘরে বন্ধ করে রেখে বললো, এখন বিশ্রাম করো। অতঃপর কি করতে হবে তাও স্থির করে ফেলেছিল রাজ-অনুচরগণ। এখানে নরেন্দ্রনগর রাজধানীর একটু ভৌগলিক বিবরণ দেওয়া আবশ্যক।

একটা উঁচু পাহাড়ের মাথা চেঁচে সমতল করে ফেলে মস্ত জায়গাটা পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘিরে নিয়ে নরেন্দ্রনগর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত। সমতল জমি থেকে রাজধানীতে পৌঁছবার একটি মাত্র আঁকাবাঁকা পথ, যেমন পাহাড়ে হয়ে থাকে আর কি। সে পথ সঙ্কীর্ণ আর খাড়া. তার উপরে আবার মাঝে মাঝে তোরণ তুলে কড়া পাহারার ব্যবস্থা। শত্রুসৈন্যকে আসতে হলে পাহাড়ের গা বেয়ে আসতে হবে, এ-পথ বেয়ে আসবার উপায় নেই। এ পথে কেবল রাজবাড়ির লোকেরা চলাচল করে। পাহাড়টার নীচে চারদিকে সমতল জমি, খেনে গম ও ভুট্টা প্রভৃতির চাষ হয়ে থাকে। দূরে-অদূরে ছোটবড় অনেকগুলো পাহাড় আছে, মধ্যবর্তী উপত্যকাগুলি ফসলের পরিণতি অনুসারে রং বদলায়। যে উপত্যকাটা একটু বিস্তৃত তাতে ছোট একটি পাহাড়ী নদী খরস্রোতি, বর্ষায় জল নামলে নদীটার দুই কূলের অনেকটা জায়গা অধিকার করে নেয়, অন্য সময়ে নদীগর্ভে বালুতে জলে ভাগাভাগি, বালুর ভাগটা বেশী। খরস্রোতির ধারে ছোট একটি পাহাড়ী গ্রাম আছে, স্থানীয় লোকেরা বলে পাথরভাঙ্গা গ্রাম। এই নামকরণ মিথ্যা নয় কারণ পাথর ভেঙ্গে গ্রামটা তৈরী। বাড়িঘরেও পাহাড়ের দেওয়াল, পাতলা পাথরের টালির ছাদ। অধিবাসীরাও পাহাড়ের সন্তান, পাথুরে তাদের গায়ের রং।

রাজধানীতে একটা নূতন মন্দির তৈরী হচ্ছে। ঐ অত নীচে থেকে পাথর কেটে বয়ে নিয়ে আসে মজুরের দল। এইসব মজুর স্বাধীন, বেতনভুক নয়। মাঝে মাঝে লড়াই হয়ে যেসব লোককে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়, তাদের উপরেই এই শ্রমসাধ্য কার্যের ভার। তা নইলে দৈনিক একটা দুটো পয়সা বা একমুঠো গমের জন্যে কে আসবে খাড়া পাহাড়ে ভারী পাথর মাথায় করে বয়ে আনবার জন্যে। এইসব মজুর দিনে বার দুই খেতে পায় আর সন্ধ্যা হলে লম্বা একটা পাথরের ঘরের মধ্যে চাবি দিয়ে তাদের বন্ধ করে রাখা হয়। তাদের পরণে এক টুকরো কাপড়, সারা অঙ্গে আর কোন আবরণ নেই; কেবল গলায় সুতো দিয়ে একটা লোহার তক্তি ঝোলানো, তার উপরে একটা সংখ্যা খোদাই করা আছে। ওটাই তার একমাত্র পরিচয়। কেউ মরলে সংখ্যাটা শূন্য হয়। নূতন লোক এসে আবার তা পূর্ণ করে তোলে। আর তাদের প্রত্যেকের পায়ে তিলে করে বেড়ি পরানো, হাঁটতে পারে তবে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এইরকম চার-পাঁচশো মজুর সকালে উঠে কাজ আরম্ভ করে. তাদের তদারকিতে থাকে বিশ-পঁচিশজন বেতনভুক রাজপেয়াদা, যাদের প্রত্যেকের হাতে লম্বা একখানা করে চাবুক। এই চাবুকের সঙ্গে অনেকবার যোগাযোগ ঘটেনি এমন মজুর বিরল। রাজ-অনুচররা স্থির করলো জরাকে এই মজুরের দলে ভর্তি করে দিতে হবে।

পরদিন প্রত্যুষে জরাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে পাহাড়তলীতে নিয়ে যাওয়া হলো, পরিয়ে দেওয়া হলো মজুরের পোষাক, গলায় তক্তি, পায়ে বেড়ি আর হুকুম হলো সবাই যেমন কাজ করছে তেমনি করতে থাকো। বিস্তারিত বলার আবশ্যক ছিল না। জরা দেখল সবাই শাবল দিয়ে পাথর ভাঙছে আর মাথায় তুলে নিয়ে রাজধানীর

দিকে চলেছে। জরা নিঃশব্দে সেই কাজে প্রবৃত্ত হলো। কোন মজুর পাহাড়তলী থেকে রাজধানী পর্যন্ত পাথর বয়ে নিয়ে যেত না, কারণ খাড়া পাহাড় বেয়ে কোন একজনের পক্ষে রাজধানীতে পৌঁছনো সম্ভব নয়, পাথরখানা দু'তিন মাথা বদল হয়ে উপরে এসে পৌঁছতো। জরা নীচের দিকেই রইলো, কাজেই কোনরকমে যে রাজার চোখে পড়বেই এমন সম্ভাবনা থাকলো না। 'রাজার' নূতন রাজগী দেখে রাজানুচরগণ খুশী হয়ে নগরে ফিরে এল তার আগে জরার উপরে তদারকির ভার চালু করে তাকে ইসারায় জানিয়ে দিল একটু চোখ রেখো। সুমন্তপুরে এসেছিল রাজার বিশ্বস্ত দেহরক্ষী, নরেন্দ্রনগরে হলো পাথর-ভাঙা মজুর। জরার কপাল বড় মন্দ নয়।

দুঃখের পাঠশালায় মধ্যাহ্ন তন্দ্রা ভেঙে জীবনপন্ডিত আবার জেগে উঠেছে, খোঁজ করছে সেই লিকলিকে লম্বা বেতগাছা গেল কোথায়। না হাতের কাছেই আছে। কিন্তু পড়ুয়ারা এই সুযোগে পাঠশালা ছেড়ে বের হয়ে আমবাগানের ছায়ায় হুটোপুটি খেলা আরম্ভ করেছিল। হঠাৎ গুরুমশায়ের নাসিকা গর্জন নিঃস্তব্ধ হতে তারা ভালমানুষের মতো ফিরে এসে যে যার যায়গায় বসে পুঁথিতে গভীর মনোযোগের ভান করতে শুরু করেছে। কিন্তু জীবন-পন্ডিতকে ভোলানো অত সহজ নয়। সারাটা জন্ম তার কেটে গেল দুঃখের পাঠশালায় ছাত্র পড়াতে।

এই রূপকের অর্থ আর কিছুই নয় জীবনপন্ডিতের অকালনিদ্রার সুযোগে জরা মনে করেছিল বুঝি তার দুঃখের পাঠশালার পালা শেষ হলো। মাস দুই কাল ছিল সে সুমন্তপুরে। সেখানকার সাময়িক রাজভোগকেই তখন মনে হয়েছিল চিরন্তন বাসুদেবকে হত্যার পর থেকে ক'মাসের দুঃখ আর তারও আগে ব্যাধজীবনের দীর্ঘায়িত অভাব ও কষ্ট সমস্তই স্বভাবের ব্যতিক্রম বলে তার মনে হয়েছিল। ভেবেছিল সুমন্তপুরের পর্বটাই সত্য আর স্থায়ী ভবিষ্যৎ বলে যে একটা কাল আছে আর সে কাল যে এমন সুখদায়ক না হতেও পারে ক্ষণেকের জন্যেও এমন মনে হয় নি। বর্তমান যখন ভূত-ভবিষ্যৎকে ভুলিয়ে দেয় বুঝতে হবে তখন মতিচ্ছন্ন হতে আর বাকি নেই। বর্তমান একটি কাল্পনিক রেখামাত্র। সমস্তটাই হয় অতীত, নয় ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ বর্তমানের মুখোশ পরে আসে বলে তাকে সবসময়ে বুঝতে পারা যায় না। জরাও বুঝতে পারেনি। আরম্ভ হলো আবার জরার দুঃখের জীবন। জরা বনে বনে শিকার করে বেড়াত, সেটাও সুখের জীবন নয় তবে তাতে স্বাধীনতা ছিল আর এমন শিরদাঁড়া টনটন করতো না। পাথরের চাঙড়াগুলো যখন মাথায় চাপিয়ে দেয় আর তত্ত্বাবধায়কের ইঙ্গিতে সর্বদা বেশী ভারীখানাই চাপিয়ে দেয় টনটন করে ওঠে সমস্ত শিরদাঁড়াটা। তার উপরে খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠবার অভ্যাস তার কোথায়। সমতলভূমির অধিবাসী সে। পাথরের চাঙড় মাথায় করে পাহাড়ে উঠতে গিয়ে প্রথম প্রথম তার মাথা ঘুরে যেত, পা টলতো, ঠিক সেই মুহূর্তে কড়া চাবুকখানা পড়তো এসে পিঠের উপরে। রাগ হতো, দুঃখ হতো, নিজের প্রতি ধিক্কার হতো আর রাগে দুঃখে ধিক্কারে জল দেখা দিত দুই চোখে। সে জল তত্ত্বাবধায়কের চোখে পড়লে কঠিন ব্যঙ্গস্বরে শুনতে পেত, আবার কান্না হচ্ছে, আহা মহারাজ রাজার চোখের জলটি দেখতে পেলেন না। জরা টাল সামনে নিয়ে উপরে উঠতে থাকে। কখনোবা শুনতে পায় মহারাজ দুটো মিষ্টিকথা বলেছিলেন আর ভেবেছিলো আকাশের চাঁদ হাতে মিললো নে ওঠ, পাথরখানা পড়ে যদি ভাঙে তবে আর মাথা আস্ত থাকবে না। জীবনপন্ডিত জেগে উঠে জরার শাস্তিবিধানে মনোযোগ দিয়েছেন।

একদিন নরেন্দ্রনগররাজ জিজ্ঞাসা করলেন, ওহে, সেই রাজাকে তো দেখছিনে। তাকে নিয়ে এসো। লোকটার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ আছে, দেশবিদেশের খবর রাখে।

অমাত্যদের একজন বললো, মহারাজ সে লোকটা আস্ত কলির চর ছিল।

রাজা বললেন, বাসুদেবের মৃত্যুর পরে কলি যুগ আরম্ভ হয়েছে, এখন আমরা সকলেই কলির চর।

অমাত্য বললো, মহারাজ যথার্থ বলেছেন, কিন্তু লোকটা পালিয়েছে।

পালাবে কেমন করে? রাজপুরী থেকে পালানোত সহজ নয়।

তবে আর কলির চর বলছি কেন মহারাজ। আমাদের সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালালো লোকটা।

রাজা বিরক্ত হয়ে বললেন, হয় তোমরা সবাই অন্ধ, নয় চোখ বুজে ছিলে।

অমাত্য রাজাকে খুশী করবার উদ্দেশ্যে বললো, ঠিক কথা মহারাজ, মহারাজই আমাদের চোখ কান নাক মুখ পঞ্চেন্দ্রিয়।

তাই যদি হয় তবে তোমাদের টাকা দিয়ে রাখাটাই বৃথা। হয় লোকটাকে এনে হাজির করো নয় কার দোষে পালালো আমাকে জানাও।

অমাত্য ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে বললে, যে আজ্ঞে মহাশয়, এখনই আসামীকে হাজির করে দিচ্ছি এই বলে সে দ্রুত পশ্চাৎ করলো।

নিপুণ মনঃস্তত্ত্ববিদ না হলে কেউ নিখুঁত রাজামাত্য হতে পারে না। এ লোকটি মনঃস্তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ ছিল, সে জানতো যে আর দশটা জরুরী কাজের মধ্যে রাজা এমন ব্যস্ত থাকবেন যে কিছুকাল আর জরার কথা তার মনে পড়বে না তারপরে যখন মনে পড়বে তখন ক্ষেত্র কর্ম বিধীয়তে। যাহোক একটা কিছু বোঝালে চলবে। আপাততঃ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করা যাকগে।

(১০)

সংসার যদি নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় হত তবে একরকম মন্দ ছিল না কারণ দুঃখের অনুভূতিই হত না। সুখ সম্বন্ধেও সেই কথা। সুখ-দুঃখের যুগলতন্তুতে সংসারটা বোনা বলেই খেলা এমন হয়ে ওঠে। কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, কেউ বুক চাপড়ায় আর এই দোরোখা বসনটি যিনি বুনেছেন তিনি উপর থেকে নির্বিকারভাবে দেখেন।

জরার পরিশ্রম ও দুঃখ একেবারে নিরবচ্ছিন্ন ছিল বললে ভুল হবে। রাজার জন্মদিন, রাণীর জন্মদিন, নানারকম তিথি-পার্বণ প্রভৃতি উপলক্ষে মজুরদের কাজ বন্ধ থাকত। সেদিন তাদের ছুটি তবে ছুটে পালাবার উপায় নেই। কেননা পায়ের বেড়ি কোন উপলক্ষেই খোলা হত না, তবে লাভের মধ্যে এই যে হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে বিরাম আর কাছেভিতে ঘোরাফেরা করবার আরাম। এইরকম একটা ছুটি উপলক্ষে জরা ঘুরতে ঘুরতে পাথরভাঙা গ্রামটার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। সমতল দেশের অধিবাসীর চোখে এ রকম ঘর বাড়ী আগে পড়ে নি। দেওয়াল গুলো পাথরের আবার ছাদের ছাউনিটাও পাতলা করে কাটা পাথরের টালির, গবাক্ষ বলতে কিছু নেই, দরজা সরল গাছের তক্তা দিয়ে তৈরী। এই রকম গায়ে গায়ে বাড়ী চলেছে এমন বিশ পঁচিশখানা বাড়ী নিয়ে এই পাথরভাঙা গ্রাম। প্রত্যেক বাড়ীর সামনে ছোট একটুকরো আঙিনা।

হাঁটুজল খরস্রোত নদী পার হয়ে জরা এই রকম একটা বাড়ীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল, দেখতে পেল বাড়ীর উঠোনে পাথরের উদুখলে কাঠের মুষল দিয়ে গম ভাঙছে একটি অল্পবয়সের মেয়ে। আর বছর দুই তিনেকের একটি ছেলে আঙিনার মধ্যে টলমল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ক্লান্ত হলে এসে উদুখলটা ধরে সামলে নিচ্ছে। সেই সঙ্গে মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসছে যেন একটা মস্ত বাহাদুরী করা হল, মা তার মুখে গোটা কয়েক ভুট্টার খই পুরে দিচ্ছে, ছেলেটা খুসী হয়ে আবার টলমল করে হাঁটতে হাঁটতে অন্য দিকে যাচ্ছে।

এক খন্ড পাথরের উপর বসে অনেকক্ষণ ধরে জরা এই দৃশ্যটি দেখল। হঠাৎ তার বুকের ভিতর থেকে অনেক কালের চাপা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল আর সেই সঙ্গে হাঁটুর উপরে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল চোখ থেকে। চমকে উঠল জরা। অনেক অনেক কাল সে কাঁদে নি। অনেক অনেক কাল সে এমন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেনি। হঠাৎ এমন হতে গেল কেন বুঝতে পারল না। নিজের মন বিশ্লেষণ করবার শক্তি যদি থাকত তবে বুঝত সম্মুখের এই দৃশ্যের মধ্যে চমক মেরে যাচ্ছে আর এক দৃশ্য, অবশ্য ছেলেটির অস্তিত্ব সম্ভাবনার মধ্যে। তারও একটি এই রকম বাড়ী ছিল, এমন পাহাড়ের পারে নয় বটে তবে তার চেয়েও ভাল, সমুদ্রের ধারে। পাহাড় চিরকাল এক রকম, নিত্যনূতন সমুদ্র। ওই বধূটির মত তারও পত্নী ছিল। সে এমনি ভাবেই গৃহস্থালীর কার্য করত জরা যখন বনে বনে শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারপরে সন্ধ্যাবেলায় বরা কিংবা হরিণ মেরে নিয়ে

এনে ধপ করে উঠোনের মধ্যে ফেলে দিয়ে বলত দেখ জয়া কি এনেছি। জয়ন্তী মনে মনে খুসী হলেও মুখে সে ভাব প্রকাশ করত না। বলত, বেশ করেছ, এখন স্নান করে এসে খাও। যেদিন সময় থাকত সমুদ্রে গিয়ে স্নান করে আসত, নইল বাড়ীর কাছের একটা খাড়িতে।

এক দিনের কথা তার স্পষ্ট মনে পড়ে। জয়ন্তী বলেছিল প্রত্যেক দিন হরিণ আর বরা ভাল লাগে না, একটা নতুন কিছু খাওয়াতে পার।

জয়া বলেছিল দাঁড়া তোকে একদিন রাজমাংস খাওয়াব।

জয়ন্তী বলল, রাজহাঁস পর্যন্ত জানি, রাজমাংস আবার কি গো? তুমি কি শেষে রাজাকে মারবে নাকি?

যদিই বা মারি, ক্ষতি কি?

ক্ষতি আর কি? শূলে যাবে।

এবারে জয়া বলল, আরে না না তোর সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম।

ঠাট্টা নয় গো। তুমি কোনদিন শিকারে গিয়ে রাজাগজা হত্যা করে ফেলবে, আর সবশুদ্ধ আমাদের মরতে হবে শূলের উপরে।

জয়া বলল, দূর পাগলী! বনের মধ্যে রাজাগজা আসতে যাবে কেন?

তা কি বলা যায়? রাজাগজাদের মতি-গতিই আলাদা।

তা যদি রাজবাড়ী ছেড়ে তারা বনের মধ্যে এসে শুয়ে থাকে, তবে মরবে।

নদীর স্রোতে অসহায় নৌকাখানার মত তার মন চিন্তাস্রোতে হঠাৎ চোরাপাহাড়ে এসে গুঁতো মারল। প্রথমেই মনে হল বিপদটা গুরুতর নয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, গলগল করে জল উঠছে, বেশীক্ষণ আর সামাল দেওয়া যাবে না নৌকোটাকে। নৌকায় চাপা, রশি খোলা, স্রোতের মুখে ভাসিয়ে দেওয়া এ সমস্তই কখন তার অগোচরে ঘটে গিয়েছে। চোখে যখন দেখছিল সম্মুখের এই শিশু ও জননীকে, মন তখন ভিতরে ভিতরে আর একটি দৃশ্যকে অনুসরণ করছিল। সেই দৃশ্যের জের ঠেলতে ঠেলতে ফেলল এনে তাকে চোরাপাথরের উপরে। এখন নৌকা সামলায় কে? মানুষের মন চলে দাবার ছকের ঘোড়ার মত। এও সেই সংসারের সুখ-দুঃখে বুননের আর একটি নমুনা। সুখের দৃশ্য হঠাৎ তাকে এনে ফেলল দুঃখের ডুবজলের মধ্যে। জরা যদি বিশ্লেষণপরায়ণ হত তবে বুঝত জীবন-পণ্ডিতের দুঃখের পাঠশালায় এও একরকম দণ্ড। কাউকে দণ্ড লাঠি দিয়ে, কাউকে দণ্ড ভালোছেলেদের দেখিয়ে তুলনায় নিজের অকিঞ্চিৎকরতা বুঝিয়ে দিয়ে। কাউকে দণ্ড স্মৃতির চাবুকে, কাউকে দণ্ড চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে। এতরকম ভাবে সাজা দিতেও জানে জীবনপণ্ডিত।

এবারে শিশুটি টলতে টলতে জরার কাছে এসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেঁদে উঠল, ভেবেছিল বাবা, এযে নূতন লোক। তার কান্নায় মায়ের চোখ পড়ল জরার দিকে, শুধালো, তুমি বুঝি রাজবাড়ীর মজুর?

কি করে বুঝলে? শুধালো জরা।

মেয়েটি নীরবে তার পায়ের বেড়ির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করল।

পরিচিত বেড়িজোড়া নতুন করে দেখে জরা লজ্জিত হল।

মেয়েটি বলল, নিত্য দেখি কিনা, বেড়ি পায়ে মজুররা পাথর কাটছে। কখনও আবার এদিকেও আসে। তোমাকে নতুন দেখছি।

জরা বলল, হাঁ, আমি অল্পদিন হল এখানে এসেছি।

বুঝেছি, তোমাকে সমন্তপুর থেকে বন্দী করে এনেছে, তাই না?

জরা বলল, তাই বটে।

কিন্তু তোমাকে তো আমাদের এদেশী লোক বলে মনে হয় না।

কি করে জানলে?

এদেশী লোকের মুখ-চোখ, আচার ব্যাভার সব জানি কিনা।

জরা বলল, না সত্যিই আমি এদেশের লোক নই।

কোথায় তোমার বাড়ী গা?

সে অনেক দূরদেশে। নাম বললে চিনতে পারবে না।

মেয়েটি তক্ষশীলার হাটে বারকয়েক গিয়েছে। অনেক দূরদেশে শুনে বলল, তক্ষশীলার নাকি?

না। আরও অনেক অনেক দক্ষিণে। একেবারে সমুদ্রের ধারে।

ওমা, সে যে অনেকদূর, বলে হাতের মুষল রেখে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণ কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ চালাচ্ছিল। হাঁ, অনেক দূরেই বটে।

তবে এখানে এলে কি করে?

জরা অনেকটা আপনমনেই বলল, পাপ করেছিলাম, তা সাজা পেতে হবে তো।

মেয়েটি এমন অদ্ভুত কথা জীবনে শোনেনি। পাপই বা কি, আর তার সাজাই বা কেন, কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকাল জরার মুখের দিকে। জরা বুঝল মেয়েটিকে আবার বলা দরকার। সে বলল, পাপের সাজা ভোগ করছি।

সে শুধালো, পাপ কাকে বলে?

এবারে মেয়েটির প্রশ্ন শুনে জরার অবাক হবার পালা। কি উত্তর দেবে, ভেবে পেল না। জরার দোষ দেওয়া যায় না। যে প্রশ্নের সদুত্তর সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করলে পাওয়া যায় না অবোধ জরা তার কি উত্তর দেবে? তবু একবার বোঝাতে চেষ্টা করা উচিত তাই সে বলল, ধর কেউ কাউকে মারল, সেটাই পাপ।

কেন পাপ হতে যাবে কেন? আমি আমার ছেলেটাকে দরকার হলে মারি, আমার লোকটা কখনও কখনও মাতাল হয়ে এসে আমাকে মারে, আবার গাঁয়ের লোকেরা পরবের দিনে মদ খেয়ে মারামারি করে মাথা ফাটায়। এ তো নিত্যিকার ব্যাপার। একে বুঝি তোমাদের দেশে পাপ বলে?

জরা দেখল, না, মারামারির উদাহরণ দিয়ে সুবিধা হবে না। তাই এবারে নতুন দৃষ্টান্ত গ্রহণ করল। বলল, ধর কেউ এমন কাজ করল, যাতে তোমার মনে কষ্ট হল। তাকে কি পাপ বলবে না?

ওমা, পাপ বলব কেন? কষ্ট বলব।

জরা হতাশ হয়ে পাপের মর্ম বোঝাবার আশা ছেড়ে দিল। জরা বলল, আচ্ছা, আর একদিন এসে তোমার সঙ্গে গল্প করব, আজকে সন্ধ্যা হল, উঠি।

মেয়েটি বলে উঠল, সেকি, কিছু না খেয়ে যাবে? এই বলে পাতার ঠোঙ্গায় ভুট্টার খই এনে দিল, আর পাথরের বাটীতে পানীয় জল। রাজবাড়ীর মজুর হিসাবে যে খাদ্য সে পেত তার তুলনায় এই শুকনো খই অমৃত বলে মনে হল জরার। মুখেণ সাগ্রহে সমস্ত খইগুলি খুঁটে খেল, তারপরে এক নিশ্বাসে সেই শীতল নির্মল জল পান করে আরামের আঃ শব্দ উচ্চারণ করল। তারপর বলল, পাপ কাকে বলে তোমাকে বোঝাতে পারলাম না, তবে এটা জেনো, পাপের উল্টো পুণ্য। এ শব্দটা আরও অদ্ভুত লাগল মেয়েটির কানে। বলল, সেটা আবার কি?

এই যে আমাকে খেতে দিলে, পান করতে জল দিলে, এই তো পুণ্য।

পুণ্যের এই ব্যাখ্যা শুনে মেয়িটি হেসে কুটিকুটি হল, তাহলে তো আমি রোজ ঝুড়ি ঝুড়ি পুণ্য করি।

জরা বলল, তেমনি নিশ্চয় রোজ ঝুড়ি ঝুড়ি পাপও কর। ছেলেটাকে মারো, স্বামীর মনে কষ্ট দাও।

মেয়েটি পুনরায় গম ভাঙতে ভাঙতে বলল, না বাপু, তোমাদের পাপ পুণ্য বুঝবার ক্ষমতা আমার নাই। তার চেয়ে অনেক সহজ ক্ষেতি করা, গম ভাঙা আর—

তার বাক্য শেষ হতে পারল না, দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে শুনল ঘোড়ার খুরের তড়বড়ি শব্দ। দুজনেই তাকাল, তবে কোনদিকে তাকাতে হবে জানত মেয়েটি। সে বলে উঠল, ওই যে মহারাজ শিকার করে ফিরছেন। এক লহমার মধ্যে নরেন্দ্রনগররাজের ঘোড়া মেয়েটির বাড়ীর কাছে এসে পৌঁছোল। রাজা ঘোড়া থামিয়ে কুটীরের দিকে তাকিয়ে বললেন, সুবালা, সব খবর ভাল তো?

সে ছোট্ট একটি অভিবাদন করে বলল, মহারাজার অধীনে আমরা সুখেই আছি।

এমন সময়ে রাজার চোখ পড়ল জরার দিকে, চমকে শুধালেন, একি, 'রাজা' যে, তোমার এ অবস্থা কে করল?

জরা রাজানুচরদের কৌশল কিছুই জানতো না। সে নীরবে কপালে হাত ঠেকিয়ে বোঝাতে চাইল, এ অবস্থা করেছে অদৃষ্ট।

রাজা বললেন, এবারে সব বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, আমি সব ব্যবস্থা করছি। বলে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন রাজধানীর দিকে। জরা কিছুই বুঝতে পারলো না, ধীরে ধীরে পায়ের বেড়ী বাজিয়ে কয়েদখানার দিকে চলল।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

সময় ও প্রযুক্তিবিদ্যা

মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কী?

সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ—সময়। মানুষের লিখিত ইতিহাসে এমন নিদর্শন প্রচুর যা থেকে বোঝা যায়, সময় যে পার হয়ে যাচ্ছে তাই নিয়েই মানুষের অন্তহীন ভাবনাচিন্তা। সময়ের পার হয়ে যাওয়াটাকে একটা হিসেবের মধ্যে আনতে কত ভাবেই না সে চেষ্টা করেছে। সুখের বিষয়, এমনকি আজকের দিনেও যখন প্রায় কোনো বিষয়েই কোনো দেশের সঙ্গে কোনো দেশের মিল নেই তখন অন্তত সময়ের মাপ নেবার ব্যাপারে সাধারণ মতৈক্য আছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির এমন এক পর্বে আমরা বাস করছি যখন সময়ের নিখুঁততম মাপ নেবার একটি ব্যবস্থা ছাড়া আমাদের জীবন অচল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। একটি দৃষ্টান্ত দিই। সকলেই জানেন, মিডিয়াম তরঙ্গে কলকাতা-ক বেতার-প্রোগ্রাম প্রচারিত হয় ৬৭০ কিলোহার্ৎস-এ। কথাটার মানে কি? এই বিশেষ মাপের তরঙ্গে প্রতি সেকেণ্ডে ৬৭০ হাজার কম্পন সৃষ্টি হচ্ছে। প্রতি সেকেণ্ডে সাইকল-এর সংখ্যাকে বলা হয় হার্ৎস। সংখ্যাটিকে কিলোতে প্রকাশ করা হয়েছে। তাহলে ৬৭০ কিলোহার্ৎস কথাটার মানে দাঁড়াচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে ৬৭০ হাজার সাইকল। এই মাপটি অবশ্যই নির্ভুল হলে পরেই আমাদের বেতার গ্রাহকযন্ত্রে প্রোগ্রামটি আমরা ঠিকমতো ধরতে পারি। সহজেই অনুমান করা চলে, সেকেণ্ডে ৬৭০ হাজারের মাপ যদি নির্ভুলভাবে নিতে হয় তাহলে আমাদের হাতে অবশ্যই এমন যন্ত্র থাকা দরকার যার সাহায্যে সেকেণ্ডের ৬৭০ হাজার ভাগের একভাগ হিসেবও ধরা পড়ে। আবার কলকাতা-ক থেকে যে-সময়ে বেতার-প্রচার হচ্ছে সেই একই সময়ে কলকাতা-খ কলকাতা-গ ইত্যাদিতেও প্রচার চলছে। একটির সঙ্গে অপরটি মিশে যায় না তার কারণ তরঙ্গের মাপ ভিন্ন ভিন্ন। এই ভিন্নতা নির্ভুলভাবে বজায় থাকে বলেই বেতার গ্রাহকযন্ত্রে প্রত্যেকটি স্টেশনকে পৃথকভাবে ধরা চলে। এ থেকেও বোঝা যাচ্ছে, তরঙ্গের মাপ নির্ভুল হওয়াটা কতখানি জরুরি।

সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের একভাগ সময়ের মধ্যে কী ঘটছে বা না-ঘটছে তাও এখন বিজ্ঞানীদের জানবার প্রয়োজন ঘটে। তা জানবার ব্যবস্থাও হয়েছে। একটি বুলেট একটি তাসকে আড়াআড়ি ফুঁড়ে যেতে কত সময় নেয়? কিছুকাল আগেও এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়া অসম্ভব ছিল। এখন বলা চলে, এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের একভাগ। এ থেকে অনুমান করা চলে, সময়ের মাপ নেবার ব্যবস্থা আজকাল কতখানি নিখুঁত।

আর শুধু তো মাপ নেওয়া নয়, সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ হয়েছে তার ছবি নেবার ব্যবস্থাও। অসিলোস্কোপ যন্ত্র যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন, সেকেণ্ডে কয়েক হাজার সাইকল বিশিষ্ট এই যে তরঙ্গ—তারও একটি ছবি ফুটিয়ে তোলা চলে। তেমনি, তাসের মধ্যে দিয়ে বুলেট চলে যাচ্ছে তার ছবিও অতিবেগসম্পন্ন ক্যামেরায় ধরে রাখাটা অসম্ভব ব্যাপার নয়।

মানুষের গলার স্বরের কম্পাঙ্ক শুরু সেকেণ্ডে ৭৫ সাইকল-এর কাছাকাছি মাপ থেকে। টেলিফোন যন্ত্র থেকে যদি ঠিকভাবে কাজ পেতে হয় তাহলে এই মাপ ঠিকভাবে জেনে রাখা দরকার। অন্যদিকে সম্প্রতিকালে ট্রাঙ্ক-টেলিফোনের সঙ্গে সম্পর্কিত এমন যন্ত্রেরও চল হয়েছে যার মাপ সেকেণ্ডে কোটি কোটি সাইকল-এর মাত্রায় বাঁধা।

ভাবলে অবাক হতে হয়, যে-মানুষ এককালে চাঁদের কলার হিসেব রেখে সময়ের হিসেব রাখত সেই মানুষই এখন সেকেণ্ডকে দশ লক্ষ ভাগে ভাগ করছে! অবশ্যই ব্যাপারটি ঘটতে সময় লেগেছে শত শত বৎসর। 'স্প্যান' পত্রিকার গত মে সংখ্যায় রবার্ট ক্যারেল বিষয়টি নিয়ে সুন্দর একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। বিজ্ঞানের কথার পাঠকদের কাছে এই প্রবন্ধের বক্তব্য ও আরো কিছু তথ্য উপস্থিত করতে চাই। এই লেখার সঙ্গে যে-ছবিটি দেওয়া হল তাও 'স্প্যান' পত্রিকা থেকে।

০

সময়ের মাপ নেবার ব্যাপারে প্রথম অবদান প্রাচীন মিশরীয়দের। তারা লক্ষ করেছিল নীলনদে বান আসার সময়ে ভোরের ঠিক আগে পূব আকাশে বিশেষ একটি তারা ওঠে। তারপরে দিন গুণে গুণে তারা দেখল এই বিশেষ তারাটি ৩৬৫¼ দিন পরে পরে পূব আকাশে ওঠে। এই হিসেবটি মোটামুটি সঠিক ছিল। কিন্তু ক্যালেণ্ডার তৈরি করতে গিয়ে তারা কিন্তু এই ভগ্নাংশটিকে বাদ দিয়ে পুরো ৩৬৫টি দিনে একটি বছরের হিসেব করল। তার মানে, একটি দিনের সিকিভাগ সময় বাদ পড়ল ক্যালেণ্ডারের হিসেব থেকে। ফল হল এই যে নীলনদের বন্যা ক্যালেণ্ডারের এক বছরের হিসেব থেকে ক্রমেই পিছিয়ে যেতে লাগল। অর্থাৎ বন্যা আসতে লাগল এক বছর পার হয়ে যাবারও আরো কিছুকাল পরে পরে। যতো বছর পার হয় পিছিয়ে যাওয়ার মাত্রাও ততো বাড়ে।

বোঝা গেল, এই সিকি-দিন নিয়েই যতো সমস্যা। সমস্ত হিসেব বেহিসেব হয়ে যাচ্ছে এই সিকি-দিনের হেরফের থাকার জন্যে। বছরে সিকি-দিন মানে চার বছরে পুরো একটি দিন। ব্যাপারটা অবশ্যই তুচ্ছ করার নয়। এই সমস্যার একটা সমাধান করলেন জুলিয়াস সীজার প্রতি চার বছরে একটি করে লীপ-ইয়ার প্রবর্তন করে। এই লীপ-ইয়ারের বছরে একটি দিন থাকে অতিরিক্ত—অর্থাৎ, লীপ-ইয়ারের বছর ৩৬৬ দিনে। এ-ঘটনা খৃস্টজন্মের ৪৫ বছর আগে। সে-সময়ের লীপ-ইয়ারের ব্যবস্থায় মার্চ শুরু হবার ছ-দিন আগের তারিখটি (আমাদের ২৪এ ফেব্রুয়ারি) দু-বার করে আসত। পরবর্তীকালে একই তারিখ দু-বার করে না এনে লীপ-ইয়ারের ফেব্রুয়ারি মাসটিকে করা হল ২৯ দিনের। জুলিয়াস সীজারের আগে বছর শুরু হত মার্চ মাসে, কিন্তু সীজারীয় ক্যালেণ্ডারে শুরু হল জানুয়ারি মাসে। বছর যে মার্চ মাসে শুরু হত তার প্রমাণ এখনো কয়েকটি মাসের নামের মধ্যে রয়ে গিয়েছে—যেমন, সেপ্টেম্বর মানে সপ্তম মাস। জুলিয়াস সীজার আরো একটি কাণ্ড করলেন। কুইনটিলিস বা পঞ্চম মাসের নামটি পাল্টে রাখলেন নিজের নামে—জুলাই। তাঁর উত্তরাধিকারী অগাস্টাসও পরের মাস সেক্সটিলিসের নাম পাল্টে রাখলেন—অগাস্ট। যাই হোক, আমাদের আলোচনার মূল কথাটি হচ্ছে—খৃস্টপূর্ব ৪৫ অব্দে লীপ-ইয়ার ব্যবস্থার প্রবর্তন।

কিন্তু এতেও কি সমস্যার সমাধান হল? না, হয়নি। সীজারীয় ক্যালেণ্ডারেও প্রতি ১২৮ বছরে একদিনের হিসেব গরমিল হয়ে যাচ্ছে। কেন? সিজারীয় ক্যালেণ্ডারে হিসেবের গরমিল মেলানো হয়েছে সিকি-দিনের বা ৬ ঘণ্টার; আসলে কিন্তু গরমিলটা পুরোপুরি ৬ ঘণ্টার নয়, তার চেয়েও কিছু কম। একটি বছরের সঠিক পুরো মাপ হচ্ছে ৩৬৫ দিন, ৫ ঘণ্টা, ৪৯ মিনিট (সেকেণ্ডকে হিসেবে ধরলে ৩৬৫ দিন, ৫ ঘণ্টা, ৪৮ মিনিট, ৪৬ সেকেণ্ড)। সে-জায়গায় ক্যালেণ্ডারে বছরের মাপ যদি ধরা হয় ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা তাহলে ক্যালেণ্ডারের বছর আসল বছরের চেয়ে ১১ মিনিট বড়ো হয়ে যায়। তার মানে, আসল বছর শেষ হয়ে যাবার পরেও ক্যালেণ্ডারের বছর থেকে যাচ্ছে—প্রথম বছরে আরো ১১ মিনিট, দ্বিতীয় বছরে ২২ মিনিট, এমনি চলতে চলতে ১২৮ বছরে পুরো একটি দিন। অর্থাৎ খৃস্টপূর্ব ৪৫ অব্দে প্রবর্তিত ক্যালেণ্ডার খৃস্টীয় ৮৩ অব্দে এসেই একটি দিনের গরমিলে পড়ে যাচ্ছে। আসল বছর

যখন শেষ তখনো এই ক্যালেণ্ডারে বছর শেষ হতে একদিন বাকি। এমনি যদি চলতে দেওয়া হয় তাহলে তো গরমিলের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যাবার কথা। তাই বেড়েছিল। এমনি চলতে চলতে ১৫৮২ সালে এসে দেখা গেল গরমিলের মাত্রা একদিনের নয়, দু-দিনের নয়, পুরো দশ দিনের। ক্যালেণ্ডার এগিয়ে গিয়েছে দশ দিন—সূর্য আকাশের যে-অবস্থানে আসার কথা ২১এ মার্চ তারিখে (মহাবিষুবে), সেখানে এসে যাচ্ছে ১১ই মার্চ তারিখেই। এই গরমিল দূর করার জন্যে বিজ্ঞানীদের পরামর্শ নিয়ে পোপ গ্রেগরি আরো একবার ক্যালেণ্ডারের সংস্কার করলেন। প্রথমত, ক্যালেণ্ডার থেকে পুরো দশটি দিন বাদ দিয়ে দিলেন একেবারে। ১৫৮২ সালের ৪ঠা অক্টোবরের পরের দিনটিকে ঘোষণা করা হল ১৫ই অক্টোবর—মাঝখানের ৫ই অক্টোবর থেকে ১৪ই অক্টোবর পর্যন্ত পুরো দশটি দিন বেমালুম বাদ। দ্বিতীয়ত, ঘোষণা করলেন শতাব্দীর সালগুলো—অর্থাৎ ১৬০০, ১৭০০, ১৮০০ ইত্যাদি সালগুলো
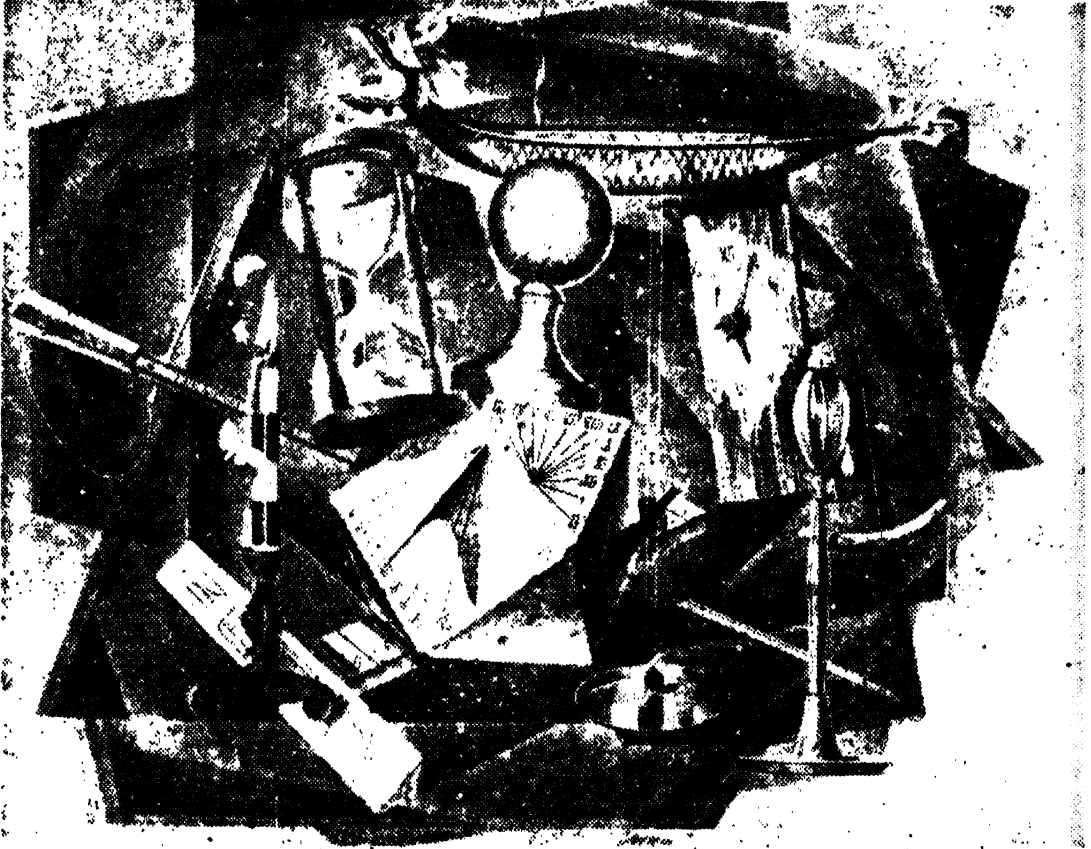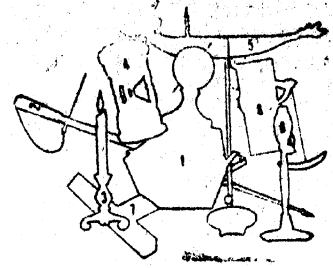
অতীতের কয়েকটি সময় নির্দেশক ব্যবস্থা

১। প্রাচীন রোমান সূর্যঘড়ি

২। ভারতীয় সময়-নির্দেশক লাঠি। এই লাঠির মাথায় আছে একটি ফুটো, ফুটোর মধ্যে ঢোকানো আছে একটি ছোট পেরেক—লাঠির সমকোণে। লাঠির প্রান্তে লাগানো দড়ির সাহায্যে লাঠিটি তুলে ধরা হয়। পেরেকের ছায়া পড়ে লাঠির ওপরে, তা থেকেই সময়ের নির্দেশ।

৩। **মোমবাতি ঘড়ি।** গোড়ার দিকে মোমবাতিতে পর পর রং-এর ছোপ থাকত। এক-একটি ছোপের মোম পুড়তে সময় লাগত এক ঘন্টা করে।

৪। **বালি ঘড়ি**

৫। **চীনা ড্রাগন অগ্নি ঘড়ি।** একটি ছোট নৌকার আকারের পাত্রে বসানো থাকত কাঠের গুঁড়ো ও পিচ দিয়ে তৈরী একটি রড। রডের ওপর দিয়ে ঝোলানো থাকত সুতো দিয়ে বাঁধা দুটি গোলক। রডের একদিকে আগুন লাগানো হত। নির্দিষ্ট সময়ের পরে আগুন পৌঁছে যেত সুতোর জায়গায়। সুতো পুড়ে যেত। আর গোলক দুটি সশব্দে গিয়ে পড়ত একটি ধাতুর থালার ওপরে।

৬। **তৈল ঘড়ি।** আধারের গায়ে দাগ দেওয়া থাকত। তেল পুড়তে পুড়তে [illegible] নামত। কতটা নিচে নামছে তা থেকেই সময় সম্পর্কে ধারণা।

৭। **মিশরীয় ছায়া ঘড়ি।**

৮। **পেণ্ডুলাম ঘড়ি।**

যদি ৪০০ দিয়ে ভাগ করা চলে তবেই লীপ-ইয়ার, নইলে নয়। ১৬০০ ও ২০০০ সাল দুটি লীপ-ইয়ার, কিন্তু ১৭,১৮০০, ১৯০০ সাল তিনটি নয়।

এই গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডার কিন্তু সংগে সংগে সব দেশে প্রবর্তিত হয়নি। যেমন, রুশদেশে নয়। রুশদেশে প্রবর্তিত হয়েছিল ১৯১৭ সালের অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে। ফলে বিপ্লব-পূর্ব রুশদেশের ঘটনাবলীর তারিখ অনেকের কাছেই এখনো গোলমেলে ঠেকে। যেমন, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিবসটি পালন করা হয় ৭ই নভেম্বর তারিখে। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিবস নভেম্বরে পড়ে কি করে? আসলে বিপ্লবটি যে-সময়ে ঘটেছিল রুশদেশে তখনো সিজারীয় ক্যালেণ্ডার চালু। এই ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী তারিখটি ছিল ২৬এ অক্টোবর ১৯১৭। কিন্তু গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী তারিখটি হওয়া উচিত ৭ই নভেম্বর ১৯১৭। লেনিনের জন্ম সিজারীয় ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ১০ই এপ্রিল ১৮৭০, গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ২২এ এপ্রিল ১৮৭০। রুশদেশের বিপ্লব-পূর্ব ইতিহাসে সাধারণত ঘটনার তারিখ দেওয়া হয়ে থাকে পুরনো স্টাইলে (সিজারীয় ক্যালেণ্ডারে) এবং বন্ধনীর মধ্যে নতুন স্টাইলের (গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডারে) তারিখ উল্লিখিত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডারই চলছে।

যাই হোক, দেখা যাচ্ছে বছরের হিসেব মোটামুটি একটা পদ্ধতি মেনে চলেছিল। কিন্তু মাসের হিসেব? দিনের হিসেব? ঘন্টার হিসেব? এসব ক্ষেত্রে কিন্তু বিজ্ঞান ও কুসংস্কারের অদ্ভুত একটি সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। ব্যাবিলোনিয়ার জ্যোতির্বিদ-পুরোহিতরা আকাশকে বারোটি রাশিতে ভাগ করেছিলেন। সূর্য এক-একটি রাশিতে যতোদিন অবস্থান করে, চাঁদের কলার একটি চক্র (যেমন, অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা, আবার পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা—এই একটি চক্র) সম্পূর্ণ হতেও ততোদিন লাগে। বছরকে ১২টি মাসে ভাগ করার মূলেও এই ঘটনার প্রভাব বড়ো রকমের।

সহজেই অনুমান করা চলে, প্রাচীনদের কাছে '১২' এই সংখ্যাটির মাহাত্ম্য খুবই প্রবল হবার কথা। কেননা আকাশে রাশির সংখ্যা ১২, সারা বছরে সূর্যের পরিক্রমা যে-ক'টি রাশিতে তার সংখ্যা ১২! অতএব দিন ও রাত্রিকে ঘন্টায় ভাগ করতে গিয়ে প্রাচীনরা এই ১২ সংখ্যাটিকেই অবলম্বন করলেন। ১২ ঘন্টার দিন ও ১২ ঘন্টার রাত্রি—দুয়ে মিলিয়ে মোট ২৪ ঘন্টা।

আর ঘন্টা ও মিনিটের বেলায়? এখানেও ব্যাবিলনীয়দের একটি সংস্কার থেকে গিয়েছে। ৬০ সংখ্যাটিকে তাঁরা মনে করতেন অলৌকিক এবং তাঁদের সকল মাপজোখে এই সংখ্যাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে গিয়েছেন। ৬০ সংখ্যাটি অবশ্যই পছন্দ করার মতো, কেননা এই সংখ্যাটিকে অনেকগুলো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা চলে। মাপজোখের মধ্যে এই সংখ্যাটি থাকলে জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা কম। অতএব ঘন্টাকে মিনিটে করার সময়ে এই ৬০ সংখ্যাটিকেই অবলম্বন করা হবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

বছর, মাস, ঘন্টা ও মিনিটের হিসেব নিয়েই আমাদের এবারে এসে দাঁড়াতে হবে একেবারে আধুনিক কালে। আগেই বলেছি, সময়ের হিসেব এখন ক্রমেই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে চলেছে এবং যতোদূর মনে হয়, অনন্তকাল ধরে হয়ে চলবে। তবুও একথা বলতেই হবে, সময়ের পরিমাপ সংক্রান্ত অনেকগুলো খুঁটিনাটি বিষয়ের মীমাংসা হয়েছে একেবারেই সম্প্রতিকালে। যেমন, সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্থানীয় সময়ের মধ্যে একটা সমন্বয় ও শৃঙ্খলা আনতে পারা গিয়েছিল মাত্র বিগত শতাব্দীর শেষ দিকে। ১৮৮৪ সালে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওয়াশিংটনে। এই সম্মেলনেই প্রথম গোটা বিশ্বকে চব্বিশটি সমান এলাকায় ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেকটি এলাকার সময় নির্ধারিত হয় গ্রীনউইচ মধ্যরেখার সময়ের ভিত্তিতে।

আরো একটি বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটল বর্তমান শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে। বিজ্ঞানীরা সময়ের মাপ নেবার আরো সঠিক পদ্ধতি অনুসন্ধান করছিলেন। আরো সঠিক পদ্ধতি কেন বলা হচ্ছে? প্রচলিত পদ্ধতি কি যথেষ্ট সঠিক ছিল না? দৈনন্দিন কাজের পক্ষে অবশ্যই সঠিক ছিল এবং এখনো আছে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা ততোদিনে জেনে গিয়েছেন যে পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তনের বেগ স্থির নয়। পৃথিবী নিজের অক্ষের চারদিকে একটি পাক দেয় ২৪ ঘন্টায়। এই পাক দেওয়ার বেগ যদি স্থির থাকে তাহলেই গ্রীনউইচের সময়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত অন্য সমস্ত এলাকার সময়ের যাথার্থ্য বজায় থাকে, নইলে নয়। বিজ্ঞানীরা তখন প্রবর্তন করলেন এক ধরনের নতুন সময়, নাম 'এফিমেরিস টাইম' (ই, টি)। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর কক্ষ-পরিক্রমার ওপরে নির্ভর করে এই সময়। ১৯৫৫ সাল থেকে ই, টি সেকেণ্ডকে স্ট্যাণ্ডার্ড ধরে নেওয়া হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ও টেকনিকাল প্রয়োজনে যথাযথতার প্রয়োজন যেখানে এক কোটি ভাগের এক ভাগেরও অধিক সেখানে সময়ের মাপ নেওয়া হয় এই ই টি সেকেণ্ডে।

১৯২৮ সালে বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিতে প্রথম নির্মিত হয় কোয়ার্টজ বা শিলাস্ফটিকের ঘড়ি। ব্যাপারটি ঘটে এইভাবে : সঠিক আকারের একটি শিলাস্ফটিকে যদি ঠিক মতো বিদ্যুৎপ্রবাহ সরবরাহ করা হয় তাহলে শিলাস্ফটিকটিতে সুনির্দিষ্ট মাত্রার কম্পন সৃষ্টি হয়ে থাকে—প্রতি সেকেণ্ডে নির্দিষ্ট সংখ্যক। এই কম্পনের সাহায্যে অলটারনেটিং বিদ্যুৎপ্রবাহকে (এ সি) নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে। বৈদ্যুতিক ঘড়ি চলে এই নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যে। পৃথিবীর অক্ষ আবর্তনের বেগ যে স্থিরমাত্রার নয় তা এই কোয়ার্টজ ঘড়ির কাছেই প্রথম ধরা পড়েছিল। স্বীকার করতেই হবে যে কোয়ার্টজ ঘড়ির যথাযথতা খুবই উচ্চমাত্রার। একটি ভালো কোয়ার্টজ ঘড়ির সময়ের নির্দেশে সারা দিনে এক সেকেণ্ডের ৫০,০০০ ভাগের এক ভাগের বেশি হেরফের ঘটে না।

এখানেই শেষ নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ফলে সময়ের মাপে অধিকতর যথাযথতার প্রয়োজন ঘটছে। বিজ্ঞানীরা এবারে তাকালেন অণু ও পরমাণুর দিকে। বিজ্ঞানীদের আসলে প্রয়োজন একটি কম্পনের উৎস। প্রকৃতি-জগতে কম্পনের উৎস হিসেবে অণু ও পরমাণুর চেয়ে নির্ভরযোগ্য আর কিছু নেই। অ্যামোনিয়া গ্যাসকে যদি উচ্চ-কম্পনবিশিষ্ট বেতারতরঙ্গের সাহায্যে উত্তেজিত করা হয় তাহলে অ্যামোনিয়া অণুর পরমাণুগুলোতে একটি অবিশ্বাস্য মাত্রার কম্পন সৃষ্টি হয়ে থাকে—সেকেণ্ডে ২,৮৩৭ বিলিয়ন বার (এক হাজার মিলিয়ন বা ১,০০০,০০০,০০০ বার)। ১৯৫১ সালে বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিতেই এই অ্যামোনিয়া গ্যাসের সাহায্যে একটি মাইক্রোওয়েভ অ্যাম্প্লিফায়ারে স্থিতি আনা হয়েছে এবং এই অ্যাম্প্লিফায়ার থেকে নিঃসরিত সংকেতের সাহায্যে একটি ঘড়ি চালিত হয়েছে।

এখানেও শেষ নয়। সিজিয়াম নামে একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুকে ব্যবহার করে নির্মিত হয়েছে আরো একটি ঘড়ি যাতে ৩০ বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত কম্পাঙ্কের মাপ নির্ধারিত হতে পারে। আর এই ঘড়িতে সময়ের হেরফের ঘটার সম্ভাবনা হাজার বছরে এক সেকেণ্ড মাত্র।

বলা বাহুল্য, এই ঘড়িটিই শেষতম ঘড়ি—এমন কথা কিছুতেই বলা চলে না। কয়েক হাজার বছর আগে মানুষ সময় সম্পর্কে ধারণা করত মাটিতে পোঁতা একটা কাঠির ছায়া দেখে। পেণ্ডুলাম ঘড়ি নির্মিত হয়েছিল ১৬৫৭ সালে। ইংল্যাণ্ডে সর্বসাধারণের সময় দেখার জন্যে প্রকাশ্য স্থানে ঘড়ি রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল প্রথম ১২৮৮ সালে। তারপরেও আরো প্রায় দুশো বছর ঘড়ি থাকত শুধু গির্জায়। শুধু ঘড়ির দিকে তাকালেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হয়—কত অল্প সময়ের মধ্যে কোথা থেকে শুরু করে কোথায় এসে আমরা দাঁড়িয়েছি! আর কোথায় যাব তা কল্পনাও করা চলে না।

—অমলকান্ত

চতুর্থ পর্ব

চিত্রলেখার ঘর থেকে এসেই বিছানায় শুয়ে পড়লাম কিন্তু কিছুতেই ঘুমুতে পারলাম না। চুপ করে শুয়ে আছি ঠিকই অথচ ভিতরে ভিতরে দারুণ উত্তেজনাবোধ করছি।

আমার প্রশ্নের জবাব ও দেয়নি। দিতে পারেনি। হাজার হোক মেয়ে। বাঙালী মেয়ে। লজ্জা পেয়েছে নিশ্চয়ই। তাছাড়া সংকোচবোধ করাও স্বাভাবিক। আমার হয়ত অমন করে হঠাৎ ও-কথা বলাও ঠিক হয়নি। আমি কেন বললাম, তা জানি না। ও-কথা বলতে আমি ওর ঘরে, ওর কাছে যাইনি। ভাবিনি এত বড় কঠিন কথা এত সহজভাবে ওকে বলতে পারব। মানসীর সঙ্গে ছোটবেলা থেকে মিশেছি। খেলা করেছি, গল্প করেছি, মারামারি করেছি। আস্তে আস্তে আমরা দুজনে বড় হয়েছি কিন্তু তবুও দুজনে দুজনকে দূরে রাখতে পারিনি। কেউই পারতাম না। কোনদিনই না। ও যখন কলেজে পড়ে, মেডিক্যাল কলেজে পড়ে তখনও না। ওর সঙ্গে সব রকম কথা বলেছি। শুনেছি। কেউই লজ্জা পেতাম না।

পরে আর কারুর সঙ্গে অমন করে মিশতে পারিনি। চাইনি। বুলার সঙ্গে মিশেছি, গল্প করেছি, ঘুরে বেড়িয়েছি। ভাল লেগেছে কিন্তু দুর্বলতা বোধ করিনি। বুলা এলে ভাল লাগত, বুলার কাছে গেলেও ভাল লাগত। ভাল লাগত ওর হাসিঠাট্টা-কথাবার্তা। ওর সান্নিধ্যেই আমার ক্ষত-বিক্ষত আহত মন সুস্থ হয়। স্বাভাবিক হয়। ওকে ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়েছে। বিচ্ছেদ-বেদনার তীব্র জ্বালা অনুভব করেছি কিন্তু ওকে নিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিনি। বুলা আমাকে নিয়ে কোন স্বপ্ন দেখেনি তো?

জানি না।

এখানে এসে চিত্রলেখাকে দেখে, ওর সেবা-যত্নে মুগ্ধ হয়ে বুলার প্রতি কোন অন্যায় করছি না তো? আমি বুঝতে পারছি না। বুলা কোন প্রত্যাশা নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে কি?

আমি চলে আসার পর ওর মন নিশ্চয়ই কিছুদিন খারাপ ছিল। খুবই স্বাভাবিক। ওর চিঠিতে আমি তার স্পষ্ট আভাস পেয়েছি। আস্তে আস্তে ওর চিঠির সুর পাল্টেছে।...জানেন সাগরবাবু, আমার মনে হয় আমাদের এই মিষ্টিমধুর সম্পর্ক চিরস্থায়ী হবে। যেভাবে আমরা মেলামেশা করেছি তাতে অনেক কিছু হবারই সম্ভাবনা ছিল। সুযোগ ছিল। মাঝে মাঝে মনে হয়, হয়ত কিছু হওয়াই উচিত ছিল। কারণ ছিল। বোধহয় দু' পক্ষেরই। সে-স্মৃতি মধুর হতো নাকি তিক্ত হতো, বলতে পারব না। সম্ভব নয়। তবে আজ মনে হয় ভালই হয়েছে। এমন অম্লান হৃদ্যতার স্মৃতি সারাজীবন উপভোগ করব। আপনিও করবেন। তাই না?

মানসী আমার জীবনে ধ্রুবতারা হয়ে রইবে চিরদিন। চিরকাল। কিন্তু বুলাকেও ভুলব না। কোনদিনই না। প্রথম প্রথম যখন জ্বর হচ্ছিল তখন ওর কথা খুব মনে হতো। মনে হতো মিসেস রায়ের কথা। তখন তো চিত্রলেখাকে কাছে পাইনি। পরমানন্দের কাছে মাঝে মাঝে ওর ডাক্তারদিদির কথা শুনেছি তবে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে শুনিনি। শুনতে চাইনি। পারিনি। আমার সঙ্গে আলাপ হয়নি। দেখাও হয়নি। মুখোমুখি দেখা হয়নি। দূরে থেকে কয়েকদিন দেখেছি। তাও সন্ধ্যার পর। আবছা আলোয়, আবছা অন্ধকারে ওকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখেছি। ভালভাবে দেখতে পারিনি। তখন ভাবতে পারিনি, কল্পনা করতে পারিনি ওকে এত কাছে পাব।

প্রথম যখন জ্বর হলো তখন গ্রাহ্য করিনি। যথারীতি খাওয়া-দাওয়া কাজকর্ম করেছি। পরমানন্দ বারণ করেছিল; শুনিনি। ডাক্তার দেখাতে বলেছিল। রাজী হইনি। পরে যখন ও চিত্রলেখাকে ডাকল তখন আর আমার মতামত দেবার অবস্থা নেই। জ্বরে বেহুঁস। কোন চৈতন্য নেই। অনেক রাতে জ্বর একটু কমলে বিছানার পাশে একজন মেয়ে ডাক্তারকে দেখে হঠাৎ ভেবেছিলাম মানসী! মানসী যে বহুকাল আগেই সমস্ত হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে পাড়ি দিয়েছে, তা তখন খেয়াল হয়নি। মনে আসেনি। আমি নিশ্চয়ই ওকে মানসী বলে ডেকেছি, হুকুম করেছি, বকাবকি করেছি। হয়ত আরো কিছু।

অসুখ হলে আমার ভীষণ ভয় করে। ছোটবেলা থেকেই। কেন জানি না। অসুখ করলে একা থাকতে পারি না। আগে আগে অসুখ করলে মাগোকে আমার কাছে আটকে রাখতাম। কোন কাজকর্ম করতে দিতাম না। রান্না-বান্নার জন্য মাগোকে উঠতেই হতো। তখন মামা এসে বসতেন আমার কাছে। মামা অফিস যাবার পর মাগোকে আমার কাছ থেকে উঠতে হলে মানসীকে ডিউটি দিতে হতো। একটু বেশী জ্বর-টর হলে তো মামার অফিস যাওয়া, মানসীর স্কুল-কলেজ যাওয়া বন্ধ হতো। এবার দেখলাম আমার সে-অভ্যাস এখনও বদলায়নি। সারাদিন পরমানন্দকে কাছে রাখতাম। ঘরের বাইরে যেতে দিতাম না বল্লেই চলে। পরমানন্দও আমাকে একলা রেখে কোথাও যেত না। চিত্রলেখাকেও তাই। সকালে উঠেই ওকে হাসপাতালে যেতে হতো। যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হতো কিন্তু আমার জন্য ওর রাত্রে বিশ্রাম জুটত না। কত রাত্রে, কখন যে খাওয়া-দাওয়া করত, তাও জানি না। তখন আমি ওসব জানতে চাইতাম না। ওর সুখ-দুঃখের চাইতে আমার প্রয়োজনটাই তখন বড় মনে হতো।

প্রথম দিন রাত্রের কথা মনে নেই। পরের দিন সন্ধ্যায় চিত্রলেখাকে আমার জন্য অত ঝামেলা সহ্য করতে দেখে ভীষণ লজ্জিত হলাম। এক হাতে সেবা-যত্ন ও চিকিৎসা করা সহজ নয়। পরমানন্দ যাবার পরই ও ঘরদোর গুছিয়ে, আমার বিছানা পরিষ্কার করে আমার টেম্পারেচার দেখল, স্টেথিসস্কোপ দিয়ে বুক-পিঠ পরীক্ষা করল, পেট টিপল, জিভ দেখল, পায়ের গাঁটের জয়েন্টগুলো টিপল। আরো কত কি! আমাকে ওষুধ খাওয়ালো। আমি এতক্ষণ কোন কথা বলিনি। চুপ করে ওর কথা শুনেছি। এবার একটু বিশ্রাম করবার জন্য চিত্রলেখা পাশের চেয়ারে বসল। আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না।

'আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।'
'কেন?' চিত্রলেখা সত্যি অবাক হয়ে জানতে চাইল।

'আমার জন্য আপনাকে কত কষ্ট করতে হচ্ছে অথচ......'

'ওসব কথা এখন থাক।'
'আপনাকে কষ্ট দেবার কোন অধিকার আমার নেই কিন্তু......'

এবারও ও আমার কথা শেষ করতে দিল না, ডাক্তারের কর্তব্য আমি করেছি। রোগী হিসেবে এটুকু আপনার ন্যায্য প্রাপ্য।

রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও আমি হাসলাম। আপন মনে আবৃত্তি করলাম, আমার প্রাপ্য!

'নিশ্চয়ই।'

আবার হাসলাম। একটু চুপ করে রইলাম।

'আচ্ছা কাল রাত্রে আমি খুব চেঁচা-মিচি-বকাবকি করেছি, তাই না?'

'কি করে জানলেন?'

'অসুখ হলেই আমি সবাইকে জ্বালাতন করি।'

'সব ডাক্তার-নার্সকেই এসব জ্বালাতন সহ্য করতে হয়।'

আমি কচি বাচ্চা নই। আমি জানতাম, আমার জন্য কোন ডাক্তারই এমন জ্বালাতন সহ্য করবে না। করতে পারে না। কেন করবে? তার কি গরজ? রোগীর চিকিৎসা করা এক কথা আর তার দেখাশুনা সেবা-যত্নের ভার নেওয়া অন্য কথা। তাছাড়া চিত্রলেখা যে দরদ দিয়ে, আন্তরিকতার সঙ্গে, মনে-প্রাণে আমার চিকিৎসা আর সেবা-যত্ন করেছে তার তুলনা হয় না। আমি মাঝে মাঝেই অবাক হয়ে ভেবেছি ও এমন করে কেন আমাকে দেখেছে, আমার সেবা করছে। উত্তর পাইনি। তবে ওকে দেখে, দিনের পর দিন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে, সন্দেহ হয়েছে কোথায় যেন ও আঘাত পেয়েছে। দারুণ আঘাত পেয়েছে। কেউ যেন ওর স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে।

চিত্রলেখার বয়স বেশী নয়। আমার চাইতে একটু ছোটই হবে। টল টল করছে ওর যৌবন। সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন মধু ঝরছে। মৃগনাভী হরিণীর মত ও তো এখন পাগল হয়ে ছুটবে। মাতাল হয়ে ঘুরবে। ওর গন্ধ, স্পর্শ, চাঞ্চল্যে আর সবাই মদির হয়ে উঠবে। কিন্তু চিত্রলেখা কেমন যেন নির্লিপ্ত। উদাস! নির্বিকার! আমি অবাক হয়েছি, বহুদিন অবাক হয়েছি ওর নির্বিকার, নির্লিপ্তভাব দেখে।

একবার নয়, দু বার নয়, এক-দু দিন নয়, দিনের পর দিন ওকে আমি ঘনিষ্ঠ-ভাবে, নিবিড় ভাবে পেয়েছি। নানা সময়ে পেয়েছি। গোধূলির মিষ্টি আলোয়, রাতের অন্ধকারে। দারুণ বর্ষার দিনে, ঝড়ের রাতে। কখনো ঘুমের মধ্যে, কখনো তন্দ্রায়; জেগে জেগেও ওর মৃগনাভীর সঙ্গ পেয়েছি। দুর্বল শরীরেও চাঞ্চল্য বোধ করেছি।

'ডাক্তার!'

'বলুন।'

'মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।'

'মাথা টিপে দেব?'

'আপনার কষ্ট হবে না?'

ডাক্তার কেমন একটু হাসল। আপন মনে, ঠোঁটটা একটু বেঁকিয়ে। 'কষ্ট পাব বলেই তো এসেছি।'

আমি ওর হাসি, ওর কথার অর্থ বুঝতে পারিনি। তখন শরীর বা মন, কোনটাই তা চায়নি। আমি চুপ করে গেছি। চোখ বুজে শুয়ে থেকেছি। চিত্র-লেখা চেয়ারটাকে আমার চৌকির পাশে টেনে নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আমার কপালে। মাথায়। বেশ লাগত। মাথার যন্ত্রণা কমত কিনা জানি না; তবে মনের যন্ত্রণা, অপরিতৃপ্ত মনের ব্যথা নিশ্চয়ই কমত।

কোন কোন দিন সন্ধ্যার পর ঘুমিয়ে পড়েছি। অঘোরে ঘুমিয়েছি। খিদে পেলেও ঘুম ভাঙেনি। চিত্রলেখা ঘুম থেকে তুলেছে।

'সাগরবাবু! সাগরবাবু!'

ঘুমের মধ্যেই একবার চোখ মেলেছি। দেখেছি ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ডাকছে, সাগরবাবু, উঠুন।

আমি তবুও উঠিনি। এবার ওর ডাকাডাকিতে চোখ মেলে দেখেছি চিত্র-লেখা আমার পাশে বসে গায় হাত দিচ্ছে। ঘুমের ঘোরে ওর কোলে হাত রেখেছি, হাতে হাত রেখেছি। বলেছি, আজ আর কিছু খাব না।

'না, না, তাই কি হয়?'

'সত্যি খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'ইচ্ছা না করলেও একটু খেতে হয়।'

চিত্রলেখা হর্লিক্সের গেলাসটা পাশের টেবিলে রেখে আমাকে তুলেছে। মাথার তলায় হাত দিয়ে আস্তে আস্তে টেনে তুলেছে। আমার মুখের সামনে হর্লিক্সের গেলাস তুলে ধরেছে। 'নিন। আস্তে আস্তে খেয়ে নিন।'

আমি এক চুমুক খেয়েই মাথা কাত করেছি। ওর হাতে, গলার কাছে, বুকের পর। অসুস্থতার মধ্যে, ঘুমের ঘোরেও আমি সম্বিত ফিরে পেয়েছি। নতুন অনুভূতির রসে মনটা ভিজে গেছে কিন্তু চিত্রলেখার কোন পরিবর্তন, কোন চাঞ্চল্য দেখতে পাইনি। কোন দিন পাইনি। মনে হয়েছে ও আমাকে কাছে নিয়েও যেন কত দূরে থাকত। হাতের পাশে থেকেও ও যেন দূরের আকাশে ভেসে বেড়াত। মহাশূন্যে বিচরণ করত।

ডাক্তারকে দেখতে ভারী সুন্দর। মুখটা ভারী মিষ্টি। কমনীয়। ও আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে যখন স্টেথো দিয়ে আমার বুক-পিঠ পরীক্ষা করত, তখন আমি এক দৃষ্টিতে ওকে দেখতাম। রোজ। না দেখে পারতাম না। দেখতে দেখতে মনে তৃপ্তি পেতাম। শান্তি পেতাম। আর? নতুন আশায় মন ভরে যেত।

মানসী চলে গেছে। আর কোনদিন ওকে পাব না। ওর গন্ধ, স্পর্শ আর কোনদিন পাব না। অনেকদিন পাই না কিন্তু চিত্রলেখার গন্ধ-স্পর্শে পুরানো দিনের স্বাদ পাচ্ছি। পেয়েছি।

'কি দেখছেন?' চিত্রলেখা হঠাৎ জানতে চাইল।

'অনেক কিছু।'

'তার মানে?'

'অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত—অনেক কিছুই দেখছি।'

স্টেথো দিয়ে বুক পরীক্ষা করতে করতে আমার দিকে তাকাল। 'কার? আমার না আপনার?

'হয়ত দুজনেরই।'

'আমাকে নিয়ে ভাববেন না।'

'কেন?'

'কেন?' একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো ডাক্তার। একটু থামল। 'আমাকে নিয়ে কেউ ভাবে না। ভাববে না। আমিও ভাবি না।'

এসব কথা আমি বলতাম না। বলতে চাইনি। কিন্তু ডাক্তারকে যত দেখেছি তত বেশী মনে হয়েছে, সন্দেহ হয়েছে, আমার চাইতেও ওর অতীত ইতিহাস দীর্ঘ ও দুঃখের। আমার মনে অনেক ব্যথা, বেদনা। অনেক দুঃখ, অনেক চোখের জল। ডাক্তারের জীবনে যেন আরো কিছু, অনেক কিছু লুকিয়ে আছে, চাপা পড়ে আছে। ওর চোখ দুটো দেখলেই বোঝা যায়।

'একদিন আমিও আমাকে নিয়ে ভাব-তাম না।'

আমার কথায় ডাক্তার হাসল। আপনাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা?

আমি আর ওর কথায় জবাব দিইনি। কি দেব? দেবার কি দরকার? ও যেভাবে আমাকে দেখত, সেবা-যত্ন করত, চিকিৎসা করত তাতে আমি বেশ বুঝতে পারতাম ওর মনটা কত নরম, কত দুঃখের। স্পষ্ট করে বুঝতে পারতাম আমার সেবা করে ও যেন ওর দুঃখের ভার লাঘব করার চেষ্টা করছে। অতীতের কোন ব্যথা-বেদনাকে চাপা দেবার চেষ্টা করছে।

চিত্রলেখা এখানে না থাকলে আমার কি হতো, জানি না। একা পরমানন্দ নিশ্চয়ই সামলাতে পারত না। যারা যেতাম না ঠিকই কিন্তু হাসপাতালের জেনারেল

ওয়ার্ডে পড়ে থাকতে হতো দু' সপ্তাহ। না, না, ওসব ভাবার দরকার নেই।

*

পিঠে দুটো বালিশ দিয়ে বসে আছি। ভাবছি। ওর ঘর থেকে ফেরার পর থেকেই ভাবছি। ঘুম আসছে না। ঘরে আলো জ্বলছে। বাইরে বেশ অন্ধকার। বেশ রাত হয়েছে। বোধহয় সাড়ে এগারটা-বারোটা। হঠাৎ টেবিলের পর নজর পড়ল। ফ্লাস্কটা রয়েছে। পরমানন্দ যেভাবে রেখে গেছে ঠিক সেই ভাবেই রয়েছে। ঘুমুতে যাবার আগে ঐ ফ্লাস্কের দুধ খাবার কথা। রোজ। দুধ খাবার দশ-পনেরো মিনিট পরে একটা ট্যাবলেট খেতে হয়। কিন্তু প্রায়ই ভুলে যাই। ভাবি, ঘুমুবার আগে দুধ আর ট্যাবলেট খেয়ে নেব। হয় না। ঠিক ঘুম আসার সময় ভুলে যাই। ঘুমিয়ে পড়ি। চিত্রলেখা এসব জানে। ও নিজে দুধ আর ট্যাবলেট খাইয়ে শুইয়ে দিয়েছে বেশ কয়েক দিন। আজও দুধ খেতে ইচ্ছা করছে না। ভাল লাগছে না। নিজের জন্য বেশী ঝুট-ঝামেলা ভাল লাগে না। সারা মাস পরিশ্রম করে রোজগার করা সম্ভব কিন্তু নিজের জন্য এক কাপ চা তৈরী করতে বা এক মুঠো ভাত ফুটিয়ে নিতে বড় বিরক্ত লাগে।

খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিলাম। অসুখের সময় দু' সপ্তাহ এই দরজা সারা রাত খোলা থাকত। চিত্রলেখা অনেক রাত পর্যন্ত আমার এখানে থাকত। একদিন কি দুদিন সারা রাত থেকেছে। চিত্রলেখা যাবার পর চৌকিদার চেয়ার নিয়ে দরজার গোড়ায় থাকত। এখন আবার দরজা বন্ধ করে শুতে হয়।

'কে?' মনে হলো কে যেন উঁকি দিল।

'আমি, চৌকিদার।' বোধহয় সার্কিট হাউসের দিকে যেতে যেতেই উত্তর দিল।

বোধহয় ঘরে আলো জ্বলছে বলে দেখে গেল। দেখে গেল আমি ঘুমিয়ে পড়েছি কিনা। ওর উৎকণ্ঠা, চিন্তা দেখে হাসি পেল। কই ডেরাডুনে এফ আর আই-এর গেস্ট হাউসে তো কেউ এমন করে দেখে যায়নি। কত রাত কাজ করতে করতে আলো জ্বালিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছি কিন্তু চৌকিদার আমার খবর নিতে আসেনি। আমি অসুস্থ হবার আগেও এই বুড়ো চৌকিদার এমনি করে আমাকে দেখত। বেশী রাত পর্যন্ত কাজ করতে দেখলে বারণ করত। আজ তো কিছু বলল না?

চিত্রলেখা? এত রাত্রে? চৌকিদারের কাছে খবর পেয়েই এলো?

আমি কিছু ভাবনা-চিন্তার অবকাশ পেলাম না। ও প্রায় ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে ফ্লাস্কের দুধ একটা কাচের গেলাসে ঢেলে আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, খেয়ে নিন।

আমি একবার ওর দিকে তাকাবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। কিছু না বলে দুধের গেলাসে চুমুক দিলাম। দুধ খাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জলের গেলাস হাতে তুলে দিল। দুধের গেলাসটা টেবিলে রেখে ট্যাবলেটটা তুলে নিল।

'ট্যাবলেটটা খেয়ে নিন।'

নিলাম। কিছু না বলেই খেয়ে নিলাম। ও জলের গেলাসটা টেবিলের 'পর রাখতে রাখতে বলল, শুয়ে পড়ুন। আলো অফ করব।

'আপনি যান। আমি একটু পরে শোব।'

'আর পরে নয়, এক্ষুনি শুয়ে পড়ুন। অনেক রাত হয়েছে।'

'অনেক রাত হয়েছে বলেই কি ঘুম আসে?' একটু থেমেই আবার বললাম, এত রাত হলো অথচ আপনার তো ঘুম আসেনি?

ওর মুখের দিকে তাকিয়েই কথাগুলো বললাম।

'চৌকিদার হয়ত কিছু ভাবছে। আমি যাই।'

ডাক্তার টেবিল লাইটের সুইচটা অফ করে দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অন্ধকার ঘরে শুয়ে রইলাম। ঘুম এলো না। ডাক্তার কি ঘুমুচ্ছে? একবার দেখতে পারলে হতো! ওকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছা করছে। একবার যাব? ঘুরে আসব ওর ঘর? যদি চৌকিদার দেখতে পায়? জানতে পারে? তাহলে তো সর্বনাশ! মহা কেলেঙ্কারী হবে। সকালে আর কারুর কাছে মুখ দেখান যাবে না। চিত্রলেখাও মুখ দেখাতে পারবে না।

না, না, তা হয় না। আমার একটা মর্যাদা আছে। সুনাম আছে। সবাই আমাকে ভাল মনে করে। ভাল বলেই জানে। সামান্য একটু ভাবাবেগের জন্য এই সুনাম, এই মর্যাদা নষ্ট করা উচিত? নাকি সম্ভব?

অসম্ভব। কল্পনাতীত।

কিন্তু ওকে দেখতে যে বড় বেশী ইচ্ছা করছে। দারুণ ইচ্ছা করছে। ছুটে যেতে ইচ্ছা করছে। এক মুহূর্ত দেরী সহ্য হচ্ছে না। আচ্ছা চৌকিদার শুয়ে পড়েনি তো? ও তো মাঝরাতের পরেই সার্কিট হাউসের বড় ড্রইংরুমের দরজার ধারে বিছানা করে শুয়ে পড়ে। ঘুমোয়। রোজই ঘুমোয়। আমার অসুখের সময় আমার কটেজের দরজায় থাকত। ঘুমিয়ে থাকত। তবে মাঝে মাঝেই উঠত। আমাকে দেখত। জিজ্ঞাসা করত কিছু দরকার আছে কিনা। ওটা অভ্যাস। চৌকিদারী করার অভ্যাস। দরকার মত ঘুমুতে পারে, উঠতে পারে। এখন ঘুমুচ্ছে কি?

উঠতে গিয়েও পারলাম না। একবার নয়, অনেকবার। কিছুতেই পারলাম না। চিত্রলেখার জন্যই পারলাম না। আমার ঢেংকানলের কাজ শেষ হয়েছে। এবার আমার যাবার পালা। আমি চলে যাবার পর লোকে নিন্দা করলে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ওকে তো এখানে থাকতে হবে! চাকরি করতে হবে! আমি এমন কিছু করতে পারি না যার জন্য ওর কোন ক্ষতি হয়।

উঠলাম না। শুয়েই রইলাম। চুপ করে শুয়ে রইলাম। ঢেংকানল ছাড়তে হবে। এবার কিছুদিন কটকে কাজ করতে হবে। তারপর ভুবনেশ্বরে। ঢেংকানল ছাড়তে, ডাক্তারকে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। মানসী যেন নতুন করে আমার কাছে এসেছে। ধরা দিয়েছে। ও যেন কটি বছর লুকিয়ে ছিল। আমাকে পরীক্ষা করছিল। আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। ও খুশী হয়েছে। আমার তীব্র ভালবাসার টানে আবার আমার কাছে এসেছে। ও যদি আবার লুকিয়ে পড়ে তাহলে বোধহয় আমি পাগল হয়ে যাব। এই এত বড় পৃথিবীতে আব একলা একলা থাকা সম্ভব নয়। একলা একলা সব দুঃখ সহ্য করলাম, করছি কিন্তু আনন্দের অংশীদার হবার সৌভাগ্য হলো না। হচ্ছে না।

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েই মনে হলো রাত ফুরিয়ে আসছে। আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। উঠে পড়লাম। ঘড়িটা দেখলাম। পাঁচটা বাজে। আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। উঠে পড়লাম। ঘড়িটা দেখলাম। পাঁচটা বাজে। চৌকিদার নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে। এখন আমি উঠতে পারি। এখনও অন্ধকার আছে ঠিকই তবে অন্ধকারও ফিকে হয়ে এসেছে। এখন কেউ আমাকে দেখলেও কিছু ভাবতে, সন্দেহ করতে পারবে না। মনে করবে ঘুম থেকে উঠে পড়েছি।

সামনের দিক থেকে দরজাটা বন্ধ করে সার্কিট হাউসের দিকে এগুলাম। বারান্দায় উঠেই দেখলাম চৌকিদার মোটা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম।

বেশী দূরে এগুতে হলো না। চৌকিদারকে পিছনে ফেলে কয়েক পা যাবার পরই দেখি ডাক্তার! ও সন্ধ্যাবেলায় এই বেতের চেয়ারে বসে থাকে জানি, কিন্তু এখন?

'এলেন?' খুব মিষ্টি শান্ত গলায় ডাক্তার প্রশ্ন করল।

'হাঁ।'

'এই শরীর নিয়ে সারারাত জেগে রইলেন?'

আমি জবাব না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ডাক্তার আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আসুন, ঘরে আসুন।

আমি ওকে অনুসরণ করে ঘরে গেলাম। বসলাম। দুটো বালিশে কনুইয়ের ভর রেখে ওর বিছানায় বসলাম। ডাক্তার সামনের চেয়ারে বসল। মুখ নীচু করে বসল।

'সারা রাত বারান্দায় ছিলেন?'

'না।'

'এত ভোরে বারান্দায় গেলেন?'

'জানতাম আপনি আসবেন।'

'জানতেন?'

'হ্যাঁ?'

'আর কি জানেন?'

ও জবাব না দিয়ে কি যেন ভাবছিল। ভাবল। অনেকক্ষণ ধরে।

'কি ভাবছেন?'

'ভাবছি আপনার কথা।'

'আমার কথা?'

'হ্যাঁ?'

'আমার কথা কি ভাবছেন?'

'ভাবছি না জেনে-শুনে আপনার কি ক্ষতি করলাম।'

'ক্ষতি?'

'ক্ষতি বৈকি!'

আমি হাসলাম।

'হাসবেন না সাগরবাবু। সত্যিই ক্ষতি করলাম কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি ক্ষতি করতে চাইনি......

কথাগুলো শেষ হলো না। শেষ করতে পারল না। গলার স্বরটা বন্ধ হয়ে এলো।

'না, না, আপনি ক্ষতি করবেন কেন?'

'ক্ষতি করেছি নিশ্চয়ই। তা না হলে আপনার চোখের ঘুম কেড়ে নিল কে?'

'সে অপরাধে তো আমিও অপরাধী।'

বাইরের আকাশ একটু একটু ফর্সা হচ্ছে। ঘরের মধ্যে এখনও বেশ আবছা অন্ধকার। তবুও আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম ডাক্তার কাঁদছে। চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। আমি আর বসে থাকতে পারলাম না। উঠে গেলাম ওর কাছে। আস্তে আস্তে ওর মাথার হাত দিতে দিতে বললাম, কাঁদছেন কেন? কাঁদবেন না।

ওর চোখের জল বন্ধ হলো না। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, আমি যে পরিত্যক্ত। আমি যে একজনকে নিয়ে ঘর করেছি। আমি তো আর......

আর পারল না। আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল। আমিও আর পারলাম না। দু' হাত দিয়ে ওকে টেনে নিলাম। বুকের মধ্যে টেনে নিলাম। 'আপনি তো একজনের দ্বারা পরিত্যক্ত আর আমি যে সবার দ্বারা পরিত্যক্ত!'

'আমিও। আজ আর আমারও কোথাও স্থান নেই।'

'আমার শূন্য জীবন পূর্ণ করেও বলছেন কোথাও স্থান নেই?'

ডাক্তার কোন জবাব দিল না। অনেকক্ষণ।

'চা করব?'

'না।'

'কেন?'

'ইচ্ছা করছে না।'

'কেন?'

'আগে আসল প্রশ্নের জবাব দিন।'

'কোন প্রশ্নের?'

'আমি কি ঢেংকানল ছেড়ে চলে যাব?'

'কেন? আমাকে সহ্য হচ্ছে না?'

'ভীষণ অসহ্য লাগছে।'

দুজনেই . হাসলাম। প্রায় একসংগেই হাসলাম।

'সত্যি চলে যাবেন?' আমার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে ডাক্তার প্রশ্ন করল।

'আজকালের মধ্যে কটকে যাবার কথা কিন্তু ইচ্ছা করছে না।'

'এখান থেকে যাতায়াত করলে চলবে না?'

'চলবে?'

'তাহলে যাবেন কেন?'

'যাব না?'

ডাক্তার আবার মুখ নীচু করল। আমি আলতো করে ওর মুখ তুলে ধরে দেখলাম দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়াতে কামড়াতে কাঁদছে। আমি আমার শেষ প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করলাম, যাব না?

ও শুধু মাথা নেড়ে বল্লো, না।

আমি ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চীৎকার করলাম, ডাক্তার!

'আপনি আমাকে কোনদিন ছেড়ে যাবেন না তো?'

আনন্দে, খুশীতে, উত্তেজনায় হঠাৎ বলে ফেললাম, শেষে কি ছেলেমেয়েদের কাছে বকুনি খাওয়াবে?

লজ্জায় ডাক্তার আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকোবার চেষ্টা করল। পারল না। হঠাৎ এক ঝলক প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়ায় তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

'চা করি?'

'কর।'

[সমাপ্ত]

বীরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

খৃষ্টমাস্ ইভ, ১৯৪২।
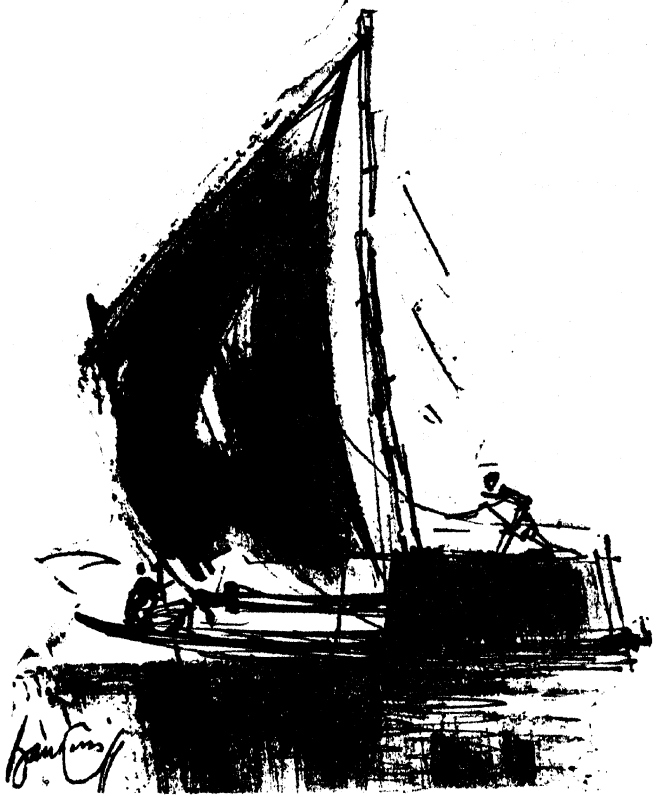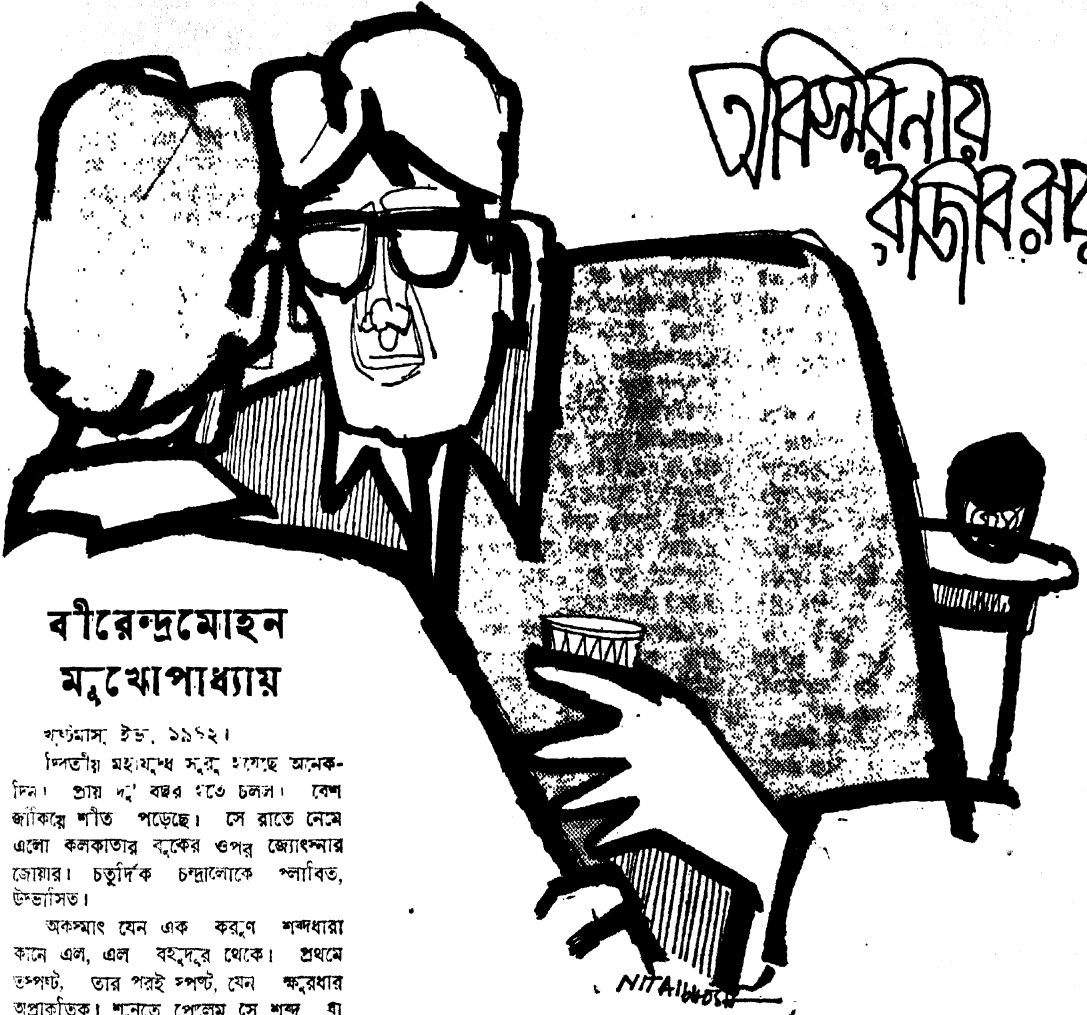
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হয়েছে অনেকদিন। প্রায় দু' বছর হতে চলল। বেশ জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। সে রাতে নেমে এলো কলকাতার বুকের ওপর জ্যোৎস্নার জোয়ার। চতুর্দিক চন্দ্রালোকে প্লাবিত, উদ্ভাসিত।

অকস্মাৎ যেন এক করুণ শব্দধারা কানে এল, এল বহুদূর থেকে। প্রথমে অস্পষ্ট, তার পরই স্পষ্ট, যেন ক্ষুরধার অপ্রাকৃতিক। শুনতে পেলেম সে শব্দ যা থেকে, উৎক্ষিপ্ত হয়ে ধরিত্রীর জ্বলন্ত জঠর থেকে, উৎক্ষিপ্ত হয়েছে চক্রবাল সন্নিহিত গভীর সানুদেশ থেকে, প্রথমে মৃদুস্বরে, তরপর ধীরে ধীরে তার উর্ধ্বগতি—পারা, তারা, মন্দারা ছাড়িয়ে সপ্তগ্রামে গিয়ে পেঁছিল, তীব্র, তীব্রতর, তীব্রতম হয়ে উঠল, ভেঙে পড়ল যেন নিস্তব্ধ, ভয়-ভীষণ জনহীন মহাশ্মশানে অজস্র ডাকিনীর মহাডাকে, মৃত্যুর মহা-আমন্ত্রণে। সে যেন কুহকিনী সমুদ্র-নারীর অপার্থিব, বিরতিহীন, মায়াময় ক্রন্দনধ্বনি, যার সুর একবার নামে, আবার উঠে যায়, আবার নামে, আবার উঠে যায়।

সাইরেন! সাইরেন বাজছে। সাইরেনের কৌতূহলাক্রান্ত শব্দ, অপার্থিব শব্দ, নির্গত হচ্ছে যেন প্রেত-নিলয় থেকে, যে শব্দের মাঝে নিহিত হয়ে আছে ভয়াবহ অর্থ, অনিবার্য মৃত্যুর রহস্যময়তা, অনিবার ধ্বংসের মহাবারতা। উৎকণ্ঠিত হয়ে শুনলেম কয়েক মুহূর্ত। তারপরই সে শব্দ বিলুপ্ত হয়ে গেল স্তব্ধ-পারাবারে।

জাপানী বোমা পড়ল। জাপানী বোমারুরা কলকাতার আকাশে হানা দিয়েছে। বোমা পড়ল লালবাজার ষ্ট্রীটে, বোমা পড়ল ওয়েস্টন ষ্ট্রীটে—বন্দুকগলির আশে পাশে, বজবজের ধারে ধারে। সবগুলোই মানুষ-মারা বোমা। কোথায় আগুন জ্বলে উঠলো, কোথায় ছাপাখানা জ্বলে গেল, সর্বত্রই আতঙ্ক। তবু দেখলেম, মানুষ কি করে বিপর্যয়ের রাত্রে সব মেনে নিয়েও বে-পরোয়া হয়ে যায়।

যখন সে জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাত্রে ঘটনাস্থলে পেঁাছেচি, তখন দেখি চারিধারে বিভীষিকার চিহ্ন—সর্বত্রই ভয়ার্ত মানুষের দলে দলে অনুসন্ধান। কি হয়েছে? কত লোক মরেছে? কত ধ্বংস হয়েছে? নানা প্রশ্ন।

সেই সঙ্গেই সবার অলক্ষ্যে, নিঃশব্দে, অতি সন্তর্পণে সুরু হয়ে গেছে আর এক মারাত্মক আক্রমণ। কলকাতার হাটে-বাজারে জাল-ভারতীয় নোটে ছেয়ে গেল। ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। মানুষ-মারার থেকে এটা আরও সাংঘাতিক, আরও ভয়ঙ্কর। এটা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় অতর্কিত আক্রমণ। এটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে, অর্থনৈতিক সামঞ্জস্যকে পঙ্গু করে দেয়। এতে দেশবাসীরা আস্থা হারায় সরকারের ছাপা কারেন্সী নোটের ওপর। কোনটা তারা নেবে? বিদেশীর ছাপা জাল নোট, না, সরকারের ছাপা নোট? বিভ্রান্তির সৃষ্টি করল জনসাধারণের মনে—কিন্তু উপায় কি?

কি করে ধরা পড়ল জাপানী জাল সেটাই আমার বলা প্রয়োজন। এক দিন এক ঝাঁক একশ টাকার আর দশ টাকার নোট কারেন্সীতে পৌঁছল। আসল নোট আর জাল নোটে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু নম্বরে। একই নম্বর বারে বারে বিভিন্ন নোটের উপর ছাপা রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠল এ অদ্ভুত জাল-নোটের সৃষ্টি হোল কি করে? নোট কোথা থেকে এল? কেমন করে এল? কে ছাপালে? ইত্যাদি আশু তদন্তের হোল প্রয়োজন এবং সেই তদন্তের ভার শেষ পর্যন্ত আমারই বরাতে জুটল।

আমার তদন্তের কি ফলাফল হোল, কেমনভাবে তদন্ত করলেম এবং তার শেষ কোথায় হোল, সে সব আমার আখ্যান বস্তু নয়। উদ্দেশ্য আমার, যাঁর সাহায্যে তদন্ত

জানিয়েছিলাম, তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের ব্যর্থ আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা, উত্থান-পতনের বিচিত্র ইতিহাসের বর্ণাকিঞ্চিৎ পাঠকের কাছে তুলে ধরা। তাঁকেই আমি আমার চলার পথে পেয়েছিলেম শিক্ষকভাবে। বহুদিন হোল তিনি এ পৃথিবীর আলো-বাতাসের সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, জীবনের সব কিছু হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দিয়ে বহুদিন হোল চলে গেছেন। কিন্তু তবু তাঁকে ভুলতে পারিনি। আজও তিনি আমার মনের কোনে, অলস মুহূর্তে সহসা জেগে ওঠেন, বিস্মৃতির চিরান্ধকার ঠেলে দিয়ে। আজও যেন শুনতে পাই তাঁর ভারী গলায় মিনতিভরা শেষ প্রশ্ন, "বল ভাই, আজ যে অঙ্গীকার করলে তা রাখবে তো?"

নাম ছিল রাজীব রায়। এ নামে কারোর সঙ্গে পরিচয় ছিল না। জানতাম না —চিনতাম না তাঁকে। একদিন গোয়েন্দা বিভাগের এক প্রাচীন ঝানু সহ-আরক্ষাধ্যক্ষ আমাকে বললেন, "দেখ, সত্যি যদি এই নোট-জালের কিনারা করতে চাও, তবে যাও রাজীব রায়ের কাছে। আমি চিঠি দিচ্ছি। সেই চিঠি নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করো। তিনি সাহায্য করবেন যথাসাধ্য। এই আমার অনুমান। তিনি এখন একেবারে জীবন পালটেছেন—এখন আর সেই আগেকার দিনের মত, ভয়ঙ্কর জালিয়াৎ নন।"

প্রথমেই খট্‌কা লাগলো। জালিয়াৎ? জালিয়াৎ কি সাহায্য করবে? আর কেনই বা তাঁর সাহায্য নেবো? এতো অসঙ্গত কার্যপ্রণালী? এ তো বিধিবহির্ভূত ব্যবস্থা? আমার মনের কথা যেন বহুদূর থেকে তিনি বুঝতে পারলেন। ধীরে ধীরে অধর-প্রান্ত থেকে সিগারেট নামিয়ে বললেন, "মাষ্টার! বুঝতে পারছো না। আগে তোমায় জানতে হবে নোট জালিয়াতী কি? যেতে হবে বিশেষজ্ঞের কাছে, তাঁর পরামর্শ নিতে হবে। সরকারের ভাণ্ডারে এমন একজনও নেই যিনি তোমাকে এ বিষয়ে দক্ষ পরামর্শ দিতে পারেন। যদি সত্যি কেউ এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ থাকে তাহলে সে এক-মাত্র রাজীব রায়।"

গেলাম রাজীব রায়ের কাছে। মধ্য কলকাতায় এক বিখ্যাত ছাপাখানার তিনি ফটো-লিথো ডিপার্টমেন্টের কর্ণধার। পরিচয় দিলেন নিজের। পরিচয়-পত্রও দিলাম। তাঁর কাছে আসার কারণও জানালাম এবং দেখালাম আসল এবং নকল দশ ও একশ টাকার নোট, যা বাজারে ছেয়ে গেছে।

রাজীব রায় প্রথমে কোন মন্তব্য করলেন না। ধীরে ধীরে চুরুটে টান দিতে দিতে, একদৃষ্টে, একমনে সেই নোটের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। বহুক্ষণ অতিবাহিত হয়ে গেল। আমি চুপচাপ বসেই আছি। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "বলুন কি জানতে চান?"

প্রশ্ন করলাম,—এটা কি ধরণের জাল নোট? কি পদ্ধতিতেই বা ছাপা হয়েছে? আসল-আর নকলের তফাৎই বা কোথায়?

এগিয়ে আসুন কাছে। দেখুন। প্রথমতঃ এটা হাতে তৈরী নয়। দ্বিতীয়তঃ এটা লিথোগ্রাফিও নয়, অর্থাৎ প্রস্তরাঙ্কন থেকে কাগজেও ছাপা নয়, যাতে হাত দিয়ে রং চড়ানো হয় আর বাদবাকীটা লিথোগ্রাফীর পদ্ধতি অনুসারে হয়। তা যদি হোত তবে নকল নোটের মুদ্রাঙ্কন নির্জীব হয়ে যেতো। স্পষ্টতার কোন চিহ্নই থাকতো না। একের পর এক যখন নোট ছাপা হোত তখন সে অস্পষ্টতা হোতো আরও দুরবস্থা। তৃতীয়তঃ এটা ফটো-লিথোগ্রাফিও নয়, যেখানে এক আসল নোটের আলোকচিত্র লিথোগ্রাফের পাথর ফলকে স্থানান্তরিত করা হয়। তার আলোকচিত্রের একটা অঙ্কন কাগজে প্রক্ষিপ্ত করা হয়। লিথোগ্রাফীর মধ্যে যে অন্তর্নিহিত ত্রুটি থাকে, সেগুলো এ পদ্ধতিতেও থেকে যায়, একেবারে মিলিয়ে যায় না। তবে কি এটা ফটো রিলিফ ব্লক প্রণালীতে হয়েছে? তাও নয়? যখন বিরাট সংখ্যায় জাল নোট তৈরী করার প্রয়োজন হয় তখন সব সময়ে এ পদ্ধতি কার্যকরী হয় না। তবে আমার মনে হয় এ নোট তৈরী হয়েছে ফটো এচিং এবং ফটো এনগ্রেভিং প্রসেস-এ। এই পদ্ধতি অনুসারে তাম্রপত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটাই সব থেকে সুবিধাজনক পদ্ধতি, যার দ্বারা মুদ্রাঙ্কন কালি আর রং-এর সাহায্যে নোটের ছাপ তৈরী করা যায়।

যাক্! আপনি অত শত এক নিঃশ্বাসে বুঝে ফেলার চেষ্টা করবেন না—আর করলেও কিছুই হদিশ পাবেন না। শুধু এইটুকুই জেনে রাখলে যথেষ্ট হবে যে আসল নোট যে পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়েছে, নকল নোট সেই একই ভাবে সৃষ্টি হয়েছে। আসল নোট যে অর্থব্যয়ে ছাপানো হয়েছে, নকল নোট ছাপানোর জন্যে প্রায় একই অর্থ খরচ হয়েছে।

আর আসল আর নকলের পার্থক্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন? সাধারণের দৃষ্টিতে কোন তফাৎই নেই। প্রথমেই দেখুন, কাগজের খড়মড়ে শব্দ এবং কাগজের আকুঞ্চন আসল আর নকল দুটো নোটেই এক। দুটো নোটকে মুড়লে দুটোই হাতে শক্ত ঠেকবে। কাগজের বুনানি দেখুন, দেখুন এর ঘনময়তা দুটোতেই এক। দুটোই ছাপা হয়েছে পার্থক্য প্রকাশক কাগজে। লক্ষ্য করুণ দুটোতেই বর্ণবিন্যাস এক, বর্ণের বিভিন্নতা দুটোতেই নেই। দুটোতেই অক্ষর ও সংখ্যা নির্ভিক ও স্পষ্ট। দেখুন রাজার মুখের গবাক্ষ, জলছবির বাতায়ন, অন্তরসূত্র। দুটোতেই কোন তফাৎ নেই। দুটো নোটেই লক্ষ্য করুন ছিদ্রচিহ্ন, যার উদ্ভব হয় তার দিয়ে নোট গাঁথা থাকলে, সে ছিদ্রচিহ্ন দুটোতেই বর্তমান এবং প্রতিটি নোটের দুটো ছিদ্রের দূরত্ব, ব্যবধান ও আকৃতি একই। আর একটা অদ্ভুত জিনিষ লক্ষ্য করুন যে নোটের প্রান্তসীমায় সে চিত্রাঙ্কন এবং ভেতরকার নকসায় যে সূক্ষ্ম রেখা-গুলি এঁকে বেঁকে ঘুরে ঘুরে গেছে সে-গুলো দুটোতেই স্পষ্ট, অক্ষুণ্ণ, কোন স্থানে এক রেখা অন্য রেখার উপর গড়িয়ে পড়েনি —কোথাও ভার্বালিং-এর দোষে দুষ্ট নয়। তফাৎ শুধু মাস্মাত্রিক প্যাটার্ন-এ। এই নকসার সম্মিশ্রকরণ উদ্ধার করা। কিন্তু এটা সাধারণের চোখে ধরা পড়া অত্যন্ত কঠিন। দুটো নোটই ছাপা হয়েছে মুদ্রাঙ্কন কিন্ডারগের দ্বারা, মহামূল্য যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে আসল আর নকল নোট। তারপর যা মহামূল্য লৌহপত্র ব্যবহার করা হয়েছে দক্ষ সুকৌশলী এনগ্রেভার বা শিল্পকোষকারীর সাহায্যে।

কিন্তু কেন এত যন্ত্রণা। এটা তো বুঝতে পারলাম না? প্রশ্ন করলাম।

উত্তর অত্যন্ত সহজ। যাঁরা ঐ নোট ছেপেছেন তাঁরা আমাদের দেশে নোট চালাতে চাননি। তাঁরা চেয়েছেন বিভ্রান্তি। জনসাধারণের মনে এক প্রচণ্ড বিভ্রান্তি নিয়ে আসতে। তা হলেই তো তাঁদের কাজ হাসিল।

যখন তিনি যন্ত্রপাতির সাহায্যে নোট-গুলোকে পরীক্ষা করছিলেন, তখন তাকে দেখাচ্ছিল যেন সাক্ষাৎ আর্কিমিডিস। দেখছি তার বিরাট চশমায় আবৃত তীব্র দৃষ্টি। দেখছি—তার উদাত্ত গভীর রেখা-সঙ্কুল ললাটের নীচে ভ্রু-যুগল সংকুঞ্চিত। তার শ্বেতশুভ্র কেশদামের এক গুচ্ছ গড়িয়ে এসে পড়েছে কপালের উপর। কোথায় যেন হারিয়ে গেছেন। কোন পারাবারে জানিনে।

সেদিনকার মত বিদায় নিলাম। কিছু-দিন পর তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের আদেশে নাসিকে গেলাম, সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে। আসল নোট ছাপা শিক্ষার জন্যে। রাজীব রায় যা আমাকে বুঝিয়েছিলেন, তার থেকে বেশী কিছু শিখিনি। সেই একই কথা।

এরপর কলকাতা ফিরে এসে রাজীব রায়ের সঙ্গে বহুবারই পরামর্শ করেছি। বহুবারই তার উপদেশ নিয়েছি, ধীরে ধীরে সঙ্গোপনে চলে এসেছি তার আসঙ্গ-সঙ্গে, ঠাঁই করে নিয়েছি তার হৃদয়ের অন্দর মহলে। এখন আমি তার কাছে 'আপনি' নয়, চলে এসেছি 'তুমি'র পর্যায়ে।

একদিন কথায় কথায় বললেন, তুমি ভাই, আমার বাড়ীতে আসো না কেন? আমার সংসারের খবর তো তোমার জানার দরকার? গোয়েন্দা তো তুমি? তোমার তো জানা উচিত।

উত্তর দিলাম,—নিশ্চয়ই যাবো। সামনের শনিবারে।

সে শনিবারে, সন্ধ্যাকালে, রাজীব রায়ের গৃহে আমি হাজির। মারকাস স্কোয়ার অঞ্চলে তার ভাড়া বাড়ী। বাসিন্দাদের মধ্যে তিনি আর বিলাসিনী। যথাযথ রাজীব রায় স্বয়ং দ্বারোদ্ঘাটন করলেন, তারপর উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেন বিলাসিনী! বিলাসিনী!' দেখলুম তাকে ছেলেমানুষের মত উৎফুল্ল, বোধকরি কিঞ্চিত মদ্যপানের ফলে। তাকে অফিসে যেভাবে দেখেছি সেভাবে যেন আর নেই।

উপর তলার সুসজ্জিত বসবার ঘরে বসলাম। টেবিলের উপর অর্ধনিঃশেষিত

বিদেশী হুইস্কির বোতল, কয়েকটি সোডা আর চুরুটের বাক্স।

প্রশ্ন করলেন, তুমি কি ভাই মদ খাও? দেবো কি—একপাত্র?

উত্তর দিলাম—আজ্ঞে না। আমি খাই না। হঠাৎ তিনি বললেন, আজ আমার অনেক কিছু তোমায় বলার আছে। সেই কারণেই তোমাকে আমি এখানে ডেকেছি। বয়স আমার সত্তর বছরের আঙিনায় পৌঁছেচে। বয়সের ভারে ধীরে ধীরে শক্তিহীন হয়ে পড়ছি। কতদিন যে বেঁচে থাকবো তা আমি জানি না। যাবার আগে তোমাকে যদি সব বলে যেতে না পারি—তোমাকে একটা ভার যদি দিয়ে যেতে না পারি, তবে নিশ্চিন্তে মরতে পারবো না। সে কারণেই তোমাকে আমার আমন্ত্রণ।

জানিনে আমার দ্বারা তোমার কতটুকু উপকার হয়েছে, হয়তো হয়েছে, হয়তো বা নয়! কিন্তু সে প্রসঙ্গ আজ আর নয়। আজ তোমার কাছে আমার একটা আবেদন, একটা অনুরোধ! সেটা তোমায় রাখতেই হবে।

কড় হুইস্কিতে দু চুমুখ দিয়ে তিনি বলতে সুরু করলেন,—এতদিনে নিশ্চয়ই তুমি আমার ইতিবৃত্ত গোয়েন্দা বিভাগের ফাইলে দেখেছ—তার মধ্যে অনেক সত্য আছে আবার অনেক মিথ্যাও আছে। আমি যুধিষ্ঠির নই, বাল্মীকিও নই বা পাপাত্মা দুঃশাসনও নই। আমি যা, আমি তাই। কেউ আমাকে ছোট করে দেখে, কেউ বা মায়া করে আমাকে বড় করে ভাবে। আমার কিন্তু কিছুতেই কিছু এসে যায় না। আমার জীবনের যৎকিঞ্চিৎ তোমাকে জানাবার সময় এসেছে—সেটা হয়তো তোমার গোয়েন্দা দপ্তরের রেকর্ডে পাবে না। মুস্কিল কি জানো? বড় ঘনিষ্ঠ তুমি হয়ে গেছ আমার কাছে। তোমার উপর নির্ভর করা ছাড়া আর যে কোন উপায় নেই।

—কর্মচক্রে জন্ম হয় পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার এক গ্রামে, এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে। পিতা ছিলেন তখনকার দিনে ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিসের এক উচ্চ কর্মচারী। পড়াশুনায়, বিশেষতঃ বিজ্ঞানে আমি সব সময়েই সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি—কোথাও পেয়েছি মেডেল, কোথাও বা পারদর্শীতার জন্য স্কলারশিপ। যখন কলেজের শেষ পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ সম্মান পেলাম তখন পিতা আনন্দে আত্মহারা। পুত্রের কৃতিত্বের গর্ব কোথায় যে রাখবেন তা জানেন না। স্থির করলেন বিলাতে পাঠাবেন ছাপাখানার কাজে পারদর্শিতা লাভ করার জন্যে। জানতে চাইলেন আমার মনোভাব। আমি দ্বিরুক্তি না করে সম্মতি জানালাম। বিলাত যাবার সব ব্যবস্থাই ঠিক হোল।

কিন্তু বাদ সাধলেন আমার মা। বললেন, না, না বিয়ে করে ওকে যেতে আমি দেবো না। বিয়ে করুক। তারপর চলে যাক। মার মনে কেন এই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল জানিনে। হয়তো বা ভালোরই জন্যে। হয়ত বা ভুলবশতঃ। যাই হোক আমার বিয়ে হয়ে গেল এক প্রকাণ্ড সম্ভ্রান্তশালী ঘরের একমাত্র কন্যার সঙ্গে—অর্থের শেষ নেই সম্পত্তির নেই পারাপার। বিলাত যাত্রার বিলম্ব হয়ে গেল—কেটে গেল দু বছর। কিন্তু তার মধ্যেই আমার দুটি পুত্রসন্তান হয়ে গেছে।

তারপরই বিদেশে পাড়ি দিলাম অকূল সমুদ্র-যাত্রায়। বোঝো তুমি, তখনকার দিনে সমুদ্র-যাত্রা কাকে বলে? যেন ছিন্ন করে চলে যাচ্ছি সমস্ত বন্ধন। মাতার অশ্রুপাত, স্ত্রীর ক্রন্দন কিছুই আমাকে দমাতে পারলো না।

বিলেত গিয়ে এক বিরাট ছাপাখানায় যোগ দিলাম, সেই সঙ্গে ইউনিভারসিটিতে। এক বছরের মাঝেই সেই বছরের শ্রেষ্ঠ লিথোগ্রাফার এবং শ্রেষ্ঠ এনগ্রেভারের পদক পেলাম। তারপর? তারপর আর কিছু নেই। পিতাকে জানালাম এখানে যা শেখার সবই শিখে নিয়েছি, ডিপ্লোমা পেয়েছি, সার্টিফিকেট পেয়েছি। ছাপাখানার সব কাজেই দক্ষতা আহরণ করেছি। এখন চলে যেতে চাই। অন্য কোথাও, যেখানে আরও গবেষণায় ব্যবস্থা হতে পারে। পিতা জার্মাণীর এক বিখ্যাত ফার্মের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তারা রাজী হলেন আমাকে শিক্ষানবীশ রাখতে। এক বছরের মধ্যেই আমি এনগ্রেভিং বিভাগের কর্মকর্তা হলাম।

কিন্তু অকস্মাৎ বজ্রপাত। যখন আমি অনুশীলন করছি একটার পর একটা, তখন এক পাবে দেখা হোল কুমারী রিক্‌মীর সঙ্গে। অশুভ মুহূর্তে, অশুভ দৃষ্টি। একসঙ্গে মদ্যপান করলাম, নৃত্য করলাম বাহুবন্দী হয়ে। কিন্তু তারপর হাজার চেষ্টা করেও রিক্‌মীর উপর আসক্তি থেকে মুক্তি পেলাম না। সে তীব্র আকর্ষণ কিছুতেই এড়াতে পারলাম না। রিক্‌মী ভিড়িয়ে দিলেন কয়েকজনের সঙ্গে যাদের অতীত জীবন হয়তো বা পুলিশের খাতায় লিপিবদ্ধ আছে। আমি তাদের পছন্দ করতাম না। তবু তাদের অব্যর্থ শরসন্ধানের পথ থেকে দূরে থাকতে পারলাম না। রিক্‌মীর মোহে তখন আমি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন।

মনে পড়ে একদিন সুইটজারল্যাণ্ডে বেরন-এর পথে পথে ঘুরছি। আমার সঙ্গিনী রিক্‌মী। হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি তো ছাপাখানা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানো, নোট জাল করার পদ্ধতি আমার বন্ধুরা শিখতে চায়—তাদের তুমি শিখিয়ে দাও না কেন? তারা বলেছে যা রোজগার হবে তার এক তৃতীয়াংশ তোমাকে দেবে।'

মনে হোল যেন রিক্‌মীকে ছুঁড়ে মারি, আছড়ে মারি, এই অসম্ভব রোমহর্ষক প্রস্তাবের জন্যে! কিন্তু তারপর। পারলাম না। রিক্‌মীর চোখের জলে আমার যত রাগ, যত দ্বন্দ্ব কোথায় যেন ধুয়ে মুছে গেল। তার প্রস্তাবে রাজী হলাম দুই শর্তে। আমি শিখিয়ে দেবার পর কোনদিন আর তারা আমার সঙ্গে দেখা করবে না। তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ যা কিছু রোজগার হবে তার এক তৃতীয়াংশ যেন তারা আমাকে দিয়ে দেয় রিক্‌মীর মাধ্যমে।

তিন বছর ছিলাম জার্মাণীতে। অর্থের অভাব ছিল না! প্রায় লক্ষপতি হয়ে গিয়ে ছিলাম। তারপরই দলের একাংশ ধরা পড়ল কিন্তু তার আগেই আমি জানতাম রিক্‌মীর কৃপায় ওরা ধরা পড়বে। ডিপ্লোমা, ডিগ্রী আমি বহু পেয়েছি। কিন্তু জার্মাণীর কাছে শ্রেষ্ঠ ডিপ্লোমা নেবার আগেই আমি দেশে পাড়ি দিলাম।

মনে পড়ে রিক্‌মী স্খলপথে অনেকটা এগিয়ে দিল। এখনও চোখে ভাসে বিদায়-কালে তার অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডল। ভারতে এসে রিক্‌মী ও তার বন্ধুদের কোন খোঁজ রাখিনি। তিন বছর পরে খবর পেলাম কারা যেন রিক্‌মীকে খুন করেছে। আমি বেরিয়ে এসেছিলাম দলের আওতা থেকে। কিন্তু কেউ যদি আমাকে যথাসময়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে থাকে, তবে সে রিক্‌মী। যখন দল ধরা পড়ল, তাদের দলের একজন আমার সত্যকারের নাম ধাম, পরিচয় রিক্‌মীর কাছে জোর করে আদায়ের চেষ্টা কোরল। কিন্তু রিক্‌মী নিরুত্তর—সে আমায় কোনদিনই ধরিয়ে দেবে না—এই ছিল তার অঙ্গীকার। রিভলবারের গুলীতে সে প্রাণ দিল—তবু অঙ্গীকার ভঙ্গের কথা কখনও তার মনে হোল না। আমি বেঁচে গেলাম, রইলাম অনেক দূরে, হয়তো অনেক শান্তিতে।

কিন্তু ভুল? আমি কি শান্তি পেলাম আমার দেশে? কাজ পেয়ে গেলাম এক বিরাট ছাপা প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু শীঘ্রই সেই ছাপাখানা প্রতিষ্ঠানের এক অংশীদারের সঙ্গে গভীর হৃদ্যতা হোল। তিনি আমার জাল নোট করার প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলেন।

সুরু হয়ে গেল কাজ, জাল নোট ছাপা। সেই ছাপাখানারই একাংশে সুরু করলাম জাল নোট করার ব্যবসা। এক এক দিনে হাজারও নোট তৈরী হয়। জাল কারবার চলতে লাগলো বেশ—দু তিন মাসের মধ্যেই প্রায় দেড় লক্ষ টাকা আমার ভাগে এল। কিন্তু তারপরই ঘটল বিপর্যয়। আমার এক বিশ্বস্ত কর্মীর সঙ্গে মতবিরোধ হোল টাকা পয়সার হিসাব নিয়ে। সে আমাকে ব্যবসা গুটোতেও সময় দিলে না। পুলিশে খবর দিল।

একদিন প্রত্যুষে কাকপক্ষী জাগবার আগে গোয়েন্দারা আমার বাড়ী আর ছাপাখানা ঘিরে ফেললো। আমার বাড়ীতে ও প্রেসে জাল নোট তৈরী করার অনেক কিছু দ্রব্যসম্ভার পাওয়া গেল—আমার বিরুদ্ধে স্বাক্ষীসাবুদের অভাব হোল না। মামলায় আমার দশ বছর জেল হোল। আমার দুঃখ ছিল না, খেদ ছিল না, আমি অপরাধী! অপরাধের শাস্তি আমাকে মাথা পেতে নিতেই হবে। শুধু এই ভেবে দুঃখ পেয়েছিলাম যে কেউ কারুকে যদি হত্যা করে থাকে, তবে সে আমি নিজেকেই নিজে করেছি। জানো! জানো তারপর কি হোল?

উত্তর দিলাম, জানি। আমি আপনার ফাইল পড়েছি। আপনার চিঠি দেখেছি স্যার চার্লসকে লেখা। কি অদ্ভুত হস্তাক্ষর যেন ক্যালিগ্রাফিক আর্ট। কেউ বুঝবে না যে সেটা ছাপা নয়। সেই চিঠিতে জানিয়েছেন মুক্তির জন্য আপনার অনুরোধ—আপনার বিনীত প্রস্তাব।

ঠিক বলেছ! আমি যে একজন আর্টিষ্ট এটা ওরা ভুলেই গিয়েছিল, আমি ছিলাম

সব্যসাচী। দুই হাতই আমার চলত। একাধারে আমি আর্টিস্ট, ডিজাইনার, ফটোগ্রাফার, প্রোসেসার, এনগ্রেভার, ব্লক-মেকার কি নই? স্যার চার্লসকে জানিয়েছিলাম যদি কেউ কোনদিন জাল নোটের ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারে, তবে সে আমিই পারবো। আমি অনুতপ্ত। দশ বছরের মধ্যে পাঁচ বছর জেল জীবন কাটিয়েছি, এবার আমায় মুক্তি দিন। আমি কথা দিচ্ছি আপনার সাহায্যে নিশ্চয়ই আসব।

সে সব দিনে পুলিশ কমিশনারের ক্ষমতার অন্ত ছিল না—বিশেষ করে স্যার চার্লসের মত দক্ষ কর্মচারীর। তিনিও দেখলেন এই সুযোগ, আমার সাহায্যে জালিয়াতীর কেন্দ্রগুলিকে সমূলে উৎপাটন করবেন। তার ক্ষমতা যেন চীফ সেক্রেটারীর মত, তখনও পর্যন্ত ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অস্তায়মান অস্তিত্বের ধারা তার মত লোকই অব্যাহত রেখেছেন। নিজের দেশে ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছেন তার নিরলস কর্মোন্মাদনার জন্য, সেই অগ্নিযুগের সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের অভ্যুত্থান তিনি নির্মম হস্তে দমন করতে তখন বদ্ধপরিকর। কে তাকে ঠেকিয়ে রাখবে?

স্যার চার্লসের হস্তক্ষেপের ফলে পাঁচ বছর জেল খাটার পর রাজীব রায় মুক্তি পেলেন। সেই থেকে সুরু হয়ে গেল রাজীব রায়ের প্রতিশ্রুতি রক্ষার দীর্ঘ পদযাত্রা। সেই থেকে সুরু হোল অঙ্গীকার পালনের জন্য অকুণ্ঠ ক্লেশ স্বীকার। স্যার চার্লস রাজীবের কল্যাণে জালিয়াত গোষ্ঠী নির্মূল করলেন। তার মনোভিলাষ পূর্ণ হোল।

জেল থেকে যখন ফিরে এলাম জানো? দেখলাম আমার কেউ নেই। আমাকে কেউ চিনতেই পারে না। আমার স্ত্রী নয়, আমার দুই ছেলেও নয়। মাতাপিতা দুজনেই তখন স্বর্গত। স্বগৃহে যেন অপরিচিত, অবাঞ্ছিত, অনাহূত। তবু সেই বাড়ীতে রইলাম দশ মাসকাল জোর করে। কিন্তু তার পরই বিদায় নিতে বাধ্য হলাম। স্ত্রী আমাকে শেষ পর্যন্ত জানিয়ে দিলেন যে চোরের সঙ্গে রাত্রিবাস করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হবে না। আর তাছাড়া তার ছেলেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তার একমাত্র অনুরোধ আমি যেন কোনদিন তার বাড়ীতে পদার্পণ না করি। মেনে নিলাম মাথা পেতে স্ত্রীর নির্দেশ। তাছাড়া বাড়ীর ওপর তার কি অধিকার? সে সম্পত্তি তো নিছক তার স্ত্রীর? কিন্তু গৃহত্যাগের আগে জানলাম এক অমোঘ সত্য, আমার স্ত্রী তৃতীয়বারের মত সন্তান-সম্ভবা।

তখন আমি সম্পূর্ণ একাকী। আমাকে দেখবার কেউ নেই। শুধু আছে বিলাসিনী। বাড়ী ভাড়া করলাম মার্কাস স্কোয়ারে তারপর পুলিশ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় চাকরী পেলাম, বড় চাকরী মোটা মাইনে। এর থেকে চোদ্দগুণ বেশী মাইনে পেতাম জার্মাণীতে, কিন্তু সে কথা ভুলে যাওয়াই ভাল।

যখন আমি নোট জাল করি তখন এক [illegible] বিলাসিনীর সঙ্গে দেখা [illegible] বারবণিতা। কিন্তু প্রথম দর্শনেই বিলাসিনী আমার সঙ্গে হৃদয় বদল করলেন। আমাকে শ্রদ্ধা, স্নেহ, যত্নে ঘিরে ফেললেন। তখন থেকে বিলাসিনী পৃথিবীর কাছে বারবণিতা হতে পারেন—আমার কাছে তিনি স্ত্রী, আমার সহধর্মিণী। আমার ব্যবসা নিয়ে বিলাসিনীর সঙ্গে বাগ-বিতণ্ডা, কত না তীব্র বিবাদ হয়েছে। বিলাসিনী আমায় বারে বারেই বারণ করেছে সে পথে যেতে। কিন্তু তার কোন কথার দাম দিইনি, যেহেতু সে দাম দাবী করেনি কোনদিন। মনে পড়ে, তখন আমি জেলে, কতদিন কত ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সর্বাঙ্গ সিক্ত অবস্থায় সে আমার জেলখানার দরজায় হাজির হয়েছে খাবার নিয়ে। রোগক্লান্ত দেহ নিয়ে রোজই হাজির আমার কাছে। কত মানা করেছি আমি, করেছি কত ভর্ৎসনা, কিন্তু কেন মানাই সে আমার শোনেনি। তারই অনুরোধে আমি বাড়ী ফিরে গিয়েছিলাম সহজ সরল জীবনযাপন করব বলে। কিন্তু সে আমার ভাগ্যে জুটল না। কেন সে এরকম করবে? কেন? সবাই যখন ছেড়ে গেল বিলাসিনী কেন ছাড়ল না? তার পয়সা নেই, কড়ি নেই, তবু কেন ঋণ করে সে আমার সুখের দিকে, শান্তির দিকে চেয়ে থেকেছে। স্ত্রী-চরিত্র আমি কিছুই বুঝি না। দেবতারাই বোঝেন না, আমি তো সাধারণ মানুষ। আমি মনস্তাত্ত্বিকও নই। তবে আমার মনে হয় কি জানো! মনে হয় যখন কোন নারী সত্যকারের কোন পুরুষকে হৃদয় দিয়ে দেয়, তখন সে দানের তুলনা হয় না—সেখানে নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না সবটাই দেওয়া—কোথাও মন ভোলানো নয়, মন খেয়ালে, কোথাও স্বার্থের বস্তু-কামনা নয়, ত্যাগের আত্মাহুতি। সে প্রেমে সুখ নেই, আছে আনন্দ, আরাম নেই, আছে সমধুর অবকাশের শস্যশেষ প্রান্তর, আহার নেই, আছে মুক্ত বিহার, ধনরত্নের প্রাধান্য নেই, আছে নিঃস্বতার গৌরব। সেখানে দোহন নেই, দহনও নেই।

আজ আমার বিলাসিনীর যৌবন নেই, প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেচে! তবু সে আমাকে ভোলে নি। আমার কেউ নেই জীবনে আছে শুধু বিলাসিনী আর আমার ছোট ছেলে যার কথা তোমাকে আগেই বলেছি।

বড় ছেলে আমার এঞ্জিনিয়ার, বিরাট ফ্যাক্টরীর কাজ করে। দ্বিতীয় ছেলে সেও সুবিখ্যাত রাজকর্মচারী। কিন্তু আমার ছোট ছেলে স্কুলে তখন পড়ছে। কি সুন্দর চেহারা। মনে পড়ে, লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ীতে যেতাম খেলনা কিনে নিয়ে তখন সে শিশু। সে এলেই কত না চুমা খেতাম কত না আদর করতাম। সে সবদিন আজ স্বপ্ন বলে মনে হয়। আমার বাড়ীর বাসিন্দারা কেউ যে আমার শিশুর সঙ্গে মিলনের খবর জানতেন না তা নয়—সবাই তার জানতো, লক্ষ্য করতো, কিন্তু আমার ছেলেকে নিয়ে যেতে দিতো না।

কিন্তু বিধির বিপাক কেউ রোধ করতে পারে? বিজ্ঞানে আমার কনিষ্ঠ পুত্র আমারই মত কীর্তিমান হোল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ সম্মানলাভ করার পর হোল। আমার কত আনন্দ, কত গৌরব সে কারুর কাছে প্রকাশ করিনি—শুধু আনন্দ পেয়েছে বিলাসিনী আমার ছেলের গৌরবে। কিন্তু তারপর? আমারই মত উচ্চাশিক্ষার্থে গেল জার্মাণীতে। সেখান থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে এলো। তারপর বিহার গভর্ণমেন্টের অধীনে চাকুরী পেল। কিন্তু তারপর? জানো? জানো? এক অস্বাভাবিক স্বর তার গলার পর্দায় চড়ে উঠলো। জানো? জান তো? জান কি? সে আমারই পথ নিয়েছে, আমাকেই অনুকরণ করেছে। নোট জাল করার জন্যে বিহারে ধরা পড়েছে। তুমি? তুমি কি তাকে বুঝিয়ে বলবে না ক্রাইম নেভার পেইস?

সেদিন রাত্রি গড়িয়ে আসছিল। বললাম, এবার তো আমায় যেতে হবে?

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বিলাসিনীর প্রবেশ। সুদীর্ঘ দেহ, বয়স প্রায় পঞ্চাশোর্ধ। সামনে নিয়ে এসেছেন উজাড় করে খাদ্যের পূর্ণ তালিকা। পরিচয় করে দেয়, এই আমার বিলাসিনী। আর এই আমার গোয়েন্দা ভাই।

যাত্রার সময় হোল। রাজীব রায়ের কাছে যখন বিদায় নিলাম তখন তার অনেক মদ্যপান হয়ে গেছে। প্রশ্ন করলেন আমি শুয়ে পড়বো ভাই। উত্তর দিলাম নিশ্চয়ই। যখন চলে যাচ্ছি তখন বিলাসিনীকে দেখি দরজার পাশে, আধো আলো, আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অশ্রুপাত করছেন।

কিন্তু সেই থেকে বেশ কিছুদিন রাজীববাবুর কাছে যাওয়া হয় নি। কার্যোপলক্ষে চার মাসকাল কলকাতার বাইরে ছিলাম।

এক সন্ধ্যায় রাজীববাবুর গৃহে হাজির হলাম। সব যেন নিস্তব্ধ, নিঝুম, চারিদিকে খাঁ খাঁ করছে। অনেকক্ষণ কড়া নাড়লাম। বিলাসিনী এসে ধীরে ধীরে দ্বার খুলে দিল। প্রশ্ন করলাম, রাজীববাবু কি নেই? সংক্ষিপ্ত উত্তর, হ্যাঁ! আছেন। উপরে। আপনি আসবেন?

দেখি রাজীববাবু শয়নকক্ষে শয্যাশায়ী, কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত। সর্বাঙ্গ ফুলে গেছে। রক্তহীন, নিষ্প্রভ চোখের স্তিমিত দৃষ্টি অসহায়ের মত আমার মুখে পড়ে রয়েছে। দেখলাম তার দীর্ঘ অধর-যুগল ঈষৎ কেঁপে উঠলো। কি যে বললেন বোঝা গেল না। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রশ্ন করলাম, —আপনি কি কিছু জানাতে চাইছেন আমাকে?

সামান্য ঘাড় নাড়লেন। একবার তার হাত আমার হাতের উপর রাখলেন। ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, ভাই মনে রাখবে তো তোমার অঙ্গীকার? আমার ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। জীবনের সহজ পথে, সরল পথে। বুঝিয়ে দেবে তো ক্রাইম নেভার পেইস।

উত্তর দিলাম কথা দিচ্ছি। খুব চেষ্টা করবো। সেই সময়ে দূরে শয্যার এক পাশে বসে আছেন বিলাসিনী। বসে আছেন ধীর, [illegible]।

অদ্রীশ বর্ধন

চাণক্য চাকলাদারের বিচিত্র কীর্তিকথা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মাসা দাউদের মড়ার চোখ নির্নিমেষে চেয়েছিল আধখানা কম্ফোর্টার দিকে। বীভৎস সেই দৃশ্য। মিসেস ফ্যান্টমাসের এহেন হাল—এ যে কল্পনারও অতীত। শক্তিশেলও যাকে ভয় পেয়েছে, লৌহভীমও যার শক্তির কাছে বালখিল্য, ফ্যান্টাসি কাহিনীর দুর্ধর্ষ ফ্যান্টমাসের মত যার আসুরিক ক্রিয়াকলাপ—সেই স্ত্রীলোকটি আজ বিগতপ্রাণ। খুলি ছাতু। মজ্জা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত।

মিসেস ফ্যান্টমাস মৃত। কিন্তু তার ঘাতক যে তার চাইতেও কি বিপুল শক্তির ধারক—শোচনীয় এই মৃত্যুই তার প্রমাণ। মাসা দাউদের বরফ খণ্ড চোখ বরফ খণ্ডই থাকে, কিন্তু চঞ্চল হয় মস্তিষ্ক। ভয়াবহ সত্যটা যেন বৃশ্চিক হয়ে কুরে কুরে খাচ্ছে মগজটাকে।

থানডার! থানডার! নৃশংস থানডার! অশরীরী ছায়ামানবের মতই যার কীর্তি কিংবদন্তীতে পরিণত! ভয়ঙ্কর সেই চাণক্য চাকলাদারের অবিশ্বাস্য শক্তি স্বচক্ষে দেখে মাসা দাউদও আজ চঞ্চল!

ঘরে ঢুকল মাংচু—"সর্বনাশ হয়েছে।"

বরফ খণ্ড ফিরল সেইদিকে—"কি হয়েছে?" ঠাণ্ডা গলা। বরফের মতই।

"ট্রান্সমিটার বসিয়েছে থানডার।"

"কোথায়?"

"ওপরতলার জানলায়। ছোট্ট রেডিও-ট্রান্সমিটার। বেলুন দিয়ে এরিয়েল হয়েছে। এতক্ষণে ওদের দলবল সজাগ হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ থেকেই খবর যাচ্ছে তো।"

'অ।' কিছুক্ষণ চুপ। ' হীরের বাক্স আছে, না, গেছে?"

"গেছে। থানডার সঙ্গে নিয়ে গেছে।"

চেয়ে রইল মাসা দাউদ। তুষের মুখ নির্বিকার—"পাহারায় কারা ছিল?"

"কেউ বেঁচে নেই। চারজনেই খুন হয়েছে।"

"অ।" চিবুক চুলকোলো মাসা দাউদ।

"হুকুম দিন। কি করবো?"

"আটজনকে ওরা দুজন শেষ করেছে। হাতে আছে আরও বিয়াল্লিশজন। চারজন আমার সঙ্গে লঞ্চে চলুক। তুমিও। বাকি সবাই ওদের খুন করে হীরে নিয়ে লঞ্চে আসুক। যাও।"

"লঞ্চে?"

"উজবুক। এক ঘণ্টার মধ্যে এ দ্বীপ ছেড়ে যেতে হবে। রেডিও ট্রান্সমিটারের খবর পেয়ে ওরা বসে নেই। ধরা পড়তে চাও?"

"না।"

"তবে যাও।"

উধাও হল মাংচু।

●

ইঁদারার তলায় পড়ে রইল হীরে ভরা পেটিকা।

ইসাবেলাকে কাঁধে নিয়ে তরতর করে নেমে এল চাণক্য। জিরাফ ঠ্যাংয়ে ক্যাঙারু ক্ষিপ্রতা। ফসফরাস চোখে বাঘের চাহনি।

পাহাড় যেখানে ঢালু হয়ে নেমেছে, সেইখানে শেষ হয়েছে গোপন সিঁড়ি। নিঃসীম অন্ধকার। তাই একটা পেন্সিল টর্চ জ্বালিয়ে দাঁতে কামড়ে ধরল চাণক্য।

তারপর পাহাড় আর ঝোপ পেরিয়ে, মূল পথ এড়িয়ে, অন্ধকারে গা ঢেকে কিভাবে বালিয়াড়ির আড়ালে পৌঁছোলো দুজনে—বিস্তারিত সেই কাহিনী এখানে

নিষ্প্রয়োজন। দুই বালিয়াড়ির মধ্যে একটা ভাঙা দেউল। শীর্ষে মহাকালের প্রস্তর মুখ সাগরের দিকে ফেরানো। প্যাগোড়া দ্বীপে এককালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের আধিপত্য ছিল—বোরোবুদুরের অনুকরণে গড়া এই মন্দির তার শেষ চিহ্ন।

মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ তখন সবে উঁকি দিয়েছে। দূরে কাঠের জেটিতে ভাসছে লঞ্চ। আরও দূরে মাসা দাউদের জাহাজ।

আলো জ্বলছে লঞ্চে। জাহাজেও। গুলীবর্ষণের শব্দে সচকিত সবাই। অর্থাৎ চুপিসাড়ে লঞ্চ দখল এখন অসম্ভব।

ইসাবেলা এলিয়ে পড়েছে। দুপাশে বালির পাহাড়ের মধ্যে শুয়ে আছে চিত হয়ে। তারা দেখছে। চাঁদের আলোয় বিবর্ণ মুখ ব্লটিংয়ের মত শুষ্ক।

ঝুঁকে পড়ল চাণক্য। রক্তক্ষরণে বাহিল হয়ে পড়েছে ইসাবেলা। তাই আগে প্রয়োজন ফার্স্ট-এইড। পেন্সিল টর্চের তীক্ষ্ম রশ্মিরেখা গিয়ে পড়ে উরুর ক্ষতে।

পর-পর দুটি ছিদ্র। রক্তে ভেসে গেছে স্ল্যাক। রক্তে মাখামাখি চাণক্যের পিঠও। তবুও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চাণক্য। কেননা, উরুর ঠিক ছেনেও দুটি ছিদ্র।

বার মানে। সাবমেশিনগানের জোড়া বুলেট উরুতে প্রবেশ করলেও হাড়ে আটকে নেই—ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে পেছন দিয়ে।

জ্যাকেট খুলে ফেলল চাণক্য। খুলল মেরুনরঙের টি-সার্ট। কুকরি দিয়ে সার্ট ছিঁড়ে তৈরি হল ব্যান্ডেজ-পটি। কষে বাঁধা হল ক্ষতস্থান। শক্ত গিঁট দিয়ে দুদিকেই রক্ত চুয়োনো বন্ধ করল চাণক্য।

এবার পলায়নের চিন্তা।

চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে অনেক দূর। বালিয়াড়ির মাথায় উঠল চাণক্য। উঁকি দিতেই দেখল চারটি মাথা।

মাসা দাউদের স্যাঙাতরা কয়েক দলে ভাগ হয়ে খুঁজছে ওদের। এ দলে রয়েছে চারজন। বালির ওপর চাণক্যের পায়ের ছাপ আর ইসাবেলার রক্তচিহ্ন দেখে এগুচ্ছে এইদিকে। বুকে হেঁটে আসছে যেন চার-চারটে অতিকায় শুঁয়োপোকা।

বালিয়াড়ির মাথায় চাণক্যের উঁকি মারা ওদেরও চোখ এড়োয় নি। কেননা, সহসা অগ্নির ঝলক। ফায়ারিংয়ের শব্দ শোনা গেল। বুলেটের ঘায়ে বালির ঝড় বয়ে গেল চাণক্যের মাথা ঘিরে।

উল্টে ডিগবাজি খেয়ে নেমে এসেছিল চাণক্য। গড়াতে গড়াতে এসে ঠেকল ইসাবেলার পাশে। কথা বলল না। অটো-মেটিক রাইফেলটা নিয়ে দৌড়োলো বালিয়াড়ির অপর প্রান্তে।

বিশ সেকেন্ডের মধ্যে পেঁছোলো চাণক্য। দেখল ওরা দুদল হয়ে গেছে। দুজন আসছে সিধে ওর দিকেই। অন্য দুজন যাচ্ছে বালিয়াড়ির অপর প্রান্তের প্রবেশ পথে। দূরে সোরগোল শোনা যাচ্ছে। এগিয়ে আসছে হট্টগোল। গুলীবর্ষণের আওয়াজ ওদের কানেও গিয়েছে।

প্রমাদ গণল চাণক্য। পালাবার পথ বন্ধ। সামনে মাসা দাউদের পুরো দল। উদ্বেগ যার কুষ্ঠিতে লেখা নেই। এ পরিস্থিতিতেও বিচলিত হল না সে। রাইফেল বাগিয়ে তাগ করল দূরের দুজনকে। পর-পর দুটি গুলী। বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল দুজন।

এদিকে আগুয়ান দলটি গুলীবর্ষণের শব্দে চমকে গিয়ে বালিতে আছাড় দিয়েছিল বলেই বেঁচে গেল। উঁচুনিচু বালির আড়ালে লক্ষ্য স্থির থাকে না। মিছিমিছি গুলী খরচ করে লাভ কি?

●

চাণক্যের বাঘের চোখ যখন মাসা দাউদের স্যাঙাতদের প্রতীক্ষায়, ঠিক তখন অসহায়া ইসাবেলা অন্য কাজে ব্যস্ত।

প্রথমে কোমরবন্ধনীর কোল্ট পাইথন নেড়েচেড়ে দেখল গুলীভরা কিনা। সন্তুষ্ট হয়ে রিভলবার রাখল বেল্টের খাপে।

তারপর খুলল দুপায়ের বুট। হ্যাঁচকা টান মারতেই চড় চড় করে খুলে এল রবারের সোল দুটো। দেখা গেল, শুকতলা দুটো আসলে শুকতলা নয়—খাঁজকাটা ঢালাই লোহার ওপর সিকি ইঞ্চি ঢালাই করা রবার। বাইরের দিকে ঢেউ খেলানো শুকতলা প্যাটার্ণ। ভেতরের দিকে রবারের অস্তরণ নেই। সেখানে দুসারি হুক লাগানো। দুটো শুকতলার রবারহীন ভেতর দিক দুটো গায়ে গায়ে লাগিয়ে টান মারতেই আটকে গেল ঘাটে-ঘাটে। সম্পূর্ণ হল অত্যন্ত শক্তিশালী হ্যান্ডগ্রেনেড। হাতবোমা।

কেননা, বাঁদিকের লোহার বাক্সে আছে তিন আউন্স প্রলয়ংকর বিস্ফোরক। ডানদিকের লোহার বাক্সে আছে স্প্রিং চালিত হাতুড়ি, ডিটোনেটর-টুপি, আড়াই সেকেন্ড জ্বলবার মত গানপাউডার পলতে আর পারামিশোনো এক জাতীয় বারুদ। দুটো বাক্সেই সরু ছিদ্র রয়েছে। পলতে ঢুকিয়ে বাক্স দুটোর বারুদ এক করে দিল ইসাবেলা। যে পিন-টি টানলে পলতে জ্বলে উঠবে, সেটির ওপর সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে নিয়ে হেলান দিয়ে বসল বালিয়াড়িতে।

ইসাবেলা জানে মৃত্যু আসন্ন। বৃষ্টির মত গুলীবর্ষণের মধ্যে দুজনের টিঁকে থাকা বেশিক্ষণ সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে আচিন, এ্যাম্বকলাল যদি এসে যায়, ভাল। হীরেও পাবে, চাণক্য ইসাবেলাকেও পাবে। দেরি হলে, শুধু হীরেই পাবে—ফুংগীর কাছে সে খবর তো রইলই। আর পাবে দুটি লাশ—ডানাপিটে চাণক্য আর ইসাবেলার।

মরণেও এত সুখ? বালিয়াড়ির অপর প্রান্তে চোখ রাখল ইসাবেলা। ঐ তো ডানপিটে মানুষটা দুপা বালিতে গেঁথে রাইফেলের মাছিতে চোখ রেখে শুয়ে আছে উপুড় হয়ে। নির্বিকার, নির্লিপ্ত। ইসাবেলা তাকে ভালবাসে। ভালবাসে চাণক্যও। কিন্তু দেহাতীত প্রেম। ইসাবেলার যে অঙ্গ নিয়ে এত রঙ্গ পুরুষ মহলে, চাণক্য তা নিয়ে মোটেই ব্যগ্র নয়।

আশ্চর্য পুরুষ চাণক্য চাকলাদার! আশ্চর্য তার মানসিকতা!

সোরগোল এগিয়ে আসছে। চমক ভাঙে ইসাবেলার। তাগর চোখ ফেরায় বালিয়াড়ির অপর প্রান্তে।

চাণক্যের চোখ সামনের দিকেই শুধু নয়—পাশের দিকেও বটে। কাঠের জেটিতে বাঁধা লঞ্চ। নজর সেই দিকেই।

কারণ, চাণক্যের মন বলছে, মাসা দাউদ এখুনি চম্পট দেবে। মাসা দাউদ অতিকায় ধুবন্ধর—গোঁয়ার মোটেই নয়। যে মুহূর্তে আবিষ্কৃত হবে রেডিও-ট্রান্সমিটার, সেই মুহূর্তেই ধূর্ত-শিরোমণি লম্বা দেওয়ার ফন্দী আঁটবে। রেডিও সিগন্যাল যাদের কাছে পৌঁছোচ্ছে, তারা নিশ্চয় বসে নেই। অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান হয়ে তারা আসছে প্যাগোডা-দ্বীপে হানা দিতে। আসবার আগেই গা-ঢাকা দেওয়াই বুদ্ধি-মানের পরিচয়।

কাজেই এক থেকে দেড় ঘন্টার মধ্যে পাততাড়ি গুটোবে মাসা দাউদ। সদলবলে উঠবে লঞ্চে। সেখান থেকে জাহাজে। তারপর সুবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ, বোর্ণিওর মধ্যবর্তী দ্বীপময় ভারতের যে কোনো অংশে হারিয়ে যাবে তার কদাকার মূর্তি।

কাঁসার মূর্তির মতই কঠোর হয়ে ওঠে চাণক্যের মুখ। মালয়, শ্যাম, লাওস, কম্বোজ, আনামের প্রতিটিতে ঘাঁটি রয়েছে মাসা দাউদের। পালের গোদাটিকে নিপাত করতে পারলেই ছত্রভঙ্গ করা যেত ওর সংগঠন।

কিন্তু একটিমাত্র রাইফেল নিয়ে অসাধ্যসাধন সম্ভব নয়। কাটিই বা গুলী আর অবশিষ্ট। আত্মরক্ষা আগে, দাউদ-নিধন পরে।

সোরগোল এগিয়ে আসছে। দলে ভারি ওরা। চাণক্য একা। ইসাবেলা চলৎশক্তিহীন।

ঘাড় ফেরায় চাণক্য। গুলীবিদ্ধ পা-টাকে বালির ওপর দিয়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ইসাবেলা। এক হাতে একটা বস্তু। চাঁদের আলোয় দূর থেকেও চিনতে পারল চাণক্য। হাতবোমা। শুকতলার ছদ্মবেশে সেই প্রলয়ংকর হাতবোমা। ইসাবেলার অন্যতম কীর্তি।

ঈষৎ কোমল হয় চাণক্যের কঠোর চক্ষু। ইসাবেলা অতি কষ্টে এগুচ্ছে ভাঙা মন্দিরটার দিকে। চূড়ার মহাকাল-মুখ যেন ডাকছে ওকে—সাগরের দিকে মুখ ফিরিয়েও বরাভয় দিচ্ছে। ইসাবেলা মন্দিরের চত্বরে গা-ঢাকা দিয়েছে। এবার ও সুরক্ষিত। বালিয়াড়ির অন্য প্রান্ত আগলানোর ভার ইসাবেলার।

ঘড়ি দেখল চাণক্য। প্যাগোডা থেকে বেরোনোর পর পঁয়তাল্লিশ মিনিট গিয়েছে। আর বড়জোর আধ ঘন্টা। এর মধ্যেই পালাতে হবে মাসা দাউদকে। ভোর পর্যন্ত লড়বার সাহস ওর হবে না। কারণ, চাণক্যর মন বলছে বাটাভিয়া থেকে এমন কিছু বেশিদূরে নয় এই প্যাগোডা দ্বীপ।

তবে হ্যাঁ, যাবার আগে মরণ মার মেরে যাবে ওর দলবল।

তারই প্রস্তুতি চলছে সামনে।

দুটি দল এগুচ্ছে। একদল বালিয়াড়ির ওমুখের দিকে। আর একদল সিধে

চাণক্যের দিকে।... এক-একদলে আঠারো উনিশজন মুশকো ষণ্ডা। গাঁট্টাগোট্টা বেঁটে গুড়গুড়ে চেহারা। খাকি পোশাক। হাতে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র।

চাণক্যের দিকে যে-দলটি আসছে, তার পুরোধা একজন খ্যাংরা-গুঁপো লোক। গায়ে বাঘছালের জ্যাকেট। মাথায় ভালুকে টুপি। রনটো। পিয়ানোর তার ফাঁসি দিতে যার জুড়ি নেই।

লক্ষ্য স্থির করে ঘোড়া টিপল চাণক্য। শূন্যে লাফ দিয়ে উঠল রনটো। আছড়ে পড়ে আর নড়ল না।

বাদবাকি স্যাঙাতরা শুয়ে পড়েছে। চাণক্যও তাই চায়। গুলী খরচ কমিয়ে ঠেকিয়ে রাখাই এখন দরকার। দরকার সময় নষ্ট করার।

ওদিকের দলটা বালিয়াড়ির অন্য মুখে পেঁছে গেছে। দৌড়ে আসছে চাণক্যর দিকে। ভাঙা দেউলের সামনে আসতেই ছায়ার মধ্যে থেকে শূন্যে নিক্ষিপ্ত হল একটা বস্তু। ছদ্মবেশী মাণিকজোড় শকুন্তলা।

মাত্র আড়াই সেকেণ্ডের পলকে জ্বলে গেল যেন চোখের নিমেষে। পুরো দলটার ঠিক মাঝখানে বিস্ফোরিত হল শকুন্তলা-বোমা। কানের পরদা বুঝি ফেটে গেল চাপা শব্দে। দুই বালিয়াড়ির মধ্যে প্রতিহত হয়ে প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে গেল দূর হতে দূরে। ব্যাঙের ছাতার মত ধূম্রকুণ্ডলি তাল পাকিয়ে উঠল বালিয়াড়ির মাথায়।

বালির খাঁজে আগেই নিজেকে আড়াল করেছিল চাণক্য। বোমার টুকরো শন শন শব্দে বেরিয়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে।

তারপর মুখ তুলল। উঁকি দিল।

পুরো দলটাই ধরাশায়ী হয়েছে বালির ওপর। দু'একজন গোঙাচ্ছে। ছটফট করছে। বাকি নিস্পন্দ।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণ আর ব্যাঙের ছাতার মত ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখে নিশ্চয় চোখ কপালে উঠেছিল চাণক্যর সামনের দলটির। ওদের স্নায়ু এখন অসাড়। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করল চাণক্য।

গড়িয়ে সরে এল বালিয়াড়ির আড়ালে। পরমুহূর্তেই উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়োলো কুপোকাৎ দাউদবাহিনীর দিকে। হাতিয়ারগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এদিকে সেদিকে। চাণক্যর লক্ষ্য সামনের সাবমেশিনগানটির দিকে।

কিন্তু পৌঁছোনোর আগেই ধরাশায়ী একটা হাত কাঁপতে কাঁপতে উঠল শূন্যে। টলতে টলতে কোনমতে বসে চাণক্যর দিকে রিভলবার তাগ করল একজন।

পরমুহূর্তে মন্দিরের দিক থেকে গর্জে উঠল ইসাবেলার কোল্টপাইথন। লোকটা পাকসাট খেয়ে মুখ গুঁজড়ে পড়ল। চাণক্য কিন্তু এত কাণ্ডর মধ্যেও দাঁড়ায়নি —থমকায়নি। উল্কাবেগে দৌড়ে এসে সাবমেশিনগানটি তুলে নিয়েই ফিরে গেল বালিয়াড়ির প্রবেশমুখে।

রন্টা এখনো পড়ে আছে। জনাপাঁচেক হাঁটু গেড়ে বসে চেয়ে রয়েছে এইদিকেই। চাণক্যর আবির্ভাব ঘটতেই ধমক দিল ওদের হাতিয়ার।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব গেল এদিক থেকে। লেলিহ আগুনের যেন তরল ধারা বয়ে গেল সাবমেশিনগানের নলচে দিয়ে। বালির ঝড় সৃষ্টি হল সামনে।

উড়ন্ত বালির মধ্যে দিয়েই দেখা গেল ওরা দৌড়োচ্ছে। পেছন ফিরে দৌড়োচ্ছে। মনোবল ওদের ভেঙে গেছে। প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ ওদের বুঝিয়ে দিয়েছে থানডার এখনো মরেনি। অতীতের বিভীষিকা আবার মূর্ত হয়েছে। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় যাদের গারদে বন্দী করা হয়েছিল তাদেরই হাতে রেডিও-ট্রান্সমিটার এবং বোমা কি করে আসে—এ রহস্যের কিনারা করতে গেলে জাদুবিদ্যা আর অলৌকিক শক্তিকে বুঝি বিশ্বাস করতে হয়। কি দরকার ঐ ডিগডিগে শরীরী আতংক আর রূপসীটাকে ঘাঁটিয়ে। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

অতএব ওরা চম্পট দিল।

ক্রূর হাসি ফুটে ওঠে চাণক্যর কাংস্য মুখে। বাঘের চোখ ফেরায় কাঠের জেটির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায় মুখের হাসি।

অনুমান মিথ্যে হয়নি। ভুল হয়নি হিসেবে। মাসা দাউদ পালাচ্ছে।

বালির ছোট বড় টিলার আড়ালে আড়ালে গা ঢেকে এগুচ্ছে পাঁচজনের একটা দল। দলের পুরো ভাগে রয়েছে মর্কট মূর্তি। দূর হতেও ও নরবানরকে চেনা যায়। মাংচু। মাসা দাউদ তার পেছনেই। তাকে ঘিরে স্টেনগান বাগিয়ে চলেছে তিন সাগরেদ। মার্জার চরণে ওরা চলেছে কাঠের জেটির দিকে।

বালিতে চিবুক ঠেকিয়ে শুয়ে রইল থানডার। কাঁসার চোয়ালের মতই শক্ত হল চোয়াল। নির্মম হল চোখ। অদৃশ্য শক্তি যেন অকস্মাৎ বিচ্ছুরিত হল অবয়ব ঘিরে। কানে ভেসে এল একটা নতুন শব্দ। লঞ্চের ইঞ্জিন চালু হয়ে গেছে।

পেছনে কোল্ট পাইথনের ধমক শোনা গেল আবার। চোখ ফেরালো না চাণক্য। ও জানে ইসাবেলা আর একজনকে যমালয়ে পাঠালো।

সাবমেশিনগান রেখে অটোমেটিক রাইফেলটা তুলে নিল চাণক্য। মাছির ওপর দিয়ে লক্ষ্যস্থির হতে গেল দু সেকেণ্ড। পরের দুটি সেকেণ্ডে দুটি নির্ঘোষ শোনা গেল। দুটি তপ্ত বুলেট ধেয়ে গেল সামনে। দু সেকেণ্ডে ধরাশায়ী হল দুজনে। আগে মাসা দাউদ। পরে মাংচু।

•

দাউদ-নিধনের পরবর্তী দশ মিনিটের মধ্যে ঘটল পর-পর কয়েকটি নাটকীয় ঘটনা।

লঞ্চের ইঞ্জিন আরো জোরদার হয়ে উঠেছিল। শোনা গেল তীব্র বংশীধ্বনি। জাহাজের বাঁশিও বেজে উঠল। সমুদ্রের ডাকিনীরা বুঝি অকস্মাৎ দাউদ নিধনে মুমূর্ষু হয়ে মড়াকান্না জুড়েছে।

মাসা দাউদ আর মাংচু মর্কটের লাশ টপকে ঊর্ধ্বশ্বাসে জেটির দিকে দৌড়োচ্ছে বাকি তিন সাকরেদ। আবার বুঝি ডাকিনীরা কেঁদে ওঠে। বাঁশির ডাকে কেঁপে কেঁপে ওঠে বাতাস।

বালিয়াড়ির আড়াল থেকে দৌড়ে আসছে আরো স্যাঙাত। পড়ি কি মরি করে দৌড়োচ্ছে কাঠের জেটির দিকে।

অবাক হল চাণক্য। বাঁশির সংকেতে যে দলবলকে ফিরে আসতে বলা হচ্ছে, তা বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু আচম্বিতে এই জরুরী তলব কেন? দাউদ-পতনের সঙ্গে সঙ্গে রণে ভঙ্গ দেওয়ার প্রচেষ্টা? না, আরো কিছু?

এই 'আরো কিছু'টা চাক্ষুস দেখা গেল পরের মিনিটেই।

প্রথমে শোনা গেল দূরায়ত গুঞ্জন। যেন হাজার বোলতা খেপেছে। গোঙরাচ্ছে। গজরাতে গজরাতে তেড়ে আসছে।

তারপর দেখা গেল চন্দ্রালোকিত আকাশে একটা প্রাগৈতিহাসিক টেরো-ড্যাকটিল জাতীয় উড়ন্ত বস্তু। অতিকায় ফড়িং।

ভ্রম কাটল পরমুহূর্তেই। বিশাল ছায়া দানবের মত দুলতে দুলতে বালিয়াড়ির ওপরে ঘুরে গেল বস্তুটা।

হেলিকপটার।

মাথার ওপর ঘূরন্ত ঘনঘনে প্রপেলারের গর্জনে কানে তালা লেগে যাওয়ার উপক্রম হল চাণক্যর। লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল ও। ইসাবেলাও পা টেনে টেনে বেরিয়ে এসেছে মন্দিরের বাইরে। সুতির সোয়েটার খুলে নাড়ছে শূন্যে।

চাণক্যও চিনেছিল। হেলিকপটারের ঠিক তলায় আঁকা ধর্মচক্র। অর্থাৎ বৌদ্ধ কিঙ নাংপোর নিজস্ব সম্পত্তি। উড়ন্ত আকাশযানের পাইলটের পাশ দিয়ে মুখ বাড়াচ্ছে দুটি পুরুষ। দেখছে চাণক্যকে। ইশারাতে কাঠের জেটির দিকে যেতে নির্দেশ করল চাণক্য।

উড়ে গেল হেলিকপটার। বোমাবর্ষণ শুরু হল তারপরেই।

প্রথম বোমাটা ফাটল কাঠের জেটির ঠিক ওপরে। নিশ্চিহ্ন হল পুল।

দ্বিতীয় বোমাটা ফাটল লঞ্চের ওপর। কাৎ হল লঞ্চ।

তৃতীয় বোমাটা ফাটল পলায়মান লোকগুলোর ঠিক মাঝখানে। অনেকেই ধরণীকে আশ্রয় করল। যে-কজন খাড়া রইল, তারা হাতিয়ার ফেলে হাত তুলে দাঁড়াল। আত্মসমর্পণ।

যুদ্ধ শেষ। দুই বালিয়াড়ির ফাঁকে হাতিয়ারহীন লোকগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে এল উড়ন্ত হেলিকপটার। তারপর জমি স্পর্শ করতেই লাফিয়ে নামল আচিন আর ব্রাম্বকলাল। একটু পরেই ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে স্বয়ং রাজা নাংপো।

চাণক্য সাবমেশিনগান ফেলে দিয়ে হেঁটে গেল বালির ওপর দিয়ে। এগিয়ে এলেন কিঙ নাংপো। পিগমি বপুর জালা-পেট রইল সবার আগে। প্রবল বেগে আলিঙ্গন করলেন চাণক্যকে—'ও মাই ডিয়ার থানডার! গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি দেখছি।'

'সে কথা পরে। জাহাজ নিয়ে ওরা কিন্তু পালাবে এখন।'

'পালিয়ে যাবে কোথা? আমার লোক জাহাজে আসছে। সব পোর্টে ট্রান্সমিটারে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। মাঝপথেই ধরা পড়বে।'

আর কিছু বলল না চাণক্য। ব্রাম্বকলাল বলল—'খুব বেশি দেরি হয়নি নিশ্চয়?'

'না,' হাসল চাণক্য। 'তবে ইসাবেলা জখম হয়েছে।' বলে তাকালো ভাঙা মন্দিরের দিকে।

মন্দিরের ছায়ায় শায়িত দুটি দেহ। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অধরে অভিন্ন অধর।

আচিন আর ইসাবেলা।

শব্দহীন অট্টহাসে অকস্মাৎ নেচে ওঠে চাণক্য চাকলাদারের ঈশান চক্ষু।

(শেষ)

প্রায় মিনিট দশেক কিছু বুঝতে পারল না অনুপম। চোখের সামনে হালকা অন্ধকার, মাথার ভেতর যেন সেই অন্ধকার ক্রমশ জমা হচ্ছে; অবিকল শীতের ভোর ধোঁয়ার মত। সকাল হয়ে গেছে, অথচ তার চোখে, চোখের পাতায়, কপালে, গালের নিচে এখনো শীতল অন্ধকারের স্পর্শ; একবার চারপাশে তাকাল অনুপম, চোখ ভারি, কিছুই আলাদা করে যেন দেখতে পাচ্ছে না এখন, সব কেমন ঝাপসা, অনেক-দূরের বৃষ্টির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া কোনো দৃশ্য চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল। ঘরের দেয়ালে, জানলার ওপরে, এখনো ফিকে অন্ধকার; এই ঘর, দেয়াল, দেয়ালে ফোটো, টেবিল, জানলার বাইরে পরিচিত গাছ, বাড়ি, অনেকটা খোলামেলা আকাশ, ইলেকট্রিক পোস্ট, সব কিছু চোখের ওপর ভারি কুয়াশায় দুলে উঠল হঠাৎ; অনুপম ক্রমশ সব গুলিয়ে ফেলছিল, তাহলে কী আমি কোনো স্বপ্ন দেখছি? স্বপ্নে যেমন দেখা যায় পরিচিত মাঠ কখন নদী হয়ে গেল আর সেই নদীতে ভাসছে কার মাথার মুকুট, সোনার শরীর জলে ভিজে নীলচে হয়ে গেছে...অথবা আর একদিন সে যেমন স্বপ্ন দেখেছিল, তাদের অফিসের সামনে গেট বাঁধা হয়েছে, নহবৎ বসেছে, আর মধ্যরাতে [illegible] জোৎস্নায় সে অফিসের ছাদে দাঁড়িয়ে কার জন্য যেন কাঁদছে; বড় অদ্ভুত! স্বপ্ন ভেঙে গেলে সে শরীরে ক্লান্তি, ঘাম আর এক ধরনের দুঃখ টের পেয়েছিল। ঠোঁট শুকিয়ে গিয়েছিল, উঠতে গিয়ে ভয়ে আঙুল কাঁপছিল তার, কী জানি, হয়তো সত্যিই এখন কোনো বাড়ির ভেন্টিলেটারে একটা পাখি আটকে গিয়ে ছটফট করে মরছে; অনুপম বুঝতে পেরেছে রাত বেশি হয়ে গেলে, এসব কথা, এরকম কথা, মাঝে মাঝে মনে হয়, বুক শুকিয়ে যায় তার...কেন যে...বোধহয় গভীর রাতেই মানুষ বেশি বেঁচে থাকে; এক বিশাল আকাশের শূন্যতা তখন চেপে ধরে তাকে। তখন তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বেলে দেয় সে... ভয়, সমস্ত রোমকূপের মধ্যে ভয় যেন ঘাম হয়ে ছড়িয়ে পড়ে; পরে এক সময় পার্থকে বলতেই ও বলেছিল, ঘুমের ওষুধ খেয়ে দ্যাখ, আর না হয় ছুটি নিয়ে বাইরে কোথাও ঘুরে আয়; দুবরাজপুরে খুব ভাল জায়গা, আমার বন্ধু আছে সেখানে, তুই যাবি? কিন্তু অনুপম ভেতরে এক ধরনের শীত টের পাচ্ছিল তখন, আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ক্রমশ ছাই হয়ে যাচ্ছিল, কোথাও কী বেড়াল বাচ্চা কাঁদছিল; খুব কাছেই?... অথচ...অথচ...

তাহলে এতক্ষণ আমি কী স্বপ্নই দেখছিলাম? মাথা কেমন ভার লাগছে, অনেকটা জল খেলে হয়তো সব স্বাভাবিক হয়ে আসবে; বার কয়েক মাথা ঝাঁকাল অনুপম, তারপর চোখ রগড়ে উঠে বসার চেষ্টা করল সে, আর উঠে বসার চেষ্টা করতেই সে টের পেল কপালের পাশ থেকে একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা ক্রমশ পিঠের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, ঘাড়ের কাছে শিরাগুলো দপ-দপ করছে, সমস্ত শরীর ঘামে বিশ্রী লাগছে তার; তাহলে জ্বরটর হয়েছে নাকি আমার? নাকি অন্য কোনো অসুখ, যার ফলে আজীবন তাকে এই বিছানায় এইভাবেই শুয়ে থাকতে হবে? মাথা তুলে আর একবার বাইরে তাকাবার চেষ্টা করতেই দেয়াল, পাশের টেবিল জলের গ্লাস, সব কেমন দুলে উঠল, দুলতে থাকল।

ঠিক ভয় নয়, অথচ ভয়ের মত কিছু যেন এখন তাকে নিচের দিকে টানছে, অনুপম চোখ বুজলো, খুললো, তারপর আবার চোখ বন্ধ করতেই সকলের চোখের সামনেই বোধহয় সে জলের ভেতর তলিয়ে যাচ্ছে, জিভ টানছে তার, পা ভারি হয়ে আসছে, একবার ইচ্ছে হল কারো নাম ধরে চিৎকার করে ডেকে উঠে; কিন্তু কোনো শব্দ হল না মুখে, সমস্ত শরীর পেঁচিয়ে অবসাদ; বড়

অপারেশনের পর খুব ক্লান্ত ভাঙ্গতে আবার যেন সে পৃথিবীতে ফিরে আসছে, মাথার ভেতর অন্ধকার নাকি ধোঁয়া ভরে আছে এখন? অনুপম হাত তুলে কিছু ধরার চেষ্টা করছিল, মনে হয়, অসংখ্য টুকরোয় শরীর ভেঙে যাচ্ছে তার, এক লক্ষ ঝিঁঝি ডাকছে নাকি কানের ভেতর? তাহলে...তাহলে...

পুরনো কোনো সিনেমার ভাল লাগা দৃশ্যের মত অনুপমের ধীরে ধীরে সব যেন মনে পড়ছিল। অনেকটা হাওয়া টেনে নিল বুকের ভেতর। আহ! যেন তার সমস্ত শরীর কার ইচ্ছের হাতে ছেড়ে দিয়েছে সে।

কাল অফিস থেকে বেরিয়ে সে ঠিক করেছিল বাড়ি ফিরে শ্যামলকে একটা চিঠি লিখবে; দিন পনের আগে ওর একটা চিঠি পেয়েছে, পুরুলিয়ায় একা একা পড়ে থাকায় জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল বলে খুব দুঃখ করেছে শ্যামল; না, ওকে বুঝিয়ে লেখা দরকার—কোথাও সুখ নেই রে, কলকাতায় তো আমরা চালাক মাছির মত বেঁচে আছি, আমাদের চারপাশে শুধু আঠারো কুড়িতলা বাড়ি উঠে যাচ্ছে... তারপর মনে পড়েছিল মার হরলিকস ফুরিয়েছে, নিয়ে যেতে হবে: মানে এইভাবে কর্তব্য ও সাংসারিকতার একটা উত্তেজনায় সে সকাল সকাল বাড়ি ফেরার কথা ভাবছিল। অথচ আশ্চর্য! তখনই তার দারুণ আড্ডার কথা মনে পড়েছিল। স্বদেশ কাল দুটো টাকা ধার চেয়েছিল: হঠাৎ অনুপম উল্টোদিকের বাসের ভিড়ে নিজেকে চালান করে দিল।

তারপর যথারীতি সে আড্ডায় জমে গিয়েছিল। অনেকদিন পর তাপস এসেছে আসাম থেকে। তাপস নেপাল টেপাল নিয়ে গলা ভারি করে কথা বলছিল, শেখর সিগারেটের প্যাকেটের ওপর একটা মন্দির বানিয়ে ফেলল পেন দিয়ে; চাকরি নেই বলে অঞ্জন নির্বিকারভাবে সিগারেট টেনে যাচ্ছিল। আশিসের গল্প কোন এক গুজরাটী মেয়ে অনুবাদ করেছে এই নিয়ে অশোক ওকে খোঁচাচ্ছিল, অমল হঠাৎ দুটো বড় বড় সাদা ট্যাবলেট খেয়ে নিয়ে বলল, আমাদের ওদিকে পুলিশ খুব ঝামেলা করছে...কোন এক মাস্টারনী সুব্রতর গল্প পড়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে, মানে এইরকম হতে হতে, আসলে আড্ডায় যা হয়, তারপর রাত দশটা বেজে গেলে সে এক সময় বেরিয়ে একটা প্রায় ফাঁকা দোতলা বাসের জানলার ওপর মাথা নামিয়ে রেখেছিল। আর বাসে টিকিট লাগে নি বলে নামবার সময় নিজেকে খুব স্মার্ট লাগছিল তার। বাস থেকে নেমে সিগারেট ধরাতে আঙুল একটু কেঁপে গিয়েছিল; রাস্তাটা মনে হয়েছিল বড় বেশি চওড়া, ক্রমশ টের পাচ্ছিল সে, তার হাত, পা, মাথা সব খুব হাল্কা লাগছে, বাড়িগুলো কী আকাশ ভেদ করে কোথাও উঠে গেছে? গোলাকার আকাশ নেমে আসছে তার হাতের মুঠোয়, দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে, গায়ে হাত দিয়ে টের পাচ্ছিল ভেতরটা খুব গরম, তাহলে কী জ্বর...নাকি বাড়ি ফিরে স্নান করলেই—ভাল করে চারদিকে তাকিয়ে রাস্তা ডিঙিয়ে বাড়ির পথ ধরেছিল এক সময়।

আর বাড়ি ফিরতেই সে দেখেছিল, বাবার ঘর অন্ধকার, বড়দার ঘরে রেডিওটা তখনো ঘ্যানঘ্যান করছে। বৌদি কিছু করার নেই বলে খবরের কাগজটা উল্টে যাচ্ছে, আর কিছু ভাল মনে পড়ে না তার, মানে, সে খেয়েছিল কী না, অথবা কারো সঙ্গে কথা বলেছিল কী না, কিছুই আলাদা করে ভেবে নিতে পারছিল না অনুপম, তবে খুব আবছা, যেন মিহি কুয়াশার মত এখন মনে পড়ল, সেই সময় তার মাথার যন্ত্রণাটা বোধহয় খুব বাড়ছিল, সমস্ত পিঠে জ্বালা, মিনুর কাছ থেকে চেয়ে কী যেন 'স্যারিডন' না 'আসপ্রো' কী একটা খেয়েছিল, আর সেই মুহূর্তে সে টের পাচ্ছিল তার সমস্ত শরীরে, রক্তের ভেতরে, শিরা-উপশিরায়, দ্রুত করাত-মেশিনের শব্দের মত কিছু ছুটে যাচ্ছে...অনেকদূর থেকে মৃদু ধাতব ঘন্টা-ধ্বনির মত সে শুনতে পেয়েছিল মার গলা, তাহলে আর খেয়ে টেয়ে কাজ নেই তের, আলো নিভিয়ে দিচ্ছি, শুয়ে একটা টানা ঘুম দিলেই...দিনরাত টো-টো করে সাতরাজ্য ঘুরে বেড়ান, শরীরের আর দোষ কী?...

অনুপম নিজেও তখন অনেকটা সেই রকমই ভেবেছে। সত্যিই শরীরটা একটু কাহিল হয়েছে, তাছাড়া তার তো প্রেসার আছেই, ডাক্তারের নিষেধ অগ্রাহ্য করে সে বড় বেশি অনিয়ম করে; কথাটা মনে হতেই কেমন অসহায় বোধ করল সে, এইবার হয়তো একটা শক্ত অসুখ বাধিয়ে বসবে সে; নতুন চাকরি তার! পিঁপড়ের কামড়ের মত কথাটা বুকের কাছে ছড়িয়ে যেতেই তাড়াতাড়ি জল খেয়ে শুয়ে পড়েছিল সে।

অন্ধকার মশারির ভেতর, মশারির বাইরে। সেই অন্ধকার ক্রমশ তার মাথায় ঢুকে যাচ্ছিল। বাইরে কোথাও কী গাড়ির হর্ণ আটকে গেছে? সব কেমন নাগরদোলার মত ঘুরে যায় তার চোখের ওপর। মনে হয়, এই ঘর নেই, দেয়াল নেই, মশারি নেই, তার শরীর এখন ভাসছে অন্ধকারে, তার হাত, পা, বুক কে খুলে নিচ্ছে এক এক করে; হাতের ওপর মশা পিন ফোটাল, তার মনে মশারির ভেতর সে একলা নয়; জানলার দিকে পাশ ফিরল অনুপম, সেই মুহূর্তে হাতুড়ির শব্দের মত কথাটা তার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। পড়তে থাকল। ক্রমশ অনুপম মনে করতে পারছিল আড্ডার মুখগুলো...ধোঁয়া, অনেক-গুলো টেবিল, ফিকে সবুজ দেয়াল, দেয়ালে ঘড়ি আর স্বদেশের চোখ, ঠোঁটের ভাঁজ... সব অবিকল মনে পড়ে গেল তার।

স্বদেশ হঠাৎ মুখটা ছুঁচলো করে অনেকটা আলো ভেতরে টেনে নিয়ে তার হাতের রেখাগুলো মাপছিল, তারপর সিগারেটটা পায়ের নিচে পিষে দিতে দিতে কেমন যেন ওর গলাটা শুকনো হয়ে উঠছিল, মানে যা দেখছি, তোর সময়টা এখন খুব খারাপ যাচ্ছে, মানে রাহু আর শনি দুটোই তোকে খুব ট্রাবল দিচ্ছে, একটা অসুখ বিসুখ হতে পারে, আর তার চেয়েও যেটা ডেঞ্জারাস, মানে, তোর একটা বড় রকম ক্ষতিটতি হতে পারে; তুই বরং...কী অসুখ? অনুপম কষ্ট করে হেসেছিল। তার চোখে আলোগুলো বড় বেশি লাগছিল। চারপাশে বড় বেশি শব্দ, মনে হল খুব কাছেই কোথাও জল পড়ে যাচ্ছে, শেখরকে হলদে ডোরাকাটা জামায় কী রকম হিংস্র লাগল তার চোখে, সব কটা মুখই ক্রমশ একরকম হয়ে যাচ্ছে, স্বদেশের চোয়ালের গড়নটা সিনেমার ভিলেনের মত হয়ে যাচ্ছে কেন? কেউ কী এখন তার বুক লক্ষ্য করে...

—ঠিক করে বলতো, কী ক্ষতি হবে, মানে কে আবার ক্ষতি করবে, আমার তো কোনো—

—সেটা তো হাত দেখে ঠিক বলা যাবে না, তবে তুই একটু সাবধান থাকার চেষ্টা করিস; একটা 'স্টোন' পড়ে দেখতে পারিস।

স্বদেশের কথায় অনুপম শব্দ করে হেসে উঠেছিল। কিন্তু সে টের পাচ্ছিল তার কপাল ক্রমশ ঘেমে উঠছে আঙুল কাঁপছে তার, পরপর কয়েকটা কাঠি নষ্ট করে সিগারেট ধরিয়েছিল; একটা উত্তেজনা যেন তার রক্তের মধ্যে আবর্তে তৈরি করছে অনেকটা জল খেল অনুপম, তার কানের পাশে কী সাইরেনের শব্দ উঠছে?

—আচ্ছা, কতদিনের মধ্যে এসব ঘটবে বলে তোর মনে হয়? হঠাৎ প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল সে।

—তুই কিন্তু সত্যিই নার্ভাস হয়ে যাচ্ছিস, স্বদেশ দেশলাইটা নাচাতে নাচাতে ওর দিকে ছুঁড়ে দিল কথাটা, স্বদেশ কী হাসছে এখন?

অনুপম টের পাচ্ছিল তার গেঞ্জি গায়ের সঙ্গে এঁটে বসে গেছে অশোক এখনো হাসিয়ে যাচ্ছে খুব, অমল হাত তুললো কার দিকে, কার গলা হঠাৎ শোনা গেল কলকাতা কী রকম কলকাতার মত এখন...এবার আমি শালা জাম্বিয়া চলে যাবো। অনুপম শুনতে পাচ্ছিল সুব্রতর গলা: ভদ্রমহিলা পরশুদিন আমাকে ডিমভাজা খাওয়ার জন্য যেতে বলেছেন...তাপস প্রায় হীরের কায়দায় সবাইকে শোনাতে লাগল: থুত্তোর! কী রকম তাড়াতাড়ি বাবা-কাকা হয়ে যাচ্ছি! তোরা বেশ আছিস! কেমন লাজ তোলা ঘোড়ার মত...অনুপম এখন, আর একটা মুখও যেন আলাদা করে নিতে পারছে না, অনেকদিন পর কোনো পুরনো ছবি দেখছে সে, সব গোলাটে সব ঝাপসা: সকলের মুখের ওপর মাকড়সা কী জাল বুনে চলেছে? টেবিল ছুঁয়ে দেখল একবার... আলো ক্রমশ উজ্জ্বল লাগছে চোখে, দুলছে, তার চোখের ওপর অসংখ্য আলোর বিচ্ছুরণ!...চোখ বন্ধ করে ভয়ংকর কিছুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল সে: মানে, এই মুহূর্তে সমস্ত কলকাতায় কারফিউ ঘোষণা হবে,

অথবা...অথবা এইমাত্র জানলার আড়ালে দেখে গেল পোলের, রেলিং দিয়ে তার শরীর বাঁধা, দেখছে সে, আশিস, শেখর, অজয় ওরা সবাই কেমন লাফিয়ে পড়ছে, অথচ...ধোঁয়ায় সে কী অন্ধ হয়ে যাচ্ছে?...

—কী রে? হঠাৎ ঝিম খেয়ে গেলি কেন? স্বদেশ ঝুঁকে পড়ে কাঁধে চাপ দিল তার।

দাঁড়িয়ে পড়ল অনুপম, ঠোঁট ঘসল রুমাল দিয়ে তারপর জলের ওপর মুখ ভাসানোর মত অবসন্নতায় বলল—নে, চল, অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে; মাথার ভেতরটা যেন—

সিঁড়ি দিয়ে নামতে কার সঙ্গে যেন ধাক্কা খেল অনুপম, দু'একজন মহিলার শরীরের গন্ধ ভেসে গেল পাশ দিয়ে, সিঁড়ির কোনে থুথু ফেলার বাকসে কী রক্ত পড়ে আছে? দেয়ালে দু'একটা পত্রিকার কভার আঁটা, নিচে সিগারেটের দোকানে ট্রানজিস-টারের শব্দ, এখন সেই শব্দ ব্রীজের ওপর দিয়ে ছুটে যাওয়া ট্রেনের শব্দের মত তার স্নায়ুতে ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

বাসস্টপে দাঁড়াল ওরা। স্বদেশ দেশলাই কিনতে পিছিয়ে গেল একটু; অনুপমের শরীরে অজস্র হাওয়া, মাথা তুলে আকাশ দেখল একবার, মসৃণ অন্ধকারে কয়েকটি দুর্বল নক্ষত্রের বিন্দু চোখে পড়ে...মাথার ওপর বিশাল রহস্যময় ওই গ্রহজগৎ; আশ্চর্য! অনুপম এতদিন ভুলে ছিল!... হঠাৎ তার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে, রাতে খেয়ে দেয়ে ছাদে চলে আসতো সে আর দাদা, তার ধারণা ছিল একদিন সে চিনে নিতে পারবে তার নিজস্ব গ্রহজগৎ...কিন্তু কখন রাত ভারি হয়ে উঠতো, সাদা জ্যোৎস্নার টুকরো লেগে থাকত ছাদের কার্ণিসে, জ্যোৎস্নায় মাঠ, পুকুর, সদরঘাটের রাস্তা, সাইকেল রিকসার স্ট্যান্ড, নতুন বাজারের কাছে সেই উঠতে থাকা সিনেমা হল, সব ক্রমশ একটা অলৌকিক ছবি হয়ে উঠত।... আর একবার তাকাল অনুপম, বুক খালি হয়ে যাচ্ছে তার; কতদিন...কতগুলো বছর...কী জানি, আর হয়তো কোনোদিন এভাবে আকাশ দেখতে পাবো না, কী জানি, স্বদেশ হয়তো সব জেনে গেছে...

মুখের ভেতর যেন কোনো স্বাদ নেই, অথচ একটু আগেই তো জল খেয়েছে, কিন্তু আবার জল খেতে ইচ্ছে করছিল; আবার যদি কোথাও বসতে পারত সে!

—আচ্ছা, তুই যে বললি অসুখ টসুখ, মানে কী রকম অসুখ, ধর যদি লিউকোমিয়া হয়, তাহলে তো...স্বদেশের মুখের সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছে এখন, কী রকম শক্ত হয়ে উঠছে ওর মুখ, স্বদেশ কী কিছু ভাবছে?

—কী রে কথা বলছিস না যে?

স্বদেশ একবার তাকাল ওর মুখের দিকে। দোকানের ছিটকে আসা আলোয় ওকে এখন খুব সুখী আর নিশ্চিন্ত মনে হয় অনুপমের; ওর কপালে কোনো দাগ নেই...ছোট করে হাসল স্বদেশ।

—তোর দেখছি মাথার ভেতর ও সব ঘুরছে এখনো; আরে দূর! কী সব ভেবে মরলাম, আর তুই পিরিয়াসলি নিয়ে একেবারে ঘামতে সুরু করে দিলি?...চা খাবি আর একবার? অনুপম আবার তাকাল ওর মুখের দিকে, খুব বড় একটা সাফল্যের পর মানুষের মুখে, চোখের ভেতর এক ধরনের চকচকে উত্তেজনা ফুটে ওঠে, স্বদেশের মুখ এখন সে রকম লাগছে; হঠাৎ ইচ্ছে হয় অনুপমের ওর পা জড়িয়ে ধরে; তুই আমাকে বাঁচা স্বদেশ, এভাবে যদি একটা কিছু ঘটে যায়...

চুলের ভেতর, কপালে, বাতাসের ঠাণ্ডা স্পর্শে এক ধরনের আমেজ পাচ্ছিল অনুপম। একটা বাস না থেমেই বেরিয়ে গেল। বাসস্টপের ময়লা বোর্ডটা হঠাৎ তাকে কেনো আশ্চর্য যাদুপ্রদর্শনীর কথা মনে পড়িয়ে দিল। ওদিকের ফুটপাথে রেলিংএ এখনো বইয়ের দোকান সব বন্ধ হয় নি, দেয়ালের গায়ে লেখা সংগ্রাম চলছে, চলবে; কী রকম স্নায়ু ঢিলে হয়ে আসছিল তার, তেরছা এক টুকরো আলোয় স্বদেশকে কেমন অপরিচিত মনে হয়; টের পাচ্ছিল সে, তার হাত ঘামছে, খুব উত্তেজনায় বা দুর্বলতায় এরকম হয় তার; ক্রমশ তার বুকের ভেতর, রক্তের ভেতর একটা বস্তু যেন ছড়িয়ে যাচ্ছে। হয়তো এখুনি যন্ত্রণায় সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। বাসস্টপের কাছে দু'তিনটি ছেলেমেয়ে, সেন্টিনারি বিল্ডিংএর জোরালো আলোগুলো এখনো সব নেভে নি। চারপাশে আর একবার সব কিছু সে ভাল করে দেখে নিতে চাইল। মানুষ, শব্দ, বাস, নিভেআসা আকাশ, পার্কের ভেতর উদাসীন বিদ্যাসাগর...সব কিছু যেন বৃষ্টিতে হারিয়ে যাচ্ছে। নাকি কুয়াশা ঝুলে আছে চোখের ওপর? কী জানি, আর হয়তো কখনো এই বাসস্টপে এসে দাঁড়াতে পারবো না, আর হয়তো কখনো শেখর পেছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকবে না...আর কখনো...

স্বদেশ মুখ তুলছে না কেন? ও কী তবে কোনো কিছু প্ল্যান ঠিক করে নিচ্ছে? আর একটু পরেই শক্ত আঙুলগুলো তার গলায় বসিয়ে দেবে?

বাসে ওঠার আগে তার কাঁধে হাত রেখে সামান্য হাসল স্বদেশ।

বাসে তেমন ভিড় নেই। সমস্ত শরীর ছড়িয়ে অনুপম এক ধরনের আরাম টের পেল। যেন হাত তুললেই এই বাস তাকে পাহাড়ের মধ্যে ঘন জঙ্গলের পথে পৌঁছে দেবে; চোখের ভেতর হলুদ আলো ঢুকে যাচ্ছিল তার, জ্বরের মত উত্তাপ টের পাচ্ছিল শরীরে; জানলার ফ্রেমে মাথা নামিয়ে আনল অনুপম, দোকানের আলো, সিনেমার পোস্টারে দারুণ সুন্দরী তার দিকে তাকিয়ে আছে, ময়দান চন্দন, পানের দোকানের সামনে সুখী মানুষ, সামনেই লাল রঙের বাস, ট্রামের গায়ে বলরামের গেঞ্জি, রিকসায় বসে থাকা গোল গোল চেহারার চীনা না মালয়ী মেয়ে...সমস্ত দৃশ্যটা তাকে যেন টানছিল। কেউ কী কোথাও আসার জন্য অপেক্ষা করছে? তারপর সে নামলেই অল্প আলোয় ঝকঝক করে উঠলো তার হাতের মুঠো।

না, যন্ত্রণাটা এখন পিঠের দিকে নেমে যাচ্ছে, সামনের সীটে বসা একজন লোক ছোট চোখে একবার তার দিকে তাকাল। এরকম অভিজ্ঞতা তার আগে কখনো হয়নি; জ্বলে যাচ্ছে সমস্ত পিঠ; ছোটবেলা থেকেই সে নানা অসুখে ভুগেছে, কিন্তু তার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। বুকের শব্দ যেন বাসের চাকার শব্দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। আসলে তার ভয় করছিল, আঙুল কাঁপছিল; পেছনের বাসেই কী কেউ তাকে ফলো করে আসছে? হয়তো একটা সুযোগের অপেক্ষা, তারপর কোনো গাছের নিচে পড়ে থাকা তার শক্ত দেহ...রক্তের দাগ...ঠোঁট চাটল অনুপম। একবার ইচ্ছে হল কন-ডাকটরকে জিজ্ঞেস করে বাসটা কী ঠিক পথেই যাচ্ছে! নাকি কোনো স্বপ্নের মধ্যে নেমে যাচ্ছে সে? বাসের আলোগুলো যেন হাজার হাজার জোনাকি হয়ে তার মাথার ভেতর ছুটে আসছে, হাত বাড়িয়ে কিছু ধরতে চাইল অনুপম, মাথার ভেতর জমা হচ্ছে নীল কুয়াশা, চোখের সামনে দেয়াল, আলো, চেয়ার, অনেকগুলো মুখ সব ঘুরে যাচ্ছে, মাথা তুলতে পারছে না অনুপম, স্বদেশ, তুই একটা ইডিয়ট, তোর জেল হওয়া উচিত, এভাবে মানুষকে নার্ভাস করে দিয়ে তুই কী...আসলে...আমি তুই এসব বাজে অভ্যাস ছেড়ে দে স্বদেশ, কালকেই তাপসকে ফোন করে ওর সঙ্গে একটা খুনোখুনির ছবি দেখতে যাব, স্বদেশ তোর এসব চালাকির জন্য ভুগতে হবে তোকে...সামান্য ঠোঁট নড়ল অনুপমের, ঘুমের মধ্যে মশা তাড়াবার মত হঠাৎ তার হাত উঠেই আবার নেমে গেল।

ঘাড়ের নিচের জ্বালাটা ক্রমশ ছড়িয়ে যাচ্ছে সমস্ত পিঠে; তার শরীরে কী কেউ পিন ফুটিয়ে যাচ্ছে? চাদরটা জড়িয়ে যাচ্ছে বুকে পিঠে। না, ঘুমের আর কোনো চানস্ নেই। এর পর পাহারাওয়ালার লাঠির শব্দ, কুকুরের বিটকেল চিৎকার, মাঝে মাঝে দূর থেকে মাটি কাঁপিয়ে ট্রেন চলে যাওয়া, হঠাৎ ট্যাকসির হর্ন, সব তার মাথার ভেতর তালগোল পাকিয়ে যাবে, ক্রমশ একটা অন্ধকারের ঢেউয়ের মাথায় ভাসতে ভাসতে সে শুনতে পাবে একটা বাজে, দুটো বাজে তিনটে...তারপর ভোরের নরম হাওয়ায় পায়ের শব্দ, ট্রাম বেরিয়ে পড়ার ঝনঝন শব্দ।...

বিছানায় উঠে বসল অনুপম। অন্ধকার। অন্ধকার। মশারির ভেতর। মশারির বাইরে। জানলার ওপিঠে সমস্ত পৃথিবী এখন যেন বাদামী আলোয় ভরে আছে, অনেকটা মেটে জ্যোৎস্নার মত। এইরকম আলোয় হঠাৎ কার জন্য বুক ভারি হয়ে আসে; যেন নিজেকে খুব পাপী মনে হয়; এই আলোয় দেয়াল ভেদ করে যতদূর ইচ্ছে যেন সে দেখতে পাচ্ছে। চোখের সামনে মশারি দুলছে, ছাদ, টেবিল, জলের গ্লাস, দেয়ালের ক্যালেণ্ডার সব ঘুরে যাচ্ছে। চোখ বন্ধ করল অনুপম।

খুলল। আবার বন্ধ করল। একসময় মশারির বাইরে চলে এল অনুপম। অন্ধকার সমস্ত ঘরে সরের মত ভাসছে, তার কপালে, চোখের পাতায় শীতল অন্ধকার, অনেকটা বাতাসে বুক ভরে নিল সে। তারপর সমস্ত ঘরে পায়চারি শুরু করল অনুপম। টেবিলের নিচে দেয়ালের আড়ালে কেউ কী সুযোগের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে? হয়তো... না, আর কিছুই আলাদা করে ভাবার শক্তি নেই তার। হাজার হাজার দমকল যেন ছুটে যাচ্ছে তার মাথার ভেতর, সে কী এখুনি মাটিতে পড়ে যাবে?

না, এ হতে পারে না। নির্ঘাৎ স্বদেশ ইয়ার্কি করেছে আমার সঙ্গে। আমি সুস্থ। স্বাভাবিক। ঠিক আর পাঁচজন মানুষের মত। সংসারে খুব আরামে আর পাঁচজনের মতই জলছবি হয়ে বেঁচে আছি। আমার কোনো দুঃখ রোগ নেই, অ্যামবিশান নেই। তবে আমার কী হবে? কী ক্ষতি হতে পারে আমার? কে ক্ষতি করবে? হোয়াই?... আমি পাবলিক ম্যান নই, চোরাকারবারী নই, লেখক নই, অভিনেতা নই, রাজনীতি করি না আমি, আমার তিরিশ বছর বয়স হয়ে গেল, আমি অনুপম, অনুপম সেন। অত্যন্ত নিয়মিত জীবনযাপন করি। অফিস করি, কাজে ফাঁকি দেই, বড়বাবু মেজাজ দেখালে ব্যাটাকে মনে মনে তুলোধুনো করি, ভিড়ের গুঁতোতে কষ্ট পাই, টাইপ সেকসানের লম্বাটে মেয়েটিকে কেমন দুঃখী বলে ভাবতে ভাল লাগে আমার, অফিসারের ধমক খেয়ে দাঁত বের করে থাকি অনেকক্ষণ; আড্ডা মারি, ঘুমোই, মাঝে মাঝে গোপাল কেবিনে বসে রাস্তার নরম চোখমুখ জরিপ করি, ভিখিরিকে দুপয়সা দিলে দারুণ অহংকার হয় আমার, বাড়িতে অনুরোধের আসর শুনি, মাঝে মাঝে স্বপ্নের মধ্যে লটারির দশ লক্ষ টাকা জিতে যাই, সুচিত্রা সেনের ছবি এলে দু'তিনবার করে দেখি, মিনু মাঝে মাঝে দু' একটাকা চেয়ে নেয় আমার কাছ থেকে, কখনো শরীর খারাপ লাগলে খুব ট্যাক্সি করতে ইচ্ছে হয় আমার, শালার ড্রাইভাররা আমাকে পাত্তা দেয় না। আমার মাথায় একটা পাকা চুল বার করে মিনু একদিন খুব জোরে হেসেছিল—ছোড়দা, তুই এবার একটা বিয়ে কর; মাও হেসেছিল; আর বিয়েফিয়ে করলে আটদশদিন ছুটি নিয়ে সুন্দর একটা জায়গায় হয়তো চলে যাব, বানিয়ে বানিয়ে কথা বলব; বৌকে যেমন সবাই খালি বৌয়ের মত ভাবে, আমিও তাই ভাবতে থাকব। আহা! সন্ধ্যাবেলা ভিড়ের মধ্যে বৌকে নিয়ে হেঁটে যাওয়া... শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে গরম সিঙাড়া খাওয়া, খাম আর সেফটিপিন কিনে আনা; তার মানে সবাই যেভাবে বেঁচে আছে, মানে এক দুই তিন সবার যা যা হলে সুখ, আমিও সেই সুখের জন্য হাত বাড়িয়ে বসে থাকব। তবে আমার নতুন কী হতে পারে? কী ক্ষতি হবে আমার? চাকরি চলে যাবে? বাসে অ্যাকসিডেন্ট হবে? স্বদেশ তুই কী শেষ পর্যন্ত মানুষ ঠকাতে শুরু করলি?

আবার বিছানায় ফিরে এল অনুপম। চাদরটা উল্টে দিল। বালিশগুলো সরিয়ে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। রাত্রির মন্থর নির্জনতার গন্ধ বাতাস ভারি করে তুলছে এখন। চোখে কপালে বুকের ওপর অন্ধকার আর হাওয়া; কোথাও কী ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে যাচ্ছে? আজ কী শেষ রাতে জ্যোৎস্না উঠবে? চোখ বন্ধ করল অনুপম। অনেকগুলো টুকরো ছবি একসঙ্গে চোখের ওপর গড়িয়ে যাচ্ছে এখন। সেই বিরাট শূন্যমার্গ, একটা জীর্ণ কালো হয়ে আসা শিবমন্দির, তাদের মাঠের গোলপোস্ট, পূর্বদিক দিয়ে আসানসোলের লাইন, এগারোটায় গোমো প্যাসেঞ্জার চলে গেল, এবার বাবার বাড়ি ফিরে আসা, সরস্বতী পুজোর দিনরাত জাগা, বৃষ্টিতে ভিজে ফুটবল খেলে জ্বর বানিয়ে পরীক্ষা না দিতে পারা... আর একদিন কার্তিকের ছোট বিকেলে গাছের মাথায় রোদ যখন অভিমানের মত ছড়িয়ে ছিল তখন রুমাদির রেললাইনে মাথা পেতে দেওয়া; রক্ত... শরীর বেঁকে দুমড়ে যাওয়া...ইংরেজিতে অনার্স পড়ত রুমাদি; তাকে একটা নীল রঙের সোয়েটার বানিয়ে দিয়েছিল, সার্কাস দেখতে গিয়ে যার মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া ...সব সব অবিকল মনে পড়ল, মনে পড়ছে এখন। শান্তির একটা ছোট নিঃশ্বাসে বুক ভরে গেল তার। ঠিক আছে। তাহলে সব ঠিক আছে। স্মৃতি অবিকল আছে আমার। অনেকদিন পর রোদ দেখলে যে রকম মানুষ খুশি হয়ে ওঠে, অনুপম তার ভেতরে অবিকল সে রকম কিছু টের পাচ্ছিল এখন। শিস দিল একবার। হাততালি দেবো একবার? ঠোঁট ফাঁক হল অনুপমের। চোখ বুজে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমের কথা ভাবল অনুপম।

হাওয়ার ভেতর যেন মিহি একটা শব্দ ভেসে আসছে। শব্দটা তার জানলার ওপর ছড়িয়ে যাচ্ছে। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সেই শব্দটা ধরতে চেষ্টা করল অনুপম। বাইরে কে তাকে ডাকছে। সব কেমন গুলিয়ে ফেলছিল সে; এত রাতে কে তাকে ডাকবে? মানে কে তাকে ডাকতে পারে? পাড়ার কেউ? কিন্তু সে তো পাড়ায় তেমন একটা মেশে না কারো সঙ্গে; তবে?...

জানলার বাইরে আবার নিজের নাম পরিষ্কার শুনতে পেল অনুপম। ভুল নেই, কেউ তারই নাম ধরে ডাকছে। অস্বস্তি বাড়ছিল তার, ঠিক দাঁতের ফাঁকে কিছু আটকে থাকার মত, কে আবার জ্বালাতন শুরু করল এত রাতে? রাবিশ! কী চায় তার কাছে? নাকি কারো বাড়িতে অসুখ টসুখ, একটা ফোন করতে চায়, কিন্তু ফোন তো বড়দার ঘরে; তাহলে? পুলিশের লোক? সে বেরোলেই তাকে... না, মাথার ভেতর ঝনঝন করে ওঠে; অনুপম উঠে দাঁড়াল। জানলার বাইরে এখনো বাদামি আলো, দূরের বাড়িগুলো এখন কেমন পরিত্যক্ত মনে হয়, একটু যেন শীত টের পাচ্ছিল সে; হঠাৎ নিজের জন্য অদ্ভুত এক কষ্ট টের পেল অনুপম; অফিস, কাজ, দেয়ালের পোস্টার, পরিবার ছোট রাখুন, ট্রামের তার ছিঁড়ে যাওয়া, বোমার আঘাতে সাতজন আহত,... এসব যেন অন্য কোন গ্রহের কথা মনে হয়... এই মুহূর্তে বিশাল অন্ধকারে সে একা; নির্জনতায় ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে শুধু; এই আলোয় দীর্ঘকাল কার জন্য অপেক্ষা করে থাকার কথা মনে হয়; কোথাও কী পাখি ডেকে উঠল? এখন কী পাতায় টলটল করছে নীলাভ শিশিরের ফোঁটা?...

আর একবার তার নিজের নাম ঘরের অন্ধকারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। আর তখন পরিষ্কার হয়ে গেল সব কিছু; বাইরে স্বদেশের গলা; স্বদেশ ডাকছে তাকে। তৃপ্তিতে চোখ বুজে এল তার।

দ্যাখো, তখন একটা বাজে ইয়ার্কি করে এখন সেটা সামলে নিতে এতদূরে ছুটে এসেছে স্বদেশ। হয়তো বাড়ি ফিরে ওর মনে হয়েছে কথাটা আমি অন্যভাবে নিতে পারি, আর তার ফলে প্রেসার ট্রেসার বেড়ে গিয়ে একটা অনর্থ...কিন্তু ও এল কী করে? বাস ট্রাম তো কখন বন্ধ হয়ে গেছে; তাহলে হেঁটে? এতটা পথ? সেই যতীন দাস রোড থেকে টালিগঞ্জ? কী জানি! হয়তো বাড়ি ফিরে স্বদেশও ঘুমোতে পারেনি। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে এল অনুপম।

মধ্যরাতের এক ধরনের স্নিগ্ধতায় এখন বাতাস ভারি হয়ে আছে। গাছের পাতা খুব হালকাভাবে দুলছে, কাঁপছে। আকাশকে মনে হয় খুব গভীর, রহস্যময়। অনেক কিছু মনে পড়ে এই রকম গোলাকার আকাশের নিচে দাঁড়ালে। হাওয়া ছুঁয়ে যায় তাকে। চারপাশে তাকাল অনুপম, একটুকরো জমির ওপর ফিকে আলোয় স্বদেশ দাঁড়িয়ে আছে; ওকে এখন কী রকম পাথরের মূর্তির মত মনে হয়; লিচু গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে স্বদেশ।

—কী রে, তুই এত রাত্তিরে?

অনুপম তাড়াতাড়ি ওর দিকে এগিয়ে গেল। এই মাঝ রাত্তিরে তোকে আসতে হল তো?... কিন্তু লিচু গাছের নিচে স্বদেশের ছায়ামূর্তি অচল। এগিয়ে এল না, কথা বলল না; ভৌতিক ছায়ার মত বাদামি আলোয় গাছের সঙ্গে যেন মিশে আছে। অনুপম দেখতে পেল লিচু গাছের ডালপালা ভেঙে একটা অদ্ভুত ছায়ার কারুকার্য জড়িয়ে আছে ওর সমস্ত শরীর; অবাক হয়ে গেল সে, শরীরে শুধু একটা চাদর জড়ানো, খালি পা স্বদেশের। ও কী তবে বিছানা থেকে সোজা উঠে চলে

এসেছে? ওর খালি পা কেন? তাহলে কী ওদের বাড়িতে কোনো বিপদ আপদ...

অনুপম হাত তুলল। একবার জোরে স্বদেশের নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠতে চাইল; কিন্তু কথা ফুটলো না, কী রকম ভেঙে ভেঙে ওর স্বর হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে ভেসে গেল। তবু আর একবার চেষ্টা করল অনুপম; ওভাবে ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আয়, ভেতরে আয়।

ফিকে আলোয় গাছের জড়িয়ে থাকা ছায়ার ভেতর স্বদেশের শরীর একটা পাহাড়ী ভাল্লুকের মত নড়েচড়ে উঠল; আঙুল তুলল স্বদেশ, চল, বাইরে চল।

—কোথায়?...

কিছুই বুঝতে পারছিল না অনুপম। কোনো উত্তর না দিয়ে স্বদেশ তখন হাঁটতে শুরু করেছে। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল অনুপম—কী হয়েছে তোর? তুই কী কিছু চুরি করে পালাচ্ছিস নাকি?... এত জোরে হাঁটছিস কেন?

অদ্ভুত একটা গন্ধ নাকে এল অনুপমের। এই গন্ধে স্নায়ু কেমন ঢিলে হয়ে আসে, চোখ ভার ভার লাগছে, ধোঁয়ায় যেন ভরে যাচ্ছে তার চোখ: চারপাশের রাত্রির মন্থর নির্জনতা লক্ষ হাত বাড়িয়ে টানছিল তাকে। আর আশ্চর্য! তখন সে খিদে টের পেল, পরিষ্কার মনে পড়ল রাতে তার খাওয়া হয়নি, তলপেটে কেমন চিনচিন ব্যথা করছে; রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বুক কেঁপে ওঠে, আহা! যদি একটু জল খেতে পারা যেত!... অদ্ভুত! এই পথে সে কোনোদিন হেঁটে যায়নি, এসব বাড়ি সে জীবনে দেখেছে বলে মনে করতে পারল না, অনেক গাছ আকাশ চিরে শূন্যে উঠে আছে, ফিকে জ্যোৎস্নার আলো তার গায়ে পিছলে যাচ্ছে, আর একটু আগেই স্বদেশের ছায়ামূর্তিটা এগিয়ে যাচ্ছে, অনুপম টের পাচ্ছিল তার পা ক্রমশ ভারি হয়ে উঠছে। কয়েকবার দ্রুত দম ফেলল সে, আঙুলগুলো কী বসে যাবে মাটিতে?... টের পাচ্ছে অনুপম, বিশাল আকাশ আর চারপাশের সীমাহীন নিস্তব্ধতা তার রক্তের ভেতর শিরাউপশিরায় একটা করুণ ঘণ্টাধ্বনির মত ছড়িয়ে যাচ্ছে...ক্রমশ...তার হাতে কী রক্ত লেগে যাচ্ছে?...

—এই স্বদেশ: কী হচ্ছে তোর?...

সমস্ত ব্যাপারটা অসহ্য লাগছিল তার, এসব কী আরম্ভ করেছে স্বদেশ? থামছে না, ডাকলে উত্তর দিচ্ছে না? তবে কী শেষ পর্যন্ত স্বদেশ আমাকে...

অনুপম পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবল একবার।

পায়ের নিচে জলের মত ঠাণ্ডা একটা স্পর্শ টের পেল অনুপম। জলই হবে হয়তো। সেই ঠাণ্ডা স্পর্শটা ক্রমশ তার সমস্ত শরীরে উঠে আসছে, রক্তপ্রবাহ জমিয়ে দিচ্ছে তার, গোড়ালির মাংস কী খুলে পড়ে যাবে? দূরে স্বদেশের ছায়ামূর্তিও দাঁড়িয়ে। অনুপম আর একবার হাত তুলল, সমস্ত ইন্দ্রিয় এখন শিথিল হয়ে আসছে তার, এই অন্ধকার যেন ছুটে আসছে তার বুক লক্ষ্য করে; ঠোঁট সামান্য ফাঁক হল তার, জিভ দিয়ে অন্ধকার চাটল একবার, আকাশ না গাছ কোথায় আগুন লেগেছে এখন? শেষ চেষ্টা করল একবার;

স্বদেশ শোন, এভাবে তুই আমাকে...

ক্রমশ জায়গাটা চিনতে পারছিল অনুপম। এখন আর চোখের ভেতর ধোঁয়ার অস্পষ্টতা নেই, জ্যোৎস্না ঝকঝক করে উঠল, খুব স্বাভাবিক হয়ে আসছে তার নিঃশ্বাস। যেন মধ্যরাতে ঘুম না এলে সে এমনি পথে ঘুরতে বেরিয়েছে। ভাল করে তাকাল চারদিকে; সেই পুরনো মাঠ, তাদের গোলপোস্ট, বৃষ্টির মধ্যে বল নিয়ে ছুটছে তারক, একটু দূরেই টিলার ওপরে নীল রুমাল হাতে স্বদেশ দাঁড়িয়ে আছে... তেইশে জানুয়ারি আঙুল বিঁধিয়ে শপথ নিচ্ছে তারা, ওই তো একসারি তাল গাছ পর পর সাজানো, এখানেই পিকনিক করতে এসে মীরাদির শাড়িতে আগুন ধরে গিয়েছিল, সূর্যাস্তের অলৌকিক আলোর মধ্য দিয়ে মাঠের ওপর সাইকেলে তাদের ইতিহাসের টীচার ভুবনবাবু কোথায় যেন যাচ্ছেন; বাবলা কাঁটার জঙ্গলে ছবিটা হারিয়ে গেল। ঝমঝম শব্দে বেরিয়ে যাচ্ছে ট্রেন: অদ্ভুত মিষ্টি একটা ফুলের গন্ধ; ঘুম ভেঙে চোখে পড়ে তার আকাশ ঝুঁকে আছে তাদের জানলায়, তার হাতের মুঠোয় অসংখ্য নক্ষত্র, তাড়াতাড়ি বালিশ সরিয়ে মার শরীরে মুখ ঢাকে সে; ছুটে আসছে বাচ্চু, তপু, খোকন... রেললাইনের ওপর পড়ে আছে রুমাদির কাটা শরীর। রক্ত! দলাপাকানো নরম শরীর!... অথচ রুমাদির আঙুলগুলো মনে হত মোমের তৈরি... ম্যাটিনি শো দেখতে গেল মা... অনুপম চিৎকার করে উঠতে চাইল; রুমাদি, ট্রেন আসছে!...

আর তখনই সেই ভয়ংকর দৃশ্যটা তার চোখে আটকে গেল। তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে স্বদেশ, চোখ দুটো ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, স্বদেশের হাত রক্তহীন হয়ে ক্রমশ ফুলে উঠছে... আবার বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দটা শুনতে পাচ্ছিল অনুপম। আলো তীরের ফলার মত বিঁধে যাচ্ছে চোখে, সমস্ত রোমকূপ খাড়া হয়ে উঠছে বোধহয়; পরিষ্কার দেখল অনুপম, জ্যোৎস্নায় স্বদেশের হাতের মুঠোয় ছুরিটা ঝকঝক করে উঠল। ওর সমস্ত মুখ ঘামে ভিজে যাচ্ছে এখন, ক্রমশ স্বদেশের ফ্যাকাসে হাত তার বুকের কাছে উঠে আসছে, অনুপমের শরীর কী ওর নিঃশ্বাসে পুড়ে যাবে?...

—কী চাস তুই? তোর চোখমুখ এরকম অশ্লীল হয়ে উঠছে কেন? স্বদেশের হাত আরও এগিয়ে আসছে, এইবার এই ছুরিটা সোজা তার বুকে...স্বদেশ, তুই কী এখানে টেনে এনে এভাবে আমাকে খুন করবি এখন?... দ্যাখ, আমি তো তোর কোনো ক্ষতি করিনি। তুই আমার হাফ-প্যান্ট পরার সময় থেকে বন্ধু, আমায় তুই ছেড়ে দে, প্লীজ!... আমার মা, মিনু, আমার বিয়ের জন্য মা আজকাল ফোটো-টটো দেখে বেড়াচ্ছে, সামনের মাসে আমার ইনক্রিমেণ্ট; স্বদেশ একবার সবটা ভেবে দ্যাখ তুই...

ছায়াজড়ানো পাহাড়ী ভাল্লুকের মূর্তিটা শুধু একবার নড়েচড়ে উঠল। আর পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে অনুপম দেখল সমস্ত আকাশ লাল হয়ে উঠছে আগুনে, স্বদেশের হাতের ছোরাটায় তাজা রক্ত!...

স্বদেশ, তুই আমায় ছোরা মারলি!...

চিৎকার শুনে মিনু ছুটে এ ঘরে এল। কিন্তু ঘরে ঢুকতে গিয়েই দরজার ফ্রেমে পাথর হয়ে গেল মিনুর শরীর। শুধু কোনোরকমে মুখ দিয়ে আর্ত স্বর বেরিয়ে এল একটা—মা, বড়দা, একবার শিগগির এসো, ছোড়দার ঘরে!...

তখন সবাই এল। সবাই দেখতে পেল। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরে। স্বাভাবিক, স্নিগ্ধ হাওয়া ঘরের ভেতর, বাইরে গোলাকার চকচকে আকাশ, একটা কাঠগোলাপ গাছে পাখির কিচিরমিচির... মশারিটা হাওয়ায় দুলছে, একটা বালিশ পড়ে আছে মেঝেতে, অনুপমের একটা হাত ঝুলে আছে বাইরে, চাদরটা পেঁচিয়ে গেছে বুকে পিঠে; সমস্ত শরীর রক্তে ভাসছে অনুপমের, বালিশে রক্তের দাগ, এমন কী মেঝেতেও রক্ত গড়িয়ে যাওয়ার চিহ্ন।

—কী হল অনুর?... বড়দা ছুটে এলেন বিছানার কাছে।

—এ কী সর্বনাশ হল!... মার গলা বসে যাচ্ছে কান্নায়।

—ছোড়দাকে কে খুন করেছে? একটা বিহ্বল প্রশ্ন মুখ থেকে বেরিয়ে এল মিনুর।

চাদরটা সরাতে সরাতে বড়দা বললেন—কাল অনেক রাতে স্বদেশ ফোন করে জিজ্ঞেস করেছিল, অনু ঠিকমত বাড়ি ফিরেছে কীনা;—এরই বা মানে কী?...

তারপর প্রচণ্ড শক্তিতে বড়দা অনুপমের শরীর ধরে ঝাঁকানি দিলেন; অনু...এই অনু...

কিন্তু কিছু দেখতে পেল না, কিছু শুনতে পেল না অনুপম।

সরল ছন্দে

শীতকালে কলকাতা শহরে সন্ধ্যা নামতেই এক অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। রাস্তাঘাট ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে যায়। রাস্তার আলোগুলি টিমটিম করে জ্বলে। একটু দূরের কিছু স্পষ্ট দেখা যায় না। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ধোঁয়া আর কুয়াশায় জট পাকিয়ে এই পরিবেশের সৃষ্টি। এর নাম ধোঁয়াসা। বর্ষার এই প্যাচপ্যাচানির মধ্যে শীতের সেই নির্মেঘ দিনগুলির জন্য অস্থির হয়ে দিন গুনছি। কিন্তু ধোঁয়াসার কথা মনে পড়তেই সেখানেও সব আনন্দ কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। প্রাণে ধরে আর কোনদিনের জন্য প্রতীক্ষা করে থাকা যায় না।

ধোঁয়ার তাড়নায় এমনিতেই আমরা অস্থির। সকালবেলা ঘরে ঘরে উনুন জ্বলে। কয়লা-ঘুঁটের ধোঁয়ায় পাড়া মাৎ। এমনি আর একবার হবে সন্ধ্যেবেলা। ধোঁয়ায় চারদিক ধোঁয়াক্কার। এই দুই বেলার জীবনই আমাদের কাছে খুব পরিচিত। কলকাতা শহরে বাস করতে গেলে এটুকু বোঝার ওপর শাকের আঁটি হিসাবেই গণ্য করতে হবে। রাতে মশা আর দিনে মাছির সঙ্গে দুবেলার এই বাড়তি উপদ্রবটুকুকেও মানিয়ে নিতে হবে। এর হাত থেকে রেহাই নেই। এদিকে স্বাস্থ্য-বিদ্‌দের সতর্কবাণী অহরহ ধ্বনিত হচ্ছে, এই ধোঁয়ায় নাগরিকদের স্বাস্থ্য বিপন্ন হবার সম্ভাবনা। এতো বিপদের সম্ভাবনা। কিন্তু ত্রাণের পথ নেই। দুবেলা উনুন জ্বলবে। কারণ, জঠরজ্বালার সঙ্গে এর সম্পর্ক। কোন নিষেধ এখানে খাটবে না। স্বাভাবিকভাবেই ঘুঁটে-কয়লার ধোঁয়ায় বাতাস ভারি হবে। কার্বনের ভাগ বাতাসে এমনিতেই বেশি। কল-কারখানার চিমনি-নির্গত ধোঁয়ায় এই পরম উপকারটুকু সাধিত হয়। উনুনের ধোঁয়ায় এই মাত্রা একটু বাড়ে। অক্সিজেনের পরিবর্তে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে কার্বন-ডাই-অক্‌-সাইডের সম্পর্কটাই নিবিড় হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্যের সব সম্পর্কই প্রায় এমনিভাবে ছিন্ন হয়ে পড়ছে দিনে দিনে।

শহরেই এই সমস্যা প্রবল। গ্রামে তেমন নয়। কাঠের উনুনে ধোঁয়া খুব একটা হয় না। আর গ্রামে জনবসতিও তেমন ঘন নয়। সেদিক থেকে সেখানকার জীবন এমনিতে স্বাস্থ্যবিধিসম্মত। কিন্তু শহরজীবনে এই প্রথম শর্তটুকুই লঙ্ঘিত হয়। স্বাস্থ্যবিধির লঙ্ঘন কিন্তু এই শেষ নয়, শুরু বলা চলে। ঘুঁটে-কয়লার রান্নায় খাদ্যপ্রাণও নষ্ট হয় বেশ। এই ক্ষতিটা কাঠের জ্বালে হয় না। অন্য সব ক্ষতির সঙ্গে এটুকুও আমাদের মেনে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। কারণ, এই শহরের নাগরিকদের স্বাস্থ্যরক্ষায় কারো তেমন উৎসাহ নেই। সবাই উপদেশ দিয়েই খালাস।

এদিকে শহরে জনসংখ্যা বাড়ছে। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার কোন উপায় নেই। একটা কিছু করতেই হবে। অবশ্য ইলেকট্রিসিটিকে রান্নাবান্নার কাজে হাতে লাগানো হচ্ছে। কিন্তু তারপরেও একটা 'কিন্তু' আছে। প্রথমত, এর ব্যবহারবিধি সবাইকে জানতে হবে। দ্বিতীয়ত, খরচের দিকটা এতে বাড়বে বই কমবে না। অধিকাংশ পরিবারের পক্ষে এই বাড়তি বোঝা বহন করা অসুবিধাজনক এবং ক্ষেত্র-বিশেষে অসম্ভব। তবে কোন কোন বাড়িতে নিজ নিজ উদ্যোগে বিদ্যুতে রান্নাবান্না করা হয়। এতে শুধু যে শহর ধোঁয়ার হাত থেকে বেঁচে যায় তাই নয়, বাড়িটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার সুযোগ পায়। আসবাবপত্র কয়লার ধোঁয়ায় মলিন হওয়ার সুযোগ পায় না। খরচ হয়তো এতে কিছু বেশি পড়ে কিন্তু বাঁচোয়া অনেক দিক থেকে। সেটা ভেবেই কেউ কেউ এই ব্যবস্থা নিয়েছেন।

এতো গেল গোটা শহরে হাতে গোনা কয়েকটি পরিবারের কথা। এর বাইরে রয়েছে অসংখ্য পরিবার যাঁরা কয়লা উনুনের হাত থেকে রেহাই পেতে চান
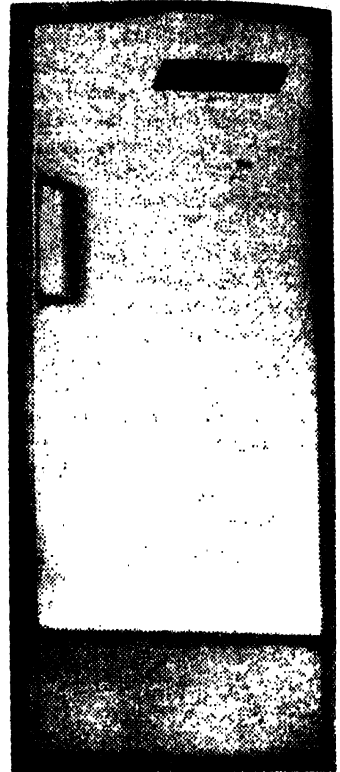
কয়লার ধোঁয়ায় স্বাস্থ্য তো নষ্ট হয় সকলের কিন্তু বাড়িঘর নোংরা হওয়া অসহ্য। বিশেষ, বাড়ি করতে সবাই টের পেয়ে যান কেমন খরচ পড়ে। ইদানীং যাঁরা বাড়ি করছেন, তাঁরা একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে বাড়ির নকসা তৈরি করছেন। এক-একটা বাড়ি যেন এক-একটা ছবি। শহরের কয়েকটি অঞ্চল দেখে তাই মনে হয়। কয়লার ধোঁয়ায় এ-বাড়ি নোংরা হোক কার প্রাণে তা সহ্য হয়। এদিক থেকে একটা বিকল্পের সন্ধান করছিলেন এঁরা। এঁদের এই সুযোগ এনে দিয়েছে গ্যাস। এতে ধোঁয়ার উৎপাত নেই। প্রয়োজনে বার্নারটি খুলে দেশলাই দিয়ে ধরিয়ে নেওয়া। রান্না করতে সময় বেশ কম লাগে। সবচেয়ে বড়ো সুবিধে হলো, আঁচ ওঠার জন্য পাখার হাওয়া করতে হয় না আর আঁচ পড়ে যাওয়ার আশংকাও নেই। কয়লা-ঘুঁটে-কেরোসিনের ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এজন্য আলাদা জায়গার বন্দোবস্ত করতে হতো। সেদিক থেকে কিছুটা জায়গারও সুবিধে হয়। সকাল থেকে সন্ধে অবধি উনুনে ঠেলার দায় থেকে গিন্নিরা অব্যাহতি পাচ্ছেন।

গ্যাসে রান্না করা সুবিধে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রথমদিকে একটু খরচ বেশি পড়ে যায়। কারণ এজন্য আলাদা উনুন কিনতে হয়। কোমর-সমান উঁচু করে এই উনুন বসাতে হয়। গ্যাস সিলিণ্ডার ফুরিয়ে গেলে কোম্পানী খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে নয়া সিলিণ্ডার দিয়ে যায়। নানা কোম্পানী গ্যাস যোগানের দায়িত্ব নিয়েছে। তাছাড়া সরাসরি গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থাও আছে। এই ব্যবস্থা গিন্নিদের খুবই মনে ধরেছে। রান্নাবান্নায় গ্যাসের ব্যবহারও ক্রমেই বাড়ছে। রান্নার প্রায় অর্ধেক ঝামেলাই কমে গিয়েছে। আগে যেখানে উদ্যোগ-আয়োজন করতে করতেই অনেকখানি সময় কেটে যেতো, সেটা আর নয়া ব্যবস্থায় হয় না। এটা কম আসানের কথা নয়। রান্নার দেরির জন্য অফিস লেট হওয়ারও আশংকা নেই। রোজগেরে স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে এই ব্যবস্থা খুবই সহায়ক।

গ্যাসের অনেক আগেই আর একটি জিনিস গিন্নিদের পরম সহায়করূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেটি হলো রেফ্রিজারেটর। আমাদের দেশে সবাই রোজ রান্না করেন। আসলে আমরা রান্না করতে ভালবাসি। একদিন রেঁধে তিনদিন চালানো আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ। বাসি খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যবিধিতে আটকায়। যতদিক দিয়ে যত স্বাস্থ্যহানিই হোক এটুকু কিন্তু আমরা বরাবর রক্ষা করে আসছি। বাসি খাবার মুখে তুলতে সবাই নারাজ। ফ্রিজ থাকলে রান্নাকরা খাবারদাবার আর বাসি হবার সুযোগ পায় না।

ফ্রিজ কেউ কেউ ভাবেন বিলাসের সামগ্রী, বাড়িতে রাখা সম্ভব নয়। এখন আর ওটা বিলাসের বস্তু নয়—প্রয়োজনীয় জিনিস। হায়ার-পারচেজে তা কেনাও যায়। একবার একটা ফ্রিজ কিনতে পারলে নানা-

দিক থেকেই সুবিধা। আমাদের পরিশ্রম অনেকখানি বেঁচে যাবে। কয়লার উনুন থেকে যেমন গ্যাসে উত্তীর্ণ হয়ে আমরা সারাদিন উনুন ঠেঙানোর দায় থেকে অব্যাহতি পেয়েছি, তেমনি ফ্রিজ কিনতে পারলে রোজ রান্নার ঝামেলা থেকে বেঁচে যাবো। এতে সময়ই শুধু বাঁচবে তা নয়, খরচও কমবে।

ফ্রিজের ঠাণ্ডা খাবার খেতে যদি অসুবিধে হয় তো একটু গরম করে নিলেই চলবে। এজন্য হট প্লেটের ব্যবস্থা রাখলে আর কোন ঝঞ্ঝাটই নেই। অবশ্য গ্যাস উনুনে কেউ কেউ গোড়াতেই হট প্লেট বসিয়ে নেন। আবার যাঁরা বিদ্যুতে রান্না করেন, তাঁরাও হট প্লেটযুক্ত উনুন ব্যবহার করেন। এর পর সংসার করা আর কোন সমস্যাই নয়। সব সমস্যারই সমাধান প্রায় হয়ে গেল।

ঘরসংসার করতে গেলে রান্না ছাড়াও অনেক কাজ করতে হয়। কাপড় কাচা, ঘর ধোওয়া মোছা, জানালা-দরজা পরিষ্কার করা এমনি আরো কত কি। আগেকার দিনে ঘর ধুতে মুছতে বা জানালা-দরজা পরিষ্কার করতে কোমর ব্যথা হয়ে যেতো। উবু হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়ে এসব কাজ করতে হতো। এখন আর এ-কাজে তেমন সমস্যা নেই। স্পঞ্জ আর লিনেন ডাস্টারের সাহায্যে এসব কাজ করতে তেমন কষ্টও হয় না আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোমর-পিঠ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকতেও হয় না। কয়েক মিনিটেই সব কাজ সাঙ্গ করে গা টানটান করা যায়।

এর চেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল কাপড় কাচা। এমনি খুচখাচ কাচাকাচি রোজই থাকতো। মাঝে মাঝে একদিন বাড়ির সমস্ত কাপড় কাচতে হতো। তার নাম ছিল ক্ষার কাচা। আগের দিন রাত্রিবেলা সেসব কাপড় সেদ্ধ করা হতো। পরদিন সকালবেলা শুরু হতো কাচা। এতো কাপড় কাচতে বেলা ক'টা বাজবে কেউ জানে না। যেদিন ক্ষার কাচা হতো, সেদিন খেতে খেতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। এমনি ছিল ব্যবস্থা। সে-ব্যবস্থার এখন অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। কাপড় কাচার

বাঙলা দেশের মেয়েরা এক চরম দুঃস্বপ্নের মুখোমুখি

মেশিন বেরিয়েছে। তাবৎ নোংরা কাপড়ও সেখানে কাচা হয়ে যায় মুহূর্তে। কাচতে কোনরকম কায়িক শ্রমের দরকার হয় না। কাচা হয়ে যাওয়ার পর জামাকাপড় নিংড়ে টাঙিয়ে দেওয়া। এতে পরিশ্রম কমে শুধু নয়, খরচও বেশ কমে। ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উইলসনের স্ত্রী বলেছিলেন, আমার স্বামী এখন প্রধানমন্ত্রী। কোন বিলাস আমার কাম্য নয়। একটি কাপড় কাচার মেসিন কিনে এবার সর্বশেষ ঝিটিকেও বিদেয় করে দেব। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভাল যে, কাপড় কাচার মতো কাপড় শুকোনোর মেসিনও আছে। এতে আরো নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কাপড় কাচার পর বর্ষা-বাদলা যদি বাদ সাধে, সে-পথ বেশ মেরে দেওয়া হলো। এখন আর কারো মুখাপেক্ষী নয়।

যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে আমাদের কায়িক শ্রম অনেক কমেছে। বাড়তি সময় পেয়ে পেয়ে একদিন হয়তো আমরা পুরোপুরি শ্রমবিহীন হয়ে পড়বো। ইতিমধ্যে শোনা যাচ্ছে অটোমেশনের পদধ্বনি। এখন পর্যন্ত আমাদের কাজকর্মে যেটুকু সময় ব্যয় হয়, তখন হয়তো আর তারও প্রয়োজন হবে না। যন্ত্রের কৃপায় সব কাজ ইচ্ছানুযায়ী সম্পন্ন হবে। সে-দিনের কথা ভাবতেও বেশ রোমাঞ্চ হয়। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ভাবনা গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। কর্মহীন মানুষের দিনগুলি কাটবে কি করে? তবে এ-ভাবনাটা আপাতত মাথায়ই ঘুরঘুর করুক। ঝেড়ে ফেলার দরকার নেই, আবার খুব একটা মাথা ঘামানোরও কারণ নেই। এর সঠিক হিসেবনিকেশ হবে ভবিষ্যতের সেই বিশেষ দিনক্ষণে। তবে এই পরিশ্রম বাঁচার জন্যে কর্তারা কিছুটা ব্যাজার হয়েছেন। কারণ তাঁরা ভাবেন যে, যন্ত্রের দৌলতে গিন্নিরা দিন দিন কুঁড়ে হয়ে পড়ছেন এবং প্রতিটি মুহূর্তকেই বিশ্রামসুখে ভরিয়ে তুলছেন। হয়তো কোন সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকা হাতে নিয়ে বিছানা বা আরামকেদারায় গা এলিয়ে তাঁরা বসে থাকেন। এদিকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে কর্তাদের রোজগার করতে হচ্ছে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য। এই মন কষাকষি থেকে বাঁচবার একটা পথই আছে। সেটা হলো কর্তাদের ব্যাজার মন খুশি করতে একটা সহজ রোজগারের উপায় যদি গিন্নিরা মাথা খাটিয়ে বের করতে পারেন। গিন্নিরা একটু ভেবে দেখুন।

— প্রমীলা

চুঁচুড়ায় গঙ্গার তীরে আজও একখানি পুরোনো জীর্ণ বাড়ির কঙ্কাল দেখা যায় যার ইতিহাস সুদূর অতীতের স্মরণীয় অনেক কাহিনীর মতোই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন। অষ্টাদশ শতকে ওলন্দাজরা যখন এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে তখন ওরা যে ধাঁচে বাড়ি তৈরী করত, এ বাড়িখানি ছিল তারই অনুরূপ। স্থানীয় লোকেরা এ বাড়ির নাম দিয়েছিল 'বিধবার কুঠী'। কিন্তু কেন যে বাড়িখানি ঐ নামে অভিহিত হয়েছিল সে ইতিহাস পরবর্তী-কালে কেউ আর মনে রাখেনি। শতাধিক বৎসর পরে ঐ রহস্য সম্প্রতি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে নিতান্ত আকস্মিকভাবে। ইংলণ্ডের ওয়েস্টারশায়ারে এক জমিদার বাড়ির পুরোনো আসবাবপত্র বিক্রি হবার পর সেই ভাঙগাচোরা জিনিসপত্রের মধ্যে ক্রেতার নজরে পড়ে একরাশ চিঠিপত্র ভরা একটা পুরোনো কাঠের বাক্‌স। চিঠিগুলি লেখা অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে। লেখক কল-কাতার একজন অখ্যাত ইংরেজ ব্যবসাদার। চিঠিগুলো সে লিখেছে ওয়েস্টারশায়ারের বাসিন্দা তার এক বন্ধুকে। চিঠিগুলির বেশীর ভাগই লেখকের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনার বিবরণেই ভরা। তবে ওরই ফাঁকে ফাঁকে পত্রলেখক তৎকালীন প্রবাসী ইংরেজ সমাজের নানান খবর পরিবেশন করেছে বন্ধুর কাছে। এদিক থেকে অনু-সন্ধিৎসু পাঠকসমাজের কাছে চিঠিগুলির যে একটা মূল্য আছে এটা অনস্বীকার্য। চিঠিগুলি যে একদা সর্বসাধারণের চোখে পড়তে পারে, এ সম্ভাবনা লেখকের মনে আদৌ জাগেনি আর সেই কারণেই সব-কিছু সে ব্যক্ত করেছে অকপটে। প্রবাসী ইংরেজদের চারিত্রিক দুর্বলতা গোপন করার চেষ্টা করেনি কোথাও। এই পত্রাবলী থেকেই আমরা জানতে পারি কলকাতার বাসিন্দা এক ইংরেজ দুহিতার কথা প্রেমের প্রতি যার নিষ্ঠা উপন্যাসের নায়িকার প্রেমকেও ম্লান করে দেয়। স্বামীর অকালমৃত্যুর ফলে সে এমনি শোকাহত হয়ে পড়ে যে যৌবনেই সংসারের সকল সুখ পরিহার করে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটিয়ে দেয় চুঁচুড়ায় গঙ্গার তীরে এক নিরালা পুরীতে—শুধু স্বামীর স্মৃতিটুকু সম্বল করে।

যে সময়কার কাহিনী আমরা বলছি তখন ইংলণ্ডে অভিজাত সমাজের একদল তরুণ অত্যন্ত উচ্ছৃংখল ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। এদেরই একজন ছিল রডনি লিণ্ডসে। অল্পবয়সেই পিতা-মাতাকে হারিয়ে শিক্ষার সুযোগ সে পায়নি। পিতা প্রতিপত্তিশালী জমিদার ছিলেন বটে, কিন্তু জমিদারী চাল বজায় রাখতে গিয়ে তাঁর সম্পত্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে। পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে রডনি যে সম্পত্তিটুকু পায় তার আয়ে তার বিলাস-বহুল জীবনযাত্রার ব্যয় মেটানো অসম্ভব

হয়ে পড়ল। রডনি যে শুধু বিলাসপ্রিয় ছিল তা নয়, জুয়া খেলার নেশা ছিল তার প্রচণ্ড। জুয়ায় প্রচুর টাকা লোকসান দিয়ে সে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টায় সে হয়ে উঠল বেপরোয়া। সেই সময় ফ্রান্স থেকে গোপনে মদ আর রেশমী কাপড় আমদানি করে মোটা টাকা রোজগার করছিল একদল অর্থলোভী দুর্বৃত্ত। ঋণমুক্ত হবার আশায় রডনি যোগ দিল সেই দলে। শুল্ক ফাঁকি দিয়ে মাল আনার কোনো সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল না ওদের। দিন কতক ওরা বেশ সাফল্যের সঙ্গেই কাজ চালিয়ে গেল। তারপর একদিন অকস্মাৎ বিপদ এল ঘনিয়ে। রাত্রির অন্ধকারে মাল নিয়ে ওরা ফিরছিল সাসেক্সের সমুদ্রোপকূল থেকে। আগে থেকে খবর পেয়ে শুল্ক অফিসাররা ফাঁদ পেতেছিল ওদের ধরবার জন্যে। বেপরোয়াভাবে পিস্তল চালিয়ে পুলিসের ব্যূহ ভেদ করে ওরা পালিয়ে গেল কোনরকমে। সংঘর্ষের সময় গুরুতরভাবে আহত হল একজন শুল্ক অফিসার। যারা ঐ বেআইনী ব্যবসা চালিয়ে আসছিল এতদিন, তারা সবাই ভয় পেয়ে গা ঢাকা দিল সঙ্গে সঙ্গে। রডনি আশ্রয় নিল, গ্রামাঞ্চলের এক নিভৃত পল্লীতে। ভাবল, বিপদটা কেটে যাবার পর সে ফিরে আসবে শহরে। কিন্তু পুলিশ কর্তৃপক্ষ কোন সূত্রে খবর পেল, ঐ ঘটনার সঙ্গে রডনি জড়িত এবং ওর সন্ধানে তৎপর হয়ে উঠল। আর্থিক অবস্থায় ভাঁটা পড়লেও রডনির আত্মাভিমান এতটুকু কমেনি। সে যে এক বনেদী জমিদারবংশের সন্তান এ গর্বটা ছিল তার পুরোদস্তুর। আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখে অবশেষে এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের শরণাপন্ন হল সে। ইনি ব্যবসায়ী ছিলেন বলে রডনি এঁকে এতকাল অবজ্ঞার চোখেই দেখে এসেছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকায় ইনি ঐ কোম্পানীতে একটা চাকরি জুটিয়ে দিলেন রডনিকে এবং ভারতগামী জাহাজে তুলে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন বাংলা মুলুকে।

রডনি ছিল অত্যন্ত উদ্ধত ও একগুঁয়ে। বয়সটা তার তখন এমন যে সদুপদেশে কান দেওয়া দূরের কথা, সদুপদেশ কেউ দিলে মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। রডনিকে চাকরি জুটিয়ে দিলেন যিনি, তিনি অবশ্য ওকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিলেন যেন সে অতঃপর কুসংসর্গে না মেশে, ভদ্রভাবে জীবন যাপন করে বিদেশে। রডনি কিন্তু সহৃদয় আত্মীয়ের উপদেশ তো শুনলই না, বরং ও যে ঠিকপথের চলেছে এটা প্রমাণ করার জন্যই যেন কলকাতায় পৌঁছেই একদল উচ্ছৃঙ্খল যুবককে বেছে নিল সঙ্গী হিসেবে। ওরা ছিল সার ফিলিপ ফ্রান্সিস-এর অনুগামী ও অন্ধ স্তাবক। ফান্সিস-এর প্রতি ওদের শ্রদ্ধা ছিল এমনি উৎকট রকমের যে ওরা তাকে বলত, 'কিং ফ্রান্সিস দা ফার্স্ট'। ওদের কারও কোন প্রতিভা ছিল না, ওরা শুধু নেতার চালচলন অনুকরণ করত অন্ধের মতো আর সব কিছুর [illegible] এমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব প্রদর্শন করত যাতে সবাই মনে করে শিক্ষাদীক্ষায় ওরা সাধারণের অনেক ঊর্ধ্বে। প্রতি রবিবার সকালে ঘোড়ায় চড়ে, স্যর ফ্রান্সিস-এর কুকুরগুলো নিয়ে শিকারে যেত ওরা এবং ঐ ঘোড়ায় চড়ার পোশাকই ওরা পরে থাকত সারাদিন। এমন কি নাচের আসরেও ওরা হাজির হত ঐ পোশাকেই শিকারের চাবুকটা সগর্বে দোলাতে দোলাতে। এদেশের কোনো কিছুই ফ্রান্সিস-এর কাছে প্রীতিকর ছিল না বলে ওরা ভারতীয় ভাষা ও রীতিনীতি সম্বন্ধে নিজেদের অজ্ঞতা অশোভন গর্বের সঙ্গে জাহির করে বেড়াত। শুধু তাই নয়, উপনিষদ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস-এর প্রচেষ্টাকে ওরা কদর্য ভাষায় উপহাস করত প্রকাশ্যভাবে। ফ্রান্সিস-এর অনুগ্রহপুষ্ট হওয়ায় ওদের স্পর্ধা এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে, একবার ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সামনেই অভদ্র আচরণ করতে দ্বিধাবোধ করেনি ওরা। ওয়ারেন হেস্টিংস অবশ্য ওদের এই অপরাধ উপেক্ষা করেছিলেন, তবে এটা মনে করা ভুল হবে যে, ওদের দাপটের দরুণ শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেননি তিনি। আসল ব্যাপার ছিল এই যে, ফ্রান্সিস-এর সঙ্গে তাঁর যে বিরোধটা ছিল সেটাকে তিনি আর বাড়িয়ে তুলতে চাননি ঐ সব অপদার্থ যুবকদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু এ ব্যাপারে হেস্টিংসকে নিষ্ক্রিয় দেখে ওরা ধারণা করে বসল, ওরা এত শক্তিমান যে কেউ ওদের অঙ্গস্পর্শ করতে সাহস করে না এবং ঐ ধারণার ফলে ওদের উচ্ছৃঙ্খলতা দিনে দিনে চরমে গিয়ে পৌঁছল। পথেঘাটে যখন তখন ঝগড়া মারামারি করা, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অপমান করা এসব ওদের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম হয়ে দাঁড়াল।

এই উচ্ছৃঙ্খল তরুণদলে রডনির প্রতিপত্তি ছিল সবচেয়ে বেশী। একে তো সে জমিদারের ছেলে, তার ওপর সে ছিল এক সময় লণ্ডনের ডাকসাইটে ক্লাবগুলোর সদস্য। পরে যখন ওরা শুনল রডনির সাহস ও বিক্রমের কথা, পুলিশের সঙ্গে তার মুখোমুখি লড়াই আর পিস্তলের গুলীতে একজন শুল্ক অফিসারকে জখম করে অন্তর্ধান, তখন তাকে রীতিমত ঈর্ষার চোখে দেখতে লাগল ওরা। কারণ ওদের বেশীর ভাগই ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে এবং স্বদেশে থাকার সময় ওরকম বেপরোয়া গুণ্ডামির সুযোগ পায়নি কোনদিন।

রডনিকে দলের গৌরব বলে মনে করলেও তার সাহচর্য সবসময় বরদাস্ত করতে পারত না ওরা। রডনি ছিল উগ্রস্বভাব ও খামখেয়ালী। চুঁচুড়ায় একখানা বাড়ি কিনেছিল সে। হয়তো তার মতলব ছিল, বিলাতী অভিজাত ক্লাবের ধরনে ওখানে একটা ক্লাব গড়ে তুলবে প্রমোদ-পিয়াসীদের জন্যে। কিন্তু তার ঐ খেয়ালী [illegible]স্বভাবের দরুণ সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে গেল। একবার বহু নিমন্ত্রিত অতিথির সমাগম হয়েছিল তার বাড়িতে। সবাই যখন হাস্য-পরিহাস ও খোশগল্পে মশগুল সেই সময় হঠাৎ রডনি হল থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়াটা বার করল আস্তাবল থেকে, তারপর তার পিঠে চেপে রাতের অন্ধকারে কোথায় যে চলে গেল কেউ তা জানতে পারল না। অতিথিরা কিছু বুঝতে না পেরে রডনির জন্য অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ, তারপর যে যার ঘরে ফিরে গেল ক্ষুব্ধচিত্তে।

পরিচিত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে রডনি টাকা ধার করত নির্লজ্জের মতো এবং যতক্ষণ হাতে টাকা থাকত ততক্ষণ সে খরচ করত বেপরোয়াভাবে। টাকা যেই ফুরিয়ে যেত অমনি বাড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে কোন সদাশয় বন্ধুর স্কন্ধে ভর করত বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না করে। কিন্তু মজার কথা এই যে, বন্ধুদের আতিথেয়তার সুযোগ নিতে দ্বিধাবোধ না করলেও তাদের প্রসন্ন রাখার চেষ্টা সে করত না কোনদিন। তারা যে অতি সাধারণ স্তরের মানুষ ও নিতান্ত ভাগ্যগুণে ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছে একথাটা সে তাদের শুনিয়ে দিত সুযোগ পেলেই।

রডনির প্রতি বন্ধুদের অনুরাগ কমে এল দিনে দিনে এবং রডনির মানসিক অস্থিরতা এমন এক স্তরে এসে পৌঁছল যে জীবনের যা কিছু আনন্দ তার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেল।

এর পর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। তারপর এসে পড়ল বড়দিনের উৎসব। নাচের আসর বসল লাটসাহেবের বাড়িতে। শহরের শ্বেতাঙ্গিনীরা সবাই এল সেই আসরে—লাট সাহেবের প্রণয়িনী থেকে শুরু করে দীনতম কর্মচারীর কন্যা পর্যন্ত। সেসময় ফ্রান্সিস-এর প্রণয়পাত্রী ছিল রূপসী মাদাম দে গ্রাঁদ। সে-ও এসেছে চটকদার পোশাক পরে। ফ্রান্সিস এর ভক্ত তরুণদের কয়েকজন ঘোরাফেরা করছে তার চারপাশে, সসম্ভ্রমে অভিবাদন করছে তাকে আর মাঝে মাঝে দলপতির অশালীন রসিকতার তারিফ করছে কৃত্রিম হাসি হেসে। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সেখানে এসে দাঁড়াল রডনি।

রডনির চেহারা ছিল সুন্দর, মেয়েদের আকর্ষণ করবার মত। তাছাড়া অর্থগৃধ্নু স্বৈরিণী বলে রডনি ওকে অবজ্ঞা করত বলে মাদাম গ্রাঁদেরও চেষ্টা ছিল রডনিকে ঘায়েল করবার। কোন পার্টি বা সমাবেশে যখনই রডনি কাছে এসে দাঁড়াত তখনই লালসাভরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে তাকাত তার দিকে। রডনি যেই লক্ষ্য করল মাদাম গ্রাঁদ-এর নীল চোখ দুটো তার মুখের ওপর নিবদ্ধ অমনি সে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল সেখান থেকে। যেখানে মদ পরিবেশন করে অতিথিদের আপ্যায়ণ করা হচ্ছে সে-জায়গাটার আকর্ষণ তার কাছে অনেক বেশী।

এই হৈ-হুল্লোড় রডনি পছন্দ করে না মোটেই। ঐ যে দুর্বলচিত্ত পুরুষগুলো যারা

রুপোলি কর্ড-লাগানো জাম্বী কোট পরে ঘর্মাক্তদেহে নাচছে আর ওদের ঐ লাস্যময়ী সঙ্গিনীরা যাদের সারা মুখে রং ও পাউডারের কদর্য আস্তরণ, পোশাকের আড়ম্বরে দেহের কুশ্রীতা ঢাকবার জন্যে যারা সচেষ্ট— কোনদিনই ওরা মোহ জাগায় না তার মনে। ওরা তার ঘৃণার পাত্র।

হলের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে রডনি লক্ষ্য করল, এক জায়গায় একটা টেবিলের ধারে বসে রয়েছে ন্যাথানিল পিকারিং। লোকটি তার পরিচিত। ঘোড়ার সাজের ছোট্ট একটা দোকান আছে তার, কয়েকবার টুকিটাকি কাজও সে করেছে তাকে খুশী করবার জন্যে। তারই পাশে বসে রয়েছে উনিশ কুড়ি বছরের একটি তন্বী তরুণী। চকচকে কালো সিল্কের পোশাক তার পরনে। মুখে রঙের প্রলেপ নেই, অলংকারের বাহুল্যও নেই। শুধু কাঁধের কাছে রংবেরঙের পাথর-বসানো ছোট একটি ব্রুচ। ঐ সব সাজ-গোজ করা রঙ্গিণীদের মধ্যে তাকেই যেন সবচেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছিল। কি ভেবে রডনি এগিয়ে গেল ওদের কাছে।

ন্যাথানিল শশব্যস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বার বার হাত দুটো ঘষতে ঘষতে বিনয়ের সঙ্গে জানাল সঙ্গিনী তার বাগ্‌দত্তা স্ত্রী। মেয়েটিকে এক নজরে দেখে নিল রডনি। মেয়েটি সুশ্রী, মুখের চেহারায় সারল্যের ভাব পরিস্ফুট। বাঁকা ভুরুর নীচে টানা টানা চোখে কেমন এক স্বপ্ন আবেশ।

রডনি বসে পড়ল ওদের পাশে। শুরু করল নানান আজেবাজে গল্প। মিনিট কয়েকের মধ্যেই নিজেকে সে বেশ অন্তরঙ্গ করে ফেলল হাসিকৌতুকের মধ্য দিয়ে। লক্ষ্য করল, মেয়েটির চোখ মুখে উৎসাহের দীপ্তি ফুটে উঠেছে। আবার বেহালার সুর বেজে উঠল হলঘরে। সবাই তৈরী হল নাচবার জন্যে। রডনি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল সে নাচতে রাজী কিনা তার সঙ্গে। সম্মতি জানাল মেয়েটি। ন্যাথানিল খুশীই হল এতে, কারণ সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোকানে কাজ করে পা দুটো তার ক্লান্ত, নাচবার সামর্থ্য নেই। একটা নাচ শেষ হবার পর আরেকটা নাচ। তারপর আবার আরেকটা। তৃতীয়বার ন্যাথানিলের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করল না ওরা। ন্যাথানিল বসে রইল বিমর্ষমুখে, হয়তো মনে মনে ঠিক করে নিচ্ছিল কী সে মেয়েটিকে বলবে তিরস্কারের ছলে রডনি বিদায় নেবার পর।

কিন্তু ন্যাথানিল কোনো সুযোগই পেল না মেয়েটিকে কিছু বলবার। বল নাচের শেষের দিকে নৃত্যরত পুরুষ ও মহিলারা নাচতে নাচতে হলের চারদিকে ঘুরতে লাগল বিপুল বেগে এবং সেই হট্টগোলের মধ্যে রডনি আর ন্যাথানিলের বাগদত্তা ঐ মেয়েটি কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল কেউ টের পেল না। বিমূঢ়ের মতো ন্যাথানিল যাকে সামনে দেখতে পায় তাকেই প্রশ্ন করে রডনি আর তার বাগ্‌দত্তা পত্নী সম্বন্ধে। সবাই তখন ঘরে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত, কেউই তার কথায় কর্ণপাত করে না। রাগে দুঃখে ন্যাথানিল মনে মনে অভিসম্পাত করে রডনিকে।

পরের দিন সকালেই সবাই শুনল, রডনি বিয়ে করেছে। রাত তিনটের সময় সে নাকি যাজকের বাড়ি গিয়ে দরজায় করাঘাত করতে থাকে ভীষণভাবে। ঘুম থেকে উঠে দারোয়ান দরজা খুলে দেয়। দারোয়ানকে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিয়ে সে সোজা চলে যায় যাজকের শোবার ঘরে এবং পিস্তল উঁচিয়ে তাঁকে বাধ্য করে শয্যা থেকে উঠে এসে নাইটক্যাপ-পরা অবস্থায় বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে। অনুষ্ঠানের একমাত্র সাক্ষী ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত ঐ নিদ্রালু দারোয়ান এবং বিবাহবন্ধনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয় একটা পিতলের আংটা যা রডনি ছিনিয়ে নিয়েছিল যাজকের মশারির ছত্রি থেকে।

রডনির স্বভাবটা যারা জানত তারা ওর ঐ অদ্ভুত ব্যাপারটা শুনে একটুও আশ্চর্য হল না, এ নিয়ে আলোচনাও করল না নিজেদের মধ্যে। কিন্তু শহরের শ্বেতাঙ্গ সমাজের বেশীর ভাগ স্ত্রী-পুরুষের কাছে এটা রসদ জোগাল খোশগল্পের। আলোচনা করবার এধরনের রসালো ব্যাপার অনেকদিন পায়নি তারা। সবচেয়ে মজার কথা এই যে, রডনির নবপরিণীতা বধূর এমন কোনো গুণপনার কথা তারা শোনেনি এ পর্যন্ত যা কোনো বুদ্ধিমান পুরুষকে আকর্ষণ করতে পারে। মাস কতক আগে মা-বাবার সঙ্গে মেয়েটি এদেশে আসে ন্যাথানিলকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে। কিশোরীসুলভ তার সরল সলজ্জ আচরণ এদেশে কোনো ইংরেজ যুবককে আকৃষ্ট করে নি। শোনা যায়, ন্যাথানিলকে বিয়ে করে স্বদেশে ফিরে গিয়ে ওরা ওখানে ঘোড়ার সাজের কারবার খুলে বসবে এই নাকি ছিল ওর ইচ্ছা। এর বেশী আর কিছু ও চায় না। ওর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ওর বাবার মতন। বাবা ছিলেন সৎ নির্লোভ ও নিষ্ঠাবান খৃষ্টান। কলকাতায় সুতীবস্ত্রের ব্যবসা ছিল তাঁর। প্রবাসী ইংরেজদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা আদৌ পছন্দ করতেন না তিনি। আর সেই কারণেই ব্যবসায় বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি।

সপ্তাহ দুই পরে রডনিকে আবার দেখা গেল কলকাতা শহরে। একদিন সন্ধ্যার দিকে সে হাজির হল বাকস ক্লাবে। অত্যধিক মদ্যপান করার ফলে তার পা দুটো তখন টলছে। টেবিলের ওপর গোটা কয়েক ব্রান্ডির বোতল পর পর সাজিয়ে রেখে কাউকে কিছু না বলে সে বেরিয়ে এল ক্লাবঘর থেকে এবং বাইরে এসে ঘোড়ার পিঠে চাপল কোনরকমে।

ন্যাথানিলের দোকানের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল রডনি। তার চুল এলোমেলো, মুখচোখের চেহারা কেমন যেন অস্বাভাবিক। দোকানের ভিতর ঢুকে ন্যাথানিলকে সে বললে, ইউরোপ থেকে আমদানি করা হাল ফ্যাশানের এক জোড়া 'স্পার' তার চাই। কয়েক জোড়া স্পার ছিল দেওয়ালের গায়ে উঁচু তাকের ওপর। মই বেয়ে উঠে উপর থেকে এক জোড়া স্পার নামিয়ে আনল ন্যাথানিল। কাউন্টারের ওপর কনুই রেখে স্পার জোড়া ভালো করে পরীক্ষা করল রডনি। তারপর মুখ না তুলে আস্তে আস্তে বললে, 'তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি, ন্যাথানিল। অবশ্য আমি যদি বুঝতাম, আমি যেমন আশা করেছিলাম ঠিক তেমনিভাবে চলবে সব কিছু, তা হলে ক্ষমা চাইতাম না আমি। মেয়েটির কথা চিন্তা করে বা তোমার মনে দুঃখ দিয়েছি বলে অনুতাপ জাগত না আমার মনে।

ওকে আমি বিয়ে করেছিলাম কেন তা তুমি জানো না। আমার মনে হয়েছিল ও শান্ত সরল ও বোকা এবং আমি চেয়েওছিলাম ও ঐরকমই থাকুক চিরদিন। একটা ক্ষীণ আশা আমার ছিল, একদিন হয়তো ওর ঐ সরলতা ও সহজ মাধুর্য আমার এই উদ্দাম জীবনকে সংযত করতে পারবে। কিন্তু দেখলাম, আমার ধারণা ভুল। মেয়েটির বুদ্ধি প্রখর আর নীতিজ্ঞান কঠোর। ও যেটাকে সত্য বলে জানে তা থেকে এক চুলও ওকে নড়ানো যায় না। এই অনমনীয়তা ও পেয়েছে ওর বাপের কাছ থেকে। ও যে এই প্রকৃতির মেয়ে তা কে জানত? আমি ভেবেছিলাম ও সেই রূপকথার সিন্ডারেলা—যে শুধু তার স্নিগ্ধ মাধুর্য দিয়ে ভরিয়ে রাখবে আমার মন, নিজের আদর্শ নিয়ে মাথা ঘামাবে না কোনদিন।'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে মুখ তুলে তাকাল ন্যাথানিয়েলের মুখের পানে। 'এর জন্যে অবশ্য অন্য কাউকে দায়ী করা যায় না—কাজটা আমারই। তোমার যে ক্ষতিটুকু করেছি—সেটা ঠিকমতো পূরণ করবার চেষ্টা করবো আমি।"

এক মুহূর্ত থেমে সে ব্যস্তভাবে বললে, "চট করে এসো দেখি একবার, ঘোড়ার পিঠে চড়তে আমায় একটু সাহায্য করো প্রসন্নমনে। দেখছ তো আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না, পা দুটো কাঁপছে।"

ন্যাথানিয়েল রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিল। রডানিকে সে পছন্দ করত বরাবরই, কারণ সে জানত রডানির আচরণ একটু উগ্র হলেও ছোট বড় সকলকেই সে সমান চোখে দেখে। রডানি তার বাগদত্তাকে ছিনিয়ে নেওয়ায় তার মনে দারুণ আঘাত লেগেছিল বটে, কিন্তু রডানির ওপর রাগটা সে মনের মধ্যে পোষণ করেনি বেশীদিন। রডানির এই অদ্ভুত আচরণ আর এলোমেলো কথাবার্তা তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। ওর যা অবস্থা তাতে পথে বিপদ ঘটা কিছু বিচিত্র নয়। এক মিনিট সে ভাবল, তারপর আর দ্বিধা না করে ওকে তুলে দিল ঘোড়ার পিঠে। কিন্তু মনটা কেমন খচ খচ করতে লাগল তার। চুপ করে বসে থাকতে পারল না। যে পথে রডানি গিয়েছে সেই পথ ধরে চলল ঘোড়ায় চেপে।

শহরের পাকা সড়ক ছাড়িয়ে গাঁয়ের পথে এগিয়ে চলল সে। দুপাশে ঝোপ-ঝাড় খানা-ডোবা। চাঁদের আলোয় পথ ধরে যেতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। অনেকটা পথ অতিক্রম করার পর চুঁচুড় থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে রডানির ঘোড়াটাকে সে দেখতে পেল পথের পাশেই একটা মাঠে চরে বেড়াতে। ঘোড়াটা ঘাস খাচ্ছে মনের সুখে, কিন্তু পিঠে তার আরোহী নেই। ন্যাথানিয়েলের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। রডানি গেল কোথায়?

এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করতেই সে দেখতে পেল রডানি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে পথের ধারে খানার মধ্যে। চুলগুলো কাদায় জড়িয়ে গেছে, পোশাক রক্তে লাল। ওয়েস্ট কোটের বোতাম খুলে সে ওর বুকের ওপর হাত রেখে দেখল, তখনও হৃদপিণ্ডটা ধুক ধুক করছে। আস্তে আস্তে রডানিকে তুলে নিয়ে সে ঘোড়ার পিঠে চাপালে, তার পর লাগামটা এক হাতে ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলল রডানির বাড়ির দিকে।

দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে স্বামীর জন্যে হলঘরে অপেক্ষা করছিল রডানির স্ত্রী। পায়ের শব্দ শুনে দুহাতে দুটো জ্বলন্ত মোমবাতি তুলে ধরে ব্যস্তভাবে এগিয়ে এল সে। রডানিকে ঐ অবস্থায় দেখে মুখখানা তার ফ্যাকাশে হয়ে গেল, কিন্তু কোনরকম চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না সে। রডানিকে একটা কোচের ওপর শুইয়ে দিল ন্যাথানিয়েল। এক গামলা জল আর একটা তোয়ালে নিয়ে এল রডানির স্ত্রী। রডানির মুখের কাদা আর রক্ত ধুয়ে দিল পরিষ্কার করে। তারপর রডানির মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে রইল স্থিরভাবে। যখন বোঝা গেল রডানির জীবন-দীপ নিবে এসেছে তখন সে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না, ভেঙে পড়ল কান্নায়।

"রডানি, আমায় কিছু বলবার আছে তোমার?" আকুলভাবে প্রশ্ন করে সে।

"না, বলবার কিছু নেই। আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।" অস্পষ্ট ভারী গলায় জবাব দিল রডানি।"

"যদি তোমার মৃত্যু হয়, জেনে যাও অন্য কাউকে বিবাহ করব না আমি। আজীবন তোমার চিন্তায় কাটাবো।"

রডানি কোন জবাব দিল না।

"তুমি কি চাও অন্য কাউকে বিবাহ করি আমি?"

"তোমার যা খুশী করতে পারো—তাতে আমার কিছু যায় আসে না।" ক্লান্তভাবে রডানি মুখ ফেরালো দেওয়ালের দিকে এবং তার পরই তার কণ্ঠ নীরব হয়ে গেল চিরদিনের মত।

ন্যাথানিয়েল একটু ইতস্ততঃ করল, রডানির স্ত্রীর বেদনাবিহ্বল মুখের দিকে একবার তাকাল, তারপর নিঃশব্দে চলে গেল বাইরে।

রডানির মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রীর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব কিছুদিন চুপ করে বসে রইল। তারা ওর সঙ্গে যোগাযোগ করবার কোনো চেষ্টাই করল না। আশা করল, নিশ্চয়ই ও কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হবে এবং ফিরে আসবার জন্য আবেদন জানাবে মা বাবার কাছে। তারা অবশ্য আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল, আবেদন এলেই সাড়া দেবে এবং দু-চারটে তিরস্কারের বাণী শুনিয়ে দেবার পর ওকে আবার গ্রহণ করবে পরিবারের মধ্যে। কিন্তু এক মাস কেটে যাবার পরও যখন মেয়েটির দিক থেকে কোন আবেদন এসে পৌঁছল না, তখন তারা ইউনিটেরিয়ান চার্চের যাজকের শরণাপন্ন হল। যাজক রাজী হলেন সাহায্য করতে। ভদ্রলোক তর্কে সুপটু, মনটাও উদার। চুঁচুড়ায় গিয়ে একদিন তিনি দেখা করলেন মেয়েটির সঙ্গে। তিনি যে তার আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে এ কাজে ব্রতী হয়েছেন এটা অবশ্য গোপন করলেন তার কাছে। ঘটনাচক্রে যে হতভাগ্য যুবকের সঙ্গে কিছু-দিনের জন্য তার ভাগ্য জড়িত হয়েছিল তার নৈতিক দুর্বলতা সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে তিনি তাকে বললেন, বাইবেলে বর্ণিত সৎ মেষপালকের মত তিনি এসেছেন পথভ্রষ্ট মেষকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। মেয়েটি সব কথাই শুনল তাঁর। তারপর ধীর শান্ত গলায় বলল, রডানি যখন চার্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি কোনদিন, তখন চার্চের আশ্রয় গ্রহণ করে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারবে না সে। তার স্বামী যা ভালো বলে মনে করেছিল সেটা যে তার পক্ষেও ভালো এ বিশ্বাস সে ত্যাগ করতে চায় না। যাজক ভেবেছিলেন, মেয়েটি কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করবে। কিন্তু অনুতাপের কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। যাজকের যুক্তি খণ্ডন করবার জন্য কোনো চেষ্টাও সে করল না। দৌত্য নিষ্ফল হল দেখে বিমর্ষ-মুখে ফিরে গেলেন যাজক।

এর পর এলেন তার বাবা। সে যাতে পরিবারের কাছে ফিরে যায় তার জন্য অনেক বোঝালেন তিনি, কিন্তু মেয়ে কোনো কথাই কানে নিল না। তার সেই এক কথা—স্বামীর ঘর ছেড়ে কোথাও যাবে না সে। বিরক্ত হয়ে ফিরে গেলেন বাবা।

বাড়ি এসে রুষ্টমুখে বললেন, 'মেয়েটা ভারী একগুঁয়ে। যা ঝোঁক ধরবে তা থেকে এক চুলও ওকে নড়াতে পারবে না কেউ। আমার মেয়েকে আমি চিনি তো!

অল্পবয়সী মেয়ে, একা রয়েছে বাইরে। কীভাবে সে দিন কাটাচ্ছে জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে বাড়ির সকলেই। গোড়ায় বাবা কিছু ভাঙতে চান না। পরে তিনি সব বলেন সবিস্তারে। ওখানে সে রয়েছে ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহিণীদের মত। রডানি ছিল অভিজাত বংশের সন্তান। কাজেই তার বংশমর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে মেয়েটির সতর্ক দৃষ্টি। জমিদার-

বাড়ির গৃহিণীদের চালচলন, আদব-কায়দা সে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছে বইপত্র পড়ে। ওদেশে জমিদার বাড়িতে যেমন কুকুর আর ঘোড়া থাকে বিস্তর, সেও তেমনি এক পাল কুকুর আর ঘোড়া রেখেছে বাড়িতে। চাকর-বাকরদের যে উর্দি দিয়েছে তাতে রডনির কুলচিহ্ন। বিকেলের দিকে খোলা গাড়িতে চড়ে সে প্রায়ই বেড়াতে বেরোয় গ্রামের পথে আর মাঝে মাঝে স্থানীয় কয়েকজন বৃদ্ধ ওলন্দাজ অফিসারকে আমন্ত্রণ করে সামাজিক শিষ্টাচার রক্ষা করার জন্য। এই পল্লীভবন যেন তাকে সম্মোহিত করে রেখেছে—এ তার স্বামীর ঘর, এ জায়গা ছেড়ে কোথাও যেতে মন চায় না তার।

বন্ধুবান্ধবরা যখন এই সব কথা শুনল তখন রীতিমত অবাক হয়ে গেল তারা। তাদের অনেকে তাকে দেখতে এল চুঁচুড়ায়, কিন্তু ক্রমশঃ তাদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে এল। নিয়মিত আসা-যাওয়া করত শুধু ন্যাথানিল। ন্যাথানিল এলে রডনির স্ত্রী খুব খুশী হত বটে, কিন্তু পুনরায় বিয়ে করার চিন্তা কোনো-দিনই উদয় হত না তার মনে। ন্যাথানিলের অনুরাগ যেন বাড়ছিল দিনে দিনে। কত না রঙীন ছবি সে আঁকত মেয়েটির মন ভোলাবার জন্যে! ইংলণ্ডের নরম সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ, সেই মিষ্টি বাতাস, ওদের সেই ছোট্ট শহর মার্কেট হারবরো, ওখানে আবার ফিরে যাবে ওরা, ঘোড়ার সাজের ব্যবসা করবে, সুন্দর একখানি বাড়ি তৈরী করবে রাস্তার ধারে, নীচের তলায় থাকবে দোকান, উপরতলায় বাস করবে ওরা, অভাব-অভিযোগ থাকবে না, দিনগুলো কাটবে অনাবিল আনন্দে। কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টাই হত নিষ্ফল, মেয়েটির মন গলাতে পারত না কিছুতেই। মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বলত, না, তা হয় না—সে আবার বিয়ে করে এ ইচ্ছা ছিল না রডনির। তার এই যে জীবন এটাই ছিল রডনির কাম্য এবং সে-ও তাই এটা গ্রহণ করেছে প্রসন্নচিত্তে। সে যদি স্বামীর ইচ্ছাটাকে মর্যাদা না দেয়, তবে তার স্বামীর আত্মা শান্তি পাবে না পরলোকে। রডনির চিন্তা শুধু যে তার সারা মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা নয়, রডনি এখন যেন সর্বগুণসম্পন্ন এক অতিমানবের মূর্তি নিয়ে তার সামনে উদ্ভাসিত!

দেখতে দেখতে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। কলকাতায় রডনির স্ত্রীর পরিচিত ছিল যারা, তাদের অনেকেই মোটা টাকা সঞ্চয় করে ফিরে গেল ইংলণ্ডে। বাকী যারা রইল এখানে, তারা একে একে চির-বিশ্রাম নিল সেটেলমেন্ট চার্চের প্রাঙ্গণে সবুজ ঘাসের নীচে। চুঁচুড়ায় রডনির স্ত্রীকে দেখতে আসত যারা, তাদের সংখ্যা কমে এল ক্রমশঃ। শেষ পর্যন্ত ন্যাথানিল ছাড়া অন্য কেউ আর আসত না ওর খোঁজখবর করতে। ন্যাথানিল অবশ্য ঠিক করেছিল, বিদেশে ওকে একা ফেলে রেখে স্বদেশে ফিরবে না কোনো কারণেই। ইতিমধ্যে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছিল ন্যাথানিল। ইচ্ছা করলে একখানা কেন, দশ বিশখানা বাড়ি সে কিনতে পারত মার্কেট হারবরোতে। কিন্তু এ টাকা তার কাছে এখন নিরর্থক। রডনির স্ত্রীও ইতিমধ্যে বদলে গেছে অনেক—চেহারায় ও মনে। এখন তার মুখে কুঞ্চনরেখা দেখা দিয়েছে, চোখের দৃষ্টিতে সে উজ্জ্বলতা আর নেই। যৌবনে যেটা ছিল মনের বিলাস বার্ধক্যে সেটা পরিণত হয়েছে এক উৎকট মানসিক ব্যাধিতে। দিনের বেলা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আপন-মনে সে কথা বলে ঘন্টার পর ঘন্টা, সন্ধ্যায় সাজগোজ করে হল-ঘরে টেবিলের ধারে বসে কল্পিত অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করে গভীর রাত পর্যন্ত।

প্রিয়তমার এই মানসিক বিপর্যয় ন্যাথানিলকে প্রভাবিত করল কিছুটা। সে-ও ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলল তার মানসিক ভারসাম্য। শেষে-র দিকে ওরস্টারশায়ারের বন্ধুর কাছে সে যে সমস্ত চিঠি লিখেছিল সেগুলোর বেশীর ভাগই দুর্বোধ্য। প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই বল নাচ আর পার্টির উল্লেখ দেখা যায় বার বার, তবে সেই সব আসরে উপস্থিত ছিল যারা তারা হয় মৃত, নয় কলকাতা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে। শেষের এই চিঠিগুলি থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায়, রডনির বিধবা স্ত্রীর মতোই ন্যাথানিলও তখন অপ্রকৃতিস্থ।

শরণার্থী — ফটো : প্রণব মুখার্জি
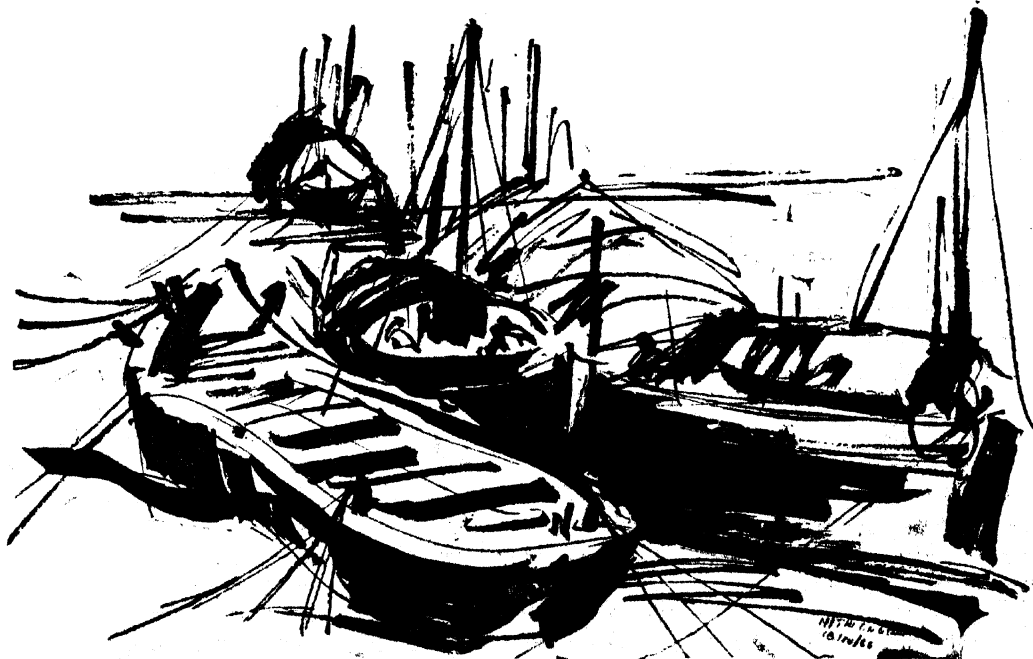
প্রবীণ শিল্পী জে এস বোথরা সম্প্রতি বিড়লা একাডেমীতে তাঁর একটি ছবির প্রদর্শনী করলেন। ৬ থেকে ১১ জুলাই অবধি অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীতে মাঝারি মাপের প্রায় সাতাশখানির মত ক্যানভাস রাখা হয়েছিল।

শ্রীবোথরার কাজে স্টাইলের বৈচিত্র্য এবং রঙের পরিণতি এই দুটি জিনিষই বিশেষ করে চোখে পড়ে। প্রথমটির মধ্যে সর্বত্র আকর্ষনীয়তা আছে বলা যায় না, কিন্তু দ্বিতীয়টির বিষয়ে মুন্সীয়ানা থাকার জন্যে অনেক ত্রুটিই চাপা পড়ে গিয়েছে। অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ফিগারেটিভ ও আধা-ফিগারেটিভ সবরকম রীতির ছবিই এখানে দেখা গেল। কয়েকটি ছবির ফর্মকে সাজানোর কাজ চমৎকার। 'আনড্রেসিং' ছবির চাপা নীল সবুজ ও বাদামীর সমারোহ আবছা দেখতে পাওয়া বস্ত্র উন্মোচন-কারিণীর আভাস বা প্রায় কুয়াশাচ্ছন্ন আব-হাওয়ার মধ্যে দেখা ধ্যানী মহাপুরুষের প্রস্তর-মূর্তি (সাব্লিমিটি) কিম্বা গোমতে-শ্বরের মূর্তির আদলে জোরালো তুলি চালনায় করা ফিগারের আমেজ বা প্রায় অ্যাবস্ট্রাক্ট 'ন্যুড'-এর মধ্যে পরিণত দৃষ্টি-ভংগীর ছাপ দেখা যায়। নানা টোনের স্পেস সৃষ্টি করে "প্যাসেজ" ছবিটির বর্ণাঢ্য রূপ বেশ তৃপ্তিকর। 'জৈনপট্ট' ছবিটিতে নিম্ন-গ্রামের রঙের ব্যবহারে ডেকরেটিভ ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মহিষমর্দিনী মূর্তিটি ভাস্কর্যের অনুপ্রেরণায় আঁকা। 'স্প্রিং', 'আভাস' ইত্যাদি সিরিজের ছবি-গুলির মধ্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন রঙের ওপর ছোট ছোট শাদা রং-এর ডেক-রেটিভ ছোপ দেওয়া হয়েছে। এতে টেক্সচার তৈরীর সুযোগ পাওয়া গেলেও মেজাজের দিক থেকে একটু একঘেয়ে ভাব এসে গিয়েছে।

●

[illegible] মুখার্জি ৭ থেকে ১৩ জুলাই [illegible] অব ফাইন আর্টসে কতকগুলি ড্রয়িং-এর প্রদর্শনী করলেন। বর্তমান পরি-স্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই অধিকাংশ ড্রইং তৈরী হয়েছে। প্রধানত সরু কালির রেখার মাঝে মাঝে মোটা রেখা টেনে একটা ক্যালিগ্রাফিক মেজাজ ও চেষ্টাকৃত বলিষ্ঠতা দেখানো হয়েছে। দু-একটি ঘোড়াও এঁকে-ছেন তিনি, ধূসর জমিতে বাদামী কালি ও শাদা চক দিয়ে। যীশুখৃষ্টের মত মূর্তিও এঁকেছেন, হয়ত নিখিল বিশ্বাসকে মনে করিয়ে দেবার জন্যে। 'আদিম' ছবিতে দণ্ডায়মান নগ্ন পুরুষ মূর্তি এঁকে একটু শক্ দেবার চেষ্টা করেছেন। শকুনে ঠুকরে নরদেহ ভক্ষণ করছে তার ছবিও এঁকেছেন। প্রতিরোধকারী জনগণ বল্লম হাতে দাঁড়িয়ে তা আঁকা হয়েছে। পি সি সরকারের ম্যাজিকের মত মাঝখান থেকে দ্বিখণ্ডিত করা নর-মূর্তি আঁকা হয়েছে। খুব ছোট মাপের চেয়ারের দু-পাশে দুটি দণ্ডায়মান নগ্নিকা মূর্তি আঁকা ছিল। কিন্তু কোন ছবিতেই পুরো ফিগার আঁকার চেষ্টা করেন নি। পন্মার বিবর্তনে কেমন যেন তেজের অভাব।

●

১০ থেকে ১৭ জুলাই আশুতোষ মিউজিয়ামের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সম্মেলন উপলক্ষ্যে মিউজিয়াম ভবনে বিভিন্ন মিউ-জিয়ামের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ও পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করা হয়। পৃথিবীর নানা দেশের নানা মিউ-জিয়াম কর্তৃক প্রকাশিত মনোগ্রাফ, স্লাইড, ছবির পোষ্টকার্ড, বই পোস্টার ইত্যাদির প্রচুর নিদর্শন এখানে প্রদর্শিত হয়। আশুতোষ মিউজিয়াম প্রকাশিত পুস্তক, পোষ্টকার্ড ইত্যাদিও প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ ছিল।

●

বাংলা দেশের বাস্তুহারাদের সাহায্যার্থে নানারকম আয়োজনের মধ্যে ফটোগ্রাফির একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। ফটো-গ্রাফার প্রণব মুখার্জি এবিষয়ে সচেতন তাই অল্পদিন হল বারানসী ও দিল্লীতে দুটি বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের ফটোগ্রাফের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনী দুটিই বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। উদ্বাস্তুদের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ছাপ অনেকগুলি মুখের মধ্যেই পরিষ্কার ভাবে প্রতিফলিত। তাছাড়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে প্রতি-রোধ গড়ে উঠছে তার ছবি তুলতেও তিনি অভ্যন্তরে অনেকদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তরুণ-তরুণীদের আত্মরক্ষা ও আক্রমণ-কৌশল শিক্ষার কয়েকটি ছবি ও পাকি-স্থানী মীরজাফরদের গ্রেপ্তারের ছবির মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয়তার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

—চিত্ররসিক

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে শ্রাবস্তী নগরীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বিষ্ণু-পুরাণের মতে সূর্যবংশীয় রাজা শ্রাবস্তের নামে এই নগরীর নামকরণ হয়েছে। রাম-চন্দ্রের পুত্র লব পিতার কাছ থেকে শ্রাবস্তীর অধিকার লাভ করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের পরবর্তীকালে অযোধ্যা শ্রীহীন হয়ে পড়ায় শ্রাবস্তীই হয় কোশলের রাজ-ধানী। ভগবান বুদ্ধের কালে কোশল ছিল ভারতের ষোলটি মহাজনপদের (প্রদেশ) অন্যতম, আর শ্রাবস্তী ছিল এর রাজধানী। বুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বকালে এখানে জৈন ধর্মের প্রভাব খুবই গভীর ছিল, রাজা প্রসেনজিত নিজেও জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। জৈন ধর্মের তৃতীয় ও অষ্টম তীর্থঙ্কর সম্ভবনাথ ও চন্দ্রপ্রভ এই শ্রাবস্তীতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে বুদ্ধের সমকালে এখানে তীর্থঙ্কর মহাবীরেরও পদার্পণ ঘটেছিল।

শ্রাবস্তী নগরী ছিল ভারতের একটি প্রাচীন ও প্রশস্ত বাণিজ্যপথের ধারে, এই পথটি রাজগৃহ, বারানসী পরিক্রম করে শ্রাবস্তী থেকে গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত পৈথান (প্রতিষ্ঠান) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পথটির সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অংশেরও যোগাযোগ ছিল। শ্রাবস্তীর নাগরিকেরা ব্যবসায়-বাণিজ্য সূত্রে প্রচুর ধন উপার্জন করত এবং এই কারণে শ্রাবস্তীর শিল্প-কলাও উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছিল।

শ্রাবস্তীর অন্যতম ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী ছিলেন সুদত্ত। ইনি গরীব-দুঃখীদের অন্নদান করে অনাথ-পিন্ডিক খ্যাতিলাভ করেছিলেন (বাংলাতে ইনিই অনাথপিন্ডদ নামে প্রসিদ্ধ)। ব্যবসায় সূত্রে এঁর রাজগৃহে যাতায়াত ছিল। বুদ্ধত্ব লাভের অব্যবহিত পরেই রাজগৃহের অধিবাসীরা বিপুল সংখ্যায় বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। ভগবান বুদ্ধের অন্যতম প্রচারকেন্দ্রও ছিল তদানীন্তন মগধের রাজধানী রাজগৃহ। রাজগৃহে প্রতিনিয়ত যাতায়াতের ফলে বুদ্ধ প্রভাবিত অনাথপিণ্ডিক বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ধর্মপ্রচারের জন্য শ্রাবস্তী আসার জন্য অনাথপিণ্ডক পুনঃপুনঃ বুদ্ধদেবকে অনুরোধ করায় বুদ্ধ তাঁর নিকট এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, শ্রাবস্তীতে একটি উপযুক্ত বিহার নির্মিত হওয়ার পরই তিনি শ্রাবস্তী যেতে পারেন এবং মাঝে মাঝে সেখানে বাস করতে পারেন। বুদ্ধের অনুমতি পেয়ে অনাথপিণ্ডক শ্রাবস্তীর উপকন্ঠে বুদ্ধ-বিহার নির্মাণের জন্য যে স্থানটি নির্বাচন করেন সেটি ছিল শ্রাবস্তীর অধীশ্বর প্রসেনজিতের পুত্র কুমার জেতের একটি উদ্যান, এটি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি—এর নাম ছিল জেত-বন। উদ্যানের ভূমিটুকু আচ্ছাদন করতে যত সুবর্ণমুদ্রা লাগবে তার বিনিময়ে অনাথপিণ্ডককে এই উদ্যান বিক্রয় করবেন কুমার জেতের এই সর্তে অনাথপিণ্ডক সম্মত হয়েছিলেন, কারণ ভারতের অন্যতম ধনী শ্রেষ্ঠী হিসাবে তাঁর

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

ভাণ্ডারে সুবর্ণমুদ্রার অপ্রতুলতা ছিল না। ভগবান বুদ্ধের প্রীতিসাধন, তাঁর সান্নিধ্য-লাভ ও সেবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। ১৮ কোটি সুবর্ণমুদ্রার বিনি-ময়ে অনাথপিণ্ডক জেতবনের ভূমিখণ্ড ক্রয় করে এখানে বুদ্ধ এবং বুদ্ধশিষ্যগণের বাসের জন্য মন্দির, সঙ্ঘারাম, বিহার প্রভৃতি নির্মাণ করান। এই কাজে তাঁর আরও আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হয়েছিল। বুদ্ধের ইচ্ছানুযায়ী বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য মৌদগল্যায়ন এই বিহার নির্মাণ কার্য পরি-চালন করেন। অনাথপিণ্ডক বলীবর্দবাহিত শকটের সাহায্যে কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা এনে যখন জেতবনের ভূমির উপর বিছিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন কুমার জেত অনাথ-পিণ্ডকের বুদ্ধভক্তি দেখে বিস্মিত হয়ে যান এবং তাঁর মনেও বুদ্ধভক্তির সঞ্চার হয়। অনাথপিণ্ডককে তিনি কিছু ভূমি-খণ্ড অনাবৃত রাখার অনুরোধ করেন এবং এই ভূমির উপর তিনি স্বয়ং নিজ ব্যয়ে একটি বিহার নির্মাণ করিয়ে দেন। খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভরাহুতে উৎকীর্ণ একটি প্রস্তর ফলকে অনাথ পিণ্ডক কর্তৃক সুবর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে জেতবনের ভূমি ক্রয় ঘটনাটি চিত্রিত আছে। বৌদ্ধসাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে জেতবন নির্মাণের কাহিনীতে বৈচিত্র্য দেখা যায়। কোন কোন পুস্তকে লিখিত আছে যে রাজ-কুমার জেত শেষ পর্যন্ত সুদত্ত প্রদত্ত ১৮ কোটি স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করেন নি এবং নিজ ব্যয়ে জেতবনে একটি বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন। যাই হোক, জেতবন বিহার নির্মাণে সুদত্ত বা অনাথপিণ্ডক যে বহু স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করেছিলেন, সে বিষয়ে কোন ভিন্নমত নেই। কুমার জেতের ভক্তিতে প্রসন্ন ভগবান বুদ্ধের ইচ্ছানুসারে কুমার জেতের নামে এই বিহারের নামকরণ করা হয় জেতবন বিহার। জেতবনে বুদ্ধের বাসের জন্য অনাথপিণ্ডক যে দুইটি মনোরম সৌধ নির্মাণ করান—তার নাম ছিল গন্ধ কুটি ও কোসাম্ব কুটি। বুদ্ধত্ব লাভের পর তৃতীয় বর্ষে ভগবান বুদ্ধ প্রথম

শ্রাবস্তীর ধ্বংসাবশেষ

শ্রাবস্তীতে পদার্পণ করেন। অচিরকালের মধ্যে শ্রাবস্তীর অগণিত নরনারী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। বুদ্ধের মহিমামুগ্ধ রাজা প্রসেনজিতও জৈনধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। জেতবনের অদূরে শ্রাবস্তীর নগরাভ্যন্তরে রাজপ্রাসাদের নিকটেই বুদ্ধের উপদেশ দানের জন্য একটি বিস্তৃত ও মনোরম ধর্মমণ্ডপ এবং জেতবনের মধ্যে বুদ্ধের বাসের জন্য সললাগার নামে একটি বাসগৃহও রাজা প্রসেনজিত কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। প্রসেনজিতের ভগ্নী সুমনা বুদ্ধের প্রভাবে ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করেন এবং কালে ইনিই শ্রাবস্তীর ভিক্ষুণী সংঘের নেত্রী হন। রাজা প্রসেনজিত জেতবনের অদূরে ভিক্ষুণীদের বাসের জন্যও একটি সংঘারাম প্রতিষ্ঠা করেন, এর নাম ছিল রাজকারাম। শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠা ধনী বিশাখা ছিলেন বুদ্ধের একজন একনিষ্ঠা শিষ্যা, জেতবনের পূর্বপ্রান্তে পুর্বারাম নামে অপর একটি বিহার বিশাখার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বুদ্ধের সময়ে জেতবনে বহুসংখ্যক ভিক্ষুর বাস হেতু স্থানাভাব ঘটায় জেতবনের সীমানার বাইরে এই সব বিহার স্থাপন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বুদ্ধ জেতবন বিহারে ২৪টি বর্ষা ঋতু যাপন করেন। বুদ্ধের বহু অমূল্য উপদেশ এই জেতবন বিহারেই প্রদত্ত হয়, ভগবান বুদ্ধের জীবনের বহু অলৌকিক ঘটনাও এই শ্রাবস্তী বাসের কালে ঘটেছিল—বৌদ্ধ-সাহিত্যে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে।

বুদ্ধের তিরোধানের পর আনন্দ, কুমার কাশ্যপ প্রভৃতি তাঁর শিষ্যগণ এখানে থেকে বৌদ্ধধর্মকে সঞ্জীবিত করে রাখেন। বুদ্ধের তিরোধানের পরেও বহু শতাব্দী ধরে বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্র হিসাবে ভারতবর্ষে শ্রাবস্তীর একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোক তীর্থদর্শনার্থীরূপে শ্রাবস্তী আগমন করেন এবং জেতবন বিহারে দুটি স্মারক স্তম্ভ নির্মাণ করান। বৌদ্ধ-সাহিত্যের বিবরণে দেখা যায় যে, তিনি এখানে এসে সারিপুত্র, মোদগল্যায়ন, মহাকাশ্যপ ও আনন্দের সমাধি-স্তূপের পূজা সম্পন্ন করেছিলেন। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, ভগবান বুদ্ধের চারিটি প্রধান শিষ্য শ্রাবস্তীতেই দেহরক্ষা করেছিলেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যখন শ্রাবস্তী পরিদর্শনে আসেন তখন শ্রাবস্তীর গৌরব-রবি প্রায় অস্তমিত। শ্রাবস্তী নগরীতে তিনি মাত্র দুইশতটি পরিবারের বাস দেখতে পান, এই সময়ে শ্রাবস্তীর বিহারগুলির উপর হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জেতবন বিহারের উদ্যান শোভা এবং কূপ-তড়াগাদি পূর্ববৎ থাকা সত্ত্বেও এখানে জনসমাগম ছিল না, জেতবনের আশেপাশে পূর্বারাম প্রভৃতি বিহার সম্পূর্ণ ভাবেই পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। এর প্রায় দু'শ বৎসর পর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে অপর এক চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাং শ্রাবস্তী এসে কয়েকটি সংঘারাম দেখতে পেয়েছিলেন. রাজা প্রসেনজিতের প্রাসাদটি তখন ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় ছিল। জেতবন বিহারের পূর্বভাগে ৭৫' উচ্চতাবিশিষ্ট দুটি অশোকস্তম্ভ ও একটি বিশাল বুদ্ধ মূর্তির উল্লেখও তাঁর ভ্রমণ বিবরণী থেকে পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দী অর্থাৎ কাণ্যকুব্জ সাম্রাজ্যের অন্তিমকাল পর্যন্ত শ্রাবস্তী কোনরকমে তার খ্যাতি বজায় রেখেছিল, এই সময় পর্যন্ত যে এখানে কিছু কিছু ভিক্ষু বাস করতেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রাবস্তীর শেষ হিন্দু নরপতি সুহেল দেও ছিলেন জৈন ধর্মাবলম্বী, তিনি একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। সুহেলদেও-এর মৃত্যুর পর শ্রাবস্তীর নাম আর ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ রাজনৈতিক কারণে অথবা পার্শ্ববাহিনী অচিরবতী নদীর বন্যার প্রকোপে শ্রাবস্তী নগরী সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত বা পরিত্যক্ত হয়েছিল। অতঃপর এই স্থান পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকের দ্বারা সাহেত-মাহেত নামে অভিহিত হত। স্থানীয় কথ্যভাষানুযায়ী ওলট-পালট, সর্বনাশ, বিপর্যয় ইত্যাদি সাহেত-মাহেত শব্দের সমার্থক। সুদূর অতীতে রাষ্ট্র-বিপ্লব বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের স্মৃতিই সাহেত-মাহেত এই যুগ্ম অভিধার মাঝখানে লুকিয়ে আছে বলেই মনে হয়।

বৌদ্ধ ও জৈন-সাহিত্যে বহু উল্লিখিত ও আলোচিত শ্রাবস্তীর অস্তিত্ব কোথায় ছিল তা গত শতাব্দীর প্রথমার্ধেও অজ্ঞাত ছিল। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধিকর্তা আলেকজান্ডার কানিংহাম ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বর্তমান উত্তরপ্রদেশের গোন্ডা ও বাহারাইচ্ যথাক্রমে এই দুটি জেলার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সাহেত-মাহেত নামে পরস্পর সংলগ্ন দুটি জনবিরল স্থান খনন করে সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন—যে এই ভূখণ্ডটুকুই ছিল প্রাচীন শ্রাবস্তী। সাহেত নামক স্থানের মাটি খুঁড়ে তিনি একটি বিরাট বোধিসত্ত্ব মূর্তি উদ্ধার করেন। মূর্তির পীঠিকার ক্ষোদিত লিপি থেকে জানা যায় যে, এটি মথুরাবাসী বাল নামক ভিক্ষু কর্তৃক জেতবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মূর্তিটি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণ যুগে নির্মিত হয়েছিল। সাহেতের যে ধ্বংসপ্রাপ্ত সৌধস্তূপের মধ্য থেকে মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়েছিল কানিংহাম সেটি বৌদ্ধ-সাহিত্য ও চৈনিক পরিব্রাজকের দ্বারা বর্ণিত জেতবনস্থ কোসাম্ব-কুটি বলে সিদ্ধান্ত করেন। ১৮৭০ খৃঃ পুনরায় এখানে উৎখনন চালিয়ে কানিংহাম আরও অনেকগুলি মন্দির, স্তূপ ও সংঘারামের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেন। এরপর তিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন যে এইগুলি জেতবন বিহারের ধ্বংসাবশেষ। এই বিহার থেকে প্রায় অর্ধমাইল পূর্বে অবস্থিত মাহেত নামক স্থানটি তিনি অতঃপর শ্রাবস্তী নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে স্থির করেন। পরবর্তীকালে উৎখননের ফলে যে সমস্ত প্রত্নবস্তু এই দুই স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়, তা' থেকে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান সাহেত ও মাহেত যথাক্রমে জেতবন ও শ্রাবস্তী নগরী, কানিংহামের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত পরিপূর্ণ রূপে অভ্রান্তই ছিল।

১৮৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দে ডঃ হোই মাহেতে উৎখনন পরিচালনা করে বহু প্রত্নবস্তু ও প্রাচীন সৌধের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেছিলেন। দশ বৎসর পরে ডাঃ হোই আর একবার এখানে উৎখনন করেন, এইবারও অনেক প্রত্নদ্রব্য ও সৌধাদির ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার পেয়েছিল। ১৯০৭-৮ ও ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে সাহেত-মাহেতে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে আরও দুবার উৎখনন পরিচালিত হয়েছিল। এই দুই-বারেই বহুসংখ্যক খোদিত লিপি, ছাপ মুদ্রা, ধাতু ও প্রস্তর নির্মিত মূর্তি প্রভৃতি প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছিল। শ্রাবস্তী থেকে সংগৃহীত বেশীর ভাগ প্রত্নদ্রব্য লক্ষ্ণৌ-এর সরকারী সংগ্রহশালায় রক্ষিত হয়েছে। সামান্য কিছু কিছু অংশ কলিকাতার সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে।

পূর্বোত্তর রেলপথের গোণ্ডা-গোরক্ষপুর শাখা পথের বলরামপুর স্টেশন থেকে পশ্চিম দিকে অবস্থিত সাহেত-মাহেতের দূরত্ব প্রায় দশ মাইল। বলরামপুর স্টেশন থেকে বাহারাইচ্গামী সরকারী বাসে সাহেত-মাহেত পৌছান যায়। মূল সড়ক থেকে সাহেত বা জেতবনের দূরত্ব আধ মাইলেরও কম। বলরামপুর স্টেশন থেকে সাহেত-মাহেত যাওয়ার জন্য ট্যাক্সি ও রিক্সা ইত্যাদি পাওয়া যায়।

বলরামপুর থেকে বাহারাইচ্গামী সড়ক থেকে সাহেত-মাহেতে আসার পথে প্রথমে সাহেত বা জেতবন হয়ে পরে মাহেতে পৌছান যায়। কিছুকাল পূর্বে জেতবন বিহারে দুটি বুদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে. এর একটি ব্রহ্মদেশীয় ও অপরটি চীন দেশীয় বৌদ্ধদের দ্বারা নির্মিত। সিংহল দেশীয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণের দ্বারা এখানে একটি বুদ্ধমন্দির নির্মাণের উদ্যোগ চলছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ থেকে প্রতি বৎসর বহু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী তীর্থস্থান দর্শনের উদ্দেশ্যে শ্রাবস্তী আসেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে বর্ণিত শ্রাবস্তীর মাহাত্ম্যই তাঁদের এই নিভৃত স্থানে টেনে নিয়ে আসে।

জেতবন বা সাহেতের বিস্তৃতি প্রায় ৭৫,০০০ বর্গফুট। এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আছে কয়েকটি মন্দির, স্তূপ ও সংঘারাম। অধিকাংশেরই বর্তমানে শুধু ভিত্তি ও পীঠিকা সম্বল। যে চারটি সংঘারামের ধ্বংসাবশেষ এখানে পাওয়া গেছে, সেগুলি বহু কক্ষযুক্ত ছিল তা বেশ বোঝা যায়, এর আশেপাশে প্রাচীনকালের কূপও দেখা যায়। এগুলি বিহারবাসীদের পানীয় জোগাত। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে শ্রাবস্তীর ধ্বংসাবশেষগুলিকে এক একটি

সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করে দেওয়া আছে। পাঁচ সংখ্যা চিহ্নিত স্তূপটির নিকটে যে অশ্বত্থ বৃক্ষটি রয়েছে এটি সুপ্রাচীন আনন্দ-বোধি বৃক্ষ। জেতবন বিহার প্রতিষ্ঠাকালে বুদ্ধের আদেশে মহামৌদগল্যায়ন গয়ার বোধিদ্রুমের একটি শাখা নিয়ে আসেন এবং অনাথপিণ্ডিক এটি স্বয়ং রোপন করেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। বর্তমান বৃক্ষটি মূল মহাবৃক্ষের কোন্ শাখা-প্রশাখার বংশধর হওয়াই সম্ভব। আনন্দ-বোধিবৃক্ষের প্রায় ২৫০ ফিট উত্তর দিকে রয়েছে কোসাম্বকুটির ধ্বংসস্তূপ, এই গৃহেই বুদ্ধদেব শ্রাবস্তী অবস্থান কালে অধিক সময় বাস করেছিলেন, এর সামনে দুটি প্রশস্ত চত্বর রয়েছে, এই চত্বর দুটি ছিল বুদ্ধের পদচারণ স্থান। কানিংহাম এই স্থানের ভূমিগর্ভ থেকেই বিশাল বোধিসত্ত্ব মূর্তিটি উদ্ধার করেছিলেন। এই মূর্তি প্রাপ্তির জন্যই এই বিশেষ ধ্বংসস্তূপটিকে কোসাম্বকুটি বলে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। ধ্বংসস্তূপটি পরীক্ষা করে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে মূল কোসাম্বকুটির ধ্বংসাবশেষের উপর বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত সৌধটি সম্ভবতঃ গুপ্ত যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বুদ্ধের সমসাময়িক সৌধটি ধ্বংসোম্মুখ হওয়ার পর সেই স্থানে পরবর্তীকালে নূতন সৌধ স্থাপিত হয়েছিল অথবা সেটি পুনর্নির্মিত হয়েছিল, আর সেটি ধ্বংস হওয়ার পর আবার যেখানে নূতন সৌধ নির্মিত হয়েছিল—এই সত্যটি শুধু কোসাম্বকুটির ক্ষেত্রে নয় সাহেত-মাহেতের প্রায় সকল ইষ্টক নির্মিত পুরাকীর্তি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কোসাম্বকুটির ২০০ গজ উত্তরে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত আর একটি বুদ্ধাবাস 'গন্ধকুটির' ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। গন্ধকুটি বুদ্ধের কালে ছিল সপ্ততল প্রাসাদ। ফা হিয়েন পঞ্চম শতাব্দীতে যখন শ্রাবস্তী পরিদর্শন করেন তখন এটি ছিল দ্বিতল। এর দুইশত বৎসর পর অপর চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ যখন এখানে আসেন তখন দ্বিতল গন্ধকুটিও পতনোম্মুখ ছিল। গন্ধকুটির সম্মুখে সোপানযুক্ত একটি বিরাট মণ্ডপের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধসাহিত্যে গন্ধকুটির সম্মুখস্থ ধর্মমণ্ডপের বিবরণ আছে, এখানে ভগবান বুদ্ধ সমবেত নরনারীদের ধর্মোপদেশ দিতেন। গন্ধকুটির উত্তরে জেতবনের সীমানার মধ্যে আরও তিনটি সংঘারাম ও স্তূপের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। জেতবনের প্রায় এক মাইল পূর্ব-দক্ষিণে একটি সুউচ্চ টিলা আছে, এটিকে বুদ্ধশিষ্যা বিশাখা প্রতিষ্ঠিত বহুখ্যাত পূর্বারাম বিহারের ধ্বংসাবশেষ বলে চিহ্নিত করা হয়। হিউ-এন-সাঙ্ বর্ণিত সুউচ্চ অশোকস্তম্ভ দুটির কোন চিহ্নই বর্তমানে পাওয়া যায় না, সম্ভবতঃ দীর্ঘকালের ব্যবধানে এদুটি ভগ্নাবস্থায় গভীর মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত হয়ে গিয়েছে।

ধ্বংসস্তূপে আকীর্ণ জেতবনের উদ্যান-

তথাগত বুদ্ধের মূর্তি

শোভা এখনও দর্শকের মনকে আকৃষ্ট করতে পারে।

জেতবন বিহারের সীমানার বাইরে উত্তর-পূর্ব কোণে প্রায় আধ-মাইলের মধ্যে মাহেত বা প্রাচীন শ্রাবস্তীর ধ্বংসাবশেষ। প্রাচীন বিবরণানুযায়ী শ্রাবস্তীর তিনদিক যে অর্ধচন্দ্রাকারে উচ্চপ্রাচীরবিশিষ্ট ছিল তার চিহ্ন বর্তমান রয়েছে, এর উত্তর সীমানায় প্রবাহিতা রয়েছে অতীতের অচিরবতী নদী থেকে বর্তমান নাম রাপ্তী। জেতবনের দিক থেকে মাহেতে প্রবেশ করতে হলে দুদিকের প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে যে পথে প্রবেশ করতে হয় তার নাম সোমনাথ দ্বার। এই প্রবেশপথের অদূরে সোমনাথ নামে একটি মন্দির আছে। এই সোমনাথ মন্দিরটি তৃতীয় জৈনতীর্থংকর সম্ভবনাথের জন্মস্থানের উপর নির্মিত হয়েছিল। সোমনাথ মন্দিরের কিছুদূরে পূর্বদিকে একটি বিশাল অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়, এটি পক্কীকুটি নামে পরিচিত। ডঃ হোইর মতানুসারে এটিই রাজা প্রসেনজিত কর্তৃক নির্মিত সদ্ধর্ম মহাশালার ধ্বংসাবশেষ, ভগবান বুদ্ধ এখানে শ্রাবস্তীর নরনারীদের ধর্মোপদেশ দিতেন। বৌদ্ধগ্রন্থাদিতেও এই ধর্মমণ্ডপের উল্লেখ আছে। কানিংহাম এই ধ্বংসাবশেষটিকে অঙ্গুলিমাল কর্তৃক বুদ্ধের জন্য উৎসর্গীকৃত স্তূপ বলে চিহ্নিত করেছেন। নরঘাতক দস্যু অঙ্গুলিমাল নরহত্যা করে নিহত ব্যক্তিদের অঙ্গুলি কর্তন করে সেগুলি মাল্যাকারে গলায় প্রলম্বিত রেখে আনন্দলাভ করত, এই জন্যই সে অঙ্গুলিমাল আখ্যা পায়।

বুদ্ধের উপদেশে অঙ্গুলিমালের মতি পরিবর্তিত হয় এবং সে অহিংসা ব্রত গ্রহণ করে। অতীতের কুকীর্তির জন্য অহিংসাব্রতী হয়েও অঙ্গুলিমালকে বহু লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল, এর জন্য সে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করেনি বা পূর্বজীবনে ফিরে যায়নি। অবশিষ্ট জীবন সে প্রকৃত বুদ্ধশিষ্যরূপেই অতিবাহিত করেছিল। পক্কীকুটির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আর একটি সুউচ্চ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আছে; এটি কাচ্চীকুটি নামে খ্যাত। এর পীঠিকাটি ১০৩'×৩২' ফুট, এটি বহুতলবিশিষ্ট ছিল, উচ্চতলে যাওয়ার জন্য প্রশস্ত সোপানপথেরও চিহ্ন আছে। সৌধের ইষ্টকগুলিতে রামায়ণ-মহাভারত বর্ণিত ঘটনাবলী চিত্রিত আছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন এটি বুদ্ধের উত্তরকালে নির্মিত একটি বিশাল দেবায়তনের ধ্বংসাবশেষ। এখানে যে মূল মন্দির বা স্তূপ ছিল সেটি অনাথপিণ্ডিক বা সুদত্ত কর্তৃক ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণে শ্রাবস্তী নগরীর অভ্যন্তরে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত একটি বিশাল স্তূপের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ অনাথপিণ্ডিক নির্মিত মূল সৌধটি বিনষ্ট হওয়ার পর একাধিকবার সেটি পুনর্নির্মিত হয়।

এলান / রেখা

প্রেক্ষাগৃহ

চলচ্চিত্রে আমদানী-রপ্তানী

ভারতে বৃটিশ শাসনকালে চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে যদিও বেশীর ভাগ ছবিই আসত আমেরিকা এবং ইংলণ্ড থেকে, তবু মাঝে-মাঝে আমরা সাধারণ ব্যবসায়িক প্রদর্শনীর (কমার্শিয়াল স্ক্রীনিং) মাধ্যমে রাশিয়া (ব্যাটলশিপ পোটেমকিন, কমরেড শ্যাফট), জার্মানী (টার্টুফ, ফাউস্ট, লাস্ট লাফ, প্যান্থার অব প্যারিস), ইটালী (কুও ভেডিস, মারে নোস্ট্রাম), ফ্রান্স (লে মিজারেবল) প্রভৃতি দেশের ছবি দেখতে পেতুম। কিন্তু চলচ্চিত্রে সবাক যুগ শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গে আমেরিকার হলিউড এবং বৃটেনের ছবি ছাড়া অন্য দেশের ছবির ব্যবসায়িক প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে যায় সম্ভবত এই কারণেই যে, ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণভাবে ইংরাজী ছাড়া অন্য কোন বিদেশী ভাষার সঙ্গে পরিচিত নন। ইংলণ্ড এবং আমেরিকা থেকে আমদানী-করা ছবির মধ্যে আবার দ্বিতীয়োক্ত দেশের ছবিই ছিল বেশী। কলকাতার বিদেশী চিত্রগৃহগুলির মধ্যে (যার সংখ্যা ছিল আটটি) একমাত্র নিউ এম্পায়ার ছাড়া অন্য কোথাও বৃটিশ ছবি দেখান হত না। বর্তমানে 'রিগ্যাল' ভারতীয় চিত্রগৃহে পরিণত হয়েছে এবং নিউ এম্পায়ার আমেরিকান — বিশেষ করে ওয়ার্ণার ব্রাদার্স নির্মিত ছবি দেখাচ্ছে। অর্থাৎ বৃটিশ ছবির নিয়মিত প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে গেছে।

পাঠকরা চিন্তা করে দেখেছেন কিনা জানি না যে, এই যে হলিউডী ছবির ঢালোয়া আমদানী হয় আমাদের ভারতে—স্বাধীন ভারতে (প্রতি বছর গড়পড়তা ৩০০ থেকে ৩৫০), এর পরিবর্তে ভারতবর্ষ থেকে কিন্তু একখানিও ছবি ব্যবসায়িক প্রদর্শনীর জন্যে আমেরিকায় রপ্তানী করা হয় না। স্বাধীন ভারত সরকার তার দীর্ঘ চব্বিশ বছরের জীবনে এ ব্যাপারে বিগত বৃটিশ সরকারেরই পদাংক অনুসরণ করে চলেছেন। আমাদের স্বাধীন সরকার একবারও চিন্তা করে দেখেন নি, এই যে তাঁরা প্রতি বছর ৩০০।৩৫০ হলিউডী ছবি আমদানী হতে দিচ্ছেন, এর পরিবর্তে সমপরিমাণ ভারতীয় ছবি আমেরিকায় রপ্তানী করা সম্ভবপর কিনা। ভারতীয় ছবি রপ্তানী করার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য অজুহাত হচ্ছে, আমেরিকায় ভারতীয় ছবির কোন বাজার নেই। কিন্তু বাজার নেই অর্থাৎ চাহিদা নেই, একথাটা তাঁদের জানিয়েছে কে? আমেরিকার চিত্র-ব্যবসায়ীরা ছাড়া আর কেউ নয় নিশ্চয়? আমেরিকার সাধারণ দর্শকরা ভারতীয় ছবি দেখতে আদৌ চায় কিনা, তা কি করে জানা যাবে, যদি না তাদের সামনে নানা ধরনের ভারতীয় চিত্র প্রদর্শিত হয়? ভারতীয় ছবির বাজার যে সম্প্রসারণ করার আশু প্রয়োজনীয়তা আছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কাজেই যে-আমেরিকায় তার বাজার নেই, সেখানে তার বাজার খুলতে হবে এবং এর একটি মাত্র রাস্তাই আমাদের সামনে খোলা আছে। মোশান পিকচার একসপোর্ট এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সংগে নতুন করে চুক্তি সম্পাদনের সময়ে তাদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাতে হবে, ব্যবসায়িক প্রদর্শনীর জন্যে তোমরা যতগুলি ভারতীয় ছবি আমদানী করতে রাজী হবে, আমরা মাত্র ততগুলিই—এবং তার একখানিও বেশী নয়—আমেরিকান তথা হলিউডী ছবি ভারতে রপ্তানী করতে দেব। তাদের আরও বলতে হবে, যদি তোমরা ভারতীয় ছবি নিতে অসম্মত হও, আমরাও আমেরিকান ছবি নেব না। আজকাল হলিউডে নির্মিত বেশীর ভাগ ছবিই এমনই নিম্ন মানের যে, সেগুলি মাত্র যে না দেখলেও চলে, তাই নয়, সেগুলি সাধারণ্যে প্রদর্শিত হবার জন্যে আমদানী হওয়াই উচিত নয়। এখানে বিশেষ জোর দিয়েই বলব, হলিউডী ছবির অবাধ আমদানী যতশীঘ্র সম্ভব বন্ধ হওয়া দরকার এবং এর জন্যে আমেরিকাতেই ভারতীয় দূতাবাসের অধীনে বা উদ্যোগে একটি সুযোগ্য স্ক্রীনিং কমিটি (কোন্ ছবি যাওয়া উচিত এবং কোন্ ছবি যাওয়া উচিত নয় তাই নির্ধারণ করার সমিতি) গঠিত হওয়া উচিত। হলিউডী ছবির আমদানী সীমিত করতে পারলে ভারতে অবস্থিত বিদেশী চিত্রগৃহগুলিতে যে-প্রদর্শনী সময়টা (স্ক্রীনিং টাইম) উদ্বৃত্ত হবে, তাতে ফ্রান্স, জার্মানী (পূর্ব ও পশ্চিম), পোলাণ্ড, সুইডেন, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইটালী, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশের ভাল-ভাল ছবির ব্যবসায়িক প্রদর্শনীর সুযোগ হওয়া সম্ভব হবে। এমন কি, কিছু ভারতীয় ছবির প্রদর্শনী ক্ষেত্র এর ফলে বর্ধিত হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার্স প্রোডিউসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি আই এস জোহর সম্প্রতি যে-প্রস্তাব করেছেন, সেটি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেছেন, ভারতীয় চলচ্চিত্রের রপ্তানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সকল বিদেশী ছবির

আমদানী ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার একসপোর্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে হওয়া উচিত। গেল মঙ্গলবার, ১৩ জুলাই মোশান পিকচার একসপোর্ট এসোসিয়েশান অব আমেরিকার সঙ্গে ভারত সরকারের চুক্তিকে নতুন করে বলবৎ করার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, হলিউডী ছবিকে ভারতে আমদানী করার অনুমতি দেওয়ার সময়ে অপরাপর দেশের ছবি যেন ভারতে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, সে-পথ অবশ্যই খোলা রাখতে হবে।

গেল বছরে ভারতীয় ছবি রপ্তানী করে ৬ কোটি টাকা পরিমাণ আয় হলেও ভারত যে জাপান, ইউরোপ এবং আমেরিকার বাজারে বিশেষ কিছু মাথা গলাতে পারে নি, শ্রীজোহর সেকথার উল্লেখ করেন। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি জানান, ইউ. কে অর্থাৎ ইংলণ্ডে ভারতীয় ছবির রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়েছে।

শ্রীজোহর মনে করেন, ইউরোপ ও জাপান থেকে ছবি আমদানী করলে চলচ্চিত্রের ব্যাপারে আমদানীর বিনিময়ে রপ্তানীর প্রথা—যাকে ইংরেজীতে বলে টু-ওয়ে ট্রাফিক—চালু করা সম্ভব হবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে ইমপেককে (ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার একসপোর্ট কর্পোরেশনকে) আমদানী লাইসেন্স দেওয়া উচিত এবং যে-সব দেশে ভারতীয় ছবির কোন বাজার চালু নেই, সেই সব দেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। শ্রীজোহরের মতে বিদেশের সমস্ত চলচ্চিত্রকেই ই-ম-পে-ক-এর মাধ্যমে আমদানী করাই হবে এ ব্যাপারে প্রকৃষ্ট পন্থা।

কোন রকম দুর্নীতি প্রবেশ না করে এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার ইম্পোর্ট অ্যাণ্ড একসপোর্ট এসোসিয়েশানের (না থাকলে নতুন করে গড়ে তুলে) মাধ্যমে ভারতীয় ছবির বিভিন্ন দেশে রপ্তানী ও তার পরিবর্তে সেই সব দেশ থেকে সমসংখ্যক ছবি ভারতে আমদানী করার রীতি গ্রহণ করা ভারত সরকারের পক্ষে একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ পন্থা এবং সেই পন্থা অনতিবিলম্বে চালু করবার জন্যে যা-কিছু আইন-কানুন প্রণয়ন বা রদ-বদল করা প্রয়োজন, তা যতশীঘ্র সম্ভব করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কারণ এই ব্যবস্থায় ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। প্রত্যক্ষ উপকার হচ্ছে, ভারতীয় চলচ্চিত্রের বহির্বাণিজ্যের দ্রুত সম্প্রসারণ এবং পরোক্ষ লাভ হচ্ছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে অধিকতর যোগ স্থাপনের ফলে নূতন ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে নব-নব দিগন্তের আবিষ্কার ও সামগ্রিক উন্নতি সাধন।

আশা করব, ভারত সরকারের বহির্বাণিজ্য বিষয়ক কর্তারা চলচ্চিত্রের আমদানী-রপ্তানী ব্যাপারটিতে সনাতন পদ্ধতি ত্যাগ করে একটু খোলা মন নিয়ে বিচার-বিবেচনা করবেন।

এই পর্যন্ত লেখবার পরেই সংবাদ পেলুম, ১৪ই জুলাই লোকসভার অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সরকারের বহির্বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী এল এন মিশ্র ঘোষণা করেছেন, গেল ৩০ জুন তারিখে মোশান পিকচার্স এসোসিয়েশন অব আমেরিকার (আগে লেখা মোশান পিকচার একসপোর্ট এসোসিয়েশন অব আমেরিকার কথাটা ভুল) সঙ্গে ভারত সরকারের আমেরিকার চলচ্চিত্র আমদানী করা সম্পর্কে যে-চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, সেই চুক্তিকে নতুন করে চালু করবার ইচ্ছা ভারত সরকারের নেই। বিগত চুক্তিতে অন্যতম শর্ত ছিল যে, মোশান পিকচার্স এসোসিয়েশন অব আমেরিকা মার্কিন মুলুকে ভারতীয় ছবিকে জনপ্রিয় করে তোলবার জন্যে এবং ভারতীয় ছবির রপ্তানীর বাজারকে প্রসারিত করতে সাহায্য করবার জন্যে সাধ্যমত প্রচেষ্টা করবেন। 'কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে', শ্রীমিশ্র বলেন, 'আমাদের আশা ফলবতী হয় নি।' শ্রীমিশ্র আরও বলেছেন, 'ভারত সরকার প্রদত্ত শর্তাবলী মোশান পিকচার্স এসোসিয়েশন অব আমেরিকা না মেনে নিলে বিগত চুক্তির মেয়াদ বর্ধিত করা হবে না।

এই শর্তাবলীর মধ্যে একটি হচ্ছে, আমেরিকাতে কয়েকটি নির্দিষ্ট সংখ্যক (সমান সংখ্যক নয় কেন?) ভারতীয় ছবি আবশ্যিকভাবে আমদানী করতে হবে।

ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার্স প্রোডিউসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি আই এস জোহর বিদেশী ছবির আমদানী ও ভারতীয় ছবির রপ্তানী—দুই-ই ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার্স একসপোর্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে পরিচালিত করবার যে-প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তার উল্লেখ করে শ্রীমিশ্র বলেন, প্রস্তাবটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে। তবে বর্তমানে যে-হেতু শতকরা ৯০ ভাগ ছবিই বেসরকারী সংস্থা বা ব্যক্তিদের দ্বারা আমদানী করা হয়ে থাকে, প্রধানত সেই কারণে ই-ম-পে-ক-এর মাধ্যমে সমস্ত বিদেশী ছবি আমদানী করার পথে কিছু আইনগত অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। এই বাধা এড়াবার জন্যেই মাত্র স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের মারফৎ সকল বিদেশী ছবি আমদানী করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রীমিশ্র বলেন, বিদেশী ছবির আমদানী রীতি নির্ধারণের ব্যাপারে ভারতীয় ছবির বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির কথা মনে রেখে যে-সব দেশ ভারতীয় ছবি আমদানী করে থাকে, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শ্রীমিশ্র একথাও প্রকাশ করে বলেন যে, ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার্স একসপোর্ট

বনপলাশীর পদাবলী/মাধবী মুখোপাধ্যায় এবং শিপ্রা মিত্র। **পরিচালনা :** উত্তমকুমার।

ফটো : অমৃত

কর্পোরেশনের পরিচালক সমিতিটিকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে, যার মধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রযোজক-পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের মত লোক থাকবেন। শ্রীমিশ্রের মতে ভারতীয় ছবি যখন বিদেশে উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা লাভ করছে, তখন প্রধান-প্রধান আন্তর্জাতিক টেলিভিশন গোষ্ঠীর মাধ্যমে আমাদের ভারতীয় ছবি দেখানোর প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে।

বিদেশী ছবির আমদানী সম্পর্কে আমরা এই নিবন্ধে আগেও যে-কথা বলেছি, সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলব, যে-সংস্থার ওপর ভারতীয় ছবির রপ্তানী করবার ভার ন্যস্ত আছে বা থাকবে, সেই সংস্থাকেই বিদেশ থেকে ছবি আমদানী করবারও দায়িত্ব দেওয়া উচিত। মাত্র তাহলেই লেন-দেনের মধ্যে একটি সমতা-রক্ষাকারী বিধিনিয়ম প্রবর্তিত হতে পারে এবং বিভিন্ন দেশ থেকে ভারতবাসীর দেখার উপযোগী ছবির আমদানীর সঙ্গে-সঙ্গে বিদেশে ভারতীয় ছবির বাজারের সম্যক সম্প্রসারণের ব্যবস্থাও পাকা হতে পারে।

চিত্র-সমালোচনা

নিশাচর

হাঁফিয়ে উঠছিলেন বাঙলা ছবির দর্শকেরা। পর পর কয়েক সপ্তাহে কোন নতুন ছবির মুখ না দেখে বেশ খানিকটা অস্বস্তির মধ্যেই কাটছিল সময়। এ অবস্থা চলছে দীর্ঘকাল ধরেই। চোখের সামনেই একের পর এক বাঙলা ছবি নির্মাণের সংখ্যা কমে আসছে। নানান ধরনের প্রতিকূলতার মুখে পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব চলচ্চিত্র শিল্পেরই আজ সর্বনাশা সংকট। নিজ বাসভূমে এ ধরনের দুঃখের, ক্ষোভের, লজ্জাজনক অবস্থা আর কতদিন চলবে কে জানে? তাই, যখন 'নিশাচর' মুক্তি পেল, তখন স্বাভাবিকভাবেই খুশি। যাঁরা জানেন এ ছবি নির্মাণের ইতিহাস, তাঁদের কাছে এর মুক্তিলাভ নিঃসন্দেহেই যেমন বিস্ময়ের তেমনি গভীর আনন্দের। অনেক ঝড়-ঝাপটাই সইতে হয়েছিল এই চিত্রটিকে। পেরোতে হয়েছে অগণন চড়াই-উৎরাই। তৈরিও হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। তাই, এ ছবির মুক্তির উল্লাস একটু বেশি বৈকি! বলাবাহুল্য, আমাদের সঙ্গে দর্শকেরা 'নিশাচর' দেখে হবেন শিহরিত, রোমাঞ্চিত। রহস্যঘন বাঙলা চিত্রের জগতে 'নিশাচর' উজ্জ্বল নির্মাণ।

সাংবাদিকেরাই দিয়েছিলেন এই নাম। দিনের আলোয় যিনি আলাদা মানুষ, রাতের বেলায় তাঁরই চেহারা যায় বদলে। অন্ধকারের গভীরে চলে তার অভিযান। হত্যার অভিযান। ব্যক্তি-জীবনের দুঃসহ স্মৃতিটা তাঁকে খেত কুরে কুরে। ভুলতে পারতেন না সেই স্নেহ-প্রতিমার আর্তি। আত্ম-অবমাননার ধ্বংসাবশেষ। ঘূর্ণির ভিতর দিয়ে কেটে গিয়েছিল কয়েকটি বছর। দেখতে দেখতে বদলে গেলেন শিবপদ। তৈরি করলেন নিজেকে। চোখের সামনে দেখলেন অফুরন্ত রহস্যের কুয়াশা। ঘৃণিত জগত। ক্ষোভে-ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইলেন। আত্ম-অভিমানে দীর্ণ ক্রূরতার প্রতীক হলেন শিবপদ। চলল অভিযান। রাতের বেলায় প্রতিশোধ নেবার পালা। আশ্চর্য রোমহর্ষক অভিযান। সারা শহর আতঙ্কিত। লোকের মুখে মুখে নিশাচরের নাম। সংবাদপত্রের শিরোনামে নিশাচরের অভিযান। বিভ্রান্ত পুলিশ মহলও। কেন এই হত্যা? কোন্ দুঃসহ স্মৃতির প্রতিশোধে এই প্রাণের মাশুল?

অভিনয়ের দিক থেকে প্রথমেই বলতে হয় শম্ভু মিত্রের কথা। তাঁর প্রাণবন্ত অভিনয় এ-ছবির সম্পদ। তবে মাঝে মাঝেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে তিনি আসলে মঞ্চ জগতের অভিনেতা, খ্যাতকীর্তি নট শ্রীশম্ভু মিত্র। বিকাশ রায় তাঁর স্বাভাবিক বলিষ্ঠতা নিয়েই উপস্থিত। মঞ্জু দে সাবলীল। সুমিতা সান্যাল, অসিতবরণ, দিলীপ রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলাবতীর অভিনয় চরিত্রানুগ। ছবির কলাকৌশল, সঙ্গীত সাধারণ মানের। পরিচালক হিসেবে ভূপেন রায় প্রথানুগ।

সম্পাদনে স্বল্প শিথিলতা সত্ত্বেও মন্দিরা ফিল্মস পরিবেশিত, গায়ত্রী প্রোডাকসন্স-এর 'নিশাচর' বাঙালী দর্শককে আনন্দ দেবে। দেবে বৈচিত্র্যের আস্বাদ।

খুঁজে বেড়াই/পরিচালনা : সলিল দত্ত। অপর্ণা সেন এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

বুড্ডা মিল গয়া

কাহিনী সব সময়েই একটা-না-একটা থাকে। কিন্তু বেশির ভাগ হিন্দি ছবিতেই কাহিনী প্রধান না হয়ে তার উপভোগ্যতার দিকটিই হয়ে ওঠে মুখ্য। হাসি-ঠাট্টা, খুন-খারাবি আর নাচে-গানে ভরা অজস্র প্রমোদ-উপকরণে তৈরি এসব ফিল্ম দেখে এক ধরনের দর্শক মজা নিয়েই পান স্বস্তি। চারদিকের নানান জটিলতা আর অশান্তির মাঝখানে পান আরামের একটু ফুরসৎ। এদিক থেকে এল-বি-ফিল্মস-এর রঙীন চিত্র 'বুঢ্‌ঢা মিল গয়া' সার্থক।

হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ নিয়ে তোলা এ ছবিটিকে যেমন ক্রাইম পিকচারের মর্যাদা দেওয়া যায় তেমনি কৌতুক রসের ছবি হিসেবে দেওয়া যায় বিশেষ মূল্য। তা বলে, বুঢ্‌ঢা মিল গয়া কোনো নতুন জাতের চিত্র নয়। বরং গতানুগতিকতা এখানে পুরো মাত্রায় রক্ষিত। ঠাস-বুনোট এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা-সমৃদ্ধ ছবিটি শুরু থেকে শেষ অব্দি বজায় রেখেছে দর্শকের কৌতূহল। এদিক থেকে পরিচালক হৃষীকেশ মুখার্জি তাঁর কৃতিত্বের অনন্য স্বাক্ষর রেখেছেন।

এ ছবির সবচেয়ে বড়ো কথা হল অভিনয়ের দিকটি। বুদ্ধের ভূমিকায় অভি-

অমল দত্ত পরিচালিত আবিরে রাঙানো চিত্রে অনিল ও সুচন্দ্রা

নয় করেছেন ওমপ্রকাশ। তিনি যে কতো বড়ো অভিনেতা তার নজির চিত্রের সর্বত্র। এ'র এমন প্রাণবন্ত হৃদয়গ্রাহী, অভিনয় বিশেষ দেখা যায় না। নবীন নিশ্চল, দেবেন বর্মা, অর্চনা, ললিতা পাওয়ার, সোনিয়া সাহানীর অভিনয় ছিল একই ছন্দে গাঁথা। এর মধ্যে বিশেষ করে নবীন নিশ্চল তাঁর সাফল্যকে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন অনায়াস-ভঙ্গিতেই। ললিতা পাওয়ারেরও এমনতর চোখ-জুড়োনো অভিনয় ভোলা যায় না।

ছবির কলাকৌশলের দিকটি উন্নত-মানের। রঙের প্রয়োগও মনোরঞ্জক। সংগীত পরিচালক রাহুল দেববর্মন রেখেছেন অসামান্য কৃতিত্বের নজির। প্রত্যেকটি গানই প্রাণ-মাতানো।

হাসি-গানে, রহস্যের মায়াজালে এল, বি, ফিল্মস-এর বুড্‌ঢা মিল গয়া উপভোগ্য ছবি।

*

এপার ওপারের সঙ্গীত গ্রহণ : গত সপ্তাহে অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত ও পরিবেশিত সমরেশ বসুর 'এপার ওপার' [illegible] সত্যেন চ্যাটার্জি রেকর্ডিং করেন। গান দুখানির একখানিতে কণ্ঠ দিয়েছেন মান্না দে ও অন্যখানিতে বনশ্রী সেনগুপ্ত। সঙ্গীত পরিচালনা করেন সুধীন দাশ-গুপ্ত। এপার ওপার ছবিখানি পরিচালনা করছেন আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। টেকনি-সিয়ান স্টুডিওতে ছবিখানির একটানা সাতদিন চিত্রগ্রহণে ছিলেন সৌমিত্র চট্টো-পাধ্যায়, অপর্ণা সেন ও দিলীপ রায়। আশুবাবু ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্বও নিয়েছেন। চিত্রগ্রহণে আছেন রামানন্দ সেনগুপ্ত। এন-এ ফিল্মস ছবি-খানির পরিবেশক।

মানসী : সুনীল চক্রবর্তীর কাহিনী অবলম্বনে অরোরা ফিল্মসের পরবর্তী প্রয়াস 'মানসী'র কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রবীণ পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প-নির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে আশু দত্ত, বিশ্বনাথ ও প্রফুল্ল মল্লিক। সঙ্গীত-পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে কণ্ঠদান করেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল ও তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, ভাস্কর চৌধুরী, তরুণকুমার, জহর রায়, শিশির মিত্র, জীবেন বসু, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, আনন্দ মুখো-পাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস, সীতা মুখোপাধ্যায় এবং নায়িকা চরিত্রে রূপদান করছেন নবাগতা বৈশালী চট্টোপাধ্যায়, যাঁর অভিনয় প্রতিভা এই বৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কাররূপে চিহ্নিত হবে বলে আশা করা যায়।

মঞ্চাভিনয়

লিটল থিয়েটার গ্রুপ : 'বর্গী এলো দেশে' এবং 'সূর্যশিকার' নাটকের অভূত-পূর্ব সাফল্যের পর পিপলস লিটল থিয়েটার এর নবতম নাট্যপ্রযোজনা বাংলা-দেশের সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় 'ঠিকানা' নাটক উপস্থাপন করছেন ২ আগস্ট একাডেমী অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে। বাংলা নাট্যমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি ঘোষণা করছেন 'টিনের তলোয়ার' নাটকে রবীন্দ্রসদন মঞ্চে আগামী ১১ আগস্ট। আর প্রস্তুতির পথে রয়েছে ১৮৭১ সালের প্যারিসের রাজপথে ব্যারিকেডে ব্যারিকেডে শ্রমিক সংগ্রামের রক্তাক্ত অধ্যায় 'পারী কমিউন' নাটক। বিশ্ববিশ্রুত জার্মান নাট্যকার বের্টল্ট ব্রেশটের 'ডী টাগে ডের কম্যুনের' বাংলা অনুবাদ। রচনা ও পরিচালনায় রয়েছেন শ্রীউৎপল দত্ত, আলোকসম্পাতে শ্রীতাপস সেন, মঞ্চে শ্রীসুরেশ দত্ত, সঙ্গীতে প্রশান্ত ভট্টাচার্য, আর চরিত্র রূপায়ণ করছেন শ্রীউৎপল দত্তের নেতৃত্বে পিপলস লিটল থিয়েটারের শক্তিশালী শিল্পীবৃন্দ। এই নাট্যগোষ্ঠী একাডেমী অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে আগামী ১৩ আগস্ট জন্মাষ্টমীর সন্ধ্যায় সারারাত্রিব্যাপী অভিনয় করবেন, 'ঠিকানা', 'সূর্যশিকার' এবং 'টিনের তলোয়ার' নাটক।

ক্যাপ্টেন হুররা : শ্রীমোহিত চট্টো-পাধ্যায় রচিত উপরোক্ত নাটকটি কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী নক্ষত্রের প্রযোজনায় আগামী ২৬ জুলাই সন্ধ্যে সাতটায় মুক্ত অঙ্গনে অভিনীত হবে। প্রয়োগপ্রধান শ্রীশ্যামল ঘোষ।

ইউনিটি থিয়েটারের 'মধ্যমপুরুষ' : অনিশ্চয়তা, ব্যর্থতা, হতাশা, অসাড়তার নিঃসীম অন্ধকারের আবর্তে ঘুরে মরছে আজকের মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষগুলো। পরিশ্রান্ত সৈনিকের গ্লানি এদের সর্বাঙ্গে। স্বপ্ন, কল্পনা, প্রতিশ্রুতি, শপথ সব কিছুই হয়তো ধ্বংসতায় মিলিয়ে যাচ্ছে। অস্পষ্ট আচমকা অচেনা আলোয় যা এবং যতটুকু দেখা যাচ্ছে, তাতে শুধু লেখা বেদনার এক করুণ কাহিনী। তবু এরা ছুটে চলেছে মানুষের চিরন্তন সুন্দর রূপকে ফুটিয়ে তুলতে; প্রসন্ন হাসির কল্লোলে কান্না মুছে দিতে। বহু ঝড়ের আঘাতে পর্যুদস্ত হোলেও উদাত্ত কণ্ঠ মেলে ধরে সোচ্চারে বলতে চাইছে, আমরা নতুনতর এক দীপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে বাঁচবো, আমরা সমাজকে গড়ে তুলবো নিজেদের পরিশ্রমে আর আন্তরিকতায়। মধ্যবিত্ত সমাজের এই পরিশ্রান্ত স্বাপ্নিক মানুষগুলোর অন্তর জীবনসংগ্রামকেই হয়তো ভাষা দিয়েছে গোর্কির 'পেটি বুর্জোয়া' অনুপ্রাণিত 'মধ্যমপুরুষ' নাটকটি। গোর্কির তীব্র সমাজচেতনা ও গভীরতর জীবনবোধ যা 'পেটি বুর্জোয়া' নাটকটির প্রতিটি মুহূর্তে মুখর হয়ে উঠেছে 'মধ্যমপুরুষেও সেই রেশ থেকেছে অব্যাহত। এর জন্য প্রশংসার দাবী প্রথমেই করতে পারেন শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। সত্যি তাঁর ভাবানুবাদে কৃত্রিমতা কোথাও চোখে পড়েনি। সম্প্রতি 'রঙ্গনায়' এই নাটকটি অভিনয় করে ইউনিটি থিয়েটারের শিল্পীরা নাট্যানুরাগীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

একটি মধ্যবিত্ত পরিবারকে কেন্দ্র করে 'মধ্যমপুরুষ' নাটকটির যন্ত্রণাময় সংঘাত গড়ে উঠেছে। এতে আছে অবসরপ্রাপ্ত লোকের যন্ত্রণা; প্রেম আর অনুরাগের জন্য দীর্ঘশ্বাস; তরুণের সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে চাপা বিদ্রোহ, আবার সঙ্গে সঙ্গে আছে এই অমিলের মধ্যেই, এই যন্ত্রণার মধ্যেই মিল আর জীবনের চরমতম অর্থ খুঁজে নেওয়ার কিছু চেষ্টা। ভবতারণ, দীনতারণ, পার্থ, নিখিল, তাপস, কাদম্বিনী, তপতী, প্রীতি, ইলা এরা সবাই এই দুই অনুভূতির দোলায় আবর্তিত হয়েছে। এই আবর্তনে কোথাও ঝরেছে কান্না, কোথাও বেশ মুখর হয়ে উঠেছে সমন্বয়সাধনের বলিষ্ঠ প্রচেষ্টার কথা। 'এরই মাঝে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি', এইটেই বোধ হয় 'মধ্যমপুরুষ' নাটকের চিরন্তন সত্য।

এই নাটকের শৈল্পিক প্রযোজনাটিকে প্রাণবন্ত করে তুলতে যে নাট্যনির্দেশক ও শিল্পীদের নিবিড় সহযোগিতা ছিল, তা প্রথম থেকেই বোঝা গেছে। প্রয়োগ-পরিকল্পনার ব্যাপারে কয়েকটি মুহূর্তে অজক চট্টোপাধ্যায়ের সূক্ষ্ম শিল্পবোধ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে একটি কথা। নাটকটির দু একটি জায়গায় জোনাল অ্যাকটিং-এর এফেকট কিন্তু ভালো করে স্পষ্ট হোতে পারেনি।

আলোর আঁধারে ছবিতে অপর্ণা সেন। পরিচালনাঃ অগ্রদূত। ফটোঃ অমৃত

অভিনয়ের ব্যাপারে যাঁর কৃতিত্বের কথা প্রথমেই মনে আসে তিনি হোলেন 'নিখিল'-রূপী বরুণ দাস। মঞ্চে শিল্পীর স্বচ্ছন্দ চলা ও সংলাপ বলার প্রাণোচ্ছল ভঙ্গিমা সত্যি অপূর্ব। শৈবাল বসুও 'পার্থ' চরিত্রের যন্ত্রণা আর ক্ষুব্ধ হতাশাকে বেশ সংযতভাবেই পরিস্ফুট করতে পেরেছেন। অজিত শাসমলের 'তাপস'ও অনেক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হোতে পেরেছে। ভবতারণের ভূমিকায় অরুণ চৌধুরী নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছেন। তবে তাঁর বাজারে যাবার পোশাক ধোপদুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবী না হোলেই ভালো হোত। রাণু রায়ের 'কাদম্বিনী', ও সুকন্যা রায়ের 'তপতী' হয়েছে মর্মস্পর্শী। 'প্রীতি' ও 'ইলা'র ভূমিকায় ছায়া এডওয়ার্ড ও কবিতা গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয়ে প্রাণের অভাব ছিল। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে ছিলেন সুজিত পাল, রোহিনী সরকার, বিমল গুহসরকার।

বালিগঞ্জ নাট্যসমাজের 'একটি পয়সা' : বালিগঞ্জ নাট্যসমাজের যাত্রা বিভাগের শিল্পীরা কিছুদিন আগে বালিগঞ্জ শিক্ষা-সদনে ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ সামাজিক নাটক 'একটি পয়সা' পরিবেশন করেছেন। সামগ্রিকভাবে প্রয়োগ পরিকল্পনা ও অভিনয়ে সেদিনকার প্রযোজনা সার্থকতায় ভরে উঠেছিল। এর জন্য প্রথমেই যিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা দাবী করতে পারেন, তিনি হোলেন নাট্যনির্দেশক শ্রীধীরাজ দাস।

প্রতিটি চরিত্রই হয়েছে সুঅভিনীত। তবুও এর মধ্যে জিতেন দাসের 'ভুজঙ্গ-নারায়ণ', গৌর শ্রীমানির 'দিবাকর', শম্ভু লাহার 'শুভঙ্কর', বুলবুল চ্যাটার্জির 'মৌসুমী' ও রাণু রায়ের 'রাঙাবৌ' বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়। অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় ছিলেন কৃষ্ণ ঘোষ, শান্তি চক্রবর্তী, মণি চক্রবর্তী, সত্য ঘোষ, আদ্য বোস, রথীন হালদার, রবি গুপ্ত, মণি মান্না ও অর্পিতা ঘোষ।

এই সুষ্ঠু প্রযোজনার আর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল প্রাণময় সুরসৃষ্টি। অপূর্ব সুরের ছন্দে নাটকের গতিবেগ অসাধারণ গভীরতা লাভ করেছিল। এর জন্য প্রায় সম্পূর্ণ কৃতিত্বের অধিকারী সঙ্গীতনির্দেশক শ্রীনটবর দাস।

সেণ্ট্রাল একসাইজ এণ্ড কাস্টমস্ ক্লাবের 'ফাঁস' : শ্রীশৈলেশ গুহ নিয়োগীর অফুরন্ত হাসির নাটক 'ফাঁসে'র মঞ্চসফলতা আর একবার কিছুদিন আগে নতুন এক আলোয় পরিস্ফুট হয়ে উঠলো স্টার থিয়েটারে। এই অসাধারণ উচ্ছল প্রাণবন্ত নাটকটি সেদিন সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেছিলেন সেণ্ট্রাল একসাইজ এণ্ড কাস্টমস ক্লাবের শিল্পীরা।

নাটকটির প্রয়োগপরিকল্পনায় অনেক নতুনতর শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যও চিহ্নিত ছিল। এ ব্যাপারে নিশ্চিত প্রশংসার দাবী রাখেন নির্দেশক ধীরেশ ভট্টাচার্য। সুষ্ঠু চরিত্র চিত্রণের জন্য যাঁদের প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য তাঁরা হোলেন শিশির বসু (সোমনাথ), অচিন গুহ (ডেপুটি), প্রদ্যোৎ বসাক (বিমান), সত্যেন মিত্র (তপন)। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন নিমাই দাস, রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী, সরোজ দে, কাজল ব্যানার্জি, বীণা রায়, অমলেশ সরকার, শঙ্কর গাঙ্গুলী, নিমাই দাস, মুকুল রায়, সত্যেন মিত্র।

প্রচ্ছন্ন মহিমা : পি এণ্ড টি (ক্যালকাটা টেলিফোনস — বাগবাজার) রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রযোজনায় সম্প্রতি বনফুলের 'প্রচ্ছন্ন মহিমা'র নাট্যরূপ পরিবেশিত হোল বিশ্বরূপায়। নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীরতন-কুমার ঘোষ। বিশু চ্যাটার্জি নির্দেশিত এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেন অজিত চ্যাটার্জি, অরুণাভ চক্রবর্তী, মদনমোহন চক্রবর্তী, রঞ্জন ঘোষ, অনন্ত মিত্র, প্রবীর মল্লিক, রানু রায়, শিবানী ভট্টাচার্য, অজিত রাজগুরু, প্রভাস চক্রবর্তী, মুকুল দত্ত, তারক দে, শচীকান্ত মুখার্জি, লালবিহারী ঘোষ, শম্ভু নন্দী, বিশ্বনাথ রায়, গোপীনাথ ঘোষ, কানাই মণ্ডল, মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী ও দীপা হালদার।

দুই মহল : জ্যোছন দস্তিদারের বলিষ্ঠ নাটক 'দুই মহল' সম্প্রতি অভিনয় করলেন ভিলাই স্টীল প্ল্যাণ্ট ক্যালকাটা অফিস

রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা। স্টার থিয়েটারে পরিবেশিত এই নাটকের নির্দেশনায় সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় দেন শংকর রায়। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন শৈলেন মিত্র, ভোলা সেন, মাধব বোস, নির্মল চক্রবর্তী, প্রতিমা পাল, অসিত চক্রবর্তী, মঞ্জুশ্রী সেনগুপ্তা, রাধিকা মুখার্জি, লক্ষ্মী দাস, শঙ্কর রায়, সুনীল দাশগুপ্ত, জয়ন্ত সোম, পঞ্চানন দে, সুব্রত চৌধুরী।

বিবিধ সংবাদ

জয়শ্রী ব্যানার্জি

সেতার শিল্পী জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়—

গত ১২ই জুলাই থিয়েটার সেন্টারে আয়োজিত একটি ঘরোয়া আসরে প্রতিভাময়ী সেতার শিল্পী জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহা) সেতারে প্রথমে মালকোষ ও পরে বাগেশ্রী শোনালেন। সঙ্গে তবলা সংগত করলেন শঙ্খ চট্টোপাধ্যায়। জয়শ্রীর হাতের কাজ অতি সূক্ষ্ম এবং ভঙ্গী সরল। সুর পরিবেশনে এই কৃতিত্বের জন্য সেদিনের আসরে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁর বাজনা শুনেছেন।

এই মাসের শেষের দিকে বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি একক সেতার বাজনা শোনাবার ব্যবস্থা করছেন। এই দিনকার আসরে বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সবিতাব্রত দত্ত, বিমান ঘোষ, তরুণ রায়, শম্ভু মিত্র প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সূচনায় প্রবীন সাংবাদিক নির্মলকুমার ঘোষ সংক্ষিপ্ত ভাষণে জয়শ্রীর পরিচয় প্রদান করেন।

জয়শ্রীর পিতৃদেব পণ্ডিত শচীন সাহা ওস্তাদ দবীর খানের শিষ্য এবং বর্তমানে মেদিনীপুর মিউজিক কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। পিতার সংগীত বিষয়ে অসাধারণ জ্ঞান কন্যা জয়শ্রীর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। জয়শ্রী একজন কৃতী ছাত্রী। তিনি ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর এম-এ এবং হিন্দুস্থানী গানে প্রথম শ্রেণীতে সংগীত সরস্বতী উপাধি পেয়েছেন। এম-এ পরীক্ষার পর তিনি বৃটেনে যান। সেখানে বি বি সি এবং টেলিভিসনে তাঁর সেতার পরিবেশিত হয়। ১৯৬৭-তে লণ্ডনে পার্লাফোন (গ্রামাফোন) জয়শ্রীর যে বিলম্বিত লংপ্লেয়িং ডিস্ক প্রকাশ করেন, তা অচিরেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং প্রচুর বিক্রী হয়।

জয়শ্রীর সেতার পরিবেশনায় বৈচিত্র্য আছে, তিনি একটা নতুন ধারার প্রবর্তনে প্রয়াসী। নতুনের সন্ধানে তাঁর অন্তর আকুল হয়ে আছে। তাঁর সেতার বাদনের মধ্যে যে সূক্ষ্ম কারুকার্য লক্ষ্য করা গেল, তাতে একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, জয়শ্রীর শিল্পনৈপুণ্য অচিরেই অসীম জনপ্রিয়তা অর্জন করবে।

দিশারী পুরস্কার অনুষ্ঠান

নাট্য-সাংবাদিকদের বিচারে ১৯৭০ সালের শ্রেষ্ঠ যাত্রা, নাটক ও উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত প্রভৃতির ক্ষেত্রে স্রষ্টা ও শিল্পীদের 'দিশারী পুরস্কার' দ্বারা সম্মানিত করা হয় গত ১৬ জুলাই রামমোহন লাইব্রেরী হলে। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। সভাপতির ভাষণে শ্রীবসু বলেন—তরুণ প্রতিভাধর স্রষ্টা ও শিল্পীদের স্বীকৃতি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এর একটা সুফল আছে। পুরস্কৃত স্রষ্টা ও শিল্পীরা এর ফলে পরবর্তীকালে আরও মহৎ সৃষ্টিতে উৎসাহ লাভ করেন। সুতরাং দিশারীর এই পুরস্কার প্রদান সর্বদিক থেকে প্রশংসনীয়।

ডঃ রমা চৌধুরী মহৎ আদর্শ ও সৎ প্রচেষ্টার জন্য দিশারীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। সাধারণ সম্পাদক রমেন ঘোষ আগামী কার্যসূচী বর্ণনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে যাঁরা পুরস্কার গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিজয় চক্রবর্তী, সুব্রত রায়চৌধুরী, গোবিন্দ বসু, মায়া চ্যাটার্জি, লিপিকা গুপ্ত, সমর মুখার্জি, বাউল ঠাকুর, হীরক মুখার্জি, দেবকুমার ভট্টাচার্য, ছন্দা চ্যাটার্জি, রমেন লাহিড়ী, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, অজাতশত্রু, সুজিত পাঠক, ভক্ত মল্লিক ও ছবি চ্যাটার্জি। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন কল্পনা সাহা রায়।

নিউ প্রভাস অপেরা

গেল বছরের 'বিপ্লবী ভিয়েতনাম' পালা অভিনয়ে নাট্য সাংবাদিকদের বিচারে ১৯৭০ সালের শ্রেষ্ঠ নাট্যসংস্থা প্রভাস অপেরার এ বছরে প্রধান পালা রমেন লাহিড়ী রচিত ও পরিচালিত 'রাহুমুক্ত রাশিয়া'। এছাড়াও আছে 'অগ্নিদূত'-এর 'বর্বর সভ্যতা', কমলেশ ব্যানার্জির 'বাঘিনী' এবং কানাই নাথের 'অপরাধী কারা'। সুরারোপে আছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস, অজিত বসু ও মহেন্দ্র দত্ত। অংশগ্রহণ করছেন : ননী ভট্ট, অভয় হালদার, রাধারমণ পাল, অনাদি চক্রবর্তী, জয়ন্তকুমার, অমূল্য ভট্টাচার্য, রাজকুমার, মুকুন্দ মালি, সতীশ দাস, কল্যাণী ভট্টাচার্য, অরুণা গোস্বামী, প্রতিমা ভট্টাচার্য, রীতা সেন প্রমুখ।

সঙ্গীতচক্রের রবীন্দ্র-নজরুল জন্মোৎসব

সম্প্রতি এক মনোরম সন্ধ্যায় সঙ্গীত চক্রের শিল্পীবৃন্দ বিদ্যালয় ভবনে রবীন্দ্র-নজরুল জন্মোৎসব পালনের আয়োজন করেছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র। বিদ্যালয়ের শিক্ষক রামকমল চট্টোপাধ্যায়, স্বপন গুপ্ত প্রমুখ প্রথিতযশা ও বহু উদীয়মান শিল্পীদের কণ্ঠসঙ্গীত রসিক শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিল। ছাত্রছাত্রীরাও এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য লীলা দেবী, মণ্টু মুখোপাধ্যায়, গীতশ্রী দত্ত, জয়তী মুস্তাফী, কল্যাণকান্তি দাস, অসীমা পাল, দেবযানী চক্রবর্তী, অদিতি মুখার্জি, সীমা ঘোষ, মোহন মুখার্জি, বলদেব চট্টোপাধ্যায়, আগমনী সিংহ, বাণী চক্রবর্তী প্রমুখ। শিশুশিল্পীদের উদ্বোধনী সঙ্গীত প্রশংসা করবার মতো। অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন হরেন দে এবং দেবব্রত দত্ত।

চিত্তরঞ্জনে সান্ধ্য সম্মিলনী

চিত্তরঞ্জনে বিশিষ্ট চিত্র-পরিচালক শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সম্প্রতি 'রঞ্জন' প্রেক্ষাগৃহে এক মনোরম সান্ধ্য সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে নাচ-গান-বাজনায় ও মূকাভিনয়ে স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি আরো যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তাঁরা হলেন—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় (বোম্বে), কার্তিক-বসন্ত (বাংলার আশা ও লতা), কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, বলরাম দাস ও খ্যাতিমান মূকাভিনেতা দীপক ঘোষ। শ্রীঘোষের 'জয়বাংলা' ফিচারটি দর্শকদের সহর্ষ অভিনন্দন লাভ করে।

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দল

১৯৭১ সালের ইংল্যান্ড সফরের ৬ষ্ঠ খেলায় ভারতীয় ক্রিকেট দল এক ইনিংস ও ৩ রানে ওয়ারউইকসায়ার কাউন্টি দলকে পরাজিত করেছে।

তিনদিনব্যাপী খেলার প্রথম দিনে ওয়ারউইকসায়ার দল প্রথম ইনিংসের ৩ উইকেটে ৩৭৭ রান সংগ্রহ করে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করলে ভারতীয় দল খেলার বাকি সময়ে ২ উইকেটের বিনিময়ে ৯৪ রান সংগ্রহ করেছিল। ওয়ারউইকসায়ার দলের জন জেমসন এবং হোয়াইটহাউস ভারতীয় বোলিংকে তছনছ করে খেলায় আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। জেমসন ডাবল সেঞ্চুরী (২৩১ রান) করেন। তিনি ২৬৫ মিনিট খেলে তাঁর ২৩১ রানে ৪টে ওভার-বাউন্ডারী এবং ৩৩টা বাউন্ডারী করেছিলেন। ৩য় উইকেটের জুটিতে জেমসন এবং মাইক স্মিথ বাড়ের গতিতে ১৭৯ মিনিটের খেলায় ২৩১ রান সংগ্রহ করেন। মাইক স্মিথ ৭২ রান করে নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসে ৫১০ রান দাঁড়ায় (৬ উইকেটে)। সরদেশাই ১২০ রান করেন—এবারের সফরে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী। ৩য় উইকেটের জুটিতে ওয়াদেকার ও সরদেশাই ১৫৬ রান এবং ৪র্থ উইকেটের জুটিতে সরদেশাই ও বিশ্বনাথ ১১৮ রান তুলেছিলেন।

তৃতীয় দিনে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ৫৬২ রানের মাথায় শেষ হয়। ইংল্যান্ড সফরে এই ৫৬২ রানই ভারতীয় দলের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রান।

তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ওয়ারউইকসায়ার দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৮২ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতীয় দল এক ইনিংস ও ৩ রানে জয়ী হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়ারউইকসায়ার : ৩৭৭ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। জন জেমসন ২৩১, হোয়াইটহাউস ৫২ এবং মাইক স্মিথ নট আউট ৭২ রান। বেদী ১০৬ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৮২ রান (রোহন কানহাই ৫৯ রান। বেদী ৬৪ রানে ৫ এবং প্রসন্ন ৫৭ রানে ৪ উইকেট)

ভারতীয় দল : ৫৬২ রান (ওয়াদেকার ৭৭, সরদেশাই ১২০, বিশ্বনাথ ৯০ এবং আবিদ আলী ৯৩ রান। ব্র্যাকিকরণ ১০০ রানে ৫ উইকেট)

সফরের সপ্তম খেলায় ভারতীয় দল ১০২ রানে ১৯৬৯ সালের কাউন্টি লীগ চ্যাম্পিয়ান গ্ল্যামর্গ্যান কাউন্টি দলকে পরাজিত করে উপর্যুপরি তিনটি খেলায় জয়লাভের গৌরব লাভ করে। সাতটি খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে—ভারতীয় দলের জয় ৪, হার ১ এবং খেলা ড্র ১।

প্রথম দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ২৮৪ রানের মাথায় শেষ হলে গ্ল্যামর্গ্যান ১০টা উইকেট হাতে জমা নিয়ে ৪৬ রান সংগ্রহ করেছিল। ল্যাংকাসায়ার কাউন্টি দল থেকে ছুটি পেয়ে উইকেট কিপার ফারুক ইঞ্জিনীয়ার এই প্রথম ভারতীয় দলে খেলতে নামেন এবং দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৬২ রান করে অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে গ্ল্যামর্গান দলের প্রথম ইনিংস ২০৩ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতীয় দল ৮১ রানে এগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ২৪৫ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। গ্ল্যামর্গান দলের প্রথম ইনিংসের শেষ ৪টা উইকেট মাত্র ১৯ রানে পড়ে যায়। ভেঙ্কটরাঘবন এবং বেদীর বোলিংয়ের ভেল্কিতে এই বিপর্যয় ঘটে। ভেঙ্কটরাঘবন ৭৬ রানে ৬টা এবং বেদী ৬৬ রানে ৩টে উইকেট পান। ভেঙ্কটরাঘবন ২য় ইনিংসে ৫৭ রান করে ব্যাটিংয়েও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। যেখানে খেলায় জয়লাভের জন্য গ্ল্যামর্গানের ৩২৭ রানের প্রয়োজন ছিল সেখানে তারা ১০টা উইকেট

বিষেণ সিং বেদী

হাতে নিয়ে ২য় দিনের খেলায় ১১ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে গ্ল্যামর্গান দলের ২য় ইনিংস ২২৪ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ১০২ রানে হেরে যায়। খেলায় বেদী ১৫৯ রানে ৯টা এবং ভেঙ্কটরাঘবন ১৭০ রানে ৯টা উইকেট পান।

ভেঙ্কটরাঘবন

এখানে উল্লেখ্য, ১৯৩২ সালে ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রথম সরকারী সফরে গ্ল্যামর্গান দলের বিপক্ষে ভারতীয় দল যে দুটি ম্যাচ খেলেছিল তার প্রথমটি ড্র ছিল এবং দ্বিতীয় খেলায় ভারতীয় দল ৫৪ রানে জয়ী হয়েছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারতীয় দল : ২৮৪ রান (বেগ ৪৭, বিশ্বনাথ ৫২, আবিদ আলী ৪৬ এবং ইঞ্জিনিয়ার নট আউট ৬২ রান। টনি কর্ডল ৪৯ রানে ৪ উইকেট)

ও ২৪৫ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ওয়াদেকার ৭৩ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ৫৭ রান)।

গ্ল্যামর্গান : ২০৩ রান (এম খান ৭৮ রান। ভেঙ্কটরাঘবন ৭৬ রানে ৬ এবং বেদী ৬৬ রানে ৩ উইকেট)

ও ২২৪ রান (ম্যালকম নাশ ৭৫ এবং জোন্স ৫৫ রান। বেদী ৯৩ রানে ৬ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ৯৭ রানে ৩ উইকেট)।

ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান

তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলা

ইংল্যান্ড : ৩১৬ রান (জিওফ বয়কট ১১২ এবং বেসিল ডি ওলিভিয়েরা ৭৪ রান। আশিফ ইকবাল ৩৭ রানে ৩ এবং ইন্তিখাব আলম ৫১ রানে ৩ উইকেট)

ও ২৬৪ রান (ডি ওলিভিয়েরা ৭২, এমিস ৫৬ এবং ইলিংওয়ার্থ ৪৫ রান। সেলিম ১১ রানে ৪, ইন্তিখাব ৫১ রানে ৩ উইকেট)

পাকিস্তান : ৩৫০ রান (জাহির আব্বাস ৭২, মুস্তাক মহম্মদ ৫৭ এবং ওয়াসিম বারি ৬৩ রান। রিচার্ড হাটন

৭২ রানে ৩, গিফোর্ড ৬৯ রানে ৩ এবং ওলিভিয়েরা ৪৬ রানে ৩ উইকেট)

● ২০৫ রান (সাদিক মহম্মদ ৯১ রান। পিটার লেভার ৩টি, ইলিংওয়ার্থ ৩টি, ওলিভিয়েরা ২টি এবং গিফোর্ড ২টি উইকেট পান)

লিডসের শেষ তৃতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড নাটকীয়ভাবে পাকিস্তানকে ২৫ রানে হারিয়ে ১৯৭১ সালের টেস্ট সিরিজে ১—০ খেলায় (ড্র ২) 'রাবার' জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে পাকিস্তান কখনও 'রাবার' জয়ী হয়নি। এই দুই দেশের মধ্যে এপর্যন্ত যে ৬টি টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে তার ফলাফল ঃ ইংল্যাণ্ডের 'রাবার' জয় ৪টি এবং সিরিজ অমীমাংসিত ২টি। টেস্ট খেলার ফলাফল ঃ মোট খেলা ২১টি ইংল্যাণ্ডের জয় ৯টি, পাকিস্তানের জয় ১টি এবং খেলা ড্র ১১টি।

চার বছর আগে ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষ ইংল্যাণ্ড সফরে গিয়ে টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ডের কাছে হেরেছিল—পাকিস্তান ১—২ খেলায় এবং ভারতবর্ষ ০—৩ খেলায়। পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষের চলতি ১৯৭১ সালের ইংল্যাণ্ড সফর ১৯৬৭ সালের পর প্রথম।

ক্রিকেট খেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ফলাফল সম্পর্কে দারুণ অনিশ্চয়তা। তার প্রমাণ ইংল্যাণ্ড-পাকিস্তানের শেষ তৃতীয় টেস্ট খেলায় হাতে-নাতে পাওয়া গেল। শেষ পঞ্চম দিনে পাকিস্তান ধাপে ধাপে জয়লাভের পথে এগিয়েছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে আর মাত্র ২৮ রান তুলতে পারলেই পাকিস্তানের জয় — হাতে তিনটে উইকেট জমা এবং সময়ও যথেষ্ট। খেলার ঠিক এই অবস্থায় ইংল্যাণ্ডের পরাজয় যে অবধারিত তা তাদের অতি বড় গোঁড়া সমর্থকরাও মেনে নিয়েছিলেন।

বেসিল ডি ওলিভিয়েরা এক ওভারে পাকিস্তানের দুটো উইকেট নিয়ে ইংল্যাণ্ডের অনুকূলে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি যে দুজনকে আউট করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসের নায়ক সাদিক মহম্মদ, যিনি তাঁর ব্যক্তিগত ৯১ রানে আউট হন। এরপর ল্যাঙ্কাশায়ার কাউণ্টি দলের পেস বোলার পিটার লেভার কোন রান না দিয়ে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসের শেষ তিনটে উইকেট নিলেন মাত্র চারটে বল খেলে। আর মাত্র ২৬ রান সংগ্রহ না করতে পারায় পাকিস্তান ২৫ রানে হেরে গেল—খেলার কি নাটকীয় পরিণতি!

আগের প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট খেলা ড্র যায়—টেস্ট সিরিজের এই অবস্থায় ইংল্যাণ্ড এবং পাকিস্তান শেষ তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামে। ইংল্যাণ্ড টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করে। খেলার সূচনা মোটেই শুভ হয়নি—৪ রানের মাথায় ১ম এবং ১০ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়। খেলার মোড় ঘুরিয়েছিলেন ৪র্থ উইকেট জুটি বয়কট এবং ওলিভিয়েরা। তাঁরা ৪র্থ উইকেটের জুটিতে দলের ১৩৫ রান তুলেছিলেন। জিওফ বয়কট ১১২ রান করে আউট হন। তিনি ২৫৫ মিনিট খেলে তাঁর ১১২ রানে ১৩টা বাউণ্ডারী করেন। দুটি টেস্ট খেলাতেই বয়কট সেঞ্চুরী করেছেন। তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়জীবনে সেঞ্চুরীর সংখ্যা দাঁড়ালো ১১টি। প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩০৯ (৯ উইকেটে)।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংস ৩১৬ রানের মাথায় শেষ হয়। পাকিস্তানের উইকেট-কিপার ওয়াসিম ব্যার ৫টা সর্বাধিক লুফে পাকিস্তানের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় উইকেট-কিপার হিসাবে সর্বাধিক 'ক্যাচ' নেওয়ার যে রেকর্ড ছিল তা স্পর্শ করেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় পাকিস্তান প্রথম ইনিংসের ৪টে উইকেট খুইয়ে ২০৮ রান সংগ্রহ করেছিল। এই ২০৮ রানের মধ্যে ১২৯ রান তুলেছিলেন ৩য় উইকেট জুটি জাহির আব্বাস (৭২ রান) এবং মুস্তাক মহম্মদ (৫৭ রান)।

তৃতীয় দিনে পাকিস্তানের ১ম ইনিংস ৩৫০ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ৩৪ রানে এগিয়ে যায়। খেলার বাকি সময়ে ইংল্যাণ্ড ২য় ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে ১৭ রান সংগ্রহ করেছিল। পাকিস্তানের উইকেট-কিপার ওয়াসিম বারি ৬৩ রান করে শেষ আউট হন। তিনি উইকেটকিপিং এবং ব্যাটিংয়ে বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দেন। ৮ম উইকেটের জুটিতে বারি এবং সেলিম আলতাফ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে দলের অতি মূল্যবান ৫৭ রান তুলেছিলেন।

চতুর্থদিনে চা-পানের পর ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংস ২৬৪ রানের মাথায় শেষ হয়। ইংল্যাণ্ডের শেষ ৫টা উইকেট পড়েছিল মাত্র ১৬ রানে। সেলিম মাত্র ১১ রানের বিনিময়ে ৪টে উইকেট পান। এক সময় তিনি ১৫টা বল খেলে ৩টে উইকেট পেয়েছিলেন মাত্র ১ রান দিয়ে। উইকেট-কিপার ওয়াসিম বারি ২য় ইনিংসে ৪টে 'ক্যাচ' লুফেছিলেন। প্রথম ইনিংসে লুফেছিলেন ৫টা।

খেলায় জয়লাভ করতে পাকিস্তানের ২৩১ রানের প্রয়োজন ছিল। চতুর্থ দিনের বাকি সময়ের খেলায় তারা কোন উইকেট না খুইয়ে ২৫ রান সংগ্রহ করেছিল।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনের খেলার সূচনায় পাকিস্তানকে মহাসংকটে পড়তে হয়েছিল। কোন রান করার আগেই পূর্ব দিনের ২৫ রানের মাথায় তাদের দুটো উইকেট পড়ে যায়। ৬৫ রানের মাথায় পড়েছিল ৪র্থ উইকেট। এর পর দৃঢ়তার সঙ্গে তারা খেলতে থাকে। এক সময় স্কোর বোর্ডে দেখা গেল ১৬০ রান উঠেছে ৪টে উইকেট পড়ে। জয়লাভের জন্যে আর ৭১ রান তুলতে হবে, হাতে জমা আছে ৬টা উইকেট। খেলার এই অবস্থায় পাকিস্তানের জয়লাভের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান শেষ রক্ষা করতে পারেনি, বাকি ৬টা উইকেটের বিনিময়ে ৭১ রানের পরিবর্তে তারা মাত্র ৪৫ রান সংগ্রহ করেছিল। ইংল্যাণ্ডের অনুকূলে খেলার মোড় নাটকীয়ভাবে ঘুরিয়েছিলেন ওলিভিয়েরা এবং লেভার।

রোডস কাপ

ইউরোপীয়ান জোনের 'বি' গ্রুপের ফাইনালে রুমানিয়া ৫—০ খেলায় পশ্চিম জার্মানীকে পরাজিত করে প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে ভারতবর্ষের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হকি দলের অস্ট্রেলিয়া সফর

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হকি দল কৃপাল সিংয়ের নেতৃত্বে তাদের অস্ট্রেলিয়া সফর শেষ করে অপরাজিত অবস্থায় স্বদেশে ফিরে এসেছে। সফরের মোট ৯টি খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে ঃ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলের জয় ৮ এবং খেলা ড্র ১। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দল ৪৪টি গোল দিয়ে মাত্র ৭টি গোল খেয়েছে।

চিঠিপত্র

শ্রীহট্টের লোকসংগীত

সম্পাদক মহাশয়, বাংলাদেশ ছেড়ে আসার পর যত অশান্তিতেই থাকি না কেন—একটা সুযোগ ঘটেছে। সেটা হলো অমৃত পড়ার সুযোগ। ইতিমধ্যে আমি অমৃতের অনেকগুলো সংখ্যা পড়ে ফেলেছি—এবং অমৃতত্ত্ব উপলব্ধি করার বিচক্ষণতা আমার না থাকলেও আমি এটাকে ভালো-বেসেছি। সেই দাবী নিয়েই চলতি সালের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দেবনাথ-এর 'শ্রীহট্টের লোকসংগীত' শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পর্কে আমি কয়েকটা কথা বলবো।

প্রবন্ধটিতে লেখক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন এবং এটি তাঁর তীক্ষ্ণ মননশীলতার প্রমাণ দেয়। রাধারমণ দত্ত আর সৈয়দ শাহনূর সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা খুবই খাঁটি, এবং সত্যি কথা বলতে কি পূর্ব-বাংলায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় গত দু'বছরে এই ধরনের আলোচনা চোখে পড়েনি। প্রবন্ধটি খুবই সংক্ষিপ্ত এবং বাহুল্যদোষ বর্জিত। কিন্তু তাই বলে যে এটা সম্পূর্ণ—এটা আমরা বলতে পারিনে। কিছু কিছু উপেক্ষা করার দোষে এটা জর্জরিত। যেমন ধরুন, হাছন রজার কথা। সিলেটের কবি হাছন রাজা বাংলাতে 'মরমী কবি' হিসেবে আখ্যাত হয়েছেন। প্রবন্ধকার এক জায়গাতে তার নামটি শুধু বলেছেন আর একটি কথাও বলেননি। স্বপ্ন-ঘেরা কাজল-মাটির দেশ সিলেট সম্পর্কে কোন কথা বলতে বা লিখতে গেলে যাকে প্রথম স্মরণ করা কর্তব্য—তাঁকে বাদ দিয়ে অথবা তার সম্পর্কে এতটা মৌনভাব অবলম্বন করলে ভালো লাগে না। তাছাড়া এই উপেক্ষিতদের মধ্যে আছেন—বাউল শাহ-মণ্ডলা ও শের আলী। লোকসঙ্গীতে কি এঁদের দান এতই কম যে প্রবন্ধকার বিনা-বিচারে এঁদের প্রবন্ধের চৌহদ্দি থেকে বের করে দিলেন? প্রবন্ধটি দীর্ঘায়িত করার অনিচ্ছা না হয় লেখককে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে—এটা বুঝলাম, কিন্তু এই জন্যে এঁদের মত দুজন প্রতিভাবান লোক-গীতিকার ও লোকসংগীতজ্ঞকে উপেক্ষা করার তো কোনো কারণ নেই।

অবশ্য আমি বলছি না—প্রবন্ধটি আরো বড়ো হলে ভালো হতো। আমার কথা হলো সংক্ষিপ্ত আলোচনা কি কখনো পূর্ণাঙ্গ হয় না? এই অপূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধটি আমাদের কয়েকটা তথ্য পেশ করেছে যেগুলোকে আমরা নিঃসন্দেহে সত্য বলতে পারি না। যেমন ধরুন, এক জায়গায় তিনি হজরত শাহজালাল ও শ্রীচৈতন্যের ভাবধারার উত্তরাধিকার পল্লীকবির সংখ্যা একশ কুড়িজন বলে নির্দেশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটা হবে একশ চল্লিশ। লাউড়কে হিন্দু-রাজ্যের আওতায় রেখে প্রবন্ধকার আরেকটি ঐতিহাসিক সত্য সম্পর্কে ভ্রান্তিপাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন। কারণ আমরা জানি তখন হজরত শাহ-ই-আরেফীন (হজরত শাহজালালের অন্যতম শিষ্য) লাউড় অধিকার করেন এবং ইসলাম-ধর্ম প্রচার করেন। এটা একটা ধ্রুব সত্য কথা যে, অনেক তত্ত্ব ও তথ্যানুসন্ধানী পাঠক ভ্রান্তিপাশে না পড়ার জন্যে সাময়িক পত্র-পত্রিকা পাঠ করেন। এক্ষেত্রে অমৃতের মতো একটি বহুল-প্রচারিত পত্রিকা থেকে পাঠক-মহলের বিভ্রান্তির পরিসর না বাড়ানোটাই আমরা আশা করি।

বরুণ চক্রবর্তী,
গৌহাটি-১১

তিরুমালা প্রসঙ্গে

গত ১৭ই আষাঢ়, 'অমৃতে' (১১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা) শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের 'তিরুমালা' ভ্রমণ-কথা আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম। শ্রীসান্যালের লেখায় ইতিপূর্বে দক্ষিণ ভারতের কথা পড়েছি বলে মনে পড়ে না; তাঁর ভ্রমণ কাহিনীর প্রতি বাঙালী পাঠকমাত্রেরই কৌতূহল বেশী।

তিরুপতি শহরের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন: 'সম্প্রতি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলেছে।' যতদূর জানি তিরু-পতি শহরে শ্রীভেংকটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে ১৯৫৪ সালে। 'একটি বিশ্ববিদ্যালয়' বলতে লেখক কি শ্রীভেংকটে-শ্বর বিদ্যালয় বোঝাতে চেয়েছেন; এবং নির্মাণ কাজ কি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বাড়ির? ভ্রমণকাহিনীতে উল্লেখ থাকলে অনেক প্রশ্নের উত্তর পেতে সহজ। শ্রীভেংকটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয় একটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান বলেই এ কথা মনে এল। নমস্কারান্তে ইতি—

শোভন বসু,
কলকাতা-৩৩

(২)

মেদিনীপুর জেলার সুদূর পল্লীগ্রামের অমৃত পত্রিকার এক অনুরাগী পাঠকের নমস্কার গ্রহণ করুন। বহুদিন অমৃত পড়ছি নিতানূতনতর লেখার আস্বাদ পাওয়ায় আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। পরে লিখি যে—শ্রীযুক্ত প্রবোধ-কুমার সান্যাল মহাশয়ের তিরুমালা ভ্রমণ কাহিনী এত সুন্দর হয়েছে—পড়তে পড়তে মন সুদূর সেই দাক্ষিণাত্যে চলে যায়। সব চেয়ে লেখাটি এক জায়গায় এত ভালো লেগেছে, যেখানে উনি লিখেছেন—এত ধন-বানদের গড়া মন্দিরের ঠাকুররা যদি জগৎ পূজ্য হতেন বা ঐসব বিত্তশালীদের ঐ অর্থ যদি সর্বহারাদের হত কত সুন্দর না হত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট—এঁরা দরিদ্রের ঘরে জন্ম নিয়েও আজ জগৎ-পূজ্য। কিন্তু ভারতের এইসব মহৎ ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কত সুন্দরভাবে মানুষের আকুল আশাকে নূতনভাবে রূপায়িত করেছেন তা লিখে কি আর জানাব। এই অমৃতে বিবেকানন্দ মুখো-পাধ্যায় লিখিত দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের ইতিহাস একটি অমূল্য সম্পদ। ইতিহাসের একটি নূতন সৃষ্টি। অমৃত সত্যি অমৃত। এটা কোন স্তাবকতা নয়, সাহিত্যের দিক দিয়ে এক অমূল্য সৃষ্টি। জানি না এই চিঠি অমৃতের চিঠিপত্র বিভাগে ছাপা হবে কিনা। তবু ভাল যেটা তাকে সাধুবাদ দিতেই হবে।

ডাঃ অমিলকুমার হাজরা,
মেদিনীপুর।

'স্ত্রী শিক্ষার উন্মালনে' প্রসঙ্গে

মহাশয়,

গত ১০ই আষাঢ়ের 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত আশা দেবীর 'স্ত্রী শিক্ষার উন্মালনে' প্রবন্ধটি পড়লাম।

প্রবন্ধটির কোথাও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামোল্লেখ না দেখে মর্মাহত হলাম। আজ আমাদের দেশের যে হাল-চাল তাতে 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' বলে কোন ব্যক্তি আমাদের দেশে কোনদিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। জানি না, এরই বশবর্তী হয়ে লেখিকার তাঁর সম্বন্ধে বিস্মরণ ঘটেছে কি না।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে কলকাতায় ভারত-হিতৈষী ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন কর্তৃক যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, সেই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক হিসেবে কাজ করবার জন্য বীটন সাহেব বিদ্যাসাগরকেই নিযুক্ত করেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এতই উৎসাহ বা আগ্রহ ছিল যে, তিনি [illegible] বাসীকে এ-বিষয়ে সচেতন [illegible] জন্য বিদ্যালয়ের বালিকা [illegible] দুপাশে 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ'—মনুসংহিতার এই শ্লোকাংশ খোদিত করে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই প্রচেষ্টায় উত্তরকালে অর্থাৎ নবেম্বর ১৮৫৭ থেকে মে ১৮৫৮ এই ক'মাসের মধ্যে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় (হুগলী জেলায় ২০টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি এবং নদীয়ায় ১টি)। বিদ্যালয়গুলির ছাত্রী সংখ্যা ছিল প্রায় ১৩০০, মাসিক খরচ হোত ৮৪৫ টাকা।' (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

বারিদবরণ ঘোষ,
চুঁচুড়া
হুগলী।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১১শ বর্ষ
১ম খণ্ড

১৩শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday 30th July, 1971 ১৩ই শ্রাবণ ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীমলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

'এক নজরে'

রাজনীতি ও ব্যক্তিগত জীবন :

উত্তর আয়ারল্যান্ডের (আলস্টার) বিদ্রোহী তরুণী কুমারী বার্নাদেৎ দেভলিন দু বছর আগে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন, মাত্র একুশ বছর বয়সে বৃটিশ কমন্সসভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে। উত্তর আয়ারল্যান্ডের নির্যাতিত সংখ্যালঘু ক্যাথলিকদের প্রতিনিধি তিনি, তাঁদের ক্ষোভ ও অভিযোগের কথা বৃটিশ জনগণকে জানানোর উদ্দেশ্যেই তিনি ১৯৬৯ সালে মধ্য আলস্টার কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রার্থী হন ও বিপুল জনসমর্থনে জয়লাভ করেন। পরের বছর সাধারণ নির্বাচনেও তিনি ঐ কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন। ইতিমধ্যে তিনি উত্তর আয়ারল্যান্ডের জনগণের হয়ে নানা বিক্ষোভ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধও হয়েছেন। সম্প্রতি বৃটিশ পার্লামেন্টের ঐ কুমারী সদস্যা ঐ দ্বীপরাজ্যের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে আবার দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন, আগামী শরতে তিনি সন্তানের জননী হবেন—এই অভাবনীয় চাঞ্চল্যকর সংবাদ ঘোষণা করে। সন্তানের পিতা কে তা তিনি জানান নি।

শ্রীমতী দেভলিনের ঘোষণা সবচেয়ে বিমূঢ় করে মধ্য-আলস্টারের জনগণকে যাঁরা দুবার তাঁকে নির্বাচিত করে পাঠিয়েছেন বৃটিশ কমন্স সভায়। কিন্তু ধীরে-ধীরে তাঁরাও ব্যাপারটাকে সহজ করে নিচ্ছেন বলে মনে হয়। ক'দিন আগে শ্রীমতী দেভলিন ঘোষণা করেছেন, তিনি শীঘ্রই তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক ঘরোয়া সভায় মিলিত হবেন। আর ঐ কেন্দ্রের ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোস্যালিস্ট এসোসিয়েশনের বিশিষ্ট নেতা হ্যারী ম্যাককয় বলেছেন : আমরা এখনও তাঁকে পূর্ণ সমর্থন করি। তিনি আমাদের দলের প্রতিনিধিরূপে নির্বাচনে জয়ী হন, ভবিষ্যতেও তিনি আমাদের প্রতিনিধি থাকবেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব ব্যাপার, আমরা তার সঙ্গে রাজনীতিকে জড়াতে চাই না। আমরা তাঁর রাজনৈতিক আদর্শে আস্থা স্থাপন করেছিলাম, সে আস্থা আমাদের এখনও অটুট আছে।

উত্তর আয়ারল্যান্ডের সব রাজনৈতিক মহল শ্রীমতী দেভলিনের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্যে নারাজ, এবং ঐ এলাকা থেকে নির্বাচিত কমন্স সভার অন্যান্য বিরোধীপক্ষীয় সদস্য স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, শ্রীমতী দেভলিনের ব্যক্তিগত জীবনের কোন ব্যাপার নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাতে চান না।

পুলিশ জুলুম চলবে না :

এই সুপরিচিত ধ্বনিটি বিশ্বের অন্যান্য দেশেও মাঝে-মাঝেই শোনা যায়। সম্প্রতি বৃটেনের পাঁচ শতাধিক যুবক-যুবতী এক যুক্ত বিবৃতিতে দাবী জানিয়েছেন যে, রীডিং পপ ফেস্টিভ্যালে পুলিশ তাদের সঙ্গে যে অপমানকর ব্যবহার করেছে তার পূর্ণ তদন্ত করতে হবে এবং এ ধরনের লাঞ্ছনা যাতে তাঁদের আবার সইতে না হয় তার জন্য দোষী পুলিশ অফিসারদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। ঐ যুবক-যুবতীদের হয়ে এখন আন্দোলন চালাচ্ছে 'এ ডি ই' নামক এক নাগরিক অধিকার রক্ষা আন্দোলনকারী দল।

যুবক-যুবতীদের অভিযোগ, নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যের সন্ধানে পুলিশ তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায় এবং এ ব্যাপারে কোন বাদ-বিচার করা হয় না বা শালীনতাও রক্ষা করা হয় না, যদিও অতক্ষণ ধরে তল্লাসী চালিয়েও পুলিশ আপত্তিকর কিছুই প্রায় পায় নি। বহু পুরুষ পুলিশ অফিসারের সম্মুখে তল্লাসীর নামে মেয়েদের প্রায় বিবস্ত্র করে ফেলা হয় এবং সেসময় বহু অশ্রাব্য মন্তব্য পুলিশ অফিসারদের মুখে শোনা যায়। অনেককে দু-তিনবার তল্লাসী করা হয়।

উনিশ বছরের অন্তঃসত্বা মেয়ে শ্রীমতী প্যাট্রিসিয়া বেয়লী তাঁর অভিযোগলিপিতে বলেছেন, তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে ঐ উৎসবে গিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ এক নারী পুলিশ তাঁকে দেহ-তল্লাসীর জন্য যেতে বলে এবং তিনিও যেতে বাধ্য হন। তারপর নিকটবর্তী একটি বাড়ীর দোতলায় তাঁকে নিয়ে গিয়ে প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, পরে তাঁর হ্যান্ডব্যাগটি টেবিলের উপর উল্টিয়ে ঝেড়ে দেখা হয়, তার মধ্যে আপত্তিকর কিছু আছে কিনা। কিন্তু নারী পুলিশ অফিসাররা তাতেও সন্তুষ্ট হতে না পেরে দরজা বন্ধের আদেশ দেন এবং তারপর 'আমার সর্বদেহ তল্লাসী শুরু হয়। প্রথমে জ্যাকেট খুলি, তারপর ব্লাউজ। তাতেও ওরা সন্তুষ্ট হতে না পেরে আমার ব্রার মধ্যে আঙুল চালিয়ে দেখতে লাগল, কিছু পায় কিনা সেখানে। তারপর ওরা আমার স্ফীতোদর নিয়ে কিছু অশালীন মন্তব্য ও পরিহাস করে আমাকে ছেড়ে দিল।'

একুশ বছরের মেয়ে কুমারী ডায়েনা মিলস বলেছেন, তিনি মেলায় গিয়েছিলেন ছয়জন বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে, শেষ পর্যন্ত হাজতবাস করে ঘরে ফিরেছেন, যদিও আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যায়নি তাঁদের কাছে। আরও অনেকের মতো তাঁদেরও জোর করে ছবি ও আঙুলের ছাপ নিয়েছে পুলিশ।

এ ডি ই-সম্পাদক টনি স্মিথ বলেছেন, একমাত্র অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরই ছবি বা আঙুলের ছাপ পুলিশ নিতে পারে এবং তাও পারে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অনুসারে। এভাবে যাকে-তাকে ধরে এনে জোর করে ছবি নেওয়ার বা আঙুলের ছাপ দিতে বাধ্য করার কোন অধিকার পুলিশের নেই। পুলিশ যা করেছে সেটা তার স্বভাবসুলভ হলেও সম্পূর্ণরূপে তার ক্ষমতা ও এক্তিয়ার-বহির্ভূত আচরণ। প্রায় হাজার খানেক ছেলে-মেয়ের উপর এই অন্যায় আচরণ ও জবরদস্তি কখনও মেনে নেওয়া যেতে পারে না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমগ্র ব্যাপারটি সম্পর্কে পূর্ণ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন।

পাবলো পিকাসো :

বিশ্বখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসোকে তাঁর ৯০তম জন্ম দিনে ও ফ্রান্সে বসবাসের সত্তর বর্ষপূর্তির স্মারক হিসাবে 'সিটিজেন অফ প্যারিস' সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। প্যারিস সিটি কাউন্সিল শুধুমাত্র বিশ্বের বিশিষ্ট নাগরিকদেরই এই সম্মান দিয়ে থাকেন। ইতিপূর্বে স্যার উইনস্টন চার্চিল ঐ সম্মান লাভ করেছিলেন।

২২।৭।৭১ —প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

কুৎসিৎ নাটক

বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে রাজনৈতিক মহানাটকের পালাটা বেশ জমে উঠেছে। হাস্য, করুণ, বীর ও বীভৎস রসের সমাবেশে গঠিত এই নাটক কিঞ্চিৎ প্রাচীনপন্থী। ব্রেখটীয় রীতির জটিল নাটক নয় যে, সাধারণের পক্ষে মর্ম গ্রহণ করা কঠিন হবে, তাই পালাটা সহজেই আসর মাৎ করেছে। নিকসন সাহেব চীন দেশে যাবেন এবং তার পূর্বে নাকি রাশিয়াতে সেখানকার কর্তাদের সঙ্গে দেখাও করবেন। শান্তির প্রয়োজনে মানুষ কি না করে। তিনিও তাই নানা রকম প্রক্রিয়ার দ্বারা এই অভিযাত্রার পরিকল্পনা করেছেন। যে দূতী এই অভিসারের পিছনে গোপনে কাজ করেছেন তাকেও ইতিমধ্যে কয়েক জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র উপঢৌকন পাঠান হয়েছে। অবশ্য এ'রা সবাই সজ্জন, তাই এই সব দ্রব্য দেওয়া হল পূর্ব প্রতিশ্রুতি মাফিক। কিন্তু বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে যেদিন থেকে সেই ২৫শে মার্চের পর, কোনো রকম অস্ত্র সাহায্য যাতে পাঠানো না হয় তার জন্য কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে বাংলাদেশের কোটি-কোটি মানুষ উৎপীড়িত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত হয়ে ভারতবর্ষে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। তারা আসছে ত' আসছেই, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সবাই আসছে, সীমান্ত পার হয়ে থালা-ঘটি, হাঁড়ি-কলসী যা-কিছু শেষ সম্বল তা মাথায় করে চলে আসছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের কর্তারা কিন্তু 'কটু কহিব না, কটু শুনিব না, কটু দেখিব না' এই নীতি অনুসারে চোখে মুখে কানে হাত চাপা দিয়ে গান্ধীজীর সংগ্রহে রক্ষিত সেই তিনটি দারুভূত বানরের মত এতকাল নীরবে বসে ছিলেন। শুধু সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট মহাশয় ব্যক্তিগত মত হিসাবে মানব ইতিহাসের এই জঘন্যতম ট্রাজেডির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ অবশেষে এই সব উদ্বাস্তুদের জন্য কি আন্দাজ সাহায্য সরবরাহ করা দরকার তা সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য প্রিন্স সদরউদ্দীন আগা খাঁকে পাঠালেন। প্রিন্স সাহেব ইসলামাবাদ, ঢাকা, নয়াদিল্লী আর বনগাঁর সীমান্ত অঞ্চল দেখে-শুনে যেখানে যেমন মন্তব্য করা সমীচীন তা করলেন। আর ঠিক তারপরই নিকসনের চীন সফরে যাবার সংবাদে পৃথিবী মুখর হয়ে উঠল। ইয়াহিয়া খুশী, তাঁর দূতীগিরি সার্থক। তিনি তাই সেই মওকায় লন্ডনের 'ফাইনানসিয়াল টাইমসে'র সংবাদদাতাকে (সেই 'ইনডিয়াস চায়না ওয়ার' নামক ভারতবিরোধী গ্রন্থের লেখক রেজিন্যাল্ড ম্যাকসওয়েল) ডেকে বললেন—'ভারত যদি ইষ্ট পাকিস্তানের কোনো অঞ্চল দখল করার চেষ্টা করে, পৃথিবীর মানুষ জেনে রাখো আমি তাহলে যুদ্ধ ঘোষণা করব। আর এই যুদ্ধে পাকিস্তান একা লড়বে না।' আর সেই সঙ্গে একথাও সংবাদদাতাকে জানালেন 'পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আমি রাজী, কিন্তু 'লেডী' রাজী নন।' অর্থাৎ তাঁর যা কিছু গন্ডগোল তা ভারতকে নিয়ে। বাংলাদেশের ব্যাপারটি কিছু নয়, ভারতের সঙ্গে বোঝাপড়া হলেই ত সব গোল চুকে যায়। ঠিক এই সঙ্গেই প্রস্তাব এলো ভারত-পাক সীমানা বরাবর রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনী মোতায়েন করা হোক। তার ফলে উদ্বাস্তুরা অন্তরে নিরাপত্তা অনুভব করবে আর হাসিমুখে 'ফিরে চলো আপন ঘরে' গান করতে-করতে স্বদেশে ফিরবে। ভারত ও পাক দু পক্ষ যেন তুল্যমূল্য। ইসলামাবাদের শাসকচক্রের সুবিধার্থে তাঁরা যা খুসী ইয়াহিয়ার রাজত্বে করুন, কিন্তু ভারতের ভূমিতে তাঁরা দাঁড়াবেন কোন প্রয়োজনে? ভারত আশ্রয়দাতা আর ইসলামাবাদের জঙ্গী শাসকচক্রের পৈশাচিক বর্বরতায় উৎপীড়িত হয়ে শরণার্থীরা এদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ইয়াহিয়াকে ত্রাণ করার জন্য স্বার্থপরায়ণ বিদেশী রাষ্ট্রগুলির এই চালাকী ভারত কোনোমতেই বরদাস্ত করবে না। এদিকে মুক্তিবাহিনীর সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত ঘোষণা করেছে, আমরাও ওদের অস্ত্র সাহায্য করব। এই ঘোষণা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। মুক্তিবাহিনী জয়যুক্ত হলেই উদ্বাস্তুরা সোনার বাংলায় ফিরবেন, তার পূর্বে নয়। এদিনের এই নাটকীয় হুংকার ও তর্জন-গর্জনের অবসানে এই কুৎসিত নাটকের যবনিকা পতন তখনই সম্ভব হবে।

জুনের শেষে যে নাটকীয়ভাবে পশ্চিম বাংলার রাজনীতির মোড় ঘুরে গেল তার অন্ততঃ একটা বাহ্যিক কারণ ছিল বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীর স্রোত। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে যে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার দাঁড় করান হল, একেবারে শুরু থেকেই তার গোড়ায় জোর ধাক্কা দিতে শুরু করল এই স্রোত। ঈশ্বর জানেন, পশ্চিম বাংলার নিজস্ব সমস্যার অন্ত নেই। সেই সব সমস্যা সামলাতে যে-কোন জবরদস্ত সরকারেরই হিমসিম খেয়ে যাওয়ার কথা। তার ওপর এই শাকের আঁটি। নড়বড়ে কোয়ালিশন সরকার যে নাজেহাল হয়ে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কী?

গোড়া থেকেই ঘোষণা করা হল যে, বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের সামলানোর সব ভার কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু দিল্লী তো হাজার মাইল দূরে, প্রথম চোটটা সামলাতে হবে এই রাজ্যকেই। মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার কিছুদিন পরই অজয়বাবু দিল্লীতে, এমন কি প্রধানমন্ত্রীকে পর্যন্ত ব্যক্তিগত চিঠি দিয়ে সমস্যার গুরুত্ব বোঝাতে চাইলেন। পশ্চিম বাংলার একার পক্ষে যে এই বিরাট দায়িত্ব বহন করা সম্ভব নয় সে-কথাও তিনি স্পষ্ট করে দিলেন। সৈন্য বাহিনীর হাতে শরণার্থীদের দেখাশোনার ভার ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাবও উঠল। অন্যান্য রাজ্যে শরণার্থীদের সরিয়ে নেওয়ার কথাও তোলা হল। কিছু কিছু সরানোও হল। রাশিয়া থেকে বিরাট বিমান এল। শরণার্থীদের অনেকে সেই বিমানে চেপে মানা গেলেন। সেই সঙ্গে কিছু ট্রেন বোঝাই করেও মানা পাঠান হল। কিন্তু তাতে মূল সমস্যার বিশেষ সুরাহা হল না।

এ পর্যন্ত ভারতে যত শরণার্থী এসেছেন তাঁদের মোট সংখ্যা সত্তর লাখ ছুঁই-ছুঁই করছে। এর মধ্যে পশ্চিম বাংলাতেই এসেছেন ৫২ লাখের বেশী। এর মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র সোয়া লাখের মত শরণার্থীকে মানা, গয়া ও এলাহাবাদে কেন্দ্রীয় শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাকী সকলেই আছেন এই রাজ্যেই—শিবিরে, আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে, পাতার ছাউনি দেওয়া 'ঘরে' বা কংক্রিটের পাইপে, রাস্তার ধারে অথবা গাছতলায়।

এখনও পর্যন্ত রোজ গড়ে বিশ হাজার করে শরণার্থী আসছেন। এই স্রোত কি কমবার কোন সম্ভাবনা আছে? সেই সম্ভাবনা তো নেই-ই, বরং খুব শীগগির এই স্রোত রীতিমত প্লাবনের আকার ধারণ করতে পারে।

শরণার্থীরা প্রথম আসতে শুরু করেন ২৫ মার্চের পরেই। সেই দলে হিন্দুরা ছিলেন, কিন্তু মুসলমানের সংখ্যাও নগণ্য ছিল না। মাঝে কিছু দিন একটু ভাঁটা পড়ে। তারপর পাক ফৌজ যখন হিন্দুদের ওপর সুপরিকল্পিত অত্যাচার শুরু করে তখন আবার দলে-দলে শরণার্থীরা আসতে থাকেন। তাঁরা প্রায় সকলেই হিন্দু। তারপর আবার শরণার্থী আগমনের হার কিছু কমে যায়। আগে যেখানে দিনে ৫০ হাজার থেকে লাখ খানেক আসছিলেন, এখন সেখানে কুড়ি হাজার—কম মানে এই আর কী! কিন্তু সবচেয়ে বড় ধাক্কা বোধহয় এখনও বাকী। তার কারণ, বাংলাদেশে গুরুতর খাদ্যসংকট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা। পাক ফৌজী শাসকরা এখনও কোন অসামরিক শাসন-ব্যবস্থা সেখানে চালু করতে পারে নি। মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের আক্রমণ জোরদার করে তুলেছেন। ফলে বাংলাদেশে প্রায় সব প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। খাদ্য বন্টন ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত। ফলে অন্ততঃ তিন কোটি লোক খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে খবর এসেছে। বাংলাদেশের মধ্যে যদি তাঁদের জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে ওঠে তবে অনেকেই ভারতে চলে আসবেন। ত্রিপুরা, মেঘালয় ও আসামেও তাঁরা অনেকে যাবেন, কিন্তু বেশীর ভাগই আসবেন পশ্চিম বাংলায়। তাঁদের অধিকাংশই হবেন মুসলমান। কেন্দ্রীয় সরকার আশঙ্কা করছেন, শরণার্থীর মোট সংখ্যা কোটিতে পৌঁছবে। আসলে হয়ত সেই সংখ্যাও ছাড়িয়ে যাবে। এই বছর আদমসুমারীতে পশ্চিম বাংলার লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাড়ে চার কোটি। এই ঘনবসতি রাজ্যে তার ওপর আরো ৫০ লাখ থেকে কোটি খানেক লোক এসে পড়লে অবস্থা কি দাঁড়াবে?

* * *

সব দায়িত্বই কেন্দ্রীয় সরকারের, ঠিকই। পশ্চিম বাংলার বাজেটে এ-জন্যে আলাদা ৫০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে তাও ঠিক। কলকাতার থিয়েটার রোডে আগে যেখানে কুখ্যাত কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্নার দপ্তর ছিল সেখানেই নতুন করে গড়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় ত্রাণ দপ্তর। সেই দপ্তরের কর্তা কর্ণেল লুথরা।

কিন্তু এই দপ্তরের কাজটা অনেকটাই কো-অর্ডিনেশানের। দিল্লীর সংগে যোগাযোগ রাখা, সব কাজ ঠিকমত হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখা। আসল ধাক্কাটা আসছে পশ্চিম বাংলা সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থার ওপর। কিন্তু সেখানেও বিভ্রান্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট। পুনর্বাসন ও ত্রাণের কাজের জন্যে সরকারের একটি দপ্তর আছেই। তার ভার কমিশনার পর্যায়ে একজন অফিসারের ওপর। তার ওপর একটা বিশেষ পদও তৈরী করা হয়েছে — ডিরেকটর-জেনারেল অফ ইভাকুইজ। এঁদের কার কী এক্তিয়ার তা এখনও স্পষ্ট করে বলা হয় নি। ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু পুনর্বাসন দপ্তরই থাক আর নতুন পদ তৈরী করাই হোক, সেটা অনেকটাই রাইটার্স বিল্ডিংসের ব্যাপার। যে-সব জেলায় সরকারী অফিসাররা শরণার্থীদের সামলাতে হিমসিম খাচ্ছেন তাঁদের এতে বিশেষ আসে-যায় না, কারণ সব ঝামেলা তাঁদের ওপরেই। নির্দেশ রিলিফ কমিশনারের কাছ থেকেই আসুক অথবা ডিরেকটর-জেনারেল অফ ইভাকুইজের কাছ থেকেই আসুক, সেটা নিছক টেকনিক্যাল তফাৎ।

যে-আটটি জেলার ওপর প্রধানত চাপ এসে পড়েছে সেখানে অবস্থা কি রকম? এক কথায়, শোচনীয়। শরণার্থীদের দেখাশোনার দুটো দিক আছে—শিবির রক্ষণাবেক্ষণ এবং শিবিরের বাইরে যে-সব শরণার্থী আছেন তাঁদের সমস্যা। শিবিরে যাঁরা স্থান পেয়েছেন তাঁদের নিয়ে সমস্যা অপেক্ষাকৃত কম। তাঁদের জীবনধারা মোটামুটি একটা ছকের মধ্যে এসে গেছে। তা ছাড়া শিবিরের কাজের জন্যে নতুন লোকও সরকার অনেক নিয়োগ করেছেন। কিন্তু যাঁদের শিবিরে স্থান হয় নি তাঁদের নিয়ে ভাবনা আরো বেশী। তাঁদের সংখ্যাও কম করে বিশ লাখের মত।

সরকারীভাবে হয়ত স্বীকার করা হবে না, কিন্তু ঐ আটটি জেলায় ত্রাণ ছাড়া অন্যান্য সব কাজ-কর্মই প্রায় বন্ধ। সেটা অস্বাভাবিকও কিছু নয়। প্রথম কারণ লোকাভাব। যেমন ধরুন, ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমা। সেখানে সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা সোয়া শ' মতো। কিন্তু বসিরহাটে এ-পর্যন্ত শরণার্থী এসেছেন অন্তত পাঁচ লাখ, এসেছেন মাস তিনেকের মধ্যে। এই সংখ্যক শরণার্থী সামলে ঐ শ'খানেক কর্মচারী অন্যান্য কাজের দিকে মন দেওয়ার কতটা সময় ও সুযোগ পেতে পারেন? অন্যান্য জেলা বা মহকুমাতেও অবস্থা এই রকমই। বনগাঁ মহকুমায় শরণার্থীর সংখ্যা সাত লাখ হবে। পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় অন্ততঃ পনের লাখ। এই

গুরুভার বইবার ক্ষমতা [illegible] জেলায় কর্তৃপক্ষেরই নেই।

ইতিমধ্যে বর্ষা নামায় বিভিন্ন জেলা কর্তৃপক্ষ পড়েছেন আরো কঠিন সমস্যায়। প্রথম দিকে যেখানেই খালি জমি পাওয়া গিয়েছিল সেখানেই আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তার মধ্যে যেগুলো নীচু জমি সেখানে এখন অবস্থা কাহিল। ফলে অনেক জায়গা থেকেই শিবির সরিয়ে নিতে হয়েছে। তাছাড়া বর্ষার জল জমে স্বাস্থ্য-রক্ষার সমস্যাকেও তীব্রতর করে তুলেছে। অনেক জায়গাতেই জল প্রায় টিউবওয়েলের মুখ পর্যন্ত চলে আসছে। খাবার জল যদি দূষিত হয় তবে আবার বড় রকমের অসুখ-বিসুখের আশঙ্কা। এমনিতেই বর্ষায় ঠাণ্ডা লেগে অসুখ-বিসুখ হচ্ছে। কয়েক জায়গায় ছোট আকারে কলেরার আক্রমণও ঘটেছে—যেমন পশ্চিম দিনাজপুরের কোন-কোন শিবিরে।

বর্ষায় শিবিরের শরণার্থীদের অবস্থাই যদি কাহিল হয়ে থাকে তবে শিবিরে যাঁদের ঠাঁই হয় নি তাঁদের অবস্থা কল্পনা করা চলে সহজেই। জোর বৃষ্টি এলে তাঁরা অনেকেই ছুটে এসে শিবিরের মধ্যে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সেখানে জায়গা কোথায়? তাছাড়া, কাছাকাছি শিবিরও তো সব জায়গায় নেই। তাই কোন-কোন জায়গায় শরণার্থীরা বাঁচবার জন্যে খালি বাড়ী দেখলেই ঢুকে পড়ছেন। এক বনগাঁ মহকুমা থেকেই এই ধরনের বেশ কয়েকটি ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। পুলিশ অবশ্য বাড়ীগুলি আবার খালি করে দিতে পেরেছে, কিন্তু এই ধরনের ঘটনা স্থানীয় লোকেদের মধ্যে যদি অসন্তোষের সৃষ্টি করে তবে সেটা আশ্চর্যের বিষয় নয় মোটেই।

উত্তেজনার আরো কারণ দেখা দিচ্ছে। বিভিন্ন শিবিরে শরণার্থীরা যে-পরিমাণ রেশন পাচ্ছেন তার পরিমাণ সন্তোষজনক। কিন্তু পশ্চিম বাংলার অনেক মফঃস্বল এলাকাতেই আছে শুধু মডিফায়েড রেশনিং ব্যবস্থা, যার পরিমাণ যথেষ্ট নয়। অনেক জায়গাতেই আবার তা-ও নেই। এই রাজ্যেও দুঃস্থ, ক্ষুধার্ত লোকের অভাব নেই। এই অবস্থায় তাঁদের মধ্যে অসন্তোষ স্বাভাবিক। তাছাড়া, বাজারে খাদ্যদ্রব্যের দামও বেড়ে গেছে।

সীমান্তবর্তী অনেক জেলাতেই ভেসে-বেড়ান শরণার্থীদের মধ্যে কেউ-কেউ ইতি-মধ্যেই চাষবাসের কাজে যোগ দিয়েছেন। যেহেতু তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং যে-কোন খড়কুটো পেলেই তা ধরতে সচেষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, তাই তাঁরা অনেক কম মজুরীতেই খাটতে রাজী হচ্ছেন। জমির মালিকেরাও এই সুযোগ নিতে কার্পণ্য করছেন না। শুধু ক্ষেতমজুর নয়, স্থানীয় লোকের অন্যান্য জীবিকাতেও হাত পড়েছে। যেমন, রিকসাওয়ালাদের।

বর্ষা দেখা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আর এক চিন্তাতেও জেলা কর্তৃপক্ষের ঘুম হচ্ছে না। সীমান্তবর্তী কয়েকটি জেলাতেই বর্ষায় নদী কূল ছাপালে প্রতি বছর বেশ কিছু লোক আশ্রয়হারা হন। অন্যান্যবার তাদের স্থানান্তরিত করে সাময়িক শিবিরে বা স্কুল-কলেজে বড় বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া হয়। এবার অনেক জায়গাতেই স্কুল-কলেজে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে শরণার্থীদের। বন্যায় যাঁরা আশ্রয়হারা হবেন তাঁদের নিয়ে এবার কি করা হবে?

জেলা কর্তৃপক্ষের এই সমস্যার তালিকাই শেষ নয়। শিবিরের মধ্যে বা বাইরে যে-সব শরণার্থী আছেন তাঁদের কুপথে নিয়ে যাওয়ার লোকের অভাব নেই। শিবিরে যাঁরা আছেন তাঁদের সম্বন্ধে সরকার গোড়া থেকেই কিছুটা সতর্ক। তাঁদের শিবিরের বাইরে বিশেষ আসতে দেওয়া হয় না। কিন্তু যাঁরা শিবিরে ঠাঁই পান নি তাঁদের সম্পর্কে এই সতর্কতা সম্ভব নয়।

এত জটিল সমস্যা সামলে জেলা কর্তৃপক্ষ যদি অন্যান্য কাজে হাত দিতে না-পারেন তবে তাঁদের হয়ত দোষ দেওয়া যাবে না। কিন্তু অন্যান্য কাজও তো চলা দরকার। যেমন ধরুন, কোন কোন জায়গায় এর জন্যে বর্ষার মুখে চাষীদের বীজ বা সার সরবরাহের কাজও ব্যাহত হয়েছে। অথচ তা হতে দেওয়া মোটেই চলে না। অন্যান্য উন্নয়নের কাজ না-হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। জেলায়-জেলায় প্রতি ব্লকে একশ' লোককে চাকরী দেওয়ার কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার কাজ শীঘ্রই শুরু হওয়ার কথা। সেই কাজ শুরু করার সময় পাওয়া যাবে তো? এমনিতেই পশ্চিম বাংলায় উন্নয়নের কাজের জন্যে বরাদ্দের পরিমাণ অন্যান্য অনেক রাজ্যের চেয়ে কম। তার ওপর প্রশাসনিক অসুবিধেয় যদি সেটুকুও রূপায়িত না-হয় তবে সেটা কত দুর্ভাগ্যের হবে ভেবে দেখুন।

*

এই সমস্যার সমাধানের কোনো পথ দেখা যাচ্ছে কি?

কেন্দ্রীয় সরকার, ফলে পশ্চিম বাংলা সরকারও এখনও এই ধারণা আঁকড়ে আছেন যে, সব শরণার্থীই বাংলাদেশে ফিরে যাবেন। আগে একটা সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল যে, ছ মাসের মধ্যেই তাঁরা দেশে ফিরবেন। এখন আর তা বলা হচ্ছে না, কারণ সেই সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার আর বেশী দেরী নেই। প্রথমত, বাংলাদেশে অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হলেও যে কতজন ফিরবেন সেটা খুব সন্দেহের ব্যাপার। অন্ততঃ হিন্দুরা প্রায় কেউই ফিরতে চাইবেন না সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আরো একটা ব্যাপার আছে। এদেশে ছ' মাসের বেশী বসবাস করলেই পূর্ব বাংলার (ভূতপূর্ব পূর্ব পাকিস্তান) মানুষ ভারতের নাগরিক হওয়ার অধিকার পারবেন। তখন তাঁদের দেশে ফিরতে বাধ্য করা যাবে না।

প্রথমে বলা হয়েছিল, আট লাখ শরণার্থীকে পশ্চিম বাংলা থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে। তাও যদি হত তবু এই রাজ্যে প্রায় ৪৫ লাখ শরণার্থী থেকে যেতেন। আসলে কিন্তু সোয়া লাখের বেশী শরণার্থী এখনও যে সরান হয় নি, সে-কথা আগেও বলেছি। অন্যান্য রাজ্য শরণার্থীদের দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক, যদিও অনেক বিধান-সভাতেই বাংলাদেশের জন্যে দরদে গদগদ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এখন, বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে সব ভাবনা যেন পশ্চিম বাংলার বাঙালীর।

কিন্তু পশ্চিম বাংলার বিপর্যস্ত বৈষয়িক ব্যবস্থা কি এই গুরুভার বহন করতে পারবে? নাকি এই ভারই শেষ পর্যন্ত হবে যাকে বলা হয় উটের পিঠে শেষ খড়ের কুটো?

শরণার্থীরা আবার দেশে ফিরে গিয়ে সুখে-শান্তিতে বাস করবেন, এমন একটা মনোহর পরিণতির স্বপ্ন কেন্দ্রীয় সরকার দেখতে চান দেখুন। কিন্তু সেই সঙ্গে এখনই যদি শরণার্থীদের দেশের মধ্যে নানা স্থানে সরিয়ে না-নেওয়া হয় এবং এখন থেকেই তাঁদের সম্ভাব্য পুনর্বাসনের আগাম পরিকল্পনা তৈরী করা না-যায় তবে পশ্চিম বাংলার বিপর্যয়ের যেটুকু বাকী আছে তাও সম্পূর্ণ হবে। দেশ ভাগের পর থেকে যে-সব উদ্বাস্তু এসেছিলেন তাঁদের পুনর্বাসনে দিল্লীর ব্যর্থতা পশ্চিম বাংলার বর্তমান দুরবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ। এখন যদি আরো পঞ্চাশ লাখ থেকে কোটি খানেক লোক পশ্চিম বাংলায় থেকে যান তবে এই রাজ্যের গোটা সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক চেহারাটাই পাল্টে যাবে। রাজনৈতিক দিক থেকে শেষ পর্যন্ত এর ফল কি দাঁড়াবে তা আপাতত বলা না গেলেও অদূর ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে। যত দিন এই বিপুল ভার এই রাজ্যে থাকছে তত দিন অন্ততঃ নির্বাচন যে অনুষ্ঠিত হতে পারছে না এটা এক রকম নিশ্চিত। কারণ, সব কিছুর ওপরে জেলা কর্তৃপক্ষকে এখন নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নিতে বলা দুঃসাধ্য।

২৯।৭।৭১ —দেবদত্ত

প্রেসিডেন্ট নিকসনের চমকপ্রদ ঘোষণার তিন দিনের মধ্যেই বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বললেন, 'ভারত যদি পূর্ব পাকিস্তানের কোন অংশ দখল করার চেষ্টা করে' তাহলে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। এই রকম কোন চেষ্টা হলে তিনি সেটাকে পাকিস্তানের উপর আক্রমণ বলে গণ্য করবেন। অতএব? অতএব, 'সারা দুনিয়া শুনে রাখুক, আমি যুদ্ধ ঘোষণা করব।'

সারা দুনিয়াকে এই যুদ্ধের হুমকি দেওয়ার জন্য মাধ্যম হিসাবে ইয়াহিয়া খাঁ কোন্ বিশেষ সাংবাদিকটিকে বেছে নিয়েছেন সেটাও ভালভাবে লক্ষ্য করার মতো। এই সাংবাদিকের নাম হচ্ছে নেভিল ম্যাক্সওয়েল। যারা খবর রাখেন তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, এই ম্যাক্সওয়েল সাহেবই ১৯৬৭ সালে ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের সময় বলেছিলেন, ভারতের প্রথম সাধারণতন্ত্রের দিন ফুরিয়ে আসছে, আর চতুর্থ নির্বাচনই হবে এদেশের শেষ নির্বাচন। আরও সম্প্রতি এই ম্যাক্সওয়েল সাহেবই বই লিখে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ১৯৬২ সালে ভারত নিজের দোষেই চীনের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে ছিল। এই বৃটিশ সাংবাদিক এক সময়ে ভারতে লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকার সংবাদদাতা ছিলেন। সম্প্রতি তিনি লণ্ডনের 'ফিনান্সিয়াল টাইমস'-এ যোগ দিয়েছেন এবং সেই পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবেই তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

এহেন ম্যাক্সওয়েলের মারফৎ পাকিস্তানের জঙ্গী ডিকটেটর আরও কয়েকটি খবর দিয়েছেন। যেমন, (১) কয়েকটি বৈদেশিক সরকার মধ্যস্থতা করার জন্য যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তারই জবাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া 'যে কোন সময়ে যে-কোন জায়গায়' প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে রাজী আছেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু, মহিলাটি 'না' বলে দিয়েছেন। (২) ভারতবর্ষ থেকে পূর্ববঙ্গের যেসব আশ্রয়প্রার্থী ফিরে আসবেন তাঁদের তদারক করার জন্য পূর্ববঙ্গে রাষ্ট্রসংঘের তরফ থেকে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ নিয়োগের প্রস্তাবে তাঁর সম্মতি আছে। এই পর্যবেক্ষকদের কাজ হবে, 'আশ্রয়প্রার্থীদের পক্ষে ফিরে আসা যে নিরাপদ সেবিষয়ে নিশ্চিত হওয়া এবং ভারতবর্ষে আশ্রয়প্রার্থীদের এই আশ্বাস দেওয়া যে, তাঁরা ফিরে যেতে পারেন।' (৩) শেখ মুজিবুর রহমানকে শীঘ্রই বিচারের সম্মুখীন করা হবে। এই বিচার গোপনে এবং সামরিক আদালতে হবে। শেখের পক্ষে দাঁড়াবার জন্য উকিল নিতে দেওয়া হবে; কিন্তু বিদেশী আইনজীবীর সাহায্য নিতে দেওয়া হবে না। শেখের বিরুদ্ধে যে অপরাধের অভিযোগ আনা হবে তার দণ্ড হচ্ছে মৃত্যু। তবে দণ্ডাদেশ পুনর্বিবেচনা করার ক্ষমতা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর থাকবে।

ইসলামাবাদের জঙ্গী নায়কের এইসব ঘোষণা সম্পর্কে নয়াদিল্লির সরকারী প্রতিক্রিয়া হলঃ—

(১) পাকিস্তান যদি কোন ছল-ছুতায় ভারতকে আক্রমণ করে তাহলে 'আমরা নিজেদের রক্ষা করার জন্য তৈরি আছি।' আসলে, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের দৃঢ়-সঙ্কল্প দেখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বিচলিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু মুক্তিফৌজের জয় হবেই।

একথা লোকসভায় বলেছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং।

(২) বাংলাদেশ প্রশ্ন নিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর কোন আলোচনা হতে পারে না। পাকিস্তানের যে বন্ধুরা মধ্যস্থতা করতে আগ্রহী তাঁরা বরং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে মুজিব ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলোচনা করতে বলুন। জনসাধারণ এদের প্রতিই তাঁদের আস্থা জ্ঞাপন করেছেন।

লোকসভায় এই কথাগুলিও বলেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং।

(৩) ভারতের পররাষ্ট্র বিভাগের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে, বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে ভারতবর্ষের মাটিতে রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব 'ঔদ্ধত্যপূর্ণ' এবং যারা এই প্রস্তাবের ওকালতি করবে ভারত সরকার তাদের কাজকে 'অমিত্রোচিত' বলে গণ্য করবে।

(শরণার্থীদের সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের হাই-কমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন খাঁর কাছ থেকে সর্বপ্রথম এই প্রস্তাব এসেছিল। পরে রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে মার্কিন প্রতিনিধিও এই প্রস্তাব দেন। সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীসমর সেন মহাসচিব উ থান্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনিও শ্রীসেনের কাছে প্রস্তাবটি পেড়েছিলেন।)

রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষক নিয়োগের বিরুদ্ধে ভারতের আপত্তির কারণগুলি হলঃ—প্রথমতঃ, এতে ভারতকে সত্তর লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীকে জায়গা দেওয়ার পর সদাচরণের জবাবদিহি করার দায়ে আবদ্ধ করতে চাওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ আশ্রয়প্রার্থীদের ফিরে যেতে রাজী করাবার জন্য যে একমাত্র পথ খোলা আছে সেই পথে না যাওয়ার জন্যই পাকিস্তানকে একটা অজুহাত যুগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কোনরকম মীমাংসায় না আসার জন্য পাকিস্তানকে একটা ছুতো তুলে দেওয়া হচ্ছে। তৃতীয়তঃ একমাত্র রাষ্ট্রসংঘের স্বস্তি পরিষদেরই এই ধরনের পর্যবেক্ষক নিয়োগ করার অধিকার আছে এবং তাও শুধু দুই দেশের মধ্যে প্রকৃত যুদ্ধাবস্থা দেখা দিলে পর।

(ভারত-পাকিস্তান শীর্ষ সম্মেলনের ও দুই সীমান্তে রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাব, দুটিই বাংলাদেশ প্রশ্নের সঙ্গে ভারতকে জড়াবার অপচেষ্টা। প্রথমে চেষ্টা করা হয়েছিল বাংলাদেশের ঘটনার জন্য ভারতের উস্কানিকে দায়ী করার। দ্বিতীয় চেষ্টা হল ইয়াহিয়া-ইন্দিরা সাক্ষাৎকার ঘটাবার। ক্যানাডার পার্লামেন্টের সদস্যদের প্রতিনিধি দলের মারফৎ প্রথমে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়। ভারত এ প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় এখন তিন নম্বর চেষ্টা চলছে—সীমান্তের দুই পাশে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক মোতায়েন করার জন্য।)

(৪) শেখ মুজিবর রহমানের বিচার সংক্রান্ত ঘোষণা সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং লোকসভায় পাকিস্তানকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, পাকিস্তান যদি শেখকে শাস্তি দেয় এবং 'পাগলামির রাজনীতি' চালিয়ে যেতে থাকে তাহলে স্বাধীনতার সংগ্রামীরা তাঁদের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্যই আরও কৃতসঙ্কল্প হবেন।

বাংলাদেশ সংক্রান্ত প্রশ্নের মূল বিষয়টি থেকে যখন এভাবে নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে তখন সেই মূল বিষয়টিই কিন্তু আরও জটিল হয়ে গেছে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ গত ২৮ জুন তারিখে তাঁর বেতার ভাষণের 'ক্ষমতা হস্তান্তরের' যে পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন সে বিষয়ে সপ্তাহ তিনেক একেবারে 'স্পীকটি-নট' হয়ে থেকে সম্প্রতি পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো মুখ খুলেছেন। তাঁর দলের সভা হয়েছে এবং তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর সঙ্গে দেখাও করে এসেছেন। এই সাক্ষাৎকারের পরেই পাকিস্তান রেডিওতে ঘোষণা করা হয় যে, ভুট্টো ইয়াহিয়ার ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা মেনে নিয়েছেন।

কিন্তু ভুট্টো নিজে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, পাকিস্তান রেডিওর এই সংবাদ ঠিক নয়। তিনি শুধু আওয়ামী লীগ সম্পর্কে ইয়াহিয়া খাঁর ঘোষণা মেনে নিয়েছেন। তিনি চান, ইয়াহিয়া খাঁ অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন। তার জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। প্রচণ্ড দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যেও যদি বৃটেন ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে থাকতে পারে তাহলে পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতেও সেটা সম্ভব না হওয়ার কারণ নেই। ভুট্টো মনে করেন, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও আমলাদের ভিতরকার চক্র সেখানে ক্ষমতার হাতবদলে বাধা দিচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর ২৮ জুনের ভাষণে নূতন নির্বাচনের কথা বলেন নি. শুধু আওয়ামী লীগের যেসব সদস্য তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী হবেন না তাঁদের আসনগুলিতে নতুন সদস্য নির্বাচন করা হবে, এতে ভুট্টো খুশী। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এই সুযোগে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে পূর্ববঙ্গে জায়গা করে নেওয়ার মতলব করছেন। কিন্তু ইয়াহিয়ার পরিকল্পনায় অন্যান্য যেসব অংশ

তাঁকে খুশী করতে পারে নি, সেগুলি হল —প্রথমতঃ, ইয়াহিয়া যে বলেছেন, নিছক আঞ্চলিক পার্টিগুলির কোন প্রয়োজন পাকিস্তানের আছে কিনা সেটা ভেবে দেখতে হবে. এতে ভুট্টোর দলের উপর কোপ পড়ার সম্ভাবনা আছে, কেননা সেটিও পাঞ্জাব ও সিন্ধুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, ইয়াহিয়া সংবিধান তৈরি করার ক্ষমতা জাতীয় পরিষদকে দেন নি, একদল বিশেষজ্ঞের হাতে সেই কাজের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। তৃতীয়তঃ, ইয়াহিয়া বলে দিয়েছেন, জাতীয় পরিষদের মাথার উপর আরও কিছুকালের জন্য সামরিক আইনের ছাতা ধরে রাখা হবে।

ভুট্টোর ভাবনার আরও একটি কারণ সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। পাকিস্তানের কিছু কিছু কিছু নেতা এখন ভাবতে শুরু করেছেন যে, পাকিস্তানে যে 'রাজনৈতিক শূন্যতা' ভরাট করার জন্য বামপন্থী ও "আঞ্চলিক" দলগুলি এগিয়ে এসেছিল সেই শূন্যতা পূরণ করার সবচেয়ে ভাল পথ হল মুসলিম লীগকে আবার জীইয়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগের তিনটি অংশকে এক করার একটা চেষ্টাও আরম্ভ হয়েছে।

এই চেষ্টায় ভুট্টোর খুশী হওয়ার কথা নয়। কিন্তু জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৯০টি আসনের অধিকারী যে পিপলস পার্টি তার নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো অসামরিক শাসন প্রবর্তনে যতটা আগ্রহী অন্যান্য দলের নেতারা ততটা নন। ভুট্টো এখন কি করবেন? আন্দোলনে নামবেন? যদি নামেন তাহলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের আশা আরও সুদূরপরাহত হয়ে যাবে।

*

ইতিমধ্যে, পূর্ববাংলা থেকে আশ্রয়প্রার্থীদের তৃতীয় আর একটি তরঙ্গ ভারতের দিকে আসছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম ধাক্কায় চলে এসেছিলেন খানসেনাদের দ্বারা নিগৃহীত পূর্ববঙ্গের মানুষ — হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। দ্বিতীয় ধাক্কায় বেছে বেছে হিন্দুদের তাড়ান হয়েছিল।

এবারকার এই ধাক্কায় প্রধানত মুসলমানরা চলে আসছেন বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। রয়টারের সংবাদদাতার খবর হচ্ছে, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলা থেকে প্রায় ৪০।৫০ লক্ষ মানুষ চলে আসার জন্য তৈরি হচ্ছেন। এঁরা আসছেন ক্ষুধার তাড়নায়। পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দিয়েছে এবং ঢাকা ও ইসলামাবাদ থেকে পাঠানো মার্কিন প্রতিনিধিদের তারবার্তা উদ্ধৃত করে মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ফাঁস করে দিয়েছেন যে, পূর্ববঙ্গে কয়েক মাসের মধ্যেই দারুণ আকাল দেখা দেবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

লোকসভায় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রী আর কে খাদিলকারও দুর্ভিক্ষের তাড়নায় পূর্ববঙ্গের মানুষদের সীমান্ত পার হয়ে চলে আসার সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, ভারতে পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা কিছুদিনের মধ্যেই এক কোটিতে পৌঁছবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

এদিকে শাসক কংগ্রেসের পার্লামেন্টারি পার্টির কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় অর্থমন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চ্যবন বলেছেন যে, আশ্রয়প্রার্থীদের বাবদ বাজেটে যে ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল সেটা নিঃশেষিত হয়ে গেছে। এই বাবদে ব্যয় যেভাবে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে তার সঙ্গে এঁটে ওঠার জন্য সংসদের বর্তমান বাজেটে অধিবেশনের মধ্যেই একটি অতিরিক্ত বাজেট পেশ করে অর্থের সংস্থান করতে হবে। এই সভায় শ্রীচ্যবন ও শ্রীমতী গান্ধী দুজনই পরিষ্কার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, আরও বেশী ট্যাক্সের বোঝা বইবার জন্য ও খরচ কমাবার জন্য জনসাধারণকে তৈরি হতে হবে।

*

মরক্কোর পর দ্বিতীয় আর একটি আফ্রিকান রাজ্যে সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা হল। এবং এখন পর্যন্ত যতদূর বোঝা যাচ্ছে, মরক্কোর মতো সুদানেও এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। আফ্রিকার বৃহত্তম দেশ সুদানের আয়তন প্রায় দশ লক্ষ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। জাফর আল-নিমিরি নামে সামরিক বাহিনীর এক মেজর জেনারেল ১৯৬৯ সালের ২৫শে তারিখে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সেদেশে ক্ষমতায় এসেছিলেন। ক্ষমতায় আসার পর তিনি একটি বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করে চলতে থাকেন। বিদেশী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্কগুলি ও সংবাদপত্র রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। বাবাকর আবদাল্লা নামে একজন সুপরিচিত ও সম্মানিত সমাজতন্ত্রী নেতাকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসান হয় এবং মন্ত্রিসভায় অন্ততঃ চারজন জানা কম্যুনিস্টকে স্থান দেওয়া হয়। ১৯৬৯ সালের শেষ দিক থেকে রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল নিমিরির সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পর্ক খারাপ দিকে যেতে থাকে। আবদাল্লা ইউরোপে সুদানী ছাত্রদের এক সভায় বলেন যে, কম্যুনিস্ট পার্টি সুদানের সরকারের একটি অত্যাবশ্যক অংশ। দেশে ফিরে আসার পর তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর আসন থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। ১৯৭০ সালের ১৬ নভেম্বর সামরিক বাহিনীর বিপ্লবী নেতৃ-পরিষদ থেকে তিনজন সদস্যকে সরিয়ে দেওয়া হল। এদিকে সুদানের সরকারী নীতিও ধীরে ধীরে বদলাতে আরম্ভ করল। ১৯৭১ সালের গোড়ার দিকে ঘোষণা করা হল রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কোনগুলি রাষ্ট্রের অধিকারে রাখা হবে আর কোনগুলি ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারে ছেড়ে দেওয়া হবে, সেটা একটি কমিশন বিবেচনা করে দেখবেন। শিল্পে ও একমাত্র জল্লা বাদে কৃষির অন্য সব ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগে কোন বাধা দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করা হয়।

এরপর জেনারেল নিমিরির প্রাণনাশ করার জন্য একটা ব্যর্থ চেষ্টা হল। গত ১২ ফেব্রুয়ারী তারিখে বিপ্লবী নেতৃ-পরিষদের ১২ ঘণ্টাব্যাপী একটি বৈঠকের পর মেজর জেনারেল নিমিরি ওমদুরমান রেডিও থেকে

ঘোষণা করলেন যে, তাঁর সরকার সুদানের কম্যুনিস্ট পার্টিকে 'দমন ও ধ্বংস' করবেন। সুদানের কম্যুনিস্ট পার্টিকে এর আগে সরকার পার্টি তুলে দিয়ে অন্য সকলের সঙ্গে দেশব্যাপী একটি পার্টির মধ্যে ঐক্য-বদ্ধ হতে বলেছিলেন। কম্যুনিস্ট পার্টি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। (আসলে, জেনারেল নিমিরি ও তাঁর সহযোগীরা যখন ক্ষমতায় আসেন তখন অন্যান্য সব দলের সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টিকেও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সুদানের কম্যু-নিস্টরা প্রথম দিকে সরকারের অংশ হিসাবে এবং পরে গোপন সংস্থা হিসাবেও বিভিন্ন ফ্রন্টের মধ্য দিয়ে কাজ করেছেন। সুদানী কম্যুনিস্ট পার্টি প্রধানত মস্কোমুখী, তবে ইদানীং তার মধ্যে চীনা প্রভাবও কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে বলে সংবাদ আছে।)

১২ ফেব্রুয়ারির এই বেতার ঘোষণায় জেনারেল নিমিরি বেসরকারী ব্যবসায়ী-দের আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, সুদানের বিপ্লবে তাঁদেরও একটা ভূমিকা আছে।

মে মাসের মধ্যে জেনারেল নিমিরির সরকার স্বরাষ্ট্র দপ্তর, সেনাবাহিনী ও পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি থেকে ৬০ জন কম্যুনিস্টকে সরিয়ে দেন বলে খবর পাওয়া যায়।

কম্যুনিস্টদের সঙ্গে জেনারেল নিমিরির এই সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই [illegible] বাহিনীর একটি নূতন বিপ্লবী নেতৃ-পরিষদ গঠনের চেষ্টা হয়। এই চেষ্টার নেতৃত্ব করেন মেজর হাশেম আট্টা। গত বছর নভেম্বর মাসে বিপ্লবী নেতৃপরিষদের যে চারজন সদস্যকে সরান হয়েছিল তাঁদের একজন হলেন এই মেজর আট্টা। তিনি প্রায় বিনা বাধাতেই তাঁর কাজ হাসিল করেছিলেন। ক্ষমতা দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কম্যুনিস্ট প্রভাবিত শ্রমিক, ছাত্র, যুবক ও নারী সংগঠনগুলির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে দিলেন। ১৯৬৯ সালের বিপ্লবের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। নূতন রাজত্বে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে নিযুক্ত হলেন কর্নেল বাবাকর এল-নুর। গত নভেম্বরে বিপ্লবী নেতৃপরিষদ থেকে অপসারিতদের মধ্যে তিনিও একজন।

কিন্তু ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই চাকা উল্টে গেল। লণ্ডন থেকে বি-ও-এ-সির বিমানে সুদানের রাজধানী খার্তুমে আসছিলেন কর্নেল নুর। বিমানটিকে সিরিয়ার কর্তৃপক্ষ বেনগাজী বিমানবন্দর থেকে নামতে বাধ্য করলেন এবং কর্নেল নুর ও তাঁর এক-জন সহযাত্রী যিনি হচ্ছেন সুদানের কম্যু-নিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের ভাই—এই দুইজনকে বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হল। প্রায় একই সময়ে সৌদী আরবের আকাশে ইরাকের একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এই বিমানে ইরাকের একদল প্রতিনিধি খার্তুমে যাচ্ছিলেন সেখানকার নূতন সরকারকে অভিনন্দন জানাবার জন্য।

এরপর ঠিক কি হল বোঝা গেল না। তবে, ওমডুরমান রেডিওর সংবাদ উদ্ধৃত করে মধ্য প্রাচ্য সংস্থা জানালেন যে, একজন সুদানী লেফটেনান্টের নেতৃত্বাধীন একদল সৈন্য রেডিও ষ্টেশন দখল করেছেন, মেজর আট্টা ও তাঁর সহ-যোগীদের আটক করেছেন এবং জেনারেল নিমিরিকে ক্ষমতায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে-ছেন।

এর পর মেজর আট্টা ও আরও কয়েক-জনকে গুলী করে হত্যা করার খবর আসতেও দেরী হল না।

জেনারেল নিমিরিকে ক্ষমতায় পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে লিবিয়া এবং মিশরের হাত থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে, লিবিয়া, মিশর, সিরিয়া, ও সুদানকে নিয়ে একটি আরব রাষ্ট্র গঠনের যে প্রস্তাব হয়েছে সুদানের কম্যুনিস্ট পার্টি তার বিরোধিতা করেছে।

১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে জেনারেল নিমিরি যে কম্যুনিস্ট-বিতাড়ন আরম্ভ করেন তার পিছনেও এই আরব যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব নিয়ে বিতর্কটিই ছিল আসল কারণ।

২০-৭-৭১ —পুণ্ডরীক
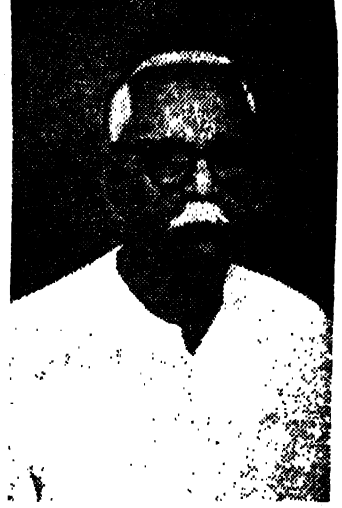
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

(স্মৃতি রচনা নানা সময়ে। কোনো কোনো রচনায় তারিখ দেওয়া আছে।)

বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে নিয়ে, আমি শনিবারের চিঠিতে যোগ দেবার (১৯৩২) আগে, খবরের কাগজে অনেক রসিকতা করা হয়েছিল, মনে পড়ে। বোমারু বারীন্দ্র, পরে বীমারু বারীন্দ্র, পরে বামারু বারীন্দ্র ইত্যাদি।

বোমার যুগ উদ্বোধন করার অনেক কাল পরে বারীন্দ্রকুমার অন্ন সংস্থানের আশায় নানা বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। চায়ের দোকান খুলেছিলেন, বীমা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছিলেন, পরে স্টেটস্‌ম্যান কাগজের লেখক হয়েছিলেন, দৈনিক বসুমতীতেও সম্পাদনার কাজ করেছেন।। তারপর সংসার করবেন মানসে বিবাহ করেছিলেন।

এসব নিয়ে যাঁরা রসিকতা করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কিন্তু আমি যোগ দিতে পারি নি। বারীন্দ্রকুমারের জীবনের এই পর্যায় রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বিচিত্রায় প্রকাশিত হারুর জীবনের সঙ্গে অনেকটা মেলে। হারু গরিব, কিছু উপার্জনের আশায় ফেরিওয়ালা হয়েছিল, কিন্তু লোকে টিটকারি দিতে লাগল। সে কাজ ছেড়ে সে চাবের কাজে লাগল। লোকে তবু টিটকারি দিতে লাগল। হারু এসব সহ্য করতে না পেরে সন্ন্যাসী হলে। তখন, যারা ওকে টিটকারি দিয়েছিল তারাই এসে ওর পায়ে ভক্তিভরে লুটিয়ে পড়ল। বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে হারুর কিছু মিল আছে। তিনি যখন তাঁর জীবনের বিপ্লবী যুগ শেষ করেছেন, তখন অন্য কাজ করা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না কিছুই। তিনি আমরণ বোমা তৈরি করে সাহেব মারবেন, এমন আশা করা অবশ্যই অন্যায়। তবে বোমার যুগের কার্যকলাপ জনসাধারণের মনে একটি পবিত্র যুগের ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছিল। এঁদের সবার কাজ একটি দেবকাজ রূপে স্থায়ী ছাপ এঁকে দিয়েছিল। তাই বোমার যুগের মানুষ সাধারণ চাকরি করছে, চায়ের স্টল খুলছে, এতে মনে আঘাত লাগা স্বাভাবিক, এবং এই আঘাত থেকেই পরে বিদ্রূপের উদ্ভব।

তাই যখন ১৯৩৩ সনে বারীন্দ্রকুমার বিবাহ করলেন, তখন তা নিয়ে কোনো কোনো কাগজ খুব রঙ্গরহস্যে মেতে ওঠে। আমি কিন্তু এ ঘটনা খুব স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছিলাম। তার প্রমাণ আছে তখনকার লেখায়।

বারীন্দ্রকুমারের কিছু কিছু লেখা আমি যখন যুগান্তর 'সাময়িকী বিভাগে' প্রকাশ করি, তখন একটি লেখা উপলক্ষে তাঁর জন্মস্থান তারিখ ইত্যাদি চেয়ে পাঠাই। তিনি মূল 'বার্থ সার্টিফিকেট' ও তৎসহ জীবনের উল্লেখযোগ্য কিছু কিছু ঘটনার একটা তালিকা পাঠান। সে বোধ হয় ১৯৫৬ হবে। বছর দশেক ধরে তাঁর কিছু কিছু লেখা আমি ছেপেছি, খুব অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, আমাকে লেখা তাঁর অনেক চিঠিতে তার প্রমাণ। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় যেমন আমাকে 'পরিমলদা' সম্বোধন করতেন, চিঠিতে (ও মুখে) বারীন্দ্রকুমারও মাঝেমাঝে তাই করতেন। তিনি আমার অনুরোধে যে সব জন্মকথা লিখেছিলেন তার ভিতর থেকে মূল বার্থ সার্টিফিকেটখানা আমি ফেরৎ দিয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে না দিলেই ভাল হত, তা এখন কোথায় কিভাবে আছে জানি না। হাতের লেখা যেখানা আছে তা এই—

আমার সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

১। জন্ম—লন্ডনের উপকণ্ঠে ক্রয়ডনে ১৮৮০, ৫ই জানুয়ারী।

২। এক বৎসরের শিশু ভারতে আগমন—রোহিণীতে রেল লাইনের ধারে গ্র্যান্ট সাহেবের বাড়ীতে খানসামা আয়া বাবুর্চিসহ পাগল মায়ের সহিত বাস। (বারীন্দ্রকুমারের মাতার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।)

৩। আমার ৬ হইতে ৯ বৎসর অবধি লালা তারিণীচরণের বাড়ীতে বাস। পাগল মায়ের হাতে দিদি ও আমার প্রহার নির্যাতন ও অর্ধাহারে ক্ষীণদেহ।

৪। ৯ বৎসর বয়সে রাঙামায়ের ইচ্ছায় ডাঃ কে ডি ঘোষ (কৃষ্ণধন ঘোষ, পিতা) তাঁহার বন্ধু ভঞ্জ চৌধুরীর সাহায্যে গুণ্ডার দ্বারা আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যান।

৫। সেই প্রথম গোমস লেনের বাটীতে রাঙামায়ের কাছে আদরের জীবন ও হাতে খাড়ি।

৬। ১৮৯২ সনে পিতৃবিয়োগ, ভোর রাত্রে স্বপ্নে রাঙামাকে পিতার দর্শন দান।

৭। পরবর্তী বৎসরে ধর্মান্ধ গোঁড়া ব্রাহ্মদের দ্বারা আবার মাতৃকোল হইতে ছিন্ন। (প্রসঙ্গতঃ রাজনারায়ণ বসু এঁর মাতামহ ছিলেন।)

৮। দেওঘরে ঋষি রাজনারায়ণের সহিত বাস—১৯০১ এন্ট্রান্স পরীক্ষা অবধি আট-নয় বৎসর দেওঘর বাস।

৯। মেজদা প্রফেসর মনোমোহন ঘোষের বিবাহ, ঢাকায়। কিছুদিন পাটনা কলেজে পাঠের পর মেজবৌদির সহিত ঢাকায় বাস। ঢাকায় কবি জীবন।

১০। আবার পাটনা, রাঙা মায়ের টাকায় B. Ghose's Tea stall প্লেগের মহামারী। বরোদায় কবি, কৃষি ও মৃগয়ার জীবন।

১১। বিপ্লবের পথে—১৯০৩ হইতে ১৯০৮। দুইবার বাংলায় গুপ্তচক্র স্থাপন।

১২। সুরাট কংগ্রেস ভাঙা—লেলের কাছে আমার দীক্ষা, বরোদায় অরবিন্দের দীক্ষা।

১৩। ১৯০৮ ২রা জুন গ্রেপ্তার, বিচার দ্বীপান্তর দন্ড। ১৯০৯ হইতে ১৯২০ ডিসেম্বর অবধি।

১৪। কালাপানি হইতে প্রত্যাবর্তন ও কারামুক্তি। বিজলী, চেরী প্রেস।

১৫। পন্ডিচেরীতে ৭ দিন। তিন মাস। ১০ মাস। ৬½ বছর।

১৬। পন্ডিচেরী ত্যাগ। দ্বিতীয় পর্যায় বিজলী।

১৭। বসুমতীতে ৭ বৎসর।

এর পরেও আছে, কিন্তু তা তাঁর সাধনা জীবনের ভবিষ্যতের ইচ্ছা ও ইঙ্গিত, এখানে তার উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন।

এই পর্যন্ত লিখে থেমে গিয়ে ১০ই মার্চ (১৯৭০) পণ্ডিচেরীতে নলিনীকান্ত সরকারকে কয়েক প্রশ্ন করে একখানা চিঠি লিখি। নলিনীকান্ত ১২ই মার্চ তার উত্তরে যা জানিয়েছেন তার অংশবিশেষ এই—

লেলের পুরো নাম বিষ্ণুভাস্কর লেলে। ইনি গৃহযোগী ছিলেন। বারীনদা লেলের কাছে যোগসাধনার দীক্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু মন্ত্রদীক্ষা নয়। যোগসাধনায় নির্দেশ। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নেন শাখারিয়া স্বামীর কাছ থেকে। এই শাখারিয়া স্বামীর আশ্রম ছিল নর্মদা অঞ্চলে। বারীনদার পর শ্রীঅরবিন্দ যোগসাধনার নির্দেশ নেন লেলের কাছ থেকে।

রাঙা-মা সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। 'বিজলী'র গোড়ার দিকে এই 'রাঙা-মা'র সঙ্গে এক পরিবারভুক্ত হয়ে আমি দীর্ঘদিন কাটিয়েছি। তখন তিনি বৃদ্ধা।

স্ত্রী স্বর্ণলতা পাগল হয়ে যাওয়ায় স্বামী কৃষ্ণধন ঘোষ (ডাঃ কে ডি ঘোষ নামেই সমধিক পরিচিত) বহুবিধ চিকিৎসায় বিফল হয়ে দেওঘরের কাছে রোহিনী গ্রামে একটি বাড়ি ভাড়া করে বালকপুত্র বারীন্দ্রকুমার ও নিতান্ত বালিকা কন্যা সরোজিনী সহ স্ত্রীকে সেখানে রাখার ব্যবস্থা করেন। অদূরেই দেওঘরে থাকতেন রাজনারায়ণ বসু। পাগল কন্যার তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা তিনিই করে-ছিলেন।

ডাঃ কে ডি ঘোষ তখন খুলনার সিভিল সার্জন। (রাঙা-মাও (আসল নাম আমি জানি না, বারীন দা তাঁকে রাঙা-মা বলেই ডাকতেন) খুলনার মেয়ে। তাঁর যৌবনকালেই ডাঃ কে ডি ঘোষ তাঁকে গ্রহণ করেন এবং কলকাতার দপ্তরি-পাড়ায় একটি বাড়ি তাঁর নামে কিনে সেখানে তাঁকে রাখেন। পাগল মায়ের কাছ থেকে বারীনদাকে একরকম চুরি করেই আনা হয় কলকাতার এই বাড়িতে। বারীনদার বয়স তখন মাত্র দশ বছর। অপূর্ব সুন্দরী দেখে তাঁকে বারীনদা রাঙা-মা বলতেন।

এই রাঙা-মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বারীনদা পাটনায় চায়ের দোকান খোলেন। দোকানের সাইনবোর্ডে থাকত B Ghose's Tea Stall, Half anna cup rich in cream.

রাঙা-মা দপ্তরিপাড়ার বাড়ি বিক্রি করে বর্ধমানে বাড়িভাড়া করে ছিলেন কিছুদিন। পাটনার ব্যবসায়ে বিফল হয়ে রাঙা-মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বারীনদা বরোদায় যান শ্রীঅরবিন্দের কাছে।

এ চিঠিতে বিস্তারিত খবর জানা গেল। আমার বাল্যকালে বারীন্দ্রকুমার ও অন্যান্য বিপ্লবীদের কথা স্মরণমাত্র মনে এক অভূত-পূর্ব রোমাঞ্চ জাগত। সেই বোমার যুগ স্বদেশী যুগের আসল অর্থ কি তা বুঝি না বুঝি দূরে পল্লীতেও যে একটা নব যুগের হাওয়া এসে লেগেছিল তাকে খুব পবিত্র মনে হত। বোমার যুগস্রষ্টা বারীন্দ্র-কুমারের প্রতি যে একটা রোমাঞ্চকর শ্রদ্ধা বালকবয়সে আমার মনে জেগেছিল, তা শেষ পর্যন্ত আমার মন থেকে দূর হয়নি। তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি যে দুঃখ পেয়েছেন, তার জন্য আমি বেদনা বোধ করেছি, এবং আমার যেটুকু সাধ্য ততটুকু সাহায্য তাঁকে করেছি—অবশ্য তাঁর লেখা চেয়ে নিয়ে ছাপিয়ে। তাঁর যে ক'খানা চিঠি আমার কাছে আছে, তাতে তাঁর অভাবের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু হীনতার ভাব কোথাও নেই।

বাঁচতে হলে কিছু অর্থ চাই, মানুষের জীবনে বিধাতাবাবস্থিত এই ট্র্যাজিডিকে মেনে চলতেই হয়। যিনি আত্মিক সাধনায় রত থাকবেন, তাঁরও এ থেকে নিস্তার নেই। একই সঙ্গে সাধনার পথে চলা এবং ব্যবসা করে কিছু উপার্জন এই দুয়ের শিক্ষা এদেশে কেউ পায়নি "moral businessman" সম্ভবত পরস্পরবিরোধী কথা। তাই অ্যামে-রিকানদের শিক্ষাকে বিদ্রূপ করে এক রসিক লেখক বলেছেন, তিনি একটি ৪র্থ বার্ষিক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি কি কি বিষয় নিয়েছ?' সে উত্তর দিল 'Salesmanhip and Religion'! লেখক মন্তব্য করছেন—

> Here was a young man whose training was destined to turn him unto a moral businessman.

তিনি একথা অক্সফোর্ডের ছাত্রদের কাছে বলেছিলেন। আমাদের ছাত্রদের কাছেও বলতে পারতেন। কিন্তু এসব প্রসঙ্গত।

বারীন্দ্রকুমার বোমার যুগ শেষ করে প্রবীণ বয়সে ঘরের শান্তি কামনা করে-ছিলেন। এবং এই উদ্দেশ্যেই বিবাহ করে-ছিলেন। কিন্তু তা নিয়ে কোনো কোনো কাগজে খুব বিদ্রূপ করা হয়েছিল। যেন কতবড় অধঃপতন। আমরা শান্তিতে ঘরে শুয়ে বারীন্দ্রকুমারের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে রংগরহস্যে মেতেছি। এ জিনিস আমার পছন্দ ছিল না। আমি ১৯৩৩ সনে—তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত তখন আমি—শনিবারের চিঠিতে (তখন আমি সম্পাদক) এই প্যারা-গ্রাফগুলি লিখেছিলাম—

বারীনদার বিবাহ হইয়াছে। মানুষেই বিবাহ করিয়া থাকে—ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। বয়সের সংগে সংগে কাহারো দৃষ্টির প্রসার হয় কাহারো সংকোচন ঘটে—মোটকথা কেহ একই মত অথবা দৃষ্টি লইয়া বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত কাটাইয়া দেয় না। শেষ সত্য পাইয়াছি ইহা এক হোমিওপ্যাথ ছাড়া আর কাহাকেও বলিতে শুনি নাই। সুতরাং বারীনদা যদি এতকাল পরে বিবাহের প্রয়োজন বোধ করিয়া থাকেন, তাহাতে বাঙালী-জাতির সর্বনাশ হইল বলিয়া মনে হয় না।

বাঙালী হইয়া বিবাহ করিল না—এটা অসাধারণত্ব। এইজন্য কেবলমাত্র বিবাহ না করিলেই অনেকে অবিবাহিত লোকটিকে অসাধারণ লোক বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। অনেক সময় পাঁচ-জনের মুখে এইরূপ অতিমানবতার স্তুতি শুনিয়া শ্রবণকারীর ইহকাল পরকাল নষ্ট হইয়া যায়। বোমার বারীনদা বীমায় ঢুকিবার পরেও কোনো কোনো কৌতূহলী লোকের মনে এরূপ ধারণা থাকা অসম্ভব ছিল না যে, তিনি হয়তো একদা কোনো বীমা কোম্পানির ডিরেক্টর বা অ্যাকচুয়ারিকে হত্যা করিয়া আবার আন্দামান যাইবেন। কিন্তু এই বিবাহ হইবার পর তাঁহাদের সে আশা চূর্ণ হইল।...

লোককে যখন নির্দিষ্ট কোনো একটি আশা দ্বারা উস্কাইয়া তোলা হয়—তখন তাহারা ভাবে না যে, যিনি আশা দিলেন তিনি মানুষ। অদ্যকার যে লোকটি আশা দিলেন—আগামীকল্য তিনি আর সে লোকটি থাকিবেন না। এইটুকু ভুলিয়া যাওয়াতেই যত অনর্থ। বারীন্দ্র-কুমার সম্বন্ধে দেশ আর কি আশা করিতে-ছিল? ভদ্রলোক জীবনে একবার দেশের জন্য জীবন পণ করিয়াছিলেন—তাহার পর বুঝিয়াছেন তাঁহাদের সেই পথ ভারত উদ্ধারের পথ নহে। পথ হউক অপথ হউক যৌবনের প্রথম আগুনে এই পথেই তিনি জ্বালাইয়া নিজেকে ভস্মে পরিণত করিয়াছেন। এখন যদি তিনি সাধারণ লোকের মতো বিবাহ ইত্যাদি করিয়া সংসার পাতিতে চাহেন তাহাতে নিন্দার কিছু নাই।...

(অগ্রহায়ণ ১৩৪০)

বারীন্দ্রকুমার এ সময়ে আমার অপরিচিত আগেই বলেছি। তাই তাঁর বিষয়ে তখন যা বলেছি তা হয়তো সম্পূর্ণ সত্য না হতেও পারে কিন্তু তাঁর বিবাহ করা যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ঘটনা এ বিশ্বাস আমার তখনো ছিল—এখনো আছে, এবং

তিনি যে 'লোকে কি বলবে' সে কথা না ভেবে নিজের বুদ্ধিতে চলেছিলেন এজন্য তিনি আমার শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। উপরে যেটুকু উদ্ধৃত করেছি তা আংশিক, দুটি প্যারাগ্রাফ বাদ দিয়েছি। মনে রাখতে হবে ঐ লিখনটি আজ (১৯৭০) থেকে ৩৭ বছর আগে লেখা। বারীন্দ্রকুমারের শেষ জীবনে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই আমার মনে একটা বেদনার ছবি এঁকে দিয়েছে। আত্মিক সাধনার দিকে ঝুঁকে পড়েও শেষ পর্যন্ত অভাবই তাঁকে দীর্ঘজীবী হতে দেয়নি।

বারীন্দ্রকুমারের মৃত্যু ঘটল ১৯৫৯ সনের ১৮ই এপ্রিল। তাঁর শ্রাদ্ধক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় ১৭ই মে ১৯৫৯। শ্রীযুক্তা লতিকা ঘোষ নিজে এসেছিলেন চিঠি দিতে। দেখা হয়নি। খামে লিখে গিয়েছিলেন

I missed you by some minutes
Lotika Ghose 11.5.59.

লতিকা ঘোষের অনেক অনুরোধ আমি পালন করেছি, এটি পারিনি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিমাতা হেমলতা দেবী। তাঁর দুখানা চিঠি রয়েছে আমার সংগ্রহে। অন্যত্র অন্য উপলক্ষে এ চিঠি দু'খানা ছাপা হয়েছিল, কিন্তু এখানে তার পিছনের স্মৃতি, এবং ব্যাখ্যা অন্য।

হেমলতা ঠাকুরের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৩০-এর পর থেকেই। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গলক্ষ্মী' মাসিকে আমি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছি এর কাছাকাছি সময়। হেমলতা দেবী ছিলেন তার সম্পাদিকা। পরিচয় শুধু সেই সূত্রেই নয়। কিন্তু সে কথা অবান্তর। ১৯৩৯ সনে আমার ভগিনী মঞ্জুর বিবাহ (সরোজ আচার্যের সঙ্গে) উপলক্ষে আমাদের বাড়িতে একবার এসেছিলেন। (সেই সময় তাঁর একখানা ফোটোগ্রাফ তুলেছিলাম।)

১৯৩৮ সনে কৃষ্ণনগর সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে কথাসাহিত্য বিভাগের সভানেত্রী-রূপে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটি প্রস্তুতের ব্যাপারে তিনি আমার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর দু'খানা চিঠি এই সম্পর্কেই। কিন্তু সে কথা বলার আগে ১৯৩৩ সনের একটি ঘটনায় ফিরে যাই। একদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন একটি পরামর্শের জন্য। তাঁর ইচ্ছা প্রতি বৎসর তিনি বাছাই করা একজন কথাশিল্পীকে একটি নগদ টাকার পুরস্কার দেবেন। কিন্তু কিভাবে একটি বিচারকমন্ডলী গঠন করা যায় সেই বিষয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান। আমি যেদিন তাঁর কাছে যাব সেদিন সজনীকান্ত দাসকেও আমার সঙ্গে যেতে বললাম। সজনীকান্তও খুব উৎসাহী হয়ে উঠলেন।

১৯৩৩ সনের এক শীতের সকাল। তারিখটি মনে নেই। ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলির বিখ্যাত বাড়ি। এই বাড়ির সঙ্গে আমার সামান্য কিছু স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ১৯২৩ সনে একদিন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি ফোটোগ্রাফ তুলতে গিয়েছিলাম ঐ বাড়ির দোতলার পশ্চিমের বারান্দায়। এই সময়ের কিছু আগে ঐ ৬ নম্বরের বাড়ির নিচের একটি ঘরে বাস করেছি। ১৯২৭ (?) ঐ বাড়িতে নটীর পূজা অভিনয় দেখেছি। ১৯২৩ থেকে ১৯৩৭ সনের মধ্যে চারবার ব্যক্তিগত কারণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেছি। ১৯৩৬ সনে তাঁর গদ্যকাব্যের আবৃত্তি সভায় যোগ দিয়েছি ৬।১ নম্বর বাড়িতে। এবং এই সময় বাসব ঠাকুরের আহ্বানে তার ঘরে বসে তার কয়েকটি নতুন লেখা কবিতা শুনেছি।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাব্য পাঠের দিন একটি অতি কৌতুককর ঘটনার কথা বলি। ৬।১ নম্বর বাড়ি—সেখানে পরে বিশ্বভারতী পত্রিকা অফিস হয়েছে, সে বাড়ির দোতলায় ওঠার সিঁড়িটি খুব প্রশস্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তৎকালীন গদ্যকাব্য পাঠ করে শোনাবেন নিমন্ত্রিতদের কাছে। সজনীকান্ত দাস, প্রথমনাথ বিশী ও আমি যথাসময়ে গিয়েছি সেখানে। সিঁড়িটি জুতোয় ভরতি। পাঠ শেষে যখন নিচে নামছি তখন সজনীকান্তের নজরে পড়ল প্রকান্ড একজোড়া বিদ্যাসাগরী চটির উপর। তৎক্ষণাৎ বোঝা গেল এ জুতো রবীন্দ্রনাথের না হয়ে যায় না। সজনীকান্ত বললেন এ জুতো সরাতে হবে। তাঁর নিজ মুখে আগে শুনেছিলাম রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত অন্যান্য জিনিসও তিনি কিছু কিছু হস্তগত করেছেন। তার মধ্যে তাঁর নিজ-হাতে মার্জিনে মন্তব্য লেখা বইও আছে। বইখানা কার লেখা এখন আর আমার মনে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত যে-কোনো জিনিস ভবিষ্যতে বিশেষ মূল্যবান হয়ে উঠবে এ বোধ সজনীকান্তের একটু তীব্র রকমেরই ছিল। শ্রীযুক্তা হেমন্তবালা দেবীকে দেওয়া কয়েকটি জিনিসও সজনীকান্ত তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন, এবং পরে রবীন্দ্রনাথ তা জানতে পেরে হেমন্তবালা দেবীর উপরে কিছু অসন্তুষ্টও হয়েছিলেন। সে সব কথা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র(৯)তে ছাপা আছে। (যে সব চিঠিতে এর উল্লেখ আছে ছাপার সময় তা থেকে সজনীকান্তের নাম অবশ্য বাদ দেওয়া হয়েছে।)

অতএব রবীন্দ্রনাথের চটি সজনীকান্তের সংগ্রহকে আরো মূল্যবান করবে এই আশায় তাড়াতাড়ি জুতো জোড়া সরাবার উপক্রম করতেই শিল্পী (শান্তিনিকেতনের) দীর্ঘকায় দীর্ঘপদী হরিপদ রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, আমার চটি কোথায়? সজনীকান্ত তাড়াতাড়ি কাগজের ভিতর থেকে চটিজোড়া যথাস্থানে রেখে দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, এ চটি কার—হরিপদদার নাকি? পরে এ নিয়ে খুব হাসাহাসি হয়েছিল।

সজনীকান্ত ও আমি যথাসময়ে গিয়ে পৌঁছলাম ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে। কে যে আমাদের পথ দেখিয়ে সেই গোলক ধাঁধার পারে হেমলতা দেবীর ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল সে কথা আজ আর মনে পড়ে না। তবে সাহিত্য বিষয়ে অনেক আলাপ হয়েছিল এবং কথাশিল্পীরা যে আমাদের দেশে অধিকাংশই গরিব সে সব কথা আলোচনার পরে পুরস্কারের কথা পাড়লেন। তিনি বললেন, তিনি শ্রেষ্ঠ বাংলা গল্প বা উপন্যাস লেখককে বছরে যে পুরস্কার দিতে চান তার মূল্য একশত টাকা।

অঙ্কের পরিমাণ শুনে দমে গেলাম: অথচ সে যুগে একশত টাকা খুব কম ছিল না। টাকার দাম তখন কেমন ছিল অন্যভাবে তার আভাস দেওয়া যেতে পারে। ঐ টাকায় তখন খুব ভাল চাল পাওয়া যেত ৬০০ সের। অথবা মিলের ধুতি কেনা যেত মাঝারি ধরনের ৫০ জোড়া। রুই মাছ পাওয়া যেত ২০০ সের। এবং এই সময় সজনীকান্ত দাস মাসে ২০০ টাকা বেতনে বঙ্গশ্রী সম্পাদক নিযুক্ত হওয়াতে বন্ধুমহলে উৎসব আরম্ভ হয়েছিল। এত বড় চাকরি সহজে কারো ভাগ্যে মেলে না! সেই বাজারে একশত টাকা পুরস্কারের কথা শুনে যে দমে গিয়েছিলাম (যাঁরা এই পুরস্কার পেতেন, তাঁদের মনোভাব যাচাই না করেই) সে অন্য কারণে। আমরা জানতাম হেমলতা দেবীর অনেক টাকা আছে। এবং পথে আমরা অনুমান করেছিলাম অন্তত পাঁচশত টাকা অবশ্যই তিনি দিতে চাইবেন। কিন্তু আমরা যেমন দমে গেলাম, তিনিও তেমনি। বাংলা সাহিত্যের জন্য প্রথম পুরস্কার ঘোষণায় ঐতিহ্য গড়ে ওঠায় নিজেদের অবিমৃষ্যকারিতায় জন্যই বাধা দিলাম। পুরস্কার প্রথা সর্বপ্রথম প্রচলিত করেন হেমেন্দ্র বসু, কুন্তলীন পুরস্কার ঘোষণা করে। কিন্তু তা ছিল অন্য জাতের। গল্পের জন্য পুরস্কার, এবং সে গল্পে কৌশলে কুন্তলীন তেলের নাম ব্যবহার করতে হবে। জগদীশচন্দ্র বসুও ২০ টাকার কুন্তলীন পুরস্কার পেয়েছিলেন, একটি গল্প লিখে। লম্বা বই, যতদূর মনে পড়ে গাঢ় গোলাপী কালীতে কুন্তলীন প্রেসে ভারী সুন্দর ছাপা, বাল্যকালে পড়েছি। হেমলতা দেবীর পুরস্কারই হত আসল সাহিত্য পুরস্কার।

কৃষ্ণনগর সাহিত্য সম্মিলনীর (১৯৩৮) ভাষণ প্রস্তুতে সাহায্য করার জন্য হেমলতা দেবীর দুখানা চিঠির উল্লেখ করেছি, তার প্রথমখানি এই—

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি,
৬০-বি মির্জাপুর স্ট্রীট,
কলিকাতা—৪-১-৩৮

কল্যাণীয় পরিমল,

"তারাদাসের মুখে তুমি আমাকে কথাসাহিত্যে অভিভাষণ সম্বন্ধে সাহায্য করবে জেনে আমি যার পর নাই সুখী হয়েছি। আমি জানি তুমি এ সম্বন্ধে যে তথ্য দেবে তা কত মূল্যবান ও সুচিন্তিত হবে। একেই তো এ রকম একটি অভিভাষণ লিখতে গেলে অনেক জানা থাকা দরকার, তা ছাড়া ভাবতেও হবে অনেকখানি। এ সব করতে আমার একেবারেই সময় অভাব। আপাতত তুমি বই ঘেঁটে কথা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারাটি আমাকে ধরিয়ে দেবে, শেষে নিজের ভাষায় সেটি গেঁথে নেব। নানা কাজে আমি এত ব্যস্ত যে বেশি সময় এর জন্য দিতে পারছি না, অতএব তুমি অভিভাষণটি এক রকম তৈরি করেই দেবে আমি নিজের ভাষায় গুছিয়ে নেব মাত্র। এ কাজে তোমাকে খানিকটা সময় দিতে হবে, তোমার সময়ের ও পরিশ্রমের মূল্য আমি জানি। সামান্য কিছু সাহায্য সেজন্য আমি তোমাকে তারাদাস মারফৎ পাঠালাম। ৮।১০ দিনের মধ্যে লেখাটুকু পেতে পারব তো? আমাকে আবার গুছিয়ে ভাষায় বসিয়ে নিতে সময় দিতে হবে। ইতি বড়মা

"পুঃ পাঁচটি টাকা পাঠালুম।—বড়মা"

এবারে আট-দশ দিনের পরিশ্রম সার্থক মনে হল। টাকা একেবারেই আশা করিনি। *ঐ টাকায় এক মাসের চাল (চল্লিশ সের, চার টাকা) ও দুদিনের বাজার হল (আট আনা+আট আনা।) সাহিত্য কর্মের জন্য বার্ষিক একশ টাকা দিতে চেয়েছিলেন তিনি, তখন তা মনঃপূত না হওয়াতে যে ভুল করেছিলাম, এবারে আর সে ভুল করিনি।*

পত্র ও টাকা বাহক তারাদাস—তারাদাস মুখোপাধ্যায়, বীরভূমের মানুষ। তখন বয়স সম্ভবত ২৫ বছর—ছদ্মনাম ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়।

হেমলতা ঠাকুরের দ্বিতীয় চিঠি—

ওঁ

৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন,
জোড়াসাঁকো, ৩।২।১৯৩৮

কল্যাণীয় পরিমল,

কাল তোমার চিঠিখানি পেয়ে বিশেষ উপকৃত হয়েছি এবং তোমার নির্দেশ মত স্থানে স্থানে পরিবর্তন করে দিলুম। কাকামহাশয় (রবীন্দ্রনাথ) পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেছেন এই সব প্রবন্ধে ব্যক্তিগতভাবে নাম উল্লেখ করতে। তাই উল্লেখ করতে সাহস পাই নাই। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বর্তমান সম্মিলনীর জন্য যে অভিভাষণ লিখেছেন, তাতে একজনেরও নাম উল্লেখ করেন নাই যা বলবার সব সাধারণভাবে বলেছেন, আমার প্রবন্ধটা একবার কাকামহাশয়কে দেখিয়ে আনার জন্য শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তিনি যা বলেন তাই করি।

আমি যে এ সব বিষয়ে অনেকটা আনাড়ি সবাই তা জানে, তবে তাই বলে যা তা লিখতে হবে তা হতে পারে না। কেউ কাজে না দিলেও মনে গ্রহণ না করলেও আমাকে অবশ্য সাবধান হতেই হবে।

তোমার Suggestions পেয়ে কাল খানিক ২ বদলেছি এবং তাতে ভাল হয়েছে। কাকামহাশয় পছন্দ করেন না অনেক নাম উল্লেখ করা তাই করতে সাহস করলুম না তবে তাঁরা যে প্রতিভাশালী সে কথা বিশেষ করে উল্লেখ করেছি।

তুমি যে আমার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছ এ জন্য আমি কৃতজ্ঞ। —বড়মা

এ চিঠি পাবার কিছু দিনের মধ্যে হেমলতা ঠাকুর আমাকে ঐ তারাদাস মুখোপাধ্যায়ের হাতে একটি ব্ল্যাক বার্ড ফাউন্টেন পেন কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নীল রঙের কলমটার কথা আজও ভুলিনি। কাজ করিয়ে নিয়ে তার পরিবর্তে কিছু দেওয়া কর্তব্য এ বোধ যাঁরই আছে, তাঁর প্রতিই আমি শ্রদ্ধা পোষণ করি। হেমলতা ঠাকুরের জন্য সামান্য কাজ করার বিনিময়ে আমি কিছু যে আশা করিনি, একথা আগে বলেছি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রায় অনুরূপ ঘটনার কথা মনে এলো। এ ক্ষেত্রেও এক মহিলা। এবং তিনিও ধনী। উপরন্তু তিনি ধনী পিতার সন্তান। পিতা, স্যর তারকনাথ পালিত, স্বামী ভাগলপুরের বিখ্যাত জমিদার দীপনারায়ণ সিং। এঁর সঙ্গে আমাকে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন লেখক এনজিনিয়ার কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য। দীপনারায়ণ সিং অল্প দিন হল মারা গিয়েছেন, লীলা সিং তখন শোকসন্তপ্ত বিধবা।

আলাপের পরে লীলা সিংএর ইচ্ছা হল আমি তাঁর স্বামীর বিষয়ে বাংলায় একটা প্রবন্ধ লিখি। লেখার জন্য প্রয়োজন খবরের কাগজের কিছু কিছু কাটিং পেলাম। এবং আমার অনুরোধে তিনি দীপনারায়ণের পড়বার ঘর, বিশ্রাম ঘর এবং তাঁদের প্রাসাদের পরিবেশটি ঘুরে ঘুরে দেখাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এইভাবে প্রায় সর্বদা বিশ্বভ্রমণরত দীপনারায়ণের মনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম।

প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল—যতদূর মনে পড়ে জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ভগ্নদূত নামক সাপ্তাহিকে। তার কোনো কপি আমার নেই। আমার সেই লেখা পাঠের পর লীলা সিং আমাকে ভাগলপুর থেকে এই চিঠিখানা লেখেন।

much has been written about him since his death but nothing I have read has really moved me as greatly as your article.

এ রকম একখানা চিঠি পেয়ে মনটা স্বভাবতই স্ফীত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই স্ফীতির কেন্দ্রে কি পাঁচ টাকার একখানা চেক পাব এমন দুরাশা লুকিয়ে ছিল? এখন আর তা স্পষ্ট মনে পড়ে না। তবে সত্যই যদি পেতাম, তা হলে অবশ্যই আশা করতে থাকতাম যে এবারে হায়দারাবাদের নিজামের বিষয়ে কিছু লেখার আদেশ পাব।

হেমলতা প্রসঙ্গ শেষ করতে শান্তিনিকেতনের কথায় ফিরে যাচ্ছি। ১৯২৯ সনে সেখানে নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীর সঙ্গে পরিচয় হয়। অল্প দিনের পরিচয়।

অথচ কি এক মধুর স্মৃতি অর্ধশতক কাল পার হয়ে আমার মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। কোনো উপকার পাওয়ার স্মৃতি নয়, স্বার্থের স্মৃতি নয়। সে যে কি তা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে না, শুধু একটা চরিত্র মাধুর্যের স্মৃতি মনের মধ্যে বয়ে বেড়াচ্ছি। তাই দীর্ঘ ৩৫-৩৬ বছর পরে যখন আমি মাসিক বসুমতীতে 'স্মৃতিচিত্রণ' নামক স্মৃতির ছবি আঁকতে শুরু করি, তখন নিত্যানন্দবিনোদের কথা মনের মধ্যে একটা আনন্দের আলো জ্বালিয়ে তুলেছিল। একটি কথা লিখেছিলাম এই যে তাঁর শ্মশ্রুশীর্ষ আমার স্মরণ রেকর্ডখানার উপর নীডলের কাজ করছে। যখন তাঁকে দেখি, তখন তাঁর ছাঁটা দাড়ি ঠিক একটা পিনের আগার মতো নিচের দিকে ঝুলে ছিল। এই স্মৃতিকথা নিত্যানন্দবিনোদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে, এবং সেটি পড়ার পর তিনি ২১-৪-৫৮ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে যে চিঠিখানি লেখেন তা এই—

"সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন, এই চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই একটু চমকাবেন। মাসিক বসুমতী যখন মাঝে মাঝে হাতে এসে পড়তো তখন আপনার স্মৃতিচিত্রণ পড়ার সুযোগ হতো। সম্প্রতি আমাদের শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে অখণ্ড 'স্মৃতিচিত্রণ' [গ্রন্থ]খানি নিয়ে অখণ্ড আনন্দ করলাম। শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল। বইখানির ঝরঝরে ভাষাতে সমস্তটা সৌন্দর্য পরিমলেই মনোরম হয়েছে। ঘটনার বৈশিষ্ট্য, নানা মানুষের আনাগোনা প্রাকৃতিক দৃশ্য-গুলি সত্যই চিত্রের মতোই চোখে ভেসে ওঠে। অথচ যাঁর স্মৃতিচিত্র তিনি কিন্তু 'প্রমিনেন্ট' হবার চেষ্টা করেননি এইটেই খুব ভাল লাগল। আমি এখনো ধরাধামে বিরাজমান আছি। শরীর খুবই ভেঙে পড়েছে। আমার যে 'শ্মশ্রুশীর্ষ' আপনার স্মরণ রেকর্ডখানার উপর (স্টীলের) নীডলের কাজ করেছে, আজ তা এলুমিনি-য়ামের (শুভ্র) নীডলত্বপ্রাপ্ত। আপনার চিত্রণের একপাশে চিত্রিত হয়ে গেছি, এজন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। নিশ্চয়ই চেহারাতে বদল হয়েছে, পথেঘাটে ট্রামেবাসে পরস্পরকে আর চিনে উঠতে পারব না।—শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী।"

যে স্নিগ্ধ সহৃদয়তা নিত্যানন্দবিনোদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য, তার প্রমাণ এই চিঠিখানাও বহন করছে।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ সম্মান তিনি পেয়েছিলেন — 'দেশিকোত্তম'। এই সংবাদ পাবার পর আমি নিত্যানন্দ-বিনোদকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। তার উত্তরে তিনি লিখলেন—ঠিকানা হাসপাতালের।

P. M. Hospital
Santiniketan
30.12.65

...মৃতদেহের মাথায় তাজ, সাজের বিষয় না লাজের বিষয়।...আজ চার বছরের অধিককাল স্ট্রোক হয়ে হাসপাতালে অচল অবস্থায় শেষ শয্যায় বিকলের মতো শায়িত আছি, হাত-পা সব কাজে জবাব দিয়েছে। সুতরাং আমার অবস্থা অনুমানযোগ্য। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় হুইল চেয়ার বাহনে মঞ্চের কাছে যেতে হয়েছিল।...এইবার বাহাত্তুরে ধরল। সুতরাং বয়েসের রস নেই যশও নেই, এখন এক পা ওপারের জমিতে এক পা এপারের ভূমিতে আটকে দাঁড়িয়ে আছি। সত্বর একটা পা তুললেই হবে।... শুয়ে-শুয়ে লিখলাম পড়তে কষ্ট হলে ক্ষমা করবেন।—নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী।

আজ তাঁর সম্পর্কে লিখছি, মে, ১৯৭০-এ। আজ আমিও শুয়ে-শুয়ে লিখছি। পায়ের কথা বলব না। হাত আমার অনেক, সেই সব হাত দিয়ে অনেক জিনিস আঁকড়ে ধরে আছি। কেউ যদি ছাড়িয়ে নেয়, নেবে, তা নিয়ে ভাবি না।

বাসব ঠাকুরের কথা বলেছি আগে। ১৯৩৩ কিম্বা ৩৪ সনে তার ঘরে বসে কবিতা শুনেছিলাম। খুব ভাল লেগেছিল। তারপর সে ১৯৩৬ সনে বিলেত যায়। ছিল কবি, হয়ে এলো রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী। মাঝখানে যুদ্ধের কাজে সে লণ্ডনে এ-আর-পিতে যোগ দিয়ে ভ্যান ড্রাইভার হয়েছিল। তার বিষয়ে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা আমার আজও মনে পড়ে, এবং কৌতুক অনুভব করি ভাবতে গেলেই। ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়-তৃতীয় দুটি পুত্রই শিল্পীরূপে খ্যাতি লাভ করেছে সুভো ও বাসব। বাসব চমৎকার জাপানী, ইংরেজী বা বাংলায় মনোগ্রাহী কথা বলে যেতে পারে, কিন্তু কিছু লিখতে হলে বানান বিষয়ে ভয়ানক রকমের দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। তবু তাকে দিয়ে নানা বিষয়ে লিখিয়েছি, এবং অত্যন্ত সুপাঠ্য হয়েছে। তার বিবাহ হয় ১৯৫৮তে। শ্রীমতী স্মৃতিও খুব সুন্দর ঘরোয়া আলোচনা মেয়েদের বিভাগে অনেকগুলি লিখেছে। কিন্তু বাসব যেদিন স্মৃতির লেখা প্রথম আমাকে দেয়, সে-লেখায় লেখিকার নাম ছিল না। আমি বললাম, নাম লিখে দাও তুমিই। কিন্তু এ অনুরোধ তার কাছে বিভীষিকাবৎ বোধ হতে লাগল! স্ত্রীর নাম স্মৃতি না সৃতি কিছুতে মনে পড়ে না। আমি বললাম দুইয়েরই মানে হয়, অতএব তার কাছ থেকে শুনে আমাকে পর দিন জানাবে। বিবাহের দু-এক বছরের মধ্যেই স্ত্রীর নাম বিস্মৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত সহজে চোখে পড়ে না। আসলে বানানটাই ছিল তার কাছে সমস্যা।

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সম্বন্ধে এই জাতীয় একটি গল্প প্রচলিত আছে বটে। কাশীতে সীতা অভিনয় কালে হঠাৎ স্টেজে তাঁর ভুল হয়ে গেল, তিনি রাম না লক্ষ্মণ-পীর। কৌশলে প্রম্পটারের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রম্পটার ধাঁধায় পড়ে গেল। বলল, ভিতরে মেয়েদের কাছে জিজ্ঞাসা করে আসি।

সমুদ্র ॥ দিব্যেন্দু পালিত

আমিও পেরিয়ে আসি স্মৃতিলব্ধ সেই ধালিয়াড়ি;
দ্রুত দৌড়ের টানে পায়ের গভীর ক্ষত
রয়ে যাবে ভাবি না কখনো—
সমস্ত স্টেশনে আজও চলে ট্রেন, সবুজ পতাকা
আজন্ম বিশ্বাসভঙ্গ ক'রে গেছে—বহুদূরে—দ্যাখেনি কখনো
বালিতে ক্ষতের চিহ্ন, কুমারীর ভাঙা শাখা
পড়ে আছে অল্প ব্যবধানে,
প্রসব-যন্ত্রণা থেকে বের হয়ে জননীর নাভি
অনন্ত শূন্যের ভারে নুয়ে পড়ে আশ্রয় যেদিকে...!

একেকটি ঢেউ আসে, সমুদ্র সমূহ কেড়ে নেয়

প্রতিশ্রুতি রাখো ॥ কালীকৃষ্ণ গুহ

প্রতিশ্রুতি রাখো ওই পাহাড়ের উপর, ওই রৌদ্রে,
ওই পাইনগাছগুলির পাশে দীর্ঘ ছায়ায়।

শৈশবের শুদ্ধতা রয়েছে এখানে, এখানে একটি শিশু
আকাশ দেখতে-দেখতে বড়ো হয়,
রৌদ্র নিয়ে খেলা করে সারাদিন।

এখানে কোনো নগ্নতা এনো না।
তার মধ্যজীবনে যখন তীব্র মাদার-ফুল
উড়ে পড়বে রৌদ্রে, অন্তর্লীন
শান্ত বিকেলবেলায়, তখন প্রতিশ্রুতি রেখো।

আমি ওই পাহাড়ের উপর আর কোনোদিন যাবো না,
সে শুধু থাকবে
একা, অস্তরাগে

পাইনগাছগুলি সারাদিন ছায়া ফেলে রেখে সন্ধ্যাবেলা
গুটিয়ে নেয়
পাইনগাছগুলি সূর্যের কাছ থেকে পরিণতি শিখে নিয়ে ছড়ায়
তুষার-দিন, হাওয়া, হিম-হাওয়া

তার পাশে তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রাখো,
কোনো নগ্নতা এনো না।

॥ কে রয়েছে মনে হয় ॥

শুভ মুখোপাধ্যায়

এ ঘরে মানুষ জাগে
তিমির প্রহরে
শেষ রাখী হাতে
অবন ঠাকুরের বুকে রাখা
সেদিনের সুবর্ণিকায়
কারো ঘুম ভাঙে
একে একে জন্মদিনকে মনে পড়ে যায়
সে যে তোমার জন্যে
বার বার
ফিরে ফিরে দুঃখ জেবলে রাখে

এ ঘরে মানুষ জাগে।

গোধূলি

মিহির আচার্য

সমস্ত সম্পর্কের দাগগুলো নির্দয় হাতে মুছে নিয়ে অনিলা চলে যাওয়ার পর পরমেশের দিনরাতগুলো শূন্য, বিবর্ণ হয়ে গেল। অনিলা ছিল, দীর্ঘদিনের পরিচয়ে অস্তিত্বের একটা বস্তুগত বোধ ছিল পরমেশের চেতনায়। নিজের বেঁচে-থাকাটাও অপরের স্বীকৃতির নাগালে না-থাকলে অর্থরিক্ত হয়ে পড়ে। হাতের থাবায় উদ্গত হাইটাকে বাধা দিয়ে পরমেশ পুনরূপ ভাবল : আশ্চর্য, অনিলা নেই। এবং পরমেশের অস্তিত্বজ্ঞাপক সংজ্ঞাটুকুও কেও মুছে নিয়ে গেছে। একুশ শীতগ্রীষ্ম-বসন্তের মেয়েটার তূণে এত শক্তি ছিল! ছিল। নাহলে চৌত্রিশ বছরের পোড়খাওয়া, সন্ততিকালের এক বৃহন্নলা যুবক পরমেশ, তার এই নিঃস্ব ফতুর অবস্থা কেন! পরমেশের পৃথিবী বিশাল, চাকরি, বন্ধুবান্ধব, খেলা-রাজনীতি এবং কেতাব-পঠন, আহ্, তাবৎ জগতটার ওপরই কালি ঢেলে অনিলা লেপেপুঁছে একাকার করে দিল। তার অর্থ কী এই : অনিলার বিদায়ের সঙ্গে অন্য জগতটাও অন্তর্হিত হয়েছে। কিংবা, উলটো করে ভাবলে, অনিলা স্থির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল বলেই বাইরের দুনিয়াটা অটুট ছিল! কেন এমন হল? অনিলা তাকে সর্বরিক্ত করে দেবে বলেই প্রতিজ্ঞা করেছিল। যেমন করে পথিক রাত্রির আশ্রয়টাকে লণ্ডভণ্ড করে চলে যায়। অনিলা যতদিন ছিল পরমেশ কী তার দাম বোঝেনি? পরমেশ কী তাকে নিস্পৃহ উদাসীনতায় দিন দিন হতাশ করেছে? একুশ বসন্তে সমৃদ্ধ ওর রক্ত মাংস হিংসা লোভ-সংযুক্ত লোলিহান শরীরটা...। অহো, পরমেশ কী বিশেষ-ভাবে দগ্ধ হতে চায়নি এই আগুনে? বৈদগ্ধ্য? পরমেশ ঢোক গিলল। শেষ কয়েকদিন অনিলা বেশ অন্যমনস্ক ছিল, উদ্বিগ্ন। কিছু চিন্তা করছিল। অনিলা চিন্তা করে? ওর চিন্তার চেহারাটা ভাববার চেষ্টা করল পরমেশ।

সেদিন আলো-মরা বিকেলে ঘর্মসিক্ত, ক্লান্ত, অনিলা এসে দাঁড়াল দরোজায়, দরোজার ফ্রেমে ওর পরিপুষ্ট শরীরটা কিছুক্ষণ মাধবীলতার ঝাড়ের মতো দুলতে লাগল, চোখের তারা ঘূর্ণমান, ঠোঁট কাঁপছে।

'আমি চলে যাচ্ছি।' ধ্রুব মৃত্যুর মতো ঘোষণা করল অনিলা।

পরমেশ বাক্যটাকে বুঝবে না বলেই বুঝতে চাইল না। বিষয়টা এইরকম : আজ সবাই সব কিছু বোঝে, তবু তাকে স্বীকার না-করাই ভালো। কারণ তাহলে অন্যের সঙ্গে রচিত সেতুটা ভেঙে যায়। মানুষ একা হয়ে পড়ে।

পরমেশ একটু থেমে বলল : 'এ কথাটা বলবার জন্যে কী এতদূর আসার দরকার ছিল?'

অনিলা বলল : 'আমি নাটক করতে চাইনে।'

'নাটক।'

'হ্যাঁ, সহজভাবে বিদায় নিয়ে যেতে চাই।'

পরমেশ বলল : 'তার কোনো দরকার ছিল না।'

অনিলা হাসল। 'সংসারে কোন্ জিনিসটারই বা দরকার আছে। প্রয়োজনগুলো আমরা বানাই।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। বাঁচতে গেলে বানাতে হয়।'

'এতদিনের এই সম্পর্কের বনেদটাও তাহলে বানানো ছিল?'

'সেটা তোমার থেকে আর কে বেশি জানে।'

পরমেশ দৃঢ়স্বরে বলল : 'না, আমি জানিনে।'

অনিলা বলল : 'তোমার কাছ থেকে এম, এ-র নোটগুলো আদায় করবার জন্যেই আমাদের আলাপ। তোমার ওগুলো না পেলে আমি হাই সেকেণ্ড ক্লাশ কিছুতেই পেতাম না।'

পরমেশ ব্যঙ্গ করে বলল : 'আমার নোটে তুমি পেলে সেকেণ্ড ক্লাশ। আর আমি থার্ড ক্লাশ।'

অনিলা বলল : 'সেটা তোমার অতিরিক্ত আত্মসচেতনতার ফল।'

পরমেশ বলল : 'তাহলে তোমার কেরিয়ারের জন্যেই আমার প্রয়োজন ছিল। আর কিছু নয়? ময়দানের সন্ধ্যাগুলো, রেস্তোরাঁর পরদাটানা কেবিনগুলো, এই ঘরের চারদেয়ালের সান্নিধ্যগুলো?'

'অন্যের কাছে সুবিধে নিতে গেলে কিছু প্রশ্রয় দিতেই হয়।'

'প্রশ্রয় ?'

'হ্যাঁ। নাহলে কারবারি চেহারাটা বড় স্পষ্ট হয়ে পড়ে।'

পরমেশ বলল : 'এই বয়েসে তোমার এত হিসেবী বুদ্ধি, অবাক হতে হয়।'

অনিলা বলল : 'হিসেব না-করলে আমরা কবে ভেসে যেতাম।'

নিশ্বাস ফেলে পরমেশ বলল : 'আমি কোনো হিসেব করিনি।'

'কারণ তোমার হিসেব না-করলেও চলে। তোমরা জানো সংসারটা একান্ত তোমাদেরি। আর সবকিছু তোমাদের আবর্তে মুখ বুজে ঘুরবে। অনিলা বলে' মেয়েটির আলাদা কোনো সংজ্ঞা নেই তোমার চেতনায়। কোনোদিন ছিল না। একজন যুবতী একজন পুরুষের সংগে পাস্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকবে, এটা কোনো ঘটনাই নয়।'

'তোমার গলায় অভিযোগের গন্ধ পাচ্ছি।'

'নাহ্, এমন বোকামি আমি দ্বিতীয়-বার করব না।'

'দ্বিতীয়বার ?'

'হ্যাঁ দুবারের বেশি কোনো মানুষেরই একই বোকামি করা উচিত নয়।'

পরমেশ ক্ষুব্ধ হল : 'প্রথম বোকামিটা কী আমার সংগে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার কারণে? আমাকে অবহেলা করতে পারো কিন্তু আহত করবার অধিকার তোমাকে দিইনি।'

অনিলা বলল : 'আমি দুঃখিত।'

পরমেশ বলল : 'আমাকে যদি বিশ্বাস করতে না পেরে থাকো তার জন্যে আমি দায়ী নই।'

'তুমি নিজেকেই কী বিশ্বাস করো?'

'মানে?'

'না। এম্নি বলছিলাম।'

'কাকে বিশ্বাস বলো তুমি?'

'কী জানি। মনে পড়ছে না।'

'চালাকি কোরো না। বলতেই হবে তোমাকে।'

'বলছি। আজ বলবার জন্যেই এসেছি।' অনিলা চেয়ার টেনে বসল : 'এই তিন বছরে এই ঘরটা, এই তুমি-আমি, ঠিক এক জায়গায় আটকে আছি। তোমার ব্যবহার, তোমার চলাফেরা, কথাবার্তা মুখস্তের মতো হয়ে গেছে। আমি চোখ বন্ধ করেও বলে দিতে পারি।'

'কী-রকম ?'

'এম, এ. পাশ করে আমি কলেজে কাজ পেলাম। আর তুমি থার্ড ক্লাশের অপবাদ ঘোচাবার জন্যে আরেকবার পরীক্ষা দিলে না।'

'আমি পারিনি।'

'পারোনি নয়, পারতে চাওনি। তুমি পুরুষ, তোমার একধরনের অহংকার..'

পরমেশ বলল : 'বেশ। অহংকারই হল। তোমার কী আসে-যায়?'

অনিলা বলল : 'সেটা বুঝলে যে তোমার অহম্ খর্ব হয়।'

পরমেশ নির্বাক।

অনিলা বলল : 'তোমার নোট মুখস্ত করে আমি সেকেন্ড ক্লাশ আদায় করলাম। আর, তুমি রইলে থার্ড ক্লাশ। আমাকে আঙুলে উঁচিয়ে সব সময় স্মরণ করিয়ে রাখা।'

পরমেশ আশ্চর্য হল।

অনিলা আবার বলল : 'আমাকে অধমর্ণ করে রেখে তুমি মহাজনের আত্ম-প্রসাদ লাভ করতে চাও। তার মানে তুমি আমাকে কখনো তোমার সমান ভাবোনি, বন্ধু ভাবোনি। আর, দিনের পর দিন আমাকে এক হীনমন্যতায় ন্যুব্জ করে রেখেছ। আমি আত্মমর্যাদাবোধ অনুভব করিনি, কুণ্ঠা-লজ্জা-সংকোচ-অপরাধের ভারে আমি ছোটো হয়ে গেছি। আমার স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিয়ে তোমার সান্নিধ্যে দম-দেয়া পুতুলের মতো চলতে হয়েছে। যেন তোমার ইচ্ছাগুলোকে আমি বাধা না দিই। যেন তোমাকে বুঝতে না দিই 'আমি আছি—আমি আছি'...

পরমেশ বলল : 'হুম। এত জ্ঞান-লাভের পরও তুমি সম্পর্ক রাখলে কী করে?'

অনিলা টেবিলের বইটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল : 'কী জানি, বোধহয় পুরনো অভ্যেসের দাস হয়ে পড়েছিলুম।'

'অভ্যেস!'

'আমরা অজানতে কখন একটা অভ্যেসের পৌনপুনিকতায় লীন হয়ে পড়ি। এক সময় আমাদের জীবনবোধটাও অভ্যেসের সমষ্টি হয়ে পড়ে। এই অভ্যেসের পিছনে নিজস্ব কোনো চেষ্টা নেই, পুরনো জুতো পায়ে গলাবার মতো....'

'আহ্।'

'তারপর এই অভ্যেসের কারাগারে আমরা স্বেচ্ছায় বন্দী হই, বন্দিত্বের অপরাধবোধগুলো ভোলবার জন্যে অভ্যেস-গুলোকে ভালোবেসে ফেলি।'

পরমেশ ক্রুদ্ধ গলায় বলল : 'অভ্যেসের দাসত্ব যখন কাটাতে পেরেছ তখন আর কী, এবার তুমি মুক্ত, স্বাধীন। আমাদের জন্যে আর নাইবা ভাবলে, আমরা এইভাবেই জীবন কাটিয়ে দিতে পারব।'

অনিলা কথা বলল না, চুপ করে রইল।

পরমেশ আবার বলল : 'আমি জানি আমার কোনো উচ্চাকাংক্ষা নেই, আমি বড় স্বপ্ন দেখিনে, আমার মনের আধারটা ভীষণ ছোটো।'

অনিলা বলল : 'একথা বলে তো পার পাওয়া যায় না পরমেশ। আমি উচ্চাকাংক্ষার কথা তুলিনি, বড় স্বপ্নের কথাও নয়। যু

ওসব লোভ আমি দেখিনে, কোনোদিনই নয়।' একটু হেসে : 'কী জানো, আমরা কেউই রাজারানী হয়ে জন্মাইনি। আমাদের যখন জ্ঞান বাড়ে, ক্রমশ পৃথিবীর সম্মুখীন হই, তখন দ্বিতীয় একটি সত্তার মুকুরে আমরা তিলে তিলে নিজেকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করি। একে দ্বিতীয় জন্ম বলতে পারো। কাব্য করে বলতে গেলে প্রভাতের সূর্যোদয়ে যেমন পদ্মের জাগরণ। হ্যাঁ মানুষই এটা পারে, চেষ্টা করে। নিজের জন্যে নয়, আরেকজনের জন্যে। যাকে সে ভালোবাসে, যাকে সে স্নেহ করে, আদর করে। তা নাহলে আরেক জীবনের সঙ্গে একটি জীবন যুক্ত হতে চাইবে কেন।'

'আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছিনে।'

অনিলা মৃদু গলায় বলল : 'পারছ। স্বার্থপরতার বেড়াটা ভেঙে ফেলো। পারবে। ভালোবাসা একটা অস্ফুট গানের মতো, পবিত্র মন্ত্রের মতো। ভালোবাসা মানেই আরেকজনের জন্যে তৈরি হয়ে ওঠা। যদি-না তা বুঝতে পারি তাহলে অপরকে আমি কী দেবো।'

'আমি...' ভাবনাটা গুছিয়ে উঠতে না-পেরে পরমেশ চুপ করে গেল।

অনিলা বলল : 'রাগ কোরো না। তোমার ঘরের দশটা আসবাবের মতো আমি নিতো খেলো হয়ে গেলাম। আমি দীর্ঘদিন ভেবেছি। আর লজ্জা পেয়েছি নিজের অক্ষমতায়, শক্তিহীনতায়। আমি তোমার জীবনে অনিবার্য হতে পারিনি। অথচ— ভেবেছিলাম। দূর, যাকগে। এখন আর সেসব কথা ভেবে লাভ কী।'

পরমেশ অনেকক্ষণ পর বলল : 'তুমি সত্যিই চলে যাবে?'

অনিলা বলল : 'একটা বন্ধ্যা-সম্পর্ককে জিইয়ে রেখে কী লাভ হবে। হয়তো এমনও হতে পারে, আমি ঠিক তোমার উপযোগী নই, হয়তো অন্য কেউ অপেক্ষা করে রয়েছে। তার জন্যেই আমাকে জায়গা করে দিতে হবে।'

'না, অনিলা, না। সব মিথ্যে। আমি তোমাকে ছাড়া...'

'হ্যাঁ কষ্ট হবে বইকি। এতদিনের একটা বন্ধন। কিন্তু পরে বুঝতে পারবে : ভালোই হয়েছে। জানো, ভালবাসার ক্ষেত্র প্রস্তুত হবার আগেই আমরা ভালোবেসে ফেলি। সে-ভালোবাসা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না। প্রস্তুত-ক্ষেত্রে দ্বিতীয়জন আসে। তখন পরিপূর্ণ ভালোবাসার ফসল ফলে ওঠে।'

'না, অনিলা, না।'

'তোমার দোষ নেই। না, দোষ কারুরই নয়। জীবন এইরকমই। তোমার জড়তা থেকে যদি আমি তোমাকে জাগাতে না পেরে থাকি সে-অক্ষমতা সে-দুঃখ আমারি।'

'অনিলা, তুমি চলে যেও না। আমাকে নতুন করে চেষ্টা করতে দাও।'

'তা হয় না পরমেশ। দেরি হয়ে গেছে। ভিক্ষে করে অধিকার পাওয়া যায় না। সেটা আমাদের সম্পর্ককে আরো ছোটো করে দেবে। আমাকে এখন উঠতে হবে। নাঃ বাধা দিও না। জোর করে সব সময় কাজ হয় না।'

অনিলা চলে গেল।

অনিলা চলে যেতে পারল! আর, আশ্চর্য, সাতটা নিটোল দিন আয়ুর হিসেব থেকে খারিজ হয়ে গেল। পরমেশ ঘুম থেকে উঠেছে, ব্রেকফাস্ট করেছে, নিভুল হাতে ক্ষুরচালনা করেছে, আপিস গেছে, আড্ডা মেরেছে, খেলাধুলো-রাজনীতি-সিনেমা। একেকবার মনে হয়েছে ঘরের দরজায় তালা দিয়ে এসেছে কিনা। আর, একটা অনুভূতি, গ্রীষ্মের ছুটিতে মামার-বাড়ির সঙ্গে অনিলা একমাসের জন্যে পুরী গেলে যে-স্বাদটা তাকে সিক্ত করে রাখত! তারপর সত্যিই অনিলা একদিনও এল না। ক্লান্তি, অসহায়তা, দুঃখ, ক্ষোভ এবং ক্রোধ তাকে জটিল করে তুলল। মাঝে কদিন অলৌকিক কোনো সম্ভাব্যতার সে বিশ্বাসী হয়ে উঠল। যেমন : আজ-একটা-কিছু-হবে। হল না।

সাতদিন পরে দুরছাই বলে সে উঠে দাঁড়াল। গায়ে জামা গলিয়ে রাস্তায় নেমে এল। বড় রাস্তায় ট্রামে সওয়ার হল। ঠিক স্টপে নেমে গলিতে এসে পড়ল। এক-দুই-তিন, চার। পাঁচ নম্বরের বাড়িটার এ মুড়ো ও মুড়ো বার কয়েক চক্কর মারল। ইচ্ছে করলেই পরমেশ বাড়িতে সোজা ঢুকে পড়তে পারে। ওই তো রাস্তার দিকের দোতলার কোণের ঘরটা অনিলার। ছোট্ট ড্রেসিং টেবিল, স্প্রিং-এর খাট, সোফায় অনিলার ছিপছিপে বেগবতী দেহটা। কিন্তু কিছুতেই পা উঠল না পরমেশের। উদ্যম খরচ হয়ে যাচ্ছে। দরজা খুলে এই মুহূর্তে কে বেরুল? মামাতোভাই সুনীল। ও কী দেখে ফেলেছে। না। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল পরমেশ। ট্রাম—রাস্তায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। যদি এসে পড়ে অনিলা। যদি...। বেলা বাড়ল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দ্বিগুণ হতাশ হল পরমেশ। নিশ্বাস ফেলল আহ্। রাস্তার লোকগুলো কী তাকে লক্ষ্য করছে? পরমেশকে কী উদ্ভ্রান্ত, বেকুব কিশোরের মতো দেখাচ্ছে? জনস্রোত পিছলে যাচ্ছে গা বেয়ে। রোদে ঘামে কান্নায় সিক্ত হচ্ছে পরমেশ। চোখ ঝাঁ ঝাঁ করছে। অন্ধকারের তরঙ্গ। কখন ট্রামে উঠে পড়ছে পরমেশ। আবার নেমেছে। সুমুখে মেয়েদের কলেজের শাদা পাঁচিলটা। আরে, রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে অনিলা না? অ-নিলা। একটা দুস্তর আতংককে পরাস্ত করতে পরমেশ ছুটে গেল।

দরদর ঘাম। হাঁপাচ্ছে।

'তুমি!' অনিলা বলল।

পরমেশ বলল : 'তোমার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।'

'আমার একটুও সময় নেই। ফার্স্ট পিরিয়ডে ক্লাশ।'

'কখন? কোথায়?'

'বিকেলে আসতে পারো গড়িয়াহাটের মোড়ে। হ্যাঁ পাঁচটায়। চলি।' অনিলার পাতলা শরীরটা কলেজের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

এখন কী করবে পরমেশ? সবে দশটা পনেরো বেজেছে। নাঃ আপিস যাওয়া হবে না। বাড়ি? হ্যালো, পরমেশ না? কী করছ এখানে? রজত। মেডিকেল কোন ফার্মের দুধর্ষ প্রতিনিধি। চলো, কাজ নেই তো? একটু কফি খাওয়া যাক। কী করছ কাজকর্ম কেরানীগিরি? পরীক্ষাটা আর দিলে না? অনার্সে না তুমি ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিলে? তোমাদের মতো উজ্জ্বল ছেলে। দু কাপ কফি। স্ন্যাকস? নো। থ্যাংকস। বাড়ি যাওয়ার দরকার। বিকেলের জন্যে ভাবনাগুলো গুছিয়ে নেয় দরকার। রজতকে কী বলবে, তার ভালো লাগছে না। সে খুব ক্লান্ত, অসুস্থ। হ্যাঁ পৃথিবীর গভীর অসুখ এখন। নাঃ রজত তোমার মিস মজুমদারের খবরে আমার কোনো দরকার নেই? কী তোপচাঁচি বাংলোয় তোমরা তিনটে রাত মস্ত কাটিয়েছ? রজত তুমি সাধের কিছু জানো না। তুমিও একটা সিসটেমের দাস। আচ্ছা চলি। আডুই! সো লঙ্।

বাড়ি। তোমার সঙ্গে একটু দরকার ছিল। দরকার! শব্দটা ব্যবহার করার আগের মুহূর্তেও পরমেশ বোঝেনি ওটা দরকারী হবে। অথচ ভেবে দেখতে গেলে কথাটার কোনো অর্থই নেই। আজ কী বলবে অনিলাকে? বিকেলের ওই উত্তপ্ত ভিড়ে গড়িয়াহাটে দাঁড়িয়ে? ক্ষমা? ক্ষমা? অনুতাপ? অনুতাপ! আহ্। অনুগ্রহ? পরমেশকে না হয় ক্ষমা করল অনিলা। তা? তোমাকে ক্ষমা করলেম পরমেশ। তারপর? চলো একটু চা খাই। খেলাম। তারপর তো সপ্রেম আবরণগুলোকে না হয় প্রশ্রয়ই দিল অনিলা। তারপর? তোমার সঙ্গে একটু দরকার আছে। আহ্, দরকার।

পরমেশ ঘুমিয়ে পড়ল।

উৎকট গরমে ঘামে-গলা ওর নিদ্রিত শরীরটা এখন গলিত শবের মতো দেখাচ্ছিল। ওর পাশ থেকে গন্ধ উঠছিল। পচা গন্ধরাজের মতো। ওর ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক-করা। সম্ভবত ওর নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছিল। ওর অন্তরটা ছটফট করছিল কিনা কে জানে। হাতের ঘড়িটা আর খোলেনি পরমেশ। পাছে সময় ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়।

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল পরমেশ। হাত ঘড়ি দেখল। পৌনে চারটে। নাঃ দেরি হয়নি। নিদ্রার ভেতরেও সে সতর্ক ছিল। চোখ খুলে কিছুক্ষণ শয্যা আঁকড়ে রইল পরমেশ। হাতে আধঘন্টা সময় নিয়ে বেরুলেই চলবে। তাড়াতাড়ি নয়, আবার দেরিও নয়। বেশি গরজ দেখাবার কিছু নেই। যেন কিছু একটা বিষয় নয় এমন ভাবে তার ইন্দ্রিয়গুলোকে শ্লথ করে রাখল পরমেশ। উত্তেজনাকে লালন করতে অধৈর্য হয়ে উঠতে হবে। না এখন উত্তেজনার সময় নেই।

কী যেন কথাটা? দরকার ছিল। দরকার! যেন অর্থ না-বুঝে একটা শক্ত প্রশ্ন করে ফেলেছে এমন বিহ্বলতা বোধ করল পরমেশ। দরকার আছে! গলার ভেতর শুকিয়ে এল পরমেশের। এমনভাবে প্রশ্নটা রাখা উচিত ছিল না। বাস্তবে সত্যিই তো দরকার বলে কিছু মনে করতে পারছে না। নতুন করে আবার আরম্ভ করতে হবে। যৌবন থেকে পুনরায় হামা-গুড়ি-দেয়া শৈশবে? ইচ্ছে করলেই কী শৈশবে প্রত্যাবর্তন করা যায়! নাহ্, পরমেশ নিজেকেই ধমকাল : যথেষ্ট বয়স্ক হয়েছে সে। বয়স্কতা মানেই আত্মমর্যাদা-বোধ, আত্মগৌরববোধ। পরমেশের চোয়াল দুটো কঠিন হয়ে উঠল। আবার হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় গড়িয়ে রইল সে।

তারচেয়ে অন্য কোথাও চলে গেলে কী হয়? হরিণঘাটায় বোনের বাড়ি। অনেকদিন সুকুমারীকে দেখেনি। গতবার ভাইফোঁটায় যেতে পারেনি। এখুনি জামাকাপড় পরে বেরিয়ে গেলে কাছাকাছি সময়ের কোনো ট্রেন ধরতে পারবে নিশ্চিত।

সাড়ে চারটে।

পরমেশ জামাকাপড় পরে প্রস্তুত হয়ে নিল। চিরুনিতে চুল আঁচড়াল। দিবানিদ্রায় শরীর ভারি ঠেকছে। মনটাও বোকা-বোকা লাগছে। টেবিল থেকে মানিব্যাগটা পকেটস্থ করল।

দরজা বন্ধ করে ভারি পায়ে নেমে এল পরমেশ। সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরির লাল দেয়ালে বিকেলের ক্লান্ত রোদ। একটা ট্রাম আসছে। শেয়ালদায় বদল করতে হবে। পরমেশ ট্রামে উঠে পড়ল। এই সময়েও ভিড় কম নয়। আশ্চর্য, এই ভিড়ের মধ্যেও নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারছে না কেন পরমেশ। সে যেন আলগা হয়ে ওপর-ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। পরমেশ কী আবার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে। একটা বিরক্তিকর হস্তক্ষেপ তাকে যেন রজ্জুবন্ধ করে রেখেছে। বিরক্তি, বেদনা, ক্লান্তি, এবং এবং একটা আকণ্ঠ ঘৃণা তাকে নিয়ত আবর্তিত করছে।

না না না। মূক কন্ঠস্বর জান্তব গোঙানির মতো শোনাল। ট্রামটা বালিগঞ্জ ফাঁড়ি অতিক্রম করে ঋজু নিয়তির মতো ধাবমান। মাথার ওপরে ফ্যানটা কী বন্ধ হয়ে গেছে! দম বন্ধ লাগছে কেন পরমেশের।

পিছনে কারা কথা বলছে। কী ভাষায় কথা বলছে ওরা। পরমেশ কিছুই বুঝতে পারছে না।

ট্রামটা হোঁচট খেয়ে থেমে গেল।

গড়িয়াহাট।

পরমেশ উঠতে গিয়ে পারল না। জানালার বাইরে ডান দিকের ফুটপাথে অসহায় চোখ মেলে ধরল। রজনীগন্ধার পেছনে কে দাঁড়িয়ে। পরিচিত শাড়ি। অনিলা। হ্যাঁ অনিলাই। হাতঘড়ি দেখছে। রাস্তার এদিক ওদিক দেখছে। পাঁচটা পনেরো। এবার পরমেশকে নামতে হয়। অনিলা অপেক্ষা করছে। আবার অপেক্ষমান অনিলার দীর্ঘ দেহের দিকে তাকাল। অনিলা কী ভ্রূ তুলল, ওর গৌর মুখে উদ্বেগ, বিরক্তি, না কিসের ভাঁজ?

ট্রামটা তখন বাঁক ঘুরে স্টেশনের দিকে ছুটেছে।

ট্রামে বসে দরদর করে ঘামতে লাগল পরমেশ। কে জানে অনিলার চোখে সে ধরা পড়ে গেছে কিনা।

চলন্ত ট্রাম থেকে শেষবারের মতো নামবার চেষ্টা করে অক্ষম মানুষের মতো ব্যর্থ, পংগু সীটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে রইল পরমেশ।।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মৌখিক ভাষার শব্দসম্ভার

বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক পর্যায়ে লোকসাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণায় অধিকতর আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন গবেষক অসাধারণ নিষ্ঠায় বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের লোকসংস্কৃতির বিবরণ সংগ্রহ করছেন। এই কাজে ব্রতী হতে আমাদের অনেক দেরী হয়ে গেছে। বিগত শতকের শেষ দিকে এই বিষয়ে আমরা সচেতন হয়েছি। রমেশচন্দ্র দত্ত, রামগতি ন্যায়রত্ন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি সাহিত্য-সাধক বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। ১৮৯২ খৃস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের ধারাবাহিক গবেষণার কাজ শুরু হোল। চট্টগ্রামের আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, ঢাকার সতীশচন্দ্র রায়, বাঁকুড়ার যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ প্রভৃতি গবেষকের অক্লান্ত সাধনায় অনেক হারান সম্পদ সংগৃহীত হল এবং বাঙালী শিক্ষিত সমাজের লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য বিষয়ে অনুরাগ বৃদ্ধি পেল।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের সকল বিভাগের পক্ষেই পরম কল্যাণকর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতির উৎসাহ এবং উদ্যম বাঙালীকে এক রত্নখনির সন্ধান দিয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রায় প্রথম দিক থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন লেখকদের নানাবিধ গবেষণাপূর্ণ রচনার মাধ্যমে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের শব্দ সংগ্রহের পরিচয় প্রকাশিত হত। ১৩০৮ সনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শব্দসংগ্রহ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব', 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' এই ১৩০৮ সনেই সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

মৌখিক ভাষার শব্দগুলি এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মুখের ভাষার শব্দসংগ্রহ সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ শব্দকোষ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন থেকেই অনুভূত হয়েছিল কিন্তু এই জাতীয় কাজে কোন গবেষক অগ্রণী হয়ে আসেন নি। লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির প্রবীন গবেষক শ্রীকামিনীকুমার রায় সুদীর্ঘকাল অসামান্য নিষ্ঠায় এই কাজে ব্রতী আছেন। ১৩৩৯ সনে তাঁর শব্দসংগ্রহ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই চল্লিশ বছরকাল ধরে তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ লোকের মৌখিক ভাষার শব্দ সংগ্রহ করেছেন।

শ্রীকামিনীকুমার রায় সম্প্রতি 'লৌকিক শব্দকোষ' নামক গ্রন্থের দুটি খণ্ড সম্পূর্ণ করেছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন—

'১৮৯৫ সালের জুন মাসের 'দাসী' পত্রিকায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'প্রাদেশিক কথিত বাংলা' প্রবন্ধে সাধারণের কথিত ভাষার কতকগুলি শব্দ বৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনা করেন এবং কত যুগ আগেই তিনি একখানি গ্রাম্য শব্দকোষ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।'

অর্থাৎ আজ থেকে ৭৬ বছর পূর্বে যা ছিল স্বপ্ন তা সত্যে পরিণত করলেন শ্রীকামিনীকুমার রায়। এই ধরনের কাজ করা অধ্যবসায় এবং প্রচুর পরিশ্রমসাপেক্ষ। শুধু তাই নয় সদ্‌গ্রন্থের প্রকাশনায় উৎসাহী প্রকাশকেরও বাংলা দেশে যথেষ্ট অভাব, তাই শ্রীকামিনীকুমার রায়ের সকল ক্লেশ ও পরিশ্রম সার্থক করে এই গ্রন্থটি যে সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত হয়েছে এ অতি-আনন্দ সংবাদ। বাংলা সাহিত্যের হাটে এই সংবাদ সগর্বে ঘোষণা করার মত সংবাদ। এই জাতীয় পূর্ণাঙ্গ লৌকিক শব্দকোষ প্রকাশনায় সরকারী সাহায্যেরও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা সম্ভব না হলেও শ্রীকামিনীকুমার রায় একক চেষ্টায় যে এই দুরূহ কর্ম সম্পাদনে সফল হয়েছেন তার জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য।

শ্রীকামিনীকুমার রায় প্রথম খণ্ডে প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি মূল্যবান ভূমিকায় সংগ্রহ বৃত্তান্ত, শব্দ নির্বাচন, শব্দ বিন্যাস প্রণালী, শব্দের প্রচলন-স্থান ও বিষয় বিভাগ, শব্দ বৈচিত্র্য, আক্ষরিক অর্থের লোপ প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে বাঙালী জীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত আম, কলা, মাছ, পান তামাক, হুঁকা, গায়ে-হলুদ, সিঁদুর-দান, কন্যাদায় প্রভৃতি বিষয়ে সকল সম্ভাব্য তথ্যাদি পরিবেশন করেছেন।

এই সংগ্রহ কর্মে আসাম, গোয়ালপাড়া, পাবনা, পুরুলিয়া, বরিশাল, তরাই অঞ্চল, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা বা দক্ষিণবঙ্গ, ময়মনসিংহ, মুর্শিদাবাদ, রাঢ় অঞ্চল, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, রাজসাহী, রংপুর প্রভৃতি বাংলাদেশের বৃহত্তর অঞ্চলের প্রায় সবগুলিই গ্রহণ করেছেন। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মৌখিক বা লৌকিক ব্যবহারের ভাষার বিরাট সমুদ্র এভাবে মন্থন করে এমন মূল্যবান রত্নরাজি আহরণ করা যে সহজকর্ম নয় সেকথা বলাবাহুল্য।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'বাংলাভাষাকে তাহার সকল প্রকার মূর্তিতেই আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি, এই জন্য তাহার সহিত তন্ন-তন্ন করিয়া পরিচয়সাধনে আমি ক্লান্তিবোধ করি না।'

সেই তন্ন-তন্ন পরিচয়সাধনে ব্রতী হয়েছেন 'লৌকিক শব্দকোষে'র রচয়িতা শ্রীকামিনীকুমার রায়। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে শব্দ সংগ্রহের কাজে হাত দিয়েছিলেন আজ পরিণত বয়সে পৌঁছে 'লৌকিক শব্দকোষ' সম্পূর্ণ করলেন। তাঁর এই কাজ বাংলা কোষ-গ্রন্থের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অবদান। আচার্য হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন সমগ্র জীবন ধরে পরিশ্রম করে অভিধান সংকলন করেছেন, এই শব্দকোষ প্রণেতা শ্রীকামিনীকুমার রায়ও তেমনই সারা জীবন ধরে কাজ করে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, তিনি অখণ্ডভাবে শুধু এই কাজ করতে পারেন নি, জীবিকা আহরণের জন্য তাঁকে অন্য প্রকার কাজও করতে হয়েছে দীর্ঘকাল। এই কারণে তাঁর নিষ্ঠা এবং সাধনার প্রশংসা না করে পারা যায় না।

এই শব্দকোষের প্রথম খণ্ডটিতে তিনি শব্দগুলিকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন, যথা, ঘর-বাড়ী, গৃহসামগ্রী, চাষ-আবাদ, উদ্ভিদ, জীব-জন্তু আচার-অনুষ্ঠান ও নামাবলী। নামাবলী অংশটির দুটি ভাগ, সম্বন্ধসূচক ও ব্যক্তিবাচক।

যেভাবে তিনি শব্দ সংগ্রহ করেছেন এবং তার অর্থ এবং সেই সম্বন্ধীয় নানা তথ্যাবলী পরিবেশন করেছেন তার দৃষ্টান্ত হিসাবে 'আচার-অনুষ্ঠান' নামক পরিচ্ছেদের সূচী উদ্ধৃত করছি—

'আচার-অনুষ্ঠান (১) বিবাহে লোকাচার : বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহে যে সকল লোকাচার তথা স্ত্রী-আচার পালিত হয়, তাহার বিবরণ এবং তুলনামূলক আলোচনা। নানা যুগে [illegible] ও [illegible]'

(২) বিবিধ ব্রতাচার ও লোকবিশ্বাস—সাধারণ মানুষের কতকগুলি ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা ঃ বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানসম্পৃক্ত কতকগুলি শব্দের বিবৃতি।'

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে নটি অধ্যায় আছে। এই অধ্যায়গুলি মনুষ্যদেহ, খাদ্য-পানীয়, বসন-ভূষণ, ব্যবসা ও পেশা, যান-বাহন, বিশেষক পদ, নৈসর্গিক, বিবিধ শব্দ, দেব-দেবীর নাম প্রভৃতি বিষয়ক শব্দসম্ভার পাওয়া যাবে।

দেব-দেবীর নাম সংক্রান্ত অধ্যায়ে বাংলাদেশের শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরার দেব-দেবীর বিশেষ করে লৌকিক দেবতার ও পীর-ফকিরের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়; তাঁদের পুজো-হাজোতের বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট লোকাচার ও লোকশ্রুতি প্রভৃতি বিশদভাবে দেওয়া হয়েছে।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন—

'সারা বাংলার জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে, চিন্তা প্রণালীতে, রহন-সহনে যে সাম্য আছে, তাহা একই শব্দের বিভিন্ন বিচিত্র রূপের মধ্যেও প্রকাশ পাইয়াছে। বইখানি সহৃদয় পাঠকের নিকট উপাদেয় এবং উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য। ইহার বৈজ্ঞানিক মূল্যও আছেই। সাংস্কৃতিক দিকও ইহার আর একটি গুণ।'

আমরা এই মন্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। শুধুমাত্র শব্দ এবং তার অর্থটুকু দিয়েই গ্রন্থকার ক্ষান্ত হন নি তিনি সেই সব শব্দের সঙ্গে তার পরিবেশ, সমাজ সংশ্লিষ্ট আচার--অনুষ্ঠান, লোক-বিশ্বাস প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণও দিয়েছেন ফলে একত্রে বাংলা লোকসংস্কৃতির অজস্র পরিচয় হাতের মুঠোয় এসে গেছে। গ্রন্থকারের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের এই পরিচয় পেয়ে আমরা আনন্দিত হয়েছি।

—অভয়ঙ্কর

লৌকিক শব্দকোষ (১ম ও ২য় খণ্ড)—কামিনীকুমার রায়। লোকভারতী। ৫।১ হরিদেবপুর রোড, কলিকাতা—৪১। দাম প্রথম খণ্ড—১২·৫০ পঃ। দ্বিতীয় খণ্ড—পনেরো টাকা।

শিলাইদহ কুঠিবাড়ি ও রবীন্দ্রনাথ—অশোক কুণ্ডু। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পক্ষে সোমেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ঃ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বইটির উৎসর্গপত্র বাংলাদেশের সেই নাম-না-জানা বাঙালী যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে অর্পিত, যাঁরা পাকিস্তানী সৈন্যদের নিষ্ঠুর আক্রমণ থেকে রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত কুঠিবাড়িকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলেন। সাম্প্রতিক এই দুঃখিত ইতিহাসের বেদনাই আমাদের মনকে আরো অনেক বেশী মনোযোগী করে তোলে এই বিশেষ বইটি পড়ে।

শিলাইদহ নামটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। লেখক অত্যন্ত নিষ্ঠার শিলাইদহের কুঠিবাড়ির সূচনাকাল থেকে রবীন্দ্রনাথের সময় পর্যন্ত ঐতিহাসিক সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। কবির জমিদারী কাজ শেখা, জমিদারীর ভারগ্রহণ, কুঠিবাড়ির অবস্থান ও পরিবেশ সকল কথাই উল্লেখিত। শিলাইদহে সংসার পাতার পরিকল্পনা সেই সঙ্গে কবি এবং কবি-পত্নীর মানসিক গঠনের বেদনাদায়ক পার্থক্য লেখক অত্যন্ত অল্প কথায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। শিলাইদহে সন্তানদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে গৃহবিদ্যালয় স্থাপন এবং এই গৃহবিদ্যালয় যে শান্তিনিকেতন শিক্ষায়তনের পূর্বাভাষ বহন করছে সে কথাও আমরা জানতে পারি। রেশম চাষ, কৃষি ব্যবসা ইত্যাদি সকল বিষয়েই কবির উৎসাহ। রবীন্দ্রনাথের সহমর্মী জমিদারী নীতির ছবি লেখক পত্র উদ্ধৃতিসহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর একটি উদ্ধৃতি আমরা স্মরণ করতে পারি 'রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে মহাজনের কবল থেকে প্রজাকে রক্ষা করবার জন্যে আজীবন কি করে এসেছেন তা আমি সম্পূর্ণ জানি, কেননা তাঁর সেরেস্তায় আমিও কিছু দিন আমলার কাজ করেছি।...রবীন্দ্রনাথ কবি হিসাবেও যেমন জমিদার হিসাবেও তেমনি Unique—' (রায়তের কথা—প্রমথ চৌধুরী)

এ ছাড়া শিলাইদহে কবির উপস্থিতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তারিখ এই গ্রন্থে নির্দিষ্ট এবং সেই সঙ্গে শিলাইদহে রচিত কবিতাবলীর প্রথম লাইন ও কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখিত।

কিন্তু আমাদের একটা কথা মনে হয়, লেখক যতটা যত্নসহকারে রবীন্দ্রনাথের কর্ম-জীবনকে লিপিবদ্ধ করেছেন ঠিক সেই মত শিলাইদহের আকাশ মাটি এবং মানুষকে নিয়ে কবির হৃদয় অনুভূতির কথা পরিচ্ছন্নভাবে উল্লেখিত নয়। ছোটগল্পের মানুষ এই শিলাইদহের মাটির থেকে পাওয়া, একান্ত কাঁচা মাটির গন্ধমাখা রক্ত-মাংসের চরিত্র। এ বিষয়ে আলাদাভাবে আলোচনার অবকাশ ছিল। লেখক কেন জানি না ছোটগল্প এই শব্দটি উল্লেখ করেছেন মাত্র কিন্তু এর সম্পূর্ণ আলোচনাকে পাশ কাটিয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে এখানে রচিত কবিতাবলীও ভাব, আবেগ ও অভিজ্ঞতার মিলিত ফসল, এসব বিষয়ও যথেষ্ট আলোচনার দাবী রাখে। বইটির এই ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য আলোচনাগুলির গুরুত্ব স্বীকার্য।

শিশু পালনের দুটি কথা—ডাঃ সরোজিৎ বাগচী। প্রকাশকঃ বীরেন্দ্রকিশোর বাগচী সঞ্জীব ভবন, ডি বি সি রোড জলপাইগুড়ি। ৭৫ পয়সা

সাদা কথায় সহজ ভঙ্গিতে সাধারণ শিক্ষিতা মায়েদের জন্যে এই অবশ্য প্রয়োজনীয় বইটিতে শিশু পালনের নানান

কথা আলোচনা করা হয়েছে। মায়েরা এই বইটি পড়লে উপকৃত হবেন।

মিশরের বন্দী—অতীন মজুমদার। রূপ ও কথাঃ ৬৮বি, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড কলকাতা-১৪। দু টাকা।

কিশোর-কিশোরীদের জন্যে লেখা এই বইটি আধুনিক মিশর নয়—প্রাচীন মিশরের কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে। ইহুদি জাতির এক গোষ্ঠীপতির ছেলে যোসেফ। তাকে ঘিরেই এ কাহিনী জমে উঠেছে।

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ত বিভাগ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৩·৭৫ টাকা।

ছুটিছাটায় বাঙালীবাবুদের 'পশ্চিম' বেড়ানোর একটা রেওয়াজ বহুদিন যাবৎ চলিত আছে। দিল্লী আগ্রা ফতেপুর সিক্রি ঘুরে না এলে অনেকে সমাজে মুখ দেখাতে পারেন না। কিন্তু ঘরের কাছেই যে সব ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক ও শিল্পকস্তুর অপূর্ব নিদর্শন রয়েছে সে সম্বন্ধে অনেকেই উদাসীন থেকে যান। আজকে দেশ বিভাগ হয়ে গেলেও পশ্চিম বাঙলায় প্রাচীন শিল্প ও সভ্যতার নিদর্শন অল্প নেই। সেগুলি সর্বভারতীয় স্থাপত্য নিদর্শনের মত বিপুলায়তন নয় ঠিকই। কিন্তু শিল্পরসের দিক থেকে এবং আঞ্চলিক ইতিহাসের দিক থেকে তাদের গুরুত্ব অনেকখানি। তথাপি তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। তাছাড়া এসব প্রাচীন দ্রষ্টব্যবস্তুর পরিচয় দেবার মত সহজলভ্য গ্রন্থও এতদিন ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত বিভাগ বর্তমানে পশ্চিম বাংলার সবকটি জেলা ও কলকাতার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির সচিত্র বিবরণসহ একটি গ্রন্থাবলী প্রকাশনের পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং এই সিরিজের প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশ করলেন।

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি নিয়ে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল ধরে সরেজমিনে কাজ করেছেন। ইতিপূর্বে প্রকাশিত বাঁকুড়ার মন্দিরের ওপর তাঁর বইটি সকলের সমাদর লাভ করেছে। বর্তমান গ্রন্থের রচনার ভার তাই ন্যায়সঙ্গত কারণেই যোগ্য ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত হয়েছিল।

বইটির ভূমিকায় বাঁকুড়ার জাতিবিন্যাস ও ধর্মীয় বিবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যমূলক বিবরণ দিয়ে পুরাতন মন্দির-গুলির স্থাপত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাক-মুসলিম যুগের উড়িষ্যার শিল্পরীতির প্রভাব ও মুসলিম অধিকার কালে ইসলামী শিল্পরীতির প্রভাব এই দুটি বিষয়ই যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বাঁকুড়ার মন্দির শিল্পরীতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কিছু—কম নব্বইটি স্থানের মন্দিরের বিবরণ ও অবস্থান দেওয়া আছে। কোথা থেকে কিভাবে সেখানে যেতে হয় সেটিও উল্লেখ করতে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ভোলেননি। যদিও তিনি সবিনয়ে স্বীকার করেছেন যে বাঁকুড়ার সমস্ত দর্শনীয় স্থানের বিবরণ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি তবু একশ চৌত্রিশ পৃষ্ঠার এই মুদ্রণপ্রমাদবিবর্জিত বইটিতে সাধারণ ভ্রমণকারীর দেখবার বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে এবং একটু অসাধারণ ভ্রমণকারী বা শিল্প-ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির জন্যে অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

লেখক নিজে একজন উঁচুদরের আলোকচিত্রশিল্পী। তাঁর তোলা চৌষট্টি-খানি ফটোগ্রাফ বইটিকে বিশেষ লোভনীয় করে তুলেছে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

অন্য মনে (ত্রৈমাসিক : তৃতীয় বর্ষ : প্রথম সংখ্যা '৭৮)—সম্পাদক : সুজন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশিসকুমার সান্যাল। ১৭এম ইস্ট রোড, কলকাতা-৩২। এক টাকা।

'অন্য মনে' সাময়িক সাহিত্যের চলতি হাজারো পত্রিকা থেকে একেবারে অন্য ধরনের। সমাজ ও জনজীবনের বিবিধ সমস্যার ওপর দৃষ্টির সূক্ষ্ম বিচারের আলোকপাত সৃষ্টিশীল মনন ও পরিণত বোধের পরিচয় সত্যিই অভিনব এবং অভি-নন্দনীয়। প্রতিটি সংখ্যাই বিশেষ সংখ্যা। এ ধরনের চেষ্টা এর আগে দেখা যায় নি। আলোচ্য সংখ্যায় 'বর্তমান পরিস্থিতি ও জনসংযোগ'-এর নানান দিক নিয়ে আলো-চনা করেছেন নীহার দাশগুপ্ত, গোপাল ভৌমিক, উইলিয়ম লীড-গেট, প্রশান্ত সান্যাল, সনৎ লাহিড়ী, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, অমিতাভ চৌধুরী, অমূল্যধন দাশশর্মা প্রমুখ।

পরিচয় (বাঙলাদেশ সংখ্যা ২)—সম্পাদক : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তরুণ সান্যাল। ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা—৭। দাম এক টাকা।

ঐতিহ্যসমন্বিত 'পরিচয়' পত্রিকার এটি দ্বিতীয় বাঙলাদেশ সংখ্যা। শ্যামল চক্রবর্তীর 'জাতিতত্ত্বের বিচারে বাঙলাদেশের সংগ্রাম' এবং জহির রায়হানের 'পাকিস্তান থেকে বাঙলাদেশ' আলোচনা দুটি সব থেকে মূল্যবান। বাসব সরকার, গৌরী আইয়ুব, হিরণকুমার সান্যাল এবং সুব্রত বড়ুয়ার কয়েকটি আলোচনা আছে। গল্প কবিতা এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, সত্যেন সেন, অসীম রায়, বিতোষ আচার্য, শিবশম্ভু পাল, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, নফর কুণ্ডু, আশিস সান্যাল, রত্নেশ্বর হাজরা, তুলসী মুখোপাধ্যায়, গণেশ বসু, শিশির সামন্ত, অমিয় ধর, রবীন সুর, শুভ বসু, দুলাল ঘোষ।

ঘোড়সওয়ার (বৈশাখ ১৩৭৮)—সম্পাদক : আশিস সান্যাল। ৫৩ বিধানপল্লী। কলকাতা—৩২। দাম : এক টাকা।

তরুণ লেখক সমাজের মুখপত্র ঘোড়-সওয়ারের প্রথম সংখ্যাতেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। এই সংখ্যায় লিখেছেন আশিস সান্যাল, গণেশ বসু, কালীকৃষ্ণ গুহ, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, তুলসী মুখোপাধ্যায়, রথীন্দ্র মজুমদার, চন্দন সেন, শুভ মুখোপাধ্যায়, সুভাষ ঘোষাল, অজয় সেন, সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জিতা দাশ, উদয়ন ভট্টাচার্য, হিমাদ্রিশেখর বসু, অমল ভৌমিক, নিশিনাথ সেন, পঙ্কজ সাহা। নাইজেরিয়া, জাপান এবং অসমীয়া কবিতার অনুবাদ সংখ্যাটির বিশেষ আকর্ষণ।

মুকুর (বাংলাদেশ সংখ্যা)—বাওয়ালী, রথ-তলা, ২৪ পরগণা। এক টাকা।

ষাণ্মাসিক সাহিত্যপত্র। সাতজন সম্পাদক। 'বাংলাদেশ' বিষয় সংখ্যায় লিখেছেন : আবদুল জব্বার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, নীরেন্দ্র-নাথ চক্রবর্তী, শান্তনু দাস, পবিত্র মুখো-পাধ্যায়, সন্ধ্যা কর, এবং আরো অনেকে।

সুরের খেয়া (কবিতা সংকলন) নির্মলেন্দু ঘোষ। প্রকাশক : প্রণবকুমার মুখো-পাধ্যায়। নর্থ স্টেশন রোড, আগড়-পাড়া, ২৪ পরগণা। এক টাকা।

কাকলি (বৈশাখ '৭৮) সম্পাদিকা : পারুল দাশ। অভয়নগর আগরতলা, ত্রিপুরা। প'চাত্তর পয়সা।

ত্রৈমাসিক পত্রিকা। নামেই এর পরিচয়। ছোটদের নিজস্ব লেখা আছে অনেকগুলি আর ছোটদের জন্যে বড়দের লেখাও। প্রশংসনীয় আয়োজন।

প্রাপ্তিস্বীকার

গোলমারী (সুভাষবাদী বাংলা সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : মহিমারঞ্জন শর্মা। ৬৬ এস এন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ১৩। পনেরো পয়সা।

তির্যক (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, '৭৮)—সম্পাদক সেখ সদরউদ্দিন। ১৪বি, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলকাতা-৬। এক টাকা।

বরেন্দ্রভূমি (সংবাদ সাহিত্য সাপ্তাহিক)—সম্পাদক : শৈলজানন্দ রায়। বরেন্দ্রভূমি কার্যালয়, বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর। পনেরো পয়সা।

কাল (ত্রৈমাসিক পত্রিকা)—সম্পাদক : কি[illegible] দেব। খোয়াই, আগরতলা, ত্রিপুরা। 'সোনার বাংলা' বিশেষ সংখ্যা। পঁচি[illegible] পয়সা।

তমিস্রা (জুলাই, ১৯৭১)—সম্পাদক অনুপম মুখোপাধ্যায়। ওলাইচণ্ডীতলা ফার্স্ট বাই লেন, উদয়পুর, নিমতা কলকাতা-৪৯। পঞ্চাশ পয়সা।

সমুদ্র (জুলাই, ১৯৭১)—সম্পাদক : ম[illegible] মুখোপাধ্যায়। চৌপথি, আলিপুর দুয়ার, জলপাইগুড়ি। ৩০ পয়সা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'সার্ভিস ইন এনি ফর্ম ইজ এ সার্ভিচিউড অ্যান্ড কেনট বি এনিবডিজ এম্বিশান' লিখেছিলেন ঈশান চৌধুরী বেনারসের কুইন্স কলেজের ছাত্র কনিষ্ঠপুত্র বাইশ বছরের ভবনাথকে। কলকাতার ঘোড়ার ট্রাম থেকে পা হড়কে পড়ে যাওয়ায় কপাল সামান্য ছড়ে যায় ভবনাথের, পার্সিভেল সাহেবের ছাত্র ভবনাথের যেতে হয় বেনারস যেখানে কাকা ডাক্তার অঘোর চৌধুরীর দু টাকা ভিজিটে একচ্ছত্র পসার। এই দু ভাইয়েরই খ্যাতি প্রধানত তাঁদের জেদ ও সততার দরুন। একবার গঙ্গার ওপারে রামনগরের রাজার চোখের চিকিৎসায় ডাক পড়ে অঘোর চৌধুরীর। ওপারে নামতে যাচ্ছেন এমন সময় রাজার পাইক নিষেধ করলে জুতো পরে না নামতে: রাজার রাজত্বে জুতো পরে যাওয়া মানা। তৎক্ষণাৎ নৌকো ফিরিয়ে নিলেন অঘোর। পরে রাজার প্রধান অমাত্য এসে তাঁকে জুতো সমেত নিয়ে ওপারে যায় কারণ 'এ কানুন ডাক্তার অঘোর চৌধুরীকে লিয়ে নেহি।'

দু-ভাই ইংরেজের চাকরীকে গোলামী বলতেন। তাঁরা যে স্বদেশী আন্দোলনে খুব ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন এমন নয়।

দু'ভাইয়েরই কাছে স্বাদেশিকতার একটা খুব ধরা-যায়-ছোঁয়া-যায় এমন ধরনের চেহারা ছিল। সেই উদ্দীপ্ত শীর্ণ তাপসী অবনী ঠাকুরের 'ভারতমাতা', তাঁদের স্বদেশের চিত্রকল্প মোটেই ছিল না। এটা প্রবল আঞ্চলিক স্বাদেশিকতা—পাবনার দুধ আর ইলিশ মাছ, সিরাজগঞ্জের রুই, গ্রামের গাঁট-ছড়ায় বাঁধা উঠতি শহুরে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মাঠের মাঝখানে বাড়ি, ঘরজামাই ভাগ্নে ভাইপো ভাইঝি, অর্ধ ডজন বিধবা পিসী মাসী মিলিয়ে ঝগড়াঝাঁটি নির্ভরতায় ভরা জমজমাট একান্নবর্তী পরিবার এই ছিল ঈশান চৌধুরীর দেশের ছবি। এরই মাঝখানে উত্তর বাংলার জেলায় জেলায় সফর—পাল্কীতে ট্রেনে বোটে। এইসব নিরন্তর ভ্রমণে আদালতে আদালতে হাকিমদের জ্ঞানদান, তারপর উদাস বিকেল হাতপাখার নীচে ইলেকট্রিক আলোবিহীন নিচ্ছিদ্র কালো রাত—এই দেশ। অঘোর চৌধুরীর কাশী এমন ভাল লেগেছিল, এমন রক্তমাংসের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল উত্তর ভারতের অসহ্য ফোস্কা-পড়া গরম আর হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা যে বিশাল জমিজমা কিনে গঙ্গার ওপর মস্ত বড় বাড়ি হাঁকালেন। চোখের চিকিৎসাও করতেন, সে ব্যাপারে আরও জ্ঞানলাভের জন্যে বিদেশে যাবার বাসনাও হয়েছিল কিন্তু যাননি। তার কারণ সেখানে গা খুলে সরষের তেল ডলা যায় না। কলকাতায় আসার জন্যে কখনও বিশেষ মন কেমন করে নি তাঁদের। কারণ দেশটা তাঁদের কাছে কোন পতাকায় আঁকা ছিল না, দেশটা সারা দেশেই ছড়িয়ে ছিল। সেখানকার আচার-বিচার বসনভূষণে, সেখানকার খাদ্যে, সেখানকার জলে রোদে।

অবশ্য ঈশান চৌধুরীর কথা দাঁড়ায়নি। স্বর্ণসুন্দরীর বাবা বিহারের কালেকটার অক্ষয়চন্দ্র বসু তাঁর জামাইকে টেনে নেন ইংরেজের গোলামীতে। তাঁর মুরুব্বী ডিইক সাহেবকে বলে কয়ে ব্যাপারটা ম্যানেজ করেন, প্রথমদিকে আপত্তি থাকলেও দেশ-কালের অবস্থা চিন্তা করে সেই কথাবার্তায় অত্যন্ত কুশলী জবরদস্ত অফিসার অক্ষয় বসুর কন্যাকেই পুত্রবধূ করতে মনস্থ করলেন শেষপর্যন্ত।

মুঙ্গের থেকে অক্ষয় বসু পাবনায় এলে পূর্বদিকে লাইব্রেরী ঘরের পাশে সব-চেয়ে বড় দুখানা ঘর ছেড়ে দেওয়া হোল। ঈশান চৌধুরীর মেজাজের খ্যাতি অক্ষয় বসুর কানেও পৌঁছেছিল। কোন কথাটা কার ভাল লাগতে পারে এবং সে কথাটা চেষ্টা না করে কত স্বাভাবিক ভাবে বলা যায় এ ব্যাপারে তারিফ করার মতো ক্ষমতা তাঁর। স্বর্ণ বাপের সম্পর্কে ঠিকই বলেছিলেন! তিনি শুধু কাজই করতেন না, সব ব্যাপারে তাঁর চোখকান ছিল আশ্চর্যরকম সজাগ। অক্ষয় বসু এসে কেবল তাঁদের পারিবারিক কাহিনী বললেন। তিনদিন পর ভাইকে ইংরাজীতে চিঠি লিখলেন ঈশান চৌধুরী। এসেনশিয়ালস অঘোর, এসেনশিয়ালস। আর কিছু মানুষের দরকার নেই সে উকিল হতে পারে, ডাক্তার হতে পারে, ইংরেজ সরকারের গোলাম হতে পারে, কিন্তু তার যদি এসেনশিয়ালস ভাল হয় তাহলে আরগুলো সব ছোটকথা। অক্ষয় বসুর কন্যাকেই পুত্রবধূ করব সিদ্ধান্ত করেছি। নদীয়ার দুলভপুর গ্রামের ইস্কুল মাষ্টারের ছেলে অক্ষয়। জন্মানোর পরই পিতৃহীন। মা অসুস্থ হলে হাত পুড়িয়ে রেঁধে মাকে খাইয়েছে। আগাগোড়া জলপানি পেয়ে উঠেছে। এ সেলফমেড ম্যান।

কন্যার রাশিচক্রে খাঁচ ছিল কিন্তু ঠাকুর-মশাই বললেন সেটা বয়সকালে কেটে যাবে। বিবাহে আর কোন বাধা ছিল না।

আর ইংরেজের গোলামীতে ঈশান চৌধুরী বাধা দেননি তার কারণ ভবনাথের ক্ষেত্রে তাঁর ক্রমশই এ উপলব্ধি জন্মায় যে বেটা বাপের থোড়া থোড়া পেলেও সেই থোড়া যথেষ্ট নয়, বাপের প্রতিকৃতি যেমন ছেলেতে বর্তায় না তেমনি জাগতিক ব্যাপারে উৎসাহ ও অভিনিবেশে, সাদা ও কালোয় মাখামাখি এ ভুবনে মেজাজের ভারসাম্য অর্জনে বাপ ও ছেলের মেজাজের ফারাক শুধু অনিবার্যই নয় স্বাভাবিক। বরং ভবনাথের সমাহিত পরিচ্ছন্ন মেজাজের সঙ্গে তাঁর বাবা রুদ্রনাথ চৌধুরীর প্রতিকৃতি তিনি খুঁজে পান। রুদ্র চৌধুরী ভজন পূজনে, সাধু সন্তদের মালপয়া ক্ষীর খাইয়ে, গ্রামের বাড়িতে সাবেকী পোড়া ইঁটের তৈরী পুরনো গোপীনাথ মন্দিরের বিশাল চত্বর সম্বলিত নাটমন্দির প্রতিষ্ঠায়, প্রজাদের দারিদ্র্য অভিভূত হয়ে ঘন ঘন খাজনা মকুবে জমিদারী ডকে তুলে বাইশ হাজার টাকা দেনা রেখে যান মৃত্যুর আগে।

এ শতাব্দীর প্রথমদিকে পাবনা শহরের উঠতি মধ্যবিত্তদের মধ্যে জোতদার-অফিসার বা জোতদার-উকিলদের ঘরে ঘরে একটা গল্প চালু ছিল রুদ্র চৌধুরীর মৃত্যু সম্পর্কে। মৃত্যু যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েও তাঁর

রেহাই ছিল না, বারে বারে জ্ঞান ফিরে আসছে, আর বারে বারে ছটফট করছেন। এ দৃশ্যে কাতর হয়ে তৎকালীন হুগলী মহসীন কলেজের ছাত্র জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশান বললেন, 'বাবা তোমার কেন এ কষ্ট? তুমি তো সাধু। তোমারও এমন কষ্ট?' রুদ্রনাথ ছেলের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, 'বাবা আমার ঋণ-কষ্ট। একথা আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। আমি তো নিজেই বুঝিনি ঋণের কি প্লানি, কি প্রবল প্রতাপ। ঋণ কষ্টে আমি মেতে পারছি না।' সঙ্গে সঙ্গে উনিশ বছরের ছেলে তাঁর বাবাকে বলেছিলেন, 'তোমার সমস্ত ঋণের ভার আমি মাথায় নিলাম।' বিশাল দাড়ি আর জটা রেখেছিলেন রুদ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনে। সমস্ত মুখখানা ছেলের দিকে ফিরিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বল্লেন, 'যাঁহা মুস্কিল তাঁহা আসান।' তারপর চোখ বুজলেন।

তারপর প্রবল পরিশ্রমে ধীরে ধীরে বিশাল পসার গড়ে তুললেন ঈশান। শহরের বুকে আট বিঘে জমির ওপর প্রকান্ড গাড়ি-বারান্দাওয়ালা বাড়ি তুললেন। গত শতাব্দীর শেষ পনেরো বছর এবং এ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত ঈশান চৌধুরী ক্ষমতা ও পসারের পাহাড় ঠেলে তুললেন কাঁধ দিয়ে। এরই মধ্যে বড় ছেলে পরেশ ক্রমাগত বাপের টাকা চুরি, মায়ের গয়না বিক্রি এবং প্রচুর সন্তান সন্ততি ছাড়া আর কিছু না করে বাপের ভাবনার কারণ হলেন। দ্বিতীয় পুত্র বিশ্বনাথের ওপর পিতৃস্নেহের কিঞ্চিৎ আধিক্য ছিল কারণ তিনিই বাপের আইন ব্যবসায় এলেন। তবে সিপাই এবং সিপাই-য়ের ঘোড়ার চাল কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা গেল একেবারে আলাদা। বাপের রোয়াব তিনি পুরোপুরি নিলেন। সামান্য কারণেই বাপের মত 'শালা' এবং 'শুয়োর' এ দুটি কথার প্রবল আকর্ষণ বোধ করতেন। কিন্তু ঈশান যেমন লোককে চটাতেন তেমনি লোককে টানতেন প্রবলভাবে। বিশ্বনাথ প্রথমটায় পারতেন। ক্রমে এমন ফৌজদারী ব্যাপার আরম্ভ হল যে শুধু শহরের আইন-জীবিই নন পাড়ার মুদি পর্যন্ত তাঁর সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকতে পারলে বাঁচেন। এরই মাঝখানে মাঝখানে পারিবারিক চেঁচা-মেচি অন্দরমহল থেকে বৈঠকখানা পর্যন্ত ধাওয়া করতে লাগল। গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া হয়ে দাঁড়াল দুই জামাই। নিকষ কৌলীণ্য প্রীতির দরুণ দুটি নিরেট কাঠ কুলীনের হাতে মেয়ে দিয়েছিলেন ঈশান। তাঁরাও বলতে নেই বছরে বছরে সংসার ভরাট করে চললেন আর কিছু না করে। ঈশান চৌধুরী তাঁর কাজের মাঝখানে ডুবে থেকেও টের পেতে লাগলেন তাঁর ভরাপালের সংসার-তরণী মুখ ফিরিয়েছে, শন শন করে ছুটে চলেছে কোন ধ্বংসের আবর্তের দিকে। মাঝে মাঝে সচেষ্ট হয়েছেন তরণীর মুখ ফেরাতে কিন্তু প্রতিকূল হাওয়ার বিরোধিতায় চেষ্টা সফল হয়নি।

অবশ্য পাবনা বাড়ির শেষ অবস্থায় পৌঁছবার অনেক আগেই অক্ষয় বসুর পদার্পণ এ বাড়িতে। তখন জমজমাট সংসার। তুঙ্গীতে ঈশান চৌধুরীর অবস্থান। আগামী বেশ কয়েক বছরের স্খাচ্ছল্য অক্ষয় বসু সহজেই টের পান। আর ঠোঁটের ওপর নবীন গোঁফের বাহার ও বড় বড় চোখের লাজুক দৃষ্টি নিয়ে যখন ভবনাথ বাপের কাছে এসে দাঁড়াল তখন তিনি বিনা দ্বিধায় তাকে অন্য জগতের বাসিন্দে হতে অনুমতি দিলেন। ১৮৮৩ সালের গরমে (হ্যাজাক) পেট্রোম্যাকস কার্বাইড ঝলকানো কৃষ্ণপক্ষের রাতে বধূবরণ হল পাবনা বাড়িতে। পরের বছর কাশী থেকে যে ঘন ঘন ভবনাথের চিঠি আসত ড্যাফোডিল কিংবা লাইলাক ফুল আঁকা ছোট চৌকো পুরু ও মসৃণ বিলিতি কাগজে তার মধ্যে একটা এরকম :

রামাপুরা
বেনারস
৫।৮।৮৪

প্রাণের স্বর্ণ!

তুমি হয়ত আমার আগের চিঠিখানা পাইয়া কষ্ট পাইয়াছ। বোধ হয় রাগ করিয়াছ—মনে ভাবিয়াছ 'আমার চিঠির কি এই উত্তর?'

তোমার চিঠির উত্তর পাও নাই—উত্তর লিখিয়াছিলাম—অনেক যত্ন করিয়া লিখিয়াছিলাম, ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। আবার উত্তর লিখিতে বসিয়াছি—আর তেমন হইবে কি?

চিঠি কেন ছিঁড়িয়াছিলাম, বলিতেছি। কাল রাতে লিখিয়া আজ সকালে পোষ্ট করিব বলিয়া টিকিট আনিতে অন্য ঘরে গিয়েছিলাম ইত্যবসরে কেউ একজন—তাহার নাম করিব না, চিঠিখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়াছে। তাই ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। রাগে আমার চোখের জল পড়িতে লাগিল। তারপর ডাক যায় দেখিয়া দু লাইন লিখিয়া দিলাম—তোমার চিঠির উত্তর দিই নাই। বুঝিতে পারিলে তো?

স্বর্ণ! জীবন ছেড়ে কি কেউ কখনও বাঁচে? আমি আমার পরাণ ছেড়ে কি করে থাকব? তাই প্রাণহীন দেহে একলা ঘরের কোণে বসে ভাবি, আর 'নীরব ক্রন্দন শুধু আমার সম্বল'।

সেই কতদিন আগে—দুদিনের জন্যে এক ফোঁটা দেখা হইয়াছিল। কত পুণ্য ফলে শুধু দুদিনের জন্য মর্তে স্বরগ সুখ অনুভব করিয়াছিলাম। সে মধুর হাসি আর অস্ফুট, অস্পষ্ট, সলজ্জ কথা-গুলি দূরশ্রুত স্বর্গীয় বীণাধ্বনির মত এখনও কর্ণকুহরে বাজে। আবার কদিন পরে শুনিব? থাক আর লিখিব না। যত বেশী লিখিব ততই কষ্ট বেশী হবে। আমারও বুক ফেটে যাবে, তোমারও পড়িতে কষ্ট হইবে।

কেমন আছ আমার জীবন? আর আর সকলে কেমন আছে? আমি আরও ৮।১০ দিন এখানে থাকিব। আসি তবে। আমার বুকভরা ভালবাসা ও শত সহস্র চুম্বন জানিবে। তৃষ্ণার্তের কি মরীচিকা দর্শনে পিপাসা নিবৃত্তি হয়? তবু জলাশয়-ভ্রমে একটু আনন্দ হয় বটে। তেমনি কল্পনার চুম্বনে কি প্রকৃত চুম্বনের মত সুখ হয়, তবু একটু আনন্দ হয়। আমার চিঠির উত্তর খুব শীঘ্র দিতে পারিবে কি? এখানে সকলে ভাল আছে।

তোমারই
হতভাগা
ভবনাথ

ডিভিশনাল কমিশনার জর্জ ফকস এবং ম্যাজিস্ট্রেট আর্থার র‍্যান্ডি যখন পুব দিকের গেটের কাছে রাণাঘাট বাজারের সেরা চাল ব্যবসায়ী বিলাসী প্রসাদের কমলা রংয়ের ফোর্ড গাড়ি থেকে নামলেন তখন বিকেল পড়ন্ত হলেও জ্বলন্ত। গেটের গায়েই কাঁচা আমে ঝুমঝুমে ঝাড়ালো লম্বা গাছটার মাথায় [illegible] ঝকঝকে আলো, সামনের মাঠ থেকে তখনও গরম ভাপ উঠছে।

ঢ্যাঙা হালকা চেহারা ছুঁচলো চিবুক, তীক্ষ্ণ ছোট চোখ, ব্রাউন বাজখাঁই গোঁফ, ট্রিনিটি কলেজের ছাত্র জর্জের মিলিটারী অফিসারের কর্মতৎপর চেহারা। [illegible] রংয়ের স্যুট আর চকোলেট টাই-পরা সাহেবটিকে কিছু দূরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা আধ-ন্যাংটো ছেলেমেয়েগুলোর অপেক্ষাকৃত কম বয়সীই মনে হয়। র‍্যান্ডির গড়ন অনেক সাদামাটা। সাদা স্যুট কালো টাই-পরা তরুণ আই সি এস টি-র প্রায় ভারতীয় চেহারা, ফোলা ফোলা মুখ, [illegible] চোখ বয়সের তুলনায় শরীর কিঞ্চিৎ ভারী।

স্টেশনে বিলাসী প্রসাদের গাড়ি নিয়ে ভবনাথ অপেক্ষা করছিলেন। [illegible] সজোরে ভবনাথের করমর্দন করে কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করে গাড়ির পেছনের সীটে বসেই দুজনে গোটাল আলাপ আবার ছাড়তে থাকেন।

'[illegible] মাস্ট [illegible] ইট [illegible] এক্সেপ্সনালি ফানি। [illegible] ইউ শুড হ্যাভ সিন ইট।' [illegible] ফকাস তার অট্টহাসি মাঝপথে থামিয়েই মুখে রুমাল চাপা দেন। চারদিকে ধুলো উড়ছে।'

'দা মিউনিসিপ্যালিটি ইজন্ট ফাংশানিং ভবনাথ?' র‍্যান্ডি বললেন।

'ইয়েস স্যার, ইট্‌স ইন এন [illegible] স্টেট। অলওয়েজ গ্রাম্বলিং ফর লাক অফ মানি।'

এবার দুধারে মাঠের মধ্যে দিয়ে গাড়ি যায় পাকা রাস্তা ধরে। ধুলোও কম।

'হোয়াট হাউ কড আর সি টেল ইউ? ইউ হ্যাভ সিন হিম আর্থার, হাভন্ট ইউ? ভেরী শর্ট, ভেরী ফ্যাট। ভেরী ডার্ক অ্যান্ড হি সেড—হোয়াই ড ইউ বদার এবাউট রাইস প্রাইস জর্জ? আই নেভার টেক রাইস। ওনলি মাই সার্ভেন্টস [illegible] রাইস।'

আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন ফকাস।

'হোয়াট ইস ডটার্স আর একসিডিং কালচার্ড। দে স্পিক ইংলিশ অ্যাট হোম।

'আই নো, আই নো। আর সি নোজ গ্রীক, দে স্পিক ইংলিশ অ্যাট হোম। আই হ্যাভ প্লেড টেনিস উইথ নলিনী। বাট আই মাস্ট সে, আর সিস রিমার্কস অ্যাট ক্যালকাটা ক্লাব লাস্ট নাইট ওয়াজ একসিডিংলি ফানি।'

'দে আর আওয়ার অ্যাসেটস জর্জ' গম্ভীরভাবে বললেন ব্র্যাণ্ডি। ভারতীয়দের ইংরেজীপনা নিয়ে ঠাট্টা ব্র্যাণ্ডির মনঃপূত নয়। ডিভিশনাল কমিশনার হলেও এবং উড়িষ্যার আদিবাসীদের জীবনযাত্রার যথেষ্ট সমাদৃত একখানা বই লিখলেও ব্র্যাণ্ডির মতে জর্জ ফকাস পুরনো জমানার লোক যে জমানায় সন্ত্রাসবাদীদের বোমা ছিল না, কংগ্রেসের বন্দেমাতরম্ ছিল না।

ইঞ্জিনের শব্দের নীচে ধীরে গলায় বললেন, 'উই আর পাসিং থ্রু ডিফিকাল্ট টাইমস জর্জ।'

জর্জের ফূর্তিতে দ পড়ে। তিনিও আস্তে আস্তে বলেন, 'ইয়েস দ্য টেরারিস্টস দে আর এ নুইসেন্স। তাঁর ফূর্তিতে জ্বলজ্বলে মুখখানাও হঠাৎ গম্ভীর দেখায়।

ব্র্যাণ্ডি গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন মহকুমার অবস্থা কি রকম।

ভবনাথ বললেন গত রবিবার চোদ্দ পনেরো বছরের কয়েকটা ছেলে হঠাৎ আদালতে ঢুকে পড়ে, শার্টের নীচ থেকে ছোট ছোট তেরঙ্গা পতাকাগুলো বার করে বন্দেমাতরম শুরু করে। দু মাস করে জেল ঠুকে দিয়েছেন।

'ইয়েস, ডিল উইথ দেম ফার্মলি', ব্র্যাণ্ডি বললেন।

গাড়ি এস ডি ও বাংলোর কাছে আসবার আগেই আবার ধুলোর রাজত্ব।

ভবনাথ রাস্তার দিকে চেয়ে চেয়ে মিউনিসপ্যালিটির আর্থিক দুর্দশার কথা জানালেন, শহরের মেয়েদের একটা ভাল হাই স্কুল হওয়ার কথাও বললেন।

ব্র্যাণ্ডি কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'বাট দোজ থিংস কেন ওয়েট ভবনাথ। লেট দ্য সিচুয়েশান সেটল দেয়ার ইজ নো হারি।'

ভবনাথ ভুরু কুঁচকালেন। ওপর-ওয়ালার আদেশে অভ্যস্ত হলেও ওপর-ওয়ালার অবজ্ঞা তিনি হাসিমুখে হজম করতে পারেন না। গোমড়া মুখে বসে থাকেন।

ফকাস চেঁচিয়ে উঠলেন, 'লুক অ্যাট দোজ ট্রিজ, আর্থার। দে রিমাইণ্ড মি অফ পপলার্স।' গেটের আগে রাস্তার দুধারে ঝাউয়ের সারি। গেটের পাশেই গাড়ি রাখতে বললেন ফকাস।

সামনেই অপেক্ষমান ভদ্রলোকের সারি, পেছনে একটু দূরে রোদ্দুরে তামাটে খালি গা এক সার ছেলেমেয়ে। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অফ পুলিশ, রাখাল সরকার এগিয়ে এসে সম্বর্ধনা জানান, 'গুড আফটারনুন স্যার।'

পেছনে আর একজন পুলিশ অফিসার, সার্কল অফিসার বেবির বাবা, হেডমাস্টার শ্যামবুবাবু — নলিনী উকিল — পেস্কার সুরেন, ব্যবসায়ী বিলাসীপ্রসাদ। কেউ কেউ করমর্দন করেন, কেউ হাত জোড় করে নমস্কার করেন। বিলাসীপ্রসাদের বাগান থেকে ফার্ণ দিয়ে জোড়া টকটকে লাল গোলাপের দুটো মালা একটা রুপোর থালায় নিয়ে বলাই আর্দালি দাঁড়িয়েছিল। পাশে নীল অর্গাণ্ডির ফ্রক পরা বুড়ী। উত্তেজনায় তার ছোট্ট বুকখানা উঠছে পড়ছে একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। ভবনাথ চারদিকে চেয়ে তাঁর ছোট ছেলেকে খোঁজেন। কিন্তু তার কোন পাত্তা পান না। ফকাশ আর ব্র্যাণ্ডি এগিয়ে আসতেই পেছন থেকে বলাই আস্তে করে ঠেলে দেয় বুড়ীকে। রোদে পুড়ে তামাটে দেখায় বুড়ীর মুখ।

গলায় মালা দিতেই ফকাশ বুড়ীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ। হোয়াটস্ ইওর নেম্ মাই গার্ল।'

'গায়ত্রী চৌধুরী' চেঁচিয়ে ওঠে বুড়ী মরীয়াভাবে। এরপর যদি কিছু জিজ্ঞেস করে বসে সাহেব, কথাটা মুহূর্তের জন্যে মনে খেলে যায় তার।

'ইওর ডটার' ভবনাথের দিকে চেয়ে ফকাস বলেন।

'ইয়েস স্যর।'

সাহেবদের গলাফেরত দুটো মালা বলাই হাতে ঝুলিয়ে পেছন পেছন আসে।

'হোয়াট আর দোজ ট্রিজ? বকুল আই সাপোজ। আই নো কোয়াইট এ লট অফ নেমস্ অফ ইণ্ডিয়ান ট্রিজ।'

'ইয়েস স্যর।'

মাঠের দক্ষিণে পুকুরের পাড়ে অনেক-গুলো বকুল গাছ—টুটুল আর বুড়ীর দ্বিপ্রহর অভিযানের জায়গা। পুকুরের গায়ে সিমেণ্ট বাঁধানো বেদী। এস ডি ও নবীন সেন এখানে পায়চারী করতে ভালবাসতেন। একবার কমবয়সী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও এনেছিলেন এ বাগানে। এখন পোড়ো জংলা জায়গাটা।

বাড়ির সামনের মাঠে ছায়া পড়েছে। সেখানে সাদা ধবধবে ঢাকা টেবিল পাতা হয়েছে জোড় দিয়ে। ফকির উর্দি পরে তদারক করছে।

ব্র্যাণ্ডি বললেন তাঁদের হাতে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় আছে। পরের ট্রেণটাই ধরবেন ফিরতে।

এক ঝাঁক পানকৌড়ি মাথার ওপর দিয়ে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত উড়ে যায়। সেদিকে চেয়ে চেয়ে টেবিলের এক-দিকে বসা জর্জ ফকাসের ফূর্তির মেজাজ আবার ফিরে আসে।

'আই সাম টাইমস ফিল, পিপ্‌ল লাইক আর সি উইল গো অন ফর এভার ইন ইণ্ডিয়া, ইভন হোয়েন উই লীভ সাম্ ডে।'

শেষ কথাটা খুব মৃদু গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন।

'ডোণ্ট সে দ্যাট জর্জ, ডোণ্ট সে দ্যাট। ইফ্ উই লীভ দেয়ার উইল বি কেওস।'

'ডু ইউ থিঙ্ক সো?'

ব্র্যাণ্ডি চাপা অসহিষ্ণুতার বললেন, 'সার্টেনলি। দে উইল বি লিভিং অ্যাজ দে ইউজড টু লিভ আণ্ডার দ্য রাজা অফ্ আউথ। লুট, আর্সন অ্যাণ্ড ভায়লেন্স উইল বি অর্ডার অফ দ্য ডে।'

'টেক সাম্ সন্দেশ স্যর। দে আর ফ্রম ভীম নাগ, ক্যালকাটা।' ভবনাথ সন্দেশের প্লেট সামনে ধরে বললেন।

ফকাস একটা সন্দেশ তুলে নিলেন চামচে করে। ব্র্যাণ্ডি মাথা নাড়ালেন।

এস-পি রাখাল সরকার অনেকক্ষণ উসখুস করছিলেন ইংরেজী বলবার জন্যে। এবার চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'সন্দেশ ইজ গুড ফর হেলথ স্যর।'

ব্র্যাণ্ডি সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে মাথা নাড়িয়ে হেসে অসম্মতি জানালেন।

'দ্য ডকটর প্রেসক্রাইভ সন্দেশ টু মাই সান সাফারিং ফ্রম টাইফয়েড', রাখাল সর-কার আবার বললেন।

'ও রিয়্যালী?' ব্র্যাণ্ডির নীলচে চোখে চাপা বিদ্রূপ।

'হোয়াট এবাউট দ্য ল' অ্যাণ্ড অর্ডার সিচুয়েশন, সারকার?'

'আণ্ডার দ্য প্রেসেণ্ট সারকাম্স্টেনসেস কোয়াইট গুড সার। উই হ্যাভ রাউণ্ডেড আপ দ্য সাসপেক্টস্। দ্য ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস ইজ ডুইং ফাইন।'

'সাম্ ট্রাবল অ্যাট্ স্যান্‌টিপোর?

'ইয়েস স্যর। বাট আণ্ডার দ্য প্রেসেণ্ট সারকামস্টেনসেস্ ইট ইজ অল রাইট।'

হাণ্টলী পামারের বিস্কুট দার্জিলিং চায়ের সঙ্গে খেতে খেতে ফকাস মৃদু গলায় বললেন, 'আই নো হিম ফর দ্য লাস্ট টেন ইয়ার্স। বাট্ ফ্রাংকলি......

ফকাসের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ব্র্যাণ্ডি চাপা গলায় বললেন, 'ফ্র্যাঙ্কলি হি ইজ এ গুড পোলিস অফিসার।' তারপর তেমনি চাপা গলায় বললেন কেমন ভাবে রাখাল সরকার অ্যাসিস্টেণ্ট সাব-ইন্স-পেকটরের পদ থেকে এখন জেলার পুলিস সুপার হয়েছেন।

চায়ের টেবিলে বেশীক্ষণ অফিসের কথা ফকাসের পছন্দ নয়। তিনি জানেন ব্র্যাণ্ডি ইতিমধ্যেই খুব জবরদস্ত অফিসার নামে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর আর বছর তিনেক চাকরী। ডিভিশনাল কমিশনারের পরে কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিং। চীফ সেক্রেটারী বোধহয় হবেন না, তবে নির্ঘাত হোম সেক্রেটারী, তখন ব্র্যাণ্ডির মত দুঁদে জেলা শাসকদের সংস্পর্শ আরও বাড়বে। ফকাসের মনে হল এই যে ইংরেজ সিভি-লিয়ানদের চাকরীর একটা বাঁধা গত্ত তা থেকে চাকরীর প্রথমদিকে উড়িষ্যায় ছত্রিশ-গড়ে আর তার আশেপাশে কয়েক বছরের চাকরীটা ছিল একটু আলাদা। তখন বন্দে-মাতরম আর বোমার হিড়িক এত ছিল না। সেই রোদে ঝোমরানো লাল পাথুরে রাস্তার ধারে ধারে নির্জন ঝিমন্ত ডাকবাংলো,

রাত্তিরে শালবনে জালিকাটা জ্যোৎস্নায় ও'রাও যুবক যুবতীর নাচের তালে তালে বিলাপের সুর। স্কচ হুইস্কি পাশে প্রথম স্ত্রী রোজালিও।

পড়ন্ত রোদে ঘন বকুল বনের দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ ফকাস বলে উঠলেন, 'বাই দ্য ওয়ে, হোয়ারস ইওর ডটার ভবনাথ? শি রিমাইন্ডস সি অফ্ সাম ওয়ান।'

বুড়ী দূরেই দাঁড়িয়েছিল। এতক্ষণে সাহেবদের দেখে দেখে, মাঝে মাঝে তাদের হাসি আর আলাপ শুনে শুনে সে অনেকটা ধাতস্ত। বাপের ডাকে সে এগিয়ে আসে।

'টেক এ বিসকিট,' সাহেব বিস্কুটের প্লেট-টা এগিয়ে দেয়।

'কেন ইউ সিং?'

বুড়ী আন্দাজে মাথা নাড়ায়। 'নো? শিওরলি ইউ নো সাম্।'

বুড়ী বিহ্বলভাবে তাকায়। সাহেবটার বাদামী গোঁফ হাসিতে ভরা ছোট চোখ তার মোটের ওপর অপছন্দ নয়। কিন্তু সাহেব তো একটাও ঠিকমত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে না। নাম জিজ্ঞেস করার পর দ্বিতীয় প্রশ্ন হওয়া উচিত সে কোন ক্লাসে পড়ে। তার উত্তর সে ঠিক বলে দিতে পারে। বুড়ী তাই করল। তার ফ্রকের কোনটা এক হাতে চেপে ধরে স্পষ্ট গলায় বলে উঠল, 'আই রিড ইন ক্লাস টু।'

ফকাস হো হো করে হেসে বললেন, 'ইউ রিড ইন ক্লাস টু? হাউ ওয়ান্ডার-ফুল।'

'ওয়ান্ডারফুলের' মানে বুড়ী জানত। এ হর্ষধ্বনি তার বাবা প্রায়ই উচ্চারণ করেন। সুতরাং তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরটাও ফস্ করে বলে উঠল 'মাই ব্রাদার্স নেম ইজ্ অনিন্দ্য চৌধুরী।'

'ও দিস ইজ গ্রেট!' ফকাস বুড়ীকে কোলে টেনে তার ঝুঁটিক নেড়ে দেন। ভবনাথের দিকে চেয়ে বলেন, হোয়ারস ইওর সান?'

'হি ওয়াজ হিয়ার সাম হোয়্যার, হি ইজ রাদার শাই!'

'পুট হিম্ টু এ গুড স্কুল,' ব্র্যান্ডি বললেন।

'মাই এলডেস্ট সান ইজ ডিফারেন্ট, হি ইজ ভেরী সোশ্যাল,' ভবনাথ বললেন।

'হোয়্যার ইজ হি নাউ?' ফকাশ প্রশ্ন করেন।

'হি ইজ ইন প্রেসিডেন্সী কলেজ। হি ইজ এ ব্রিলিয়্যান্ট স্টুডেন্ট। আই হোপ টু সেন্ড হিম টু ইংল্যান্ড নেকস্‌ট ইয়ার ফর সিভিল সার্ভিস।'

'দ্যাটস্ ফাইন, দ্যাটস্ ফাইন।' ব্র্যান্ডি উৎসাহের সঙ্গে মাথা নাড়লেন। ভারতীয়দের সম্পর্কে ফকাসের উৎসাহ তাঁর না থাকলেও ভারতীয় রাজকর্মচারীদের সম্পর্কে তাঁর আশা প্রবল। রাজকর্মচারীরা এই বোমা আর বন্দেমাতরমের অস্থির জলরাশির মধ্যে এক-একটি সুরক্ষিত পুরিজন্ম দ্বীপ। ভারতবর্ষের আয়তনটা এত বড় যে, এই দ্বীপগুলো বাড়িয়ে বাড়িয়ে একটা গোটা দেশে পরিণত করা যাবে না নিশ্চয় কিন্তু এগুলোর পরিধি বাড়ালে ব্র্যান্ডি মনে করেন ইংরেজ সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা অটুট থাকবে।

'মাই সান ইজ গোইং টু কলেজ নেকস্‌ট ইয়ার। আই শ্যাল অলসো সেন্ড হিম টু ইংল্যান্ড।' এস-পি রাখাল সরকার কাটলেট খেতে খেতে চেঁচিয়ে উঠলেন টেবিলের এক কোণ থেকে।

ব্র্যান্ডি আবার মাথা নাড়িয়ে বললেন, 'দ্যাটস্ ফাইন, দ্যাটস্ ফাইন।'

ফকাস মিটমিট করে হাসেন।

মর্মাহত হল বাবুর্চি ফকির। কাটলেটের প্লেট বারে বারে সাহেবদের সামনে ধরেও কিছু হল না। বারে বারেই তারা ধন্যবাদ জানিয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। সাঁটালেন এস-পি সাহেব, আর হেড-মাস্টার শ্যামবাবু, পেস্কার সুরেন। সেদিকে চেয়ে ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় চোখের ইসারায় ভবনাথ প্লেট সরিয়ে নিতে বললেন ফকিরকে।

বোধহয় তার বড় ছেলের সম্ভাব্য বিলেত যাত্রার জন্যেই ব্র্যান্ডি ভবনাথের প্রতি কিঞ্চিৎ আকর্ষণ বোধ করেন। ভবনাথের টেনিস খেলার খ্যাতি ছিল, নেটে হাতের কাজ ভাল ছিল, একবার বোধহয় ব্র্যান্ডি খুব বিশ্রীভাবে হেরেও ছিলেন। ভবনাথের টেনিস খেলা কেমন চলছে জিজ্ঞেস করলেন। ভবনাথ জানালেন, রাণাঘাট ক্লাবের দুরবস্থার কথা। আর তাছাড়া ভাল পার্টনারের বড় অভাব। যাঁরা খেলেন, তাঁরা এত এলেবেলে যে, তাঁদের সঙ্গে খেলে খেলার মান নেমে যায়!

ফকাস ঘড়ি দেখলেন।। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জায়গায় একঘণ্টা হয়ে গেছে। সমস্ত মাঠটা এখন ছায়ায় ঢাকা, বকুল বন আরও ঘন আরও কালো লাগে। এক ঝাঁক পানকৌড়ি আবার আকাশের এ-মোড় থেকে ও-মোড় পর্যন্ত উড়ে যায়।

ভবনাথ আঁচ করেন, এইটাই মাহেন্দ্রক্ষণ। এই সময়টাকেই ঠিকমত কাজে লাগানোকেই না স্বর্ণ ঝোপ বুঝে কোপ মারা বলে? এই সময়টার যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহারের ওপরেই না মানুষের ব্যক্তিত্ব দাঁড়ায় যেমন তাঁর শ্বশুরমশাই দাঁড়িয়েছেন। আর ভবনাথ টের পান ব্র্যান্ডিও তাঁর নীল চোখদুটো কেমন কোমলভাবে মেলে আছেন, যেন অপেক্ষা করছেন।

'উই মাস্ট রেজ আওয়ার গ্রান্টস টু দ্য মিউনিসিপ্যালিটি। দ্য রোডস আর ইন প্রিটি ব্যাড শেপ।' ভবনাথ হঠাৎ বলে উঠলেন।

ব্র্যান্ডি ভুরু কুঁচকালেন। 'আই টোল্ড ইউ দিজ থিংস ক্যান ওয়েট। ইউ মাস্ট লুক টু দ্য আদার সাইড। দ্য চিটাগাং আরমারী রেড। দ্য নন-কোওপারেশান মুভমেন্ট।'

'আওয়ার ডিস্ট্রিক্ট ইজ কোয়ায়েট, কমপ্যারেটিভলি।'

'আই নো, আই নো। বাট হিউ কান্ট বি টু শিওর। দি টেররিস্টস মে কাম টুমরো হিয়ার।'

ভবনাথ আবার স্বর্ণ-র কথা স্মরণ করে। স্ক্রিনের বাইরে যেমন প্রম্পটার বারে বারে অভিনেতাদের মুখস্থ পার্ট স্মরণ করায়, তেমনি অদৃশ্যভাবে স্ত্রী স্বর্ণ ভবনাথের মুখে কথা জুগিয়ে দেয়। 'আই এম সরি স্যার, আই পোজড্ দ্যাট মিউনিসিপ্যাল প্রবলেম। বাট ইউ মাস্ট রিমেম্বার মাই কেস।'

এমন আচম্বিতে ভবনাথ কথাটা তোলেন যে, ব্র্যান্ডি হতবাক হয়ে পড়েন। বলেন, 'হোয়াট ডু ইউ মিন?'

ভবনাথকে কিঞ্চিৎ বিহ্বল দেখায়। পর্দার অন্তরালে তিনি যেন প্রম্পটার স্ত্রীর দিকে কান পেতে আছেন। কিন্তু সেদিক থেকে কোন শব্দ আসে না। প্রম্পটার ঘুমিয়ে পড়েছে। ভবনাথ নিজের টেনিস খেলা নিয়ে বলতে পারেন এবং বেশ ভালভাবেই বলতে পারেন। কিন্তু নিজের চাকরীর ব্যাপারে ঠিক জোর করে কিছু বলতে পারেন না। অস্পষ্টভাবে প্রায় বালকের মতো অসহিষ্ণুতায় বললেন, 'হোয়েন উইল আই গেট এ ডিস্ট্রিক্ট?'

ব্র্যান্ডি তাঁর নীল চোখে তীক্ষ্ণভাবে চেয়ে থাকেন ভবনাথের দিকে। দুরকম ভারতীয়দের উচ্চপদস্থ ইংরেজদের সচরাচর ভাল লাগে। যেসব ভারতীয় তাদের কথাবার্তায় হাবভাবে ইংরেজ ওপরওয়ালাদের 'ইউ আর মাই ফাদার-মাদার' বলতে পারেন অথবা যারা সমানে সমানে উত্তর দিতে পারেন, দুর্বিনয়ের সামনে দাঁড়াতে পারেন দুর্বিনয়, হাসির সঙ্গে চৌকস করে হেসে পাল্লা দিতে পারেন। এর মাঝামাঝি ভারতীয়রা উদ্ভিদসদৃশ, তাদের সম্পর্কে কোন দায় নেই। ব্র্যান্ডিরও অনুভূতি এব্যাপারে সমান। তাছাড়া এই বালকোচিত প্রশ্নের পেছনে বোধহয় ভবনাথের আন্তরিক তাগিদ নেই, এ-কথাটা ব্র্যান্ডির মনে খেলে যায়; এ-প্রশ্নটা এই টি-পার্টির চা-বিস্কুটেরই অঙ্গ বলে সে ভাবছে। কিন্তু এই প্রশ্নটা পাড়তে অপেক্ষা করতে হয়, ঠিক সময় বুঝে তুলতে হয়। ব্র্যান্ডির মনে মনে একটা গোটা ইংরেজী বাক্য চলিত প্রবাদের স্বতঃসিদ্ধতায় ঝলকে ওঠে—যার ট্যাক্‌ট নেই তার কিছু নেই।

ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, 'ভর্জ, ইটস হাই টাইম উই গো।' তারপর সবাই উঠে পড়লে আস্তে আস্তে বললেন, 'আই রিমেম্বার ইউর কেস, অলরাইট। বাট ইউ উইল, হ্যাভ টু ওয়েট ফর সাম ইয়ার্স। দ্য টাইমস আর সো আনসার্টেন।'

আর লোকে যেমন একটা অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলে আরাম পায় তেমনি আরামের দীর্ঘশ্বাস ফেলেন ভবনাথ

ফকাসের দিকে চেয়ে চেয়ে বলেন, 'হোপ ইউ উইল বি কুলার নাউ।'

'ইট লুক্স সো' ফকাস বললেন সামনের ছায়াভর্তি মাঠের দিকে চেয়ে। এতক্ষণ ঘাম হচ্ছিল, এখন ঝির ঝিরে হাওয়া বইতে থাকে।

'উই হ্যাড এ নাইস টাইম', ফকাস বললেন ভবনাথের দিকে চেয়ে।

অভ্যাগতরা যখন মাঠ পার হচ্ছেন, তখন দেখা গেল চাপরাশী বলাইয়ের হাত ধরে টুটুল আসছে। পরনে ধোপদুরস্ত সাদা হাফ প্যান্ট শার্ট ইতিমধ্যেই সে বেশ ঘামসেছে। নতুন পালিশকরা কালো চকচকে জুতোর মাথা ধুলোর পুরু আবরণ ভেদ করে ঝিকিয়ে উঠছে। রোদ্দুরে মুখ-চোখ লাল।

'তোমায় আজ বাবু বকবেন টুটুল-বাবু', বলাই চাপাগলায় ভর্ৎসনা করল।

টুটুল কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, 'আমি ইংরিজী বলব না, আমি ইংরিজী বলব না।' তারপর বজ্জাতির আলো খেলে তার চোখে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, 'আমাকে নিয়ে যেও না বলে দিচ্ছি। আমি বন্দেমাতরম বলে দেব।'

'তার থেকে তুমি তোমার ঠাকুরমার ঝুলির গল্পটা করে দিও না সাহেবদের। আমাকে যেমন দাঁড়িয়ে শোনাও।'

'আমি বলব না। নীলকমলের ইংরেজী কি? বুড়ীও জানে না।'

অতিথিদের কাছে এলে ইসারায় ভবনাথ ছেলেকে ডাকেন। তারপর ফকাসের দিকে চেয়ে বললেন, 'হিয়ারজ মাই নটি বয়।'

ফকাস হাত বাড়িয়ে টুটুলের হাত ধরেন। তারপর ইংরেজী ছড়ার সুরে বলেন, 'নটি বয়, নটি বয়, হোয়ার হ্যাভ ইউ বিন?'

টুটুল বললে, 'মাই নেম ইজ আনন্দা চৌধুরী।'

বুড়ীর স্বতঃপ্রণোদিত দ্বিতীয় উত্তর ফকাসের মনে পড়ে যায়। বলেন, "হোয়াট ক্লাশ ডু ইউ রীড ইন?

'আই রীড ইন আই রীড ইন, টুটুলের আটকে যায়।

'নেভার মাইন্ড, ইউ আর এ ফাইন ল্যাড।' তারপর মাথা নীচু করে জিজ্ঞেস করেন, 'টুমি কোঠায় ছিলে?'

টুটুলের মুখচোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভাষার যে দুর্লঙ্ঘ্য দেয়ালে সে এতক্ষণ ধাক্কা খাচ্ছিল, আর যে প্রবল অস্বোয়াস্তির ভয়ে এতক্ষণ পালিয়ে বেড়িয়েছে, তা মুহূর্তের মধ্যে কেটে যায়। মাঠের কোণটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, 'ঐ যে বকুলবাগান দেখছো, ঐখানে ছিলাম। ওখানে একটা পুকুর আছে। পুকুরটা একদম শুকনো। খালি কাদা। ওখানে চিংড়ি মাছ পাওয়া যায়'।

ফকাস সব কথাগুলো বুঝতে পারলেন বলে মনে হল না। কিন্তু তার হাতের মধ্যে হাত রাখা কোঁকড়া চুলওয়ালা স্বাস্থ্যবান শিশুটির উৎসাহ তাকে স্পর্শ করে। চিংড়ি মাছটা বুঝতে পেরে বললেন, 'ভালো মাছ?'

'আমি কবিতা বলতে জানি। আমার ঠাকুরমার ঝুলি আছে জানো? দাদাবাবু এসেছিল না? দাদাবাবু দিয়েছে। শুনবে শুনবে?' হাত ছাড়িয়ে টুটুল চেঁচিয়ে আবৃত্তি করে, 'নীল কমলের আগে লাল কমল জাগে, আর জাগে তলোয়ার; দপ্ দপ্ করে ঘিয়ের বাতি জ্বলে, কার এসেছে কাল?'

দুমাস হল বইখানা উপহার পাওয়ার পর এ ছত্র দুটি প্রায়ই সে আবৃত্তি করে। বকুলবাগানে হাতে কঞ্চি নিয়ে, কিংবা সন্ধ্যের পর রান্নাঘরে অন্ধকার উঠোন পার হতে হতে চীৎকার করে সে নিজেরই মনে সাহস সঞ্চার করে। এতক্ষণ বকুলবনের এই কর্মই চলছিল। ফকাস মুগ্ধ দৃষ্টিতে টুটুলের দিকে চেয়ে থাকেন। ভবনাথ হেডমাস্টার শ্যামবাবু, পেস্কার সুরেন অপ্রস্তুতভাবে সাহেবের দিকে তাকায়। বলাই কিন্তু মুগ্ধ। রোজ কাছারী যাবার আগে বাবু যখন খেতে গেছেন সেই অবসরে তাকে ঠাকুমার ঝুলি শোনায় টুটুল। সে মুগ্ধভাবে তার গুরুর দিকে চেয়ে থাকে।
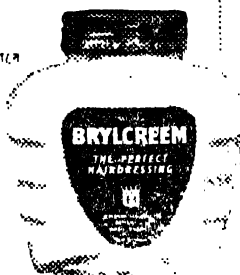
'ইউ আর ভেরী ফ্রেন্ডলি উইথ চিলড্রেন, ইট সিমস,' ব্র্যাণ্ডি বলেন।

ইয়েস, দে আর দ্য সেম্ এভরি হোয়ার।'

(৫)

মাঠভর্তি শিশির ছিল ঘন্টা দুয়েক আগে। এখন নটা বেজেছে। মাঠ এখনও ভিজে, খালি পায়ে ভেজা মাঠ পার হতে হতে বলাই দুবার হাঁচে। ঢাকের বাজনা আসছে চূর্ণী নদীর ধারে গ্রাম থেকে। বলাইয়ের শক্ত লোমশ সবল হাতের ডানা বাজারের থলির ভারে টনটন করে। মুখ উৎফুল্ল। ধুতির ওপরে পরা খাটো কুর্তা ঘামে ভিজে গেলেও হাসিতে উজ্জ্বল।

সামনের বারান্দায় এক কোণে ছায়ায় ঢাকা সিঁড়িতে বসে টুটুল তার ঠাকুরমার ঝুলি পড়ছে। আর দূরে কাঁচা বেল ভর্তি উঁচু গাছটার দিকে চেয়ে চেয়ে বিড় বিড় করে কি বলছে। ভেতরের উঠোনে এসে বলাই হাঁক দেয়, 'মা।'

সচরাচর যা করেন না স্বর্ণসুন্দরী আজ সকালে তাই করেছেন, পাটভাঙা মোটা লালপেড়ে শাড়ি পরেছেন। চুলে আঁচড়ও দিয়েছেন। বড়ছেলে আর মেজোমেয়ের কলকাতা থেকে আসার কথা।

মন্থরগতিতে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে একটা টুলের ওপর বসেন স্বর্ণসুন্দরী। ফর্দ মিলিয়ে মিলিয়ে বলাই জিনিস বার করে। সম্পূর্ণ উদাসীন গলায় স্বর্ণময়ী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি মাছ?'

'সে তোমায় বলতে হবে না মা,' বলাই এক থালুই ভর্তি টকটকে লাল তাজা পাবতা ঢেলে দেয় দাওয়ায়।

'দাম কত?' নিস্পৃহ বিরক্ত গলা স্বর্ণসুন্দরীর।

'ছ আনা।'

'ছ আনা? সে কি রে?'

'কি বলছো মা, দেড়সের মতো মাছ আছে। আর চেহারা দেখেছো?' বলাই কোমল রক্তাভ কটা মাছ চোখের ওপর তুলে নাচায়।

'থাক থাক, খুব করেছো। যত দিন যাচ্ছে তত অগ্নিমূল্যের বাজার। মানুষ খেয়ে পরে থাকবে কি করে?'

'যা বলেছেন মা! দশ আনা বারো আনায় ফুলকাটা শাড়ি কিনেছি, এই দু-তিন বছর আগে। আজ তুমি যে বলেছিলে শাড়ি আনতে, এনেছি দেখো, এমন কিছু আহামরি নয় মা। নিলে কত জানো? চোদ্দ আনা।'

বগল থেকে ফুলপাড় লাল শাড়িখানা বার করে বলাই। শাড়িটার দিকে একবার তীর্যক অপ্রসন্ন দৃষ্টি দিয়েই চোখ ফিরিয়ে নেন স্বর্ণসুন্দরী। তিনিও অবিকল এই শাড়ি ব্যবহার করেন। শাড়ির খোল হাত দিয়ে নেড়ে-চেড়ে বললেন। 'ভালই হয়েছে।' বলাইয়ের নতুন বউয়ের শাড়ির জন্যে যে পয়সা ধর্য করেছিলেন তা থেকে আনাচারেক পয়সা বেশী খরচ করেছে বলাই। চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'গোপীনাথ, মাছগুলো নিয়ে যাও। এখন কুটে ফেল। মুস্তো আসেনি—না? দেরী করবে না একদম। বাবুর আজও অফিস।'

ষষ্ঠীর দিনও ভবনাথকে কোর্টে যেতে হবে। দুই ভাইয়ের জমি নিয়ে বিবাদে খুনের মামলা। আজও সাক্ষী আছে। ভবনাথ তাড়াতাড়ি কেসটা সারতে চান। ওদিকে জমি কেনার পর দক্ষিণ কলকাতায় তাঁদের বাড়ির ভিত খোঁড়া হচ্ছে। তদারক করতে পুজোর মধ্যেই একবার কলকাতা যাবেন। যাবার আগে হাতের কাজগুলো হাল্কা করতে চান।

ফাট ফাট থলি থেকে বলাই বার করতে থাকে এক আনায় একসের বেগুন, দু আনায় একসের আলু, দু পয়সার গোটা মিট কুমড়ো চার আনায় সেরখানেক পাটালি, পাহাড় প্রমাণ শাক, কয়েক পয়সার মশলা লংকা—সর্বসাকুল্যে এক টাকার বাজার। এছাড়া বলাইয়ের নতুন বউয়ের জন্যে স্বর্ণসুন্দরীর উপহার চৌদ্দ আনায় লাল ফুলপাড় মিলের শাড়ি।

'দেখো, বউয়ের পছন্দ হয়।'

'না, মা, বউ আমার খুব পছন্দ,' বলাই নিজের মনেই বলে উঠল, 'আর রং মা ফেটে পড়ছে। ঠিক তোমার মত।'

'মরণ', স্বর্ণসুন্দরী হেসে ফেললেন। তরকারি কুটতে বসে বললেন, 'তোমার বউয়ের রং কেমন জিজ্ঞেস করিনি বলাই। আমি বলছি তোমার বউ-এর এ শাড়ি পছন্দ হবে তো?'

'হবে না? আমার মা যে শাড়ি গায়ে দেয় সে শাড়ি বৌটির পছন্দ হবে না?'

চাপা উল্লাস আত্মপ্রসাদে ডগমগ করে বলাই। ষোল বছরের একহারা ফর্সা বউকে কাল নিয়ে এসেছিল। তার নিজের বয়স তিরিশ-বত্রিশ। খাকি উর্দি পরা বিশাল পাট জোয়ান বলাইয়ের পাশে যখন একহারা ছোটখাটো বউটা এসে দাঁড়াল তখন স্বর্ণসুন্দরীর বিসদৃশ লাগেনি। কারণ, বলাই তার প্রাণোচ্ছলতায় বয়সের পার্থক্য ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। হাওড়ায় হাঁড়িমুখ আধবুড়ো নির্মল আর্দালী যখন বিয়ে করে নতুন একরত্তি বউ নিয়ে এসেছিল তখন স্বর্ণসুন্দরী অপ্রসন্ন না হয়ে পারেননি।

'এবারে পুজো কেমন হচ্ছে?'

'খুব ধুমধাড়াক্কা লেগেছে। পালচৌধুরীদের বাড়ি তিন দিন যাত্রা, কৃষ্ণসুদামা, সিরাজদৌল্লা আর নদের নিমাই। আজ রাত্তিরে সং আসবে শান্তিপুর থেকে। যাবে মা? এই একেবারে জেলখানা পর্যন্ত নিয়ে আসবে। আমি টুটুলবাবুকে নিয়ে যাব।'

'না না ওসব জায়গায় গেলে বাবু রাগ করবে। কিসব বিচ্ছিরি কুচ্ছিরি গান হয়।'

'ওদের ঘাড়ে মাথা আছে? সাহেব কুঠির কাছে মস্করা? তিন মাস জেল ঠুকে দেব না?'

কাছারীতে [illegible] থেকে বলাইয়ের এ ধারণা [illegible] এবং তার সাহেব অভিন্ন, সুতরাং সাহেবের জেল ঠুকে দেওয়া এবং তার জেল ঠুকে দেওয়া একই ব্যাপার। অন্তত এভাবেই সে জ্ঞাতি বন্ধুদের কাছে বলে থাকে। এবং সম্প্রতি রাণাঘাটের পরের স্টেশন পায়রাডাঙায় জ্ঞাতিদের সংগে সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ হয় তারও সাম্প্রতিক নিষ্পত্তির অন্যতম কারণ বলাইয়ের এই রকম হাকিমী উক্তি। সে সাহেবকে বলে কিভাবে আইনের কত ধারায় ক' মাসের জেল ঠুকে দেবে সে আস্ফালন ব্যর্থ হয়নি।

'পুরাণ কাহিনী থাকবে, মহাভারত থাকবে। রাসের মেলার সময় যেমন হয় তেমনি হবে। কতগুলো মূর্তিতে রং চাপানো হয়েছে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেও।'

বলাই স্বর্ণসুন্দরীকে যেমন জমিয়ে নিয়েছে অন্য কোন এস-ডি-ও গিন্নীকে পারেনি। ভবনাথের আগে কালিপদ মুখার্জী সাহেব ছিলেন। তাঁর স্ত্রীকে বলাই বলত মেমসাহেব, মা বলতে পারত না। তার কালো পেড়ে রুচ আঁটা ফরাসডাংগা শাড়ি পরনে বিয়ে পাশ মিসেস মুখার্জী তার রিমলেস চশমার ভেতর থেকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন, তখন হড়বড়ে বলাইয়ের বাকশক্তি লোপ পেত। বর্তমান সাহেব আসার পর থেকেই গত দু বছরে তার ভাগ্য ফিরছে। বহুদিনের জমির বিবাদ নিষ্পত্তি হয়েছে। মুখার্জী সাহেবের আগে সদ্যোবিবাহিত নাগসাহেব এলেন এস-ডি-ও হয়ে তখন তার প্রথম পক্ষের ছেলে কলেরায় মরল, স্ত্রী মরল দু মাসের মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান প্রসবকালে আকাশ ভেংগে পড়েছিল বলাইয়ের মাথায়। গত বছর থেকেই তার স্বাভাবিক ফূর্তি আবার ফিরে এসেছে। এ সাহেব যদি আরও দু-তিন বছর থাকতেন, বলাই আজকাল মাঝে মাঝে কল্পনা করে আনন্দ পায়, তার ভাগ্য তাহলে হয়ত আরও নতুন নতুন দিকে খুলে যেত।

'মায়েদের এখন কলকাতায় বাড়ি হচ্ছে। কলকাতায় গেলে মা তো চিনতেই পারবে না বলাইকে।'

'দূর! গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। জমি কিনতেই এত টাকা পড়ে গেল। কবে বাড়ি হবে!'

'বড়দার বিলেত যাওয়া সব ঠিক?'

'দূর! কোথায়?'

'বড়দার বিয়ে দেবে না? এখনই তো বিয়ের যুগ্যি বয়েস।'

'আর বকিও না বলাই। গোপীনাথ ভেপারে পাবতা মাছ করবে। প্রতাপ ভালবাসে। আর বড়ি দিয়ে ডগা দিয়ে একটা মাখামাখা তরকারী, ট্যালটলে করবে না। বাবু একদম খেতে পারেন না। অড়হর ডালে হিংয়ের ফোড়ন। আর গাছে যদি চালতে থাকে, না থাক। আজ আর হবে না, দেরী হয়ে যাবে।' স্বর্ণসুন্দরী উঠে পড়েন।

(ক্রমশঃ)

উপেক্ষায় পড়ে আছি
—রঘুনাথ সিংহ

কিছুদিন আগে রবীন্দ্র সদনে একটা নাটক দেখে বাড়ী ফিরছিলাম। সাড়ে সাতটা কি আটটা হবে, হৈ হৈ করে কলকাতার রাত তখন উদ্দাম হয়ে উঠছে। রাস্তা জুড়ে ট্যাক্সি আর প্রাইভেট কারের মিছিল। একটা বড় সাহেবী ক্লাবে বোধ হয় সেদিন কোন বড় উৎসব ছিল। মাইকে অ্যানাউনসারের গলা ভেসে আসছে ঃ অমুক নম্বর গাড়ী জল্দি। একদল দিশী বিলিতী সাহেব মেম বেরোচ্ছেন তো আর এক ঝাঁক ঢুকছেন। সন্তর্পণে ঐ গাড়ী আর অজানা মানুষের স্রোত ঠেলে এগুতে এগুতে হঠাৎ চোখে পড়ল উল্টোদিকে নিয়নের আলোয় ক্যালকাটা ইনফরমেশন সেন্টারের একতলার এগজিবিশন হলটা একটা হাসপাতালের করিডোরের মত পড়ে রয়েছে—কি সব ছড়ানো ছিটোনো সারা ঘরে। কৌতূহল হল তাই রাস্তা পেরিয়ে এসে উঁকি দিলাম। ঘরে ঢুকবার মুখে বাঁহাতে টেবিলে মাথা রেখে অল্প বয়সী (কারণ ঘাড়ের চামড়া সতেজ টান টান) দুটি ছেলে ঘুমোচ্ছে দেখে ফিরে আসছিলাম, কানে এল ঃ আসুন। এখানে আমাদের স্কালপচার এগজিবিশন চলছে।

আধঘন্টা ধরে ঘুরে ঘুরে ওঁরা আমায় সেদিন ওঁদের কাজের নমুনা দেখিয়েছিলেন। আর ফেরার সময় বলেছিলেন, এখনো মনে পড়ে, আজ সন্ধ্যায় আপনি একাই শুধু দর্শক।

এই তো অবস্থা। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির পীঠস্থান বলে কলকাতাকে নিয়ে যত গর্বই আমরা করি না কেন, মুষ্টিমেয় একদল রসিক ছাড়া গোটা সমাজটাই এসব ব্যাপারে উদাসীন। একটা ঘুড়ির লড়াই দেখতে রাস্তায় যে ভিড় জমে তার সিকির সিকিও দেখা যায় না ভাস্কর্যের প্রদর্শনীতে। কেন?—এই প্রশ্নই সেদিন করেছিলাম এ যুগের অন্যতম প্রধান ভাস্কর—রঘুনাথ সিংহকে।

মানুষটা, অন্তত বাইরে থেকে দেখে যা মনে হয়, খুব সুস্থির। প্রশ্নটি শুনলেন। মনে মনে ভাবলেন। তারপর ধীরে সুস্থে গুছিয়ে উত্তর দিলেন—শিল্পের সংগে শিক্ষার একটা প্রচন্ড যোগ আছে একথা নিশ্চয়ই মানেন। ইউরোপে দেখেছি কলেকারখানায় খেটে খাওয়া মানুষও ছুটির দিনে স্ত্রী কাচ্চা বাচ্চাকে নিয়ে ছুটছে মিউজিয়ামে বা কোন পরিচিত শিল্পীর স্টুডিওতে। সামর্থ্য নেই যে অরিজিন্যাল কিছু কিনবে, তাতে কি, রেপ্লিকা কিনে এনে ঘরের ও মনের সৌন্দর্য বাড়াচ্ছে। এ কেমন করে সম্ভব হোল? এর কারণ খুঁজতে গেলে একটা উত্তরই পাব বলে আশা করি, তা হল ওদের শিক্ষা ব্যবস্থা। যে ব্যবস্থা মানুষকে প্রয়োজনের দাস করে তোলে না, তার মানবিক বৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তোলে। আর সমস্ত শিল্পেরই তো মূল উদ্দেশ্য মানুষকে সুস্থ, সচেতন ও পুরোপুরি মানবিক করে তোলা। পড়াশোনা মানে তো কতগুলো বই গেলা, তার সংগে জীবনের সম্পর্ক কোথায়? জীবনকে বাদ দিয়ে যে শিক্ষা তা তো কোথাও পৌঁছে দেয় না। তাই দেখুন হাল্কা, মোটা মোটা ব্যাপারে আমরা সবাই খুশী। সূক্ষ্ম কলাশিল্প আমাদের টানে না।

আর টানে না বলেই, আমরা যখন কাগজের পাতায় বিদেশী শিল্পীদের অরিজিন্যালের নীলাম-দাম শুনে চমকে উঠি, মনে মনে শ্রদ্ধা জানাই ওদের শিল্পপ্রীতিকে তখন আমাদের ঘরের যোগীরা শুধু দু মুঠি অন্নের সংস্থানে যেখানে সেখানে যা হোক একটা কাজ জুটিয়ে নিজেদের টিঁকিয়ে রাখবার সংগ্রামে পাগল হয়ে ফেরেন। এই ধরুন না রঘুনাথ বাবুর কথা।

দু-পুরুষ আগে রঘুনাথরা ছিলেন হাওড়া জেলার শালকিয়ার বাসিন্দা। ক্ষেত্রনাথ চ্যাটার্জী লেনে ছিল ওঁদের আদি বাস। ঠাকুর্দা সদানন্দ সিংহ ডকে মাল সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করতেন। অবস্থা ভালই ছিল। কিন্তু শেষ বয়সে ব্যবসা টেঁকাতে না পেরে সদানন্দ উড়িষ্যায় জাজপুরে ছোট ভাই-এর কাছে চলে যান। জাজপুরেই রঘুনাথের জন্ম। বাবা জগন্নাথ সিংহ ছিলেন ওভারসীয়ার। রঘুনাথরা তিন ভাই ও এক বোন। ভাইবোনদের মধ্যে রঘুনাথ মেজ। ছেলেবেলা থেকেই রঘুনাথ পুরীতে মামাবাড়ীতে মানুষ। মামা ছিলেন স্কুল শিক্ষক।

—বাসায় মা-কে দেখেছি কি সুন্দর ছবি আঁকতেন, সেলাইয়ের কাজ করতেন। ঠিক তাঁকে দেখেই কি না মনে নেই আমিও ছেলেবেলা থেকেই কাগজে পেন্সিল বুলিয়ে ছবি আঁকতাম। জাজপুরে বাড়ীর পাশেই ছিল কুমোর পাড়া। কুমোরের চাক বন বন করে ঘুরত, আর দুটো সমান্তরাল হাতের তালে তালে পাক খেয়ে নানা রকম ঘরগেরস্থালীর নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী হয়ে উঠত। দেখতে দেখতে কেমন নেশা ধরে যেত। তখন আমিও কাগজের পাশাপাশি মাটির তালে আঙুল বুলোতে শুরু করি।

পুরীতে যখন স্কুলে ভর্তি হলাম, তখন আর একটি মানুষকে দেখলাম যার এ ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্ট। আমাদের আর্ট টীচার পূর্ণ সিংহ। মাষ্টার মশাই চিরদিন আমায় উৎসাহ দিয়েছেন। বাবা কিন্তু এসব পছন্দ করতেন না। যতদিন ছেলেমানুষী বলে ব্যাপারটা চলেছে, কেউ তেমন বাধা দেন নি, কিন্তু যখনই স্কুলের পড়া ফেলে মাটি ছেনে মূর্তি গড়ায় সকাল দুপুর সন্ধ্যে করে ফেলেছি তখনই উঠেছে যত আপত্তি। বাবা বলতেন, এসব করে কিসু হবে না। মামাও খুব সুনজরে দেখেন নি।

নাইনটিন ফোরটি সেভেনে চোদ্দ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করলাম। স্বাধীনতার বছর। দেশ স্বাধীন হোল। আমিও ঠিক করলাম আমার জীবন আমি স্বাধীনভাবে

গড়ে তুলব। বাড়ীতে সবাই আপত্তি করল। বাবা তো রেগে কাঁই। শুধু মা কিছু বলেন নি। কারণ তার দু বছর আগেই আমি মাকে হারিয়েছি। সবার সব আপত্তি অস্বীকার করে চলে গেলাম কটকে।

বিখ্যাত ওড়িয়া শিল্পী, শ্রীমুরলীধর তালি তখন কটকে 'কলিঙ্গ স্কুল অব আর্ট' গড়ে তুলতে ব্যস্ত। পূর্ণবাবুর সাথে শ্রীতালির খুব জানাশোনা ছিল। সেই সুবাদেই মুরলীধরবাবু আমাকে তাঁর স্কুলে টেনে নিলেন।

স্কুলে তো ভর্তি হলাম, কিন্তু থাকা, খাওয়া, জামা-কাপড়, আঁকার সরঞ্জামের খরচ আসবে কোথা থেকে? বাড়ীর রাস্তা তো বন্ধ। মুরলীধরবাবু স্কুলেরই এক কোণে থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন। আর পেট চালানোর ব্যবস্থা করে দিলেন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট বিভূতিভূষণ কানুনগো। বিভূতিবাবুর ওখানে বইএর মলাট, সাইন-বোর্ড পেন্টিং, ইনটিরিয়র ডেকরেশনের কাজ করে মাস গেলে ষাট পঁয়ষট্টি টাকা আয় হোত। তাতেই আমার চলে যেত।

কিন্তু মন ভরল না। মুরলীধর বাবুর ইচ্ছে ছিল আমি হই পেন্টার। অথচ আমার বাসনা স্কালপটর হওয়ার। এদিকে কলিঙ্গ স্কুলের তখন টালমাটাল অবস্থা! সব দিক বিবেচনা করে দু বছর বাদে দুম করে একদিন কটকের পাট চুকিয়ে চলে এলাম কলকাতায়। আমারই পরিচিত জনৈক ব্যবসায়ীর কলকাতায় বৌবাজারে একটা আস্তানা ছিল। প্রথমে এসে উঠলাম ওখানেই। ভর্তি হলাম ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে।

ছ মাস বাদে অ্যাডমিশন টেস্ট উৎরে ভর্তি হলাম চৌরঙ্গীর গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজে। কলেজেরই এক বন্ধু কার্তিক পাইন আমার থাকা খাওয়ার অসুবিধে দেখে নিজেই আমাকে ডেকে নিয়ে গেল ওদের বাড়ীতে, গ্রে স্ট্রীটে। পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন, পাঁচ বছর কার্তিকদের বাড়ীতে থেকেই কলেজের পড়াশোনা চালিয়েছি।

বাড়ী বিমুখ। ফলে কলেজের মাইনে ও অন্যান্য খরচ অনেক কষ্টে তুলতে হোত। গ্রে স্ট্রীটে কার্তিকদের বাড়ীর কাছেই ছিল এক সাইন বোর্ড পেন্টারের দোকান। চিরকালই আমি আর্লি-রাইজার। ভোরে ঘুম থেকে উঠে লেগে পড়তাম কাজে। কলেজে যাওয়ার আগে ঘন্টা দু-তিনেক যা সময় পেতাম তাতে সাইন বোর্ড পেন্টিং ছাড়াও, বিভিন্ন কনজিউমার গুডসের শো-কেস, বুক কভার ইত্যাদি করে দুটো পয়সা রোজগার করতাম। আর ফার্স্ট ইয়ার থেকে কখনো কলেজের মাইনে লাগে নি। স্কলার-সিপ পেয়েছি—নইলে আর উপায় কি ছিল বলুন?

ঝকঝকে হাসিতে সারাটা মুখ ভরে উঠল। ও-মুখে কারুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের ছাপ নেই। এ যেন একটা খেলা। যোগদানের আনন্দেই শিল্পী বিভোর। একটু থেমেছিলেন রঘুনাথবাবু, আমি আবার উস্কে দিলাম, তারপর?

তারপর এইভাবে কেটে গেল পাঁচ পাঁচটা বছর। পঞ্চান্ন সালে পাশ করে বেরোলাম। হাতে কোন কাজ নেই। কি করি? শুরু করলাম ফ্রি-ল্যানসিং, যা ছেলেবেলা থেকেই করে আসছি। বিভিন্ন কমার্শিয়াল ফার্মের ইনটিরিয়র ডেকরেশন থেকে শুরু করে অর্ডারী মূর্তি গড়ার কাজ—সব করেছি।

কাজের সুবিধা হবে বলে পাইনদের সুখচরের (সোদপুর) ঠাকুরবাড়ীতে তখন থাকতাম। কোম্পানীর কাজ করতে করতে ঝড়তি পড়তি যা মালমশলা পেতাম তাই দিয়েই চালাতাম নিজের স্বপ্নগড়ার কাজ। প্লাসটার, রি-ইনফোর্সড কনক্রিট, সিমেন্ট যখন যা পেয়েছি তাই দিয়েই কাজ করেছি, থেমে থাকি নি কখনো। এরই মধ্যে আটান্ন সালে ভারত সরকারের একটা স্কলারসিপ পেয়ে চলে গেলাম বরোদায়।

মহারাজা সয়াজীরাও গাইকোয়াড় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিখ্যাত শিল্পী শ্রীশঙ্কর চৌধুরীর কাছে শুরু করলাম কাজ। দু বছর ছিলাম বরোদায়। বরোদার স্মৃতি কিছুতেই মোছে না—এমন সুন্দর পরিবেশ, গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন একটা কাজের গন্ধ ম ম করত।

দেখতে দেখতে কেটে গেল দুটি বছর। বরোদার পড়াশোনা শেষ হতে, আর কলকাতায় ফিরলাম না, স্ট্রেট চলে গেলাম দিল্লী। তিন বছর ফ্রি-ল্যান্সার হিসাবে কাজ করেছি ওখানে। তেষট্টিতে ইতালী সরকারের একটা স্কলারসিপ পেলাম। এক বছরের। আবার আমার আস্তানা পাল্টাল।

এবার আর দেশে নয়, বিদেশে। নেপলসে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসে শুরু হোল আমার জীবনের আর এক অধ্যায়। এমিলিও গ্রেকো ছিলেন আমার মাস্টার মশাই। এ এক অদ্ভুত লোক। জগৎ জোড়া নাম। অথচ কোনদিন কারুর ওপর নিজের ইচ্ছের বোঝা চাপিয়ে দিতেন না। বরং উৎসাহ দিতেন যার যেমন ক্ষমতা সেইটুকু যাতে নিজের মত করে ডেভলপ করতে পারে। ঠিক এই জায়গাতেই দেখেছি আমার গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজের মাস্টার মশাই প্রদোষবাবুর সঙ্গে ওঁর আশ্চর্য মিল। প্রদোষ দাশগুপ্ত কোনদিন আমার ওপর কিছু ইমপোজ করেন নি।

অনেক অনেক ঘুরেছি আমি ঐ এক বছরে। দেখে বেড়িয়েছি প্রাচীন রোমক ও মধ্যযুগীয় পুরাকীর্তির স্বাক্ষর। রোম, ফ্লোরেন্স, মিলান, কারারা, পিসো, সান্তা, অরভিয়েতো, সিসিলি। ইতালীর বাইরে ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, নরওয়ে, সুইডেন। ঘুরে ফিরে দেখে শুনে একটি ধারণাই হয়েছে, পুরোনোকে নকল করে মডার্ন হওয়া যায় না। শিল্পী নিজেকে এক্সপ্লোর করার জন্য যে কোন মেটিরিয়াল দিয়েই মনের ব্যাপার স্যাপারগুলোকে ফুটিয়ে তুলবে। পাথর, সিমেন্ট, কংক্রিট, ব্রোনজ জোটে তো ভাল, না জোটে তো তুলে নাও অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, যে কোন সস্তা সীট মেটাল। পার্মানেন্ট মেটিরিয়ালের দাম বেশী। কিন্তু শিল্প যে কোন মেটিরিয়ালেই তো মূর্ত হয়ে উঠতে পারে। রসিক মানুষ শিল্পেরই কদর করে, মেটিরিয়াল সেখানে বাহ্য।

হ্যাঁ যা বলছিলাম। চৌষট্টিতে স্কলার-সিপের মেয়াদ ফুরিয়ে গেল। ফিরে এলাম আবার এই কলকাতায়। আমার বয়স তখন একত্রিশ। একটা কোন পাকাপাকি অবলম্বন দরকার যাকে আশ্রয় করে পেট ও শিল্প দুই-ই চলতে পারে। তাই বাধ্য হয়েই চাকরী নিলাম হ্যান্ডিক্রাফট বোর্ডের আঞ্চলিক অফিস ডিজাইন সেন্টারে। কাজটা হোল কাঁচ বা সেরামিকের ওপর নানা রকম ডিজাইন ফুটিয়ে তোলা যা নিয়ে হস্ত-শিল্পীরা তাদের কাজগুলোকে নিখুঁত ও সুন্দর করে তুলবেন। গত সাত বছর আমি তাই করে যাচ্ছি। অথচ সকলেই জানে রঘুনাথ সিংহ ভারত বিখ্যাত ভাস্কর।

—[illegible]

ষষ্ঠ অধ্যায়

পশ্চিম রণাঙ্গণের চরম যুদ্ধ—১

হল্যান্ড ও বেলজিয়ামের পতন

১৯৪০ সালের মে মাসে কেবল নরওয়ে ও ডেনমার্ক অতিদ্রুত এবং অতর্কিত দখলের দ্বারাই জার্মানী বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল না, তখনকার দিনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, দূরপ্রসারী এবং চরম যুদ্ধের অনুষ্ঠান হইল পশ্চিম রণাঙ্গনে, যাহা আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসে Western Front নামে বিখ্যাত। কিন্তু এই যুদ্ধের আগে ইউরোপের আকাশ যদিও সর্বত্র রক্তমেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, তথাপি এর আকস্মিক ভয়াবহ বিস্ফোরণ সম্পর্কে পশ্চিম জগতের রাজধানীগুলিতে তেমন কোন গভীর উৎকণ্ঠা ছিল না, কিম্বা তা প্রতিরোধ করার জন্য সতর্ক আয়োজন ছিল না। অথচ এই বছরের গোড়ার দিকেই ইউরোপের অন্তত ২ কোটি লোককে অস্ত্র ধারণের জন্য আহ্বান জানান হইল এবং অস্ত্র নির্মাণের কারখানাগুলিতে নূতন করিয়া অস্ত্র উদ্গীর্ণ হইতে লাগিল। মার্কিন ঐতিহাসিক লুইস স্নাইডার তাঁর গ্রন্থে (দি ওয়ার ১৯৩৯—১৯৪৫) বলিয়াছেন যে, মিউনিক চুক্তির বছরে বা ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর সৈন্যবাহিনীগুলিতে ১০ মিলিয়ন বা ১ কোটি সৈন্য বৃদ্ধি পাইল, নৌবহরগুলির বৃদ্ধি পাইল মোট ৮০ লক্ষ টনেজ, মিলিটারী প্লেন প্রায় ৫০ হাজার এবং পৃথিবীব্যাপী মোট সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইল ১৭০০ কোটি ডলারে। এই সংখ্যাগুলি নিশ্চয়ই তুচ্ছ করার নয়। আর ১৯৩৯ সালে হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশন শক্তিগুলির — যেমন বৃটেন, ফ্রান্স, রুমানিয়া, গ্রীস, পোল্যান্ড একত্রে ছিল ২৮২ ডিভিসন সৈন্য, অপর পক্ষে জার্মানী ইতালী হাঙ্গেরী ও স্পেন বা অক্ষশক্তিবর্গের এই কোয়ালিশনের ছিল ৩০৯ ডিভিসন সৈন্য। আর যে কোন দুইটি ইউরোপীয় নৌশক্তির তুলনায় একা বৃটিশ নৌবহরই অনেক বেশী শক্তিধর ছিল। সৈন্য শক্তির মত উভয় কোয়ালিশনের রণ-বিমানের শক্তিও (৬৫০০) বোধহয় সমান ছিল। কিন্তু পোল্যান্ড ও নরওয়ের যুদ্ধের সংকটে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি অপদার্থ ও উদাসীন বলিয়া প্রমাণিত হইল। সুতরাং চারদিকের তুমুল রাজনৈতিক ঝড়ের মধ্যে লন্ডন ও প্যারিসে শোষণবাদী পুরাতন নেতৃত্ব যখন বিদায় নিল, তখন অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। কারণ, হিটলারী জার্মানীর আধুনিকতম যান্ত্রিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসীর যেমন কোন সর্বাত্মক যুদ্ধের আয়োজন ছিল না, তেমনি নেতৃত্বের মধ্যেও কোন দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা ছিল না। সুতরাং ১০ই মে উইনস্টোন চার্চিল যখন ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রীর এবং পল রেণো ফরাসী মন্ত্রিসভার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন, তখন উহার আগেই মিত্রপক্ষ জার্মানীর অভাবনীয় সর্বগ্রাসী যান্ত্রিক অভিযানের সম্মুখীন হইলেন। আর একটি মহাবিপর্যয়ের এবং সর্বনাশের যবনিকা পৃথিবীর সামনে উদ্ঘাটিত হইল।......

হল্যান্ড

......৯ই মে, ১৯৪০ — হল্যান্ড, বেলজিয়ম, লাকসেমবার্গ ও ফ্রান্সের উপর নিশীথ রাত্রির নিঃশব্দ অন্ধকার নামিল। নাগরিকেরা নিশ্চিন্তমনে নিদ্রামগ্ন ছিলেন। ইহার আগে পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের সৈন্যরা বিশেষভাবে বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনী কিভাবে সময় কাটানো যায় তাহা লইয়া ব্যস্ত ছিল। তাদের আমোদ-প্রমোদ একটা সমস্যা হইয়া পড়িয়াছিল এবং জার্মান রেডিও প্রচার করিতেছিল যে, বেলজিয়াম ও ফরাসী মেয়েরা সাবধান! 'ভাল সামলাও'— এই ছিল তাদের রেডিওর বুলি। বৃটিশ সৈন্যরা ঠাট্টা-মসকরা করিয়া সময় কাটাইল।

এই মনোবৃত্তির ৮ মাস কাটিবার পর ৯ই মে গভীর রাত্রি আসিল। এই রাত্রির কথা ইতালীর কাউন্ট সিয়ানো তাঁর ডায়েরীতে লিখিতেছেন :—

জার্মান দূতাবাসে (রোমের) গলীবামা-জাগে ডিনার খাইলাম। নৈশভোজের পর দীর্ঘকাল অতিবাজে এবং একঘেয়ে আলাপ —হরেক রকম কথাবার্তা যাহা জার্মানদের সঙ্গে সম্ভব। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি কথাও হইল না। রাত্রি ১২টা ২৫ মিনিটের সময় যখন আমরা দূতাবাস হইতে চলিয়া আসি তখন ভন ম্যাকেনসন (জার্মান রাজদূত) বলিলেন, সম্ভবত রাত্রে তিনি আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাইবেন। কারণ বার্লিন হইতে একটা বার্তা আসিবার কথা আছে। সুতরাং তিনি আমার প্রাইভেট টেলিফোন নম্বর টুকিয়া লইলেন।

'রাত্রি ৪টার সময় তিনি আমাকে টেলিফোন করিয়া বলিলেন যে, মিনিট পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছেন এবং আমরা দুইজনে মিলিয়া 'ডুচের' সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাপবে। শেষ রাত্রি ঠিক ৫টার সময় মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহাকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে (বার্লিন হইতে)। অকস্মাৎ কেন এই সাক্ষাৎ? — এই সম্পর্কে তিনি টেলিফোনে কিছু বলিতে অক্ষম। যখন তিনি (ম্যাকেনসন) আমার গৃহে পেঁৗছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে এক গাদা কাগজপত্র দেখিলাম। নিশ্চয়ই টেলিফোনে এতগুলি কাগজপত্র আসে নাই!......

'দুইজনে মিলিয়া আমরা 'ডুচের' কাছে গেলাম। তাঁকে আমি পূর্বেই সতর্ক করিয়া রাখিয়াছিলাম। সুতরাং তিনি আগেই উঠিয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁর মুখ হাসি-হাসি এবং তাঁকে স্থির দেখিলাম। তিনি হিটলারের নোটগুলি পড়িলেন। কেন হল্যান্ড ও বেলজিয়ম আক্রমণ করা হইয়াছে, সেই কারণগুলির একটি তালিকা এই সমস্ত নোটে ছিল। উপসংহারে হিটলার সাদর আহ্বান জানাইয়াছেন মুসোলিনীকে তাঁর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটা স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। তারপর 'ডুচে' দীর্ঘকাল ধরিয়া কাগজপত্র পরীক্ষা করিলেন এবং প্রায় দুই ঘন্টা পর ভন ম্যাকেনসনকে বলিলেন যে, তিনি নিশ্চিত উপলব্ধি করিতেছেন যে, ফ্রান্স ও বৃটেন বেলজিয়ম ও হল্যান্ডের মধ্য দিয়া জার্মানীকে আক্রমণের আয়োজন করিতে-ছিল। সুতরাং তিনি সর্বান্তঃকরণে হিটলারের কার্য অনুমোদন করিতেছেন।'

৯ই মে শেষ রাত্রে রোম নগরীর এই ক্ষুদ্র নাটিকা, যখন নিদ্রামগ্ন ডাচ ও বেলজিয়ম নাগরিকদের স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল আকস্মিক বোমা ও গোলাবর্ষণের শব্দে। যুদ্ধের গুজব তারা দীর্ঘকাল যাবৎ শুনিয়া আসিতেছিল বটে, কিন্তু উহার বাস্তবতার দিকে তাদের বিশ্বাস ছিল না। বিশেষত তারা ছিল নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং তাদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে হিটলার ইতিপূর্বেই গ্যারান্টি দিয়াছিলেন একাধিকবার।

*'Ciano's Diary'—page 245-46

কিন্তু ঐ দিন সন্ধ্যাবেলা ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ তাদের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের মারফৎ এই সাংকেতিক বার্তা পাইলেন—"Tomorrow at dawn, hold tight". তৎক্ষণাৎ হল্যাণ্ডের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এইচ জি উইকলম্যান আত্মরক্ষার পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর আকাশ ও সমুদ্রপথ সক্রিয় হইয়া উঠিল—সমুদ্রে বিস্ফোরণ ঘটিতে লাগিল চুম্বক মাইনের জন্য। রাত্রি ৩টার সময় জার্মান বিমান দেখা দিল হল্যাণ্ডের আকাশে এবং বিমান ঘাঁটিতে বোমা বর্ষিত হইল। ইহার পরেই জানা গেল যে, জার্মান সৈন্যেরা সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে এবং ইহার তিন ঘণ্টা পর জার্মান দূত কাউণ্ট ভন জেফ ওলন্দাজ গভর্নমেণ্টকে জানাইলেন যে, বৃটেন ও ফ্রান্স হল্যাণ্ড ও বেলজিয়মের ভিতর দিয়া এবং তাঁদের সম্মতিক্রমে জার্মানীর রুঢ় অঞ্চল আক্রমণে উদ্যোগী হইয়াছে বলিয়া রাইখ গভর্নমেণ্ট বাধ্য হইয়াই হল্যাণ্ড দখল করিতেছেন।......

কেবল ওলন্দাজদের দেশই নহে, বেলজিয়ম, লাকসেমবুর্গ ও ফরাসী সীমান্ত একযোগে আক্রান্ত ও অতিক্রান্ত হইল। সুতরাং ১০ই মে ভোর বেলা শুরু হইল ইতিহাস প্রসিদ্ধ পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধ, যাহা ১৯১৪—১৮ সালে পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধের অবতারণা করিয়াছিল এবং এবারও সেই ভয়াবহ পরিণতির সূত্রপাত করিল।

পাঁচ দিনের যুদ্ধে হল্যাণ্ড খতম হইয়া গেল, যার আয়তন মাত্র ১২৫০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৮৭ লক্ষ। কিন্তু দেশটা কৃষিকার্য এবং ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উপনিবেশে ঐশ্বর্যশালী, লোভনীয় এবং সমুদ্রতীরবর্তী ও জলপ্রধান বলিয়া ধার নৌবহরও উল্লেখযোগ্য ছিল। আর উত্তর সমুদ্রের উপকূলবর্তী হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম ইংলণ্ড আক্রমণের পক্ষে অনুকূল, অবরোধ ব্যর্থ করিবার পক্ষে উপযোগী এবং ফ্রান্সের পার্শ্বদেশ ছিন্ন করিবার পক্ষে চমৎকার। আর জার্মানীর পশ্চিম সীমান্তের সংলগ্ন বলিয়া দ্রুত আক্রমণের পক্ষেও আদর্শস্থানীয়। সুতরাং হিটলারী বিবেচনায় এই সমস্ত ক্ষুদ্র দেশের নিরপেক্ষতা টিকিতে পারে না, জার্মানীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হওয়াই ইহাদের একমাত্র অদৃষ্ট।

কাগজ-পত্রে হল্যাণ্ডের ৪ লক্ষ সৈন্য ছিল। কিন্তু তাদের না ছিল অস্ত্রসজ্জা, কিম্বা আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধের কোন সমরোপকরণ। সুতরাং ঝড়ের বেগে জীর্ণপত্রের মত ওলন্দাজেরা উড়িয়া গেল নাৎসী বোমার মুখে। ১০ই মে ভোরবেলা হইতেই অজস্র বোমারু, প্যারাস্যুট সৈন্য, বিমানবাহিত সৈন্য এমন কি বিভিন্ন জলপথে রথারের নৌকাযোগে আনীত সৈন্য হল্যাণ্ড যেন ছাইয়া গেল।

কাগজে-পত্রে সৈন্য সংখ্যার মত হল্যাণ্ডের আত্মরক্ষার একটা প্ল্যানও জেনারেল উইকলম্যান ঠিক করিয়াছিলেন। বেলজিয়ম ও হল্যাণ্ডকে একত্রে 'নীচু জমির দেশ' বলা হয় এবং সমুদ্র তীরবর্তী এই দেশগুলি প্রভৃত নদী, খাল জলাভূমি ও জলপথের দ্বারা আচ্ছন্ন। ফলে শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য এই দেশগুলি বরাবরই জলপথের এই প্রতিবন্ধকগুলিকে ব্যবহার করিয়া থাকে। সুতরাং উত্তর হল্যাণ্ডের জুইডার জী জলপথ, যাহা ভিতরের দিকে প্রশস্ত খাড়ির মত অনেক দূর প্রবেশ করিয়াছে, সেই অংশে, ইজেল নদীপথ ধরিয়া (জার্মান সীমান্ত) এবং তারপর হল্যাণ্ডের পূর্ব সীমানায় গ্রীব্ লাইন এবং দক্ষিণে পীল-র‍্যাস জলাভূমি ধরিয়া আত্মরক্ষার লাইন তৈয়ারীর চেষ্টা হইল। পূর্ব দিকের এই লাইনগুলিকে আত্মরক্ষার প্রথম সীমান্তবর্তী সারি বলা যাইতে পারে। এগুলি ভাঙ্গিয়া গেলে ভিতরের দিকে খাস 'হল্যাণ্ড দুর্গের' লাইন ধরিয়া বাধা দেওয়া হইবে—আমস্টারডাম এলাকায় জুইডার জী জলপথ, ময়েরেডিক জলপথ ও সেতু পর্যন্ত আত্মরক্ষার এই ব্যূহ প্রসারিত ছিল।

কিন্তু জার্মানদের কাছে এই সমস্ত অতিপরিচিত এবং অতিতুচ্ছ ছিল। তারাও তিন অংশ ধরিয়া আক্রমণ চালাইল, যথা—(১) উত্তর হল্যাণ্ড পূর্ব ও পশ্চিমে জুইডার জলপথের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু জুইডার জী বাঁধের দ্বারা এই দুই অংশকে সংযুক্ত করা হইয়াছিল। পূর্বাংশে গ্রোলিনজোন ও ফ্রিসল্যাণ্ড প্রদেশ ধরিয়া জার্মানীরা জুইডার জী বাঁধ অভিমুখে উত্তর হল্যাণ্ড আক্রমণ করিল। (২) হল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী অংশে গ্রীব্ লাইন ধরিয়া এবং তারপর আরও ভিতরের দিকে 'হল্যাণ্ড দুর্গ' অভিমুখে, যাহাকে 'নিউ ডাচ ওয়াটার লাইন'ও বলা হইয়া থাকে, সেখান দিয়া দ্বিতীয় আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল। (৩) তৃতীয় আক্রমণ ঘটিল নিউজ বা মাস নদী এলাকা বা দক্ষিণ হল্যাণ্ডের পীল-র‍্যাস অঞ্চল দিয়া ময়েরেডিক সেতু, জীল্যাণ্ড (সমুদ্রোপকূলবর্তী) এবং বেলজিয়ম অভিমুখে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, লাকসেমবুর্গ ও ফ্রান্স—এই দেশগুলি পরস্পরের সহিত যুক্ত বলিয়া একই রণনৈতিক অবস্থানের মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ একটা শিকলের মত ইহারা পরস্পরের সহিত যুক্ত ছিল। আবার হল্যাণ্ড ও বেলজিয়মের উত্তর পার্শ্বদেশ ছিল ডেনমার্ক ও নরওয়ের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং ডেনমার্ক ও নরওয়ে আগেই দখল হইয়া যাওয়ায় হল্যাণ্ডের উত্তর পার্শ্ব ছিন্ন হইয়া গেল, আবার হল্যাণ্ডের দ্বারা বেলজিয়ম এবং বেলজিয়মের দ্বারা লাকসেমবুর্গ ও ফ্রান্সের উত্তর পার্শ্ব ছিন্ন হইয়া গেল। এজন্যই জার্মান অভিযানও একই সঙ্গে এই সমস্ত দেশগুলিকে আচ্ছন্ন এবং বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল।

জল, স্থল ও আকাশ, তিন পথেই জার্মান আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল এবং সেই প্রবল আক্রমণের মুখে ওলন্দাজেরা কোথাও দাঁড়াইতে পারিল না। ম্যাস নদী মোহনায় ময়েরেডিক সেতু ছিল খাস হল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে আক্রমণের পক্ষে প্রধান যোগসূত্রের মত। এখানকার দুইটি বৃহৎ সেতুই অক্ষত ছিল। জার্মানরা প্রথম দিনেই সেতুগুলি দখল করিয়া লইল এবং উহার আগেই বহু প্যারাস্যুট সৈন্য ও বিমানবাহী সৈন্য ওয়ালহ্যাভেন, রোজেন, সিফোল, হেগ, রটারডাম, আমস্টারডাম ইত্যাদি বিমানঘাঁটি ও শহর ছাইয়া ফেলিল। নিদারুণ বোমাবর্ষণে ঘাঁটিগুলি ও এরোপ্লেন বিধ্বস্ত বা বেদখল হইয়া গেল। সেই ভয়ঙ্কর বোমাবর্ষণে জনসাধারণ ও ওলন্দাজ হাইকম্যাণ্ড বিহ্বল, বিমূঢ় এবং তাঁদের আত্মরক্ষার নক্সা একেবারে বানচাল হইয়া গেল। এর সঙ্গে আবার পঞ্চম বাহিনী সক্রিয় হইয়া উঠিল। হল্যাণ্ডে বহু জার্মান বাসিন্দা ছিল এবং তারা জার্মানীর সঙ্গে ঐক্যের পক্ষপাতী ছিল। এ ছাড়া হিটলার ও নাৎসীভক্ত লোকও অনেক ছিল। তারা ডাকহরকরা, পুলিশ, ট্রাম কণ্ডাকটার, এমন কি পাদ্রী ও স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশেও জার্মান বিমান ও সৈন্যদিগকে সাহায্য করিয়াছিল। জার্মান পরিচারিকারা কয়েকটি ক্ষেত্রে 'গাইড' হিসাবেও কাজ করিয়াছিল এবং রাত্রিবেলা ছাদ বা বাতায়ন হইতে আলো জ্বালাইয়া বিমান বহরকে 'সিগন্যাল' করিয়াছিল। জেনারেল ভন স্পোনেক নামে একজন নিহত জার্মান সেনাপতির মৃতদেহে এই সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও পাওয়া গিয়াছিল। *(২)

১০ই মে তারিখ জার্মান বিমান ও ছত্রী সৈন্যেরা হেগের রাজপ্রাসাদে বোমাবর্ষণ করিয়া রাণী উইলহেলমিনা, প্রিন্সেস জুলিয়ানা এবং রাজপরিবারের অন্যান্যকে ধরিবার চেষ্টা করে। ছত্রী সৈন্যেরা এই উদ্দেশ্যে রাজপ্রসাদ ঘেরাও করিয়াছিল। কিন্তু রাণী উইলহেলমিনা ও অন্যান্য সকলে কোনমতে ত্রাণ লাভ করেন এবং ১৩ই তারিখ একটি বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজে হল্যাণ্ড হইতে পলায়ন করিয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় লাভ করেন।

এদিকে সর্বত্র আগুনে বোমা, অতিবিস্ফোরক বোমা ও মেসিনগানের গুলী বিমান হইতে বর্ষিত হইতে থাকে এবং যান্ত্রিক সৈন্য দল ওলন্দাজদের প্রতিরোধ ব্যূহ চূর্ণ করিয়া দ্রুত ধাবমান হইতে থাকে। ১৪ই মে বেলা ১টার সময় জার্মান বোমারু রটারডাম শহরে বোমা মারিয়া শহরটির কেন্দ্রস্থল ধ্বংস করিয়া ফেলে। কয়েক হাজার লোক রটারডামের বোমাবর্ষণে হতাহত হইয়াছিল।

উত্তর হল্যাণ্ডে ওলন্দাজ সৈন্যেরা ১০ই তারিখ রাত্রে জুইডার জী বাঁধ ধরিয়া একবারে উত্তর-পশ্চিম তীরের ডেন হেল্ডারে পশ্চাদপসরণ করে এবং জার্মানরা তাহাদের পিছু ধাওয়া করে। দক্ষিণ দিকে তাহারা

The Second Great War — Hammerton & Gwynn, Vol 4 page 15-17

ম্যাস বা মিউজ নদী এবং ইজেল নদী পার হইয়া যায়। ১৩ই তারিখ তাহারা গ্রীব লাইন দখল করিয়া লইল এবং ১৪ই তারিখ জার্মানরা খাস 'হল্যাণ্ড দুর্গে' প্রবেশ করিল।

১০ই তারিখই দক্ষিণ হল্যাণ্ডের পীল-র‍্যাস ব্যূহ পরিত্যক্ত হইল এবং ১৪ই তারিখ ওলন্দাজেরা এই অংশেও একেবারে পশ্চিম দিকে প্রস্থান করিল। এদিকে ১৩ই তারিখ জার্মান মোটরারূঢ় সৈন্য দল মোয়েরডিক সেতুপথ দিয়া রটারডাম ও হল্যাণ্ডের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিল। ওদিকে বেলজিয়মের উত্তর পার্শ্বদেশও তখন ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং আর প্রতিরোধ অসম্ভব বিবেচনা করিয়া ১৪ই তারিখ সন্ধ্যা ৮টার সময় ওলন্দাজ সেনাপতি জেনারেল উইকলম্যান যুদ্ধবিরতির আদেশ দেন এবং ১৫ই মে, বেলা ১১টার সময় হল্যাণ্ড জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিল।

এভাবে মাত্র ৫ দিনের মধ্যে হল্যাণ্ড বিধ্বস্ত, পরাজিত ও পদানত হইল এবং এই যুদ্ধ নিতান্তই ছিল এক তরফা। কারণ ওলন্দাজদের পক্ষে সংগ্রাম করার কোন সুযোগ ছিল না।

বেলজিয়াম

হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের আত্মরক্ষা প্রায় একই সূত্রে বাঁধা ছিল। কিন্তু হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম নিরপেক্ষতা ঘোষণা করায় ইঙ্গ-ফরাসীর সঙ্গে ইহাদের সামরিক মৈত্রী এবং আত্মরক্ষা ও রণক্রিয়ার বিস্তৃত কোন পরিকল্পনা পূর্বাহ্নে স্থির করা সম্ভব হয় নাই। ফলে জার্মানী ইহাদিগকে পরস্পরের কাছ হইতে টুকরা-টুকরা করিয়া ফেলিবার অভূতপূর্ব সুযোগ পাইল। নিরপেক্ষতা বা দুর্বল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার কোন প্রয়োজন নাৎসী জার্মানী অনুভব করিল না। সুতরাং হল্যাণ্ডের মত বেলজিয়ামের অদৃষ্টেও একই দুর্বিপাক ঘনাইয়া আসিল।

বেলজিয়াম ও ফরাসী সীমান্তের লাকসেমবুর্গ ১০ই মে তারিখ রাত্রি ভোর হওয়ার আগেই আক্রান্ত হইল। আক্রমণের পর সকাল সাড়ে ৮টার সময় জার্মান রাজদূত বেলজিয়ান পররাষ্ট্রসচিব মঃ

স্প্যাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া জার্মান গভর্নমেন্টের 'ঘোষণাপত্র' পেশ করিতে উদ্যত হইলে মঃ স্পাক প্রথমেই বাধা দিয়া জার্মানীর এই ন্যায় ও নীতিবিরোধী আক্রমণের প্রতিবাদ করেন এবং পূর্বাহ্নে কোন প্রকার দাবী-দাওয়া বা চরমপত্র পেশ না করিয়া এভাবে বেলজিয়ান রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করার জন্য জার্মানীকে দায়ী করেন।

অতঃপর জার্মান দূত হল্যাণ্ডের অনুরূপ একটি নাৎসী সরকারী ঘোষণা পাঠ করেন এবং মঃ স্পাক আবার মধ্যপথে বাধা দিয়া বলেন, 'দলিলটা আমার হাতে দিন। এত কষ্ট করিয়া ওটা আর পড়িবার দরকার নাই।' *(৩)

বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিলে বেলজিয়ামের রাজ্য ও উপনিবেশ রক্ষা করা হইবে, এই প্রতিশ্রুতি পত্র যখন পঠিত হইতেছিল, তখন জার্মান বোমারু বিমান বেলজিয়ামের আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছিল এবং দলে দলে নাৎসী সৈন্য সীমান্ত অতিক্রম করিতেছিল। বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড আত্মরক্ষার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন এবং মিত্রশক্তির সঙ্গে একত্রে যুদ্ধযাত্রায় বাহির হন। একটা নক্সাও এজন্য কিছুকাল আগে স্থির হইয়াছিল।

১,১,৭,৭৫ বর্গমাইল পরিমিত ক্ষুদ্র বেলজিয়ামের লোকসংখ্যা ৮৩ লক্ষ এবং ইহা ফ্রান্সের উত্তর পার্শ্বদেশে অবস্থিত। ১৯১৪—১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধেও বেলজিয়াম জার্মানী কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল প্যারিস অভিযানের পথে। এবারও সেই একই ধ্বংসলীলার পুনরাবৃত্তি হইল। শান্তির সময়ে বেলজিয়ামের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৮৬ হাজার এবং যুদ্ধের সময় ইহা ৬ লক্ষ হইতে সাড়ে ৬ লক্ষে দাঁড়াইল এবং কাগজেপত্রে মোট সমাবেশের সংখ্যা দাঁড়াইল ৯ লক্ষে। নিঃসন্দেহে বেলজিয়ামের পক্ষে সংখ্যাটি সর্ববৃহত্তর। এই সৈন্যবাহিনী নানা শ্রেণীর ২১টি ডিভিসনে বিভক্ত ছিল, এবং উহার মধ্যে ১২ ডিভিসন ছিল এলবার্ট ক্যানেল এলাকায়। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধযাত্রায় ও যান্ত্রিকতায় ইহারা বহু দূর পিছনে ছিল। সুতরাং কার্যকরীভাবে যে ১২ ডিভিসন সৈন্য মিত্রশক্তির সঙ্গে জার্মানীকে বাধা দিল, তাদের দশাও ওলন্দাজদের মতই ঘটিল।

আক্রান্ত হওয়ার কিছুকাল আগে বেলজিয়ান সেনানীমণ্ডলী বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে পরামর্শক্রমে এই মর্মে একটি আত্মরক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন যে, আক্রমণের তৃতীয় দিবসে বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনী বেলজিয়ামে রণক্রিয়ায় লিপ্ত হইবে। এন্টোয়ার্প হইতে লীজ পর্যন্ত এলবার্ট ক্যানেল (খাল) ধরিয়া এবং লীজ হইতে নামুর পর্যন্ত মিউজ নদী ধরিয়া বেলজিয়ান বাহিনী 'বিলম্বিত রণক্রিয়া' অনুসরণ করিবে এবং এভাবে যে সময় পাওয়া যাইবে, উহার মধ্যে বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যেরা এন্টোয়ার্প-নামুর-গিভেট (ফরাসী সীমান্তের) লাইনে দণ্ডায়মান হইবে। তৃতীয় দিবসে ইহা ঘটিবে বলিয়া অনুমান ছিল এবং এই লাইনের এন্টোয়ার্প হইতে লুভেন পর্যন্ত খণ্ডাংশ বেলজিয়ানদের রক্ষা করার কথা ছিল। ইহা ছাড়া হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম সীমান্তের আত্মরক্ষার বহির্ঘাঁটি তো ছিলই।

ভোর রাত্রি ৪টার সময় জার্মান বোমারুর দল ঝাঁক বাঁধিয়া বেলজিয়ামের বিমানঘাঁটি রেল স্টেশন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলির উপর প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ ও মেশিনগানের গুলী চালাইতে লাগিল। বেলজিয়াম বিমানবহরের অর্ধেকের বেশী ভূমিতেই নষ্ট হইয়া গেল এবং সীমান্তের আত্মরক্ষা

* ৯৯৯ বর্গমাইল ভূমি ও ৩ লক্ষ বাসিন্দাপূর্ণ লাকসেমবুর্গ একটি অতি ক্ষুদ্র রাজ্য জার্মানী, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স—এই তিনটি রাজ্যের সীমানায় ইহা অবস্থিত এবং ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে জার্মান যৌথরাষ্ট্র হইতে ইহার উদ্ভব হয়। শক্তিবর্গ ইহার নিরপেক্ষতারও প্রতিশ্রুতি দেন। রণনৈতিক কারণে দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বার্ষিক ৪০ লক্ষ টন লৌহ ধাতু এবং ২০ লক্ষ টন ইস্পাতের উৎপাদনের জন্যও ইহার গুরুত্ব রহিয়াছে। ইহা কতকটা জমিদারী রাষ্ট্রের মত—বোধহয় আমাদের দেশের 'দেশীয় রাজ্যের' (প্রাক্তন) সঙ্গে অনেকাংশে তুলনীয়।

—লেখক

*(৩) বেলজিয়াম পররাষ্ট্র দপ্তরের সরকারী বিবৃতি—১৯৩৯-৪০ সালে উদ্ধৃত 'The Second Great War' — vol 4.

ব্যূহ জার্মান পদাতিক, ট্যাঙ্ক ও ছোমারু বিমানের প্রবল আক্রমণে ভাঙিয়া গেল।

কিন্তু বেলজিয়ামের আত্মরক্ষার সর্বাপেক্ষা সংকটজনক বিন্দু ছিল ম্যাসট্রিকটের দক্ষিণে, যেখানে বিখ্যাত লীজ দুর্গশ্রেণী মিউজ নদীর পথে সতর্ক প্রহরীর মত দণ্ডায়মান ছিল। ১৯১৪ সালে কাইজারের বাহিনীও এই পথ দিয়াই অভিযান করিয়াছিল। কিন্তু সেই দিন দীর্ঘ আত্মরক্ষায় যে যুদ্ধ তীব্র ও রক্তাক্ত হইয়াছিল, আজ হিটলার তাহা অতি সহজে বিদ্যুৎগতিতে কাড়িয়া লইলেন। এই দুর্গশ্রেণীর উত্তরবর্তী ইবন-ইমেল নামক আধুনিক কেল্লা দুর্ভেদ্য বলিয়াই পরিচিত ছিল। কিন্তু জার্মানরা অভিনব দুঃসাহসিকতায় ইহাকে চক্ষের নিমেষে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। প্লাইডার বাহিত জার্মান সৈন্যেরা শেষ রাত্রির অন্ধকারে এই দুর্গের ছাদের উপর নামিল এবং বিস্ফোরক ও বোমা মারিয়া কামানগুলি অকেজো করিয়া ফেলিল, পরে দেওয়াল বিদীর্ণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। আর একই সময়ে জার্মান গোলন্দাজ, ট্যাঙ্ক ও প্যারাসুট সৈন্যেরা ইহার উপর আক্রমণ (রবারের তৈরী কৃত্রিম প্যারাসুট সৈন্য চারদিকে প্রচুর সংখ্যায় ছড়াইয়া দিয়া প্রকাণ্ড ধাপ্পা দেওয়া হইয়াছিল।) চালাইল এবং পরদিন ১১ই মে এই দুর্ভেদ্য দুর্গ ধরাশায়ী হইল। এলবার্ট ক্যানেল বরাবর যে ৭নং বেলজিয়ান ডিভিসন আত্মরক্ষা করিতেছিল, জার্মানরা ম্যাসট্রিকটের পথে সেখান দিয়া
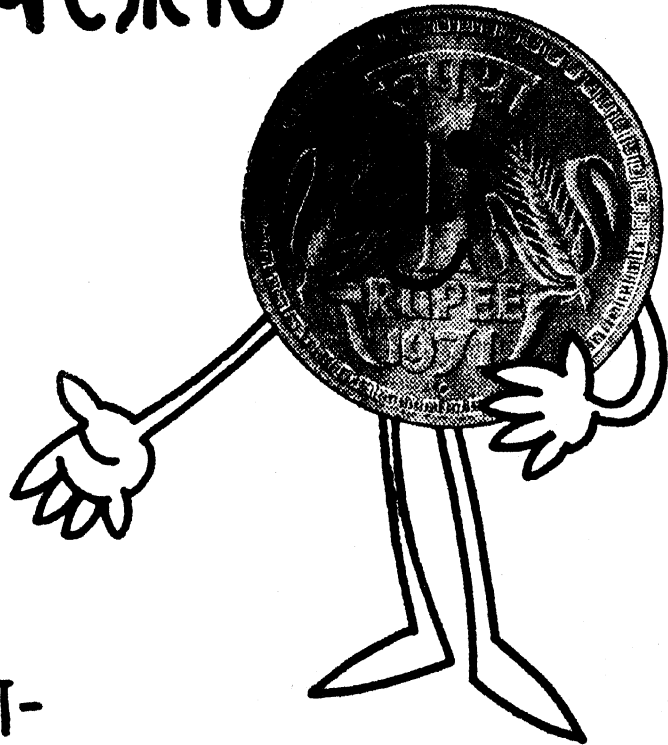
অগ্রসর হইল এবং তাহাদিগকে হটাইয়া দিল। এই ক্যানেলের দুইটি সেতু জার্মানরা অক্ষত অবস্থায় হস্তগত করিল, আর এগুলির উপর দিয়া দলে দলে জার্মান মোটরারূঢ় ও যান্ত্রিক সৈন্য যেন বন্যাপ্রবাহের মত বেলজিয়ামের ভিতর ঢুকিতে লাগিল। জার্মানরা দ্রুত টংগ্রেস ছাড়াইয়া অগ্রসর হইল এবং ১১ই তারিখ রাত্রে বেলজিয়ানরা এলবার্ট ক্যানেল লাইনের এলাকা (যেখানে জার্মানদিগকে বিলম্বিত রণক্রিয়ায় আটকাইবার কথা ছিল) ত্যাগ করিয়া পিছু হটিল এবং মিত্রবাহিনীর সহিত একত্রে প্রধান আত্মরক্ষার লাইনে আসিয়া দাঁড়াইল।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে ১ নং ও ৯ নং ফরাসী বাহিনী এবং লর্ড গোর্টের অধীন বৃটিশ অভিযাত্রী দল এই লাইন রক্ষার জন্য সন্নিবিষ্ট হইল। ১৩ই মে তারিখ এণ্টোয়ার্প ও লুভেনের মধ্যে দাঁড়াইল বেলজিয়াম সৈন্যরা আর তাদের বামপার্শ্ব রক্ষা করিল আর এক দল ফরাসী বাহিনী—জেনারেল জিরোর অধীন ৭ নং ফরাসী আর্মি শেল্ড নদী মোহনা অঞ্চলে। ৩টি বৃটিশ ডিভিসন ছিল লুভেইন ও ওয়েভারের মধ্যে, আরও ৬টি বৃটিশ ডিভিসন ছিল ইহাদের পিছনের দিকে ডাইল ও শেল্ড নদীর মধ্যে। লর্ড গোর্টের দক্ষিণে ওয়েভার ও নামুরের মধ্যে ছিল জেনারেল ব্লানচার্ডের অধীন ১ নং ফরাসী আর্মি। খাস নামুর দুর্গ এলাকায় ছিল ৫নং বেলজিয়াম আর্মি কোর এবং আর্দেনেশ এলাকা হইতে পশ্চাদপসরণকারী বেলজিয়ান সৈন্যরা। নামুর হইতে মিউজ নদী ধরিয়া মেজিয়ার্স পর্যন্ত ছিল জেনারেল কোরাপের অধীন ৯ নং ফরাসী বাহিনী, আবার ইহাদের দক্ষিণে ছিল ২নং ফরাসী বাহিনী।

বেলজিয়ামের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ভ্যান ওভারষ্টেটেনের অধীন সৈন্যেরা এবং বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনীগুলি আত্মরক্ষার জন্য মোটামুটি এভাবে দণ্ডায়মান হইলেও তাদের ব্যূহ অতি দ্রুত ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। আকাশ পথে জার্মান বিমান একাধিপত্য বিস্তার করিল এবং ভয়াবহ বোমাবর্ষণে শত-সহস্র ভীত আতঙ্কিত ও বিমূঢ় বেলজিয়ান সৈন্যেরা পলাতক অবস্থায় আসিয়া শহরে ভীড় করিল এবং আতঙ্কিত নাগরিকদের ত্রাস আরও বাড়াইয়া তুলিল। এক-একবারে হাজার হইতে দুই হাজার পর্যন্ত বিমান হানা দিতে লাগিল। মিত্র সৈন্যদের পক্ষে ইহা ছিল অপ্রত্যাশিত। সুতরাং বিভ্রাটে বিলম্ব হইল না।

এই বিভ্রাট গুরুতর আকারে দেখা দিল লাকসেমবুর্গ ও নামুরের মধ্যবর্তী আর্দেনেশ পার্বত্য এলাকা হইতে। গভীর ঘন জঙ্গল, কুটীল ও বক্রগতি নদী এবং বন্ধুর পাহাড়িয়া ভূমির দ্বারা আচ্ছন্ন এই এলাকা ভেদ করিয়া জার্মানরা দ্রুত ধাবমান হইবে, এই বিশ্বাস মিত্রপক্ষের ছিল না। কিন্তু দুর্ধর্ষ ও গতিশীল যান্ত্রিক জার্মান সৈন্যেরা মাত্র ৪৮ ঘন্টার মধ্যে এই পার্বত্য প্রদেশ ভেদ করিয়া ফেলিল। তখন ৯ নং ফরাসী বাহিনী নামুরের দক্ষিণে মিউজ নদীর ধারে ছিল। ১২ই মে তারিখ জার্মানরা অগ্রসর হইল এবং সবিস্ময়ে দেখিল যে, মিউজ নদীর ৬টি সেতু অক্ষুন্ন রহিয়াছে! এখানে যে ৫০ মাইল চওড়া ও ৫০ মাইল দীর্ঘ বৃহৎ ছিদ্র তারা সৃষ্টি করিল, সেই ছিদ্র পথে মিউজ নদীর অক্ষত সেতুগুলির উপর দিয়া দলে দলে জার্মান যান্ত্রিক সৈন্য প্রবেশ করিল—ঠিক এলবার্ট খালের সেতুর মত। নিঃসন্দেহ মিউজ নদীর এই ৬টি সেতু অক্ষুন্ন রাখা অত্যন্ত মারাত্মক ছিল। কেন না শত্রুর আক্রমণ মুখে সেতু উড়াইয়া দেওয়া আত্মরক্ষাকারী সৈন্যদের একটি প্রাথমিক কর্তব্য মাত্র। (এই সমস্ত সেতুর কাহিনী লইয়া সেই সময় মিত্রপক্ষীয় মহলে তুমুল তোলপাড় হইয়াছে এবং কোন কোন ফরাসী অফিসারের বিরুদ্ধে ইহার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হইয়াছিল।) কিন্তু এই মারাত্মক ত্রুটির ভয়াবহ পরিণতি ঘটিল। যদিও ইহার জন্য ১৫ই মে তারিখ নামুর-মেজিয়ার্স লাইনের ৯ নং ফরাসী বাহিনীর নায়ক জেনারেল আদ্রে কোরাপ পদচ্যুত এবং তাঁর স্থলে জেনারেল জিরো নিযুক্ত হইলেন, তথাপি শেষ রক্ষা হইল না। ইতিহাস বিখ্যাত সেডান (১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স-প্রুশিয়ান যুদ্ধে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের ফ্রান্সের শোচনীয় পরাজয়) এলাকায় ২ নং ফরাসী বাহিনীর উপর জার্মানরা যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইল, উহার ফলে ১৩ই মে অপরাহ্ন ৫টায় সেডানের ব্যূহ অর্থাৎ ম্যাজিনো লাইন ভাঙ্গিয়া গেল। (প্রকৃতপক্ষে ওটাই ছিল জার্মান যান্ত্রিক বাহিনীর প্রধান আক্রমণ। পরে এ বিষয়ে আরও আলোচনা করা হইয়াছে।) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ম্যাজিনো লাইনের কেল্লা শ্রেণী সিংগাপুরের নৌ-দুর্গের মতই পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল এবং ফরাসীদের আত্মরক্ষার একমাত্র ভরসা ছিল এই ম্যাজিনো লাইন, যাহা সুইজারল্যাণ্ডের সীমানা হইতে লাকসেমবুর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল—দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ মাইল। সেডানে আসিয়া ইহার 'পাকা গাথুনি' শেষ হইয়াছিল এবং সেডানের পর বেলজিয়ামের সীমানা ধরিয়া ইহা ছিল 'কাঁচা গাঁথুনির' লাইন। সেডান ও মন্টমিডির মধ্যস্থলে ম্যাজিনো লাইনের এই দুর্বল গ্রন্থিতে আঘাত করিয়া জার্মানী ইহাকে বিধ্বস্ত ও বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। কার্যতঃ পশ্চিম রণাঙ্গনের চূড়ান্ত সংগ্রামের বিয়োগান্ত পর্ব এখান হইতেই সুরু হইল।

সেডানের ব্যূহ ভেদের পর ৯ নং ফরাসী বাহিনী পর্যুদস্ত হইয়া গেল এবং ১৬ই মে তারিখ উহার প্রধান সেনাপতি জেনারেল জিরো লা ক্যাপেলে শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন। উত্তর ফ্রান্স ও বেলজিয়মের রণক্ষেত্রের মধ্যে বিচ্ছেদ সুরু হইল এবং বেলজিয়ামের মিত্রবাহিনীও বেষ্টিত হইবার জো হইল। ১৫ই মে সন্ধ্যায় জেনারেল জর্জেস এণ্টোয়ার্প-নামুর নাইন ত্যাগ করিয়া শেল্ড বা এস্কোয়াট নদীর পিছনে আশ্রয় লইবার হুকুম দিলেন। ৭ নং বেলজিয়ান আর্মি কোরও প্রভৃত সৈন্য বলির পর নামুর শহর ছাড়িয়া আসিল, যদিও নামুর ও লীজ দুর্গগুলি আরও কিছুকাল আত্মরক্ষা করিল। কিন্তু বেলজিয়ামের প্রধান আত্মরক্ষার লাইনই এভাবে চূর্ণ হইয়া গেল।

১৬ই মে তারিখের মধ্যে মিত্রবাহিনীর সর্বত্র পশ্চাদপসরণ ঘটিল। এণ্টোয়ার্পের পশ্চিমে বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের জীল্যাণ্ড অঞ্চলে যে ৭ নং ফরাসী বাহিনী ছিল, তারা ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্টের আত্মসমর্পণের পর অতি বিশৃংখলভাবে এণ্টোয়ার্পে পিছু হটিয়া আসিল। আর বেলজিয়ান সৈন্যরাও পর পর তিনটি পর্যায়ে শেল্ড নদীর পিছনে গিয়া আশ্রয় লইল।

এদিকে জার্মানরা সেডানে ব্যূহ ভেদের পর উত্তর ফ্রান্সের (বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী অঞ্চল) অভ্যন্তরে অগ্রসর হইতে লাগিল। এখানে ছিল ফরাসী বাহিনীগুলির মূল আত্মরক্ষার ব্যূহ, আর বেলজিয়ামে ছিল তাদের দূরবর্তী আত্মরক্ষার ঘাঁটিস্বরূপ। জার্মান যান্ত্রিক সৈন্য দল দুর্বার গতিতে সমস্ত বাধা চূর্ণ করিয়া ১৮ই মে সন্ধ্যাবেলা পেরোন, ২০শে মে ক্যাম্বাই দখল করিয়া একেবারে উত্তর পশ্চিম ফ্রান্সের সমুদ্রতীরবর্তী সুপরিচিত আবেভিল বন্দর বিপন্ন করিয়া তুলিল। অর্থাৎ বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের রণক্ষেত্রের মধ্যে জার্মানী এক বৃহৎ কীলক প্রবেশ করাইয়া দিল এবং এই দুই রণাঙ্গন পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার জো হইল, যার ফলে উভয় রণক্ষেত্রেই মিত্রবাহিনী জার্মান বেষ্টনীর মধ্যে পড়িবার আশঙ্কা জাগাইল।

এই সময় ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী পল রেণো তাঁর মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন করিলেন এবং বিগত মহাযুদ্ধের ভার্দুন বিজয়ী বৃদ্ধ মার্শাল পেতাঁকে সহকারী প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিলেন—১৮ই মে, ১৯৪০। পরদিন ১৯শে মে বিগত মহাযুদ্ধের অন্যতম ফরাসী নায়ক 'ওয়াশর জয়ী' জেনারেল ওয়েগাঁ পশ্চিম রণাঙ্গনের সমগ্র মিত্রবাহিনীর সর্বপ্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন। জেনারেল গ্যামেলাঁ ছিলেন এতদিন পশ্চিম রণাঙ্গনের সর্বাধিনায়ক, ব্যর্থতার অভিযোগে তিনি এই পদ হইতে অপসারিত হইলেন।

২০শে মে তারিখ জার্মানরা শেমিন ডে ডেম্স ও অরেফ-আইনে খাল ধরিয়া অগ্রসর হইল, আমিয়েন্স ও আরাস দখল হইল এবং ক্রমে ক্রমে বলোন, ক্যালে ইত্যাদি বিখ্যাত ফরাসী বন্দরগুলি বিপন্ন হইল। ২১শে মে তারিখ ইপ্রেতে মিত্রপক্ষীয় রণনেতাদের এক

বৈঠক বসিল। বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের মিত্র-বাহিনীগুলি পরস্পরের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এই 'বিচ্ছেদ' নিবারণের জন্য জেনারেল ওয়েগাঁ উত্তর ও দক্ষিণ অর্থাৎ বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের উভয় দিক হইতে যুগপৎ পাল্টা-আক্রমণের এক পরিকল্পনা করিলেন এবং ইপ্রে বৈঠকে ইহা লইয়া আলোচনা হইল। ইহার ফলে মিত্রবাহিনী-গুলির নূতন করিয়া সৈন্য সমাবেশ ও পশ্চাদপসরণ ঘটিল বটে, কিন্তু সেই পরি-কল্পিত পাল্টা-আক্রমণ আর অনুষ্ঠিত হইল না। বৃটিশ ও বেলজিয়ান সৈন্যেরা শেল্ড নদীর এলাকা হইতে লাইস নদীর আড়ালে অপসারিত হইল। ইহার আগেই হল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবর্তী ওয়ালচেরেন দ্বীপ পরিত্যক্ত হইয়াছিল (১৯শে মে)। সেখান হইতে জার্মানী কর্তৃক পশ্চাৎ আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিল। ২৪শে তারিখ জার্মানরা লাইস নদী অতিক্রম করিল কোর্টরাই এলাকায় এবং এক বৃহৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রকাণ্ড জার্মান বোমারুবহর সমগ্র বেলজিয়ান খণ্ডাংশে ধ্বংসলীলা বিস্তার করিতে লাগিল এবং নূতন সৈন্য আমদানী করিয়া তারা মেনিন হইতে ইপ্রে পর্যন্ত আক্রমণ চালাইল এবং বেলজিয়ান ও বৃটিশ বাহিনীর মধ্যে সংযোগ নষ্ট করি-বার চেষ্টা করিল। বৃটিশ ও বেলজিয়ান, উভয় সৈন্যদলই ঘেরাও হইবার জো হইল এবং পরিত্রাণের বন্দরগুলির একে একে পতন ঘটিতে লাগিল—২৪শে বোলোন এবং ২৭শে ক্যালের পতন হইল।

পরিত্রাণের পথ ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে থাকায় ইংরাজ সৈন্যদল বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নির্দেশে 'চাচা আপন বাঁচা' নীতি অনু-সরণ করিতে লাগিল। এই সময় ২৫শে মে তারিখ জার্মানরা ঘেণ্ট ও কোর্টরাই দখল করিয়া লইল! আর ইঙ্গ-ফরাসী সঙ্কটের জন্য সামরিক নেতৃত্বের বহু পরিবর্তন ঘটিল। ১৫ জন ফরাসী জেনারেল বা সেনা-পতি পদচ্যুত হইলেন এবং ইংলণ্ডে ইম্পি-রিয়াল জেনারেল ষ্টাফের বড়কর্তার পদে জেনারেল স্যার আইরণ সাইডের বদলে জেনারেল স্যার জন ডিল নিযুক্ত হইলেন—২৬শে মে।

২৫শে মে বৃটিশ সৈন্যেরা ডানকার্ক হইতে তাদের ইতিহাস বিখ্যাত পলায়ন-পর্ব সুরু করিল, আর হতভাগ্য বেলজিয়াম সৈন্যেরা পরিত্রাণের পথ হারাইয়া নিরুপায় হইয়া পড়িল। তথাপি এই অবস্থায়ও রাজা লিওপোল্ড আত্মরক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং ২৫শে মে রাত্রিবেলা ও পরদিন দুর্ধর্ষ জার্মান ট্যাঙ্ক বাহিনীর গতিরোধের জন্য রুলার্স হইতে ইপ্রে পর্যন্ত ২০০০ রেল ওয়াগন প্যাসেনডেলের সম্মুখে (যে স্থান বিগত মহাযুদ্ধের রক্তাক্ত বিভীষিকায় স্মর-ণীয়) সাজাইয়া বাঁচিবার শেষ চেষ্টা করি-লেন। এই সময় জেনারেল বিলোট, যিনি বেলজিয়ান রণাঙ্গনের মিত্রবাহিনীগুলির মধ্যে প্রধান সংযোগরক্ষাকারী সেনাপতি ছিলেন, তিনি এক মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হইলেন। ফলে রাজা লিওপোল্ডের জরুরী বার্তা লণ্ডনে পৌঁছিল না এবং ফ্রান্সের সহিত যোগাযোগও নষ্ট হইয়া গেল। ২৬শে মে বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষ বৃটিশ হেড কোয়া-র্টারে খবর পাঠাইলেন যে, অধিকতর আত্ম-রক্ষা কঠিন হইয়া পড়িতেছে; তখন রাজা লিওপোল্ড তাঁর সদর দপ্তর ইংলিশ চ্যানেলের তীরবর্তী ওস্টেণ্ড বন্দরের নিকট অপসারিত করিলেন। তাঁরা শেল্ড ও লাইস নদীর মধ্যে জার্মানীর পার্শ্ব ও পশ্চাৎ আক্রমণের জন্য বৃটিশ বাহিনীকে অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু বৃটিশ পক্ষ উত্তর দিলেন, তাহা সম্ভব নহে এবং ফরাসীরাও কোন সাহায্য দিতে পারিলেন না।

২৭শে মে জার্মানীর প্রবল আক্রমণের মুখে বেলজিয়ানদের শেষ মজুত সৈন্যদল নিক্ষিপ্ত হইল, কিন্তু ইহা ছিল অনল শিখায় শেষ আহুতি দানের মত। বেলা ১২-৩০ মিনিটের সময় রাজা লিওপোল্ড বৃটিশ সেনাপতি লর্ড গোর্টকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইলেন যে, অবস্থা সাংঘাতিক, আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায় নাই। ফরাসীদের তিনি জানাইলেন যে, বেলজিয়ান রণাঙ্গন ধনুকের জীর্ণ ছিলার মত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে!

বেলজিয়ামের অন্তিম মুহূর্ত ঘনাইয়া আসিল। রণক্ষেত্র ভঙ্গ, সৈন্যদল পরাজিত, বিহ্বল ও ছত্রভঙ্গ, আর জনপদ, পল্লী ও নগরে জনসাধারণের মধ্যে সর্বত্র ত্রাস ও আতঙ্ক। হতাহতে রণক্ষেত্র পরিকীর্ণ, হাস-পাতালে আহতের স্থান নাই, কামানের গোলাগুলী পর্যন্ত নিঃশেষিত। রণক্ষেত্র হইতে সমুদ্রতীরবর্তী যতটুকু ফাঁক ছিল সেই সংকীর্ণ অংশে পলায়মান উন্মাদ জন-তার ভীড়—জার্মানদের হাত হইতে পুরুষের প্রাণ ও মেয়েদের সম্মান বাঁচাইবার জন্য সর্বত্র ধাবমান নরনারী ও শিশু। খাদ্য নাই, আশ্রয় নাই—৩০ লক্ষ নরনারী ৬৫০ বর্গ-মাইল ভূমিতে মাথা গুঁজিবার জন্য পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল!

এই সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যে ২৭শে মে, অপরাহ্ন ৫টায় রাজা লিওপোল্ড জার্মানীর ১৮ নং বাহিনীর সদর দপ্তরে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। রাত্রি ১০টায় হিটলার বিনা সর্তে আত্ম-সমর্পণ দাবী করিলেন। রাত্রি ১১টায় সেনানীমণ্ডলীর সহিত পরামর্শক্রমে রাজা লিওপোল্ড সেই দাবী মানিয়া লইলেন এবং ভোর ৪টায় (২৮শে মে) সমগ্র বেলজিয়ান রণাঙ্গনে যুদ্ধ বিরতির ভেরী বাজিয়া উঠিল। ২৮শে মে সকালবেলা আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল।

রাজা লিওপোল্ড বন্দী হইলেন, কিন্তু জার্মানরা তাঁর প্রতি 'রাজোচিত' সম্মান দেখাইবার জন্য তাঁকে পরিবার, ভৃত্যমণ্ডলী ও সামরিক কর্মচারীসহ একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকায় থাকিবার অনুমতি দিলেন। 'সম্মানজনক আত্মসমর্পণের চিহ্ন' স্বরূপ বেলজিয়াম অফিসারদিগকেও অস্ত্র রাখিবার অনুমতি দেওয়া হইল।

বেলজিয়ান সৈন্যবাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়করূপে রাজা লিওপোল্ডের আত্ম-সমর্পণ এবং ৩ লক্ষ সৈন্য কর্তৃক অস্ত্র ত্যাগ ১৯৪০ এবং উহার পরেও মিত্রপক্ষীয় মহলে তীব্র সমালোচনার উদ্রেক করিয়াছিল। বিশেষতঃ ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী পল রেনো এক বেতার বক্তৃতায় ক্রুদ্ধস্বরে তিরস্কার করিয়া-ছিলেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল অবশ্যই ধৈর্যের পরিচয় দিয়া বলিয়াছিলেন যে, রাজা লিওপোল্ডের কার্য সম্পর্কে রায় দেওয়ার সময় এখনও আসে নাই। তিনি বেলজিয়ান বাহিনীর বীরত্বেরও যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

কিন্তু রাজার পক্ষপাতী লোকেরা বলিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে লিওপোল্ডকে দায়ী বা দোষী করা চলে না, বরং ১৮ দিন পর্যন্ত বেলজিয়ান বাহিনী যে অসম্ভব রকম অসহায় অবস্থার মধ্যে যুদ্ধ করিয়াছে, তাতে সৈন্যগণের প্রশংসাই প্রাপ্য। তবে, সমগ্র মিত্রপক্ষের রণনীতি এবং ইঙ্গ-ফরাসী রাজ-নীতির জন্য যে দুর্বিপাক ঘটিয়াছে, উহার জন্য নিশ্চয়ই ক্ষুদ্র বেলজিয়াম কিংবা একা লিওপোল্ডই দায়ী নহেন। যে অবস্থায় তিনি পড়িয়াছিলেন, তাতে আত্মসমর্পণ, কিংবা মৃত্যুবরণ ছাড়া উপায় ছিল না।

(ক্রমশঃ)

সমীরকুমার মিত্র

একটি মহিমান্বিত প্রদীপ্ত নাম—রাজা! হ্যাঁ রাজাই বটে। তবে রাজা ফারুক বা ইংলণ্ডের রাজার (বর্তমান রাণী) কথা বলছি না। বলছি গুজরাটের গির অরণ্যে পশুরাজ সিংহের কথা।

অরণ্যের অতলে পশুরাজের স্বকীয় দীপ্তি নিবিড় চোখ মেলে দেখেছিলাম, আর প্রাণভরে নিয়েছিলাম স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার ঔজ্জ্বল্যকে। এই ধরনের নিরাভরণ প্রাণময় অভিজ্ঞতার মুখোমুখি এসে নিজের অনুভূতিকে প্রসারিত ও ব্যাপ্ত করতে পেরেছিলাম, তার নেপথ্যে ছিল গুজরাটের নতুন রাজধানী গান্ধীনগরে সাংবাদিক সম্মেলনে যোগদান। সম্মেলনের সুষ্ঠু আয়োজন করেছিলেন ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অফ ওয়ার্কিং জার্ণালিষ্ট; গুজরাট সরকারের তত্ত্বাবধানে এই সম্মেলন যে অভাবনীয় তাৎপর্য লাভ করেছিল, তার নজীর হল সম্মেলনে আগত প্রায় দেড়শ সাংবাদিকের জন্য বিভিন্ন প্রসিদ্ধ স্থান পরিদর্শনের সুব্যবস্থা। সোমনাথ, দ্বারকা প্রভৃতি স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক জায়গার মত গির অরণ্যও এক নতুন উপলব্ধির তোরণদ্বারে উন্নীত করেছিল আমাকে। জানার আকাশে সে এক অবিস্মরণীয় সূর্যোদয়।

রাজকোটের বিখ্যাত স্থান 'বালভবন' থেকে বেরিয়ে, ঐতিহাসিক শহর জুনাগড়কে পেছনে ফেলে মেনদারদার মধ্য দিয়ে আমরা সরকারী বাসে করে গির অরণ্যের গহীনতাকে স্পর্শ করলাম। প্রথম ছোঁয়ার বিহ্বল আবেশকে মধুময় করে তুলল প্যাখম-তোলা ময়ূরের অনুরাগে ভরা সঞ্চরণ। যেন, সে আমাদের স্বাগত জানাবার জনাই অপেক্ষা করছিল। পথে নানা জাতের পাখি ও সম্বর চোখে পড়ল। কিন্তু অরণ্যের মধ্যে সিংহ দেখবার জন্য মন ভীষণ উতলা হয়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে আমরা সাসানে এসে পেণঁছেছি। কারণ এখানেই "স্যাংকচুয়ারী সুপারিণ্টেডেন্ট' আমাদের সিংহ ও অরণ্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো জানিয়ে দিলেন। এখান থেকে আরও ৬ মাইল ভিতরে যেতে হবে 'লায়ন শো' বা সিংহ প্রদর্শনী দেখবার জন্যে।

জানতে পারলাম গির অরণ্যে সিংহের সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৭৭টিতে এবং এদের রক্ষা করবার জন্য সরকার পক্ষ থেকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। গিরের সিংহ আফ্রিকার সিংহের থেকে একটু ছোট হলেও, বড় লেজের জন্য গির সিংহ বিখ্যাত। ভারতীয় সিংহের আয়তন ২৫০ থেকে ২৮৭-৫ সেঃ মিঃ, যেখানে আফ্রিকার সিংহের আয়তন আরও ৩০ সেঃ মিঃ বেশী। ১,৫১৫ স্কয়ার কিলো মিটার বিস্তৃত শুষ্ক গির অরণ্য তাই ভ্রমণকারী ও জন্তু-জীবন সম্বন্ধে জানতে উৎসুক সুদূরের পিয়াসী মানুষকে বার-বার কাছে ডেকে নিতে চায়।

'লায়ন শো' দেখবার জন্য মন আমার চলচঞ্চল শিশুর মত উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। তাই বাসটি যখন সেই অরণ্যকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যুৎ বেগে ছুটতে লাগল তখন আমার মন নৃত্যোদোদুল ছন্দে উন্মনা হয়ে উঠল। ভীতির সমুদ্রও যে মনে দোল খাচ্ছিল না, তা নয়। তবে এই ভয়ের মধ্যে ছিল একটা রোমাঞ্চের অদ্ভুত এক শিহরণ। দিগন্তের বুকে সূর্যাস্তের বিষণ্ণতা নেমে আসছে, ঠিক এমনি সময় অরণ্যের পূর্ব প্রান্তের

এক স্থানে আমাদের বাস থেকে নামতে বলা হল। বাস থেকে নেমে পাঁচ-সাত গজ এগোতেই অরণ্যরক্ষীদের একজন আমাদের আর এগোতে বারণ করল। কারণ, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তার থেকে ২০।২৫ গজ দূরে ৬টি সিংহ দেখা গেল। এরা কেউ-বা বসে আছে, কেউ আবার প্রাকৃতিক পরিবেশে বিচরণ করছে। কিন্তু অদূরেই যে এতগুলো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে তাদের কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। ফেরার পথে জঙ্গলের আর এক স্থানে আমাদের বাস থমকে দাঁড়াল। তখন ক্লান্তির ভারে ভারাক্রান্তা পৃথিবীর মুখর জলসার অন্ধকার নেমে এসেছে। হয়ত বা বিস্মৃতির অন্ধকার। আমাদের 'পাইলট কার' থেকে 'সার্চলাইট' ফেলার সঙ্গেই দেখতে পেলাম ৬।৭টি সিংহ—কেউ কিছুটা দূরে, আবার কেউ আমাদের থেকে ১০।১২ গজ দূরত্বের ব্যবধানে বসে আছে। দুইজন অরণ্যরক্ষী একটা মহিষ শাবককে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটা সিংহ মহিষ শাবকটার দিকে একাগ্র চিত্তে তাকিয়ে বসে আছে। কিন্তু আক্রমণ করছে না। এমন কি এতগুলো মানুষকে দেখেও এতটুকু বিচলিতবোধ করছে না। রূপকথার গল্পের মত মনে হচ্ছিল। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে, অরণ্যরক্ষীদের সঙ্গে গির সিংহদের সখ্যতা গড়ে উঠেছে। এবং গিরের সিংহ খাদ্যের প্রয়োজনে ছাড়া কখনও জীব হত্যা করে না। সিংহের ২৬টি দাঁত আছে। এর মধ্যে আটটি দাঁত ও তার বিশাল থাবা দিয়ে সে তার কবলিত যে কোনও জীব-জন্তুকে টুকরো-টুকরো করে ফেলতে পারে।

চার বৎসর বয়সে একটি সিংহকে প্রাপ্ত বয়স্ক বলা হয়। কিন্তু সিংহী দুই থেকে আড়াই বৎসর বয়সেই মাতৃত্ব লাভ করে থাকে। একটা সিংহী প্রতিবারে দুই থেকে তিনটি শাবক প্রসব করে, আবার কখনও-কখনও পাঁচটিও প্রসব করতে দেখা গেছে। একটি সিংহের গড় আয়ু হচ্ছে ১৫ বৎসর। সব চাইতে মজার ব্যাপার এই যে, খাদ্যের ব্যাপারে প্রথমে সিংহ তার ভাগ গ্রহণ করবে। এই কারণেই বোধহয় 'লায়ন্স সেয়ার' কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। এবং সিংহী তার ভাগ গ্রহণ করবার পর শাবকেরা তাদের খাদ্য গ্রহণ করবে।

গির অরণ্য থেকে কল্লোলমুখর কলকাতা ফিরে এসে বুঝতে পেরেছি যে, সিংহের বসে থাকা, চলা-ফেরা এবং প্রতিটি নিখুঁত অঙ্গ-ভঙ্গীর মধ্যে যে একটা 'ম্যাজেষ্টিক' ভাব আছে, তাই তাকে পশুরাজের অতুলনীয় সম্মান দিয়েছে। আর এই প্রাণময় উপলব্ধি এই পরিশ্রান্ত শহর-জীবনে দিয়েছে কিছুটা অন্য জীবনের স্বাদ। চলতি মুহূর্তগুলোতে তাই হয়ত নতুন করে দেখতে পাব স্মৃতি আর বিস্মৃতির দোদুল দোলন।
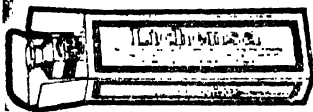
(তৃতীয় খণ্ড)

(১১)

নরেন্দ্রনগররাজ ভোরবেলাতে জরাকে সঙ্গে নিয়ে নির্মীয়মান মন্দিরটি দেখছিলেন। জরার বেশ-ভূষায় আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে। মাথায় তার শাদা হালকা কাপড়ের উষ্ণীষ, গায়ে বুটিদার আঙরাখা, পরণে সৌম বস্ত্র, পায়ে শুঁড়তোলা পাটকিলে রঙের পাদুকা, আর কণ্ঠে ও বাহুতে স্থানোচিত অলঙ্কার। কদিন আগে যার পায়ে ছিল বেড়ি, কটিতে সামান্য জীর্ণ আচ্ছাদন আর গায়ে চাবুকের দাগে—একি সেই জরা। এই পরিবর্তনে সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছিল জরা নিজে। কি জন্যে, কেন, এই পরিবর্তন হল বুঝবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে— অনেকক্ষণ চেষ্টার পরে। আর সবচেয়ে লক্ষণীয় অপ্রত্যাশিত রাজপ্রসাদ-লাভ।

পাথরভাঙ্গা গ্রামে সুবালার কুটিরের কাছে হঠাৎ রাজার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে সে আতঙ্কে চমকে উঠেছিল নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে আসবার ফলে না জানি কি দণ্ড পেতে হবে। রাজা তো চলে গেলেন, ভয়ে ভয়ে সে আবাসে ফিরে এলো। কিছুক্ষণ পরেই রাজার প্রেরিত লোক এসে বলল চলো।

শঙ্কিতভাবে শুধালো কোথায়?

মহারাজার কাছে।

কেন?

কেন আমরা কি করে জানবো, তবে মনে হচ্ছে মহারাজা তোমার উপরে খুশী হয়েছেন।

খুশি হয়েছেন। জড়বৎ অনুবৃত্তি করে জরা।

রাজভৃত্য বিনীতভাবে অভিবাদন করে একটি অশ্ব দেখিয়ে দেয়।

নীরবে জরা দেখিয়ে দেয় পায়ের বেড়ি।

রাজভৃত্যের ইঙ্গিতে কামার এসে খুলে ফেলে দেয় সে বেড়ি। তখন জরা ঘোড়ায় চেপে বসে; রাজভৃত্য সসম্ভ্রমে রাজপুরীর পথটা দেখায়। অবশেষে জরা রাজপুরীতে পৌঁছে মহারাজার সমীপে উপনীত হয়, ঘোড়া থেকে নামে, রাজাকে নত হয়ে অভিবাদন করে।

রাজা বলেন, এসো রাজা, তোমার উপরে অনুচরগণ অন্যায় আচরণ করেছিল, তারা তিরস্কৃত হয়েছে।

জরা কিছুই বুঝতে না পেরে আর একবার অভিবাদন করে।

ব্যাপারটা এই।

নরেন্দ্রনগররাজ অনুচরদের আদেশ করেছিলেন রাজাকে (জরা নাম তাঁর অজ্ঞাত) যেন আরামে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি আরও বলেছিলেন লোকটা গুণী, ভবিষ্যতে ওকে দিয়ে কাজ হবে। আগেই বলা হয়েছে যে এই সামান্য রাজানুগ্রহই জরার কাল হল, তার পায়ে বেড়ি এবং পিঠে চাবুক পড়লো। হঠাৎ রাজার চোখে না পড়ে গেলে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে খাটতে এবং চাবুক খেতে খেতেই ওর জীবনাবসান হতো। ওকে পাথরভাঙা গ্রামে দেখবামাত্র রাজা এক লহমায় প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পারলেন। রাজানুচরদের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে রাজার পরিচয় অপ্রত্যাশিত নয়।

একজন আমাত্যকে ডেকে বললেন, ওহে রাজার এ দশা কেন।

সে বলল, মহারাজ কি বলবো ওকে তো আরামেই রাখবার ব্যবস্থা করেছিলাম কিন্তু ওর ভাগ্যে আরাম নেই। লোকটা কলির চর। পালিয়ে যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে ধরে নিয়ে এসে বললাম, বাবা, তুমি পালালে যে আমাদের শির যাবে। তুমি দয়া করে রাজসমাদরে বাস করো।

রাজা শুধালেন তারপর?

মহারাজ, বলবো কি লোকটা তো বুনো, আসল জংলি, পরমান্ন, মিস্টান্ন দেখলে বমি করে, গোটা আটার রুটি ছাড়া আর কিছু রোচেনা তার মুখে। তাও না হয় সহ্য করেছিলাম। যার যা খাদ্য তাই খাক। কিন্তু আবার পালালো। তখন বাধ্য হয়ে ওর পায়ে বেড়ি পরালাম, অবশ্য কাজ-কর্ম ওকে কিছু দেওয়া হয়নি, আর যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতেও বাধা ছিল না। তাই তো পাথরভাঙা গ্রামে মহারাজার চোখে পড়লো লোকটা।

রাজকর্মচারীদের স্বভাব রাজাকে নির্বোধ ভাবা, তা নইলে তাদের জীবন-যাত্রা দুঃসহ হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে রাজা-দের স্বভাব রাজকর্মচারীদের বিশ্বস্ত ভাবা নচেৎ কাজকর্ম চলে না। দুজনেই জানে প্রকৃত ব্যাপার। ঠিক বিপরীত। এই ভাবে আপোষে চোখ-ঠারাঠারি করে চলে রাজসংসারের কাজ। মানব-সংসারের বললেও বোধ করি ভুল হয় না, এখানেও একের সম্বন্ধে অপরের এই রকম ধারণা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে পারলে সংসারের মতো এমন বিচিত্র প্রহসন আর কোথায়।

রাজা জানতেন লোকটা গুণী, কিন্তু তারপরে তার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে যা জানতে পেলেন তাতে তাঁর চোখে জরার নতুনতরো তাৎপর্য প্রকাশ পেলো।

রাজা শুধালেন, তোমার দেশ কোথায় হে রাজা।

জরা বলল, ভারতবর্ষে মহারাজ।

আহা ভারতবর্ষে তো আমরাও বাস করি, এ অঞ্চল তো ভারতের বাইরে নয়, এ অঞ্চলের আমরা সবাই মহারাজা যুধি-

ঠিরের সামন্ত। তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি ভারতের কোথায়? মৎস্য, পাঞ্চাল, মদ্র, কোশী, কোশল নানা প্রদেশ আছে— কোথায়?

জরা বলল, তা তো জানিনে মহারাজ, আমি থাকতাম দ্বারকায়!

দ্বারকায়! চমকে উঠলেন রাজা। কানকে বিশ্বাস হল না, পুনরপি শুধালেন—কি বললে?

দ্বারকায়।

দ্বারকায়! বাসুদেবের দেশে।

না জেনে জরা কি পিছল পথে পদক্ষেপ করলো নাকি, কিন্তু আর তো ফিরবার উপায় নাই—বলল, হাঁ মহারাজ।

তুমি বাসুদেবের দেশের লোক। কি আশ্চর্য, এতদিন বলোনি কেন?

মহারাজা না শুধোলে বলি কি উপায়ে।

এতে আর শুধোনো অশুধোনো কি! এত বড় সৌভাগ্য কি লুকিয়ে রাখতে হয়। এই যে মন্দিরটা তৈরি করছি, চলো দেখে আসি, এখানে বাসুদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

জরার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। ভাবে এই এত দূরে দেশে, কত রাজ্য, পাহাড়-পর্বত, নদী মরুভূমি পার হয়ে এখানেও পৌঁছেছে বাসুদেবের নাম। তখন মনে পড়ে জরতীর কথা। তবে হয়তো লোকটা সত্যি কেউকেটা ছিল। তবে জরতী যে বলেছিল ভগবান তা হতেই পারে না। ভগবানের যদি মৃত্যু হয়ে থাকে তবে কি ত্রিভুবনে এখন ভগবান নাই। এ হতেই পারে না। ভগবান যদি না থাকে তবে চন্দ্র সূর্য উঠছে, বৃষ্টি হচ্ছে, বাতাস বইছে কি করে? মায়ের কাছে ছেলেবেলায় শুনেছিল যে এই যে চন্দ্র-সূর্য উঠছে বৃষ্টি হচ্ছে, বাতাস বইছে, সবই ভগবান আছেন বলে। এখনও তো এসমস্ত ঠিক আগের মতই হচ্ছে। কাজেই ভগবান আগের মতই আছেন। আর তা যদি থাকেন, তবে বাসুদেব কখনই ভগবান হতে পারেন না।

এত কথা এত চিন্তা আর এমন যুক্তির সূত্র জরার পক্ষে নূতন। ক'মাস আগে, যখন সে বনে বনে পশু শিকার করে বেড়াত, তখন এমন চিন্তাধারা ও যুক্তি তার ধারণার অতীত ছিল। এই ক'মাসে ভিতরে ভিতরে তার যে পরিবর্তন ঘটেছে তারই চিহ্ন এই চিন্তাধারায়। বাসুদেবকে হত্যা করবার মুহূর্তে জরার অজ্ঞাতসারে জীবন-পণ্ডিত তাকে ভর্তি করে নিয়েছিল নিজের পাঠশালায়। এ পাঠশালা বড় আশ্চর্য প্রতিষ্ঠান। এখানে কে পড়ায়, কারা পড়ে, পড়বার রীতি বা কি রকম কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না। পড়ুয়াদের প্রশ্ন করলে তারা হেসেই উড়িয়ে দেবে, তারা আবার পাঠশালার ছাত্র। আর এই পাঠশালায় যে বিচিত্র ধরনের দণ্ডের ব্যবস্থা আছে তার কিছু কিছু বিবরণ আগে দিয়েছি। এখানে দুঃখ দিয়ে শেখানো হয়, সুখ দিয়ে শেখানো হয়, আর সবচেয়ে বেশী শেখানো হয় সুখের ছদ্মবেশে যখন দণ্ড আসে।

বাসুদেবকে হত্যার পরেই জরার আরম্ভ হল দুঃখের শিক্ষা। সেই পাঠ চলল সুমন্তপুরে পৌঁছানো অবধি। সুমন্তপুরে যে মাসাধিককাল সে ছিল, তখন সুখের পাঠ চলেছিল। নরেন্দ্রনগরে পৌঁছানোর পর ক'দিন আবার দুঃখের পাঠ। তারপরে এখন আরম্ভ হল সব দণ্ডের সেরা সুখের ছদ্মবেশে দুঃখের দণ্ড।

জরা এখন রাজার প্রিয়পাত্র, সারাদিন তিনি জরাকে সঙ্গে রাখেন, কারিগররা মন্দির তৈরী করছে, জরাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখেন, কোথায় কোন্ বেদীর উপরে বাসুদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবে বুঝিয়ে দেন। রাজা বলেন, আমার ইচ্ছা বাসুদেব দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন, কারণ ওই দিকেই দ্বারকা। আর রাজ-পুরোহিত বলেন, না মহারাজ, সর্বদিকের শ্রেষ্ঠ পূর্বদিক, যেদিকে সূর্য ওঠে, বাসুদেব পূর্বাস্য হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবেন। তুমি কি বল রাজা?

জরা অবাক হয়ে বলে, মহারাজ, আমি মুখ্যু মানুষ, আমি কি বলব?

রাজা বলেন, সে কি কথা, তুমি বাসুদেবের দেশের লোক, তোমার উপরে কার কথা?

তারপরে রাজা বলেন, দেখ, বাসুদেবের মূর্তি পরিকল্পনা নিয়ে আমরা সংকটে পড়েছি। এদেশের কেউ তাকে চোখে দেখে নি। এমন কি যে শিল্পী মূর্তি গড়বে সেও দেখেনি, সকলেরই শোনা কথার উপরে নির্ভর।

তারপরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসেন, তুমি কি কখনও তাঁকে চোখে দেখেছ?

এই নিদারুণ প্রশ্নে জরার সমস্ত অস্তিত্ব মোচড় খেয়ে ওঠে, একি নিদারুণ সংকটের মুখে পায়ে পায়ে সে এগিয়ে চলেছে, এর চেয়ে যে মাথায় করে পাথর বওয়া সহজ ছিল। সে কেবল কায়িক কষ্ট। নিতান্ত অসহ হলে, মাথা থেকে নামিয়ে জিরিয়ে নেওয়া চলে, আর, এ বোঝা যে মানসিক, এ তো নামাবার উপায় নেই। জরা হঠাৎ কোনো উত্তর দিতে পারে না।

রাজা শুধান, কি হে, তাঁকে কখনও চোখে দেখনি একি হতে পারে?

জরা বলে, মহারাজ, আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ।

রাজা বলেন, ভগবানের কাছে কি মূর্খ-পণ্ডিত ভেদ আছে। তিনি যে স্বয়ং ভগবান।

জরা কোন উত্তর দেয় না।

এবারে রাজা অন্য প্রসঙ্গ তোলেন। বলেন, কিভাবে তাঁর লীলাবসান ঘটল জান? নানা লোকে নানা কথা বলে।

জরার সেই এক উত্তর, মহারাজ, আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ।

রাজা বলেন, আমরা এতদূরে থেকে শুনলাম, আর তুমি সে রাজ্যে থেকেও শুনতে পেলে না, একি হয়।

তারপরে কিছুক্ষণ দুজনে ঘুরে ঘুরে মন্দিরটি দেখে। রাজা বলেন, মন্দিরটি উচ্চতায় একশ বিশ হাত হবে। কেন না, ওই বয়সেই বাসুদেব দেহত্যাগ করেছেন। তারপরে অনেকটা যেন নিজের মনেই বলে যান, কতজনে কত পরামর্শ দিল। কেউ বলে মহারাজ শ্বেতপাথর দিয়ে মন্দির তৈরী করান, কেউ বলে লালচে পাথর দিয়ে গড়ুন, দেখতে খুব সুন্দর হবে। কিন্তু কালো পাথরের কাছে কেউ নয়। বুঝলে রাজা, লাল বল, সাদা বল, সমস্ত কালক্রমে ম্লান হয়ে আসে। কেবল কালোর মহিমাই দিনে দিনে গভীর হতে থাকে। তাছাড়া বাসুদেবের রং কালো ছিল। ইচ্ছা করেই কালোর মহিমা বোঝাবার জন্য ওই বর্ণ ধারণ করে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

মন্দিরটা ঘুরে দেখতে দেখতে হঠাৎ বলে বসেন, শুনেছি একটা ব্যাধের শরাঘাতে তাঁর লীলাবসান ঘটেছিল।

জরা হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার মত হয়।

সাবধানে পা ফেলো, পাথরের টুকরো ছড়ান রয়েছে।

রাতে সুখশয্যায় শয়ান জরার ঘুম আসে না। এর চেয়ে যে মজুরদেরে করেদখানা অনেক ভাল ছিল। গবাক্ষপথে আকাশের দিকে তাকায়, তারাগুলো তার অচেনা নয়, বনে-জংগলে মাঠে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো যার অভ্যাস, তারা না চিনে তার উপায় কি? দেশ ছাড়বার পরে এমন করে তারাগুলোর দিকে তাকাবার অবকাশ পায় নি সে। দেখতে পায় কালপুরুষের তলোয়ারখানা ঝুঁকে পড়েছে। তার দিকেই নাকি? আর আকাশের ওই যে কোণে একটা তারা রাজার হাতের আঙটির লাল পাথরটার মত চোখ পাকিয়ে রয়েছে সেকি তার দিকে তাকিয়ে? এই তারাগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে দ্বারকার বন-বাদাড়ের কথা মনে পড়ে যায়, সমুদ্রের শব্দ রাতের বেলায় যেন দ্বিগুণ প্রবল হয়ে ওঠে, গরমের দিনে রাতের বেলা ঢেউয়ে-ঢেউয়ে হাজার জোনাক জ্বলতে থাকে। সেই

সুরে মনে পড়ে যায় জরতীকে। জরতী শুধাতো, ওগুলো কি রে জরা? ও সম্বন্ধে জ্ঞান দুজনেরই সমান। জরা বলে ঃ

সাপের মাথায় মণি থাকে শুনেছিস তো? সেই মণি।

এত সাপ এলো কোথা থেকে?

কোথা থেকে কি রে? সমস্ত সাপেরই তো বাস সমুদ্রে।

তবে দিনের বেলায় দেখতে পাই নে কেন রে?

এর সদুত্তর জানে না জরা। তাই সে চুপ করে থাকে। কতক্ষণ দেশের কথা জরতীর কথা চিন্তা করেছে তার হুঁস ছিল না। যখন আবার আকাশের দিকে চোখ পড়ল, দেখতে পেলো কালপুরুষের তলোয়ারখানা আরও অনেকটা ঝুঁকে পড়েছে তার দিকে। জরার ভয় হল এমনিভাবে ঝুঁকে পড়তে থাকলে কখন এক সময় তার বুকে এসে বিঁধবে। মনে হল, তাহলে বড় অন্যায় হয় না। এমনি ভাবেই তো তার শর গিয়ে বিঁধেছিল বাসু-দেবের পায়ে। বাসুদেবের কথা মনে হতেই ভাবল তাঁকে হত্যা করে যদি পাপ করেই থাকি, তবে রাজার কাছে এত সমাদর পাচ্ছে কেন? তখনই মনে হল, রাজা তো জানেন না। ভগবান জানেন। তবে তিনি কেন এত সমাদর দিচ্ছেন রাজার হাত দিয়ে। বিশেষ যে সমাদর তার প্রাপ্য নয়, সেই সমাদর যখন সে পাচ্ছে, বুঝতে হবে বাসুদেবকে হত্যা করায় পাপ হয় নি। তবে কালপুরুষের তলোয়ারখানা আরও ঝুঁকে পড়েছে কেন তার দিকে? পাপ, পুণ্য, ভগবান, বাসুদেব সবশুদ্ধ মিলিয়ে তখন তালগোল পাকিয়ে যায় তার মনের মধ্যে। সে না পারে ঘুমোতে, না পারে জেগে থাকতে। তাকালে কাল-পুরুষের তলোয়ার, চোখ বুজলে জটিল চিন্তার গোলকধাঁধা। সুখশয্যা তার পক্ষে অসহ্য হয়। সে উঠে বসে সজোরে কপাল চাপড়াতে থাকে।

দিনের বেলায় রাজবাড়ীর সমাদর রাতের বেলায় সুখ শয্যার যন্ত্রণা' জরার আর সহ্য হয় না। সেই যে সেদিন বাসুদেবের মৃতদেহ দেখে জরতী বলে উঠেছিল ওরে জরা তোর নরকেও স্থান হবে না। সেই কথার অর্থ এত দিনে বুঝি বুঝতে পারছে। তবে নরক বুঝি সমাদর ও যন্ত্রণায় সমভাগে মিশিয়ে তৈরি তাই এমন দুঃসহ। কিম্বা যে-সমাদর প্রাপ্য নয়, সেই সমাদরের মুখোশ পরে যন্ত্রণা আসে বলেই বুঝি তাকে নরকযন্ত্রণা বলে।

রাতের বেলায় সুখশয্যার তপ্ত বালু খোলায় বসে সংকল্প করে কালকেই সব কথা রাজসমীপে নিবেদন করে এই দ্বৈতাবস্থার অবসান ঘটাবে—একদিন যে শূলদণ্ড থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল সেই দণ্ড আবার যেচে নিয়ে সব যন্ত্রণা ঘুচিয়ে দেবে। কিন্তু কার্য-কালে দিনের বেলায় সাহসে কুলোয় না।

এক-একদিন যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হয় পাথরভাঙ্গায় সুবালার বাড়ীতে যায় এখন আর কোথাও যাওয়ার বাধা ছিল না। সেদিন সুবালার বাড়ীতে গিয়ে দেখে শুকনো কুসুম ফুলের গুঁড়ো জলে গুলে কাপড় রাঙাচ্ছে।

ও কি হচ্ছে সুবালা?

শাড়ী রাঙাচ্ছি, কাপড় রাঙাচ্ছি, ছেলেটার আংরাখা রাঙাচ্ছি।

সবই তো দেখছি রাঙিয়ে ফেললে, তবে আর বাড়ীঘরগুলো বাদ থাকে কেন?

সুবালা হঠবার পাত্র নয়—বলল, তাও রাঙাবো।

কি এই রং দিয়ে নাকি?

সে হেসে উঠে। হাসবার সময়ে অনেক-গুলো দাঁত দেখা যায়, স্ফটিকের মতো শাদা আর ঝকঝকে। হেসে উঠে বলে তুমি কেমন লোক গা! কুসুম ফুল দিয়ে কি বাড়ীঘর রাঙায়!

তবে কি দিয়ে?

কেন গৌর মাটি আর গোবরে মিশিয়ে। তোমাদের দেশে কি করে?

সে প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই ছেলেটা এসে জরার হাঁটু ধরে দাঁড়ায়। এই ক'দিনের যাতায়াতে জরাকে চিনেছে। ছেলেটা কোলে উঠে তার পাগড়ি ধরে টানাটানি করে।

সুবালা বলে নামিয়ে দাও, খুলে ফেলবে।

ফেলুক না বলে জরা। তার মনে পড়ে তার একটি ছেলে হয়েছিল, বেশি দিন ছিল না, বছর দুই হতেই মারা গিয়েছিল। সে-ও এমনি ভাবে তার পাগড়ি ধরে টানাটানি করতো। গলার পুঁতির মালা কতবার ছিঁড়ে ফেলেছে। জরা পাগড়ি খুলে তার মাথায় জড়িয়ে দেয়। তার মুখ অবধি ডুবে যায় পাগড়িতে, টান দিয়ে খুলে ফেলে দেয়। হো-হো করে হেসে ওঠে জরা। তারপরে সুবালার উদ্দেশ্যে বলে, তা হঠাৎ এত কাপড়-চোপড় বাড়ীঘর রাঙাবার ধুম পড়ে গেল কেন?

সুবালা বলে, পরব আসছে যে।

কি পরব আবার।

বাঃ তুমি রাজবাড়ীতে থাক আর জানো না।

বাস্তবিক কিছুই জানে না জরা।

সুবালা বুঝতে পারে, বলে বাসুদেবের মূর্তি বসবে যে মন্দিরে!

এখানেও বাসুদেব। জরা চমকে ওঠে এখানেও লোকটা পিছু পিছু এসেছে দেখছি। কোথায় সেই সমুদ্রতীরের দ্বারকা আর কোথায় এই পাঁচ-সাতশো ক্রোশ দূরের পার্বত্য অঞ্চল, তায় কিনা আবার পাহাড়ী-দের জীর্ণ কুটীর। এমন শত্রুও তো দেখিনি, সে ভাবে সুযোগ পেলে আবার তাকে তীর মারে। হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে বাসুদেব কে?

শাড়ীখানা নিংড়াতে নিংড়াতে সুবালা বলে, বাসুদেব যে ভগবান।

তারপরে আবার আর একখানা শাড়ী নিয়ে পড়ে। তার বিশ্বাস চূড়ান্ত উত্তর দিয়েছে, অধিক বিস্তার সাধন অনাবশ্যক। কিন্তু জরাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। সে শুধায়, বাসুদের তোমাদের কি করেছে?

কি আবার করবে। ভগবান ভগবান। তিনি কি বোঝা বইবেন, না ঝরণা থেকে জল এনে দেবেন।

ভগবান কি মানুষের হাতে মরে।

ভগবানের ইচ্ছা কেমন করে জানবো! ও জানবার চেষ্টা করতে নেই। তবে সেই মানুষটাকে পেলে একবার দেখে নি।

কি করতে তাকে নিয়ে।

ঐ পাথরখানা দিয়ে মাথা গুঁড়িয়ে দিতাম। মনে করো যদি আমিই মেরে থাকি।

সুবালা খিলখিল করে হেসে ওঠে, এমন অসম্ভব কথার হাসি ছাড়া আর কী উত্তর হতে পারে।

সেদিন রাতে তার সুখ হরণ করে সুবালার সরল বিশ্বাস। তখনি মনে পড়ে জরতীকে, তারও এমনি সরল বিশ্বাস ছিল। মূর্খ জরা জানে না যে মেয়েরা সরল বিশ্বাসের উপরে নির্ভর করে নির্ভয়ে পথ

চলে; পুরুষে জ্ঞানের উপরে নির্ভর করবার ফলে পথ হারিয়ে ফেলে। বিশ্বাস পাহাড়ী ঝরণা, জ্ঞান কাটা খাল। তার মনে পড়ে একদিন এই রকম সরল বিশ্বাস তো তারও ছিল, জীবনের পথ ছিল মসৃণ সমতল, তারপরে কি কুক্ষণেই ঐ শর নিক্ষেপ করলো। সব কেমন উল্টে-পাল্টে গেল।

হঠাৎ দারুন ক্রোধ হয় খট্যাসের উপরে, কেন বাঁচাতে গেল তাকে। মৃত্যুদন্ডই তো তার প্রাপ্য ছিল। আর বাঁচালোই যদি বা এমন নির্মোচ্য জালের মধ্যে জড়িয়ে ফেললো কেন? সেই শরাঘাতের মুহূর্ত থেকে তার সরল জীবনে গ্রন্থির পরে গ্রন্থি পড়ে চলেছে। কোথায় কিভাবে এর বিরাম কে জানে। যেভাবেই হোক যত শীঘ্র হয় সে বেঁচে যায়—এভাবে আর চলে না।

রাজা বলছিলেন, ওহে মিতে রাজা, ভাস্কর কাকে বলে জানো তো, যারা মূর্তি গড়ে এই আর কি, কাল রাতে এসে পড়েছে। কালো পাথরে বাসুদেব মূর্তি গড়বে। চলো তার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দি তাহলে বাসুদেবের মূর্তি সম্বন্ধে কিছু ধারণা তাকে দিতে পারবে।

রাজার জেরার দায়ে ঠেকে একদিন জরা স্বীকার ক'রে ফেলেছিল যে দূরে থেকে তাঁকে দু-একবার দেখেছে।

রাজা বলেছিলেন তা হলেই হল, যে লোক একবারও দেখেনি সে যখন মূর্তি গড়তে সাহস করছে, তোমার পক্ষে তাকে সাহায্য করা অসম্ভব নয়।

অগত্যা রাজি হতে হয় জরাকে। জরা শিল্পীর সঙ্গে কথা বলছে এমন সময়ে একজন অমাত্য এসে নিবেদন করলো, মহারাজ সেই যে দুজন বন্দী পালিয়েছিল তারা ধরা পড়েছে।

কোথায় ধরা পড়লো।

মহারাজ, ওরা বিদেশী লোক, এদেশের পথঘাট জানে না; এ পাহাড় সে পাহাড় করে ঘুরে ঘুরে অনাহারে শুকিয়ে গিয়ে দেউতাঙ্গি গাঁয়ে ভিক্ষার সন্ধানে গিয়েছিল। সে গাঁয়ে মহারাজার অনুচরদের অনেকের বাস তাদের একজন চিনতে পেরে রাজবাড়ীতে সংবাদ দেয়। তখন রাজবাড়ী থেকে সৈন্য গিয়ে বন্দী করে আনে।

তাদের বোধকরি পালাবার সামর্থ্য ছিল না।

মহারাজার অনুমান যথার্থ। তাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল ধরা পড়ে তারা যেন কৃতার্থ হল।

যাক যখন ধরা পড়েছে খুব জুলুম যেন না হয় ওদের উপরে। আগে খাইয়ে-দাইয়ে চাঙ্গা করে তোল তারপরে অন্য কথা। হাঁ শোনো, লোক দুটো যুদ্ধের বন্দী না বাজার থেকে কেনা।

এদের দুজনকে তক্ষশিলার বাজার থেকে কিনে আনা হয়েছিল।

ওখানে তো চড়া দাম নেয়।

হাঁ মহারাজ, আর লোক দুটোরও প্রকৃতি নামের অনুরূপ।

কৌতূহলী রাজাশুধান, নামের অনুরূপ! তার মানে?

একজনের নাম নরক একজনের নাম অসুর।

নাম দুটো তপ্ত লৌহ শূলের মতো জরার কানে প্রবেশ করে—এতক্ষণ শিল্পীর সঙ্গে কথোপকথনে মগ্ন ছিল। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। রাজা ও অমাত্য ওদের ইতিহাস আলোচনায় নিযুক্ত থাকায় জরার পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারলো না।

নরক ও অসুর। জরার সেই মহা অপরাধের সাক্ষী, তার সমস্ত অপকর্মের সঙ্গী। তারা মুখ খুলবা মাত্র তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তাদের অপরাধের তুলনায় জরার অপরাধ পর্বত-প্রমাণ। সে কিনা আজ রাজপ্রসাদভোগী আর ওরা দুজনে কড়া চাবুকের আসামী। জরা আর মনঃস্থির করতে পারছিল না, কোনরকমে দায় সারা করে আপসে ফিরে এলো। সে বুঝলো তার জীবনের আর একটা সংকট ঘনীভূত। সে এসব নিরিবিলিতে নিষ্কৃতির উপায় চিন্তা করতে চায়। হয় নিষ্কৃতি নয় নিয়তি। নিয়তির স্রোত দুর্নিবার।

(১২)

দুদিন পরে।

এই দুদিন ভয়ে ভয়ে কেটেছে জরার, ভয় এবং দুশ্চিন্তায়। সে ভেবেছে দুর্ভাগ্য তার পিছু নিয়েছে নতুবা কে জানতো নরক আর অসুর এখানে। তারা তার সব কীর্তির প্রত্যক্ষ সাক্ষী ও সহকর্মী। সুমন্তপুরে ও নরেন্দ্রনগরে রাজসমাদর পাওয়ায় তার ধারণা হয়েছিল পশ্চাৎধাবমান দুর্ভাগ্যকে এড়াতে পেরেছে। এখন দেখল সে ধারণা ভ্রান্ত। পাকা শিকারী জরার এমন ঘটনা অজ্ঞাত নয়। পোষা কুকুর নিয়েছে হরিণের পিছু, দুজনে আগু পিছু বেশ ছুটছে, হঠাৎ কুকুর থমকে দাঁড়ায়, হরিণের গন্ধ হারিয়ে ফেলেছে। তাই বলে হরিণ যে রক্ষা পায় তা নয়, আবার গন্ধের নিশানা পেয়ে হরিণের পিছু নেয়। এক্ষেত্রেও সেই রকম। মানুষ দুর্ভাগ্যের শিকার।

দুদিনেও যখন অশুভ প্রতিক্রিয়া ঘটল না জরার বিশ্বাস হল ওরা জানে না যে জরা এখানে আছে। জানবেই বা কি প্রকারে, জানবার কারণ নেই। এক নিতান্ত কাকতালীয়বৎ যদি তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আপাতত তালের উপরে না বসতে বদ্ধপরিকর।

জরা কেমন করে জানবে যে তারাই প্রথম অনুমান করেছিল ঐ পায়রা মারা জরার কীর্তি হওয়া অসম্ভব নয়। তারপরে যখন যুদ্ধ বেধে উঠল তারা পালালো, তাই যুদ্ধের পরিনাম ও জরার বন্দীরূপে আগমন তাদের অজ্ঞাত রয়ে গেল তবে দীর্ঘকালের জন্য নয়।

সেদিন জরা গিয়েছিল পাথরভাঙা গ্রামে সুবালাদের বাড়ীতে। হঠাৎ সুবালা প্রশ্ন করে বসলো, আগে যখন আসতে পাপ পুণ্য সম্বন্ধে কথা তুলতে দামী কাপড় পরবার ফলে ওসব বুঝি ভুলে গিয়েছ।

এমন প্রশ্ন আশা করেনি জরা তাই উত্তর জোগালো না মুখে। তাকে নীরব দেখে সুবালা বলল, তবেই বুঝতে পারছ পাপ পুণ্য বলে কিছু নেই, মানুষের যখন অবস্থা কিম্বা মন খারাপ হয় তখনই ওসব আগাছা গজায় মাথায়।

এবারে কথা জোগালো জরার মুখে, বলল, তাহলে রাজাদের বেলায় বুঝি পাপ-পুণ্য নেই।

কেন, রাজবাড়ীর ছাদে কি কখনো অশথ গাছ গজায় না। বিশেষ মন খারাপ তো রাজা-গজাদেরও হতে পারে।

তা তোমার মতটা কি শুনি না।

কতবার তো বলেছি। সোজা পথে যারা চলে না তাদেরই মাথায় ওসব আগাছা দেখা দেয়।

কিন্তু সুবালা পথ দীর্ঘ হলে তো সবটা সোজা না হওয়াই স্বাভাবিক।

কি জানি বাপু। আমাদের এগাঁয়ে যে কয় ঘর লোক বাস করি কারো মাথায় ওসব বালাই নেই।

তোমরা তা হলে সুখী।

দুঃখ হতে যাবে কেন?

না, সুবালা, দুঃখ আছে, পাপ আছে, নেই বলে এ সাপের বিষ উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তুমি যদি পাপ করে থাকো তবে এমন সুখে আছ কি করে?

আজ আছি কালকে না থাকতেও পারি। বলে জরা বিদায় নিয়ে পাহাড়ী পথ বেয়ে উঠতে লাগলো। পাশের শুঁড়ি পথ বেয়ে পাথরের চাপড়া মাথায় বন্দী মজুরেরা উঠছে। জরা নিতান্ত আপন মনে না চললে দেখলে দেখতে পারতো সেই দলের দুজন হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো এবং জরাকে ইসারায় দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করলো। শিকারীর নাকে আবার এসেছে শিকারের হারানো গন্ধ।

চিন্তার সমুদ্রে চৈতন্যের ভেলা এই কিছুক্ষণ মাত্র ডুবেছে, জরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এমন সময়ে দুজন মানুষ এসে দাঁড়ালো তার শিয়রে, আলো আঁধারিতে তাদের চেহারার খসড়ার বেশি দেখা যাচ্ছিল না। গবাক্ষপথে আকাশের যে আলোটুকু আসছিল তাতে একবার চকচক করে উঠল একখানা অস্ত্র। কিরীচ হতে পারে। তারা

ইসারায় পরস্পরে কী বলাবলি করলো, হয়তো বা মারতেই চায়। এমন সময়ে ঘুম ভেঙে গিয়ে জরা উঠে বসলো।

কে তোমরা কি চাও, এত রাত্রে কেন?

অতগুলো প্রশ্নের উত্তর কি একসঙ্গে দেওয়া যায়।

এ যে চেনা গলা।

গলাটা যখন চিনেছ তখন মানুষ দুটো ত অচেনা থাকবে না।

কে, নরক আর অসুর নাকি?

হাঁ রাজা, একসঙ্গে নরকাসুর, অলপ্‌ সমাস বলে নরেন্দ্রনগররাজ।

অপরজন বলল, এখন আমাদের দুজন রাজা, নরেন্দ্রনগররাজ, আর আমাদের দলের রাজা। কাকে মেনে চলবো তাই জানতে এসেছি। এবারে জানলে কি চাই?

নরক বলল, রাতে কেন এসেছি বুঝতে কষ্ট হবে না। দিনের বেলায় দশজনের সম্মুখে আমাদের ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ পেলে কি তোমার পক্ষে গৌরবের হতো।

অগৌরব কেন?

তুমি এখন রাজামাত্য আর আমরা দাগী আসামী।

অসুর বলল, যাই বলো, রাজা আমরাই বেশি গৌরব দিয়েছিলাম। ছিলে রাজা হলে রাজামাত্য।

এত রাতে এখন ঠাট্টা রাখো, কি চাও বলো।

কয়েদী কী চায়, মুক্তি।

আমি তার কি করবো।

বলো কি রাজা, এখন তুমি নরেন্দ্র-নগররাজের নয়নের মণি, রাজার রাণী নেই নইলেও তারও ঐ রকম কিছু হতে। তুমি একটু ইঙ্গিত করলেই রাজা খুশি হয়ে আমাদের ছুটি দেবেন।

একবার তো ছুটি নিয়ে গিয়েছিলে ফিরলে কেন?

ভাগ্যে রাজদর্শন লেখা ছিল তাই।

কিন্তু আমি কেন তোমাদের মুক্তির জন্যে ইঙ্গিত করতে যাবো।

নিজের মঙ্গলের জন্যে।

নইলে অমঙ্গল।

অমঙ্গল কি?

মৃত্যু হতে পারে।

রাজার আদেশে?

আমাদের হাতে হতেই বা বাধা কি? এই বলে দেখালো কিরীচখানা।

জরা বলল, মরলে তোমাদের মুক্তির জন্যে ইঙ্গিত করবো কি ভাবে।

এই তো পথে এসো রাজা। আমাদের ছুটি করে দাও, আমরা দেশে চলে যাই, কেউ জানতে পাবে না যে বাসুদেবের হত্যাকারী।

এখানে বসে বসে বাসুদেবের মূর্তি গড়তে সাহায্য করো, মূর্তি প্রতিষ্ঠা করো, চাই কি তার পাশে নিজেরও একটি মূর্তি দাঁড় করিয়ে দাও।

এই বলে নরক হেসে উঠল।

জরা ভাবে উঃ কি নারকীয় হাসি, এ যেন খট্টাসকেও হার মানায়।

আর , যদি রাজার কাছে দরবার না করি।

তবে বাধ্য হয়ে আমাদের করতে হবে। বাসুদেব ভক্ত রাজা নিশ্চয় বাসুদেব হত্যাকারীকে ক্ষমা করবেন না।

দাগী আসামীর কথা রাজা বিশ্বাস করবেন কেন?

সেই কৌস্তুভমণির হারটা কোথায় রাখলে।

জরার মনে পড়লো সীমন্তিনীর স্মৃতি, বলল সেটা আর যেখানেই থাকুক আমার কাছে নেই।

বাসুদেব হত্যার ওটাই প্রধান চিহ্ন, সেটা না থাকায় ওরা কিঞ্চিৎ হতবুদ্ধি হল।

এবারে জরা বলল, আমি যদি ঐ অপরাধে তোমাদের অভিযুক্ত করি।

তবু রাজা আমাদের বিশ্বাস করবেন।

কেন?

একজন সাক্ষীর চেয়ে দুইজন সাক্ষীর গুরুত্ব বেশি।

এধারে অসুর বলল, রাত শেষ হয় রাজা, আর পীরিত চটিও না, রাজাকে বলে আমাদের মুক্তি দাও, নইলে চলো তিনজনেই পালিয়ে চলে যাই।

আমি এ দুয়ের একটাতেও রাজি নই, দৃঢ়ভাবে বলল জরা।

তবে এই নাও বলে হঠাৎ আক্রমণ করলো নরক। কিরীচখানা তার হাতেই ছিল। জরা তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে দেয়ালে ঝোলানো তলোয়ারখানা টেনে নিল। নরকাসুরের ধারণা ছিল শয়নগৃহে রাতেরবেলায় জরাকে নিরস্ত্র পাওয়া যাবে। এরকম ভাবা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু জরা কখনো নিরস্ত্র থাকতো না। তার প্রতি রাজপুরীর লোকদের মনো-ভাবের পরিচয় পেয়েছিলেন নরেন্দ্রনগর-রাজ। তাঁর পরামর্শেই জরা সর্বদা সশস্ত্র থাকতো।

জরা যে অসি চালনায় এমন নিপুণ নরক বা অসুর জানতো না। তাদের ধারণা ছিল ব্যাধের ছেলে শুধু তীর ধনুক চালাতেই জানে। এখন তার অসিতে পটুতা দেখে তড়কে গেল,—কিন্তু আর পিছোবার উপায় নেই।

সেই গভীর রাতের আলো-আঁধারির মধ্যে নরক ও জরা মৃত্যু পণ করে লড়তে লাগলো। অসুর দেখলো নরক এক পা এক পা করে পিছু হটছে, গতিক ভালো নয়। তার উপরে আর এক মস্ত অসুবিধা এই যে এ ঘরটা তাদের পরিচিত নয়—প্রস্থ দৈর্ঘ্য উচ্চনিচতা কিছুই তাদের জ্ঞাত নয়। সেদিন জরাকে দেখবার পরে নিভৃতে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলবার ইচ্ছা তাদের হয়েছিল; সুযোগের সন্ধানে ছিল; আজ বিকালে মাত্র জরার শয়ন ঘরটা আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিল। গভীর রাতে রাজপুরী নিস্তব্ধ হলে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

জরা বুঝে নিয়েছিল যে অস্ত্রধারী মাত্র একজন—তাই নির্ভয়ে লড়ছিল। নরক নিতান্ত অনিপুণ নয় তবে জরার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছিল না। দ্বৈরথ শীঘ্রই শেষ হয়ে গেল, নরকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার বুকে অসিখানা আমূল বিদ্ধ করে দিল জরা। অস্ফুট আর্তনাদ করে সে মাটিতে পড়ে গিয়ে বার দুইচার আপাদ-মস্তক কেঁপে উঠলো, তার পরে স্থির হয়ে গেল।

অসুর তার হস্তচ্যুত তলোয়ারখানা কুড়িয়ে নিতেই জরা তাকে আঘাত করলো। দক্ষিণ হাত শুদ্ধ তলোয়ারখানা সশব্দে মেঝেতে পড়ে গেল। সে চীৎকার করতে করতে গৃহত্যাগ করলো। জরা কি করবে ভাবছে এমন সময়ে তার কানে গেল অসুরের চীৎকার। সে তারস্বরে ঘোষণা করছে ওগো তোমরা সবাই এসো, ভগবান বাসুদেবের হত্যাকারীকে ধরো—শীগগীর এসো, আর এক লহমা বিলম্ব হলেই সে পালাবে।

এই ঘোষণার জন্যে জরা প্রস্তুত ছিল না; সে বুঝলো এই মুহূর্তেই তার ভাবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করতে হবে; লোকজন এসে পড়লে আর রক্ষা নাই। কর্মপন্থা একটিই ছিল—পলায়ন। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পুরীর দেয়াল টপকে বাইরে লাফিয়ে পড়লো, তার পরে অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল সে। এসব এক নিমেষে ঘটে গেল, তখনো অসুরের নিদারুণ ঘোষণার ক্ষীণ রেশ তার কানে আসছিল।

পাহাড়ের পথঘাট জরার জানা হয়ে গিয়েছিল, পাহাড় থেকে নেমে খরসুতি পেরিয়ে, পাথরভাঙা গ্রামের কোণ ঘেঁষে সে ছুটছে। একবার যেন সুবালাদের কুটীরখানার অস্পষ্ট খসড়া তার চোখে পড়লো। সে অবিরাম ছুটছে, অন্ধকারে দিক্‌জ্ঞান সম্ভব নয়, সে সব দিনের বেলায় স্থির করলেই চলবে। এখন নরেন্দ্রনগর ও তার মধ্যে ব্যবধান যত বাড়বে তত বেশি তার নিরাপত্তা। মন্ত্রতাড়িত প্রেতাত্মার মতো ছুটে চলেছে সে।

জীবন-পণ্ডিতের পাঠশালায় পণ্ডিত-মশাই হঠাৎ জেগে উঠে বেতগাছা টেনে নিয়ে পড়োদের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন।

(ক্রমশঃ)

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরতত্ত্ব: ষড়জ-মধ্যম-পঞ্চম

সুধীন মিত্র

স্যার ফ্রান্সিস গালটন একদা এক ধরণের মজার বাঁশী তৈরী করেছিলেন। মানুষ এর শব্দ শুনতে পেত না, কিন্তু কুকুর পেত এবং শব্দের মানে বুঝতে পেরে আদেশ পালন করত ঠিক ঠিক। এর কারণ কি? একই শব্দ অথচ দুজনের ক্ষেত্রে দুরকমের প্রতিক্রিয়া কেন?

আমরা জানি শব্দের উৎপত্তি কম্পন তরঙ্গ থেকে। আমরা যখন কথা বলি, আমাদের কণ্ঠ থেকে একটা কম্পন তরঙ্গ বের হয়ে চারপাশের বাতাসের মধ্য দিয়ে নিজেকে টেনে নিয়ে চলে এবং তা শ্রোতার কানের পর্দায় ধাক্কা দিয়ে তার স্নায়ু উত্তেজিত করে। শ্রোতার মস্তিষ্ক সেই কম্পনতরঙ্গকে বুদ্ধির কাছে পাঠিয়ে দেয়। বুদ্ধি তাকে অর্থ এবং ভাবে রূপান্তর করে তা অনুভব করে। অর্থাৎ তখনই শ্রোতা শব্দকে গ্রহণ করতে ও একই সঙ্গে মানে বুঝতে পারেন। কথা বলবার সময় বক্তার গলার জোর যত বাড়ে, কম্পন তরঙ্গের সংখ্যা তত বেশী হয়। অপরদিকে আস্তে গলায় কথা বললে কম্পন তরঙ্গের সংখ্যা হয় কম।

সাধারণ হিসেব তুলে ধরে বলা হয়ে থাকে, বাতাসকে প্রতি সেকেণ্ডে পঁচিশ বারেরও কম কাঁপিয়ে যে শব্দ আমাদের কানে আসতে চায় তা যেমন সাধারণ কান শুনতে পায় না, তেমনি প্রতি সেকেণ্ডে বাতাসকে চল্লিশ হাজারেরও বেশী বার কাঁপিয়ে যে শব্দ ওঠে তাও আমরা শুনতে পাই না। অবশ্য এ হিসেবটা অনুমান-ভিত্তিক। কারণ শোনবার ক্ষমতা সকলের সমান নয়। আমার কানের যন্ত্র খুবই শক্তিশালী, সামান্য শব্দ হলেও তা আমি শুনতে পাই। একজন বধিরের কানের কাছে চেঁচিয়ে কথা বললেও সে শুনতে পায় না। ঠিক একই কারণে গালটন সাহেবের বাঁশী কুকুর শুনতে পেত যদিও মানুষের কানে তার রেশ একেবারেই পৌঁছত না।

কিন্তু কার কানে পৌঁছল আর কার কানে পৌঁছল না, কে শুনতে পেল বা কে পেল না তা নিয়ে শব্দের অত মাথাব্যথা নেই। কেউ শুনলেও শব্দ আছে, কেউ না শুনলেও তাই। চরাচর ব্যাপ্ত করে শব্দ শ্রবণ-নিরপেক্ষ হয়ে বিরাজ করছে বলে ইংরাজী প্রতিশব্দ সাউন্ড-এর সঙ্গে তাকে এক পংক্তিতে বসানো চলে না। শব্দ যখন তার কম্পন তরঙ্গ সংখ্যাকে সীমার মধ্যে বেঁধে শ্রবণযোগ্য করে তখনই তা সাউন্ড হয়। শব্দ আরও ব্যাপক।

শব্দের এই ব্যাপকতাকে ভারতবর্ষের ঋষিরা মনপ্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা শব্দকে বলেছেন 'স্পন্দন'। শব্দ তার স্পন্দন নিয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে বশ করে ফেলেছে। শ্রোতার কানে যে শব্দ ধরা পড়ল তার তুলনায় যা পড়ল না তার জগতটাই আকারে বৃহৎ।

শিক্ষাকার পানিনী শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা যেমন দার্শনিক, তেমনি বিজ্ঞানসম্মত। তাঁর মতে, 'আত্মা বুদ্ধ্যাসমেত্যার্থান্ মনো যুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া। মনোঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম। মারুতস্তুরসি চরণ মন্দ্রং জনয়তি স্বরম্।'

অর্থাৎ আত্মা চেতনার সঙ্গে মিলিত হয়ে মনকে প্রেরণ করে, মন দেহের অগ্নিকে জ্বালিয়ে দেয়, সেই অগ্নি প্রাণবায়ুকে প্রেরণ করে, প্রাণবায়ু উরদেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নাদ বা শব্দের সৃষ্টি করে। স্বরের উৎপত্তি সেই নাদ থেকেই। চৈতন্যযুক্ত আত্মার সঙ্গে মন এসে যোগ দিলে অগ্নি অর্থাৎ শক্তির উদ্বোধন হয়। এই শক্তি থেকেই প্রাণবায়ু সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। শব্দের নিগূঢ় রহস্য প্রাণবায়ুর এই সঞ্জীবনী শক্তির মধ্যে।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে রচিত 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থে শার্ঙ্গদেব শব্দ ও স্বরের জন্মকথা আরও বিশদভাবে বলেছেন। শার্ঙ্গদেবের মতে, আত্মা চেতনার আলোয় দীপ্ত হয়ে মনকে প্রেরণ করে। মন দেহের অভ্যন্তরে যে আগুন রয়েছে তাকে জ্বালিয়ে প্রাণবায়ুর কাছে পাঠিয়ে দেয়। প্রাণবায়ু দেহের উর্ধ্বমূলে চলতে চলতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ধ্বনির সৃষ্টি করে। এই ধ্বনিই নাদ বা শব্দের জন্মদাতা। নাদ অব্যক্ত হলে তাকে সূক্ষ্মশব্দ বলে, ব্যক্ত হলেই তাকে বলে স্বর।

তন্ত্রশাস্ত্র শব্দের ব্যাখ্যায় আরও এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে। তন্ত্রমতে শব্দ শক্তির আধার। শক্তি তিনরূপে আপনাকে প্রকাশ করে। একদিকে সৃষ্টিকে পূর্ণ করে তোলা তার কাজ, অপরদিকে শূণ্য করা। মাঝখানে থাকে স্থিতিশক্তি। তার সমতা রক্ষা করে সে। শব্দ এই শক্তির বিকাশকে পূর্ণতম করে। পৃথিবীর আদি শব্দ ওঁকার তাই এই তিনরূপেরই সমাহার।

শব্দকে বলা হয় আকাশের গুণ (Quality of Æther)। বর্ণাত্মা ও ধ্বন্যাত্মক —এই দুটি ভাগে তাকে বিভক্ত করা যায়। অনাহত শব্দ ধ্বন্যাত্মক শব্দের উপাদান। একেই বলা হয়েছে শব্দব্রহ্ম। দেহস্থ কোনও অংশে আহত না হয়ে বা ধাক্কা না খেয়ে যে শব্দের জন্ম, তা-ই অনাহত শব্দ। অন্যদিকে বাক্য, পদ বা বর্ণ নিয়ে বর্ণাত্মক শব্দ গঠিত। বর্ণাত্মক শব্দ সেই কারণে অর্থের দ্বারা সীমিত।

আমাদের দেহের মধ্যে সূক্ষ্ম, কারণ ও স্থূল শরীর রয়েছে, শব্দেরও তেমনি রয়েছে চারটি অবস্থা। এগুলির নাম যথাক্রমে পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরী। পরা শব্দের উৎপত্তি মহাবিন্দু থেকে। কুণ্ডলিনী শক্তির মধ্যে এর অবস্থান। স্থির এবং অচঞ্চল পরাশব্দ হল শব্দের সমাধিস্থ রূপ। এই শব্দ অনন্ত ও অবিনাশী। পশ্যন্তী বা সামান্য স্পন্দ শব্দ এসেছে পরাশব্দ থেকে। পশ্যন্তী শব্দ বাস করে মূলাধার চক্র থেকে মণিপুর চক্রের মধ্যে। মনের সঙ্গে পশ্যন্তী সংশ্লিষ্ট। শব্দের ঈশ্বররূপ বলে একে বর্ণনা করা হয়েছে। মধ্যমা শব্দ বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত।

মণিপুর চক্র থেকে হৃদয় পর্যন্ত এর এলাকা। এরই এক নাম হিরণ্যগর্ভ শব্দ। মধ্যমা শব্দ যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে স্থূল বাক্যের সাহায্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে তখন তাকে বৈখরী শব্দ বলে। বৈখরীকে কেউ কেউ বিরাট শব্দও বলে। বিরাট শব্দ মধ্যমা শব্দেরই স্থূল অভিব্যক্তি। ইচ্ছাশক্তি থেকে জন্ম নিয়ে বৈখরী শব্দ স্পন্দনের আকারে কণ্ঠে পুষ্ট হয় এবং বর্ণ ও বাক্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

দেখা যাচ্ছে, চেতনা থেকে ইচ্ছা, ইচ্ছা থেকে কম্পন, কম্পন থেকে নাদ বা শব্দ এবং সবশেষে শব্দ থেকে এল স্বর।

সঙ্গীতের ইতিহাসে স্বরের আবির্ভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ সলিলে সৃষ্টি তখন রহস্যাবৃত। জীবনের অস্তিত্ব তখনও অনুপস্থিত। সূর্যের থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বিশ্ব তখন গলিত ও উত্তপ্ত।

যুগের পর যুগ পার হয়ে গেল। শান্ত ও শীতল হল পৃথিবী। জলে সাঁতার কাটল মাছ, আকাশে উড়ল পাখী, বনে বনে অতিকায় বন্যপ্রাণীদের পদক্ষেপে পায়ের তলার মাটি উঠল কেঁপে। সমস্ত স্তব্ধতা ভঙ্গ করে শব্দে শব্দে ভরে উঠল ভুবন। পাখীদের কণ্ঠে, জলের মাছের পাখনার শব্দে, বন্যপ্রাণীদের চলার ছন্দে, যে বৈচিত্র্য এল তার মধ্য দিয়েই সুরের প্রথম অভ্যুদয় প্রাণের সমাজে ঘটল। আবিষ্কারের চিন্তা তখনও অনেক দূরের ব্যাপার ছিল। সুরকে স্বর দিয়ে বেঁধে রাখবার কথা ভাববার কোনও অবসর তখনও ছিল না। মানুষ তখনও তার অনুসন্ধানী প্রজ্ঞা নিয়ে হাজির হয় নি।

সৃষ্টির শেষ ধাপে এল মানুষ। জয় করে নিল সমস্ত প্রকৃতি। প্রাণের বিকাশ শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠা পেল। প্রাণের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলল সভ্যতা। আপনার স্বরূপকে জানবার আগ্রহ মানুষের মনে জেগে উঠল। মানুষ দেখল বিশ্বপ্রকৃতির মহলে মহলে তার চিত্তপ্রকৃতি আপনাকে সঞ্চার করে দিয়েছে। মানুষ আরও দেখল, বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণের কেন্দ্রে তার চিত্তপ্রকৃতিকে স্থায়ী করে রাখতে হলে তাকে সুরের বিন্দুতে স্থাপন করা দরকার। মানুষের এই উপলব্ধি থেকে সুরের অন্বেষণ আরম্ভ হল।

অন্বেষণের প্রথম স্তরেই একথা বোঝা গেল, হৃদয়ের আদান-প্রদানই হচ্ছে আত্মীয়তাকে নিবিড় করবার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পথ। আবার সুরের আদান-প্রদান হৃদয়ের আদান-প্রদানের সবচেয়ে নিকট মাধ্যম। কারণ সুরের আবেদন সরাসরি হৃদয়ের কাছে। মস্তিষ্কের কাছে তাকে পরিচয়পত্র পেশ করতে হয় না। প্রকৃতির সুরকে আপন করে নেবার তাই চেষ্টা চলল নিরন্তর। দেখা গেল, প্রকৃতির সুরকে গ্রহণ করতে হলে, তার যে যে জায়গায় সুর লুকিয়ে আছে, সেখানে প্রবেশ করতে হবে আহরণের মনোভাব নিয়ে। কার্যতঃ প্রকৃতির এই সুর আছে ময়ূরের ডাকে, কোকিলের কুহুশব্দে, অশ্বের হ্রেষায়, আছে নদীর ছলোছলে আর মেঘের গর্জনে। এদের কাছে আত্মীয়তার বন্ধন স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হল না মানুষ। কণ্ঠে এদের ধ্বনি ধারণ করল। এই ধ্বনিকে সুশৃঙ্খলভাবে স্থায়ী করতেই স্বরের আবিষ্কার হল।

সঙ্গীতের ইতিহাসে স্বর-আবিষ্কারের অধ্যায় মোটামুটি এখান থেকেই শুরু হয়েছে। বর্তমানে আমরা সাত স্বরের যে মার্জিত রূপ পাই, তখন কিন্তু তেমন ছিল না, থাকা সম্ভবও নয়। আজকের সাতস্বর শ্রুতি, মূর্ছনা ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়ে একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত হয়েছে।

সঙ্গীতের প্রথম যুগের নাম আর্চিক যুগ। একটিমাত্র স্বর দিয়েই মনের ভাবপ্রকাশের কাজ এ যুগে মানুষকে চালিয়ে নিতে হত। আর্চিকের পর গাথিক যুগ এল দুই স্বর নিয়ে। আবার চলল গবেষণা। সামিক যুগে তিন স্বরের আবিষ্কার হল। ক্রমশ এল স্বরান্তরের যুগ অর্থাৎ চার স্বরের যুগ, ঔড়ব বা পাঁচ স্বরের যুগ। ষাড়ব যুগের শুরু হল ছয় স্বরকে সঙ্গে নিয়ে। সবশেষে সম্পূর্ণ যুগে এসে পড়ল। সাতটি স্বর আপন সুরের সাতটি পাঁপড়ি মেলে দিয়ে বিশ্বসঙ্গীতের আত্মাকে নন্দন সৌন্দর্যে ভরিয়ে তুললে।

স্বরের জন্মকথা প্রসঙ্গে একটি বিতর্ক আজও চলে আসছে। আমরা শুনেছি আর্চিক যুগ এক স্বরের যুগ। কিন্তু এটি কোন্ স্বর এ সম্বন্ধে নানা পণ্ডিত নানা মতবাদ পোষণ করে থাকেন। অন্যান্য যুগের স্বর সম্বন্ধেও একই ধরনের বিতর্কের অবকাশ আছে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে নির্ভরযোগ্য মনে করলে বলতেই হয়, আর্চিক যুগে আবিষ্কৃত স্বরটি মধ্যম। গাথিক যুগে মধ্যমের সঙ্গে পঞ্চম এসে মিলল। সামিক যুগে মধ্যম, পঞ্চম ও ষড়জের যুগ। তারপর এল স্বরান্তরের যুগ। মধ্যম, পঞ্চম,ষড়জ এবং গান্ধার—এই চারিটি স্বর এ যুগের স্বর। অতঃপর ঔডব যুগে চারিটি স্বরের সঙ্গে ঋষভ এসে যুক্ত হল। ষাড়ব যুগে এদের সঙ্গে সংযোজিত হল নিষাদ স্বরটি। সম্পূর্ণ যুগে ধৈবৎ স্বরটিকে নিয়ে সাতটি স্বর সঙ্গীতের ব্যঞ্জনাকে গভীর করে তুলল।

সঙ্গীতের জগতে সাতটি স্বরের প্রত্যেকেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রত্যেক স্বরই আত্মাকে জড়ত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে আপন আপন দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাচ্ছে। তবুও এরই মধ্যে একটু মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলে যেটা চোখে না পড়ে পারে না, তা হল, ভারতীয় সঙ্গীতসাধকেরা সাতটি স্বরের মধ্যে মধ্যম, পঞ্চম ও ষড়জকেই একটু বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখেছেন। আমাদের সঙ্গীতে এই স্বর তিনটি যেন অধিকতর সম্মানের স্থান অধিকার করে বসে আছে। কিন্তু কেন? এ সম্মান কি ভিত্তিহীন?

কোনও বিশেষ স্বরকে যথার্থ মূল্য দিতে হলে সেই বিশেষ স্বরটির আবেদনকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের কষ্ঠিপাথরে যাচাই করে নিতে হবে। দেখতে হবে, স্বরটির প্রয়োগমূল্য কতখানি। বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে মানবচৈতন্যের যোগসূত্র রচনায় সে কতটা কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

ভারতীয় জীবনধারায় স্বাভাবিকভাবেই নিখিল প্রকৃতিকে মানবপরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা আনন্দের দিনে আকাশকে সঙ্গী করেছি, আনন্দের ভাগ দিয়েছি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অণুপরমাণুকে। দুঃখের মুহূর্তে বাতাস সমবেদনা জানিয়েছে, সমস্ত সৌরমণ্ডল কান্নার সুরে সুর মিলিয়েছে। সঙ্গীতের স্বরগুলিও তাই তত বেশী শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছে যত সে আকাশের কাছে, বাতাসের কাছে, এককথায় বিশ্বপ্রকৃতির মধ্য দিয়ে সমগ্র মানব, অন্তরাত্মার কাছে ঋণ স্বীকার করেছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে মধ্যম, পঞ্চম ও ষড়জকেই অপর চারিটি স্বরের তুলনায় সর্বব্যাপী বলে মনে হয়।

প্রথমেই ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরগুলির উপর যে তান্ত্রিক বর্ণবীজ আরোপ করা হয়েছে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্। বিশ্লেষণের পূর্বে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য হিসেবে তন্ত্রসাধনা সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু কথাবার্তা সেরে নেওয়া যেতে পারে।

আমাদের দেহকাণ্ডকে ঘিরে যে সমস্ত নাড়ী শাখা-প্রশাখার মতো পল্লবিত হয়ে দেহের অন্তর্নিহিত সজীবতাকে বহন করে রয়েছে—আমাদের তন্ত্রসাধনায় তাদের চালনা করবার প্রণালী তুলে ধরা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে এদের সংযত নিয়ন্ত্রণের ফলে কেমন করে অসাধ্যসাধন করা যায়। এদের মধ্যে সুষুম্না নাড়ী ইড়ার ডানদিকে ও পিঙ্গলার বাঁদিকে অবস্থিত হয়ে মস্তক পর্যন্ত প্রসারিত। তান্ত্রিক বীজ হিসেবে 'অ' থেকে 'হ' পর্যন্ত যে বর্ণগুলি ব্যবহার করা হয়, আপাতদৃষ্টিতে সেগুলি অর্থহীন বলে মনে হলেও আসলে এদের ধ্বনি ও ভাব দেহের অভ্যন্তরের নাড়ীগুলিকে কঠোর ছন্দে বেঁধে দেহযন্ত্রকে সংযত রাখে।

অঙ্কশাস্ত্রে বলা হয়েছে, আমাদের দেহে ছ'টি চক্র আছে। এগুলি যথাক্রমে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। নিজ নিজ চক্রের মধ্যে অবস্থিত হয়ে এরা ধ্বনির মাধ্যমে কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও পরোক্ষ প্রভাব রেখে যাচ্ছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুত, ব্যোম—এই পঞ্চভূতের উৎপত্তি ব্রহ্ম থেকে। উপরোক্ত ছ'টি চক্রের উৎস আবার পঞ্চভূতেই নিহিত। 'বিশুদ্ধ' চক্র কণ্ঠদেশে, 'অনাহত' হৃদয়ে, 'আজ্ঞা' ভ্রূ-র মাঝখানে, 'মণিপুর' চক্র নাভিমূলে, 'স্বাধিষ্ঠান'

লিঙ্গমূলে, এবং 'আধার' বা 'মূলাধার' চক্র পায়ুদেশের কিছুটা ঊর্ধ্বে অবস্থিত। 'অ' থেকে 'অঃ' পর্যন্ত ষোলটি বর্ণ স্থান পেয়েছে 'বিশুদ্ধ' চক্রে, 'অনাহত' চক্রে পেয়েছে 'ক' থেকে 'ঠ' পর্যন্ত বারোটি বর্ণ, 'মণিপুর' চক্রে 'ড' থেকে 'ফ' দশটি বর্ণ, 'স্বাধিষ্ঠান' চক্রে এসেছে 'ব' থেকে 'ল'—এই ছয়টি বর্ণ এবং 'মূলাধার' চক্র গ্রহণ করেছে 'ভ' থেকে 'স' পর্যন্ত চারিটি বর্ণ। 'আজ্ঞা' চক্রে আছে 'হ' এবং 'ক্ষ' বর্ণ দুটি। প্রতিটি চক্রের সঙ্গে তাদের মধ্যস্থিত বর্ণগুলির অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। চক্রগুলির কর্মশক্তি বর্ণগুলির ধ্বনি ও উচ্চারণের সঙ্গে জড়িত। বর্ণগুলি চক্রগুলিকে এমনভাবে বেঁধে রেখেছে যে বর্ণগুলি উচ্চারণ করলেই তাদের ধ্বনিমাহাত্ম্যে চক্রগুলির কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। সংস্কৃত বর্ণমালার অক্ষরগুলি দেহের বিভিন্ন অংশে এদের ক্রিয়া অনুসারে পাঁচ ভাগে বিভক্ত। কণ্ঠ, তালব্য, মূর্ধা, দন্ত্য, ও ওষ্ঠ্য এই বিভাগের অন্তর্গত। বিশেষ বিশেষ বিভাগগুলির মধ্যে যে বিশেষ বিশেষ বর্ণগুলিকে বসানো হয়েছে, তাদের সঠিক উচ্চারণে তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিশেষ বিশেষ চক্রগুলির উপর ছাপ পড়ে যায়। যেমন 'হ' উচ্চারণ করলে তা 'আজ্ঞা' (মস্তিষ্ক)কে স্পর্শ করে, 'ভ' উচ্চারণ করলে 'মূলাধার'কে স্পর্শ করে।

আমাদের সঙ্গীত প্রত্যেক স্বরের পেছনে একটি করে তান্ত্রিক বীজ মন্ত্র রয়েছে, তারও মূল উদ্দেশ্য হল ধ্বনির প্রভাব প্রয়োগের দ্বারা সঙ্গীতসাধকদের দেহের বিভিন্ন অংশগুলিকে শক্তির ঐশ্বর্যে অলঙ্কৃত করে স্বরের মাধুর্যকে পবিত্র রাখা। তা রাখতে পারলে স্বরগুলি সর্বাধিক শ্রুতিমধুর হবে।

ষড়জের তান্ত্রিকবীজ 'ল', মধ্যমের 'ম' এবং পঞ্চমের 'প'। ষড়জ স্বরের উৎস স্বাধিষ্ঠান চক্রে. মধ্যমের মূলাধার চক্রে এবং পঞ্চমের মণিপুর চক্রে। শক্তির অফুরন্ত যোগান দেয় মধ্যম এবং তার মাঝখানে কুন্ডলিনী শক্তির বাস। পঞ্চমের উৎস নাভিমূলে. সৃষ্টির সমস্ত রহস্য যেখানে আত্মগোপন করে আছে। ষড়জ্ এদিক থেকে পৃথিবীর মাটির সঙ্গে যোগ রেখেছে। যেখানে স্বর্গ ও পাতাল এক হয়েছে, পঞ্চভূতেরা যেখানে কোনও না কোনওভাবে নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছে, ষড়জ্ সেই জগতের। ষড়জ্, মধ্যম ও পঞ্চমকে যদি পুষ্ট করা যায় অর্থাৎ নাভি, মূলাধার এবং স্বাধিষ্ঠান চক্রের শক্তির কর্মতৎপরতাকে যদি অধিকতম ত্বরান্বিত করা যায়, তবে অন্যান্য স্বরগুলিকে আয়ত্তে আনবার শক্তি সঞ্চয় অনায়াসসাধ্য হয়। প্রাণের যা কিছু শক্তি প্রাণের ভেতরেই আছে, তার বাইরে নয়, আর শব্দ তার ধ্বনির মাধ্যমে সেই শক্তিকে মন্দ্রিত করে স্বরের কেন্দ্রে তাকে স্থাপন করেছে। তান্ত্রিক বীজমন্ত্রের বর্ণগুলির দ্বারা স্বরগুলি এইভাবে উপকৃত হচ্ছে।

তান্ত্রিক বর্ণবীজ ভেতরের দিক দিয়ে স্বরগুলিকে ধ্বনিমান করে দেহের বিভিন্ন অংশকে জাগ্রত করছে। সঙ্গীতের স্বরের পেছনে যে বর্ণ বা রঙের কল্পনা করা হয়েছে সেগুলিও সঙ্গীত-সাধকের মনস্তত্ত্বের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করে তার শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতাকে সারিয়ে তুলছে। এবং এখানেও মধ্যম, পঞ্চম ও ষড়জের স্থান অন্যান্য চারিটি স্বরের অনেক উপরে।

বিজ্ঞান বলে, সূর্যের আলো সাতরঙের সমষ্টি। সাতটি রঙকে সমান অনুপাতে মিশিয়ে ফেললে সাদা রঙকে পাওয়া যায়। কালো রঙ পাওয়া যাবে যদি কোনও অদৃশ্য ব্লটিং পেপার দিয়ে সূর্যের আলো থেকে সাতটি রঙকেই শুষে নেওয়া সম্ভব হয়। সাত রঙের মধ্যে লাল, নীল ও হলদে হল মৌলিক। সাদা রঙকে যদি পূর্ণতার প্রতীক বলে ধরে নিই, কালো তাহলে শূন্যতার স্থান নিতে পারে নিশ্চয়ই। অবশ্য, আমাদের দর্শনশাস্ত্রে শূন্যতাকে কোনও অংশেই খাটো দেখানো হয়নি। সৃষ্টিতত্ত্বে প্রলয় ত শূন্যতাকেই মর্যাদা দিয়েছে। সৃষ্টি এবং প্রলয়—পূর্ণতা ও শূন্যতার ভারসাম্য রক্ষা করছে স্থিতিশক্তি। সে দেখছে, কেউ যেন অপরকে ছাড়িয়ে না যায়। শূন্যতা এবং পূর্ণতা একই পরিপূর্ণতার দুই সমান ভগ্নাংশ। বর্ণের দিক দিয়ে বিচার করলে তাই সাদা ও কালো এই দুটি রঙই বর্ণজগতে মহামান্য অতিথির আসন গ্রহণ করতে পারে, যা মৌলিক বলে স্বীকৃত হলেও হলুদ বা নীল রঙ পারে না। পারে না সবুজ, বেগুনী বা ঐ ধরনের রঙগুলিও।

লাল রঙ-এর ব্যাপারটা এক্ষেত্রে কিছু পৃথক। ভিড়ের মাঝে সে হারিয়ে যায় না। সমতারক্ষক বর্ণ হিসেবে তার খ্যাতিও আছে। বর্ণের রূপময়তা যখন রূপহীনতার অথৈ সমুদ্রে ভাবের নৌকো ভাসিয়ে অনন্তের পথে যাত্রা করে, লাল রঙ তাকে আলোকস্তম্ভের মতো পথ দেখিয়ে বলে, 'এইবার তোমাদের রূপলীনতার রাজ্যের সীমানা আরম্ভ হল।' কথাটাকে ব্যাখ্যা করা যাক।

পরমাণুর কেন্দ্রে বাস করে নিউক্লিয়াস। এ বুঝি একই সংসারে মিলে মিশে বাস করা। সংসারের অন্যান্য সভ্য হল নিউট্রন আর প্রোটনের দল। নিউক্লিয়াসের চারপাশ দিয়ে উপবৃত্তের মতো প্রচন্ডবেগে ঘুরছে ইলেকট্রন। নিউট্রন 'হ্যাঁ'-তেও নেই, 'না'-তেও নয়। কিন্তু ইলেকট্রনের প্রকৃতি প্রোটনের সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রোটন ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত, ইলেকট্রন ঋণাত্মক। ইলেকট্রনের ঋণাত্মক তড়িৎকে প্রোটনের ধনাত্মক তড়িৎ নাকচ করে। সেটা আবার কেমন? মনে করা যাক, আমি বেচারা বড়ই দুর্বল। প্রোটন আমাকে কিছু শক্তি দিল। আমি নিজেকে শক্তিশালী ভেবে আনন্দে গদগদ, ঠিক সেই সময় ইলেকট্রন সেই শক্তিটুকু আমার কাছ থেকে কেড়ে নিল। আমি আবার দুর্বল হয়ে পড়লাম। আমার অবস্থা—'যথা পূর্বং তথা পরং'। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই, যে বিদ্যুৎ শক্তি যোগ করে চলে তাকে বিজ্ঞানের ভাষায় 'ধনাত্মক তড়িৎ' বলা হয়েছে, অপরদিকে শক্তিকে ক্ষয় করে যে বিদ্যুৎ তা-ই ঋণাত্মক তড়িৎ। এই যোগ-বিয়োগের দরুন পদার্থমাত্রেই তড়িৎসম্পন্ন হয় না। কিন্তু এরও ব্যতিক্রম আছে। বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে ইলেকট্রন মাঝে মাঝে কেন্দ্রশক্তির (কেন্দ্রাতিগ বলের) কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তখন তার শক্তি খানিকটা বেরিয়ে যায়। একেই ইলেকট্রন বিকীরণ বলে। এই বিকীরণের ফলে ইথারের উপর যে কম্পনতরঙ্গের সূচনা করে, সেই তরঙ্গ সংখ্যার উপরই নির্ভর করে রঙের নাম। এই তরঙ্গ সংখ্যাগুলিকে একটা সীমার মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন—এই উভয়-সীমার মধ্যবর্তী কম্পনতরঙ্গগুলিকেই আমরা রঙ বলে মেনে নিই। সাদা সমস্ত রঙের কম্পনতরঙ্গের মিলিত রূপ। লাল ন্যূনতম কম্পন সংখ্যাবিশিষ্ট বর্ণ। রঙ বলে মেনে নিতে পারি এমন কম্পন তরঙ্গের ন্যূনতম সংখ্যাও যেখানে গরহাজির তাকেই কালো বলে চিহ্নিত করা হয়। কাজেই রঙের জগতে কালো, লাল ও সাদা বিশেষ খাতির দাবী করতে পারে।

সূর্যের আলো থেকে যে সাতটা রঙ বিশ্লেষণ করা হয়, তার মধ্যে সাদা ও কালোকে ধরা হয় না। এর কারণ কী? সাদা ও কালো তবে কি রূপের অতীত? কোনও কম্পনতরঙ্গের সীমারেখায় এ দুটি রঙকে কি বেঁধে রাখা যায় না? না কি বৈজ্ঞানিকের দল সীমাতীতকে সীমার মধ্যে বন্দী করে তাদের উপর অবিচার করতে চান নি? ঘটনা যা-ই হোক, ব্যাখ্যাটা এভাবে করতে সত্যিই ভাল লাগে।

আলোর মধ্যে ধরা পড়ে যে সাতরঙ, পুরাণে যাকে বলেছে সপ্তাশ্ব, তাদের চুলচেরা হিসেব নিলে দেখা যাবে; স্থিতিস্থাপক লাল রঙ অন্য ছয় রঙের চাইতে অনেক বেশী প্রাধান্য লাভ করেছে। লাল রঙের জীবনীশক্তি অন্য সব রঙকে ছাপিয়ে উঠেছে। অনেক বেশী গতিসম্পন্ন সে। সচল মনকে একাগ্র করতে তার জুড়ি নেই। মানুষের মনে যতখানি তার তুলনাহীন প্রভাব, জীবজগত ও জড়জগতেও ঠিক ততখানি। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত যে, লাল রঙের পরিবেশে অঙ্কুরিত শস্য অন্যান্য রঙের পরিবেশে রাখা শস্য অপেক্ষা দীর্ঘতর ও সজীবতর হয়।

প্রভাবের কথাই যদি উঠল তবে বলতেই হবে লাল আমাদের মনোস্তত্ত্বে যে কী বিচিত্র ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখেছে, আমাদের সমাজে বিবাহ অন্নপ্রাশন বা ঐ ধরনের শুভ ও পবিত্র উৎসবের নিমন্ত্রণ পত্রে আজও লাল কালির ব্যবহার তার সাক্ষ্য দেবে। এ ছাড়া লাল রঙ হৃদযন্ত্রকে সবল করে। হৃদযন্ত্র বিকল হলে বর্ণ-চিকিৎসকেরা রোগীকে লাল রঙ-এর পরিবেশে রাখবার পরামর্শ দেন।

বর্ণতত্ত্বে সাদা, কালো ও লাল অন্যান্য রঙের চাইতে স্বতন্ত্রতর, সঙ্গীতের স্বর-

তবুও মধ্যম, পঞ্চম ও ষড়জ—এই তিনটি শ্রেষ্ঠ স্বরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে সাদা, কালো ও লাল, এই তিনটি শ্রেষ্ঠ বর্ণের কল্পনা করা হয়েছে। ছান্দোগ্যে বলা হয়েছে—'ত্রীণি রূপানীত্যেব সত্যম।' তিনটি বর্ণই সত্য, বাকী সব বিকৃত।

শিক্ষাকার নারদ মধ্যমকে আদিস্বর বলেছেন। মধ্যমের বর্ণ সাদা তাই অত্যন্ত ব্যাপক। এত ব্যাপক যে আকাশ ছাড়া আর কারও এত ক্ষমতা নেই তাকে ধারণ করে। আকাশই মধ্যমের দেবতা। শার্ঙ্গদেবের মতে, আত্মা আকাশকে জন্ম দিয়েছে, আকাশ জন্ম দিয়েছে অগ্নি ও তেজকে, অগ্নি ও তেজের মধ্যে পৃথিবীর জন্মরহস্য লিখিত। সাংখ্যদর্শন ও তৈত্তীরেয় উপনিষদেরও সেই কথা। অতএব আত্মাকে যদি বলি কারণ নাদ, তবে আত্মার সবচেয়ে কাছাকাছি রয়েছে আকাশ, তেজ ও পৃথিবী। তেজ বা শক্তির প্রকাশক হল সূর্য। মধ্যমের দেবতা আকাশের কথা আগেই বলা হয়েছে। পঞ্চমের দেবতা সূর্য এবং ষড়জের পৃথিবী। সংগীতের আত্মার নিকটতম আত্মীয় হল এরা। ষড়জ ও পঞ্চমের অন্য গুরুত্বও আছে। এরা অবিকৃত। স্থিতিস্থাপক স্বর হিসেবে ষড়জ আকাশ ও সূর্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। প্রত্যেক স্বরের সঙ্গেই তার বন্ধুত্বের গাটছড়া বাঁধা। রাগবিবোধকার সোমনাথ ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চমকে স্বয়ং সৃষ্ট বলে সম্মানিত করেছেন। সিংহভূপালের মতে, মধ্যম স্বর দেবকুলে উৎপন্ন। সুতরাং উত্তরাঙ্গ ও পূর্বাঙ্গের যে সমস্ত রাগ-রাগিনী আছে, তাতে ষড়জ, মধ্যম এবং পঞ্চমই (স-ম-প) আসর জাঁকিয়ে বসে আছে।

ভারতীয় সংগীতকারদের এই স্বীকৃতি-দান কোনও অলীক উচ্ছ্বাস নয়। আমাদের অধ্যাত্মবাদ আমাদের জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, আমাদের সংগীতও আমাদের জীবনকে বাদ দিয়ে চলে না। ভারতীয় সংগীত তাই এত নিটোল, এত অর্থবহ। জীবন, আধ্যাত্মিকতা ও সংগীত পরস্পরের সঙ্গে একসূত্রে আবদ্ধ। যখনই বন্ধন শিথিল হবে বলে আশংকা হয়েছে, তখনই চলেছে পুনরায় ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা। সংগীতের স্বরগুলিকে অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত করবার জন্য গবেষণা চলেছে অবিরাম। ফলে, আমাদের সংগীতে যা কিছু বিবর্তন, সবই বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে আপন সত্তাকে মুক্ত করার প্রয়াস।

এই প্রচেষ্টা যে কত আন্তরিক, তার প্রমাণ হল চেতন-অচেতন সমস্ত পদার্থের পেছনে ভারতীয় সত্যদ্রষ্টাদের তিন রূপের কল্পনা। এই তিন রূপ যেন সমগ্রতার ধারক। দুইদিকে দুই চরম প্রান্তসীমা, মাঝখানে সংহত কেন্দ্রবিন্দু। একদিকে স্থিতি, অপরদিকে গতি, মাঝখানে স্থিতিস্থাপক সংযমবন্ধন।

বিজ্ঞানের দোহাই না দিলে আমরা হাল আমলের আধুনিকেরা কোনও কথাই সহজ মনে নিতে পারি না। এখানে তাই বলে রাখা ভাল বিজ্ঞানও পদার্থের তিন অবস্থার কথা স্বীকার করে। কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়—এই তিন অবস্থাতেই সৃষ্টির যাবতীয় রূপান্তর ঘটছে। আত্মার কম্পন থেকেই প্রাণের সৃষ্টি। কম্পন নির্ভর করে গতির বেগের উপর। গতির ধ্বংস অসম্ভব। ক্ষেত্রবিশেষে তার পরিবর্তন অবশ্যই আছে। সেই পরিবর্তন কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়—এই তিন অবস্থার মধ্যেই চক্রাকারে আবর্তন করে।

বিশ্বের প্রতিটি পদার্থের বহিরঙ্গ রূপকে বিজ্ঞান কঠিন তরল ও গ্যাসীয় বলে বর্ণনা করেছে। সেটা ঠিক। তবুও বৃহত্তর জীবনের পটে বহিরঙ্গ রূপের ভূমিকা ত তার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। স্থূল বহিরঙ্গ রূপের পেছনে বিরাজ করছে সূক্ষ্মতম অন্তরঙ্গ রূপ। এই রূপকেও যদি তিন অবস্থায় বেঁধে ফেলা যায় তবে কবিতার ছন্দে চলবে বিশ্ব। ত্রিত্ববাদ সঙ্গতকারণেই আকৃতিকেই নিয়েই সন্তুষ্ট নয়, প্রকৃতিকেও সে যথেষ্ট মূল্য দেয়। সংগীতের তিনটি স্বর ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম, এদের বর্ণ লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ। মানবিক তিনটি ভাব সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমোর সঙ্গে এদের প্রকৃতিগত মিল রয়েছে। অন্তরপ্রকৃতির এক-দিকে ভাল, অন্যদিকে মন্দ, মধ্যবিন্দু রজঃ ভালো-মন্দের মিশ্রিত ঐক্য রূপ। এই তিনের মিলিত মাধুরীতে স্নিগ্ধ হয়েছে ভারতীয় সংগীত। চিত্তের অনুভূতিকে প্রকাশময় করে জীবন ও দর্শনের মতো আমাদের সংগীতও বিশ্বরসিকের রসের আকর হয়েছে।

ভরত বলেছেন, অনুভূতির বস্তু রস। বিশ্বপ্রকৃতি ও চিত্তপ্রকৃতি পরস্পর মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ। বিশ্ব ও চিত্তের অন্তর্লোকে যে আত্মা নিত্য অধিষ্ঠিত, রস হল তারই নির্যাস। আত্মার নির্যাস বলে নায়ক ও নায়িকাকে কেন্দ্র করে রসের যে রূপায়ণ ঘটে, আপাত অর্থে স্থূল বলে মনে হলেও তা কিন্তু অ[illegible] তা নয়। নায়ক ও নায়িকা এখানে পুরুষ ও প্রকৃতি, শিব ও শক্তি, অর্থ ও বাক। যথার্থ রসের অধিকারী নায়ক মাত্রেই শিব এবং অধিকারিণী নায়িকা মাত্রেই শক্তির ঐশ্বর্যে ভূষিত হন। আসলে সূক্ষ্ম কথাকে গম্ভীরভাবে বলা হয়েছে বেদ-উপনিষদের স্তোত্রে স্তোত্রে, সূক্ষ্ম কথাকে রমণীয় করে বলা হয়েছে রসশাস্ত্রে নায়ক ও নায়িকার প্রতীক গ্রহণ করে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম ও তাকে কেন্দ্র করে যে বিচিত্র ও অপূর্ব সুষমামণ্ডিত মানসিক বিবর্তন ও স্পন্দের ছবি আঁকা হয়েছে সেখানে, তাতে যেমন সাধনার সত্য রূপটি রয়েছে, তেমনি রয়েছে শিল্পী ও প্রেমিকের মনের কথা।

আমাদের সংগীতেও রসের এই [illegible] কথাটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। [illegible] মর্যাদা দিতে ভারতীয় সংগীতে [illegible] স্বরের গুরুত্ব অনুযায়ী [illegible] বিন্যাস ঘটিয়েছেন। শুক্লবর্ণ মধ্যম ও কৃষ্ণ-বর্ণ পঞ্চম—রাধা ও কৃষ্ণ, পুরুষ ও প্রকৃতি, শিব ও শক্তির দ্যোতক। উভয়ের রসই হল শৃঙ্গার। শুক্ল ও কৃষ্ণ—বর্ণের দুই বিপরীত মেরু। শুভ্রবর্ণ মিলন ও কৃষ্ণবর্ণ বিরহকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শৃঙ্গার রসে প্রেমের পূর্ণতা ও বিরহের শূন্যতা দুই-ই এসে মিলে গিয়েছে মোহানার কাছে এসে শাখা নদীর মতো। এককথায় শৃঙ্গার আদি ও শ্রেষ্ঠ রস। ভরত শৃঙ্গারকে নির্বেদ উদ্দীপক মনে করেন।

অনেকের মতে শৃঙ্গার রসে কাম ভাবের আতিশয্য রয়েছে। তাই যদি হয় তাতেই বা দোষ কি? কাম কি সর্বস্থলেই অপাঙক্তেয়? সুস্থ কাম প্রবৃত্তি কি উজ্জ্বল ও পবিত্র নয়? সৃষ্টি যে এত মহীয়ান, তা তো এই কামকে অবলম্বন করেই: 'স অকাময়ত, এ কোহম বহুস্যাম প্রজায়েয়।'

বস্তুতঃ শান্ত, মধুর, দাস্য ও বাৎসল্য সব রসকেই শৃঙ্গার আত্মস্থ করে বসে আছে। সারথি অশ্ব ও রথকে চালনা করেন, মন পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে সংযত করে, শৃঙ্গার অন্য সব রসকে নিয়ন্ত্রণ করে। শৃঙ্গার শুদ্ধাচারী হলে বীভৎস, ভয়ানক ও অদ্ভুত রস তাদের অধিকারের অপ-প্রয়োগ করতে পারে না। লবণ ও মশলার সমানুপাত মিশ্রণ ব্যঞ্জনকে সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যসম্মত করে, বীভৎস, অদ্ভুত ও ভয়ানক রসের যথাযক্ত ব্যবহার রসাশ্রিত ভাবকে মহিমামণ্ডিত করে। শৃঙ্গার বাস্তবিকই সুগৃহিণী। বিপ্রলম্ভ হয়ে শৃঙ্গার বিরহের জয়গানে মুখরিত হয়, সংভোগ হয়ে মিলনকে সে নিবিড় করে। সমস্ত রসের অন্তরে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়ায় সে ব্যাপক।

মধ্যম ও পঞ্চমের রস শৃঙ্গার হওয়ায় একথা বেশী করে মনে হয় যে আমাদের দেশের সংগীতঋষিরা স্বরের কেন্দ্রবিন্দুতে রস ও ভাবকে স্থাপন করবার সময় কত রকম দৃষ্টিকোণ থেকেই না তাদের বিচার-বিবেচনা করতেন। মধ্যম মিলনের ব্যাপকতার প্রকাশক পঞ্চম বিরহের ব্যাপকতার। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, আমাদের সংগীতের স্বর-গুলি পশু-পক্ষীদের কন্ঠস্বরকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছিল। মাণ্ডুকীতে একথার সমর্থন আছে। পশু-পক্ষীর কন্ঠধ্বনিকে অনুসরণ করে এই যে স্বরসৃষ্টি এর হিসেব নিলেও কিন্তু মিলনের ও বিরহের তাৎপর্য আমাদের বিস্মিত করে। মধ্যম স্বর আবিষ্কারের সময় ক্রৌঞ্চের কন্ঠস্বরকে কাজে লাগানো হয়েছে, পঞ্চম আবিষ্কারের সময় কোকিলের। ক্রৌঞ্চ মিলনের ছবি আনে। বাল্মীকি উদ্ভাবিত অনুষ্টুপ ছন্দে জগতের প্রথম যে কবিতা মানুষের মনে ঝংকার তুলেছে, তাও ক্রৌঞ্চ দম্পতির যুগল মিলনকে কেন্দ্র করে। অবশ্য সেখানে করুণতা আছে। বোধহয় আমাদের সংগীত, সাহিত্য ও চিত্রকলার যেখানেই মিলনকে দেখানো হয়েছে সেখানেই বিরহ ও করুণতাকে পাশাপাশি রাখা হয়েছে। বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে মিলন আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। পঞ্চমের ক্ষেত্রেও তাই। কোকিলের

কণ্ঠের অনুসরণে তাকে গড়ে তোলা হয়েছে। কোকিল বিরহের বাহক। অথচ বসন্তের দূত সে। বসন্ত ঋতু ও প্রকৃতিকে যৌবনবতী করে পূর্ণতাকেই প্রকাশ করে। তবে সেখানে বিরহ কেন? এখানেও সেই এক উত্তর। মিলন ও বিরহ হাত ধরাধরি করে চলে। চলে বলেই মধ্যম ও পঞ্চমের রস শৃঙ্গার সম্পূর্ণ যুক্তিভিত্তিক।

ষড়জ এমতাবস্থায় মধ্যম ও পঞ্চমের ছায়াতলে আশ্রিত। তার রস বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত হলেও তাই তার প্রয়োগ সুসমঞ্জস। ষড়জ স্থিতিস্থাপক স্বর। তার একদিকে মধ্যম, অন্যদিকে পঞ্চম। কাজেই একই রসের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ঋষভের মতো সে ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যায়নি। ময়ূরের ডাকের অনুসরণে সে সৃষ্ট। ময়ূর কলাপ বিস্তার করে বুঝি বিশ্বের মিলনকে স্বাগতম জানায়।

ব্যষ্টির অনুভূতিকে বিশ্বের অনুভূতির সঙ্গে এক করে দেওয়াই রসের প্রধান ধর্ম। আমাদের সঙ্গীতে একেই বলা হয়েছে 'সাধারণীকরণ।' প্রিয়জনবিরহে আমাদের অন্তর কেঁদে ওঠে। সেই কান্নাকে যখন আমরা রোদনের মাধ্যমে ব্যক্ত করি, তখন তা হয় ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু যেই রোদনকে ঘিরে করুণ রসের ছোঁয়া লাগল, সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত কান্না বিশ্বমানব মনের চিরন্তন কান্নায় পরিণত হয়। রস-স্নিগ্ধ কান্নাও আনন্দের বস্তু। জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতায় যদিও দেখি, আনন্দের উৎপত্তি আনন্দ থেকে, দুঃখের থেকে দুঃখ, যেই রসের হাওয়া লাগল, অমনি বিশ্বসত্তায় লীন হয়ে গেল। তখন সুখেও আনন্দ, দুঃখেও তাই।

রসের এই আনন্দ তত ঘনীভূত হয়ে উঠবে, শ্রুতির সংখ্যা সেখানে যত বেশী হবে। শ্রুতি রসকে স্বর্গীয় পর্যায়ে উন্নীত করে। আমাদের সঙ্গীতে প্রতিটি সপ্তকে শ্রুতির সংখ্যা বাইশ। একটি স্বর থেকে পরবর্তী স্বরে আরোহণের সময় কয়েকটি কম্পনকে অতিক্রম করে যেতে হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই কম্পনের সংখ্যা ষোল পর্যন্ত হতে পারে। এই কম্পনের শ্রুতি-যোগ্য স্তরগুলিকে ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞেরা আলাদা করে ভাগ করেছেন। মনে করা যাক, কোনও স্বরের কম্পনসংখ্যা ষোল। দেখা গেল, চারিটি কম্পনের পর তাদের সুরের তারতম্যকে পরিষ্কার ধরা গেল। সমান অনুপাতে এই তারতম্য ঘটলে তবেই বলা যাবে ষোলটি কম্পনের ক্ষেত্রে শ্রুতির সংখ্যা ১৬+৪=৪। এই হিসেব, বলা বাহুল্য, কল্পিত। কেন না, সব সময়েই যে সমানানুপাতে তারতম্যে এই কম্পন শ্রুতি-যোগ্য হবে তার কোনও স্থিরতা নেই।

এই হিসেবের দ্বারা এটা বোধহয় স্পষ্ট হয়েছে যে একস্বর থেকে অন্য স্বরে সুর ক্ষেপণের সময় শ্রুতি যত অধিক সংখ্যক হবে, স্বরটি ব্যাপকতায় তত বিপুল হয়ে উঠবে।

স্বরের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের কথা যত্নসহকারে অনুধাবন করে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর সঙ্গীতশাস্ত্রী নারদ শ্রুতির নামকরণ করেছেন—

'দীপ্তায়তা—করুণানাং মৃদু মধ্যমেয়োস্তথা।
শ্রুতিনাং যোংবিশেষজ্ঞো ন স আচার্য উচ্যতে।।

নারদের বর্ণনা অনুসারে শ্রুতি পাঁচটি—দীপ্তা, আয়তী, করুণা, মৃদু ও মধ্যা। ভরতমুনি এগুলিকে জাতিশ্রুতি বলে আখ্যা দিয়ে আরও বিশদভাবে এর বিবরণ রেখেছেন। শ্রুতির সার্থকতাকে চূড়ান্তভাবে রূপ দেবার জন্য তিনি দীপ্তা ও মৃদুকে চারভাগে, আয়তাকে পাঁচভাগে, করুণাকে তিনভাগে এবং মধ্যাকে ছয়ভাগে ভাগ করলেন। বিভাগগুলির মধ্যে জাতি-শ্রুতির গুণ ভাব ও বৈশিষ্ট্যকে পুরোপুরি বজায় রাখা হল।

দীপ্তার অর্থ প্রদীপ্ত। এর রস মানুষের হৃদয়ে উদ্দীপনাকে আহ্বান জানায়। এর উপশ্রুতি তীব্রা, রৌদ্রী বজ্রিকা ও উগ্রার কাজ হল উদ্দীপনার এই রসকে চিরস্থায়ী করা। আয়তা শব্দের অর্থ বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা, এর রসও শ্রোতার চেতনাকে উদারতায় মহৎ করে। কুমুদ্বতী, ক্রোধা, প্রসাধণী, সংদীপনী ও রোহিনী—আয়তার এই পঞ্চ-উপশ্রুতি আপন সুরের বীণায় প্রসারতার রাগিণীর কেন্দ্রস্থলে উদাস বৈরাগ্যের বীজ বপন করে। করুণা শব্দের মানেটা বুঝতে চেষ্টা করলেই দেখব আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয় এবং মন কোমলতায় হয়েছে স্নিগ্ধ। আনন্দের অমৃতে দাক্ষিণ্যের পেয়ালা কানায় কানায় ভরে উঠেছে। করুণার উপশ্রুতি দয়াবতী, আলাপিনী ও

মদন্তীর ভাবের বক্তব্যও তাই। মৃদু পছন্দ করে প্রসন্নতা ও প্রীতিকে। মন্দা, রতিকা, প্রীতি ও ক্ষিতি, যারা নাকি মৃদুর উপ-শ্রুতি, তাদেরও পছন্দ একই ধরণের। অবশেষে জাতিশ্রুতি মধ্যার কথা বলতে হয়। নাম থেকেই অনুমান করে নেওয়া যায় এর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। কোনও রকম বাড়াবাড়ি মধ্যা বরদাস্ত করে না। তার মধ্যে এমন একটা গুণ আছে যার দর্পণে সমতার লাবণ্যময় ছবি ভেসে ওঠে। আর আছে রঞ্জনীশক্তি, অনুরাগের আকর্ষণকে নিবিড় করে রাখবার ক্ষমতা। এই আকর্ষণীয় শক্তিকে অক্ষুন্ন রাখতে সাহায্য করে তার উপশ্রুতি ছন্দোবতী, রঞ্জনী, মার্জনী, রক্তা, রম্যা ও ক্ষোভিণী।

মূলতঃ সঙ্গীতের শ্রুতিগুলি শুধু সাহিত্যবোধ-দীপ্ত নয়, ভাবরসসমৃদ্ধও বটে। কোনও স্বরের শ্রুতিসংখ্যা স্বরটির সার্থকতার পরিমাপক হিসেবে চিহ্নিত করা কিছুমাত্র অন্যায় নয়। শ্রুতি যত বেশী হবে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে স্বরটিকে প্রয়োগ করা তত সহজ হবে। স্বরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় তার মন জয় করবার ক্ষমতার দ্বারা। মন জয় করার বিদ্যার যাদু আবার লুকিয়ে আছে, স্বরটির অনুরণনের মধ্যে। এই অনুরণনই শ্রুতি। কোন স্বরের শ্রুতিসংখ্যা কত—সে সম্বন্ধে ভরত বলেছেন,

> 'ষড়জশ্চতুশ্রুতিজ্ঞেয় ঋষভস্ত্রিঃ শ্রুতিঃ স্মৃতঃ।
>
> দ্বিশ্রুতিশ্চাপি গান্ধারো মধ্যমশ্চ চতুঃশ্রুতি।।
>
> চতুশ্রুতিঃ পঞ্চমঃ স্যাৎ ত্রিঃশ্রুতি ধৈবতস্তথা।
>
> দ্বিশ্রুতিস্তু নিষাদঃ স্যাৎ ষড়জগ্রামে স্বরান্তরে।।'

ষড়জগ্রামে ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চমের শ্রুতিসংখ্যা চার, ঋষভ ও ধৈবতের তিন, গান্ধার ও নিষাদ স্বরের দুই। শ্রুতি-সংখ্যাকে বিচারের মাপকাঠি মনে করলে বলতেই হয়, ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বর তিনটিই শীর্ষস্থানীয়। তিনটি স্বরের প্রত্যেকটিরই চারটি করে শ্রুতি। প্রাচীন সঙ্গীতকারেরা এই তিনটিকে নিয়েই তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। দর্শন, সাহিত্য, মনোস্তত্ত্ব, গণিত ও বিজ্ঞান—সব দিক দিয়েই এদের ভেতর পর্যন্ত দেখতে চেয়েছিলেন সযত্নে। আর কোনও স্বর সম্বন্ধে তারা এতটা উৎসাহী ছিলেন না।

ষড়জ ও মধ্যমের কারণশ্রুতি একই—দীপ্তা, আয়তা, মৃদু ও মধ্যা। করুণা এখানে সশরীরে উপস্থিত নয়। স্বর বেদনার রসে সিঞ্চিত হলে তবেই করুণার আত্মপ্রকাশ অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কোমলতা ও বেদনা—করুণার কাছে উভয় রসের সন্ধানই পাওয়া যায়। ষড়জ ও মধ্যম স্বর করুণাকে প্রত্যক্ষভাবে টেনে আনে না সত্য, কিন্তু অন্যভাবে এর অভাবকে পূরণ করা হয় প্রাজ্ঞ শ্রুতি নির্বাচনের দ্বারা। কারণশ্রুতি এক হলেও ষড়জের উপশ্রুতি মধ্যমের থেকে পৃথক হয়ে ষড়জকে স্বাতন্ত্র্যের আলোয় আলোকিত করেছে। একের পর এক আলোচনা করা যাক। ষড়জের কারণশ্রুতি দীপ্তা, আয়তা, মৃদু ও মধ্যা। দীপ্তার উপশ্রুতি এখানে ধরা হয়েছে তীব্রা (উগ্রা নয়), আয়তার কুমুদ্বতী (ক্রোধা নয়), মৃদুর মন্দা এবং মধ্যার ছন্দোবতী। ষড়জের অন্তর্লোকে তীব্র, বিস্তৃত, প্রসন্ন, কোমল ও মধুর—এক কথায় সব রসেরই কম-বেশী মিশ্রণ ঘটেছে। মধ্যমের কারণশ্রুতি ষড়জের অনুরূপ হলেও দীপ্তার সঙ্গে এসেছে বজ্রিকা, আয়তার সঙ্গে এসেছে প্রসারিণী, মৃদুর সঙ্গে প্রীতি ও মধ্যার সঙ্গে মার্জনী। অর্থাৎ এখানে আরোপিত উপশ্রুতিগুলি উদাত্তগুণযুক্ত। একটা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব স্বীয় শক্তিতে মধ্যমকে গম্ভীর মর্যাদা দিয়েছে। পঞ্চমের কারণশ্রুতি মৃদু, মধ্যা, আয়তা ও করুণা। এদের মধ্যে মৃদুর উপশ্রুতি ক্ষিতি, মধ্যার রক্তা, আয়তার সংদীপনী এবং করুণার আলাপিণী। পঞ্চম স্বরের কারণ-শ্রুতির দলে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হয়েছে করুণা, অনুপস্থিত হয়েছে দীপ্তা। করুণা পঞ্চমে সুস্পষ্ট, তাই বিন্দুমাত্র উগ্র রস সেখানে আসেনি, পরিবর্তে মূর্ত হয়েছে প্রেম, প্রীতি, প্রসন্নতা ও বেদনার মেজাজ।

আমাদের সঙ্গীতের মূল লক্ষ্যটিও সেই রকম। বেদনাই ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাণ। শব্দের উৎপত্তি এবং সেই কারণে স্বরেরও, ভাবপ্রকাশের আকুল বেদনা থেকেই। বেদনাকেই সুরে সুরে রাঙিয়ে আমরা তার মধ্যে রসের আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি। এই চাওয়ার পেছনে নিষ্ঠার অভাব ছিল না বলেই নির্জনতাকে আমরা সাধনার সহায় হিসেবে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছি, কোলাহলকে নয়। প্রকৃতির ভান্ডার মন্থন করে সঙ্গীতের সমৃদ্ধিকল্পে আমরা সেই সেই উপাদানগুলিকে বারবার আহরণ করেছি যেখানে দেখেছি নির্জনতা সম্মান পেয়েছে। স্বরের ক্ষেত্রেও দেখেছি, নির্জনতাকে সর্বাধিক স্বীকৃতি দিয়েছে যে যে স্বর তাদের আমরা মাথায় তুলে রেখেছি। ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বর তিনটি, সুতরাং, ভারতীয় সঙ্গীত জগতে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। বেদনা প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম হিসেবে এই তিনটি স্বর ভারতীয় সঙ্গীতের মর্ম-লোকে অনন্তপ্রসারী প্রতিক্রিয়া রেখে যেতে সক্ষম হয়েছে। এসব কথা মনে রেখে নির্দ্বিধায় ষড়জ, মধম ও পঞ্চমকে ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যসিদ্ধ ইতিহাসে সর্বোত্তম ও অভিনব সংযোজন বলে মেনে নেওয়া যায়।
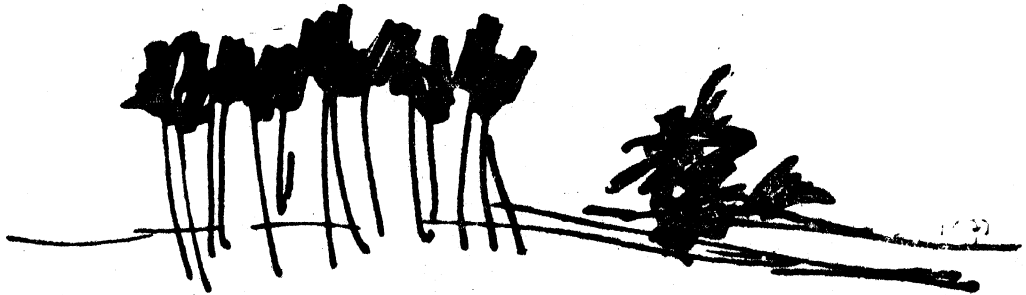
'প্রেমের কথাই যদি বলেন',—বিষ্ণুবাবু বললেন, 'তাহলে আমি বলবো এ অতি বিচিত্র বস্তু। কবি যে বলেছেন, 'কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে'—এ হ'ল অতি সত্যি কথা। আর এর স্বাদ হচ্ছে অম্ল-মধুর। যদি কেউ বলেন এর আদিতে মিষ্টি এবং অন্তে মধুর, আমি অন্ততঃ একমত হতে পারবো না তাঁর সঙ্গে।'

আমরা কোন মন্তব্য করলাম না। বোঝা যাচ্ছিল বিষ্ণুবাবু বাধা না পেলে গল্পটা শুরু করতে পারেন। গল্পের লোভে আমরা চুপ করে রইলাম। বাইরে সন্ধ্যে ক্রমেই ঘন হয়ে আসছিল। ঘরে আমরা পাঁচজন। ঘড়িতে সাতটা।

'অবশ্য আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল নিতান্তই যাকে বলে বিয়োগান্ত। আর এ-ব্যাপারে আমার একটা অপরাধবোধও রয়েছে এখনো।' তিনি সকলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। 'তা'বলে খুব রসালো কিছু একটা আশা করবেন না যেন। আমার কেসটা আদালতের দাঙ্গাজোর মত কিছু হয়নি। অপরাধটা আমার নিজের কাছেই। আর তার দণ্ডও আমার ভেতরের বিচারক আমাকে দিয়েছে।'

গল্পের আভাস পাচ্ছি অথচ তাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাচ্ছি না দেখে সকলেই আমরা খুব অধৈর্য হয়ে পড়ছিলাম। বোঝা যাচ্ছিল না তিনি আর কতক্ষণ সুতো ছাড়বেন। তারপর অকস্মাৎই বিষ্ণুবাবু আমাদের একেবারে কাহিনীর মাঝখানে এনে ফেললেন।

'সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হিসেবে আমার ঘরটা ছিল হোস্টেলের তিনতলায়। একটাই ঘর তিনতলায়। বাকি দোতলার সবটা ছেলেদের থাকবার ঘর। আর একতলার একদিকে রান্নাঘর-খাবার ঘর, বাকী একটা দিকে আমাদের বামুনঠাকুর বিপিনের থাকার ঘর-কাম-ভাঁড়ার ঘর। হোস্টেল কম্পাউণ্ডের মধ্যে একটা টিউবওয়েল।

'এই টিউবওয়েল নিয়েই শুরু। হোস্টেলের চার্জ নেওয়ার দ্বিতীয় দিনের মধ্যেই আমি বুঝতে পারলাম, আমাদের পাচকঠাকুরটি বিদেশে একা একা থাকতে না পেরে কিছু একটা সাময়িক বন্দোবস্ত করেছে। আর ঐ কলতলাই হচ্ছে তার হৃদয় নিয়ে চোরাকারবারের ঘাঁটি।

'আমি কিন্তু কলতলায় পাহারা দেওয়ার জন্যেই ঘরে বসেছিলাম না। সারাদিন ক্লাস করে শরীরটা ক্লান্ত লাগছিল, বিছানায় গড়িয়ে পড়েছিলাম। ছেলেরা হোস্টেলে ছিল না কেউ, খেলতে গিয়েছিল সব। আমি শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখছিলাম। তিনতলার জানালা থেকে আকাশ দেখতে ভালোই লাগছিল। কিন্তু হঠাৎ মাটিতে নেমে এলাম। মেয়েলি গলার হাসি ছেলেদের হস্টেলে অপ্রত্যাশিত ছিল। তাই আবার যখন হাসি শুনলাম জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

'আমাদের বামুনঠাকুর, বিপিন, তখন সেই মেয়েটার হাত চেপে ধরে রেখেছিল। মেয়েটির কাঁধে মাটির কলসী একটা এক হাত দিয়ে বেড় দেওয়া, অপর হাতটি

বিপিনের মুঠোয়। বিপিনের ছাড়ার ইচ্ছে ছিল বলে মনে হল না। কিন্তু মেয়েটির হাসি যখন প্রায় কোপে পরিণত হওয়ার যোগাড় তখন বিপিন হাত ছেড়ে দিয়ে কি যেন বলল। সে তখন রাগ করে চলে যাচ্ছিল প্রায়, কিন্তু বিপিনের কথায় দাঁড়িয়ে পড়ল। আর আমি ওপর থেকে দেখলাম, বিপিন রান্নাঘরের ভেতর থেকে ছোট একটা বালতি করে এক বালতি ভাত এনে রাখলো তার সামনে। ও প্রসন্ন হল বোধহয়। আবার একবার হাসল তারপর বালতিটা উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল।

'অম্যার কর্তৃত্ব সজাগ হয়ে উঠলো। তাহলে এইভাবে চালের খরচ বেশী হয়। আচ্ছা, আমি যদি থাকি,—মনে মনে বিপিনের উদ্দেশ্যে বললাম, তাহলে তোমার কারসাজি বন্ধ করছি আমি। অনেক সুপারিন্টেন্ডেন্টকে ফাঁকি দিয়েছ তুমি বিপিন, কিন্তু আমি তোমাকে ফাঁদ দেখিয়ে ছাড়ব—মনে মনে বললাম।

'রাতে খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে, ছেলেরা যে যার ঘরে চলে গেলে আবার নীচে নামলাম আমি। বিপিন খাচ্ছিলো। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো। যেন কিছুই জানি না এমনিভাবে ধূর্ত গোয়েন্দার মত আমি প্রশ্ন করলাম—কত চাল সকালে নিয়েছিলে বিপিন? এক মুহূর্ত ও চেয়ে রইল আমার দিকে,—"কেন স্যার, আপনার সামনেই তো নিলাম; পাঁচ সের।" "চাল বোধহয় বেশী নিচ্ছ তুমি"—
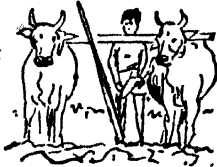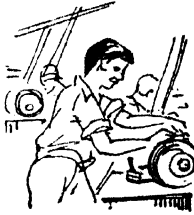
আমি বললাম। —"পাঁচ সের লাগতেই পারে না এই কটা লোকের।" "বহুদিন থেকেই তো স্যার পাঁচ সের লাগছে—" "তখন অন্য স্যার ছিলেন—" তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই আমি বললাম প্রায় ধমক দিয়ে। "আগের মত কিছুই চলবে না আর মনে রেখো"—বলে আমি বেরিয়ে এলাম। মনে হল বিপিন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

'সে রাতটা গুমোট ছিল একটু। তার ওপরে এই ভাতচুরির ব্যাপারটা মাথায় ঘুরছিল। কাজেই ঘুম আসছিল না মোটেই। মাঝে একটু তন্দ্রার মত এসেছিল বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে। তারপর একসময় পিপাসা পেতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। উঠে জল খেলাম, ঘড়ি দেখলাম। রাত সাড়ে এগারো জল পেটে পড়তেই একবার নীচে নামবার প্রয়োজন হল। কারণ কলতলাতেই বাথরুম ইত্যাদি সব।

'সিঁড়ি দিয়ে নেমে তারপর বাইরে যাওয়ার দরজা। বাইরের দরজা খোলার আগেই নজরে পড়ল এক চিলতে আলো আসছে বিপিনের ঘর থেকে দরজায় ফাঁক দিয়ে। বিপিনের ওপর রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল। ব্যাটা শুধু দুষ্কর্মই করছে তাই নয়, আবার রাত জেগে কেরোসিনও পোড়াচ্ছে! প্রথমে ভাবলাম দরজায় ধাক্কা দিই। তারপর কৌতূহল হ'ল। কি করছে! কি করছে এত রাত পর্যন্ত বিপিন? চুপি চুপি দরজার ফাঁকে গিয়ে চোখ রাখলাম। এই সময়ে একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে ছেলেদের জাগিয়ে তোলাটা ভাল মনে করলাম না।

'এখন মনে হয়, দরজায় চোখ না দিলেই ভাল হ'ত। কারণ সেই আমার মরণের শুরু। কি দেখলাম—সে আমি বর্ণনা করতে পারবো না, সে সাহস আমার নেই, স্বীকার করছি। তবে বিপিনের ভাত-চুরির আরও একটা জলজ্যান্ত সাক্ষ্য পেয়ে গেলাম। দেখলাম, বিপিন তার ভাতের দাম উশুল করছে।

'মাথাটা আমার ঝিমঝিম করতে লাগলো। এক মিনিট বোধহয় দাঁড়িয়ে-ছিলাম সেখানে। তারপর পা টিপে টিপে চলে এলাম নিজের ঘরে। প্রাকৃতিক কর্তব্য ছাদেই সারলাম। আর তারপর নিশি-পাওয়ার মত এসে শুয়ে পড়লাম নিজের বিছানায়।

সেইরাতে বিপিনকে হাতে-নাতে ধরতে আমি পারতাম। কিন্তু তাতে ছেলেদের পক্ষে সেই নোংরা ব্যাপারের সাক্ষী হওয়াটা বাধা দেওয়া যেত না। আর তাছাড়া আমি নিশ্চিন্ত হলাম এই ভেবে যে, বিপিন তো আমার হাতের মুঠোয় রইলই। এ-ব্যাপার নিশ্চয়ই একদিনেই শেষ হচ্ছে না।

'সে-রাতে আমার আর ঘুম আসছিল না। আর ঘুম না আসার ফলস্বরূপ আমার মনের একটা রূপান্তর ঘটছিল। জীবনের যে অংশটার সামান্য থেকে সামান্যতম আভাসটুকুই আমি জানতাম, তার পাতা-গুলো যেন পট্‌পট্‌ করে খুলে যেতে লাগলো আমার চোখের সামনে অন্ধকারে। আর কি আশ্চর্য, প্রত্যেক পাতায় একই ছবি। আমার মন যেন একলাফে তার যৌবনে পৌঁছে গেল। আর, একসময়ে শেষ পর্যন্ত মনে হল বিপিনের থেকে আমার আর কোন তফাৎ নেই।

'সেই রাতের কথা আজও ভুলতে পারিনি। বোধহয় কখনও পারবোও না। উত্তেজনায় এপাশ-ওপাশ করতে লাগলাম। একসময় মাথায় যেন খুন চেপে গেল। মনে হল যাই, নিচে নেমে যাই। বহু কষ্টে নিজেকে সামলালাম। তারপর অনেকক্ষণ—কতক্ষণ জানি না—ছটফট করতে করতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

'পরদিন ঘুম ভাঙলো কিন্তু অনেক সকালে। এই পনেরো দিন এখানে আসার পর এত সকালে আমার ঘুম ভাঙেনি কখনো। আজ কি জানি কি হল। ঘুম ভাঙতেই উঠে পড়লাম। সকালে এক গ্লাস জল খাওয়ার অভ্যাস আমার বরাবর—পেট পরিষ্কার রাখার জন্যে। বিছানা ছেড়ে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে জানালার কাছে গ্লাস ধরতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

'হোস্টেলের বাঁদিকে যে পুকুরটা ছিল সেখানে আমার চোখ আটকে গেল। চারপাশে অল্পবিস্তর ঝোপঝাড়, তারপর পুকুর,—তারপর খান-দুই খোড়ো ঘর। পুকুরের নারকেল গুঁড়ি দেওয়া সিঁড়িতে মেয়েটি তখন স্নান সেরে চুল ঝাড়ছে। এক নিমেষে তাকে চিনে নিতে দেরী হ'ল না। কিন্তু আমি সরে যেতে পারলাম না সেখান থেকে। চোখ ফেরাতে পারলাম না। ভিজে গামছার তার শরীরকে ঢাকার পরিবর্তে আরও উগ্র করেছে যেন। প্রতিবার সে পেছন দিকে হেলে দুহাতে গামছা দিয়ে চুল ঝাপটা দিচ্ছে আর তার সারা পুরন্ত শরীরটা কাঁপন-লাগা কলাগাছের মতো থরথরিয়ে উঠছে। মিনিটখানেক ছিলাম দাঁড়িয়ে কি মিনিট দুই। তারপরেই আমার ওপর চোখ পড়ে গিয়েছিল তার। একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে-ছিল চোখ বড় বড় করে। তারপর হাতের গামছাখানা গায়ে জড়িয়ে দৌড় দিল। গাছ-গাছালীর আড়ালে আর দেখা গেল না তাকে।

'আমি দাঁড়িয়েছিলাম প্রায় মোহগ্রস্তের মত। তারপরেই কলতলায় ছেলেদের গলার আওয়াজে চমক ভাঙলো। ওরা উঠে পড়েছে। এখানে দাঁড়ানো আর নিরাপদ নয়। তাই সরে এলাম।

'চাল নেওয়ার সময় বিপিন আমায় জিজ্ঞেস করলে,—চাল কত নেবো স্যার? মুহূর্ত থমকে আমি বললাম,—যা নিচ্ছ তাই নাও। দু'-একদিন আমি দেখি আরও, তারপর হিসেব করে দেবো। বিপিন যেন নিশ্চিন্ত হল। বললে,—আপনি মিথ্যে সন্দেহ করছেন আজ্ঞে: আমার ঘরে এসে দেখুন, চাল কোথাও আমি লুকিয়ে রাখি কিনা। আমি ধমকে বললাম,—সে-কথা আমি বলিনি। কেন বাজে তর্ক কর। নিজের কাজ করগে যাও। আমার হিসেব পড়ে আছে।

'বিপিন চলে গেল। আমার হিসেবের খাতা যেমন পড়েছিল, তেমনি পড়ে রইল। নিজেকেই জিজ্ঞেস করলাম, চাল আগের মতই নিতে বললাম কেন। মনের একটা দিক জবাব দিল, ঠিকই হয়েছে; হয়তো ভাত একটা দিন বেশী হয়েছিল, তাই বিপিন তার ভালবাসার লোককে দিয়েছে। তাতে হয়েছে কি? ফেলা তো যেতই নাহলে। ঠাকুর চাকর কে কি করছে, তা আমার দেখার দরকারটাই বা কি।

'কিন্তু মনের আর একটা দিক এত সহজে আমায় ছেড়ে দিলে না। সে বলতে লাগল—তোমার এসব যুক্তি নেহাৎই নিজেকে চোখ ঠারা। মেয়েটার ওপর নিজের দুর্বলতা জন্মাচ্ছে তোমার, তাই তুমি কিছু বললে না বিপিনকে। বিপিনের কাছে ওর আসা-যাওয়া বন্ধ করতে চাও না তুমি, তাই—। আমি প্রাণপণে বোঝালাম তাকে না, না—কখনই তা নয়। কিন্তু আমার মন জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললে, হ্যাঁ—তাই, তাই।

'এইরকম আচ্ছন্নের মত অবস্থায় সেদিনের ক্লাসগুলো সারলাম। কোন কাজেই মন দেওয়া গেল না। বিকেলবেলায় ঘরেই রইলাম। এবং ওপর থেকে বিপিনের ভাত দেওয়া লক্ষ্য করলাম আজও।

'সেই রাতে জেগে রইলাম অনেকক্ষণ। তারপরে নীচে নামলাম পা টিপে টিপে। কিন্তু না; হতাশ হলাম। বিপিন ঘুমোচ্ছে একাই। সে আসেনি।

'পরদিন ভোরে নেশাগ্রস্তের মত জ্বালাধরা চোখে দাঁড়ালাম এসে জানালার ধারে। যেমন আশা করেছিলাম, তাকে দেখতে পেলাম আজও। আজ কিন্তু সে ধড়ফড়িয়ে পালিয়ে গেল না আগের দিনের মত। বরং আমার দিকে চেয়ে থাকল। আরও আশ্চর্য, যাবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে হেসে গেল একবার।

'এইভাবে দিনকয় কেটে গেল। এই ক'দিন যে কিভাবে কাটলো তা বলা শক্ত আমার পক্ষে। নেশাগ্রস্তের মত, জরাগ্রস্তের মত দিনগুলো যাচ্ছিল। আমার পড়া চুলোয় গেল, পড়ানোও। দিনে সারাদিন এক ভাবনা ভাবি আর রাতে বিনিদ্র হয়ে বিছানায় গড়াই। দু-একদিন নীচে নেমে বিপিনের দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়েছি উন্মত্তের মত ওর দরজায় ধাক্কা দিতে গেছি, কিন্তু পারিনি,—শেষপর্যন্ত বিপিনের সমপর্যায়ে নিজেকে নামিয়ে আনতে পারিনি।

'ব্যাপারটা চূড়ান্ত রূপ নিল একদিন। বিপিন দিন-সাতেকের ছুটিতে গেছে সেই সময়ে, ছেলেরা পালা করে রান্না চালাচ্ছে। বিকেলে সেদিন ছেলেরা খেলতে বেরিয়ে যেতে আমিও নেমে এলাম। কেউ নেই সারা হোস্টেল বাড়ীতে। আমার মন খালি বলতে লাগলো, এইবার,—এইবার! কিন্তু আমি জানতাম না যে, সে আমার চেয়েও বেশী সাহসী, অনেক বেশী। দেখি, ঠিক সেই সময়টাতেই সে জল নিতে এলো তার পুরোনো মাটির কলসীটা নিয়ে।

যতক্ষণ সে জল ভরতে লাগল কল পাম্প করে, আমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম দরজার কাছে। প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা করতে লাগলাম এগিয়ে যাওয়ার; কিন্তু পা উঠছিল না। অবশেষে কলসীটা কাঁখে নিয়ে যখন সে চলে যাওয়ার উদ্যোগ করছে, প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করে আমি এগিয়ে গেলাম তার দিকে। সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'দু'পা পেছিয়ে এলাম আমি ভয়ে। এই বুঝি ও গলা দিয়ে উঠবে চীৎকার করে। গলার ভেতরটা শুকিয়ে এল; ভাবলাম ছুটে দিই বাড়ীর মধ্যে। কিন্তু না, সে চেঁচিয়ে উঠল না, গালও দিলে না। খালি বললে, নীচে থেকো, রাতে আসবো। বলেই হেসে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল, যেন কিছুই হয়নি।

'সেই রাতে খেতে বসে ছেলেদের গম্ভীরভাবে হোস্টেলের নিয়ম স্মরণ করিয়ে দিলাম। ইদানীং কেউ কেউ বেশী রাত করে পড়াশুনো করছিল, তা করতে নিষেধ করে দিলাম। কারণ হোস্টেলের নিয়ম দশটার মধ্যে সকলে শুয়ে পড়বে। সকাল-সকাল শুলে সকাল-সকাল ওঠা যায়. আমি ছেলেদের বললাম, আর তাহলেই পড়াশুনো এবং স্বাস্থ্য দুই-ই ভাল থাকে।

'জানি এই উপদেশের মধ্যের প্রকাণ্ড ভণ্ডামীতে আপনাদের হাসি আসছে, কিন্তু আমার তখন নিমেষের জন্যে নিজের ওপর করুণাও হয়েছিল। তবে মুহূর্তের জন্য। আমার তখনকার অবস্থা বলে বোঝাতে পারবো এমন আশা আমি করছিনে। আমি শুধু চাইছিলাম ছেলেরা শুয়ে পড়ুক তাড়াতাড়ি। সব অন্ধকার হয়ে যাক, সব আলো নিভে গিয়ে একটা অসীম গোপনতার অভেদ্য অবরণ এনে দিক।

'ছেলেরা শুয়ে পড়লে দুবার ওপর-নীচ করে দেখে নিলাম ভাল করে। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করলাম প্রায় আধঘণ্টা। তারপরেই নেমে এলাম নীচে। আবার কি ভেবে উঠে গেলাম তিন-তলায়। নিজের ঘরের তালাটা খুলে এনে বন্ধ করলাম দোতলার সিঁড়ির দরজাটা, যাতে ছেলেরা না হঠাৎ নীচে নামতে পারে।

'সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে রইলাম অন্ধকার সদর দরজা খুলে। ধীরে ধীরে অনেকটা সময় কেটে গেল। প্রথমটা মনটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল অসম্ভব। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তা একটা হতাশার রূপ নিল। এলো না, সে এলো না বোধহয়। হয়তো আমাকে মিথ্যেই বলেছে তখন, অথবা বুঝি সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি। তার ওপরে রাগ হতে লাগল, নিজের ওপরেও,—কেন তার কথা বিশ্বাস করলাম।

'অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এইসব ভাবছি এমন সময় সে যেন অন্ধকার ফুঁড়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। অন্যমনস্ক ছিলাম কিছুটা, তাই তাকে দেখতে পাইনি বোধহয়। তাই প্রথমটা চমকে উঠেছিলাম। মুহূর্ত পরেই আমি রান্নাঘরের ভেতরে ঢুকে গেলাম। আমার বুকে তখন হাতুড়ি পড়ছে। পেছন-পেছন এলো ও। সে ঘরে ঢুকলে পলকের জন্য যেন আমি পাগল হয়ে গেলাম। দরজা বন্ধ করার কথাও মনে পড়লো না, দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওকে।

'এই সময়টা ঠিক কি ঘটেছিল, তা আমি বর্ণনা করতে পারবো না ঠিক ঠিক। তবে তখুনি ওর গায়ে কি-একটা কঠিনতা অনুভব করে ওকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। নাহলে বোধহয় ও-ই ছাড়িয়ে দিত।

'দাঁড়াও,—ও ফিসফিস করে বললে। তারপর বুকের মধ্যে থেকে গোটা-তিনেক বোতল বের করে আমার সামনে ধরলে। এগুলো রাখতে হবে আগে,—ও বললে।

'কি এগুলো,—আমি হতবুদ্ধি হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'মদ গো বাবু, মদ'—অন্ধকারে চাপা হাসি হাসলে ও, 'আমরা চোলাই করি তো তাই। কাল পুলিশ আসবে—ও বললে,—তাই তোমার কাছে রাখতে এসেছি গো!'

'আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই ধরনের কিছু শোনবার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না আমি।

'—কি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন গো বাবু? নাও, এগুলো তোমার ওপরের ঘরে নিয়ে রেখে দিও। পরে হুল্লা মিটে গেলে আমি নিয়ে যাবো।—বলে সে বোতলগুলো মাটিতে নামিয়ে রাখতে গেলো।

'আমি বাধা দিলাম তাকে। বললাম—আমার এখানে কেন? জানো, চোলাই করা, মদ লুকিয়ে রাখা, বেআইনী—অন্যায়?'

'—অন্যায়? সে আবার হেসে উঠলে। —কোনটা অন্যায় গো বাবু?—আর কোনটা নয়? দুপুর রাতে ঘরে মেয়েছেলে ঢোকানো অন্যায় নয়? নাও গো বাবু, ধর। রাত পুইয়ে এলো।'

'আমি কিন্তু হাত বাড়াতে পারলাম না। আমার ভেতরের ভদ্রলোকটা সঙ্কুচিত হয়ে গেল। মেয়েটি অপেক্ষা করলে বোধ-হয় মিনিটখানেক। তারপরে ফিরলো দরজার দিকে।

'সে বেরিয়ে যায়-যায় এমন সময়ে এগিয়ে গিয়ে তার হাত চেপে ধরলাম আমি। এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিল সে। ফুঁসে উঠলো ক্রুদ্ধ বেড়ালের মত।—ছাড় গো ভদ্দরলোক,—সে তীব্র চাপা স্বরে বলে উঠলো,—অত ফালতু ফূর্তি হয় না। তারপর বেরিয়ে গেল সোজা অন্ধকারের মধ্যে।

'সম্বিত ফিরে পেতে আমার সময় লাগলো কিছুটা। তারপর বেরিয়ে এলাম বাইরে। কিছু দেখা গেল না নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে। দরজাটা বন্ধ করে দিলাম কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে থাকার পর। অবশেষে তালা খুলে পা টিপে টিপে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এলো অবশেষে এক সময়ে। তারপর ঘুমিয়েও পড়লাম কখন।

'সকালে স্বাভাবিকভাবেই ঘুম ভাঙতে দেরী হয়ে গিয়েছিল সামান্য। ব্রাশটা নিয়ে নীচে কলতলায় নামতেই ছেলেরা ভিড় করে এলো।

'—স্যার, ওদের বাড়ীতে পুলিশ এসেছিল ভোরবেলায়।

'—পুলিশ? কাদের বাড়ীতে? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'—ঐ যে স্যার, ঐ পুকুরধারে চাষীদের বাড়ীটা আছে—কয়েকজনে মিলে হৈ-চৈ করে উঠলো একসঙ্গে।

'একজন বলো। সকলে একসঙ্গে চীৎকার কোরো না।—তাদের আমি ধমকে থামিয়ে দিলাম। তারপর যা শুনলাম তা বুঝি গত রাত্রের নাটকের শেষ অঙ্ক। ভোরবেলা আবগারী পুলিশ এসেছিল ওদের বাড়ীতে এবং বেশ কয়েক বোতল চোলাই মদের সঙ্গে ওদের মেয়েটাকেও ধরে নিয়ে গেছে।

'কোনরকমে মুখ ধুয়ে তিনতলায় উঠে গেলাম নিজের ঘরে। সেখান থেকে জানলা দিয়ে দেখলাম, বাড়ীটার ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে। কাছাকাছি জঙ্গল পিটিয়ে পুলিশ মদের সন্ধান করেছে। উঠোনে টেনে বের করেছে একখানা ভাঙা তক্ত-পোষ। এদিক-ওদিক খানকয়েক ছেঁড়া কাপড়, কাঁথা লুটোচ্ছে, আর গড়াচ্ছে কয়েকটা মাটির হাঁড়ি-কলসী।—একেবারে তছনছ করে দিয়েছে ওদের ঘরকন্না।

'সেদিন ক্লাসে যেতে পারলাম না আর। সর্বদাই মনের মধ্যে একটা অপরাধবোধ খচ্‌খচ্‌ করছিল। মনে হচ্ছিল যেন আমিই দায়ী এই ঘটনার জন্য। বারবার ভাবছিলাম, যদি আমি লুকিয়ে রাখতাম বোতলকটা, তাহলে হয়তো এই দশা হতো না ওদের। মেয়েটি যা দিতে এসেছিল তার বিনিময়ে তো সামান্যই দাম চেয়েছিল সে। অন্যায় হতো? বে-আইনী হতো? তার জবাব তো ও নিজেই দিয়ে গেছে আমাকে। নীচে তো নেমেছিলাম আমি, অনেক নীচেই,—তার চেয়ে আর কত নীচে নামা হতো চোলাই লুকিয়ে রাখলে।'

বিষ্ণুবাবু একটানা অনেকক্ষণ বকে স্তব্ধ হলেন। আমরাও সকলে চুপ। প্রভাস নীরবতা ভাঙলে প্রথম। 'আপনার ভালই তো হয়েছিল সবদিক থেকে। কোনো অন্যায়টাই আপনাকে করতে হয়নি। সুতরাং আপনি যে অপরাধবোধের কথা বলেছিলেন গোড়ায় তার কোনো যুক্তিই নেই।'

'যুক্তি আছে।'—আমি বললাম। 'বিষ্ণু-বাবু যা বলতে চেয়েছিলেন তা বোধহয় এই,—তাঁর অতৃপ্ত বাসনাটা না মেটানোটাও বোধহয় এক ধরনের অপরাধ ছিল সেই সময় তাঁর কাছে। ঘটনার কালটা কত বছর আগে, সেটাও আমাদের খেয়াল করতে হবে। আশা করি আমাদের এই কাহিনীর নায়কও সে-কথা স্বীকার করবেন।' এই বলে আমি তাঁর দিকে তাকালাম।

বিষ্ণুবাবু কিরকম একটু হাসলেন। তারপর বললেন—'কি জানি।'
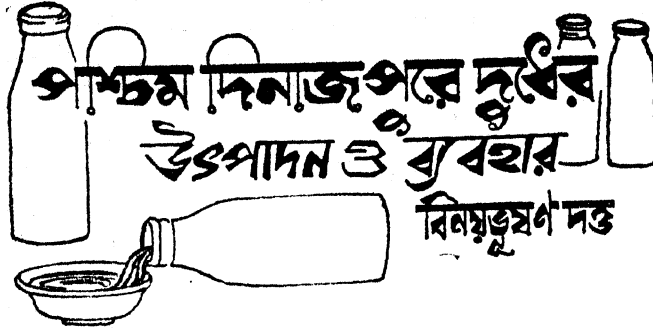
খাদ্য সমস্যা বলতে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি খাদ্যশস্য ও আমিষ জাতীয় খাদ্যের ঘাটতি এবং অত্যধিক মূল্য। কিন্তু সুষম খাদ্যে দুধ যে অপরিহার্য একথা আমরা আজকাল ভুলতে বসেছি। সাধারণ বাঙালীর দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় দুধ তাই আজকাল দেখা যায় না। ফলস্বরূপ অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন রোগ। খাদ্য সমস্যা আলোচনায় যদি আমরা পুষ্টিকর খাদ্যের উপযুক্ত গুরুত্ব দিই তাহলে দেখা যাবে খাদ্য সমস্যার তীব্রতা ভয়ানকভাবে বেড়ে যাবে। অপুষ্টিকর খাদ্যের মূলে সমস্যা দুধের অভাব। এই সমস্যা কত তীব্র বোঝা যাবে যদি আমরা কোন একটা অঞ্চল নিয়ে আলোচনা করি। সরকারী তথ্যের ভিত্তিতে উত্তর বাংলার পশ্চিম দিনাজপুর জেলা নিয়ে আলোচনা করা যাক। ১৯৫৬ সালের হিসেব অনুযায়ী এ জেলায় গরু ও মোষের দুধ উৎপাদনের পরিমাণ দৈনিক ৪০২০০ লিটার। ১৯৬১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী এ জেলার লোকসংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

মোট লোকসংখ্যা	১৩,২৩,৭৯৭
১৪ বৎসরের অনূর্ধ্ব লোকসংখ্যা	৫,৭৭,১১৩
১৫ থেকে ৩৪ বৎসরের মধ্যে লোকসংখ্যা	৪,১৯,৮০৪
৩৫ থেকে ৫৯ বৎসরের মধ্যে লোকসংখ্যা	২,৭০,৮৩২
৬০ বৎসরের ঊর্ধ্বে লোকসংখ্যা	৫৫,১৮৯

এই লোকসংখ্যার বয়সগত ব্যবধানের ভিত্তিতে জেলায় দৈনিক কি পরিমাণ দুধের প্রয়োজন তার একটা আভাষ দেওয়া যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের সুপারিশে দেখা যায় একজন সুস্থ ব্যক্তির সুষম খাদ্য তালিকায় দৈনিক ৫ ছটাক দুধ থাকা প্রয়োজন। আমাদের হিসেবে এর চাইতে আরো কম ধরা হল। সাধারণত শিশু ও বৃদ্ধের খাদ্যে দুধের প্রয়োজন সর্বাধিক। তাছাড়া আছেন প্রসূতি ও সন্তানসম্ভবা নারী। সাধারণভাবে বলা চলে যদি ১৪ বৎসরের অনধিক প্রত্যেকের এবং ৬০ বৎসর ও তদূর্ধ্ব ব্যক্তিদের দৈনিক ¼ লিটার দুধের প্রয়োজন মনে করা হয়—তবে কেবলমাত্র এদের জন্য প্রয়োজন দৈনিক ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭৫ লিটার দুধের। যদি লোকসংখ্যার বাকী অংশের জন্য দৈনিক গড়ে ¼ লিটার দুধের প্রয়োজন বলে ধরে নেওয়া যায় যা স্বাস্থ্য বিভাগের সুপারিশের অনেক নীচে তাহলে এ জেলায় প্রত্যহ ২,৪৪,৪৬৪ লিটার দুধের প্রয়োজন। এ হিসেবের মধ্যে প্রসূতি নারী, অসুস্থ ব্যক্তি ও হোটেল-রেস্টুরেন্ট চা ও দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য দুধের চাহিদার উল্লেখ করা হল না। তথাপি দেখা যাচ্ছে আমাদের হিসেব অনুযায়ী চাহিদার মাত্র ১৬ শতাংশ দুধ এ জেলায় উৎপন্ন হয়।

প্রশ্ন থেকে যায় দুধের চাহিদা ও যোগানের এই বিরাট ব্যবধান কিভাবে পূরণ করা হয়। প্রথমত পার্শ্ববর্তী বিহারের কাটিহার, মনিহারী প্রভৃতি অঞ্চল থেকে কিছু পরিমাণে মোষের দুধ এ জেলায় আসে। তাছাড়া, আমরা দুধের চাহিদার পরিমাণ হিসেব করেছি একটি ন্যূনতম জীবন ধারণের মানের ভিত্তিতে। দুধের সরবরাহ খুব কম থাকায় এবং মোটেই সহজলভ্য না হওয়ায় নিম্নমধ্যবিত্ত লোকের কাছে দুধের ব্যবহার খুব সীমিত। অধিকাংশ লোকই অসুখ-বিসুখ ছাড়া দুধ ব্যবহারের কথা ভাবেন না। যদি নিয়মিত দুধের সরবরাহ থাকত এবং দাম কিছুটা কম হত তাহলে অনেকেই প্রত্যহ দুধ ব্যবহারের কথা ভাবতেন যার ফলে তাদের নিষ্ক্রিয় চাহিদা সক্রিয় হতে পারত।

দুধ উৎপাদনের দিকটা এবার আলোচনা করা যেতে পারে। সরকারী তথ্যে দেখা যায় ১৯৫৬ সালের ১৫ই এপ্রিল এই জেলায় গরুর হিসেব ছিল ঃ

বাচ্চা হয়নি এমন গরুর সংখ্যা... ৩৫,৫৫৬
দুধ দেয় এমন গরুর সংখ্যা... ৪৪,৫০৭
দুধ দেয় না এমন গরুর সংখ্যা... ৯২,৯৫৬

একই তারিখের মোষের হিসেবে দেখা যায় ঃ

বাচ্চা হয়নি মোষের সংখ্যা ... ৪৫৬
দুধ দেয় মোষের সংখ্যা ... ২৮৮৯
দুধ দেয় না মোষের সংখ্যা ... ২০৫০

অর্থাৎ ১৫ এপ্রিল, ১৯৫৬তে দুধ দেওয়া গরু ও মোষের সংখ্যা—৪৭৩৯৬। কিন্তু এ সময়ে দুধের উৎপাদনের পরিমাণ ৪০,২০০ লিটার অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এ জেলার গরুর দুধ উৎপাদনের গড় দৈনিক এক লিটারের কম। দ্বিতীয়ত দেখা যাচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় এ জেলায় গরুর সংখ্যাও বেশ কম। এর কারণ দুটো। আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রথায় গো-মহিষ পালনের কোন ব্যবস্থা এ জেলায় নেই। পশ্চিমবঙ্গের হরিণঘাটা কিম্বা মহারাষ্ট্রের আনন্দ প্রকল্পে দেখা গেছে আধুনিক পদ্ধতিতে মিশ্র প্রজনন জাত (cross breeding) গরু সাধারণ গরু অপেক্ষা কয়েক গুণ বেশী দুধ দেয়। ২৪ পরগণা, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার বেশ কিছু সম্পন্ন চাষী মিশ্র প্রজনন জাত গরু পালন করে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়েছেন। এ জেলায় সরকারী বেসরকারী কোন তরফ থেকেই সে রকম কোন চেষ্টা নেওয়া হয় নি। দ্বিতীয়ত এ জেলার গরু-মোষ ইত্যাদির মোট সংখ্যা (১৯৬১ সালের গণনায়) ৮,৭২,০০৬। এ ছাড়া অন্যান্য তৃণভোজী পশুও যথেষ্ট রয়েছে। অথচ ঐ সময়ের হিসেবে দেখা যাচ্ছে এ জেলার আয়তন ১৩,১৩,২৮০ একর এবং তার মধ্যে ১১,৩২,৮০০ একর অর্থাৎ মোট আয়তনের ৮৬ শতাংশ জমি চাষ-আবাদভুক্ত। বাকী ১৪ শতাংশ জমিতে শহর গ্রামের লোকেরা বসবাস করে এবং বিবিধ কাজে ব্যবহার করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পতিত জমি না থাকায় এ জেলায় কোন গোচারণ ভূমি নেই। শীত থেকে বর্ষার শুরু অবধি পাঁচ মাস মাঠ ফাঁকা থাকে। কিন্তু এ সময়ে প্রাকৃতিক আবহাওয়ার জন্য জমিতে ঘাসও থাকে না। তাই পশু খাদ্যের অভাব অনেকটা নিয়মিত। খড়ের দ্বারা এ অভাব কিছুটা পূরণ করা হয়ে থাকে। খাদ্যের অভাবে এ জেলার গবাদি পশুর দুধের পরিমাণ কম হওয়ার অন্যতম কারণ।

পশ্চিমবঙ্গের অন্য কয়েকটি জেলার সাথে তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। এই রাজ্যে দুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে ২৪-পরগণা—মোট উৎপাদনের ১৭ শতাংশ। অবশ্য এ জেলার লোকসংখ্যা রাজ্যের লোকসংখ্যার ১৮ শতাংশ। তাই অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। সেদিক থেকে বর্ধমান রয়েছে শীর্ষে—লোকসংখ্যা ৯

শতাংশ এবং দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ১৬ শতাংশ। মেদিনীপুর সবার নীচে—লোকসংখ্যা ১৩ শতাংশ এবং দুধ উৎপাদন ৮ শতাংশ। উত্তর বাংলার মালদহ, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের আনুপাতিক অবস্থা পশ্চিম দিনাজপুরের অনুরূপ। দার্জিলিং-এর অবস্থা কিছুটা ভাল—লোকসংখ্যা ২ শতাংশ এবং দুধের পরিমাণ ৩ শতাংশ।

সারা ভারতের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় আমাদের শোচনীয় ব্যর্থতার আরো কিছুটা আভাষ পাওয়া যাবে। ১৯৬১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গো-মোষ-ছাগ দুধের উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গে ৫·১৭ লক্ষ মেট্রিক টন। সারা ভারতে তার পরিমাণ হল ২০৩·৩৫ লক্ষ মেট্রিকটন। অর্থাৎ দৈনিক মাথাপিছু দুধ উৎপাদনের পশ্চিমবঙ্গীয় গড় হল ৪১ গ্রাম এবং ভারতীয় গড় ১২৭ গ্রাম—তিন গুণেরও বেশী। ১৯৫১—৬১তে এ রাজ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৩ এবং ১৯৫১—৫৬তে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ০·৬। সুতরাং বর্তমান বৎসরের গণনায় যে আরো শোচনীয় অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। অপর দিকে পাঞ্জাবে সবুজ বিপ্লবের অভাবনীয় সাফল্যের পরবর্তী কর্মসূচীর নাম দেওয়া হয়েছে 'শ্বেত বিপ্লব' (white revolution) —দুধ উৎপাদনে পাঞ্জাব অপ্রতিহতগতিতে সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

কিভাবে এ জেলায় দুধের উৎপাদন ও ব্যবহারের পরিমাণ বাড়ান যায় আলোচনা করা যাক। প্রথমত জেলার শহরগুলোর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কয়েকটি ছোট ডেয়ারী প্রকল্প গড়ে উঠতে পারে। স্থানীয় উৎসাহী কিছু সংখ্যক লোক যদি এ ব্যবসায়ে অগ্রণী হন তারা সরকারী সাহায্য পেতে পারেন। মনে হয় স্টেট ব্যাঙ্ক (State Bank of India) থেকে তারা ঋণ পাবেন। কয়েক বিঘা জমি নিয়ে এভাবে গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ডেয়ারী গড়ে উঠতে পারে যেখানে সরকারী আনুকূল্যে উন্নত ধরনের গো-মহিষ রাখা সম্ভব হবে এবং পশু চিকিৎসার সব সুযোগ থাকবে। প্রসঙ্গত, এ জেলায় প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি করে এবং আরো দশটি ব্লক-সংলগ্ন পশু হাসপাতাল রয়েছে—এই হাসপাতালগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলে গবাদি পশুর মালিকরা উন্নত প্রথায় গোপালন করে উপকৃত হতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, এ জেলায় যদি গবাদি পশুর একটি মিশ্র প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা যায় তাহলে অধিবাসীরা কোন ডেয়ারী প্রকল্পে না থেকেও উন্নত গবাদি পশু পালনে সমর্থ হবেন এবং ফলস্বরূপ দুধ উৎপাদনের পরিমাণ প্রচুর বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। তৃতীয়ত, পশুখাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ কিভাবে সারা বছর রাখা যায় ভাবা দরকার। সব পতিত জমি চাষের আওতায় না নিয়ে কিছু জমি সরকারী আনুকূল্যে গোচারণ ভূমি হিসেবে রাখা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে মনে হয় সরকার এই জেলায় পতিত জমি (vested land) যা উদ্ধার করেছেন তার সবটাই ভূমিহীনদের বিতরণ না করে ধান চাষের পুরো উপযোগী নয় এরকম কিছু পরিমাণ জমি গোচারণ ক্ষেত্র হিসেবে রাখতে পারেন। সম্প্রতি রাজ্য সরকার কল্যাণীতে একটি পশু খাদ্য উৎপাদনের কারখানা স্থাপনে অগ্রণী হয়েছেন। দ্বিতীয় কারখানাটি খোলার কথা শিলিগুড়িতে। এই কারখানা দুইটি তাড়াতাড়ি চালু করে এবং আরো অধিক সংখ্যায় কারখানা খুলে গ্রামাঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে পশুখাদ্য বিতরণ করাই হবে এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। অপ্রাসঙ্গিক হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে গ্রামাঞ্চলে যে প্রচুর সংখ্যক বেকার এবং বাড়তি কৃষি শ্রমিক রয়েছেন, তাঁদের কর্মসংস্থান গ্রামাঞ্চলেই করতে হবে—শহরের শিল্প-কারখানায় তা একেবারেই সম্ভব নয়। তাই যথেষ্ট সংখ্যায় ডেয়ারী, পোলট্রি ইত্যাদি ক্ষুদ্র গ্রামীণ শিল্প (যার সাথে কৃষির যথেষ্ট সংযোগ রয়েছে) স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের বেকারদের কর্মসংস্থানের কথা ভাবতে হবে। এতে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে যা মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, গ্রামাঞ্চলে এভাবে প্রচুর দুধ উৎপাদন করলে দুধ অবিক্রিত থেকে দুধের দাম খুব কমিয়ে লোকসান ঘটতে পারে। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী এ অঞ্চলে এ ধরনের চিন্তায় অভ্যস্ত। তাদের অভিযোগ হলো এ অঞ্চলের লোকদের ক্রয়-ক্ষমতা খুবই সীমিত। এর জবাব হলো আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদি পশু পালন করলে লোকের একাংশের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। তাছাড়া দুগ্ধজাত দ্রব্য শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি এমন কি কলকাতায় (ফারাক্কার সড়ক সেতু এ বছরেই চালু হবে) চালান দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া বর্তমানে দুধের সরবরাহ কম থাকায় তার চাহিদা কিছুটা অস্থিতিস্থাপক। সরবরাহ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়লে এবং নিয়মিত হলে চাহিদা স্থিতিস্থাপক হবে — অর্থাৎ সরবরাহ বাড়িয়ে দাম সামান্য কমালেই দুধের বিক্রয় প্রচুর বেড়ে যাবে। সব চাইতে বড় কথা, সুস্থ সবল জাতি হিসেবে আমাদের টিঁকে থাকতে হলে দুধের ব্যবহার সকল স্তরের লোকের মধ্যে চালু করতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে দুধ উৎপাদন ও সহজে স্বল্পমূল্যে বন্টন। *

---

* এই প্রবন্ধে উল্লেখিত পরিসংখ্যানে নিম্নলিখিত বইগুলোর সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

(1) Statistical Abstract of the Indian Union-1967.
(২) পরিসংখ্যান, জুলাই, ১৯৬৯
(3) Census of India 1961, volume XVI.
(4) Census 1961, W. Bengal — West Dinajpur
(5) W. Bengal District Gazettieers, West Dinajpur.

পাকিস্তান বনাম পাকিস্তান

ফলাফল — বাঙলাদেশ
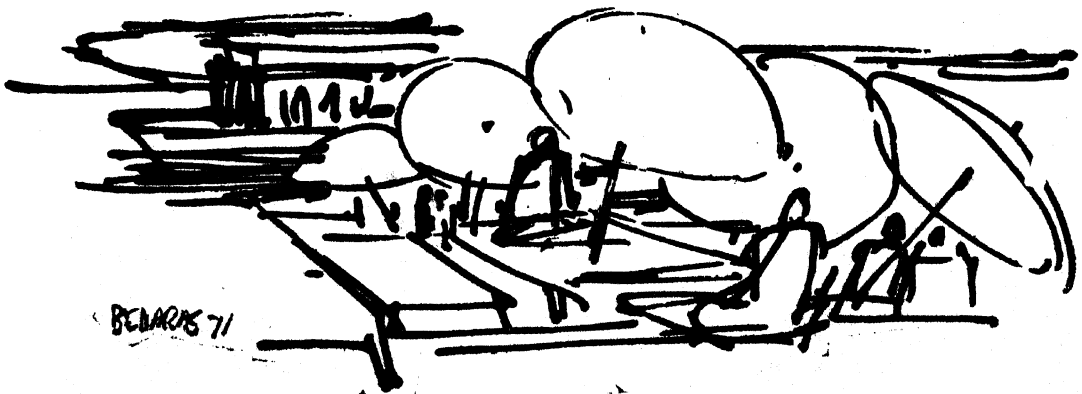
রঞ্জু নাগ

(১)

পূর্ব পাকিস্থানের অর্থনীতি প্রধানত কৃষিনির্ভর। কিন্তু এই কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতি যাতে উন্নত না হয়, তার দিকে পশ্চিম পাকিস্থানের শাসকগোষ্ঠীর সযত্ন দৃষ্টি ছিল। সরকারীভাবে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ এমনভাবে নেওয়া হত, যার ফলে পূর্ব পাকিস্থানের কৃষি বরাবরই স্কুইজড হয়ে আসছিল। পশ্চিম পাকিস্থানের কৃষিপণ্যের বিনিময়মূল্য—আন্তর্জাতিক এবং ঘরোয়া—দুদিক থেকেই পূর্ব পাকিস্থানের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। অন্যদিকে শিল্পদ্রব্যের বিনিময়মূল্য ছিল পূর্ব পাকিস্থানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্থানে অপেক্ষাকৃত কম। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্থানের কৃষক একদিকে যেমন তাঁর কৃষি উৎপাদনের জন্য কম মূল্য পেতেন; অন্যদিকে তেমনি তাকে পশ্চিম পাকিস্থানের শিল্পদ্রব্যের জন্য বেশী মূল্য দিতে হত। পূর্ব পাকিস্থানে শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য বেশী ছিল; যেহেতু সেখানে শিল্পোৎপাদন পশ্চিম পাকিস্থানের তুলনায় ছিল খুবই কম। উপরন্তু, পূর্ব পাকিস্থানের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার নিয়ন্ত্রণ যতটা কঠোর ছিল, পশ্চিম পাকিস্থানের বেলায় তা ছিল না। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্থানে আমদানী যতটা সুলভ এবং স্বচ্ছন্দ ছিল, পূর্ব পাকিস্থানে ছিল ঠিক তার বিপরীত। সরকারী নীতির পক্ষপাতিত্ব ছাড়াও আর একটি কারণ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তা হল পূর্ব পাকিস্থানের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা। ফলশ্রুতি হয়েছে এই যে, পূর্ব পাকিস্থানে শিল্পোদ্যোগ তেমন গড়ে ওঠে নি। ফলে শিল্পোৎপাদনও থেকে গেছে খুবই নীচু স্তরে। উপরন্তু ছিল পূর্ব পাকিস্থানের আমদানীর ক্ষেত্রে সরকারী কঠোরতা। অথচ পূর্ব পাকিস্থানে আমদানীর জন্য লাইসেন্স যদি আরও বেশী বরাদ্দ করা হত, তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরও বেশী হতে পারত। কিন্তু সেই উন্নয়নই বোধহয় পাক সরকারের বাঞ্ছিত ছিল না। এইজন্যই আমদানী নীতির এই দুরভিসন্ধিমূলক পক্ষপাতিত্ব। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে, আমদানী লাইসেন্স কাকে দেওয়া হবে বা হবে না—তা ঠিক করেন পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকার।

পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্থানের মধ্যে এই আমদানী লাইসেন্স বিতরণের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য ছিল, তা নীচের তথ্যচিত্রে তুলে ধরা হল। এই তথ্যচিত্রে কয়েক বছরের আমদানী লাইসেন্সের মূল্যের শতকরা হিসাব দেওয়া হল ঃ

	করাচী*	করাচী ব্যতীত পশ্চিম পাকিস্থান	পূর্ব পাকিস্থান
১৯৫৩ জানুয়ারী-জুন	৮৯·৮		১০·২
১৯৫৩।৫৪ জুলাই-ডিসেম্বর	৭৪·৩		২৫·৭
জানুয়ারী-জুন	৫৮·৮	১৩·২	২৮·০
১৯৫৪।৫৫ জুলাই-ডিসেম্বর	৬০·৪	১০·৫	২৯·২
জানুয়ারী-জুন	৬৬·২	৯·১	২৪·৭
১৯৫৫।৫৬ জুলাই-ডিসেম্বর	৫৭·১	১১·৬	৩১·৩
জানুয়ারী-জুন	৫৯·৬	১১·৬	২৮·৮

দেখা যাচ্ছে ঃ পূর্ব এবং পশ্চিম—দুই পাকিস্থানের তুলনায় করাচীই সবচেয়ে বেশী লাইসেন্স পেয়েছে। করাচীস্থ লাইসেন্সীরা আমদানীকৃত জিনিসপত্র আবার বেশিরভাগটাই বিক্রী করতেন সেই সব লোক এবং প্রতিষ্ঠানকে, যারা করাচীরই লোক বা প্রতিষ্ঠান। করাচীস্থ এই সব লাইসেন্সীরা করাচী ছাড়া পাকিস্থানের অন্যান্য অংশেও আমদানীকৃত জিনিসপত্রাদি বিক্রী করতেন। অর্থাৎ কৃষিজীবীদের কাছ থেকে আয়ের পুনর্বণ্টনে লাভবান হলেন করাচীর লাইসেন্সীরাই। পূর্ব পাকিস্থানে ব্যক্তিগত উদ্যোগের মাধ্যমে আমদানীকে মোটেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ কৃষিকে নিষ্পেষণ করে যে অঙ্গুলীমেয় লাইসেন্সীরা লাভবান হলেন, তাঁরা করাচীর লোক, যে করাচীতে তখন পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান এবং সেই সরকার, যার হাতে রয়েছে আমদানী লাইসেন্স বরাদ্দ করার চূড়ান্ত ক্ষমতা।

করাচীর প্রাধান্য কয়েকদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ লাইসেন্সী করাচীর হওয়ায়, শিল্পায়নের জন্য দরকার যেসব যন্ত্রপাতি, তা তারা আমদানী করতে পেরেছে। ফলে ওখানে এবং পশ্চিম পাকিস্থানে শিল্পায়ন ঘটেছে দ্রুত হারে। শিল্পসংস্থাগুলি এখানে একবার গড়ে ওঠার ফলে, তারাই উত্তরকালে বৈদেশিক মুদ্রার বৈধ দাবীদার হিসেবে গৃহীত হল। আবার কমার্সিয়াল লাইসেন্সিং প্রথা চালু হলে করাচীর শিল্পপতিরাই তার সুযোগ নিয়েছেন বেশী। কারণ, এই প্রথা চালু করার সময় যে শ্রেণী (Category) নির্ণয় করা হয়, তা করা হয়েছিল ১৯৫০-৫২ সনের আমদানীর ভিত্তিতে। আর সেই সময় করাচীর শিল্পপতিরাই ছিলেন সবচেয়ে বেশী আমদানীকারক।

বাঙলাদেশে নির্যাতনের প্রতিবাদে হোয়াইট হাউসের সামনে বিক্ষোভ

* ১৯৫৪ সনের জানুয়ারীর আগে করাচীর জন্য তথ্য আলাদাভাবে পাওয়া যায় না। সুতরাং ১৯৫৩ সনের জানুয়ারী-জুন এবং ১৯৫৩।৫৪ সনের জুলাই ডিসেম্বরের তথ্য গোটা পশ্চিম পাকিস্থানের জন্য ধরতে হবে।

এরা এসেছে বাঙলাদেশ থেকে। ফটো : প্রণব মুখার্জি
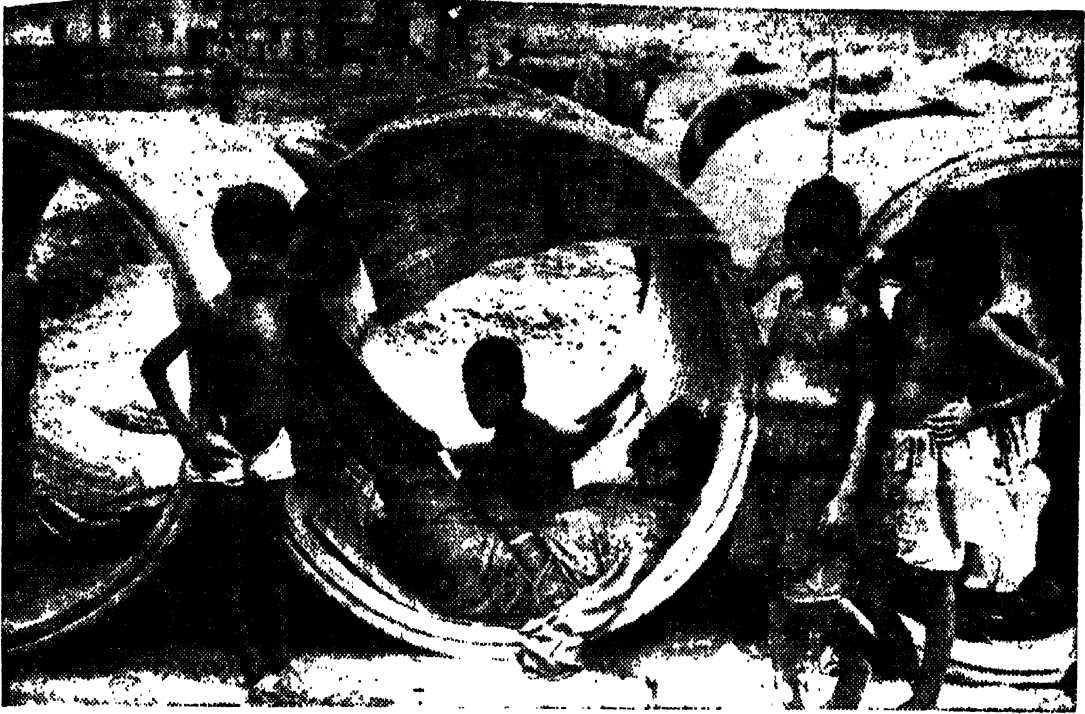
কমার্সিয়াল লাইসেন্স ছাড়াও আর একরকম লাইসেন্স পাকিস্থান সরকার ইস্যু করতেন। তা হল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্স। এখানে, সংক্ষেপে এই দুইরকম লাইসেন্সের প্রকৃতি সম্পর্কে দুচার কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পাকিস্থানে আমদানী লাইসেন্স আসলে হল একটি পারমিট। এই পারমিট কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ইস্যু করা হত। এই পারমিটের দৌলতেই সে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে আমদানী করতে পারত। এই পারমিটেই কয়েকটি বিষয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত। যেমন, কোন কোন জিনিস আমদানী করা যাবে; কত মূল্যের জিনিস আমদানী করা যাবে; পাকিস্থানের কোন অঞ্চলে সেইসব জিনিস ব্যবহার করা যাবে। কমার্সিয়াল লাইসেন্স হল সেই পারমিট, যার কৃপায় আমদানীকারক আমদানীকৃত জিনিসপত্রাদি বিক্রয় করতে পারেন। আর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্স হল সেই পারমিট, যার দৌলতে প্রস্তুতকারকেরা শুধু নিজেদের ব্যবহারের জন্যই যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল আমদানী করতে পারতেন। উভয় ক্ষেত্রে পাক সরকারের আমদানী এবং রপ্তানীর মুখ্য নিয়ামকই হলেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকর্তা। এই সরকারী সিদ্ধান্ত কত ব্যাপকভাবে পশ্চিম পাকিস্থানের অনুকূলে যেত এবং পূর্ব পাকিস্থানের প্রতিকূলে যেত, পরিসংখ্যানই তার সাক্ষ্য বহন করছে।

১৯৫৭ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত যত কমার্সিয়াল লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে, তার মোট মূল্যের শতকরা ভাগ কোন পাকিস্থানের ভাগ্যে কতটুকু জুটেছে, তার হিসেব নীচের তথ্যচিত্রে দেওয়া হল :

এই তথ্যচিত্রে স্পষ্ট হচ্ছে পূর্ব পাকিস্থানের ভাগ্যে মোট কমার্সিয়াল লাইসেন্সের অর্ধেকও জোটেনি কোন বছর। গোটা পশ্চিম পাকিস্থানই বরাবর বেশী লাইসেন্স পেয়েছে; তার মধ্যে আবার দেখা যাচ্ছে করাচীর প্রাধান্য। ১৯৬০

	করাচী	করাচী ব্যতীত পশ্চিম পাকিস্থান	পূর্ব পাকিস্থান
১৯৫৭			
জানুয়ারী-জুন	৪৪·৮	১৩·২	৪২·০
১৯৫৭-৫৮			
জুলাই-ডিসেম্বর	৪৯·২	১৭·৮	৩৩·০
জানুয়ারী-জুন	৪৮·৮	১৮·৩	৩২·৯
১৯৫৮-৫৯			
জুলাই-ডিসেম্বর	৪৯·৯	১৮·২	৩১·৯
জানুয়ারী-জুন	৪৮·৯	১৫·৩	৩৫·৮
১৯৫৯-৬০			
জুলাই-ডিসেম্বর	৪২·১	১৭·৮	৪০·১
জানুয়ারী-জুন	৪৭·৬	২০·৩	৩২·১
১৯৬০-৬১			
জুলাই-ডিসেম্বর	৪১·৮	১৪·৬	৪৩·৬
জানুয়ারী-জুন	৪০·৯	১২·৮	৪৬·৩
১৯৬১-৬২			
জুলাই-ডিসেম্বর	৩৬·১	১৭·৮	৪৬·০
জানুয়ারী-জুন	৩৬·৯	১৭·৫	৪৫·৬
১৯৬২-৬৩			
জুলাই-ডিসেম্বর	৪২·৯	১৮·৮	৩৮·৪
জানুয়ারী-জুন	৪১·৩	২১·৭	৩৭·০
১৯৬৩-৬৪			
জুলাই-ডিসেম্বর	৩৬·০	২৪·৪	৩৯·৬
জানুয়ারী-জুন	৩০·২	[illegible]	৪৬·৩

সালের আগে করাচী মোট কমার্সিয়াল লাইসেন্সের অর্ধেক পেয়েছে; আর তার পরে পেয়েছে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী। করাচী বাদ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্থানের অংশ এক-পঞ্চমাংশের কম থেকে বেড়ে উঠেছে প্রায় চার ভাগের এক ভাগে। যদিও পূর্ব পাকিস্থানের ভাগ এক-তৃতীয়াংশের থেকে দুই-পঞ্চমাংশেরও বেশী হয়েছে, ১৯৬২ থেকে আবার তা কমতির দিকে যায়। ১৯৬০ সনের আগেপরে যে হেরফের দেখা যাচ্ছে তার কারণ হচ্ছে এই : ঐ সনেই পাক সরকার আমদানীর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ কিছু শিথিল করেন। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণমুক্তি পূর্ব পাকিস্থানকে যে খুব একটা সাহায্য করেছে তা নয়।

এবারে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্সের ক্ষেত্রেও যে বৈষম্য ঘটানো হয়েছে তার হিসেব নেওয়া যাক। নীচের তথ্যচিত্রে এই লাইসেন্সের মোট মূল্যের শতকরা ভাগ দেখানো হচ্ছে :

	করাচী	করাচী ব্যতীত পশ্চিম পাকিস্থান	পূর্ব পাকিস্থান
১৯৫৭			
জানুয়ারী-জুন	৪০·৬	৩০·৫	২৮·৯
১৯৫৭-৫৮			
জুলাই-ডিসেম্বর	৩৭·৪	২৫·৫	৩৭·১
জানুয়ারী-জুন	৩৯·৬	৩৩·৮	২[illegible]·৬
১৯৫৮-৫৯			
জুলাই-ডিসেম্বর	৪২·৮	৩১·৮	২৫·৪
জানুয়ারী-জুন	৪৬·৯	৩০·৫	২২·৬
১৯৫৯-৬০			
জুলাই-ডিসেম্বর	৩৮·০	২২·৫	৩৯·৬
জানুয়ারী-জুন	৩৬·৩	৩২·১	৩১·৬
১৯৬০-৬১			
জুলাই-ডিসেম্বর	৪৩·৩	৩০·৩	২৬·৪
জানুয়ারী-জুন	৩৭·৫	২৪·৪	৩৮·২
১৯৬১-৬২			
জুলাই-ডিসেম্বর	৩৬·৪	২৭·০	৩৬·৭
জানুয়ারী-জুন	৩৬·৫	৩২·৬	৩০·৯
১৯৬২-৬৩			
জুলাই-ডিসেম্বর	৪৬·৬	২৭·৪	২৬·০
জানুয়ারী-জুন	৪৫·০	৩০·৩	২৪·৭
১৯৬৩-৬৪			
জুলাই-ডিসেম্বর	৩৭·০	৩৬·৫	২৬·৫
জানুয়ারী-জুন	৩৭·৭	২৯·৪	৩২·৯

এখানেও সামগ্রিকভাবে করাচীর প্রাধান্য। অথচ করাচীতে পাকিস্থানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২ থেকে ৩ ভাগের বাস। এবং গ্রামীণ জনপদগুলি থেকে করাচীর অবস্থান বেশ দূরে। অথচ করাচীই যেখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্সের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ বরাবরই পেয়ে এসেছে; পূর্ববঙ্গের ভাগ্যে জুটেছে এক-তৃতীয়াংশেরও কম। এই পক্ষপাতিত্বের ফলে করাচীর মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পপতি, যাঁরা আসলে ছিলেন ব্যবসায়ী এবং সরকারী অর্থনীতির পক্ষপাতিত্বের সুযোগেই হয়ে উঠলেন শিল্পপতি, লাভবান হয়েছেন। আমদানীর এই অসমবণ্টনের ফলে যা ঘটেছে, তা হল : কৃষিক্ষেত্র থেকে শিল্পক্ষেত্রে সম্পদের অসম স্থানান্তরণ। এই স্থানান্তরণ পশ্চিম পাকিস্থানে যতটা ঘটেছে, পূর্ব পাকিস্থানে তেমন কিছুই হয়নি।

এমনকি সরাসরি সরকারী উদ্যোগে যে আমদানী হত, সেক্ষেত্রে দুই পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য বজায় রাখা হয়েছে। পাঁচ বছরের তিনটি পর্বে সরকারী আমদানীর শতকরা ভাগ নীচের তথ্যচিত্রে তুলে ধরা হল :

	প্রাক পরিকল্পনাকাল ১৯৫০-৫১—১৯৫৪-৫৫		প্রথম পরিকল্পনাকাল ১৯৫৫-৫৬—১৯৫৯-৬০		দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল ১৯৬০-৬১—১৯৬৪-৬৫	
	সরকারী আমদানী	সরকারী আমদানী খাদ্যদ্রব্য	সরকারী আমদানী	সরকারী আমদানী খাদ্যদ্রব্য	সরকারী আমদানী	সরকারী আমদানী খাদ্যদ্রব্য
পূর্ব পাকিস্তানা	৩০·৩	৫১·৩	৩৫·৫	৩১·৯	৩৬·০	৪১·৫
পশ্চিম পাকিস্তান	৬৯·৭	৪৮·৭	৬৪·৫	৬৮·১	৬৪·০	৫৮·৫
সমগ্র পাকিস্তান	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০

দেখা যাচ্ছে : পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে সরকারী আমদানীর অংশ এই তিনটি পর্বেই বেড়ে চলেছে। কিন্তু এমন কিছু বাড়ে নি, যে পশ্চিম পাকিস্থানকে ছাড়িয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তান বরাবরই সরকারী আমদানীর সিংহভাগ ভোগ করেছে। একক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল: খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য সরকারী আমদানী। এবং মোট আমদানী থেকে এর পার্থক্য। প্রাক পরিকল্পনাকালে যখন মোট আমদানীর থেকে সরকারী আমদানী এক-পঞ্চমাংশের কম ছিল, তখন খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য সরকারী আমদানীর অর্ধেকের বেশী পেয়েছে পূর্ব পাকিস্তান। প্রথম পরিকল্পনাকালে যখন সরকারী আমদানী মোট আমদানীর প্রায় অর্ধেক হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তান তখন খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত সরকারী আমদানীর এক-তৃতীয়াংশের কম পেয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে, যখন মোট আমদানীর মধ্যে সরকারী আমদানীর অংশ খুবই কমতির দিকে গেছে, পূর্ব পাকিস্তান তখন খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য সরকারী আমদানীর অংশ ছিল পাঁচ ভাগের দুই ভাগ। অথচ দেখা যাচ্ছে যে, মোট আমদানীর মধ্যে সরকারী আমদানীর ভাগ এবং সরকারী আমদানীর মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত অন্যান আমদানীর যে ভাগ পূর্ব পাকিস্তান পেয়েছে — তার মধ্যে সম্পর্কটা বৈপরীত্যমূলক। মোদ্দা কথা হল : পূর্ব পাকিস্থান শুধু যে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে যে লাইসেন্স দেওয়া হত, তাই কম পেয়েছে তা নয়; সরকারী উদ্যোগে যে বৈদেশিক মুদ্রা বন্টন করা হত, তাও পেয়েছে খুব কম।

প্রসঙ্গসূত্রে একজন পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদের এই মন্তব্যগুলি তুলে দেওয়া হল : 'যেহেতু রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে, পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা যতটা পরিমাণে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দুর্নীতির মাধ্যমে পেয়েছেন, পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা তা পান নি। একজন পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতি যৎসামান্য ব্যয় করেই কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে গিয়ে তদ্বির-তদারক করে কাজ গুছিয়ে আনতে পারেন। কিন্তু একটা সামান্যতম বিষয় জানতে হলে একজন পূর্ব পাকিস্তানীকে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করলে দীর্ঘ কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হয়। সরকারী প্রশাসকেরা যে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতিদের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন, তার ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্যে জুটেছে শুধু অবহেলা।' এই অবহেলা আসলে পূর্ব পাকিস্থানে বাঙালী

বাঙলা দেশের এই বৃদ্ধ ব্যক্তিকে নিয়ে চলেছেন একজন বালক　　ফটো : প্রণব মুখার্জি

ব্যবসায়ীদের ভাগ্যেই জুটেছে। অবাঙালী-দের ভাগ্যে নয়।

(২)

পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষোভের একটি অন্যতম কারণ হল রপ্তানী থেকে যে বিদেশী মুদ্রা আয় হয়, দুই অংশের মধ্যে তার অসম বন্টন। পাঁচ বছরের তিনটি কালপর্বে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানী এবং রপ্তানীর শতকরা মূল্যে পরিমাণ তুলে ধরা হল নীচের তথ্যচিত্রে। এই আমদানী বিশ্ব থেকে দুই পাকিস্তানে এবং রপ্তানী দুই পাকিস্তান থেকে বিশ্বে। দেখা যাচ্ছে রপ্তানী বাণিজ্য থেকে পূর্ব পাকিস্তান বিদেশী মুদ্রার অর্ধেকেরও বেশী আয় করেছে। কিন্তু আমদানীকৃত জিনিসপত্রের এক-তৃতীয়াংশেরও কম তার ভাগ্যে জুটেছে। এই তথ্যচিত্র থেকে আরও একটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা হল : পাকিস্তান সৃষ্টির ঠিক পরে পূর্ব পাকিস্তান যা রপ্তানী করত, সাম্প্রতিক কয়েক বছরে তার চেয়ে বেশী করেছে।

যখন পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়, পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে তেমন কোন বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল না। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই এই দুই অংশের মধ্যে এই সম্পর্কে তৈরী হয়। ১৯১৪ সন পর্যন্ত দেখা গেছে : বৃটেনের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যে ঘাটতি থেকে যাচ্ছিল; কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যে ভারতের উদ্বৃত্ত ঘটছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ বাদ দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যে বৃটেনের মন্দাবস্থা যাচ্ছিল। এই মন্দাবস্থা সে কাটাতো ব্রিটেন বাদ দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যে ভারতবর্ষের যে উদ্বৃত্ত ঘটত, সেই উদ্বৃত্ত লুট করে নিয়ে। এই লুট সে চালাত হোম চার্জের মাধ্যমে এবং ভারতবর্ষের শিল্পগুলিকে শ্বাসরুদ্ধ করে।

১৯৫০।১ থেকে ১৯৫৪।৫ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ঘাটতি ছিল ২১২০·০ মিলিয়ন টাকা। কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যে তার উদ্বৃত্ত হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের বাণিজ্যে যে উদ্বৃত্ত ঘটেছিল, তার পরিমাণ ছিল ১৩০৯·৫ মিলিয়ন টাকা। ১৯৫৪।৫ থেকে ১৯৫৯।৬০ সনে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ঘাটতি ছিল ১৪১৮·৫ মিলিয়ন টাকা। কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যে তার উদ্বৃত্ত ছিল ১৭৭৫·০ মিলিয়ন টাকা। সামগ্রিকভাবে তার উদ্বৃত্ত তাহলে দাঁড়িয়েছিল ৩৫৬·৫ মিলিয়ন টাকা। কিন্তু ১৯৬০।১ থেকে ১৯৬৪।৫ সনে পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্যে সামগ্রিকভাবে ঘাটতি হল। এই ঘাটতির কারণ হিসেবে বলা যায় : পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানকে বাধ্য করেছিল উচ্চমূল্যে পশ্চিম পাকিস্তানের জিনিসপত্রাদি কিনতে। শুধু তাই নয়, উন্নয়নমূলক সম্পদসমূহকে পূর্ব পাকিস্তানে না খাটিয়েও এই ঘাটতি ঘটান হয়েছে। এই ঘাটতির পরিমাণের হিসেবটা এই রকম : পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যের ঘাটতি বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২১২২·৫ মিলিয়ন টাকা; কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমে নেমে আসে ২০৫·৫ মিলিয়ন টাকায়। অতএব সামগ্রিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের ঘাটতি হয়েছিল ১৯১৭·০ মিলিয়ন টাকা।

পরপৃষ্ঠার তথ্যচিত্রে দুই পাকিস্তানের মধ্যে আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য এবং বহিঃ-

আমদানী : শতকরা মূল্যে

	১৯৫০।১—১৯৫৪।৫	১৯৫৫।৬—১৯৫৯।৬০	১৯৬০।১—১৯৬৪।৫
পূর্ব পাকিস্তান	২৯·৪	২৯·১	৩০·৫
পশ্চিম পাকিস্তান	৭০·৬	৭০·৯	৬৯·৫
সমগ্র পাকিস্তান	১০০·০	১০০·০	১০০·০

রপ্তানী : শতকরা মূল্যে

	১৯৫০।১—১৯৫৪।৫	১৯৫৫।৬—১৯৫৯।৬০	১৯৬০।১—১৯৬৪।৫
পূর্ব পাকিস্তান	৫০·৩	৬১·৪	৫৯·৫
পশ্চিম পাকিস্তান	৪৯·৭	৩৮·৬	৪০·৫
সমগ্র পাকিস্তান	১০০·০	১০০·০	১০০·০

বিশ্বের সঙ্গে দুই পাকিস্তানের বাণিজ্যের বার্ষিক গড়ের পরিসংখ্যান মিলিয়ন টাকার অঙ্কে দেওয়া হল :

বৈদেশিক মুদ্রা যা অর্জিত হয়েছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে যে আয় খুবই বেড়ে যায়, তার অংশ পূর্ব এবং পশ্চিম পাকি-

পাকিস্তানে। এই স্থানান্তরণ আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে তা ঘটেছে স্বল্পআয়বিশিষ্ট অঞ্চল থেকে অধিক

	১৯৫০।১—১৯৫৪।৫	১৯৫৫।৬—১৯৫৯।৬০	১৯৬০।১—১৯৬৪।৫
পূর্ব পাকিস্তান			
বিদেশ থেকে আমদানী	৪৩৯·৪	৬২৪·৮	১২১৯·২
পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানী	২৮৭·৮	৫৬৪·৩	৮৮১·৫
মোট আমদানী	৭২৭·২	১১৮৯·১	২১০০·৭
বিদেশে রপ্তানী	৮৬৩·৪	৯৭৯·৮	১২৬০·৩
পশ্চিম পাকিস্তানে রপ্তানী	১২৫·৭	২৮০·৬	৪৫৭·০
মোট রপ্তানী	৯৮৯·১	১২৬০·৪	১৭১৭·৩
পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যালান্স	—১৬২·১	—২৮৩·৭	—৪২৪·৫
বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যালান্স	৪২৪·০	৩৫৫·০	৪১·১
সামগ্রিকভাবে লাণিজ্যের ব্যালান্স	২৬১·৯	৭১·৩	—৩৮৩·৪
পশ্চিম পাকিস্তান			
বিদেশ থেকে আমদানী	১০৫৩·১	১৫২৫ ০	২৭৭২·৭
পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমদানী	১২৫·৭	২৮০·৬	৪৫৭·০
মোট আমদানী	১১৭৮·৮	১৮০৫·৬	৩২২৯·৭
বিদেশে রপ্তানী	৮৫২·৮	৬১৬·৩	৮৫৭·২
পূর্ব পাকিস্তানে রপ্তানী	২৮৭·৮	৫৬৪·৩	৮৮১·৫
মোট রপ্তানী	১১৪০·৬	১১৮০·৬	১৭৩৮·৭
পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যালান্স	১৬২·১	২৮৩·৭	৪২৪·৫
বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যালান্স	—২০০·৩	—৯০৮·৭	—১৯১৫·৫
সামগ্রিকভাবে বাণিজ্যের ব্যালান্স	— ৩৮·২	—৬২৫·০	—১৪৯১·০

এই হিসেব থেকেও দেখা যাচ্ছে : বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ঘটেছে ঘাটতি। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্য হয়েছে আভ্যন্তরীণ মূল্যমান অনুসারে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য হয়েছে আন্তর্জাতিক মূল্যমান অনুসারে।) এমনকি, সামগ্রিকভাবেও পূর্ব পাকিস্থানের ব্যালান্স অফ ট্রেডে আর উদ্বৃত্ত থাকল না; দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল থেকেই তাতে ঘাটতি দেখা দিল। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত দেখিয়েছে; কিন্তু তার ঘাটতি ঘটেছে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যে। অবশ্য সামগ্রিকভাবে তার ব্যালান্স অফ ট্রেডে ঘাটতি থেকেই যায়।

এই সব তথ্য থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বেরিয়ে আসে। তা হল এই : প্রথম পরিকল্পনাকাল থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানে জিনিসপত্র রপ্তানী করছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে স্তানের মধ্যে সমানুপাতিক হারে বণ্টন করা হয়নি। উপরন্তু আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক মূল্যমানের যে তারতম্য ছিল, তার যদি একটা সমন্বয় সাধিত হয়, তাহলে দেখা যাবে : আন্তঃ প্রাদেশিক এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদই চলে গেছে পশ্চিম পাকিস্তানে।

দুই পাকিস্তানের মধ্যে আঞ্চলিক বৈষম্য যে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল, তার একটি প্রধান কারণই হল পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদের এই স্থানান্তরণ। বলাই বাহুল্য যে, আন্তপ্রাদেশিক এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত আয় থেকেই স্থানান্তরণ ঘটেছে। প্রাকপরিকল্পনাকালে প্রতি বছর পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে ২১০ মিলিয়ন টাকার প্রকৃত সম্পদের স্থানান্তরণ হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনাকালে হয়েছে ১০০ মিলিয়ন টাকা। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক আয়ের একটা মোটা অংশই চলে গেছে পশ্চিম উচ্চআয়বিশিষ্ট অঞ্চলে। আর তা সম্ভব হয়েছে exchange control এর মাধ্যমে। এই নিয়ন্ত্রণানুসারে রপ্তানীকারককে তার অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সমর্পণ করতে হয় সরকারী বিনিময়হারে দেশীয় মুদ্রা লাভের জন্য। এইভাবে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়, তাই আবার আমদানীকারকদের দেওয়া হয়। তা দেওয়া হয় সরকারী নীতি অনুসারে। তাই কোন অঞ্চলে কী পরিমাণ বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী হবে, তা নির্ভর করে সেই অঞ্চলের আমদানীকারকেরা কতদূর কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টিবিধান করতে পারেন, তার ওপর। পশ্চিম পাকিস্তান এ ব্যাপারে খুবই সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে; যদিও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তার ঘাটতি ছিল বরাবরই; অথচ প্রায় সবসময়ই এ ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত ছিল।

নতুন বাসস্থানের পথে এগিয়ে চলেছে বাঙলাদেশের মেয়েরা। বর্তমানের দুর্দশায় এরা মুহ্যমান—কারণ এরা ফিরে যাবে একদিন স্বাধীন বাঙলাদেশে।

ভিন্ন দৃষ্টিতে

মানুষ একা একা থাকলে নিজের খুশিমতো চলতে পারে। কিন্তু বিবাহিত জীবনে এই খুশি অন্য খাতে বাঁক নেয়। দুটি মনের খুশি তখন কাছাকাছি এসে এক চিরন্তন পথ বেয়ে চলে। সে পথে আসে সন্তানসন্ততি। ঘর ভরে ওঠে। আদিম পৃথিবী থেকে শুরু করে এই রেওয়াজই চলে আসছিল। তারপর অনেক পরিবর্তনের স্রোত বয়ে গেছে পৃথিবীর উপর দিয়ে। হালফিল দুনিয়া আরো বদলাচ্ছে। পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা মানুষের অভ্যাস। দুনিয়া যেমন যেমন বদলাচ্ছে মানুষও তেমনি চালচলনে অভ্যস্ত হচ্ছে। এখন আর কেউ ঘরভরতি সন্তানসন্ততি চায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম সন্তানটি প্রায় স্বাভাবিক নিয়মেই আসে। এতেও অনেকের কত না গড়িমসি। কেউ কেউ সন্তান চায় একটু দেরিতে। তবু প্রথম সন্তান নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক। কারণ, বিবাহিত জীবনে কেউই প্রায় সন্তানবিহীন থাকতে চায় না।

এখান থেকেই প্রশ্নটা উঠেছে, প্রথম সন্তানের পর আর কটি? এই প্রশ্নটিকে ঘুরিয়ে বলা চলে, বিবাহিত জীবনে কটি সন্তান কাম্য?

এই একটি প্রশ্নকে নিয়ে আজকের দুনিয়া হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। নানাদিক থেকে নানাভাবে প্রশ্নটিকে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ও এ সম্পর্কে একাধিক সমীক্ষা চালিয়েছে। তাতে দেখা গেছে যে, যেসব অঞ্চলে এমনিতেই জন্মের হার কম তাদের সন্তান-আকাঙ্ক্ষাও কম। আবার যে অঞ্চলে জন্মের হার বেশি সেই অঞ্চলের মহিলারা চান তিন বা ততোধিক সন্তান।

জন্ম-হার সাধারণত নির্ভর করে সামাজিক পরিবেশের উপর। পারিবারিক প্রস্তুতি, নারীর সামাজিক মর্যাদা, সাংস্কৃতিক মান, শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ-সুবিধা, বাসস্থান প্রভৃতির উপরই সন্তানের আগমন নির্ভর করে। এরই মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব হলো পারিবারিক প্রস্তুতির। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনির উচ্চনিনাদ যেন চকিতে উধাও না হয়ে যায়, তবু সন্তান আকাঙ্ক্ষা খুব-একটা বাড়ে না। এ সম্বন্ধে গোড়ায় সবাই সতর্ক হয়ে যায়। স্বাভাবিকতাকে মেনে নেবার পর সব ব্যাপারটাই অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে।

রুশদেশে নানাদিক থেকেই জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান সম্ভব হয়েছে। কাজকর্মের

সুব্যবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা, বাসস্থান এবং বলতে গেলে কোন কিছুরই অভাব নেই। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে মানুষের গড় আয়ুও বেড়েছে। মৃত্যুর হার কমেছে। দেশের লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটেছে। সাংস্কৃতিক মান ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী।

ভাবতে বেশ মজা লাগে যে, পৃথিবীর অনেক দেশ যখন জন্মহার কমানোর জন্য মাথা ঘামিয়ে অস্থির, তখন রুশদেশে জন্ম-হার বাড়ানোর জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এবং কম জন্মহার নিয়ে তাঁরা রীতিমতো বিব্রত। এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, গত দশকে সেদেশে মৃত্যুর হার বেশ হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এই সময়ে জন্ম-মৃত্যুর হিসেব কষে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতি হাজারে জন্মহার প্রায় এক তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েছে। যদিও নব-জাতকের সংখ্যা হাজার পিছু দশজন। এই সংখ্যা খুব-একটা নিরুৎসাহব্যঞ্জক নয়। যেকোন সমৃদ্ধ দেশের পক্ষে এই জন্মহারও কিছুটা বাড়াবাড়ি। কিন্তু জন্মহারের এই মাপকাঠি সমগ্র রুশদেশের পক্ষে কিছুটা আশার সঞ্চার করা উচিত ছিল। এদেশের

ক্ষুধা আর রোগ বাঙলাদেশের এইসব অসহায় শিশুদের জীবনে ডেকে এনেছে এক মর্মান্তিক পরিণতি—মৃত্যুর হাত থেকে এ'দের বাঁচাবার দায়িত্ব নিয়েছেন মানবিক প্রেমে উদ্বুদ্ধ বিশ্ববাসী।

[...]র্বত্র জন্মহার এক নিয়মে চলে না। কোথাও জন্মহার কম আবার কোথাও বেশি। এক [...]ায়গায় যদি হাজার প্রতি ৩০ থেকে ৩৬ [...]য় তবে অন্য এক প্রান্তে তা হলো ১৪ [...]থকে ১৭।

কিন্তু সমস্যা হলো যে, দীর্ঘদিন যাবত [...]ই জন্মহার বলতে গেলে অপরিবর্তিত [...]য়ে গেছে। আবার যেখানে জন্মহার কম [...]সখানে তা কোনক্রমেই বাড়তির মুখে নয় [...] স্থিরও থাকছে না। জন্মহার কমেই চলেছে। [...]কথা কারো পক্ষে জোর করে বলা সম্ভব [...] যে, এসব অঞ্চলে জন্মহার আরো কমবে [...] বা যে ধারা চলছে তাই অক্ষুণ্ণ থাকবে। [...]জেই এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের [...]ায়িত্ব বাড়ছে। জন্মহার কমানো নিয়ে [...]রা পৃথিবী মাতামাতি করলেও তাঁদের [...]ন্ম দিকে নজর দিতে হবে। জন্মহার [...]ংক্রান্ত সকল তথ্য জানতে হবে এবং তা [...]ন হ্রাস পাচ্ছে তাও খুঁটিয়ে দেখতে হবে। [...]ারণ, এখানে এমনও একটা আশংকা আছে [...] জন্মহারের এই নিম্নমান যদি অব্যাহত [...]াকে তবে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক [...]্রগতি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা [...]বে অদূর ভবিষ্যতে। তাই সময় থাকতেই [...]তর্ক হওয়া প্রয়োজন।

এথেকে অনেকের মনে একটা ধারণা [...]তে পারে যে, জন্মহারের খুব বৃদ্ধি বুঝি [...]শদেশের আকাঙ্ক্ষিত। আসল ঘটনা কিন্তু [...] নয়। এর পেছনে যে যুক্তিটা সবচেয়ে [...]শি কার্যকর তা হলো, জন্মহার হ্রাস [...]তে পেতে এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে [...]ৌঁছুবে যে বয়স্ক মানুষদের (বাপ-[...]দাদার) চেয়ে সন্তানসন্ততির সংখ্যা হবে [...]। জন্মহারের খুব বৃদ্ধি যেমন কাম্য [...], তেমনি এরকম একটা অস্বাভাবিক [...]অবস্থাকেও কোন অবস্থাতেই মেনে নেওয়া [...] না। সেজন্যই এসব অঞ্চলে জন্মহার [...]দ্ধির জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা [...]ছে। এটা যদি সম্ভব না হয় তবে এখানকার [...]সংখ্যা এমন হ্রাস পাবে যে, সেই আশংকা [...]দিন বাস্তবে রূপ নিয়ে সারা মানব-[...]তাকে উপহাস করবে। সেজন্য বিশেষজ্ঞরা [...]টামুটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জন্মহার [...] যেমন আছে তা থেকে কিছুটা বাড়াতে [...]। তাহলে দেখা যাবে যে, দুটি বা [...]টি সন্তান হবে পরিবারভিত্তিক হিসাব।

এপর্যন্ত যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তা [...]ক দেখা যায় যে, অনেক অঞ্চলে পরিবার-[...], একটি সন্তানই কাম্য। খুব বেশি [...] দুটি। আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে [...] এই ধারার কোন পরিবর্তন না হয়, [...]দেশের আর্থিক উন্নয়ন ব্যাহত হওয়ার [...]ংকা সত্যি হবে। দেশের সম্পদে শিশু-[...]অধিকারও সঙ্গে সঙ্গে কমে যাবে। [...]জায়গায় আসবে বৃদ্ধের দল। সবল এবং [...] লোকের জায়গা এরা দখল করবে। [...]ভাবে দেশে গুরুতর সংকট দেখা [...], 'ম্যান পাওয়ারের'। এর ফল ভোগ [...] সমগ্র দেশ ও জাতি। বৈজ্ঞানিক এবং [...]বিদ্যার ক্ষেত্রে দেশ পিছিয়ে যাবে। [...], নতুন বংশধররা যুগের সঙ্গে তাল [...]য়ে চলতে পারে এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষাও হবে যুগোপযোগী। সেই সঙ্গে থাকবে তাদের বলিষ্ঠ দেহ। বয়স্কদের কাছে এগুলো প্রত্যাশা করা যায় না।

এই জাতিগত দুর্দৈবের হাত থেকে বাঁচতে হলে এবং আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সকল দিকে দেশের অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে হলে জন্মহার বৃদ্ধি ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ, দেশের ভার নেবে নতুন বংশধররা। পুরাতনের হাতে চিরকাল নির্ভর করে বসে থাকা যায় না। পুরাতনের দায়িত্ব শেষ হওয়ার সংগে সংগে নতুনকে এসে সব বুঝে নিতে হবে। তাই জন্মহার বৃদ্ধির পক্ষে জনমত গঠন করতে হবে। জন্মহার সেটুকুই দরকার যতটুকু হলে কোন অনাসৃষ্টি সম্ভব নয়। এবং এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য যেখানে জন্মহার স্বল্প।

যাঁরা একটি সন্তান চান তাঁদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, একটি সন্তান বড় হয়ে ওঠে পুরোপুরি স্বাধীনতার ভিত্তিতে। পরিবারে তার একচ্ছত্র আধিপত্য। তার অধিকারে হাত দেবার কেউ নেই। সে যখন যা আবদার করে মা-বাবা তাই সাধ্যমতো পূরণ করেন। মা-বাবা এবং আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে সে যা পায় তা ফিরিয়ে দেওয়ার অভ্যাস তার গড়ে ওঠে না। এর চেয়েও বড়ো কথা যে, নিঃসঙ্গ বেড়ে ওঠার ফলে সে হয়ে পড়ে কিছুটা স্পর্শকাতর। এরকম সন্তানের পক্ষে একা একা পৃথিবীতে চলা-ফেরা খুবই দুঃসাধ্য। নিজের সম্বন্ধে এদের কোন সঠিক ধারণা থাকে না এবং সব সময় সব ব্যাপারেই কিরকম অসন্তোষে ভোগে। কোন কিছুতেই সে তৃপ্তি পায় না। অন্য সন্তান না চেয়ে এমনিভাবে তাদের একটি মাত্র সন্তানকে সবকিছু উজাড় করে দেন।

শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে এর বিষময় ফল ফলে। বিশেষজ্ঞদের মতে প্রথম সন্তান দ্বিতীয় এবং তৃতীয়ের তুলনায় হীনস্বাস্থ্য এবং দুর্বল হয়। অথচ মা-বাবা নিজেদের অজ্ঞাতে এই দুর্বল শিশুকে আরো দুর্বল করে গড়ে তোলেন।

এদিক থেকে বিচার করে দুটি বা তিনটি সন্তান পরিবারের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। সমাজের পক্ষে তো বটেই। সন্তান শুধু যে মা-বাবার ভবিষ্যতের ভরসা তাই নয়, দেশেরও ভবিষ্যৎ। তাই সন্তানের যত্ন নেওয়া, তাকে বড় করা মা-বাবার ব্যক্তি-গত দায়িত্ব নয়, দেশেরও একই সমান দায়িত্ব। বিশেষজ্ঞরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে জন্মহার বাড়ানোর ব্যাপারে নতুন উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারেন। বিশেষত যেখানে জন্মহার খুবই কম। এজন্য প্রয়োজন সেখান-কার সমগ্র অবস্থা বিবেচনা করে দেখা। তারপর ব্যক্তিগত সদিচ্ছার সঙ্গে দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। তবে হয়তো সুফল পাওয়া যেতে পারে।

আসলে প্রেরণা জাগাতে হবে নারীদের মধ্যে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সন্তান পালন বা মানুষ করা খুব একটা সমস্যা নয় এবং এ দায়িত্ব পুরোপুরি তাদের একা বহন করতে হবে না। সমগ্র দেশ এজন্য তার পেছনে রয়েছে। বাচ্চা হওয়ার পরও যদি পরিবারের আর্থিক এবং অন্যান্য অবস্থার কোন পরিবর্তন না হয় তবে বিবাহিতের দল দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সন্তানের ব্যাপারে উৎসাহ অনুভব করবে। আর এভাবেই জন্মহারও বৃদ্ধি পাবে। দেশ এক ভবিষ্যতের প্রচণ্ড সংকট থেকে ত্রাণ পাবে।

জন্মহার বৃদ্ধির মাধ্যমে রুশদেশ জাতীয় সংকট থেকে ত্রাণের পথ খুঁজছে, আর আমরা জন্মহার কমানোর মাধ্যমে জাতীয় সুদিনের প্রতীক্ষা করছি। পৃথিবীর দেশে দেশে কি বিপুল বৈচিত্র্য!

—প্রমীলা

পরলোকে নির্মলা মা

নির্মলা মা দেহত্যাগ করেছেন ২০শে জুলাই মঙ্গলবার বিকেল ৬টায়। তিনি একজন সাধিকা ছিলেন এবং আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঅন্নদা ঠাকুরের স্ত্রী মা মণি-কুন্তলা দেবীর শিষ্যাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র জীবিত। ঢাকার সিংহ-পাড়ায় এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ সংঘের অধিকর্তা এবং ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীহেমচন্দ্রের সহধর্মিণী ছিলেন। কুড়ি বৎসর বয়সে শ্রীশ্রী অন্নদাঠাকুরের পাদপদ্মে তিনি নিজেকে সমর্পণ করেন এবং অবশেষে তাঁর স্ত্রী মণিকুন্তলা দেবীর শিষ্যা হন। তিনি কিছুদিনের জন্য আড়িয়া-দহ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ঠাকুর এবং গুরুমাতার দেহত্যাগের পর তিনি সম্পূর্ণরূপে ধ্যান এবং পূজাকার্যে

নিজেকে সমর্পণ করেন। তিনি সংঘের প্রচারকার্যের জন্য পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারে পরিভ্রমণ করেন।

কয়েকটি ঐতিহাসিক দরওয়াজার কাহিনী

নারায়ণ সেনগুপ্ত

দরওয়াজা বলতে সচরাচর বসবাসকারী গৃহে আমরা যা ব্যবহার করে থাকি—এগুলি বুঝি তার ব্যতিক্রম। এই দরওয়াজা-গুলি নির্মাণের পিছনে কোথাও ঐতিহাসিক তাৎপর্য, আবার কোথাও নির্মিত হয়েছে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে। নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারের হিসাব নিকাশের পরোয়া করা হয়নি এইসব দরওয়াজাগুলি নির্মাণের ক্ষেত্রে। তাই ইতিহাসের পাতায় অন্যান্য তথ্যনির্ভরশীল সাক্ষীর মত আজো এদের প্রাধান্য সমান-ভাবে বিরাজ করছে। ভ্রমণ-পাগোল লোকদের কাছে সমান আদরনীয়, দর্শনীয় বস্তু হিসেবে বাহবা লুটছে।

আগ্রা যাঁরা গেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ফতেপুর সিক্রী না দেখে ফিরে আসেননি। আর ধুলো উড়িয়ে বাসটা যখন সিক্রীর বুড়ি ছুঁই ছুঁই করে, তখন যেটি প্রথমে নজরে পড়ে সেটি হলো বুলন্দ দরওয়াজা। ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চ ও পৃথিবীর বৃহত্তম প্রবেশ-দ্বারের অন্যতম। এটি তৈরী হয়েছিল ১৬০২ খৃঃ বিজয় তোরণ হিসেবে। সম্রাট আকবর যখন দাক্ষিণাত্য জয় করে আগ্রায় ফিরে আসেন তখন তাঁর সম্মানার্থে এই ১৭৬ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট তোরণটি নির্মিত হয়।

এই ফতেপুর সিক্রী প্রাসাদের অপরদিকে আরেকটি দরওয়াজা আপনার নজরে পড়বে—যার নাম বাদশাহী ফটক। একমাত্র বাদশাদের ব্যবহারের জন্য এটি নির্মিত হয়েছিল। যোধাবাঈ প্যালেসের সঙ্গে এই প্রাসাদের যাতায়াতের নিভৃততম সংযোগকারী হিসেবে বাদশাহী ফটকের গুরুত্ব কম ছিল না।

আগ্রার তাজমহল দেখবার সৌভাগ্য অনেকেরই ঘটেছে। আনমনা হয়ে সবাই যখন হেলহনিয়ে ঝাউবীথি আর ফোয়ারার মাঝখান দিয়ে সোজা চলে যেতে চান তাজের প্রধান চত্বরের দিকে, তখন ক'জনই বা ফেলে যাওয়া প্রধান তোরণটি খুঁটিয়ে দেখবার কথা ভাবেন? আছেন অবশ্য অনেকে। যাঁরা সত্যিই দেখেন, আর ইতিহাসের পাতা উল্টে যাচাই করে নেন। এই তোরণের দৈর্ঘ্য ১৫১ ফুট, প্রস্থ ১১৭ ও উচ্চতা ১০০ ফুট। গোটা তোরণটি ২১১ বর্গফুট বি[illegible] একটি খাস বেলেপাথরের মঞ্চের উ[illegible] অবস্থিত। এটি একটি দ্বিতল প্রবেশদ্বা[illegible]

আগ্রা দুর্গের প্রবেশপথে যে তো[illegible]

চারমিনার। হায়দ্রাবাদ

আরো বহু ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য জিনিষ রয়েছে—যা সত্যই একাগ্রভাবে দেখবার অবকাশ রাখে।

এই দিল্লীতে একাধিক ফটক রয়েছে। প্রাধান্যের দিক দিয়েও হেয় নয় কোনটি। খুনী দরওয়াজার কথা কে কবে ভুলতে পেরেছে? দিল্লী গেট, কাশ্মীরী গেট, আজমীর গেট—এই তিনটি দরওয়াজা শহরের বিভিন্নপ্রান্তে বিরাজ করছে নিজস্ব মহিমায়।

ফিরোজশাহ কোটলা পঞ্চম নগরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দিল্লীতে। নাম দিয়েছিলেন 'ফিরোজাবাদ'। এই প্রাসাদে দুটি বিখ্যাত জিনিষ আছে দেখবার। প্রথমটি মসজিদ—যার গঠন প্রণালী ও সৌন্দর্য সত্যিই গর্বের বস্তু। দ্বিতীয়টি--বিখ্যাত অশোক স্তম্ভ। সম্রাট অশোক আম্বালা থেকে এটিকে এনেছিলেন। এই দুটি জিনিস দেখে বেড়িয়ে এলে সন্নিকটে যেটি নজরে পড়বে সেটি হলো 'খুনী দরওয়াজা'। সিপাহী বিদ্রোহের সময় 'ফাসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান।' তাঁদের অনেকেরই হৃদপিণ্ডের স্পন্দন চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেছিল এই খুনী দরওয়াজায়।

এবার মুখ ফেরানো যাক বোম্বের দিকে। সমুদ্রের বুক থেকে উঠে মাটিতে পা ফেলতেই যে দরজাটি আপনাকে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানাবে তার নাম 'গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া' —ভারতের প্রবেশদ্বার। আধুনিক প্যাটার্নের তৈরী বিরাটাকৃতি ফটক। শিল্প মাধুর্যে তেমন প্রাধান্য না পেলেও, গঠন প্রণালীতে বৈশিষ্টের দাবি রাখে।

সম্ভবতঃ এটি তৈরী হয়েছিল প্রথম পর্তুগীজ ঔপনিবেশের প্রাক্কালে।

এবার আসা যাক রাজস্থানের দিকে। শিল্পগরীয়সী রাজস্থান। চিতোর একটি ঐতিহাসিক স্থান। দেশী-বিদেশী টুরিস্ট-দের লীলাভূমি। এই চিতোর দুর্গে প্রবেশের পথে পর পর কতকগুলি তোরণ অতিক্রম করতে হয়। যথা বেহরণ পোল, রাম পোল, হনুমান পোল, গণেশ পোল, লক্ষ্মণ পোল ইত্যাদি। এগুলি ছোট ছোট আড়ম্বরহীন এক একটি তোরণ। এর মধ্যে পাডোন পোলের গুরুত্ব অধিক। ঐতিহাসিকদের মতে

তাজমহলের ভিতরে। আগ্রা

এই পাডোন পোলের ফাঁকে ফাঁকে আলা-উদ্দিন খিলজীর সৈন্য লুকিয়ে ছিল এবং অতর্কিতে রাণা কুম্ভকে আক্রমণ করেছিল। বিশ্বাসঘাতকতার চরম স্বাক্ষর বহন করছে এই পাডোন পোল।

সূর্যতোরণ, আরেকটি হৃত গর্বিত ফটক। দিল্লীশ্বর আকবর আক্রমণ করেছেন চিতোর। রাণা উদয় সিংহ গেছেন পালিয়ে কিন্তু বীর রাজপুতেরা মাতৃভূমিকে শত্রুর হাতে ফেলে দিতে পারেননি। তারা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এই দুর্দিনে সূর্যতোরণ রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেলেন সহিদাস। আর পুত্ত? মাত্র ১৬ বছর বয়সের কিশোর পুত্ত? ছুটে গেছিলেন রাজপুরীতে মা বোন আর স্ত্রীকে রক্ষা করতে। কিন্তু এ কি? দেখলেন বোন মারা গেছেন, স্ত্রীও গত। কিন্তু মা? মৃতপ্রায়া। গেলেন মার কাছে। মা আশীর্বাদ করলেন আর সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলেন বীরের কর্তব্য। পুত্ত আবার ছুটে গেলেন সূর্যতোরণ রক্ষা করতে। কিন্তু পারেননি। শত্রু পক্ষের গুলিতে তাঁর দেহ লুটিয়ে পড়েছিল এই দরওয়াজার প্রান্তে।

আজমীরের বহু দ্রষ্টব্য জিনিসের তালিকায় একটি ফটকের নাম পাওয়া যায়—নিজামী ফটক। মৈনুদ্দিন চিস্তির দরগায় প্রবেশের মুখেই পড়বে নিজামী ফটক। হায়দ্রাবাদের নিজাম এটি নির্মাণ করেছি[লেন।] শিল্পকার্য অপূর্ব। জৈনশিল্প। চি[স্তি] সাহেবের প্রতি নিজাম বাহাদুরের অ[...] শ্রদ্ধার কথা স্মরণ করছে নি[জামী] দরওয়াজা।

এই জাতীয় দরওয়াজার শেষ [...] ভারতে। কিন্তু এ নিবন্ধে তার সম্যক প[...] দেওয়া সম্ভব নয়। তাই মাত্র আর [...] ঐতিহাসিক দরওয়াজার কথা উল্লেখ [...] আমরা এ নিবন্ধের শেষ করবো।

এই তোরণটির নাম দখল দরও[য়াজা।] কেউ কেউ আবার বলেন দাখিল দরও[য়াজা।] পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় অব[...] হিন্দু স্থাপত্যের শেষ কীর্তি, রা[...] গৌড়-এ প্রবেশের পথে দেখা যায়। গৌড়কে সৌন্দর্য নগরী বলেছিলেন হু[...] বলেছিলেন—জামাতাবাদ। যার ইং[...] তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'রেসিডেন্স [...] প্যারাডাইস' এই গৌড়-এর ইতি[...] শশাঙ্ক একটি পরিচিত নাম। তারপর [...] পাল যুগ, সেন যুগ। হিন্দুরাজাদের [...] আর মুসলমান রাজত্বের সুরু। তাই অ[...] করা হয়—প্রথম মুসলমান শাসক হু[...] ১৫৩৮ খৃঃ যে দরওয়াজা দিয়ে প্রথমে [...] ধানী গৌড়-এ প্রবেশ করেন—সেটিই [...] দরওয়াজা নামে খ্যাত। অথ দর[...] কাহিনী সমাপ্ত।

'জলসা'

নবনালান্দা প্রযোজিত "ঋতুরঙ্গ"
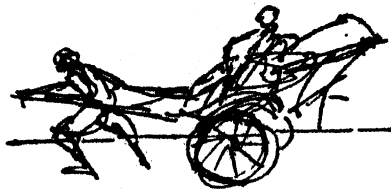
রবীন্দ্র সদনে মঞ্চস্থ নবনালান্দার নব-প্রযোজনা 'ঋতুরঙ্গ' নৃত্যনাট্য সম্প্রতি-
লর এক অনিন্দনীয় রূপকল্পনা।

ঋতুচক্রের অবিরাম আবর্তনের অন্তহীন
চয় যে বিস্ময়, আনন্দ, রং ও মাধুর্য-
প্রতিমুহূর্তে কবিকে উদ্বেলিত করে
ই রসঘন রূপ—এই ঋতু উৎসবের
তকাব্যের বিরাট ভাণ্ডার—এখানে কবির
তরমহলের খাসদরবারী এলোমেলো
বেগ যেন আপনাকে প্রকাশের আনন্দেই
ছ গুচ্ছ ফুল হয়ে ফুটেছে, আর সেই
নন্দ স্বতঃস্ফূর্ত বলেই আপন সুষমা
তাদের অন্তরকেও সবলে আকর্ষণ
র। শিল্পী ও দর্শকচিত্তের এই
রস্পরিক মিলন-সূত্র রচনাই সেদিনের
উৎসবের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ঋতুরাজের এক চরণের আঘাতে সর্ব-
সী নির্দয় লীলা অন্য চরণের আঘাতে
টে ওঠে সৃষ্টির শতদল। প্রথমেই
শাখের তাপস নিঃশ্বাসে দাবদগ্ধ
ন্তের উত্তপ্ত হাহাকার মূর্ত হয়ে
ল—' এসো হে বৈশাখের' সম্মিলিত
ত্য ও গান দিয়ে। এরপর বর্ষার আগমন
নও দুরন্ত আবেগে (হৃদয় আমার
রে) কখনও সজ্জয় রসাবেশে (সুচিত্রা
গীত 'ঝরে ঝরঝর') কখনও কৌতুক-
গুন সুরের অন্তর গহনস্থিত আবেগ
প্রার্থনায় শ্রাবণ পূর্ণিমার আলো-
য়ার অপরূপ ভাষায় বিনতি—(কণিকা
ন্দ্যোপাধ্যায় গীত 'আজ শ্রাবণের
পূর্ণিমাতে') — আবার নীপবনে আনন্দ
নের মধ্যে পূব হাওয়ার স্পর্শে আনমনা
ওঠা (চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়—পূব
ওয়াতে দেয় দোলা)—এরই মধ্যে কখন
রপাতের পথে ধরণী ও গগনের মিলনের
ন্দর মধ্যেই বিচ্ছেদের আশঙ্কা গভীর হয়ে
ল যখন সুচিত্রার কণ্ঠে শোনা গেল—
ভেবেছিলেম আসবে ফিরে'—

বর্ষার পরই শরৎ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু
ভূত অন্ধকারের বিপরীতের একটি
র মতই সমুজ্জ্বল। কারণ রসের
বেদন ওজনে নয়—আয়োজনের
তায়। এমনি করে হেমন্ত ও শীতের
র পেরিয়ে নৃত্য ও সংগীতের ধারা
ন্তের অন্তহীন উচ্ছ্বাসের সমুদ্রে মেশে
নে চির নতুন পুরাতনের মধ্যে লুকো-
করে বেড়াচ্ছে। গৌরবের ভারে নড়া
না। তাই ঋতুরাজ জয়মুকুট নামিয়ে
গের বেশ ধারণ করে অগৌরবের
বে মেতে উঠেছেন।

গানের নির্বাচন ও পরিচালনায় শিল্প-কৃতিত্ব পরিচয় দিয়েছেন ভারতী মিত্র। আর শিল্পীরা সবাই পরিবেশিত গানের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছেন বলেই প্রতিটি গান যেন ঝর্ণার মত স্বচ্ছপ্রবাহী।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অলংকৃত কণ্ঠে ভাবনিবিড় স্বপ্নছায়ায় 'কার বাঁশী নিশি ভোরে বাজিল' তে জৌনপুরীর দূরাগত আভাস মনকে উদাস না করে পারে? ঠিক তেমনই মধুর 'দখিন হাওয়া জাগো জাগো' (কোরাসের) উল্লাসের মাতনে তাঁর 'ধীরে ধীরে বও ওগো উতল হাওয়ার'—মিনতি। তারপর যখন 'আমার কিছু কথা আছে ভোরের বেলার তারার সাথে'—এখানে মনে হয়েছে ভোরের বেলার তারার সাথে কথা বলা এহেন স্বপ্নময়ীর পক্ষেই সম্ভব। সুচিত্রার কণ্ঠে 'শুকনো পাতা কে'দে ঝরে' যেমন প্রাঞ্জল তেমনই অনবদ্য 'ভেবেছিলেম আসবে ফিরে'—যেখানে গভীর অভিমানে শিল্পী বিদায়োদ্যতকে থাকবার মিনতি জানাতে নারাজ। তেমনই উপভোগ্য কোরাসের মধ্যে যুগ্মকণ্ঠে—'ঐ আসে ঐ অতি'র অংশ বিশেষ। চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের 'এখন আমায় সময় হোলো' ও 'এবার অবগুণ্ঠন' সু-পরিবেশিত। বনানী ঘোষের 'সে কি ভাবে' সুন্দর।

একটি প্রতিশ্রুতিদীপ্ত কণ্ঠ শোনা গেল প্রণতি লাহিড়ীর। গোরা সর্বাধিকারী শ্রাবণের গানে সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছেন। সমবেত সংগীত অত্যন্ত সুন্দর এবং অনুষ্ঠানের সার্থকতার অন্যতম অঙ্গ। এর জন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য—যাঁদের তাঁরা হচ্ছেন প্রণতি লাহিড়ী, চিত্রিতা দাশগুপ্ত, উমা বসু মজুমদার, প্রতিমা রায়, মিতা হালদার, সুমিতা দাশগুপ্ত, রত্না দাশ, সুব্রতা মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া সেন, অর্পিতা সেন, শিশিরকিরণ চট্টোপাধ্যায়, অসীমা মুখো-পাধ্যায়, প্রবীর লাহিড়ী, মৃণাল বসু, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, প্রবীণ চট্টোপাধ্যায়, প্রণবেশ সেন, শংকর বসু, সমীর সিংহ, সমীন সিংহ, সুব্রতা গাঙ্গুলী, গৌরাঙ্গ রায়। আবৃত্তি ও সংলাপে ছিলেন কাজী সব্য-সাচী, প্রশান্ত ঘোষ, সুচিত্রা মিত্র। নৃত্য পরিচালনায় আপন সম্মানে প্রতিষ্ঠিত অনাদিপ্রসাদ। আপনাপন মান অনুযায়ী নৃত্য ও অভিনয়কে সার্থক করেছেন শিব-শংকর, শম্ভু ভট্টাচার্য, সুমিত্রা মিত্র, পারমিতা চৌধুরী, নরেশকুমার, জয়শ্রী লাহিড়ী, অলকানন্দা চাকলাদার, সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতী দাশ, সুতপা দাশ-গুপ্ত, শুভ্রা দাশগুপ্ত, শম্ভু ভট্টাচার্য, পিনাকী রায়, ভানু দে। কিন্তু কণিকার 'যদি তারে নাই চিনিগো'—গানটির উচ্চমান ক্ষুন্ন করেছে তুলনামূলক বিচারে লঘু নৃত্য। দীনেশ চন্দের আবহসংগীত সৌন্দর্য সৃষ্টির একটা বড় অংশ।

ওস্তাদ মজিদ খাঁর সম্বর্ধনা

বাংলা তথা ভারতের শীর্ষস্থানীয় তবলিয়া ওস্তাদ মজিদ খাঁ সাহেবের এ বছর একাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্তির গৌরবময় উপলক্ষ উদযাপনার্থে তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ক্যানাল স্ট্রীটের মুখার্জি হাউসে সম্প্রতি এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেন। ওস্তাদ মজিদ খাঁ একাধারে সার্থক শিল্পী, সার্থক সাধক এবং সার্থক গুরু।

সার্ধ শতাব্দীকাল ধরে ভারতের বহু আসরে তাঁর তবলা বাদন গুণীসমাজের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের কারণ হয়েছে। একক—বাদনে তাল লয় বোলের চক্রাধার তাঁর সম্মোহিনী শক্তির অনিবার্য আকর্ষণের সংগে উচ্চাঙ্গ সংগীতের শ্রোতা মাত্রই পরিচিত। বিশেষ করে বাঁয়ার কাজে তিনি এক নতুন ঢং-এর প্রবর্তক যার স্বাক্ষর তৎপুত্র ওস্তাদ কেরামতুল্লার বাজনায় সোচ্চার। সমান নৈপুণ্য সিদ্ধ ছিল তাঁর সংগত। গান বা যন্ত্রের সংগে তাঁর সংগত যেন জুড়ি হয়ে বাজত।

সভাপতি ডাঃ বিমলচন্দ্র রায় ওস্তাদের সার্থক সংগীত জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে সংগীতজগতে তাঁর দুই বিরাট অবদান ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ ও সংগীতনায়ক জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের উল্লেখ করেন। একজন দিকপাল অপরজনের মধ্যে বহুমুখী প্রতিভার অপূর্ব মিলনসঙ্গম শুধুমাত্র ভারতে নয় দুনিয়ার সংগীত জগতে সমাদৃত।

সম্বর্ধনার উত্তরে গুণীর স্বাভাবিক বিনয়নম্রতায় ওস্তাদ মজিদ খাঁ সাহেব বলেন যে, শিষ্য-প্রশিষ্যদের চার পুরুষের বাজনা শুনে তিনি আপন শ্রম ও সাধনার সার্থকতা উপলব্ধি করছেন। তবলাবাদন ও সংগত নীতির ওপরও ইনি মূল্যবান অভিজ্ঞতার বিবরণ দেন।

সভান্তে তবলা বাদনের প্রলম্বিত অনুষ্ঠান আরম্ভ হোলো ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁর আমেরিকান বালক শিষ্য মাস্টার গর্টালপের লহরা বাদন দিয়ে। মাত্র ১০ মাসের শিক্ষায় তার পরিচ্ছন্ন বাদনে নিষ্ঠার

পরিবেশন আনন্দদায়ক একক। তবলা বাদনে অংশ গ্রহণকারী অন্যান্য শিল্পীরা হলেন শঙ্কর ঘোষের (জ্ঞানবাবুর ছাত্র) দুই ছাত্র বিমল রায় ও সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় জ্ঞানবাবুর দুই শিষ্য—মাস্টার অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় ও সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় এবং ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁর পুত্র সাবীর খাঁন।

এছাড়া ওস্তাদ মুনাব্বর খাঁর কণ্ঠসংগীত ও ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁর তবলা সংগতে মণিলাল নাগের সেতার বাদন জমে উঠেছিল শিল্পীদের নৈপুণ্য এবং গুণী শ্রোতার সমাবেশের কারণে।

'ব্যাকুল বাদল সাঁঝে'

রবীন্দ্রসদনে কিংশুক নিবেদিত 'ব্যাকুল বাদল সাঁঝে' আর এক উপভোগ্য অনুষ্ঠান।

নিজস্ব ছন্দে, মাধুর্যে, ব্যাকুলতায়, সৌন্দর্যবৈচিত্র্যে রবীন্দ্রকাব্য ও সঙ্গীতে বর্ষার ঋতু একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। কবিকৃতিতে নানান মেজাজ ও নানান আবেগসমৃদ্ধ বর্ষার আবাহনের যেন সীমা নেই।

মঞ্চময় বনপ্রকৃতি তার অপরূপ মায়া মেলে ধরেছে। আম্রকুঞ্জ নীপবনের ওপর ঘনিয়ে এসেছে মেঘনীল ছায়া—তারই মধ্যে এক-একজন শিল্পী বর্ষামুখর সন্ধ্যা-প্রণামের এক-একটি ভাবের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন রবীন্দ্র-মানসের অফুরন্ত ঐশ্বর্যলোকের খবরটি —শুধু কি তাই? সেদিন বারবার মনে একটি প্রশ্নই জেগেছে পৃথিবীর আর কোনো দেশের কোনো কবি কোনো কালে শুধু গানে-গানে তাঁর চির-চাওয়াকে পূজা করে সেই পূজার প্রসাদ কি দর্শকচিত্তেও এমনই করে বিলিয়ে দিতে পেরেছেন?

দেবব্রত বিশ্বাস 'রুদ্রবেশে এ কোন খেলা', 'কে দিল আবার আঘাত' ও 'দ্বারে কেন দিলে নাড়া'—এই তিনটি গানের নির্বাচনে অন্তর্লীন ভাবধারায় ক্রম-পরিণতি—রবীন্দ্র-দর্শন ও সাহিত্যের সঙ্গে

১১ই জুলাই রবীন্দ্রসদনে নবনালন্দা পরিবেশিত ঋতুরঙ্গ নৃত্যনাট্যে যাদের কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর লাহিড়ী, প্রণতি লাহিড়ী, মিতা হালদার, শমিতা দাশগুপ্ত, বনানী ঘোষ এবং আরো অনেকে।

শিল্পীমনের একাত্মীকরণ ও সংযত আবেগের মধুর ছোঁয়ায়—সেদিনের রসোন্মুখ প্রতিটি চিত্তকে পরিপ্লাবিত করেছেন। বিশেষ অনুরোধে গাওয়া 'শ্রাবণ ঘন গহন' গানটির বারবার প্রশংসা করতে হয়। শ্রীবিশ্বাসের বিশিষ্ট গাওয়ার ভঙ্গিতে তা হয়ে উঠেছিল অনির্বচনীয়। রীতিপ্রকরণ কেতাবী নয় বলেই সহজ প্রকাশে এ-গান মনে দাগ কাটতে পেরেছে।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূপুর-নিক্কিত কণ্ঠে বর্ষার উদাসী ভাববিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যেন অলক্ষ্যে বর্ষণছন্দের দূরো-ভাষী সংগত-গুঞ্জন শোনা গেল। 'সখী আঁধারে একলা ঘরে'-র বিরহ-উতল চিত্ত 'গোধূলি-লগনে'র গৈরিক আভাষে করুণ-মধুর হয়ে উঠল। সুর ও রূপের রাজ্যে

আপনাকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন কর… পারেন বলেই শ্রোতৃচিত্তকেও তিনি সী… বন্ধনমুক্ত করে অসীমের পথে উধাও ক… দেবার শক্তি রাখেন।

আপন দৃপ্ত অনুভবের উজ্জ… দীপ্তিতে যেন সুচিত্রা মিত্র প্রশ্ন জা… 'কোথায় আলো কোথায় ওরে আ… তারপরই 'কৃষ্ণকলি' কালোহরিণ চো… একরাশ বিস্ময় ছড়িয়ে, 'ঝরঝর বরি… ধারা ঝরে পড়েই যেন নিস্পৃহতার … মাণিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ় তোমার মা… এঁকে চলেন বাউলের সেই সবহার… অথচ সব-পাওয়া রূপ যার কাছে… হোলো 'মাণিক'—আর বজ্রগর্জিত … হোলো মহামূল্য রত্নহার।

মায়া সেনের 'তিমির নিবিড়… 'চলে ছলছল' ও 'আজি নাহি নাহি নি… ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের দোলা… দুলিয়ে দিয়েছে। এছাড়া চিন্ময়… পাধ্যায়ের 'ছায়া ঘনাইছে', 'আমার … 'ওগো মিতা', সুমিত্রা সেনের… শ্রাবণের', 'সতিমির রজনী' ও আ… তরুর প্রাণোচ্ছল গায়কীতে 'যেতে… একলা পথে', 'ঝড়ে যায় উড়ে' উপ…

সাগর সেনের দুটি গান সু… বেশিত। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী না… ৩ খানি রবীন্দ্রসঙ্গীতে নিষ্ঠার… রেখেছেন দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। ভাবগাম্ভীর্যে দ্বিজেন মুখোপাধ্যা… প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—'অনেক কথা… ছিলেম', 'তিমির অবগুণ্ঠনে' ও '… পবনে' তিনটি গানে। এরই মাঝে… বসু ও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের … অনুষ্ঠানকে রসনিবিড় করে।

—া

প্রেক্ষাগৃহ

সংলাপ/নন্দিনী মল্লিক

আমেরিকান ছবির অবাধ আমদানী বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে

মেট্রো-গোল্ডুইন-মেয়ার, প্যারামাউন্ট, টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স, ইউনাইটেড আর্টিস্টস, কলাম্বিয়া, ইউনিভার্সাল, ওয়ার্নার ব্রাদার্স এবং অ্যালায়েড আর্টিস্টস — এই আটটি আমেরিকান ফিল্ম কোম্পানীর ...শ চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ আটটি ভারতীয় ...স (যাদের ঐ ঐ কোম্পানীর ইণ্ডিয়ান সোসিয়েট বলা হয়) প্রতিষ্ঠিত আছে ...বাই শহরে। এই সংস্থাগুলি আবার ...যোগে 'কিনেমেটোগ্রাফ রেন্টার্স সোসাইটি প্রাইভেট লিমিটেড (কে আর এস পি এল) ... দিয়ে তাঁদের ব্যবসায় চালিয়ে থাকেন। ... সভাপতি হচ্ছেন মেট্রো-গোল্ডুইন মেয়ার ...ণ্ডিয়া) লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ...ঃ ডবল্যু. টি উইলসন। সম্প্রতি লোক-...ায় বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রী যে বলেছেন, ...ঃপর স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন বিদেশী ...বির আমদানী করবার দায়িত্ব গ্রহণ করবে, ...ক্ষেত্রে বিস্ময় প্রকাশ করে মিঃ উইল-...লেছেন, সত্যিই এ-ব্যাপার ঘটলে ...র আটটি আপিসকে ব্যবসা গুটুতে ... কারণ, এতদিন এ'রা ব্যবসা চালিয়ে ...ন রয়্যালটি প্রথায়—সম্পূর্ণ বিক্রয়ের ... এর মধ্যে নেই। এবং এই প্রথায় বছরে গড়ে ১২০ খানি ছবি আমদানী মাত্র ২৫ লাখ টাকা খরচ করে। তাঁর এই সমসংখ্যক ছবি স্টেট ট্রেডিং ...রেশনের মারফত আমদানী করতে হ'লে ... প্রায় ২ কোটি টাকা। কাজেই অবস্থা ...ক দাঁড়াবে, তা সহজেই অনুমেয়।

মিঃ উইলসন বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রী ...এন মিশ্রের উক্তির প্রতিবাদ করে বলেন, ...রিকাতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের বাজার ... করবার জন্যে কিছুই করা হয়নি ... ভুল করা হবে। মোশান পিকচার্স ...সিয়েশন অব আমেরিকা এর জন্যে ...র সাহায্য-হস্ত প্রসারিত করেছিলেন ... কিন্তু কোনো ভারতীয় প্রযোজক ...র সাহায্য নেবার জন্যে এগিয়ে যাননি। ...বছর দেড়েক আগে তাঁদের ভারতীয় ... কে-আর-এস-পি-এল এই ধরনের ...ব্যের কথা জানিয়ে ভারত সরকারের ... একটি 'সাহায্য স্মারকলিপি' পাঠিয়ে-... কিন্তু তাতেও কোনো সাড়া পাওয়া ...। এমন কি এখনও যদি ভারতীয় ...কেরা আমেরিকায় ভারতীয় ছবির ... খোলবার জন্যে তাঁদের সাহায্য ...া করেন, তাঁরা তা করবেন বলে ...য়েছেন মিঃ উইলসন।

কিন্তু মোশান পিকচার্স এক্সপোর্ট ...সিয়েশন অব আমেরিকার জনৈক ...র ঠিক উল্টো কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, যদিও আমরা কথা দিয়ে-ছিলুম যে, ভারতীয় ছবিকে আমেরিকার ছবিঘরগুলির মালিকদের নজরে আনবার জন্যে আমরা একজন সৎ দালালের মতো যথাসাধ্য চেষ্টা করব, কিন্তু তাই বলে আমরা তো 'ভারতীয় ছবি দেখাতেই হবে', এইভাবে তাঁদের ওপর জোর খাটাতে পারিনা। তিনি আরও বলেছেন, ভারতীয় ছবি যদি ভালো হয়, তাহলে তা আমেরিকার বাজারে বিক্রী না হবার কোনো সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অতি অল্পই ভারতীয় ছবিকে ভালো বলা যেতে পারে।

আমাদের জিজ্ঞাসা, বছরের বাহান্ন হপ্তা ধ'রে কলকাতার চৌরঙ্গীপাড়ার ছবিঘর-গুলিতে যে-সব মার্কিনী ছবি দেখানো হয়ে থাকে, তার প্রতিটিই কি নির্জলা ভালো? ওয়েস্টার্ন আর রু্ড স্টোরি ধরনের অগুন্তি ছবি মানুষের যৌন ও হিংসা প্রবৃত্তিতে ইন্ধন যোগানো ছাড়া আর কি করে জানতে পারি কি? চিত্রসমালোচক হিসাবে আমরা প্রতি সপ্তাহে গড়ে পাঁচখানা আমেরিকান বা ইতালী-আমেরিকার যুগ্ম প্রযোজনার ছবি দেখে থাকি। কিন্তু তার মধ্যে ভালো ছবিতো 'কোটিকে গোটিক'। এবং বললে অন্যায় হবে না, হিসেব করে দেখলে দেখা যাবে যে, আজকাল হলিউড বছরে যতগুলি ভালো ছবি তৈরী করে, ভারত তার থেকে অনেক, অনেক বেশী সংখ্যক ভালো ছবির স্রষ্টারূপে গর্ববোধ করতে পারে। এ অবস্থায় আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী আমেরিকান ছবির অবাধ আমদানী বন্ধ করে যে ভালোই করে-ছেন, এ কথা অনস্বীকার্য। এর দ্বারা অপ-রাধমূলক ও যৌনসর্বস্ব আমেরিকান চিত্রের কু-প্রভাব থেকে আমাদের তরুণরা তো রক্ষা পাবেই; তা ছাড়া পরোক্ষভাবে সাধারণ হিন্দী চলচ্চিত্রের প্রযোজকরা ঐসব ছবি অনুকরণ করার সুযোগও কম পাবেন।

ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার্স এক্সপোর্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এ. এম. তারিক সম্প্রতি জানিয়েছেন, লেবানন এবং অপর কয়েকটি দেশে ভারতীয় ছবি আমেরিকান

আন্দাজ/রাজেশ খান্না ও হেমা মালিনী

ছবিকে দ্বিতীয় স্থানে ঠেলে দিয়ে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান প্রভৃতি দেশ সমসংখ্যক ছবির আদান-প্রদানের হারে ভারতীয় ছবি কিনতে ইচ্ছুক। এমন কি, ওরা আমাদের দেশে ছবিঘর নির্মাণ করতেও প্রস্তুত। ইরাণ, তুরস্ক, সিংহল, ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক প্রভৃতি দেশ প্রায়ই অভিযোগ করে থাকে যে, ওরা ভারতীয় ছবির নিয়মিত খরিদ্দার হওয়া সত্ত্বেও ভারত ও-সব দেশের চিত্রপ্রযোজনা সম্পর্কে আদৌ আগ্রহশীল নয়। ভারতীয় ছবি কেনবার ব্যাপারে আমেরিকা থেকে কিছুদিন আগে যে একদল বিশেষজ্ঞকে পাঠানো হয়েছিল, তার উল্লেখ ক'রে মিঃ তারিখ বলেন যে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের পক্ষে অপমানজনক। প্রায় বছর দুই আগে যখন আমেরিকার চলচ্চিত্রশিল্পের অন্যতম প্রধান, লস্ এঞ্জেলেস-এর মেয়র বোম্বাই শহরে পদার্পণ করেছিলেন, তখন তাঁকে স্বাগত জানিয়ে মিঃ তারিক মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা যে আমেরিকাতে ভারতীয় ছবির বাজার সৃষ্টি বিষয়ে তাঁদের কর্তব্য পালন করছেন না, এ-কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছিলেন এবং এই অবহেলার ভবিষ্যৎ ফল কি হতে পারে, তারও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এখন কে-আর-এস-পি-এল-এর সভাপতি মিঃ উইলসনের বিস্ময় প্রকাশ তাই তাঁর কাছে বিস্ময়কর লেগেছে।

আমেরিকার বাজে ছবির অনুকরণে নির্মিত বাজে হিন্দী ছবি আমেরিকায় দেখানো হোক, এ আমরা কখনই চাই না। কিন্তু ফ্রান্স, রাশিয়া ও জাপানের মতো দেশ প্রচুর ভারতীয় ছবিকে ক্রয়যোগ্য বলে মনে করছে এবং কিনছে, একথা আমেরিকার চলচ্চিত্র আমদানীকারকদের মনে রাখা উচিত।

অগণিত ভারতীয় চিত্রামোদীর অন্যতম রূপে বলতে পারি, কোনো দেশেরই ভারতে ছবি দেখানোর একচেটিয়া অধিকার থাকা উচিত নয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যত ভালো ছবি নির্মিত হচ্ছে, তা দেখার সুযোগ প্রতিটি ভারতীয় চিত্রদর্শকেরই থাকা উচিত। এবং এরই ওপর যেমন নির্ভর করবে ছবির ভালোমন্দ সম্পর্কে জ্ঞানের বিকাশ,

এপার ওপার/অপর্ণা সেন

তেমনিই ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রযোজনাক্ষেত্রে মানোন্নয়নে এই ব্যবস্থা হবে রীতিমত সহায়ক।

চিত্র-সমালোচনা

আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে সংঘাত

একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বলেছিলেন, বড়ো হওয়ার চেয়ে ভালো হওয়া আরও ভালো। **নবকেতন এন্টারপ্রাইজ-এর নিবেদন বিজয় আনন্দ প্রোডাকসান-এর ইস্টম্যানকলার চিত্র 'তেরে মেরে স্বপ্নে'র** নায়ক ডাক্তার আনন্দ-এর চরিত্র আমাদের সেই কথা মনে পড়িয়ে দিল। 'বহুজন হিতায়'-র যে-আদর্শ নিয়ে সে তার চিকিৎসক জীবনের সূচনা করেছিল, সত্যপথে চলবার যে-আদর্শ তাকে মিথ্যা সার্টিফিকেট দেওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল, ন্যায়পথে থেকে মাথা উঁচু করে চলবার যে-আদর্শ তাকে ধনী মালিকের হাসপাতালের চাকরী ত্যাগ করে অসহ

আগামী সপ্তাহ থেকে
ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে
নতুন স্বাদের
গোয়েন্দা কাহিনী

হরপ্পার ফুল

লিখেছেন

নির্মল সরকার

দারিদ্র্যের মুখোমুখী দাঁড় করিয়েছিল, সহসা ভাগ্যলক্ষ্মীর অকৃপণ আশীর্বাদ লাভ করে সে তার সেই আদর্শকে ভুলতে বসেছিল, স্ত্রী নিশার ব্যাকুল আবেদন সত্ত্বেও সে মানুষকে মানুষ জ্ঞান করতে অস্বীকার করেছিল, বন্ধু ডাঃ জগনের যে-মদ্যপানকে সে একদিন কর্তব্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী কু-অভ্যাস বলে ধিক্কার দিয়েছিল, নিজে সেই মদ্যপানকে অবসাদ নিবারণকারী বলে সমর্থন ও গ্রহণ করেছিল। সামান্য গ্রাম্য চিকিৎসকরূপে কাজ করতে এসে তার পরিচয় হয় স্কুল শিক্ষয়িত্রী নিশার সঙ্গে। পরে বিবাহিত না হলে চাকরী পাবে না, এই পরিস্থিতিতে আনন্দ যখন নিশাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করে, তখন নিশা আনন্দের মন বোঝবার জন্য প্রথমে অস্বীকার করে এবং পরে ওর মনের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে বিবাহে সম্মতি দেয়। নিশা যখন মা হতে চলেছে, তখন ধনী দেওয়ান মূলচাঁদের অসতর্ক গাড়ী

অপর্ণা/তনুজা ও সুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

চালানোর ফলে সে আহত হয় এবং অপারেশন করিয়ে জীবন রক্ষা হলেও ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ আশংকা প্রকাশ করেন, সে মা হওয়া হতে হয়ত চিরতরে বঞ্চিত হল। ধনীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায় হেরে গিয়ে হাসপাতালের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে ডাঃ আনন্দ যখন বোম্বাই শহরে এসে রীতিমত হাবুডুবু খাচ্ছে, তখন দৈবক্রমে চিকিৎসা সূত্রে তার পরিচয় হয় চলচ্চিত্রের নায়িকা মালতী-মালার সঙ্গে এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর ভাগ্যেরও পরিবর্তন হয়। যক্ষ্মা সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে সে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ উপাধি দ্বারা ভূষিত হয় এবং ক্রমে তার কাছে এত রোগী আসতে থাকে যে, তার স্নানাহারের সময় পর্যন্ত থাকে না। ফলে সে তার স্বাভাবিক

এপার-ওপার/সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। গ্রামে থাকতে যে-শিশুটিকে ভূমিষ্ঠ করিয়ে সে উপহার-স্বরূপ একশো টাকার একটি নোট লাভ করেছিল, সেই শিশুই আজ অসুস্থ হয়ে ওর বাড়ীতে চিকিৎসিত হতে এসেছে ওরই কাছে। কিন্তু নিশার শত অনুরোধকে উপেক্ষা করে সে তাকে হাসপাতালে পাঠাল এবং নিজে চিকিৎসা না করে অপরের অস্ত্রোপচারের ফলে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল। একে নিশা মালতীমালার সঙ্গে তার স্বামীর মেলামেশাকে সন্দেহের চোখে দেখছিল, তার ওপর এই মর্মান্তিক ঘটনা তাকে তার স্বামী সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তুলল। তাই সে একদিন স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করে গ্রামে তার মাসীর বাড়ীতে চলে এল। এখানে হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়ায় ডাঃ জগন এল ওকে পরীক্ষা করতে এবং যখন সে বুঝল, সে আবার মা হতে চলেছে এবং এই মা হওয়া তার পক্ষে কি বিপজ্জনক, তখন সে ডাঃ আনন্দকে খবর দিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স গাড়ী নিয়ে হাজির হল এবং হাসপাতালে নিশাকে পৌঁছে দিল। এর পর নিশার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া ও স্বামীর সঙ্গে তার মিলিত হওয়ার দৃশ্যে ছবির সমাপ্তি।

'তেরে মেরে স্বপ্নে' ছবিতে আজকের সাধারণ হিন্দী ছবির মতো নায়িকার পিছনে নায়কের ধাওয়া করা নেই, খল নায়ক নেই, নায়িকাকে উপলক্ষ্য করে নায়ক ও খল নায়কের মধ্যে ছুটোছুটি, মারামারি, খুনোখুনী প্রভৃতির দৃশ্য নেই। পরিবর্তে আছে আদর্শ ও আদর্শচ্যুতির আবেগপূর্ণ ঘটনা, প্রেমের অতি সহজ, স্বাভাবিক ও চিত্তগ্রাহী দৃশ্যাবলী। যেখানে নিশার কাছ থেকে বিবাহ প্রস্তাব সম্পর্কে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আনন্দ চলে গেল এবং পর মুহূর্তে রাস্তা থেকে শুনল নিশা গাইছে 'রাধানে মালা জপি শ্যামকী', সেখান থেকে আনন্দের উৎফুল্ল হয়ে ফিরে আসা, বিবাহ

হওয়া এবং দু'জনে মিলে ছোট্ট সংসার পেতে আনন্দে দিন যাপন করা প্রভৃতি দৃশ্য ঐ এক গানের মাধ্যমে দেখানো অভিনব এবং চিত্তাকর্ষকভাবে কাব্যধর্মী। তেমনি অন্য একটি গানের প্রয়োগ—'হ্যয়, ম্যয়নে কসম লি'—ওদের প্রথম দাম্পত্য জীবনের সুখের দিনে এবং যেখানে দু'জনের মধ্যে বিরোধের প্রাচীর উঠছে, সেই দুঃখেরও দিনে দর্শকচিত্তকে আশ্চর্য-ভাবে স্পর্শ করে। শুধু মনে হয়, যে-প্রচুর অর্থ ডাঃ আনন্দের মনে মাদকতা এনে দিয়েছিল, তা যদি নিশার আগেকার মতো সাদাসিধেভাবে জীবন-যাপনকে উপলক্ষ করেই ওদের মধ্যে তুমুল কলহ মাঝে মাঝে উত্তাল হয়ে উঠত, তাহলে আমরা যেন অধিকতর বাস্তবতার ছোঁয়াচ পেতুম।

'তেরে মেরে স্বপ্নে' ছবিতে যদিও প্রায় প্রতিটি শিল্পীই সু-অভিনয়ের নিদর্শন রেখেছেন, তবু নায়িকা নিশারূপে মমতাজ যে আশ্চর্য সংযত অথচ সংবেদনশীল অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, তা আমাদের রীতিমত বিস্মিত করেছে। সংলাপ ও চিত্রনাট্য-রচয়িতা পরিচালক বিজয় আনন্দ ডঃ জগন বেশে মদ্যাসক্ত ও পরবর্তী সুস্থ জীবনে আনন্দ-নিশার সহৃদয় বন্ধু হিসেবে সার্থক অভিনয় করেছেন। ডাঃ আনন্দের ভূমিকায় দেবআনন্দ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সু-অভিনয় করলেও মনে হয়, একটু তীর্যক ভঙ্গীতে চলাফেরা করা ও ভ্রূ কুঞ্চিত করে সময় সময় সংলাপ বলা ও'র যেন মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়েছে। হেম মালিনী এ ছবিতে যথার্থই গ্ল্যামার গার্ল বা চাকচিক্যময়ী তারকা। তিনি ফিল্ম স্টুডিওর ফ্লোরে শ্যুটিং করার ভঙ্গীতে নেচেছেন ও প্লে-ব্যাকে ঠোঁট মিলিয়েছেন। আর একটি নাচ-গান স্টেজে এবং বাকীটা তাঁর হাসি-হাসি মুখে কথা বলা। এ-ছাড়া মহেশ কাউল (ডাঃ প্রসাদ), আগা (ডাঃ কোঠারী), প্রেমচাঁদ (দেওয়ান মুলচাঁদ) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। বিশেষ করে ক্যামেরাম্যান রাত্রা গৃহীত মমতাজ ও দেবআনন্দের যুগ্ম ক্লোজআপগুলি তুলনা-হীনভাবে সুন্দর। টি. কে. দেশাইয়ের শিল্প নির্দেশনাধীনে গঠিত সেট বিষয়োপযোগী ও ঘটনা উপযোগীও বটে। শচীন দেববর্মণকৃত সুরারোপে ছবির প্রায় প্রতিটি গানই সুখশ্রাব্য। বিশেষ করে আগে যে গান দু'টির কথা বলা হয়েছে, সে-দু'টি তো জনপ্রিয়তার শীর্ষে ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে।

নবকেতনের নিবেদন বিজয়আনন্দ প্রযোজিত ও পরিচালিত 'তেরে মেরে স্বপ্নে' একটি আদর্শপ্রচারী চিত্তাকর্ষক চিত্ররূপে সমাদৃত হবে।

মঞ্চাভিনয়

'নিষাদ' ও 'ভুশণ্ডির মাঠে' : আজকের ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের অসংখ্য লোভ ও লালসার আবর্তে বিকৃত, ক্লান্ত ও বিভ্রান্ত সত্তাও সংগ্রামশেষে মাঝে মাঝে নিজের প্রত্যাশিত রূপ খুঁজে পায়। প্রাপ্তির পরম লগ্নে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে টিকে না থাকা গেলেও আগামী বংশধরদের সামনে সোচ্চারে ঘোষণা করা যায় মহত্তর কোন সামাজিক ও মানসিক বিপ্লবের বাণীকে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের শৈল্পিক সুষমা-মণ্ডিত নাটকে হয়তো এই সত্তাকেই সংঘাতের মুখরতায় ভাষা দেওয়া হয়েছে। বাটানগর থিয়েটার ইউনিটের শিল্পীরা কিছুদিন আগে এই নাটকের একটি প্রাণবন্ত প্রযোজনা পরিবেশন করে নাট্যানুরাগীদের মুগ্ধ করেছেন।

মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি 'দিবাকরের' ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় শৈলীর স্বাক্ষর রেখেছেন সংগ্রাম চ্যাটার্জী। হৃদয়ের পুঞ্জীভূত আশা-আকাঙ্খা, যন্ত্রণার নিঃসীমতা তাঁর চরিত্র-চিত্রণে আশ্চর্য সূক্ষ্মতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। মায়া ঘোষ আর একটি মর্ম-স্পর্শী চরিত্র রূপায়ণের নজীর রেখেছেন দিবাকরের স্ত্রী লতার ভূমিকায়। অন্য কয়েকটি চরিত্রে সুষ্ঠু রূপদান করেন অমিত রায় (প্রথম সাংবাদিক), দিলীপ চন্দ (দ্বিতীয় সাংবাদিক), কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *(যাদুকর), সুপ্রিয়া ঘোষ, সুবীর গুহ, স্বপন দাস, চিত্তরঞ্জন মাইতি, মোহনলাল দত্ত।*

আর একটি অফুরন্ত হাসির নাটক শিল্পীরা এরপরে অভিনয় করেন। নাটকটির নাম ;ভুশণ্ডির মাঠে।' পরশুরামের একটি ছোট গল্প অবলম্বন করে এই নাটকটি রচনা করেছেন অমল মজুমদার। উচ্ছ্বসিত হাসির এই নাটকটির বিশিষ্ট ভূমিকায় ছিলেন অমল মজুমদার, অমিত রায়, মোহনলাল দত্ত, বিকাশ বোস, অজিতবরণ সিনহা, আলোক দাশগুপ্ত।

নাটক দুটির নির্দেশনায় সুগভীর শিল্পবোধের পরিচয় রেখেছেন অমল মজুমদার। মঞ্চসজ্জা ও আলোক সম্পাতে ছিলেন দীপক পাল ও অলোক দাস।

'সর্জনে'র 'সাহিত্যিক' ও 'কথায় কথায় রূপকথা' : কিছুদিন আগে বালীগঞ্জ শিক্ষা সদনে দুটি নাটকের প্রাবণ্যন্ত প্রযোজনা পরিবেশিত হোল। অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন 'সর্জন' নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা। নাটক দুটি হোল বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যিক' ও মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কথায় কথায় রূপকথা।'

হতাশা, ব্যর্থতা, যন্ত্রণায় ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত সাহিত্যিকের জীবনকে ও সংঘাতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'সাহিত্যিক' নাটকের মর্মন্তুদ কাহিনী। হতাশা আর যন্ত্রণার মধ্যেও মাঝে মাঝে দু-একটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে আশার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সাহিত্যিকের ভবিষ্যতের জীবন কোন প্রদীপ্ত সূর্যালোকে আলোকিত হবে কিনা সে সম্পর্কে বোধহয় কোন স্পষ্ট ইংগিত নাটকে নেই।

নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যিকের কয়েকটি মানসিক অস্থিরতার দৃশ্য অতিরিক্ত সংযোজিত হোলেও, তাতে শ্রীবন্দ্যো-পাধ্যায়ের শিল্প চেতনার গভীরতাই ক্ষীণতর হয়েছে। যে ক'জন সাবলীল অভিনয় করে প্রযোজনাটিকে সুন্দর করে এগিয়ে দিতে সাহায্য করেছেন তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্ত চট্টোপাধ্যায় নির্মল দে সরকার। আলোকসম্পাতে শ্রীকানিষ্ক সেন তাঁর পূর্ণসুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

উদ্ভট ঘটনা এবং ততোধিক উদ্ভট সংলাপকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা 'কথায় কথায় রূপকথা' নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়ে সেদিনকার দর্শকেরা অফুরন্ত ধারায় শুধু হেসেছেন। সহ-নায়ক 'গঞ্জালেস' হঠাৎ যখন আচমকা নায়িকা (মণিকা)-কে 'তোমার বাসর গোরে বাজাইবে—জামাই-ভাড়া সুনিবে' বলে গীটারটা নায়িকার হাতে তুলে দিয়ে 'গুডবাই' বলে চলে গেল এবং ভৃত্য নীলমাধব 'হে-হে-হে' করে হেসে উঠলো, সেই সময়টি হয়েছে নাটকটির অগ্রগতির পক্ষে অপূর্ব। প্রচণ্ড এক উৎকণ্ঠায় নিয়ে গিয়ে দর্শকদের এমন অনা-বিল হাসির তুফানে ভাসিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত সচরাচর চোখে পড়ে না।

অভিনয়ের ব্যাপারে প্রায় প্রতিটি শিল্পীই নৈপুণ্যের পরিচয় রাখেন। দর্শকদের একেবারে অভিভূত করে রাখেন 'গঞ্জালেস' বেশী নীহারেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন রজত রায়চৌধুরী, শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়, সলিল গঙ্গোপাধ্যায়, গোপা ভট্টাচার্য, রবীন চট্টোপাধ্যায়, সুধীর গঙ্গোপাধ্যায়। এই নাটকটির মঞ্চসজ্জা ও নির্দেশনার দায়িত্ব নেন সুনীথ মজুমদার।।

শুভম নাট্যগোষ্ঠীর 'স্ট্রীট বেগার' : সম্প্রতি শুভম নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে 'স্ট্রীট বেগার' নাটকটি পরিবেশন করলেন।

সুঅভিনীত এই নাটকের কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকায় ছিলেন সুমিত দেব, তপন ধর, অমর দাস, অমিত দেব, সুনীল দত্ত, শুক্লা দাঁ, শিবানী ভট্টাচার্য। নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন কমলেশ ভট্টাচার্য।

'অনুকৃতি'র 'নবজাতক সূর্য': আদর্শ, প্রেম, আনন্দ, বিশ্বাস, মানুষের চিত্তের এই চিরন্তন বৃত্তি ও বোধগুলো বারবার সামাজিক নিষ্ঠুরতার চাপে বিপর্যস্ত হোলেও, অস্তিত্বের ইতিহাসে এরা অম্লান থাকে। **বোধ হয় এই সত্যই** বিঘোষিত হয়েছে 'অনুকৃতি' প্রযোজিত 'নবজাতক সূর্য' নাটকে। **সম্প্রতি এ নাটকটি পরিবেশিত হয়েছে 'মুক্তাঙ্গনে'র মঞ্চে।**

প্রয়োগপরিকল্পনার ব্যাপারে আরো একটু গভীরতর চিন্তা প্রসারিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। এদিক দিয়ে নির্দেশক অমল ঘোষের একটু শৈথিল্যই চোখে পড়েছে। তবে গৌতম দত্তের উদাত্ত কণ্ঠে বাউল গান দর্শকদের মনে এনেছে নতুনত্বের দোলা। এ ব্যাপারে সংগীতপরিচালক রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রয়াসও নিঃসন্দেহে অভিনন্দন-যোগ্য। বিভিন্ন মুহূর্তে বিভিন্ন রাগ পরিবেশন করে নাটকের আন্তর গতিবেগকে গভীরতর করে তুলতে পেরেছেন। পিন্টু বসুর আলোকসম্পাত নাটকের কয়েকটি মুহূর্তকে সজীব করে তুলেছে। তবে দৃশ্য-সজ্জায় আরো একটু শৈল্পিক ব্যঞ্জনার প্রয়োজন ছিল।

বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন স্বরাজ চ্যাটার্জী, শশাঙ্ক ঘোষ, স্নেহাংশু চক্রবর্তী, মনীষ রায়, অমল ঘোষ, অসিত নাগ, গৌতম দত্ত, রণজিৎ রায়, ধরণী মুখার্জী, মধুছন্দা দাস ও শাশ্বতী মুখার্জী।

মুভিং থিয়েটারের 'ইয়াহিয়া ও গণ-আদালত': মুক্ত আকাশের নিচে প্রায় দু হাজারের ওপর নানান বয়সী মানুষের যেন মেলা। সোদপুরের গোশালার বিশাল চত্বরের কোথাও এতটুকু সাড়াশব্দ নেই। সমস্ত দৃষ্টি সংহত হয়ে রয়েছে সামনের জোড়া-তালি দিয়ে তৈরি মঞ্চের দিকে। দর্শকেরা স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখছিলেন 'বাংলাদেশে' যে নারকীয় কাণ্ড ঘটে চলেছে তারই জান্তব রূপ—'ইয়াহিয়া ও গণ-আদালত' মঞ্চাভিনয়। বাঙালী জাতীয়তাবোধের নব উন্মেষের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক শক্তির রুদ্র সংঘর্ষের বাস্তব রূপ নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন সোদপুরে মুভিং থিয়েটার তাঁদের সাম্প্রতিক মুক্তাঙ্গন অভিনয়ে। অভিনয়ের আগে সভাপতি বিমল বসু জনমত জাগরণে এই ধরনের অভিনয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং 'ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর বাংলাদেশ' তরফ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানান। অভিনয়ের প্রারম্ভে 'সোনার বাংলা' গানটি নিবেদন করেন সুস্মিতা বিশ্বাস ও বকুল বিশ্বাস। অভিনয়ে মুভিং থিয়েটার তাঁদের পূর্ব-সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। সামগ্রিকভাবে নাট্যাভিনয় দর্শক চিত্তকে অভিভূত করে রাখে। অংশ গ্রহণ করেছিলেন শিবনাথ দত্ত, সুকুমার বসু, প্রতাপ রায়চৌধুরী, বাচ্চু দত্ত, কুমার চক্রবর্তী, কালিপদ দাস, চন্দ্র-মৌলি ব্যানার্জি, বাবলু সমাদ্দার, রবি ভট্টাচার্য, রমানাথ চক্রবর্তী, প্রবীর সিংহ, দিলীপ চক্রবর্তী, তপন তপাদার, শঙ্কর দে ও পারুল দাস। সংগীত পরিচালনা করেন লাজুক সোম। নাট্যকার সুকুমার বসু নাটক পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় দেন।

দুটি একাংকের যৌথ প্রযোজনা

আগামী ২৯ জুলাই মুক্ত অংগন রঙ্গ-মঞ্চে প্রাচীতীর্থ প্রযোজিত ঋত্বিক ঘটকের 'জ্বালা' ও সন্ধিক্ষণ নাট্যগোষ্ঠীর 'বিজয়ের অপেক্ষায়' ক্লিফোর্ড ওদেতের 'ওয়েটিং ফর লেফটি' অনুপ্রাণিত)—এই দুটি একাঙ্ক নাটক অনুষ্ঠিত হবে। নির্দেশনার দায়িত্বে আছেন যথাক্রমে শ্রীঅমল কর ও শ্রীগৌরকৃষ্ণ ভদ্র। অভিনয় আরম্ভ সন্ধে সাতটায়।

'নতুন দিনের আলোয়' কাঁচড়াপাড়া আর্ট থিয়েটার

কাঁচড়াপাড়া আর্ট থিয়েটার বাংলা নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে সুনামের অধিকারী। বিগত একুশ বছর ধরে এই নাট্যগোষ্ঠীটি নাট্যরসিকদের উপহার দিয়েছেন বহু নাটক। সম্প্রতি এই দল 'হাইনমার্স' রঙ্গালয়ে অভিনয় করলেন নতুন নাটক 'নতুন দিনের আলোয়'। নাট্যকার ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশনা সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পটভূমিতে বিধৃত এই নাটক মূলতঃ মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। কয়েকটি উপভোগ্য নাট্য মুহূর্ত রচনা ও সৃষ্টিতে নাট্যকার ও নির্দেশকের দক্ষতার পরিচয় মেলে। অভিনয়ে বিশেষ করে উল্লেখ্য হলেন অনিল মুখোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র দোবে, কালি-পদ ভৌমিক, বাসন্তী মুখোপাধ্যায়, মলিন রায় ও শ্যামলী মজুমদার।

স্টুডিও থেকে

'আন্দাজ'-এর শুভমুক্তি

সিপ্পী ফিল্মস্ নিবেদিত জি, পি, সিপ্পী প্রযোজিত এবং রমেশ সিপ্পী পরিচালিত ইস্টম্যানকলারে তোলা 'আন্দাজ' ছবিটি এই শুক্রবার, ৩০ জুলাই সোসাইটি, হিন্দ, দর্পণা, মেনকা, প্রেস, গণেশ, ছায়া, ইন্টালী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। ছবিটিতে অভিনয় করেছেন শাম্মী-কাপুর, হেমা মালিনী, রাজেশ খান্না, সিমি প্রভৃতি শিল্পী। শঙ্কর-জয়কিষেণের সুর-সংযোজিত এই ছবিটির পূর্ব-ভারতীয় পরিবেশক হচ্ছে রাজশ্রী পিকচার্স।

শপথ নিলাম

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যাঁদের আত্মত্যাগের অ.বস্মরণীয় কীর্তি চিরভাস্বর, সেই মুক্তিযোদ্ধা বীরসন্তানদের কর্মসাধনার দলিল 'শপথ নিলাম' মুক্তিপ্রতীক্ষায়।

শৈলেশ দের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি প্রযোজনা করেছেন কৃষ্ণা মল্লিক। শচীন অধিকারী পরিচালিত ও সুকুমার মিত্র সুরারোপিত এই ছবির গীতরচয়িতা অমিতাভ নাহা।

কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে রূপদান করেছেন সমিত ভঞ্জ, সাবিত্রী চ্যাটার্জি, দিলীপ রায়, শিবানী বসু, শুভেন্দু চ্যাটার্জি, শমিতা বিশ্বাস, শেখর চ্যাটার্জি, মলিনা দেবী, ভাস্কর চৌধুরী, মন্মথ, মৃণাল, বলাই মুখার্জি ও নবাগতা সুনন্দা দাশগুপ্তা আরও অনেকে।

একমাত্র পরিবেশক : ইস্টার্ন ফিল্ম একসচেঞ্জ।

স্ত্রী/আরতি ভট্টাচার্য এবং উত্তমকুমার। পরিচালনা : সলিল দত্ত। ফটো : অমৃত

স্বীকৃতির আউটডোর : এলিট মুভিজ নিবেদিত ও আশিস রায় প্রযোজিত স্বীকৃতি ছবির বহির্দৃশ্যের জন্যে শিল্পী ও কলাকুশলীসহ এই মাসের শেষে সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, টোকিও ও হংকং-এ যাচ্ছেন পরিচালক কণক মুখোপাধ্যায়। কাহিনী ও চিত্রনাট্যও স্বয়ং পরিচালকের। এই বহির্দৃশ্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ছবির কাজ সমাপ্ত হবে। সঙ্গীতপরিচালনা অমল মুখোপাধ্যায়ের। চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের। ছবির নেপথ্য কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ছবির প্রধান তিন শিল্পী অপর্ণা সেন, শমিত ভঞ্জ ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, তমাল লাহিড়ী, কল্যাণী মণ্ডল এবং বিকাশ রায় ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়।

ভিন্ন স্বাদ অন্যরসের ছবি : কুহেলির চিত্র মুক্তি

চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার এবার ভিন্ন স্বাদ এবং অন্যরসের ছবি দর্শক সাধারণকে উপহার দিচ্ছেন। এ ছবির ভিন্ন প্রকৃতির কাব্যরসাশ্রিত 'নিমন্ত্রণ' থেকে একেবারে 'ছুটি'—এর জাত এবং স্বাদ একেবারে আলাদা। 'কুহেলি' এই নতুন ছবির নাম। নামেই পরিচয় মেলে। ক্রাইম থ্রিলার। রুদ্র ভয়াল ভয়ঙ্কর রসের পটভূমিতে এ ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে। শ্রেষ্ঠাংশে আছেন স্বনামখ্যাতরা—যেমন বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, সুমিতা সান্যাল, সুখেন্দু, রবি ঘোষ, উৎপল দত্ত এবং আরো অনেকে। সঙ্গীত রূপারোপ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণে সৌমেন্দু রায় আর সুনীতি মিত্র আছেন দৃশ্যপরিকল্পনা।

আগামী ৩০ জুলাই রাধা, পূর্ণ সহ সতেরোটি চিত্রগৃহে এই ছবিটি দর্শকদের অভিবাদন জানাবে।

বিরাজ বৌ : সমাপ্তি পথে

সুনীল রাম প্রযোজিত কে সি দাস প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ'এর চিত্রগ্রহণের কাজ ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে প্রায় অর্ধেকের ওপর হয়ে গেছে। চিত্রনাট্য রচনা—সলিল সেনের। পরিচালনায় আছেন—মানু সেন। সুর দিচ্ছেন: কালীপদ সেন। নেপথ্য কণ্ঠে আছেন: সন্ধ্যা মুখার্জী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র ও অনুপ ঘোষাল। ছবির বিশিষ্ট ভূমিকায় আছেন—উত্তমকুমার, মাধবী চক্রবর্তী, অনুপকুমার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, নীলিমা দাস, বিকাশ রায় শিবানী বসু, শর্মিলা, কমল মিত্র, তরুণকুমার, জীবেন বসু, জহর রায়, বেনু

সিংহ, ধীরাজ দাস, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শীতল, গৌর সী, বীরেন চ্যাটার্জী, আনন্দ মুখার্জী, রাজলক্ষ্মী (ছোট) প্রমুখ।

অপর্ণা: মুক্তি পথে

সরকার প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ নিবেদিত ও শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ পরিবেশিত জরাসন্ধের—'অপর্ণা'-র চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। ছবিটি এখন মুক্তির দিন গুনছে। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা সলিল সেনের। সুর দিয়েছেন—রবীন চট্টোপাধ্যায়। গান লিখেছেন—প্রণব রায় ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণঃ কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনায়—সুবোধ রায়। নেপথ্য কন্ঠে—আরতি মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত ও সিপ্রা বসু। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেনঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তনুজা, অরুণ মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, গীতা নাগ, গীতা দে, অমরনাথ, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম, তপতী ঘোষ, রেবা দেবী, অজন্তা চৌধুরী, বিজন ভট্টাচার্য, তরুণকুমার ও জহর রায়।

স্ত্রীর চিত্রগ্রহণ চলছে: বেবী জুন প্রোডাকসনের 'স্ত্রী' ছবির চিত্রগ্রহণ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। বিমল মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করছেন সলিল দত্ত। নচিকেতা ঘোষের সঙ্গীত পরিচালনা এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় আছেন বিজয় ঘোষ, অমিয় মুখোপাধ্যায় ও সত্যেন রায়চৌধুরী। ছবিটির ভূমিকালিপি আকর্ষণীয়। সলিল দত্তের সফল ছবি 'অপরিচিত'র পর আবার উত্তমকুমার ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে এই ছবির দুটি প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে। নায়িকা চরিত্রে আছেন আরতি ভট্টাচার্য। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পী জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, সাধন সেনগুপ্ত, পারিজাত বসু। পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন এস-বি-ফিল্মস।

বিবিধ সংবাদ

শঙ্করস্কোপে নতুন যোজনা 'ছিন্নবিচ্ছিন্ন'

পাকিস্তানী জঙ্গীবাহিনীর অকথ্য অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে বাংলাদেশ থেকে কাতারে কাতারে আশ্রয়প্রার্থীর দল পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করছে সীমান্ত অতিক্রম করে। গ্রাম-বাংলার তাদের শান্তির নীড় আজ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। এই আশ্রয়প্রার্থী দলের মর্মকথাকে আশ্চর্যভাবে রূপায়িত করেছেন সার্থকস্রষ্টা উদয়শঙ্কর একটি নাতিদীর্ঘ ব্যালের মাধ্যমে, যাতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন জনৈক একক নর্তক এবং ক্ষণে ক্ষণে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বহু নর্তক-নর্তকী। এই ব্যালে সোচ্চার হয়ে উঠেছে সুনিপুণ আবহ-সঙ্গীতের সহায়তায়। মঞ্চ এবং পর্দার কৌশলী সমন্বয়ে গঠিত উদয়শঙ্করের সৃষ্টি বিস্ময়-

চিত্রে/ললিতা চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা : মকরন্দ চট্টোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

কারী 'শঙ্করস্কোপ'-এর সঙ্গে যুক্ত হলেও 'ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন' একটি বিশুদ্ধ ব্যালে।

মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ভারত

মস্কো শহরে গেল হপ্তা থেকে যে সপ্তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব শুরু হয়েছে, তাতে যোগদানের জন্যে পাঠানো হয়েছে বাঙলা কাহিনী-চিত্র 'সাগিনা মাহাতো' এবং ফিল্মস্ ডিভিশনকৃত কয়েকখানি তথ্যচিত্র। খবরে প্রকাশ, গেল ২০ জুলাই তারিখে 'সাগিনা মাহাতো' দেখানো হয়ে গেছে। এই উপলক্ষ্যে তথ্য ও বেতার দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ধরমবীর সিং-এর নেতৃত্বে আন্ডার সেক্রেটারী কে কে খান এবং প্রযোজক হেমেন গাঙ্গুলী গেল রবিবার, ১৮ জুলাই মস্কো যাত্রা করেছেন। বোম্বাই-এর মেহবুব স্টুডিওতে হিন্দী 'সাগিনা মাহাতো'র শুটিং চলতে থাকায় ছবির পরিচালক তপন সিংহ কথা থাকা সত্ত্বেও এই দলের চতুর্থ সভ্যরূপে যোগ দিতে পারেন নি।

পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক চলচ্চিত্র পুরস্কৃত

হোমি, জে, এইচ, তালিয়ারখান-এর নেতৃত্বে চোদ্দজন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি পুরস্কার-সমিতির সুপারিশ অনুসারে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক মন্ত্রক ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯-এর মধ্যে নির্মিত পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত যে-চলচ্চিত্রগুলিকে পুরস্কৃত করেছেন, তাদের সংস্থা ও পরিচালকসহ নাম ও পুরস্কারের পরিমাণ ঘোষণা করেছেন :

শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্রের জন্য প্রথম পুরস্কার : ৭৫,০০০ টাকা—প্রযোজক ৬০,০০০ ও পরিচালক—১৫,০০০ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার : ২৫,০০০ টাকা—প্রযোজক— ২০,০০০ ও পরিচালক— ৫,০০০ টাকা।

স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্রের জন্য প্রথম পুরস্কার : ১০,০০০ টাকা—প্রযোজক—৭,৫০০ ও পরিচালক—২,৫০০ টাকা; দ্বিতীয় পুরস্কার : ৫,০০০ টাকা—প্রযোজক— ৪,০০০ ও পরিচালক—১,০০০ টাকা; তৃতীয় পুরস্কার : ২,০০০ টাকা—প্রযোজক—১,৫০০ ও পরিচালক—৫০০ টাকা।

শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্রের প্রথম পুরস্কারটি তিনটি ছবির মধ্যে সমভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে : (১) পরিবার (হিন্দী) : প্রযোজনা ও পরিচালনা : কেবল. পি, কাশ্যপ; (২) ধর্মকন্যা (মারাঠি) : প্রযোজনা শ্রীমতী দময়ন্তী শিন্ধে; পরিচালনা—মাধব শিন্ধে; (৩) কাড়ি ধুপ কড়েছান (পাঞ্জাবী) : প্রযোজনা : পুরেন্দ্র শর্মা; পরিচালনা : কানওয়ার শোরে। দ্বিতীয় পুরস্কার : ওলাথুমতী (মালয়লম) : প্রযোজন : এম, পি, চন্দ্রশেখরন পিল্লাই; পরিচালনা : কে, এস, সেথুমাধবন্।

স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্র : প্রথম পুরস্কার—বাপ রে বাপ; বোম্বাইয়ের ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার পক্ষে প্রযোজনা : প্রসাদ পিকচার্স; পরিচালনা : রামমোহন; দ্বিতীয় পুরস্কার—ডেঞ্জার সিগন্যাল; ফিল্মস্ ডিভিশনের পক্ষে প্রযোজনা ও পরিচালনা : পি, কে, রাজহংস এবং তৃতীয় পুরস্কার—দো ইয়া তিন বাচ্চে : প্রযোজনা : ত্রিবেনী পিকচার্স ও পরিচালনা : রাম পাহওয়া।

এ-ছাড়া প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়েছে ফিল্মস্ ডিভিশন প্রযোজিত 'শ্যাডো অ্যান্ড সাবস্ট্যান্স অ্যান্ড আমব্রেলা এবং মেসার্স আমা প্রযোজিত এবং এস, সাজ পরিচালিত 'খিলোনে' ছবি দুটিকে।

আলজিরিয়ায় ভারতীয় চলচ্চিত্র ক্রয়

আলজিরিয়ার সরকারী চলচ্চিত্র পরিবেশনা সংস্থার মুখ্য ব্যক্তি, মিঃ মোহাম্মেদ আউলেদ মুসা ভারতে এসে ১৬ খানি ভারতীয় চিত্র ক্রয় করেছেন ৪৫,৫০০ ডলার মূল্যে দিয়ে। ছবিগুলির মধ্যে মাত্র পাঁচখানি সাদা-কালো, বাকীগুলি রঙীন। পাঁচখানি সাদা-কালো ছবির মধ্যে সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেন পরিচালিত আধুনিক শিল্পধর্মী ছবি আছে।

চলচ্চিত্রের দর্শক সংখ্যার দিক দিয়ে ভারত তৃতীয়

ইউনাইটেড নেশন বার্ষিক পরিসংখ্যানে প্রকাশ, চলচ্চিত্রের দর্শক সংখ্যা হিসেবে ভারত ১৯৬৯ সালে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। প্রথম স্থান অধিকারী সোভিয়েত ইউনিয়নের দর্শকসংখ্যা যেখানে ৪৬৫ কোটি ৫৯ লক্ষ, ভারতের দর্শকসংখ্যা সেখানে ২১৯ কোটি। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে চীন।

২১ জুলাইয়ের 'প্রাভ্দা' পত্রিকা ঠিক আগের দিনে মস্কো চলচ্চিত্রোৎসবের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান হিসেবে ক্রেমলিন প্যালেস অব কংগ্রেস-এ প্রদর্শিত 'সাগিনা মাহাতো' সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে বলেছে, 'ছবিটি আকারে বাস্তবধর্মী, বিষয়বস্তুতে সামাজিক এবং সাধারণ রঙীন গীতিবহুল মেলোড্রামাগুলি (ভারতীয় হিন্দী ছবিগুলির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের।...'সাগিনা মাহাতো' চলচ্চিত্রে কলিকাতা রীতির (ক্যালকাটা স্কুল অব সিনেমার) একটি সুযোগ্য নিদর্শন—এই কলিকাতা রীতির নেতা হচ্ছেন প্রখ্যাত শিল্পী সত্যজিৎ রায়।' প্রাভদাতে বলা হয়েছে, ছবির পরিচালক তপন সিংহ এবং নায়ক-নায়িকা দিলীপকুমার ও সায়রাবানু সম্ভবত আসচে হপ্তায় মস্কো চলচ্চিত্রোৎসবে যোগ দিতে আসছেন।

'সাগিনা মাহাতো' ছাড়া ভারত দুটি তথ্যচিত্র ও দুটি শিশুচিত্রও পাঠিয়েছে মস্কো চলচ্চিত্রোৎসবে প্রদর্শিত হবার জন্য।

ভেনিস চলচ্চিত্রোৎসবে 'প্রতিদ্বন্দ্বী'

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত এবং অসীম দত্ত ও নেপাল দত্ত প্রযোজিত পূর্ণিমা পিকচার্সের নিবেদন 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে পাঠাচ্ছেন ভারত সরকার। উৎসবটি ১৯৭১-এর আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে শুরু হচ্ছে। স্মরণ থাকতে পারে, শ্রীরায়ের 'অপরাজিত' এই ভেনিস চলচ্চিত্রোৎসব থেকেই 'স্বর্ণ-সিংহ' (গোল্ডেন লায়ন) পুরস্কার লাভ করেছিল।

'প্রতিদ্বন্দ্বী'র বিশেষ আমন্ত্রণ

আগামী ৫ থেকে ২০ নভেম্বর শিকাগোয় সপ্তম বার্ষিক আন্তর্জাতিক ছায়াচিত্র উৎসবের আসর বসছে। এই উৎসবে অংশ গ্রহণ-এর জন্যে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ এসেছে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত প্রিয়া ফিল্মস-এর 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র। উৎসব পরিচালকরা শিকাগোতেই বিশ্বের রসিক-সমাজের সামনে এই অবিস্মরণীয় ছবির চিত্রমুক্তি ঘটাতে উৎসাহী হয়ে প্রযোজক নেপাল দত্ত, অসীম দত্ত এবং পরিচালক রায়কে এই উৎসবে অংশ গ্রহণের জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন।

গীতাঞ্জলি সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ফলাফল

—৩বি, ললিত মিত্র লেনস্থিত শ্যামবাজার কলি-৪ গীতাঞ্জলি সঙ্গীত শিক্ষায়তন আয়োজিত চতুর্থ বর্ষ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় সকল বিভাগের ও বিষয়ের কেবলমাত্র প্রথম স্থানাধিকারীগণ :—ধ্রুপদ, ধামার : অরুণা বসু। খেয়াল : কাবেরী কর, স্বপ্না চক্রবর্তী, মধুমিতা দাস। ঠুংরি : কাবেরী কর, আশীষ ঘোষরায়। রাগপ্রধান : কাবেরী কর, গৌরী সরকার, সুচেতা ভট্টাচার্য, মহুয়া ঘোষ। ভজন : অরুণা বসু, ভাস্বতী বিশ্বাস, সুস্মিতা গোস্বামী। শ্যামাসঙ্গীত : প্রশান্তকুমার রায়, কাজলরেখা ব্যানার্জী, গৌরী সরকার, ইন্দ্রাণী দাস, মধুমিতা দাস। লোকসঙ্গীত : পলি ভট্টাচার্য, মালা চক্রবর্তী, রাধারাণী কর্মকার, তন্ময় কর, শিপ্রা চক্রবর্তী, পম্পা চৌধুরী। প্রাচীন বাংলা গান : পলি ভট্টাচার্য, শুক্লা পাল। রবীন্দ্রসঙ্গীত : মৃত্যুঞ্জয় মুখার্জী, কাজলরেখা ব্যানার্জী, সুস্মিতা সাহা, ইন্দ্রাণী দাস, সুস্মিতা গোস্বামী, শান্তা বসু, কল্পনা মজুমদার, মিনাক্ষী মুখার্জী, দেবযানী চৌধুরী, আশিস ঘোষরায়, দীপালি সাধুখাঁ, বুলবুল মণ্ডল। অতুলপ্রসাদ : বাদল চ্যাটার্জী, কাবেরী কর, বনানী মিত্র, চৈতালী সোম, মধুমিতা দাস, দীপালি সাধুখাঁ, শিবানী গাঙ্গুলী, স্বপ্না সাহা। নজরুল : প্রশান্তকুমার রায়, কাবেরী কর, গৌরী সরকার, তনুশ্রী বসু, রিংকু চক্রবর্তী, আশিস ঘোষরায়, দীপালি সাধুখাঁ, শিবানী গাঙ্গুলী। আধুনিক : বাদল চ্যাটার্জী, মালা চক্রবর্তী, মধুমিতা দাস, তন্ময় কর, মুক্তা ঘোষ, পম্পা চৌধুরী, প্রভাসচন্দ্র সরকার, জলি পোদ্দার, শিবানী গাঙ্গুলী, স্বপ্না সাহা। পাশ্চাত্য : প্রভাসচন্দ্র সরকার, জলি পোদ্দার, শিবানী গাঙ্গুলী। ভারতনাট্যম : কৃষ্ণকলি বাগচী, সুতপা বসু, পাপিয়া বিশ্বাস, মণিকা বসু। কথক : তন্ময় কর, কাজল রায় মৃদুলা ভট্টাচার্য। কথাকলি : কৃষ্ণকলি বাগচী, মুক্তা ঘোষ, দেবযানী চৌধুরী। সমবেত লোকনৃত্য : বাণীপীঠ নৃত্য-গীতায়ন। তবলা : নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায়। আবৃত্তি : সৌরেন অধিকারী, অরুন্ধতী চক্রবর্তী, মিতা দত্ত, অভিজিৎলাল রায়, কল্লোল ঘোষ।

পূরবী মুখোপাধ্যায়ের একক আসর

গেল ১৮ই জুলাই দক্ষিণ কলিকাতার জনপ্রিয় সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান 'নৃত্যের তালে তালে'-র এক ঘরোয়া আসরের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সমবেতকণ্ঠে সংস্থার ছাত্রছাত্রীর গীত তিনখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রশংসনীয়। তারপর শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়ের পনেরোখানি রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রত্যেকটিই উপভোগ্য রসসৃষ্টিতে উত্তীর্ণ। সর্বশেষে এবং সকলের অনুরোধে ইনি 'সার্থক জনম আমার' ও 'আমার সোনার বাংলা' গানদুটি দিয়ে আসর সমাপ্ত করেন। তাঁর সঙ্গে সুনিপুণ তবলাসঙ্গতে ছিলেন শ্রীযশোদাদুলাল মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান সুপরিচালনার জন্য ধন্যবাদার্হ সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শ্রীসনৎকুমার দাশগুপ্ত, অধ্যক্ষা মুক্তশ্রী মীরা দাশগুপ্তা ও অনিমেষ বসু।

খেলাধুলা

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ড
প্রথম টেস্ট খেলা

লর্ডসে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের প্রথম টেস্ট বৃষ্টির জন্যে ড্র হয়েছে।

১৯৭১ সালের আগে ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতবর্ষ যে ৬টা টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলেছিল তার কোন খেলাতেই জিততে পারেনি। টেস্ট খেলার ফলাফল ছিল—ভারতবর্ষের হার ১৫ এবং খেলা ড্র ৪। এই অবস্থায় গত ২২শে জুলাই লর্ডস মাঠেই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষ ১৯৭১ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামে। টসে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক রে ইলিংওয়ার্থ ভারতবর্ষের অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকারকে হারিয়ে দিয়ে প্রথম ব্যাট করার দান নিয়েছিলেন। কিন্তু ইংল্যান্ড খেলার প্রথমদিকে খুব বেশী সুবিধা করতে পারেনি। মাত্র ৬১ রানের মধ্যে তাদের চারজন বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যান। এরপর ৭১ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। দলের এই দারুন সংকটকালে ৬ষ্ঠ উইকেট জুটিতে উইকেটকিপার এ্যালেন নট (৬৭ রান) এবং অধিনায়ক ইলিংওয়ার্থ (৩৩ রান) দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ইংল্যান্ডের অনুকূলে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। তাঁদের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ৯৮ মিনিটের খেলায় ৯০ রান উঠেছিল। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ২৫২ রানের (৮ উইকেটে)
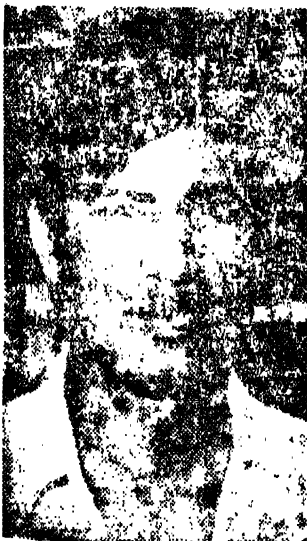
একনাথ সোলকার
১ম ইনিংসে ৬৭ রান

অজিত ওয়াদেকার
অধিনায়ক—ভারতবর্ষ

মাথায় প্রথমদিনের খেলা শেষ হয়। বোলার জন স্নো ৫১ রান করে নটআউট থাকেন। ভারতীয় খেলোয়াড়রা পালা করে যদি 'ক্যাচ' না ফস্কাতেন তাহলে ইংল্যান্ডের অবস্থা খুবই শোচনীয় হত।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩০৪ রানের মাথায় শেষ হয়। ৯ম উইকেট জুটিতে স্নো এবং গিফোর্ড ৯১ মিনিটে ৭১ রান তুলে দলের মুখ রেখেছিলেন। স্নো তাঁর ৭৩ রানে আউট হন —টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে তাঁর এ-ই সর্বোচ্চ রান।

ভারতবর্ষ দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে প্রথম ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ১৭৯ রান সংগ্রহ করেছিল। উইকেটে
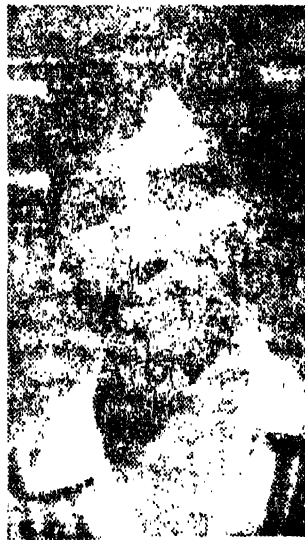
জি বিশ্বনাথ
১ম ইনিংসে ৬৮রান

রে ইলিংওয়ার্থ
অধিনায়ক—ইংল্যান্ড

অপরাজিত ছিলেন বিশ্বনাথ (২৪ রান) এবং সোলকার (০)। ভারতবর্ষেরও প্রথম ইনিংসের সূচনা ভাল হয়নি—১ রানের মাথায় ১ম এবং ২৯ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়। অধিনায়ক ওয়াদেকার ব্যক্তিগত ৮৫ রান তুলে অবস্থা ফিরিয়েছিলেন।

তৃতীয় দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৩১৩ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ ৯ রানে এগিয়ে যায়। ইংল্যান্ডের মাটিতে এই নিয়ে ভারতবর্ষ দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ডের থেকে যে-কোন পুরো ইনিংসের খেলায় বেশী রানে অগ্রগামী হন। ১৯৩৬ সালে এই লর্ডস মাঠেই প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসের ১৩৪ রানের থেকে ভারতবর্ষ ১৩ রানে এগিয়েছিল। এইদিন বিশ্বনাথ ৬৮ রান এবং সোলকার ৬৭ রান করে আউট হন। বিশ্বনাথ এবং সোলকারের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ৯২ রান উঠেছিল। তাঁরা মাত্র ১৪ রানের জন্যে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ৬ষ্ঠ উইকেট জুটির ভারতীয় রেকর্ড ভাংগতে পারেননি। ৬ষ্ঠ উইকেট জুটির ভারতীয় রেকর্ড ১০৫ রান (হাজারে এবং ফাদকার, লিডস, ১৯৫২)।

বিশ্বনাথ এবং সোলকার কি দৃঢ়তা এবং ধৈর্য নিয়েই না খেলেছিলেন! দলের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁদের মন্থর গতিতে এই খেলা পূর্ণ সমর্থনযোগ্য।

তৃতীয় দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ৭ মিনিট আগে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হয়।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ১৪৫ রান সংগ্রহ করেছিল। মাত্র ৪ রানের মাথায়

জন স্নো (ইংল্যান্ড)
প্রথম ইনিংসে ৭৩ রান

ইংল্যান্ডের ১ম উইকেট পড়ে যায়। বয়কট (৩৩ রান) এবং এর্ডারিচ (৬২ রান) ২য় উইকেটের জুটিতে ৬১ রান তুলে প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নিয়েছিলেন। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে দেখা গেল ইংল্যান্ড ১৩৬ রানে এগিয়ে, হাতে জমা ৫টা উইকেট।

শেষদিনে ইংল্যন্ডের ২য় ইনিংস ১৯১ রানে শেষ হয়। ভারতবর্ষ ২য় ইনিংসের ৮ উইকেটে ১৪৫ রান তুলেছিল। জয়লাভের জন্যে আর ৩৮ রানের দরকার ছিল; হাতে জমা ছিল ২টো উইকেট। কিন্তু বৃষ্টির ফলে চা-বিরতির পর খেলা হয়নি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড: ৩০৪ **রান** (নট ৬৭ এবং স্নো ৭৩ রান। বেদী ৭০ রানে ৪ এবং চন্দ্রশেখর ১১০ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৯১ রান (এর্ডারিচ ৬২ রান। ভেঙ্কট-রাঘবন ৫২ রানে ৪ উইকেট)।

নরম্যান গিফোর্ড (ইংল্যান্ড)
১ম ইনিংসে ৪ উইকেট

ভারতবর্ষ: ৩১৩ **রান** (ওয়াদেকার ৮৫, বিশ্বনাথ ৬৮ এবং সোলকার ৬৭ রান। গিফোর্ড ৮৪ রানে ৪ উইকেট।

ও ১৪৫ রান (৮ উইকেটে। গাভাস্কার ৫৩ রান। গিফোর্ড ৪৩ রানে ৪ উইকেট)।

ইংল্যান্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দল

১৯৭১ সালের ইংল্যান্ড সফরের অন্টম খেলায় ভারতীয় ক্রিকেট দল ৫ উইকেটে হ্যামশায়ার কাউন্টি দলকে পরাজিত করে উপর্যুপরি চারটি খেলায় জয়লাভের গৌরব লাভ করে। লর্ডসের প্রথম টেস্ট খেলার ঠিক আগে ভারতীয় দলের এইভাবে পরপর চারটি খেলায় জয়লাভ দলের সংহতি এবং মনোবল বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট উপাদান।

প্রথম দিনে হ্যামশায়ার দলের প্রথম ইনিংস ১৯৮ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতীয় দল দু উইকেট খুইয়ে ৯৮ রান সংগ্রহ করেছিল। হ্যামশায়ার দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় গাভাস্কার ৮ রানের বিনিময়ে শেষ দুটো উইকেট পেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ৩৬৪ রানের মাথায় শেষ হয়। ফলে তারা ১৬৬ রানে এগিয়ে যায়। ভারতীয় দলের এই দুজন সেঞ্চুরী করেন—বিশ্বনাথ (১২২ রান) এবং অশোক মানকাদ (১০৯ রান)। চলতি ইংল্যান্ড সফরে মানকাদের এই প্রথম সেঞ্চুরী। অপরদিকে বিশ্বনাথের তৃতীয় সেঞ্চুরী। তাঁরা ৪র্থ উইকেটের জুটিতে শতাধিক রান সংগ্রহ করেছিলেন। ভারতীয় দলের শেষ ৬টা উইকেটে মাত্র ৫৭ রান উঠেছিল। খেলার শেষে হ্যাম-শায়ার দলের রান দাঁড়ায় ২৫, কোন উইকেট না পড়ে।

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে হ্যামশায়ার দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৭১ রানের মাথায় শেষ হয়। ভেঙ্কটরাঘবন একাই ৯৩ রানে ৯টা উইকেট নিয়ে ভারতীয় দলের জয়লাভের পথ সহজ করে দেন। ভারতীয় দল ৫ উইকেট খুইয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১০৬ রান তুলে ৫ উইকেটে জয়ী হয়।

এই খেলার শেষে ১৯৭১ সালের ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলের পক্ষে খেলার ফলাফল দাঁড়ায়: জয় ৫, হার ১ এবং ড্র ২।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

হ্যামশায়ার : ১৯৮ রান (রিচার্ড গিলিয়েট ৫০ রান। প্রসন্ন ৩, গোবিন্দরাজ ২ এবং গাভাস্কার ২ উইকেট পান)

ও ২৭১ রান (গিলিয়েট ৭৯ এবং লিউস ৭১ রান। ভেঙ্কটরাঘবন ৯৩ রানে ৯ উইকেট)

ভারতীয় দল : ৩৬৪ রান (বিশ্বনাথ ১২২, মানকাদ ১০৯ এবং গাভাস্কার ৩৩ রান। ওস্যালিভান ১১৬ রানে ৫ এবং ওরেল ১০২ রানে ৪ উইকেট।

ও ১০৬ রান (৫ উইকেটে। গাভাস্কার ২৫ ও ওয়াদেকার ২৭ রান। ওস্যালিভান ২৭ রানে ৩ উইকেট)

ডেভিস কাপ

ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনাল

১৯৭১ সালের ডেভিস কাপ আন্ত-র্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালের একদিকে ভারতবর্ষ খেলবে রুমানিয়ার সঙ্গে এবং অপরদিকে চেকো-শ্লোভাকিয়া খেলবে ব্রেজিলের সঙ্গে।

ইউরোপীয়ান জোনের 'এ' গ্রুপের ফাইনালে চেকোশ্লোভাকিয়া ৩-২ খেলায় স্পেনকে এবং 'বি' গ্রুপের ফাইনালে রুমানিয়া ৫-০ খেলায় পশ্চিম জার্মাণীকে পরাজিত করে ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

ভারতবর্ষ বনাম রুমানিয়ার ইন্টার জোন সেমি-ফাইনাল খেলাটি আগামী ৩০শে জুলাই নিউ দিল্লীর ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্লাবের লনে আরম্ভ হবে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

আঠারোটি
বহুগুণসমন্বিত গাছ-গাছড়া
দিয়ে প্রস্তুত
ভিকো
বজ্রদন্তী
ভিকো বজ্রদন্তী টুথপেস্ট ও টুথ পাউডার সর্বপ্রকার টুথপেস্ট আর টুথ পাউডারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ১৮-টি নানাগুণসমৃদ্ধ বিভিন্ন গাছ-গাছড়াসহযোগে তৈরী। স্বতন্ত্রভাবে এই গাছ-গাছড়ার গুণগুলি সর্বজনবিদিত। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে তাদের সংমিশ্রণ অনেকগুণ বেশী কার্যকরী। বর্তমান ফরমূলা বহুবৎসর ব্যাপী গবেষণার ফল।
নিয়মিত ব্যবহারে দাঁতের ক্ষয়, পায়োরিয়া, মাড়ি থেকে রক্ত ও পুঁজ ক্ষরণ এবং মুখের দুর্গন্ধ নিবারিত হয়।
একবার পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ হউন
আয়ুর্বেদিক
টুথপেস্ট
ও টুথ পাউডার
মুখাভ্যন্তরের
স্বাস্থ্যরক্ষায় অনন্য
VICCO
Vajradanti
ভিকো
বজ্রদন্তী
STRONG
VICCO LABORAT
VICCO
Vajradanti
TOOTH
PASTE
বাবলা
লবঙ্গ
বকুল
ভিকো লেবোরেটরিজ
দাদার বোম্বাই-১৪

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

১৪শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 6th August, 1971. ২০শে শ্রাবণ ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীগৌতম কররায়

সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী প্রসঙ্গে

আমাদের বাংলাসাহিত্যে সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী জাতীয় একটি গ্রন্থের অভাব অনুভব করে এবছর "রূপকল্প ১৩৭৮" নামে একটি সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী প্রকাশ করেছি। এতে আছে—বর্তমান সাহিত্যিকদের ঠিকানা, ছদ্মনামের তালিকা, বিভিন্ন সাহিত্যিকদের পুরস্কারের তালিকা, সাহিত্যিকদের জন্ম-মৃত্যুর তাং, ১৩৭৭ সালে পরলোকগত এবং শত ও অর্ধশত-বার্ষিকী উত্তীর্ণ সাহিত্যিকদের জীবনী, গ্রন্থপঞ্জী ও তাঁদের সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধ, ১৩৭৭ সালের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসংবাদ, গ্রন্থপরিচিতি ইত্যাদি। যদিও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বহু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছি, তবুও আগামী বছর ২৫শে বৈশাখ যথানিয়মে 'সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী'র ২য় সংখ্যাটি প্রকাশ করব বলে আশা করছি। কিন্তু আমার পক্ষে সবচেয়ে অসুবিধা হয়ে দাঁড়িয়েছে লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। অথচ বর্তমান জীবিত লেখকদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা না তৈরি করতে পারলে আমার গ্রন্থের পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কাগজে নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিয়ে লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত আর্থিক ক্ষমতাও আমার নেই। তাই আপনাদের এই 'চিঠিপত্র' কলমের স্বারস্থ হলাম। যদি চিঠিটি প্রকাশ করেন তাহলে অনুগৃহীত হবো।

যে-সমস্ত সাহিত্যিকদের অন্ততঃ একটিও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের ঠিকানা যাঁরা জানেন এবং সাহিত্যিকরা নিজেও যদি ঠিকানাটি জানান তাহলে আমরা চিঠি পাঠিয়ে তাঁদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নেব। চিঠি পাঠাবার ঠিকানা—গ্রাম—বোড়হল, পোঃ—জাঙ্গিপাড়া, জেলা—হুগলী। বাংলা-সাহিত্যের একটি প্রামাণ্য ইতিহাস রচনায় সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

অশোক কুণ্ডু, হুগলী।

কালাপানির দেশে

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'কালাপানির দেশে' প্রবন্ধটি পড়ার পর ১৬ জুলাই সংখ্যার অমৃততে শ্রীসত্যভূষণ সেন—গোহাটি ১১ থেকে লেখা চিঠিটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীসেনের তিনটি তথ্যের শেষ দুটি সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য রয়েছে।

(১) 'লোকাল' নামে চিহ্নিত মানব-গোষ্ঠী সম্বন্ধে শ্রীসেনের বক্তব্যের মধ্যে বাস্তবতার ছবির চেয়ে কিছুটা যেন সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। 'লোকাল' নামে যে জাতি (?)-র কথা তিনি বলতে চেয়েছেন, আমার মনে হয় তা যুক্তিযুক্ত নয়। দণ্ডপ্রাপ্ত ছাড়াও বহু কর্মচারী এবং ব্যবসায়ী আন্দামানের পোর্টব্লেয়ার শহরে রয়ে গিয়েছেন; তাঁরা এবং তাঁদের বংশধরেরা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তাঁরাও সাধারণের কাছে 'লোকাল' নামে অভিহিত হয়েছেন। শ্রীসেনের 'জাতিধর্মের পুরাতন পরিচয়'—এর যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করছি না, এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার ঘটনা বিরল নয়। কিন্তু তা'বলে 'ইতিহাস বিহীন, ঐতিহ্য-বিহীন একটি জাতিতে পরিণত'—এ উক্তিটি যেন শ্রীসেন নিতান্তই আবেগ বশতঃ করেছেন বলে মনে হয়। শ্রীসেনের 'লোকাল' কথাটিকে পোর্টব্লেয়ার অঞ্চলের পুরাতন বাসিন্দাদের বলা হয়। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চাই যে পুরাতন বাসিন্দারা 'লোকাল' কথাটিকে বিশেষ পছন্দ করেন না। কথাপ্রসঙ্গে বলা যায় যে এই পুরাতন বাসিন্দাদের বংশধরেরা, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে স্বয়ং পুরাতন বাসিন্দারাও, বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে, আদালতে সর্বস্তরের সরকারী চাকুরীর বিভিন্ন কাঠামোতে নিযুক্ত আছেন এবং অনেকেই আজ মূল ভূখণ্ডের বিভিন্ন স্থানের শিক্ষায়তনে উচ্চশিক্ষা লাভ করছেন। আজ তাঁরা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের সর্বস্তরের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং এদের কি 'অতীত ইতিহাসবিহীন ঐতিহ্য-বিহীন একটি জাতি' (?) বলে ভাবা যায়?

(২) শেষ পর্যায়ে শ্রীসেন আন্দামানে বাঙালীদের একটি অভিযোগকে কেন্দ্র করে কিছু বক্তব্য রেখেছেন। আন্দামানে বহু অভাব অভিযোগের কথা আমিও নিজে স্বীকার করি। তবে শ্রীসেন আন্দামানকে যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেছেন তাতে সায় দিতে পারছি না। কারণ আন্দামানে হতাশার ফাঁকে ফাঁকে আকর্ষণ এবং সৌন্দর্যের উঁকিঝুঁকি সকলের মনকে জয় করবেই। পোর্টব্লেয়ার শহরটি এমনই সুন্দর যে এখানে কেউ কিছুদিন থাকলে জীবনের বৈচিত্র্যময় দিকগুলি অনায়াসে অনুভব করতে পারবেন। আন্দামান দেখবার জন্য প্রায় কেউ সেখানে বেড়াতে যান না—এ অভিযোগ আমার মতে কিছুটা অমূলক। ১৯৬৬ সন থেকে কলকাতার একটি বিশেষ পর্যটন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রতি বছর আন্দামান ভ্রমণের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। দুটি জাহাজ এবং সপ্তাহে দুবার ভাই-কাউন্ট প্লেন সারা বছর চলার ফলে আন্দা-মানের অপূর্ব সৌন্দর্য টুরিস্টদের কাছে ক্রমশঃ আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। শ্রীসেন আর একটি মন্তব্যে লিখেছেন 'আন্দামানের বাঙালীদের পক্ষে ভারতবর্ষের লোকদের সহিত সংযোগ সংস্পর্শ রক্ষা করা সহজ নয় সেজন্য লোকেরা তাদের প্রতি উদাসীন—এটা তাদের কাছে মর্মান্তিক।' শ্রীসেনের এই মন্তব্যের পক্ষে কতটা যুক্তি আছে তা অবশ্য চিন্তাসাপেক্ষ। আন্দা-মানের বাঙালীদের ভাগ্য যে ভারতবর্ষের লোকদের কাছে এতটা মর্মান্তিক রূপ ধারণ করেছে, তা আমি সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থানের মধ্য দিয়েও বুঝতে পারিনি। আন্দামানের বাঙালী সমাজ সেখানে প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে: (ক) পূর্ববঙ্গ হতে আগত এবং (খ) সরকারী ও বেসরকারী কাজে নিযুক্ত বাঙালী। আমার মনে হয় পূর্ববঙ্গ হতে আগত বাঙালীরা আন্দামানের বিভিন্ন দ্বীপে পুনর্বাসিত হয়ে অন্তত মানুষের মত বাঁচার অধিকার লাভের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভাবকে কিছুটা পূরণ করতে পেরেছেন। অপরদিকে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত বাঙালীরা এক অসহনীয় অবস্থার মধ্যে আছেন—তা আমার মনে হয় না। শ্রীমুখো-পাধ্যায়ের লেখনীর বন্ধনে আন্দামানের বাঙালীদের করুণ আবেদন 'আমাদের কথা তাদের বলবেন—আমাদের কথা বলবেন'—এবং শ্রীসেনের এই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও আমার মনে হয় না যে বাঙালীরা অনেকেই আজ সেখানে এক সংকটময় মুহূর্তের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করছেন। কারণ এ ধরনের উক্তি তথাকথিত 'কালা-পানির দেশ'-এর প্রতি আকৃষ্ট বাঙালী সমাজের কাছে স্বভাবতই ভীতি স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। কথা প্রসঙ্গে বলতে চাই, আন্দামানের পোর্টব্লেয়ার শহরে সরকারী দপ্তর এবং ব্যবসায়ী ক্ষেত্রে বাঙালীদের তুলনায় অবাঙালীদের বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতীয়দের একচেটিয়া আধিপত্য বিরাজ করে আসছে। প্রতি ক্ষেত্রে বাঙালীরা আজ সেখানে অবাঙালী বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতীয়দের কাছে ঘরমুখো এবং অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণতায় আচ্ছন্ন। আমার বক্তব্য 'আমাদের কথা তাদের বলবেন, আমাদের কথা বলবেন'—এ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ না হয়ে বাঙালীরা অবাঙালীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আন্দামানে নিজেদের কুশলতাকে প্রমাণ করুন; কেন আজ বাঙালীরা ভাবপ্রবণতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকবেন?

প্রণবজ্যোতি দে
কলকাতা-৫০।

একটি তথ্য সম্পর্কে

অমৃত-র ১১শ সংখ্যায় "মঞ্চাভিনয়" স্তম্ভে (৯৬২ পৃঃ) লেখা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের "সে" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সালের বৈশাখ মাসে (১৯৩৭-এর এপ্রিল)। তথ্যটি ঠিক নয়। অধুনালুপ্ত ছেলেমেয়েদের মাসিক পত্রিকা প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত "রংমশালে"এর প্রথম সংখ্যায় (১৩৪৩ কার্তিক, ১৯৩৬ অকটোবর) "সে" প্রথম প্রকাশিত হয়। গল্পটি চিত্রিত করেছিলেন শ্রীপ্রফুল্ল লাহিড়ী, যিনি পরে "পিসিয়েল" ছদ্মনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

দুর্গাবতী দেবী,
টালিগঞ্জ, কলকাতা।

সম্পাদকীয়

সংবিধান সংস্কার

সুপ্রীম কোর্টের রায়, মধ্যবর্তী নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনে শাসক কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা নতুন যুগ রচনা করেছে। এইবার যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা এক হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, জনগণ এভাবে শাসকগোষ্ঠীর সমর্থনে অনেকদিন ভোটদান করেন নি। শাসক কংগ্রেস নির্বাচনের পূর্বে যে সমাজতান্ত্রিক কার্যসূচীর কথা ঘোষণা করেছিলেন তা সফল করতে হলে এই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন ছিল। যে প্রস্তাব আনা হয়েছে নতুন দুটি বিলে তার দ্বারা সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অংশগুলি সংশোধনের অধিকার সরকারের হাতে দেওয়া হবে। এখন থেকে সরকার যে সব সম্পদ, গৃহ বা ভূমি সম্পত্তি গ্রহণ করবেন তার ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থের মোট পরিমাণ স্থির করবেন সংসদ। আর রাজন্য ভাতা বিলোপ, আই. সি. এসদের সুযোগ সুবিধা হ্রাস প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁদের ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ। এমন কি মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রেও সংসদই ভাগ্যনিয়ন্তা। এই সূত্রে গোলকনাথ মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায় স্মরণযোগ্য। গোলকনাথ মামলায় সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে অভিমত দিয়েছেন যে মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোনো আইন প্রণয়নের অধিকার সংসদের নেই।

বর্তমান সরকার শক্তিমান, কিন্তু অতিরিক্ত উৎসাহে সেই শক্তির অপব্যবহার অনুচিত। ইতিপূর্বে তেইশবার সংবিধান সংশোধিত হয়েছে, সুতরাং তেইশবার যখন হয়েছে আরো তেইশবার তা সংশোধন করা সম্ভব। বিরোধী দল বিল দুটি উত্থাপনের দিনেই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। অপ্রয়োজনীয় মনে হলে নিশ্চয়ই এই সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করা যায়, কিন্তু সমগ্র বিষয়টি সুবিবেচনার দাবী রাখে। চতুর্বিংশতিতম সংশোধনী বিলটির দ্বারা সংসদকে সংবিধানের সকল পরিচ্ছেদ সংশোধনের ক্ষমতা দান করা হবে, তার মধ্যে আছে মৌলিক অধিকার।

'সংবিধান যখন রচিত হয় তখন কল্পনা করা সম্ভব ছিল না যে একদা সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী প্রবর্তনের প্রয়োজনে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত বিধিনিষেধ একটা প্রচণ্ড বাধা হয়ে উঠবে। সংবিধান যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁরা ছিলেন জনপ্রতিনিধি, আজ যাঁরা সেই সংবিধানের সংস্কারক তাঁরাও জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, বর্তমান সংসদ তাঁদের সহযোগিতায় সুপ্রতিষ্ঠ। এই কারণে, সংসদ যদি আজ সংবিধানের কালোপযোগী পরিবর্তনে ব্রতী হন তাহলে সেই কাজকে অসঙ্গত বলা যায় না।

বিরোধী দলের একজন সম্মানিত নেতা পরলোকগত নাথ পাই, বিগত সংসদে এই জাতীয় একটি বিল উত্থাপন করেছিলেন। প্রতিষ্ঠিত স্বার্থসংরক্ষক কিছুসংখ্যক সদস্য এই বিল দুটির বিরোধিতা করলেও তাঁদের যুক্তি এবং বক্তব্য হয়ত তেমন তীক্ষ্ণ হবে না। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সীমা নির্ধারণে আদালতের এক্তিয়ার থাকবে না। এই ব্যবস্থানুসারে একত্রিশতম অনুচ্ছেদে "ক্ষতিপূরণ" কথাটির পরিবর্তে 'দেয় অর্থের পরিমাণ" বা অ্যামাউণ্ট কথাটি বসানো হয়েছে। এর অর্থ কোনো সম্পত্তি বা প্রতিষ্ঠান সরকারি অধিকারে নেওয়া হলে তার জন্য যে মূল্য দেওয়া হবে তাকে ক্ষতিপূরণ বলা যাবে না, এর ফলে হয়ত খেয়ালখুশি মাফিক যা হয় একটা অর্থ আমলাতন্ত্রের করুণায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পাবেন।

এই ধারার অপব্যবহার হতে পারে এমন আশঙ্কা সরকারেরও আছে—তাই বিলে বলা হয়েছে সংশোধিত আইন রাজ্যগুলিতে প্রচলিত আইনের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করবে না, সেটা অবশ্য রাষ্ট্রপতির বিবেচনাসাপেক্ষ। এই বিলে এমন কোনো রক্ষাকবচ নেই যা ভবিষ্যতের কোনো ক্ষীণ গরিষ্ঠতাসম্পন্ন সংসদকে ত্রাণ করতে পারে। যে সংসদ আজ সংবিধান সংস্কারে ব্রতী ভবিষ্যতের প্রয়োজনের দিকেও তার সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

ঠিক সময় ঠিক কথা বলার জন্যে প্রমোদ দাশগুপ্তের খ্যাতি আছে। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যখন পশ্চিম বাংলার জন্যে বিশেষ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিযুক্ত হলেন, তখন প্রমোদবাবু সংগে সংগে বললেন, বৃটিশ রাজ যেমন ভাইসরয় থাকা সত্ত্বেও ভারতের জন্যে একজন সেক্রেটারী অফ স্টেট নিয়োগ করত, কেন্দ্রীয় সরকারও তেমনি রাজ্যপাল থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম বাংলার জন্যে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করেছেন। পশ্চিম বাংলা দিল্লীর কলোনি—মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির এই শ্লোগান অনুসারে প্রমোদবাবুর তুলনাটা বেশ লাগসই নিশ্চয়ই। আবার গত বছর রাষ্ট্রপতির শাসনের গোড়ার দিকে পুলিশ খুব গুলি চালাচ্ছিল, কিন্তু বিশেষ কেউ মরছিল না। এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে প্রমোদবাবু চট্ করে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, তবে কি পুলিশের বুলেটে "নিরোধ" লাগানো আছে?

কিন্তু সেই প্রমোদবাবুও একটি বিষয়ে চট করে মুখ খুলতে চাইলেন না সেদিন। বিষয়টি হল প্রেসিডেন্ট নিক্সনের পিকিং সফরের প্রস্তাবের পর চীন-মার্কিন বোঝাপড়ার সম্ভাবনা। এ-কথা ঠিকই যে এই খবরের আকস্মিকতায় পৃথিবী জুড়ে অনেকে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু অনেকেরই মুখ খুলতেও দেরি হয় নি। যেমন, আমাদেরই দেশের সি পি আই। নিক্সনের পিকিং সফরের খবর আসার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে এই দল চীনাকে গালমন্দ করে বিবৃতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রমোদ বাবু তথা মার্কসবাদীরা যে অ—বাক হয়ে রইলেন তার কারণ শুধু ঘটনার আকস্মিকতায় নয়:

সকলেই জানে, আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে সি পি এম কোনো বিশেষ শিবিরে নেই। অতীতে রাশিয়াকেও এই দল যেমন গাল পেড়েছে, চীনকেও একেবারে ছেড়ে দেয় নি। তবু পলিটব্যুরোর বৈঠকের আগে কোনো মার্কসবাদী নেতা চীন-মার্কিন সমঝোতা সম্পর্কে কিছু বলতে চাইলেন না কেন? তার কারণ চীন সম্পর্কে এই মুহূর্তে কিছু বলার আগে তাঁরা একটু ভেবে-চিন্তে এগোতে চান। মার্কসবাদীরা এখনই এমন কিছু বলতে চান না যাতে চীনের চটবার আশংকা আছে। আবার আগের সমালোচনার পর এখন রাতারাতি চীনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়াও তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। আসলে, ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে চীনের বর্তমান মনোভাব সি পি এমের কাছে যদি কিছুটা রহস্যাবৃত মনে হয় তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। চীন সম্পর্কে পার্টির সতর্কতার কারণও এখানেই।

সি পি এম যে চীনা বা সোভিয়েট, কোনো শিবিরেই নেই সেটা হয়ত তাদের পক্ষে এক দিক দিয়ে ভালোই—কারণ কম্যুনিস্ট পার্টি মাত্রেই যে বিদেশের দালাল তাদের এই অপবাদ দেওয়ার অন্ততঃ কোনো উপায় নেই। তবে কম্যুনিস্ট আন্দোলন যখন আন্তর্জাতিক আন্দোলন, তখন আন্তর্জাতিক যোগাযোগেরও প্রয়োজন আছে বৈকি? সি পি এম সেই দিক দিয়ে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে প্রায় নির্বান্ধব। মস্কোয় কম্যুনিস্ট সম্মেলন হলে সি পি আই নেতাদের ডাক পড়েছে, চীনের আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছে সি পি আই (এম - এল), কিন্তু সি পি এম নেতাদের একমাত্র যোগসূত্র ইউরোপের ছোট্ট কম্যুনিস্ট দেশ রুমানিয়া। রুমানিয়া ওয়ার্কার্স পার্টির বৈঠকে যোগ দিতে জ্যোতি বসু কিছু দিন আগে সেখানে গিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ স্থাপনের আরো কিছু কিছু চেষ্টা এর আগে সি পি এম করেছে—যেমন কোরিয়া মারফৎ চীনের সংগে। কিন্তু সে-চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নি।

১৯৬২ সালে ভারত-চীন সংঘর্ষের সময় অনেক অন্তর্বিরোধ কাটিয়ে উঠে সি পি আই শেষ পর্যন্ত চীনের নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। তারপর থেকেই এই পার্টি চীনের বিষদৃষ্টিতে পড়ে। ১৯৬৪ সালে যখন সি পি আই সরকারীভাবে দু'ভাগ হল তখনও তার অন্যতম কারণ ছিল চীন সম্পর্কে পার্টির মনোভাব কী হবে সেই প্রশ্ন। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি তৈরি হওয়ার পর চীন এই নতুন দলকে সরকারীভাবে স্বীকৃতি দেয় নি। কিন্তু দুই পার্টির মধ্যে মার্কসবাদীদের প্রতিই যে চীনের পক্ষপাতিত্ব ছিল, এ-কথা সকলেই জানেন। অবিভক্ত পার্টির মধ্যে যাঁরা চীনাপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন তাঁরা সকলেই নতুন পার্টিতে যোগ দেন—যেমন, হরেকৃষ্ণ কোঙার, চারু মজুমদার, সুশীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত প্রভৃতি।

চীনের আক্রমণের পর বাম কম্যুনিস্টদের ধরপাকড় উপলক্ষ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দা যে "হোয়াইট পেপার" প্রকাশ করেছিলেন তাতে তো অভিযোগ করা হয়েছিল ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিতে চীনা লাইন আমদানির প্রধান ভার ছিল হরেকৃষ্ণবাবুর ওপর। ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বরে হানয়ে ভিয়েৎনাম পার্টির কংগ্রেসে যোগদানের পর তিনি নাকি গোপনে চীনেও গিয়েছিলেন।

সে যাই হোক, নতুন পার্টি তৈরি হওয়ার পর সি পি এম বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রশ্নে যে-মনোভাব গ্রহণ করে তাতে চীনের লাইনের প্রতিই পার্টির সহানুভূতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কম্যুনিস্ট আন্দোলনে ক্রুশ্চেভ যে লাইন আমদানি করেন তার সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে সি পি এম। শান্তির পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং পুঁজিবাদী ও কম্যুনিস্ট দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতার যে-নীতি ক্রুশ্চেভ চালু করেন, সি পি এম তার প্রত্যেকটির বিরুদ্ধতা করায় এই সব প্রশ্নে চীনের বক্তব্যের সংগে পার্টির বক্তব্য বেশ মিলে যায়। শুধু তাই নয়, চীন-সোভিয়েট বিরোধের ফলে কম্যুনিস্ট শিবির যে আজ দু'টুকরো হয়ে গেছে তার জন্যেও সি পি এম দায়ী করে সোভিয়েট রাশিয়াকেই।

কিন্তু চীনের প্রতি এই সহানুভূতি সত্ত্বেও ১৯৬৭ সালের পর থেকে সি পি এম ক্রমশঃ চীনের কাছ থেকে সরে আসে। এর সূত্রপাত অবশ্যই নকশালবাড়ি আন্দোলন ও সি পি আই (এম-এল) গঠন থেকে। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে সি পি এমেরই একাংশ যখন দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার সেই আন্দোলন দমনে সচেষ্ট হলেন তখনই চীন প্রকাশ্যে এসে দাঁড়াল নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতাদের সমর্থনে। ১৯৬৭ সালের ২৮ জুন পিকিং বেতার থেকে এই আন্দোলনকে "মাও সে তুঙের শিক্ষার আলোকে ভারতীয় জনগণের সমস্যা

বিপ্লবের সামনের থাবা" বলে অভিহিত করা হল। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে 'ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতের যন্ত্র' বলেও গাল দেওয়া হল। ঐ সময় পিপলস্ ডেইলির কয়েকটি মন্তব্যেও ফুটে উঠল একই সুর। যেহেতু সি পি এম ছিল ফ্রন্টের প্রধান শরিক তাই এই দলও প্রতিক্রিয়াশীলদের দালালের মার্কা পেয়ে গেল। তারপর তো ১৯৬৮ সালের ৭ অকটোবর পিকিং বেতার চারু মজুমদারের দলকেই ভারতের আসল কম্যুনিস্ট পার্টি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে দিলে।

এদিকে সি পি এমের নানা প্রস্তাবেও চীনের নীতির সমালোচনা স্পষ্ট হয়ে উঠল। ১৯৬৭ সালেরই আগস্টে মাদুরাইয়ে সি পি এমের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবেই প্রথম চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির বিভিন্ন নীতির নিন্দা করা হল। ভারতে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে দুই পার্টির মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা গেল। সি পি এম এ-কথা কিছুতেই মানতে রাজী হল না যে, ভারতের বর্তমান অবস্থা চীনের প্রাক-বিপ্লব অবস্থার অনুরূপ। ভারত সরকার যে সাম্রাজ্যবাদের দালাল এবং ভারতে বিপ্লবের রূপ হবে মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, এ-তত্ত্বও সি পি এম অগ্রাহ্য করল। সবচেয়ে বড় কথা, পার্লামেন্টারি পথে কোনো অগ্রগতিই সম্ভব নয় এবং সশস্ত্র বিপ্লবই একমাত্র পথ, সি পি এমের দৃষ্টিতে চীনের এই বক্তব্যও অসার মনে হল। ভারতের বিপ্লব হুবহু চীনের পথেই হবে, সি পি এম এই কথা মানতে পারল না। অর্থাৎ সংক্ষেপে, প্রধান প্রধান বিষয়ে এই পার্টি ও চীনের মধ্যে মতপার্থক্য ক্রমশঃ দুস্তর হয়ে দাঁড়াল।

*

তাই যদি হয় তবে চীন সম্পর্কে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির বর্তমান সতর্কতার কারণ কী? ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে চীনে এখন কি কোনো নতুন চিন্তা দেখা দিচ্ছে? নকশালপন্থী তথা সি পি আই (এম-এল) সম্পর্কে চীনের মোহভঙ্গের কোনো ইঙ্গিত কি পাওয়া যাচ্ছে? আর সেই ধরনের ইঙ্গিত কি সি পি এমের মনে চীন সম্পর্কে কোনো নতুন আশার সৃষ্টি করছে?

সত্যি কথা বলতে কি, চীনের কাছ থেকে এ-পর্যন্ত কোনো ইতিবাচক ইঙ্গিত পাওয়া যায় নি। অর্থাৎ চীন এখনও চারু মজুমদারের দলের কোনো প্রকাশ্য সমালোচনা করে নি। তবে কয়েকটি নেতিবাচক লক্ষণ থেকে অনেকে মনে করছেন যে, সি পি আই (এম-এল)-এর বর্তমান ক্রিয়াকলাপে হয়ত চীনের সমর্থন নেই। আর এ-কথা যাঁরা মনে করেন তাঁদের মধ্যে ঐ দলেরই অনেক শীর্ষস্থানীয় নেতাও আছেন। আর ঐ দলের মধ্যে বর্তমানে যে অন্তর্বিরোধ চলছে তার মূলেও রয়েছে এই বিষয়টিই।

গত বেশ কয়েক মাসের মধ্যে পিকিং বেতার থেকে প্রচারিত কোনো অনুষ্ঠানে সি পি আই (এম-এল)-এর কোনো কার্যকলাপের উল্লেখ করা হয় নি। অথচ তার আগে পিকিং বেতারের বিভিন্ন কথিকাতেই ভারতে বিপ্লবের অগ্রগতির আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ দলের কার্যাবলীর প্রশংসাসূচক উল্লেখ করা হত। নকশালবাড়ি আন্দোলন যখন সুরু হয় তখন তো পিকিং বেতার ও চীনের নানা পত্র-পত্রিকায় ঐ আন্দোলনের সুদীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল।

কিন্তু এই যে বীরভূমে এত বড় কান্ড হয়ে গেল, যেখানে নকশালপন্থীরা মুক্তরাজ কায়েম করেছে বলেও দাবি করা হল, সেই বীরভূম সম্পর্কে চীনের কোনো প্রচার-মাধ্যমেই কোনো উল্লেখ পাওয়া গেল না। তার চেয়েও বড় কথা, সম্প্রতি পিকিং রিভিউর একটি সংখ্যায় বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের অগ্রগতির যে-বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ভারতের বা সি পি আই (এম-এল) দলের সম্পর্কে কোনো কথাই বলা হয় নি। অথচ এর আগে, এই ধরনের যে-কোনো পর্যালোচনাতেই সি পি আই (এম-এল) সম্পর্কে উল্লেখ করা হত।

এই সব লক্ষণ দেখেই অনেকের মনেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে, চারু মজুমদারের দলের ক্রিয়াকলাপকে চীন হয়ত ভালো চোখে দেখছে না। বেশ কিছুদিন ধরেই এই দলের সংগ্রামের স্ট্র্যাটেজিতে যে-পরিবর্তন দেখা গেছে সেটা ঠিক মাওবাদী পথ বলা চলে না। মাওবাদের প্রধান কথা গ্রামের কৃষকদের সংগঠিত করে সশস্ত্র বিপ্লবের সূত্রপাত। কিন্তু ইদানীং সি পি আই (এম-এল) দলের অ্যাকশনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে শহর অঞ্চল। সেই দিক থেকে তাদের কাজকর্মে মাওবাদের চেয়ে ল্যাতিন আমেরিকার "শহুরে গেরিলাদের" পথের পরিচয়ই বেশি করে পাওয়া গেছে। অন্যান্য দেশে শহুরে গেরিলাদের কার্য-কলাপের নিন্দা করেছে চীন, কিন্তু এ-পর্যন্ত চারু মজুমদারের দল সম্পর্কে সরাসরি কোনো নিন্দাবাদ করে নি।

তবে ইদানীং পিকিং বেতারের নীরবতা থেকে দলের একাংশ, যাঁদের নেতা হলেন অসীম চ্যাটার্জি, এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, দলের বর্তমান নীতিতে চীনের কোনো আস্থা নেই। যেহেতু চারুবাবু এই নীতির জনক তাই তাঁরা চারুবাবুর বিরুদ্ধে একরকম বিদ্রোহ ঘোষণা করে দলকে সঠিক মাওবাদের পথে পরিচালিত করতে উদ্যোগী হয়েছেন। বীরভূমে অসীম চ্যাটার্জির নেতৃত্বে আন্দোলন সেই উদ্যোগেরই প্রকাশ। কিন্তু এই সঠিক মাওবাদী পথে প্রত্যাবর্তনও পিকিংয়ের আশীর্বাদ পেয়েছে, এমন প্রমাণ এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

• •

চীনের এই অস্পষ্ট মনোভাবই চীন সম্পর্কে সি পি এমের সতর্কতার কারণ। তাই নিকসনের পিকিং সফর সম্পর্কে পলিটব্যুরো যে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন তাতেও তাই সতর্কতার চিহ্ন ফুটে উঠল।

চীন-মার্কিন বোঝাপড়ার ফলে সমাজ-তান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষতি হতে পারে, এই আশঙ্কা প্রকাশ করা সত্ত্বেও কিন্তু পলিটব্যুরো চীনের নিন্দা করলেন না। বরং এ-কথাই বললেন যে, প্রেসিডেন্ট নিকসনের এই সফরের প্রস্তাব চীনের কাছে আমেরিকার পরাজয় স্বীকার ছাড়া কিছুই নয় এবং চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তিরই প্রমাণ। এর সঙ্গে তুলনা করুন রুশ-মার্কিন বোঝাপড়া সম্পর্কে সি পি এমের কঠোর সমালোচনার। রাশিয়া সম্পর্কে কটূক্তি করে সি পি এম বলেছিল, আধুনিক সংশোধনবাদীরা মুখে আমেরিকাকে "সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক শোষণকারী," "পৃথিবীতে প্রতিক্রিয়ার সবচেয়ে বড় ঘাঁটি" এবং "পৃথিবীর মানুষের প্রধান শত্রু" বলে গাল দেয়, কিন্তু কাজের বেলায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যেন তাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্ভব (মাদুরাই, ১৯৬৭, কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব)। চীন-মার্কিন বোঝাপড়ার সম্ভাবনা সংক্রান্ত এবারের প্রস্তাবে কিন্তু চীন সম্পর্কে এই ধরনের বক্রোক্তি নেই।

তা ছাড়া সি পি এম চীন-মার্কিন বোঝাপড়ার চেষ্টা থেকে ভারত সরকারকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণের আহ্বানও জানিয়েছে। চীনের কাছে মার্কিন পরাজয়ের পর ভারতের কী করা উচিত? উচিত চীনের প্রতি বন্ধুত্বের নীতি অনুসরণ করা। এখন ভারত সরকারের ঘুম থেকে ওঠা দরকার, বোঝা দরকার এতদিন চীন সম্পর্কে যে-নীতি অনুসৃত হয়ে এসেছে তা চূড়ান্ত ভুল নীতি। এখনও ভারত সরকারের সুযোগ আছে এই নীতি পরিবর্তন করে চীনের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার।

অর্থাৎ সি পি এমের বিচারে চীন-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্তমান অচলা-বস্থার জন্যে সব দায়িত্ব ভারত সরকারের এবং এ-বিষয়ে চীন সরকারের কিছু করার নেই। দু হাত না-হলে যেমন তালি বাজে না, তেমনই দু হাত না-হলে মিলনের সম্ভাবনাও থাকে না। সুতরাং চীনেরও ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে এগিয়ে আসা দরকার নয় কি? সি পি এম অবশ্য তেমন কোনো আহ্বান জানায় নি। সেই জন্যেই অনেকে মনে করছেন, এই ধরনের মনোভাব গ্রহণ করে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি চীনের সঙ্গে ভবিষ্যৎ যোগাযোগের একটা পথ খুলে রাখছে।

৩০।৭।৭১ —জেবকন্ঠ

দেশে বিদেশে

রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীসমর সেন ও পাকিস্থানী প্রতিনিধি আগা শাহীকে ডেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কি আলোচনা করেছিলেন, সেকথা সরকারীভাবে প্রকাশ করা হয়নি। স্বস্তি পরিষদের সভাপতিকে পত্র লিখে কি জানিয়েছেন তাও জানান হয়নি।

খবর ছিল যে, মহাসচিব মহাশয় নাকি রাষ্ট্রসংঘের স্বস্তি পরিষদের সদস্যদের প্রথমে একটি ঘরোয়া বৈঠকে এবং পরে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে ডাকার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। কারণ, বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পাছে লড়াই বেধে যায় সেজন্য তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং এই খবর অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, স্বস্তি পরিষদের ঘরোয়া বা আনুষ্ঠানিক কোন সভা ডাকারই প্রস্তাব উ থাণ্টের কাছ থেকে আসেনি।

কিন্তু, রাষ্ট্রসংঘের এই বিদায়ী মহাসচিব যে বাংলা দেশের সীমান্তের দুই পারে রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খাঁ, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ ও প্রেসিডেন্ট নিকসনের মতলব হাসিল করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন তাতে সন্দেহ নেই। রাষ্ট্রসংঘের এই পর্যবেক্ষকদলের নেতৃত্ব নিয়ে জন কেলি নামে রাষ্ট্রসংঘের একজন অফিসার আসছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

ভারত সরকার আগেই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন।

•

ক্রমেই এটা এখন পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে, জুলফিকার আলি ভুট্টো নন, তাঁর পিপলস্ পার্টিও নয়, খাঁ আবদুল কায়ুম খাঁ ও তাঁর অল পাকিস্তান মুসলিম লীগই এখন ইসলামাবাদের জঙ্গী শাসকদের নয়নের মণি। ইয়াহিয়া খাঁ যদি কখনও রাজনৈতিক ক্ষমতার ছিটেফোঁটাও হস্তান্তর করার কথা ভাবেন তাহলে এই কায়ুম খাঁর কথাই তাঁর আগে মনে হবে।

পাকিস্তানের শাসকরা বিচ্ছিন্নতাবাদের দাওয়াই হিসাবে প্রথমে তিনটি মুসলিম লীগকে এক করে কায়েদে আজম জিন্নার পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করার মতলব করেন। "পাকিস্তান টাইমস্"-এর সম্পাদক জেড এ সুলেরিকে দিয়ে এই নীতির স্বপক্ষে জোর প্রচার চালান হয়। তিনি তাঁর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ক্রমাগত এই পার্টির গৌরবময় অতীত ও তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা মনে করিয়ে দেন।

অবশেষে, গত ১৪ জুলাই তারিখে কাউন্সিল মুসলিম লীগের মিঞা মমতাজ দৌলতানা ও কনভেনশন মুসলিম লীগের ফজলুল কাদের চৌধুরী ঘোষণা করেন যে, তাঁরা দুই লীগকে এক করার সিদ্ধান্ত করেছেন এবং খাঁ আবদুল কায়ুম খাঁ অল-পাকিস্তান মুসলিম লীগকে তাঁদের সংগে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

এই ঘোষণার পরই পাকিস্তান টাইমস্ তিন লীগকে এক করার ওকালতি ছেড়ে কায়ুম খাঁর গুণকীর্তন আরম্ভ করে দেয়। কায়ুম খাঁ না এলে তো রাম ছাড়া রামায়ণ লেখার সামিল হবে, এই হল পাকিস্তান টাইমস্-এর মন্তব্য। পত্রিকাটি তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, "সব নেতার মধ্যে তিনিই নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফল দেখাবার মতো লড়াকু মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন এবং কোনরকম আপোষ রফা না করে পাকিস্তানের মতাদর্শ আঁকড়ে ধরে রাখার সৎ সাহস দেখিয়েছেন।" মুসলিম লীগের ভবিষ্যৎ আলোচনা করে সুলেরি সাহেব সম্প্রতি বলেছেন, "(লীগের) উজ্জ্বলতম ভবিষ্যৎ সম্ভবত কায়ুম খাঁর উপরই নির্ভর করে।"

পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কায়ুমের চেয়ে যোগ্যতর স্যাঙ্গাৎ সে দেশের শাসকদের পক্ষে খুঁজে বার করা কঠিন। ধর্মনিরপেক্ষতার ধার তিনি ধারেন না, কট্টর ইসলামপসন্দ দল তাঁর, ভুট্টোর মতো সমাজতন্ত্রের বুলিও তিনি কপচান না।

•

আগামী ২২ আগস্ট তামিলনাড়ুর কৃষ্ণগিরি নির্বাচনকেন্দ্রে একটি উপনির্বাচন হওয়ার কথা আছে। এই উপনির্বাচনে অন্যতম প্রার্থী হচ্ছেন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ও পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম। যদিও তিনি শাসক কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী হিসাবেই এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন 'তা' হলেও তাঁকে নির্ভর করতে হবে ডি এম কে দলের সমর্থনের উপর। এখন পর্যন্ত ঠিক আছে, ডি এম কে এই উপনির্বাচনে কোন প্রার্থী দেবে না, শ্রীসুব্রহ্মণ্যম্ যাতে জয়ী হন সেজন্যই তারা চেষ্টা করবে।

কিন্তু এই সমর্থনের জন্য ডি এম কে দল শাসক কংগ্রেসের কাছ থেকে একটা মূল্য আদায় করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সেই মূল্যটা হচ্ছে এই যে, কাবেরী নদীর জল ভাগ করার প্রশ্ন নিয়ে তামিলনাড়ুর সংগে (এবং কেরলের সংগে) মহীশূরের যে বিরোধ আছে সেই বিরোধ ফয়শালার জন্য ট্রাইবুন্যাল বসাতে হবে।

এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে ডি এম কে-র এই দাবী মেনে নেওয়া খুবই কঠিন। কেননা, কাবেরীর জলের উপর দাবীতে যেমন তামিলনাড়ুর সব দলই ডি এম কে-র পিছনে সামিল হয়েছে তেমনি মহীশূরের মানুষও তাদের দাবীতে অটল। তামিলনাড়ুর দাবী মিটিয়ে দিলে শাসক কংগ্রেসের পক্ষে কৃষ্ণগিরিতে সুবিধা হতে পারে এবং বেচারা শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের জন্য দিল্লিতে একটা আসন জুটিয়ে দেওয়া সম্ভব হতে পারে। কিন্তু মহীশূরে এর ধাক্কা শাসক কংগ্রেস কি করে সামলাবে? সেখানেও তো নির্বাচন আসছে।

কাবেরীর জল সত্যিই শাসক কংগ্রেসকে উভয় সঙ্কটে ফেলেছে।

এই জল নিয়ে দক্ষিণের তিনটি প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে বিরোধের ইতিহাস দীর্ঘ ও জটিল। পৃথিবীর যেসব নদীর জল মানুষের প্রয়োজনে সবচেয়ে ভালভাবে কাজে লাগান হয়েছে কাবেরী তাদের মধ্যে অন্যতম। একটি হিসাবে প্রকাশ যে, শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ জলই ব্যবহার করা হয় প্রায় দশ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে সেচ দিতে। বহু প্রাচীন কাল থেকেই দাক্ষিণাত্যের রাজা-রাজড়ারা কাবেরী নদীর জল আটকে খালের সাহায্যে মাঠে-মাঠে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। পাথরে তৈরি একটি বাঁধ ১৬০০ বছরেরও অধিক কাল যাবৎ এই অঞ্চলে সেচের জল যুগিয়ে এসেছে ও বন্যা প্রতিরোধ করেছে। ইদানীংকালে তামিলনাড়ুর তাঞ্জোরের জেলা যে প্রচুর ধানের ফলনের জন্য খ্যাতি লাভ করেছে সেই ফলন কাবেরীর জল ছাড়া সম্ভব হত না।

ভারতবর্ষের পূর্ববাহিনী নদীগুলির মধ্যে চতুর্থ বৃহত্তম এই নদী আজ আন্তরাজ্য বিরোধের বিষয়ে পরিণত হলেও ভারতের ঐক্য কল্পনায় কাবেরীর একটা বৃহৎ স্থান রয়েছে। ভারতীয় হিন্দুর প্রার্থনাবাক্যে আছে :

"গঙ্গে চৈব যমুনে চৈব গোদে চৈব
সরস্বতী
নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলে
অস্মিন্ সন্নিধিং কুরু"

অর্থাৎ যে সাতটি নদীকে ভারতের পবিত্রতম নদীরূপে গণ্য করা হয় সেগুলির মধ্যে একটি হল কাবেরী। এক অর্থে কাবেরী গঙ্গার চেয়েও পবিত্র নদীরূপে গণ্য হয়। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গায় অবগাহন করে শুদ্ধ হয় পাপী মানুষ আর গঙ্গা নাকি শুদ্ধ হয় বৎসরান্তে একবার পাতালপথে কাবেরীর সঙ্গে মিলিত হয়ে। এই হচ্ছে প্রচলিত বিশ্বাস। কাবেরীর আর এক নাম দক্ষিণ গঙ্গা।

কাবেরীর জলরাশিকে মানুষের কাজে লাগাবার বিপুল সম্ভাবনার কথা আধুনিক কালে যাঁদের মাথায় এসেছিল, তাঁদের একজন হলেন এম বিশ্বেশ্বরায়া। তিনি তখন মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান। তিনি কাবেরীর উপর বাঁধ পরিকল্পনা করলেন। এই নিয়ে মহীশূরের সঙ্গে বিরোধ বাধল পার্শ্ববর্তী বৃটিশ প্রদেশ মাদ্রাজের। মাদ্রাজের আশংকা, নদীর উজান থেকে মহীশূর যদি জল টেনে নিয়ে যায়, তাহলে ভাটিতে মাদ্রাজের কপাল পুড়বে। ১৯২৪ সালে মাদ্রাজ ও মহীশূরের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হল তাতে স্থির হল যে, মাদ্রাজ মহীশূরকে বাঁধ বাঁধতে দেবে (পরবর্তীকালে যার নাম হল কৃষ্ণরাজ সাগর বাঁধ), মাদ্রাজও মেট্টুরে বাঁধ তৈরি করতে পারবে। আরও স্থির হল যে, কৃষ্ণরাজসাগর বাঁধটি পরিচালনা করা হবে কতকগুলি বাঁধাধরা বিধি-নির্দেশ অনুসারে। মাদ্রাজে কাবেরী নদীর বদ্বীপ অঞ্চলের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জল ছেড়ে দিতে মহীশূর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকল।

তামিলনাড়ু ও কেরলের অভিযোগ, মহীশূর কাবেরী অববাহিকার জন্য নূতন কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে ১৯২৪ সালের সেই চুক্তির শর্ত খেলাপ করেছে। মহীশূরেরও পাল্টা অভিযোগ আছে।

কৃষ্ণরাজ সাগর বাঁধের উজানে কাবেরীর অন্যতম উপনদী হেমবতীর উপর একটি বাঁধ নির্মাণের জন্য মহীশূর যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা নিয়ে তামিলনাড়ুর সঙ্গে তার বিরোধ চলছে ১৯৬৬ সালের জুন মাস থেকে। মহীশূর সরকার বলছেন, ১৯৬৮ সালের আগস্ট মাসে সেচ ও বিদ্যুৎ বিভাগের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক আন্তঃরাজ্য বৈঠকেই এই বিষয়ে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। তামিলনাড়ু সরকার একথা স্বীকার করেন না।

হরঙ্গী নদীর উপর বাঁধ নির্মাণের জন্য মহীশূর সরকার যে পরিকল্পনা করেছে সেটি নিয়েও মহীশূরের সঙ্গে তামিলনাড়ুর বিরোধ আছে। বিরোধটি আরও জটিল। কেননা, এই বাঁধটি যেখানে তৈরি হওয়ার কথা আছে সে জায়গাটা আগেকার কুর্গ অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। কুর্গ রাজ্য মহীশূরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর এখন সেই জায়গাটা মহীশূরের। কিন্তু যেহেতু ১৯২৪ সালের চুক্তি যখন হয়েছিল তখন কুর্গ মহীশূরে ছিল না সেহেতু সঠিক ভাবে বলতে গেলে হরঙ্গী বাঁধের পরিকল্পনা এ চুক্তির আওতায় আসে না।

কেরলের সঙ্গে মহীশূরের বিরোধ কাবেরীর আর একটি উপনদী কাবিনি নিয়ে। এই কাবিনি নদীর উপর জলাধার তৈরির একটা পরিকল্পনা মহীশূর হাতে নিয়েছে। এই জলাধার তৈরি হলে কেরলের প্রায় ২৫০ একর জমি ডুবে যাবে। রাজ্যগুলির সীমানা পুনর্বিন্যাস এক্ষেত্রেও জটিলতার সৃষ্টি করেছে। কেননা, ১৯২৪ সালের চুক্তি যখন হয় তখন ঐ এলাকা মাদ্রাজের অন্তর্ভুক্ত থাকলেও আজ সেটা কেরলের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু কেরল ১৯২৪ সালের চুক্তির শরিক নেই। মহীশূরের আর একটি যুক্তি এই যে, তামিলনাড়ু যে ভবানী জলাধার পরিকল্পনা করেছে তার ক্ষতিপূরণ হিসাবেই মহীশূর চুক্তি অনুযায়ীই কাবিনি পরিকল্পনা করার অধিকারী।

মহীশূরের সুবর্ণবতী পরিকল্পনা সম্পর্কেও তামিলনাড়ুর আপত্তি আছে। মহীশূরের বক্তব্য, এটা হচ্ছে তামিলনাড়ুর অমরাবতী পরিকল্পনার ক্ষতিপূরণ।

তামিলনাড়ুর কয়েকটি সেচ পরিকল্পনা সম্পর্কেও মহীশূরের পাল্টা অভিযোগ আছে।

১৯৭০ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে সংশ্লিষ্ট তিনটি রাজ্যের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রথমে সরকারী অফিসার স্তরে এবং পরে মন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনা হয়। এইসব আলোচনার শেষে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ভারত সরকারের কাছে প্রস্তাব দেন যে, ১৯৫৬ সালের আন্তঃরাজ্য জলবিরোধ আইন অনুযায়ী এই বিরোধ ফয়শালার জন্য একটি ট্রাইবুন্যালে পাঠান হোক। কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী ডাঃ কে এল রাও মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন, পরিকল্পনা কমিশন যেসব প্রকল্প মঞ্জুর করেনি সেগুলির কাজ যেন তাঁরা বিরোধ নিষ্পত্তির আলোচনাসাপেক্ষে স্থগিত রাখেন। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে মহীশূরের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন্দ্র পাতিল বলেন যে, তাঁদের কোন প্রকল্প তাঁরা স্থগিত রাখার কথা চিন্তা করছেন না। তিনি আরও বলেন যে, কেন্দ্রীয় সাহায্য না পাওয়া গেলেও তাঁরা প্রকল্পগুলির কাজ চালিয়ে যাবেন। মহীশূর সরকার ঐসব প্রকল্প বাবদ দশ কোটি টাকার বেশী ইতিমধ্যেই খরচ করে ফেলেছেন।

ভারত সরকার কাবেরী বিরোধ ট্রাইব্যুনালে দিতে চান না, তাঁরা সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মধ্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা এই বিরোধের মীমাংসা করতে চান। মহীশূরের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর বলেছেন,

বিষয়টি ট্রাইব্যুন্যালে দেওয়ার প্রস্তাব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নির্বাচিত সরকার। রাষ্ট্রপতির শাসনের পরিচালক হিসাবে তিনি এই প্রস্তাবে রাজী হতে পারেন না। এদিকে, তামিলনাড়ু বিধান সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে ট্রাইব্যুন্যালের দাবী জানান হয়েছে এবং এই দাবী মেনে নেওয়া না হ'লে কৃষ্ণগিরিতে শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের মুশকিল হবে বলেও আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় এইটুকু কবুল করেছেন যে, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে এই বিরোধের ফয়সালা করা না গেলে ট্রাই-ব্যুন্যালই বসবে। আলাপ-আলোচনার দ্বারা নিষ্পত্তির আশায় কতদিন অপেক্ষা করা হবে সেটা অবশ্য তিনি খুলে বলেন নি।

●

সুদানের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল নিমিরি তাঁর বিরুদ্ধে ব্যর্থ বিদ্রোহ দমন করার পর ঐ বিদ্রোহের যেসব নেতাকে ফায়ারিং স্কোয়াড দিয়ে গুলি করে অথবা ফাঁসকাঠে ঝুলিয়ে হত্যা করেছেন তাঁদের একজন হলেন আব্দুল খালেক মাহজুব। তিনি ছিলেন সুদানের কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক। গত ২৬ জুলাই তারিখে ওমদুরমান শহরের একটি ছুতারের বাড়ী থেকে জেনারেল নিমিরির অনুগত সৈনিকরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। খার্তুম শহরের উপকণ্ঠে একটি মিলিটারি ব্যারাকে সংক্ষিপ্ত "বিচারের" পর ঐ শহরেরই কোবার জেলে ৪৪ বছর বয়স্ক এই কম্যুনিস্ট নেতাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। এই বিচারের সময় কিছু সাংবাদিককে উপস্থিত থাকতে দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা এই বেঁটেখাট কম্যুনিস্ট নেতাকে সামরিক আদালতে জবানবন্দী দেওয়ার সময় টেলিভিসনের কড়া আলোর সামনে দাঁড়িয়ে ঘামতে দেখেছিলেন।

সুদানই আফ্রিকার একমাত্র দেশ যেখানে একটি সুসংগঠিত কম্যুনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছে। আর সেখানে যাঁরা ঐ পার্টি গড়ে তোলেন তাঁদেরই একজন ছিলেন এই আব্দুল খালেক মাহজুব।

মাহজুব কায়রোতে পড়াশুনা করতে গিয়ে কম্যুনিস্ট হয়ে দেশে ফিরে আসেন ১৯৫৪ সালে। সেই সময়েই স্থাপিত হয় সুদানের কম্যুনিস্ট পার্টি। কয়েক বছরের মধ্যে এই পার্টির জোরদার শ্রমিক, ছাত্র, যুব ও নারী সংগঠন গড়ে ওঠে। খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেও এই পার্টি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ১৯৬৪ সালের নির্বাচনে কম্যুনিস্টরা গ্র্যাজুয়েটদের ১৫টি আসনের মধ্যে ১১টিতে জিতে যান। ১৯৬৬ সালে পার্টি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

১৯৬৯ সালের মে মাসে জেনারেল নিমিরির অধীনে একদল সামরিক অফিসার সুদানে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পর কিছুদিন সুদানের কম্যুনিস্ট পার্টি খুবই আধিপত্য লাভ করে। কিন্তু বৈষয়িক নীতি ও সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে জেনারেল নিমিরির সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির ব্যবধান ক্রমেই বাড়তে থাকে। মাহজুবকে কারারুদ্ধ করা হয়। কিন্তু তিনি জেল থেকে পালিয়ে যান। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কারারক্ষকও উধাও হয়ে যান।

গত ১৯ জুলাই জেনারেল নিমিরির বিরুদ্ধে যে সামরিক অভ্যুত্থান হয় তাতে অন্যান্যদের সঙ্গে মাহজুবও নেতৃত্ব করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

৩০-৭-৭১ —পৃথ্বীরাজ

শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় কলকাতার পথে। ২৫শে জ্বলাই ১৯৪১ খৃঃ

স্বর্গত শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে একদা সাহস ক'রে একখানি চিঠি লিখেছিলুম, তার বক্তব্য ছিল মোটামুটি এইঃ দেশের সবাই বলে কবিগুরু, বিশ্বকবি, কবীন্দ্র, কবিকুলচূড়ামণি, কবিসম্রাট ইত্যাদি। কিন্তু বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, সেক্‌সপীয়র—এ'রা যদি 'মহাকবি' বলে বর্ণিত হন, রবীন্দ্রনাথ কেন হবেন না।

'প্রবাসী'র সম্পাদক রামানন্দবাবু ছিলেন অতিশয় রাশ-ভারী ব্যক্তি, তাঁর কাছাকাছি পৌঁছতে তৎকালে চট্ করে কেউ সাহস পেত না। সমগ্র সাংবাদিক জগৎ তাঁকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখত, এবং সম্পাদক মহলে তাঁর মতো মনীষী সংখ্যায় খুবই কম ছিলেন।

চিঠিখানা পাঠিয়ে একান্ত উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছিলুম—যদি বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেড়ে! যদি এক লাইন জবাব আসে।

এর মধ্যে সামান্য একটু কথা আছে। ১৯২৪ খৃস্টাব্দে অত্যন্ত তরুণ বয়সে সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা' বার করেছিলুম। সেই একই সময়ে প্রবাসীর বিজ্ঞাপন বিভাগে অন্য একজন ব্যক্তির সাহায্যে কিছু কাজ করে দিতুম। রামানন্দবাবুর তৎকালীন সহ-সম্পাদক যিনি, তাঁর নাম ছিল এডভোকেট অশ্বিনীকুমার ঘোষ। আবার এই অশ্বিনীবাবুই ছিলেন আমার 'বিচিত্রা'র সম্পাদক। আমাদের পীড়াপীড়ি দেখে রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্রা'র জন্য একটি কবিতা (না, গান নয়) দিলেন। সেটি হল, 'আনমনা গো আনমনা, তোমার কাছে আমার বাণীর গাঁথনখানি আনব না—' ইত্যাদি।

রামানন্দবাবু পরের মাসের 'প্রবাসী'তে এই কবিতাটি 'সংকলন' অংশে ছেপে দিলেন। 'বিচিত্রা' প্রবাসী প্রেসেই ছাপা হত। এই 'বিচিত্রা'রই কয়েক মাস আগে ডাঃ সুন্দরীমোহন দাশের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযোগানন্দ দাশ ও রামানন্দবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়—এ'রা দুজন বার করেন সাপ্তাহিক 'শনি-বারের চিঠি'—যেটি ছোট একখানা খামে মুড়ে তখন বিক্রি হত চার পয়সায়!

যাই হোক, আমার পয়েন্ট আমি কিন্তু ভুলি নি!

'প্রবাসী'র প্রায়-নিয়মিত লেখক হিসেবে রামানন্দবাবু আমাকে জানলেও চিঠির জবাব কিন্তু এল না। ঠিক মনে নেই,

এর মাস দুই কালের মধ্যে যখন দেখলুম, সম্পাদকীয় 'বিবিধ প্রসঙ্গে' মহাকবি শব্দটি রবীন্দ্রনাথের নামের আগে ছাপা হয়েছে, সেদিন বড়ই আনন্দ পেয়েছিলুম।

সেই মহাকবির মৃত্যু আসন্ন।

১০ শ্রাবণ থেকেই কলকাতায় গুমোট চলছে। হাওয়া নেই, রোদ নেই, বৃষ্টি নেই। সমস্ত আকাশে নিশ্চল মেঘরাশি—যেন সমগ্র বিশ্বের মহাশ্মশানের ভস্মরাশির মতো। ওরে কবি, 'এ বিশ্বের মৃত্যুর নিঃশ্বাস, আপন বাঁশীতে ভরি গানে তারে বাঁচাইতে চাস?' জীবনের শ্রেষ্ঠ গান,—গীতবিতান,—এবার বুঝি চিরকালের মতো স্তব্ধ হতে চলল। গত তিন-চার দিন ধরে ডাক্তারদের বুলেটিন একটির-পর-একটি প্রকাশ করা হচ্ছিল। কবির অবস্থা উদ্বেগজনক। ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং শল্যচিকিৎসক ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—এ'রা সর্বদাই কবির প্রতি লক্ষ্য রাখছেন।

তিরিশ বছর আগেকার ইতিবৃত্ত আজ তুলে ধরছি। অনেক ছোট-ছোট ঘটনা ও তার টুকিটাকি মন থেকে হারিয়ে গেছে। তবু বলছি এই কারণে যে, সর্বাধুনিক কালের ছেলে-মেয়েরা সেদিনের ছবিটি একবারটি দেখেই নিক না কেন?

তখন আমি 'যুগান্তরের' অন্যতম সহযোগী সম্পাদক, এবং বাংলা দৈনিকের পক্ষে সেই প্রথম রবিবারের 'সাময়িকী'র বিভাগ আমার হাতে। এই সূত্রে তখন মহাকবির কাছ থেকে ছিটে-ফোঁটা একটু-আধটু লেখাও আদায় করে নিতুম। 'যুগান্তরের' জন্মকাল থেকেই আমি তার সঙ্গে যুক্ত।

সে যাই হোক, দৈনিক কাগজ মানেই রাজনৈতিক কাগজ। সুতরাং তখনকার রাজনৈতিক ভারতের চেহারাও এই সূত্রে একটু বলা দরকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে তখন প্রায় দু বছর। হিটলারের রকেট-বোমায় লন্ডন তখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে। চরম বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে ফাসিস্তরা সোভিয়েট ইউনিয়নকে আক্রমণ করেছে মাত্র দেড় মাস আগে। ইউরোপের একেকটি রাজ্য হিটলারের আঘাতে তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়েছে। জাপান প্রায়ই আমেরিকাকে হুমকী দিচ্ছে। চারিদিকে একটা অনিশ্চয়তা। এদিকে প্রায় সাত মাস আগে সুভাষচন্দ্র সংগোপনে ভারত ত্যাগ করে গেছেন, এবং তিনি এখন কোথায় কেউ জানে না! গান্ধীজীর সঙ্গে ভারতের বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর বাক-বিচ্ছেদ ঘটেছে। তখন চলছে গান্ধীজীর পরিচালিত ব্যক্তিগত 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন। সেই প্রথম দেশের লোক শুনলো একটি নাম, বিনোবা ভাবে। ওটা ছিল এখনকার মতো অনেকটা 'পিংপং' রাজনীতি এবং 'ডিংডং' যুদ্ধের মতো। গান্ধীজীর এ-ব্যাপারটায় কারও বিশেষ সমর্থন নেই। নেহরু-প্যাটেলাদি তখন কারাগারে বন্দী। কংগ্রেস তখন মৃত, তার সভাপতি আবুল কালাম আজাদ নামেই আছেন শুধু। জিন্না তখনও পাকিস্তান সৃষ্টির হুজুগ নিয়ে হৈ-চৈ সৃষ্টি করেন নি। বৃটিশ গভর্নমেন্ট তাঁদের ঘোরতর বিপদের কালেও ভারতে জাঁতা হয়ে বসে ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। সুতরাং তখনকার ভারতের আকাশ অমানিশায় ঘনঘোর। এই সময় মহাকবির জীবন-কালের সর্বশেষ বৈশাখের প্রথম দিনে বৃটিশরাজ তথা ইংরেজের বিরুদ্ধে এই অশীতিপর বৃদ্ধের সর্বশেষ ধিক্কার তাঁর কম্বুকণ্ঠের বজ্র-বিঘোষণে উচ্চারিত হল একটি প্রবন্ধে। সেটির নাম 'সভ্যতার সংকট'। এই প্রবন্ধে মহাকবির একটি অমোঘ ভবিষ্যৎ বাণীর সংকেত প্রকাশ পেয়েছিল, ইংরেজ ভারতকে ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে! আমরা ক্ষুদ্রপ্রাণ, তাঁর কথাটা শুনতে ভাল লেগেছিল, কিন্তু কথাটায় তেমন আমল দিই নি। তাঁর মৃত্যুর ৬ বছর ১ সপ্তাহকাল পরে উপমহাদেশ ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছিল!

পরম্পরায় খবর পাওয়া গেল, মহাকবিকে ৯ শ্রাবণ তারিখে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শান্তিনিকেতন থেকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এনে তাঁর কিডনিতে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। সেটি বোধহয় ১৩ শ্রাবণ। যিনি এই কাজ করেছেন তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শল্য-চিকিৎসক ডাঃ ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাঃ নীলরতন ও ডাঃ বিধান-চন্দ্র সর্বদা কবির প্রতি যত্নবান ছিলেন। এই অস্ত্রোপচারের পর মহাকবি কতকটা সুস্থ হয়ে শুয়ে-শুয়ে কবিতা লিখিয়েছেন, (১৪ শ্রাবণ) গান গাইবার ফরমাস করেছেন, ডাঃ রায়ের সঙ্গে ব্যঙ্গ-কৌতুক করেছেন, সুভাষচন্দ্রের খবর কিছু পাওয়া গেল কিনা শুনতে চেয়েছেন, এবং তাঁর শেষ কবিতার বইটির কি নাম হবে তাও আলোচনা করেছেন। এর কিছুদিন আগে তিনি 'সম্মুখে শান্তি পারাবার ভাসাও তরণী হে কর্ণধার—' কবিতাটিও লিখিয়ে-ছেন,—যার একটি ছত্রের সর্বশেষ অসম্পূর্ণ অক্ষরটি তাঁর মৃত্যুর পরে বসিয়ে দিয়েছিলেন অধুনা পণ্ডিচেরীবাসী শ্রীযুক্ত নলিনী-কান্ত সরকার মহাশয়। মহাকবি তাঁর সর্বশেষ ছোট কবিতাটির নাম 'মৃত্যু'—এই শিরোনামা নিজে দিয়েছিলেন কিনা আমার জানা নেই।

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কেন তাঁকে বেশ কিছুদিন আগে আনা হয় নি, তাঁর রোগনির্ণয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগ ছিল কিনা, তাঁকে কলকাতায় আনার প্রাক্কালে নানা জল্পনা ও জটিলতার দরুণ অশান্তি দেখা দিয়েছিল কিনা,—এ নিয়ে কিছু কিছু গুজব শোনা যাচ্ছিল। অবশ্য জগৎসভার সর্বত্র তখন এটি প্রচারিত যে, রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহাশয় পীড়িত। কিন্তু অন্দর মহলের একটিই ত সংবাদ—'বুড়োকর্তা ভুগছে খুব!'

যাই হোক, ১৬ শ্রাবণ থেকে মহাকবির অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটতে থাকে এবং তখন থেকে কবির অবস্থা রেডিও কর্তৃপক্ষ যখন-তখন ঘোষণা করছেন, এবং ডাঃ রায় ও ললিত ব্যানার্জি স্বাক্ষরিত বুলেটিনও বের হচ্ছে। কিন্তু ২০ শ্রাবণ তারিখে ভারতবাসীর মন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল, এবং পৃথিবীর নানা দেশ থেকে উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রপ্রধানগণ ও মনীষীরা কবির খবর নিতে লাগলেন। আমেরিকা তখন অনেক দূরে, বিশ্বযুদ্ধেও সে তখন জড়িত নয়, এবং আমাদের পৃথিবীর বাইরে। সুতরাং সে-দেশের উদ্বেগ আমাদের কাছে ছিল একটা থ্রিল! বাংলাদেশে সেদিন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নেতা কেউ নেই, ফলে রাজনৈতিক বাংলা তখন ধুঁকছে। বাংলার কংগ্রেস মৃত ও নির্জীব এবং এক মহিলার আঁচল-ধরা। একমাত্র এম এন রায় মহাশয় তখন অনেকটা মিত্রশক্তির পক্ষে বাঙলার আসরে নেমেছেন।

২১ শ্রাবণ মহাকবির অন্তিম অবস্থা দেখা দিল। রাত্রের দিকে তাঁর দেহের আভ্যন্তরীণ কলকব্জা সব আলগা হয়ে এল, এবং মধ্যরাত্রে ঝুলন পূর্ণিমার কালে অনেকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এসে জড়ো হলেন। সেদিন দুবার বুলেটিন বেরিয়ে ছিল, এবং সংবাদপত্রগুলির আপিসে 'অবিচুয়ারী' রচনাগুলি চুপি-চুপি সাজানো হচ্ছিল। না, আর কিছু করার নেই। সমগ্র বাঙালী জাতি আর যেন আজকের দিনটিতে কোনও কাজ খুঁজে পাচ্ছে না! অনেকের বাড়ীতে রান্নাবান্না বন্ধ,—ওই ছ' আনা সেরের গঙ্গার ইলিশ আর এক পাকের খিচুড়ি! তখন ঘরে-ঘরে রেডিয়ো হয়নি। ট্রানজিস্টার তখন স্বপ্নবৎ। সংবাদপত্রের বিক্রি শুধু কিছু বেড়েছে যুদ্ধের খবরের জন্য। কলকাতার ট্রাম-বাসে তখন ভিড় বলতে কিছু নেই। অনেক ডেলি-প্যাসেঞ্জার সেদিন মহাকবির শেষ সংবাদ শোনার জন্য বাড়ী ফেরে নি।

আজ ২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮। ইং ৭ আগস্ট ১৯৪১। ঝুলন পূর্ণিমা থাকবে সকাল ১১-৩৮ মিঃ পর্যন্ত। অন্তিমকালের রোগীদের পক্ষে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা নাকি ভাল নয়! কেননা প্রতিপদে ওলটালেই টাল আসে। ঠিক এক বছর আগে এই ৭ আগস্ট তারিখে ভারতের চীফ জাস্টিস স্যার মরিস গয়ার দিল্লী থেকে কলকাতা হয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়ে মহাকবিকে অক্সফোর্ডের ডকটরেট উপাধিতে ভূষিত করে যান। এ সম্মান সেদিন অন্য কারও পক্ষে পাওয়া সম্ভব ছিল না।

আমার ঘুম ভেঙেছিল তখন রাত চারটে। আর-জি-কর হাসপাতালের পাশের গলিতে থাকি। দিন-তিনেক থেকে আমি অসুস্থ ছিলুম। কিন্তু সেই উষাকালে কোনও দিকে না তাকিয়ে শ্যামবাজার হাতীবাগান শোভাবাজার মানিকতলা জেলে-টোলা সিংহীবাগান ও কাঁসারীপাড়া ছাড়িয়ে চাষাধোপাপাড়ার পাশ কাটিয়ে নতুনবাজার ও কোম্পানীবাগান একে-একে পেরিয়ে যখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এসে পেঁছিলুম, তখন ভোর পাঁচটা। তখনও লোক চলাচল হয়নি, জনসাধারণকে দেখা যাচ্ছে না, ট্রাম চলছে না তখনও চিৎপুর রোডে। তেমনি গুমোট, আকাশ তেমনি ধূসর, হাওয়া নেই কলকাতায়। মহাকাল যেন রুদ্ধশ্বাসে চরম লগ্নের বীজমন্ত্র জপ করছেন। সোজা ভিতরে ঢুকে কোল্যাপ-সিবল্ গেট ছেড়ে বাঁহাতি সরু সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেলুম। ছোট সাঁকো পেরিয়ে এলুম এ-বাড়ীর বারান্দায়—চিৎপুর রোডে দাঁড়ালে সোজা পূব দিকে যে-বারান্দা দেখা যায় সেইটি। পাশে দু-একখানা ঘরে দুই-একজন-তিনজন অপরিচিত লোক। হলঘরখানায় বিশেষ কারোকে দেখছিনে। চাকর-বাকর ঘুরছে এক-আধ-জন আশে-পাশে। কেউ চেনে না আমাকে, আমি চিনিনে কারোকে। বোধহয় সেই প্রভাতে প্রথম বাইরের লোক! বারান্দা ধরে পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলুম সেই দক্ষিণ প্রান্তের ঘরটির সামনে,—পাশেই নীচে নামবার পুরনো কাঠের সিঁড়ি, রেলিংও কাঠের। প্রশস্ত সেই সিঁড়ির মাথার উপরে নকসাকাটা সিলিংয়ের উপর দোছত্রীর বারান্দা। আগাগোড়া সবটাই বোধ করি মহর্ষির আমলের।

ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালুম। মহাকবি শায়িত রয়েছেন একখানা খাটে। তাঁর মাথা পূর্বদিকে, পা দুখানি পশ্চিমে,—যেদিকে গঙ্গা। কবি বলতেন, তিনি গাঙ্গেয়! তিনি তখনও জীবিত, নিদ্রায় নিলীন। নিদ্রা ঠিক নয়, যোগতন্দ্রায় নিমীলিত নেত্র। শায়িত অবস্থায় আগে তাঁকে দেখিনি, এই প্রথম দেখছি। তিনি একালে ঈষৎ ঝুঁকে হাঁটতেন, সেজন্য তাঁর ঋজু দেহের সঠিক পরিমাপ করা যেত না আজ শায়িত অবস্থায় এ যেন দেখছি বিরাট এক পুরুষ, যেন সেই গোদাবরী তীরের বিশাল শাল-প্রাংশু, যেন ভারতের মহাপ্রাচীন সভ্যতার সর্বশেষ আর্যঋষি!

মকাকবি তখনও জীবিত। ঘরের মধ্যে প্রথম জন দুই মহিলা ছিলেন, এখন হলেন চারজন। কিন্তু আমি তখনও কাঠের পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে। আমি দেখছিলুম তাঁর সাংঘাতিক চওড়া হাতের কব্জি আর পায়ের গোছের গড়ন,—ধব-ধব করছে এখনও গৌরবর্ণ। বুকের ছাতি এপার থেকে ওপার পর্যন্ত অনেক দূর। মাথাভরা শাদা চুল, একটু-একটু টাক পড়েছে মাঝে-মাঝে। ললাট যেন কৈলাসের চূড়া! দু হাতের বড়-বড় আঙুলগুলোকে দেখলে পুরানের ময়দানবকে মনে পড়ে। কিন্তু সেই আঙুলগুলির বর্ণ যেন কনকচাঁপার। এই আঙুলের সৃষ্টি শান্তিনিকেতন।

একদা মনুমেন্টের তলায় দাঁড়িয়ে তিনি বৃটিশ রাজের স্বৈরশাসন-প্রণালীর যখন সমালোচনা করছিলেন, চারদিকে দাঁড়িয়েছিল দু লক্ষ লোক। ওই দু লক্ষর জনসমুদ্রের মধ্যে শুধু তাঁরই উন্নত শির দেখা যাচ্ছিল দূর থেকে। সাধারণ মানুষ যে কত ক্ষুদ্রকায়, তাঁকে না দেখলে ঠিক বোঝা যেত না। তিনি স্থূলাঙ্গ ছিলেন না, ছিলেন বিশালাকার। ব্যক্তি হিসাবে তিনি ছিলেন অতি মধুর এবং পরিহাসপ্রিয়। কিন্তু তবু কাছাকাছি যেতে গা ছমছম করতো, দু-একটি কথা বলার পর যেন গলা শুকিয়ে যেতো। প্রথম দু-একবার আমার খুবই বিপদ গেছে। 'কল্লোল যুগে' একবার অচিন্ত্য গিয়েছিল মহাকবির সঙ্গে দেখা করতে। মহাকবি সামনে এসে দাঁড়িয়ে সহাস্যে সম্ভাষণ করলেন। অচিন্ত্য ফিরে এসে লিখেছিল, "এ ত' আগমন নয়, আবির্ভাব!"

সকাল আটটায় এসে গেল অনেক লোকজন। মহাকবির ঘরের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা বেড়ে গেছে অনেক। ঘরে ধূপ জ্বালা, ফুলের গন্ধ ঢালা। কবি তখনও জীবিত রয়েছেন, সামান্য একটু বুঝি নড়েছেন!

অনেকে বিরক্ত হচ্ছিল ওদিক থেকে একটা অসামাজিক ও অভদ্র আওয়াজ শুনে। সমস্ত বারান্দা ও বাড়ী সেই

আওয়াজে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। দেখতে-দেখতে একে-একে এসে পড়ছেন গণ্যমান্যরা। সবাই নিঃশব্দ সন্তর্পণে কয়েক পা এগিয়ে দর্শন করে যাচ্ছেন মহাকবিকে। চারিদিকে একটা স্তব্ধ বেদনা ও বিচ্ছেদের ছায়া। কিন্তু ওই আকাট বিশ্রী আওয়াজটা যেন হাতুড়ীর ঘায়ে সেটাকে দীর্ণ করে দিচ্ছিল। না, এ সহ্য করা যায় না। আমি ছুটে গেলুম চারু ভট্টাচার্য মশায়ের কাছে। বললুম, এ বড় অশোভন, এ অন্যায় চারুবাবু! কোথা থেকে কারা কি কারণে এ রকম আওয়াজ করছে? একে থামানো যায় না?

চারুবাবু অমায়িক শান্ত প্রকৃতির লোক। বললেন, শব্দটা একটু বেশী হচ্ছে, কিন্তু ও ছাড়া ত উপায় নেই! ওদিকে মিস্ত্রিদের কাজ হচ্ছে! দেখুন ত একবার?

বারান্দার ছোট সেতুটি পার হয়ে দক্ষিণমুখী হল-এ এলুম এ-বাড়ীতে। এ সেই হল যেখানে এই কিছুকাল আগেই আমাদের সকলের উপস্থিতিতে মহাকবি তৎকালীন 'আধুনিক সাহিত্যের' বিচারসভা ডেকেছিলেন। এসে দেখি সেই হলেরই মাঝখানে জন-তিনেক ছুতোর মিস্ত্রি দুম-দাম হাতুড়ী পিটিয়ে একখানা বড় ইজি-চেয়ারের তলায় বাঁশের মতো লম্বা-লম্বা দুখানা কাঠ জোড়া দিচ্ছে বড়-বড় পেরেক ঠুকে। কবিকে নাকি এই চেয়ারে বসিয়েই শান্তিনিকেতন থেকে আনা হয়েছে। এই পুরনো রংচটা চেয়ারেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে নিমতলায়। এ তারই আয়োজন। পরম্পরায় শুনলুম এটি নাকি নন্দলাল বসু মহাশয়ের নির্দেশক্রমে নির্মাণ করা হচ্ছে।

বেলা নটা। কবি তখনও জীবিত। ইদানীং তিনি কানে একটু কম শুনতেন। সেটি বোধহয় ছুতোর মিস্ত্রিরা জানতো! মৃত্যু যাঁর তখনও হয় নি, তাঁর কাছাকাছি বসে সৎকারের আয়োজন করাটা যে কত দৃষ্টিকটু, এটি বিবেচনা করার মতো মানুষ আশে-পাশে কেউ ছিল না। আমি লক্ষ্য করলুম, এই ষ্ট্রেচার-চেয়ারখানা আন্দাজ আড়াই ফুট চওড়া এবং লম্বায় মোট ছয় ফুট নাও হতে পারে। যাঁর সোনার দেহকে নিয়ে যাবার জন্য সোনার পালঙ্ক দরকার ছিল, তার বদলে এই খেলো সঙ্কীর্ণ শস্তা চেয়ার? অপরাহ্নকালে লক্ষ্য করেছিলুম কবির শবদেহের পক্ষে এটি খুবই অপ্রশস্ত। শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসু মহাশয়ের শিল্পী-জীবনে এইটি একমাত্র অপসৃষ্টি।

সাড়ে নটার পর এলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র ও ডাঃ ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়। ওঁদের পিছু-পিছু গিয়ে মহাকবির ঘরের কাছে দাঁড়ালুম। অমল হোম মহাশয় তখন উপস্থিত হয়েছেন। বোধহয় মিনিট পাঁচেক, তারপরই ডাঃ রায়ের সঙ্গে-সঙ্গেই বেরিয়ে এলেন ললিতবাবু। দু-চারজন ঘিরে ধরেছিলেন দুই স্বনামপ্রসিদ্ধ চিকিৎসককে। ডাঃ রায় দ্রুতপদে যাবার সময় বলে গেলেন, না, আর কিছু করার নেই। ওঁর আশা নেই আর। পালস্ আর পাওয়া যাচ্ছে না। জীবন নাভিশ্বাস দেখা দিয়েছে। অক্সিজেন [illegible]

বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ল ডাঃ রায়ের মন্তব্য।—

নীচের উঠোনে উৎসুক জনতার ভিড় জমছিল। দৈনিক কাগজগুলির রিপোর্টাররা ছুটোছুটি করছেন। তখন মুভি-ক্যামেরা, টেপ-রেকর্ড—এসব হয় নি। শুধু ষ্টিল-ক্যামেরা ফিরছে হাতে-হাতে। দেখতে-দেখতে এসে পড়লেন দেশের বহু গণ্যমান্যরা। রাজা, মহারাজা, শিল্পপতি, নাইট-উপাধি-ধারীরা, রায়বাহাদুর ও রায়সাহেবরা, শান্তিনিকেতন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকে, অধ্যাপক ও ব্যারিষ্টারের দল, হাইকোর্টের বাঙালী জজেরা, মাঝারী হাকিমেরা। রামানন্দবাবু সকালে এসেছিলেন সপরিবারে। আমার সমকালীন লেখকদের মধ্যে একমাত্র ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। মাঝখানে এলেন সঙ্গীতশাস্ত্রী ও গেরুয়াপরিহিত দিলীপ-কুমার রায়। এছাড়া অগোচরে কোথাও বসেছিলেন শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাখন সেন, নরেন্দ্র দেব, গিরিজা বসু ও সজনী দাস। মহাকবির জ্যেষ্ঠা ভগ্নি স্বর্ণকুমারী দেবীও এক সময় এসে পৌঁছলেন। এলেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বাঙালী সমাজ।

কবির ঘরে মেয়েরা ললিত কোমল কণ্ঠে কবিরই গান গাচ্ছিলেন। সেই গান মর্মচ্ছেদী আতুরতায় যেমন নিবিড়, তেমনি ব্যথায়-বেদনায়-কারুণ্যে এবং ব্রহ্মাস্বাদস্পর্শে যেন আকুল। সে-গান কান্নারই মতো। আন্দাজ ১১টার পরে জনতাকে আর আয়ত্তে রাখা যাচ্ছে না। এবার চড়া রোদ দেখা যাচ্ছে। মৃত্যু এগিয়ে আসছে এবার দুর্বারগতিতে। সে যেন আসছে এক প্রচন্ড উন্মত্ত অশ্বপৃষ্ঠে বল্গা হাতে,—তাকে দেখছিনে, সে যেন বহু দূর থেকে আসছে ধুলো উড়িয়ে! যেন বহুকাল থেকে আসছে সে,—১২৬৮ সনের ২৫ বৈশাখে সে যাত্রা করেছে, যেদিন এই একই বাড়ীতে মহাকবির জন্ম হয়। ওই অশ্বারোহীর হাতে ২০ বছর ৩ মাস আগে সেই জন্মদিনেই মৃত্যুর পরোয়ানা দেওয়া ছিল! সে ছুটে আসছে উন্দাম ঝড়ের গতিতে।

আমরা ভয় পাচ্ছিলুম। মৃত্যু অনিবার্য দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু পায়ের তলাটা কাঁপছে,—যেমন থরথর করছে ভারতের হৃৎপিন্ড! ওই রুদ্রাকাশ, ওই তার করাল কুটিল আলো, মহাবিশ্বের কোটি কোটি গ্রহ-জ্যোতিষ্ক-তারকা — যেখানে যেটিতে কবির বিবাগী মনের ভাবনা বাসা বাঁধতে যেতো— তারাও যেন এই আসন্ন বিচ্ছেদের আতঙ্কে কাঁপছে।

নীচের দিকে বিশাল জনতা ক্ষণে-ক্ষণে অধীর চঞ্চল হচ্ছে। তারা প্রতি মুহূর্তে কবির সর্বশেষ সংবাদ শুনতে চাইছে, জীবন্ত কবিকে শেষবারের মতো দেখতে চাইছে। আপাতত এ বাড়ীর কর্তৃপক্ষ কারা জানতে পাচ্ছিনে, কিন্তু এ-বাড়ীর প্রশাসন ব্যবস্থা এখন আলগা। নীচের তলার সব জানলা দরজা এবং প্রত্যেকটি প্রবেশপথ বন্ধ। কিন্তু আবেগ-ব্যাকুল সেই জনস্রোত যেন শ্রাবণ-বন্যার জলস্রোতের মতো সর্বত্র আঘাত করছে। [illegible]

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভিড় ঠেলে প্রাণপণে ঢোকবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু স্থূলকায় শ্যামাপ্রসাদকে অবশেষে পাঁচিল টপকিয়ে আসতে হল। নীচে অত বড় ময়দানের মতো উঠোন, সমস্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, দূরে চিৎপুর রোডের যতটা অংশ চোখে পড়ে,—শুধু নিরেট নরমুণ্ডের একটা বিশাল পিন্ড! 'পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই, সবারে আমি প্রণাম করে যাই।' সে কি, এ যে মিছে কথা! সমস্ত পৃথিবী ছুটি নিচ্ছে আজ তোমাকে প্রণাম জানাবার জন্য! তুমি ভাবছ তোমার যোগতন্দ্রার মধ্যে সমুখে শান্তি পারাবার, আর আমরা দেখছি তুমি এই শতাব্দীর বাঙালীকে পথে বসিয়ে চলে যাচ্ছ! এই ঘোরতর দুর্দিনে, বিশ্ব-যুদ্ধের মাঝখানে, নরপিশাচদলের কানা-কানির চক্রান্তে, হিংসা বিদ্বেষ হানাহানির বিষবাষ্পের মধ্যে,—তুমি রেখে যাচ্ছ এই নিরুপায় নেতৃত্বহীন মূঢ় বাংলাকে? তুমি কি জানো না এর ভয়াবহ পরিণাম? তুমি জানো না কি তোমার এই ছিন্নমস্তার পূজারী বাঙালী জাতিকে যারা চিরকাল নিজেদের টুঁটি কেটে নিজেরাই সেই রক্ত পান করে? এই হতভাগ্য, মরিয়া, আত্মনাশা, কর্মবিমুখ, আত্মকলহশীল জাতিকে কোন্ নরককুণ্ডে ফেলে দিয়ে পালাচ্ছ? এই কি তোমার ছুটি নেবার কাল?

হঠাৎ কে যেন ডাকল পাশ থেকে। ফিরে দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র। এরা সবাই 'শ্রীহর্ষ' সাময়িক পত্রিকার গোষ্ঠী—আমার একান্ত আপনজন। বিজয় চট্টোপাধ্যায়, বিজন মিত্র, প্রবোধ ঘোষ, ভক্তি, — আরও কেউ-কেউ। আমি ওদের কাগজে প্রায়ই লিখি। ওরা এক দল বলিষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবক। ওরা বলল, আপনাকেই খুঁজছি এতক্ষণ। আমরা এলুম পূর্ব-দক্ষিণের পাঁচিল টপকিয়ে। আমি বললুম, তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছি! এবার কোমর বাঁধো, —এদের দেখে ভরসা হচ্ছে না।

এ 'গাঁয়ে' আমাদের কেউ মানে না, কিন্তু আমরাই 'মোড়ল' সাজলুম। উপর-তলায় রাশি-রাশি লোক এলোমেলো ভিড় পাকাচ্ছিল — সব মিলিয়ে যেন অনাবশ্যক একটা জনতা। ওদেরকে সরিয়ে চারজন যুবক দাঁড়িয়ে গেল পশ্চিমের বারান্দায়। সিঁড়িতে পাহারা দুজন, পূর্বদিকে,— যেদিকে থিয়েটার হয়,—সেখানে মেয়েদের আনাগোনার বারান্দায় দাঁড়িয়ে গেল জন-দুই। আমাকে বলল, আপনি কবির ঘরের দরজায় থাকুন।

এতক্ষণ পরে আমার সাহস ফেরে গেল।—

প্রায় বেলা ১২টা। কবির নাভিশ্বাস চলছিল। তাঁর মুখের উপরে ঈষৎ কুন্তলের ছায়া দেখে ডাক্তার অক্সিজেনের যন্ত্রটা সরিয়ে নিলেন। সমস্ত ঘরখানা মহিলায় ভরা। পন্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর কাজ সেরে বেরিয়ে গেলেন। বহু মহিলা, যাঁদের অনেককেই চিনি, তাঁরা কাঁদছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ আসছেন, যাচ্ছেন। রথীন্দ্র, [illegible]

দেখছিনে। একবারও দেখি নি রথীন্দ্রনাথকে। প্রতিমা দেবী কোথায় রয়েছেন লক্ষ্য করি নি। নন্দিতার দিকে চোখ পড়ে নি। রাণী মহলানবিশকে দেখছিলুম। উপনিষদের মন্ত্র পাঠ শুনছিলুম। বেদস্তোত্র-সঙ্গীত চলছিল মহাপরিনির্বাণের আগে।

ঝুলন-পূর্ণিমা বোধ হয় প্রতিপদে উত্তীর্ণ হল। কৃষ্ণপক্ষের স্পর্শ লাগল জ্যোতিষ্কলোকে।

হঠাৎ নিমেষ নিহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ডাক্তার মহাকবিকে একবার স্পর্শ করেই বললেন, না, আর নেই। ১২টা বেজে ১০। নেই? কি বলছেন, নেই? নেই মানে? বেঁচে নেই? চলে গেছেন মহাকবি?

উত্তাল জনসমুদ্রের তরঙ্গাঘাত বাইরে তখন আছাড়ি-পিছাড়ি গর্জন করছিল। বারান্দা দিয়ে ছিটকিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন অমল হোম। ছুটে গিয়ে ধরলুম, কোথা যাচ্ছেন? ওদের বলে দিন? এনাউন্স করুন?

না, না, আমি পারব না। বলতে হয় তুমি বলো! — চোখে রুমাল চেপে অমল হোম চলে গেলেন।

মুহূর্তে-মুহূর্তে দোতলায় জানছে সবাই। ঘরে-বারান্দায় মহিলারা কাঁদছেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে। কিন্তু খবরটি ঘোষণা করবার জন্য কোনদিক থেকে কেউ এগিয়ে আসছে না। ছুটে এল 'শ্রীহর্ষে'র বিজয় আর বিজন। ওরা কান্না চাপছিল আমাকে ধরে। তারই মধ্যে আবেগে উত্তেজিত হয়ে বিজয় বলল, আপনি বলুন, শিগগির এনাউন্স করুন, — ওরা ক্ষেপে যাচ্ছে,— লোহার গেট ভেঙে পড়ছে—শিগগির সামনে যান—

আমি গিয়ে বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়ালুম। তখন প্রায় ৩ মিনিট দেরী হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ পরে এবার আমাকে দেখে সেই বিরাট জনতা ক্ষিপ্তোন্মত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, বলুন—খবর বলুন—

দু হাত বাড়িয়ে আমারই প্রেতাত্মা যেন আর্তনাদ করে উঠল, না, মহাকবি আর নেই। তাঁর মৃত্যু ঘটেছে ১২টা বেজে ১০ মিনিটে!!

সেই জনসমুদ্র যেন কল্লোলিত হয়ে উঠল। পৃথিবীর ইতিহাসের সেই অভিশপ্ত দিনটিতে সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ঘোষণা যে-ব্যক্তি করল সে ত বাইবেলের সেই বারাব্বাস অপেক্ষাও নরাধম! সুতরাং তার ছবিও তুলে রাখো! চক্ষের পলকে নীচের উঠোনে অনেকগুলি ক্যামেরা ক্লিক করে উঠল।

শুধু মনে আছে, ছুটে এসে মহাকবির পা দুখানি ধরে আরেকবার মাথা রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলুম। সম্ভবত বিজন আমাকে সরিয়ে এনেছিল।

সেই বৃহৎ জনতা—অবাধ্য ও দুঃশীল —শুধু চেঁচামেচি করেই ক্ষান্ত রইল না। এবার তারা সেই মস্ত লোহার কোলাপসিবল গেটটি মুচড়িয়ে দুমড়িয়ে ফাঁক করে জলপ্রপাতের মত ভিতরে ঢুকলো! এ যেন সেই ফরাসী বিপ্লব-কালের বাস্তীল দুর্গের পতন ঘটল! বহুলোক দেয়াল ধরে কার্ণিশে পা রেখে দোতলায় উঠতে লাগল। পিছনের বাগানের দিককার পাঁচিল টপকিয়ে হাজার-হাজার লোক ভিতরের দিকে আক্রমণ করল। 'শ্রীহর্ষে'র ছেলেরা এবং আরও অনেক লোক শুধু আমাদের এই বারান্দাটা ওদের হাত থেকে রক্ষা করছিল। ওরা নীচের তলাকার ঘরের জানলা, দরজা, সিঁড়ির প্রবেশ পথ—সমস্ত ভাঙছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ নীচের থেকে উপরে এসেছিলেন কিনা আমার মনে নেই, কিন্তু তাঁর কথা কেউ শোনে নি। জনতার উচ্ছৃঙ্খলতা অবাধে চলতে লাগল।

রবীন্দ্রনাথের পারিপার্শ্বিক সমাজ রাজনীতিক সমাজ ছিল না। তাঁকে ঘিরে থাকত উচ্চশিক্ষিত সংস্কৃতিবান একটা অভিজাত সম্প্রদায়—যাদের সঙ্গে জনজীবনের যোগ ছিল কম। তিনি নিজে থাকতেন শান্তিনিকেতনে, এবং মধ্যে মাঝে কলকাতায় আসতেন হয় জাতির একান্ত প্রয়োজনে, নয়ত তাঁর বাইরে চলে যাবার আয়োজনে। তিনি ছিলেন আজীবন ভ্রমণপিপাসু এবং ভ্রাম্যমান। এর ফলে হয়েছিল এই, সাধারণ মানুষ কোনদিনই তাঁর নাগাল পায় নি, এবং কাছে থেকে দেখে নি। তাঁর চারদিকে ছিল একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর, একটা দুর্ভেদ্য আবেষ্টনী,—যেটাকে এড়িয়ে তাঁর কাছে পৌঁছনো যেতো না। কলকাতায় এলে তিনি থাকতেন একটা পাহারার মধ্যে, এবং তাঁদের সম্মতি ছাড়া তাঁর দিকে এগোনো যেত না। ১৯৩৪-এ একখানা চিঠিতে তিনি আমাকে লিখেছিলেন, 'কোনও দ্বারোয়ানের বাধা স্বীকার করো না, সোজা চলে এসো।'

'রক্তকরবীর' সেই অন্তরালবর্তী 'রাজাকে' কাছে দাঁড়িয়ে দেখার জন্য জনসাধারণের মনে একটা ক্ষুধা পুঞ্জীভূত হয়েছিল বহুকাল থেকে। আজ সেই দ্বারোয়ানরা সরে দাঁড়িয়েছে—জনতার উপরে যাদের তিলমাত্র দখল নেই। এই বারান্দায় এবং অন্যান্য কক্ষে ও হলঘরগুলোয় যে বৃহৎ বরেণ্য সমাজ আজ মহাকবির অন্তিমশয্যার চারিদিকে সমবেত হয়েছেন তাঁরাও সমগ্র দেশের শ্রদ্ধার পাত্র, প্রত্যেকে বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, বাংলা ও ভারতের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁরা, তাঁরা আপন-আপন জগতে স্ব-স্ব প্রধান, অনেকে বিশ্ববাসীর নিকটেও সুপরিচিত, এবং প্রবল-প্রতাপ বৃটিশ রাজের দরবারে অনেকে অতিশয় প্রভাব-প্রতিপত্তিশালীও বটে। কিন্তু আজকের এই সঙ্কটকালে যখন হাজারে-হাজারে স্বেচ্ছা-

চারী জনতা প্রচন্ড উদ্দীপনায় অবাধে এই অট্টালিকার সর্বত্র ভাঙনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তখন তাদের সংযত করার জন্য কারোকে পাওয়া যাচ্ছে না। ও'রা—যাঁরা বরেণ্যসমাজ, যাঁদের পরিচয় ও আভিজাত্য গগনস্পর্শী—তাঁরা তখন কক্ষে-কক্ষে আতঙ্কিত ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আত্মগোপন করে রইলেন। অবস্থা যখন চরমে উঠছে, তখন কিছু লোক ছুটোছুটি করতে লাগলেন মহাকবির পুত্র রথীন্দ্রনাথের কাছে নির্দেশ নেবার জন্য। কিন্তু কোথায় রথীবাবু? কোথাও তিনি নেই. বহু চেষ্টা করেও কেউ তাঁর খোঁজ পাচ্ছে না! ঘরে-বাইরে, কবির কক্ষে—কোথাও তাঁকে দেখা যায় নি এখন পর্যন্ত। অনেকে অসন্তুষ্ট, অনেকেই দুঃখিত। পরম্পরায় শোনা গেল, তাঁর মাথা ধরেছে এবং তিনি এই অট্টালিকার কোনও এক নিভৃতলোকে বিশ্রাম নিচ্ছেন। প্রতিমা দেবীও নাকি সেইখানে। তা হবে। কিন্তু সমগ্র দেশবাসী ও এই বরেণ্যসমাজ যখন উদ্বিগ্ন হয়ে মহাকবির একমাত্র পুত্রের আবির্ভাবের অপেক্ষায় প্রতিটি মুহূর্ত গুনছে, সেই সময় সামান্য একটু ওষুধ খেলেই হয়ত মাথা ধরাটা কমে যেতে পারতো। তাঁর এই অনুপস্থিতির মূলে কারণ আর কোথাও কিছু ছিল কিনা,—সেটি হয়ত বলতে পারেন রথীন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীযুক্ত অমল হোম,—যিনি আজও রোগশয্যায় শায়িত রয়েছেন। কিন্তু কবির মৃত্যুর পরের দিন সংবাদপত্রগুলিতে এমন কিছু-কিছু সংবাদ বেরিয়েছিল যার অনেকগুলি সত্য নয়। আশী বছরের পিতার মৃত্যুতে পঞ্চান্ন বছরের প্রবীণ পুত্রের পক্ষে শোকে মুহ্যমান হয়ে লোকচক্ষের অন্তরালে শয্যাশ্রয়ী থাকাটা অনেকের কাছে একটু বেমানান ঠেকেছিল।

সেই বৈপ্লবিক পরিস্থিতি যখন আয়ত্তের বাইরে যেতে বসেছে তখন তদানীন্তন নেত্রী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী চেঁচামেচি করে উঠলেন। অমন যে নিরীহ ভদ্রচিত্ত বুদ্ধদেব বসু—সেও এক সময়ে দাঁড়িয়ে উঠে আর্তনাদ করল, য়্যাট্রসাস!

সেদিন সেই জনসংকটকালে সকলের চেয়ে বেশী করে যাঁর আলোচনা উঠেছিল, তিনি হলেন সুভাষচন্দ্র! বয়স্ক ব্যক্তিরা বলাবলি করছিলেন, আজ সুভাষ এখানে উপস্থিত থাকলে এমন দুরবস্থা হত না। লাখো-লাখো লোকের সামনে সে দাঁড়াতে জানতো। তার ডাকে এক ঘন্টার মধ্যে হাজার-হাজার স্বেচ্ছাসেবক শৃঙ্খলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে যেতো! আজ সকলের বড় দুর্ভাগ্য, সুভাষ কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে!

এমন সময় এগিয়ে এলেন উত্তর কলকাতার সৌম্যদর্শন পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মিঃ শোভান। তিনি বললেন, আপনারা অনুমতি করুন, আমি আজকের সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি। আমার অফিসাররা সবাই প্রস্তুত আছেন। বিলেত থেকে সেক্রেটারী অফ স্টেট, দিল্লী থেকে ভাইসরয়, কম্যান্ডার-ইন-চীফ, বাংলার গভর্নর, কলকাতার পুলিশ কমিশনার—এ'দের সকলের ইচ্ছা কবির জন্য আমরা ষ্টেট প্রশেসন করি, ও'কে ইউনিভার্সিটিতে 'লাইং-ইন-ষ্টেট' করে দিন-দুই রাখা হোক, — গভর্নমেণ্ট এজন্য সমস্ত দায়িত্ব বহন করবেন। উনি পৃথিবীর সব দেশের, সব জাতির, সব সম্প্রদায়ের কবি। আপনারা অনুমতি করুন, আমরা এই জনতাকে কনট্রোল করে নিচ্ছি।

সম্মতি লাভের অপেক্ষায় মিঃ শোভান উৎসুক হয়ে একপাশে দাঁড়ালেন।

আগের বছরে বাঙলার গভর্নর মিঃ ব্রাবোর্ণের মৃত্যু ঘটে এই কলকাতায়। তাঁর শবযাত্রার সেই 'ষ্টেট প্রশেসন' কলকাতার পক্ষে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। মিঃ ব্রাবোর্ণ ছিলেন খাঁটি, সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান একজন অভিজাত ইংরেজ। তিনি বাঙলায় প্রথম জনপ্রিয় গভর্নর, এবং সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত তাঁর সুখ্যাতি করতেন। আমি এই 'ষ্টেট প্রশেসনের' বিশালতা এবং বর্ণাঢ্যতার অনন্যসাধারণ চেহারা স্বচক্ষে দাঁড়িয়ে দেখেছিলুম।

যাঁরা আজ একে-একে লোকান্তরিত হয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে কোনও বিরূপ মন্তব্য করা অশালীন ও রুচিবিগর্হিত কিন্তু সেদিনকার সেই সমবেত সমাজপতিগণের মাঝখানে রথীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতি খুবই দুঃখদায়ক ছিল। তাঁর অভাবে কেউ কিছু বলতে সাহস পেলেন না। মোটামুটি কথাটা এই দাঁড়াল, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ হলেন জাতিয়তাবাদী কবি, এবং তাঁর সর্বশেষ রচনা 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধটি বৃটিশরাজ বিরোধী,—সেই হেতু মিঃ শোভানের প্রস্তাব সেইখানেই প্রত্যাখ্যান করা হল! মহাকবির দেশবাসীই মহাকবির শবদেহের দায়িত্ব গ্রহণ করুক।

কথাটা শুনতে ভালো, কিন্তু দেশবাসী কারা? ওই যাদের দেখছি আজ এই মহর্ষি নামাঙ্কিত অট্টালিকার উপর আক্রমণকালে? ওই উচ্ছৃঙ্খল জনগণ, — যারা সভ্যতা, সৌজন্য ও সংযমের তোয়াক্কা রাখছে না? সেদিন এই কক্ষের মধ্যেই উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মৌলভী ফজলুল হক, ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যর আজিজুল হক, জাষ্টিস হাসান সুরাবর্দী, মেয়র ফণীন্দ্র ব্রহ্ম, নাটোরের মহারাজা, ছিলেন স্যর মন্মথনাথ, ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা, ছিলেন অগ্রজসজ্জ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আর স্যর যদুনাথ সরকার প্রভৃতি। ও'দের সকলের সিদ্ধান্তে কেন জানি না—সেদিন যথেষ্ট উৎসাহবোধ করি নি!

কবির ঘরের দরজা ও জানলা দুদিক থেকে বন্ধ। ভিতরে তাঁর শবদেহকে শ্মশান যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল।

এই ঝুলন পূর্ণিমায় মহাকবি একদা রচনা করেছিলেন তাঁর 'জনগণমন অধিনায়ক জয়হে জয় ভারতভাগ্যবিধাতা—।' এই ঝুলন পূর্ণিমা তিথিতেই মহাকবির নেতৃত্বে বাঙালী জাতি একদিন স্বদেশী আন্দোলনের মন্ত্র দীক্ষা নিয়েছিল। একদা বাঙলার ভ্রাতা ও ভগ্নীদের মধ্যে রাখীবন্ধনের যে উৎসব মহাকবির নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল,—তারও প্রথম সূচনা এই ঝুলন পূর্ণিমায়।

আগেই বলেছি আমার উপর ভার ছিল কবির ঘরের দরজা পাহারা দেবার। সেই দরজা খোলা হল বেলা আড়াইটের পর। ইতিমধ্যে মহাকবির দেহকে ঘৃত ও চন্দন মিশ্রিত এবং গোলাপ-যুঁই-রজনীগন্ধা ও পদ্মদলমথিত সুগন্ধী জলে স্নান করিয়ে কোঁচানো গরদের ধুতি, রেশমের পানজাবি এবং গরদের উত্তরীয় পরিধান করানো হয়। মাথার চুলগুলি সুন্দরভাবে আঁচড়ানো, এবং ললাটে বরচন্দন অলঙ্কৃত করা। কবির দক্ষিণ হাতের মুঠিতে দেওয়া হয়েছে একটি নীলাভ শ্বেতপদ্ম। ঠিক যেন রাজবেশ ধারণ করেছেন মহাকবি। ভিতরে ধূপ, ধুনা, পুষ্প চন্দন সৌরভ, আর্ত সঙ্গীতসহ বেদমন্ত্র ধ্বনি—এ যেন মৃত্যুপুরী নয়,—এ অমৃতলোক, এ যেন বৈকুণ্ঠের অমরাবতী।

কতক্ষণ মুগ্ধ চক্ষে চেয়েছিলুম সেই রাজবেশধারী 'ভাগবতী তনুর' প্রতি!

ইতিমধ্যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, জনসাধারণ সারিবদ্ধভাবে নিঃশব্দে ও শান্তভাবে মহাকবিকে দর্শন করে যাবে। উত্তরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসবে, এবং দক্ষিণের ঘরের পাশের সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকবে। তাই হল। কিন্তু প্রথম যিনি এলেন তিনি সামরিক পোষাকে এক ইংরেজ,—হাতে তাঁর সুন্দর একটি বড় স্বেতপদ্মের মালা। তিনি গভর্নরের মিলিটারী সেক্রেটারী। মহাকবির মৃতদেহের সামনে নগ্নপদে তিনি নতজানু হয়ে অভিবাদন করে মালাটি রাখলেন পায়ের দিকে। পরে উঠে দাঁড়িয়ে সামরিক স্যালিউট করলেন, তারপর বেরিয়ে গেলেন। ইংরেজ জাতি শেষবারের মতো মহাকবিকে অভিবাদন জানিয়ে গেল।

এরপর সারিবদ্ধভাবে আরম্ভ হল জনস্রোত। নির্দেশ ছিল এই, কেউ থামবে না, মুখের আওয়াজ করবে না, পরস্পর কথা বলবে না, কবির পায়ের ধুলো নেবার চেষ্টা করবে না, চলতে-চলতেই বাঁদিকে মুখ ফিরিয়ে শুধু দর্শন করে যাবে। তাই সই। জনতা এবার কতকটা শান্ত, কিছুটা সংযত। 'শ্রীহর্ষে'র বিজয় আর আমি—দুজন কঠিন ও নির্বিকার মুখে সেই দরজার দুদিকে কালপ্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কয়েকটি বলিষ্ঠ, নির্ভীক এবং শৃঙ্খলানিষ্ঠ যুবক সেদিন বহু লোকের প্রীতি ও প্রশস্তি অর্জন করেছিল। রবীন্দ্র-পার্শ্বচর যাঁরা সেদিন ভয় পেয়ে নিজ-নিজ গর্তে লুকিয়েছিলেন—তাঁদের হাততালিতে কিছু বেশী শব্দ শুনেছিলুম সেদিন।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে প্রথম সিঁড়ির প্রবেশপথ বন্ধ করা হল। এর মধ্যে আন্দাজ হাজার তিরিশেক লোক রাজবেশধারী মহাকবিকে দর্শন করে গেল। ভিতরে তখনও মহিলা কণ্ঠে করুণ মন্ত্রসঙ্গীতের মূর্চ্ছনা উচ্ছ্বসিত হচ্ছিল। আমাদের পাশে একে-একে তখন এসে দাঁড়িয়েছেন ইম্প্রেসারিও হরেন ঘোষ, শান্তিনিকেতনের জন-দুই ছাত্র, বিজন মিত্র এবং বিজয় চট্টোপাধ্যায় ও

আছেই। এবার কবির শবদেহকে তুলে নীচে নামিয়ে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত হল। আর দেরী করা চলে না। আপিস, আদালত, হাইকোর্ট, এসেম্বলি, কাউন্সিল, কর্পোরেশন, ইস্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, দোকানপাট এবং সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান মায় ডালহাউসি স্কোয়ার ও লালবাজার, এমন কি রেল-আপিস ও ট্রেন চলাচলও বন্ধ হয়ে গেছে! বাঙলার প্রশাসনিক ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়েছে। লক্ষ-লক্ষ নাগরিক বেরিয়ে পড়েছে পথে। নারী-সমাজ তাদের সকল শাসন-বাঁধন ছিঁড়ে ছুটে যাচ্ছে এদিক-ওদিক দিশাহারার মতো। টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে নিউজ-বয়রা নগরের পথে-পথে চিৎকার করছে। আর দেরী নয়। বৃহত্তর জনতা লক্ষে-লক্ষে এগিয়ে আসছে চিৎপুর রোড ধরে। এবার তোলা যাক।

কবির মাথার নীচে ফুলকাটা ওয়াড়-যুক্ত নধর বালিশ, পিঠের তলায় নতুন টিকিনের তোষকের উপরে ধবধবে শাদা নতুন চাদর। বাকী সমস্তই পুষ্পশয্যা।

'যাবার সময় হল বিহঙ্গের,

এখনই কুলায় রিক্ত হবে—'

সেদিন বৃহস্পতিবার। মহাগুরু বৃহস্পতি বিদায় নিচ্ছেন। কিন্তু সেদিন আমারও তুঙ্গে ছিল বৃহস্পতি। মহাকবির মাথাটা নিয়েছিলুম আমার বুকের মধ্যে. একখানা হাত রেখেছিলুম তাঁর পিঠের তলায়। পিঠ আর কোমর নিল বিজয়, বিজন, হরেন ঘোষ, শান্তিনিকেতনের একটি ছাত্র, এবং সঠিক মনে নেই—বোধ হয় হিরণ সান্যাল এবং আরও দু-একজন চেনা মুখ—তাঁরা নিলেন কোমর থেকে পা পর্যন্ত। কিন্তু এখানে স্বীকার করে নিচ্ছি সেই নাটকীয় কালে আমার স্মৃতির তালিকায় কিছু ভুল থাকতে পারে।

শামুকের গতিতে আমরা এগোচ্ছিলুম সিঁড়ির দিকে। কবিগুরুর দেহ ছিল অতিশয় গুরুভার। কিন্তু আমি অন্যমনস্ক হয়েছিলুম কতক্ষণের জন্য। আমার বুকের মধ্যে মহাকবির চন্দন-পুষ্প সুবাসিত দেহ, তাঁর ডান হাতখানা আমার হাতে নির্ভর রয়েছে। আমি চেয়ে রয়েছি তাঁর মুখের উপরে। না, ভুল হচ্ছে না। মৃত্যুর তিনঘন্টা পরে তাঁর মুখের উপর থেকে মৃত্যুর ছায়া স'রে গেছে। যেন সেই মুখে এবং নিমীলিত চক্ষে নেমে এসেছে একপ্রকার দিব্য দীপ্যমান প্রসন্নতা। আমার বুকের মধ্যে চিরজীবনের মতো রয়ে গেল তাঁর পুষ্প-সুবাসিত দেহসৌরভ!

সবেমাত্র আমরা এক-এক-পা সিঁড়ি দিয়ে নামছিলুম। কিন্তু সেই সময়ে জনতার প্রচণ্ড চাপে হঠাৎ আমার ডান হাতের সমস্ত কাঠের পুরনো রেলিংটা হুড়মুড় ক'রে সবশুদ্ধ ভেঙে পড়ল নিচের দিকে, এবং আমাদের মাথার উপরে ধর্নকের ভয়ানক চাপে দোছত্রীর বারান্দা মড়মড় করে শব্দ ক'রে উঠল। আজ আমার আর মনে পড়ে না সেদিন অবধারিত অপমৃত্যুর হাত থেকে কেমন করে বাঁচলুম! শুধু আমার একার মৃত্যু ঘটত না, অনেকেই যেত আমার সঙ্গে। তার চেয়েও বড় কথা। মহাকবির শবদেহের অবস্থা কি ঘটত তা ভাবলেও ভয় করে।

শুধু মনে আছে সেদিন সেই মুহূর্তে আমি একপ্রকার ক্ষিপ্ত কঠিন কায়িক শক্তি প্রয়োগ ক'রে ইঞ্চি ছয়েক দেওয়ালের দিকে ঘেঁষেছিলুম! পরবর্তী কয়েকদিন অবধি আমার মন থেকে এদিনের আতঙ্কের ছায়া সরেনি!

নিচের তলায় পূর্বদিকের চকমিলানো উঠোনে কবিকে নামিয়ে সেই কাঠঠোকরা স্ট্রেচার-চেয়ারখানায় যখন তাঁকে শোয়ানো হচ্ছে তখন সেই জনতার প্রবল ধাক্কাধাক্কির মধ্যে বি-এম-সেনের সঙ্গে আমার বাকযুদ্ধ বেধে গেল। আমি নতুন বিছানাটা দিতে চেয়েছিলুম, তিনি রাজি হননি। সেটি আমার পক্ষে দুঃখজনক ছিল। ইঞ্জিনিয়ার বি-এম-সেন চেয়েছিলেন ওই অবজ্ঞাত হতশ্রদ্ধ স্ট্রেচার-চেয়ারের মাপে সবকিছু হতে হবে। যাই হোক, কবিকে আমরা কাঁধে তুললুম দশ-বারো জন, কিন্তু ভিড়ের চাপ ছিল ভয়াবহ। যাঁরা কাঁধে তুললেন তাঁদের মধ্যে আমরা ছাড়া ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র এবং জন-নেতা অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুসঙ্গের কুমার সুহৃদ সিংহ, কবীন্দ্র ঠাকুর, বীরেন সেন, মনোজ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও কেউ কেউ—যাঁরা প্রবল শারীরিক শক্তির অধিকারী। ভিড় ঠেলে-ঠুলে পশ্চিমের দরজা দিয়ে বেরোতেই গর্জমান জন-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ সেই বড় উঠোনের চারিদিক থেকে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি ছিলুম খাটের মাথার দিকে, এবং নিজের দৈহিক শক্তির সম্বন্ধে আমার কতকটা আত্মপ্রত্যয়ও ছিল। কিন্তু জনতার সেই তরঙ্গাঘাতে আমি যখন ছিন্নভিন্ন, বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে প্রায় প'ড়ে যাচ্ছিলুম, সেই সময় পাশ থেকে প্রচণ্ড বলশালী এক ডাকাত-সর্দারের মতো যিনি আমার কাতর মুখের দিকে চেয়ে চক্ষের পলকে শবাধারের মাথার দিকটা কাঁধে তুলে নিলেন, তিনি ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল মহাশয়। তাঁর অমিতশক্তি ও বিক্রমকে সেদিন তারিফ করেছিলুম।

শবাধারটা যখন জনতার উপর দিয়ে একপ্রকার ভেসে চ'লে গেল, আমি তখন কোথায়? শুধু মনে পড়ে কিছু লোক আমাকে মাড়িয়ে ফুটবলের মতো ছিটকিয়ে দিয়ে গেছে লোহার ফটকের রেলিংয়ের ধারে। আমি ওখানেই পড়েছিলুম। না, বেহুঁস হইনি। শুধু মার খেয়ে চোখ বুজে ধুঁকছিলুম। ভাবখানা ছিল এই, কা'রা যেন আমার বুকের ধন ছিনিয়ে নিয়ে গেছে!

পড়েছিলুম অনেকক্ষণ, কিন্তু আমার নাম ধ'রে যে ব্যক্তি ডাকল এবং আমাকে হিঁচড়িয়ে মেঝের থেকে টেনে তুললো, সে অনেক লেখকরই বন্ধু এবং আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, 'ডাফ চার্চের' যতীন চৌধুরী। দুঃখে দুর্দশায় সে, বেদনা, যন্ত্রণায়ও সে। আমার পা কেটেছিল, জামাটা ছিন্নভিন্ন, কপালে কালশিরা, পায়ে জুতো নেই, সর্বাঙ্গে ধুলো-কাদা। ছেঁড়া ধুতিখানা কি ভাগ্যি কোমরে তখনও রয়েছে,—ওখানা আগেভাগে গেরো দিয়ে রেখেছিলুম!

খোঁড়াচ্ছিলুম,—যতীনদা হাত ধরল। বলল, চল্ আমার ওখানে। আগে এক পেয়ালা চা খাবি। ওসব সেরে যাবে। চল্ আমি মালিশ ক'রে দেবো। বাড়ির ভেতরটা দেখে এলুম রে। হাজার দুই জুতোর পাটি, আর চারদিকে ফুল ছড়ানো। বাড়ি ঘর দোর ভেঙেচুরে একসা! চল্—

শেষের অংশটুকু না বললেই ভাল হ'ত।—

কিন্তু থাক্ না কেন আমার নামের সঙ্গে সেদিনের সত্য কাহিনীটুকু জড়িয়ে? যতীন চৌধুরীর সঙ্গে ঘন্টা-দুই কাটিয়ে আমি সুস্থ হয়েছিলুম। পথে-পথেই আমি ছিলুম, এমন সময় 'যুগান্তরের' জনৈক রিপোর্টার ছুটে এসে আমাকে ধরল,—একি, এখানে আপনি? ওরা সবাই খুঁজছে যে? শিগগির চলুন শ্মশানের দিকে। ও'রা 'ডেড্‌বডি' ওদিক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!

অনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলাবিহীন একটা জনতার ভিতর দিয়ে অতি দ্রুতগতিতে শবাধারটি গিয়ে পৌঁছয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হল-এর সামনে। সেটা শবযাত্রা নয়, শুধু মানুষের ভিড়। তারপরে আর কোনও প্রোগ্রাম নেই। শবাধার সেখান থেকে ফিরল। না, আর কিছু করবার নেই। এবার সোজা নিমতলায়! কিন্তু সেই ক্ষুদ্রাকার শবাধারটি কাঁধে নিয়ে বাহকরা যেন ঠিক ছুটতে লাগল। ওদের পিছু পিছু ছুটেছে কলকাতার হাজার-হাজার নাগরিক। শববাহকরা যেন পালাচ্ছে ওদের ভয়ে নিমতলার দিকে! আমি নিজে অনেকগুলি ঐতিহাসিক শবযাত্রার সঙ্গে ছিলুম। স্যার আশুতোষ, স্যার সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, যতীন দাশ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, স্যার জগদীশ বসু, বিপিন পাল, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎ বসু—এ'দের শবযাত্রা মনে পড়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শবযাত্রার মতো এমন অনাদৃত, উপেক্ষামিশ্রিত এবং শৃঙ্খলা-বুদ্ধিহীন ওদের মধ্যে একটিও ছিল না। এ-নিয়ে পরে অনেকে অনেকরকম নালিশ জানিয়েছিল। পরম্পরায় রটনা করা হয়েছিল এই, কবির ইচ্ছা ছিল তাঁকে যেন নিমতলায় শ্মশানেই দাহ করা হয়, কারণ তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শেষকৃত্য ওখানেই সম্পন্ন করা হয়েছিল।

এই রটনায় সেন্টিমেন্টের একটি চটক ছিল। কিন্তু মূলত রটনাটি সত্য নয়। প্রাচ্যের সর্বপ্রধান নগর কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়ত নানা কারণে ভালই হয়েছে, কিন্তু অশীতিপর অসুস্থ বৃদ্ধের অন্তিম-বাসনাটা ছিল এর বিপরীত। তিনি কবি,

তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনাস্থল হ'ল শান্তিনিকেতন। ওই আম্রকুঞ্জ, যেখানে আশ্রমিক বালকেরা একদা 'গুরু গৌতমের' কাছে প্রথম পাঠ নিয়েছিল, যেখানে জাম-বনের আশেপাশে পুষ্পবীথিকায় প্রভাতী পাখীর কূজন গুঞ্জনে মহাকবির মন কবিতায় উচ্ছ্বসিত হত,—কবির একান্ত কামনা ছিল সেই প্রকৃতির ক্রোড়ভূমিতে তিনি চোখ বুজবেন। তিনি আসতে চাননি, তাঁকে আনা হয়েছিল! তিনি নিরুপায়, অসমর্থ, জরা-ব্যাধিগ্রস্ত,—তাঁর অন্তিম অভিমতের দাম ছিল না কিছু। এ-ছাড়া তাঁর পারিবারিক জীবন সেইকালে যথেষ্ট শান্তিদায়ক ছিল কিনা, এ প্রশ্নও থেকে গেছে।

নিমতলার শ্মশানের কাছাকাছি গিয়ে দেখি এই খোলা জায়গায় জনতার পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশি। রেল লাইন ভ'রে গেছে, মালগাড়িগুলো নরমুণ্ডে পরিপূর্ণ, মানুষের গাদিতে পথ-ঘাট ভরা। সেই কাশী মিত্তির, শ্মশানেশ্বর, শোভাবাজার, আহিরীটোলা মানিক বোস, আনন্দময়ীতলা, জগন্নাথের ঘাট —মানুষে-মানুষে-মানুষে ছয়লাপ। শ্রাবণের উদ্বেলিত গঙ্গায় শত-শত নৌকা হাজারে হাজারে যাত্রী নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। সেই গঙ্গা-পথে শত-শত ছেলে দূরের থেকে সাঁতরিয়ে আসছে নিমতলার শ্মশানঘাটের দিকে। সেদিন অপরাহ্ণে ও গোধূলির কালে কলকাতাবাসীর একটা বড় অংশ হায়-হায় ক'রে চারদিকে ছুটোছুটি করছিল,—কবির শবযাত্রা তা'রা দেখতে পেলো না। চৌরঙ্গী, পার্ক স্ট্রীট, রাসেল স্ট্রীট, ক্যামাক স্ট্রীট, হ্যারিংটন স্ট্রীট, থিয়েটার রোড, হেস্টিংস, ময়ডন, লাউডন, খিদিরপুর, আলিপুর—এসব অঞ্চল তখন সাহেব-মেমে ভরা। তা'রা কোনওদিন 'নেটিভ-কোয়ার্টারে' আসতো না। কিন্তু মহাকবির মৃত্যু সেদিন তাদের উদভ্রান্ত করেছিল। তা'রা কলেজ স্ট্রীট, ঠনঠনে, শিমুলিয়া, চোরবাগান, পটলডাঙ্গা —সমস্ত ঘুরেছে, কিন্তু শবযাত্রার চিহ্নও দেখতে পায়নি!

আমরা কয়েকজন শ্মশানের মধ্যে কবির দেহ পাহারা দিচ্ছিলুম। কিন্তু কতটুকু আমরা? শবদেহ যা'রা আনল তা'রা কোথায়? শ্মশানের শেষকৃত্যের দায়িত্ব কা'রা নিচ্ছে? রবীন্দ্রনাথের নিজ পরিবারের লোকেরা কই? কোথায় রথীন্দ্রনাথ? কোথায় বিশ্বভারতীর কর্তারা, কোথায়ই বা ব্রাহ্ম সমাজের নেতা ও কর্মীরা? না, ধারে কাছে কেউ কোথাও নেই, কেউ নিচ্ছে না শবদেহের দায়িত্ব! হাজারে-হাজারে জনতা যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে কবির শব-দেহের চারপাশে,—তখন আত্মীয়-স্বজন বন্ধু পরিজন পার্শ্বচর অনুগ্রহপুষ্ট সুবিধাভোগী ধ'রে বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন—তাঁদের কেউ নেই আজ ধারে-কাছে!! চারিদিকের সেই প্রবল উত্তেজনায় এবং সেই উন্মত্ত জনতার ছেঁড়াছিঁড়ির মধ্যে কবির মৃতদেহটার শেষ দশা কি প্রকার ঘটেছিল, সে-দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দেখিনি। কিন্তু সেই উন্মত্ততা চারিদিকের সেই প্রবল উত্তেজনা, উন্মত্ততা ও কদাচারের মাঝখানে আমার দুই চোখ দিয়ে ঠিকরিয়ে বেরোচ্ছিল রোষবহ্নি! ক্ষুব্ধ ভাবে দাঁতের ওপর দাঁত ঘষে নিজেই বিড়-বিড় করছিলুম, এ বিশ্বাসঘাতকতা, এ চরম কলংক, একে ধিক্কার দিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে চলে যাও!

ওইটুকুর মধ্যেই একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। শ্মশানের সেই চাতালে জল থৈ-থৈ করছিল। পা পিছলিয়ে যাচ্ছিল কথায়-কথায়। ওরই মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুই পা ফাঁক ক'রে দুদিকে দু'হাত বাড়িয়ে অনেকের সঙ্গে আমিও শবদেহ পাহারা দিচ্ছিলুম। এমন সময় একটি প্যান্ট ও হাফশার্ট পরা ছোকরা সাঁতরিয়ে গঙ্গা থেকে উঠে এসে কবির শবদেহের কাছে যাবার চেষ্টা পাচ্ছিল। আমি তাকে বার-বার ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিলুম, আর সে বার-বার পিছলিয়ে ছিটকিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে ছেলেটা মরীয়া হয়ে উঠল। আমার মতন বাধাকে অতিক্রম করার জন্য সে ওই চাতালের ওপর উপুড় হয়ে সরীসৃপের মতো আমার দুই পায়ের ভিতর দিয়ে গ'লে যাবার চেষ্টা করল। সেই অবকাশটুকুর মধ্যেই লক্ষ্য করলুম ছেলেটা হাউ-হাউ করে কাঁদছে আর বিড়বিড় ক'রে কি যেন প্রলাপের মতো বকছে। এবার ছেলেটার সেই স্বগতোক্তি কান পেতে শুনলুম,—শালা, আমি শালা কুঠিঘাট থেকে সাঁতরে এলুম শালা...শালা...তুমি রবিঠাকুর...তুমি এরই মধ্যে বাংলা মায়ের কোল ছেড়ে চলে যাবে? —শালা...আমি এখানে জান দিয়ে চ'লে যাব, শালা—!

ছেলেটা সবেগে আমার পায়ের তলা দিয়ে উপুড় হয়ে তীরের মতো আরেকবার গ'লে যাবার চেষ্টা করতেই আমিও আরেক-বার তা'কে মেনি-বেড়ালের মতো ঘাড়ের কলাসি ধ'রে তুলে সরিয়ে দিলুম!

বাইরে যাবার সময় দেখে গেলুম আমারই মতো দুই অপরিণত-বুদ্ধি ও নিঃস্বার্থবাদী রবীন্দ্র-অনুরাগী বন্ধুকে,—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও পঙ্কজকুমার মল্লিক। ও'দের সেদিনকার শ্মশান-ভাষণ ও সংগীত বাঙ্গালীর কতক লজ্জা নিবারণ করেছিল।

সন্ধ্যারাত্রির পর সেই প্রথম দিনতিনেক বাদে নামল শ্রাবণ-বর্ষণ। সেই ধারা-বর্ষণে মহাকবির চিতা শীতল হয়েছিল। পরদিন সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল, ঠাকুর পরিবারেই নীতি অনুসারে মহাকবির মুখাগ্নি করেছিলেন।

*

সেই বছরেই কার্তিকের শেষে বিন্ধ্যা-চলের ছোট্ট জনপদের একটি বাড়ির ছাদের ঘরে নিভৃতবাস করছিলুম। একদিন মধ্যাহ্নে গঙ্গাস্নান সেরে উঠছি,—হঠাৎ একজন বয়স্ক সৌম্যদর্শন ব্যক্তি আমার পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন;

ও মশাই, কলঙ্কের কাহিনী কি ভুলেছেন এরই মধ্যে? বলি ও মশাই—

পিছন ফিরলুম। ভদ্রলোকের এই আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলুম না। কিন্তু কিছু বলবার আগেই তিনি আবার চেঁচিয়ে বললেন,—হ্যাঁ হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের মারা যাবার দিনের কথা বলছি। আপনি ছিলেন আগাগোড়া, সব দেখেছি,—স্বচক্ষে সব দেখেছি শ্মশানে!

দেখেছেন নাকি?

কিছু মনে করবেন না, আপনারা দেশের কলঙ্ক, জাতির কলঙ্ক। কবি আপনাদের একা নন, আমাদের সকলের। অপমানে সেদিন বাঙ্গালীর মাথা হেঁট ক'রে দিয়েছেন আপনারা।

সবিনয়ে বললুম, কি ব্যাপার, বলুন না খুলে?

ভদ্রলোক তবু উত্তেজিত। আবার তিনি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন,—খুলে বলব? ঢাকা আছে কিছু? আপনি বোধহয় একটু ন্যাকাই সাজছেন মনে হচ্ছে! আমি নিজে সবজান্তা লেখক হ'লে আপনাদের মুখোষ খুলে ধরতুম। মনে নেই কবির সেই সোনার দেহ শেয়াল-কুকুরের হাতে ছেড়ে দিয়ে আপনারা সব পালিয়ে ছিলেন দু' ঘন্টার জন্যে? জানেন না কি ঘটেছিল?

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালুম। ভদ্রলোক আবার বললেন, কবি বোধহয় মরবার আগে জেনে যাননি যে, আপনাদের মতন অপদার্থ, মেনিমুখো আর কাপুরুষের দল তাঁর উত্তরাধিকারী হবে। আর ওই শান্তি-নিকেতন? আপনাদের মতন ছুঁচো-ইঁদুররা ওর মধ্যে ঘুরবে, আর বাস্তুঘুঘুর দল বাইরে-বাইরে চ'রে বেড়াবে! দেখে নেবেন আমার কথা সত্যি কিনা। ধিক আপনাদের জীবনে, ধিক বাঙালীকে। কবি যদি আরও আশী বছর বাঁচতেন তাহলেও আমাদের মতন বনমানুষকে তিনি মানুষ করতে পারতেন না।—নমস্কার।

ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে বাজারের দিকে চলে গেলেন। লোকটার কিছু মাথার দোষ [illegible]

তার মুখ এত পরে স্পষ্ট করে দেখতে পেল সমীরণ। দেখল, চোখদুটো বড় বড়। চুল ঈষৎ কোঁকড়া এবং ঘন কালো। নীলাভ আলোয় সমীরণের মনে হল তার গায়ের রঙ খুব ফর্সা। চওড়া কপাল, বলিষ্ঠ পেশী। সে শুয়ে থাকলেও সমীরণ কল্পনা করে নিতে পারল তার দেহ বেশ দীর্ঘ।

এতক্ষণ অনেক মানুষ তার চারপাশ ঘিরে ছিল। ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখছিল। আগন্তুকদের মধ্যে কিছু মেয়েও ছিল। সম্ভবত কলেজের ছাত্রী। কেউ কেউ অনেক ফুল এনেছিল। সেইসব ফুল এখন স্তূপের মত হয়ে আছে তার মাথার কাছে, এপাশে-ওপাশে। সমীরণ ফুলের গন্ধ পাচ্ছিল এবং এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার দিকে।

তার খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল। এক-একবার সে তার হাটু চেপে ধরে অস্ফুট আর্তনাদ [illegible]

মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, ডাক্তাররা প্রায়ই তার খবর নিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখতে দেখতে ভিতরে ভিতরে বড় অবসন্ন হয়ে পড়ছিল সমীরণ। চৈত্রের বিকেল অল্প অল্প করে সবে নিভে গেছে। আজ সারাদিন বড় গরম ছিল। একটু আগে ঝড়ের মত দমকা হাওয়া উঠেছিল। উঠেই থেমে গেছে। এখনো ভাল করে অন্ধকার হয়নি তবুও আলো জ্বলে উঠেছে। শুয়ে শুয়ে সমীরণ দেখতে পাচ্ছিল হাসপাতালের কম্পাউন্ডে ছোট একটা গাছের মাথায় নিওনের রেখা ছিটকে পড়েছে। শুয়ে থাকতে সমীরণের আর ভাল লাগছিল না কিন্তু উঠে বসবারও ক্ষমতা ছিল না তার। সমীরণের মনে হচ্ছিল একখন্ড জ্বলন্ত অঙ্গার তার পেটের ভেতরে দপদপ করছে। বারবার তার জল খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল। নার্স অনেকক্ষণ [illegible] কাছে আসেনি অথচ সে আকণ্ঠ তৃষ্ণা

চেপে রেখে চুপচাপ শুয়েছিল। আর এক-একবার কাতর চোখ মেলে দেখছিল তার পাশের বেডের মানুষটিকে। সে সমীরণের সমবয়েসীই হবে বোধহয়। জ্বলন্ত অঙ্গার-খন্ডের মত একটা অনুভূতি পেটের ভেতরে ধকধক করে উঠলেও যন্ত্রণায় কোনরকম স্বর এখনো বেরিয়ে আসেনি সমীরণের মুখ থেকে। সে তার জ্বালাকে এক অমিত বিক্রমশালী যুবকের মত অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টা করছিল মনে মনে। এবং তা করতে করতে তার মনে হচ্ছিল সে একটা শত্রুশিবিরে সৈন্যসামন্ত পরিবেষ্টিত [illegible] অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছে।

সমীরণ জানত বাইরে দুজন পুলিশ বসে বসে তাকে পাহারা দিচ্ছে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সে বাড়ি যেতে পারবে না, তাকে যেতে হবে [illegible]। এবং পরে আদালতে তার বিচার [illegible]

হবেই এমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সমীরণের। আর জেল হলে মার বুকের ব্যথাটা আরো অনেক বেড়ে যাবে। খাওয়া-দাওয়া সব ছেড়ে দেবে মা—শুধু কান্নাকাটি করে দিন কাটাবে।

মা-র ভাবনা মনে উঠতেই একটু বিষণ্ণ হয়ে পড়ল সমীরণ। তার পেটের মধ্যে জ্বলন্ত অংগারখন্ডটা আবার যেন নতুন করে দপদপ করে উঠল। মা-র করুণ মুখটা বার-বার মনে পড়তে লাগল তার। সমীরণ যে পুলিশের গুলীতে আহত হয়ে হাসপাতালে আছে, মা এখনো সে খবর পেয়েছে কি-না তা সে জানে না।

সমীরণ ভাবল, সম্ভবত মা-কে খবর দেয়া হয়নি। খবর পেলে মা একবার না একধার আসত তাকে দেখতে—তার খবর নিতে। আর এখানে এই অবস্থায় তাকে দেখতে দেখতে মা-র চোখ থেকে টপ্‌টপ করে জল পড়তই। কেন পড়ত তা যেন এখন একটা অসহ্য যন্ত্রণা পেটের মধ্যে বহন করতে করতে এখানে একা শুয়ে-শুয়ে সমীরণ বড় স্পষ্ট করে বুঝতে পারে। সে ছাড়া আর কেউ নেই তার। রোগে ভুগে ভুগে একরকম বিনা চিকিৎসায় বাবা মরেছে বছর কয়েক আগে। সে-বছরেই উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা ছিল সমীরণের। এবং সে পাশও করেছিল। কলেজে পড়বার খুব ইচ্ছে থাকলেও তা সম্ভব হয়নি। পয়সাকড়ি আর কিছুই তো ছিল না। তখন সবচেয়ে বেশী করে দরকার ছিল একটা চাকরির। সমীরণ বহু মানুষের কাছে গেছে, পাগলের মত ছুটোছুটি করেছে। কিন্তু তার জন্যে কোন চাকরি কোথাও খালি ছিল না। মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের অস্তিত্বটাই বড় লজ্জাকর মনে হত সমীরণের। এবং সে তার রক্তের ভিতরে একটা প্রবল চাপ অনুভব করত।

যে মানুষটি শুয়েছিল সমীরণের পাশের বেডে তার মুখ থেকে কাতর একটা ক্ষীণ শব্দ উঠতেই একটি অল্পবয়েসী নার্স দ্রুত পায়ে তার কাছে এসে ঝুঁকে পড়ল প্রায় মুখের ওপর। এবং খুব মিষ্টি করে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, 'কী কষ্ট হচ্ছে?'

হাসবার চেষ্টা করে সে বলল, 'না-না, ব্যস্ত হবেন না। হঠাৎ হাঁটুটার ভিতরে কট করে উঠল।'

'অপারেশনের পর একটু ব্যথা-ট্যথা থাকে দু-চারদিন। খুব গরম পড়েছে তো। কাল সকালে ব্যান্ডেজ বদলে দিলে অনেক আরাম পাবেন।'

'খুব আরামেই তো আছি। আপনারা যা করছেন!' সে একটু থেমে নার্সের মুখের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকল কিছু সময়। আর তাকিয়ে থাকতে থাকতে চাপা একটা উত্তেজনায় তার মুখ ঈষৎ বিকৃত হয়ে এল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'দিদি, যে গুলীটা বার করেছে ডাক্তার আমার হাঁটু চিরে ফেলে—আপনি সেটা দেখেছেন নাকি?

'কোন দেশের ছাপ ছিল গুলীটায় জানবার ইচ্ছা হয়।'

নার্স হেসে বলল, 'বেশ তো, কাল ডাক্তার মৈত্রকে জিজ্ঞেস করে আপনাকে বলব।'

'না-না, থাক—' সে শুকনো হাসল, ওসব জেনে লাভ কী! আচ্ছা দিদি, কবে ছাড়তে পারবেন আমাকে?'

'বেশীদিন আটকে রাখব না—' নার্স তার মাথার বালিশটা ঠিক করে দিতে দিতে বলল, 'চুপচাপ শুয়ে থাকবার চেষ্টা করুন তাহলে খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে ছাড়া পেয়ে যাবেন।'

সে নার্সের কথা মেনে চলবার চেষ্টা করলেও একটু ছটফট করল। একবার তাকিয়ে দেখল সমীরণের দিকে। একটু উত্তেজিতও হয়ে উঠল যেন। নার্স ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আস্তে শুধু বলল, 'ঘুমোন।'

'ঘুমাতে পারি না দিদি। ঘুম আসবে কেমন করে বলেন? দেশটাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে জানোয়ারেরা। মা-বোনকে দিনে-দুপুরে বে-ইজ্জত করছে—'

নার্স তার এইরকম উত্তেজনা দেখে বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, 'আপনারা তো উচিত শিক্ষাই দিচ্ছেন ওদের। কিন্তু দয়া করে এখন ওসব ভাববেন না, আরো অসুস্থ হয়ে পড়বেন।'

সে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। আস্তে আস্তে চোখ দুটো বড় করুণ হয়ে এল তার। মৃদু এক ভাবপ্রবণতায় আচ্ছন্ন হয়ে সে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকল। এক-একবার এখনো সে তার ব্যান্ডেজ বাঁধা হাঁটুতে হাত বুলোবার চেষ্টা করছিল।

নার্স কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকল তার খাটের কাছে। কপালে হাত ছুঁইয়ে সে তার দেহের তাপ পরীক্ষা করল। এবং দেখল তার গোটা ডান পা-টাই ফুলে উঠেছে। দেখতে দেখতে ঈষৎ গম্ভীর হয়ে গেল নার্স। হয়তো ডাক্তারের সংগে আলোচনা করবার জন্যেই আস্তে আস্তে সরে গেল তার কাছ থেকে।

এত সময় পাশের খাট থেকে সমীরণও তাকিয়েছিল তার দিকে। সে খুব মন দিয়ে নার্সের মিষ্টি-মিষ্টি কথাও শুনছিল। দুজনের কথাবার্তা শুনতে শুনতে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল সমীরণ। তার দৃষ্টিও একটা উৎসাহে ভরে যাচ্ছিল।

এখন বাইরে বেশ অন্ধকার। হাওয়ায় নানারকম কড়া ওষুধের গন্ধ সমীরণের নাকে এসে লাগছে। এই ওয়ার্ডেই অনেক রুগী কাতরে উঠছে থেকে থেকে। সমীরণও চিৎকার করে উঠতে চাচ্ছিল কিন্তু এখানকার কাউকে যন্ত্রণাকাতর মুখ দেখাতে তার আত্মসম্মানে বাধল। প্রাণহীন একটা পদার্থের মত স্থির হয়ে থাকল সমীরণ।

নার্স তার খুব কাছেই ছিল এতক্ষণ। সে পাশের মানুষটির সঙ্গে কথা শেষ করে যখন চলে যাচ্ছিল তখন সমীরণ তাকে তার

কিন্তু তা বলবার ইচ্ছে হল না সমীরণের। তার এত কাছে এইরকম একটা মানুষকে পেয়ে সে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল—এত বিমূঢ় যে ক্ষুধা কিম্বা তৃষ্ণার কথা তার আর মনেই ছিল না। এখনো সমীরণের দৃষ্টি ছিল তারই দিকে।

এই মানুষটির পরিচয় এখন মনে মনে পেয়ে গিয়েছিল সমীরণ। যদি গুলী খাওয়ার যন্ত্রণায় সে দিশাহারা না হয়ে পড়ত এবং সারাদিন একটা ঝিম-ঝিম ভাব তাকে অস্বস্তি না দিত তাহলে তাকে যখন অনেক সম্ভ্রান্ত মানুষ বহন করে নিয়ে এল তখনই সমীরণ বুঝে নিতে পারত সে কে।

ওপারের আহত অনেক সৈনিক নিরুপায় হয়ে ছিটকে এসেছে এপারে। সরকারী হাসপাতালগুলো ভরে উঠছে। একটা মানবিকবোধেই এপারের মানুষেরা তৎপর হয়ে উঠছে এদের সেবায়। সমর্থন করছে এদের মহৎ উদ্যম। সমবেদনা জানাচ্ছে। সমীরণ এসব জানে।

এবং জানে বলে যন্ত্রণার সংগে সংগে একটা বেদনাও হঠাৎ আস্তে আস্তে তার মনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল। মরবার ভয় তারও নেই। সে-ও দুঃসাহসী। রাজনীতির জন্যে সে জীবনকে তুচ্ছ করেছে অনেকবার। সমীরণ পাশের বেডের মানুষটার দিকে তাকিয়ে ভাবল, এসব কথা কি সে জানে? তার মনে ঈর্ষার একটা অনুভূতিও হচ্ছিল।

সমীরণের ইচ্ছে হচ্ছিল চিৎকার করে তার পাশের বেডের লোকটাকে বলে, আমিও গুলী খেয়েছি। জানের পরোয়া না করে আমিও রাজনীতি করতে নেমেছি—যুদ্ধ করে এসেছি যারা দেশটাকে রসাতলে দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে।

এসব ভাবতে ভাবতে মনে মনে একটু বেশীমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল সমীরণ এবং সেই কারণেই পরে সে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তার গলা ঠেলে বমি উঠে আসছে, বুকটা খালি-খালি লাগছে। শীর্ণ চোখে এপাশে-ওপাশে তাকিয়ে দেখল সমীরণ—তার চেনাশোনা কেউ নেই।

মা খবর পেলে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে নিশ্চয় একবার তার কাছে আসত। কিন্তু আর কেউ যে তাকে দেখতে আসবে না সেকথা সমীরণ বেশ ভাল করেই জানে। কারুর আসবার উপায়ও নেই। তার কাছে কেউ এলে পুলিশ তার পিছনে লাগবে—গ্রেপ্তার করেও রাখতে পারে।

এসব জানলেও সমীরণের মনটা বড় কোমল হয়ে এল। তার চেনাশোনা কেউ কাছে এলে বড় ভালো লাগত এখন। সে তো না-ও বাঁচতে পারে আর। কে জানে, দু-একদিনের মধ্যে এই হাসপাতালেই সে শেষ হয়ে যেতে পারে। মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতেও একটা নিষ্ঠুর উল্লাস অনুভব করল সমীরণ। সে মরলে খুব জব্দ হয়ে যাবে পুলিশ।

এলাকাতা তৃষ্ণার স্বাদ বেশীক্ষণ গ্রহণ

আলো হঠাৎ ম্লান হয়ে এসেছে। বাইরে হাওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দ হচ্ছে। বড় চুপচাপ হয়ে গেছে চারপাশ। শুধু রাস্তার একটা কুকুর অনেক দূরে একসুরে ডেকে যাচ্ছে।

'মা—' অস্ফুট উচ্চারণে সমীরণের একবার ডাকবার ইচ্ছে হল। শেষের দিকে যদিও মা-র ওপর তার বেশী টান ছিল না। রাজুদা তাকে বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছে যে মায়ের সুবোধ সন্তান হয়ে থাকলে এ যুগে রাজনীতি করা চলে না। সব ঠেলে ফেলে জীবনপণ করে কাজে নামতে হবে—তবেই সার্থক হবে শ্রম।

চাকরি পাওয়ার আশা যখন একরকম ছেড়ে দিয়েছিল সমীরণ—একটা অবসাদ তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল হতাশায় গহন অন্ধকারে ঠিক সেই সময় রাজুদা তাকে বেঁচে থাকবার নতুন রাস্তাটা চিনিয়ে দেয়। এবং বেশ ভাল করেই বেঁচে ওঠে সমীরণ।

'কে এখন চাকরি দেবে তোকে?' একটা ক্রূর হাসি খেলে যায় রাজুদার ঠোঁটে, 'কুত্তার বাচ্চারা নিজেদের পকেট ভরতেই ব্যস্ত। পলিটিক্স করে বোঝবার চেষ্টা কর গলদটা কোথায়। ব্যস, তারপর তোর হাতেই সব। সময় হলে দেখবি শালারা বাপ-বাপ বলে চাকরি দেবে।'

সমীরণ মন্ত্রমুগ্ধের মত প্রশ্ন করে, 'দেবে?'

'না দিয়ে যাবে কোথায়! আরে, দুর্নীতি দমন করার জন্যেই তো আমাদের সংগ্রাম। সুদিন আনতেই হবে—বুঝলি?'

সমীরণ স্পষ্ট করে কিছু না বুঝলেও রাজুদার চোখে-মুখে দৃঢ়-সংকল্পের ছাপ দেখে সে ভিতরে ভিতরে একটা জ্বলন্ত আশা পোষণ করে এবং বেশ জোরে বলে ওঠে, 'আপনি যা বলবেন আমি তা-ই করব।'

'আমি কে রে!' অমায়িক হাসি হেসে রাজুদা বলে, 'চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছিস না কী অবস্থা হয়েছে দেশটার? শালারা যার যা খুশী করে যাচ্ছে—' কথা বলতে বলতে বড় কঠিন হয়ে ওঠে রাজুদার মুখ, 'মরে তো আছিই আমরা, কাজেই মরার ভয় আর আমাদের নেই। লড়ে যা!'

টুকরো-টুকরো স্মৃতির আমেজে চোখ বন্ধ হয়ে এসেছিল সমীরণের। একটু-একটু ঘুমও বোধহয় আসছিল। শরীরটা অবশ হয়ে আসছে। ঘুমের মত মনে হলেও সমীরণ জানত এত সহজে সে ঘুমিয়ে পড়তে পারবে না। পেটের ভেতর আবার ধক-ধক করে উঠবে—ঘুম ছুটে যাবে।

ব্যথার কথা মনে হতেই চোখ খুলল সমীরণ। খুলেই দেখল তার বিছানার পাশে একটা পুলিশ এসে দাঁড়িয়েছে। যে-দুজন বাইরে বসে তাকে পাহারা দিচ্ছে বোধহয় তাদেরই একজন। তাকে দেখে ব্যথা-টাথার কথা ভুলে গেল সমীরণ। তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

সমীরণ ভাবল, একটু [illegible] করে কর্তব্য করবার চেষ্টা করছে পুলিশটা। বোধহয় এই ভেবে ভয়-[illegible] আছে যে [illegible]

এখান থেকে জানলা টপকে সে পালিয়ে যেতে পারে।

এইরকম ভাবনার ভিতরে একটা তৃপ্তিও অনুভব করল সমীরণ। তার ভাবনায় পুলিশের ঘুম ছুটে যায়। সমীরণ একটু চেষ্টা করে পাশের বেডের মানুষটিকে দেখল। জেগেই আছে সে। সমীরণের মাথার কাছে একটা জলজ্যান্ত পুলিশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সম্ভবত খুব অবাক হয়ে গেছে। সে এদিকেই তাকিয়েছিল।

তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে রুক্ষস্বরে সমীরণ পুলিশকে জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

তার প্রশ্নে হঠাৎ চমকে উঠে পুলিশ বলল, 'চুপচাপ শুয়ে থাক।'

সমীরণ জোরে বলে উঠল, "শুয়ে থাকব না তো কি আপনার গলা বাড়িয়ে ধরে নাচব?"

পুলিশ হাসল, "নাচতে ইচ্ছে করছে নাকি?"

"এখান থেকে যান। আমি ঘুমব। কেন এসেছেন ভেতরে?"

"চট কেন? কেমন আছ জানতে এসেছিলাম—"

সমীরণ বলল, "খুব ভাল আছি। আজ রাতে আপনার যখন একটু ঢুলুনি আসবে তখনই কাট লাগাব এখান থেকে—বুঝেছেন?"

"হুঁ," পুলিশের মুখ অপ্রসন্ন হয়ে এল। সে আর কথা না বাড়িয়ে আবার বাইরে এসে বসল।

সমীরণ দেখল পাশের বেডের মানুষটি তখনো তাকিয়ে আছে তার দিকে। আলাপ করবার ছলে অল্প অল্প হাসছে। সমীরণও হাসল। এদিকে নার্স-টার্স কেউ নেই। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। একটু শীত শীত লাগছিল সমীরণের।

সেই প্রথম কথা বলল, "কেমন আছেন?"

"ভালই তো—" ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতটার দিকে আর একবার তাকিয়ে সমীরণের পাশের বেডের মানুষটি সাবধানে তার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, "আপনার কোথায় চোট লেগেছে?"

"আমিও গুলির খদ্দের। শালারা গুলি পেটে লেগেছিল—"

"কারা গুলি করল?"

সমীরণ লক্ষ করল পাশের বেডের মানুষটি তার উত্তর শোনবার জন্যে বড় অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে। তার এই রকম উৎকণ্ঠা খুব ভাল লাগল সমীরণের। এতক্ষণে সে নিজের বীরত্ব জাহির করতে পারবে—তাকে বুঝিয়ে দেবে যে সেও গুলি-টুলি গ্রাহ্য করে না।

সমীরণ অল্প হেসে বলল, "পুলিশ ছাড়া আবার কে গুলি করবে আমাকে। দেখলেন না এক বেটা ঘুরে গেল একটু আগে? শালা আমাকে পাহারা দিচ্ছে বাইরে বসে।"

সমীরণের কথা তার কাছে বোধহয় খুব দুর্বোধ্য মনে হল। কেননা সে বেশ কিছু সময় চুপচাপ তাকিয়ে থাকল তার মুখের দিকে। সব জানবার একটা অদম্য কৌতূহলে তার চেহারা বেশ তীক্ষ্ন হয়ে উঠেছিল। ঘরের শেষ প্রান্তে এক রুগী হঠাৎ খুব জোরে আর্তনাদ করে উঠল। ওদিকটা অন্ধকার। কিছু দেখা গেল না।

কিছু পরে সমীরণই আবার বলল, "আমি রাজনীতি করি কি-না তাই হঠাৎ একটা ঝামেলায় পড়েছিলাম।"

রাজনীতির কথা শুনে অন্য আর এক-জনের মুখ থেকে বিস্ময়ের রেখাটা মুছে গেল। সে বেশ অন্তরঙ্গ স্বরে বলল, "আপনাদের খবরের কাগজ আমাদের হাতে পড়ত না। আমার বাড়ি যশোহর। আমি কলেজের ছাত্র। খবর রাখতাম যে আপনাদের এখানে রাজনীতির চর্চা খুব জোর চলেছে—"

"চলবেই। দেশের যা অবস্থা! আমরাও আপনাদের মত জান কবুল করে উঠে পড়ে লেগেছি—" একটা উত্তেজনার ঘোরে গলার স্বর অনেকটা তুলেছিল সমীরণ, হঠাৎ সতর্ক হয়ে একেবারে চুপ হয়ে গেল। এসব কথা এত জোরে বলবার জায়গা এটা নয়। কেউ শুনে ফেললে সে-ই মুশকিলে পড়বে।

পরে সমীরণ নিচু গলায় পাশের বেডের মানুষটিকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার কী নাম?"

"মীরণ—" সে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে আরো স্পষ্ট করে বলল, "মীরণ ফজলার রহমান।"

'কী পড়তেন?' নিজের নামের সংগে তার নামের মিল আছে দেখে খুশী হয়ে সমীরণ জিজ্ঞেস করল।

"বি-এ—আমি আর্টসের ছাত্র—" একটু থেমে মীরণ পাল্টা প্রশ্ন করল সমীরণকে, "আপনিও ছাত্র বোধহয়, না?"

"না-না, সেসব চুকে গেছে। আমি এখন রাজনীতি নিয়েই আছি"—হাসবার চেষ্টা করল সমীরণ।

"ভালই তো"—মীরণ একটু উঠে হাতের ওপর মাথা রাখল, "একবার মন দিয়ে রাজনীতির চর্চা শুরু করলে আর কিছু করতে ইচ্ছা হয় না। বহুদিন আমরা শান্তিতে পড়াশুনা করতে পারি নি। বুঝলেন দাদা, ঠকতে ঠকতে ভিতরে-ভিতরে সকলেই ক্ষেপে উঠেছিল। তাই রুখে দাঁড়াতে দেরী হয় নি আমাদের।"

"তাই তো দেখছি—" এবার সমীরণও একটু কৌতূহলী হয়ে উঠল, "আপনারা কি আগে থেকেই যুদ্ধের জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন?"

ইতস্তত করল না মীরণ। সমীরণের কথা শেষ হতেই বলল, "মনে মনে ঠিক করেছিলাম ওদের বাধা দেব—আমাদের শ্রমের ফসল ওদের আর লুঠ করে নিয়ে যেতে দেব না। জানতাম ওরাও জোর করে কেড়ে নিয়ে যেতে চাইবে—"

"তাই তো হল।"

"হ্যাঁ, তাই যুদ্ধও হল—" মীরণ তার আঘাতের কথা ভুলে একটা তেজী যুবকের মত মাথা তুলে বলল, "যুদ্ধ-টুদ্ধ আমরা চাইনি, তবে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। শুধু আমাদের মত ছেলেরা নয়, গোটা বাংলাদেশের সব মানুষ মনে মনে ওদের বাধা দেয়ার জন্যে পুরোপুরি তৈরি হয়ে নিয়েছিল।"

"বেশ করেছিল—" সমীরণ যেন নিজে মীরণেরই মত আর একজন যোদ্ধা এমন ভাব করে বলল, "অত্যাচার সহ্য করতে-করতে মানুষ এক সময় মরীয়া হয়ে ওঠে, তখন তার আর ভয়-ডর থাকে না, সে হাতির বল পায়।"

"ঠিক ঠিক—" কাতর একটা শব্দ করে কিছু সময় চুপ করে থাকল মীরণ, পরে আবার বলল, "আমরা হাতীর বলই পেয়েছি। অস্ত্রশস্ত্র বেশী কিছু নাই আমাদের, শুধু মনের বলই ভরসা।"

বিজ্ঞ একটা মানুষের মত সমীরণ বলল, "অস্ত্রশস্ত্রের চেয়ে তার দাম অনেক বেশী।"

"খুব ঠিক কথা।"

ওরা আস্তে আস্তে কথা বললেও চারপাশ একেবারে নীরব হয়ে গেছে বলে ওদের স্বর আছড়ে পড়ছিল এদিকে-ওদিকে। আশেপাশের কোন-কোন রুগীর বোধহয় ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছিল, চোখ পিট পিট করে ওরা দেখছিল এদের দিকে। চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে কিছুদূর থেকে একজন নার্সও ওদের দেখল। বোধহয় সমীরণ বলেই কাছে এসে ধমকাতে সাহস পেল না। একটু পরেই দপ করে সব আলো নিভে গেল।

রোজ ঠিক এই সময় হাসপাতালের এই ওয়ার্ডের সব আলো নিভিয়ে দেয়া হয়। সমীরণ বুঝল এখন রাত আটটা হয়েছে। হঠাৎ আলো নিভে যাওয়ায় অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে উঠল। খুব কাছাকাছি থাকলেও মীরণের মুখ স্পষ্ট করে দেখতে পেল না সমীরণ।

এখন ঘুমের সময় হলেও চোখ বন্ধ করে সমীরণ চুপচাপ পড়ে থাকতে পারবে না। মীরণের সংগে আরো কথা বলার একটা জেদ চেপে গিয়েছিল তার। এবং এতক্ষণ বকেছে বলে তার গলাও শুকিয়ে এসেছিল, আবার জল খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল।

কিন্তু এবারেও তৃষ্ণা দমন করে মীরণের অন্ধকার বিছানার দিকে তাকিয়ে সমীরণ আস্তে জিজ্ঞেস করল, "ঘুম পাচ্ছে নাকি আপনার?"

"না-না, ঘুম-টুম কবে ছুটে গেছে। এখান থেকে ছাড়া পেয়ে ঠিক জায়গায় আবার ফিরে যেতে পারলে বাঁচি!"

"আবার যুদ্ধ করবেন?"

"করব না?" অল্প অল্প হাঁপাচ্ছিল মীরণ, "আমার এই পা-টা কেটে বাদ দিলেও আমি আবার বন্দুক ধরব। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে অন্তত একটা হানাদারকে—পাকিস্তান সরকারের একটা দালালকে খতম করব। আমাকে যেতেই হবে"।

অন্ধকার চোখে সয়ে গিয়েছিল সমীরণের। সে এখন মীরণের মুখ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। তার দৃঢ় স্বর শুনে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকল সমীরণ। সে ভাবল, সেরে ওঠার জন্যে অধীর মীরণ—যুদ্ধ করবার জন্যে ব্যাকুল। সমীরণ আপন মনে তারও একটা রণক্ষেত্র খুঁজে ফিরছিল। কিন্তু হঠাৎ তার চোখের সামনে এবং মনের ভিতরে সব কিছু যেন ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় ঝাপসা হয়ে গেছে।

সমীরণের আরও মনে হল, মীরণের মত তার জন্যে বিশেষ কোন রণক্ষেত্র নেই। তাকে সাহায্য করবার জন্যে লক্ষ মানুষের গড়া মুক্তিফৌজ নেই। এবং তার অগ্রগমনের জন্যে আপামর জনসাধারণের অকুণ্ঠ উৎসাহ ও আত্মত্যাগ তো নেই-ই।

সমীরণ খুব নরম স্বরে মীরণকে জিজ্ঞেস করল, "জখম হলেন কেমন করে?"

মীরণ হাসল, "হঠাৎ একটু বে-কায়দায় পড়ে গিয়েছিলাম—" কথা বলতে বলতে স্বর দৃঢ় হয়ে এল তার, চোখে তেজ ঝলসাতে লাগল, "আমাদের যশোহর আমাদেরই দখলে ছিল—জন্মভূমিকে রক্ষা করবার জন্যে আমরা জান দিয়ে লড়ছিলাম—"

"তারপর?"

"শয়তান দালালরা পিছন থেকে ছুরি চালাল"—একটু দম নিয়ে বলতে লাগল মীরণ, "এক রাতে ঐ দালাল গুণ্ডারা গেরস্থ বাঙালীদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে ছারখার করে দিল—পথ চিনিয়ে নিয়ে এল হানাদারদের। ব্যস, শুরু হল খুন, জখম, মা-বোনের ওপর অত্যাচার। আমরা বাধা দিলাম। একটা রেজিমেন্ট ঘিরে ফেলল ওদের।"

সমীরণ আবার বলল, "তারপর?"

"আগেই বলেছি আমরা জান দিয়ে লড়ছিলাম। অত গোলাগুলি বারুদ থাকলেও ওরা পিছু হঠছিল আমাদের বেপরোয়া আক্রমণে—" এতটা বলে মীরণ লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বড় আস্তে বলল, "ওদের গুলি লাগল আমার পায়ে। অন্ধকারে পড়ে গেলাম। গলগল করে খুন ঝরতে লাগল। প্যান্ট-মোজা সব ভিজে গেল। মাথার ভিতর সোঁ সোঁ করছিল, চোখ বুজে এল—"

বালিশটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে একদিকে হেলে পড়ল মীরণ। একটু বিশ্রাম নিয়ে থেমে থেমে পরে বলল, "একটা পরিবার বুঝি ভয়ের চোটে তল্পীতল্পা নিয়ে ভাগছিল আপনাদের এপারে—মনে হয়, তারাই ধরাধরি করে নিয়ে আমাকে—"

মীরণ ম্লান হাসল, "আমার জান আপনারাই তো বাঁচালেন।"

সমীরণ প্রশংসা করার মত বলল, "আপনার প্রাণের দাম কত!"

"আর আপনার জানের বুঝি দাম নাই?" হাল্কা হাসল মীরণ, পরেই ঈষৎ ভারী স্বরে প্রশ্ন করল, "পুলিশের গুলি কেমন করে লাগল আপনার গায়ে? এবার আপনার খবর বলেন।"

অন্ধকারে হয়তো দেখতে পেল না মীরণ, করুণ একটা আভা সমীরণের মুখে থম থম করে উঠল। সে স্থির করতে পারল না মীরণের প্রশ্নের উত্তরে কী বলবে। সমীরণ চুপ করে থাকল। মীরণ যেমন করে বলে গেল তার কাহিনী তেমন কোন মহান যুদ্ধের কথা সে-ও যদি বলতে পারত তাহলে তার পেটের ভিতরে যে ব্যথা ধকধক করে উঠছে তা বোধহয় অনেকটা কমে যেত। কিন্তু সেইরকম কিছু ঘটে নি তার জীবনে।

সমীরণ জানে স্বীকারোক্তি করিয়ে নেয়ার জন্যে হয়ত তার মত ছেলের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করা হবে। এখন যদিও কেউ কোনরকম অত্যাচার করছিল না তবুও সমীরণের মনে হচ্ছিল মীরণের ছোট একটা প্রশ্ন তার দেহ ও মনকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে। সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের দীর্ঘ কাহিনী শোনাবার আন্তরিক ইচ্ছায় তার মন উন্মুখ হয়ে উঠলেও গভীর হতাশায় সে অনুভব করল তার ঝুলি একেবারে শূন্য—মীরণকে বলবার মত তার কিছু নেই।

এই ওয়ার্ডের কাছাকাছি হাসপাতালের কোন অন্ধকার গাছে একটা পেঁচা দু-একবার কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল। চোখ দুটো আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে আসছে সমীরণের, কড়া ওষুধের গন্ধে নাক জ্বলে যাচ্ছে। সে বিমূঢ় হয়ে যাচ্ছিল। থুতু জমে উঠছিল তার জিবে। যেন অনেক কষ্ট করে তা গিলে ফেলে সে তার শুকনো গলা ভিজিয়ে নিল।

আবছা অন্ধকারে মুক্তিফৌজের এক আহত সৈনিকের খুব কাছে শুয়ে সমীরণ ম্লান মুখে ভাবছিল তার রণাঙ্গন যশোহর নয়, মাত্র কয়েকদিন আগে সে গুলি খেয়েছে এখানে—এই কলকাতায়। রাতে নয়, সকাল এগারোটার আগে-আগে। রাস্তায় অনেক মানুষের ভিড়। বাস ট্রাম ট্যাক্সি গাড়ি হু-হু করে ছুটে যাচ্ছিল।

একটা ছেলেকে ধরবার চেষ্টা করছিল সমীরণ। সে নাকি লুকিয়ে-লুকিয়ে রাজুদার নামে পুলিশের কাছে লাগিয়েছে। ছেলেটার নাম নন্দ, একটু দূরে ট্রাম ডিপোর কাছাকাছি সে থাকে। তবে টিকটিকির কাজ করবার পর থেকেই বেশ সাবধান হয়ে গেছে নন্দ, ট্রামে আর কলেজে যায় না। গলি-ঘুঁচি দিয়ে কিছু দূরে পিছিয়ে গিয়ে বাস ধরে। দু-চারদিন চেষ্টা করেও নন্দকে ধরতে পারে নি সমীরণ।

ট্রাম ডিপোর কাছাকাছি বাঁকা আর তিনুর সঙ্গে বাস স্টপেজে সমীরণ দাঁড়িয়েছিল। পাশেই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। আজ ধরতেই হবে নন্দকে—রাজুদার ডেরায় নিয়ে যেতেই হবে তাকে।

নন্দর বাস এ রাস্তা দিয়েই যাবে। আজ সমীরণের দলও পুরোপুরি তৈরি। নন্দ যাতে দেখতে না পায় এমনভাবে তাকে অনুসরণ করেছে লালু। সে-ও ওই এক বাসে উঠবে। তারপর বাসটা এখানে দাঁড়ালেই চিৎকার করে খবর দেবে সমীরণকে।

এই জায়গাটা ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছে সমীরণ। এখানে অনেক লোক ওঠে, নামে। সব বাস এখানে থামবেই। রোদ বড় কড়া। একটা ছায়া-ছায়া জায়গায় দাঁড়িয়েছিল বাঁকা তিনু আর সমীরণ। এক-একটা বাস এসে দাঁড়াচ্ছিল আর ওরা তিনজনেই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে লক্ষ করছিল, চঞ্চল হয়ে উঠছিল।

"এই যে, শালাকে পেয়েছি—" বাসের ঘণ্টার দড়ি শক্ত হাতে টেনে রেখে সমীরণ বাঁকা আর তিনুকে বলল লালু।

"এই নাম—" ওরা তিনজন উঠে পড়ল ভিড়ের বাসে লাফ দিয়ে, নন্দকে সীট থেকে গায়ের জোরে টেনে তুলে বলল, "একটা কথা বলবি কি ফিনিশ করে দেব"—

কান্না-কান্না গলায় নন্দ মিনতি করার মত বলল, "আমাকে মাপ করুন, কালীর দিব্যি আমি কিছু করি নি—"

"নাম শালা, নাম।"

'আপনাদের পায়ে ধরছি আমাকে ছেড়ে দিন—'

'চোপ!' নন্দকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল এই চারজন বেপরোয়া ছোকরা।

বাসসুদ্ধ লোক প্রথমে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, বাধা দেয়ার কিম্বা একটা কথা বলার সাহস কারুর ছিল না। ওরা নির্বাক দর্শকের মত শুধু দেখছিল দিনের প্রখর আলোয় ওদেরই চোখের সামনে একজন যাত্রীকে গায়ের জোরে বাস থেকে নামান হচ্ছে।

এক মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক একটু যেন বিরক্ত হয়েই কণ্ডাকটারকে বলল, 'বেলটা দিন না মশাই, অফিসের সময়—'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই তাকে তাড়া দিয়ে সমীরণ বলে উঠল, 'থামুন, এক চুল নড়লে জ্বালিয়ে দেব বাস—'

নন্দকে ঠেলে একটা ট্যাক্সিতে তুলল ওরা। আর কোন প্রতিবাদ জানাল না নন্দ। ভয়ে তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। ওদের হুকুম মত স্টার্ট দিয়েছিল ড্রাইভার। আর একটু হলেই নন্দকে রাজুদার ডেরায় এনে তুলতে পারত সমীরণের দল।

কিন্তু যা কখনো হয় না, হঠাৎ তাই হল। হুড়মুড় করে একসঙ্গে নেমে এল বাসসুদ্ধ লোক। সেই ট্যাক্সিকে ঘিরে ফেলে চিৎকার করে উঠল, 'দিনের আলোয় এত বাড়াবাড়ি! ধর শালাদের, এই নেমে আয়! পিটিয়ে পাছার ছাল তুলে দেব।'

একজন সমীরণের কলার চেপে ধরতেই সে ধাঁ করে তার মুখে মারল এক ঘুষি, তারপর মুহূর্তে পিছিয়ে এসে পকেট থেকে হাত-বোমা বের করে পর পর দুটো ছুঁড়ে মারল বাসটার গায়ে। বোমার আওয়াজ হতেই লোকগুলোর মেজাজ হিম হয়ে গেল, যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল।

সমীরণও ছুটছিল। এখনো সে শুনছিল দূর থেকে কিছু লোক চিৎকার করছে, 'ধর ধর, মেরে ফেল শালাকে—'

এই সময় ঝোঁকের মাথায় একটু ভুল করেছিল সমীরণ। ইচ্ছে করলে একটা পাঁচিল টপকে সে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারত। কিন্তু নন্দ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় তার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। যে লোকগুলো তাকে গালাগাল করে চিৎকার করছিল তাদের থামিয়ে দেয়ার জন্যে আর একটা বোমা ফাটাতে যাচ্ছিল সমীরণ, ফাটাতে পারল না। কয়েক মুহূর্ত সে বিমূঢ় হয়ে থাকল। উল্টোদিক থেকে

একটা পুলিশ ভ্যান তার খুব কাছে এসে গেছে। যে বোমা বের করেছিল সমীরণ নিরুপায় হয়ে তা ছুঁড়ে মারল পুলিশের কালো গাড়ির গায়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেও হুমড়ি খেয়ে পড়ল রাস্তার ওপর। তার পেটে গুলি লেগেছে।

এসব ভাবতে ভাবতে অদ্ভুত এক উত্তেজনায় মড়ার মত এখন পড়েছিল সমীরণ। তার এই কাহিনী বাংলাদেশের এক মুক্তিযোদ্ধাকে শোনাতে তার দ্বিধা হচ্ছিল। এবং কিছু বলতে পারছিল না বলে তার পেটের ভিতরে সে দ্বিগুণ যন্ত্রণা অনুভব করছিল।

সমীরণকে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকতে দেখে বড় ক্লান্ত স্বরে মীরণ জিজ্ঞেস করল, 'ঘুমালেন?'

ইচ্ছে করেই একটা হাই তুলল সমীরণ, পরে বলল, 'একটু একটু ঘুম পাচ্ছে এখন—'

'তবে ঘুমান।'

'শুনুন—' খুব সতর্ক হয়ে চারপাশে তাকিয়ে নিল সমীরণ এবং ফিসফিস করে উঠল, 'রাজনীতির ব্যাপার কি-না। আমার জখমের কথা এখানে কিছু বলা ঠিক হবে না। বলব আপনাকে পরে সব।'

'বেশ, তাই বলবেন।'

সমীরণ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওদের খাটের দিকেই টর্চ হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছে ডাক্তার—সঙ্গে সেই অল্প-বয়েসী নার্স।

ওদের দেখে হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল সমীরণ। তার শরীর একটা আশঙ্কায় সিরসির করে উঠল। মনে হল, ভিন্ন লোকের দুটি ছায়ামূর্তি রাতের অন্ধকারে চুপে চুপে তাকে ইহলোক থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্যে একটা ষড়যন্ত্র করছে।

ডাক্তার মীরণের কপালে হাত রাখল। টর্চ জেলে তার পা দেখল। পরে বিব্রত হয়ে নার্সকে বলল, 'আর একবার টেম্পারেচার নিন। শুনুন, আপনি একেই অ্যাটেন্ড করুন সারারাত। আমি এখুনি ডাঃ মৈত্রকে ফোন করছি।'

মীরণ বলল, 'ব্যস্ত হবেন না। আমি ভালই আছি ডাক্তারবাবু।'

'হ্যাঁ, ভালই তো আছেন।'

'শুধু পা-টা জ্বলে যাচ্ছে।'

'আমি ওষুধ দিচ্ছি।'

নার্স থার্মোমিটারটা ভাল করে ঝেড়ে মীরণের মুখের কাছে ধরতেই সে তা জিবের তলায় ঠেলে ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরল। ডাক্তার তখন নাড়ী পরীক্ষা করছিল তার। সমীরণ চুপচাপ সবই দেখছিল।

কিছু পরে মীরণের মুখ থেকে থার্মোমিটার টেনে নিয়ে নার্স দেখল প্রথম, পরে ডাক্তারকে তার জ্বরের কথা খুব নিচু গলায় জানাতেই বিস্ময়ের অস্ফুট একটা আওয়াজ বার হল ডাক্তারের মুখ থেকে।

সে পরে নার্সকে বলল, 'আপনি এখানেই থাকুন, আমি আসছি।'

এত রাতেও নার্স ও ডাক্তারের তৎপরতা এবং সেবাযত্নের এইরকম বহর দেখে সমীরণের মন কুঁকড়ে-কুঁকড়ে তার দেহটাকে এতটুকু করে তুলছিল। বালিশে ঘাড় গুঁজে জড়োসড়ো হয়ে পড়েছিল সে। ঈর্ষার জ্বালায় নয়, অবহেলার বেদনায় সে চোখ বন্ধ করে ছিল। কেননা তার মনে হচ্ছিল, চোখ বন্ধ করে আছে বলে সে যেমন কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, তেমনি কেউ তাকেও দেখতে পাবে না।

অন্য প্রান্তের কোন রুগী এখন আর্তনাদ করে উঠছিল না।

মীরণের খাটের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ শুয়েছিল সমীরণ। থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে, সজল একটা ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। তবুও ভয়ংকর একটা তাপ যেন সমীরণের দেহ এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে আসছে।

মীরণের খাট একঘণ্টাও বোধহয় খালি ছিল না। মৃত্যুর বেশ কিছু পরে খুব ঘটা করে তার দেহ এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। গণ্যমান্য বহু লোক এসেছিল, খবরের কাগজের লোকরাও ছিল। মুহুর্মুহু ক্যামেরা ঝলসে উঠছিল। সমীরণ জানত তার কথা সব কাগজেই খুব ফলাও করে বেরুবে। কাগজগুলো দেখবার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল সমীরণের।

ডাক্তারগুলোর ওপর সে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। এত চেষ্টা করেও মীরণকে বাঁচাতে পারল না তারা। ক্রমশ তার শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়, পা-টা বীভৎস হয়ে ওঠে। শেষের দিকে অচৈতন্যের মত হয়ে গিয়েছিল মীরণ—কথা-টথা আর বলত না।

তার সঙ্গে সমীরণের মাত্র কয়েকদিনের আলাপ, তবু এই আকস্মিক বিচ্ছেদের ব্যথা তাকে বড় কাতর করে তুলেছিল। সে-ই তো এখানে একমাত্র সঙ্গী ছিল সমীরণের।

এখন মীরণের খাটে শুয়ে আছে থুরথুরে এক বুড়ো। কথা একেবারেই বলে না, চুপচাপ ওপরে তাকিয়ে থাকে। তাকে দেখতেও লোক আসে, তার মাথার কাছে বসে থাকে পুরো দুঘণ্টা।

এ বুড়োটাও হয়তো মরবে। কাতর একটা নিশ্বাস ফেলে সমীরণ ভাবল, খাটটাই অপয়া। এবং এইরকম ভাবনা মনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার জানবার ইচ্ছে হচ্ছিল সে যে-খাটে শুয়ে আছে সেখানে তার আগে যে রুগী ছিল সে সুস্থ হয়ে ফিরে গেছে না মরেছে।

চোখ দুটো করুণ হয়ে এল সমীরণের—ভয়-ভয় লাগল। আজকের বিকেল হয়তো তার জীবনের শেষ বিকেল। সমীরণ তাকিয়ে দেখল ন্যাতন্যাতে ঠাণ্ডা একটা আভা তার চোখের সামনে স্থির হয়ে আছে।

এখন আত্মীয় বন্ধুদের আসবার সময়। অনেক রুগীর খাটের কাছে কেউ না কেউ এসে বসেছে। যারা ভেতরে ঢুকছে তাদের কারুর হাতে বড় ঠোঙা কিম্বা আপেল আঙুর বেদানা—এইরকম সব ফল। এসব দেখতে দেখতে বড় ঝিমিয়ে পড়ছিল সমীরণ।

বৃষ্টিটা বোধহয় একটু ধরেছে। কিন্তু ঠাণ্ডা নেই, বড় গরম। এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না সমীরণের। কবে এরা ছাড়বে কে জানে। তারপর সে যাবেই বা কোথায়! আবার সেই মারধোর, অত্যাচার—কথা আদায় করবার জন্যে কতরকম নির্যাতন!

তার চেয়ে মরে যাওয়াই যেন ভাল। সমীরণের মনে পড়ল বিনয়, বাদল দীনেশের কথা। ওদের মধ্যে একজন গুলির ক্ষত ইচ্ছে করে আঁচড়ে সেপটিক হয়ে মরে গিয়েছিল। সমীরণও সেইরকম করবে নাকি! মীরণও মরল সেপটিক হয়েই।

চোখ খোলা থাকলেও কিছু দেখছিল না সমীরণ, একটা বিপুল ক্লান্তিকর শূন্যতার মাঝে সে আপন মনেই ঘুরে ফিরছিল। তার কানে আসছিল অস্ফুট গুঞ্জন—আশেপাশের রুগীরা তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে মনের কথা বলে যাচ্ছে।

'মীরু!'

খুব চেনা গলার স্বর শুনে সমীরণ চমকে উঠে দেখল এতদিন পর মা এসে তার খাটের কাছে দাঁড়িয়েছে। ভাবনায় ভাবনায় মার চেহারা ভেঙে পড়েছে। পরনের থানটাও আধময়লা, জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া।

'মা!' একটা উৎসাহের ঝোঁকে উঠে বসবার চেষ্টা করল সমীরণ, 'পুলিশ গিয়েছিল? সার্চ-টার্চ করেছে? বস না—'

মা বসল না। তার দু চোখে জল টলমলো করছিল, ঠোঁট কাঁপছিল।

সমীরণের মা তার কথার উত্তর না দিয়ে ধরা গলায় শুধু বলল, 'মীরু, তুই আমাকে আর কত দুঃখ দিবি!'

কিছু বলবার ছিল না সমীরণের। তার শীর্ণ মাকে আশ্বাসের একটি কথাও সে এখন বলতে পারল না। মা দু-হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছিল। সমীরণের মনে পড়ল এই রকম করে আর একবার মা কেঁদেছিল—তার বাবা যখন মারা যায় তখন।

মীরণের খাটের দিকে দেখল সমীরণ, অপ্রস্তুত হয়ে গেল। মাকে বলতে চাইল, মা আমি মরিনি—আমি বেঁচে আছি! কিন্তু অনেক চেষ্টা করে সে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না।

মার চোখ থেকে হু-হু করে জল পড়ে যাচ্ছিল।

আলব্রেখট ড্যুরার

ধ্রুবজ্যোতি সেন
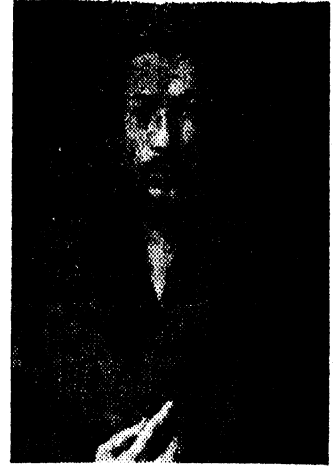
আত্মপ্রতিকৃতি (১৫০০)

১৯৭১ সাল জার্মানীতে ড্যুরার বৎসর হিসেবে পালিত হচ্ছে। সারা দেশ জুড়ে সরকারী ও বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ড্যুরারের স্মৃতির সম্মানে নানা প্রদর্শনী, আন্তর্জাতিক সমালোচকদের সেমিনার ও বিভিন্ন ধরনের উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। শিল্পীর জন্ম ও কর্মস্থান ন্যুরেমবার্গ শহরে ড্যুরারের পঞ্চশত জন্মবার্ষিকী বিশেষ সমারোহে উদযাপিত হচ্ছে, কারণ জীবিতকালে শিল্পী এখানকার বিশিষ্ট নাগরিক হিসেবে সম্মানিত ছিলেন। আধুনিক শিল্পীদের কাছে ড্যুরারের শিল্পদর্শনের আজও কোন অর্থ আছে কিনা সেই উদ্দেশ্যে তাঁর দর্শনের ভিত্তিতে আধুনিক শিল্প-কলারও কয়েকটি প্রদর্শনী করা হবে।

যাঁকে নিয়ে ফেডারেল রিপাব্লিকে এত হৈচৈ তাঁর পূর্বপুরুষের বাসভূমি ছিল হাঙ্গেরীর এইটাস গ্রামে, যেখান থেকে তাঁর পারিবারিক নামের উৎপত্তি। এইটাস অর্থে দরজা—জার্মান 'ট্যুর'; ড্যুরারের বাবা নাম সই করতেন 'ট্যুরার' বলে। তবে ম্যাগিয়ারদের মত লম্বা চুল রাখলেও ড্যুরারের পূর্বপুরুষ সম্ভবতঃ জাতে জার্মানই ছিলেন। বাবা আলব্রেখট স্বর্ণকার হিসেবে ন্যুরেমবার্গের অভিজাত ও শিক্ষিত পির্খাইমার-পরিবারের বাড়ির খুব কাছেই বসতি স্থাপন করেন এবং তাঁর নিয়োগকর্তার কন্যা বারবারা হোল্পারকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের আঠারোটি সন্তানের তৃতীয় সন্তান হলেন শিল্পী আলব্রেখট ড্যুরার—জন্ম ২১ মে, ১৪৭১।

ছেলেবেলায় কয়েক বছর স্কুলে লেখাপড়া শেখার পর ড্যুরার বাবার দোকানে সোনারূপার কাজ, ডিজাইন ও এনগ্রেভিং শেখেন। এই শিক্ষা তাঁর অনেক কাজে লেগেছিল। তাঁর পরবর্তী কালের উডকাট, পরিচয় আছে তা এই ছেলেবেলার হাতেখড়ির ফল। আজকেও তাঁর পেন্টিং-এর চাইতে এই সব কাঠ-খোদাই ও এনগ্রেভিংগুলিই সকলের কাছে সমাদর পেয়ে আসছে।

ছেলেবেলা থেকেই ড্রাফটসম্যানশিপে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা দেখা গিয়েছিল। মাত্র তের বছর বয়সে সিলভার পয়েন্টের মত কষ্টসাধ্য মাধ্যমে আঁকা তাঁর নিজের প্রতিকৃতিই তার প্রমাণ। ১৪৮৬ সালে ড্যুরারের বিশেষ ইচ্ছায় এবং তাঁর বাবার কিছুটা অনিচ্ছায় তাঁদের প্রতিবেশী শিল্পী মিখায়েল ফোলগেমুট-এর স্টুডিওতে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হয়।

মধ্যযুগ ও রেনেসাঁসের স্টুডিওর মত এটিও ছিল ছবি তৈরীর কারখানা বিশেষ। অনেকের সঙ্গে ড্যুরার এখানে কাজ করতে করতে শিক্ষালাভ করেন। তবে সহকর্মীদের ঈর্ষার পাত্র হয়ে পড়ায়, ভদ্র, শান্ত ও সংযত চরিত্রের শিল্পীর শিক্ষানবীশি কাল অবিমিশ্র সুখে অতিবাহিত হয়নি। ছবি আঁকার বিভিন্ন প্রক্রিয়া ছাড়া কাঠখোদাই কাজের হাতেখড়িও এখানেই হয়। তাঁর জন্মের প্রায় বিশ বছর আগে ছাপাখানা আবিষ্কার হয়। ন্যুরেমবার্গের বিখ্যাত প্রকাশক ছিলেন অ্যান্টন কোবার্গার—ড্যুরারের ধর্মপিতা। তাঁর অনেক বইয়ের কাঠখোদাই ছবি ফোলগেমুটের স্টুডিওতে তৈরী হত।

স্টুডিওর শিক্ষা সমাপন হলে ১৪৯০ নাগাদ অন্যান্য কারিগরদের মত তিনিও ভ্রমণে বার হন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে, সে যুগের বিখ্যাত এনগ্রেভার মার্টিন শ্যোনগাউয়ারের কাছে কাজ শিখতে তিনি কোলমার যাত্রা করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর উপস্থিতির পূর্বেই শ্যোনগাউয়ারের মৃত্যু হয়। তাঁর ভাইয়েরা অবশ্য শিল্পীকে শিল্পীর এক ভাইয়ের কাছে তাঁকে পাঠিয়ে দেন। বাসেল এবং স্ট্রাসবুর্গের প্রকাশকদের জন্যে কিছু কাঠখোদাই ডিজাইন করে ১৪৯৪এ ড্যুরার ন্যুরেমবার্গে ফিরে আসেন।

ইতিমধ্যে তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শ্বশুর হানস্ ফ্রে ছিলেন নানারকম যন্ত্রপাতির নির্মাতা, উচ্চঘরের অবস্থাপন্ন লোক। দেশে ফিরতেই তাঁর কন্যা অ্যাগনেসের সঙ্গে ড্যুরারের বিয়ে হয়ে গেল। যৌতুক মিলল দুশ ফ্লোরিন—নেহাৎ অল্প নয়।

এঁদের বিবাহিত জীবন সর্বৈব সুখের হয়নি। তা সেটা আর কজনারই বা হয়ে থাকে। অসুখের কারণ সম্পর্কে নানা জনের বিভিন্ন মত আছে। অল্পবয়সে অ্যাগনেস মোটামুটি সুশ্রীই ছিলেন। তবে বয়সের সঙ্গে চেহারায় একটা দজ্জাল ভাব এসে গিয়েছিল। কেউ বলেন বিখ্যাত স্বামীর অনেক হেনস্থা সত্ত্বেও পরিবারটি মোটামুটি শান্তশিষ্ট ভালমানুষ গোছের গৃহিণী ছিলেন। অপরের মতে গিন্নীটি ছিলেন একটি খাণ্ডার। তাঁর দাপটে কর্তাটি শেষের দিকে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিতেও সাহস পেতেন না। পয়সা পয়সা করে স্বামীর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। এবং কতকটা সেই জন্যেই নাকি স্বামীটি বেশী দিন বাঁচেন নি। তবে সকলেই স্বীকার করেন যে, নিঃসন্তান বিবাহিত জীবন এঁদের কারো পক্ষেই সুখের হয়নি। ড্যুরারের ডায়েরি বা চিঠিপত্রে কি আত্মজীবনীতে কিন্তু স্ত্রীর সম্বন্ধে বিশেষ কোন সস্নেহ উক্তি নেই ; পরিহাসোক্তি যেটুকু আছে তার মধ্যেও কেমন একটা সহানুভূতিহীনতা চোখে পড়ে। ১৫২০-২১ সালে যখন তিনি সপরিবারে (জীবনে একবারই সপরিবারে ভ্রমণ করেন) নেদারল্যান্ডস যাত্রা করেন

তখনকার ভ্রমণ কাহিনীতে কোথায়, কবে, কার সঙ্গে কতবার ডিনার খেয়েছেন তার হিসেব লেখা আছে। তার মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে আহারের সংখ্যা খুবই কম। অথচ নিজে নিমন্ত্রণ কর্তার সঙ্গে বসে ভোজ খাচ্ছেন আর ঝিয়ের সঙ্গে অ্যাগনেস ওপরে রান্নাঘরে বসে আহার করছেন এমন ঘটনারও উল্লেখ রয়েছে। পতি-দেবতাটি যে একজন প্রতিভাবান পুরুষ সেটা সম্ভবতঃ অ্যাগনেস বুঝতে পারেননি। তিনি যদি মধ্যযুগের অর্থে স্বামীকে একজন তসবিরওয়ালা বলে মনে করে থাকেন ত তার জন্যে অপরাধ দেওয়া যায় না। লোকে যেমন চেয়ার-টেবিল বা কোট-প্যাণ্ট বানিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, এরও তেমনি বেশী করে ছবি বানিয়ে দুটো পয়সা যাতে আসে সেদিকেই মন দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করে থাকতে পারেন। তা না করে দিনরাত লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরাতত্ত্ব, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা কি রসতত্ত্ব এসব নিয়ে দিনরাত বক বক করলে কোন গেরস্ত বৌয়েরই বা সহ্য হয়। আসলে দুজনে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে বাস করতেন বলেই কাছাকাছি আসতে পারেননি। তাই অ্যাগনেস তাঁর স্বামীর বন্ধুবান্ধবদের দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না।
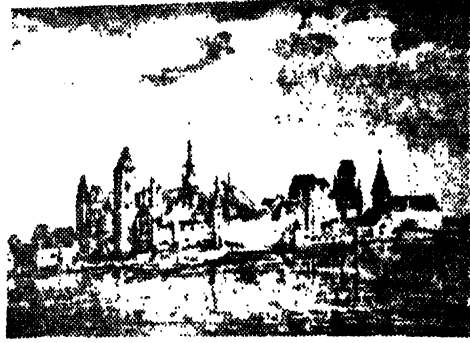
আর বিশেষভাবে ঘৃণা করতেন তাঁর স্বামীর আশৈশব অভিন্নহৃদয় বন্ধু, বিখ্যাত হিউম্যানিস্ট, রাজনীতিবিদ এবং নিকটতম প্রতিবেশী ভিলিবাল্ড পির্খাইমারকে। পির্খাইমারও তাঁকে তেমন সুনজরে দেখেননি; কারণ ড্যুরারের মৃত্যুর পর শোকে অভিভূত অবস্থায় তাঁদের আরেক বন্ধুকে তিনি যে-চিঠিটি লেখেন তাতেই তিনি শিল্পীর মৃত্যুর জন্যে সোজাসুজি অ্যাগনেসকে দায়ী করেন। চিঠিটা অবশ্য রাগ ও দুঃখের মাথায় লেখা, আদৌ সুস্থ মস্তিষ্কে নয়। কারণ, শিল্পীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল অসাধারণ রকমের গভীর, যদিও আকৃতি ও প্রকৃতিতে এত প্রভেদ দেখা যায় না। ড্যুরারের চেয়ে বছরখানেকের বড় ছিলেন তিনি। ধনী, উচ্চবংশের সন্তান —পাদুয়া ও পাভিয়াতে আইন, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি পাঠ করেছেন। নুরেমবার্গের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতা এবং একজন পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে তাঁর খ্যাতি এবং সম্মান ছিল। বিরাট চেহারা, সুপুরুষ বলা চলে না, প্রচণ্ড জীবনীশক্তি, ভীষণ মেজাজ, রসিক, উদ্ধত এবং কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের লোক ছিলেন তিনি। স্ত্রী মারা গেলে আর বিয়ে করতে রাজী হননি, কারণ অবিবাহিত থাকার সুবিধে অনেক। তিনিই ড্যুরারকে গ্রীক ও রোমান সাহিত্য, সমকালীন জীবনদর্শন ও প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আকৃষ্ট করেন। শিল্পীর অনেক ছবির বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করে দিতেন এবং নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করেন। শিল্পীর সমাধি-ফলকে লিখে দেন 'আলব্রেখট ড্যুরারের মরদেহের যা-কিছু তাই এখানে সমাধিস্থ রয়েছে।' বন্ধুর মৃত্যুর বছর-দুয়েক বাদেই তিনিও তাঁর অনুসরণ করেন। এত ভালবাসায় অ্যাগনেসের যে রাগ হবে তাতে আর বিচিত্র কি?

ইন্‌সব্রুকের দৃশ্য জল রং

বিয়ের পরেই ড্যুরার ভেনিস যাত্রা করেন। ইটালী তখন রেণেসাঁস শিল্প-আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। গ্রীস ও রোমের প্রাচীন শিল্প-সাহিত্যের চাবি সেখানেই। তাছাড়া বন্ধু পির্খাইমার তখন পাভিয়াতে পড়াশোনা করছেন। এ-সময় উত্তর ইউরোপের গথিক-রীতির অনুসরণকারীদের মক্কা ছিল ব্রুজ এবং গাঁ। ইটালীর প্রভাব ততটা ছড়ায়নি। ড্যুরারই সেই যুগে জার্মান শিল্পীদের ইটালীর পথ দেখা-

স্থায়ী হয়েছিল, তবু এরই ফলে পশ্চিম ইউরোপে রেনেসাঁসের প্রভাব আসতে শুরু করে।

১৪৯৫-এ দেশে ফিরে তিনি একটানা দশ বছর ধরে অনেকগুলি ছবি ও প্রায় ষাটখানির মত উডকাট ও এনগ্রেভিং তৈরী করেন। এসব প্রিণ্ট তাঁর মা এবং স্ত্রী বাজারে বা মেলায় বেচতেন। বিখ্যাত ইটালীয়ান শিল্পী মান্তেনা এবং পোলাই-উওলোর কিছু কাজ তিনি কপি করেন। মান্তেনার প্রভাব তাঁর ওপর অনেকখানি পড়েছিল। তাঁর দ্বিতীয়বার ভেনিস যাত্রার সময় মান্তেনা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। ড্যুরারও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাত্রা করেন। কিন্তু তাঁর পৌঁছবার পূর্বেই মান্তেনার মৃত্যু হয়। এটি ড্যুরারের বিশেষ আক্ষেপের কারণ হয়েছিল। জ্যাকোপা ডি বারবারি নামে নুরেমবার্গ প্রবাসী এক ভেনেশিয়ান শিল্পী তাঁকে একদা একটি পুরুষ ও রমণীর নগ্ন মূর্তির ড্রয়িং দেখিয়ে বলেন, যে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে এরকম মূর্তি গঠন সম্ভব, কিন্তু পদ্ধতিটি গোপন করেন। বিষয়টি তখন থেকেই ড্যুরারের মাথায় ঘুরতে থাকে। সারাজীবন ধরেই তিনি নিখুঁত নরদেহ আঁকবার ফরমুলা খুঁজে বেড়িয়েছেন। ভেনিসে বেলিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। এঁদের বর্ণ-চাতুর্যের প্রভাবও তাঁর পক্ষে মূল্যবান হয়েছিল। তবে তাঁর আসল সাফল্যের কারণ হল সর্ব বিষয়ে অপরিসীম কৌতূহল ও কাজে নিষ্ঠা। যখনই যেখানে কোন বিচিত্র মানুষ, দৃশ্য বা জন্তু-জানোয়ার দেখেছেন, তখনই নোট-বইয়ে তা টুকে রাখতেন। ভেনিসে থাকতে একটি সামুদ্রিক কাঁকড়া ও চিংড়ির চমৎকার জলরঙের ছবি আছে। অন্যত্র এক সিন্ধুঘোটকের ড্রয়িং করা আছে। পোর্তুগাল থেকে একজন গণ্ডারের বর্ণনা ও একটি স্কেচ পাঠিয়েছিলেন, তাই দেখে গণ্ডারের একটি উডকাট প্রকাশ করে ফেলেন—খুব তথ্যমূলক না হলেও সুন্দর কাজ। এমনকি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেও তার নিখুঁত বর্ণনা লিখে এবং ছবি এঁকে রেখে গিয়েছেন। নানারকম জন্তু-জানোয়ার; পাখি, সরীসৃপ ইত্যাদি সাজিয়ে একটি বিরাট নিসর্গদৃশ্যের মধ্যে পেন অ্যাণ্ড ইংক জল-রং-এর ওয়াশে যে ম্যাডোনা মূর্তি তিনি তৈরী করেন, সেরকম বিষয় নিয়ে আর কোন শিল্পী কোন মাতৃমূর্তি আঁকেননি।

সে-যুগে দেশভ্রমণ কষ্টসাধ্য এবং বিপদসঙ্কুল হলেও ড্যুরার একাধিকবার বিদেশ যাত্রা করেন। সবগুলিই যে নিছক বেড়ানোর খাতিরে করা হয়েছিল তা নয়। প্লেগের আক্রমণ এড়াবার জন্যেও তিনি শহর ছেড়ে বাইরে গিয়েছেন। এইসব ভ্রমণের ফলে তাঁর নিসর্গদৃশ্যের ছবিগুলির বিশেষ উন্নতি হয়। ফোলগেমুটের স্টুডিওতে কাজ শেখার সময় তিনি জল রঙে কিছু নিসর্গদৃশ্য এঁকেছিলেন বটে কিন্তু তেমন পারস্পেকটিভ ভালো করে রপ্ত হয়নি। আলো-বাতাসের ছাপও ছবিতে অনুপস্থিত। নিছক তথ্যপূর্ণ এবং কিছুটা শুষ্ক চেহারার ছবি হত। কিন্তু প্রথম ইটালী যাত্রার সময় আল্পস অঞ্চলের যেসব ছবি তিনি ভ্রমণের দলিল হিসেবে নিয়ে আসেন, তখন থেকেই তাঁর কাজের পরিণতি দেখা যায়। ভেনেশিয়ান রঙের ছটায় এগুলি আর নিছক দলিলে পরিণত হয়নি, ছবি হয়ে ওঠে। ছবির ক্ষুদ্র অংশগুলির সঙ্গে গোটা ছবির সুসম্বন্ধ ভাব, আলো, আবহাওয়া, মেজাজ সবই পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল।

এখানে ড্যুরারের জল রঙের ছবি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাঁর জীবদ্দশায় এগুলি সম্পর্কে খুব অল্প কয়েকজনই খবর রাখতেন। কিন্তু নিসর্গ-দৃশ্য রচনায় তিনি যে একজন পথিকৃৎ, তা আজকে এগুলি থেকে প্রমাণিত হয়েছে, যদিও তাঁর পেণ্টিং বা গ্রাফিককে ব্যবহারের জন্য রেফারেন্স হিসেবেই এগুলি আঁকা হয়েছিল। কিন্তু আজ এগুলি পূর্ণাঙ্গ চিত্র হিসেবেই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দাবী করতে পারে। তাঁর পরিণত ছবিতে যে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের ক্ষণস্থায়ী আভা এবং তুলি চালনার দক্ষতা, আবহাওয়া সৃষ্টি এবং প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধের নিদর্শন পাওয়া যায়, তা আবার দেখা গিয়েছিল দীর্ঘকাল পরে। প্রকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে নিসর্গদৃশ্য রচনার জন্যে কেউ কেউ তাঁকে ইম্প্রেশনিজমের পুরোধা বলেও চালাতে চান, যদিও সেরকম কোন শিল্প-তত্ত্ব আবিষ্কারের বাসনা তাঁর ছিল না। তেমনি কিউব এবং প্লেনের সাহায্যে গঠনকে বোঝাবার জন্যে কতকগুলি ড্রয়িং থাকলেও তাঁকে কিউবিজমের স্রষ্টা বলা চলে না বা স্বপ্নের ছবি আঁকলেও সুর-রিয়্যালিজমের পুরোধা বলা উচিত নয়। আসল উদ্দেশ্য ছিল যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ। আঙ্গিকের দিক দিয়েও তাঁর কাজে বৈচিত্র্য দেখা যায়। কালি-কলমের ওপর জল রং, জল রঙে এঁকে কলম চালিয়ে ফিনিশ করা, কলমের কালি শুকোবার আগেই রং চাপানো, স্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছ জল রঙের ব্যবহার ইত্যাদি নানা রীতিতে করা ছবির নিদর্শন রয়েছে। তাঁর বিখ্যাত খরগোশের ছবিটিতে সূক্ষ্ম তুলি চালনার আরেকটি নিদর্শন পাওয়া যায়। অতি-সূক্ষ্মভাবে ড্রাই ব্রাশ চালাতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। একটি শিরস্ত্রাণের তিনটি স্টাডি, ভোরবেলা বনের ধারে ছোট্ট একটি পুকুর, নদীর ধারের মিল বা একেবারে মাটির কাছ থেকে দেখা ঘাস-ভর্তি একটুকরো জমির ছবিতে নিখুঁত রিয়্যালিজম ও গীতিকাব্য-ধর্মীতার মিলন খুব আধুনিক লাগে। এই আঙ্গিকের চর্চা আজকের আমেরিকান শিল্পী অ্যাণ্ড্রু ওয়াইয়েথের কাজেও দেখা যায়। ড্যুরারের প্রিয় নুরেমবার্গের শহরতলীর নিখুঁত বর্ণনার সঙ্গে শেষ বয়সের আঁকা কাল-চেরুথ গ্রামের দৃশ্যের তুলনা করলে তাঁর স্টাইলের আরেক পরিবর্তন দেখা যায়। শেষোক্ত ছবিতে অনেক খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে দৃশ্যের সামগ্রিক রূপ ও মেজাজটা-কেই তুলে ধরা হয়েছে। এ ধরনের জোরালো তুলি চালনা এবং সামগ্রিক মেজাজ বাহুল্য বর্জন করে তুলে ধরার চেষ্টার পূর্ণ পরিণতি আরো প্রায় একশ' বছর বাদে হারকিউলিস সেগার্স ও রেমব্রাণ্ট প্রমুখ শিল্পীদের কাজের মধ্যে দেখা গিয়েছিল।

১৪৯৬-এ স্যাক্সনির শাসক ও পরবর্তীকালে লুথারের আশ্রয়দাতা ফ্রেডারিক দি ওয়াইজ ড্যুরারকে দিয়ে তাঁর নিজের প্রতিকৃতি ও গীর্জার জন্যে দুটি ধর্মীয় ছবি আঁকান। ফলে এঁর সঙ্গে শিল্পীর আজীবন সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। এই সময়েই তিনি বড় একটি জায়গায় নিজের কর্মস্থল সরিয়ে নিয়ে যান, সহকারী নিযুক্ত করেন, একটি প্রেস কেনেন এবং পির্থাইমারের দর্জিকে দিয়ে মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরী করিয়ে একজন উচ্চ শ্রেণীর নাগরিকের মত সাজ-সজ্জা করে নিজের একটি ছবি আঁকেন। জানলার ভেতর দিয়ে দূরে ইটালীর পার্বত্য দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে শিল্পী দুটি হাত একত্র করে সংযতভাবে

ফোর অ্যাপস্‌লস (১৫২৬)

কতকটা আভিজাত্যের সঙ্গে দর্শকের দিকে একটু আড়চোখে তাকিয়ে আছেন। ছবিতে ফ্লেমিশ ও ইটালীয়ান রীতির সুন্দর মিলন ঘটেছে। দক্ষিণ ইউরোপে শিল্পী তখন সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত, আর সে-সম্মান আদায় করেছিলেন লিওনার্দো। উত্তরে এই প্রথম শিল্পীকে 'ভদ্রলোক' হিসেবে আঁকা হল আর এই সামাজিক সম্মানও সেখানে আদায় করেন জার্মানীর লিওনার্দো, আলব্রেখট ড্যুরার। বয়স তখন তাঁর ছাব্বিশ—সারা ইউরোপে তাঁর খ্যাতি তখন ছড়িয়ে পড়ার মুখে।

কোন বিরাট পেণ্টিং বা রাজা-মহারাজার বিরাট পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্যে এই খ্যাতি আসেনি। তাঁর নিজের তাগিদে করা কতগুলি কাঠখোদাই ইলাস্ট্রেশন থেকেই তাঁর এই খ্যাতির সূত্রপাত। যুগের পটভূমিকায় ঘটনাটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইটালীর রেণেসাঁসের ধারা যদি প্রাচীন গ্রীস রোমের সৌন্দর্য ও দর্শনের পুনরুজ্জীবনের খাত বেয়ে এসে থাকে ত জার্মান রেণেসাঁসের লক্ষণ হিসেবে ধর্মের পুনরুজ্জীবন প্রধান নায়ক হলেন মার্টিন লুথার। চার্চের নানারকম দুর্নীতি থেকে তাকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যেই তিনি আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কিন্তু পরে তা প্রোটেস্টাণ্ট মতবাদ হিসেবে আলাদা একটি মতবাদ হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু তাঁর আন্দোলনের অনেক আগেই আকাশে বাতাসে এই সংস্কারের রব ও দুর্নীতির প্রতিবাদ শোনা গিয়েছিল। সাধারণ মানুষের ধারণা হয়েছিল যে, এই পাপের রাজত্ব বেশী দিন চলবে না, শেষ বিচারের দিন আগতপ্রায় এবং ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতেই তা আসবে। নানারকম অনৈসর্গিক দুর্লক্ষণ দেখা যেতে থাকে এবং সেসব শেষ বিচারের পূর্বাভাস বলে ধরা হয়। গীর্জায় গীর্জায় ধর্মভীরুদের ধর্ণা পড়ে যায়। এই সময় ১৪৯৮-৯৯ নাগাদ ড্যুরার 'সেণ্ট জনের রিভিলেশন'-এর একটি সচিত্র সংস্করণ প্রকাশ করলেন। এই গ্রন্থে ঈশ্বরের নিকট প্রত্যাদেশরূপে প্রাপ্ত বিশ্বের পাপ ও ধ্বংসের বর্ণনা করা হয়েছিল

১৫টি পুরোপাতা কাঠখোদাই ছবিতে শিত হয় এবং সারা ইউরোপ তার তৎকালীন ভাবনার প্রতিচ্ছবি দেখে একে সাদরে গ্রহণ করে। এই বইয়ের 'দি ফোর হর্সমেন অব দি অ্যাপোক্যালিপ্স' ছবিটি হয়ত অনেকেরই পরিচিত। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও মৃত্যু ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলেছে, পায়ের তলায় রাজা-মহারাজা পোপ কার্ডিনাল সব নরকের ড্রাগনের উদরস্থ হচ্ছেন। লুথারের আন্দোলন শুরু হবার ১৭।১৮ বছর আগেই শিল্পী চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে এইভাবে প্রচার চালান। তাছাড়া উডকাট-শিল্পে ছবিগুলি যুগান্তর এনেছিল। এই প্রথম সরু মোটা রেখায় ছাপা ছবিতে এমন সুন্দর আলো, মডেলিং এবং টোনের প্রতিফলনে এক নাটকীয়তার সৃষ্টি হল। নিছক কারুশিল্প থেকে কাঠ খোদাই চারুশিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হল। মান্তেনার শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। ড্যুরারের গ্রাফিক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তখনকার বিখ্যাত হিউম্যানিস্ট রটারডামের এরাজমাজ বলেছিলেন যে, অ্যাপেলেসকে রঙের সাহায্য নিতে হয়েছিল কিন্তু ড্যুরার শুধু কালো রেখাতেই রঙের কাজ শেষ করেছেন। এসব ছবিতে রঙ দিতে গেলে ছবির ক্ষতি হবে। ১৫১৭-তে রিফর্মেশন আন্দোলন শুরু হলে ড্যুরার লুথারকে কিছু প্রিন্ট পাঠান। লুথারও তার যথাযোগ্য সমাদর করে একটি চিঠি লেখেন তাঁর এক বন্ধুকে। ড্যুরারের বাসনা ছিল লুথারের একটি প্রতিকৃতি আঁকার কিন্তু উভয়ের সাক্ষাৎ না হওয়ায় সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। লুথার যখন জার্মান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করেন, তখন তাঁর ছবিগুলির জন্যে ড্যুরারের এই ছবিগুলিকেই আদর্শ হিসেবে নিয়েছিলেন। ড্যুরারের এই ছবি যখন প্রকাশিত হয় তার অল্পকাল পূর্বে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন এবং ভাস্কো-ডা-গামা সদ্য কালিকটে উপস্থিত হয়েছেন। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় চিত্রে উল্লিখিত অশ্বারোহীদের তাণ্ডব শুরু হতে অল্প কয়েক বছর বাকি আছে।

শিল্পীর অন্তর্জীবনেও বোধহয় কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৫০০ সালের আত্মপ্রতিকৃতিতে দু' বছর আগেকার সেই সৌখীন ভদ্রলোকের কোন চিহ্ন নেই। খৃষ্টের মত সন্ন্যাসীর রূপ, রং বা সাজপোশাকের কোন বাহুল্য নেই। ঘোর রঙের মধ্যে সামনে ফেরা মুখ ও ডান হাতটুকু আলোকিত; কতকটা ধর্মীয় আইকনের মত। খৃষ্ট প্রতিমার সঙ্গে নিজের সাদৃশ্য দেখাবার কারণ হয়তো এই যে 'খৃষ্টের অনুসরণে' নিজেকে পরিপূর্ণ করবার বাসনা তাঁর মনে এসেছিল। যে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার বলে শিল্পী সৃষ্টি করতে সক্ষম বলে তিনি বিশ্বাস করতেন, সেই ঈশ্বরকেই বোধহয় তিনি এই বিচিত্রভাবে আরাধনা করেছেন।

১৫০২-তে পিতার মৃত্যুর পর তাঁর দোকানটি বিক্রী করে অর্থোপার্জনের

এনগ্রেভিং করেন। এ সময়কার ছবির মধ্যে 'মেরীর জীবনী' কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির প্রতিকৃতি ও কিছু ধর্মীয় চিত্র এবং 'রিটার্ণ অব প্রডিগ্যাল সান', 'সেন্ট ইউস্টাস', 'গ্রেট ফরচুন (বা নেমেসিস) এবং 'ফল অব ম্যান' নামে কয়েকটি এনগ্রেভিং বিখ্যাত। নেমেসিস ছবিটি নানা প্রতীকে ভরা এবং নগ্নদেহ রচনার এক উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। ভিট্রুভিয়াসের পরিমাপে তৈরী হলেও ইটালীয়ান আদর্শের চাইতে গথিক রিয়্যালিজমই বেশী প্রকট। শূন্যে ভাসমান নেমেসিসের পায়ের তলায় টিরোলিয়ান আল্পসের নিসর্গ দৃশ্যটি চমৎকার। 'ফল অব ম্যান' ছবির অ্যাডাম, ঈভ, সাপ, জীবজন্তু ও গাছপালার বিভিন্ন টেক্সচার ও এনগ্রেভিং-এর সূক্ষ্মতা আর পরিবেশ সৃষ্টি লক্ষ্য করার মত। এ যুগের পেণ্টিং-এর মধ্যে, ফ্রেডারিক দি ওয়াইজের জন্যে আঁকা (বর্তমানে উফিৎসিতে) 'অ্যাডোরেশন অব দি মেজাই' বিখ্যাত। নিখুঁত স্পেসের মধ্যে নিখুঁত কয়েকটি মূর্তি বসানো। ভাঙা প্রাচীন বাড়িঘরের পটভূমিকায় শিশুযীশুকে তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি উপহার দিতে এসেছেন। মধ্যের ফিগারটি লিওনার্দোর মত। রং কম্পোজিশন সবই জমাট তবে পটভূমি ও ফিগার আপন স্বাতন্ত্র্যে বিরাজমান।

ভেনিসের জার্মান ব্যবসাদারদের অনুরোধে তাদের গীর্জার একটি বৃহৎ বেদী-চিত্র আঁকবার জন্যে তিনি দ্বিতীয়বার ইটালী যাত্রা করেন। ১৫০৫-৭ পর্যন্ত এই ইটালী প্রবাসকালে তিনি বিখ্যাত শিল্পী হিসেবে অনেকের সম্মান ভালবাসা ও ঈর্ষা কুড়িয়েছেন। পির্খাইমার তাঁর খরচ হিসেবে কিছু আগাম টাকা দেন ও নিজের জন্যে নানান জিনিস কিনে আনতে বলেন। ড্যুরারের চিঠিতে জানা যায় ভেনিসের জার্মান সুযোগ পেলেই মানুষ জন্তু সবাইকে ঠকায়।

এখানে তিনি বেশ সৌখীন জীবন-যাপন করতেন। এমন কি নাচের ইস্কুলেও ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু তাল-জ্ঞানের অভাবে বার দুয়েক চেষ্টার পর ও পথে আর পা দেন নি। অনেক শিল্পী তাঁকে ঈর্ষা করত বলে তাঁর বন্ধুরা যত্রতত্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে বারণ করেন কারণ এদের বিষ খাওয়াবার বদনাম ছিল। ড্যুরার লিখেছেন, 'সুযোগ পেলেই এরা আমার ছবির নকল করে, আর বলে বেড়ায় যে আমার কাজে কোন ধ্রুপদী গুণ নেই।' বৃদ্ধ জোভান্নি বেলিনি তখনো জীবিত এবং ড্যুরার তাঁকে ভেনিসের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে সম্মান করতেন। বেলিনি তাঁর স্টুডিওতে এসে তাঁর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন ও তাঁর একটি ছবি কিনতে চান। একবার তিনি ড্যুরারের কাছে, যে সরু তুলিটি দিয়ে তিনি অত সূক্ষ্ম চুল আঁকেন, সেই রকম একটি তুলি প্রার্থনা করেন। ড্যুরার একটি সাধারণ তুলি বেছে নিয়ে ক্যানভাসে দীর্ঘ কয়েক গোছা চুল এঁকে দেখিয়ে দেন যে, তুলির গুণে নয়, তুলি চালানোর গুণেই সূক্ষ্মতার সৃষ্টি হয়।

'ফীস্ট অব দি রোজ গারল্যাণ্ডস' ছবিটি তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচকদের মুখের

মাইট, ডেথ অ্যাণ্ড দি ডেভিল (১৫১৩)

মত জবাব হয়েছিল। উত্তর ইউরোপের রেখা ও বর্ণনাভঙ্গীর সঙ্গে ভেনেশিয়ান রঙের সুন্দর সমন্বয়ে এই ছবিটি সৃষ্টি হয়। ছবির বিভিন্ন প্রতীক আজকে সকলের কাছে পরিস্ফুট না হতে পারে, কারণ এখানে রোজারী বা জপমালার প্রবর্তন সম্পর্কে অনেক নিহিত ইঙ্গিত রয়েছে। মাতৃমূর্তি ছাড়া ছবির বিভিন্ন পাত্রপাত্রী সমকালীন বিখ্যাত ব্যক্তিদের আদর্শে গড়া হয়। বহু মেরামতির পর আজকে অবশ্য মূল শিল্পীর হাতের কাজের অল্পই অবশিষ্ট আছে। কিন্তু ছবি যেদিন শেষ হয়, সেদিন ভেনিসের সমস্ত অভিজাতবর্গ ও শাসককুল ছবি দেখতে এসেছিলেন। তাঁদের তরফ থেকে মোটা মাসোহারা দিয়ে শিল্পীকে শহরে স্থায়ী-ভাবে বসবাসের অনুরোধ জানানো হয়, কিন্তু নুরেমবার্গ ছাড়া ড্যুরার কোথাও বাস করতে চাননি।

এই সময়কার অন্যান্য ছবির মধ্যে 'ক্রাইস্ট অ্যাণ্ড দি ডক্টরস' একটু অসাধারণ। স্বভাবসিদ্ধ খুঁটিয়ে কাজ করার পরিবর্তে কতকগুলি রঙের পোঁচে শেষ করা। ছজন কদাকার কুজ্ঝটিক বৃদ্ধ মোটা বই হাতে কিশোর যীশুকে ঘিরে আছে আর তিনি শান্তচিত্তে তাদের কুটিল প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। ছবির কেন্দ্রাংশে নানা রকমের হাতের ভঙ্গী। বৃদ্ধদের চেহারা কতকটা লিওনার্দোর কতকটা বা বশ্-এর ক্যারিকেচারের মত তবে গথিক প্রভাবই প্রকট। এ সময় যে দু-একটি রমণীর প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন, সেখানে ভেনেশিয়ান রীতির প্রভাবই ছড়িয়ে আছে এবং দেখা যায়, যে সুন্দরীদের রূপের প্রতি সুবিচার করবার ক্ষমতাও তাঁর কম ছিল না।

ইটালী প্রবাসকালে স্থাপত্য, জ্যামিতি, দেহসংস্থান বিদ্যা ও পারস্পেকটিভের সমস্যা নিয়েও অনেক সময় দেন। আলবের্টি ও দাভিঞ্চির চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং পারস্পেকটিভের 'গোপন পদ্ধতি' জানবার জন্য তিনি বোলোনা যাত্রা করেছিলেন। এ সময়কার ড্রয়িং থেকে স্বদেশে ফেরার পর অ্যাডাম ও ইভের যে দুটি প্রমাণ মাপের ছবি করেন তাতেও রঙের ছটা [illegible] গথিক রীতিই প্রাধান্য পায়।

দেশে ফিরে একটি বাড়ি কিনে শহরের সম্মানিত নাগরিক রূপে মোটামুটি স্বচ্ছল জীবনযাপন করতে থাকেন। ১৫০৭ ও ১৫১১-র মধ্যে যে গোটা তিনেক ধর্মীয় চিত্র আঁকেন তার মধ্যে হেলার ও ল্যান্ডা-উয়ার নামে দুই ব্যক্তির জন্য আঁকা দুটি ছবি উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি পুড়ে গিয়েছে, দ্বিতীয়টি আঁকতে হয়েছিল শহরের বৃদ্ধদের এক আশ্রমের জন্য। পবিত্র ট্রিনিটির চার দিক ঘিরে নানা সাধুসন্তদের মধ্যে ছবির দাতা উপস্থিত। ছবির প্রধান নাটকীয় অংশটি স্বর্গে স্থাপিত। নীচে মর্ত্যে সরু একটু জায়গায় দিগন্ত বিস্তৃত এক নিসর্গ দৃশ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে শিল্পী ঘটনাটি অবলোকন করছেন। দুরকম পারস্পেকটিভের ব্যবহারে স্বর্গকে নিকটে এবং মর্ত্যকে দূরে স্থাপন করা হয়েছে। তুলি চলেছে এনগ্রেভিং-এর সূক্ষ্ম রেখার মত।

এই সময়ে খৃস্ট-জীবনীর ওপর ১৪টি এনগ্রেভিং ও কাঠখোদাইয়ের একটি সিরিজ প্রকাশিত হয়। তাঁর এনগ্রেভিংগুলি পরে বহু দূরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইউরোপ ছাড়া তুরস্ক, পারস্য এমন কি ভারতেও এগুলির প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে।

হোলি রোমান এম্পারার ম্যাক্সিমিলিয়ন ছিলেন একাধারে মধ্যযুগের শেষ নাইট ও রেনেসাঁসের একজন ইউনিভার্সাল ম্যান—সর্ববিষয়ে আগ্রহান্বিত সদাশয় ব্যক্তি। ১৫১২তে নুরেমবার্গে এলে ডুরারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ডুরার সম্রাটের একটি কাঠকয়লায় স্কেচ করেন যার থেকে সম্রাটের মৃত্যুর পর একটি বৃহৎ উডকাট সৃষ্টি হয়। নিজের রাজত্বকাল অবিস্মরণীয় করবার উদ্দেশ্যে তিনি অনেকগুলি বিরাট পরিকল্পনা করেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর ফলে সেসব সম্পন্ন হয়নি। তাঁর মহিমার প্রতীক হিসেবে সূক্ষ্ম কাঠখোদাইয়ের নানা প্রতীক চিহ্ন ভূষিত বিরাট এক বিজয় তোরণ ছাপা হয়। অন্যান্য শিল্পীদের সহায়তায় ডুরারের তত্ত্বাবধানে ও পির্খাইমারের দেওয়া বিভিন্ন আইডিয়ায় ১১-৫ ফুট দীর্ঘ এবং ৯-৭৫ ফুট প্রস্থ তোরণটি ১৯২টি কাঠের ব্লক থেকে ছাপা হয়। একটি বৃহৎ জয়যাত্রার কাজও অনেকদূর এগোয় তবে সম্রাটের মৃত্যুতে সমাপ্ত হয়নি। তবু এর ব্লকগুলি পাশাপাশি সাজালে প্রায় ষাট গজ লম্বা হয়। সম্রাটের সবচেয়ে প্রিয় কাজ হয়েছিল শিল্পীর নিজের হাতে করা সম্রাটের প্রার্থনা পুস্তকের অলংকরণ। বিশেষ টাইপে ছাপানো এই বইয়ের পাতার মার্জিনে লাল, সবুজ ও বেগুনী রঙে কালিতে বাইবেলোক্ত চরিত্রের সংগে নানা রকম জন্তু জানোয়ার, প্রতীক ও নিসর্গ দৃশ্য মিশিয়ে প্রিমিটিভ ও আধুনিক মেজাজের সমন্বয়ে বিচিত্র এক অলংকরণ সৃষ্টি করেন তিনি।

১৫১৪তে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। তাঁর বাবার মত মায়ের কোন পেন্টিং নেই। কিন্তু মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে করা কাঠকয়লার ড্রয়িংটি অনেক পেন্টিং-এর চেয়ে মূল্যবান। শীর্ণ কায়া বৃদ্ধার [illegible]

দৃষ্টিতে ও দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে ৬৩ বছরের নিঃশব্দ বেদনা লুকিয়ে রয়েছে। ছবির কোণে শিল্পী লিখে রাখেন তাঁর মা অনেক রোগ ভোগ করেছেন, অনেক কষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু কখনো অভিযোগ করেন নি। মাস দুয়েক বাদেই তাঁর মৃত্যু হয়। ডুরার লেখেন 'মৃত্যুতে জীবিতাবস্থার চাইতেও তাঁকে সুন্দর দেখাচ্ছিল, আমার সাধ্যমত সম্মানের সঙ্গে তাঁকে সমাধিস্থ করলাম।' এর কিছুকাল পরেই তাঁর বিখ্যাত এনগ্রেভিং 'মেলাঙ্কলিয়া' প্রকাশিত হয়।

১৫১৩ থেকে ১৪র মধ্যে যে তিনখানি 'মাস্টার এনগ্রেভিং' ডুরারকে গ্রাফিক শিল্পীদের অগ্রগণ্য করে রেখেছে সেগুলি হল 'নাইট, ডেথ অ্যান্ড ডেভিল', 'সেন্ট জেরোম' এবং 'মেলাঙ্কলিয়া-১'। এগুলি প্রায় একই মাপের এবং সম্ভবতঃ একটি সিরিজের কাজ। প্রথমটিতে সামনে মৃত্যু এবং পিছনে শয়তানকে উপেক্ষা করে সুদূরস্থ ধর্মের দুর্গকে লক্ষ্য করে অন্ধকারাচ্ছন্ন পার্বত্য পথে নিঃশঙ্কচিত্তে এক অশ্বারোহী চলেছে; সঙ্গে বিশ্বস্ত কুকুর। এরাজমুজের খৃস্টীয় সৈনিকের বর্ণনার প্রভাবে আঁকা অল্পালোকিত ছবি। খৃস্টীয় পন্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রতিফলন হয়েছে দ্বিতীয় চিত্রে। ঘরের অজস্র খুঁটিনাটির বর্ণনার মধ্যেও দূরে লিখনরত বৃদ্ধের মূর্তি হারিয়ে যায় নি। সামনে অর্ধনিদ্রিত পোষা সিংহ, জানলা দিয়ে ছড়িয়ে পড়া রূপোলী আলোয় একটা শান্ত ও ঘরোয়া ভাব ফুটে উঠেছে। তৃতীয় ছবির বক্তব্য ও প্রতীক অনেক আলোচনার পরেও পরিষ্কার হয়নি। অনৈসর্গিক আলো-আঁধারের মধ্যে ছবির দক্ষিণে ডানাওয়ালা এক রমণী মূর্তি নানা যন্ত্রপাতি পরিবৃত হয়ে একটি ম্যাজিক স্কোয়ার ও সময়-নির্দেশক কাচের আধারের তলায় বসে কি যে চিন্তা করছে তার হদিশ মেলা ভার। পাশে এক শাণ-পাথরের ওপর কিউপিড বসে কি যেন লিখছে। পায়ের কাছে এক নিদ্রিত কুকুর। দূর দিগন্তে এক উড্ডীয়মান বাদুড়ের কোলে লেখা 'মেলাঙ্কলিয়া-১'। আরো সিরিজ করবার ইচ্ছে ছিল কি না কে জানে। এ সময় শিল্পী নিখুঁত সৌন্দর্যের ফরমুলা আবিষ্কারের চেষ্টায় ছিলেন। তিনি একবার লেখেন, 'নিখুঁত সৌন্দর্য যে কি তা আমি জানি না।' তাই মনে করা হয় যে এখানে সৃষ্টির নানান যন্ত্রপাতি পরিবৃত হয়েও শিল্পী যে নিখুঁত সুন্দরকে সৃষ্টি করতে অক্ষম তাই প্রতিফলিত হয়েছে। প্রতিভার অশান্ত বেদনার এ এক রূপ। একে ডুরারের মোনালিসা বলা চলে।

সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ান ডুরারের জন্যে একটি পেনসনের ব্যবস্থা করেন। তাঁর মৃত্যুতে সেটি বন্ধ হয়ে গেলে নতুন সম্রাট পঞ্চম চার্লসের অনুমোদনের জন্যে আবেদন করতে ১৫২০তে ডুরার সস্ত্রীক নেদারল্যান্ড যাত্রা করলেন।

নেদারল্যান্ড ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ তাঁর [illegible] পাওয়া যায়। [illegible]

বহু বিখ্যাত ব্যক্তি ও শিল্পীদের কাছ থেকে তিনি সাদর অভ্যর্থনা পান ও ভোজসভায় আমন্ত্রিত হন। তাঁর অনেক প্রিন্ট এ সময়ে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার থেকে বিশেষ লাভ হয়নি, কারণ সামান্য উপকারের বিনিময়ে অনেক ছবি বিলিয়ে দেন বা অনেকের ছবি এঁকে দেন। অনেক অসাধারণ জিনিসের বর্ণনা বা ছবি আঁকা আছে এবং অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনেছেন বলেও জানা যায়। জীল্যান্ডে এসে শোনেন সমুদ্রের ধারে এক বিরাট প্রাণী এসেছে। নৌকা নিয়ে তখনি দেখতে ছোটেন। কিন্তু ততক্ষণে সেটি (তিমি) ভেসে গিয়েছে। কিন্তু ফেরার মুখে ঝড়জলে ভিজে তাঁর যে ব্যাধি হয়, সেটি তাঁর মৃত্যুর অন্যতম কারণ হয়েছিল। এরাজমুজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তাঁর একটি প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। ডেনমার্কের রাজা ক্রিশ্চিয়ান তখন পঞ্চম চার্লসের অভিষেকে যোগ দিতে আসেন। ডুরার তাঁর একটি ড্রয়িং ও পেন্টিং করে দেন এবং তাঁর সঙ্গে রাজা চার্লসের অভিষেকে উপস্থিত হন। এই দুই রাজাই শিল্পীকে ভোজে নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়িত করেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য সফল হয়, কারণ বছরে ১০০ ফ্লোরিন পেনসন মঞ্জুর হয়েছিল। অ্যান্টওয়ার্পে তাঁকে স্থায়ী বসবাসের অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু এটি তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। এখানেই একটি শ্মশ্রুমন্ডিত বৃদ্ধের ব্রাশ ড্রয়িং তাঁর শেষের দিকের সেন্ট জেরোম নামে একটি পেন্টিং-এর মডেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ড্রয়িং-এর ওপরকার লেখা থেকে জানা যায় যে, বৃদ্ধের বয়স তখন ৯৩ এবং তাঁর শক্তি ও বুদ্ধি নষ্ট হয়নি। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ ড্রয়িংগুলির একটি।

১৫২১এ দেশে ফেরার পর খৃস্টজীবনী নিয়ে একটি উডকাটের সিরিজ এবং পির্খাইমার, এরাজমুজ, মেলাঙ্কথন (প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনে লুথারের অন্যতম সহকারী ও বিখ্যাত হিউম্যানিস্ট) প্রমুখ কয়েক জনের এনগ্রেভিং প্রকাশ করেন। নুরেমবার্গের মেয়র য়াকব মুফেল ও সেনেটর হিয়েরোনিমাস হলশুহের-এর দুটি প্রতিকৃতি উল্লেখযোগ্য পেন্টিং। এই সময়ে নিপীড়িত খৃস্টের রূপে নিজের একটি ড্রয়িং করেন। উপবিষ্ট নগ্ন বেদনার্ত মূর্তি, হাতে নিপীড়নের যন্ত্র একটি চাবুক। ২২ বছর আগেকার সুন্দর মূর্তি নয়। এ যেন জীবনের সমাপ্তি সূচনা।

তাঁর শেষ মহৎ চিত্র হল 'ফোর অ্যাপসলস' বা খৃস্টের চার শিষ্য পল, পিটার, ম্যাথু ও মার্ক, যাঁরা খৃস্টের বাণী চারিদিকে ছড়িয়ে দেন। এ ছবিও কারো আদেশে আঁকা নয়। নিজের তাগিদেই এঁকেছিলেন এবং নুরেমবার্গের কাউন্সিলকে উপহার দিয়েছিলেন, কোন চার্চকে নয়।

তাগিদের কারণ ছিল। ডুরার যদিও ক্যাথলিক চার্চ পরিত্যাগ করেন নি, তবু

লুথারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। নেদারল্যান্ডে থাকতে যখন গুজব ওঠে যে লুথার গ্রেপ্তার হয়েছেন তখনকার দীর্ঘ আক্ষেপ থেকে বোঝা যায় শিল্পী লুথারকে কি চোখে দেখতেন। তাছাড়া নুরেমবার্গ শহরই প্রথম লুথারের স্বপক্ষে যায়। কিন্তু লুথারের মতবাদ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লে তার যেসব প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, তা লুথার ও সমকালীন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের গভীর দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল। চরমপন্থীরা লুথারের শিক্ষাকে মূর্তি ধ্বংস, সাম্যবাদ ও বহু বিবাহ ইত্যাদির সমর্থনে লাগাতে চায় এবং নানারকম অনাচার চালাতে থাকে। জার্মানীতে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়। লুথার অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে এদের উচ্ছেদ কামনা করেন। অনেকেরই মনে হল রোমের চাইতে ভেতরের শত্রুই বেশী মারাত্মক। তাই শহরের শাসকবর্গের প্রতি সতর্কবাণী হিসেবেই এই ছবির সৃষ্টি। খৃস্টের প্রকৃত বাণীর কেউ যেন ইচ্ছামত বিকৃতি সাধন করে মানুষকে বিভ্রান্ত না করে তারই সাবধান বাণী—প্রোটেস্টান্ট শিল্পের একটি দলিল।

দীর্ঘকায় দুটি প্যানেলে দুজন করে পূর্ণাঙ্গ দণ্ডায়মান মূর্তি। তাঁদের হাতে বাইবেল ও বিভিন্ন প্রতীক। ছবির নীচে তাঁদের কয়েকটি বিশিষ্ট উক্তি লিপিবদ্ধ করা। ছবির সামনের দিকে জন ও পল এবং পেছন দিকে পিটার ও মার্ক যেন চারদিক রক্ষা করছেন। সে যুগের ধারণা অনুযায়ী চারজনকে চার রকমের চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। চেহারাগুলি সমকালীন অনেক বিখ্যাত চরিত্রের থেকে আহরণ করা হয়। এর রং রূপ মডেলিং কাপড়ের ভাঁজ ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যেই রেণেসাঁস আদর্শের ছাপই বেশী। ১৫২৬এ নুরেমবার্গ কাউন্সিলে ড্যুরার একটি চিঠিতে লেখেন, 'এইমাত্র যে ছবিটি আঁকা হয়েছে তাতে যে কোন ছবির চাইতে বেশী পরিশ্রম করেছি। একমাত্র আপনাদেরই আমি এই স্মৃতিচিহ্নটি রক্ষা করবার উপযুক্ত বলে মনে করি।' কোন অতিশয়োক্তি করেন নি। কাউন্সিল সাদরে এই উপহার গ্রহণ করেন ও শিল্পীকে উপহারস্বরূপ ১০০ ফ্লোরিন দেন।

১৫২৮-এর ৬ই এপ্রিল ড্যুরার মারা যান প্রায় হঠাৎই। বন্ধু পির্খাইমারও তাঁর আকস্মিক অসুস্থতার খবর পাননি। লুথার থেকে শুরু করে জার্মানীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা তাঁর জন্যে শোক প্রকাশ করেন। সামান্য স্বর্ণকার গৃহে জন্মে রাজা-মহারাজা, জ্ঞানী-গুণীদের সম্মানের পাত্র হয়েছিলেন তিনি এবং প্রায় একাই জার্মানীকে রেণেসাঁস শিল্প-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে যান।'

শিল্পী-জননী (১৫১৪)

শিল্পচিন্তায় রেণেসাঁস থেকে পথের সন্ধান নিলেও নিজের অভিজ্ঞতা এবং গথিক আদর্শ থেকে গ্রহণীয় কিছু তিনি পরিত্যাগ করেন নি। শিল্প শিক্ষার জন্যে যে বৃহৎ বইয়ের পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন তাতে নিজের অর্জিত জ্ঞান সকলকে দিতে চেয়েছিলেন। অনেকের মত আঙ্গিকের কলাকৌশল গোপন করার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। পারস্পেকটিভ, শরীর সংস্থান বিদ্যা, স্থাপত্য, অঙ্কন বিদ্যা এবং আশ্চর্যের বিষয় প্রতিরক্ষার ওপরেও মূল্যবান রচনা রেখে যান। কামানের প্রচলনের ফলে তখন যুদ্ধবিদ্যার আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। তাঁর অল্প কয়েকটি এচিং-এর মধ্যে বিস্তৃত নিসর্গ দৃশ্যের শান্ত পরিবেশের মধ্যে বৃহৎ একটি কামান একটি অনবদ্য ছবি। তাঁর প্রতিরক্ষার ওপর বইটি গত শতাব্দী পর্যন্ত সমরবিদরা আলোচনা করেছেন।

লুথারের বাইবেল প্রকাশিত হলে জার্মান গদ্যের রূপ পরিবর্তন হয়। ড্যুরারের দানও উপেক্ষণীয় নয়। তিনিই প্রথম জার্মান গদ্যে বৈজ্ঞানিক ও নন্দনতাত্ত্বিক রচনার সূত্রপাত করেন। এর পরিভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর অনেক কিছুই তাঁকে হাৎড়ে বার করতে হয়েছিল; কারণ ল্যাটিনেই এসব বিষয় নিয়ে লেখা হত।

সারা জীবন তিনি আদর্শ সৌন্দর্য খুঁজেছিলেন। কিন্তু শেষে বোঝেন যে, অনেকের মত গ্রহণ করলেই যে কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তিনি বলতেন যে যতই প্রকৃতির অনুকরণ করা যায়, ততই ছবির শিল্পগুণ বাড়ে, তবে অন্ধের মত অবৈজ্ঞানিক প্রথায় করলে চলবে না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র ঈশ্বরই আদর্শ সৌন্দর্যের ধারণা করতে পারেন, মানুষ কেবল আপেক্ষিক সৌন্দর্যের কথা চিন্তা করতে সক্ষম। তাই যা কিছু তাঁকে আকৃষ্ট করেছে তার মধ্যেই সুন্দরকে দেখতে চেয়েছেন। ব্রুসেলসে থাকার সময় মেক্সিকো থেকে সদ্য লুণ্ঠিত সোনারূপোর কাজ ও রেডইন্ডিয়ানদের ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মধ্যেও সৌন্দর্য আবিষ্কার করেন। তখন এসব জিনিসের মধ্যে নিছক কৌতূহলের খোরাক ও এর আর্থিক মূল্যটাই সকলের কাছে প্রধান ছিল।

তিনি মনে করতেন শিল্পী চয়ন করবে বাইরে থেকে আর তার সমন্বয় হবে মনের মধ্যে। দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলে বাইরের সাহায্য বিনাই রূপ সৃষ্টি সম্ভব। শিল্প এবং জ্ঞান তাঁর কাছে সমার্থক ছিল, এবং যেহেতু এ জিনিস প্রকৃতিতে নিহিত তাই তার ভেতর থেকে একে নিংড়ে বার করতে হবে। তবে ঈশ্বরের চেয়ে ভাল কিছু সৃষ্টি করার শক্তি মানুষের নেই। ধর্মীয় পরিবেশে মানুষ হওয়ার ফলে তাঁর শিল্পচর্চায় ধর্মবিষয়ক ছবি ও যুগের প্রধান ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি এই দুটি বিষয়ই প্রধান হয়ে উঠেছিল।

প্রতিভার মৌলিকত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি বলেন যে, প্রতিভাবান শিল্পীর এক বেলায় আঁকা কালি-কলমের একটি স্কেচ অপরের এক বছরের পরিশ্রমে আঁকা বৃহৎ ছবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আজ এ কথা স্বতঃসিদ্ধ মনে হতে পারে; কিন্তু যে যুগে রং-তুলি-ক্যানভাসের দাম আর পরিশ্রমের ঘন্টা হিসেবে ছবির মূল্য ধার্য হত বা কটা মুণ্ডু আঁকা হয়েছে গুণে দেখা হত, সে যুগে এই উক্তির মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। শিল্পীর নিজের আঁকা ছবি এবং ড্রয়িংগুলির মধ্যেও এই উক্তির সত্যতা দেখা যাবে। নিজেও এই অনন্যত্ব সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন। তাঁর সমস্ত ছবি ও ড্রয়িং তাঁর বিখ্যাত মনোগ্রাম দিয়ে সই করতেন ও তারিখ দিয়েছেন, প্রিন্ট জাল হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং প্রায় নার্সিসিস্ট-এর মত নিজের প্রতিকৃতি এঁকে গিয়েছেন ও তাঁর পারিবারিক ইতিহাস লিখে গিয়েছেন। সে যুগে তিনিই উত্তর ইউরোপের একমাত্র শিল্পী যাঁর লেখা থেকে তাঁর নিজের সম্বন্ধে এত তথ্য জানা যায়।

তবু এত বিদ্যা ও নিজের মৌলিকত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তাঁকে বিনয় থেকে বঞ্চিত করেনি। শেষ বয়সে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, 'আমার নিজের শিল্পকে আমি সামান্যই জ্ঞান করি। সকলে যেন তাদের শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী আমার ভুলভ্রান্তিগুলির সংশোধনের চেষ্টা করে। যদি ঈশ্বর করতেন তবে ভবিষ্যতে যেসব মহাশিল্পীরা আসবেন তাঁদের কাজ আমি দেখে যেতে পারতাম।'

বাঙালী জীবনে রবীন্দ্রনাথ

বাঙালীর সমাজে ও জীবনে রবীন্দ্রনাথ এক স্থায়ী আসন বিস্তার করেছেন। বাঙালী এমনভাবে আর কোন মনীষীকে গ্রহণ করেন নি। অথচ রবীন্দ্রনাথ ধর্মগুরু ছিলেন না, রাজনৈতিক হীরো ছিলেন না যে, তাঁকে ঘিরে ব্যক্তিপূজোর প্রবণতা গড়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক আর সর্বোপরি তাঁর জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে বাঙালীর হৃদয় মন জয় করেছেন। তাঁরই ভাষায়—'আমার হিয়ায় আমায় বুঝি, কেবল তুমি, কেবল তুমি।' — তিনি আমাদের ঘিরে আছেন। তাঁর তিরোভাবের পর এতগুলি বছর কেটে গেছে, আজ যাঁরা যুবক তাঁরা রবীন্দ্রনাথের দেহাবসানের পর জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁরা প্রবীণ তাঁরা সেদিন নবীন ছিলেন। ইতিমধ্যে দেশ বিভাগ ঘটে গেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, আর তার পর স্বাধীনতা-উত্তর-অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবু রবীন্দ্রনাথের গুরুত্ব হ্রাস পায় নি, হ্রাস করার প্রয়াস সফল হয় নি। তিনি আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খানের পৈশাচিক তাণ্ডবের বীভৎস আবহাওয়ায় আবার ভেসে উঠল রবীন্দ্রনাথের সেই আনন্দসুন্দর মূর্তি। ধ্বনিত হল তাঁর 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।' রবীন্দ্রনাথ বাঙালী, কারণ তিনি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বাংলা ভাষায় লিখেছেন, বাঙালী জাতিকে একটা নতুন মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বাংলাদেশে খান সেনাদের উৎপাতের পর অনেক বিদেশী সাংবাদিক ইয়াহিয়ার বর্বরতার একটা সুস্পষ্ট চিত্র বিশ্বের দরবারে পেশ করেছেন। একমাত্র এই সব নির্ভীক সাংবাদিকের নিরপেক্ষ 'ডেসপ্যাচ' আজ বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের সমস্যাকে কিছু পরিমাণে সুস্পষ্ট করে তুলেছে।

আমেরিকার বিখ্যাত দৈনিকপত্র 'নিউ-ইয়র্ক' টাইমসের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম জেমস পি ব্রাউন লিখিত 'বাংলাদেশ—রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার, অদৃষ্টের পরিহাস' — নিবন্ধটি নিউইয়র্ক টাইমসের ৩রা মে ১৯৭১ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধের অংশ-বিশেষের উদ্ধৃতি দিয়ে কোনো একটি প্রভাবশালী দৈনিকপত্রে বাংলাদেশে যা কিছু ঘটছে তার জন্য দায়ী রবীন্দ্রনাথ। এই ধরণের একটি আলোচনা সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। মিঃ জেমস পি ব্রাউনের রচনাটির অংশ বিশেষ যেভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছিল তা অতিশয় বিভ্রান্তিকর এবং রবীন্দ্রনাথকে কিঞ্চিৎ হীনভাবে রূপায়িত করার অপচেষ্টা হয়েছে এমন ধারণা পাঠকের মনে জাগা স্বাভাবিক।

মিঃ ব্রাউন পূর্ণ দু বছর কলিকাতায় বাস করেছেন এবং বাঙালীর জীবন ও সমাজ তাঁর কাছে বিশেষ পরিচিত। আমাদের জনৈক লেখকবন্ধু শ্রীদেবপ্রসাদ সিংহ মিঃ ব্রাউনের সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁর কলিকাতায় অবস্থানের কালে। শ্রীযুক্ত সিংহ 'নিউইয়র্ক টাইমসে'র সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি কোথাও সন্ধান করতে না পেরে মিঃ ব্রাউনের কাছে সেটি চেয়ে পাঠান, এবং সেই সূত্রে তাঁকে জানান যে, এই প্রবন্ধের অংশ-বিশেষ এখানে মুদ্রিত হওয়ায় রবীন্দ্রানুরাগী সমাজ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। পত্র পাঠমাত্র মিঃ ব্রাউন প্রবন্ধের একটি অনুলিপি পাঠিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে একদা বাঙালী মহলে তিনি যেভাবে সমাদৃত হয়েছেন সেকথাও জানিয়েছেন। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সিংহের কাছে প্রেরিত এই প্রবন্ধটি দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছে। সমগ্র প্রবন্ধটি পাঠ করলে দেখা যায় মিঃ ব্রাউন বাঙালীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন। তিনি বাঙালী জীবনে রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় ভূমিকার কথা সুনিপুণ ভঙ্গীতে বিধৃত করেছেন।

তিনি বলেছেন—'গাঙ্গের উপত্যকায় ১১০ মিলিয়ন বাঙালীর বাস, পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের এটি পূর্বাঞ্চল। পূর্ব পাকিস্তানে থাকেন ৭৫ মিলিয়ন মুসলমান এবং ভারতের পশ্চিম বাংলায় বাস করেন ৩৫ মিলিয়ন হিন্দু, ভারতীয় উপ-মহাদেশে এরা আয়ারল্যাণ্ডবাসীদের সমগোত্রীয়।'

মিঃ ব্রাউন অবশ্য একটি বিরাট ভুল করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানে ৭৫ মিলিয়নের মধ্যে হিন্দুও কিছু ছিলেন এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ৩৫ মিলিয়নের মধ্যে কয়েক মিলিয়ন মুসলমানও আছেন।

মিঃ ব্রাউন বলেছেন, 'চরিত্রে বাঙালীরা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে সহিংস হয়ে ওঠে আবার কখনও তারা অতি সুশ্রী, ভদ্র এবং তীব্রভাবে কবিতা এবং রাজনীতিতে আসক্ত। তারপর বলেছেন—

> "It is no exaggeration that where there is one Bengali there is a poet; where two, a little magazine, where three a political party".

সাহিত্য ও রাজনীতির সঙ্গে বাঙালীর নাড়ীর যোগ মিঃ ব্রাউন তা দেখে গেছেন। তিনি কলিকাতা ও ঢাকাস্থ কফি হাউসে বিরামবিহীন আড্ডার আলাপাচারও দেখেছেন। বলেছেন গ্রামের অশ্বথের তলায় এই সব সামাজিক আলোচনা কেন্দ্র বসে। আর এই সব কারণে পশ্চিম পাকিস্তানীবৃন্দ এবং ভারতের পশ্চিমপ্রান্তবাসীরা বাঙালী-দের 'অলস এবং গপ্পে' বলে একটু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে দেখে থাকেন। আর অপর পক্ষে—

> "The Bengalis, in turn, assert there considerable intellectual and cultural achievements with disdain for outsiders that often borders on insufferable arrogance".

বাঙালীর চরিত্রে এই ঔদ্ধত্যের মধ্যে অন্য কারণও যে আছে মিঃ ব্রাউন সেদিকটা বিশ্লেষণ করার সুযোগ হয়ত পান নি। তিনি বলেছেন—বাঙালীরা বিদেশীদের প্রতি অতিশয় মধুর ব্যবহার করে, সেই ব্যবহার উৎসাহবর্ধক। বাঙালীদের বাসভূমি সবুজ শ্যামল, প্রায় আয়ারল্যাণ্ডের মতই। তবে আয়ারল্যাণ্ডের চেয়ে পূব ও পশ্চিম বাংলার মাটি অতিশয় উর্বর। এখানে ধান, পাট, ইক্ষু প্রভৃতি বীজ পড়লেই জন্মায়। অনেক মাছ নদীর জলে সঞ্চরণশীল। কিন্তু মধ্যযুগীয় যুদ্ধবিগ্রহের অভাবে এবং আধুনিক ওষুধপত্রের দয়ায় এই আব-হাওয়ায় প্রজনন শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে এই দুটি অঞ্চলের জনসংখ্যা এদেশের মধ্যে সর্বাধিক। একদা যেদেশে কমল বনে বিহার

করা সম্ভব ছিল সেদেশ আজ নিদারুণ দারিদ্র্যের কবলে।

কিন্তু এই অত্যধিক জনবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য সত্ত্বেও বাংলাদেশের পরিবেশ অতি-মনোরম। দৃশ্যপট কাব্য সুষমায় মণ্ডিত। সবুজ বাঁশের ঝাড়, নারকেল গাছের সার আর ট্রপিক অঞ্চলের উষ্ণ আবহাওয়া সব জড়িয়ে এ এক বিচিত্র দেশ। বর্ষার জলে পরিপূর্ণ অনেক গ্রাম দ্বীপের আকৃতি নেয়। আর বাংলার পল্লী অঞ্চলের সৌন্দর্য এবং বাঙালীর বিত্তবৃত্তি—

"The beauty of the Bengal country side and the spirit of the Bengalis is encapsulated in the works of the Nobel Prize-winning poet-philosopher Rabindranath Tagore. Every Bengali, Hindu or Mosle . reveres Tagore and can recite from his works by heart".

এর পর তিনি লিখেছেন—অনেক বছর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগীয় জনৈক গদাময় ব্যুরোক্রাটের সঙ্গে একদা তিনি জীপে চড়ে বাংলার গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করছিলেন। সেদিনকার সন্ধ্যাটি চমৎকার। সহসা তিনি রবীন্দ্রনাথের ছন্দোময় কবিতা আবৃত্তি শুরু করলেন।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে পশ্চিম পাকিস্তানীদের পৈশাচিক অত্যাচারের কালের একটি ঘটনার তিনি উল্লেখ করেছেন—

'Several weeks ago, during the brutal suppression of the Bengali autonomy movement in Dacca, West-Pakistani troops broke into a school master's home and angrily pointed to a picture of a bearded and on the wall.

"Bhasani?" they demanded accusingly, referring to the East Pakistani Communist leader.

"No" he replied scornfully "Tagore".

সৈন্যদল সন্তুষ্ট। লোকটা তাহলে বিদ্রোহী নয়। স্কুল মাস্টারকে ছেড়ে দিয়ে সৈন্যরা বিদায় হল।

মিঃ ব্রাউন বলেছেন, কিন্তু ওরা ভুল করেছে। যে কোন উগ্র রাজনৈতিক কর্মীর চেয়ে গ্রন্থের কবির ভয়ংকরত্ব অপেক্ষাকৃত কম মনে করে ওরা ভুল করেছে।

এর পরই তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ—

"Tagore, through his enormous contributions to enriching the Bengali language, has been a major force fostering Bengali nationalism which has precipitated violent division in Pakistan and chronically threatens the unity of India. This is an ironic legacy for a poet who preached the brotherhood of all men".

রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর জীবনে ও সমাজে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন একথা মিঃ ব্রাউন বুঝেছেন, তবে সাম্প্রতিক কালের রাজনৈতিক ও সামাজিক বহুবিধ আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকায় বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সমস্যার এই চমৎকার বিশ্লেষণ ঈষৎ ত্রুটি-পূর্ণ হয়েছে। তথাপি তাঁর এই সহানুভূতিশীল নিবন্ধটির জন্য বাঙালী হিসাবে আমরা কৃতজ্ঞ। —অভয়ঙ্কর

BANGLADESH—TAGORE'S IRONIC LEGACY (An article) By· JAMES P. BROWN, a member of the Editorial Board—of the New York Times — (N. Y. TIMES : May 3, 1971)

রাখালদাস নাহার শোকসভা : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রাখালদাস নাহা কয়দিন আগে গুপ্তঘাতকের হাতে নির্মম-ভাবে নিহত হন। পরিচিত-অপরিচিত সকলেই এই মানুষটির মৃত্যুতে গভীর শোকাহত। গত শুক্রবার প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সভায় সভাপতির ভাষণে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সকল দল এবং জন-গণের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন যে, আপনারা এমন এক পরিবেশ রচনা করুন যার মধ্যে সাংবাদিকরা নির্বিঘ্নে ভয়হীন চিত্তে তাঁদের কর্তব্য পালন করতে পারেন। সাংবাদিকরা কারো শত্রু নন, তাঁরা জন-গণের দাস। তাঁরা নিজস্ব বিবেক অনুসারে সৎ মনোভঙ্গীতে সংবাদ রচনা করেন। কোনো রিপোর্টার রচিত রিপোর্ট একদিন হয়ত প্রীতিকর মনে হল না, কিন্তু সেই বিশেষ রিপোর্টার রচিত অন্য রিপোর্ট পরদিন হয়ত প্রীতিকর হল। প্রবীণ সাংবাদিক হিসাবে আমি জানি সংবাদ সংগ্রহের ব্যাপারে কি পরিমাণ বিপদের ঝুঁকি সাংবাদিককে নিতে হয়। আমার মতে সাংবাদিকরা মহৎ দেশপ্রেমিক, কারণ সংবাদপত্রে কাজ করে তাঁরা জাতির সেবা করে থাকেন। নাহার মৃত্যুতে আমি ব্যথিত, তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছিলেন. এই কঠিন পরিশ্রমী মানুষটি সর্বদাই সকলকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসতেন। তাঁকে হত্যা করে কার উপকার হল জানি না—সাংবাদিকের এই জাতীয় পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের আর কোনো রেকর্ড নেই। সভায় প্রধানমন্ত্রী প্রেরিত একটি বাণী পঠিত হয়।

মানব মস্তিষ্ক বিষয়ে বক্তৃতা : সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে মানব-মস্তিষ্ক প্রসঙ্গে এক তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন ডাঃ বি মুখোপাধ্যায়। মস্তিষ্ক সম্পর্কে সহজ এবং সরল ভঙ্গীতে তিনি অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করেন। তিনি বলেন—আমাদের মস্তিষ্কের ওজন মাত্র তিন পাউন্ড, তার ভিতরে যে পদার্থ থাকে তা সামান্য অথচ তার ভিতর প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ নার্ভ-সেলের অবস্থান। এদের কার কি ভূমিকা তা এখনও ঠিক জানা যায়নি। বিজ্ঞানীরা কিন্তু মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ কি কি কাজ করে তা নির্ধারণ করেছেন, যথা মস্তিষ্কের সামনের

অংশ ব্যক্তিত্ব ও সৃজনশীলতার কাজে সহায়ক। মানব-মস্তিষ্কের বর্তমান **অবস্থাই চরম** অবস্থা নয়, ভবিষ্যতে এই **মস্তিষ্কের বিকাশ** আরো উন্নত এবং প্রখর **হবে।**

সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের **বায়োকেমিস্ট্রি** বিভাগ আয়োজিত মস্তিষ্ক-**বিষয়ক** দেওয়াল-চিত্র প্রদর্শিত হয়।

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন : পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্য এ-বছর বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন 'মহাজাতি সদনে' আগামী ২৯শে আগস্ট ১৯৭১ থেকে ৭ই সেপ্টেম্বর দশদিন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ আগামী সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনের বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানসূচীর জন্য উভয় বাংলার শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। *সদস্যপদ গ্রহণের শেষ তারিখ—৮ই আগস্ট, '৭১ ধার্য করা হয়েছে। এসম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্মেলন কার্যালয় ১৯বি, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট কলিকাতা-৭ এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।*

আন্তর্জাতিক রামায়ণ উৎসব : *ইন্দোনেশিয়া ও রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের যুক্ত প্রচেষ্টায়* আগামী আগস্ট মাসে ইন্দোনেশিয়ায় প্রথম আন্তর্জাতিক রামায়ণ উৎসব ও আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র-অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ভারত সরকার কর্তৃক এই অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মনোনীত হয়েছেন। তিনি 'ভারতে রামায়ণের শিল্পরূপায়ণ' বিষয়ে ভাষণ দান করবেন।

নতুন বই

আমার সোনার বাংলা (সংকলন)— সোমেন পাল সম্পাদিত। রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন। ৩০, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৯। দাম পাঁচ টাকা।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য এক এবং অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু বাঙলা দেশ খণ্ডিত। রাজনৈতিক বেড়াজালে দু-পারের মানুষের মুখ দেখাদেখি যেখানে ছিল বন্ধ, সাংস্কৃতিক সংযোগের সম্ভাবনাও সেখানে ছিল অবাস্তব। অথচ ওপার বাঙলার ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রসারিত হয়েছে ; সমৃদ্ধ হয়েছে। যবনিকার অন্তরালে বর্তমান, সেই সংস্কৃতির স্বাদ আমরা পাইনি। ওপার বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ স্বাধীনতা ঘোষণা করায়, সীমান্তের আবরণ শিথিল হয়েছে। অসংখ্য মানুষ এপারে আশ্রয় নিয়েছেন নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। সেই সঙ্গে এপারে এসে পৌঁছেছে ওপার বাঙলার সাংস্কৃতিক সম্পদ, যা আমাদেরও একান্ত নিজস্ব।

ওপার বাংলার রচনাবলীর কিছু কিছু সংকলন সম্প্রতি প্রকাশিত হোচ্ছে এপারে। *ওপারের কবি, কথাশিল্পী, প্রবন্ধকার, বুদ্ধিজীবীর চিন্তার আলেখ্য এইসব সংকলন। 'ও আমার সোনার বাংলা'র সম্পাদক সোমেন পাল বাঙলাদেশের লেখকদের রচনা নির্বাচন করেছেন আন্তরিকতার সঙ্গে গল্প, কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধ সমৃদ্ধ এই সংকলনটিতে যাঁদের লেখা আছে* শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বদরুদ্দিন উমর, আহমদ ছফী, জসীমুদ্দিন, বেগম সুফিয়া কামাল, শামসুর রহমান, কায়সুল হক, শাহেদা খানম, আবদুল মান্নান সৈয়দ, নিয়ামত হোসেন, দিলওয়ার, রাবেয়া খাতুন সিকদার আমিনুল হক, আসরাফ সিদ্দিকী ওমরআলি, মুনীর চৌধুরী, জাহাঙ্গীর খালেব, সাহেদ আলী, আনোয়ার আহমদ, আনসার আলী, দাউদ হায়দার, আবুল-কালাম শামসুদ্দীন, সৈয়দ সামসুল হক, মাহবুল হক, মাহমুদ আলি জামাল, এবং আবুল হাসান। সংকলনটি সমাদৃত হবে।

আরব্য রজনী (পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড)— তারাপদ রাহা। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা ১২। দাম পাঁচ টাকা।

'অ্যারাবিআন নাইট' এক অফুরন্ত গল্পের খনি। বাঙলা ভাষায় এর কিছু কিছু অনুবাদ হলেও পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ হয়নি। শ্রীতারাপদ রাহা সেই দায়িত্ব পালন করছেন দীর্ঘকাল যাবৎ। আরব্য রজনীর চারটি খণ্ড আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি বেরিয়েছে ৫ম ও ষষ্ঠ খণ্ড। আগেকার খণ্ডগুলির আলোচনাকালে আমরা লেখকের উদ্যম এবং প্রকাশকের দায়িত্ববোধকে স্বাগত জানিয়েছিলাম। শহারাজাদীর যাদুকরী গল্পের ইন্দ্রজাল বাঙলাভাষী পাঠককে যে মুগ্ধ করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ শ্রীরাহা অপূর্ব মুন্সিয়ানায় গল্পের সম্পূর্ণ অবয়বকে দেশীয় পরিমণ্ডলে নিয়ে এসেছেন। বর্তমান খণ্ডদুটিতে আছে অপূর্ব আতিথেয়তা, তিনবোনের কাহিনী, নকল-খলিফা, চোর চোর নয়, জেলে খলিফার কাহিনী, কামার-অল-জমান ও [illegible]দুরের কাহিনী, ছদ্মবেশে খলিফা এবং আবু হাসানের কাহিনী। গল্পরস কোথাও ক্ষুন্ন হয়নি।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

কণ্ঠস্বর (নজরুল জয়ন্তী বিশেষ সংখ্যা)— সম্পাদক : সত্যরঞ্জন বিশ্বাস। ৪৯।এল।৭ নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড, কলিকাতা—১১। দাম : তিরিশ পয়সা।

কণ্ঠস্বর আধুনিক কবিতার যুগধর্মী মাসিক মুখপত্র। গত পাঁচ বছর ধরে এই পত্রিকাটি পশ্চিমবঙ্গে তরুণদের কবিতা আন্দোলনে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক কবিতার ছন্দ, গতি ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালাচ্ছেন এঁরা। আলোচ্য সংখ্যাটি অভিনব এজন্য যে, কবি নজরুলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে উভয় বাংলার প্রায় ষাটজন কবি-সাহিত্যিক কবিতা ও আলোচনা করেছেন। প্রখ্যাত অনেক সাহিত্যিকেরও পাশে অতি তরুণরাও লিখেছেন। নজরুলকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি, নজরুল রচনা থেকে উদ্ধৃতি ও নজরুল গ্রন্থাবলী থাকায় পত্রিকাটি বিদগ্ধজনের প্রশংসা পাবে। সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, সৌম্যেন ঠাকুর প্রভৃতিরা কবিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যে রচনা লিখেছেন তাও সংক্ষেপে আছে। পত্রিকাটি পরিকল্পনা করেছেন অমিতাভ চৌধুরী।

ঊষালোক (আষাঢ়, ১৩৭৮) সম্পাদক : পরিমল মুখোপাধ্যায় ও অরবিন্দ ভট্টাচার্য। ১২৩।এ, কেশব সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯। পঞ্চাশ পয়সা।

সাময়িক পত্রিকার অঙ্গনে নবজাতকের নতুন পদক্ষেপ গল্প-কবিতার সংকলন হিসেবে। সম-কালীন সাহিত্য ও সাহিত্য আন্দোলনের ওপর লেখা তরুণ সন্যালের প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

বক্রদৃষ্টিতে সীমা তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, না, আপনি ভুল করছেন, আমার নাম অমিতা রায় নয়।

—কিন্তু আপনাকে আমাদের অফিসে কাজ করতে দেখেছি আমি,—বলল অরুণ বসু। সচরাচর এমন ভুল তার হয় না।

—কোন্ অফিস? সীমা তাকাল ভদ্রলোকের দিকে।

—কোলরিজ অ্যান্ড সন্স।

—কখনও নাম শুনিনি। হয়ত আমার চেহারার সঙ্গে কিছুটা মিল আছে আপনার পরিচিতার। কথাটা বলে আর দাঁড়াল না সীমা, একটা বাসে উঠে পড়ল। অরুণ বসু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সেইদিকে তাকিয়ে।

বাসে উঠে সীমা লেডিজ সীটে গিয়ে বসল বটে, কিন্তু ভীড়ের জন্য অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সাধারণতঃ সে অফিসের সময় বাসে বা ট্রামে যায় না। কিন্তু লোকটাকে এড়াবার জন্য এছাড়া আর অন্য উপায় ছিল না। টিকিট কেটে কয়েক স্টপেজ পরেই নেমে গেল সে। এতক্ষণে যেন সে নিশ্চিন্ত বোধ করছে। তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকে কেউ লক্ষ্য করছে—একথাটা চিন্তা করলেই সে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তার দেহের স্নায়ু কঠিন হয়ে যায় সেই মুহূর্তে। এটা কেন হয় সে বুঝতে চেষ্টা করেছে। এটার পেছনে কোন যুক্তি আছে কিনা, তা সে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। সৌন্দর্যের তারিফে বা মুগ্ধদৃষ্টির আকর্ষণে মেয়েরা স্বভাবতঃই প্রীতি অনুভব করে থাকে। কিন্তু তার বেলায় মানসিক প্রতিক্রিয়া [illegible] রূপ নেয় কেন এটা তার কাছে দুর্জ্ঞেয়। তবে একটা জিনিস তার মাঝে মাঝে মনে হয়। তার মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা অতলস্পর্শী গহ্বর লুকিয়ে আছে। একটা অলঙ্ঘনীয় বিরাট বাধা আত্মগোপন করে আছে তার অগোচরে। রাস্তাটা পার হয়ে সীমা অপর দিকের স্বল্প পরিসর ছোট রাস্তাটা ধরল, তারপর কিছুদূর যাবার পর একটা ম্যানসন হাউসের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দক্ষিণ কলকাতার এ অঞ্চলটা অপেক্ষাকৃত জনহীন। নতুন বাড়ী এবং রাস্তা, তার সঙ্গে অচেনা মুখের সারি। জায়গাটা সীমা পছন্দ করে। আর কিছু না হোক, রোয়াকে বসা চোঙা প্যান্টপরা ছেলেদের চোখা মন্তব্য শুনতে হয় না কিংবা আশেপাশের প্রতিবেশীও যেচে আলাপ করার চেষ্টাও করে না। [illegible]

তার ফ্ল্যাটে সে থাকতে পায় ততক্ষণ সে নিশ্চিন্ত। অন্ততঃ বিশ্রামের সুযোগটা মেলে। আজকাল বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা কেন তার বেড়ে গিয়েছে। অল্পতে এখন সে অসীম ক্লান্তি অনুভব করে। অসহায় বোধ করে সামান্য মানসিক চাঞ্চল্যে। নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে কিনা, সীমা তাই ভাবছে এখন। নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হলে বিশেষতঃ মেয়েদের পক্ষে, মানসিক বৃত্তিগুলো অন্যরকম হওয়া উচিত বলেই সীমার বিশ্বাস। মেয়ে বলেই যে সে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে এমন কিছু কথা নেই। তার মনে হয় অর্থনৈতিক বা দৈহিক কারণটা মেয়েদের পঙ্গু করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। অকর্মণ্যতা আর দাসত্ব-বন্ধন আনে মানসিক দুর্বলতা আর অলীক ভাবালুতা।

ব্যাগের মধ্য থেকে ইয়েল চাবিটা বের করে দরজা খুলে ফেলল সীমা। ঘরে ঢুকতেই পোড়া গন্ধ তার নাকে ঢুকল। নাকটা কুঞ্চিত করে সীমা ভাবতে চেষ্টা করল গন্ধের কারণ। মনে পড়ে গেল সকালের ওমলেট তৈরীর দুর্ঘটনার কথা। একটু অন্যমনস্ক হওয়ার ফলে পুড়ে গিয়েছিল সেটা। কিছু না খেয়েই তাকে বেরোতে হয়েছিল সেই কারণে। নিজের ওপর বিরক্ত হোল সীমা। অন্যমনস্ক হওয়া তার পক্ষে শুধু অশোভন নয়, রীতিমত অপরাধ! সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতির ফলে অনেক বিপর্যয়ের কথাই জানে সে। তাড়াতাড়ি ব্যাগটা সাইড-টেবিলে রেখে কিচেনে গেল সে। জানালা বন্ধ রাখার জন্য অপ্রিয় গন্ধটা সবটা বেরিয়ে যেতে পারে নি। এটা তার আর একটা শৈথিল্য। বোকার মত জানালাটা বন্ধ করে যদি না দিত তাহলে এই অসহনীয় দুর্গন্ধটা তাকে বিফল সকালের কথা মনে করিয়ে দিত না। জানালাটা খুলে দিল সে। এবার নজর পড়ল ফ্রাইং-প্যানে রাখা পোড়া সামগ্রীটির ওপর। তাড়াতাড়িতে সেটা ফেলে দিতেও ভুলে গিয়েছে। এবার গৃহ-স্থালির দিকে নজর দিল সীমা। প্রথমে কিচেনের আসবাবপত্রের নিখুঁতভাবে সংস্কার করল তারপর বেডরুমে ফিরে এসে তার পোশাকটা পাল্টে নিল। হঠাৎ সীমা অনু-ভব করল, তার প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছে। এবার ডিমের দিকে আর গেল না সীমা। কয়েকটা টোস্ট আর এক পেয়ালা চা নিয়ে সে খেতে বসল ধীরেসুস্থে। অনেক খুঁজে এই ফ্ল্যাটটা সে যোগাড় করেছে। সুন্দরী নিঃসঙ্গ যুবতীকে ভাড়া দিতে বাড়ীওয়ালা প্রথমে নারাজ হয়েছিল। কিন্তু অনেক বোঝা-বার পর তিনি সম্মত হয়েছিলেন শেষ-পর্যন্ত। একলা বাড়ীতে থাকতে সীমার ভাল লাগে। এটা তার অভ্যাস আছে। অন্য লোকের সংস্পর্শে সে শুধু দ্বিধাবোধ করে না, কুণ্ঠিত হয় রীতিমত। তার কাছে একাকীত্বের মূল্য অনেক। চা আর টোস্ট শেষ করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল সীমা। বিছানার নরম স্পর্শে তার দেহের সজীবতা আর মনের বিশ্রান্তি ফিরে এল। এতক্ষণে পরম নিশ্চিন্ত হোল সে। বিছানার ওপর একটা টিকিট পড়েছিল। অলস কৌতূহলে সেটা তুলে নিয়ে দেখল, বাসের টিকিট। বাসস্টপের অরুণ বসুর কথা মনে পড়ল: কোলরিজ অ্যাণ্ড সন্সের অরুণ বসু। চার বছর পরেও লোকটা তাকে চিনতে পেরেছে। কিন্তু চিনতে পারার কথা নয়। অনেক পরিবর্তন ঘটেছে তার। অনেক পার্থক্য হয়েছে তার সাজসজ্জায়, বেশভূষায় আর চেহারায়। সীমার মনে পড়ল, সে সময় তার চুলটা ববড্ করা ছিল। শুধু তাই নয়, তার রঙটা তখন ট্যানড্ ছিল। দুষ্প্রাপ্য আমেরিকান প্রসাধন সংগ্রহ করে তার গৌর-বর্ণকে ঢাকা দিতে পেরেছিল অনেক কষ্টে। ভ্রূটা তখন সরু আর তির্যক ছিল। এখন সে সবই পালটে গিয়েছে। চুলে এখন সে বেশীর ভাগ সময় বেণী বাঁধে। দেহের শুভ্র রঙটা অমলিন রয়েছে। ভ্রূটা ঈষৎ মোটা আর ধনুকের অনুকরণে সে এখন এঁকে থাকে। তবু অরুণ বোস তাকে চিনেছে। কথাটা মনে হতেই সীমা উত্তেজনায় উঠে বসল বিছানার ওপর। সেই অরুণ বসু—কোলরিজ অ্যাণ্ড সন্সের জুনিয়র পার্টনার। অবশ্য অন্যের মত গায়ে পড়া ভাব ছিল না লোকটার, কিন্তু একটা অভিভাবকসুলভ আধিপত্যের ভাব ছিল তার ব্যবহারে। প্রয়োজন না হলে কাজে অকাজে সদাসর্বদা তাকে শুদ্ধ উপদেশ দেবার ছলে এগিয়ে আসত না। তার ভালমন্দর ওপর এত নেকনজর দেবার কোন প্রয়োজনই ছিল না বলে মনে হোল সীমার। কেতাদুরস্ত আর শান্ত-প্রকৃতির লোক অরুণ বসু—একথা অস্বীকার করতে পারে না সে। লোকটার চালচলন, কথাবার্তায় একটা অদ্ভুত জোর ছিল সেটা তার বেশ মনে আছে। অরুণ বসুকে মনে মনে ভয় করেছে সীমা। কেন ভয় করেছে, তা হয়ত বলতে পারবে না সে। তবে তার উপস্থিতিতেই সীমার স্বাচ্ছন্দ্যবোধ লোপ পেত, অস্বস্তি বোধ হোত প্রচুর। ঠিক এই কারণে সে পারতপক্ষে অরুণ বসুর সামনে আসতে রাজী হোত না। অরুণ বসুকে বাসস্টপে দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। আর একটু হলে আতঙ্কে হয়ত আর্তনাদ করে ফেলত। গাড়ীছাড়া অরুণ বসুকে সে দেখেনি। সুতরাং বাসস্টপে অরুণ বসুর উপস্থিতিটা আকস্মিক দুর্ঘটনার মত কাজ করেছিল তার পক্ষে। কোলরিজ অ্যাণ্ড সন্সে সে কাজ করেছিল প্রায় এক বছর। তারপরেই সে সরে গিয়েছিল অন্য জায়গায়। তার অন্তর্ধানটা কোম্পানী এবং অরুণ বসু কিভাবে নিয়েছিল সেটা মাঝে মাঝে কল্পনা করে আনন্দ পেয়েছে সীমা।

বিছানা থেকে নেমে মেঝের ওপর দাঁড়াতে তার বক্সারের কথা মনে পড়ল। বক্সার সীমার কুকুর। গাঢ় বাদামী রঙএর এই ভীষণ-দর্শন জীবটাই সীমার একমাত্র বন্ধু। এটা বুলডগ জাতীয় কুকুর—লম্বায় অ্যালসেসিয়ানের থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট, কিন্তু পরিধি কিঞ্চিদধিক। বুলডগের চেয়ে বেশী একগুঁয়ে, তবে রাগ কম। তার আকৃতি এবং গর্জনই যথেষ্ট। তবে প্রয়োজনে দু-একটা লোককে সাংঘাতিকভাবে আহত করতে কয়েক সেকেণ্ডই লাগে তার। অরুণ বসুর পরই বক্সারের কথা মনে পড়ল। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। ছোট ঘরটা সীমা বক্সারের জন্যই ব্যবহার করে থাকে। সে শুধু সীমার বন্ধুই নয়—অন্ত্র, প্রহরী। রাত্রে শোবার সময় সীমা মাঝের দরজাটা খুলে রাখে। মানুষের চেয়ে কুকুরকে সে বিশ্বাস করে বেশী। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বক্সার এক লাফে তার কাছে এগিয়ে এল। তার আনন্দের আতিশয্য সীমার পক্ষে ভয়ের কথা, কারণ সীমার চেয়ে তার দেহের ওজন হয়ত বেশী।

সিট ডাউন বক্সার—চেঁচিয়ে বলল সীমা।

বক্সারের কথাটা মনঃপূত হোল না। কিন্তু অমান্য করতে পারল না সে। তার ইচ্ছে ছিল সারাদিন অদর্শনের পর সীমা তার আনন্দের উচ্ছ্বাসটা তারিফ করে। পাশে রাখা বেতটার দিকে লক্ষ্য পড়ল বক্সারের। এটা দিয়ে আঘাত করলে তার দেহের কোন ক্ষতি হয় না, তবে আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয়। সেটা তার পক্ষে আরও অসহনীয়। বক্সারের তদ্বির করার জন্য সীমা বাড়ীর ঝাড়ুদারকে নিয়োজিত করেছে। দুবেলা তার খাবার এবং প্রসাধনের ব্যবস্থা সে করে দিয়ে যায়। দিনে একবার বেড়াতে যায় বক্সার। এই নিয়মটা তার সবচেয়ে লোভনীয়। অপরপক্ষে সীমার এটাকে দুঃসময় বলা চলে। রাস্তায় বার হলে তাকে সামলান শক্ত হয়ে পড়ে। সীমা সঙ্গে থাকলে তার আনন্দের উচ্ছ্বাসটা যেন বেশী প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

বক্সারকে আজ একটু সকালেই নিয়ে বাড়ী ফিরল সীমা। তার অবচেতন মনের মধ্যে অরুণ বসু উপদ্রব শুরু করেছে, সেই কারণে তার মনটা তেমন ভাল নেই।

ইন্টারভিউ হবার একটু আগেই সীমা এসে উপস্থিত হয়েছে। অফিসটা নতুন খুলেছে। ক্যাশ-ডিপার্টমেন্টে একজন অ্যাসিসট্যেন্ট পদপ্রার্থী সে। ছোট ঘরটার মধ্যে বেশ কয়েকজন বসে রয়েছে উন্মুখ হয়ে। বেশীর ভাগই পুরুষ। শুধু সীমা আর একজন মেয়ে এসেছে চাকরীর অন্বেষণে।

আপনি সর্টহ্যাণ্ড জানেন? জিজ্ঞাসা করলেন মিস্টার মোদী—কোম্পানীর একজন ডাইরেকটর তিনি।

হ্যাঁ জানি, উত্তর দিল সীমা।

অনেক বিখ্যাত কোম্পানীর লেটার অফ রেকমেনডেশন রয়েছে।। এতে আপনার সম্বন্ধে অনেক ভাল কথা আছে। তাছাড়া আপনার অভিজ্ঞতা দেখছি প্রচুর।

নম্রভাবে একটু হাসল সীমা। এ ধরনের হাসি এ সময়ে খুব কার্যকরী হয় বলে জানে সীমা।

অনেক টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে, খুব রিস্কি,—মন্তব্য করলেন মিস্টার মোদী।

এর আগেও করেছি, সোজাভাবে তাকাল সীমা।

সাধারণতঃ আমরা সিকিউরিটি চেয়ে থাকি, বললেন মিঃ মোদী।

দরকার হোলে তাও দিতে পারি। ছোট করে উত্তর দিল সীমা।

তাহলে পঞ্চাশ হাজার—হাসিমুখে তাকালেন মিঃ মোদী।

আমার নামে বাবা প্রায় দেড় লক্ষ টাকার সম্পত্তি রেখে গেছেন।

বলেন কি? তাহলে চাকরী করতে এসেছেন কেন? কটাক্ষ করলেন মিঃ মোদী।

টাকার জন্য নয়, সময়টা কাজে কাটাতে পারলে শরীরমন ভাল থাকেই বলে জানি।

ঠিকই জানেন। বাই দি ওয়ে, কবে থেকে জয়েন করতে পারবেন।

যখন বলবেন।

তাহলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা নিয়েই যাবেন আর যদি অসুবিধে না হয় তাহলে কালই জয়েন করবেন। আমাদের এখন লোকের অভাব।

মিস্টার মোদীর বয়স প্রায় ষাট বছর। মাথাভরা চকচকে টাক, গোঁফদাড়ি মসৃণভাবে কামানো। পরনে নিখুঁতভাবে তৈরী স্যুট তার সঙ্গে ম্যাচ করা টাই এবং জুতো। মুখের মধ্যে মিস্টার মোদীর নাকটা অসংগতভাবে উদ্ধত। মুখে তার সদাসর্বদা যেন একটা তৈলাক্তভাব ফুটে রয়েছে বলে মনে হয়। কথাগুলো মোলায়েমভাবে বেরিয়ে আসছে মোটা ঠোঁটের মধ্য দিয়ে। সীমার কিন্তু মনে হোল মিস্টার মোদীর দৃষ্টিটা সুবিধের নয়। কথা বলার সঙ্গে যেমনভাবে সীমার সর্বাঙ্গে চোখ বুলোচ্ছেন, সেটার অর্থ কোন মেয়ের পক্ষেই বোঝা কষ্টকর নয়। এতে বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না সীমার। কারণ ইতিমধ্যে চাকরীর খাতিরে এইটুকু সহ্য সে করতে পারে, কিন্তু উর্ধে নয়। হঠাৎ অরুণ বসুর কথা মনে পড়ে গেল সীমার। তার দৃষ্টির মধ্যে এ ধরনের অশালীনতা ছিল না। কিন্তু এমন একটা কিছু ছিল যা তাকে বিরক্ত করত। অরুণ বসুর দৃষ্টিটা অন্তর্ভেদী বলা যায়। তার চোখের দিকে বেশীক্ষণ তাকাতে পারত না সীমা। অকারণে ভয় পেত যেন। অবশ্য মিস্টার মোদীর মত অনেকেই তার দিকে তাকিয়ে থাকে। অনেক মেয়ে আছে তারা নাকি এটা পছন্দ করে। তাদের সৌন্দর্য অপরকে আকৃষ্ট করে এতে তারা আনন্দ পায়, গৌরব অনুভব করে। সীমা সমস্ত জিনিসটাকে ঘৃণা করে। বয়স্ক লোকদের প্রতি তার তবুও কিছুটা শ্রদ্ধাবোধ ছিল, কিন্তু মিঃ মোদীর আপত্তিকর দৃষ্টিপাতের পর সে ধারণা তার পালটাতে শুরু করেছে।

সীমা সান্যাল কথা কম বলে কাজ করে বেশী। ক্যাশ ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু বলাই দত্ত শুধু নয়, সকলেই সীমার কর্মদক্ষতা, কর্তব্যবোধ আর নিষ্ঠার প্রশংসা করে। অফিসের কাজ অনেক বেড়ে গিয়েছে। শুধু ইয়ারলী ক্লোজিং-এর জন্য নয়। মাইনের সময় এটা। বলাইবাবুর সম্প্রতি ব্লাডপ্রেসার হয়েছে। তার ওপর কাজের চাপ পড়াতে তিনি একটু অস্থির হয়ে পড়েছেন। অন্যান্য অ্যাসিস্টেন্টের ওপর তিনি নির্ভর করতে পারেন না। শুধু অত টাকাকড়ির ব্যাপার বলে নয়, সবাই যেন ফাঁকি দিতে পারলে আর কিছুই চায় না। সকলেই চেষ্টা করে কত সকাল সকাল চেয়ার ছেড়ে বাড়ীমুখো হবে। চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মধ্যে একটা উস্‌খুস্‌ ভাব লক্ষ্য করেছেন তিনি। একমাত্র সীমা সান্যাল ছাড়া। মেয়েটি যেন কাজ করতে পারলে আর কিছুই চায় না। সকাল থেকে একনাগাড়ে একটার পর একটা কাজ করে চলছে—ক্লান্তি নেই, বিরক্তির চিহ্ন নেই। সীমা সান্যাল নিজের কাজ করেই ক্লান্ত নয়, অন্য লোকের কাজ করতেও তার আপত্তি নেই।

মিস সান্যাল,—ডিপার্টমেন্টের ছোটবাবু সলিল চৌধুরী সেদিন সীমার শরণাপন্ন হলেন।

বলুন,—সীমা তাকাল তার দিকে।

আমায় একটু সাহায্য করতে হবে; লেজারের অর্ধেক আইটেম লেখাই হয়নি। করুণভাবে তাকান সলিল চৌধুরী।

দিয়ে যান করে দিচ্ছি।

এ ধরনের সাহায্য সীমাকে প্রায়ই করতে হয়। এতে তার আপত্তি নেই। সেই কারণে সীমা আর বলাইবাবু সব শেষে অফিস থেকে ছুটি পায়। তাদের পর ঝাড়ুদার আর দারোয়ান নিস্কৃতি পেয়ে থাকে। দুজনে অপেক্ষা করে থাকে কখন ক্যাশ ডিপার্টমেন্টের আলো বন্ধ হবে। বড়বাবু বেশী মাইনে পান, তাছাড়া পুরনো লোক। তার কাজে চাড় থাকতে পারে, কিন্তু সান্যাল মেমসাব নতুন ঢুকে এত কাজ করেন কেন, তা তাদের কাছে যুক্তিহীন বলে মনে হয়। এদিক দিয়ে অন্যান্য বাবুরা অনেক ভাল, সাড়ে চারটের পর থেকেই সরে পড়েন, তাদের অযথা ঝামেলায় ফেলেন না। সান্যাল মেমসাব না থাকলে একলা বড়বাবু নিশ্চয় থাকতে পারতেন না। মোদী সাহেবের কথা অবশ্য আলাদা। তিনি অফিসের ম্যানেজিং ডাইরেকটার। সুতরাং

তিন চৌপর রাত থাকলেও বলার কিছু নেই।

মিস সান্যাল, আজ লেবার পেমেন্টের দিন মনে আছে। বলাইবাবু মনে করিয়ে দেন।

পে সীট রেডি আছে, উত্তর দেয় সীমা।

আপনার কাজে কোন ত্রুটি নেই সে আমি জানি, কিন্তু আর একটা ব্যাপার আছে, মানে পার্সোনাল বলেই আপনাকে বলছি।

সীমা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল বলাই-বাবুর দিকে।

আমায় আজ একটু সকাল সকাল ফিরতে হবে, পেমেন্টটা যদি আপনি করে দেন—

আমি! কিন্তু অত টাকা—বিস্মিত হয়ে তাকাল সীমা।

কেন, এর আগের বারেও আপনিই দিয়েছিলেন।

তা দিয়েছি, কিন্তু আপনার উপ-স্থিতিতে। না মিস্টার দত্ত, ও আমি পারব না, আমার ভয় করে।

কি মুস্কিল, ভয় কিসের? মাত্র ত সাতাশ হাজার টাকা।

তাহলে আর একজন লোক দিন।

আর লোক কোথায়? সাড়ে চারটের পর কাউকে পাবেন না। আপনি অমত করবেন না মিস সান্যাল, তাহলে আমি ভীষণ বিপদে পড়ব। চেকে যাদের পেমেন্ট হবে, তাদের ব্যবস্থাটা আমি আর সলিল-বাবু ম্যানেজ করে দিচ্ছি, ক্যাশটা আপনি করে দিন।

আজও আবার মিসেস মোদী আসবেন।

হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে, তিনি সাহেবের ঘরে থাকবেন। ওতে আপনার কাজ আট-কাবে না।

বলাইবাবু সাড়ে চারটের সময় সীমাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে অন্য সকলের সংগে চলে গেলেন। পাঁচটা বাজার একটু পরেই মিসেস মোদী এলেন। মঙ্গলবার আর শুক্রবার তিনি মিস্টার মোদীর সংগে বাড়ী ফেরেন। মিসেস মোদীর বয়স কম। প্রায় সীমারই মত। তার চুলগুলো ববড্ করা, চোখে হালকা রঙের গগলস্ আর পরনে পিঙ্ক-রঙের শাড়ী এবং চোলী। মিসেস মোদী মাত্র দুটি রঙ পছন্দ করে থাকেন, হয় পিঙ্ক, না হয় মেরুন। সীমা এক মাস ধরে লক্ষ্য করেছে মিসেস মোদী এ ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করেন না। মিসেস মোদী হাতে সাদা ব্যাগটা ঝুলিয়ে ছোট ছোট পা ফেলে দরজা পার হলেন। দারোয়ান তাকে প্রকান্ড সেলাম করল একটা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে তিনি সোজা চলে গেলেন মিস্টার মোদীর এয়ার কন্ডিশনড্ ঘরে। মিস্টার মোদীর ঘরের দরজা বন্ধ হতেই সীমা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। তার ব্যাগটা নিয়ে সে বাথরুমে ঢুকল সন্তর্পণে। প্রথমেই তার লম্বা বেণীটা খুলে রোল করে নিল ববড্-করা চুলের মত। তার পর ব্যাগ থেকে পিঙ্ক সিল্কের শাড়ী আর চোলীটা পরল নিখুঁতভাবে। এবার ঠোঁটে গাঢ়রঙের লিপস্টিক আর মুখে কমপ্যাক্টের তুলি বুলিয়ে প্রসাধন শেষ করল সে। হাতের ঘড়িতে লক্ষ্য করে দেখল সাজসজ্জায় ঠিক ছ' মিনিট লেগেছে। এখনও হাতে তার কয়েক মিনিট সময় রয়েছে। ছাড়া কাপড়-জামা পরিপাটী করে ভাঁজ করে ব্যাগের মধ্যে ভরে নিয়ে শান্তভাবে সে আবার ফিরে গেল নিজের চেয়ারে। লোহার আলমারীর চাবিটা বলাইবাবু দিয়ে গিয়েছিলেন। সেটা দিয়ে আলমারীর লকার খুলে টাকার বান্ডিলগুলো বার করে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখল সীমা। সব কাজগুলোই সে ঠান্ডা মাথায় করেছে। প্রত্যেকটি ভংগীই তার সামঞ্জস্যপূর্ণ আর নিখুঁত। ব্যাগ থেকে আগের শাড়ী বার করে তা থেকে দুটো টুকরো ছিঁড়ে নিল এলোমেলোভাবে। এবার আর একটি জিনিস বার করল সে। সচরাচর ছেলেরা যে ধরনের রুমাল ব্যবহার করে সেই রকম একটি রুমাল পাকিয়ে লম্বা করে মেঝের ওপর শাড়ীর টুকরোগুলো ফেলে দিল। বসার চেয়ারটা ধীরে ধীরে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে টেবিলে রাখা খাতার কাগজপত্র ছড়িয়ে দিল চতুর্দিকে! একবার ভালভাবে তাকিয়ে দেখে নিল তার কাজের কোন খুঁত আছে কিনা। পর্যবেক্ষণে সন্তুষ্ট হোল সে। ক্ষিপ্র সতর্কতার সংগে নোটের বান্ডিলগুলো ব্যাগে ভরে নিল। শুধু তার থেকে দু-তিনটি বান্ডিল মেঝের ওপর ফেলে দিল ইতস্তত ভাবে। তারপর ব্যাগ থেকে গগলস নিয়ে সেটা পরে বেরিয়ে গেল ধীরে ধীরে বাইরের দিকে। দারোয়ান তাকে মিসেস মোদী ভেবে লম্বা সেলাম জানাল।

অফিসের বাইরে বেরিয়ে সীমার অসম্ভব খিদে পেল। এরকম ঘটনার পরে সে লক্ষ্য করেছে তার খিদে পেয়ে থাকে। তার সংগে পেটের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে। এটা কেন হয় তা সে বুঝতে পারে না। প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, ভয় থেকে হয়ত এই ব্যথা জাগে, কিন্তু ইদানীং একাজে সে ভয় পায় না, উলটে যেন একটা তৃপ্তি মেলে, সাফল্যের স্বাদ পায়।

অরুণ বসু অমিতাকে বাস স্টপে দেখবে এটা ভাবেনি, এমনকি কলকাতায় তার দেখা পাবে এটা আশা রাখেনি। কোলরিজ কোম্পানীর টাকা চুরি যাবার পর যখন অমিতা রায়কে সন্দেহ করা হয়েছিল তখন সে-ই প্রথম আপত্তি জানিয়েছিল। একটা কোম্পানীকে দেওয়ার জন্য চেকটা রেডি করে রাখা হয়েছিল। কোম্পানীর স্ট্যাম্প সমেত রসিদ পাওয়া গিয়েছিল বটে কিন্তু টাকাটা তারা পায়নি। সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় জিনিসটা ধরা পড়েছিল প্রায় ছ'মাস আগে। অমিতা রায় তার আগেই রিজাইন দিয়ে চলে গেছে। পদ্ধতিটা সহজ, সরল, আর কার্যকরী। চুরিতে সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। যে কোম্পানীর নামে চেক ছিল, সেই নামে একটা নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল নামজাদা একটা ব্যাঙ্কে। এতে আপত্তি করার কিছু ছিল না। কোলরিজ কোম্পানীর চেকটা তাতে জমা দিয়ে যথাসময়ে সেটা নকল সই দিয়ে ক্যাশ করতে কোন অসুবিধে হয়নি অমিতার। কিন্তু অরুণের আপত্তি সত্ত্বেও এ-বিষয়ে যথারীতি তদ্বিরের ফলে এটা স্পষ্টই জানা গিয়েছিল অমিতা রায়ই টাকাটা আত্মসাৎ করেছে। জাল রসিদ আর নকল সই দুটোই ধরা পড়েছিল তারপর। অরুণ বসু লজ্জিত হয়েছিল অমিতা রায়ের হয়ে ওকালতি করার জন্য। অমিতাকে একটু অন্য ধরনের বলে মনে হয়েছিল তার। শান্ত, স্বল্পবাক মেয়েটি শুধু পরি-শ্রমী আর ভদ্র নয়, তার মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়েছিল অরুণ। সাধারণত যেসব মেয়েরা অফিসে কাজ করে তা থেকে অমিতা রায়কে ভিন্ন বলে মনে হয়েছিল। মেয়েরা কাজ করে সংসার চালাবার জন্যে, না হয় সময় কাটাবার জন্যে। অমিতা কিন্তু কোন দলের মধ্যেই পড়ে না। তার কাজ করার ভংগী আর নিষ্ঠা দেখে অরুণ প্রথম একজন মেয়ের মধ্যে অফিসের কাজকে পেশা বলে মেনে নিতে দেখল। এটা কম কথা নয়। এই ধরনের মেয়ে প্রতারণা করে টাকা আত্মসাৎ করবে এটা ভাবতেও পারেনি অরুণ। অনেকদিন পর অমিতাকে দেখল সে। অরুণের মনে পড়ল তার নাম যে অমিতা নয়, এটা বেশ সহজ-ভাবেই অস্বীকার করল সে। চোখে তার ভয়ের কোন চিহ্ন ছিল না, জড়তাও ছিল না তার ব্যবহারে।

ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার সময় অরুণ অমিতার কথাই ভাবছিল। নামটা যখন অস্বীকার করেছে তখন নতুন আর একটা পরিচয় নিশ্চয় নিয়েছে সে। অরুণের ভাবতেও আশ্চর্য লাগে অমিতার মত মেয়ে কেন এমন অস্বাভাবিক হোল। চেহারায় তার দারিদ্র্য বা অশিক্ষার চিহ্ন সে খুঁজে পায়নি। অরুণ বসুর এটা নিছক কৌতূহল নয়। ভদ্রঘরের মেয়ের অস্বাভাবিক অপরাধ-প্রবণ প্রবৃত্তির কারণটা খোঁজার জন্যে সে উৎসুক। সমাজ বা সংসারের চাপে পড়ে অনেকের মন অস্বাভাবিক রূপ নেয়, এটা তার অজ্ঞাত নয়, কিন্তু অমিতাকে সেই শ্রেণীভুক্ত বলে মনে হয়নি তার।

(ক্রমশঃ)

'৭১-এর লোকগণনায় ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯৭১ সালের লোকগণনার যে প্রাথমিক হিসাব সেন্সাস কমিশনার প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যায় যে, দশ বছরের ব্যবধানে ভারতের লোকসংখ্যা ২৪-৫৭ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় সিকিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মোটামুটি হিসাবে, '৬১ সালে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৪৩ কোটি ৯০ লক্ষ. '৭১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫৪ কোটি ৭০ লক্ষ।

ইতিপূর্বে কোন দশকের ব্যবধানে ভারতের লোকসংখ্যা এত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায় নি। পূর্বের লোকগণনার হিসাব-গুলিতে দেখা যায়, ১৯২১—৩১, ১৯৩১—৪১ ও ১৯৪১—৫১ দশকে ভারতের লোক বৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ১০-৬, ১৩-৫ ও ১২-৫ শতাংশ হারে। তারপর ১৯৫১—৬১ সালে লোক বৃদ্ধির হার হঠাৎ বেশ খানিকটা বেড়ে হয় ২১-৫ শতাংশ। আর এবার বাড়ল ২৪-৫৭ শতাংশ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই বৃদ্ধির হার যদি অব্যাহত থাকে তবে এই শতাব্দীর শেষে অর্থাৎ ত্রিশ বছরের মধ্যে ভারতের লোকসংখ্যা হবে ৮৫ কোটি, যা '৬১ সালের লোকসংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ।

অথচ এইবারের লোকগণনার হিসাবেই প্রকাশ, এদেশের শতকরা সত্তরজন, অর্থাৎ ৩৮ কোটি ২৯ লক্ষ লোক এখনও নিরক্ষর এবং প্রায় আট কোটি লোক নিরাশ্রয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষা ও আশ্রয় সমস্যা সমাধানে সরকারী উদ্যোগ সমতা রক্ষা করে চলতে পারছে না বলে নিরক্ষর ও নিরাশ্রয়ের সংখ্যাও প্রতি দশকের ব্যবধানে কয়েক কোটি করে বেড়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে কর্মহীন মানুষের সংখ্যাও দুর্নিবার গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং ত্রিশ বছরের মধ্যে দেশের লোকসংখ্যা যখন ৮৫ কোটি হবে, তখন প্রকৃত পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে তার আভাস এবারের লোকগণনার হিসাব থেকেই যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর অবশ্য এই বছরে এক কোটি দশ লক্ষ হারে লোক বৃদ্ধিতে খুব বিচলিত হন নি। বরঞ্চ এর মধ্যে তাঁরা পরিবার পরিকল্পনা অভিযানে সাফল্যের সুনিশ্চিত প্রমাণ পেয়ে বেশ খানিকটা আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করেছেন। কারণ, তাঁরা বলেছেন, তাঁদের অনুমান ছিল (আশঙ্কাও বলা যায়) '৭১ সালে ভারতের লোকসংখ্যা হবে ৫৬ কোটি ১০ লক্ষ। কিন্তু সে বৃদ্ধি যে ৫৪ কোটি ৭০ লক্ষে এসে থেমেছে, পরিবার পরিকল্পনার দাবী, সেটা তাঁদেরই নিরলস ও সফল অভিযানের সুফল।

কিন্তু এ দাবী যে অর্থহীন তা কোন যুক্তি দিয়ে বোঝানোর অপেক্ষা রাখে না। বছরে ২-৫ শতাংশ হারে লোকবৃদ্ধি, যার ফলে একটি দেশের লোকসংখ্যা আটাশ বছরে দ্বিগুণ হয়ে যায়, তা জনগণনার হিসাবে অতি দ্রুত বৃদ্ধির হার বলেই বিবেচিত হয়ে থাকে। ল্যাতিন আমেরিকা ও এশিয়া, আফ্রিকার দু-চারটি দেশ বাদে এত দ্রুত হারে পৃথিবীর কোথাও লোক বৃদ্ধি হয় না। ভারতেও ইতিপূর্বে কোন দশকে এত দ্রুত হারে লোকবৃদ্ধি ঘটে নি। সুতরাং পরিবার পরিকল্পনার সাফল্যের দাবী নিতান্তই অর্থহীন বলে মনে হয়। আসলে মৃত্যুহার এদেশে যতটা হ্রাস পেয়েছে বলে পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর মনে করেছিলেন ততটা হ্রাস না পাওয়ার জন্যই এদেশের লোকসংখ্যা ঐ দপ্তরের অনুমিত হিসাবে পৌঁছাতে পারে নি। ১৯২১—৩১ সালে ভারতের মৃত্যুহার ছিল হাজার-করা ৩৬-৩, চল্লিশ বছর পরে ১৯৬১—৭১ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে হাজার-করা ১৫-৬। মৃত্যুহারের এই হ্রাস নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের আশা ছিল, ১৯৬১—৭১ সালে মৃত্যুহার আরও কমে হাজারে ১২-৫ দাঁড়াবে। সেটা না হওয়ার জন্যই ভারতের লোকসংখ্যা তাঁদের হিসাব মত ৫৬ কোটি ১০ লক্ষ হতে পারে নি। অর্থাৎ, ভারতের লোকসংখ্যা যে এক দশকের ব্যবধানে আরও এক কোটি চল্লিশ লক্ষ বাড়তে পারে নি তার জন্য পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের চেয়ে চিত্রগুপ্তের কৃতিত্বের দাবীই বেশী।

পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে এদেশের মৃত্যুহার যেখানে হাজার-করা ৩৬-৩ থেকে কমে ১৬-৬ হয়েছে, সেখানে ঐ সময়ের ব্যবধানে জন্মহার কমেছে হাজার-করা ৪৬-৪ থেকে মাত্র ৩৯-৮-এ। আসলে আগে যে লোকবৃদ্ধির হার কম ছিল তার প্রধান কারণ ছিল মৃত্যুহারের আধিক্য। সুতরাং জন্মহার প্রায় অপরিবর্তিত থেকে মৃত্যুহার যত দ্রুতগতিতে হ্রাস পাবে লোকবৃদ্ধির হারও তত দ্রুতগতিতে বেড়ে যাবে। এই জন্যই জনস্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যুহার যেমন হ্রাস পাবে জন্মহারও সেই মত এবং প্রয়োজনে তার চেয়েও দ্রুতগতিতে হ্রাস পাওয়া দরকার, আর তারই জন্য প্রয়োজন পরিবার পরিকল্পনার। আলডুস হাক্সলির ভাষায়—

> A society that practises death control, must at the same time practise birth control

পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে ভারত পৃথিবীর অন্যতম অগ্রণী দেশ। প্রতি পঞ্চবার্ষিক যোজনাতেই পরিবার পরিকল্পনার জন্য অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে এবং প্রতিবারেই বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায় পরিবার পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ২৭ কোটি টাকা; আর চতুর্থ যোজনায় সে অঙ্ক প্রায় দশ গুণ বাড়িয়ে ৩১৫ কোটি টাকা করা হয়. জন্মহার হাজার-করা ২৫-এ নামানোর লক্ষ্য স্থির করে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, জন্মহার ৪০-এর নীচে নামানো সম্ভব হয়নি, যদিও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির ফলে মৃত্যুহার বেশ খানিকটা হ্রাস পেয়েছে। চতুর্থ যোজনার মেয়াদ অবশ্য এখনও শেষ হয়নি, কিন্তু অবশিষ্ট সময়ে বড় একটা সাফল্যের আশা নিশ্চয়ই কেউ করেন না।

আসলে জন-সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য যে জাতীয় চেতনা দরকার, তা আমাদের নেই। তার জন্য প্রধানত দায়ী অশিক্ষা, তারপরে দায়ী কুশিক্ষা ও কুসংস্কার। '৭১-এর লোকগণনার হিসাবে দেখা যাচ্ছে, দশ বছরে এদেশে শিক্ষিতের সংখ্যা ২৪-০৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৯-৩৫ শতাংশ করা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং যে-দেশের ৭০ শতাংশেরও বেশি লোক এখনও নিরক্ষর, এবং নানা ধর্মীয় ভীতি ও লৌকিক কুসংস্কারে যে-দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রায় সকলেই আচ্ছন্ন সে-দেশের সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় জন্ম-নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী হবে এমন আশা দুরাশারই নামান্তর। অথচ জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি জাতির সার্বিক উদ্যোগ অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে কি বিপুল সাফল্য অর্জন করতে পারে তা জাপানের দিকে তাকালেই বুঝতে পারি। ১৯৪৭ সালে জাপানে জন্মহার ছিল হাজারে ৩৪-৩, মাত্র দশ বছরের ব্যবধানে, ১৯৫৭ সালে সে-হার নেমে হয় ১৭-২। এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে জাপান, গর্ভপাত থেকে শুরু করে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় পদ্ধতি ও প্রয়োগকে আইনানুমোদিত ও সরকারি প্রচেষ্টায় সহজলভ্য করে। জাপানের সব লোক শিক্ষিত ও জাতীয় চেতনাসম্পন্ন। তারা জানে যে, জাপানের লোকবৃদ্ধি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত না হলে সে-দেশের জীবনযাত্রার বর্তমান উন্নত মান বজায় রাখা কিছুতেই সম্ভব হবে না। আমাদের দেশে সে-জাতীয় সচেতনতা জাগিয়ে তোলার জন্য কতটুকু চেষ্টা হচ্ছে?

বিশ্বের প্রতি সপ্তমজন ভারতীয়

সর্বশেষ হিসাব অনুসারে পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যা ৩৭১ কোটি। তার মধ্যে ভারতের লোকসংখ্যা ৫৪ কোটি ৭০ লক্ষ। যার মানে হল পৃথিবীর প্রতি সাত-জনের একজন ভারতীয়। পৃথিবীর ভূ-খণ্ডের মাত্র দুই-শতাংশ স্থান নিয়ে ভারত, অথচ পৃথিবীর চোদ্দ শতাংশ লোক বাস করে এখানে।

১৯০১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত লোকগণনার হিসাব নিম্নে দেওয়া হল। তাতে দেখা যাবে, সত্তর বছরে এ-দেশের লোকসংখ্যা ১২৯-৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯০১ — ২৩,৮৩,৩৭,০০০
১৯১১ — ২৫,২০,০৫,০০০
১৯২১ — ২৫,১২,৩৯,০০০
১৯৩১ — ২৭,৮৮,৬৮,০০০
১৯৪১ — ৩১,৮৫,৩৯,০০০
১৯৫১ — ৩৬,০৯,৫০,০০০
১৯৬১ — ৪৩,৯০,৭৩,০০০
১৯৭১ — ৫৪,৭০,০০,০০০

১৯৭১ সালের লোকগণনার হিসাবে দেখা গেছে, ভারতে নারীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যা দু'কোটি বেশি।

ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশ সর্বাপেক্ষা জনবহুল, সেখানে বাস করে ৮ কোটি ৮৩ লক্ষ লোক, যা ভারতের মোট লোকসংখ্যার ১৬-১৪ শতাংশ। তবে উত্তরপ্রদেশ গঠিত ভারতের ৯-৬৫ শতাংশ স্থান নিয়ে, এবং আয়তনের দিক থেকে সে চতুর্থ রাজ্য, লোকসংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী রাজ্য যথাক্রমে বিহার ও মহারাষ্ট্র। ভারতের ৫-৭১ শতাংশ স্থান নিয়ে গঠিত বিহার আয়তনের দিক থেকে ভারতের অষ্টম রাজ্য কিন্তু মহারাষ্ট্র আয়তন ও লোক-সংখ্যা উভয় দিক থেকেই ভারতের তৃতীয় রাজ্য। ভারতের ১০-০৮ শতাংশ স্থান নিয়ে গঠিত ঐ রাজ্যটিতে এখন ভারতের ৯-২০ শতাংশ লোক বাস করে।

এদিক থেকে সবচেয়ে ভাল অবস্থা হল মধ্যপ্রদেশের। ভারতের ১৪-৫৪ শতাংশ স্থান নিয়ে গঠিত ঐ বৃহত্তম রাজ্যটিতে বাস করে ভারতের ৭-৫৮ শতাংশ লোক এবং লোকসংখ্যার হিসাবে মধ্যপ্রদেশ ভারতের ষষ্ঠ রাজ্য।

এই হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ। আয়তনের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের ত্রয়োদশ রাজ্য হলেও লোকসংখ্যার দিক থেকে তার স্থান চতুর্থ। ভারতের ২-৮৭ শতাংশ স্থান নিয়ে গঠিত পশ্চিমবঙ্গে বাস করে ভারতের ৮-১২ শতাংশ লোক। '৬১ সালের লোকগণনায় চতুর্থ স্থানে ছিল অন্ধ্রপ্রদেশ। এবার পশ্চিমবঙ্গ তাকে পঞ্চম স্থানে নামিয়ে দিয়ে তার স্থানটি দখল করেছে। পশ্চিম-বঙ্গের বর্তমান লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ৪০ হাজার, দশ বছর আগে ছিল ৩ কোটি ৪৯ লক্ষ ২৬ হাজার। সুতরাং দশ বছরের ব্যবধানে এই রাজ্যে লোক বেড়েছে ২৭-২ শতাংশ, যেটা ভারতের বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশ কিছুটা বেশি। পশ্চিম-বঙ্গে এখন প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জন-বসতির ঘনত্ব ৫০৭। এ-ব্যাপারে তার স্থান কেরলের পরেই। আয়তনের দিক থেকে ভারতের পঞ্চদশ রাজ্য কেরলে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনবসতির ঘনত্ব ৫৪৮।

শিক্ষার অবস্থা

দশ বছরের ব্যবধানে ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৫-৩২ শতাংশ। কিন্তু জনবৃদ্ধির হার সে-তুলনায় বেশি ছিল বলে নিরক্ষরের সংখ্যা আরও বেড়ে গেছে। '৬১ সালে এদেশে শিক্ষিতের হার ছিল ২৪-০৩ শতাংশ; '৭১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৯-৩৫ শতাংশ। অর্থাৎ ভারতের ৭১-৬৫ শতাংশ লোক এখনও নিরক্ষর। ১৯৬১ সালে ৪৩ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের মধ্যে ২৪-০৩ শতাংশ শিক্ষিত থাকায় তখন এদেশে নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল ৩৩ কোটি ৪০ লক্ষ লোক। আজ ৫৪ কোটি ৭০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৭০-৬৫ শতাংশ নিরক্ষর হওয়ায় নিরক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৮ কোটি ৯২ লক্ষ।

শিক্ষার ব্যাপারে পূর্বে ভারতের অগ্রগতি বিশেষ লক্ষণীয়। দশ বছরের ব্যবধানে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের হার ২৯-২৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩-০৫ শতাংশ হলেও অন্যান্য রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় এগিয়ে যাওয়ায় শিক্ষায় অগ্রগতির তালিকা পশ্চিমবঙ্গ একাদশ স্থান থেকে দ্বাদশ স্থানে নেমে গেছে। শিক্ষার তালিকায় রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন স্থান জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের। সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে ১৮-৩০ শতাংশ শিক্ষিত; '৬১ সালে ঐ রাজ্যে শিক্ষিতের হার ছিল ১১-০৩ শতাংশ।

তবে জম্মু ও কাশ্মীরের উপরেই অবস্থান করছে ভারতের চারটি হিন্দী-রাজ্য — মধ্যপ্রদেশ (শিক্ষিত ২২-০৩ শতাংশ), উত্তরপ্রদেশ (শিক্ষিত ২১-৬৪ শতাংশ), বিহার (১৯-৯৭ শতাংশ) ও রাজস্থান (শিক্ষিত ১৮-৭৯ শতাংশ)। হিন্দী রাজ্যগুলির উপরে অবস্থান করছে ওড়িশা (শিক্ষিত ২৬-১২ শতাংশ), তার উপরে আসাম (শিক্ষিত ২৮-৭৩ শতাংশ)। তবে আসামই ভারতের একমাত্র রাজ্য যার গত দশ বছরে শিক্ষিতের হার হ্রাস পেয়েছে। ১৯৬১ সালে আসামে শিক্ষিতের হার ছিল ২৯-১৯ শতাংশ।

শিক্ষার তালিকায় প্রথম স্থানাধিকারী রাজ্য কেরল, সেখানকার ৬০-১৬ শতাংশ লোক সাক্ষর। ১৯৬১ সালে কেরলে সাক্ষর ছিলেন ৫১-০৬ জন। শিক্ষার অগ্রগতিতে

এখন কেরলের পরে স্থান তামিলনাড়ু রাজ্যের, সেখানে শিক্ষিতের হার ৩৯-৪৪ শতাংশ। তারপর মহারাষ্ট্র (৩৯-০৬), গুজরাট (৩৫-৭০) ও পাঞ্জাব (৩৩-৩৯)। পাঞ্জাবের পরে স্থান পশ্চিমবঙ্গের। এখানে বলা দরকার, ভারতের সব রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলকে নিয়ে যে শিক্ষিতের হারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বাদশ। কিন্তু শুধু রাজ্যগুলির মধ্যে এ-ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ষষ্ঠ। ভারতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মোট সংখ্যা ২৮।

এবারের লোকগণনার হিসাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পুরুষের তুলনায় ভারতের নারীকুল সাক্ষর অভিযানে অধিক সাফল্য অর্জন করেছেন। ভারতের পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৩৯-৪৯ জন এবং নারীদের মধ্যে শতকরা ১৮-৪৭ জন এখন সাক্ষর; ১৯৬১ সালে এই হিসাব ছিল যথাক্রমে ৩৪-৪৫ শতাংশ ও ১২-৯৫ শতাংশ।

নারীশিক্ষার অগ্রগতিতে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্যও লক্ষণীয়। এ-রাজ্যের ৩০-১৯ শতাংশ নারী এখন সাক্ষর। নারী-শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে এ-রাজ্যের চব্বিশ পরগণা ও হুগলী জেলায়। দার্জিলিং, পুরুলিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদা ও মেদিনীপুর জেলায়ও নারী-শিক্ষার অগ্রগতি লক্ষণীয়।

পশ্চিমবঙ্গে নারী-পুরুষের হারে যে ব্যবধান ছিল, তাও এবার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। '৬১ সালের লোকগণনায় দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে প্রতি হাজার পুরুষ-পিছু নারীর সংখ্যা ছিল ৮৭৮, এবার তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৮৯২। জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, বর্ধমান, হাওড়া ও কলকাতায় নারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কলকাতায় ১৯৬১ সালে প্রতি হাজার পুরুষ-পিছু নারীর সংখ্যা ছিল ৬৫৪, এবার ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬৯৬।

শ্রমিক শক্তি হ্রাস

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা দশ বছরে ২৭-২ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও এ-রাজ্যের শ্রমিক-সংখ্যার আনুপাতিক হার কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৬১ সালে এ-রাজ্যের শ্রমিক-সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৩-২ ভাগ, এবার তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে শতকরা ২৮-৩৭ ভাগ। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি জেলাতেই এই শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা হ্রাস লক্ষ্য করা যায়। এ-ব্যাপারে কলকাতার অবনতিও লক্ষণীয়। ১৯৬১ সালে কলকাতার লোকসংখ্যার ৪০-৪ শতাংশ ছিলেন শ্রমজীবী, এবার তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৩৭-০৫ শতাংশ। কলকাতার অগণিত কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়াই এর কারণ বলে মনে হয়। এমনকি দুর্গাপুর, বার্ণপুর, চিত্তরঞ্জন, সেন-র‍্যালে, রূপনারায়ণপুর, জে কে নগরসমৃদ্ধ বর্ধমান জেলাতেও শ্রমজীবী মানুষের আনুপাতিক হার এক দশকের ব্যবধানে ৪৬-২ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৪২-৫ শতাংশ হয়েছে। ইতিমধ্যে ঐ জেলায় ক্ষেতমজুরের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যই শ্রমজীবীর সংখ্যা আরও হ্রাস পায়নি। প্রকৃতপক্ষে এ-রাজ্য যে একটা বড় রকমের শিল্প-সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে শ্রমজীবী মানুষের আনুপাতিক সংখ্যা হ্রাস তারই ইঙ্গিত বহন করে।

কলকাতা পৌর এলাকায় এখন ৩১ লক্ষ ৪১ হাজার লোকের বাস। দশ বছরে কলকাতার লোকবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৭-৩ শতাংশ, যদিও রাজ্যে লোক বেড়েছে ২৭-২ শতাংশ। শিল্প-সঙ্কট বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় জীবিকার অভাব ঘটছে বলেই এই মহানগরীর লোকবৃদ্ধির এই মন্থরগতি। অবশ্য কলকাতার চারপাশে উপনগরীগুলি গড়ে ওঠাও কলকাতার পৌর এলাকায় লোকবৃদ্ধির গতি হ্রাস পাওয়ার আর একটি কারণ। আর ঐ উপ-নগরীগুলি নিয়ে কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকা গঠিত হয়েছে। লোকসংখ্যার দিক থেকে তা ভারতের বৃহত্তম জনাকীর্ণ এলাকা।

ভারতের সর্বশেষ জনগণনার যেটুকু হিসাব এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, তা প্রাথমিক হিসাব মাত্র। কিন্তু তাতেই এদেশের সর্বক্ষেত্রে একটা হতাশাজনক অবস্থার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া গেছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। পরন্তু রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক প্রচেষ্টাগুলি বর্ধিত জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে প্রসারিত হতে পারছে না বলে দেশে নিরক্ষর, নিরাশ্রয়ের সংখ্যা সমানেই বেড়ে যাচ্ছে। শিল্পায়ণের অগ্রগতিও আশানুরূপ নয় বলে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যানুপাতিক হার দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। আর এই সবের ফলে সারা দেশের জীবনযাত্রার মানের যে অবনতি ঘটছে, তাতেই পরিবার পরিকল্পনার কাজ ব্যাহত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। মানুষ যখন শিক্ষিত হয় ও তার জীবনযাত্রার মান একটা নির্দিষ্ট স্তরে উন্নীত হয়, তখনই সে তা রক্ষার জন্য পরিবার ছোট রাখার কথা চিন্তা করে। আর যে-দেশের অধিকাংশ মানুষের দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্য ছাড়া হারানোর কিছু নেই, তার কাছে পরিবার-পরিকল্পনার আবেদন কতটুকু? যতদিন না অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে এদেশের সাধারণ মানুষ মুক্তি পাবে, ততদিন এদেশে জন-সমস্যার প্রকৃত সমাধানের অতি সামান্যই সম্ভাবনা। জন-সমস্যা যে আসলে অর্থনৈতিক সমস্যারই বাইপ্রোডাক্ট, রাষ্ট্রকে সবার আগে এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে।

চতুর্থ খণ্ড

(১)
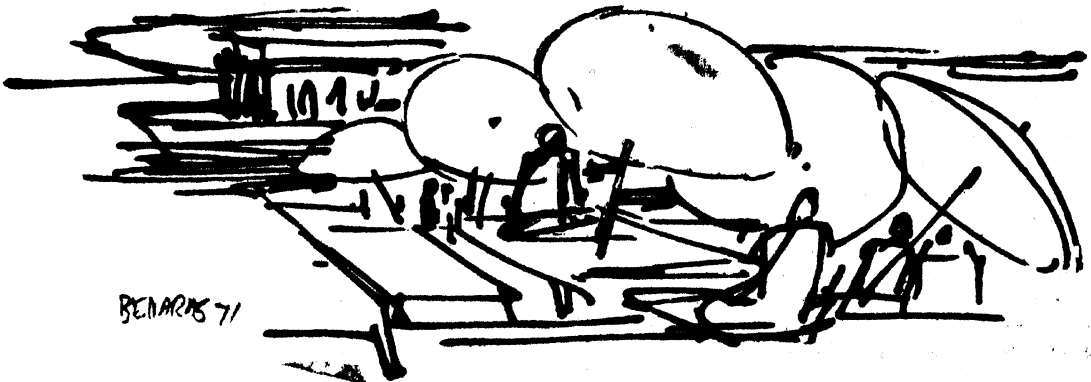
ছুটে ছুটে ছুটে, খরপুতির উপত্যকা পার হয়ে সুবালাদের পাথরভাঙ্গা গ্রামখানি ডাইনে রেখে পাহাড়টার উপরে উঠে দে ছুট ছুট ছুট। পথেরও শেষ নেই আর মানুষের হৃদপিন্ড ও মাংসপেশী কে জানতো তার শক্তি এমন অমিত।

আকাশে শুক্লা চতুর্দশীর প্রকাণ্ড এক-খানা চাঁদ পণ করে বসেছে আকাশ ও পৃথিবীর কোন স্থান কোন রন্ধ্র কোন গুহা গহ্বর আজ অনালোকিত রাখবে না, সমস্ত দিবাভাগের মতো স্পষ্ট আর উজ্জ্বল। সম্মুখে পথটা মৃত অজগরের মতো নিশ্চল ভাবে শায়িত। সেই পথ ধরে আত্মপলায়িত জরা ছুটছে। পা ছড়ে গিয়েছে, কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছে, মাথার পাগড়িটা কখন কোন গাছের ডালে আটকে গিয়েছে কে জানে। বুকের পাঁজরের মধ্যে হৃদপিন্ডটা, দমাদম হাতুড়ি পিটছে যে কোন মুহূর্তে হাড় পাঁজরা ভেঙ্গে যাবে। আর চলে না. একবার দম নেবার জন্যে থামলো. ডান পাশে পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো, বসতে সাহস হয় না আর যদি উঠতে না পারে। আর কিছু নয়, নরেন্দ্রনগরের সংগে ব্যবধানটা দীর্ঘতর করতে এই তার প্রতিজ্ঞা।

কত দূরে এলো দেখবার জন্যে পিছনে ফিরে তাকালো এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম। তাকিয়েই শিউরে উঠল আতঙ্কে. একি ঐ তো নরেন্দ্রনগর—হাত বাড়ালেই যেন স্পর্শ করতে পারা যাবে। তবে সে কি এতক্ষণ এক স্থানেই ছুটে মরেছে. না নরেন্দ্রনগর রাজপুরীটা তার পিছু ধাওয়া করে ছুটেছে। পাহাড় অচল, নগর, অচল তারা আজ সচল হল কেমন করে। জরার সম্বিৎ থাকলে বুঝতে পারতো যেখানকার পাহাড়, যেখানকার রাজপুরী সেখানেই আছে। একে পার্বত্য প্রদেশের আবহাওয়া স্বচ্ছ তার উপরে পরিপূর্ণ চাঁদের আলো তাই দূরকে এমন নিকট মনে হচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হল কিসের যেন কোলাহল, কারা যেন তার পিছু নিয়েছে, না. আর এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়, আবার সে আরম্ভ করলো ছুটতে।

কোলাহল বটে তবে তা মনুষ্যকৃত নয়। পাহাড়টার বাঁদিকে গভীর খাদ সেই খাদের মধ্যে প্রবাহিত ঝরণা—এই ঝরণাটাই উপত্যকায় নেমে খরপুতি নাম ধারণ করেছে। রাতের নিস্তব্ধতায় সেই ঝরণার স্পষ্টতর শব্দ জরার আতঙ্কিত কানে তার পশ্চাদ্ধাবমান রাজপুরীর লোকজনের কোলাহল। আবার ও কারা চাপাগলায় কথা বলে। গাছের পাতায় পল্লবে ফিসফাস শব্দ। কিন্তু কে বুঝবে, কার বুঝবার মতো এখন মনোভাব।

হঠাৎ তার কানে এলো নিহত নরকের আর্তনাদ, অসুর ভাই রাজবাড়ীতে খবর দাও গে। আর সংগে সংগে অসুরের তার-স্বরে ঘোষণা: ওগো তোমরা জাগো—শীগগির ওঠো, বাসুদেব হত্যাকারী পালালো। এ মনের বিকার নয়, কানের ভুল নয়, স্পষ্ট সজীব সত্য। হায় জরা কান আর মন কি আলাদা। মন যা শোনায় কান তাই শোনে। কিন্তু মনের মধ্যে এলো কি ভাবে। আরে, মনের মধ্যেই যে ব্রহ্মাণ্ড। প্রকৃতিস্থ অবস্থাতেও এ বিচার করবার ক্ষমতা ছিল না জরার এখন সে তো পরি-পূর্ণ বিকারগ্রস্ত।

জরা ভাবলো নগর তার পিছু পিছু ছুটেছে [illegible] রাজ-বাড়ীর লোকজনের তার পিছু নেওয়া অসম্ভব নয়। না, তাই ঘটেছে। তার মনে পড়লো আগামীকাল পূর্ণিমায় নতুন মন্দিরে বাসুদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে। ঠিক তার আগের দিনটিতে যদি জানতে পাওয়া যায় বাসুদেব হত্যাকারী রাজপুরীর মধ্যে আছে, আর শুধু তাই নয় সে রাজার প্রিয়পাত্র, বাসুদেবের দেশের লোক বলে, বাসুদেবকে স্বচক্ষে দেখেছে বলে বিশেষ অনুগ্রহ করে—

এখন সেই যদি নরাধম প্রতিপন্ন হয় তবে রাজার মনে দেখা দেবে উৎকট প্রতিক্রিয়া। পলাতক অপরাধীকে পাকড়াও করতে কোন চেষ্টার ত্রুটি হবে না তার দিক থেকে। এই সব যুক্তি জরাকে বোঝালো দারুন কোলাহল করতে করতে ছুটে আসে রাজবাড়ীর লোকজন। সে আবার ছুটলো।

কতক্ষণ ছুটেছে, কত দূরে এসেছে ছুটে, দেশকালের জ্ঞান নেই তার, এমন অবস্থাতে কারোই থাকে না। তাড়া-খাওয়া শিকার যেমন মাঝে মাঝে পিছন ফিরে শিকারীর সান্নিধ্য অনুমান করতে চেষ্টা করে, তেমনিভাবে পিছন ফিরে তাকালো জরা। কি আশ্চর্য! কোথায় নরেন্দ্রনগর, কোথায় কোলাহল, নিশুতে রাত নির্জন নিঃশব্দ নিদ্রিত। এ কি হল কোথায় গেল রাজবাড়ীর লোকজন, কোথায় গেল তাদের কোলাহল। সমস্তই মায়া নাকি। আসল কথা ছুটতে ছুটতে জরা অজ্ঞাতে মোড় ঘুরেছে, আর ঝরণাটাও খাদ বদলে অন্য খাদে গিয়েছে— তা ছাড়া এদিককার পাহাড়ে গাছপালাও বিরল। কাজেই নরেন্দ্র-নগর, লোকজনের কোলাহল. চাপা কণ্ঠের ফিসফাস সমস্তই লোপ পেয়েছে। এতক্ষণে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে একখানা পাথরের উপরে বসলো. আর কখন যে ঘুমিয়ে পড়লো কিছুই টের পেলো না।

জরার যখন ঘুম ভাঙলো অনেকক্ষণ ভোর হয়ে গিয়েছে, সূর্য প্রথম প্রহরের আকাশে আর সম্মুখে দাঁড়িয়ে জনদুই লোক যাদের মুখটা চেনা-চেনা, তাদের চোখেও পরিচয়ের আভা। উভয়পক্ষ কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকবার পরে লোক দুটোই প্রথমে কথা বলল, তা আপনি এখানে এ অবস্থায় কেন?

জরা দিনের আলোর এই প্রথম নিজের অবস্থা দেখল, পায়ে পাদুকা নেই, গায়ে আঙরাখা নেই, মাথায় উষ্ণীষ নেই, দেহে এখানে ওখানে ছড়ে গিয়েছে—সবশুদ্ধ মিলে যতদূর লক্ষ্মীছাড়া বেশভূষা হতে হয় তাই। জরা বলল, তোমাদের তো চিনলাম না।

আমরা আপনাকে খুব চিনি, আপনি মহারাজার পার্ষদ, তা এখানে কেন?

জরার চোখ প্রশ্ন করলো তোমাদের তো চিনলাম না।

চোখের প্রশ্নের উত্তর মুখ দিল, বলল, আমরা রাজবাড়ীতে কাজ করি, কাছেই আমাদের গাঁ ভিখনটুনি সেখান থেকে রাজবাড়ীতে যাতায়াত করি।

যতক্ষণ ওরা কথা বলছিল সময়োচিত উত্তর ভেবে নিচ্ছিল জরা। এবারে সে বলল, আর বলো না বাপু, কালকে চমৎকার জ্যোৎস্না রাত দেখে মনে ইচ্ছা হল শিকারে বের হলে মন্দ হয় না। বের তো হলাম তারপরেই গোলযোগের সূত্রপাত হল। একে রাত্রিবেলা তাতে এদিকটায় আগে আসিনি—পথ ভুল হল। কোনদিকে চলেছি বুঝতে না পারায় ঘোড়াটাকে বেঁধে যেমনি কতকটা অগ্রসর হয়েছি একসঙ্গে তিনজন দস্যুতে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসলো। অনেকক্ষণ লড়লাম, তারা তিনজন আমি একা। এই দেখো না কি অবস্থা হয়েছে—

বলে গায়ের ক্ষতচিহ্নগুলো দেখিয়ে দিল, তারপরে বলল, উষ্ণীষ আঙরাখা অস্ত্রশস্ত্র তো গেলই বেটারা ঘোড়াটা শুদ্ধ দক্ষিণাস্বরূপে নিয়ে গেল। একটু বিশ্রাম করবার জন্যে বসেছি কি ঘুমিয়ে পড়েছি।

লোক দুটো সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বলল, তা আর কি করবেন, আমাদের সঙ্গে ফিরে চলুন।

ওদের একজন বলল, এই পাহাড়গুলোয় চোর-ডাকাতের আস্তানা, কত নিরীহ লোক যে রাহাজানিতে প্রাণে মারা পড়েছে তার স্থির নেই। যাই হোক বাসুদেবের কৃপায় আপনি রক্ষা পেয়ে গিয়েছেন—এই ঢের।

জরা সংক্ষেপে বলল—হাঁ বাপু তাই।

তারা বলল, আর বসে থেকে লাভ নেই, চলুন আমাদের সঙ্গে।

জরা বলল, তোমরা এগোও, আর একটু জিরিয়ে নিয়ে আমি আসছি।

ওরা যেতে যেতে বলল, তবে আমরা রাজবাড়ীতে খবর দিইগে—একটা ঘোড়া পাঠিয়ে দেবে।

শঙ্কিত জরা নিষেধ করতে যাবে দেখল তারা পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। জরা বুঝলো আর একমুহূর্ত এখানে নয় তা ছাড়া এ পথেও অগ্রসর হওয়া চলবে না। সে নিশ্চয় জানতো বাসুদেব হত্যাকারীকে পাকড়াও করতে রাজা সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন।

যে পাহাড়টার কোণে বসেছিল জরা তার মাথায় উঠে দাঁড়াতেই এমন দৃশ্য তার চোখে উদ্ঘাটিত হল যার অনুরূপ দেখা দূরে থাক কল্পনাও করেনি। উত্তরে-দক্ষিণে দূরে পশ্চিমে যতদূর দেখা যায়, পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়েছে বলে দেখা যায় অনেক দূর কেবল পাহাড়, পাহাড়ের পারে পাহাড়, ছোট বড় মাঝারি ঢেউ খেলে চলে গিয়েছে। ঢেউগুলোর মাঝখানে চাষের জমি, ক্ষীণ সোতা এক-আধখানা গ্রাম। বামদিকে পাহাড়ের গায়ে তির্যকভাবে ঐ যে গ্রামখানা ঝুলে আছে খুব সম্ভব ঐ হচ্ছে ভিখনটুনি।

জরা পাহাড়ের দেশের লোক না হলেও ইতিমধ্যে পাহাড়ের সঙ্গে যতটুকু পরিচয় হয়েছে বুঝেছে পলাতকের যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে তবে এই পাহাড়ের অরণ্যের মধ্যে তাকে পাকড়াও করা অসম্ভব না হলেও নিতান্ত কঠিন। পাহাড়ী পথে সর্বত্র ঘোড়া চলে না কাজেই অনুসরণকারীকে পায়ের উপরে ভরসা করতে হবে। তাতে দুজনেই সমান-সমান। আর বেগতিক দেখলে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যেতে কতক্ষণ আর লুকোবার গুহা-গহ্বরের তো মোটেই অভাব নেই। সে ভাবলো আসুক রাজবাড়ীর লোক- আসবে সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না।

সন্ধ্যার আলোয় কতকটা সাহস পেয়েছিল জরা তবে ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাদের দাবী ছাড়বে কেন। অদূরে একটা ঝরণা দেখতে পেয়ে পেট ভরে জলপান করলো সেই সঙ্গে শীতল নির্মল জলে স্নান। সুযোগ পেয়ে ক্ষুধা নিজ মূর্তি ধারণ করলো। কিন্তু কী খাবে।

অনেকের ধারণা প্রাচীনকালে মুনিঋষিগণ অরণ্যে বনজ ফল-মূল খেয়ে জীবনধারণ করতেন। এরচেয়ে ভুল আর কিছুই হতে পারে না। বনে হরতকি আমলকি বহেড়া, বুনো কুল খেজুর প্রভৃতি কয়েকটা ফল জন্মায় বটে তবে সেসব খেয়ে কারো পক্ষে জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। পশুমাংস সুলভ আর এক বনের পশু ফুরিয়ে গেলে বনান্তরে গেলেই চলে। যত কিছু সুস্বাদু ও সুখাদ্য ফল-মূল এবং শস্য সমস্তই মনুষ্যের দীর্ঘকালের কৃষিচর্চার ফলে লব্ধ। তপোবনের একমাত্র শস্য নীবার ধান্যজাত তণ্ডুল অবিলাসী মুনিঋষিদের যোগ্য খাদ্য হলেও গৃহীর পাতে চলবে না, এমন কি রেশনের দোকানেও নয়। মোট কথা এই সেকালের তপোবনের জীবন বড় সুখের ছিল না অন্তত খাদ্যের বিচারে একথা বনচারী জরার চেয়ে কেউ বেশি জানতো না তাই সে অসম্ভবের আশা না করে হাতের কাছে দু-চারটে কটু কষায় ফল যা পেলো তাই কোনমতে গলাধঃকরণ করে একটা ঝোপের ছায়ায় উপবেশন করলো। আবার সর্বদুঃখহরা নিদ্রা।

পূর্ণ চৈতন্য ও গভীর সুষুপ্তির মাঝখানে এক ফালি চওড়া জমি আছে তাকে স্বপ্নলোক বলা যেতে পারে। জরার মন তখন সেখানে বিচরণ করছিল। সে শপথ করে বলতে পারবে না স্বপ্ন দেখছিল না বাস্তব ঘটনা দেখছিল—তবে অভিজ্ঞতা মিথ্যা নয়। একদল সশস্ত্র ঘোড়সোয়ার সবেগে ছুটে আসছে সঙ্গে কয়েকটা শিকারী কুকুর। একবার মনে হয় সত্য একবার মনে হয় স্বপ্ন; শোনা যায় তাদের হলাহল ধ্বনি, শোনা যায় ঘোড়ার খুরের দড়বড়ি, অতি স্পষ্ট, স্বপ্ন কি এমন প্রত্যক্ষ হয়। ক্রমে তারা কাছে এসে পড়ে জরা যেখানে শায়িত তার সিকি ক্রোশের মধ্যে। এবারে হঠাৎ তার তন্দ্রা ছুটে যায়—ঐ তো তারা, তবে তো স্বপ্ন নয়। জরা দেখতে পায় আট-দশজন অশ্বারোহী, কাঁধে তাদের তূণীর ও ধনুক, হাতে কারো বল্লম কারো অসি। বিদ্যুৎবৎ তার মাথায় খেলে যায় এ ঐ রাজবাড়ীর লোক দুটোর কীর্তি। তারা গিয়ে সংবাদ দিয়েছে পাকড়াও করতে ছুটে আসছে রাজপুরীর সৈনিকেরা। ওকে আসতে না! ঐ যে সবার আগে। তবে আর সন্দেহের কী আছে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরের দিকে ছোটে জরা।

পাহাড়ে দেশের লোক না হলেও এ কয়মাসে পাহাড়ে ওঠা-নামা করতে, পাহাড়ের প্রকৃতি বুঝতে শিখেছে সে। পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে ওঠা সহজসাধ্য নয়, তার চেয়ে দ্রুত ছুটবে সে। পাহাড়ের

উপরে উঠতেই রাজানুচরদের চোখে পড়ে যায় জরা, ঐ যে ঐযে, ঐ যে পালায়। একসঙ্গে কয়েকটা তীর এসে পড়ে আশে-পাশে। সাবধান মেরো না, মহারাজা ওকে জীবিত ধরে নিয়ে যেতে বলেছিল। এ কার গলা! কার আবার অসুরের, এ গলা বেশ পরিচিত তার। জরা স্থির করে জীবিত তাকে কেউ ধরতে পারবে না। আক্ষেপ করে যে তীর-ধনুক হাতে নেই, থাকলে একলাই এ কয়টাকে নিকেশ করে দিতে পারতো।

ছুট ছুট ছুট, এবারে আর সরল পথে নয়। পাহাড়ের গা বেয়ে, বড় বড় পাথরের পিণ্ডগুলোর পাশ কাটিয়ে, কখনো লাফিয়ে কখনো মাথা নীচু করে। কখনো হঠাৎ মোড় ঘুরে; পাহাড়ী ছাগলের চেয়েও দ্রুততর, নিশ্চিততর, অধিকতর অশিক্ষিত পদক্ষেপে জরা ছুটছে। এক-একবার পিছন ফিরে দেখে লোকগুলো কতদূরে। না দূরত্ব ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে, এমনভাবে চললে ঘাড়ের উপরে এসে পড়তে আর বিলম্ব নেই। আবার ঐ যে কুকুরগুলো কানখাড়া করে জিব বার করে মাটি শুকতে শুকতে ছুটে আসছে। জরা বোঝে এবারে আর রক্ষা নেই। তখন হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল কোন দেব-দেবীকে বা পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে নয়—যাকে স্বহস্তে বধ করে ফেলেছে সেই জরতীকে। জরতীরে এবার যে মরি। একখানি উঁচু পাথরের
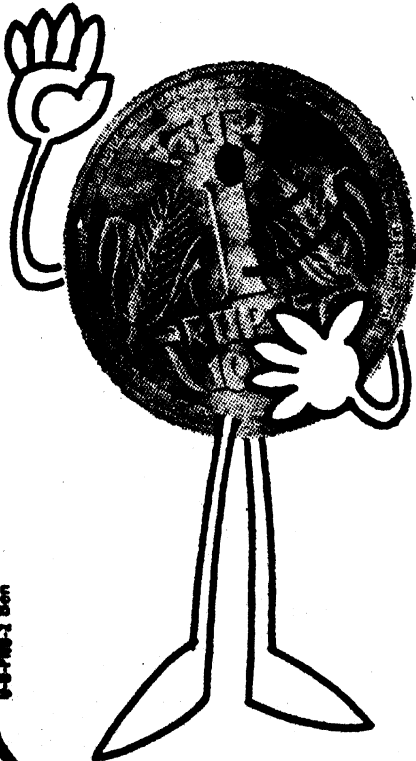
উপরে থেকে তাকে লক্ষ্য করে লাফিয়ে পড়ে অসুর অবাক হয়ে যায়—একি কোথায় গেল লোকটা! দশ হাতের মধ্যে ছিল, আর একেবারে অদৃশ্য। একি ভোজবাজি না ইন্দ্রজাল। মাটির মধ্যে তলিয়ে গেল না বাতাসে গেল মিশিয়ে। না কোথায় জরার চিহ্ন মাত্র নাই।

অন্য সকলে অসুরের পাশে এসে দাঁড়ায়, পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করে একি হল, কোথায় গেল। বাতাসে মিশে গেল না মাটিতে তলিয়ে গেল। সবচেয়ে বেশি অসুর, কথা বের হয় না তার মুখ দিয়ে শুধু বলে, তাই তো।

কালকে রাতে তারস্বরে রাজপুরীর লোকজনকে জাগিয়ে তুলিয়ে প্রকৃত ঘটনা জানিয়েছিল, বলেছিল না—বাসুদেবের ভক্ত রাজা ও রাজপুরী ঐ লোকটা তাঁকে হত্যা করেছে। এই হত্যার গুরুত্বে নরকের মৃত্যু এতই তুচ্ছ ব্যাপার যে সেটা কেউ দেখেও দেখল না।

ভোরবেলা নরেন্দ্রনগররাজ সমস্ত শুনলেন, বললেন, যেমন করে পারো তাকে ধরে নিয়ে এসো পালাতে দিলে চলবে না।

কিন্তু কোথায় সে? কোন দিকে গিয়েছে? এমন সময়ে ভিখনটুলির সেই রাজভৃত্যরা এসে সংবাদ দিলে তাদের গাঁয়ের কাছে দেখেছে জরাকে।

রাজা আদেশ করলেন শীগগির যাও, ধরে আনা চাই। অসুর, সেই লোক দুটো আরও জনসাতেক ছুটলো জরার সন্ধানে। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেকটা সময় গিয়েছে, জরা আরও দূরে এসে পড়েছে। জরার আকস্মিক অন্তর্ধানে ওরা যখন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে তখন বেলা অপরাহ্ণ। পাহাড়ে ভোরের আলো এবং সন্ধ্যার অন্ধকার দুই ত্বরান্বিত আসে। ওরা যখন কিংকর্তব্য চিন্তা করছে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ওদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

(২)

জরা ওদের চেয়েও বেশি বিস্মিত হয় ভাবে ব্যাপারটা কি হ'ল? হঠাৎ কি মাটির তলায় তলিয়ে গেল না কোন গুহার মধ্যে এসে পড়লো। মাটির তলায় যদি, তবে নিশ্বাস নিচ্ছে কিভাবে? গুহার মধ্যে যদি তবে ঢুকলো কি ভাবে? মাটির তলা হোক কিম্বা গুহার মধ্যে হোক দুয়ে একটা মিল আছে—ঘোর অন্ধকার। কিন্তু এলো কি-ভাবে। অবশ্য তখন তার এসব খুঁটিয়ে বিচার করবার মতো মনের অবস্থা নয়। পড়ি কি মরি ক'রে প্রাণের দায়ে ছুটছে। তবু মনে পড়লো, এই নিরেট অন্ধকারের মধ্যে বসে মনে পড়লো আততায়ীদের হাত এড়াবার আশায় যখন হঠাৎ মোড় ফিরতে উদ্যত তখন পিছন থেকে একটা হেচকা টান যেন অনুভব করেছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে ভেবেছিল গাছের ডালপালা হবে—তারপর কিছুক্ষণ সম্বিৎ ছিল না, তারপরে ঘোরান্ধকার। মাটির তলায় না গুহার মধ্যে।

মাটিতে বসে যখন সে জিরোচ্ছে আর [illegible] সমস্ত কিস্যটাকে পরিপাক করবার চেষ্টা করছে, অদূরে অন্ধকারের মধ্যে থেকে তার কানে এলো একটা অস্ফুট অদ্ভুত শব্দ। হুঁ-হু, হুঁ-হু, হুঁ-হু! এ আবার কি? মানুষ নয় নিশ্চয়, মানুষে এমন শব্দ করে না। জন্তু-জানোয়ার হবে খুব সম্ভব বুড়ো বুনো ছাগল কাছেই কোথাও পড়ে ধুঁকছে। বনের মধ্যেই এমন দেখেছে। ক্রমে ঐ শব্দটা কাছে আসতে আসতে একেবারে হাতখানেকের ব্যবধানে এসে পড়লো।

হুঁ-হুঁ হুঁ-হু হুঁহুঁ বলি কি ভাবছ?

এ-যে মানুষের কণ্ঠস্বর। সাহস পেয়ে জরা শুধোয়, প্রভু আপনি কে?

তুমি কি ভেবেছিলে বলো তো।

জরা উত্তর দেয় না।

বলই না লজ্জা কিসের? বুড়ো ছাগল ভেবেছিলে নিশ্চয়।

জরা সত্যি তাই ভেবেছিল, তবে মুখের উপরে তা তো আর বলা যায় না। চুপ করে থাকে।

আরে বলোই না, ক্ষতি কি?

জরা বলে, কি ক'রে জানলেন প্রভু?

পাঁচজনে বলে তাই জানলাম।

এবারে সাহস পেয়ে জরা শুধালো, প্রভু এখন তো মানুষের মতো কথা বলছেন, তবে আবার ও-রকম অদ্ভুত শব্দ আবার করেন কেন?

কেন? আমার চেহারাখানির সঙ্গে মিল রাখবার জন্যে। একবার আমার চেহারাখানি দেখলে বুঝতে পারবে ঐ রকম অদ্ভুত শব্দটাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক, তবে যে মানুষের মতো কথা বলি সেটা পূর্ব সংস্কারবশতঃ।

কিছুই বুঝতে পারে না জরা। তবে এটুকু বোঝে, কিছু বলা আবশ্যক। বলে প্রভু কখন আপনার দেখা পাবো?

বুঝেছি, আমার মুখখানি দেখে সন্দেহ-ভঞ্জন করতে চাও। তা এখনি পাবে, একটু অপেক্ষা করো, আরো ওরা দূরে যাক, এখনো কাছাকাছি আছে। ভাবছে তুমি নিকটেই কোথাও লুকিয়ে আছ। আর তাদের রাজার বাবার সাধ্যি নেই তোমাকে খুঁজে বের করে—একেবারে গর্ভগৃহে লুকিয়ে রেখেছি না।

কি ক'রে জানলেন প্রভু?

প্রভু কোন উত্তর দেয় না, তার বদলে সেই রহস্যময় শব্দ করে হুঁহু, হুঁহু, হুঁ।

কিছুক্ষণ পরে সেই রহস্যময় লোকটি বলে, নাও, এবারে চন্দ্রালোকে আমার মুখ-চন্দ্র দর্শন করো, বলে পাথরের দেয়ালে ঠেলা দেয়—একখানি পাথর সরে যায়। পাথরখানা স'রে যেতেই অনেকখানি চাঁদের আলো এক ঝলকে ঢুকে পড়ে লোকটির মুখের উপরে পড়ে। সে মুখ দেখে অবাক হ'য়ে যায় জরা।

ভীষণ মুখ বটে খটাসের। সে মুখ দেখলে আতঙ্কে প্রাণ কাঁদে—কতক্ষণে ছুটে পালাবে ভাবে দর্শক। এ মুখের ছাঁদ স্বতন্ত্র। রহস্যময় বললে যথার্থ হয়। মুখ-খানি যেন দর্শকের দিকে তাকিয়ে রহস্য করছে; দেখলে হাসিও পায়, আবার করুণাও হয়। মুখমণ্ডল শুকিয়ে একটি শুষ্ক হরিতকীর মতো শীর্ণ, জীর্ণ, চিবুকে একগোছা কাঁচা-পাকা দাড়ি। আর চোখ দুটি ক্ষুদ্র, তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল। জরার মনে হ'ল মনুষ্য হওয়া সত্ত্বেও কোথায় যেন বুনো ছাগলের সঙ্গে মিল আছে সেমুখে।

কি দেখলে তো?

জরা শুধালো, প্রভু আপনাকে কি বলে ডাকবো?

সবাই যা বলে ডাকে, ছাগর্ষি।

বুঝতে পারে না জরা। তার অবস্থা বুঝতে পেরে বলে পেটে বুঝি ঢু-ঢু, টোল চতুষ্পাঠীর সঙ্গে বুঝি জন্ম থেকেই আড়ি।

অপ্রস্তুত জরা বলে, প্রভু, মুখখু মুখখু মানুষ লেখাপড়া শিখবো কি ক'রে।

তা বেশ করেছ। লেখাপড়া শিখে যারা মূর্খ হয় তাদের তুলনা নেই। তা বাড়ী কোথায়? এ-দেশী লোক যে নও চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি।

জরা বলে দক্ষিণ দেশে।

ব্যবসা কি?

জরা আবার বলে ব্যাধ।

চমকে উঠে লোকটি বলে দক্ষিণ দেশে বাড়ী, ব্যবসা ব্যাধগিরি। বাহা বাহা শুনেই পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছে।

জরা তো অবাক, মূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে।

আরে এটা বুঝলে না, তোমাদেরি জ্ঞাত-গোত্রের কারো শরাঘাতে সেই কালান্তক বেটা সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেছে।

জরা ভাবে এ-কি, এই সুদূর পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ের গুহার মধ্যেও সে সংবাদ প্রবেশ করেছে।

বুঝতে পারছ না। আমি বসুদেবের বেটা বাসুদেবের মৃত্যুর কথা বলছি। দেখলে না কেমন ঘোট পাকিয়ে লড়াই বাঁধিয়ে দিলে আর আঠারো অক্ষৌহিণী নিরীহ প্রাণী মারা পড়লো। এ নাটের গুরু তো সেই বেটা। তেমনি আক্কেলও হয়েছে বেঘোরে মারা পড়লো এক ব্যাটা ব্যাধের তীরের আঘাতে।

প্রভু এ-কি বলছেন, তিনি যে ভগবান! আজ নরেন্দ্রনগরে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে।

খুবই স্বাভাবিক। রাজা বেটাদের কাজই হচ্ছে মানুষ মারা। সেই মানুষ মারার সর্দারের প্রতি তাদের ভক্তি হবে না-তো কার উপরে হবে। থাক এসব কথা বুঝবে না, তোমার বিদ্যার দৌড় বুঝে নিয়েছি কি না।

প্রসঙ্গান্তরে খুশী হ'য়ে জরা শুধালো কি বলে ডাকবো প্রভু আপনাকে।

কেন, ঐ যে বললাম ছাগর্ষি। ছাগ ঋষি সন্ধি করলে দাঁড়ায় ছাগর্ষি। আর সমাস করলে—আচ্ছা ওটা না হয় থাক, সমাস বোঝাতে হয়ত্ন লাগবে।...হুঁহুঁ হুঁহুঁ, হুঁহুঁ।

জরা সঙ্কোচে নিবেদন করে, ও নামে কি ডাকা যায় আপনাকে।

আরে এ-তো তদ্ভব সংস্কৃত ভাষা। দেব ভাষার মাহাত্ম্যে কত কদম পার হয়ে যাচ্ছে। এ অঞ্চলের লোক আমাকে সোজা-সুজি ছাগলা, ছাগলা ঋষি, বুনো ছাগল, পাহাড়ী ছাগল কত নামেই না ডাকে।

আপনি অপ্রসন্ন হন না।

অপ্রসন্ন হ'লে চলবে কেন? ওরা যে আমার অন্ন জোগায়, তা একটু রহস্য করবে বই কি।

তারপরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে, মুখ যে শুকিয়ে গিয়েছে কখন খেয়েছিলে?

এতক্ষণ উত্তেজনাবশে ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গিয়েছিল জরা, এবারে খাদ্যের নামে ক্ষুধানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠল, বলল কালকে রাতে।

তবে তো ক্ষিদে না পেয়ে যায় না, দেখি কিছু আছে কিনা। এসো আমার সঙ্গে।

দু'চার পা চলতেই মোড় ঘুরতে হ'ল সেখানে ঘোর অন্ধকার।

প্রভু কিছু যে দেখতে পাই না।

আমার হাত ধরো। আমার আবার কি জানো অন্ধকারে যেমন দেখতে পাই, আলোতে তেমন নয়। বুঝলে না, আঠারো বছর এই গুহার মধ্যে আছি। বের হইনি, অন্ধকার বেশ সড়গড় হ'য়ে গিয়েছে।

বের না হ'লে আমাকে রক্ষা করলেন কি ক'রে?

তাতে বের হওয়ার প্রয়োজন হবে কেন? ঐ যে পাথরখানা ঠেলে সরাতে চন্দ্রালোক এসে ঢুকলো, মাঝে মাঝে ঐ পাথরখানা ঠেলে সরিয়ে মানুষের রঙ্গ-রহস্য দেখি। তখন ঘোড়ার ক্ষুরের দড়বড়ি শুনে পাথর ঠেলে দেখি যে তোমাকে ধরলো বলে—তখন এক টানে তোমাকে ভিতরে টেনে নিয়ে আবার পাথরখানা ঠেলে দিলাম। বেটারা খানিকটা এদিক-ওদিক করে ফিরে গেল। নিশ্চয় নরেন্দ্রনগরের লোক কি বলো?

হ্যাঁ প্রভু।

তা তোমার উপরে এমন সদয় কেন? তাও খেতে খেতে বলা শুনি।

এই বলে খানকতক বাজরার রুটি আর একটু শাক ও চাটনি দিল, সেই সঙ্গে মাটির ভাঁড়ে জল।

জরা গো-গ্রাসে গিলতে আরম্ভ করলো। তার মুখে সেই শুকনো রুটি অমৃতের স্বাদ দেয়। ক্ষুধার অন্ন অমৃত, বিলাসের অন্ন গরল।

জরা বলল, প্রভু, আমি রাজরোষে পড়েছি।

সে তো বাপু বুঝতেই পারছি। ঘোড়-সোয়ার দিয়ে তাড়া ক'রে যে বিয়ের বর সন্ধান করে না, এ-তো সকলেই জানে। হঠাৎ রাজার রোষটা হ'ল কেন তাই শুধোচ্ছি।

হঠাৎ রাজার প্রসাদ লাভ করেছিলাম, তারই পাল্টা হ'ল হঠাৎ রাজার রোষ।

বেশ এ-ও সহজবোধ্য। এবারে হঠাৎ প্রসাদ ও হঠাৎ রোষের কারণটা বলো দেখি।

জরা বলে, রাজা বাসুদেবের ভক্ত।

তা' শুনেছি।

আমি বাসুদেবের দেশের লোক শুনে আমার প্রতি প্রসন্ন হ'লেন।

তুমি বাসুদেবের দেশের লোক। চমকে ওঠে ছাগর্ষি, কই একথা তো বলোনি।

ঐ যে বললাম দক্ষিণ দেশের লোক।

হাঁ এখান থেকে দ্বারকা দক্ষিণে বটে, তবে আরও অনেক দেশ তো দক্ষিণে, কেমন ক'রে বুঝবো যে তুমি দ্বারকার লোক।

আপনি বাসুদেবের প্রতি অপ্রসন্ন তাই বলিনি।

এখন তর্কের মুখে বলতে বাধ্য হ'লে কি বলো?

জরা চুপ ক'রে থাকে।

তারপরে রোষের কারণ?

রাজার একজন প্রিয় পাত্রকে হত্যা করে ফেলেছি।

কেন বলো তো।

সে আমাকে আক্রমণ করেছিল।

আততায়ীকে হত্যা তো অপরাধ নয়।

সে-কথা বলবার অবকাশ পেলাম কই?

প্রকৃত ঘটনা বলতে ভরসা পায় না জরা।

ছাগর্ষি বলে, ওসব কথা থাক, এখন খেয়ে নাও।

জরার আহার শেষ হ'য়ে গিয়েছিল।

ছাগর্ষি বলল, এই গুহার শেষের দিকে একটা ঝরণা আছে সেখান থেকে আমি জল সংগ্রহ করি।

আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, আপনি দেখছেন কি ক'রে?

আমি যে আজ চল্লিশ বছর এই গুহার মধ্যে বাস করছি। অন্ধকারে চোখ এমন অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছে যে অনায়াসে দেখতে পাই, বরঞ্চ আলোতেই এখন কষ্ট হয়। তাই সারাদিন পাথরখানা দিয়ে গুহার মুখ বন্ধ ক'রে রাখি, কেবল রাতের বেলায় খুলে রাখি, বাতাস আসে আবার চাঁদের আলোও আসে। তবে আজ বেশিক্ষণ আলো পাওয়া যাবে না। আজ চন্দ্রগ্রহণ একেবারে পূর্ণ গ্রাস।

গ্রহণ শব্দটি শুনবামাত্র জরার সমস্ত অস্তিত্ব কেঁপে ওঠে। শীতান্তে সর্পের মতো জেগে ওঠে পূর্বস্মৃতি। সে মন্ত্রের মতো আবৃত্তি ক'রে চলে গেল, গেল, তাই তো।

গ্রহণ শুনে অবাক হ'লে কেন, কখন কি গ্রহণ দেখনি।

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জরা শুধায়, ভূমিকম্পও হয় নাকি?

প্রায়ই পাহাড়ে দেশের রীতিই এই।

আচ্ছা শহর সমুদ্র ভেঙে আসে না?

সমুদ্র এখানে কোথায়? পাগল হ'বে গেলে নাকি? হাঁ বাপু, কৌশলে আমার নামটি তো জেনে নিলে, এবারে তোমার নামটি বলো তো শুনি। কতক্ষণ আর সর্বনাম দিয়ে চালানো যায়।

প্রভু আমার নাম জরা ব্যাধ।

বেশ নামটি তো। জরা ব্যাধ। কে দিয়েছিল এ নামটা। তোমার বাপ-মা দেখছি তত্ত্বদর্শী ছিলেন। জরা ব্যাধ। জরা তো ব্যাধই বটে, তার বাণে সকলকেই নিহত হ'তে হবে।

ছাগর্ষির এসব কথা জরার উদ্দেশ্যে ততটা নয়, যতটা নিজের উদ্দেশ্যে। জীবন-রহস্যকে সে যেন লাভ করলো একটা সূত্রাকারে। জরা ব্যাধ কিম্বা জরাব্যাধি।

জরা শঙ্কিত হয়ে ওঠে, কি জানি কোন্ স্মৃতির টানে কোন গুপ্ত রহস্য প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে। তাই সে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেবার আশায় শুধোয়, প্রভু, আপনি এই গুহায় একাকী চল্লিশ বৎসর বাস করছেন কেন?

হুঁহুঁ হুঁহুঁ হুঁহুঁ। সে অনেক কথা তুমি বুঝবে না। পেটে বিদ্যা না থাকলে সে কথা বোঝা যায় না।

বুঝিয়ে দিলে অবশ্যই বুঝবো।

না তাও বুঝবে না। বাতিতে তেল থাকলে তবে আলো জ্বালানো যায়। সে তেলটুকুই যে নাই তোমার ঘটে।

ছাগর্ষি বুঝতে পারে না, জরা বুঝতে পারলো না।

তবে শোনো বলি অনেক বিষয় আছে যা বোঝবার জন্যে গোড়ায় একটু জ্ঞান থাকা দরকার। তোমার সেই গোড়ার জ্ঞান-টুকুর অভাব। তবে এই পর্যন্ত শুনে রাখো যে মানুষের সঙ্গে আমার বনলো না।

কেন প্রভু?

ঘটনাটা শুনে নাও, তত্ত্বটা বুঝতে চেষ্টা ক'রো না। আমি অমরাবতী রাজ্যের রাজা ছিলাম। ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, সৈন্য সামন্ত রূপ, যৌবন, কিছুরই অভাব ছিল না আমার। সকলেই আমার জয়ধ্বনি করতো, ভাবতাম তারা আমাকেই চায়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারলাম যে, তারা আমার ধন, রূপ, যৌবন, শক্তির জয়ধ্বনি করছে, সে জয়ধ্বনি আমার উদ্দেশ্যে নয়। আমার ধারণা যে অমূলক নয় প্রমাণ হ'তেও দেরী হ'ল না। দারুপত্তনের রাজা আমার রাজ্য জয় ক'রে নিয়ে আমাকে বিতাড়িত ক'রে দিল। রাজ্য ছেড়ে পালাবার সময়েও শুনতে পেলাম তেমনি জয়ধ্বনি উঠছে, তবে এবারে তা বিজয়ীর উদ্দেশ্যে। ভাবলাম তা'হলে বিত্ত, রাজ্য, রূপ, যৌবন শক্তির এই মূল্য, এই প্রকৃতি, এই পরিণাম। তখন হুঁহুঁ হুঁহুঁ হুঁহুঁ। কি করলাম বলতে পারো।

জরার নিরুত্তরতা প্রমাণ করে সে বুঝতে পারেনি।

রাজ্য ছেড়ে দেশ দেশান্তরী হলাম। স্ত্রী-পুত্র কেউ এলো না সঙ্গে, কাজেই নিঃসঙ্গ। সে ভালোই হ'ল কারো কাছে দায়িত্ব নেই। আমারও কোন দায় নেই। লোকে দরিদ্রকে ভিক্ষা দেয়, সন্ন্যাসীকে

ভিক্ষা দেব। রাজচ্যুত রাজাকে ভিক্ষা দেবে কে? বরঞ্চ সকলেই যেন খুশী, ভাবটা এই যে, কেমন এখন হয়েছে তো! খুব যে রাজা সেজে সকলের মাথার উপরে ছড়ি ঘোরাতে। এখন নাও পথে পথে হা-অন্ন হা-অন্ন ক'রে ঘুরে মরো! দু'চার দিনে মানুষের মনোভাব বুঝতে পেরে জনপদ ছেড়ে দিয়ে বনে চলে এলাম। তখন খাদ্য পানীয় গাছের ফল আর নদীর জল। ক্রমে এসে উপস্থিত হ'লাম এই পাহাড়ী দেশে। এখানে দূরে দূরে পাহাড়ীদের ছোট ছোট গ্রাম। নীচু জমিতে চাষ, আর পাহাড়ময় ছাগলের পাল। ছাগল হচ্ছে পাহাড়ীদের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য। ওরা দুধ জোগায়, মাংস জোগায়, মাল বহন করে, ওদের চামড়া দিয়ে পাদুকা তৈরি করে যা নইলে পাহাড়ে চলাফেরা করা দায়। কি শুনছ না ঘুমিয়ে পড়লে?

মা বাবা শুনছি।

বেশ মন দিয়ে শোনো। একদিন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে এই পাহাড়ের কাছে একটা জায়গায় ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম পাতলা হ'য়ে আসতেই অনুভব করলাম, পেটের মধ্যে ক্ষুধায় করাত চালাচ্ছে। ভাবছি কোথায় যাই, কী খাই, না হয় পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেই সব জ্বালা জুড়াই। চোখ খোলবার বড় ইচ্ছা আর ছিল না, কিন্তু চোখ বুজেই বা কতক্ষণ পড়ে থাকা যায়। তাকিয়ে দেখি আমার কাছে একটি ছাগী দাঁড়িয়ে আছে, দুধের ভারে তার বাঁট ঝুলে পড়ে টন-টন করছে। আমাকে চোখ মেলতে দেখে সে এগিয়ে গেল, তার বাঁটদুটো আমার মুখের কাছে। মনে হ'ল সে আমার কোন জন্মের মা, সন্তানের ক্ষুধা টের পেয়ে এগিয়ে এসেছে। আমি সেখানে শুয়ে শুয়ে পেটভ'রে তার দুধ পান করলাম। আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'লে ছাগলটা গাঁয়ের দিকে চলে গেল। সেই মাতৃদুগ্ধ পান ক'রে নূতন জীবন লাভ করলাম। শুনছ তো?

আজ্ঞে হাঁ।

দেখো কেমন গল্প ফেঁদেছি। ইচ্ছা আছে, কোনদিন যদি লোকালয়ে যাই তবে এই কাহিনী নিয়ে ছাগ-পুরাণ রচনা ক'রে অষ্টাদশ পুরানের সঙ্গে যোগ ক'রে দেবো। তবে তা আর হ'য়ে উঠবে না।

কেন প্রভু?

খামোকা প্রশ্ন ক'রো না। মন দিয়ে শুনে যাও। আমার মনে হ'ল ছাগলটা আবার আসবে আমাকে স্তন্য পান করাতে। তাই সেখানেই রয়ে গেলাম। দেখি হাঁ সকালবেলাতে সে এসে উপস্থিত হ'য়েছে। মাতৃকোলে শুয়ে পেটভরে দুধ পান করলাম মায়ের দুধের স্বাদ তো বড় হ'লে মনে থাকে না, ভাবলাম এইরকমই অমৃতময় ভাবে। তারপর থেকে রোজ দুবেলা আমার ছাগমাতা এসে মানবসন্তানকে দুধ পান করিয়ে যায়। ভাবতাম আমি কেন ওর ছোট্ট বাচ্চাটি হ'লাম না, মায়ের সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতাম, উপত্যকার সবুজ ঘাস খেতাম, ক্ষিদে পেলে পেটভ'রে দুধ খেতাম। তা, না হয়ে হায় আমি মরতে কেন মানুষ হ'তে গেলাম, তায় আবার রাজা। পূর্বজন্মে অনেক ব্রহ্মহত্যা নরহত্যা করলে তবে রাজা হয়ে জন্মায়। যাক গে ওসব বাজে কথা, এবারে কাজের কথা শোনো। ক্রমাগত ছাগলের দুধ পান করবার ফলে দেখি আমার কণ্ঠস্বরে বেশ ছাগলের ডাকের গিটকিরি খেলতে শুরু করেছে। হু'হু, হু'হু হু'হু। কেমন না। আর একদিন পল্বলে জলপান করতে গিয়ে দেখি বা-বা-বা চেহারাটি বেশ ছাগভাব-যুক্ত হয়ে উঠেছে। ছাগলা, দাড়ি, ছাগলা মুখ, ছাগলা চোখ—কণ্ঠটি তো অবিকল ইতিমধ্যে হয়েছে কি জানো পাহাড়ীরা লক্ষ্য করেছে যে রোজ ছাগলে এসে আমাকে দুধ খাইয়ে যায়, তার উপরে আমার মুখের চেহারা আর কণ্ঠস্বর। সরল পাহাড়ীদের ধারণা হল আমি ছাগ জাতির দেবতা, দয়া করে দেখা দিয়েছি। তারা ভাবলো এখানে যতদিন থাকবো তাদের ছাগপালের মঙ্গল হবে, তারা মড়কে মরবে না, শ্বাপদের হাতে মরবে না। আমাকে এখানে স্থায়ী করবার আশায় নিত্য বজরায় রুটি, শাক চাটনি লাড্ডু প্রভৃতির ভোগ জোগাতে লাগলো, অন্না-ভাব, আমার ঘুচে গেল।

এতক্ষণ জরা নীরবে এই অদ্ভুত কাহিনী শুনছিল এবারে বলল, প্রভু তবেই তো দেখলেন মানুষের মনে দয়ামায়া আছে।

রামচন্দ্র! আমাকে মানুষ করলে কি ভোগ জোগাতো। তাছাড়া স্বার্থ যে স্বার্থের দান তো বেতন, তাকে দয়ামায়া বলছ কেন? ওরাই আমাকে এই গুহাটা দেখিয়ে দিল। এখন এখানে বেশ স্থায়ী হয়ে বসেছি, দুবেলা ভোগ খাই, মাঝে মাঝে মুখখানা বের করে দর্শন দি, আর হু'-হু' হু'-হু হু'হু করে ছাগলাদ্য তান ছাড়ি। এখানেই আছি, এখানেই থাকবো, এখানেই মরবো। আর পরজন্মে ছাগশিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করে এই পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় লাফালাফি করে বেড়াবো।

প্রভু মার্জনা করবেন কথকতার আসরে শুনেছি যে যিনি ছাগ সৃষ্টি করেছেন মানবও তাঁর সৃষ্টি।

ঐ সব ছেঁদো কথা রাখো তো। বিধাতারও ভুল হয়ে থাকে। ঐ ছাগ পর্যন্ত এসে থামলেই যথার্থ হতো। আবার মানুষ কেন?

শুনেছি মানুষ সব সৃষ্টির সার।

বটে বটে। সার তবে সমস্ত দোষের সার। ছাগলের রিরংসা, কুকুরের স্বজাতি বিদ্বেষ, ছাগলের শঠতা, মেষের ভীরুতা, বানরের অনুসরণ প্রিয়তা, সর্পের প্রতি-হিংসা স্পৃহার ঘনীভূত মূর্তি মানুষ। আর কোন প্রাণী কি উপকারীর অপকার করে? আর কোন প্রাণী কি খাদ্যদাতার হস্ত দংশন করে? আর কোন প্রাণী কি নখদন্তকে যথেষ্ট না মনে করে নরমেধী অস্ত্র উদ্ভাবন করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে? তবে কি জানো আর বেশি দিন নয়, বিধাতার ভ্রম সংশোধন করবার ভার মানুষ নিজেই গ্রহণ করেছে। ঐ যদুবংশের ইতিহাসটাই সমগ্র মনুষ্যজাতির অনতি-দূরবর্তী ইতিহাস। বিধাতা যখন মারতে চান নিজে কষ্ট স্বীকার করেন না মুমূর্ষুর হাতে অস্ত্র জুগিয়ে দেন। বাসুদেবের উপরে আমার রাগের কারণ মুমূর্ষুর হাতে অস্ত্র জুগিয়ে দেন। বাসুদেবের উপরে আমার রাগের কারণ কৌরব পাণ্ডব যদুবংশ যদি নাশ করলেন বাকি কটাকে রাখতে গেলেন কেন। মোট কথা এই যে মানুষের সঙ্গে আমার বনলো না তাই মানুষকে একঘরে করেছি। বুঝলে কিছু হু'-হু হু'-হু হু'-হু।

জরা বলে, প্রভু মানুষের উপরে আপনার যদি এতই রাগ তবে আমার উপরে এই অনুগ্রহ কেন?

তাই তো ভাবছি ভিতরে হয় তো কোথাও কাঁচা রয়ে গিয়েছে। তবে আর বেশিক্ষণ নয় কাল সকালেই তুমি বিদায় নাও। নাও এখন ঘুমোও রাত অনেক হয়েছে।

তারপরে বলে, ঐ পাথরখানা খোলা রয়েছে, রাতের বেলা খোলাই থাকে, ঐ ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ো। আমি ঐ কোণায় ঘুমোচ্ছি, আমার আবার আলো সহ্য হয় না।

এই বলে ছাগর্ষি অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হল।

জরা ঐ ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে পড়লো, কিন্তু ঘুম এলো না তার চোখে, তার বদলে নানারকম চিন্তা মাকড়সার মতো জটিল জাল বুনতে লাগলো সমস্ত মনটা আচ্ছন্ন করে। চরাচর নিস্তব্ধ, কেবল গুহার কোন্-অন্ধকার কোণ থেকে মাঝে মাঝে কানে আসতে লাগলো হু'-হু হু'-হু হু'-হু শব্দ।

(ক্রমশঃ)

সন্ধিৎসু চোখে

আপাত সুখের আড়ালে

জয়শ্রী রায়চৌধুরী
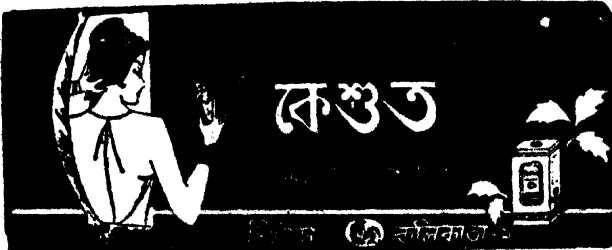
'শিয়রে কৈলে সর্পাঘাত, কোথায় বাঁধিব তাগা?'—আধুনিক বিজ্ঞান তবু এই প্রশ্নটির মোটামুটি উত্তর দিতে পেরেছে; পারেনি আজো কর্কট দংশনের দাওয়াই বাৎলাতে। ক্যানসার মানেই অবধারিত মৃত্যু। এখন পর্যন্ত যা চিকিৎসা হয় তা সবই রুগীকে সাময়িক রিলিফ দিতে বা বড়জোর আর কিছুদিন মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম। আসল চিকিৎসা কিছুই নেই। সম্ভব নয়। আদতে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র দশ বছর পরিশ্রম করেও রোগটির মূলে এযাবৎ পৌঁছোতে পারে নি; পরীক্ষা-নিরীক্ষার গবেষণাগারে শুধু হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

ক্যানসার কি?—এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে চিকিৎসকরা বলেন, টিস্যু এবং কোষের অস্বাভাবিক নতুন বৃদ্ধি যাকে আকটানো যায় না, যা ক্রমাগত বেড়েই চলে এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাই হচ্ছে কানসার। গাছপালা, জীবজন্তু থেকে মানুষ কেউই এর হাত থেকে রক্ষা পায় না।

সাধারণত খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে ক্যানসার দু ধরনের—উৎপত্তির কারণ অনুসারে কার্সিনোমা ও সার্কোমা। এ ছাড়া রোগের বিস্তার পর্যায় লক্ষ্য করে একে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) প্রাথমিক বা লোকালাইজড্ (২) মেটাসটেটিক (৩) সারা দেহে ব্যাপ্ত। যদিও ক্যানসার মাঝ-বয়েসী বা বৃদ্ধদের রোগ বলেই পরিচিত, তবুও যে কোন বয়সেই এই রোগ দেখা দিতে পারে। আর সে জন্যই গোড়া থেকে সাবধান হওয়া দরকার। মাথা থেকে পায়ের পাতা দেহের কোন অংশই বাদ যায় না এর আক্রমণ থেকে—ত্বক, মুখ-গহ্বর, জিহ্বা, ল্যারিংস, থায়রয়েড গ্ল্যান্ড, গলা, ফুসফুস, গলনালী, স্টম্যাক, প্যাংক্রিয়াস, মলদ্বার, স্তন, ইউটেরাস, মূত্রাশয়, প্রোস্টেট ও হাড়।

বাদ যায় না কেউ অথচ রোগ জাঁকিয়ে বসলে প্রচলিত চিকিৎসায় দেহের অংশ-বিশেষ কেটে বাদ দেওয়াই নিষ্কৃতির প্রাথমিক উপায়। কোন কোন বিশেষ ধরনের ক্যানসারে রন্টজেন রশ্মি বা গামা রশ্মি দিয়ে অস্বাভাবিক ক্রমবর্ধমান কোষ বা টিস্যুগুলিকে পুড়িয়ে ফেলা হয়। আবার কিছু কিছু ক্যানসারে হরমোন ট্রিটমেন্ট করেও সুফল পাওয়া যায়। বিশেষ ধরনের ক্যানসারে ডাক্তাররা রেডিও অ্যাকটিভ আইসোটোপ ব্যবহার করেও সুফল পেয়েছেন। আবার লিম্ফয়েড টিউমারে রাসায়নিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগে ফল পাওয়া গেছে।

এত করেও কিছু হচ্ছে না, তার কারণ একটাই—কেন ক্যানসার হয় সেই কারণটাই আজো আমরা বার করতে পারিনি। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দুরূহ ও জটিল ব্যাপার স্যাপার আমার মত একজন নভিসকে বোঝাতে গিয়ে রীতিমত ঝামেলায় পড়েছিলেন ডকটর রায়চৌধুরী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুবোধ মিত্রের মেয়ে জয়শ্রী রায়চৌধুরী, জন্ম ইস্তক এই বিশেষ রোগটির সাথে পরিচিত। একমাত্র মেয়ে ডকটর মিত্রের। ছোটবেলা থেকে ছায়ার মত ঘুরেছেন বাবার সঙ্গে। কানে শুনে নয়, নিজের চোখেই দেখেছেন সেই জাত-চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর কাজকর্ম। ক্যানসার হসপিটালের গোড়াপত্তন থেকে ক্যানসার রিসার্চ সেন্টারের ব্লুপ্রিন্ট সবই ওঁর জানা। তাই তেপান্ন সালে লরেটো হাউস থেকে আই-এস-সি পাশ করে মেয়ে যখন জিদ ধরল : আমি ডাক্তারী পড়ব, বাবা মুখে বিস্ময় প্রকাশ করলেও মনে মনে নিশ্চয় খুসী হয়েছিলেন! ঘরাণার ঐতিহ্য এভাবেই তো বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হয়।

বাবা যখন 'মিত্র অপারেশন অব ক্যানসার সেরভিক্সের' মত জটিল কাটাছেঁড়ার তত্ত্ব উদ্ভাবনে ব্যস্ত তারই মধ্যে মেয়ে ধাপে ধাপে বছর পেরিয়ে আটান্ন সালে পুরোপুরি ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে এলেন মেডিক্যাল কলেজ থেকে। সেই বছরই বিয়ে আর সেই বছরই মা হলেন মেয়ে। তবু নেশা ছাড়ে

না। পুরোপুরি বাঙালী গৃহিনী হলে হবে কি, জয়শ্রীর রোখ সাংঘাতিক। সারা জীবন যে রোগের বিরুদ্ধে বাবা লড়াই করেছেন, তার শেষ না দেখে ছাড়ব না, কিছুতেই না। জানতেই হবে এ রোগের কারণ কি?

আর সে জন্যই বিয়ের বছরেই পাড়ি জমালেন সুদূর আমেরিকায়। নিউইয়র্কে কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে 'স্লোয়ান-কেটারিং ইন্সটিটিউট ফর ক্যানসার রিসার্চে' দু বছর ডকটর অ্যালিস মুর-এর আণ্ডারে থেকে শিখলেন ক্যান্সার গবেষণার প্রাথমিক কাজ—টিস্যু কালচার, ভায়রোলজি ও অ্যালায়েড বায়োলজি।

জয়শ্রী যখন বিদেশে, ঠিক সেই সময়েই চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালে একটি ক্যানসার গবেষণা কেন্দ্র খুলেছেন প্রতিষ্ঠাতা-ডিরেকটর ডকটর সুবোধ মিত্র। শুধু রোগ নির্ণয় করে আর প্রচলিত পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে যে এই দুর্নিবার রোগকে ঠেকানো যাবে না, মনস্বী-চিকিৎসক তাঁর সারাজীবনের সাধনায় তা উপলব্ধি করেছিলেন। আর সেই উপলব্ধিরই ফসল হোল 'চিত্তরঞ্জন ক্যানসার রিসার্চ সেন্টার'। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় দিন দিন সেন্টারটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে লাগল। ষাট সালে আমেরিকা থেকে ফিরেই জয়শ্রী এই সেন্টারে জুনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার হিসেবে যোগ দিলেন।

কেন ক্যানসার হয়? এর উৎপত্তি কোথায়? প্রশ্ন দুটির উত্তর জগতের তাবৎ বিজ্ঞানীরা আজকাল খুঁজছেন তিন ধরনের গবেষণায়—কেমিক্যাল রি-অ্যাকশন, ফিজিক্যাল রি-অ্যাকশন ও ভাইরাস ইনফেকশন। জয়শ্রী শেষোক্ত বিষয় নিয়েই আমেরিকায় দু বছর বিশদভাবে পড়াশোনা করেছিলেন। রিসার্চ সেন্টারে যোগ দিয়ে ঐ বিষয় নিয়েই গবেষণা শুরু করলেন।

লাখ লাখ কেস স্টাডি করে বিজ্ঞানীরা আজকাল নিঃসংশয় হয়েছেন যে, কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্যের প্রতিক্রিয়া জীবদেহে ক্যানসার টিস্যু বা সেলের জন্ম দিয়ে থাকে। আবার বিভিন্ন ধরনের তেজস্ক্রিয়ের প্রতিক্রিয়া যে ক্যানসারের কারণ তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে। ক্যানসারের কেমিক্যাল ও ফিজিক্যাল উৎপত্তি তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা এরই মধ্যে প্রৌঢ়ত্বের দরজা পেরিয়ে বার্ধক্যের পা বাড়িয়েছে। এদের তুলনায় ভাইরাস সম্পর্কিত গবেষণা নেহাতই শিশু। বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন কোন কোন বৈজ্ঞানিক অনকোজেনিক ভাইরাসই ক্যানসারের কারণ বলে দাবী করলেন তখন গোটা পৃথিবীতে সাড়া পড়ে যায়। অনেকেরই চোখ পড়ল এদিকে—তাই তো ক্যানসার ভাইরাস থেকেও তো হতে পারে। ধেড়ে ইঁদুরের গা থেকে লিউকেমিয়া আক্রান্ত টিস্যু নিয়ে সম্পূর্ণ নীরোগ একদিনের বাচ্চা ইঁদুরের দেহে চালান দিয়ে প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক এল, গ্রস সফল হলেন সুস্থদেহে লিউকেমিয়ার জন্ম সাধনে। এই গবেষণাই দরজা খুলে দিল ভায়রোলজির।

রিসার্চ সেন্টারে জয়শ্রী এই টিউমার ভায়রোলজির ওপরেই কাজ করতে শুরু করলেন। জয়শ্রী যেদিন এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন, সেদিন অন্তত কলকাতায় দ্বিতীয় কোন ভায়রোলজিস্ট ছিলেন না। একজন মাত্র হেলপার (চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী) সম্বল করেই অতবড় কাজে হাত দিয়েছিলেন—গবেষণার পাশাপাশি ভায়রোলজি ডিপার্টমেন্টটিও গড়ে তুলতে লাগলেন জয়শ্রী।

তিন বছর দিন রাতের কোন পার্থক্য অনুভব করেন নি জয়শ্রী। চৌরঙ্গী টেরেসের বাসা আর হাজরার মোড়ে গবেষণাগার এরই মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। হাজার দিনের পরিশ্রমের পুরস্কার চৌষট্টি সালে পেলেন—ডাক্তার জয়শ্রী রায়চৌধুরী হলেন ডকটর। এম-বি-বি-এস ডিগ্রীটির পাশেই জমা হোল আর একটি ডিগ্রী পি-এইচ-ডি।

ডিগ্রী বেড়েছে তবু কারণ জানা যায় নি—তাই ক্ষান্ত হলেন না জয়শ্রী। শুরু হোল আর এক পর্যায়ের গবেষণা। গবেষণাপত্রটির টেকনিক্যাল নাম : রাইবোজোম ইন ক্যানসার। সহজ করে বলতে গেলে বলতে হয় যে এই গবেষণার উদ্দেশ্য একটি স্বাভাবিক কোষ ও একটি অস্বাভাবিক কোষের কাজকর্মের পদ্ধতি ও ঢং খুঁটিয়ে দেখা। স্বাভাবিক কোষে রাসায়নিক দ্রব্য বা ক্যানসার ভাইরাস ঢুকিয়ে দিয়ে, তার চালচলন ভালভাবে নজর করলে ধরা পড়বে—(১) কেন ক্যানসার হয় (২) ঠিক কখন থেকে স্বাভাবিক কোষ ক্যানসার কোষে পরিণত হয়। চার বছর একটানা এই বিষয়ে গবেষণা করে গত আটষট্টি সালে জয়শ্রী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর একটি সম্মানপত্র আদায় করেছেন—ডি-এস-সি।

নতুন সম্মানপত্রের আমদানী চাকুরী-জীবনেও ঘটিয়েছে পরিবর্তন। জুনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার থেকে প্রমোশন পেয়ে ঐ বছরই ডকটর রায়চৌধুরী হলেন সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার সেই সঙ্গে বিভাগীয় প্রধান।

দায়িত্বভার বাড়লেও কাজের বিষয় শীগগিরই তাঁকে পালটাতে হোল। এতদিন ভায়রোলজি নিয়েই গবেষণা চালাচ্ছিলেন, কিন্তু ও ব্যাপারে নানা ঝামেলা। প্রথমত ভাইরাস বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। বাইরে থেকে আনলেই তো চলবে না, সেগুলো জিইয়ে রাখতে হবে। তার জন্য চাই ডীপ ফ্রিজ, চাই ইনকিউবেটর, চাই ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ-প্রবাহ। এত সব চাওয়া মেটানোর গ্যারান্টি কে দেবে? তাই বছর কয়েক ধরে ভায়রোলজি সংক্রান্ত গবেষণা বন্ধ রেখে টিউমার-বায়োলজি সম্পর্কে গবেষণা চালাচ্ছেন ডকটর রায়চৌধুরী।

ইতিমধ্যে ডিপার্টমেন্ট বেড়েছে অনেক। একদিন মাত্র একজন হেলপার নিয়ে যে কাজ শুরু করেছিলেন, আজ সেখানে তাঁকে সাহায্য করছেন একজন জুনিয়র রিসার্চ অ্যাসিসট্যান্ট, দুজন ল্যাবরেটরী অ্যাসিসট্যান্ট ও পাঁচজন রিসার্চ ফেলো। এরই মধ্যে ওঁর আণ্ডারে কাজ করে একজন পি-এইচ-ডি পেয়েছেন। এখন কাজ চলছে ক্রোমোজোম, ক্যানসার সার্ভিকস ও টিউমার সেলের জৈবিক ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে।

খ্যাতি প্রতিপত্তি অনেক পেয়েছেন জয়শ্রী। তাঁর কাজ দেশে-বিদেশে সুনাম কুড়িয়েছে অনেক। ঘরে ফুটফুটে দুটি বাচ্চা—দেবশ্রী ও দেবযানী। ওরা দেবতারই আশীর্বাদ। স্বামী স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বলে চিকিৎসক মহলে খ্যাত। আমাদের মত সাধারণ মানুষ, যা চায়—বিদ্যা, অর্থ, নাম, সুখী সংসার—সবই পেয়েছেন জয়শ্রী, তবু সুখী নন! কেন?—এই প্রশ্নই সেদিন ওঁর কাছে রেখেছিলাম।

সদ্যফোটা গোলাপের মত পবিত্র দুটি চোখে দেখেছি করুণার আভাস। আজো তো কারণ বার করতে পারি নি—পাতলা ফুরফুরে ছোট্ট ঠোঁট বেয়ে একটু একটু করে বেদনার ধারা নিঃসৃত হচ্ছে—বাবা সারা জীবন এই দারুণ রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। উনিই আমার জীবনের একমাত্র ইনসপিরেশন। বলতে বলতে পাশের দেওয়ালের দিকে তাকালেন জয়শ্রী—চিরদিনের জন্য ফ্রেমে বন্দী হয়ে আছেন ডকটর সুবোধ মিত্র। যেখানে যেটুকু চিকিৎসা চলছে সবই তো অনুমান ভিত্তিক। মূল কারণটা না জানলে কি করে এ রোগকে ঠেকানো যাবে?

—অনিন্দ্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বলাইও ওঠে। আজ ষষ্ঠীতে সচরাচর অফিস বন্ধ। সাহেব জোর করে অফিস করছেন এ জন্যে তার একটা দিনের ছুটি মারা গেল। টুটুল বুড়ীদের ছুটি চলেছে। গোয়ালের পাশে কুয়োর পাড়ে মুক্তো ঝি যেখানে চায়ের বাসন ধুতে বসেছে সেখানে স্কিপিং করছে বুড়ী। মাঝের ঘরের পাশ দিয়ে বলাই যখন সামনের বারান্দায় আসছে তখন অসম্ভব হেঁড়ে গলায় ডাক এল, 'বলাই, বলাই শোন।'

বলাইয়ের পিত্তি জ্বলে যায়। এ নিশ্চয় ভুঁড়িবাবু। একবার অপাঙ্গে চেয়ে দেখলে, ঠিক তাই। তাকধিরিঙ্গে হাড়গিলে বাইশ-তেইশ বছরের লোকটা টান হয়ে শুয়ে আছে বাড়ির সবচেয়ে লম্বা তক্তা-পোষটায়। খালি গা, পরনে লাল লুঙ্গি। অমৃত বাজার পত্রিকা কাগজখানা পেটের ওপর নিয়ে কড়ি কাঠের দিকে চেয়ে আছে।

ভবনাথের বোনপো রাধাগোবিন্দ দত্ত বা ভুঁড়িবাবু তিন মাস আগে যখন মামার বাড়ি এলেন তখন বলাই থ মেরে গিয়ে-ছিল তার পেটের দিকে এক নজর চেয়ে। এক তিল ভুঁড়ির চিহ্ন নেই, বরং পা দুমড়ে বসলে পেট বিসদৃশভাবে তলিয়ে যায়। সাহেবদের দুঃস্থ জ্ঞাতি সম্পর্কে বলাইয়ের এক নির্দিষ্ট লাইন আছে,— তারা অবজ্ঞার পাত্র। বলাই তাই রাধা-গোবিন্দের কথায় জবাব না দিয়ে বেরিয়ে যেতে চায়।

'মরবে, এ বউটাও মরবে! যা লাশ!' ভুঁড়িবাবু পা নাচাতে নাচাতে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে বললে।

বলাই ঘুরে দাঁড়াল। এগিয়ে এসে বললে, 'তোমার লাশটাও বড় কম যায় না।'

'কি মাছ এনেছিস?'

'তুই' সম্বোধনে এবং তার স্পর্দ্ধিত চরণ যুগলের দিকে চেয়ে বলাই ফেটে পড়ল, 'বেলা সাড়ে নটায় টান হয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গোনা কদ্দিন চলবে?'

'কাল রাত কটা পর্যন্ত জেগেছিস রে? চোখের নীচে যে কালি পড়ে গেছে!' নির্বিকার উদাসীন গলায় ভুঁড়ি বললে।

লোকটার প্রতি আপাদমস্তক ঘৃণায় বলাই স্তব্ধ হয়ে থাকে। সাহেবের আত্মীয় না হলে বোধহয় মেরেই বসত। 'কি মাছ এনেছিস রে?' দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করে ভুঁড়িবাবু।

'তাতে তোমার কি?' বলাইয়ের জিভের ডগায় শালা কথাটা এসে গিয়েছিল। অপরিসীম সংযমে সামলে নেয়।

'তুই আবার বিয়ে করলি কেন রে? একবার বিয়ে করে জুত হল না?'

'তোমার মতো তো ঢ্যামনা সাপ নই আমরা।'

'অ্যাই! গাল দিস না বেটা। জানিস মামাকে বলে তোর চাকরি খতম করে দিতে পারি!'

'বলো না, বলো না, বলবার মাথা আছে?'

'যা-যা, বাবুদের তেল দে।' এতক্ষণে বলাইয়ের দিকে চেয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে ছোকরা বললে।

'যাই বলো বাবু, তোমায় তেল দেব না।'

'আমায় দিবি কেন? তেলা মাথায় তেল দে, গিভ অয়েল টু অয়েলি হেড।'

'অত ফড় ফড় করে ইংরেজী বোল না। গালাগাল আমরাও বুঝি।'

'গালাগাল না, মাইরি গালাগাল না।' ভুঁড়ি উঠে বসে, তারপর গলায় যতখানি সম্ভব বন্ধুত্ব ঢেলে বললে, এদিকে আয় এদিকে আয়।'

আর বলাইও আঁচ করতে পারে। সে দু চার পা সামনে এগিয়ে আসে।

'হাঁড়ি বসিয়েছিস?'

দুদিকের খোলা দরজার দিকে চেয়ে বলাই বললে, 'আটা খাটো করতে পার না? বসিয়েছি। সন্ধ্যের পর এসো। শান্তি-পুর থেকে সং আসছে সন্ধ্যের পর। একেবারে জেলখানার গোড়া পর্যন্ত আসবে।'

'তাই নাকি? বা বা!' ভুঁড়িবাবু উঠে বসে। মাস তিনেক চাকরীর অপেক্ষায় মামার বাড়ি হাপিত্যেশ করে বসে বসে সে হাঁপিয়ে উঠেছে। অবশ্য নির্ঝঞ্ঝাট ঘুম আর খাওয়া-দাওয়ায় শরীর যে ফিরছে আয়নার সামনে দাঁড়ালেই টের পাওয়া যায়। এরই মধ্যে কন্ঠার হাড় প্রায় ভরে এসেছে। তবে সন্ধ্যের পর বেশ একঘেয়ে লাগে। তারপর মামার বড় ছেলে আসছে। সে যাচ্ছে বিলেতে আই-সি-এস পড়তে আর সে আছে অপেক্ষা করে কোন গতিকে আশে-পাশের কোর্ট-কাছারীতে পেস্কার করে ঢুকিয়ে দেবে মেজো মামা। বিধির এই বিধানে সে কিঞ্চিৎ মুহ্যমান। বলাইয়ের সঙ্গে কন্ধ্যেবেলা তাড়িপার্টি অবশ্য এই জীবনযাত্রায় ব্যতিক্রম। বলাইয়ের টিনের বাড়ি আর সবজি ক্ষেতের গায়েই পোড়ো মাঠে। তার গায় খেজুর গাছগুলো বলাই দখল করে নিয়েছে। দু হপ্তা হোল হাঁড়ি বসানো শুরু হয়েছে। চাঁদনি রাতে মাটির দাওয়ায় বলাইয়ের পাশে উবু হয়ে তাড়ি পান ভুঁড়িবাবুর বাইশ বছরের জীবনে একটি সুখকর স্মৃতি। বলাই অবশ্য এ ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান, যদি ধরা পড়ে তাহলে তার চাকরী যাবে। কারণ এ সাহেব একেবারে গোঁড়া, সার্কিট হাউসে বোতল চলেছে, কিন্তু সাহেব ছোঁননি। বলাই নিজের চক্ষে দেখেছে। জানতে পারলে নির্ঘাত চাকরি যাবে, আর তাছাড়া ভুঁড়িবাবুর মতো দুঃস্থ অথচ দুর্বিনীত আত্মীয় বলাইয়ের অবজ্ঞার পাত্র। কিন্তু এই ঢালোয়া লাইন সত্ত্বেও তার দু-দুবার পদস্খলন হয়েছে। তাছাড়া এই মেঠো মদির রসের আকর্ষণ সেও যেমন বোধ করে তেমনি সাহেবের বাড়ির লোকও

করে প্রকাশ্যভাবে এই বোধে তার আত্ম-প্রসাদও জন্মায়। প্রায় সমগোত্রীয় লোকের চালে বলাই বললে 'তুমি তাহলে আসছো সন্ধ্যের পর। একটু সকাল সকালই এসো, টুটুলবাবুকে নিয়ে সং-এ যাব।'

আবার দড়াম করে শুয়ে পড়ে ভুঁড়ি। কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে পা নাচাতে থাকে।' গিভ অয়েল টু অয়েলি হেড', পা নাচানোর তালে তালে আপনমনে বলতে থাকে।

বাইরে সিঁড়িতে ছায়ায় তন্ময় হয়ে টুটুল তার ঠাকুরমার ঝুলির ওপর ঝুঁকে পড়ে আছে, হাতের তেলো গালে। এক-দৃষ্টিতে সে দেখছে। অরুণ-বরুণ-কিরণমালা উপাখ্যানের রাজপুত্রবেশী কিরণমালার ছবিখানার দিকে।

ঢং ঢং করে দশটা বাজল জেলখানার পেটা ঘড়িতে। আরও আধ ঘন্টা বাকী। বলাই সিঁড়িতে সবচেয়ে নীচ ধাপে বসে পড়ে বললে, 'পড় না ছোটদাদাবাবু শুনি।'

ঘুমের ঘোর থেকে যেন টুটুল জেগে উঠল। এক ঝাড় কোঁকড়া চুল হাওয়ায় ক্রমাগত মুখে এসে পড়ছে, সেগুলো সরাতে সরাতে বললে, 'কোনটা পড়ব ?'

শুনে শুনে বলাইয়েরও গল্পগুলো প্রায় মুখস্ত। এক নজর ছবিখানার দিকে চেয়ে বললে। 'ঐ যে কিরণমালা দেখল তার দাদারা মারা গেছে ঐখান থেকে বল।'

বইখানা হাঁটুর ওপর ঠিকমত রেখে টুটুল পড়ে চলে, 'ভোরে উঠিয়া কিরণমালা দেখেন, তীরের ফলা খসিয়া গিয়াছে, ধনুর ছিলা ছিঁড়িয়া গিয়াছে—অরুণদাদা গিয়াছে, বরুণদাদাও গেল, কিরণমালা কাঁদিল না, কাটিল না, চক্ষের জল মুছিল না; উঠিয়া কাজললতাকে খড় খৈল দিল, গাছ-গাছালির গোড়ায় জল দিল, দিয়া রাজপুত্রের পোশাক পরিয়া মাথে মুকুট হাতে তরোয়াল,—কাজললতার বাছুরকে, হরিণের ছানাকে চুমু খাইয়া, চক্ষের পলক ফেলিয়া কিরণ-মালা মায়া পাহাড়ের উদ্দেশে বাহির হইল।'

উত্তেজনায় টুটুলের চোখ ছলছল করে। সেদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে বলাই শুনে যায়, 'যায়—যায়,—কিরণমালা আগুনের মত উঠে, বাতাসের আগে ছুটে;—কে দেখে, কে না-দেখে; দিবারাত্রি পাহাড় জঙ্গল, রোদবান সকল লুটাপুটি গেল; ঝড় থমকাইয়া বিদ্যুৎ চমকাইয়া তের রাত্রি তেত্রিশ দিনে কিরণমালা পাহাড়ে গিয়া উঠিলেন।'

বয়সের তুলনায় আশ্চর্য পরিষ্কার উচ্চারণ টুটুলের। তাছাড়া এসব উপা-খ্যানের মধ্যে সে এমন ডুবে আছে যে সে কিছুতেই বুঝবে না সারা পৃথিবী শুদ্ধ লোক কেন কান পেতে থাকবে না এই গল্প শুনবার জন্যে। আর সত্যিই গল্প শুনতে শুনতে আধ ঘন্টা পেরিয়ে যায়। ভুবনাথ যখন খোঁজ দেয়ে টাই আঁটছে তখন টুটুল বলাই ওই নীলকমল আর লালকমল কাহিনীতে।

খোকখুকুদের সাক্ষী সুর অবিকল নকল করে টুটুল চেঁচাচ্ছে, 'খাঁ খাঁ রে?' যার মুখের তলা এমন, না জানি সে কি রে?' এমন সময় ভবনাথের গলা এল, 'বলাই'।

বলাই উঠে পড়ে বললে, 'দুপুরে ঘুমিয়ে নিও দাদাবাবু। সন্ধ্যের পর সং দেখতে বেরোব।'

দুপুরে ঘুমায় নি টুটুল। স্বর্ণ-সুন্দরীর ঘুম যখন জমে ওঠে ঠিক সে সময় ভাইবোন পা টিপে টিপে বের হয়। আজ লক্ষ্যস্থল পুকুরপাড়ের ঢালু জমিতে খেজুর ঝোপের স্বল্প ছায়ায় যে কয়েকটা ফোকর গজিয়েছে গত বর্ষার পর সেখানে পাখির ছানা সন্ধান। শীতের রোদ্দুর এখন খুব মিঠে, মাঝে মাঝে শুকনো কনকনে হাওয়া দিচ্ছে। এ বছর মনে হচ্ছে শীতটা বেশী পড়বে। পাখির ছানা সন্ধান একটু বিপজ্জনক, যে এই ব্যাপারে তাদের দীক্ষা দিয়েছে সুরেন পেস্কারের ছেলে তাদের সাবধান করেছে, আগে সাবধানে একটা লম্বা লাগি খানিকটা ঢুকিয়ে দেখতে, ভেতর থেকে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ আসছে কিনা তা কান পেতে শুনতে। যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে কয়েকটা ফোকর পরপর পরীক্ষা করেও বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। টুটুলের উৎসাহই বেশী। সে গর্তে কাঁধ পর্যন্ত হাত ভরে কয়েক খাবলা মাটি বার করলে। শীতের রোদ্দুরও অনেকক্ষণ মাথায় লাগাতে অস্বোয়াস্তি লাগে। বকুল বনের ছায়ায় বাঁধানো বেদীতে বসতেই টুটুল বললে, 'আচ্ছা বুড়ী, মানুষ কি করে জন্মায় ?'

'আমার দিদি না বললে বলব না।'
'তুই জানিস না, আমি জানি।'

'কি জানিস ? বল বল'।

'আমি দেখেছি, মুংলীর বাছুর হতে
আমি দেখেছি।'

'কি অসভ্য ? আমি মাকে বলে দেব। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে টুটুল জিজ্ঞেস করে, 'আমরা কি সব মরে যাব ?'

বুড়ী বোধহয় এ ব্যাপারে বিশেষ ভাবিত নয়। বললে, 'বুড়ো হয়ে গেলে মরে যায়।'

'বাবা মরে যাবে ? মা মরে যাবে ?'
'দূর! বাবা কি বুড়ো!'

'আমাদের ক্লাসে সিদ্ধার্থের বাবা মরে গেছে, জানো ?'

বুড়ী প্রসঙ্গ পাল্টাতে চায়। বলে, 'আজ কত লোক কত রকম সেজে আসবে। বলাইদা বলছিল, কেউ রাজা হবে, কেউ ভিক্ষে করবে লাঠি নিয়ে।'

'আমাদের বুকে একটা ধুকধুকি আছে। এখানে... ঠিক এইখানটায়। এখানে কানটা পাত।' টুটুল বুড়ীর মাথাটা ঠেলে তার বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আস্তে আস্তে বলে, 'সিদ্ধার্থের বাবার ধুকধুকিটা বন্ধ হয়ে গেছে।'

'আমি জানি, আমি জানি। আমারও আছে ধুকধুকি সকলেরই আছে।' বুড়ী বললে।

তারপর হঠাৎ ভেংচাতে থাকে, 'ধুকধুকি আছে, ধুকধুকি আছে! তুই একটা বোকা আস্ত বোকা!' দু হাতের আঙুলগুলো কুঁকড়ে সে টুটুলের চোখের সামনে খোলে আর বন্ধ করে।

টুটুল লাফিয়ে ঝুলে পড়ল বুড়ীর বেণী ধরে। এর পর আঁচড়া-আঁচড়ি। গায়ের জোরে ভাইয়ের সঙ্গে না পেরে বুড়ী কট করে কামড় বসিয়ে দেয় টুটুলের গালে। সঙ্গে সঙ্গে টুটুলের বকুল-বন কাঁপানো কান্নামিশ্রিত চীৎকার। কান্না আর চীৎকারের একটা ডেলা টাল খেতে খেতে মাঠ পার হয়ে বাড়ির দিকে ছুটে আসে। পেছনে কাঁদো কাঁদো বুড়ী, বারান্দায় স্বর্ণসুন্দরী দাঁড়িয়ে। টুটুল এসে হাউ-হাউ করে মাকে জড়িয়ে ধরে। যে হাতখানা খালি ছিল সেই হাতখানা দিয়ে তিনি ঠাস করে চড় কষিয়ে দিলেন বুড়ীকে। বুড়ীও সঙ্গে সঙ্গে কান্নার বান্ডিল, টাল খেয়ে পড়ল বিছানায়। কড়া গলায় স্বর্ণ-সুন্দরী হুকুম দিলেন, 'আজ সন্ধেবেলা কোথাও যাওয়া বন্ধ।'

বললেন বটে, কিন্তু বিকেল পড়ে এলে যখন জেলখানার সামনে বাদামতলায় লোক জমায়েত সুরু হল তখন বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলেন, বলাইটা কখন আসবে। সম্প্রতি শহরে থিয়েটার হলে সিনেমা দেখানো আরম্ভ হয়েছে। প্রথম বই 'চন্ডীদাস' দেখতে ছেলেমেয়ে স্বামীশুদ্ধ বক্সে গিয়ে বসেছিলেন। জমেও উঠেছিল। কিন্তু এক নাটকীয় মুহূর্তে উমাশশী রামী যখন তার ঢল ঢল চোখ তুলে আর্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে দুর্গাদাস অভিনীত চন্ডীদাসকে—'চন্ডী ঠাকুর এ কি সাজা?' তখনই ঘরর-ঘরর শব্দে ফিল্ম কাটল। তারপর অবশ্য 'কপালকুন্ডলা' দেখে ছেলেমেয়েরা দু-তিনটে রাত ঘুমায় নি। কিন্তু সং তাদের ভালই লাগবে। তাঁর নিজেরও যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু স্বামী বোধহয় পছন্দ করবেন না ভেবে ছেলেমেয়েদের জামা পরাতে গেলেন।

সন্ধ্যে সাতটা না বাজতেই কারবাইড আর হ্যাজাকের আলোয় বাদামতলা ঝলমল করে। নদীর ওপার থেকে আসে সবুজ লুঙ্গি আর দাড়ি নিয়ে মুসলমান চাষী, শহরের দোকানদার—বাড়ি ফিরবার মুখে কারো হাতে কেরোসিনের বোতল, জেল-খানার ওয়ার্ডার কেউ নিপুণভাবে ঠোঁট আর দাঁতের ফাঁকে খৈনি ঢেলে হাতে তালি মারছে। নতুন জামাপরা বাবুদের ছেলে-মেয়ে, সাদা থানপরা ঝিয়ের দল, অতগুলো লোকের কলরবে উঁচু বাদাম গাছের মাথা থেকে পাখা ঝাপটে বাদুড় উড়ে যায়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টুটুলের পা ধরে গেল। বলাইয়ের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে সে অমনতর প্রশ্ন করে, 'কখন আসবে?' আর

বলাই প্রত্যেকবারই জবাব দেয়, 'এখনই এসে যাবে। একটু সবুর কর না!'

বুড়ীর কিন্তু ভালই লাগছে। চপেটাঘাতের দুঃখে কান্নার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমও এসে গিয়েছিল। সন্ধ্যে গাড়িয়ে তবে উঠেছে। এখন তাই বিস্ফারিত চোখে কালো দাড়ির ওপরে কার্বাইডের আলো, শ্যামবাবুর বড় মেয়ের মাথায় গোলাপী রিবনের ফুল, ঘন সবুজ আর টকটকে লাল এক পয়সার ঘোলের সরবতের জন্যে ছেলে-মেয়েদের ভিড়, উড়ন্ত বেলুন—সবটাই খুব ভাল লাগছে।

রাস্তাটা যেখানে মোড় খেয়েছে সেখানকার অপেক্ষমান জনতা হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর কোথা থেকে কয়েকজন ফচকে ভলান্টিয়ার 'আপনারা হটে যান, হটে যান' করতে করতে তেড়ে আসে। আলোয় ঝলমল প্রথম গোরুর গাড়িটা দেখা যায়। বুড়ী মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে থাকে—রামচন্দ্রের সভা, ঝকমকে জরিদার পোশাকে, ঝুটো মুক্তো গলায় আশ্চর্য সুন্দর লাগে রাম-সীতাকে। একজন চামর ঢুলোচ্ছে, নীচে হাত জোড় করে হনুমান—অবিকল হনুমানের মতো। আর হাত জোড় করে বসে লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন আর অমাত্যরা। বুড়ী লক্ষ্য করলে অমাত্যদের সঙ্গে শ্যামবাবুর ছোট ছেলে বসে গেছে। পরের গরুর গাড়িতে ফেস্টুন আঁটা, 'মেরেছিস কলসী কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না?'—হাত তুলে নিমাই দাঁড়িয়ে, গরুটা হোঁচট খাওয়ায় তাল সামলাবার জন্যে একবার নেচে উঠল, মাথায় পরচুলায় এক খাবলা আলতা, নীচে হাঁটু গেড়ে জগাই-মাধাই। গাড়িগুলো থামতেই সবাই এগিয়ে আসে, তারিফ করে। আবার উদগ্রীব প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। এর পর যে সং আসে তা দেখে অনেকে হৈ-হৈ করে, তরুণরা কেউ-কেউ সিটি দেন, কিন্তু বুড়ী টুটুলের কাছে ব্যাপারটা বোধগম্য হয় না। গরুর গাড়িটার মাঝখানে দুটো বাঁশ আঁটা। মাথায় ঘোমটা দেওয়া বউকে বর কাঁধে নিয়েছে, আর দুদিকে দু হাত দিয়ে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের চুলের ঝুঁটি ধরে আছে। বউয়ের আলতা-পরা পায়ের দিকে নজর দিয়ে বুড়ী বুঝতে পারে মেয়েটি তারই সমবয়সী। এর পর আরও সং আসে, কিন্তু বড্ড দেরীতে-দেরীতে, বেশীর ভাগই রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যান, মাঝে-মাঝে সামাজিক প্রহসন। ঘুমে জড়িয়ে আসে টুটুলের চোখ, বলাই তাকে কোলে তুলে নেয়।

শেষের দিকে একটা ব্যাপার ঘটে যায় যা ছিল বলাইয়ের কল্পনাতীত। অবশ্য আড়ংয়ের গান সে আগেও শুনেছে কৃষ্ণনগরে। কিন্তু এখানে এস-ডি-ও সাহেবের কোয়ার্টারের সামনে এমন নির্লজ্জভাবে গান গেয়ে লোকগুলো হাসির হররা তুলবে সে ভাবে নি।

গানের পার্টি এল খোল, হারমোনিয়াম, খঞ্জনী। একজন মাথা ঝাঁকিয়ে ক্রমাগত হারমোনিয়াম বাজিয়ে হঠাৎ ডান হাত তুলে গান ধরলে ঃ

ওগো ননদিনী রাই!
তোমার ছোট ভাই, তোমার ছোট ভাই
কলতলাতে নিয়ে গিয়ে টিপে দিল তাই!

সামনের দিকে বুবকবুন্দ হাসি আর হাততালিতে ফেটে পড়ল। বলাই শিহরিত হয়ে শুনতে থাকে কলতলায় আর কি-কি হল তার আনুপূর্বিক বর্ণনা। আবার হাসি আর হাততালি। সাদা থানের দল 'ওমা . ওমা, একি!' বলে হাসিতে গড়িয়ে পড়ল। দাড়িওয়ালা লোকগুলো কিন্তু গম্ভীরভাবে চেয়ে থাকে। খোল করতালের সঙ্গতে আর হাসির হররায় জমজম করে চার পাশ। পেছন থেকে হঠাৎ হেঁড়ে গলার আওয়াজ আসে, 'বাবা-বাবা-বাবা-বাবা!' বলাই চমকে পেছন ফিরে দেখলে ভুঁড়িবাবু। মুখে মৃদু হাসি, চোখ প্রায় বোজা।

বলাই এবার বুড়ীর হাত ধরে টানতে থাকে, 'চলো দিদি, এবার ফিরি।' বুড়ীর ব্যাপারটা বোধগম্য নয়। সবাই হাসছে দেখে সেও হাসছে। যখন তারা ফিরব-ফিরব করছে তখন চার পাশের চিৎকারে টুটুলের ঘুম ভাঙে। শেষ গাড়িটা আসছে। কোঁচানো ধুতি আর গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী পরা লম্বা এক ছোকরা গান ধরে, 'রাণাঘাট সোনার শহর, ও বাবু মহাশয়।' আর তার সঙ্গে দোয়ারকি দেয় বেঁটে দাড়িওয়ালা লোকটা। গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে নেচে-নেচে হাততালি দিয়ে হাঁকে, 'তাই তো তাই তো তাই কো।'

একবার বলাই আর টুটুলের সামনেও নাচে, 'তাইতো তাইতো তাইতো!'

(৬)

'ওমা, রাঙাদি, রাঙাদি!' বুড়ি দৌড়ে আসে পুকুরের পাড়ে ভোরবেলায়। ভোরের ট্রেনে ভবনাথের বড় ছেলে প্রতাপ, মেজছেলে চোঙা এবং মেজ মেয়ে গৌরী এসেছে কলকাতা থেকে। স্বর্ণময়ীর হাঁক-ডাকে বাড়ি গরম। টুটুলেরও ঘুম ভেঙেছে। সেও ভোরের ঠান্ডায় হাঁচতে হাঁচতে উঠে এসেছে দিদির পেছনে।

দিদির মত টুটুলও হাঁ করে চেয়ে-চেয়ে গৌরীর দাঁত ব্রাশ করা দেখে। বিশেষ করে তার ফর্সা মুখে ঝকমকে রিমলেশ চশমার দিকে। এক বছর আগে গৌরী রাণাঘাট হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক দিয়েছে। সে আর সার্কল অফিসারের মেয়ে বেবি মাস্টার-মশাইয়ের সঙ্গে ক্লাসে গুটি-গুটি করে ঢুকত এবং মাস্টারমশাইরা তাঁদের বগলদাবা করে টিচার্স রুমে ফিরতেন। এরই কোন ফাঁকে লালমোহন বলে করিতকর্মা ছেলেটি তাকে প্রেম নিবেদন করে বসল চিঠির মারফত। তা নিয়ে হুলুস্থুল। হেডমাস্টার শ্যামবাবু পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়ায়। লালমোহনকে বেত দেবার পর ব্যাপারটা আরও ঘোরাল হয়। দু-তিন দিন পর কাগজের ছোট-ছোট পাকান বল কোন অনির্দিষ্ট দিক থেকে ক্রমাগত গৌরীর নাকে-মুখে পড়তে থাকে। তারপর সার্কল অফিসারের মেয়ে বেবী এ আন্দোলনকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল তার দাঁতে দাঁত চাপা 'জুতো খা, জুতো খা' চিৎকারে। শেষ পর্যন্ত ফয়সালা করলেন স্বর্ণময়ী। লালমোহনের মা ছিলেন নারীমঙ্গল সমিতির অন্যতম উদ্যোক্তা। তাঁকে বাড়িতে ডেকে চা খাইয়ে ব্যাপারটা ম্যানেজ দিলেন।

গৌরীর টুথপেস্টের বাক্সটা নাড়াচাড়া করে সসম্ভ্রমে বুড়ী। ভবনাথের বাড়িতে টুথপেস্ট ব্রাশের চল এখনও হয় নি। নিজে নিমের দাঁতনে অভ্যস্ত এবং বাড়ির আর সবাই খড়ির গুঁড়োর সঙ্গে কর্পূর কিম্বা সুপারী পোড়ান ছাইয়ে দাঁত মাজে।

পেছন থেকে অচিন্ত্য ডাকনাম চোঙা বলে 'আমারও আছে জানিস?' তারও হাতে ব্রাশ।

(ক্রমশঃ)

হিসেবের অংক ॥ গোলাম-কুদ্দুস

মুক্তিমন্ত্র সুকঠিন
আরো কঠিন মুক্তির সংগ্রাম,
কঠিনতম আত্ম-বলিদান।
যখন তা হ'য়ে ওঠে সহজতম
রক্তগংগা বয়ে আনে প্রাণগংগার ধারা
রক্ত থেকে জন্ম নেয় রক্তবীজের চারা
তখনই ট্যাংক উড়িয়ে দিয়ে গুঁড়িয়ে যায় রোশেনারা।

আমি শুনলাম সেই অজ্ঞাত অখ্যাত মেয়ের নাম
মানুষের মুখে মুখে,
আমি দেখলাম রোশেনারা হ'য়ে উঠেছে
মানুষের মিছিলের পতাকা,
আমার কানে বাজল ঃ জয় রোশেনারার জয়।

সে-মেয়ে এই জয়ধ্বনি শুনতে পাবে না কোনোদিন,
চিরকালের মত মাটি হ'য়ে মিলিয়ে গেছে মাটিতে,
ক্ষমতা থাকলে হয়ত ব'লে উঠত ঃ
আমায় জাগিয়ো না, ঘুমাতে দাও,
যারা জেগে আছ এগিয়ে যাও, প্রাণ হাতে নিয়ে এগিয়ে যাও।

যারা জেগে জেগে ঘুমায় তাদের তুমি কি বলবে রোশেনারা?
যারা তোমাদের নামে মাতোয়ারা
তারা তোমাদের স্বীকার করে না কেন রোশেনারা?
কেন এত লাভ-লোকসানের কড়ি মেলায়?
আমি জানি, রোশেনারা, তোমাদের বেহিসেবী প্রাণ-বলিদান
ওদের হিসেবের অংক একদিন গরমিল ক'রে দেবেই দেবে।

তমসা পারের গান ॥ কার্তিকচন্দ্র মিত্র

তমসার পার থেকে ভেসে আসে গান।
বিক্ষুব্ধ হাওয়ার দোলায় সরোবরে
নিজস্ব মুখের প্রতিবিম্ব আপাতত ম্লান।
বারুদের গন্ধ শুঁকে আমার মধ্যাহ্ন কাটে—
কার্পাসের বন লুঠ হ'য়ে গেছে কবে!
শূন্য মাঠ—আলালের ঘরে ধান।

বারুদ স্তূপের মাঝে আমার মধ্যাহ্ন বয়ে যায়।
আলালের ঘর উড়ে গেছে বোমার আঘাতে।
ভস্মীভূত তুলোর গুদাম আর ধান।

তমসা পারের মহান চরিত্র পুরুষের ছায়া
গলিত মনের সরোবরে এখন অপরিচিত।
তবু তমসার পার থেকে ঠিকমত
নন্দিত বীণার ঝংকারে ঝংকারে
ভেসে আসে বাঁচা ও বৃদ্ধির গান।

মধ্যাহ্নের ব্যাধ ॥ শান্তনু দাস

ঃ আমি আছি
পিঠে তূণ, ছিলায় আঁঠালো রক্ত
অনন্ত অনাদিকালে পাঁশুটে রক্তিম,
দয়াময়ী জননী সুন্দর ঃ তুমি কোন্ তাম্বুল আলোর কোলে
ফেলে দিয়ে সোনার বাছাকে চলে গেছ,
যে আলোতে ফোটে ফুল, ভোরের শিশিরে ঝরে স্মৃতি,
যে আলোতে রাতের অতিথি হাঁটু গেড়ে নতজানু,
নির্মম শিবিরে এসে মহাকাল, দাঁতে কাটে আলোর করাত।

ভয়? কাকে ভয়? ভয় আমি কাউকে করিনা,
আমার শরীর দ্যাখো তামাটে ইস্পাত, হাতে জ্বালা,
বনের গন্ধে যদি কখনো আচম্ব ঘুম নেমে আসে, তবু জেনো—
ছিলায় সতর্ক হাত; পিঠে তূণ, পাঁশুটে রক্তিম।

পিতামহ ঃ সার্থকপূর্বক—
তুমিও কি ভয়ঙ্কর শাখা-প্রশাখার ঝাড়ে তুলেছো তুফান?
তুমিও কি মধ্যাহ্নের স্বর্ণছায়া দু' পায়ে মাড়িয়ে
মিশে আছো, গভীর নৈঋতে?
কিংবা কোনো লক্ষ্যভেদে দুরন্ত শার্দুল পিঠে আদিম উল্লাসে'
রক্তঝরা ললাটে আঁকড়ে নিয়ে স্মৃতি!
আমি জানি ঃ আমার ধমনী জুড়ে সেই শব্দ পিতৃপুরুষের
গরম লাভার স্রোতে ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে বলে—
আগে চল।

কেউ কারে স্মরণে রাখে না ঃ
শুধু মাত্র দৃশ্যপটে উত্তপ্ত পারদ ওঠে নামে,
নম্রতায় ঝরে পড়ে হলুদ পাতারা
কিংবা কোনো তারা ঘর বদলে নেয় অন্ধকারে।
শিয়রে দুঃখ নিয়ে জেগে রাখি চোখ,
যেমন বাঘিনী ঘোরে হেতাল বনের ধারে
ফেলে রেখে ঘুমন্ত শাবক
সে আগুন আমার শরীরে
নিমেষেই দাবানল, নিমেষেই অনন্ত দহন।

হে পিতৃপুরুষ ঃ তোমরা শোনো—
নিজের শোণিতে আমি খেলা করি মাছের মতন,
হে উত্তরসাধক ঃ আমি নতজানু তোমাদের কাছে,
দয়াময়ী জননী সুন্দর ঃ
জানিনা কখন তুমি তাম্বুলে আলোর নীচে
ফেলে গেছো সোনার বাছাকে,
শুনে যাও আমি আছি,
যৌবনের লাভাস্রোতে নির্মম আগুন নিয়ে
বনজ মাটির কাছাকাছি,
পায়ে কাঁপে গর্ভিনী মেদিনী,
পিঠে তূণ, আমি এক মধ্যাহ্নের ব্যাধ,
আদিম প্রহরে স্বতঃ ঋজু
ঋজুতম সাহসে সামিল।।

সামুরাই প্রেত

কমল চৌধুরী

উইলিয়ম কুপার অঙ্কিত এই কার্টুন ১৯৪১ খৃঃ ৯ ডিসেম্বর ডেইলি ওয়ার্কার-এ প্রকাশিত হয়।

জাপান শুধু একটি রহস্যময় দেশই নয়, সক্রিয় বিকাশশীল দেশও বটে। জাপানীদের চরিত্রে একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। ওরা পুরোনকে ছাড়তে দ্বিধাগ্রস্ত, নতুনকেও দেখে সংশয়ের চোখে। চিন্তাধারায় এক আশ্চর্য রাজনৈতিক অবাস্তব অথচ মধুরভাবের সঙ্গে ধর্মীয় এবং দার্শনিক ভাবধারা আছে জট পাকিয়ে। মধ্য ও বর্তমান যুগ জটিল রূপ পেয়েছে ওদের মানসিকতায়: অন্য দেশের তুলনায় এখানকার সবকিছুই কেমন বিস্ময়সূচক। দেশটি এমন যা যুগপৎ, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করে। জাপানী জনগণের শ্রমশীলতা প্রশংসাজনক। একজন সাধারণ জাপানীর অপরের প্রতি ব্যবহারের সৌজন্য ও সংযম এবং সহনশীলতা অতুলনীয়। তাছাড়া তারা বিখ্যাত অধ্যবসায়, শৃংখলাবোধ, জীবন ও শ্রম নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মগুলির প্রতি আনুগত্যের জন্য। জাপানীদের দীর্ঘকাল অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বারবার ডেকে এনেছে অন্তহীন দুর্দশা। এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়েই অর্জিত হয়েছে দুর্লভ চারিত্রিক গুণাবলী।

দীর্ঘকাল সামন্ততান্ত্রিক শাসনে নিষ্পেষিত জাপানী জনগণ। এই [illegible]কালীন শাসন নেতিবাচক প্রভাব জাপানীদের চারিত্রিক গঠনকে এক বিশেষ খাতে প্রবাহিত করে। তৎকালীন বুশিদো আচরণবিধি অর্থাৎ যোদ্ধার আচরণবিধি ছিল সমাজের উচ্চস্থান অধিকারী সামুরাই বা সামন্ত প্রভুদের জন্য। কিন্তু অতি সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মানুষরাও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। বুশিদো আচরণবিধির বহু ধারাই সামরিক নিয়মাবলীতে এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও বিশেষত সরকারী আমলাতন্ত্রের আচরণবিধিতেও দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল। জাপানে মধ্যযুগীয় ভাবধারার অবসান ঘটে ১৮৬৮ খৃঃ। বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। সামন্ত প্রভুদের ওপর নবীন বুর্জোয়া সমাজ আধিপত্য বিস্তার করে। তারপর শুরু হয় সোগানদের কাল। সোগান উপাধিধারীরা ছিল শক্তিশালী শাসনকর্তা। নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই চলত অবিরত। অনেকটা ভারতীয় ক্ষত্রিয়দের মতো। দীর্ঘকাল পরে হাতে ক্ষমতা পান সম্রাট মাৎসুহিটো। শুরু হয় তথাকথিত মেহজি যুগ। জাপানী ঐতিহাসিকদের মতে এটা হচ্ছে মেহজি বিপ্লব। কিন্তু এই বিপ্লব মধ্যযুগীয় দর্শন এবং নীতিকে বাঁচিয়ে রাখল মাত্র। তারপর অনেক ঝড় উঠেছে জাপানে। এক-একজন নেতা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশের পথ নির্দেশ করেছেন। কখনো পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা, কখনো সম্পূর্ণ নিজস্ব পথে চলেছে জাপান। প্রাচীন সামুরাই মনোভাব কাটিয়ে এক নতুন জাতীয় সত্ত্বার বিকাশ ঘটছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠে জাপানের দ্রুত সামরিকীকরণ ঘটতে থাকে। এশিয়ায় প্রভুত্ব কামনায় জাপানী শাসকবর্গ উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জাপানের ওপর এল কালো মেঘ নিয়ে।

ফ্যাসিস্ট লেখক মিশিমা আত্মহত্যা করেছেন কিছুকাল আগে। যে রকম অমানুষিকভাবে হারাকিরি করে আত্মহত্যা করেছেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর আত্মহত্যার উদ্দেশ্য হোল সামরিক বাহিনী ও জনগণের মধ্যে 'সামুরাই' মনোভাব জাগিয়ে সংবিধান পরিবর্তনের জন্য তাদের সংগ্রামে নামানো। অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এই সংবিধানে বলা হয়েছে যুদ্ধ পরিহারের কথা এবং সশস্ত্র বাহিনী গঠনের প্রতি অসমর্থন। একখানি তরবারি দিয়ে উদর বিচ্ছিন্ন করে মিশিমা দেখালেন যে, সামুরাই মনোভাব এখনো জীবন্ত। এই সামুরাই মনোভাব যদি একটা জীবন্ত চিন্তা হিসাবে এখনও থেকে থাকে, তাহলে সিন্টোধর্মও কম জীবন্ত নয়। এই ধর্মমতে সম্রাট অতিমানব হিসাবে চিহ্নিত। নাগরিকদের তাঁর উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গের আহ্বান জানান হয়েছে।

একশ বছর আগে সামুরাইদের স্মৃতিরক্ষার জন্যে টোকিওর ইয়াসুকুনি মন্দির নির্মিত হয়েছিল। গত একশ বছর ধরে যত সৈন্য এবং সৈন্যবাহিনীর অফিসার বিভিন্ন যুদ্ধে জাপানে মারা গেছে তাদের চিতাভস্ম অথবা পারিবারিক স্মৃতিফলক এখানে আনা হয়েছে। এসব যুদ্ধই হোল আগ্রাসী যুদ্ধ, তার একটিও ব্যতিক্রম নয়। লক্ষ লক্ষ পারিবারিক স্মৃতিফলক নাকি এখন এই মন্দিরে আছে।

আই টিকইয়োসির নমুনা থেকে টোকিও-র একটি পার্কে সুন্দর একটি মন্দির তৈরি করা হয় ১৯৬৮ খৃঃ। এখানে

আছে মনোরম একটি কৃত্রিম জলপ্রপাত। অন্যান্য সিন্টো তীর্থস্থানের মতো বিস্তীর্ণ এবং শান্ত। পরিবেশটা মনোরম কবিত্বময়। একে বলা হয় জাপানমাতার প্রতীক। জাপানমাতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত জাপানী বীরদের আত্মার তৃষ্ণা মেটাচ্ছেন। এখানে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে মহাসমরের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রের প্রস্তরখন্ড। ম্যানিলা থেকে করেগিডর থেকে গুয়াম দ্বীপ থেকে বোগেইন দ্বীপ থেকে এবং অন্যান্য জায়গার পাথর নিপুণভাবে দেওয়ালে লাগান হয়েছে। তীর্থযাত্রীদের বিরাম নেই। অবিশ্রাম গতি, সপরিবারে আসে সকলে। মনে হবে প্রাচীন কোন নিদর্শন দেখার কৌতূহলে এসেছে তারা। কিন্তু মন্দিরের দরজায় ঘোষণা করা হয়েছে, যারা বিশ্বাসী, তারা অমুখ তারিখে খাবাবিন অধিকারের জন্য যেসব যোদ্ধা আত্মাহুতি দিয়েছিলেন তাদের স্মৃতিতর্পণ অনুষ্ঠানে যোগ দিন। বার্মার যুদ্ধে নিহতদের স্মৃতিতর্পণের জন্যও রয়েছে অনুরূপ অনুরোধ। ধীরে ধীরে সমগ্র পরিবেশের রূপ যায় পাল্টে। মনে হয় টোকিও শহরের মাঝখানে প্রতিহিংসাপরায়ণতার একটি প্রতীক জীবন্ত।

ধর্মীয় আবরণের মোড়কে সামরিকীকরণের যে প্রয়াস চলেছে, জাপান জুড়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছে বারবার। জাপানের নিজস্ব সংস্কৃতি আজ বিপন্ন। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ বিনষ্ট করতে নয়া উপনিবেশবাদীরা বৌদ্ধধর্মকে ব্যবহার করেছে। জাপানে এরাই আওয়াজ তুলেছেঃ আমরা কি চাই—কম্যুনিজম না স্বাধীনতা ?—সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত। জাপানের ধর্মীয় সমাজও এই অসুস্থ চিন্তাধারার আত্মপ্রকাশে বিপন্ন বোধ করছে। কাউন্সিল অফ রিলিজিঅনিষ্ট ফর পিসের সেক্রেটারি জেনারেল রেভারেন্ড সুজুকি বলেছেনঃ

> "Neocolonialist policies have already been brought to Japan. Because of the Japan-US Security Treaty, many national traditions, many cultural achievements have been destroyed. And grave criminal acts are increasing in this country just as in the United States itself : the use of narcotics, heroin, and other drugs, and so on. The very fact to being a human is threatened. The struggle against this — against the very simple things of life that are being destroyed by the Japan-US Security Treaty — must also grow into a struggle against imperialism, against the Treaty Japan has become a semicolony, its politics and the Japanese people themselves as human beings, are being contaminated and destroyed. We have to struggle against that.

কিছুদিন যাবৎ টোকিওতে একটি ছবি দেখান হচ্ছিল পর্দায়। ছবিটির নাম 'টোরা, টোরা, টোরা'। ছবিতে আছে, কি করে জাপানীরা পার্ল হারবার বিধ্বস্ত করেছিল। এই ঘটনায় প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের সূত্রপাত। মার্কিন-জাপান যৌথ উদ্যোগে ছবিটি তৈরি। বিখ্যাত জাপানী পরিচালক কুরোসাওয়াকে এই ছবিটি করতে অনুরোধ জানান হয়। কিন্তু কুরোসাওয়া অসম্মতি জানান। তারা আর একজন পরিচালকের শরণাপন্ন হলেন। এবং শেষ পর্যন্ত ছবিটি প্রস্তুত হোল। এই ছবির দুটো উদ্দেশ্য আছে। প্রথমত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তারা তাদের প্রাক্তন শত্রুদের উচ্চাশার খুব তারিফ করছে। কিন্তু এখন সেই শত্রুরাই হোল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে জাপানীরা বিধ্বস্ত করেছিল সেই জাপানীদের তারা তারিফ না করে পারে না। আর দর্শকরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে হতবাক। তাদের কাছে একটা জিনিসই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে যদিও জাপানীরা সত্যি-সত্যি বিধ্বস্ত করার মত শক্তিমান ছিল, তবু আমেরিকানদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে জাপানীরা ঠিক করে নি, তাদের উচিত ছিল এই অভিযানকে অন্য দিকে পরিচালিত করা। আর কোন দিকে সেই অভিযানকে পরিচালনার কথা হচ্ছে তা স্পষ্ট করে না বললেও সবাই বুঝতে পারে। ফিল্ম, টেলিভিশন, নাটক সর্বত্রই 'সামুরাই' মনোভাব। এক তীব্র অনাসক্তি মনকে বিষণ্ন করে তোলে। কিন্তু আপাত দৃশ্যমান বেশ কিছু সংগঠন ব্যাপকভাবে যুবকদের মধ্যে সামুরাই মনোভাব জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জাপানী জনসাধারণের জন্য ডেকে এনেছিল এক দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি। বলা যায়, যুদ্ধ পরবর্তী কয়েক বছর জাপানের এক অন্ধকার যুগ। যে বিদ্যুৎ এক সময় রাস্তাঘাট ঘরবাড়ী আলোকিত করে রাখত, তা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত, শিল্প সংগঠন কলকারখানা অতি পরিমিত বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারত। ট্রাম চলাচল হয়ে যায় অনিয়মিত। মোটর চলাচলও কঠোর পেট্রোল রেশনিং-এ বিপর্যস্ত। রাস্তাঘাট ঘরবাড়ী নীরব নিস্তব্ধ। কাঠকয়লার অভাবে স্টোভ জ্বলে না। জামাকাপড়ও রেশনিং-এর আওতা থেকে বাদ পড়ে না। নতুন নতুন ফ্যাশান নিষিদ্ধ। জাপানের ঐতিহ্যময় জাতীয় পোশাক কিমোনোও বাদ পড়ে না --এর আওতা থেকে। কুটিরশিল্প বিধ্বস্ত। ট্রেন চলাচল অনিয়মিত। শহরের সাংস্কৃতিক জীবন সম্পূর্ণ বন্ধ্যা। শিক্ষাক্ষেত্রগুলি মিলিটারির হাতে। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের দিয়ে নানা ধরনের কাজ করান হোতে থাকে। কাফে, রেস্টুরেন্টগুলি বন্ধ। একমাত্র নিয়মিত চলছিল সিনেমাহলগুলি। সেখানে কেবল পুরোন সামুরাই ছবি দেখান হতে থাকে। আর দেখান হয়েছিল জাপানের নতুন সামরিক গৌরব কাহিনী। জাপানের প্রাণবন্ত ছুটির দিনগুলি যেন হারিয়ে গেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে জাপানের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সমর বিভাগ আমেরিকার অধীনে চলে যায়। যুদ্ধের পরেকার প্রথম বছরেই আমেরিকা জাপানীদের নানাবিধ সংস্কার প্রচেষ্টায় সমর্থন জানায়। বিশেষ করে জাপানের অর্থনীতি বিকাশে কৃষি উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। অনুন্নত অঞ্চলগুলির উন্নয়নে গভীর মনোযোগ দেওয়া হয়। মৎস্য চাষের ওপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সব কিছুই ছিল একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের স্বার্থকেন্দ্রিক।

> "The outlook for the development of individual parts of the country, especially in the north (Hokkaido, Tohoku) was considered earlie ıther in the light of the interests of the big monopolies or with an eye to framing administrative measures. For this reason such problems were dealt with for the most part by officials of central and local bodies. Japan, K.Po ov Moscow 1969).

পরিকল্পনায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হতে থাকে। জাপানী একচেটিয়া গোষ্ঠী এবং মার্কিনী 'গণতন্ত্রের' পক্ষে এই উন্নয়ন প্রয়াস ছিল তখন অত্যাবশ্যকীয়। জাপানী জনগণ এই পরিকল্পিত অর্থনীতিকে স্বাগত জানায়। তাদের ধারণা ছিল 'মার্কিনী সৈন্যদল' মুক্তিসেনা।

ক্রমশঃ মার্কিনী কৃষি ও ভোগ্যপণ্যাদি জাপানে রপ্তানি হতে থাকে। গম, দুধ, মাংস, ফল, ডিম এসব আসত আমেরিকা থেকে। ফলে জাপানী কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন আসে। এর আগে জাপানের কৃষি ব্যবস্থা ছিল মূলত চাল, গম, সিল্ক দ্রব্যের কাঁচামাল এবং ডেয়ারি ভিত্তিক। কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে পরিবর্তন এল এত দ্রুত এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে যে গরীব কৃষকেরা কৃষিকাজ ছেড়ে এসে ভীড় জমাতে থাকে শহরে। ১৯৬০ খৃঃ—১৯৬৮ খৃঃ মধ্যে ৭৬০,০০০ কৃষি পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তারা শহরে এসে কাজ নেয় নানান কলকারখানায়। শহর অঞ্চলে বর্তমানে এক মিলিয়নেরও বেশী অস্থায়ী কারখানাকর্মী রয়েছে। শতকরা কুড়ি ভাগেরও নীচে নেমে গেছে কৃষিপরিবারের হার। কৃষি অঞ্চল হয়ে পড়েছে জনহীন এবং দরিদ্র। এমন কি দৈনন্দিন খাদ্য দ্রব্যেরও চেহারা বদল ঘটেছে। চালের ব্যবহার কমে গেছে। রুটির অভ্যাস বেড়েছে জাপানীদের। আর এইসব রুটি তৈরি হয় মার্কিনী গমে।

বর্তমানে জাপানী শিল্প দ্রব্যের বাজার বিশ্বব্যাপী। অবশ্য এর প্রধান কেন্দ্র দক্ষিণ-

পূর্ব এশিয়া অঞ্চল আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে। যদিও উৎপাদনের ক্ষেত্রে জাপানের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়, কিন্তু এক অসম অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জাপানীরা বিধ্বস্ত। জীবনধারণের মান অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে জাপানের স্থান ২০তম। একজন জাপানী কর্মীর মাসিক আয় ১১০—১২০ মার্কিন ডলার। যেখানে একজন নতুন কর্মীর আয় ৩০ ডলার, সেখানে জাপানী ব্যবসায়ী বছরে আয় করে এক হাজার মিলিয়ন ইয়েন (৩৬০ ইয়েন এক মার্কিন ডলারের সমান)।

জাপানে শতকরা ৯৩ জনের ঘরে টি ভি আছে। প্রভাতী এবং সান্ধ্য দৈনিকের প্রচার সংখ্যা ৫ মিলিয়নেরও বেশী। সাপ্তাহিকের প্রচার সংখ্যা ৫০ মিলিয়ন। একমাত্র টোকিওতে আছে সাতটি টি ভি কেন্দ্র। পরিচালনা করে মার্কিনী এবং জাপানী প্রতিক্রিয়াশীলরা। যুদ্ধ বিষয়ের ছবি এবং যৌনতার ছড়াছড়ি। আমেরিকান কার্টুন এবং নাটক টিভিতে পরিবেশিত হয় প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬ থেকে ৯ পর্যন্ত। এ সময়ই অধিকাংশ মানুষ টি ভি দেখতে অভ্যস্ত। যাবতীয় প্রগতিশীল সংবাদ কৌশলে বাদ দেওয়া হয়ে থাকে। জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবার জন্য বিকৃত প্রচার চলে অবিরত। অবশ্য কখনও কখনও বামপন্থী নেতাদের গোল টেবিল বৈঠকে ডাকা হয়ে থাকে। পাঠ্যপুস্তক প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারায় পূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পুলিশ প্রবেশ করতে পারে বিনা অনুমতিতে। যুদ্ধ, সামরিক চিন্তা এবং উপনিবেশবাদে দীক্ষিত করে তোলার নয়া পাঠক্রম চালু হয়েছে। বর্তমান শাসকগোষ্ঠী সংবিধানকে ভেঙে ইচ্ছামত দেশ শাসন করছেন।

পঁচিশ বছর আগে পরাজয় স্বীকার করার পর জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছোট শরিক থেকে রূপান্তরিত হয়েছে প্রতিযোগীতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত জাপানেও আজকাল মোটরগাড়ি, বড় বড় জাহাজ, বৈদ্যুতিক কৃৎকৌশলগত দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য ও ওষুধপত্রের মতো শিল্পজাত সামগ্রী উৎপন্ন এবং রপ্তানি হচ্ছে। বহু উৎপাদনসূচকেই জাপান দুনিয়ায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী।

জাপানী শিল্পের পুনরুজ্জীবনের ইতিহাস শুরু হয় ১৯৫০ খৃঃ, কোরিয়ায় যুদ্ধের সময়। তখনই আমেরিকা জাপান সম্পর্কে তার নীতি বদলায়। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে জাপানকে তুলে দিতে তারা তৎপর হয়ে ওঠে। জাপান সরকার এবং পুঁজিপতিদের এটাই ছিল কাম্য। জাপানী দ্রব্যাদির চাহিদা বেড়ে যেতে থাকে। বর্ধিত চাহিদার সুযোগ নিয়ে জাপানী একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলি দ্রুত তাদের পূর্বেকার অবস্থান [illegible] জাপানী

বিক্ষুব্ধ জাপানী ছাত্র

অর্থনীতির প্রকৃত প্রভু, তিনটি প্রাক্তন সংস্থা জাইবাৎসু পুনর্গঠিত হয়। পুঁজিবাদ দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৫৫ খৃঃ থেকে ১৯৬৫ খৃঃ পর্যন্ত শিল্পোৎপাদন বেড়ে যায় তিনগুণ এবং মোট জাতীয় উৎপাদন বাড়ে আড়াই গুণ।

জাপানী ভারী শিল্প দ্রুত ফেঁপে উঠতে থাকে। আমেরিকা জাপানের শিল্পবিকাশে নিজেদের প্রভাব অক্ষুন্ন রাখে এশিয় দেশগুলিকে শোষণ করবার জন্য। কোরিয়া-জাপান, তাইওয়ান-জাপান চুক্তিগুলি তার প্রমাণ। জাপানী শিল্পকে ঋণ দান ও আধুনিকতম সাজসরঞ্জাম দেওয়ার ব্যাপারে আমেরিকানরা বদান্যতা দেখিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক স্বার্থেই এটা দরকার ছিল। ১৯৫০ খৃঃ থেকে ১৯৬৯ খৃঃ মধ্যে জাপান বিদেশ থেকে, প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পেয়েছে ৫০০ কোটি ডলারেরও বেশি। জাপানের দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের যাদুটি এভাবেই সংঘটিত হয়েছে।

দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে জাপান তার বিদেশের বাজারকে সম্প্রসারিত করতে বাধ্য হয়েছে। জাপানী একচেটিয়াপতিরা আবার এশিয়ায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকারের আশা পোষণ করছেন। সেই সঙ্গে জাপানী সমরবাদীদের আকাঙ্ক্ষা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলকে সংশোধন করা। এই উদ্দেশ্যে গড়ে উঠছে দেশের সামরিক উদ্যোগ এবং প্রতিহিংসাকামী মনোভাব। সে কারণে জাপানী একচেটিয়া পুঁজি শোষণের এক ভয়াবহ ব্যবস্থার সাহায্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে বিরাট বিরাট কৃতিত্বগুলিকে এবং শ্রমিকদের মহান প্রয়াসকে ব্যবহার করছে নিজেদের স্বার্থে।

জাপানী একচেটিয়াপতিরা যেকোন নতুন জিনিসকে পশ্চিম ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের চেয়েও অধিকতর দ্রুততায় গ্রহণ করেন। জাপানী ব্যবসায়ী রাজারা একথা ভালোভাবেই জানেন যে, যারা পিছনে পড়ে থাকে, নির্মম প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রাম তাদের বাতিল করে দেয়। আর যার দুর্বল অংকুরগুলি পরবর্তীকালে অতি-মুনাফার জন্ম দেবে সেগুলিকে তারা যথাসময়ে দেখতে পায় এবং লালনপালন করে।

সমগ্র জাপান জুড়ে চলেছে যেন এক কর্মযজ্ঞ। সে সব কিছু সযত্নে উপলব্ধি করবার। গড়ে উঠেছে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ল্যাবরেটরি এবং অগুন্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

।। দুই ।।

জাপান-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৫১ খৃঃ। জাপানে মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতিকে আইনসিদ্ধ করা হয় এই চুক্তিতে। জাপানী ভূখণ্ডে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অধিকার পায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই চুক্তি অনুযায়ী জাপান তথাকথিত মার্কিন পারমাণবিক-ছত্রের রক্ষা ব্যবস্থা মেনে নেবার অঙ্গীকার করে। সেই সঙ্গে 'আত্মরক্ষার ব্যবস্থাকে' শক্তিশালী করার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। বর্তমানে অবশ্য দুটি দেশের তথাকথিত বাধ্যতামূলক 'পারস্পরিক প্রতিরক্ষার' আওতায় শুধু জাপানই পড়ে নি, এশিয়ার সমগ্র অঞ্চলটিই তার মধ্যে পড়েছে। ফলে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিসমূহের পক্ষে গুরুতর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই চুক্তি। অবশ্য জাপানী একচেটিয়া গোষ্ঠী-গুলি মনে করে, [illegible]

সমৃদ্ধির ক্ষেত্রটি পুনরুজ্জীবিত করার আর একটি সুযোগ উপস্থিত। জাইবাতসু (প্রধান একচেটিয়া গোষ্ঠী) একে তাদের স্থিতিশীলতার চিহ্ন মনে করে। বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এই চুক্তিকে দেখে তাদের শিল্পক্ষমতা পুনরুদ্ধারের অন্যতম শর্ত হিসাবে। জাপানী সমরবাদীরাও যথেষ্ট আগ্রহী। এক্ষেত্রে একমাত্র অসুবিধার কথাটা জাপানী একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলি ও সমরবাদীরা হিসেবে ধরেন নি। সেই অসুবিধাটি হোল যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আগাগোড়া বদলে গেছে। অর্থনৈতিক অপেক্ষা রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার বৈপ্লবিক রূপান্তর এসেছে। আমেরিকানরা পর্যন্ত আস্তে-আস্তে একথা বুঝতে শুরু করেছে। মূল জাপান ভূখণ্ডে অন্তহীন অশান্তি। জাপান সরকার জনসাধারণের এক বিরাট অংশের প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই চুক্তির মেয়াদ আরো দশ বছর বাড়ায় ১৯৬০ খৃঃ জুন-এ। প্রবল জনবিক্ষোভের সম্মুখীন হয় জাপান সরকার। নতুনভাবে চুক্তি সম্পাদনের সময় অবশ্য সরকার যথেষ্ট কৌশল অবলম্বন করেন। গণবিক্ষোভ এড়ানোর জন্য মেয়াদ বৃদ্ধিকে আনুষ্ঠানিক ব্যাপার করা হয় নি। নতুন ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, কোন পক্ষ কর্তৃক বাতিল না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকবে।

কিন্তু এই বিপজ্জনক মৈত্রীর বিরুদ্ধে জাপান সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষে পর্যন্ত জনগণ নামতে বাধ্য হয়েছে। বিক্ষোভের অন্ত নেই। এই মৈত্রী সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে যুব সংগঠন রেড আর্মি বলেছেন:

> Fascism is not limited to the Nazis of ancher epocn but is a necessary development within the US-Japanese alliance. The Security Treaty is a treaty between two fascist states, two fascists Capitalist governments.
>
> Our struggle against the Treaty i a struggle against war and invasion and against fascism. It is the struggle of anti-imperialist forces of reaction —US imperialist and Japanese Capitalism—militarism—whose joint and continuing objective is the oppression of the people of Asia.

জাপানী পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী এই চুক্তির জন্য দেশের মানুষের ওপর দিনের পর দিন বিরাট করের বোঝা চাপিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে সাটো সরকার। সরকার প্রবল বিক্ষোভে আতঙ্কগ্রস্ত। দশ বছর আগে প্রধানমন্ত্রী কিসি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই গণবিক্ষোভ ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠছে। শতকরা আশীজন ছাত্র এতে অংশ নিচ্ছে। তাদের দাবী নিরাপত্তা চুক্তি বাতিল এবং ওকিনাওয়া ফেরৎ দেওয়া। এক সময় জনতার রোষ প্রশমনের জন্য মার্কিনী ঘাঁটি শহরাঞ্চল থেকে দূরে সরাতে হয়েছিল। এমন কি উত্তাল জনসমুদ্র মার্কিন দূতাবাস কর্মীদের বিব্রত করে তোলে। জাপানের সাধারণ মানুষ আজ এই চুক্তির স্বার্থগত দিকগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। অধিকাংশ বামপন্থী দলগুলির মতে নিরাপত্তা চুক্তির কোন প্রয়োজন নেই। তারা মনে করে তীব্র চীন ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার আতঙ্কে ভুগছে বর্তমান জাপানের শাসকবর্গ এবং আমেরিকা। তাছাড়া এশিয়ার মানুষকে দাবিয়ে রাখা এবং চীনকে প্রহরা দেওয়া একটা বড় উদ্দেশ্য। তাই যুদ্ধে পরাস্ত নিরস্ত্র জাপান আজ পরিণত হয়েছে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় (কোরিয়া ও ইন্দোচীন) যুদ্ধে লিপ্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চাদবর্তী সামরিক ঘাঁটি, মেরামত কেন্দ্র ও অস্ত্র ভাণ্ডারে। শুধু এশিয়া নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্যে জাপানকে হাতে রাখা আমেরিকার দরকার। জাপানকে তাই সাধারণ উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে কেবলমাত্র নয়, আণবিক অস্ত্রেও সজ্জিত করা হয়েছে। এর ফলে এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিও বেশ অসহায় বোধ করছে।

সামরিক ক্ষমতার দিক থেকে এশিয়ায় জাপানের শক্তির তুলনা হয় না। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় তার স্থান দ্বিতীয়। ক্ষুদ্র এই দেশটিতে অর্থনীতির দ্রুত বৃদ্ধি এখন নিজস্ব সমস্যা সৃষ্টি করেছে। সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা এক নতুন মেজাজ ও আক্রমণমুখীনতা নিয়ে এসেছে। অবশ্য এই পুনরুজ্জীবন দেশের সমগ্র অর্থনীতিকে বিকশিত করে নি। কারণ এই প্রবাহে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে মাত্র জাপানী একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলি এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন ডলারের দাম বেড়ে যায়। আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের খেলা চলতে থাকে। অর্থনীতির বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের ভিত্তিতে পরিণত হয় ডলার। আবার ১৯৬০ খৃঃ-এর প্রথমেই ডলার সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। সেই দুরবস্থা এখনও বর্তমান। ১৯৬৭ খৃঃ শরৎকাল থেকে তীব্র আকার নেয়। মার্কিন সাহায্য কর্মসূচী পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে থাকে। আমেরিকা কর্তৃক তার মিত্রদের প্রদত্ত সামরিক বা অর্থনৈতিক সাহায্য রাজনৈতিক রণনীতি ছাড়া আর কিছু নয়। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মোকাবিলার দরকার হয়েছে এই রণনীতির। বিশ্ব কমিউনিস্ট বিরোধী ব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখাও একটা লক্ষ্য। এশিয়ায় কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশকে বাধা দিতে মার্কিন সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অবশ্য এই প্রতিজ্ঞার পিছনে এশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের গোপন বাসনাও যে প্রবল, তা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তাই বিশ্বব্যাপী মার্কিন সাহায্যের পরিমাণ ও পরিধি না বাড়িয়েও উপায় নেই। কিন্তু তার নিজের আন্তর্জাতিক লেনদেনের অবস্থা শোচনীয়। মার্কিন ডলার সঙ্কট জটিল চেহারা নিয়েছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরোধগুলি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রূপ নিয়েছে এই সঙ্কটে। অর্থনৈতিক অসুবিধাগুলি অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টা করছে অন্যান্য দেশকে প্রদেয় সামরিক সাহায্যের বোঝার একটা অংশ তার মিত্রদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে। এশিয়ার বিশেষ আশা রাখা হয়েছে জাপানের ওপর। শক্তিশালী মিত্রের ওপরই কেবল ভরসা রাখা সম্ভব। জাপানকে তাই আত্মনির্ভরশীল হওয়ার দীক্ষা দিয়েছে আমেরিকা। কিন্তু ওপরে রয়েছে সদা-সতর্ক দৃষ্টি।

মনে রাখা দরকার, বর্তমান জাপানী সরকার ও জাপানী একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অনুগত। ফলে 'ডলার রক্ষা করার' জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই তারা করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। ডলার সংকট মোকাবিলার জন্য তারা মার্কিন মুদ্রা সঞ্চয় করে। জাপানে তার যে সঞ্চয় ভাণ্ডার দুশো কোটি ডলারে ওঠানামা করছিল ১৯৬৮-র শেষ দিকে তা তিনশো কোটি ডলারে পৌঁছায়। একই উদ্দেশ্যে জাপানী একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলি তাদের পণ্যের রপ্তানীকে দ্রুত বাড়াতে থাকে। ১৯৬৮ খৃঃ জাপানী রপ্তানীর মোট মূল্য হয় তেরশ কোটি মার্কিন ডলারের সমান অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৪ শতাংশ বেড়ে যায়। অপর দিকে এ সবই এক উভয় সঙ্কটের সৃষ্টি করে; জাপানী একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলি এখন সেই উভয় সঙ্কটে পড়েছে। আগে জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সরবরাহ করত প্রধানত ছোটখাট শিল্পদ্রব্য। এখন ভারী শিল্প, বিশেষ করে লোহজাত যন্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম রপ্তানী করছে। অবশ্য বর্তমান হারে রপ্তানীর পরিমাণ বাড়তে থাকলে অবশ্যম্ভাবীরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক লেনদেনের অবনতি ঘটবে এবং ডলার সঙ্কটকে আরো গুরুতর করে তুলবে। এই অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র পথ আমদানীকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সাধারণভাবে 'ডলার রক্ষা' ব্যবস্থায় তৎপর হওয়া। জাপানী রপ্তানী ক্রমবিকাশে হবে প্রতি-

অন্ধকতার সৃষ্টি। তাই আজকের মার্কিন ডলার সংকট জাপানী একচেটিয়া গোষ্ঠীগুলিকে ফেলেছে উভয় সংকটে।

অনুকূল পথের সন্ধান করতে হচ্ছে জাপানকে। এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য জাপান এশীয় দেশগুলির প্রতি মনোযোগ দিয়েছে। দীর্ঘকাল যাবৎ জাপানী দ্রব্যাদির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি বাজার ছিল এশীয় দেশগুলিই। কিন্তু এশীয় দেশগুলির অধিকাংশই রয়েছে অর্থনীতির বিকাশের নিচুস্তরে। এশিয়ার বাজারও নিম্ন জীবনমানসম্পন্ন। জাপানী একচেটিয়াপতিদের ক্ষুদ্র এই বাজার তৃপ্ত করতে পারে না। সেই জন্যই প্রয়োজনমাফিক তার পণ্য বিক্রয়ের বাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাপানকে ব্যক্তিগত রপ্তানি হ্রাস করে, নিজেকেই এই দেশগুলির অর্থনৈতিক কাঠামো নতুনভাবে তৈরি করে নিতে হচ্ছে। অবশ্য আমেরিকার বিকাশশীল মিত্রদের প্রদেয় অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যের বোঝা অন্যান্য সুউন্নত পুঁজিবাদী দেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার মার্কিন বাসনার সঙ্গে এটা সম্পূর্ণ মেলে না।

।। তিন ।।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী সাটো ওয়াশিংটন সফর করেন '৬৯ সালে। বাইশ নভেম্বর ১৯৬৯ খৃঃ জাপান-আমেরিকান যুক্ত বিবৃতি প্রকাশের পর দু-দেশের মৈত্রীস্বরূপ স্পষ্ট হয়ে গেছে। প্রকৃত পক্ষে অতীতের নিরাপত্তা চুক্তিকে নতুনরূপে নিকসনের গুয়াম নীতি (এশীয়দের দিয়ে এশীয়দের বিরুদ্ধে লড়াই করানো) নামে খ্যাত আমেরিকার নতুন এশীয় নীতি রূপায়ণের জন্যেই জাপান-মার্কিন সামরিক মৈত্রীজোট। ইন্দোচীনে মার্কিন আগ্রাসনে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহ এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্রীড়নক সরকারগুলির জাকার্তা সম্মেলনে (মে, ১৯৭০) জাপানের সক্রিয় অংশ গ্রহণও এর একটা প্রমাণ। জাপানসহ সমগ্র দূর প্রাচ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার কথা বলা হয় যুক্ত বিবৃতিতে। জাপান শুধু তার নিজের ভূখণ্ডেই নয়, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ও অন্যান্য যেসব অঞ্চল সম্পর্কে আগ্রহ দেখাচ্ছে, সেখানকার 'প্রতিরক্ষা' সংক্রান্ত সামরিক দায়-দায়িত্ব সে গ্রহণ করে। জাপানী পত্রপত্রিকাগুলি প্রকাশ্যেই এইসব বিষয়ে লিখছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির লেকচারে এবং ব্যবসা-জগতের বিশিষ্টদের বক্তৃতায় তা উল্লেখ করা হচ্ছে।

জাপানী সংবাদপত্রগুলিতে শিরোনামা বৈচিত্র্য শুরু হয়েছে। শিরোনামগুলির মধ্যে কয়েকটি : 'জাপানের কূটনীতিতে নতুন বাঁক', 'জাপানের প্রথম পদক্ষেপ', 'জাপানকে একটি প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করার পথে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ' প্রভৃতি। সংবাদপত্র আসাহী লিখেছে : 'মার্কিন-জাপানী শীর্ষ আলোচনায় জাপান যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সম্মেলনে (জাকার্তা) জাপানের অংশ গ্রহণ সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার প্রথম সুনির্দিষ্ট কাজ।'

এশীয় রাজনীতি থেকে আমেরিকার সরে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তার একার পক্ষে এই বিস্তৃত অঞ্চলে চৌকিদারীও অসম্ভব। এই কাজটা সে ভাগ করে নিতে চায় জাপানের সঙ্গে। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে রচিত জাপানী সংবিধানে দেশে সৈন্য বাহিনী প্রতিষ্ঠা বা জাপানী দেশবাহিনীকে কাজে লাগানো নিষিদ্ধ। কিন্তু সংবিধান-বিরোধী কাজে কেন এগিয়ে যাচ্ছে জাপানী শাসকবর্গ ?

এশিয়ায় জাপান হোল আমেরিকার ছোট শরিক ও সঙ্গী তাই আমেরিকা পৃথিবীর এই অংশে জাপানের অর্থনৈতিক আক্রমণের অধিকারকেও স্বীকার করে নিতে রাজী আছে। এখনই অ-কমিউনিস্ট প্রশান্ত মহাসাগরীয় এশিয়ায় এমন কোনো অঞ্চল নেই যেখানে জাপানীরা ব্যাপকভাবে তাদের কার্যকলাপ বাড়ায় নি এবং অচিরেই সমগ্র এশিয়া হয়ে উঠবে জাপানের পক্ষে একটা কারখানার মতো—বিশেষত সেই সমস্ত অঞ্চলে, যেখানে চীনা কর্মীবাহিনী ও চীনা সংস্কৃতি আছে। মন্তব্যটি করেছেন মার্কিন প্রশাসনের বিতর্কমূলক তত্ত্ববাগিশ হেরমান কান। তিনি আরো বলেন : 'এই সম্প্রসারণের ফলে উক্ত অঞ্চলে প্রচুর শত্রুতা জাগানো হচ্ছে, এবং জাপান ও মুক্তিসংগ্রামী এশিয়ার জনগণের মধ্যে একটা অবশ্যম্ভাবী মোকাবিলার পূর্বাভাস তিনি করেছেন।

জাপানের বিশাল ধাতুবিদ্যাগত প্রতিষ্ঠান ফুজি সেইতত্সু-এর প্রেসিডেন্ট সিগি ও নাগানো বলেছেন: 'পারস্পরিক সমৃদ্ধির ভিত্তিতে এশীয় দেশগুলিতে বাজারের বিকাশ জাপানের অর্থনীতির ভবিষ্যতের দিক থেকে পরম বাঞ্ছনীয়।' মাইনিচি পত্রিকার বক্তব্য : 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের অর্থনৈতিক স্বার্থ আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে বেশি। এবং এই অঞ্চলে জাপানের যে ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করার কথা তা থেকে আর সে দূরে সরে যেতে পারে না।' 'শাসকগোষ্ঠীর বিভিন্ন কার্যক্রমে দলিলে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত এই দৃষ্টিভঙ্গী। ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ খৃঃ অনুষ্ঠিত লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির কংগ্রেস জাপানের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়েছে 'ঠিক (!) পথটি ধরে, এশীয় দেশগুলির বিকাশের ক্ষেত্রে তার যথাসাধ্য সাহায্য করতে।' গৃহীত একটি দলিলে সরাসরি বলা হয়েছে যে, 'প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুগে সত্তরের দশকে, জাপান এশিয়ার নেতৃভূমিকা লাভ করবে।' জাপানের দ্রুত সামরিকীকরণ এই মতবাদটির সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলে যায়।

দূরপ্রাচ্যের সমস্যাবলীর একজন বিশেষজ্ঞ রবার্ট গিলেইন। প্যারিসের 'লে মঁদ' পত্রিকায় তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। গিলেইন স্পষ্ট বলেছেন যে, ইন্দোচীনের যুদ্ধে জড়িত মার্কিন ফৌজের 'আংশিক অপসারণ' ঘটাবার জন্য মার্কিন সরকারের সিদ্ধান্ত এবং 'এশিয়ায় মার্কিন ক্ষমতাকে রক্ষা করার জন্য তার দৃঢ়পণ' আদৌ পরস্পরবিরোধী নয়, বরং তা জুলাই ১৯৬৯ খৃঃ ঘোষিত নিকসন নীতির দুটি দিককেই প্রতিফলিত করে। এর যাথার্থ প্রমাণের জন্য তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাপানকে ওকিনাওয়া দ্বীপ ফেরৎ দেওয়ার বাসনার প্রকৃত কারণ দেখিয়ে কিছু তথ্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বীপটি জাপানকে ফিরিয়ে দিতে চায়—এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা অনির্দিষ্টকাল নিজেদের দখলেই রাখবে। কারণ ওকিনাওয়া সমরনীতিগতভাবে সবচেয়ে ভালো জায়গায় অবস্থিত এবং সবচেয়ে ভালোভাবে অস্ত্রসজ্জিত। জাপানে আমেরিকার ১৭০টি সামরিক ঘাঁটির মধ্যে ওকিনাওয়াতেই আছে ১১৭টি। ওকিনাওয়াতে যে আনবিক অস্ত্রঘাঁটি গড়ে তোলা হয়েছে, তাও প্রমাণিত। বিষাক্ত গ্যাস ও জীবাণু সংরক্ষণ কেন্দ্র আছে। এশিয়ায় আমেরিকার সামরিক কার্যকলাপ চলে এখান থেকেই। ওকিনাওয়ার কাদিওয়াক ঘাঁটি থেকে গিয়ে বি-২৫ এবং বি-৫২ বোম্বার উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ করে থাকে। ওকিনাওয়ার লোকসংখ্যা ১৭৮,০০০ (১৯৭০ খৃঃ)। এদের আয়ের প্রধান উৎস হোল মার্কিন সমরঘাঁটিতে সরবরাহ ও যোগাযোগ, চিনি, চাল এবং আনারস উৎপাদন। ১৯৭০ খৃঃ রপ্তানি পরিমাণ ছিল ১০৬,০০০,০০০ মার্কিন ডলার এবং আমদানি পরিমাণ ছিল আনুমানিক ৪৮১,০০০,০০০।

আগামী বছরের এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে ওকিনাওয়ার লোক দেখানো হস্তান্তর ঘটবে। এ ব্যাপারে জুনে যে চুক্তি পত্র স্বাক্ষর হয়েছে, তার অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট নিকসন এবং ওকিনাওয়ার প্রধান কর্মাধ্যক্ষের অনুপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

গিলেইন সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন, 'জাপানকে (ওকিনাওয়ার) উপর সার্বভৌমত্ব আবার ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সেই অঞ্চলের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হচ্ছে; কিন্তু সামরিক ঘাঁটিগুলি নয়।' সুতরাং দ্বীপটির ওপর জাপান সরকারের সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। এর ফলে সাটো সরকার অবশ্য আভ্যন্তরিক রাজনৈতিক প্রচারের বিশেষ সুবিধা পাবে। কারণ ১৯৭২ সালেই নির্বাচন।

গিলেইন এই রাজনৈতিক কৌশলের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন যে, 'আমেরিকানরা

ওকিনাওয়ায় মার্কিন ঘাঁটি অপসারণের দাবীতে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সংগে পুলিশের সংঘর্ষ

জাপানীদের সংগে একটা সূক্ষ্ম খেলা খেলতে বাধ্য। তার মতে ঃ একদিকে তারা চায় যে জাপান এখন আরো শক্তিশালী হয়ে উঠুক এবং তাদের শক্তি এশীয়দের অনুভব করাক। অন্যদিকে তারা চায় যে, এই শক্তি যেন সীমাবদ্ধ থাকে এবং আংশিকভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে।'

'নিকসন নীতি একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত জাপানের পুনরস্ত্রসজ্জাকে উৎসাহিত করে। তাতে জাপান সরকারকে তার সশস্ত্র-বাহিনী যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াবার আহ্বান জানানো হয়। দাবি করা হয় যে, আজ পঁচিশ বছর ধরে ওয়াশিংটন যে এশীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, জাপান তার একজন সক্রিয় সদস্য হোক। জাপান যেভাবে (এই ব্যবস্থার) একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে, অন্য কোনো এশীয় দেশই তেমনটি পারবে না। কিন্তু অন্যদিকে, নিকসন-নীতির কিছু পাল্টা প্রতিশ্রুতিও দরকার, যাতে নিশ্চিত দেওয়া হবে যে, জাপান সামরিক ক্ষেত্রে 'অতিরিক্ত' (!) বলশালী এবং 'অতিরিক্ত' (!) স্বাধীন হবে না।'—গিলেইন এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওকিনাওয়াতে তার সামরিক ঘাঁটিগুলি বজায় রাখতে চায় এবং সেগুলিকে ব্যবহার করতে চায় এশিয়ায় সামরিক তৎপরতার জন্য—শুধু সেখানকার ঘাঁটিগুলিই নয়, মূল জাপানের দ্বীপগুলির ঘাঁটিকেও।

ওকিনাওয়াতে আমেরিকানদের থেকে যাওয়ার ব্যাপারে সাতো সরকার ইতি মধ্যেই পরিপূর্ণ সম্মতি দিয়েছেন। চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে যতদিন সম্ভব মৈত্রী চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত নীতির সংগে এটা সংগতিপূর্ণ। কারণ এই মৈত্রীর ফলে, জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'পারমাণবিক ছাতার তলায় থাকতে পারে, এবং অস্ত্রসজ্জা বাবদ তাকে অত্যধিক ব্যয় না করলেও চলে। ঠিক এই কারণেই জাপানকে ওকিনাওয়া দ্বীপ ফিরিয়ে দেওয়া সম্পর্কিত প্রাথমিক চুক্তিতে জাপানের এই বিশ্বাসের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে যে 'দূরপ্রাচ্যে মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতি, সেই অঞ্চলে স্থিতিশীলতার এক আবশ্যিক উপাদান।'

সুতরাং স্পষ্ট হয়ে উঠছে, প্রথমত, এশিয়া থেকে তার সশস্ত্রবাহিনী সরিয়ে নেওয়ার কোনো মতলব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেই; এবং দ্বিতীয়ত, এশিয়ায় তার আগ্রাসী ষড়যন্ত্র রূপায়ণের কাজে সে জাপানকে সক্রিয়ভাবে জড়িত করেছে। গিলেইনের প্রবন্ধ অনুযায়ী বলা যায়, জাপানী শাসকচক্র এই ষড়যন্ত্রকে সমর্থন করতেই ইচ্ছুক। এখন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছোট শরিকের ভূমিকা তাদের স্বার্থানুগ, কারণ এর ফলে তাদের নিজেদের মতলব হাসিল করাটা সহজতর হবে।

।। চার ।।

জাপানী আত্মরক্ষা বাহিনীতে বর্তমানে আছে ১৩ ডিভিসন সৈন্য (৫০০,০০০), ১০০০বিমান, ২০০[illegible] আনবিক অস্ত্র, রকেট ঘাঁটি, ক্ষেপণাস্ত্র, ট্যাংক ইত্যাদি। স্থলবাহিনীতে ১৩০,০০০ জন। বাকি নৌ এবং বিমানবহরে। অবশ্য এই আত্মরক্ষাবাহিনী মার্কিন দূর প্রাচ্য-বাহিনীর অধীনে। সম্প্রতি এফ—ফ্যানটম হক, এফ—৮৬ ফাইটার বম্বার যুক্ত হয়েছে। জাতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রধান ইয়াসুহো সাকাসোন ১ ডিসেম্বর (৭০) বিদেশী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান : 'টোকিওর অনেক পর্যবেক্ষকই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন যে কোথায় এবং কখন আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার কাজ শেষ হবে। তবু সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন সংখ্যা বলা অসম্ভব। কারণ অজ্ঞাত ও পরিবর্তনশীল অনেক ঘটনা ঘটেছে।' গতবছর ডিসেম্বরে ৭ তারিখ 'আসাহী' সংবাদপত্রে একটি বিশদ বিবরণ বেরোয়। ঐ বিবরণে ছিল: ১৯৭২ খৃঃ থেকে শুরু করে পাঁচ বছরের জন্য প্রতিবছর ২০০০,০০০,০০০,০০০ ইয়েন জনসাধারণের কাছ থেকে কর হিসেবে আদায় করা হবে। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হবে জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য সামরিক শক্তি গড়ে তুলতে। প্রায় ২,৫০০,০০০০ লক্ষ ইয়েন অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত হবে এবং এই অর্থ তৃতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দের দ্বিগুণ। সুতরাং প্রতিটি জাপানীকে কোলের শিশুকেও বছরে ৫০০০ ইয়েন [illegible] অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য দিতে হবে।

জাপান ১৯৬৭ খৃঃ থেকে [illegible] খৃঃ [illegible]

জন্য ব্যয় করেছে ২০৪০,০০০০ ইয়েন। ১৯৭২ খৃঃ—১৯৭৬ খৃঃ মধ্যে প্রতিরক্ষা ব্যয় দ্বিগুণেরও বেশী অর্থাৎ ৫৮০০,০০০০ ইয়েন (১৬০০ কোটি ডলার) পরিমাণ দাঁড়াবে। একটি নতুন নৌবাহিনী গড়ে তুলতে ব্যয় বেড়ে যাবে ১৩০ শতাংশ। বিমানবাহিনী গড়ে তোলার জন্য ব্যয় বাড়বে ১০০ শতাংশ। দেশের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার জন্য এটি হল চতুর্থ পরিকল্পনা। পরিকল্পনার রচয়িতারা জাপানের সমরশিল্পের ত্বরান্বিত বিকাশের এক নীতি উপহার দিয়েছেন। আধুনিকতম উপকরণের বিকাশের অনুকূলে কথা বলেছেন। শুকোন আসাহি পত্রিকা লিখেছে যে চতুর্থ পরিকল্পনা রূপায়ণের সময়ে অস্ত্রনির্মাণকারকদের তরফ থেকে চাপ বেড়ে যাবে, তারা সামরিক ব্যয় বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করবে। পত্রিকাটি আরো বলেছে যে 'এক সামরিক শিল্প সমাহারের আবির্ভাব এবং তার হাতে প্রচণ্ড শক্তি কেন্দ্রীভূত হবার সুযোগ জাপানে সব সময়েই আছে।'

এমন কি জাপানের যে সমস্ত বুর্জোয়া সংবাদপত্র জাপানের পুনরস্ত্রসজ্জার যাথার্থ্য প্রমাণের চেষ্টা করে, তারাও পর্যন্ত এই পরিকল্পনাটির প্রকাশ উপলক্ষে বিপদ সংকেত জানাতে বাধ্য হয়েছে। শুকোন আসাহির অভিমতঃ 'এই পরিকল্পনা অধ্যয়ন করার পর শুধু বিদেশেই নয়, আমাদের দেশের জনসাধারণের একটা বেশ বড় অংশের মধ্যেও আশংকা দেখা দেবে...... অতীতে যে-পথ সে একবার অনুসরণ করেছে জাপান কি আরেকবার সেই পথই গ্রহণ করছে না?' ইয়োমিউরি পত্রিকা বলেছে যে 'জাপানের নেতৃস্থানীয় মহলগুলি সামরিকীকরণের যে নীতি চালাচ্ছে তা শুধু দূরপ্রাচ্যে উত্তেজনা বাড়াতেই সক্ষম হবে।'

।। পাঁচ ।।

নতুন সামরিক কর্মসূচীর আত্মপ্রকাশকে জাপানের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি সম্বর্ধনা জানিয়েছে দৃঢ় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের সঙ্গে। তারা দেশের সামরিকীকরণের বিরুদ্ধে বার বার আন্দোলনের পথে নেমেছে। দেশের নীতিকে তারা শান্তি ও নিরপেক্ষতার পথে পরিবর্তিত করার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার বাসনা ঘোষণা করেছে। নতুন এক সামুরাই সভ্যতার যুগে তারা প্রত্যাবর্তন করতে চায় না। অথচ দেশের পরিবেশ এমনভাবে পাল্টে গেছে যে, প্রগতিশীল সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষকে একত্রিত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। জাপানের বামপন্থী শক্তিগুলি নানা ধারায় বিভক্ত। তাদের একত্রিত করার মত অনুকূল পরিবেশ নেই। তবুও চেষ্টা চলেছে ট্রেড [illegible] একত্রিত করার, [illegible] জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে মিলিত করার এবং পার্লামেন্টে অধিক সংখ্যায় সদস্য প্রেরণ করবার। যে সব প্রগতিশীল শক্তি মূল্যবৃদ্ধি অবসান, শ্রমিকবিরোধী আইন বাতিল এবং গণতন্ত্র রক্ষার অভিলাষী তারা অনেক কাছাকাছি এসেছেন অতিসাম্প্রতিক কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। এই প্রসঙ্গে কাউন্সিল অফ রিলিজিঅনিস্ট ফর পিসের জেনারেল সেক্রেটারি রেভারেণ্ড সুজুকির মন্তব্য স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, অন্যসব দল বা গোষ্ঠী তাদের মতানুযায়ী এগিয়ে চলেছে আন্দোলনের ক্ষেত্রে। এদের মধ্যে কেউ কেউ বিপ্লবপন্থী। যার যে পথই হোক না কেন, বৃহত্তর জাপানী জনগণের স্বার্থে তাদের পাশে আমরা সব সময়েই থাকব। কোন আন্দোলনে জনসমর্থন সব থেকে বড় পাথেয়। আমরা সে কাজে কখনও বিরত থাকব না। শত্রুদের যত তাড়াতাড়ি কোণঠাসা করা যায় সেই চেষ্টাই আমাদের করতে হবে।

সাটো সরকার যে অনেকটাই কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন এপ্রিল মাসের নির্বাচন থেকে তা উপলব্ধি করা যায়। ১৯৬২ খৃঃ নির্বাচনে ওকিনাওয়া প্রত্যাবর্তন কেন্দ্র করে সাটোর লিবারেল ডেমোক্র্যাট পার্টি বিপুল সাফল্য লাভ করেছিল। কিন্তু এদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি জনগণ ধরে ফেলেছে। উপরন্তু জাপানী জনগণের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমেরিকান ঘাঁটি ক্রমশ বৃদ্ধির দিকে। ওউরা নৌঘাঁটিকে পোলারিস ও পোসেডন আণবিক সাবমেরিন ব্যবহারোপযোগী করা হচ্ছে। কাদেনা বিমানঘাঁটিতে রয়েছে তিনখানি এস আর-৭১ গোয়েন্দা বিমান। এরা সমাজতান্ত্রিক দেশের ওপর গোয়েন্দা কাজ চালায়। জাপানে এমন একটি বিশেষ ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র তৈরি হয়েছে, যেখানে কোন জাপানী বা আমেরিকানের শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। কিন্তু তৃতীয় কোন দেশের মানুষকে বিশেষ ধরনের সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এ নিয়ে প্রতিবাদ প্রতিরোধ চলেছে অন্তহীন। কিছুদিন আগে ওকিনাওয়ার ৭০,০০০ মানুষের এক ধর্মঘট হয়। সমর্থনে বিরাট বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বেরিয়েছিল টোকিও আর কিয়োটোতে। জাপানী শাসকবর্গ উদ্বেগ বোধ করতে থাকেন। কিন্তু এপ্রিলের নির্বাচনী ফলাফল এই উদ্বেগকে আরো বাড়িয়েছে। এই প্রিফেকচার নির্বাচনে বামপন্থীরাই লক্ষ্যণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এই নির্বাচনের ফলাফলে কমিউনিস্ট পার্টি প্রিফেকচার, শহর ও জেলা অ্যাসেম্বলিগুলিতে প্রতিনিধির সংখ্যার দিক থেকে উঠে এসেছে তৃতীয় স্থানে। লিবারেল ডেমোক্র্যাট ও সোশ্যালিস্ট পার্টির পরে।

এবারকার নির্বাচনী অভিযান পঁচিশ-দিনব্যাপী তীব্র উত্তেজনার মধ্যে কাটে। লিবারেল ডেমোক্র্যাটরা এবং তাদের সমর্থক দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট পার্টি নির্বাচনী অভিযানে হুমকি ও ব্ল্যাকমেলের আশ্রয় নিতেও পরাঙ্মুখ হয়নি। বামপন্থীরা আগে থেকেই জোট বাঁধবার চেষ্টা চালাচ্ছিল। বহু শহর ও প্রিফেকচারে কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট পার্টিগুলি এক যুক্তফ্রণ্ট গঠন করে। শাসক লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রের তীব্র বিরোধিতা করে যুক্তফ্রণ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে যে প্রচার চালান হয়, কার্যত তা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে।

টোকিয়ো ও ওসাকায় গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি বিরাটভাবে জয়লাভ করেছে। মোট ২১০ লক্ষ জনসংখ্যাবিশিষ্ট জাপানের তিনটি বৃহত্তম প্রিফেকচারের গভর্নর পদগুলিতে এখন কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টদের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রণ্টের প্রতিনিধিরা অধিষ্ঠিত। টোকিওর ২৩টি জেলা অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে ১২৮ জন কমিউনিস্ট প্রার্থীর মধ্যে সকলেই নির্বাচিত হয়েছেন। দেশের তৃতীয় বৃহত্তম শহর ইয়াকোহামার মেয়র পদ গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির হাতে। টোকিওর পর জাপানের পাঁচটি বৃহত্তম পৌর অ্যাসেম্বলিতেও শাসক পার্টির শক্তি হ্রাস পেয়েছে। আগে ছিল ১৪৮টি আসন। এখন ১২৯টি। অধিকন্তু, প্রিফেকচার অ্যাসেম্বলিগুলিতে তারা হারিয়েছে প্রায় ১৫০টি আসন। টোকিওর ২৫টি জেলা অ্যাসেম্বলিতে হারিয়েছে কয়েক ডজন আসন।

সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে একত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কমিউনিস্ট পার্টি টোকিও ও ওসাকায় প্রিফেকচার অ্যাসেম্বলিগুলিতে তাদের আসন সংখ্যা বাড়িয়েছে ৩৫ থেকে ১০৫ অর্থাৎ তিন গুণ। ইয়াকোহামা, নাগোয়া, ওসাকা, কিয়োতো ও কোবেতে পৌর কাউন্সিলারদের সংখ্যা বেড়েছে ২৪ থেকে ৫২ অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশী। প্রতিটি শহরেই লিবারেল ডেমোক্র্যাটরা পরিষদের কিছু আসন হারিয়েছে আর কমিউনিস্টরা আসন সংখ্যা বাড়িয়েছে।

একদিকে সামুরাই মনোভাব জাগানো হচ্ছে। অপরদিকে জনগণের মধ্যে বামপন্থী চিন্তাধারা প্রবল প্রভাব বিস্তার করছে। এই দুই মতাদর্শের সহাবস্থান অসম্ভব। নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি প্রবল হয়ে উঠলেও সামরিক চক্র কি তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে ভরসা পাবেন। অনেকেই আশঙ্কা করছেন অদূর ভবিষ্যতে জাপানের শাসনক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে গিয়ে পড়তে পারে। বিশ্ব রাজনীতির চেহারা ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ছে। আমেরিকাও নিজেকে নানাভাবে জড়িয়ে ফেলেছে। [illegible]

দ্বিতীয় পর্ব

সপ্তম অধ্যায়

পশ্চিম রণাঙ্গনের চরম যুদ্ধ—২

ফ্রান্সের আত্মসমর্পণ

পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধ সামরিক ইতিহাসে 'সুপার ব্যাটল' বা চরম যুদ্ধ নামে পরিচিত। কেননা, পশ্চিম ইউরোপের শক্তিগুলি এই যুদ্ধের দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া গেল এবং প্রায় চক্ষুর নিমেষে তারা ধরাশায়ী হইল। তখনকার দিনের সামরিক ইতিহাসে এমন অদ্ভুত গতিসম্পন্ন নিখুঁত যান্ত্রিক যুদ্ধ আর হয় নাই। চার্চিল বলিয়াছেন যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে যখন কোন যুদ্ধ ছিল না সেই ৮ মাস কাল হিটলার তার সৈন্যবাহিনীগুলি ১৫৫ ডিভিসনে দাঁড় করাইলেন এবং যান্ত্রিক-সজ্জা ও ট্রেনিংয়ের দ্বারা আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী করিয়া তুলিলেন। ওদিকে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে প্যাক্ট থাকায় দুই রণাঙ্গনের কোন বিপদও তাঁর ছিল না। সুতরাং ১০ই মে পশ্চিম রণাঙ্গনে উত্তর সাগরের তীর থেকে সুইস সীমানা পর্যন্ত বিশাল সৈন্য বাহিনী সমাবেশ করিয়া হিটলার ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মারাত্মক আঘাত হানিলেন। এই আক্রমণে ১২৬ ডিভিসন সৈন্য নিয়োগ করা হইল। সেই সঙ্গে পুরা ১০ ডিভিসন প্যাঞ্জার বা যান্ত্রিক সৈন্যদলের সাঁজোয়া-অস্ত্রশক্তির প্রচণ্ডতা। তিন হাজার আর্মার্ড কার, যার মধ্যে অন্ততঃ এক হাজার ছিল হেভী বা ভারী ট্যাঙ্ক—যান্ত্রিক শক্তির এই বিপুল অস্ত্রসম্ভারসহ হিটলারী সৈন্য দল ৩টি আর্মি গ্রুপে বিভক্ত হইয়া পশ্চিম রণাঙ্গনে নিম্নলিখিত আক্রমণের অংশগুলিতে দাঁড়াইল :

১। আর্মি গ্রুপ-বি—২৮ ডিভিসন সৈন্য. প্রধান সেনাপতি জেনারেল ফন বোক, অবস্থান — উত্তর সমুদ্র তীর থেকে Aix-la-Chapelle পর্যন্ত। এদের দায়িত্ব ছিল হল্যান্ড ও বেলজিয়ামকে পর্যুদস্ত করা এবং তারপর জার্মান দক্ষিণ (ডান) পার্শ্বরূপে ফ্রান্সের অভ্যন্তর ভাগে অগ্রসর হওয়া।

২। আর্মি গ্রুপ—এ—৪৪ ডিভিসন সৈন্য। প্রধান সেনাপতি জেনারেল ফন রুন্ডস্টেড—এই বাহিনীর আক্রমণই প্রধান। অবস্থান—মধ্যবর্তী রণাঙ্গনের (Aix-la-Chapelle) আর্দালেস অঞ্চল থেকে মোজেল নদী পর্যন্ত।

৩। আর্মি গ্রুপ—সি—১৭ ডিভিসন সৈন্য। প্রধান সেনাপতি জেনারেল ফন সীব, অবস্থান—মোজেল নদী থেকে সুইস সীমানা পর্যন্ত রাইন নদীর সম্মুখ ভাগ।

এই সমস্ত সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ ছাড়াও সুপ্রীম আর্মি কমান্ড বা ও কে এইচ প্রায় ৪৭ ডিভিসন সৈন্য মজুত বা রিজার্ভ রাখিল। এর মধ্যে ২০ ডিভিসন ছিল বিভিন্ন আর্মি গ্রুপের পিছনে হাতের কাছেই প্রস্তুত। আর ২৭ ডিভিসন ছিল সাধারণভাবে মজুত সৈন্য দল।

আক্রমণের যে প্রচণ্ডতা এবং নূতন যন্ত্র ও অস্ত্রসজ্জার যে অভিনবত্ব গোড়াতেই পরিস্ফুট হইল, ইতিহাসে তার কোন তুলনা নাই। চার্চিল তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় সেই ভয়াবহ আক্রমণের স্মৃতি হিসাবে লিখিয়াছেন :

> ".... after eight months of inactivity on both sides * the Hitler inrush of a vast offensive, led by spear-print masses of Cannon-proof or heavily armoured vehicles, breaking up all defensive oppsition and for the first time for centuries, and even perhaps since the invention of gunpowder, making artillery for a while almost impotent on the battle field".

চার্চিলের মত বহুদর্শী সমরবিশেষজ্ঞের বর্ণনার মধ্যেও রণক্রিয়া ও আক্রমণের যে পরম বিস্ময় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তা লক্ষ্য করার মত। সোজা বাংলায় তাঁর বক্তব্য দাঁড়ায় এই—ক্যাম্ব্রোজের মত এই প্রচণ্ড হিটলারী আক্রমণের পুরোভাগে ছিল এমন সমস্ত বর্মাবৃত এবং লক্ষ্যভেদকারী অজস্র যান ও যন্ত্র যেগুলি প্রতিরক্ষার সমস্ত বাধাদানকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং সে-ই সর্বপ্রথম বহু শতাব্দীর মধ্যে—এমন কি, বোধ হয় সেই বহু দূরে আগেকার গান-পাউডার আবিষ্কৃত হওয়ার পর কামানের গোলা-গুলী বা গোলন্দাজী শক্তিকে একেবারে অকেজো করিয়া ফেলিল।

ফন বোক ও ফন রুণ্ডস্টেডের এই আক্রমণের ফল কি দাঁড়াইল? আবার চার্চিলের কথাই উদ্ধৃত করা যাক :

> Complete tactical surprise was achieved in really every case. Out of the darkness came suddenly innumerable parties of well-armed ardent storm troops, often with light artillery and long before the daybreak a hundred and fifty miles of front were aflame.

সোজা কথায় আক্রমণের প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই রণকৌশলের দারুণ বিস্ময় অর্জিত হইল। হঠাৎ অন্ধকার থেকে প্রচুর অস্ত্রসজ্জিত, এবং অনেক সময় হাল্কা গোলন্দাজী অস্ত্রসমন্বিত যেন অদম্য উৎসাহী অজস্র ঝটিকা সৈন্যদল বাহির হইয়া আসিল এবং রাত্রি প্রভাত হইবার অনেক আগেই দেড়শ মাইল রণাঙ্গন অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠিল।

• •

এভাবে হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও লাক্সেমবুর্গের রাজ্য সীমানায় ১০ই মে তারিখ হইতে জার্মানী যে আক্রমণ আরম্ভ করিল, তাতে এক সপ্তাহের মধ্যেই সমগ্র পশ্চিম রণাঙ্গনের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িল। উত্তর-পূর্ব হল্যান্ডের জুইডার জী হইতে ফরাসী সীমান্তের লাক্সেমবুর্গ, মোজেল ও ম্যাজিনো লাইন পর্যন্ত ২৫০ মাইল রণাঙ্গনে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হইল। এন্টোয়ার্প দুর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া ম্যাসট্রিক্ট পর্যন্ত এলবার্ট ক্যানেল প্রবাহিত—বেলজিয়ামের আত্মরক্ষার জন্যই ইহা তৈয়ারী হইয়াছিল। ম্যাসট্রিক্টের অদূরবর্তী নিম্নে লীজ দুর্গ এবং তারও দক্ষিণে নামুর দুর্গ। ম্যাসট্রিক্টের সোজা পশ্চিমে বেলজিয়াম রাজধানী ব্রুসেলস। মিউজ নদী (ওলন্দাজ ভাষায় ম্যাস) এই স্নায়ুকেন্দ্র ভেদ করিয়া নিম্নাভিমুখে ফ্রান্সের দিকে আর্দেনেজ পর্বতের পাশ কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে—৫৭৫ মাইল দীর্ঘ এই নদী হল্যান্ড বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রবাহিত। জার্মানরা ইহার স্নায়ুকেন্দ্র ম্যাসট্রিক্ট দখল করিল, এলবার্ট খাল পার হইল এবং লীজ দুর্গ ভেদ করিয়া নামুর দুর্গের প্রান্তে পৌঁছিল ও মিউজ নদী অতিক্রান্ত হইল। আর ১৭ই তারিখ বেলজিয়ামের ব্রুসেলস, লুভে ও ম্যাসট্রিক্ট এবং ১৮ই তারিখ এন্টোয়ার্পের পতন হইল। সেই সঙ্গে ১৭ই তারিখ [illegible] দক্ষিণে

---

* চার্চিল এখানে পশ্চিম রণাঙ্গনে সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল ৮ মাসের 'উভয় পক্ষের নিষ্ক্রিয়তা'র কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। জার্মানী নিষ্ক্রিয় ছিল না, পোল্যান্ড দখলের পর সৈন্যবাহিনীর পুনর্সজ্জা ও প্রস্তুতির জন্য ব্যস্ত ছিল। —লেখক

ফরাসী ব্যূহ বিচ্ছিন্ন হইল। আর মিত্রপক্ষের সর্বপ্রধান সেনাপতি জেনারেল গ্যামেলাঁ তাঁর নির্দেশনামায় হুকুম দিলেন—মিত্রপক্ষ ও আমাদের স্বদেশ এবং পৃথিবীর ভাগ্য এই যুদ্ধের উপর নির্ভর করিতেছে।... সুতরাং 'মারো, না হয় মরো — conquer or die"; কিন্তু এই তেজোদ্দীপ্ত ঘোষণাতেও কুলাইল না। ফরাসী বাহিনী আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। মঃ রেগো এক বক্তৃতায় আর্তনাদ করিয়া বলিলেন যে, অবিশ্বাস্য রকমের ভুলের জনাই মিউজ নদীর সেতুগুলি ভাঙা হয় নাই। জার্মান যান্ত্রিক সৈন্যেরা জেনারেল গুডেরিয়ানের নেতৃত্বে এই সমস্ত সেতু দিয়া দলে দলে ফ্রান্সের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

জার্মান পক্ষ দাবী করিলেন যে, ১০০ কিলোমিটার বা ৬০ মাইল চওড়া স্থানে ম্যাজিনো লাইন বিদীর্ণ করা হইয়াছে। এখান হইতেই পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধে মিত্রপক্ষের বিপর্যয় শুরু হইল। হল্যান্ড দখলের দ্বারা জার্মানী ইংলন্ডের মুখোমুখি সমুদ্রতীর কাড়িয়া লইল, আর উত্তর ও পূর্ব বেলজিয়াম (এন্টোয়ার্পের পতনের পর) দখলের দ্বারা মিত্র সৈন্যদিগকে যেমন শেল্ড নদীর দিকে ঠেলিয়া দিল (ফ্লান্ডার্সের এলাকা) এবং তাদের দক্ষিণ পার্শ্ব বেষ্টন করিল, তেমনই সেডান ও গিভেটের পথে ম্যাজিনো লাইন ও আর্দেনেশের পার্বত্য এলাকা ভেদ করিয়া জার্মানরা ইংলিশ চ্যানেলের উপকূলের দিকে ধাবিত হইল।

ইহার পরেই উত্তর ফ্রান্স ও ফ্লান্ডার্সের যুদ্ধ শুরু হইল, যার পরিণতিতে ঘটিল এক দিকে ডানকার্ক এবং অন্য দিকে প্যারিস অভিযান। কিন্তু জার্মান বাহিনী ১৯১৪ সালের মত আগে প্যারিসের দিকে লক্ষ্য করিল না—তার চেয়েও ভয়াবহ ফাঁদ সৃষ্টি হইল। হিটলার সমগ্র মিত্র বাহিনীকে ধ্বংস করিয়া পশ্চিম রণাঙ্গনকে চূর্ণ করিবার সংকল্প করিলেন। সুতরাং ফরাসী সীমান্তের সেডান ও বেলজিয়ামের নামুর-এন্টোয়ার্প ব্যূহ ভেদের পর জার্মান বাহিনী এক মারাত্মক সাঁড়াশীর চাপে নিদারুণ বেষ্টন কৌশল অনুসরণ করিল। জীব্রাগ, অস্টেন্ড, নিউপোর্ট, ডানকার্ক, ক্যালে ও বোলোন—ইংলিশ চ্যানেলের তীরবর্তী এই সমস্ত ফরাসী ও বেলজিয়াম বন্দর প্রত্যক্ষ বিপদে পড়িল। ১৯শে তারিখ সন্ধ্যাবেলা প্যারিসে ঘোষিত হইল যে, জেনারেল গ্যামেলাঁ পদচ্যুত হইয়াছেন এবং বিগত মহাযুদ্ধের খ্যাতিমান জেনারেল ওয়েগাঁকে সর্বপ্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু বিগত যুগের এই বৃদ্ধ সেনাপতিকে নিয়োগ করিয়াও কোন লাভ হইল না। কারণ, পেঁতা বা ওয়েগাঁ দুইজনের চিন্তাধারাই গ্যামেলাঁর চেয়েও সেকেলে ছিল। মিত্রসৈন্যেরা উত্তর ফ্রান্সের সোম ও আইনে নদী ধরিয়া পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইল এবং আইনে নদীতীরস্থ রেথেল দখল হইয়া গেল। জার্মান ট্যাঙ্কবহর আরাস ও পেরোনের মধ্যে দেখা দিল এবং ২১শে মে তারিখ হিটলারের শিবির হইতে
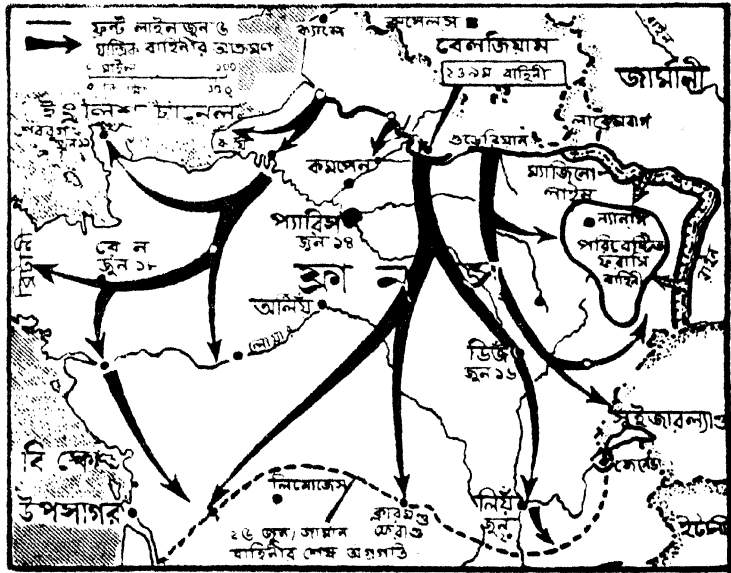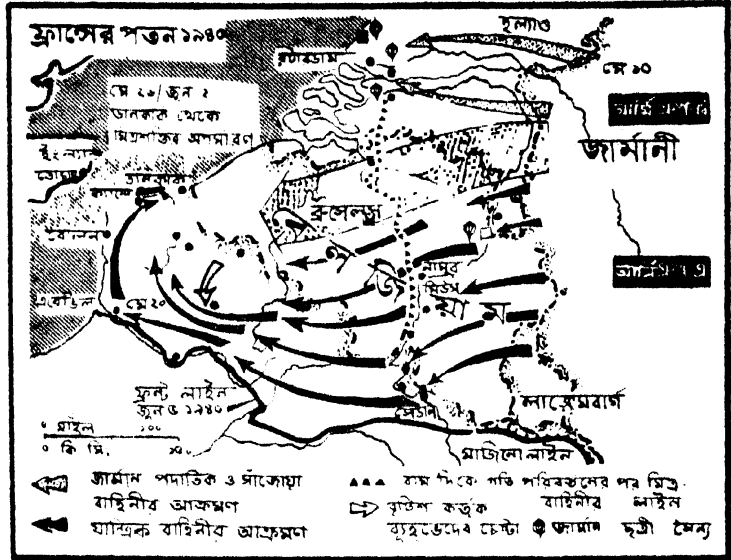
দাবী করা হইল যে, পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম আক্রমণের অভিযানে জার্মান সৈন্যেরা জয়ী হইতেছে। বেলজিয়াম হইতে সেডান পর্যন্ত মিউজ নদীর তীর ধরিয়া যে ৯নং ফরাসী বাহিনী জার্মানদিগকে বাধা দিতেছিল, তাঁরা পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়াছে। ইহার অধিনায়ক জেনারেল জিরো তাঁর স্টাফসহ বন্দী হইয়াছেন। বিচ্ছিন্ন ফরাসী ব্যূহের নানা অংশ ধরিয়া জার্মান ডিভিসনগুলি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে এবং তাদের পুরোগামী ট্যাঙ্ক ও মোটরারূঢ় সৈন্যদল আরাস, আমিয়েন্স এবং আবেভিল (সোম্ নদীর মোহনাস্থিত) বন্দর দখল করিয়াছে। সোম্ নদীর উত্তরদিকস্থ সমস্ত শত্রুসৈন্য—ফরাসী, বৃটিশ ও বেলজিয়ানদিগকে ইংলিশ চ্যানেলের উপকূলে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হিটলারের এই দাবী আদৌ অতিরঞ্জিত ছিল না, বরং মিত্রপক্ষের নিদারুণ বিপর্যয়ের বিবেচনায় এই ইস্তাহার ইতিহাসের দিক হইতে স্মরণীয় ছিল। ২১শে মে তারিখের এই জার্মান অগ্রগতি দ্বারা মিত্রবাহিনী উত্তরে ও দক্ষিণে বিচ্ছিন্ন এবং খণ্ডিত হইয়া গেল। এই দুই অংশের মধ্যে ৩০ মাইল ব্যবধান রচিত হইল—যাকে ইংরাজীতে বলা হইয়াছে দুই অংশের মধ্যবর্তী অন্তপথ। উত্তর দিকে ইহা ফ্লান্ডার্স এবং দক্ষিণদিকে ইহা সোম নদী রেখায় বিচ্ছিন্ন। ফ্রান্সের ক্যালে বন্দর হইতে বেলজিয়ামের শেল্ড নদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত অংশের নাম ফ্লান্ডার্স, যাহা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বহু যুদ্ধবিগ্রহের জন্য পরিচিত ছিল। কেবল ফ্লান্ডার্স নহে, উত্তর ফ্রান্সের এই সমস্ত রণক্ষেত্রও প্রথম মহা-

যুদ্ধে কিম্বা আগেকার ইতিহাসের দ্বারা খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ২১শে মে তারিখ আবেভিল বন্দরের পতনের এক সপ্তাহের মধ্যে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম রণক্ষেত্রের মধ্যে যে বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হইল, তাহা ৩০ মাইল চওড়া হইয়া জার্মান যান্ত্রিক বাহিনীর যেন প্লাবন ডাকিয়া আনিল। উত্তর দিকে ঘেন্ট-ভ্যালেন্সিনেস-আরাস এবং দক্ষিণ দিকে সোম ও আইনে নদী—মোটামুটি এই দুই রেখায় মিত্রবাহিনীর মধ্যে যে বিরাট বিচ্ছেদ ঘটিল, উহা পূর্ণ করিবার জন্য ২৩শে মে তারিখ মিত্র সামরিক কর্তৃপক্ষ জেনারেল ওয়েগাঁর পরামর্শ অনুসারে যুগপৎ উভয় দিকে পাল্টা আক্রমণের প্ল্যান করিলেন এবং ২৬শে মে তারিখ এই পাল্টা-আক্রমণের দিন ধার্য হইল। কিন্তু এই পাল্টা-আক্রমণের কোন সুযোগ জার্মানীরা রাখিল না। বিদ্যুৎবেগে তারা শেল্ড পার হইল এবং বেলজিয়ান ও বৃটিশ সৈন্যদের মধ্যে সংযোগ নষ্ট করিয়া তাদের ডানকার্কে পিছু হটিবার পথ বন্ধ করিবার উপক্রম করিল। ২৫শে মে তারিখ অপরাহ্নে জার্মানীরা দাবী করিল যে, বেলজিয়ান বাহিনী ১নং, ৭নং ও ৯নং ফরাসী বাহিনীর কতগুলি অংশ এবং বৃটিশ বাহিনীর অধিকাংশ বেষ্টিত হইয়াছে। ঘেন্ট ও কোর্টরাই দখল হইয়াছে, লাইস নদী অতিক্রান্ত এবং বোলোন বন্দরের পতন হইয়াছে। ইহার পর অবরুদ্ধ ক্যালে বন্দরেরও অনুরূপ দশা ঘটিল। ১নং ফরাসী বাহিনীর জেনারেল প্রিয়ো সদলবলে বন্দী হইলেন। এই অবস্থার মধ্যে ২৮শে মে তারিখ বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড আত্মসমর্পণ করিলেন।

ডানকার্ক

তখন বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনী ও মিত্রসৈন্যদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তারা কেবল সমুদ্রতীরের সঙ্কীর্ণ বালুকা ভূমিতেই তাড়িত হইল না, অধিকন্তু তিন দিকে বেষ্টিত হইয়া পড়িল। অস্টেন্ড, লিলে, ডানকার্ক (প্রকৃতপক্ষে ডানকার্ক ও ক্যালের মধ্যবর্তী ফাঁক)—এই ত্রিভুজাকৃতি অতি অল্প পরিসর ভূমিখণ্ডে সমুদ্রকে পশ্চাতে রাখিয়া মিত্র সৈন্যদিগকে সরিয়া আসিতে হইল। যে অভূতপূর্ব বিপদের মধ্যে বৃটিশ সৈন্যেরা পড়িল, তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু ইংরাজ সেনাপতি লর্ড গোর্ট তাঁর সৈন্যদলসহ পলায়নের বিস্ময়কর শক্তি দেখাইলেন এবং ইতিহাসের এক বৃহত্তম পৃষ্ঠরক্ষার লড়াইয়ের দ্বারা ত্রাণলাভের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিলেন।

লর্ড গোর্টের 'ডেসপ্যাচে' (যাহা ১৯৪১ সালের ১৭ই অকটোবর প্রকাশিত হইয়াছিল), দেখা যায় যে, মোট ১৩ ডিভিসন সৈন্য লইয়া বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনী গঠিত ছিল, তবে ইহার মধ্যে তিন ডিভিসন পুরোপুরি অস্ত্রসজ্জিত সৈন্য ছিল না। ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে এই সমস্ত সৈন্য রাখা এবং ৪৫ হাজার যানবাহন আনিতে ও নামাইতে ১৪টি বন্দর ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ গোলাগুলী ও যান্ত্রিক সজ্জা ছিল না। লর্ড গোর্ট বৃটিশ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হইলেও কার্যত তিনি ছিলেন উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনের জেনারেল জর্জেসের অধীনে এবং জেনারেল জর্জেস ছিলেন মিত্রবাহিনীর সর্বপ্রধান ফরাসী সেনাপতি জেনারেল গ্যামেলাঁর অধীনে। অর্থাৎ বৃটিশ বাহিনী ফরাসী সৈন্যদলেরই একটা শাখা ছিল মাত্র। ১৯৩৯ সালের শরৎকালে মিত্রপক্ষের রণনৈতিক নক্সা স্থির হয় এবং কয়েকবার অদল-বদলের পর 'প্ল্যান ডি' অনুসারে ফ্রাঙ্কো-বেলজিয়ান সীমানা হইতে ৬০ মাইল অগ্রসর হইয়া গিয়া ডাইল নদী ব্রুসেলস পর্যন্ত লাইন ধরিয়া জার্মান আক্রমণে বাধা দেওয়ার পরিকল্পনা হয়। কিন্তু জার্মানীর দুর্ধর্ষ আক্রমণে ও বিদ্যুৎগতি অভিযানে এই সমস্ত নক্সা চুরমার হইয়া গেল এবং শেষ পর্যন্ত ফ্লান্ডার্স অঞ্চলের বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যেরা ইংলিশ চ্যানেলের তীরবর্তী ডানকার্কের ফাঁদে বা পকেটের মধ্যে গিয়া পড়িল। ২৩শে মে তারিখ পর্যন্তও লণ্ডনের সমর দপ্তরের আশা ছিল যে, লর্ড গোর্ট জেনারেল ওয়েগাঁর পাল্টা-আক্রমণের পরিকল্পনায় যোগ দিতে পারিবেন। কিন্তু এই আশা ছিল ভ্রান্ত ধারণার উপর। ২৬শে মে সকালে লর্ড গোর্ট জেনারেল ব্লাঁশার্ভের সঙ্গে একযোগে ফরাসী সৈন্যদের সহিত লাইস নদীর পশ্চাতে তাদের সৈন্যদের ঘুরাইয়া সমুদ্রের অভিমুখে নিতে চাহিলেন এবং সেদিনই নিজের শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া লণ্ডনের সমর-দপ্তর হইতে এই মর্মে এক টেলিগ্রাম পাইলেন যে, বোধ হয় বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনীকে সরাইয়া আনা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। ইহার পরেই আর একখানা টেলিগ্রাম আসিল—

> 'Sole task now is to evacuate to England maximum of your force possible'. —

—'আপনার একমাত্র কার্য হইতেছে সৈন্যদের যত বেশী সম্ভব ইংলণ্ডে ফিরাইয়া আনা।' *

তারপর শুরু হইল ডানকার্কের ফাঁদ হইতে উদ্ধার লাভের আসুরিক চেষ্টা এবং সেই চেষ্টা করিতে গিয়া বৃটিশ সৈন্যেরা পৃষ্ঠরক্ষার প্রাণান্তকর সংগ্রাম করিল। বৃটিশ নৌবহর ও বিমানবাহিনী (R.A.F.) তাদের যথাসাধ্য সমগ্র শক্তি এই উদ্ধার কার্যে নিয়োগ করিল। আর জার্মান বোমারুর দল তাদের ডানকার্কের বালুকাতটে ধাওয়া করিল। কিন্তু পলায়নের দৃঢ়-সংকল্প লইয়া যারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছে, তাদের বাধা দেওয়া সম্ভব হইল না। বৃটিশ নৌবহরের দুই শতাধিক হাল্কা রণপোত এবং ৬৫০ খানার বেশী বিভিন্ন ধরনের পোত—মোট প্রায় হাজারখানেক জলযান অসংখ্য লস্কর ও স্বেচ্ছাসেবক এই উদ্ধার কার্যে নিযুক্ত হইল। বহু বৃটিশ সৈন্য তীর হইতে জল সাঁতরাইয়া এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া গিয়া জাহাজে উঠিল। (এই অবস্থায় লজ্জা-সরম না থাকিবারই কথা!) সমস্ত গোলা-বারুদ, কামান, অস্ত্র, দ্রব্য ইত্যাদি ফেলিয়া তারা ছুটিতে লাগিল এবং জার্মানরা এই পলায়ন প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিল না। সত্য-সত্যই ডানকার্ক হইতে এই ত্রাণলাভ সকলকে চমকাইয়া দিল, আর মিত্রপক্ষের নেতা, সংবাদপত্র ও প্রচার বিভাগ মিলিয়া বৃটিশ বাহিনীকে ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল। স্বয়ং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল কমন্সসভায় এক বক্তৃতায় (৪ঠা জুন, ১৯৪০) ডানকার্ক থেকে এই পরিত্রাণ লাভকে miracle of deliverance বলিয়া ইংরেজের কীর্তি গানে মুখরিত হইয়াছিলেন। (কিন্তু পাঠকদের জানা উচিত যে, এর মধ্যে মিরাক্যাল বা অঘটন কিছু ছিল না, ছিল জার্মান হাইকমাণ্ডের ভ্রান্তি, সে বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।)

২৯শে মে তারিখের রাত্রি হইতে বৃটিশ সৈন্যেরা ডানকার্ক পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে পৌঁছিতে আরম্ভ করে এবং ৪ঠা জুনের মধ্যে ডানকার্ক সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইল। চার্চিল কমন্সসভায় এক জোরালো বক্তৃতায় প্রকাশ করিলেন যে, মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সেডান ও মিউজ নদীতটে ফরাসী ব্যূহ ভাঙিয়া পড়ায় এবং বেলজিয়াম আত্মসমর্পণ করাতেই বৃটিশ সৈন্যেরা বেলজিয়ান রণাঙ্গন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তিনি ডানকার্ক হইতে বৃটিশ সৈন্যদের উদ্ধার লাভের ভূয়সী প্রশংসা করেন—নিয়ম-শৃঙ্খলা, ধৈর্য, সাহস, নৈপুণ্য এবং নিষ্ঠার দ্বারাই পরিত্রাণের এই বিস্ময় সম্ভব হইয়াছে। এই ত্রাণকার্যে ৩০ হাজার সৈন্য হতাহত ও নিখোঁজ হইয়াছে। তবে বৃটেনের ৭ হাজার টন গোলা-বারুদ, ৩০০ কামান, ১ লক্ষ ২০ হাজার যানবাহন এবং সমস্ত সাঁজোয়া গাড়ী, ৯০ হাজার রাইফেল, ৮ হাজার ব্রেনগান, ৪ শত ট্যাঙ্ক মারা রাইফেল—যেগুলি বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে ছিল, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে খোয়া গিয়াছে। ফলে, বৃটেনের যুদ্ধ সজ্জায় আরও বিলম্ব ঘটিবে। কেবল তাহাই নহে, তিনি স্বীকার করেন যে, ডানকার্ক হইতে ত্রাণলাভই যুদ্ধ জয় নহে,—
'wars are not won by evacuations' এবং ফ্রান্সে ও বেলজিয়ামে যাহা ঘটিয়াছে, নিঃসন্দেহে তাহা এক নিদারুণ সামরিক বিপর্যয়— Colossal military disaster' মিঃ চার্চিলের এই মন্তব্য অক্ষরে-অক্ষরে সত্য ছিল এবং ইহার পরেই শুরু হইল খাস ফ্রান্সের যুদ্ধ ও ফরাসী জাতির পতন।

ডানকার্ক হইতে মোট ২,২৪,৫৮৫ জন ইংরাজ এবং ১,১২,৫৪৬ জন মিত্রসৈন্য (অধিকাংশই ফরাসী) উদ্ধার পাইয়াছিল। আর ডানকার্কের দক্ষিণে ক্যালে বন্দরের অবরোধ যুদ্ধে ৩ হাজার বৃটিশ সৈন্যের প্রায় সকলেই নিহত হইয়াছিল।

* 'This Expanding War' — by Liddel Hart page 199.

প্যারিসের পতন

ডানকার্ক হইতে যখন বৃটিশ সৈন্যদের প্রস্থানের নাটক জমিয়া উঠিতেছিল, তখন জেনারেল ওয়েগাঁর নেতৃত্বে ফরাসী সৈন্যরা ফ্রান্সের আত্মরক্ষার জন্য ব্যূহ রচনা করিতেছিল। সোম নদী যেখানে ইংলিশ চ্যানেলে পড়িয়াছে, সেই মোহনা হইতে ম্যাজিনো লাইনের আসল দুর্গমালার মন্টমিডি পর্যন্ত এই আত্মরক্ষার ব্যূহ তাড়াতাড়ি রচিত হইতেছিল। প্রকৃতপক্ষে জার্মানরা ফ্রান্সকে নিঃশ্বাস ফেলিবারও সময় দিতেছিল না এবং সোম নদী ধরিয়া পাকাপোক্ত কোন ব্যূহও গড়িয়া উঠিল না। কেবল স্থানে স্থানে কতগুলি ট্যাঙ্ক-মারা ফাঁদ তৈয়ারী হইল। তবে, আত্মরক্ষার এই লাইন ছিল প্রায় একটানা নদী ও জলপথের দ্বারা বিঘ্নবহুল, যে-বিঘ্ন যান্ত্রিক যুদ্ধের মুখে বিশেষ কোন কাজে আসিল না।

ফ্লান্ডার্সের যুদ্ধেই ফরাসী বাহিনী-গুলি কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং লড়াই করিবার ক্ষমতাও বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ইহা ছাড়া ফরাসী বাহিনীগুলির একাংশ ছিল ম্যাজিনো লাইনের দুর্গশ্রেণী আশ্রয় করিয়া এবং অপরাংশ ছিল ইতালী-সুইজারল্যাণ্ডের সীমানায় পাহারারত। সোম নদী মোহনার আবেভিল বন্দর হইতে আমিয়েন্স, সেণ্ট কুইণ্টিন, ল্যায়ন, রেথেল ইত্যাদি হইয়া মণ্টমিডি পর্যন্ত ফরাসীদের ছিল ৪৩টি পদাতিক ডিভিসন (অধিকাংশই দুর্বল) ৩টি সাঁজোয়া ডিভিসন (যাহাদের ট্যাঙ্ক ছিল অতি সামান্য) এবং ৩টি দুর্বল অশ্বারোহী ডিভিসন। আরও ১৭ ডিভিসন ছিল দুর্গশ্রেণীর আড়ালে মণ্টমিডি ও সুইস সীমান্তের মধ্যে। (২)

৫ই জুন হিটলার সৈন্যবাহিনীর নিকট এক নির্দেশনামায় ঘোষণা করিলেন যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে আর একটি বৃহৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা জার্মান জাতির মুক্তি এবং লন্ডন ও প্যারিসের শত্রু-শাসকের দল ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। আর একটি ঘোষণাপত্র তিনি প্রচার করিলেন জার্মান জাতির উদ্দেশ্যে এবং বলিলেন যে, পৃথিবীর বৃহত্তম যুদ্ধে জার্মান সৈন্যেরা জয়ী হইয়াছে, মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ১২ লক্ষ শত্রুসৈন্য বন্দী হইয়াছে। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, বৃটিশ বাহিনীর অধিকাংশ হয় ধ্বংস, না হয় পলায়িত হইয়াছে। শত্রুরা এখনও শান্তির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতেছে। সুতরাং তাদের ভাগ্যে রহিয়াছে সম্পূর্ণ সংহারের সামগ্রিক যুদ্ধ।

হিটলার অবশ্য বৃথা গর্ব করেন নাই। ৫ই জুন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম শুরু হইল এবং যাহা 'ব্যাটল অফ ফ্রান্স' নামে পরিচিত, তাহা অতি দ্রুত সারা ফ্রান্সের বিপর্যয় ডাকিয়া আনিল। ইংলিশ চ্যানেলের উপকূল হইতে ল্যায়ন-সয়সন্ সড়ক পর্যন্ত ১২০ মাইল দীর্ঘ রণক্ষেত্রে সোম-নদীর তীর ধরিয়া প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত্যার মত ট্যাঙ্ক, গোলাগুলী ও বোমাবর্ষণের মধ্যে এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের উদ্বোধন হইল —এই আক্রমণের জার্মান নেতা ছিলেন ভন বোক্। ফরাসী সৈনাদল যথাসম্ভব বাধা দেওয়া সত্ত্বেও ঐদিন রাত্রেই সোম নদীর মোহনা হইতে আমিয়েন্স পর্যন্ত ফরাসী ব্যূহ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ৬ই জুন আবেভিল হইতে আইনে নদী পর্যন্ত জার্মানদের প্রায় দুই হাজার ট্যাঙ্ক দলবদ্ধভাবে আক্রমণ চালাইল—এক এক দলে ২।৩ শত করিয়া ট্যাঙ্ক ছিল। সোম নদীর নিম্নভাগে যে ৫১নং হাইল্যাণ্ড ডিভিসন (বৃটিশ) ছিল, তারাও এই আহবে পিছু হটিয়া গেল। কিন্তু তখনও মঃ রেণো আশাবাদী ছিলেন এবং এক বেতার বক্তৃতায় বলিলেন যে, ওয়েগাঁ যুদ্ধের গতিতে সন্তুষ্ট আছেন! কিন্তু পরদিন ৭ই জুন, অর্থাৎ যুদ্ধের তৃতীয় দিবসেই সমগ্র সোম নদী রণাঙ্গন টুকরা টুকরা হইয়া গেল। আক্রমণের প্রথম হইতেই ফরাসীদের আত্মরক্ষার কিন্দু-গুলিতে খাদ্য ও গোলা-বারুদ সরবরাহে বিঘ্ন হইতেছিল। সুতরাং ফরাসীদের অবস্থা ভাবিবার মত ছিল। ১০নং ফরাসী বাহিনী সোম নদীর এলাকা ছাড়িয়া পশ্চিম অভিমুখে সরিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু এক ডিভিসন জার্মান সাঁজোয়া সৈন্য সোম অতিক্রম করিয়া ফরাসীদিগকে ঘিরিবার জন্য অতি দ্রুত সেই দিকে আক্রমণ চালাইল। প্যারিসের উত্তরে ৭নং ফরাসী বাহিনী আয়স নদীর দক্ষিণ-পূর্বে পিছু হটিতে বাধ্য হইল এবং ইহার ফলে তাদের দক্ষিণ পার্শ্বে ৬নং ফরাসী বাহিনীও পশ্চাদপসরণ করিল। ৯ই জুন রবিবার জার্মানদের ভাষায় আবার 'ইতিহাসের বৃহত্তম যুদ্ধ' আরম্ভ হইল। ইহাই ছিল জার্মান বাহিনীর অন্যতম প্রধান আক্রমণ। প্যারিসের পূর্ব দিকে আয়স নদী পার হইয়া এই আক্রমণ আরম্ভ হইল এবং পদাতিকেরা যে সেতুমুখ প্রতিষ্ঠা করিল, জার্মান ট্যাঙ্কবহর অতি দ্রুত সেখান দিয়া ছড়াইয়া পড়িল এবং ফরাসী সৈন্যদিগকে বিখ্যাত মার্ণ নদী পর্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া গেল। সমুদ্রতীর হইতে প্যারিসের উত্তরে এবং সেখান হইতে পূর্ব দিকের আইনে নদী পর্যন্ত সমগ্র রণক্ষেত্রে প্রবল আক্রমণ চলিতে লাগিল এবং এই বিদ্যুৎগতি অভিযান ও ভয়াবহ যান্ত্রিক আক্রমণের দ্বারা ফরাসী বাহিনীগুলি অতি দ্রুত ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। তাদের যোগাযোগ-ব্যবস্থা পর্যন্ত বানচাল হইয়া গেল।

এই অবস্থায় পাল্টা আক্রমণের কোন প্রশ্নই ছিল না। সামরিক দিক দিয়া যখন এই বিপর্যয়, তখন শত শত বোমারু বিমানের আক্রমণে বে-সামরিক জনগণের মধ্যে ত্রাস, ভীতি ও হতাশা গোটা ফরাসী জাতির মেরুদণ্ড যেন ভাঙ্গিয়া দিল।

একজন মার্কিন লেখক বলিয়াছেন :

All France degenerated into panic, terror, hysteria, confusion. There was chaos on the roads. The onrushing Germans, aiming to immobilise the retreating enemy, deliberately induced a mass exodus of the civilian population. Hundreds of thousands of refugees, desperately anxious to escape from Paris, *

Jammed the roads south to Bordeaux for a distance of 400 miles. They used everything they could move — carts, bicycles taxi cabs, trucks, bakery vans, roadsters, even hearses. All these were loaded with human being, shouting, wailing, cursing.

সংক্ষেপে প্যারিস থেকে দক্ষিণ দিকে বর্দো পর্যন্ত ৪০০ মাইল দীর্ঘ রাস্তার সর্বত্র হাজার হাজার আর্ত, আতঙ্কিত পলায়মান নর-নারীর ভিড় এবং তারা হাতের কাছে যে-কোন যানবাহন পাইল তাতেই চড়িয়া বসিল, আর চলিতে চলিতে তারা চীৎকার ও আর্তনাদ এবং অভিশাপ দিতে লাগিল...

কিন্তু এই হতভাগ্য পলায়মান শরণার্থীরা কেবল তাতেই ত্রাণ পাইল না। দ্রুতবেগসম্পন্ন জার্মান বোমারুগুলি গাছের মাথার নীচু পর্যন্ত নামিয়া আসিয়া ভিড়ের মধ্যে বন্দীর মত অসহায় নর-নারীর উপর বোমা ও মেসিনগানের গুলী বর্ষণ করিতে লাগিল। আর রাস্তার উপর রাশি-রাশি মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে বা ঝুলিয়া থাকিতে দেখা গেল :

'It seemed to be a field day for Hitler's young Supermen. German pilots in speedy Heinkels roared up and down at tree level over the roads where civilian refugees were trapped and helpless in traffic jams. Bombs and bullets burst among the automobiles, carts, farm wagons and bicycles, catching humans and horses in a ceadly melange of flame and smoke. Lining the roads leading south from Paris were hundreds of bodies spread-eagled in grotesque attitudes of death".

যুদ্ধের নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত সাধারণ ফরাসী নর-নারীর কী ভয়ঙ্কর মৃত্যু এবং কী ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা! একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলিতেছেন যে, যারা ফরাসী বিপ্লবের জন্ম দিয়াছিল, যারা বাঘের মত লড়াই করিয়াছিল স্বাধীনতার জন্য, যারা খালি হাতে ব্যাস্টিল দুর্গ আক্রমণ ও তার পতন ঘটাইয়াছিল, সেই বীর ফরাসী

---

* 'The Second Great War' — vol 3 page 923

* ১৯৪০ সালের ফ্রান্সের অগণিত ত্রাস-গ্রস্ত নর-নারীর এভাবে পলায়ন প্রসঙ্গে হয়তো অনেক পাঠকের মনে পড়িবে ১৯৭১ সালে পূর্ববঙ্গ থেকে ইয়াহিয়া খানের আক্রমণের জন্য বিপন্ন ৬০ লক্ষ মানুষের ভারতে পলায়নের কথা।—লেখক

সন্তানদের এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা বিশ্বাস করাও কঠিন।

*

১০ই জুন মধ্যরাত্রে যখন ইতালী কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণার দ্বারা আল্পস পর্বতের এলাকায় নূতন ফ্যাসিস্ট আক্রমণ আসন্ন ছিল, তখন ওয়েগাঁ লাইনের আত্মরক্ষার সমগ্র অঞ্চল বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল এবং ফরাসী জাতির নাভিশ্বাসের তাহা ছিল পূর্ব লক্ষণ। জার্মাণ সৈন্যেরা জয়দর্পে দ্রুত প্যারিসের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সোম, আইনে, মার্ণ এবং সীন নদী জার্মান যান্ত্রিক সৈন্যের বন্যাপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছিল। সয়সন হাতছাড়া, রুয়েঁ এবং রেইমস প্রায় তাহাই। জার্মানরা প্যারিসের শহরতলী হইতে ২৫।৩০ মাইলের মধ্যে পৌঁছিল।

প্যারিসের পতন আসন্ন হইয়া উঠিল এবং ১০ই জুন ফরাসী গভর্ণমেণ্ট রাজধানী ত্যাগ করিয়া টুর্ণে চলিয়া গেলেন। ১১ই তারিখ সমগ্র রণাংগনের অবস্থা আরও খারাপ হইল এবং ৪ঠা জুন যে ৪৩ ডিভিসন পদাতিক সৈন্য ছিল, উহার মধ্যে অন্ততঃ ৯ ডিভিসন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল, ১২ ডিভিসনের সংখ্যাগুলি দাঁড়াইল এক চতুর্থাংশে, অর্থাৎ ইহারাও কার্যতঃ অকেজো হইয়া পড়িল এবং ১৯ ডিভিসন অর্ধেকে দাঁড়াইল। সুতরাং ফরাসী সৈন্যদলের আর বাকি রহিল কি? ১২ই জুন জার্মানরা প্যারিসের উত্তরে অয়েস নদী উপত্যকা দিয়া সেনলিসে পৌঁছিল। পশ্চিম দিকে সীন নদী বরাবর তারা লে হ্যাভার বন্দরের দিকে অগ্রসর হইল এবং এব্রো অঞ্চলে সীন নদী দক্ষিণে অতিক্রান্ত হইল। পূর্ব দিকে তাহারা মার্ণ নদী অতিক্রম করিল এবং আরও পূর্বে মণ্টমিডি অঞ্চলে তারা ফরাসী রণাঙ্গনকে ম্যাজিনো লাইন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উপক্রম করিল। এই অবস্থায় আর কতক্ষণ আত্মরক্ষা সম্ভব? ১২ই তারিখই জেনারেল ওয়েগাঁ ফরাসী মন্ত্রিসভাকে জানাইলেন যে যুদ্ধ-বিরতির প্রার্থনা না জানাইয়া আর উপায় নাই। কিন্তু ইহার এক অক্ষরও এমনকি কাণাঘুষাও তখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল না।* ১৩ই জুন সকালবেলা প্যারিস খোলা বা অরক্ষিত শহর বলিয়া ঘোষিত হইল এবং দলে দলে নরনারী প্যারিস ছাড়িয়া আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটিতে লাগিল। রাস্তাঘাট জনশূন্য, বিরাট অট্টালিকাসমূহ নিস্তব্ধ, সমগ্র শহর শ্মশানের মত, দৈনিক পত্রিকাগুলির প্রকাশ বন্ধ—কেবল অদূরবর্তী রণক্ষেত্রের ধূম ও অগ্নিশিখা রাত্রির আকাশকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল...

১৩ই জুন সন্ধ্যাবেলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূত মিঃ উইলিয়াম বুলিট টুর্ণে অবস্থিত তাঁর সহকর্মীকে প্যারিস হইতে টেলিফোনযোগে জানাইলেন যে, জার্মান সৈন্যেরা প্যারিসের নগরদ্বারে প্রবেশ করিয়াছে। কার্যতঃ প্যারিস প্রায় চারিদিকেই বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং ১৪ই তারিখ জার্মান হাইকম্যাণ্ড এক ইস্তাহারে পূর্ণ জয়ের দাবী করিলেন এবং ঐদিন সকাল ৭টায় জার্মান সৈন্যেরা দলে দলে প্যারিস নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজধানী এবং একটি শ্রেষ্ঠ জাতির মর্মকেন্দ্রের পতন হইল।

The War—Louis S. Snyder 1960 P. 163

*The Second Great War—vol 3 P. 967

ইতালীর যুদ্ধ ঘোষণা

১০ই জুন ইতালী সরকারীভাবে ফ্রান্স ও বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ফ্যাসিস্ট নায়ক মুসোলিনী গোড়া হইতেই সামরিকবাদ প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন এবং দীর্ঘ অতীতের গর্ভে লুপ্ত রোমক সাম্রাজ্যের নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া ইতালীকে এক অদ্বিতীয় রাষ্ট্রশক্তিতে পরিণত করিবার দিবাস্বপ্ন রচনা করিতেছিলেন। জার্মানীতে নাৎসী দল-নায়ক হিটলারের শক্তিলাভে এই দিকে তিনি আরও উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছিলেন এবং হিটলারের সঙ্গে দল পাকাইয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও ডিক্টেটারি করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। উত্তর আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরকে তিনি তাঁর কল্পিত রোমক সাম্রাজ্যের এলাকা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপে হিটলারের অগ্রগতিতে তিনি একবার ক্রুদ্ধ, একবার লুব্ধ এবং অন্যবার ক্ষুব্ধ ও ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়িতেছিলেন। শক্তি হিসাবে ইতালী কোন দিক দিয়াই জার্মানীর সমকক্ষ ছিল না। মনে মনে তিনি এ-কথা জানিতেন, কিন্তু নিজকে হিটলারের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর পুরুষ বলিয়া ভাবিতেন। বিশেষতঃ তিনিই ছিলেন ইউরোপে ফ্যাসিজমের পথ-প্রদর্শক; সুতরাং হিটলারের শক্তি ও প্রতিপত্তি তাঁকে অস্থির এবং বিকারগ্রস্ত করিয়া তুলিল। রণসজ্জায় ও যুদ্ধযাত্রায় ইতালী বহু পশ্চাতে ছিল, একথা অনুভব করিয়া তিনি সময় সময় আরও বেসামাল হইয়া পড়িতেন। কাউণ্ট সিয়ানোর ডায়েরীতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের এই চিত্র চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

হিটলার যখন পোল্যাণ্ড আক্রমণে দৃঢ়সংকল্প হইলেন, তখন মুসোলিনী যুদ্ধ ও শান্তি—এই দুই প্রশ্নের মধ্যে গভীর সংশয়ের দ্বারা আন্দোলিত হইলেন। কিন্তু সামরিক প্রস্তুতির অভাবে তিনি জার্মানীর সহিত গোপন চুক্তির দ্বারা ১৯৪২ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কার্য বলিয়া ভাবিলেন। ইতিমধ্যে তিনি স্নায়ুর লড়াইয়ের দ্বারা ভূমধ্যসাগরে পার্শ্ববর্তী বলকান অঞ্চলকে, আফ্রিকায় এবং বিশেষভাবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে টিউনিস, কর্সিকা, নিস ও স্যাভয় লইয়া গলাবাজীর দ্বারা বাজীমাৎ করিতে চাহিলেন। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বাধিবার পর তিনি 'নিরপেক্ষতার' বদলে অযুধ্যমান সাজিয়া হিটলারকে খুসী রাখিলেন এবং ইতালীয় বন্দরগুলিকে মিত্রশক্তির অবরোধের বিরুদ্ধে জার্মানীর সাহায্যের জন্য ব্যবহার করিলেন। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না। পোল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে হিটলারের দিগ্বিজয় যাত্রা ও জার্মান সাম্রাজ্যের জয়ডঙ্কায় তাঁর সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল এবং ইতালীয় জনসাধারণ এই যুদ্ধে উৎসুক নহে, একথা জানিয়াও তিনি ১৯৪০ সালের ১০ই জুন মুমূর্ষু ফ্রান্সকে পিছন হইতে ছুরিকাঘাতে উদ্যত হইলেন।

কাউণ্ট সিয়ানোর ডায়েরীতে দেখা যায় যে, ৩০শে মে তারিখই মুসোলিনী যুদ্ধযাত্রার সংকল্প স্থির করেন এবং ৫ই জুন যুদ্ধ ঘোষণার তারিখ নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু হিটলার আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করিতে বলেন। কারণ, ফরাসী বিমানবহর ধ্বংসের যে প্ল্যান হিটলারের ছিল, তাহা ইতালী কর্তৃক পূর্বাহ্নে যুদ্ধ ঘোষণার দ্বারা বানচাল হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং তারিখটা পিছাইয়া গেল।

৪ঠা জুন ইতালীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে সকলেই যখন মুসোলিনীর এত বড় সংকল্প লইয়া প্রকাণ্ড রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ও বাহ্বাস্ফোটের প্রত্যাশা করিতেছিলেন, তখন তিনি গম্ভীরভাবে শুধু মাত্র বলিলেন— 'This is the last council of Ministers during peace-time." —এবং একথা বলিয়াই নাটকীয় কায়দায় কর্ম-তালিকায় হাত দিলেন। 'গত ১৮ বৎসরের মধ্যে এমন শাসনতান্ত্রিক কায়দা' নাকি আর হয় নাই!

১০ই জুন অপরাহ্ন সাড়ে চারিটায় ইতালীর পররাষ্ট্রসচিব কাউণ্ট সিয়ানো ফরাসী এবং বৃটিশ রাজদূতকে যুদ্ধ ঘোষণার দলিল পড়িয়া শুনাইলেন। ফরাসী দূত মঃ পসেঁট বিচলিত এবং কাতর হইয়া বলিলেন, "যে লোক পড়িয়া গেছে, ইহা দ্বারা তার উপরেই ছোরা মারা হইল! তথাপি আপনাকে ধন্যবাদ যে, আপনার হাতে ভেলভেটের দস্তানা!" কিন্তু বৃটিশ রাজদূত স্যার পার্শি লোরেনের মুখের একটি রেখাও কুঞ্চিত হইল না, চক্ষুর পলকও পড়িল না, শুধু যুদ্ধ ঘোষণার দলিলটা তিনি টুকিয়া লইলেন এবং যথোচিত মর্যাদা ও শিষ্টাচারের সঙ্গে বিদায় লইলেন। এমনকি, কাউণ্ট সিয়ানোর সঙ্গে আন্তরিকভাবে দীর্ঘ করমর্দনেও ভুলিলেন না।*

*সিয়ানো তাঁর ডায়েরীতে ইংরাজ জাতির এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একাধিকবার প্রশংসা করিয়াছেন। বার্লিনে বৃটিশ দূতের ভাবভঙ্গীও অনুরূপ মর্যাদাব্যঞ্জক ছিল। —লেখক

মুসোলিনী মাইক্রোফোনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করিয়া ১০ই জুন ইতালীর জনগণের উদ্দেশ্যে এক বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন। "পশ্চিমের প্রতিক্রিয়াশীল গণতন্ত্রীরা, যারা ইতালীর অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন করিয়াছে", তাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধযাত্রা। 'ইতালীর স্থলভাগের সীমানা নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সমুদ্রপথের সীমানার মীমাংসা হওয়া দরকার।...যদি সমুদ্র পথে অবাধ স্বাধীনতা না থাকে তবে, সাড়ে ৪ কোটি ইতালীর জনগণের পক্ষে স্বাধীনতা নিতান্তই অর্থহীন। সুতরাং যে ভৌগোলিক ও সামরিক শৃঙ্খলার দ্বারা আমরা আমাদের সমুদ্রে বন্দী হইয়া রহিয়াছি, তাহা আমরা ছিন্ন করিয়া ফেলিতে চাই।'...'যে সমস্ত শোষক জাতি পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও স্বর্ণভাণ্ডার লুণ্ঠের মত আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে', তাদেরই বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম এবং 'এই সংগ্রাম দুই শতাব্দী ও দুইটি মতবাদের মধ্যে।'

হিটলারেরই অনুরূপ ভাষায় মুসোলিনীর এই বক্তৃতা এবং 'পৃথিবীর এই যুগান্তকারী ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের জন্য' স্বয়ং হিটলার ঐ দিনই তারযোগে মুসোলিনীকে সাদর অভিনন্দন জানাইলেন এবং এই সংগ্রামে তাঁরা দুইজন এবং দুই রাষ্ট্রই যে একাত্মা, তাহাও প্রকাশ করিলেন। ইহাই তাঁদের 'কমরেডশিপ'।

অতএব প্রথম মহাযুদ্ধের মিত্রপক্ষের সঙ্গী ইতালী, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। চার্চিল, এট্‌লী, রুজভেল্ট প্রভৃতি এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নেতা ও ভারতীয় সংবাদপত্র সমূহও মুসোলিনীর এই বিশ্বাসঘাতকতা এবং ফ্রান্সের প্রতি কাপুরুষোচিত আচরণের তীব্র নিন্দা করিলেন। চার্চিল তাঁকে শৃগালের মত হীন বলিয়া গালি দিলেন এবং মার্কিণ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট প্রতিবেশীর পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাতের জন্য ধিক্কার দিয়া বলিলেন,

"…. the hand that holds the dagger has struck it into the back of its neighbour'. *

মুসোলিনীর যুদ্ধ ঘোষণা যেমন অদ্ভুত, ইতালীর সৈন্যদের লড়াইও ছিল তেমন হাস্যকর। তিনি নিজে ইতালীর 'সুপ্রীম কম্যাণ্ডারের' পদ (যদিও শাসনতন্ত্র অনুসারে রাজা এই পদ চাহিয়াছিলেন) গ্রহণ করিলেন, কিন্তু আসলে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব রহিলেন মার্শাল বদোগলিও। ফ্রান্স তখন জার্মানীর হাতে সম্পূর্ণ পরাজিত এবং হিটলারের নিকট সন্ধিপ্রার্থী। কিন্তু সেই অবস্থাতেও ২১শে জুন হইতে ২৪শে জুনের মধ্যে মুসোলিনীর সেনাপতিরা ইতালী-ফরাসী সীমান্তে আক্রমণ চালাইয়া কোন ফললাভ করিতে পারিল না। বোধ হয় অতি কষ্টে ইতালীর সৈন্যরা ফরাসী রাজ্যের দুই তিন মাইল অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। কাউন্ট সিয়ানো তাঁর ডায়েরীতে লিখিয়াছেন, '২১শে জুন তারিখ মুসোলিনীকে অত্যন্ত অপদস্থ বলিয়া মনে হইল। কারণ, আমাদের সৈন্যরা এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারে নাই। এমন কি, আজও তারা অগ্রসর হইতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ, প্রথম ফরাসী দুর্গের মুখে কিছু বাধা পাওয়ায়, তাদের গতি রুদ্ধ হইয়াছে।' ৯ মাস অপেক্ষা করিবার পর মুমূর্ষু ফরাসীদের সহিত লড়িতে গিয়াও ইতালীর এই অবস্থা! তথাপি মুসোলিনী চাহিয়াছিলেন সমগ্র ফরাসী দেশ দখল করিতে ও সমগ্র ফরাসী নৌ-বহরের আত্মসমর্পণ দাবী করিতে! কিন্তু যুদ্ধটা বেহাৎ হিটলার জিতিয়া গেলেন. সুতরাং সন্ধিসর্তও হিটলারই আরোপ করিবেন। মুসোলিনী ইহাতে মর্মাহত। কারণ, রণক্ষেত্রে দীপ্ত গরিমা অর্জনের আজীবন যে স্বপ্ন তাঁর ছিল, তা এভাবে মিলাইয়া গেল। সুতরাং হিটলার, জার্মানী, ইতালীর সৈন্য ও জনগণ সকলের উপরেই তিনি বিরক্ত হইলেন।" ইহাই ইতালীর যুদ্ধ এবং মুসোলিনীর ব্যক্তিগত জিগীষার রূপ।(৬)

ফ্রান্সের আত্মসমর্পণ

১৪ই জুন প্যারিসের পতনের পর ফ্রান্সের প্রতিরোধ কার্যতঃ শেষ হইয়া গেল এবং দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনী তারপর পরাজিত, ছত্রভঙ্গ ও বিশৃঙ্খল ফরাসী সৈন্যদিগকে কেবল তাড়া করিতে লাগিল। পশ্চিম মধ্য ও পূর্ব ফ্রান্স—মোট ফরাসী রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ পোল্যাণ্ডের অনুরূপ তারা ছাইয়া ফেলিল। উত্তরে সমগ্র ইংলিস চ্যানেল উপকূল, পশ্চিমে শেরবুর্গ, ব্রেস্ট বন্দর ও নানটেস্ (অতলান্তিক মহাসমুদ্রের তীরে) এবং প্যারিস ছাড়াইয়া দক্ষিণবর্তী মধ্য ফ্রান্সের লয়ের নদী ও সেভার্ন (২৫শে জুন) পূর্বদিকে ডিজোন, লিয়ন্স ও সুইস সীমানা, আর ম্যাজিনো লাইন দ্বিখণ্ডিত ও দখল হইল মেৎস্ ও বেলফোর্টের মধ্যে (১৮ই জুন)। যে ভার্দুন দুর্গ বিগত মহাযুদ্ধের ১৯১৬ সালে ফরাসী দুর্জয় প্রতিরোধের বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা প্যারিসের পতনের পরদিন ১৫ই জুন প্রায় কয়েক ঘন্টার মধ্যেই দখল হইয়া গেল। বিদীর্ণ ও বিধ্বস্ত ফ্রান্স আত্মসমর্পণের বার্তা লইয়া হিটলারের দ্বারস্থ হইল। সমগ্র ফরাসী জাতি এবং সারা পৃথিবী স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হইয়া গেল।...

সামরিক বিপর্যয়ের আগেই ফ্রান্সের রাজনৈতিক বিপর্যয় সুরু হইয়াছিল এবং এক্ষণে রণক্ষেত্রে পরাজয় ফরাসী জাতির সর্বনাশ সম্পূর্ণ করিয়া তুলিল। ১০ই জুন মঃ রেনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের নিকট সাহায্যের জন্য করুণ আবেদন জানাইলেন। ১১ই জুন তিনি চার্চিলের নিকট প্রস্তাব করিলেন বৃটেনের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি হইতে ফ্রান্সকে মুক্তি দিতে, যে প্রতিশ্রুতির দ্বারা বৃটেন ও ফ্রান্স উভয়ে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, পরস্পরের সম্মতি ছাড়া জার্মানীর সহিত পৃথক কোন সন্ধি করা হইবে না এবং বৃটিশ গবর্নমেন্ট যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে এবং যথাসম্ভব সৈন্য ও সমরোপকরণ পাঠাইয়া সাহায্য দিতে প্রস্তুত হইলেন। ১৩ই জুন মঃ রেনো পুনরায় রুজভেল্টের নিকট আবেদন করিলেন, 'অজস্র রণবিমান পাঠাইয়া ইউরোপের দানবীয় শক্তিকে পরাভূত করিবার জন্য' সাহায্য করিতে। ১৫ই জুন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ফ্রান্সের এই ঘোরতর দুর্বিপাকে প্রভূত সহানুভূতি দেখাইয়া এবং 'যতদিন মিত্র গভর্নমেন্টসমূহ প্রতিরোধ করিবেন, ততদিন সাহায্য দানের' প্রতিশ্রুতি জানাইয়া টেলিগ্রাম করিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও জানাইলেন যে, সামরিক সাহায্য মঞ্জুরির অধিকার একমাত্র কংগ্রেসের।

১৬ই জুন ফরাসী সৈন্যদলের আর আশা রহিল না এবং লণ্ডনের কর্তৃপক্ষীয় মহলও এই অবস্থা অনুভব করিলেন। তথাপি মিঃ চার্চিল যুদ্ধ চালাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ফরাসী গভর্নমেন্টের নিকট আফ্রিকা ও সমুদ্র পারবর্তী ফরাসী সাম্রাজ্য হইতে হিটলারের বিরুদ্ধে লড়িবার পরামর্শ দিলেন। তিনি সরকারীভাবে এক চাঞ্চল্যকর নাটকীয় প্রস্তাব পেশ করিলেন, কিন্তু সামরিক অবস্থা আরও খারাপ হওয়াতে উহার দুই দিন আগে ১৪ই তারিখ টুর্স হইতে ফরাসী গভর্নমেন্ট বর্দোতে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। চার্চিলের এই চাঞ্চল্যকর প্রস্তাবের মর্ম ছিল এই যে, ফ্রান্স ও গ্রেটবৃটেন অতঃপর ইহাতে একটি মাত্র ফ্রাঙ্কো-বৃটিশ মিলিত রাষ্ট্রে পরিণত হইবে এবং ফরাসী ও ইংরাজ আর পৃথক দুটি জাতি বলিয়া পরিচিত হইবে না। তাঁরা একত্রে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনৈতিক বিলিব্যবস্থা ইত্যাদি পরিচালিত করিবেন। অতঃপর হইতে বৃটিশ ও ফরাসী জনগণ পরস্পরের প্রজা ও নাগরিকের পূর্ণ অধিকার পাইবেন। দুইটি পার্লামেন্টও একটি মাত্র আইনসভায় রূপান্তরিত হইবে এবং একটি মাত্র সমর মন্ত্রিসভা সমগ্র যুদ্ধ পরিচালনা করিবেন।

* 'The Second Great War' —vol 3 page 253-59

(৬) Ciano's Diary'—Page 265|66

জার্মানীর বিরুদ্ধে অব্যাহত যুদ্ধ পরিচালনায় চার্চিলের এই ঐতিহাসিক প্রস্তাব (যাহা আইনের ভাষায় 'অ্যাক্ট অফ ইউনিয়ন' নামে পরিচিত) একটা যুগান্তকারী রাজনৈতিক ঘটনার মত। ফরাসী মন্ত্রিসভায় এই প্রস্তাব লইয়া যথেষ্ট আলোচনা হইলে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহা প্রত্যাখ্যাত হইল * ফরাসী মন্ত্রিসভা ১৩-১১ ভোটে (বিরুদ্ধদলের ভোটসংখ্যা লক্ষ্য করিবার মত) অর্থাৎ দুইটি মাত্র ভোটাধিক্যে যুদ্ধবিরতির মারাত্মক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। যদিও প্রধানমন্ত্রী মঃ রেণো এবং তাঁর সমর্থক অন্যান্য মন্ত্রীরা ফ্রাঙ্কো-বৃটিশ মিলনের প্রস্তাব সমর্থন এবং যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু বিরোধীরা এই প্রস্তাবের প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন। মার্শাল পেঁতা প্রস্তাবটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিলেন না, বরং তাঁরা এর মধ্যে বৃটেনের অভিসন্ধি—অর্থাৎ বৃটেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য হাত করার কুমতলব পর্যন্ত আবিষ্কার করিলেন এবং অভিযোগ করিলেন যে, এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ফ্রান্স বৃটেনের আশ্রিত ও অধীন রাজ্যে পরিণত হইবে। জেনারেল ওয়াগাঁ মার্শাল পেতাঁকে বুঝাইলেন যে, হিটলার তিন সপ্তাহের মধ্যেই ইংলণ্ডকে মুর্গীর ছানার (চিকেন) মত ঘাড় মটকাইয়া মারিয়া ফেলিবে!' আর পেতাঁ স্বয়ং মন্তব্য করিলেন, বৃটেনের সহিত মিলনের অর্থ 'মৃত দেহের সঙ্গে মিলন'। আর একজন ফরাসী কূটনীতিবিদ বলিলেন, আমরা বরং নাৎসী প্রদেশে পরিণত হইব, তবু ইংলণ্ডের সঙ্গে যাইব না।

এভাবে ফরাসী মন্ত্রিসভা তোষণকামী এবং প্রচ্ছন্ন নাৎসী পক্ষপাতী সদস্যরাই জয়ী হইলেন। তখন প্রধানমন্ত্রী পল রেণোর শরীর ও মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—ক্রমাগত আঘাতে ও ক্লান্তিতে তিনি অবসন্ন। ঐ দিন রাত্রি ৮টায় তিনি ও তাঁর মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলেন। প্রেসিডেন্ট লেব্রাঁ মার্শাল পেতাঁকে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনে আহ্বান করিলেন। ৮৪ বৎসরের বৃদ্ধ মার্শাল পেতাঁ প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াই সরকারীভাবে হিটলারের নিকট যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাঠাইলেন স্পেনীয় রাজদূতের মারফৎ। হিটলার সম্মত হইলেন এবং ২২শে জুন ৬-৫০ মিনিটের সময় যুদ্ধবিরতির চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। আর ইতালীর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল ২৪শে জুন সন্ধ্যাবেলা। মাত্র দেড় মাসের যুদ্ধে সমগ্র পশ্চিম রণাঙ্গন ও তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র চুরমার হইয়া গেল, যেগুলির মধ্যে অন্ততঃ একটি ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তির অন্যতম।

কিন্তু এই চুক্তিপত্র যেখানে এবং যেভাবে স্বাক্ষরিত হইল তাহাও এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ২২ বৎসর আগে ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজিত জার্মানীকে মিত্রপক্ষের ফরাসী সর্বাধিনায়ক মার্শাল ফস্ যে কাম্পইন অরণ্যের যে রেলওয়ে কামরায় নির্দিষ্ট চেয়ারে বসিয়া চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত করিয়াছিলেন, হিটলার সেই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে সেই অরণ্য এবং সেই রেলওয়ে কামরার একই চেয়ার ও টেবিল (যাহা স্মৃতিচিহ্নরূপে সংরক্ষিত হইয়াছিল) ব্যবহার করিলেন। ২১শে জুন অপরাহ্ণ ৩টায় হিটলার সগৌরবে সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং ফিল্ডমার্শাল গোয়েরিং, জেনারেল কাইটেল, জেনারেল ব্রাউসিৎস, গ্রাণ্ড এডমিরাল রুয়েডার, ভন রিবেনট্রপ ও ডেপুটি ফুয়েরার রুডলফ্ হেস তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। জার্মান সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষরূপে কাইটেল যুদ্ধবিরতির ভূমিকা পড়িয়া শুনাইলেন এবং বলিলেন যে, বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিয়া ফ্রান্স একটি মাত্র শোণিতস্রাবী যুদ্ধেই পরাজিত হইয়াছে। সুতরাং এই প্রকার বীর প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধবিরতির চুক্তিকে তাঁরা কোন 'লজ্জাকর রূপ' দিতে ইচ্ছুক নহেন। (কিন্তু স্বাক্ষরিত চুক্তিতে এই ঔদার্যের কোন প্রমাণ নাই।) পরদিন ২২শে জুন ফ্রান্সের পক্ষ হইতে জেনারেল হান্টিজার এবং জার্মানীর পক্ষ হইতে জেনারেল কাইটেল চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত করিলেন।

আত্মসমর্পণের চুক্তি অনুসারে জার্মানী সমগ্র ফ্রান্সের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দখল করিল। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের স্পেনীয় সীমান্ত হইতে টুর্স পর্যন্ত এবং টুর্স হইতে পূর্ব দিকে জেনেভা (সুইজারল্যাণ্ড) পর্যন্ত রেখা টানিলে উপরের দিকে যে সমগ্র অংশ পাওয়া যায়, তাহাই জার্মানীর দখলে গেল। অর্থাৎ জার্মানী ফ্রান্সের প্রায় সমস্ত শ্রমশিল্প ও কৃষিতে উর্বর এলাকা ইংলিশ চ্যানেল ও আতলান্তিক মহাসমুদ্রের সমগ্র উপকূল ও বন্দর এবং ১৭টি প্রধান নগরীর ১০টি দখল করিল। ৪ কোটি ২০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ফরাসী জার্মান শাসনের অধীনে গেল। প্রাকযুদ্ধকালীন ফ্রান্সের [illegible] শতকরা ৯০ ভাগ, বীটের ৯০ ভাগ, কয়লার ৬৬ ভাগ এবং গমের ৫০ ভাগ জার্মানীর অধিকারে গেল। ফ্রান্স দখলের ব্যয়স্বরূপ জার্মানীকে দৈনিক ৮০ লক্ষ ডলার (অংকটা লক্ষ্য করিবার মত) করিয়া দিতে হইবে এবং সমস্ত জার্মান যুদ্ধবন্দী এবং নাৎসী-বিরোধী যে সমস্ত জার্মান ফ্রান্সে বা তাঁর সাম্রাজ্যে আশ্রয়প্রার্থীরূপে অবস্থান করিতেছে, তাদের সকলকে জার্মানীর হাতে সমর্পণ করিতে হইবে। নিঃসন্দেহে এমন সর্ত রাষ্ট্রিক মর্যাদার ও অধিকারের বিরোধী। সুতরাং জেনারেল ওয়েগাঁর মত পরাজয়বাদী নেতাও আপত্তি করিলেন, কিন্তু আলোচনার সময় জেনারেল কাইটেল চীৎকার করিয়া বলিলেন—"ওরাই জার্মান জনগণের প্রতি সবচেয়ে বেশী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, ওদের ফেরৎ দিতেই হইবে।'

এই সমস্ত সর্তের জামীনস্বরূপ হিটলার সমস্ত ফরাসী যুদ্ধবন্দীকে (যাঁদের সংখ্যা ১৫ লক্ষ হইবে) নিজের হাতে রাখিয়া দিলেন। অধিকৃত ফ্রান্সের সমগ্র সামরিক সম্ভার ও দুর্গ ইত্যাদিও জার্মানীর হাতে গেল। স্বাক্ষরিত চুক্তির মধ্যে ফরাসী নৌবহর সংক্রান্ত চুক্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই নৌবহর পৃথিবীর অন্যতম সেরা বা চতুর্থ শীর্ষস্থানীয় নৌবহর ছিল। চার্চিল এই নৌবহরের পরিণাম নিয়া অত্যন্ত দুর্ভাবনাগ্রস্ত ছিলেন। কেননা, এই নৌবহরের সঙ্গে যদি ইতালী ও জাপান বা অক্ষশক্তিবর্গের নৌশক্তি একত্রিত হয়, তবে ইংলণ্ডের সমূহ বিপদ ঘটিবে। সুতরাং চার্চিল ফরাসী নৌবহরের প্রধান কর্তা এডমিরাল দারলাঁ এবং ফরাসী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অনেকটা প্যাঁচ কষিয়াছিলেন এই নৌবহর বৃটেনের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে আনিবার জন্য। কিন্তু হিটলারও কম ঘুঘু ছিলেন না, তিনি কিছুতেই এটা ঘটিতে দিলেন না এবং ফরাসী নৌবহর সম্পর্কে এই চুক্তি হইল যে, ফরাসী বন্দরে এগুলিকে ফিরাইয়া আনা হইবে। তবে, জার্মানী ব ইতালী কেহই এগুলিকে ব্যবহার করিতে পারিবে না—অবশ্য নৌবহরগুলিকে নিরস্ত্রীকৃত করা হইবে।

(এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ফরাসী নৌবহর সংক্রান্ত এই চুক্তি নাৎসী জার্মান ভঙ্গ করে নাই। একথা চার্চিলও স্বীকা করিয়াছেন।)

ইতালীর ডুচে মুসোলিনীর খুব স ছিল যে, তিনিও হিটলারের সঙ্গে এক ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের দলীলে যৌ স্বাক্ষরের 'গৌরব' অর্জন করিবেন। কি মুসোলিনীর কপাল মন্দ, হিটলার রা হইলেন না এবং ইতালীর সঙ্গে ফ্রান্সে পৃথক চুক্তি স্বাক্ষরের কোন উল্লেখযো ঘটনাও ছিল না।

কিন্তু একথা নিঃসন্দেহ যে, জার্মান সঙ্গে স্বাক্ষরিত ফ্রান্সের এই আত্মসমর্প দলীল অত্যন্ত কঠোর ছিল। কিন্তু বি প্রথম মহাযুদ্ধের বীর মার্শাল পেতাঁ হীন আত্মসমর্পণ স্বীকার করিয়া ি ঘোষণা করিলেন : 'Honour has be saved!' অর্থাৎ 'সম্মান বাঁচিয়াছে।'

(ক্রম

* বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ছিল না। ১৬ই মে চার্চিল অতিরিক্ত ৬ স্কোয়াড্রন জঙ্গী বিমানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, ফ্রান্সে তাহা পৌঁছে নাই। —লেখক

বিজ্ঞানের কথা

অ্যাপোলো—১৫

তিন বারের পর চার বার। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারির পরেই আবার ুলাই-এ। তিনজন নভশ্চরকে নিয়ে াপোলো ব্যোমযান আবার যাত্রা করেছে াঁদের দিকে। সব যদি ঠিক থাকে তাহলে ই লেখা যেদিন প্রকাশিত হবে, ার আগেই নভশ্চর জেমস আর- উন ও নভশ্চর ডেভিড চন্দ্রযানে চড়ে াঁদের মাটিতে নামবেন আর অপর নভশ্চর ালফ্রেড ওয়াডেন মূল ব্যোমযানে থেকে েবেন এবং চাঁদের কক্ষে পরিক্রমা করে বেন। রওনা হওয়া ও চাঁদের মাটিতে বতরণ করার ব্যাপারগুলো অ্যাপোলো- ১, অ্যাপোলো-১২ ও অ্যাপোলো-১৪ িযানগুলোতে যেমন যেমন ঘটেছিল, বারকার অ্যাপোলো-১৫ অভিযানেও তার য়ে অন্যরকম কিছু নয়। তবে একটি াপারে অ্যাপোলো-১৪ অভিযানের চেয়ে াপোলো-১৫ অভিযান নির্বিঘ্নে হয়েছে। হচ্ছে তৃতীয় পর্যায়ের রকেট চালু করে দের দিকে রওনা হবার পরে মূলযানের ঙ্গ চন্দ্রযানের জোড়া লাগাবার ব্যাপারটি। াপোলো-১৪ অভিযানে ছ-বারের চেষ্টায় াড়া লাগানো গিয়েছিল (প্রথম ঁচবারের চেষ্টা কেন সকল হয়নি তার রণ কিন্তু জানা যায়নি)। অ্যাপোলো-১৫ ভযানে একবারের বেশি চেষ্টা করতে ানি।

অ্যাপোলো-১৫ অভিযানে চাঁদের নতুন টি এলাকাকে লক্ষ্যস্থল করা হয়েছে। াপোলো-১১, ১২ ও ১৪ অভিযানে শ্চররা নেমেছিলেন চাঁদের বিষুবরেখার াছাকাছি এলাকায় (একশো মাইলের য়)। অ্যাপোলো-১৫ অভিযানের শ্চরদের নামার কথা বিষুবরেখা থেকে েরা অনেক উত্তরে (প্রায় পাঁচশো ইল)। জায়গাটি আপেনাইন ও হ্যাড্‌লি ি-এর মাঝখানে, আপেনাইন হচ্ছে টি পর্বতমালা আর হ্যাড্‌লি হচ্ছে চাঁদের মাটিতে শুকনো র মতো গভীর একটি খাদ।

এবারকার অভিযানের আরো বৈশিষ্ট্য ছ। চাঁদের মাটিতে নভশ্চরদের পায়ে টে ঘুরে বেড়াতে হবে না। তাঁদের সঙ্গে ছে জীপের মতো দেখতে একটি ংচলমান যান, নাম 'রোভার'। এই টির বেগ ঘন্টায় প্রায় ১৩ কিলো- ার। এই যানে চেপে নভশ্চররা হ্যাড্‌লি পার্বত্য এলাকায় তিনটি চক্কর দেবেন। র পার্বত্য এলাকায় পাড়ি দেবার যোগী করে তৈরী এই যানটি ৭৫

অ্যাপোলো-১৫ অভিযানের নভশ্চররা এবারে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন একটি স্বয়ংচলমান যান 'রোভার'। চাঁদের মাটিতে এই যানটির তিনটি চক্কর দেবার কথা আছে। ছবিতে এই তিনটি চক্কর দেখানো হয়েছে। চক্করের পথে যে সংখ্যাচিহ্নগুলো রয়েছে সেগুলো রোভারের থামবার জায়গা। নভশ্চররা এই জায়গাগুলো থেকে নমুনা সংগ্রহ করবেন ও পরীক্ষানিরীক্ষা চালাবেন।
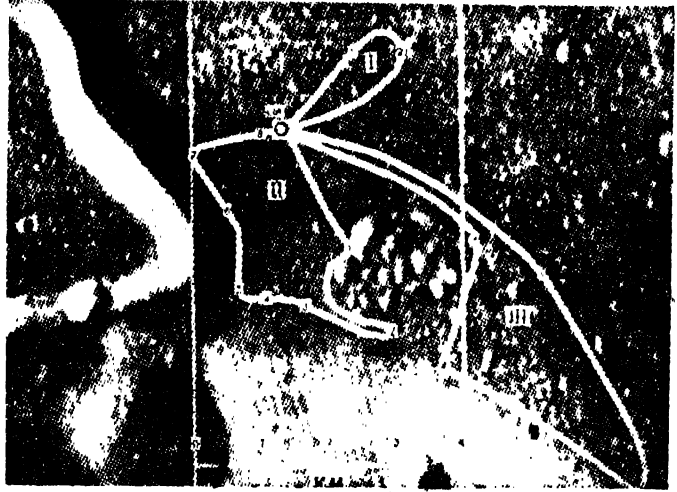
কিলোমিটার পর্যন্ত চলতে পারবে, ব্যাটারি চালিত, প্রায় তিন মিটার লম্বা। সঙ্গের একটি ছবিতে নভশ্চরদের তিনটি চক্কর দেখানো হয়েছে। ইংরেজি অক্ষরে এল-এম লেখা জায়গায় চন্দ্রযান অবতরণ করেছে। সেখান থেকে প্রথম চক্করটি খুবই ছোট এলাকায়, দ্বিতীয়টি আরো বড়ো, তৃতীয়টি আরো আরো বড়ো। প্রতি চক্করে রোভারের থামার জায়গাগুলো সংখ্যাচিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে। প্রথম চক্করে থামছে দু-বার, দ্বিতীয় চক্করে আট-বার, তৃতীয় চক্করে পাঁচবার। যতোবার থামছে, নভশ্চররা পাথরের নমুনা সংগ্রহ করছেন ও নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছেন।

এবারের অভিযানে নভশ্চরদের চাঁদের মাটিতে সময় কাটাবার কথা ৬৭ ঘন্টা— অ্যাপোলো-১৪ অভিযানের চেয়ে দ্বিগুণ। এটি অবশ্যই একটি রেকর্ড হবে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, এবারের অভিযানে চাঁদের এমন এক এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে আনা হচ্ছে যার ফলে হয়তো চাঁদের জন্ম সম্পর্কে অনেক জরুরি সূত্র জানা যাবে।

ভবিষ্যতের মহাকাশ-অভিযান

অ্যাপোলো পর্যায়ের অভিযান আগামী দু-বছর ধরে চলবে। চাঁদের উপরিতলের অন্যান্য এলাকা সম্পর্কে জানার চেষ্টা হবে এবং আরও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা চলতে থাকবে।

ন্যাসা (ন্যাশনাল এরোনটিক্স এন্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ-গবেষণা এই সংস্থাটির পরিচালনায় হয়ে থাকে) থেকে ভবিষ্যতের যে-সব পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছে তাতে দেখা যায়, শুধু চাঁদ নয় সৌরমন্ডলের অন্যান্য গ্রহেও পর্যবেক্ষণমূলক অভিযান অদূর ভবিষ্যতেই শুরু হতে চলেছে। আগামী দু-বছরের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় ব্যোমযান রওনা হবে মঙ্গলগ্রহকে ঘিরে পাক খাবার জন্যে এবং এই গ্রহ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবার জন্য। স্বয়ংক্রিয় ব্যোমযান রওনা হবে বুধ ও শুক্রগ্রহের উদ্দেশেও এবং এই দুটি গ্রহের খুব কাছাকাছি এলাকা দিয়ে পার হবে। একটি মনুষ্যহীন ব্যোমযান মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করতে চলেছে ১৯৭৫ সালে। পরবর্তী বছরগুলোতে ব্যোমযান রওনা হবে বাইরের দিকের গ্রহগুলোকে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে, এক-এক বারে একটি করে নয়, এক অভিযানে সবকটিকে। অর্থাৎ বাইরের দিকের সবকটি গ্রহের কাছাকাছি এলাকা দিয়ে একটি ব্যোমযানই পার হয়ে যাবে ও তথ্যসংগ্রহ করবে। ১৯৭৬ সালের কথা ধরা যাক। এ-বছরে একটি মহাকাশ-অভিযান শুরু হবার কথা বৃহস্পতিগ্রহের দিকে এবং সম্ভবত বৃহস্পতি ছাড়িয়ে শনি ও প্লুটোর দিকে। ১৯৭৯ সালে স্বয়ংক্রিয় ব্যোমযান পর্যটন করবে বৃহস্পতি, ইউরেনাস ও নেপচুনের এলাকা। বলা বাহুল্য, অনেক বছর ধরে চলবে এই অভিযানগুলো। ১৯৭৯ সালে যে ব্যোমযানটির রওনা হবার কথা সেটির নেপচুনে পৌঁছতে সময় লাগবে দশ বছর। অর্থাৎ সেই ১৯৮৯ সালে। তারপরে আর ফিরে আসার কোনো প্রশ্ন নেই। নেপচুনের পাশ কাটিয়ে ব্যোমযানটি চলে যাবে মহাশূন্যে।

মহাকাশ-অভিযানের ক্ষেত্রে আরো একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই হতে চলেছে। সকলেই জানেন, কৃত্রিম উপগ্রহই হোক বা ব্যোমযানই হোক, তাদের পৃথিবীর মাটি থেকে উৎক্ষেপণের জন্যে রকেট ব্যবহার করতে

হয়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক রকেট। এই রকেটটি আর ফিরে আসে না। আজ পর্যন্ত যে অজস্র কৃত্রিম উপগ্রহ ও ব্যোমযান পৃথিবীর মাটি থেকে আকাশে উঠেছে, প্রত্যেকটির জন্যে ব্যবস্থা করতে হয়েছে নিজস্ব এক-একটি রকেটের। অ্যাপোলো-১৫ অভিযানের জন্যে যে প্রচণ্ড শক্তিশালী স্যাটার্ন-৫ রকেটটি ব্যবহার করা হয়েছে, তৃতীয় পর্যায়ের জ্বালানী শেষ হবার পরে তার কাজও শেষ। সেটি দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা যাবে এমন কোনো সম্ভাবনা নেই। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে একটি মোটরগাড়ি বা একটি এরোপ্লেন প্রথমবারের যাত্রাশেষে বাতিল করার মতো। মহাকাশ-অভিযানের বিপুল খরচের মূলে এটি একটি কারণ—প্রত্যেক বারে পৃথক পৃথক রকেট ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা। খরচের বিপুলতা সম্পর্কে ধারণা হতে পারে যদি বলি ১৯৬৬ সালে ন্যাসার বাৎসরিক বরাদ্দ ছিল ৫৯০ কোটি ডলার (৪৪২৫ কোটি টাকা)। পরবর্তী বছরগুলোতে খরচ অবশ্য কিছুটা কমানো হয়েছে। যাই হোক, মার্কিন বিজ্ঞানীরা গত বছরের গোড়া থেকেই বারবার ব্যবহার করা যায় এমন এক ধরনের ফেরী-রকেট তৈরি করার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। ফেরী-রকেট বলতে এমন একটি ব্যবস্থা যার সাহায্যে পৃথিবীর মাটি থেকে পৃথিবীর কক্ষপথের একটি স্টেশনে বারবার যাতায়াত করা চলবে। ফেরী-রকেটটি পৃথিবীর মাটি থেকে খাড়া আকাশে উঠবে, পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত হবে, আবার ফিরতি রকেট চালু করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে. তারপরে অনেকটা এরোপ্লেনের মতো মাটিতে নেমে আসবে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা যে ফেরি-রকেট নিয়ে কাজ করছেন তা অন্তত একশোবার এমনি যাতায়াত করতে পারবে বলে তাঁরা আশা করছেন।

অনুমান করা চলে, ফেরি-রকেট চালু হবার পরে মহাকাশ-অভিযানের ব্যাপারটি যেমন হবে অনেক কম খরচের, তেমনি অনেক সুবিধেরও। তখন আর চাঁদে অভিযান করতে হলে পৃথিবীর মাটি থেকে সরাসরি যাত্রা করার প্রয়োজন থাকবে না। যাত্রা শুরু হবে পৃথিবীর কক্ষপথের একটি স্টেশন থেকে। অ্যাপোলো-১৫ ব্যোমযানটিও প্রথমে উঠে এসেছিল পৃথিবীর একটি কক্ষপথে এবং প্রায় তিন ঘণ্টা সময় সেই কক্ষপথে অবস্থান করার পরে পুনরায় রকেট চালু করে চাঁদের দিকে যাত্রা করেছে। ফেরি-রকেটের ব্যবস্থা চালু হবার পরে ব্যোমযানটি যাত্রা শুরু করবে এই কক্ষপথ থেকেই, তার আগে যাত্রার জন্যে তৈরি হয়ে এই কক্ষপথেই অপেক্ষা করবে। আবার চাঁদের দেশে পেঁৗছে ব্যোমযানটি থেকে যাবে চাঁদের কক্ষে, চাঁদের মাটিতে নামবে চন্দ্রযান। তেমনি চাঁদের মাটি থেকে উঠে এসে চন্দ্রযান থেকে যাবে চাঁদের কক্ষে, পৃথিবীর দিকে রওনা হবে ব্যোমযান। পৃথিবীতে পেঁৗছে ব্যোমযানটি থেকে যাবে পৃথিবীর কক্ষে, প্রয়োজনীয় মালপত্র সমেত নভশ্চররা পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসবেন ফেরি-রকেটে। এই ব্যবস্থায় কোনো পর্যায়েই কোনো কিছু বাতিল করতে হচ্ছে না। একই ফেরি-রকেট, একই ব্যোমযান, একই চন্দ্রযান (এটিও চাঁদে নামা ও চাঁদ থেকে ওঠার জন্যে এক জাতীয় ফেরি-রকেট) বারবার ব্যবহার করা যাচ্ছে। ব্যবস্থাটা পুরোপুরি চালু হবার পরে (আশা করা যাচ্ছে এই দশকের মধ্যেই) চাঁদে একবার ঘুরে আসা, নিদেনপক্ষে পৃথিবীর কক্ষপথের একটি স্টেশনে কয়েকদিন কাটিয়ে আসা খুব একটা শক্ত ব্যাপার হবে না। কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলছেন, বর্তমান শতক শেষ হবার আগেই, চাই কি, চাঁদে পুরোদস্তুর একটি উপনিবেশেরও পত্তন হয়ে যেতে পারে। মাত্র পনেরো বছরের মধ্যে নভশ্চারণবিদ্যার যে আশ্চর্য অগ্রগতি হয়েছে তা মনে রাখলে স্বীকার করতে হয়, আগামী পনেরো বছরের মধ্যেই (শতক শেষ হতে এখনো উনত্রিশ বছর বাকি) যা ঘটতে চলেছে তা হয়তো এখন আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

তবে একটা কথা আছে। ধরে নেওয়া গেল মহাকাশে যাতায়াত করার যান্ত্রিক আয়োজনটি সুসম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর এই মাধ্যাকর্ষণে বন্দী মানুষের পক্ষে কতদিন মহাশূন্যের ভরহীন অবস্থায় কাটানো সম্ভব? আবার ব্যাপারটা তো শুধু ভরের নয় (মহাশূন্যেও কৃত্রিম উপায়ে ভর সৃষ্টি করা চলে), পৃথিবীর এই বায়ুমণ্ডল মহাশূন্যের বহু প্রাণঘাতী বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করে (বায়ুমণ্ডলকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা আছি এই সমুদ্রের একেবারে তলদেশে—ছুটন্ত উল্কা, তেজস্ক্রিয় রশ্মি, অতিবেগুণী রশ্মি ইত্যাদি অনেক কিছুর নাগালের বাইরে), বাইরের অবাধ এলাকায় আমাদের প্রাণ বাঁচবে তো? মার্কিন বিজ্ঞানীদের ১৯৭৩ সালের 'স্কাইল্যাব' এই বিশেষ দিকেই বিশেষ গবেষণা।

সোভিয়েত 'সালিয়ুৎ'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কিনী স্কাইল্যাবের কথা বিজ্ঞানের কথায় পাঠকদের কাছে আগের একটি সংখ্যায় বলেছি। সালিয়ুৎ-এর গবেষণাও ছিল একই উদ্দেশ্যে—মহাশূন্যের ভরহীন অবস্থায় দীর্ঘকাল কাটানো মানুষের শরীরের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর, কিংবা আদৌ ক্ষতিকর কিনা (সালিয়ুৎ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী তিনজন সোভিয়েত নভশ্চরের মৃত্যু, বস্তোদের জানা গিয়েছে, টেক্‌নিকাল কারণে)।

পরিকল্পনা অনুসারে, স্কাইল্যাবে নভশ্চররা ২৮ দিন থেকে ৫৬ দিন পর্যন্ত কাটিয়ে আসবেন। এই নভশ্চরদের পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা জানতে পারবেন মহাশূন্যের ভরহীন অবস্থায় দীর্ঘকাল কাটিয়ে আসার প্রতিক্রিয়া শরীরের দিক থেকে ও মনের দিক থেকে কী প্রকার। স্কাইল্যাবে থাকার সময়ে নভশ্চররা অবশ্যই নানা পরীক্ষানিরীক্ষাও চালাবেন এবং উন্নত ধরনের দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করবেন।

মহাকাশগবেষণার আরো একটি বিরাট দিকে রয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহ দিয়ে নানা-রকমের কাজ সম্পাদন। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আবহাওয়ার খবরাখবর অনেক আগে থেকে ও অনেক সঠিকভাবে পাওয়া সম্ভব তার দৃষ্টান্ত আগেই পাওয়া গিয়েছে। তবে ১৯৭২ সালে মার্কিন বিজ্ঞানীরা আরেকটি নতুন ধরনের উপগ্রহ স্থাপন করবেন যার উদ্দেশ্য হবে এই পৃথিবীকেই পর্যবেক্ষণ করা ও পৃথিবীর সম্পদ সম্পর্কে খবরাখবর দেওয়া। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়েও এই অনুসন্ধান চলতে পারে, বা এমনকি বিমান থেকেও। ১৯৭২ সালে একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর সম্পদের অনুসন্ধানে ফললাভ কতখানি।

তবে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে বেতার ও টেলিভিশন প্রচার যে কতখানি উন্নত হয়ে উঠতে পারে তার দৃষ্টান্ত তো ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৬৯ সালে আর্মস্ট্রং ও আলড্রিন যখন চাঁদের মাটিতে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন তখন সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ টেলিভিশনে তা দেখার সুযোগ পেয়েছিল। তারপরে আরো দু-বার চাঁদের মাটিতে পৃথিবীর মানুষের প্রত্যেকটি পদক্ষেপের ছবি টেলিভিশন মারফৎ সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে পেঁৗছেছে। এবারও পেঁৗছবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের একটি চুক্তি হয়েছে যে একটি কৃত্রিম উপগ্রহের মারফৎ (অ্যাডভান্সড্ টেক্‌নোলজি স্যাটেলাইট বা এ টি এস) ভারতের ৫,০০০ গ্রামে ভারত গভর্ণমেন্ট রচিত শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম প্রচার করা হবে।

সব মিলিয়ে বর্তমান দশকটি মহাকাশ-গবেষণা ও নভশ্চারণার ক্ষেত্রে বিরাট এক সম্ভাবনা নিয়ে শুরু হয়েছে, বলা চলে। ১৯৮০ সালটি এখন কল্পনা করাও শক্ত।

নিউটন সম্পর্কে কীন্‌স

জন মেনার্ড কীন্‌স-কে বলা হয় বর্তমান শতকের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ। ১৯৪৬ সালের এপ্রিলে তিনি মারা গিয়েছেন, তার পঁচিশ বছর পরে লণ্ডনের রয়েল ইকনমিক সোসাইটি তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে 'জন মেনার্ড কীন্‌স-এর রচনা-সংগ্রহ' প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। এ-পর্যন্ত চারটি খণ্ড (১, ২, ১৫, ১৬) প্রকাশিত হয়েছে। টাইমস লিটারেরি সাপ্লিমেন্ট-এর (২রা জুলাই, ১৯৭১) সমালোচনা থেকে জানা যায় যে অর্থনীতি ছাড়াও অন্য বহু বিষয়ে কীন্‌স লিখে গিয়েছেন: দৃষ্টান্ত হিসেবে এই সমালোচনায় নিউটন সম্পর্কে কীন্‌স-

এর একটি লেখা থেকে উধ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

এই চমৎকার লেখাটির নাম 'মানুষ নিউটন'। নিউটনকে কীন্‌স বলছেন "কেম্ব্রিজের শ্রেষ্ঠ সন্তান"। কীন্‌স-এর এই উক্তি অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু তাঁর মতে, নিউটন আধুনিক যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানীদের প্রথমতম নন, বরং মধ্যযুগীয় অ্যালকেমিস্ট ও 'যাদুকরদের শেষতম'। নিউটন হচ্ছেন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এমন এক শিশু যার ওপরে আন্তরিক ও যথাযোগ্যভাবেই ঐন্দ্রজালিকের কৃপাবর্ষণ হতে পারে। ঝুঁকি নিয়ে তিনি কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হন নি, ঝড়ঝাপটায় বিপন্ন নন, লক্ষ্মীর বরপুত্র থেকেই মারা গিয়েছেন। "বুদ্ধিবৃত্তির প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাঁর অর্জন ছিল অসাধারণ মাত্রার—তিনি যতো বড়ো গণিতবিদ পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন তার চেয়ে কম বড়ো আইনবিদ ইতিহাসবিদ ও ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন না।"

কীন্‌স বলছেন, "আমার বিশ্বাস, নিউটন কোনো একটি সমস্যাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাঁর মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারতেন, যতোক্ষণ না সেই সমস্যার রহস্য তাঁর কাছে ধরা পড়ত। এবং যেহেতু তিনি ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় গাণিতিক কারিগর—জনসমক্ষে উপস্থিত করার জন্যে তারপরে সেটির গায়ে, যেমনটি দরকার তেমনটি, পোশাক চড়াতে পারতেন। এক্ষেত্রে তাঁর ইনটিউইশন বা স্বজ্ঞা ছিল মাত্রাতিরিক্ত রকমের অসাধারণ—দ্য মর্গান বলছেন, 'নিজের অনুমান নিয়েই এমন ভরপুর থাকতেন যে মনে হত প্রমাণ করার উপায় যতোখানি তাঁর আয়ত্তে আসার সম্ভাবনা তার চেয়েও বেশি জানেন।' যে কথা আমি বলেছি, হিসেবমতো ও দরকারমতো প্রমাণগুলো তিনি সাজিয়ে তুলতেন পরে—আবিষ্কারের হাতিয়ার সেগুলো হত না। গ্রন্থের গতি সম্পর্কে তাঁর একটি সবচেয়ে মূলগত আবিষ্কার সম্পর্কে হ্যালি-কে তিনি কিভাবে জানিয়েছিলেন সে-সম্পর্কে একটি গল্প আছে। হ্যালি জবাব দিয়েছিলেন, 'তা বেশ, কিন্তু আপনি কি করে এটা জানলেন? আপনি কি এটা প্রমাণ করতে পেরেছেন?' নিউটন থতমত খেয়ে গিয়ে বললেন, 'তা কেন, আমি এটা কয়েক বছর ধরেই জেনে এসেছি। আপনি আমাকে কয়েকটা দিন সময় দিন, এটার প্রমাণ আমি নিশ্চয়ই আপনার কাছে হাজির করব।' এবং হাজির তিনি করেছিলেন যথাসময়েই।"

—অয়স্কান্ত

অঙ্গনা

অন্য জগৎ

মিসিসিপি ও লুইসিয়ানার সীমানা-নির্ধারণের সময় প্রেসিডেণ্ট থিয়োডোর রুজভেল্ট একদিন ভালুক শিকারে বেরোলেন। সঙ্গী একদল সাংবাদিক। শিকার মিলতে দেরি হলো না। একেবারে নাগালের মধ্যে। সবাই ভাবছেন যে এক্ষুনি প্রেসিডেণ্ট ট্রিগার টিপবেন আর ভালুকটা লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু সকলকে চমকে দিয়ে তিনি বন্দুক নামিয়ে নিলেন। ভীত সন্ত্রস্ত ভালুক পালিয়ে বাঁচলো।

সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন ওয়াশিংটন স্টারের কার্টুনিস্ট। তিনি রুজভেল্টের এই মহানুভবতার দৃশ্যটি অমর করে রাখতে চাইলেন। এই কার্টুনিস্টের তুলিতে ধরা পড়লো সেই বিখ্যাত 'টেডি ভালুক'—ভীত শাবকের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে।

পৃথিবীর সর্বত্রই কার্টুনটির ব্যাপক প্রচার হয়েছিল। খেলনাপ্রস্তুতকারকরা এর দ্বারা বিশেষ উৎসাহিত হয়েছিলেন। তাঁদের কল্পনার নতুন দিগন্ত প্রসারে কার্টুনটির অবদান অসামান্য। একজন এই কার্টুনটি নিয়ে গেলেন মার্গারেট স্টেইফের কাছে। তিনি ছিলেন জার্মানীর এক নামকরা খেলনাপ্রস্তুতকারক। ইউরোপ-আমেরিকার খেলনাপ্রস্তুতকারকদের মধ্যে তখন তাঁর বেশ নামডাক। সেসব দেশে তাঁর খেলনার যথেষ্ট সমাদর।

এই প্রতিষ্ঠান শুরু করেন ফ্রাউ স্টেইফে। বছর-আড়াই বয়সের সময় পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শারীরিক দিক থেকে অকর্মণ্য হয়ে পড়েন। আঘাত প্রচণ্ড হলেও তিনি ভেঙে পড়েননি। অক্ষমতাকে স্বীকৃতি না দিয়ে তিনি হুইল-চেয়ারে বসে কাজ শিখতে থাকেন। অবসর সময়ে রং-বেরং-এর কাপড় দিয়ে মজার মজার খেলনা তৈরি করা ছিল তাঁর একটা নেশা। তাঁর প্রত্যেকটি খেলনাই উৎসাহীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং তিনি ক্রমেই বেশ বিখ্যাত হয়ে পড়েন। ফলে অচিরেই ব্যবসাটি চালু হয়ে গেল। এমনিভাবে শারীরিক ক্ষেত্রে মার খেয়েও স্বক্ষেত্রে প্রতিভায় হয়ে রইলেন প্রায় রূপকথার সামিল।

তিনি মারা গেলে শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসেন মার্গারেট। খেলনার জগতে মার্গারেট এক বিরাট কৃতিত্বের অধিকারী। সেই বিখ্যাত কার্টুনটি পেতেই নতুন নতুন খেলনার হাজার ভাবনা তাঁর মাথায় ভিড় করে এলো। সব ভাবনা আস্তে আস্তে থিতিয়ে আসতে যে-ভাবনাটি রয়ে গেল, তা থেকে রূপ নিল 'টেডি ভালুক'। আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে টেডি ভালুক অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। বেস্ট খেলার লিস্টে তখন টেডির আধিপত্য দ্বিতীয়রহিত। খেলনাটির এই জনপ্রিয়তা এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। পাশাপাশি মার্গারেটের আর যে খেলনাগুলি শিশুচিত্ত জুড়ে রয়েছে, তা হলো জাম্বো দি এলিফ্যাণ্ট, স্নবি দি পোডল, স্নো দি ট্রুবল এবং লোজি দি রিনোসারোজ। এছাড়াও রয়েছে ডজনখানেক অন্যান্য খেলনা পুতুল। বিশ্বজোড়া যাদের বিরাট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি।

পুতুলের ব্যাপারে জার্মানীর নুরেমবার্গ শহরের ঐতিহাসিক খ্যাতি আছে। চতুর্দশ লুই তাঁর চার বছরের ছেলেকে পুতুলের সেনাবাহিনী দিয়ে চমকে দিতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি তাঁর যুদ্ধমন্ত্রীকে প্রথমেই নুরেমবার্গে পাঠান।

ব্ধমন্ত্রী যে-পত্তুলের সেনাবাহিনী সংগ্রহ করেন তারা সকলেই ছিল অটোমেটিক কায়দায় সুসজ্জিত। শতাব্দী পরেও নুরেমবার্গের এই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ আছে। এবং বর্তমানে সেখানকার 'টিন সোলজার্স' ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রেখেছে। বিশ শতকে খেলনা সম্পর্কে জটিলতর ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। বড়দের কাছে পত্তুলের অর্থই গেছে পালটে। তবে পত্তুলের সঙ্গী অর্থাৎ শিশুরা এসম্পর্কে মাথা ঘামায় না বলেই বাঁচোয়া। এজন্যই আজকাল জার্মান পত্তুলশিল্পে অনেক সাইকোলজিস্টের সমাবেশ ঘটেছে। নির্মাতারা এসব সাইকোলজিস্টের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। এরই মধ্যে এক ধরনের লুডোর জনপ্রিয়তা কিন্তু আজো অক্ষুণ্ণ আছে। তবু লুডো-নির্মাতাদের ভাবনা যে এই খেলনারও পরিবর্তন হতে পারে। তাই তাঁরা আগে থেকেই এসম্বন্ধে সতর্ক হয়েছেন। পুরনো জার্মান দুর্গগুলি ঘুরে নতুন খেলা চালু করার উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি ঘুরতে বেরোন। ঘুরতে ঘুরতে ব্যাভিরিয়ার এক দুর্গে একটি চিত্র দেখে তিনি থমকে দাঁড়ান। একটা টেবিলে কয়েকজন লোক বসে খেলছে। এটা হচ্ছে সেকালের টেবিল গেম। ভদ্রলোক হৃষ্টচিত্তে ফিরে এলেন। তারপর 'কনফারেন্স' নাম দিয়ে খেলনাটি বাজারে ছাড়লেন। সংগে সংগে বাজার মাৎ। দোকানে ভিড় আর ধরে না। অবশেষে খেলনাটির রেশন করতে হয়।

পুরনো মডেলের গাড়ি যেমন অচল তেমনি হাল সেকেলে খেলনা-পত্তুলের। একটি খেলনাগাড়ি বিক্রি করতে হলে তার লাইট, হর্ণ এবং মেকানিকের দিক থেকে আধুনিক হতে হবে। আমেরিকা অনুপ্রাণিত এবং জাপানে প্রস্তুত বার্বী ডল এখন বাজার জাঁকিয়ে বসেছে। আবার রুচির পরিবর্তনের ফলে কিছু পত্তুল আবার জনপ্রিয়তাও হারিয়েছে। কাঠের পত্তুল সম্পর্কে নতুন করে আগ্রহ বেড়েছে। আবার শিক্ষাগত খেলনা, যেমন 'কেমিস্ট্রি সেট' শিশুদের বেশ প্রিয়। ইদানীং টয়-সোলজার অপেক্ষা কাউবয় এবং ভারতীয় পত্তুলের জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

ভারতীয় পত্তুলের কথা উঠলেই মনে পড়ে শ্রীমতী অসীমা মুখোপাধ্যায়ের কথা। পত্তুল তৈরির ব্যাপারে তিনি যে অভিনবত্বের সূচনা করেছেন, সে-ধারা অব্যাহত থাকলে অতীতের ভারতীয় মসলিনের মতো ভারতীয় পত্তুলও কাঞ্চনমূল্যে বিদেশে বিক্রি হবে। বিদেশে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের তৈরি পত্তুলের চাহিদা খুবই। আমেরিকা, ডেনমার্ক, জার্মানী প্রভৃতি সব দেশ থেকেই প্রতি বছর অনেক অর্ডার আসে। কিন্তু তিনি ঠিকমতো সাপ্লাই দিতে পারেন না।

শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের পত্তুলের বৈশিষ্ট্য তা পুরোপুরি ভারতীয়। দেশীয় ভাবধারাকে তিনি কোথাও ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। বহুবিচিত্র আমাদের দেশকে তিনি

পুরস্কৃতা শ্রীমতী সুমিত্রা সিনহা

পত্তুলের মাধ্যমে একত্রে উপহার দেন। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের বর-কনে আর বিভিন্ন জীবিকার মানুষজন তাঁর পত্তুলে মূর্ত হয়ে ওঠে। সেই সংগে পাশাপাশি এসে দাঁড়ায় শাশ্বত ভারত। কালিদাসের শকুন্তলা অপরূপ সৌন্দর্যে শিল্পীর সৃষ্টিতে শ্রীমন্ডিত।

সাধারণ গেরস্থঘরের বউ শ্রীমতী অসীমা মুখোপাধ্যায়। ঘরকন্নার অবসরে নিজের খেয়ালে ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে পত্তুল গড়তেন। অভ্যাসটা এমনি থেকে যেতো যদি না পেতেন স্বামীর উৎসাহ। পত্তুল গড়ায় স্ত্রীর অনুরাগ দেখে তিনি সবসময় উৎসাহ দিতেন। স্বামীর উৎসাহ ও প্রেরণায় শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় ১৯৬৮-৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন এবং স্বীয় বিভাগে প্রথম স্থান দখল করেন। এবার আসে আরো বড়ো সাফল্য। ১৯৬৯ সালে বার্লিনের মেলার জন্য তাঁর পত্তুল মনোনীত হয়।

এমনিভাবে আসে একের পর এক সাফল্য। ১৯৬৯ সালে একটা ছোটখাটো প্রদর্শনীও করেন। কিন্তু এই-ই তাঁর জনসমক্ষে প্রথম আত্মপ্রকাশ। আর প্রথম আত্মপ্রকাশেই রসিকজনেদের বিস্মিত অভিনন্দন প্রশংসা কুড়োলেন অপর্যাপ্তভাবে। পত্তুলে আমাদের দেশ দেখে ঠিক ভারত ভ্রমণের অনান্দ পাওয়া গেল।

সাইকোলজিস্টদের মতে, কথাবলা পত্তুল মেয়েদের তুলনায় মায়েদেরই আকর্ষণ করে বেশি। শিশুরা অল্প সময়েই পত্তুল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ে। সাত বছর পর্যন্ত মেয়েরা এটা পছন্দ করে। কারণ, পত্তুলের জবাব দেওয়ার রহস্যটা তারা তখনো ভাল বুঝে উঠতে পারে না। আবার কেউ কেউ বলেন যে, কুড়িটি ভালো পত্তুল তেরো বছর পর্যন্ত মেয়েদের সন্তুষ্টিবিধানে সমর্থ। পত্তুলের প্রাচুর্য তাদের ক্লান্ত করে ফেলে! শ্রীমতী অসীমা মুখোপাধ্যায়ের পত্তুল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের এই সতর্কবাণী নিরর্থক। তাঁর পত্তুল কথাও বলে না এবং কুড়িটির জায়গায় অনেক বেশীতেও ক্লান্তি আসে না। আর তা একই সংগে বয়সের দুস্তর ব্যবধান পেরিয়ে সকলের মনোরঞ্জনের অফুরন্ত শক্তি ধরে।

দুই গ্রামসেবিকা

বিহারের রিগা ব্লকের গ্রামসেবিকা শ্রীমতী সুমিত্রা সিনহা। নিজের ব্লকের উন্নতি কিভাবে হবে সেই তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। এজন্য তিনি দিনরাত পরিশ্রম করতে রাজি। আর করেনও তাই।

মেয়ে হিসেবে গৃহ-উন্নয়ন এবং নারী প্রগতির দিকটাই তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছেন। এর ফলে গ্রামের মহিলাদের মধ্যে পরিবার-পরিকল্পনার সুবিধাগুলি তিনি বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন আর বাসস্থানকে স্বাস্থ্যকর করে তোলার প্রচেষ্টায় অনেকখানি সফল হয়েছেন। প্রত্যেক বাড়িতে হাওয়া চলাচলের জন্য অন্তত একটি জানালা বা দেওয়ালে একটি বড় গর্ত রাখার জন্য প্রতিটি গৃহস্থকে তিনি উৎসাহিত করেছেন। ব্লকের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যোন্নয়নের চেষ্টায় তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো রিগা ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ৪১০টি পয়ঃপ্রণালী এবং ১৫০টি ধূম্রহীন চুল্লী তৈরি করা। এই কৃতিত্বটুকু শ্রীমতী সিনহার একক প্রচেষ্টার ফল। ব্লকের স্বাস্থ্যের উন্নতির সংগে সংগে অর্থনৈতিক দিক সম্বন্ধেও তিনি ওয়াকিবহাল। মহিলাদের হাতের কাজ শেখানোর জন্য ৫টি সেলাই-স্কুল আর ২০টি মহিলামণ্ডল গড়ে তুলেছেন। আর শতাধিক মহিলা ও পুরুষকে কৃষিকর্মে শিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে।

গ্রামসেবিকা হিসেবে নিজের দায়িত্ব যথেষ্ট নিষ্ঠার সংগে পালন করছেন, একথা বলাই বাহুল্য।

এমনি আর একজন সফল গ্রামসেবিকা হলেন মণিপুরের শ্রীমতী লাইসারাম

আনন্দি দেবী। তাঁর আন্তরিক চেষ্টার ফলে থাউবাল ব্লকের প্রতি গৃহাঙ্গন আজ শাকসব্জীতে ভরে উঠেছে। গৃহস্থদের বিশেষত মহিলাদের তিনি বুঝিয়েছেন যে বাড়ির ফাঁকা জায়গাটুকু কাজে লাগানো দরকার। এই দায়িত্বটুকু বাড়ির বউ-ঝিদেরই দিতে হবে। পুরুষেরা ফাঁক-ফোকরে তাদের সাহায্য করবে। তাঁর এই চেষ্টা পুরোপুরি সফল হয়েছে। চাষের সঙ্গে সঙ্গে সার তৈরিও বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ১৬টি গ্রাম নিয়ে শ্রীমতী লাইসারাম অত্যন্ত একটি সুখী এবং সমৃদ্ধ পরিবার গড়ে তুলেছেন।

সম্প্রতি রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে এই দুই সফল গ্রামসেবিকাকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করা হয়। ১৯৬৯-৭০ সালে গ্রামোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য শ্রীমতী সুমিত্রা সিনহাকে মানপত্র দেওয়া হয়। এর সঙ্গে নগদ দেড় হাজার টাকা এবং একটি সাইকেল দেওয়া হয় তাঁর সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ। আর শ্রীমতী লাইসারাম বছরের শ্রেষ্ঠ গ্রাম-সেবিকার সম্মান লাভ করেন।

—প্রমীলা

দুই শিল্পী মা ও মেয়ে

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের তাজ আর্ট গ্যালারিতে শ্রীমতী অঞ্জলি দাশগুপ্ত ও তাঁর নয় বছরের কন্যা নন্দিনীর যৌথ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীমতী দাশগুপ্তের বেশীর ভাগ ছবির অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে আসামের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী। তাঁর গার্হস্থ্য চিত্রগুলিও উল্লেখযোগ্য। 'ড্যাডিস কর্নার' 'আফটার আওয়ার মিলস' ইত্যাদি ছবিগুলি ইতিপূর্বে পুরস্কার লাভও করেছে।

কন্যা নন্দিনীর হাতও কম পাকা নয়। চার বছর বয়স থেকেই সে ছবি আঁকে। বর্তমানে মায়ের যোগ্য কন্যা হয়ে উঠেছে। বেশীর ভাগ ছবিই জলরঙে করা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রীমতী দাশগুপ্ত পরে বোম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল সায়েন্স থেকে ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শিক্ষা-লাভ করেন ও পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের স্টাডিস অ্যান্ড রিসার্চের স্পেশাল অফিসার হিসেবে কাজ করেন।

কিন্তু একমাত্র কন্যার দীর্ঘ অসুস্থতার জন্য তাঁকে গৃহবন্দী হয়ে থাকতে হয়। সেই সময় থেকেই তিনি রং তুলি ধরেন এবং পরে জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারীর প্রদর্শনীতে শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

ইভন গুলাগঙ উপন্যাসের নায়িকা

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী বংশোদ্ভূতা ইভন গুলাগঙের সঙ্গে 'মাই ফেয়ার লেডী' উপন্যাসের নায়িকা এলাইজা ডু লিটলের অনেকখানি মিল আছে। এলাইজাকে সমাজের উঁচুতলার উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন প্রফেসার হিগিনস। ইভনকে গড়ে তুলেছেন ভিক এডওয়ার্ডস। উইম্বলডন টেনিসে মহিলা বিভাগে বিজয়িনী অস্ট্রেলিয়ার এই আদিবাসী তরুণীর জীবন পাশ্চাত্য সভ্যতার ছায়ায় বর্ধিত ও পুষ্ট হলেও তার শুরু হয়েছিল সিডনী থেকে চারশো মাইল দূরে এক আদিবাসী বসতিতে। ইভন গুলাগঙের বাবার শরীরে মিশ্র রক্ত, মা পুরোপুরি আদিবাসী। শ্রীযুক্ত গুলাগঙ স্বল্পশিক্ষিত, স্থানীয় পশুপালক। মা নিরক্ষর। তাদের আটটি ছেলেমেয়ে। ইভন এগারো বছর বয়স থেকেই বাড়ীছাড়া। ঐ বয়সেই তিনি প্রখ্যাত টেনিস কোচ ভিক এডওয়ার্ডসের চোখে পড়ে যান।

ভিক এডওয়ার্ডসের টেনিস স্কুল পালা করে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন স্থানে সাপ্তাহিক শিক্ষণ-কেন্দ্র খুলতো। এইরকম একটি শিক্ষণ-কেন্দ্রে ইভনের ক্রীড়া-প্রতিভা তাঁর শিক্ষকের চোখে পড়ে যায় এবং তিনি ভিক এডওয়ার্ডকে সেকথা জানান। ভিক এডওয়ার্ডসের জহুরীর চোখ, এই অসাধারণ ক্রীড়া-প্রতিভাকে চিনতে দেরী করলো না। তিনি এও বুঝলেন যে, ইভনের প্রতিভার যথাযথ স্ফুরণ হতে গেলে তাকে তার পারিপার্শ্বিক থেকে সরিয়ে আনা দরকার।

ভিক ও ইভা নিজেদের ছেলেমেয়েদের সাথে ইভনকে মানুষ করেছেন সিডনীর অভিজাত পল্লীতে। অভিজাত স্কুলে ইভনের শিক্ষা-দীক্ষা। ভিক এডওয়ার্ডস অবশ্য বলেন যে, ইভনের জন্য আলাদা করে তিনি কিছুই করেননি, কিন্তু একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তাঁদের সস্নেহ ও সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া ইভনের পক্ষে নতুন পারিপার্শ্বিকের সাথে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এডওয়ার্ডসরা শুধু তাকে টেনিস খেলাই শেখাননি, টেনিস খেলোয়াড়ের যে জগৎ, যেখানে অর্থ-কৌলীন্য ও ফ্যাশন কোনটারই অভাব নেই সেখানে মেশবার মত সহজ আত্মবিশ্বাসও তার মধ্যে এনে দিয়েছেন। এই সহজ আত্মপ্রত্যয়ের জন্যই ইভন নিজের ভুলে ঘাবড়ে না গিয়ে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে আজ হাসতে পারেন। কিছুদিন আগেও তাঁকে নিয়ে ভিক ও তাঁর স্ত্রীর চিন্তার অবধি ছিল না। ভিক এডওয়ার্ডসের সবচাইতে দুর্ভাবনা হল উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী না পেলে ইভন খেলায় তেমন মন দেন না। এ বছরও ইভা এডওয়ার্ডস ইভনের সাথে উইমবলডনে এসেছেন। যদিও এডওয়ার্ডস-দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রীতিমধুর এবং গুরু শিষ্যার কিন্তু ইভন ক্রমশ স্বনির্ভর হচ্ছেন।

ইভনের রং বাদামী। মাথাভর্তি কোঁকড়ানো কালো চুল। বন্ধুবান্ধবরা বলেন ইভন নিজের রং সম্পর্কে একেবারেই সচেতন নন। তার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কোন কৌতূহল তাঁকে বিরক্ত করে। ইভন গুলাগঙ টেনিস খেলোয়াড়। টেনিসেই তাঁর উৎসাহ। কিন্তু টেনিসের বাইরে যে জগৎ তাকে কি তিনি বেশীদিন এড়িয়ে চলতে পারবেন?

একথা সত্যি যে বর্ণবৈষম্য ইভনের জীবনে কোন বাধা সৃষ্টি করেনি। বরং অস্ট্রেলিয়ানরা তাঁকে নিয়ে গর্বিত। কিন্তু যে আদিবাসী সমাজে ইভন জন্মেছেন তার প্রতি তাঁর দায়িত্বকে তিনি কি অস্বীকার করতে পারবেন? অন্য দশজন টীন এজারের মত ফ্যাশানের স্রোতে গা ভাসিয়ে এবং পপ মিউজিক শুনে ইভন কি অত্যাচারিত ক্ষয়িষ্ণু আদিবাসী সমাজকে ভুলে থাকতে পারবেন?

গত মার্চ মাসে 'দাসত্ব প্রথা নিবারণী সমিতির' সম্পাদক কর্নেল মন্টগোমারী উত্তর অস্ট্রেলিয়া সফর করে সেখানকার আদিবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে এক তীব্র বিবৃতি দেন। তিনি এদের নিরুপায় অবস্থাকে অস্ট্রেলিয়ার কলংক বলে ঘোষণা করেন। তিনি দেখেন হতাশায় কর্মহীন আলস্যে আদিবাসী জীবন ভেঙে পড়ছে। মদ্যপান জুয়া খেলা ইত্যাদি উপসর্গ এসে জুটেছে। পারিবারিক জীবন ধ্বসে পড়ছে। বেকারত্ব আদিবাসী জীবনে সবচাইতে বড় অভিশাপ।

সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছে যে বংশানুক্রমে যে জমিতে তারা বসবাস করে এসেছে তাতে তাদের কোন অধিকার বা স্বত্ব নেই। কর্নেল মন্টগোমারী মনে করেন এ অবস্থার প্রতিকার হতে পারে যদি বিশ্ব জনমত এ সম্পর্কে জাগ্রত হয়।

ইভন গুলাগঙ হয়তো নিজের অজান্তেই বিশ্বসমাজে তাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। হয়তো শাদা অস্ট্রেলিয়ানরাও অনুভব করছে যে ইভনের মত আরও অনেক আদিবাসী প্রতিভা শুধু সুযোগের অভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারছে না। স্বীকৃতি পেলে অস্ট্রেলিয়ার জন্য তারাও জয়মাল্য এনে দিতে পারে।

আদিবাসীরা সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছেন ইভন তাঁদের কথা বলেন কিনা দেখতে। ইভন কি তাদের নিরাশ করবেন?

—রাখী ঘোষ।

অ্যায়সা ভি হোতা হ্যায়/নিকিতা। পরিচালনা ঃ কামরান। ফটো ঃ অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

(১) একদা নিষিদ্ধ প্রেম

একদিন ছিল, যখন বিধবা বিবাহকে হিন্দুসমাজ সমর্থন করত না। বিশেষ করে বিধবা বয়সে যতই নবীনা হোক না কেন, যদি সে পুত্রবতী হ'ত, তাহলে তার দ্বিতীয়বার স্বামীগ্রহণের কথা চিন্তা করাও নাকি পাপ ছিল। কিন্তু আজ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। নানা কারণে যৌথ পরিবার ভেঙে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তরুণী বিধবা তো দূরের কথা, সধবা আলোক-প্রাপ্তা (শিক্ষিতা?) তরুণীরা 'স্বামী কর্তৃক মানসিক উৎপীড়নের অভিযোগে' বিবাহবন্ধন ছিন্ন ক'রে নতুন ক'রে সংসার পাতছেন। কাজেই সিপ্পি ফিল্মস্ নিবেদিত, জি-পি সিপ্পি প্রযোজিত এবং রমেশ সিপ্পি পরিচালিত 'আন্দাজ' ছবিতে সুন্দরী তরুণী বিধবা শীতল ও বিপত্নীক যুবক রবি যখন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন দর্শক তার মধ্যে কোন অন্যায় দেখতে পায় না। রবির পাঁচ বছর বয়সের মেয়ে মুন্নি ও শীতলের চার বছর বয়স্ক ছেলে দীপু যখন ঘনিষ্ঠ খেলার সাথী হয়ে উঠে দু'জনেই শীতল ও রবিকে মাম্মি-ড্যাডি ব'লে সম্বোধন করতে থাকে এবং মজা করে গান গেয়ে ওঠে—'পাপাকো মম্মিসে, মম্মিকো পাপাসে প্যার হ্যায়, প্যার হ্যায়' তখন দর্শক ওদের গানের কথাকে সমর্থন ক'রে এই কামনাই করে যে, রবি ও শীতল যত শীঘ্র সম্ভব পরস্পরের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। সম্পর্কিত ভাই বাদল যখন রবির মার কাছে জানায়, রবি সন্তানবতী এক বিধবাকে বিবাহ করতে উদ্যত ও বিধবাটির সেই সন্তান অবৈধ, তখন রবির মায়ের সনাতনী সংস্কারাচ্ছন্ন মন রবির বিরুদ্ধবাদী হয়ে উঠলেও দর্শক কিন্তু রবির মার আচরণকে সমর্থন না করে রবির পক্ষেই রায় দিয়েছে; কারণ তারা দেখেছে, শীতলের প্রথম স্বামী রাজ তাকে দেবতার সমক্ষে ধর্ম-পত্নী ব'লে স্বীকার করেছে এবং তাদের পরস্পরের মিলনের মধ্যে কোনো খাদ ছিল না।

বিধবা শীতল ও বিপত্নীক রবির মধ্যে প্রেম 'আন্দাজ' ছবির কাহিনীর মুখ্য উপজীব্য হলেও, ওদের দুজনেরই অতীত প্রেম ও দাম্পত্য-জীবনকে দুটি ফ্লাশব্যাকের মাধ্যমে সুন্দরভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। শীতলের রাজের সঙ্গে প্রেম ও গোপন পরিণয় একটি আনন্দের দিনে দুর্ঘটনার ফলে রাজের মৃত্যুতে কেমন করে গভীর বিষাদময়তার মধ্যে শেষ হয়েছিল এবং অপরদিকে রবির বিবাহিত সুখী জীবন সন্তানজন্মের ফলে তার স্ত্রী মোনার অপমৃত্যুর মাধ্যমে কি আকস্মিকভাবে ছেদ পড়ে, দুই-ই দর্শক দেখেছেন তাদের বর্তমান জীবনের অন্তর্নিহিত শূন্যতাকে উপলব্ধি করবার জন্যে।—এই সরল কাহিনীটিকে কিছুটা পল্লবিত করবার জন্য রবির প্রণয়াকাঙ্ক্ষী এক গ্রাম্য তরুণীর চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে, যার প্রতি রবিরই এক বোবা চাকর তার নিরুচ্চার প্রেমনিবেদন করে একটি ক'রে ফুল উপহার দিয়ে এবং যে শেষ পর্যন্ত রবির সম্পর্কিত ভাই বাদল দ্বারা ধর্ষিত হয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। এমন কি, এই তরুণীটির আত্মহত্যার জন্যে রবিকেই দায়ী করা হয় প্রথমে। অবশ্য রবি নিজেই রহস্য উদ্ঘাটন ক'রে নিজেকে দোষমুক্ত করে।

স্রেফ প্রেমের চিত্র হিসাবে 'আন্দাজ' সার্থকতা লাভ করেছে। চার-পাঁচ বছরের দুটি বালক-বালিকার উপস্থিতি এই প্রেমকে দিয়েছে পবিত্রতা ও মাধুর্য। গুলজারের সংলাপ ও হসরৎ জয়পুরীর রচিত গীত ছবিটির মাধুর্যকে করেছে বর্ধিত।

অভিনয়ে রবি, রাজ, শীতল ও মোনার ভূমিকায় যথাক্রমে শাম্মী কাপুর, রাজেশ খান্না, হেমা মালিনী ও সিম্মী অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দরদী চরিত্র চিত্রণের সাহায্যে কাহিনীটিকে মনোহর করে তুলেছেন। গ্রাম্য তরুণী বেশে অরুণা ইরাণী কাহিনীর লঘু অংশটিকে উপভোগ্য করতে সহায় করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় অভি (রাজের বাবা), অচলা সচদেব (রবির মা), অভি ভট্টাচার্য (গির্জার পাদরী), বে গৌরী (মুন্নি), মাস্টার মলংকার (দীপু), বাদল (রূপেশকুমার), রণধাওয়া (বোবা চাকর) প্রভৃতি উল্লেখ্যভাবে অভিনয় করেছেন।

ছবির কলা-কৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসনীয়। শঙ্কর-জয়কিষণ-এর সুরে গাওয়া 'জিন্দগী এক সফর সুহানা', 'মুঝে প্যাস ওইসী প্যাস

হৈ' এবং 'হ্যায় ন বোলো বোলো' গানগুলি অনায়াসেই কানকে তৃপ্ত করে অপরিসীম মাধুর্য দ্বারা।

সিপ্পি ফিল্মসকৃত 'আন্দাজ' দর্শকদের প্রচুরভাবে খুশী করবে।

(২) বিপর্যয়ের মুখে অসহায়া বালিকা

মাতৃহারা ছোট্ট মেয়ে কমলের একমাত্র আশ্রয় তার বাবা—ঠাকুর সামশের সিং। বাবাকে সে বারংবার জিজ্ঞেস করে; মার মতো তুমিও আমাকে ছেড়ে স্বর্গে চলে যাবে না তো? আদরের মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে সামশের বলে, না বেটি, তোমায় ফেলে আমি কোথাও যাব না।—কিন্তু নির্মম নিয়তি! বেচারা কমলের জন্মদিনে উৎসব অনুষ্ঠানের আসর থেকে পুলিশ সামশেরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছিল জাদুঘর থেকে মাণিক্যখচিত বিষ্ণুমূর্তি চুরি করার অপরাধে। যাবার সময়ে বন্ধু রণজিতের ওপর মেয়ে ও সম্পত্তির ভার দিয়ে গেল সামশের। কিন্তু হঠাৎ কি হতে কি হয়ে গেল। 'বাবাকে ফিরিয়ে আন', বাচ্চা কমলের এই কাতরোক্তিতে বিগলিত হয়ে তার পিতৃব্যতুল্য গুলখাঁ বন্দুক হাতে ছুটে বেরিয়ে গেল এবং মুহূর্তে গুলির আঘাতে পুলিশের গাড়ীকে স্তব্ধ ক'রে সামসেরের মোটরকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল তীব্রবেগে। অনুসরণকারী পুলিশ বহু দূর পর্যন্ত ওদের পশ্চাদ্ধাবন করবার পরে সবিস্ময়ে দেখল গাড়ীটি হাজার ফুট উঁচু থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রবক্ষে। পুলিশ জানল, ওদের মৃত্যু ঘটেছে।

রণজিৎ তার বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখবার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু তার স্ত্রী ও পুত্র রঘুবীরের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন ধরনের। রণজিতের স্ত্রী চেয়েছিল, কোনোক্রমে তার ছেলের সঙ্গে কমলের বিয়ে হয়ে গেলে সামশেরের অগাধ সম্পত্তি তারই ভোগ-দখলে থাকবে। তাই কমল যখন বড়ো হল, তখন ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকবার জন্যে সে রঘুবীরকে উপদেশ দিত। রঘুবীরের উদ্দেশ্য ছিল অন্য রকমের। সে চাইত কমলের সঙ্গে মজা লুঠতে—বিবাহের প্রতি তার কোনো রকম আগ্রহ ছিল না। একদিন যখন কমলকে কলেজে পৌঁছবার অছিলায় সে তাকে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে তার উপর বলপ্রয়োগ করতে চেয়েছিল, তখন কমলকে রঘুবীরের কবল থেকে উদ্ধার করেছিল ডাক্তার সন্দেব নামে একটি সুদর্শন যুবক। সন্দেবের সঙ্গে পরিচয়কে ক্রমে ভালোবাসায় পরিণত হতে দেখে রঘুবীর ক্ষেপে গেল এবং ভয়ালদর্শন মুখোশধারীর সাহায্যে কমলকে ভয়ত্রস্ত করে তুলল। পিতা রণজিতের সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে সে কমলকে অপ্রকৃতিস্থ প্রমাণ ক'রে তাকে মানসিক চিকিৎসালয়ে ভর্তি করে দিল। সেখানে বহু নির্যাতন ভোগ করবার পরে কমল সুযোগ বুঝে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ডাঃ সন্দেবের আশ্রয়ে গিয়ে পৌঁছুল দৈবক্রমে এক দুর্ঘটনায় আহত হবার পরে।

এদিকে সামশের ও গুলখাঁ বহু দিন ছদ্মবেশে সমুদ্রোপকূলে মাছের ব্যবসা করবার পরে প্রচুর অর্থোপার্জন করে কেদার নামে এক দুর্বৃত্তের সহায়তায় সেই বিষ্ণুমূর্তি এবং মাণিক্যখচিত একটি ছোরা পুলিশের হেপাজত থেকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। সদলবলে কেদার ও-দুটিকে হস্তগত করে সামশের ও গুলখাঁর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায়। অনেক অনুসন্ধানের পরে ওরা দুজনে এসে পড়ে ডাঃ সন্দেবের বাড়ীতে। কেদার ঐ বাড়ীতেই জিনিসদুটিকে লুকিয়ে রেখেছে, এই সন্দেহে ওরা সন্দেব ও কমলের ওপর পীড়ন করতে থাকে। নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে যাবার পর ওরা যখন প্রকৃত সত্য জানতে পারে, যখন শোনে মেয়েটি ওদেরই সেই ছোট্ট আদরের কমল, তখন ওদের অনুতাপের শেষ থাকে না এবং সেই অভিশপ্ত বিষ্ণুমূর্তি ও ছোরাকে হাতে পেয়ে সামশের জলে ফেলে দেয়। কিন্তু তখনও সামশেরের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় নি। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরবার মুহূর্তটিতেই পুলিশের গুলি ওর বক্ষ ভেদ করে।

—প্রচুর উত্তেজনাময় ঘটনাপ্রধান এই কাহিনীটিকে নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে **র‍্যামজে প্রোডাকসন্স (ইণ্ডিয়া)-র ইস্টম্যান কলার ছবি 'এক নান্হী মুন্নী লেড়কী থী'।** বিশ্রাম বেদেকার পরিচালিত এই ছবিটিতে সাসপেন্স থ্রীলারের সংগে সন্তানবাৎসল্য ও প্রেম ভালোবাসার সংগে খলতা, নারী নির্যাতন প্রভৃতি বিভিন্ন রসাত্মক ঘটনাবলীকে একসংগে চালাতে গিয়ে ছবির ভারসাম্য বিচ্যুত হয়েছে প্রায়ই। ফলে ছবিটি একটি অনিবার্য পরিণতির পথে সুষ্ঠুভাবে এগোতে পায় নি।

তবু প্রাচীন শিল্পী পৃথ্বিরাজ-এর অনবদ্য অভিনয় ছবিটিতে দিয়েছে প্রাণের স্পন্দন। তাঁর ঠাকুর সামশের হচ্ছে একটি অবিস্মরণীয় চরিত্রচিত্রণ। বিভিন্ন রসের

এবছর শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে অমৃতের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান হবে আগামী সংখ্যায়। ছয়টি সুলিখিত আলোচনা এবং শিল্পগুরুর অসংখ্য শিল্প-নিদর্শনের প্রতিলিপিসহ প্রকাশিত হবে সংখ্যাটি

অভিব্যক্তি কি নিপুণভাবেই না প্রকাশ করেছেন এই সিদ্ধ শিল্পী। তাঁর সহচর-রূপে গল্পখানের ভূমিকায় জয়ন্তও সার্থক অভিনয় করেছেন। বিশেষ ক'রে হেলেনের নাচের সংগে তাঁর গান আশ্চর্য মাদকতার সৃষ্টি করে। খলনায়ক রঘুবীরের ভূমিকায় শত্রুঘ্ন সিংয়ের অনবদ্য অভিনয় তাঁকে বোম্বে চলচ্চিত্র জগতের উঠতি ভীলেন রূপে প্রতিষ্ঠিত করবে। শিশু কমল রূপে ববী ষতটুকু সুন্দর কাজ করেছে, বড়ো কমল-বেশে মমতাজকে তার হাজারগুণ বেশী

কাজ করতে হয়েছে। মমতাজ যে একজন শক্তিময়ী অভিনেত্রী সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। এই ছবিতে কি প্রেমের দৃশ্যে, কি নিপীড়িত হওয়ার দৃশ্যে—তিনি সু-অভিনয়ের উজ্জ্বল নিদর্শন রেখেছেন। দেখা যাচ্ছে, সম্প্রতি বহু ছবিতেই তাঁকে নায়িকার ভূমিকা দেওয়া হচ্ছে। মনে হয়, তিনিও যেন স্থির পদক্ষেপে নায়িকার মুকুট ধারণ করবার যোগ্যতার দিকে এগিয়ে চলেছেন। নায়ক ডাঃ সন্দেবরূপে সুরেন্দ্র-কুমারকে মানিয়েছে ভালো, তবে তাঁর অভি-নয়ের আরও উন্নতির অবকাশ আছে। ভীলেন কেদারবেশে শ্যামকুমারও সার্থক। এছাড়া সজ্জন (রণজিৎ), নাদিরা (রণজিতের স্ত্রী), হীরালাল (ফেন্স), ধুমল (রামু), লক্ষ্মীছায়া (পুলিশ-প্রেরিত নারীচর) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন। হেলেনের নৃত্য ছবিটির একটি বিশেষ আকর্ষণ।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসা দাবি করতে পারে। বিশেষ করে ছবির শিল্পনির্দেশনা দৃষ্টি আকর্ষক। গণেশের সুরযোজনা অভিনবত্ব-পূর্ণ।

র‍্যামজে প্রোডকসন্স (ইণ্ডিয়া) নিবেদিত 'এক নান্‌হী মুন্নী লেড়কী থী' একটি বহু ঘটনাপূর্ণ রহস্যচিত্র।

স্টুডিও থেকে

'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট' শীঘ্রই আসছে

জয়দীপ পিকচার্সের নিবেদন 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট' অবশেষে দর্শকদের আনন্দে মাতাতে আসছে। ছবিটি মিত্রা, বীণা ও বসুশ্রী-তে মুক্তির অপেক্ষায়। মুখ্য দুটি চরিত্রে আছেন দুই হাস্যকৌতুক—সম্রাট ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায়। ছবির রোমাণ্টিক জুটি হচ্ছেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও লিলি চক্রবর্তী এবং তাদের সংগে আছেন পাহাড়ী সান্যাল, পদ্মা দেবী, কল্যাণী ঘোষ, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় ও রূপক মজুমদার।

পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী পরিচালিত ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গীত-রচনা প্রণব রায়ের। শ্যামল মিত্রের সুর-সংযোজনা এ-ছবির অন্যতম আকর্ষণ। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে রামানন্দ সেনগুপ্ত ও অমিয় মুখোপাধ্যায়। হাস্য-মুখর ছবিটির প্রযোজনা করেছেন বাদলরাজ সিন্‌হা।

পুজোয় আসছে 'খুঁজে বেড়াই'

গীতালি পিকচার্স নিবেদিত ও এস বি ফিল্মস পরিবেশিত 'খুঁজে বেড়াই' রূপবাণী, ভারতী ও অরুণাতে পুজোর অন্যতম আকর্ষণরূপে চিহ্নিত।

আজকের সমাজ-জীবনের পটভূমিকায় মানুষের চাওয়া-পাওয়ার চলচ্চিত্র-রূপ হচ্ছে 'খুঁজে বেড়াই'। পরিচালনা করেছেন বহু সফল ছবির পরিচালক সলিল দত্ত। এই ভিন্ন স্বাদের কাহিনীর চিত্রনাট্য ও সংলাপও তিনিই রচনা করেছেন।

সংগীত-পরিচালনা, চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে রবীন চট্টোপাধ্যায়, বিজয় ঘোষ এবং অমিয় মুখোপাধ্যায়।

ছবিটির ভূমিকালিপিও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং অপর্ণা সেন। একটি বিশিষ্ট চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়।

অন্যান্য চরিত্রের শিল্পী : বিকাশ রায়, উৎপল দত্ত, দিলীপ রায়, তরুণকুমার, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, সুনীলেশ ভট্টাচার্য, শোভা সেন, জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়, মিস পলিন ও জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাপুজোর আকর্ষণ 'শচীমার সংসার'

মহাপুজোর প্রাক-লগ্নে মালবিকা চিত্রের নিবেদন ভক্তিরস-প্রধান চিত্র 'শচীমার সংসার' মুক্তিলাভ করছে।

ভূপেন রায় পরিচালিত ছবিটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অনন্ত চট্টোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণে আছেন ননী দাস। সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন অমিয় মুখোপাধ্যায়।

শচীমা এবং নিমাই-এর চরিত্রে রূপদান করেছেন সন্ধ্যারাণী এবং অসীমকুমার। অন্যান্য চরিত্রচিত্রণে : দিলীপ রায়, তরুণকুমার, জহর রায়, অসিতবরণ, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, মাঃ অরিন্দম, শমিতা বিশ্বাস, নবাগতা সংহিতা রায় ও জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পী।

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সংগীত পরিচালনায় ছবিতে কণ্ঠদান করেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, বনশ্রী সেনগুপ্ত, শিপ্রা মিত্র, মাধবী চট্টোপাধ্যায়, শ্যামলী মুখোপাধ্যায়, মানস মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে।

পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন এস ফিল্মস্।

মঞ্চাভিনয়

আগন্তুকের 'আবর্ত' ঃ কৃষক-জীবনের ঃখ, দারিদ্র্য, হতাশা, যন্ত্রণা ও সবশেষে গ্রাম করে বেঁচে থাকার দৃপ্ত শপথকে রেই গড়ে উঠেছে সমরেশ বসুর বাস্তব-ঠ কাহিনী 'আবর্ত'। আর এরই মুখ-রতেই সোচ্চার হয়ে উঠেছে নাটকের বার এক সংঘাত। কাহিনীটির প্রবহ-নতাকে যিনি সংলাপের কল্লোলে ভাষা য়ে মঞ্চের আলোয় প্রোজ্জ্বল করে লেছেন, তিনি হোলেন বরুণ দাশগুপ্ত। ত্রে কলকাতার একটি নতুন দল াগন্তুক গোষ্ঠী' সম্প্রতি এই নাটকের কটি মোটামুটি সপ্রতিভ প্রযোজনা পস্থিত করে নাট্যানুরাগীদের মনে ছুটা স্থান করে নিতে পেরেছেন বলেই মাদের বিশ্বাস।

চাষার ছেলে 'সনাতন' আর 'রাজা'কে রেই গড়ে উঠেছে নাটকটির মূল ঘটনা। হরের কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ লে দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে মুক্তি ওয়া যাবে, অন্তত দু'বেলা পেট পুরে তে পাওয়া যাবে, এই বিশ্বাসে যান্ত্রিক রের মাঝখানে এলো 'সনাতন'। আর রই ছোটভাই 'রাজা' জোতদার মহিন কুরের পরামর্শে আর উৎসাহে তারই নুর্বর জমিতে ও ধারের টাকায় লেগে লো ভাগচাষে। দিন-রাত মাথার ঘাম য়ে ফেলে সেই অনুর্বর জমিতে সোনার ল তুলে দিল রাজা, কিন্তু জোতদার হন ঠাকুরের প্ররোচনায় ও ছলচাতুরিতে ন ফসল তার গোলায় সে তুলতে পারলো । এমন কি ভাগ্যের দুঃসহ নিষ্ঠুর তে তার বাড়ী ঘরও বাঁধা পড়লো। ক করবে রাজা। সামনে কোন উপায় না খে দাদা সনাতনের কাছে শহরেই যাবে ক করলো। কিন্তু সেই মুহূর্তে শহর থকে বেকার হয়ে ফিরে এলো সনাতন। ন্ত্রণার অতলে তলিয়ে না গিয়ে সে অন্য আর সব কৃষকদের আহ্বান জানালো বাঁচার গিদে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য।

মুক্ত অঙ্গনে পরিবেশিত এই নাটকটির প্রয়োগ-পরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন গাকুল সেন। নাটকটির মূল সুর সম্পর্কে তিনি যে বেশ সচেতন ছিলেন, বিশেষ কয়েকটি মুহূর্ত থেকেই তা প্রতিভাত হয়। শিল্পীদের স্বচ্ছন্দ চরিত্রচিত্রণের জন্য সামগ্রিক প্রযোজনাটি মোটামুটিভাবে শথিলামুক্তই ছিল বলতে হবে।

'সনাতন' চরিত্রটিকে অতি স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় মঞ্চে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন তিক ভট্টাচার্য। কিন্তু কানু ব্যানার্জীর াজা' বোধ হয় সব সময়ে সজীব হয়ে উঠতে পারেনি। আর দুটি সুষ্ঠু অভিনয়ের াক্ষর রেখেছেন প্রশান্ত ব্যানার্জী (বজ্র) পরেশ মুখার্জী (সুবল)। অন্য কয়েকটি রত্রে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় চিহ্নিত করেন ারসাদ ব্যানার্জী (ইনসপেক্টর), অপেন্দু দেব (ময়িম ঠাকুর), সবিতা মুখার্জী ও মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী।

ইসকাবনের গোলাম ঃ মেখলীগঞ্জের অন্যতম নাট্যগোষ্ঠী 'উদয়ন সংঘের' শিল্পীরা সম্প্রতি অশিনদত্তের 'ইসকাবনের গোলাম' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে পরি-বেশন করলেন। সমর সেনের নির্দেশনায় নাটকটির সামগ্রিক প্রযোজনায় অনেক স্বাতন্ত্র্যের ছাপ ছিল। কয়েকটি ভূমিকায় প্রাণবন্ত অভিনয় করেন শিখা মুখার্জী, শম্ভু ভৌমিক, অশোক সাহা, প্রবীর গোস্বামী, রবি ঘোষ, নীলমণি গোস্বামী, দ্বিজেন চক্রবর্তী, সমর সেন।

তিনটি একাঙ্কিকা ঃ সম্প্রতি নাট্য সম্প্রদায়ের শিল্পীরা মুক্তঅঙ্গনের মঞ্চে তিনটি একাঙ্কিকা পরিবেশন করলেন। নাটক তিনটি হোল শিবতোষ জাদুড়ীর 'বলি', সলিল চৌধুরীর 'দেবী নেই' ও কৌশিক সান্যালের 'প্রজাপতির প্রাণ'। বিংশ শতাব্দীর জটিলতম জীবনবোধের পরিচয় মেলে এই তিনটি একাঙ্কিকাতেই। তা ছাড়া 'প্রজাপতির প্রাণ' নাটকটিতে পাত্রী নির্বাচনের মতো একটি প্রায় তুচ্ছ ও স্বাভাবিক ব্যাপারকে কেন্দ্র করে এক করুণ নাট্যবিন্যাসের সৃষ্টি করা হয়েছে।

কৌশিক সান্যাল নির্দেশিত নাটক তিনটির কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অংশ নেন সন্তোষ ভট্টাচার্য, অরুণ বসু, রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সুনীল সরকার, মুকুল দাস, মন্দিরা দাস, অঞ্জলি সেন, পরিমল ভৌমিক, প্রণব বসু, কল্যাণ সর্বাধিকারী, সমীর রায় ও তারাপদ মুখোপাধ্যায়।

মূকাভিনেতা শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী ঃ বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলা ও বহি-র্বাংলায় মূকাভিনয় পরিবেশন করে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। শিল্পী পরিবেশিত প্রত্যেকটি ফিচার পরিণত শিল্প চিন্তার স্বাক্ষর বহন করে।

বিবিধ সংবাদ

ভারত ভ্রমণে শঙ্করস্কোপ

মঞ্চ ও পর্দার সাহায্যে বিভিন্ন 'সিঙ্ক্রোনাইজড্' নৃত্যগীতসংবলিত ও কৌতুক প্রদর্শনীপূর্ণ 'শঙ্করস্কোপ' যে কলিকাতাবাসীদের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে, সে-কথা বলাই বাহুল্য। যাতে এই অভিনব অনুষ্ঠানটি ভারতের বিভিন্ন শহরের অধিবাসীরা প্রত্যক্ষ করতে পারে, এবার তারই আয়োজন চলেছে।—শনিবার, ৩১ আগস্টে ময়দান প্রেস ক্লাব টেণ্টে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীউদয়-শঙ্কর এই কথাই জানালেন। অক্টোবর মাসে এই 'শঙ্করস্কোপ' অনুষ্ঠিত হবে দিল্লীর 'মভলঙ্কর' হলে। উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি শহরে প্রদর্শনী হবার পরে বোম্বাই শহরের বিরাট 'সম্মুখানন্দ হলে' অনুষ্ঠানটির আসর বসবে জানুয়ারীর মাঝামাঝি এবং একাদিক্রমে তিন সপ্তাহ ধরে চলবে। এর পরে এটি মাদ্রাজেও

প্রদর্শিত হবে। শ্রীশঙ্কর সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, তিনি বছরখানেকের মধ্যেই একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য ব্যালে এই 'শঙ্কর-স্কোপে'র মাধ্যমে উপস্থাপিত করবেন। তিনি আরও জানান, 'উদয়শঙ্কর ব্যালে গ্রুপ' নামে একটি সংস্থা রেজেস্ট্রী হতে চলেছে নৃত্যগীতের সর্বাঙ্গীণ চর্চার জন্যে।

'অ্যাপোলো ১৫'-র প্রস্তুতিচিত্র

মানুষের সভ্যতার বিকাশকে পরপর ধারাবাহিকভাবে প্রতীকের সাহায্যে দেখাবার পর মানুষের মহাকাশ অভিযান ও সাম্প্রতিক 'অ্যাপোলো ১৫'-র চন্দ্রাভিযানের প্রস্তুতিপর্ব অতি সুন্দরভাবে নির্মিত একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের সাহায্যে দেখানো হ'ল সেদিন আমেরিকান ইনফরমেশন সার্ভিসের প্রেক্ষাগৃহে। ছবিটিতে 'অ্যাপোলো ১৫'-র অভিযাত্রী তিনজন—আলফ্রেড ওয়ার্ডেন, জেমস আরউইন এবং ডেভিড স্কটের অভিযানসম্পর্কীয় আশা, আকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ়চিত্ততাও তাঁদের সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

শিল্পী সংসদ-এর নতুন কার্যনির্বাহক সমিতি

সভাপতি : উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়। সহ-সভাপতিগণ : বিকাশ রায়, পন্টু সেন, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী অমলা-নন্দ ও শ্রীমতী মলিনা দেবী। সম্পাদক : অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। সহ-সম্পাদক : শ্যামল মিত্র ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ : জহর রায়। কার্যকরী সমিতি : তরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার চক্রবর্তী, শিশির মিত্র, অজিত মিত্র, প্রভাত রায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী উৎপলা সেন, শ্রীমতী মাধবী চক্রবর্তী ও শ্রীমতী জয়শ্রী সেন।

এই বৎসর শিল্পী সংসদের নিবন্ধ চিত্র 'ধনপলাশীর পদাবলী' উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আরম্ভ হয়েছে।

ইয়ুথ পাপেট থিয়েটার, ইণ্ডিয়ার যোগাযোগ এবং আমেরিকা ভ্রমণ
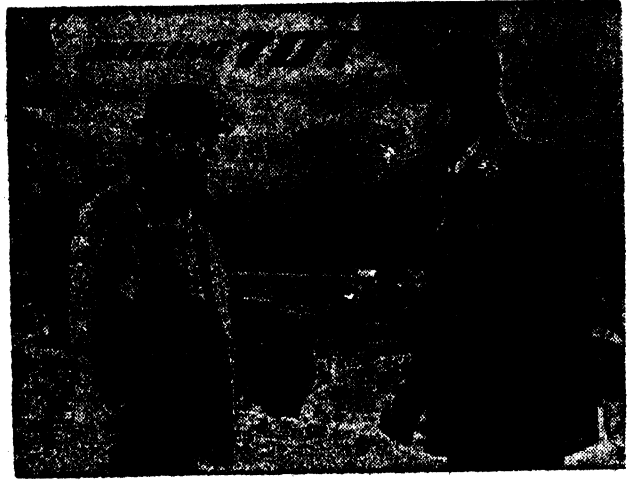
কোলকাতার প্রখ্যাত পাপেট গোষ্ঠী ইয়ুথ পাপেট থিয়েটার, ইণ্ডিয়া গেল ২ আগস্ট ১৯৭১-এ আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স-এ যাত্রা করেছে আমেরিকার বিখ্যাত পাপেট গোষ্ঠী 'পাপেটিয়ার্স অফ আমেরিকা'র দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে 'শিক্ষা ও পাপেট্রী' সম্মেলন ও জাতীয় উৎসব (১৯৭১)-এ যোগদান করতে। ইয়ুথ পাপেট থিয়েটার, ইণ্ডিয়া উক্ত জাতীয় উৎসবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পাপেট গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেরাও অংশ গ্রহণ করবে।

ইয়ুথ পাপেট থিয়েটার গোষ্ঠীর সম্বন্ধে সকলেই নিশ্চয় অবগত আছেন যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পাপেট অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সংস্থাটি আপন খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছে ও বিগত ১৯৭০ সনে লক্ষ্ণৌ-এ অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় উৎসবে 'অল রাউণ্ড বেস্ট পারফর্ম্যান্স ট্রফি' লাভ করেছে।

এয়ারপোর্ট / বার্ট ল্যাঙ্কাস্টার, জর্জ কেনেডি

রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম সমিতির ৬৪তম বার্ষিক উৎসব

গত ২৮শে জুন সোমবার সন্ধ্যায় বিশ্বরূপা মঞ্চে রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম সমিতি উদ্‌যাপন করল তাদের শুভ ৬৪তম বার্ষিক উৎসব। ধূপ, দীপ ও সুরভিতে আমোদিত পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে শঙ্খধ্বনি ও পণ্ডিত বিস্মিল্লা সম্প্রদায়ের সানাই বাদ্যে উৎসবের শুভ সূচনা হয়। স্বস্তিবাচন ও বেদ পাঠ করেন পণ্ডিত জগদীশচন্দ্র তর্কতীর্থ। কুমারী শর্মিষ্ঠা ঘোষের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর বরণ করেন উদ্বোধক প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায়, প্রধান অতিথি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী এবং বিশিষ্ট অতিথি প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্যকে সভাপতিরূপে। সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশ স্বাগত ভাষণ জানান।

উদ্বোধক শ্রীরায় বলেন—৬৪ বছরের প্রতিষ্ঠান আজও যে নিষ্ঠার সঙ্গে সমস্ত কিছু বজায় রেখে চলেছে এটা বাস্তবিকই গৌরবের। সমিতির ব্যায়াম শিক্ষক আচার্য রবীন চক্রবর্তীর পরিচালনায় সমিতির সভ্যগণ নানাবিধ ব্যায়াম প্রদর্শন করেন। আবৃত্তি ও সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করে মাধুরী বসু, সোনালী দাস, রিঙ্কু মিত্র। সাধারণ সম্পাদকের ভাষণ দেয় শ্রীমুরারীধর মল্লিক ও সাংস্কৃতিক বিভাগীয় সম্পাদক দুলাল ঘোষ। প্রধান অতিথি ডঃ চৌধুরী বলেন—দীর্ঘ দিনের এ সমিতির কার্যাবলী সত্যই প্রশংসার্হ। এই সমিতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি। সভাপতির ভাষণে শ্রীভট্টাচার্য বলেন—সমিতির প্রাক্তন সভাপতি শ্রদ্ধেয় হেমন্তদার সঙ্গে বহু সেবামূলক কাজ করেছি। তাঁর কার্য পদ্ধতিকে সমিতি আরব্ধ কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছে শুনে আনন্দিত হলাম। প্রত্যেক সংগঠনই দু-একজন কর্মীর নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতায় চলে কিন্তু যদি কোন কারণে ঐ কর্মীর উৎসাহ-উদ্দীপনা কমে যায় তখনই দেখা দেয় সমিতির অচলাবস্থা ও নিষ্প্রাণতা। এ সমিতি সে অভাববোধ করে না বলে আজ ৬৪ বছরে পদার্পণ করল পূর্বসূহৃদের গৌরবকে বজায় রেখে। প্রার্থনা করি এদের কার্য পদ্ধতি আরও প্রসার লাভ করুক। পরিশেষে সমিতির প্রধান সংগঠক শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সাময়িক বিরতির পর সাংস্কৃতিক শাখার সভ্য-সভ্যাগণ কর্তৃক 'অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত ও শ্রীঅমর বসু পরিচালিত ধর্ম-মূলক পৌরাণিক নাটক 'ফুল্লরা' বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

বিপ্লবী নায়ক : তারকনাথ অপেরা এবারের নতুন মরশুমে দীপ্তিকুমার শীল রচিত নতুন পালা বিপ্লবী নায়ক বিভিন্ন আসরে পরিবেশন করবেন। এছাড়া চারণ কবি মুকুন্দ দাস (ভূপেন চক্রবর্তী) মধুমালতী (বলরাম সাঁতরা) ও রক্তে বাঁধন (নন্দগোপাল রায় চৌধুরী) পালা গুলিও পরিবেশন করবেন। দলে আছে প্রখ্যাত নট তারা ভট্টাচার্য, রেখা ভট্টাচার্য সুখদেবকুমার ও অসিতকুমার। সুর—অ ভট্টাচার্য।

লর্ডস মাঠে ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের ১ম টেস্ট খেলার শেষ দিনে ভেঙ্কটরাঘবনের বলে ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক ইলিংওয়ার্থ 'ক্যাচ' তুললে সোলকার তা ধরার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

টেস্ট খেলা প্রসঙ্গে

লর্ডস মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের প্রথম টেস্ট খেলার বিবরণ এবং ফলাফল মাসের গত সংখ্যাতেই আপনারা পেয়ে গেছেন। এই সংখ্যায় প্রথম টেস্ট খেলার বিভিন্ন দিকের আলোচনা এবং সেই সংগে বিদেশী ক্রিকেট সমালোচকদের মন্তব্য দেওয়া হল।

লর্ডসের প্রথম টেস্টের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে খেলা রীতিমত জমেছিল। বৃষ্টির ফলে চা-বিরতির পর খেলা বাতিল হওয়াতে দু' পক্ষেরই মুখরক্ষা হয়েছে। চা-বিরতির পর ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের ১৪৫ রাণের (৮ উইকেটে) মাথায় খেলাটি বাতিল ঘোষণা করা হয়। ফলে খেলার ফলাফল ড্র দাঁড়ায়। যে অবস্থায় খেলাটি বাতিল হয়েছে তাতে বলা যায় সেই সময় খেলার গতি খানিকটা ইংল্যাণ্ডের অনুকূলে ছিল। তবে ইংল্যাণ্ডের এই অনুকূল অবস্থার পরিবর্তন করা ভারতবর্ষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল এমন কথা ক্রিকেট খেলায় জোর দিয়ে বলা চলে না। জয়লাভের জন্যে ভারতবর্ষের আর ৩৮ রাণের দরকার ছিল, হাতে ছিল দুটো উইকেট। শেষ দিনের খেলায় ১৯১ রাণে ১৩টা উইকেট পড়ে—ইংল্যাণ্ডের ৪৬ রাণে ৫টা এবং ভারতবর্ষের ১৪৫ রাণে

দর্শক

৮টা। এই ৮টা উইকেট পাওয়ার মধ্যে ইংল্যাণ্ডের বোলারদের বিশেষ কোন বাহাদুরী ছিল না। কারণ দ্রুত গতিতে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রাণ তুলতে গিয়েই ভারতীয় খেলোয়াড়রা আউট হয়েছিলেন। অন্যদিকে ভারতীয় স্পিন বোলার চন্দ্রশেখর এবং ভেঙ্কটরাঘবন অল্প রাণে ইংল্যাণ্ডের শেষ পাঁচটি উইকেট নিয়ে শুধু তাঁদের কৃতিত্বের পরিচয়ই দেননি, দলের হাতে জয়লাভের সুবর্ণ সুযোগ তুলে দিয়েছিলেন।

শেষ দিনে যখন ইংল্যাণ্ড খেলতে নামে তখন তাদের রাণ ছিল ১৪৫ (৫ উইকেটে) এবং হাতে জমা ছিল ২য় ইনিংসের আরও ৫টা উইকেট। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের অনুকূলেই খেলার গতি ছিল। কিন্তু দেড় ঘণ্টার মধ্যেই ১৯১ রাণের মাথায় ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংসের খেলা শেষ হলে খেলার গতি ভারতবর্ষের অনুকূলে ঘুরে যায়। ইংল্যাণ্ড ৯০ মিনিটের খেলায় তাদের শেষ পাঁচটা উইকেটের বিনিময়ে পূর্ব দিনের ১৪৫ রাণের সংগে মাত্র ৪৬ রাণ যোগ করেছিল। ইংল্যাণ্ডের এই হাঁড়ির হাল করেছিলেন চন্দ্রশেখর এবং ভেঙ্কটরাঘবন। এই দিনের খেলায় চন্দ্রশেখর ২৫ রাণে ২টো এবং ভেঙ্কটরাঘবন ১০ রাণে ৩টে উইকেট পেয়েছিলেন।

খেলায় জয়লাভের জন্যে ভারতবর্ষের ১৮৩ রাণের দরকার ছিল। হাতে ছিল ৪ ঘণ্টা ২০ মিনিট সময়। উইকেটের অবস্থা কিন্তু অনুকূল ছিল না। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে টেস্ট ক্রিকেট খেলায়

প্রথম জয়লাভের এমন সুবর্ণ সুযোগ ভারতবর্ষের হাতে আগে কখনও আসেনি। সুতরাং ভারতীয় খেলোয়াড়রা দ্রুত গতিতে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৮৩ রাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মরিয়া হয়ে খেলেছিলেন। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাঁরা পাল্লা দিয়ে রাণ তুলেছিলেন। প্রথম ৪৫ মিনিটের খেলায় ৪৭ রাণ উঠেছিল। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের স্কোর ছিল ৪৭ রাণ, দুটো উইকেট পড়ে। ৯৩ মিনিটের খেলায় দলের ১০০ রাণ উঠেছিল। তৃতীয় উইকেট জুটি ইঞ্জিনিয়ার এবং গাভাসকার ঘড়ির কাঁটাকে পিছনে ফেলে ৫০ মিনিটে ৬৬ রাণ তুলেছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার মাত্র ৪০টি বল খেলে তাঁর ব্যক্তিগত ৩৫ রাণ সংগ্রহ করেন। ইঞ্জিনিয়ারের বিদায়ের পরই রাণের গতি কমে যায় এবং তাড়াতাড়ি উইকেট পড়তে থাকে। এই পতনের মুখে একমাত্র গাভাস্কারই যা দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে নিজস্ব ৫৩ রাণ করেছিলেন।

বৃটিশ ক্রিকেট সমীক্ষকদের সমালোচনায় ভারতীয় স্পিন বোলিং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাঁরা চন্দ্রশেখর, বেদী এবং ভেঙ্কটরাঘবনের স্পিন বোলিংয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন, ইংল্যাণ্ডের কোন খেলোয়াড়ই এঁদের বোলিংয়ে স্বাভাবিকভাবে খেলতে পারেননি। ব্যাটিংয়ে প্রশংসা পেয়েছেন ওয়াদেকার, ইঞ্জিনিয়ার এবং গাভাস্কার। তবে তাঁরা পঞ্চমুখে ইঞ্জিনিয়ারের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মতে ইঞ্জিনিয়ারের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা অতুলনীয়।

ডেভিস কাপ

ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনাল

নয়াদিল্লীতে ভারত বনাম রুমানিয়ার ইন্টার-জোন সেমি-ফাইনাল খেলায় রুমানিয়া ৪-১ খেলায় জয়ী হয়েছে। প্রথম দিনে যে দুটি সিঙ্গলস খেলা হয় তার প্রথমটিতে রুমানিয়ার নাস্তাসে ৬-৩, ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে ভারতের জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় সিঙ্গলস খেলায় প্রেমজিৎলাল ১৪-১২, ৬-৩ ও ৯-৭ গেমে রুমানিয়ার টিরিয়াককে পরাজিত করে খেলার ফলাফল সমান (১—১) করেন।

দ্বিতীয় দিনের ডাবলস খেলাটি আলোর অভাবে অসমাপ্ত থেকে যায়। খেলা বন্ধের সময় ভারতীয় জুটি জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎলাল ৩-৬, ৮-৬ ও ৬-৫ গেমে এগিয়ে ছিলেন। রুমানিয়ার পক্ষে ডাবলসের খেলায় নেমেছিলেন নাস্তাসে এবং টিরিয়াক।

তৃতীয় দিনে বৃষ্টির দরুণ দ্বিতীয় দিনের অসমাপ্ত ডাবলসের খেলাটি আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি।

চতুর্থ দিনে রুমানিয়ান জুটি নাস্তাসে এবং টিরিয়াক ৬-৩, ৬-৮, ৮-৬ ও ৬-১ গেমে ভারতীয় জুটিকে পরাজিত করে স্বদেশকে ২—১ খেলায় এগিয়ে দেন।

এখানে উল্লেখ্য, ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় রুমানিয়ার বিপক্ষে এর আগে ভারতবর্ষ মাত্র একবার খেলেছিল—বুখারেস্টে ১৯৬৯ সালের ইন্টারজোন সেমি-ফাইনালে। এই খেলায় রুমানিয়া ৪—০ খেলায় ভারতবর্ষকে হারিয়ে শেষ পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে ০-৫ খেলায় আমেরিকার কাছে হেরেছিল।

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা

১৯৭৪ সালের জুন-জুলাই মাসে পশ্চিম জার্মানীর ৯টি স্থানে দশম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসবে। সম্প্রতি ১৯৭৪ সালের বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দেশের সংখ্যা ৯৮। এত বেশী দেশ ইতিপূর্বে যোগদান করেনি। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হবে ১৯৭৪ সালের ১৩ই জুন।

এই উদ্বোধনী খেলায় ১৯৭০ সালের চ্যাম্পিয়ান ব্রেজিলের সঙ্গে কোন দেশ খেলবে, তা পরে ঠিক হবে। ফাইনাল খেলা হবে ৭ই জুলাই, মিউনিখের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে।

যোগদানকারী ৯৮টি দেশের মধ্যে মাত্র ১৬টি দেশ পশ্চিম জার্মানীতে শেষ লীগ পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণ করবে। প্রতিযোগিতার নিয়মানুসারে গতবারের (১৯৭০) চ্যাম্পিয়ান ব্রেজিল এবং ১৯৭৪ সালের প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা দেশ পশ্চিম জার্মানী সরাসরি শেষ লীগ পর্যায়ে খেলতে নামবে। কিন্তু বাকি ৯৬টি দেশকে প্রতিযোগিতার নিয়মমাফিক বাছাই পর্বে খেলায় অংশগ্রহণ করে শেষ লীগ পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

ব্রেজিল এবং পশ্চিম জার্মানীকে বাদ দিয়ে ৯৬টি দেশকে নিয়ে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার বাছাই পর্বের খেলার তালিকা তৈরী হয়েছে। যোগদানকারী দেশগুলির ভৌগোলিক অবস্থান বিচার করে এই ৬টি জোনে তাদের খেলা স্থির হয়েছে—(১) ইউরোপ (২) আফ্রিকা (৩) এশিয়া, (৪) দক্ষিণ আমেরিকা, (৫) উত্তর মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান (৬) ওসেনিয়া। প্রতি জোনের অন্তর্ভুক্ত দেশ সংখ্যা এই রকম : ইউরোপীয় জোনে ৩৩টি, আফ্রিকান জোনে ২৪টি এশিয়ান জোনে ১৫টি দক্ষিণ আমেরিকান জোনে ১০টি, উত্তর-মধ্য আমেরিকান জোনে ১৪টি এবং ওসেনিয়ান জোনে ২টি।

অন্যান্য জোনের তুলনায় ইউরোপীয় জোনেই যোগদানকারী দেশের সংখ্যা বেশী—৩৩টি। পশ্চিম জার্মানীতে শেষ পর্যায়ের খেলায় যে ১৬টি দেশ খেলবে তার মধ্যে ইউরোপের ৯টি দেশ তো খেলবেই, এমনকি ১০টি দেশও হতে পারে। কারণ ইউরোপীয়ান জোনের ৯নং গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান দেশের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার ৩নং গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান দেশের যে খেলা হবে তার বিজয়ী দেশই পশ্চিম জার্মাণীর শেষ পর্যায়ের খেলায় অংশ গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করবে।

এশিয়ান জোনের দুটি গ্রুপে ১৬টি দেশ খেলবে—'এ' গ্রুপে ৮টি এবং 'বি' গ্রুপে ৮টি। ভারতবর্ষের খেলা পড়েছে 'বি' গ্রুপে।

পশ্চিম জার্মাণীতে ১৬টি দেশ চারটি গ্রুপে সমান ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে। তারপর প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দেশকে নিয়ে নক আউট প্রথায় খেলা হবে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

বর্ষ
খণ্ড

অমৃত

১৫শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday 13th August, 1971. ২৭শে শ্রাবণ ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : মুকুল দে

এক নজরে

বিজ্ঞান ও পৃথিবী :

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে বিরাট বিরাট পরিবর্তনের ঝুঁকি মানুষ নিচ্ছে তাতে আগামী পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীর আবহাওয়া এমনভাবে পাল্টে যাবে যা মানুষের বর্তমান স্বাভাবিক জীবনকে অসম্ভব ক'রে তুলবে। বিপর্যয় ঠেকানোর জন্য এখনও বছর দশেক সময় আছে। কিন্তু প্রকৃতি জয়ের নেশায় উন্মত্ত মানুষ এই সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করবে বলে মনে হয় না। —এই আশংকা প্রকাশ করা হয় স্টকহোমে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত তিন সপ্তাহব্যাপী নিখিল বিশ্ব বিজ্ঞানী সম্মেলনে।

বিশ্ব বিজ্ঞানী সম্মেলনে আলোচ্য বিষয় ছিল—দূষিত আবহাওয়া ও পৃথিবীর বুকে বড় বড় ওলটপালটের বিপজ্জনক পরিণতি। নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কলকারখানার ময়লা আর পোড়া কয়লা পেট্রোলের ধোঁয়ায় কিভাবে বাতাস দূষিত হচ্ছে, নদীর জল কলুষিত হচ্ছে তা উদ্বেগের সঙ্গে পর্যালোচনা করেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু তার চেয়েও তাঁরা বেশি বিচলিত হন পৃথিবীর বুকে যেসব বড় বড় পরিবর্তনের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে তার পরিণতির কথা চিন্তা ক'রে। যেমন পেট্রোলিয়মের সন্ধানে ও মানুষের খাদ্য ও বাসস্থানের প্রয়োজনে যদি সাহারা মরুকে শ্যামল প্রান্তরে রূপান্তরিত করা হয় তবে আইসল্যান্ডের মতো বরফচাপা হয়ে যাবে বৃটেন ও পশ্চিম ইউরোপ। সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি সাইবেরিয়ার নদীগুলির গতিপথ ঘুরিয়ে দেয় ও সেগুলিকে নাব্য রাখার জন্য উত্তর মেরুর বরফ গলানোর ব্যবস্থা করে তবে তা পৃথিবীর সমগ্র উত্তর গোলার্ধের আবহাওয়া পরিবর্তিত করে দিতে পারে। সমগ্র উত্তর আমেরিকা তখন আলাস্কার মতো হিমশীতল হয়ে পড়বে। আর পশ্চিম ইউরোপ হয়ে যাবে শুষ্ক। কৃষিকার্যে সেচের প্রয়োজনে যেভাবে নদীর জল ছড়িয়ে ফেলা হচ্ছে তাতে অনেক বেশি জল বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে, যার ফলে বৃষ্টি বেড়ে যাচ্ছে পৃথিবীতে। বাতাসে যেভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ছে তাতে বৈজ্ঞানিকদের আশঙ্কা, এই শতাব্দীতেই সারা পৃথিবীর আবহাওয়ার তাপ তিন সেণ্টিগ্রেড বেড়ে যাবে।

সব পর্যালোচনার শেষে বৈজ্ঞানিকরা মন্তব্য করেছেন, পরিণতির কথা চিন্তা না করেই মানুষ এইসব সর্বনাশের খেলায় মেতেছে।

বালিকাদের নতুন সমস্যা :

বৃটেনের ফ্যামিলি প্লানিং এসোসিয়েশনের ডাইরেক্টর শ্রীক্যাসপার ব্রুক সেদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, বিভিন্ন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে বারো থেকে ষোল বছরের মেয়েদের ভিড় দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। তারা জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত হতে চায়, এবং কেন্দ্রগুলির পরিচালকরাও তাদের প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। কারণ তাঁরা দেখতে পান যে, ঐ বালিকারা প্রকৃত অর্থে কেউই কুমারী নয় এবং যে কোন মুহূর্তে ওদের যে কোনজন বিপন্ন হতে পারে।

শ্রীব্রুক আরও বলেন, এ ব্যাপারে তাঁদের প্রধান সমস্যা হল আইনের প্রতিবন্ধকতা। কারণ আইনানুসারে যারা এখনও সম্মতির বয়সে (এজ অফ কনসেণ্ট) পৌঁছায়নি তাদের তাঁরা জন্মনিয়ন্ত্রণের উপদেশ দেন বা বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করান কেমন করে? অথচ তারা যে অবস্থায় আসে শুধুমাত্র মানবিক কারণেই, সে অবস্থায় তাদের ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীব্রুক ফ্যামিলি প্লানিং এসোসিয়েশনের যে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাতে তিনি দেখান যে, এ-বছরের প্রথম তিন মাসে, গত বছরের প্রথম তিন মাসের তুলনায় ইংলণ্ড ও ওয়েলস-এ অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাদের গর্ভপাতের ঘটনা অত্যধিক বেড়ে গেছে। ১৯৭০ সালের প্রথম তিন মাসে ৩,৫৯৯ জন অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার গর্ভপাত ঘটানো হয়; এ বছরের প্রথম তিন মাসে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪,৫৫৬। তাদের মধ্যে ষোল বছরের কম বয়সের বালিকার সংখ্যা ছিল ১,৭৯১। এ অবস্থায় যদি বিপন্ন মেয়েদের আইনগত কারণে ক্লিনিক থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবে অপ্রাপ্তবয়স্কদের গর্ভপাতের সংখ্যা আরও দ্রুতগতিতে বেড়ে যাবে। এক বছরের ব্যবধানে ২৮ শতাংশ বৃদ্ধি ত সামান্য কথা নয়।

এ ব্যাপারে নতুন আইনের প্রশ্ন তোলা হয়েছে মেডিক্যাল ডিফেন্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। ঐ সংস্থার সহকারী সেক্রেটারি ডঃ জন ওয়াল সেদিন সাংবাদিকদের বলেন, কোন অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা যদি অন্তঃস্বত্ত্বা হয় তাহলে তার গর্ভপাত ঘটানোর ব্যাপারে আইনত অভিভাবকদের মতামতই চূড়ান্ত হবে এমন কোন কথা 'ফ্যামিলি ল রিফর্মস এক্ট'-এ বলা হয়নি। ওসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মেয়েটির মত অবশ্যই নিতে হবে এবং ও ব্যাপারে তার মতই হবে শেষ কথা। ডঃ ওয়াল বলেন : এ ব্যাপারে আমাদের অভিমত হল, একটি মেয়ে যদি অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার বয়স অর্জন করে থাকে তবে সে সন্তান তার কাম্য কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বয়সও তার হয়েছে। সুতরাং তার ওপর অন্যের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া সঙ্গত হবে না।

বলা বাহুল্য, ঐ মেডিক্যাল ডিফেন্স ইউনিয়নের আন্দোলনের জন্যই আজ বৃটেনে বিভিন্ন অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার গর্ভপাতকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ আন্দোলন তীব্রতর হচ্ছে। কদিন আগে হাউস অফ কমন্সে শ্রমিক সদস্য শ্রীমতী রেনো শর্ট অভিযোগ করেন যে, বিভিন্ন হাসপাতালের বহু চিকিৎসক এখন তাঁদের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস বা অন্য কোন কারণের জন্য গর্ভপাত ঘটাতে চাইছেন না, এবং তার ফলে গর্ভপাত আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে চলেছে। সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্যার কিথ যোসেফ তখন শ্রীমতী শর্টকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, দেশের প্রয়োজনে গর্ভপাত আইন কতটা সহায়ক হচ্ছে সেটা পর্যালোচনার জন্য যে কমিশন গঠন করা হয়েছে, তাঁরা এ সম্পর্কেও তদন্ত করে দেখবেন।

—প্রত্যক্ষদর্শী

ছায়া কালো-কালো

ইয়াহিয়া খানের রণহুংকার ভারতবর্ষের পক্ষে উপেক্ষা করা আর সম্ভব নয়। এই দেশের সামরিক শক্তি পাকিস্তানের চেয়ে বেশী হলেও, সেই দেশের সামরিক শাসকচক্র একটা সংঘর্ষের জন্য একেবারে মুখিয়ে আছেন। মুক্তিফৌজের আক্রমণ যত তীব্রতর হয়ে উঠছে পূর্ব বাংলায় কর্মরত কম্যাণ্ডারবৃন্দ ততই পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তাদের চাপ দিচ্ছেন কিছু একটা করে মুখরক্ষা করার জন্য। এই সূত্রে ভিয়েতনামে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার উল্লেখ হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ভিয়েতনামের মার্কিন কম্যাণ্ডারবৃন্দ শুধু কম্বোডিয়ার এবং হো-চি-মিন ট্রেইলের ঘাঁটিতে আক্রমণ করার চাপ দিয়ে ক্ষান্ত হন নি দক্ষিণ ভিয়েতনামে বিদ্রোহ রুখবার জন্য উত্তর ভিয়েতনামেও হামলা চালিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট জনসন উত্তর ভিয়েতনাম আক্রমণের লোভটা সংবরণ করেছিলেন। তবে তার পিছনে অন্য কারণও ছিল।

ইসলামাবাদের জঙ্গীচক্র পূর্ব বাংলায় যুদ্ধ করে বিজয়ী হওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে মুক্তিফৌজের হাতে পরাজয় স্বীকার না করে বরং ভারতের হাতে চড় খাওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন। তাহলে পাকিস্তানের নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব হবে, স্বদেশে দেশাত্মবোধ জাগানো যাবে—বলা যাবে ভারতের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ। এই যুদ্ধে মৃত্যু হলে একেবারে সশরীরে বেহেস্তে যাওয়া সুনিশ্চিত। পাকিস্তানী সেনাদল জেহাদের মানসিকতায় গড়ে উঠেছে। তার ওপর পাকিস্তানের মুরুব্বির জোর আছে। কোনো কোনো জীববিশেষ খোঁটার জোরে লড়াই করে। পাকিস্তানও কম কি, নিকসন চাচার ছত্র-ছায়ায় সে যা অস্ত্রসম্ভার পাচ্ছে তা একটা ছোট্ট দেশের পক্ষে যথেষ্ট, তার ওপর এই সব অস্ত্র আসছে বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে। ওদিকে সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্তান তার দুই প্রধান পৃষ্ঠপোষক আমেরিকা ও চীনের কাছ থেকে অনেককিছু পেয়েছে এবং পাবে কিন্তু তার চেয়ে বেশী পাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ থেকে। ভারী অস্ত্রশস্ত্র, স্বল্প-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র এবং তিন স্কোয়াড্রোন জঙ্গী বিমান পেয়েছে। এই সব দ্রব্যগুলি আসল পশ্চিমা মাল, শুধু হাত-ফেরতা হয়ে আসছে মাত্র। আরও জানা যায় ত্রিশ হাজার নতুন সেনা তৈরী হয়েছে, এই সেনা দিয়ে বোধ হয় পূর্ব-বাংলার গৃহযুদ্ধে নিহতদের কিঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণ করবে। পাকিস্তান শুধু ভাবছে এখনই তারা ভারতের সঙ্গে লড়াই শুরু করবে না বর্ষার পর—এই নিয়ে তাদের সামরিক বাহিনীর মধ্যে মতভেদ আছে। মুক্তিবাহিনীর অবস্থা বর্ষার শেষে কি রকম দাঁড়ায় অনেকে সেটা দেখতে চান; অপর পক্ষ বলছেন না, এখনই, দিই লাফ—

এই সব কারণে ভারতকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখতে হবে তার সব কটি সীমান্তে। পাকিস্তান যে কোনো ঘাঁটিতে হঠাৎ একটা খেল শুরু করতে পারে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই কিছু-কিছু সুশিক্ষিত গুপ্তচর অনুপ্রবেশ করছে। আরো কিছু আসতে পারে।

ইয়াহিয়ার ভারতবিদ্বেষ, উৎকট সমরতৃষ্ণা এবং হঠকারিতা সত্ত্বেও একথা আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন যে, ইয়াহিয়ার পরিকল্পনা সুচিন্তিত এবং তার পিছনে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানী মস্তিষ্ক কার্যরত তা নয়, দু-একটি বিদেশী রাষ্ট্রের ঝানু-সমরকুশলী ধুরন্ধর এই সব প্ল্যান প্রস্তুত করছেন। ইয়াহিয়া জানেন যে, বিশ্বের দরবারে আজও তাঁর রাষ্ট্র অসহায় নাচার শিশুরাষ্ট্র হিসাবে বিবেচিত, সবাই তাঁদের নানা কারণে নেকনজরে দেখে থাকেন। সেই আন্তর্জাতিক মুরুব্বিরাই তাদের প্রধান আশ্রয়। পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য মিত্রভাবাপন্ন রাষ্ট্রগুলির সহযোগে সে তার প্রতিটি পদক্ষেপ স্থির করছে একথা জানার জন্য কোনো বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। যুক্তরাষ্ট্র ত এখনই ইউ-এনের মারফৎ ভারত ও পাকিস্তানে ইউ-এন পর্যবেক্ষক বসানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করছেন। নিকসনীচক্রের যুক্তি যে, ইউ-এন-এর এই পর্যবেক্ষক দল সীমান্তে এসে দাঁড়ালেই বাস্তুত্যাগীরা একেবারে নির্বাহীনচিত্তে স্ব-স্ব গৃহে ফিরে যাবেন। কিন্তু এই ছলনার অর্থ অন্যবিধ। ভারতের সীমান্তে লোক রেখে দেখা মুক্তিযোদ্ধাদের ভারত যেন কোনো রকম সাহায্য দিতে না পারে।

পাকিস্তানের প্ল্যানের প্রথমাংশ বেশ কার্যকরী হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবাই প্রায় মেনে নিয়েছেন ঘরোয়া কোঁদলে কারো গায়ে-পড়ে যাওয়া অকর্তব্য। যাঁরা গোড়ায়-গোড়ায় বলতেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে একটা রাজনৈতিক বোঝাপড়া না হলে বাস্তুত্যাগীরা দেশে ফিরতে পারেন না, তাঁরাও এখন ইয়াহিয়ার দিকে ঢলে পড়েছেন। ভারত তীব্র ভাষায় বলেছেন যে, ভারত ও পাকিস্তানে কোনো কলহ নেই, কলহ তার নিজের ঘরে সুতরাং আমরা পর্যবেক্ষক চাই না। ইয়াহিয়া এখন সেই কলহটাই সৃষ্টি করতে চায়। জগৎকে দেখাতে চায়—দেখো ভারত কি কাণ্ডটা করছে—আর সেই অবস্থা যদি ঘটে তাহলে ভারতের অবস্থা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটু কাহিল হবে।

আমাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বার বার বলেছেন—আক্রান্ত হলে আমরা তা প্রতিরোধ করতে পারব। তার জন্য আমরা প্রস্তুত। এই আশ্বাস মূল্যবান। কিন্তু শুধু অস্ত্রের ঝনঝনা নয়, কূটনীতির দাবা-খেলায় মোক্ষম চাল দিতে যেন ভুল না হয়। আমাদের সেই দিকে চোখ খুলে থাকতে হবে।

সবক'টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন মিলে আগামী ২৫ আগস্ট যে বাংলা বন্‌ধের ডাক দিয়েছে সেটা কি মার্কস্‌বাদী কম্যুনিস্ট পার্টির একটা উল্লেখযোগ্য জয়লাভ? নাকি এই ঐকমত্যের জন্যে পার্টিকে বেশ চড়া মাশুল দিতে হল? আর এই সর্বসম্মত আহ্বানকে পশ্চিমবাংলা সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার তথা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কী চোখে দেখবেন?

এর অন্ততঃ প্রথম দু'টি প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের একটু পিছনের দিকে তাকাতে হবে। অবশ্য খুব বেশি পিছনে নয়, গত জুনের শেষের দিক থেকেই শুরু করা যায়। ঐ সময়েই মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা সিটু প্রথম আহ্বান জানায় মিলিত আন্দোলনের। অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার কাছে লেখা একটি চিঠিতে এই ডাক দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট, শ্রম-বিরোধী নীতি, এই সবই এই আন্দোলনের লক্ষ্য হবে স্থির ছিল। এর কিছুদিন আগে দিল্লীতে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি তৈরি হয়েছিল শ্রী এস এ ডাঙ্গের উদ্যোগে। সিটু ঐ কমিটি তৈরিতে সহযোগ করেছিল। তাই সিটুর ধারণা ছিল, তার সহযোগের উত্তরে এ আই টি ইউ সি পশ্চিমবাংলায় তার আহ্বানে সাড়া দেবে।

কিন্তু সিটুর সেই আশা ফলবতী হল না। যে-কারণে ঐ সময়েই কংগ্রেস-বিরোধী মোর্চা গঠনের জন্যে সি পি এম-এর ডাক অন্যান্য বামপন্থী দল প্রত্যাখ্যান করল, ঠিক সেই কারণেই যুক্ত ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনের প্রস্তাবও ভেস্তে গেল। সেই কারণটা হল, পশ্চিম বাংলায় ক্রমাগত খুনোখুনি। সিটুর আহ্বানের উত্তরে অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা বললেন, শরিকী সংঘর্ষ ও হত্যার রাজনীতি বন্ধ না হলে সংযুক্ত আন্দোলন করাই যাবে না। তাই আগে চাই, এই বিষয়ে বোঝাপড়া। সিটুর ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন—প্রথমতঃ, খুনোখুনি বন্ধের প্রশ্ন প্রধানতঃ রাজনৈতিক, সেই রাজনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসার আশায় বসে থাকলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন চলবে না। দ্বিতীয়তঃ, সংযুক্ত আন্দোলনই খুনোখুনি বন্ধের পথ।

জুলাইয়ের গোড়ায় সি পি এম রাজ্য কমিটি যে-প্রস্তাব নিল, তাতেও একই ধরনের কথাই বলা হল। প্রমোদ দাশগুপ্ত জানালেন, 'জরুরী দাবি নিয়ে, অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু না করলে সমাজ-বিরোধীদের রোধ করা যাবে না।' কিন্তু মার্কস্‌বাদীদের এই ব্যাখ্যা অন্যান্যরা মেনে নিতে পারলেন না। তাই পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার পাত্র—এই ধরনের তর্কের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে দিশাহারা হয়ে গেল সিটুর প্রস্তাব।

মার্কস্‌বাদীরা অবশ্য হাল ছাড়লেন না। তাঁরা নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করেই ডাক দিলেন বাংলা বন্‌ধের। তারিখ ঠিক হল ১১ আগস্ট। তবে সেটা সাময়িকভাবে। অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নকে এই বন্‌ধ পালনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সিটুর পক্ষ থেকে বলা হল, সকলে যদি চান তারিখ পাল্টাতে কোনো অসুবিধে হবে না। অর্থাৎ দর-কষাকষি ও আপসের একটা ছোট দরজা খুলেই রাখা হল।

তবু কিন্তু প্রথম দিকে মনে হচ্ছিল, সি পি এম-কে বুঝি একলাই নামতে হবে শক্তিপরীক্ষায়। আর এবারও জাহাজ আটকে যাচ্ছিল একই চড়ায়। অর্থাৎ খুনোখুনি বন্ধ সম্পর্কে একটা আচরণবিধি তৈরির প্রশ্নে।

অ-মার্কস্‌বাদী কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা নিয়ে পশ্চিম বাংলায় একটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি আছে। সি পি আই, এস ইউ সি, পি এস পি প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার নেতারা এই কমিটিতে আছেন। সিটুর চিঠিটি তাঁরা বিবেচনা করতে বসলেন জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে। আই এন টি ইউ সি নেতা শ্রীকালী মুখার্জিকেও ডাকা হল বিশেষভাবে এই আলোচনায় যোগ দিতে।

সিটুর চিঠির উত্তরে তাঁরা বেশ কড়া ভাষায় জানালেন যে, প্রস্তাবিত বন্‌ধে তাঁদের সমর্থন নেই। কারণ? কারণ এই যে, যে-সব দাবির ভিত্তিতে বন্‌ধ ডাকা হচ্ছে তাতে ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য গড়ে তোলার কাজে কোনো সাহায্য হবে না, শ্রমিক-শ্রেণীর দাবি পূরণের কোনো কর্মসূচীও গড়ে তোলা যাবে না। সিটুর আহ্বানের মধ্যে তাঁরা পেলেন রাজনীতির গন্ধ—একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গীর চিহ্ন। এই ধরনের সংকীর্ণ দলগত দৃষ্টিভঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর বলে তাঁরা রায় দিলেন।

শরিকী সংঘর্ষ ও সন্ত্রাসের প্রশ্নও তাঁরা তুললেন। দলে-দলে যখন সংঘর্ষ ঘটে, তখন বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যেও যে তা ঘটবে তা আর বিচিত্র কী? অনেক ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীই হয়েছেন এই সংঘর্ষের বলি। এই আত্মঘাতী পথ এড়িয়ে সমবেতভাবে শ্রমিক আন্দোলন চালাতে হলে প্রথমেই দরকার একটা আচরণ-বিধি তৈরি করা। সেই আচরণ-বিধির মূল কথা হবে, ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসায় সন্ত্রাসের কোনো স্থান থাকবে না। এইসব কথা বলার পর কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতারা সিটুর প্রতি কিছুটা বক্রোক্তি করতেও ছাড়লেন না। 'কোনো দুর্বোধ্য কারণে' সিটু এই ধরনের প্রস্তাবকে তেমন আমল দিচ্ছে না। আর তার ফলেই যুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তোলার উপযুক্ত পরিবেশও তৈরি হতে পারছে না।

তবে যেটা লক্ষ্য করা দরকার, কমিটি কিন্তু সিটুর সঙ্গে সমঝোতার সব পথ বন্ধ করে দিলেন না। কী জানি, ভবিষ্যতে যদি কোনো দরকার হয়! তাই কমিটির নেতারা বললেন, বন্‌ধের তারিখ বা যে-সব দাবির ভিত্তিতে বন্‌ধ হবে, সে-সব বিষয়ে অবশ্যই আরো আলোচনা করা যেতে পারে। আর সেই আলোচনার জন্যে সিটুকে সাদর আমন্ত্রণ জানানোও হল।

চেষ্টাও চলতে লাগল একটা মিলিত বৈঠকের। একদিন (২৬ জুলাই) বৈঠক বসতে পারল না, কারণ কে বৈঠক ডেকেছেন, সে-বিষয়ে নাকি কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দেয়। পরদিন আবার চেষ্টা হল বৈঠকের। সি পি আই, এস ইউ সি, পি এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলের ট্রেড ইউনিয়ন শাখার নেতারা বৈঠকের জন্যে তৈরিই ছিলেন। কিন্তু তবু বৈঠক হল না। কারণ, কালী মুখার্জি এবং আর এস পি-র যতীন চক্রবর্তী তখন দিল্লীতে। তাঁরা না হাজির থাকলে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে বিশেষ লাভ নেই, এই কথা জানানো হল সিটুর পক্ষ থেকে।

বৈঠক অবশ্য বসল শেষপর্যন্ত—৩১ জুলাই। সব ট্রেড ইউনিয়নের নেতারাই হাজির রইলেন। শুনতে একটু অদ্ভুত হলেও, বৈঠক যে শেষপর্যন্ত হল তার জন্যে অনেকটা কৃতিত্বই দাবি করতে পারেন কালী মুখার্জি। তবে প্রথম দিনেই সব প্রশ্নের ফয়সালা হল না। আবার বৈঠক বসল ২ আগস্ট। সভাপতিত্ব করলেন কালী মুখার্জি।

• • •

যে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ২৫ আগস্ট হরতালের ডাক দেওয়া হল তা বিশ্লেষণ

করলে কী দেখা যায়? দেখা যায়, দু' পক্ষই কিছু কিছু ছেড়েছেন। বন্‌ধের তারিখ পালটানোটা খুবই গৌণ ব্যাপার, ওটা তো সিটু আগে থেকেই বলে রেখেছিল। এটাকে সিটুর বিপক্ষ গোষ্ঠীর জয় বলা তাই অর্থহীন। সিটু তাহলে বড় রকমের কোনো প্রশ্নে কি এক-পা পিছিয়ে এসেছে? আচরণ-বিধির প্রশ্নে তারা কিছুটা নরম হয়েছে বৈকি। বৈঠকের প্রথম দিকে সিটুর কমল সরকার ও আর এস পি-র যতীন চক্রবর্তী অবশ্য কোনোরকম আচরণ-বিধি তৈরির প্রবল বিরোধিতাই করেন। যতীনবাবু নাকি বৈঠক ছেড়ে চলে যাবেন বলেও হুমকি দেন বলে শোনা যায়। তবে শেষপর্যন্ত দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে একটা প্রস্তাব তৈরি হল। না, ঐ বৈঠকেই আচরণ-বিধি তৈরি করা হল, তা নয়। তবে সব দল একবাক্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে শরিকী সংঘর্ষের নিন্দা করলেন।

বৈঠকের পর যে-বিবৃতি প্রচার করা হয়েছে তাতে কিন্তু এই প্রসঙ্গটি অনেকটা জায়গাই জুড়ে আছে। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের উদ্যোগে সর্বদলীয় বৈঠকে হত্যার রাজনীতি সম্পর্কে যে-প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা তার প্রতি সমর্থন জানালেন। শরিকী সংঘর্ষের ফলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাও স্বীকার করা হল। আর বড় কথা, তারা একটা আচরণ-বিধি তৈরির প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করলেন। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীরা যাতে এই কথা মনে রেখে ভবিষ্যতে চলেন তার জন্যেও আবেদন জানানো হল।

অবশ্যই এ-কথা ঠিক যে, সিটু তথা মার্কস্‌বাদীরা এই প্রথম একটা আচরণ-বিধির প্রয়োজনীয়তার কথা মেনে নিলেন। সিদ্ধার্থবাবুর উদ্যোগে এ-পর্যন্ত যে-সব সর্বদলীয় বৈঠক হয়েছে সেখানেও মার্কস্‌বাদী নেতারা এই ধরনের আচরণ-বিধির জন্যে এস ইউ সি ও অন্যান্য দলের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার কারণ, সি পি এম-এর মতে এই রাজ্যের খুনো-খুনির মূলে কারণ শরিকী সংঘর্ষ নয়, কংগ্রেস ও নকশালপন্থীরা একযোগে গণতান্ত্রিক দলের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে বলেই চলছে সংঘর্ষ। কিন্তু এখন বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের (অর্থাৎ বিভিন্ন দলের) মধ্যে একটা আচরণ-বিধি পালনে রাজী হওয়া মানেই পরোক্ষভাবে এই কথা স্বীকার করে নেওয়া যে, শরিকী সংঘর্ষ অশান্তির একটা বড় কারণ।

অ-মার্কসবাদীরা এই বিশ্লেষণে হয়ত উল্লসিত হবেন, কিন্তু খুনোখুনি সম্পর্কে সি পি এমের মনোভাবে এর আগেই কি একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিতে সুরু করে নি? অজয়বাবু মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় যে শান্তি বৈঠকের [illegible] সি পি এম যে তাতে যোগ দিতে [illegible] নি, তার অন্যতম কারণ ছিল, এই দল 'খুনী' কংগ্রেসের সঙ্গে এক টেবিলে বসতে চায় না। কিন্তু সেই 'খুনী' কংগ্রেসেরই নেতা এবং পশ্চিম বাংলায় 'দিল্লীর ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতীক' সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যখন অনুরূপ বৈঠক ডাকলেন তখন সি পি এম তাতে যোগ দিলো। শেষ পর্যন্ত ঐ বৈঠকে যে প্রস্তাব গৃহীত হল তাতেও সি পি এমের সম্মতি পাওয়া গেল। দিল্লীতে জ্যোতি বসু স্বেচ্ছায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হওয়ার কারণ হিসেবে সি পি এমের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, সি পি এম স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে কতোটা আগ্রহী এই বৈঠক তারই প্রমাণ।

অর্থাৎ, গত মাস খানেকের মধ্যে এই ব্যাপারে সি পি এমের সুর যে ক্রমশঃ নরম হয়ে আসছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এখন ট্রেড ইউনিয়ন বৈঠকে বাংলা বন্‌ধের প্রস্তাব গ্রহণের সময় পার্টির গলা আর এক পর্দা নেমেছে। এটাকে যদি পার্টির পশ্চাদপসরণ বলতে চান, বলুন। তবে তার আগে ভেবে দেখা দরকার, এর বিনিময়ে মার্কসবাদীরা কী লাভ করলেন? অর্থাৎ এই পশ্চাদপসরণ স্ট্র্যাটেজিক রিট্রিট কিনা?

বাংলা বন্‌ধের সর্বসম্মত ডাকের মধ্যে দিয়ে সি পি এম তিনটি ক্ষেত্রে লাভবান হলঃ

এক—ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচনের দাবিতে সব ট্রেড ইউনিয়নকে (অর্থাৎ দলকে) সামিল করা গেল। আশু নির্বাচনের দাবি প্রথম সি পি এমই তুলেছিল। সিদ্ধার্থবাবুর সর্বদলীয় বৈঠকেও সি পি এমের অনুগামীরা বলেছেন, নির্বাচন হলেই খুনোখুনি বন্ধ হয়ে যাবে, তাই যত শীঘ্র সম্ভব নির্বাচন করতে হবে। সি পি এম পোলিট-ব্যুরো নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের ডাক দেয়। ট্রেড ইউনিয়ন বৈঠকেও আশু নির্বাচনের ডাক দেওয়া হল, তবে তার সময়-সীমাটা কিছুটা পিছিয়ে দেওয়া হল, এই যা।

দুই—সর্বসম্মত হরতালের ডাকের মধ্যে দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে মার্কসবাদীদের নিঃসঙ্গতা ঘুচে গেল। এই সিদ্ধান্তের আগে সিটু ছিল এক দিকে, আর বাকি সব কটি ট্রেড ইউনিয়ন ছিল বিপরীত দিকে। এখন যে সব মতভেদ ঘুচে গেল তা নয়। ট্রেড ইউনিয়ন বৈঠকের পর প্রচারিত বিবৃতিতেও অনেক বিষয়ে মত-পার্থক্যের কথা স্বীকার করা হয়েছে। তবু এখন অন্য সব কটি ট্রেড ইউনিয়ন সিটুর সঙ্গে একত্রে আন্দোলন চালাতে রাজী হয়েছে। এটাও সি পি এম লাইনের জয়, কারণ 'কংগ্রেস-বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল করাই' মার্কসবাদীদের উদ্দেশ্য। কংগ্রেস-বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তি ছাড়া সি পি এম এখন একটা ফাউও পেয়ে গেল—সেটা হল আই এন টি ইউ সি।

তিন—সি পি এম প্রথমে ১১ আগস্ট যে বন্‌ধের ডাক দেয় তাকে প্রধানমন্ত্রী বলেন রাষ্ট্র-বিরোধী। লোকসভায় স্বরাষ্ট্র-দপ্তরের মন্ত্রী কে সি পন্থও অনুরূপ মন্তব্য করেন। সিদ্ধার্থবাবু বলেন, এই বন্‌ধের ডাক পরিতাপজনক। এই সব মন্তব্যেরই লক্ষ্য ছিল সি পি এম। কোনো কোনো মহলে এই দাবিও উঠল যে, সি পি এম যদি রাষ্ট্র-বিরোধী কাজই করছে, তবে তাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন? তাদের সঙ্গে শান্তি বৈঠকেরই বা দরকার কী? কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, সি পি এম তো বটেই, পশ্চিম বাংলার অন্যান্য বামপন্থী দলও এই রাষ্ট্র-বিরোধী বন্‌ধের ডাকে গলা মিলিয়েছে। শুধু তাই নয়, যে আটটি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে এই ডাক দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে আই এন টি ইউ সি। অর্থাৎ এখন রাষ্ট্রদ্রোহী বলে শুধু মার্কসবাদীদের দায়ী করা যাবে না, অন্যান্য দলকেও করতে হবে এবং সেই সব দলের মধ্যে কংগ্রেসও এসে পড়বে, কারণ আই এন টি ইউ সি কংগ্রেসেরই শাখা। এটা কি সি পি এমের কম লাভ?

এই ধরনের যুক্ত আন্দোলনে হাত মিলিয়ে হরতাল ডাকা আই এন টি ইউ সির পক্ষে এই প্রথম। এই সংস্থা যে নিতান্তই কংগ্রেসের লেজুড় নয়, এ-কথা প্রমাণ করাই কি কালী মুখার্জির উদ্দেশ্য? তা হোক আর না-ই হোক, কংগ্রেসের একাংশ কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক কল-কারখানায় আই এন টি ইউ সির পাল্টা ইউনিয়ন চালু করতে উদ্যোগী হয়েছেন। সেটা নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ।

৬-৮-১৯৭১ সেন গুপ্ত

দেশে বিদেশে

এই সাপ্তাহিক সংবাদ পর্যালোচনা লেখার সময় পুণ্ডরীকের সামনে যেটা সব চেয়ে বড় খবর সেটা হল এই যে, সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো ভারত সফর করতে আসছেন বলে অকস্মাৎ ঘোষণা করা হয়েছে।

এর ঠিক আগে নয়াদিল্লির বিশেষ দূত হিসাবে মস্কোতে পাঠান হয়েছিল প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী ডি পি ধরকে।

বোম্বাইয়ের একটি পত্রিকার সংবাদ যদি সত্য নয় তাহলে বুঝতে হবে, নয়াদিল্লি কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি আসন্ন এবং ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ হচ্ছে এই সম্ভাবনারই পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ক্রমেই দুর্বার হয়ে উঠছে, পূর্ব বাংলায় বেশ কিছু অংশ তারা নিজেদের দখলে এনেছেন। এদিকে পাকিস্তানের জঙ্গী ডিরেক্টর ইয়াহিয়া খাঁ ভারতের সঙ্গে 'টোটাল ওয়ার'-এর হুমকি দিচ্ছেন। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসিতে চড়াবেন বলেও দম্ভ প্রকাশ করেছেন। জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টো *তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। আমেরিকা পাকিস্তানকে পথে আনতে সাহায্য করবে বলে ভারত যে আশা করেছিল সেই আশা মিলিয়ে গেছে। সেদেশের ডেমোক্র্যাটিক প্রাধান্যযুক্ত প্রতিনিধিসভা ২০০-১৯২ ভোটে প্রস্তাব গ্রহণ করে পাকিস্থানকে একমাত্র ত্রাণ বাদে অন্যান্য বাবদ যাবতীয় ডলার সাহায্য দেওয়া বন্ধ রাখতে বলেছেন।* কিন্তু তা সত্ত্বেও রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট নিকসন বলেছেন, 'আমেরিকা পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ রাখুক, এই মত আমরা সমর্থন করি না।' তিনি বলেন, 'পশ্চিম পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে যেতে থাকলেই আমরা এবিষয়ে সবচেয়ে গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারব বলে আমরা মনে করি।'

অন্যদিকে, পূর্ব বাংলা থেকে আশ্রয়প্রার্থীদের ভারতে আসার বিরাম নেই। এই সংখ্যা ইতিমধ্যে ৮০ লক্ষে পৌঁছে গেছে।

এই আশায় ভারত সরকার কি একটা নূতন, নাটকীয় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন? বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ভারত সরকার যে 'উপযুক্ত সময়ের' কথা বলে আসছেন সেই 'উপযুক্ত সময়' কি এসে গেছে? এই পর্যালোচনা পাঠকদের হাতে গিয়ে পৌঁছবার আগেই সম্ভবতঃ এই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

*

হেনরি গোলকনাথ নামে পাঞ্জাবের একজন অধিবাসী ১৯৫৩ সালে মারা যান।

প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক ও সি গাঙ্গুলিকে তাঁর বাসভবনে ৯০তম জন্মদিনে সম্বর্ধনা জানান হচ্ছে।

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিবস অনুষ্ঠান

গত ১লা আগষ্ট বিখ্যাত শিল্প সমালোচক শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের নব্বই বছর পূর্ণ হল। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁর গৃহে একটি সুন্দর ঘরোয়া সভার আয়োজন হয়। কলকাতার অনেক প্রবীণ ও নবীন ব্যক্তি তাঁকে সম্বর্ধিত করতে আসেন। সর্বশ্রী রমেশ মজুমদার, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূপতি মজুমদার, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বীরেন ভদ্র ও মনোজ বসু প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের কর্মবহুল জীবনের আলোচনা ও তাঁর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করে তাঁকে অভিনন্দন জানান।

১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসে জলন্ধর বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার ঐ হেনরি গোলকনাথের পুত্র, কন্যা ও নাতিনাতনিদের জানান যে, ১৯৫৩ সালের একটি আইন অনুযায়ী তাঁদের হাতে ৪১৮ স্ট্যান্ডার্ড একরের কিছু বেশী জমি উদ্বৃত্ত রয়েছে। ১৯৬৬ সালে গোলকনাথের এই ওয়ারিশরা সুপ্রীম কোর্টে একটি মামলা দায়ের করে এই আপত্তি তোলেন যে, পাঞ্জাবের উপরোক্ত আইনের ধারাগুলি সম্পত্তির উপর মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সংবিধানের নির্দেশের বিরোধী।

এই ঐতিহাসিক মামলার রায় দিতে গিয়েই ১৯৬৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীকোকা সুব্বা রাও বললেন যে, সংবিধানের ৩৬৮ অনুচ্ছেদে সংবিধান সংশোধনের যে পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা আছে সেটা মৌলিক অধিকারগুলি সম্পর্কে প্রযোজ্য নয় অথবা, অন্য কথায়, মৌলিক অধিকারগুলি খর্ব করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধন করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের নেই।

১১ জন বিচারপতির বেঞ্চের তরফ থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় দিয়ে শ্রীসুব্বা রাও বলেন, 'মৌলিক অধিকারগুলি হচ্ছে সেইসব আদিম অধিকার যা মানুষের ব্যক্তিত্বের

বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই সব অধিকারই মানুষকে তার অভিরুচি অনুযায়ী জীবন গড়ে তুলতে দেয়। ...

"আমাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলিকে উচ্চতম স্থান দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলিকে পার্লামেন্টের এক্তিয়ারের বাইরে রাখা হয়েছে। ... রাষ্ট্রীয় নীতির যেসব নির্দেশ সংবিধানে রয়েছে, সেগুলি মৌলিক অধিকার হরণ বা খর্ব না করেই কার্যে পরিণত করা যাবে বলা যুক্তিসংগতভাবেই আশা করা যেতে পারে।...

"মৌলিক স্বাধীনতাগুলির উপর এত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, সংসদের উভয় কক্ষের সকল সদস্যের সর্বসম্মত ভোটে গৃহীত আইনও এই সব মৌলিক স্বাধীনতা খর্ব করতে পারে না।

"সংবিধানের নীতিনির্দেশক ধারাগুলি কার্যকর করা যেমন পার্লামেন্টের কর্তব্য, ঠিক তেমনি মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ না করে এই সব নীতিনির্দেশ কার্যকর করাও পার্লামেন্টের দায়িত্ব। মৌলিক অধিকারগুলির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের আইন সম্পর্কে পার্লামেন্টের রায় চূড়ান্ত নয়, এই রায় আদালতের বিচারসাপেক্ষ। যদি তা না হত তাহলে সংবিধানের কাঠামোই ভেঙে পড়ত।

"মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করার অধিকার থেকে পার্লামেন্টকে বঞ্চিত করলে বিদ্রোহই একমাত্র অনিবার্য পরিণাম হবে না।"

সুপ্রীম কোর্টের এই রায়ের আগে ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলি বার তিনেক সংশোধন করা হয়েছে (সংবিধানের প্রথম, চতুর্থ ও সপ্তদশ সংশোধন)। এই সব সংশোধনের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল সম্পত্তি সংক্রান্ত মৌলিক অধিকার সংকুচিত করা। সংবিধানের এই সব সংশোধনই জমিদারি দখলের এবং জনস্বার্থে অন্যান্য সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষমতা সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে। ১৯৫২ সালে 'শংকরীপ্রসাদ সিং দেও বনাম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র' মোকদ্দমায় সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি পতঞ্জলি শাস্ত্রী এবং ১৯৬৫ সালে 'সজ্জন সিং বনাম রাজস্থান সরকার' মোকদ্দমায় প্রধান বিচারপতি পি বি গজেন্দ্রগড়কর সংবিধানের দ্বারা স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি সংশোধন করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের রয়েছে বলে মেনে নিয়েছিলেন।

কিন্তু ১৯৬৭ সালে গোলকনাথ মামলার রায় সব কিছু উল্টেপাল্টে দিল। ঐ মামলায় বিচারপতিরা অবশ্য বিভ্রান্তি এড়াবার জন্য ইতিপূর্বে মৌলিক অধিকারের যেসব সংশোধন হয়েছে সেগুলি বহাল রাখলেন; কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য পার্লামেন্টের হাত বেঁধে দিলেন।

১৯৬৭ সালের ঐ রায় কিন্তু সর্বসম্মত ছিল না। বেঞ্চের ১১ জন বিচারপতির মধ্যে প্রধান বিচারপতি সুব্বারাও সহ ছয়জন এক দিকে ছিলেন। এই ছয় জনের মধ্যে আবার বিচারপতি হেদায়েতুল্লা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মেনে নিয়ে তাঁর নিজের এই মত জুড়ে দিয়েছিলেনঃ—

"সম্পত্তির অধিকার একটা মৌলিক অধিকার, এই তত্ত্ব আমাদের সংবিধানে মেনে নেওয়া হয়েছে। সমাজতন্ত্রই যদি কাম্য মনে হয়ে থাকে তাহলে এটা করা সম্ভবতঃ ভুল হয়েছিল। সংবিধানে সম্পত্তির অধিকারকে অলঙ্ঘনীয় বলে গণ্য করা হয়েছে। এর ব্যতিক্রম করা যেতে পারে তখনই যখন জনস্বার্থে সেটা করা প্রয়োজন মনে হবে। কিন্তু যেখানে এই ব্যতিক্রম করা হবে সেখানেও সেটা করতে হবে আইনের পদ্ধতিতে এবং ক্ষতিপূরণ দিয়ে। কয়েকটি সংশোধনের পর অবশ্য অবস্থাটার লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে। এই সব সংশোধনের ফলে এখন যা দাঁড়িয়েছে সেটা হলঃ—একমাত্র নির্দিষ্ট সীমার অন্তর্ভুক্ত জোতজমি বাদে অন্য সমস্ত জমি দখল করে নেওয়া যেতে পারে এবং ঐসব জমির উপর অধিকার বিনা খেসারতে হরণ অথবা খর্ব করা যেতে পারে। সেই বাবদে সংবিধানের ১৪, ১৯ ও ৩১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন আইনের বিরুদ্ধে আদালতে আপত্তি তোলা যাবে না।

মুর্শিদাবাদে রাস্তার ধারের একটি ক্যাম্পে শিশু সন্তানকে ঘুম পাড়াচ্ছেন বাঙলা দেশের একজন মা

"যেহেতু সম্পত্তির উপর অধিকার খর্ব করার এই প্রবণতা অন্যান্য মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে, সেহেতু প্রক্রিয়াটি থামিয়ে দেওয়ার দরকার হয়ে পড়েছে।"

১৯৬৭ সালের সেই ঐতিহাসিক মামলার রায় ভারতবর্ষের পার্লামেন্টের উপর যে নিষেধ চাপিয়ে দিয়েছে তা থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে লোকসভা সংবিধানের চতুর্বিংশতিতম সংশোধন বিলটি গ্রহণ করেছেন। এই সাড়ে চার বছরে গোলকনাথ মামলার রায় নিয়ে দেশব্যাপী তুমুল বিতর্ক হয়েছে। ঐ রায় বেরোবার পাঁচ সপ্তাহের মধ্যেই মহারাষ্ট্রের রাজাপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত পি-এস-পি সদস্য নাথ পাই সংবিধান সংশোধনের উদ্দেশ্যে একটি বেসরকারী বিল আনেন। ঐ বিলে মৌলিক অধিকার সংশোধন করার ক্ষমতা পার্লামেন্টকে দিতে চাওয়া হয়। এই একটি বেসরকারী বিল নিয়ে লোকসভা ও তার কমিটি যত সময় ব্যয় করেছেন তার অন্য নজির নেই। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসের পর থেকে একমাত্র ১৯৬৯ সালের শেষ অধিবেশন ছাড়া লোকসভার অন্য সমস্ত অধিবেশনে এই বিল নিয়ে কিছু না কিছু আলোচনা হয়েছে। বিলটি বিবেচনার জন্য লোকসভা ও রাজ্যসভার যে যুক্ত সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়েছিল তার ১৫টি বৈঠক হয়েছিল। সংসদের ভিতরে, তার কমিটিতে ও সংসদের বাইরে এই নিয়ে তুমুল বাদানুবাদ হয়েছে।

১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে নয়াদিল্লিতে একটি আলোচনাচক্রে শ্রী ভি কে কৃষ্ণ মেনন বলেন যে, সম্পত্তির অধিকার হচ্ছে 'প্রগতির পথে একটি প্রতিবন্ধক'। বিচার বিভাগে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা বিত্তবান মানুষ এবং সামাজিক প্রগতির বিলম্ব নিয়ে তাঁদের মাথা ঘামাতে হয় না, এই মন্তব্য করে শ্রীমেনন বলেন, "কোন বিচারপতি যদি পার্লামেন্টে গৃহীত কোন আইন মেনে নিতে ক্লেশ বোধ করেন তাহলে তাঁর উচিত পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়ে এসে ভিতর থেকে সেই আইনের বিরুদ্ধে লড়াই করা।" ঐ আলোচনাসভায় কম্যুনিস্ট নেতা এস এ ডাঙ্গে বলেন যে, "গোলকনাথ মামলার রায়ের মধ্য দিয়ে বিচার বিভাগের যে

মর্জিমাফিক সিদ্ধান্তের পরিচয় পাওয়া গেছে” সেটা বদলাবার অন্য সব চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয় তাহলে “রাস্তায় সেটা বদলান হবে।” মোহন কুমারমঙ্গলম ঐ সভায় বলেন যে, সামাজিক অগ্রগতির জন্য যে সম্পত্তি দখল করা হবে তার খেসারতের পরিমাণ নির্ধারণ করার ক্ষমতা একান্তভাবে পার্লামেন্টেরই হাতে থাকা উচিত। সিলেক্ট কমিটিতে প্রাক্তন অ্যাডভোকেট-জেনারেল এম সি শীতলবাদ বলেন, “গোলকনাথ মামলায় অধিকাংশ বিচারপতি যে রায় দিয়েছিলেন সেটা ঠিক নয়।” তিনি বলেন, “পার্লামেন্ট যেভাবে মৌলিক অধিকারগুলি রদবদল করেছেন” তাতেই এই ধরনের রায় দিতে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা প্ররোচিত হয়েছেন। যদিও এইসব সংশোধনে প্রধানত সম্পত্তি সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারেই হাত দেওয়া হয়েছে তাহলেও অন্যান্য মৌলিক অধিকারগুলির দিকে পার্লামেন্ট হাত বাড়াতে পারেন—এই আশঙ্কাতেই সুপ্রীম কোর্ট ঐ রকম রায় দিয়েছিলেন বলে শ্রীশীতলবাদ মনে করেন।

নাথ পাইয়ের বিল লোকসভায় সরকারের সমর্থন লাভ করেছিল, যদিও তাঁরা সেটিকে সরকারী বিল হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী হন নি।

অন্যদিকে, স্বতন্ত্র পার্টির নেতা জে এম লোবো প্রভু, নির্দলীয় সদস্য ফ্র্যাংক অ্যান্টনি, আচার্য কৃপালনী প্রভৃতি পার্লামেন্টের ভোটের দ্বারা সুপ্রীম কোর্টের অভিমত নাকচ করে দেওয়ার বিরোধিতা করেন। সমাজতন্ত্রী নেতা ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া এই বলে হুঁশিয়ার করে দেন যে, নাথ পাইয়ের বিল গৃহীত হলে ‘হিটলারবাদের অনুরূপ বিপদ’ দেখা দেবে। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ‘মানবাধিকার দিবস’ উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় প্রধান বিচারপতি এম হিদায়েতুল্লা মন্তব্য করেন যে, বাইরে যখন ‘মানবাধিকার দিবস’ পালিত হচ্ছে পার্লামেন্ট তখন মৌলিক অধিকারগুলি কি করে কেটে দেওয়া যায়, তাই নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন, এটা ‘অদ্ভুত ব্যাপার।’ তিনি বলেন যে, “সম্পত্তির অধিকারকে সংবিধানে একটি মৌলিক অধিকাররূপে অন্তর্ভুক্ত করাতেই যত অসুবিধা দেখা দিয়েছে। মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা থেকে এই অধিকারকে বাদ দেওয়া যায়।” পার্লামেন্ট সম্পর্কে এই মন্তব্য করার জন্য প্রধান বিচারপতি হিদায়েতুল্লাকে লোকসভার সদস্যদের কটু কথা শুনতে হয়েছিল।

দেশব্যাপী এই সব বিতর্কের শেষে এল লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন। গোলকনাথ মামলার রায় বনাম পার্লামেন্টের অধিকারের প্রশ্নটি ঐ মধ্যবর্তী নির্বাচনে শাসক কংগ্রেস ও অন্যান্য কয়েকটি দল কর্তৃক একটি বড় নির্বাচনী ইস্যুরূপে উত্থাপিত হয়েছিল।

মধ্যবর্তী নির্বাচন শাসক কংগ্রেস দলকে যে ক্ষমতা দিয়েছে তারই বলে বলীয়ান হয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার এবার লোকসভায় সংবিধানের ২৪তম সংশোধনের বিলটি পাশ করিয়ে নিলেন। এই বিল এক অর্থে নাথ পাইয়ের উদ্দেশে লোকসভার স্মৃতিতর্পণ। তিনি যা চেয়েছিলেন, তার জন্যই এই বিল যখন এল তখন তিনি লোকান্তরিত। স্বতন্ত্র পার্টি জনসংঘ, মুসলিম লীগ ও ফ্র্যাংক অ্যান্টনির মতো কয়েকজন নির্দলীয় সদস্য ছাড়া আর সকলেই বিলটি সমর্থন করেছেন। বিরোধী কংগ্রেস দল এই বিল সমর্থন করবে কিনা সে বিষয়ে গোড়ার দিকে দলের ভিতরেই কিছু দ্বিধাসংশয় ছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দলের সদস্যরা বিলের সমর্থনেই ভোট দিয়েছেন। বিলের পক্ষে ৩৮৪ ও বিপক্ষে ২৩ ভোট পড়ে। এইভাবে লোকসভার সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনের সর্তটি পূরণ হওয়ায় লোকসভায় বিলটি গৃহীত হয়েছে। এর পর বিলটি রাজ্যসভায় যাবে। তার পর রাজ্য বিধানসভাগুলির অন্তত অর্ধেকের দ্বারা এটি অনুমোদিত হলে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পেশ করা হবে।

এই বিলের পশ্চাদনুসরণ করে আরও গোটা দুয়েক সংবিধান সংশোধন বিল আসছে। এই দুটির মধ্যে একটির অর্থাৎ ২৫তম সংবিধান সংশোধন বিলের উদ্দেশ্য হল, সরকার কর্তৃক অধিকৃত সম্পত্তির দরুন উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা তুলে দিয়ে আইনসভার বিচারবিবেচনা অনুযায়ী একটি অঙ্ক দিয়ে মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা রাখা এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সম্পত্তি অধিকারের আইনগুলিকে আদালতের আওতার বাইরে রাখা। সংবিধানের ২৪ ও ২৫ নম্বর সংশোধনের বিল আইনে পরিণত হয়ে গেলে পরবর্তী বিল আনার পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। ঐ শেষ বিলটি আনা হবে প্রাক্তন দেশীয় রাজা ও ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের ভাতা ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধাদি বাতিল করার জন্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ২৫তম সংশোধন করা হয়েছিল ঐ সংবিধান চালু হওয়ার ১৭৮ বছর পরে। আর ভারতবর্ষের সংবিধানের ২৫তম সংশোধন ঐ সংবিধান

চালু হওয়ার ২২ বছরের মধ্যেই গৃহীত হবে বলে মনে হচ্ছে।

•

লোকসভায় এবারকার বাজেট অধিবেশন সমাপ্তির প্রাক্কালে গৃহীত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল হল 'মেডিক্যাল টার্মিনেশন অব প্রেগন্যান্সিস বিল'। এটিও আর একটি বিল যার বিষয়বস্তু নিয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ দেশব্যাপী বিতর্ক হয়েছে এবং যা নিয়ে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মত প্রকাশ পেয়েছে।

বিলটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, গর্ভপাত ঘটান সম্পর্কে এখন আইনের যে নিষেধাজ্ঞা আছে সেটি বাতিল করে দিয়ে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের গর্ভপাত ঘটাবার আইনগত অধিকার দেওয়া।

লোকসভায় গৃহীত এই বিলের প্রধান ধারাগুলিতে বলা হয়েছে, অনধিক ১২ সপ্তাহের গর্ভাবস্থায় একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক এবং ১২ থেকে ২০ সপ্তাহের গর্ভাবস্থায় দুজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কয়েকটি সর্তাধীনে গর্ভপাত ঘটাতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক যদি মনে করেন যে, গর্ভের দরুণ গর্ভবতীর জীবন বিপন্ন হতে পারে অথবা তাঁর শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুতর হানি হতে পারে কিম্বা এই গর্ভের সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সেই সন্তান শারীরিক অথবা মানসিক অস্বাভাবিকতার দরুণ গুরুতরভাবে পঙ্গু হয়ে থাকতে পারে কেবল তাহলেই ঐ চিকিৎসক গর্ভপাত ঘটাতে পারবেন। ধর্ষণের ফলে অথবা জন্মনিরোধের ব্যর্থতার দরুণ গর্ভসঞ্চার হলে আইনের সর্ত পূরণ হল বলে ধরে নেওয়া যাবে।

গোপনে ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গর্ভপাত করাতে গিয়ে গর্ভবতী স্ত্রীলোকরা যে বিপদ ডেকে আনেন সেদিক নজর যাওয়ার পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন স্তরে আলোচনা হচ্ছে। একটি অনুমান এই যে, আমাদের দেশে প্রতি বৎসর যেখানে দু কোটি দশ লক্ষ শিশু জন্মগ্রহণ করে সেখানে আইনবিরুদ্ধ গর্ভপাতের সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ এবং গর্ভপাত করাতে গিয়ে হাতুড়েদের হাতে যেসব নারী প্রতি বছর মারা যায় তাদের সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় পরিবার কল্পনা বোর্ড বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন. মহারাষ্ট্রের তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীশান্তিলাল শাহের সভাপতিত্বে গঠিত একটি কমিটি ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন। এই কমিটির রিপোর্টে বলা হয়, 'গর্ভপাত ঘটান সম্পর্কে সমাজের যে নীতিবোধের কথাই বলা হয়ে থাকুক না কেন, এই সত্য কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না যে, বহু সংখ্যক জননী পূর্ণ সময় পর্যন্ত গর্ভ বহন করার চেয়ে বরং বেআইনী গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন করতে প্রস্তুত আছেন। এটাও সত্য কথা যে, এই জননীদের অধিকাংশই বিবাহিতা এবং তাঁদের গর্ভ গোপন করার বিশেষ কোন কারণ নেই।'

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে গর্ভপাতের বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা আছে সেটা তুলে দিয়ে শান্তিলাল শাহ কমিটি এই বিষয়ে কড়াকড়ি অনেক শিথিল করার প্রস্তাব দেন।

কমিটির প্রস্তাব নিয়ে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। ডাঃ ভি কে আর ভি রাও ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বলেন যে, ভারত সরকার একমাত্র জননীর স্বাস্থ্যের কারণে ছাড়া অন্য কারণে গর্ভপাত আইনসিদ্ধ করার প্রস্তাবে সম্পূর্ণ বিরোধী।

রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্যা শ্রীমতী শারদা ভার্গব বলেন, 'গর্ভপাতের কড়াকড়ি শিথিল করলে যদি অনাচার বাড়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে পরিবার পরিকল্পনার অন্য সব উপায়ও অনাচারে উৎসাহ যোগাতে পারে।'

১৯৬৭ সালের অকটোবর মাসে কেন্দ্রীয় পরিবার পরিকল্পনা পরিষদের সভায় কেরলের তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মি উইলিংডন বলেন যে, গর্ভপাত হল মানুষের প্রাণ নষ্ট করা, যদিও সেই মানুষ গর্ভস্থিত ভ্রূণমাত্র।'

এই সব বিতর্ক লক্ষ্য করে ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত স্থির করেন যে, গর্ভপাত আইনসিদ্ধ করা হবে না, তবে নিষেধাজ্ঞার কড়াকড়ি শিথিল করা হবে। লোকসভায় যে বিলটি গৃহীত হয়েছে সেটি ঐ সিদ্ধান্তের ফল। রাজ্যসভায় বিলটি এর আগেই গৃহীত হয়েছে।

৬-৮-৭১ —পুণ্ডরীক

আশুতোষ ভট্টাচার্য

একটি মাত্র যে ক্ষুদ্র রচনার মধ্য দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার একটি অসাধারণত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার নাম 'বাংলার ব্রত।' বাংলা দেশের মেয়েলী ব্রতের দুইটি দিক আছে, একটি শিল্পের দিক আর একটি সাহিত্যের দিক। অবশ্য ইহার শিল্প যেমন লোক-শিল্প তেমনই ইহার সাহিত্যও লোক-সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত। এই দুইটি বিষয়েই সমান অনুরাগ অভিজ্ঞতা এবং অধিকার না থাকিলে অন্ততঃ বাংলার ব্রত সম্পর্কে কোন আলোচনা সার্থক হইতে পারে না। বাংলা দেশে বোধহয় একমাত্র অবনীন্দ্রনাথের মধ্যেই এই দুইটি গুণের একত্র সমাবেশ দেখা যায়. সেই জন্য এই বিষয়টির আলোচনায় তিনি যে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন তাঁহার পরবর্তী কালেও আর কেহ এই সার্থকতা লাভ করিতে পারেন নাই।

বাংলা দেশের মেয়েলী ব্রত সম্পর্কিত কোন আলোচনাকেই পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিবার জন্য আরও একটি বিষয়ের আবশ্যক, তাহা হিন্দুসমাজের শাস্ত্রীয় এবং লৌকিক আচার-আচরণ সম্পর্কিত যথার্থ জ্ঞান। শিল্প এবং সাহিত্যের প্রতিভা ব্যক্তিবিশেষের সহজাত গুণ হইতে পারে, কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আয়ত্ত করিবার প্রয়োজন হয়। অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর বিষয় এই যে তিনি কেবলমাত্র সহজাত শিল্পী এবং সাহিত্যিকের প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই নহে, তিনি অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে ব্রতাচারের উৎস সন্ধান করিতে গিয়া জাতিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বও যে গভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বাংলার ব্রত বইখানি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়।

অবনীন্দ্রনাথের পূর্বে এবং পরে যাঁহারাই বাংলার ব্রতকথা সংগ্রহ এবং তাহা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই ইহাদের সুগভীর উৎসের সন্ধান দিতে পারেন নাই; এমন কি তাহার কোন প্রয়াসই পান নাই। কিন্তু প্রথমতঃ ব্রতের মধ্যে যে লোক-শিল্পের ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহার প্রতি অনুরাগ বশতঃই হোক কিংবা বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের উৎস সন্ধান করিবার আগ্রহেই হউক, যে কারণেই বাংলার ব্রত বিষয়টির প্রতি অবনীন্দ্রনাথ আকর্ষণ অনুভব করুন না কেন, তিনি সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই বিষয়টি আলোচনার দায়িত্ব অপরিসীম এবং তাহা কেবলমাত্র শিল্প এবং সাহিত্যবোধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—তাহা জাতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রসারিত। সুতরাং তিনি সুগভীর অভিনিবেশের সঙ্গে এই সকল বিষয় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং যদিও এই বিষয়ক শিক্ষায় যে একটি গতানুগতিক ধারা আছে, তাহার সঙ্গে তাঁহার কোন যোগ ছিল না, তথাপি সহজেই তিনি এই সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করিয়া তাঁহার বাংলার ব্রত বিষয়ক আলোচনাকে সম্পূর্ণতা দান করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অথচ এই আলোচনা কেবলমাত্র নীরস তথ্য দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিবার পরিবর্তে যাহাতে সরস পাঠ্যবস্তু হয়, সেইজন্য তাঁহার শিল্পী এবং সাহিত্যিকসুলভ মনও সজাগ এবং সক্রিয় হইয়াছিল। তাহারই ফলে তাঁহার 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থখানি যেমন ... সরস তথ্য দ্বারা পরিপূর্ণ

অবনীন্দ্রনাথের রেখাচিত্র

হইয়া আলপনার চিত্রে এবং কাব্য রসাসিক্ত প্রকাশভঙ্গিতে অনবদ্য হইয়া উঠিয়াছে। এইখানেই অবনীন্দ্রনাথের অসাধারণত্ব।

অবনীন্দ্রনাথ একাধারে শিল্পী, সাহিত্যিক, ভাবুক এবং তত্ত্বজ্ঞানী। এইখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্যও অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বস্তুর কাব্যরস আস্বাদনে যতখানি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন, (তাঁহার প্রবন্ধগুলি তাহার প্রমাণ।) অবনীন্দ্রনাথ তথ্যের বাস্তবমূলকে স্বীকার করিবার ফলে কদাচ তেমন হইতে পারিতেন না। *বাংলার ব্রতের কেবলমাত্র যে শিল্পগত সাহিত্যগত মূল্যই নাই, তাহার যে একটি গভীরতর তথ্যগত মূল্যও আছে, তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন এবং এই বিষয়ক আলোচনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে গিয়া তাঁহার কাজকে লঘু করিয়া লইবার জন্য ইহার তথ্যগত আলোচনা পরিহার করিতে যান নাই; রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় যেখানে কেবল ধূম্র এবং বাষ্প, অবনীন্দ্রনাথের আলোচনায় সেখানে মধ্যে মধ্যে গৌরীশৃঙ্গের কঠিন তুষার প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।*

'বাংলার ব্রত' বইখানির ভিতর অবনীন্দ্রনাথ ভারত ইতিহাসের একটি মৌলিক বিষয় লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন; সুতরাং বইখানি আকারে যত ক্ষুদ্রই হোক, ইহার মধ্যে যে সকল তথ্য এবং তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা আছে, তাহাদের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর।

অবনীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র শিল্পী নহেন, ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস এবং তত্ত্বকথা সুগভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছেন, বাংলার ব্রতের আলপনাকেও তিনি কেবলমাত্র বাংলাদেশের বিচ্ছিন্ন একটি লোকশিল্প হিসাবেই দেখেন নাই, ভারতীয় বৃহত্তর শিল্পচেতনার সঙ্গে তাহার যোগ লক্ষ্য করিয়া সেই অনুযায়ী তাহার আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।

একথা সত্য বাংলা দেশের আলপনাই হোক, কিংবা মেয়েলী ব্রতই হউক, তাহা কখনও বাংলা দেশ এবং বাঙালীর সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া নাই। প্রায় সারা ভারতবর্ষেই একভাবে না হোক অন্যভাবে ইহাদের প্রচলন আছে। অবনীন্দ্রনাথও সেই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই বিষয়টির আলোচনা করিয়াছেন, ইহার কারণ, শিল্পসাধনায় অবনীন্দ্রনাথের একটি ভারতীয় অখণ্ড বা সামগ্রিক দৃষ্টি ছিল, সেই দৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়াই তিনি বাংলার ব্রতের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। *বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিকা ব্যতীত ভারতীয় ধর্ম কিংবা আচারবিষয়ক কোনও আলোচনাই সার্থক হইতে পারে না। কারণ, দেখা যায়, যে ব্রত কিংবা তাহার কথা বাংলা দেশে প্রচলিত আছে, তাহা গুজরাটের মত সুদূর অঞ্চলেও প্রচলিত। যে আলপনার অভিপ্রায় (মোটিভ) বাংলাদেশের নিভৃত পল্লীঅঞ্চলে* প্রচলিত আছে, তাহা অন্ধ্রদেশের সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রচলিত। যে লোকাচার আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহারও একটি সর্বভারতীয় শাস্ত্রীয় ভিত্তি আছে। সুতরাং জাতীয় জীবনের সাংস্কৃতিক কোন উপাদানই বিচ্ছিন্ন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অবনীন্দ্রনাথ এই বিষয়টি সম্যক বুঝিতে পারিবার প্রধান কারণ এই যে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় শিল্প এবং দর্শনের উপরই তাঁহার লক্ষ্য ছিল, কেবলমাত্র বাংলা দেশ এবং বাঙালী জাতির মধ্যে তাহা তিনি সীমাবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। তিনি সর্বত্রই লোকশিল্পই হোক কিংবা উচ্চতর শিল্পই হউক, তাহাদের মৌলিক উৎসের সর্বদা সন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার 'আর্য ও অনার্য শিল্প' প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—

'ভারতশিল্পের ইতিহাস এবং পুরাতত্ত্ব, ছবি মূর্তি মন্দির মঠ ইত্যাদির সঠিক ছাপ ও ফটোগ্রাফ দিয়ে হাজার হাজার বই ছাপা হলো। চোখ এবং মন দুই নিয়ে এই বিরাট সংগ্রহের মধ্য দিয়ে চলাফেরা করতে করতে একটা কথা বারবার আমার মন বললে—কই, এতো সম্পূর্ণ ইতিহাস পেলেম না, এ যেন একথা না পুঁথির শেষ গোটাকতক অধ্যায় মাত্র পেলেম, পূর্বের অধ্যায়গুলো হারিয়ে গেছে।...ভারতশিল্পীদের রচনা সমস্ত ধারাবাহিকভাবে যেমন তেমন প্রকাশ পেয়েছিল, তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন তো আমাদের চোখের সামনে ধরা নেই আজ, এখানে গোটাকতক টুকরো, ওখানে খানিক, মাঝে মাঝে মস্ত মস্ত ফাঁক,—এইভাবে দেখা দিচ্ছে সব।...চোখ এবং মনকে পাঠাতে হবে সেখানে মহাকালের মধ্যে যেখানে ইতিহাসের অখ্যাত যুগের ভারতবাসী আরণ্যক ঋষিরা যাঁদের নাম দিলেন অনাব্রত— তাঁরা কাজ করেছেন।'

এই ইতিহাসের অখ্যাতযুগের ভারতবাসীর আচার-আচরণের অনুসন্ধান করিতে গিয়াই অবনীন্দ্রনাথ বাংলার ব্রতগুলির অনুশীলন করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অন্যান্য সাধারণ লোক-শিল্প কিংবা লোক-সাহিত্য রসিকগণ যেমন এই বিষয়গুলির কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ কিংবা বস্তুগত বিশ্লেষণ কিংবা সংগ্রহের মধ্যেই তাঁহাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, এমন কি, রবীন্দ্রনাথও তাঁহার লোক-সাহিত্য বিষয়ক আলোচনায় যাহা করিয়াছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ তাহা হইতে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়া ইহার আলোচনা করিয়াছেন। বৈদিক যুগের আর্য ঋষিগণ যাহাদিগকে 'অনাব্রত'ধারী, অর্থাৎ যাঁহারা ব্রাত্য বলিয়া পরিচিত, অবনীন্দ্রনাথ অনুভব করিয়াছেন যে, 'এ'রা ভারত শিল্প চর্চার বেলায় কোন্ স্থান অধিকার করেন সেটা দেখার বিষয়।' কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, তাহার উপরই ভারতশিল্পের *মূল ভিত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। বাংলার ব্রতের আলপনার মধ্যেও তিনি তাহাই সন্ধান করিয়াছেন।*

বাংলাদেশের মেয়েলী ব্রতকে অবনীন্দ্রনাথ দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন— শাস্ত্রীয়ব্রত ও নারীব্রত; নারীব্রত তাঁহার মতে আবার দুই ভাগে বিভক্ত—কুমারীব্রত ও নারীব্রত।

ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা যে ব্রতের পৌরোহিত্য করা হইয়া থাকে, তাহাই তাঁহার মতে শাস্ত্রীয়ব্রত এবং যাহাতে নারীরাই সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন, তাহাই তাঁহার মতে নারীব্রত। কিন্তু শাস্ত্রীয়ব্রত বলিয়া একশ্রেণীর ব্রতের তিনি উল্লেখ করিলেও তাঁহার 'বাংলার ব্রত' বইখানির মধ্যে তাহার বিশেষ কোন আলোচনা নাই। ইহার কারণ, শাস্ত্রীয়ব্রত বলিয়া মূলতঃ কিছু নাই। কোন কোন মেয়েলী ব্রত উচ্চতর সমাজের ব্রাহ্মণ পুরোহিতের হাতে পড়িয়া বাহ্যতঃ শাস্ত্রীয় রূপ লাভ করিয়াছে মাত্র, অর্থাৎ তাহাতে কিছু কিছু শাস্ত্রীয় আচার যেমন আচমন, স্বস্তিবাচন, কমণ্ডলু, সংকল্প ইত্যাদি

প্রতানুগতিকভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহারা শাস্ত্রীয়ব্রত নহে, শাস্ত্রে ইহাদিগকে 'যোষিৎ' ব্রত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে, কোন কোন সময় তাহার উদ্দিষ্ট দেবতাকে 'যোষিতাং ইষ্টদেবতা' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। সুতরাং ইহাদিগকে কেবলমাত্র পুরোহিতের সম্পর্কের জন্যই শাস্ত্রীয় বলিয়া মনে হইয়া থাকে।

যখনই পূজারী ব্রাহ্মণের হাতে কোন লৌকিক ব্রতানুষ্ঠান কিংবা 'যোষিৎ' প্রচলিত ব্রতের ভার পড়ে, তখন যে পুরোহিত যে পূজানুষ্ঠানে অভ্যস্ত তিনি সেই অনুযায়ী তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন—কারণ, ইহাদের সুনির্দিষ্ট কোন বিধি নাই। বৈষ্ণব পুরোহিত বৈষ্ণব আচারে, শাক্ত পুরোহিত শাক্ত আচারে এবং তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত পুরোহিত তান্ত্রিক আচারে এই সকল লৌকিকব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কোথাও ব্রাহ্মণ পুরোহিত সংস্কৃত ভাষায় ব্রতের কথাও পাঠ করেন, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরোহিত পূজা সম্পন্ন করিয়া যাইবার পরও পরিবারের নারীরাই ব্রতের কথা নিজস্ব ভাষায় বলিয়া থাকেন। ইহাতেই পুরোহিতের অনুপ্রবেশ যে পরবর্তীকালে হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। শাস্ত্রীয়ব্রত বলিতে অবনীন্দ্রনাথ ইহাই মনে করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারাও মেয়েলী ব্রতেরই অন্তর্ভুক্ত. কেবল শাস্ত্রীয় আচার দ্বারা প্রভাবিত মাত্র. ইহার অধিক আর কিছুই নহে।

বাংলার ব্রতগুলির উৎপত্তির ইতিহাস যে কুয়াসাচ্ছন্ন তাহা অবনীন্দ্রনাথ যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি এই কুয়াসার জাল ছিন্ন করিয়া সত্য নির্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন. যুক্তি এবং বিচার দিয়া সেখানে সত্যকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন. এখানে তাঁহার যুক্তিবাদী মন. তাঁহার স্বাভাবিক ভাববিলাসিতার নিকট নতিস্বীকার করে নাই।

বাংলার ব্রতের ছড়াগুলিকে অবনীন্দ্রনাথ বেদের সূক্তের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। ইহাদের ভাব এবং ভাষাগত সরলতা বৈদিক সূক্তগুলিরই অনুরূপ বলিয়া তিনি অনুভব করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'খাঁটি মেয়েলী ব্রতগুলিতে. তার ছড়ায় এবং আলপনায় একটা জাতির মনের, তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাই। বেদের সূক্তগুলিতেও সমগ্র আর্যজাতির একটা চিন্তা, তার উদ্যম উৎসাহ ফুটে উঠেছে দেখি। এ দুয়েরই মধ্যে লোকের আশাআকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা ও কামনা আপনাকে ব্যক্ত করেছে এবং দুয়ের মধ্যে এই জন্যে বেশ একটা মিল দেখা যাচ্ছে।' তারপর তিনি বৈদিক সূক্ত হইতে নদী এবং সূর্যের স্তব উদ্ধৃত করিয়া, তাহাদের সঙ্গে বাংলার মেয়েলী ব্রতে যে নদী এবং সূর্যের সম্পর্কে ছড়া প্রচলিত আছে. তাহাদের তুলনা করিয়াছেন।

সামাজিক জীবনের যে স্তর হইতে একদিন বৈদিক সূক্তগুলি রচিত হইয়াছিল. বাংলার মেয়েলী ছড়াগুলির রচনার মধ্যেও তাহারই অস্তিত্ব অনুভব করিবার মধ্যে যে কত সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং সংস্কারমুক্ত মনোভাবের অভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মন সংস্কারমুক্ত না হইলে সত্যের সন্ধান কদাচ সার্থক হইতে পারে না। বেদ অপৌরুষেয় ইহাই ভারতীয় হিন্দুর চিরন্তন সংস্কার, অথচ ইহা প্রকৃত সত্যোপলব্ধির যে অন্তরায় তাহা সে যুগে অনেকেই ভাবিয়া দেখেন নাই। ইহার আরও একটি দিক এই যে বাংলার মেয়েলী ছড়াগুলি অভিজাত সমাজের নিকট নিতান্ত তুচ্ছ এবং অবহেলিত হইয়া ছিল, ইহাদের সম্পর্কে এই প্রকার বিশ্বাস ইহাদের মর্যাদাই যে কেবল বাড়াইয়া দিয়াছে, তাহা নহে 'নিতান্ত সাধারণ জিনিসের মধ্যেও যে অসাধারণ বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে. অবনীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস, তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষত্ব প্রকাশ করিয়াছে।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনার মধ্যেই ক্ষুদ্রের মধ্যেই মহত্বের সন্ধান করিয়াছেন। লোক-শিল্প হইতেই তাঁহার উচ্চতর শিল্পসাধনা সার্থকতা লাভ করিয়াছে, লোক-সাহিত্য অবলম্বনে তাঁহার সমগ্র জীবনের সাহিত্য সাধনাকেও রূপায়িত করিয়াছেন, তাহারই স্বাভাবিক ধারা অনুসরণ করিয়া তিনি বাংলার মেয়েলী ব্রতের ছড়ার মধ্যে বৈদিক সূক্তের প্রেরণার সন্ধান করিয়াছেন।

যখন পর্যন্তও ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখকগণ ভারতীয় সংস্কৃতি বলিতে কেবলমাত্র আর্য সংস্কৃতিই বুঝিতেন অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষীণতম উপকরণটির জন্যও একমাত্র বেদকেই এক এবং অদ্বিতীয় মনে করিতেন তখন অবনীন্দ্রনাথ পাণ্ডিত্যের এই সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিয়া এই বিষয়ে অনার্য সংস্কৃতির দাবীকেও স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার পক্ষে সেদিন কম দুঃসাহসের কথা ছিল না। বাংলার ব্রতের প্রতি অনুরাগের কারণ তাঁহার মুখ্যতঃ ইহাই। কারণ, ইহার মধ্যে ভারতীয় সনাতন আচার-জীবনের অনুশাসনমুক্ত বিচিত্র উপকরণের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ কুমারী ব্রতের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন; ইহার তত্ত্ব, শিল্প এবং সাহিত্য কোন দিকের আলোচনাই তিনি পরিত্যাগ করেন নাই, তাহার ফলে ইহা যেমন তথ্যনিষ্ঠ হইয়াছে, তেমনই সরস সাহিত্যগুণান্বিত হইয়াছে। কুমারী ব্রতের আলোচনার মধ্যে পূর্ব বাংলার মাঘমণ্ডল ব্রতের আলোচনাটি দীর্ঘতম স্থান অধিকার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছড়া সংগ্রহে দুই একটি ব্যতীত পূর্ব বাংলার ছড়া সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ পূর্ব বাংলার ছড়াই সর্বাধিক সংগ্রহ করিয়াছেন। হয় ত এই বিষয়ে তিনি বিশেষ কোন সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

দেশ দেশান্তরের লৌকিক ধর্মাচারের সঙ্গে বাংলার মেয়েলী ব্রতের তুলনামূলক আলোচনা অবনীন্দ্রনাথের বাংলার ব্রত বিষয়ক আলোচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ যে সুগভীর অধ্যয়নের ভিতর দিয়া পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা সে যুগের পক্ষে প্রকৃতই বিস্ময়কর। তিনি এক ক্ষেত্রে বাংলার নারীদিগের মধ্যে প্রচলিত বৃষ্টি কামনা করিয়া একটি ব্রতের সঙ্গে আমেরিকার 'হুইচল' জাতির মধ্যে প্রচলিত অনুরূপ একটি ব্রতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা তিনি যে ভাবে দিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে পারা যাইবে, ইহার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি তাঁহার কি সুগভীর লক্ষ্য ছিল। যেমন তিনি লিখিতেছেন, 'একটি মাটির চাকতি বা সরা; তার এক পিঠে আলপনা দিয়ে সূর্যের চারিদিকে গতিবিধি বোঝাতে ফুলের মত একটা চিহ্ন; সেই চিহ্নের মাঝে একটি গোল ফোঁটা—মধ্য দিনের সূর্যকে বুঝিয়ে; এরই

চারিদিকে সরার কিনারায় সব পর্বতের চূড়ো, এবং চূড়াগুলির ধারে ধারে ধানখেত ঝোঝাবার জন্যে লাল ও হলুদের সব বিন্দু; তারই ধারে বৃষ্টি বুঝিয়ে কতকগুলি বাঁকা বাঁকা টান। সরার অন্য পিঠে লাল নীল হলদে রঙের বাণে ঘেরা চক্রাকার সূর্য মূর্তির আলপনা লিখে পুজো বাড়ীতে রেখে ব্রত করা। হয়তো এই আলপনা দিয়েই ব্রত শেষ, হয় তো বা ছড়াও কিছু বলা হয়।'

এই ব্রতটির বর্ণনায় দুইটি স্বতন্ত্র দৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে;—প্রথমতঃ একটি শিল্পীর রস দৃষ্টি, দ্বিতীয়টি একটি তত্ত্বানুসন্ধানীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। এই দুইয়ের সম্মেলনেই এই বর্ণনাটি অপূর্ব সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। এই বর্ণনার ভিতর দিয়া লেখক এই চিত্রটিকে যেন বাঙলা দেশের নিজস্ব পরিবেশের মধ্যে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন, বাংলা দেশেরই মাঘমন্ডল ব্রতের একটি আলপনার ছবি ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বর্ণনাটি অবনীন্দ্রনাথ কোন চিত্র হইতে পাইয়াছেন বলিয়া মনে হইবে নতুবা কেবল মাত্র লিখিত বর্ণনার ভিতর হইতে এত খুঁটিনাটি করিয়া ইহার বিষয় উল্লেখ করিতে পারিতেন না। বাংলার আলপনা কিংবা ব্রতাচারের উৎস সন্ধান করিতে গিয়া তিনি যে কত দূর পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি বিস্তার করিয়াছিলেন, এই বর্ণনাটি তাহার প্রমাণ।

অবনীন্দ্রনাথ মেয়েলী ব্রতের যে বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন, তাহা যে কত বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়িয়া ব্যাপ্ত হইয়াছে তাহার আরও একটু নিদর্শন উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিতেছেন,

'ধর্মানুষ্ঠানের দিক দিয়েও আর্য জাতি এই সব অন্য জাতির চেয়েও বেশি দূর অগ্রসর হন নি। জগৎ-সংসারের এক নিয়ন্তাকে স্বীকার বৈদিক আর্যদেরও মধ্যে অনেক দেরীতে ঘটেছে। তার পূর্বে জলের এক দেবতা, আগুনের দেবতা, বৃষ্টির দেবতা, এমন কি মন্ডূক পর্যন্ত। অন্য ব্রতদের মধ্যেও এই সব দেবতা পৃথিবীর নানা স্থানে উপাসিত হচ্ছেন—কেবল ভিন্ন ভিন্ন নামে দেখি। যেমন বেদের সূর্য ঈজিপ্তের রা অথবা রা আ, মেকসিকোতে রায়সী, বাংলায় রায় বা রাঈ।'

অবনীন্দ্রনাথের রেখাচিত্র

এই সকল তুলনামূলক আলোচনাকে কোন মতেই কষ্টকল্পনার ফল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না, ইহাদের মধ্য দিয়া অবনীন্দ্রনাথ যে সত্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা সুগভীর অনুশীলন সাপেক্ষ এবং এই ধারায় অগ্রসর হইতে পারিলে ইতিহাসের বহু ছিন্ন উপকরণ একত্র সংযুক্ত করিতে পারা যাইবে, তাহার ফলে পৃথিবীর বুকে মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে পারে।

'বাংলার ব্রত' ভাষার দিক দিয়া দুইটি ভাগে বিভক্ত—প্রথমতঃ সহজ গদ্য, দ্বিতীয়তঃ কাব্যধর্মী গদ্য। বইখানির যে অংশে তথ্য এবং তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে, সেখানে অবনীন্দ্রনাথ সহজ গদ্য ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে কাব্য কিংবা গীতিরসের স্পর্শ মাত্র নাই, কিন্তু যেখানে তিনি ব্রতের কথা বিশেষতঃ মাঘমন্ডল ব্রতের নাট্যধর্মী কাহিনীটি বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে তিনি স্বভাবতই কাব্যধর্মী ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন অর্থাৎ ব্রতের কথাটিকে যথাযথ করিয়া প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে অবনীন্দ্রনাথের গল্প বলিবার নিজস্ব ভঙ্গিই প্রকাশ পাইয়াছে, মেয়েলী ব্রতকথা স্বভাবতঃই যথাযথ প্রকাশ পাইতে পারে নাই।

কোন কোন ব্রতের ছড়া উদ্ধৃত করিয়া অবনীন্দ্রনাথ তাহা এমন খুঁটিনাটিভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে তাহাতে একটি ছবি চোখের সামনে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কুলাই ঠাকুরের ব্রতটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, 'এই ছড়া ত শুধু আউড়ে যাবার নয়; এতে বাঘ হতে হবে, জোরে জোরে হাঁটা, ঝপাৎ ঝপাৎ পড়া, সজাগ হয়ে এ দিক ও দিক দেখা এবং হাম্বুর হাম্বুর গর্জন! নাট্যকলার অনেকখানিই পাওয়া গেল। গানে কোরাস পর্যন্ত।' এর সঙ্গে পাড়াগাঁয়ের রাত্রি, অন্ধকার গাছপালা, মশাল জেলে রাখাল ছেলেরা এবং ছেলেমেয়ে বুড়ো নানা দর্শকের নানা ভাবভঙ্গি, খড়ের ঘর প্রদীপের আলো ইত্যাদি জুড়ে দেখলে এক পক্ষব্যাপী যাত্রার অনেকখানিই গ্রামের আসরে বসে নিজের চোখে এই অনুষ্ঠান দেখিয়াছেন, আমরা পাব। ইহা হইতে মনে হইবে যেন অবনীন্দ্র-নাথ স্বয়ং পল্লী বাংলার মেয়েলী ব্রতগুলি যে তথ্য, তত্ত্ব, শিল্প এবং সাহিত্যগত এত তাৎপর্যপূর্ণ তাহা অবনীন্দ্রনাথের পূর্বে কিংবা পরে কেহই এমন নিবিড়ভাবে অনুভব করেন নাই। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা শিল্প এবং সাহিত্যের যুগ্মপ্রেরণায় রূপলাভ করিয়াছে, ইহার মধ্যে তত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং তথ্যানুসন্ধানের প্রেরণাও আসিয়া সার্থকভাবে যুক্ত হইয়াছে। সেইজন্যই তাঁহার বাংলার ব্রত এক অভাবনীয় রচনা।
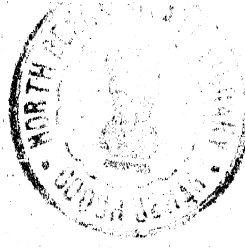
ভূদেব চৌধুরী

(১)

"কেবল শিল্পীদের কাছে নয়, সাধারণ জনতার পক্ষেও চিত্রশিল্পীর ভাবনা ও রচনা চিরকাল লোভনীয় হয়। লেখার মধ্যে আমরা তাঁর কৃতির গোপন রহস্যটি খুঁজে পাবার ভরসা করি, অথবা তাঁর মানস ব্যাকুলতার প্রতিফলন! আকাঙ্ক্ষা করি তাঁর জীবনের নিভৃতে অনুপ্রবেশ করতে পারার।" অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কেই এই কথা উচ্চারণ করেছিলেন আঁদ্রে কার্পেলেস, (১) 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' প্রবন্ধাবলীর আলোচনায় শ্রীমতী আঁদ্রে নিজেও ছিলেন চিত্রাঙ্কন রসমগ্ন শিল্পী!

বস্তুতঃ বাংলা ভাষায় অবনীন্দ্রনাথের সকল লেখারই শ্রেষ্ঠ মূল্য ঐ 'ভরসা' পূরণের সম্ভাবনায়; ঐটুকুই তাঁর সাহিত্য-কীর্তির একমাত্র রস-উৎসও। লিপিশিল্পে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বকর্মা; শেষ জীবনে ছবি এঁকেও দিগ্বিজয় করে গেছেন; তবু নিজেই বলেছেন, (২) তাঁর একমাত্র পরিচয়, তিনি "কবি-মাত্র"। অবনীন্দ্রনাথের লিপি-কৃত্যের মূল্য বাংলাসাহিত্যে অনন্য, কেবল গুণে ও স্বাদে নয়, বৈচিত্র্য এবং বিস্তারেও। একখানি ছবি না আঁকলেও কেবল লেখার জন্যেই বাংলাসাহিত্যে অবিস্মরণীয়তা তিনি দাবি করতে পারতেন, এমন যুক্তিও (৩) প্রগল্‌ভ-ভাষণ নয় মোটেই। আর ইতিহাসের বিচারে কলম আর তুলি তাঁর হাতে চলেছে যুগপৎ। ১৯০৬ খৃস্টাব্দে আর্ট কলেজের উপাধ্যক্ষ পদের জন্য যে আবেদন পত্র পাঠিয়েছিলেন, তাতে তখন পর্যন্ত পাওয়া গোটা তিন চিত্রাঙ্কনী স্বীকৃতির পাশে স্পষ্টই উল্লেখ করেছিলেন, (৪) "এবং আমি বাংলাসাহিত্যের কিঞ্চিৎ খ্যাতিসম্পন্ন লেখকও।" তা হলেও অবনীন্দ্রনাথ অন্তঃপ্রকৃতি-বশে আদি-অন্তে সম্পূর্ণ নির্ভেজাল এক চিত্রশিল্পী ছাড়া আর কিছুই নন। রবীন্দ্রনাথের বেলা যেমন গল্প-উপন্যাস-নাটক থেকে চিত্রাঙ্কন পর্যন্ত সব কিছুই তাঁর মৌলিক কবি-প্রতিভার সহযোগী কিংবা সম্পূরক, অবনীন্দ্রনাথের সকল লেখাই তেমনি তাঁর চিত্রশিল্পী মনের রূপবাহী। আর এই বিচারে শব্দশিল্পীর কাছে ছবির মত, চিত্রশিল্পীর ব্যক্তিত্বের পক্ষে লেখার দাম তার চেয়ে অনেক বেশি, অনেক একান্ত।

সকল সার্থক সৃষ্টিই শিল্পীর আত্ম-রচনা; রবীন্দ্রনাথের কথাই চূড়ান্ত ও 'আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে। আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।" সৃষ্টির মধ্যে শিল্পী আত্মসমর্পণ করেন আসলে আত্ম-আস্বাদনের লোভেই। আর তাইতেই সৃষ্টির জন্ম। অবনীন্দ্রনাথও তাই বলেছেন; (৬) "রচনা যেখানে রচয়িতার স্মৃতি ও কল্পনার কাছে ঋণী সেইখানেই সে আর্ট।" কিংবা (৭) সৃষ্টির প্রকাশ হল স্রষ্টার অভিমতে, শিল্পের প্রকাশ হল শিল্পীর অভিমতটি ধরে, ব্যক্তিবিশেষের বা শাস্ত্রমত বিশেষের সঙ্গে না মেলাই তার ধর্ম।" শিল্পীর স্মৃতিলোক, কল্পনাজগৎ ও তারই পরিপোষণে গঠিত তাঁর 'অভিমত' তথা বিশিষ্ট মনোভাবনার প্রলেপেই শিল্প তার অনন্যপর স্বাদুতা লাভ করে থাকে। তাকে আস্বাদন করতে হলে মূলে পৌঁছানো চাই; শিল্পকে ধরে শিল্পীর

মুখোস / অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত

আনন্দচেতনায়, বাইরে থেকে একেবারে ভেতরে।

কিন্তু বাইরের চাকচিক্য কিছু কম নয়, তাই রসের সন্ধানে আমাদের দিন কাটে অন্দরমহলের পথে—দেউড়ির কাছে। চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট কথন আজ আমাদের মুখে মুখে—ভারতবর্ষকে তিনি "বিশ্বজনের আত্মউপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন। আজ সমস্ত ভারতে যুগান্তরের অবতারণা হয়েছে চিত্রকলায় আত্মউপলব্ধিতে। সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছে।" কিন্তু এটুকু তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার মূল্যায়ন—তাঁর রচিত সৌন্দর্যের আস্বাদন নয়। অথবা 'পাশ্চাত্য বস্তুজ্ঞান তিনি সংগ্রহ করেছেন সন্দেহ নেই, প্রাচ্যের ধ্যানমগ্নতাও কিছুমাত্র বর্জন করেন নি, উভয়কেই যেভাবে ব্যবহার করেছেন, তাতেই তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য চিত্ররীতির সংগত একটি সমন্বয় ঘটিয়ে তোলার আশ্চর্য সিদ্ধি।—' বিশেষজ্ঞ কন্ঠের এ সব উক্তিও (৮) শিল্পের স্থূল চরিত্র লক্ষণেরই দিকনির্দেশক,—অনির্বচনীয় সৌন্দর্যলোকের চাবিকাঠিটি এখানেও উপস্থিত নেই।

সে লুকোনো আছে স্রষ্টার অন্তর্লোকের স্ফটিক স্তম্ভে। অবনীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা আর উক্তিতেই তার সন্ধান ছড়িয়ে আছে যত্রতত্র—একটির কথাই বলি.(৯) ইটালিয়ান আর্টিস্ট গিলার্ডির বাড়ি গিয়ে তখন (১৮৯০) (১০) রোজ সকালে অয়েল পেন্টিং শেখেন। নিচের তলায় থাকেন বুড়ো এক ইটালিয়ান মিউজিক মাস্টার আর তাঁর মেয়ে. দুজনে মিলে রোজই তখন বাজান,—"মেয়ে পিয়ানো বাজায় বাপ বাজায় বেহালা।...... একদিন সকালে রোজকার মত ছবি আঁকছি, নিচে থেকে বেহালার সুর এল কানে, উদাস করে দিলে।......সুর তো নয় যেন বেহালাটা কাঁদছে। সেদিন সে সুর স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে, বেহালার ছড়ি বেহালার তার আর যে বাজাচ্ছে তার মানসতন্ত্রী এক হয়ে গেছে। আজ আর পিয়ানো নেই সঙ্গে। গিলার্ডিকে বললুম, 'সাহেব, আজ বেহালা যেন কাঁদছে মনে হচ্ছে, কেন বলো তো? এমন তো শুনি নি কখনো?' সাহেব বললেন, 'চুপ চুপ, জানো না, বুড়োটির মেয়ে কাল চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে!' সেদিন আর ছবি আঁকা হল না আমার। খানিক বাদে আস্তে আস্তে নেমে এলুম। সিঁড়ির কাছের ঘরটিতে দেখি, বুড়োটি বসে আছে চেয়ারে কাঁধে বেহালাটি রেখে মাথা হেঁট করে, একমাথা সাদা চুল পাখার হাওয়ায় উড়ছে। সেদিন বুঝেছিলুম মনে ধরল আজ সুরের আগুন। অন্তর বাজে তো যন্তর বাজে।'

শিল্পের সঙ্গে শিল্পীর অন্তরের নিভৃত মিলন-বিন্দুটিই রসের উৎস। রাণী চন্দকে গল্পটি বলেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের সেই উৎসের সন্ধান দিতে (১১) —স্কালি কলম মন। লেখে তিনজন।' কিন্তু এখানেও মনের পুরো খোঁজটি নেই,—এক বিশেষ মুহূর্তের মানসিকতা অব্যবহিত ব্যথার বৃন্তে সুরের কুঁড়ি হয়ে ফুটেছিল বেহালা বাদকের হাতে। আরো গভীরে মনের যে চরিত্র চিরন্তন, সেদিনের ঐ এক বাজনার মতো সকল বাজনাতেই যার সমান প্রসারের আকাঙ্ক্ষা—তার প্রকাশের পূর্ণতাতেই শিল্পের নিজস্বতা, তার উপভোগেই শিল্পের স্বাদ সম্পূর্ণ। অবনীন্দ্রনাথের ছবি দেখে অভিভূত ভাস্কর-অধ্যাপক ল্যানটেরি মাকিব লেছিলেন (১২)—'আর্টিস্ট রং চাপিয়ে relief তুলেছেন। অফুরন্ত রঙের বাজনা শুনছি, আর আমি তাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আর্টিস্টকে।'

এই দেখতে পাবার ক্ষমতাতেই শিল্পরসের উপভোগ সার্থক, কারণ শিল্পীর নিজেকে দেখাতে পারার আগ্রহ থেকেই তো শিল্পের জন্ম। প্রকাশই শিল্পের প্রেরণা, কারণ প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা শিল্পীর মজ্জায় স্পন্দিত। কিন্তু প্রকাশের মাধ্যম যেমন বিচিত্র, তার মাত্রাও সেই অনুপাতে বিভিন্ন। লিপির ভাষা শব্দার্থে মুখর, কিন্তু রেখার ভাষা নির্বাক মনোহারিতায় মর্মস্পর্শী। বাণীর তুলনায় ভাব, অর্থের চেয়ে ব্যঞ্জনা, বক্তব্যের অপেক্ষা সঙ্কেত রেখার পরতে পরতে সাজিয়ে দিয়ে চিত্রশিল্পী নিজেকে নিবেদন করেন আপন সৃষ্টির পাত্রে। সে প্রকাশের সংবেদনা গভীর যত, তত অস্ফুটও—আবেদনও তাই সীমিত, কেবল আলংকারিক তাৎপর্যে নয়, আক্ষরিক অর্থেই চিত্রশিল্প একান্তভাবে 'সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী'। সেই মৌন ভাষা রসিকের মনকে যত আবিষ্ট করে, ততই আরো অনেক না-জানার আক্ষেপে করে রাখে অতৃপ্ত। সেই স্নিগ্ধ অনির্বাণ মোহময় অতৃপ্তিই রসিক মনে চিত্রশিল্প-রসের ক্ষরণ-বিন্দু, এ আস্বাদনে আবেশ আছে, তেমনি উৎকন্ঠাও। যে ছবিকে ভালোবেসে মুগ্ধ হই, অথচ তার 'মানে' বুঝি না—বুঝি না শিল্পের ভাষা অনুভববেদ্য, বোধগম্য নয় বলেই! শিল্পীর কোন নিভৃত আক্ষেপ অথবা রহস্যময় কোন আয়াসে সেই ছবি রেখার বাঁধনে মমায়িত হতে চাইছে, তাকে খুঁজে পাবার—নিঃশেষে নির্ণয় করতে পারার অবিরাম ব্যাকুলতাই সাধারণ মানুষের মনেও শিল্পীর লেখার প্রতি আগ্রহ জাগায়—তাই বলতে চেয়েছেন আদ্রে' কার্পেলেসও।

আর এ আগ্রহ শিল্পরসিকের চেয়ে শিল্পীরও কম নয়, নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করে ফেলাই তো তাঁর একাগ্র ব্রত।—ব্রতও! অন্যে যে যাই করুন, অবনীন্দ্রনাথ রেখার মাত্রায় যে-আপনাকে নিবেদন করেছেন আপনারই অন্তরের আত্মরসপিপাসু সৌন্দর্য চেতনার কাছে, জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তাকেই মাত্রাহীন অজস্র কথার মাত্রা দিয়ে আর এক ভাবে মেলে ধরতে চেয়েছেন আপন রেখালুব্ধ মনের সামনে! রেখায় আর লেখায় মিলে শিল্পীর পূর্ণ প্রকাশ। লেখার মূল্য এইখানেই, এবং আরো বেশি এই জন্যে যে-লেখায় সে প্রকাশ আক্ষরিক অর্থে হয়েছে 'সর্বসাধারণীকৃত!' অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যপাঠ আসলে শিল্পীর সেই ব্যক্তিমূর্তির মূল সন্দর্শনের 'করণ-কৌশল',—চিত্রের আধারে যার প্রকাশ শিল্প-রসের অমূর্ত ভাষায়! লেখাপাঠ যেন রেখা-পাঠের ভূমিকা! রেখা পড়বার বিদ্যে জানা নেই, তাই মূল পড়ার আগের মুখবন্ধটুকুই বর্তমান আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য!

কিন্তু সে চেষ্টাও হঠাৎ শুরু করবার উপায় নেই। অবনীন্দ্রনাথের লেখার ভাষাও নিছক বাণী-শিল্প নয়—'বাগর্থের' হর-গৌরীত্ব যার ভিত্তি। আসলে এ লেখাও রেখাশিল্পের রূপান্তর, এমন কি ক্ষেত্র-বিশেষে হয়ত বা তার পরিশীলিত মানোন্নতির চেষ্টা। মাঝে প্রায় বছর আট-নয় (১৮৩০—১৮৩৮।৩৯) (১২ক) ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে প্রধানতঃ যাত্রা লিখতে বসেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। তখন একবার মনে হয়েছিল, (১৩) "দেখলুম ছবি-টবি কিছু নয়। ছেলেমানুষি। গভীরতর রসের সন্ধানে নেমেছি। নানারকম শব্দ বাজিয়ে বাজিয়ে দেখছি কি রকম চিত্র ফুটে ওঠে মনের মধ্যে।" —অবনীন্দ্রনাথের লেখনীর ভাষা আসলে 'বাগর্থের' দর্পণে চিত্রশিল্পীর আত্মানুসন্ধানের পরিভাষা। এ ভাষায় বর্ণনার চেয়ে ব্যঞ্জনা বেশি—বহুভাষী বিবৃতির ছদ্মবেশে ঘটেছে নিগূঢ় আত্ম-রোপণ! ছবির ভাষার মত তাঁর লিপি-কর্মও তাই রহস্য মোহাবেশে মোড়া। পড়লে মনে হয়, শিশুশিল্প হয়েও কেবল শৈশব-সীমায় আবদ্ধ করে রাখবার মত নয়,—বড়োদের রসানুভবকে চরিতার্থ করেও শিশুর জগতে তার চিরন্তন আবাস। ফল-কথা, অবনীন্দ্রনাথের ছবির চেয়ে লেখার ভাষায় তাঁর আত্মউন্মোচন মুখরতর হলেও কম রহস্যাবিষ্ট নয়! তাই লেখার মধ্যেও তাঁর ব্যক্তিত্বকে হঠাৎ এক সঙ্গে মুঠো করে ধরবার উপায় নেই। ব্যক্তিকে জানার মধ্য দিয়েই ব্যক্তিত্বকে ক্রমশঃ আবিষ্কার করতে হয়।

আর ব্যক্তি অর্থে, অন্তত শিল্পীর পক্ষে, কেবল জন্মমৃত্যু আর নূতনতর প্রজন্মবাহী তথ্যের আধারটি মাত্র নয়! এমন ক্ষেত্রে ব্যক্তি আর ব্যক্তিত্বের ওতঃপ্রোত স্বভাবটিকে খবরের অঙ্কের চেয়ে অনুভবের তুলাদণ্ডে যাচাই করাই সহজ। আসলে এ-দুয়ের সম্পর্ক পরস্পর নির্ভর-শীল—একে অন্যের পরিপূরক। ব্যক্তি-বিশেষের সহজাত মনঃপ্রকৃতি তাঁর ব্যক্তিত্বের ভিত্তি.—সারা জীবনব্যাপী তার ক্রম-উন্মোচন। অন্য পক্ষে ব্যক্তির জীবনের অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ তাঁর ব্যক্তিত্বের গঠন ও ঘনীভবনে প্রভাব বিস্তার করে। অবনীন্দ্রের লেখা আর রেখায় তাঁর সেই রহস্য-সত্তারই বিচিত্র প্রকাশ। বর্ণনার চেয়ে তুলনার মাধ্যমেই হয়ত এসব দুরূহ কথা স্বচ্ছ হতে পারে!

রবীন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথ—মাত্র দশ বছরের বড়-ছোট খুড়ো-ভাইপো। রবীন্দ্রনাথের জন্মের তারিখ ৬ই মে, ১৮৬১, অবনীন্দ্রনাথের—৭ই আগস্ট ১৮৭১। পরস্পরের মধ্যে নৈকট্য ছিল

নিবিড়, শৈশব-অভিজ্ঞতার সাদৃশ্যও কম নয়। তবু ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে দুজনে ছিলেন পরস্পর বিপরীত। একজন আজন্ম-পরিণত যদি হন—আর একজন চিরশিশু। অবনীন্দ্রনাথ গল্প বলেছেন (১৪) তাঁদের ছোটোবেলায় 'ইস্কুল-ইস্কুল খেলা'র। 'দীপুদা ভাঙ্গা কাঠের চেয়ারে বসে গম্ভীর সুরে বলেন, 'পড় সবাই।' পড়া আর কি, কোলের উপর ঠোঙা রেখে তার থেকে চিনাবাদাম বের করে ভাঙছি আর খাচ্ছি, দীপুদার হাতেও এক ঠোঙা, তিনিও খাচ্ছেন।......একদিন আবার প্রাইজ ডিস্ট্রি-বিউশন হল। কে প্রাইজ দেবে। উপরের বারান্দায় পায়চারি করছেন রবি-কা। তিনি আসতেন না বড়ো আমাদের খেলায় যোগ দিতে। সমান বয়সের ছেলেও তো থাকত ঐ খেলায়। কিন্তু তিনি ওই তখন থেকেই কেমন একলা একলা থাকতেন, একলা পায়চারি করতেন। সেখান থেকেই মাঝে মাঝে দেখতেন দাঁড়িয়ে, নীচে আমরা খেলা করছি। গিয়ে ধরলুম তাঁকে, 'আমাদের ইস্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হবে, তোমায় আসতে হবে।' রবিকা একটু হেসে নেমে এলেন, প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হল। ...প্রাইজের পরে আবার তিনি দাঁড়িয়ে বক্তৃতাও দিলেন একটি খুব শুদ্ধ ভাষায়।'

—রবীন্দ্রনাথের একাকিত্বের নয় কেবল, স্বভাব 'বড়ো'ত্বের—অর্থাৎ নিজেকে বড়ো বলে ভাববার আন্তরিক আগ্রহের এক কৌতুক-কর ছবি এটি। আসলে তিনিও তো তখন ঐসব খেলুড়েদের দলে! অন্যদের কথা ছেড়ে দিলেও 'দীপুদা' অর্থাৎ দীপেন্দ্রনাথ (১৮৬২-১'৯২২) রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোটো! খেলায় যোগ দিলে অন্ততঃ মাস্টারমশায়ের পদবীটি তাঁর পক্ষে অবশ্যই মানানসই হত! তা নয়, ওপরের বারান্দা থেকে দাঁড়িয়ে ভারিক্কি চালে 'ছোট'দের খেলা দেখতেন নেকনজরে, 'একটু হেসে' নেমে আসেন তাঁদের আবদারে ধরা দিতে, কিংবা সেই বড়োমির চালটুকু ধরে রাখতে 'দাঁড়িয়ে শুদ্ধ ভাষায়' বক্তৃতাও করেন। উন্নতশির্তায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন চিরকাল দ্বিতীয়-রহিত!

আর অবনীন্দ্রনাথ? তিনি নিজেই বল-ছেন (১৫)—"চিরকালের খ্যাপা আমি। সেই খ্যাপামি আমার গেল না কোনো কালেই। আমার নামই ছিল বোম্বেটে। দুরন্তও ছিলুম, আর যখন যেটা জেদ ধরতুম, তখন সেটা করা চাই-ই। তাই সবাই আমার ওই নাম দিয়েছিলেন। রবিকারাও চিরকাল ওই 'খ্যাপা' 'পাগলা' বলে আমায় ডাকতেন। আমিও যেন তাঁদের কাছে গেলে ছোট্ট ছেলেটি হয়ে যেতুম। এই সেদিনও রবিকাদের কাছে গেলেই আমার বয়স ভুলে আমি যেন সেই পাগলা খ্যাপা হয়ে যেতুম। তাঁরাও আমায় সেইভাবে দেখতেন।

"জ্যোতিকাকার কাছে রাঁচিতে গেলুম, তখন তো আমি কত বড়, ছেলেপুলে নাতি-নাতনি আমার চারদিকে। জ্যোতিকাকা-মশায় রোজ সকালে টুং টুং করে রিক্সা বাজাতে বাজাতে ফিরতেন। কোলের উপর একটি কেকের বাক্স। রিক্স থেকে নেমে কেকের বাক্সটি আমার হাতে দিয়ে বলতেন।

বিশ্রাম / অবনীন্দ্রনাথ।

'অবন, তোমার জন্য এনেছি, তুমি খেয়ো।' ঘর ভরতি নাতি-নাতনি, সে সব ফেলে আমার জন্য নিজের হাতে বাজার থেকে কেক কিনে আনলেন। এনে আমার হাতে দিয়ে বারে বারে বললেন, 'তুমি খেয়ো কিন্তু, তোমার জন্যেই এনেছি।' আমি মহা অপ্রস্তুতে পড়তুম। ...কিন্তু তা হবে না। ছোট ছেলেকে লজেঞ্জুস খেতে যেমন দেয়, অবন কেক খেতে ভালোবাসে, নিজের হাতে এনে দিতে হবে। এমনিই ছোট্টটি করে দেখতেন ও'রা আমাকে চিরকাল। এখনো এক-একদিন আমি স্বপ্ন দেখি যেন বাবামশায় ফিরে এসেছেন, আর আমি ছোট্ট বালকটি হয়ে গেছি। একেবারে নিশ্চিন্ত। আনন্দে ভরপুর হয়ে যাই স্বপ্নেতে। এ স্বপ্ন আমি প্রায়ই দেখি। মা-পিসিমারা সব বাড়িতে আছেন, আমিও বড় এই রকমই আছি, ছেলেপুলে সব ঘর ভরতি।"

উদ্ধৃতি নিশ্চয় দীর্ঘ হল, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের অজরামর শিশুমনকে চেনা গেল তাতে। বড় থেকেও, ঘর ভরতি ছেলেপুলে, নাতি-নাতনির মাঝখানে বড় থেকেও, ছোট্ট বালকটি হয়ে যাবার স্বপ্ন দেখা—ঐ অবচেতন আকাঙ্ক্ষা দিয়ে মোড়া তাঁর শিল্প-ব্যক্তিত্ব। তাই তাঁর লেখা ছোটোদের জন্য হলেও বড়োদের লোভের সামগ্রী, কিংবা বড়োদের জন্যে লেখাতেও ছোট্টটি হয়ে পড়তে চাওয়ার মোহাবেশ। তাছাড়া তাঁর বাক্রীতিতে নারীসুলভ ভঙ্গিমার বৈশিষ্ট্যটুকুও লক্ষ্য করার মত। অবশ্য সে সবই বিশেষার্থে। চিত্রেও ঐ নিভৃত ব্যক্তি-লক্ষণ কি বিভার সৃষ্টি করেছে সে সব কথা অধিকারী মনের আলোচ্য। কিন্তু তার আগে ঐ অম্লান শৈশব আর অবগুণ্ঠিত রমণীয়তার রহস্য-মধুরিমাটুকুর সন্ধান করতে হয় ব্যক্তির বিকাশের ইতিহাসে।

(২)

ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্র-নাথ আর অবনীন্দ্রনাথের শৈশব পরিবেশের

লাবণ্য যত, বৈশাদৃশ্যও তার চেয়ে কম নয়। রবীন্দ্রনাথ পিতামাতার সর্বকনিষ্ঠ জীবিত সন্তান—কালের হিসেবে ছিলেন পরাগত। (১৬) অবনীন্দ্রনাথ তা নন, তাছাড়া ছোট বোনও ছিলেন তাঁর দুজন, তাহলেও তিন ভায়ের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ মা-বাবার জীবিত ছোট ছেলে। রবীন্দ্রনাথের মত অবনীন্দ্রনাথেরও শৈশবের একটা অংশ কেটেছে স্বজন-বিচ্ছিন্নতাবোধে পীড়িত হয়ে, ভৃত্যদের মহলে। উপেক্ষিতমনা সে বেদনার গ্লানিটুকু বেশি বয়সের স্মৃতি থেকেও মুছে ফেলতে পারেন নি শিল্পী! মায়ের মহলে দুটি 'আশ্চর্য' নরম কুকুর ছিল, (১৭) "কুকুর দুটো পাঁউরুটি বিস্কুট আর মুরগীর ডিম খায়। আমার জন্যে পড়ে থাকে কোচের নীচে খালি ডিমের খোলা।" একদিন নাকি তাই তুলে মুখে দিয়ে ধরা পড়েছিলেম, বাবার কাছে শাস্তিও জুটেছিল। ক্ষোভের বশে সেদিন কুকুর দুটোকে খুন করার ফিকির চিন্তা করতে পেরেছিলেন শিল্পি-শিশু, এই স্বীকৃতি-টুকু উপেক্ষাযোগ্য নয়।

দাদাদের প্রসঙ্গেও নিজের সম্পর্কে ছিল এক অবমূল্য-মনস্কতা। অল্প বয়সে নর্মাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন (১৮৭৬?) (১৮) মেজদাদা তখন সে স্কুলে সাফল্যের সঙ্গে পড়ছেন, দাদা গগনেন্দ্রনাথ সেন্ট জেভিয়ারস-এর ভালো ছাত্র। (১৯) আর অবনীন্দ্রনাথ স্কুলে বাবার নামে কাঁদেন, স্কুলে গিয়েও 'বোম্বেটেপনা' করেন, শেষ পর্যন্ত তো অস্বাভাবিক শাস্তি ভোগের সূত্রে স্কুলে যাওয়াই বন্ধ হয়ে গেল (১৮৮০) (১৮)। বাবা ভাবতেন বড়ো দুই ছেলে বিদেশ যাবে, য়ুরোপে! আর অবনীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন (২০), আমাকে দেখিয়ে বড় পিসিমাকে বললেন, 'ও থাকুক এখানেই। আমার সঙ্গে ঘুরবে, ইন্ডিয়া দেখবে জানবে।' তখন থেকেই সকলে আমার বিদ্যেবুদ্ধির আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। "এই অনুভবে গোপন যে বেদনাবোধ রয়েছে—তার সঙ্গে কিশোর রবীন্দ্রনাথের রিক্তমনস্কতার সাদৃশ্য স্পষ্ট। তা হলেও সে শূন্যতাবোধ রবিকার মত নিরবলম্ব ছিল না। তিনটি পুত্রের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল, ছোট ছেলেটিকে বাবা কাছ ছাড়া করতে চান না, এই ভাবনার মধ্যে আপাত অক্ষম শিশু মন একটি করুণ মমতার আশ্রয়ও খুঁজে পেত নিশ্চয়, বাৎসল্যের সেই কারুণ্যে গলিত ছায়ারূপ,—যার ঘনতর প্রকাশ শিশু-শিল্পীর মনকে স্পর্শ করেছিল অকাল-মৃত ছোট ভাইটির প্রসঙ্গে (২১), "একটি ভাই ছিল আমার, সকলের ছোট, দেখতে রোগা টিংটিঙে, বড় মায়াবী মুখখানি। আমরা ছিলুম তার কাছে পালোয়ান। একটু হুমকি দিলেই ভয়ে কেঁদে ফেলত। বাবামশায় খুব ভালবাসতেন তাকে আদর করে ডাকতেন 'র‍্যাট', বাবামশায়ের র‍্যাট ছিল তাঁর গোলাপি হরিণেরই সামিল এত আদর-যত্ন। হরিণেরই মতো সুন্দর চোখ দুটো ছিল তার।"

হরিণের মতো সৌন্দর্যের দাবি কোনো দিক থেকেই ছিল না অবনীন্দ্রনাথের—বুড়ো বয়সেও 'কালো কষ্টিপাথর', 'অবনঠাকুর'কে নিয়ে তাঁর কৌতুক-আক্ষেপ ছিল অবিরাম। (২২) তবু দাদাদের চেয়ে কেবল ক্ষমতায় দুর্বল বলেই, সারাজীবন বাবার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার পাসপোর্ট জুটে গেল, বঞ্চিতমনা শিশুর কাছে করুণামিশ্র এই বাৎসল্যের লোভ মোহে-মাধুর্যে নিশ্চয়ই অনির্বচনীয় হয়েছিল। কিন্তু শুরুতেই বজ্রপাত, অকস্মাৎ বাবার অকাল-মৃত্যু হল। মধুর প্রত্যাশার এই নিষ্ঠুর অবসান কিশোর মনে শৈশব-তৃষ্ণাকে অবদমনে ঘনীভূত করেছিল। সেই আক্ষেপের তাড়নে বাবার আশ্রয়ে তলিয়ে গিয়ে শৈশব-স্বপ্ন যাপনের স্বপ্ন-রেখা ঘুচল না কখনো শিল্পীর জীবনে—কাটলো না কোনোদিন বড়দের কাছে নীরবে নিভৃতে শিশু হয়ে পড়তে পারার অদম্য লোভ।

তাছাড়া শিশুর প্রত্যাশায় বাৎসল্যের দুটি রূপ একান্ত প্রার্থিত। বাবার স্নেহে শাসন আছে, মায়ের স্নেহে কেবলই অন্তহীন লালন। ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের কবি দৃঢ়-পৌরুষ অনাসক্ত পিতার স্নেহে অভিষিক্ত হয়েছিলেন একবার কৈশোর আরম্ভে। শান্তিনিকেতনের প্রান্তর থেকে ডালহৌসি পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত ব্যাপ্ত সেই অভিজ্ঞতার স্মৃতি। চিরকালের জন্য রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব বিকাশের ধ্রুব পথটি সে বেঁধে দিয়েছিল। তার মূলে প্রেম ছিল অনিবার, কিন্তু আসক্তি ছিল না বিন্দুমাত্র,—জীবনের প্রতি আকর্ষণ ছিল উৎকণ্ঠিত, কিন্তু আশ্লেষণের লোভ ছিল না একেবারেই। এই অনাবিষ্ট মমতা রবীন্দ্র-রচনার আবেগময় মুহূর্তেও তাঁর প্রকাশরীতিকে দিয়েছে নৈর্ব্যক্তিক ঋজুতা, ব্যক্তিত্বে এবং প্রকাশের বৈশিষ্ট্যে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই এলিগ্যান্ট।

৫নং বাড়ির ধারা ছিল তার বিপরীত; প্রথমাবধি সে বাড়িতে গার্হস্থ্য জীবনের সূত্রপাত মহিলা-অভিভাবকতায়। গিরীন্দ্রনাথ (১৮২০-৫৪) স্বল্পজীবী ছিলেন, তাঁর পুত্র দুজনও তাই। গগনেন্দ্রনাথ (১৮৪১-৬৯) নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন মাত্র আটাশ বছর বয়সে; আর গুণেন্দ্রনাথের (১৮৪৭-৮১) মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল বাবার মতই চৌত্রিশ। গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময়ে তাঁর দুই পুত্রের বয়স যথাক্রমে ১৩ এবং ৬। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে হিমালয় থেকে মহর্ষি যেদিন কলকাতায় ফিরে আসেন তখন বাড়িতে দ্বারকানাথের কালের জগদ্ধাত্রী পূজার অনুষ্ঠান চলেছে। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব তখন অবিচল। তাই পূজোর ক'দিন ব্রাহ্মসমাজে কাটিয়ে বাড়ি ফেরেন। তারপরে কুলদেবতার পরিত্যাগ সম্পর্কেও তিনি দৃঢ়সংকল্প হন। ঐ বছরেই মহর্ষির কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ অবিবাহিত থেকে লোকান্তরিত হন; তার বছর কয় আগেই তিনি পৈতৃক সম্পত্তি পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন। তিন ভাই যখন একত্র ছিলেন, তখন অনুজ ও পরিবারবর্গের আপত্তি হেতু মহর্ষি পৈতৃক ধর্মানুষ্ঠান বর্জন করতে পারেন নি; পূজোর সময়ে নিজে বরং গৃহত্যাগ করে যেতেন। এবারে তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল পাকা অতএব গিরীন্দ্রনাথের বিধবা যোগমায়াদেবী দুই শিশুপুত্র, দুই কন্যা ও দুই জামাতাকে নিয়ে ৫নং বাড়িতে দ্বারকানাথের বৈঠকখানায় উঠে আসেন, কুলদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণকে নিয়ে স্থায়ী বসবাস করতে। তাঁর দুই পুত্র গণেন্দ্র ও গুণেন্দ্রর বয়স তখন যথাক্রমে সতেরো আর দশ। অতএব মায়ের অভিভাবকতায় সূচিত হয়েছিল ৫নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেনের জীবনযাত্রা; বলা ভালো, আদরের লালনে সেই ধারাই প্রবাহিত হয়ে এল পরবর্তী প্রজন্মে। গণেন্দ্রনাথ ছিলেন অপত্যরহিত; গুণেন্দ্রনাথ গেলেন চৌদ্দ, এগারো এবং দশ বছরের তিন পুত্র রেখে; মেয়ে দুটি আরো ছোট। অতএব আবার মা অভিভাবক; বৈষয়িক দায়িত্বের অধিকারে আগের মতই রইলেন গিরীন্দ্রনাথের জামাতা দুজন; অবনীন্দ্রনাথের পিসেমশায় তাঁরা! মেয়েলি স্নেহে আসক্তিই মূল প্রবণতা—জড়িয়ে ধরবার, ভালোবেসে অধিকার করতে চাওয়ার ব্যাকুল আগ্রহ! আর মার কাছে, কোনো আগল নেই তো!—না লজ্জার, না সম্ভ্রমের! অতএব তামুক খেতে শিখবেন কিনা, তাঁর নির্দেশ যেমন, তেমনি আর্ট স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল পদের জন্য হাভেল সাহেবের আহবানে সাড়া দেবেন কিনা,—সব কিছুতেই মায়ের অধিকার ছিল চূড়ান্ত। অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে ঐ 'ফেমিনিন্ কোয়ালিটি' ছিল এক মুখ্য সম্পদ,—মেয়েদের মত সন্তর্পণ, ভীরু, তাঁর অনুরাগ,—জীবনকে জড়িয়ে ধরে পাবার আকুলতা তাঁর ভালোবাসায় এবং সৃষ্টিতেও।

এসব প্রসঙ্গ দোষগুণের নয়,—ব্যক্তিগত অন্তর্লক্ষণের, সৃষ্টিতে যা ব্যক্তিত্বের বিভা বিচ্ছুরিত করেছে। রবীন্দ্র ও অবনীন্দ্রের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'র দুটি চরিত্রকে মনে পড়ে, —একজন যুবরাজ আর এক রাজপুত্র।—অভিজিৎ আর সঞ্জয়;—একজন দৃপ্ত, উদাস, অনাসক্ত; আর একজন স্নিগ্ধ, মধুর এবং আবিষ্ট,—হয়ত তাই করুণও। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, (২৩)—"আমি কখনো নিজেকে জড়িয়ে ফেলিনি সংসারে। কোনো কিছুতেই আবদ্ধ হয়ে পড়া আমার স্বভাব নয়।...... সবই করেছি কিন্তু জালে জড়াই নি।...... ছেলেদের মানুষ করা, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা, সে করেছি, কিন্তু সে যেন একটা intellectual task, সেটা বুদ্ধির বিবেচনা দিয়ে করেছি পুরুষের মত করেই।"

অন্যপক্ষে ভালোবাসার জালে জড়িয়ে পড়াই ছিল অবনীন্দ্রনাথের স্বভাব। কন্যা উমাদেবী লিখেছেন, (২৪) "বড়ো ঘরোয়া ছিল তাঁর স্নেহপ্রবণ মনটি। সবসময় সকলকে কাছে কাছে নিয়ে থাকবেন এই ছিল সব সময়ের ইচ্ছে।" কিংবা, (২৫) "নানান জায়গায় বেড়াতে যাবার শখ ছিল বাবার খুবই। এতে তাঁর হাওয়াবদলও হতো, ছবি আঁকার খোরাক সঞ্চয়ও হতো। আর কোথাও গেলে সকলকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া চাই-ই।" অন্যপক্ষে শেষজীবনে মেয়ের কাছে শিল্পী বলেছিলেন, (২৬) "জানিস্ কোথা থেকে

না আমন্ত্রণ পেয়েছি। দিল্লী, লাহোর, জয়পুর, বম্বে, মাদ্রাজ, মহীশূর, ইংলন্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান, চীন সব জায়গা থেকে আমায় ডেকেছে। কেন যাইনি জানিস? তোর মাকে একলা রেখে যেতে হবে বলে। বড়ো ভীতু ছিল সে।"

কেবল 'অলকের মা'র (২৭) জন্যেই নয়, ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনি ভরা গোটা সংসারটাকে আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে, অধিকার করে তবেই চলত তাঁর ব্যক্তিজীবনের চাকা,—তাই তিনি চিরকাল ঘরবন্দী,—'ঘরোয়া' কথার অফুরন্ত ভান্ডার। পুরী, রাঁচি, এলাহাবাদ, মুসৌরী, দার্জিলিং—যেখানে গেছেন, সেখানেই তিনি ঘরবন্দী; একাকী কোথাও বেরিয়ে পড়তে পারেন নি,—পুত্র অলকেন্দ্রনাথ বলেছেন, (২৮) তাজমহলের অমর ছবি এঁকেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, কিন্তু তাজমহল দেখা হয়নি তাঁর জীবনে কোনোদিন।

এমনিতে ছিলেন শিশুর মত আত্ম-ভোলা বেহিসেব;—অথচ বলতেন, 'যাকে রাখ সেই রাখে।' কাজের অকাজের অজস্র সঞ্চয় থাকত তাঁর ডেস্কে পোরা। মেয়েদের মত রক্ষণশীল ছিলেন,—ইংরেজি অর্থে নয়, ব্যুৎপত্তিগত অর্থে। তাঁর শিল্পী মনেও সব কিছুকে ধরে রাখবার,—সঞ্চয়ের আগ্রহ, শিল্পরচনাতেও; অন্তত লিপিশিল্পে। কিন্তু রক্ষণশীলতা ছিল অন্যতর অর্থেও এবং বাড়ির স্বভাব-বৈশিষ্ট্য; অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব থেকে তাঁর সৃষ্টিতে যা অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে গেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন একটি চিঠিতে, (২৯)—"লেখক হিসাবে আমার একটা অভাব আছে। আমি আমাদের দেশের সমাজকে ভাল জানিনে। তাই গল্প যখন লিখি, ছুবতে ফাঁক থাকে, পাশ কাটিয়ে চলতে হয়।" অন্যত্র লিখেছিলেন, (৩০) "ছেলেবেলা থেকে সমাজ থেকে দূরস্থ বাড়িতে বাস করে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার আমার পক্ষে যথেষ্ট সহজ হয়নি। লোকে মনে করে সে আমার অহঙ্কার, কিন্তু আমার উপায় নেই।"—কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের লেখায় সব ফাঁক ভরাট হয়ে আছে;—আগাগোড়া মানুষটি যেমন, তেমনি তুলি-কলমের আঁচড়ও তাঁর নিভাঁজ সহজ। অথচ একই বাড়িরই তো দুই ছেলে,—কিংবা এ-বাড়ি ও-বাড়ির। এ পার্থক্য আসলে মানসিকতার, যা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া।

রবীন্দ্রনাথের সতত দূরসঞ্চারী নিঃসঙ্গতা,—সব কিছুর মাঝখানে থেকেও কোনো কিছুতেই জড়িয়ে না পড়তে পারার ঐতিহ্য তাঁর পৈতৃক উত্তরাধিকার।—মহর্ষি ছিলেন মনের দিক থেকে সর্বদাই হিমালয়-চর,—সমস্ত সাংসারিক দায়িত্ব নির্বাহের সময়েও মন থাকত ঈশ্বর-চিন্তার তুঙ্গ-চূড়ায়। তাছাড়া পারিপার্শ্বিক সমাজের মাঝখানে থেকেও তিনি ছিলেন সকল কিছুর ঊর্ধ্বে। সমাজ অর্থে কলকাতার বনেদী ধনী সমাজ,—যাঁদের লতা-পরগাছার মত আশ্রয় করে গড়ে উঠত মধ্য ও নিম্নবিত্ত শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনতার সমাগম। সেই 'বাবু'কেন্দ্রিক যৌথ জীবনযাত্রার সূত্র ধরেই গড়ে উঠেছিল নগর কলকাতার আমোদ-আহ্লাদ, উৎসব-সংস্কৃতির কাঠামো! কবি-গান, টপ্পা-তর্জা-খেউড় যেমন,—তেমনি যাত্রা-থিয়েটার, ঘুড়ি ওড়ানো, পাখি ওড়ানো প্রভৃতিরও নবজন্ম কলকাতার উদীয়মান জনসমাজে। তার অনেক কৌতুকচিত্র আছে 'নববাবু বিলাস', 'আলালের ঘরের দুলাল' কিংবা 'হুতোম প্যাঁচার নকশায়'। কিন্তু সেগুলি অনেকখানি বাস্তবচিত্রও,—আর সবটুকুই তার লঘু কৌতুকের বিষয়ও নয়। দেবেন্দ্রনাথ এই সমাজে জাত ও বর্ধিত হয়েও তার সামাজিক ছিলেন না। তিনি ঈশ্বর-মনস্ক প্রগতিপন্থী এক নতুন বুদ্ধি-জীবী 'আত্মীয়' সমাজ গড়ে তোলার তপস্যায় আত্মমগ্ন। দেশের সম্পর্কে অবিচল মর্যাদাবোধ ছিল মহর্ষির,—কিন্তু সে দেশ নির্বিশেষ শাশ্বতকালীন ভারতবর্ষ।—অর্থাৎ বৃহৎ ভারতবর্ষের যতটুকু অমর মহিমাদীপ্ত বলে নিজের কাছে প্রতিভাত হয়েছে, তাকেই তিনি স্বীকার করেছেন। তাতে একদিকে ছিল বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ-বর্জনের তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী বিচার প্রক্রিয়া,—আর একদিকে যা কিছু বিশেষ, যা কিছু অব্যবহিত, একান্ত কাছের বলেই পরম আপন,—যাকে বুদ্ধি দিয়ে বিচার নয়, মন দিয়ে জড়িয়ে ধরতে হয় মহর্ষির তুঙ্গস্থ দৃষ্টির কাছে তা ধরা পড়ে নি। শুধু তাই নয়, বহমান অকিঞ্চিৎকর পরিত্যক্ত হয়েছে বলেই, তাঁর চারপাশে অসাধারণের ভিড় জমেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আবাল্য অভিজ্ঞতায় উচ্চ চিন্তা, শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং অসাধারণ পরিমন্ডলের সঙ্গ পেয়েছেন।—কিন্তু যা কেবল কলকাতার, নিছক তাৎকালিক,—বাংলা ও বাঙালীর সাধারণ সম্পদ ও অভিজ্ঞতা, তার সঙ্গে নিবিড় নৈকট্যবোধ ঘটেনি তাঁর। তাই তাঁর ভাবনা ও রচনায়—প্রকৃতি, মানুষ, প্রেম সকলেরই এক উত্তুঙ্গ নির্বিশেষ স্বভাব,—চেতনাকে তা উদ্বোধিত করে—কখনোই মনকে আবিষ্ট করে না। অন্যপক্ষে অবনীন্দ্র-লিপি মন-জড়ানো আবেশেই আদি-অন্ত আমোদিত।

তার উৎস এ-বাড়ির রক্তে জমেছে গিরীন্দ্রনাথের কাল থেকেই। মহর্ষি যখন উচ্চ চিন্তা, সমুচ্চ ধ্যান নিয়ে মগ্ন,—বৈষয়িক জীবনের দায়িত্ব তখন গিরীন্দ্রনাথের ওপরে ন্যস্ত। তিনি ছিলেন সার্থক জমিদার,—কেবল ভূসম্পত্তির চালনায় নয়,—জীবন-যাত্রার প্রকরণেও। কলকাতার ধনাঢ্য সমাজের সহজ জীবন-ধারার সঙ্গে তিনি ওতঃপ্রোত-জড়িত ছিলেন।—নিজে যাত্রা লিখতেন,—কথকতা, কীর্তন, পাল, পার্বণ সমস্ত কিছুর সঙ্গে যোগ ছিল কেবল অভ্যাসের নয়—বিনম্র শ্রদ্ধা ও বিশিষ্ট রুচির। অবনীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের ভাষারূপ দেখে মনে হয় 'হুতোম প্যাঁচা'র মেজাজ আর জীবনপ্রচ্ছদ যেন ঠাকুরবাড়ির মার্জিত রুচির মোড়ক পরে অপরূপ প্রাণশক্তিতে ভূষিত হয়ে এসেছে। আবহমান, গতানুগতিক, কখনো বা আবিল ঐতিহ্যকে পরি-শীলিত আভিজাত্যের সূক্ষ্ম পরিমার্জনায় নবজন্ম দানের প্রেরণা ৫ নম্বর বাড়িতে সূচিত হয়েছিল গিরীন্দ্রনাথের উত্তরাধি-কার বংশে। সব কিছুর মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে ছড়িয়ে দেবার কৌশল ছিল অবনীন্দ্রনাথের, —আর সব কিছুর মাঝখানে থেকেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সবার ঊর্ধ্বে। গিরীন্দ্র-দেবেন্দ্রের স্বভাব প্রেরণা এইভাবে বাংলার তথা ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের চরিত্র নির্দেশ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের চেতনায় দেশ-কাল-সমাজ সব কিছুই তাঁর কল্পনার,—সৃজনকর্মের প্রচ্ছদ! অবনীন্দ্রনাথের পক্ষে তা আরো বেশি—সে রক্তের ঐতিহ্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে কথকতা, কীর্তন ইত্যাদির কথাই মনে করা যেতে পারে! রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই সব-কিছু দেশীয় শিল্পের উদ্দীপক উপাদান,—অবনীন্দ্রনাথের পক্ষে তা আরো বেশি,—ধর্মকথা! তাই দুজনের কাছে এর আবেদন যেমন পৃথক,—তাঁদের শিল্পের বুননেও সেই পার্থক্যের চিহ্ন আছে,—আকারে নয় কেবল, নিভৃত স্বাদেও। অবনীন্দ্রনাথ যখন দেশীয় শিল্পের রহস্য-স্বভাবটি আবিষ্কার করলেন, রবীন্দ্রনাথই তাঁকে তখন বলেছিলেন (৩১) "বৈষ্ণবপদাবলী পড়ে ছবি আঁকতে। রবিকাকা আমাকে বাতলে দিলেন যে চন্ডী-দাস বিদ্যাপতির কবিতাকে রূপ দিতে হবে।" রবীন্দ্রনাথের কাছে বৈষ্ণবপদাবলী দেশীয় মানসিকতা চর্চার যথার্থ একটি 'পারস্পেকটিভ' তাঁর চোখে, (৩২) "বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া এই ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে প্রভুর জন্য দাস প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকটে আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।"

'আইডিয়া' হিসেবে এ পরিকল্পনার মহিমা বিশ্বজনীন; কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে বৈষ্ণবপদাবলীর মূল্য ছিল আরো সজীব, প্রায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ 'ট্রাডিশন'। 'ছোট পিসীমা'র ঘরে 'কৃষ্ণের পায়েস ভক্ষণে'র ছবি দেখেছিলেন শিশু অবনীন্দ্র-নাথ—সে ছিল তাঁর জীবনে ছবির স্বাদ গ্রহণের একেবারে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা, (৩৩) —"দেশী ধরনের অয়েল পেন্টিং,......সামনে নৈবেদ্য সাজিয়ে চোখ বুজে ধ্যানে বসে আছেন, চুপি চুপি কৃষ্ণ হাত ডুবিয়ে পায়েসটুকু তুলে মুখে দিচ্ছেন, হুবহু কথক ঠাকুরের গল্পের ছবি।" পারিবারিক ধর্মানু-ষ্ঠান, কথকতা, ছবি,—সবকিছু মিলে এ অভিজ্ঞতা কেবল সজীব এবং প্রত্যক্ষ নয়,—

আদি-অন্তে সম্পূর্ণ নিটোল। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'বৈষ্ণবপদাবলী'র চিত্রধারায় এই অতীন্দ্রিয়বেদ্য ঐতিহ্যবোধকে যুক্ত করেছিলেন, বিশেষজ্ঞের চোখেও তাতে স্বাদের অভিনবতা সঞ্চারিত হয়েছিল। জরাবোধানে 'দানখণ্ড' ছবি এঁকেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ,—বৈষ্ণব কবিতায় "আমা কিম বিকাইনু বলে" ইত্যাদি বিখ্যাত ভাবের অনুসরণে। শিল্পীর যৌবনরক্তের উত্তাপ নিশ্চয় জড়িয়েছিল সে ছবির পরিকল্পনায়; কিন্তু পরিণামী মূল্যে কুলদেবতার গৃহে আসন পেয়েছিল ছবিটি। অনেকদিন পরে দেখেও প্রবোধেন্দু ঠাকুরের বিস্মিত মনে হয়েছিল, (৩৪)—"পদাবলীর আলোলীন ভাবের শৃঙ্গার-সাত্ত্বিক রসরূপটি যেমন ফুটে উঠেছে অবনীন্দ্রনাথের 'দানখণ্ডে' তেমনটি যেন কোটেনি বৈষ্ণব-কবির পিরীতি-লোল ভাষায় প্রাকৃত সরলতাতেও।'

মূল কবিতার সংগে ছবির এই প্রতিতুলনায় মূল্য নিয়ে বিতর্ক যদি বা হয়, তবু স্বীকার করতেই হয়, রবীন্দ্রকাব্যে পদাবলীর যে মূল্য—তার সৌন্দর্য অপেক্ষাকৃত 'ইনটেল্যাকচুয়াল', অবনীন্দ্রনাথের রচনারসের উৎস ট্রাডিশন্যাল।' এ আলোচনা ধর্মীয় প্রসঙ্গের নয়,—সামাজিক আন্তরিকতা এবং আত্মস্থতার। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের এই বিশেষ দৃক্‌কোণ থেকে তাঁর রেখাশিল্পের স্বতন্ত্র কোনো স্বাদুতা আহরণ করা সম্ভব কিনা জানা নেই,—কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যের গাঢ়তাই রবীন্দ্রপ্রভাবে সর্বাপেক্ষা লালিত-চেতন অবনীন্দ্রনাথের লিপিশৈলীকে রবীন্দ্র-শৈলী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রেখেছে। নিজের লেখা সম্পর্কে শিল্পী বলেছিলেন, (৩৫)—"আমি গান বাঁধি, ছড়ায় গান, যাত্রায়,—আর রবিকা গান বাঁধেন, পড়ায় গান।"—নির্বাচনীর আইডিয়া, আর প্রত্যক্ষ ঐতিহ্য-চেতনা-বাহিত লোকায়ত শৈলীর পার্থক্য এখানেই,—একটি লেখা শোনার, দেখার,—আর একটি পড়ে উপভোগ করার। একজন জীবনকে উপলব্ধি করেছেন নিঃসঙ্গ দূরত্বের গহনে বসে,—আর একজন জীবনের একেবারে মাঝখানে বসে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে কথা বলে উঠেছেন। পারিপার্শ্বিক জীবনের কাছে এই একান্ত বাঁধা পড়ে-যাওয়া অবনীন্দ্রনাথের প্রকাশরূপের একটি ছবি তাঁর প্রথম গান শেখার কাহিনীতে। কোন্নগরে তখন রয়েছেন বাবার সংগে,—পুরস্কার পেয়েছেন অর্গ্যান একটি। বুড়ো চাটুজ্জে মশায়ের কাছে তখন এই গান শিখেছিলেন, ...(৩৬)—হায়রে সাহেব বেলাকর / আমি গাই দোব দুই বাছুর ধর। / ওটি শিষ্ট বাছুর, গুঁতোয় নাকো / কান দুটো ওর মুচড়ে ধর্ / হায়রে সাহেব বেলাকর।।" / "ব্ল্যাকওয়ার সাহেব রোজ ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে ফেরবার সময় গয়লাবাড়ি গিয়ে গয়লানির কাছে একপো করে দুধ খেতেন। পাড়ার লোকে এই দেখে তাঁর নামে গান বেঁধেছিল।"

কোন্নগর আর 'পেনেটি' গঙ্গার এপার-ওপার। ওপারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংগে যুবক রবীন্দ্রনাথও তখন সেখানে। কিন্তু এ-গান শোনার কিংবা এ-গান শেখার উপায় কবির ছিল না। এ কেবল অভিজ্ঞতার দূরত্ব নয়,—দৃষ্টিভংগী তথা 'অ্যাটিচ্যুড'-এর পার্থক্যের কথা। আরো একদিক থেকে 'অ্যাটিচ্যুড'-এর বিশিষ্টতা ছিল অবনীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের। ঐশ্বর্যমগ্ন,—তথা ঐশ্বর্যব্যাকুল এক আশ্চর্য উৎকণ্ঠা ছিল তাঁর চোখে-মুখে। পথে-ঘাটে, বাগানে, জনসমাগমের সর্বত্র হীরে খুঁজে খুঁজে বেড়াবার শিশু-সুলভ উদ্ভট বাতিক ছিল সারাজীবন।" কিন্তু রূপশিল্পীর অদ্ভুত 'খ্যাপামিও' তাঁর শিল্পি-চরিত্রের ব্যঞ্জনাবহ। লোভী নয়, ঐশ্বর্যমগ্ন এক অপরূপ রূপ-দৃষ্টি রয়েছে তার মূলে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি,—তার অতীত স্মৃতি শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের চোখে ছিল ষড়ৈশ্বর্যের যেন পীঠভূমি;—সেই ঐশ্বর্যমোহিত মন তাঁর শিল্পের রেখায় রেখায় উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে,—তুলি ও কলম দুয়েরই মুখে;—লেখার বেলায় সে ঐশ্বর্য বিচ্ছুরিত হয়েছে কথা নিয়ে অনায়াস-বিচিত্র খেলার ছন্দে! অত্যন্ত সাধারণ আটপৌরে শব্দ ও প্রবৃত্তি যেন নানা রঙের ফুলঝুরির ছিটিয়ে বেড়িয়েছে তাঁর ভাষায়। ছবির কথা কিছু বলেছেন শিল্পী নিজেই।

অনায়াস ঐশ্বর্যের সে অবিরাম বিস্তার আসলে আন্তরিক ঐশ্বর্য-সম্ভোগেরই সহজ প্রকাশ। রানী চন্দকে বলেছিলেন, (৩৭)—"কি সুখের স্থানই ছিল, কি সুখের হাওয়াই বইত ওইটুকখানি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। ......পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত সেসব সুখের দিন গেল। তার স্বাদ পাওনি কি ওই নামের ছবিতে আমার। প্রসাধনের বেলায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যে সুন্দর মুখ সব, যে ছবি সব সংগ্রহ করলে মন, আমার 'কনে সাজানো' ছবিখানিতে তার অনেকখানি পাবে।" ঐ মেয়েলি প্রসাধনের মত যত্নসাধিত, কিন্তু তারই মত অকৃত্রিম পরিমার্জনা আছে অবনীন্দ্রনাথের ভাষাশৈলীতে,—সে তাঁর ঐশ্বর্যমগ্ন অতলস্পর্শ মানসিকতারই সহজ প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, (৩৮) "আমি ধনের মধ্যে জন্মাই নি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।" আর অবনীন্দ্রনাথদের প্রসংগে মোহনলাল গংগোপাধ্যায় লিখেছেন, (৩৯)—"দাদামশায়দের তিন ভাই নিয়ে শুরু হয়েছিল এই জোড়াসাঁকো। তিন দাদামশায় আর তিন দিদিমা। তখন কেউ দাদামশায় আর দিদিমা হননি। সবে বাপ-মা হতে শুরু করেছেন হয়তো। ছ' জনের সংসার আর প্রকান্ড জমিদারী। মাথার উপরে মা। বিলাসী ছিলেন না কেউ। অমিতব্যয় কর্‌তে তিন ভাই-এর এক ভাইও জানতেন না।.... দান-ধ্যান ছিল। আশ্রিত ছিল অনেক।..... ঝর্ণার ধারার মতো জমিদারী থেকে যে টাকা এসে পৌঁছত, তাই দিয়েই খরচ মিটে যেত সমস্ত সংসারের এবং সমস্ত কর্মের।"—লক্ষ্য করতে হয় ৬নং জোড়াসাঁকোর বাড়ির জীবনযাত্রার আশ্রয়ও ছিল ঐ একই জমিদারি। রবীন্দ্র-জন্মের সাত বছর আগে গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর মহর্ষি ভায়েদের মধ্যে সম্পত্তির ভাগ করে দিয়েছিলেন, যদিও গোটা জমিদারির পরিচালনা তখনো চলেছিল এজমালিতে। তখনো পৈতৃক ঋণের অনেক অংশ অপরিশোধিত ছিল; ভায়েদের ব্যক্তিগত ঋণও যুক্ত হয়েছিল তার সংগে। তাহলেও গিরীন্দ্রনাথের দুই নাবালক পুত্র গোটা জমিদারির এক তৃতীয়াংশের অধিকারী হয়েছিলেন; চার বছর পরে অবিবাহিত নগেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর এক তৃতীয়াংশও দুইভাগে বিভক্ত হয়েছিল ৬ এবং ৫নং বাড়িতে! মহর্ষির সংসারে তখন জনতার হাট,—ছেলে, মেয়ে, বধূ, জামাতা,—তাঁদের ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রত্যেক দম্পতির পৃথক মহল। এই বিরাট সংসারের অপরিমাণ ব্যয় নির্বাহের একমাত্র ভরসা ছিল এজমালিতে পরিচালিত ঠাকুর-জমিদারির অর্ধাংশ। বাকি অর্ধাংশের আয় থেকে ৫নং বাড়িতে পরিচালিত হত অপেক্ষাকৃত ছোট সংবৃত গিরীন্দ্র-পরিবার। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে গুণেন্দ্রনাথের তিনপুত্র গগনেন্দ্র-সমরেন্দ্র-অবনীন্দ্র সাবালক হয়ে ওঠার পর জমিদারি পরিচালনার দায়িত্বও মহর্ষি পৃথক করে দিয়েছিলেন। মোহনলালের বিবৃতিতে হয়ত তারই ইংগিত রয়েছে। কিন্তু অবনীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের উদ্ভাবন তো জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁর শৈশবস্মৃতি ও অভিজ্ঞতার মূলে প্রোথিত।

রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার সংগে তার পারিবেশগত পার্থক্য ছিল না খুব। বিরাট সংসারচক্রের রথযাত্রার প্রাচুর্যপূর্ণ বিবৃতি, এমন কি মেয়ে মহলে দুপুরবেলা চুড়িওয়ালির আবির্ভাব কিংবা ছাত্তের মহলে মার মেয়েলি আসর আর আচার রোদে দেবার কাহিনী কিছুই বাদ পড়ে নি কবির 'ছেলেবেলা'র স্মৃতি থেকে। কিন্তু মনে এর কিছুই দাগ কেটে বসে নি; যা বসেছিল অক্ষয় অক্ষরে লেখা হয়ে, সে হল,—(৪০) দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রূপার রেকাবিতে বেলফুলের গোড়ে মালা ভিজে রুমালে, পিরিচে এক গ্লাস বরফ দেওয়া জল আর বাটাতে ছাঁচি পান।

'বৌঠাকরুন গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা, বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়া সুরের গান। গলায় যেটুকু সুর দিয়েছিলেন বিধাতা তখনও তা ফিরিয়ে নেন নি। সূর্যডোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত আমার গান। হুহু করে দক্ষিণে বাতাস উঠত দূর সমুদ্র থেকে, তারায় তারায় যেত আকাশ ভরে।'

—এ অনুভব কেবল অনির্বচনীয় নয়, বস্তুত্তীর্ণ! অবনীন্দ্রনাথ বস্তুর ঐশ্বর্য-মূর্তির মধ্যে সুন্দরকে অধিকার করতে চেয়েছেন মুঠো ভরে। তাঁর সৃষ্টিতেও তাই শিশুর বিস্ময় আর রমণীয় ঐশ্বর্যাবেশ। কিন্তু সে শিশুধর্ম ছিল প্রৌঢ় প্রজ্ঞার গুহা-নিঃসারিত, রমণীয়তার উৎসে ছিল অধ্যবসায় পরিশীলিত বলিষ্ঠ দীপ্তি। এর সবটুকুই কিন্তু অলৌকিক প্রতিভার দান নয়,—বহুলাংশে শিল্পীর আয়াস-সাধ্য প্রস্তুতির ফলও। অবনীন্দ্রনাথের বাণী ও ব্যক্তিত্ব এমন আপন-

ভোলা, এবং দৈনিক, হয়ত প্রাকৃত, যে তাঁর প্রতিভাকে অশিক্ষিতপটু বলে ভ্রম করার আশংকা কিছু কম নেই। কিন্তু অধ্যয়নে তাঁর আগ্রহ এবং প্রয়াস ছিল নিরবধি; রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি ছিলেন বহুলাংশে আত্ম-শিক্ষিত। নর্মাল স্কুলের বিদ্যাভ্যাস অল্পেই শেষ হয়েছিল,—কিন্তু পিতার মৃত্যুর পরে অভিভাবকেরা আবার তাঁকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দেন, সেখানে একটানা দশ বছর পড়াশোনা করেন (১৮৮১—৯০)। তার-ও পরে ইংরেজি পড়তে তিনি সেন্ট জেবিয়ার্স কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। অন্য পক্ষে সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময়ে সরস্বতী সম্পর্কে একটি চিত্রও এ'কেছিলেন। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরীক্ষা না দিলেও এন্ট্রান্স মান পর্যন্ত অধ্যয়ন তিনি সাঙ্গ করেছিলেন; তাছাড়া সংস্কৃতে তাঁর অধিকারও জন্মেছিল প্রচুর। পরবর্তী জীবনে সে অভ্যাস তো ছিলই, তাছাড়া নানা বিষয়ে অধ্যয়নে মগ্নতা দেখা দেয়,— বলা বাহুল্য পাঠ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি, সবই ছিল। শেষ বয়সে তাঁর অধ্যয়নের একটা খসড়া ধরে দিয়েছেন ছেলে-মেয়ে দুজনে—অতি সংক্ষিপ্ত হলেও অধ্যয়ন মাধ্যমে অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-পরিণতির আভাস তার থেকে অনুমান করাই চলে কেবল। উমা দেবী জানিয়েছেন, (৪১)—'বাবার নিজের ছিল সংগৃহীত বহু প্রাচীন গ্রন্থ, সংস্কৃত পুঁথি, ইংরাজি সাহিত্য প্রভৃতি।' অলোকেন্দ্রনাথের সাক্ষ্য (৪২) 'ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ শাস্ত্র, শিল্প, ইতিহাস আর শিশুসাহিত্য পড়তেন, তাছাড়া হুগো, বালজাক, স্কট, ডিকেন্সের উপন্যাসগুলিও পড়তেন। মার্ক টোয়েন-এর বই তাঁর বড় প্রিয় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের বই, পুরাতন পুঁথি আর সংস্কৃত কাব্যও পড়তেন। বই পড়া ছিল তাঁর একটা বিলাস।' কেবল 'বিলাস' নয় অধ্যয়ন অবনীন্দ্রনাথের পক্ষে তপস্যাও ছিল বহুলাংশে,—এ দাবি করা যেতে পারে উদ্ধৃত তথ্যের নজির থেকেই। কেবল পুরাতন গ্রন্থরাজিই নয় সংস্কৃত প্রাচীন পুঁথি সম্পর্কেও তাঁর সজীব আগ্রহ ছিল;—এসব নৈষ্ঠিক বিদ্যানুরাগের নিশ্চিত স্বাক্ষর। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বই ছিল এমন, যাতে করে তপস্যার কাঠিন্যও বিলাসের ঐশ্বর্যদীপ্ত উপভোগে উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

অলোকেন্দ্রনাথই বলেছেন,— (৪২)—'বই পড়ে তার মধ্যে একেবারে ডুবে যেতেন।' সেই ডুবে যাবার একটা উদাহরণ, (৪৩) রবীন্দ্রনাথ একবার যুরোপ ভ্রমণ থেকে ফিরে 'অবন'কে অনুযোগের সুরেই বললেন, সারা য়ুরোপ জুড়ে ওর কত ভক্ত; নিজের শিল্প-রচনার সিদ্ধির জন্যেও তাঁর ঐসব দেশ ঘুরে আসা উচিত। বিশেষ করে প্যারিসের 'ল্যাটিনকোয়ার্টার' প্রভৃতি দেখে আসা নিতান্তই প্রয়োজন। তখন নাকি অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গড়গড়ায় নলে খুব খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—আমি শিল্পী, মানসচক্ষে সব দেখতে পাই ঐ ধোঁয়ার মধ্যে। হুগো আর বালজাক যখন পড়েই নিয়েছি, তখন আর নিজের চোখে প্যারিস দেখার দরকার হবে না। তুমি আমাকে বল, আমি হুবহু ল্যাটিন কোয়ার্টারের ছবি এ'কে দিচ্ছি।'—

—এমনই ছিল শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের মানস-প্রবণতা। অধীত বিদ্যাকেও তিনি মনের মুঠো ভরে অধিগত করে নিতেন,—তখন সে তাঁর নিজস্ব সম্পদ। যেমন তাজমহল না দেখে তাজমহল আঁকবার রসদ মনে জোগাড় করেছিলেন বই পড়ে এবং ছবি দেখে নিশ্চয়। কিন্তু সে দেখা এবং পড়াকে এমন করে হাত করে নিলেন,—অনায়াসে দেখা দিল তাজমহলের শিল্পরূপ;—সন্দেহ করবার অবকাশ রইল না যে, এ শিল্পী মনের প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল নয়। ঐখানেই ছিল তাঁর ঐশ্বর্য-স্বপ্নবিলাসী মনের যথার্থ সম্পদ; জ্ঞানকে মনোলীন করে আপন করে নিয়েছেন,—সেই জ্ঞান অধীত বিদ্যা কিংবা অভিজ্ঞতা যা-কিছুরই ফল হোক। তারপর তাকে নিয়ে দুই হাতে রূপের ফুলঝুরি খেলেছেন রেখায়, লেখায়,—মনে হয়, সর্বকিছু যেন তাঁর অশিক্ষিত-পটু মনের একান্ত মরসুমী ফসল।

সর্বকিছু মিলে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল এক অতলস্পর্শ গভীরতা,—যার উপরিভাগ নিস্তরঙ্গ। গভীর জ্ঞানের বোঝা তলানি হয়ে পড়ে থাকে মনের গহনে,—বাইরে বিচ্ছুরিত হয় ভারহীন দৈশিকতার নিরাবরণ স্বচ্ছ-প্রকাশ উপলব্ধির অতলস্পর্শতা রূপ ধরে শিশুর বিস্ময় আর বিশ্বাসপ্রবণতায়; বিশ্ব-রূপরস-জিজ্ঞাসু পরিশীলিত মনের সাথে রমণীয় মমতা ও রুক্ষধর্মী অপরিমার্জিত সহজ। 'প্রাকৃত' মনস্কতার ছদ্মবেশে আশ্চর্য রহস্যজ্যোতি বিস্তারিত করতে থাকে। আপাত-বিপরীতের ব্যঞ্জনা-বাহী সেই রহস্যরশ্মি অবনীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের মূলে থেকে তাঁর অজস্র শিল্প কর্মে ছড়িয়ে পড়ে রূপকথার মোহ-মাধুরী রচনা করেছে ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল পাঠকের মনে। সেই খানেই তার সৌন্দর্যলোকের গোপন উৎস;—সৃষ্টির অবরোধে সেই রস-উৎসার ধীর অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে।

নির্দেশপঞ্জী

1. "What a painter thinks and what he writes has at all times been of interest not only to artists but to the public at large. We hope to find in his writings the secret of his endeavours or the rejections of his restlessness; we wish to penetrate into his life". — Andreu Karpels — An Introduction to Abanindranath Tagore's Sadanga. Viswa Bharati Quarterly, May 1942. P. 45

২ দ্রষ্টব্য :— রবীন্দ্রনাথ, 'আত্মপরিচয়' রবীন্দ্র রচনাবলী ২৭ পৃঃ ২৩৯।

3. O. C Ganguly—Abanindranath Tagore : An Impromptu Portrait— V. B. Qly. May 1942. P102.

৪। দ্রষ্টব্য :— ওসি গাঙ্গুলি 'ভারত শিল্প ও আমার কথা'—পৃঃ ১৪৫। ৫। রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'—রবীন্দ্র রচনাবলী ১৯—পৃঃ ৭৮। ৬। অবনীন্দ্রনাথ—বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী—পৃঃ ১১২। ৭। তদেব—পৃঃ ১১৩। ৮। দ্রষ্টব্য : অবনীন্দ্রনাথ ও রাণী-চন্দ—'ঘরোয়া'—পৃঃ ৩। ৯। অসিত হালদার —'অবনীন্দ্রনাথ' (প্রবন্ধ)—দ্রষ্টব্য কানাই সামন্ত সম্পাদিত 'চিত্রদর্শন'—পৃঃ ১৩২। ১০। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

A Chronology of Abanindranath's Paintings. V. B. Qly May 1942 P123.

১১। দ্রষ্টব্য : অবনীন্দ্রনাথ ও রাণীচন্দ—'জোড়াসাঁকোর ধারে'—পৃঃ ৭১। ১২। দ্রষ্টব্য : প্রবোধেন্দু ঠাকুর—'অবনীন্দ্র-চরিতম্' পৃঃ ৭৩। ১২(ক)। দ্রষ্টব্য : মুকুল দে :

Abanindranath Tagore : A Survey of the Master's Life & Works: V. B. Qly. May 1942 P32

১৩। দ্রষ্টব্য :— মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়—'দক্ষিণের বারান্দা'—পৃঃ ১৫৪। ১৪। অবনীন্দ্রনাথ ও রাণীচন্দ—'জোড়াসাঁকোর ধারে'—পৃঃ ৪৬। ১৫। তদেব—পৃঃ ৮০-৮১। ১৬। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : ভূদেব চৌধুরী—'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' ১ম পর্ব, প্রথম অধ্যায়। পৃঃ—৭—২২। ১৭। অবনীন্দ্রনাথ—'আপন কথা'—পৃঃ ৫৭। ১৮। দ্রষ্টব্য :—

Mukul Dey — Abanindranath Tagore : A Survey of the Master's Life & Works. Visva Bharati Quarterly—P29-30.

১৯। দ্রষ্টব্য :—অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর' :—পৃঃ ১২। ২০। অবনীন্দ্রনাথ ও রাণীচন্দ—'জোড়াসাঁকোর ধারে'—পৃঃ ৫২। ২১। তদেব—পৃঃ ৪৯। ২২। দ্রষ্টব্য :— প্রবোধেন্দু ঠাকুর—'অবনীন্দ্রচরিতম'— পৃঃ ৪৬। ২৩। দ্রষ্টব্য :— মৈত্রেয়ী দেবী—'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' পৃঃ ৯৮। ২৪—২৬। উমা দেবী 'বাবার কথা'—পৃঃ ৪৯, ৩৪—৩৫,। ২৭। স্ত্রী সৌদামিনী দেবীকে অবনীন্দ্রনাথ ঐ নামে উল্লেখ করতেন। ২৮। অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর'—পৃঃ ৩৫। ২৯। রবীন্দ্রনাথ—'চিঠিপত্র', ৯ম—পৃঃ ৩৬। ৩০। তদেব—পৃঃ ৩৭৭। ৩১। অবনীন্দ্রনাথ ও রাণীচন্দ—'জোড়াসাঁকোর ধারে'—পৃঃ ১২৮। ৩২। রবীন্দ্রনাথ—'পঞ্চভূত'—পৃঃ রবীন্দ্র রচনাবলী ২য়— পৃঃ ৫৭৭। ৩৩। অবনীন্দ্রনাথ ও রাণীচন্দ—'জোড়াসাঁকোর ধারে'—পৃঃ ১৮—১৯। ৩৪। প্রবোধেন্দু ঠাকুর—'অবনীন্দ্র-চরিতম্' পৃঃ ৭৩। ৩৫। দ্রষ্টব্য :— তদেব—পৃঃ ৫৯। ৩৬। অবনীন্দ্রনাথ ও রাণীচন্দ—'জোড়াসাঁকোর ধারে'—পৃঃ ১৯—২০। ৩৭। তদেব—পৃঃ ৪৭, ৫৪। ৩৮। রবীন্দ্রনাথ—'অবতরণিকা'— রবীন্দ্র রচনাবলী, ১। পৃঃ ৯/ ৩৯। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় — 'দক্ষিণের বারান্দা'— পৃঃ ১৪০—১৪২। ৪০। রবীন্দ্রনাথ—'ছেলেবেলা' রবীন্দ্র রচনাবলী ২৬—পৃঃ ৬১। ৪১। উমা দেবী—'বাবার কথা'—পৃঃ ৪২। ৪২। অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর'—পৃঃ ৩৪—৩৫। ৪৩। দ্রষ্টব্য :— তদেব—পৃঃ ৩১।

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কাছের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘকাল শিল্পগুরু আচার্য অবনীন্দ্রনাথের প্রতিবেশী হিসাবে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন. কাছের মানুষ অবনীন্দ্রনাথে পাওয়া যাবে অবনীন্দ্রনাথের শেষজীবনের অনেক অন্তরঙ্গ কাহিনী। প্রতিদিনের যে আলাপাচার দিনপঞ্জীতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন লেখক—তা 'অমৃতে' ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে।

তখন দ্বিতীয় মহাসমর সারা ইউরোপ খণ্ডে দোর্দণ্ডবেগে চলছে, যার ফলে সারা দুনিয়ায় একটা বিরাট ঝড় উঠেছে। সে-ঝড় একাধারে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক। প্রাচীন চিন্তাধারার বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে। সে ঝড় ভারতবর্ষের মাটিতেও বইছে। সারা বিশ্বে সামাজিক, অর্থনৈতিক বিপ্লব শুরু হয়েছে। প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার ঘুণধরা কাঠামো ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। দ্রব্য-মূল্য মহার্ঘ হওয়ায় পুরুষের রোজগারে সংসার চলা হয়েছে দুষ্কর; তাই বহুদিনের প্রাচীন সংস্কার কাটিয়ে মেয়েরাও চলেছে চাকরী করতে; ছেলেরা চলেছে যুদ্ধে যোগ দিতে,—নতুন নতুন কলকারখানায় যোগ দিতে। তার জন্য তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি, নতুন নতুন বিমানবন্দর, অজস্র ঘরবাড়ি। তৈরি হচ্ছে নরঘাতী আয়ুধসম্ভার। ঠিকেদারেরা নানা ফন্দিতে অজস্র টাকা লুটছে। প্রচুর টাকা জমা হচ্ছে কালোবাজারী পথে। সমাজের নৈতিক মানদণ্ড নেমে গেছে অনেক নীচে। প্রজারা জমিদারের খাজনা দেয় না, কিন্তু সরকার তার প্রাপ্য কর তো জমিদারের কাছে ছাড়ে না। দায়দায়িত্ব সব রয়েছে, তবে তা সুষ্ঠুভাবে পালন করার রসদ ক্ষীণ হয়ে আসায় কিছুই সম্ভব হচ্ছে না। জমিদার-বাড়ির চিরাচরিত প্রথা তো হঠাৎ একদিনে বন্ধ হবার নয়। তাই বাইরের চাকচিক্য বজায় রাখতে বনেদী অচলায়তন একেবারে অন্তঃসারশূন্য ও ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। প্রাচীনকাল হতে রক্তশোষক বেতালের মত যাঁরা জমিদারের অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন, তাঁদের কেমন করে আজ ব্যর্থ নমস্কারে আত্মনির্ভর হওয়ার উপদেশ দিয়ে বিদায় দেওয়া যায়? দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের পাঁচ নম্বর বাড়ির মানুষ যাঁরা, যে-বাড়ির পুরুষদের দীর্ঘ সময় কেটেছে দক্ষিণের প্রশস্ত বারান্দায় ব'সে শিল্প, নাট্য ও সাহিত্যের সাধনায়, তাঁদের কিনা ডাক এল শতাধিক বর্ষের স্মৃতিবিজড়িত এই পিতৃপুরুষের প্রাচীন বাড়ি ছাড়ার। ঋণের দায়ে তাঁরা বুঝেছিলেন যে, বাড়িটাকে আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। এদিকে বাড়ির প্রতিটি ইঁটের সঙ্গে তাঁরা মায়ার বাঁধনে জড়িত; এই পিতৃকুলের অনন্ত স্মৃতি-বিজড়িত অট্টালিকা ছেড়ে যেতে হবে। তাঁরা জানতেন 'যেতে নাহি দিব' বললেও একে আটকানো যাবে না। তাঁরা আরও জানতেন আপন গরজে বিক্রী করলে তার যথার্থ মূল্যও পাওয়া যাবে না। তাই তাঁরা কালাতিপাত করে সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। এই বাড়িটার উপর অবনীন্দ্রনাথের কত যে মায়া, কত যে মমতা ছিল, তা তাঁর শৈশব স্মৃতির রোমন্থনে কিছুটা জানা যায়। 'বাড়ির দক্ষিণ জুড়ে ফুলবাগান, পুকুর, গাছপালা, মেহেদির বেড়াঘেরা সবুজ চত্বর। সেদিকে প্রকৃতির সৌন্দর্যসুষমা ও কল্পনা। চাঁদ ওঠে সেদিকে, সূর্য ওঠে সেদিকে, মস্ত বটগাছের আড়াল দিয়ে। পুকুরের জলে পড়ে দিনরাত আলোছায়ার মায়া। দুপুরে ওড়ে প্রজাপতি, ঝোপে ডাকে ঘুঘু, আর কাঠঠোকরা থেকে থেকে। ময়ূর বেড়ায় পাখনা মেলিয়ে, রাজহাঁস দেয় সাঁতার, ফোয়ারাতে জল ছোটে সকাল-বিকেল। সারস ধরে নাচ বাদলার দিনে, ঝড়-বাতাসে নারকেল গাছের সারি দোল খায়। গরমের দিনে দুপুরে চিল স্থির ডানা মেলিয়ে ভেসে ঝিম সুরে ডাক দিয়ে ঘুরে ঘুরে ক্রমেই ওঠে ওপরে। পায়রা থেকে থেকে ঝাঁক বেঁধে বাড়ির ছাদে উড়ে উড়ে বেড়ায়। কাক উড়িয়ে নেয় শুকনো ডাল মাটি থেকে গাছের আগায়। সন্ধ্যায় ওঠে নীল আকাশের তারা। রাতে ডাকে পাপিয়া, কত দূর থেকে কোকিল তার জবাব দেয় পিউ পিউ, কিউ কিউ। আবার শেয়ালও ডাকে রাতে, ব্যাঙও বলে বর্ষায়। বেজীও বেড়ায়, খেঁড়ালও বেরোয় থেকে থেকে শিকার সন্ধানে। একটা একটা নেড়ি-কুত্তা, সেও ফাঁক বুঝে হঠাৎ ঢোকে বাগানে চারিদিক দেখে নিয়ে হুট্ করে সরেও পড়ে রবাহূত গোছের ভাব দেখিয়ে। বেশী রাত না হলে দক্ষিণের ঝিলমিল-দেওয়া জানলাকটা পুরোপুরি খোলা ছিল তখন বেদস্তুর। ঐ দিকটা বন্ধ রাখা প্রথা হয়ে গিয়েছিলো কতটা দায়ে পড়েও। এ-বাড়িটা বৈঠকখানা হিসেবে তৈরী করা—এটাকে আমাদের বসতবাড়ি হিসাবে করে নিতে এখানে ওখানে নানা পর্দা দিতে হয়েছে, না হ'লে ঘরের আব্রু থাকে না। বৈঠকখানায় বাস করতে হবে মেয়েছেলে নিয়ে সেটাও একটা দুর্ভাবনা জাগিয়েছিলো নিশ্চয়ই; তাই কতকগুলো পর্দা ঝিলমিল ও চলাফেরার নিয়ম দিয়ে বাড়ির কতক অংশ, পুরোনো বাড়ি ছেড়ে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গেই, অন্দর হিসেবে দেওয়াল ঝিলমিল ইত্যাদি দিয়ে ঘিরে নিতে হয়েছিলো আব্রুর জন্যও বটে, বাসঘরের অকুলানের জন্যও বটে। এবং সেই পর্দা দেওয়াল ইত্যাদি ওঠার সঙ্গে কতকগুলি জানলা বন্ধ দরজা বন্ধ নিয়মও সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো আপনা হতেই। বহির্জগতের খিড়কি দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখার মত ছবি-গুলো। মানুষ, মুরগী, হাঁস, গাড়িঘোড়া, সহিস, কোচম্যান, ছিরু মেথর, নন্দ ফরাস, গোবিন্দ খোঁড়া, বুড়ো জমাদার, ভিস্তি, মুটে, উড়ে বেহারা, গোমোস্তা, মুহুরী, চৌকিদার, ডাক-পেয়াদা—সবাইকে দিয়ে মস্ত একটা যাত্রা চলছে এই উত্তরের আঙিনাটায়।' এ এক মহা আড়ম্বর পর্বের অন্তিমযাত্রা শুরু হয়েছিলো কবে তা বলা সুকঠিন। কিন্তু শেষ আঘাত হানলো যে দ্বিতীয় মহাসমর অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বহুদিন থেকে এই বাড়ি বিক্রীর নানা জল্পনা-কল্পনা চলছিল। হিতৈষীদের উপদেশে ও ভবিষ্যতে আসন্ন শুভদিন এবং স্থাবর সম্পত্তির উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধির

আশায় বাড়ি বিক্রীর বিষয়টি বিলম্বিত হচ্ছিল। অবনীন্দ্র-ভ্রাতারা মনে মনে আশা ও যুগপৎ পরিকল্পনা রাখতেন যে, এই বড় বাড়ি বিক্রীয় এমন দাম পাওয়া যাবে যে সেই দামে অতীতের সকল চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে যুক্ত পারিবারিক দেনা শোধ হয়ে তিন ভায়ের তিনখানা মনোমত পৃথক বাড়িও হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে তিন ভায়ের তিনখানা নতুন বাড়ির জন্য প্রস্তুতি ও নক্সা রচনার ভার নিয়েছিলেন শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ নিজে। একরকম নক্সা আঁকা হোল, যেখানে বসার ঘর, শোবার ঘর, স্নানের ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, খাবার ঘর, লাইব্রেরী ঘর প্রভৃতি সব দেখানো। তার নিত্য রদবদলও কাগজের ওপর নিরন্তর চলতে লাগলো নব-নব লীলায়। আখেরে সব রয়ে গেল সেই পরিকল্পনার স্তরে। ১৯৩৮ সালে গগনেন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে নতুন বাড়ির স্বপ্ন কোন্ দিক দিয়ে ভেঙে ভেসে গেল কেউ জানলো না। সারা সংসারে এসে নামল বিষাদের এক করাল ছায়া। অন্য ভায়েরা মৃত্যু-পথিকের পদধ্বনি শুনতে পেলেন আর সেই সঙ্গে হল নব-নব নক্সার পরিকল্পনার নিত্যনতুন অনুশীলনের ইতি। নক্সা অঙ্কের উপর পড়লো কালো যবনিকা। ভবিষ্যৎ কালে অবনীন্দ্রনাথ বাড়ির বিষয়ে আমার সঙ্গে কিছু জল্পনা-কল্পনা করেছিলেন তা পরে যথাস্থানে বলা হবে। বিশ্ব-মহাযুদ্ধ মাথায় নিয়ে পিতৃপুরুষের ভিটে সাথের জোড়াসাঁকোর ঐতিহ্যমণ্ডিত বাড়ি ছেড়ে সপরিবারে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে উঠে এলেন ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে দক্ষিণের থাম ও রেলিং দেওয়া পৈত্রিক বাসভবনের অনুরূপ 'গুপ্তনিবাসের' বাগানবাড়িতে। ফেলে-আসা স্মৃতির অচলায়তনের অনুরূপ বাড়িতে এসে অতীত স্মৃতির রোমন্থনের এক উপযুক্ত পরিবেশ পেলেন বাংলার প্রখ্যাত সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী ও বর্তমানের বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ। তাঁর শিষ্যরা হলেন অসিতকুমার হালদার, নন্দলাল বসু, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রভৃতি খ্যাতিমান শিল্পীরা। পলাশীর যুদ্ধের সাতাশ বছর বাদে কুশারী বংশের নীলমণি ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পাশের খালি জমিতে তাঁর পৌত্র প্রিন্স দোয়ারকানাথ টেগোর (দ্বারকানাথ ঠাকুর) বিরাট বৈঠকখানা বাড়ি তুলেছিলেন। এটিই হল দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের পাঁচ নম্বর বাড়ি। দ্বারকানাথের তৃতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী যোগমায়া দেবী বৈঠকখানা বাড়িতে উঠে যান। গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র গুণেন্দ্রনাথের ভাগে এ-বাড়ি পড়ায় তাঁর তিন পুত্র গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের ভাগে এ-বাড়িটি উত্তরাধিকার সূত্রে আসে। গুণেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র গণেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান ছিলেন। অতএব বাড়ির মালিকানা অবনীন্দ্রনাথের তিন ভ্রাতার।

সি এফ এণ্ডরুজ । অবনীন্দ্রনাথ অংকিত
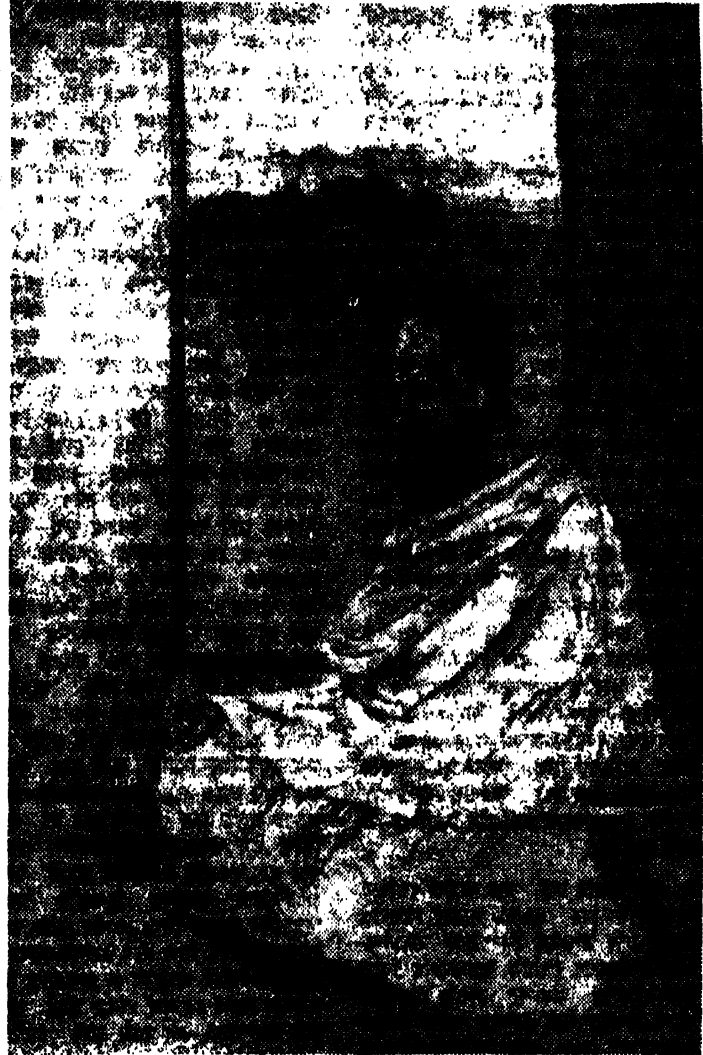
সেই বাড়ি বর্তমানে বিক্রী হওয়ায় মাড়োয়ারী ক্রেতা বিরাট বাড়ির ইঁট, কাঠ, পাথর, রাবিশ, জানলা, দরজা, পাইপ, টালি, কড়ি, বরগা ভেঙে নিয়ে যায়। এমনি করেই অতীতেও মাটিতে-পড়ে-থাকা প্রাচীন অশোকস্তম্ভ ভেঙে বাড়ি তৈরীর মালমসলারূপে ব্যবহার করতে নিয়ে গিয়েছিল স্বার্থপর মানুষ। সেই শিল্পকলার স্মৃতি-বিজড়িত বহু দেশী-বিদেশী বিশিষ্ট শিল্পীর পদরজঃপূত প্রশস্ত দক্ষিণের বারান্দা কলকাতার মাটি থেকে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। চেক্ মাতবো শ্রীমতী মিলাডা গাঙ্গুলী প্রাচীন ঐতিহ্যের বিরাট বিকাশ ক্ষেত্রকে কিছুটা আলোকচিত্রে আবদ্ধ করে রেখেছেন অবনীন্দ্রনাথের লেখা 'আপন কথা' গ্রন্থখানির চিত্রাবলীতে। যাঁরা এই প্রাচীন দক্ষিণের বারান্দাকে শিল্পে সাহিত্যে ও রূপে প্রোজ্জ্বল করে রাখতেন, ঠাকুর বংশের বোধহয় কেউই আজ আর ইহলোকে নেই। গগনেন্দ্রনাথ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন এই বাড়িতে। সমরেন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন গৃহহারা হয়ে। অমরধামে চলে গেলেন অবনীন্দ্রনাথ 'গুপ্ত নিবাসের' ভাড়া বাড়িতে। নেই সুহাসিনী দেবী, নেই জামাতা মণিলাল, এমনকি দৌহিত্র মোহনলালও নেই। আছেন অবনীন্দ্রনাথের তিন পুত্র অলোকেন্দ্র, তরুণেন্দ্র, মনীন্দ্রনাথেরা তিনজনে। ঠাকুর বংশের প্রাচীন ইতিহাস বিমণ্ডিত কুলাচারপূত দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের পাঁচ নম্বর বাড়ি আর নেই। জাতীয় সরকারের প্রচেষ্টায় ঠাকুর বংশের মূল বাড়িটি যেখানে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বসবাস করে গেছেন, সেটি মাড়োয়ারী ক্রেতাদের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে সংস্কৃতিবান মানুষ ও সরকারের চেষ্টায় রক্ষা পেয়েছে। এখন সেখানে রবীন্দ্র-

ভারতী' বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে এটি জাতির পরম গৌরবের বস্তু। স্ট্যাটফোর্ডে মহাকবি শেক্সপীয়ারের বাড়ি শেকস-পীয়ারের জীবিতকালে যেমনটি ছিল, ঠিক তেমনটি করে বাঁচিয়ে রাখার প্রবল প্রচেষ্টা আজও দ্বিগুণ উৎসাহে চলছে। জার্মানীতে মহাকবি 'গ্যেটের' যে-বাড়ি বিগত মহাযুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, সেটিও আবার ঠিক তেমনটি করে গড়ে তোলা হয়েছে। যে-রকম কাঠ দিয়ে মেঝে তৈরী হয়েছিল সেই রকমের কাঠ ব্যবহার করা হয়েছিল। মানুষ চলার সময় কাঠের পাটাতনের উপর জুতোশুদ্ধ পা পড়লে যে-রকম মচ্‌মচ্‌ আওয়াজ হোত, সে-রকম আওয়াজ যাতে হয়, তারও পুনরাবৃত্তি করার আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে ও তাতে তারা সমর্থও হয়েছে। পুরোন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আকৃতির যথার্থ পুনর্বিন্যাস সফলতা লাভ করেছে। আমাদের স্বাধীন দেশে বিশ্বকবির বাসস্থান ধ্বংসের মুখ থেকে দৈবে রক্ষা পেয়েছে। বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের প্রচুর প্রচেষ্টায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপ চ্যাটার্জি লেনের বাসা-বাড়িটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে এসেছে সত্য, কিন্তু সেই ভগ্ন অট্টালিকা আজও ভগ্নাবস্থায়। তার কোন বিহিত আজও হয়নি, জাতীয় সরকারের সহানুভূতি ও সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে হয়তো শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের সাধনাক্ষেত্র এমনি-ভাবে ধূলিসাৎ হয়ে যেতো না, স্মরণীয় হয়ে বেঁচে থাকতো। 'যন্নষ্টং তন্নদীয়তে' যা চলে গেছে তাকে আর তো ফিরে পাওয়া যাবে না।

জন্মস্থানের কত শত স্মৃতি-বিজড়িত আকর্ষণ কাটিয়ে ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্র-নাথ সপরিবারে পৈত্রিক বাসভবনের অনুরূপে দক্ষিণের বারান্দা দেওয়া বরানগরে *'গুপ্ত নিবাসে' উঠে এলেন। গুপ্ত নিবাস' কামারহাটী পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত এক বিরাট বাগানবাড়ি। এটি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ও ম্যাগাজিন রোডের সংযোগস্থলে উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এই ম্যাগাজিন রোড বর্তমানে ডক্‌টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড বা আর এন টেগোর রোড নামে* ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড থেকে বেরিয়ে পশ্চিম মুখে গঙ্গার ধারে পর্যন্ত চলে গেছে। গঙ্গার ধারে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক প্রাচীন বাড়িতে ইংরেজের গোলাবারুদ রাখা হ'ত। সেই গোলা-বারুদের ম্যাগাজিনের বাড়িগুলো ও সংলগ্ন ভূখন্ড নিয়ে 'ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া ম্যাচ কোম্পানীর' বিরাট দেশলাই প্রস্তুতের বৃহত্তম কারখানা গড়ে উঠেছে। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড যেখানে ক্যালকাটা কর্ড রেলের 'বরাহনগর রোড' স্টেশনের গা দিয়ে উত্তর মুখে 'ডানলপ টায়ারস্‌' লেখা রেলের সেতুর তলা দিয়ে পার হলেই পশ্চিমমুখো রাস্তা ছিল ম্যাগাজিন রোড। একদিন এই রাস্তা ছিল বরাহনগর ও কামারহাটি পৌর এলাকার সীমারেখা। যুদ্ধের সময় গঙ্গার ধারের ম্যাগাজিন রোড লোপ করে গড়ে উঠলো 'উদ বিমানবন্দরের' মেরামতি কার-খানা। এবং কতকগুলি বিমান প্রতীক্ষার স্থান। বর্তমানে তা সামরিক ঘাঁটি। অনেকটা জায়গায় তিন স্তর ইঁট বিছিয়ে তার উপর পিচ ঢেলে চওড়া 'রাণওয়ে' করা হয়। এই ম্যাগাজিন রোডের পাশে নদীর ধারে বরাহনগর কামারহাটীর যৌথ জল কলের গঙ্গা জল পাম্প করার স্ক্রু পাইলের উপর মোটর ও পাম্প বসান জেটি। বিরাট 'গুপ্ত নিবাসের' (বিখ্যাত ম্যালেরিয়ার ডি, গুপ্তর টনিক বিক্রেতা ডি, গুপ্তদের বাগানবাড়ি) ঠিক পশ্চিমে রায়বাহাদুর প্রসন্ন বাঁড়ুজ্জের বাগান। কলকাতার ইডেন গার্ডেনের অনুকরণে এক বিরাট ফল-ফুলে ভরা বাগান অতি যত্নে ও নিরলস চেষ্টায় তিনি গড়ে তোলেন। সেখানে ঝিল কেটে নানা পাতাবাহারের গাছ সাজিয়ে ওখানে নানা রকমের গাছে ভর্তি করা হয়। যুদ্ধের হিড়িকে সেই বাগান ভেঙ্গে চুড়ে তৈরী হয়েছিল এ, কে, সরকারের পেট্রোল ড্রাম মেরামতের কারখানা ও পটারী। তারই ঠিক পশ্চিম গায়ে বিরাট জমি নিয়ে বরাহ-নগর কামারহাটী পৌর প্রতিষ্ঠানের যৌথ জল কল। ক্যালকাটা কর্ড রেলের বাঁধ তৈরী করতে যে বিরাট মাটি লেগেছিল সেই মাটি যে দুটি বিস্তৃত জায়গা থেকে গভীর করে কেটে বিরাট দুটি হ্রদের মত করা হয়। সেই বিরাট দুটি হ্রদে বর্ষায় জল নদী থেকে ধরে রেখে গরমের সময় গঙ্গার নোনা জল পাম্প করে না তুলে মিষ্টি জল জমিয়ে রাখার বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ম্যাগাজিন রোডে পৌর প্রতিষ্ঠানের বহুদিন বিজলীর আলো আসেনি। রাতের বেলা এখানে লোক চলা-চলের ব্যাপারই ছিল না। ওয়াগন-ভাঙ্গা ও খুনে ডাকাতের আড্‌ডা ও যাতায়াত ছিল *এই সব জায়গায়। কত মানুষ মেরে রেখে দিত এর জলে, এর মাঠে, রেল লাইনের উপরে, রেলের সেতুর তলায়। জল কলের এই বৃহৎ হ্রদের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে রেলের লাইন আগরপাড়া স্টেশন থেকে বরাহনগর চটকলে।*

এই বাগানবাড়ির দুটি গেট ছিল। একটি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে ঢোকার অপরটি ম্যাগাজিন রোড দিয়ে। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে ঢুকলেই বাঁদিকে পড়বে দারোয়ানের ছোট্ট একটি ঘর। পশ্চিম মুখে একটু খানি ঢুকলেই রাস্তা দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে, পুকুরের দু পাড় দিয়ে এসে মিশেছে দোতলা বাড়ির সামনে। নীচু ধাপের সিঁড়ি বেয়ে কোলাপসিবল্‌ গেট দিয়ে বিরাট চওড়া বারান্দায় আসা যায়। বারান্দায় ডানদিকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। উত্তর দিকে রাস্তা দিয়ে পৃথক রান্না বাড়িতে ঢোকা যায়। পুকুরের পশ্চিম পারে সান বাঁধানো ঘাট ও ঘাটের ধারে হেলান দিয়ে বসার চাতাল। ঘাটের উত্তর দিকে মাজা-ভাঙা প্রাচীন চাঁপা গাছ। মূল বাড়ির দক্ষিণে বিরাট খোলা জায়গা। আগে সেখানে গোলাপ, বেল, ও নানা মৌসুমী ফুলগাছ ছিল। দক্ষিণের গেট দিয়ে ঢুকলেই গেটের পাশে আর একখানা ছোট ঘর। সেটি 'শিল্পাচার্যের' স্টুডিও হিসাবে ব্যবহৃত হত। মূল বাড়িটার পশ্চিমে বিরাট ফলের বাগান সেটি পৃথক করে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হয়েছে যাতে স্পষ্ট করে বোঝা যায় যে সেই অঞ্চলটি এ বাড়ির ভাড়ার আওতার মধ্যে নয়। সেটি ডি, গুপ্তদের নিজস্ব অধিকারে। দক্ষিণের বারান্দার সামনে পাঁচিল দেওয়া বাগান। তার পাশ দিয়ে প্রাচীন ম্যাগাজিন রোডের খোয়ার রাস্তা যা সংস্কারের অভাবে বন্ধুর সেই রাস্তা পার হ'লে উঁচু রেলের মাটির বাঁধ 'বরাহনগর রোড স্টেশন' থেকে দক্ষিণেশ্বরের দিকে চলে গেছে। এই বাগানবাড়িতেই অবনীন্দ্রনাথ আসার আগে ভাড়া ছিলেন সংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌ অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ অর্থাৎ রাণী মহলানবীশের স্বামী অর্থাৎ প্রখ্যাত অধ্যক্ষ ব্রহ্মচূড়ামণি নীতিবাগীশ হেরম্ব মৈত্রের জামাতা। এই হেরম্ব মৈত্র ছিলেন সিটি কলেজের অধ্যক্ষ ও ইংরাজী সাহিত্যের এক প্রখ্যাত লেখক। তাঁর সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, কোন এক যুবক রাস্তায় তাঁকে দেখতে পেয়ে ষ্টার থিয়েটার যাবার পথ কোন দিকে জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—জানি, কিন্তু বলব না। যেহেতু কলকাতার লোক তাঁরা, হাতী বাগানের মোড়ে স্টার থিয়েটারের অবস্থিতি তাঁর জানা আছে অতএব এ সত্য তিনি গোপন করতে পারবেন না। আবার সেখানে যাবার পথের নিশানা জানিয়ে দিলে সেখানে থিয়েটার দেখে যদি ঐ যুবক গিয়ে নীতিভ্রষ্ট হয় তার নৈতিক দায়িত্বও তিনি নিতে পারেন না। তাই তিনি তাকে পথের নির্দেশ বলে দেবেন না। এ হেন নীতি-বাগীশ হেরম্বর মৈত্রের পুত্র অশোক মৈত্র একসময় রেজিষ্ট্রি করা বিবাহিত সহ-ধর্মিনী রূপে অভিনেত্রী শ্রীমতী কাননবালা। *মাঝে মাঝে শ্রীমতী রাণী মহলানবীশের অতিথি হয়ে আসতেন এই বাগান-বাড়িতে। এমনতর উদার হৃদয় ছিল মহলা-নবীশ পরিবারের। আবার এই বাড়িতে মাঝে মাঝে অতিথি হয়ে আসতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এখানের ফাঁকা জায়গায় স্থান ও বায়ু পরিবর্তনে বিশ্বকবির স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হোত। 'শ্যামলী' কাব্য গ্রন্থটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী রাণী মহলানবীশের নামে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ* পত্রের বর্ণনা যে এই বাগানবাড়িরই তা অতি সুস্পষ্ট।

ইঁট কাঠে গড়া নীরস খাঁচার থেকে
আকাশ বিলাসী চিত্তেরে মোর এনেছিলে
তুমি ডেকে শ্যামল শুশ্রূষার
নারিকেল বন পবন বীজিত নিকুঞ্জ
আঙিনায়।
শরৎ লক্ষ্মী কনকমাল্যে জড়ায়
মেঘের বেণী
নীলাম্বরের পটে আঁকা ছবি সুপারী
গাছের শ্রেণী
দক্ষিণ ধারে পুকুরের ঘাটে বাঁকা যে
কোমর-ভাঙ্গা

লিলি গাছ দিয়ে ঢাকা তার ঢালু ডাঙ্গা।
জামরুল গাছে ঝরে অজস্র ফুল
হরণ করেছে সরু বালিকার হাজার
কানের দুল।
লতানে যূথিকা বিতানে মৌমাছিরা
ফিরিতেছে ঘুরাফিরা
পুকুরের তটে—তটে।
মধুছন্দা রজনীগন্ধা সুগন্ধ তার রটে।
ম্যাগ্‌নোলিয়ার শিথিল পাপড়ি খসে খসে
পড়ে যায়
ঘরের পিছন হতে বাতাবি ফুলের
খবর আসে।
একসার মোটা পাথাভারী পাম
ঊর্ধ্বত মাথা তোলা
রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছে যেন বিলিতি
পাহারা ওলা।

বসি ঘরে বাতায়নে—
কলাম শাকের পার দেখা যায়
পুকুরের এক কোণে।
বিকেল বেলার আলো
জলে রেখা কাটে সবুজ সোনালি কালো।
ঝিলিমিলি করে আলোছায়া চুপে চুপে
চলতি হাওয়ার পায়ের চিহ্ন রূপে
জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে—
আমের শাখায় আঁটি ধেয়ে যায়
সোনার রসের আশে
লিচু ভরে যায় ফলে
বাদুড়ের সাথে দিনে আর রাতে
অতিথির ভাগ চলে
বেড়ার ওপারে মৌসুমি ফুলে
রঙের স্বপ্ন বোনা
চেয়ে দেখে দেখে জানলার নাম
রেখেছি 'নেত্রকোনা'।

রবীন্দ্রনাথ বহুবার এসেছেন এই বাগানে। বরাহনগর পৌর এলাকায় ব্যারাকপুর ট্রাংক রোডের উপর স্ট্যাটিসটিকাল ইন্সটিটিউটের নতুন বাড়ি হওয়ায় 'গুপ্ত নিবাস' ছেড়ে অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ নতুন বাড়িতে উঠে গেলেন। সেই সময় খালি বাগানবাড়ির খোঁজে 'গুপ্ত নিবাস' পছন্দ হওয়ায় লীজ নিয়ে এলেন আপন নীড়ভ্রষ্ট শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ এই বাড়িতে। বাগানবাড়িগুলি আগেকার দিনে ধনী সুবর্ণ বণিক ও অন্যান্য ধনী পরিবারের অধিকারে ছিল। ভাড়া দেওয়ার তখন কায়দা ছিল না। কলকাতার ধনী সম্প্রদায় বিলাসব্যসনে ও সপ্তাহান্তে দিন রাত্রি স্ফূর্তিতে কাটাবার জন্য স্ব স্ব কুলাচার পুষ্ট বেষ্টনী ছেড়ে মুক্ত বিহঙ্গমের মত এখানে রাত কাটিয়ে যেতেন। তখনকার দিনে বাগানবাড়িতে আসতো বাজিয়ে, বাইজী, মদ ও মিত্রেরা। নানা উদ্দেশ্য সিদ্ধি নিয়ে নানা প্রকারের জনসমাগম হোত। এই সব বাগানবাড়ি দ্বিতীয় মহাসমরে সামরিক ও অসামরিক প্রতিরক্ষার কাজে, কখনও উপদপ্তর হিসাবে, কখনও বিকল্প হাসপাতালরূপে কাজে লাগানো হোল। দ্রব্যমূল্যের মহার্ঘতার ও বংশবৃদ্ধির চাপে অর্থনৈতিক অবস্থার অবলম্বন হওয়ায় বিরাট বাগানবাড়ির ধনী মালিকরা বাগানবাড়িগুলির উপায়ান্তর না দেখে ভাড়া দিতে শুরু করলেন। যেখানে লোকেরা বসবাস করছিল সেখান থেকে সরানো তাঁদের শক্ত, যদিও তখন বৃটিশ শাসন দোর্দণ্ড প্রতাপে চলছে। সবার মনে এই বাড়িটি ধরে গেল কেননা এখানেও সেই খোলামেলা জায়গা, পুকুর, বাগান ও আবার দক্ষিণের বারান্দা। খোলা বাগান, বাগান পার হ'য়ে রাস্তা ও রেলের বাঁধ। গেটের পাশে গোয়ালারা বিকল্প গোয়াল খুলেছে। সেখানে গরু-মোষের দুধ সামনে দুইয়ে দেওয়া হয়।

দোতলায় দক্ষিণের বারান্দায় পুরোতন পাঁচ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের দক্ষিণের বারান্দার শোভা বিবর্ধক বিশেষ আকৃতির ইজিচেয়ার সারি সারি এখানেও পাতা হ'ল। চওড়া বারান্দার এধারে ওধারে শান্তিনিকেতনী মোড়া। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেই ডান দিকের ঘরটি সস্ত্রীক অবনীন্দ্রনাথ থাকতেন। ছেলেরা অন্যানা ঘর দখল করলেন। যুদ্ধের সময় ঠিকমত নাপিত পাওয়া না যাওয়ায় তিনি দাড়ি রাখলেন। অসুখ-বিসুখ হলে আসতো আলমবাজারের কানাই ডাক্তার (ডাক্তার কানাইলাল পাল)। কতদিন কত অপরাহ্নে এসে বসেছি পুকুরের ধারে কোমর ভাঙ্গা বৃদ্ধ চাঁপা গাছটার তলায়, সান বাঁধানো ঘাটে, নয় দোতলার ডেক্ চেয়ার পাতা দক্ষিণের খোলা বারান্দায়। কত রকম যে কথাবার্তা চলতো তার শেষ নেই। কত স্নেহ যে করতেন আমাদের পরিবারের সবাইকে তা আজ পঁচিশ বছর বাদেও অম্লান হয়ে আছে। অতীত স্মৃতির রোমন্থনে পুরোনো পরিবেশ স্মরণে মন আনন্দে ভরে ওঠে।

প্রথম পরিচয়

১৯৩০ সালের স্কটিশ চার্চেস কলেজের অর্থনীতির ছাত্রদের বার্ষিক সম্মেলনীর উৎসব উপলক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে আসেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ভোসেদের বাড়ীর সুন্দরী ও বিনীতা ছাত্রীদের ও কর্মকর্তাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও বিশেষ উদ্যমে এ অভিলাষ চরিতার্থ হয়। তাঁর সঙ্গে এলেন অন্যান্য মান্যগণ্য অতিথিবৃন্দ। ডক্টর আর্কাট সাহেব তখন স্কটিশ চার্চেস কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি ও অন্যান্য অধ্যাপক ও কর্মী ছাত্রছাত্রীরা প্রধান অতিথি ও অন্যান্য আমন্ত্রিতদের আহ্বান জানাবার জন্য কলেজের দরজায় অপেক্ষা করছিলেন। বিশ্বকবি সপারিষদ তাঁর তসরের চিরন্তনী আলখাল্লার মত পরিচ্ছদে আবৃত হয়ে উপস্থিত হলেন কলেজের সম্মুখে। তাঁকে সমাদরে নিয়ে যাওয়া হল প্রধান অতিথির আসনে। অনুগামী বরেণ্যরাও এসে সম্মুখের আসনে উপবেশন করলেন। তার মধ্যে ছিলেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথও। 'প্রার্থনা হলে' তিলধারণের স্থান ছিল না। অধ্যাপক ও ছাত্রীছাত্র বসার আসন পূর্ণ এ দুধারে বারান্দায় ঠেসাঠেসি করে ছাত্র-ছাত্রীরা সম্মানীয় অতিথিবৃন্দকে দেখতে ব্যস্ত। রবীন্দ্রনাথকে তারের বাঁধা রক্ত গোলাপের শক্ত মালা পরিয়ে দিল তরুণী এক ছাত্রী। রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে উদ্বোধন গান গাওয়া হল। পরে রিপোর্ট পাঠ, রবীন্দ্রনাথের কবিতার সুমধুর আবৃত্তি প্রভৃতি চললো কিছু সময়। একজন ছাত্রী বিনা যন্ত্রসঙ্গীতের সহযোগে খালি গলায় অপূর্ব গান শোনালেন। আজ আমার আর তাঁদের নাম মনে নেই। কিন্তু কানে সে সুরের রেশ আজও বাজে। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথও সেই সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন।

বিশ্বকবি তাঁর ছোট বক্তৃতায় প্রথমেই রক্ত গোলাপের মালার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন—এই যে রক্ত গোলাপের কঠিন মালা এ পরতে গেলেও বাজে আর খুলতে গেলেও লাগে। এ মালা কবরের উপর রেখে দিয়ে আসার মালা। এ জীবন্ত মানুষের গলার ভূষণ নয়। সম্মিলনের মিলন মালা হওয়া উচিত সাদা ফুলের মালা যা বেল, চামেলি, কুন্দ, যুঁই ও রজনীগন্ধার গুচ্ছ মালা। তা গলায় নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকে। আর যন্ত্রসংগীত বিহীন গায়িকার শুদ্ধ গলায় রবীন্দ্রসংগীতের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আজকাল গায়ক-গায়িকার কণ্ঠ ছাপিয়ে যন্ত্রসঙ্গীতের আবহ সুরারোপ করা এক রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। এ শুধু অবাঞ্ছনীয় নয়, অমার্জনীয় প্রভৃতি।

অবনীন্দ্রনাথকেও বক্তৃতা দিতে বলা হল। ছেলেরা নাছোড়বান্দা। তিনি বলেন—আমি সামান্য শিল্পী আমার আবার অর্থনীতির উপর ভাষণ দিতে বলা লজ্জা দেওয়ারই নামান্তর। যাই হোক তাঁর অতি ঘরোয়া চলতি ভাষায় অর্থনীতির মূলতত্ত্বগুলি সরসভাবে বলে গেলেন। তিনি বললেন 'তেলা মাথায় সবাই তেল দেয়। অর্থাৎ যেখানে অর্থ আছে সেখানেই বেশী অর্থ জমা হয়। এই রকম রসাল স্বল্পস্থায়ী বক্তৃতায় সেদিন সকলেই আনন্দিত হয়েছিল।

এবার সভার আনুষ্ঠানিক পর্বের শেষে ছেলে-মেয়েদের অটোগ্রাফের খাতায় মাননীয় অতিথিদের নাম সই করানোর পালা। সেখানে তরুণী তরুণদের বেজায় ভিড়। অটোগ্রাফের খাতা এগিয়ে দিলেই তিনি নামটি সই দিচ্ছেন। তাছাড়া উপায়ও ছিল না। অনেকে সই পেয়েই খুসী। এক-একজন নাছোড়বান্দা। কিছুতেই ছাড়বে না, কিছু না কিছু বাণী লিখে দিতেই হবে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'বাণী লেখার লোক ঐখানে।' তবু তারা ছাড়বে না। অগত্যা তাঁর সইয়ের উপরে লিখে দিলেন 'তোমারই'। 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর' লিখে সই করা আগে থেকেই আছে। কেউ বললে আর একটু লিখে দিন।

অবনীন্দ্রনাথ মৃদুহাস্যে বললেন 'আমি যখন তোমারই হয়ে গেলাম, তখন এর চাইতে আর বড় বাণী কিছু আছে?'

সেদিনের সেই বরেণ্য অতিথিবৃন্দের সান্নিধ্য ও স্মৃতি আজও স্মরণপটে অমলিন আছে। জীবনে কত ঘটনা ঘটে

গেছে। কত মননীয় মানুষের সান্নিধ্য ও স্নেহ লাভের সুযোগ পেয়েছি কিন্তু সেই কলেজের দিনের এ মধুর স্মৃতি আজও আমার মনের পটে চির উজ্জ্বল হয়ে আছে।

শিক্ষা পর্বের অবসানে কর্মব্যপদেশে আমায় কলিকাতার উপকণ্ঠে এক নতুন জলকলে কাজ নিতে হয়। তখন বরানগর পৌরপ্রধান ছিলেন পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শশাঙ্ক চক্রবর্তী অবনীন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্রের সহপাঠী ছিলেন। শশাঙ্কবাবু আমাদের বিশেষ বন্ধু স্থানীয়।

একদিন সকালে শশাঙ্কবাবু আমায় টেলিফোনে বললেন,—শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ আপনার প্রতিবেশী।

ঠিক বুঝতে পারলাম না. এখানে কাছে পিঠে তো কোন বাড়ী নেই, যাই হক তাকে আমি উল্টে প্রশ্ন করলাম—

—কোন বাড়ীতে এসেছেন তিনি?

—ঐ ডি গুপ্তদের বাগানে, যেখানে আগে অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশ থাকতেন। তাঁরা নিজেদের বাড়ী ক'রে উঠে গেছেন। ও'রা সেই খালি বাড়ীতে এলেন।

—তাই নাকি? যাব একদিন দেখা করতে।

—নিশ্চয় যাবেন। দেখা ক'রে খুসীই হবেন।

—আমার যেতে হ'ল না দেখা করতে। তিনিই পরের দিন সকালে দুই নাতির হাত ধ'রে জলকলের ঝিলের ধারে বেড়াতে এলেন। হেঁটে হেঁটে চলে এলেন আমার কোয়ার্টারের সামনে।

তাঁর দীর্ঘ চেহারা, পায়ে কটকী চটি, পরণে লুঙ্গি, হাতে লাঠি, গায়ে আলখাল্লা দেখে বুঝতে কোনই অসুবিধে হ'ল না ইনিই সেই শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ। তাঁর চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করে আমার পরিচয় দিলাম।

তিনি পিঠে হাত দিয়ে বললেন, আপনার কথাই তো শশাঙ্ক বলছিল।

—ঠিক কথা। শশাঙ্ক চক্রবর্তীও আমায় টেলিফোনে আপনি যে আমাদের পাড়ায় এসেছেন, সেকথা বললো।

রোদ উঠে যাওয়ায় তিনি আর সেদিন আমাদের বাসায় এলেন না, পরে একদিন আসবেন বলে গেলেন, কথায় কথায় চারজনে পায়ে পায়ে পুবের দিকে তাঁর বাসার দিকে অনিকদুর গিয়ে বিদায় নিয়ে বললাম—

—একদিন আমাদের বাসায় আসতে হবে।

—নিশ্চয়ই যাব।

বংশ পরিচয়

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বংশের সেই শাখার যাঁরা ব্রাহ্ম হননি এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'আদি ব্রাহ্ম সমাজের গণ্ডিভুক্তও হননি। সেদিন চিৎপুর রোডের (বর্তমানে যার নাম রবীন্দ্রসরণি, উপর আদি ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনা মন্দিরটির দৈন্যদশা ও শোচনীয় অবস্থা দেখে মর্মাহত হলাম। বর্তমানে সেখানে বেলেপাথর ও মারবেল ব্যবসায়ীর গুদোম ঘর। ভেতরে অন্ধকার, ধুলো ও স্যাঁৎসেঁতে, বাইরেও জীর্ণ বৃদ্ধ জরাগ্রস্তের দৃশ্য। তবে বংশ-তালিকা থেকে দেখা যায় যে ঠাকুর বংশের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সন্তান-সন্ততিদের বিবাহাদি করণ-কারণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মদের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হ'ত। ধর্মান্তরিত না হ'য়ে গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশধরেরা অত্যন্ত প্রগতিশীল ও প্রাচীন সংস্কারমুক্ত ছিলেন। ওরা ব্রাহ্ম না হ'লে কি হয়, ব্রাহ্ম পরিবারের তো ওরাও একজন। পাড়াগাঁয়ের মত ওদের বাড়ী খাবো না, ওদের ছায়া মাড়াবো না, ইত্যাদি পুরোতন ছুঁৎমার্গের কবল মুক্ত ছিলেন। শহরে নিজেদের মধ্যে এসব অধিক ক্ষেত্রে অচল। ক্রিয়াকর্মে নিমন্ত্রণে যাতায়াত সবকিছু করণ-কারণে দুই বাড়ীর যাতায়াত ছিল, কোনখানে কোন ত্রুটি ছিল না। বাইরের লোকেরা সহজে বুঝতে পারবে না কোন অংশ ব্রাহ্ম ও কোন অংশ অব্রাহ্ম। এখানে নীলমণি ঠাকুরের আমল থেকে অবনীন্দ্রনাথের সন্তান-সন্ততির বংশলতিকা সংযুক্ত করা হ'ল।

রবীন্দ্রনাথের মত অবনীন্দ্রনাথও পরিচিত জনের নানা রকম নাম দিতেন। তিনি নিজের ছেলের মজার মজার নাম দিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের তিন পুত্র—অলোকেন্দ্র, তরুণেন্দ্র ও মানীন্দ্রনাথ। তরুণেন্দ্রের ডাক-নাম 'কোকো' মানীন্দ্রের 'টোটো'। একজন হয়তো কোকো খেতে ভালবাসত, অন্যজন টোটো ক'রে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসতো। আমারও তিনি একটি নাম দিয়েছিলেন—'জীবনদাতা'। যেহেতু আমি জলকলের কর্মী তাই 'জল' অর্থে 'জীবন'। যে জল দেয় সে হ'ল—জীবনদাতা।

জ্যেষ্ঠ পুত্র অলোকেন্দ্র বিবাহ করেন নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী পারুল দেবীকে। পারুল যৌবনে যে সুন্দরী ছিলেন, তা তাঁর প্রৌঢ়ত্বেও প্রকাশ পায়। তিনি সর্ববিষয়ে সুশিক্ষিতা, সুগৃহিনী, মার্জিতরুচি ও প্রিয়ভাষিণী ছিলেন তা তাঁর আপন করা আত্মিক টানে আজও আমরা মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হই।

অলোকেন্দ্রনাথের দুই পুত্র—অমিতেন্দ্র ও সুমিতেন্দ্র অর্থাৎ বীরু ও বাদশা। বীরু ১৯৩৪ সালে শান্তিনিকেতনের চীনা ভবনে চীনা ভাষা শিক্ষা করেন ও ১৯৪৭ সাল থেকে সেখানে তিন বছর অধ্যাপনা করেন। ভারত সরকারের সামরিক শিক্ষায়-তনে দেরাদুন ও পুণার শিক্ষকতা করেন ও পরে কিছুকাল পিকিংয়েও বসবাস করেন। সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে তিনি পেন-সিলভেনিয়া বিদ্যালয়ে ও পরে ওকল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তারও একটি মাত্র পুত্র। বীরুর সহধর্মিনী অধুনালুপ্ত প্রখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'কথাশিল্পে'র সুযোগ্যা সম্পাদিকা বীণা চক্রবর্তীর কন্যা। বাদশার বিবাহ হয় মোহনলাল ঘোষালের কন্যার সঙ্গে। এরও একমাত্র পুত্র। বাদশা এখন মাঝারি শিল্প-ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছে। অলোকেন্দ্রনাথের মধ্যে যে শিল্পীমন ছিল তার কিছু প্রয়োগ করেন নানারকম ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে—যেমন নল কূপের স্ট্রেণার, পেতলের কব্জা প্রভৃতি। অলোকেন্দ্রনাথের শিল্প-খ্যাতির সঙ্গে সাহিত্য খ্যাতিও বর্তমান। তাঁর বাটিকের কাজ দুই দশক আগে গুণীমনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর চিত্রকলার এত সাধারণ প্রদর্শনীও হয়।

মধ্যম পুত্র তরুণেনাথের বিবাহ হয় বিলেতে থাকাকালে এক ইংরেজ মহিলার সঙ্গে। অবনীন্দ্রনাথের সহধর্মিনীর মৃত্যুর পর ইংরেজ পুত্রবধু এবাড়ীতে প্রবেশের অধিকার পান। তাঁর অন্তরে অপত্য স্নেহের ফল্গুধারা ছিল নিত্য-প্রবাহিত। সংসারে অশান্তি আনার ভয়ে তিনি মনোবেদনা দমন করেছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের মধ্যম কন্যা করুণা দেবীর সঙ্গে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। অল্প বয়সে প্রখ্যাত সাহিত্যিক মণিলালের মৃত্যু হওয়ায় বিধবা করুণাদেবী দুই শিশু পুত্র নিয়ে পিতৃগৃহে আসেন। এই দুই দৌহিত্রের নাম হ'ল খ্যাতনামা সাহিত্যিক মোহনলাল ও তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শোভনলাল। মোহনলাল বিলেতে থাকার সময় লণ্ডনে এক চেক মহিলার সঙ্গে পরিচয় ও পরে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। এঁর নাম মিলাডা গাঙ্গুলি। এদেরও একটি পুত্র ও একটি কন্যা, মিতু ও সামি—অমিতেন্দু ও ঊর্মিলা।

এই গুপ্ত-নিবাসে অবনীন্দ্রনাথের সহ-ধর্মিনী দেহ রক্ষা করেন। এখানে বীরুর বিবাহ হয়। অবনীন্দ্রনাথও দেহত্যাগ করেন এই বাগানবাড়ীতে। মরদেহ ভস্মীভূত করা হয় আলমবাজারের শ্মশানঘাটে। বরাহনগর পৌর প্রতিষ্ঠান থেকে শেষকৃত্যের স্থানে মর্মর ফলক স্থাপন করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কিছুকাল পরে তিন পুত্র পৃথকভাবে বসবাস সুরু করেন। অলোকেন্দ্রনাথ যখন একলাই এই বাগানে থাকতেন সেই সময় একটা ডাকাতির চেষ্টা হয়। তারপর তিনি ঐ বাড়ী ছেড়ে মানিক-তলার কাছে তাঁর এক বন্ধুর ভাড়াবাড়ীতে উঠে যান। সেখান থেকে কয়েক বছর পরে ভি, আই পি রাস্তার প্রায় ওপরে মাণিক-তলা মেন রাস্তার কাছে নিজস্ব বাসভবন নির্মাণ করান।

বর্তমানে সেই 'গুপ্তনিবাস' ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট ভাড়া নিয়েছেন নীচের তলায় পুবের অংশে মোহনলাল ইনস্টিটিউটের কর্মী হিসেবে ভাড়া থাকতেন। দোতলায় ডক্টর দাস তাঁর বিদেশী পত্নী ও শিশু সন্তান নিয়ে বসবাস করেন।

(ক্রমশঃ)

রাধার চিত্র দর্শন-বিশাখা দেখায় আনি। অবনীন্দ্রনাথ অংকিত

শতবর্ষের আলোয় অবনীন্দ্রনাথ

সুধা বসু

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ। বঙ্গভূমি বাঙালীর ভাববন্যার তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ। সেই তরঙ্গায়িত ভাবপ্রবাহে বাঙালীর জীবনক্ষেত্র উর্বরা ও পরিপুষ্ট হয়েছিল নানাদিকে। অতঃপর বাংলাদেশে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের ফলশ্রুতি যখন সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে নবচেতনা সঞ্চার করে চলছিল তখন চিত্রকলার রাজ্যেও একটি নব অরুণোদয়ের পূর্বাভাস লক্ষিত হোল। বাংলাদেশে জাতীয় চেতনা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর পাঁচ নম্বর আবাসে চিত্রকলার মুক্তিযজ্ঞের হোতা অবনীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হলেন আজ থেকে শত বর্ষ আগে একটি শুভ দিনে।

দিনটি বাংলা ১২৭৮ সাল, ২৩শে শ্রাবণ, জন্মাষ্টমীর পুণ্য তিথি (ইং ৭ই আগষ্ট, ১৮৭১)। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র গিরীন্দ্রনাথ। তাঁর পৌত্র অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথের পিতা গুণেন্দ্রনাথও ছিলেন চিত্রশিল্পী। নানা কারুকলা ও সংগীতে ছিল তাঁর প্রবল অনুরাগ। বাড়ীর সমগ্র পরিবেশই ছিল সৌন্দর্য সাধনার বিশেষ অনুকূল। শিশু অবনীন্দ্রনাথ সেই সুন্দর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ঘুরে ফিরে, দেখেশুনে তাঁর সহজাত কৌতূহল ও সৌন্দর্যবোধকে পরিপুষ্ট করার অপূর্ব সুযোগ পেয়েছিলেন।

ঠাকুর বাড়ীর সাধারণ নিয়মে তিনিও দাস দাসীর আওতায় মানুষ হন। তাদের সংগ সান্নিধ্যও অবনীন্দ্রনাথের কল্পনা-প্রবণ মনের যথেষ্ট খোরাক জুগিয়েছিল। বিদ্যালয়ের মামুলী শিক্ষানীতির বাঁধা নিয়মে তিনি বেশীদিন আবদ্ধ থাকতে পারেননি। একদিন ইংরেজী শিক্ষকের বেত্রাঘাতের চরম চিহ্ন পিঠে ধারণ করে বালক অবনীন্দ্রনাথ চিরদিনের মত চলে এলেন নর্ম্যাল স্কুল ত্যাগ করে। কিন্তু সেখানে তিনি তাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্যানুভূতির যে চমৎকার প্রেরণা অনুভব করেছিলেন তা জীবনের শেষ বেলাতেও বিস্মৃত হননি। তার পরে সংস্কৃত কলেজের স্কুলে পড়ার সময়ও তিনি চিত্রাঙ্কন শেখার কিছু সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলেন। তবে সেখানেও তিনি সাধারণ শিক্ষার শেষ সীমানা অতিক্রম করতে পারেননি।

অতঃপর গৃহশিক্ষকের কাছে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পাঠ কিছুদিন চলেছিল; আর সেই সংগে চলতো ছবি আঁকা ও স্কেচ করার পালা। বাড়ীর আসবাব, পোষা পশুপাখী, উৎসব আনন্দ ও সৌখীন ক্রিয়া-কলাপ, বাগানের গাছপালা ও রৌদ্র ছায়ার খেলা—সব কিছুর মধ্যেই তিনি শিল্পানুভূতিকে পুষ্ট করার অপূর্ব সুযোগ পেতেন।

বালক অবনীন্দ্রনাথের কল্পকৌতূহল মেটাবার শ্রেষ্ঠ উপায় হয়েছিল-তাঁর ছোট পিসিমার ঘরটি। সেখানে ছিল নানা পৌরাণিক আখ্যানের চিত্রাবলি ও কৃষ্ণনগরের অদ্ভুত সুন্দর সব পুতুল ও প্রতিমা। আর একটু বড় হয়ে অবনীন্দ্রনাথ পিতার কানুগড়ের বাগান বাড়ীতে গিয়ে আপনমনে ছবি ও স্কেচ করে যেতেন। কুঁড়েঘর গাছপালা ও পশুপাখীর, তার গঙ্গানদীর বুকে ভাসমান নৌকার। বাল্য-কৈশোরের সেই বাগান বাড়ীতে আঁকা ছবি ও স্কেচ এবং [illegible] তাঁর ভাবী শিল্পী জীবনকে নানাভাবে করেছিল অনুপ্রাণিত ও পরিপুষ্ট।

আপনমনে ও নিজের খেয়ালে ছবি এঁকে এঁকে সতের বছরে উপনীত হলেন অবনীন্দ্রনাথ। সেই সময় তাঁর পিতার অকাল বিয়োগের ফলে বাড়ীতে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। তাও তাঁর ভাবুক মনকে আন্দোলিত করেছিল প্রবলভাবে। তখন তাঁর মা তাঁকে বিয়ে দিলেন। আর তিনিও পড়াশুনায় সম্পূর্ণ ছেদ টেনে ছবি আঁকা ও গানবাজনায় বিভোর হয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। কিন্তু রীতিমত চিত্রবিদ্যা শিক্ষার তখনও কোন সুব্যবস্থা হয়নি। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন যে তাঁর পিতা-মাতার কিছুমাত্র ইচ্ছা চেষ্টা ছিল না যে তাঁদের কনিষ্ঠপুত্র আর্টিস্ট হন।

এমতাবস্থায় কিছুদিন যেতে অবনীন্দ্রনাথের মেজ জ্যেঠাইমা (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী) তাঁর চিত্রাঙ্কন শেখার রীতিমত ব্যবস্থা করে দিলেন পরপর দুজন ইউরোপীয় শিক্ষকের কাছে। তাঁরা হলেন মিঃ গিলার্ডি ও মিঃ পামার। এতদিনের ভাবালুতার জীবন ছেড়ে অবনীন্দ্রনাথ প্রবেশ করলেন অতি বাস্তব এক জীবন সাধনার পথে। বিদেশী শিক্ষকের কাছে পাশ্চাত্ত্যের

বাস্তববাদী প্রথাতে চিত্রাঙ্কনের শিক্ষায় তিনি অতি দ্রুত সাফল্যের শিখরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। শেষোক্ত শিক্ষকের ছাত্রপত্র পেয়ে তিনি পুরোদস্তুর একজন নিসর্গ চিত্রের শিল্পী ও পোর্ট্রেট পেইন্টার রূপে হলেন আত্মপ্রতিষ্ঠ। আত্মীয় বন্ধু সকলের প্রতিকৃতি অঙ্কন করলেন প্যাস্টেলে। মুঙ্গেরে গিয়ে ঘুরে ঘুরে কত বিচিত্র দৃশ্যপট করলেন রচনা। তবু 'ভরিল না চিত্ত'। কি যেন এক অপ্রাপ্তি ও অজানার বেদনা-ব্যথায় মন তাঁর পীড়িত হয়ে চললো।

এমন সময়ে হঠাৎ এল পরিবর্তনের পালা। প্রপিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লাইব্রেরীতে পেয়ে গেলেন মুঘল যুগের সুচিত্রিত একটি পাণ্ডুলিপি পুঁথি। সেই চিত্রনিচয়ের কারুকলা ও বর্ণ বাহার দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন; আর কিভাবে তাকে আয়ত্ব করা যায় সেই চিন্তায় হলেন বিভোর। তার পরে হাতে এল একখানি পার্শিয়ান ছবির বই। এর আগে হিন্দুমেলাতেও তিনি দিল্লীর কিছু মিনিয়েচার ছবি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাও তাঁর মনকে খুব নাড়া দিয়েছিল। এবারে পশ্চাত্য প্রথার রঙ্-তুলি সরিয়ে রেখে ভারতের মধ্যযুগীয় চিত্রশৈলীর রস-রহস্য উদ্ধার করবার চেষ্টায় হলেন রত। কিন্তু সমস্যা হোল আঁকবেন কি?

সে সমস্যার সমাধান করলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি বললেন বৈষ্ণব পদাবলী নিয়ে ছবি হোক্। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশেই অবনীন্দ্রনাথ কবির চিত্রাঙ্গদা কাব্য এবং বধূ ও বিম্ববতীর চিত্র এঁকেছিলেন রেখার রূপে-ছন্দে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্ন প্রয়াণেরও কয়েকটি ছবি করেছিলেন অতি চমৎকার। কিন্তু এসবই ছিল সেই বিদেশী প্রথায় শিক্ষার ফলশ্রুতি।

রবি-কার নির্দেশে ভাইপো অবন রূপ দিলেন বৈষ্ণবকবিতার শুক্লাভিসারকে।। দেশী মতে ছবি হোল। নতুন পথ ও পন্থা হোল নির্ণীত। কিন্তু শিল্পীর মন তৃপ্ত হোল না একেবারেই। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন, যেন শীতের রাত্তিরে মেম সাহেবকে শাড়ী পরিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ বিদেশী রীতির শিক্ষার প্রভাব তখনও চলছিল পুরোদমে। তাহলেও অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু হাল ছাড়েননি।

আবার শুরু করলেন কৃষ্ণলীলার নতুন চিত্ররচনার কাজ। এবারে পথ খুঁজে পেলেন। তার মধ্যে ছবিতে সোনা লাগানোর পদ্ধতি আয়ত্ব করে নিয়েছিলেন। কুড়ি খানি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ছবি হয়ে গেল কয়েক দিনের মধ্যে। এই চিত্রগুচ্ছে তাঁর নতুন আংগিক রীতি ও রূপ রচনায় কিছু দুর্বলতা ও ত্রুটি পরিলক্ষিত হলেও তা আধুনিক চিত্রকলার ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিল নিঃসন্দেহে।

এই ঘটনা ১৮৯৫ সালের। কৃষ্ণলীলার ছবি এঁকে এবারেও তাঁর মন পুরো পরিতৃপ্ত হয়নি। ভক্তিমানের হৃদয়ে সাড়া জাগাতে পারেননি এবং রসিকের বিচারে তা রসোত্তীর্ণ হয়নি। সুতরাং আবার পথ খোঁজার পালা চললো অবিরত। অবনীন্দ্রনাথ সংকল্প গ্রহণ করলেন 'দেশীমতে ছবি আঁকতে হবে'। তিনি তাঁর আদি শিক্ষা, অর্থাৎ পাশ্চাত্য রীতির সঙ্গে দেশীয় প্রথা-পদ্ধতির মিলন ঘটিয়ে, গ্রহণ বর্জনের ভিত্তিতে নিজের মতে ও স্বকীয় পন্থায় নতুন সৃষ্টির সাধনায় হলেন নিমগ্ন। কোন একটি নির্দিষ্ট ভাব-ভাবনা ও করণ কৌশলে আবদ্ধ না থেকে তিনি নানা নবনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে লাগলেন চিত্র পটে। ক্রমশঃ যেমন প্রকরণ পদ্ধতির বৈচিত্র্য দেখা গেল, তেমনি এল কত শত ভাব-ভাবনা ও বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব। এই সময়কার কথা প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"তখন কি আর ছবির জন্য ভাবি, চোখ বুজলেই ছবি দেখতে পাই—তার রূপ, তার রেখা, মায় প্রত্যেক রঙের শেড পর্যন্ত......।"

বিদেশী ধারায় শিক্ষার ভিত্তি ও দেশের মধ্যযুগীয় চিত্রের প্রেরণা নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ রেখার সৌকুমার্যে, রঙের মনোহারিত্বে ও রূপের অভিনবত্বে গড়ে তুললেন এক অভূতপূর্ব ও একান্ত স্বকীয় শিল্পরাজ্য। একটির পর একটি ছবি তৈরী হোল সেই নবকল্পিত রঙ-এ ও রেখায়। বিষয়বস্তু সংগৃহীত হোল পৌরাণিক আখ্যান, বুদ্ধজীবন কথা ও কালিদাসের কাব্যসমূহ থেকে। সেই প্রথম প্রচেষ্টা ও পরীক্ষাকালের সৃষ্টি গুলির মধ্যে কয়েকটি নিদর্শন চিরকালের শ্রেষ্ঠ রচনার পর্যায়ভুক্ত হয়ে আছে। তাঁর সেই প্রথম পর্বের অভিসারিকা, দীপাবলী ও সিদ্ধার্থপতিযুগল কালের সীমানা ডিঙিয়ে চিরায়ত রূপকল্পনার নতুন প্রতীক হয়ে রয়েছে।

ইতিমধ্যে ১৮৯৭ সালে অবনীন্দ্রনাথের জীবনে এল আর একটি যুগ পরিবর্তনের পালা। তিনি পরিচিত হলেন কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের তৎকালীন ইংরেজ অধ্যক্ষ ই বি হ্যাভেলের সঙ্গে। তিনি এদেশে কর্মভার নিয়ে এসে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার ঐশ্বর্যমহিমা দেখে তাকে নতুন যুগের উপযোগী করে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার সঙ্কল্প নিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের নতুন ধারায় চিত্রচেষ্টার মধ্যে তিনি তাঁর শুভ সঙ্কল্পকে সার্থক রূপায়ণের সঙ্কেত-সহায়তায় স্পর্শ অনুভব করলেন। নানা চেষ্টা-ব্যবস্থা করে তিনি অবনীন্দ্রনাথকে আর্ট স্কুলে সহকারী অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত করলেন ১৯০৫ সালে। অবনীন্দ্রনাথের পরিচালনায় আর্ট স্কুলে একটি ভারতীয় বিভাগ হোল উন্মুক্ত। ক্রমান্বয়ে একটি দুটি করে ছাত্র এসে সেই বিভাগে যোগ দিলেন নতুন চিত্রপদ্ধতি শিক্ষার জন্য। অবনীন্দ্রনাথ গুরুর আসনে হলেন অধিষ্ঠিত। আর তাঁর প্রবর্তিত নব্য চিত্ররীতিকে প্রসার ও পুষ্ট করার নানা সুযোগ সৃষ্টি করে চললেন ভারত-শিল্পপ্রেমী হ্যাভেল সাহেব।

অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুলে যোগদানের পূর্বে হ্যাভেল সাহেবের প্রেরণায়ই দিল্লীর দরবার প্রদর্শনীতে (১৯০২) ছবি পাঠিয়ে সম্মানপদক লাভ করেন। তিনি তখন জল-রঙ-এ তাঁর নবীন সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন বটে, কিন্তু সেই প্রথম সম্মান স্বীকৃতি লাভ হয়েছিল তেল-রঙ-এ অঙ্কন করে। বিষয় ঃ শাজাহানের অন্তিম অবস্থা। বিষয়বস্তুও যেমন দেশীয়, টেকনিকও তেমনি দেশজ অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথের স্বকীয় পন্থা।

অবনীন্দ্র চিত্রের বিদেশে প্রথম প্রচারও হয়েছিল ১৯০২ সালে। হ্যাভেল সাহেব বিলাতের স্টুডিয়ো পত্রিকায় সচিত্র প্রবন্ধ লিখে ইউরোপের শিল্প রসিকমহলে ভারতের নতুন চিত্ররীতিকে প্রচার করেন তাঁর শ্রদ্ধাপ্লুত লেখনী মাধ্যমে। ক্রমান্বয়ে আরও অনেক ভারত কলাপ্রেমী বিদেশী ব্যক্তিরা অবনীন্দ্রচিত্রশৈলীর প্রচারে সহায়তা করেন নানা প্রবন্ধ নিবন্ধ ও সমালোচনার মধ্যে দিয়ে।

১৯০২ সালেই জাপানের শিল্পবেত্তা মনীষী কাকুজো ওকাকুরা ভারত ভ্রমণে এসে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর নবীন চিত্র সাধনার সঙ্গে পরিচিত হন। দেশে ফিরে যাবার সময় তিনি প্রস্তাব দিলেন ও ব্যবস্থা করলেন যে কতিপয় জাপানী চিত্রশিল্পীকে কলকাতায় পাঠাবেন দুই দেশের চিত্রভাবনা ও আদর্শ বিনিময়ের জন্য। অনতিবিলম্বে জাপান থেকে কলকাতায় এলেন হিশিদা ও টাইকান নামে দুই তরুণ শিল্পী। তাঁদের চিত্র রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গী, বিশেষ করে জাপানী প্রথায় ছবির পটকে জলে ধুয়ে অঙ্কনের রীতি দেখে তিনি তাকে নিজের মত করে, আপনভাবে ও নতুনতর উপায়ে প্রয়োগ করার চেষ্টায় হলেন রত। কিন্তু তিনি জাপানী ওয়াশ পদ্ধতিকে হুবহু গ্রহণ করেননি কখনও।

এই নতুন ভাবধারা গ্রহণের ফলে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রসাধনার আর একটি নব পর্যায়ের সূচনা হয়েছিল। গোড়াতে তিনি পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর ভারতের

মধ্যযুগীয় চিত্র তাঁর অনুপ্রেরণা ও নতুনভাবে 'দেশী মতে' ছবি আঁকার মৌল আদর্শ হয়েছিল। অবশেষে জাপানী জলেধোয়া রীতির ভাবধারা গ্রহণের ফলে তাঁর চিত্রশৈলী অতি অভিনব ও অভূতপূর্ব এক রূপশ্রী মণ্ডিত হয়ে উঠলো। সেই নব প্রবর্তিত চিত্ররীতির সঙ্গে দেশী-বিদেশী কোন প্রথার সমরূপতা দেখা যায় না। অবনীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম রেখার সাধনার সঙ্গে জলেধোয়া রীতিতে বর্ণরঞ্জনের ফলে ছবিতে একটা কুহেলিকাময় স্বপ্নালুভাবের আবেশ এসে গেল। ক্রমশঃ তাঁর প্রতিটি রচনা অভিনব রূপে, অদ্ভুত কল্পনার অতলান্ত প্রবাহ ও উচ্চাঙ্গের করণ-কৌশলের সার্থক নিদর্শন হয়ে উঠেছিল।

অবনীন্দ্র প্রতিভার মধ্যে বিশিষ্টতা হোল তাঁর উদার মনোভঙ্গী, সংকীর্ণতাবর্জিত স্বাজাত্যাভিমান ও চূড়ান্ত কৌশলের রূপ সৃষ্টির অসীম ক্ষমতা। দেশ-বিদেশ, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য--এই বিভেদ তিনি কখনও করেননি। তিনি এযুগের উপযোগী আধুনিক চিত্রশৈলীর পত্তন করলেও প্রাচীনকে কখনও অস্বীকার করেননি। তাঁর আধুনিকতা কোন সমকালীন প্রেরণাসঞ্জাত ও নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল না। ভারতের সুপ্রাচীন শিল্প-ঐতিহ্যের মধ্যে মূল আবদ্ধ রেখে তাঁর চিত্রভাবনাকে তিনি শাখা পল্লবিত করেছিলেন নানা রূপে-রঙে ও রসের আবেশে। আর তা শুরু থেকেই বিভিন্ন ভাব প্রবাহের স্তর বেয়ে ক্রমঃপরিণতির দিকে চলেছিল এগিয়ে।

নিজের উদ্ভাবিত রীতিতে গোড়ার দিকে যে অনিশ্চয়তা ও অপরিপক্কতার ছাপ ছিল, ভাব প্রকাশের জন্য যে ব্যাকুলতা দেখা যেত তা ক্রমশঃ এগিয়ে চললো অতুলনীয় উৎকর্ষের অভিমুখে। পথ খোঁজার পালায় প্রথম ছেদ চিহ্নের ইঙ্গিত দেখা গেল ওমর খৈয়ামের চিত্রগুচ্ছে (১৯০৭-৮)। এল মানস জাগৃতির মাহেন্দ্রক্ষণ। এই চিত্র মধ্যে দেখা যায় তাঁর জলে ধোয়া রীতিতে বর্ণযোজনায় অপূর্ব কৌশল লাভ করেছে চূড়ান্ত পরিণতি। জীবনজিজ্ঞাসার ছাপও ক্রমঃস্ফুট। ভাবের আলোড়নে দোলানো মন ক্রমশঃ ভাবসংহতির দিকে চলেছিল এগিয়ে। এই ছবি ক'খানি অবনীন্দ্রনাথের চিত্রসাধনার ক্ষেত্রে এক একটি landmark। ওয়াশ পদ্ধতিতে তাঁর প্রথম সার্থক সৃষ্টি এযুগের নতুন কল্পনার ভারতমাতার চিত্র। এটির রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৯০৩ সাল।

১৯১১ সালে অবনীন্দ্রনাথের জীবনে আবার দেখা গেল নবতর আর একটি পর্যায়ের শুভসূচনা। ইংলণ্ডের রাজারাণী এলেন ভারত ভ্রমণে। কলকাতায় এসে রাণী অবনীন্দ্রনাথের 'তিষ্যরক্ষিতা'র চিত্র দেখে মুগ্ধ হলেন। শিল্পী ছবিটি রাণীকে উপহার দিলেন। তার কিছুকাল পরেই তিনি সি আই ই উপাধি লাভ করেন। ইতিমধ্যে অবনীন্দ্রনাথ [illegible] অবাধবিচরণ করেছেন [illegible]। [illegible]সাহিত্যের রাজ্যে তাঁর আসন তখন [illegible]।

দীপাবলী—অবনীন্দ্রনাথ অংকিত

এমন সময়ে ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বাগেশ্বরী অধ্যাপক পদে নিয়োগ করলেন চারুকলার তত্ত্বাদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা দানের জন্য (১৯২১-২৯)। তাঁর সেই বক্তৃতা প্রায় ত্রিশটি নিবন্ধে হয়েছিল বিধৃত। সময়টি তাঁর চিত্র নির্মীতির মধ্যাহ্ন। [illegible] কিন্তু তিনি তখন ভূমিকা গ্রহণ করলেন সব্যসাচীর। এক হাতে চলছিল তুলি; এবারে যেন আর এক হাতে ধরলেন লেখনী। এত দিন ছিলেন রঙ-রেখার যাদুকরের ভূমিকায়—এবারে হলেন সৌন্দর্যসাধনার গূঢ়-মন্ত্রের অদ্বিতীয় ব্যাখ্যাতা। তাঁর আবাল্য সাধনার রূপ-প্রতীক, তাঁর অনুভব-অনুভূতি ও নন্দনরুচিকে তিনি ব্যাখ্যা করলেন এই বক্তৃতামালায় অনবদ্য ভঙ্গীতে ও ভাষায়। বাংলা ভাষায় নন্দনতত্ত্বের ব্যাখ্যানে তিনি অবিসংবাদী পথিকৃৎ। এই অপূর্ব সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি লাভ করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট্ ডিগ্রী।

এইজাতীয় প্রভূত সাহিত্য সাধনায় তাঁর চিত্রচর্চা কখনও ব্যাহত, বিঘ্নিত হয়নি। এই বিষয়েও অবনীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয় ও অনন্য। ওমর খৈয়ামের চিত্রকল্পনায় তাঁর সৃজনী প্রতিভার যে দ্যুতি বিকীর্ণ হয়েছিল, তাঁর তুলি ও রঙ্-রেখার মায়াজালের যে সর্বব্যাপী বিস্তার শুরু হয়েছিল তা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছিল চল্লিশ বছরেরও অধিককাল। আর তা যে কত বিচিত্রভাবে ও ভঙ্গীতে হয়েছিল তার শেষ নেই। হাজার পটে হাজার বিষয়বৈভব। যত পট, যত ছবি; তত রীতি-পদ্ধতি ও রূপবৈচিত্র্য। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, যুগপৎ কোন ছবিতে দেখা যায় গীতিময়তা ও স্বপ্নালুভাব, আবার তারই পাশে আর কোনও চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে ওজস্বিতা ও প্রাণোচ্ছলতার সঙ্গে স্থিরগম্ভীর ভাব ও ঐতিহ্য কীর্তিতে অনুরাগ। অনেক চিত্রে লঘুচপল পরিহাস প্রিয়তার ছাপও সুস্পষ্ট। বর্ণরঞ্জনে ছিলেন ঐন্দ্রজালিকতুল্য। সূক্ষ্ম মোলায়েম রেখা রচনার মৌল প্রেরণা মুঘল শিল্পীদের 'একবাল' কলমের মধ্যে হলেও অবনীন্দ্রনাথ নিজের রুচি ও প্রয়োজনানুসারে তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন অনেকখানি।

জেবউন্নিসা—অবনীন্দ্রনাথ অংকিত (রবীন্দ্র ভারতী) সংগ্রহ
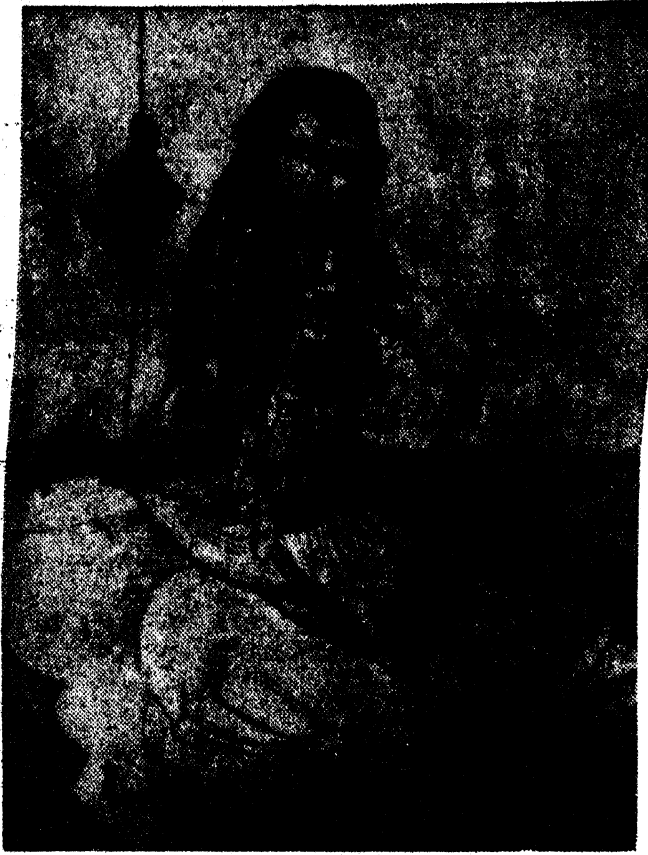
তাঁর সুদীর্ঘ শিল্পীজীবনের সৃষ্টি-সম্ভারে বিষয় বৈচিত্র্যও সুপ্রচুর। মানুষের প্রতিমূর্তি, নিসর্গ শোভা, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী, পশুপাখীর বিচিত্র রূপাকৃতি, রবীন্দ্র কাব্য ও নাটকের চিত্ররূপ, প্রতীক ধর্মী ও আখ্যানমূলক চিত্র এবং বিচিত্র রকমের সব মুখোশ রচনার সমারোহ দেখা যায় সেখানে। নির্মল শুভ্র হাসি ও ব্যংগ বিদ্রূপের জোয়ারও এনেছেন অনেক চিত্রপটে। হাস্যরসাত্মক চিত্র শিল্পীর সূক্ষ্ম অনুভূতি, সুসংযত পরিমিতিবোধ ও অন্তর্নিহিত গূঢ় রসব্যঞ্জনায় সিক্ত। মুখোশ-চিত্রও ব্যক্তি বিশেষের ও নাটকের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অদ্ভুত আলেখ্য। তিনি নিজেকেও মুখোশের মাধ্যমে অসীম রহস্যঘনরূপে প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হননি। নিসর্গ চিত্রে এনে দিয়েছেন প্রকৃতির স্বাভাবিক রূপের মধ্যে এক অনির্বচনীয় অধরা মাধুরীর প্রবাহ। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ের চিত্রায়ণেও তিনি স্বকীয় ভাবানুভূতির প্রাধান্যে ও পটকে অলংকারে সাজিয়ে ধরতে পরতে তাকে বর্ণাবিষ্ট করেছেন। সেই স্বপ্নের মায়াজাল রচনা ও রোমান্টিকতার আবেশ-অনুভাব যেন আরব্য-রজনীর চিত্রাবলী রচনার পরে তাঁর মনে একটা ক্লান্তির স্পর্শ এনে দিয়েছিল।

তার ফলে তিনি— ফিরে গেলেন স্পষ্টতা, বলিষ্ঠতা ও সহজবোধ্যতার অভিমুখে। নতুন ভাব ভাবনা ও আংগিকের পরিবর্তন দেখা গেল শেষ বয়সের চণ্ডীমঙ্গল ও কৃষ্ণমঙ্গল সিরিজের চিত্রে এবং আরও নানা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের স্বতন্ত্র চিত্রপটে। মনে হয় তিনি আর একবার শৈশব কল্পনার বাঁধনছেঁড়া ও রীতিনীতির জোয়ালহীন স্বচ্ছন্দচারী এক শিল্পচেতনায় হয়েছিলেন উদ্বুদ্ধ। বিগত কালের সূক্ষ্ম রেখাকে ও জলে ধোয়া রঙের খেলাকে তাঁর প্রবীণ মনের হৃদয় রসে আর একবার মন্ত্রস্নান করিয়ে নিলেন। মঙ্গলকাব্য মূলক এই চিত্ররাজি বুদ্ধনয়নের দৃষ্টিতে ও মোটা তুলির টানে যে অভিনবত্ব লাভ করেছে তার রসাবেদন উচ্চস্তরের।

আরব্য রজনীর চিত্রাবলীতে তাঁর শিল্প প্রতিভার মধ্যাহ্ন-দীপ্তির শেষ রশ্মিজাল বিস্তৃত হয়ে যে মাধুর্য, উচ্চাঙ্গের আংগিক-কৌশল ও অভিনব কল্পনার অসীম বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়েছে তা' তাঁর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ চিত্রের পাশে স্থান লাভের যোগ্য। তাঁর ওমর খৈয়ামের চিত্রনিচয়, শেষ বোঝা, দারাশুকো, আলমগীর, দারার মুণ্ড, কজ্জরী, কালোমেয়ে, উমা, মাটির মেয়ে, রাধিকা, ভোরের বাঁশী, পাহাড়ী মেয়ে, পদ্মপাতে অশ্রুবিন্দু, এবং আরও কতশত ছবির গুণমহিমা অবর্ণনীয়। তা চোখে দেখে মনে-প্রাণে রসাবিষ্ট হয়ে প্রভূত আনন্দ লাভের বস্তু।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকলায় দ্বিতীয় স্বরূপ বিকশিত হয়েছিল তাঁর শেষ বয়সে রচিত কুটুম-কাটামে। প্রকৃতির বুকে কুড়িয়ে পাওয়া এবং জীবনে পরিত্যক্ত ও অবহেলিত জিনিস ছিল তাঁর এই রূপায়ণ কর্মের মুখ্য উপাদান। তুচ্ছকে ঊর্ধ্বের সীমানায় তুলে দেবার ইহা এক অদ্ভুত নিদর্শন। এই অভিনব শিল্পায়নে হয়েছে শৈশব-বার্ধক্যের ও রূপ-বিরূপের সুখ-সম্মেলন। সৃজনীশক্তির অসীম প্রাণ-রহস্যে তা পরিপূর্ণ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে আজ দেশে-বিদেশে অবনীন্দ্র-চিত্রের অপব্যাখ্যান শোনা যায় অহরহ। অথচ যখন ১৯০৮ সাল থেকে কলকাতা শহরে এবং ১৯১৪ সাল থেকে ইউরোপ, আমেরিকা, যাভা, সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও ভারতের নানা অঞ্চলে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের প্রদর্শনী হয়েছে—তখন প্রতিবারই দেশ-বিদেশের সমালোচক ও পত্র-পত্রিকাকে দেখা গিয়েছে অতিমাত্রায় প্রশংসামুখর। কিন্তু আধুনিক কোন কোন সমালোচক এখন বলতে চান যে অবনীন্দ্রনাথের কিছু মৌলিক প্রতিভা ছিল না। তিনি প্রাচীন ভারতীয় শিল্প-রীতির পুনরুজ্জীবন করেছেন মাত্র। একথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

অবনীন্দ্রনাথের জাতীয় ঐতিহ্যে আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল অবিচল। তিনি দেশের চিরাগত প্রথায় মূল আবদ্ধ রেখেই নতুন নতুন সৃষ্টিতে হয়েছিলেন নিমগ্ন। তিনি পুরাতনের জাবর কাটেননি কখনও। দেশ-বিদেশ, একাল-সেকাল, সকলের কাছ থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন, আবার বর্জনীয়কে করেছেন বর্জন। তাঁর সমগ্র সৃষ্টিসম্ভার স্বকীয়তার পূর্ণ রূপ-প্রতীক। তাঁর প্রবর্তিত চিত্রশৈলী অবনীন্দ্র-প্রতিভার প্রখর দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল। তাকে যদি বিশেষ কোন ব্যাখ্যা দিতে হয়, তবে তা হচ্ছে 'অবনীন্দ্র-রীতি।'

এই রীতির প্রবর্তন করে তিনি আধুনিক ভারত-কলাকে বিশ্বের শিল্প-দরবারে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তার বিনিময়ে তিনি কিছু চাননি। এই প্রসংগে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উল্লেখনীয়। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি বলেছিলেন,—

'অবন কিছু চায় না, জীবনে চায়নি কিছু। কিন্তু এই একটা লোক যে শিল্প-জগতে যুগ পরিবর্তন করেছে, দেশের সব রুচি বদলে দিয়েছে। সমস্ত দেশ যখন নিরুদ্ধ ছিল, এই অবন তার হাওয়া বদলে দিয়েছে।'

সেই 'রুচি ও হাওয়া বদলে'র কথা স্মরণ করে আজ তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর শুভ দিনে তাঁকে নতুন করে জানতে ও বুঝতে হবে। আর তাতেই এই পুণ্যলগ্নে তাঁকে শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন বাস্তবিকরূপে সফল ও সার্থক হয়ে উঠবে।

কথাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ

ভবানী মুখোপাধ্যায়

অবনীন্দ্রনাথ বাংলার এক অবিস্মরণীয় পুরুষ। বাংলার সাংস্কৃতিক নবজন্মে এই মহান পুরুষের দান অসামান্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

'দেশকে উদ্ধার করেছিলেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন; তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন।'

অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সব কথাই যেন এই কথাগুলির মধ্যে বলা হয়েছে। শিল্প-গুরুর সাহিত্যসাধনার ইতিহাসও সুদীর্ঘ। শিল্পচর্চার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে সাহিত্য-রচনা। আর সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা রবীন্দ্র-নাথের অত কাছে থেকেও সাহিত্য-রচনায় কি করে পিতৃব্যের প্রভাব থেকে আপনাকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন। মনকে পিঞ্জর-খোলা পাখির মতো মুক্তি দিয়ে শূন্য গগনে সেই মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমকে তিনি অবাধ বিহারের সুযোগ দিয়েছেন। তারপর যে কল্পলোকে বিচরণ করেছেন, তার জন্য স্বহস্তে রচনা করেছেন স্বপ্ন ধরার জাল নিজের মতো করে তারপর—

'বিশ্বের চলাচলের পথের ধারে নিজের আসন বিছিয়ে চুপটি করে নয়—সজাগ হয়ে।'

এই সদাজাগ্রত দৃষ্টি শিল্পগুরুকে সাহিত্য-সৃষ্টির কাজে এক অনন্যসাধারণ শক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। স্বপ্ন ধরার জালটি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে রচনা করতে পেরেছিলেন বলেই রঙে ও রেখায় অবলীলাক্রমে যা ফুটিয়ে তুলতে পেরে-ছিলেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই অনায়াস-ভঙ্গীই তাঁকে সিদ্ধিদান করেছে।

কি সূত্রে কথাটা উঠেছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথ কুড়ি-একুশ বছর বয়সের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বললেন—

'তুমি লেখোনা, যেমন করে তুমি মুখে গল্প কর, তেমনি করেই লেখো।'

পিতৃব্যের এই নির্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃব্যের কাছে উৎসাহ পেয়ে এক ঝোঁকেই তিনি লিখে ফেললেন 'শকুন্তলা'। তারপর রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যেতে তিনি ভালো করেই পড়লেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—'মনে বড় ফূর্তি হল, নিজের ওপর মস্ত বিশ্বাস হল। তারপর পটাপট করে লিখে যেতে লাগলুম—ক্ষীরের পুতুল, রাজ-কাহিনী ইত্যাদি—'

ছোটবেলায় শোনা কাহিনী 'ক্ষীরের পুতুল' অবনীন্দ্রনাথের কলমে যে আকার লাভ করল তার তুলনা নেই। এ এক অপূর্ব শিল্পকর্ম। এই কাহিনীর ইংরাজী অনুবাদও উচ্চ প্রশংসিত। দুয়োরানীর দুঃখে কাতর বানরের রাজাকে ধোঁকা দেওয়া। দুয়োরানীর পুত্রের বিয়ে উপলক্ষে শোভাযাত্রা করে বর নিয়ে যাওয়া। বরের পরিবর্তে ক্ষীরের পুতুলকে বর সাজানো, এবং ক্ষিধের জ্বালায় ষষ্ঠীঠাকুরানীর সেই ক্ষীরের পুতুল ভক্ষণ এবং ধরা পড়া আর তারপর বানরকে দিলেন দিব্য চক্ষু আর সেই চোখে বানর ষষ্ঠীতলায় ছেলের রাজ্য দেখতে পেল—

'সে এক নতুন দেশ, স্বপ্নের রাজ্য—সেখানে কেবল ছুটোছুটি, কেবল খেলা-ধুলো; সেখানে পাঠশালা নেই, পাঠশালার গুরু নেই, গুরুর হাতে বেত নেই, সেখানে আছে দীঘির কালো জল, তার ধারে সরবন, তেপান্তর মাঠ, তারপরে আম-কাঁঠালের বাগান; গাছে গাছে লেজঝোলা টিয়াপাখি, নদীর জলে গোল-চোখ বোয়াল মাছ, কচু বনে মশার ঝাঁক; আর আছেন বনের ধারে বনগাঁবাসী মাসী-পিসি, তিনি খৈয়ের মোয়া গড়েন—'

মাসী-পিসি বনগাঁবাসী, বনের ধারে ঘর—এই প্রচলিত ছড়াটিকে তিনি এইভাবে প্রয়োগ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে রূপকথা এবং ছড়ার রাজ্যেই যেন তিনি বিচরণ করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথ 'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী'র অন্তর্গত শিল্প ও ভাষা নামক প্রবন্ধে বলেছেন—

'ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মানুষ যে 'মা' শব্দ উচ্চারণ করেছে এবং চোখের তারা ফিরিয়েছে বা হাত বাড়িয়েছে মায়ের দিকে, তার থেকে কথিত চিত্রিত ও ইঙ্গিতের ভাষার একই দিকে সৃষ্টি হয়েছে বললে ভুল হবে না।'

অবনীন্দ্রনাথের কাছে তাই ছবির ভাষা আর লেখার ভাষা এক। শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য রচনা করেছেন অবনীন্দ্র-নাথ, তাই সে-ভাষা এত ছন্দোময়, এত জীবন্ত।

ক্ষীরের পুতুলের পর 'রাজকাহিনী' প্রকাশিত হয় আজ থেকে ৬২ বছর পূর্বে। ১৩১১ সালের ভারতীতে রাজকাহিনীর চারটি গল্প প্রকাশিত হয়—শিলাদিত্য, গোহ, পদ্মিনী, বাপ্পাদিত্য। এই কাহিনী-গুলির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারায় গদ্য-রীতি ও সেই সঙ্গে পরিবেশন-ভঙ্গী সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। এখানেও সেই কাব্য সুষমামণ্ডিত অপূর্ব ভাষায় ঝঙ্কার আর সেই সঙ্গে চিত্রময় প্রকাশ। 'শিলাদিত্যে'র একটি অংশ উদ্ধৃত করা হল দৃষ্টান্ত হিসাবে—

'সুভগা ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়ে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে শেখা সেই সূর্যমন্ত্র উচ্চারণ করলেন; তখন সমস্ত পৃথিবী যেন জেগে উঠল, সুভগা যেন শুনতে পেলেন, চারিদিকে পাখির গান, বাঁশির তান, আনন্দের কোলাহল। তারপর গুরু গুরু গভীর গর্জনে সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে, চারিদিক আলোয় আলোময় করে সেই মন্দিরের পাথরে দেয়াল, লোহার দরজা, যেন আগুনে আগুনে গলিয়ে দিয়ে, সাতটা সবুজ ঘোড়ার পিঠে আলোর রেখা কোটি কোটি আগুনের সমান জ্যোতির্ময় আলো-ময় সূর্যদেব দর্শন দিলেন। সে-আলো সে-জ্যোতি মানুষের চোখে সহ্য করা যায় না।'

যদি চোখ বুজিয়ে উপরোক্ত বর্ণনাটুকু কল্পনা করা যায়, তাহলে কি একটি সুন্দর ছবি মনের ভিতর ফুটে ওঠে না। মহা-দ্যুতিময় কাশ্যপের যেন চোখের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

অবনীন্দ্রনাথের ছবির কাজের সঙ্গে লেখার কাজ এইভাবে এগিয়ে চলল। এই 'রাজকাহিনী' লেখার প্রায় পাঁচ বছর পর প্রকাশিত হল 'ভূতপতরীর দেশ'। 'ভূত-পতরীর দেশ' অবনীন্দ্রনাথের আর এক আশ্চর্য সৃষ্টি। অবনীন্দ্রনাথের অতি-পরিচিত পটভূমিতে রচিত এই অতি-প্রাকৃত কাহিনী প্রকৃতপক্ষে ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী'র পর বাংলা-সাহিত্যে আবার নতুনরূপে আবির্ভূত হল। 'কঙ্কাবতী' অনেক সময় কিঞ্চিৎ 'ক্রুড' মনে হতে পারে, কিন্তু 'ভূতপতরীর দেশে' কবিকল্পনা ও চিত্রময়তায় এক আশ্চর্য শিল্পকর্ম।

'দেখছি আলোটা ক্রমে এ-গাছ সে-গাছ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল; তারপর আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে এল। সেই সময় দেখি পূর্ণিমার চাঁদের মত প্রকাণ্ড একটা কাচের গোলা মাঠের ওপর দিয়ে বোঁ বোঁ করে গড়িয়ে আসছে—যেন একটা মস্ত আলোর ফুটবল।...'

তারপর সেই গোলাটার ভিতরে পাক্কি-শুদ্ধ ঢুকে পড়ার পর আর পালাবার পথ নেই।

'একেবারে গড়িয়ে চলেছি,—বন্ বন্ করে লাটিমের মত ঘুরতে ঘুরতে। সে কি ঘুরুনি! মনে হল, আকাশ ঘুরছে, তারা ঘুরছে, পৃথিবী ঘুরছে, পেটের ভিতর আমার মাসির মোয়াগুলোও যেন ঘুরতে লেগেছে।'

ফ্যানটাসি রচনায় অবনীন্দ্রনাথ একটা নতুন পথের যেমন সন্ধান দিয়েছেন, তেমনই ফ্যানটাসির ভাষাও যে কেমন হওয়া প্রয়োজন তার পথ প্রদর্শন করেছেন।

১৯১৬-তে 'নালক' লিখেছিলেন গৌতম বুদ্ধের জীবনের কাহিনী নিয়ে। এই কাহিনীর মধ্যেও মুখে মুখে গল্প বলার একটা নিজস্ব ভঙ্গী তিনি প্রকাশ করেছেন। জাতকের কাহিনীও যে এইভাবে পরিবেশন করা সম্ভব তা হয়ত সেদিন কল্পনা করা সম্ভব হয়নি। 'পথে বিপথে' স্মৃতিচারণমূলক রচনা। পথে বিপথের বর্ণনাভঙ্গীও কাব্যধর্মী এবং চিত্রময়। তিনি প্রত্যুষের এক অপূর্ব ছবি এঁকেছেন কয়েকটি মাত্র কথায়—

'একটুখানি আলোর আঘাত, নিশীথ বীণায় সোনার তারের একটুখানি তীব্র কম্পন। ঊষার অচঞ্চল শিশির, তার মাঝখানে একটিবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছি নতুন দিনের দিকে মুখ করে। পৃথিবীর পূর্বপার পর্যন্ত অনেকখানি অন্ধকার এখনো রাশিকৃত দেখা যাচ্ছে।'

সমগ্র বর্ণনাটি যেন এক অনবদ্য ল্যাণ্ডস্কেপের বিষয়বস্তু। ১৯১৯ খৃঃ 'ভারতী'তে অবনীন্দ্রনাথ ফরাসী উপন্যাসকার রোস্তাঁদের একটি সুপরিচিত কাহিনী অনুসরণে লিখলেন 'আলোর ফুলকি'।

অবনীন্দ্রনাথের জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় 'ভারতী'র সেই সময় অন্যতম সম্পাদক ছিলেন, এবং 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথও একজন হলেন। শুনেছি তিনিও ছবি, রচনা এবং উপদেশ দিয়ে 'ভারতী'কে সাহায্য করতেন। যতদূর মনে পড়ে 'ভারতী'তে প্রকাশিত বারোয়ারী উপন্যাসের একটি অংশ অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। ভারতী গোষ্ঠীর লেখকরা সে-যুগে বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। মনে হয়, জামাতা মণিলালের তাগিদে অবনীন্দ্রনাথ 'আলোর ফুলকি' রচনায় হাত দেন। 'আলোর ফুলকি'র মূল কাঠামো ফরাসী হলেও এড্যাপটেশ্যানে অবনীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে তা যেন এক মৌলিক গ্রন্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমনটি ঘটেছে 'খাজাঞ্চির খাতা' (পিটার প্যানের অনুসরণে) বা বুড়ো-আংলার বেলায়। বুড়ো আংলা সেলমা লাগেরলাফের একটি কাহিনীর ছায়া।

বাংলা সাহিত্যের অনেক সমালোচক এই গ্রন্থগুলিকে মৌলিক ধরে নিয়েই বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। অবনীন্দ্রনাথের এই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। 'আলোর ফুলকি'তে অবনীন্দ্রনাথ যে আশ্চর্য ভাষা ও শব্দব্যঞ্জনা প্রকাশ করেছেন, তা তুলনারহিত। এখানেও সেই কাব্যসুষমামণ্ডিত চিত্রময় বর্ণনাবৈচিত্র্য। 'পথে বিপথে' যে প্রত্যুষের বর্ণনা আগে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার সঙ্গে 'আলোর ফুলকি'র এই অংশটুকু তুলনীয়—

'দেখতে দেখতে আকাশের শেষ তারাটি সকালের আলোর মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেল, তারপর দূরে দূরে গ্রামের কুটিরের ওপর জ্বলন্ত আখার সাদা ধুঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে সকালের আকাশের দিকে উঠে চলল আস্তে আস্তে। কুকড়ো দেখলেন আলোর ঝিকিমিকি আঁচলের আড়ালের সোনালিয়ার সুন্দর মুখ। কুঁকড়ো মোহিত হলেন। আজ তাঁর সকালের আরতি সার্থক হল। তিনি এক আলোতে তাঁর জন্মভূমিকে আর তাঁর ভালোবাসার পাখিটিকে সোনায় সোনায় সাজিয়ে দিলেন।'

রোস্তাঁদের মূল রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই, কিন্তু রোস্তাঁদ পড়া না থাকলেও অবলীলাক্রমে বলা যায়, এই চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব, তিনি সূত্রটুকু নিয়ে আপন মনের মাধুরী বিস্তার করে এমন এক শিল্পকর্ম রচনা করেছেন যা হয়ত মূল রচনাকেও অতিক্রম করে গেছে।

'বুড়ো আংলা'র গল্পটি আমাদের ছোট বয়সে 'মৌচাক' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এখানেও বলা কর্তব্য যে 'মৌচাক' 'ভারতী' গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদেরই আর এক বিচরণ ক্ষেত্র। সেলমা লাগেরলাফের গল্প থেকে বেরিয়ে এল হৃদয় ওরফে রিদয়, গণেশ ঠাকুরের কাছে আবেদন নিয়ে বলেছে—কৈলাস যাত্রার পথে বুড়ো আংলার 'টুং-সোনাডা ঘুম' ইত্যাদির ব্যবহার—অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারা। এ-ছাড়া ভাষাকে দুমড়িয়ে-মুচড়িয়ে একতাল কাদামাটির মতো যথেচ্ছ ব্যবহার করে তার থেকে এক প্রতিমা বানিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ। 'বুড়ো আংলা' যদি অবনীন্দ্রনাথের মৌলিক রচনা হত, তাহলে লুই ক্যারলের 'এলিস ইন দি ওয়ানডারল্যাণ্ডে'র সমগোত্রীয় গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হত। পিটার প্যানের অনুসরণে রচিত 'খাতাঞ্চির খাতা' অবনীন্দ্রনাথের আর এক অপূর্ব সৃষ্টি। গল্পকথকের ভঙ্গীতে কাহিনীটি বিধৃত।

'বুড়ো আংলা' নামকরণেও বৈশিষ্ট্য আছে। গল্পের নায়ক রিদয় অতি দুষ্টু ছেলে, গণেশ ঠাকুরের অভিশাপে খর্ব হয়ে গেল, তারপর গণেশ ঠাকুরের কাছে আবেদন জানানোর জন্য তার কৈলাস যাত্রা এবং পরিশেষে পিতার প্রশ্ন—ফিরে কিছু ভাঙিসনি ত'?—তার চৈতন্য আনে। যতক্ষণ শেষ অংশটুকুতে না পৌঁছানো যায় ততক্ষণ উদ্বেগের আর সীমা থাকে না। 'বুড়ো আংলা'র একটি আশ্চর্য অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হল—

'গ্রামে গ্রামে মটকায় কুঁকড়ো সব পাহারা দিচ্ছে। ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে চলন্ত পাখিরা তাদের কাছে খবর পাচ্ছে। 'কোন গ্রাম?' 'তেঁতুলিয়া, সাবেক তেঁতুলিয়া—হাল তেঁতুলিয়া।' 'কোন শহর?' 'নোয়াখালি—খটখটে।' 'কোন মাঠ?' 'তিরপুনির মাঠ—জলে থৈ থৈ।' 'কোন ঘাট?' 'সাঁকের ঘাট—গুগলী ভরা।' 'কোন হাট?' 'উলোর হাট—খড়ের ধুম।' 'কোন নদী?' 'বিষ নদী—ঘোলা জল।' 'কোন নগর?' 'গোপালনগর—গয়লা ঢের।' 'কোন আবাদ?' 'নাসীরাবাদ—তামুক ভালো।' 'কোন গঞ্জ?' 'বামুনগঞ্জ—মাছ মেলা দায়।' 'কোন বাজার?' 'হালতার বাজার—পলতা মেলে।' 'কোন বন্দর?' 'বাগাবন্দর—হুক্কাহুয়া।' 'কোন জেলা?' 'রুরুলী জেলা—সিঁদুরে মাটি।' 'কোন বিল?' 'চলন বিল—জল নেই।' 'কোন পুকুর?' 'বাঁধা পুকুর—কেবল কাদা।' 'কোন দীঘি?' 'রায় দীঘি—পানায় ঢাকা।' 'কোন খাল?' 'বাজির খাল—কেবল চড়া।' 'কোন ঝিল?' 'হীরাঝিল—তীরে জেলে।' 'কোন পরগণা?' 'পাতলে দ—পাতলা হ।' 'কোন ডিহি?' 'রাজসাই—খাসা ভাই।' 'কোন পুর?' 'পেসাদপুর—পিঁপড়ে কাঁদে।' 'কার বাড়ি?' 'ঠাকুর বাড়ি।' 'কোন ঠাকুর?' 'ওবিন ঠাকুর—ছবি লেলেখে।' 'কার কাচারি?' 'নাম কর না, ফাটবে হাঁড়ি।'

পালকী-বেহারার বোলের ঢঙে রচিত এই জাতীয় প্রশ্নোত্তরমালা একটা অপরূপ ছবি মনে জাগায়। খেয়ালী শিল্পী ওবিন ঠাকুর—ছবি আঁকেন ত' বটেই, তিনি ছবি লেখেন।

'খাতাঞ্চির খাতা'র শুরুতে অবনীন্দ্রনাথ মূল গ্রন্থ পিটার প্যানের বক্তব্য দিয়ে গ্রন্থারম্ভ করলেও এই বক্তব্য তাঁর নিজস্ব—

'সব ছেলের মনের সিন্দুকে একটি করে লুকোনো দেরাজ আছে। চাবি ছেলেরা হারিয়ে ফেললে মুস্কিল হবে, তাই এই লুকোনো দেরাজে চাবি নেই; একটা করে খিল আছে, সেইটে সরিয়ে দিলেই দেরাজটি আপনি খুলে যায়। সেইখেনে সবার সবুজ পাতায় বাঁধানো এতটুকু খেলার খাতাখানি। সারাদিন যে যা খেলেছে, যা দেখেছে, যা পেয়েছে, যা হারিয়েছে, আর যা পেতে চায়, খুঁজে বেড়ায় এমনকি রাতের স্বপ্নের ছবিও এই ছোট্ট খাতায় রোজ রোজ নতুন নতুন করে লেখা হয়ে যাচ্ছে—'

ছোটদের মনের গহনে অবনীন্দ্রনাথ ডুব দিয়েছিলেন, তাই শিশুমনের অরূপ রতনের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। যে স্পর্শমণির স্পর্শে লেখনী যাদুদণ্ডে রূপান্তরিত হয়, অবনীন্দ্রনাথ সেই স্পর্শমণির সন্ধান পেয়েছিলেন, তাই তিনি রূপকথার যাদুকর।

কথক অবনীন্দ্রনাথ কথকতার এই বিশিষ্ট ধারার অধিকারী ছিলেন বলেই 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' আজ বাংলা-সাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ। অবশ্য এর জন্য রানী চন্দের কাছেও বাঙালী পাঠকের ঋণের পরিমাণ কম নয়।

খাতাঞ্চির খাতায় অবনীন্দ্রনাথ এইভাবে যাদুকরের ভঙ্গীতেই গল্প বলেছেন। —দিনের বেলার শহর যেই সাঁজ নটার তোপ পড়ে, অমনি মিলিয়ে গিয়ে বাগান, বাজার,

মাঠ আর পুকুর হয়ে যায়। 'থাকবার মধ্যে থাকবে রাজার কেল্লা, রায়-মহাশয়দের বৈঠকখানা আর জোড়াসাঁকো আর এই তেতলা বাড়ি।' এখন শ্রোতার যদি এইসব আজগুবি কথা বিশ্বাস না হয়, তাই তাকে আশ্বাস দিয়ে বলা হচ্ছে—

'—বিশ্বাস হচ্ছে না? ভাবছ আমি বাজে কথা বলছি! আচ্ছা সকালবেলা পুব দিকের আকাশে লাল রঙের একটা ফানুস দেখতে পাও—সাদা ফানুস থাকে না তো? রাত্তিরে দেখো দিকি সেখানে সাদা একটা ফানুস ঝুলছে দেখবে—আবার সেটা কখনো দেখবে রুপোর বাটি যেন কাৎ হয়ে পড়েছে, কখনো বা দেখবে যেন একখানি নৌকো ভাসছে।'

এর পর আরো নানা রকম কথা বলা হয়েছে শ্রোতার মনে বিশ্বাস জাগানোর জন্য এবং এমনভাবে বলা হয়েছে যা বিশ্বাসযোগ্য। বিশ্বাস করতেই হয়।

অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় এই ভঙ্গীটাই স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি তিনি কথাও বলতেন এই ভঙ্গীতে, এমনকি ব্যক্তিগত চিঠিপত্রও এমনই ভাষা ও ভাব প্রকাশ করে লিখতেন। পরিণত বয়সে মুখে মুখে বলে গেছেন, 'ঘরোয়া' আর 'জোড়াসাঁকোর ধারে' তার মধ্যেও এই বিশিষ্ট ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাবে।

অবনীন্দ্রনাথ কেন 'শকুন্তলা' লিখলেন এ-কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। তখন তার মাত্র একুশ বছর বয়স। 'ক্ষীরের পুতুল' যখন লিখলেন তখন বাইশ বছর বয়স। শকুন্তলার কাহিনী নির্বাচনে অবনীন্দ্র-নাথের শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মুখ্যতঃ চিত্রশিল্পী। পিতৃব্যের নির্দেশে পরীক্ষামূলকভাবে 'শকুন্তলা' নিয়ে হাতে খড়ি। পিতৃব্যের কাছ থেকে সবুজ নিশানের ইঙ্গিত পেয়ে তিনি উৎসাহিত হলেন। বলেছেন, 'পটাপট করে লিখে যেতে লাগলুম।' সত্যি 'পটাপট' করে লেখারই বয়স সেটা, নবযৌবনের উৎসাহ ও উদ্দী-পনার সঙ্গে কোনো কিছু খাপ খায় না। কিন্তু একুশ বছরের লেখকের ভাষার মধ্যে একটা উজ্জ্বল তীক্ষ্ণতার সন্ধান পাওয়া গেল। অথচ অবনীন্দ্রনাথ সংস্কৃত শব্দের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। 'পত্রপুটের জল' লিখেছিলেন বলে পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথ তা কাটতে গিয়েও কাটেননি, তার একমাত্র কারণ যা, অনুমান করা যায় তা হল কবি শকুন্তলার সামগ্রিক রচনাভঙ্গীর সঙ্গে 'পত্রপুটের জল' কথাটি আশ্চর্য খাপ খেয়ে গেছে এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন। তাই বলেছিলেন না থাক।

অবনীন্দ্র হালকা সুন্দর শব্দের সঙ্গে অনায়াসে গুরুগম্ভীর শব্দ প্রয়োগ করতেন আর তা চমৎকার মিশ খেয়ে যেত।

'শকুন্তলা' রচনার তিন বছর পরে প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়সে অবনীন্দ্রনাথ 'দেবী প্রতিমা' নামে একটি গল্প লিখে-ছিলেন ১৩০৫ সালের 'ভারতী'তে তখন ভারতীর সম্পাদনার ভার রবীন্দ্রনাথের ওপর। সেকালের প্রচলিত রীতি অনুসারে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষায় এই কাহিনী লিখিত হয়—যথা :

"পশ্চাতে লোকলোকেশ্বরী মন্দিরের মহাবিস্তীর্ণ স্তম্ভ শ্রেণী বেষ্টিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, জনতার কোলাহলে ভক্তি উচ্ছ্বাসে স্ফীত তরঙ্গিত পরিপূর্ণ আকাশ কলাপীর কণ্ঠের ন্যায় নীল মসৃণ কোটি তারকার উজ্জ্বল এবং সেই পূর্ণ সন্ধ্যায় অস্ফুট চন্দ্রালোকে ঈষদুদ্ভাসিত, নিঃশব্দ গম্ভীর পাষাণ মন্দিরের গম্ভীর অন্ধকারে, পাষাণ-মন্দিরের গম্ভীর অন্ধকারে। পাষাণময়ী লোকেশ্বরী প্রতিমার চরণতলে স্বর্ণ বিজ-ড়িত রত্ন খচিত আরতি প্রদীপের সহস্র শিখা, সহস্র ভক্তের একাগ্র চিত্তের ন্যায় নিস্কম্প, নিশ্চল, নিস্কলুষ জ্বলিতেছিল।'

এই ভঙ্গীতে তিনি আর না লিখলেও এই রচনা প্রকাশের ছ' বছর পর যখন রাজ-স্থানের ইতিহাসের কাহিনী লিখলেন, প্রথমে লিখলেন শিলাদিত্য, গোহ, বাপ্পা-দিত্য, পদ্মিনী, এবং পরে আরো পাঁচটি গল্প লিখলেন হাম্বির, হাম্বিরের রাজ্যলাভ, চণ্ড, রাণাকুম্ভ, সংগ্রাম সিংহ। রাজকাহিনীর এই ন'টি গল্প অবনীন্দ্রনাথের আর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। শুধু গল্প নির্বাচনে নয়, গল্পের কথন ভঙ্গী এবং বর্ণনা চাতুর্যের মধ্যে কল্পনাকুশলী লেখকের শিল্পীমানসের প্রতিফলন সুস্পষ্ট। এছাড়া ১৩০৫ সালে লিখিত 'দেবী প্রতিমা'র ভাষা তার ঝকমকে ওপরকার আবরণ ফেলে দিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করেছে এই কাহিনী-গুলিতে।

অবনীন্দ্রনাথের 'একে তিন তিনে এক', অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুর তিন বছর পরে প্রকাশিত হয়, তার দু বছর পরে 'মারুতির পুঁথি, তারও দু বছর পরে 'চাঁই বুড়োর পুঁথি' এবং 'রং বেরং' এবং ১৯৬৩-তে প্রকাশিত হয় 'হানাবাড়ির কারখানা'। বলা বাহুল্য যে এই সব অপ্রকাশিত রচনাবলী যে কোনো কারণেই হোক অবনীন্দ্রনাথ প্রকাশে উদ্যোগী হননি বা উদ্যোগী প্রকাশক পাওয়া যায়নি। অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর অনেক অপ্রকাশিত যাত্রা পালা প্রকাশিত হয়েছে, গ্রন্থাকারে সবগুলি হয়ত আজো প্রকাশিত হয়নি।

মারুতির পুঁথি এবং চাঁইবুড়োর পুঁথি সমগোত্রীয় রচনা। চাঁইবুড়ো পুঁথি পাঠক। তিনি পুঁথি পাঠের পূর্বে গণ্ডূষ করে মন্ত্র পড়ছেন—

'হুম্ গণেশ চিং পটাং
তত: মারুতি চিংপটাং
আকাশে চিংপটাং বাতাসে চিংপটাং
জলে জলে কাদা মাটিতে চিংপটাং—।।"

তারপর মারুতি বদতি বলে শুরু ও পুরাণ থেকে ধুয়া-বচনটি আওড়ালেন—

"যেখানে নাম সেখানে বদনাম—
পমাণ ধ'রো তার ভত্তো-বম্বাই আম ।।
সোয়াদ সে আমের মিষ্টি-
ডাক নাম অনাছিষ্টি,
মারুতি বলেন—নামেতে কাজ কি, রাম বোলে চাখো না আম।

চ্যাংড়াবুড়ি বল্লেন—"বুঝলে বৌঝির মা?"

সে ড্যাবা চোখ আকাশে তুলে বল্লে—বুঝলাম কিছু কিছু—হনুমানের আসল নাম মারুতি।

বেঙাচির বাবা কট কটা করে বল্লেন—যদি মারুতিই হবে আসল নাম—তবে কোথা থেকে এলো ল্যাজ-গুটি-সুটি হনুমান?"

চাঁই বুড়ো বল্লেন—"কথাটা উঠবে বুঝেই স্বয়ং মারুতি পুঁথির শুরোতে ঐ কথাটি লিখেন। নামের ফাঁকি নিয়ে তর্ক না কর, বাপধন, মাঠাকরুণ সকল, নাম রহস্য ক্রমশঃ প্রকাশ্য হবে পাঠের—সঙ্গে সঙ্গে। শুনু—"বলে চাঁই বুড়ো বাজখাঁই সুরে গলা ছাড়লেন—"

এমনই অপরূপ লিখন ভঙ্গী যে সমগ্র রচনাটি উদ্ধৃত করার লোভ হয়। রচনার কারু কার্য এবং সেই সঙ্গে প্রাচীন কথকতার ভঙ্গীতে বর্ণিত কাহিনী ফেলে আসা এক স্মরণীয় অতীতকে মনে আনে।

চাই বুড়োর পুঁথির সুরু এইভাবে—

"আষাঢ়স্তে বেলায়, শাস্ত্রমত তেল কালি আর লঙ্কার ধুমো দিয়ে শেলেষ্মা শোধন করে, তবে চাঁইবুড়ো পোড়ালঙ্কার পুঁথি পাঠ শুরু করলেন, হনুমানের মন্তব্য দিয়ে।"

তারপর সেই বড় বড় বানরের বড় বড় পেট, সবাই লঙ্কা ডিঙোতে মাথা করলেন হেঁট—। ইত্যাদি। এই কাহিনীর মধ্যে বিচরণ করছেন রাক্ষস-রাক্ষসীরা, কারণ এটা পোড়ালঙ্কার পুঁথি।

অবনীন্দ্রনাথের 'হানাবাড়ির কারখানা' অন্য জাতের রচনা। ভূমিকায় লেখক লিখে-ছেন— আষাঢ়ন্ত বেলার রোদ পড়ো-পড়ো। বেড়াল-বৌ হুঁকোর নলের জন্য আমতলায় পাতা খুঁজে বেড়াচ্ছে, সোনাতন টিকে ধরাচ্ছে, এমন সময় "তারং ব্রহ্মস্বনাতন দীননাথ দীনবন্দো।" বলে হাঁক দিতেই সোনাতন থাতাপি মশায় ঘরে ঢুকে বললে 'কর্তা ডাকছেন?'

'আরে তোরে ডাকবো কেন? হঠাৎ শ্বশুর বাড়ির স্বপন দেখে ডরিয়ে উঠেছি।

সোনাতন একথা শুনে বলে তবে যে কর্তা শুনতে পাই লোকে বলে থাকে—অন্তরে খেজো হৃৎমাঝে হায় শশুর মন্দির! তার নামে কর্তা কেন অস্থির?

তখন কর্তা জানালেন—সে তুমি বুঝবে না. সেটা শ্বশুর বাড়ি নয়, আমায় শ্বশুরে বাড়িতো নয়—একটা হানাবাড়ি।"

তারপর রামপাখির মালসাভোগ চড়িয়ে দেন। জীবন গোঁসাই, জগদ্রাম মুনশী, চোলারাম চণ্ডু আর যাগণিশু সবাই মিলে এক একটি কারখানা বলেন—আর হপ্তায় নয়টা করে মালসা পোড়াতে-পোড়াতে দিন ছোট, রাত বড় হয়ে উঠলো। তখন মালসা এবং রামপাখীরও দর এত চড়ে গেল যে, তখন আর বৈঠক বসানো অসম্ভব হয়ে পড়ল তখনই খতম হল হানাবাড়ির কারখানা।

হানাবাড়ির কারখানার মধ্যে যে ছড়াগুলি আছে সেগুলিও অপূর্ব।

'রং বেরং' ও 'একে তিন তিনে এক' গ্রন্থ দুটি খুরবো রচনার সংকলন। তার মধ্যে আছে ছড়া আর মজাদার গল্প। উর্দু হিন্দি মিশ্রিত এক অদ্ভুত রস সৃষ্টি। এই ধরনের রচনাও অবনীন্দ্রনাথ ১৯২০-২১-এ লিখতে সুরু করেন।

অবনীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনা আজো যেমন প্রকাশিত হয়নি, তেমনই কথা শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে আজো আমরা আবিষ্কার করিনি। তাঁর রচনাবলী শুধু শিশু পাঠ্য নয়, সকল বয়সের সর্বজন পাঠ্য।

আমরা কালজয়ী কথাটি ইদানীং সব ব্যাপারেই ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের রচনাবলী প্রকৃতই কালজয়ী। তিনি যে পথ প্রদর্শন করে গেছেন, সে পথে নতুন পথিকের আজো যাত্রা সুরু হয়নি।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) চিত্রশিল্পে উজ্জ্বল তারা। সেই সঙ্গে বাংলা গদ্যভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে একটি অবিস্মরণীয় নাম। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের ছায়ায় গদ্যলেখক অবনীন্দ্রনাথের কীর্তি কিছুটা আবৃত।

একথা অবশ্যস্বীকার্য, দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর সাহিত্য সাধনায় অবনীন্দ্রনাথ যে কীর্তি রেখে গেছেন, গদ্যরীতি ও বাক্-রীতি নিয়ে যে বিচিত্র পরীক্ষা করেছেন, মহৎ চিত্রশিল্পীর স্বভাব নিয়ে গদ্যে সূক্ষ্ম কারুকার্য, কবিত্বগুণ ও চিত্রধর্মিতা আরোপ করে যে অমেয় ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেছেন, তা আপন মহিমায় বর্তমান। ভারতী-কল্লোল-কালি-কলম গোষ্ঠীর লেখকদের উপর অবনীন্দ্র-গদ্যের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। ন্যারেশনের আদর্শ ভাষা ('রাজকাহিনী'র ভাষা) সৃষ্টিতে তাঁর কৃতিত্ব অবশ্যস্বীকার্য। সেই সঙ্গে স্বীকার্য, অবনীন্দ্রনাথ এমন একজন গদ্যশিল্পী যিনি নিজের সৃষ্ট ভাষারীতিকে বারবার অতিক্রম করে গেছেন।

১৮৯৫ থেকে ১৯৫১—অবনীন্দ্রনাথের জীবিতকালে ২১টি বই, মৃত্যুর পর আরো দুটি দশেক বই প্রকাশিত হয়েছে। শকুন্তলা (১৮৯৫) ও ক্ষীরের পুতুল (১৮৯৬), রাজকাহিনী (১৯০৯।১৯৩১), ভূতপতরীর দেশ (১৯১৫) ও খাতাঞ্চির খাতা (১৯২১), আলোর ফুলকি (১৯১৯) ও বুড়ো আংলা (১৯৪১); নালক (১৯১৬) ও পথে-বিপথে (১৯১৯); বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী (১৯২১-২৯); ঘরোয়া (১৯৪১), জোড়াসাঁকোর ধারে (১৯৪৪); ও আপন কথা (১৯৪৬); মারুতির পুঁথি (১৯৫৬) ও চাঁই বুড়োর পুঁথি (১৯৫৮); একে তিন তিনে এক (১৯৫৪) ও রং-বেরং (১৯৫৮); লম্বকর্ণ পালা (১৯৪৯): অবনীন্দ্রনাথের গদ্যভাষার বিচিত্র উদাহরণ।

অবনীন্দ্র-গদ্যের দুটি প্রধান গুণ—চিত্রধর্মিতা ও আলাপচারিতা। এ দুটি গুণ তিনি প্রতিভাবলে আয়ত্ত করেছিলেন, এ সত্য আমাদের মেনে নিতে হয়। কারণ, গোড়া থেকেই তিনি পরিণত সিদ্ধশিল্পী।
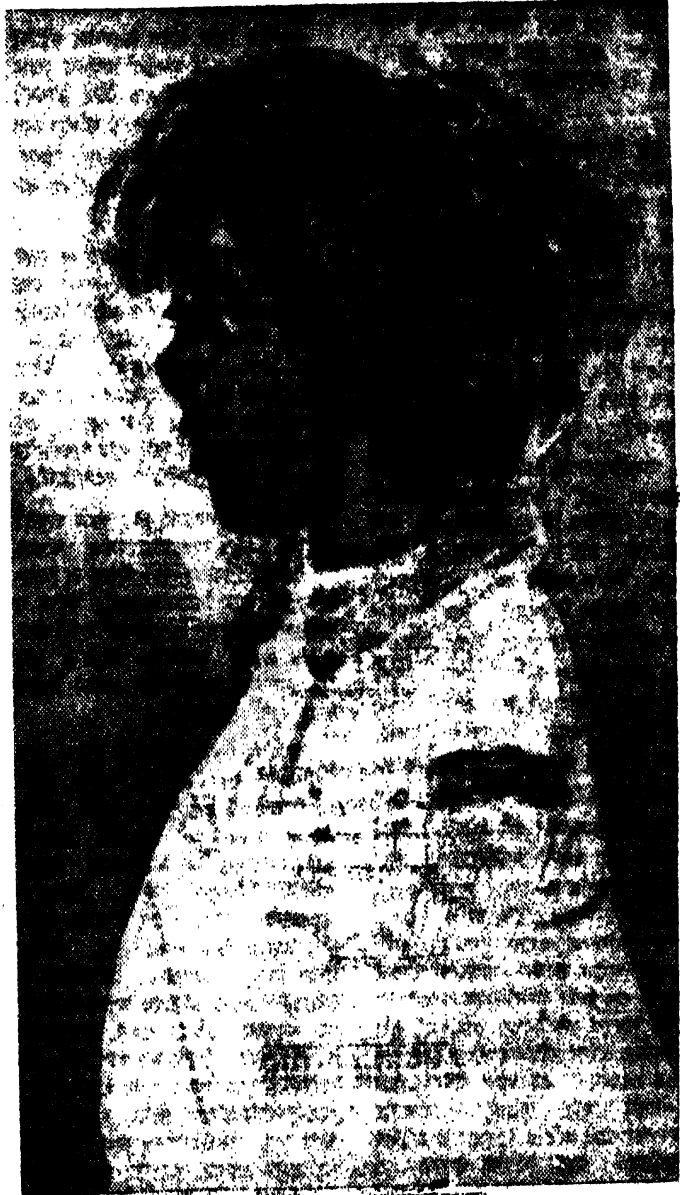
ধীরা দেবী। অবনীন্দ্রনাথ অংকিত

অবনীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার সূত্রপাত হয় শকুন্তলা'য় (১৮৯৫), যা বাল্য-গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত। সে কাহিনী তিনি নিজেই লিখেছেন :

'একদিন আমায় উনি (রবীন্দ্রনাথ) বললেন, 'তুমি লেখো না, যেমন করে তুমি মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখো।' আমি ভাবলুম—বাপ্‌রে, লেখা—সে আমার দ্বারা কস্মিনকালেই হবে না। উনি বললেন, 'তুমি লেখোই না; ভাষায় কিছু দোষ হয় আমিই তো আছি।' সেই কথাতেই মনে জোর পেলুম। একদিন সাহস করে বসে গেলুম লিখতে। লিখলুম এক ঝোঁকে একদম শকুন্তলা বইখানা। লিখে নিয়ে গেলুম রবিকাকার কাছে, পড়লেন আগাগোড়া বইখানা, ভালো করেই পড়লেন। শুধু একটি কথা 'পল্বলের জল', ওই একটি মাত্র কথা লিখেছিলেম সংস্কৃতে। কথাটা কাটতে গিয়ে 'না থাক' বলে রেখে দিলেন। আমি ভাবলুম, বাঃ। সেই প্রথম ভাবলুম, আমার বাংলা বই লেখবার ক্ষমতা আছে।'

(জোড়াসাঁকোর ধারে)

এই বিবরণের মধ্যেই অবনীন্দ্র-গদ্যের শিল্পরহস্য নিহিত। যখন 'শকুন্তলা' লেখেন তখন আঁকছেন রাধা-কৃষ্ণ চিত্রাবলী। ভারতীয় চিত্রকলার রীতি-পদ্ধতি তখন তাঁর আয়ত্তে। ভাব দেবার—শিল্পে প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্রটি অবনীন্দ্রনাথের হাতেই ছিল। অবনীন্দ্রনাথের নিজের কথায়, 'শব্দের সংগে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য যদি হোলো উচ্চারিত ছবি, তবে ছবি হোলো রূপের রেখায় রঙের সঙ্গে কথাকে ছড়িয়ে নিয়ে রূপকথা।'

অবনীন্দ্র-ভাষা বিচারে আমাদের মুখ্য অবলম্বন এই সংজ্ঞার্থ—'শব্দের সংগে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে' রচিত বাক্য হল 'উচ্চারিত ছবি'। মুখের ভাষা ও ছবি ভাষার অদ্বৈতবোধের কথা অবনীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলীতে। আর স্মরণযোগ্য 'বুড়ো আংলা'য় তাঁর আত্মপরিচায়ক উক্তি : 'ওবিন ঠাকুর, ছবি লেখে।' আমাদের মনে রাখতে হয়, অবনীন্দ্রনাথ আগে চিত্ররচনায় দক্ষতা অর্জন করেছেন, তারপরে ভাষারচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। চিত্রের পথ ধরেই তিনি ভাষারাজ্যে এসেছেন। এই ঘটনার প্রভাব অবনীন্দ্র-গদ্যে প্রকট। অবনীন্দ্রগদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য চিত্রধর্মিতা—রেখার সূক্ষ্ম কারুকার্য, বর্ণের বিচিত্র বাহার, রং ও রেখার নিপুণ আলিম্পন এখানে স্পষ্ট। আর্ট-স্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবের দেওয়া আতসী কাচ দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন বকের পালকে কত সূক্ষ্ম কারুকার্য, তাঁর গদ্যভাষায় আমরা দেখি কত সূক্ষ্ম কাজ, কত রঙের সমাবেশ। এই ঘটনা ঘটে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে। তার আগেই বেরিয়েছে 'শকুন্তলা' আর ক্ষীরের পুতুল'। এ দুটিতে ভাষাচিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ঋজুতা ও সরলতা। তখন তিনি রাধাকৃষ্ণ চিত্রাবলী আঁকছেন। তখনকার ভাষাচিত্রের ব্যঞ্জনা সহজের ও সরল সুষ্ঠুতার ব্যঞ্জনা।

'ঘোর গরমের দিনে ভিজে কাদায় পড়ে ঠাণ্ডা হচ্ছিল, তাড়া পেয়ে শিং উঁচিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে গহন বনে পালাতে লাগল। হাতী শুঁড় তুলে জল ছিটিয়ে গা ধুচ্ছিল, শালগাছে গা ঘষছিল, গাছের ডাল ঘুরিয়ে মশা তাড়াচ্ছিল, ভয় পেয়ে শুঁড় তুলে, পদ্মবন দলে, ব্যাধের জাল ছিঁড়ে পালাতে আরম্ভ করলে। বনে বাঘ হাঁক্‌কার দিয়ে উঠল, পর্বতে সিংহ গর্জন করে উঠল, সারা বন কেঁপে উঠল।' (শকুন্তলা)

ছোট ছোট সরল বাক্য একটি দীর্ঘ বাক্যের বিধৃত। বিশেষণের অনুপস্থিতি, ক্রিয়াপদের সরলতা, বর্ণনার ঋজুতা এখানে লক্ষ্যণীয়। মনে হয় তুলির টানে আঁকা, প্রতিটি রেখা স্পষ্ট, প্রতিটি টান অব্যর্থ আর সমস্ত ছবিটা জীবন্ত।

এরপরই তিনি মুঘল চিত্রকলার ডীটেল ও মিনিয়েচার কাজ সম্পর্কে অবহিত হলেন (১৮৯৭)। তখন ভাষা হয়ে উঠল চিত্রধর্মী ন্যারেশনে এলো ছবির গতি ও ভঙ্গি। বের হল 'রাজকাহিনী'। ভাষায় এলো লাবণ্য, সৌকুমার্য; ইতিহাসের বস্তুতে সঞ্চারিত হল রূপকথার মায়া।

'বাদশা ঘোড়া থামিয়ে বাজের পা থেকে সোনার জিঞ্জীর খুলে নিলেন তখন সেই প্রকাণ্ড পাখি বাদশার হাত ছেড়ে নিঃশেষে অন্ধকার আকাশে উঠে দুখানা কালো ডানা ছড়িয়ে দিয়ে শিকারীদের মাথার উপরে একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল, তারপর একেবারে তিনশো গজ আকাশের উপর থেকে, এক টুকরো পাথরের মতো সেই দুটি শুকশারীর মাঝে এসে পড়ল।' (পদ্মিনী। রাজকাহিনী)

আজ থেকে সাতষট্টি বছর আগে ভারতী পত্রিকার ১৩১১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় এই কাহিনী প্রকাশিত হয়। আজও তা আধুনিক। কী ভাবে নিরাভরণ ঋজু বর্ণনা ও বিবরণের মধ্য দিয়ে চিত্রসৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায়, তা এখানে লক্ষ্যণীয়। ধ্বনি ও ছন্দ অবলম্বন করে অবনীন্দ্রনাথ এখানে চিত্রময় জগৎ সৃষ্টি করেছেন।

অবনীন্দ্র-গদ্যের দ্বিতীয় প্রধান গুণ —আলাপধর্মিতা। এই গুণ গোড়া থেকে অবনীন্দ্র-রচনায় অনুস্যূত। পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যনায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, দুজনের প্রভাব অস্বীকার করে অবনীন্দ্রনাথ মুখের ভাষাকে, কথ্যস্পন্দ গদ্যকে শিল্পরূপ দিয়েছিলেন। সাধু ও চলতি ভাষার কৃত্রিম বাধা উল্লঘনে তিনি ঈশ্বর গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কৃতিত্বের অংশীদার। সে-গুণ শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী বা বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলীতে নয়, নালকে ও পথে-বিপথে গ্রন্থে সুপ্রতিষ্ঠিত। পথে-বিপথের ভাষার ভিত্তি রাজকাহিনীর ভাষা আর পথে-বিপথের ভাষা পরবর্তী স্মৃতিচারণ গ্রন্থের (ঘারোয়া, জোড়াসাঁকোর ধারে, আপন কথা) ভাষায় ভিত্তি। ন্যারেশনের ভাষাকে অবনীন্দ্রনাথ স্মৃতিচারণার ভাষারূপে ব্যবহার করলেন। এখানে আলাপধর্মিতা-গুণের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। রাজকাহিনীর ন্যারেশনের ভাষার অমেয় শিল্পসম্ভাবনা নোতুন করে পরীক্ষিত ও শিল্পসাফল্যে প্রতিষ্ঠিত হল পথে-বিপথে, যা আসলে স্মৃতিচিত্র ভ্রমণগ্রন্থ নয়। অন্তরঙ্গ মাধুর্যময় হার্দ্য ভাষারূপে পথে-বিপথে-র ভাষার প্রতিষ্ঠা।

তথাকথিত সাধু গদ্য ও চলতি গদ্যের বিরোধ বা সমস্যাকে গদ্যশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাই পথে-বিপথে গ্রন্থে। একথা স্মর্তব্য, অবনীন্দ্রনাথ সাধুক্রিয়াপদিক ভাষা মাত্র দুবার—'দেবীপ্রতিমা' গল্পে, ভারতী শ্রাবণ, ১৩০৫, আর পথে-বিপথে-র 'সিন্ধুতীরে' অধ্যায়ে কোনার্ক-মন্দির-বর্ণনায়—ব্যবহার করেছেন। আসলে সাধুক্রিয়াপদিক গদ্যে অবনীন্দ্রনাথের কোনো আগ্রহ ছিল না। এবং ক্রিয়াপদের তথাকথিত সাধুরূপের মোহে অবনীন্দ্রনাথ নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি।

পথে-বিপথে গ্রন্থের ভাষাচিত্রে—রাত্রিশেষে পূর্ব আকাশে আলোর প্রথম কাঁপনের চিত্রে—অবনীন্দ্রনাথ ক্রিয়াপদের সমস্যাকে অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছেন :

'একটুখানি আলোর আঘাত, নিশীথ-বীণায় সোনার তারের একটুখানি তীব্র কম্পন উষার অচঞ্চল শিশির, তার মাঝখানে একটিবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছি নূতন দিনের দিকে মুখ করে। পৃথিবীর পূর্বপার পর্যন্ত অনেকখানি অন্ধকার এখনো রাশীকৃত দেখা যাচ্ছে। কৃষ্ণসার চর্মের মতো একটি কোমল অন্ধকার, তারই উপরে আলোর পদক্ষেপ ধীরে ধীরে পড়ছে। সম্মুখে দেখা যাচ্ছে একটি পদ্মের কলিকা জলের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে; যেন ভূদেবী বিশ্বদেবতাকে নমস্কার দিচ্ছেন।' (গিরিশিখরে, 'পথে-বিপথে')

ক্রিয়াপদের যথাসম্ভব বিলুপ্তি, তৎসম শব্দ নির্ভরশীলতা, তদ্ভব শব্দ ও ইডিয়মের নিপুণ ব্যবহার এখানে পাই। সেই সংগে পাই চিত্রভাষা ও ধ্বনিভাষার সমীকরণ।

পথে বিপথের আগেই প্রকাশিত হয় নালক। গোড়াকার সহজ সরল গদ্য, তার সংগে যুক্ত হয়েছে চিত্রধর্মিতা ও আলাপধর্মিতা। নেই দীর্ঘায়িত বাক্যের জটিলতা ও ক্রমান্বিত অন্তর্বাক্যের পল্লবিত বিস্তার, যা আছে ভূতপতরীর দেশ ও খাতাঞ্চির খাতায়। আছে ছবির মতো স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ভাষাচিত্র।—

'সন্ধ্যাবেলা। নীল আকাশে কোনোখানে একটু মেঘের লেশ নেই, চাঁদের আলো আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত নেমে এসেছে, মাথার উপর আকাশগঙ্গা এক টুকরো আলোর জালের মত উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত দেখা দিয়েছে। কেবল ঋষি গ্রামের পথ দিয়ে গেয়ে চলেছেন 'নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়'; মায়ের কোলে ছেলে শুনছে 'নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়'। ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মা শুনছেন 'নমো নমো'; বুড়ি দিদিমা ঘরের ভিতর থেকে শুনছেন

'নমো'; অমনি তিনি সবাইকে ডেকে বলছেন —'ওরে নোমো কর, নোমো কর।'

সমস্ত বিবরণটি শিল্পিত গদ্যে পবিত্র ঘন্টাধ্বনির মতো বেজে উঠছে।

ফ্যান্টাসি বা অতিকল্পনার রাজ্য দুখানি বই 'ভূতপতরীর দেশ' ও 'খাতাঞ্চির খাতা'। এ দুয়ের গদ্যও ফ্যান্টাসির গদ্য— যার সৃষ্টি অতি দুরূহ কর্ম। অবনীন্দ্র-গদ্যের সারল্য ও চিত্রধর্মিতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কলমের মুখে আজগুবি ছবি-আঁকার ভাষা। চেনাশোনার বাইরে তার নিরুদ্দেশ যাত্রা, অসংলগ্নতা আর অসম্ভবের রাজ্যে তার অভিযান। এই ফ্যান্টাসি-ভাষার মূল উপাদান দীর্ঘায়িত বাক্য—ক্রমান্বিত অন্তর্বাক্য (পেরেনথিসিস)। এর সাহায্যে তিনি গড়ে তুলেছেন অসংলগ্ন ছায়াছবির মতো দ্রুতাবলীয়মান ভাষাচিত্রের মিছিল। ছবি ও সংকেতের আলো-আঁধারিতে ভাষা হয়ে উঠেছে ব্যঞ্জনাগর্ভ।

'দেখছি আলোটা ক্রমে এ-গাছ সে-গাছ ক'রে ঘুরে বেড়াতে লাগল; তারপর আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে এল। সেই সময় দেখি পূর্ণিমার চাঁদের মতো প্রকাণ্ড একটা কাঁচের গোলা মাঠের উপর দিয়ে বোঁ বোঁ করে গড়িয়ে আসছে—যেন একটা মস্ত আলোর ফুটবল।......

গেছি, পাল্কিসুদ্ধ গোলাটার ভিতরে ঢুকে গেছি। হাঁড়ির ভিতরে গাছের মত আর পালাবার জো নেই। একেবারে গড়িয়ে চলেছি.—বন্‌বন্ করে লাটিমের মত ঘুরতে ঘুরতে। সে কি ঘুরুনি! মনে হল আকাশ ঘুরছে, তারা ঘুরছে, পৃথিবী ঘুরছে, পেটের ভিতর আমার মাসির মোয়াগুলোও যেন ঘুরতে লেগেছে। কখনো মাঠের উপর দিয়ে, কখনো গাছের মাথা ডিঙিয়ে, গোলাটা সাদা খরগোসের মত লাফিয়ে গড়িয়ে, কখন জোরে, কখন আস্তে আমাকে নিয়ে ছুটে চলেছে।' (ভূতপতরীর দেশ)

অতিকল্পনার উপযোগী বাহন এই গদ্যভাষা—তার গতি দীর্ঘায়িত বাক্যের পথে, অন্তর্বাক্যের অসংলগ্ন ছায়াছবির পথে।

অবনীন্দ্র-গদ্যের আরেক নিদর্শন 'আলোর ফুলকি'। এতে পাই শকুন্তলা-ক্ষীরের পুতুলের সরল কবিত্ব, রাজকাহিনীর ন্যারেশনের শব্দচিত্রময় ঋজুতা, পথে-বিপথে ও নালকের ছন্দ-চিত্রময় বর্ণনামাধুর্য। এর ভিত্তি ছড়ার সরল সৌন্দর্য কিন্তু তা নিরাভরণ নয়, পরন্তু সূক্ষ্ম কারুকার্যসমন্বিত. লিরিক-আবেগ ও লাবণ্যমণ্ডিত, কখনো বা নির্ভার লালিত্য। আলোর ফুলকিতে ধ্বনি মূল মাধ্যম; শব্দের ভূমিকা ধ্বনির অনুগত হয়ে, তাকে ছাড়িয়ে নয়।

'পায়রা রেগে গলা ফুলিয়ে বলে উঠল, 'বোকো না, বোকো না, মোটে না, বোকো না।' ঠিক সেই সময় বেড়ার উপরে ঝুপ করে এসে কুঁকড়ো বসলেন। পায়রা দেখলে মানিকের মুকুট আর সোনার বুক-পাটায় সেজে যেন এক বীরপুরুষ এসে দাঁড়িয়েছেন। সন্ধ্যার আলো তাঁর সকল গায়ে পলকে-পলকে রামধনুকের রং ধরে ঝিকমিক ঝিক্‌মিক করছে, দৃষ্টি তাঁর আকাশের দিকে স্থির। মিষ্টি-মধুর সুর তিনি ডাকলেন, 'আ-লো। আ-লো। আ-লো।' তারপর তাঁর বুকের মধ্যে থেকে যেন সুর উঠল, 'অতু-ল ফু-উ-ল। আলোর ফুল'। আলো, প্রাণের ফুলকি আলো, চোখের দৃষ্টি আলো, এসো ফুলের উপর দিয়ে, এসো পাতায় লতায় ফুলে ঝিক্‌মিক। আলোতে ঝিক্‌মিক—দেখা দিক, সব দেখা দিক, ভিতরে থাক তোমার প্রভা, বাইরে থাক তোমার আভা. একই আলো ঘিরে থাক্ শত দিকে শত ধারে, অনেক আলোর এক আলো, অনেক দলের এক' মা।......বনের তলায় সোনার লিখা, সবুজ ঘাসে সোনার চুমকি, আলোর ফুলকি, অ-তু-উ-ল অমূল আলো।' (আলোর ফুলকি)

শব্দচিত্র ও ধ্বনিচিত্রের সমীকরণে, শব্দ-ভাষা ও ধ্বনিভাষার সমীকৃত শিল্পসৃষ্টিতে অবনীন্দ্রনাথের সামর্থ্য এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত।

চিত্রময় ধ্বনিময় স্বপ্নময় ভাষা অবনীন্দ্র-গদ্যের ঐশ্বর্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ন্যারেশনের আদর্শ রাজকাহিনীর ভাষা, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চিত্রগুণ। নালক আর পথে-বিপথে এই ভাষারই সহজ অন্তরঙ্গ রূপ। এই পথ ধরেই এসেছে বৈঠকী ভঙ্গিতে লেখা ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা—ঘরোয়া জোড়াসাঁকোর ধারে-আপন কথা। এর ভাষা অন্তরঙ্গ, মাধুর্যময়, আলাপচারী। সদ্য অতীত কালের বর্ণনায় অবনীন্দ্রনাথ সঞ্চার করে দিয়েছেন স্বপ্নের সূক্ষ্মতা ও মাধুর্য, আর রূপকথার বস্তুভারহীন লাবণ্য। ঘরোয়া-তে রাজেন মল্লিকের প্রাসাদের বর্ণনা আর জোড়াসাঁকোর ধারেতে সুরধুনী গঙ্গার বর্ণনা এর পরিচায়ক। তা ভোলা যায় না, ভোলবার নয়।

অবনীন্দ্র-গদ্যের শেষ অধ্যায় কথকতা-ভঙ্গির গদ্য। এখানে তিনি গদ্যপদ্যের নির্বিরোধ সাধনে প্রয়াসী। একে তিন তিনে এক, মারুতির পুঁথি, চাঁইবুড়োর পুঁথি, রং-বেরং, লম্বকর্ণ পালা—প্রমুখ যাত্রাপালা এর অন্তর্ভুক্ত।

অবনীন্দ্রনাথ ছোটবেলায় মিশেছিলেন সমাজের নানা স্তরের মানুষের সঙ্গে—দাস-দাসী, দারোয়ান কোচোয়ান, লাঠিয়াল বরকন্দাজ, খানসামা বাবুর্চি, খালাসী মাল্লা. খাতাঞ্চি নায়েব, বহুরূপী কথকঠাকুর। ঠাকুরবাড়ির উচ্চ কোটির জীবনযাত্রা থেকে যাত্রাপালার প্রেরণা আসে নি, এসেছিল লোকজীবন থেকে। এইসব যাত্রাপালার দেশি কথকতাশৈলী। এই কথনকার, অবনীন্দ্রনাথ বহুযত্নে আয়ত্ত করেছিলেন, তাকে চারু-শিল্পের মর্যাদা দিয়েছিলেন। গ্রাম্য পরস্তাব, মেয়েলি গল্প, কিস্‌সা, দস্তান শুনে শুনে অবনীন্দ্রনাথের কথকতার শৈলী আয়ত্ত করেছিলেন। গদ্যশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের সকল কৌশল যুক্ত হল কথনকারুতে, সৃষ্টি হল যাত্রাপালা। আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়ে স্বাভাবিক নৈপুণ্য, চিত্রাঙ্কন-নৈপুণ্য, ছবিতে ভাব দেখাবার সামর্থ্য—সব মিলিয়ে এই ভাষারীতি।

কথকঠাকুরদের পাঠে অনায়াসলক্ষ্যণীয় যে তাতে পাঠের সঙ্গে আছে ছড়া, আবৃত্তি, কথোপকথন, লাচাড়ি বা পয়ার ছন্দের গান। সেই সঙ্গে যুক্ত আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়—অঙ্গভঙ্গি, করমুদ্রা, ঘূর্ণিত নয়ন ও মুখমণ্ডল-পেশীর চালনা, কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি ও স্বরক্ষেপ। তার ফলে গড়ে ওঠে কথক ও শ্রোতার অন্তরঙ্গতা। অবনীন্দ্রনাথের কথকতাভঙ্গিময় যাত্রাপালায় কথকতার এইসব গুণ বর্তমান।

এর উপাদান প্রাকৃত ভাষা উপভাষা, দেশী বিদেশী শব্দ, কৌতুক ও রঙ্গ।

'ভাব লেগে চাঁইবুড়ো যেন মূর্চ্ছিত হন, এমনি ভাব দেখিয়ে আকাশে চক্ষু তুলে বল্লেন—'ঐ তিনি এসে গেছেন—

মারুতির পুঁথির পাঠ হইবে যে স্থানে
তাঁহার উদয় হইবে সে-স্থানে।।'

সবাই আকাশের পানে চায়—মাথার পরে চাঁদোয়া অল্প দুলছে, পেঁপে পাতার ছাতা যেমনি—হেলে না দোলে না। সকলে একটু বিচলিত দেখে চাঁইবুড়ো বল্লেন—'যদি বা তিনি এসে থাকেন তো সূক্ষ্ম শরীরে শ্রোতাদের মধ্যে নিশ্চয় এসেছেন। নিজের প্রসঙ্গ শ্রবণ করতে তো তিনি প্রকাশ্য হতে পারেন না। অতএব বিলম্বেনালম্—'

(মারুতির পুঁথি)

গদ্যপদ্যের নির্বিরোধ সাধনে অবনীন্দ্রনাথের প্রযত্ন গোড়া থেকেই আছে। শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, ভূতপতরীর দেশ, নালক, আলোর ফুলকি, বুড়ো আংলা, জোড়াসাঁকোর ধারে, মাসি, চাঁইবুড়োর পুঁথি, মারুতির পুঁথি, একে তিন তিনে এক—সর্বত্রই তার নিদর্শন মিলে। শেষ পর্যায়ে তা প্রকট। রূপকথা, উপকথা, খোশগল্প, ছড়া, কথকতা, যাত্রাপালা—সর্বত্রই অবনীন্দ্রনাথ এই পরীক্ষা করেছেন। তার সামান্য নিদর্শন উদ্ধার করে গদ্যশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের বিচিত্র গদ্য সাধনার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ছেদ টানি—

এস করি হিড়িকিড়ি।
হাঁড়ি পেট নখে চিঁড়ি!—করি ফাঁক।।
সেই পথে প্রাণপাখি। বাহারে যাক।
—তিড়িবিড়ি।

ঝট্ হোক কাজ সাফ।।

ঢুকে যাক্ লাফালাফ।।—আড়ি ভাব।
দন্ত কিড়িমিড়ি।

আমরা এখানে পড়ে থাকি।
দেশে উড়ে যাক প্রাণপাখি।
—যেখানে তার ইস্তিরী।
বসে চিবোচ্ছে কাঁচাপাকা তিন্তিড়ী।।
(মারুতির পুঁথি)

বাংলা গদ্যছন্দে অবনীন্দ্রনাথ

সনৎকুমার গুপ্ত

বাংলা গদ্যছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরম্ভ হয়। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' কাব্যের ভূমিকায় স্বয়ং যা বলেছেন ঃ

'গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্য শ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না। মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম। তিনি স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু চেষ্টা করেন নি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি, বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।

তারপরে আমার অনুরোধক্রমে একবার অবনীন্দ্রনাথ এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমার মত এই যে, তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমায় মধ্যে এসেছিল, কেবল ভাষা-বাহুল্যের জন্যে তাতে পরিমাণ রক্ষা হয় নি।'

রঙ-তুলিকে বিশ্রাম দিয়ে, শুধু কালির আঁচড়ে অবনীন্দ্রনাথ যে লেখাগুলি প্রকাশ করেছিলেন, এই রচনাবৈচিত্র্যের মধ্যে গদ্য-ছন্দের কয়েকটি রচনা বাংলা সাহিত্য আলোচনার অবকাশ দিয়েছে।

বাংলা গদ্যছন্দ সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব মতবাদ কি ছিল তা কবি সাবিত্রী-প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অভ্যুদয়' প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৫০ সালে প্রকাশিত হয়। এই মূল্যবান রচনাটি এ-যাবৎ কোনো সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। এমন কি তাঁর কোনো গ্রন্থ সংগ্রহেও প্রকাশিত হয় নি। এটি পত্রাকারে প্রকাশিত হয় 'অভ্যুদয়' পত্রিকায়। লেখা হয় প্রীতিভাজন মোহনলাল ও শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে। ভবিষ্যতে সংগীত গবেষণাকারীদের কাজে লাগতে পারে, এ জন্য রচনাটি যথাযথ মুদ্রিত হলো ঃ

ভাই—মোঃ—শোঃ—

তোমরা বাংলাতে ছোটদের পদ্যলেখায় এ আমলে নাম কিনেছ। সেই জন্যেই তোমাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে ঃ বলি —বিদ্যাসাগর তাঁর 'কথামালা' গদ্যতে লিখেছিলেন না পদ্যতে না গদ্যছন্দতে—এটি তো তোমাদেরই ঠিক করে দিতে হয়। আমি তো দেখছি ছেলেবেলায় কথামালাকে গদ্য বলেই পড়ে গেছি কিন্তু এখন দেখি ওটা পুরো গদ্যছন্দে লেখা কিন্তু গল্পের আর্ট প্রয়োগ করে গেলেন ওটার ওপরে কথামালা-রচয়িতা। দু-একটা গল্প সামান্য কলম চালিয়ে প্রায় কথামালার রূপটা ছন্দে বজায় রেখে গদ্য-ছন্দের স্বরূপটা প্রকাশ করে দিলেম, এখন তোমরা কি বল এ সম্বন্ধে।

(এক)

"মধুর কলসী"

এক দোকানে মধুর কলসী
উলটিয়া পড়িয়া
চারিদিকে মধু ছড়াইয়া দিল।
মধুর গন্ধ পাইয়া
ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি আসিয়া
সেই মধু খাইতে লাগিল
নড়িল না!—
যতক্ষণ পড়িয়া রহিল
এক ফোঁটা মধু!...

আবার বলি তবে একটা গল্প, সেটাও গদ্য-ছন্দে লেখা।

(দুই)

"কুকুর ও প্রতিবিম্ব"

মাংসের এক খণ্ড মুখে এক কুকুর
নদী পার হইতেছিল।
নির্মল জলে প্রতিবিম্ব তাহার পড়িয়াছিল,
অন্য কুকুর।

মনে মনে লোভে পড়িয়া
প্রতিবিম্বকে অন্য কুকুর

স্থির করিয়া
ধরিতে গেল কুকুর মুখ বিস্তৃত করিয়া
অলীক মাংসখণ্ড।

তখনি আপনার মুখের আহার সত্যকার
জলে পড়িয়া স্রোতে পড়িয়া
পর পার চলিয়া গেল বহুদূরে।

(তিন)

"সর্প ও কৃষক"

শীতকালে, অতি প্রত্যুষে, কৃষক সে
ক্ষেত্রে যাইতে, দেখিতে পাইল—
পথের ধারে হিমে মৃতপ্রায় একটি সর্প!
তখন সে ঐ সর্পকে উঠাইয়া
বাটিতে আনিয়া
আগুনে সেঁকিয়া
সজীব করিল।

•

এইরূপে সর্প
সজীব হইয়া
উঠিয়া কৃষকের সন্তানকে
সম্মুখে পাইয়া
দংশন করিতে উদ্যত হইল।

*

কুপিত কৃষকের
হস্তস্থিত কুঠারের
প্রহারের আঘাতে
সর্পের মস্তক—
দ্বিখণ্ডিত হইল।

এখন কথা হচ্ছে, 'শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস ঠাকুরকে বঙ্গভাষায় আদি কবি বলিয়া সকলে স্বীকার করেন। ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে, চণ্ডীদাস ঠাকুর শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।' একটা ছত্র ঠিক গদ্য, এর মধ্যে ছন্দ ধরানো শক্ত। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মালা এ জিনিস নয়। এই ভাবের গদ্যের দিক দিয়েও যায় নি কেন না বিদ্যাসাগর শিশুদের জন্য লিখতে চেয়েছিলেন কাজেই ছন্দের সাহায্য নিতেই হয়েছিল তাঁকে। না হলে কথামালা মালা না হয়ে হত শিশু-পাঠ্য একখানা শক্ত বই কি না সেইটে তোমরা বিচার করে বল। সাহিত্যিকদের কাছে গদ্য-ছন্দ লিখে প্রথম তাড়া খেয়েছি আমি, কাজেই আমার ঢের পূর্বে যে পথ মহাজন দেখিয়ে গেলেন, এটা জানতে পেরে আমার সাহস বাড়লো এবং দুঃখ কমলো জেনে তোমরা দুজন অন্তত খুসি হবে আর কেউ হোক বা নাই হোক কিছু আসে যায় না।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জনক রাজার ধানক্ষেত

মহাশ্বেতা দেবী
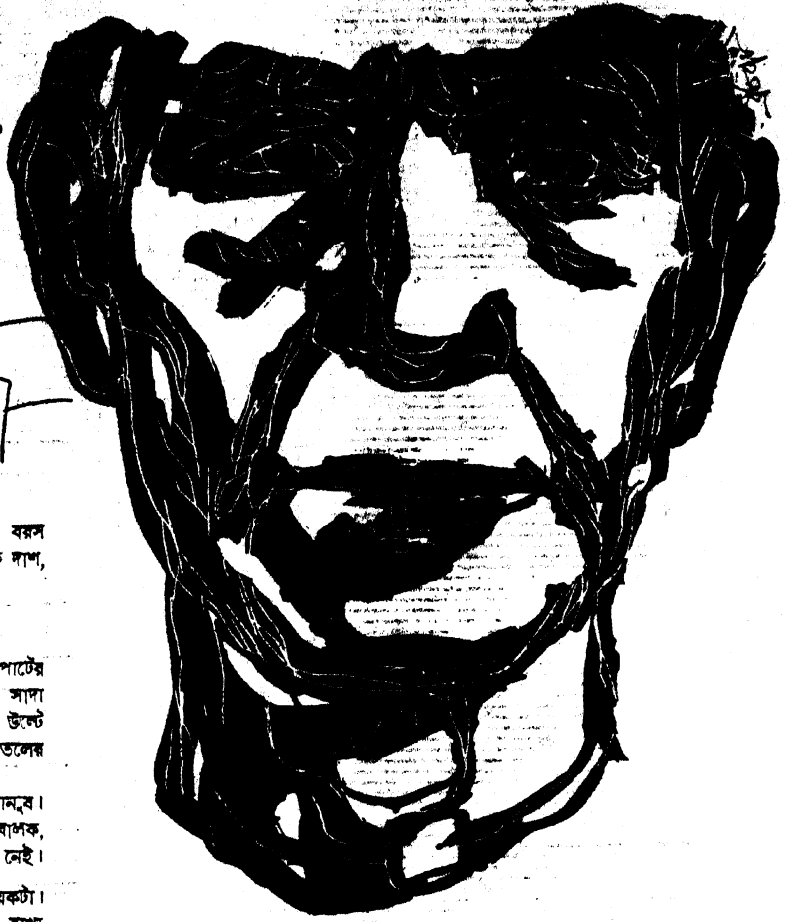
লোকটাকে দেখলে মনে হয় বয়স পঞ্চাশ হবে কিন্তু ও বলল নাম জনক দাশ, বয়স তিন কুড়ি দশ।

সত্তর?

আজ্ঞা।

লোকটার বুক সিন্দুকের কপাটের মত, কালো, চওড়া, তাতে সাদা সাদা লোম। কপালের চুল পেছন পানে উল্টে ফেলা। কাঁচা পাকা। গলায় একটা পেতলের তক্তি। কোমরে ধুতি, কাঁধে গামছা।

চারদিকে মানুষ, অগণিত মানুষ। ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, বুড়ি, জোয়ান, বালক, কাছারির মাঠে পা ফেলবার জায়গা নেই।

মাঠের ওপাশে চালা কয়েকটা। কলেরা রোগীদের আলাদা করে রাখা হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স ক'দিন ধরে চালা থেকে মানুষ তোলে আর হাসপাতালে, হেলথ সেন্টারে নেয়।

কান্না, হট্টগোল, বাসের হর্ন। মানুষ বাসে উঠছে, ক্যাম্পে যাচ্ছে, বাসে উঠছে, ক্যাম্পে যাচ্ছে।

বাবা তখন ওরা পোয়ালে আগুন দিল, নিরাপক্ষদের ধরে এনে শুওর খোঁচা করে মারল। তখন পাইলে বাঁচালি আর হেথা এসে ওলায় মরলি বাবা।

মায়ের কান্না। এখন কাছারির মাঠে মা রা অমন কাঁদে। বলে আর এট্টু মুখখানা দেখাও বাবা, নে যেওনা।

তাঁবুর সামনে লাইন, টিকে দেওয়া হচ্ছে। তাঁবুর সামনে লাইন, ওষুধ দেওয়া হচ্ছে।

জনক এই সব কিছুর দিকে আশ্চর্য নির্লিপ্ত চোখে তাকিয়েছিল। যেন এই জনস্রোত জলস্রোত। মধুমতীর স্রোত। এ পারে এসে সমুদ্রে পড়েছে। জনক যেন জাহাজের মালিম। বসে বসে দূর আকাশের তারা দেখে দিক ঠিক করছে। যেন ও জাহাজের পাঞ্জেরী। সমুদ্রের সবচেয়ে দূরের দিক সীমারেখার দিকে চেয়ে থাকাই ওর কাজ যেন।

জনক কাঠের কাঁকই দিয়ে মাথার চুল আঁচড়াচ্ছিল। হিন্দুস্থানের আকাশে বর্ষার মেঘ কালো, বাতাসে ঠাণ্ডা। এই মেঘ-গুলোকে জনক ওর যৌবনকালে বড় চিনত। তখন ওর জমি ছিল না, হাল লাঙল ছিল না। জনক তখন লখীন্দরের নৌকোর জলে জলে বনে যেত। সুন্দরী গাছ কাটত, গোলপাতা আনত।

জনকের যৌবনে নদীতে জল ছিল, সমুদ্রে মাছ। খেতে ধান হত, সব সময়ে সে ধানে জনক পালা দিতে পারে নি। জনক জানতনা তাতে কোন দুঃখ আছে। সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে, বিধির নিয়ম। জনক জানত ওরা বিছন তোলে, ধান রোয়, ধান কাটে, ওকরা লাগলে তামাকপাতার জল ছেটায়, হেমন্তে-আষাঢ়ে ধান কাটে আর সে ধানে পালা দেয় কুবের মল্লিকের উঠোনে। বিধির নিয়ম।

কিন্তু জনকের যৌবনকালে জনক সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আষাঢ়ের আকাশে মেঘ উঠে আসতে দেখেছে। সমুদ্রের জলের চেয়েও গাঢ় কালো মেঘ।

হাতীর মত পালে পালে উঠে ওরা আকাশ ঢেকে ফেলত।

আরো কত দেখেছে জনক। সমুদ্রের ওপার কামান গর্জাতে শুনেছে গুম গুম গুম। [illegible] [illegible] মাটির রাজা করা যেন কেড়ে নিয়েছিল। তাই প্রতাপ-রাজা গিয়ে জলের দেবতার সঙ্গে সমুদ্রের দখল নিয়ে যুদ্ধ করত।

কিন্তু যুদ্ধ বলতেই শুধু পবনের কথা মনে পড়ে।

যুদ্ধ করতে হবে, যুদ্ধ বোঝেন? আজ্ঞা, যুদ্ধ বোঝেন?

তুই বোঝ গা যা। যুদ্ধ করে গিয়েছে সাহেব গোরা, তখন তোর বাপ সা জোয়ান। এট্টা বোয়াল মাছের যথাকথ যেমন একা খায়। তোরা যুদ্ধ করবি? তোদের কি আছে, বন্দুক আছে? বন্দুক বিনে যুদ্ধ হয়?

আজ্ঞা, যুদ্ধ না করলে ওরা মোদের বাঁচতে দেবে না।

কোথা থেকে যুদ্ধের হাওয়া এসেছিল? নৈঋত থেকে? অগ্নি থেকে? ঈশান থেকে? জীবনভরে জনক আর কিছু জানে নি শুধু চাষ জেনেছে। কত কষ্টে জমি নেওয়া, সে জমি হাসিল করা। বৈশাখে মাটি ফাটা ফাটা, জ্যৈষ্ঠের মাটি তেষ্টায় হাঁ করা। বিষ্টি এসে সেই মাটিতে ঝাঁপ দিত। জনক তখন ওর সযত্নে আনজানো চাষাগুলো নিয়ে সেই মাটিতে নেমে পড়ে নি?

আজ্ঞা, আপনি কিছু বোঝেন না, শুধু চাষ বোঝেন।

তুই বোঝ না যা। কেন, চরণদাসের মেয়েতে মন ওঠে না? বিয়ে করালাম, সোমসার করগো যা পবন। ঐ কত্তার কত্তার আজ লেখহাটা। কাল মাগনা, শ্বশুর গাঁয়ে যেয়ে যেয়ে তুই মরতেছিল। যুদ্ধ করব। যুদ্ধ করে লড়াই গোরা। তুই জেমো চাষা, তুই যুদ্ধের কি জানিস রে?

আপনিও জান।

কিছু জানি না।

না তে ভোট দেওনি আপনি?

তা বলে যুদ্ধ করব বলিছি?

আপনি জান না।

তুই জান্ মেয়ে।

অনীম, অন্যের প্রশ্রয়ে জনক হাসত। জনকের মনে হত এসব ছেলেখেলা পবনের। ওর জমি আছে, হাল-লাঙল-বলদ সব আছে। মা বসুন্ধরা মাটির বাঁধন কেটে সন্তানকে মাটি ধরায়। তখন ধর মেয়ে সোমসারটা সে রক্তের জোলাটাকে হাত পেতে ধরে। তখন সোমসারটা মানুষের মা হয়ে যায়। বসুন্ধরাটা বাঁধনে বাঁধে। এই খেত-বিছন - ধান - হাল - লাঙল - বউটা-ছেলেটা সন্ধের উঠোনে ভাতের ম ম গন্ধটা সেইসব বাঁধন। জনক ভাবত চরণদাসের মেয়েটার কোলে কাঁখে ছেলে এলে পবনের মন ধরে যাবে।

পবনের মন ধোরে নি। পবন যুদ্ধে গিয়েছিল। গাছ কেটে কেটে পথে ফেলে বাঁশগাড়ি দিয়েছিল। পথে খানাখন্দ কেটে গাছপাতা দিয়ে ঢেকেছিল।

বন্দুক বিনে যুদ্ধ হয় না? আজ্ঞা, আপনি কিছু বোঝ না।

পবনাটা যুদ্ধে গিয়েছিল। জনকের ছেলের ছেলে, রক্তের রক্ত পবন। ইস্কুলে অল্প সল্প কি পড়ল না পড়ল, ঠাকুরদা-র ডান হাত হয়েছিল।

ওরা পবনদের গুলি করে নি। গুলিতে খরচ আছে। চাষাভুষো গ্রামের মানুষের হাতে বন্দুক থাকে না, তার পেছনে কেগুলি খরচ করে?

ওরা পবনদের বুকে পেটে সঙীন ঢুকিয়ে দিয়েছিল। মানুষের শরীর বড় নরম, স্নেহে আদরে গড়া। সঙীন ঢুকে যেতে পলকের বেশি সময় লাগে না।

সঙীন ঢোকাবার আগে ওরা পবনদের ধরে এনে গাছ তুলিয়েছিল। খানাখন্দ ওদের দিয়ে বুজিয়েছিল।

পবনের কথাগুলো জনকের মনে পড়ে।

আজ্ঞা, আপনি কিছু বোঝ না। মানুষ না মরলি যুদ্ধ হয়?

পবনের বউটা সেই থেকে পাগল পাগল। এখন ও গাছের নিচে বসে ভিজতে ভিজতে বলল,

কোন্ থে এত মানুষ এয়েল গো?

নানা দেশ থনে আসতেছে।

এত মানুষ ওপারে ছিল?

ছিল না?

কি জানি? একন কি হবে?

জানি না।

জনকের বউ জবাব দিল। ওর বয়স অনেক। পুত্র শোকে, পৌত্র শোকে ও এখন রাবণের মা নিকষা হয়ে বসে আছে। দিনেরাতে ওর এখন একটিই কাজ, জনককে গালি দেওয়া। এখন ও জনককে গালি দিতে শুরু করল।

বলি বেবস্থা করলে? যে যেমন পারতেছে, বেবস্থা করতেছে, দেখ না? শুধু হুঁচ নিলে আর খিচুড়ি খেলে হয়ে যাবে?

জনক বলল,

যেখানে সে যাবে, যাব।

তা আর যাবে না? আমার জলজলে সোমসার জলে দিয়ে তুমি ভালমানুষ সাজবে না? কিছু নিতে দিল না গো! কুকুর তাড়া করে বললে এখনি চল। গাই গরু দড়ি কেটে ছেড়ে দিয়েল গো!

ওরা আজ বললে হাটবাজারে যেতে পাবি না, কাল এসে বলে পুকুরে গাড়া ফেলে গেল, বলল মা এ জাতের মানুষ ঘর ছেড়ে বেরাতে পাবা না?

নয় ঘরে পড়ে রইতাম!

নাত বউ, দুলি, আম্মা সবাইরে কি করতিস?

য্যামন বনেজঙ্গলে লুকে থাকছিল, তাই থাকত।

ওরা মোদের ঘরে আগে আগুন দিত।

কেন? পবনের আজা আজির ঘর বলে?

মোদের ওরা আগে মারত।

মারলে মরতে।

জনকের বউ কিছুক্ষণ কাঁদল। তারপর জনককে বলল

এখানে বাবুরা পবনরে ভালো বলতেছে ক্যান? বলতেছে পবনরা তিনোজনা যুজ্জ করে মরেছে?

যুজ্জ করে মরেছে? এ কথা এখানেও বাবুরা বলতেছে?

বলতেছে না?

জনক মাথা নাড়তে লাগল। যোবেন না, জনক কিছুই বোঝে না। এই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ অবধিও ত' দেশে থাকা গিয়েছিল। জ্যৈষ্ঠ শেষ হতে ওরা কেমন করে জানতে পারল জনকাদের গ্রামের তিনজনকেই হাটে বেয়নেট করা হয়েছিল।

আজ বলল হাটে-বাজারে-দোকানে যাবেনা।

কাল বলল গ্রামের বাইরে যাবে না। গরু-ছাগল কার ঘরে এখনও কি আছে সব জম্মা দিয়ে দিতে হবে।

তথাপি জনকরা রাতের অন্ধকারে বেরোল। এই এতদিন বাদে। হালের বলদ, গোয়ালের গরুর দড়ি কেটে দিয়ে বেরোল। রাতে হেঁটে, দিনে লুকিয়ে থেকে তবে এখানকার মাটিতে পা দিল। কিন্তু পবন ত মরল ওদের সঙীনে। বন্দুক হাতে না থাকলে লড়ুয়ে গোরা হয়? এখানে বাবুরা কেন বলছে পবন যুদ্ধ করে মরেছে?

কি ভাবতেছ?

কিছু না।

তুমি তোমার ধানের কথা ভাবতেছ।

ধুস্। ফেলে থুয়ে এসেছি, আমনের চারা যেমন মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে তেমনি চলে এসেছি। আর ভাবি!

তবে?

জনক অনামনস্কভাবে বলল,

কুবের মল্লিক বলত এখানে আমনের চাষ জবর। তা এখানে চাষ কোথা করে রে বউ? আমি ত কিছু ঠাওর পেলাম না।

ত্যাত মাটি, ত্যাত খেত কোতা?

অন্যত্তর আছে।

এই এত এত মানুষ! এই এত মানুষ এরা কোতা থোবে বল দিখি।

আমি মেয়েমানুষ, আমি জানি? ঐ শোন কি বলতেছে ওনারা।

জনক ঘাড় কাত করে শুনল। মাইকে ওরা হেঁকে বলল আজ যারা ক্যাম্পে যায়নি তারা দু একদিনের মধ্যেই যাবে।

এখন জনকের বউ, জনক, পবনের বউ আস্তে আস্তে গাছের কোল ঘেঁষে বসল। জায়গাটা এর মধ্যে খানিকটা ভালো। দুটো খুঁটির ওপর দুটো মাদুর। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দেওয়া যায়। ওরা পাত্র করে খাবার আনতে গেল। জনক গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে চেয়ে রইল। পবনা সব কথা বুঝত না। সেবারকার সমুদ্দুরে বানের পর বলেছিল,

আজা গো, দেশে আর মানুষ নি। সব ভেসে গেল।

মানুষ, মানুষ, অনন্ত অর্বুদ মানুষ। আকাশের তারার চেয়েও অগুণতি। আহা, পবন ত সব জানত না। সমুদ্র যাদের টেনে নিয়েছিল তাদের সব উগরে দিয়ে গেল বুঝি। নইলে এত মানুষ আছে বলে ত কই জনক জানে নি? এত মানুষ থাকবে কোথা, খাবে কি? ক'দিন থাকবে?

হা দেখ, ফিরে গেলে কেমন হয়?

একথা বলতে গেলেই সবাই ওকে মারতে ওঠে। জনক বোঝে না কেন ওরা রেগে যায়। দেশ-ঘর ছেড়ে মানুষ কতদিন এমন করে থাকবে? জনকের বলদ জোড়ার মধ্যে রাঙাটা সেয়ানা আছে। দুষ্ট বলদ যাকে বলে। ক'দিন খেতে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে খাবে। তারপর?

জনকের ভাবনা বউ আর নাতবউকে নিয়ে। চরণদাসের মেয়েটার বয়স বেশি নয়। এখনও ও মাঝে মাঝে ওকেই জিগ্যেস করে।

বাঁশগাড়ি দিলে যুজ্জ হয়? বাঁশগাড়ি দিলে মানুষকে অমন ফুঁড়ে মারে?

কে বলে যুজ্জ?

জনক উত্তর দেয় আর মাথা নাড়ে। বলে

যুজ্জ যুজ্জ বলে মাথা খারাপ করিস না দিদি। যুজ্জ হত আগে। বাপ রে নড়ুইয়ে গোরা দেখিছি। হয়া দেখ, যুজ্জে যেয়ে মরেছিল কাদের শেখের ছেলে। এই ডাক জোয়ান, বুকে চাপড় মেরে হা হা বলে হাসত। যুজ্জে মরেছিল বলে কাদের টাকা পেত।

তোমার নাতি বলে গেছে মোরা সব পাব গো!

ছুবো!

জনক চেঁচিয়ে উঠেছে। পবনের কথা পবনের বউয়ের মুখে ও শুনতে পারে না। যুজ্জ যুজ্জ বল কেন সবাই? বন্দুক সঙীন হাতে সেপাই পবনদের খুঁচিয়ে

মারল এর নাম যুদ্ধ? ঘরে ঘরে আগুন, হাট লুঠ, বাজার লুঠ, এর নাম যুদ্ধ? তাত লাগলে মাটি ফুঁড়ে যেমন পিঁপড়ে বেরোতে থাকে তেমনি করে মানুষ ঘরদোরের ছেড়ে বেরুচ্ছে আর বেরুচ্ছে। এর নাম যুদ্ধ?

জনক মাথা নাড়তে লাগল। জনক কিছুতে মানবে না এরা নাম-যুদ্ধ।

এর নাম কি?

জনক জানে না। জনক ধানের অষ্টোত্তর শতনাম জানে, ওদের চিকিৎসা জানে, ধানরা পোকা ধান গাছ থেকে নির্মূল করতে জানে। আর জানে বিছন-রোয়া-নিড়েন. বিছন-রোয়া-নিড়েন। আর হেমন্তে ধানকাটা। আষাঢ় শ্রাবণে আল কেটে জল বাওয়ানো।

জনক রাজা চাষ করে আলেন।

জনকের যৌবনে জনকের বউ বলত। বউএর কোলে যখন টুকটুকে মেয়েটা এল, জনক বলত

সীতা খুঁড়ে এনেছি, জানিস?

জনক এই সব জানত, এখনো জানে। এই ত' ছিন্দেশখানে আসতে আসতে ওর কি শুধু মনে হচ্ছিল না সমুদ্রের ওপর মেঘের মত বিশাল সাত্রী বলদ দিয়ে লাঙ্গিয়ে পাড়ে সব জমি চাষ করে ফেলে?

শুধু সেই সব জানে জনক। কিন্তু আজা গো! আজামশাই গো! বলে বলে পবন যে মরে গেল তার নাম যে কি তা জনক জানে না। এখানে বাবুরা কি বলছে তা শুনে জনকের হুঁস পায়। কত ছেলে-মানুষ ওরা! কত কম জানে! আর জনকরা যখন থেকে আসতে শুরু করেছে তখন থেকে ওদের দিনেরাতে বিশ্রাম নেই।

জানে না গো! পবনটার মত হাবাটা। তাই বলে যুজ্জ। যুজ্জ কারে বলে তা জানে না।

কিন্তু ওরা বলল পবন যুদ্ধ করে করে মরেছে।

তুমি, তুমি, জনক দাশ?

আজ্ঞা।

নিবাস..

শেখহাটী জান? ছাড়িয়ে চলে যাও। মধুমতীর গাঙ ধরে দখিন পানে নামুতে যেতে যেতে তবে মোদের গ্রাম গো।

তোমার নাতি পবন দাশ?

আজ্ঞা।

এঁদের চেন?

না বাবুরা।

এঁরা পবনদের জানতেন। পবনের কথা ওরা জানতেন।

জানতে তোমরা?

জানতাম।

জনক অবাক হয়ে ওদের দিকে চেয়ে রইল। যেন জাহাজের পাজেরী জনক, জাহাজের মালিক। ঢেউ দেখা আর ডাঙা দেখা আর দিক চক্রবালে চেয়ে থাকাই ওর কাজ।

জনকের চোখ নিষ্পাপ, একাগ্র, স্বচ্ছ।

তবে পবনা মরল কেন?

মরল কেন?

সবাই যদি সব জানতে তবে মোর পবন মরল কেন?

তুমি বুঝতে পারছ না। পবন যুদ্ধে মরেছে।

ওর নাম যুজ্জ?

যুদ্ধ নয়?

অমন যুজ্জ হয়? বাবুরা, আমি কিছু জানি না, তাই শুধাই, বন্দুক নেই, কিছু নেই, ওর নাম যুজ্জ?

হ্যাঁ।

ওরা আস্তে আস্তে বলতে লাগল। যে যা জানে, তাই নিয়ে লড়াই করার নামই যুদ্ধ। যে যা জানে তাই করে চলার নামও যুদ্ধ করা। শুনতে শুনতে জনকের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। এত ভালো ভালো কথা জনক কখনও শোনে নি।

তোমরা এখানে আছ?

আজ্ঞা।

কাল পরশু ক্যাম্পে চলে যাবে।

আজ্ঞা। সে কি দূরে?

তেমন দূরে নয়।

জনক গাছতলার আশ্রয়ে ফিরে এল। যে যা জানে তাই করে চলার নামই যুদ্ধ করা।

তোমরাও ত যুজ্জ করতেছ বাবুরা?

আমরা?

এই যে এত এত জীবকে দেখতেছ, সাধ্যমত খাওয়াতেছ, আছুয়ে দিতেছ, এর নাম যুজ্জ লয়?

তা বলতে পার, বলতে পার বটে।

জনক গাছতলায় ফিরে এসে হেলান দিয়ে বসে রইল।

এখান থেকে অন্য জায়গায় যাবে। সে কতদূরে? জনকের ঘর-খেত-পালা গাদা থেকে কতদূরে? সবাই চলে যাবে, ওরা দেশঘরে থাকতে দেবে না? কেমন করে জনক যাবে?

চোখ বুজে থাকতে থাকতে জনক ছবির পর ছবি দেখতে পেল। সেই সমুদ্রের ওপর মেঘ। সেই প্রথম জমি নিয়ে হাসিল করার আনন্দ। পবনার বাপের মুখেপ্রসাদ হয়েছিল আর বাজনার শব্দ কানে শুনতে পেল জনক। তখন জনকের বাপ বেঁচে আছে। মেয়ে বউরা নতুন কাপড় পরে বনের ষাঁড়াগাছটার তলায় পুজো দিয়ে এসেছিল।

সেই ছেলে বড় হল। জনক বত্রিশটা বাঁধনে ক্রোমসুয়ারের কেমনে থেকে কত সুখ পেয়েছে। ছেলে মরেছে, নাতি মরেছে। জনকের বিশ্বসংসার ত অন্ধকার হয়ে যাবার কথা। তা ত হয়নি।

তখনও যে জনক সুখ পেয়েছে কত? বিছনে-নিড়ানে-রোয়াতে সুখ ছিল। ধান কাট, আঁটি বাঁধ, কাঁড়, সারি দাও, পালা বাঁধ। কত সুখ, কত আনন্দ। শুধু সে আনন্দে পুত্রশোক ভুলতে পারে, পৌত্রশোক ভুলতে পারে। সব সুখ থেকে কারা তাকে দূরে, আরো দূরে নিয়ে যাবে? যুদ্ধ? জনক যুদ্ধ করবে না।

আজ্ঞা, আপনি কিছুই বোঝ না।

তুই বোঝ পা যা।

আজ্ঞা, এর নাম যুজ্জ।

আমি তোদের যুজ্জ জানি না।

জনক মনে মনে পথের কথা ভাবতে লাগল। ওরা বলে ফিরে যেও না। জনক ফিরে যাবে। জনক ত আর জনক রাজা নয়। অজর অক্ষয় আয়ু কোথায় তার? তার ত মানুষের আয়ু, মানুষের পরমায়ু। যে কাজ করতে তার পৃথিবীতে আসা সে কাজ জনক ফেলে রাখে কেমন করে? জনক যদি ফিরে যায় তার ফেরার পথে বাঁশগাড়ি দেয় কে? কার এত ক্ষমতা?

অন্ধকার, পরিত্যক্ত গ্রাম। শ্মশান শ্মশান যেন। আষাঢ়ের মধুমতীর গর্জন যেন ঘরের পৈঠায় বাজে। এখন সকাল, তবু মেঘে মেঘে আকাশ অন্ধকার। আকাশ ঘরের চাল ছুঁয়ে আছে।

জনক ওর খেতে গিয়ে দাঁড়াল। যুজ্জ আর যুজ্জ। তোদের যুজ্জ একরকম পবন, তোর আজা সে যুজ্জ বোঝে না। তোর আজার বয়স অনেক। এক সময়ে তোর আজা মাটি খুঁড়ে সীতা তুলে তোর আজিমার কোলে ফেলে দিয়েছিল।

জ্যৈষ্ঠে বোনা ধান খেতের চারা এখন সতেজ, সবুজ। নিড়েন পড়ে নি তাই চারার মাঝে মাঝে আগাছা। আগাছা ঘন হলে জল বাধবে, জল জমবে, বাইন লাগবে, আমনের মরণ।

জনক নিচু হয়ে পাগলের মত আগাছা উপড়োতে লাগল। হেই! হেই! হেই! আগাছা-গুলোকে গাল দিতে লাগল জনক। যেন ও যুদ্ধ করছে. তাই ওর হাতের মুঠো এত সবল, এত কঠিন। মাটির গন্ধ কি আশ্চর্য, কি উত্তেজনা তাতে। যার যা কাজ তা না করতে দিলে মানুষ বাঁচে না। বাবুরা কি সেই কথাই ওকে বলেছিল?

মাটির গন্ধে, ধানচারার গন্ধে জনক অন্ধ হয়ে গেল। কালা হয়ে গেল তাই পেছন থেকে ওদের চীৎকার জনক শুনতে পেল না, দেখতে পেল না সামনে থেকে কারা ওর দিকে বন্দুক তুলেছে।

ভাইমার ন্যাশনাল থিয়েটারের (বার্লিন) নিজস্ব মঞ্চে ভাষায় অভিনীত রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের একটি দৃশ্য
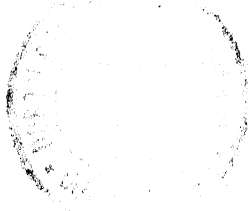
বার্লিনের নাট্যোৎসবে ব্রেখট ও রবীন্দ্রনাথ

আগামী অক্টোবর মাসে জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের রাজধানী বার্লিনে যে নাট্য-উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার প্রধান অংশ জুড়ে থাকছে বের্টোল্ট ব্রেখ্টের নাটক। দর্শকরা এ-উপলক্ষে ব্রেখটের অনেকগুলি নাটক একসঙ্গে দেখার সুযোগ পাবেন। ব্রেখ্ট প্রতিষ্ঠিত বের্লিনার অ'সেম্বল এবারে এই প্রথম 'টুরান্‌ডোট' নাটকটি মঞ্চস্থ করছেন। অন্যান্য নাটকের মধ্যে থাকবে 'আর্টুরো উই', 'মা', 'গ্যালিলিওর জীবন', 'সেনোরা কারারের রাইফেল', 'থ্রী পেনি অপেরা' ইত্যাদি।

ব্রেখ্টের এই নাটকগুলি আমাদের দেশেও মঞ্চস্থ হওয়ায় সাধারণের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে। বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে ব্রেখ্টের নাটকের জনপ্রিয়তা এবং ব্রেখ্ট সম্পর্কে আগ্রহ ক্রমবর্ধমান। আমাদের দেশের নাট্যকর্মী ও নাট্যশিল্পীদের একটি প্রতিনিধি দল বার্লিনের এই উৎসবে যদি উপস্থিত থাকেন তাহলে আমাদের দেশে ব্রেখ্টকে উপযুক্তভাবে পরিচিত করার অধিকতর সুযোগ পাওয়া যাবে।

আসন্ন এই নাট্য উৎসবের আর একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ—ভাইমারের (গ্যেটে ও শিলারের নগর) জাতীয় থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকটির পুনরাভিনয়। দিল্লীর শ্রীমতী আল্‌কাজি এই নাটকটির পরিচালিকা।

বিদেশের কয়েকটি বিখ্যাত নাট্যপাঠীও এই উৎসবে উপস্থিত থাকবেন আশা করা যায়।

পিঞ্জর (উপন্যাস)—সুভাষ সিংহ। বিচিত্র প্রকাশনী, ৭, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা : ৯। বারো টাকা।

তরুণ শক্তিমান লেখক শ্রীসুভাষ সিংহের দ্বিতীয় উপন্যাস 'পিঞ্জর' আজকের যুগ-মানসের অন্তরঙ্গ বাস্তব রূপায়ণ। চলমান চঞ্চল জীবনের কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু রঞ্জত ও মীরা। তাদের ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে অসংখ্য ঘটনার ঘূর্ণি, এসেছে ছোট-বড় বিস্তর চরিত্র। সাড়ে তিনশো পাতারও বেশি বিস্তীর্ণ পরিধিতে কাহিনীর স্বাভাবিক চলমানতার মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটেছে এবং যে সব চরিত্র এসেছে তারা সবাই উঠে এসেছে জীবন থেকে—কেউই আরোপিত, প্রোথিত, প্রক্ষিপ্ত বা অপরিচিত নয়। সবাই, সবকিছুই আমাদের চেনাজানার পরিচিত চৌহদ্দির মধ্যে। এই স্বাভাবিকতাই কাহিনীকে করেছে জীবন্ত ও বেগবান। যারা আধুনিক জীবনের অপরিহার্য জটিলতা, যন্ত্রণা, উৎকেন্দ্রিকতা, অনিশ্চয়তা ও প্রাত্যহিকতার শিকার—যারা কাছে টানতে গেলে দূরে ফেলে, ভালোবাসতে গিয়ে ঘৃণা করে, ঘর বাঁধতে গেলে ঘর ভাঙে—জীবনধারণে ক্লান্ত তারা সবাই। অস্থির উচ্ছৃঙ্খল রঞ্জত, ঘর বাঁধার স্বপ্নে আতুর জীবন থেকে জীবনে ছুটে বেড়ানো বিবাহিতা মীরা, সাধারণ মেয়ে শেফালি, প্রাত্যহিকতায় ক্লান্ত জীবনভীরু বিনয়, পন্যা মেয়ে লতা, চাকুরিজীবিনী চন্দ্রাণী—আমাদের রোজকার জীবনে একান্ত পরিচিত ও নিত্যসঙ্গী। লেখক জীবনের গল্প বলেছেন, তাই এ কাহিনী পাঠকমনকে এত নাড়া দেয়। কাহিনীর বিন্যাসে, নাটকীয় ঘটনার টানাপোড়েনে এবং চরিত্র-চিত্রণে লেখক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সুভাষ সিংহের সবচেয়ে বড় গুণ তিনি গল্প বলতে জানেন এবং সার্থকভাবে তা পেরেছেনও। কাহিনীর সূত্রপাত থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সমানভাবে তিনি পাঠকমন ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছেন। শুরু করলে সমাপ্তি না করা পর্যন্ত পাঠকের মন স্বস্তি পায় না। অসতর্ক শব্দের কিছু প্রয়োগ এবং কাহিনীতে যতি টানবার জন্যে শেষদিকে দ্রুত লিখন এর একমাত্র ত্রুটি। তবু একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, রচনার প্রসাদগুণে, চরিত্র-চিত্রণে ও জীবনের বাস্তব প্রতিফলনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে 'পিঞ্জর'। যুগজীবনের বাস্তব চিত্র হিসেবে সাম্প্রতিক সাহিত্যে বিশিষ্ট সংযোজন বলে এ উপন্যাসটি গণ্য হবে।

তুফান যখন আসবে (উপন্যাস)—শঙ্করানন্দ বিশ্বাস। প্রকাশক : সুশীলকুমার সরকার, ১৬২।৯৯, লেক গার্ডেন্স, কলকাতা : ৪৫। পাঁচ টাকা।

ভারতের বিশেষ করে আজকের পশ্চিম-বাংলার পটভূমিকায় লেখা উপন্যাসটির মধ্যে যে ভাবতরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠেছে তা হল সমাজ সংস্কার ও দেশপ্রেম। সর্বহারা মানুষদের বন্ধনমুক্তির এবং নব্য সমাজের পত্তনের মধ্যেই রয়েছে দেশ ও সমাজের সামগ্রিক উন্নতি। এই বক্তব্যের বিস্তারে কাহিনী বহু ঘটনার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। কাহিনী গঠনে ও ঘটনার সমাবেশে ত্রুটি এড়াতে পারলে উপন্যাসটি উপভোগ্য হোত। ত্রুটি বানানে এবং মুদ্রণেও। অথচ প্রচ্ছদ শোভনসুন্দর।

অতীতের কান্না (ঐতিহাসিক নাটক)—তিলক দাস। ভৈরব লাইব্রেরী, ১৩।১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ৩·৫০ টাকা।

কালের হাওয়া বদলেছে। তাই হালে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে ঐতিহাসিক নাটকের আর তেমন কদর নেই। মঞ্চপ্রেমীরা 'এই কাল এই যুগ'-এর প্রতিফলক নাটকে আর মঞ্চে রূপায়ণে ব্যস্ত। পুরনো ঐতিহাসিক নাটক কখনো কখনো দলছুট অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সহযোগিতায় পুনরভিনয়ের বিরল সৌভাগ্য লাভ করে। ঐতিহাসিক নাটকের প্রয়োজন অবশ্য এখনও আছে। 'যাত্রা'র অধিকারীরা এর পৃষ্ঠপোষকতা করে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখছেন সগৌরবে, সেই সঙ্গে অক্ষরজ্ঞানহীন সাধারণ মানুষদের প্রেরণা ও আনন্দ যুগিয়ে আসছেন নিরলসভাবে। 'অতীতের কান্না' রাজস্থানের এক অতীত কাহিনীর নবরূপায়ণ। কোঠা রাজ্যের হারা-বংশীয় রাজপরিবারের ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী এর পটভূমি। নাটক রচনায় মুন্সিয়ানার পরিচয় মেলে। নানান ঘটনার টানাপোড়েনে, নাটকীয় সংঘাতের আবর্তে নাটকটি দর্শকচিত্তে দোলা দেবে।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

সমকালপত্র। সম্পাদক : অরুণ কর ও কল্যাণ সেনগুপ্ত। ১৬ বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা—৬। পঞ্চাশ পয়সা।

তরুণ লেখক-লেখিকাদের গল্প-কবিতা প্রবন্ধ-নাটিকায় সংকলনে যুবমানসের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। সম্পাদকদ্বয় ভূমিকায় বলেছেন : '...সমাজের মুখে বালি গুঁজে যাঁরা চুপ করাবার চেষ্টা করছেন, সমকাল-পত্র হল সেই হিতৈষীজনের (?) প্রতি নিক্ষিপ্ত শক্তিশেল।...' দীপেন্দু চক্রবর্তীর 'বাংলা সাহিত্যে হিপি নৃত্য' সেই নিক্ষিপ্ত শক্তিশেলের একটি 'শেল'। সুবিমল মিশ্রের গল্প 'ব্যবসায়ীগণ! সত্বর বকেয়া জমা দিন' ও অভ্র ঘোষের বিতর্কমূলক প্রবন্ধ 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় বাস্তবতাবোধ' উল্লেখ্য। এছাড়া লিখেছেন : মোহিত চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ সেনগুপ্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, পবিত্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

প্রগতি ('বাংলা দেশ' বিশেষ সংখ্যা)। সম্পাদক মৃণাল চট্টোপাধ্যায়। ৩৯বি, ভেন্টমিশন রোড, কলকাতা—২৩। ১·২৫ পয়সা।

এই বিশেষ সংখ্যায় 'বাংলাদেশ'-এর নানান বিষয়ের ওপর ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য হল সুদর্শন চৌধুরীর 'সময়-সমীক্ষা', ইন্দ্রনীলের 'শরণার্থীদের জন্য বাংলাদেশে মুক্ত অঙ্গন চাই', সৌগত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্রোহী কর্ণমালা'। এছাড়া লিখেছেন : ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলকুমার গুপ্ত, সুকুমার সেনগুপ্ত, বিমান চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

লোক-সংস্কৃতি (প্রথম সংস্করণ)—সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতি : দুলাল চৌধুরী। অ্যাকাডেমী অব ফোকলোর। ২৬৫ যোধপুর পার্ক। কলকাতা—৩১।

বাংলাদেশের লোক-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমী অব ফোকলোর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। লোক-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ, আলোচনা, সংগ্রহ, সংবাদ প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়েই এদের ত্রৈমাসিক সংকলন 'লোক-সংস্কৃতি' প্রকাশিত হয়েছে। প্রচলিত ছড়া, গান, কথা, ধাঁধা, প্রবাদ, নানা রকমের শিল্প কাজ ও পুরাবস্তুর বিবরণ,

আচার-অনুষ্ঠানের বিশদ পরিচয়, মাচ ও রজনার তথ্যাবলী, আঞ্চলিক শব্দ ইত্যাদি লোকতীয় বিষয় এই পত্রিকায় থাকবে। বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন : অমলকুমার দাস (চারুশিল্পে আদিবাসী সংস্কৃতির রূপায়ন), চিন্ময় ঘোষ (পূর্ব ভারতের চা-শিল্পে আদিবাসী শ্রমিক), সাধনা চৌধুরী (বঙ্গে বিবাহ রীতি : মালদহ), জ্যোতির্ময় বসু রায়চৌধুরী (বেনাকি—চব্বিশ পরগণার একটি লৌকিক দেবতা), মুহম্মদ আয়ুব হোসেন (আঞ্চলিক শব্দ : বর্ধমান), তুলিকা মজুমদার (দার্জিলিং জেলা)। সাধারণ পাঠকদের মধ্যে পত্রিকাটি প্রচারের জন্য চেষ্টা করা উচিত। লোক-সংস্কৃতি বিষয়ে প্রত্যেক মানুষের মনে যে ঔৎসুক্য আছে, তাকে সঠিক পথে পরি-চালিত করতে পারে এই সব পত্র-পত্রিকা।

মীরাজনা (সপ্তদশ সংকলন) সম্পাদক : প্রিয়লাল মৌলিক। ৩৫সি মতিলাল নেহরু রোড, কলকাতা : ২৯। পঞ্চাশ পয়সা।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি নতুন ভাবনার খোরাক যুগিয়ে ইতিমধ্যে সাহিত্য-পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পঞ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি নানাদিক দিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। 'বাংলাদেশ'-এ জাতীয়তাবোধের উন্মেষ এবং ব্যাপ্তির বিস্তৃত পরিচয় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে বিবৃত করেছেন মোহাম্মদ সুলতান। জাতীয়তাবোধের জাগরণ ও ভাষা-আন্দো-লনের ক্রমপরিণতি কেমন করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঢেউ তুলেছে তাই বাঙ্ময় হয়েছে শ্রীসুলতানের 'আন্তর্জাতিক বাংলা প্রসঙ্গে' নিবন্ধটির মধ্যে। এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জঙ্গীশাহী ইয়াহিয়ার নারকীয় গণহত্যা-কাণ্ডের বীভৎস কাহিনীর বিবরণ। প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামীর 'বদরুদ্দিন ওমর' রচনা উল্লেখ করবার মতো। এছাড়া লিখেছেন : জগন্নাথ চক্রবর্তী, প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, রণেন মিত্র প্রমুখ।

বাঙলাদেশ (স্মারকপত্র) সম্পাদক : কৃষ্ণজীবন মজুমদার। ৩।৯, লকগেট রোড, কলকাতা : ২। এক টাকা।

'বাঙলাদেশ' ওপর লেখা গল্প-প্রবন্ধ-কবিতা ও মহৎ মানুষদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে 'বাঙলাদেশ' স্মারক গ্রন্থে সত্যকার স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লিখেছেন : রবি সেন, দিলীপ ঘোষাল, অতীন বন্দ্যো-পাধ্যায়, শামসুল আলম সাইদ, মণীন্দ্রনাথ ঘোষাল, মণীন্দ্র রায়, দিলীপ দত্ত, সুকুমার বিশ্বাস, নীরদবরণ মুখোপাধ্যায়, উদয়ন চৌধুরী প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দু মুসলমান' ও লেনিনের 'জাতীয়তাবাদ' নিবন্ধ দিয়েই স্মারকপত্রের পরিক্রমা শুরু। প্রচ্ছদ প্রখ্যাত শিল্পী অন্নদা মুন্সীর। সম্পাদকের কৃতিত্ব এবং সুন্সিমান্ন তারিফ করার মতো।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান (আষাঢ় '৭৮)— সম্পাদক : মুরারিমোহন চক্রবর্তী। সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদ, সোদপুর, ২৪ পরগণা। পঞ্চাশ পয়সা।

আলোচ্য সংখ্যাটি 'কবি শান্তশীল দাস সম্বর্ধনা সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষাব্রতী কবি শান্তশীলের কাব্য-ভাবনার নানাদিক নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে, বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, মিলন দত্ত, কালিদাস রায়, দিলীপকুমার রায়, বিজয়লাল চট্টো-পাধ্যায়, পুলিনবিহারী সেন, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, নারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ সাহিত্য-সেবীরা। এছাড়া রত্নেশ্বর হাজরা, কমল গুপ্ত, গদাধরচরণ নিয়োগী, প্রদীপকুমার দত্ত, দীপকভূষণ মজুমদার প্রমুখের রচনা-গুলি উল্লেখ করার মতো।

জাগরী (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮)—সম্পাদক : অপূর্বকুমার সাহা। ৭৪।৫এ বাগ-বাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৩। পঞ্চাশ পয়সা।

শ্রীঅরবিন্দ ভাবে ভাবিত 'দিব্য-জীবন'-অভিসারী মাসিক পত্রিকাটি ইতিমধ্যেই সাহিত্যরসিক পাঠকদের অভিনন্দন-ধন্য হয়েছে। আলোচ্য সংখ্যাটি 'রবীন্দ্র-নজরুল সংখ্যা' হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন : দক্ষিণারঞ্জন বসু, শক্তি চট্টো-পাধ্যায়, রঞ্জিত সিংহ, অপূর্বকুমার সাহা এবং আরো অনেকে। 'ওপার বাংলায় রবীন্দ্রনাথ' 'তারা তিনজন' রচনাগুলি পড়ে দেখবার মতো। সবচেয়ে উল্লেখ্য হল নজরুল-লিখিত (রচনাকাল ১৩৩৯) 'বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য' প্রবন্ধটির পুন-র্মুদ্রণ। সাহিত্যরসিক এবং সাহিত্যপথ-যাত্রীরা এই প্রবন্ধে অনেক চিন্তার খোরাক পাবেন।

সপ্তদীপা (এপ্রিল-যুন ১৯৭১) সম্পাদক—রবীন দত্ত ও জীবনময় দত্ত। ৮।১২৪, কিংকরবাগ কলোনী পাটনা—১। পঞ্চাশ পয়সা।

বিহারে একমাত্র ত্রৈমাসিক পত্রিকাটিতে প্রবাসী বাঙালীদের বাংলাভাষা ও সাহিত্য প্রীতির প্রশংসনীয় পরিচয় মেলে। গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ ছাড়া হিন্দী কবিতার অনু-বাদও আছে। অধিকাংশ লেখাই 'বাংলা-দেশ'কে নিয়ে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য বাসবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পূর্ব বাংলায় রবীন্দ্রনাথ' ও সুভাষচন্দ্র সরকারের 'বাংলা দেশের জাতীয় সংগীত।'

চারুবাক (তৃতীয় বর্ষ, মার্চ ১৯৭১) সম্পাদক : অরুণ মুখোপাধ্যায়। ৪৩, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা—১৬।

চারুবাক অফিস পাড়ার ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র। পত্রিকাটির সব অবয়ব জুড়ে আন্তরিকতার ছাপ। লেখা ও ছাপার কারু এবং কারুকৃতি লক্ষণীয়। গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখেছেন : অনুময় চট্টো-পাধ্যায়, চিত্ত তরফদার, সূর্য মুখোপাধ্যায়, কে নজরুল ইসলাম, শংকরানন্দ মুখো-পাধ্যায়, দেবেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শচীন ঘোষ, অমিয় ভট্টাচার্য, অরুণজ্যোতি বসু, আশানন্দ চৌধুরী, জয়তিলক গুহরায় প্রমুখ। বিশেষ উল্লেখ্য রচনা : রবীন্দ্রনাথের সমাজচেতনা, জনসাহিত্য এবং নির্বাচনী ইশতেহার, অফিসপাড়ায় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পর্যায়ক্রম। 'অধুনা' বিভাগটির জন্যে সম্পাদক অবশ্যই সাধুবাদ পাবেন।

ষষ্টি-মধু (বৈশাখ '৭৮) সম্পাদক : কুমারেশ ঘোষ। ২৮।৩।আর রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলকাতা—৫৪। পঁচাত্তর পয়সা।

'বরস বাংলার সরস পত্রিকা' ষষ্টি-মধু এবার কিন্তু সত্যিই 'সিরয়স'—'বাংলাদেশ' বিশেষ সংখ্যা তার জীবন্ত নজীর। 'মা কী ছিলেন, মা কী হইয়াছেন, মা কী হইতে চলিয়াছেন'— তারই আলোছায়া বিস্তর পরিশ্রমে বাংলা সাহিত্য মন্থন করে সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে হালের কথাকারদের রচনা উদ্ধৃতির সার্থক সংযোজনায় বাংলাপ্রেমীদের 'অবশ্য দ্রষ্টব্য' এই বিশেষ সংখ্যাটি।

সিন্ধু সারস (প্রথম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা ১৩৭৮) সম্পাদক : জ্যোতির্ময় দাশ, সরিৎ শর্মা, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। ৫০, কাঁটাপুকুর থার্ড বাই লেন, হাওড়া-১। পঞ্চাশ পয়সা।

'সিন্ধুসারস' তার অকপট অস্থির ডানা দুটি মেলে 'মানুষের সভ্যতার শেষ জাফরান রৌদ্রলোক পর্যন্ত' যন্ত্রণার অসীম সমুদ্রের আকাশে উড়তে অভিলাষী—এই ঘোষণা দিয়ে সাময়িক সাহিত্যে, প্রথম পদার্পণ করল। তরুণ মনের ভাবনার ভাস্বর গল্প কবিতা শিল্প সম্পর্কীয় পত্রিকাটি লেখা রেখা এবং ছাপার দিক থেকে স্বাতন্ত্র্যধর্মী এবং পরিচ্ছন্ন।

ফাল্গুনী (প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা '৭৮)— সম্পাদক : প্রবীর ঘোষ। কবি ভুজঙ্গ ধর রোড, নতুনবাজার, বসিরহাট। ষাট পয়সা।

দেয়ালা (ছোটদের পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ '৭৮)— শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়। ১১।৪, ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-২৬। পঁচিশ পয়সা।

একেবারে খুদে শিশুদের পত্রিকা। লেখক-লেখিকা ছোটরা। সম্পাদকও তাই। চমৎকার ছাপা। গল্প-কবিতাগুলো মন টানে। কার্টুন পর্যন্ত বাদ যায়নি। ছোটরা এমন বই পেলে খুশী হবে নিশ্চয়ই। ছোট্ট বন্ধুদের এই আয়োজনকে সাধুবাদ জানাই।

নক্ষত্রের রোদ : (জুন ১৯৭১) সম্পাদক : সব্যসাচী দেব ও সুব্রত ভট্টাচার্য। ১১০।১, অশোকগড় পূর্ব কলকাতা—৩৫। ষাট পয়সা।

দুটি কবিতা

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

এঙ্গলিন।।

এক॥

বন্ধক দিয়েছি সব-ই, বলো আর কার কাছে যাবো?
সূর্য তুমি পারো নাকি দিতে অন্তত একভরি সোনা?
ক্ষুধিত সন্তার কান্না যদি হয় অসহ্য কখনও
হৃদয়কে হত্যা করতে তবে কিন্তু কুণ্ঠিত হবো না।।

দুই॥

এখনও হইনি বৃদ্ধ, এখনও বিশ্বাসে মুগ্ধ চোখে
প্রেমের তুলনা খুঁজি আশ্বিনের পান্নাতে নীলায়,
জটিল তর্কের মতো দেখিনি অনেক পথ, তাই
দেখি না পুরনো প্রেম পুরনো চালের উপমায়।।

---

*এঙ্গলিন এক ধরনের ওয়েলশ কবিতা

স্বগত।।

কিছুই প্রার্থিত নেই, কি দেবে? নিজস্ব বেদনার
সাম্রাজ্যের আমি অধীশ্বর,
নীলিমায় অহংকৃত স্থির আত্মবিশ্বাসী আকাশ
নয় কারো করুণা-নির্ভর।

বরং তোমাকে আমি তোমার-ই অজান্তে প্রতিদিন
আমার সর্বস্ব দিয়ে ঋণী ক'রে যাই,
ফুল-ফোটানোর ব্রতে কৃতার্থ মৃত্তিকা গন্ধে রঙে
রাখে তার স্বপ্নের দোহাই।।

অন্ধকারে নীল নিম এক ॥

জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত

আমাদের বংশতালিকায় এক অন্ধকারে নীল নিম আছে :
রাত্রির স্তব্ধতা বেয়ে একটি নক্ষত্র
রোজ ওঠে তার শিয়রের কাছে,
বিস্মৃত অনেক স্মৃতি চুপিসারে পায় প্রাণ
অন্ধকারে লীন সেই নীল নিম গাছে।

পূর্ব-পুরুষের কত শেওলায় ঢাকা মুখ
নম্র চোখে ওর কাছে আসে,—
পূর্ব জীবনের কত বিস্মৃত স্মৃতির তীর
বিঁধে আছে ওরই চারিপাশে।
ঘর-বাড়ী কবে গেছে, শুধু এক কোণে
সেই নম্র তরু পুরাণো আকাশে।
অনির্বচনীয় কোনো শোকের সম্মুখে
সন্ন্যাসিনী ধ্যানরত।—রাতে আরো গাঢ় হয় ধ্যান,—
কথা নাই মুখে,
শরীরে জড়ানো সব বুনো ফুল
জোছনার হিম মাখে বুকে,—সুখের অসুখে।

সে-পেঁচারা বেঁচে নেই তাহাদের ফেলে-যাওয়া স্বপ্নান্তর স্বর,—
যে-পাখিরা মরে গেছে তাহাদের মোহ-মাখা নিদাঘ কুহর
সযত্নে সজ্জিত আছে ওর শাখা প্রশাখার ভাঁজে,—
আমাদের বংশতালিকায় আজো নম্র এক নীল নিম আছে।
প্রাচীন পোকারা কবে ডিম পেড়ে নতুন পোকার জন্ম দিয়ে
আদিম সৃষ্টিতে মিশে গেছে:
শৈশবের ছায়া-ভাসা উঠোনেতে চাঁদের তবক
সব ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।
তারা সব—
আরো যেন কারা সব
অনেক সমৃদ্ধি আর সৃষ্টিশীল মন নিয়ে
সময়ের বুকে সরে গেছে.—
শুধু ঐ নিমগাছ সব কিছু একাকী দেখেছে।

হেঁটেছি যৌবনে আমি একদা যেসব নদী-কূলে
তাহাদের অঙ্গশোভা তরঙ্গিত যে মেয়ের চুলে,
তারা সব ঐ স্নিগ্ধ ছায়াতুর নিমতলা দিয়ে হেঁটে গেছে,—
বংশের মর্যাদা-লিপ্ত ঐ নীল নিম গাছে
তাহাদের অঙ্গ-তিক্ত নির্যাস লেগেছে।

একটি তারার আলো জেলে নিয়ে শিয়রের কাছে
প্রাচীন বুড়ির মত সে সব প্রত্যক্ষ করিয়াছে—
অন্ধকারে লীন নীল নিম ছাড়া এক ভিটের আকাশে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পাথরখানার ফাঁক দিয়ে চন্দ্রগোলকের কতকটা দেখতে পাওয়া যায় সেইদিকে তাকিয়ে থাকে জরা। মাঝে মাঝে কানে আসে নিশাচর পাখীর কলরব, নিদ্রিত পাখীর পাখা ঝটপটানি আর শ্বাপদের গর্জন। এই শেষের রবটার সঙ্গে সে খুব পরিচিত, এক সময় ওদের সন্ধানেই ফিরতো, হরিণের আর্তনাদ, বাঘের হুংকার, ভালুকের হাসির ন্যায় চীৎকার, বুনো কুকুরের তারস্বর সমস্তই তার চেনা। এত প্রাণীও আছে পাহাড়টায়—অথচ দিনের বেলায় কিছুই বুঝতে পারেনি—কোথায় থাকে তারা সারা দিনমান। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনটা আবার ফিরে আসে কোটরে। ও যেন একটা পাখী, কিন্তু কোটরে তো শান্তি নেই, মনটা থেকে থেকে পাখা ঝটপটিয়ে ওঠে। তার চোখ দুটো আকাশের দিকে, মনটা কোটরস্থ।

দুঃখের লোস্ট্রখানা পড়েছে মনের মধ্যে, চিন্তার তরঙ্গবলয় ক্রমবর্ধিত পরিধিতে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে তার গতির আর সীমা নেই। এই কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা সেই তরঙ্গতাড়নে পাতার ভেলার মতো কাঁপতে থাকে। সেই নিদারুণ শরাঘাত, জয়ন্তীর মৃত্যু, মদিরার কুটীরে আগমন, বনের দিকে প্রস্থান, খট্যাসের হাতে আত্মসমর্পণ, ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার প্রয়াস, রাজ্যাভিষেক, যদুবংশীয়দের অনুসরণ, আক্রমণ ও বন্দীদশা, ভক্তিজিতার বাজার, সুমন্তপুর, নরেন্দ্রনগর, নরককে হত্যা ও পলায়ন, অবশেষে ছাগঋষির গুহায়। এদের যে কোন একটি ঘটনা নৌকা বানচাল করবার পক্ষে যথেষ্ট, আর এতগুলো তরঙ্গাভিঘাত সহ্য করেও সে যে এখনো জীবিত, তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। সুমন্তপুর ও নরেন্দ্রনগরের রাজপ্রসাদ মনে ধারণা জন্মে দিয়েছিল যে পাপটা অলীক, কেননা, পাপের পরিণাম তো সুখ হতে পারে না। তবে সে এত সুখী কেন, এত সুখ কেন তার ভাগ্যে। তবে তো খট্যাস মিথ্যা বোঝায় নি যে হত্যা করে পাপ করে নি, হত্যায় পাপ নেই। আর হত্যাও তো সে অল্প করেনি। বাসুদেব, জয়ন্তী, নরেন্দ্ররাজ ও মদিরা, তারপরে নরক। এ যে অনেকগুলি। তখনি মনে পড়ে জরার কথা এ যদি সত্য তবে আবার দুঃখের মধ্যে পড়লো কেন। কিছুই বুঝতে পারে না। তখন মনে পড়ে যায় পাথরভাঙা গ্রামের সুবালার সরল প্রশ্ন। পাপ কাকে বলে? পাপ বলে কিছু তো জানে না তারা। বেশ সুখে আছে তারা। তবে সেই বা দুঃখে পড়বে কেন? এ কেনর সদুত্তর নেই। আসল কথা এই যে এর সদুত্তর দেওয়ার সাধ্য নেই জরার, ঘটনাক্রমের ক্রীড়নক সে, ঘটনাক্রমের বিচারক নয়।

জরা তাত্ত্বিক নয় যে জীবনের সমস্ত ছিন্নসূত্র জোড়া দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছবে যেমন পৌঁছেছে ছাগর্ষি তা যতই ভ্রান্ত হোক না কেন। সে হালভাঙা পালছেঁড়া কর্ণধারহীন জল হাওয়ার যড়যন্ত্রের অধীন অসহায় নৌকামাত্র। যখন দুঃখের খাদে পড়ে পড়ে ভাবে দুঃখটাই জীবনের নিয়ম, আবার যখন সুখের তরঙ্গশীর্ষে ওঠে ভাবে দুঃখটা অলীক জীবন সুখময়। তৎসত্ত্বেও একটা স্থূল বিষয় বোঝে সেই অসতর্ক শরাঘাতে বাসুদেবকে হত্যার পর থেকেই এই দুর্গতির, সুখদুঃখের ওঠাপড়ার সূত্রপাত হয়েছে তার জীবনে। না জানি আরও কী আছে ভবিষ্যতের জন্যে। এখন কোথায় যাবে কী করবে জানে না। এইটুকু মাত্র জানে যে এই বর্তমান মুহূর্তটি মাত্র তার হাতে আছে। এইটুকু মাত্র যার সম্বল তার মতো হতভাগ্য আর কে আছে।

কতবার সে স্থির করেছে সেই মূল ঘটনাটিকে সে বিস্মৃত হবে, কিছুতেই তাকে প্রশ্রয় দেবে না মনের মধ্যে। কিন্তু যখনি ধীরভাবে মনের মধ্যে তাকায় চোখে পড়ে বাম চরণ ভেদ করে একটি পদ্মরাগ বর্ণ রক্তরেখা নির্গত হচ্ছে, কাঁচ দুর্বাতৃণের মতো কান্তিময় দিব্যদেহ নিশ্চল হয়ে রয়েছে, একবার দক্ষিণ পাণি উত্তোলন করে কী জানালো অভয় না সান্ত্বনা না কী। সেই রক্ত ওষ্ঠাধর পুট, সেই নিমীল নেত্র, সেই প্রশস্ত ললাট। না, এসব কিছুতেই মনে মানবে না। কিন্তু সাধ্য কি? মনের মধ্যে পাথরে গাঁথা হয়ে গিয়েছে—সে ঐ চন্দ্রগোলকের মধ্যে শান্ত স্নিগ্ধ সৌম্য। কিন্তু এ কি চাঁদটা হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল কেন? আলো এখন ক্ষীণ হয়ে এলো কেন? ও কিসের ছায়া ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে চন্দ্রলোকের গায়ে। আবার ও কী অনুভব করছে সে, পিঠের তলাকার পাথরখানা নড়ছে কেন? আর ঐ চাপা গুরু গুরু শব্দ কিসের? সে চীৎকার করে লাফিয়ে ওঠে গেরণ, ভুঁই দোল, সমুদ্রের কোলাহল। ক্রমাগত এই তিনটি শব্দ আর্তনাদ করে বলতে থাকে। গেরণ, ভুঁই দোল, সমুদ্র।

হুহু হুহু হুহু! কি হল এবার এত রাতে।

প্রভু গেরণ, ভুঁই দোল, সমুদ্র। সেই সেদিনকার মতো।

কোন দিনকার মতো আবার।

সে প্রশ্নের উত্তর দেয় না, বলে প্রভু, ঐ দেখুন, আকাশে অন্ধকার হয়ে গেল, পৃথিবী আড়মোড়া ভাঙছে, সমুদ্র হাঁ করে ছুটে আসছে। ঠিক সেইদিনকার মতো।

কোনদিনকার মতো বলছ জানি না, তবে তিথি অনুসারে চন্দ্রগ্রহণ যথা সময়ে হয়েই থাকে, আর পাহাড়ী অঞ্চলে ভূমিকম্প প্রায় নিত্যকার ব্যাপার, কিন্তু সমুদ্র কোথায়? সে তোমার ঐ দক্ষিণ দেশে, এখানে থেকে পাঁচশো যোজন দূরে।

জরার মনে বাস্তব ও কল্পনার বিভ্রম ঘটে গিয়েছে। সেদিন আতঙ্কিত কল্পনায় যা দেখেছিল, যা অনুভব করেছিল আজ বাস্তবে তার অনুরূপ দেখছে, অনুভব করছে। হঠাৎ এই ঘটনায় আঘাতে

মাঝখানকার কয়েক মাস, মাঝখানকার সমস্ত ঘটনা লোপ পেয়ে গিয়েছে। সে আবার এসে দাঁড়িয়েছে বাসুদেব-হত্যার মুহূর্তে। তার ইচ্ছা হল এখান থেকে ছুটে পালাবে সেদিন যেমন পালিয়েছিল, কিন্তু পালাবে কোথা দিয়ে, গুহা থেকে বের হওয়ার পথ তার অজ্ঞাত। তাই সে ক্রমাগত আর্ত চীৎকার করতে লাগলো, প্রভু ঐ যে আবার ফিরে এসেছে আমাকে গ্রাস করবে।

ছাগর্ষি বলল, সবাই আমাকে দেখে অবাক হয়, তুমি যে আমাকেও অবাক করলে হে। কি হয়েছিল শুনি বলো তো। সেদিন, সেদিন করছ, কোনদিন, কি করেছিল?

প্রভু, আমি মহাপাপী।

আরে বাপু মানুষ হয়ে যখন জন্মেছ পাপী হতেই হবে, জন্মগ্রহণটাই তো পাপ। খুলে বলো।

বাবা আমি মহা দুঃখী।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। সুখী হলে পাহাড় জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে কেন? এই দেখানো কেন আমার দশা।

বাবা, আপনি তো পাপী নন।

কে বললে পাপী নই। মানুষের সঙ্গে যার বনলো না, মানুষ যার দু চক্ষের বিষ সে যদি পাপী না হয় তবে পাপী আর কে?

কিন্তু বাবা আমি যে মহাপাতক করেছি।

বড়ই বিরক্ত করলে তো। পাপও যাকে বলে পাতকও তাকেই বলে। কিন্তু পাতকটা কি? ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, পিতৃ-হত্যা না কি খুলে বলো।

সেদিনও তেমনি আকাশ এমনি অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, পৃথিবী কেঁপে কেঁপে উঠেছিল, সমুদ্র ছুটে চলে এসেছিল।

সবই তো বুঝলাম। সেদিন কি হয়েছিল?

কিছুতেই কৃতকর্মটা জরার মুখ দিয়ে বের হতে চায় না। পাপ যে ঘৃণ্য তার প্রধান প্রমাণ মহাপাপীও কৃতকর্মকে আভাসে ইঙ্গিতে বলে। চোর চুরিকে বলে বড়কর্ম, খুনী হত্যাকে বলে কণ্ঠচ্ছেদ। নামান্তরে যেন রূপান্তর হয়ে যায়।

জরা কিছু বলে না শরাহত মৃগের ন্যায় শুয়ে পড়ে ছটফট করতে থাকে—কেবল বলে হত্যা করেছি তাকে আমি হত্যা করেছি।

আরে বাপু ভূ-ভারতে আজ এমন কোন ব্যক্তি আছে যাকে হত্যা করলে এমন আত্মগ্লানি হয় বুঝতে পারি না। অনেকে যাকে ভগবান মনে করে আমি যদি সেই বাসুদেবকে হত্যা করতাম তবু এমন আত্ম-গ্লানিতে ভুগতাম মনে হয় না।

ছাগর্ষির কথা শুনে ডুকরে কেঁদে উঠলো জরা, বলল, প্রভু, আমি তাকেই হত্যা করেছি—মৃগভ্রমে শরাঘাতে তাকে হত্যা করেছি। এই বলে সে পাথরের উপরে মাথা কুটতে লাগলো।

তার স্বীকারোক্তি শুনে ছাগর্ষি স্তম্ভিত হয়ে গেল, বাসুদেব হত্যাকারী এই লোকটা। বলে কি? কারো প্রতি তার যে বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল তা নয়, সাধারণভাবে সে মানববিদ্বেষী, তবে বাসুদেব সম্বন্ধে মনঃস্থির করতে পারে নি সে। কখনো মনে করে যে কালান্তক, কুরু পাঞ্চাল যদুবংশ প্রভৃতি ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যেই জন্ম। আবার কখনো বা ভাবে এতই যদি করলো তবে বাকি ক'টাকে রেখে গেল কেন? পরশুরাম করেছিল নিঃক্ষত্রিয়, এ না হয় করতো নির্মানব। কখনো ভাবে অবতার, কখনো ভাবে মহা ধাপ্পাবাজ; কখনো ভাবে কৃকস্ত ভগবান কখনো ভাবে শঠ কপট লম্পট। যাই ভাবুক লোকটা যে অসামান্য তাতে সন্দেহ ছিল না ছাগর্ষির। জনশ্রুতিতে তার কানে এসে পৌঁছেছিল বাসুদেব দেহরক্ষা করেছেন। কিন্তু সে যে এই লোকটার শরাঘাতে কখনো কল্পনাও করতে পারে নি। চেয়ে দেখল পায়ের কাছে তখনো মুমূর্ষু পশুর মতো আকুলি বিকুলি করছে। ছাগর্ষির বিস্ময় এতই মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল যে ক্ষণকালের জন্য ছাগভাবার মুদ্রা দোষ হুঁহু শব্দ করতেও ভুলে গেল।

ছাগর্ষির মুখে হুঁহু শব্দ না শুনে জরা শঙ্কিত হয়ে উঠল, না জানি তার প্রতি কি আদেশ হয়। তার মনে হল মানুষ মাত্রেই এখন তার বিচারক। তার পা জড়িয়ে ধরে কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করলো, বাবা এখন আমার কি গতি হবে।

কি জানি বাপু বুঝতে পারছি না, তুমি মহাপাপী না মহাপুণ্যবান, নরকের কীট না স্বর্গের দেবতা, ভারতের কলঙ্ক না উদ্ধারকর্তা, তোমাকে অভিসম্পাত দেবো না মাথায় করে নাচবো কিছুই বুঝতে পারছি না।

জরার মুখে ঐ এক কথা, কি আমার গতি হবে বাবা, কি আমার গতি হবে।

ছাগর্ষি বলল, এগিয়ে দেখো হাত জোড়া।

কিছু বুঝতে না পেরে অবোধ পশু যেমন প্রভুর দিকে মুখ তুলে তাকায় তেমনি ভাবে তাকালো তার মুখের দিকে, গাল দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, তবে তা চোখে পড়লো না ছাগর্ষির, আর চোখে পড়লেও অর্থ বুঝতে পারতো কি? আজ চল্লিশ বছরের মধ্যে চোখের জল চোখে পড়ে নি নিঃসঙ্গ গুহাবাসীর।

কোথাও এগোবো বাবা, কার হাত জোড়া।

আরে কথাটার অর্থ বুঝলে না। ভিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা বা সামর্থ্য না থাকলে গেরস্ত ভিখারীকে বলে এগিয়ে দেখো হাত জোড়া। আমারও সেই ভাব। তোমার সমস্যা মীমাংসা করবার সামর্থ্য আমার নেই—তাই বলছি এগিয়ে দেখো।

কোন দিকে এগোবো, শুধায় জরা।

সে কি দিকের অভাব কি? এই পাহাড়টা ঠিক হিমালয় নয় তবে হিমালয়ের শাখাপ্রশাখা বলতে পারো, উত্তরে পূবে যতদূর খুশি চলে যাও সেই লৌহিত্য অবধি সহস্র যোজনা পথ হিমালয়পর্বত। আর যদি পাহাড় ছেড়ে সমতলে নামো তবে হাজার হাজার যোজন-ব্যাপী পড়ে রয়েছে ভারতবর্ষ। দেখো বিধাতা যত ব্যাধি সৃষ্টি করেছেন সেই সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন তার ঔষধ। কেবল খুঁজে বের করবার অপেক্ষা। পাপ সম্বন্ধেও সেই কথা। পাপ থেকে মুক্তির রহস্যও নিহিত আছে এই মহাদেশে এই মহাপর্বতমালায়। কত মুনি-ঋষি জ্ঞানী গুণী যোগী তপস্বী আছেন কেউ তাঁদের সংখ্যা জানে না। যাও এগিয়ে যাও, সকলেরই যে হাত জোড়া থাকবে এমন নয়, কেউ না কেউ জানবেন তোমার মুক্তির পথ।

জরা বলে, পথ যে অন্তহীন।

আরে সেই তো সুবিধা, অন্তহীন বলেই কখনো অন্ত হবে না, কোথাও না কোথাও সন্ধান মিলে যাবে।

জরা প্রবোধ মানে না মাথা কুটতেই থাকে। ও কি করছ?

মরতে চেষ্টা করছি।

মূঢ়, মরে কেউ কখনো মুক্তি পায় না, বৃথা মাথা কুটলেও মুক্তির সন্ধান মিলবে না।

প্রভু, এত বড় পাপ কেউ কখনো করেছে?

ঐ তো আগে বলেছি তুমি পাপী কি পুণ্যবান সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই।

আমাকেও পুণ্যবান বলবে এমন কি সম্ভব।

জরা এ বড় আশ্চর্য জগৎ, এখানে বোধ করি তাও সম্ভব। এই দেখোনা কেন আমারই তো সন্দেহ ঘুচছে না।

এমন সময়ে বাইরে হুঁহু হুঁহু হুঁ হু শব্দ শোনা গেল। ছাগর্ষি বলে উঠল, ঐ আমার ছাগমাতা এসেছে দুধ পান করাতে, তুমি থাকলে ভয় পাবে, তুমি এবারে পালাও।

তারপরে কিঞ্চিৎ রুক্ষভাবে বলল, চল্লিশ বছর পরে মানুষের সঙ্গে এতক্ষণ বাস করলাম, কেন করলাম জানি না; ভিতরে এখনো কোথাও কাঁচা আছে। যাও যাও তুমি এখনি যাও।

আবার বাইরে শব্দ উঠল হুঁহু, হুঁহু, হুঁহু। ছাগর্ষি ভিতর থেকে শব্দ করলো হুঁহু হুঁহু হুঁহু। অমনি পাথরের ফাঁক দিয়ে একটি বুনো ছাগল তুড়ুপ করে লাফিয়ে প্রবেশ করলো: শুয়ে পড়লো ছাগর্ষি, আর ছাগলটা তার মুখের কাছে এসে দাঁড়ালো, বাঁটে মুখ নামিয়ে সে দুধ পান করতে করতে হাত দিয়ে বার বার ইসারা করতে লাগলো জরাকে চলে যেতে। অগত্যা জরা গুহা থেকে বের হয়ে পথে এসে দাঁড়ালো।

৪

জরা চলতে সুরু করলো। পথ, পথ, পথ। এ সংসারে আর সকলেরই অন্ত আছে, কেবল পথ অন্তহীন, অনাদিও বটে। পথ ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়, নিজে কোথাও পৌঁছয় না। অরণ্য পর্বত প্রান্তর কান্তার, নগর, জনপদ কিছুই বাধা দিতে পারে না, নদ নদী ঝরণা

...কিছুই তার কাছে বাধা নয়। কোথাও ...ফিতের মতো, কোথাও সূক্ষ্ম সূতোর ...তো, কোথাও কেবল ছোট বড় উপলখণ্ডের ...দ্বারা চিহ্নিত দীর্ঘ দীর্ঘ অন্তহীন। পৌরাণিকগণ যে অনন্ত সর্পের কল্পনা করেছে এ বুঝি তারই কেউ হবে। আর সব-চেয়ে রহস্যময় পাহাড়ী পথ। দূর থেকে মনে হয় ঐখানে শেষ হ'য়ে গিয়ে শূন্যে মিশে গিয়েছে, কাছে যেতেই দেখা যায় পাহাড়টাকে বেষ্টন করে আবার সেই পথ। উপত্যকার যে নিম্নতম অংশে ঝরণা প্রবাহিত তারই ধার ঘেঁষে চলেছে, পথে আর ঝরণায় অন্তহীন প্রতিযোগিতা। অবশেষে দেখতে পাওয়া যায় ঝরণাও শেষ হয়েছে আর একটা ঝরণায় মিশে, পথ চলতেই থাকে। নদী? তার উপ-...য়েও পথের জিত। নদীর শিখর আছে সঙ্গম আছে কিন্তু পথের? নদীতে নৌ-চলাচলের চিহ্ন থাকে না, পথেও কি থাকে? দিনের বেলার হাজার পথিকের পদাবলী ধূলোয় উড়ে কোথায় বিলীন হয়ে যায়, ভোরবেলা আবার সদ্যজাত অকলঙ্ক অচিহ্নিত। তোমার শোক-তাপ থাকে পথে এসে দাঁড়াও, সমস্ত ভুলিয়ে দেবে, সুখে আনন্দে তুমি অধীর, পথে এসে দাঁড়াও দেখবে তাদের আর সে মূল্য নেই। তুমি যদি নিঃসঙ্গ হও পথ তোমাকে সঙ্গদান করবে, তুমি যদি সসঙ্গ হও পথ তোমাকে নির্জনতা দেবে। তুমি যদি পুণ্যবান হও পথের কাছে সেই শান্তি পাবে যা সমস্ত পুণ্যের লক্ষ্য। আর তুমি যদি পাপী হও, নদীস্রোত যেমন সঞ্চিত আবর্জনা ধুয়ে মুছে নিষ্কলুষ ক'রে দেয়, পথচলা তেমনি তোমার পাপের ভার নষ্ট ক'রে দিয়ে মুক্তির দিকে তোমাকে চালনা করবে। পায়ে পায়ে পথের জপমালা আবর্তিত করতে করতে চলো। জরা চলেছে।

এতদিন পর্যন্ত জরা মনুষ্যসমাজের অন্তর্গত ছিল, এবারে নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গতার নিদারুণ মূর্তি দেখেছে নির্বাসিত অন্ধকার গুহাবাসী ছাগর্ষির মধ্যে। নিঃসঙ্গতাকে আর তার ভয় নাই। দিনে পথে চলে, রাতে পথে ঘুমোয়, কোনদিন একটা গুহা পেলে ধন্য মনে করে। খাদ্যও? মাঝে মাঝে পাহাড়ী-দের গ্রাম, রাহী আদমিকে দু'খানা রুটি একটু শাক দেওয়াকে তারা পুণ্য মনে করে। যেদিন পথে গ্রাম না পড়ে গাছে ফল তো আছেই। তাও যেদিন মেলে না, সেদিন অনাহার। আর সমস্ত অভাব পূর্ণ ক'রে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ঝরণার ধারা। সেই অমৃত বারি থেকে তাকে বঞ্চিত করবে কে।

ছাগর্ষির পরামর্শ নিরন্তর বাজছে তার মনের মধ্যে—এগিয়ে দেখো হাত জোড়া। কিন্তু কি ক'রে সে বুঝবে কার হাত পূর্ণ, কে দান করতে পারে তার কাম্য বস্তু। নিরন্তর মনে মনে জপতে থাকে আমি পাপী, কি গতি হবে আমার। কই এমন তো কাউকে চোখে পড়ে না যার কাছে হাত পাতা যায়, সকলকেই তার মতো প্রার্থী মনে হয়। একদিন সে দেখতে পেলো পথের পাশে বিশ্রাম করছে একজন প্রবীণ ব্যক্তি, ভাবলো সাধু-সন্ন্যাসী হবে। তার কাছে গিয়ে প্রণাম ক'রে বলল, বাবা, আমি মহাপাপী, আমার কি গতি হবে?

লোকটি হেসে বল্‌ল, আমার চেহারা দেখে বুঝি সাধু-সন্ন্যাসী মনে হ'য়েছে। না বাপু, আমি ব্যবসায়ী, কালকে রাতে লুঠেরা আমার সমস্ত মালপত্তর লুট ক'রে নিয়ে গিয়েছে। এখানে বসে বিশ্রাম করছি। আমি কি উত্তর দেবো তোমার জিজ্ঞাসার।

জরা অবাক হয়ে ভাবে এই পাহাড়ের মধ্যেও ব্যবসায়ী আছে, লুঠেরা আছে। অবাক হ'য়ে আবার চলতে থাকে।

আর একদিনের অভিজ্ঞতা মনে পড়লে তার হাসি পায় যদিচ ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত মারাত্মক হ'তে পারতো। সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময়ে চোখে পড়লো পথের পাশে গাছের ছায়ায় একদল লোক কালো কম্বল গায়ে চক্রাকারে বসে আছে। তার ধারণা হ'ল তীর্থ-যাত্রী সাধুর দল হবে, রাতের মতো আড্ডা গেড়েছে। ভাবলো ভালোই হ'ল, এদের কাছে আশ্রয় পাওয়া যাবে, আর সাধু সঙ্গে একটা সদুত্তর পাওয়া যাবে তার জিজ্ঞাসার। পথ ছেড়ে ধীরে ধীরে সেই দিকে চলল, যখন খুব কাছে এসে পড়েছে, পায়ে হয়তো শব্দ হ'য়ে থাকবে, তখন সেই সাধুদের একজন মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখ্‌ল, সে-ও দেখ্‌ল আর তখনি এক দৌড়ে পথের উপরে এসে বসে প'ড়ে হাঁফাতে লাগলো। সাধু নয় এক পাল ভালুক। ভাবলো আর একটু হ'লেই চরম গতি হ'য়ে যেতো। পরে এ কথা মনে ক'রে হেসেছে কিন্তু তখন কাঁপুনি থামতে চায় নি।

জরার পথ চলায় আর বিরাম নাই। সকালবেলা সূর্য্য দেখে দিক স্থির ক'রে নেয়, পূব দিকে হিমবন্ত, দক্ষিণে ভারতবর্ষ। এই দুই দিক তার গন্তব্য, আপাততঃ হবে। শাখা-প্রশাখা ছেড়ে নিজ হিমালয়ে গিয়ে উপস্থিত হ'তে হবে। ছাগর্ষির কাছে শুনেছিল সেখানেই নাকি জীবনের সব জিজ্ঞাসার মীমাংসা সঞ্চিত। সেই খনি থেকে রত্ন উদ্ধারের আশাতেই আবহমান কাল মুনি ঋষি যোগী তপস্বীদের সেখানে ভিড়। মনে পড়লো দ্বারকায় থাকতে কার কাছে যেন শুনেছিল শীঘ্রই পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করবেন—সেও তো এই হিমালয়ের দিকে। সকলের সব প্রশ্নের উত্তর জানে এই আদি বৃদ্ধ, তার প্রশ্নের উত্তরটাই কি তার অজানা? আমি পাপী, কি গতি হবে আমার।

কালের মাত্রা ভুল হয়ে গিয়েছে জরার। সূর্যোদয়ে দিন, সূর্যাস্তে রাত্রি—এইটুকু মাত্র জানে। সপ্তাহ মাস বৎসর আর সব মাত্রা হারিয়ে গিয়েছে তার মন থেকে। একদিন পল্বলে স্নান করতে নেমে ছায়া দেখে চমকে উঠ্‌ল, এত লম্বা চুল দাড়ি কার? তবে তো অনেক বছর পার হ'য়ে গিয়েছে। হয়তো চার পাঁচ বছর হবে, এতদিন গেল তবু মিললো না তার প্রশ্নের উত্তর। এতদিনেও এমন একজন লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না যার হাত পূর্ণ। সংসারে কি তবে সকলেরই হাতজোড়া। হতাশ হ'য়ে মাটিতে বসে পড়ে।

স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন ৫৲ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনালোকে ৭৲

জরা পথে পথে চলছেই, কখনো উপ-ত্যকা কখনো অধিত্যকা, কখনো প্রান্তর, কখনো কান্তার। কখনো চড়াই, কখনো উৎরাই, কখনো জনপদ, কখনো নির্জন, এমন কত কি দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর। বেহুঁস ভাবে আপন মনে চলেছে তো চলেইছে। তবে দৃশ্যপট যেমনি হোক মুখে তার এক বুলি, আমি পাপী, আমার কি গতি হবে, পাপীর কি মুক্তি নাই। পথে যার সঙ্গে দেখা হোক রাজা কি রাখাল, বাসুদেব তো দু-ই ছিল, শুধায় আমার কি গতি হবে। তারা বুঝতে না পেরে অবাক হ'য়ে দেখে চলে যায়। পথে যার সঙ্গে দেখা হয় সাধু কি ভন্ড শুধায় পাপীর কি মুক্তি নাই। কেউ স্নেহের চোখে দেখে, কেউ সন্দেহের চোখে দেখে চলে যায়। কেউ বলে বাউরা, কেউ বলে পাগলা, কেউ বলে লোন্ডা, কেউ বলে মহাত্মা আদমি কিন্তু আসল কথার উত্তর দেয় না।

একদিন জরা গিয়ে উপস্থিত হ'ল এক পাহাড়ী গাঁয়ে, সেখানে কি একটা পরব চলছিল। জটাজুট শ্মশ্রুসমন্বিত জরাকে তারা সমাদর করে বসালো। খেতে দিল, এমন খাদ্য অনেককাল সে পায়নি, তারপরে বিদায়ের সময়ে একখানি ধুতি আর পশমী গায়ের কাপড় দিল। এ দুটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তার পরিধেয় ও গায়ের কাপড় লজ্জা ও শীতাতপ নিবারণের অযোগ্য হ'য়ে পড়েছিল। তবে এ তিনের কোনটারই বোধ ছিল না তার। বিদায়ের সময় একজন প্রবীণ ব্যক্তিকে শুধালো, বাবা, আমি পাপী আমার কি গতি হবে।

সে ব্যক্তি বলল, সাধুজি, আপনার মতো সাধু যদি পাপী হন, তবে আমাদের গৃহীদের কি আর পাপের অন্ত আছে। আপনার নৌকোয় ফুটো হ'য়ে গিয়েছে আর আমাদের নৌকা তো অনেকদিন বানচাল।

তবে চলছে কি ক'রে?

একে কি আর চলা বলে। এ-যে তলিয়ে যাওয়া।

তবে এত হাসি গান পরব কিসের।

সাধুজি, কি আর বলবো, এসব মুমূর্ষুর বিকার।

জরা ব্যাকুল ভাবে শুধায়, তবে আমার প্রশ্নের মীমাংসা কার কাছে পাবো?

কেমন ক'রে বলবো বাবা, তবে কি জানেন, পরমাত্মা কৃপা করলে নিশ্চয় মীমাংসা হবে আপনি এগিয়ে দেখুন।

জরা শোনে সেই পুরাতন উত্তর এগিয়ে দেখো হাত জোড়া। ভাবে হাত জোড়া হবে না কেন? হাত যে সুখের উপাদানে পূর্ণ! সে আবার এগিয়ে চলে।

সেদিন ভোরে যখন পথ চলতে সুরু করেছে তখনো কুয়াশার ঘোর কাটেনি। এসব স্থানে ভোরের কুয়াশা একটা নিত্য-কার ব্যাপার। সেই প্রায়ান্ধকারে কার সঙ্গে লাগলো ধাক্কা। জরা বলে উঠল, বাবা আমি পাপী আমার কি গতি হবে। অন্য সময় দেখেছে প্রশ্ন শুনে লোকে পাশ কাটিয়ে যায়। এবারে পাশ কাটালো না। জরা ও সে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলো। বাবা পাপীর কি মুক্তি নেই? কুয়াশা স্বচ্ছ হ'য়ে এলে দেখতে পেলো একটা পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিল। ভাবলো ক্ষতি কি? এক-কালে পাথর ভেদ ক'রেই তো নৃসিংহ-মূর্তিতে নারায়ণ প্রকাশ পেয়েছিলেন। আমার কি সে সৌভাগ্য হবে না! আমি কি হিরণ্যকশিপুর চেয়েও নরাধম। জরার আবার সুরু হয় চলা।

একদিন দেখতে পেলো নদীর তীরে, ঝরণা সেখানে হঠাৎ প্রশান্ত হয়ে গিয়ে নদীর বিস্তার লাভ করেছে, এক সাধু উপবিষ্ট। তাকে প্রণাম ক'রে সেই চিরন্তন প্রশ্ন শুধালো, বাবা, পাপীর কি মুক্তি নেই? সাধু তাকে নিরীক্ষণ ক'রে বলল, বসো। জরার আশা হ'ল। এপর্যন্ত কেউ তো বসতে বলেনি। দেখল সাধুজি একটা ছোট কল্কে যথারীতি সাজিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, বেটা পিও তেরা মুক্তি মিল যায়গা।

জরা বলে, আগে বাবা প্রসাদ ক'রে দিন।

সাধু একটান দিয়ে তার হাতে কল্কে দিল।

জরা বাল্যকাল থেকে গাঁজা ভাঙ প্রভৃতি যাবতীয় নেশা পারঙ্গত, কিন্তু এ কি পাহাড়ী গাঁজা বাপ, একটান দিয়েই তিনদিন অচৈতন্য। তিনদিন তিন রাত পরে যখন সে প্রথম চোখ মেলল সাধু শুধালো কি বেটা শান্তি মিলল?

জরা বলল, অচৈতন্য অবস্থায় শান্তি পেয়েছিলাম, এখন আবার অশান্তি।

সাধু বলল, বেটা সংসারে শান্তি কোথায়? সংসার পাপের আগার। মুক্তি বলো শান্তি বলো সমস্তই এই এর মধ্যে— এই বলে গাঁজার কল্কেটি দেখালো।

জরা শুধায়, তবে হিমালয়ে হাজার হাজার যোগী মুনি ঋষির ভিড় কেন? গাঁজা তো সংসারেও মেলে।

মেলে বইকি, তবে তা পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। আর হিমালয়ে তা পথেঘাটে ফলে রয়েছে তুলে নেওয়ার অপেক্ষা মাত্র: তাছাড়া এ দেবলোকের গাঁজায় দৈবগুণে প্রমাণ তো হাতে হাতে পেলি বেটা।

তা পেলাম বাবা, কিন্তু আমার মীমাংসা তো পেলাম না। এ মুক্তি ক্ষণিক, আমি চাই স্থায়ী মুক্তি।

তখন সাধু বলল, এগিয়ে যা, আর কিছুদূরে গেলেই হিমালয়ের আরম্ভ, সেখানে প্রথমেই মিলবে কিন্নর রাজ্য। সেখানে তোর স্থায়ী মুক্তি মিলবে—এই বলে সাধু অস্থায়ী মুক্তির দ্বারস্বরূপ কল্কেটিতে মনোনিবেশ করলো। আশান্বিত জরা ত্বরান্বিত পদে কিন্নর রাজ্যের দিকে যাত্রা করে।

কয়েকদিন পথ চলবার পরে জরা বুঝতে পারলো, জরার মতো তন্ময় লোকের পক্ষেও সহজবোধ্য হ'ল যে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটতে সুরু করেছে। চড়াইগুলো এখন বেশি খাড়া, উৎরাইগুলো বেশি ঢালু, উপত্যকাগুলো গভীরতর, শিখরগুলো উচ্চতর, দিনমান তেমন আর গরম নয় রাত্রি শীতলতর, যখন-তখন কুয়াশা এসে স[...] অবলুপ্ত ক'রে দেয়, মেঘের দল [...] দিক থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে [...] আকাশ যখন পরিষ্কার থাকে তারাগু[...] কি স্বচ্ছতা, আর পাহাড়ের গায়ে [...] সুঠাম সরল গাছগুলো থাকে থাকে উপ[...] দিকে উঠে গিয়েছে একেবারে শিখ[...] চূড়ান্ত অবধি। দেওদার, ধুপি, [...] প্রভৃতি কয়েকটা গাছ বাদ দিলে অধিকা[...] গাছপালা তার অপরিচিত। আর উপত্য[...] যে ঘন সবুজ তৃণ তাদের রঙটি এমন [...] এমন নবীন মনে হয় বসলে কাপড়ে [...] লেগে যাবে। জরার চোখ কিছুদিন [...] পাহাড়ে অভ্যস্ত হ'লেও এ দৃশ্য [...] চোখে নূতন। এ পাহাড় নয়, পর্বত।

এতকাল যে-সব পাহাড়ে পাহাড়ে [...] ঘুরেছে, সে-সব হিমালয়ের শাখাপ্র[...] হ'লেও তার গৃহীরূপ। এবারে যে[...] এসে পৌঁছল জরা সেখানে হিমালয় [...] ত্যাগী মহাযোগী। হিমালয়ের দু[...] দুর্বার, দুর্জয়, দুরারোহ তুষারশৃঙ্গ [...] দেখেই কি প্রাচীনেরা ধূর্জটির কল্প[...] করেছেন! আর উমা? সে তো নব[...] কোমল তটিনী-তরল শ্যামলঘন শস্য[...] উপত্যকাগুলি। উপত্যকা, অধিত্যকা [...] শিখর এবং নিবিষ্ট অরণ্য গায়ে [...] সংযুক্ত থেকে যে বিষম সৌন্দর্যের [...] করেছে কে নিশ্চয় ক'রে বলতে পারে [...] হর-গৌরী পরিকল্পনার মূলে নয়? [...] লয়ের প্রতিটি শৃঙ্গ স্বর্গারোহণের [...] একটি সোপান, এখানকার বায়ুতে, [...] জলে, ফলে আয়ু এবং অমৃত। [...] মুক্তির সোপান। সেখানে আজ প্র[...] জরা।

এতদিন একটা ক্লান্তির সঙ্গে [...] ক'রে যেন চলছিল জরা, পাদুখানা [...] বহন করতো না, তাকেই টেনে নিয়ে [...] হ'তো পাদুখানাকে। এখন যেন [...] অদৃশ্য পাখা গজিয়েছে, উড়িয়ে [...] চলেছে তাকে: এখানকার বায়ুতে [...] একটা আশ্বাস অনুভব করলো মনে [...] মোড়টা ঘুরলেই বুঝি মুক্তি। কিন্তু [...] জরা জানতো না যে, ধূর্জটির তপো[...] নন্দী ভৃঙ্গী দ্বাররক্ষী। নন্দীর [...] শাসন, ভৃঙ্গীর ত্রাসন। একজন স্বর্ণ[...] উঁচিয়ে করে, অপরজন নানা উপায়ে [...] দেখিয়ে আগন্তুককে নিবারিত করে। [...] হাত থেকে ছাড়পত্র পেলে তবেই প্রবে[...] অধিকার, তবেই শান্তি, আনন্দ ও মুক্তি [...] ত্রয়ী ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরের বিভূতি।

খাড়া চড়াই উঠতে উঠতে আরও উঠ[...] হবে যখন প্রত্যাশা করছে, হঠাৎ [...] হঠাৎ চড়াই-এর উচ্চতম স্থানটা একেবা[...] সমতল হ'য়ে গিরিশিখরগুলোর দিগ[...] অবধি প্রসারিত। জরা এসে উপস্থি[...] হ'য়েছে একটি অধিত্যকায়—যেখানে [...] সেই সাধু-কথিত কিন্নর রাজ্য।

উচ্চাবচ পাহাড়ের মধ্যে সমতল অ[...] ত্যকা দেখে জরা বিস্মিত হ'য়ে গিয়ে[...] তারপরে যখন তার চোখে পড়লো [...] সমতলে সুন্দর একটি নগর, সুরম্য অ[...]

...কা, উদ্যান, বিপণি, ফোয়ারা, শ্বেত-পাথরে ঘাট বাঁধানো সরোবর, সরোবরে নীল রক্ত উৎপল, পথের দু'দিকে বকুল, শিরিষ, চম্পক, কামিনী প্রভৃতি সপুষ্পক বৃক্ষের গাছ, তখন তার বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু বিস্ময় একেবারে চরমে উঠল নগরের অধিবাসীদের দেখে। সকলেই তরুণ-তরুণী, শিশু, বালক-বালিকা কিশোরীও আছে, তবে তারা তো তারুণ্যের কুঁড়ি, ফুটে উঠলেই তরুণ-তরুণী। একটিও বৃদ্ধ চোখে পড়লো না তার, আর একটিও কুৎসিত বা বিকলাঙ্গ, রূপ ও যৌবন যেন এ-রাজ্যের নিয়তি। ...ধীন সাধুরে আশ্বাসে মনে পড়লো, হাঁ ...খানে পাপের মুক্তি, পাপীর শান্তি ...লে মিলতেও পারে।

সে এগিয়ে গিয়ে সরোবরের ঘাটে উপস্থিত হল, দেখলো, কয়েকজন তরুণী সম্পূর্ণ বিবসন অবস্থায় জলে সাঁতার কাটছে, পান্নাতরল জলে এতটুকু আবরণের ...জ করেনি। আর কয়েকজন স্খলিত-...স্ত তরুণী ঘাটে বসে সোনার লোষ্ট্র-...ন্ড দিয়ে পা ঘসছে, কেউ বা সোনার দর্পণে মুখ দেখছে, আর কেউ বা মেঘমুক্ত ...সচ্ছে তেল মাখছে যার সুগন্ধ, কেশের গন্ধ আর তেলের গন্ধে মিলে অধিকতর ...লোচ্ছ এতদূরে এসে নাসায় প্রবেশ করছে ...রার। তাকে কেউ দেখল কিনা বুঝতে পারলো না, আর দেখে থাকলেও জিজ্ঞাসা ...বিকার জাগলো না তরুণীদের ...বিহারে। ঘাট থেকে দূরে এক জায়গায় ...লে নেমে আকণ্ঠ জল পান ক'রে যখন ...উঠল, মনে হ'ল জল নয় অমৃত। ...ত কখনো পান করেনি বটে, তবে এই-...ক্ষ হওয়াই সম্ভব।

তারপরে সে একটি বীথিকা-পথ ধরে অগ্রসর হ'তে লাগলো। সে দেখতে পেলো পথটির একদিকে বকুল, শিরিষ চাঁপা, অন্য দিকে কদম, শিউলি, লোধ্র, আরও দেখতে পেলো উদ্যানে মল্লিকা যূথী, চামেলি, কুন্দ বিভিন্ন ঋতুর ফুল প্রস্ফুটিত। এমন তো কোথাও দেখেনি, তবে আগে তো কিন্নর-রাজ্যেও আসেনি। এমন সময়ে দেখতে পেলো তিনটি তরুণী, তিনটি সুবর্ণ-প্রতিমা নিষ্কলঙ্ক তুষারের উপরে প্রথম সূর্যরশ্মির আভা তাদের রঙে, তার দিকে আসছে।

সাহসে ভর ক'রে তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, এটা কি কিন্নর রাজ্য?

তরুণীদের একজন বলল, হাঁ।

তার ব্যবহারে লজ্জা ও সংকোচের ...মাত্র ছিল না, খুব সম্ভব ও দু'টি ...দ নয় ঐ ভাবদু'টির সঙ্গেও তাদের পরিচয় নেই।

আর একজন বলল, তোমাকে তো বিদেশী মনে হচ্ছে, কোথা থেকে আসছ?

জরা বলল, সে অনেক দূরে, অনেক সময় লেগেছে এখানে পৌঁছতে।

দেশ ছেড়ে কেন এখানে এলে?

সে অনেক কথা শুনে লাভ নাই। আমি বেড়াচ্ছি মুক্তির আশায়। আমি পাপী, মহাপাপী, আমার কি গতি হবে তোমরা বলতে পারো।

তৃতীয়া বলল, এ-রাজ্যে এরকম কথা এই প্রথম শোনা গেল।

বিস্মিত জরা বলে, সে-কি, পাপ-পুণ্য এসব কথা কি তোমরা শোননি?—তার মনে পড়ে যায় সুবালাকে, সে-ও তো এই রকম চমকে উঠেছিল।

তরুণীদের একজন বলল, ওসব শব্দ আমাদের দেশে অজ্ঞাত, পাপ পুণ্য কাকে বলে?

আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধরো একজন মানুষকে খুন করলাম, নরহত্যা মহাপাপ।

কিন্তু হঠাৎ হত্যা করতে যাবে কেন?

মনে করো লোভে।

ওদের একজন বলে, লোভ হবে কেন?

জরা বলে, মনে করো তার ধনরত্নে আমার লোভ।

ওরা বলে, আমাদের দেশে ধনরত্ন যথেষ্ট আছে কিন্তু সেসব কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।

তবে! বিস্ময় প্রকাশ করে জরা।

তবে আর কি যার যা প্রয়োজন নেয়।

কেউ বাধা দেয় না?

কে বাধা দেবে? আমাদের দেশে রাজা নেই, রাজশাসন নেই—ওসব ছাড়াই আমাদের চলে যায়।

আচ্ছা ধনরত্ন থাক। মনে করো কারো সুরম্য একটা অট্টালিকা বাড়ী আছে, তার লোভে হত্যা করলাম।

দেখো বিদেশী, এদেশে সকল হর্ম্যই সুরম্য কিন্তু তাও কারো ব্যক্তিগত নয়, যার যেখানে খুশী বাস করছে।

জরা বলল, আচ্ছা বাড়ীও থাক্। কারো সুন্দরী নারী আছে তার লোভে স্বামীকে হত্যা করলাম।

এবারে সুন্দরীরা হেসে উঠল, বলল, দেখতেই পাচ্ছ এদেশে নরনারী সকলেই সুন্দর। কিন্তু তাদের মধ্যেও সম্বন্ধ ব্যক্তিগত নয়।

কেন বিবাহপ্রথা কি তোমাদের নাই?

না, যে যার সঙ্গে খুশী বাস করছে, তাকে ভালো না লাগলে আবার আর এক-জনের সঙ্গে গিয়ে বাস করছে।

জরা শুধায়, তাদের সন্তান হলে?

সন্তান হয় বইকি? তবে তারাও কারো ব্যক্তিগত নয়?

তবে কার?

সকলেই এই কিন্নর রাজ্যের নাগরিক। একটু বয়স হলেই তারা যথেচ্ছ বিচরণ করে।

বিস্ময়ের ধমকে জরা নির্বাক হয়ে যায়।

এমন সময়ে তরুণীদের একজন উচ্চ-স্বরে ডাকে, তুহিন, এদিকে এসো।

জরা দেখে তার ডাক শুনে একজন সুন্দর যুবক এগিয়ে আসে। সে লোকটি কাছে এলে সেই তরুণীটি বলে, তুমি আজ রাতে আমার কাছে থাকবে।

তুহিন নামে সেই যুবকটি বলে, নবীনা, তোমার কাছে থাকতে পারলে খুশী হতাম, কিন্তু আগেই যে আরতিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। তুমি কেন আজকার মতো আর কাউকে বলো না।

তাই হবে গন্ধর্বকে না হয় বলবো।

জরা তাদের কথোপকথন শুনে ভাবে এরা কি বাতুল নাকি?

এবারে তুহিন লক্ষ্য করে জরাকে, শুধায় একে তো আগে দেখিনি।

নবীনা বলে, বিদেশী লোক।

এখানে কেন?

পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় লোকটা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তুহিন বলে, তার মানে মাথা খারাপ।

জরা আর নীরবে থাকতে পারে না, বলে, মাথা খারাপ কার? আমার না তোমাদের?

কেন বলো তো, শুধায় তুহিন।

কেন আবার কি! তোমাদের এখানে দেখছি নীতি বিবেক ধর্ম রাজশাসন কিছুই নেই।

তুহিন বলে, সত্যাই ওসব কিছু নেই, তবু তো দেখো আমাদের আনন্দে চলে যাচ্ছে।

জরা বলে, এখন যাচ্ছে বটে, যৌবনে ওরকম মনে হয় কিন্তু বয়স হলে দেখতে পাবে যে......

বাধা দিয়ে তুহিন বলে, বয়স তো কম হয়নি আমাদের। আমার বয়স দেড়শ বছর, আর এই সুন্দরীদের বয়স একশ পঁচিশ ত্রিশ হবে।

কি যতসব বাজে কথা বলছ। তোমার বয়স খুব বেশি হবে তো পঁচিশ ত্রিশ, আর এই তরুণীদের কিছুতেই পঁচিশের বেশি নয়।

তুহিন বলে, তোমার কাছে মিছে বলায় কি লাভ?

জরা বলে, তবে দেখছি তোমাদের চির-যৌবন।

এতক্ষণে ঠিক বুঝেছ, কিন্নররাজ্যে চিরযৌবন।

এ কেমন করে সম্ভব হল।

খুব সহজে। এই তো এখুনি বিস্মিত হয়েছিলে আমাদের এখানে কারো শাসন নেই, না রাজার না সমাজের। ওসব নেই সত্য, তবে এক শাসন আছে, সে শাসন স্বভাবের।

সে আবার কি?

স্বভাব যদি তার বিধিনির্দিষ্ট পথটি পায়, কোন বাধা না আসে, কেউ বাধা না দেয় তবে মানুষ চিরানন্দময় হয়। চিরানন্দ-ময়ের আবার জরা মরণ কি? সে তো চির-যৌবন চিরজীবী।

চমকে উঠে জরা শুধায়, বলো কি! তোমাদের কি মৃত্যু নেই?

না। মরবে কেন? কেন জীর্ণ হবে মানুষ!

জীর্ণ হবে কারণ আধিব্যাধি জরা নিরন্তর তার জীবনরস শুষছে। সাধ্য কি মানুষ চিরযৌবন চিরজীবী হয়।

সে তোমাদের দেশের নিয়ম হতে পারে। তোমরা স্বভাবের পথে ধ্যানধারণা পাপ-পুণ্য নীতি বিবেক ঈশ্বর পরকাল স্বর্গ নরক প্রভৃতি এনে ফেলছ, তাই স্বভাব বিধিনির্দিষ্ট পথটি না পেয়ে কখনো শাকিনর মত কখনো বন্যা প্রভৃতি। তোমরা ...

কুব্জ রুগ্ন জীর্ণ বৃদ্ধ হয়ে পড়ো। মরণ তো ভালো, এইসব থেকে মুক্তি দেয়।

স্বভাবের নিয়ম বলতে কি বোঝায়?

এতো সহজ। মন যা চাইবে প্রাণ যা চাইবে ইন্দ্রিয় যে পথে যেতে চাইবে বাধা দিয়ো না। মন নারী চায় ভোগ করো, সুখাদ্য চায় ভোগ করো, ধনরত্ন চায় ভোগ করো, নৃত্যগীত বিলাস চায় ভোগ করো, দেখবে জরা মৃত্যু দুঃখ পাপ ঘেঁষতে পারবে না।

জরা হতাশ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে এক-খানা শিলাসনে বসে পড়ে, আপন মনে বলতে থাকে, তবে তো দেখছি এদের কাছে মুক্তির উপায় মিলবে না। এরা স্বভাবত মুক্তজীব, বন্ধন না মানলে মুক্তির উপায় জানবে কি করে? তবে তো সাধুজী ভুল সংবাদ দিয়েছেন।

তুহিন বলল, কোন সাধু তোমাকে কি সংবাদ দিয়েছে জানি না, কোন সাধু সন্ন্যাসী আমাদের দেশের রীতিনীতি জানে না, সত্যি কথা বলতে কি এখানে তাঁদের প্রবেশের পথ রুদ্ধ। তুমি যে কিভাবে প্রবেশ করলে বুঝতে পারছি না।

জরা বলল, তোমাদের রীতিনীতি তোমাদের থাক। আমার কি গতি হবে তাই ভাবছি।

দেখো বিদেশী, তোমার গতি তারাই বলতে পারবে যারা ঐ পথের পথিক। কিন্নর রাজ্য আধিব্যাধি জরামরণহীন আনন্দময় চিরযৌবনের দেশ—বলল তুহিন।

জরা স্বগতভাবে বলে, এমন রাজ্য যে পৃথিবীতে আছে জানতাম না।

তোমার কথা এক হিসাবে সত্য। এ রাজ্য পৃথিবীর অন্তর্গত নয়। এ রাজ্যের অবস্থিতি পৃথিবী ও স্বর্গের ঠিক সীমান্তে। আর এক ধাপ অগ্রসর হলেই নন্দনলোক।

তবে তোমরা আর এক ধাপ এগিয়ে সেখানে যাওনা কেন? শুধায় জরা।

মনুষ্যদেহধারীর সেখানে প্রবেশ নিষেধ, শুনেছি মহারাজ যুধিষ্ঠির সেখানে সশরীরে যাবেন।

তোমরা দেখছি যুধিষ্ঠিরকে জানো। তাহলে নিশ্চয় বাসুদেবের নাম শুনেছ।

তুহিন বলে, কি বলছ তাঁর নাম কে না শুনেছে? তবে কি জানো আমরা বাসু-দেবের ভক্ত নই, আমাদের আরাধ্য ব্রজের কৃষ্ণ, সেই চিরানন্দময় চিরকিশোর।

তবে যে বললে তোমরা ঈশ্বর মানো না।

কে বলল মানি না! আমরা মানি ভগবান আছেন। আছেন তো আছেন, তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরি না।

তবে কেন কৃষ্ণকে স্বীকার করো।

স্বীকার করি সখা বলে, বন্ধু বলে, আমাদের আনন্দের সঙ্গী বলে, ভগবান বলে নয়।

আমি তো তোমাদের ভাবগতিক কিছুই বুঝতে পারছি না। কৃষ্ণকে মানো বাসু-দেবকে মানো না। এ দুই কি আলাদা।

সহজ কথাটা সহজে বুঝতে না ... তোমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে বিদে... যে রূপে তিনি গোপিনীদের সখাদের ... বাসীদের আনন্দ দিতেন আমরা তাঁর চিরকিশোর রূপটি মানি। বাসুদেব ... তো তিনি আনন্দময় নন। তখন ... ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ধনুকখানায় আরোপণ করেছেন, তখন তিনি বীরে... শাস্ত্রস্রষ্টা, চিন্তানায়ক, রাষ্ট্রপতি, তখন ... বিশ্বমূর্তি। ঐ মূর্তি দেখে মহাবীর অ... অবধি ভীত হয়েছিলেন। বিশ্বরূপের ক... বন্ধুরূপে দেখা দিতে মিনতি করেছি... কৃষ্ণকে। তবু বলি ও রূপে ম... মানুষের যাদের সমস্যা অসংখ্য, আর ... অসংখ্যের নাগপাশ থেকে যারা মু... প্রয়াসী।

তুহিনকে বাধা দিয়ে নবীনা ব... বিদেশীর স্নানাহার হয়নি দেখছি, ... ব্যবস্থা করে দাও।

জরা বলল, সেজন্য তোমাদের ভা... হবে না, আমি ঐ সরোবরের জল... করেছি, জল তো নয় অমৃত, ওতে ক্ষুধা... দুই মিটেছে। এখন আমাকে বিদায় দাও...

কোথায় যাবে?

পথ যেখানে নিয়ে যায়।

পথ কি তোমার মুক্তির খবর রা...

হয়তো রাখে না, তবু পথ ... আমার আর গতি কি? পথে পথে ... ঘুরেই জীবন কাটাবো যদি কখনো ... লোকের সাক্ষাৎ পাই। তেমন কাউকে তো... জানো?

তুহিন বলল, শুনেছি হিমাল... কোনখানে আশ্রম স্থাপন করে ... করছেন চারুবাক নামে ঋষি। যদি ... থাকে তাঁর সাক্ষাৎ পাবে, তিনি তো... প্রার্থনার উত্তর দিলেও দিতে পারেন।

কি নামটি বললে, আর একবার ব...

ঋষি চারুবাক্।*

চারুবাক্—না আর ভুল হবে ... চললাম। এই বলে তাদের কাছে বিদায় ... জরা আবার পথ চলতে শুরু করলো।

জরার বিদায়ে চিরানন্দ লোক ... রাহুর উপচ্ছায়া অপসারিত হল। (ক্র...

---

*মহাভারতে পাওয়া যায় যে দ... ধনের চার্বাক নামে এক বন্ধু ছিলেন। 'বাক্যবিশারদ' দার্শনিককে বোধ Sophist বললে অন্যায় হয় না। ... বেদবিরোধী ছিলেন বলে বেদবাদী ঋ... তাঁকে বলেছেন চার্ব্বাক রাক্ষস। সম্ভব চার্ব্বাক শব্দটি চারু-বাক্ শ... সংক্ষিপ্ত রূপ। তা যদি হয় তবে ব... হবে অনেকের কাছে তার বাক্য সুন্দর হতো। সম্ভবতঃ চারুবাক্, চার্ব্বাক শ... মধ্যে এই ইতিহাস লুপ্তাকারে ... গিয়েছে। মহাভারতের সমাজ, পৃঃ ... শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, সপ্ততীর্থ (...

অঙ্গনা

পরিস্থিতি ঃ মানসিকতা

বিয়ে করাটা সামাজিক কর্তব্য। একদিন এটাই ছিল সমাজ-জীবনের ন্যূনতম বিধান। সেদিন ছেলে বা মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হলে মা-বাবা আর আত্মীয়স্বজন এক মুহূর্ত নিশ্চিন্ত বসে থাকতেন না। উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রীর সন্ধান করে বিয়ের পাটটা চুকিয়ে ফেলে তবে নিশ্চিন্তি। এজন্য তোড়জোড় সব শুরু হয়ে যেতো সেই কবে থেকে, বলতে গেলে প্রায় মেয়ের জন্মের পর থেকেই। ছেলের জন্য অতটা ভাবনা ছিল না। দায় হলো মেয়ের বাপের। মেয়ে বড়ো হলে তিনি যেচে আসবেন ছেলের কাছে। ছেলের বাপ পায়ের উপর পা দিয়ে দিব্যি আরামে বসে থাকতেন। মেয়ের বাপ খোঁজ-খবর নিয়ে ছেলের বাপের কাছে হাজির হয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে নিজের আবেদন পেশ করতেন। সহজে সেই আবেদন মঞ্জুর হতো না। হাজার কথার আদানপ্রদান যার মোদ্দা কথা কি না দেনাপাওনা নিয়ে চুলচেরা বিচার হতো। দরাদরিটা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় কসাইয়ের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুত। যার সঙ্গে দুদিন পরে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হবে তার সঙ্গে এমনিভাবে চলতো প্রাথমিক পরিচয়ের পালা।

সেদিন 'উপযুক্ত' ছেলে বলতে বাপের আর্থিক অবস্থার দিকেই নজর রাখা হতো বেশ। লেখাপড়া বা ছেলের রোজগারের উপর খুবএকটা ভরসা করা হতো না। আর এরকম সম্পর্ক স্থাপনে ছেলে বা মেয়ের মত ও কোনো প্রাধান্য পেতো না। দুপক্ষে লেন-দেন পাকাপাকি হয়ে গেলে নির্দিষ্ট দিনে ছেলেকে হাজির থাকতে হতো। মেয়ের তো কোন কথাই নেই। তাকে হাজির রাখার দায় বাপ-মা আর আত্মীয়স্বজনের। অনেক ক্ষেত্রে বিয়ের আগে একজন আর একজনকে দেখতেও পেতো না। এমনিভাবে সেদিন স্বামী-স্ত্রীর সুন্দর সম্পর্কটি স্থাপিত হতো।

সেদিনের রেওয়াজ ছিল মেয়ে মানেই দায়। তাই মেয়ের বাপ-মায়ের চোখে ঘুম থাকতো না মেয়ে বিয়ের যোগ্য হলে। ছেলের বাপের কাছে তাঁদের কম হেনস্থা হতে হতো না। এরকম অনেক কাহিনীই আমাদের জানা আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা যে, চেষ্টাচরিত্র করলে সেদিন বিয়ের ব্যাপারটা মিটতে খুব একটা অসুবিধা হতো না। মেয়ের কথা ছেড়ে দিলেও ছেলে জানতো যে বিয়ের ব্যাপারে তার কোন ওজর-আপত্তি খাটবে না। কারণ তার দায়িত্ব যেমন মা-বাবার তেমনি বউয়ের দায়িত্ব...

ভবিষ্যতে অবশ্য সব দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে। আর সেও অনেক পরের কথা। সুতরাং প্রচলিত সংস্কারকে সে শ্রদ্ধা করেই চলতো। এবং চলা ছাড়া কোন উপায়ও ছিল না। না হলে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কানাঘুষো চলবে। নানা কথা রটবে। বাপ-মায়ের অসম্মান হবে।

সে ছবি আজ পুরোপুরি বদলে গেছে। বিয়ের ব্যাপারে মেয়ে এবং ছেলে দুজনেরই মত এখন সমান প্রাধান্য পায়। তাই বিয়ের ব্যাপারটাও এখন জটিল হয়ে গেছে। ইচ্ছে করলেই মেয়ে বা ছেলের বিয়ে চুকিয়ে ফেলা যায় না। আজকাল বিয়ের পরই স্ত্রীর সব দায়িত্ব স্বামীকে গ্রহণ করতে হয়। তাই রোজগারের দিকটা আগে ভেবে নিতে হয়। এই রোজগারের কথা ভেবে অনেকেই বিয়ে থেকে পিছিয়ে আসছে। চট করে বিয়ের আসনে বসতে চাইছে না। আবার মেয়ের দিক থেকেও বেশ কিছুটা নিশ্চিন্ত মেয়ের বাপ। এখন মেয়ে মানেই আর দায় নয়। মেয়েও লেখাপড়া শিখছে। ছেলের মতোই রোজগার করছে। মা-বাবার সুখ-সুবিধার দিকে পুরো নজর রাখছে। পুরাতন কালের গৌরী-দানের প্রথা আর নেই। তাই ছেলে এবং মেয়ে দুজনেরই বয়স বাড়ছে। এর ফলে বিয়ের পর আগেকার সেই সুস্থ এবং সাবলীল জীবনের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। সে জীবন যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কেউ কেউ মনে করেন যে, এ জন্য ছেলেরা দায়ী। বিয়ের কথা শুনলেই যেন তাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কোন মতেই সময় থাকতে তারা বিয়ে করতে রাজি হয় না। সেই বিয়ে করে সময় পেরিয়ে গেলে। মেয়েদের দোষ এদিক থেকে ততটা নয়। লেখাপড়ার প্রসার ঘটলেও মেয়েরা স্বাভাবিকভাবে সংসারের আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু অপর পক্ষ সব সময় ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকতে চায়। তাই তাদেরও অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। অথচ মেয়েদের অনেকেই আজকাল রোজগার করছে। তারা যে সেই আদ্যিকালের মতো ছেলেদের চিরস্থায়ী বোঝা তাও নয়। বরং অনেক পরিবারে এখন স্বামী এবং স্ত্রীর রোজগারেই চলছে। একার আয়ে সংসার চালানো যায় না। তাই দুজনকেই রোজগার করতে হচ্ছে।

এই সুযোগ এখন অনেকে নিচ্ছে। বিয়ের কথা উঠলেই ছেলেরা খোঁজ করে

মেয়ে চাকরি করে কি না। চাকরি করা মেয়ে হলে তারা বেশ সহজেই রাজি হয়ে যায়। কিন্তু যদি চাকরি করা না হয় তবে সহজে রাজিই হতে চায় না। এর বিপরীতে আবার দেখা যায় যে, কেউ কেউ স্ত্রীর চাকরি করাটা সুনজরে দেখে না। মেয়ে যদি অফিসে কাজ করে তবে ছেলে আর সেখানে মাথা পাততে রাজি হয় না। এর অর্থ স্ত্রী যদি চাকরি করে তবে সংসার স্বাভাবিক হবে না। সেখানে সবটাই হবে দায়সারা।

ছেলেদের এই দুই মনোভাবেরই বলি হচ্ছে মেয়েরা। এ থেকে মুক্তির পথনির্দেশ মিলতে এখনো অনেক দেরি। এই সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ছেলেমেয়েরা নিজেদের পথ নিজেরাই খুঁজে নিতে সচেষ্ট হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রেমঘটিত বিয়ে দ্বারা সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে যে, প্রেমজ বিয়েকে আমরা এখনও সহজভাবে গ্রহণ করতে পারি নি। এ রকম বিয়ে আকছার হচ্ছে। তবু মনের দিক থেকে তাতে সায় দিতে পারি না। এর পেছনে যে আশংকা খুব বেশি সক্রিয় তা হলো যে ওরা দুজনে এরকম মিলেমিশে সারা জীবন কাটাতে পারবে তো? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দুরকম চিত্রই আমাদের অভিজ্ঞতার ক্যানভাসে ধরা পড়ে। সেখানে আমরা দেখতে পাই যে কেউ কেউ সুখী জীবন যাপন করছে আবার কেউ কেউ বিয়ের পর থেকেই ঘোরতর অশান্তিতে ভুগছে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, খারাপ দিকটা ভেবেই আমরা শঙ্কিত হই। তবে একথাও খুবই সত্যি যে মা-বাবার মনোমত বিয়েতেও যে অশান্তি না হয় তেমন নয়। তবে সে ক্ষেত্রে অতীতে এক রকম প্রতিষেধক ছিল। কিন্তু আজ সে ব্যবস্থা প্রায় অচল বললেই চলে।

সেদিক থেকে নতুন ব্যবস্থাকে স্বাগত জানানোয় এখনো কিছু দ্বিধা থাকলেও তা টিকবে বলে তো মনে হয় না। তাছাড়া ছেলে বা মেয়ে বিয়ের দায় যে কোন পক্ষেরই নয় সেটা এতে প্রমাণ হয়ে যাবে। ছেলে এবং মেয়ে নিজেদের গরজে ভালবেসে সংসার পেতেছে। কোন মা-বাবাকেই মাথা নত করতে হবে না। আর এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হলো যে ওদের ভবিষ্যৎ ওরা নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারবে। যে টানা পোড়েন ছেলে বা মেয়ের বিয়ে নিয়ে এখন মা-বাবাকে ভুগতে হয় তা থেকে তারা মুক্তি পাবেন।

দিনে দিনে ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রসার ঘটছে। কেউ চায় মেয়েরা চাকরি করুক। আবার কেউ চায় মেয়েরা চাকরি করবে না। কিন্তু মেয়েরা যখন সমান সুযোগের অধিকারী তখন সুযোগ তাদের দিতেই হবে। তবে কোন মেয়ে যদি স্বেচ্ছায় সে সুযোগ না নেয় তবে সে কথা আলাদা। আসল কথা সবকিছু নির্ভর করে পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর। দুজন যদি দুজনের সাহায্যে সমান উদার হয় তবে তো আর কিছু ভাববার থাকে না। কোন কোন মেয়ে এমনিতেই বিয়ের পর বাইরের জগৎকে ভুলে ঘরকন্নায় মেতে ওঠে। আবার কেউ কেউ বাইরের জগতের সঙ্গে সব সময় ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বজায় রেখে চলতে চায়। ভালবাসা দুটি মন পরস্পরকে বোঝায় গভীর সাহায্য করে। আর এই সমস্যার সমাধান হবে সেখান থেকেই।

পশ্চিমের দেশগুলিতে মেয়েরা যে-কোন বয়সে চাকরি পাবার অধিকারী। সাধারণত এসব দেশে মেয়েরা বিয়ের পরই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সংসার করে। তখন সংসারই তার ধ্যান-জ্ঞান। তারপর বাচ্চা হলে তাকে মানুষ করার দায়িত্ব এসে পড়ে। তখন তো আর চাকরি করার চিন্তাও মাথায় আসে না। বাচ্চা স্কুলে না যাওয়া পর্যন্ত মা নিশ্চিন্ত নয়। বাচ্চা যখন একা চলে ফিরতে পারে তখন মা আবার চাকরিতে ফিরে যায় সংসারকে আর একটু স্বচ্ছল করতে। নবাগত আসায় খরচ বেড়েছে। তাছাড়া এখন দায়িত্ব একটু হাল্কা হয়েছে। সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আর সেদেশে স্ত্রীকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার কোন ক্ষমতাই স্বামীর নেই। স্ত্রী নিজের খুশি মতো চাকরি-বাকরি করতে পারে। স্বামীকে সেদেশে স্ত্রীর এই অধিকারটুকু মেনে নিতে হয়।

কিন্তু আমাদের দেশে চাকরির অতো স্বাচ্ছল্য নেই। এদেশে একটা চাকরি পাওয়া ভগবান পাওয়ার সামিল। তাই বিয়ের পর মেয়েদের পক্ষে চাকরি ছেড়ে আবার কাণক বিরতিতে নতুন চাকরি নেওয়া খুব সহজ নয়। এ-ক্ষেত্রে একটা সুরাহা আছে। বিয়ের বয়সটা এখন যেমন চড়চড় করে উঠে যাচ্ছে তা না করে মেয়েদের কুড়ি থেকে একুশের মধ্যে বিয়ে দিয়ে দিলে কয়েক বছর বিবাহিত জীবন যাপনের পর বয়স থাকতে থাকতে একটা চাকরি জোগাড় করে নেওয়া চলতে পারে। তাহলে বোধহয় সবদিক বেশ রক্ষা পায়। কিন্তু সেখানেও তো একই প্রশ্ন, ছেলে যদি বিয়ে করতে রাজি না হয়। তবে এক্ষেত্রে একটা পথ আছে। তা হলো যে, যদি হৃদয়ঘটিত ব্যাপার হয় তবে মা-বাবাকে একটু উদ্যোগ নিয়ে বিয়ের ব্যবস্থাটা সেরে ফেলতে হবে। এভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত করা সম্ভব।

মা-বাবাকে হাল ছাড়তে হবে। সেই দিন যে আর নেই এবং তা ইতিহাসের পাতায় জমা হয়ে গেছে এই সত্যটুকু তাদের উপলব্ধি করতে হবে। যে দিন আর কখনো ফিরে আসবে না তার জন্য মায়া বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। তাদের ফিরে যা সম্ভব হতো এখন আর তা সম্ভব নয়। বরং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের পাঠ তাদের নেওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে স্বামী-পুঙ্গবদের একচেটিয়া প্রভুত্বের দিনও অবসান। স্ত্রীর দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই স্বামীর। কিন্তু আজকের স্ত্রী আর অসহায়া নয়। নিজের পায়ে চলার ক্ষমতা সব সময়ই তার করায়ত্ত। বিয়ের ব্যাপারে দেরি করে ছেলেরা শুধু দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা করছে না সেই সঙ্গে সামাজিক অনিষ্টেরও কারণ ঘটাচ্ছে। (অবশ্য আর্থিক দিক থেকে অর্থাৎ রোজগার শুরু করার পরই একথা প্রযোজ্য)। একথা তাদের মনে রাখতে হবে যে ভবিষ্যৎ তাদের এই ইন্ধন জোগানোর মূল্য পুরোপুরি আদায় করে নেবে।

বিশ্বপর্যটন শেষে

মিস শীলা স্কট আবার বিশ্ব পর্যটনে বেরিয়েছিলেন। এবারও তাঁর সঙ্গী ছিল সেই হাল্কা বিমানখানি। এই সেদিন তিনি ছুঁয়ে গেলেন মাদ্রাজ বিমানবন্দর। তখনো তাঁর ঘরে ফেরার অনেকটা বাকি। কিন্তু তিনি ঘরের ডাকে অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন। তাই পাঁচ দিনের পথ পেরোলেন সাড়ে তিন দিনে। ডারবান থেকে অস্ট্রেলিয়া হয়ে লণ্ডনে পৌঁছেন তিনি। বিমানবন্দরে সমবেত কয়েক হাজার উৎসাহী দর্শক তাঁকে স্বাগত জানান। এবারের বিশ্বপরিক্রমায় তিনি অতিক্রম করলেন ৩৪ হাজার মাইল পথ। আর সেই সঙ্গে তিনি পূর্ণ করলেন তাঁর শততম আকাশ-ভ্রমণের রেকর্ড।

প্রাক্তন অভিনেত্রী মিস শীলা স্কট বার বৎসর আগে বিমান চালানো শুরু করেন এবং সাতাটি নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। বিমান চালিয়েদের মধ্যে তাঁর অনন্য কৃতিত্ব হলো, একক চালনায় একটি হালকা বিমান নিয়ে তিনি উত্তর মেরুর উপর দিয়ে উড়ে এসেছেন।

এবারকার মিস স্কটের বিশ্বপর্যটনের বৈশিষ্ট্য হলো যে বিশ্বভ্রমণে তাঁর মানসিক এবং শারীরিক প্রতিক্রিয়ার সব রেকর্ড করা হয়েছে। এসব খবর পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে যখন তিনি আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছেন। একটি কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর ফলে বিজ্ঞানীদের গবেষণা নতুন দিগন্ত খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা।

—প্রমীলা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গৌরী তার ছোট ভাই-বোনদের চুমু খায়। তার গা থেকে সেন্টের গন্ধ পায় টুটুল। এক বছরে কলকাতা বাসে ছোড়দা আর রাঙাদিকে তার অনেকখানি অপরিচিত লাগে।

'বায়োস্কোপ দেখেছিস?' চোঙা তার কালো লম্বা শরীরখানা দুলিয়ে জিজ্ঞেস করে।

'আমরা কাল সং দেখেছি', টুটুল বললে।

'ধোৎ আমরা দেখেছি চণ্ডীদাস, ভাগ্যচক্র, কোহিনুর, প্রিজনার অফ জেন্দা, যমুনা পুলিনে, চার্লি চ্যাপলিন।' এক-একটা সিনেমা যেন এক-একটি অধিকৃত সাম্রাজ্য, আর সে বিজয়ী সেনাপতি।

বুড়ী বললে, 'হকি খেলবে না রাঙাদি? তুমি থাকতে কি হকি খেলা হত! গরমের ছুটিতে এলেই না।'

'গরমের ছুটিতে যে দার্জিলিং গেলাম ভাই কলেজের মেয়েদের সঙ্গে। চোঙাকেও নিয়ে গেলাম অনেক বলে-কয়ে।'

'দার্জিলিং কি ফাইন জায়গা বুড়ী। কি ঠাণ্ডা! ম্যালে সাহেব-মেমরা নাচছে। চারদিকে ফগ, ঘরের মধ্যে ফগ আসছে। আমরা কি রকম ফগ খেতাম রাঙাদি?' চোঙা বললে।

টুটুল আর বুড়ী অবাক হয়ে শোনে। বুড়ীর ঠিক নীচেই চোঙা। এক বছরের মধ্যে তার এই অভাবিত সৌভাগ্যে বুড়ীর ঈর্ষা হয়। চোঙার বদলে সে কি কলকাতায় পড়তে পারত না? তাহলে সেও দিদির সঙ্গে দার্জিলিং যেত।

চোঙার পা দুটো অস্বাভাবিক লম্বা, বয়সের তুলনায় দৈর্ঘ্যে প্রায় দু ইঞ্চি বেশী। টুটুলের মাথা ভর্তি অগোছাল কোঁকড়া চুলের পাশে তার টান-টান, পেছনের দিকে ব্রাশ করে তোলা চুল, ট্রেনের হাওয়ায় তা একটু এলোমেলো।

প্রতাপ এল হাল্কা পায়ে কুয়োর পাড়ে। তিন ভাইয়ের মধ্যে তার চেহারাই সবচেয়ে সুন্দর। শুধু ফর্সা রংয়ের জন্যে নয় এক ধরনের বাঙালী কমনীয়তা তার মুখের আদলে খুব স্পষ্ট। পরনে পাজামা সাদা পাঞ্জাবী। এসেই টুটুলকে কোলে তুলে গাল টিপে আদর করে বললে, 'দেখি কত বড় হয়েছিস!' সে যে ভবনাথের ভাষায় 'ব্রিলিয়ান্ট' সেটা তার প্রেসিডেন্সী কলেজের মাস্টারমশাই, তাদের বাড়ি, তার বন্ধুবান্ধব সবাই মেনে নিয়েছে যেমন লোকে ভাল জিনিস মেনে নেয় তর্ক না করে। ইকনমিক্সে তার ফার্স্ট ক্লাশ সেকেণ্ড হওয়ার খবর যখন কয়েক দিন আগে পৌঁছল তখন ভবনাথ তো ক্ষেপে উঠেছিলেন। চিঠিটা হাতে নিয়ে চেঁচাতে-চেঁচাতে ভেতরের বারান্দায় এলেন, 'মার দিয়া, মার দিয়া!'

গোপীনাথ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে জড়িয়ে ধরলে প্রতাপকে, 'তুমি খুব ভাল করিয়াছো, আরও ভাল করিবে। বিলাত যাইবে। কিন্তু দেখিও বাবা, তোমার মামার মতো...

মামা মানে অক্ষয় বসুর একমাত্র ছেলে অজয় গত আট বছর ধরে বিলেতে চার্টার্ড একাউন্টেন্সী পরীক্ষা দিয়ে চলেছে। অক্ষয় বসু রিটায়ার করার পর ক্রমান্বয়ে চিঠি লিখছেন ছেলেকে দেশে ফিরবার জন্যে কিন্তু অজয় সে ব্যাপারে উদাসীন। বেশী চিঠিপত্র চললে তার শরীর খারাপ হয়ে যায়, অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন হয়, বাঁ পায়ে 'নিউরালজিক পেন' জন্মায়। তিন মাস ছুটি নিয়ে একবার দেশে মুখ দেখিয়ে যাবে বলে সম্প্রতি জানিয়েছে। এই আশ্চর্য কাণ্ডটা ঘটেছে অক্ষয় বসু মাসে-মাসে যে চারশো টাকা করে দিয়ে আসছেন তার পরিসমাপ্তি ঘটার ইঙ্গিত কোন চিঠিতে থাকায়। গোপীনাথ এই পারিবারিক ইতিহাসের আদ্যোপান্ত জানে।

প্রতাপ বললে, 'না না কি বলছো? আমি দেখো ঠিক দু-তিন বছরের মধ্যেই চলে আসব। ওদেশে কি আছে? আমাদের মতো গাছপালা আছে? রবীন্দ্রনাথের গান আছে?'

'নানা নানা, তুমি বলতো রবি ঠাকুর কেমন দেখতে?' টুটুল বায়না ধরে।

'দূর আমি কি জানি।'

'ও রবিবাবু চূর্ণী নদী দিয়ে গিয়েছিলেন? বাবা লিখেছিলেন কয়েক মাস আগে।' গৌরী বললে।

'সে আর কি বলিব! নদীর ধারে গাছের ওপর থেকে লোক ঝুলিতেছে। আর রবিবাবু নৌকোয় একটা চেয়ারে একেবারে চোখবন্ধ, হাত জোড় করিয়া বসিয়া আছে।'

'ঠিক যেমন ছবিতে দেখায় সেইরকম দেখাচ্ছিল?'

'সেইরকম পারা। বুড়ো চাষী ইয়াকুব আসত বেগুন লইয়া, সেই মত পারা!'

'তুমি বেশ বললে নানা', প্রতাপ বললে।

'আমি কি মিথ্যা বলছি? বলাইকে বলো। বলাইও বলিবে। ঠিক ইয়াকুবের মত দেখিতে। আর একটু ফর্সা।'

বিকেল না হতেই গন্ধে গন্ধে লালমোহনের দল এসে গেল। এখন টাউনস্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের সঙ্গে গৌরী কম্পানীর সন্ধি। সামনের বিস্তৃত মাঠে হকি খেলা শুরু হয়। হকি স্টিক তিনখানা—প্রতাপ, গৌরী আর লালমোহনের। আর সবাই বাঁশের বাখারি নিয়ে খেলায় মেতে ওঠে। গৌরী তার দাদার বুট পরে শন্ শন্ করে ছোটে। তার চেহারায় বেশ খেলোয়াড়ী ভাব আছে রিমলেস চশমা সত্ত্বেও, মোটেই লাজুক আত্মসচেতন কিশোরী নয় সে। তার উৎসাহে লালমোহন কম্পানীও দুর্দান্ত খেলে। বিপক্ষ দল প্রতাপদের গোলে পর পর দুখানা গোল দিয়ে দিল। তখন রোদ পড়ে গেছে। অদূরে কাছারীর কাছ থেকে একটা আওয়াজ আসে। তারপর গাছ আর ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে আওয়াজটা মাঠের পা দিয়েই জেলখানার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। 'বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম।' এস-ডি-ও সাহেবের বাড়ির কাছটাতেই গলার জোর আরও বেড়ে যায়। কয়েকটি তরুণের সঙ্গে সঙ্গে হেড-কন্সটেবল আর জেলখানার দুজন ওয়ার্ডার। মুহূর্তের জন্যে খেলা থেমে যায়। কেউ কোন প্রশ্ন করে না। সবাই জানে বন্দেমাতরম বলে আর একটা জগত আছে যেটা সমান্তরাল যার সঙ্গে এই চারপাশের সকাল দুপুর সন্ধ্যার কোন যোগ নেই, যা দূরে কাছারীর কাছে, বাবা কিংবা দু'বির

বাজার কথাবার্তায় অথবা সকালে অমৃতবাজার কাগজে মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়েই মিলিয়ে যায় কিন্তু এই চূর্ণীর ধারে শিশুদের জীবনযাত্রায় কিংবা কলকাতায় শেয়ালদার দিকে মাসিক পনেরো টাকা ভাড়ার ফ্ল্যাটের বাসিন্দে প্রতাপ আর তার ভাইবোনদের চিন্তায় বিশেষ রেখাপাত করেনি। যারা জেলে যায়, চরকা কাটে, বন্দেমাতরম বলে চীৎকার করে তারা দেশের স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন করছে বটে কিন্তু তারা প্র্যাকটিকাল নয়, তারা এক বায়বীয় অস্পষ্ট জগতের বাসিন্দে—এইরকমভাবে চিন্তা করে প্রতাপ। এদের সম্পর্কে তার উৎসাহ নেই, অবজ্ঞা নেই। আরও অনেকের মত শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা শুনেছে, আরও অনেকের মত হাততালি দিয়েছে, ভিড়ের মধ্যে দু-একবার বন্দেমাতরমের সঙ্গে গলাও মিলিয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তারপর পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে সত্যাগ্রহ করার প্রস্তাব তার কাছে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক লেগেছে।

খেলোয়াড়দের নিস্তব্ধতা ভেঙে প্রতাপ চেঁচিয়ে উঠল, 'ও আর কি দেখবার আছে! লালমোহন সেন্টার করো।'

লালমোহন সেন্টার করলে, গৌরী তার হাকিস্টিক কাত করে বেমানান বটে সত্ত্বেও শন্ শন্ করে দৌড় দিল, তার বাদামী কোঁকড়া চুল হাওয়ায় ওড়ে, হাওয়ায় এলোমেলো ফ্রকের ভেতর থেকে তার দীর্ঘল পেশীস্বচ্ছল পা দুটো ঝলকায়। পেছনে পেছনে বাখারী নিয়ে টুটুল আর বুড়ী তিড়িং তিড়িং করে ছোটে। গৌরী পাস দিলে, লালমোহন তৃতীয় গোল করল। প্রতাপ এবার চোট্টামি করল। লালমোহনের এক সাকরেদ যে লালমোহনের চেয়েও ভাল খেলে তাকে নিলে নিজের দলের ফরোয়ার্ডে গৌরীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও। এবার দুর্দান্ত জমে ওঠে খেলা। প্রতাপ একটা গোল দিল, লালমোহনের সাকরেদও দিলে আর একটা। গোল শোধ হয় হয় এমন সময় রিমলেস চশমা মুছতে মুছতে ঘামে ভেজা মুখ-লাল গৌরী প্রায় হুকুম দিলে খেলা বন্ধের জন্যে, কারণ আলো পড়ে আসছে।

সন্ধ্যেবেলা আরও উত্তেজনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন' প্লে হবে। এ বিষয়ে সাংঘাতিক মাথা খেলে প্রতাপের। আগের বার পুজোয় 'প্রতাপাদিত্য' হয়েছিল, স্ক্রিন ভাড়া করা হয়েছিল দু দিনের জন্যে। এবার দশ-বারো দিন ধরে রিহার্সেল চলে। প্রতাপ জয়সিংহ আর গৌরী অপর্ণা। লালমোহন চেষ্টা করেছিল জয়সিংহের ভূমিকা ম্যানেজ করতে, কিন্তু হয়নি। আর্ট ডাইরেক্টার প্রতাপ এ ব্যাপারে জটিলতার সম্ভাবনা আঁচ করতে পেরেছিল। তাছাড়া স্বর্ণসুন্দরীর ভাষায় মাদামারা উকিলের ছেলে না হয়ে লালমোহন যদি কলকাতার প্রতাপের কোন বন্ধু হোত, বাপের বিষয়-সম্পত্তি থাকত তাহলে তাকে জয়সিংহের ভূমিকা দেওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু তার বাবাকে প্রতাপ দেখেছে, ছাতায় অসংখ্য ফুটো। বাজারের কাছে টিনের চালওয়ালা বাড়ীটায় কয়েকবার গিয়ে তাদের দৈন্যে নিজেই লজ্জা পেয়েছে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও দেয়ালে দেয়ালে রংজ্বলা ভেলভেটের ওপর রঙের আঁশের টিয়াপাখী কিংবা গোলাপ ফুল সাজিয়েও না প্রতাপ আসবে শুনে মাছের ডিমের বড়া ভেজেও সে দৈন্য লালমোহনের মা ঢাকতে পারেন নি। আর স্বল্পভাষী, কালো, লাজুক লালমোহন, গৌরীকে একলা প্রেমনিবেদনকারী, ম্যাট্রিকে জলপানি পেলেও আর বেশীদূর পড়তে পারবে না, কোর্টের কেরাণী কিংবা পেশকারীর জন্যে তার বাবা ইতিমধ্যেই ভবনাথের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে জয়সিংহের ভূমিকা অসম্ভব। অপর্ণার ভূমিকায় গৌরী তাকে বলবে, 'জয়সিংহ, হোয়ো না নিষ্ঠুর! যায় যায় ফিরায়ো না! কী সহেছি অন্তর্যামী জানে!' অসম্ভব। তাই প্রতাপ জয়সিংহ, লালমোহন গোবিন্দমাণিক্য, লালমোহনের সেই সাকরেদ যে মাঠে নেমেই বাখারির স্টিক দিয়ে পর পর দুটো গোল করেছিল, সে রঘুপতি আর গৌরী অপর্ণা। চমৎকার ছাঁটকাট করে প্রতাপ কালীপুজোর দুরাত্তির আগে 'বিসর্জন' নাটক নিবেদন করলে। মাঝের হলঘরে চেয়ার-টেবিল-আলমারী সরিয়ে ভাড়া করা স্টেজ, উইংস খাটানো হল। টুটুল আর বুড়ীর এ ব্যাপারে উর্ধ্বশ্বাস উৎসাহ। তারা কারিগর আর ছুতোরের অনবরত ফরমাইস খাটছে। তাদের ডেকে ডেকে চা খাওয়াচ্ছে। যখন প্লে শুরু হল তখন শহরের গণ্যমান্য লোকে ঘর ভর্তি, লালমোহনদের একটা বিশাল দল বাইরের গোটা বারান্দা ছেয়ে ফেলল। দু রাত্তিরের জন্য এস-ডি-ও সাহেবের নিরাপত্তা মুলতুবী থাকল। সন্ধ্যের পরেই সশস্ত্র সেপাই হাঁক দিত, 'হু কামস দেয়ার?' আর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, 'ফ্রেন্ডস, ফ্রেন্ডস, আমি শ্যামবাবু, পেস্কার, পেস্কার',—এসবের বালাই নেই। যদিও টাউনস্কুলের ছেলেরা দুতিনজন সাদা পুলিশের উপস্থিতি নিয়ে বলাবলি করেছিল নিজেদের মধ্যে তবু সেটা খুব একটা গুরুত্বের কিছু ছিল না। আর্ট ডাইরেক্টারের সাফল্যে দর্শকদের অনুরোধে দ্বিতীয় রাত্রিতেও প্লে হল। লালমোহন ছোকরা বেশ লম্বা, গালে খড়ি দিয়ে টানা-টানা চোখে, গলায় ঝুটো মুক্তোর মালা দুলিয়ে জমকালো জরির পোশাকে আশ্চর্য অভিনয় করলে। আর স্বর্ণসুন্দরীর মেটে লাল বেনারসী মালকোঁচা মেরে পরে মাথায় হলুদ পাগড়ি এঁটে প্রতাপের জয়সিংহ অভিনয়ে হৈ হৈ পড়ে গেল। তারপর বুকে নারকোলের মালা আঁটা পুরুষদের ফিমেল পার্ট দেখতে অভ্যস্ত টাউনস্কুলের বয়স্ক ছাত্রদের কাছে চুল এলোকরা গৌরীর প্রেমনিবেদনের কোন জবাব নেই। রক্তচন্দনের ফোঁটাকাটা রঘুপতিও খারাপ হয়নি, যদিও মাঝে মাঝে ছোকরার শ্লেষ্মা জমে যাওয়ায় গলা খাঁকারি কিঞ্চিৎ বেশী হচ্ছিল। দেখতে দেখতে অভিভূত হয়ে দু রাত্তিরই স্বর্ণসুন্দরী বিধাতার পরিহাসের কথা ভাবছিলেন। সম্ভব ছিল না লালমোহনের বাবার অবস্থান্তর? ফুটো ছাতা, বাদামী কেডসের জুতো আর হেঁটো কাপড়ের বদলে সম্ভব ছিল না সিল্কের পাঞ্জাবী আর চকচকে কালো পাম্পসু পরা ভদ্রলোক, হাতে ছড়ি কিংবা সিগারেটের টিন, তাদের দক্ষিণ কলকাতার বাড়ির পাশেই যিনি জমি নিয়েছেন, বাড়ি তুলছেন এবং তাঁদের মতোই কোন ছেলেকে বিলেত পাঠানোর চিন্তা করছেন? গোবিন্দমাণিক্যকে দেখতে দেখতে স্বর্ণসুন্দরী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বুড়ী রাণীর সহচরী আর চোঙাকে প্রহরীর পার্ট দেওয়া হয়েছিল, চোঙার ছটফটানিতে তার মাথায় মুকুট খসে পড়ে দর্শকদের হাসির কারণ ঘটায়। তবে ধ্রুবর পার্টে টুটুলের বিশেষ করার ছিল না। তার ঘুমন্ত অবস্থায় পার্ট সে সময় রঘুপতির বক্তব্য 'এসো এসো পান করি কারণসলিল' অংশটা তার মুখস্ত। কিন্তু সারা দিনের উত্তেজনায় ঘুমন্ত ধ্রুবর পার্টে টুটুল সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল। [illegible] পাঞ্জাবী পরে একরাশ চুল মাথায় কড়া স্টেজের আলো মুখে টুটুল নির্বিবাদে ঘুমোয়। দর্শকদের কৌতূহল তাকে স্পর্শ করে না।

(৭)

মেজো বৌদি ছড়া কাটতে ভালবাসতেন। যদিও তাঁর ঠেঁটামারা কথায় তরুণ ভবনাথের প্রাণ মাঝে মাঝে ওষ্ঠাগত হয়েছে এবং ততোধিক বিচলিত বোধ করেছেন নববধূ স্বর্ণসুন্দরী তবু সেই ফর্সা ড্যাবরা-নয়নী মেজো বৌদির সঙ্গ না হলে ভবনাথের চলত না। তিনি যে যাঁতিতে স্বর্ণসুন্দরীর চেয়েও ঝিরি ঝিরি সুপুরী কাটতে পারেন সে বিদ্যা মেজো বৌদির জন্যে। আর পার্সিভেল সাহেবের ছাত্র ইংরেজী সাহিত্যে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত তরুণ ভবনাথ মেজো বৌদির মুখে বাংলা রাগঝালের ভাষায় তাঁর কাছে মুগ্ধ হতেন। 'ঠেকারে যে মাটিতে পা পড়ে না' মেজো বৌদি বলেছিলেন যখন তাঁকে প্রণাম করতে গেছেন ভবনাথ নতুন চাকরী পেয়ে। লোকজনের ওপর রাগ হলে বলতেন, 'জাঁথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না।' একদিন মেজাজ খুব ভাল ছিল। বললেন, 'আচ্ছা ভব, তুই তো সব মেডেল ফেডেল পেয়েছিস। বলতো এটার কি মানে—'কালের কোমল চরণপাত, লোহার মতো শক্ত হাত।'

কথাটা কুড়ি বছর পর বৈঠকখানায় বসে শীতের সকালে বাইরে মেজো বেল গাছটার দিকে চেয়ে চেয়ে মনে পড়ল ভবনাথের। ভবনাথ ঠিক মত উত্তর দিতে পারেননি, কি বলেছিলেন তা এখন স্মৃতির পাথরে চাপা পড়ে গেছে। তবে মেজো বৌদির কথাগুলো মনে আছে। 'বুঝতে পারলি না? এই তো যখন প্রথম এলাম তখন তোর গোঁফ গজায়নি। গাল টিপে আদর করতে কি ভাল লাগত। আর এখন দেখো, কোট প্যান্ট পরা সাহেব।'

'কিন্তু কালের হাত আর পা-টা কি?'

'কালের পা বুঝলি না ভব? আরও কথাছর বাক বুঝবি? কাল তো নাচতে নাচতে চলেছে, আমার কটা ছেলে বাঁচল

মরল, তোর চাকরী থাকল না তোকে কান ধরে বার করে দিল সাহেবরা কিছু পরোয়া করে না। নাচতে নাচতে চলে গেল।'

'আর হাত?'

'হাতের ছাপ রেখে গেল। আমার এমন চেহারা ছিল? এমন টিপি ছিলাম? এখন তো স্বর্ণকে দেখে চোখ জুড়োচ্ছি! আমার বয়সে আমার পাশে দাঁড়াত?

ভবনাথের আজও স্পষ্ট মনে আছে। ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে মেজো বৌদি চেয়ে আছেন তার দিকে। আর কালের এই ভ্রূক্ষেপহীন, নৈর্ব্যক্তিক চেহারা যা একই সঙ্গে স্থাবর ও জঙ্গম সেই দ্বৈত সত্তার কথা ভবনাথের মনে আসে টাকে হাত বুলোতে বুলোতে। চুলটা আর রাখা গেল না। তাঁর যৌবনের মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুলে কালের হাত পড়েছে। সমস্ত চাঁদি আর তার চারপাশে গড়ের মাঠ। ভবনাথ হাত নামিয়ে তাঁর কাঁচা-পাকায় মেশা ভোজ-পুরী গোঁফে তা দিতে থাকেন।

'মে আই কাম ইন সার?' ছুটির দিনে সকালে কোন আগন্তুক চান না ভবনাথ। ভুরু কুঁচকে তাকান।

ষণ্ডা ফর্সা আদ্দির পাঞ্জাবী পরা এক তরুণ পর্দার ফাঁকে দাঁড়িয়ে। ভবনাথ চমকে ওঠেন। টেররিস্ট যুগে এই ধরণের আগন্তুকের আবির্ভাবে ভয়াবহ পরিণতি ঘটার সম্ভাবনা যথেষ্ট। তবে পাশেই বলাইকে দেখে আশ্বস্ত হলেন।

'সার্কাস পার্টি থেকে এসেছি সার। রয়েল বেঙ্গল সার্কাস। আমি তার ম্যানেজার। ছোকরা পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা কার্ড টেবিলে রাখে।

'কদিন চাই?'

'সাত দিনের জন্যে সার। সিদ্ধেশ্বরী তলায়। আমরা আগেও করেছি স্যার, তিন বছর আগে। তখন ছিলেন.....'

'কি খেলা দেখান?'

'বাঘ সিংহ ঘোড়া ট্র্যাপিজ। বুকে হাতি.....'

'আপনি কি দেখান?'

'আমি স্যার বুকে হাতি নিই। দেখবেন স্যার দেখবেন।' লোকটি ঝাঁ করে ঢোলা পাঞ্জাবীর হাতা গুটিয়ে হাতের গুলি ফোলায়। ফর্সা প্যারালাল বার স্ফীত বাহারে বাইসেপ। তরুণটি নিজেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেদিকে।

ভবনাথ একটুকরো কাগজ ছিঁড়ে তারপর দু লাইন লিখে সই করে দেন। বলাই স্ট্যাম্প মারে। দ্রুত কার্যোদ্ধারে প্রফুল্ল তরুণটি হাত তুলে নমস্কার করে।

ভবনাথ সেই পেছন ফেরা তরুণটির দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে বললেন, 'শুনুন।'

তরুণটি ঘুরে দাঁড়াতেই ভবনাথ বললেন, 'আমার বাইসেপটা দেখবেন নাকি?'

ভবনাথ বসে বসেই পাশ ফিরে হাতের পেশী তাঁর করলেন। বুকে হাতি-তোলার মতো অতো স্ফীত বাহারে নয়, তবে শক্ত-মজায় সেই স্নিগ্ধ উত্তোলিত বাদামী বাইসেপ জলে ধোয়া পাথরের মতো বলিষ্ঠ। অবাক হয়ে তরুণটি বলে, 'বাঃ, আমার চেয়েও ভাল।'

'না-না, একটু ডাম্বেল করার অভ্যেস আছে।' আত্মসচেতনভাবে বললেন ভবনাথ।

তরুণটি চলে যাবার পর অমৃতবাজার পত্রিকার পাতা ওল্টান।

প্রথম পাতাতেই একটা খবর দুবার পড়েন ভবনাথ। ভিয়েনার খবর। সত্যাগ্রহ আন্দোলন সাময়িকভাবে বন্ধ করার জন্যে সুভাষচন্দ্র বসু ও বিঠলভাই প্যাটেল রয়টারের কাছে এক বিবৃতিতে গান্ধীজীকে নিন্দে করে বলেছেন সংকটকালে তিনি দেশকে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম। ভবনাথ তাঁর টাকে হাত বুলোতে বুলোতে ভাবেন, 'বন্দেমাতরম' চীৎকার মিছিল ততো ভয়ের নয়, তবে বাংলাদেশের জেলায় জেলায় এই বোমা পিস্তলের হিড়িকটা বন্ধ হলে প্রাণ বাঁচে।

এই সব আন্দোলনের খবর, সরকারী অর্ডিনান্স জারী হবার পর ওপরওয়ালাদের নতুন নতুন হুকুম এসব ছাপিয়ে একটা চিন্তা বা দুশ্চিন্তাই ভবনাথকে আবৃত করে রেখেছে। বাড়ির ভিত হয়েছে, দেয়াল গাঁথা হয়েছে। বেশ ভরা তালে কাজ চলে-ছিল। কিন্তু ছাতে এসে ভবনাথের তরী আটকে গেছে। দিন দশেক হল প্রায় কাজ বন্ধ। মিস্ত্রিদের মজুরী বাবদ সাত আটশো টাকা অবিলম্বে না ঢালতে পারলে কাজ মার খাবে। ভবনাথের স্বপ্নের ইমারত চোট খাবে।

ঠিক সত্তর বছর আগে ভবনাথের বাবাও ঠিক এমনি স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাজারের সেরা মাল দিয়ে বাড়ি বানাবেন। বর্ষার দিনে টিনের চালে বৃষ্টির চড়বড় আর শুনতে হবে না। এমনভাবে গাঁথনি তৈরী হল পাবনার বাড়ি যে দু-তিনশো বছর চলে যাবে সামান্য যত্নে। তখন ঈশান চৌধুরী জানতেন না, বড় ছেলেটা নষ্ট হয়ে যাবে, মেজো ছেলে টিম টিম করে চালাবে তাঁর আইন ব্যবসা, ছোট ছেলে দেশের বাড়ি ত্যাগ করবে, জামাইগুলো হবে অপোগণ্ডো। শুধু ইট পাথরের প্রতাপে বাড়ি টিঁকে থাকবে না।

ভবনাথ এসব কথা ভোলেননি। কিন্তু প্রত্যেক মানুষই ভাবে সে নিজে ব্যত্যয়, জীবনের ভঙ্গুরতার ঊর্ধ্বে। কালের অব্যর্থ গুলি তার পাশের লোকটাকে রাস্তার মুখ থুবড়ে ফেলে দেবে কিন্তু সে রক্ষা পাবে। আর তাছাড়া কালের এই অনিবর্তনীয় গতির কথা চিন্তা করে কি কিছু করার আছে। তার বড়দা যে কম বয়স থেকেই বৈঠকখানায় মক্কেলদের টাকার তোড়ার বাট-পাড়ি করেছে, মায়ের সাতনরী সোনার হার, বিশ গাছা চুড়ি, দুজোড়া বালা লোপাট করেছে সিন্দুকের চাবি হাতসাফাই করে সে এখন দীক্ষা নিয়েছে কোন এক গুরুর কাছে। প্রায়ই বলেন, 'সবই তো তিন মুঠো ছাই।' কাজেই কালের অনিবর্তনীয় গতির কথা চিন্তা করে আলগা বিচ্ছিন্ন স্বার্থপর মানুষে পরিবর্তিত হতে চায় না ভবনাথ। কালের হাতের শক্ত পাঞ্জা আর লঘু পদক্ষেপ মেনে নিতে হবে প্রসন্নচিত্তে। পোতাজিয়া থেকে পাবনা আবার পাবনা থেকে কলকাতা। আর কলকাতার বাস যদি যায় তো যাবে।

কিন্তু এ তত্ত্ব ছাপিয়ে ভবনাথ স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন দেখেন রসা রোডে অক্রূর বসুর বাড়ির মতো মার্বেলের সাদা সিঁড়ি, উঠেই ছোট বসবার ঘর। পাশে দক্ষিণে পালিশকরা ঘন সবুজ সিমেন্ট মেজের লম্বা ঘর, ব্যালকনি। কালো-সাদা মোজেইকের করিডর পার হয়েই বড় ছেলের ঘর। পাশে একটা ছোট ঘরে মাস্টারমশাই এসেছে। ছোট ছেলেমেয়েরা পড়ছে। ভাঁড়ার ঘরের গায়ে আরও একখানা বড় শোবার ঘর। সবার শেষে কালো মার্বেলের ঠাণ্ডা ছোট ঠাকুরঘর।

(ক্রমশঃ)

দ্বিতীয় পর্ব

অষ্টম অধ্যায়

পশ্চিম রণাঙ্গনের চরম যুদ্ধ—৩

একটি বিমান দুর্ঘটনা ও ম্যানস্টাইন প্ল্যান

পশ্চিম রণাঙ্গনের চরম যুদ্ধ সুরু হওয়ার আগে হিটলার সেই আক্রমণের তারিখ বার বার পরিবর্তন করিয়াছেন এবং বারে বারে ইতস্ততঃ করিয়াছেন। একথা আগেই (পঞ্চম অধ্যায়ের শেষের দিক দ্রষ্টব্য) উল্লেখ করা হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে ১০ জানুয়ারী, ১৯৪০ খৃঃ তারিখের একটি অদ্ভুত বিমান দুর্ঘটনার কথা আলোচনা করা হইয়াছে। আমরা জানি বিজ্ঞানের অনেক আশ্চর্য আবিষ্কার আকস্মিক কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনা থেকে উদ্ভূত হইয়াছে, কিন্তু একটা ঐতিহাসিক যুদ্ধের রণনৈতিক পরিকল্পনাও কোন দুর্ঘটনার জন্য পাল্টাইয়া যাইতে পারে এবং তার ফলাফল অভূতপূর্ব সাফল্যের দ্বারা সুদূরপ্রসারী বা যুগান্তকারী হইতে পারে, এমন ঘটনার কথা কদাচিৎ শুনা যায়। পাঠকবর্গের বোধ হয় মনে আছে যে, জার্মান বিমান বাহিনীর একজন মেজর পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণের সম্পূর্ণ পরিকল্পনাসহ যখন মুনস্টের থেকে কালোন (মতান্তরে বন্) অভিমুখে যাইতেছিলেন, তখন অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ ঝড়ো আবহাওয়ার জন্য তাঁর বিমান বেলজিয়ামে অবতরণে বাধ্য হয় এবং আক্রমণের দলিলপত্রগুলি মেজর কর্তৃক পোড়াইয়া ফেলার চেষ্টা সত্ত্বেও ঐগুলির অন্ততঃ কিছু অংশ বেলজিয়ান সৈন্যদের হাতে পড়ে এবং বেলজিয়ান ও ডাচ্ কর্তৃপক্ষ সেগুলির মর্ম জানিতে পারেন। এভাবে ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃপক্ষের সেগুলি জানার কথা। কিন্তু সেই সময় জার্মাণ কর্তৃপক্ষ ঐ দলিল-গুলির ভাগ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের গভীর সন্দেহ জাগিয়াছিল। মার্শাল গোয়েরিং তো এই ঘটনায় রাগিয়া টঙ্ হইলেন, কিন্তু হিটলার মাথা ঠান্ডা রাখিলেন, তবে, প্রথমে তিনি ভাবিয়াছিলেন অবিলম্বেই আক্রমণ সুরু করিবেন, কিন্তু পরে (১৬ই জানুয়ারী) আক্রমণের মূল পরিকল্পনাই বাতিল করিয়া দিলেন এবং তার পরিবর্তে ম্যানস্টাইন পরি-কল্পনা গ্রহণ করিলেন। এর ফল একেবারে যুগান্তকারী হইল। (১)

কিন্তু কিভাবে এই ম্যানস্টাইন পরি-কল্পনার উদ্ভব হইল?—সেই কাহিনীও কম ঐতিহাসিক ও কম রোমাঞ্চকর নয়। কারণ, সমস্ত প্ল্যানটাই সেনানীমন্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল রুন্ডস্টেডের একজন তরুণ ষ্টাফ অফিসার এরিক ভন্ ম্যানস্টাইনের 'উর্বর মস্তিষ্ক সঞ্জাত' ও 'উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত'। পশ্চিম রণাঙ্গনের শ্রেষ্ঠ ট্যাঙ্কযোদ্ধা ও যান্ত্রিক সংগ্রামের কুশলতম সেনাপতি কর্ণেল জেনারেল হেইঞ্জ গুডেরিয়ান যিনি এই পরিকল্পনা হাতে-কলমে প্রয়োগ করিয়া সামরিক ইতিহাসে প্রসিদ্ধ অর্জন করিয়াছেন, ১৯৫২ সালে তাঁর লিখিত 'প্যাঞ্জার লীডার' নামক বইতে তিনি এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সেখান থেকে কিছুটা উল্লেখ করা হইতেছে :

'হিট্লারের নির্দেশে আর্মি হাইকমান্ড সেই ১৯১৪ সালের বিখ্যাত শ্লিয়েফেন প্ল্যান অনুসারেই পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণ চালাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। পরি-কল্পনাটি সারল্যই একটা বড় গুণ ছিল। যদিও তেমন অভিনবত্ব ছিল না। এমন সময় একদিন নভেম্বর মাসে (১৯৩৯) ম্যানস্টাইন আমার কাছে এসে হাজির। তিনি আমাকে এই বিষয়ে তাঁর নূতন চিন্তার কথা বলিলেন এবং মোটামুটি তাঁর পরিকল্পনার একটা নক্সা আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। এই পরি-কল্পনায় তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, বেলজিয়ম ও লাক্সেমবুর্গের দক্ষিণ দিক দিয়া এক প্রচন্ড ট্যাঙ্ক আঘাত হানিতে হইবে এবং এই অঞ্চলে ম্যাজিনো লাইনের বর্ধিত দিকটা বিদ্ধ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে এবং এখানকার সমগ্র ফরাসী রণাঙ্গনকে এভাবে বিদীর্ণ করিয়া দুই টুকরা করিয়া ফেলিতে হইবে।

একজন ট্যাঙ্ক-বিশারদ হিসাবে তিনি আমাকে পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিলেন। আমি তখন সেই অঞ্চলের মানচিত্র গভীরভাবে অনুধাবন করিলাম এবং বিগত প্রথম মহাযুদ্ধে এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে আমার যে অভিজ্ঞতা ছিল, তা মিলাইয়া দেখিয়া আমি ম্যানস্টাইনকে এই নিশ্চিত ভরসা দিলাম যে, তাঁর এই পরি-কল্পনা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তবে, উহার একমাত্র সর্ত এই যে, যথেষ্ট পরিমাণ সাঁজোয়া এবং মোটরায়িত ডিভিসন-গুলিকে এবং সম্ভব হইলে সমস্ত গুলিকেই প্রয়োগ করিতে হইবে।

'আমার এই মতামত শুনিবার পর ম্যানস্টাইন এই বিষয়ে একটা মেমোরেন্ডাম লিখিয়া ফেলিলেন এবং কর্ণেল জেনারেল ভন্ রুন্ডস্টেডের স্বাক্ষর ও সম্মতিসহ তিনি এটা আর্মি হাইকমান্ডের নিকট পাঠাইয়া দিলেন ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৩৯। বলাই বাহুল্য যে, তাঁরা এই পরিকল্পনা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিলেন না। তাঁরা রণক্ষেত্রের প্রস্তাবিত অংশে মাত্র এক বা দুইটি যান্ত্রিক ডিভিসন প্রয়োগ করিতে চাহিলেন। কিন্তু আমি প্রবল আপত্তি তুলিলাম। কারণ, এই ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বল ট্যাঙ্ক শক্তিকে আরও টুকরা করিয়া ফেলিলে মারাত্মক ভুল হইবে। কিন্তু হাই-কমান্ড কিছুতেই রাজী নন। এদিকে ম্যান-স্টাইন জেদ করিতে লাগিলেন। ফলে, হাই-কমান্ড তাঁর উপর এমন চটিয়া গেলেন যে, তাঁকে ট্যাঙ্ক বাহিনী থেকে নামাইয়া একটি পদাতিক বাহিনীর (ইনফ্যান্ট্রি কোর্) কমান্ডিং জেনারেল করিয়া দেওয়া হইল। এর ফলে আমাদের রণক্রীড়ার সব চেয়ে উৎকৃষ্ট মস্তিষ্কটিকে ('ফাইনেস্ট অপারেশনাল ব্রেন') আক্রমণের তৃতীয় তরঙ্গে অংশ গ্রহণ করিতে হইল, যদিও অনেকাংশে তাঁরই 'অপূর্ব উদ্যোগের' (ব্রিলিয়ান্ট ইনিশিয়েটিভ্) জন্যই এই প্রস্তাবিত আক্রমণ এক অপূর্ব সাফল্য অর্জন করিয়াছিল।

'কিন্তু একটা দুর্ঘটনার জন্য আমাদের প্রভুরা শ্লিয়েফেন প্ল্যান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইতিমধ্যে ম্যানস্টাইন নূতন কোর্ কমান্ডাররূপে হিট্লারের নিকট যখন হাজিরা দিলেন, তখন তিনি সেই সুযোগে তাঁর পরি-কল্পনার কথা বলিলেন। এভাবে ম্যানস্টাইন প্ল্যান গভীরভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখার সিদ্ধান্ত হইল। ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০, কোবলেঞ্জে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারী মায়ানে—পর পর দুইবার এই পরিকল্পনার মহড়া দেওয়া হইল। কিন্তু আর্মি জেনারেল ষ্টাফের প্রধান জেনারেল হ্যালডার সেডানের নিকট মিউজ নদী জোরপূর্বক পার হওয়া এবং যান্ত্রিক বাহিনীগুলির সাহায্যে ফরাসী ব্যূহ বিদীর্ণ করিয়া আমিয়েন্সের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টাকে 'নির্বোধ' চিন্তা বলিয়া আপত্তি করিলেন।......

'এভাবে হাইকমান্ডের নেতাদের সঙ্গে বহু তর্ক-বিতর্ক এবং প্রভূত আলোচনা হইল। একমাত্র হিট্লার, ম্যানস্টাইন ও আমি নিজে ছাড়া এই পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে আর কাহারও বিশ্বাস ছিল না। সমগ্র পরিকল্পনা হিট্লারকে বুঝাইয়া দিয়া আমি বলিয়া-ছিলাম যে, আক্রমণের পঞ্চম দিনে আমি

---

(১) লিডেলহার্ট প্রণীত দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের ইতিহাস, লন্ডন, ১৯৭০, ৩৭ পৃঃ

মিউজ নদী পার হইব এবং ঐ দিন সন্ধ্যায়ই নদীর ওপারে সেতুমুখ স্থাপন করিব। তখন হিট্‌লার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিন্তু নদী পার হয়ে তুমি কি করবে?' তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাঁর মাথায় এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি আসিয়াছিল—

"He was the first person to ask me this vital question!

'আমি জবাব দিলাম যে, আমি আমার অগ্রগতি বজায় রাখিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া যাইব। তবে, সুপ্রিম কমান্ড অবশ্যই স্থির করিবেন আমার লক্ষ্য আমিয়েন্স হওয়া উচিত কিম্বা প্যারিস? তবে, আমার মতে যথার্থ পথ হওয়া উচিত আমিয়েন্স পার হয়ে ইংলিশ চ্যানেলের দিকে চলে যাওয়া।

'হিট্‌লার মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানালেন এবং আর কোন মন্তব্য করিলেন না।' (২)

যে কোন দুঃসাহসিক এবং বেপরোয়া পরিকল্পনাই হিট্‌লারকে আকর্ষণ করিত। সুতরাং ম্যানস্টাইনের এই পরিকল্পনায়ও তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং অনুমোদন করিলেন—যদিও জড্‌ল, ব্রাউসিৎস প্রমুখ অনেক জেনারেল এর গুরুতর বিপদের ঝুঁকি সম্পর্কে আপত্তি তুলিয়াছিলেন। কিন্তু এতদিনে হিট্‌লার নিজেকে একজন সামরিক প্রতিভা (মিলিটারি জিনিয়াস্) বলিয়া মনে করিতে সুরু করিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়াইল যে, এই ম্যানস্টাইন পরিকল্পনাকে তিনি তাঁর নিজের চিন্তাপ্রসূত বলিয়াই ভাবিতে লাগিলেন! সোজা কথায় পরের পরিকল্পনা আত্মসাৎ করিয়া নিজের বলিয়া চালাইতে লাগিলেন। (লীডেল হার্ট, উইলিয়াম শারার ও আলান বুলক প্রমুখ বিখ্যাত সামরিক ইতিহাস লেখকেরাও একথার উল্লেখ করিয়াছেন।) বলাই বাহুল্য যে, হিট্‌লারের অনুমোদনের পর জেনারেল হ্যালডার, যিনি এটাকে গোড়ার দিকে উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত বলিয়া প্রায় অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তিনিও এই পরিকল্পনাকে এখন লুফিয়া নিলেন এবং জেনারেল ষ্টাফের অফিসারেরা এর প্রভূত পরিবর্জন-পরিবর্ধন করার পর এটি সরকারীভাবে গৃহীত এবং নির্দেশ হিসাবে প্রচারিত হইল—২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০। এবং এই পরিকল্পনা অনুসারে ৭ মার্চের মধ্যে সৈন্যবাহিনীগুলির পুনর্বিন্যাস করার হুকুম জারী হইল।

অবশ্য বিমান দুর্ঘটনার আগে পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণের এই নক্‌সার সাঙ্কেতিক নাম ছিল 'কেস্ ইয়েলো' এবং বিমান দুর্ঘটনার পর পরিবর্তিত এই পরিকল্পনা লইয়া জার্মাণ জেনারেলদের মধ্যে বহু বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। সেই বিতর্কের মূল কথা ছিল—এটা কি সেই প্রথম মহাযুদ্ধের বিখ্যাত জার্মাণ পরিকল্পনা শ্লিফেন প্ল্যানেরই পরিবর্তিত সংস্করণ? হ্যালডার এবং গুডেরিয়ান প্রমুখ সেনাপতিরা সেকথাই বলেন। শ্লিফেন প্ল্যান অনুসারেও জার্মাণ বাহিনী কর্তৃক বেলজিয়াম ও উত্তর ফ্রান্সের মধ্য দিয়া আগাইয়া গিয়া ইংলিশ চ্যানেলের বন্দর-শহরগুলি দখলের কথা ছিল। কিন্তু তারপর চক্রাকারে ঘুরিয়া গিয়া সীন্ নদী পার হইয়া পূর্বদিকে প্যারিসের নীচে গিয়া বাকী ফরাসী বাহিনীগুলিকে ধ্বংস করার কথা ছিল। কিন্তু সেবার অল্পের জন্য শ্লিফেন প্ল্যান সফল হইতে পারে নাই। এবার ম্যানস্টাইন প্ল্যান অনুসারে জার্মাণীর প্রধান আক্রমণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আর্দেনিস পার্বত্য এলাকার মধ্যবর্তী অংশে এবং তার পর সেডানের উত্তরে মিউজ নদী পার হইয়া ফ্রান্সের খোলা প্রান্তরে প্রকাণ্ড সাঁজোয়া ও যান্ত্রিক বাহিনীসহ ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এবং ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীকে বিদীর্ণ করিয়া ইংলিশ চ্যানেলের দিকে ধাবমান হওয়া, যে কথা আগেই উল্লেখ হইয়াছে। হিট্‌লারের জেনারেলদের মধ্যে পারস্পরিক পেশাগত ঈর্ষা ছিল, ম্যানস্টাইনের (অপেক্ষাকৃত জুনিয়র অফিসার) অভিনব পরিকল্পনার বিরুদ্ধাচরণের অন্যতম কারণও তাই ছিল। কিন্তু জেনারেল রুন্ডস্টেড্ এই পরিকল্পনার উপর খুব ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তিনি এটা খুব পছন্দ করিতেন বলিয়াই নয়, বিশেষভাবে এজন্য যে, এই আক্রমণাত্মক অভিযানে তাঁর 'আর্মি গ্রুপ-এ' (যাঁর তিনি সর্বাধিনায়ক ছিলেন) মুখ্য এবং চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করিবে। ফলে, তাঁর নেতৃত্বাধীন আর্মি একটা বড় কীর্তি অর্জনের সুযোগ পাইবে।

এই নূতন পরিকল্পনা হাইকমান্ডের আশীর্বাদ লাভ করা সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে কিন্তু স্বয়ং সুপ্রীম কমান্ডার হিট্‌লারেরও আতঙ্ক হইয়াছিল। গুপ্ত দলিলপত্রে দেখা যায় যে, ১ মে-তারিখ তিনি হুকুম দিয়াছিলেন ৫ মে আক্রমণের জন্য, কিন্তু আবহাওয়ার দোহাই দিয়া ৩ মে তারিখ উহা স্থগিত রাখিলেন ৬ মে পর্যন্ত এবং তার পর ৭ মে, গোয়েরিং চাহিলেন অন্ততঃ ১০ মে পর্যন্ত স্থগিত রাখিতে এবং শেষে ৮ মে 'উত্তেজিত ফুয়রার' স্থির করিলেন ১০ মে আক্রমণ চালাইতেই হইবে, আর একদিনও বিলম্ব না (৩)

ফিনফেনক্রুগ থেকে হিট্‌লার হাইকমান্ডের কাইটেল, জড্‌ল প্রমুখ শীর্ষ সামরিক নেতাদের সঙ্গে ৯ মে বিকেল পাঁচটায় ট্রেণযোগে রওনা হইলেন সীমান্তের সদর দপ্তরের দিকে—এই দপ্তরের তিনি নাম দিয়াছিলেন 'Felsennest', এটি মুয়েনস্টারইফেল সহরের নিকট। ১০ মে

(2) Decisive Battles of the Second World War — edited by Peter Yanng, London, 1967, p 18-21

(3) The Rise & Fall of the Third Reich — Williams L. Shirer p 860-63.

ভোর হওয়ার ঠিক আগে উত্তর সমুদ্র থেকে ম্যাজিনো লাইন পর্যন্ত ১৭৫ মাইল রণাঙ্গনে নাৎসী সৈন্যেরা হল্যান্ড, বেলজিয়ম, লাক্সেমবুর্গ তিনটি দেশের বারম্বার ঘোষিত ও স্বাক্ষরিত নিরপেক্ষতার চুক্তিকে চূর্ণ করিয়া আক্রমণের তান্ডবে মাতিয়া উঠিল।......

কিন্তু হিট্‌লারের বিরুদ্ধেও গোয়েন্দাগিরি ছিল, বৈরিতা ছিল। (এমন কি ১০ জানুয়ারীর সেই ঐতিহাসিক বিমান দুর্ঘটনার মূলেও খোদ গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তা—এডমিরাল ক্যানারিসের কোন কারসাজি ছিল কিনা, অন্ততঃ রণপন্ডিত সিডেলহার্ট সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় নন।—তাঁর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।) কর্ণেল ওস্টার ছিলেন নাৎসী বিরোধী ষড়যন্ত্রের একজন পান্ডা। তাঁর সঙ্গে বার্লিনের ওলন্দাজ দূতাবাসের মিলিটারি এ্যাটাসি কর্ণেল জি জে সাস্ নামে একজন অফিসারের খুব অন্তরঙ্গতা ছিল এবং তিনিই ৯ মে তারিখ কর্ণেল সাস্‌কে বলিয়া ছিলেন—'শূকরের বাচ্চাটা পশ্চিম রণাঙ্গনে গিয়াছে।" 'শূকরের বাচ্চা' অর্থে এখানে হিট্‌লার। সুতরাং কিছুক্ষণের মধ্যেই এই গোপন সংবাদ সাসের চেষ্টায় বেলজিয়াম ও ডাচ কর্তাদের কানে পৌঁছিল। অবশ্য এর দ্বারা যুদ্ধের ফলাফলের কোন তারতম্য হইল না।

•

১০ মে যে আক্রমণ সুরু হইল, তখনকার দিনের ইতিহাসে এত বড় বিদ্যুৎগতি যান্ত্রিক আক্রমণ আর অনুষ্ঠিত হয় নাই। একেবারে পরিকল্পনা মাফিক, এমন কি তার চেয়েও নিখুঁত এবং দ্রুতগতিতে জার্মাণ বাহিনীগুলি আগাইয়া যাইতে লাগিল, আর পাঁচ দিনের মধ্যেই ইঙ্গ-ফরাসী বা মিত্র বাহিনীর সঙ্কট চরম আকারে দেখা দিল। ১৫ মে সকালে সাড়ে সাতটায় তখনও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ঘুম থেকে ওঠেন নাই। তাঁর শোয়ার ঘরে বিছানার পাশে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। প্যারিস থেকে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী পল্ রেণোর আর্ত কন্ঠস্বর শুনা গেল :

'আমরা পরাজিত হয়েছি, আমরা হেরে গেছি!'—এই কথাগুলি পশ্চিম রণাঙ্গনের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু চার্চিল যেন একথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যে ফরাসী বাহিনী ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তির ঐতিহ্যবাহী সেই বাহিনী এত দ্রুত হারিয়া গেল? ১৬ মে চার্চিল প্লেনযোগে উড়িয়া গেলেন প্যারিসে, সেখানে প্রধানমন্ত্রী রেণো এবং প্রধান সেনাপতি জেনারেল গ্যামেলার সঙ্গে দেখা হইল। জেনারেল মহাশয় চার্চিলকে সেডান রণক্ষেত্রের ছত্রভঙ্গ অবস্থা, যার ফলে ফরাসী বাহিনী বিধ্বস্ত—এই অবস্থায় জার্মাণ বাহিনী চ্যানেলের দিকে কিম্বা প্যারিসের দিকে ছুটিতে পারে—এই গুরুতর কথাগুলি পাঁচ মিনিটের মধ্যে বলিয়া ফেলিলেন।

খানিক নিস্তব্ধতার পর চার্চিল ফরাসী ভাষায় জেনারেল গ্যামেলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনার স্ট্রাটেজিক্ রিজার্ভ বা রণনৈতিক মজুত বাহিনী কোথায়?'

(চার্চিল লিখিয়াছেন যে, এই আলোচনার সময়েই তিনি জানালা দিয়া দেখিলেন যে, মন্ত্রিভবনের বাগান থেকে ধোঁয়া উঠিতেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দলিলপত্র পোড়ানো হইতেছে। অর্থাৎ ইতিমধ্যেই প্যারিস পরিত্যাগের পরিকল্পনা সুরু হইয়াছে।)

গ্যামেলা চার্চিলের দিকে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—'রিজার্ভ কিছু নাই!'

এই উত্তর শুনিয়া চার্চিল 'স্তম্ভিত' হইয়া গেলেন এবং লিখিয়াছেন—

—'আমার জীবনে পরমতম বিস্ময় বোধের এটি ছিল অন্যতম, একথা আমি সরলভাবেই স্বীকার করিব।'......

এই 'পরম বিস্ময়' একটির পর একটি করিয়া পশ্চিম রণাঙ্গনে ঘটিয়া যাইতে লাগিল এবং ১৯ মে সকাল বেলা চ্যানেলের দিকে ধাবমান ৭টি আর্মার্ড ডিভিসন প্রথম মহাযুদ্ধের সেই বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্রগুলি (লোডার্সের) অতিক্রম করিয়া গেল এবং ২০ মে সন্ধ্যাবেলা জেনারেল গুডেরিনের ট্যাংক বাহিনীর হাতে আবেভিল বন্দর দখল হইয়া গেল। আর বেলজিয়াম, বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনীগুলি সেই ফাঁকে বেষ্টিত হইয়া পড়িল।

বিস্মিত হিট্‌লার আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

•

কিন্তু গুডেরিয়ানের ট্যাঙ্ক অভিযানের জাঁতাকলের মধ্যে পড়িয়া যখন মিত্রপক্ষীয় সৈন্যেরা চূর্ণ হইতে লাগিল এবং ইংলিশ চ্যানেলের বন্দরগুলি একে একে পাকা ফলের মত হাতের মুঠোয় আসিতে লাগিল, তখন বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনীর ডানকার্ক থেকে পলায়নের সেই অঘটন ঘটিল কিরূপে? যুদ্ধের সেই নাটকীয় মুহূর্তগুলিতে আসল কারণটা জানা যায় নাই। কিন্তু পরে জানা গিয়াছে যে, প্রথমে ১৭ মে ঊর্ধ্বতন কর্তাদের নিকট থেকে জেনারেল গুডেরিয়ানের নিকট নির্দেশ আসে আর চ্যানেলের দিকে অগ্রসর না হওয়ার জন্য। কিন্তু গুডেরিয়ান এতে একেবারে অবাক হইয়া যান (তাঁর পুস্তকে লিখিত বক্তব্য অনুসারে)। কারণ, তাঁর ধারণা ছিল যে, ম্যানস্টাইন প্ল্যান যখন গৃহীত হইয়াছিল, তখন হিট্‌লারের সঙ্গে তাঁর কথা অনুসারে তিনি চ্যানেলের দিকে অব্যাহত গতিতে আগাইয়া যাওয়ার অধিকারী। সুতরাং প্যাঞ্জার গ্রুপের অধিনায়ক জেনারেল ভন্ ক্লাইস্টের সঙ্গে এই নিয়া তাঁর বিরোধ দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি পদত্যাগ করেন। পরে অবশ্য আর্মি গ্রুপের সর্বাধিনায়ক জেনারেল রুন্ডস্টেডের হস্তক্ষেপের ফলে তিনি পুনরায় তাঁর সৈনাপত্য (কমান্ড) গ্রহণ করেন। কিন্তু আবার বিভ্রাট দেখা দিল। এবার ২৪ মে একেবারে খোদ সুপ্রীম কমান্ড থেকে হুকুম আসিল আর ডানকার্কের দিকে অগ্রসর না হওয়ার জন্য। স্বয়ং হিট্‌লার এই হুকুম জারি করিয়াছেন। অতএব ডানকার্কের দিকে অগ্রগতি স্তব্ধ করিয়া দিতে হইল।

এই আদেশ পাইয়া গুডেরিয়ান স্তব্ধ বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেলেন। কারণ, এমন আদেশের কোন মাথামুন্ডু বুঝা গেল না। হিট্‌লার অবশ্য পরে বলিয়াছিলেন যে, ফ্লান্ডার্স অঞ্চলের অসংখ্য ক্যানেল ও ডিচ্ (খাদ) ইত্যাদির জন্য ট্যাঙ্কের পক্ষে অগ্রগতি সম্ভব ছিল না। কিন্তু এটা বাজে ওজর বলিয়া প্রতিভাত হইল।

২৬ মে অপরাহ্নে হিট্‌লার অবশ্য আবার অনুমতি দিলেন ডানকার্কের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য। কিন্তু তখন অত্যধিক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। সেই সুযোগে বৃটিশ সৈন্যেরা চ্যানেল পার হইয়া গেল। জার্মাণ বাহিনী দূর থেকে সেটা দেখিলেন। অর্থাৎ ডানকার্ক থেকে বৃটিশ সৈন্যদের এভাবে পরিত্রাণ মোটেই সম্ভব হইত না, যদি না সুপ্রীম হেড্‌কোয়ার্টার্স ১৯নং আর্মি কোরকে তাদের গতিপথে থামাইয়া না দিতেন। কিন্তু হিট্‌লারের নার্ভাসনেসের জন্যই মূল্যবান সুযোগ নষ্ট হইয়া গেল। (৪)

কিন্তু গুডেরিয়ানের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। কারণ, আর্মি গ্রুপের প্রধান অধিনায়ক জেনারেল রুন্ডস্টেডও এর জন্য সমভাবে দায়ী ছিলেন। তিনিই অগ্রসরমান যান্ত্রিক বাহিনীর ক্ষয়-ক্ষতির দিকে তাকাইয়া কিছুটা দম লইবার জন্য এই পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং হিট্‌লার তাতে রাজী হইয়াছিলেন। অবশ্য বিমান বাহিনীর অধিনায়ক গোয়েরিংয়ের আত্মম্ভরিতাও হিট্‌লারের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কারণ, গোয়েরিং চাহিয়াছিলেন উপকূল ভাগের দিকে ফাঁদে পড়া শত্রু সৈন্যদিগকে তাঁর বিমান বাহিনীর দ্বারা সাবাড় করিতে।

কিন্তু রণপন্ডিত সিডেলহার্ট বলিয়াছেন যে, এই ঐতিহাসিক ও বিতর্কমূলক নির্দেশের পিছনে একমাত্র সামরিক কারণ ছিল না, আসলে ছিল রাজনৈতিক কারণ। ২৪ মে তারিখ হিট্‌লার ও রুন্ডস্টেডের মধ্যে সাক্ষাতের ব্যাপার সম্পর্কে রুন্ডস্টেডের

---

(4) Decisive Battles of the Second World War — Peter Yanng, p 42-43

রণক্রিয়ার প্রধান অধ্যক্ষ জেনারেল গ্যয়েনহার ব্রুমেনট্রিট্ লীডেলহার্টের নিকট (যুদ্ধের পর) যা' বলিয়াছিলেন, তার মর্ম এই ঃ

'হিট্‌লার খুব উল্লসিত ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস এই অভিযানে একটা মিরাক্যাল্ ঘটিয়া ঘটিয়া গিয়াছে এবং যুদ্ধ ছয় সপ্তাহের মধ্যে শেষ হইয়া যাইবে। তারপর ফ্রান্সের সঙ্গে একটি যুক্তিসঙ্গত শান্তি-সন্ধি করার পর বৃটেনের সঙ্গে চুক্তি করারও অবাধ সুযোগ পাওয়া যাইবে।

'অতঃপর হিট্‌লার বৃটিশ সাম্রাজ্যের এমন গুণগান করিলেন যে, আমরা অবাক হইলাম। তাঁর মতে বৃটেন পৃথিবীতে একটা নূতন সভ্যতা আনিয়াছে।......

'উপসংহারে তিনি বলিলেন যে, তাঁর উদ্দেশ্য হইতেছে; বৃটেনের সঙ্গে একটা সম্মানজনক সন্ধি করা।' (৫)

সুতরাং ইতিহাসের বিচারে ডানকার্ক থেকে বৃটিশ সৈন্যের পরিত্রাণ কোন 'মিরাক্যাল্' ছিল না, জার্মাণ হাইকমান্ডের ভুলের জন্যই এটা ঘটিয়াছে এবং যে ভুল বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক হিট্‌লারী যুদ্ধের একটা 'মেজর মিসটেক্' বা বড় রকমের ভুল বলিয়া স্বীকৃত।

●

ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে বিপর্যয় ও প্যারিস নগরীর আত্মসমর্পণের সময় (১৮নং জার্মাণ বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ফন্ কুয়েচলার ১৪ জুন এই মহানগরী দখল করিয়া বিখ্যাত ইফেল টাওয়ারের উপর স্বস্তিক পতাকা উড়াইয়াছেন) অনেক নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ হইয়াছিল, যেগুলির বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। তবে, একটি ক্ষুদ্র ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে ঐতিহাসিক কারণে। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয়ের পর জার্মাণ সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলম নির্বাসিতরূপে হল্যান্ডে আশ্রয় নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাঁর কথা বাইরের জগতে কাহারও স্মরণে ছিল না। কিন্তু হঠাৎ হিট্‌লারী দিগ্বিজয়ে উৎফুল্ল হইয়া হল্যান্ডের ডুর্ণ শহর থেকে নির্বাসিত কাইজার ১৯৪০, ১৭ জুন তারিখে হিট্‌লারের উদ্দেশ্যে এক উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জ্ঞাপক টেলিগ্রাম পাঠাইলেন--যে হিট্‌লারকে তিনি এত দিন 'একটা ভুঁইফোড় চাষাড়ে' লোক বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন। যুদ্ধের পর এই অভিনন্দন ধৃত নাৎসী কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। অভিনন্দনের ভাষা ছিল নিম্নরূপ ঃ

> "Under the deeply moving impression of the capitulation of France I congratulate you and the German wehrmacht on the mighty victory granted by God, in the words of the Emperor willhelm the Great in 1870: 'what a turn of events brought about by divine dispensation'... ......".

প্রাক্তন জার্মাণ সম্রাট এই তারবার্তায় সম্ভবতঃ একটু ভুল করিয়াছিলেন। কারণ, জার্মাণীর এত বড় জয়ের জন্য তিনি হিট্‌লারী প্রতিভার কোন উল্লেখই করিলেন না, একমাত্র ভগবানের কৃপার উপর দোহাই দিলেন। সুতরাং হিট্‌লার নমো নমো করিয়া যে জবাবের খসড়া তৈয়ার করিয়াছিলেন, তা আদৌ পাঠানো হইয়াছিল কিনা, সন্দেহ-জনক। কারণ, নথিপত্রে তার কোন প্রমাণ নাই।

কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলম ডুর্ণ শহরে মারা যান পরের বছর ৪ জুন, ১৯৪১। কিন্তু তাঁর এই মৃত্যু জার্মাণীতে কেউ খেয়াল করেন নাই। (৬)

হিট্‌লারের প্রতিশোধ

পশ্চিম রণাঙ্গনে অভূতপূর্ব জয় লাভের পর হিটলার প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মাণীর পরাজয়ের প্রতিশোধ কিভাবে নিয়াছিলেন, আগের অধ্যায়ে তা' খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ঘটনাটা এত ঐতিহাসিক এবং নাটকীয় যে, এখানে সেই রোমাঞ্চকর কাহিনীর কিছুটা উদ্ধৃত করা যাইতেছে......

হিট্‌লার আগেই ঠিক করিয়াছিলেন যে, সেই কম্পেটন অরণ্যের ঠিক সেই স্থানেই ফ্রান্সের যুদ্ধবিরতির চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইবে, যেখানে প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মাণীর চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। স্থানটি হইতেছে প্যারিসের ৪৫ মাইল উত্তরে এবং কম্পেটন শহরের ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। মার্শাল ফস্ ১৯১৮ সালের যুদ্ধবিরতির চুক্তিপত্র যে রেলওয়ে কামরায় (ওয়াগন সীট্) বসিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, কম্পেটন অরণ্যের একটি জায়গায় সযত্নে নির্মিত মিউজিয়মের মধ্যে সেটি রক্ষিত ছিল। ১৯ জুন অপরাহ্নে জার্মাণ মিলিটারি ইঞ্জিনীয়াররা সেই মিউজিয়ামের দেওয়াল ভাঙিয়া ফেলিয়া রেলওয়ে কামরাটি বাহির করিলেন এবং ঠিক ১৯১৮ সালের যথাস্থানে ওটি পুনরায় স্থাপন করিলেন। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী (বিখ্যাত মার্কিণ সাংবাদিক উইলিয়াম শিরার) লিখিয়াছেন যে, তখন জুন মাসের চমৎকার গ্রীষ্ম, স্থানটি বড় বড় ওক, সাইপ্রাস, পাইন ইত্যাদি গাছের নিবিড় ছায়ায় বড় রমণীয়। এখানে একটি প্রকান্ড রাস্তার শেষে ছিল আলসাস-লোরেণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত একটি মনুমেন্ট—জার্মাণ সাম্রাজ্যের প্রতীকস্বরূপ দেখানো হইয়াছে একটি খোঁড়া ঈগল পাখী, যাকে বিদ্ধ করিতেছে মিত্রশক্তির প্রতীক-তুল্য একটি বৃহৎ তরোয়াল এবং তাতে নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ ছিল ঃ

> "To the heroic soldiers of France, defenders of our country and of right, glorious liberators of Alsace Lorraine".

১০ জুন অপরাহ্ন ঠিক ৩-১৫ মিনিটে হিট্‌লার, গোয়েরিং, কাইটেল প্রভৃতি শীর্ষ-নেতাদের সঙ্গে একটি প্রকান্ড মার্সেডিজ বেন্ গাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁর পরণে ইউনিফর্ম ও বুকে আইরণ ক্রস ঝুলানো ছিল এবং তিনি ওই মনুমেন্টের প্রতি তাকাইয়া দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলেন। তখন তাঁর মুখমন্ডল গম্ভীর এবং প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায় যেন রক্তিম হইয়া উঠিল, বিজয়ীর ঔদ্ধত্য এবং দম্ভও তাঁর প্রতি পদক্ষেপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কিন্তু যখন তিনি আগাইয়া গিয়া আর একটি প্রস্তর ফলকে ফরাসী ভাষায় নিম্নলিখিত কথাগুলি নিঃশব্দে পড়িলেন......

> "Here on the eleventh day of November, 1918, succumbed the criminal pride of the German Expire, vanquished by the free peoples which it tried to enslave" ......

তখন তাঁর (হিট্‌লারের) মুখে যে ঘৃণার অভিব্যক্তি দেখা গেল, তার কোন তুলনা নাই। তাঁর চোখের দৃষ্টিপাতেও যেন 'masterpiece of contempt'!....

(হিটলারের আদেশে তিন দিন পর সেই প্রস্তর ফলকটি চূর্ণ করিয়া ফেলা হইল।)

তারপর হিট্‌লার সেই রেলওয়ে কামরায় ১৯১৮ সালের মার্শাল ফসের ব্যবহৃত সেই আসনে গিয়াই বসিলেন। জার্মাণ ও ফরাসী প্রতিনিধি দলের মধ্যে নিয়মমাফিক কায়দা-কানুন অনুষ্ঠিত হইল। তখন হিট্‌লারের নির্দেশে জেনারেল কাইটেল যুদ্ধবিরতি চুক্তির ভূমিকা পড়িয়া শুনাইলেন। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে ঠিক ২৭ মিনিট সময় লাগিল— যদিও এর পরেও উভয় পক্ষে যুদ্ধবিরতির আলোচনায় ২৭ ঘন্টা লাগিয়াছিল।

হিট্‌লার তাঁর মূল্যবান সময় আর নষ্ট করিলেন না। বিজয়ীর দর্পে গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। আর বিমর্ষ ও বিপর্যস্ত ফরাসী প্রতিনিধি দল কাছেই একটি তাঁবু থেকে বিশেষভাবে নির্মিত টেলিফোনের সাহায্যে ফরাসী সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ-বিরতির কঠোর সর্তগুলি নিয়া কিছুক্ষণ আলোচনা করিলেন।......

এভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের যুদ্ধবিরতির উপর আর একটি কৃষ্ণ যবনিকা নামিয়া আসিল। সামরিক দিক থেকে এর মূলে ছিল ম্যানস্টাইন প্ল্যানের সার্থক প্রয়োগ।

(ক্রমশঃ)

---

(৫) লীডেলহার্ট প্রণীত দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের ইতিহাস, লন্ডন, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৮৩

(৬) উইলিয়াম এল শিরার প্রণীত—দি রাইজ্ এন্ড ফল্ অব্ দি থার্ড রাইখ্, পৃঃ ৮৮৬

হলদিয়ার প্রতিশ্রুতি

সুধীর কুমার সেন

পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ বেকারীর পরিপ্রেক্ষিতে অদূর ভবিষ্যতে অন্ততঃপক্ষে লাখখানেক মানুষের কর্মসংস্থানের যে আশ্বাস হলদিয়া দিচ্ছে, সে দিক থেকে এই নির্মীয়মান শিল্পনগরীর আকর্ষণ কম নয়। পশ্চিমবঙ্গ এমনই একটা রাজ্য যেখানে ব্যাপক কর্মসংস্থানের জন্য কলকাতাই ছিল একমাত্র নগরী, যদিও মানুষের নতুন জীবিকার পথ সৃষ্টির সামর্থ্য তার অনেকদিন পূর্বেই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। অথচ এখানে কর্মপ্রার্থী শুধু এ রাজ্যের লোক নয়, অন্যান্য রাজ্য থেকেও অসংখ্য মানুষ কর্মের সন্ধানে এখানে এসে বেকারের তালিকা স্ফীত করেছে। ফলে নগরীর দারিদ্র্য বেড়েছে, অশান্তি অরাজকতা জনজীবনকে গ্রাস করেছে এবং কলকাতা লক্ষ লক্ষ মানুষের রুটির জন্য দৈনন্দিন ব্যর্থ সংগ্রামের এক জীবন্ত চিত্রের রূপ নিয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর কালে দুর্গাপুর যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল, প্রশাসনিক অকর্মন্যতা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর চিন্তায় ও কাজে রাজ্যের সামগ্রিক স্বার্থবোধের অভাব তার পূরণের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে দুর্গাপুর আজ কর্মপ্রার্থীদের সামনে নতুন আকর্ষণ হওয়ার পরিবর্তে প্রশাসন কর্তৃপক্ষের গুরুতর শিরঃপীড়ার কারণে রূপান্তরিত হয়েছে।

তাই হলদিয়ার প্রতিশ্রুতির পিছনে দুর্গাপুরের তিক্ত অভিজ্ঞতা যে ছায়া বিস্তার করেনি তা নয়। তবুও একথা অবশ্যম্ভাবীকার্য যে পশ্চিমবঙ্গের এই দ্রুত অধোগতি যদি রোধ করতে হয় তাহলে বর্তমান অরাজকতা কঠোর হস্তে দমনের সঙ্গে সঙ্গে বেকারী নিরসনের জন্যও প্রাণপণ সংগ্রামে নামতে হবে এবং সেক্ষেত্রে হলদিয়ার গুরুত্ব কম নয়।

গুরুত্ব কম নয় এই জন্য বলছি, কারণ হলদিয়ার পরিকল্পনার শুরুতে তাকে কর্মসংস্থানের দিক থেকে কলকাতার এক পাল্টা শিল্পনগরী হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল, যার আসল লক্ষ্য হবে কলকাতা থেকে কর্মপ্রার্থীদের ভিড় কমানো। আকর্ষণ হিসেবে এখানে যে শিল্প-[illegible] গড়ে তোলা হবে তাও কম নয়। সবচেয়ে বড় কথা, এখানে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব হয়েছে, তার অনেকগুলোরই পশ্চিমবঙ্গে ইতিপূর্বে কোন অস্তিত্ব ছিল না।

হুগলী নদী ক্রমাগত মজে যেতে থাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ কলকাতা বন্দরে কোন বড় জাহাজ ভিড়তে পারে না। ফলে বন্দর পরিচালনার ব্যয় যেমন ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল, তেমনি যেসব জাহাজ এখানে এসে ভেড়ে তাদের ব্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

কলকাতা বন্দরের এই সমস্যা অবশ্য নতুন নয়, শ'খানেক বছর আগে এর সূচনা হয়। হুগলী নদীতে এত তলানি পড়ে যে বছরের একটা অংশে এর নাব্যতা গুরুতরভাবে হ্রাস পায় এবং বন্দরে বড় জাহাজ ভিড়তে পারে না। গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে নিয়মিতভাবে ড্রেজিং করে নদীর নাব্যতা কোনভাবে বজায় রাখা হলেও বর্তমানে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে বছরে মাস দুয়েক ছাড়া বন্দরে বড় জাহাজ ভেড়ার মত জল থাকে না। বিশেষজ্ঞরা আশা করেন যে ফারাক্কা বাঁধ শেষ হলে গঙ্গার নাব্যতা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়বে, কারণ তখন প্রচুর জল পাওয়া যাবে। তবু বেশী বড় ড্রাফটের জাহাজ এখানে ভবিষ্যতে ঢুকতে পারবে এরকম আশা নেই।

কলকাতা বন্দরের এই বর্তমান সমস্যার সমাধানের চিন্তাই হলদিয়ায় নতুন বন্দর নির্মাণের পরিকল্পনার জন্ম দেয়। তমলুক মহকুমায় নয় বর্গমাইলের কিছু বেশী এলাকা হুকুম দখল করে যে বন্দরনগরী নির্মাণের কাজ চলছে তাতে ৪০ ফুট ড্রাফটের জাহাজ এখনই ভিড়তে পারবে যেখানে কলকাতা বন্দরে ২৬ ফুটের বেশী ড্রাফটের জাহাজ ভিড়তে পারে না। বর্তমানে হলদিয়া ডকে ত্রিশ হাজার পর্যন্ত টনের জাহাজ আসতে পারে। কলকাতা পোর্ট কমিশনার্সের মতে, ফারাক্কার কাজ শেষ হলে এক লক্ষ টন পর্যন্ত জাহাজও হলদিয়া বন্দরে ভিড়তে পারবে।

হলদিয়া বন্দরে যে ডক তৈরী হচ্ছে তাতে থাকবে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত চারটি বার্থ ও দুটি জেটি। এগুলি প্রধানতঃ কয়লা, লৌহ, পেট্রল ও ফার্টিলাইজার বোঝাই-খালাসের কাজে লাগবে। অয়েল জেটির কাজ শেষ হয়েছে ১৯৬৮ সালেই। এখন এখানে বিদেশ থেকে আমদানী তেল পাঠিয়ে দেওয়া হয় পাইপ লাইন বরাবর বিহারে বারৌনি তৈল শোধনাগারে। ডকের কাজ তিন-চতুর্থাংশের কাছাকাছি শেষ হয়েছে। ১৯৭১ সালের মধ্যেই ডক নির্মাণ শেষ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কাঁচামালের অভাবে কাজ কিছুটা হয়ত বিলম্বিত হবে।

শিল্প-প্রত্যাশা

আধুনিক বন্দর ও জেটি এতবেশী যান্ত্রিক যে সেখানে শিল্প-পরিধির তুলনায় মানুষের কর্মসংস্থান খুব কম। বন্দরের কাজ একেবারে শেষ হলে তাতে পাঁচ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু বন্দরে জাহাজ বোঝাই খালাস, মাল পরিবহন, বন্দরে আশ্রিত জাহাজগুলোর রসদ প্রভৃতি যোগানের জন্য আরো যে কতকগুলো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে তাতে কর্মসংস্থান হবে আরো অনেক বেশী মানুষের। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, এখানে যে তৈল শোধনাগার নির্মিত হচ্ছে তার ফলে সৃষ্টি হবে অসংখ্য উপজাতশিল্পের যাতে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। তৈল আমদানী-রপ্তানীর বন্দরের কাছে ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন তার কারখানা গড়ে তুলছে। এর কাজ সম্পূর্ণ হতে আরো কমবেশী দু'বছর লাগবে। রিফাইনারির উপজাত কাঁচামাল ব্যবহারের জন্য বসবে আর দুটি শিল্প—পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স ও সার কারখানা। পেট্রো কেমিক্যাল কমপ্লেক্সকে শিল্প না বলে শিল্পসমবায় বলাই যুক্তিযুক্ত হবে, যা থেকে রং, কৃত্রিম রবার, প্লাস্টিক প্রভৃতি বহু শিল্প জন্ম নেবে। এছাড়া এখানে মেথানল ও সোডা অ্যাশ কারখানা, জাহাজ তৈরীর কারখানা, ইলেকট্রনিক শিল্প প্রভৃতি প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা আছে। এই রাজ্যে জাহাজ কারখানা স্থাপনের জন্য দীর্ঘদিনের দাবী আছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে তথ্যা-

দেখি আপনি কেমন আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে দেখতে পারেন। হাতের বাইসেপস ফুলিয়ে পেট ভিতরে টেনে নিয়ে চট করে একবার আপাদমস্তক দেখে নেওয়া নয়-যে চোখে লোকে আপনাকে দেখে সেই ভাবে খোলা চোখে একটার পর একটা ভালমন্দ বিচার করুন।

নিজের কাঁধের দিকে তাকান, আপনার হাতের উপর ও নীচের দিক, আপনার বুক, কোমর, পা দুটো দেখুন। আয়নায় যদি ঠিক অহংকার করার মত তেমন কিছু না পান-আর যদি সারা-দিনে একটা সহজ, সরল, বিনা পরিশ্রমের আইসো-মেট্রিক "ধরে রাখা"র ব্যায়াম করার জন্যে ৫টা মিনিট খরচ করতে রাজী হন, তবে গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আয়নার মধ্যের "আপনি" ও বুলওয়ার্কারের সাহায্যে তৈরী শক্তিশালী, স্বাস্থ্যবান ও পুরুষোচিত "আপনি" এই দুইয়ের মধ্যেকার ফাঁক আমরা ভরাট করতে পারি। বাধা নিষেধের বালাই নেই।

১৬ বা ৬০ যাই আপনার বয়স হোক, যাচ্ছেতাই রকম মোটা বা রোগা হোন, ইতিমধ্যে অনেক ধরণের ব্যায়াম চর্চা করে থাকুন বা বহু বছর ধরে ব্যায়ামের সাথে সম্পর্ক না থাকুক, বুলওয়ার্কার আপনাকে যে সুনির্দিষ্ট সুফলের গ্যারান্টি দিচ্ছে সেটা মাত্র দু সপ্তাহ পরে আপনি আয়নায় দেখতে পারছেন ও ফিতে দিয়ে সত্যি সত্যি মাপতে পারছেন: আর যদি তা না হয়, এক পয়সাও দিচ্ছেননা। সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য আজই কুপন ডাকে দিন। কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কোন সেলসম্যান আপনার সাথে যোগাযোগ করবেননা।

বিনামূল্যে

1908

হ্যাঁ, বুলওয়ার্কারের যে পরীক্ষিত ব্যায়ামসূচী শক্তিশালী পুরুষোচিত, স্বাস্থ্যবান দেহের গ্যারান্টি দেয়, তার সম্পূর্ণ বিবরণ আমাকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিন।

নাম ....

ঠিকানা ....

.... বয়স

AM4

BULLWORKER SERVICE,
15 Mathew Road, Near Opera House, Bombay 4

অনুগ্রহ করে আমাদের ঠিকানা ইংরাজীতে লিখুন

নুসন্ধানের জন্য দশজন সদস্য নিয়ে একটি কমিটিও গঠন করেছেন। দিন কয়েক আগে বিশ্বব্যাঙ্কের একটি শিপিং মিশনও হলদিয়া পরিদর্শন করেছেন। ভারতীয় কয়েকটি জাহাজী কোম্পানী তৈলবাহী ট্যাঙ্কার ক্রয়ের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে ঋণ প্রার্থনা করায় তাঁরা কলকাতায় পোর্ট কমিশনার্সের কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে হুগলী নদীর বর্তমান এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ নাব্যতা (ফারাক্কার কাজ শেষ হওয়ার পরে) সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। হলদিয়া পরিদর্শনকালে তাঁরা সেখানকার প্রস্তাবিত পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স সম্বন্ধেও খোঁজ-খবর নিয়েছেন।

জাহাজ কারখানা

হলদিয়ায় জাহাজ তৈরীর কারখানা যদি কেন্দ্রীয় অনুমোদন পায় তাহলে এর প্রথম পর্যায়ের কাজেই পঞ্চাশ কোটি টাকা ব্যয় হবে। কারখানা স্থাপনের যে পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে তা যদি দ্রুত প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা এড়িয়ে সূচনার ধাপে পা দিতে পারে এবং অবিলম্বে এর নির্মাণকার্য শুরু হয় তাহলে এই রাজ্যের বহু বেকারের এখনই কর্মসংস্থান সম্ভব হতে পারে।

হলদিয়ায় জমি সংগ্রহ করার ব্যাপারে কিছু বেহিসেবী কাজ আছে যার ফলে বর্তমান সংগৃহীত নয় বর্গমাইল এলাকায় ডক, রিফাইনারি, পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স ও সার কারখানা ছাড়া বেসরকারী মালিকানায় কোন শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উপযোগী জায়গা নেই। এই হুকুম দখল করা জায়গায় ডক, কারখানা ছাড়া যেসব বসতবাড়ী গড়ে উঠবে সেগুলোও শুধু সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বন্দর ও কারখানার কর্মী ও শ্রমিকদের জন্য। যেখানে সরকারী মালিকানায় এতগুলো শিল্প গড়ে উঠবে, সেখানে বেসরকারী উদ্যোগেও বহু আনুষঙ্গিক ও সহায়ক শিল্প গজিয়ে উঠবে। এবং উপনগরীর চাহিদা মেটাতে অসংখ্য স্কুল, কলেজ, ব্যাঙ্ক, বীমা অফিস, হোটেল, রেস্তরাঁ, বাজার, দোকানের জায়গা দরকার হবে। বসতি বৃদ্ধির সংগে সংগে ঘরবাড়ী করার জন্য প্রচুর জায়গা প্রয়োজন হবে। এই স্থান সংগ্রহের জন্য অবশ্য চেষ্টা চলছে। কিন্তু যদি এতে প্রশাসনিক শৈথিল্যের দরুণ বিলম্ব ঘটে তাহলে উপনগরী গড়ে ওঠার কাজও বিলম্বিত হবে। দ্বিতীয়ত মানুষের আপাতঃ প্রয়োজন মেটাতে এই শিল্পনগরীকে ঘিরে নিতান্ত অপরিকল্পিতভাবে কতকগুলো ঘিঞ্জি শহরতলী গড়ে উঠবে। কলকাতা এবং শহরতলীগুলোর অব্যবস্থা ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের কথা স্মরণ রেখেও কর্তৃপক্ষের পূর্বেই এ ব্যাপারে তৎপর হওয়া উচিত ছিল।

সড়ক, পরিবহন

পরিবহন ও সড়ক নির্মাণের ব্যবস্থাও এখন পর্যন্ত অনেক পিছিয়ে। মহিষাদল থেকে হলদিয়া পর্যন্ত যে রাস্তা আছে তাই-ই এখন পর্যন্ত যাত্রী পরিবহনের একমাত্র পথ। মেচেদা থেকে হলদিয়া পর্যন্ত যে রেললাইন আছে তাতে বর্তমানে মালগাড়ী চলে কিন্তু যাত্রী পরিবহনের ট্রেন এখনও চালু হয়নি। যাতে দূরে অঞ্চলের মানুষরাও এসে হলদিয়ায় কাজ করে সন্ধ্যা বেলা আবার ঘরে ফিরে যেতে পারেন তজ্জন্য ট্রেন বাস ও লঞ্চ সার্ভিসের সুষ্ঠু পরিকল্পনা দরকার। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী কলকাতা-বোম্বাই জাতীয় সড়কের সংগেও হলদিয়াকে যুক্ত করা হবে। কিন্তু পরিকল্পনাগুলোর রূপদানে যদি অহেতুক বিলম্ব হয় তাহলে হলদিয়ার সংগে বিভিন্ন কাজকর্মে যুক্ত মানুষদের অসুবিধার অন্ত থাকবে না।

রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং শিল্প-ক্ষেত্রে অসুস্থ পরিবেশের জন্য বিগত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে নতুন কোন শিল্প গড়ে উঠতে পারেনি বরং ঘেরাও, ধর্মঘট, ক্লোজার প্রভৃতির ফলে চালু বহু কারখানাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে কর্মক্ষেত্রে নবাগতরাই শুধু বেকারের তালিকায় স্থান পাননি, পূর্বে কর্মরত বহু ব্যক্তিও তালিকার কলেবর বৃদ্ধি করেছেন। এই অবস্থার জন্যে শ্রমিক-মালিক উভয়কেই অভিযুক্ত করা যেতে পারে। ট্রেড ইউনিয়নগুলির রেষারেষিও এর জন্য কম দায়ী নয়। এই অশান্ত ও অনিশ্চিত পরিবেশের জন্য গত কয়েক বছরের মধ্যে চালু শিল্পগুলোর স্বাভাবিক প্রসারও ঘটেনি। বহু শিল্প ও মূলধনের রাজ্যান্তরে প্রস্থানের ঘটনাও বিরল নয়। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী হিসেবমতোই বেকারের সংখ্যা ত্রিশ লক্ষে পৌঁছেছে. বেসরকারী হিসেবে যা নিশ্চয়ই আরো অনেক বেশী হবে। এছাড়া, অর্ধবেকার ও সাময়িক বেকাররাও আছে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পঙ্গুতা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চিন্তার অস্বাভাবিক দৈন্য এই রাজ্যকে এক নিদারুণ ব্যাধির কবলিত করেছে। এই ব্যাধি যদি হলদিয়ায়ও যথারীতি সংক্রামিত হয় তাহলে এই রাজ্যের অধোগতি রোধের আর কোনো অবকাশ থাকবে না। এই রাজ্যের যাঁরা প্রকৃতই মঙ্গলকামনা করেন তাঁরা নিশ্চয়ই হলদিয়াকে দুর্গাপুরের পথে ঠেলে দেবেন না।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল সীমা। সাধারণতঃ সে স্বল্পাহারী কিন্তু এ সময়ে তার খাওয়ার পরিমাণ দেখে সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায়। শুধু তাই নয় তার খাদ্যতালিকা মাত্র দুটো জিনিসেই সীমাবদ্ধ থাকে—চিংড়ি মাছ এবং ডিম। এছাড়া অন্য খাবার সে স্পর্শ করে না এসময়। রেস্তোরায় এদুটির অভাব থাকলে সে অন্য আর একটা খুঁজে নেয়। চিংড়ি মাছ এবং ডিম তার চাই। এ সময়ে এ দুটো জিনিস তার ভাল লাগে কেন তা' সে বুঝতে পারে না। রেস্তোরার বিলটা চুকিয়ে সে একটা বাসে উঠল। প্রায় আধঘন্টা চলার পর ট্রামে চড়ে উলটো রাস্তা ধরল আবার। এটা সতর্কতার লক্ষণ। তাকে যদি কেউ অনুসরণ করে তবে এভাবে তাকে এড়ানো সম্ভব বলেই তার বিশ্বাস। অবশেষে ট্রাম থেকে নেমে সীমা একটা ট্যাক্সি ডেকে তার ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত হ'ল। অনেকক্ষণ ধরে বক্সারের জন্য তার মন কেমন করছিল। কতক্ষণে সে তার গাঢ় বাদামী রঙের মসৃণ চামড়ায় হাত বুলিয়ে আদর করবে সেই কথাই সে ভেবেছে সারা সময়। ব্যাগটা বিছানার ওপর ফেলে দিয়ে সে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সীমার পায়ের আওয়াজ বক্সার পেয়েছে তাই সে প্রস্তুত হয়েই ছিল তাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে। অনেকক্ষণ ধরে তাকে আদর করল সীমা। বক্সারের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, বিস্কুট খাইয়ে, আদরের নাম ধরে ডেকে সে তৃপ্তি পেল। এই জন্তুটা তার কাছে বিশ্বাস, বন্ধুত্ব আর নির্ভরতার প্রতীক। বক্সারের কাছ থেকে এসে সীমা বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল। এতক্ষণে সমস্ত জিনিসটা মনে মনে

ভেবে দেখবার সময় পেল সীমা। না, কোথাও খুঁত নেই তার কাজে। জায়গাটা দেখলেই মনে হবে যে, গুন্ডার দল এসে তাকে কাবু করে টাকাটা করায়ত্ত করেছে। পুলিশ এসে অনুসন্ধান করবে নিশ্চয় কিন্তু কি প্রমাণ তারা পাবে? দারোয়ান হলফ করে বলবে মিসেস মোদীকে সে বেরিয়ে যেতে দেখেছে কিন্তু তাকে দেখেনি। তার অন্তর্ধানে দুটো জিনিসই অবশ্য মনে হবে পুলিশের। হয় সে গুন্ডাদের কবলে রয়েছে কিংবা সে নিজেই টাকাটা সরিয়েছে। চুরি কথাটা কেমন অদ্ভুত বলে মনে হয় সীমার কাছে। বুদ্ধির জোরে সকলেই রোজগার করে তবে এটাকে লোকে চুরি বলবে কেন? প্রথম সীমা কবে চুরি করেছিল সেটা তার স্পষ্ট মনে আছে। তখন সে স্কুলে পড়ে। স্কুলের একজন মেয়ের ব্যাগ থেকে মাইনের টাকাটা সে বেমালুম সরিয়ে নিয়েছিল। মেয়েটা আকুল হয়ে গিয়েছিল টাকার শোকে। অস্থির হয়ে খুঁজেছিল চতুর্দিকে যদি টাকাটা পাওয়া যায়। সীমার বেশ মজা লেগেছিল সে সময়. খুব আনন্দ পেয়েছিল সে। মাইনের টাকাটা নিয়ে কি করেছিল এখন তা আর মনে নেই তবে মনে বেশ জোর এসেছিল টাকাটা পাওয়াতে, বিষাদভরা থিতিয়ে যাওয়া মনে সাড়া জেগেছিল এটা সে এখনও ভুলে যায়নি।

প্রথমবার একটু ভয় হয়েছিল, বুকের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক কাঁপুনি জেগেছিল বলে মনে পড়ল সীমার। তারপরে আর কোন ঘটনাই তাকে এধরণের বিপদে ফেলতে পারে নি। উপরন্তু এতে একটা উত্তেজনা সে উপভোগ করে, জয়লাভের গৌরব অনুভব করে কাজের সাফল্যে। ধরা পড়লে কি হ'তে পারে সে বিষয়ে সীমা চিন্তা করে না। সাধারণতঃ চুরি করে ধরা পড়লে যেভাবে জনসাধারণ তারে শাস্তি দেয় সেটা তার পক্ষে প্রযোজ্য হতে পারে না কারণ সে বাসে-ট্রামে পকেট মারে না কিংবা লোকের বাড়ী সিঁদও দেয় না আর সবচেয়ে বড় কথা সে মেয়ে। অবশ্য স্ত্রীলোক হিসেবে সে পুরুষদের কাছে বিশেষ সুবিধা প্রত্যাশা করে না। আদালতে বিচারের প্রহসন তার কাছে হাস্যকর বলে ঠেকে। সাক্ষীসাবুদ ওলটপালট করে নরকে হয় কন্যা ত প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। অবশ্য প্রহারের স্বাদ সে পেয়েছে, বেশ ভালভাবেই পেয়েছে। ......উত্তর কলকাতার অন্ধকার ঘুপসী একতলা বাড়ীটার কথা মনে পড়ে গেল সীমার। নোনা ওঠা, চওড়া আর বালি ওঠা দেওয়ালগুলো এখনও স্পষ্ট মনে আছে তার। কেমন একটা অদ্ভুত ঠান্ডা আর স্যাঁৎসা গন্ধ বার হ'ত সেগুলো থেকে। মা, মানু কাকা, বাবা, সবাইকেই মনে আছে তার। দেয়ালের গায়ে কুলুঙ্গি, চটা ওঠা মেঝে, শোবার ঘরে কবজা ভাঙ্গা জানলাটা সবই মনে পড়ছে সীমার। কবজা ভাঙ্গা জানালা থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ হ'ত। সেই শব্দে বড় ভয় পেত সীমা। তখন তার বয়স আর কত হবে বোধহয় বছর চারেক। মানু কাকা বাবারই বন্ধু, বেশীর ভাগ সময় তাদের বাড়ীতেই থাকত। বাবা কাজ করতেন কাগজের অফিসে। এক সপ্তাহ দিনে আর এক সপ্তাহ রাতে তাঁকে অফিসে যেতে হত। বাবাকে সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে তার। রোগা ছিপছিপে চেহারা ছিল তার বাবার। মাথায় লম্বা চুলগুলো এখনও যেন স্পষ্ট দেখতে পায় সে। কাশির শব্দটাও ছিল বাবার অদ্ভুত ধরণের। জোর করে যেন সেটা চাপতে চেষ্টা করতেন তিনি। আর অব্যক্ত আর্তনাদের মত বেরিয়ে আসত শত চেষ্টা সত্ত্বেও। বাবার হাঁপানি ছিল। রাতে মাঝে মাঝে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যেত। কবজা ভাঙ্গা জানলার শব্দ আর বাবার কাশির আওয়াজ, দুটো প্রায় একসঙ্গে হ'ত। এর সঙ্গে অবশ্য মায়ের বকুনিও ছিল। কাশির শব্দে মার ঘুম ভেঙ্গে যেত; ঘুম ভেঙ্গে গেলে বাবাকে অনেক কথা শুনতে হ'ত এমন কি গালাগাল পর্যন্ত। বড় মায়া লাগত সীমার। ছোট হাত দুটো সে বাবার বুকে বুলিয়ে দিত যাতে বাবার কাশি থেমে যায়, মার কাছ থেকে আর বকুনি শুনতে না হয় বাবার। কিন্তু তাতে কিছু হ'ত না, বাবার কাশি থামতে বেশ সময় লাগত। বাবার কাছে কিছু চাইত না সীমা। কারণ বাবার পয়সা তার জন্য খরচ হলে মায়ের পয়সা কম পড়বে। টাকাপয়সার জন্য বাবাকে মা কষ্ট দিত আর অপমান করত নানাভাবে। হাঁপানি আর অর্থকষ্টে বাবার শরীর ক্রমশঃ ভেঙ্গে যাচ্ছিল। চা খেতে বাবা ভালবাসতেন কিন্তু সেদিক দিয়েও তাঁর নিস্তার ছিল না। সে সময়ে সীমার মনে হ'ত, যদি কল দিয়ে জল না বেরিয়ে চা আসত তবে নিশ্চয়ই বাবা মায়ের কাছে চা চাইত না। বাবার মাথার কাছে রামকৃষ্ণদেবের একটা ছবি ছিল। সীমার মনে আছে সেদিকে তাকিয়ে বাবা অনেকক্ষণ বসে থাকতেন। আর বাইরে যাবার সময় ছবিতে প্রণাম করে বার হতেন। সীমা ঠাকুরকে অনেকবার বাবার হাঁপানি সারিয়ে দিতে আর কলের জলের বদলে চা দিতে বলেছিল। কিন্তু তা হয় নি। রামকৃষ্ণদেবের ছবিটা হাসি হাসি মুখ নিয়ে শুধু তাকিয়ে থাকত তার দিকে।

মাথাটা হঠাৎ ঝিম ঝিম করে উঠল সীমার। ছোটবেলার কথা ভাবলেই তার এরকম হয়। তাই সে পারতপক্ষে সব ভাবনা মন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, বাধা দেয় প্রাণপণে। আবার সে স্নান করবে। স্নান করা তার পক্ষে একটা অত্যাবশ্যকীয় অনুষ্ঠান। খুব মন দিয়ে সে এই কাজটি করে থাকে। বাথরুমে যাবার আগে ব্যাগ খুলে সীমা নোটের বান্ডিলগুলো সাজিয়ে রাখল বিছানার ওপর একের পর এক। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সে সেই দিকে। আশ্চর্য হ'ল সীমা এই কাগজের টুকরোগুলোর ক্ষমতা দেখে। মানুষের কত স্বপ্ন, কত আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে আছে একে কেন্দ্র করে। সুখদুঃখের অনুভূতি কেন এর দুই দিকে মাথান রয়েছে। কিছুক্ষণ পরে বান্ডিলগুলো তুলে ফেলল তার আলমারীর মধ্যে। কালই ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কে, বিভিন্ন নামে সে টাকা জমা রাখে, এতে তার সুবিধে হয়। এতক্ষণে সে বাথরুমে যাবার সময় পেল। বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের তলায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সীমা। এধরণের কাজের পর সে কাপড়জামা পরা অবস্থায় জল ঢালে। তার মনে হয় পরা কাপড়জামাগুলো ধুয়ে ফেলা উচিত। শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে সে শাড়ীটা খুলে ফেলল ধীরে ধীরে। তারপর এক এক করে চোলি, ভিতরের ব্রা, পেটিকোট ফেলে দিয়ে স্থিরনিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জলের ধারার তলায়। ফিনকি দিয়ে শাওয়ারের জল যখন তার মাথায় পড়ে তখন সে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পায়, সেটা যেন তার সর্বাঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়ে যায় ধীরে ধীরে। জলের ধারা তার শরীরের ওপর দিকে এঁকেবেঁকে যাচ্ছে, সীমা তাকিয়ে দেখছে সেদিকে তন্ময় হয়ে। স্নানে তার শুধু শরীর আর স্নায়ু স্নিগ্ধ হয় না, এটা তাকে যেন ক্লেদমুক্ত করে, নবজীবন দেয়। পিংক রঙের ভিজে শাড়ী আর চোলিটার দিকে তাকিয়ে রইল সে, মিসেস মোদীর এইখানেই ইতি। বিসর্জনের পর প্রতিমার মত এখন ওটা শুধু মাটি, খড় আর আবর্জনার স্তূপ মাত্র। মিসেস মোদী এখন অদৃশ্য, নিশ্চিহ্ন, লুপ্ত। এবার আর ওবিষয়ে কিছু ভাববে না। ওটা একটা উল্টে যাওয়া বইয়ের পাতার মত, আর পড়বার বা দেখবার প্রয়োজন হবে না তার। কোলারিজ কোম্পানীর কথাও সে আর ভাববে না, পিছনে ফেলে আসা দিনগুলি সম্বন্ধে তার কোন মমতা নেই, সম্পূর্ণ উদাসীন সে। মন থেকে জোর করে সরিয়ে দেবে সে, না হ'লে তার কর্মক্ষমতা ব্যাহত হয়। অকারণে বিষাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে সীমা।

বড় বাথ টাওয়েল দিয়ে সে সর্বাঙ্গ মুছে দিল সযত্নে তারপর টাওয়েল জড়িয়ে ঘরে গিয়ে নতুন জামাকাপড় পরে নিল। পিংক রঙের শাড়ী আর চোলি এখন ঝাড়ুদারের প্রাপ্য। ড্রেসিং টেবিলের সামনে প্রসাধন করতে করতে নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করল সীমা, অনেক পরিবর্তন এসেছে। তাকে এখন সুন্দরী আখ্যা দেওয়া যায় স্বচ্ছন্দে। চোখ, মুখ, তার দেহের গঠন একেবারে নিখুঁত। চোখের ভাষা এবং মুখের ভাব—সে পলকে পলকে পাল্টাতে পারে। শান্ত ভালমানুষের মত কিংবা নিরীহ অবোধের ভঙ্গীটা সে সহজে নকল করতে পারে। দেখলে মনে হবে সহজ, সরল, নিষ্পাপ মেয়েটি। কথাটা ভাবতেই হেসে ফেলল সীমা। তার পরবর্তী কাজ সম্বন্ধে একটু ভেবে নিল সে। প্রথমেই টাকা জমা দেবে অন্য একটা ব্যাঙ্কে। কলকাতার অলিগলিতে এখন ব্যাংক, নগদ টাকা নিতে কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু এবার কি নাম নেবে? তার আসল নামটা বেশীর ভাগ সময়ই মনে পড়ে না। এখন একমাত্র তার বুড়ী পিসিমা ছাড়া আর কেউ সে নামটা জানে কিনা সন্দেহ। এই নিয়ে সে ছ'বার নাম পাল্টাল। কোন ক্ষতি হয় না তাতে। প্রথমতঃ সে কারও সঙ্গে মেশে না। দ্বিতীয়তঃ তার বন্ধু বলতে কেউ নেই, স্কুলজীবনেই তার শেষ হয়েছে। তাই বা কেন, তার স্কুলেই বা বন্ধু কে ছিল? কেউ নয়। না, ছোটবেলার কথা আর সে ভাববে না। এবার তার নাম হবে শ্যামলী সেন। নিজে আর একবার

[illegible] করল সীমা। এরপর শ্যামলী সেনের [illegible] ভাল চাকরীর দরকার। কাজের [illegible]পনগুলো কাল থেকেই পড়তে হবে। [illegible]টাও পাল্টাতে হবে সেই সঙ্গে। [illegible]শিতে নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে [illegible]ার মিষ্টি হাসল সীমা।

পরের দিন টাকাটা নতুন অ্যাকাউন্টে [illegible] দিয়ে নতুন এক প্রস্থ পোষাক কিনে [illegible] সীমা। তারপর চৌরঙ্গীর একটা বিউটি [illegible]লে গিয়ে তার চুলটা ছোট করে নিল। [illegible]র আর ববড় নয়, ঘাড়ের চুলগুলো [illegible]ট করে ছেটে ফেলা হল। মুখের চেহারা [illegible]র সম্পূর্ণ পালটে গেল এই প্রসাধনের [illegible]ল। এবার তার বিশ্রাম চাই সর্বতোভাবে-- [illegible]নসিক এবং শারীরিক। পুরী হোটেলে [illegible]র কন্ডিশনড করা একটা ঘর বুক করল [illegible]মলী সেনের নামে। সমুদ্র তার ভাল [illegible]গে। নিষ্ফলে ভেঙ্গে পড়া ঢেউগুলো আবার [illegible] যায় সমুদ্রের বুকে। এর শেষ নেই, [illegible] নেই। সমুদ্রকে কেউ জয় করতে পারে না, [illegible]কলেই পরাজিত তার কাছে। তুচ্ছ মানুষ [illegible]র তার তৈরী জলযান সমুদ্রের কাছে তুচ্ছ, [illegible] নগণ্য! সমুদ্রের বলিষ্ঠতাকে ভালবাসে [illegible]ীমা, তার মনে হয় সে যেন সমুদ্রেরই একটা [illegible]নেতম অংশ। তাকে আছড়ে ভাঙ্গলেও [illegible]স ভাংগবে না, তার সত্তা হারিয়ে যাবে না, [illegible]রবার ফিরে আসবে তার প্রচন্ড মূর্তি [illegible]নয়ে। নিষ্ফলতায় চূর্ণ হয়ে যাবে হয়ত [illegible]কন্তু তার গতি রুদ্ধ হবে না কোনমতে।

প্রায় দশদিন সে পুরীতে এসেছে। খাওয়া আর বেড়ান ছাড়া অন্য কোন কাজই নেই তার। সেই কারণে এবার যেন একটু একঘেয়ে লাগছে। মনে পড়ে যাচ্ছে কলকাতার ঘটনাগুলো। কি নিয়ে দিনগুলো কাটাবে তাই চিন্তা হচ্ছে সীমার। পারতপক্ষে সে আলাপ করতে কারও সংগে চায় না। ডাইনিং হলে সীমা খেতে যায় না। যতখানি সম্ভব সে নির্জনেই থাকে, হয় নিজের রুমে নয় নির্জন সমুদ্রতীরে। সমুদ্রের শব্দ তার স্নায়ু আর মনকে শান্ত করে। একমনে সীমা এই গর্জনটা শোনে সর্বদা।

মাফ করবেন। অপরিচিত এক যুবক।

আমায় বলছেন? তাকাল সীমা। বুকের মধ্যে তার একটা অজানা আতঙ্কের সাড়া জাগল।

হ্যাঁ, আপনাকে প্রায়ই একলা বেড়াতে দেখি, আপনি কি একলা এসেছেন?

হ্যাঁ, একলাই এসেছি।

কিছু মনে করবেন না অহেতুক কৌতূহলের জন্যে। একজন আত্মীয়া আছে আমার অবিকল আপনার মত দেখতে। তাই যেচে আলাপ করার অসৌজন্যতা ক্ষমা করবেন।

আপনি এখানে কতদিন আছেন, জিজ্ঞাসা করল সীমা।

আমি দিন তিনেক এসেছি ব্যবসার খাতিরে।

ব্যবসা?

হ্যাঁ, এখানের তৈরী রূপোর জিনিস কিনে আমি অন্যান্য শহরে বিক্রী করি তাছাড়া আমার অন্যান্য ব্যবসাও আছে; আমি জুয়েলার, কলকাতায় আমার জুয়েলারীর ব্যবসাও আছে।

সীমা একবার তাকাল তার দিকে। পুলিশের লোক বলেই সন্দেহ হল তার। কিন্তু সে প্রস্তুত রয়েছেই। তার সন্ধান যে পুলিশ করবে এটা আশ্চর্যের কথা নয়। যেচে আলাপ করার কারণটাও তার মতকে দৃঢ়তর করল। পুলিশের লোক হলেও সে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে না। তাহলে তার মারাত্মক ভুল হবে। সাবধান হল সীমা। অন্য কিছু নয়, এত লোকের সামনে অপদস্থ হতে সে নারাজ। সমুদ্রের ধার ছেড়ে শহরের মধ্যে যেতে লাগল এবার। পুরী ছোট শহর। শুধু তাই নয় ধোঁয়া-ধুলো আর চিৎকারের জন্যে সীমা প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। এবার সে ফিরে যাওয়ার আয়োজন শুরু করে দিল। সেদিন সকালে একটা সংবাদের ওপর নজর পড়ল তার। লেখাটা মনযোগ দিয়ে পড়ল সে: "মোদী এ্যান্ড সন্সের অফিসে একজন লেডী অ্যাসিস্টেন্ট সমেত সাতাশ হাজার টাকা অদৃশ্য হয়েছে। বেলা পাঁচটা আন্দাজ মিসেস মোদী অফিসে আসেন। তার মিনিট পনের পরে দরোয়ান তাঁকে চলে যেতে দেখে। অবশ্য মিসেস মোদী একথা অস্বীকার করেন। তিনি প্রায় আধ ঘন্টা পরে তার স্বামীর সংগেই গিয়েছিলেন বলে জানান। ক্যাশ ডিপার্টমেন্টে ধস্তাধস্তির কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ লেডী অ্যাসিস্টান্ট মিস সীমা সান্যালের খোঁজ করছে। এ পর্যন্ত কেউ ধরা পড়ে নি।"

যা আন্দাজ করেছিল সীমা তাই হয়েছে। অবশ্য পুলিশ তাকে ধরলেও তার লড়বার রাস্তা সে রেখে এসেছে। সে জন্যে কোন চিন্তা নেই তার। তার অদৃশ্য হওয়ার জোরাল কৈফিয়ৎ তৈরীই আছে। পুরীতে সে গা ঢাকা দিতে আসে নি। সে এসেছে একটু বিশ্রাম নিতে। অশান্ত মন আর দুর্বল স্নায়ুকে সে পুনরায় উজ্জীবিত করে কাজে লাগাবে। কিসের পর কি হতে পারে সেটা তার জানা আছে। বিভিন্ন অবস্থায় তার কাজের ধারাটা কি হবে সেটা সে আগেই ঠিক করে রাখে।

শ্যামলী সেন নাম দিয়ে সীমা ক্রস্ অ্যান্ড কেরাওয়ে কোম্পানির বিজ্ঞাপনের উত্তরে দরখাস্ত পেশ করেছিল। সীমা লক্ষ্য করেছে তার আবেদন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হয়। কয়েক জায়গায় অবশ্য তাকে বিফল মনোরথ হতে হয়েছে, কিন্তু চাকরীর ব্যাপারে তার ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলা চলে। ক্রস্ অ্যান্ড ক্যারাওয়ে কোম্পানির ইন্টারভিউ-এর আহ্বানপত্র পেয়ে তাই সে বিস্মিত হয় নি। এটা সে একরকম আশাই করেছিল। শনিবার বেলা দুটোর সময় তার ইন্টারভিউ।

কিছুক্ষণ বসার পর তার ডাক এল। টেবিলের একধারে তিনজন বসে আছেন। সীমা তাদের নড্ করে অপর দিকের চেয়ারে বসল।

আপনার নাম?

শ্যামলী সেন। শান্ত দ্বিধাহীন কণ্ঠে উত্তর দিল সীমা।

কোন স্কুল থেকে টাইপ শিখেছেন?

সেন্ট্রাল টেকনিক্যাল।

কত স্পীড?

সত্তর; কোনকালেই তার স্পিড সত্তর নয়।

এর আগে কোথায় কাজ করেছেন?

একটা কোম্পানির নাম করল সীমা।

কখনও নাম শুনি নি। মন্তব্য করলেন একজন।

আপনি কোলারিজ কোম্পানির নাম শুনেছেন? পরিচিত স্বর। সীমার শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। অরুণ বসুই প্রশ্ন করেছে তাকে। সীমা এটা আশা করে নি। তার শরীর যেন অবশ হয়ে এল। তার মাথার ওপর একটা প্রকান্ড ভারী বোঝা কে যেন চাপিয়ে দিয়েছে। অসহ্য একটা যন্ত্রণা হচ্ছে তার। অনেক বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্যে সে পড়েছে। কিন্তু আর যাই হোক জ্ঞান সে কোনদিনই হারায় নি। মনকে শক্ত করল সে। অরুণ বসু তার কি করতে পারে? ধরিয়ে দেবে পুলিশে; এছাড়া তার করার কিছুই

নেই। বড়জোর সকলের সামনে তাকে চোর বলে অভিহিত করতে পারে। তাতেই বা কি এসে যায়। জবাব তার তৈরী আছে। সুতরাং তার ভয় পাবার কি থাকতে পারে? রুমালে ঘর্মাক্ত মুখটা মুছে সীমা জবাব দিল।

হ্যাঁ কোলরিজ কোম্পানিতে আমি কাজ করেছি।

ক'বছর আগে। অন্যলোকের গলা।

চার বছর। সীমা এবার লোকগুলোর দিকে তাকাল। অরুণ বসু তার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখে তার কোন ভাবের প্রকাশ নেই; ডাক্তার তার রোগীকে লক্ষ্য করছে রোগ নির্ণয়ের আশায়। সেই অরুণ বসু। কোলরিজ কোম্পানির অরুণ বসু—যে তাকে অনুবীক্ষণের মত তীক্ষ্ন দৃষ্টি দিয়ে বিরক্ত করত দিনের পর দিন। কিন্তু এখানে কেমন করে এল সে। এ কোম্পানির সঙ্গে তার সম্পর্ক কিসের? সীমাকে আর একটা প্রশ্ন করা হয়েছে, সেটা সে ঠিক শুনতে পায়নি। অরুণ বসু তাকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছে। বেগ ইওর পার্ডন, বলল সীমা।

আমাদের এখানে কাজ নিলে বাইরে যেতে হবে মাঝে মাঝে, বললেন একজন প্রশ্নকর্তা।

তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।

সীমা আশা করে নি এত তাড়াতাড়ি সে নিস্কৃতি পাবে। প্রশ্নের ধারা পালটে যাবে। বাইরে বেরিয়ে সে হাফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু এখনও তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। নিজেরই আশ্চর্য লাগছে সীমার। সাতাশ হাজার টাকা ব্যাগে ভরে নেবার সময়ও তার এতখানি দুর্বলতা আসে নি। নিজের অক্ষমতায় বিরক্ত হল সে। সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে সে একতলায় গিয়ে পৌঁছল। গেটের বাইরে যাবার মুখে অরুণ বসুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মিস সেন—অরুণ বসু এগিয়ে এল তার দিকে।

আমায় বলছেন? সীমা পাশ কাটাতে পারল না।

হ্যাঁ, এবার আমার ভুল হয় নি, আপনিই মিস শ্যামলী সেন ত?

সীমা তার মুখের দিকে তাকাল, সেখানে ব্যাঙ্গের কোন চিহ্ন নেই। সীমা কোন উত্তর দিল না, শুধু মাথাটা সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে নাড়ল একবার।

গাড়ীতে উঠুন। অরুণ বসুর স্বরটা গম্ভীর।

আমি একটা ট্যাক্সি নেব। অস্পষ্ট স্বরে বলল সীমা।

দরকার নেই, আমার গাড়ীতে উঠুন—দরজাটা খুলে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অরুণ বসু। আশে-পাশে মানুষের ভিড়। অনেকেই দাঁড়াল নাটকীয় পরিস্থিতির আশায়। গাড়ীতে উঠে পড়ল সীমা। অরুণ বসু তার পাশে বসে গাড়ীটা চালিয়ে দিল।

চাকরীটা আপনার হয়েছে, বলল অরুণ বসু, কিন্তু কতদিন করবেন এটা।

কোন উত্তর দিতে পারছে না সীমা। ঠিক এ অবস্থায় যে তাকে পড়তে হবে এটা তার স্বপ্নাতীত।

আমায় এখানে দেখে আশ্চর্য হয়েছেন বোধহয়? আমাদের গ্রুপের আর একটা ফার্ম এটা। সীমা এবার তাকাল অরুণের দিকে। পাশ থেকে শক্ত চোয়ালের সঙ্গে ভাবলেশহীন মুখটা দেখতে পেল এতক্ষণে।

আপনাকে কোথায় পৌঁছাব?

এবার তার মনের মত প্রশ্ন করেছে অরুণ, তাই সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল।

এখানেই ছেড়ে দিন—। নিস্কৃতি পেলে বাঁচে সীমা।

আপনি অযথা ভয় পাচ্ছেন আমাকে। ট্রাফিক সিগন্যালের রক্তচক্ষুর দিকে তাকিয়ে বলল অরুণ বসু।

কেন, ভয় কিসের? অরুণের দিকে তাকাল সীমা। তার কথায় একটা তাচ্ছিল্যের সুর রয়েছে।

সেটা আপনিই জানেন, তবে একটা কথা আপনাকে আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই—।

বলুন—সীমা সোজাসুজি তার দিকে তাকাল।

আমায় বন্ধু বলে মেনে নিতে পারেন। আস্তে কথাটা উচ্চারণ করল অরুণ। তারপর গিয়ারটা চেঞ্জ করে বলল—আমি আপনাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছি না, এটা বিশ্বাস করা কি আপনার পক্ষে কঠিন।

কিন্তু আমাকে সাহায্যই বা আপনি করবেন কেন? সীমার প্রশ্নটা তীক্ষ্ন কিন্তু সোজা।

আমি সাহায্যের কথা বলিনি, আমি বলছি আমাকে শত্রু বলে ভাবার কোন কারণ নেই। গাড়ীটা ময়দানের পাশ দিয়ে বেগে চালিয়ে দিল অরুণ।

কোথায় যাচ্ছেন? হঠাৎ ভয় পেল সীমা।

সাউথ ক্যালকাটায়—আপনি ত ঐদিকেই থাকেন?

হ্যাঁ, কিন্তু আমায় এখানে ছেড়ে দিন চলবে।

আপনার চলবে, কিন্তু আমার চলবে না।

তার মানে? সোজা হয়ে বসল সীমা।

তার মানে, এখানে নো পার্কিং জোন, থামলে আমি বিপদে পড়ব।

অরুণের মুখে হাসি দেখতে পেল সীমা।

কিন্তু আমায় এভাবে গাড়ীতে তুললেন কেন বুঝতে পারছি না।

না তুললে বিপদে পড়তেন।

কি বিপদ? বুকটা ধড়াস করে উঠল সীমার।

ট্রাম বাস বা ট্যাক্সি কিছুই পেতেন না।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল সীমার।

আপনি কবে জয়েন করছেন? না, ভয় এড়িয়ে যাবেন না, চাকরীটা ভাল, ছাড়বেন না, ছাড়লে আপনারই ক্ষতি হবে।

কেন, ক্ষতি কিসের?

সে কথাটা এখন স্পষ্টভাবে বলতে পারব না, তবে আপনাকে অনুরোধ করব চাকরীটা নিতে।

একটু চুপ করে অরুণ আবার বলে, আমার ব্যবহারে আপনি হয়ত খুব আশ্চর্য হয়েছেন, তবে একটা কথা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া ভাল যে চাকরীতে জয়েন না করলে আপনি বিপদে পড়বেন।

আপনি কি আমায় ভয় দেখাচ্ছেন?

বাই নো মিনস্; আপনাকে ভয় দেখিয়ে লাভ কি? গাড়ীটা ফুটের বাঁদিক ঘেঁসে থামাল অরুণ, তারপর বলল—এবার নামুন।

কাঠের পুতুলের মত সীমা নেমে গেল।

আমার কথাটা মনে রাখবেন। কথাটা বলে অরুণ এগিয়ে গেল তার গাড়ী নিয়ে।

কয়েক পা এগিয়ে সীমা দাঁড়িয়ে পড়ল থমকে। এতক্ষণ যেন সে স্বপ্ন দেখছিল। কোলরিজ কোম্পানির অরুণ বসু তাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে এতদূর পৌঁছে দিয়ে গেল তাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ না করে। এটা তার বোধগম্য হচ্ছে না কোনমতেই। অবিশ্বাস্য লাগছে এই ঘটনাকে। সীমা ফ্ল্যাটে উপস্থিত হল স্বপ্নাবিষ্টের মত। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সে ভাবতে বসল তার ভবিষ্যতের কর্মপন্থা সম্বন্ধে।

প্রথম কথা হল সে নতুন অফিসে জয়েন করবে কিনা? যদি সেখানে কাজটা সে নেয় তাহলে দিবারাত্র তাকে অরুণ বসুর আওতার থেকে তার স্থির দৃষ্টির তলায় নিজ্জীবের মত দিন কাটাতে হবে। কিন্তু তাকে এড়ানোই বা যাবে কিভাবে? লোকটা গোয়েন্দার মত সন্ধানী। ইতিমধ্যে তার বাসস্থান যে দক্ষিণ কলকাতায়, তাও জেনে ফেলেছে। অবশ্য ফ্ল্যাট পালটাতে তার বেশী সময় লাগবে না। সেটা বড় সমস্যা নয়। অরুণ বসু তাকে সাবধান করেছে কেন এটা বুঝতে তার অসুবিধে হচ্ছে। তার কাছে সব থেকে বড় হেঁয়ালী হল অরুণ বসুর, এই চাকরী করার জন্যে অনুরোধ। এতে অরুণ বসুর কি স্বার্থ থাকতে পারে তা ভেবে কোন কিনারা করতে পারল না সীমা।

(ক্রমশঃ

জলসা

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বর্ধিত

গত ১লা আগষ্ট রবীন্দ্র সরোবর প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধিকা শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মধুবনী সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে সম্বর্ধনা জানানো হোলো। গুণী সম্বর্ধনা এই সংস্থার বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবের অনুষ্ঠান তালিকার প্রধান অঙ্গ। এবারের সম্বর্ধিতা শিল্পী হলেন শ্রীমতী কণিকা।

শিল্পীকে আশীর্বাদ জানিয়ে সে দিনের সভাপতি ডঃ রমা চৌধুরী বলেন আনন্দ থেকেই জগতের প্রকাশ আর এই আনন্দেরই এক ভাবঘন মধুর রূপ হোলো সঙ্গীত। কবিগুরু তাঁর ধ্যানে কল্পনায় মুহূর্তের জন্যও এই আনন্দের স্বর্গলোক থেকে বিচ্যুত হন নি। কিভিন্ন ভাবদ্যোতী তাঁর অন্তহীন সঙ্গীতগুচ্ছ এই গগনচারী কল্পনারই এক আশ্চর্য প্রকাশ। আমাদের একান্ত স্নেহের পাত্রী কণিকা জীবনব্রতের মত এই সঙ্গীতকে গ্রহণ করে তাঁর কণ্ঠ ও হৃদয়মাধুর্যে এর গহন-গভীর বাণীকে শ্রোতৃচিত্তে পেঁৗছে দিয়েছেন। তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোটা আমাদের পক্ষে একটা পরম আনন্দের কাজ ও দায়িত্ব। পরমা জননীর কাছে প্রার্থনা করি কণিকা দীর্ঘজীবী হয়ে কবির গানে গানে সারা দেশ ভরিয়ে রসিকসমাজের অনাবিল আনন্দের উৎস হয়ে উঠুক।—এরপর ডঃ রমা চৌধুরী এই সংস্থাপ্রদত্ত পুষ্পস্তবক, শাড়ী, সংগীতগ্রন্থ ও মানপত্র শিল্পীর হস্তে অর্পণ করেন। মানপত্র পাঠ করলেন সভাপতি রণজিৎ সেন। শিল্পীকে অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জানান জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও অখিল নিয়োগী। শিল্পী অসুস্থ ছিলেন বলে স্ব-কণ্ঠে পরিবেশিত গানের ডালি ভরে দিতে পারেন নি। স্ব-লিখিত একটি ভাষণও অ-পঠিত থেকে গেল তাঁর বিনম্র-স্বভাবের স্বাভাবিক কুণ্ঠার কারণে।

অ-পঠিত সেই ভাষণ তাঁর গানের চেয়ে কিছু কম মধুর নয় বলেই তার কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হোলো—'আজকের এই মুহূর্তে একটি মহীরুহের মত প্রতিভা-দীপ্ত ব্যক্তিত্বের স্মৃতি মন উচ্চারণ করছে। জীবনের পরম সত্যের মত সেই মানুষের সান্নিধ্য নিবিড় স্নেহদৃষ্টির আশীর্বাদের ছায়ায় ধন্য হয়ে আছে।...গুরুদেব বলতেন 'গানের একটা কথা থাকা চাই বইকি। এমনই একটা কথা যা সুরে লীলাময় হয়ে প্রাণের মর্মে এসে লাগে।'

কি কথায়, কি কবিতায়, কি গানে, কি জীবনের প্রতিদিনের স্তরে প্রাণের ভিতর এই প্রাণকেই তিনি মূল্য দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর বাণীর কত বিচিত্র সুর কত রকম ভাব যে প্রাণে বেজেছে তার ত অন্ত নেই। সমুদ্রের সব তরঙ্গেই স্নান করব এমন সাধ্য কোথায়? তাই একটি তরঙ্গকেই বেছে নিয়েছি শুধু—সে তাঁর গান। তাই নিয়েই আজীবনের পূজা সাঙ্গ করব।'

সর্বশেষে সংস্থার পক্ষ হতে শ্রীসন্তোষ ঠাকুর পরিচালিত 'নিবিড় মেঘের ছায়ায়' নৃত্য ও সঙ্গীতালেখ্য মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে সংস্থার শিক্ষার্থীদের উচ্চমানের নৃত্য ও গানের মধ্য দিয়ে।

রবিতীর্থের আষাঢ় সন্ধ্যা

গত ৭ই আগষ্ট সু-খ্যাত সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান রবিতীর্থের পঞ্চবিংশতিতম জন্মদিবস পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রসদন মঞ্চে একক সঙ্গীতের অকৃপণ ধারায় 'আষাঢ় সন্ধ্যা'র পুঞ্জীভূত বেদনাকে মুক্তি দিলেন শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র।

পেঁৗছলাম যখন, গানের পালা তখন অনেকখানিই এগিয়ে গেছে। কিন্তু জমে-ওঠা আসরের রসমাধুর্য অপূর্ব নিবিড়তায় যেন সঞ্চিত হয়ে উঠছিল স্তব্ধ শ্রোতার মুগ্ধ হৃদয়ের আনাচে কানাচে। কখনও 'অশ্রু ভরা বেদনা'র বিষণ্ণ আভাষে, কখনও বা 'আষাঢ় পূর্ণিমা আমা'র মধুর দ্বিধায় প্রশ্ন 'এ কি ভুলে যাওয়া? একি মনে রাখা?'— তারপরই স্মৃতিচারণের আলোয় 'অনেক কথা বলেছিলেম'? এর অন্তরচারী ভাবপরিক্রমার পর হঠাৎ অনুভব করা গেল আষাঢ় সন্ধ্যায় শুধু ভাবুক চিত্ত-ই একা নয়। একাকিনী প্রকৃতির মুখেও রহস্যের ঘোমটা টানা। তাই কবির প্রশ্ন 'তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী?'— মানুষ ও প্রকৃতির মিলনে নীরবতাও যেন মুখর উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে।

গানের পর গান যেন সমুদ্রের ঢেউ-এর মত ভাসিয়ে নিয়ে চলে' কখনও বিলম্বিত লয়ে 'কোথা যে উধাও'-এর উদাস্ত দিগ-দিগন্তে—তারপরই নৃত্যলয়ে 'মম মন উপবনে'র উল্লাস। এমনই নানানচারী আবেগের পথ বেয়ে 'ঝরে বরষায়' —যখন থামল তখন সত্যিই ধরিত্রী বর্ষাপ্লাবিতা., বর্ষণ ও সংগীতের যুগপৎ দোলায় শ্রোতৃচিত্ত আন্দোলিত। সুচিত্রার গায়কী ও অন্তর্গাহী পরিবেশনার সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছুই নেই। সেদিনও আপন স্বজুতায়, বলিষ্ঠতায় তিনি অচলপ্রতিষ্ঠ ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য আর একটি অনুষ্ঠান ছিল শ্রীমতী মিত্রের পরিচালনায় 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে' ও 'হে নিরুপমা'র সমবেত সঙ্গীত। এ অনুষ্ঠান সুসংবদ্ধ এবং বৈচিত্র্য সৃষ্টিকারী। উদ্বোধনী ভাষণে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্র সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত দর্শনের ওপর আলোকপাত করেছেন।

দীনেশ চন্দ'র সেতার সঙ্গতে প্রতিটি গানের রাগের অনুরণন কাব্যমধুর সঙ্গীত পটভূমিকা রচনা করে।

আশ্রমিক-সঙ্ঘ পরিচালিত নৃত্যনাট্যোৎসব

প্রতিবারের মত এবারও শান্তি-নিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রসদন মঞ্চে দীর্ঘ আট দিন-ব্যাপী রবীন্দ্রনৃত্য নাট্যোৎসবের আসর বসে। অনুষ্ঠান তালিকায় ছিল একাধিক নৃত্যনাট্য—'মায়ের খেলা', 'ভানু সিংহের পদাবলী', 'তাসের দেশ', 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা'।

রবীন্দ্রমানসের বিচিত্র গতির বিভিন্ন অধ্যায় নতুন করে আস্বাদ করা ও অতুলনীয়

সংলাপ ও গানের মননশীলতা ও রসানুভূতির মিলন ও তার অপরূপ প্রকাশভঙ্গীকে নতুন করে আস্বাদনের ভূমিকায় এ উৎসবের সার্থকতা অনস্বীকার্য।

কিন্তু পরিবেশনা ও প্রযোজনার ত্রুটি আমাদের প্রত্যাশী চিত্তকে ক্ষুণ্ণ করেছে। 'মায়ার খেলা' অবশ্য কিছুটা রসোত্তীর্ণ শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র ও বনানী ঘোষের গীতাভিনয়ে, কিন্তু সজ্জা পরিকল্পনার ত্রুটি অকল্পনীয় —বিশেষ করে মায়াকুমারীদের আরব্য রজনীর নর্তকীদের মত সাজ।

অন্য নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে 'ভানু সিংহের পদাবলী'তে পূর্ণিমা ঘোষের নৃত্য প্রাণবন্ত। সামগ্রিক বিচারে— নৃত্য, অভিনয়, রূপসজ্জা সব মিলিয়ে একটি অনুষ্ঠানও দর্শকদের খুশী করতে পারে নি। বিশেষ করে পুরুষ চরিত্রের শিল্পীদের নিম্নমানের রূপাভিনয় রসিকচিত্তকে পীড়িত করেছে। তবে সব ত্রুটীর অনেকখানিই ক্ষতিপূরণ ঘটিয়েছে শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে পরিবেশিত 'শ্যামা' ও 'চিত্রাঙ্গদা'র গান। নীলিমা সেন, মায়া সেন ও কমলা বসুও প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য প্রশংসার দাবী রাখেন গোরা সর্বাধিকারী। উত্তীয়ের গানগুলি আশাতীত দক্ষতায় গেয়ে ইনি শুধু অগ্রগতির পরিচয়ই দেন নি দর্শকবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসাও অর্জন করেছেন।

ভারতী রেকর্ড কোম্পানীর রবীন্দ্রার্ঘ্য

ভারতী রেকর্ড কোম্পানী নিবেদিত রেকর্ডগুচ্ছে স্বল্প-পরিসরের মধ্যেও এক পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচয় চিহ্নিত। কবিগুরুর সু-নির্বাচিত সঙ্গীতগুচ্ছ রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রোতাদের অবশ্যই আনন্দ দেবে।

প্রতিষ্ঠান-পরিচালক ও সুগায়ক সমর গুপ্তর কণ্ঠে 'কেন বাজাও কাঁকন' ও 'সারাজীবন দিল আলো' পরিবেশনার আন্তরিকতায় মুগ্ধকারী। শ্রীগুপ্তেরই পরিচালনায় গীত অন্যান্য শিল্পীদের গাওয়া গানগুলি সুশ্রাব্য। শিল্পী এবং তাঁদের গাওয়া গানগুলি যথাক্রমে সাজিয়ে দেওয়া হোলো।

দেবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তোমারি গেহে' এবং 'ওরে আমার', তারক চন্দর 'আজি নির্ভয় নিদ্রিত' ও 'এই ত তোমার আলোকধেনু', সত্যেন কুন্ডুর 'পাগল যে তুই' ও 'যে ছিল আমার' এবং ভূপেন মুখোপাধ্যায়ের 'এরা সুখের লাগি' এবং 'কবে আমি'। এছাড়া দীপক রায়ের ইলেকট্রিক গীটারে বাজানো 'তুমি রবে নীরবে' ও 'আমার কণ্ঠ হতে' বৈচিত্র্যবর্ধক। বিলাস মুখোপাধ্যায়ের 'সুন্দর হৃদিরঞ্জন' এবং 'আমার যদি বেলা' সুশীল মল্লিকের পরিচালনায় সুগীত।

উদ্বোধন-উৎসব

মল্লার মিউজিক সারকেলের উদ্বোধন অনুষ্ঠান কাশিমবাজার হাউসে গত ২৪শে জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ী সান্যাল। সভাপতির ভাষণে শ্রীসান্যাল এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে উদ্যোক্তাদের গুরু দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন। অনুষ্ঠানের শুরু ঊষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের খেয়াল গানে। তাঁর 'পুরিয়া কল্যাণ' রাগের খেয়াল উপভোগ্য। তবলায় ছিলেন অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের শেষ অংশে ছিলেন বলরাম পাঠক। তাঁর ও তাঁর সুযোগ্য পুত্রের 'পূর্বশ্রী' রাগের সেতার শ্রোতাদের আনন্দবর্ধন করে। সঙ্গে তবলায় ছিলেন শ্রীচন্দ্রভানু।

'বাণীবিতান'-এর উৎসব অনুষ্ঠান: সম্প্রতি চারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ)-এর সভাপতিত্বে এক ভাবগম্ভীর ও মনোজ্ঞ পরিবেশের মধ্য দিয়ে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংস্থা 'বাণীবিতান'-এর প্রতিষ্ঠা স্মারকোৎসব এবং ১১০তম রবীন্দ্রজয়ন্তী একযোগে প্রতিপালিত হয়ে গেল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক স্বাগত জ্ঞাপনের পর নতন প্রদীপ প্রজ্জ্বালনে নববর্ষকে আহ্বান জানিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী। অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে দুর্লভ মুখোপাধ্যায় ও সুমিত্র দাসের আবৃত্তি দিয়ে এবং উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত দে ও রেণু ভৌমিক।

কর্মাধ্যক্ষের প্রতিবেদনে নির্মলেন্দু বসু বাঙলা তথা ভারতের অতীত গৌরব এবং তার ত্যাগ-তপস্যা ও মৌলিক চিন্তাধারার কথা উল্লেখ করে নবীন ও প্রবীণের মধ্যে সেতুবন্ধন সম্বন্ধে এক বলিষ্ঠ ও তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। এর পরে 'বঙ্গ সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে আলোচনায় অংশ নেন ডঃ সুধাময় আচার্য, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ উমা রায়। আলোচনান্তে সৌরেন্দ্রনাথ দে ও কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়ের যুগ্ম-পরিচালনায় 'আলোকের বাণী' শীর্ষক একটি দেশাত্মবোধক গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

—চিত্রাঙ্গদা

বি-বি-সি, লন্ডনের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় এইচ-এম-ভি ট্রাঁপিকানা রেডিও পুরস্কার

গত অকটোবর মাসে লন্ডনের বি বি সি বাংলা প্রোগ্রামে আয়োজিত এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রদত্ত তিনটি এইচ-এম-ভি 'ট্রাঁপিকানা' ট্রানজিস্টর রেডিও পুরস্কার হিসাবে ঘোষিত হয়। প্রবন্ধের বিষয় ছিল—'বি-বি-বি'র বাংলা প্রোগ্রামের ভার পেলে আপনি এক সপ্তাহের প্রোগ্রাম কেমন করতেন?'

শত শত শ্রোতা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন, তার মধ্যে নদীয়ার হামিদুল হক, কলকাতার সুশান্ত দত্ত এবং চুঁচুড়ার সমীর দত্ত নির্বাচিত হন।

সম্প্রতি গ্রামোফোন কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে বি বি সি লন্ডনের বাংলা প্রোগ্রামের প্রতিনিধি শ্রীকমল বসুর উপস্থিতিতে গ্রামোফোন কোম্পানীর বিপণন বিভাগীয় কর্তা মিঃ জে পি ভাটনগর বিজয়ীদের পুরস্কারগুলি বিতরণ করেন। কমল বসু সংক্ষিপ্ত ভাষণে বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান।

চিত্রে মিঃ ভাটনগরকে পুরস্কার দিতে দেখা যাচ্ছে।

পরলোকে মঞ্চবিদ সতু সেন

শনিবার, ৭ আগস্ট অকস্মাৎ সংবাদ ওয়া গেল, সতু সেন ঐদিন সকালে লোক ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর স হয়েছিল ৬৯ বছর। তাঁর মরদেহের তি শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবার জন্যে বহু শিল্পী, নাট্যশালাধ্যক্ষ ও নাট্যানুরাগী ত্তর কলকাতার বিভিন্ন রঙ্গালয়ের সামনে য়ে নিয়ে যাওয়ার সময়ে সমবেত হন। ন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় নিমতলা মহাশ্মশানে। মৃত্যুকালে শ্রীসেন তাঁর স্ত্রী, তনটি কন্যা এবং একমাত্র পুত্র পার্থসনকে রেখে গেছেন। আমরা তাঁর রলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি ও শাকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি নাই।

বাঙলা সাধারণ রঙ্গালয়ে সতু সেন একটি ঐতিহাসিক নাম। উনিশ শো তিরিশ সালের শেষাশেষি কিংবা একত্রিশের গোড়ার দিকে কলকাতার নাট্যমোদীরা এই নামটি প্রথম শুনতে পান আমেরিকায় বিপদগ্রস্ত শিশির-সম্প্রদায়ের পরিত্রাতা হিসেবে। 'সীতা' নাটকের সসাজমহলায় (ড্রেস-রিহার্সালে) অসন্তুষ্ট হয়ে আমেরিকায় শিশির-সম্প্রদায়ের উপস্থাপয়িত্রী এলিজাবেথ মারবারী যখন চুক্তি নাকচ করে ঐ অভিনয় ব্যাপার থেকে হাত গুটিয়ে নেন এবং ফলে নিউইয়র্কের বিলাসবহুল বিল্টমোর থিয়েটারে নির্ধারিত অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়, তখন নিউইয়র্ক ল্যাবরেটারী থিয়েটারের তদানীন্তন টেকনিক্যাল ডিরেক্টার সতু সেন নামে বাঙালী ভদ্রলোকটি বিপন্ন শিশিরকুমারের দিকে তাঁর সাহায্য-হস্ত প্রসারিত করেন এবং তাঁরই আপ্রাণ চেষ্টায় অভিনয় না করতে পাওয়ার গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে শিশির-সম্প্রদায় তাঁদের 'সীতা'কে মঞ্চস্থ করবার সুযোগ লাভ করেন 'ভ্যাণ্ডারবিল্ট থিয়েটার'-এ ১৯৩১-এর জানুয়ারীতে। আমেরিকা ত্যাগ করবার সময়ে এ'রা যে আর্থিক বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা থেকেও উদ্ধার করেন এই সতু সেনই।

সতু সেন আমেরিকায় আসলে গিয়েছিলেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষা ও ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের জন্যে। যতদূর জানি, তিনি ওয়েস্টিং হাউস কর্পোরেশনের শিক্ষানবিশ-কর্মী হিসাবে যোগদানও করেছিলেন। এ হচ্ছে ১৯২৫ সালের কথা। এর আগে তিনি কলকাতার রিপন কলেজ থেকে বি, এসসি পাশ করবার পরে বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। কিন্তু মঞ্চনাট্যপ্রয়োগশিল্পের প্রতি তাঁর একটা সহজাত আকর্ষণ থাকায় তিনি শেষ পর্যন্ত ঐ দিকেই ঝুঁকে পড়েন এবং এ সম্পর্কে ব্যবহারিক ও তত্ত্বগত বিদ্যা আহরণ করেন। পিট্স্বার্গ কার্নেগী ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজীতে এবং নিউইয়র্কের ল্যাবরেটারী থিয়েটারে স্ট্যানিস্ল্যাভস্কির প্রয়োগবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন রিচার্ড বোলেস্লাভস্কির কাছে তিনি এই বিশেষ বিষয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পান। পরে এই ল্যাবরেটারী থিয়েটারেই তিনি টেকনিক্যাল ডিরেক্টার হিসেবে নিযুক্ত হন এবং এখানে 'ডন কুইকসোট' প্রভৃতি কয়েকটি নাটক তাঁর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়। এই সময়েই তিনি শিশিরকুমারের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসেন এবং তাঁর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন।

১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারীতে শিশির-সম্প্রদায় কলকাতায় ফিরে আসবার কয়েক মাস পরেই সতু সেনও কলকাতায় এসে হাজির হন। নবনির্মিত রঙমহলের উদ্বোধন হয় ১৯৩১-এর ৮ আগস্ট তারিখে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী লিখিত 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' নাটককে অবলম্বন করে শিশিরকুমারের অধিনায়কত্বে। এতে মঞ্চাধ্যক্ষ (স্টেজ ম্যানেজার) নিযুক্ত হন শ্রীসেন। কলকাতার নাট্যজগতে তিনি তখন সেন সাহেব নামে পরিচিত।

প্রবোধচন্দ্র গুহের আহ্বানে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করবার আশায় শ্রীসেন কিছুদিনের মধ্যেই রঙমহল ত্যাগ করে নাট্যনিকেতনে যোগদান করেন এবং ১৯৩১-এর ১৪ নভেম্বরে প্রথম অভিনীত, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত 'ঝড়ের রাতে' নাটকে তাঁর প্রয়োগনৈপুণ্যের সম্যক পরিচয় প্রদান করেন। এই সময়ে তাঁর মহলা দেবার পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। দেখেছি, তিনি মঞ্চের ওপর খড়ি দিয়ে দাগ কেটে শিল্পীদের গতিপথ এবং অবস্থানের নির্দেশ দিতেন। এ-ছাড়া সংলাপের কোন্ স্থানে কতটুকু সময় থামতে হবে, কোন্ দিকে মুখ রাখতে হবে ইত্যাদি সমস্তই এমন ঘড়ি ধরে নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে শিক্ষা দিতেন যে, এই 'ঝড়ের রাতে'র অভিনয় প্রতিদিনই ঠিক একই সময় নিত (ধরুন, ৩ ঘণ্টা ৪২ মিনিট); কোনোদিনই এক মিনিট বেশী বা কম হত না। ঠিক এই ব্যাপার নাট্যনিকেতনের পরবর্তী নাটক 'শুভযাত্রা'তেও দেখা গিয়েছিল শ্রীসেনের প্রযোজনাগুণে।

এর পরে সতু সেন আবার চলে আসেন রঙমহলে। ১৯৩২-এর জুলাই মাসে জলধর চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'অসবর্ণা' নাটকে কালিকাতাণ্ডবের সঙ্গে । তাঁর

আলোর খেলা যে অভাবনীয় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে, তার তুলনা আজও কোনো নাট্যাভিনয়ে মেলে না। হেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত 'নেচেছে প্রলয় নাচে, হে নটরাজ, তাথৈ তাথৈ' গানটি গাইতেন কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং তাঁর সংগে খাঁড়া হাতে কালিকাতাণ্ডব নাচতেন (কালো) আঙুরবালা এবং এই নাচ-গানকে প্রচণ্ডভাবে উদ্দীপনাময় করে তুলতেন শ্রীসেন মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের বিভিন্ন অংশের আলোকে পর্যায়ক্রমে নিভিয়ে ও জ্বালিয়ে। দর্শকমনে এতে যে কি অসম্ভব প্রতিক্রিয়া হত, তা আজ আর বলে বোঝানো যাবে না।

১৯৩৩-এর গোড়ার দিকে রঙমহল পরিচালনার ভার নেন মিলিতভাবে শিশির মল্লিক, সতু সেন ও যামিনী মিত্র। এই ত্রয়ীর পরিচালনা বাঙলা নাট্যশালায় যুগান্তর আনে বললেও অত্যুক্তি হয় না। পর পর রঙমহলে 'মহানিশা', 'পতিব্রতা', 'কাজরী', 'বাঙলার মেয়ে', 'পথের সাথী' প্রভৃতি নাট্যপ্রযোজনায় এ'রা মিলিতভাবে উচ্চ সাফল্যের পরিচয় দিয়ে নাট্যরসিক দর্শকবৃন্দের অকৃপণ প্রশংসা অর্জন করেন।

প্রথম নাটক মহানিশাতেই সতু সেন প্রবর্তিত ঘূর্ণন মঞ্চ (রিভলভিং স্টেজ) প্রথম ব্যবহৃত হয়। এর আগে কভার-ডিসকভার পদ্ধতিতে দৃশ্যপরিবর্তনে যে-অসুবিধা ও কালক্ষেপ হত, এই রিভলভিং মঞ্চ তা দূর করে নাটকের গতিকে ক্ষিপ্রতর করে তুলল। অবশ্য এই ঘূর্ণন-মঞ্চ দৃশ্যের আয়তনকে দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে বেশ ছোট ক'রে ফেলেছে এবং এই কারণে এতে সামাজিক নাটকের অভিনয় সম্ভব হলেও পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাট্যাভিনয়ের উপস্থাপনা রীতিমত দুঃসাধ্য।

এই সময়ে শ্রীসেন চলচ্চিত্র পরিচালনার দিকেও মনোনিবেশ করেন শিশির মল্লিক দ্বারা উৎসাহিত হয়ে এবং তারই ফলে পপুলার পিকচার্স প্রযোজিত এবং শ্রীসেন পরিচালিত 'মন্ত্রশক্তি' ছবিটি উত্তরা সিনেমায় মুক্তি পায় ১৯৩৫-এর ২১ আগস্ট তারিখে। এর পরে তাঁর পরিচালিত ছবি হচ্ছে : আবর্তন (১৯৩৬), পণ্ডিত মশাই (১৯৩৬), সার্বজনীন বিবাহোৎসব (১৯৩৮), চোখের বালি (১৯৩৮), স্বামী-স্ত্রী (১৯৪০)।

শিশির মল্লিকের সঙ্গে শ্রীসেনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে চিত্রপরিচালনার সংগে সংগে তিনি বিভিন্ন মঞ্চে তাঁর প্রয়োগরীতিও চালিয়ে গেছেন। আলফ্রেড মঞ্চে স্থাপিত নাট্যভারতীতে তিনি একাধিক নাট্যপ্রযোজনার সংগে যুক্ত ছিলেন এবং ১৯৪৪-এর জানুয়ারীতে তিনি রঙমহলে এককভাবে 'রামের সুমতি' পরিচালনা করে অভাবিত সাফল্য অর্জন করেন। ১৯৪৮-এ মিনার্ভাতে প্রবোধ সান্যাল রচিত 'প্রিয়বান্ধবী'র নাট্যরূপ 'স্ত্রী'ও শ্রীসেনের প্রযোজনায় উপস্থাপিত হয়েছিল। তাঁর সর্বশেষ প্রয়োগনৈপুণ্যের পরিচয় বহন করেছিল সলিল মিত্র পরিচালিত স্টার থিয়েটারে 'শ্যামলী' নাটকটি (নিরুপমা দেবীর উপন্যাস থেকে)।

শ্রীসেন ১৯৫৫-তে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের অধ্যাপক ও ১৯৫৮-তে দিল্লীর ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা এবং এশিয়ান থিয়েটার ইনস্টিটিউটের অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্যে আমন্ত্রিত হন

প্রেম ও অপ্রেম / সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা : বিমল ভৌমিক। ফটো : অমৃত

ভয় স্থানেই তাঁর বিদ্যাবত্তার জন্যে
নম্মান অর্জন করেন।
য জীবনে শারীরিক অসুস্থতার
তিনি অবসর যাপন করছিলেন
মানসিক হাসপাতালের প্রাঙ্গনস্থ
ত্রে পার্থ সেনের বাসভবনে।
ংলার নাটমঞ্চ প্রযোজনা, আলোক-
ঘূর্ণমঞ্চ প্রভৃতি বহুবিধ দিক দিয়ে
নর কাছে ঋণী। আর মাত্র কিছুদিন
বাংলার সাধারণ রঙ্গালয় যখন তার
র শতবর্ষপূর্তি উৎসবে মেতে উঠবে,
আগেই তাঁর বিচিত্র কর্মময় জীবনের
ন ঘটায় উৎসব কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই একটি
শূন্যতা অনুভব করবেন।

কটি তথ্যমূলক চিত্র

(১) সুন্দরবনে তুলার চাষ

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল
রবনে বন্য জন্তুদের পাশাপাশি মনুষ্য-
শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে
ই। এবং বাস করবার সঙ্গে সঙ্গেই
সেখানে শুরু করেছিল ধানের চাষ।
ধান তো মাত্র তিন-চার মাসের ব্যাপার।
রে জমি থাকে পতিত। ফলে ওখানকার
ন্দাদের দুরবস্থার সীমা থাকত না।
থা দেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি
গ গবেষণা আরম্ভ করলেন সুন্দরবনের
দ্রোপকূলবর্তী নোনা জমির ওপর কি
ফলানো যায়, যা বাসিন্দাদের দুঃখ
করতে সাহায্য করবে। দেখা গেল,
র চাষ করতে পারলে ফল ভালো হবে।
ষীদের মধ্যে বিলি করা হোল তুলোর
, সার, কীট-পতঙ্গনাশক ওষুধ। তাদের
ঝয়ে দেওয়া হল কিভাবে তুলোর চাষ
তে হয়। শুরু হোল চাষ। ৪৫ থেকে
দিনের মধ্যে তুলো গাছে দেখা গেল
শাদা ফুল এবং ৩-৪ মাসের মধ্যেই
ফেটে বেরুল কম-বেশী এক ইঞ্চি
শগুলা তুলো। চাষীদের মুখে হাসি ধরে
কলকাতা থেকে সাংবাদিকরা গেলেন এই
শ্চর্য পরীক্ষার ফল প্রত্যক্ষ করতে
রাও খুশী। তুলোর চাষের সাফল্য
ন্দরবনের তথা পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক
নিয়াদকে নিশ্চয়ই দৃঢ়তর করতে সাহায্য
রবে।

—এই পরীক্ষামূলক তুলার চাষের তথ্য-
ত্র তুলেছেন 'লুক পার্বালিসিটি'; পরি-
লনা করেছেন সুধীশ মুখোপাধ্যায়। চিত্র-
হণ, সম্পাদনা ও সুরযোজনায় আছেন
থাক্রমে কানাই দে, গোবর্ধন অধিকারী ও
ভ গুহঠাকুরতা। প্রণবেশ চক্রবর্তী লিখিত
চত্রনাট্য অবলম্বন করে তোলা ছবিটি সুন্দর-
নের পরিবেশ, তাতে ধানের চাষ, বছরের
ন্য সময়ে জমির অবস্থা, তুলা চাষের
পযোগিতা, তুলা চাষে সাফল্য প্রভৃতি
ত্যন্ত আকর্ষকভাবে তুলে ধরেছে। শ্রীগুহ-
কুরতার সুর সৃষ্টি ছবিটির আকর্ষণকে
র্ধিত করেছে।

(২) হুইলস অ্যান্ড দি হুইলস(?)

শিক্ষিত ছেলেদের স্বাবলম্বী করবার
চেষ্টায় আসাম রাজ্য সরকার গৌহাটিতে
তাদের মধ্যে কিছু অটো-রিকসা শর্তাধীনে
বিলি করেছেন। বেশ কিছু যুবকের এ
থেকে জীবিকার্জন হচ্ছে। এই ঘটনাকে একটি
বলিষ্ঠ তথ্যচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত
করেছেন পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সম্পা-
দনায় ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত (১৯৬৪) ভূতপূর্ব
ছাত্র দুলাল সাইকিয়া। তিনিই ছবিটির
চিত্রনাট্য লিখেছেন ও সম্পাদনা করেছেন।
নতুন প্রবর্তনের সময়ে গৌহাটির বহু
লোকের, বিশেষ করে মেয়েদের তাতে চাপতে
সঙ্কোচবোধ থেকে শুরু করে গাড়ীর
চালক হিসেবে যুবকদের উৎসাহ এবং ক্রমে
অটো-রিকসার বহুল প্রসার অত্যন্ত চিত্তা-
কর্ষকভাবে ছবিটির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।
জয়ন্ত হাজারিকার অভিনব সুর-সংযোজনা
ছবিটির একটি বিশেষ সম্পদ। সুজিত
সিংহের ক্যামেরার কাজ ভালো।

(৩) আরোহণ

একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে নিয়ে
এক সুখী দম্পতির পাশাপাশি আর একটি

আজকের নায়ক/শমিত ভঞ্জ ও জয়শ্রী রায়। পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত। ফটো : অমৃত

বহু ছেলেমেয়েওলা স্বামী-স্ত্রীর পথ পরিক্রমা শেষে অনেকগুলি ধাপসহ একটি পাথুরে সিঁড়ি পেরিয়ে ওপরে উঠবার মুখোমুখী নিয়ে আসা হয়েছে পরিবার পরিকল্পনামূলক তথ্যচিত্র 'আরোহণ'-এ। অত্যন্ত স্বাভাবিকতার সঙ্গে দুই জোড়া মা-বাপের মানসিকতার বিভিন্নতা লক্ষ্য করবার মতো করে দেখিয়েছেন সম্পাদক পরিচালক দুলাল সাহা।

*

রূপচক্রের 'কোথায় যাবো ?'

আগামী ১৪ই আগষ্ট '৭১ সন্ধ্যা ৭টায় মুক্তঅঙ্গন মঞ্চে রূপচক্র সংস্থা শ্রীমনোজ মিত্রের হাসির নাটক 'কোথায় যাবো ?' পুনরাভিনয় করবে।

মঞ্চাভিনয়

পত্রিকা সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীদের নাট্যাভিনয় : আগামী ১৫ই আগষ্ট সকাল ৯টায় অমৃতবাজার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীরা 'স্টার' থিয়েটারে অভিনয় করবেন নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা' নাটক। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেবেন সমীর মিত্র, প্রবীর সেন, অর্ণব ঘোষ, প্রকাশ ঘোষ, নিশীথ বড়াল, অচ্যুত সিনহা, সত্যেন রায়, কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, অবিনাশ দে, সত্যনারায়ণ নন্দ, দিলীপ দত্ত, জগবন্ধু ভাণ্ডারী, সরোজ মল্লিক, শ্যামল দে, রাণু রায়, ইরা মিত্র, মিস্ পলিন, শিপ্রা চক্রবর্তী ও দিলীপ মৌলিক। নাট্যনির্দেশনায় আছেন দিলীপ মৌলিক। আলোকসম্পাত ও আবহসংগীতের দায়িত্ব নিয়েছেন অমৃত চট্টোপাধ্যায় ও শচীন বসু। নাটানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন 'যুগান্তর' সম্পাদক শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ।

'প্রয়াসী'র নাটক : 'প্রয়াসী' নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা আগামী ১৭ই আগষ্ট সন্ধ্যায় মুক্তঅংগনে 'বাঁচা একটি প্রশ্ন' নাটকটির অভিনয় করবেন। নাটকটি লিখেছেন তপনকুমার ঘোষাল।

'সমকাল'-এর দুটি একাঙ্ক : দক্ষিণ কলকাতার সুপরিচিত নাট্যগোষ্ঠী 'সমকাল'-এর শিল্পীরা কিছুদিন আগে 'মুক্তঅংগনে' দুটি একাংক নাটকের অভিনয় করে নাট্যানুরাগীদের মুগ্ধ করেছেন। নাটক দুটির নাম 'চাঁদনী রাত', 'আমেন'।

'চাঁদনীরাত' নাটকটি লেডী গ্রেগরীর 'রাইজিং অব দি মুন' অবলম্বনে রচিত হয়েছে এবং নাট্যরূপ দিয়েছেন বারীন রায়। প্রধান চরিত্রের অভিনয়ে অমরনাথ মুখোপাধ্যায় অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। মধু বসুর 'বাউল' চরিত্রচিত্রণও হয়েছে মর্মস্পর্শী। তাঁর কণ্ঠের গান দর্শকদের মনকে আপ্লুত করেছে। হিন্দুস্থানী কনেষ্টবলের ভূমিকায় অনন্ত ঘোষ আশ্চর্য সুন্দর অভিনয় করেছেন।

দ্বিতীয় নাটক 'আমেনে'র রচয়িতা হোলেন রমেন লাহিড়ী। প্রথমটির মতো নাটকের প্রযোজনা ততোটা আকর্ষণীয় না হোলেও দু'একটি অভিনয় সত্যি মনে রাখার মতো। এ নাটকের সার্থক দুটি চরিত্রচিত্রণে যাঁদের নাম মনে আসে তাঁরা হোলেন অমরনাথ মুখোপাধ্যায় (এগবার্ট) ও বাসুদেব মুখোপাধ্যায় (ডেভিড)। অন্য কয়েকটি ভূমিকায় রূপ দেন চিন্ময়শংকর, রূপক সেনগুপ্ত এবং পার্বতী মুখোপাধ্যায়।

দুটি নাটকের প্রয়োগ পরিকল্পনায় বলিষ্ঠ শিল্পচিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন অমরনাথ মুখোপাধ্যায়। পিন্টু দত্তের আলোকসম্পাত দুটি নাটকের মেজাজকে পরিস্ফুট করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

চারণ দলের নাটকাভিনয়

চারণদলের প্রযোজনায় আসছে ১৬ আগষ্ট সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় মুক্তঅংগন রংগালয়ে 'মে দিবস' ও 'হিমালয়ের থেকে ভারী' নাটক দুটির পুনরাভিনয় হচ্ছে।

'বৈকালিকে'র আগামী নাট্যপ্রযোজনা

দক্ষিণ কলকাতার নাট্যগোষ্ঠী এবার দিলীপ মৌলিক রচিত 'আলোর প্রহরে' মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'বাজপাখি' নাটক দুটোর মহড়া চালাচ্ছেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে এই একাঙ্ক নাটক দুটি অভিনীত হবে। নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন দিলীপ মৌলিক।

: পালা সংবাদ :

* **'নিউ প্রভাস অপেরা'** এবারের মরশুমে যে কটি পালা নিয়ে যাত্রার আসরে উপস্থিত হবেন তা হোল রমেন লাহিড়ীর 'রাহুমুক্ত রাশিয়া', কমলেশ ব্যানার্জির 'নীচের পৃথিবী' অগ্নিদূতের 'বর্বর সভ্যতা'। শিল্পী-তালিকায় রয়েছেন অভয় হালদার, ননী ভট্ট, রাধারমণ পাল, অনাদি চক্রবর্তী, জয়ন্তকুমার, রাজকুমার, অমূল্য ভট্টাচার্য, মুকুল ঘোষ, সাধন দাশগুপ্ত, কল্যাণী ভট্টাচার্য, প্রতিমা ভট্টাচার্য, অরুণা গোস্বামী, রীতা সেন, পুতুল দাস। আলোকসম্পাতে রয়েছেন অজাতশত্রু।

* **'তরুণ অপেরা'র** শিল্পীরা এবার শম্ভু বাগের 'মহেঞ্জোদারো', অমর ঘোষের 'আমি সুভাষ' ও দিগিন ব্যানার্জির 'দুরন্ত পদ্মা' পালা তিনটি উপহার দেবেন। পালা পরিচালনা করবেন অমর ঘোষ। শ্রেষ্ঠাংশে রয়েছেন শান্তিগোপাল, স্বর্ণালী মজুমদার ও শিব ভট্টাচার্য।

* **নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা'র** নতুন পালা হোল ভৈরব গাঙ্গুলীর 'ভাঙো শিকল ভাঙো'। শিল্পীগোষ্ঠীতে রয়েছেন বিজন ভাওয়াল, বটুবাবু, অজিত সাহা, অঞ্জনকুমার, তারা ভট্টাচার্য, বিভূতি পাল, পাঁচু মুখার্জি, তারা পাল, রূপশ্রী মিত্র, তনুশ্রী ঘোষ, মালতী মণ্ডল, ছবিরাণী।

* **লোকনাট্যের** শিল্পীরা আগামী ২১শে আগষ্ট 'মহাজাতি সদনে' তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী'র পালারূপ পরিবেশন করবেন। কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় রূপ দেবেন ভোলা পাল, শিবদাস ভট্টাচার্য, রাখাল, সুবিমল, রীতা দত্ত, সোনালী গোস্বামী, শশিকলা ও বিজয় মুখার্জি। পালা পরিচালনা করবেন বিজন মুখার্জি।

মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে সমবেত বিদেশী প্রতিনিধি

বিবিধ সংবাদ

মস্কো চলচ্চিত্র উৎসব : ৭ম মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে যোগদানকারী ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের উপমন্ত্রী শ্রীধরমবীর সিংহ বলেন যে, মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবের বিশ্ব-জোড়া মর্যাদা রয়েছে এবং সেজন্যই এবার মস্কো উৎসবে 'একটি নতুন ধরনের ভারতীয় ছবি' আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য দেওয়া হয়। মস্কো থেকে এ পি এন এ খবর দিয়েছে।

মস্কো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অন্যতম পুরস্কারবিজয়ী 'সাগিনা মাহাতো' (শ্রীতপন সিংহ পরিচালিত) ছবিটির প্রদর্শন উপলক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা একথা বলেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিভিন্ন সোভিয়েত ছবির শিল্পগুণের প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'সোভিয়েত চিত্র-নির্মাতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সংযোগের উদ্যোগ আমরা চালিয়ে যাব।' উল্লেখযোগ্য, ইতিমধ্যেই ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের চলচ্চিত্র-পরিচালকরা যুক্তভাবে কয়েকটি ছবি করেছেন।

'সাগিনা মাহাতো' ছবিটির প্রযোজক ও ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য শ্রীহেমেন গাঙ্গুলি মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবের সাফল্য সম্পর্কে 'মস্কো নিউজ'-এর সাম্প্রতিক সংখ্যায় লিখেছেন, 'মস্কো উৎসব, অন্যান্য উৎসব থেকে স্বতন্ত্র। কারণ ছবির বিচারে শুধু ছবির আঙ্গিক নয়, বিষয়বস্তুর ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।' প্রথাগত 'বাজার-চলতি ছায়াছবির' থেকে পৃথক, ভারতীয় চিত্রজগতে 'নতুন ধারার ছবি' সম্পর্কে সোভিয়েত দর্শক ও চিত্র-সমালোচকদের যে আগ্রহ তিনি দেখেছেন, সে সম্পর্কে তিনি আশান্বিত। 'সাগিনা মাহাতো' ছবিটিতে শ্রমিক-আন্দোলনের কথা আছে। 'প্রাভদা' পত্রিকাতে এই ছবিটি সম্পর্কে যে পর্যালোচনা বের হয়, তা বিশেষভাবে তিনি উল্লেখ করেন। মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবের 'বিরাট সাফল্য' সম্পর্কে এ-পি-এন'এর সংবাদদাতার কাছে শ্রীগাঙ্গুলি বলেন, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার বিরাটত্বের দিক থেকে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের দিক থেকে মস্কো উৎসবটি অসাধারণ।'

মস্কোয় ৭ম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ১৯ জুলাই-এ শুরু হয়ে ২ আগস্ট শেষ হয়।

২ আগস্ট ক্রেমলিনে অনুষ্ঠিত সমাপ্তি উৎসবে সপ্তম মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবের জুরীর চেয়ারম্যান গ্রিগরী কুজিনৎসেভ ঘোষণা করেন উৎসবের নিম্নলিখিত ফলাফলঃ

(১) কানেটো শিন্দো পরিচালিত 'লিভ টু ডে, ডাই টু মরো' (জাপানী চিত্র)—শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসেবে স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত।

(২) দেমিয়ানো দামিয়ানি পরিচালিত 'কনফেসন্স অব এ পুলিশ কমিশনার টু এ পাবলিক প্রসিকিউটার' (ইতালীয় চিত্র) ও (৩) যুরী ইলিয়েঙ্কো পরিচালিত 'এ হোয়াইট বার্ড উইথ এ হোয়াইট মার্কিং' (সোভিয়েত চিত্র)।

সোভিয়েট-আফ্রো-এশিয়ান সলিডারিটি কমিটি সৃষ্ট পুরস্কারটি পেয়েছে ভারতীয় চিত্র 'সাগিনা মাহাতো।'

পোলিশ পরিচালক আন্দ্রে ওয়াইদা সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচালক বিবেচিত হয়েছেন।

অহীন্দ্র চৌধুরীর ৭৬তম জন্মদিবস

"অভিনয়"-পত্রিকার পরিচালক গোষ্ঠী নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর ৭৬তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন করলেন তাঁদের দপ্তরে গেল শনিবার, ৭ আগস্ট সন্ধ্যায়। নাট্যকার মন্মথ রায়ের পৌরোহিত্যে শ্রীচৌধুরীকে সংবর্ধিত করা হল পত্রিকার তরফ থেকে মাল্যচন্দন বিভূষিত করে এবং একটি কবিতাবদ্ধ মানপত্র দ্বারা। অপরাপর বহু সংস্থাই এর সামিল হয়েছিলেন। শ্রীচৌধুরীর দীর্ঘ সুস্থ জীবন কামনা করে বক্তৃতা দেন সভাপতি শ্রীরায়, নাট্যকার রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, ডঃ অজিত ঘোষ, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, শিশিরকুমার বসু প্রভৃতি। সভায় টেপ রেকর্ডে শ্রীচৌধুরীর 'বিল্বমঙ্গল' থেকে আবৃত্তি এবং তিরিশ বছর আগে গ্রামোফোন রেকর্ডে 'আলমগীর' থেকে রাজসিংহের ভূমিকাভিনয়ের অংশ বাজিয়ে শোনানো হয়। পরিশেষে সম্বর্ধনার উত্তরে ভাষণ দান প্রসঙ্গে শ্রীচৌধুরী হেনরী আর্ভিং-এর আমেরিকা যাত্রার সময়ে জাহাজে এলেন টেরীর সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গ এবং তাঁর মহাপ্রয়াণের দৃশ্য বর্ণনা করে সকল ব্যাপারেই ঈশ্বরের অমোঘ শক্তির কথা ব্যক্ত করেন।

তরুণ মার্কিনীদের তৈরী ক্ষুদ্র ছবির উৎসব

গেল ৬ থেকে ১৭ আগস্ট (১৫ আগস্ট বাদে)— এগারো দিন ধরে কেশব সেন স্ট্রীটস্থ আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেন্টারে আমেরিকার কলেজ ছাত্র, স্কুল ছাত্র এবং কিছু শিক্ষক-ছাত্র অন্যান্য ব্যক্তির মিলিতভাবে তৈরী ছোট ছোট চলচ্চিত্রের একটি উৎসব চালু হয়েছে। এই কদিনে কমবেশী প্রায় ১০০ খানি ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন কর্তৃপক্ষ। ছবিগুলি সবচেয়ে কম এক মিনিট থেকে শুরু করে নব্বই মিনিট কাল স্থায়ী। এদের মধ্যে আছে কার্টুন, তথ্যমূলক, পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ও নাট্যধর্মী ছবি। বেশীর ভাগই রঙীন।

সিঙ্গাপুরে আয়োজিত এশিয়ান স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় যুগ্ম-বিজয়ীর পুরস্কার হাতে ভারতীয় স্কুল ফুটবল দলের খেলোয়াড়বৃন্দ।

দর্শক

ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দল

১৯৭১ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে ভারতীয় বনাম মাইনর কাউন্টি দলের তিনদিনব্যাপী খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। বৃষ্টির জন্যে প্রথমদিনে খেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় দিনে মাইনর কাউন্টি দল ৫ উইকেটে ২০৩ রান সংগ্রহ করে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলার বাকি সময়ে ভারতীয় দল ১ উইকেট খুইয়ে ১৫৪ রান তুলেছিল মানকাদ ৫৮ রান এবং বেগ ৩২ রান করে নট আউট ছিলেন।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে ভারতীয় দল তাদের প্রথম ইনিংসের ২৫২ রানের (৩ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে ৪৯ রানে এগিয়ে যায়। ভারতীয় দল এইদিন ঘড়ির কাটাকে পিছনে ফেলে ৮৩ মিনিটে ৯৮ রান সংগ্রহ করেছিল। অপর-দিকে মাইনর কাউন্টি দল দ্বিতীয় ইনিংসের ৬টা উইকেটের বিনিময়ে ১৯৯ রান সংগ্রহ করে যখন খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে তখন মাত্র ২০ ওভার বল খেলার মত সময় ছিল। এই সময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৫১ রান সংগ্রহ করা অসম্ভব ছিল। সুতরাং ভারতীয় দল তার চেষ্টা করেনি। ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ২৬ রান করেছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

মাইনর কাউন্টি: ২০৩ রান (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। এম মসলিন ৬১ রান। চন্দ্রশেখর ৩৯ রানে ৩ উইকেট)
ও ১১৯ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। মিলেট ৫০ নট আউট এবং হান্টার ৪১ রান। চন্দ্রশেখর ৩০ রানে ২ উইকেট)

ভারতীয় দল: ২৫২ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। গাভাসকার ৫৪, মানকাদ ৬৩ এবং বেগ ৬৪ রান। মানকাদ এবং গাভাসকার রান আউট)
ও ২৬ রান (বিনা উইকেটে)

ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম সারে কাউন্টি ক্রিকেট দলের তিনদিনব্যাপী খেলাটিও ড্র যায়।

প্রথম দিনে সারে দলের প্রথম ইনিংস ২৬৯ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতীয় দল কোন উইকেট না খুইয়ে ২৮ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয়দিনে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৫৭ (৫ উইকেটে)। প্রথম উইকেটের জুটিতে মানকাদ এবং জয়ন্তীলাল ১২৯ রান তুলেছিলেন। মানকাদ ১৭৫ মিনিট খেলে তাঁর ৭৭ রানে আউট হন। জয়ন্তীলাল ৮৪ রান করেন।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে ভারতীয় দল তাদের প্রথম ইনিংসের ৩২৬ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করলে খেলার বাকি সময়ে সারে দল ৪ উইকেটের বিনিময়ে ২৫৭ রান তুলেছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

সারে: ২৬৯ রান (ইউনিস আমেদ ৫৩ গ্রাহাম রোপ ৬০ এবং ইন্তিখাব আলম ৫৫ রান। বেদী ১১১ রানে ৭ উইকেট)
ও ২৫৭ রান (৪ উইকেটে। রোপ ৫৬ নট-আউট এবং স্টোরে ৭০ নটআউট প্রসন্ন ৬৯ রানে ৪ উইকেট)।

ভারতীয় দল: ৩২৬ রান (৮ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড। মানকাদ ৭৭ এবং জয়ন্তী-লাল ৮৪ রান। বব উইলিস ৭৫ রানে ৩ উইকেট)।

শেষ সংবাদ

ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ড

দ্বিতীয় টেস্ট খেলা

ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় টেস্ট বৃষ্টির ফলে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

আগামী সংখ্যায় এই খেলার বিস্তারিত সচিত্র বিবরণ এবং পর্যালোচনা থাকবে।

অ্যাথলেটিক্স

তেহেরাণ, সিঙ্গাপুরে এবং মালয়েশিয়ায় আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দল প্রেরণের উদ্দেশ্যে তরুণ অ্যাথলীটদের নিয়ে তিনটি পৃথক দল গঠন করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি দলই দ্বিতীয় শ্রেণীর ভারতীয় দল। তরুণদের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এইভাবে দল

তরী করা হয়। পশ্চিম বাংলার মাত্র একজন অ্যাথলীট—এম পাওয়েল ভারতীয় দলের সঙ্গে তেহেরাণের ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে ব্রোঞ্জ পদক পান। তাছাড়া তিনি ৪×১০০ মিটার রিলে রেসে স্বর্ণ পদক এবং ৪×৪০০ মিটার রিলে রেসে রৌপ্য পদক পান।

তেহেরাণে আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকস অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষ মোট ১৩টি পদক জয়ী হয়েছে—স্বর্ণ ৪টি, রৌপ্য ৪টি এবং ব্রোঞ্জ ৫টি। ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের পক্ষে ২টি স্বর্ণ পদক পেয়েছেন একমাত্র হরভজন সিং (হ্যামার ও ডিসকাস)।।

পদক বিজয়ী ভারতীয় অ্যাথলীট

স্বর্ণ (৪): ১০০ মিটার—কে নটরাজন, হ্যামার ও ডিসকাস—হরভজন সিং, ৪×১০০ মিটার রিলে—বচান সিং, এম পাওয়েল, কে নটরাজন।

রৌপ্য (৪): সটপুট—গুরদীপ সিং, ৮০০ ও ১৫০০ মিটার দৌড়—শ্রীরাম সিং, ৪×৪০০ মিটার রিলে—বচান সিং, এম পাওয়েল ও নির্মল সিং।

ব্রোঞ্জ (৫): ডিসকাস থ্রো—লোকনাথ বোলার, ১১০ ও ৪০০ মিটার হার্ডলস—নির্মল সিং, ১০০ মিটার দৌড়—এম পাওয়েল, ৪০০ মিটার দৌড়—বচান সিং।

মালয়েশিয়ার ৪৯তম অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ মোট ৯টি পদক (স্বর্ণ ৫ এবং রৌপ্য ৪) জয়ের সূত্রে আগন্তুক দলের পক্ষে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। প্রথম স্থান পায় ফিলিপাইন—মোট ১৬টি পদক (স্বর্ণ ৬, রৌপ্য ৭ এবং ব্রোঞ্জ ৩)। সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগদানের ফলে মালয়েশিয়ার পক্ষে সর্বাধিক ২৯টি পদক (স্বর্ণ ৯, রৌপ্য ৮ এবং ব্রোঞ্জ ১২) জয় সম্ভব হয়েছিল।

ভারতবর্ষের পক্ষে দুটি করে স্বর্ণ পদক পেয়েছিলেন—পুরুষ বিভাগে রঘুনাথন এবং মহিলা বিভাগে সীতা কাউর। রঘুনাথন স্বর্ণ পদক পান ট্রিপল ও লং জাম্পে। অপরদিকে সীতা কাউর পান সটপুট ও ডিসকাস থ্রোতে।

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা

১৯৭৪ সালের বিশ্ব ফুটবল

যোগিতায় যে ৯৬টি দেশ বাছাই পর্বের লীগ প্রতিযোগিতায় খেলবে তাদের খেলার তালিকা নীচে দেওয়া হল। এই বাছাই পর্বের লীগ খেলায় মাত্র ১৪টি দেশ ১৯৭৪ সালের জুন-জুলাই মাসে পশ্চিম জার্মানীর শেষ লীগ পর্যায়ের খেলায় অংশ গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করবে। গত বারের (১৯৭০) কাপ বিজয়ী ব্রেজিল এবং উদ্যোক্তা দেশ পশ্চিম জার্মানী বাছাই পর্বের খেলায় অংশ গ্রহণ না করেই সরাসরি শেষ লীগ পর্যায়ে খেলবে।

ইউরোপ

১নং গ্রুপ : সুইডেন, হাঙ্গেরী, অস্ট্রিয়া, মালটা।

২নং গ্রুপ : ইতালী, সুইজারল্যান্ড, তুরস্ক, লুক্সেমবার্গ।

৩নং গ্রুপ : বেলজিয়াম, হল্যান্ড, নরওয়ে, আইসল্যান্ড।

৪নং গ্রুপ : রুমানিয়া, পূর্ব জার্মাণী, আলবানিয়া, ফিনল্যান্ড।

৫নং গ্রুপ : ইংল্যান্ড, পোল্যান্ড, ওয়েলস।

৬নং গ্রুপ : বুলগারিয়া, পর্তুগাল, উত্তর আয়ারল্যান্ড, সাইপ্রাস।

৭নং গ্রুপ : যুগোশ্লাভিয়া, স্পেন, গ্রীস।

৮নং গ্রুপ : চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, স্কটল্যান্ড।

৯নং গ্রুপ : রাশিয়া, ফ্রান্স, রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ড।

দক্ষিণ আমেরিকা

১নং গ্রুপ : উরুগুয়ে, কলোম্বিয়া, ইকুয়েডর

২নং গ্রুপ : আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, বোলিভিয়া।

৩নং গ্রুপ : পেরু, চিলি, ভেনেজুয়েলা।

এশিয়া

১নং গ্রুপ : ইস্রাইল, তাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনস, হংকং, রিপাবলিক অব কোরিয়া, জাপান, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম।

২নং গ্রুপ : ভারতবর্ষ, ইরাণ, ইরাক, কুয়েত, সিংহল, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া বনাম নিউজিল্যান্ডের বিজয়ী দেশ।

আফ্রিকা

১নং গ্রুপ : মরোক্কো, সেনেগাল, গায়না, আ ল জে রি য়া, ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক, তিউনিশিয়া, আইভরী কোস্ট, সিয়েরা লিয়ন।

২নং গ্রুপ : সুদান, কেনিয়া, মরিশাস, মাদাগাস্কার, ইথিওপিয়া, তানজানিয়া, জাম্বিয়া, লেসোথো।

৩নং গ্রুপ : নাইজেরিয়া, কঙ্গো-ব্রাজাভিলে, ঘানা, ডাহোমি, টগো, কঙ্গো-কিনসাসা, ক্যামেরুণ, গাবন।

মধ্য ও উত্তর আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান

১নং গ্রুপ : কানাডা, আমেরিকা, মেক্সিকো।

২নং গ্রুপ : গুয়াতেমালা, এল সালভাডর

৩নং গ্রুপ : হন্ডুরাস, কোস্টারিকা

৪নং গ্রুপ : জামাইকা, নেদারল্যান্ডস অ্যান্টিলেস

৫নং গ্রুপ : হাইতি, পুয়েরতো রিকো

৬নং গ্রুপ : সুরিনাম, ত্রিনিদাদ, অ্যান্টিগুয়া

এশিয়ান স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা

সিঙ্গাপুরে ৮টি দেশ নিয়ে এশিয়ান স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। প্রতিযোগিতায় দুটি বিভাগ ছিল। একটি বিভাগে ১৫ বছরের কমবয়সী এবং অপর বিভাগে ১৮ বছরের কমবয়সী খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করেছিল। যে-বিভাগে ১৫ বছরের কমবয়সী খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করেছিল তার ফাইনালে গতবারের বিজয়ী তাইল্যান্ড ৪—০ গোলে মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে। অপর বিভাগের ফাইনালে ভারতবর্ষ এবং মালয়েশিয়া যুগ্মবিজয়ী হয়েছে। এই বিভাগের 'এ' গ্রুপের রানার্স-আপ ভারতবর্ষ সেমি-ফাইনাল খেলায় গতবারের বিজয়ী তাইল্যান্ডকে ২—০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা

কুয়ালালামপুরে ১৯৭১ সালের মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষকে নিয়ে ১২টি দেশ যোগদান করেছে। যোগদানকারী দেশগুলি সমান দুভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে। 'এ' গ্রুপে খেলছে—দক্ষিণ কোরিয়া (গত বছরের চ্যাম্পিয়ন), মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, জাপান, তাইল্যান্ড এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনাম। অপরদিকে 'বি' গ্রুপে খেলছে ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, হংকং, ফিলিপাইন এবং সিঙ্গাপুর।

এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৭ জন খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় দল গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে ১০ জন খেলোয়াড় দলে স্থান পেয়েছেন এবং বাংলার চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।
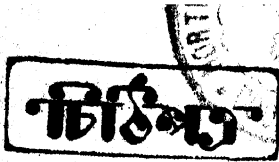
'বাংলাদেশ' সংখ্যা ও "গোরনিদ্রা"

বলে রাখা ভালো, আমি সাপ্তাহিক অমৃত এবং সাপ্তাহিক দেশ দুটোরই নিয়মিত পাঠক।

কি আশ্চর্য! এ রকমও হয় নাকি? অমৃতর বাংলাদেশ সংখ্যা নববর্ষ ১৩৭৮-এ প্রকাশিত শওকত ওসমানের ছোট-গল্প 'গোরনিদ্রা', তেসরা জুলাই প্রকাশিত ৩৫ সংখ্যা দেশ-এ 'গোরস্থানে নয়' নামে প্রকাশ! এ ব্যাপারে কোন স্বীকৃতি কোথাও চোখে পড়ল না। অবাক লাগছে। দুটি ঐতিহ্যপূর্ণ সাপ্তাহিকে মাত্র তিন মাসের ফারাকে একই গল্পের হুবহু মুদ্রণ কেমন করে সম্ভব? একটু ভুল হোল, হুবহু ঠিক নয়। কিছু কিছু পরিবর্তন অবশ্যই আছে। প্রথমতঃ নামে। একটিতে 'গোরস্থানে নয়'। অন্যটিতে 'গোরনিদ্রা'। তাছাড়া মাঝে মধ্যে দু-একটি শব্দের এদিক সেদিক। যেমন, গল্পের শেষ দিকে (অমৃতয়)—...আমার দিকে এগোতে এগোতে হে'কে উঠলো, স্লামালেকুম! স্লামালেকুম!'

আমি ভূতের সঙ্গে কথা বলব?... কোন রকমে উচ্চারণ করে ফেললাম, আলায়কুম আস্‌সালাম:

(দেশএ)... আমার দিকে এগোতে এগোতে হে'কে উঠলো, 'আদাব, আদাব, সালামালেকুম...।'

আমি কি ভূতের আদাবের জবাব কোনরকমে উচ্চারণ করে ফেললাম, আদাব, আদাব।

পরিবর্তন আরো আছে, যেমন অমৃতয় প্রকাশিত গল্পের শেষ লাইনটি 'বিপদোত্তর শঙ্কায় চোখ বন্ধ করে নিলাম'—দেশ-এ নেই।

এ চিঠিটি অমৃতে প্রকাশ করে আমাদের মত মফঃস্বলী লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের কৌতূহল মেটাবেন।

বিনায়ক দেব
ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি

(২)

নিবেদন এই যে, 'বাংলাদেশ' সংখ্যা প্রকাশের ব্যাপারে, যতদূর জানি, সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে অমৃত পথিকৃৎ। সেদিক থেকে প্রত্যেক বাংলাদেশবাসী আপনাদের নিকট চিরঋণী।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ সংখ্যায় মুদ্রিত শওকত ওসমানের একটি গল্প নিয়ে পাঠক সমাজ থেকে অভিযোগ উঠেছে। কারণ, একই গল্প আবার অন্য নামে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত। এমন হওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু লেখকের এদেশে অনুপস্থিতি—এবং তার সঙ্গে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা না থাকার ফলে, আপনাদের পক্ষেও অনুমতি নেওয়ার সুযোগ ঘটে নি। যোগাযোগ হলে না পারিশ্রমিকের প্রশ্ন ওঠে।

শওকত ওসমান আমার বহু দিনের পরিচিত বন্ধু। তাই জোর দিয়ে বলতে পারি, বাংলাদেশের ব্যাপারে আপনারা যে সহৃদয়তা দেখিয়েছেন এবং যে নৈতিক সমর্থন দিয়েছেন তার জন্যে, অনুমতি-পারিশ্রমিক ইত্যাদির প্রশ্ন তোলা ত দূরের কথা, শুধু একবার নয়, শওকত ওসমান বারবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন এবং তা লিখিতভাবে সর্বজনসমক্ষে।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের আবার ধন্যবাদ জানাই।

নানা কারণে নাম উহ্য রাখতে বাধ্য থাকলাম। জয়বাংলা।

ওয়াকিবহাল
কলকাতা-১৭

"বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দর"

বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দরের ঘটনাটি কোথায় যে ঘটেছিল, তা এখনও নিশ্চিত করে কেউই বলতে পারেন নি। এটা অবশ্য পৌরাণিক যুগের (খৃষ্ট-জন্মের পূর্বে এবং মহাভারতীয় যুগের পরে) উল্লেখযোগ্য ও মহিমাময় ঘটনা। এ নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের দাবী-দাওয়ারও অন্ত নেই। আসামের ঐতিহাসিকরা দাবী করেন, এটা ঘটেছিল আসামের ধুবড়ীতেই। তাই নেতা ধোপানীর নাম অনুসারে এই নগরের নাম হয়েছে ধুবড়ী। কারণ ধুবড়িতে এখনও 'নেতা ধোপানীর ঘাট' নামে একটি স্থান রয়েছে। এই ঘাটেই 'শুক্র বৈদ্য-কুল-তিলক' নেতা কাপড় কাচতেন।

আবার শ্রীহট্টের পণ্ডিতরা মনে করেন, 'চাঁদ সওদাগরের বাড়ি' বলে বর্ণিত ও চিহ্নিত তথায় একটি জঙ্গলময় জায়গা আছে। লাউড়ের দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্র-সদৃশ শনির হাওরেই নাকি চাঁদের চৌদ্দ ডিঙ্গা তরঙ্গ-তাড়িত হয়ে নিমজ্জিত হয়েছিল।

'এই বাঁক ছাড়াইয়া কন্যা বিজয়াগমন।
ধনা-মনার বাঁকে গিয়া দিলা দরশন।।'
—ষষ্ঠীবর দত্ত।

পদ্মপুরাণে ধনা ও মনা নামে দুজন ম্লেচ্ছ-পতির নাম উল্লিখিত আছে। ওদেরে নিয়ে দুটি পালাগানও শ্রীহট্ট জেলায় প্রচলিত আছে। লাউড় রাজ্যের অন্তর্গত বর্তমান শাখা-সুরমা নদীর তীরে এদের বসতি ছিল। বেহুলার কলার ভেলা এই নদী দিয়েই গমন করেছিল এবং পরে বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদী দিয়ে আসাম উপত্যকা অতিক্রম করে ভেলা দেবপুরে (বর্তমান মানস সরোবরে) পৌঁছেছিল। কথিত আছে শ্রাবণ সংক্রান্তির শুভ দিবসেই নাকি মনসাদেবী লক্ষ্মীন্দরকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। সেই হেতু শ্রীহট্ট জেলায় শ্রাবণ সংক্রান্তির দিবসে প্রতি ঘরে ঘরে মনসাদেবীর যথারীতি অর্চনা হয়। মনসাপূজা শ্রীহট্টে জাতীয় উৎসবরূপে পরিগণিত হয়েছে।

আবার বঙ্গদেশের ঐতিহাসিক পণ্ডিতরাও সমস্বরে দাবী করেন যে বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর ঘটনাটি নাকি বর্ধমান জেলার কোনও এক স্থানে ঘটেছিল। আর চাঁদ সওদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা কালীদহে (বঙ্গোপসাগর) নিমজ্জিত হয়েছিল। যা হোক, সকলের দাবীকেই সামনে রেখে এই ঘটনাটি কবে এবং কোথায় ঘটেছিল, তাহা নির্ণয় করতে ঐতিহাসিকদের একান্ত অনুরোধ করি।

সুরেশচন্দ্র দেবনাথ
এলাহাবাদ

'নূর-নামা' প্রসঙ্গে

অমৃত নববর্ষ সংখ্যায় (১৩৭৮) একটি ত্রুটী লক্ষ্য করা গেল—অষ্টাদশ শতাব্দীর (?) 'নূর-নামার' কবি আবদুল হাকিমের কবিতার উদ্ধৃতিতে। ১৯৫৩ ইং সনের ২৩শে এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্থান সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতায় ডঃ শহীদুল্লাহ যে উদ্ধৃতি দেন তাহল—

'যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সবার কিবা রীতি নির্ণয় না জানি।
মাতা পিতা যয় ক্রমে বঙ্গেতে বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশে না যায়।।

(দ্রষ্টব্য শিক্ষা-ব্রতী রবীন্দ্রসংখ্যা, ১৯৬১ পৃঃ ১৫)

অমৃতে প্রকাশিত হয়েছে এই রূপে—
'যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগ কেন বিদেশ ন যায়।।
মাতা পিতা মহক্রমে বঙ্গেতে বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মান হিত অতি।।'

কোনটি সঠিক?

সুনীল পা
কামাখ্যাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সংগে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং স সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষান্মাষিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন.

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

১৬শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 20th August, 1971 শুক্রবার, ৩রা ভাদ্র, ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীশচীন দাস

এক নজরে

মূলোচ্ছেদের প্রয়াস :

দশ বছর ধ'রে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে আমেরিকা। কত লোকের যে জেল, জরিমানা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তবু তার নিরলস, সর্বাত্মক ও অতন্দ্র প্রহরা ভেদ ক'রে অগণিত ছিদ্রপথ দিয়ে তাল তাল আফিং ঢুকেছে সেদেশে, আর গোটা আমেরিকা, বিশেষ ক'রে তরুণ আমেরিকা যেন নেশাগ্রস্ত বৃদ্ধের মতো ঝিমিয়ে পড়ছে দিন দিন। একদা অর্থলোলুপ শ্বেতাঙ্গ বণিকরা যেমন ক'রে আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল গোটা চীনকে, তেমনি এক কালঘুম গ্রাস করছে সমগ্র আমেরিকা।

তাই নিকসন প্রশাসন এবার মূলোচ্ছেদে উদ্যোগী হয়েছে। সম্প্রতি তুরস্কের সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে আমেরিকার যাতে স্থির হয়েছে, শুধু ওষুধের প্রয়োজনে যেটুকু আফিং চাষ প্রয়োজন সেটা মাত্র চারটি জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে আর সব জেলায় আফিং চাষ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করবে তুরস্ক সরকার। আর তার জন্য তুরস্কের যে আর্থিক ক্ষতি হবে তা আমেরিকা পুষিয়ে দেবে আর্থিক ও অন্যান্য বৈষয়িক সাহায্য দিয়ে। প্রধানত তুরস্ক থেকেই চোরাপথ দিয়ে মার্সাই বন্দর হয়ে নানা হাত ও নানাপথ ঘুরে পাউন্ড পাউন্ড আফিং প্রবেশ করে আমেরিকায়। সুতরাং তুরস্কে যদি আফিং চাষ বন্ধ হয় তাহলে পণ্যের অভাবে ঐ আন্তর্জাতিক চোরাচালানের কারবারটি আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। আপাতত দেখা গেছে, এতে দু' পক্ষেরই লাভ হবে যথেষ্ট। কারণ আমেরিকাকে স্বদেশে এবং বিদেশে ফরাসি পুলিশ, 'ইন্টারপোল' প্রভৃতির পেছনে চোরাচালান বন্ধের ব্যর্থ প্রয়াসে যে বিপুল অর্থব্যয় করতে হয়, তার একটা অংশ পেলেই তুরস্ক খুশিমনে আফিং চাষ বন্ধ করে দেবে। তাছাড়া তুরস্ককেও ত চোরাচালান বন্ধের জন্য কম অর্থ ব্যয় করতে হয় না। গত বছর শুধু তুরস্কের পুলিশের হাতেই ধরা পড়েছে ১,১৮৮ পাউন্ড আফিং ও প্রায় নয় পাউন্ড মরফিন। এর জন্য জেলে পাঠাতে হয়েছে প্রায় ছয়'শ চোরাকারবারীকে। তুরস্ক গত বছর আমেরিকার কাছে যে আর্থিক সাহায্য পায় তার অর্ধেক ব্যয় হয়ে যায় আফিং-এর চোরা কারবার বন্ধ করতে।

তুরস্কের চল্লিশটি জেলায় আফিং চাষ হয় এবং প্রায় আশি হাজার কৃষকের প্রধান জীবিকা হল আফিং উৎপাদন। আফিং বেচে তুরস্ক প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। সারা দেশে বছরে প্রায় ১৫০ টন আফিং উৎপাদন হয়। কিন্তু সরকারের হাতে জমা পড়ে মাত্র ৬০ টন, যার মানে হল ৯০ টন চলে যায় চোরাপথে। প্রতি কিলোগ্রাম আফিং-এর সরকারি দাম হল ৩-৩ ডলার, কিন্তু চোরাকারবারীরা দাম দেয় কিলোপিছু ৭ থেকে ১১ ডলার। গত বছর চাষ ভাল হয়নি বলে চোরাবাজারে দর উঠেছিল কিলোপিছু ৪৪ ডলার। সদ্যসমাপ্ত তুরস্ক-মার্কিন চুক্তি অনুসারে ১৯৭২ সালের শরৎকাল থেকে তুরস্কের মাত্র চারটি জেলায় পপির চাষ হবে এবং তা থেকে যে আফিং উৎপন্ন হবে তা শুধু ওষুধ প্রস্তুতের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে। এবং আমেরিকা যে ক্ষতিপূরণ দেবে তা দিয়ে বৃত্তিচ্যুত কৃষকদের বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে।

পাঁচ মিনিটের ব্যাপার :

কুন্দ শুভ্র স্বর্ণকান্তি, নীলনয়না সুবর্ণকেশী সুন্দরী [illegible] নগ্ন-সুন্দরী প্রতি-যোগিতায় প্রথম হয়েছেন। ওন্টারিও রাজ্যের কোন এক স্থানে অনুষ্ঠিত ঐ প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিনীর সংখ্যা ছিল ১৭। সাংবাদিক, বেতার ও টি-ভি'র ভাষ্যকার নিয়ে বিচারক ছিলেন ১৪ জন এবং দর্শক সংখ্যা তিন হাজার। সকলের বিচারে পঞ্চ-বিংশতি উড়া শ্রীমতী হেসই শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বিবেচিত হন। একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কর্মী শ্রীমতী হেসের দেহের মাপ ৩৫-২৪-৩৫।

বছর পাঁচেক আগে ইউরোপে থাকাকালে হেস-দম্পতি নগ্নবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। এ ব্যাপারে শ্রীমতী হেসের সুস্পষ্ট অভিমত—সমস্যাটা মাত্র মিনিট পাঁচেকের। চার মিনিট পরে আর কিছুই দেখার থাকে না।

সংস্কৃতির উত্তরাধিকার :

মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার যে বিশ্বজনীন এবং তাকে যে কোন দেশ, কাল বা ধর্মের গণ্ডিতে সীমিত করা যায় না, তা বোধহয় ইন্দোনেশিয়াই সর্বাধিক আন্তরিকতার সঙ্গে বিশ্বাস করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে পূর্ব এশিয়ার নব-জাগরণের কালে ভারতবাসী প্রথম বিস্মিত হয় ইন্দোনেশিয়ার নেতৃবৃন্দের সুকর্ণ, সুবন্ত্র, সুশান্ত প্রভৃতি নাম শুনে। তারপর সে বিস্ময় আরও গভীর হয় যখন জানা যায় যে, তাঁরা সকলেই ইসলামধর্মী। ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়েছে বলিদ্বীপ বাদে সমগ্র ইন্দোনেশিয়া, কিন্তু দূর অতীতকাল থেকে যে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ কাহিনীর শুচিস্নিগ্ধ প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল ঐ দ্বীপময় রাজ্যে, ধর্মান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকেও তারা বর্জন করেনি। রামায়ণ মহাভারতের যুগের মতো ইন্দোনেশিয়ার মানুষ আজও শুধু একটি নামেই পরিচিত, মধ্যনাম বা উপাধি সে-দেশে বাহুল্যজ্ঞানে বর্জিত। রাজা দশরথ, ধৃতরাষ্ট্র, শল্য, কর্ণর মতোই একনামে পরিচিত প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ, সুহার্তো এবং ইসলামধর্মী প্রধান সেনাপতির নাম কর্নেল অভিমন্যু।

আগামী ২৯শে আগষ্ট থেকে ইন্দোনেশিয়ার যোগ্যকর্তা শহরে যে আন্তর্জাতিক রামায়ণ উৎসব শুরু হচ্ছে তাতে যোগ-দানের জন্য ইন্দোনেশিয়া ছয়টি দেশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সে দেশগুলি হল ভারত, নেপাল, বর্মা, খে'র সাধারণতন্ত্র (কম্বোডিয়া), সিংহল ও মালয়েশিয়া। ইন্দোনেশিয়াকে নিয়ে উৎসবে যোগদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা হবে সাত। তিনদিনব্যাপী উৎসবে ইন্দোনেশিয়া তার সুরকর্তা, যোগ্যকর্তা ও বলিদ্বীপে প্রচলিত রামায়ণ নৃত্যনাট্যগুলি উপস্থাপিত করবে। ভারত, বর্মা, খে'র সাধারণতন্ত্র ও নেপালের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে যে, উৎসবে যোগদানের জন্য তারা নৃত্যনাট্যদল পাঠাবে। এই ধরনের সাংস্কৃতিক বন্ধন দুটি দেশের সম্পর্ককে যত নিবিড় করে, কোন কূটনৈতিক মারপ্যাঁচেই সেটা সম্ভব নয়।

কৃষ্ণকলি কালো নয় :

আফ্রিকা, এশিয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অশ্বেতকায়দের আগমনে সম্প্রসারিত ও সুপরিচিত হয়েছে ইংলণ্ডের স্লাউ শহরটি। সম্প্রতি সেখানে যে 'মিস ব্ল্যাক এণ্ড বিউটিফুল' প্রতি-দ্বন্দ্বিতার আয়োজন হয়েছিল তা পরাজিতা প্রতিদ্বন্দ্বিনীদেরই সোচ্চার প্রতিবাদ ও হৈহট্টগোলে শেষ পর্যন্ত ভণ্ডুল হয়ে যায়। তাদের অভিযোগ, যাকে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী নির্বাচিত করা হয়েছে (কেনিয়ায় জন্ম, ভারতীয় বংশোদ্ভূতা শ্রীমতী অমৃত চাওলা) তিনি অশ্বেতকায় হলেও প্রকৃত অর্থে কৃষ্ণাঙ্গিনী নন।

অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বিনী, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের শ্রীমতী গ্লোরিয়া টমসন এ সম্বন্ধে বলেন : তিনি সুন্দরী হতে পারেন, কিন্তু কালো একেবারেই নন।

—প্রত্যক্ষদর্শী

সম্পাদকীয়

মহাপঙ্কে পশ্চিমবঙ্গ

যে কোন কারণেই হোক ভারত সরকারের শাসনযন্ত্রের চাকা অতি মন্থরগতিতে চলে। কলিকাতার জন্য আজ শুধু ভারতবর্ষ নয় সারা পৃথিবীর উদ্বেগের আর অন্ত নেই। দুঃস্বপ্ন নগরী, মিছিল নগরী ইত্যাদি বিশেষণগুলি অতি পুরাতন হয়ে গেছে; এখন যতক্ষণ না যুৎসই কিছু একটা বিশেষণে কোনো উচ্চপদস্থ মনীষী কলিকাতাকে চিহ্নিত করছেন অন্ততঃ সেই ফাঁকে বলা যাক বিভীষিকা-নগরী। এই সব নানা হাঙ্গাম এবং অস্থিরতার কথা কিন্তু কেন্দ্রও চিন্তা করছেন। কিন্তু যে করছেন তার প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গীয় প্রশাসনে নজর রাখার জন্য একজন ফুলটাইম মন্ত্রীর ওপর ভার দেওয়া হয়েছে। কলিকাতার যা কিছু প্রয়োজন তা জোগানোর জন্য দিল্লী এখন বিশেষ ঝোঁক দিয়েছেন। তা যদি না হত তাহলে মেট্রোপোলিটান ডেভেলপমেণ্ট সংস্থার সবরকম স্কীমের বাবদ মোট টাকাটা দিয়ে দিতে তাঁরা সহজে রাজী হতেন না। অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে, এখন কাজটুকু সুসম্পন্ন হলেই সব দিক থেকে মঙ্গল।

অর্থের অভাবে যে কাজ আটকেছে তা বলা যায় না, কাজটা তাড়াতাড়ি করিয়ে নেওয়ার জন্য জরুরী তাগিদ বোধ করেননি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। পাঁচ বছর আগে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সহায়তায় একটা পরিকল্পনা করা হয়েছিল। টাকার অঙ্কটা বেশ মোটা। কাজে হাত না দিয়ে কলিকাতা কর্পোরেশন রাজ্য সরকারের কাছ থেকে টাকাটা আদায় করে নেওয়ার জন্য কসরৎ শুরু করলেন। এই পরিকল্পনাটি কার্যকরী করার চেষ্টা হলে কেন্দ্রীয় সাহায্য এবং বৈদেশিক সহায়তার অভাব হত না। তিন কোটি টাকার বরাদ্দের মধ্যে এই জাতীয় টানা-হেঁচড়ার ফলে মাত্র ৬০ লক্ষ টাকা গত বছর ব্যয় করা হয়েছিল। সুতরাং এই ধারণা করা হয়ত অন্যায় হবে না যে চতুর্থ পরিকল্পনা বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের ১৫০ কোটি বরাদ্দ টাকা থেকে হয়ত সামান্য একটা অংশ খরচ হবে। নানা মুনির নানা মত। অজস্র ডিপার্টমেণ্ট আর অজস্র কর্তা। সকলকার মনঃপূত না হলে এবং অনুমোদন না পেলে ত' বরাদ্দ অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করা যাবে না।

রাজ্য সরকার এবং কর্পোরেশনের এই টাল-বাহানার মধ্যে শিব সদাগরের মত দাঁড়িয়ে আছেন সি এম ডি এ সংস্থা। কিন্তু স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে উপযুক্ত কাজ চালানোর মত দায়িত্বভার তাঁদের হাতে আছে কি? যথেষ্ট দায়িত্ব যদি এই প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয় এবং প্রতি পদে পারিপার্শ্বিক বাধা এবং বিধি-নিষেধের আওতা থেকে তাঁরা যদি মুক্ত থাকেন তবেই তাঁদের পক্ষে পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে সি এম ডি এ-র সংগঠন পার্লামেণ্টারী সাব-কমিটির ব্যবস্থানুসারে কর্পোরেশন এবং রাজ্য সরকারের সমসংখ্যক প্রতিনিধি আছেন। সমগ্র বিষয়টি ভালোভাবে বিচার করলে সাধারণের কাছে মনে হবে যে, এই ব্যবস্থাটি ত্রুটিমুক্ত নয়। যেখানে দ্রুত ফললাভের আশা করা যায় সেইখানে সিদ্ধান্তও দ্রুত লয়ে গ্রহণ করতে হয়, বিলম্বিত লয়ে উন্নয়নমূলক কার্য করা সম্ভব নয়। উপযুক্ত সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অর্থ ব্যয়ও কম হয়, বিলম্বে যে অর্থ ব্যয় করতে হয় তার পরিমাণও অনেক বেশী হয়ে পড়ে। বরাদ্দ অর্থ যাতে যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগান হয় সেদিকে নজর রাখা বিশেষ প্রয়োজন। ৩৮ কোটি টাকার ওপর অর্থ বস্তী উন্নয়ন ও গৃহনির্মাণ খাতে ধরা আছে। যদি ঠিকমত এই অর্থ ব্যয় করা হয় তাহলে সাধারণের কল্যাণ হবে সন্দেহ নেই।

পশ্চিমবঙ্গ-বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় সম্প্রতি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক উন্নতির দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন। তাঁর এই আগ্রহের কারণও সুস্পষ্ট। হাহাকার যত বৃদ্ধি পাবে, অস্বস্তি ও অস্থিরতাও ততই বৃদ্ধি পাবে। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়ন করে দরিদ্র জনগণের রুজি-রোজগারের পথ প্রশস্ত করার যে চেষ্টা তাও তেমন সফল হয়নি। বর্তমান কালে পশ্চিমবঙ্গ আর্থিক ও বৈষয়িক দিক থেকে এক মহাসংকটের মুখে, তার উপর বাংলাদেশ থেকে আগত কোটি কোটি শরণার্থীর দায়-দায়িত্বও এই পশ্চিমবঙ্গের ওপর অনেকখানি পড়েছে। অভাব, অনটন, আশ্রয়হীনতা, কর্মহীনতা প্রভৃতি নানাবিধ সামাজিক অভিশাপে আজ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জর্জরিত, প্রধানমন্ত্রী হয়ত এই দুর্দশার সংবাদ কিছু পেয়েছেন, তাই তাঁর এই আগ্রহ। কিন্তু ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে কোনো পরিকল্পনাই যদি অচিরাৎ দ্রুত তালে সম্পন্ন না করা যায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের অসহায় মানুষ দুর্দশার মহাপঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে হয়ত ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অর্থনৈতিক নিরাময় সাধনে উপযুক্ত বৈদ্যের প্রয়োজন। পরিকল্পনা পরিপূরণে উপযুক্ত কর্মীর প্রয়োজনই আজ সর্বাধিক।

অনেকেই আক্ষেপ করেন যে, এদেশে ছোট ছোট দলের সংখ্যা এত বাড়ছে যে, তার ফলে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র ব্যবস্থাটাই প্রায় বিপন্ন হয়ে পড়েছে। কারণ গোটা দুই-তিন বড় দল থাকলেই নাকি পার্লামেন্টারি খেলাটা জমে ভালো। তবু যে এই সেদিন, অর্থাৎ ৯ আগস্ট, প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি, ইন্ডিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টি সবাই মিলে নতুন একটা সোস্যালিস্ট পার্টি গড়ে তুলল সেটা কিন্তু দেশে তেমন সাড়া জাগালো না। কেরলে, বিহারে তবু একটু হৈ চৈ হল, কিন্তু আমাদের এই পশ্চিম বাংলায় তো এই নিয়ে প্রায় কোনো আলোচনাই হল না, উত্তেজনা তো দূরের কথা। অথচ হওয়া উচিত ছিল, কারণ সমাজতন্ত্র কথাটা এখন বেশ একটা ধরতাই বুলি। তা ছাড়া, কংগ্রেসও চান না, কম্যুনিস্টদেরও ভালো চোখে দেখেন না, মাঝামাঝি একটা প্রগতিশীল বিকল্প চান—এমন লোকের সংখ্যা কি নিতান্তই কম?

তবু কেন এই আগ্রহের অভাব? একটা কারণ, বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দলের ঐক্য সম্বন্ধে অনেকের মনেই গত কয়েক বছরে এক ধরনের সিনিসিজম দেখা দিয়েছে। সমাজতন্ত্রীরা এর আগেও যুক্ত হয়েছেন, আবার বিযুক্ত হয়েছেন, আবার যুক্ত হয়েছেন এবং আবার বিযুক্ত। ১৯৫১ সালে আচার্য কৃপালনি যে কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি গড়লেন পরের বছর সাধারণ নির্বাচনের পর সেই দল সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলিত হওয়ায় গড়ে উঠল প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি। ১৯৭১ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল সাফল্যই সমাজতন্ত্রীদের ঐক্যবদ্ধ হতে উৎসাহিত করেছে, ১৯৫২ সালের ঐক্যের পিছনেও ছিল ঐ একই কারণ। কিন্তু মতভেদ দেখা দিতেও দেরি হল না। পি এস পি ছেড়ে ডঃ রামমনোহর লোহিয়া গড়লেন সোস্যালিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (১৯৫৫)। কিন্তু সাধারণ নির্বাচনে দু' দলের কোনোটিই বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। আবার উঠল ঐক্যের কথা। '৬৪তে গড়ে উঠল সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি। কিন্তু এবারের ঐক্য টিঁকলো আরো কম দিন। বছর না-ঘুরেতেই পি এস পি নেতারা প্রায় সকলেই এস এস পি ছেড়ে গেলেন। তার পর থেকেই [illegible] মাঝে মাঝেই মিলনের কথা নির্বাচনের ধাক্কা না এলে সে প্রয়াস এখনও হয়ত সফল হত না। ঐ ঐক্যও ক'দিন টিঁকবে তা নিয়ে যদি অনেকের মনে সন্দেহ দেখা দেয় তবে অবাক হওয়ারও তেমন কিছু নেই।

সমাজতান্ত্রিক দলগুলির ঐক্য নিয়ে পশ্চিম বাংলায় যে তেমন আগ্রহ দেখা দিল না, তার কারণ অবশ্য শুধু এই সন্দেহ নয়। এই রাজ্যে সমাজতান্ত্রিক দলগুলি হীনবল বলেই এ নিয়ে কোনো উত্তেজনা দেখা দিল না। ধরুন আজ যদি সি পি এম ও সি পি আই-এর মিলন প্রস্তাব উঠত, এমন কি শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে সংগঠন কংগ্রেসের হাত মেলাবার কথা হত তবে পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক আকাশে বিদ্যুৎ চমকে যেত। প্রথম সম্ভাবনার ক্ষেত্রে তো বটেই, এমন কি দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও এই রাজ্যের রাজনীতিতে তার উল্লেখযোগ্য রেশ পড়ত। কিন্তু পি এস পি-এস এস পি মিলনে সে-ধরনের কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না।

ইদানীং পি এস পি ও এস এস পি, দুটি দলই টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। সরকারী পি এস পি ভেঙে গড়ে উঠেছিল বিদ্যুৎ বসু, স্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্যের বিক্ষুব্ধ পি এস পি। সুধীর দাস শেষের দিকে সরকারী পি এস পিতেও ছিলেন না, বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীতেও ছিলেন না, তবু তিনিও ছিলেন পি এস পি নামের দাবিদার। এস এস পিও ভাঙন এড়াতে পারে নি। একটা অংশ ভেঙে তৈরি হল সোস্যালিস্ট পার্টি। আবার কাশীকান্ত মৈত্র হলেন আর এক দলছুট অংশের নেতা।

কিন্তু খন্দ-দীর্ণ হওয়ার আগেও যে সমাজতন্ত্রীরা পশ্চিম বাংলার মনে তেমন-ভাবে নাড়া দিতে পেরেছিলেন তা নয়। যদিও স্বাধীনতার ঠিক আগে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির নামের থেকে 'কংগ্রেস' শব্দটা কাটা পড়েছিল, তবু এই রাজ্যে সোস্যালিস্টরা কংগ্রেসের 'বি-টিম' বলেই পরিচিত হয়ে রইলেন অনেকের কাছে। পি এস পিকে 'পরম সুবিধাবাদী পার্টি' বলতেও অনেকের আটকালো না।

এর একটা কারণ সম্ভবত এই যে, বাঙালির মন-কাড়বার মতো তেমন জবরদস্ত নেতা সোস্যালিস্টদের মধ্যে দেখা যায় নি। গোড়ায় যাঁরা কংগ্রেসের মধ্যেই সোস্যালিস্ট পার্টি গড়ে তোলেন তাঁদের মধ্যে শীর্ষ-স্থানীয় বাঙালি নেতা বিশেষ কেউ ছিলেন বিরোধিতার পথ ধরলেন তখনও কিন্তু তা বাঙালির কাছে তেমন আবেদন জানাতে পারল না। তার কারণ কংগ্রেস-বিরোধী পথ হিসেবে কম্যুনিস্ট আন্দোলন এখানে রীতি-মতো শক্তিশালী। দ্বিতীয়তঃ বিরোধী অথচ অ-কম্যুনিস্ট এবং সমাজতন্ত্রী একটি দলও পশ্চিম বাংলায় বেশ প্রভাবশালী—তার নাম ফরওয়ার্ড ব্লক। এই দলের সঙ্গে যেহেতু জড়িত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নাম, তাই এর আকর্ষণের কারণ বুঝতেও অসুবিধে হয় না।

১৯৬৭ সালে সাধারণ নির্বাচনের আগে যখন আসন ভাগাভাগি নিয়ে বামপন্থীদের মধ্যে কোন্দল চলছিল তখন মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি পি এস পিকে একটিও আসন দিতে চায় নি। পি এস পি সম্বন্ধে বামপন্থীদের একাংশের মনোভাব এর মধ্যে দিয়েই ফুটে ওঠে। কিন্তু মার্কসবাদীরা এস এস পিকে ২৪টি আসন দিতে চেয়েছিলেন। কারণ আর এস পি এবং এস ইউ সি'র মতো এস এস পিও তখন মার্কস-বাদীদের নেতৃত্ব মানতে রাজী ছিল। আসন-রফার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর যখন দুটো বামপন্থী ফ্রন্ট তৈরি হল তখন এস এস পি রয়ে গেল মার্কসবাদীদের সঙ্গেই। কিন্তু পি এস পি সরকারীভাবে কোনো ফ্রণ্টেই রইল না।

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল তাতে পি এস পি'র বিশেষ অসুবিধে হয়নি। কারণ এস এস পি'র মতো এই দলও সাতটি আসনে জিতে গেল। স্পষ্টতঃই দেখা গেল, পি এস পির শক্তি সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের ধারণায় গলদ ছিল। পি এস পি এবং এস এস পি, দু' দলই মোট কম-বেশি আড়াই লাখ ভোট পেয়েছে দেখা গেল।

কিন্তু যে এস এস পিকে বেশি আসন দেওয়ার জন্যে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি নির্বাচনের আগে জোর লড়াই করেছিল, প্রথম যুক্তফ্রন্ট তৈরি হওয়ার পর সেই দলের সঙ্গেই লেগে গেল জোর বিবাদ। এস এস পি'র অন্যতম ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বি পি ঝা ঐ সময়ই নিহত হন। এস এস পি অভি-যোগ করে যে, মার্কসবাদীদের হাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। দলের নেতা ডঃ ভূপাল বসু দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গিন।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট অনিবার্যভাবে ভাঙনের দিকে যখন এগোতে থাকে তখন মার্কস-বাদীরাও অবশ্য ছেড়ে কথা কইলেন না। ফ্রন্টকে যারা দুর্বল করছে, তাদের তালি-কায় বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে পি এস পি এবং এস এস পির নামও জুড়ে দিলেন মার্কস-বাদীরা। পি এস পি'র সঙ্গে মার্কস-বাদীদের কোনো সরাসরি সংঘর্ষ ঘটে নি, কিন্তু সি পি এমের সঙ্গে অজয় মুখার্জির বিরোধে পি এস পি নেতারা অজয়বাবুর পক্ষেই ছিলেন। পি এস পি'র জাতীয় পরি-ষদ যে-বৈঠকে ঘেরাওয়ের নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করেন সেই বৈঠকে হাজির ছিলেন ফ্রণ্ট সরকারের পি এস পি মন্ত্রী নিশীথনাথ

কমিশন গঠন নিয়ে যখন ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দেয় তখনও নিশীথবাবু অজয়বাবুকে দৃঢ় সমর্থন জানান। '৬৭ সালের সেপ্টেম্বরে অজয়বাবু যখন কংগ্রেসের সহযোগে সি পি এম-বিরোধী মন্ত্রিসভা গঠনের তোড়জোড় করছিলেন, তখনও তিনি যাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন নিশীথবাবু ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্রথম যুক্তফ্রণ্ট ভাঙলেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তাঁর সঙ্গে যাঁরা ফ্রণ্ট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে বাংলা কংগ্রেসের একাংশ ছাড়াও ছিলেন পি এস পি'র কয়েকজন সদস্য।

১৯৬৯ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্টে পি এস পি সরকারীভাবে যোগ দেয়নি বটে, কিন্তু আঞ্চলিক বোঝাপড়ার ফলে চারটি আসনে ফ্রণ্ট এই দলের বিরুদ্ধে কোনো প্রার্থী দেয়নি। ঐ চারটি আসনে পি এস পি তো জিতলই, তার সঙ্গে আর একটিতেও। ফ্রণ্টের সঙ্গে সহযোগে যাঁরা জিতেছিলেন, তাঁরা হাওয়া বুঝে ফ্রণ্টে যোগ দিতে বিশেষ দেরি করলেন না। কিন্তু গোড়া থেকেই ফ্রণ্টে থাকায় এস এস পি লাভবান হল আরো বেশি। এই দলের আসন সংখ্যা সাত থেকে বেড়ে হল নয়।

কিন্তু ইতিমধ্যে সি পি এমের সঙ্গে এস এস পি'র সম্পর্ক বেশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আসন বণ্টনের সময় সি পি এম এবার এস এস পি'র পক্ষে কোনো কথাই বলে নি। এস এস পি এক সময় তো হুমকি দেয় যে, নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন না পেলে তারা ফ্রণ্টেই থাকবে না। আবার নির্বাচনের পরে এস এস পি থেকে ক'জনকে মন্ত্রী করা হবে তা নিয়েও সংকট দেখা দেয়: এস এস পি চেয়েছিল অন্ততঃ দু'জনকে পুরো মন্ত্রী করা হোক। কিন্তু ফ্রণ্ট ঠিক করে একজনকে পুরো মন্ত্রী ও একজনকে রাষ্ট্রমন্ত্রী করা হবে। প্রতিবাদে এস এস পি মন্ত্রিসভাতেই যোগ দিল না, যদিও ফ্রণ্টে থেকে গেল।

তবে সি পি এমের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশঃই খারাপ হতে লাগল। আসানসোল-রাণীগঞ্জের খনি অঞ্চলে দু' দলের মধ্যে শরিকী সংঘর্ষ আরম্ভ হল পুরো দমে। এত দিন পর্যন্ত ঐ এলাকায় সি পি এমের কোনো প্রভাব ছিল না বললেই চলে। সি পি এম দ্রুত সেই ফাঁক পূরণের চেষ্টা করতে লাগল। তার ওপর ঐ সময়েই রামানন্দ তেওয়ারি আর শান্তি আইচ, এই দুই এস এস পি নেতা আসানসোলে গ্রেপ্তার হলেন। দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্টের আমলে এই দু'জন ছাড়া আর কোনো দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা গ্রেপ্তার হন নি। ফলে এস এস পি গেল ক্ষেপে। দলের সাধারণ সম্পাদক জর্জ ফারনাণ্ডেজ জ্যোতি বসুকে কড়া চিঠি দিয়ে বললেন, ফ্রণ্ট যদি ভাঙে তবে সি পি এমের সন্ত্রাসের জন্যেই ভাঙবে।

পি এস পিও ছিল কেরল ও পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রণ্টের তীব্র সমালোচক। তাই ফ্রণ্টের শেষের দিকে যখন ফ্রণ্টের মধ্যেই সি পি এম বিরোধী জোট গড়ে উঠল তখন দু'টি **সমাজতন্ত্রী দলকেই তার মধ্যে দেখতে পাওয়া গেল।**

কিন্তু ১৯৭১ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে সি পি এম-বিরোধী ফ্রণ্টে সরকারী পি এস পি বা এস এস পি কেউই রইল না। যদিও বিক্ষুব্ধ পি এস পি দল সংযুক্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের মধ্যেই রইল।

বিশেষতঃ সরকারী এস এস পি'র পক্ষে এই নির্বাচনের ফল হল মারাত্মক। লোকসভার চারটি আসনে লড়াই করে চারটিতেই জামানত হারাতে হল, আর যাঁরা হারলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন দেবেন সেনের মতো নেতা। বিধানসভায় একটিও আসন পেল না এস এস পি। কাশীকান্ত মৈত্র কৃষ্ণনগর থেকে অবশ্য জিতলেন, কিন্তু আগেই বলেছি তিনি একটি ভগ্নাংশের নেতা।

পি এস পি অবশ্য সামান্য ভালো ফল দেখাল। কারণ মেদিনীপুর থেকে এই দলের তিনজন বিধানসভায় নির্বাচিত হলেন—প্রবোধ সিংহ, অনিল মান্না ও সুধীর দাস। এঁদের মধ্যে প্রথম ও শেষোক্ত জন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীও হলেন। লোকসভার একটি আসনেও পি এস পি প্রার্থী সমর গুহ কাঁথি থেকে জিতলেন।

•

ঐক্যবদ্ধ সমাজতন্ত্রী দল গঠনের ফলে আসছে নির্বাচনে কি সমাজতন্ত্রীরা ভালো ফল দেখাতে পারবেন? গোটা দেশেই গত নির্বাচনে পি এস পি এবং এস এস পি'র বিপর্যয় ঘটেছে। লোকসভায় পি এস পি সাকুল্যে পেয়েছে দু'টি আসন এবং এস এস পি তিনটি। তাঁদের মিলিত সদস্য সংখ্যা হবে পাঁচ। লোকসভার মোট সদস্য সংখ্যা যে ৫২০ তা সকলেই জানেন। নির্বাচনের পর এমন আশঙ্কাও দেখা দেয় যে, দু'টি দলই হয়ত নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সর্বভারতীয় দল হিসেবে স্বীকৃতি হারাবে।

গোটা দেশে এবং পশ্চিম বাংলায় সমাজতন্ত্রীদের এই বিপর্যয়ের পরও কিন্তু নতুন দলের নীতি নির্ধারিত হয়েছে যে, ভবিষ্যতে কোনো নির্বাচনে এই দল অন্য কোনো দলের সঙ্গে আঁতাত করবে না। নীতিহীন আঁতাত যে অনেক রাজনৈতিক অসাধুতারই উৎস তা ঠিক, কিন্তু রাজনীতি তো বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা নয়। ইংরিজিতে তো পলিটিক্সের অন্য নাম 'আর্ট অব দি পসিবল্'। দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের আরো বছর পাঁচেক দেরি। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় আবার নির্বাচনের খুব দেরি নেই। তার জন্যে জোট বাঁধার তোড়জোড় গত বিধানসভা ভাঙার পরই সুরু হয়ে গেছে। নতুন সমাজতন্ত্রী দল যদি কোনো জোটেই না থাকে তবে তার ভবিষ্যৎ কী? পশ্চিম বাংলায় এখন কোয়ালিশনের যুগ। এখানে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি বা কংগ্রেসও একা লড়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার সাহস করতে পারছে না। সমাজতন্ত্রীরা অবশ্যই বলবেন, তাঁরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্যে লড়বেন না, সুতরাং তাঁদের ভয় কী? কিন্তু নির্বাচনের আগে যদি দু'টি প্রধান পাল্টা জোট গড়ে ওঠে তবে তার মাঝে পড়ে তাঁদের হাল কী হবে? গত নির্বাচনেই দেখা গেল কংগ্রেস এবং সি পি এমের মাঝখানে পড়ে সংযুক্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টই কাহিল হয়ে পড়েছিল।

অন্য সব দলকে অস্পৃশ্য ঘোষণা করে সমাজতন্ত্রীরা একলা চলার যে নীতি ঘোষণা করেছেন তার মূল উদ্দেশ্য হল সমাজতন্ত্রী দলের একটা স্বতন্ত্র চেহারা জনসাধারণের সামনে হাজির করা। কিন্তু কংগ্রেস ভাগ, শ্রীমতী গান্ধীর প্রগতিশীল নীতি, ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ থেকে সংবিধান সংশোধন, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি—এই সব কি সেই উদ্দেশ্য পূরণের পথে বিরাট বাধা নয়? কারণ, শাসক কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে যতোই ব্যবস্থা নেবে, সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে কংগ্রেসের পার্থক্য ততই কমে আসবে নাকি? চারিত্র্যের এই সংকট সমাজতন্ত্রীরা কাটিয়ে উঠবেন কী করে?

—দেবদত্ত

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভাষণ দানের পর সিনেটর কেনেডি দিল্লীর লালকেল্লায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

দেশে বিদেশে

সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকোর সাম্প্রতিক ভারত সফরের সঙ্গে ডাঃ হেনরি কিসিংগারের সাম্প্রতিক পিকিং সফরের তুলনা করেছেন কোন কোন পর্যবেক্ষক। ডাঃ কিসিংগারের দৌত্যের পরই যেমন নিকসনের পিকিং যাত্রার নাটকীয় ঘোষণা প্রচার করা হয়েছে তেমনি গ্রোমিকোর সফরের মধ্যেই নাটকীয় আকস্মিকতার সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে সোভিয়েট রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে কুড়ি বছরের "শান্তি, বন্ধু ও সহযোগিতার চুক্তি।" কেউ কেউ অনুমান করেছেন, ভারত-রুশ চুক্তিটা অংশত ওয়াশিংটন-পিকিং সম্ভাব্য বোঝাপড়ার প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু উভয় ঘটনার মধ্যে একটা বড় রকমের পার্থক্যও লক্ষ্য করার আছে। প্রেসিডেন্ট নিকসনের প্রস্তাবিত পিকিং সফরের সংবাদ যদিও আকস্মিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে তা হলেও এই ধরনের একটা পরিণামের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কিছুকাল ধরে প্রকাশ্য প্রস্তুতি চলছিল। কমিউনিষ্ট চীনের সঙ্গে অধিকতর স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করা দরকার, এই নিয়ে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, ব্যবসায়ী মহলে ও সরকারী মহলে কিছুকাল যাবৎ আলোচনা চলছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে ধাপে

পিকিংয়ের সঙ্গে সংলাপ শুরু করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট নিকসন যে সেখানে যাচ্ছেন তার পিছনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে জনমতের চাপ ছিল। কিন্তু ভারত-সোভিয়েট চুক্তি সম্পর্কে সে রকম কোন কথা বলা যায় না। দুই দেশের মধ্যে বর্তমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে যে একটা আনুষ্ঠানিক চুক্তির দ্বারা নথিভুক্ত করা দরকার এবং বিশেষ করে তার মধ্যে প্রতিরক্ষা সম্পর্কে পারস্পরিক সহায়তার একটা প্রতিশ্রুতি রাখা দরকার, এমন কোন দাবী ভারতবর্ষের জনমতের তরফ থেকে ওঠে নি। এমন কি, যে সব দল সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী তারাও কখনও সুনির্দিষ্টভাবে এই ধরনের প্রতিরক্ষা-সম্পর্কিত চুক্তির প্রস্তাব দেয় নি। অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল শ্রীব্রজমোহন কল তাঁর সদ্য-প্রকাশিত বইয়ে যা বলেছেন সেটা বাদ দিলে, আর কারও কথা মনে করা যাচ্ছে না যিনি সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে এই ধরনের একটা চুক্তি করার জন্য প্রকাশ্যে দাবী তুলেছিলেন। অর্থাৎ, এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে যে, এই চুক্তি জনমতের চাহিদার সৃষ্টি নয়, ভারতের পররাষ্ট্র নীতি যাঁরা তৈরি করেন নয়াদিল্লীর সেই উপর মহলের

লোকসভায় বলেছেন, গত বছর দুয়েক যাবৎ বিষয়টি নিয়ে ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে আলোচনা হলেও ব্যাপারটা খুব ভালভাবে গোপন করে রাখা গেছে। এ-রকম একটা কিছু যে হতে যাচ্ছে তার বিন্দুমাত্র আভাষ কখনও পার্লামেন্টে দেওয়া হয়নি, এমন কি, শাসক দলের মধ্যেও বিষয়টি নিয়ে কখনও আলোচনা হয়েছে বলে শোনা যায়নি।

তার মানে অবশ্য এমন নয় যে, এই চুক্তি আমাদের দেশে জনমতের সমর্থন লাভ করে নি। বরং তার উল্টো। পার্লামেন্টে এই চুক্তি বিপুল সমর্থন লাভ করেছে। যেদিন এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেদিনই বিকালে শাসক কংগ্রেস কর্তৃক আয়োজিত দিল্লীর বিশাল এক জনসভায় যোগ দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই সমর্থনের প্রমাণ রেখেছেন।

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি থেকে আরম্ভ করে এ কে গোপালন পর্যন্ত বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মতের মানুষ এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। আসলে, এমন এক সময়ে এই চুক্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে যখন বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারত অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করছিল। এই চুক্তি সেই নিঃসঙ্গতা বোধ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে জেনেই বিভিন্ন দল এই চুক্তি সমর্থন করেছে। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর দিন লোকসভায় পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্বরণ সিং বলেছেন, এমন সময়ে এই চুক্তি হয়েছে যখন এমনকি যাঁরা এর বিরোধিতা করতে চান তাঁরাও জানেন যে, মানুষ এর পিছনে আছে এবং তাঁদের নিজেদের চামড়া বাঁচান দরকার।"

পররাষ্ট্র মন্ত্রী যে খুব ভুল কথা বলেন নি সেটা চুক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। যাঁরা এই চুক্তি সমর্থন করেছেন তাঁদেরও অনেকে হাতে রেখে কথা বলেছেন। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট নেতা এ কে গোপালন বলেছেন যে, একটা সমাজতন্ত্রী দেশের সঙ্গে নিকটতর সম্পর্ক স্থাপিত হল বলে তাঁরা খুশী; কিন্তু চীনের সঙ্গে মিটমাটের কথাটা যেন ভুলে যাওয়া না হয়। এই চুক্তি বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের এক তরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিবন্ধক হয় কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে চান জনসঙ্ঘ নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী, নির্দলীয় নেতা ফ্র্যাংক অ্যান্টনির মতে এই চুক্তির দ্বারা ভারতের জোটনিরপেক্ষতার নীতি বিসর্জন দেওয়া হল এবং সেই কারণে তিনি খুশী; কিন্তু তাঁর আশা, এর ফলে ভারত 'সোভিয়েট কলোনীতে' পরিণত হবে না।

এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে সব প্রতিক্রিয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে স্বভাবত ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থানের যুদ্ধের হুমকি ও সম্ভাব্য চীন-মার্কিণ সমঝোতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। চুক্তির নবম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'চুক্তিবদ্ধ দুই পক্ষের মধ্যে কোন একটি আক্রান্ত হলে অথবা আক্রমণের সম্ভাবনায় বিপন্ন

পূর্ব জার্মানীর পার্লামেন্টারী দল সল্ট লেকে শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করছেন।

সমালোচনা করবেন। এই আলোচনার উদ্দেশ্য হবে ঐ আশঙ্কা দূর করা এবং নিজের এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ও ফলপ্রদ ব্যবস্থা অবলম্বন করা।' ইয়াহিয়া খাঁ ভারতের বিরুদ্ধে যে 'টোটাল ওয়ার'-এর হুমকি দিয়েছেন তার কথা মনে রেখেই কি এই পারস্পরিক আলোচনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে? চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমেরিকা রাশিয়াকে কোনঠাসা করার চেষ্টা করতে পারে, এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই কি রাশিয়া ভারতের সঙ্গে এই ধরনের চুক্তি করতে উৎসাহিত হয়েছে? এই-সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য মনে রাখতে হবেঃ—(১) বছর দুয়েক ধরে এই ধরনের একটা চুক্তির বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল; অতএব আজকের পরিস্থিতিই এই চুক্তির একমাত্র হেতু হতে পারে না। (২) তা হলেও, এই পরিস্থিতির কথাটা যে অন্তত ভারতের দিক থেকে মনে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্বরণ সিংয়ের মন্তব্যে। চুক্তি স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানের সময় তিনি রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'আপনি এমন এক সময়ে সফর করতে এসেছেন যখন পৃথিবীর এই অঞ্চলে আমাদের উভয় দেশের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত ঘটনাসমূহ ঘটছে। এই সব ঘটনা শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুন্ন করতে পারে।' (৩) চুক্তিটি পার্লামেন্টে পেশ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছেন তার এক জায়গায় তিনি বলেছেন 'আমাদের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে কোন কোন শক্তির আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সেই সব শক্তি এই চুক্তির পর তাদের সেই উদ্দেশ্য থেকে নিবৃত্ত হবে।'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে, সোভিয়েট তরফ থেকে এই চুক্তি সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করা হয়েছে সেগুলিতে শুধু ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার চিরাচরিত বন্ধুত্বেরই উল্লেখ করা হয়েছে, ভারত যে পাকিস্থান ও চীন কর্তৃক আক্রান্ত হতে পারে সেই সম্ভাবনার কথাটা সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর দিন গ্রোমিকো যখন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে সওয়া দুই ঘন্টা ধরে কথা বলে বেরিয়ে এলেন তখন সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেন, ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থানের যুদ্ধের হুমকি এবং বাংলাদেশ প্রশ্নের উপর এই চুক্তির প্রভাব কি হবে বলে তিনি মনে করেন। গ্রোমিকো এই বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করে বলেন, পরিস্থিতি এমনিতে জটিল, সেই জটিলতা তিনি আর বাড়াতে চান না।

রাশিয়ার এই সাবধানতার আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে গ্রোমিকোর সফর শেষে যে ভারত-পাকিস্থান যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছে তার মধ্যে। বাংলাদেশ প্রশ্নে এই ইস্তাহারের ভাষা অত্যন্ত সংযত ও কেতাদুরস্ত। পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ শব্দ ব্যবহার না করে ইস্তাহারটিতে পূর্ব পাকিস্থান শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ইস্তাহারে যদিও বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলা হয়েছে তা হলেও সেই সমাধান যে, পূর্ববঙ্গের মানুষের ইচ্ছানুগ হতে হবে তার কোন উল্লেখ নেই, বরং ঐ সমাধান 'পাকিস্থানের সমগ্র জনসাধারণের স্বার্থের অনুকূল হতে হবে' বলে একটা শর্ত দেওয়া হয়েছে—যাতে এই রকম একটা ধারণা সৃষ্টির অবকাশ রাখা হয়েছে যে, পাকিস্থান ভাগ না করেও বাংলাদেশ সমস্যার 'রাজনৈতিক সমাধান' সম্ভব। এই ধারণা নয়াদিল্লীর ইতিপূর্বে ঘোষিত অভিমতের বিরোধী।

পাকিস্থানের পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকর আলি ভুট্টো অবশ্য প্রত্যাশিতভাবেই বলেছেন, 'এটা আক্রমণের চুক্তি। এই চুক্তি পাকিস্থান ও চীনকে আক্রমণ করার জন্য ভারতকে সাহস যোগাবে।' কিন্তু ৯ আগষ্টের চুক্তি ও ১১ আগষ্টের যুক্ত ইস্তাহার মিলিয়ে দেখে এখনই একথা মনে করা যাচ্ছে না যে, এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান দ্রুততর করার ক্ষমতা ভারতের হাতে এসেছে।

এটা খুবই সম্ভব যে, ২০ বছরের মেয়াদে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা চুক্তি শুধু আজকের প্রয়োজন বিবেচনা করে সম্পাদন করা হয়নি, অধিকতর দূরবর্তী কোন লক্ষ্য সামনে রেখে এই চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। যদি তাই করা হয়ে থাকে, তাহলে সেই লক্ষ্যটা কি?

এই প্রশ্নের উত্তর এখনও পরিষ্কার নয়। তবে এটা হতে পারে যে, ভারত জেনে বুঝেই ক্ষমতার বিশ্ব-রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করছে—এবং তা করতে গিয়ে তার জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি একেবারে বাতিল না করলেও তার অনেকখানি সংশোধন করছে। নেহরুর আমলে যে জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির উদ্ভাবন করা হয়েছিল সেটা ছিল শান্তির অবসরের উপযোগী এবং তখন বিশ্ব রাজনীতি মূলত দুই মেরুতে বিভক্ত ছিল। আজ একটা সংঘর্ষের পরিস্থিতির উপযোগী পররাষ্ট্রনীতির জন্য ভারতকে হাতড়ে বেড়াতে হচ্ছে। যে পাকিস্থানের সঙ্গে ভারতকে সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হতে হচ্ছে সেই পাকিস্থান এক-

দিকে চীন ও অন্যদিকে আমেরিকার সাহায্য পাচ্ছে, আবার চীন একই সঙ্গে রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে ও আমেরিকার সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসার চেষ্টা করছে—এই সব কারণেই পরিস্থিতি ভারতের পক্ষে জটিল হয়ে পড়ছে। এর মধ্যেও ভারত কি তার পুরানো জোটনিরপেক্ষতার নীতি আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে? ৯ আগস্টের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী জোর দিয়ে বলেছেন যে, সমালোচকরা যেভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন, (এই চুক্তির ফলে) ভারত তার জোটনিরপেক্ষতার নীতি থেকে বিচ্যুত হয়নি। তিনি বলেন, 'সোভিয়েট ইউনিয়নকে আমরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি, ভারত জোটের রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চায়। সেটা মেনে নেওয়া হয়েছে।' পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্বরণ সিং আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, 'এই চুক্তি আমাদের জোটনিরপেক্ষতার শক্তিকে আরও শক্তিশালী করবে। চুক্তিতে এই নীতির প্রতি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। (চুক্তির একটি অনুচ্ছেদে ভারতের জোটনিরপেক্ষতার নীতির সপ্রশংস উল্লেখ আছে।)......জোটনিরপেক্ষতা একটি গতিশীল নীতি। এই নীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিতে পারে।'
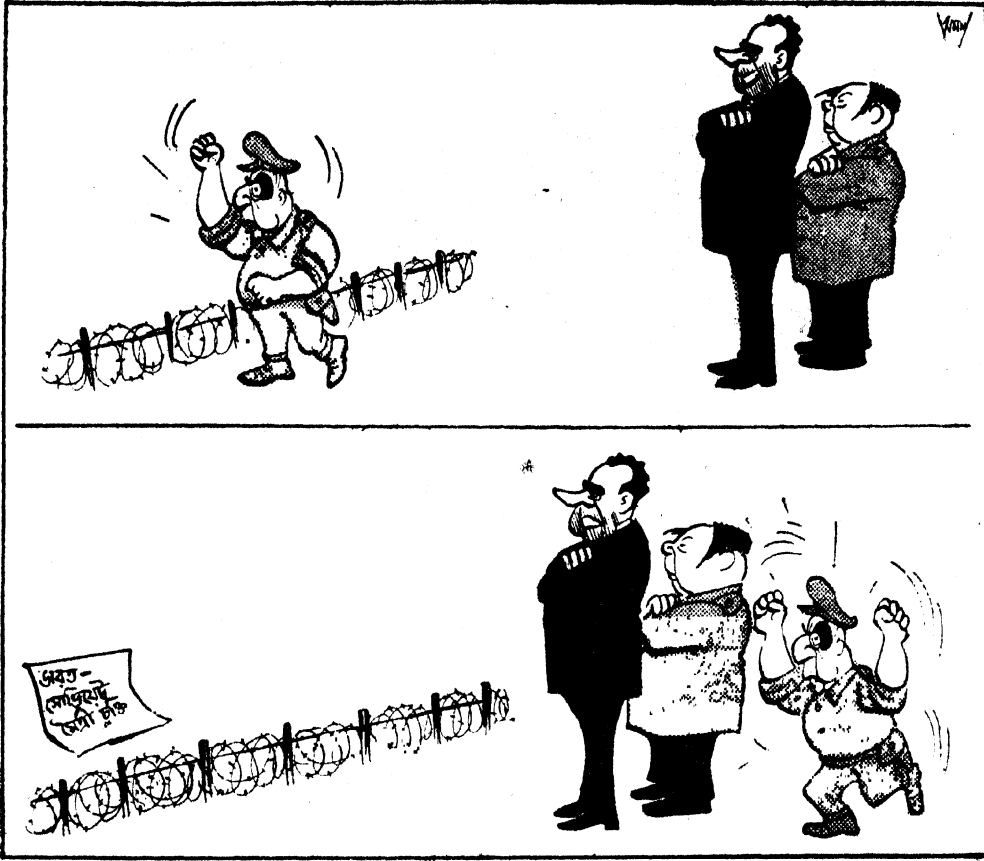
একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, ভারত এর আগে একমাত্র নেপাল ছাড়া অন্য কোন দেশের সঙ্গেই প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত চুক্তি করে নি। নেপালে ভারত ছিল আশ্বাস-দাতা, আর ভারত-সোভিয়েট চুক্তির ক্ষেত্রে [illegible]। অতীতে ভারত এই ধরনের সামরিক সহায়তার আশ্বাস নিতে, বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিগুলির কাছ থেকে নিতে, ভারত অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। আজ তার ব্যতিক্রম হওয়া সত্ত্বেও ভারত জোটনিরপেক্ষতার নীতি থেকে বিচ্যুত হয়নি, একথা যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের যুক্তি হলঃ—(১) এক দেশ আক্রান্ত হলে অন্য দেশ আপনা-আপনিই সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসবে, এমন কোন প্রতিশ্রুতি চুক্তির মধ্যে নেই, শুধু উভয়পক্ষের আলোচনার কথা বলা হয়েছে। (২) চুক্তির ভাষায় এমন কিছু নেই যাতে বোঝাতে পারে যে, এক পক্ষ কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হলে অন্য পক্ষ আপনা আপনি তাতে জড়িত হয়ে পড়বে। (৩) ভারত 'এই অঞ্চলের' অন্যান্য দেশের সঙ্গেও এই চুক্তি করতে রাজী আছে। (৪) সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে একই ধরনের চুক্তি করে মিশর যদি গোষ্ঠীনিরপেক্ষ থাকতে পারে এবং ফিনল্যান্ড যদি 'ইউরোপীয়ান ফ্রি ট্রেড এসোসিয়েশনে' যোগ দিতে পারে তাহলে ভারতই বা এই চুক্তির পর তার স্বাধীন ইচ্ছামতো আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষা করতে পারবে না কেন?

সঠিকভাবে দেখতে গেলে, ভারত তার চিরাচরিত নীতি বিসর্জন দিয়ে কোন জোটের মধ্যে প্রবেশ করল কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত চুক্তির ভাষার মধ্যে পাওয়া যাবে না, চুক্তিটিকে কিভাবে কার্যকর করা হয় তার মধ্যে এর উত্তর পাওয়া যাবে।

চুক্তি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আর দুটি প্রশ্ন হলঃ-অতঃপর ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক ও ভারত-চীন সম্পর্ক কোথায় এসে দাঁড়াবে?

এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভারতীয় পররাষ্ট্র দপ্তর নয়াদিল্লীস্থিত মার্কিণ রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিংকে ডেকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, ভারত-মার্কিণ সম্পর্ক অপরিবর্তিত থাকবে। অন্যদিকে, ওয়াশিংটনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত লক্ষ্মীকান্ত ঝা একজন সাংবাদিককে বলেছেন যে, বাংলাদেশ সম্পর্কে আমেরিকার ভূমিকায় ভারত হতাশ হয়েছে। তিনি এই ইঙ্গিত দিয়েছেন সে, যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে তার তুলনায় এই চুক্তির তাৎপর্য অনেক বেশি, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স সংক্ষেপে শুধু এইটুকু মন্তব্য করেছেন যে, এই চুক্তি শান্তির সহায়ক হবে বলে তাঁরা আশা করেন। ওয়াশিংটন থেকে যতটুকু খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে, এই চুক্তির জন্য সেখানকার সরকার প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা এর তাৎপর্য বুঝে উঠতে সময় নেবেন। তবে, আপাতত এটাকে তাঁদের পরাভব হিসেবেই গ্রহণ করছেন।

নয়াদিল্লীর সরকারী মহল ভারত-চীন সম্পর্কের দিক থেকে এই চুক্তির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে, 'ভারত-চীন সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথে এই চুক্তি কোন বাধা সৃষ্টি করবে না।'

এসব ব্যাপারে চুক্তির প্রভাব সম্পর্কে আপাতত শুধু বলা চলে—ক্রমশ প্রকাশ্য।

১৩-৮-৭১ —পুণ্ডরীক

আমার আনন্দের আর সীমা নেই। অনেক উপরে উঠে এসেছি আমি। মনে হচ্ছে আকাশের যেন প্রায় কাছাকাছি।

জানালায় বসে তাই শিস দিই, আর গান করি। গান করি, আর শিস দিই।

যারা বলে আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই, আমি তাদের দলে না। আমি শেষ পেয়ে গিয়েছি আমার আকাঙ্ক্ষার। এর চেয়ে বেশী উন্নতি জীবনে আর চাইনে।

আনন্দ তাই আমার ধরে না।

অনেক দিনের আশা পূর্ণ হয়েছে আমার। পূর্ণ হয়েছে অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা। দোতলায় ঘর পেয়ে গিয়েছি একটা। জীবনে এই আমার প্রথম দোতলার জীবন। এতে আনন্দ কার না হয়?

মেটে কুঠরি আর কোঠাবাড়ী অনেক দেখা গেছে। সেসব কিছু নতুন না। তারা সকলেই সমতলের সঙ্গে সমতালে বাঁধা। এই সমতলের জীবন ছিল আমার একটানা। তখন সেই নীচু থেকে আকাশের দিকে চেয়ে যে-স্বপ্ন দেখতাম সে-স্বপ্ন আকাশ-স্বপ্নই। স্বপ্ন দেখতাম দোতলায় বাস করার একটা রোমাঞ্চকর জীবনের। নিজেকে মাটি থেকে খানিকটা উঁচুতে টেনে তুলতে না পারলে চারদিক ঠিকমত দেখাই হয় না।

ঠিক কি-কি জিনিস যে দেখা বাদ পড়ে যায় তা অবশ্য জানিনে, তা অবশ্য বলতে পারিনে। কেবল এইটুকু বুঝি যে-সমতলের এই নীচু জীবনটা কিছু না।

তাই উঁচুতে উঠে এসেছি আমি। বেশি উঁচু না হলেও এই সামান্য উঁচুটুকুই আমার কাছে অসামান্য। যারা আরও উঁচুতে—তিনতলায় বা চারতলায়—বাস করে, আশ্চর্যই লাগে আমার, তাদের দেখে হিংসে হয় না এতটুকু। কিন্তু আমার আগে যারা দোতলায় বাস করত তাদের আমি মনে করতাম সম্রাট।

আমি এখন হয়েছি সেই সাম্রাজ্যের অধিকারী। আর কোন আক্ষেপ আমার নেই। আমার জীবনের একটা ভীষণ স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে।

তাই আমি দোতলার এই জানালায় বসে মনের আনন্দে শিস দিই, আর গান করি।

আমি নিজেই নিজের এই আনন্দের রকম দেখে হেসে মরি আর-কি। এমন আনন্দও আমার ছিল, মনের মধ্যে এমনভাবে চাপা ছিল—এইটেই আমার বিস্ময়।

আকাশের দিকে তাকাতে ভুলে গেছি এখন। এখন আমি মাটির দিকে চেয়ে দেখি সকলকে। দূরের ঐ মাঠ পার হয়ে হেঁটে গেছি কতদিন কতবার। সে-মাঠ যে অমন আড়াআড়িভাবে পায়ে-হাঁটা-পথ দিয়ে দু ভাগে ভাগ করা, তা চোখে পড়ে নি। এখন দেখি, আমারই ভূতপূর্ব জীবনের কোন সহচরই হয়তো ওই হাঁটাপথে ওই হেঁটে চলেছে একা-একা। করুণা হয় ওর কথা ভেবে। ও জানে না, ও বুঝতেই পারছে না—সাদা সিঁথির মত কি রকম একটা পরিচ্ছন্ন পথ ধরে ও চলেছে।

এখান থেকে যা দেখি তাই কেমন ভাল লাগে। ওই পানা-পুকুরটাও। ফ্রক-পরা তিনটি মেয়ে কলার ভেলা বুকে নিয়ে ওই সাঁতার কাটছে জলে। এমন কী মধু আছে ওই সাঁতারে? তবু কেমন ভাল লাগে সব। এক-একবার কেমন ইচ্ছে করে—ঝাঁপ দিয়ে পড়ি গিয়ে ওদের মধ্যে। সারা গায়ে পানা মেখে সং সেজে কি আরামই যেন পাব বলে মনে হয়। বসন্তের সবুজ গুটিকার মত সর্বাঙ্গে পানার দাগ এঁকে জীবনে নতুন বসন্ত আনতে যেন ইচ্ছে জাগে।

একদিন সত্যিই জাগল এই বসন্ত। জানালায় ব'সে শিস দিচ্ছি আর গান করছি, অমনি কোন্ গাছের পাতার আড়াল থেকে কে যেন শব্দ করে উঠল—কুউ।

তিনবার শুনলাম ঐ শব্দ। আমি তাকাতে লাগলাম এদিকে আর ওদিকে।

কিছু দেখতে পেলাম না। আমার ঠোঁটের শিস আর গলায় গান বন্ধ হয়ে গেল। কেবল দুটো চোখ ছটফট করে বেড়াতে লাগল চার ধারে।

দোতলার জীবনে উঠে এসে জীবনের যে চরম শান্তি লাভ করেছিলাম, সামান্য ওই একটা শব্দে সেই শান্তি গেল উধাও হয়ে।

চারদিকে তাকিয়ে দেখি কত ঘর-বাড়ী। কোনোটা একতলা, কোনোটা দোতলা, কোনোটা-বা তিন-চারতলা। কোনো বাড়ির কোনো জানালায় কাউকে দেখতে পাইনে। উঁচু-জীবনের সঙ্গে তারা নিশ্চয় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে তাই তারা আমার মত এমন উৎকট আনন্দে আত্মহারা হয়ে জানালায়-জানালায় এসে বসে নি।

আমার গান বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এবার প্রাণ হয়ে উঠেছে উন্মুখ ও উদাস।

ওই শব্দটার কথা ভাবি। আরও কয়েকবার শুনেছি ওই শব্দ। আশ্চর্য হয়েছি—যখনই আমি জানালায় গিয়ে বসি ঐ শব্দটা কেন-যেন তখনই বেজে ওঠে। অন্য সময় ঐ শব্দটা তো শুনিনে।

কোকিলের ডাকের সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে। প্রথমে ঐ শব্দটাকে কোকিলের গলা বলেই ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু বার-কয়েক ওই শব্দ শুনে কেন-যেন মনে হল—এ শব্দ কোকিলের কণ্ঠের নয়, এ শব্দটা নিশ্চয় অন্য কোন জীবের গলার।

মনের কথা অকপটে খুলেই বলি—আমার মনে হল, এ শব্দ নিশ্চয় কোন কোকিলকণ্ঠীর।

কিন্তু কে সে? কেন সে অমন শব্দ করে ডেকে ওঠে? ইচ্ছে করে জানালায় গিয়ে বসি, কিন্তু সেই সঙ্গে মনের মধ্যে ভয়ের শিহরণও অনুভব করি—আমি জানালার কাছে যাওয়া মাত্র যদি আবার কানে আসে ওই শব্দ!

জানালার ঠিক কাছে না গিয়ে একটু তফাতে থেকে চুরি ক'রে-ক'রে দেখি চার ধার। দুটো বাড়ি পরে একটা ছাতে রোজ ঠিক এই সময়ে বাচ্চাদের জামা আর ফ্রক মেলে দিতে আসে মাঝবয়সী একটা বউ। দুটো বাঁশের সঙ্গে তার বাঁধা—জামা-ফ্রকে ভরে যায় সেই তার। কতগুলো বাচ্চা যে আছে ওই বউটির, জামা গুনে-গুনে তাই হিসেব করার চেষ্টা করি। আর দেখি, আরো দূরে চিলেকোঠা ডিঙিয়ে মাথা তুলে আছে নারকেল-গাছের কতকগুলো ঝালর-দার পাতা। চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে এসে তেতলার ছাতে পায়চারী করেন এক বৃদ্ধ। আর-এক পা এগিয়ে আলগোছে উঁকি দিয়ে দেখি আমার এই দোতলা-বাড়িটার দেয়াল-ঘেঁষা পেয়ারা-গাছটা। দুটো শালিক তার ডালে বসে ঝগড়া করছে। আমার দিকে একবার তাকিয়েই পাখি-দুটো পালিয়ে গেল। আর একটু এগোলাম, পেয়ারাগাছের গা থেকে যেন মরা চামড়া উঠছে, তার ডালে কচি-কচি কয়েকটা ফল ধরেছে। কিছুক্ষণ দেখার পর অতিসন্তর্পণে আর-এক পা এগোলাম।

একটু দম নিয়ে আবার আর-এক পা যেই এগিয়েছি অমনি আচমকা বেজে উঠল সেই শব্দ।

খেয়াল ছিল না — আমি আমার অজানিতে একেবারে পৌঁছে গিয়েছিলাম জানালার গায়ে। শব্দটা শোনা মাত্র বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল, আমি এক লাফে পিছনে সরে এলাম।

কিসের ঐ শব্দ? আমার এত সাধের দোতলার জীবন এমনভাবে বিপন্ন করে তুলেছে যে-শব্দ, সে-শব্দ কার? — কার গলার?

ঘরের মেঝেতে চুপ করে মাথা নীচু করে বসে পায়ের নখ খুঁটতে-খুঁটতে কতক্ষণ যে ঐ গবেষণা করেছি জানিনে। যখন মাথা তুলে তাকালাম, তখন দেখি পেয়ারাগাছের মগডালে পড়ন্ত দিনের নিভন্ত রোদে বসে চারটে কাক থেকে-থেকে ডেকে উঠছে। তাদের ঐ কর্কশ গলার আওয়াজে কোন আতঙ্ক বোধ করলাম না। কিন্তু মন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল যে সুদূরে নেপথ্যদেশ থেকে সত্যিকারের কোকিল পঞ্চমে কূজন করে ওঠে, সেই সুদূরে অজানা দেশের উদ্দেশ্যে উড্ডীন হল সারা মন।

আমার এই দোতলার জীবন বাসী হতে চলেছে। তার সমস্ত সুগন্ধ উধাও হয়ে গেছে, তার সমস্ত রোমাঞ্চ নিঃশেষ হয়েছে এখন কেমন-যেন বিস্বাদ ঠেকছে এই জীবনটা। এক-এক সময় মনে হয়, আগেই ভালো ছিলাম ওই সমতলের দেশে। সেখানকার জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া গিয়েছিল। এখন, সেখান থেকে নিজেকে তুলে নিয়ে আসায় জীবনের তাল যেন কেটে গিয়েছে একেবারে।

তাই, ইচ্ছে করে চলে যাই। এই সাধে আর এই স্বপ্নে কাজ নেই আর। কিন্তু সাধ নয়, স্বপ্ন নয়, আমি বাঁধা পড়ে গেছি কি-এক মায়ায়।

আপনারা বলতে পারেন এটা মাথা-খারাপের লক্ষণ ছাড়া কিছু না। আপনাদের এ অনুমান ভুল না হতে পারে। আমার নিজেরই এক-এক সময় এমন সন্দেহ হয়েছে। কিন্তু নিজেকে পাগল বলে ঘোষণা করতে পারি নি। নিজের পাগলামি নিজেই যদি ভালো-মত ধরতে পারতাম তাহলে সে পাগলামি কবে ভাল হয়ে যেত।

কয়েক দিন জানালার ধারে যাই নি। সেদিন জানালার কাছ থেকে পালিয়ে আসার পর থেকে অনেকগুলি দিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু আমি বুকের মধ্যে একটা ভীষণ মায়া আঁকড়ে ধরে পড়ে আছি। অনেক দিনই হয়ে গেল—ওই শব্দটা শোনা হয় নি আমার। জীবনটা তাই কখনো-কখনো নোনা-নোনা ঠেকে।

ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে অনেক রাত্রে একদিন মরীয়া হয়ে গিয়ে বসলাম জানালায়। পেয়ারাগাছের পাতায় হাওয়া লেগেছে—পাতাগুলো একটু-একটু কাঁপছে। গাছটার ওপারে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা অন্ধকার। দূরের সেই চিলেকোঠায় মিট-

মিট করে জ্বলছে একটা আলো, চৌকো জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সেই আলোর রেশ মাত্র।

অনেকক্ষণ বসে আছি এইভাবে। ভয়ের ভাবটা যেন কেটেছে। আমি আমার অজানিতেই গুন-গুন করতে আরম্ভ করলাম। ভয় আরো কেটে গেল। গলা আর একটু ছেড়ে অনেকদিন বাদে এই জানালায় বসে ধরলাম একটা গান।

দু চরণও গাওয়া শেষ হয় নি, অমনি আবার কানের যেন একেবারে পাশেই হঠাৎ বেজে উঠল সেই কুহু-ধ্বনি।

চমকে উঠলাম। ছিটকে সরে এলাম জানালার কাছ থেকে। অমনি শুনলাম একটা হাসির শব্দ। কে-যেন ব্যঙ্গ করল আমাকে।

চাপা গলায় ফিসফিস শব্দে জিজ্ঞাসা করলাম—'কে তুমি, কে তুমি?'

জবাব না পেয়ে আবার জানালার কাছে গেলাম, বললাম, 'কে তুমি?'

জবাব না পেয়ে আবার বললাম, 'এ কী মায়া!'

পেয়ারা-গাছের গোড়ার দিক থেকে যেন সাড়া এল, কে যেন বলল, 'মায়া না। আমি মমতা।'

ঐ গলার স্বর অনুসরণ করে আমি শব্দের উৎসটা খুঁজতে লাগলাম। অনেকক্ষণ খোঁজার পরে নীচে ওই প্রাচীর-ঘেরা বাড়িটার জানালায় দেখতে পেলাম একটা ছায়া। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছায়াটা।

রোমাঞ্চে সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল।

সাধের দোতলার জীবন সাধনার পীঠ-স্থান হয়ে উঠল এক নিমেষে।

উঁচু প্রাচীরের নেপথ্যে এমন যে একটা মমতার জগৎ ছিল, যদি সমতলের জীবনেই নিজেকে বেঁধে রাখতাম, তাহলে সেই জগতের সাক্ষাৎ পেতাম না কখনোই। এই জন্যে দোতলাকে নূতন ক'রে ভালো লাগল এখন। কত প্রাচীরের কত নেপথ্যে যে এমনি এক-একটা মমতাময়ী লুক্কায়িত আছে—বসে-বসে তাই ভাবি।

এখন আমার জীবন নতুন স্বাদে সুস্বাদু হয়ে উঠেছে। এখন প্রকাশ্য দিবালোকে আমি জানালায় গিয়ে আর বসি নে। আমাদের দু-জনের মধ্যে কেমন-যেন একটা বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে। আমরা এখন রাত্রের ঘন অন্ধকারের আড়ালে বসে আলাপ করি।

আমি বলি, 'তোমার নাম মমতা। আমার নাম নিশ্চয় তুমি জানতে চাও। কিন্তু এতদূর থেকে বলব না। কাছে গিয়ে বলে আসব একদিন।'

উত্তর দেয় না। ভীষণ আনন্দ হয় নিশ্চয় ওর। কেমন অস্বাভাবিক শব্দ করে হাসে।

যেদিন প্রথম আমি ওকে স্পষ্ট দেখলাম [illegible]

জ্যোৎস্নার স্পষ্ট আলো গিয়ে পড়েছে ঐ জানালায়, আমি দোতলা থেকে চেয়ে দেখলাম ওকে ঐ আলোয়। শুকনো গুঁড়ো-গুঁড়ো চুল ফুরফুর করে উড়ছে হালকা বাতাসে। উপরের দিকে চেয়ে ও হাসল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

ঐ মুখ, ঐ চোখ আর ঐ হাসি দেখে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। নিজেকে অসীম সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান বলে স্বীকার করলাম।

প্রাচীরের অন্তরালবর্তিনী ঐ বন্দিনীকে উদ্ধার করার জন্যে বীরত্ব জেগে উঠতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ কোনো ঝুঁকি না নিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

একদিন বললাম, 'আমি গান গাইলে তুমি অমন ব্যঙ্গ কর কেন।'

উত্তর পেলাম না। হাসির শব্দ পেলাম।

বললাম, 'তোমার গলা এমন মিষ্টি, তোমাকে আমি কী বলি জান?—কোকিলকণ্ঠী। তুমি গান গাওনা কেন!'

উত্তর দিল না। আবার হাসল।

বুঝতে পারলাম—কথা বলার অসুবিধে ওর আছে। কেউ শুনে ফেলতে পারে।

ও না হলে আমার জীবন যে ব্যর্থ হয়ে যাবে, ক্রমশ আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল। সেই সঙ্গে অনুমান করতে পারলাম, আমার সম্বন্ধেও ওই ধারণা ও-ও লালন করে।

আমাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা অল্পদিনের মধ্যেই নিবিড় হয়ে এল। গভীর রাত্রে প্রত্যহ আমাদের এইভাবে দেখা সাক্ষাৎ চলেছে।

একদিন বললাম, চারদিক তো নিঝুম নিঝুম। আমি আসব তোমার কাছে? প্রাচীর আর কতটুকু, ডিঙিয়ে ঠিক যেতে পারব। বলো, আসব?'

কোনো উত্তর দিল না। হাসল।

'আসছি কিন্তু!'

আবার হাসল। এর চেয়ে ভালোভাবে আর কী করে ডাকা যায়?

তার এই অনুমোদন পেয়ে আমি নীচে নামলাম।

ধীরে ধীরে পেয়ারা গাছের ডালে পা দিয়ে উঠলাম প্রাচীরে। দেখলাম, জানালায় ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

প্রাচীর থেকে লাফ দিয়ে পড়লাম ওপারে। এই শব্দে কেউ জেগে উঠল না তো? একটু দাঁড়ালাম। শব্দ করে হেসে উঠল মমতা।

আমি ধীরে ধীরে তার কাছে গেলাম। জানালার গরাদে ধরে দাঁড়ালাম, বললাম, 'মমতা!'

আমি এ কী! বিকট চীৎকার করে উঠল সে, বীভৎস অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল সে। সেই ভয়ংকর শব্দের সঙ্গে বেজে উঠল যেন লোহার শেকলের শব্দও।

হতভম্ব হয়ে গেলাম আমি। আমি জড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম নিশ্চল মূর্তির মত।

ওদের বাড়ির সকলে জেগে গেল, ঘরে-ঘরে চটপট জ্বলে উঠল আলো। সেই আলোয় আজ প্রথম তাকে এত স্পষ্টভাবে দেখলাম। দেখলাম, লোহার শেকল ওর দুই পায়ে পরানো। এই বন্দিনীকে উদ্ধার করতে এসে আমি ধরা পড়ে গেলাম।

এর পরের কথা আমার মনে নেই। সাত বছর বাদে কাল আমি ছাড়া পেয়েছি। আমার মাথা নাকি একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছিল, একেবারে বদ্ধপাগল হয়ে গিয়েছিলাম নাকি। এতদিন একটানা চিকিৎসার পর এবার নাকি সুস্থ হয়েছি। এখন আমার আচরণ নাকি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তাই মুক্তি পেয়েছি আমি।

ভাবছি, চিকিৎসা করলে যদি এ রোগ সারে, তাহলে আর একজনের ব্যাপারে চিকিৎসার ব্যবস্থা হল না কেন। এখনো কি তার জন্যে কিছু করা যায় না? তার পায়ের শেকল কেটে মুক্তি দেওয়া যায় না তাকে?

সবই নিছক ভাবনা। সে এখন কোথায় বা কেমন আছে, তা অবশ্য জানিনে।
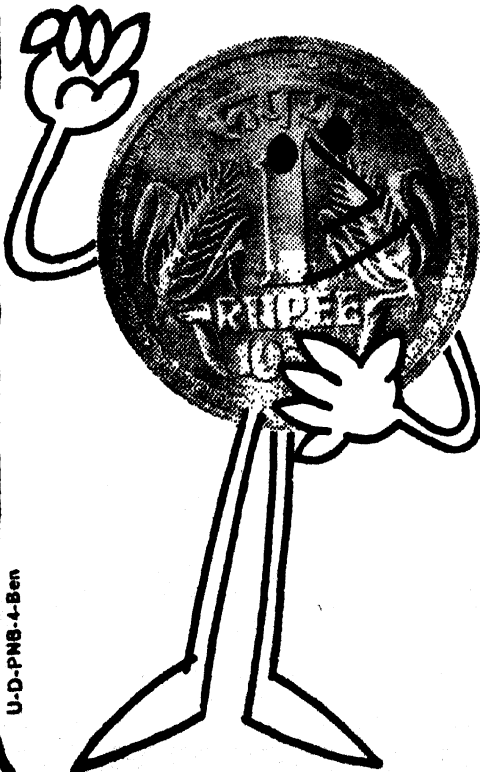
সুন্দরী 'মানা' ভয়ঙ্করী

বিশ্বদেব বিশ্বাস

"সাব্ ডায়ারী লিখো,—ডায়ারী লিখো। —হাম্ লোক্ সব কই খতম্ হো গিয়া।" —ঝড়ের বেগে তাঁবু ঠেলে ঢুকে পড়ল শেরপা নরবু। উন্মত্তপ্রায় প্রবীণ শেরপা কুকুরের মত হাঁপাচ্ছে, আর বলছে, —'হাম্ লোক্ খতম্ হো গিয়া।' তার দৃঢ় ধারণা আমরা আর বাঁচব না।

তাই এই ডায়েরি লেখা।

এই ডায়েরি মানা অভিযানের দলপতির দিনলিপি নয়। কোন সেনানায়কের সমর-সজ্জার সচিত্র পরিকল্পনাও নয়। এক পর্বতারোহী লিখছে তাদের দলের অন্তিম-ক্ষণের এক করুণ কাহিনী। প্রকৃতির রুদ্র রোষের ক্রমাগত নির্যাতনের এক নিষ্ঠুর প্রতিচ্ছবি। ২৩ হাজার ফুট উঁচুতে মৃত্যুর কোলে শুয়ে শেষ সময়ের অপেক্ষায় থেকে দলের দলপতি লিখছে তার পার্থিব জীবনের শেষ লিপি। তাদের অভিযানের সাল-তামামী। এই লিপি কোন দিন মর্তলোকে পোঁছবে কিনা তা আমি নিজেই জানি না। যদি পোঁছায়,—যখন পোঁছাবে, তখন আমরা হয়ত ইহলোক ছেড়ে পরলোকের পথে পাড়ি দিয়েছি।

কাহিনীর সুরু কলকাতাতেই। একের পর এক পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কাহিনী চরম মুহূর্তের দিকে এগিয়েছে।

সুরু থেকেই প্রকৃতির বহুবিধ প্রতি-রোধ। একের পর এক আক্রমণ আর আঘাত দিয়েই প্রকৃতি বুঝি অভিযানের সংগঠনের সুরুতেই আমাদের শেষ করে দিতে চেয়েছে। দলের সবাই দুর্ধর্ষ, মরিয়া। তাজা প্রাণের উপঢৌকন নিয়ে দুর্দমনীয় তেজে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করেছে। প্রবল পরাক্রমে সকল প্রতিরোধ একের পর এক অতিক্রম করেছে। সকলের দুর্নিবার আকাঙ্খা,—শেষ অবধি চড়ব, জিতব,—মানায় সফল হব,—শীর্ষে উঠব,—প্রাণের বিনিময়েও।

'মানা' শেষ পর্যায়ে এই দামাল মরিয়া-গুলোকে নিরস্ত্র করতে তার তূণের মারাত্মক অস্ত্র ছেড়েছে। জানি না,—পরিণতি কি? ঐ অস্ত্রের আঘাতে আমাদের অবলুপ্তি না মোহমুক্তি? সবাই এখন পরিশ্রান্ত, রণক্লান্ত। শক্তি সামর্থ্যের শেষ সীমায় এসে পোঁছে গেছে।

উত্তর-গাড়োয়াল হিমালয়ে উদ্ধত শীর্ষ 'মানা' (২৩,৮৬০ ফুট) আপন সৌষ্ঠবের আড়ম্বরে মহীয়ান। সুন্দরী গরবিনী। যেন 'ছুঁয়োনার' নিষেধ ঘেরা আলেয়া। ফ্রাঙ্ক স্মাইথ নামে এক বৃটিশ, আজন্ম হিমালয় অনুসন্ধানী পরিব্রাজক, দক্ষ পর্বতারোহীও। তিনি ১৯৩১ খৃঃ 'কামেট' (২৫,৪৪৭ ফুট) অভিযানে এসে 'মানা'-র নিরাবরণ উত্তর-গাত্রের দিকে নজর দিয়ে চমকে উঠে-ছিলেন। চোখধাঁধানো রূপ। জীবন্ত আকর্ষণ। স্থির থাকতে পারেন নি। কাছে যাওয়ার উদগ্র বাসনায় পথের অনুসন্ধানে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ শেষে ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখে, 'অসম্ভব', 'আলেয়া',—এই আখ্যা দিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু মানার উগ্র রূপের মোহিনীমায়া কাটাতে পারেন নি। সুস্থির থাকতে না পেরে আবার ফিরে এলেন ১৯৩৭ খৃঃ। —এবার ভিন্ন পথে। 'দক্ষিণ-গাত্র'-পথে। সফলও হলেন শেষ অবধি একা। তারপর এই সুদীর্ঘ ২৪ বছরে অন্য কেউ মানার কোন পথে আসে নি। উত্তর-পথে ত সাহসই করে নি।

ছেলেবেলা থেকেই মা বলতেন, আমার যেন সৃষ্টিছাড়া স্বভাব। সকল স্বাভাবিক কাজেই আমার কি রকম অনীহা। যে কাজে লড়াই আছে সে কাজেই নাকি আমার উৎসাহ দ্বিগুণ, ছেলেবেলার একটি ঘটনা মনে পড়ছে। একদিন স্কুল পালিয়ে আম পাড়তে গিয়েছিলাম বিরাট এক গাছে উঠে। হঠাৎ ডাল ভেঙে পড়ে গেলাম। ভীষণ আঘাত লাগল। সর্বাঙ্গ দিয়ে অঝোরে রক্ত ঝরতে থাকল। গায়ের জামা-প্যাণ্ট রক্তে লাল হয়ে গেল। বাড়ীতে বকবে এই ভয়ে পাশে এক পুকুরে ডুব দিলাম,—মতলব, রাতের অন্ধকারের আড়ালে বাড়ী ঢুকে পড়ব। কেউ কিছু দেখতে পাবে না। দাদু খবর পেয়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এতটুকু বকেন নি। ডাক্তার ডেকে পাঠিয়ে শুধু বলেছিলেন,—'অসাবধানতার ফল।'

আর একদিনের অনুরূপ ঘটনা। অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে ভূত দেখতে গিয়ে-ছিলাম। পাড়ায় একজনকে ভূতে ধরেছিল। রোজা এসে বলল, অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে ভূত ভোজন না করালে ভূত ছাড়বে না। বিশ্বাস করি নি। তখনকারের শিশুমনেও কেমন যেন ঘটনাটাকে নিছক মিথ্যা বলে মনে হয়েছিল। রোজা বলল, বিশ্বাস না হয় আমার সঙ্গে গিয়ে দেখতে পার। তার ধারণা, ভয়ে কেউ যাবে না। আমি চুপি চুপি লুকিয়ে গিয়েছিলাম। যাবার আগে আমার তখনকারের খেলার বান্ধবী জানতে পেরে গিয়েছিল। সে অনেক কান্নাকাটি, কাকুতি-মিনতি করেও যখন আটকাতে পারল না তখন আমার পায়ে ভীষণ জোরে কামড়ে দিয়েছিল। ব্যথা পা নিয়ে যাতে শ্মশানে যেতে না পারি। মা শুনে খুব কান্নাকাটি করেছিলেন। দাদুও টের পেয়ে গিয়েছিলেন। ফিরে এলে,—এতটুকু বকেন নি,—শুধু বলেছিলেন, —'সাহস ভাল,—তবে এরকম মিথ্যা বাজে কাজে নয়।' —আমার মার ধারণা ছিল,—কোনদিন জঙ্গলে, পুকুরে, কি আগুনে আমার কপালে নাকি অপঘাতেই মৃত্যু আছে। —কিন্তু আমার দাদু ও আমার বাবা কোন সময়ের জন্য নিরুৎসাহ করেন নি।

আমার ছেলেবেলার বেয়াড়া স্বভাব বড় বয়সেও থেকে গেছে। আজ এই পর্বত অভিযানের স্পৃহার পেছনে ছোট বয়সের সেই দস্যিপনাই প্রেরণা জুগিয়েছে। তাই-ত

বরফ প্রাচীর আরোহণ

মানা শীর্ষের উদ্দেশে

'মানা'-র উত্তর-পথ 'ভয়ঙ্কর', 'অসম্ভব'—এই বলে দক্ষ পর্বতারোহী স্মাইথ যখন ছেড়ে দিয়েছে তখন সেই ভয়ঙ্করকে প্রত্যক্ষ করতে হবে এই দুষ্টুবুদ্ধি মাথায় চেপেছে। অসম্ভবকে দেখব, ভয়ঙ্করের সঙ্গে লড়াই করব এই উৎসাহ। জগতে দামাল ছেলের অভাব কোন সময়ই নেই। কলকাতা শহরে এসে দেখলাম আমার মত কতশত দাঁসা ছেলে প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। বেপরোয়া। তাদেরই কয়েকজনা আমাদের মানা অভিযানের সঙ্গী।

১৫,৭০০ ফুট থেকে ২১,০০০ ফুট। মূল শিবির থেকে চতুর্থ শিবির। ভাল-মন্দ, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেছি। পথ এক-রকম ছিল। সহজ স্বাভাবিক না হলেও দুরূহ দুর্গম নয়। এ পথে চরম কষ্ট ছিল কিন্তু প্রাণের ঝুঁকি ছিল না। চতুর্থ শিবিরের পর প্রকৃত ভয়ঙ্করের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালাম। চমকে উঠলাম। স্মাইথের আখ্যা দেওয়া জীবন্ত অসম্ভব। মানার উত্তর প্রাচীর। যেন বিরাট এক দৈত্য উদ্ধত মাথায় দাঁড়িয়ে আছে,—এক দুর্লঙ্ঘ কঠিন শ্বেত স্তম্ভ।

ক্ষণিকের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। পারব কি? চতুর্থ শিবির পর্যন্ত পৌঁছতেই আমাদের শক্তি, সামর্থ্য, সম্পদের সবটুকুই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সুরু থেকেই প্রকৃতির এত বাধা, এমন সব অকল্পনীয় আক্রমণ অমাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে যার সঙ্গে লড়াই করতে করতে আমরা সর্বস্বান্ত। সাধারণ একটা বড় অভিযান শেষেও এত বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। হলে,—অনেক আগেই অভিযান গুটিয়ে ফেরৎ আসে এমন নজির অজস্র আছে।

হরিদ্বার থেকে যোশীমঠ। এই সুদীর্ঘ ১৭০ মাইল পথে বাস চলে। ভাগ্যের পরিহাসে অকাল বর্ষণে এই বাস চলা পথ যত্রতত্র ভেঙেছে। যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। অসহায় হয়ে কখনও পথে বসেছি দিনের পর দিন। কখনও অভিযানের রসদ পিঠে ফেলে সমানে হেঁটেছি। বহু দিন আহার জোটে নি, অনাহারে দিন কাটিয়েছি। শোয়ার আস্তানা জোটে নি, বসে থেকেছি সারা রাত্রি। সমানে বৃষ্টিতে ভিজেছি। গায়ের জল, ভেজা পোষাক গায়েই শুকিয়ে গেছে। তথাপি নিরুপায় নিরুৎসাহ হয়ে ক্ষান্ত দেই নি।

আমাদের এই ১৯৬১ খৃঃ মানা অভিযানের শেরপা সর্দার আংশেরিং,—সাক্ষাৎ মৃত্যুঞ্জয়। অত্যন্ত ধীর, স্থির, প্রাজ্ঞ এক পর্বত শার্দূল। ১৯৩৪ খৃঃ এক জার্মান দলের নাঙ্গাপর্বত অভিযানে আংশেরিং ছিল অন্যতম মূল শেরপা। সেই দল যখন নাঙ্গা শীর্ষের প্রায় শেষ বরাবর এসে গেছে তখন হঠাৎ এক বিপর্যয় দেখা দিল। আংশেরিং সহ দশজন তখন পাহাড়ের উচ্চ স্থানে। বিপর্যয়ের মুখে পড়ে সেই দশজনের ন'জন মারা গেল। আর মৃতকল্প আংশেরিং একা জীবন্ত ফিরে এল,—সাতদিন বিনা আহারে বিনা পানীয়ে কাটিয়ে। সেই আংশেরিংও আমাদের এই মানা অভিযানে এসে আহত হয়েছে। বুকের হাড় ভেঙে গেছে। তাকে দ্রুত নিচে বেসক্যাম্পে ডাক্তারের কাছে পাঠান হয়েছে। নচেৎ বুকে জল জমে মারা যাবে।

আর এক বলিষ্ঠ বিচক্ষণ শেরপা আজীবা। সম্পর্কে আংশেরিং-এর ভাই। ১৯৫১ খৃঃ ফরাসী অভিযাত্রী দলের ঐতিহাসিক অন্নপূর্ণা অভিযানে যশস্বী। সেই আজীবাও শ্রান্ত, ক্লান্ত, নিঃশোণিত হয়ে নিচে নেমে চলে গেছে ডাক্তারের কাছে।

দিলীপ দলের শ্রেষ্ঠ আরোহী। অত্যন্ত কর্মক্ষম দুঃসাহসী। ১৯৬০ খৃঃ ভারতের প্রথম বেসামরিক অভিযান নন্দাঘুন্টির শীর্ষে উঠে বাংলার পর্বত অভিযান ইতিহাসের সূচনা করেছিল। দিলীপ আমাদের দলের এক বড় সম্পদ। সে যেন দিলীপকে 'মানা' তার সমস্ত জীবনীশক্তি নিঙড়ে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। তাকেও বেসক্যাম্প ডাক্তারের কাছে ফেরৎ পাঠান হয়েছে।

দলের সহ-নেতা, আমার অন্যতম প্রধান সহকারী নিমাই অভিযানের উচ্চ পর্যায়ের এক মূল্যবান মস্তিষ্ক। সেও অসুস্থ।

বৈজ্ঞানিক শরদিন্দু বসু তাঁর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষণের কালে সহসা ঠাণ্ডায় জমে শেষ হয়ে যাচ্ছিলেন। তাকেও কোনক্রমে বাঁচিয়ে নিচে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ডাক্তারের কাছে।

এমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে রীতিমত চিন্তিত হয়েছিলাম,—পারব কি? স্মাইথের আখ্যা দেওয়া সেই,—'অসম্ভব,—ভয়ঙ্কর!' পরক্ষণেই আবার উদ্দীপ্ত হয়েছি। গগনচুম্বি 'মানার' উদ্ধত চ্যালেঞ্জ শ্বেত গম্বুজের দিকে তাকিয়ে আপন মনেই বলে উঠেছি,—

(Just wait the old thing, ye'll get you yet" ।

কোন কিছুই আমাদের পথরোধ করতে পারে নি। যেমন আমার শিশু বয়সের স্কুলের সহপাঠী পায়ে কামড়ে দিয়েও শ্মশানে ভূত দেখতে যাওয়া আটকাতে পারে নি!

সব বাধা উপেক্ষা করে মদন ও গৌরাঙ্গকে দিয়ে একটা দল পাঠিয়েছিলাম,

মানা শীর্ষ ২৩,৮৬০ ফুট
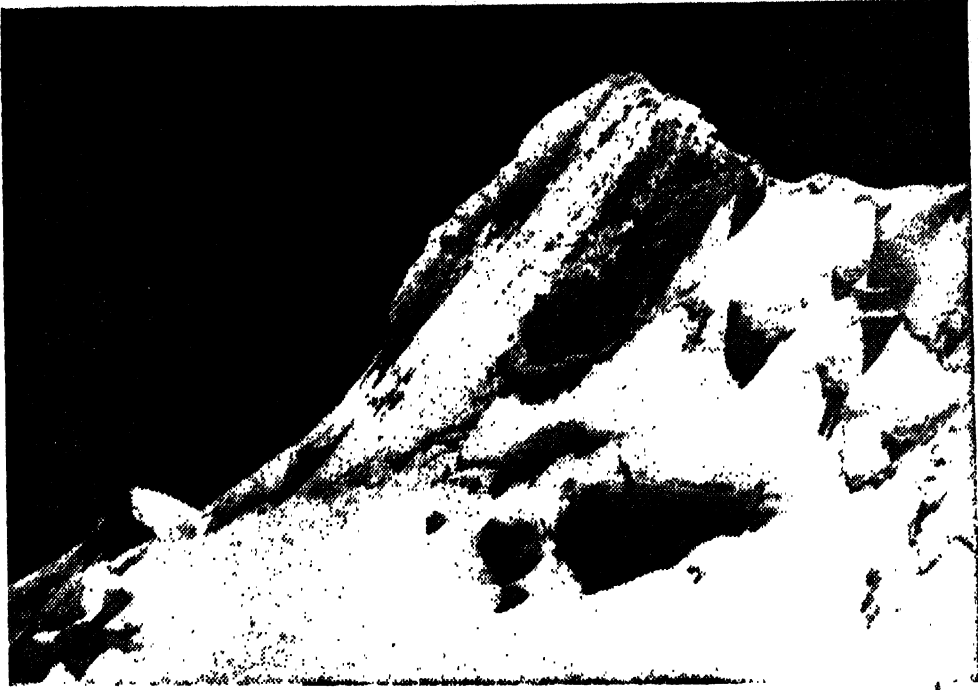
—শীর্ষে উঠবে। ওরা বিফল হয়ে ফিরেছে আর বিহ্বল হয়ে স্মাইথের মতেই সমর্থন জানিয়েছে,—উত্তরের পথে মানা শীর্ষ প্রকৃতই অলঙ্ঘ্য, অনারূঢ় অসম্ভব,—ভয়ঙ্কর। জটিল, কুটিল হিমবাহের মাথায় ঝুলন্ত কার্নিশগুলো যেন মুখব্যাদন করে দাঁড়িয়ে আছে, টন টন ওজনের বরফের চাঁই। যে কোন মুহূর্তে ধ্বসে পড়ে সব নিশ্চিহ্ন করে দেবে। —জীবন্ত চ্যালেঞ্জ, সাক্ষাৎ মৃত্যু।

আমার ছেলেবেলার সেই বদস্বভাব আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেই আমার বিশেষ সত্তা উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তখন মৃত্যুভয়কে আমার কি রকম যেন এক নিছক সেকেলে সংস্কার বলে মনে হয়। আমাদের স্কুলের স্পোর্টের মাষ্টার মহাশয় একটা কথা বারে বারে বলতেন,—কাপুরুষেরা দু'বার মরে,—একবার ভয়ে মরে আর একবার মৃত্যুকালে মরে। ঘরে বসে থাকলেই কি মৃত্যুকে এড়ান যায়? পাহাড়ে এসে আর একটা কথা জেনেছি,—পর্বতারোহীরা পাহাড়ে মরতে পারলে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করে,—কর্মক্ষেত্রে মৃত্যু বীরের,—অনেক গৌরবের,—তাই পাহাড়ে মৃত্যুভয় আমাদের প্রেরণার ইন্ধন।

মদন গৌরাঙ্গের প্রথম শীর্ষারোহীদল বিফল হয়ে ফেরার পর আমরা দ্বিতীয় দল। প্রদ্যোৎ ও আমি, সঙ্গে দুই শেরপা, নরবু ও তাংদাওয়া। চতুর্থ শিবির থেকে রওনা হলাম। পঞ্চম শিবিরে রাত কাটিয়ে পরের দিন প্রত্যুষে শীর্ষে পাড়ি দোব। এবারের দুর্ভাগ্য ছিঁচ্‌কাঁদানে ছেলের মত সবসময় যেন ঘেনর ঘেনর করতে করতে আমাদের পেছনে লেগে আছে।

আমরা যখন রওনা হলাম আকাশ পরিষ্কার ছিল, বাতাস ছিল স্তব্ধ। উজ্জ্বল সূর্যালোক দেখে মনে হয়েছিল মানা বুঝি তার মহামূল্য মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে পুণ্যপিয়াসী এই পূজারীদের। পুণ্য হবে আমাদের এই পর্বতারোহী জীবন, ধন্য হবে আমাদের অভিযান, সফল হব 'মানা' শীর্ষে।

প্রায় দু'শ ফুট আন্দাজ উঠেছি। হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল পূবে আকাশে পাহাড়ের মাথা থেকে এক ফালি কালো মেঘ উঁকি মেরে দেখছে। কি যে হোল, ভাবলে শিউরে উঠি। সহসা সে মেঘ হু হু করে ধেয়ে এসে সারা আকাশ যেন কালো কালিমাখা হয়ে উঠল। ঐ উজ্জ্বল পরিষ্কার আকাশ সহসা রুদ্র মূর্তিতে রূপ বদলালো। পাহাড়ের সর্বনাশা ঝড় হা হা করে তেড়ে এসে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। —ঘূর্ণিঝড়, যার নাম ব্লিজার্ড। কি প্রচণ্ড তার বেগ, কি মারাত্মক তার দাপট, যেন পাহাড় থেকে আমাদের উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে। ঘন্টায় সে ঝড়ের গতি কত ছিল তা পরিমাপ করার মানসিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলেছিলাম। দেখছিলাম এই ঘূর্ণিঝড় পাহাড় থেকে বরফ তুলে আবার পাহাড়ের গায়েই আছড়ে মারছিল। এরই মধ্যে একবার দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম, ঝড় নিমেষের মধ্যে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আছড়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে বরফের মধ্যে গাঁইতি গুঁজে কোমরের দড়ি জড়িয়ে দিলাম যেমন করে মাঠে খোঁটা পুঁতে গরু বাঁধে। অনেকক্ষণ পাহাড়ের বুকে মুখ গুঁজড়ে পড়েছিলাম যেন মরুভূমির বুকে উট।

পাহাড়ের এই প্রাণনাশী ব্লিজার্ড যে কি রকম সর্বনাশা তার নজির পর্বত অভিযান ইতিহাসের পুরোনো পাতাগুলো উল্টালে দেখা যায় আর শিউরে উঠতে হয়। কি নির্মম নির্যাতন পর্বতারোহীদের উপর এই ব্লিজার্ড করেছে,—কত মহামূল্য প্রাণ ধ্বংস করেছে; কখনও তিলে তিলে অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে মেরেছে,—কখনও এক কোপে ধ্বংস করে দিয়েছে। সে সকল নির্যাতন ও ধ্বংসের কাহিনীগুলো মনে পড়লে আজও যেন নিহত প্রাণগুলোর করুণ কান্নার সুর কানে ভেসে আসে তখন অব্যক্ত অস্থিরতায় আপনা হতেই কি রকম চঞ্চল হয়ে উঠি।

আমি জীবনে কোনদিন এমন পরিস্থিতিতে পড়িনি। সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে উঠে এসে উন্মুক্ত আকাশের নিচে এমনভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি কখনও হইনি। পাহাড়ে ঝড়ের অত্যাচারের যে ঘটনাগুলো এতদিন পুস্তকের পাতায় রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীরূপে পড়েছি তার এমন নির্মম প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটবে কল্পনাও করতে পারিনি। ক্ষণেকের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। ভাবনা শুধু আমার একটি প্রাণের জন্য নয়। আরও তিনটে প্রাণ রয়েছে। আমার সহ-অভিযাত্রীটি—সে বাপ-মায়ের একটি মাত্র সন্তান।

ক্ষণমাত্র এই বিভ্রান্তি। পরক্ষণেই মরিয়া হয়েছি। বাঁচতে হবে,—সকলকে বাঁচাতে হবে। সুরু হল সংগ্রাম,—বাঁচার সংগ্রাম, ওঠার সংগ্রাম, ঝড়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা। ঝড়ের দমকা হাওয়া আসে মুখ গুঁজরে বরফের মধ্যে পড়ে থাকছি। দমক কমে, অমনি গুঁড়ি মেরে উঠতে থাকি। আবার ঝড়ের দমক আসে আবার মুখ

গুঁজে বসে পড়ি। ঝড়ে উড়ে আসা বরফের কণাগুলো দেহের একমাত্র অনাবৃত অংশ মুখে লাগছে,—মনে হচ্ছে ধারাল ছুরি দিয়ে মুখটাকে ফালাফালা করে চিরে দিচ্ছে। নিজের পোষাকের ভার—সে অনেক; পিঠে খাবারের বোঝা তারও ওজন ৩৫ পাউন্ড। এর উপর কোমরের দাঁড়, জুতোর কাঁটা। ভীষণ শ্বাসকষ্ট। আরোহণের পথ—সামনে ৬৫ ডিগ্রী খাড়া বরফ প্রাচীর। সব মিলিয়ে অবস্থা এমনই অসহনীয় ভয়াবহ তা সমতলে বসে কল্পনা করা যায় না। এই পরিস্থিতিতে পড়ার আগে আমরাও এতবার পাহাড়ে এসেও কল্পনা করতে পারিনি। মনে হচ্ছে আর এক পাও বুঝি উঠতে পারব না। এই বসে থাকাই বোধহয় চিরস্থায়ী হয়ে অনড় অচলরূপে থেকে যাব,—স্ট্যাচু হয়ে। সে যে কি অবস্থা তা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই। জীবনে প্রাণের মায়া করে কোনদিন মৃত্যুভয় করিনি। বহু ক্ষেত্রে বিপদের মুখোমুখি হয়ে বেপরোয়া হয়েছি। বর্তমানের তুলনায় সে সকলই দেখছি কত ছেলেখেলা! এখন মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি প্রাণ বস্তুটা আমাদের কত প্রিয়। ওর মায়া অমোঘ,—তুচ্ছ করা যায় না।

লড়াই করে বেঁচে আছি। ঐ ঝড় ঠেলে শেষঅবধি পঞ্চম শিবিরে উঠে পেঁৗছেছি। চার ঘন্টার আরোহণ পথ উঠতে লেগেছে ন'ঘন্টা। তখনও বুঝিনি এই ব্লিজার্ড আমাদের হত্যার আয়োজন আরও সাড়ম্বরে করে রেখেছিল। যখন পেঁৗছেছি, আমাদের অবস্থা মৃতপ্রায়। আপন এয়ার ম্যাট্রেস ফুলিয়ে তাতে শোব সে অবস্থাও নেই। সহযাত্রীর মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে। ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে, নিজেরও অনুরূপ অবস্থা ভুলে গিয়ে তাকে সমানে চাপড়াচ্ছি তার শরীর গরম করতে।

পঞ্চম শিবিরে এসে আটক পড়েছি। সেদিন, সেই রাত্রি। তারপরেও একদিন—এক রাত্রি; আরও একদিন—একরাত্রি। সেই ঝড় থামেনি। সামনে বইছে ব্লিজার্ড। তাঁবু ছিঁড়ে ফেলার অবস্থা। অদৃষ্টের এই পরিহাসের মধ্যে তাঁবু যদি কোথাও একটুও ফাটে তাহলে একটা মাত্রই পরিণতি,—মৃত্যু। আবহাওয়ার তাপমাত্রা ভীষণ কমে গেছে। ০ ডিগ্রীরও বহু নীচে। ভীষণ শীত করছে। পরনে ও গায়ে চারটে করে গরম পোষাক, গলায় পশমের মাফলার, জোড়া পাখীর পালকের স্লিপিং ব্যাগের মাথায় পশমের টুপি। শুয়ে আছি এক ভেতর। তাঁবুর কাপড়ও দু পর্দা মোটা। একদম হাওয়া ঢোকে না। এরপরেও শীতে এমন কাঁপছি ছেলেবেলার ম্যালেরিয়া জ্বরের কাঁপুনিকে হার মানিয়ে দেয়।

অস্বাভাবিক রকমের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, অ্যাজমা রুগীর মত। বাতাসে শ্বাস-বায়ুর অভাব,—অক্সিজেন কম। হাঁপানী ছাড়াও আরও নানা উপসর্গ দেখা দিয়েছে। শরীরের অবস্থা শুয়ে থেকেও ধীরে ধীরে খারাপ হয়ে আসছে। মাথা তুলতে পারছি না, অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। মাঝে মাঝে বমি হচ্ছে। ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ছি। নাক দিয়ে চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, যেমন আমাদের দেশে শীতকালে হয়। সেই জল মুছে দেখছি লালচে—রক্ত। চোখ দিয়ে, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে আপনা হতেই! ঠাণ্ডায় হাতে-পায়ে শিরটান ধরছে। হাত পায়ের আঙুলগুলো কি রকম বেঁকে যাচ্ছে। চীৎকার করে উঠছি। রক্ত চলাচল চালু রাখতে হাতে হাতে তালি লাগাচ্ছি। পায়ে পায়ে ঠুকছি।

ঝড়ের বেগে তাঁবুর বাঁধন ছিঁড়ে যাচ্ছে। এই ঝড়ের মধ্যে পড়ে আজ আমরা বড় অসহায়,—মনে হচ্ছে শুধু অন্তিমের অপেক্ষায়। আমাদের এই অবস্থার কথা মা, মাসীমা যদি জানতে পারেন তাহলে অঝোরে চীৎকার করে কাঁদবেন আর প্রকৃতিকে অভিসম্পাত দিতে দিতে মায়ার বাঁধন দিয়ে নিষেধের খাঁচায় আবদ্ধ রাখবে, কোনদিন আর হয়ত পাহাড়ে আসতে দেবে না। কিন্তু না,—পাহাড়ের টান বড় দুর্নিবার। যেন নিয়তির অমোঘ আকর্ষণ। এই আকর্ষণেই যুগ-যুগ ধরে দেশ-দেশান্তর থেকে পর্বতপ্রেমী পাগলগুলো ছুটে এসেছে। বহু অমূল্য প্রাণ এই পাহাড়ের বুকে মিলিয়ে দিয়ে চলে গেছে। তবুও আবার অনেকে এসেছে,—যেমন আগুনের লোভে পোকাগুলো উড়ে এসে আগুনেই পড়ে মরে। পাহাড়ের রূপ বড় উগ্র—আকর্ষণ বড় তীব্র। কোন পার্থিব প্রাণীর আকুল ক্রন্দনেও কারও চিত্ত কিছুমাত্র ব্যাকুল হয় না।

*

আপন মৃত্যু কেউ কখনও প্রত্যক্ষ করেছে? আমরা এখন করছি। প্রায় ২৩ হাজার ফুট উঁচুতে পঞ্চম শিবিরে বসে থেকে দেখছি আমাদের সাক্ষাৎ মৃত্যু যেন এক পার্থিব বস্তুর রূপ নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ বাদেই সে আমাদের কাছে পেঁৗছে যাবে। তারপর?—আমাদের চোখ থেকে পৃথিবী দেখার আলো নিভিয়ে দেবে। তখন সব শেষ। অনন্ত অন্ধকার। এ এক অলৌকিক আস্বাদন।

পাহাড়ের শুষ্ক আবহাওয়ায় শরীরের রস শুকিয়ে যাচ্ছে। পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে। সমানে জল জল করছি। কোথাও এক ফোঁটা জল নেই। বারে বারে বমি করে শরীরের জল আরও কমে গেছে। মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। চতুর্দিকে বরফরূপে অনন্ত জলরাশি। এমনই পরিহাস, এক ফোঁটা পান করার উপায় নেই। আজ দুদিন থেকে গলায় এক ফোঁটা জল পড়েনি। স্টোভে বরফ গলাতে হবে তবে জল পাওয়া যাবে।

ঠাণ্ডায় সর্বশরীর হিম হয়ে আসছে। কোল্ড স্ট্রোক হতে পারে। এই ঠাণ্ডার মধ্যে বেঁচে থাকতে হলে গরম পানীয় এখনই। দরকার। এখানে গরমের একমাত্র উৎস স্টোভ। সেটা জ্বলছে না। বরফ গলান যাচ্ছে না। জল নেই। পানীয় কিছু নেই, গরমও কিছু না। সুতরাং? অবশ্যম্ভাবী পরিণতি? যদিও বা এই ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পাই তাহলেও পিপাসাকাতর হয়ে এই ৩০ ডিগ্রী 'বিলো ফ্রিজিং' ঠাণ্ডায় কোল্ড স্ট্রোক হয়ে জমে মরা বোধহয় ঠেকান যাবে না। 'জলের অপর নাম জীবন'—ছেলেবেলায় পাঠ্য-পুস্তকে পড়েছি তখন একথার অর্থ এক বর্ণও বুঝিনি। আজ জীবন দিয়ে বুঝতে বসেছি জলের অপর নাম কেন জীবন! জল বিনা জীবন যায়।

আমাদের কাছে এই মুহূর্তে এক ফোঁটা তরল পানীয় কিছু নেই। তবে তরল তেজ আছে,—বর্তমানের তরল প্রাণ। দু-পাঁইটের বড় দু ফ্লাস্ক ভর্তি গরম চা ছিল। নীচে থেকে নিয়ে এসেছিলাম। ঘূর্ণি ঝড়ের দাপটে পথিমধ্যে এক ফোঁটাও খেতে দেয়নি। এই সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে উষ্ণতা হারিয়ে গেলেও চা এখনও তরল আছে। ফ্লাস্কের গুণ নিঃসন্দেহ।

আমাদের তাঁবুতে আরও একটা তরল বস্তু ছিল,—৮ আউন্স পরিমাণ 'রম্‌'—তেজস্কর পানীয়। সমতলে এটার নাম—'মদ',—পাহাড়ে, বরফে,—এই ৩০ ডিগ্রী বিলো ফ্রিজিং ঠাণ্ডায় আমরা ঐ মদকে বলি,—'আগুন।' আগের দল, মদন ও গৌরাঙ্গরা সঙ্গে করে এনেছিল। ওদের প্রয়োজন হয়নি, রেখে গেছে। রম্‌টুকু সমস্ত তরল চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি। দু' ফ্লাস্ক তরল তেজস্কর পানীয়ই আমাদের তরল প্রাণ। প্রাণ রাখতে ঐ পানীয় পান করছি, শরীর গরম হচ্ছে। ধীরে ধীরে চুমুক চুমুক খাচ্ছি,—যেন মৃত্যুর পেছনে ছুটে ধরে রাখতে চাইছি আমাদের প্রাণ। যত পান করছি ঐ প্রাণরস তত কমছে, ফ্লাস্কের তলার দিকে তত নামছে আর আমাদের প্রাণের পরিমাণ তত কমছে। ফুরিয়ে আসছে। একদম তলদেশে শূন্য প্রান্তে মৃত্যুর পাণ্ডুরতা। শোঁশোঁ শব্দে ঝড় বইছে, তাঁবুর কাপড়ে আঘাত করে ঝুর ঝুর

শিঙ্গার কুমকুম ঐ ললাটে অপরূপ হয়ে উঠুক ফুটে!
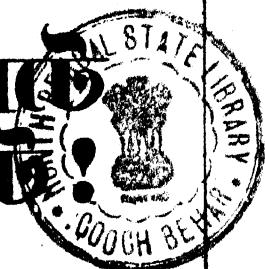
তুলে নিন, লাগিয়ে দিন শিঙ্গার কুমকুম। আপনার সুন্দর ললাট এর রঙের ছটায় হয়ে উঠবে অপরূপ। আপনার মুখকান্তিতে ফুটে উঠবে এক অপূর্ব শোভা—অনবদ্য আভা··· হৃদয়ে জাগাবে পুলক। ১২টি অনন্য রামধনু রঙের কুমকুম থেকে আপনার মনের ভাব বুঝে পছন্দমত মানানসই বেছে নিন আপনার রুচি মাফিক কুমকুম। আপনার প্রিয় শাড়ী, কুর্তা আর সবচেয়ে সেরা লুঙ্গী আর বেলবটমের সঙ্গে মিলিয়ে কপালে লাগান শিঙ্গার কুমকুম—টিপ। দারুণ মানাবে।

চলুন—ফ্যাশন জগতে ভ্রমণ করুন।
শিঙ্গার—ফ্যাশানদুরুস্ত আধুনিকা মহিলাদের জন্যে কুমকুম বিন্দি

বিন্দি জগতে একটি বিখ্যাত নাম

শিঙ্গার

ডিলাক্স কুমকুম বিন্দি
ভেলভেট ফিনিশ

প্যারামাউন্ট উৎপাদন ওয়াডালা, বোম্বাই-৩১

আওয়াজ হচ্ছে, যেন মেসিনগান চলছে। মনে হচ্ছে তাঁবু উপড়ে যাবে, ফেটে যাবে। এই ঝড় না থামলে, এই স্টোভ না জ্বললে, যতক্ষণ পানীয়টুকু আছে শরীর গরম থাকবে। তারপর? সব ঠাণ্ডা। সব অন্ধকার। এই শরীর তুষারীভূত হয়ে অনন্ত হিমরাজ্যে বিলীন হয়ে যাবে। হিমশীলা হয়ে পড়ে থাকবে।

এই অবস্থায় পড়ে নিদ্রা গেছে, শক্তি গেছে, শারীরিক সুস্থতা গেছে। মানসিক স্বাভাবিকতাটুকুও নষ্ট হয়ে গেছে। অসহায় অবস্থায় পড়ে আছি অন্তিম কালের অপেক্ষা করে। এমন আসন্ন মৃত্যু কোন মরণোন্মুখ ব্যক্তি সজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করেছে কিনা জানি না। কিন্তু এই আসন্ন মৃত্যু দেখেও আমাদের কোন বিকার নেই, কোন উত্তেজনা নেই, শুধু নির্লিপ্ত প্রশান্ত উদাসীনতা। অফুরন্ত সময়, অবাঞ্ছিত বিরাম। যেন দৈনন্দিন কর্মচক্রের নিয়মমাফিক ঘটনারই অন্তর্ভুক্ত এই মৃত্যু আগমন। বাঁচার জন্য কোন ব্যাকুলতা নেই।

এই ডায়েরি লিখতে লিখতে সহসা ইচ্ছে হোল মরার আগে বাইরের তান্ডব প্রকৃতি একবার একটু প্রত্যক্ষ করি। দেখি কি তার রূপ। তাঁবুর পর্দা একটু ফাঁক করেই চমকে উঠলাম প্রলয়ের প্রত্যক্ষ রূপ দেখে। কি ভয়ংকর, কি সুন্দর! মনে হোল চিরনিরুত্তর অচল হিমাদ্রি সহসা যেন সচল হয়ে উঠেছে। পাহাড়ের সেই চিরন্তন নীরবতা ভঙ্গ করে ঝড়ের শোঁ-শোঁ শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন রণশিঙা বাজছে। মহারুদ্র ধ্বংসেশ্বর বুঝি সংহার মূর্তিতে ক্ষেপে উঠেছে। জগতের আদি অন্ত পঞ্চভূত থর-থর করে কাঁপছে। পাথরে-বরফে, আকাশে বাতাসে, অন্তরীক্ষে সমগ্র মহাশূন্য জুড়ে মহাপ্রলয়।

কবি ও সাহিত্যিকদের ভাষায় ঝঞ্ঝার ভয়ংকর সৌন্দর্যের কথা পড়েছি। সেই প্রাণঘাতী চণ্ডলীলা কোনদিন প্রত্যক্ষ করার উপলক্ষ্য ঘটেনি। আজ তা সামনে দেখছি। সুদূরে প্রসারিত তুষার মহাসমুদ্র। সে সমুদ্র সাইক্লোনের ঘূর্ণাবর্তে বিক্ষুব্ধ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। উড়ন্ত তুষার রাশিতে সারা পাহাড় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আকাশ কালো মেঘাচ্ছন্ন। মহারুদ্রের এই করাল রূপও মনোহর। বসন্তের উল্লাসই শুধু সুন্দর নয়, নটরাজ রুদ্রের প্রলয় তান্ডব নৃত্যেও তা বিভাসিত।

এই আকাশই পাহাড়ের সারি টপকে বহু দূরে নীচে নেমে গেছে। দিগন্তের শেষে বিলীন হয়ে গেছে সমতলের হরিত শ্যামলিমায়। সমতলে মাথার উপরেও এখন এই আকাশই। সেই আকাশে হয়ত এখন শরৎকালের সূর্যকিরণ নীলোজ্জ্বল। স্নিগ্ধ মদিরতায় রোমাঞ্চ হরষ। সে রোমাঞ্চকর পৃথিবীকে কবে ছেড়ে এসেছি। ফেলে এসেছি অনেক দূরে নীচে। পেছনে চাওয়ায় চোখ বুজেছি। সামনে এগিয়ে এসেছি পাহাড়ের অচ্ছেদ্য টানে। বন্ধুর পথের বন্ধুর টান। স্বজন পরিজন প্রিয়জন সকলের বাঁধন ছিঁড়ে এসেছি পাহাড়ের এই নিবারণ নিস্কলঙ্ক উগ্ররূপের তীব্র আকর্ষণে।

জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে এসে মার কথাটা বড় বেশী করে মনে পড়ছে.--'আমার কপালে নাকি আঘাতেই মৃত্যু আছে।' না, এখন যদি মৃত্যু আসে সে মৃত্যু অপঘাতে মৃত্যু নয়,—পুণ্যবানের সঞ্চয় করা কর্মজীবনের গৌরবময় পরিসমাপ্তি। এখন বড় আফশোষ হচ্ছে:--এই কথাটা মাকে গিয়ে আর বোঝাবার সময় পাব না! আজ যখন সাক্ষাৎ-মৃত্যু সামনে এসে ডাক দিচ্ছে তখন আমি মার কাছ থেকে অনেক দূরে। পবিত্র হিমালয়ের অনেক উঁচুতে এক পুণ্যলোকে। আমার সহপাঠী আমার পায়ে কামড়ে দিয়ে ভূতের ছোবল থেকে আমায় বাঁচাতে চেয়েছিল। কিন্তু নিয়তি বোধহয় আরও ধারাল দাঁতের ছোবল মেরে নিয়ে যাচ্ছে এই মায়াময় মরজগত থেকে দেবলোকে।

সব চিন্তার জাল ছিঁড়ে দিয়ে ঝড়ের সঙ্গে বেগে তাঁবু ঠেলে ঢুকে পড়ল শেরপা নরবু। শংকমাখা মুখখানা দেখেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ওর লাল মুখ থেকে সমস্ত রক্ত কে যেন বার করে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। কালো কালিমাখা হয়ে গেছে ওর মুখখানা। ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে.--কুকুরের মত হাঁপাচ্ছে.--উন্মত্তপ্রায়। মুখ দিয়ে কোন কথা বার হচ্ছে না, হাত-পা নাড়ছে, অথচ কি বলতে চায়, বলতে পারছে না।

অনেক কষ্টে বলল,--'সাব ডায়ারী লিখো,—হাম লোক খতম হো গিয়া।'

নরবু আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। নিশ্চেষ্ট হয়ে অসহায়ভাবে ভাগ্যের হাতে প্রাণ দোব না এই সংকল্পে আমাদের স্টোভ দুটো জ্বালাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন ধরে। অবশেষে পরাস্ত হয়ে নিশ্চিত হয়েছে এই স্টোভ আর জ্বলবে না। —আমরাও আর বাঁচব না। এই ভেবেই হঠাৎ নরবু কি রকম যেন অস্থির হয়ে উঠেছে,--উন্মত্তপ্রায়। তাই আমায় বলতে চাইছে, ডায়েরিতে সব ঘটনা লিখে রাখ, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ঘটনা। এই ডায়েরি কোনদিন উদ্ধার পেলে জানা যাবে প্রকৃতির সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করে আমরা শেষ অবধি কিভাবে মৃত্যুবরণ করছি।

হায় রে,--এই মুহূর্তে একটিবার যদি মার সঙ্গে দেখা করে আসতে পারতাম!

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মনোবিজ্ঞানীর মনের কথা

কেউ যদি সহসা এসে বলে 'আমি অনন্তের একটি অণুকণা' তাহলে চোখ কপালে তুলে তার মুখের পানে সবিস্ময়ে তাকাতে হয়, কিন্তু সেই ব্যক্তিটির নাম যদি কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং হয় তাহলে আর কোনো কথা বলা যায় না। ইয়ুং যেন প্রাচীন যুগের একটা অংশবিশেষ আর তিনি লিখেছেনও সেই ভঙ্গীতে। তাঁর জীবদ্দশায় অজস্র মানুষের ব্যাধি নিরাময়ে তিনি সহায়ক হয়েছেন, তিনি রোগ-উপশমের বিদ্যায় পারংগম ছিলেন। তাঁর কথা তাই মানতে হয়, শুনতে হয়। অনন্তের গায়ে ধাক্কা লাগেনি কখনো আমাদের মতো মর্ত্যের মানুষের কিংবা অচেতনের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াইনি। কিন্তু ইয়ুং-এর সংগে অনন্ত বা ইনফিনিটি-এর সঙ্গে মোলাকাৎ প্রতিদিনই ঘটেছে। অচেতনের কাছ থেকে তিনি নিয়মিত বার্তা পেয়েছেন এবং সেই বার্তার মর্মোদ্ধার করেছেন। ইয়ুং তাঁর জীবনের কথা 'মেমারিস, ড্রীমস, রিফ্লেকসানস' নামক স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর দু' বছর পরে এই মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থটি মুখ্যতঃ অচেতনদের সংগে দেখাশোনার কথাবার্তাই লেখা হয়েছে, অচেতন এবং অনন্ত ইয়ুং-এর অতি-পরিচিত জগৎ।

এমন আশ্চর্য জীবনকথা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে হয়, শুনতে কোনো অসুবিধা নেই, অসুবিধা অন্যত্র। কোনোরকম প্রশ্ন মনে জাগলেই সব আনন্দ মাটি। অচেতন জগতের গভীরে কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং-এর হাত ধরে নামার সময় হাতে কোনো মশাল না থাকাই বাঞ্ছনীয়। অন্ধকারে বিচরণ করার যোগ্যতা চাই। দান্তে যখন নরকের অতল তলে নেমেছিলেন তখন তাঁর হাতে লণ্ঠন ছিল না। সংগে ভার্জিল ছিল এই পর্যন্ত। অন্ধকারে অবতরণে চাই একজন পথনির্দেশক গুরু, যিনি সকল অন্ধকারের মধ্যেও আলো দেখাতে পারেন। ইয়ুং স্বয়ং সেই গুরু। গুরুর পদে তাঁকে বরণ করা যায়। ইয়ুং-এর সমস্ত বক্তব্য এমন ধারায় বিধৃত যে তিনি যে গভীরের গোপনতম সংবাদে ওয়াকিবহাল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই গোপন কথা ধাঁধার মত, তাই ইয়ুংও তাঁর কথা বলেছেন হেঁয়ালির ভঙ্গীতে।

অতিসাধারণ বস্তুও তাঁর চোখে প্রহেলিকা-প্রায়। আমরা যখন দুধ পান করি তখন প্রশ্ন করি না আমরা দুধ পান করছি না দুধ আমাদের পান করছে। আমরা সমুদ্রতীরে কিংবা শৈলশিখরে যখন বসি তখন আমরা ঠিক ঠিক জানি কোথায় আছি।

কিন্তু ইয়ুং-এর অবস্থা স্বতন্ত্র। যখন মাত্র ন' বছর বয়স তখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পৃথিবীটা ভীষণ এবড়ো-খেবড়ো, আমরা যেটুকু সমতল দেখি তাও চোখধাঁধানো ব্যাপার। নিজেদের বাড়ির বাগানে একটা পাথরের টুকরোর ওপর বসে তিনি অবাক বিস্ময়ে চিন্তা করছেন—

"Am I the one who is sitting on the stone, or am I the stone on which he is sitting?"

এই ধরনের প্রশ্ন আমরা কেউ করলে আমাদের মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠবে। কিন্তু যে মহামনীষী হাজার হাজার মনোবিকারের রোগীকে নিরাময় করেছেন তাঁর মস্তিষ্ক সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করার সাহস আছে কার?

হেঁয়ালি কাকে বলে সে বিষয়ে আমাদের সকলের একটা যা হয় ধারণা আছে। তথাকথিত স্বাভাবিক সুস্থ এবং স্বাস্থ্যবান মানুষ ইয়ুং-এর চোখে কিন্তু—

"Optimistic tadpoles who bask a puddle in the sun, in the shallowest of waters, crowding together and amiably wriggling their tails, totally unware that the next morning the puddle will have dried up and left them stranded".

ডোবার জল শুকিয়ে যাওয়ার আগেই ইয়ুং সেই আশ্রয় ত্যাগ করতে পেরেছেন, কারণ তাঁকে 'অচেতন' উপযুক্ত সময়ে সতর্ক করে দিয়েছে। যখন তিনি শিশুমাত্র তখনও 'অচেতন' তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে। বুড়ো-বয়সেও সেই সতর্কবাণী তিনি অতীতের মধুর স্মৃতির মত মনে করেছেন।

"Who spoke to me then? Who talked of problems far beyond my knowledge? Who brought the above and below together and laid the foundation for every thing that was to fill the second half of my life with stormiest passions? Who but the alien guest who came both from above and from below?"

এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। এখানে ডোবার 'বেঙাচি'র রূপকটির অর্থভেদ করার জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যদি ওপর এবং নীচে থেকে অতিথি এসে হাজির হয় তখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগবে 'তোমার আসন পাতব কোথায় হে অতিথি?'

এই রহস্যময় অতিথির সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে হলে মনের দিক থেকে অতিশয় সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ইয়ুং এই অত্যাশ্চর্য 'মন'-এর অধিকারী ছিলেন। তিনি শুধু 'অপর'-এর বাণী শুনেছেন তা নয়, নিজের অর্থাৎ 'অহং'-এর বাণীও তাঁর অন্তরে প্রবেশ করেছে।

উপনিষদে আছে আত্মা দুটি পাখির মত, একটি পাখি কূজন করে অপরটি নীরবে তা শুনে যায়, একটি অহং আর অপরটি আত্মা। আমরাও জানি আমরা মাঝে মাঝে দুটি বিভিন্ন প্রাণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ি—কিন্তু আমাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ নয় তাই কোনটি যে কোনজন তা বিচার করা সম্ভব হয় না। ইয়ুং তৃতীয় নয়নের অধিকারী তাই তিনি শুধু যে দুজনকেই দেখতে পান তা নয়, উভয়ের পরিচ্ছদের পার্থক্যও তাঁর নজরে পড়ে। যখন তিনি স্কুলের ছাত্র ছিলেন তখনও তাঁর এই শক্তি ছিল। তিনি সেই সময়েই একাধারে যে দুই তা বুঝতে পেরেছেন—

"Then, to my intense confusion, if occured to me that I was actually two different persons."

এদের মধ্যে একজন স্কুলের ছাত্র, তার মাথায় এলজেব্রার অংক প্রবেশ করে না। আত্মবিশ্বাসেরও অভাব আছে, অন্যদিকে অপর চরিত্র একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী—

"—was important, a high authority, a man not to be trifled with—"

ইয়ুং বুঝতে পেরেছিলেন এই অপর সত্তাটি একটি অষ্টাদশ শতাব্দীর বৃদ্ধ মানুষ—তাঁর পরিধানের বৈশিষ্ট্যও ইয়ুং-এর নজরে পড়েছে—

—"Wore buckled shoes and a white wig and went driving in a fly with high, concave rear wheels, between which the box was suspended on springs and leather straps",

এই অপর প্রাণীটি সর্বদাই যে বকলস আঁটা জুতো পরে তা নয়—তার পোষাক অন্যরকমেরও হতে পারে। তাছাড়া তিনি যে চিরতরে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই আবদ্ধ তা নয় যে সময় কিমিয়া বিদ্যা বা 'এলকেমি' অতিশয় জনপ্রিয় ছিল সেই সপ্তদশ শতাব্দীতেও তিনি ছিলেন এমনকি খৃষ্ট-পূর্ব সপ্তদশ শতাব্দীও এই অপর সত্তার বিচরণ ক্ষেত্র হতে পারে।

কিন্তু এই দুটি সত্তা যে যুগেরই মানুষ হোন না কেন তাদের দুজনকে এক-সূত্রে বেঁধে রাখা ইয়ুং-এর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

তিনি বলছেন—

"The play and counter-play between personalities No. 1 and No. 2 which has run through my life has nothing to do with a split or dissociation in the ordinary medical sense".

কিন্তু তিনি আমাদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে এই দ্বিতীয় সত্তা যদিও এক বিশেষ চরিত্র তবু তার যথার্থ রূপ সকলের চোখে ধরা পড়ে না। কারণ অধিকাংশ মানুষের সচেতন মনের বোধশক্তি তেমন তীক্ষ্ন নয়, তারা যে কি তা উপলব্ধি করা সহজ নয় সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর ভাষায়—

"Most people's conscious understanding is not sufficient to realise that he is also what they are."

বলা বাহুল্য পৃথিবীর শতকরা নিরানব্বুই জনই এই তীক্ষ্ন বোধশক্তির অধিকারী নন।

এই মূল্যবান গ্রন্থটি বিষয়ে আলোচনার শেষ অংশটি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। —অভয়ংকর

MEMORIES, DREAMS, REFLECTIONS : By Carl Gustav Jung: Recorded and edited by Aniela Jaffe. Translated by Richard and Clara Winston—(Collins with Routledge & Kegan Paul) Price-45 shillings. only.

বাঙালিনী (উপন্যাস)—সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। রবি প্রকাশনী, ৫৪।১, কাশীপুর রোড, কলকাতা : ৩৬। ৪-৫০ টাকা।

জাহানারা বেগম আর প্রদীপ রায়। একজন মুসলমান, অন্যজন হিন্দু। প্রথমা ছিলেন ওপার বাংলার, অপরজন এপারের। ঘটনার আবর্তে ও ঘাত-প্রতিঘাতে পারাপারের ব্যবধান ঘুচে গিয়ে জাতি-পাঁতি-ধর্মের ভেদ-প্রাচীর মুছে গিয়ে জাতীয়তা-বোধের প্রাণ-গঙ্গায় অবগাহন করে জাহানারা আর প্রদীপ হল নতুন মানুষ—বাঙালী। আদর্শবাদে আপ্লুত এই উপন্যাসটিতে পূব বাংলার জাতীয়তাবোধের উন্মেষের সঙ্গে এপার বাংলার করনীয় কর্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত লক্ষ্য করবার মতো। উদ্দেশ্য মহৎ হলেও উপন্যাস রচনার প্রাথমিক শর্ত এ লেখায় অনুপস্থিত এবং ক্লান্তিকর বক্তৃতাধর্মী সংলাপের দরুণ কাহিনী রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি।

মনে রেখো (উপন্যাস)—আশীষ বসু। বাকসাহিত্য প্রাঃ লিঃ, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা : ৯। ৩-৫০ টাকা।

তিল তিল করে ক্ষয়ে যাওয়াই কি জীবন? বেঁচে থাকাই কি জীবনের পরমায়ু। সারা জীবনটা মস্ত জুয়াখেলা—রঙের সঙ্গে রঙ মেলানো? জীবনটা কি একটা কম্প্রোমাইজ, একটা মেনে নেওয়া।—আজকের জীবনের এই প্রশ্নটাকে সামনে রেখে লেখক অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে একটি নিটোল প্রেমের ট্র্যাজিক কাহিনীর সূত্রপাত ঘটিয়েছেন কলকাতার বৈঠকখানা সেকেন্ড বাই লেনে এবং যতি টেনেছেন দার্জিলিঙে। কাহিনীর প্রাণবিন্দু মণিময়কে ঘিরে এবং তার জীবনকে ছুঁয়ে ছুঁয়েই নানান ঘটনার আবর্তে স্বাভাবিক ধারায় এসেছে নানান চরিত্র—নরনারীর বিচিত্র মিছিল। এরা সবাই—কলকাতার মেঘমালা, শুভময় দত্ত, চন্দ্রকান্তবাবু, মা চারুলতা, চামেলী, শ্যামলী, হিরন্ময়বাবু এবং কেশবপুরের কল্যাণী, কামিনী, পীতাম্বরবাবু, আবদুল হোসেন, গঙ্গাধরবাবু, ত্রিলোচন দত্ত—এমনকি দার্জিলিঙের ভায়োলেট আমাদের একান্ত চেনা মানুষ। এই চেনা ভাগ্যের হাতে মার-খাওয়া জীবনযন্ত্রণায় কাতর মানুষদের ও নিচুতলার মানুষদের বঞ্চিত জীবনের ছবি বড় নির্মম বড় করুণ করে এঁকেছেন লেখক। কাহিনী শেষে মন বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কাহিনী বুননে এবং বিস্তারে লেখক দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। পরিমিতিবোধ এবং স্বল্প-কথায় বৃহতের আভাস আনার বিরল বৈশিষ্ট্য এবং গল্পবলার গুণে কাহিনী নদীর মতো স্বাভাবিক ধারায় বয়ে চলেছে। গ্রাম-বাংলার প্রতি মমতা, গ্রাম-শিল্প সম্পর্কে লেখকের 'বিশেষ জ্ঞান' এবং নিঃস্ব গ্রাম্য শিল্পীদের ('সোলাশিল্প') করুণ কাহিনী উপন্যাসটিকে অধিকতর হার্দ্য মানবিক এবং মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। আলোচ্য উপন্যাসটি যদি এই শক্তিমান লেখকের প্রথম লেখা হয় তাহলে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতিতে উজ্জ্বল। সুন্দর প্রচ্ছদে পরিচ্ছন্ন মুদ্রণে এবং জীবনধর্মী কাহিনীতে প্রাণময় 'মনে রেখো' বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রতিক প্রকাশনীতে মনে রাখবার মতো উপন্যাস বলে চিহ্নিত হবে।

টইটম্বুর (ছড়া-ছবির বই)—ধীরেন বল। সঞ্চিতা প্রকাশনী, ২১।২ বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা ৩৭। ২-৫০ টাকা।

কবি কবিতা লেখে আর ছড়া লেখে। ছবি-আঁকিয়ে তাকে ছবিতে রূপ দেয়। দুটি মানুষ কিন্তু আলাদা। আলাদা কাজ দুজনের। এই দুজনের কাজ একজনে পারে? পারে কখনো কখনো। তা যখন হয় ছড়া তখন গান গেয়ে ওঠে, ছবি কথা কয়। শ্রীবল 'টইটম্বুরে' সে কাজ করেছেন আশ্চর্য সুন্দরভাবে। দুটি বিষয়েই—কবিতা লেখায় এবং ছবি আঁকায়—তাঁর খ্যাতি সুদীর্ঘকালের। সে খ্যাতি অক্ষুন্ন আছে দেখে ভালো লাগল। কিশোর-কিশোরীদের জন্যে লেখা মজাদার কবিতা ও ছবিতে ভরা টইটম্বুর শিশু-কিশোরমহলে হাসির হিল্লোল তুলবে সেকথা বলাই বাহুল্য। বুড়ো বয়স্কদের মনেও তার রেশ এসে লেগে হারানো কিশোর-বয়সকে মনে পড়িয়ে দেবে। রঙচঙে প্রচ্ছদে মজাদার ছবিতে এবং হাসির কবিতায় ভরা চমৎকার ছাপা এ বইটি খুশী হওয়ার মতো।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

গ্রন্থজগৎ (এপ্রিল-মে ১৯৭১)—সম্পাদক : বিনোদলাল চক্রবর্তী। বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা। ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা—৭। দাম : পঞ্চাশ পয়সা।

বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার মুখপত্র হলেও 'গ্রন্থজগৎ' কেবল বইয়ের খবরে বোঝাই নয়, উন্নত মানের প্রবন্ধে নিবন্ধে আকর্ষণীয় একটি সাহিত্য-পত্রিকাও। এ সংখ্যায় লিখেছেন নারায়ণ চৌধুরী (পূর্ব বাংলার প্রবন্ধ সাহিত্য), সুনীল মুখোপাধ্যায় (ওপার বাংলার সাহিত্যাকাশ), রাণা বসু (বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার কবিতা), আনোয়ার পাশা (পূর্ব বাংলার রসসাহিত্য), প্রকাশ ভাণ্ডারী ও অনিলকুমার ভৌমিক। 'ভাষার ঐক্য' শীর্ষক রবীন্দ্রনাথের একটি লেখা ও ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহের একটি প্রবন্ধের (বাংলাভাষার রীতিনীতি ও সম্ভাবনা) পুনর্মুদ্রণ সময়োপযোগী হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, পত্রিকাটি সকলের কাছেই সমানভাবে আদৃত হবে।

গ্রন্থ পরিক্রমা (বাংলাদেশ সংখ্যা)—সম্পাদক অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ১৫, দেবী নিবাস রোড, দমদম, কলকাতা ২৮। ষাট পয়সা।

কয়েকটি অসাধারণ প্রবন্ধ নিয়ে বেরিয়েছে 'গ্রন্থ পরিক্রমার' এ সংখ্যাটি। 'বাংলাদেশের যুদ্ধ ও আমরা' 'উদ্বাস্তু সমস্যা : তখন ও এখন' 'পাক পররাষ্ট্র-নীতির তিনযুগ' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। লেখকদের মধ্যে আছেন পান্নালাল দাশগুপ্ত, বিবেকানন্দ রায়, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, প্রফুল্ল চন্দ, দ্বীপেশচন্দ্র ভৌমিক ও দিলীপ সেন। পত্রিকাটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

পরলোকে প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় : কল্লোল-কালিকলম যুগের প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় রবিবার ২৬শে আষাঢ় (১১ জুলাই) তারিখে লোকান্তরিত হয়েছেন। এই সংবাদ কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। শ্রাবণ মাসের 'কথা সাহিত্য' নামক সাহিত্যপত্রে এই সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যের একটি অংশ উদ্ধৃত করা গেল—

'সাংবাদিক ও সাহিত্যিক প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়ের নাম আজিকার পাঠক মহলে তেমন পরিচিত নয়—লেখকরাও অনেকে হয়ত তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারিবেন না। এই শক্তিমান ব্যক্তিটি অকালে—নিজে সাধ করিয়াই মোটা মাহিনার চাকুরী ও লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা বা খ্যাতির সম্ভাবনা ঘুচাইয়া একদিন কলিকাতার বিদ্বজ্জন সমাজ হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। কিছুদিন এখানে প্রায় অজ্ঞাতবাস করার পর কাশীতে গিয়া নিভৃতে নির্জনবাস করিতেছিলেন। এই দীর্ঘ সময় তিনি অর্থোপার্জন বা যশোপার্জনের কোন চেষ্টা করেন নাই। একরূপ অজগরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন।'

এই মন্তব্যটির সঙ্গে আমরা একমত। প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় 'আনন্দ সুন্দর ঠাকুর' এই ছদ্মনামে 'কালিকলমে' যে ধরনের সাহিত্য আলোচনা করতেন এ যুগে তা বিরল। তাঁর 'মেজদার ডায়েরী' নামক গ্রন্থটি একদা পণ্ডিত মহলে সমাদর লাভ করেছিল। তিনি আমেরিকা প্রবাসী বাঙালী লেখক ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কিছু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদও করেছিলেন। সেই কালে সাহিত্য সমাজে এই প্রিয়দর্শী মানুষটির যথেষ্ট সমাদর ছিল। তিনি 'রয়টার' নামক বিখ্যাত সংবাদ প্রতিষ্ঠানের কলিকাতা ও দিল্লী শাখায় বার্তা সম্পাদক হিসাবে কাজ করতেন। সেই সময় তাঁর কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছেন সেযুগের সাংবাদিকরা। ব্যক্তিগত জীবনে হয়ত কোনো আঘাত পেয়েছিলেন তাই এই ধরনের সন্ন্যাস তিনি গ্রহণ করেছিলেন। শুনেছি তাঁর এই অজ্ঞাতবাসের কালে প্রবোধকুমার সান্যাল যোগাযোগ রক্ষা করতেন। প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়ের মত মানুষ বর্তমানকালে বিশেষ চোখে পড়ে না তাই তাঁর মৃত্যু আমাদের কাছে নিদারুণ দুঃখের সংবাদ হয়ে এসেছে। আমরা তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

সরোজকুমার সম্বর্ধনা : প্রবীণ উপন্যাসকার ও সাংবাদিক শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ হয়ে আছেন। তাঁর 'ময়ূরাক্ষী' 'সোমলতা' 'শৃঙ্খল' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। লেখকের আগামী জন্মদিনে তাঁর অনুরাগী সাহিত্যিক ও বন্ধুগণ তাঁকে একখানি 'স্মারক গ্রন্থ' উপহার দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবেন। এই গ্রন্থটিতে সরোজকুমারের জীবন ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করছেন বাংলার বিশিষ্ট লেখকবৃন্দ।

শ্রীঅরবিন্দের গ্রন্থাবলী : ১৫ই আগস্ট তারিখ থেকে শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র রচনাবলী ত্রিশটি খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। মহামনীষীর দর্শন, যোগ, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার ফলশ্রুতি এই গ্রন্থাবলী ডেভলপমেন্ট কনসলট্যান্টস্ লিমিটেড—পার্ক স্ট্রীট কলিকাতা-১৬ থেকে পাওয়া যাবে। সমগ্র সংস্করণটির মূল্য ৭৫০্ টাকা এখন যাঁরা গ্রাহক হবেন তাঁরা ৫০০ টাকায় পাবেন আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

সোভিয়েত লেখক কংগ্রেসের সম্মেলন। সম্প্রতি ক্রেমলিনে পশ্চিম সোভিয়েত লেখক সম্মেলন কবি কোইকেন ফুলিয়েতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে এশিয়া ও আফ্রিকার সাহিত্যকারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করা হয়।

মূর্তির কর্তিত মুণ্ডের পুনঃপ্রতিষ্ঠা : পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যু-দিবসে একটি মহৎ কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। পথে যেতে আসতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও বিদ্যাসাগরের মুণ্ডহীন মূর্তি বড়ই পীড়াদায়ক মনে হ'ত। বিদ্যাসাগর ও প্রফুল্লচন্দ্রের মূর্তির মুণ্ড দুটি দুষ্কৃতকারীরা কর্তন করে। পাথরের মূর্তির এই লাঞ্ছনায় সকলেই ব্যথিত হলেও সংস্কার সাধনে সময় লেগেছে। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির উদ্যোগে বাঙালী জাতির এই কলঙ্ক মোচন সম্ভব হল। এই দিনকার সভায় ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—প্রবল হিংসা ও অনীহায় রাতের অন্ধকারে অস্ত্রাঘাত করে, তাঁর অঙ্গহানি করে তাঁকে অসম্মান করেছিলাম, আজ এই অনুষ্ঠান সেই দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত।

এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন মেয়র শ্যামসুন্দর গুপ্ত। সভায় ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, অনিলা দেবী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। বিদ্যার্থীরঞ্জন সংস্থা এই উপলক্ষ্যে কলেজ স্কোয়ারে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেকানন্দ স্মারক বক্তৃতামালায় এ-বছরে বক্তা ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেন—দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্ত ও সাজাহান সার্থক রচনা। অন্য নাটকে ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনাপ্রবাহ ও মুখ্য চরিত্র সৃষ্টিতে অসঙ্গতি থাকলেও দেশাত্মবোধ ও কাব্যধর্মীতা এবং জীবনের রাজপথ থেকে বিচ্যুত কয়েকটি গৌণ চরিত্রের মহিমা তিনি অপরূপ ভঙ্গীতে ফুটিয়েছেন। পাণ্ডিত্যপূর্ণ এই সুদীর্ঘ ভাষণে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে এমন তথ্য সমাবেশ ও তুলনামূলক আলোচনা কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়।

আগডূম বাগডূম

অন্নদাশঙ্কর রায়
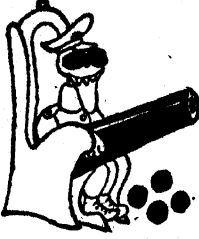
আঁদরেল বাঁদরেল ছয়জন জাঁদরেল
রাজ্য চালাতে গিয়ে দেখান আজব খেল।
এক একটি সুলতান ঢাকা থেকে মুলতান
গোলা আর গুলী দিয়ে করে যান গুলতান।
চেঙ্গিজ তৈমুর নাদিরশা হুলাকু
মেরেছেন এক লাখ মেরেছেন দু' লাখু।
তাঁদের উপরে নাকি দিয়েছেন টেক্কা
সার্থকনামা বীর জাঁদরেল টিক্কা।

শুনে কাঁদে এ পরাণ শুনে কাঁপে এ হিয়া
নাদিরের ঘরানা শাহান শা এহিয়া
অর্ধেক লোক মেরে রাখবেন একতা
ছয় কোটি মরবে সত্য কি একথা?
ছয় কোটি অক্কা! একদম ছক্কা!
লাশ হয়ে দেশ হবে মাশরিকি মক্কা!
হাঁক শুনি দৈনিক সাথে আছে চৈনিক
আরো কত জাঁদরেল আরো কত সৈনিক।

আসবেন চেঙ্গিজ আসবেন তৈমুর
দেখবেন দু' ইয়ার দিল্লী অনেক দূর।
কপালে কি আছে লেখা জানে সবজান্তা
বাংলায় হারবেই মিলিটারি জাণ্টা।
আঁদরেল বাঁদরেল ছয়জন জাঁদরেল
বাংলা বিষম ফাঁদ সেখানে ফুরাবে খেল।

৫

আবার পথে। একে পথ বলা ভাষার অপব্যবহার। খাড়া পাহাড়ের কাঁধ-বরাবর পথিকের পায়ে পায়ে একটা নিরিখ পড়ে গিয়েছে, কোন মতে একজন লোক চলতে পারে, উল্টোদিক থেকে আর একজন এসে পড়লে বিপদ, একজনকে পাহাড়ের গায়ে গাছপালা আঁকড়ে ধরে পাশ দিতে হয়। ডান দিকে পাহাড় সোজা উঠে গিয়েছে একেবারে আকাশের সীমানা অবধি; গায়ে বনস্পতির অক্ষৌহিনী; তার পায়ে মাথায় জড়ানো মোটা মোটা লতা; অজানা ফুলে অজানা পতঙ্গের চঞ্চলতা; সেই অরণ্যের মাঝে নিশ্চয় আছে অজানা শ্বাপদের দল: সমস্ত নিস্তব্ধ কিন্তু নীরব নয়, কেমন একটা গম্ গম্ গম্ভীর ধ্বনি, একেই বোধকরি প্রাচীনেরা ওংকার শব্দ বলেছেন। আর বাঁ দিকে ঐ অতি নিম্নে পাহাড়-বরাবর একটি ক্ষীণ শাদা সুতো, তার দুপাশের শাল দেওদার বনস্পতির ক্ষুদ্রায়তন স্মরণ করিয়ে দেয় উপত্যকার গভীরতা।

সর্বত্র পথ পায়ে চলার মতো হলেও বা হতো, অনেকগুলিই পথের নিরিখ নয়, পাথরের খন্ড পড়ে আছে—ওটাই নাকি পথ। পায়ের চাপে একখানা পাথর খসে পড়লেই নির্ঘাৎ পতন, হাড় মাংসের আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না, ঐ যে নীচে মাংসাশী পাখীগুলো উড়ছে তারা বঞ্চিত হবে না। উপত্যকার ওপারে আবার পাহাড়ের ঐ একই দৃশ্য। আজ সারাদিনের মধ্যে একখানি পাহাড়ী গ্রাম চোখে পড়েনি জরার। গতকল্য এক পাহাড়ী গ্রামে আশ্রয় জুটেছিল, গ্রামের লোকে সাধু মনে করে তাকে খাদ্য ও ঘরের দাওয়ায় রাত্রি যাপন করতে দিয়েছিল। আজ সারাদিন অনাহার, তাতে জরা অনভ্যস্ত নয়, রাতে যে কোথাও আশ্রয় মিলবে তারও আশা নাই—তাতেও সে অভ্যস্ত। তবে একটা বসবার স্থান তো আবশ্যক—এই পাথর সংকুল পথে পা ফেলবার স্থানও যে সুলভ নাই।

সারা দিনের মধ্যে চোখে পড়েনি একটা পথিক। কাউকে শুধাতে পারেনি তার গতি কি হবে, শুধু মনের মধ্যে জপে চলেছে আমি পাপী, আমার কি গতি হবে। এমন সময়ে মোড় ঘুরতেই জরার চোখে পড়লো অনেকটা সমতল স্থান, সেখানে গাছপালাও কম। এখন এই হঠাৎ দৃশ্যান্তরে আর সে বিস্ময় বোধ করে না। পাহাড়ে সবই অভাবিত আচমকা। তার পা আর চলছিল না, একটা গাছের গুঁড়ির কাছে বসলো, বসলো কি ঘুমিয়ে পড়লো। যখন ঘুম ভাঙলো দেখলো আকাশ আলোয় ভরে গিয়েছে আর সম্মুখে হাত জোড় করে দণ্ডায়মান কয়েকজন পাহাড়ী স্ত্রীপুরুষ, বাবাজী গোড় লাগে।

জরা তাদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় বলল, আমি সাধু সন্ন্যাসী নই, নিতান্ত পাপী মহাপাপী।

তাতে ঠিক উল্টো ফল হল। এই সরল পাহাড়ীরা জানে প্রকৃত সাধুরা সহজে ধরা দেন না, নানা অছিলায় মুক্তি পেয়ে প্রস্থান করেন।

তারা বলল, বাবাজী, সংসারী মানুষ পাপী তাপী হবে, আপনার মতো গৃহত্যাগী পাপী হতে যাবে কোন দুঃখে।

জরার এরকম অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে, জানে যে দোষ স্বীকার করে সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রসাদ প্রত্যাশীদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। তাই সে নীরবতা অবলম্বন করলো। তাতে গৃহীদের ভক্তি গেল আরও বেড়ে। এমন সময়ে একজন গৃহী এক লোটা দুধ আর কতকগুলো আখরোট নিয়ে এসে উপস্থিত হল, সাধুর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলো। জরা বুঝলো এগুলো প্রত্যাখ্যান করলে তাদের ভক্তিতে এমন আতিশয্য হবে যে সে এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। আর তা ছাড়া কালকার অনাহারে সে এমনি দুর্বল হয়ে পড়েছিল খাদ্যের তার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। দুধটা পান করে কয়েকটা আখরোট ভেঙে খেল, বাকি-গুলো বিতরণ করে দিল, তারা সেগুলি প্রসাদ মনে করে মাথায় ঠেকিয়ে গাঁয়ের দিকে প্রস্থান করলো। জরা এই সুযোগে করলো স্থান ত্যাগ।

জরার দেশ কাল সম্বন্ধে বিভ্রম জন্মে গিয়েছে। কতকাল হল নরেন্দ্রনগর পরিত্যাগ করেছিল খেয়াল নাই—সে যেন গতজন্মের স্মৃতি। কিন্নর রাজ্য ছেড়েছে কবে? কখনো মনে হয় দু'চার দিন আগে, কখনো মনে হয় অনেক অনেক কাল। আর স্থান? এ কোন্ স্থান জানে না, কোথায় চলেছে জানে না। দেশভ্রমে দিক্‌ভ্রম। তবে সেটা হতে দেয়নি। প্রতিদিন প্রাতে সূর্যোদয় দেখে, ঘড়ি মিলিয়ে নেবার মতো দিকনির্ণয় করে নেয়। ছার্গার্যের উপদেশ পূবে যাবে দক্ষিণে যাবে, পূর্বে হিমালয়, দক্ষিণে ভারতবর্ষ উত্তরে বা পশ্চিমে নয়। জরা পূর্বদিকের যাত্রী। মাঝে মাঝে পাহাড়ী নদীতে স্নান করতে নেমে নিজের দাড়ি আর চুলের দৈর্ঘ্য দেখে বুঝতে পারে অনেক কাল গিয়েছে তার মাথার উপর দিয়ে। কত কাল? তা জানে না। নরেন্দ্রনগরে তার দাড়ি ছিল না, চুল সামান্য। এখন দাড়ি বুকের উপরে এসে পৌঁছেছে, চুল পিঠের উপরে। সেই গোঁফ দাড়ির আগাছা ভেদ করে চোখে পড়লো নিজের মুখখানি। এ দুয়ে কত প্রভেদ। হাঁ কপালে ও গালে দুঃখ কষ্ট ছাপ বসিয়ে দিয়েছে বটে তবু তারুণ্য ঘোচাতে পারেনি। তার বয়স কতই বা হবে, খুব বেশি হবে তো দুই কুড়ি। তার কিছু কম হওয়াই সম্ভব। অবশ্য দাড়ি গোঁফ কামিয়ে ফেললে তারুণ্য স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। তখনি মনে পড়ে যায় কিন্নর রাজ্যের তরুণ-তরুণীদের।

জরা ভাবে বোকা পেয়ে তাকে ধাপ্পা দিয়ে ঠকিয়ে দিলে না তো। বলে কিনা ছোকরার বয়স দেড়শ, আর ছুঁড়ি তিনটের শোয়াশ। ওদেশে যে বৃদ্ধ নেই, অর্থাৎ চুল দাড়ি পাকা ন্যুব্জদেহ মানুষ নেই সে তো চোখেই দেখলাম। আর এই চিরযৌবন নাকি প্রবৃত্তিকে বাধা না দেওয়ার ফল। সে হলে যেত সব...কিন্তু তখনি মনে পড়ে যায় যা

দেখলে আর শুনলো তাকে মিথ্যা বলে কি করে? ছোকরা এসে ছুঁড়ি তিনটাকে পথের মাঝে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলে আর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান কেমন সরলভাবে হয়ে গেল। ওরা তো স্পষ্টই বলল, প্রবৃত্তির পথে ধর্মনীতি বিবেক আচার প্রভৃতির শিলাখণ্ড ফেলবার ফলেই বন্যা ঘটে তাতেই অকালে ধ্বসে পড়ে তারুণ্য যৌবন আনন্দ সুখ-স্পৃহা। নাঃ ওরা বেশ সুখে আছে। অজ্ঞাত-সারে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। আর সে কিনা পথে পথে ঘুরে মরছে মুক্তির সন্ধানে। নাঃ এরা বেশ সুখে আছে।

তখনি মনে পড়ে যায় খট্যাশ আর দলবলকে। তারাও তো বেশ সুখী ছিল। ধর্মনীতি বিবেক বলে হায় হায় করে বুক চাপড়ে মরতো না। মাঝখান থেকে তার এ-দশা কেন? দুই দিকে সুখের সমান্তরাল তীরভূমি, মাঝখানকার দুঃখের আবর্তে সে হাবুডুবু খাচ্ছে। তখন মনে পড়ে যায় কিন্নর রাজ্যের তরুণটি কি একজন ঋষির যেন নাম করেছিল—চারুবাক না কি। পাছে নামটা ভুলে যায় তাই বারবার মনে মনে উচ্চারণ করে, এক-আধবার হয়তো জোরে বলে ফেলেছিল।

কি বাবাজী সকালবেলাতেই ঐ অলক্ষুণে নামটা করছো কেন?

জরা চমকে চেয়ে দেখে পাশে এসে বসেছে আর একজন সন্ন্যাসী। হিমালয় সন্ন্যাসীর রাজ্য!

জরা শুধালো, আপনি কখন এলেন? কোথায় থাকেন?

নবাগত একটু রুক্ষভাবেই বলল, এখনি এসেছি। আর নিজে সন্ন্যাসী হয়ে জানেন না কোথায় থাকি! সন্ন্যাসীর যেখানে রাত সেখানে কাত। আপনার প্রশ্নের উত্তর পেলেন তো, এবারে আমার প্রশ্নের উত্তর শুনি—সকালবেলাতেই ঐ পাষণ্ডটার নাম করছিলেন কেন?

কেন তাতে দোষ কি?

সকালবেলায় পাষণ্ডের নাম করলে দোষ কি?

পাষণ্ড বলেই দোষ।

নবাগত বললো, আর এযে মহাষণ্ড।

পাষণ্ড, মহাষণ্ড! সে কি আমি শুনেছি তিনি ঋষি।

ও বেটা যদি ঋষি হয় তবে বনের ভালুকগুলোও ঋষি। তা নামটি কোথায় পাওয়া হল?

জরা জানায় কিন্নর রাজ্যে।

ও, ইতিমধ্যে সেখানেও যাওয়া হয়েছে। তবে তো নরকের দরজাটা দেখেছ, এবারে খাস নরকটা দেখতে বুঝি ইচ্ছা।

জরা বলল, সাধুজী, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, কেন তাঁকে পাষণ্ড বলছেন।

আগে কি প্রয়োজন সে বেটার কাছে শুনি।

জরা বলে, আমি ঘোরতর পাপী, মুক্তির সন্ধানে বেরিয়েছি, কিন্নর রাজ্যের লোকেরা বলল, ঋষি চারুবাক জানেন মুক্তির সন্ধান।

ঋষি চারুবাক! বেটা রাক্ষস চার্বাক।

রাক্ষস কেন? মানুষ খায় নাকি—শুধায় জরা।

মানুষ খায় না, খায় তার মুণ্ডুটি আর তার ইহকাল পরকাল।

জরা বলে আমার তো ঐ দুয়ের একটাও নেই।

মুণ্ডুটি আছে তো এবারে সেটাও থাকবে না।

সাধুজী, আমার মাথা মুণ্ডুতে কি প্রয়োজন? মুক্তি ছাড়া আমি আর কিছু চাই না।

তা দেবে মুক্তি। গোটাকতক যুবতী জুটিয়ে দেবে, আর সেই সঙ্গে পায়স পিষ্টক পুরোডাস আর হাঁড়ি ভাঁড় মাধ্বী! মুক্তি না পেয়ে আর উপায় কি?

কি বলছেন! তিনি একজন ঋষি।

আরে ঋষি বলেই তো বলছি। এক ঋষি বিশ্বামিত্র, আর এক ঋষি পরাশর, আবার এক ঋষি বেদব্যাস। এদের কন্যেকে কান পাতবার উপায় নেই।

তার সন্তোষ বিধানার্থে বলল, সাধুজী আপনিও তো একজন ঋষি।

তবে রে বেটা! আমি হলাম কিনা ঋষি—এই বলে হাতের দণ্ডখানা উত্তোলন করলো জরার মাথা লক্ষ্য করে।

জরা সরে এসে বলল, মাপ করবেন, আমি জানতাম না আপনি কী?

নবাগত সদম্ভে বলল, আমি মুনি, মৌন থাকাই আমাদের ধর্ম আর সেই সঙ্গে অক্রোধ ক্ষমা তিতিক্ষা।

মুনি-ধর্মের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখে তাঁর মুনিত্বে আর সন্দেহ রইল না। এখন সে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলো, প্রভু এতক্ষণ চিনতে পারি নি, দোষ হয়ে গিয়েছে। এবারে চারুবাক ঋষির আশ্রমের সন্ধান যদি জানেন তবে দয়া করে বলে দিন।

মুনি প্রস্থান করতে করতে বলল, জানি না।

তারপরে ফিরে এসে বলল, জানি কিন্তু বলবো না।

এই বলে সবেগে প্রস্থান করলো, স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো জরা।
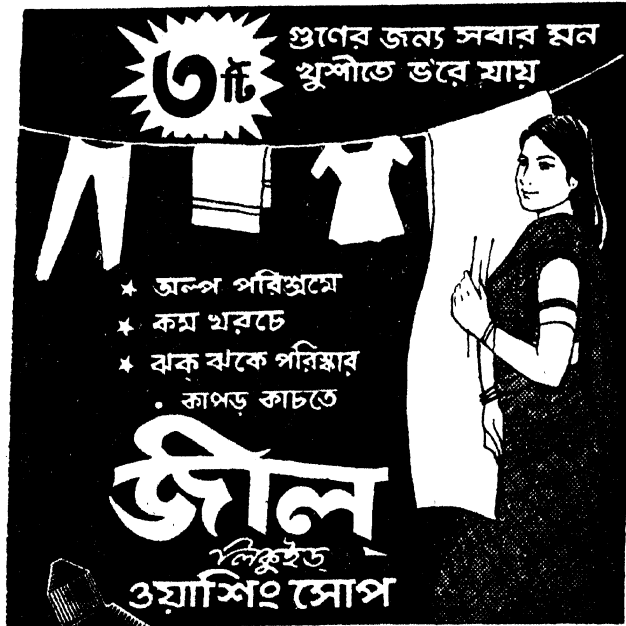
৬

জরা যখন চার্বাক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হ'ল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়।

আশ্রমে প্রবেশ করতেই একজন তরুণ শিষ্য তাকে অভ্যর্থনা করে পাদ্য অর্ঘ্য দিল, তারপরে বলল, আর্য, এখন আপনি বিশ্রাম করুন, কালকে প্রাতঃকালে আশ্রমগুরুর কাছে আপনাকে নিয়ে যাবো।

জরা বলল, বৎস সত্যই পথশ্রমে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত, আমার বিশ্রামের বড় প্রয়োজন।

শিষ্যটি বলল, সে তো খুবই স্বাভাবিক। হিমালয়ের এই দুর্গম অধিত্যকা আসতে হ'লে অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

তাকে অনুসরণ করে চলতে চলতে জরা দেখতে পেলো সরল দেওদার প্রভৃতি বনস্পতির ছায়ায় ছোট ছোট পর্ণকুটীর, কুটীরে কুটীরে দীপ প্রজ্জ্বলিত, আশ্রমের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সমস্ত তকতক ঝকঝক করছে। আর সেই স্নিগ্ধশীতল আবহাওয়া পরিব্যাপ্ত করে একটি নিবিড় শান্তি। ভারি আরাম বোধ করলো সে।

শিষ্য তাকে নিয়ে একটি পর্ণকুটীরে প্রবেশ ক'রে পাথরের মেঝের উপরে খানদুই কম্বল বিছিয়ে দিল, বলল, আপনি উপবেশন করুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আহারের সময় হবে তখন আপনাকে মহানসের সমীপে ভোজনশালায় নিয়ে যাবো।

জরা বললো, বৎস, তোমাদের অভ্যর্থনা ও সমাদরে আমি অত্যন্ত প্রীত হ'লাম। তোমাকে আশীর্বাদ করছি।

জরা উপবেশন করলে অদূরে মেঝের উপরে বসলো। জরা বলল, বৎস তুমি শীতল মেঝেতে বসলে কেন? এই কম্বলের উপরে এসে বসো।

শিষ্যটি বলল, আর্য, অতিথির সঙ্গে সমাসনে বসা বিধেয় নয়, আমি এখানে বেশ আছি।

জরা শুধালো, তোমার নাম কি বৎস?

আমার নাম অরণি।

অরণি, বেশ সুন্দর নামটি।

অরণি শুনে হেসে উত্তর দিল, আর্য, শুধু আমার নামটি নয়, আমাদের এখানে সমস্তই সুন্দর, কালকে ভোরের আলোয় দেখে সন্তুষ্ট হবেন।

জরা প্রশ্ন করলো, বৎস, তোমরা এখানে কোন্ দেবতার উপাসক?

উত্তর শুনতে পেলো, আর্য, আমরা কোনো দেবতার উপাসক নই, আমরা ব্রাত্য।

ব্রাত্য শব্দটি কখনো শোনেনি জরা, তাই শুধালো, ব্রাত্য বলতে কি বোঝায়?

আমরা দেবোপাসক নই বলে বেদবাদী মুনি-ঋষিগণ আমাদের বলে ব্রাত্য অর্থাৎ ব্রতভ্রষ্ট বা পতিত। তারা আমাদের একঘরে ক'রে রেখেছে।

জরা শুধায়, তাই বুঝি এই দুর্গম স্থানে তোমাদের আশ্রম।

না আর্য ঠিক সে জন্য নয়। এ স্থান সুন্দর স্বাস্থ্যময়, নগর কোলাহল হ'তে দূরে অবস্থিত বলে সাধনার প্রশস্তক্ষেত্র।

জরা বলে, এই মাত্র বললে, তোমরা কোন দেবতার উপাসনা করো না তবে আবার সাধনা কিসের? কার সাধনা করো?

অরণি বললো, কারো সাধনা নয়,

আমরা জীবনের সাধনা করি, আমরা জীবনসাধক।

বিষয়টা তো বুঝতে পারলাম না বৎস, বুঝিয়ে দাও।

আর্য অতি কঠিন প্রশ্ন করেছেন, বোঝাবো, এমন সাধ্য আমার নেই। কাসকে আশ্রমগুরুকে প্রশ্ন করলে জানতে পারবেন।

এমন সময় শঙ্খবাদিত হল।

জরা শুধালো, কোন্ মন্দিরে শঙ্খ বাদিত হল।

শিষ্যটি বলল, কোন মন্দিরে নয়, তবে মন্দিরশব্দ প্রয়োগ করতে হলে বলা যায়, ভোজনমন্দিরে—এই বলে সে মৃদু হাস্য করলো।

তারপরে বললো, গাত্রোত্থান করুন, ভোজনশালার দিকে যাওয়া যাক।

অরণিকে অনুসরণ করে জরা ভোজনশালায় এসে পৌঁছল। দেখতে পেল দীর্ঘ দুই সারিতে কুশাসনে ভোক্তাগণ উপবিষ্ট, প্রত্যেকের পাশে এক লোটা জল, সম্মুখে কালো পাথরের থালাতে এক গুচ্ছ পুরোডাস, শাক, পাথরের বাটীতে মাংস ও পায়সান্ন। এই দীর্ঘ সারির একান্তে একজন বিভূতিসম্পন্ন কান্তিপুরুষ উপবিষ্ট। তিনি বললেন, আর্যগণ, এবারে অনুগ্রহ করে ভোজন আরম্ভ করুন। অরণি নবাগত অতিথিকে পাশে নিয়ে বসেছিল। জরা বুঝলো, এদের মতবাদ যাই হোক, এরা খায়দায় ভালো, তখনি মনে পড়লো এরা জীবনসাধক। হাঁ জীবনসাধনার উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী বটে। নরেন্দ্রনগর ছাড়বার পরে এরকম সুখাদ্য জোটে নি জরার ভাগ্যে, অধিকাংশ সময়েই জুটেছে অখাদ্য ও নিখাদ্য। কাজেই সে যে আগ্রহের সঙ্গে খাবে এ আর বেশি কি। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, খাদ্য গ্রহণে সকলেরই সমান আগ্রহ। জরা ভাবে তবে কি এরা সকলেও তারই মতো গেহী আদাম নাকি। না, তাতো নয়, অরণির কাছে শুনেছিল যে, সেদিন অতিথির সংখ্যা বেশি। দুপুরবেলাতেও এই সংখ্যা ছিল। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ক্ষুধার এই সজীব রূপ দেখে বুঝলো, এদের জঠরাগ্নি কিছু প্রবল, আর তা হবেই বা না কেন? হিমালয়ের জল ও হাওয়া দুই স্বাস্থ্যের অনুকূল।

কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি হলে জরা লক্ষ্য করলো, এতক্ষন একমাত্র লক্ষ্য ছিল পুরোডাস ও মাংসের প্রতি। এক সারিতে, যে সারিতে সে নিজে উপবিষ্ট ভোক্তাগণ গুম্ফ ও শ্মশ্রুমান, অনেকে শ্মশ্রুর দৈর্ঘ্যে জরার দাড়িকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। অন্য সারিতে যুবকদলের গুম্ফ শ্মশ্রু ক্ষৌরিত চিক্কন কান্তিমৎ মুখমন্ডল। অরণি কানে কানে বলল, এ সারিতে, সমাগত অতিথিগণ, সম্মুখের সারিতে আশ্রমিকগণ, আর ঐ যিনি আহার করতে অনুরোধ করলেন তিনি আশ্রমগুরু চার্বাক। জরা সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে তাঁকে দেখল তবে ইনিই বহুশ্রুত বহুনিন্দিত বহুনিন্দিত ঋষি চার্বাক। কই ঋষিযোগ্য তো কিছুই নাই তাঁর মধ্যে, গোঁফ দাড়ি ঘটাপটা। এ-কেমন ঋষি!

জরা শুধালো, এত অতিথি সমাগম কি নিত্য হয়ে থাকে।

অরণি জানালো, প্রায় প্রত্যহ কিছু অতিথি সমাগম হয় তবে আজ কিছু সংখ্যা বেশি।

কোন পর্ব আছে কি?

না আর্য, আগামীকল্য এক বিতর্ক হবে।

কি নিয়ে?

অরণি জানায় এইসব অতিথি বেদবাদী অর্থাৎ আত্মা ঈশ্বর, পরকাল প্রভৃতি মানেন। আমরা মানি না। তর্ক এই দুই পক্ষে হবে।

জরা শুধায়, তোমরা কি পাপপুণ্য মানো না? পাপ পুণ্যের ঊর্ধ্বে এক অবস্থা আছে, আমরা তাই মানি।

কি সেটা?

আনন্দ। আমাদের জীবসাধনা এই আনন্দ উপলব্ধির জন্যে।

শুনেছি বেদবাদীগণও আনন্দ স্বীকার করেন।

করেন কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের পথের ব্যবধান অনেক। আর্য এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে আমি অনধিকারী। আজ রাতের মতো ধৈর্য ধরুন কালকে বিচারসভায় সমস্ত অবগত হবেন।

ইতিমধ্যে ভোজন ও আচমন শেষ করে যে-যার কুটীরে প্রস্থান করলো। জরা শয্যায় শয়ন করবমাত্র নিদ্রামগ্ন হল।

যে জরা তীর-ধনুক নিয়ে বনে বনে শিকার ক'রে বেড়াতো, বাসুদেবকে হত্যা করেছিল, মদিরার ঘরে ঢুকে মদ খেয়ে মাতলামো করতো সে-জরা আর আজকের জরায় অনেক প্রভেদ। সুমন্তপুরের জরা আর নরেন্দ্রনগরের জরা অনেক উন্নত, রাজকীয় আচারব্যবহার শিখেছিল তবু, সে জরা আজকার জরা নয়। তারপরে দুঃখের অনুশোচনায়, কষ্টের তাড়নায় সংকটে বিপদে পথে-পথে অনেক বছর কেটে গিয়েছে তার। সাধুসঙ্গ করেছে, অসাধুসঙ্গ করেছে, বাঘের মুখে পড়েছে, ভালুকের তাড়া খেয়েছে, কিন্নর রাজ্য দেখেছে। এইভাবে দুঃখের কটাহে তপ্ত-তপ্ত হতে হতে ভিতর থেকে ধীরে ধীরে পেকে উঠেছে; কেতাবীজ্ঞান না পেলেও জ্ঞানের যা সার ভালোমন্দ বিচার করবার কিছু ক্ষমতা লাভ করেছে। বেদ পুরাণ লোকায়ত মত সম্বন্ধে তার তাত্ত্বিক জ্ঞান না থাকলেও ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ হয়েছে। জ্ঞানীদের কথা বুঝতে পারে যদিচ নিজে জ্ঞানী বা পন্ডিত নয়। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, চুম্বকশলাকা যেমন নিরন্তর উত্তর দিকে তাকিয়ে থাকে তেমনি তার মনটি একাগ্র হয়ে আছে অভীষ্ট লাভের দিকে, কিভাবে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এই অভিলাষ নিয়ে সে যখন পরদিন প্রাতে বিচারসভায় এসে বসলো দেখলো পান্ডিত্যের তুলো ধুনে চতুর্দিক অন্ধকার করে ফেলেছে উভয় পক্ষের পান্ডিতে। কেবল আশ্রমগুরু চার্বাক প্রসন্নমুখে নীরব।

উভয় পক্ষে বিতর্কটা কি রকম হচ্ছে বোঝাতে হলে আধুনিক রণকৌশলের সঙ্গে তুলনা দিতে হয়, অন্য কিছু তুলনীয় তো দেখি না। যুদ্ধের প্রারম্ভেই উভয় পক্ষ কামানের গোলা চালাতে শুরু করে, গোলাবর্ষণ ক'রে প্রতিপক্ষকে থেঁতলে ঘায়েল ক'রে নেওয়া উদ্দেশ্য, তারপরে প্রয়োজন মতো পদাতিক বা অশ্বারোহী। এ-ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে, কামানের গোলার বদলে দুর্বোধ্য দুর্বহ সংস্কৃত শ্লোক। জরার এমন বিদ্যা নেই সংস্কৃত বোঝে, তাই গভীরভাবে নীরব হয়ে থাকলো। কিছুক্ষণ পরে উভয় পক্ষ যখন রণক্লান্ত তখন শ্মশ্রুমান একজন বেদবাদী বলে উঠল হে চার্বাক রাক্ষস, সাধ্য থাকে তো প্রমাণ করো যে আত্মা, ঈশ্বর ও পরকাল নাই।

তার অনার্য সম্ভাষণে চার্বাকপন্থীদের একজন বলে উঠল, আশ্রমগুরুর অপমান অসহ্য, ভদ্রভাবে কথা বলুন।

সেই শ্মশ্রুমান ব্যক্তিটি বলল, অনার্যের সঙ্গে ভদ্রতা অনাবশ্যক।

শিষ্যটি বলল, উনি যে অনার্য সেটা প্রমাণসাপেক্ষ।

প্রমাণ ও ভদ্রতা অবান্তর। যুদ্ধ বিজয়ের পরে মহারাজ যুধিষ্ঠির সিংহাসনে উপবিষ্ট হলে অনাহূতভাবে এই অশিষ্ট ব্যক্তি সভায় প্রবেশ ক'রে সম্মিলিত ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাণী উপেক্ষা করে তাঁকে ধিক্কার দিয়েছিল বলল বেদবাদী ব্রাহ্মণটি।

শিষ্য উত্তর দিল, অসংখ্য আত্মীয় ও নিরীহ প্রজার প্রাণের বিনিময়ে লব্ধ সিংহাসন সজ্জনের ধিক্কারের যোগ্য।*

তার উত্তর শুনে বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ অবজ্ঞাসূচক উচ্চহাস্য করে উঠল, বলল, ধর্মযুদ্ধে শত্রু নিধন পাপ নয়, বরঞ্চ শত্রুনিধন না করাই পাপ। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তাদের বাক্যে লোকায়তগণ বলল, আপনারা অপোগণ্ডের মতো কথা বলছেন, কৃষ্ণ পর্যন্ত মানতে রাজি আছি কিন্তু তিনি যে ভগবান তার প্রমাণাভাব।

বেদবাদীদের একজন বলল, অন্ধের কাছে জগৎটাই প্রমাণের অতীত।

অন্ধ জগৎ দেখতে না পেলেও তাকে স্পর্শ করতে পারে, তাকে আস্বাদ করতে পারে, কিন্তু আপনাদের কে ভগবান প্রত্যক্ষ করেছেন বলুন।

তিনি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হলেও মানস প্রত্যক্ষ।

সে প্রত্যক্ষতা আপনাদের কাছে সত্য হতে পারে অন্যে তা মানবে কেন?

বেদবাদীগণ বলল, তবে তোমরা কি মানো বলো দেখি।

লোকায়তগণ অভিমত প্রকাশ করলো, যা প্রত্যক্ষ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যসম্মত তাই মানি, প্রমাণাভাবে তদতিরিক্তের অস্তিত্ব নাই।

---

* মহাভারতের সমাজ পৃঃ ৬৫২, শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, সপ্ততীর্থ।

তবে তোমরা আত্মা মানো না, কেন না তা প্রত্যক্ষ নয়।

নিশ্চয়ই মানি না।

তবে তো দেখছি তোমরা ঈশ্বর, পরকাল, ধর্মনীতি বিবেক কিছুই মান না।

একথা সত্য স্বীকার করলো লোকায়তগণ। তারা আরও বলল, ঈশ্বর, পরকাল ধর্ম প্রভৃতি অলীক কল্পনা। রাজন্যগণের প্রেরণায় অভিসন্ধিপরায়ণ পরপিণ্ডভোজী ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি। ও এক প্রকার মানসিক মদ্য।—ঐ মদ্য পান করিয়ে জনসাধারণকে বিকল করে রাখা হয়েছে।

কেন বলো তো বাপু, শুধলো একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

এই জন্যে যাতে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে থাকে. রাজাদের হাত থেকে নিজেদের প্রাপ্য ছিনিয়ে না নিতে পারে।

ধরো তোমার কথা যদি সত্যই হয় তাতে ব্রাহ্মণগণের লাভ কি?

লাভ রাজপ্রসাদ।

ব্রাহ্মণগণ দীন জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত, সামান্য আতপ চাল ও ঘৃতের বেশি তাদের প্রয়োজন হয় না তবে কেন অন্যায়ভাবে রাজপ্রসাদ যাচ্ঞা করতে যাবে।

তা নইলে যে ঐটুকু মেলে না। পরজীবী পরাশ্রয়ী পরান্নভোজীদের জীবন ধারণের আর কি উপায়।

এসব যুক্তি অর্বাচীনের মতো, অর্বাচীনরাই এতে মুগ্ধ হবে। আচ্ছা বাপু, তোমরা তো আত্মা ঈশ্বর পরকাল কিছুই মানো না, তবে তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি?

লোকায়তদের একজন বলল, সুখ লাভ!

সুখ লাভ তো পরকালবাদীদেরও কাম্য, তবে তফাৎটা কোথায়?

তফাৎটা পন্থায় ও সাধনরীতিতে।

সকলে চেয়ে দেখল আশ্রমগুরু এতক্ষণ নির্বাক হয়ে শুনছিলেন এবার বলে উঠলেন, বেদবাদীদের সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ লোকায়তগণের লক্ষ্যে প্রভেদ নাই —প্রভেদ সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায়ে।

সমস্ত বেদবাদীগণ দীর্ঘ চামরের মতো দাড়ি সঞ্চালিত করে বলল, আর একটু খুলে বলুন।

তথাস্তু বলে চার্বাক শুরু করলেন—আপনারা তপস্যা তিতিক্ষা কৃচ্ছ্রসাধন প্রভৃতি দ্বারা জীবনকে অহরহ কণ্টকিত ক'রে রেখেছেন। অনাহারে অনিদ্রায় ভোগরাহিত্যে নিজেকে ক্লিষ্ট করেন, কেননা, আপনাদের ধারণা ঐ সব প্রক্রিয়ার পরিণামে সুখ লাভ করবেন। কিন্তু শতকরা নিরানব্বুই জন ঐসব অমেধ্য প্রক্রিয়ার পরিণামে দেহরক্ষা করেন, সুখলাভ আর ঘটে না।

ব্রাহ্মণগণ বলল, ইহলোকে না হোক পরলোকে হয়।

চার্বাক বলেন, পরলোক যে আছে তা তো প্রমাণ হয় নি। আর তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করাই যায় যে পরলোক আছে তবু আমাদের জিৎ।

আমরা ইহলোকে হাতে হাতে সুখলাভ করি, কোন অনির্দিষ্ট পরলোকের জন্য তা মুলতুবি রাখি না।

ব্রাহ্মণগণ বলে, আমাদের সাধনপন্থা তো বিবৃত করলে এবারে তোমাদের সাধনপন্থা কি শুনি।

বিলক্ষণ বলে পুনরায় সুরু করেন চার্বাক। জীবনকে বঞ্চিত করো না, পঞ্চেন্দ্রিয়কে তাদের ভোগ্য জোগাও। হাতে হাতে সুখ পাবে। রসনা সুখাদ্য চায় তাকে বঞ্চিত করো না, ঘ্রাণেন্দ্রিয় সুগন্ধ চায় গন্ধ পুষ্প ও সুরভিতে গৃহ পূর্ণ রাখো. শ্রবণেন্দ্রিয় মধুরধ্বনি প্রত্যাশা করে সুরম্য সংগীত শ্রবণ করো, ত্বক ও উপস্থ নারীর স্পর্শ কামনা করে সুন্দরী যুবতী নারী উপভোগ করো—এই আমাদের সাধনরীতি। এভাবে যদি চলো তবে জরামরণরহিত হয়ে চিরপুণ্যলোকে মানুষ বিরাজ করতে পারবে। পারবে নয় পারে, হিমালয়ে অনেকগুলি কিন্নর রাজ্য আছে সেগুলি দেখে আসুন।

তারপরে তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের শুধালেন, মহাশয়, আমার বয়স কতো অনুমান করেন?

একজন তাকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করে বলল, যে রকম নাদুসনুদুস দেখছি চল্লিশের ঊর্ধ্বে নয়।

চার্বাক বলল, আমার বয়স দুই হাজার বছর, আরও অন্তত দুই হাজার বছর বাঁচবো, হয়তো বা চিরজীবীও হতে পারি। এবার জিজ্ঞাসা কতে পারি কি আপনাদের বৃদ্ধতমের বয়স কত?

এই অভাবিত প্রশ্নে হকচকিয়ে গেল ব্রাহ্মণগণ। কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে জানালো এই যে উদ্দালক ঋষি ইনিই আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, এঁর বয়স চুরাশি।

তবেই দেখুন বেদজ্ঞমহাশয়গণ এই সামান্য বয়সে ভ্রান্ত সাধনপন্থা অবলম্বনের ফলে আপনারা শুকিয়ে চামচিকের মতো হয়ে গিয়েছেন। আমার এই সৌম্য শিষ্যগণের মধ্যে তরুণতমের বয়স চুরাশির অনেক বেশি। এরা সকলেই ভোগী, সুখী ও লব্ধকাম।

একজন বেদজ্ঞ বলল, মহাশয়, ক্রমাগত ভোগে যে ইন্দ্রিয় শিথিল হয়ে পড়ে, ক্রমে উদরাময়, অগ্নিমান্দ্য, ধ্বজভঙ্গ রোগ দেখা দেয়, রোগ ও জরা মৃত্যুর অগ্রদূতরূপে এসে আক্রমণ করে তখন সুখ যে মাথায় ওঠে।

চার্বাক বলল মহাশয়গণ ভুল করছেন অতিরিক্ত ভোগেই ঐসব পরিণাম ঘটে, অতিরিক্ত ভোগে অগ্নিবর্ণ নষ্ট হয়েছিল, অতিরিক্ত ভোগে চন্দ্র ক্ষয়রোগযুক্ত। ভোগ ও অতিরিক্ত ভোগে আকাশপাতাল প্রভেদ। এই দেখুন না কেন অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনে অকালে আপনারা শুষ্ক হরিতকিতে পরিণত হয়েছেন। সর্বমত্যন্তম গর্হিতম্। আরও যদি অনুস্বর-বিসর্গযুক্ত বাক্য শুনতে চান তবে বলি—সন্তোষহৃদিমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। বিচার ক'রে নিয়মিত ভোগ করুন ইহজীবনেই পরম সুখ লাভ করবেন

ঈশ্বর পরকাল-ফরকাল কল্পনা করবার প্রয়োজন হবে না।

চার্বাকের যুক্তির মধ্যে যতই ফাঁক থাকুক সে ফাঁক ধরবার মতো বিদ্যা উপস্থিত বেদবাদীদের ছিল না তবু তারা ভাঙে তথাপি মচকায় না।

একজন জিজ্ঞাসা করলো, বেশ ঈশ্বর পরকাল প্রভৃতি যেন নাই—কিন্তু জড়জগতে চৈতন্য এলো কি ভাবে?

চার্বাক বলল, চৈতন্যরূপ স্বতন্ত্র কিছু কল্পনা করবার প্রয়োজন নাই, চৈতন্য জড়েরই বিকার। এই ধরুন না কেন তণ্ডুল, গুড় প্রভৃতি নানা দ্রব্যের কল্ক মিলিত হলে দুইতিনদিনের মধ্যে মাদকতা শক্তি উৎপন্ন হয় সেই যথাযথ সমাবিষ্ট পঞ্চভূত থেকে চৈতন্যের সৃষ্টি। কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়—অগ্নি তো কাষ্ঠেরই অবস্থান্তর। অয়স্কান্তমণি যেমন লৌহকে সঞ্চালিত করে সেই সমুৎপন্ন চৈতন্য ইন্দ্রিয়সমূহকে চালিত করে। অতএকথায় কাজ কি, ভোগাবস্তুর ভোক্তৃত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত শরীরাতিরিক্ত জীব স্বীকারের প্রয়োজন নাই। কাজেই চৈতন্য জড়ের মধ্যেই বর্তমান।

চার্বাকের ব্যাখ্যা শুনে বেদবাদী কিছুক্ষণ নীরব থেকে তারপরে সমস্বরে বলে উঠল, ধিক্ পাপ আলোচনা। এ নরকসদৃশ স্থানে আর তিলার্ধকাল অবস্থান করা উচিত নয়।

এই বলে তারা গাত্রোত্থান ক'রে চার্বাকের পিত্রান্ত করতে করতে সদলে প্রস্থান করলো, চার্বাকের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপরোধে বিচলিত হল না।

এতক্ষণ একান্তে বসে জরা সমস্ত ব্যাপারটা দেখছিল এবং শুনছিল, কতক বুঝতে পারছিল, কতক পারছিল না। সবাই চলে যাওয়ার পরে একমাত্র শ্মশ্রুমান ব্যক্তি হওয়ায় সহজেই চার্বাকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। চার্বাক বলল, মহাশয়, আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনি বেদবাদীগণের সঙ্গে প্রস্থান করেন নি। আপনি দয়া করে আশ্রমের আতিথ্য গ্রহণ করুন।

জরা উত্তর দেওয়ার আগেই অরণি তার বিবরণ নিবেদন করলো, বললো গত রাত্রে তিনি এসেছেন, আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে।

তখন চার্বাক বলল, বড়ই আনন্দিত হলাম, তা কিভাবে আপনার সেবা করতে পারি।

জরা করজোড়ে নিবেদন করলো, প্রভু, আমি মূর্খ, পেশাতে ব্যাধ। শাস্ত্র জানিনা, এই যে আলোচনা হচ্ছিল তার সামান্যই বুঝতে সক্ষম হ'য়েছি। আমি জড়বাদী বা চৈতন্যবাদী কিছুই নই। আপনারা সুখসাধক, আর আমি ঘোরতর দুঃখী।

চার্বাক স্নিগ্ধভাবে শুধালো, কিসের দুঃখ আপনার।

প্রভু, আমি মহাপাপী। সেই পাপ থেকে মুক্তির উপায় সন্ধান করে আমি দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। শুনেছি হিমালয়
[illegible]

তাই এখানে এসেছি যদি আমার কোন একটা গতি হয়।

জরার বাক্য শ্রবণ করে চার্বাক অধোবদনে নীরবতা অবলম্বন করলো, উত্তর-প্রত্যাশী জরা করজোড়ে উন্মুখ হয়ে বসে রইলো। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন পক্ষে বাক্‌স্ফূর্তি হল না। অবশেষে চার্বাক মুখ তুলে বলল, আর্য, আপনি লোকায়ত তত্ত্বের মর্মে আঘাত করেছেন।

জরা সকাতরে শুধালো কেন প্রভু?

চার্বাক বলল, সংসারে সকলেই সুখের প্রত্যাশী. সকলেই সুখের সন্ধানে আমার কাছে আসে, এ পর্যন্ত কেউ পাপ থেকে মুক্তিলাভের আশায় আমার কাছে আসেনি, কাজেই ও সমস্যার সম্মুখে আমাকে কখনো পড়তে হয়নি। এই প্রথম। আজ এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বুঝতে পারলাম আমার তত্ত্বে এমন কোন উপায় নাই যাতে দুঃখীর দুঃখ দূর করতে পারে, পাপীর পাপমুক্ত করতে পারে।

তার কথায় জরার দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো, সেটুকু এড়ালো না চার্বাকের চোখ। তিনি বললেন, পাপ তাপ দুঃখের উর্ধ্বে সুখলোক, লোকায়ত তত্ত্ব সেই সুখের সন্ধান জানে। এ তত্ত্ব স্বাস্থ্য সম্ভার করতে সমর্থ, রোগমুক্ত করতে পারে না। স্বভাবতই সুখলাভের উপায় আবিষ্কার করেছি. ভেবেছি সংসারকে সুখময় করে তুলবো কিন্তু পাপীকে দুঃখীকে কিভাবে সুখলোকে উদ্বর্তন করানো যায় কখনো চিন্তা করিনি। কাজেই, আর্য, আপনার প্রার্থনার কি উত্তর দেবো ভেবে পাচ্ছি না তবে এটুকু বুঝতে পারছি যে লোকায়ত তত্ত্বের ক্ষমতা সর্বসিদ্ধিদায়িনী নয়—এর সীমা আছে। কাজেই স্বীকার করতে বাধা হচ্ছে আপনার গতি নির্দেশ করবার শক্তি আমার নাই।

চার্বাকের সরল স্বীকারোক্তি শুনে জরা নীরবে অধোবদনে অশ্রুমোচন করতে লাগলো। এমন সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করলো, তাকে দেখে আহ্লাদিত হয়ে চার্বাক বলল, সখা আনন্দ, অনেককাল পরে তোমার দর্শন পেয়ে মন খুশী হল. এসো আমার কাছে উপবেশন করো।

জরা দেখল নবাগত আশ্রমিকগণের ন্যায় চিরতরুণ নয়, তার দেহে বয়সের নখক্ষত বিদ্যমান, বয়স পঞ্চাশের কাছে হবে।

চার্বাক শুধালো, তোমার তো ঘুরে বেড়ানো চিরকালের অভ্যাস, বলো, এবার কোথা থেকে আসা হচ্ছে।

আনন্দ বলে, তোমার কথা সত্য, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেই আমার আনন্দ, আমি দীর্ঘকাল একস্থানে স্থির হয়ে থাকতে পারি না।

সে তো জানি কিন্তু এবারে এখানে কিছুকাল স্থায়ী হও।

আনন্দ স্বীকার করে যে তার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন, বলে কিছুকাল থাকবো তবে কতকাল বলতে পারি না. নিয়তি ইঙ্গিত করলেই আবার পথে বের হয়ে সে দেখা যাবে, এখন বলো কোথা থেকে আসা হচ্ছে।

আনন্দ বলে, এখন সোজা আসছি ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে।

ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে। আগ্রহের সঙ্গে আবৃত্তি করে চার্বাক। বলো সেখানকার সংবাদ কি?

অনেক সংবাদ। দ্বারকায় যদুবংশ আত্মনাশ ক'রে লোপ পেয়েছে। বলভদ্র ও বাসুদেব দেহরক্ষা করেছেন আর পঞ্চপান্ডব ও দ্রৌপদী মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেছেন।

চার্বাক শুধায়, এসব কতদিনের কথা।

তা অনেকদিন হল বইকি। সাত আট বছর হতে পারে।

বলো কি। এতদিন হয়েছে, আমরা তো কিছুই জানতে পারিনি।

জানতে পারবে কি করে? তোমার আশ্রম হিমালয়ের দুর্গম উপত্যকায় সুখলোকে, পৃথিবীর দুঃখের এখানে প্রবেশে অনধিকার। ভ্রাতঃ চার্বাক, দুঃখের মহাসমুদ্রের মাঝখানে ক্ষুদ্র এই সুখের দ্বীপ রচনা করায় কার কি লাভ? এ দ্বীপে ক'জনের স্থান হবে?

নৌকা বানচাল হলে ভাসমান কাষ্ঠখন্ডে যে কয়জনের স্থান হয় তাই লাভ। সকলে মিলে ডুবে মরার চেয়ে যে ক'জন বাঁচে।

ভ্রাতঃ আনন্দ, তোমার কথার মূল্য এইমাত্র বুঝতে পেরেছি। তোমার আগমনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এই আর্য—এই বলে দেখালেন অধোবদন জরাকে, পাপ থেকে মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

তুমি কি উত্তর দিলে?

জানালাম যে এ সমস্যার উত্তর দান আমার ক্ষমতার অতীত। আজকে লোকায়ত তত্ত্বের সীমানা বুঝতে পেরেছি। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে পরে আলোচনা করবো, এই আর্যের সঙ্গেও পরে আলোচনা হবে। এখন বলো অমেয় রক্তপাতে বিজিত পান্ডব সাম্রাজ্যের কি সংবাদ।

সে সংবাদ না শোনাই ভালো।

কেন এমন বলছ আনন্দ।

নামে সাম্রাজ্য কাজে মহা অরাজকতা, তালপুকুরে এখন ঘটি ডোবে না।

এই দুঃসংবাদে চার্বাক ও জরা দুজনেই উৎসুক হয়ে উঠল, চার্বাক প্রকাশ্যে, জরা মনে মনে।

খুলে বলো আনন্দ।

আনন্দ আরম্ভ করলো, হৃদপিন্ডের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে রক্ত পৌঁছয় না দেহের সীমান্তে, দেহে দেখা দেয় জরা ও মৃত্যুর আভাস। পান্ডব সাম্রাজ্যেও আজ সেই প্রক্রিয়া আরব্ধ। একদিকে বহিরাগত শত্রুর আক্রমণ, আর সেই সঙ্গে তাল রক্ষা করে অন্তর্গত প্রজাবিদ্রোহ। একটাকে সামলাতে পারে এমন শক্তি কোন্ রাজার। রাজা দুর্বল, ঘটনাচক্রের দাস। আদেশ প্রচারিত হয়, পৌঁছয় না তা সীমান্তপ্রদেশসমূহে, আর যদিবা পৌঁছয় সামন্ত ও রাজকর্মচারীগণ তাকে সরাসরি অগ্রাহ্য করে নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ করে যায়।

কী তাদের ইচ্ছা?

সকলেরই ইচ্ছা ছিন্নভিন্ন সাম্রাজ্যখন্ড নিয়ে রাজ্যস্থাপন করে। তখন একজনের ইচ্ছার সঙ্গে আর একজনের ইচ্ছার সংঘর্ষ বেধে যায়। প্রজাসাধারণ সুযোগ বুঝে একদিকে যোগ দেয়—দুর্বল পিষ্ট হয়ে মরে। অনেকেই বোঝে কাজটা অন্যায়, কিন্তু বুঝলে কি হবে নিছক প্রাণরক্ষার তাগিদে যে কোন দিকে যোগ দিতে বাধ্য হয়। ভ্রাতঃ চার্বাক, পান্ডব সাম্রাজ্যে আজ কারো ধন-প্রাণ নিরাপদ নয়, যে কোনদিন যে কোন মুহূর্তে যে কোন উপলক্ষ্যে যে কোন ব্যক্তির প্রাণ যেতে পারে। এই এখন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চার্বাক সমস্ত নীরবে শুনে বললেন, দেশের সবগুলি আলো একে একে নিভে গেল।

আনন্দ বলল, কুরুক্ষেত্রের ঝাপটায় গেল অধিকাংশ, তার পরে বাসুদেবের তিরোধানে আর সর্বশেষ পান্ডবগণের মহা-প্রস্থানে বাকি ক'টা গেল।

উজ্জ্বলতম আলোটা গেল বাসুদেবের সঙ্গে।

নীরবে সমর্থন করলো আনন্দ। তখন চার্বাক বললে, শুনেছি এক ব্যাধের শরা-ঘাতে বাসুদেব দেহরক্ষা করেছেন।

আমিও সেইরকম শুনেছি চার্বাক। ভেবে পাইনে ব্যাধটা কেন মহাপুরুষকে মারতে গেল।

চার্বাক বলে হয়তো না জেনে মেরেছে।

তা-ও কি সম্ভব সংক্ষেপে মন্তব্য করে চার্বাক। তারপরে বলল, না জানি সেই হতভাগ্যের মনে কী আত্মগ্লানি অনুভূত হচ্ছে, না জানি কী হল তার পরিণাম।

কে রাখে তার সন্ধান, মন্তব্য করলো আনন্দ।

চার্বাক কিছুক্ষণ নীরবে থেকে বলল, করে ইনি পথে পথে মুক্তির উপায় সন্ধান ক'রে ফিরছেন। কি পাপ ইনি করেছেন জানি না, তবে এমন আর কি গুরুতর হবে। একটা সাধারণ পাপে যদি এত গ্লানি হয় তবে বাসুদেবকে হত্যার পাপে না জানি কি দাবানল জ্বলছে সেই অভাগা ব্যাধটার মনে।

এতদিনে বোধকরি আত্মহত্যা করে সব জ্বালা জুড়িয়েছে লোকটা।

সে পাপের গ্লানি কি এক জীবনে দূরে হওয়ার।

একি কথা তোমার মুখে চার্বাক। তুমি তো পরকাল মানো না।

আমি মানি না সত্য কিন্তু সে লোকটা তো মানে। তা'লে হল। অনেক বিষয় আছে যার অস্তিত্ব নির্ভর করে মানা না-মানার উপরে।

তারপরে চার্বাক জরাকে সম্বোধন ক'রে বললে, আর্য এখন চলুন স্নানাহারের উদ্যোগ করা যাক। সন্ধ্যাবেলায় আপনার সঙ্গে আবার আলোচনা করবো।

৭

সন্ধ্যাবেলায় চার্বাক ও জরার মধ্যে কথোপকথন হচ্ছিল, আর কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল না।

চার্বাক বলছিলেন আর্য, আমার দ্বারা আপনার অভীষ্ট লাভ হ'ল না, পাপ থেকে মুক্তির সন্ধান দান আমার তত্ত্বের অতীত। কিন্তু আপনার দ্বারা আমি লাভবান হয়েছি।

চার্বাকের স্বীকারোক্তিতে জরা লজ্জিত হয়ে বল্‌ল, এমন ক'রে বলবেন না, ওতে আমার পাপের ভার আরও বাড়ে যে।

সত্যভাষণে পাপ বাড়বে কেন? আর আমার এই উক্তি অত্যন্ত নির্মম সত্য।

কেমন প্রভু, শুধায় জরা।

আপনার সমস্যার সম্মুখীন হ'য়ে বুঝতে পেরেছি লোকায়ত তত্ত্ব নীরন্ধ্র নয়। বেদবাদীরা যদি ভ্রান্ত হয় তবে লোকায়ত তত্ত্বও অভ্রান্ত নয়। বেদ নির্দিষ্ট পন্থা যদি সুখ দিতে না পারে তবে লোকায়ত পন্থাও দুঃখ দূর করতে সক্ষম নয়। লোকে কখনো না কখনো কোন না কোন অবস্থায় পাপ করবেই। সেই পাপ থেকে মুক্তির পন্থা যদি না থাকে তবে তো জীবন অসহ্য হ'য়ে ওঠে।

সত্যই কি মুক্তির পন্থা নেই প্রভু?

অবশ্যই আছে তবে তা লোকায়তগণ ও বেদজ্ঞগণ কেউ জানে না।

তবে পাপীর কি গতি হবে প্রভু!

সেই প্রশ্নই তো আজ সারাদিন নিজেকে করেছি।

উত্তর?

পাইনি বল্‌লেন চার্বাক।

তবে?

হতাশ হওয়ার কারণ নেই আর্য, আমি না জানলেও কেউ না কেউ অবশ্যই জানবে।

আপনার মতো জ্ঞানী যদি না জানেন—

তাকে বাক্যটি সম্পূর্ণ করবার অবসান দিলেন না চার্বাক, বল্‌লেন, আমি জ্ঞানের বুঝতে পারলাম জীবনে একটা অন্ধকার দিক আছে। এতদিন তার সন্ধান জানতাম না, এবারে সেই প্রচেষ্টা করবো। জানি তার পরিণাম কি? আমি যে কৃত্রিম সুখলোক নির্মাণ করেছি তাতে কলি প্রবেশ করবে।

তার ফলে?

তার ফলে শুকিয়ে উঠবে পাতা, ঝরে পড়বে ফুল, ফল ফলবে বিষময়।

দুঃখের সঙ্গে জরা বল্‌ল, আমি এসে দুর্বিপাকটি ঘটালাম।

মোটেই নয়, আপনি এসে আমার মুখ ফেরাতে বাধ্য করলেন সেই দিকে যে দিকটা আমি এতকাল অস্বীকার করেছি। বেদ-বাদীরা আমাদের পরিহাস ক'রে বলে যে, আমাদের ইষ্টমন্ত্র হচ্ছে যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচবে, ঋণ ক'রেও খাবে, কারণ দেহ ভস্মীভূত হলে আর ফেরে না। ভস্মীভূত দেহ আর ফেরে কি না ফেরে জানি না, তবে আপনাকে দেখে বুঝতে পারলাম যে দেহ ভস্মীভূত হওয়ার আগেও মানুষ পলে পলে দগ্ধ হ'তে পারে। আপনাকে নমস্কার। রাত অনেক হয়েছে এখন বিশ্রাম করুন।

জরা বল্‌ল, প্রভু, আমি বিদায় নিয়ে রাখছি শেষরাত্রে আবার পথে নামবো।

কে বলতে পারে হয়তো পথেই আপনার অভীষ্টলাভ হবে, বলে বিদায় নিলেন চার্বাক ঋষি।

এর পরে কি আর জরার ঘুম হওয়া সম্ভব। তার মনে পড়লো সকালবেলায় আনন্দর মুখে শুনেছিল দেশ এখন সম্পূর্ণ অরাজক, সাধু নির্জিত অসাধু প্রবল; রাজা অবজ্ঞাত রাজকর্মচারী আত্মাভিমুখী; বহিঃশত্রু সমাগত অন্তঃশত্রু সমুদ্যত। অরাজকতা আর কাকে বলে। এখন তার মনে হল তার হৃদয়টারও সেই অবস্থা। অরাজক অরাজক ঘোর অরাজক তার উপরে অন্ধকার। আলোগুলো একে একে নেভেনি, এক সর্বনাশা দমকায় উজ্জ্বলতম আলোটা নিভে গিয়েছে।

আর অদৃষ্টের নিদারুণ বিদ্রূপ। সাধারণ পাপীর যদি এত আত্মগ্ল্যানি হয় তবে না জানি বাসুদেব হত্যাকারীর গ্ল্যানি কি জ্বালাময় মন্তব্য করেছিলেন চার্বাক। যদি তিনি জানতেন সেই নরাধম সেই মুহূর্তে তার সম্মুখে উপবিষ্ট। তা হ'লে না জানি কি কান্ডই ঘটতো। হঠাৎ তার কি কারণে জানি না হাসি পেলো—হাঃ হাঃ শব্দে হেসে উঠলো। তারপরেই সেই হাঃ হাঃ শব্দ হায় হায় শব্দে পরিণত হ'ল আর হাসির বাষ্প গলে গিয়ে দুই চোখ জলে ভেসে গেল। জরা কি পাগল হয়ে যাবে নাকি। তখন প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি বলে হাসি-কান্নাকে এক জোয়ালে জুড়ে দিয়ে সে আর্তনাদ ক'রে উঠল—বাসুদেব বাসুদেব, রক্ষা করো। তোমার হত্যাকারীকে একমাত্র তুমিই রক্ষা করতে পারো। বাসুদেব, বাসুদেব,
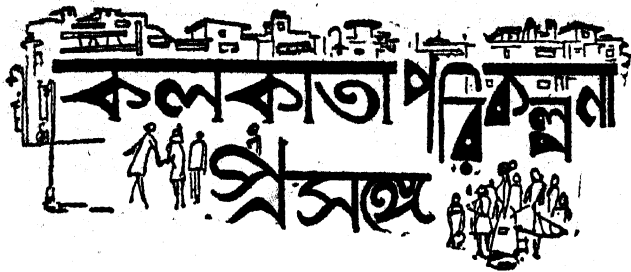
প্রিয় গুহ

অনেক কাল ধরে অনাদৃত ও অবহেলিত এই কলকাতার তথা বৃহত্তর কলকাতার ওপর নজর পড়েছে। ঠিক হয়েছে এবার তার সংস্কার করা দরকার। এ দরকার অনেকদিন আগেই হয়েছে, কিন্তু বহু কারণে তার রূপায়ণ হয়নি। কোনো বিসম্বাদ বা বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে,—যা করার প্রচেষ্টা আজ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তার সুষ্ঠু পরিচালনায় ও পরিকল্পনায় সমবেত চেষ্টা এবং সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা ও সাহচর্যই কাম্য। দেশের ও দশের উপকার হওয়া দরকার, আমার বা আমার দলীয় মতের স্বপক্ষে যদি তা না হয় তাহলে হওয়ার দরকার নেই এই রকম একটি মনোভাব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অনেক সময় দেখা দেয়, কিন্তু সাধারণ মানুষের শুভবুদ্ধি ও সদিচ্ছা তার ঊর্ধ্বে উঠবে এইটাই আশা করা যায়। এই সম্পর্কে পরিকল্পনাকারী সংস্থার নিজ দায়িত্ব-সচেতনতা সর্বস্তরের মানুষের প্রয়োজনের সংগে মিলিয়ে চললেই অসঙ্গতি ও বাদানুবাদের উপল সংকুলতায় পরিকল্পনার ধারা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা কম হবে। কয়েকটি মৌলিক এবং অত্যাবশ্যক কথা এই প্রসংগে এই জন্যই বলা প্রয়োজন। এইগুলি কারিগরি বা কুশলীদের বৃত্তি বা কৌশল প্রয়োগের সহায়ক হবে বলেই এবং সেগুলি প্রকৃত মানবিক ব্যবহারে কার্যকরী করার জন্য প্রথমেই বিচার করে নেওয়া দরকার।

প্রথমতঃ যারা এই পরিকল্পনার ধারা-বাহক সংস্থা তাদের দায়িত্ব এবং নির্দেশনা কী? এদের নাম কলকাতা-নগর-উন্নয়ন প্রাধিকার। (ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অর্থরিটি (সি এম ডি এ)।

১৯৭০ খৃঃ ১৬ জুলাই ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁর সতেরো নম্বর হুকুমনামা বা অ্যাকটের মাধ্যমে এই সংস্থার গোড়া-পত্তন করেন এবং তাতে এই আইন প্রণয়নের কারণও ব্যাখ্যা করেছেন। এতে বলা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমেরিকার ফোর্ড সংস্থার সহযোগিতায় একটি উচ্চ পর্যায়ের পরিকল্পনা, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এবং তারা বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন কার্যে প্রথম পাঁচ বছরের জন্য ১০৭ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। আর্থিক অসচ্ছলতা এবং বিভিন্ন কারণে তার রূপায়ণ বিঘ্নিত হওয়ায় এবং রাজ্যের রাজস্ব বা আর কিম্বা জাতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায় রাজ্যের জন্য বিভাজিত অংশ থেকে একে সম্পূর্ণ রূপায়িত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়—যার দ্বারা এই উন্নয়নের সূচনা করা সম্ভব। ইতিমধ্যে অবশ্য এই পরিকল্পনা অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণে এবং কলকাতার চারদিকের ছোট ছোট পৌর সংস্থাগুলিকে ঋণগ্রস্ত করা অসমীচীন বিবেচনায় একটি মুখ্য সংস্থার গোড়া-পত্তন করা জনহিতার্থে দরকার হয়ে পড়ে।

বৃহত্তর কলকাতার পরিধি ও পরিমাপ কী তা ১৯৬৫ খৃঃ ১৪ নম্বর বিধিবন্ধ আইনের স্থিরীকৃত হয়েছে এবং তার বিস্তৃতি ভাগীরথীর দুই পারের বিভিন্ন পৌর অঞ্চল এবং সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে এমন একটি বিরাট অঞ্চল যে তার উন্নয়ন কার্যে বহু শত কোটি টাকার প্রয়োজন। *—উন্নয়ন তো শুধু ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, জল নিষ্কাশন, পানীয় জল ইত্যাদি নিয়েই নয়, এর সংগে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং অন্যান্য বাহ্যত অপরিদৃষ্টমান বহুবিধ সামাজিক ও মানসিক উন্নয়নও সংযুক্ত।

*Calcutta Metropolitan Planning Area (use and Development of Land) Control Act 1965 West Bengal Act XIV of 1965.

সি এম ডি এ তো তৈরি হোল। কে তার ধারক, বাহক এবং সংযোজক? এঁরা কে এবং এঁদের দায়িত্ব এবং অন্যান্য অধিকার কী কী?

এতে আছেন—

১। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী—সভাপতি। অভাবে রাজ্য সরকারের মনোনীত ব্যক্তি।

২। উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগের কমিশনার।

৩। উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগের অন্তর্গত নগর ও গ্রাম পরিকল্পনা বিভাগের কমিশনার।

৪। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক-সঙ্গতি সম্বন্ধীয় কমিশনার।

৫। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্বাচিত অনুর্ধ্ব তিনজন ব্যক্তি যার মধ্যে—(ক) একজন কলকাতা পৌরসভা সদস্য বা কাউন্সিলার। (খ) দুইজন বৃহত্তর কলকাতার অন্তর্ভূত কোন পৌরসভার সদস্য যারা সি এম ডি এর অন্তর্ভুক্ত।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে উপরোক্ত সদস্যদের মধ্যে বেশীর ভাগই পদাধিকার বলে মনোনীত এবং সেইজন্য ধারাবাহিক-

তার অভাব সম্ভাব্য—এবং এর মধ্যে কেউই পরিকল্পনা কুশলী নন। সাধারণ বুদ্ধির প্রাখর্য হয়ত সম্ভব কিন্তু পরিকল্পনাগত বিশেষ বুদ্ধি বা বিদ্যার সম্পূর্ণ অভাব। এর সহায়ক কার্যনির্বাহক সমিতিতে তাঁরা আছেন, (পরে দ্রষ্টব্য) এখানে না থাকার যৌক্তিকতা কিঞ্চিৎ রাজনীতি বা আমলা তান্ত্রিকতা দুষ্ট বলে মনে হতে পারে।

কতকগুলি আইনগত বাঁধিগৎ, যাতে টাকা নেবার এবং দেবার, সভা আহবান এবং তাতে সিদ্ধান্ত নেবার, সহ-সভাপতি নির্বাচন করবার, সভার কার্য বাবদ যাহা খরচ ইত্যাদি মঞ্জুর করার অধিকার এবং কাজ করার ও করাবার সমস্ত আইনগত অধিকার এই আইনে অঙ্গীভূত করা আছে। এই সংস্থার উপরোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পৌরসভার সদস্যরা তিন বছরের জন্য স্থায়ী যদিনা তার ভেতর পদাধিকার পরিবর্তিত হয় এবং সেক্ষেত্রে সরকারের পুনর্নির্বাচন করার ক্ষমতা থাকবে।

শুধু সংস্থা গড়লেই তো হোল না, তাকে চালাবার এবং তার নির্দিষ্ট কাজ করার অর্থ কোথা থেকে আসবে? তিনটি উপায় নির্ধারিত হয়েছে:—

প্রথম চুঙ্গী কর.—কলকাতায় ব্যবহার বিক্রি বা প্রয়োগজনিত কোন মালের প্রবেশের উপর যে কর বা শুল্কে আদায় হবে সেই অর্থ, *

দ্বিতীয়, ঋণ গ্রহণ করে—এবং

তৃতীয়, রাজ্য সরকার বা অন্যান্য অধিকার বা মাধ্যমের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ। এখানে অবশ্য পরিষ্কারই বলে দেওয়া হোল যে কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনকে দাতা হিসাবে অন্তর্গত করা হোল। —এটা অবশ্য বোঝা গেল না যে কোন বিদেশী বন্ধু রাষ্ট্রের সাহায্য ইত্যাদি এর মধ্যে পড়বে কী না।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমেই এককালীন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে অবশ্য এগিয়ে এসেছেন।

মোটামুটি ভাবে এই হোল সংস্থার বুনিয়াদ। এই বুনিয়াদের উপর যে প্রাসাদ গড়তে হবে তাতে অনেকের সাহায্য, অনেকের সহযোগিতা দরকার। এই সংস্থার কার্যকল্প বিধিবদ্ধ করা, সহকার স্থাপনা করা এবং সুষ্ঠু সন্নিবেশনার জন্য একটি উপদেষ্টা দল গঠন করার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যুক্তির অবতারণা করার কোন অবকাশ নাই। এই উপদেষ্টা দল স্বভাবতই কলকাতায় এবং রাজ্য সরকারে এই জাতীয় কাজে রত যে সমস্ত বিভাগ এবং আধিকারিক সংস্থা নিযুক্ত আছে তাদের নিয়ে গঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়,—কারণ, তারা জানে এবং বোঝে কোথায় কতটা এবং কী প্রকারে উন্নয়নের কাজ সহজে রূপায়ণ সম্ভব। কিন্তু সকলকে অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে এই দলটি এমন একটি বিরাট ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে যে শেষে অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্টের পর্বে পৌঁছান অসম্ভব নয়। তবে সবই নির্ভর করে উপরের লোকের পরিচালন ক্ষমতা এবং সরকার ও এই সংস্থার সদিচ্ছা এবং প্রচেষ্টার উপর। এই উপদেষ্টা দলটি হোল:—

১। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী—সভাপতি।

২। সি এম ডি এর সহকারী সভাপতি—যাকে প্রাথমিক সংস্থায় নির্বাচন করা হবে এবং প্রাথমিক সংস্থায় যিনি একজন সদস্য।

৩। কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের সভাপতি।

৪। কলকাতা পৌর সংস্থার কমিশনার।

৫। নগর পরিকল্পনা এবং স্থাপত্য বিদ্যায় পারদর্শী দুজন—যাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনোনীত করবেন।

৬। সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে মনোনীত একজন।

৭। কলকাতা পৌরসভা ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গীভূত পৌরসভা বা পৌরসংস্থা থেকে সরকার দ্বারা মনোনীত তিনজন।

৮। কলকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানীর পক্ষে সরকার মনোনীত একজন।

৯। কলকাতা ট্রাম কোম্পানীর পক্ষে সরকার মনোনীত একজন।

১০। বৃহত্তর কলকাতা জল এবং স্বাস্থ্য-উৎকর্ষ সাধন পর্ষদের একজন। *

১। বৃহত্তর-কলকাতা - পরিকল্পনা সংস্থা পক্ষে সরকার মনোনীত একজন। *

১২। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা পক্ষে অধ্যক্ষ মনোনীত দুজন।

১৩। বৃহত্তর কলকাতা রেল পরিবহনের মুখ্য আধিকারিক।

১৪। সরকার মনোনীত চারজন।

এছাড়া অবশ্য প্রয়োজনমত কার্যনির্বাহক সমিতি নিয়োগ করার অধিকার সি এম ডি এর থাকবে। অবস্থানুযায়ী এই সব সভা সমিতি আসন পরিগ্রহ করবেন এবং তাদের কার্যপদ্ধতি, পারিশ্রমিক এবং অন্যান্য কার্যকরী বিষয় সম্বন্ধে বিধি রচনা করা হবে।

এই বৃহত্তর উন্নয়ন সংস্থা এবং তার আইনগত অধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে সমস্ত কিছু ঠিক হবার পর তার দায়িত্বের বিশ্লেষণে অনেক খুঁটিনাটি কথাই আইনগতভাবে বলা হয়েছে কিন্তু আসল বক্তব্য হোল যে সে বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন, পরিকল্পনা এবং তাকে কার্যে পর্যবসিত করবার একমাত্র সার্বিক সংস্থা। এর থেকে বেশী জানবার প্রয়োজন সাধারণ লোকের দিক থেকে আর কিছু নেই, তবে একটা ভুল ধারণা লোকের মনে হতে পারে যে কাজের সমস্ত দায়িত্বই বুঝি তাদের। এটা ঠিক নয়. এই জন্য যে পরিকল্পনার নির্দিষ্ট দায়িত্ব বৃহত্তর কলকাতা পরিকল্পনা সংস্থার সাহায্যে তৈরি হোলেও উপরে উল্লিখিত সবগুলি অধিকারই এর সঙ্গে জড়িত এবং কাজ করার দায়িত্ব যে যে সংস্থার উপর অর্পিত হবে সেটুকু বিশেষভাবে তারই। কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান বা পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দপ্তর যেই যে কাজ করুক না কেন সেই কাজের তত্ত্বাবধান এবং অন্যান্য দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে এবং মুখ্যত তাদেরই। গাফিলতি বা পরিদর্শনের বিশেষ ভুল-ত্রুটি ব্যতিরেকে উন্নয়ন সংস্থার পক্ষে কোন হস্তক্ষেপ করা কাজের গতি বা সৌষ্ঠবের পক্ষে হানিকর হওয়া স্বাভাবিক।

সংস্থার গঠন তার দায়িত্ব এবং কর্ম সম্বন্ধীয় বিধি বিধানের কড়চা হোল আবয়বিক। এই অবয়বের অন্তর্গত যে প্রাণ বা পরিকল্পনার পিছনে মানবিক প্রয়োজনের এবং সামাজিক উন্নতির হৃদস্পন্দন সচঞ্চল হবে তার আকার, রূপ ও বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ কী করে পাওয়া যাবে বা কোথা থেকে আসবে? এ সম্বন্ধে যে দু-চারটি কথা উপস্থাপিত হবে সেইটি এই নিবন্ধের দ্বিতীয় পর্যায়।

যাঁরা প্রয়োগকুশলী এবং যাঁদের মধ্যে আছেন স্থপতি, নগর পরিকল্পক, পূর্তবিদ, প্রশাসক, অর্থনীতি বিশারদ, স্বাস্থ্যবিদ, শিক্ষাবিদ, সমাজবিজ্ঞান বিশারদ ইত্যাদি সকলেই, তাঁরা নিজ নিজ গণ্ডীর বাইরে মানুষের জীবনের সামগ্রিক উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে নিজের বিশেষ এবং বিশিষ্ট বুদ্ধিকে সামাজিক কল্যাণে ব্যবহার করবেন। এই ক্ষেত্রে প্রয়োগকুশলীদের মধ্যে স্থপতি, নগর পরিকল্পক এবং পূর্তবিদদের কাজ অনেকখানি প্রত্যক্ষ। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এঁদের অবদান অনেক নিশ্চিত এবং ধ্রুব। এঁদের চিন্তাধারার কোথাও যদি ত্রুটি থাকে কোথাও যদি পরিসংখ্যানের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে ও মানুষের সঙ্গে এতটুকু অনৈক্য ঘটে তাহলে যে বিপুল [illegible] তা

*Taxes on Entry of Goods into Calcutta Metropolitan Area Act 1970.

*Calcutta Metropolitan Water-Supply and Sanitation Authority.

*Calcutta Metropolitan Planning Organisation.
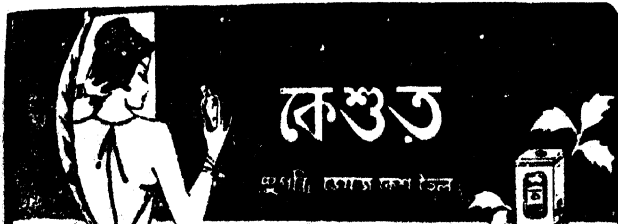
এতই সাংঘাতিক যে আরও একটু বিশদ আলোচনা করা দরকার।

বক্তব্য এই যে, এই বিশিষ্ট প্রয়োগ-কুশলীরা যাদের পেশা বা বৃত্তি উন্নয়ন পরিকল্পনায় জৈবিক এবং দার্শনিক রূপ পরিস্ফুট করা, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী শুধু তাদের নকশা, ছবি বা প্রতিরূপের উৎকর্ষই নয়, উপরন্তু মানবিকতা, সামাজিক মঙ্গল, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সমাজ এবং মনুষ্য কল্যাণের প্রতিরূপ তাঁদের নকশা বা ছবিতে প্রতিফলিত করা। এইটি করতে গেলে পরিকল্পনার গোড়ার কথায় যেতে হয়। প্রথমেই জিজ্ঞাস্য পরিকল্পনা ব্যাপারটা কী? সাধারণ বুদ্ধিতে বিচার করলে পরিকল্পনা মুখ্যত শ্রেষ্ঠতর জীবনযাত্রা এবং জীবনের সুষ্ঠু অগ্রগতির মানবিক সমন্বয় সাধন। স্থান বা বৃত্তির বিন্যাসেই তার সমাধা হয় না বরং মানুষের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তার একত্বীভূত হওয়ায় যে ভূমার চেতনা থাকে তাকে স্পর্শ করবার দায়িত্বেই তার প্রাণশক্তির প্রকাশ। এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী হয়ত সচরাচর লক্ষ্যের মধ্যে থাকে না কারণ বেশীর ভাগ পরিকল্পকই তাঁর পুঁথিগত প্রয়োজনের মাপকাঠিতে পরিসংখ্যানের হিসাব মেলাতে এতই পর্যুদস্ত হন যে তাঁরা মানবিক কল্যাণ, সমৃদ্ধি, জীবন উপভোগের ক্ষেত্রে সামাজিক মান উন্নয়ন কিম্বা আধুনিক জীবনযাত্রার চাপ হ্রাস করার কথা ভাববার সুযোগ বা অবকাশই পান না। অধিকন্তু, স্থপতি-পরিকল্পকের দৃষ্টিভঙ্গিতে তার কান্তি-বিদ্যা, সৌন্দর্য বিজ্ঞান, স্থাপত্য রচনার সাম্য ইত্যাদি, পূর্ত বিশারদের কাছে তার ঋজুতা, সমতা, সাংগঠনিক যোগ্যতা ইত্যাদি এবং অন্যান্য পরিকল্পক গোষ্ঠীভুক্তদের কাছে তাদের নিজের নিজের বিদ্যার বিশিষ্ট প্রয়োগ মানুষের প্রয়োজনের থেকে বড় হয়ে দাঁড়ায়। পরিকল্পকের কাছে সমস্ত পরিকল্পনায় ধারা ভূ-ব্যবহার বা উন্নয়নবিধি এত বেশী বড় হয়ে ওঠে যে সমস্ত চিন্তার স্রোত একমুখী হয়ে মানুষের জন্য পরিকল্পনার ব্যবহার না হয়ে পরিকল্পনার ব্যবহারে মানুষকে প্রয়োগের প্রশ্ন সঞ্জাত হয়।

সাধারণ লোকের কাছে পরিকল্পনার প্রয়োজন ভূ-ব্যবহার ও ভূ-বন্টনেই * শেষ হয় এবং তাতেই আনুমানিক হিসাবে জীবন ও তার নির্বাহের প্রশ্ন মীমাংসিত হয়ে গেল বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু তাই কি ঠিক? পরিকল্পক তার প্রয়োজনীয় তথ্যাদির হদিশ পেয়ে তাই নিয়ে বসে যায় নকশায় পারে ছক মেলাতে আর এই ছক মেলাতে তার কাছে থাকে কতগুলি পরিকল্পনায় রীতি, ধারা ও বিধি—যেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে বা পরিকল্পনা শিক্ষা সংস্থাগুলিতে উদ্ভূত হয়েছে। এই নিয়ে সে প্রবৃত্ত করে মানুষের জীবন-শক্তিকে সীমায়িত করে তার পরিকল্পনায় ভেতর বেঁধে রাখতে। কিন্তু তাই কি সম্ভব।

"জীবনেরে কে রাখিতে পারে
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।"

—এটা সত্যি যে এই জীবন দর্শনের গুরুত্বের সঙ্গে, ভূ-ব্যবহার, পৌর প্রয়োজন বা ইঁট কাঠ পাথরের আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠা করা খুবই দুরূহ, কিন্তু এটাও দরকার যে পরিকল্পকের মানসিক-সজ্জা, এই আদর্শের বিশ্বাসটুকু ধারণ করবে।

বিদেশের একটি বড় শহরের মুখ্য সচিবের কথা উদ্ধৃত করলেই বোঝা যাবে পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গী কোন দিক থেকে দেখা দরকার—

'আমরা তো পরিকল্পনার ছকের ভেতর আমাদের জীবনযাপন করি না—এমন কি দৈর্ঘ্য প্রস্থ বা উচ্চতার ভেতরেও নয়। গতি, পৌর-বিন্যাস, আগম-নিগম, যানবাহন, এগুলো জীবনের মৌলিক প্রয়োজন নয়। জীবনে যা চাই তা একটি গৃহ,—কয়েকখানা ঘর নয়; একটি পরিবার—তাতে কজন প্রাণী তা অবান্তর; জীবনকে উপভোগ করা আর দারিদ্র থেকে মুক্তি,—কটাকা খরচ করা যায় তার হিসেব নয়; ভালবাসা, সাহচর্য, স্নেহ, বন্ধুত্ব—পরিসংখ্যান স্থিরীকৃত সাম্য জীবন নয়; উদ্দেশ্য, আগ্রহ, আশা, আকাঙ্খা, বিশ্রাম ও পরিতৃপ্তি,—সক্রিয়তার সংখ্যা-পরিমাপ নয়। এটাকে কখনই ভাল পরিকল্পনা বলা চলবে না যদি কোন অতি দক্ষ যান-বাহন-চালন পরিকল্পনার সঙ্গে কোলাহলময় বস্তী বা দৃশ্যমান অসৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। এটাকে কখনই ভাল পরিকল্পনা বলা চলবে না যদি কোন সুপরিকল্পিত গৃহ-সন্নিবেশের মধ্যে তাদের অনেকেরই লক্ষ্যহীনতা অসন্তোষ নিঃসঙ্গতা ও দুঃখ থাকে। মাটির ওপর কী হচ্ছে সেটাই পরিকল্পনা নয়, মানুষের জীবনের গোড়ার জিনিষগুলির চাহিদা মেটানই প্রথম। কোন পরিকল্পকের অধিকার নেই, জীবনের কঠিন প্রশ্ন-গুলির সমাধান না করে খালি সেই-গুলির ওপরই মনোযোগ দেওয়া, যেগুলি সহজে কাগজের ওপরে প্রকাশ করা যায় কিম্বা হিসেবে ধরা পড়ে বা কঠিন স্থাপত্যের শব্দাড়ম্বরে—

* ভূ-ব্যবহার— Land use

যেমন বস্তুরূপ, কান্তিবিদ্যা, সাম্য বা সংগতি ইত্যাদিতে আচ্ছন্ন করা যায়।'*

সামাজিক চিন্তাধারায় এইটে বিচার করে নিতে হবে যে পরিকল্পনা ও সমাজ উভয়ে উভয়কে কী করে এবং কীভাবে প্রভাবিত করবে।

সমাজ একটা গতিশীল সংঘবদ্ধতা যার অস্থিরতাময় চৈতন্য তার উপাদান ও গঠনের প্রকাশ। সুতরাং প্রাথমিকভাবে এটা পরিকল্পককে বুঝে নিতে হবে এবং এই প্রতিপাদ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত জীবন দর্শনের ভিত্তিতে পরিকল্পনাকে নির্ভর করতে হবে ও এই পরিপ্রেক্ষিতে স্থান কালের সামঞ্জস্যে তাকে চিন্তা গঠন করতে হবে। শুধু আজকের নয়, ভবিষ্যতের সমাজ এবং যাদের ওপর এই পরিকল্পনার লাভা-লাভ বা দোষ-গুণ বর্তাবে এবং যাদের জীবন এর দ্বারা প্রভাবিত হবে তাদের সংগে এই পরিকল্পনার সংযোগ, নৈকট্য বা ঘনিষ্ঠতা কোথায়! এই পরিকল্পনার ফলাফল যথেষ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার্য। ভেবে নিতে হবে, ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার প্রণালী, ভবিষ্যৎ মানুষের প্রয়োজন, আচার ব্যবহার, চিন্তাধারা, বেশভূষা, খাদ্য পানীয়, রীতিনীতি অথবা এক কথায় সমাজ এবং ব্যক্তিচেতনার সমস্ত আঙ্গিক ও ভাবনার সর্বাঙ্গীন প্রয়োজন ও তার সমন্বয়। ভবিষ্যৎ শুধু কল্পনা বা চিন্তার বিলাস হয়েই থাকবে না. তাকে রূপ পরিগ্রহণযোগ্য আকার ও পরিমাণ সম্বলিত বাস্তবিকতায় পর্যবসিত করতে হবে। সদা পরিবর্তনশীল সমাজের এই জৈবিক এবং দার্শনিক প্রয়োজনের স্রোতের মাঝখানে আজকের এবং ভবিষ্যতের সমাজের যে পরিকল্পনা রূপায়িত করতে হবে তাতে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার দৃষ্টিতে এবং আজকের বিশ্লেষণে সমন্বয় ঘটাতে হবে ও বহুবিধ বিপরীত বিরোধী অবস্থার সামঞ্জস্য দক্ষতার সংগে সম্পাদন করতে পারার দায়িত্ব সমাজ প্রত্যাশা করে। পরিকল্পকের দায়িত্ব কত কঠিন, গূঢ় এবং দুঃসাধ্য তা সহজেই অনুমেয়। এর জন্য যে প্রতিভা, উদ্ভাবনী শক্তি, বিদ্যা এবং অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন তা সংগ্রহ করতে হোলে যে শিক্ষা এবং বিচার-শীলতা চাই তার জন্য বহু বর্ষব্যাপী সাধনা এবং সর্ব শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করা দরকার।

*W. Frank Harris. Principal City officer and Town clerk: Newcastle upon Tyne.

সমাজ বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে আজকের দিনের সমাজের উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য। পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গীতে কতখানি অপরাধ বা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত সমাজকে এখনও করতে হবে তার চিন্তাও বেদনাময়। যে অশান্ত সামাজিক আবেষ্টনীর সূচনা দেখা দিয়েছে, যেখানে অপরাধ প্রবণতা, ধ্বংসকারী মনোবৃত্তি এবং বিরাট অসন্তোষ সমাজের সমস্ত দেহে পরিব্যাপ্ত হয়ে তার প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করছে তিলে তিলে, এর নিরোধ হয়ত সম্ভব ছিল যদি অতীতের পরিকল্পনায় যথেষ্ট মন এবং দেহের প্রসারের সুযোগ ও সুবিধা দিয়ে যৌবনের অমিত শক্তিকে বিশ্লেষণ করা যেত এবং তার প্রকাশের বেদনাকে প্রকাশের আনন্দে রূপান্তরিত করে, তাকে দুঃখহীন কল্যাণের পথ দেখিয়ে দেওয়া যেত। আজ একথা অনস্বীকার্য যে সুযোগের অভাব অসন্তোষ সৃষ্টির কারণ এবং এর প্রতিকার সম্ভব। আমরা এবং আমাদের পূর্বসূরীরা এই পরিকল্পনা বা এর চিন্তা করিনি। এ ভুল যেন আর না হয়।

স্বীকার করতে হবে যে, মানুষের পক্ষে সব সময়ে যথার্থ বা নির্ভুলভাবে ভবিষ্যতকে স্পষ্ট করে ভাবা বা দেখা হয়ত যায় না, কিন্তু সাধারণ সত্যের সংগে জীবনের সামঞ্জস্য বিধানে অপারগ হওয়া পাপ, এবং এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত সমাজকে করতেই হবে—তার দুঃখ ভোগে, তার দৈন্যে এবং তার হতাশায়। কোন পরিকল্পক যেন জীবনের সাধারণ সত্যকে উপেক্ষা করে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা না করেন, কারণ মহাকালের উদ্যত দন্ড ভুলের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সদাজাগ্রত প্রহরায় অতন্দ্র দন্ডায়মান। যদিও ভবিষ্যতের প্রয়োজন যথার্থ নিরূপণ সম্ভব নয়, তবে এটাও ঠিক যে মোটা-মুটি বৃহত্তর সাধারণ প্রয়োজনের আভাষ সর্বকালেই পাওয়া যায় এবং তার জন্য ব্যবস্থা বা বন্দোবস্ত করা ও পরিকল্পনায় যথেষ্ট নমনীয়তার স্থান নির্ধারণ করা থাকলে এই দায় উদ্ধার করা সম্ভব। সময়ের পরিক্রমায় মানুষের প্রয়োজনের যে পরিবর্তন ঘটে তার জন্য স্থানের এবং উপায়ের যেন অভাব না হয়। এটা মানুষের চাতুর্য, বুদ্ধিমত্তা ও উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা সম্ভব। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা আজ যে পর্যায়ে উন্নীত তাতে ভবিষ্যতের মানুষের প্রয়োজনের খসড়া অনেক-খানি এগিয়ে গিয়েও বলা অসম্ভব নয়। অন্য-দিকে কোন পরিকল্পনাই শাশ্বত নয় এবং তারও পরিধি ও প্রয়োজন সীমিত—সেটা হয়ত পঞ্চাশ, কি একশো, কি দুশো বছরের জন্য কল্পিত হতে পারে এবং সেই সময়ের জন্য পরিকল্পনায় এমন নমনীয়তার স্থান করে দেওয়া যায় যাতে ওই সময়ের ব্যবধানের ভেতরের পরিবর্তন সে গ্রহণ করতে পারে। তার পরেও যদি সে চলে বা চলা সম্ভব হয় তবে তার অবস্থান বা বর্ধমানতা কল্পিত চিন্তায় নমনীয়তার পর্যায়ে ধারণযোগ্য করে রাখা সম্ভব।

মনুষ্য চরিত্রের বিভিন্নতা তার সহজাত। কিন্তু সামাজিক ব্যবহারে তার যৌথ ধর্ম বা গুণ কিন্তু কতগুলি বিধি মেনে চলে, যেজন্য সমাজ বিজ্ঞান আজ তাকে বিশ্লেষণ করে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছে। পরি-কল্পনার দিক থেকে এই পাঁচটি অংশে বিচার করে নিলে একটি সুনির্দিষ্ট ধারায় সন্ধান পাওয়া যায় এবং সমস্ত ব্যক্তিক বিভিন্নতা ধরে নিয়েও সমষ্টিগতভাবে পরিকল্পনাগত

নিষ্পত্তিতে আসা সম্ভব। এই পাঁচটি ভাগ হোল :—

১। লোকসংখ্যা ভিত্তিক তত্ত্ব এবং তথ্য,

(ক) লোকসংখ্যা, তার ক্রমবিবর্তন এবং বিভিন্ন সমবয়সী ভাগ সম্বন্ধে বিচার ও বিশ্লেষণ,

(খ) গোষ্ঠীর * গঠন ও প্রকৃতি, তাদের পরিবারের সংখ্যা, বয়স, স্ত্রী, পুরুষ, জাতি, উপজাতি, পেশা, বৃত্তি, শিক্ষার মান, আয় এবং বিবাহ সম্বন্ধীয় স্থিতিবস্থার বিচার এবং বিশ্লেষণ,

(গ) লোকসংখ্যার পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন,—তার বিশ্লেষণ,—কারণ এবং যুক্তি।

২। অর্থনৈতিক কাঠামো :

পরিকল্পিত গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক গঠনের বিচার এবং বিশ্লেষণ,—বৈভব, বিস্তৃতি এবং প্রয়োজন। সম্ভাব্য শ্রম-পরিমাণ** বৃত্তি, শিল্প ইত্যাদির পরিমাপ। এই অর্থনৈতিক জিজ্ঞাসা সমাজের বা গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার যন্ত্র নির্ধারণ বা নিরূপণ করে এবং কোন পরিকল্পনার সার্থকতা বা যোগ্যতা নির্ভর করে এই নিপুণতার সত্যতার উপর।—এর একটি উদাহরণ কলকাতার কাছে কল্যাণীতে। এই পরিকল্পনাটি কলকাতা শহরের বিপরীত চুম্বক হিসাবে পরিকল্পিত হয়েছিল, কিন্তু এই চুম্বকটির আকর্ষণী শক্তির অভাবে এটি একটি শুধু রাত্রে-শোবার-শহর † তৈরি হয়েছে বোধ হয়। এটা ঘটেছে এর অর্থনৈতিক মূল্য নিরূপণে ভুল হিসাবের আওতায় পড়ে। কাজ না দিয়ে শুধু মানুষকে রেখে দিলেই শহর বা সমাজ গড়ে না,—একটা আস্তানা হয় মাত্র।

৩। সামাজিক সংগঠন :

মানুষের সমাজগত দলভুক্তি তাদের বৈশিষ্ট্য, রীতি, নীতি, অভ্যাস, ব্যবহার, সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ এবং সামাজিক মূল্যবোধ। পরিকল্পনাভুক্ত মানুষের সমাজ জীবনের সঙ্গে পরিকল্পনার প্রত্যক্ষ মিলনের বিচার।

৪। সামাজিক বিশৃংখলা :

এই ব্যাপারটি সামাজিক সংগঠনের ঠিক বিপরীত দিক, এবং ব্যষ্টির এবং গোষ্ঠী প্রশ্নমূলক ব্যবহার, তার কারণ ও ব্যাধি নিরূপণ পদ্ধতি। এই সামাজিক এবং সমাজ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মানবিক ব্যবহার শুধু শিক্ষা ও গবেষণার প্রশ্নই নয়—পরিকল্পনা ক্ষেত্রে এর ব্যবহারিক প্রয়োজন অসীম। পরিকল্পনার মধ্যে শোধনমূলক উপচার আগে থেকে তৈরি থাকলে অনেক সময় সেগুলি ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ক্ষতগুলি উপশম করা কিম্বা নিরাময় করতে যথেষ্ট সাহায্য করে। সমাজ নিশ্চয়ই আশা করে যে সামাজিক দুষ্ট-ক্ষতগুলি শোধরাবার মত উপায় পূর্ব-চিহ্নিত করা থাকবে এবং সমাজ বিজ্ঞান মতে তার সুরাহা পরিকল্পনায় গ্রথিত এবং সন্নিবিষ্ট করা থাকবে।

৫। সামাজিক মনস্তত্ত্ব ;—

মানুষের সংস্কারগত পক্ষপাত, বিদ্বেষ এবং রুচি ইত্যাদির মূলে যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ একক বা বহুর মধ্যে সঞ্চারণ করে তার কারণ এবং প্রয়োজনীয়তার মান নির্ধারণে, সামাজিক ব্যবহারের গোড়া পত্তনে এর প্রয়োজন এবং যে কোন পরিকল্পনায় এর দরকার।

পরিকল্পনার চরম লক্ষ্য যদিও সামাজিক। কিন্তু তার রূপায়ণের দৃশ্যমান দিকটাই সাধারণের কাছে প্রবল এবং কতগুলি রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর এবং পৌর প্রয়োজনের জড় বস্তুগুলিরই প্রাধান্য নজরে পড়ে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তার অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য যে বিত্ত সঞ্জাত করে তার সম্ভোগ ও বিতরণ কিন্তু সমানভাবে মুখ্য, পরিদৃশ্যমান না হোলেও অনুভূত।

পরিশেষে, যার উপর একাগ্র হওয়া প্রয়োজন, সেটা হোল, যে ভবিষ্যৎ সমাজ গড়বার ভার পরিকল্পকদের উপর যে গুরুত্বে আরোপিত হওয়া উচিত এবং হোতে বাধ্য, সেই তুলনায় এই জাতের মানুষ তৈরির দায়িত্বও সমাজ এড়িয়ে যেতে পারবে না। তার জন্য তাদের যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা দেওয়া দরকার। ভবিষ্যতের পরিকল্পক গোষ্ঠীর শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু সামগ্রিক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, তাকে সমাজ বিজ্ঞানের সহ-শিক্ষার সঙ্গে মানবিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর সংমিশ্রণে সম্পূর্ণ মানুষের চেতনা জাগ্রত করা অবশ্য দরকার।

এটা বুঝতে হবে যে আজকের পরিকল্পকরাই সমাজকে তার পারিপার্শ্বিকের অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করে আত্মনাশ থেকে বাঁচাবে।

* Community
** Labour Potential
† Counter-magnet

* Professor Donald Bogue. Professor of Sociology: University of Chicago.

বয় চিরকাল বয়ই রহে

মণি দাস

কবিতাটি অনেক দিনের পুরোনো, বোধহয় বুদ্ধদেব বসুর লেখা। সাহেবদের হোটেলে ঢুকে "বয়" বলে সাহেবদের অনুকরণে চিৎকার করলে যে ব্যক্তিবিশেষ সামনে এসে দাঁড়াবে তার নাম নেই, জাত-কুল নেই, এমনকি বয়সেরও কোন মাপকাঠি নেই, তার একমাত্র পরিচয় "বয়" এবং বালককে দিয়ে যে কাজ সম্ভবপর, যুবককে দিয়েও যা সম্ভবপর এমন কি বৃদ্ধকে দিয়েও যা করান যায় "বয়" নামধারী ব্যক্তিকে দিয়ে তাই সম্ভবপর।

সাহেবদের হোটেলে যদি এই প্রথার কোন কাজের অসুবিধা না হয়, তবে যত দোষ কি শুধু নন্দঘোষ "কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের" বেলায়? সেখানে "গালি বয়" বলে এক সম্প্রদায় আছে। বাজেটে তাদের জন্য বরাদ্দ আছে, তাদের মাহিনার বিল মাসে মাসে তৈরী হয় এবং সেই টাকাও তারা নিয়মিতভাবে পেয়ে থাকে। তাদের বয়সের দরুণ মেদবৃদ্ধি কে রোধ করতে পারে; তাদের বয়সের দরুণ দৈহিক স্থূলতার জন্য যদি তারা অপরিসর "গালি পিট"গুলিতে ঢুকতে না পারে এবং পরিষ্কার না করতে পারে তার জন্য কি তারা দায়ী; নিশ্চয়ই না, তবে উপায়; [illegible] জলে রাস্তা-ঘাট ডুবে যখন মোটরগাড়ী অচল হয়ে যায় তখন সামান্য একটু কাজ করলেই দাঁড়ানো জল তাড়াতাড়ি নেবে যাবে। রাস্তার উপরে "ম্যানহোলের" ঢাকনাগুলি খুলে দিন। হু-হু করে জল গর্তে ঢুকবে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই অচল মোটরগুলি সচল হয়ে উঠবে। অনেকে বলে থাকেন পয়ঃপ্রণালীর পরিবহন ক্ষমতা প্রয়োজনের তুলনায় কম, এইসব জল ম্যানহোল দিয়ে তবে যায় কোথায়? আবার মন্তব্য জুড়ে দেন পলি-মাটিতে সব বুজে গেছে তাই "ম্যানহোল" প্রয়োজন। উত্তর কিন্তু সেই একই—"বয় চিরকাল বয়ই রহে।" রাস্তার ঝাঁঝরা মাথায় দিয়ে যে সব "গালি পিট" বিদ্যমান সেইসব পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয় সংখ্যার উপযুক্ত "গালি বয়" মাইনে টানলেও, এখন আর "বয়" নেই, কারণ অনেকেই এখন যুবক কিম্বা প্রৌঢ়। পথের ধারের দৃশ্যমান গালিপিটের ঝাঁঝরার নীচে ইটের গাঁথনি করা চৌবাচ্চা, পয়ঃপ্রণালীর সাথে পাইপের সংযোগ থাকে। এই গালিপিট-এর চৌবাচ্চা বারো বৎসর ও তার নিম্নবয়স্ক বালকের দ্বারা পরিষ্কার রাখা সম্ভবপর, বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে উহার ভিতরে ঢুকে পরিষ্কার করা সম্ভব নহে। তবে কি করা উচিৎ, সে দায়িত্ব পৌরপিতাদের এবং পৌর কর্তৃপক্ষের।

বৃহত্তর কলকাতার সর্বাত্মক উন্নয়নের যে কর্মসূচী ইনজিনিয়াররা হাতে নিয়েছেন সেটা কারিগরী জগতের একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। বৃহত্তর কলকাতা শহর যদি কোনো দিন আবার তার স্বাভাবিক রূপে ফিরে পায় বিজ্ঞানের দৌলতে, সেটা হবে আধুনিক যুগের 'সপ্ত আশ্চর্য' নৈপুণ্যের একটি। কলকাতা শহর মৃত দুঃস্বপ্নের নগরী কিনা সেটা বিচার করবে 'কাল' তার নিজস্ব মানদণ্ড দিয়ে।

কলকাতা শহরটাকে যে আবার বাঁচিয়ে তুলতে হবে, আবার একে সক্রিয় করে তুলতে হবে এসব চিন্তা-ভাবনা ইংরেজদের কোন দিনও ছিল না। যেদিন কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেদিন থেকেই কলকাতা সরকারের ভালবাসার তালিকায় প্রথম থেকে দ্বিতীয় এবং ক্রমে ক্রমে দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়ে চলে গেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বলা হল কলকাতা একটা 'বর্ডার সিটি' Border City —চীন-জাপান অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত দিকটা একটুখানি গোলমেলে হওয়ায় কলকাতা শহর বৈদেশিক আক্রমণের শিকার। ফলে কলকাতাকে বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু কলকাতা বেড়েছে, সে বেড়েছে নিজের প্রাণশক্তিতে। দু দুটো বিশ্বযুদ্ধের তাপ তার গায়ে লেগেছে। বিশ্বযুদ্ধের তাড়নেই কলকাতার বুকে কিছু ইমারতী কাজ সুরু হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা ভেবেই অসমাপ্ত হাওড়া ব্রিজের কাজ সুরু হয়েছিল। অগ্নিকান্ডের হাত থেকে শহরকে বাঁচানোর জন্যে তৈরি হয়েছিল গঙ্গা, আদি গঙ্গা আর ক্যানালের পাড়ে বেশ কয়েকটি ফায়ার ব্রিগেডের প্লাটফর্ম, যেগুলোর চিহ্ন এখন বড় একটা দেখতে পাওয়া যাবে না।

বৃটিশরা কোনওদিন কলকাতাকে উপভোগ্য শহরে পরিণত করে তুলবে এ ভাবে নি। সে ভাবনা জব চার্ণক সাহেবের ছিল কিনা জানি না তবে দিল্লীর ভাইসরয়দের যে ছিল না এটার প্রমাণ তাঁরা বারবার দিয়েছেন।

কলকাতার গুরুত্ব বাড়িয়ে দিল বাংলা-

বৃহত্তর কলকাতা ছাড়া এত বড়ো চাপ সহ্য করবার মতো শহর আর ছিল না বাংলাদেশ কেন গোটা পূর্বভারতে। তাই অনিবার্য কারণেই কলকাতা মিছিল বা দুঃস্বপ্নের নগরী হয়েও বেঁচে রইলো মৃত সঞ্জীবনী হিসেবে। পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের আহার জোগালো বৃহত্তর কলকাতা—হাজার অসুবিধা করেও পশ্চিমবাংলার মানুষ বৃহত্তর কলকাতার অপরিসর জায়গায় মাথা গুঁজে পড়ে রইলো ভবিষ্যৎ সুদিনের কামনায়। কিন্তু মানুষ যা আশা করে তা বোধহয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হয় না। বাঙালীদের হতভাগ্য জীবনেও এলো না শান্তি ও সমৃদ্ধি। এর জন্যে কে বা কারা দায়ী জানি না। কেউই জানেন না হয়তো। কিন্তু এটা সবাই বুঝতে পেরেছিলেন যে বৃহত্তর কলকাতা জনভারে নুইয়ে পড়েছে। যে ভার সে সহ্য করতে পারে না সেই ভার চাপানো হয়েছে কলকাতার ওপর। আমরা কলকাতাকে যতোই ভালোবাসি না কেন এটা আমরা স্থির বুঝতে পেরেছিলাম কলকাতা শহরের নগর জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। সহ্য সীমা প্রায় অতিক্রান্ত। কি করা যায়?

কলকাতার সমস্যা একটা বিরাট সমস্যা। কোটি কোটি টাকার অংকটা দেখেই কিন্তু কলকাতার সমস্যার প্রকৃত আয়তন ও গুরুত্ব বোঝা যাবে না। ডি-ভি-সি, হিন্দুস্তান স্টীল, হেভি ইঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদি প্রকল্পে বহু কোটি টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু ঐ প্রকল্পগুলির রূপায়ণ আর কলকাতার উন্নয়ন প্রকল্পের রূপায়ণ সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। ঐসব প্রকল্পে মেন, মানি ও মেটিরিয়ালস যোগাড় হলেই হু-হু করে কাজ এগোয়। দেখতে দেখতে নতুন শহর জনপদ গড়ে ওঠে, কলকারখানা স্থাপনের ব্যাপার হলে বহু বিদেশী কনসর্টিয়াম এসে তাঁবু ফেলে, ভারী ভারী মেসিন বসিয়ে আলাদিনের প্রদীপের মতো যাদু মন্ত্রে মরুভূমির শুষ্ক বুকে জনকল্লোল [illegible] করে দেয়া হয়।

তোলাই হল ওসব প্রকল্পের রূপকারদের প্রধান উদ্দেশ্য।

কিন্তু কলকাতা সম্পূর্ণ আলাদা। কলকাতার সমস্যাই কেবল নয়, সেই সমস্যার সমাধানের উপায়গুলোও আলাদা। দুর্গাপুরের মত বিশাল ইস্পাত কারখানা আর নগরী গড়ে তুলবার জন্যে পৃথিবীর নানা দেশের নানা কোম্পানী হু-হু করে ছুটে আসবে কর্মদক্ষতা দেখাবার জন্যে। কিন্তু যদি বলি আমরা টাকা দেবো, কে আছো কোথায় এসো কলকাতা শহরের বস্তীগুলোকে বাস করবার মতো করে দাও, কলকাতার রাস্তাঘাটগুলোকে চওড়া করে দাও যাতে গাড়ী-ঘোড়া চলতে অসুবিধে না হয় আর—কলকাতার জন্যে প্রচুর পানীয় জলের ব্যবস্থা করো যাতে গরমের দিনে স্নান না করে অফিসে না যেতে হয়, আর পয়ঃপ্রণালীগুলো এমন করো যাতে ঘোর বর্ষায় রাস্তা কর্দমাক্ত না হয়—আর দিনের পর দিন রাস্তা জলে ডুবে না থাকে, আপনারা স্থির জানুন একটা কনসার্ন বা দেশও এগিয়ে আসবে না এ কাজ করবার জন্যে। এই বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজ আমাদেরকেই করতে হবে। এই জটিল সমস্যাপূর্ণ মানবিক দায়-দায়িত্ব নিতে বিদেশীদের বয়ে গেছে। তারা বড়জোর—কলকাতার জন্যে একটা পরিকল্পনা ছকে দিয়ে যেতে পারে যেমন দিয়ে গেছে বৃহত্তর কলকাতার জল সরবরাহ ও জল নিকাশী ব্যবস্থা নিয়ে। বাকীটুকু অর্থাৎ কিভাবে সেই কাজগুলো বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে তার ব্যাপারে বিশ্ব সংস্থাগুলো উপদেশই দিয়েছে, নিজেরা কাঁধই লাগাতে চায়নি মোটেই। তাদেরই উপদেশে প্রথমে, জল সরবরাহ ও জল-নিকাশী প্রকল্পগুলোর কাজ আরম্ভ করবার জন্য ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন অথরিটি গঠিত হয়েছিল। তাদেরই উপদেশে পরে ক্যালকাটা মেট্রো-

সি এম ডি এ বর্তমানে কলকাতা উন্নয়নের ব্যাপারে অভিভাবকের মত। কলকাতা উন্নয়নের বেশীর ভাগ টাকাটাই এই সংস্থার তহবিলে প্রথমে জমা পড়বে, [illegible] এই সংস্থাই সবাইকে টাকা দেবেন [illegible]র চাহিদা অনুযায়ী। 'সবাই' বলতে উন্নয়নের ব্যাপারে সংশিলষ্ট সংস্থাগুলি যেমন সি এম পি ও, পাবলিক হেলথ, পি ডবলিউ ডি, সি আই টি, কর্পোরেশন এসবগুলিকে মনে করছি।

কোন বৃহৎ কর্ম করতে গেলে তাতে ভুলচুক আসতেই পারে। কলকাতা উন্নয়নের বৃহৎ কর্মযজ্ঞে ভুলভ্রান্তি কিছু কিছু যে এসে যায়নি একথা কেউই জোর দিয়ে বলতে পারেন না কিন্তু ভুলগুলি যদি মারাত্মক হয় এবং তার চেয়ে বড়ো কথা সেগুলি যদি ইচ্ছাকৃত হয় তবে সে ভুলের তদন্ত করতেই হবে। অপরাধী বা অপদার্থ লোককে শাস্তি দিতেই হবে।

কলকাতার মতো বড় ও জটিল জনপদের সর্বাত্মক সমস্যাগুলিকে আলাদা আলাদা করে ভাবা সম্ভব নয়। যে রাস্তায় ঘণ্টায় কয়েক হাজার গাড়ী চলছে, তার তলা দিয়েই চলেছে ইলেকট্রিকের তার, জলের লাইন, গ্যাস আর স্যুয়ারের পাইপ, টেলিফোনের কেবলও। সেই রাস্তার উন্নয়নের কর্মসূচীতে আছে জলের লাইনটাকে বড়ো করা, স্যুয়ার লাইনের আয়তন বৃদ্ধি, নতুন গ্যাসগ্রিড বসানো, রাস্তা চওড়া করা, মাটির নিচের টিউব রেলের জন্যে বৃহৎ আকারের টানেল তৈরী করা আর প্রয়োজন মত রাস্তা পারাপার হবার জন্য ওভার ব্রীজ তৈরী করে দেয়া। এই সব কাজের মধ্যে কোন কাজটা জরুরী আর কোন কাজটা কম জরুরী সেটা যাঁরা বিচার করতে পারেন তাঁদের পক্ষে হয়তো এটা বিচার করা সম্ভব নয় যে বাস্তবক্ষেত্রেও কোন কাজটার পর কোন কাজটা করলে সুবিধা হবে। এর জন্যে প্রয়োজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারের দূরদর্শিতা এবং তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠা করবার মতো সৎসাহস ও কর্মক্ষমতা। সরকারী কাজ-কর্মের যাঁরা ওপরে বসে আছেন তাঁরা স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের সাধারণ জ্ঞান খাটিয়ে যে নীতিটা সঠিক বলে মনে করেন সেটাকে চালু করবার জন্য যথেষ্ট জোর দেবেন। এই ব্যাপারে কোনও টেকনিক্যাল লোক যদি তাঁদের এই খুসিতে ইন্ধন যোগান তবে তো আর দেখতে হবে না। এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের চিন্তাধারা এই কাজে রূপায়িত করবার জন্যে তখন কী জোর লবিইং চলবে! কাজটা সুষ্ঠুভাবে হবে কি না হবে সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে তখন চলবে শক্তির লড়াই। এ্যাডমিনিস্ট্রেটরও ছাড়বে না আবার ওদিকে ইঞ্জিনীয়ারও ছাড়বে না। বর্বরসা কালক্ষয়, ধনক্ষয় তো বটেই। কলকাতার উন্নয়নের মতো বিরাট সংস্থার সংগে যারা জড়িত তাদেরকে [illegible]

দিকে মন গেলেই দেশের ক্ষতি হবে। স্বজন-পোষণ তবুও ভালো, কিন্তু তাঁবেদার পোষণ নৈব নৈব চ।

বৃহৎ কর্মে নতুন নতুন সব সংস্থা ও সংশিলষ্ট বিভাগ গজিয়ে ওঠে। বিভিন্ন দপ্তর থেকে এবং সংস্থা থেকে অভিজ্ঞ লোক এনে, কারও বা জন্ম-ঠিকুজী বিচার করে নতুন কাজে লাগানো হয়। এক কথায় যুক্তফ্রন্ট! খুব আশ্বাসের কথা এখানে যাঁরা কাজ করতে আসেন তাঁদের কোনও পার্টি নেই। সুতরাং পার্টির স্বার্থে নতুন সংস্থার স্বার্থ বিঘ্নিত করবার প্রয়াস কারও থাকবে না। তবে গা শোঁকাশুঁকির ব্যাপারটা তো থেকে যেতে পারে। আমি ধরুন খাল-বিল কাটা ডিপার্টমেন্ট থেকে এসে জুটেছি। খুব স্বাভাবিক কারণেই আমার পিতৃ-ডিপার্টমেন্টের ওপর দরদ একটু বেশী থাকবে। নতুন সংস্থায় আমার 'পিতৃ' বংশের কেউ আসুক—এই লোভ আমায় পেয়ে বসতে পারে। বিশেষ করে এই নতুন জায়গায় কাজ শেষ হলে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে তো সেই পেরেন্ট ডিপার্টমেন্টেই আমাকে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং সেখানকার দু-চারজনকে নতুন সংস্থায় ভালো পোস্টে ঢুকিয়ে দিয়ে খানিকটা গুড উইল তৈরী করবার লোভ তো আমার হতেই পারে। এখানেও সেই তাঁবেদারের ভয়। আর আমি যদি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হই এবং আমার যদি লোক ঢোকাবার ক্ষমতা থাকে তবে যে পোস্টে রাস্তা তৈরীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকের দরকার সেই পদে আমার ইচ্ছে হবে খাল কাটার লোক নিই। তা না হলে আমার তাঁবেদারদের ঢোকাই কি ভাবে?

আমাদের জীবনে সবচেয়ে বিপর্যয় যেটা আনে সেটা হল বিজ্ঞাপনের মোহ। আমাদের ইচ্ছে হয় আমাদের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক—লোকে জানুক 'অমুকের ব্যাটা অমুক একটা দুঁদে অফিসার হইছে। কাগজ খুললেই অর নাম।' কিন্তু বিজ্ঞাপনের আসল উদ্দেশ্য যে আসর সরগরম করে তোলা—কেবল খোলা তাতানো নয় এটা ভুলে যাই আমরা সবাই। বিজ্ঞাপনের প্রথম উদ্দেশ্য হবে জনগণকে কাজে উদ্বুদ্ধ করা। 'কলকাতার জন্যে কিছু করা হচ্ছে না' এই নৈরাশ্যে যাঁরা ভুগছেন তাঁদের প্রাণে আশার সঞ্চার করা, আর যাদের দিয়ে কাজটা করিয়ে নিতে হবে তাদেরকে কর্মচঞ্চল করে তোলা। কোনও বড়ো কাজের কর্মচাঞ্চল্য এ জোয়ার আনতে সময় লাগে অনেক। এতো আর আলাদিনের চিরাগ নয় যে এক ঘসাতেই কাজ সারা। বড়ো বড়ো এ্যাডমিনিস্ট্রেটাররা বিশ কোটি টাকার চেক সই করেই পরদিন খোঁজ নেন কাজের কদ্দূর হোল। তাঁরা জানেন না বৃহৎ কর্মের প্রস্তুতিটা করতেও সময় লাগে। আপনি সাঁওতালি নাচ দেখেছেন, সাঁওতাল পরগণায় শালবনে ছাওয়া গ্রামে গিয়ে? কোনও পূর্ণিমা তিথিতে যদি আপনি এমনি কোন সাঁওতালি নাচের আসরে যান তবে বেলা থাকতে থাকতেই আপনাকে নিয়ে যাবে নাচের আসরে। আপনি নিশ্চয়ই নাচবেন না।

আপনি দর্শক। দেখবেন মেয়েরা সেজেগুজে কেমন সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কি করছে তারা? নাচছে। নাচছে? হ্যাঁ, লক্ষ্য করে দেখুন পায়ের পাতাগুলো স্থানচ্যুত হচ্ছে না কেবল ঝিলি কাটছে কোনও একটা বিশেষ ছন্দে মাতাল হয়ে। বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে যেতে আবার নজর করে দেখবেন পায়ের পাতা স্থানচ্যুত হতে সুরু করেছে, কিন্তু শরীর ও মাথা নড়ছে না। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলে, পা নিতম্ব আর কোমর পর্যন্ত দুলবে কেবল। রাত যতো গভীর হবে গোটা দেহবল্লরী ছন্দে ছন্দে দোলায়িত হবে, চোখে মুখেও খেলবে খুসির আর যৌবন উচ্ছ্বাসের জোয়ার ভাটা। রাত যখন আরও গভীর হবে নৃত্য-পরা সাঁওতালী মেয়েরা পাগল হয়ে উঠবে, পূর্ণিমা রাতের চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙে তাদের যৌবনবতী দেহ আন্দোলিত হবে মহুয়ার মাতাল গন্ধে।......তাই বলছিলাম চরমক্ষণ আসতে সময় লাগে এবং তার জন্যে প্রস্তুতি চাই।

প্রস্তুতি প্রয়োজন সব কিছুর। বৃহত্তর কলকাতার আশে-পাশের যেসব কলকারখানা গত কয়েক বছর নিষ্কাম আবহাওয়ায় ছিলো সেগুলোর হাঁটুতে মরচে ধরেছে। 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' বললেই তারা উঠতে পারছে না। প্রশ্ন করবে নানারকম। 'কারখানা খুলবো অনেক গুনোগার দিয়ে, সাপ্লাই চলবে তো বেশ কিছুদিন?' কেউ বলবে 'কিছু ক্যাপিটাল লোন দিন, কারখানা খুলি।' কেউ চাইবে, ফরেন এক্সচেঞ্জের গ্যারান্টি, কেউ চাইবে এ্যাডভান্স পেমেন্ট। এসব সমস্যা ও আবদার মিটিয়ে মাল-মশলা সরবরাহের একটা সুনিশ্চিত ব্যবস্থা আগে থাকতে পাকা করে নিতে হবে। তা না হলে আসরে নাচতে নেমে কোনও ফয়দা নেই।

মাল-মশলা যোগাড় হলেও, সেগুলোকে ব্যবহার করার মতো উপযুক্ত লোকও তো চাই। একসঙ্গে এতো কাজ চালু হয়ে গেলে ভালো ঠিকাদারের অভাব হতে বাধ্য। খুব সুখের কথা যে বেকার ইঞ্জিনীয়ারেরা আজকাল বেকারত্ব ঘোচাবার জন্য ব্যবসা-মুখী হচ্ছেন। এঁরা একবার ভালোভাবে ব্যবসার সূত্রটা ধরে ফেলতে পারলে আর চিন্তার কিছু নেই। আমরা কোয়াক Quack —ডাক্তারদের অবজ্ঞা করি, কিন্তু আমাদের দেশে যে হাজার হাজার কোয়াক ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম আছে যাদের মালিকেরা ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ই জানেন না, তাদের ব্যাপারে আমরা উদার। বেকার ইঞ্জিনীয়ারেরা ব্যবসায় ভালোভাবে ঢুকে যেতে পারলে আমাদের দেশেও ঠিকাদারদের বদনাম ঘুচবে। তবে প্রথমদিকে ইঞ্জিনীয়ার ঠিকাদারদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে যেসব 'রক্ষা কবচ' দিতে হবে সরকারকে সেগুলি 'একস্ট্রা স্ট্রং' হওয়া দরকার। তা না হলে কোয়াক ঠিকাদারদের সম্মিলিত প্যাঁচে পড়ে নয়ারা নাস্তানাবুদ হবে যাবে।

এর পরের সমস্যা হোল জনগণকে নিয়ে। বৃহত্তর কলকাতার এমন সব অঞ্চল আছে সেগুলি এতোই উপদ্রুত যে সেসব জায়গায় গিয়ে ঠিকাদাররা নাকি কাজ করতে রাজি হবে না। জানি না এসব কথার মধ্যে কতোখানি সত্যি মিথ্যে মেশানো আছে। গত নির্বাচনের আগে তো শোনা গিয়েছিল ভোট দিতে গেলেই গলা কাটা যাবে ভোটারের। কিন্তু পরে দেখা গেল এসব দুশ্চিন্তা অমূলক। সহর উন্নয়ন কাজের মধ্যে এমন কোনও উগ্র রাজনীতি থাকা সম্ভব নয় যার উপরে স্থানীয় জনসাধারণ ঠিকাদারদের গলা নেবে। সবাই যেটা আশংকা করছেন যে স্থানীয় ছোকরারা জুলুম করবে। গু... চাকরী দিতে হবে, না হলে বড়ো টাকার চাঁদা দিতে হবে আর তা না হলে কিছু ফ্যাগ খেটে দিতে হবে ক্লাব ঘরটার মেঝেটা পাকা করে দেবার ব্যাপারে। কোনও সমস্যা এতো দুরূহ হতে পারে না যার সমাধান নেই। কলকাতার উন্নয়ন সংস্থা কোনও রাজনৈতিক দলপুষ্ট নয়। এই সংস্থা প্রকল্প রূপায়ণের সময়ে রাজনৈতিক দল বেছে বেছে প্রকল্পে হাত দিচ্ছে এমনও নয়। আর এই উন্নয়ন কাজ হয়ে গেলে সেখানকার অধিবাসীরাই সবচেয়ে বেশী লাভবান হবেন এটা সবাই বুঝবেন। আর কোনও অঞ্চলে স্থানীয় অধিবাসীরা বিঘ্ন ঘটালে গৌরী সেনের টাকা অন্য অঞ্চলের জন্য ব্যয়িত হয়ে যাবে সংগে সংগে। সুতরাং কোনও অঞ্চলের অধিবাসী এমন বোকামী করবেন না।

তবে এই ব্যাপারে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে কাজ যে কোন সংস্থাই করুক না কেন এটা সরকারের টাকায় ব্যয়িত কাজ আর হচ্ছেও সরকারের নির্দেশে। কিছু টাকা হয়তো কলকাতা কর্পোরেশন বা হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি খরচ করছেন কিন্তু সেটাও সরকারের নির্ধারিত নীতি অনুসারে। কোন্ বস্তীতে কাজ হবে সেটা সরকারই ঠিক করে দিচ্ছেন। সুতরাং কর্পোরেশনের কাউন্সিলারদের যে রাজনৈতিক রঙই থাকুক না কেন সেটা কাজের মধ্যে প্রতিফলিত হতে পারবে না। এই সব ব্যাপারে সরকার আর জনসাধারণের মধ্যে যাতে ভুল বোঝাবুঝি না হয় এবং যাঁদের জন্যে কাজ করা হচ্ছে তাঁরা সহজ-ভাবে ব্যাপারটা বুঝতে পারেন তার জন্যে ব্যাপক পাবলিসিটি দরকার। দামী কাগজে সুন্দরভাবে বুকলেট ছেপে টেলিফোন ডাইরেক্টরীর ঠিকানা দেখে দেখে সেগুলো পোস্ট করে দিলেই কর্তব্য সমাধা হবে না। আরও নিষ্ঠা নিয়ে আরও আন্তরিকভাবে সমস্যাটাকে দেখতে হবে। যে হ্যাণ্ড বিল তৈরী করছি বিলোবার জন্যে সেটা কোনও এক বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীর কাছে কতোটা আকর্ষণীয় হবে সেটা বুঝে দেখতে হবে। মনে রাখতে হবে বহু সমস্যা জর্জরিত কলকাতা সহর একটি রূঢ় বাস্তব-ময়ী নগরী—এখানে সফিসটিকেশনের স্থান নেই—এখানে কাজ করবার জন্য চাই একজন মাটির মানুষ, কলকাতার বহু বঞ্চিত জনসাধারণের জন্য যাঁদের মন সত্যিকার

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বক্সারের কথা মনে পড়ল সীমার। আজ তাকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়নি। এতক্ষণ অন্যমনস্ক থাকাতে তার অভিমানমিশ্রিত প্রতিবাদের শব্দটাও শুনতে পায়নি সীমা। তাড়াতাড়ি উঠে বক্সারের ঘরে গেল সে। বক্সার অন্যদিনের মত তাকে দেখে উল্লাস প্রকাশ করল না। তার গলার স্বরটাও যেন পাল্টে গিয়েছে বলে মনে হল সীমার। বক্সারের শিকলটা ধরে বাইরে বেরিয়ে এল সে। বক্সার আজ ধীরে ধীরে চলছে। অন্যদিনের মত আজ তার স্ফূর্তি নেই। গলির মোড় পার হবার একটু পরেই বক্সার অস্ফুট আর্তনাদ করতে লাগল। এটা অস্বাভাবিক ঠেকল সীমার কাছে। তার ভাব-বৈচিত্র্যের সঙ্গে সীমা পরিচিত সুতরাং আরও কিছুদূরে যাবার পর বক্সার রাস্তার ওপর যখন বসে পড়ল অসহায়ভাবে, তখন সে বিপদে পড়ল। তাকে ওঠাতে চেষ্টা করল, [illegible] বক্সার। ছোট কুকুর হলে কোলে তুলে নিয়ে যাওয়া যেত, কিন্তু বক্সারের বেলায় একথা খাটে না, তাকে তুলতে অন্ততঃ দুজন লোকের দরকার। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল সীমা। ধারেকাছে কাউকে দেখা গেল না। একটা রিক্সা হলেও তার কাজ চলে যেত। কিন্তু তারও অভাব। এবার নিজেকে অসহায় বোধ করল সীমা। সামনে বড় বাগানওয়ালা একটা বাড়ী। গেট পেরিয়ে সাহায্যের সন্ধানে যে যাবে তাও সম্ভব নয় কারণ গেট থেকে বাড়ীটা বেশ কিছুটা দূরে। দূরে একজন লোক এগিয়ে আসছে দেখতে পেল সীমা। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। রাস্তার আলো নিষ্প্রভ।

শুনছেন? ডাকল সীমা লোকটির উদ্দেশে।

কি হয়েছে?

কুকুরটা চলতে চাইছে না।

চলতে পারবে না কারণ ও অসুস্থ। আপনি দাঁড়ান আমি ব্যবস্থা করছি।

সামনে বাড়ীটার ভেতরে ঢুকে গেল সে। সীমার মনে হল কোথায় যেন তাকে দেখেছে। চিন্তা করার আগেই কয়েকজন লোক নিয়ে এসে উপস্থিত হল ভদ্রলোক। বক্সারকে তুলে তারা সেই বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেল। এবার তাকে চিনতে পারল সীমা। পুরীর সেই ভদ্রলোক, পুলিশ। মুখটা শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল তার।

পুরীতে আপনাকে দেখেছি, মনে পড়ছে আপনার?

হ্যাঁ, মাথা নাড়ল সীমা।

বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন। কি খাবেন বলুন—চা, না কফি?

কিন্তু—

ব্যস্ত হবেন না, আমি ডাক্তার জৈনকে ফোন করেছি। উনিই আমার কুকুরের চিকিৎসা করেন। বেশ ভাল ডাক্তার। আমারও গোটাতিনেক আছে।

সীমা এবার তাকাল তার দিকে। সুবেশ, সুন্দর চেহারা লোকটির।

আপনি এখানেই থাকেন? জিজ্ঞাসা করল সীমা।

হ্যাঁ, এটা আমারই বাড়ী।

পুলিশের লোক বলে একে সন্দেহ করা সীমার ভুল হয়েছে। বাড়ী, সাজ-পোশাক, আসবাবপত্রের মধ্যে মধ্যবৃত্তীর ছোঁয়াচ রয়েছে যথেষ্ট।

পুরীতে আপনাকে আমি পুলিশের লোক বলে সন্দেহ করেছিলাম।

সীমার কথা শুনে হেসে উঠল সে। তারপর বলল—পুলিশই আমার পিছু নেয় অনেক সময়।

কেন? অবাক হয়ে তাকাল সীমা।

আমার জুয়েলারীর ব্যবসা আছে। ওরা অনেক সময় আমাদের ব্যবসাকে সন্দেহের চোখে দেখে। কিন্তু সে যাই হোক, আমাকে পুলিশ বলে মনে হওয়ার কারণটা ঠিক বুঝলাম না। আমার নাম সৌম্য দত্ত। সৌম্য দত্তের দিকে আর একবার ভাল করে দেখল সীমা। পরণে সূক্ষ্ম কাপড়ের পাঞ্জাবি তার সংগে কোঁচান ধুতি। সৌম্য দত্তর চোখের দৃষ্টিটা কিন্তু মিস্টার মোদীর মতই আপত্তিকর।

আপনি এই ম্যানসনে থাকেন? জিজ্ঞাসা করল সৌম্য।

হ্যাঁ, দেখুন, এবারে আমায় যেতে হবে। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ল সীমা।

কিন্তু এখনও ডাঃ জৈন আসেনি। আর ঐ বিরাট কুকুরটাই বা নিয়ে যাবেন কি করে? একটু কাছে এগিয়ে এল সৌম্য দত্ত. তার-পর বলল—তার চেয়ে আসুন, ড্রইংরুমে একটু বসবেন।

না থাক, এখানেই ভাল আছি।

একজন উর্দিপরা বেয়ারা চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

নিন, একটু চা খান—। সৌম্য দত্ত সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল।

বাড়ীতে কোন মেয়েছেলে নেই যে, এসে আপনাকে খেতে অনুরোধ করবে। আমি নিতান্তই একলা। সৌম্য দত্ত নেশা করেছে বলে এতক্ষণে বুঝতে পারল সীমা। চোখ-দুটো তার রক্তবর্ণ। আরও এগিয়ে এল সে।

আপনার নামটা কিন্তু এখনও বলেন নি।

আমার নাম শ্যামলী সেন। আড়ষ্ট হয়ে বলল সীমা।

রাইট—পুরী হোটেলের রেজিস্টারে তাই দেখেছি বটে। কিন্তু আপনি চা খাচ্ছেন না।

চায়ের পেয়ালা তুলে নিল সীমা। আপত্তি জানালে অহেতুক দেরী হবে। ডাক্তারসাহেব এসেছে বলে একজন বেয়ারা সংবাদ দিয়ে গেল। বক্সারকে পরীক্ষা করে ডাঃ জৈন বলল—মিঃ দত্ত, কুকুরটা কি

না, মিস্ সেনের। ইনি আমারই প্রতি-বেশী।

ওর ডিসটেম্পার হয়েছে। একটা পা প্রায় প্যারালাইজড্। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল সীমা।

তাহলে কি হবে? ব্যাকুল হয়ে পড়ল সে।

ওকে হাসপাতালে দিলেই ভাল হয়। বলল ডাঃ জৈন। সীমার চোখদুটো জলে ভরে এল। এই এক জায়গায় সে দুর্বল। বক্সার তার কাছে থাকবে না এটা ভাবা তার পক্ষে শক্ত। বক্সার তার সহায়, বন্ধু, রক্ষক। তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সীমা পরম স্নেহে।

ভয় পাবেন না মিস সেন, সৌম্য দত্ত বলল, ওর ভালোর জন্যই কয়েকদিন ওকে ছেড়ে থাকতে হবে।

ওকে আপনি রোজ দেখতে যেতে পাবেন, সেই সঙ্গে বলল ডাঃ জৈন, আর বলেন ত' আমিই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই।

খুব ভাল হয় ডাঃ জৈন। সীমার হয়ে উত্তর দিল সৌম্য।

বক্সারকে নিয়ে ডাঃ জৈন চলে যাবার পর সীমার শরীর আর মন যেন অবশ হয়ে গেল। নির্জীবের মত সে বসে রইল চুপ করে। হঠাৎ একটা অজানা স্পর্শ সে অনু-ভব করল তার উন্মুক্ত গলার ওপর। চমকে উঠে সীমা তাকিয়ে দেখল সৌম্য দত্তের একটা হাত তার নগ্ন কাঁধের ওপর রয়েছে। চকিতে দূরে সরে গেল সীমা।

কুকুরটাকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে?

সৌম্যর কথার উত্তর না দিয়ে সীমা এগিয়ে গেল দরজার দিকে। সীমা জানে মেয়েদের দুর্বল মুহূর্তগুলো কাজে লাগায় এরা।

মিস সেন—ডাকল সৌম্য। থমকে দাঁড়াল সীমা দরজার কাছে।

কুকুরের খবর আমি কালই জানিয়ে দেব আপনাকে।

সীমা আর দাঁড়াল না, বেরিয়ে গেল বাড়ীর বাইরে।

ফ্ল্যাটে গিয়ে সে ঘরের আলো নিভিয়ে চুপ করে বিছানায় বসে ভাবতে লাগল।

সমস্ত জিনিসটা তার কাছে অবাস্তব বলে মনে হল। অরুণ বসুর সামনে ইন্টার-ভিউ, গাড়ীতে তার সংগে ফিরে আসা, বক্সারের অসুস্থতা, সৌম্য দত্তের গায়ে পড়া আলাপ করা, সবগুলোই যেন আকস্মিক দুর্ঘটনার মতই একটা থেকে আর একটা ঘটনার পার্থক্য লক্ষ্য করে সে অবাক হয়ে গেল। একটু পরে বক্সারের শূন্য ঘরটার দিকে দাঁড়াল সে। অভুক্ত খাবার আর জলের

দেবার কম্বল, শোবার বিছানা—সব তাকে বক্সারের অনুপস্থিতির কথা মনে করিয়ে দিল। বক্সারের গায়ের গন্ধটা তখনও সীমা স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে। সীমা আজ নিঃস্ব, রিক্ত, নিঃসহায়। তার সামনে বন্ধুহীন রাত্রি আর অজানা শ্বাপদের নিঃশব্দ পদ-সঞ্চার। পাশের দেওয়ালটা ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

ধীরে ধীরে বিছানায় এসে সে শুয়ে পড়ল। আজ তার খাওয়ার স্পৃহাও নেই। সীমা নিজেকে এত অসহায় কেন ভাবছে তা সে বুঝতে পারে না। ছোটবেলায় তার মনে এই ভাবটা বেশী আসত সে কথা তার মনে আছে। বক্সার তখন কোথায় ছিল? সে থাকলে নানুকাকা তাকে অত বকত না, যন্ত্রণা দিতে পারত না। নানুকাকার চেহারা বেঁটে মোটা ধরনের ছিল। গোল মুখের ওপর সরু গোঁফ আর চোখে চশমা। নানু-কাকা তাদের বাড়ীতে অত থাকত কেন তা সে বুঝতে পারত না। বাবাকে সেকথা জিজ্ঞাসা করেছিল একদিন। বাবা কেমন যেন অন্যমনস্ক থাকতেন সব সময়। এক কথা পাঁচবার বলে তবে উত্তর পাওয়া যেত। তবে সীমা এটা জানত যে নানুকাকা বাবার বন্ধু; বাড়ীটাও তার। পঁচিশ টাকা ভাড়া। মাস গেলে বাবা মাইনের টাকাটা মার হাতে দিয়ে দিত। বাড়ীভাড়ার টাকা কিন্তু সীমা কোন-দিনই নানুকাকাকে নিতে দেখেনি। বাবা অফিস চলে গেলে নানুকাকা একটা বাজারের থলে নিয়ে বাড়ী ঢুকত। তাতে মাছ কিংবা মাংস থাকত। মায়ের রান্না কখন শেষ হত সে হিসেব সে রাখত না। কারণ তার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়ত বাবার খালি বিছানায় হাত রেখে। নানুকাকার সামনে সে পারতপক্ষে যেত না। যদি গিয়ে পড়ত তাহলে—

খুকু তোমার পড়া হয়েছে? বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করত নানুকাকা।

তুমি এখানে কেন? মা-ও সায় দিত নানুকাকার সঙ্গে। সে বুঝতে পারত না মা আর নানুকাকা তাকে দেখলে অত রাগ করত কেন। বাবা কিন্তু তাকে দেখতে না পেলে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। নানুকাকা তাকে সংগে করে সিনেমায় নিয়ে যেত। মা, নানুকাকা আর সে। ছবি দেখতে তার ভাল লাগত না. উসখুস করত। তাছাড়া নানু-কাকা আর মা কি যেন ফিসফিস করে বলত আর হাসত। সে আড়চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকত। সোজাসুজি তাকালে মা তাকে চিমটি কাটত। তখন তার বয়স কত হবে, প্রায় পাঁচ বছর। তারপরেই বাবা তাকে একটা মিশনারি স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে-ছিল। নানুকাকা যেদিন খেয়াল হত সেদিন তাকে নিয়ে পড়াতে বসত। স্কুলের মাদার বা সিস্টার কি সুন্দর করে ছড়াগুলি বলত, নানুকাকা কিন্তু সেরকম পারত না। একদিন সে হেসে ফেলেছিল বলে নানুকাকা তাকে খুব জোরে মেরেছিল। চৌকি দিয়ে তার রক্ত বেরিয়েছিল সে সময়। সারাদিন সে খায় নি

সে সব বলে দিয়েছিল বাবাকে। এ নিয়ে মায়ের সঙ্গে দারুণ ঝগড়া হয়েছিল বাবার। কথাগুলো সব বুঝতে পারে নি। তবে সে রাতে বাবা তাকে বুকে জড়িয়ে খুব কেঁদেছিল সেটা এখনও তার মনে আছে। সেই প্রথম বাবাকে রাগ আর ঝগড়া করতে দেখল সীমা। নানুকাকার কাছে এরপর সে অকারণে অনেকবারই মার খেয়েছে। এক এক সময় সে নানুকাকাকে কিভাবে জব্দ করবে, ভাবত। বাবা নানুকাকাকে মারে না কেন? একথা মনে হত তার মাঝে মাঝে। বাবা যে নানু-কাকার চেয়ে সর্বদিকেই দুর্বল একথা বুঝতে দেরী হয়নি সীমার। একবার নানুকাকার চশমাটা সে লুকিয়ে রেখেছিল চালের ড্রামের মধ্যে। অনেক খোঁজা হল কিন্তু পাওয়া গেল না। তার পরের দিন সীমাই সেটা বার করে মিথ্যে বলেছিল যে খাটের পিছনে সে পেয়েছে। ব্যাপারটায় ভারী খুশী হয়েছিল সে। নানুকাকার ব্যস্ততা, মায়ের হতাশার ভাব, সবই সে উপভোগ করেছিল। রাত্রে তার কষ্ট হত। দিনের বেলায় তবু স্কুলে তার সময়টা কাটত ভাল। পড়াশুনো আর খেলা নিয়ে আনন্দে থাকত। বাড়ী ফেরার মুখে আবার সেই অন্ধকার গলির ভ্যাপসা বাড়ীটা, নানুকাকা আর মায়ের কথা মনে পড়ে মনটা তার খারাপ হয়ে যেত প্রায়ই। বাবার দিনের বেলায় ছুটি থাকলে তার ভাল লাগত। আর কিছু না হোক বাড়ী গিয়ে সেদিন খেতে পেত। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে এলেই মনটা আবার তার ভার হয়ে যেত কারণ রাত্রে বাবা কাজে গেলে তাকে খালি বিছানায় শুতে হবে, সেই চিন্তাটাই পেয়ে বসত। একটানা তার কোনদিনই ভাল যায়নি। এই দুঃখের মধ্যে বাবাই অবশ্য একমাত্র তার শক্তি ও সহায় ছিল। সেই বাবাকে সে চোখের সামনে ক্ষয় হয়ে যেতে দেখল একটু একটু করে। রাত্রে বাবা ঘুমের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক আওয়াজ করত। সেটা শুনে সীমার মনে হত বাবা বোধ হয় মরে যাচ্ছে। অনেক রাতে সে উঠে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখেছে বাবা বেঁচে আছে কিনা। সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা জানলাটার আওয়াজও শুনতে পেত। সীমার কাছে রাতটা দুর্বিষহ যন্ত্রণা ছিল যেন। বিভীষিকাময় স্বপ্ন আর ভয়াবহ অস্বাভাবিক শব্দগুলো তাকে পীড়ন করত অসহনীয়ভাবে।

চিন্তাস্রোতে তলিয়ে গেল সীমা। বক্সারের অভাবে সে যে ভয় পাচ্ছে এটা অনুভব করতে পারল সঙ্গে সঙ্গে। ঘুমের কোন আশা নেই তা সে বুঝেছে। এখন সে উন্মুখ হয়ে থাকবে অচেনা অস্বাভাবিক কোন আওয়াজের জন্যে। সেইদিকেই তার মন পড়ে থাকবে সারারাত। বিছানায় উঠে বসল সীমা।

ক্লস অ্যান্ড ক্যারাওয়ে কোম্পানীতে যোগ দিল সে। এইটেই অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যবস্থা বলে মনে হল তার কাছে। সৌম্য দত্ত বক্সারের অসুখের অজুহাতে যেভাবে তাকে সাহায্য করতে ব্যগ্র হচ্ছে সেটা তার বিপদ হয়েছে, সৌম্য তার ফ্ল্যাটের সন্ধান পাওয়াতে। লোকটার হাতে প্রচুর পয়সা আছে, এটা বেশ বোঝা যায়। অবশ্য সেটাই বড় কথা নয় সীমার কাছে। সম্পদ তাকে প্রলুব্ধ করে না। কারণ এতে দায়িত্ব বেশী, বিপদও প্রচুর। সেই কারণে সৌম্য দত্তকে অরুণ বসুর মতই সে এড়িয়ে যেতে চায়। সৌম্য দত্তের সঙ্গে অরুণ বসুর তুলনা করে সীমা দেখেছে, সৌম্য দত্তের অ্যাপ্রোচটা শুধু আপত্তিকরই নয়, তার সবটাই প্রকটভাবে স্থূল। অরুণ বসুর ভাবভঙ্গী বা কথায় সৌম্য দত্তের প্রলুব্ধতা নেই। জোর করে ভদ্রতা প্রকাশের অশোভন চেষ্টা নেই। অরুণ বসুর ব্যবহারে তার প্রতি একটা সূক্ষ্ম অভিভাবকসুলভ ইঙ্গিত সে লক্ষ্য করেছে। তার হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়ায় অরুণ বসুর কি স্বার্থ থাকতে পারে সেটা এখনও বুঝে উঠতে পারে নি সীমা। সুন্দরী যুবতীর প্রতি আকর্ষণের কথা যদি ধরা যায়, তাহলেও অরুণ বসুকে সেদিক দিয়ে উদ্দেশ্যমূলক অভিপ্রায়ের দায়ে অভিযুক্ত করা যায় না। কোলরিজ কোম্পানীর টাকা চুরির ব্যাপারে পুলিশ এখনও তাকে অভিযুক্ত করছে না কেন এবং এর পিছনে অরুণ বসুর কোন ইঙ্গিত আছে কিনা সেটাও সীমার পক্ষে বোঝা কঠিন হয়ে উঠছে। অরুণ বসুর ব্যবহার তাকে শুধু ভয় পাইয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না, তার মন আর স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে এটা সে অনুভব করছে এবার। আপত্তিকর কিছুই নেই অরুণের ব্যবহারে। তাই সে সীমার কাছে দুর্বোধ্য হেঁয়ালির মত। সৌম্য দত্তকে সব মেয়েই চিনতে পারে। তার উদ্দেশ্যটা যেমনি প্রাচীন তেমনি প্রকট। সৌম্য দত্তকে চেনা যায়—তাকে ঘৃণা করতে বা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত বহু উপলক্ষ্য পেতে পারে। মোট কথা তাকে একটা বিশেষ রূপ দিয়ে যাচাই করতে অসুবিধে নেই। অপরপক্ষে অরুণ বসুর বেলায় সে কথা খাটে না। সীমা তার সামনে এবং পিছনে অবাঞ্ছিত বিপদ দেখে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। ক্লস অ্যান্ড ক্যারাওয়ে

কোম্পানীতে যোগ দেবার পরই সে বুঝতে পারছে সে যেন নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করছে। তার অলক্ষ্যে কে যেন তাকে এগিয়ে দিচ্ছে বিপদের সীমানার মধ্যে। গণ্ডীটা যেন ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে তার অজ্ঞাতে। সেটা যে একদিন পায়ের বেড়িতে পরিণত হতে পারে, সেই দুশ্চিন্তা আজকাল যেন তাকে পেয়ে বসেছে। অফিসে অরুণ বসু আর বাইরে সৌম্য দত্ত। এই দুজনকে কিভাবে এড়ান যেতে পারে, কি উপায়ে এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি সে পাবে, অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে সীমা তাই ভাবছিল মনে মনে। তার জীবনে যেন সে শুধু পাশ কাটিয়েই এসেছে বার বার। দুঃখ, ভয়, দুশ্চিন্তা, অশান্তি সবই সে এড়িয়ে এসেছে কোন না কোন কৌশলে। কোন সমস্যার সংগেই সে সামনাসামনি মোকাবিলা করে নি বা করতে চায় নি। এটা তার কাছে বোকামি বলে মনে হয় না। বুদ্ধি বা কৌশলে যদি সমস্যার আবর্ত থেকে মুক্তি সম্ভব হয় তাহলে বাহাদুরী করে তার মধ্যে জড়িয়ে যাওয়ার কোন যুক্তি খুঁজে পায়নি সীমা।

ফ্ল্যাটের কলিং বেল বেজে উঠল।

কে? জিজ্ঞাসা করল সীমা। তাকে কেউ ডাকে না এইভাবে।

আমি সৌম্য দত্ত।

কি বলুন ত। দরজার ফাঁক দিয়ে সৌম্যকে দেখতে পেল সীমা। সেই পরিচিত সাজ—ধুতি আর পাঞ্জাবি। হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট।

দরজাটা একটু খুলবেন—সৌম্য দত্তের কণ্ঠে অনুনয়ের আভাষ।

আমি এখন ব্যস্ত আছি—স্পষ্ট উত্তর দিলে সীমা।

তাহলে অপেক্ষা করছি।

না, তার প্রয়োজন নেই, বক্সারের কুশল সংবাদ আমি পেয়েছি। আপনি আর অনর্থক কষ্ট করবেন না।

বক্সারের জন্য আমি আসিনি। আমি কয়েকটা জুয়েলারী আপনাকে দেখাতে এসেছি।

আমার জুয়েলারীর কোন দরকার নেই। মিঃ দত্ত, আপনি অযথা সময় নষ্ট করবেন না।

পায়ের শব্দে শোনা গেল সৌম্য দত্ত চলে যাচ্ছে। একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। এত তাড়াতাড়ি সৌম্য দত্ত তাকে নিষ্কৃতি দেবে এটা আশা করেনি সে।

অরুণ বসুর চেম্বারটা অফিসের এক-ধারে তবে সীমার ফ্লোরে। সেদিন কাজের মধ্যে বেয়ারা চিরকুট দিয়ে জানালে যে বোস-সাহেব তাকে সেলাম দিয়েছেন। এটা সে আশা করেছিল, সুতরাং দেরী না করে সে সোজা গিয়ে ঢুকল পার্টিশান দেওয়া ঘরের মধ্যে।

আমায় ডেকেছেন?

হ্যাঁ বসুন। ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখাল অরুণ। বসল সীমা।

গত সপ্তাহে কয়েকটা স্টেটমেন্ট টাইপ করেছিলেন মনে আছে?

আছে। ছোট করে উত্তর দিল সীমা।

তাহলে কাইন্ডলি ওর কপিগুলো যদি পাঠিয়ে দেন।

আচ্ছা। এগিয়ে গেল সীমা দরজার দিকে।

আর মিস সেন—ফিরে তাকাল সীমা অরুণের দিকে।

আমি সাড়ে চারটের সময় বার হব, আপনাকে সংগে যেতে হবে।

কেন? যেন রুখে দাঁড়াল সীমা।

বোর্ডের মিটিং-এ স্টেনোর অভাব। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অরুণ বসু।

নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল সীমা। আবার অরুণ বসুর সংগে তাকে যেতে হবে। তার এটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সেটার জন্য চিন্তিত নয় সে।

গাড়ীতে উঠে বসল সীমা অরুণের পাশে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে গাড়ী চালাবার পর অরুণ তার দিকে তাকিয়ে বলল—আজ একটু দেরী হতে পারে মিস সেন?

দেরী হবে কেন? সবকিছুতেই তার সন্দেহ হয়।

প্রথমে মিটিং সেরে তারপর আপনাকে আমি আর কোথাও যাব না। ভয় হয়ে বলল সীমা।

কথাটা শুনেই ভয় পেলেন? ডগ শো-এ আজ প্রাইজ দেওয়া হবে।

আপনার কুকুর আছে? কৌতূহল হল সীমার।

হ্যাঁ, আমার স্প্যানিয়েলটা প্রাইজ পেয়েছে এবার।

বোর্ডের মিটিং শেষ হবার সংগে সংগে সীমা একবার চেষ্টা করল অরুণের নাগালের বাইরে যেতে। কিন্তু পারল না।

একসংগে অত কুকুর সীমা কোনদিন দেখে নি। ছোটবেলা থেকেই সীমা কুকুর ভালবাসে। মনে আছে ছুটির দিনে, বাড়ীর সামনে যে কুকুর দুটো থাকত তাদের নিয়ে তার সময় কাটত। নিজের খাবার থেকে লুকিয়ে রুটি বা ভাত তাদের জন্য রেখে দিত। তাদের পেট ভরাবার মত জিনিস অবশ্য তার ছিল না কিন্তু ভারী ভাল লাগত সীমার এই কুকুরদুটোকে। এই দুটো জীবকেই শুধু সে তার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে দেখেছে। তার জন্য অপেক্ষা করেছে বাবার মত অধীর আগ্রহে। সীমার ধারণা ছিল তার দুঃখের কথা বাবা ছাড়া ঐ দুটো কুকুরই বুঝতে পারত। নীরব সান্ত্বনা দিত ওরা তার দুর্দশার মধ্যে।

ভাল লাগছে? জিজ্ঞাসা করল অরুণ।

হ্যাঁ, বেশ লাগছে—। ঐ কুকুরটা কি?

পিকিনীজ।

কি সুন্দর! আনন্দে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল সীমার।

কুকুর ভালবাসেন বুঝি? অরুণ ওর ভাবান্তর লক্ষ্য করেছে।

হ্যাঁ, আমার আছে বক্সার—তার ডিস-টেম্পার হয়েছে বলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা ওটা কি?

পুড়ল।

কত ছোট, চোখদুটো সুন্দর লোমে ঢেকে গেছে।

চলুন ঐ ক্যান্টিনে একটু চা খাই, বলল অরুণ। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দুজনে চা খেল ওরা। বেশ ভাল লাগছে সীমার। এত ভাল অনেকদিন তার লাগে নি। তার ইচ্ছে হচ্ছে এইখানেই থেকে যেতে। এক-সংগে কুকুরগুলো ডাকলে নানা সুরে। ছটফট করছে সবাই প্রাণচাঞ্চল্যে। শুধু বুলডগ আর গ্রেটডেন দাঁড়িয়ে আছে তাদের বিরাট দেহ নিয়ে। তাদের গাম্ভীর্য কিন্তু অপরকে লজ্জা দিতে পারছে না। সীমার দিকে তাকিয়ে দেখল অরুণ। তার সব ব্যক্তিত্বটাই পাল্টে গিয়েছে। মুখের রুক্ষভাবটা অদৃশ্যপ্রায়। সে জায়গায় স্নিগ্ধ কোমলতার স্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করল সে। সীমাকে আর

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কাজের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ

(২)

অবনীন্দ্রনাথের বরানগরের গুপ্ত-নিবাসে বসবাসকালে তাঁর বাসায় বহুবার গিয়েছি; কখন একাকী, কখন সস্ত্রীক আবার কখন বা পুত্রসহ। আমার পিতৃদেব নীলানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ভগ্নীপতি ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় আমার কাছে এলে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে আসতেন। সব স্তরের লোকেদের সঙ্গে তিনি নানা রকমের কথাবার্তা কইতেন সমানভাবে। নাতিদের সঙ্গে, পুত্র ও পুত্রস্থানীয়দের সঙ্গে প্রায় সব সমবয়স্কদের সঙ্গে সমান ঘরোয়াভাবে আলাপ-সালাপ করতে দেখেছি। ও'দের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা আমাদের বাসায় যাতায়াত করতেন এবং আমরাও তেমনি আপনজন ও অভিভাবক ভেবে তাঁর কাছে যেতাম।

আমার নতুন বিয়ের পর যখন কোন তত্ত্বতাবাস আসতো তখনই অবনীন্দ্রনাথের বাগানবাড়ীতে লোক মারফৎ সাইকেলে পাঠিয়ে দেওয়া হত। তিনিও বিশেষ করে জন্মাষ্টমী ও তার পরের দিন প্রচুর মিষ্টান্ন ও সন্দেশ আমাদের বাড়ীতে পাঠাতেন। আমাদের এখানে জলকলের পুকুরে মাছ ধরা হলে তাঁর ওখানে পাঠানো হতো। তাঁর পরিবারের আমরাও এক আপনজন হয়ে গিয়েছিলাম। উনি সকালে নেমে আসতেন চটিটি পায়ে দিয়ে বাগানে ঘুরতেন। ছোট ছোট পরিত্যক্ত কাঠ পাথর নিয়ে কিছু শিল্পকলার 'কাটুম-কুটুম' খেলা চলতো। সামান্য জিনিসকে শিল্পীর দৃষ্টি-প্রলেপ দিয়ে এক অপরূপতার রূপ দেখতে পেতেন। সন্ধ্যার আলো নেভার আগে ওপরের দক্ষিণের বারান্দায় বসতেন তাঁর বিশেষ ইজিচেয়ারে। সারি সারি অনেক চেয়ার শান্তিনিকেতনী মোড়া প্রভৃতি পাতা থাকতো। আমি গিয়ে পাশের চেয়ারে বসতাম। আর শুনতাম তার দীর্ঘ জীবনের অনন্ত কাহিনীর কথা। অধিকাংশ সময় আমি শুধু নীরব শ্রোতা।

অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র অলোকেন্দ্রনাথ (আমাদের অলোকদা) আমায় অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখতেন। তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী পারুল দেবীর যেন স্নেহের অবধি ছিল না। অতি ধীরে ধীরে ও সুনম্র তাঁর কথা। প্রকৃত সুগৃহিণীর মত সংসারের নানান কথা জানতে চাইতেন। পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক মানুষটির কুশল সমাচার গ্রহণ করতেন। তার মধ্যে থেকে দাসদাসীও বাদ যেতো না। বেদনায় সহানুভূতি জানাতেন। মাঝেমাঝে আমাদের বাসায় আসতেন। তাঁর চাল-চলনে তাঁর সহৃদয় আচরণে সকলেই মুগ্ধ ছিল। ঘরে বাইরে সবাই তাঁর মমতাময়ী স্নেহশীলা মূর্তির অকুণ্ঠ প্রশংসা করতো ও আজও করে।

অবনীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভের পর ফিরে এসে কোন কোন দিন কিছু কিছু আমাদের আলাপ-আলোচনার কথা লিখে রেখে দিতাম। তারই কিছু কিছু অতীত দিনের স্মরণিকা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

অবনীন্দ্র সান্নিধ্যে

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বিপুল বেগে চলেছে। অবনীন্দ্রনাথ সেই দিন সকালে জলকলের কাছ দিয়ে বেড়িয়ে গেছেন। জলকলের ভিতরে উচ্চস্থিত জলাধারটি এল্যুমিনিয়াম রং করা। অত উঁচুতে বলে গায়ে ধুলো জমে এটার রং কিছু মলিন করেনি।

১৮।১।৪২ তারিখে তাঁর বাসায় যেতে তাঁরই পাশে রাখা চেয়ারে বসতেই তিনিই কথা শুরু করলেন।

দক্ষিণেশ্বর: ১৮।১।৪২

অবনীন্দ্রনাথ—আসতে আসতে ভাবছিলাম, তোমাদের চাঁদের মতো ট্যাঙ্কটা কি করবে?

আমি—ওতে একটা ক্যামোফ্লেজ রং দেবো। নীচে সবুজ ঘাসের রং ও ঠাট মিলিয়ে একটা কিম্ভূতকিমাকার করা হবে।

অ—মানে, গাছপালা করে দেওয়া, আমি ভাবছিলাম যদি ওর ঝকমকানিটা গঙ্গামাটি লেপে নষ্ট করে দাও তো কেমন হয়? কারণ এরকম রংটা ডিসকলার করলে তা আর পরে ফিরে পাওয়া যাবে সেই গঙ্গামাটি হলে পরে ঘষলে গঙ্গামাটি উঠে যাবে। সেই গঙ্গামাটি লেপার উপর থেকে তাল খেজুরের পাতা বুলিয়ে দাও। তা করলে কি হয়? নকল একটা জিনিস আমাদের চোখে দূর থেকেই ধরা পড়বে কিন্তু ওপর থেকে জলের ধারে গাছপালাই মনে হবে।

আ—যারা এরোপ্লেন করে জিনিস নষ্ট করে, তাদের আর্টের সমঝদারী চোখ নেই। তাহলে জিনিস নষ্ট করতো না। তা যাই হোক, আকাশে উড়ে দেখেছি, ধারের বিরাট জলাশয়ের মাঝখানে এটা একটা বিন্দুর মতন। এই ডামাডোলে আপনি কোথাও যাচ্ছেন নাকি?

অ—কোথায় আর যাব! এই রকম জঙ্গলের মতো জায়গা ছেড়ে, পয়সা খরচ করে যাব কোথায়? তারা এই জলা ও জঙ্গলে বোমা ফেলতে আসবে না।

আ—তা' যা বলেছেন—বোমারও তো দাম আছে। বোমা বয়ে আনবারও আবার খরচ আছে। তার উপর শত্রু শিবিরে প্রবেশ। ধনে-প্রাণে বিনষ্টিত হবারও ভয় আছে।

অ—আমার মেয়েকে বলেছিলাম, এখানে থাকবার জন্যে মরি তো একসঙ্গেই মরব।' সে বললে, বাবা আমার এই ছোট্ট মেয়ের জন্য আমাকে চলে যেতে হল। আমি বললাম ভালো। ইচ্ছে ছিল একসঙ্গে থাকা, বুঝলাম হল না। —বলে অবনীন্দ্রনাথ এক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কেমন যেন হঠাৎ উদাস ভাব।

আ—বাড়ীতে 'এয়ার রেড সেলটার' তৈরী করছেন নাকি? না নীচে একখানা ঘর সেলটারের মতো ঠিকঠাক করে নিচ্ছেন?

অ—নীচের ঘরে গিয়ে কি বাড়ী চাপা পড়ে মরব? সাইরেন বাজলে বুড়োবুড়িতে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকবো, মরতে হয় দুজনে একসঙ্গে মরব।

কথার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে শিল্পাচার্যকে জিজ্ঞেস করলাম, সামনে ঐ নেপালীটি যে ঘুরছে, আপনারা কি নতুন নেপালী দরোয়ান রেখেছেন?

অ—ওরে বাবা: নেপালী! কখন কেটে রেখে রেখে চলে যাবে। মিলিটারী মেজাজ কিনা? তবে সেকালের এক কলকাতার বড়লোকের এক গল্প বলি শোন। —বাবু এক মস্ত জমিদার। বিরাট দালান-বাগান, গাড়ী জুড়ি, দাস-দাসী কত কি! তার মধ্যে একটা বিরাট ফেটিং গাড়ী ছিল। তিনি সাহেব কোচম্যান রেখেছেন—গায়ে সোনালী জরিদার লাল মখমলের জামা, ভালো সাহেব বাড়ীর বুট, মাথায় ফেলট হ্যাট মস মস করে

কোচোয়ানের বাক্সে গিয়ে বসলেন। দুধারে দুই সহিস—ফেটিং-এর দরজা খুলে হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে। কর্তা ও গিন্নী এসে উঠলেন। সহিস দরজা বন্ধ করে দিল। কর্তা গাড়ীতে উঠেই কোচম্যানকে বলে দিয়েছেন, কোন জায়গায় যেতে হবে। তবুও কোনো রাস্তার মোড় এলেই জমিদারবাবু— কোচম্যানকে নির্দেশ দিচ্ছেন রাইট স্যার, লেফট স্যার।

দু-তিনবার এইরকম করবার পরে ঘাড় ফিরিয়ে সায়েব কোচম্যান জমিদারবাবুকে বলল, আই নো মাই বিজনেস, বাবু।

২৩।৮।৪২

অনেকদিন যাওয়া হয়নি। তাই আজ বিকালে তাঁর ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাগানে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ফটক পার হয়েই মালীর সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস করলাম বড়বাবু আছেন? 'আছেন্ত।'

পুকুরের পাড় দিয়ে সুপুরি গাছের সারি দেওয়া রাস্তা পার হয়ে পুব পুকুরের সান বাঁধানো ঘাটে দেখি শিল্পাচার্য আসীন। আমায় দেখতে পেয়ে 'আসুন, আসুন। এতদিন কোথায় ছিলেন? দেখিনি অনেকদিন। তাঁর প্রশ্নের অবকাশে তাঁকে প্রণাম করে বসলাম তাঁর পাশে। নেদা চাঁপাগাছটা সান বাঁধানো ঘাটের উপর ছায়া ফেলেছে। আর দীর্ঘ গুবাকতরুরাজি বিলম্বিত ছায়া পুকুরের কালো জলে সরল কাল রেখাপাত করে দাঁড়িয়ে আছে। সমীরণের স্পর্শে ঈষৎ চঞ্চল জলে সরল ছায়া রেখাগুলি [illegible]

যাচ্ছে। চির অভ্যস্ত সিগারে টান দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—বাড়ীর সব ভালো তো।'

—'আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে মোটামুটি ভালো।'

—'কি রকম বুঝছেন? কাল সাইরেনের সময় কোথায় ছিলেন?'

—'গতকাল আমি এখানে ছিলাম না—হাওড়ার বাড়ীতে গিয়েছিলাম এবং সাইরেনের সময় হাওড়ার বাড়ীতেই ছিলাম। গত ছ' মাসে দেখা যাচ্ছে মানুষের মনে বিপুল পরিবর্তন এসেছে। কেননা আমার নব্বুই বছরের বুড়ী ঠাকুরমাকে যখন বললাম, 'ঠাকুমা নীচে চলো, সাইরেন বাজছে।' ঠাকুমা বললেন, তোরা রয়েছিস ওপরে, আমি নীচে গিয়ে করব কি? বাইরে রাস্তায় কুল্পিবরফওলা সদাগরী মনোবৃত্তি নিয়ে আসন্ন খদ্দের না ছেড়ে কুলপি বরফ বেচতে মসগুল। পাকাউড়ীওলা লোহার তোলা উনুনে পাকাউড়ি ভেজেই চলেছে। লোহার বাটির টোপর মাথায় দিয়ে এ-আর-পি'র লোকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে—বোমা ফেলার ভয় নেই এই আশ্বাস দিয়ে।'

অবনীন্দ্রনাথ তখন বললেন—'বৌমা তো উঠতে পারেন না। টাইফয়েডের জন্য শয্যাশায়িনী। আমি বুঝতেই পারিনি যে সাইরেন বেজেছিল। বারান্দায় বসে একখানা বই পড়ছিলাম। অলকও তখন বাড়ী ছিল না।'

—'জার্মান রেডিওর খবর কি শুনেছেন? আমরা এখান থেকে যা জানি না তা যুদ্ধের সময় জার্মান রেডিও থেকে বলছে যে ভারতবর্ষের বিখ্যাত টাটা কোম্পানীর ইস্পাতের কারখানায় ধর্মঘট চলছে।

জানিয়েছে যে, যে সকল মার্কিন সৈন্যদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান মহিলাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হচ্ছে, তাদের বিবাহ করার ও মার্কিন স্ত্রী হবার রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হোক। উদ্দেশ্য যাতে স্ত্রী ও পুরুষের নৈতিক চরিত্র বজায় থাকে।'

অ—'এখানের খবর ওরা রাখে?'

আ—'দেখছি তো তাই। শরীরটা এখন কিরকম বুঝছেন?'

অ—'আমাশার ভাবটা এখনও যায়নি; তবে গরম লুচি ও মাংস খেলেই ভাল হয়ে যাবে, একটু রোদের ঝাঁঝটা কমলেই একদিন সকালের দিকে আপনাদের ওখানে যাব। এরা সব 'সিঁথিতে' মাছ ধরতে গেছে। আজ সকালে 'বেলঘরিয়া' থেকে একদল ছেলেমেয়ে দেখা করতে এসেছিল আমার সঙ্গে। আমি বললাম, 'আমায় দেখবে, দেখো।' একজন জিজ্ঞেস করলে, 'কতদিন থাকবেন আপনি এখানে?' বললাম, 'তিন বছরের তো লীজ নিয়েছি। তারপর যেখানে যাব সেখানে তোমরা দেখা করতে যেতে পারবে না। করবার বহু কাজ ছিল যখন, তখন খুবই কাজ করতাম, তখনই বেঁচে থাকার সার্থকতা ছিল। এখন কাজ শেষ হয়েছে। তাই এদের বলি, 'আমায় কোন এক জায়গায় পাঠিয়ে দে। যখন শক্তি ছিল তখন কত কঠিন রোগের সেবা, দুষ্প্রাপ্য ঔষধ আনানো, ঐ ঢাকুরে থেকে তালশাঁস, পাতিপুকুর থেকে জামরুল আনানো—সবই আমি করতাম। ছেলেদের অসুখ করেছে; রাত জাগা আমিই করতাম। আমার স্ত্রী একটু দুর্বলা, অনেক বাচ্ছাকাচ্ছা। আমিই সব করতাম। এখন কিছুই পারিনে। ছোট বৌমা বলেন, 'আপনি গল্প লিখুন।' তাও কি এখন পারি? গল্পও মনে আসে না। খুব ভোরে উঠি। চটিটি পায়ে দিয়ে ঠুকঠুক করে ওপর থেকে নেমে আসি। আর স্টুডিয়োয় গিয়ে একটু-আধটু আঁকি। তারই জন্যে বেঁচে আছি। সেগুলোকে ছবি বলা চলে না, ছবি নিয়ে খেলা।'

আ—'নতুন কি আঁকলেন?'

ছোট বউমাকে ডাকলেন। ছোট বউমা এলেন। ছোট বউমাকে বললেন, তাঁর আঁকা কয়েকটা ছবি আনতে।

ছবি এসে গেল।

অ—'নতুন আঁকার কথা বলছিলেন? এই ছবিখানা এখানেই বসে বসে এঁকেছিলাম। সামনে বাঁধ। সেই বাঁধের উপর দিয়ে রেলগাড়ী যাচ্ছে রাত্তির বেলা। তিনটি কামরার জানালা দিয়ে তীব্র আলো দেখা যাচ্ছে। সামনেই ঝাউগাছের শ্রেণী। দূরে কয়েকটা নারিকেল গাছ হাওয়ায় পাতা দোলাচ্ছে। ঝাউগাছের তলায় অন্ধকারের কালো রংয়ের বদলে একটু সাদা ফাঁকা—মনে হয় কে যেন সাদা থান পরে বসে। আসলে ছবিটা হল আমাদের বাড়ীর সামনে দোতলা থেকে দেখতে পাওয়া এমন একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য। কিন্তু বউমারা বলেন, এটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের একটি বর্ণনার দৃশ্য।'

প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা। কত উপন্যাসে কত বর্ণনাই না আছে। এক বিশেষ বর্ণনা মনে রাখা কি সম্ভব?' সকল সংশয় ও সকল তর্কের অবসানের জন্য আনা হল 'বিষ-বৃক্ষ'। পড়া হল।

বিশেষ করে সেই অংশটি রাত্রে যখন সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনীকে বলল, 'তুই বাড়ী হইতে এখনই দূর হ। নহিলে হীরা তোকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইবে।'

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের বর্ণনায় বঙ্কিম-বাবু লিখেছেন, 'গভীর রাত্রে গৃহস্থ সকল নিদ্রিত হইলে কুন্দনন্দিনী শয়নাগারের দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। দত্ত বাড়ীর বাহিরের পথ সে জানে।......

'অট্টালিকার বৃহৎ অন্ধকারময় কায়া আকাশের গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে—সেই অন্ধকার বেষ্টন করিয়া কুন্দনন্দিনী বেড়াইতে লাগিল। মানস, একবার নগেন্দ্র-নাথের শয়নকক্ষের বাতায়ন পথে আলো দেখিয়া যায়।......

'বাতায়ন পথে আলো দেখা যাইতেছে। কপাট খোলা, সার্সী বন্ধ, অন্ধকারের মধ্যে তিনটি জানালা জ্বলিতেছে। ......কুন্দ-নন্দিনী মুগ্ধ লোচনে গবাক্ষ-পথ প্রেরিত আলোক দেখিতে লাগিল—সে আলো ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। শয়নাগারের সম্মুখে কতগুলি ঝাউগাছ ছিল—কুন্দ-নন্দিনী তাহার তলায় গবাক্ষ প্রতি সম্মুখ করিয়া বসিল। বাড়ীর চারিদিকে ঝাউ গাছের শ্রেণী, সেই মেঘময় আকাশে মাথা তুলিয়া নিশাচর পিশাচের মত দাঁড়াইয়া আছে। কদাচিৎ ঝাউয়ের পল্লব ও ফল খসিয়া পড়িতেছে। দূরে নারিকেল বৃক্ষের অন্ধকার শিরোভাগ মন্দ মন্দ হেলিতেছে, দূর হইতে তাল বৃক্ষের তর তর মর্মর শব্দ কর্ণে আসিতেছে। সর্বোপরি বাতায়ন শ্রেণীর উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে।'

ছবি হাতে উৎকর্ণ শ্রোতার মত শুনে গেলাম সেই বর্ণনা ও উল্লসিত কন্ঠে বললাম, 'আশ্চর্য' অদ্ভুতভাবে মিলে গেল বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনার সঙ্গে ছবির দৃশ্যপট। শুধু শোনা যাচ্ছে না তাল বৃক্ষের তরতর মর্মর শব্দ, আর নেই সঞ্চরণশীল কুন্দ-নন্দিনী। এটা একটা অদ্ভুত কান্ড করে-ছেন। সাইকোলজিস্ট ও সাইকিয়াট্রিস্ট ডাকা দরকার। এই অসাধারণ স্মৃতিশক্তির বিশ্লেষণে। এটা সংখ্যাগণিতের খাতে এক দৈব-ঘটনা।'

শিল্পাচার্য উল্লসিত হয়ে মৃদু হেসে বললেন—'বিবরণের সঙ্গে অদ্ভুত মিলে যাবে, একথা স্বপ্নেও ভাবিনি। এঁকেছি নিজের খেয়ালে। বৌমারা মাথা ঘামিয়ে মিল বের করেছেন। তারিফ ও'দের করতে হয় বৈকি? এইরকম খেয়ালমাফিক ছবি এঁকে যাই, নানা চিত্র গড়ে যাই। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নয়।' আরও কয়েকটি ছবি দেখালেন। ছোট সাইজের কাগজে জল রংয়ে আঁকা। ফুলস্কেপ ও ফুলস্কেপের চাইতে কম-বেশী মাপের মোটা কাগজে সাধারণতঃ

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের অমর চিত্রা-বলী যেন এক অপূর্ব তুলিওয়ালার বিস্ময়কর সৃষ্টি। এই সময় খেয়ালী ছবি-গুলির মধ্যে তা আমার চোখে পড়লো না। আমি শিল্পী নই, নই শিল্পসমালোচক। শুধু সাধারণ চোখ দিয়ে সাধারণ ভালো-লাগা-না-লাগার মাপ কাঠিতে ছবি দেখি। এক সময় ছিল যখন শুনতাম, অবনীন্দ্র-নাথের নর-নারীর চিত্রের অতি দীর্ঘায়িত অঙ্গুলি আর গাছপালার পাতা সব সময় নিম্নমুখী যেন এক ঘুমন্তভাব উন্নত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছের মতো উর্ধমুখ নয়। ছবিগুলির মধ্যে চাকচিক্য বা পারিপাট্য ও শিল্পকৌশল অথবা শিল্প-নিপুণতার ত্রুটির সমালোচনা কেউ কেউ করলেও তাতে যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিত্রকরের নিপুণ হাতের স্পর্শ আছে, তা স্পষ্টই প্রতিভাত হয়। কিন্তু দেখলাম, ছবিগুলি আমার মতে যত যত্ন নেওয়া দরকার সেরকম যত্নে রক্ষিত বা সঞ্চিত হচ্ছে না। হয়তো এ বাড়ীর চিত্রপ্রাচুর্যের মধ্যে এই ছবিগুলির মূল্যায়ন অল্প কিন্তু শিল্পরসিকদের কাছে এর মূল্য অপরিসীম।

নানারকম আলাপ আলোচনা হচ্ছে। আলোচনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—বলতে কিছু হয় না। একটু ধরিয়ে দিতে পারলেই হল। তিনিই বলে যান, অতীত দিনের যত পুঞ্জীভূত স্মৃতিকথা—যা মনের পটে অসলগ্নভাবে ভেসে ওঠে।

মাছ ধরার প্রসঙ্গ উঠাতে বললাম—আজ আমাদের পুকুরে একটা প্রায় দশ-বারো সেরের বোয়াল মাছ ধরা পড়েছিল। তার হাঁ-টা বেজায় বড়—আর অসংখ্য মিহি করাতের মত দাঁত। যে-জেলে তার জালে জল থেকে তাকে তুলেছিল, তার গাল খাবলিয়ে দিয়েছে। জেলেরা বলছে যে, ওর পেট চিরলে কম করে দু' সের ছোট গোটা মাছ পাওয়া যেতে পারে। এই বোয়াল মাছ-গুলো ঠিক শার্কের ছোট ভাই। পুরীতে এইরকম বোয়াল জাতীয় সমুদ্রের মাছ পাওয়া যায়। অনেকে খায়, অনেকে খায় না। আপনি দেখেছেন ওগুলো?

অ—সমুদ্রের ধারে ঐ মাছ পাওয়া যায়। তবে আস্বাদন তেমন সুবিধের নয়।

এমন সময় বনহুগলী থেকে জিতুবাবু (জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) ও শশাঙ্কবাবু (শশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী) এলেন। আমায় দেখে 'আরে আপনি এখানে? আপনার বাড়ীতে টেলিফোন করে পেলাম না। ভাবলাম নিশ্চয়ই এখানে।'

—'আপনারা দুজনেই তাহলে ভবিষ্য-দ্বাণীর দোকান খুলুন। কারবার ভালই চলবে। মূলধন লাগবে না। প্রথমে বাড়ীতে যেখানে দোকান ভাড়াও লাগবে না।

এই কথা বলতে বলতে দুজনে অবনীন্দ্র-নাথকে প্রণাম করে পাশের দুটি চেয়ারে বসলেন।

আবার গল্প শুরু হল।

১৭।১২।৪১

এর আগে জানেকবার অবনীন্দ্রনাথ

আমাদের জলকলে বেড়াতে এসেছিলেন। একদিন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে দিতে গিয়ে দেখি সামনের রেলের বাঁধের ধার ঘেঁষে একপাল মোষ সামনের দিকে এগিয়ে আসছে।

আমি বললাম—এ মোষগুলো তেমন রাগী নয়, আওয়াজে ভয় পেয়ে ছোটাছুটি করে না। তবে একটা মজা এই যে ঘোড়া দেখলে পাড়াগাঁয়ের আযাবুনো মোষগুলা তেড়ে আসতো।

এই কথা শুনে অবনীন্দ্রনাথের অতীত দিনের এক কাহিনী বললেন—আপনি কি জানেন, ঐ মোষেরা ঘোর লাল কি ঘোর কালো রং দেখলে তেড়ে আসে। আমি তখন জোয়ান। রাঁচিতে বেড়াতে গেছি। আমার স্ত্রীও সঙ্গে গেছেন। মেয়েরা সাধারণতঃ একটু ধীরে হাঁটে। তিনি আমার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে একটু পিছিয়ে পড়েছেন। লাল চেলী তখনকার দিনে নতুন বৌয়ের জন্য ভাল কাপড়। তাই পরে তিনি বেড়াতে এসেছেন। আওয়াজ শুনে পেছন ফিরে দেখি একটা মোষ আমাদের দিকেই তেড়ে আসছে। তাই না দেখে আমার বুক শুকিয়ে গেল। আমি পাহাড়ের কিছুদূর উঠেছি, তিনিও খানিকদূর উঠেছেন। আমি নেমে তাঁর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে উপরে উঠিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে গিয়ে সাদা চাদর জড়িয়ে দিলাম। আমাদের দেখতে না পেয়ে মোষটা পালিয়ে গেল। বাড়ী ফিরে মাকে পথের বিপদের কথা বলতে তিনি বললেন, 'বৌমাকে যেন আর কক্ষণ লাল কাপড় কি জামা পরিয়ে নিয়ে যাস না। সেই থেকে আমি জানি লাল রংটার উপর মোষেদের বেশী রাগ।

১১।১১।৪২

বৈকালে যেতেই দেখি তিনি একটা কাঠের টুকরো নিয়ে ছুরি দিয়ে কী কাটুম-কুটুম করছিলেন। তাই তাকে প্রশ্ন করলাম —'কী করছেন?'

—'এই একটা ব্যাঙের মত করছি। ব'লে পুকুরপাড়ের বাঁধানো রোয়াকে সেটাকে বসিয়ে দিলেন। তারপর প্রসন্ন বদনে শিল্পীবর বললেন—

মিলিটারি থেকে বাড়ী দেখতে এসে-ছিল। তাদের সব দেখিয়ে দিলাম। মস্তবড় পচা পুকুর, নীচু জমি ও মশার আড্ডা। কলের মুখ দেখে জিগ্যেস করে যে এখানে পৌর প্রতিষ্ঠানের জলের কনেকশন আছে কিনা? তাকে বললাম, নেই, নলকূপ থেকে জল তুলে এইসব কলে আসে। আজকাল আর নলকূপ থেকে প্রায়ই জল ওঠে না। এ জল স্নানঘর ও বাসন মাজার জন্য ব্যবহার হয়। আমার ঐ জল খেয়ে আমাশয় হয়েছে। আজও ভুগছি। সেরে উঠতে পারিনি। চারিদিকে জঙ্গল ও পচা পুকুরের জন্য বাড়ীতে টাইফয়েড রুগী। বড় বৌমা এখনও সেরে উঠতে পারেন নি। এখন যেমন দেখাল, তাতে কি রকম মান হয়? তোমাদের চলবে? না আমাদের চলে যেতে

নিমন্ত্রণ ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক আগে ক'রে শাকসবজি লাগিয়েছি, তা এখন বন্ধ করেছি। নিরুদ্বিগ্ন থাকার জন্য শহর ছেড়ে এই অঞ্চলে এসেছি। নিরুদ্বিগ্ন থাকতে চাই। বলে যাও তোমাদের এ বাড়ী পছন্দ হল কিনা? বা নেবে কিনা?

—আমরা নেবার মালিক নই। তবু বলছি

We are not going to dislodge you from your residence. Go and smoke your cigar peacefully.

তারপর গেটের ধারে টিনের চালা দেখিয়ে বলে 'ওটা কি?'

বললাম, 'ওটা আমার স্টুডিও, চল দেখবে। সেখানে রয়েছে কাটুম-কুটুমের কাঠের টুকরো, মোটা বাঁশের গাঁট, নানা পুতুল, ছবি, রং তুলি। ওরা দেখে আর হাসে।

সব শুনে বললাম—আপনি যখন ওদের কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড রোগের কথা, মশার ভয় দেখিয়েছেন ও তার উপরে ঐ বড় পুকুর। ওরা নেবে না, দেখে নেবেন।

—শহরের মায়া কাটিয়ে এখানে এসেছি। শান্তিতে আছি। আর ওঠাউঠির পর্ব ভাল লাগে না। তবুও অলককে বলেছি একটা বাড়ী দেখার জন্য, গঙ্গার ধারে হলেই ভাল হয়। সেখানেও তো সেই অবস্থা। আমার জন্য আমার কিছুই ভাবনা নেই। আমাকে সবাই ঠাঁই দেবে।

—চন্দন আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

—তাই তো বলছি। আমায় সবাই ঠাঁই দেবে। রবিকাকা মাঝে মাঝে বলতেন, 'চলে এস শান্তিনিকেতনে। ছেলেদের উপর সব ছেড়ে দাও, ওরা বড় হয়েছে। কিন্তু পারি না ওরা আমাকে চায়। আমি বলি যে আমায় ছেড়ে দে। বৌমা:দের বলি তোমরা তোমাদের বাপের বাড়ী চলে যাও। তাঁরা বলেন, আপনাকে একলা ফেলে আমরা কোথায় যাব? এ হতে পারে না। দেবীপ্রসাদ বলছিল তার মাদ্রাজের বাসায় গিয়ে থাকতে। বোলপুরে গেলে যেখানে ইচ্ছে থাকতে পারি। কিন্তু এদের মায়ায় এমন জড়িয়ে, যে ছেড়ে যেতে পারি না।

—এ বাড়ী যতক্ষণ না ছাড়ছেন তখন আমাদের ওখানে মাঝে মাঝে আসুন। আর যদি ছাড়তে হয় পাকাপাকি চলে আসুন, কোন অসুবিধে হবে না।

—হাঁ, আপনাদের আমাদের দুজনে থাকবো।

—থাবার জায়গা অনেক আপনার আছে সত্য, কিন্তু সেখানে গেলে কি সুবিধে হবে? সামঞ্জস্য থাকবে না, মনে শান্তি থাকবে না। যেমন অলকদাকে তাঁর ব্যবসার জন্য এখানে থাকতে হবে। বীরুর পড়ার জন্য থাকতে হবে। বাদশার কথা এখন সে ছোট বাদই দিলাম। কিন্তু জানবেন এ বাড়ী অন্ততঃ মিলিটারী থেকে নেবে না। অতএব মনের অকারণ ভাবনা দূর করাই ভাল।

—আমি হয়েছি কি জানেন—ওই লাঠি। যার মনে ভাবনা আছে অথচ নিজের কোন ক্ষমতা নেই।

—আমি বলব এটি একটি প্রাণবন্ত লাঠি বা তরুবর, যাকে জড়িয়ে নানা লতা উঠেছে। আপনি হলেন এই বৃহৎ সংসারের সিমেন্টিং মেটিরিয়াল।

—তাই ভাবি, আর ভাবনা করব না। একলা যখন ভাবি তখন মনে হয় আমি শান্তিতেই আছি। যশ, অর্থ সবই পেয়েছিলাম কিন্তু এখন বেশ শান্তিতেই আছি।

লক্ষ্য করলাম অলক্ষ্যে একটি দীর্ঘশ্বাস সমস্ত আবহাওয়াকে উদাস করে দিল। সত্যই কি শান্তির কথা বলছেন? মনে কোন ভাবনা নেই?

প্রসঙ্গ বদলে বললেন—কাল সকালে শশাঙ্কদের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলাম। মনটা খুবই তৃপ্ত হল। বাড়ীর মেয়েরাও সন্ধ্যের সময় আরতি দেখতে গিয়েছিল।

বাড়ীর প্রসঙ্গে এসে আবার বললাম—বাড়ী নেওয়ার ব্যাপারে আমাদের দেশের লোকেরাই দায়ী। তারা দালালী করে দেখাতে নিয়ে আসছে। সাহেবদের সুযোগ হবে।

—বেশী ভাড়া পাবার লোভে বাড়ীওলাদেরও কারসাজি হতে পারে। আবার জমি ও বাড়ীর দালালরাই এসে বলছে এখানে জমি আছে, ওখানে বাগানবাড়ী আছে।

আমার মনে হয় ওসব দালালীতে মিলিটারীরা ভোলে না। ওরা খুব স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড। যা বলবে তাতে কোন লজ্জা নেই বা গোপনীয়তা নেই। খাড়া জবাব। ওদের একটা গল্প বলি শুনুন। সেবার কলকাতায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ধর্মীয় মহাসম্মিলন। সেই পার্লিয়ামেন্ট অফ রিলিজিয়নে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন দেশের ও ধর্মের ব্যক্তিরা সভাপতিত্ব করবেন। বহু বক্তা থাকে। তাঁরা তাঁদের বক্তব্য পেশ করতে নির্দিষ্ট সময়ের বেশী সময় লাগায় তাতে সভাপতির বেজায় অসুবিধে হয়। তাঁর বক্তব্য পেশ করারও সময় কমে যায়। সেদিন প্রাক্তন বিখ্যাত সেনাপতি ও পরম ধার্মিক স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাসবেণ্ডের সভাপতিত্ব করার দিন। তিনি সভারম্ভ বলে দিলেন— আমি মূল কথা। বিশেষ বক্তার বিশেষ সময় নির্দিষ্ট আছে। তাঁর বক্তব্য সেই সময়ের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। আমি একবার লাল আলো জ্বালাবো, থামবার নির্দেশ দিতে। তারপর আমি কাউকে বলতে দেবো না। অতএব আপনারা দয়া করে নির্দিষ্ট সময়ের বেশী সময় নেবেন না এই আমার ঐকান্তিক অনুরোধ। অনেকে হয়তো ক্ষুন্ন হয়েছিল কিন্তু শ্রোতারা খুশী। অধিকাংশ বক্তা অন্য সভাপতির বেলায় ঘণ্টা দেওয়া ও আলো জ্বালাবার পরও পাঁচ দশ আরও বেশী সময় বক্তৃতা করে যান। সেদিন কিন্তু বিশেষ ব্যতিক্রম হয়নি। কেউ দু-এক মিনিট বেশী নিয়েছিলেন মাত্র। সব সুশৃংখলায় পরিচালিত হয়েছিল।

—সেই সময় আমরাও একদিন স্যার ফ্রান্সিসকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলাম। মেয়েরাও উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁর একটি পোট্রেটের স্কেচ এঁকে তাঁকে দিলাম। তিনি তো বেজায় খুশী। কথাবার্তা, হাসি-তামাসা অতি স্পষ্ট। ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই। আমাদের সেই সন্ধ্যা ভালই কেটেছিল।

—আপনি নিজে না নড়লে কেউ এখান থেকে আপনাকে নড়াতে পারবে না।

—জায়গাটি আমার ভারী ভাল লেগেছে। মেয়েরাও খোলামেলা জায়গায় বেড়াতে পারে। আমি যদি দু-এক চক্কর এ বাগানে দি তো বেশ খানিকটা পরিশ্রম হয়ে গেল। কেমন খোলা হাওয়া। কলকাতার শুধু ধুলো, ধুঁয়ো, গরম ও আওয়াজ। আমি এখানে কেমন বসলাম সন্ধ্যাবেলা। স্ত্রী যে ঘরে মারা গেছেন সেই ঘরেই আমি শুই। রাত্রে মাঝে মাঝে ঘুম হয় না। তাঁর কথা মনে পড়ে। ভাবি কত কী পুরোনো কথা। ভোর না হ'তেই বারান্দায় চলে আসি। নীচে নামি টুকটুক ক'রে। বেশ আছি।

—আমাদের বাসায় কবে যাবেন?

—শীগগির যাব; দু' একদিনের মধ্যেই। বৌমাদের বলি বাপ-মা নাম রেখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ—অর্থাৎ পৃথিবীর রাজা অথচ আমার নিজস্ব থাকবার ঠাঁই নেই। পাখীদের নীড় আছে, পশুদের গুহা আছে।

—অবনীন্দ্র যাঁর নাম অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীটাই যাঁর আপনার, তিনি কি গন্ডী দিয়ে নিজেকে ছোট করতে পারেন? সবই যদি আমার ব'লে ধ'রে নেন তাহ'লে ল্যাঠা চুকে গেল। গন্ডি দিলেই মুক্তি নেই। বাঁধন আরও শক্ত হ'য়ে বসবে।

—ঠিক তাই। রাজা ভর্তৃহরি বলেছিলেন

গাছে ফল, নদীতে জল

থাকার ঠাঁই বৃক্ষতল

তার আবার দুঃখ কী? এর বেশী মানুষ কী চায়।

এমনি কথাবার্তা চলতে চলতে সন্ধ্যা হয়ে আসায় বললাম—ঠান্ডা পড়ছে, ভেতরে চলুন।

ও'কে ভেতরে এগিয়ে দিয়ে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

গীতিকায় বাঙালীর

গুরুপ্রসাদ রায়

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতককে পালাগানের আদি যুগ রূপে চিহ্নিত করা হয়। যদিও পরবর্তীকালে এগুলির অর্বাচীনতা নির্ণীত হয়েছে। বস্তুত ষোড়শ/সপ্তদশ শতকে পালাগানের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। গীতিকার ত্রিধারার মধ্যে মৈমনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকার কিছু পালাগান বিদগ্ধ চিত্তে অবিনশ্বর স্বাক্ষর রেখে গেছে। ধর্মকেন্দ্রিক নাথ গীতিকার চরিত্র-চিত্র সামাজিক অবস্থা একটা বিশেষ যুগের স্বাক্ষর বহন করে চললেও পূর্বোক্ত দুই গীতিকার মতো একটা সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। অবশ্য নাথ গীতিকার ধর্মীয় আবরণটি মুক্ত করলে যে সমস্ত চরিত্রগুলি সাধারণ মনে দোলা দেয় তাহল, রাণী, রাজপুত্র; কিছুটা অদুনা পদুনা। আর চরিত্রের বিশ্লেষণে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় গীতিকায় স্ত্রী চরিত্রেরই একাধিপত্য।

বস্তুতঃ গীতিকায় নারী সমাজ বা নারীর যত চিত্র, বিচিত্র রূপে রসে প্রকাশ ঘটেছে এমনটি আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। শাক্ত-বৈষ্ণব, নাথ, যুগী, আউল-বাউল গুহ্য তান্ত্রিক সাধনার ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত সেই বাংলা দেশ—অজস্র আচার বিচার সংস্কার পরিকীর্ণ বাংলা দেশ আজকের বিক্ষুব্ধ জটিলতার স্পর্শ মুক্ত ছিল। সহজ সরল জীবনের স্বাদে গন্ধে ভরপুর সাংস্কৃতিক বাতাবরণ আজকের মতো এমন বিষাক্ত ছিল না। এই সমস্ত গীতিকার মধ্যেই পুরোন বাংলাদেশ তার জীবন-বোধ, জিজ্ঞাসা, সংস্কার আচার-আচরণ আশা-নিরাশা, প্রতিবেশ ও রসবোধকে জীবন্ত করে তুলে ধরেছে। তাই এই গীতিকাগুলোকে বলতে পারি সামাজিক দলিল।

আজকের ব্যবসা বিমুখ বাঙালীর সান্ত্বনার কথা হল যে একসময় বাঙালী বণিকবৃত্তিতে অপ্রতিহত প্রাধান্য স্থাপন করতে পেরেছিল। সেদিনের চট্টগ্রাম, হালিশহর, ডবলমবিং, পতেঙ্গা, তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে বহু সংখ্যক 'গয়ুদ', 'সারেঙ্গা', 'কোদা', 'সুলুপ' বাণিজ্য উদ্দেশ্যে দেশান্তরে গমনাগমন করতো। ব্যবসায়িক নেতৃত্বে সমাজ [illegible] । [illegible] বণিক কবির দল সেই সব বণিকদের বৈভবের প্রশস্তি পঞ্চমুখে গেয়ে গেছেন। সাধারণ মানুষের দুবেলা দুমুঠো অন্নের অভাব ছিল না। সেই বাংলাদেশ কোথায়? যেখানে—

> হাজারে বিজারে লোক দিন রাইত খায়
> অতিথ আইলে কভু ফিরিয়া
> নাই সে যায়।
> ফকির বৈষ্ণব যদি হাঁক ছাড়ে দুয়ারে
> কাটায় মাইপ্যা চাউল দেয় হরিষ
> অন্তরে

সেই পুরানো বাংলায় সাময়িক অভাবের নমুনা এই রকম—

> টাকায় দেড় আড়া ধান পইড়াছে
> আকাল
> কি দিয়া পালিব মায় কুলের ছাওয়াল।

পুরুষের বহিরঙ্গ জীবন—ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ উপায়ের মধ্যে, আর নারীর জন্য ছিল গার্হস্থ্য জীবন। গীতিকার ছত্রে ছত্রে তারই হাজার ছবি উজ্জ্বল হয়ে আছে। সমাজে স্ত্রী স্বাধীনতার যেটুকু প্রমাণ পাওয়া যায়, তা বিস্ময়কর। বিবাহের নিয়ম বেশ শিথিল ছিল। অভিজাত কন্যাদের ওপর লোককবিদের দৃষ্টি তেমন আকৃষ্ট হতে পারেনি, অতি সাধারণ ঘরের মেয়েরাই নায়িকার মর্যাদা পেয়েছে। ধোপার পাটের নায়িকা-কাঞ্চন ধোপানি, বিদেশ প্রত্যাগত সাধুদের জন্য হত নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের মূলে ছিল নারী সমাজ। আবার বিদেশ গমনোদ্যত স্বামীর জন্য স্ত্রীর ভাবনা অন্তহীন। আগত অমঙ্গলের পূর্বাভাষ অনেক স্থলেই সুনিপুণভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

স্বামী আজম বাণিজ্যে যাবার পূর্বে যা ঘটেছিল

> উড়িয়া যাইতে তার চৈক্ষে হানিল মাছি
> ঘরের থুন বাহির হইতে মুখে
> পৈল হাঁচি—
> ডানের থুন আসি সর্প বামে গেল ধাই
> পন্থের মাঝে দেখে আজিম তুণ্ডা
> একটা গাই
> তিন বিবি বসিয়া রে মাথাত উকুন চায়
> খাইল্যা কলসী লৈয়া নারী জল
> আনিতে যায়।

বর্তমানে সর্বত্র কম-বেশী এ সংস্কার [illegible] বিশেষ অঙ্গ। ফুলশয্যার রাতে আড়ি-পাতার রেওয়াজ আজ আর তেমন দেখা যায় না, কিন্তু একসময়ে এটি একটি অবশ্য পালনীয় প্রথা হিসাবে গণ্য করা হত। 'মলুয়ায়' দেখা যায়—

> পঞ্চ ভাইয়ের বৌ নিদ্রা নাহি গেছে
> বেড়ার ফাঁক দিয়া তারা তোমায় দেখিছে।
> ভূষণের ঝুনু ঝুনু শব্দ শুনি কানে
> পরিহাস করবে তারা কালিকা বিহানে।

গৃহজীবনে সতীন ও ননদের জ্বালা যে কি নিদারুণ ছিল তার পরিচয় মঙ্গল কাব্যের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে। পরবর্তী অভিজাত সাহিত্যে তার আভাষ পাওয়া যায়, বর্তমানের আর্থিক সংকট ও আইনের দৌলতে বহুবিবাহ প্রথা বিলুপ্তির পথে। গীতিকার লোক-কবিরা সেই লোকায়ত অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়ে গেছেন—

> সতীনের বাচ্ছায় কবে বুকে
> সতাইর সুখে
> আথেরে আমার কপালে আছে
> বড় দুখ।

আর ননদিনী? ননদিনীর দৌরাত্ম্যে বধূ-জীবন অতিষ্ঠ—সুখের আলো সরে যায়।

> অবিহতা ননদিনী আছে যার ঘরে
> সে বধূর সুখ কখন না হয় সংসারে।

মাতৃহৃদয়ের রূপটিও সযত্নে তুলিকায় আঁকা। শুধু স্নেহই নয় তিরস্কারও প্রয়োজন। লোকায়ত অভিজ্ঞতার পথ ধরে তাই মায়ের গলায় শুনি—

> বাদশার ধন ফুরাই যায় বসি বসি
> খাইলে
> সংসার নষ্ট হয়রে জাইন্যা বৌ-এর
> বন্ধ্যা হৈলে।
> ইজ্জত আবরু খাইলা, খাইলা
> সদাইগরি
> ঘরর মাঝে বসি রৈয় বৌয়র
> আচল ধরি।

বাংলাদেশে 'বোকার্টাক' বলে একটি কথা প্রচলিত আছে। সন্তান-স্নেহের একাধিপত্য অধিকার যে নারী দীর্ঘকাল ভোগ করে আসছে, সেই ছেলেই বিবাহের পর, পর হয়ে যায়। নতুন অংশীদার [illegible]

নিতে পারে না। কারণে অকারণে তিরস্কার গঞ্জনা জোটে বৌ-এর কপালে। কিন্তু আয়না বিবির ভাগ্য বোধহয় একটু আলাদা ছিল। বাংলার 'বৌকাটকি' শাশুড়ির উক্তি হিসাবে বেশ অদ্ভুত বলেই মনে হয়—

আয়না যদি অইয়া থাকছেলো কন্যা
আরে ভালা ঘরে ফিইর‍্যা আয়
পান পঞ্চাইত ছারবাম তোর না
লাগিয়া রে...।

আয়না যদি অইয়া থাকছুলো কন্যা
গিরে না সে কাল
তোরে লইয়া করবাম কন্যা লো
জঙ্গলায় বসাত রে।

গার্হস্থ্য জীবনের অজস্র ছবি এঁকেছেন গ্রাম্য কবিরা। নারীর রূপসজ্জ, রান্নাঘরের ছবি, গর্ভবতী নারীর বর্ণনা, রঙ্গ রসিকতা এমনি আরো কত ছবি। সমাজে তখনো বারবণিতার অভাব ছিল না। গাঁয়ে কুটনী নারীর দেখা পাওয়া যেত। ছিল অজস্র যাদুমন্ত্র, বশীকরণ, উচাটন, পানপড়া, তেলপড়া এমনি অজস্র মন্ত্রসিদ্ধ আচারের পরিচয় যা গীতিকার মধ্যে বিধৃত রয়েছে।

গর্ভিণী নারীর রূপ ও বৈশিষ্ট্য :

সুগোল সুন্দর তনুগো লাবনি জড়িত
সর্বঅঙ্গ দিনে দিনে হইল পূরিত।

অজীর্ণ অরুচি আর মাথা ঘোরা আদি
আলস্য জরতা হৈল আছে যত ব্যাধি।

সর্ব অঙ্গে জ্বালা মাথা তুলিতে
না পারে
আহার করিবা মাত্র ফেলে বমি করে।

রুচি হইল চুকা আর চিকর মাটিতে
বিছানা ছাড়িয়া শুয়ে কোল ভূমিতে।

সমগ্র পালাগানের মধ্যে 'কমলা' পালার চিকন গোয়ালিনীর চরিত্রটি আন্তরিক রসে সিক্ত। গীতিকায় নারী চরিত্রেরই প্রাধান্য ঘটেছে। কিন্তু চিকন সকলের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তার বাচনভঙ্গী, রঙ্গ রসিকতা, উপমা ইত্যাদি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল। চিকনের চরিত্র আঁকতে লোককবির এতটুকু আড়ষ্টতা চোখে পড়ে না।

চলিতে ঢলিয়া পড়ে রসে থলথল
শুকাইয়া গেছে তার যৌবন কমল।
তবু মনে ভাবে যে সে চিকন গোয়ালিণী
বৃদ্ধা বয়সে যেমন ভাবের ভামিনী।'

বাক পটিয়সী এই বৃদ্ধার অভিজ্ঞতার চাপ—

শুন কথার লাল (মর্ম)
মরিচ যতই পাকে তত হয় ঝাল।
সময়ে বয়স যায় নাহি যায় রস
মুখের কথায় মোর ত্রিজগত বশ।

বিগত যৌবনের কথা বলতে গিয়ে বৃদ্ধা সরব রসিকতায় উথাল হয়ে উঠছে—

মৌমাছির চাক যেমন আছিলাম আমি
অখন বয়স গেছে নদী ভাটিয়াল
পাকা দই চোকা হয় এমন জঞ্জাল।

নারীরূপ বর্ণনায় এবং নারী সজ্জার বিবরণে গ্রাম্য কবিদের অপূর্ব কবিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। চারধারের উপকরণ থেকে সংগ্রহ করেছেন কবিতার মূল্যবান হীরাগুলি, আর তাই দিয়ে গেঁথেছেন কাব্যমালা।

উন্মত্ত যৈবন হৈয়ে ভালা লাগের অতি
উনাই উনাই (গলিয়া গলিয়া) পাড়
যায় গৈ শরীলের জ্যোতি।।

বেদের মেয়ে মহুয়ার রূপের কথায় কবির দৃষ্টি কোন অপার্থিব স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি......সত্যকার বাস্তব রসবোধ ব্যক্ত হয়েছে—

বাইদ্যা বাইদ্যা করে লোকে বাইদ্যা
কেমন জনা
আঁন্দাইর ঘরে থুইলে কন্যা জ্বলে
কাঞ্চা সোনা।

হাট্টিয়া না যাইতে কন্যার পায়ে
পরে চুল
মুখেতে ফুট্যা উঠে কনক চাম্পার ফুল।

আগল জাগল আঁখিতে আসমানের
তারা
তিলেক মাত্র দেখলে কইন্যা না যায়
পাশুরা

আরো আছে—

ঠুট তেলা কুচ ফল।

....

আষাঢ় মস্যা বাঁশের কেরুল মাটি
ফাট্যা উঠে
সেই মত পাও দুইখানি গজন্দসে
হাটে।
বেলাইনে বেলিয়া তুলছে দুই
বাহুলতা।

উপকরণ সামান্য কিন্তু ব্যঞ্জনা অসামান্য রূপে ধরা দিয়েছে। সুন্দরীর পায়ের উপমার জন্যে অভিজাত কাব্যের কদলী এখানে আসেনি। এসেছে বর্ষার সমাগমে গজিয়ে ওঠা বাঁশের তেউড় (চারা)। সুন্দর উপমা। বাহু সুডৌলতা জানাবার জন্যে যে জিনিসটির আবির্ভাব ঘটেছে তা হ'ল গার্হস্থ্য জীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয় রুটি লুচি বেলবার বেলুন চাকি। বেলন দিয়ে 'বেলিয়া তুলছে' সেই বাহু যুগল। উভয় ক্ষেত্রেই বস্তুরস নিষ্কাষণে বাস্তববাদী কবির জীবনাভিজ্ঞতার স্বাক্ষর বর্তমান।

বর্তমান সমাজে নিরাভরণ থাকাই শিক্ষিত শহুরে সভ্যতার অঙ্গ। শহুরে ভাবধারার প্রভাব গ্রামাঞ্চলেও সঞ্চারিত হয়েছে। অলংকার প্রসাধন প্রিয় নারী সমাজে সাজ-সজ্জা অলংকরণের রীতি-নীতি আজ পরিবর্তিত হয়ে পড়েছে। পুরানো কালের অজস্র ধরনের অলংকার আজ বিস্মৃত প্রায়—যদিও অলংকার-প্রিয়তা নারী মনের স্বাভাবিক ধর্ম তবু

সেই হারানো যুগের সাজসজ্জা কেমন ছিল? স্বামীর আগমন সংবাদ শুনে ডিঙ্গাধরের স্ত্রী অভ্যর্থনার জন্যে সেজে-ছিল এই বিচিত্র সাজ—

এই কথা শুনিয়া তবে ডিঙ্গাধরের
নারী
কোমরে বান্ধিয়া পড়ে ময়ূর পাঙ্খা
শাড়ী।

হাতেত পরে তার বাজু করিয়া যতন
চাম্পা ফুল দিয়া কন্যা বান্দিল লুটন।

লুটনে তুলিয়া দিল সোনার ভ্রমরা
কপালে কাটিয়া দিল সুবর্ণের তারা।
নাকেতে বেশর দিল কানে ঝুমকা ফুল
কপালে সিন্দুর দিল পাক্কমী সমতুল
পায়ে দিল গোল খাড়ু পঞ্চম গুঞ্জরী
এই মতে সাজান করে ডিঙ্গাধরের নারী।

সাজের বহরটা পেলাম, এবার কল্পনা করে নিতে পারি সেই সজ্জিতা নায়িকার রূপটি। সুন্দরী ভেলুয়ার সাজটাও ছিল অপরূপ. দাঁত মিসকি (মিসি) নাকে নথ, মাথায় মণিমুক্তার ছড়া, হার হাছুলি, নাকে করম ফুল, কানে বালি তার ওপর—

তোরল তাড়ন পিন্ধে দোছরা বাজুবন
দোন হাতে পরাই দিল সোনার কাঙ্কন।
মাথার উপরে দিল সীতির চাকনি

উদ্ধৃতি একটু বড় হয়ে যাচ্ছে। উপায় নেই, গ্রাম্য কবির দৃষ্টিকে সংক্ষিপ্ত ও মার্জিত করে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাতে রসাভাব ঘটতে পারে. নারীমন জয় করার জন্যে সেদিনও প্রেমিককে অনেক তোষামোদ, অনুনয় অঙ্গীকার করতে হত। মহুয়ার মন জয় করার জন্যে সাধুর নিবেদন ছিল—বসনভূষণ, নীলাম্বরী শাড়ী. নাকে কানে সোনার ফুল, লক্ষ টাকার সোনার হার, সোনা বাঁধান কামরাঙা শাঁখা, লক্ষ টাকার উদয়তারা শাড়ী, হীরা মণি, চন্দ্র-হার, নাকে নথ আর পায়ে নূপুর।

কমলরাণীর গানে—হস্তেতে ছিঁড়িয়া রইল রাজার অগ্নিপাটের শাড়ী। নীলাম্বরী উদয়তবা' ইত্যাদির মতোই কি, অগ্নিপাটের শাড়ী একটা নামকরণ মাত্র?

আধুনিকাদের দরবারে এবার আমরা একটা গহনার তালিকা পেশ করতে চাই! রুচিসম্মত হলে প্রচলন করতে দোষ কি—

বেশর আছে ঝুমকা আছে
আর আছে নাইরকল ফুল
চিক রইয়াছে সিঁতি আছে আর কানফুল
সোনার মালা বাজু আছে
আর আছে বুকের পাটা

সোনার হাসা গাথা আছে
কান খোচানি কাটা
নত্তে আছে চুনি মণি আর মুক্তা ঝুলমুল
গোপ্তা বাইসেক তাবিজ আছে
আর যে বকফুল
চন্দ্রহার, সুরজহার রূপার বাক খাড়ু

আর তো কিনিয়া আনছে কমরের ঘুংগাঙ্গী
আর বেকী কেক্কারু (বাকা মল)
নাকের নলক

সাংস্কৃতিক পরিবর্তনশীলতার পথ ধরে উপরের অলংকারগুলি এখনো নাম ও রূপ পরিবর্তন করে সমাজে প্রচলিত রয়েছে।

বঙ্গনারীর বিশেষ পরিচয় তার পারিবারিক জীবনের মধ্যে বিধৃত। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য থেকে বিশ শতকের কয়েক দশক পর্যন্ত বঙ্গনারীর বহির্বিশ্বের সংগে পুরুষোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায় না। বস্তুতঃ পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে স্নেহ-মমতা-কল্যাণময়ী সহনশীলা নারীকেই আমরা একান্তভাবে পেয়ে এসেছি। গার্হস্থ্য জীবনের অনাড়ম্বর আয়োজন ও প্রয়োজনের মধ্যে নারীসত্তার স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটেছে। সেখানে দুঃখ আছে, অভাব আছে, হাজার গণ্ডা নিয়ম-বিধি-আচার আছে, কিন্তু সবার ওপর আছে স্নেহসিক্ত, আবেগ-মথিত ত্যাগধন্য হৃদয়। সেই হৃদয়ের অমৃতধারার আকর্ষণেই পারিবারিক জীবন-বোধ কেন্দ্রীভূত হয়ে সমাজের ভারসাম্য বজায় রেখে এসেছে।

পারিবারিক জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল রান্নাশালা। এ ব্যাপারে পূর্ববঙ্গীয়রাই বিশেষ স্বকীয়তা দাবী করতে পারে। সেখানে রান্না করা শুধু মাত্র উদরপূর্তির আয়োজন নয়, রান্না একটা বিশিষ্ট শিল্পকলা। গীতিকার পাতায়-পাতায় এমনিধারা তালিকার ছড়াছড়ি, মধ্য যুগের মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও আমরা অজস্র রকমের খাদ্যের তালিকা পাই। কিন্তু মঙ্গল গান তথাকথিত ধর্মীয় সাহিত্য এবং শিক্ষিত কবির মার্জিত হাতের সৃষ্টি হিসাবে চিহ্নিত করার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। কিন্তু এই লোকগাথাগুলি বিদগ্ধ মনের স্পর্শ লাভে অনেকখানি বঞ্চিত। অনেকখানি বলছি এই কারণে যে, পালা-গানগুলির আঙ্গিক প্রকরণ, চরিত্রচিত্রণ, অলংকরণ ছন্দ-লালিত্যের মধ্যে বেশ গতানুগতিকতা এবং একটা আলগা ভাব দেখতে পাওয়া যায়। যা, প্রকৃত লোক-সাহিত্যরূপে গণ্য হবার বলিষ্ঠ প্রমাণ।

এবার আমরা কিছুক্ষণের জন্যে হেঁসেলশালা ঘুরে আসতে চাই। যেখানে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় কোনটারই অভাব নেই। আজকের অর্ধাহারী বাঙালীর রসনা যদি নীচের তালিকার দিকে তাকিয়ে রসসিক্ত হয়ে ওঠে—করার কিছু নেই, দিন পালটেছে।

মান কচু ভাজা আর অম্বল চালিতার
মাছের সরুয়া রান্ধে জিরার সম্বার।
শুকত খাইল বেনুন খাইল আর ভাজা বরা
পুলি পিঠা খাইল বিনোদ
দুধের শিন্যায় ভরা।
পাত পিঠা বরা পিঠা চিত চন্দ্রপুলি
পোয়া চই (সেমুই জাতীয়) খাইল
কত রসে টল টল।

আরো আছে—
নানা জাতি পিঠা করে গন্ধে আমোদিত
চন্দ্রপুলি করে কন্যা চন্দ্রের আকিরত
চই চপড়ি পোয়া সুরস রসাল
তা দিয়া সাজাইল কন্যা সুবর্ণের থাল

পিঠের তালিকা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। এবার একটু ব্যঞ্জনের সংবাদ নেওয়া যাক। রন্ধনপটিয়সী বঙ্গনারীর প্রস্তুত খাদ্য তালিকা থেকে প্রায় কিছুই বাদ যায় নি। লোক-কবিদের ভোজন রসিকতার স্বাক্ষর যত্রতত্র উঁকি মেরেছে।

আলু, মানকচু, বেগুন, তিলের বড়া, বেসম দিয়ে উচ্ছি ভাজা এ সমস্ত পরিচিত কিন্তু 'কৈ মাছের মুড়ি ঘণ্ট কলাই সাগ দিয়া' বস্তুটি পশ্চিমবঙ্গবাসীদের কাছে অদ্ভুত বলেই মনে হবে। তারপর—

শুক্তানী মুক্তানী দিল নাইয়ের বিশরী
তারপরে আইনা দিল
খইলসা পুটির চর্চরী।।
মুগের ডাইলে বোয়াল মাছের
মুড়া কাটা পাইয়া
ভরা বাটী ঢাইলা লইল
ভাত গেল ওরাইয়া।।
ঝোল দিল বাটী ভইরা
বোয়াল মাছের পেটী
বিষম ঝাল টকটক নাল খাইতে কিটিমিটি।
রউ মাছের মুড়ি ঘণ্ট বাসু হাইস্যা খায়
তারপরে আনিয়া দিল
কাগ্তা আম্বর অম্বল
এক বাটি ঘন দুধ আর একবাটি দই
সাপুর সুপুর খাইল বাসু
মাখাইয়া লইয়া খই।

রন্ধনশালার চার দেয়ালের মধ্যে নারীর পরিচয় সীমাবদ্ধ নয়। নারীর অন্তরঙ্গ পরিচয় তার সর্বগ্রাসী প্রেমসাধনার মধ্যে যতখানি প্রস্ফুটিত হয়েছে, ঠিক ততখানি দৈনন্দিন আটপৌরে জীবনে খুঁজে পাই না। এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের শতধারা বাংলা লোকগীতিকার সর্বাঙ্গ রসসিক্ত করে রেখেছে। প্রেমের কোন জাত নেই, ধর্ম নেই, আইন বা সমাজের কৃত্রিম বাঁধন তাকে আটকাতে পারে না। সে আপনার বেগে, তেজে পথ করে নেয়, সে ত্যাগে মহিয়সী মৃত্যুতেও গরিয়সী। গীতিকার চরিত্রগুলোর দিকে তাকালে দেখতে পাবো—তারা মুসলমান বা হিন্দু, জৈন কিম্বা বৌদ্ধ, সহজিয়া কিম্বা শাক্ত কোনটাই পরিপূর্ণভাবে নয়। এককথায় বলা যায় কোন ধর্মীয় বাতাবরণ সেখানে নেই, পরিচয় শুধু মানুষ—আশা-নিরাশা, ন্যায়-অন্যায়, হিংসা-ত্যাগ পূর্ণ সাধারণ নরনারী। দীনেশচন্দ্র বলেছেন—'এই গীতি সাহিত্যের উদার মুক্ত ক্ষেত্রে প্রেমের অনাবিল শতধারা ছুটিয়াছে, তাহা প্রস্রবনের মতো অবাধ, নির্ঝরের মত নির্মল, শ্যামল ক্ষেত্রের উপর মুক্তাবর্ষি, বর্ষার অফুরন্ত মহাদানের ন্যায় অসম্র।' এই আবেগ-কম্পিত বাচনের মধ্যে কিছু অতিশয়োক্তি থাকতে পারে সত্য, তবু এই লোকগীতিকার পাতায় পাতায় যে প্রেমের

রূপ প্রকাশ পেয়েছে তা গ্রন্থের স্মরণীয় এবং বিস্ময়কর সম্পদ। জীবন-বিবিক্ত কোন ঊর্ধ্বচারী কল্পনার পাখা বিস্তার কোথাও ঘটেনি। জীবনের সঙ্গে হাত ধরে অর্থাৎ 'সাহিত্ব' ঘটিয়ে সাহিত্যের সফল সংজ্ঞায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। অভিজাত কাব্যের বর্ণনা, উপমা, রূপক উৎপ্রেক্ষার আধিক্য ঘটেনি। এতে আছে জীবনের পরিচিত, সামান্য এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ আর আছে হৃদয়ের চিরন্তন অভাববোধ, হতাশা প্রেম ও নারীর শাশ্বত সম্পদ সতীত্ব। যে সতীত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে—

'আমরা যে সতীত্বের বড়াই করিয়া থাকি, তাহার জন্ম আইন কানুন বা আচার্যের মস্তিষ্কে নহে, তাহার জন্ম প্রেমে, তাহা নিজের বলে বলীয়ান। বাহিরের শক্তি যে পাতিব্রত্যকে রক্ষা করে, তাহার শক্তি দুর্বলতার ছদ্মবেশমাত্র কিন্তু প্রেম যাহাকে জন্ম দিয়াছে, প্রেম যাহাকে রক্ষা করিতেছে, তাহা ঋষি-বচনের প্রতীক্ষা করে না। তাহা হিন্দু-সমাজের নিজস্ব নহে, তাহা সমস্ত মানবজাতির আরাধনার ধন, সমাজ তাহাকে রক্ষা করে না, সমাজকেই তাহা রক্ষা করে।'

(মহুয়া, মলুয়া, কঙ্কলীলা, ধোপার পাট, মহীশাল বন্ধু, আরো অনেক পালা-গানে এমনিভাবে ঋষি-বচনোদ্ধৃত সতীত্বের সংজ্ঞাকে ধূলিসাৎ করে প্রেম-সাধনা আপনাই অমর হয়ে গেছে। 'মাঞ্জুর মা' পালাগানের নায়িকা একজন বারবণিতা, কিন্তু কবির আন্তরিকতায় তা আমাদের আপনজন হয়ে উঠেছে। প্রচলিত সতীত্বের সংজ্ঞা এসব গীতিকায় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর)

'সেইজন্য গীতিকার নায়িকাগণ দীর্ঘ-দিন পরপুরুষের গৃহে বন্দী থাকিয়াও একমাত্র প্রেমের শক্তিতে নিজেদের সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছে।...সতীত্ব-বোধ নারীর একটি নিজস্ব ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ। সমাজ বাহির হইতে ইহার বিধি রচনা করিয়া নারীকে ইহা দ্বারা শাসন করিলেও তাহার মনে যদি ইহার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ জাগ্রত না হয়, তবে বাহিরের শাসন ফলপ্রসূ হইতে পারে না।...প্রেমের জন্য দুঃখ তিতিক্ষা-আত্ম-ত্যাগ, সর্বসমর্পণ করিয়া নারী যে কি অসীম মহিমা লাভ করিতে পারে গীতিকা-গুলি তারই পরিচায়ক।' (আশুতোষ ভট্টাচার্য)

প্রায় সমস্ত গীতিকাই নারী-প্রধান। অবশ্য ভারতীয় সাহিত্যে নারী-প্রাধান্যের ঐতিহ্য সর্বজনস্বীকৃত। বঙ্গসাহিত্য অঙ্গনে এখনো পর্যন্ত যে-চরিত্র-কুসুম-গুলি সুপ্রস্ফুটিত হয়েছে, তার বেশীটাই নারী। তবে অভিজাত সাহিত্যের পাতায় পাতায় যে-নারীকে দেখতে পাই, সেই নারীর পরিচয় গীতিকায় নেই। অভিজাত সাহিত্যে নারীর যে জননী-সত্তার রূপ আঁকা হয়েছে, তার বিশেষ কোন ইঙ্গিত গীতিকায় পাই কি? এখানে নারীর প্রেমিকা-সত্তার পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ পেয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেমের জয়গান শোনা যায়, সে-প্রেম অলংকৃত মহিমা-দীপ্ত; কিন্তু এমন বাস্তব সচেতন জীবন-রসপূর্ণ দুর্বার প্রেমের কথা গীতিকা ছাড়া আর কোথাও নেই।

উচ্চতর সমাজ-জীবনের আবহাওয়ায় যে মার্জিত সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তার নির্যাস এই সমস্ত নিরক্ষর সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেনি। চণ্ডী-মণ্ডপের দেউলে যখন মুষ্টিমেয় রুচিশীল নাগরিক মঙ্গল-গান, বৈষ্ণব পদাবলী কিংবা সংস্কৃত-সাহিত্যের রসোপলব্ধিতে মগ্ন ছিল, তখন এই বৃহত্তর অপাংক্তেয় সমাজ চুপ করে বসে থাকতে পারেনি। তারাও আপন রুচি বিশ্বাস অনুযায়ী গ্রাম্য-মেঠো-সাহিত্য-সংস্কৃতির সৃষ্টি করে চলে-ছিল। অজস্র গীতিকা, লোকশ্রুতি—সেই সমস্ত নিরক্ষর সমাজের মানস-ফসল। গীতিকায় নারী-সত্তার স্বাভাবিক বলিষ্ঠ প্রকাশের কারণ অনুসন্ধানে বলা যায়—এক বিলুপ্ত সামাজিক ব্যবস্থা। মাতৃপ্রধান সমাজের নারী-স্বাধীনতার অজস্র ছবিতে ভরা পূর্ববঙ্গ গীতিকার অনেকগুলি আখ্যান সেই বিলুপ্ত সমাজের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা খুবই স্বাভাবিক, তাই স্বাধীন প্রেম-চেতনার ধারাটি আমাদের বিস্মিত করে তুললেও পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবিত 'কঙ্কলীলা'র পরিণতিটি আমা-দের তেমনি বিমূঢ় করে তোলে। সুতরাং নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে বৃহত্তর বাংলার মাতৃ-প্রধান সমাজ-ব্যবস্থার ভগ্না-বশেষ আজো এই গীতিকাগুলি ধরে রেখেছে। সবশেষে দীনেশচন্দ্রের এই উদ্ধৃতিটিকে আবেগপ্রবণ মনের স্বতোচ্ছ্বাস বলে মনে হলেও এখানে পরিবেশন করার ইচ্ছাকে দমন করা গেল না।

'বাংলাদেশের ইতিহাসের অধ্যায়ে-অধ্যায়ে সীতা-সাবিত্রী। কেহ জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছেন, কেহ বা তদপেক্ষাও কঠিনতর ত্যাগ দ্বারা স্বীয় মূর্তি মহিয়সী করিয়া দেখাইয়াছেন। অদূরে তমসা নদীর তীরে যে বীণা দূর অতীতকালে বাজিয়া উঠিয়াছিল—তাহার ঝঙ্কার যুগে যুগে কবিরা সুর-তান-মান-যোগে প্রতিধ্বনি করিয়া এদেশের প্রেম মহাব্রতের পবিত্রতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ সকল নারী-চরিত্রের কে বড় কে ছোট তাহা নির্ণয় করা শক্ত-এ বাগানের গোলাপ ও স্থলপদ্ম সন্ধ্যামালতী ও মল্লিকা সকলটিই নিখুঁত সুন্দর।'
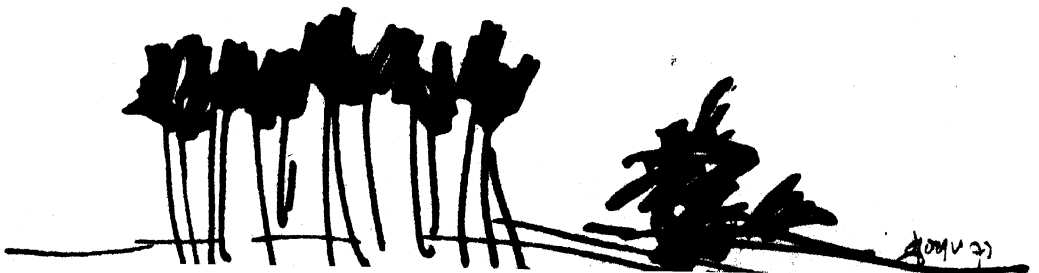
দ্বিতীয় পর্ব
নবম অধ্যায়

পশ্চিম রণাঙ্গণের রণকৌশল

রণক্রিয়ার যুগান্তরকারী পরিবর্তন

১৯৪০ খৃঃ মে ও জুন মাসে ইউরোপের পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানী বিদ্যুৎগতিতে যে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করিল এবং যার ফলে ইতিহাসের মোড় ফিরিয়া গেল, উহার পিছনে রণনীতি ও রণকৌশলের কি বৈশিষ্ট্য ছিল, তা সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার। যদিও পোল্যান্ডে এবং নরওয়েতে জার্মানীর আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধের কৌশল ইতিপূর্বেই উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, তথাপি সেই দেশগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও দুর্বল ছিল বলিয়া জার্মান রণক্রিয়ার অভিনবত্ব পৃথিবীব্যাপী সামরিক মহলকে ততখানি ব্যগ্র, উৎসুক ও বিস্মিত করিয়া তোলে নাই। কিন্তু পশ্চিম রণাঙ্গনের এতগুলি বিখ্যাত শক্তির বিরুদ্ধে মাত্র কয়েক দিনের যুদ্ধের চাপে জার্মানীর এই অভূতপূর্ব জয়লাভ দুনিয়ার লোককে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া দিল। এখানে স্মরণীয় যে, হিটলার মাত্র ২৬ দিনে পোল্যান্ড, ২৮ দিনে নরওয়ে, ২৪ ঘন্টায় ডেনমার্ক, ৫ দিনে হল্যান্ড, ১৮ দিনে বেলজিয়াম এবং ৩৫ দিনে ফ্রান্স সম্পূর্ণ জয় ও দখল করিয়া নিয়াছিলেন: কিন্তু এই সমস্ত যুদ্ধে পরাজিত পক্ষের মূল প্রতিরোধ মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী যুগে ফ্রান্সের বিখ্যাত ম্যাজিনো লাইনের কথা আজ প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেদিনের পৃথিবী ইহার বিজ্ঞাপনে ও প্রচারকার্যে অস্থির ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের কালেই উত্তর সমুদ্রের তীর হইতে সুইজারল্যান্ডের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত অংশ ইউরোপের পশ্চিম রণাঙ্গন নামে প্রসিদ্ধ। ফ্রান্সের পূর্ব সীমানায় সুইস সীমান্ত হইতে লুক্সেমবুর্গের মন্টমিডি পর্যন্ত ছিল আসল ম্যাজিনো লাইন, তারপর সেখান হইতে ফরাসী-বেলজিয়াম সীমানা ধরিয়া এই লাইন বিস্তৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহা আসল লাইনের মত ততটা পাকা দৃঢ় ও দুর্গায়িত ছিল না। লর্ড গোর্টের 'ডেসপ্যাচে'ও দেখা যায় যে, উহা ছিল কার্যতঃ একপ্রকারের ট্যাঙ্কমারা ফাঁদ মাত্র, এবং গভীর কতগুলি খাদ যেগুলি 'ব্লক হাউসে'র দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল—

—"an almost continuous anti-tank obstacle in the form of a ditch covered by concrete block houses."

(১)

কিন্তু আসল ম্যাজিনো লাইন তৈয়ার হইয়াছিল ১৯১৭-৩৫ সালে, তদানীন্তন ফরাসী সমরসচিব মঃ ম্যাজিনোর নির্দেশে। তারপরেও ক্রমাগত ইহার শক্তিবৃদ্ধি করা হইয়াছে। বহু সহস্র কোটি টাকা ব্যয়ে (মার্কিন সামরিক মহলের মতে প্রতি মাইলে ২০ লক্ষ ডলার!) সামরিক ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার চরম বিস্ময়রূপে ইহা মানুষের ইতিহাসের 'দুর্ভেদ্যতম' দুর্গমালারূপে প্রচারিত হইল। প্রায় ২০০ মাইল লম্বা, স্থানে স্থানে ইহা ১০ হইতে ৫০ মাইল পর্যন্ত চওড়া ছিল। প্রায় হাজার খানেক কেল্লা লইয়া এই লাইন ভূগর্ভ হইতে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং বলা যাইতে পারে যে, পাতালপুরীতে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল শহর। রেলপথ, বৈদ্যুতিক শক্তির আধার এবং সমস্ত প্রকার অস্ত্রসজ্জা দ্বারা এর পূর্ণতা বিধান করা হইয়াছিল। বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ মাটিতে পুঁতিলে যে অবস্থা দাঁড়ায়, এর কেল্লা, পিলবক্স, ট্যাঙ্কফাঁদ ও কামান সংস্থাপনের বিন্দুগুলিকে সেই অসম্ভব অবস্থার সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায়। এই লাইন সম্পর্কে বহু গল্প ও কাহিনী প্রচারিত হইয়াছিল এবং ফরাসী রাজনীতিবিদ ও রণনীতিবিদগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, এই দুর্গমালার ভিতর দিয়া তাঁদের চিরশত্রু জার্মানীর পক্ষে আর পিনু ফুটাইবারও সম্ভাবনা নাই! সুতরাং এই মহাদুর্গের আড়ালে দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিলেই যথেষ্ট। ফ্রান্সের এই মনোভাবকেই ম্যাজিনো মনোবৃত্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

(1) This Expanding War — by Liddel Hart Page 196.

ম্যাজিনো লাইনের জবাবে রাইন নদীর ওপারে জার্মানীও তাদের পশ্চিম প্রাচীর বা সিগফ্রিড লাইন তৈয়ার করিয়াছিল। ফ্রান্সের অনুকরণে ১৯৩৮ সালে উহা তাড়াতাড়ি নির্মাণ করা হইয়াছিল। কিন্তু ম্যাজিনো লাইনের মত উহা তেমন জাঁকালো ব দুর্ভেদ্য ছিল না কিংবা জার্মানীর রণচিন্তাও এই সমস্ত কেল্লার উপর নির্ভরশীল ছিল না।

একটিমাত্র আঘাতে পশ্চিম রণাঙ্গনে চূড়ান্ত জয়লাভের জন্য জার্মানী পূর্বাহ্নেই সমস্ত আয়োজন ও পরিকল্পনা স্থির করিয়াছিল। বিগত মহাযুদ্ধের ত্রুটিগুলি এবং শ্লিফেন প্ল্যানের ভুলচুক সম্পর্কে জার্মান হাইকম্যান্ড যেমন সতর্ক হইয়াছিলেন, তেমনই পোল্যান্ড ও নরওয়ে যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও তাঁরা কাজে লাগাইলেন। ১৯১৪-১৮ সালের চারি বৎসরের সংগ্রামে জার্মানী যাহা করিতে পারে নাই, এবার ছয় সপ্তাহের মধ্যেই তাহা সম্ভব হইল।

সুতরাং পশ্চিম রণাঙ্গনে এই আক্রমণের সন্ধিক্ষণে হিটলার সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্য ঘোষণা করিলেন যে, এই অভিযানের দ্বারা 'আগামী হাজার বৎসরের জন্য জার্মানীর ভাগ্য নির্ণীত হইবে।'—

—'to decide the fate of the German nation for the next thousand years.'

বিগত মহাযুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ লওয়া এবং 'চিরশত্রু ফ্রান্সকে' সংহার করার জন্য হিটলার তাঁর সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধজয়ের চেয়েও এক মহাবিজয়ের পরিকল্পনা হইল এবং ১৯৪০ সালে জার্মানী গোটা ইউরোপের মালিক হইয়া 'নিউ অর্ডার' বা 'নূতন রাষ্ট্রনীতি'—অর্থাৎ নাৎসী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিল।

ভিসি গভর্নমেন্টের (ফ্রান্সের পরাজয়ের পর মার্শাল পেঁতার অধীনে গঠিত অনধিকৃত ফ্রান্সের গভর্নমেন্ট) সময় দপ্তর হইতে প্রচারিত ১০ই মে হইতে ২৫শে জুন পর্যন্ত পশ্চিম রণাঙ্গনের রণক্রিয়া' সংক্রান্ত

রিপোর্ট উদ্ধৃত করিয়া ম্যাক্সভার্নার 'ব্যাটল ফর দি ওয়ার্ল্ড' পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, মিত্রবাহিনীগুলির মোট সংখ্যা ছিল ১০০ ডিভিসন। ইহার মধ্যে ১০ ডিভিসন বেলজিয়ান, ১৩ ডিভিসন ম্যাজিনো লাইনের রক্ষী এবং ১৬ ডিভিসন ছিল বয়স্কতর শ্রেণীর ফরাসী সৈন্য। আবার ইহাদের একাংশ ছিল ইতালীয় সীমান্তে। ইহা ছাড়া মিত্রপক্ষের হাতে কোন মজুত সৈন্য বা রিজার্ভ বাহিনী ছিল না। ভিসি গভর্নমেন্টের রিপোর্ট অনুসারে তাঁরা ১২৩ ডিভিসন জার্মান সৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া যে কোন মুহূর্তে রণাঙ্গনে যোগ দেওয়ার জন্য আরও ৫০ হইতে ৭৫ ডিভিসন সৈন্য জার্মান লাইনের পিছনে মজুত বাহিনীরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল। ফরাসী সৈন্যদলের মোট ২000 ট্যাঙ্ক ছিল এবং ৪২০টি জঙ্গী বিমান ও ১০০ বোমারু বা মোট ৫২০ রণবিমান এবং জার্মানীর ছিল ৭৫00 ট্যাঙ্ক, ১৫00 জঙ্গীবিমান ও ২৫00 বোমারু বা মোট ৪000 রণবিমান। কিন্তু সোভিয়েট সামরিক মহলের মতে জার্মান বিমান বহরের সংখ্যা আরও বেশী ছিল—৩৫00 বোমারু, ১৫00 ছোঁমারা বিমান এবং ৪000 জঙ্গীবিমান। অর্থাৎ মোট ৯000 রণবিমান।

ম্যাক্সভার্নারের মতে জার্মান বাহিনীর অস্ত্রসজ্জা, সংগঠন ও আঘাত হানিবার শক্তি বিবেচনা করিলে মিত্রবাহিনীর সহিত কোন তুলনা দেওয়াই যায় না। কেবল তাহাই নহে, রণনীতি, সংগঠনশক্তি, রণচাতুর্য এবং সংঘর্ষের উপযোগী মানসিক প্রস্তুতির দিক দিয়াও জার্মান বাহিনী মিত্রপক্ষের তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। সুতরাং মিত্রপক্ষ যেন একটা ঘূর্ণিবাত্যার মধ্যে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল।

এই মহাযুদ্ধে প্রথমেই জার্মানীর রণনীতি বা 'স্ট্র্যাটিজির' বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা দরকার। কারণ, সমগ্র রণক্রিয়া এই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। জার্মান রণগুরু ক্লাউসেভিৎসের (১৭৮০ খৃঃ—১৮৩১ খৃঃ) শিক্ষানুসারে আক্রমণাত্মক অভিযান ও শত্রুবাহিনীকে নির্মূল করাই ছিল ইহার লক্ষ্য। কেবল তাহাই নহে, যে ইতিহাস বিখ্যাত শ্লিফেন প্ল্যান অনুসারে ১৯১৪ সালে জার্মানী পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণ চালাইয়াছিল তাহাও এই অভিযানের নক্সায় গৃহীত হইল। কিন্তু ১৯৪০ সালে ইহা সংশোধিত আকারে অনুসৃত হইল এবং সেখানেই ছিল বর্তমান জার্মান রণনীতির বৈশিষ্ট্য। *১৯১৪ সালে শ্লিফেন প্ল্যান অনুসারেই জার্মানী বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া ফ্রান্সকে আক্রমণ ও সংহারের চেষ্টা করিয়াছিল। এবারও সেদিক দিয়া চেষ্টা হইল বটে, কিন্তু ইহার সঙ্গে যুক্ত হইল জেনারেল লুডেনডর্ফের ১৯১৮ সালের আক্রমণাত্মক প্ল্যান। এই নক্সা অনুসারে ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে লুডেনডর্ফ চাহিয়াছিলেন বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনীর সংযোগস্থলের ব্যূহ বিদীর্ণ করিয়া ইংলিশ চ্যানেলের তীর পর্যন্ত পৌঁছিতে এবং এভাবে বৃটিশ বাহিনীকে ফরাসীদের কাছ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে। কিন্তু সেবার লুডেনডর্ফের অভিযান আমিয়েন্স হইতে ১৫ মাইল দূরে গোলাবিধ্বস্ত রণক্ষেত্রে ব্যাহত হইয়াছিল। এবার জার্মানী শ্লিফেন ও লুডেনডর্ফ, উভয়ের নক্সা একত্রে মিশাইয়া এক অভিনব পরিকল্পনা অনুসরণ করিল। অর্থাৎ একদিকে হল্যান্ড ও বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া ম্যাজিনো লাইনের উত্তরবর্তী ফরাসী-বৃটিশ-বেলজিয়ান বাহিনীকে বেষ্টন এবং অন্যদিক দিয়া সেডান ও আর্দেনস এলাকায় মিত্রব্যূহ বিদারণ, ইংলিশ চ্যানেলের দিকে অভিযান ও খাস ফ্রান্সের যুদ্ধে মূল ফরাসী বাহিনীকে বেষ্টন এবং সংহার।* শুধু তাহাই নহে, শ্লিফেন প্ল্যান অনুসারে বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া জার্মানীর প্রধান ও মূল আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহা ছিল দক্ষিণ পার্শ্ব এবং বাম পার্শ্বের আক্রমণ ছিল গৌণ। কিন্তু ১৯৪০ সালে দক্ষিণ পার্শ্বের আক্রমণই ছিল গৌণ—যাহার ফলে ফ্লান্ডার্সের যুদ্ধ এবং সেডানের ব্যূহভেদের দ্বারা বাম পার্শ্বের আক্রমণ দাঁড়াইল প্রধান বা মুখ্য—যাহার ফলে খাস ফ্রান্সের যুদ্ধ। ইহার সঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বের ব্যূহভেদের দ্বারা মিত্রবাহিনী যেমন ফ্লান্ডার্স ও বেলজিয়ামে বেষ্টিত হইল, উত্তরে ফ্রান্সের মূল ফরাসী বাহিনী হইতেও (সেডান হইতে আবেভিল বন্দর পর্যন্ত অগ্রগতির দ্বারা) তারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। পরস্পরের কাছ হইতে এই বিচ্ছেদের বিস্তৃতি দাঁড়াইল ৩০ মাইল, যাহা সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সামরিক ভাষায় জার্মানীর এই চাল ও চাতুরীকে বলা যাইতে পারে ধাপ্পা আক্রমণ। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে হিটলার পশ্চিম রণাঙ্গনে তাঁর সেনাপতিবৃন্দের অনুসৃত রণনীতির সাফল্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ করিয়া বলেন,

> "I feinted to the north and moved my main mass against the left wing in contrast to the Schlieffen Plan (which moved by the right wing in 1914). There feint suceded." *1

অর্থাৎ হিটলার উত্তর দিকে বা দক্ষিণ পার্শ্বে দিলেন আক্রমণের ধাপ্পা, যাহা শ্লিফেনের প্ল্যানের বিপরীত, আর বামপার্শ্বে চালাইলেন প্রধান আক্রমণ এবং এই ধাপ্পা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

এই ধাপ্পার পাল্লায় পড়িয়া মিত্রবাহিনী দস্তুরমত 'বেকুফ' বনিয়া গেল। তারা ভাবিয়াছিল যে, দক্ষিণ পার্শ্বের কিংবা হল্যান্ড ও বেলজিয়ামের মধ্য দিয়া জার্মান অভিযানই প্রধান আক্রমণ। সুতরাং মিত্রবাহিনী যতই সেদিকে অগ্রসর হইয়া জার্মানীকে বাধা দিতে চাহিল, ততই তাহারা বঁড়শির টোপ গিলিবার মত এক কৌশলপূর্ণ ফাঁদে পড়িল। কারণ, বামদিকে ততক্ষণ সেডান ও আর্দেনস এলাকা দিয়া প্রধান জার্মান বাহিনী ম্যাজিনো লাইন যেখানে নূতন কাঁচা অংশের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে) ভেদপূর্বক ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের রণক্ষেত্রকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। উত্তর দিকের বা বেলজিয়াম রণক্ষেত্রের এই ধাপ্পা এত সাফল্যমণ্ডিত হইল যে, সেডানের ব্যূহভেদের পর মিত্রবাহিনীর হাইকম্যান্ড বুঝিয়া উঠিতেই পারিলেন না যে, অতঃপর জার্মানী কোন্ দিকে ধাবিত হইবে—ইংলিশ চ্যানেলের দিকে কিংবা প্যারিস অভিমুখে?

> 'It masked its decisive break-through at Sedan by the preceding offensive against the Netherlands and Belgium, and after this successful break-through it kept the Allied Supreme Command in suspense for several days, as to where the next decisive blow would be struck—whether against the channel cost or Pais' (2)

জার্মানীর এই অদ্ভুত রণনৈতিক চালের মধ্যে পড়িয়া মিত্রবাহিনী গোড়ার দিকেই পশ্চিম রণাঙ্গনে তাহাদের বিপর্যয় ডাকিয়া আনিল। সুতরাং এই যুদ্ধ ছিল কার্যতঃ প্রায় এক তরফা। অর্থাৎ জার্মান বাহিনীর একটানা আক্রমণ, অগ্রগতি এবং মিত্রশক্তিগুলিকে বেষ্টন ও সংহার। যেখানে উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে শক্তি, কৌশল ও মহড়ার এত বৈষম্য সেখানে পরস্পরের সংঘর্ষের কোন বিস্তৃত ইতিহাস গড়িয়া উঠিতে পারে না। সাধারণ চলিত বাংলায় তুলনা দিয়া বলা যাইতে পারে যে, ধারালো বঁটি দিয়া

* ১৯৪০ সালের ম্যানস্টাইন পরিকল্পনার এটাই ছিল বৈশিষ্ট্য, কিন্তু তখন এটা জানা ছিল না। —লেখক

*1 "The World At War"—Published by Infantry Journal 1945, P. 45.

*(2) 'Battle For the World'—by Max Werner.

মেয়েরা যেমন কুমড়ার ফালি কাটিয়া ফেলে, জার্মানীও তেমনই মিত্র বাহিনীকে দ্বিখণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন ও টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল। পশ্চিম রণাঙ্গনের এই জার্মান রণনীতি মূলতঃ ছিল তিন পর্যায়ের (১) মিত্রপক্ষের প্রথম সারির আত্মরক্ষার ব্যূহভেদ (২) গতিশীল যুদ্ধ ও বিদ্যুৎগতি এবং (৩) শত্রুর দ্রুত পশ্চাদ্ধাবনের পূর্বে সোম ও আইনে নদীর ব্যূহভেদ।*(৩)

প্রথম পর্যায়ে বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের আত্মরক্ষার জন্য নির্মিত দুর্গায়িত এলাকাগুলি জার্মানরা বোমারু, ছোঁমারা বিমান, প্যারাসুট সৈন্য ও 'পাইওনীয়ার'দের সহায্যে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। বোমারুগুলি 'উড়ন্ত গোলন্দাজের' কাজ করিল এবং এভাবে যান্ত্রিক ও মোটর সাইকেলবাহিত পদাতিকদের জন্য পথ খুলিয়া দিল। মিউজ নদীর সেতু, এলবার্ট ক্যানেল এবং লীজের বিখ্যাত দুর্গগুলির দখলে প্যারাসুট বা ছত্রীসৈন্যেরা প্রধান অংশ গ্রহণ করিল। সেডান ও মন্টমিডি এলাকায় ম্যাজিনো লাইনও যুগপৎ আকাশ ও স্থলপথের প্রচণ্ড 'বিস্ফোরক আক্রমণে' ভাঙিয়া ফেলা হইল এবং এই সমস্ত দুর্গায়িত এলাকা চূর্ণ করিতে জার্মান বাহিনীর দুই দিনের বেশী সময় লাগিল না।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রাইন নদী অঞ্চলবর্তী ম্যাজিনো লাইন এবং খাস রাইন নদী বিচ্ছিন্ন ও অতিক্রান্ত হইল। বেলজিয়ান ও ফরাসী দুর্গগুলি ভাঙিবার পর জার্মানী ট্যাঙ্ক ও যান্ত্রিক সৈন্যের সাহায্যে গতিশীল যুদ্ধের বিদ্যুৎগতি সঞ্চার করিয়া স্থিতিশীল যুদ্ধের উপর নির্ভরশীল মিত্রপক্ষকে নিঃশ্বাস ফেলিবারও সময় দিল না। ১০ই মে হইতে ১৮ই মে-র মধ্যে জার্মান বাহিনী বেলজিয়ামের অভ্যন্তরে ১২৫ মাইল অগ্রসর হইয়া গেল। ১৩ই মে হইতে ১৬ই মে-র মধ্যে ভন রাইকনাউয়ের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যান্ত্রিক সৈন্যেরা লুক্সেমবুর্গ ও ফরাসী সীমানা ভেদ করিল এবং ২০শে মে-র মধ্যে পিরোন-ক্যাম্বাই লাইনে পৌঁছিয়া অবিশ্বাস্য গতিবেগের দ্বারা মাত্র তিন দিনের মধ্যে ইংলিশ চ্যানেলের তীরবর্তী আবেভিল বন্দরে পৌঁছিল এবং সেখান হইতে উত্তর দিকে ক্যালে বন্দর অভিমুখে ঘুরিয়া ফ্লান্ডার্সের মিত্রবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন ও বেষ্টন করিল। অর্থাৎ বেলজিয়াম ও লাক্সেমবুর্গ সীমান্ত হইতে ক্যালে বন্দর পর্যন্ত দখলের যে দুই সপ্তাহ সময় লাগিল, উহার মধ্যে জার্মান বাহিনী গড়পড়তা দৈনিক ২০ মাইল হিসেবে ৩০০ মাইল অতিক্রম করিল। এবং ২১শে হইতে ২৩শে মে-র মধ্যে জার্মান বাহিনীর গতিবেগ ছিল দৈনিক ৪০।৫০ মাইল।

*৩ পূর্বোল্লিখিত পুস্তক

জার্মানীর বিদ্যুৎগতি আক্রমণের প্রথম বলি পোল্যান্ড

ফ্লান্ডার্সের এই যুদ্ধের পর (যাহার পরিণতি ডানকার্ক) সুরু হইল জার্মানীর তৃতীয় পর্যায়ের অভিযান, কিংবা প্রধান ফরাসী বাহিনীগুলির সংহার। সোম ও আইনে নদীর তীরে ইহাই খাস 'ফ্রান্সের যুদ্ধ' নামে অভিহিত। এখানে সোম নদীর নিম্নভাগে (আমিয়েন্সের দক্ষিণে ও পূর্বে) ফরাসী সৈন্যেরা প্রাণপণে লড়াই করিয়া প্রচণ্ডতম বাধা দিয়াছিল। তথাপি বাস্তব অবস্থার বিচারে ফ্রান্সের এই যুদ্ধ হাতে-কলমে মাত্র পাঁচদিন টিকিয়া ছিল—৫ই জুন হইতে ১৬ই জুন। তারপর পূর্বে ও পশ্চিমে প্যারিস বেষ্টন এবং ছত্রভঙ্গ ফরাসী সৈন্যদলের পশ্চাদ্ধাবন। সোমনদীর যুদ্ধ বা ওয়েগাঁ লাইন ভাঙিবার ফলে ফরাসী সৈন্যেরা ৩০০ মাইল পিছু হটিয়া গেল।

বোমারু বিমান, ট্যাঙ্ক ও মোটরারূঢ় জার্মান বাহিনীর এই অভাবনীয় যান্ত্রিক যুদ্ধের জন্য ফ্রান্স ও তার মিত্রবর্গ আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। আজ অবশ্য পাঠকবর্গের নিকট এই কৌশল অত্যন্ত পরিচিত, এমন কি পুরাতন। কিন্তু সেদিনের পৃথিবী বর্ণনাতীত কৌতূহল ও বিস্ময়ের সহিত পশ্চিম রণাঙ্গনের এই মহানাটকের অভিনয় লক্ষ্য করিতেছিল। সুতরাং সেদিনের অবস্থা বুঝিবার জন্য 'রয়টারের' টেলিগ্রাম ও সংবাদপত্রের বিশ্লেষণ হইতে কিছুটা উদ্ধৃত করিতেছি। ১৯৪০ সালের ১৭ই মে, 'যুগান্তর' পত্রিকায় 'যুদ্ধের ধারা পরিবর্তন' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম :—

"রয়টার জানাইতেছেন যে, বেলজিয়মের রণক্ষেত্রে কামান ও গোলাগুলীর

প্রচণ্ডতায় ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলবর্তী সহরের ঘরবাড়ীগুলি ভূমিকম্পের আলোড়নের মত কাঁপিয়া উঠিতেছে। বেলজিয়মের রণক্ষেত্র হইতে দক্ষিণ ইংলণ্ডের সমুদ্রতীর কমপক্ষে দেড় শত মাইল দূর হইবে। কামানের নিক্ষিপ্ত গোলার দ্বারা কি ভাবে দেড় শত মাইল দূরে ভূমিকম্পনের অনুরূপ আলোড়ন সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা কল্পনা করিয়া জনসাধারণ নিশ্চয়ই ভীতি ও বিস্ময় অনুভব করিবেন। বিগত মহাযুদ্ধের পর অনেক রণপণ্ডিত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক-যুদ্ধ অপরিমেয় ধ্বংস বিস্তার করিবে। সেই ধ্বংসের বার্তাই আজ রণক্ষেত্র হইতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু সমর-বিজ্ঞানের দিক দিয়া এই যুদ্ধের প্রচণ্ডতাকে বুঝিবার প্রয়োজন আছে। আগেকার প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম যে, যান্ত্রিক-বাহিনী ও বোমারু বিমানের দ্বারা বেপরোয়া আক্রমণ চালাইবার ফলে এই যুদ্ধের নীতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন হইবে। 'রয়টারের' নূতনতম তারবার্তায় এই পরিবর্তনের কথা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

> The enemy is hurling formidable forces into the battle and is attacking the whole front more on the lines of the Polish campaign than on those of 1914. The German attack has changed the war of position behind fortified lines into a war of movement. Enemy attacks now take the form of a spearhead drive of tank corps which try to penetrate the lines with the infantry following. This change in the character of the war, it is announced in Paris to-night, has involved reorganisation of French dispositions which the French High Command has now carried out.'

ইহার সহজ মর্ম এই যে, বর্তমান যুদ্ধ ১৯১৪ সালের অনুরূপ ধারায় চলিতেছে না। পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানী যে ধারায় ও পদ্ধতিতে আক্রমণ চালাইয়াছিল, নামুর সেডান যুদ্ধেও তাহাই অনুসৃত হইতেছে— war of position এক্ষণে war of movement-এ পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ ফরাসী সৈন্যেরা দুর্গের আড়ালে থাকিয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিবে বলিয়া যে সংকল্প করিয়াছিল সেই সংকল্প ত্যাগ করিতে হইয়াছে. তাহারা এক্ষণে সচল যুদ্ধের গতিবেগ অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছে। ফলে ফরাসী সৈন্যদিগকে নূতন করিয়া সন্নিবেশ ও সংস্থাপন করিতে হইয়াছে! এই কারণে সমগ্র যুদ্ধের ধারা বা character- -এর পরিবর্তন হইয়াছে। ফরাসী সামরিক কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছিলেন যে, ম্যাজিনো লাইন ও কেল্লার দ্বারা সুরক্ষিত অঞ্চলের মধ্যে তাঁহারা অবস্থান করিবেন এবং এই অচলায়তন গণ্ডীর নিরাপদ কেন্দ্রে বসিয়া আক্রমণকারীকে কামান ও মেসিনগান ইত্যাদির [illegible] যান্ত্রিক ও বোমারু বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের দ্বারা তাহারা দুর্গের 'নিরাপদ গর্ত' হইতে বাহির হইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন—

> 'French troops have had to adopt themselves suddenly from a war of position to one of rapid action on land and in the air'. (Reuter)

—ফরাসী বাহিনীকে অকস্মাৎ অচলায়তন গণ্ডীর যুদ্ধ হইতে স্থলপথে ও আকাশে সচল ও সক্রিয় যুদ্ধ অবলম্বন করিতে হইয়াছে এবং নূতন অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য নূতনভাবে সেনা সাজাইতে হইয়াছে। এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিবার মত।

"যুদ্ধ যদিও আদিমকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তথাপি যুদ্ধের ধারা ও পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন খুব ঘন-ঘন দেখা যায় নাই। এমন কি কাহারও কাহারও মতে তিনশত বা পাঁচশত বৎসরেও যুদ্ধনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু যন্ত্রবিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে রণবিজ্ঞানেরও বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ১৯১৪—১৮ সালের মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে সাধারণতঃ নেপোলিয়ানের এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান (ফরাসী ও জার্মানী) যুদ্ধের কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল যে, এই প্রকার যুদ্ধনীতি ক্রমশঃ অচল অবস্থায় গিয়া পৌঁছিতেছে ১৯১৫-১৭ সালের পরিখা শ্রেণীর মধ্যে অর্থাৎ মাটির নীচের অচল গণ্ডীতে পরিণত হইতেছে। একমাত্র কোদালিই রাইফেল ও মেসিনগানকে ব্যর্থ করিয়া দিল। ১৮৭১ হইতে ১৯১৪ সাল, এই ৪৩ বৎসরের মধ্যে সৈন্যবাহিনীর অস্ত্রসজ্জা ও রণসজ্জার সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে ধূমহীন বারুদ, দূরপাল্লার রাইফেল, মেসিনগান এবং অতি দ্রুত গোলাগুলী বর্ষণকারী বহুপ্রকার অস্ত্র আবিষ্কৃত ও প্রবর্তিত হইয়াছিল কিন্তু অস্ত্রের গতি ও প্রকৃতি যদিও আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল, সমরনীতি ও পদ্ধতি পড়িয়া রহিল পশ্চাৎবর্তী যুগে—নেপোলিয়ান ও ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের আমলে। সুতরাং আধুনিক অস্ত্র ও পুরাতন মনের মধ্যে সামঞ্জস্য রহিল না—দুই পক্ষই অবশেষে ট্রেঞ্চের মধ্যে আশ্রয় লইয়া দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস অলস মন্থরগতিতে কাটাইতে লাগিল। অবশেষে বৃটেনের আবিষ্কৃত ট্যাঙ্ক আসিয়া দুর্বার গতিতে পরিখাশ্রেণী ডিঙ্গাইয়া-চুরিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটাইল। এইভাবে tactics ও strategy উভয় দিক দিয়াতে নূতন পরিবর্তন দেখা দিল।

খুব সংক্ষেপে ইতিহাসের কথা বলা যাইতে পারে যে, সেকালে গ্রীক ও রোমান বাহিনী ঢাল, তরোয়াল ও বর্শা ইত্যাদি লইয়া প্রতিপক্ষের খুব কাছাকাছি যাইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িত, ইহাকে আধুনিক ভাষায় আক্রমণ না বলিয়া সংঘর্ষ বা assault বলা যাইতে পারে। এই সংঘর্ষ ঘটিত শ্রেণীবদ্ধ ভাবে; যাহাদের সাহস শারীরিক শক্তি ও শৃঙ্খলাগুণ যত বেশী তাহাদের জয়লাভেরও বেশী সম্ভাবনা ছিল। ফ্রেডারিক দি গ্রেটের আমল পর্যন্তও এই মূল নীতিই অনুসৃত হইয়াছিল, তফাতের মধ্যে এই ছিল যে, গুলীর দ্বারা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা হইত। কিন্তু ক্রমে সমরনেতাগণ ভাবিতে লাগিলেন যে, পরস্পরের মুখোমুখি দুই সৈন্যদলের মধ্যে যে দূরত্ব রহিয়াছে এবং যাহাকে সামরিক ভূগোলের ভাষায় no-mans-land বলা যাইতে পারে, সেই দূরত্বের হ্রাস কিভাবে সম্ভব? রাইফেল, মেসিনগান ও উন্নত শ্রেণীর কামান এই দিক দিয়া সাহায্য করিল। কিন্তু শত্রু বা মিত্র, উভয়পক্ষই যেমন নূতন আগ্নেয়াস্ত্রের সুবিধা ও কৌশল গ্রহণ করিল তেমনই আত্মরক্ষার প্রশ্নও নূতন করিয়া দেখা দিল। এই আত্মরক্ষার প্রশ্নই ক্রমশঃ ১৯১৫—১৭ খৃষ্টাব্দের অচল ট্রেঞ্চ যুদ্ধের একঘেয়েমিতে পরিণত হইল। তখনকার দিনে সাধারণতঃ আক্রমণ চলিত under cover of artillery অর্থাৎ গোলন্দাজ বাহিনী প্রচুর গোলাগুলী বর্ষণ করিয়া আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিত এবং তাহার পিছনে অনুসরণ করিত রাইফেল ও সঙ্গীনধারী পদাতিক। কিন্তু ১৯১৭-১৮ সালে ইহারও পরিবর্তন ঘটিল। তখন সদ্য আবিষ্কৃত ট্যাঙ্ককে সম্মুখভাগে রাখিয়া ক্রমে গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনী আক্রমণে অগ্রসর হইত। ইহার সঙ্গে অবশ্য এরোপ্লেনও পর্যবেক্ষণের কার্য করিত। এই নূতন অবস্থার চাপে পড়িয়া ১৯১৮ সালের নবেম্বরে মহাযুদ্ধ শেষ হইল বটে. কিন্তু উহার আগে ১৯১৯ সালের জন্য বৃটিশ সমর-নেতাগণ স্থির করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ট্যাঙ্ক বাহিনীর দ্বারা শত্রুর সম্মুখভাগ ও দ্রুতগামী এরোপ্লেন দিয়া পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করিবেন। ১৯৩৯-৪০ সালে ইহারই উন্নততর সংস্করণ জার্মানযুদ্ধে দেখা দিয়াছে। এক্ষণে বোমারু বিমান ঝাঁক বাঁধিয়া অগ্রসর হইয়া যাইতেছে এবং প্রচুর বোমাবর্ষণের মধ্যে যান্ত্রিক-বাহিনী বড় বড় ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী ও অন্যান্য যানসহ আক্রমণ চালাইতেছে এবং মোটর সাইকেল বাহিনী উহাদিগকে পদাতিকের মত অনুসরণ করিতেছে। সহজ কথায় গোলন্দাজ বাহিনীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে বোমারু বিমান এবং ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী। এই আক্রমণ কোথাও চলিতেছে বৃত্তাকারে এবং কোথাও বা বর্শা ফলকের মত অর্থাৎ একের উদ্দেশ্য হইতেছে শত্রুকে পরিবেষ্টন এবং আর একটির উদ্দেশ্য হইতেছে শত্রুবাহিনীকে তীরের মত ভেদ করিয়া যাওয়া!"

১৯শে মে তারিখ আমি লিখিয়াছিলাম :—"প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট পর্যন্ত তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, এবারের যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য অতর্কিতে আক্রমণ ও বিস্ময়কর গতিবেগ—এমন দ্রুত গতিবেগ খুব কম দেখা গিয়াছে। এই দ্রুত জয়লাভের মূলে রহিয়াছে ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমান। এই দুই অস্ত্রের জন্য বর্তমান যুদ্ধের ধারা

পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষেত্রে 'রয়টার' বলিতেছেন—

> 'The German success is mainly due to a new technique of clearing the ground by heavy tank attacks supported by lowflying bombers'.

জার্মানীর সাফল্যের প্রধান কারণ হইতেছে এই যে তাহারা ভারী ট্যাঙ্কের সাহায্যে অভিযান পথের বাধা ভাঙিয়া চুরিয়া অগ্রসর হইতেছে এবং ইহার সঙ্গে বোমারু বিমান খুব নীচু দিয়া উড়িয়া গিয়া বোমা বর্ষণ করিতেছে। ফরাসী-ইংরাজ সৈন্যদের মুস্কিল হইয়াছে যে, জার্মানদের ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমান উভয়ই অপেক্ষাকৃত বেশী। যদি এইদিক দিয়া তাহাদের সংখ্যা সমান হইত তাহা হইলে জার্মান অগ্রগতি এত দ্রুত হইতে পারিত না।......বৃটেনের বর্তমান চীফ অব দি ইম্পিরীয়েল জেনারেল ষ্টাফ জেনারেল স্যার এডমণ্ড আয়রণসাইড ১৫ বৎসর আগেকার এক বক্তৃতায় *বলিয়াছিলেন যে,

> One of the first principles of war is the maintenance of mobility. An army which can move about quickly always has the advantage over one which is slow and immobile.

যুদ্ধের একটি মূল নীতি হইতেছে ক্ষিপ্রতা, এই ক্ষিপ্রতা রক্ষা করিয়া যাহারা চলিবে তাহারা যে কোন অলসমন্থর সেনাদলের উপর জয়লাভের বেশী সুযোগ পাইবে। নেপোলিয়ানের যুদ্ধ এই দিক দিয়া সর্বাগ্রগণ্য ছিল। এই কারণেই দুর্গশ্রেণীর আড়াল হইতে ফরাসী সৈন্যেরা বর্তমানে বাহির হইয়া আসিয়াছে।"

•

কাঁকড়ার গর্তে লেজ ঢুকাইয়া শিয়াল যেমন কাঁকড়াকে বাহিরে টানিয়া হত্যা করে, জার্মান যান্ত্রিক যুদ্ধের কৌশলও ফরাসী বাহিনীকে সেভাবে দুর্গের গহ্বর হইতে বাহিরে টানিয়া আনিল এবং স্থিতিশীল 'নিরাপদ' আশ্রয়কে গতিশীল যুদ্ধের বজ্র হানিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিল। পূর্বেও জার্মান বাহিনীর গতিবেগের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে এবং এখানে আর একবার উল্লেখ করা যাইতে পারে যে হল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া জার্মানী ৫ দিনের মধ্যে সমুদ্রতীরে পৌঁছিল, কিন্তু ১৯১৪ সালে এই উপকূলে পৌঁছিতে জার্মানীর আড়াই মাস সময় লাগিয়াছিল। রণ-

কৌশলের দিক থেকে ট্যাঙ্ক ও বিমানশক্তির শ্রেষ্ঠতাই ছিল এই অভূতপূর্ব জয়ের মূল কারণ।

এই সংগ্রামের বহু অভিনব ঘটনার মত আর একটি চমকপ্রদ ঘটনা এই যে, উভয় পক্ষেই হতাহতের পরিমাণ হইয়াছিল অবিশ্বাস্য রকমের সামান্য। (ইহা দ্বারাও অসমযুদ্ধের আর একটি প্রমাণ মিলিতেছে।) জার্মান সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ১০ই মে হইতে যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত জার্মান পক্ষে নিহতের সংখ্যা ২৭,০৭৪, নিখোঁজ ১৮৩৪, আহত ১,১১,০৩৪—মোট হতাহত ও নিখোঁজ ১,৫৬,৪৯২ জন। পশ্চিম রণাঙ্গনের মহা-সংগ্রামের তুলনায় বিজয়ী পক্ষেরও এই হতাহতের সংখ্যা এত সামান্য যে, ইতিহাসে ইহা অভূতপূর্ব। জার্মানীর বেলা যেমন, ফ্রান্সের পক্ষে ইহা তেমনই অত্যন্ত অভিনব। কেননা ফ্রান্স ছিল পরাজিত পক্ষ। ফ্রান্সের আধা-সরকারী মতে নিহত ফরাসীর সংখ্যা ৭০,০০০ এবং জার্মানদের হাতে বন্দীর সংখ্যা ১৯ লক্ষ (জার্মান সরকারী ইস্তাহারেও এই সংখ্যা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, ৫ জন বাহিনী অধিনায়ক এবং প্রায় ২৯ হাজার অফিসার ধরা পড়িয়াছেন)। ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে অনধিকৃত ফ্রান্সের এক বিবরণীতে (ম্যাক্স জার্ণালের মতে) দেখা যায় যে নিহত ফরাসীদের সংখ্যা ৮০ হাজার এবং আহত ১ লক্ষ ২০ হাজার। বিশেষজ্ঞ মতে এই সংখ্যাগুলি মোটামুটি ঠিক বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য, ফরাসী আত্মরক্ষার দ্রুত অবনতি এবং জার্মানীর বেষ্টন কৌশলের জন্যই হতাহতের সংখ্যা সংগ্রামের বিশালতার তুলনায় এত সামান্য হইয়াছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, এই পর্যন্ত কোন বড় যুদ্ধের ইতিহাসেই বিজেতা ও বিজিতের এত কম হতাহতের সংখ্যা দেখা যায় নাই। ইহার আর একটা বড় কারণ এই যে, কতকগুলি ডিভিসন (যেমন, ম্যাজিনো লাইনের ও পূর্ব ফ্রান্সের) বিনাযুদ্ধে ধরা পড়িয়াছে এবং বহু ডিভিসন ঘেরাও হইয়া বন্দী হইয়াছে।

চার্চিল তাঁর ইতিহাসে মন্তব্য করিয়াছেন যে, পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধে এত কম সৈন্য হতাহত হওয়ার মূল কারণ যান্ত্রিক যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য এবং প্রসিদ্ধ বৃটিশ ঐতিহাসিক এ্যালান বুলক্ বলিয়াছেন যে, জার্মান যান্ত্রিক বাহিনী সংগঠনের কৃতিত্ব হিটলারের। তিনিই এর উপযোগিতা প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যদিও আর্মির মধ্যে তাঁর মতবিরোধিতা ছিল। *৫

(ক্রমশঃ)

*(4) 'The study of War'—edited by Major-General Sir George Aston.

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা—১৯২৫-২৬

(5) Hitler—Allan Bullock Pelican 1962. P. 588

অবনীন্দ্রনাথ

প্রদর্শনী

অবনীন্দ্র শতবার্ষিকী

মহর্ষি ভবনে রবীন্দ্রভারতী ও রবীন্দ্র-ভারতী সোসাইটির উদ্যোগে ৯ আগস্ট অবনীন্দ্রনাথ জন্মশতবার্ষিকী প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল। ২৩ আগস্ট অবধি অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীতে উনসত্তর খানি ছবি ও অবনীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ফটোগ্রাফ, ব্রোঞ্জ মূর্তি, তাঁর ব্যবহৃত রং-তুলি, ইজেল, চিঠি ও অভিনন্দনপত্র সমেত সবশুদ্ধ একশ একচল্লিশটি দ্রষ্টব্য বস্তু প্রদর্শিত হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা অবনীন্দ্রনাথের সচিত্র পোস্টকার্ডগুলি এবং অবনীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের লেখা যাত্রা পালাগানের সচিত্র পাণ্ডু-লিপি প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ। ফাল্গুনী নাটকে অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্যবহৃত অষ্টাবক্র লাঠিটিও প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছেন।

মাত্র উনসত্তর খানি ছবিতে যদিও তাঁর সমগ্র শিল্পরীতি ধরা পড়ে না, তবু তাঁর স্টাইলের পরিবর্তনের অনেকগুলি নমুনাই এখানে পাওয়া যাবে। গোড়ার দিকের আঁকা সোনা বসানো মিনিয়েচার ধর্মী কৃষ্ণলীলা থেকে সুরু করে তাঁর যাত্রা সিরিজ, ফাল্গুনী তাজ নির্মাণের পরিকল্পনা, নিসর্গ দৃশ্য, তোতা-কাহিনী, মোহমুদ্গর, আরব্যো-পন্যাস, কৃষ্ণমঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল পর্যন্ত অনেকগুলি স্টাইলের নমুনাই এখানে দেখা গেল। তাঁর অপেক্ষাকৃত সুপরিচিত ছবি-গুলির মধ্যে তেলরং-এ আঁকা "শাজাহানের মৃত্যু', 'তাজ নির্মাণ', 'ভারতমাতা', 'মেঘদূত', 'ওমর খৈয়াম', 'কুমারস্বামীর প্রতিকৃতি', ফাল্গুনীর বাউল বেশে রবীন্দ্র-নাথ, 'জাহাঙ্গীর', 'জেব উন্নিসা' ইত্যাদি অনেকগুলি ছবিই সংগ্রহ করা হয়েছে।

অপেক্ষাকৃত অল্প পরিচিত ছবির মধ্যে জাপানী রীতি প্রভাবিত 'বুলবুল', 'সারস', 'প্রভাত' নামে একটি চমৎকার বাছুরের ছবি ও মোহমুদ্গর সিরিজের সূক্ষ্ম রসিকতাময় ছবি ও মুসৌরীর দৃশ্যাবলী রাখা আছে। বেশীর ভাগ ছবিই খুব ছোট মাপের কিন্তু চমৎকার স্পেস তৈরী হয়েছে। একটি বড়ো মাপের 'শাজাদপুরে' ও 'করতোয়ার দৃশ্য'তে এই স্পেস আরো সুন্দরভাবে অনুভব করা যায়, অথচ ছবিটির অঙ্কিত অংশ অতি সামান্য। বাস্তবিক অবনীন্দ্রনাথের নিসর্গদৃশ্য নিয়ে বিশেষ কোন আলোচনাই হয়নি। আরব্য-রজনী সিরিজে 'আলাদিন' 'নুরুদ্দিনের বিবাহ', 'কনের শিরশ্ছেদ' ইত্যাদি ছবির রং ও কম্পোজিশনের বৈচিত্র্য অনেকখানি আধু-নিক জ্যামিতিক রীতি স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার শেষ বয়সের মঙ্গলকাব্যের ছবি-গুলির ওপর লোকশিল্পের অনুপ্রেরণা তাঁর সরলীকরণ পদ্ধতির আরেক নিদর্শন। আশ্চর্য লাগে এই যে, অবনীন্দ্রনাথ কোথাও নিজের পুনরাবৃত্তি করেন নি। অবশ্য এটা তাঁর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমানভাবেই ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু একটা জিনিস সারা প্রদর্শনী দেখেই বোঝা যায় যে, নানা রকম বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও শিল্পীর বিশিষ্ট একটি রসিক ও খেয়ালী মেজাজের পরিচয় তাঁর সমগ্র কাজের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে এবং এই বিশিষ্ট মেজাজটিই তাঁর ছবিগুলির বিশেষ আকর্ষণ। তবে আজকের শিল্পীর কাছে অবনীন্দ্রনাথের কোন বিশেষ মূল্য রয়েছে কিনা তার কোন পরিষ্কার আলোচনা তেমন হয়নি। কিন্তু তাঁর ছবি-গুলি যতদিন রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটির লোহার সিন্দুকে বন্ধ থাকবে ততদিন তা হওয়া সম্ভবও নয়। প্রদর্শনীর ছবিগুলি দেখেই বোঝা যাবে যে, কি অযত্নে এই জাতীয় সম্পদ সংরক্ষিত হচ্ছে। ছবির মাউন্টিং ও ফ্রেম কতকাল যে বদলানো হয়নি, জানা যায় না। কোন কোন ছবিতে নানা রকম দাগ ধরেছে। ঢিলে হয়ে যাওয়া ফ্রেমের ফাঁক দিয়ে আর্দ্রতা ঢোকার রাস্তা ত বটেই পোকামাকড় ঢোকার রাস্তাও পরি-ষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা গোড়ার দিকে দেখেছেন তাঁদের মতে শাজাহানের মৃত্যু ছবিটির রং অনেক ম্লান হয়ে গিয়েছে। এসব জিনিসের মেরামতি দরকার। সমস্ত ছবি ভাল করে বাঁচিয়ে স্থায়ী প্রদর্শনীকালে সর্বসাধারণের জন্য সযত্নে সংরক্ষিত না করলে ছবির যাঁরা জিম্মাদারী করতে নিযুক্ত হয়েছেন তাঁরা ভবিষ্যতবংশীয়দের কাছে চূড়ান্ত অপরাধে অপরাধী হবেন, কারণ বোধ হয় এঁদের কাছেই কলকাতার অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র শিল্প-কলার বৃহত্তম সংগ্রহ রয়েছে। শিল্প-কলা সংরক্ষণের ব্যাপারে আমাদের দেশে সর্বত্রই একটা ঔদাসীন্য দেখা যায়। এই শতবার্ষিকী উৎসবের সময় কয়েকটি অদ্ভুত জিনিস দেখা যাচ্ছে। প্রথমতঃ অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিল্পশৈলীর অনুসরণকারীদের ছবি নষ্ট হতে বসেছে। দ্বিতীয়তঃ কল-কাতার ইণ্ডিয়ান কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ড্রাফটসম্যানশিপ উঠে যেতে বসেছে। ছাত্র-দের অপরাধে নয়, তাঁরা এটি সংরক্ষণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এমন কি প্রদর্শনী উদ্বোধনের দিন তাঁরা তাঁদের দাবী-দাওয়া নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান নিবন্ধের রচনাকাল অবধি তার কোন ফয়সালা হয়নি। অবনীন্দ্রনাথের প্রতি ভক্তিতে যাঁদের কণ্ঠ গদগদ হয়ে এসে-ছিল সেদিন, তাঁরা চিন্তা করে দেখতে পারেন যে, কোন শিল্পবিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তিনি আনন্দিত হতেন কি না। তৃতীয়তঃ আসমুদ্রহিমাচল জুড়ে ভারতের

শিল্পী : সময় সেনগুপ্ত

শিল্পকলা একদল হীন স্বার্থান্বেষী লোক অবাধে অর্থোপার্জনের জন্য নানা পথে বিদেশে চালান করছে। দেবমন্দিরের বিগ্রহও তারা বিদেশে বিধর্মীদের কাছে অর্থ-বিনিময়ে বিক্রয় করতে কুণ্ঠিত নয়। যে ভারত শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্যে অবনীন্দ্রনাথ সারা জীবন কাজ করে গিয়েছেন, তার মূল্য আজ কেবল অর্থমূল্যে নিরূপিত হচ্ছে। দেশের শিল্পসংস্কৃতি রক্ষার যে একটা জাতীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, সে সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত লোকেদের পর্যন্ত চৈতন্য নেই। অবনীন্দ্র-শিল্প আলোচনা প্রসঙ্গে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত মন্তব্য করলেন যে, বর্তমানে আমাদের সমাজ চেতনা শিল্প-চেতনা ইত্যাদি নেই সুতরাং তাঁর শিল্প-নিদর্শন যদি বর্তমানে সংরক্ষিত না হয়, তাতে দুঃখ নেই' যেদিন চেতনা হবে সে দিনই তার যথার্থ মূল্যায়ণ হবে। অর্থাৎ বাইশ মণ তেলও পুড়বে, রাধাও নাচবে।

*

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে শিল্পায়ন আর্টিস্টস সোসাইটির উদ্যোগে সঞ্জয় সেনগুপ্তের ২৫।২৬ খানি লিনোকাট প্রদর্শনী হয়ে গেল। ২১ থেকে ২৭ জুলাই অবধি অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু ছিল কবি সুকান্ত ও আজকের জগৎ। সুকান্তের কয়েকটি কবিতাকে রূপায়িত করবার যে চেষ্টা করা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। অধিকাংশ লিনোকাটই শাদা-কালোয় ছাপা। কয়েকটিতে রঙের আমদানী করা হয়েছে। তবে শাদা-কালো কাজগুলিই বেশী আকর্ষণীয়। অনেকখানি কালোর মধ্যে শাদা রেখার ব্যবহার বা অনেকটা শাদার মধ্যে জোরালো কালোর ছাপ বেশ নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছিল। সুকান্তের চমৎকার প্রতিকৃতিটি ছাড়া 'একটি মোরগের প্রতি' 'পৃথিবীর দিকে তাকাও' 'চিল' 'হে মহাজীবন' 'বোধন' ইত্যাদি কবিতা অবলম্বনে ছবিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

*

২৪ থেকে ৩০ জুলাই ফিলিপস্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড-এর কর্মীদের ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবির একটি প্রদর্শনী ফিলিপসের হাউস জার্নাল 'পরিচয়' পত্রিকার উদ্যোগে অ্যাকাডেমির মধ্যের ঘরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এটি 'পরিচয়ের' অষ্টম সর্বভারতীয় প্রদর্শনী। ৯ থেকে ১৬ বছরের ছেলেমেয়েদের আঁকা সাড়ে তিনশোর অধিক ছবি এখানে প্রদর্শিত হয়েছিল। সাধারণ জলরং, প্যাস্টেল, ক্রেয়ন, পেন্সিল ও কালি-কলমে আঁকা ছবি ছাড়াও মোজাইক ও কালো জমির ওপর রুপোলী তার দিয়েও ছবি তৈরীর চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য প্রচুর ছিল। চারপাশের দেখা এবং শোনার জগৎ কোনোটাকেই ছেলেমেয়েরা বাদ দেয়নি। রূপকথার রাজ্য থেকে রকেট সবই এখানে দেখা গেল। প্রতি বিভাগেই কয়েকটি করে পুরস্কার দেওয়া হয়। কিন্তু পুরস্কার বিচারের কাজটি এতই দুরূহ যে, সকলের পক্ষে একমত হওয়া সম্ভব নয়। তবে বিলিতী বইয়ের ইলাস্ট্রেশনের অনুসরণে আঁকা ছবির প্রথম পুরস্কার লাভটা কেমন যেন লাগে।

৩১ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট অবধি অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে জাপানী ক্যালেণ্ডার ও পোস্টারের একটি প্রদর্শনী জাপান কনস্যুলেটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। দেড়শতাধিক ক্যালেণ্ডার ও পোস্টারের এই প্রদর্শনীতে জাপানের আধুনিক মুদ্রণ শিল্প ও ফটোগ্রাফির অনেকগুলি সুন্দর নিদর্শন দেখা গিয়েছিল। সেখানকার বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান প্রচারের জন্য কি ধরনের ক্যালেণ্ডার প্রস্তুত করে থাকেন তা দেখা গেল। প্রদর্শনীতে জাপানী উৎসব, জাপানের মন্দির, জাপানের দৃশ্য, জাপানের শিল্পকলা ও আধুনিক জাপানের জীবনযাত্রার ওপর অনেকগুলি ক্যালেণ্ডার ও পোস্টার ছিল। ছবিগুলি অনেক সময়েই জাপানের প্রথাগত চিত্ররচনারীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তোলা হয়েছে। ফলে যদিও ইউরোপ আমেরিকার যান্ত্রিক সভ্যতার ছাপ এ সবে সুস্পষ্ট, তবু যেটুকু সম্ভব জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ এতে আনবার চেষ্টা করা হয়েছে। মিৎসুবিশি, সুমিতোমো, নিপ্পন কোকান, মিৎসুই, ব্যাঙ্ক অব টোকিও প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ক্যালেণ্ডারগুলি চমৎকার যদিও কোথাও কোথাও চকোলেটের বাক্সের ডিজাইনের মিষ্টত্ব এড়ানো সম্ভব হয়নি। প্রদর্শনীটির নাম জাপানী গ্রাফিক শিল্পের নিদর্শন দেওয়ায় একটু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

*

১ থেকে ৫ আগস্ট কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে সোসাইটি ফর আর্টস অ্যাণ্ড আর্টিস্টসের দ্বিতীয় যৌথ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সাতজন শিল্পীর চব্বিশখানি তেল-রং জল-রং ও ড্রয়িং-এর চব্বিশখানি নিদর্শনের মধ্যে ফিগারেটিভ, আধা ফিগারেটিভ ও অ্যাবস্ট্রাক্ট এই সব রকমের কাজেই পরীক্ষা নিরীক্ষার ছাপ দেখা গিয়েছিল। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর অনুপ্রেরণায় আঁকা ছবি প্রদর্শনীর একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল। এসব ছবি এবং বিশেষ করে ড্রয়িংগুলি বেশীর ভাগই উর্ধক্ষিপ্ত হস্ত, কঙ্কাল, ভূপতিত নগ্নমূর্তি, মাটি ফুঁড়ে ওঠা ফুল, চোখ, কান্না, ভয় ইত্যাদি প্রতীকের সাহায্যে আঁকা—খুব একটা জোরালো নয়। জহর সাহা পোদ্দারের পেন্সিল ও তুলিতে করা সোজাসুজি ফিগারেটিভ কয়েকটি ড্রয়িং তবু মন্দ নয়। গোবিন্দ রায়ের 'নিউ কামার' ও 'অ্যাপীল' ছবির রংয়ের গুণ এবং ফিগারের ট্রীটমেন্ট সংযত ও পরিচ্ছন্ন। কেবল হাংরি জেনারেশন ছবিটি অমৃতবাজারের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় একদা প্রকাশিত কমিক স্ট্রিপের অপার্থিব প্রাণীদের মতন লাগে।

*

৪ তারিখ থেকে সপ্তাহকাল অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে স্বর্গত শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করের ছিয়াত্তরটি জলরং, লিথোগ্রাফ এবং এনগ্রেভিং ও আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং-এর প্রদর্শনী হয়ে গেল। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের ছাত্র হিসেবে শিল্পজীবন তিনি শুরু করেন এবং পরে শান্তিনিকেতনের গৃহনির্মাণের নকসা তৈরী করে খ্যাতি লাভ করেন। ওয়াশ এবং টেম্পারার মাধ্যমে করা অনেকগুলি ছোট ছোট ছবির মধ্যে বিগত-যুগের একটা মিষ্টি গন্ধ পাওয়া গেল। কোন কোন কাজে স্থাপত্যের রেখার পটভূমিকায় ফিগারের পোষাক আসাকের রেখার সামঞ্জস্য সাধন এবং প্রায় শাদার ওপর শাদা রংয়ের প্রয়োগ চমৎকার লাগে। 'মার্বল প্রিজন' 'দি প্রিন্সেস' 'কল অব দি ওয়ার্লড' ইত্যাদি ছবির এই প্রসঙ্গে নাম করা যায়। বংশীবাদনরত পাহাড়ী বালক ছবির রংয়ের ব্যবহার সুন্দর। বিলেতে থাকার সময় ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে নকল করা অনেকগুলি প্রাচীন শিল্প-নিদর্শনের ছোট ছোট কপি উল্লেখযোগ্য। এখানে থাকার সময়েই তিনি কিছুকাল এচিং ও লিথোগ্রাফ শেখেন ও শান্তিনিকেতনে তার প্রবর্তন করেন। এসব কাজের মধ্যে হরিণের পাল, গ্রামের কুকুর, পুতুল, মোগর, দাঁড়ের পুল ইত্যাদি ছবির একটা সুন্দর আমেজ সৃষ্টির চেষ্টা ভাল লাগে। তাঁর বিখ্যাত সাথী ছবিটির ড্রয়িং ও লিথোগ্রাফ উভয়ই প্রদর্শনীতে রাখা ছিল।
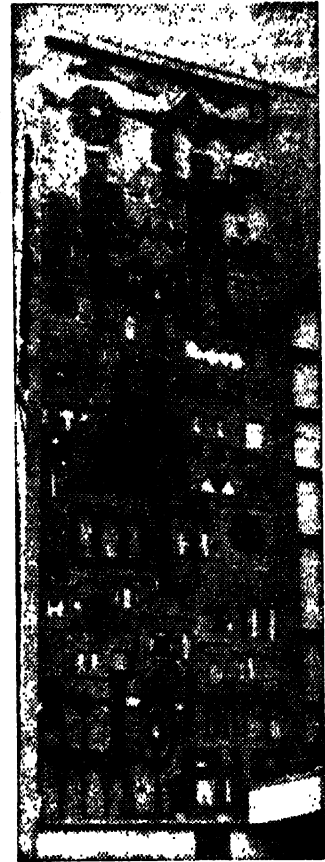
এলোরা চিত্রগৃহের মুরাল
শিল্পী : অনিলবরণ সাহা

স্থাপত্যের ড্রয়িংগুলির মধ্যে কল্যাণী কংগ্রেস, বোকারোর অতিথিশালা, ভারতী সেন সারাভাই-এর বাংলো প্রভৃতি কয়েকটি বাড়ির নকসা ছাড়াও অনেকগুলি প্রস্তাবিত বাড়ির নকশাও ছিল। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভারতীয় ছাপ এই ড্রয়িংগুলিতে সুস্পষ্ট।

●

শিল্পী অনিলবরণ সাহা কিছুকাল হল বেহালার এলোরা সিনেমার গায়ে একটি বৃহৎ মুরাল তৈরী করেছেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মানুষের প্রগতি হল মুরালটির বিষয়বস্তু। দেওয়ালের গায়ে সামান্য উঁচু করে সিমেন্ট জমিয়ে মুরালটি তৈরী হয়েছে। ঘোর এবং হাল্কা ধূসর বর্ণের দুটি টোনের সাহায্যে ষোল ফুট চওড়া ও প'য়তাল্লিশ ফুট লম্বা এই মুরালখানি নিঃসন্দেহে তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ কাজ। ফর্ম এবং ডিজাইনের সরলতা ও ছন্দজ্ঞান লক্ষ্য করার মত। দেওয়ালের অন্য দিকে প্রায় এগার ফুটের মত লম্বা একটি রমণীমূর্তিও চমৎকার কাজ। সমগ্র হলটির আভ্যন্তরীণ ডিজাইনও তিনি সুষ্ঠুভাবে সমাপন করেছেন। কলকাতায় অনেক বড় বড় ধরনের শিল্পীদের যদি এসব বাড়ির সৌষ্ঠব বর্ধনের ভার দেওয়া হয়, তাহলে শিল্পীদের কর্মসংস্থান ও শহরের শোভা বর্ধন এই দুটো কাজই সুন্দরভাবে করা যায়।

—চিত্ররসিক
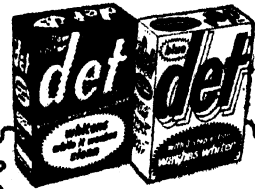
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্বর্ণসুন্দরী এলেন। অন্যদিন কখনও বৈঠকখানায় আসেন না। ছুটির দিনে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে।

আর স্ত্রীকে দেখে কয়েকদিন থেকেই যে কথাটা ঠোঁটের কাছে উঠে আসছে অথচ বলতে পারছেন না সেই প্রস্তাবটা আবার পাড়বেন কিনা ভাবেন।

'কিছু বলছো?' স্বর্ণসুন্দরী বেতের চেয়ারে বসে বললেন।

ভাসাভাসা চোখে চেয়ে থাকেন ভবনাথ স্ত্রীর দিকে।

'বাড়ির কাজ আটকে গেছে না?'

ভবনাথ চুপ করে থাকেন।

'অজিতনন্দনকে বলি আসতে। কয়েক গাছা চুড়ি বেচে দি। অতোগুলো কে পরবে? তারপর তুমি করে দিও. কেমন?'

ভবনাথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। পরদিনই স্যাকরা অজিতনন্দনের ডাক পড়ল। একমাত্র বলাই জানল ব্যাপারটা। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বর্ণসুন্দরীকে বলল, 'কথায় বলে, মেয়েদের যা যায় তা ফেরে না।'

স্বর্ণসুন্দরীও জানতেন। কিন্তু ধমকে উঠলেন, 'তোমাকে যা বলা হয়েছে তাই করো।'

পরদিন বাইশ টাকা ভরি দামে পঁয়ত্রিশ ভরি বালা, মাপচেন, দশগাছা চুড়ি বেচে দিলেন স্বর্ণসুন্দরী। শহরের সেরা স্যাকরা অজিতনন্দন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে ফেলতে গুণে গুণে ময়লা নোট আর সপ্তম এডওয়ার্ড পঞ্চম জর্জের রূপোর টাকায় সাতশো সত্তর টাকা স্বর্ণসুন্দরীর হাতে দিয়ে জ্যালজেলে নেকড়ায় গয়নাগুলো বেঁধে থলিতে পুরে বিদায় হলেন।

(৮)

ছুটির বিকেলে রোদ পড়তেই ভবনাথ বাগানে যান। উঁচু করে সার সার চড়ো বেঁধে পাশে জল যাবার নালা খুঁড়ে আলুর জমি তৈরী করছে জগা। জগা অনেককালের দাগী আসামী। সবশুদ্ধ দশ বছর জেল খেটেছে বৌকে দা দিয়ে কুপিয়ে মারার অভিযোগে। তবে গত তিন-চার বছরে তার এমন পরিবর্তন এসেছে, জেলখানার সমস্ত কাজে এমন যত্ন আর অভিনিবেশ দেখিয়েছে যে তার জেলবাস মকুব করেছেন ভবনাথ আসার সঙ্গে সঙ্গে। কুচকুচে কালো বেঁটে শক্ত চেহারা, শরীরের তুলনায় বেমানান ছোট মাথায় কদমছাঁট চুল, ঠোঁট বন্ধ হয় না, দুটো গজাল দাঁত বেরিয়ে থাকে।

'অটক্কা কোন নাম কৈর না,' জগা বিড়বিড় করে আর মাটি কোপায়। জগার এই বিড়বিড়ানি রোগ ভবনাথ আগেও লক্ষ্য করেছেন। বলেন, 'তোর দেশ কোথায়?'

'আমার দেশ সাহেব ওদা।'

'ওদা কোথায়?'

'কমলাপুরে, ওদা , হাতবাহার'...জগা কোদাল থেকে তার ঘামে ভেজা খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভর্তি মুখখানা তোলে।

'কার গরুতে হাল দিয়েছে? কোন কাম করেনি দেখছি।'

আবার জগা তার ঘামে ভেজা মুখ তোলে। জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করে, গরু-বাছুর অনবোলা জীব।'

অনবোলা মানে বোধহয় যার ভাষা নেই। ভবনাথ একটু অবাক হয়ে জগার দিকে চেয়ে থাকেন। দশ বছর আগে যে কুপিয়ে মেরেছে তার স্ত্রীকে তার গরু-বাছুর সম্পর্কে করুণা তাকে স্পর্শ করে। আদালতে এ ব্যাপারটা বহুবার লক্ষ্য করেছেন ভবনাথ, খুন একটা উত্তেজনার দ্বীপ. কিভাবে লোকে হট করে সেখানে এসে পড়ে তার পেছনে কোন চিন্তা নেই, যুক্তি নেই। কিন্তু এই দ্বীপের আশেপাশেই খেলা করছে মমতার যে বিশাল সমুদ্র তার পরিচয় খুনীদের কথাবার্তায় মাঝে মাঝে ছলকে ওঠে।

'আর কদ্দিন লাগবে? এখন যা হয়েছে ছাড়ান দে। দ্যাখ মা ডাকছে, প্রদীপে তেল ভরতে।'

ধুলো আর চোখের পাতা পর্যন্ত ঘামে ভেজা লোকটা কোদালের বাঁট দিয়ে মাটির ডেলাগুলো পিটিয়ে পিটিয়ে সমান করতে থাকে। এক পশলা বৃষ্টির দরকার, আলুর চারা বসাতে সুবিধে হবে।

মাচায় কচি নধর একটা লাউ ঝুলছিল। ভবনাথ বললেন, 'ওটা কেটে নিয়ে যা।'

আলুর ক্ষেতের পাশ দিয়ে ফুলন্ত কুল গাছ অসংখ্য কুলের কুঁড়ি গিনগিনি হলুদ ফুলের মধ্যে মাথা তুলে আছে। পাবনা বাড়ির পেছনে যে মেঠেল সেই মেঠেলের পুব দিকে জলের গায়েই একটা ঝাঁকালো টোপা কুলের গাছ ছিল। পেল্লাই সাইজের কুল হোত। একবার পায়ে কুলের কাঁটা ফুটে কি তুমুল কান্ড হয়েছিল ভবনাথের অস্পষ্ট মনে পড়ে। ভবনাথ আপন মনে তাঁর কালো চটি থেকে বাঁ পা-খানা মাটির ওপর রাখেন। চল্লিশ বছর আগের সেই ক্ষতর দাগ এখনও মেলায়নি।

নাঃ 'সার্ভিচিউডে' থেকে কিছু খারাপ হয়নি, ভবনাথ বাগান থেকে ফেরার পথে ভাবেন। সার্ভিচিউডে না থাকলে তাঁর বাবা যাবার পর থেকেই পবনা বাড়িতে যে পচন ধরেছে সেই পচা পাঁকে তাঁর পাও গেড়ে যেত। বড়দার অশিক্ষিত রোয়াব আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ভাইপোদের পরস্পর কলহ, শেষ পর্যন্ত লাঠালাঠি, পুলিশ কেস এগুলোর মাঝখানে তাঁকে আর স্বর্ণসুন্দরীকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত। কোথায় বা থাকত দক্ষিণ কলকাতায় বাড়ি অথবা বড়ছেলেকে আই-সি-এস বানাবার স্বপ্ন।

তাছাড়া তাঁর বাপের যে বিশাল পারিবারিক বোধ তা তাঁর নিজের কখনই ছিল না একথা স্ত্রী স্বর্ণসুন্দরীর আপত্তি সত্ত্বেও সত্য। স্বর্ণসুন্দরী মাঝে মাঝে এই রকম একটা আঁচ দেন যে তাঁর স্বামী পাবনা বাড়ির যূপকাষ্ঠে বলি। সামান্য কয়েকজন ভাগ্নে ভাইপোকে ছোটখাটো চাকরী করে দেওয়া ছাড়া ভবনাথ এ বিষয়ে বিশেষ কিছু করেননি, একথা তিনি বিলক্ষণ জানেন। বরং পাবনা বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মগ্লানিও এসেছিল। তাঁর বাল্যকাল, এক বাড়ি লোকের রকমারি বয়সের অভিজ্ঞতার সঙ্গে গা মিশিয়ে যে বড় হওয়া তার পাশে চোঙা টুটুল বাড়ির বড় হওয়ার যে প্রবল ফারাক তা তাঁকে পীড়া দিয়েছিল। এ ব্যাপারে তাঁর বাবার সম্পর্কে একটা গল্প কিছুতেই ভুলতে পারেন না [illegible]

ভাই অঘোর তখন ছোট, আর ঈশান চৌধুরীর প্রথম ছেলে ছ মাসের। ঈশান গিয়েছেন ঠাকুর স্টেটের মোকদ্দমায়। সেখানে টেলিগ্রাম গেল 'চাইল্ড পাস্ড অ্যাওয়ে, কলেরা রেজিং কাম শার্প।' পাবনা বাড়ির থামওয়ালা গেটে জুড়ি লাগবার সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে নেমে তিনি ছুটতে ছুটতে বারান্দা দিয়ে আসেন। ঘরের সামনেই দেখলেন অঘোর গুলি খেলছে। সঙ্গে সঙ্গে ভাইকে কোলে তুলে নিলেন। আনন্দে দু চোখে জল। পরম নিশ্চিন্তে বলে ওঠেন, অঘোর আঃ! তুই আছিস। তাহলেই হল আমার সব আছে।' পর্দার ওপাশে রোরুদ্যমানা স্ত্রীকে বললেন, কেঁদো না, কেঁদো না, এক ছেলে গেছে, আর এক ছেলে হবে। কিন্তু ভাইকে তো আর পেতাম না।'

বাড়ির কাছে আসতেই একটা চেঁচামেচি শুনে ভবনাথ মাঠের দিকে তাকান। চোঙা চীৎকার করত করতে ছুটে আসছে, টুটুল কাঁদছে আর চোখ মুছছে, বুড়ী ঘাড় নেড়ে ধুতি পাঞ্জাবী পরা বডি গার্ডকে কি বোঝাচ্ছে। স্বর্ণসুন্দরীও বারান্দায় বেরিয়ে এসেছেন।

'বাবা, টুটুল পটকা চুরি করেছে। চুরি করে ধরা পড়েছে।' চোঙা চীৎকার করে বললে।

টুটুল সামনে এসে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে। 'আমি আর করব না।' হেড কনস্টেবল খালি বলে যাচ্ছে 'কুছ হয়নি, কুছ হয়নি।'

'কি হয়েছে কি হয়েছে?' স্বর্ণসুন্দরী ঝাঁঝিয়ে বললেন।

বুড়ীই পরিষ্কার করে বলতে পারে ব্যাপারটা। হেডমাস্টার বাবুদের বাড়ি খাওয়া-দাওয়া করে বিকেলের দিকে ভাই-বোনেরা বাড়ি ফেরবার পথে কনস্টেবল দুটিকে বড় রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে পটকার দোকানে গিয়েছিল। বুড়ী তার ভাইদের অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করেছে প্রচুর বাজি বলাইদা কিনে এনেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা গিয়েছে। বুড়ী বলে চোঙাই প্রথমে সামনের ডালাতে সাজানো ছোড়া পটকার স্তূপ থেকে দুটো সরিয়ে নিতে বলে টুটুলকে। আর মন্ত্রমুগ্ধের মতো টুটুল ধীরে-সুস্থে তার মোটা মোটা আঙুল পটকার স্তূপে রেখে একমুঠো পটকা তেমনি ধীরে সুস্থে যেই বুকপকেটে রাখতে গেছে অমনি দোকানদারের এক ছোকরা সন্তর্পণে করে তার হাত চেপে ধরে পটকাগুলো বার করে ফটফট করে কান মলে দিয়েছে।

এইটুকুন বলেই ভাইয়ের অপমানে অপমানিতা বুড়ী প্রায় কেঁদে ফেলে। কিন্তু পরের ঘটনাটা সে আর বলেনি। চোঙার চীৎকারে বড় রাস্তা থেকে কনস্টেবল দুটি ছুটে আসে। এস-ডি-ও সাহেবের ছেলে শোনার পর আর তৎক্ষণাৎ দুটি কনস্টেবলের আবির্ভাবে দোকানদার আতঙ্কে বড় বড় দু ঠোঙা পটকা চোঙার হাতে তুলে দিয়েছে।

ব্যাপারটা মিটে গেছে এবং স্বর্ণসুন্দরীও অদৃশ্য দোকানদারের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কঠিন বাক্য বলে টুটুলের চোখ মুছিয়ে দিলেন। কিন্তু টুটুলের আত্মগ্লানি গেল না। তার বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। দু'মাস আগে ভবনাথের কোর্টে ফাঁসির অর্ডার হয়েছিল বোধহয় সে স্মৃতি এখনও টুটুলের মনে প্রবল। সে রাত্তিরে অন্ধকার মাঠে প্রদীপে ঝলমল বাড়িখানা দেখতে দেখতেও সেই ফাঁসির সম্ভাবনা তার মন থেকে মুছে যায় নি। ফাঁসি কোথায় হবে সে সম্পর্কেও কল্পনা করে নিয়েছিল সে। শোয়ার ঘরে উঁচু কড়ি-কাঠ থেকে টানা পাখা নামিয়ে তার ফাঁসির ব্যবস্থা হয়েছে, তার আগে সে যেমন যেমন দেখেছে তেমনি একটা ছবি ভেসে ওঠে তার মনে—কাছারীতে ভবনাথ হাকিমের চেয়ারে, সে কাঠগড়ায় আর বলাই খাঁকি উর্দি আর জরির টুপি পরে বিকট হাঁক দিচ্ছে—'আসামী হাজির?'

সেদিন সন্ধ্যায় চোঙা মনের আনন্দে পটকা ফুটিয়ে সকলের কানে তালা লাগাবার উপক্রম করল। কিন্তু টুটুল জ্বালাল শুধু রংমশাল।

পরদিন আর একটা পারিবারিক দুর্যোগ আসে। দুর্যোগই বটে! সারা বিকেল স্বর্ণ চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় তুললেন। এমনকি গোপীনাথের ওপর ঝাঝালেন, বলাইয়ের নতুন বউয়ের গল্প একেবারে আমল দিলেন না। জগাকে বললেন, 'তোর ফাঁসি হলেই ঠিক হত।' কমলির মা, ধোপা কেউ এই তোলপাড় থেকে রেহাই পেল না। আদালত থেকে ফিরে ভবনাথ ঘিয়ে ভাজা লুচি আর বেগুন শুকনো লঙ্কা ভাজা খেতে খেতে স্ত্রীর কাছে কি শুনলেন, তারপর তাঁরও স্বাভাবিক স্নিগ্ধ কোমল মুখখানা ভারী থমথম করে।

এই তুলকালামের কেন্দ্রস্থল বুড়ীর রিপোর্ট। বুড়ী তার মাকে এসে জানায় চোঙা জঘন্য কথা তাকে বলেছে।

চোঙা প্রতিবাদ করে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে চড় পড়ে তার গালে। টুটুল লক্ষ্য করলে ঐরকম একটা খানদানি চড় খেয়েও চোঙা কাঁদে না। কিন্তু স্বর্ণসুন্দরীর জেরায় ফুঁপিয়ে ওঠে, 'রতন শিখিয়েছে, একদিন টিফিনে রতন শিখিয়েছে।'

'রতন কে?'

জানা গেল, রতন চোঙার সহপাঠী। সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ হুকুম দিলেন কলকাতায় পড়া চোঙার বন্ধ। বার্ষিক পরীক্ষা দেওয়ার পরই সে টুটুলদের স্কুলে পড়বে।

ভবনাথকে খাবার টেবিলে স্বর্ণ বললেন 'কলকাতাতে বড় স্কুলে পড়ে যদি এইসব শেখে তারচেয়ে পাঠশালাতে পড়াই ভাল।' ভবনাথ সায় দিলেন।

প্রতাপ এবং গৌরী কিন্তু এসব পারিবারিক দুর্যোগে ছিল না। তারা পরিপূর্ণভাবে ছুটি কাটাতে এসেছে। তাছাড়া এমনিতেই সামনের বছরের মাঝামাঝি প্রতাপের বিলেত যাবার পর কলকাতার ডেরা তুলতে হবে। গৌরী কলেজের হস্টেলে যাবে। কাজেই ছুটিটার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে দুই ভাই-বোন। স্বর্ণসুন্দরী ভিড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন তাদের ছোট ভাই-বোনদের। কিন্তু প্রতাপ এলেবেলে-দের নিয়ে যেতে চায়নি। গত দু-তিনবার চূর্ণী নদীতে নৌকোয় পিকনিক, পাখি শিকার—এর কোনটার মধ্যেই তারা ছোটদের ফেলে নি।

সন্ধ্যেবেলায় প্রতাপরা ফেরে। পাশে গৌরী, বাদামী চুল হাওয়ার এলোমেলো। খাটো ফ্রকের নীচে থেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে তার হাঁটা স্বর্ণসুন্দরী মনে মনে তারিফ করেন। বড় মেয়ের মতো এ-মেয়ের জন্যে বোধহয় খুব পণ দিতে হবে না এরকম একটা আশা তাঁর মনের মধ্যে নড়ে-চড়ে। পেছনে লালমোহন সঙ্গে সেই বাখারীর বাতায় সুদক্ষ হকি খেলোয়াড়। লালমোহনের লম্বা লম্বা চোখদুটোর দিকে তাকান আর তার পিতৃত্বে আর একবার ধিক্কার জাগে স্বর্ণসুন্দরীর। কত সহজ ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে যেত, যদি কলকাতায় বাড়ি থাকত কিংবা. .

কালকে প্রতাপ তোমাদের দলে ছোটদের নিও। ওরাও একটু আমোদ আহ্লাদ করুক না।'

কাপড়ের থলি থেকে তিনটে রক্তমাখা তিতির নামায়, বাবার পায়ের কাছে প্রতাপ। চোঙা তার দুঃখ এক মুহূর্তে ভুলে যায়। তিতিরের ঠ্যাং নিয়ে টানাটানি লাগিয়ে দেয়।

দোনলা বন্দুকটা চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে প্রতাপ বললে, 'কাল আমরা যাব গোসাপ মারতে। এই জেলখানার গায়েই। বেটা বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। ওরাও যাবে আমাদের সঙ্গে।

টুটুল মুগ্ধ দৃষ্টিতে বড়দা-কে দেখতে থাকে। ফর্সা রং আরও লালচে দেখায়। পাশে দাঁড়করানো বন্দুক, পায়ের নীচে রক্তমাখা পাখি, তার ঠাকুরমার ঝুলির ডালিমকুমারের মতো লাগে বড়দাকে। কাছে পিঠেই নিশ্চয় দুধের মতো সাদা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। প্রতাপ আগামীকালের অভিযানের প্ল্যান বলতে থাকে তার ছোট ভাই-বোনদের কাছে।

পরেরদিন সারা বিকেল জেলখানায় উপস্থিত হয়ে অপেক্ষা, চোঙার উৎসাহই বেশী। সে সর্বত্র গোসাপের ল্যাজ, গোসাপের জ্বলজ্বলে চোখ দেখে, গোসাপের গন্ধ পায়। দোনলা বন্দুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রতাপ মাঝে মাঝে ফোঁসে, 'চোঙা চুপ কর।' চোঙা সাময়িক চুপ করে আবার চেঁচিয়ে ওঠে, 'ঐযে ঐযে।'

নালা দিয়ে দিয়ে তারা মরাকাটার ঘরের দিকে অগ্রসর হয়। কাল তিতির অভিযানে গৌরীর পা ছড়ে পেকে উঠেছে, সে তাই আসেনি। টুটুল আর বুড়ী শুকনো নালার ভেতর শুয়ে পড়ে, ঘাসের বেগুনি নীল সাদা শুকনো ফুলগুলো জোগাড় করে। যেদিকটায় ছায়া স্যাঁতসেতে সেদিকের ফুলগুলো এখনও অক্ষত।

'মা বলেছে কি জানিস, ভুঁড়িদাকে জেলে দেবে।'

টুটুল অবাক হয়ে তাকায়। 'মা বললে, য্যাদ্দিন থাকলি, খেলিদেলি, যাবার সময় বলবার জানিয়ে গেলি না?'

'আমি জানি, আমাকে বলেছে। কলকাতায় যাবে ভুঁড়িদা বলেছে চুপি চুপি। রাণাঘাট ভাল লাগে না, পাবনা ভাল লাগে না। কলকাতা সবচেয়ে ভাল। সেখানে সবসময় আলো, ট্রাম-বাস। আমিও কলকাতায় যাব বুড়ী।'

'তুই বিয়ে করবি টুটুল? আমি করব না।'

'আমিও না।'

'ধ্যাৎ তুই কি জানিস? বড়দি বিয়ে করে এল, চিনতেই পাচ্ছি না। একগুচ্ছের গয়না, শাড়ি, বাসন। আবার ছোড়দির বিয়ে হবে।'

'বিলেত কেমন রে? বিলেতে কেন লোকে যায়?'

'বিলেতে যায়? বিলেতে সব বড় হবে বলে, আরও টাকা পাবে বলে?

'বাবারও তো টাকা আছে।'

'বাঃ বাড়ি বানাতে হ'বে না।'

'বাবাও তো বাড়ি বানাচ্ছে।'

'বাঃ আরও বড় বাড়ি। তুই কিছু বুঝিস না টুটুল।'

ঠিক এই সময় দুম্ দুম্ করে পর-পর দুটো গুলির আওয়াজ আসে। সঙ্গে সঙ্গে মড়াকাটা ঘরের ড্রেনের পাশে ঝোপের মাঝখানে ঝটাপট আওয়াজ। 'তুই বটে পামর' বলে চোঙা তার ছড়ি শূন্যে ঘুরোতে ঘুরোতে সেদিক দৌড় দেয়। টুটুল আর বুড়ীও নালা থেকে উঠে সামনে দৌড় দেয়।

সামনেই প্রায় তিন ফুট লম্বা ধূসর গোসাপ। লেজটা নড়ছে।

উত্তেজিত চোঙা তিড়িং তিড়িং করে নাচে আর চেঁচায়, 'সাবধান, সাবধান, এখনই থুথু ছিটোবে। থুথু লাগলেই অবধারিত মৃত্যু।' চোঙা তার বাংলা গল্পের বইয়ের মতো কথা বলে।

প্রতাপকে লাগে সত্যিই স্বপ্নের রাজকুমারের মতো। তার কপালের ওপর কোঁচকানো চুল ঘামে ভিজে লেপ্টে আছে। মুখখানা রোদে রাঙা। আলগোছে ধরে থাকা দোনলা বন্দুকের নল থেকে ধোঁয়া বেড়োচ্ছে। পায়ের নীচে শাপ ভূপতিত। পাশেই সেনাপতি হেড কনস্টেবল রামসুভগ সিং।

বুড়ী টুটুলও মুগ্ধ দৃষ্টিতে বড়দা-কে দেখে। আর চোঙা পাগলের মতো চীৎকার করে যায়। 'পামর, তুই বন্দী।' বলে ছড়ি দিয়ে স্থির জীবটার পেটে দুবার খোঁচা দেয়। সরীসৃপটার ঘাড়ে ছ্যাঁদা, সেখান থেকে টপ্-টপ্ করে রক্ত পড়ে শুকনো ঘাসে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে সম্প্রতি স্টার থিয়েটারে দেখা নাটকের একটা লাইন মনে পড়ে যায় চোঙার। আবেগ উদ্বেল কণ্ঠে চোঙা চেঁচায়, 'জাঁহাপনা, বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!'

আধ ঘন্টা পর চোঙার প্রাণেশ্বরকে ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে যায় অরুণ মুচি।

ছুটি বেশ জম-জমাট কাটছিল। হঠাৎ কি হ'ল ভবনাথের পরিবার দুই শিবিরে *ভাগ হয়ে গেল। বড়দের ও ছোটদের এই শিবির থেকে ভবনাথ অবশ্য বাদ। তিনি* কপির ক্ষেত আর বন্দেমাতরম সামলাতে ব্যস্ত। কিন্তু স্বর্ণসুন্দরীও প্রতাপ গৌরীর দলে ভিড়ে গেলেন। রোজ দুপুরবেলা দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়ে চাপা গলায় খবরের কাগজ পড়ার রেওয়াজ শুরু হ'ল। চোঙা কিভাবে হাত গলিয়ে দরজার হুড়কো খুলে ভেতরে ঢুকেছিল। কিছুক্ষণ পরই প্রতাপ তাকে হাত ধরে পাশের ঘরে বার করে দিয়ে কট্-কট্ করে কান মলে দিল। বড়দার এই আকস্মিক নিষ্ঠুরতায় অবাক টুটুল আর বুড়ীকে চোঙাই আশ্বস্ত করলে, 'আমি সব শুনেছি। সব শুনেছি। দারুণ সব অসভ্য কথা লেখা আছে কাগজে।'

বুড়ী আন্দাজে একটা ভয়াবহ ব্যাপার আঁচ করতে পারে। চোঙা তার মনের ভাবটা বুঝতে পেরে তার সামনে আঙুল নেড়ে বলে, 'তুই তো নালিশ করে বালিশ পেয়েছিস। তুই জানিস?

সুজাতা সরকারের চাঞ্চল্যকর মৃত্যুর শুনানী কয়েকদিন থেকে খবরের কাগজের পাতায় ফলাও করে ছাপা হচ্ছে তাই শোনবার জন্যে বড়দের এই রুদ্ধদ্বার ষড়যন্ত্র। চোঙা অলক্ষিতে ঢুকে পড়ে দরজার পাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। কাগজের পাতা মুড়তে গিয়ে প্রতাপের চোখ পড়ে সেদিকে।

'আমরা একটু বললেই খারাপ, না? আর, বড়রা যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে সে বেলায় কিছু হবে না,' চোঙা চীৎকার করে বলে।

'চল, আমরা চূর্ণী নদীতে যাই,' টুটুল বললে।

'চূর্ণী নদী। চূর্ণী নদী। কি আছে সেখানে। ঘোলা জলের ওপর দিয়ে একটা-দুটো নৌকো যাচ্ছে। এই দেখতে এই দুপুরে যাই আর কি। এখানে চিড়িয়াখানা আছে? গন্ডার দেখেছিস, জলহস্তী দেখেছিস?'

টুটুল দমে যায়। সে গন্ডার কিংবা জলহস্তী স্বচক্ষে দেখেনি। কিন্তু বাবার বৈঠকখানায় 'বুক অফ নলেজের' পাতায় ও দুটো জন্তু সে দেখেছে। জলহস্তী বলতেই তো সেই বইয়ের পাতা থেকে বড় বড় দুটো হাঁ মনের মধ্যে ভেসে উঠল। কিন্তু তার সঙ্গে চূর্ণী নদীর কি সম্পর্ক সে বোঝে না। তার স্বপ্নের রাজত্বে এরকম হামলায় মাথা দুলিয়ে প্রতিবাদ করল। 'চিড়িয়াখানা দেখতে আমার বয়ে গেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে চোঙা ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাইয়ের ওপর কিন্তু টুটুলের গায়ে জোর বেশী। মার খেয়ে সে এমনভাবে জাপটে ধরে দাদাকে যে প্রায় এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি। 'মা, টুটুল মেরে ফেলল চোঙাকে,' বুড়ী চেঁচাতে থাকে। স্বর্ণসুন্দরী বেরিয়ে আসেন। বেরিয়ে এসে হাত-পাখার বাঁট দিয়ে দুই ছেলেকে বেশ জোরে কয়েক ঘা বসিয়ে দেন। টুটুল মায়ের আক্রমণে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। চোঙার চোখেও জল। সে *অবস্থাতেই চোঙা তার বাঁ হাতের কড়ে আঙুল টুটুলের কড়ে আঙুলের সঙ্গে ঠেকিয়ে আড়ি করে দিলে।*

বুড়ীর এই ধরণের মারামারি মোটেই পছন্দ নয়। আর চোঙার সব সময় কলকাতা টেনে কথা বলা তার অসহ্য। চিড়িয়াখানায় সেও একবার গিয়েছে, জলহস্তীও দেখেছে। তাতে হয়েছে কী? দুজনের সঙ্গাই ছেড়ে দিয়ে সে ভেতরের বারান্দা পার হয়ে রান্নাঘরের দালানে ওঠে।

নানা রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়ছে। সেদিকে একনজর চেয়ে ক্ষিপ্র গতিতে রোদে দেওয়া স্বর্ণসুন্দরীর কুলের আচারের মস্ত বয়ামে হাত চালিয়ে এক খাবলা আচার তুলে নেয় বুড়ী এবং নিঃশব্দে পাঁচিলের বাঁকে ছায়ায় এসে আঙুল চাটতে থাকে। কিছুক্ষণ পরই দুই ভাইকে সেদিকে আসতে দেখা যায়। 'আমাকে একটু দে-তো।' চোঙা প্রায় হুকুম করে। টুটুল কিছু বলে না। দুজনেই আচার পায় কিন্তু চোঙা চেঁচিয়ে ওঠে, 'ইস্ কি মার্কিক-চোষ, এইটুকুন দিয়েছে।'

'কেন, তোর কলকাতায় যা-না,' বুড়ী বললে।

'যাব তো।'

'হবে না, হবে না, আর যাওয়া হবে না, আমি সব জানি।'

চোঙা দাঁত টিপে ছুঁচলো মুখে দাঁড়ায়, দু-তিনবার চোখের পাতা পিট-পিট করে। বুড়ী দুর্যোগের আভাস লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে সন্ধি করে ফেলে। 'এই নে, এই নে।'

আচারের [illegible] ভাগটাই চোঙাকে দিয়ে দেয়।

চোঙার সব সময় কি করি, কি করি ভাব। কোন একটা কাজ কিংবা খেলা সে বেশীক্ষণ করতে পারে না। ভাই-বোনদের মধ্যে তার ঘুম সবচেয়ে পাতলা। রাত্তিরে খুট্ করে কোথাও শব্দ হলে সে জেগে যায়। টুটুল এদিকে তার দাদা থেকে অন্য রকম। সে কোন জিনিস ধরলে তা থেকে উঠতে চায় না। প্রায় বাড়াবাড়ি লাগিয়ে দেয়। এটা আবার বুড়ীর ভাল লাগে না। টুটুলকে বলে, 'আমার নাম বুড়ী না হয়ে তোর নামই বুড়ো হওয়া উচিত ছিল।'

টুটুল আচারের হাতটা ভাল করে চেটে গেঞ্জির ওপিঠে পুঁছে নেয়। নানার ভীষণ ছুঁচিবাই সেজন্যে এ ব্যবস্থা সেরে রান্নাঘরের দালানে উঠে নানার পিঠ ঘেঁষে বসে। নানা নিজেই চেঁচিয়ে পড়ে কারণ, চেঁচিয়ে না পড়লে বাংলাটা সম্যক বুঝতে পারে না। কানের সঙ্গে কালো কর্ডের সুতো দিয়ে আঁটা চশমার ভেতর থেকে একবার টুটুলের দিকে ফিরে, পড়ে চলে :

পূর্ণ স্বর্ণকুম্ভের উপরে আম্রসার।
শাস্ত্রের বিহিত সব মঙ্গল আচার।।
নানা রঙ্গে নির্মাইল টঙ্গ শতে শতে।
নানা বর্ণে পতাকা উড়িছে প্রতি পথে।।

প্রতি ঘরে শোভা করে সুবর্ণের ঝারা।
নানা রঙে করে লক্ষ লক্ষ চবুতরা।।
নানা রঙে নির্মল আগার সারি সারি।।
জিনিয়া অমরাবতী রম্য বেশধারী।।
ইন্দ্রপুরে যেমন সবার রম্য বেশ।
তেমনি মঙ্গলযুক্ত অযোধ্যার দেশ।।

'গোপীনাথ!' স্বর্ণসুন্দরীর ডাক পড়ে।

গোপীনাথ একটু অবাক হয়। অন্য-দিনের চেয়ে অন্তত আধঘন্টা আগে তার ডাক পড়েছে। জামগাছের গায়ের আর্ধেকটা এখনও ছায়ায় ঢাকেনি। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চশমা খুলতে খুলতে টুটলুকে বলে, 'আজ আর তোমার শোনা হইল না। বাবু আসিয়া গিয়াছেন। লুচি ভাজিতে হইবে।'

ভবনাথের থমথমে মুখখানা দেখে স্বর্ণসুন্দরীর মনে প্রশ্ন করবার ইচ্ছে জেগেছিল, কিন্তু গোপীনাথকে তাড়া লাগাতে লাগাতে ভুলে গিয়েছেন। ভবনাথ চায়ের কাপ খালি করতে করতে বললেন, 'আজ সন্ধ্যের ট্রেনে তোমাকে রেখে আসছি। টেলিগ্রাম এসেছে। শ্বশুরমশাইর শরীর খুব খারাপ।'

এক মুহূর্তে স্বর্ণসুন্দরী অন্ধকার দেখেন। পকেট থেকে ভাঁজ খুলে টেলিগ্রাম-খানা টেবিলে রাখেন। স্বর্ণসুন্দরী সেদিকে তাকান না।

রাত ন'টায় যখন ভবনাথ স্বর্ণসুন্দরী কলকাতায় অক্ষয় বসুর আগাগোড়া মার্বেল মোজাইক করা রসা রোডের বাড়িতে এসে পৌঁছলেন তখন তৎকলীন নামজাদা সাহেব ডাক্তার ডেনাম হোয়াইট এসেছেন। অক্ষয় বসু অচেতন। ডাক্তার রক্তের চাপ, বুক পরীক্ষা ইত্যাদি এসব ক্ষেত্রে যা যা করণীয় সব করলেন। অক্ষয় বসুর ছোট জামাই গগন মিত্তির যাকে বিলেত থেকে একাউটেন্সী পাশ করিয়ে ঘরজামাই করে রেখেছেন, তিনি ডাক্তারের আশেপাশে গম্ভীর মুখে ঘোরাফেরা করছেন। ডাক্তার চলে গেলেই দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'স্কাউন্ড্রেল।'

ভবনাথ অবাক হয়ে চাইতেই বললেন, 'নবা স্কাউন্ড্রেলটার কথা বলছি। আটটা বছর তো বাপের হোটেলে কাটিয়ে দিল বিলেতে। এখন বাপ মর-মর। টেলিগ্রাম করা হয়েছে। কি জবাব দিয়েছে জানেন? বলেছে একটা পার্ট টু পরীক্ষা বাকী আছে। সেটা হলেই দুমাস পর দেশে ফিরবে।'

'কবে থেকে স্ট্রোক হয়েছে?'

'এটা তো ঠিক স্ট্রোক না, মানসিক ডিপ্রেশান।'

ভবনাথ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ডাক্তার কি বললেন?'

'ব্যাটার ডাট কি! চৌষট্টি টাকা ফি নিলে। বললে তো রিকভারির চান্স আছে।'

পরদিন সকাল আটটায় প্রসিদ্ধ হোমিও-প্যাথ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এলেন স্বর্ণসুন্দরীর মায়ের ইচ্ছায়। বাড়িতে আরও আত্মীয়-স্বজনের আগমন শুরু হয়েছে। তাঁদের চা-পান জলখাবার জোগাড় দিতে দিতেই স্বর্ণসুন্দরীর সময় কেটে যাচ্ছে। একবার বাপের কাছে বসবার ফুরসতই পাচ্ছেন না। তাছাড়া তাঁর সচেতন মন অস্বীকার করলেও অক্ষয় বসু যে তখন প্রায় আর এক লোকের বাসিন্দা তা তিনি আঁচ করতে পারছিলেন। দোতলায় ইটা-লীয়ান মার্বেলে মোড়া মস্ত শোবার ঘর-খানার সংলগ্ন ব্যালকনি ছুঁয়ে আছে রাস্তার ঝাড়ালো তরুণ সবুজ দেবদারু। দোতলা পাঞ্জাবী বাসগুলো গুম্ গুম্ শব্দ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। স্বর্ণসুন্দরীর ছোট বোন তারা বা তারাসুন্দরী ছুটে ছুটে ঘরময় কাজ করে বেড়াচ্ছে, তার বিশাল গতরখানা নিয়ে। কখনও অচেতন বাপের মাথা টিপতে বসছে, কখনও দিদির সঙ্গে উঁচু গলায় চেঁচিয়ে তার শাশুড়ীর সাম্প্রতিক ষড়যন্ত্রের কাহিনী বর্ণনা করছে, কখনও ভবনাথকে ঠাট্টা করছে, 'আপনি যে দাদাবাবু সেইরকম ছোকরাই থেকে গেলেন। এখনও যে বিয়ের পিঁড়িতে বসানো যায়।' মস্ত কড়াইতে পাঁচটাকা সেরের বিশুদ্ধ গাওয়া ঘিয়ে লুচি ভাজা হচ্ছে। সারা বাড়িটা ওষুধ, ফিনাইল আর গাওয়া ঘিয়ের গন্ধে ম-ম করছে। এর মাঝখান দিয়ে মৃত্যু আসছে ভবনাথ নিশ্চিতভাবে টের পান।

গগন মিত্তির প্রচণ্ড আশাবাদী। 'আমি বলছি বাবা সেরে উঠবেন।' ক্রমাগত বলে যাচ্ছেন। 'আমি ডেনহাম হোয়াইটকে বলেছি...আমি দেখেছি এইসব ব্লাডপ্রেসার কেসে......আসলে নার্ভাস টেনশান ঐ স্কাউন্ড্রেলটার জন্যে'......এরকম কথা উঠতে বসতে বলে যেতে থাকেন।

স্বর্ণসুন্দরী আপত্তি করেন, 'নব হয়ত ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারে নি।'

'তোমরা বড়দি আদর দিয়ে দিয়ে ভাইটার মাথা তো খেয়েছো।' গগন মিত্তির বললেন।

সারা বাড়ি অনেক লোকজন, কিন্তু একজনকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ফ্যাক-ফেকে ফর্সা ছোট্ট শরীর হেমাঙ্গিনী স্বামী অসুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে শয্যা নিয়েছেন, প্রায় তিনদিন অনাহারে। প্রাণপণে বৈদ্যনাথ বিশ্বনাথ মা কালী ইত্যাদি যত দেবদেবীর নাম মনে পড়ে সবাইকে ডেকে যাচ্ছেন অহোরাত্র। কিন্তু কিছু হবার নয়। ডেনাম হোয়াইট প্রতাপ মজুমদার বাবা বিশ্বনাথ মা কালী কেউ অক্ষয়কুমার বসুর জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন না। তিনদিন আগে যেমন চিত হয়ে শুয়েছিলেন দুটো বালিশের ওপর তাঁর মাথা আর বিশাল শরীর নিয়ে ঠিক তেমনিভাবে শুয়ে থাকলেন অক্ষয় বসু।

আর যত দিন যায় ততই মৃত্যুর অনিবার্যতা সম্পর্কে সকলের দ্বিধা কেটে যেতে থাকে। ডেনাম হোয়াইটের পতন হয়েছে, তাঁর ওষুধে কিছুই হয় নি। প্রতাপ মজুমদারও তথৈবচ। কাজেই তাঁদের সমর্থকদের আর কিছু করণীয় নেই। আর আলোচনা করে জলখাবারের ওপর সন্ধ্যে গুলজার করে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। খালি হেমাঙ্গিনী তাঁর ভগবানকে ছাড়লেন না। তিনি তাঁর শীর্ণ দেহে কত-গুলো নাম বারংবার আবৃত্তি করে মৃত্যুর দ্বার বন্ধ করে দাঁড়াবেন। এভাবে চার পাঁচদিন যাবার পর ভবনাথ বুঝতে পারলেন না তাঁর কী করণীয়। আর ছুটি নেই, ফিরতেই হবে। তাঁকে অবশ্য বেশী ভাবতে হয় নি। সেদিন ভোরবেলাতেই স্বর্ণ-সুন্দরী স্বামীকে কর্মস্থলে পাঠিয়ে দিলেন।

নব-র বিলেতে অবস্থান নিয়ে সারা-বাড়ি আলোচনায় সরগরম। গগন মিত্তির তো 'স্কাউন্ড্রেল' বা 'রাসকেল' ছাড়া তার উল্লেখ করে না। সে যে ইংরেজ মহিলাদের নিয়ে বেলেল্লাগিরি করে বেড়াচ্ছে এরকম কথা-বার্তাও শোনা যায়। আসলে নব একটু আরাম চায়। এক ছেলে হওয়ার ফলে তাকে নিয়ে অনেক প্রত্যাশা, অনেক স্বপ্ন। সেসব বাদ দিয়ে নিরুপদ্রবে সাত আট বছর বিলেতে কাটিয়ে দিয়েছে, এরকম আরও কয়েকটা বছর কাটিয়ে দিলে মন্দ কি? আর মহিলাদের ব্যাপারেও সে কোনরকম ঝামেলা চায় না। মহিলাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশতে গেলেই তাদের তেল দিতে হবে, এরকম অভিজ্ঞতা নব সঞ্চয় করেছে। আর কোনরকম তেল দেওয়া নব-র পোষাবে না। সম্প্রতি এখানে তার টেনিস খেলার খুব তারিফ হয়েছে। একটা কাউন্টি প্রতি-যোগিতায় সেমিফাইনালে ওঠার পর তার 'ব্যাকহ্যান্ড স্ট্রোকের' তারিফ কাগজে বেরিয়েছে। সেটা টুকরো করে কেটে নব তার ফাইলে রেখেছে। আসলে বাবার অসুখের চিঠি পেয়ে দেশে ফেরার মনস্থির করতে না পারার প্রধান কারণ টেনিস ফাইনাল। তারপর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আল্পস পাহাড়ে ঘোরার একটা প্ল্যান আছে। ইউরোপে এতদিন থেকেও এ ব্যাপারটা সে করে উঠতে পারে নি। নব-র স্থির বিশ্বাস তার বাবা মাস দুই অন্তত টিঁকে থাকবেন।

মাঝখানে একদিন জ্ঞান হয়। অক্ষয় বসু কয়েকবার মাথা নাড়ালেন, চোখ খুলেলেন, জল চাইলেন। সন্ধ্যেবেলায় [illegible] উঠেও বসলেন। পায়ের কাছে স্বর্ণসুন্দরী বসেছিলেন, ঘরে আলো জ্বালা হয়নি। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভবনাথ ফিরে গেছে তো?'

পরের দুদিন স্বর্ণসুন্দরী সর্বক্ষণ বাপের সঙ্গে থাকেন। অক্ষয়বাবু মাঝে মাঝে বলেন, 'তোদের মা-কে একটু খেতে বল।' কয়েকদিন প্রায় অনাহারে থাকার পর হেমাঙ্গিনী ভাত নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করেন। স্বর্ণসুন্দরী বাপকে উষ্ণ জলে স্পঞ্জ করিয়ে সারা গায়ে পাউডার মাখিয়ে একটা হাতকাটা জেল্লাদার গরদেব পাঞ্জাবি পরিয়ে উঁচু বালিশের ওপর মাথাটা তুলে যখন বসিয়ে দিলেন তখন ঠিক মনে হচ্ছিল এযাত্রা কাটিয়ে উঠলেন।

এমনকি মেয়ের সঙ্গে তাদের নতুন বাড়ির কথাও তুললেন। বাড়ির একতলার ছাত হয়ে গেছে শুনে আনন্দে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেললেন। 'প্রতাপের যাওয়া ঠিক?' জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ বাবা, জাহাজে টিকিট কাটা হয়েছে।' একটু থেমে বললেন স্বর্ণসুন্দরী। 'আমরা তো ছেলেদের ভালর জন্যেই করি। ছেলেরা তার কতখানি বোঝে ভগবান জানেন!'

অক্ষয় বসু ভুরু কুঁচকালেন। নব-র প্রসঙ্গ তিনি তুলতে চান না। তাছাড়া হয়ত এই মুহূর্তে তার দেশে না ফেরার কোন সংগত কারণ থাকতেও পারে। ধীরে ধীরে বললেন, 'ও নিয়ে ভাবিস নে, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অক্ষয় বসুর মৃত্যু এল সহসা, যখন সবাই ভাবছেন তিনি আরোগ্যের পথে, যখন গগন মিত্তির আবার এই রোগ ও রোগমুক্তির ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করছেন গরম ফুলকো লুচি আলুভাজার সঙ্গে, যখন সকলেই কমবেশী মনে করছেন সেবা ও পরিশ্রমের এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় তাঁরা উত্তীর্ণ সেইরকম পারিবারিক মানসিকতার মধ্যে আবার জ্ঞান হারালেন। সেদিনই ভোর চারটেতে যাত্রা করলেন অচেতন অক্ষয় বসু অন্য লোকে।

পায়ের কাছে কুঁকড়ে মুকড়ে আধ-জাগা আধ শোওয়া অবস্থায় শুয়েছিলেন স্বর্ণসুন্দরী। মৃত্যুর মুহূর্তে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কান্নার রোলে ঘুম ভাঙল। আর মৃত বাপের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তিনি তাঁর জীবনের এক বিরাট অধ্যায় শেষ করলেন। কান্নার মধ্যে দিয়ে যে কথাটা তাঁর স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল তাঁর এত বছরের জীবন আসলে তাঁর বাবাকে-নিয়ে। এতদিন পর তাঁর স্বামী ভবনাথ আর ছেলেপেলে নিয়ে সংসার করতে স্বর্ণসুন্দরী রাণাঘাট ফিরলেন।

(ক্রমশঃ)
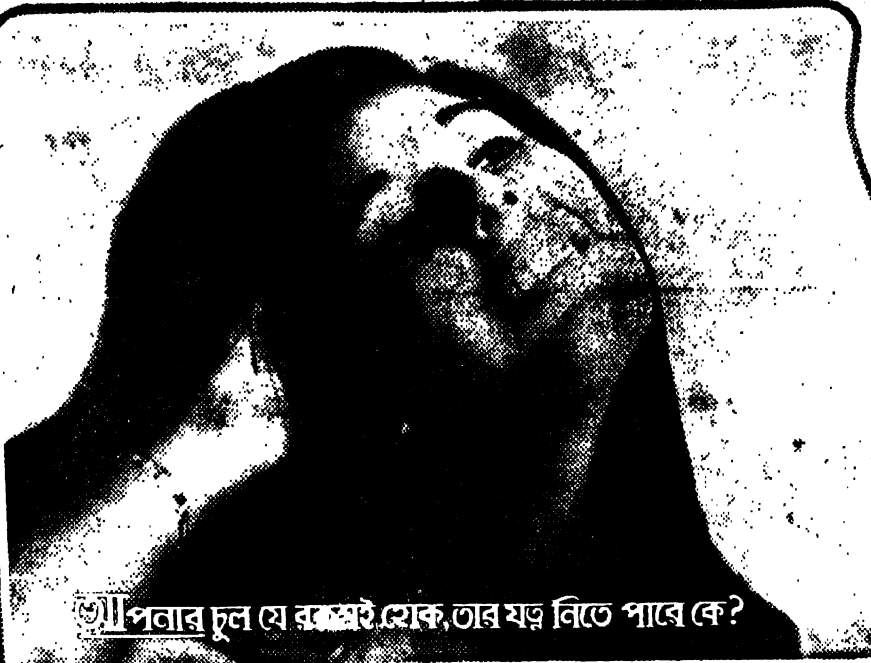
নভশ্চর স্কট (বামে) চন্দ্রে বেড়াবার গাড়ীতে বসে আছেন, আর এসময় আরউইন প্রস্তুত হচ্ছেন স্কটের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য (৩১শে জুলাইয়ের ঘটনা)। ডানে 'ফ্যাল্‌কনে'র অংশবিশেষ দেখা যাচ্ছে।

অ্যাপোলো—১৫ কেন ? মহাকাশ-অভিযান ও ভরহীনতার সমস্যা

ইতিমধ্যে খবরের কাগজের বিবরণ পড়ে সবাই জেনে গিয়েছেন যে, অ্যাপোলো-১৫ অভিযান সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছে। এবারের অভিযান মোটামুটি নির্বিঘ্ন ছিল। সামান্য কিছু যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক গোলযোগ ছাড়া এবারের অভিযানের কোনো পর্যায়েই উৎকণ্ঠিত হবার মতো কোনো কারণ ঘটে নি। তবে এই যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক গোলযোগগুলোকে সামান্য বলা হল পৃথিবীর মাটিতে অবস্থানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। পৃথিবীর মাটিতে চলমান কোনো যানে যে-সব গোলযোগকে সামান্য মনে করা হয়, মহাশূন্যের এলাকায় তা থেকেও বৃহৎ বিপদ ঘটে যেতে পারে এবং কোনো ক্রমেই উপেক্ষনীয় নয়। সুখের বিষয়, এবারকার অভিযানে বৃহৎ কোনো বিপদ ঘটে নি, এমন কি তার কোনো সম্ভাবনাও কখনো উপস্থিত হয়নি। ন্যাসা-র (ন্যাশনাল এরোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ-গবেষণা ও মহাকাশ-অভিযান যে সংস্থাটির দ্বারা পরিকল্পিত ও পরিচালিত) বিজ্ঞানীরা এবারের অভিযানে পরিপূর্ণ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা এই কৃতিত্বের জন্যে ন্যাসার বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

অথচ এবারকার অভিযানই ছিল সবচেয়ে বিপদসঙ্কুল। পৃথিবী থেকে যাত্রা করে চাঁদের কক্ষ পর্যন্ত পথটি এবারেও আগের তিনটি অভিযানেরই অনুরূপ। এই পথের বিপদ আগের তিনটি অভিযানে যতোখানি ছিল এবারেও তার চেয়ে বেশি নয়। আসলে বিপদ ছিল তার পরের পর্যায়ে, চাঁদের কক্ষ থেকে চাঁদের মাটিতে অবতরণে। অ্যাপোলো-১১ ও অ্যাপোলো-১২ অভিযানে চাঁদের মাটিতে নামা হয়েছিল সমতল এলাকায়—এই অবতরণে, যে-অর্থে এবারের অবতরণে বিপদ দেখা দিতে পারত সেই অর্থে, বিপদ ছিল না। অ্যাপোলো-১৪ অভিযানে অবতরণ করা হয়েছিল ফ্রা মরো এলাকায়। এই এলাকাটি মোটেই সমতল ছিল না এবং অবতরণে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা ছিল। মনে রাখা দরকার চাঁদের মাটিতে অবতরণ করতে হয় অবতরণের বিপরীত দিকে রকেট চালু করে ব্রেক হিসেবে কাজ করিয়ে। চন্দ্রযানটি নেমে আসে হেলিকপ্টারের মতো সিধেভাবে। চাঁদের মাটির কাছাকাছি এসে যদি দেখা যায় যে চন্দ্রযানটি যেখানে নামছে সেখানে প্রকাণ্ড একটি পাথরের চাঁই পড়ে আছে, তখন আর একটু সরে গিয়ে নামবার উপায় নেই। চন্দ্রযানটিতে ফিরে আসার মতো জ্বালানী মজুত থাকে বটে কিন্তু তা প্রয়োজনীয় পরিমাণের চেয়ে এত বেশি নয় যে চন্দ্রযান চাঁদের মাটি স্পর্শ করার আগেই তাকে আবার আকাশে উঠিয়ে এনে, ভালো করে পর্যবেক্ষণ করার পরে আবার নামার চেষ্টা করা যেতে পারে। মহাশূন্যে বাড়তি বোঝা বর্জন করা হয়, কারণ সামান্য একফোঁটা জলও যদি পৃথিবীর মাটি থেকে আকাশে তুলতে হয় তার খরচ মোটেই সামান্য নয়। যাই হোক, ধরেই নিতে হয় যে, চন্দ্রযান প্রথম বারেই চাঁদের মাটি স্পর্শ

করবে। অতএব অবতরণের স্থানটি এমনভাবে নির্বাচিত করতে হয় যে, তার চারদিকে যতোই পাহাড় থাকুক আর খাদ থাকুক অবতরণের নির্দিষ্ট এলাকাটি হবে সমতল। এজন্যে আগে থেকেই অবতরণের এলাকার আলোকচিত্র নেওয়া হয়। কিন্তু এখানেই হয় মুশকিল। অনেক উঁচু থেকে নেওয়া আলোকচিত্র যতোই স্পষ্ট হোক, তাতে মিটার পাঁচেক উচু একটা পাথরের হদিশ পাওয়া শক্ত। তাই ফ্রা মরোর মতো এলাকায় যা এবারের অভিযানের হ্যাডলে রিলের মতো এলাকায় অনেকখানি ঝুঁকি নিয়েই নামতে হয়। ফ্রা মরোর চেয়েও এবারের ঝুঁকি ছিল অনেক অনেক বেশি। তাই এবারের অভিযানই ছিল চারটি অভিযানের মধ্যে সবচেয়ে বিপদসঙ্কুল।

এতই যেখানে বিপদ, এমন এলাকায় নামার দরকারটা কী? দরকারটা হচ্ছে, লন্ডনের 'ইকনমিস্ট' পত্রিকা মন্তব্য করেছেন, অ্যাপোলো অভিযানের সার্থকতা প্রমাণ করা। খোদ আমেরিকায় এবং আমেরিকার বাইরে সারা বিশ্বে বহু বিজ্ঞানী অ্যাপোলো অভিযানের সার্থকতা সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলেছেন। চাঁদের মাটিতে তিন-তিনবার মানুষ নামাবার পরেও চাঁদের ব্যাপারটা কী বা আমেরিকার বিজ্ঞানীরা আরো বেশি জানতে পেরেছেন তা বলা চলে না। দু-বছর আগে 'ন্যাসা' যে কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন তদনুসারে হ্যাডলে রিল ছিল শেষতম অভিযানের (অ্যাপোলো-২০) অবতরণ-স্থল। পর পর কয়েকটি সফল অভিযানে পর্যায়ক্রমে চাঁদের বিভিন্ন এলাকায় অবতরণের পরে হ্যাডলে রিল হবে লোমহর্ষক উপসংহার। কিন্তু সেই হ্যাডলে রিলকেই কুড়ি থেকে পনেরোয় এগিয়ে আনতে হয়েছে, নতুবা অ্যাপোলো অভিযানের মাধ্যমে চাঁদ সম্পর্কে যা জানার ছিল তা জানা যাচ্ছে না—অর্থাৎ, অ্যাপোলো অভিযানের সার্থকতা প্রমাণ করাই শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অতঃপর আর দুটি মাত্র অভিযান বাকি থাকছে—অ্যাপোলো-১৬ ও অ্যাপোলো-১৭। অবতরণ-স্থলের দিক থেকে এই দুটি অভিযানের তেমন আকর্ষণ নেই। অ্যাপোলো-১৬ অভিযানের অবতরণ-স্থল নির্ধারিত হয়েছে চাঁদের দেকার্ত এলাকা। এটি অপেক্ষাকৃত 'নবীন', অ্যাপোলো-১১ অভিযানে প্রশান্ত সাগরে নামার পরে এই এলাকা থেকে নতুন কোনো নমুনা সংগৃহীত হবার আশা কম।

হ্যাডলে রিলকে এত আগেই অবতরণ-স্থল হিসেবে নির্বাচিত করার তাগিদটা কিসের? আগে বলেছি, আজ থেকে ৫০০ কোটি বছর আগে পৃথিবী ও চাঁদ কঠিন অবস্থা ধারণ করেছিল। কিন্তু তারপর পালোট ঘটে গিয়েছে। সে-তুলনায় পৃথিবীর ইতিহাস অনেক বেশি শান্ত, অনেক বেশি সৌন্দর্যমণ্ডিত। পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে সমুদ্র, নদী, গাছ, মাছ, পশুপাখি ও শেষপর্যন্ত মানুষ। দিনে দিনে অপরূপ হয়ে উঠেছে পৃথিবী। কিন্তু চাঁদ? অ্যাপোলো-১১ ও অ্যাপোলো-১২ অভিযানের নভশ্চররা চাঁদের যে-এলাকায় নেমেছিলেন সেখানে ছিল বিরাট এলাকা জুড়ে জমে যাওয়া লাভা প্রবাহের সমতল। মনে হয় জন্মের পরে অর্ধেকটা সময়ই চাঁদের কেটেছে প্রচন্ড একটা লন্ডভন্ডের মধ্যে। কঠিন পাথর পরিণত হয়েছে তরল লাভাস্রোতে এবং চাঁদের বিরাট সমতল এলাকা জুড়ে জমে কঠিন হয়ে আছে।

এ-অবস্থায় প্রথম দুটি অভিযান থেকে যেসব পাথরের নমুনা সংগ্রহ করে আনা হয়েছিল সেগুলো ছিল অধিকাংশই এই লন্ডভন্ড কান্ড হয়ে যাবার পরে। বয়স আড়াইশো কোটি থেকে সাড়ে তিনশো কোটি বছরের বেশি নয়। কিন্তু তারই মধ্যে ছিটেফোঁটা পাথরের সন্ধান পাওয়া গেল যার বয়স পাঁচশো কোটি বছর। অর্থাৎ এই হচ্ছে আদি পাথর, জন্মের সময়কার পাথর। বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, চাঁদের এমন কোনো এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হোক যেখানে আদি পাথর পাওয়া যেতে পারে। তাঁরা ধরে নিলেন চাঁদের পর্বতগুলোতে নিশ্চয়ই লন্ডভন্ডের ছাপ পড়ে নি, চাঁদের পর্বত থেকেই পাওয়া যাবে আদি পাথর। ফ্রা মরো এলাকায় অ্যাপোলো-১৪ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল এই আদি পাথর সংগ্রহ করা।

ফ্রা মরো এলাকা থেকে নমুনা এসেছে যতোখানি আশা করা গিয়েছিল তার চেয়েও কম। কিন্তু তার চেয়েও দুঃসংবাদ, পাথরগুলো ছিল সবই 'নবীন'। কোনোটাই আদি পাথর নয়। ৪০০ কোটি বছর বয়সের পাথরও পাওয়া যায় নি।

এ থেকে যে ছবিটি বেরিয়ে আসে তা বিজ্ঞানীদের কাছে অন্তত গ্রহণযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে ধরে নিতে হয় যে জন্মের পরে প্রায় ৮০ কোটি বছর চাঁদে কোনো উৎপাত ছিল না, শান্তশিষ্ট এই উপগ্রহটি নির্বিবাদে পাক খেয়ে গিয়েছে। তারপরেই আচমকা কোনো কারণ ছাড়াই শুরু হয়েছে তোলপাড় ও লন্ডভন্ড ঘটার একটা ব্যাপার। তৈরি হয়েছে চাঁদের উপরিতলে খাদ ও গহ্বর। অতএব আদি পাথরের নমুনা বিজ্ঞানীদের চাই-ই চাই। কোথায় তার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে? পরবর্তী অভিযানগুলোতে যেসব অবতরণ-স্থল নির্ধারিত হয়েছে তার মধ্যে একমাত্র হ্যাডলে রিল-ই একমাত্র সম্ভাব্য স্থান। শেষতম অভিযানে, তাকেই অনেকখানি এগিয়ে আনা হল।

হ্যাডলে রিল থেকেও যদি আদি পাথরের সন্ধান না পাওয়া যায়? তাহলে অন্তত বর্তমান অ্যাপোলো পর্যায়ে সম্ভাব্য দ্বিতীয় স্থান নেই।

টেলিভিশনে চাঁদ ছেড়ে আসার দৃশ্য

এবারের অ্যাপোলো অভিযানে একটি নতুন ব্যাপার ঘটেছে। চন্দ্রযানটি যখন চাঁদের মাটি ছেড়ে চাঁদের আকাশে উঠছিল তার পুরো দৃশ্যটি পৃথিবীর মানুষ টেলিভিশনে দেখেছে। নভশ্চররা যে গাড়িতে চেপে চাঁদের মাটিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন তার সামনের দিকে ছিল টেলিভিশন ক্যামেরা। গাড়িটি চাঁদের মাটিতেই রেখে আসা হয়েছে, সেই সঙ্গে ক্যামেরাটিও। এই ক্যামেরাতেই চন্দ্রযানের চাঁদের মাটি ছেড়ে আসার দৃশ্য ধরা পড়ে। শোনা যাচ্ছে এ-ঘটনার দিন তিনেক পরে যে চন্দ্রগ্রহণ হয়ে গেল তার দৃশ্যও এই টেলিভিশন ক্যামেরার মারফৎ দেখা গিয়েছে। ভাবতেও অবাক লাগে। খোদ চাঁদের মাটিতে চন্দ্রগ্রহণের দৃশ্য পৃথিবীতে বসে দেখা!

চাঁদের গাড়ি

মানুষ যেদিন প্রথম চাঁদের মাটিতে নেমেছিল সেদিন চাঁদের মাটিতে ঘুরে বেড়াবার জন্যে ও যন্ত্রপাতি বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তাকে নির্ভর করতে হয়েছিল নিজের পায়ের ওপরে। অ্যাপোলো-১৪ অভিযানে ছোট একটি ঠেলাগাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বটে কিন্তু ঘুরে বেড়ানো সেই পায়ে হেঁটেই। অ্যাপোলো-১৫ অভিযানে মানুষ চাঁদের মাটিতে ঘুরে বেড়িয়েছে মোটরগাড়িতে, নাম 'লুনার রোভার ভেহিকল' (এল আর ভি) বা চাঁদে ঘুরে বেড়াবার যান।

এই যানটি লম্বায় সাড়ে তিন মিটারের সামান্য বেশি, চওড়ায় দুই মিটারের সামান্য কম, চাকা থেকে চাকার দূরত্ব (একই সারির) সোয়া দুই মিটারের সামান্য বেশি। এই যানে ওজন বহন করা যেতে পারে ৪৫৪ কিলোগ্রাম, যানের ওজনের প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ। সাজসরঞ্জাম সমেত এক-একজন নভশ্চরের ওজন প্রায় ১৮২ কেজি, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আয়োজনের ওজন ৫৯ কেজি। বাকি থাকে প্রায় ৩২ কেজি। গাড়িতে এই ওজনের পাথর বয়ে আনা যেতে পারে। যানটি চালিত হয় প্রত্যেকটি চাকার সঙ্গে যুক্ত বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে। সিকি অশ্বশক্তির মোটরগুলির শক্তি সরবরাহ হয় দুটি ৩৬ ভোল্টের ব্যাটারি থেকে। প্রত্যেকটি ব্যাটারি ১২১ অ্যাম্পিয়ার ঘন্টার ধারণক্ষমতাবিশিষ্ট। ব্যাটারি থেকে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ হয়েছে তা জানবার একটি বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

এই দুটি ব্যাটারির সাহায্যে যানটি মোট ৯১ কিলোমিটার পর্যন্ত চলতে

যানটিকে চন্দ্রযানের মাল মজুদ করার জায়গায় ভাঁজ করে রাখা হয়েছিল। যানটি মাঝ-বরাবর ভাঁজ হয়ে যায় আর চারটি চাকাও ভাঁজ হয়ে পড়ে। স্প্রিং-এর সাহায্যে যানটির ভাঁজ খোলা হয়।

যানটিকে স্টীয়ার করা হয় সামনের ও পিছনের উভয় সারির চাকা দিয়েই। মোটর-গাড়ির মতো স্টীয়ারিং হুইল এই যানে নেই, আছে এরোপ্লেনের মতো একটি দণ্ড। যদি কোনো এক সারির স্টীয়ারিং ব্যবস্থা অকেজো হয়ে পড়ে তাহলে অকেজো ব্যবস্থাটিকে বিচ্ছিন্ন করা চলে এবং বাকি অন্য সারির স্টীয়ারিং ব্যবস্থা দিয়েই কাজ হতে পারে।

যানের চাকাগুলো তারের জাল দিয়ে তৈরী। প্রত্যেকটি চাকা ওডোমিটারের সঙ্গে যুক্ত। এ থেকে প্রত্যেকটি চাকার বেগ এবং প্রত্যেকটি চাকার দ্বারা অতিক্রান্ত দূরত্বের মাপ পাওয়া যায়।

এ-ধরনের তিনটি যান তৈরি করতে খরচ পড়েছে প্রায় ৪০ মিলিয়ন ডলার বা ৩০ কোটি টাকা। একটি যান চাঁদের মাটিতেই রেখে আসা হয়েছে। বাকি দুটি যান পরবর্তী দুটি অ্যাপোলো অভিযানের জন্যে।

মহাকাশ-অভিযান ও
ভরহীনতার সমস্যা

ভোস্তোক-১ ব্যোমযানে গাগারিন আকাশে উঠেছিলেন ও কক্ষপথে পৃথিবীকে একটি পাক দিয়েছিলেন মাত্র দশ বছর আগে। এই দশ বছরে স-মনুষ্য মহাকাশ-অভিযান বহুদূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। তবে মহাশূন্যের ভরহীন অবস্থার সঙ্গে মানুষের কতখানি খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা আছে সেটাই এখনো প্রধান গবেষণার বিষয়। বিশেষ করে সয়ুজ ব্যোমযানের তিন-জন সোভিয়েত নভশ্চর মারা যাবার পরে এই বিষয়টিই মহাকাশ-বিজ্ঞানীদের বিশেষ ভাবিত করে তুলেছে। অ্যাপোলো-১৫ অভিযান শুরু হবার ঠিক আগেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল না হওয়া পর্যন্ত অ্যাপোলো-১৫ অভিযান স্থগিত রাখার কথাও উঠেছিল। কিন্তু সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা যখন মত প্রকাশ করেন যে, অ্যাপোলা-১৫ অভিযান স্থগিত রাখার কোনো কারণ ঘটেনি তখন অভি-যানের সময়-তালিকা ঠিক ঠিক মেনে চলা হয়। কিন্তু এখনো পর্যন্ত বাইরের বিশ্বকে পুরোপুরি জানানো হয়নি এই দুর্ঘটনার মূলে কারণগুলো কী? বলা হয়েছে ছিদ্র-পথে কক্ষের অক্সিজেন বেরিয়ে যাবার ফলে কক্ষের চাপ কমে গিয়েছিল আর তারই ফলে এই মৃত্যু। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, ছিদ্র-পথ হল কী করে? এটা কি কোনো টেক্-নিকাল ত্রুটি? জবাব যদি হয়, হ্যাঁ—তাহলে অবশ্য মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারেন। কেননা টেকনিকাল ত্রুটি সারিয়ে নেওয়া মানুষের সাধ্যের মধ্যে। আর যদি বলা হয় যে নভশ্চরদের অসতর্কতা বা শৈথিল্যের জন্যেই কক্ষের অক্সিজেন বেরিয়ে যেতে পেরেছিল তাহলে গুরুতর প্রশ্ন ওঠে। যে নভশ্চররা মহাশূন্যের স্পেস-স্টেশন সালিয়ুতে প্রায় চব্বিশটি দিন ভরশূন্য অবস্থায় এমন স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে এলেন এবং এতসব কাণ্ড-কারখানা করলেন তাঁদের এমন অসতর্কতা বা শৈথিল্য কেন হবে? দীর্ঘকাল ভরশূন্য অবস্থায় থাকার জন্যেই কি? তাই যদি হয় তাহলে বিষয়টি নিয়ে অনেক কিছু ভাবার আছে।

তাছাড়াও কথা আছে। মহাশূন্যের মানুষকে কখনো কখনো আশ্রয় ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে হয়। যেমন বেরিয়ে আসতে হয়েছে অ্যাপোলো-অভিযানের দুজন নভ-শ্চরকে। তবে এক্ষেত্রে অবস্থাটা কিন্তু পুরো-পুরি ভরহীনতার নয়, অনেক কম মাত্রার ভরের। আবার পৃথিবীর কক্ষপথে থাকার সময়েও নভশ্চর অনেক সময়ে ব্যোমযানের আশ্রয় থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন, যদিও এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যোম-যান থেকে বাইরে কাটানোর মোট সময় চাঁদের মাটিতে চন্দ্রযানের কক্ষ থেকে বাইরে কাটানোর মোট সময়ের চেয়ে কম। অর্থাৎ, মহাশূন্যে মানুষের একক অবস্থান (পুরো-পুরি বা আংশিক ভরশূন্য অবস্থায়) নিয়েও অনেক কিছু গবেষণা করার আছে।

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যতোদূর আভাস পাওয়া যাচ্ছে, সোভিয়েত ও মার্কিন উভয় দেশের বিজ্ঞানীরাই পৃথিবীর কক্ষপথে স্পেস স্টেশন তৈরি করার দিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ করছেন। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের সালিয়ুৎ আগেই আকাশে উঠেছে, মার্কিন বিজ্ঞানীদের স্কাইল্যাব শীঘ্রই (১৯৭২ সালে) উঠছে। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, এই দুটি দেশের মহাকাশ-গবেষণা পরস্পরের পরিপূরক হতে চলেছে। দুই দেশ দুই দিকে—অ্যাপোলা অভিযান চলা পর্যন্ত তা বলা গেলেও—আর দুটি অভিযানের পরে অ্যাপোলো পর্ব শেষ হলে একথা বলা চলবে না।

গোটা ষাটের দশক ধরে আমেরিকার মহাকাশ-অভিযানের প্রধান লক্ষ্য ছিল চাঁদে মানুষ নামানো। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই জেমিনি পর্ব শুরু। জেমিনি-৪, জেমিনি-৫ ও জেমিনি-৭ আকাশে থেকেছিল যথাক্রমে চার, আট ও চোদ্দ দিন। ভরশূন্য অবস্থার সঙ্গে মানুষ কতখানি মানিয়ে চলতে পারবে তাই নিয়ে গবেষণা এই চারটি পরিক্রমায় অনেকখানি এগিয়েছিল। জেমিনি-৮ অভি-যানে সাফল্যের সঙ্গে জোড়-বাঁধা ও মিলন ঘটানোর পর্বটি সমাধা হয়। জেমিনি-৯, জেমিনি-১০, জেমিনি-১১ ও জেমিনি-১২ অভিযানে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ব্যোম-যানের বাইরে এসেও নানা ধরনের তৎপরতার সামর্থ্য মানুষের আছে।

জেমিনী-৭ অভিযানের স্থায়িত্ব ছিল চোদ্দ দিন। এই অভিযান থেকেই নিঃসংশয়ে বোঝা গেল মানুষের পক্ষে চাঁদে পেঁছে আবার ফিরে আসতে যতোদিন সময় লাগার কথা ততোদিন মহাশূন্যে কাটানো মানুষের সামর্থ্যের মধ্যে। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা বিষয়টি নিয়ে তারপরে আর অগ্রসর হন নি। তারপরে তাঁরা মনোযোগ দিয়েছিলেন জোড়-বাঁধা ও ব্যোমযানের বাইরে এসে মহা-শূন্যের অবাধ পরিবেশে একক নিরলম্বতার মধ্যে বহুতর কার্যকলাপের ওপরে।

রুশ বিজ্ঞানীরা কিন্তু পৃথিবীর কক্ষ-পথে স-মনুষ্য মহাকাশ অভিযানের দিকেই সবিশেষ মনোযোগ দিলেন। সয়ুজ-৪ ও সয়ুজ-৫ অভিযানে পরখ করা হল মহা-শূন্যে মানুষ কতখানি কী করতে পারে। সয়ুজ-৬, সয়ুজ-৭ ও সয়ুজ-৮ সেই একই বছরে, অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে, অক্টোবর মাসে একসঙ্গে পাঁচদিন ধরে পৃথিবীকে চক্কর দিয়েছিল। এই অভিযানগুলোর পরেই সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে মহাশূন্যের ভরহীন অবস্থায় মানুষের থাকার সমস্যা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা শুরু করেছিলেন। সয়ুজ-৯ আকাশে উঠেছিল ১৯৭০ সালের জুন মাসে এবং আঠারো দিন স্থায়ী ছিল। জেমিনি-৭ অভিযানের চেয়ে চারদিন বেশি স্থায়ী এই অভিযানের পরে দেখা গেল ফিরে আসা নভশ্চররা খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না, মারাত্মক ধরনের অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেন-শন-এ ভুগছেন। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ধারণা করলেন অভিযান চলাকালে নভশ্চর-দের যথোচিত ব্যায়াম করাতে পারলে হয়তো অন্যরকম ফল পাওয়া যেত। তার-পরে স্বল্পস্থায়ী সয়ুজ-১০, অবশেষে সয়ুজ-১১। শেষের অভিযানে এই বিশেষ গবেষণার জন্য সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ব্যাপক আয়োজন করেছিলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্বগুলো যেমনটি ভাবা হয়েছিল তেমনিভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। নভশ্চররা নিয়মিত ব্যায়ামও করেছিলেন। তবে সম্ভবত নভশ্চরদের মৃত্যুর ফলে পুরো অভিযানটি থেকে যতোখানি ফললাভের আশা করা গিয়েছিল তা অপূর্ণ থেকে গেল। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের পরবর্তী তৎপরতা অবশ্যই আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করবার বিষয়।

পৃথিবীর কক্ষপথে স্পেস-স্টেশন স্থাপন করা ছাড়াও সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই চাঁদের দেশে একাধিক মনুষ্য-হীন অভিযান সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করে-ছেন, চাঁদের মাটিতে তাঁরাও লুনোখোদ নামে একটি স্বয়ংচালিত যান নামিয়েছেন, শুক্রগ্রহে ব্যোমযান নামিয়েছেন, মঙ্গল-গ্রহের উদ্দেশে ব্যোমযান (মার্স-২ ও মার্স-৩) পাঠিয়েছেন। তবে সম্ভবত মহা-শূন্যের ভরহীনতার অবস্থা মানুষের পক্ষে কতখানি সহনীয় সে-সম্পর্কে সুনিশ্চিত তথ্য না জানা পর্যন্ত তাঁরা পৃথিবীর আকাশের বাইরে নভশ্চর পাঠাতে যাবেন না। আমেরিকার বিজ্ঞানীরাও অ্যাপোলো পর্ব শেষ হবার পরে সেই একই দিকে যাচ্ছেন। সম্ভবত সত্তরের দশকটি মহা-শূন্যের ভারহীনতার অবস্থা সম্পর্কে গবে-ষণাতেই কাটবে। মহাকাশ-অভিযানের ক্ষেত্রে

এখন এইটিই সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন। এই প্রশ্ন সম্পর্কে পুরোপুরি জানা হলে এবং এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত সমস্যাগুলোর পুরোপুরি সমাধান হলে তবে সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের দিকে স-মনুষ্য অভিযানের কথা ভাবা হবে।

অ্যাপোলো-১৫ অভিযানের পরে আরো একটি কথা উঠছে। তা হচ্ছে স-মনুষ্য অভিযানের সার্থকতা। অ্যাপোলো-১৫ অভিযানে নভশ্চররা চাঁদের যে স্থানটিতে নেমেছেন তার চারদিকের কয়েক বর্গমাইল এলাকায় চক্কর দিয়ে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছেন। একটি রোবটের সাহায্যে এত প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করা যেত কিনা সন্দেহ, একটি অভিযানে তো নয়-ই। লন্ডনের টাইম পত্রিকাও মন্তব্য করেছেন (৫ই আগস্ট তারিখে) অ্যাপোলো-১৫ অভিযান স-মনুষ্য অভিযানের সার্থকতা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে।

তবে কেউ যদি ভাবেন যে অ্যাপোলো পর্বে যে-ধরনের অভিযান চলছে তার সাহায্যে আমাদের পৃথিবী থেকে মাত্র আড়াই লক্ষ মাইল দূরের একমাত্র উপগ্রহটি জেনে নিতে পারা যাবে তাহলে বড়ো বেশি ভাবা হয়ে যাবে। অ্যাপোলো ধরনের ব্যোমযানের সাহায্যে চাঁদের বহু এলাকাতেই অবতরণ অসম্ভব। সম্ভাব্য অবতরণের এলাকাগুলোই অ্যাপোলো অভিযানের জন্যে নির্দিষ্ট হয়েছে। অ্যাপোলো-১৫ অভিযানের আগে আরো তিনবার চাঁদে অবতরণ করা হয়েছিল—তিনটি পৃথক এলাকায়। প্রচুর তথ্যও সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু তার ফলে চাঁদ সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানতে পেরেছি? লন্ডনের 'ইকনমিস্ট' পত্রিকা মন্তব্য করেছেন, তিন-তিনটি সফল অ্যাপোলো অভিযানের পরেও চাঁদ যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গিয়েছে, যা ছিল তাই রয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, চাঁদের তিন-তিনটি পৃথক এলাকার মাটি-পাথর হাতে পেয়েও (অ্যাপোলো-১৪ অভিযান থেকে যে পরিমাণ মাটি পাথর পাওয়ার কথা ছিল, পাওয়া গিয়েছে তার চেয়ে অনেক কম। একটি থলে নাকি বোঝাই হবার আগেই ভুলে বন্ধ করে ফেলা হয়েছিল।) আমরা চাঁদের জন্মরহস্য সম্পর্কে যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছি। নিশ্চিতভাবে শুধু এটুকুই জানা গিয়েছে যে পৃথিবী ও চাঁদের জন্ম একই সময়ে—আজ থেকে প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে। এমনকি ফ্রা মরোর মাটি-পাথরও নতুন আলোকপাত করে নি।

—জয়ন্তকান্ত

অঙ্গনা

চেক নারী সমাজ

বিরাট উপ-মহাদেশ ভারতের সঙ্গে পূর্ব ইউরোপের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির ভৌগোলিক তুলনা করা চলে না কিন্তু রাজনৈতিক বা সামাজিক খতিয়ানের সময় ভারত এদের দিকে চেয়ে দেখলে আনন্দ পাবে বলেই বিশ্বাস। কারণ এইসব রাষ্ট্রগুলির অনেকেই ভারতেরই মত সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ মায়েদের মেয়েদের মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন, সম্মান বৃদ্ধিতে তৎপর। চেকোশ্লোভাকিয়ার কুড়ি বছরের সমাজতান্ত্রিক জীবন সেজন্য জাতীয় জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে মেয়েদের অনুপ্রবেশের ইতিহাস। মেয়েরা সহায় হয়েছেন চেক গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গঠনে, মায়ের ভূমিকায় আগামী দিনের নাগরিকদের প্রতিপালনে।

পূর্ণ আইন ব্যবস্থা আছে গর্ভবতী বা শিশু পালনে রত কর্মী মায়েদের রক্ষা করার জন্য। মেয়েদের কতখানি মূল্য আছে আইনের চোখে বোঝা যায় এ থেকেই যে গর্ভাবস্থায় মায়েদের আপেক্ষাকৃত হাল্কা কাজ করতে দেওয়া হয় কিন্তু বেতন দেওয়া হয় পুরো। ছুটির পরে পূর্ণ সুযোগ সুবিধা নিয়ে মায়েরা বার বার কাজে ফিরে আসেন। মায়েদের এবং শিশুদের যত্ন নেবার জন্য উত্তরোত্তর উন্নততর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

উৎপাদক এবং অনুৎপাদক কর্মক্ষেত্রে চেক মহিলাদের অবদান আজ শুধু অনস্বীকার্য নয়, অপরিহার্য। সেখানের কোনো সাংগঠনিক প্রচেষ্টাই কি কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কি সমাজ-কল্যাণ বা সংস্কৃতি, কি ক্রয়বিক্রয় বা পরিবহন কি চাকরীর ক্ষেত্রে কি অন্যান্য ক্ষেত্রে, মেয়েদের ছাড়া চলার কথা ভাবাই যায় না।

মেয়েরা বাইরের কাজে নামবেন কি নামবেন না সেটা আর আধুনিক সমাজতান্ত্রিক চেকোশ্লোভাকিয়ার কোনো প্রশ্ন নয়। সমাজতন্ত্রের এটা মৌলিক অধিকার এবং সমগ্র সমাজই এ থেকে উপকৃত। এখনকার চিন্তনীয় বিষয় হোলো কর্মী মায়েরা তাদের পরিবার এবং ছেলেমেয়েদের জন্য যথেষ্ট সময় দিতে পারেন কি না সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের জন্য, আমোদ প্রমোদ এবং বিশ্রামের জন্য যথেষ্ট সময় পেতে পারেন কি না।

মেয়েরা প্রচুর সংখ্যায় কাজে নামতে আরম্ভ করায় কতগুলি সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সমাধান অবিলম্বে করার জন্য চেষ্টা চলছে। এর মধ্যে অন্যতম হোলো মেয়েদের শিক্ষার মান বাড়ানো। বছর পাঁচেক আগের হিসাবেই পাওয়া যায়, চেকোশ্লোভাকিয়ার মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে মেয়েদের সংখ্যা শতকরা ৬৪-৫ কারিগরী স্কুলগুলিতে ৫৮-৭ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ৩৭। গড় হিসাবে অল্পবয়সী মেয়েদের শিক্ষার পরিমাপ ছেলেদের চেয়ে বেশী। বিগত ক' বছরে মেয়েরা সব রকম শিক্ষা ক্ষেত্রেই আরও এগিয়ে গেছে এ কথা মেনে নিতে বাধা নেই। এসঙ্গে এদিকেও লক্ষ্য রাখা হয় যে, স্কুলের পড়া শেষ করে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা যেন কোনো না কোনো রকম কাজের সুযোগ পেয়ে যায়। ১৯৫৫-তে প্রতি তিনটিতে একটি মেয়ে কোনো রকম কারিগরী প্রশিক্ষণ ছাড়াই স্কুল থেকে বেরিয়ে কাজে ঢুকত। ১৯৬৬-তে এ সংখ্যা দাঁড়ায় প্রতি দশজনে একজন।

কৃষিবিষয়ে নানা রকম যান্ত্রিক প্রয়োগ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের সুযোগ এসে উপস্থিত হচ্ছে দেশের মেয়েপুরুষদের সামনে। সে জন্যই চিন্তা করা হচ্ছে কৃষি শিক্ষার সঙ্গেই বিভিন্ন-ধরনের কারিগরী শিক্ষা প্রদানের আয়োজন চলবে কি না যাতে বিভিন্ন ঋতুর কৃষি কার্যে একই সঙ্গে অংশ গ্রহণ করতে পারে শিক্ষিত কৃষিজীবিরা।

শিশু এবং তরুণ সমাজের সর্বাত্মক শিক্ষা লাভের, নৈতিক রাজনৈতিক এবং আদর্শগত জ্ঞানার্জনের পথ প্রশস্ত করে দেওয়ার প্রচেষ্টাই সমাজতান্ত্রিক সমাজে উন্নতির প্রথম সোপান বলে গণ্য হয়। চেক জনসাধারণ সমাজতন্ত্রের এই গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। তারা জানেন শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষাই তরুণ সমাজতান্ত্রিক নাগরিকের জীবন প্রস্তুতির রসদ যোগাতে পারে না। প্রথম যে পরিবেশে শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়ে ওঠে তা হোলো তার পরিবার।

আধুনিক মনঃসমীক্ষা, প্রজন্মতত্ত্ব এমন কি চিকিৎসা শাস্ত্রও জোরের সঙ্গে বলে থাকে যে, শিশুর জীবনের প্রথম কটি বছরেই তার ভবিষ্যত চরিত্র, চিন্তাধারা ও মানসিক গঠনের ভিত্তি প্রস্তুত হয়ে থাকে। তরুণ সম্প্রদায়ের ভাবাবেগকে সুসংহত করার জন্য, জনজীবনের শিক্ষায়তনের ক্রীড়াপ্রাঙ্গণের এবং যুব সংস্থার গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য তাদের প্রস্তুত করে তুলতে পারিবারিক পরিবেশের কতখানি মূল্য রয়েছে বিজ্ঞান সে কথা জানাতে সোচ্চার।

মাতা এবং পিতাই আধুনিক পরিবারের কেন্দ্রস্থল। শিশুসন্তানের পারিবারিক শিক্ষা কোন প্রভাবে প্রভাবান্বিত হবে তা মুখ্যতঃ নির্ভর করে পিতামাতার ঐহিক সামর্থ্য এবং ব্যক্তিত্বের উপর। তাঁদের সাংস্কৃতিক এবং রাজনীতিক মান, তাঁদের বিশ্বগত দৃষ্টিভঙ্গীই স্থিরীকৃত করে তরুণ প্রাণকটি কিভাবে পরিবারে সমাদৃত হবে কি মনোভাব নিয়ে তারা জীবনে প্রবেশ করবে, মূল্যবোধ কিভাবে তাদের অন্তরে জাগ্রত হবে, আগামী দিনের কি ছবি তাদের সামনে ফুটে উঠবে, সমাজের বুকে নিজেদের জন্য কি আসন তারা লাভ করতে চাইবে।

ক্ষুদ্রায়তন বলে চেকোশ্লোভাকিয়ার অগ্রগতির প্রচেষ্টা ক্ষুদ্র নয়। আবার, হয়তো জনসংখ্যা কম বলে সেখানে অগ্রসর হওয়া সহজতর হয়েছে। তবু এ আশা কি করা যায় না যে, সমাজতান্ত্রিক চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্র, তা সে যত ছোটই হোক যেখানে নিজের রাষ্ট্রীয় জীবনের বাঁধন দৃঢ় করতে বদ্ধপরিকর এবং সে কাজে সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছে সেখানে ভারতের মত অতিবৃহৎ রাষ্ট্রের উন্নতির পথে সকল বাধা অপসারণ করা অবশ্যই অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে?

অজিত বসু

প্রেক্ষাগৃহ

শাশ্বতী কান্তি বসু থী / লীনা

ঝড় উঠেছে

'অতঃপর ভারতে আমেরিকান ছবির অবাধ আমদানী সংক্রান্ত চুক্তির মেয়াদ 'আর বাড়ানো হবে না' ১৪ জুলাই ভারত সরকারের বহির্বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী এল এন মিশ্রের এই ঘোষণা তুমুল ঝড় তুলেছে। মার্কিনী ছবির প্রদর্শনীর সঙ্গে যাঁদের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, সেই কিনেমেটোগ্রাফ রেন্টার্স সোসাইটির সভাপতি ডবল্যু টি উইলসন সমেত ঐ সংস্থার সদস্যবৃন্দ থেকে শুরু ক'রে পরোক্ষভাবে এর দ্বারা আর্থিক এবং অন্যান্যভাবে উপকৃতদের কথা ছেড়েই দিলুম, এমন কি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় পর্যন্ত ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কোনো কোনো চলচ্চিত্র সংক্রান্ত পত্রিকা এ ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ জনমত সংগ্রহ করে তাও ফালাও ক'রে ছাপিয়েছেন। আবার অপরদিকে ভারতে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ চিদানন্দ দাশগুপ্ত প্রমুখ বেশ কিছু চলচ্চিত্র রসিক ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করেছেন।

আমরা ইতিমধ্যেই অমৃত-এর ১২ ও ১৩ সংখ্যায় (২৩ ও ৩০ জুলাই) আমেরিকান ছবির অবাধ আমদানী সম্পর্কে বেশ কিছু সমালোচনা করেছি এবং অকুণ্ঠচিত্তে মন্তব্য করেছি, 'অগণিত ভারতীয় চিত্রামোদীর অন্যতমরূপে বলতে পারি, কোনো দেশেরই ভারতে ছবি দেখানোর একচেটিয়া অধিকার থাকা উচিত নয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যত ভালো ছবি নির্মিত হচ্ছে, তা' দেখার সুযোগ প্রতিটি ভারতীয় চিত্রদর্শকেরই থাকা উচিত। এবং এরই ওপর যেমন নির্ভর করবে ছবির ভালোমন্দ সম্পর্কে জ্ঞানের বিকাশ, তেমনই ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রযোজনাক্ষেত্রে মানোন্নয়নে এই ব্যবস্থা হবে রীতিমত সহায়ক।'

আমরা মনে করি না, আমাদের এই মন্তব্য সম্পর্কে কারুর দ্বিমত থাকতে পারে বা থাকা উচিত। তবুও যে আবার ক'রে কলম ধরতে হ'ল, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, ভারত সরকারের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠতে দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার সঙ্গে ভারত সরকারের যে-চুক্তিটির মেয়াদ গেল ৩০শে জুন তারিখে শেষ হয়ে গেছে, তার অন্যতম শর্ত ছিল :

('আমেরিকাতে) ভারতীয় ছবির ক্রয় এবং' বা ভাড়াকে ক্রমবর্ধমান হারে প্রণোদিত করবার জন্যে এম-পি-ই-এ-এ (মোশান পিকচার এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ান ফিল্মস্ ডিস্ট্রিবিউটার্স অ্যাণ্ড প্রোডিউসার্স'কে অবিরত যতদূর সম্ভব সাহায্য করে যাবে, যাতে এই সংস্থার (এম-পি-ই-এ-এর) সভ্য কোম্পানীগুলির সঙ্গে তাঁরা সরাসরি আলোচনা ক'রে (বিক্রী বা ভাড়া দেওয়া সম্পর্কে) দরদস্তুর ঠিক করতে পারেন।'

ভারত সরকারের অভিযোগ এই শর্ত পালন করবার জন্যে এম-পি-ই-এ-এ কিছুই করেননি। এই অভিযোগ কি মিথ্যা? আজ কিনেমেটোগ্রাফ রেন্টার্স সোসাইটির সভাপতি মিঃ উইলসন সাফাই গাইছেন, যে-হেতু এমন কোনো আইনসঙ্গত উপায় নেই, যার বলে মার্কিন সরকার বা মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা কিংবা অপর কেউ ইউ-এস-এর কোনো চিত্রগৃহের মালিককে কোনো ছবি ভাড়া নেবার বা দেখাবার জন্যে জোর করতে অর্থাৎ বাধ্য করতে পারেন, সেই কারণে স্বভাবতই মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কোনো বিদেশী ছবির প্রদর্শনী বা মুক্তি সম্বন্ধে জামিন (গ্যারান্টি) দিতে পারেন না।— আমাদের জিজ্ঞাস্য, এই কথাই যদি সত্যি হয়, তাহলে ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তি করবার সময়ে উপরোক্ত যে-শর্ত করা হয়েছিল, সেটি কি একেবারেই অর্থহীন? এম-পি-ই-এ-এ তার বিভিন্ন সভ্য সংস্থাগুলির সঙ্গে ভারতীয় পরিবেশক ও প্রযোজক সংস্থাগুলি যাতে সরাসরি আলোচনা চালাতে পারে, তার জন্যে কুটোটিও নেড়েছিলেন কি?

মিঃ উইলসন জানাচ্ছেন যে, এম-পি-এ-এর বৈদেশিক চলচ্চিত্র পরামর্শ কর্মসূচী অনুসারে আমেরিকার চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে বৈদেশিক চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশকদের বন্ধুত্বকে দৃঢ়তর করাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য ও কাজ। এম-পি-এ-এর এই বিশেষ বিভাগের সহায়তা অন্যান্য বিদেশী সংস্থাগুলির মতো ভারতীয় প্রযোজকেরা এবং আই-এম-পি-ই-সি (ইণ্ডিয়ান মোশন পিকচার এক্সপোর্ট কর্পোরেশন)ও নিতে পারেন তাঁদের ছবিকে আমেরিকার বাজারে চালু করবার জন্যে।

এর পরে মিঃ উইলসন বলেছেন, এম-পি-এ-একে অভিযুক্ত করার পরিবর্তে খোঁজ নেওয়া উচিত, কোনো ভারতীয় প্রযোজক, পরিবেশক বা আই-এম-পি-ই-সি এম-পি-এ-এর এই সহায়তা নেবার কোনো চেষ্টা করেছেন কিনা। তাঁর প্রশ্ন, ভারতীয় সংস্থাগুলিই যখন উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসেন নি, তখন এম-পি-এ-এ অভিযুক্ত হবে কেন?

কিন্তু এম-পি-এ-এ যখন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছিল, তখন ঐ বিশেষ শর্তটি

পালন করা বিষয়ে ভারতীয় প্রযোজক, পরিবেশক কিংবা ইম্পেক (আই-এম-পি-ই-সি)-এর করণীয় কিছু আছে যা তারা নিজের থেকে অগ্রণী হয়ে না এলে এই শর্ত পালন করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না, এমন কথা জানিয়েছিল কি? এবং যখন চুক্তির মেয়াদ শেষ হয় হয় অর্থাৎ ৩০ জুন নিকটবর্তী হয়ে এসেছিল, তখনও ভারত সরকারকে জানানো হয়েছিল কি, ঐ বিশেষ শর্তটি পালন করা সম্ভব হচ্ছে না ভারতীয় প্রযোজক প্রভৃতির গাফিলতির জন্যে? কিংবা এম-পি-এ-এ ভেবে নিয়েছিল, শর্ত তো কতই লেখা থাকে, তার সবই যে মানতে হবে এমন কি কথা আছে? শর্ত পালন নিয়ে ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তর যে অমন কঠিন হয়ে উঠবে, এইটাই তাদের মনে হয়নি—এই কথাটিই হচ্ছে আসল কথা। এখন যা কিছু লেখা বা বলা হচ্ছে, সেটি হচ্ছে ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরবার চেষ্টারই সামিল।

কিন্তু আমাদের মাথা ব্যথা অন্যত্র। আমেরিকান ছবি আর দেখতে পাওয়া যাবে না, এই দুঃখে নাকি আমাদের দর্শকসমাজের বেশ-কিছুটা অংশ কেঁদে মারা যাচ্ছেন। বোম্বের একজন উৎসাহী চলচ্চিত্র দর্শক নাকি বলেছেন, হলিউডের ছবি দেখতে না পেলে তিনি শেষ পর্যন্ত মারা পড়বেন। দার্জিলিং তরুণ বলেছেন, অন্যান্য দেশের বাজে ছবি দেখার থেকে আমেরিকার ছবি দেখা ঢের ভালো। তরুণরা কোন্ কোন্ দেশের বাজে ছবি দেখেছেন, তা বোধ করি, জিজ্ঞেস করা হয়নি।

কোনো নামকরা চলচ্চিত্র সাংবাদিক লিখেছেন, পঞ্চাশ বছর ধ'রে একটানা প্রদর্শিত হবার পরে এদেশে আমেরিকান ছবির আমদানী যদি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, তা' হলে তা ব্যবসায়িক এবং আর্থিক—উভয় দিক থেকেই সবিশেষ দুঃখজনক। কিন্তু আমেরিকান ছবির আমদানী একেবারে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এ-কথা এখনই ভাবি কেন? ভারত সরকার বিদেশ থেকে ছবি আমদানী করা বিষয়ে একটি নীতি গ্রহণ

অপর্ণা / তনুজা এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনা : সলিল সেন। ফটো : অমৃত

করতে উদ্যত। সর্বোচ্চ যতগুলি বিদেশী ছবি প্রতি বছর এদেশে আমদানী করা হবে, তার মধ্যে নিশ্চয়ই আমেরিকান, ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, ইটালীয়ান, জার্মান, সুইডিস, রাশিয়ান, জাপানী প্রভৃতি সব রকম ছবিরই আসবার ব্যবস্থা থাকবে। এ-কথা তো সত্য যে, এতদিন অবাধ ভাবে আমেরিকান ছবির আমদানী হওয়ার ফলে অপরাপর দেশ থেকে খুব বেশী সংখ্যায় ছবি আমদানী করা সম্ভব হয়নি এবং এ-ও সত্য যে, আমেরিকার মতো অন্যান্য বহু দেশেই বহু দর্শনযোগ্য ছবি তৈরী হয়ে থাকে। কাজেই সব দেশ থেকেই যাতে উপভোগ্য ও দর্শনীয় ছবি আমাদের দেশে এসে পৌঁছোতে পারে, তারই রাস্তা প্রশস্ত করা উচিত। অবশ্য প্রত্যেকটি বিদেশী ছবিই যাতে নিখুঁতভাবে ইংরেজী ভাষায় ডাবড় (মূল ভাষাকে সরিয়ে দিয়ে তার পরিবর্তে ইংরেজী সংলাপ বসানো) হয়ে আসে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। তা' না হয়ে ইংরেজী সাব-টাইটেল্ সংবলিত হয়ে এলে ছবি দেখবার অর্ধেক আনন্দই মাটি হয়ে যাবে।

চিত্র-সমালোচনা

শাশুড়ী এবং বৌ

কোনো সময়ে শাশুড়ী হয় বৌ-কাঁটকী, আবার কখনও বা সে হয় বৌয়ের চক্ষুশূল—এ ঘটনা সংসারে প্রায়ই দেখা যায়। অথচ শাশুড়ী বৌয়ের মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক চলতে থাকলে সংসার সুখের হয় না। এই কথাই বলতে চেয়েছে মাদ্রাজের বাসু ফিল্মস্ নিবেদিত, বাসু মেনন প্রযোজিত এবং মধুসূদন রাও পরিচালিত ইস্টম্যান কলারে তোলা হিন্দী ছবি 'সাস্ভী কভি বহু থী'।

মোতিলাল চৌধুরীর ছেলে দিলীপের সঙ্গে ধনী বিধবা ভাগমতীর মেয়ে সাধনার বিয়ে হলে সাধনা দিলীপ দুজনেই খুশীতে উপচে পড়ল; কারণ ওরা পরস্পরকে ভালোবাসত। কিন্তু সাধনা যেদিন আবিষ্কার করল তার শ্বশুর তাঁর স্ত্রীর (অর্থাৎ সাধনার শাশুড়ীর) সঙ্গে কেন ভালোভাবে কথাবার্তা বলেন না, সেদিন থেকে সে ধীরে ধীরে নিজের শাশুড়ীর প্রতি বিরূপ হয়ে পড়তে লাগল। এমন হল, শাশুড়ী তার ভালোর জন্যেই কোনো কিছু করলে সে তার মধ্যেও মন্দ অভিপ্রায় দেখতে পেত। তাই সে সন্তানসম্ভবা হ'লে ওরই নিরাপত্তার জন্যে ওর শাশুড়ী যখন বাড়ীর নীচের তলার একটি ঘরে ওর শোবার বন্দোবস্ত করল, তখন সাধনা এই ব্যবস্থা কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। কিন্তু প্রতিফল পেল সে হাতে হাতে। হঠাৎ সিঁড়ি থেকে সে পড়ে যাওয়ায় তার পেটের সন্তানটি নষ্ট হয়ে গেল। মা ও স্ত্রীর মধ্যে এই রকম বিরূপতায় দিলীপ প্রচুর অস্বস্তি বোধ করতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত অশান্তির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে চাকরীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ল অন্য শহর অভিমুখে।

মোতিলালের বৈবাহিকা ভাগমতীর বাড়ীতেও দারুণ অশান্তি। এবং এই অশান্তির কারণ তিনি নিজেই : তাঁর একমাত্র ছেলে কানহাইয়ার তিনি বিবাহ দিয়েছিলেন চমনলালের মেয়ে লাজবন্তীর সঙ্গে। কিন্তু চমনলাল প্রতিশ্রুত পণ দিতে পারেননি বলে তিনি পুত্রবধূকে গৃহে ঠাঁই না দিয়ে পিত্রালয়ে প্রেরণ করেছিলেন। পরে যখন তিনি কন্যার বিবাহ দেন, তখনও তিনি পুত্রবধূকে ঐ বিবাহোৎসবে যোগ দেবার জন্যে আমন্ত্রিত করেন না। কিন্তু মোতিলাল কৌশলে পিতা-পুত্রীকে শুধু বৈবাহিকার বাড়ীতে আনলেই না, ভাগমতীকে বাধ্যকরেন পুত্রবধূকে গৃহে স্থান দিতে। স্থান দিলেন বটে, কিন্তু লাজবন্তীর সঙ্গে ব্যবহার করতে লাগলেন গৃহ-পরিচারিকার মতো, শুধু নয়, তাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখতে লাগলেন, যাতে সে কোনো সুযোগ না পায়

স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে। অশিক্ষিত কানহাইয়া ছিল মায়ের ওপর একান্ত নির্ভরশীল; তাই সে মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করলেও মায়ের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেতে পারত না। কিন্তু ভাগমতীর অনুপস্থিতির সুযোগে কানহাইয়া ও লাজবন্তী পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল এবং কালে লাজবন্তীর কোলে এসেছিল শিশু। এই সময়ে শ্বশুরগৃহ ত্যাগ করে সাধনা এসেছিল মায়ের কাছে; কিন্তু বধূর প্রতি মায়ের অন্যায় আচরণ দেখে সে তীব্র প্রতিবাদ করে মাতৃগৃহ ত্যাগ করে ও অবশেষে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়। এদিকে স্ত্রীর প্রতি আপন কর্তব্য পালনে অসমর্থতার লজ্জায় কানহাইয়াও যে কোনো উপায়ে গ্রাসাচ্ছাদন সংস্থানের আশায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং মাল বওয়ার কাজ করতে গিয়ে দৈবক্রমে ভগ্নিপতি দিলীপের সঙ্গে মিলিত হয়। এরপরে কি অবস্থায় ও কি কৌশলে মোতিলাল দিলীপ ও কানহাইয়ার সহায়তায় মায়া দেবী (দিলীপের মা) ও ভাগমতীর সঙ্গে ওদের পুত্রবধূর মানসিক মিলন সম্ভব করে এবং নিজের মাকেও বহুদিনের পর নিজ স্বামীর সঙ্গে মিলিত করে উভয় সংসারে শান্তি ফিরিয়ে আনে, তারই কৌতূহলোদ্দীপক দৃশ্যাবলী দ্বারা ছবির শেষাংশ রচিত।

—এই কাহিনীটিকে বিস্তারিতভাবে চিত্ররূপ দিতে গিয়ে বহু সম্ভাব্য এবং অসম্ভাব্য পরিস্থিতি কল্পনা করা হয়েছে। ফলে একদিকে মোতিলালের মানসিকতার মধ্যে যেমন যুক্তিপূর্ণ পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী প্রত্যক্ষ করা যায়, তেমনই অপরদিকে অমানুষিকভাবে রূঢ় ও ক্রূর চরিত্রের ভাগমতীকেও দেখতে পাওয়া যায়। বাস্তব এবং অবাস্তবের এমন অপূর্ব সহাবস্থান যে কি করে সম্ভব হয়, তা আমরা ভেবেই পাই না।

চরিত্রচিত্রণে উপভোগ্যতার সৃষ্টি করেছেন মোতিলাল বেশে ওমপ্রকাশ। তিনি আজকে দক্ষতার এমন একটি স্তরে পৌঁছেছেন যে, অতি অনায়াসে তিনি যে কোনও রসকে প্রকাশিত করতে সমর্থ। কানহাইয়ার ভূমিকায় জগদীপও অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন প্রশংসনীয়ভাবে। শশীকলাকে যেমন আজকাল আর ক্রূর ভূমিকায় দেখতে মন চায় না, তেমনই অবিশ্বাস্য রকম নির্দয়তার প্রতিমূর্তি রূপে ললিতা পাওয়ারও বেশ কিছুটা বাড়াবাড়িই করেছেন। তিনি চেষ্টা করলে ঐ একই ভূমিকাকে বিশ্বাস্য রূপ দিতে পারতেন। নায়ক দিলীপ বেশে সঞ্জয় মোটামুটিভাবে সার্থক। নবাগতা অনুপমা চিত্রিত লাজবন্তী সংযত অথচ সুন্দর। নায়িকা সাধনা বেশে লীনা চন্দ্রভারকর উপভোগ্যতার সৃষ্টি করতে পেরেছেন। অপরাপর ভূমিকায় সুন্দর (গোবিন্দ), প্রতিমা দেবী (মোতিলালের মা), মনমোহন কৃষ্ণ (চমনলাল) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। ছবির সাতখানি গানে সুরের কোনো নূতনত্ব প্রত্যক্ষ করা না গেলেও গানগুলি উপভোগ্য। বিশেষ করে খোলাকে বে-দরাজ গলায় গেয়েছেন, তা গানটিকে জয়প্রিয় হতে সাহায্য করবে।

বাসু ফিল্মস নিবেদিত 'শাশভী কভি বহু থী' গৃহধর্ম সম্পর্কিত উপদেশাত্মক ছবি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপভোগ্যও হয়ে উঠেছে।

স্টুডিও থেকে

দৈনন্দিন

ফিল্ম আর্ট-এর প্রযোজনায় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'দৈনন্দিন' ছবির চিত্রগ্রহণ কাজ নির্মল মিত্রের পরিচালনাধীনে শীগগীর শুরু হবে। প্রখ্যাত পরিচালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় ছবির চিত্রনাট্য রচনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন। ছবির নায়ক ও নায়িকার চরিত্রে আছেন যথাক্রমে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং অপর্ণা সেন। মানুষের সুখ দুঃখে ভরা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে অম্লমধুর, কৌতুক ও কষাঘাতের কাহিনী 'এই দৈনন্দিন'।

'সংসার' মুক্তিপথে

নর্মদা পিকচার্সের সলিল সেন পরিচালিত 'সংসার' সেন্সারের ছাড়পত্র নিয়ে মুক্তির দিন গুণছে। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীসেন স্বয়ং। সুর দিয়েছেন ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং আরতি মুখোপাধ্যায়। ছবির প্রধান চরিত্রলিপিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, সন্ধ্যারাণী, নির্মল কুমার, শেখর চট্টোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলী, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, হরিধন, মাঃ অরিন্দম, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস ও নন্দিনী মালিয়া। নর্মদা চিত্র ছবিটির পরিবেশক।

সোনার খাঁচা-র সংগীতগ্রহণ

সরকার ফিল্মস নিবেদিত এবং অগ্রদূত পরিচালিত সোনার খাঁচা-র সংগীতগ্রহণ হয়েছে বম্বেতে। কাহিনীকার ও সংগীত পরিচালক বীরেশ্বর সরকারের তত্ত্বাবধানে নেপথ্যে কণ্ঠ পরিবেশন করেছেন—লতা মঙ্গেশকর ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

ইতিমধ্যে ছবিটির চিত্রগ্রহণ এক চতুর্থাংশ

শেষ হয়ে গেছে—স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ স্টুডিওতে এবং তৃতীয় পর্যায়ের স্যুটিং শুরু হচ্ছে এ মাসের ২৪।২৫ তারিখ থেকে একটানা দশদিনের জন্যে।

মিহির সেন চিত্রনাট্যায়িত ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, কণিকা মজুমদার, অপর্ণা দেবী, সুলতা চৌধুরী, রবীন মজুমদার প্রভৃতি।

ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন চণ্ডীমাতা ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড।

নিশিকন্যা

শতরূপা পিকচার্সের প্রথম ছবি অমর কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অথৈজল' কাহিনী অবলম্বনে 'নিশিকন্যা'র চিত্রগ্রহণ কাজ এই মাসের শেষেরদিকে আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শুরু হবে। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। সুর দেবেন—সুধীন দাশগুপ্ত। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে রূপ দেবেন যথাক্রমে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও রামানন্দ সেনগুপ্ত। শতরূপা ফিল্মস্ ছবিটির একমাত্র পরিবেশক।

ফেরার

সিনে ক্রাফটের প্রথম পরীক্ষামূলক প্রয়াস 'ফেরার' এ ছবির মূল উৎস প্রিজন ভ্যান থেকে পালিয়ে যাওয়া দুজন কয়েদীর (একজন বাঙ্গালী অপরজন পাঞ্জাবী) চোখে বর্তমান পশ্চিম বাংলার সামাজিক সমস্যার এক জটিল ঘটনা—এরই এক বাস্তব চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে—'নব্য বাস্তবতার' নিদর্শন স্বরূপ। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

বিজয় বসু পরিচালিত
ফরিয়াদ / পার্থ মুখার্জি

অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় ('কোন একদিন' এবং 'হারানো প্রেম' খ্যাত)। সঙ্গীতঃ সরোজ কুশারী। চলচ্চিত্রায়ন ঃ বিজয় দে। ভূমিকায়—সম্পূর্ণ নবাগত শিল্পী অবশ্য পার্শ্ব চরিত্রে কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পীরা অংশগ্রহণ করবেন। সম্প্রতি এ ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। অবশ্য স্টুডিওর বাইরে প্রাকৃতিক পরিবেশে এবং শহরের আশে-পাশে এ ছবির কাজ চলবে (সিনেমা ভারতীর) মতো। বিশ্ব পরিবেশনায়—৩৫ এম এম ডিস্ট্রিবিউসান।

আসামী ছবি 'শেষ বিচার' সমাপ্ত

কে বি ডি প্রোডাকসন্সের আসামী ছবি 'শেষ বিচার' সমাপ্ত হয়ে আসছে দুর্গাপূজোর প্রাক্‌কালে মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। রাজকুমার মৈত্র লিখিত একটি মধুর আবেগপূর্ণ কাহিনী অবলম্বনে ছবিটিকে গড়ে তুলেছেন পরিচালক দেবকুমার বসু। ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন বিদ্যা রাও, নিপন গোস্বামী, জ্ঞানদা কাকতি, চন্দ্রা, পার্থ এবং আরও অনেকে।

মঞ্চাভিনয়

মূকাভিনয়—গত ১৪ আগস্ট ভারতে মূকাভিনয়ের পথিকৃৎ শ্রীযোগেশ দত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ মূকাভিনয় রবীন্দ্র সদন মঞ্চে পরিবেশন করেন। ঐদিনের অনুষ্ঠানে শ্রীদত্ত মূকাভিনয়ের জগতে আরও একটি নূতন ফীচার উপহার দেন। সম্ভবত এর আগে কোনও বিদেশী অভিনেতাও এই ধরণের কোনও মূকাভিনয় পরিবেশন করেন নি। কোনরূপ আঙ্গিকের যথা আলো ইত্যাদি

নাম ছিল 'একটি অধ্যায়'। একটি খোঁড়া লোক ক্রাচ-এ ভর দিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে ভিক্ষা চায়। তারপর নিরাশ হয়ে এক জায়গায় বসে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে—স্বপ্নে দেখে তার বিগত জীবনকে—একদিন যে সাইকেল চালিয়ে কাগজ বিলি করে বেড়াত, তারপর সাইকেল চুরি যাওয়ায় যে কাঁধে বাঁক নিয়ে লোকের বাড়ী বাড়ী জল দিত, রাস্তার দোকানের ছাতুই ছিল তার একমাত্র খাদ্য, তবু কারো বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ ছিল না তার। হঠাৎ একদিন কোনও একটি গাড়ীর ধাক্কায় তার একটি পা চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়, এর পরই তার ঘুম ভেঙে যায়, আবার সে ফিরে আসে তার বাস্তব জগতে যেখানে তার একমাত্র বন্ধু সেই ক্রাচটিকে নিয়ে আবার সে বেরিয়ে পড়ে ভিক্ষার চেষ্টায়। প্রতিটি অভিব্যক্তি দর্শকের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই অনুষ্ঠানে শ্রীদত্ত পরিবেশন করেন তার অন্যান্য ফীচার,—চলা, ... ম্যাসেঞ্জার, চোর, ফটোগ্রাফার, সোসাইটি লেডী এবং জন্ম থেকে মৃত্যু। প্রতিটি মূকাভিনয়ই দর্শকদের অভিভূত করে রাখে, দীর্ঘ দুঘণ্টা দর্শকরা তন্ময় হয়ে এই অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। দেশী ও বিদেশী দর্শকে পরিপূর্ণ সেদিনকার রবীন্দ্র সদন দেখে মনে হল যে মূকাভিনয় আমাদের দেশে একটি পৃথক শিল্প হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং এর জন্য শ্রীদত্তর এই প্রচেষ্টা পরিপূর্ণ রূপে সার্থকতা লাভ করেছে।

শ্রীদত্তর সঙ্গে সহযোগিতায় ছিলেন আবহ সঙ্গীতে শ্রীহিমাংশু বিশ্বাস, আলোকসম্পাতে শ্রীতাপস সেন এবং রূপসজ্জায় শ্রীঅনন্ত দাস। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন 'পদাবলী'।

"সেন্ট্রাল এক্সাইজ রিক্রিয়েশন ক্লাব"-এর "ফেরারী ফৌজ"

গেল ২১ জুলাই ১৯৭১ সন্ধ্যায় স্টার রঙ্গমঞ্চে সেন্ট্রাল এক্সাইজ রিক্রিয়েশন ক্লাব তাঁদের একাদশতম বার্ষিক প্রীতি সম্মেলন উপলক্ষে পরিচালক শিবদাস মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় উৎপল দত্তের 'ফেরারী ফৌজ' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। পেশাদার মঞ্চে অভিনীত নাটক 'ফেরারী ফৌজ'এর সার্থক রূপায়ণ অপেশাদার নাট্য সংস্থার পক্ষে সত্যিই দুর্লভ। পুলিশ ইন্সপেকটর হীতেন দাসগুপ্তের ভূমিকায় শিবদাস মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় প্রত্যেক দর্শকের মনে রেখাপাত করেছে। নীলকণ্ঠের চরিত্রে অভিনয় করে চন্দ্রভূষণ চক্রবর্তী দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছেন। বিপ্লবী দলের দেবব্রত, অশোক, ... জ্যোতির্ময়, বিপিন ও সিরাজুলের অনবদ্য অভিনয় করে দর্শকসমাজের মনে রেখাপাত করেছেন যথাক্রমে সুশান্ত সান্যাল, মৃণাল চৌধুরী, মনোরঞ্জন সিনহা, ... মুখোপাধ্যায়, জয়দেব চক্রবর্তী ও দিলীপ। অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবী রাখেন তাঁদের মধ্যে ... প্রকাশ মুখার্জী, ফাদার ফ্লানাগান, ডাক্তার, মাতাল ছবিশ রাজন ও যুবকের ভূমিকায়

ভট্টাচার্য, বিরূপাক্ষ রুদ্র, অজিত সরকার, সুনীল সরকার, গোপাল মণ্ডল, জ্যোতি-গোপাল রায় ও অসীম বিশ্বাস।

স্ত্রীচরিত্রে বৃন্ধার ভূমিকায় শ্রীমতী সৌরভিনী সান্যাল যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। রাধা বঙ্গবাসী ও শচীর ভূমিকায় যথাক্রমে দীপিকা দাস, অজন্তা চৌধুরী ও কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখান।

সংগীত পরিচালনায় জয়ন্ত বন্দ্যো-পাধ্যায় নাটকটির আবেগঘন মুহূর্ত সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়তা করেন।

।। তুঘলক ।।

'জন্মভূমি'র পর থিয়েটার ইউনিট সংস্থার নতুন নাটক 'তুঘলক'। রচনা গিরিশ কারনাড। মূল নাটক কান্নাড়াতে—বাংলা অনুবাদ করেছেন শেখর চট্টো-পাধ্যায়। ইতিহাসবিখ্যাত মুহম্মদ বিন তুঘলকের জীবনী অবলম্বনে রচিত ঐ নাটক ইতিমধ্যেই সারা ভারতে সুপরিচিত। এ নাটকের ইংরিজি অভিনয় হয়েছে বোম্বাইতে। দিল্লীতে হিন্দী এবং উর্দু—কলকাতায় হচ্ছে বাংলায়। প্রসংগত নাট্যকার গিরিশ কারনাড নাটক লেখার জন্য 'ভাবা ফেলোশিপ' পেয়েছেন। নাটক পরিচালনা ও নামভূমিকায় থাকছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। আলো এবং মঞ্চ পরিকল্পনার যুগ্ম দায়িত্ব তাপস সেন ও সুরেশ দত্ত নিয়েছেন। রবীন্দ্রসদনে তুঘলকের প্রথম অভিনয় ১০ই আগস্ট মংগলবার। পরবর্তী অভিনয় ১৭ই আগস্ট।

অভিনয়ে থাকছেন থিয়েটার ইউনিটের ষাটজন শিল্পী।

এরাও মানুষ নাটকের একটি বিশিষ্ট চরিত্রে শ্রীমতী পাইন।

পথিকৃতে'র দুটি একাঙ্কিকা : দুটি বাস্তব জীবননিষ্ঠ একাঙ্ক নাটক সম্প্রতি 'পথিকৃতে'র শিল্পীরা পরিবেশন করলেন মুক্ত অঙ্গনে। দুটি নাটকেরই পটভূমিকায় আছে একালের যন্ত্রণা ও একালের অনুভূতি। নাটক দুটি হোল সোমেন সেন-গুপ্তের **টেলিগ্রাম** ও তপন মিত্রের **যদিও সন্ধ্যা**। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় জীবন ও জীবিকার নিদারুণ অনিশ্চয়তা ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত মানুষের বিভ্রান্তি আর নৈতিক অধঃপতনের পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে উঠেছে **টেলিগ্রাম** নাটকটি। আর **যদিও সন্ধ্যাতে** আছে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে রাজনীতির প্রভাব এবং তারই আবর্তে বিভিন্ন চরিত্রের নানা রকম ঘাতপ্রতিঘাত। নাটকটির আর একটি উজ্জ্বলতম দিক হোল দর্শকদের সামনে একটি বলিষ্ঠ ও দৃপ্ত জীবনবোধের সংকেত ছড়িয়ে দেওয়া।

দুটি একাঙ্কিকায় বক্তব্যের সঙ্গে অভিনয় মিলেছে একই তালে, একই ছন্দে। স্বভাবতঃই প্রযোজনায় থেকেছে সুক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য। নাটক দুটির গতিবেগে যাঁরা স্বচ্ছন্দভাবে সাহায্য করেছেন তাঁরা হোলেন অজয় ভট্টাচার্য, তপন মিত্র, সোমেন সেন-

ভোলা দত্ত, প্রদীপ পাল, গৌতম মুখার্জী ও মিহির সরকার।

দুটি নাটকের প্রয়োগপরিকল্পনায় প্রণব চক্রবর্তী তাঁর মোটামুটি স্পষ্ট শৈল্পিক বোধের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন বলেই মনে হয়।

সব্যসাচীর 'গোলাপ কাঁটার মৃত্যু' : ওপার বাংলার সামগ্রিক পটভূমিকা বিশ্লেষণ-মূলক একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক কিছুদিন আগে মুক্ত অঙ্গনে পরিবেশিত হোল। প্রযোজনা করলেন 'সব্যসাচী' নাট্যগোষ্ঠী। দিলীপ মজুমদার রচিত এই নাটকটি বাংলাদেশের রক্তঝরা কাহিনীকে নিয়ে গড়ে উঠলেও, ওপারের সংগ্রামের নিখুঁত বাস্তব ছবি বোধ হয় নাটকটির মুখর সংঘাতের মধ্যে স্পষ্টতা পেতে পারেনি। এই শৈথিল্যকে স্মরণে রেখেও 'সব্যসাচী'র এই নাট্য প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাতেই হয়।

নাট্যকার স্বয়ং নাটকটির নির্দেশনায় দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রয়োগ-পরিকল্পনায় ছিল পরিণত মননের ছাপ।

সমবোধ রাহা, শিলাপতি চক্রবর্তী, শংকর বসাক ও যূথিকা ভট্টাচার্য।

'আলোকের স্রোত ধরে' : সম্প্রতি হাওড়ার প্রখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী 'ইউনিটি থিয়েটার কমার' হাওড়ার গোলমোহর রেলওয়ে মঞ্চে অভিনয় করলেন রাধারমণ ঘোষের 'আলোকের স্রোত ধরে' নাটকটি। স্বয়ং নাট্যকার নির্দেশিত এই নাটকের কয়েকটি চরিত্রে প্রাণবন্ত অভিনয় করেন অনিল ভট্টাচার্য, নিশু গোস্বামী, সুনীল ভট্টাচার্য, কার্তিক শী, গৌর দাস, শশাংক বসু, নবকুমার ঘোষ, তাপসী গুহ। আলোকসম্পাত ও মঞ্চসজ্জায় ছিলেন বৈদ্যনাথ নন্দী ও অংশুমান সিংহ।

একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা : 'রূপান্তরে'র পরিচালনায় আয়োজিত একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে আগামী ১৮ই আগস্ট। যোগদানের ঠিকানা :

অভিনেতৃ সংঘের অন্ধযুগ নাটকের একটি দৃশ্যে নির্মল ঘোষ, সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং জগৎ মিত্র

রঙ্গরসের 'রোশেনারা' : রঙ্গরস নাট্য-গোষ্ঠীর শিল্পীরা যে নাটকটির মহড়ায় এখন ব্যস্ত আছেন তার নাম হোল 'রোশেনারা'। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এই নাটকটি রচনা করেছেন শ্রীনির্মল রায়। নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন অরুণ সেনগুপ্ত।

সংগীত কলাকেন্দ্র

গেল ৮ আগস্ট কাঁচরাপাড়া স্পিনিং মণ্ডে সঙ্গীত কলাকেন্দ্রের চতুর্থ বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সুরভারতীর (নৈহাটী) শিল্পীরা সুন্দরভাবে পরিবেশন করেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্য। নৃত্যনাট্য পরিচালনা করেন দেব-প্রসাদ বসু। এতে অংশগ্রহণ যাঁরা করেন, তাঁরা হলেন—দ্বিজেন ভট্টাচার্য, ছবি মুন্সী, প্রণব চক্রবর্তী, অপর্ণা পাল, কালী ভৌমিক, গৌরী মুখোপাধ্যায়, সমর দুবে এবং ঋতা সরকার।

রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা'

গেল ৭ আগস্ট শনিবারে কোচবিহার সাহিত্য সভার সভ্য-সভ্যারা রাষ্ট্রীয় পরিবহন মণ্ডে রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' নাটকটির সার্থক মঞ্চাভিনয় করেন।

নাটকের একটি প্রধান চরিত্র চন্দ্রকান্ত। এই চরিত্র নীরজ বিশ্বাস এক আশ্চর্য স্বকীয়তার পরিচয় রেখেছেন তাঁর স্পষ্ট সংলাপ, রসবোধের অভিব্যক্তির সুন্দর ব্যঞ্জনায়। গদাই ও বিনোদ-এর ভূমিকায় নিখিল ভট্টাচার্য ও তরুণ ভট্টাচার্য প্রাণোচ্ছলতা ও আবেগপূর্ণ অভিনয়ে তাঁদের চরিত্র দুটি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। ক্ষান্তমণির ভূমিকায় মনীষা বিশ্বাস তেজ, তিতীক্ষা ও আবেগের সঞ্চার করেছেন। কমলের ভূমিকায় শিখা রায় ও ইন্দুর ভূমিকায় অনীতা ভট্টাচার্য সপ্রাণ ও রোমান্টিক দৃশ্যগুলোকে সজীব করে তুলেছিলেন।

অন্যান্য ভূমিকায় চারু রায়, ভূপেন্দ্র ভট্টাচার্য, ষষ্ঠী ভৌমিক, জ্যোতির্ময় লাহিড়ী, নাটকে রাবীন্দ্রিক মেজাজ, অভিনয়ে রাবীন্দ্রিক ঢঙ্ এবং মঞ্চসজ্জা ও দৃশ্য রচনায় নাটকটি ভালবাসার চৌকাঠ ডিঙিয়ে এক শাশ্বত রূপ নিতে সক্ষম হয়েছে। এ কৃতিত্ব নাট্য-নির্দেশক চারু রায় ও শিল্পীদের সমান প্রাপ্য। সংগীতের ব্যবহার সংহত ও সুপ্রযুক্ত হলেও আর একটু উদাত্ত হলে ভাল হত। সংগীতের নেপথ্যে ছিলেন, ডঃ সুবোধরঞ্জন রায়, নন্দিনী রায় ও তপন চৌধুরী। নাটকটি প্রযোজনার দায়িত্ব পালন করেন কোচবিহার সাহিত্যসভা।

মূকাভিনয়ে 'জয় বাংলা'

প্রতিভাবান তরুণ মূকাভিনেতা দীপক ঘোষ সম্প্রতি তাঁর জনপ্রিয় 'জয় বাংলা' ফিচারটি শহরে ও শহর থেকে দূরে নানান জায়গায় দেখিয়ে দর্শক-সাধারণের অশেষ প্রশংসা কুড়িয়েছেন। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষদের ওপর বর্বর পাক-বাহিনীর নির্মম অত্যাচার শ্রীঘোষের অভিনয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। শ্রীঘোষ সম্প্রতি দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন ও পাটনায় অনুষ্ঠান সেরে কলকাতায় ফিরেছেন।

কিশলয় নাট্যদলের দুটি নাটক : মছলন্দপুরের কিশলয় নাট্যদলের শিল্পীরা সম্প্রতি দুটি নাটকের অভিনয় করে স্থানীয় নাট্যানুরাগীদের যথেষ্ট আনন্দ দেন। নাটক দুটি হোল রামমোহন দত্তর 'অতীতের দিনগুলি' এবং নারায়ণ দত্ত'র 'সুহৃদের মৃত্যু'। নাটক দুটির নির্দেশনায় সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় রেখেছেন রামমোহন দত্ত। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেন শ্রীধর মুখার্জি, বিধান বসু, সুজিত সাহা, অভিজিৎ বসু, অজিত সাহা, দীপক ঘোষ, সঞ্জীব রায়চৌধুরী, তাপস দত্তরায়, সীমা নাগ ও রামমোহন দত্ত।

নাট্যরূপা'র 'সমাজদর্পণ' : নতুন নাট্য-সংস্থা 'নাট্যরূপা'র শিল্পীরা কিছুদিন আগে তরুণ-নাট্যকার দিলীপ দে'র 'সমাজদর্পন' নাটকটি সার্থকভাবে মঞ্চস্থ করেন। বর্তমান সমাজব্যবস্থার নানাবিধ সমস্যাকে কেন্দ্র করে এই নাটকটির বিভিন্ন সংঘাত মুখর হয়ে [illegible]

'নির্মল' ও রীতা মুখার্জির 'বন্যা' চরিত্র চিত্রণ সামগ্রিক নাট্যপ্রযোজনার দুটি উল্লেখ যোগ্য সম্পদ। অন্য কয়েকটি চরিত্রে ছিলেন প্রশান্ত চক্রবর্তী, রথীন মুখার্জি, চঞ্চল শেঠ অনিমেষ নাহা, প্রফুল্ল গাঙ্গুলী, নমিত পাল, মেনকা দেবী, রতন পাল।

'সাহেব বিবি গোলাম' : শ্রীবিমল মিত্র জনপ্রিয় উপন্যাস 'সাহেব বিবি গোলামে' একটি সুষ্ঠু ও প্রাণবন্ত নাট্যরূপ সম্প্রতি পরিবেশিত হোল স্টার থিয়েটারে। অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (হাওড়া) স্টাফ এসোসিয়েশনের শিল্পীরা। নাটকটির প্রায় প্রতিটি দৃশ্যবিন্যাসে গতি বেগের স্পর্শ অনুভূত হয়েছে এবং তাকে বেশী করে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে করুণ রস বিশেষ করে সংগীতের সুপরিকল্পিত ব্যবহার নাট্যমুহূর্তগুলোকে সজীব করে তুলেছে। এ ব্যাপারে নির্দেশক কালী দের প্রয়োগ পরি কল্পনাই প্রশংসার দাবী রাখে।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় রাখেন বাসন্তী চ্যাটার্জি। তাঁর 'পটেশ্বরী' হয়েছে অনবদ্য ও মর্মস্পর্শী। তিনটি গানেই তাঁর কণ্ঠের দরদ যেন ঝরে পড়েছে। বিভাস রায়চৌধুরীও ভূতনাথ চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে বেশ নিবিড় করে মিলিয়ে নিতে পেরেছেন। আর কটি উজ্জ্বল চরিত্রচিত্রণে যাঁদের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়েছে মঞ্চের আলোয় তাঁরা হোলেন কল্পনা মুখোপাধ্যায় (জবা), রেণু বসু মল্লিক (মেজ বৌ) অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় (চুনী), অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন ঘোষ, রঞ্জিত কোলে, কমলেশ মুখোপাধ্যায় গোপাল কাঁড়ার।

"সামান্য : অসামান্য" : আসানসোলের ঘরোয়া নাট্যসংস্থার শিল্পীরা সম্প্রতি গোর্কি'র কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক "সামান্য : অসামান্য"'র অভিনয় করলেন। নাট্যরূপ দিয়েছেন শশাঙ্ক গাঙ্গুলী। বাসুদেব সেনগুপ্ত নির্দেশিত এই নাটকের কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন তপন দাস, উমা প্রামাণিক, বাসুদেব সেনগুপ্ত, সন্তোষ বসু, প্রদীপ সরকার, স্বপন গাঙ্গুলী, দেবাশিষ চ্যাটার্জি, রমাপতি চ্যাটার্জি, বাবলু বোস, হীরেন ঘোষ।

লখনউয়ে বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতা : লখনউ বেঙ্গলী ক্লাব ও ইয়ং মেনস এসোসিয়েশন পরিচালিত বাংলা পূর্ণাঙ্গ নাটকের প্রতিযোগিতা এবারও অনুষ্ঠিত হোতে চলেছে। ভারতবর্ষের যে কোন নাট্যগোষ্ঠীই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। যোগাযোগের ঠিকানা : ২০ শিবানী মার্গ, লখনউ-১।

বিবিধ সংবাদ

প্রমথেশ বড়ুয়া সরণি

বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের যে অংশের (প্লট নং ১—১৮) নাম পরিবর্তন করে 'প্রমথেশ বড়ুয়া সরণি' রাখা হয়েছে, সেই

হয়ে গেছে। প্রমথেশ বড়ুয়া মেমোরিয়াল কমিটির এই প্রস্তাবটি বিগত ৮ জানুয়ারী পৌরসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এতদিনে এই প্রস্তাবটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করা হল। এই বিস্মৃতপ্রায় চিত্রস্রষ্টার নামে রাস্তার নামকরণ করে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ একটি প্রশংসনীয় কাজ করলেন।

আনন্দ মন্দির-এর গুণিজন সংবর্ধনা

আসচে ২২ আগস্ট, সোমবার, সকাল নটার সময়ে প্রাচী সিনেমা-গৃহে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আনন্দমন্দির তাঁদের গুণিজন সংবর্ধনা কর্মসূচী অনুযায়ী প্রখ্যাত শিল্পী সুধাংশু চৌধুরীকে সংবর্ধিত করবার আয়োজন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধক, সভাপতি ও প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করবেন যথাক্রমে প্রবীণ নাট্যকার মন্মথ রায়, প্রথিতযশা সুরশিল্পী তিমিরবরণ ও প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী।

বিশ্বরূপায় সতু সেনের স্মৃতিতে স্মরণসভা

গেল বুধবার ১১ আগস্ট সন্ধ্যায় বিশ্বরূপা মঞ্চে পরলোকগত সতু সেনের স্মৃতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্মৃতিচারণ করেন মন্মথ রায়, মনোজ বসু, কালীশ মুখোপাধ্যায়, তাপস সেন, দেবনারায়ণ গুপ্ত, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ কুন্ডু, অমিতাভ দাশগুপ্ত এবং পার্থ সেন (সতু সেনের যথাক্রমে জামাতা ও পুত্র)। রাসবিহারী সরকারের অনুরোধে সকলে নীরবে এক মিনিট দণ্ডায়মান হয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। সভায় সতু সেনের আলোকসম্পাত সম্বন্ধে লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত করার জন্য ও তাঁর নামে একটি রাস্তার নামকরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

সংস্কৃতি কর্তৃক সতু সেনের শোকসভা উদ্যাপন

চাকপোড়ার (হাওড়া) প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান 'সংস্কৃতি' গেল ১১ আগস্ট সংস্থা-গৃহে ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের আধুনিক প্রয়োগকলার পথপ্রদর্শক, নির্দেশক ও প্রবোজক সতু সেনের মৃত্যুতে এক শোকসভার আয়োজন করেন। এই ভাবগম্ভীর সভায় সভাপতিত্ব করেন কবি ও নাট্য নির্দেশক নিমাই মান্না। সভাপতি ও বিভিন্ন বক্তা সতু সেনের জীবনী ও বিরাট কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করেন।

জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসঙ্ঘের কর্মী সম্মেলন

২৫শে জুলাই '৭১ রবিবার ২৪ পরগণা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের কর্মী সম্মেলন ও বার্ষিক সাধারণ সভা সাফল্যের সংগে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় একশোজন প্রতিনিধি ও কর্মী এই সভায় যোগদান করেন।

সকালে স্বল্প সঞ্চয় প্রদর্শনী ও কর্মী সম্মেলন উদ্বোধন করেন শ্রীভূপেন্দ্রনাথ পোদ্দার, যুগ্ম অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। শ্রীপোদ্দার ও শ্রীসন্তোষকুমার চক্রবর্তী স্বল্প সঞ্চয় সম্বন্ধে ও জেলার কর্মধারা সম্বন্ধে বিস্তারিত বলেন। কর্মী

চিত্রি / সন্ধ্যা রায়। পরিচালনা ঃ নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়। ফটো ঃ অমৃত

দাস। সভায় সংগঠন সম্পাদক গুরুদাস আঢ্য জেলার ২৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচীর প্রস্তাব রাখেন। কার্যকরী সভাপতি শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সিনহা সকল কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান।

ইউথ পাপেট থিয়েটার ইণ্ডিয়ার বিদেশ ভ্রমণ

ইউথ পাপেট থিয়েটার ইণ্ডিয়া গত ২ আগস্ট আমেরিকার ন্যাসভাইলে এডুকেশন এণ্ড পাপেট কনফারেন্স ও আন্তর্জাতিক উৎসব-এ 'পাপেটিয়ার্স অব আমেরিকার আমন্ত্রণে অংশ গ্রহণ করতে এয়ার ইণ্ডিয়া বিমানযোগে যাত্রা করেছেন। কনফারেন্স ও উৎসব শেষে ২১ আগস্ট ট্রুপটি ইউরোপীয় দেশগুলি ভ্রমণ করবেন ও আমন্ত্রণ ক্রমে লন্ডন, রোম, ফ্রাংকফুর্ট ও সুইজারল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করে সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দেশে ফিরবেন।

তুলসী কাব্য সমারোহ

সম্প্রতি কলামন্দিরে ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদ নিবেদন করলেন 'তুলসী কাব্য সমারোহ।' এই উপলক্ষে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের পরিচালনায় শ্রীতুলসীদাসজীর ভজন সহ-পরিবেশিত হোল। সমবেত কণ্ঠে, বৃন্দবাদন সহযোগে বিভিন্ন কণ্ঠে এক সাংগীতিক নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছিল। একক সংগীতে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী ললিতা ঘোষ, রবিকুমার কিচুল, দীপংকর চট্টোপাধ্যায়, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও দীপ্তি প্রকাশ মজুমদার অংশ নেন। শ্রীঈশ্বর অনুপম সুরসৃষ্টিতে তুলসীদাসজীর ভজনের অর্ঘমালা এক ভাব-গম্ভীর ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধান দিবস

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ত্রিংশতিতম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে রবিবার ২২ শ্রাবণ, ১৩৭৮ (৮ আগস্ট, ১৯৭১) সকাল আটটার সময় নিমতলা শ্মশানঘাটে তাঁর অবিনশ্বর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনার্থ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়েছে রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির পক্ষ থেকে।

এই উপলক্ষে ঐদিন ৬, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনস্থ মহর্ষি ভবনে কবির কক্ষ ও রবীন্দ্রভারতী সংগ্রহশালা সকাল ৭টা থেকে রাত্রি ৭টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য

মস্কো এবং রিগায় অনুষ্ঠিত ৫ম গ্রীষ্মকালীন স্পার্তাকিয়াদ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ম্যারাথন দৌড় বিজয়ী ভেলিকোরোডানক। সমাজতান্ত্রিক দেশের ক্রীড়াকর্তারা, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি আভেরি ব্রান্ডেজ সহ প্রায় ১৭০জন বিদেশী অতিথি প্রতিযোগিতা প্রত্যক্ষ করেন। ফাইনালে ৭০৮২জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

দর্শক
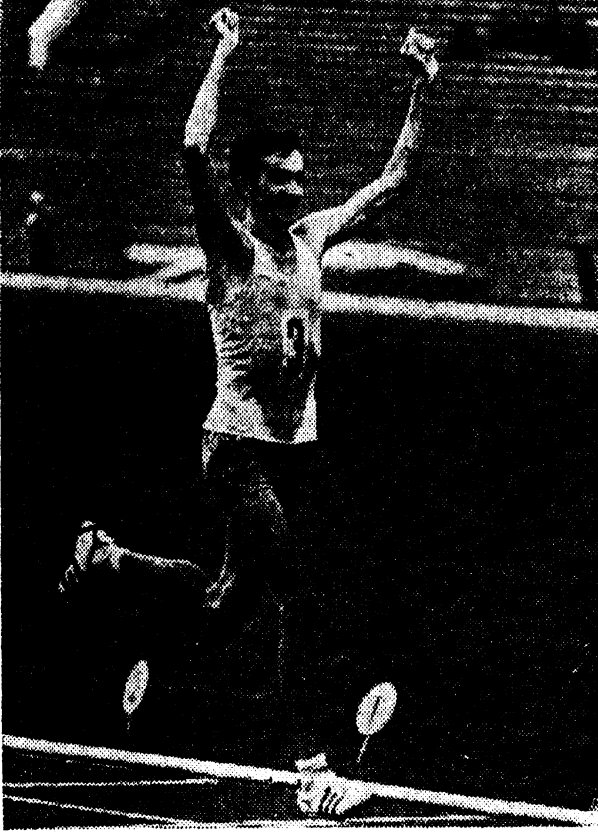
ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ড
দ্বিতীয় টেস্ট খেলা

ইংল্যান্ড : ৩৮৬ রান (লাকহার্স্ট ৭৮, নট ৪১, ইলিংওয়ার্থ ১০৭ এবং লেভার নট আউট ৮৮ রান। আবিদ আলি ৬৪ রানে ৪ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ৮৯ রানে ৩ উইকেট)।

ও ২৪৫ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। লাকহার্স্ট ১০১ এবং এডরিচ ৫৯ রান)।

ভারতবর্ষ : ২১২ রান (গাভাস্কার ৫৭ এবং সোলকার ৫০ রান। লেভার ৭০ রানে ৫ এবং প্রাইস ৪৪ রানে ২ উইকেট)।

ও ৬৫ রান (৩ উইকেটে। গাভাস্কার ২৪। প্রাইস ৩০ রানে ২ উইকেট)।

ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা বৃষ্টির জন্যে বাতিল ঘোষণা করা হয়। ফলে খেলা ড্র যায়। মুষলধারায় বৃষ্টি হওয়াতে শেষ পঞ্চম দিনে খেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি। চতুর্থ দিনের শেষে খেলার এইরকম অবস্থা দাঁড়িয়েছিল—ভারতবর্ষের দ্বিতীয়

হাতে জমা ছিল দ্বিতীয় ইনিংসের ৭টা উইকেট এবং একদিনের খেলা। সুতরাং বৃষ্টি ভারতবর্ষকে এ যাত্রা পরাজয়ের সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করেছে তা কেউ বললে জোর গলায় তার প্রতিবাদ চলে না।

বৃষ্টির জন্যে ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠের বদনাম চিরকালের। এখানে অনেক টেস্ট খেলাই বৃষ্টির জন্যে ভন্ডুল হয়েছে। এমন কি পাঁচদিনের বরাদ্দ টেস্ট খেলায় একটা বলও খেলা হয়নি এমন নজির দুটি আছে—১৮৯০ এবং ১৯৩৮ সালের ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা।

১৯৭১ সালের টেস্ট খেলা নিয়ে ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ভারতবর্ষ এবং ইংল্যান্ডের ১৯৪৬ এবং ১৯৭১ সালের টেস্ট খেলা ড্র যায়। অপরদিকে ইংল্যান্ডের জয়—১৯৫২ সালে এক ইনিংস ও ২০৭ রানে এবং ১৯৫৯ সালে ১৭১ রানে। ১৯৫২ সালের টেস্টে ভারতবর্ষের শোচনীয় পরাজয়ের মূলে ছিল ওল্ড ট্রাফোর্ডের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। তৃতীয় দিনের খেলায় ইংল্যান্ড ভিজে উইকেট পেয়ে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ৫৮ রানে এবং ২য় ইনিংস ৮২ রানের মাথায় শেষ করে এক ইনিংস ও ২০৭ রানে জয়ী হয়। ভারতবর্ষের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের এই জয়ই বৃহত্তম। এখানে উল্লেখ্য, ইংল্যান্ড বনাম ভারতবর্ষের টেস্ট খেলায় ইনিংস জয়ের প্রথম গৌরব লাভ করে ভারতবর্ষ—১৯৫১-৫২ সালের মাদ্রাজের ৫ম টেস্টে ভারতবর্ষের এক ইনিংস ও ৮ রানে জয়।

ইংল্যান্ড টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু খেলার সূচনায় তাদের মহা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। ৯০ মিনিটের খেলায় মাত্র ৪১ রান তুলতে তাদের চারটে উইকেট পড়ে যায়। এই চারটে উইকেটই পান আবিদ আলি। লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রান ছিল ৫৩ (৪ উইকেটে)। লাকহার্স্ট ১৩ রান করে অপরাজিত ছিলেন। চা-পানের সময় ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ১৬১ (৫ উইঃ)। উইকেটে অপরাজিত ছিলেন লাকহার্স্ট (৭১ রান) এবং ইলিংওয়ার্থ (১৩ রান)। পঞ্চম উইকেটের জুটিতে লাকহার্স্ট এবং নট দলের অতি মূল্যবান ৭৫ রান তুলে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তবে লাকহার্স্ট খুবই ভাগ্যবান। ভারতীয় ফিল্ডিংয়ের দোষে তিনি ১৬ এবং ২৭ রানের মাথায় আউট হওয়া থেকে খুব জোর 'বেঁচে' যান। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর ৭৮ রান সংগ্রহ করে ইংল্যান্ডকে শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন। চা-পানের দশ মিনিট পর লাকহার্স্ট খেলা থেকে বিদায় নেন। তিনি সাড়ে চার ঘন্টা খেলে তাঁর ৭৮ রানে ১১টা বাউন্ডারী করেন।

প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের সাতটা উইকেট পড়ে ২১৯ রান দাঁড়ায়।

খেলার এক সময় আবিদ আলির বোলিং পরিসংখ্যান ছিল : ১১-১ ওভার বলে ১৫ রান দিয়ে ৪টে উইকেট।

দ্বিতীয় দিনের চা-পানের কিছু পরে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলা ৩৮৬ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিনে ইংল্যান্ডের শেষ তিন উইকেটে ১৯৯ রাণ উঠেছিল। ইংল্যান্ডের ৮ম উইকেটের জুটিতে রে ইলিংওয়ার্থ (১০৭ রান) এবং পিটার লেভার (৮৮ নট আউট) দৃঢ়তার সংগে খেলে দলের যে ১৬৮ রান সংগ্রহ করেন তা ভারতবর্ষের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের অষ্টম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রানে পরিণত হয়। পূর্বের ৮ম উইকেট জুটির রেকর্ড রান ছিল ১৩৮ (রবিন্স এবং ভেরিটি, ম্যাঞ্চেস্টার ১৯৩৬)।

এই নিয়ে ইলিংওয়ার্থ টেস্ট খেলায় দুটো

ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে অনুষ্ঠিত ভারত বনাম ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের পিটার লেভারের বলে দিলীপ সরদেশাইয়ের বোল্ড-আউট হওয়ার দৃশ্য।

ওভার-বাউন্ডারী করেন। অপরদিকে লেভার তাঁর ৮৮ রানে ৭টা বাউন্ডারী করে অপরাজিত থাকেন। টেস্ট খেলায় এই তাঁর সর্বোচ্চ রান।

দ্বিতীয় দিনে বৃষ্টির ফলে এবং আলোর অভাবে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ৫০ মিনিট আগে খেলা ভেঙ্গে যায়। এই সময় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের কোন উইকেট না-পড়ে ৮ রান ছিল। এইদিন দু'ঘণ্টারও বেশী খেলার সময় বৃষ্টিতে ধুয়ে যায়।

তৃতীয় দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের এগার মিনিট আগে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২১২ রানের মাথায় শেষ হলে ইংলান্ড ১৭৪ রানে এগিয়ে যায়। ভারতবর্ষের একমাত্র গাভাস্কার (৫৭ রান) এবং সোলকার (৫০ রান) যা দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে সাময়িকভাবে দলের পতন রোধ করেছিলেন। লেভার ৭০ রানে ৫টা উইকেট পান। প্রথম টেস্টে যে নরম্যান গিফোর্ড ১২৭ রানে ৮টা উইকেট (১ম ইনিংসে ৮৪ রানে ৪ ও ২য় ইনিংসে ৪৩ রানে ৪) পেয়েছিলেন তিনি গাভাস্কারের মার খাওয়া বল ধরতে গিয়ে আঙ্গুল ভেঙ্গে খেলা থেকে বিদায় নেন। তিনি একটা বলও

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ড ৩ উইকেটের বিনিময়ে ২৪৫ রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলার এই অবস্থায় ভারতবর্ষের জয়লাভের জন্যে যেখানে ৪২০ রানের দরকার ছিল সেখানে এই দিনের বাকি সময়ের খেলায় তাদের তিনটে উইকেট পড়ে মাত্র ৬৫ রান উঠেছিল।

পঞ্চম দিনে বৃষ্টির ফলে খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। এখানে উল্লেখ্য, লর্ডসের প্রথম টেস্ট খেলাও বৃষ্টির জন্যে ভণ্ডুল হয়েছিল।

মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা

কুয়ালালামপুরে ১৫শ মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় লীগ পর্যায়ের খেলা শেষ হয়েছে। সেমি-ফাইনালে উঠেছে 'এ' গ্রুপ থেকে দক্ষিণ কোরিয়া (গত বছরের চ্যাম্পিয়ান) এবং তাইওয়ান। অপরদিকে 'বি' গ্রুপ থেকে ব্রহ্মদেশ (গত বছরের রানার্স-আপ) এবং ইন্দোনেশিয়া।

ভারতবর্ষ 'বি' গ্রুপের লীগ খেলায় অংশ গ্রহণ করে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। ভারতবর্ষের মোট পাঁচটি খেলার ফলাফল দাঁড়ায় জয়—১, হার—৩ এবং ড্র ১। ভারতবর্ষ ৫—১ গোলে ফিলিপাইনের বিপক্ষে জয়ী হয়। সিংগাপুরের সংগে ভারতবর্ষের খেলা ২-২ গোলে ড্র যায়। ভারতবর্ষের হার এই তিনটি খেলায়—ইন্দোনেশিয়ার কাছে ১—৩ গোলে, হংকংয়ের কাছে ১-২ গোলে এবং ব্রহ্মদেশের কাছে ১—৯ গোলে।

১৯৫২ সালের অলিম্পিক ফুটবল খেলায় যুগোশ্লাভিয়ার কাছে ভারতের শোচনীয় ১-১০ গোলে হার স্বীকারের পর আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতের শোচনীয় পরাজয়ের নজির ব্রহ্মদেশের কাছে এই ১—৯ গোলে।

এশিয়ান আঞ্চলিক হকি প্রতিযোগিতা

সিংগাপুরে আয়োজিত পেস্তা সুকান আঞ্চলিক হকি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ চ্যাম্পিয়ান এবং নিউজিল্যান্ড রাণার্স-আপ খেতাব লাভ করেছে। প্রতিযোগিতায় মোট ৬টি দেশ অংশ গ্রহণ করে লীগ প্রথায় খেলেছিল। ভারতবর্ষ ৫টি খেলায় মোট ৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লীগ তালিকায় শীর্ষ স্থান লাভ করে—জয় ৪, ড্র ১ (নিউজিল্যান্ডের সংগে), গোল স্বপক্ষে ২০ এবং বিপক্ষে ১। ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যান্ডের খেলা ১—১ গোলে ড্র যায়। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় নিউজিল্যান্ড ২—১ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছিল।

চিঠিপত্র

কাছের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ

২৭এ শ্রাবণের 'অমৃত' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'কাছের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ' লেখাটির মধ্যে একটি গুরুতর ভুল চোখে পড়ল। লেখকের মতে সাহিত্যরথী স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁর সহধর্মিণী, অবনীন্দ্রনাথের মধ্যমা কন্যা, করুণা দেবী অকালে বিধবা হয়ে পিত্রালয়ে চলে আসেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই—আনুমানিক ১৯১৬-১৭ সালে করুণা দেবীর অকাল মৃত্যুর পর প্রায় বারো-তের বৎসর পর ১৯২৯ সালে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৪১ বছর বয়সে লোকান্তরিত হন। সুতরাং করুণা দেবী বিধবা হননি। বিপত্নীক হওয়ার পর মৃত্যুকাল পর্যন্ত মণিলাল জোড়াসাঁকোতেই অবস্থান করেছেন। দুই পুত্র ছাড়া তাঁদের একটি কন্যাও আছেন। নাম—রেবা দেবী। অবনীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীযুক্তা সুরূপা দেবীর দেবর শ্রীযুক্ত পৃথ্বীনাথ মুখোপাধ্যায়ের তিনি সহধর্মিণী। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্রের নাম 'অমিতেন্দু' বলে লেখা হয়েছে। তাঁর প্রকৃত নাম মিতেন্দ্র। তিনি একটি গ্রন্থেরও রচয়িতা। বাঙলা সাহিত্যের কনিষ্ঠতম লেখক হিসাবে এই গ্রন্থের প্রকাশকালে তাঁর নাম ঘোষিত হয়েছিল।

কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা

ভারতীয় সংগীতের স্বরতত্ত্ব

অমৃতে (১১শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা) শ্রীযুক্ত সুধীন মিত্র মহাশয়ের 'ভারতীয় সংগীতে স্বরতত্ত্ব : ষড়জ-মধ্যম-পঞ্চম' শীর্ষক নিবন্ধটি পড়ে ভাল লাগলো। এ প্রবন্ধে প্রচুর জ্ঞাতব্য রয়েছে। লেখক প্রশংসনীয়ভাবে দুর্গম পথ-পরিক্রমা করে বহু তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অসতর্কতা বশতঃ তিনি একটি মারাত্মক ভুল করে বসেছেন। প্রবন্ধটির গোড়ার দিকেই তিনি এক স্থানে লিখেছেন, 'কথা বলবার সময় বক্তার গলার জোর যত বাড়ে, কম্পন তরঙ্গের সংখ্যা তত বাড়ে।' ঐ উক্তি শব্দ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখকের ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত, সন্দেহ নেই। আলোর তরঙ্গের বেলায় কম্পাঙ্ক কমলে বাড়লে অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ইথার তরঙ্গের কম্পনের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হলে আলোর বর্ণের পরিবর্তন হয়। তেমনি শব্দের কম্পাঙ্ক বৃদ্ধির সঙ্গে সুরের তীক্ষ্ণতার তারতম্য হয়। যদি লেখকের দাবি অনুযায়ী 'গলার জোরে'-ই সুরের তীক্ষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি করা যেতো, তবে গান হতো শুধু গলার জোরে। গায়ক সচেষ্টভাবে কম্পাঙ্ক বৃদ্ধির চেষ্টা না করে যদি শুধুমাত্র প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করেন তবে তা সম্ভব হবে না। লেখকের কথাই যদি ঠিক হবে, তবে কোন গান একই স্কেলে আস্তে বা জোরে গাওয়া কি সম্ভব হতো? শব্দের তীব্রতার সঙ্গে তীক্ষ্ণতার অনুভূতির কিঞ্চিৎ সম্পর্ক আছে, কিন্তু শব্দের তীব্রতাই সুরের তীক্ষ্ণতার নিয়ন্ত্রক নয়। লক্ষ্যণীয় যে, বাঁশিতে 'সা' যেখানে বাজে, তার অষ্টক সুর 'সা-'ও সেখানে বাজে। কিন্তু প্রথমবার সুর সৃষ্টিতে বাঁশিতে যতটা জোরে ফুঁ দিতে হবে, পরের বার তার চেয়ে বেশি জোরে ফুঁ দিতে হবে। এখানে শুধু গলার জোরে কার্যোদ্ধার হলো সন্দেহ নেই। কিন্তু সুরের অনুভূতির এ তারতম্যকে তরঙ্গ সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করলে ভুল করা হবে।

বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে কোন সুর যখন সৃষ্টি করা হয় তখন মূল সৃষ্টির সঙ্গে অন্যান্য অনেক উপসুরও থাকে। বাঁশিতে যখন 'সা' বাজে, তখন তার অষ্টক সুর 'সা'ও ঐ সুরে বর্তমান। কিন্তু তার তীব্রতা কম হলে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে ঐ সুর ধরা পড়ে না, বা মূল-সুরকে ছাপিয়ে তার অষ্টক আমাদের অনুভূতির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এটাকে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষমতার সীমা হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু জোরে ফুঁ দিলে মূল সুরের তীব্রতা যেমন বাড়বে, অষ্টকের তীব্রতাও তেমন বাড়বে। এ ক্ষেত্রে কম্পন তরঙ্গের কোন প্রকৃতিগত তফাৎ হবে না, শুধু পরিমাণগত তফাৎ হবে। কিন্তু সুরের অনুভূতি ব্যক্তিনির্ভর। তরঙ্গ-চরিত্রের পরিমাণগত তফাতের ফলেই শব্দানুভূতির তফাতের সৃষ্টি হবে এবং মূল সুরের চেয়ে তার উপসুর 'সা'-কেই প্রাধান্য দেবে আমাদের অনুভূতি।

শিশুকালে মানুষের গলায় স্বর তীক্ষ্ণ থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর মোটা হতে থাকে অর্থাৎ গলার শব্দ-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক কমে যাচ্ছে বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে গলার জোর কমে যায়, এরূপ মনে করার কোন ভিত্তি নেই।

অজয়কুমার চক্রবর্তী
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ধ্রুপদ সংগীত প্রসঙ্গে

২৪ আষাঢ়, ১৩৭৮ সালের সাপ্তাহিক অমৃতে শ্রীযুক্ত নিমাইচাঁদ বড়াল মহাশয়ের ধ্রুপদ সংগীতের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণটি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেলাম। সত্যিই যাঁরা এ বিষয়ে প্রকৃত রসগ্রাহী তাঁদের কাছে ঐতিহাসিক গবেষণাও কম আদরের নয়, বিশেষ করে যখন অনেক ছাত্রছাত্রী রবীন্দ্র-ভারতীর মত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে সংগীতে উচ্চতর শিক্ষা পাবার ও গবেষণা করবার সুযোগ পাচ্ছেন তখন তাঁদের কাছে এ জাতীয় প্রবন্ধ অনেক বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্ত তথ্যের দ্বার উদ্ঘাটন করতে সাহায্য করবে।

লেখক ঐ প্রবন্ধে চুঁচুড়া, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ ও কলকাতা মহানগরীতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চার কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছি যে, চন্দননগর বাগবাজার নিবাসী স্বর্গত বসন্তলাল মিত্র মহাশয় গোয়ালিয়রের ওস্তাদ দিওয়ান সিংকে চন্দননগরে এনে ধ্রুপদ গান শিক্ষা করেছিলেন। চুঁচুড়া ও চন্দননগরে ঐ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে আজও ধ্রুপদের চর্চা বজায় রয়েছে।

ওস্তাদ দিওয়ান সিং কেবল গায়ক ছিলেন না। চিত্র অঙ্কনেও তাঁর অদ্ভুত পারদর্শিতা ছিল। এখনও হয়তো ঐ মিত্র পরিবারে খোঁজ করলে তাঁর অঙ্কিত তৈল-চিত্রের নমুনা এক-আধটি পাওয়া যেতে পারে। বসন্তবাবুর পুত্র মণিবাবু ধ্রুপদে সুগায়ক ছিলেন। মণিবাবুর কণ্ঠ অতিশয় সুমধুর ছিল এবং তিনি ধ্রুপদ গানে পিতার যোগ্যপুত্র হয়ে উঠেছিলেন। এ বিষয়ে যদি কারও আরও বিশদ কিছু জানার আগ্রহ থাকে চন্দননগর, পালপাড়ার শ্রীজীবন নন্দী মহাশয়ের কাছে যোগাযোগ করতে পারেন। ইনি মণিবাবুর কাছে ধ্রুপদ গান শিক্ষা করেছিলেন। লেখক কলকাতার অনেক প্রখ্যাত ধ্রুপদ গায়কের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কয়েকটি দিকপালের নাম, যেমন শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখ তাঁর প্রবন্ধে কেন নেই বুঝলাম না। হয়তো প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করতে চান নি। পঞ্চাশ বছর আগে মুরারির সম্মেলনে এই দুই-জনের যুগলবন্দে সুরের আলাপ, গান ও বাটের কাজ আজও আমার প্রাণে শিহরণ জাগায়। সখারাম গণেশ ঐ সম্মেলন উদ্বোধন করতেন। দুই সহোদর শিবা পশুপতির (নেপাল রাজের সভাগায়ক) দীর্ঘকাল-ব্যাপী আলাপ আজও ভুলিতে পারিনি। তিনি স্বর্গত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটিও বাদ দিয়েছেন। বিখ্যাত মৃদঙ্গ-বাদক দুর্লভ ভট্টাচার্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা সন্তোষবাবু খান্ডারবাণী ধ্রুপদ শুনিয়ে সকলকে মুগ্ধ করতেন।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
চুঁচুড়া

… শ্রী… সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১০ … লেন কলিকাতা-৩

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

১৭শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 27th August, 1971. শুক্রবার, ১০ই ভাদ্র, ১৩৭৮ 50 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীপ্রদীপ দাশ

হৃৎপিণ্ড ছিনতাই :

বছর চারেক আগে দুর্ঘটনায় নিহত এক শ্বেতাঙ্গিনী বালিকার হৃৎপিণ্ড দিয়ে অপর এক হৃদরোগাক্রান্ত মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নব অধ্যায় সংযোজিত করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার শল্য চিকিৎসক ডঃ ক্রিস বার্ণার্ড। একের হৃৎপিণ্ড অন্যের বক্ষে স্থাপন করে নবজীবন দান করার অবিশ্বাস্য ও কল্পনাতীত কীর্তিকে সেদিন সোচ্চার অভিনন্দন জানিয়েছিল সমগ্র বিশ্ব। বিস্ময়বিমুগ্ধ মানুষ সেদিন একে অপরকে প্রশ্ন করেছিল এরপর মানুষ আর ভগবানে তফাৎ রইল কোথায়?

ডঃ বার্ণার্ডের সাফল্য যে যুগান্তকারী এবং তা যে বিশ্ব-মানবের অকুণ্ঠ অভিনন্দনের দাবী রাখে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু সে সাফল্য স্বীকার করে নিয়েও কোন-কোন মহলে সেদিন এ আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, ডঃ বার্ণার্ডের সাফল্য অনতিবিলম্বে সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অসহায় শ্রেণীর মানুষের জীবনে দারুণ অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ভাগ্যবান ক্ষমতাবান ও ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদের মহামূল্য জীবন রক্ষা করতে দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের হৃৎপিণ্ডের যথেচ্ছ ব্যবহার শুরু হবে এবং তার জন্য যেসব পন্থা অবলম্বন করা হবে তা প্রায় নরহত্যার সামিল।

সেদিনের সেই আশঙ্কা, যা তখন নৈরাশ্যবাদীদের অহেতুক উদ্বেগ বলে উপেক্ষিত হয়েছিল তাই আজ ভয়ংকর সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে হাস-পাতাল এখন যমপুরীর মতোই আতঙ্কের বস্তু। কেপটাউনের যে গ্রেটশুর হসপিটাল একদিন বিশ্বকে নবজীবনের বার্তা শুনিয়েছিল, কেপটাউনের কৃষ্ণাঙ্গ-পল্লী গুগুলেটুর মানুষ এখন তার ধারে-কাছেও যেতে ভয় পায়।

কদিন আগে ঐ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন জ্যাকসন গুনিয়া নামে এক কৃষ্ণাঙ্গ। ভর্তি হওয়ার পরে তাঁর স্ত্রী রোজালিন প্রতিদিনই হাসপাতালে যেতেন খোঁজ-খবর নিতে। সেকারণে হাস-পাতালের বহু নার্স ও চিকিৎসকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁর। তাছাড়া হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সময় যথারীতি জ্যাকসনের ঠিকানা ও নিকটতম আত্মীয়ের নামও খাতায় লিখে নেওয়া হয়েছিল। শেষ যেদিন হাসপাতালে যান রোজালিন, সেদিন শুনে আসেন স্বামীর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু পরদিন এক সাংবাদিকের মুখে রোজালিন শুনে হতবাক হয়ে যান যে, তাঁর স্বামীর হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস দিয়ে এড্রিয়ান হার্বার্ট নামক এক শ্বেতাঙ্গ রোগীর প্রাণরক্ষা করা হয়েছে। সাংবাদিকটি তখন আবার হাসপাতালে ছুটে গিয়ে জানতে চান, মৃতের আত্মীয়দের অনুমতি ছাড়াই কেন তার হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস বার ক'রে নেওয়া হ'ল? এর কোন সন্তোষজনক উত্তর হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিন-টেন্ডেন্ট ডঃ বার্জার বা অস্ত্রোপচারকারী ডঃ বার্ণার্ড দিতে পারেন নি। তাঁরা শুধু বলেন, মৃতের কোন আত্মীয়কে খবর দেওয়ার মতো যথেষ্ট সময় তাঁদের হাতে ছিল না। কিন্তু একই ধরনের ঘটনা ঐ হাসপাতালে অল্প ক'দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার ঘটলো বলে কেউই ঐ জবাবদিহিকে গ্রহণযোগ্য মনে করে নি।

রোজালিন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ এনেছেন—হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর মুমূর্ষু স্বামীর মৃত্যু ত্বরান্বিত করা হয়েছে। এ অভিযোগের জবাব দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সরকার নিশ্চয়ই দেবে না। কিন্তু সারা বিশ্বের মানবতাবাদী

জাতির কলঙ্ক :

বৃটেনের শিক্ষক পিটার উইলি ১৯৬৯ সালে চার্চিল বৃত্তি লাভ করে এক বছরের জন্য আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সম্প্রতি তিনি এক বিবৃতিতে বলেছেন, বৃটেনের অগুন্তি হিপি ছেলে-ছোকরা কাবুলের পথে পথে কুকুরের মত রুটির টুকরো আর নেশা-ভাঙ ভিখ মেগে দিন কাটাচ্ছে। আজ আফগানদের চোখে তারা চরম ধিক্কৃত ঘৃণ্য জীব।

তিনি আরও বলেছেন, তাদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে, মনের জোর সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে, আত্মচেতনা বলতেও কিছুই অবশিষ্ট নেই। বাঁচার প্রয়োজনে তারা নিজেদের বিকিয়েছে, নিজেদের সঙ্গিনীদের বাজারের পণ্যে পরিণত করেছে। কোন স্বপ্নরাজ্যের প্রত্যাশায় তারা ঘর ছেড়ে, দেশ ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল তা তারাই জানে। কিন্তু আজ যখন তারা ছিন্ন মলিন পোশাকে জীর্ণ দেহ আবৃত করে সমরকন্দ বা চিত্রলমুখী সড়কের ধারে রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরে বা সাঁকোর ওপরে দল বেঁধে বসে থাকে তখন তাদের রাস্তার ধারে আবর্জনার মধ্যে পড়ে-থাকা কতগুলো খালি টিনের কৌটো বলে মনে হয়। শিক্ষাব্রতী পিটার উইলি তাই বৃটেনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন, অবিলম্বে ঐ 'প্রডিগাল সন'-গুলিকে দেশে ফিরিয়ে এনে একটি জাতীয় কলঙ্ক দূর করা হ'ক।

সমাজতত্ত্ব :

বৃটেনের স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ দপ্তর আগষ্ট মাসের গোড়ার দিকে ইংলণ্ডের সমাজজীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর যেসব তথ্য প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যায় যে, শুধু ইংলণ্ডে ১৯৭০ সালে ১৯৬৯ সালের তুলনায় পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশী গর্ভপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬৯ সালে সেখানকার বিভিন্ন সরকারী হাস-পাতালে ৫২,০১৮টি গর্ভপাত করা হয়। পরের বছর ১৯৭০ সালে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৮০,৫২৩। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে গর্ভপাতের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কোন কারণ প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয় নি।

অত্যধিক মাদকদ্রব্য সেবনজনিত রোগ সম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯৬৫ থেকে '৬৮ সাল পর্যন্ত ঐ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির হাসপাতালে আসার সংখ্যা অতিদ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৮ সালে মোট ২,০৭২ জন নেশাগ্রস্ত ইংলণ্ডের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসিত হতে আসে। কিন্তু ১৯৬৯ সালে ঐ সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হয় ১,৯৪৮। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ঐ সংখ্যা থেকে এ অনুমান যেন না করা হয় যে, অতজন নেশাগ্রস্ত রোগী এসেছিল চিকিৎসার জন্য। কারণ একই রোগী কয়েকবার এসে থাকতে পারে। পরিশেষে রিপোর্টে এই বলে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে যে, অন্তত একটা সামাজিক ব্যাধি হ্রাস পাওয়ার সুনিশ্চিত লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

রাজধানীর জনতত্ত্ব :

দিল্লী এখন লোকসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের ২১তম শহর। তার লোকসংখ্যা ৩৬ লক্ষ ২৯ হাজার ৮৪২। তার মধ্যে পুরুষ ২০ লক্ষ ১৮ হাজার ৮২৫ আর নারী ১৬ লক্ষ ১০ হাজার ৯৯০। অর্থাৎ প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ৭৯৮। এসব তথ্য সদ্য-প্রকাশিত ১৯৭১ সালের জনগণনার রিপোর্টে পাওয়া গেছে। দিল্লীর পুরুষদের মধ্যে শিক্ষিত শতকরা প্রায় ৬৬ জন এবং নারীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৫১ জন।

রাজধানী দিল্লীর চারিদিকের কিছু পল্লী এলাকা নিয়ে যে কেন্দ্রশাসিত দিল্লী অঞ্চল তার মোট লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩৩৮। অর্থাৎ কেন্দ্রশাসিত দিল্লীর মোট লোকসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশ শহরবাসী। —প্রত্যক্ষদর্শী

কেনেডি ও কিসিংগার

আগে এসেছিলেন কিসিংগার। কিসিংগার জাতে ইহুদী, জন্ম জার্মানীতে। জেনোসাইড বা গণহত্যার ব্যাপারটার সম্যক অর্থ তাঁর অজ্ঞাত একথা মনে করা অসঙ্গত নয়। ১৯৬২-তে এই হেনরী কিসিংগার বলেছিলেন ভারতের বিরুদ্ধে চীনের সঙ্গে মিতালী করা 'নির্বোধ'-এর কর্ম। করাচীর 'ডন' পত্রিকা সেদিন কিসিংগারকে "হার্ভার্ড গুফ্" এই বিশেষণে সম্মানিত করেছিল। তারপর অনেক জল অতলান্তিকে--প্রশান্তমহাসাগরে বয়ে গেছে। আজ কিন্তু কিসিংগার পরম প্রাজ্ঞ। বাংলাদেশ আর বেলসেনের ক্যাম্প যে একই বস্তু তিনি হয়ত তা মনে করেন না। দিল্লীতে বসে তিনি নাকি লক্ষ্মীকান্ত ঝাকে বলেছিলেন পাকিস্তানের ব্যাপার নিয়ে চীন যদি ভারত আক্রমণ করে তাহলে আমাদের কাছে কোনো সাহায্য আশা করবেন না। সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করেছিলেন—একবার শরণার্থী শিবির দেখবেন? জবাবে বলেছিলেন—না, না, সেসব সময় নেই। তারপরই তিনি গেলেন সোজা ইসলামাবাদে, সেখান থেকে গোপন দৌত্যে পিকিং-এ। জনৈক রাজনৈতিক ভাষ্যকার তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

"For all his professorial background he looks and acts more like a spy than a learned emissary". তাঁরই উপদেশে নিকসন মহোদয় ইয়াহিয়াকে প্রকাশ্যে এবং গোপনে সমরাস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছেন। চীন এবং আমেরিকা আজ ভাই-ভাই হতে চলেছে। কিসিংগারের রচনাদি থেকে বোঝা যায় তিনি একজন যুক্তিবাদী মানুষ, মানবিক সহৃদয়তার এতটুকু ধার ধারেন না। কঠোর বাস্তববাদী।

যাই হোক, কিসিংগার যা করেছেন তাতে ভারতবর্ষের পক্ষে ভালোই হয়েছে। মার্কিন শাসকচক্র যে কোনোকালেই ভারতবর্ষকে সুনজরে দেখেন নি, বরং মুখে হাসি অন্তরে গরল নীতি পালন করেছেন আজ সে অবস্থা অতি বড় জড়বুদ্ধির কাছেও সুস্পষ্ট হয়েছে। ভারতবর্ষে একশ্রেণীর মানুষ আমেরিকার অঞ্চলাশ্রিত হয়ে বলে এসেছেন—ওরা আমাদের বন্ধু, আমাদের আপৎকালের বন্ধু। আজ তাই কিসিংগারকে ধন্যবাদ –এইসব মানুষের জ্ঞানচক্ষু হয়ত এতদিনে একটু উন্মীলিত হবে। ভারতবাসীর দৃষ্টিতে মার্কিন শাসকচক্রকে এক বীভৎস আকৃতিতে কিসিংগার প্রকাশিত করেছেন তার জন্যই তিনি ধন্যবাদার্হ।

কিন্তু এই-ই সব নয়। স্বদেশে ফিরে কিসিংগার যখন পরবর্তী প্যাঁচের পরিকল্পনা করছেন তখন এলেন সেনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি। আইরিশ-ক্যাথলিক বংশোদ্ভূত এই ভদ্র মানুষটি ভারতের মাটিতে পদার্পণ করার অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষের মানুষ জানতে পেরেছিল মার্কিন শাসকচক্র আর জনসাধারণ এক বস্তু নয়। সরকারী নীতির তীব্র সমালোচক একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী আজও মার্কিন মুল্লুকে আছেন। সেখানকার সংবাদপত্র প্রকৃতই স্বাধীন মত প্রকাশের শক্তিতে শক্তিমান। কেনেডি এলেন ভারতীয় সরকারী ও বে-সরকারী মহলের সঙ্গে পরামর্শ করতে কিভাবে ত্রাণসামগ্রী বন্টন এবং আহরণ করা যায়, স্বচক্ষে কোটি কোটি দুর্গত মানুষের দুর্দশা দেখতে, তারপর পিণ্ডি এবং ঢাকায় গিয়ে কথাবার্তা চালাতে। পিণ্ডি শেষ পর্যন্ত রাজী হল না তাদের বাঁশের পরদাঘেরা মুল্লুকে কেনেডি সাহেব ও তাঁর সঙ্গীদের প্রবেশের অনুমতি দিতে। এই সিদ্ধান্ত কেন যে পিণ্ডি নিয়েছেন সে বিষয়ে অনেক কানাঘুষো সংবাদও রটেছে। কেনেডি এবং তাঁর সমর্থক মার্কিন জনগণ পিণ্ডিকে যথেচ্ছভাবে সামরিক অস্ত্রসম্ভার এবং সাহায্যদানের বিরোধিতা করছেন। কেনেডির ভারত আগমনে ভারতবাসীর নজরে মার্কিন জনগণের চিত্রকল্প বা ইমেজ সুস্পষ্ট হয়েছে। মার্কিন মুলুকে কিসিংগারও আছেন আবার কেনেডিও আছেন। কেনেডি আমেরিকার বেসরকারি রাষ্ট্রদূত হিসাবে এক মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। দুটি মহান দেশের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা ও অবিশ্বাসের যে মনোভংগী প্রকট হয়ে উঠেছিল, কেনেডির এই আগমনে তাও অনেকখানি হালকা হয়ে এসেছে। "হাউজ অব রিপ্রেসেনটেটিভস" ইতিমধ্যেই পূর্ববাংলায় যতদিন না ত্রাসের রাজত্বের অবসান ঘটছে ততদিন পাকিস্তানকে কোনরকম সাহায্যদান নিষিদ্ধ করেছেন। মার্কিন সেনেটও হয়ত অনুরূপ ব্যবস্থাই গ্রহণ করবে। যুক্তরাষ্ট্রের শাসকচক্রও ভারত-সোভিয়েত চুক্তি সম্পর্কে কোনোরকম বিরূপ মন্তব্য না করাটাই শ্রেয় মনে করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন নিঃসঙ্গতার হতাশায় ভারত পিকিং ও পিণ্ডির সঙ্গে এখন আর সহসা কোনোরকম হাঙ্গামায় বিজড়িত হয়ে পড়বে না। সোভিয়েট-ভারত চুক্তি এইসব দেশের মধ্যে যে 'মনকষাকষি' বা 'টেনস্যন' চলছে তা তরল করে দেবে।

বাস্তুহারা সহায়ক সেনেট-সাব কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে কেনেডির প্রাথমিক কর্তব্য ত্রাণব্যবস্থা। কিন্তু স্বচক্ষে দেখে তিনি বুঝেছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে একটা গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এই সমাধানে পূর্ববাংলাকে স্বাতন্ত্র্যদান করতে হবে। ঠিক স্পষ্ট করে সব কথা না বললেও অনেক কথাই তিনি বলেছেন। আর বলেছেন—শেখ মুজিবরের একমাত্র অপরাধ তিনি নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। আশা করা যায় কেনেডি এবং তাঁর সহমর্মী স্বদেশবাসীরা মার্কিন মুলুকের মনোভাবকে যথার্থভাবে প্রভাবিত করতে পারবেন।

ভারতের পক্ষে কিসিংগার ও কেনেডি উভয় ব্যক্তির আগমনই ফলপ্রসূ হয়েছে একথা এখন বিনা দ্বিধায় উচ্চারণ করা যায়।

জাতীয় পরিষদের আলোচনা থেকে কংগ্রেস সম্পর্কে কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বিধার লক্ষণ স্পষ্ট। কারণ, কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলা হলেও, কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সংগ্রামের আহ্বানও জানানো হয়েছে। আবার মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে গণ আন্দোলনে সি পি এমের সহযোগিতার কথাও বলা হয়েছে। কম্যুনিস্ট পার্টির এই নীতির কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে পশ্চিম বাংলায়?

কংগ্রেসের, অর্থাৎ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসের, মধ্যে দক্ষিণপন্থীদের আবিষ্কারে কি কেউ ভুরু কোঁচকাচ্ছেন? ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে কংগ্রেস ভাগের সময়েই কি তাদের কবরস্থ করা হয়নি? তা হলে কি নতুন করে আবার তাদের অভ্যুদয় ঘটল? কংগ্রেস ভাগের সময়ে কম্যুনিস্ট পার্টির বিশ্লেষণ তা হলে কতোটা টিঁকল?

অবিভক্ত কংগ্রেসের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীলের দল একই সঙ্গে জোট বেঁধে ছিলেন, কম্যুনিস্ট পার্টির এই থিওরি অনেক পুরোনো। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, মোরারজী দেশাইয়ের পদচ্যুতি, ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ—এই সবকে কেন্দ্র করে যখন কংগ্রেস ভাগ হল তখন সেই থিওরি প্রমাণিত হওয়ায় পার্টি স্বভাবতঃই উল্লসিত হল। অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে পশ্চিম বাঙলার বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও রণেন সেনও বললেন, ব্যক্তিগত বিবাদের ফলে কংগ্রেস ভাগ হচ্ছে না, হচ্ছে গণ-আন্দোলনের আঘাতে। গণ-আন্দোলনের ফলে দক্ষিণপন্থীরা এতই ভীত যে, তারা আর কোন ঝুঁকি নিতে চায় না। সেই সঙ্গে মার্কসবাদীদের সম্পর্কে একটু বাঁকাক্তিও জুড়ে দেওয়া হল: "আমরা যখন কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীলদের অস্তিত্বের কথা বলতাম তখন আমাদের অনেক কমরেড হেসেছিলেন, আর পার্টি ভেঙে গড়েছিলেন, সি পি আই (এম)। আজ সেই সব বিপ্লবীরাও ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের জন্যে শ্রীমতী গান্ধীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন এবং কংগ্রেসের মধ্যে আদর্শগত মতবিরোধের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন।"

কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব যখন তুংগে, ১৯৬৯ সালের সেই সেপ্টেম্বরে কম্যুনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবেও স্বীকার করা হল যে, কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ মূলতঃ রাজনৈতিক—এক দিকে রয়েছে দক্ষিণপন্থীরা আর অপর দিকে গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতিনিধিরা। সুতরাং এখন কর্তব্য কী? কর্তব্য হল জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করা। সেই ফ্রন্ট পরে কেন্দ্রে জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার গড়বে। সেই সরকারে বামপন্থীরা তো থাকবেনই, সেই সঙ্গে থাকবে কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশ।

কংগ্রেস ভাগের পর পার্লামেন্টে যা অবস্থা দাঁড়াল তাতে মনে হচ্ছিল ভারতের *রাজনীতির গতি যেন* কম্যুনিস্ট পার্টির ছকের সঙ্গে একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে। না, জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হল না ঠিকই, কিন্তু টিঁকে থাকার জন্যে শ্রীমতী গান্ধীর সরকারকে তো বামপন্থীদের সমর্থনের ওপর বেশ কিছুটা নির্ভর করতে হল! তার ফলে চাপ দিয়ে সরকারকে বাম পথে নিয়ে যাওয়ারও বেশ সুবিধে হল। বামপন্থীদের বিরোধিতার জন্যেই তো কুখ্যাত আটক আইন নতুন করে পাস করানো গেল না।

কিন্তু এ বছর মার্চ মাসে সব যেন কেমন ওলোট-পালোট হয়ে গেল। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের দিবাস্বপ্ন গেল মিলিয়ে, বামপন্থীদের সমর্থনেরও দরকার রইল না শ্রীমতী গান্ধীর, তাঁর দল স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল দিল্লীতে। অন্য কেউ চাপ দিয়ে সেই সরকারকে কোনো বিশেষ পথে নিয়ে যাবে এমন সম্ভাবনাও তিরোহিত হল। শ্রীমতী গান্ধী যা চান তিনি এখন তা-ই করতে পারেন। সংবিধান সংশোধনও এখন যেমন সহজ, তেমনই সহজ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিল পাস করানো।

এই পরিবর্তিত অবস্থায় কম্যুনিস্ট পার্টির নীতির নতুন মূল্যায়ন তো অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবেই। এই সপ্তাহে দিল্লীতে পার্টির জাতীয় পরিষদ সেই কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

কংগ্রেস-ভাগের সময় পার্টি যে বিশ্লেষণ হাজির করেছিলেন সেই অনুযায়ী শ্রীমতী গান্ধীর কংগ্রেসের মধ্যে শুধু গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতিনিধিদের থাকার কথা। কিন্তু এখন [illegible] আছে, পার্টির [illegible] অন্য পথ নিচ্ছে। কারণ পার্টি এখন নতুন কংগ্রেসের মধ্যেও দক্ষিণপন্থীদের সন্ধান পাচ্ছেন। পুরোনো কংগ্রেসের মতো এই কংগ্রেসের মধ্যেও চলছে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে বামপন্থীদের লড়াই। সেই লড়াইকে পার্টি জোরদার করে তুলতে চায় সঙ্ঘবদ্ধ গণআন্দোলনের দ্বারা। সেই লড়াইয়ের পরিণতিতে আবার কংগ্রেস ভাগ হবে। আর সেই কংগ্রেস ভাগের পর কেন্দ্রে বামপন্থী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকার গঠনের সত্যিকার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

তা হলে কি এর আগে নতুন কংগ্রেস সম্পর্কে পার্টির বিশ্লেষণে কোনো ভুল ছিল? মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির বিশ্লেষণই কি ছিল তবে সত্যের কাছাকাছি? কারণ, ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রগতিশীলদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বন্দ্ব, এ-কথা মার্কসবাদীরা মানতে চাননি। অবশ্য তাঁরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভি ভি গিরিকে সমর্থন করেছিলেন, ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্তকরণেও শ্রীমতী গান্ধীকে জানিয়েছিলেন অভিনন্দন। কিন্তু প্রমোদ দাশগুপ্তের ভাষায়, জল্লাদের দড়ি যেমন ফাঁসির আসামীকে 'সাপোর্ট' দেয় এই 'সাপোর্ট'ও ছিল তেমনই!

এবারের জাতীয় পরিষদের আলোচনা থেকে মনে হতে পারে যে, কম্যুনিস্ট পার্টি যেন আবার ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকেই যাত্রা সুরু করছে। প্রগতিশীল পথে সরকারকে চালিত করার জন্যে তখনও পার্টি প্রস্তাব নিয়েছিল গণ-আন্দোলন সুরু করার। এবারের প্রস্তাবেও রয়েছে সেই ধরনের আন্দোলনেরই ডাক। মধ্যে ১৯৭০ সালের কোনো প্রস্তাবে কিন্তু এই ধরনের ডাকের বিশেষ আভাস ছিল না। তবে দু' বছর আগে কম্যুনিস্ট পার্টির আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল অনেক স্পষ্ট—সিন্ডিকেট। এখন সেটা ততটা স্পষ্ট নয়। কারণ, এখন কংগ্রেসের মধ্যে কারা দক্ষিণপন্থী, পার্টি সে-কথা স্পষ্ট করে বলছে না।

এই গণ-আন্দোলন কেন চাই? বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাষাতেই শুনুন: 'সি পি এম সব উদ্যোগটা ছেড়ে দিতে চায় শ্রীমতী গান্ধীর ওপর। আমরা চাই, প্রগতিশীল নীতির সমর্থনে ও চরম দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে কম্যুনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থীরা নিজেরাই সেই সুযোগ হাতে তুলে নিক। আমরা মনে করি এই ধরনের বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন কংগ্রেসের মধ্যে গণতান্ত্রিক ঝোঁককে শক্তিশালী করে তুলবে এবং সব চরমপন্থী চক্রান্তকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।' বিশ্বনাথবাবুর মুখে কথাগুলো শোনা গিয়েছিল ঠিক দু' বছর আগে, কিন্তু এখনও শোনা যেতে পারত। কারণ জাতীয় পরিষদের এবারের বৈঠকেও তো এই সুরেই শোনা গেল।

*

গণআন্দোলনে কম্যুনিস্ট পার্টি যাদের [illegible]

কম্যুনিস্ট পার্টিও আছে। সি পি আই সোস্যালিস্টদেরও সমর্থন চায়, কিন্তু সোস্যালিস্টরা যে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী নয় তাতে পার্টি মোটেই খুশি নয়। দু' বছর আগেও সি পি আই সমালোচনা করেছিল এস এস পি'র, তখন তার কারণ ছিল এস এস পি'র অন্ধ কংগ্রেস-বিরোধিতা। এস এস পি যে তখন যেন-তেন-প্রকারেণ শ্রীমতী গান্ধীর সরকারের পতন ঘটাতে সচেষ্ট ছিল, সেটা কম্যুনিস্ট পার্টি ভালো চোখে দেখে নি। এখন নতুন সোশ্যালিস্ট পার্টি সম্পর্কে কম্যুনিস্ট পার্টির বিরাগের কারণ ঐ দল কংগ্রেসের সঙ্গেও হাত মেলাবে না, কম্যুনিস্টদের সঙ্গেও হাত মেলাবে না।

কিন্তু সি পি এমের সঙ্গে একত্রে গণ-আন্দোলনের সম্ভাবনা কতোটুকু? পশ্চিম বাঙলায় বন্ধ ডাকার ব্যাপারে এ আই টি ইউ সি ও সিটু গলা মিলিয়েছে। কিন্তু এটা কি দেশব্যাপী মিলিত আন্দোলনের সূচক?

একটা সাম্প্রতিক ঘটনার কথা শুনুন। সি পি এমের পোলিটব্যুরোর সদস্য এ কে গোপালন গত ১ জুলাই সি পি আই সাধারণ সম্পাদক রাজেশ্বর রাওকে একটি চিঠি দেন। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইনের বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার সপক্ষে গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে অন্যান্য বামপন্থী দলের সঙ্গে সঙ্গে সি পি আইয়ের কাছ থেকেও এ-ব্যাপারে সহযোগ প্রার্থনা করেন শ্রীগোপালন। সি পি এমের মতো সি পি আই-ও পার্লামেন্টে এই আইনের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। তাই শ্রীগোপালন চেয়েছিলেন সি পি আইকেও গণ-আন্দোলনে সামিল করতে।

শ্রীরাও এই চিঠির জবাবে কী বললেন? তিনি স্বীকার করলেন যে, তাঁদের পার্টি পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে এই আইনের বিরোধিতা করছে। কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতার সপক্ষে যদি যৌথ আন্দোলন চালাতে হয় তবে তার আগে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার বলে তিনি মনে করেন। ব্যক্তি স্বাধীনতা তো রাজনৈতিক হত্যা ও সন্ত্রাসের ফলেও গুরুতরভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে পশ্চিম বাংলায়। এই হত্যা ও সন্ত্রাস আমদানি করেছে সি পি এম এবং আরো কয়েকটি দল। যদিও সিদ্ধার্থশংকর রায় কর্তৃক অনুষ্ঠিত বৈঠকে সি পি এম যোগ দিয়েছে, কিন্তু এই সমস্যার সমাধানে সি পি এম এখনও নেতিবাচক মনোভাব গ্রহণ করে চলেছে। তা ছাড়া অনেক এলাকাতেই সি পি এম এখনও শ্রীরাওয়ের পার্টির ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে।

শ্রীরাও আরো জানতে চাইলেন : বাঙলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের এবং ঐ দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কেই বা আপনাদের মনোভাবটা কী? পশ্চিম বাঙলায় আপনাদের দলের পক্ষ থেকে যে-সব বিবৃতি দেওয়া হয়েছে ও প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে তা থেকে দেখা যায় আপনাদের দল শরণার্থীদের অন্য রাজ্যে পাঠানোর বিরোধী। আমরা তো এর কারণ বুঝতে পারি না। তা ছাড়া বাঙলাদেশ সমস্যাকে আমরা একটা জাতীয় সমস্যা বলে মনে করি। কিন্তু আপনাদের দল এই ব্যাপারেও ভারত সরকার ও কংগ্রেস দলের সঙ্গে সহযোগ করতে চায় না। কংগ্রেস দল ও ভারত সরকারের সঙ্গে সহযোগ না করে কি আমরা বাংলাদেশের মানুষকে সাহায্য করতে পারস? তাই এই প্রশ্নেও আমরা আপনাদের মনোভাব ঠিক বুঝতে পারছি না।

গোপালন অবশ্যই এই চিঠির জবাব দিলেন—দু'টো অভিযোগই অস্বীকার করলেন এবং সেই সঙ্গে সি পি আইয়ের প্রতি কটূক্তি করতেও ছাড়লেন না। কেরল, বিহার, পশ্চিম বাঙলায় সি পি আই কংগ্রেসের মিতা, সুতরাং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সত্যিকার গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে সি পি আই একটু অস্বস্তি বোধ করবে বৈকি!

গোপালন তাঁর চিঠিতে পশ্চিম বাঙলার খুনোখুনি ও বাঙলাদেশ সম্পর্কে সি পি এমের মনোভাব বিশদভাবে ব্যাখ্যাও করেছেন। তার উল্লেখ এখানে অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু এই পত্রালাপ থেকে এটুকু অন্ততঃ

স্পষ্ট যে, দুই কম্যুনিস্ট পার্টির মিলিত আন্দোলনের পথে বাধা বড়ো কম নয়।

•

পশ্চিম বাঙলায় এখন কম্যুনিস্ট পার্টির নীতি কী হবে? এখানেও কি পার্টি প্রগতিশীল কংগ্রেসীদের সঙ্গে সহযোগ করবে এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে চালাবে লড়াই?

গত বছর এই সময় নাগাদ পার্টির জাতীয় পরিষদ পশ্চিম বাঙলা সম্পর্কে একটা স্ট্র্যাটিজি ঠিক করে ফেলেছিলেন: প্রথমে আট পার্টি জোট বাঙলা কংগ্রেসকে দলে টেনে ন' পার্টি হবে, তারপর সেই জোট একটা নির্বাচনী সমঝোতায় আসবে কংগ্রেসের সঙ্গে। কিন্তু সে-স্ট্র্যাটিজি যে শেষ পর্যন্ত কাজে পরিণত করা যায়নি তার কারণ, পার্টির পশ্চিম বাঙলা শাখার নেতাদের একাংশ কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতায় মোটেই রাজী ছিলেন না। তাঁদের মতে, পশ্চিম বাঙলার কংগ্রেস নেতারা যথেষ্ট প্রগতিশীল নন, সুতরাং ওঁদের সঙ্গে সমঝোতা বাঞ্ছনীয় নয়। আট-পার্টির অন্যান্য শরিকেরাও ছিলেন এই ধরনের সমঝোতার বিরোধী। পশ্চিম বাঙলা সম্পর্কে জাতীয় পরিষদের নির্দেশ এইভাবে বানচাল হয়ে যায় দেখে ভবানী সেন প্রমুখ কেন্দ্রীয় নেতারা কলকাতায় ছুটে এলেন, সহকর্মীদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করাতে চেষ্টা করলেন, তবু কিছুতেই কিছু হল না। জাতীয় পরিষদের প্রস্তাব শিকেয় উঠল।

এই বছর নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টি তথা আট-পার্টি জোট যখন মোটেই সুবিধে করতে পারল না তখন কিন্তু পার্টির মধ্যে এই সমালোচনা দেখা দিল যে, জাতীয় পরিষদের নির্দেশ অমান্য করার জন্যেই নির্বাচনী ফল এমন হল। পার্টির তরুণতর সদস্যরা তো প্রায় বিদ্রোহই করে বসলেন। প্রধানতঃ তাঁদের চাপেই সাধারণ সম্পাদক ডঃ রণেন সেনকে বিদায় নিতে হল এবং তাঁর [illegible] [illegible] গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পশ্চিম বাঙলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিবর্তন আনার জন্যে এখন যে চেষ্টা চলছে তাতে কম্যুনিস্ট পার্টির আগ্রহ থাকা খুবই স্বাভাবিক। কারণ পরবর্তী নির্বাচনে পার্টি কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতায় আসবে কিনা তা নির্ভর করছে এর ওপর। অনেকে তো [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] চেহারা দেওয়ার জন্যে যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ যে চেষ্টা করছে তার পেছনে কম্যুনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠনের মদৎ রয়েছে। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে যাঁদের সম্বন্ধে কম্যুনিস্ট পার্টির আপত্তি ছিল তাঁদের মধ্যে বিজয় সিং নাহার বিদায় নিচ্ছেন। বিজয়বাবুর জায়গায় নতুন সভাপতি এখনও নির্বাচিত হন নি, আবদুস সত্তার কাজ চালাচ্ছেন। তবে শীঘ্রই নতুন সভাপতি নির্বাচিত হবেন। এই পদের সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে আছেন তরুণকান্তি ঘোষ ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। নতুন সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর পশ্চিম বাঙলায় কংগ্রেস সম্পর্কে কম্যুনিস্ট পার্টির মনোভাব কী হবে? পার্টি কি কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী বোঝাপড়ায় উদ্যোগী হবে? যদি উদ্যোগী হয়, তবে কি কম্যুনিস্ট পার্টি আট-পার্টির অন্যান্য শরিক যথা ফরওয়ার্ড ব্লক, সোশ্যালিস্ট ইউনিট সেন্টার প্রভৃতির সহযোগিতা এ-ব্যাপারে আশা করতে পারে? এই সব প্রশ্নের উত্তরের ওপর পশ্চিম বাঙলার রাজনীতির গতি অনেকটাই নির্ভর করছে।

[illegible] [illegible]

দেশে বিদেশে

ইনস্টিট্যুট অব ডিফেন্স স্টাডিজের ডিরেক্টর কে সুব্রহ্মণ্যম সম্প্রতি বাঙলা দেশের প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার মতো একটি হিসাব দিয়েছেন। বাংলা দেশে এখন মুক্তি যোদ্ধাদের হাতে মাসে আন্দাজ এক ব্যাটালিয়ান পাকিস্তানী সৈন্য খতম হচ্ছে আর বাংলা দেশ থেকে আশ্রয়প্রার্থী আসছেন দিনে প্রায় ৪০ হাজার হারে। মাসে নূতন করে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য তৈরি করার খরচ এবং মাসেপ্রায় বারো লাখ লোককে আশ্রয় দেওয়ার খরচ, এই দুটি অংশের তুলনা করে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, বাঙলা দেশের উপর দখল বজায় রাখার চেষ্টা করতে গিয়ে পাকিস্তানকে যে খরচের বোঝা নিজের কাঁধে নিতে হচ্ছে তার ছয়গুণ বেশী বোঝা সে ভারতের কাঁধে চাপিয়ে দিচ্ছে। শ্রীসুব্রহ্মণ্যম এটাকে পাকিস্তানের 'লো কস্ট স্ট্র্যাটেজি' অর্থাৎ কম খরচে কাজ উদ্ধারের কৌশল বলে অভিহিত করেছেন।

এই কৌশলের একটি অংশ হল, বাঙলাদেশের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া। পাকিস্তানের ধারণা, মুক্তি বাহিনীর আসল জোর ও আসল ঘাঁটি হল ভারতে। এই বাহিনীর লোকেরা অবাধে সীমান্ত পার হয়ে যাতায়াত করতে পারছে বলেই তারা পাকিস্তানী বাহিনীকে এতটা বেগ দিতে সমর্থ হচ্ছে। পাকিস্তান এই অবাধ যাতায়াতের সুযোগ বন্ধ করতে চাইছে, আর সেই সঙ্গে আশ্রয় প্রার্থীদের ভারত অভিমুখী স্রোত বজায় রাখতে চাইছে। এইভাবে সীমান্তের লোক চলাচলকে একমুখী করতে পারলে পাকিস্তানের লাভ আর ভারতের লোকসান।

অথচ, পাকিস্তান জানে যে, সীমান্তে এই খবরদারি করা তার একার শক্তিতে কুলোবে না। সেই কারণেই সে এর সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘকে জড়াবার জন্য জোর কোশিস চালিয়ে যাচ্ছে, রাষ্ট্রসংঘের লোকরা এই খবরদারির কাজটা যদি ইয়াহিয়া খাঁর জঙ্গীবাহিনীর সঙ্গে ভাগ করে নেন তাহলে পাকিস্তানের সুবিধা হতে পারে, এটাই সেদেশের জঙ্গীশাহীর হিসাব। আমেরিকার আশীর্বাদ, প্রশ্রয় ও সহযোগিতা নিয়ে ইসলামাবাদ প্রথমে চেষ্টা করেছিল সীমান্তের এপারে-ওপারে রাষ্ট্রসংঘের শরণার্থী সংক্রান্ত হাই-কমিশনারের প্রতিনিধিদের নিয়োগ করতে। ভারত সরকার তীব্র আপত্তি করায় সেই চেষ্টা ফেঁসে গেছে। এরপর পাকিস্তান, সমাসীর নিরাপত্তা পরিষদকে জড়াবার চেষ্টা করেছে। পাকিস্তানের প্রস্তাব হল, নিরাপত্তা পরিষদ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে একদল প্রতিনিধি পাঠান। এই প্রস্তাবের পরিণাম কি হল তার পাকাপাকি খবর এখনও পাওয়া যায় নি, তবে যেটুকু খবর পাওয়া গেছে, তাতে জানা গেছে যে, প্রধানত সোভিয়েট রাশিয়ার মনোভাব দেখেই নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা এই প্রস্তাব নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতে চাইছেন না।

কিন্তু পাকিস্তান তার চেষ্টা ছাড়বে না, ছাড়বে বলে মনেও হয় না। বাংলা দেশের সমস্যাটাকে আসলে ভারত-পাকিস্তান সমস্যারূপে উপস্থিত করে রাষ্ট্রসংঘকে ডেকে আনার জন্য ইসলামাবাদের পান্ডারা যে কোন ছলছুতাকে কাজে লাগাতে ছাড়বেন না। এই কারণেই মধ্যে মধ্যে সংবাদ রটনা করা হচ্ছে, আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা নিয়ে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে কথা বলতে চায়, ইয়াহিয়া খাঁ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে চান ইত্যাদি।

পাকিস্তানের এই কৌশলেরই আর একটি দিক হচ্ছে সীমান্তে ক্রমাগত উত্তেজনা সৃষ্টি করা। কাছাড় ও ত্রিপুরার মধ্যে রেল ও সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য পাকিস্তান যেসব নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যেই তার প্ররোচনামূলক কার্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। গত ১৪ আগস্ট তারিখে উত্তর সীমান্ত রেলওয়ের চারগোলা রেল স্টেশনের কাছে একটি কালভার্টের ধারে পুঁতে রাখা পাকিস্তানী মাইনের আঘাতে একটি মালগাড়ী লাইনচ্যুত হয়। একটি রিলিফ ট্রেন যখন ঘটনাস্থলে আসছিল তখন সেটিও অনুরূপভাবে ঘায়েল হয়। পরে রেললাইন ও সড়ক থেকে আরও দুটি মাইন পাওয়া যায়। পাঁচদিন বাদে ঐ ঘটনাস্থলের কাছেই রেলওয়ের একজন টহলদার আরও দুটি পাকিস্তানী মাইন আবিষ্কার করে অল্পের জন্য আর একটি ট্রেন দুর্ঘটনা এড়াতে সক্ষম হয়েছেন।

সীমান্তে পাকিস্তানী উত্তেজনা সৃষ্টির আর একটি ঘটনা হল সম্প্রতি ত্রিপুরার জালিলপুর আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে পাক ফৌজের হানাদারি। এই হানাদারিতে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

●

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসন যেসব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছেন সেগুলির দ্বিবিধ উদ্দেশ্য : এক, দেশের ভিতরকার অর্থনৈতিক অবস্থাকে চাঙ্গা করে তোলা এবং দুই, আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ডলারের উপর চাপ কমানো। দেশের ভিতর মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা রোধ করার জন্য, লগ্নীর ক্ষেত্রে যে মন্দা দেখা দিয়েছে, বেকারী যেভাবে বাড়ছে সেসবের মোকাবিলা করার জন্য প্রেসিডেন্ট নিকসন তিন মাসের জন্য মজুরী ও দর বৃদ্ধি বন্ধ রাখার, সরকারী খরচ কমাবার, কোন কোন ক্ষেত্রে ট্যাক্স কমাবার ও লগ্নীতে উৎসাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। অন্যদিকে বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্রমাগত বিপুল ঘাটতি ডলারের উপর যে চাপ সৃষ্টি করছে তার সামাল দেওয়ার জন্য আমদানী শুল্ক দশ শতাংশ বাড়াবার, ৩৫ ডলারের বিনিময়ে এক আউন্স সোনা কেনা►

বেচার এবং ডলারের সঙ্গে অন্য বৈদেশিক মুদ্রার অবাধ বিনিময়ের ব্যবস্থা আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা সম্পর্কে আমেরিকা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তাতে আন্তর্জাতিক মুদ্রার বাজারে দারুণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ১৯৪৬ সালের ব্রেটন উডস্ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডলার হচ্ছে অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা যেটা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেনের অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃত। এই স্বীকৃতির পিছনে রয়েছে প্রতি আউন্স সোনা ৩৫ ডলার দামে কেনাবেচনা করার জন্য মার্কিন সরকারের বাধ্যবাধকতা। সোনার সঙ্গে ডলারের বাঁধা দাম আর ডলারের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য অকম্যুনিস্ট দেশের মুদ্রার বাঁধা দাম—এই গাঁটছড়ার ভিত্তিতেই এতদিন ধরে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বাট্টাহার নির্দিষ্ট হয়ে আসছিল আর সেই হারে আমদানী-রপ্তানীর বাণিজ্য চলছিল। এখন আমেরিকা তার বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করায় গোটা ব্যবসার উপর টান পড়েছে। সবচেয়ে বেশী টান পড়েছে জাপানের ইয়েন, জার্মানীর ডয়েটস্‌মার্ক প্রভৃতি মুদ্রার উপর। ডলারের হিসাবে এদের বাট্টাহার বাড়ানই আমেরিকার উদ্দেশ্য।

২০-৮-৭১ —পুন্ডরীক

মজলিশী মানুষ অতুলপ্রসাদ

সৌমেন্দ্রনাথ গুপ্ত

উনিশ শতকের শেষে স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কোলকাতায় 'খামখেয়ালী সঙ্ঘের আসর বসিয়েছিলেন। কবিগুরুর ডাকে সে আসর জমাবার জন্য যোগ দিয়েছিলেন সে যুগের দিকপালরা। সঙ্গীত সাহিত্য নাটক ও বঙ্গ সংস্কৃতির বিদগ্ধ মানুষেরা রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে সেদিন ভীড় জমিয়েছিলেন' অতুলপ্রসাদ তখন সবেমাত্র প্রথমবার বিলেত থেকে ফিরেছেন ব্যারিস্টার হয়ে। ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষা ও সাহেবীয়ানায় পাকা হলেও অতুলপ্রসাদ চিরদিন বঙ্গ সরস্বতীর একনিষ্ঠ সাধক ও পুজারী। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গান অতুলপ্রসাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। আইনের আঙিনা কোনদিনই অতুলপ্রসাদকে ততটা প্রলুব্ধ করতে পারে নি, যতটা সাহিত্য, কাব্য ও সঙ্গীতের মজলিশ তাঁর রসিক মনকে আকর্ষণ করেছে' রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে অতুলপ্রসাদ 'খাম-খেয়ালীর আসরে কনিষ্ঠতম সভ্য হিসাবে যোগ দিলেন। নতুন ব্যারিস্টার হিসাবে তখন কোলকাতার হাইকোর্টে পসার জমাবার জন্য অতুলপ্রসাদ যাওয়া-আসা করছেন। তখনকার দিনে বাঘা বাঘা পুরোন ব্যারিস্টারদের সঙ্গে পাল্লা দেবার শক্তি অতুলপ্রসাদের কোথায়? শুকনো আইনের খুটিনাটি তাঁর রসিক মনের সঙ্গে কিছুতেই যেন আর খাপ খায় না। তাই তিনি সুযোগ পেলেই, হাইকোর্ট ছেড়ে ছুটে চলে যেতেন রবীন্দ্রনাথের কাছে, কবিগুরুর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে অথবা শান্তিনিকেতনে—সাহিত্য-সঙ্গীত মধু আহরণের চেষ্টায়। মজলিশী মানুষ অতুলপ্রসাদ 'খামখেয়ালী' আসরে দেখা পেতেন রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও ঠাকুর বাড়ীর গগনেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির। এ আসরে আরও যাঁরা জমায়েত হতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, লোকেন পালিত, নাটোরাধিপতি মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়, লালচাঁদ বড়াল প্রভৃতি। ঘুরে ঘুরে এক এক বয়স্ক সভ্যদের বাড়ীতে 'খামখেয়ালী'র আসর বসত। শেষে অতুলপ্রসাদেরও ডাক পড়ল তাঁর বাড়ীতে খাম-খেয়ালীর আসর বসাতে। সাহিত্য ও কাব্য আলোচনা, গানের আসর এবং অনুরেল সমাপয়েৎ হিসাবে প্রচুর খানাপিনা। অতুলপ্রসাদের বাড়ীতে যেদিন এই আসর বসে, সেদিন রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকো ফিরতে রাত বারোটা বেজে গেল।

অতুলপ্রসাদের আর কোলকাতায় থাকা হ'ল না। [illegible] 'খামখেয়ালী' আসর থেকে বিদায় নিয়ে কোলকাতা ছেড়ে লক্ষ্ণৌয়ের দিকে রওনা হতে হ'ল। সাহিত্য সঙ্গীতের এইসব মহারথীদের সঙ্গসুখলাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় অতুলপ্রসাদের রসগ্রাহী ও মজলিশী মন স্বভাবতই ব্যথা পেল। কিন্তু লক্ষ্ণৌতে এসে তাঁর নিজের রসিক গোষ্ঠী তৈরী করতে বেশী দেরি হল না। তিনি নিজে বহু গান রচনা করেছেন, লক্ষ্ণৌ বসে এবং তাতে সুর দিয়েছেন নিজে। আর সেইসব গান তিনি নিজে গেয়ে শোনাতেন লক্ষ্ণৌর বিদগ্ধ মানুষদের কাছে। তাঁর গান শুনে বহুলোক তাঁর সঙ্গলাভের আশায় অতুলপ্রসাদের লক্ষ্ণৌর বাড়ীতে ঘন ঘন যাওয়া আসা শুরু করলেন। বাড়ীর আড্ডায় যাঁরা প্রায়ই আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের দল। যথা রাধাকমল ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়, ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত প্রভৃতি। এ'রা ছাড়াও অতুলপ্রসাদের বাড়ীর গানের আসরে যোগ দিতেন অম্বিকা মজুমদার, দিলীপকুমার রায়, সাহানা দেবী ও চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত প্রমুখ বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীরা। এর ওপর রবীন্দ্রনাথ যখন লক্ষ্ণৌ যেতেন অতুলপ্রসাদের আহ্বানে তাঁর অতিথি হয়ে তখন তো আসর আরও সরগরম হ'ত। অতুলপ্রসাদের কবি মন যে শুধু বাংলা সাহিত্য ও গানে নিবদ্ধ ছিল তাই নয়, তিনি হিন্দুস্থানী ও উর্দু গানের জলসা ও মুশায়ারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। অবাঙালী এবং হিন্দী, উর্দু ভাষা-ভাষীদের সঙ্গে তাঁর প্রাণের অদ্ভুত মিল ঘটেছিল। ফলে তিনি সমগ্র উত্তর ভারতীয়দের প্রাণের ও মনের মানুষ হয়ে ছিলেন।

আইনের আঙিনায় যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে অতুলপ্রসাদ সেদিন সমগ্র উত্তর ভারতের আইনজীবীদের সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন, তাঁর ব্যবহারিক জীবন শুধু আইন আদালতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তাঁর মজলিশী মন সব বাধা বিপত্তি, অহঙ্কার অভিমান ছাপিয়ে সঙ্গীতের মজলিশে আত্মনিবেদন করেছিল। লোকনিন্দা, সমাজ নিন্দা এমন কি পারিবারিক অশান্তিকেও তুচ্ছ করে তিনি অবাধে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত লক্ষ্ণৌর তৎকালীন প্রখ্যাত বাঈজীদের বাড়ীতে বসে গান শুনেছেন, তারিফ করেছেন এবং লক্ষ্ণৌর ঠুংরী থেকে রসাস্বাদান করে তাঁর নিজের রচিত বাংলা গানে সেই আহরিত সুরকে সংযতভাবে ব্যবহার করেছেন এবং এইসব গান বাংলা গানের সামগ্রিক মর্যাদাই শুধু বাড়ায় নি উপযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাঈজীরা অতুলপ্রসাদকে অত্যন্ত সমীহ ও সম্মানের চোখে দেখতেন এবং তাঁর অনুরোধে একটার পর একটা গান শোনাতে তাদের আনন্দ ও আগ্রহের শেষ ছিল না। বাঈজীদের এইসব গানের জলসায় অতুলপ্রসাদের প্রধান সঙ্গী ছিলেন অধ্যাপক ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। গানের মহল থেকে খবরাখবর এনে অতুলপ্রসাদকে দিতেন যে আজ অমুক নামকরা এক বাঈজী গান করবেন তখনই অতুলপ্রসাদের সুরসিক মজলিশী মন সেই আসরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠত। বাঈজীরা অতুলপ্রসাদের কাছে আলাদাভাবে ইনাম পেতেন বলেই যে অতুলপ্রসাদকে গান শোনাতে ব্যস্ত হতেন তা নয়, শ্রোতা যদি সত্যিকারের সমঝদার শ্রোতা হন তবে শিল্পীদের গান শোনানও

মনডে বা মণ্ডা ক্লাবের মজলিশে

লক্ষ্ণৌর বাড়ীতে একটি পারিবারিক মজলিশে

সার্থক হয় এবং এই কারণেই অতুলপ্রসাদকে শিল্পী বাঈজীর দল গান শোনাতে এত ভালোবাসতেন। শুধু মজলিশী গানই নয়, অর্থাৎ উর্দু গজল বা হিন্দী ঠুংরী নয়, তাঁরা কেউ কেউ অতুলপ্রসাদ রচিত ঠুংরী বা টপ্পা ঢং-এর বাংলা গানও গাইতেন। বেনারসের মোতিবাঈ, সিদ্ধেশ্বরী-বাঈ প্রমুখ গায়িকারা অতুলপ্রসাদ রচিত বাংলা গান বিশেষ করে 'শ্রাবণ ঝুলোতে' 'বাদল রুমঝুম বোলে' গানগুলি অনবদ্য কণ্ঠে গাইতেন।

অতুলপ্রসাদের এই রসিক মজলিশী চরিত্রের জন্য একটা বিশেষ আকর্ষণী শক্তি ছিল যার ফলে বড় ছোট নির্বিশেষে সকলেই তাঁর সঙ্গলাভের জন্য উন্মুখ হ'ত। তাঁর দীর্ঘ দেহ উদাত্ত কণ্ঠে গান, প্রাণ-খোলা হাসি, শান্ত-সৌম্য প্রেমিক চেহারা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁকে শুধু সাহিত্য সংগীতের আসরে অথবা সামাজিক ব্যাপারে নয় উচ্চ রাজনৈতিক মহলেও তাঁর পাকা আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী স্যার র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড থেকে শুরু করে ভারতের মহাত্মা গান্ধী, মহামতি গোখলে, পন্ডিত মতিলাল ও তাঁর পুত্র জওহরলাল নেহেরু, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতারা তাঁর সহজ সরল ও উদার চিত্তের পরিচয় পেয়ে, অকৃত্রিম বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন। লক্ষ্ণৌর প্রবাসী বাঙালী, হিন্দুস্থানী উর্দুভাষী মুসলমান উত্তর ভারতের খৃষ্টান, পারসী, জৈন এবং গোরাণ্টিয়ান প্রভৃতি সকল ধর্মের মানুষ তাঁর কাছে যাওয়া আসা করতেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর গভীর শোক এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে এ'রাই তাঁর মৃতদেহ বহন করে গোমতী নদীর তীরে ভৈঁস কুন্ড

অবাঙালী মানুষদের অতুলপ্রসাদ সম্বন্ধে কী শ্রদ্ধার মনোভাব ছিল তার পরিচয় তাঁর জীবিতকালেই বাড়ীর সামনের রাস্তার নাম পরিবর্তন করে এ পি সেন রোড নামাঙ্কিত করা ও মৃত্যুর পর লক্ষ্ণৌর পৌর প্রতিষ্ঠানের বাগানে একটি আবক্ষ মর্মর প্রতিমূর্তি স্থাপনের মধ্যে প্রমাণিত হয়। ১৯১৪ খৃঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণে তিনি কবির অতিথি হয়ে রামগড় পাহাড়ে গিয়ে দশ দিন বাস করেছিলেন। এই দশটা দিন প্রায় চব্বিশ ঘন্টা কবিতা গান বাজনা এবং হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে কেটেছিলো। সেবার রামগড়ে গাইয়েদের ম্যহস্পর্শ লেগেছিলো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, দীনেন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদ—এই তিনজনের গানে রামগড় সেদিন মুখরিত হয়েছিল। অতুলপ্রসাদের সুর রসিক ও মজলিশী মনের পরিচয় রবীন্দ্রনাথ আগেই পেয়েছিলেন তাই অতুলপ্রসাদকে তাঁদের কবিতা গানের আসরে পাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ উদগ্রীব হয়েছিলেন। লক্ষ্ণৌতে অতুল-প্রসাদের বাড়ীতে তাঁকে ঘিরে প্রতি সপ্তাহে ছুটির দিনে গানের মজলিশ বসত। এই মজলিশে অতুলপ্রসাদ বেশীর ভাগ সময় নিজের লেখা গীতি কবিতা পড়ে শোনাতেন, উদাত্ত কণ্ঠে গান গাইতেন এবং হাস্য রসিকতায় পরিহাসে তাদের মুগ্ধ করতেন। অতুলপ্রসাদ ছাড়াও যাঁরা গাইয়ে, শ্রোতারা থাকতেন তাঁরাও রবীন্দ্রনাথের গান অথবা অতুলপ্রসাদের কাছে শেখা তাঁরই রচিত গান গাইতেন। আর অতুল-প্রসাদ তন্ময় হয়ে শুনতেন এবং বাহবা দিতেন। গান ছাড়া সাহিত্যের আসরও বসতো এই মজলিশে। এইসব গুণী-মনীষীরা তাদের নিজেদের লেখা প্রবন্ধ কবিতা গল্প ইত্যাদি পাঠও করতেন। তখন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই বিখ্যাত ব্যারিস্টার সাহেবকে বঙ্গ ভারতীর একনিষ্ঠ সেবক-রূপেই দেখা যেত। উপস্থিত সকলে এই সাপ্তাহিক মজলিশগুলি খুবই উপভোগ করতেন এবং তাঁদের প্রিয় অতুলদা মধুরেণ সমাপয়েৎ হিসাবে চা জলখাবার ও মিষ্টি ফল খাইয়ে সকলকে বিদায় দিতেন। এদের মধ্যে মাঝে মাঝে অতুলপ্রসাদের বন্ধু পুত্র দিলীপকুমার রায়ও থাকতেন। আরেকটি লক্ষ্ণৌবাসী কমবয়েসী ছেলের গান শুনে অতুলপ্রসাদ তাঁকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। সেই ছেলেটির নাম নগেন্দ্রনাথ সান্যাল। পরে যিনি পাহাড়ী সান্যাল নামে বাংলা-দেশের ছায়াছবির রাজ্যে খ্যাত হয়েছেন। ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের খুব ভাব জমেছিল আর এই ভাব জমাবার ইন্ধন জুগিয়েছিল দুজনের সঙ্গীত পিপাসু প্রাণ।

এই সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদ লিখেছেন—'আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় সঙ্গীতের দৌত্যে, সঙ্গীতের আসরে। আমার প্রিয় গানের রচয়িতা হিসাবে যুবা বয়স থেকে তাঁর নাম শুনে এসেছি। সবুজপত্রের বৈঠকে তাঁর মুখে তাঁর গান শুনি। কৈশরবাগে (লক্ষ্ণৌ) তখন তিনি থাকতেন। অনেক রাত পর্যন্ত গান বাজনা হয়। তারপর কত আসরে তাঁর পাশে বসে গান বাজনা শুনেছি তার সংখ্যা নেই। ভালো গান বাজনা শুনলে তিনি বালকের মত অধীর হয়ে উঠতেন। অস্ফুট চীৎকার করতেন, মুখ থেকে উর্দু জবান বেরুতো। এক স্থানে বসে থাকতে পারতেন না আবার তৎক্ষণাৎ লজ্জিত হতেন। কতবার বলেছেন 'দেখ একটু ব্যাকুল ও বেসামাল হয়ে পড়লে আমার জামা ধরে টেনো। তোমাকেই বা কে সামলায় তার ঠিকানা নেই।' শারীরিক উত্তেজনা অঙ্গপাক্ষণের জন্যই তাঁকে অভিভূত করতো। তারপর ধীরে ধীরে নামতো তাঁর মুখে সর্বাঙ্গে এক সুস্মিত কমনীয়তা। যার স্মৃতি আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ।'

ধূর্জটিপ্রসাদ আর এক জায়গায় লিখেছেন—'তিনি নিজের গান আসরে ভালো গাইতে পারতেন না সভায় অতি সহজেই নিজের উপর বিশ্বাস হারাতেন মূল সুর খুঁজে পেতেন না। ছোট আসরে তাঁর গলা খুলতো। সবচেয়ে ভালো শোনাতো গুন গুন করে গাইবার সময়। তাঁর গাওয়ার মধ্যে একটি কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে, সেটা হল অবসর। আরম্ভ করবার পূর্বেই গানকে অবসর দিতেন, চোখ বুজে জমি তৈরী করতেন। কালো ভেলভেটের ওপর জামদানির কাজ আগ্রহে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে থাকতুম। গান গাইবার সময় প্রত্যেক কথাকে অবসর দিতেন। বাক্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধটি উপলব্ধি করবার জন্য উদগ্রীব হতাম। নীরবতার আশ্রয়ে গানটি মিলিয়ে যেত যেন মায়ের কোলে ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাঁর গান গাওয়া ছিল নিভৃতের কম্পিত রূপচ্ছটা, রাগ হতো সম্ভ্রমের সংযত কুশলতা। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মহাভক্ত। কবির কবিতা শুনতে পেলে আর কিছু চাইতেন না। বলতেন 'লিখতে লজ্জা হয় ইচ্ছে হয় কেবল পড়ি। কিন্তু হঠাৎ যেন হাত কি রকম করে ওঠে।' রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও অন্য কবির রচনা পড়তে তিনি খুব ভালোবাসতেন। তুলসী-দাস ও কবীরের দোঁহা, মীরাবাঈর ভজন তাঁর প্রিয় ছিলো। কিন্তু সাত রাজার ধন মানিক তাঁর নিজের ভাষা বাংলা ভাষা। প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য সভায় যোগ দেওয়া ছিলো তাঁর নেশা। তাঁর সঙ্গে একাধিক সভায় যোগ দিয়েছি। তাঁর উপস্থিতিতে রসের ফোয়ারা খুলে যেত। গান আর গান, গান আর গান। কানপুরে রাত দুটো পর্যন্ত গাইলেন। দিল্লীতে জয়ন্তী উৎসবে রাত বারোটা পর্যন্ত—শেষকালে জোর করে বাড়ী পাঠালাম। গোরখপুর, নাগপুর, কাশী সর্বত্র তিনি সৌজন্যে নয়। সাহিত্য-প্রীতি সংক্রমণে অমন রসিক সুজন দুর্লভ। রসই তাঁকে সংহিত করেছিল। রসের মর্যাদা তিনি দিতে জানতেন। পর্ণকুটিরে ভৈরবীর ঠুংরী শুনতে গিয়েছি তাঁর সঙ্গে। বৃদ্ধ ওস্তাদ কেঁপে অস্থির সেন সাহেবকে কোথায় বসাবে? সেই ছেঁড়া ভাঙ্গা খাটিয়ার ওপর বসে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে গান শুনলেন। বেলা বারোটা হ'ল। ওস্তাদের ছেলের হাতে দুখানি নোট গুঁজে দিলেন—'ওর কিসী-রোজ তস্‌রিফ' নিয়ে আসতে অনুরোধ করলেন। লক্ষ্ণৌয়ে একজন পাগলী আছে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এককালে বিখ্যাত গায়িকা ছিল। এখনও অদ্ভুত টোড়ি আর ভৈরবী গায়। অতুলদা শুনেই সংবাদ দাতাকে পাঁচ টাকা দিলেন। তাকে নিয়ে এস, নিয়ে এস, নিয়ে এস। সেদিন তাকে পাওয়া গেল না। টাকা ফেরত দেওয়ার সময় তিনি বল্লেন 'ওটা তোমার কাছেই থাক। যখন খুঁজে পাবে ধরে নিয়ে এস।' বুঝলাম এটা সুখবরের পুরস্কার। রাজকুমারের গজমোতির মালা দান, না হয় সংবাদদাতাকে সাহায্য। যে খবর এনেছিল সে ছিল বিদেশী সঙ্গীত শিক্ষার্থী। ছোট মুস্নে ওয়াজিদ আলি শা-এর দরবারে শেষ গায়ক। এসে জুটেছিল অতুল সেনের বৈঠক-খানায়। তালিম হোসেন লক্ষ্ণৌর শেষ বিখ্যাত সানাইয়া কৈশরবাগ থাকতে ভোরবেলা ভেঁরো ও টোড়ি বাজায়। দূরে থেকে অতুল সেন ঘুম থেকে সুর শুনতে শুনতে উঠতেন। ইয়াসুফের সেতারের হাত মিঠে, রাখলে হয় না? তাঁকেই রাখলেন। বরকতের ছড়ির টান ভাল—'নিয়ে এস তাকে' 'কদরদান' বলতে লক্ষ্ণৌর লোক ঠিক কি বোঝে জানি না—তবে আমি অতুলপ্রসাদ সেনকে বুঝতাম। বাংলাদেশ নবাব ওয়াজিদ আলি শার মারফৎ লক্ষ্ণৌর কাছে চিরঋণী, কিন্তু অতুলপ্রসাদকে লক্ষ্ণৌ প্রবাসী করে লক্ষ্ণৌ সে ঋণের প্রতিশোধ করেছে। অমন দরদী না হলে কেউ অমন কদর দিতে পারে?

পারিবারিক কারণে অতুলপ্রসাদকে ১৯১৬ খৃঃ লক্ষ্ণৌর কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে আসতে হয়। কলকাতায় তিনি হাইকোর্টে নতুন করে আইন ব্যবসায় শুরু করেন এবং ওয়েলেসলী ও পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে 'ওয়েলেসলী ম্যানসান'-এ একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে তাঁর বাবুর্চি সহ দুজনের সংসার পেতে বসেন। অতুলপ্রসাদ কোলকাতায় এসেছেন এ খবরটা কোলকাতায় ছড়াতে বেশী দেরি হল না। কবি সত্যেন দত্ত ছিলেন অতুলপ্রসাদের গানের খুব ভক্ত। তিনি অমল হোম মারফৎ অতুল-প্রসাদকে নতুন গান রচনা করে পাঠাতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু 'ছন্দের রাজার' কাছে অতুলপ্রসাদ সুর বিহীন শুধু কথার মালা পাঠাতে চান নি। এবারে কলকাতায় আসাতে তাঁকে গিয়ে কবি সত্যেন দত্তকে গান শোনাতে হল এবং সত্যেন দত্তর 'ভারতী'র আড্ডায় আরও সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে অতুলপ্রসাদের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হ'ল। তাঁরা সবাই অতুলপ্রসাদের গানের ভক্ত হয়ে পড়লেন।

কোলকাতায় তখন আর একটি সংস্থা জমজমাট। ননসেন্স ক্লাবের নাম রূপান্তরিত হয়ে 'মান্ডে ক্লাবে' এসে দাঁড়িয়েছে। আড়ালে আবার 'মন্ডা ক্লাব'ও বলে।

অতুলপ্রসাদের মাসতুতো ভগ্নীপতি বাংলা ভাষায় ননসেন্স রাইমস্‌-এর জন্ম-দাতা ও খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায় (সত্যজিত রায়ের পিতা) ও তাঁর দুই ভাই সুবিনয় রায় ও সুবিমল রায় এবং তাঁদের মাতুল প্রভাতচন্দ্র গঙ্গো-পাধ্যায় পিসতুতো ভাই হিতেন্দ্রমোহন বসু ('কুন্তলীন' তেলের আবিষ্কারক হেমেন্দ্র বসুর পুত্র) এবং অতুলপ্রসাদের

একটি পিকনিকে

মাসতুতো ও মামাতো ভাইরা শিশিরকুমার দত্ত হিমাংশু গুপ্ত ও ধীরেন্দ্র গুপ্ত, ভগ্নিপতি ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র (বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগের প্রতিষ্ঠাতা), সুকুমার রায়ের সম্পর্কে কাকা অমল হোম এবং তাঁদের বন্ধুবর্গ যথাক্রমে প্রশান্ত মহলানবীশ, কালিদাস নাগ, জীবনময় রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিরা মিলে সাহিত্য, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির একটি আসর কোলকাতায় স্থাপন করেন। এই আসরের বৈঠক প্রতি সোমবার বসত বলে এর নাম দেওয়া হয়েছিল মান্‌ডে ক্লাব। আসরের একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল 'ভূরিভোজ' সে জন্য মান্‌ডে ক্লাবকে 'মন্ডা ক্লাব' বলে সম্বোধন করে হাস্যরসের খোরাক যোগাতেন আসরের প্রধান পান্ডা সুকুমার রায়।

এই 'মান্‌ডে ক্লাবে' অমল হোম একদিন অতুলপ্রসাদকে ধরে নিয়ে এলেন। অতুলপ্রসাদেরই মাসতুতো ভাই শিশির দত্ত (খোদনবাবু) তখন 'মান্‌ডে ক্লাবে'র এক বিশিষ্ট সভ্য। তিনি 'ভাইদাকে' (অতুলপ্রসাদ) তখুনি সভ্যভুক্ত করলেন। হাসি গানে রসিকতায় অতুলপ্রসাদ সবাইকে মাতিয়ে দিয়ে সকল সভ্যেরই অতি প্রিয়জন হয়ে পড়লেন। অতুলপ্রসাদ এই ক্লাবে যোগ দেওয়ার পর বৈঠক প্রায়ই তাঁর ফ্ল্যাটে বসতো, কারণ সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চার পর দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটি এতো বিরাট আকার ধারণ করতো যে ক্লাবের বৈঠক অন্য কোথাও বসা দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অতুলপ্রসাদের বাড়ী ছাড়াও মান্ডে ক্লাবের বৈঠক বসেছে—ডাক্তার দ্বিজেন মৈত্রের গঙ্গার ধারে মেয়ো হাসপাতালের কোয়ার্টারের ছাদে, সুকুমার রায়ের গড়পাড় রোডের বাড়ীর প্রাঙ্গনে, অমল হোমের পিতা গগন হোমের ২০।৯ সুকিয়া স্ট্রীটের বৈঠকখানায়, সুনীতি চ্যাটার্জীর পৈত্রিক বাসভবনে অথবা আলিপুর চিড়িয়াখানার সুপারিনটেন্ট ও ডাক্তার কালিদাস নাগের মামা বিজয় বসুর বাড়ীতে।

চিড়িয়াখানায় বিজয় বসুর বাড়ীর আড্ডায় একদিন অমল হোম অস্কার ওয়াইল্ড-এর লেখা 'ম্যান এ্যান্ড হিস ওয়ার্ক' প্রবন্ধটি পড়লেন। অতুলপ্রসাদ খুব মনযোগ সহকারে শুনলেন এবং জানালেন পারের বৈঠকে তিনি অস্কার ওয়াইল্ডের ট্রায়াল বৃত্তান্ত শোনাবেন ওস্কার ওয়াইল্ডের ওল্ড বেইলিতে যখন বিচার হয় তখন অতুলপ্রসাদ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস দুজনেই বিলাতে আইনের ছাত্র। তাঁরা এই বিচার দেখতে কোর্টে উপস্থিত ছিলেন। স্যার এডওয়ার্ড কার্জনের জেরার জবাবে সেদিন ওস্কার ওয়াইল্ডের মুখে যে তুবড়ী ছুটেছিল সে গল্প সেদিন তিনি সবাইকে শোনান। মান্ডে ক্লাবের বৈঠকে অতুলপ্রসাদ একবার নির্বাচিত কয়েকটি কবিতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। আরেক বার তিনি চেস্টারটনের 'ওআরশিপ অফ দি ওয়েলোদ' পাঠ করে শোনান। মান্ডে ক্লাবের সভ্যরা নানা মনোজ্ঞ বিষয়ের আলোচনা করতেন। যেখানে এতগুলি সাহিত্যিক শিল্পী ও বিদগ্ধ মানুষের সমাবেশ সেখানে শুধু কৌতুক ও ভোজন রসের মধ্যেই বৈঠক শেষ হত না। মান্ডে ক্লাব অতুলপ্রসাদকে নিয়ে বেশ জমে উঠেছিল। কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্ণৌর দুই পুরোন বন্ধু পন্ডিত গোকরনাথ মিশ্র ও মির্জা সামিয়ুল্লা বেগের তাগিদে ও ডাকে কোলকাতা ত্যাগ করে লক্ষ্ণৌর দিকে পা বাড়াতে হ'ল। তাঁর এই কলকাতা ত্যাগ উপলক্ষ্যে মান্ডে ক্লাবের সদস্যরা ১৯১৭ খৃঃ ২৫ ফেব্রুয়ারী তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানান। এর কদিন বাদেই অতুলপ্রসাদ ট্রেনে করে লক্ষ্ণৌ অভিমুখে যাত্রা করেন।

পারিবারিক জীবনে অতুলপ্রসাদ সুখ পান নি। তাই বোধহয় তাঁর চিত্ত স্নেহ ভালবাসার কাঙাল ছিল। মানুষের সঙ্গ ও বন্ধুত্ব পেলে তিনি সব থেকে বেশী খুশী হতেন। দুঃসহ বেদনায় দাম্পত্য জীবন যেমন তাঁর চিরসাথী ছিল, সামাজিক জীবন তেমনি তাঁর সাহিত্য সঙ্গীতের মজলিশের রসে আনন্দে-ভরপুর ছিল। তিনি ৬৩ বছর বয়সে ১৯৩৪ খৃঃ ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর বেশ ক'বছর আগে থেকেই রক্তের চাপ (ব্লাড প্রেসার) বেড়ে যাওয়াতে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মজলিশী মন তাঁর কখনও ক্লান্ত হয় নি। ১৯২৯ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্ণৌতে তাঁর বাড়ীতে শেষ বারের মত অতিথি হবার সময় গান বাজনা, সাহিত্য মজলিশ বসাতে তাঁর উৎসাহের শেষ ছিল না। ১৯৩০ খৃঃ শেষবারের মত বিলাত গিয়েছিলেন—সেখানেও ভারতীয় তথা বাঙালী ছাত্রদের নিয়ে গান বাজনার আসরে মেতেছিলেন। ১৯৩২ খৃঃ কোলকাতায় এসেছিলেন তাঁর দাদা সত্যপ্রসাদের ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর শরীর খুব ভাল ছিল না, তাই সবাইকে একদিন সত্যপ্রসাদের বাড়ীতে ডাকলেন। সেদিন সেখানে আসর জমজমাট। তিনি এত অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও, বন্ধু বান্ধব আত্মীয়স্বজনকে এতদিন পর এক সঙ্গে এক স্থানে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজেই নিজের গান—'ওগো সাথী মম সাথী' গেয়ে উপস্থিত সবাইকে অপূর্ব আনন্দ দান করেন। ১৯৩৩ খৃঃ মে মাসে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের আহ্বানে স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় কিছুদিনের জন্য কারশিয়াং সহরে 'গোলকুঠি' ভবনে এসে বাস করেছিলেন। তিনি সেই ছোট সহরে এসেছেন—এ খবর স্থানীয় বাঙালী বাসিন্দাদের জানতে দেরী হল না। সবাই মিলে এসে তাঁকে ধরলো গান শোনাতে। অসুস্থ অতুলপ্রসাদ রাজী হলেন। একদিন স্থানীয় টাউন হলে গানের জলসা বসল। অতুলপ্রসাদ একাই সেদিন দেড় ঘন্টা ধরে স্বরচিত গান গেয়ে বিপুল সংখ্যক শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। সেবারেই বিশ্ববিখ্যাত নৃত্য শিল্পী উদয়শংকর তাঁর দলবল সহ দার্জিলিং থেকে ফিরছিলেন। তাঁর দলের প্রধান পান্ডা হরেন ঘোষ মশাই অতুলপ্রসাদ কারশিয়ং-এ আছেন জেনে সদলবলে একদিন গোলকুঠিতে এসে হাজির। যে কয়েক ঘন্টা তাঁরা সেখানে ছিলেন পেটভরা খাবার খাইয়ে ও গানে গল্পে, হাসিতে, রসিকতায় ভরিয়ে দিয়ে অতুলপ্রসাদ তাঁদের বিদায় দিলেন। মারা যাবার দু' মাস আগে অর্থাৎ ১৯৩৪ খৃঃ মে-জুন মাসে তিনি পুরী গিয়েছিলেন ডাক্তারদের নির্দেশে। সঙ্গে প্রায় ডজনখানেক সঙ্গী ছিলেন—সবাই তাঁরই অতিথি—অসুস্থ অবস্থায় পথশ্রম ও অচেনা জায়গায় থাকার একাকীত্ব কাটাবার জন্যেই অতুলপ্রসাদের এই প্রয়াস শুধু নয়—তাঁর মজলিশী মনকে সতেজ ও সুস্থ রাখার এবং আনন্দের খোরাক যোগাবার জন্যেও বটে।
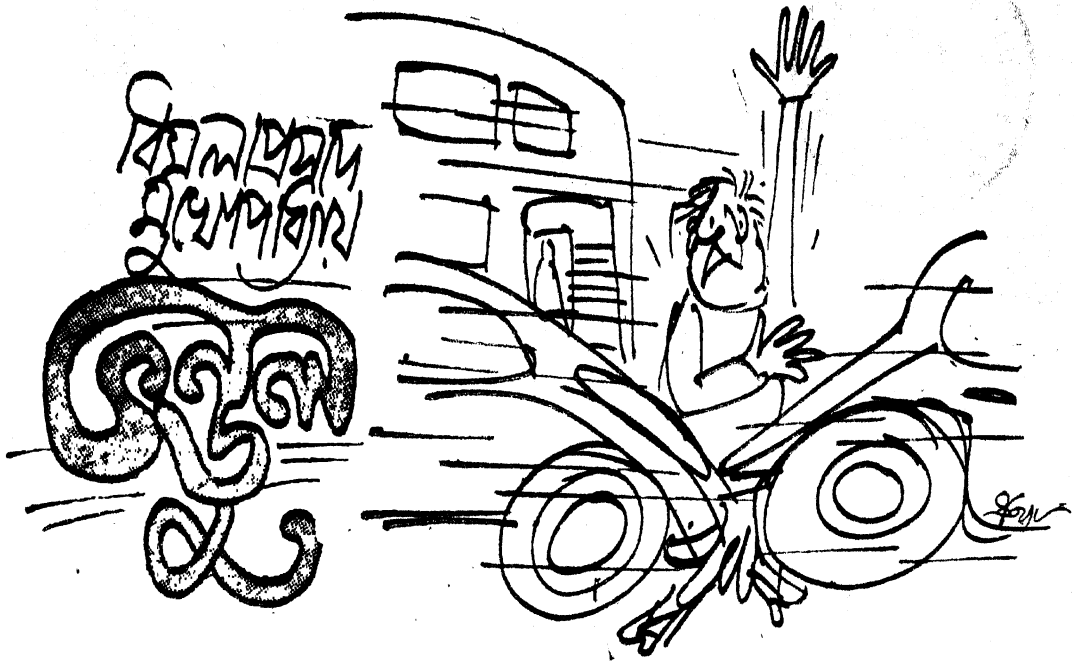
যে কথাটা বলতে চাই, সেটা বোঝাতে হলে বাংলা ভাষায় 'ভণ্ডুল' ছাড়া দ্বিতীয় শব্দ নেই। কাছাকাছি মানে হয়, এমন শব্দ দু-চারটে আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু ভণ্ডুল কথাটা যে পরিমাণে অর্থবহ, ততটা নয়। ভণ্ডুল শব্দটির এক স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা রয়েছে, একটা পরিপূর্ণতার চিত্র। অর্থাৎ এমন এক পরিস্থিতি, যেখান থেকে উদ্ধার বা নিষ্ক্রমণের পথ নেই। একটা উদ্দেশ্য বা প্রত্যাশা নিয়ে হয়তো কোনও কাজ শুরু হয়েছে এবং কিছুটা এগিয়েওছে। একটা বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে চার-দিকে আটঘাট বেঁধে। কিন্তু কি যে হল—মাঝখান থেকে এমন এক অভাবিত বাধা এসে হাজির হল, যে সব তালগোল পাকিয়ে এমন বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হল যে আর কিছু করা বা নতুন কোনও উপায়ে সেটাকে আবার চালু করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। তখন সব কিছু ছেড়ে দিয়ে, 'দূর হোক গে ছাই' বলে পাততাড়ি গুটিয়ে সরে আসা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

একেই বলে ভণ্ডুল। ইংরেজিতে আমরা বলি 'হোপলেস মাড্ল', অর্থাৎ এমন এক অচল অবস্থা যাকে কোনো মতেই সচল করা যায় না। এর কাছে হাওড়া ব্রিজ-এর ওপর ট্র্যাফিক জ্যাম সিধে করা আরও সহজ। কারণ চার পাঁচ ঘণ্টা ধরে কসরত করলে প্রাইভেট মোটর গাড়ীর গোঁয়ার্তুমি, লরী-চালকের নাছোড়বান্দা জেদ, ঠেলা আর রিক্শার নি-খাদ নির্বুদ্ধিতার জটিল মিশ্রণে যে চমৎকার 'জিগ্-স-পাজল' তৈরী হয়, তারও একটা সমাধান হতে পারে। কিন্তু যেটা ভণ্ডুল হয়ে যায়, সেটা আর মেরামত করা চলে না। যাকে বলা যায়, একদম বাতিল। শুধু তাই নয়, একটা ব্যাপার যেই ভেস্তে গেল, তারই যেন ছোঁয়াচ লেগে বাকিগুলোও একটার পর একটা খারিজ হতে থাকে।

দেখেন নি, এক একদিন এমন হয় যে, কিছুতেই কিছু হয় না। যা ধরতে যান, তাই ফসকে যায়। নয়তো লোকসান সুরু হয়। সকালে উঠে পরিপাটি চা খেলেন, তারপর খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে বাজারে বেরুলেন। বাড়ী এসে দেখলেন, হিসেব গরমিল হচ্ছে। গোটা টাকার ফারাক। তখন মনে পড়ল, দু টাকার নতুন নোটখানা এক টাকার ভেবে দোকানীকে দিয়েছিলেন এবং তার কাছ থেকে আপনি খুচরোই ফেরৎ পেয়েছিলেন, টাকাটা নয়। এখন আবার এতটা পথ ভেঙে বাজারে ফিরে যাওয়া চলবে না। আর কাল সেই দোকানীকে গিয়ে বললে সে কি আর মানবে? গেল একটা টাকা জলে! তারপর অফিস যাবার মুখে দরজির দোকানে তাগাদা দিতে গিয়ে দেখলেন, ঝাঁপ বন্ধ। কখন খুলবে এবং খুললে বাবা মুস্তাফার সঙ্গে আজ সারা দিনের মধ্যে আদৌ মোলাকাৎ হবে কিনা, সে কথা কেউ বলতে পারল না। কাল শনিবার, হাফ-ডে। অথচ জামাটা পাওয়া আজকে খুবই দরকার ছিল। এই নিয়ে প্রায় দু হপ্তা হয়ে গেল, ক্রমাগত ঘোরাচ্ছে। কিন্তু বললেই সেই এক জবাব, 'কাল সকালে নিয়ে যাবেন। নিশ্চয়ই রেডি থাকবে।'

অফিসে গিয়ে পৌঁছুলেন ঠিক, কিন্তু প্রাণ হাতে করে। বাস-এ উঠতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে আপনার ও বাসখানার মাঝ-খানে অর্থাৎ ফুটপাথের কোল ঘেঁসে ডবল ডেকার এসে গেল এবং কোনো মতে পিছু লাফ দিয়ে আপনি সে যাত্রা রেহাই পেলেন। ওদিকে বাসটা আপনার হাত উঁচু অগ্রাহ্য করে স্পীড বাড়িয়ে চলে গেল, কলা দেখিয়ে। বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন, পাশেই কলাওয়ালা—টিফিনের জন্য দুটো নেবেন কিনা। কিন্তু দাম যা! জোড়া তিরিশ নয়া। কাজেই নেওয়া গেল না। সান্ত্বনার মধ্যে আপ্তবাক্য—কলা অযাত্রা, সঙ্গে নিতে নেই। পৈতৃক প্রাণটা তো আর একটু হলেই যাচ্ছিল, বুকটা এখনও ধড়ফড় করছে। ধড়ফড়ানি যদি বা কমল, অফিসে এসে নিজের আসনে বসে একটি পুরো গ্লাস জল খেয়ে যদি বা ধাতস্থ হলেন, বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেলেন যে কাল সন্ধ্যায় কোম্পানির ডিরেক্টার বোর্ডের জরুরী মিটিং হয়ে গেছে এবং শীঘ্রই মাহিনা বৃদ্ধি অথবা বোনাস প্রাপ্তি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে।

সারাটা দিন দারুণ অস্বস্তি আর জল্পনা-কল্পনায় কাটল। কাজে মন বসানো গেল না, এ-কাগজ সে-ফাইল নাড়া-চাড়া করতে গিয়ে মাঝখান থেকে হাতের জরুরী কাজে ভুল হতে লাগল। কারণ মনে মনে আপনি তখন চিন্তা করছেন, নগদ অর্থপ্রাপ্তি বরাতে জুটবে কিনা,—যার ওপর আগামী কয়েক মাসের সাংসারিক বাজেট নির্ভর করছে। আরও ভাবছেন, যদি ইনক্রিমেন্ট বা বোনাস কিছুই না মেলে, তা-হলে অফিস থেকে 'লোন'-এর জন্য যে দরখাস্ত করেছেন, সেটা 'স্যাংশন' হলে তবু রক্ষে। আপাততঃ, তাই দিয়েই সামনের অর্থসঙ্কট সামলাতে হবে, যদিও

সে যার শোধ করতে হবে প্রতিমাসের বেতন থেকে কাটান দিয়ে।

বেলা চারটের সময়, অফিস-সুপারিন্টেন্ডেন্ট যখন ঘরে ঢুকে চারদিকের প্রত্যাশী দৃষ্টি ফেলে বেশ থমকে দাঁড়ালেন, তখন নাড়ীর স্পন্দন অস্বাভাবিক দ্রুত হয়ে উঠেছে সকলের। আপনার হয়তো দম বন্ধ হবার জোগাড়, কারণ আপনারই 'স্টেক' বা চাহিদা সবচেয়ে বেশি। তারপর যা আঁচ করা গিয়েছিল, তাই ঘোষণা করা হল। বর্তমান বাজারের যা হাল-চাল তাতে কোন রকম খরচ বৃদ্ধি করা চলবে না। আপনার হার্ট-এর বীট তখনো গণনার মধ্যে। কিন্তু কাগজপত্র গুটিয়ে চেয়ারটা হটিয়ে যখন উঠতে যাচ্ছেন, তখন বড় সাহেবের পিওন এসে আপনাকে আবেদনপত্রখানা ফেরৎ দিল। ওপরে লাল কালিতে স্পষ্ট নোট—লোন স্যাংশন করা গেল না বর্তমান পরিস্থিতিতে। সরকারীভাবে কারণ দেখানোর পর মন্তব্য আছে, চার-পাঁচ মাস পরে আবার দরখাস্ত করলে সহানুভূতির সহিত তা বিবেচনা করা হবে। এখন এর পরে সাময়িক হার্ট-ফেল অনিবার্য নয় কি? রাস্তায় বেরিয়ে দুনিয়াটা কি রকম লাগছে? একটা ছাই রঙের ঘেরাটোপ, যার মধ্যে থেকে শ্বাসরোধ হয়ে আসছে নাকি? হয়তো সেই শ্রীবৎস রাজার কাহিনীটা মনে পড়বে—যাতে হাত দেওয়া যায়, সেটাই ফসকায়—যা আশা করা যায়, সেটাই নির্মূল, যেটা নিশ্চিত ভাবা যায় তা কেমন করে অনিশ্চয়তার গহ্বরে ডুবে যায়। এক-কথায়—ভণ্ডুল!

এ অবস্থার প্রতিকার নেই। শহরের ফুটপাথে ঘেরা জায়গায় যতই শনি-পুজোর ঢালাও আয়োজন হোক এবং আসতে-যেতে পুজোর থালায় যতই প্রণামী চড়ান, কিছুতেই কিছু হবে না। নীচু মুখে জলস্রোতের গতি ফেরানো যায় না, ধ্বস নামতে থাকলে প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই ধুলোয় গুঁড়িয়ে যায়। যাকে বলে, লণ্ডভণ্ড। আমার মনে হয়, ঐ 'লণ্ডভণ্ড' থেকেই ভণ্ডুল কথাটার জন্ম। লণ্ডভণ্ড শব্দটার মধ্যে একটা আকস্মিকতার ব্যঞ্জনা আছে, আর আছে একটা খণ্ড প্রলয়ের মতো বিপর্যয়ের আবির্ভাব। ভণ্ডুল হল তারই কিছু মোলায়েম সংস্করণ, আর একটু মন্থর। এর মধ্যে 'ভ' 'ণ্ড' এবং 'ল' তিনটে ব্যঞ্জন বর্ণই রয়েছে—কেবল 'ল'এর আগে একটি হ্রস্ব উ বসিয়ে বস্তুটিকে সম্পূর্ণ ও নিশ্চিহ্ন করে তোলা হল। এ যেন একটা 'প্রোসেস'এর পরিণতি। বিভিন্ন পর্যায়ে তার প্রকাশ হতে হতে শেষকালে সবটাই বরবাদ। আফশোসটা তাই বেশি। এ যেন কিল ঘুঁসি লাথি—একটার পর একটা। অতঃপর ভূমিশয্যা। মানে, কমপ্লিট নক-আউট।

কোনও কোনও মানুষ আছেন যাঁরা সহজ সমাধানের পথ পছন্দ করেন না। ব্যাপারটাকে আরও জটিল করে তোলাই শুধু তাঁদের অভ্যাস নয়, উল্লাসের কারণ। ফলে, কোনো কাজ স্বাভাবিক ও সহজভাবে চুকে যাক—এটা তাঁরা বরদাস্ত করতে পারেন না। সব বিষয়েই অযথা হস্তক্ষেপ করতে আসেন, অনেক সময়ই অযাচিত পরামর্শ দেন এবং সেই পরামর্শ অনুসারে কাজ না করলে রীতিমত বিরক্ত হয়ে ওঠেন। অতঃপর বাধ্য হয়েই তাঁর ওপর কাজের ভারটা ছেড়ে দিতে হয়। তখন গোড়া থেকে উল্টো পথ ধরে তিনি এমন নৈপুণ্যের নমুনা দিতে থাকেন যে এক-একটি গ্রন্থিজাল এমনই নাগপাশ সৃষ্টি করে যে সমস্যাটার কোনও সুরাহা তো হয়ই না, আরও নতুন সমস্যা বা সংকটের উদ্ভব হয়। সব কিছু ভণ্ডুল করে দিয়ে কিন্তু ভবিষ্যৎ সমাধানের যথারীতি আশ্বাস দিয়ে, তিনি সরে পড়েন। এই প্রসঙ্গে জেরোম. কে. জেরোম সাইকেল মেরামতের কেরামতি নিয়ে যে সার্থক রসচিত্র এঁকেছেন, তা স্মরণযোগ্য। পাঠকরা নিশ্চয়ই জানেন যে,

সর্ববিদ্যাবিশারদ উৎসাহী সাহায্যকারী বা পরামর্শদাতাদের মুখ্য দান হচ্ছে অপরের কাজ ভণ্ডুল করে দেওয়া।

অবশ্য অবস্থা-বৈগুণ্যে বা দৈব দুর্বিপাকে ভণ্ডুল সৃষ্টি হয় বেশি। কিন্তু সেখানে মানুষের হাত নেই, কেবল প্রতিকূল অবস্থাকে আয়ত্ত করার বিফল চেষ্টাটুকুই সার। একটা সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেটা অনেকেরই হয়তো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কাজের বাড়ীতে সব-জান্তা করিতকর্মা লোকের অভাব হয় না। সবাই সমান কর্মিষ্ঠ না হলেও দু-একজন মানুষ পাওয়া যায় যাদের উপর নির্ভর করা যায়। আবার এমন ব্যক্তিও থাকেন যাঁর দায়িত্ব-জ্ঞান প্রচুর কিন্তু দায়িত্বের আনুষঙ্গিক হাঙ্গামা পোহাতে অনিচ্ছা বা অক্ষমতা, হুকুম করা ও নির্দেশ দেওয়াতেই যাঁর অভিরুচি। ফলে সদুদ্দেশ্য সত্ত্বেও এসব লোক ঝামেলা সৃষ্টি করেন এবং সহকর্মীদের মাথা ঘুলিয়ে দেন। তাই ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবস্থা অব্যবস্থায় পরিণত হয় এবং শেষ অবধি কাজ সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয় না। মাঝখান থেকে পরস্পর দোষারোপ আর আত্মক্ষালনের পালা চলতে থাকে। অর্থাৎ সর্বদা ব্যগ্র হয়ে সব দিক সামলাবার চেষ্টায় থেকে, এঁদের প্রবণতা দেখা যায় বিঘ্ন সৃষ্টির দিকে। এর উপর দৈব যদি বাদ সাধে তাহলে একেবারে লণ্ডভণ্ড। যেমন কখনো-সখনো ঘটে বিয়েবাড়ীতে কিংবা কোনো উৎসব পার্টি বা সভাসমিতির আয়োজনে। লোকবল যথেষ্ট, আয়োজনেরও ত্রুটি নেই। বিভিন্ন বিভাগে কাজের লোক মোতায়েন করা হয়েছে, ব্যবস্থা প্রায় নিখুঁত বললেই হয়। তারপর বর আসার প্রতীক্ষায় স্ত্রী-পুরুষ সবাই অধীর, লগ্ন বয়ে যায়, এমন সময় খবর এল রাস্তায় দুর্ঘটনা। কিংবা বর সভাস্থ হয়েছেন, পুরোহিতকে তাঁর বাসা থেকে কলেকট করা হয়নি। ট্যাকসি নিয়ে ছুটোছুটির পর ভগ্নদূতের মুখে শোনা গেল, হঠাৎ তাঁর 'করোনারি'! আবার কোথাও বা যাবতীয় খাদ্যসম্ভার প্রস্তুত, কেবল দই-সন্দেশ আর পৌঁছুল না। কিংবা সারাদিন খটখটে রোদ, বিকেলবেলা থেকে এমন দুর্যোগ সুরু হয়ে গেল যে, তিনশো জন নিমন্ত্রিতের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ-ষাট জন প্রায় সাঁতার কেটে হাজির হলেন। এত আয়োজন পণ্ড হল, আহার্যবস্তুর শোচনীয় অপচয় হল এই দুর্দিনে। উপরন্তু ছাদের তেরপল ফুটো হয়ে গেল কিংবা মেরাপ ভেঙে পড়ল প্রবল বাতাসে ও অঝোর বর্ষণে। কিংবা কোথাও বা যেটা আরও সাংঘাতিক, ইলেকট্রিক ব্যবস্থায় ত্রুটির ফলে শর্ট সার্কিট হয়ে অগ্নিকাণ্ড! প্রাণরক্ষার তাগিদে সবাই একসঙ্গে ছুটে বেরুতে গিয়ে কয়েকজন জখম হলেন, পাত্রের খুড়োমশায়ের বুড়ো হাড় তো কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার! আর এদিকে আগুন নেভাতে এবং নতুন করে তোড়জোড় করতেই রাত কাবার। সব ভণ্ডুল!

সভা-সমিতির আয়োজন ও উদ্দেশ্য কিভাবে ভণ্ডুল হয়ে যায়, তা অনেকে জানেন বা দেখেছেন। গোড়ায় একটা মারাত্মক গলদ থাকেই যার পরিণতি নিদারুণ হয়ে দাঁড়ায়। হয় ভুল ঠিকানা, নয় তো কাগজে ভুল বিজ্ঞপ্তি কিংবা ভুল নাম ঘোষণা। এর ফলে যা সংকট সৃষ্টি হয়, তা কখনো মুখ-হেঁট, কখনো বা দারুণ রকমের হাস্যকর। এক জায়গায় পরলোক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে বক্তৃতা হবার কথা ; বক্তা উঠে সুরু করলেন—ইহলোকের 'খাদ্যসমস্যা ও উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়'। আর একবার কোনো গবেষণা-পরিষদ থেকে ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান এবং

অর্থনীতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয়। দিনক্ষণের ভুল হোক কিংবা স্থান নির্দেশে কোনো রকম ভুল বোঝার জন্যই হোক, ফল যা দাঁড়াল, তা এই রকম। ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বক্তা উঠে দেখলেন— সামনে প্রায় ফাঁকা মাঠ। ফসলের আভাস নেই, কয়েকটি আগাছা মাত্র বিরাজ করছে! অর্থাৎ জন পাঁচ-ছয় স্থানীয় বৃদ্ধ, কিছু নাবালিকা ও অপোগণ্ড সমেত মহিলা-সংখ্যা আর হলঘরের শেষপ্রান্তে কয়েকটি 'মস্তানে'র জটলা।

আর একটি ঘটনার কথা বলি। বহুকাল আগে ছাত্রাবস্থায় এক দেশপ্রসিদ্ধ মনীষীর মৃত্যু উপলক্ষে শোকসভায় গিয়েছি। প্রথমে ভাষণ দিতে উঠলেন তখনকার দিনে নাম-করা এক উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ। বলা বাহুল্য, প্রথামত ইংরেজিতেই বক্তৃতা হচ্ছিল। সুরু হল ঠিক এই ভাষায় : 'অন দিস মোস্ট স্যাড অকেশান, আওয়ার ফার্স্ট ডিউটি ইজ টু অফার ইন রেসপেকটফুল সাইলেন্স আওয়ার সিনসিয়র হোমেজ টু দ্য গ্রেট ডিপার্টমেন্ট...' ক্ষণকাল বিরতির পর যেন শ্রোতাদের চমক ভাঙল। তারপর ধীর লয়ে হাততালি ও হাসির গুঞ্জন। একটি নিরীহ স্লিপ, কিন্তু ঐ মুখ-ফসকানো একটি বাক্যের প্রয়োগের কি দারুণ অস্বস্তি! সমস্ত প্রত্যাশা ভণ্ডুল হয়ে গেল এবং প্রতিক্রিয়া দাঁড়াল একেবারে বিপরীত।

'বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভণ্ডুলমামার বাড়ী' গল্পটি এই সূত্রে বিশেষ করে মনে পড়ছে। এর আবেদন শুধু 'প্যাথিটিক' বা করুণ জীবনচিত্র বলে নয়, পুরোপুরি 'রিয়ালিস্টিক'। এর ভিত্তিটি বাস্তব, আক্ষরিক অর্থেই। অর্থাৎ বাস্তুর ভিত থেকে সুরু করে দীর্ঘকাল ধরে একটু একটু করে দেয়াল পর্যন্ত গাঁথুনি। এই উৎসাহ আর হতাশার মিশ্রণেই গল্পটি এত জীবন্ত ও সত্য। এ বাড়ীর নির্মাণ কাজ আর শেষ হয় না, হতেও পারে না। কারণ, জীবনে ও আর্টে কয়েকটা জিনিস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অপূর্ণতার প্রতীক বলেই এ গল্পটি রসজ্ঞ পাঠকের কাছে বিশেষ অর্থবহ। মামা কিন্তু আশা ছাড়তে চান না, তাঁর মন মানে না যে সব পণ্ডশ্রম। গল্পের নামকরণটি খুব লাগসই। এখানে দেখি সর্বাত্মক ভণ্ডুল—জীবনব্যাপী জের টানা এবং সব কিছু বরবাদ হয়ে যাচ্ছে দেখেও পরাজয়কে অস্বীকার করার করুণ প্রয়াস। 'ভণ্ডুল' শুধু মামার নামেই নয়, তাঁর ধামে, তাঁর মগজে ও হিসাবের কাগজে। তাঁর ব্যক্তিত্বে, আশাবাদ আর সঙ্গতির পরম অসামঞ্জস্যে।

ভণ্ডুল হচ্ছে 'আয়রনি'র ক্রীড়াস্থল নমুনা: জীবনদেবতার এক-একটি নিষ্ঠুর বক্রোক্তি-অলঙ্কার।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মনোবিজ্ঞানীর মনের কথা (২)
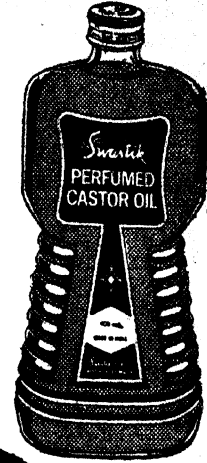
আমাদের বিশ্বাস আর অবিশ্বাস একটি বিশেষ সীমারেখায় পৌঁছে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। ইয়ুং যখন তাঁর দ্বৈতসত্তার কথা বলেন, যখন বলেন যে তিনি একাধারে শিশু এবং বৃদ্ধ তখন তা বিশ্বাস করে নেওয়া যায়।

ইয়ুং-এর এক রোগী রাতে নিজের মাথায় একটি বুলেট দিয়ে আঘাত করল, প্রভাতে ঘুম ভেঙে সে ভাবছে তার মাথায় কেউ যেন একটা বুলেট বিঁধে দিয়েছে—তার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। ইয়ুং-এর বাড়ির কাছে কোনো এক জায়গায় একটি বালক জলে ডুবছে, সেই সময় তিনি ট্রেন-এ ভ্রমণ করছিলেন, সহসা এক নিমজ্জমান মানুষের আকৃতি তাঁর চোখের ওপর ভেসে উঠল। রাতের বেলায় স্বপ্ন দেখছেন যে এক অতিকায় নেকড়ে বাঘ মৃত্যুর মূর্তিতে এসে হাজির হয়েছে, তারপর দিন প্রভাতে ঘুম ভেঙে সংবাদ পেলেন তাঁর মার মৃত্যু হয়েছে।

এরই নাম কি একসট্রা সেনসরী পারসেপসান? আমাদের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরাও অনেক আসন্ন ঘটনা ও দুর্ঘটনার পূর্বাভাষ তৃতীয় নয়নের আলোতে দেখতে পেতেন এমন উল্লেখ পুরাণ ও শাস্ত্রগ্রন্থে আছে।

ইয়ুং বলছেন—ভূত-প্রেত প্রভৃতির সংগে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়েছে। স্বপ্নে তিনি মহাশূন্যে বিবরণ করছেন—হাজার মাইল ওপর থেকে তিনি পৃথিবী অবলোকন করছেন।

অতীতের অনেক বিশিষ্ট মানুষকে তিনি দেখতে পেলেন, তাদের সঙ্গে কথা বললেন। নিজের প্রয়োজনে একটি নিরালা তোরণ তৈরী করেছিলেন ইয়ং। সেইখানে বসে পুরো একটি ঘণ্টা ধরে দুটি অর্কেস্ট্রা শুনলেন,—অদৃশ্য সূত্র থেকে। জানালা খুলে ইয়ুং চারদিকে তাকালেন কোথাও কাউকে দেখতে পেলেন না।

আর—একবার বাড়িতে বসে আছেন, হঠাৎ শুনতে পেলেন বিরাট জন কোলাহল। একটা বিশাল জনস্রোত ঘরে এসে ঢুকছে—কিন্তু চোখে কাউকেই দেখতে পেলেন না। পরদিন প্রাতে কথাপ্রসঙ্গে আরেকজন বললেন, এঁরা হয়ত মৃত আত্মা। ইয়ং এই ব্যাখ্যা মেনেছিলেন। তিনি নিজেই প্রশ্ন করছেন—

"But why, after all, should there not be ghosts? How do we know something is impossible?"

কিন্তু অসম্ভব বলে নিশ্চয়ই কিছু আছে। সমুদ্রের সমস্ত জল সহসা দুধে রূপান্তরিত হয়ে গেল—এমন ঘটনা ঘটে না। ইয়ুং নিজেই তাঁর স্মৃতিচারণ সম্পর্কে পাঠকদের সতর্ক করে বলছেন—

"The real sin of faith is that it forestalls experience".

এই কারণেই ইয়ুং-এর স্বপ্ন ফ্যানটাসির অতি-প্রকৃত পরিবেশ সাধারণের মনে বিশ্বাস জাগায় না। ঠিক যেভাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন সেই ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হবে না।

ইয়ুং অনেক নিউরোটিক অর্থাৎ স্নায়ু-বিকারগ্রস্ত রোগীকে নিরাময় করেছেন তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি প্রয়োগ করে, এইভাবে ফ্রয়েডও সাফল্যলাভ করেছেন এবং আরো অনেকে হয়ত সফল হয়েছেন। তবে মনে হয় যে ইয়ুং-এর সমস্ত ধারণা বা বিশ্বাস তাঁর নিজস্ব রোগনিরাময় পদ্ধতির পক্ষে অপরিহার্য নয়। *ইয়ুং বলেছেন যে মানুষ তখনই নিউরোটিক হয়—*

"When they content themselves with wrong or inadequate answers to the questions of life—"

কিন্তু এই যদি কারণ বলে গৃহীত হয় তাহলে কি সাধারণ সমাজে সহজ ভঙ্গীতে বিচরণশীল অনেককেই পাগলা গারদে আশ্রয় নিতে হবে না? রাজনৈতিকরা কি বলতে পারেন—জীবনের সকল প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর তাঁরা পেয়েছেন! তাঁরা যে যথাযথ উত্তর পাননি তা আমরা জানি, তবু ত তাঁরা সবাই আজো মানসিক ব্যাধির হাসপাতালে বাসা নেননি, নিউরোসিস তাঁদের কাবু করতে পারেনি।

ইয়ুং বলছেন—

"It is our loss of connection with the past, our uprootedness, which has given rise to the discontents of civilisation and to such a flurry and haste that we live more in the future chimerical promises of a golden age than in the present, with which our whole evolutionary movement has not yet caught up".

এই কঠোর বাস্তবের মধ্যে সুবর্ণ যুগের স্বপ্ন দেখার অবকাশ কোথায়? সুবর্ণ যুগ বর্তমানে নেই, ভবিষ্যতেও আশা নেই। অতীতের সঙ্গে সংযোগের ফলে স্পিরিট বা আত্মার সঙ্গে মুখোমুখি যোগাযোগ ঘটবে এমন আশা কোথায়।

ইয়ুং বিজ্ঞানী হলেও মনে মনে তিনি জন্ম-রোমান্টিক। তা যদি না হত তাহলে এত আবেগভরে রেড-ইন্ডিয়ানদের অনন্ত প্রশান্তির কথা বলতেন না। আকাশে প্রতিদিন সূর্য যেন না ওঠেন রেড-ইন্ডিয়ানরা এই প্রার্থনা করে এবং বিশ্বাস করে যে তাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করেই নাকি সূর্যদেব প্রতিদিন আকাশে ওঠেন না। ইয়ুং তাই মনে করেন যে রেড-ইন্ডিয়ানদের জীবন—

"Cosmologically meaningful because he helps the father and preserver of all life in his daily rise and descent".

এর আর এক অর্থ—আমাদের সকলের জীবন মহাজাগতিক অর্থে অর্থময় নয়।

যিনি জীবনের কথা বলতে বসে যিনি সর্বাগ্রে বলেছেন—

—"Myth is more individual and expresses life more precisely than does science".

তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে ফ্যানটাসি তিনি উল্লেখ করেছেন তা কিন্তু বিজ্ঞান নয়। কিন্তু তাঁর অন্তর-আত্মা সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয়—বিজ্ঞান নয় বটে, এটা আর্ট। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বলছেন—

"No, it is not art. On the contrary, it is nature".

এই কথার পর মনে যদি কোন সংশয় জাগে, যদি অবিশ্বাস উঁকি দেয় তখন ইয়ুং-এর বাণী কানে এসে ধ্বনিত হবে—

'It is presumptuous for any one to imagine that he produces his own thought".

একটি আত্মা একদিন ইয়ুং-এর ঘরে এসে বলে গিয়েছিল—'অরণ্যে বিচরণশীল পশুর মত, বাতাসে উড়ন্ত পাখির মত, ঘরের ভিতরের মানুষের মতই চিন্তাও একটা বিচরণশীল প্রাণী।'

ইংলণ্ডের মানুষ ইয়ুংকে বিদগ্ধ মানুষের মত শ্রদ্ধা করতে পারেনি। ইয়ুং তাদের কাছে এক পথভ্রষ্ট আত্মরতিমগ্ন মানুষ। ফ্রয়েডের তত্ত্বকে প্রেততাত্ত্বিক পোষাক পরিয়ে তিনি নিজের সুবিধামত তা প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু ফ্রয়েড এবং ইয়ুং দুজনেই কি নিজেদের ধ্যানধারণা উপযুক্ত যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন? তাঁদের বিচার-বিশ্লেষণ প্রায় সর্বদাই একতরফা, গায়ের জোরে চাপিয়ে দেওয়া।

এই গ্রন্থের মাঝামাঝি ইয়ুং ফ্রয়েডের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের কাহিনী বলেছেন। তাঁদের বিতর্কের কারণ পাঠকের কাছে নেহাৎ তুচ্ছ মনে হতে পারে। যেমন পরীদের গাত্রবর্ণ কি হতে পারে এই নিয়ে মতবিরোধ ঘটা।

অনিল জাকে ছিলেন ইয়ুং-এর বন্ধু এবং সহকারী। এই গ্রন্থের কিছু অংশ তিনি তৈরী করেছেন, বাকী অংশ জীবনের শেষের দিকে ইয়ুং নিজেই লিখে রেখে গেছেন। ইয়ুং গ্রন্থারম্ভে বলেছেন যে বহির্জাগতিক জীবন বা বহিরংগ জীবন সম্পর্কে তিনি বিশেষ কিছু বলবেন না—কারণ সে জীবন ঘটনাবিবর্জিত নিস্তরঙ্গ নদীর মত। তাই তিনি অন্তরংগ জীবনের কথা লিখেছেন—'ইনার লাইফ' ইয়ুং-এর নিজস্ব ধারায় বর্ণিত। স্বপ্ন, স্বপ্নাভাষ, ভবিষ্যৎবাণী ইত্যাদির মধ্য থেকে ইয়ুং-এর নিজস্ব তত্ত্ব কিভাবে গড়ে উঠেছে তার ইতিবৃত্ত। মানব মনে ঠিক কি কি ঘটে, কিভাবে ঘটে যায় তারই যথাযথ বিবরণ।

ইয়ুং-এর রচনার এমনই আকর্ষণ যে প্রথম পরিচয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ না করে উপায় নেই। তাঁর মতবাদে অনেকেই প্রভাবিত হয়েছেন। বিচারশীল মন নিয়ে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ফ্রয়েড আর ইয়ুং বর্তমান যুগের 'থিওলজি'র স্রষ্টা। এই তত্ত্বের মধ্যে পতন, পুনর্জন্ম, অবতারবাদ সবই মিলিয়ে-মিশিয়ে আছে। প্রতিটি ধারা রোমান্টিক, কাব্যময় এবং প্রতীকি ভংগীতে মূল্যবান।

এই সব কারণে ইয়ুং-এর আত্মস্মৃতি পড়তে বসে একাধারের যেমন আনন্দ এবং আগ্রহ জাগবে তেমনই আবার বিরক্তি ও বিতৃষ্ণাও সঞ্চারিত হবে মনে। স্বপ্নবিলাসী যে কোনও মানুষের মতই ইয়ুংকে তাঁর স্বপ্নের বাস্তব নৈর্ব্যক্তিকতাকে বিশ্বাস করতে হয়েছে। বিশ্বাসের একটা পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি তাঁকে রচনা করতে হয়েছে। মুক্তমন না হলে ইয়ুং পড়ে আনন্দ নেই।

—অভয়ঙ্কর

---

*MEMORIES, DREAMS, REFLECTIONS: By C. G. Jung. Recorded and edited by ANIELA JAFFE. Translated by Richard and Clara Winston : : (Collins and Routledge Kegan Paul Price 45 shillings only.

সাহিত্যের খবর

এমিলি ডিকিনসনের সম্মান : ঊনবিংশ শতকের প্রখ্যাত নিউ ইংলণ্ডীয় কবি শ্রীমতী এমিলি ডিকিনসনের সম্মানে যুক্তরাষ্ট্র একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করবেন। ২৮শে আগষ্ট তারিখে আট সেণ্ট মূল্যের স্মারক টিকিট বিক্রয় সুরু হবে। এর পূর্বে গত বছর কবি এডগার লী মাসটার্সের সম্মানে স্মারক টিকিট প্রকাশিত হয়। ম্যাসাচুসেটস শহরে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এমিলির জন্ম হয়—তার পরবর্তী জীবন ঘটনাহীন। প্রতিদানহীন প্রেমের বেদনায় তিনি নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে সুরু করেন। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সেই তিনি স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পথ পরিত্যাগ করে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর জীবদ্দশায় সামান্য কিছুসংখ্যক কবিতা মাত্র প্রকাশিত হয়। সেই কবিতাগুলির প্রকাশকালে লেখিকার নাম অপ্রকাশিত থাকে। ৫৪ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুর পর আবিষ্কৃত হল তাঁর কবি-প্রতিভা। গীতিকবিতা রচনায় এমিলির অসামান্য দক্ষতা ছিল।

এমিলি শ্বেতবসনা সুন্দরীর মত সর্বদাই শুভ্র পোষাক পরতেন এবং তাঁর কবিতার মত আপনাকেও তিনি অপ্রকাশ রাখতেই সদাসচেষ্ট ছিলেন।

নিখিলবিশ্ব সেকসপীয়র কংগ্রেস : এই এই বছর ক্যানাডায় ভ্যানকুভারে সর্বপ্রথম নিখিল বিশ্ব সেকসপীয়র কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে। সারা বিশ্বের পন্ডিতজন এবং সেকসপীয়র-বিশেষজ্ঞ দল এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তী এই সম্মেলনে প্রবন্ধ পাঠের আমন্ত্রণ পেয়েছেন। ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে তিনি এই সম্মেলনে যোগদান করবেন। অধ্যাপক চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যের একজন সুপ্রতিষ্ঠ কবি।

ইন্দো-সোভিয়েট কালচারাল সোসাইটি : পশ্চিমবঙ্গের ইন্দো-সোভিয়েট কালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে কলিকাতা ইনফরমেসন সেন্টারে বিগত ২০শে আগষ্ট তারিখে ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভারত-সোভিয়েট ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। এই সভায় শ্রীসত্যেন সেন, বিষ্ণু দে, ডাঃ মুরারি মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রমা চৌধুরী প্রমুখ ভাষণ দান করেন।

স্বামী ...কৃষ্ণানন্দের জন্ম-জয়ন্তী : সাংবাদিক ও পরিব্রাজক স্বামী কৃষ্ণানন্দের ১২৩তম জন্মজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী বলেন—স্বামী কৃষ্ণানন্দ ছিলেন দয়ালদাস স্বামীর শিষ্য। তিনি প্রায় পাঁচশ'টি হরিসভা প্রতিষ্ঠা করেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। প্রধান অতিথি হিসাবে দক্ষিণারঞ্জন বসু বলেন, তিনি স্বামী কৃষ্ণানন্দের 'গীতার্থ সন্দীপনা' পাঠ করে উপকার পেয়েছেন। এই সভায় সভাপতি শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী বলেন যে, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সিরাজগঞ্জে সর্বপ্রথম স্বামী কৃষ্ণানন্দের নাম শোনেন। 'আর্য ধর্ম প্রচারিণী সভা'র প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের মতো মানুষ ভারতে বিশেষ দেখা যায় না। হরিমন্দির ট্রাস্টের উদ্যোগে এই সভার আয়োজন করা হয়। ট্রাস্টের পক্ষ থেকে শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন বলেন, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে টাউন হলে কৃষ্ণানন্দ বাংলা বক্তা ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বাগ্মিতায় মুগ্ধ হন। কৃষ্ণানন্দ সামান্য রেলের কেরানী হিসাবে অতি অল্পবয়সে জীবনযাত্রা সুরু করেন, পরে তিনি সব ত্যাগ করে পরিব্রাজকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। 'সুনীতি' ও 'দি মাদারল্যান্ড' ছিল তাঁর মুখপত্র। এই সভায় ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী, পন্ডিত ক্যালিদাস মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দীনবন্ধু এন্ড্রুজ (জীবনী)—সাহিত্য সদন, ৬৫।এ, মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯। তিন টাকা।

'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'—এই-ই ছিল বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জীবন-বাণী এবং অন্বিষ্ট্য। দীনবন্ধু এন্ডরুজ যেন সেই বিবেক-বাণীর মূর্ত বিগ্রহ। অবমানিত আর্ত মানুষের সেবায় এবং নবজীবন উজ্জীবনের আন্তরিক আয়োজনে তিনি নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করেছিলেন। যুগসন্ধিক্ষণের সংকট মুহূর্তে ভারতে তাঁর পদার্পণ যেন বিধাতার অভিপ্রেয় ছিল। সংগঠন এবং সেবাকে তিনি একাত্ম করতে পেরেছিলেন। এমন মহৎ মানুষ তাঁর আগে দেখা যায়নি, পরেও না। দুই যুগন্ধর পুরুষের—মহাত্মা গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ—জীবনস্বপ্নকে সার্থক করতে তিনি তাঁর দুটি হাত দুদিকে মেলে ধরেছিলেন—একটি হাত সেবার এবং অপরটি সংগঠনের।

সি এফ এন্ডরুজ শতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থটি ভারত-প্রেমিক পরহিতব্রতী দীনবন্ধু এন্ডরুজের

বিচিত্র জীবনকাহিনী এবং সেবাব্রতের বিশদ আলোচনায় সমৃদ্ধ। তাঁর জীবন প্রবাহের বিবিধ ধারার ওপর আলোকপাত করেছেন ডকটর অমিয় চক্রবর্তী, চিন্ময়ী বসু ও দীপালি রায়। আলোচনাগুলি অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে অত্যন্ত সততার সঙ্গে লেখা। অনেকগুলি ছবি— বিশেষ করে দুষ্প্রাপ্য ছবি : দীনবন্ধু এন্ডরুজের সঙ্গে হাসপাতালে গান্ধীজীর শেষ সাক্ষাৎকারের ছবিটি গ্রন্থটির আকর্ষণ ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। এই সঙ্গে পরিশিষ্টে দীনবন্ধুর জীবন পঞ্জী এবং এন্ডরুজ প্রণীত গ্রন্থসূচীর বিস্তৃত পরিচয় স্বল্প পরিসরের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। এতে গ্রন্থখানিকে পূর্ণাঙ্গ জীবনীর আকর-গ্রন্থ হতে বিশেষ সহায়তা দিয়েছে।

অস্তিত্ব মুখর (কাব্যগ্রন্থ)—সমীর দে।। আলফা পাবলিশিং কনসার্ন, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। দাম : দু টাকা।

বইটি প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চেহারা-স্বাতন্ত্র্যের জন্য। কবিতাগুলিও অতি সাম্প্রতিকতার স্বাক্ষরবাহী। তারুণ্যের আবেগ, বিষাদ ও উজ্জ্বলতায় কবি অনুভব করেন 'অনিবার্য পরিবর্তনের প্রস্তুতি চলছে' ভেতরে ভেতরে, কিন্তু সেই প্রস্তুতির পুরো ছবিটা এখনো অস্পষ্ট।

প্রকৃতপক্ষে সমীর দে রোমান্টিক কবি। এক ধরণের দুঃখবোধ তাঁকে বিচলিত করেছে কখনো কখনো। এবং সেই মুহূর্তেই তিনি লিখেছেন : *'কাছাকাছি কেউ নেই/ একমাত্র অক্ষমতার আততায়ী/ একমাত্র সতীর্থের মৃতদেহ ছাড়া।'*

তাঁর কণ্ঠ খুবই আন্তরিক, দৃষ্টি প্রখর। আরেকটু সংযত-বাক হলে কয়েকটি কবিতা অনেকদিন মনে থাকতো। এ কাব্যগ্রন্থের ছোট কবিতাগুলিই সবচেয়ে ভালো। প্রচ্ছদ রুচিসম্মত।

ছয় কেদার সাত বদ্রী (ভ্রমণ-কাহিনী)— বিজলী গাঙ্গুলী। ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট পাবলিশার্স, ১৯ পার্ক সাইড রোড, কলকাতা-২৬। সাত টাকা।

তীর্থময় ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ কেদার-বদ্রী। তুষাররাজ্যের এই তীর্থ এককালে ছিল দুর্গম ও বিপদসংকুল। ধর্মপ্রাণ নর-নারী এবং অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষেরা প্রাণ তুচ্ছ করে কেদার-বদ্রী পরিক্রমা করেছেন। আজকে পথঘাটের উন্নতি এবং যানবাহনের অনেক সুবিধা সত্ত্বেও কেদার-বদ্রীর আকর্ষণ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি, বরং বেড়েছে। লেখিকা এই তীর্থ পরিক্রমার কাহিনী লিখেছেন সহজ সরল ভাষায়। এই যাত্রাপথে যা তিনি দেখেছেন, যাঁদের তিনি দেখেছেন— পার্বত্য প্রদেশের সরল বিশ্বাসী ধর্মভীরু মানুষজন এবং সাধু-সন্তদের—তাঁদের কথাও লিপিবদ্ধ করেছেন। তীর্থ পরিক্রমার পথ-রেখাচিত্র এবং তুষার ধবল কেদার ও বদ্রীর স্থান বিশেষের অনেকগুলি ফটো ভ্রমণ-কাহিনীর আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ পরিকল্পনা সুখ্যাতি করার মতো, কিন্তু মুদ্রণ-প্রমাদ অস্বস্তিকর।

ভারতের চীনযুদ্ধ (আলোচনা)—অপ্রিয় রায়। নবজাতক প্রকাশক। ৬ এন্টনী বাগান লেন। কলকাতা-৯। দাম বারো টাকা।

ভারত চীন যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত একখানি বিতর্কমূলক গ্রন্থ 'ভারতের চীন যুদ্ধ'। বহু সরকারী ও বেসরকারী তথ্যসহ নিজস্ব বক্তব্যকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন গ্রন্থকার। এজন্য তাঁকে ভারতীয় সেনানায়ক, দেশী বিদেশী সাংবাদিক এবং দুই দেশের রাষ্ট্র নায়কদের বক্তব্য ও পত্রালাপের সাহায্য নিতে হয়েছে। কে প্রথম আক্রমণকারী তা প্রমাণের ওপর গুরুত্ব আরোপ না করে, সাম্প্রতিক যুদ্ধের ও সমস্যার মূলকারণ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে সকলে একমত না হলেও, এই ধরনের বই-এর গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য।

ষোড়শী (কাব্যগ্রন্থ)—সমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থটির গৈরিক প্রচ্ছদের অঙ্কণ ও তার ভিতরের কবিতার দিকে তাকালে বুঝতে পারা যায় গ্রন্থকার সরলচিত্ত এবং ভক্তিপ্রবণ। আধুনিক মানসিকতার প্রতিফলন গ্রন্থটির কোথাও নেই। কবিতাগুলিতে যে বিষয় বা আঙ্গিকের ব্যবহার রয়েছে তা আর সাম্প্রতিক কবিতায় চোখে পড়েনা। প্রায় প্রতিটি কবিতায় একটি গল্প আছে। ছন্দের ব্যবহার অবশ্য ভ্রান্তি-মুক্ত নয়।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

শারীরবৃত্ত (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ১৯৭১) সম্পাদক : দেবজ্যোতি দাশ, উমাশংকর সরকার। ভারতীয় শারীর বিদ্যা পরিষৎ, ৯২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯।

মাতৃভাষাই সকল স্তরে শিক্ষার বাহন হোক—'বাংলার বাঘ' আশুতোষের সময় থেকে এই চেষ্টা শুরু। স্তরে স্তরে একটু একটু করে তাই ঘটছে। কিন্তু তার অগ্রগতির সঙ্গেই দেখা দিয়েছে ভিন্নতর সমস্যা—ইংরেজি শব্দের বিকল্পে দেশীয় শব্দের অপ্রতুলতা। বিশ্বের সবদেশে শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা— বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষাতেও তাই—সম্ভবত একমাত্র ব্যতিক্রম এই দেশ, ভারতবর্ষ। মাতৃভাষাতেই নিজের চিন্তাভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য এবং বিশেষভাবে বিজ্ঞান শিক্ষায় মাতৃভাষাকে সত্যকার বাহন করে তোলবার জন্যে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বিজ্ঞানী গোপাল ভট্টাচার্য প্রমুখ চিন্তাশীল বিজ্ঞান সাধকরা দীর্ঘকাল ধরে নানানভাবে চেষ্টা করে আসছেন। অত্যন্ত আনন্দের কথা, ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি এবং বিজ্ঞান-সাহিত্য বিকাশের সদইচ্ছা নিয়ে 'ভারতীয় শারীরবিদ্যা পরিষৎ' বিরাট পরিকল্পনায় 'শারীরবৃত্ত' ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি বার করেছেন। 'সাধারণ পাঠকের মনে মানবদেহ সম্বন্ধে বিজ্ঞান সম্মত ধারণার সৃষ্টি করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যা পাঠ্যক্রমের নানা অধ্যায় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় জ্ঞানলাভের সুযোগ দেওয়া, প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের সমাধানে তাঁদের সাহায্য করা, শারীরবিদ্যার অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক রচনায় উৎসাহিত করা, শারীরবিদ্যা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণালব্ধ তথ্য ও তত্ত্বকে লোকগোচরে আনাই এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির উদ্দেশ্য। পরিমল সেন, দেবজ্যোতি দাশ, পিনাকীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, আশিস সিংহ, অজিতকুমার মাইতি, বাসুদেব দত্তচৌধুরী, অজিতকুমার দেব, সুশীলরঞ্জন মৈত্র, উমাশংকর সরকার প্রমুখের রচনায় পত্রিকা প্রকাশের এই লক্ষ্য সাফল্যলাভ করে। দেবজ্যোতি দাশের 'শারীর বিজ্ঞানী সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ' জীবন-চিত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বিজ্ঞান তত্ত্ব জিজ্ঞাসু পাঠক-পাঠিকা এই সংকলনটি পেলে অবশ্যই খুশী হবেন তা বলাই বাহুল্য।

সোনার বাংলা (সাপ্তাহিক, সম্পাদক : প্রবীণ সেন। ২০১।এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলকাতা-৭। কুড়ি পয়সা।

'সোনার বাংলা' সাপ্তাহিক পত্রিকাটি গত ১২ জুন আত্মপ্রকাশ করেছে। উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের এপারে ওপারে মুক্তিযুদ্ধের অনুকূল প্রেরণাকে সদাজাগ্রত রাখতে যথাসাধ্য সাহায্য করা; এবং 'বাংলাদেশ'-এর সঠিক খবর এপার বাংলা-ওপার বাংলার জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই ধরনের পত্রিকার অভাব দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হচ্ছিল। ব্যবসায়িক লাভক্ষতির দিকে দৃকপাত না করে জাতীয়তাবোধে আপ্লুত জাগ্রত মনের পরিচয় রেখে 'সোনার বাংলা' সাপ্তাহিক সে অভাব মোচনে সার্থকভাবে অগ্রসর হচ্ছে। এজন্যে পত্রিকার পরিচালকবর্গ ধন্যবাদার্হ। 'সোনার বাংলা' এপার-ওপারের শুধু স্বর্ণসূত্র নয়—সখ্যসূত্র। এ পত্রিকা বাংলাপ্রেমীদের সাদর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবে এটা আশা করা যায়।

অয়ন (আষাঢ়, '৭৮)—সম্পাদক : কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য। ৯৩।১এ, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা : ৯। পঞ্চাশ পয়সা।

প্রথম নজরে আহামরি কিছু একটা মনে হয় না। কিন্তু বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে এবং সুখ্যাত লেখকদের বিদগ্ধরচনার প্রসাদগুণে সাধুবাদ জানাতে ইচ্ছে করে। লিখেছেন : বনফুল, গোপাল ভৌমিক, পরিমল গোস্বামী, কুমারেশ ঘোষ, কানাই সামন্ত, কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য, অমলেন্দু ঘোষ, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। পরিমল গোস্বামীর 'পত্রস্মৃতি'তে পুরানো দিনের সুখ্যাত লেখক জনদরদী প্রকৃতিবাদী চিকিৎসক জীবনময় রায়কে নতুন করে মনে পড়িয়ে দিল। সম্পাদকের 'দিক্-দর্শনী'তে ধার যথেষ্ট, ভারও।

চতুর্থ খণ্ড

(৮)

পরদিন ভোরবেলা চার্বাক আশ্রম থেকে বের হয়ে জরা উপত্যকার বনে নামতে লাগলো। উপত্যকার অপর দিকে যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে সেটা পার হলেই দক্ষিণ দিকের পথ পাওয়া যাবে। অরণিকে জিজ্ঞাসা করে পথের বিবরণ জেনে নিয়েছিল জরা। অরণি বলে দিয়েছিল যে ঐ পাহাড়টার নাম পাঁচচুল্লি, তারপরে দুটো পথ দেখতে পাওয়া যাবে, একটা শাখা গিয়েছে সোজা উত্তরে অপরটা কিছু দূরে পূবে গিয়ে তারপরে সোজা গিয়েছে দক্ষিণে। উত্তরের পথটা গিয়েছে উত্তর কুরুতে দক্ষিণেরটা ভারতবর্ষে। সেই পথটা আপনাকে ধরতে হবে, আর মনে রাখবেন যে আপনি যাচ্ছেন পশ্চিম থেকে। জরা তাকে জানিয়েছিল যে সে ভারতবর্ষে যেতে চায়।

উপত্যকায় নেমে একটি স্রোতস্বিনী দেখতে পেলো। এতদিনে জরা বুঝে নিয়েছে যে উপত্যকা মানেই নদী। প্রবল আর ক্ষীণ এই প্রভেদ। এই নদীটি ক্ষীণ। সে আরও বুঝেছিল নদীতে আর পাহাড়ে বেশ লুকোচুরির খেলা চলছে। পাহাড়গুলো চায় নদীগুলোকে বন্দী করতে, নদীগুলো কিছুতেই ধরা দেবে না। নদীর ধারে বসে এক পেট জল খেয়ে নিল জরা। এই ক'মাসের পাহাড়ী অভিজ্ঞতায় বুঝেছে এসব পথে জলটাকেই খাদ্য বলে গ্রহণ করতে হবে, খাদ্য কখনো কদাচিৎ মিলে গেলেও যেতে পারে। নদীর অপর পারে গিয়ে পাঁচচুল্লি পাহাড়ে উঠবার আগে একবার ফিরে তাকালো চার্বাক আশ্রমের গিরিচূড়ার দিকে। মনে পড়লো গত রাত্রে চার্বাকের স্বীকারোক্তি।

চার্বাক বলেছিল সে সুখ দিতে পারে, কিন্তু দুঃখ দূর করবার উপায় তার অজানা। অথচ ছাগর্ষি বলেছিল সংসারে সুখ বলে কিছু নেই, দুঃখের অভাবকেই কখনো কখনো সুখ বলে মনে হয়, যেমন নাকি এই পাহাড়ে সমতল ভূমি। পাহাড়ে কোন ভূখণ্ড সমতল নয়, পাহাড়ের অভাবকেই কোথাও কোথাও সমতল মনে হয়, লোকে তার নাম দিয়েছে উপত্যকা। জরা সুখের প্রার্থী নয়, চায় পাপ থেকে মুক্তি, পাপের পরিণাম তো দুঃখ। চার্বাক ও ছাগর্ষি দুজনেই অক্ষম তার পথনির্দেশ করতে। বুঝতে পারে না এখন তার কি কর্তব্য। পা দুখানার পথ চলে চলে পথচলা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, সেই অভ্যাসের বশে সে পথ চলে। সে ধরে নিয়েছে এইভাবে পথ চলতে চলতেই একদিন কোথাও মুখ থুবড়ে পড়ে জীবনের অবসান ঘটবে। ভাবে ভালোই হবে এই পাপ-পুণ্যের সুখ-দুঃখের দোটানা থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে।

জরা ভেবেছিল দুপুরবেলার মধ্যেই পাহাড়টা পার হতে পারবে, কিন্তু দুপুর পার হয়ে গেলেও দেখল এখনো অনেক পথ বাকি। পাহাড় ও নারী নিতান্ত আয়ত্তের মধ্যে মনে হলেও আসলে তারা অনেক দূরবর্তী। এতখানি পথ এসেও একটিও পথিক তার চোখ পড়েনি। এমন নেড়া ও নির্জন পাহাড় আগে দেখেনি। সন্ধ্যাবেলায় পা দুটো যখন অত্যন্ত ভারি মনে হল, একটা গুহা দেখতে পেয়ে তার মধ্যে রাতটা কাটিয়ে দিল। ভোরবেলা উঠে একটা ছোট গিরিচূড়া পার হতেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়লো তার অনুরূপ আগে কখনো দেখিনি।

সমস্ত উত্তর আকাশটা জুড়ে যতদূর দেখা যায়, দেখা যায় পশ্চিমতম থেকে পূর্বতম সীমান্ত অবধি, সে দেখতে পেলো শাদা তরঙ্গের নিস্তব্ধ ওঠাপড়া। যেন শাদা শিবিরের সারি। লোকমুখে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণ শুনেছিল, সে বিবরণ কে না শুনেছে সারা ভারতবর্ষে, শুনেছিল যে কুরু পান্ডবের উঁচু-নীচু শাদা শিবিরের সারিতে সমস্ত কুরুজাঙ্গল ভরে গিয়েছিল। সে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলো, তবে তখনো জানতো না যে এ বিস্ময়ের অ আ ক খ মাত্র। হঠাৎ একটা রঙের বিদ্যুৎ তরঙ্গিত হয়ে গেল ঐ শাদার পটে, গাঢ়তম লাল থেকে ফিকেতম বেগনি পর্যন্ত। আর রঙ যে এমন চঞ্চল হয় কে জানতো। এই যেখানে লাল ছিল সেখানে হলদে, এই যেখানে বেগনি ছিল সেখানে কমলা। একি মুহুর্মুহু রঙের পালাবদল। একবার রাজবাড়ীতে কোন একটা পরব উপলক্ষে নাচ দেখতে গিয়েছিল। আসরে বিশ পঁচিশ-জন সুন্দরী নারী নাচছে, তাদের ঘাগরাতে, কাঁচুলিতে, ওহাড়নিতে নাচের তালে তালে আর ঝাড় বাতির আলোয় আলোয় দেখেছিল এমনি রঙের পালাবদল, চোখে ধরবার আগেই বদলে যায়। হরিণের রক্তের লাল, চোখের শাদা, লোমের ধূসরতা, শিরদাড়ার পাটল আভা,—এটাই বা রঙ তার জানা। এ যে সংখ্যাতীত। কতক্ষণ মুগ্ধভাবে তাকিয়েছিল জ্ঞান ছিল না হঠাৎ সম্বিৎ হতেই দেখলো নাচ শেষ করে নটীরা অন্তর্ধান করেছে প্রকাণ্ড আসর শাদা ও শূন্য। দেখলো যে সে উপবিষ্ট, গোড়াতে দাঁড়িয়ে ছিল, কখন বসে পড়েছে জানে না। বুঝলো এ হচ্ছে চিরতুষারের দেশ যার উত্তরে নাকি উত্তর কুরু।

বিস্ময় কাটিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো দক্ষিণ দিক থেকে আসছে পাহাড়ী ছাগলের লম্বা এক সারি, তাদের পিঠে মোট বোঝাই, সেই সারির সঙ্গে মাঝে মাঝে মালিক বা প্রহরী। পথ ছেড়ে দিয়ে এক পাশে দাঁড়ালো জরা। কিন্তু তারা আর এগোল না। জরা একটা সমতল স্থানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে এসে ছাগলের পিঠ থেকে বোঝা নামালো সেই বিদেশী ব্যাপারীর দল। ছাড়া পেয়ে ছাগলগুলো পাহাড়ের গা খুঁটে খুঁটে উদ্ভিদকণা খেতে আরম্ভ করলো, এসব উদ্ভিদ যে আছে আগে জরার চোখে পড়েনি।

ব্যাপারীরা মোট খুলে বের করলো মোটা মোটা রুটি আর চাটনি আর তার-

পরে সকলে গল্প করতে করতে খেতে আরম্ভ করলো।

এমন সময় একজনের চোখে পড়লো জরাকে, ইসারা করলো কাছে আসতে। জরা কাছে এলে শুধালো, রাহী আদমি?

জরা বলল, হাঁ জী।

আর একজন তার লম্বা দাড়ি চুল ও জীর্ণ পরিচ্ছদ দেখে শুধালো, সন্ন্যাসী?

এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে জরা, শুধু কপালে হাত ঠেকালো।

ব্যাপারীরা তাকে বসতে বলে খান কতক রুটি ও খানিকটা চাটনি দিল, বলল, সাধুজী, খেয়ে নাও, এ পথে পরে কোথাও কিছু পাবে না।

জরা জানালো সে দক্ষিণ দিকে যাবে।

কোথায়?

ভারতবর্ষে। তোমরা কোথায় যাবে?

তারা জানাল—ঐ পাহাড় পেরিয়ে তাদের দেশ।

বিস্মিত জরা বলল, ও পাহাড় পার হবে কি করে? ওতো কেবল বরফ।

একজন বলল, বটে, তবে ওর মধ্যেই পথ আছে, নামান জমি আছে, ঝরণা আছে, গ্রামও আছে।

এতক্ষণে জরা লক্ষ্য করলো যে তাদের নাক চোখ কপাল একটু ভিন্নরকমের। বিদেশী সন্দেহ নাই। জরা শুধালো, তোমরা আমাদের দেশের ভাষা জানলে কি করে?

অনেক কাল থেকে আমরা ব্যবসা করতে আসা-যাওয়া করি তাই শিখে নিয়েছি। দেশের ভাষা না জানলে কি ব্যবসা করা যায়।

কিসের ব্যবসা তোমাদের, শুধায় জরা।

একজন বলে, দেশ থেকে আনি পশমী কাপড় বিক্রি করে নিয়ে যাই সুতি কাপড়।

সুতি কাপড়ে শীত মানে?

এই তো আমাদের গায়ে সুতি কাপড়। তবে এখনি তা বদলে পশমি কাপড় গায়ে দেবো।

আর একজন বলল, আমাদের দেশ থেকে সুতি কাপড় চালান হয়ে যায় কম্বোজে গান্ধারে আরও কত দেশে।

আবার কবে ফিরবে তোমরা?

আর বাধহয় শীঘ্র ফিরবো না।

কেন?

কেন কি সাধুজী, দেশে রাজা না থাকলে ব্যবসা করে সুখ নাই।

রাজা নাই কি বলো?

নামে আছে কাজে নাই।

আর একজন ব্যাপারী বলল, একেবারে, না থাকলে একরকম। এ যে সকলেই রাজা।

আনন্দর মুখে জরা কিছু কিছু শুনেছে তবু আরও জানবার আশায় শুধালো, সকলে রাজা সে আবার কি?

এই দেখো না সাধুজী, আমাদের মাল-পত্তর তিনবার লুট হয়ে গেল!

লুটে নিল। বিস্মিত হয় জরা।

লোকটি বলে, ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ, সাধু-সন্ন্যাসীর দেশ এখানে তো লুট করে নেয় না, দান বলে নেয়।

দেশের নিন্দায় কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে জরা বলে, যদি দান করে থাকো তবে আর দুঃখ কি?

সাধুজী, দান কি ইচ্ছায় করেছি? দান বলে যারা হাত বাড়ায় তাদের হাতে যখন তীর-ধনুক বল্লম রামদা দেখি তখন কাজে কাজেই দান করতে হয়।

আর একজন জের টেনে বলে, তারা যেতেই আর একজন এসে বলে ওদের অত দান করলেন আমাদের পাঁচটা ছাগল দান করুন। তাদের হাতেও অস্ত্র কাজেই দান করতে হয়।

তৃতীয়জন বলে, সঙ্গে সঙ্গে আবার আর একটা দল এসে বলে মাল ও ছাগল দান করলেন আপনার আঙরাখার জেবে যা আছে আমাদের দান করুন। দাবী সশস্ত্র কাজেই বাধ্য হয়ে দাতা সাজি। আর সাধুজী, ওরা এত সংবাদ রাখে কি করে। কেমন করে জানলো পাঁচটা মোহর ছিল আমার জেবে।

জরা বলল, গরীব খেতে পায় না তাই এমন করে।

বাধা দিয়ে একজন ব্যাপারী বলল, না, সাধুজী, আমি ত্রিশ বছর যাতায়াত করছি এদেশে গরীবকে কখনো লুটপাট চুরি-ডাকাতি করতে দেখিনি। অন্য দেশে গরীব লোক লুটেরা হয়, ডাকু হয়। এদেশে ধনীরা আরও ধনী হওয়ার আশায়, ভদ্র-লোকেরা ভদ্রতার সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় করবার আশায়, শিক্ষিতরা নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপনের আশায় চুরি করে, ডাকাতি করে, যদিচ নাম দেয় দান আর যৌতুক। সাধুজী, যদি দেশকে ভালবাসতো তাহলে নিজেদের চুরি-ডাকাতির বোঝা গরীব দুঃখীর নামে চালাতো না। না সাধুজী, এদেশে আর ফিরবো না।

জরা যা সংক্ষেপে শুনেছিল আনন্দর মুখে এবারে তার বিস্তারিত পরিচয় পেলো।

ব্যাপারীর দল সারাদিন বিশ্রাম করে পরদিন প্রাতে সুতি কাপড়ের উপরে পশমী কাপড় গায়ে দিয়ে উত্তর দিকে যাত্রা করলো, যাওয়ার সময়ে তারা খানকতক চাপাটি আর কতকটা চাটনি দিল জরার হাতে, বলল, সাধুজী, পথে খেয়ো, বদরিনাথ পৌঁছবার আগে আর কিছু মিলবে না। অপসিয়মান সেই দলটির দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দক্ষিণ দিকে চলতে আরম্ভ করলো জরা।

(৯)

অনাবিল তুষাররাজ্যে দিনের পর দিন চলতে চলতে জরার মনে হয়েছিল বুঝি এ পথের শেষ নেই, কখনো কখনো ধারণা হয়েছে বুঝি পথ হারিয়ে ফেলেছে, অসম্ভব নয় চিহ্নহীন একটানা তুষারপথ ভুলিয়ে দেবে এ আর আশ্চর্য কি। ভোরবেলায় যেদিন সূর্য দেখা যায় দিক নির্ণয় করে নেয়, সূর্য সবদিন যে দেখা যায় এমন নয়। যেদিকে দেখা যায় সমস্ত শাদা এমন কি আকাশটাও শাদাটে। মাঝে মাঝে তুষারঝড় আসে তখন প্রাণ বাঁচানো দায়, কিন্তু যার অনেক দুঃখভোগ শেষ হয়নি তাকে মারে কার সাধ্য।

সেদিন সকালবেলায় পথ চলতে চলতে হঠাৎ চোখে পড়লো দূরে পাহাড়ের গায়ে একটি কালো বিন্দু। ওটা কি? চোখের ভুল নয়তো। না, চোখের ভুল এতক্ষণ থাকে না, তাছাড়া কালোটা ক্রমেই স্পষ্টতর হচ্ছে। সেই কালো বিন্দুটা লক্ষ্য করে পথ চলে জরা। এবারে পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে নামছে; হাঁ, এতক্ষণে কালো বিন্দুটা একটা মন্দিরের আকার লাভ করেছে। তবে ওটাই বদরিনাথের মন্দির। আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে দেখতে পায় মন্দিরের কাছে অনেকগুলি ছোট ছোট কালো বিন্দু নড়ছে যেন। ওগুলো কি তবে মানুষ। দণ্ড দুয়েকের মধ্যে মন্দিরের কাছে এসে দাঁড়ায় জরা।

অবশেষে কালো একটা মন্দিরের চত্বরে এসে দাঁড়ায়, দেখতে পায় যাত্রীদের কতক ভিতরে ঢুকছে, কতক বের হয়ে আসছে, ঘণ্টা বাজছে, ধূপধুনার গন্ধ আর ধোঁয়া। কাছে কয়েকজন পসারি ফুল বেলপাতা চন্দন প্রভৃতি বিক্রি করছে। তাকে সাধু মনে করে একজন পাণ্ডা বলল, যাও সাধুজী দর্শন করো। সে কম্পিত বক্ষে মন্দিরে প্রবেশ করে দেখলো রত্নবেদী, আর সে বেদী শূন্য; দেবতা কোথায়? অথচ এ কি, যাত্রীরা কাকে প্রণাম করছে, কাকে প্রদক্ষিণ করছে, কার উদ্দেশ্যে অঞ্জলি দিচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করে দেবতা কোথায়?

দেবতা কোথায়? সবাই একসঙ্গে বিস্মিত হয়ে তাকায়। লোকটা বলে কি? একজন পাণ্ডা তখনি তাকে ঘাড় ধরে ধাক্কা দিয়ে মন্দির থেকে বের করে দেয়। একজন বলে লোকটা ভণ্ড, কেউ বলে ম্লেচ্ছ, কেউ বলে পাপী। সে-সব কথা তার কানে যায় না, পাণ্ডার প্রবল ধাক্কায় একটা পাথরের উপরে পড়ে তার কপাল ফেটে গিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। সে ব্যথা অনুভব করে না, জরার কেবলি কানে বাজতে থাকে পাপী ঘোর পাপী, মহাপাতকী।

নিরিবিলিতে গিয়ে বসে ভাবে পাপী তার আর সন্দেহ কি। পাপী বলেই দেবতা দর্শন দিলেন না, ভাবে দেবতা কি তবে কেবল পুণ্যবানের জন্যই, তবে পাপীকে উদ্ধার করবে কে? মানুষেও পারলো না, দেবতাও দেখা দিলেন না, তবে তার আর গতি নাই, গতি নাই। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে থাকে, রক্তের ধারায় আর চোখের ধারায় মিশে যায়। এক-আধটা ফোঁটা মুখের মধ্যে ঢোকে—দুয়েরই স্বাদ লবণাক্ত।

হঠাৎ জরা পিঠের উপরে স্পর্শ অনুভব করে, ফিরে তাকিয়ে দেখে একখানি শীর্ণ হাত তার তার পিছনে, সেই শীর্ণ হাতের মালিক তিনকাল-গত এক শীর্ণ বুড়ি, তার দেহটা পাহাড়ের এক খোঁদলের মধ্যে—কেবল মুখখানা উঁকি দিচ্ছে আর ঐ হাতখানা বাইরে। বিস্ময়ে সন্ত্রাসে তার রা সরে না। কিভাবে কথা আরম্ভ করবে সে। তার জিহ্বা কাটিয়ে দিয়ে বুড়িই প্রথম কথা বলল—বাবা, মনের পাপ আছে তাই দেবতা দেখা দিলেন না, দুঃখ করো না সময় হলেই দেখা পাবে।

এত কথা তুমি কি করে জানলে বুড়ি-মা।

শোনো কথা আমার ছেলের। আমি যে এখানে বসে বসে সব দেখছি, সব শুনতে পাই।

জরা খেদের সঙ্গে বলল, আর সকলেই দেখতে পেলো কেবল আমাকেই বঞ্চনা।

সে বলল, দেখতে পেলো।

কই কেউ তো বলছে না যে দেখতে পেলো না।

বাবা, ওরা সব মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। তুমি নিশ্চয় জেনো অনেকেই দেখা পায়নি দেবতার। তবে কি জানো জানালেই বলবে পাপী তাই চুপ করে থাকে। আবার কেউ কেউ বা শোনা কথা বলছে, আহা কি দেখলাম। চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি।

জরা শুধায়, বুড়িমা, তুমি কি দর্শন পেয়েছ?

নিজ মুখে বলতে নেই বাবা, তবে এ পর্যন্ত বলতে পারি যে প্রথমটায় দেখা দেননি।

কেন?

কেন কি, নিশ্চয় পাপ ছিল।

তুমি আবার কি পাপ করবে বুড়িমা।

শোন কথা। পাপ করা কি কারো এক-চেটিয়া। জেনে হোক না জেনে হোক সকলকেই পাপ করতে হবে।

না জেনে করলেও পাপ।

পাপ বইকি! এই দেখোনা কেন একটা দিনের মধ্যে আমার স্বামী পুত্র গেল, রাতের বেলায় ঘরখানা পুড়ে গেল। এসব যদি আমার পাপে না হয় তবে কার পাপে!

তখন তুমি কি করলে?

আমি কাঁদতে লাগলাম। তখন এক সাধু বললেন, কাঁদলে কি হবে মা, চোখের জলে পাপ ধুয়ে যায় না।

তবে কি করলে যায় বাবা, আমি শুধাই।

পাপ পুণ্যের মালিককে গিয়ে ধরো।

তিনি থাকেন কোথায় আবার শুধাই।

সাধু বললেন, বদরিনাথে যাও, সেখানে তিনি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তিতে বিরাজ করছেন।

আমি বলি, কার সঙ্গে যাবো বাবা, অতদূরের পথ।

জরা বাধা দিয়ে শুধায়, কোথায় তোমার বাড়ী ছিল, বুড়িমা?

সেই কাবেরী নদীর তীরে, চোলদের দেশে।

সে যে অনেক দূর।

সে কথার উত্তর না দিয়ে বুড়ি বলে, সাধু বললেন, কার সঙ্গে আবার যাবে! নিজের মনের সঙ্গে যাবে। মনটি এখানে ফেলে রেখে শুধু দেহটি নিয়ে যাবে সে হবে না।

আমি বললাম, বাবা গরীব মানুষ গাড়ী-ঘোড়া তো নাই।

থাকলেই বা কি। গাড়ী চড়ে যাবে রাজার কাছে, তোমার স্পর্ধা তো কম নয়।

তবে?

গন্ডী টানতে টানতে যাও।

সে যে অনেক বছর লাগবে।

লাগলেই বা। তীর্থের পথে মৃত্যু হলেও তীর্থদর্শনের ফল হয়।

গন্ডী টানতে টানতে এলে, শুধোয় জরা।

হাঁ বাব।

কত বছর লাগলো।

তা তো জানি না, তবে এই জানি যাত্রা করেছিলাম যুবতী বয়সে, এসে পেঁৗছলাম যখন বুড়ি হয়েছি।

দেখা পেলে?

না, বাবা।

বলো কি বুড়িমা। এত কষ্ট স্বীকার করলে তবু দেখা দিলেন না।

দেখা দেবেন কেন? তখনো যে মনটা এসে পেঁৗছয় নি, সেটা পিছনে পড়ে ছিল।

ঠাকুর তো বড় কঠিন।

হতেই হবে, পাথরে গড়া যে, বলে বুড়ি।

কবে দেখা পেলে।

সহজে আর মন্দিরে যাই না, এখানে বসে থাকি।

কেন?

দেখা পাই কি না পাই এই ভয়ে।

তার পরে কিভাবে দর্শন মিলল?

একদিন স্বপ্নে এসে বলে গেলেন, ও বুড়ি তোর জন্যে আর কত দিন বসে থাকবো, এসে আমাকে দর্শন দিয়ে যা!

তুমি দেবে দর্শন! চমকে ওঠে জরা।

সেই কথাই তো শুধিয়েছিলাম, তা তিনি কি বললেন জানো, মা কি চিরকাল ছেলেকে দেখবে, ছেলের কি কখনো ইচ্ছা হয় না মাকে দেখতে। শীগ্‌গীর আয় বুড়ি।

বুড়িমা, মি বড় ভাগ্যবতী। এই বলে হাত বাড়িয়ে তার পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তবে হয়তো আমিও দেখা পাবো।

পাবে বইকি বাবা, কেবল শক্ত হয়ে থাকা চাই। পাথরের দেবতা পাথরকে বড় খাতির করে।

কিন্তু বুড়িমা, আমি যে ঘোর পাপী।

পাপের আবার বেশি কম কি বাবা, ছোট সাপের বিষ কি কিছু কম।

বুড়িমা, আমি যে বাসুদেবের কাছে অপরাধ করেছি।

তবে তো বাবা তোমার ওষুধ এ বদ্যিখানায় নেই।

সে আবার কি রকম বুড়িমা, শুনেছি যিনি বাসুদেব তিনিই বিষ্ণু।

তা বটে, তবে কি জানো সব জল সমান হলেও কুয়োর জলের গুণ নদীর জলে নাই। আমাদের গাঁয়ে একটা কুয়ো ছিল তার জল নয় তো ওষুধ, কত দূরদূরন্ত থেকে লোকে এসে জল পান করে যেতো।

হতাশভাবে জরা বলে, আজ আট-দশ বছর ধরে কত দেশ কত পাহাড় কত গুণী-জ্ঞানীর কাছে ঘুরলাম। শেষে অনেক আশা নিয়ে এলাম এখন বলছ এখানে হবে না।

তা কি করবে বাবা, যে বদ্যিখানায় তোমার ওষুধ আছে সেখানে যেতে হবে তো।

সে কোথায়?

বাসুদেবের কাছে যদি অপরাধ করে থাকো তবে তোমাকে যেতে হবে শ্রীবৃন্দাবনে, সেখানে তিনি লীলাখেলা করে গিয়েছেন কিনা।

সারা রাত বুড়িমার কথা ভাবে জরা। একি আশ্চর্য। এই আট-দশ বছর পাহাড়-পর্বতে কত জ্ঞানী-গুণী যোগী-তপস্বীর দেখা পেয়েছে কেউ সন্ধান দিতে পারে নি পাপীর মুক্তি কি উপায়ে হতে পারে। কেউ সরলভাবে বলেছে জানি না, কেউ বা দুর্বোধ্য শাস্ত্র আউড়েছে, কেবল চার্বাক সরলভাবে জানিয়েছিল সুখের সন্ধান জানে, দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় তার অজ্ঞাত। তাদের তুলনায় এই বুড়ি নিরক্ষর নিতান্ত অজ্ঞ। আর শেষে কিনা তার কাছে একটা পথের ইসারা পাওয়া গেল। বুড়ির কত কথাই না তার মনে পড়ে। বলেছিল, বাবা পূর্ণাবতার ছাড়া কে দূর করবে তোমার দুঃখ। বলেছিল, বাবা, তুমি যদি পূর্ণা-বতারের কাছে অপরাধ করে থাকো তবে এক-মাত্র তিনিই মোচন করতে পারেন তোমার পাপ, যে-সাপে কেটেছে সেই সাপে ওঠাবে তোমার বিষ।

পূর্ণাবতার শব্দটা ইতিপূর্বে শোনে নি জরা। অবতার শব্দটা বাসুদেব প্রসঙ্গে শুনেছে। অর্থ ধরে নিয়েছে দেবতা বা ভগবান, কিন্তু পূর্ণাবতার কি, পূর্ণাবতার আবার কে? বুড়িকে শুধিয়েছিল, সে বলল, পূর্ণাবতার হচ্ছে পূর্ণাবতার, যেমন চাঁদের পূর্ণাবতার পূর্ণিমার চাঁদ। জরা ভাবে ও তো উপমা হল, অর্থ হল না। বুড়ি বলে-ছিল বৃন্দাবনে যেতে সেখানে পূর্ণাবতার লীলা করে গিয়েছেন। বেশ সেখানেই যাবে, দেখা যাক, সেখানকার লোকে বলতে পারে কিনা। আরও ভাবলো পথে যেতে যেতে সাধু সন্ন্যাসীর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করবে পূর্ণাবতার কাকে বলে, একমাত্র তিনিই তো পাপ থেকে মুক্ত করবেন তাকে, কিন্তু তার আগে জানা দরকার পূর্ণাবতার কে?

ভোরবেলা বুড়ির কাছে বিদায় নিয়ে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে, পাহাড় থেকে সমতলে নামলে তবে তো বৃন্দাবনের পথ। চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাঁকা পথ ধরে চলছে তো চলছেই, এবারে তার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট। পথে দেখতে পায় শুধু রাহী লোক, তীর্থযাত্রী আর কাঠুরে। না, এরা পূর্ণাবতারের সন্ধান জানবে কি করে? কয়েক দিন পথ চলবার পরে ভাগীরথীর ধারাকে অনুসরণ করে, দু-দিকে খাড়া পাহাড়, মাঝখানে সঙ্কীর্ণ খাদের ভিতর দিয়ে ঘোর নাদে ছুটেছে ভাগীরথী।

হঠাৎ পাহাড়ের একটা মোড় ঘুরতেই দেখতে পায় নিঃসঙ্গ এক পথিক দ্রুত এগিয়ে আসছে। তার মনে হল আর দশজন লোক থেকে তিনি যেন স্বতন্ত্র। দীর্ঘাকৃতি প্রবীণ পুরুষ, পরণের ধুতির খুঁট গায়ে জড়ানো, হাতে দেহপরিমিত যষ্ঠি, চোখ পথের দিকে নিবদ্ধ, চিবুকে দৃঢ় সঙ্কল্পের ঘোষণা। পথিক আরও কাছে পড়তেই দেখতে পেলো তার পিছনে কালো রঙের একটি শীর্ণ কুকুর। সে কি ঐ সাধুর না পথের কুকুর তাঁর সঙ্গ নিয়েছে। জরার মনে হল এই সাধু কোথায় চলেছেন জানি না, তবে তিনি পূর্ণাবতারের সন্ধান যেন দিলেও দিতে পারেন। সাধু আর একটু কাছে এসে পড়তেই পথরোধ করে জোড়হাতে দাঁড়ালো। সাধু থামলো না, তবে তাঁর চোখে জিজ্ঞাসা।

জরা করুণভাবে শুধালো, বাবা, পূর্ণাবতারের সন্ধান কোথায় পাবো?

সেই সন্ধানেই তো চলেছি বলতে বলতে সাধু এগিয়ে গেল, এক পা-ও থামলো না। জরা পিছন ফিরে দেখল মুহূর্তের মধ্যে তিনি পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, কুকুরটাও। জরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো, এই অসামান্য সাধুও যদি পূর্ণাবতারের সন্ধানে বহির্গত তবে তার মতো পাপীর কি আশা থাকতে পারে। তার ইচ্ছা ছিল অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে সাধুটিকে, কিন্তু সাধু না থামলো এক মুহূর্ত, না তাকালো তার দিকে। এহেন সাধুও যদি জিজ্ঞাসু হয় তবে তার জিজ্ঞাসার উত্তর দেবে কে। কিন্তু বসে থাকলে তো চলবে না, বৃন্দাবনে তাকে পৌঁছতেই হবে--শেষ ভরসা সেখানে বুড়ি বলেছিল।

(১০)

অবশেষে বৃন্দাবনে। সমতল ভূমিতে পদার্পণ করে অবধি জরা একটি স্বস্তির ভাব অনুভব করছিল যেমনটি গত আট-দশ বছর পাহাড়ে পাহাড়ে পায় নি। তার যদি বিশ্লেষণের ক্ষমতা থাকতো তবে বুঝতো যে সমতলবাসীর স্বস্তি সমতলে। সমতলের প্রভাবেই হো আর নাই হোক ব্রজমন্ডলে প্রবেশ করবামাত্র তার সর্বাঙ্গ যেন জুড়িয়ে গেল। যমুনার শীতল জলে স্নান করে একটি গাছের ছায়ার উপবেশন করলো। এমন সময় দেখল একজন ব্রজাঙ্গনা কিছু খাদ্য নিয়ে এসে তার হাতে দিল।

আমাকে কেন বহিন?

মেয়েটি বলল, ব্রজমন্ডলে স্নানান্তে কেউ অভুক্ত থাকে না।

কিন্তু আমাকে তো তুমি চেনো না।

ব্রজমন্ডলে কেউ কারো অচেনা নয়, সকলেই তাঁর সখা, নয় সখী।

কার. শুধায় জরা।

পূর্ণাবতারের।

কার বললে, চমকে শুধায় জ...

পূর্ণাবতারের।

আশামিশ্রিত আর্তস্বরে জরা চীৎকার করে ওঠে, আমি যে তাঁরই সন্ধানে এসেছি।

ব্রজাঙ্গনা পাশে বসে স্নেহের সঙ্গে বলল, এখানে তাঁর সন্ধান করতে হয় না, তিনিই সকলকে সন্ধান করে ফিরছেন।

সন্ধান করে ফিরছেন। কেন?

লীলা করবেন বলে।

জরার মনে পড়ে বুড়িমার কথা, সে তবে তো সত্যই বলেছিল যে বৃন্দাবনে তিনি লীলা করে গিয়েছেন।

জরা বলল, কিন্তু বহিন আমি যে পাপী।

তবে তো তোমাকে আগে খুঁজে বের করবেন।

জরা আবার বলে, আমি যে ঘোর পাপী।

তবে তো তোমার আর বিলম্ব নেই, তাঁর সাক্ষাৎ পেলে বলে।

কোথায় তিনি?

সর্বত্র। এখানকার আকাশে বাতাসে তরুলতায় কান্তারে প্রান্তরে কোথায় নয়?

মন্দিরে?

বেশ. সেখানে দেখতে চাও সেখানেও দেখা দেবেন।

কাকে শুধাবো?

যাকে খুশী, এখানকার পাখীটা অবধি তাঁর নাম উচ্চারণ না করে খাদ্য গ্রহণ করে না।

কি নাম তাঁর?

হাজার নাম, যার যেমন অভিরুচি বলে, আমরা বলি কৃষ্ণ-বাসুদেব।

জরার হাত থেকে খাদ্য স্খলিত হয়ে পড়ে যায়।

ব্রজাঙ্গনা খাদ্য তুলে তার মুখে দেয়। কিন্তু কে তখন খাবে! জরা মূর্ছিত হয়ে পড়ে গিয়েছে।

মূর্ছা ভাঙলে দেখল তার মাথা মেয়েটির কোলের উপরে আর সে পল্লব দিয়ে বীজন করছে। শুধালো, আমি কি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম।

মেয়েটি সস্নেহে তার চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে নাড়ছিল, বলল, এখানে এসেছ এখন জ্ঞান হবে।

কি করে জ্ঞান হবে? আমি যে মূর্খ।

মেয়েটি বলল, তা হলে তো জ্ঞান হতে বাধা নেই।

সে আবার কি রকম?

শাদা পটের উপরেই তো ছবি ফোটে ভালো। যারা জ্ঞানী তাদের মনে যে অনেক আঁক জোঁক, সেখানে ছবি আঁকতে গেলে সব তালগোল পাকিয়ে যায়।

জরা বিস্মিত হয়, শুধায় এসব কথা কে শেখালো তোমাকে?

কেউ নয়, মন শাদা রাখলে কথা আপনি এসে জোটে। ভরা কলসী তো ভরা যায় না, কলসী খালি রাখলেই যেমন ভরে ওঠে।

এসব তো জ্ঞানীর মতো কথা।

মেয়েটি হেসে বলে, তবে তাই।

ঐ হাসি দেখে জরার মন অতীতের মধ্যে ডুব দেয়—মনে পড়ে এ রকম হাসি যেন কোথায় দেখেছে। সে ভাবতে চেষ্টা করে।

কি ভাবছ, শুধায় ব্রজাঙ্গনা।

ভাবছি ঐ রকম হাসি যেন কোথায় দেখেছি।

আবার হেসে মেয়েটি বলে, হাসির কি আবার স্থানকাল আছে?

পাত্রপাত্রী তো থাকতে পারে।

তুমিও তো বেশ কথা বলতে শিখেছ। শেখালো কে?

জরা একটি মাত্র শব্দে উত্তর দেয়—দুঃখ।

দুঃখ হাসির কি জানে?

বলো কি বহিন, দুঃখের শক্তির মধ্যেই তো হাসির মুক্তা জন্মায়।

এত দুঃখ কিসের?

পাপীর আবার দুঃখের অভাব কি? পাপটাই তো দুঃখ।

তবে মনে করো না কেন আমিও পাপী।

তবে তো কৃষ্ণ-বাসুদেব তোমাকে দয়া করেছেন।

পাপমুখে কেমন করে বলি। আবার গম্ভীর হলে কেন?

ঐ হাসিটার ইতিহাস ভাববার চেষ্টা করছি।

সে চেষ্টা না হয় পরে করো। এখন উঠবে কি?

কোথায় যাবো?

তবে কি এই নদীর ধারেই পড়ে থাকবে?

সে কথার উত্তর দেয় না, আনমনা হয়ে বসে থাকে জরা। হঠাৎ তার মনে হয় তা কি সম্ভব! এ হাসি যার মুখে দেখত তাকে তো অনেককাল আগে নিজে সে হত্যা করেছে। তবে? তবে একরকম হাসি কি দুজনে হাসে না? তবু যেন এ হাসিতে সে হাসিতে তফাৎ আছে। সে হাসি ছিল পাথরে মেশানো সোনা, আর এ হচ্ছে নিকষিত হেম। দু-ই সোনা। তখনি মনে পড়ে সংসারে সোনা কি একাধিক খন্ডে থাকতে নেই। চিন্তার সূত্রে কেমন জট পাকিয়ে যায়।

তাকে তদবস্থ দেখে ব্রজাঙ্গনা শুধায়, আমাকে কি চিনতে পারলে না জরা?

চমকে উঠে জরা বলে, জরা! জরা! কে বলল ঐ নাম।

আমি?

তুমি! তুমি কে?

এক সময়ে যার নাম ছিল মদিরা আমি সেই অভাগিনী।

তুমি মদিরা?

এখন আর মদিরা নই, এখন ব্রজাঙ্গনা।

কিছুই যে বুঝতে পারছি না।

তোমার তো চিরকাল ঐ রকম, কিছুতেই কিছু বুঝতে পারো না, অন্ততঃ প্রথমটায়।

স্তম্ভিত জরা বলে, কিন্তু তোমাকে যে আমি স্বহস্তে বধ করেছি।

তাই তো জন্মান্তরে ব্রজাঙ্গনা নাম হয়েছে।

এখন পরিহাস রাখো, সমস্ত খুলে বলো, আমার মাথা কেমন ঘুরছে।

বুঝেছি আমার কোলের উপরে মূর্ছা যাওয়ার সাধ হয়েছে। তা মূর্ছা যাওয়ার দরকার কি, এমনি আমার কোলে মাথা দিয়ে শোও না, আবার বীজন করি। তার চেয়ে চলো আমার সঙ্গে।

কোথায়?

মঠে।

কার মঠ?

ব্রজাঙ্গনাদের।

সেখানে আমাকে ঢুকতে দেবে কেন?

সেখানে ঢুকবে কেন, পাশে আছে ব্রজবালকদের মঠ।

সেখানেই বা আমার স্থান হবে কেন?

কেন হবে না? এখানে সবাই হয় ব্রজাঙ্গনা, নয় ব্রজবালক, সকলেই হয় তার সখা, নয় সখী।

কার?

পূর্ণাবতার কৃষ্ণ-বাসুদেবের।

মদিরা, আমার সমস্ত ইতিহাস তো জানো তবু বলছ সেখানে আমার স্থান হবে।

হাঁ তবু বলছি। নাও এখন ওঠো—বলে তার হাত ধরে টানে।

জরা উঠে দাঁড়ায়, শুধায়, তোমার ইতিহাস কখন বলবে?

সময় হলেই বলবো।

সময় কখন হবে?

যখন অসময় নয়— ঐ যে আমাদের মঠ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এসো আমার পিছু পিছু।

(ক্রমশঃ)

ব্যক্তিমনের শিল্প সমন্বিত প্রকাশে হয় সাহিত্যের সৃষ্টি। আবার ব্যক্তিমন সমাজ-মনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং সাহিত্যের একটা সামাজিক ভিত্তি আছে—এটা অস্বীকার করা যাবে না।

সাহিত্যের প্রকাশমাধ্যম ভাষা। ভাষা শুধু কথা বলার বাহন নয়, একে বলা যেতে পারে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। ভাষা যদি না থাকতো মানব সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা যেত কী?

এ সরল সত্য থেকে ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাহিত্য মানুষের চিন্তা এবং অনুভূতি সঞ্চারিত করে দেবার জন্য শব্দ প্রয়োগের শিল্প ছাড়া কিছু নয়। এই যে একের চিন্তা-অনুভূতি অপর মনে সঞ্চারিত করা একে সামাজিক কর্ম ছাড়া কী বলা যেতে পারে? ভাষা যদি সঞ্চরণ কর্মের মাধ্যম বলে বিবেচিত হয় তাহলে সাহিত্যকে মানব-মনের একটা উঁচু স্তরের অবস্থা বলা যেতে পারে। লেখক নিজেই একটি সামাজিক সত্তা। যতক্ষণ না তিনি সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে না নেন ততক্ষণ তিনি তাঁর সামাজিক স্থিতি বা সম্পর্ককে উপেক্ষা করতে পারেন না। কিংবা যে পর্যন্ত তিনি সে সম্পর্ককে অস্বীকার না করেন সে যাবৎ তিনি সামাজিক জীব। লিখিত শব্দের মর্মবস্তুকে কিংবা তার কার্যকারিতায় তিনি যা গ্রহণ করেন তা সামাজিক সত্য এবং সামাজিক কোন উদ্দেশ্য।

এখানে আমাদের বক্তব্যকে আরো স্পষ্ট করে বলা যায়—সাহিত্য হলো সামাজিক মনেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু সমাজ সরল রেখায় পরিব্যাপ্ত কোন সত্তা নয়, তার গঠন প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল। সমাজের রয়েছে বহুমুখী দিক এবং তার ছাঁচও জটিলতায় ভরা। সে সমাজরূপের সকল দিক ফুটিয়ে তোলা অন্তত আজকের দিনে সম্ভব নয়। শুধু আজকে কেন প্রাগৈতিহাসিক যুগেও সম্ভব হয়নি। একটা প্রচলিত কথা আছে, 'যাহা নাই ভারতে (মহাভারতে) তাহা নাই ভারতে (ভারতবর্ষে)'। কথাটি অতিরঞ্জিত সন্দেহ নেই, যেহেতু এ মহাকাব্যে সমকালীন ভারতবর্ষের নীচু তলার জীবনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। মহাকাব্যে আদি সমাজের পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়নি। আজকের সাহিত্যে সমাজরূপের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া যাবে—এটা আশা করা অবাস্তব, যেহেতু এ কালের সমাজ আরো জটিল হয়েছে। সুতরাং সাহিত্যের অস্তিত্ব সমাজভিত্তিক হলেও সাহিত্যকর্মে সমাজের সীমিত রূপই ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। যে সমাজ লেখকের সামনে প্রত্যক্ষ—সাহিত্যে সাধারণত সে রূপই অংকিত হয়—যদিও সমাজের অজ্ঞাত রূপ থেকে অন্তহীন সমস্যা সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে।

এমন কতগুলি সামাজিক উপাদান আছে লেখক যা উপেক্ষা করতে পারেন না। সে সমস্ত উপাদান থেকে লেখক তাঁর বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন। সে সমস্ত উপাদান লেখকের কল্পনাকে আকর্ষণ করে এবং আত্মপ্রকাশে বাধ্য করে। প্রথমত, লেখকের নিজের সামাজিক স্থিতি। যে সমাজ পরিবেশে তাঁকে বাস করতে হয় সে সমাজের সমস্যাগুলি অনিবার্যভাবে তাঁর মনের ওপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাঁর দৃষ্টি-ভংগী নিয়ন্ত্রিত হয় মুখ্যত তাঁর জন্ম, পরিবেশ, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক সংগ্রামের দ্বারা। অবশ্য তাঁর মনের সত্যিকারের প্রতিক্রিয়া নির্ভরশীল স্পর্শচেতনার ওপর, অর্থাৎ যে সূক্ষ্ম সচেতনতার দ্বারা তিনি প্রতিবেশ প্রভাবে সাড়া দিতে পারেন তার ওপর নির্ভর করে তাঁর সমাজচেতনা। সুতরাং কোন গোষ্ঠীতে যে সমাজশক্তি ক্রিয়া করে তার যথাযথ এবং স্পর্শাতুর সমন্বয়েই হয় সাহিত্যের সৃষ্টি। এ দিকে সার্থকতা অর্জনের ওপরেই বহুলাংশে নির্ভর করে সাহিত্যের মূল্য এবং উৎকর্ষ।

এখানে এসে শিল্পীর সততা সম্পর্কে অতি সূক্ষ্ম প্রশ্নের সম্মুখীন হই আমরা। বুর্জোয়া সমাজে লেখককে অন্যান্য শিল্পীর মত নির্ভর করতে হয় সমাজের একাংশের পৃষ্ঠপোষকতার ওপর—যে সমাজের সঙ্গে তিনি নিজেও সম্পর্কিত। স্বভাবতই সে সমাজ তাঁর ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে তা তাঁর স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে কিংবা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য তাঁকে মতামত সংযত, সংশোধিত বা প্রচ্ছন্ন রাখতে হয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে তাঁকে আশ্রয় নিতে হয় বিভিন্ন রকমের প্রতীকের: নানা উপায়ের মধ্যে এই একটি উপায়ে সমাজ নতুন সাহিত্যিক রূপ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। শিল্পী যদি নিজের ব্যক্তিসত্তাকে কোন গোষ্ঠী, শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেন তাতে শুধু যে তাঁর দৃষ্টিসীমা সংকুচিত, কিংবা সাড়া দেবার সততা বিনষ্ট হয় তা নয়, তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সরলতাও ব্যাহত হতে পারে। উপরিতল বিহারী গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ সাধারণতঃ স্থিতাবস্থার সমর্থক। সমাজের স্থিতাবস্থার প্রতি স্পর্শক্ষম লেখকের কোন সহানুভূতি থাকতে পারে না। যে জীবন-চর্যার প্রতি লেখক সহানুভূতিশীল নন তাকে ধিক্কৃত করতে লেখক ব্যঙ্গ বক্রোক্তি প্রভৃতি তির্যক রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ ধরনের সাহিত্যে তীক্ষ্ণতা খুব বেশী। লেখকের বক্তব্যটাই এখানে প্রাধান্য লাভ করে। অপরপক্ষে অবসরবিলাসী পাঠক শ্রেণীর উদ্দেশে লিখিত সাহিত্যে ভাষা এবং আঙ্গিক—প্রসাধনের প্রয়াস বেশী। এ ধরণের লেখকদের প্রয়াস দেখে মনে হয় বহিরংগচর্চাতেই বুঝি সাহিত্যের চরম এবং পরম সার্থকতা!

অবশ্য সৎলেখকের বেলায় এটা প্রযোজ্য নয়। কোন প্রলোভন বা ক্ষতির সম্ভাবনা সামাজিক সত্য উদ্‌ঘাটনে তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। তিনি জনপ্রিয়তা হারাতে পারেন, অপমানিত হতে পারেন, দারিদ্র্যের মুখে তাঁকে ঠেলে দেওয়া হতে পারে, কিন্তু সত্যজিজ্ঞাসা থেকে কেউ তাঁকে বিচ্যুত করতে পারে না। মহাকবি দান্তের মতই তিনি আপোসহীন, উন্নতশির। প্রয়োজন হলে সৎসাহিত্যিক সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যে কোন পরিণতির সম্মুখীন হতে দ্বিধা করেন না। শিল্পী—জীবনেও বিদ্রোহ আছে, কিন্তু সে বিদ্রোহ এত চড়া নয়। পরোক্ষ উপায়ে শিল্পী সে বিদ্রোহচেতনাকে ফুটিয়ে তোলেন তাঁর শিল্পকর্মে—যেমন, সেক্সপীয়র করেছেন তাঁর Richard II -এ, কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ'-এ দীনবন্ধু 'নীলদর্পন'-এ শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী'তে। এর কারণ, যে সমাজে শিল্পী বাস করেন সে সমাজের অনিবার্য প্রভাবে গড়ে ওঠে তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তু এবং রূপাঙ্গিক।

অনেক দেশের সরকারকে সাহিত্যকর্মের পৃষ্ঠপোষকতা, নিয়ন্ত্রণ এবং দেখাশোনা করতে দেখা যায়। একে সাহিত্যের সামাজিক মূল্যের স্বীকৃতি ছাড়া আর কী বলা যায়? বিদ্রোহসচেতন সাহিত্যের প্রতি সরকার সব সময় সন্দিগ্ধ। সাহিত্যে স্থিতাবস্থার

সমর্থকদের প্রতি সরকারের যেমন সমর্থন এবং পৃষ্ঠপোষকতা বর্ষিত হয়, তেমনি সাহিত্যে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশিত স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে বিরূপ প্রবণতার প্রতি সরকারের অসন্তুষ্টি সুবিদিত। লিখিত শব্দের শক্তির ভয়ে এভাবে সেন্সারশিপ বা সরকারী পরীক্ষা-পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের হাতে এরূপ পরীক্ষা-পদ্ধতি সমাজ প্রগতির ক্ষতিকারক হতে পারে। এ পরীক্ষা-পদ্ধতি যদি খুব কড়া এবং কল্পনাহীন হয় তা মহৎ শিল্পের সর্বনাশের কারণ হতে পারে।

এর থেকে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে সাহিত্য কী তবে সামাজিক দলিলের শ্রেণীভুক্ত?

এমন কোন লেখকের অস্তিত্ব দেখা যায় না যিনি সমাজতত্ত্ববিদের সমীক্ষার উপকরণ যোগাবার জন্য শব্দজাল সৃষ্টি করেন। এটা যদি সত্য হয় তবে এটাও সমানভাবে সত্য যে, সমাজের সোচ্চার মুখপাত্র হিসেবে সাহিত্য সামাজিক দলিলে পরিণত হয়। পাঠকমনের ওপর এ ধরণের সমাজ সচেতন সাহিত্যের প্রভাব অপরিমেয়।

এ পর্যায়ের লেখকের সামাজিক রীতি-নীতি বর্ণনা, তাঁর অংকিত নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনার চিত্র, তাঁর যুগ এবং পরিবেশের বিশ্লেষণ মুখ্য বা গৌণভাবে সমাজতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার সঙ্গে জড়িত। তাঁর মনোভঙ্গী যাই হোক না কেন এ সত্য অপরিবর্তিত থেকে যায়। ব্যক্তিচরিত্রের বিচ্যুতি এবং অস্বাভাবিকতার অনুসন্ধানে সাহিত্য সব সময় মূল্যবান ইঙ্গিত দিয়ে আসছে। এছাড়া সামাজিক আচরণে স্বচ্ছন্দ এবং অসংগতি অথবা যে সমস্ত ভাবরূপ সমাজ জীবনকে সুনির্দিষ্ট কোন প্রগতির দিকে চালিত করে—তার পরিচয়ও সাহিত্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লেখক শব্দ, বাগ্‌ভঙ্গী বা ভাষা ব্যবহারের সাহায্যে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে চমৎকার ফুটিয়ে তোলেন। এলিজাবেথীয় যুগে নাটকের বিকাশ, রোমান্টিক যুগের কবিচেতনার উন্মেষ, ভিক্টোরীয় যুগের উপন্যাসের সম্প্রসারণ শুধুমাত্র স্বযুগে শিকড় বিস্তার করেনি,—তাদের ওপর প্রতিবিম্বিত হয়েছে সামাজিক প্রবণতার মূল্যবান ইঙ্গিত এবং যে সামাজিক পরিবেশে তাদের সৃষ্টি হয়েছে তারও আভাস।

মোটের ওপর এ মন্তব্য বোধহয় সঙ্গত যে সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নিবিড় এবং সমাজ-বাস্তবকে উপেক্ষা করে সাহিত্য-সৃষ্টি অকল্পনীয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের ফরাসী কবিদের কাব্য মতবাদে ছিল আবেগহীন নিরপেক্ষতা। তথাপি সে মতবাদ যে যুগের সৃষ্টি সে যুগকে বাদ দিলে তার মর্মলোকে প্রবেশ করা যায় না; সে মতবাদে প্রতিফলিত হয়েছে সামাজিক দায়িত্বের নান্দনিক অস্বীকৃতি। তাঁদের ধারণা হয়েছিল এ রকম দায়িত্ব নেবার তাঁরা উপযুক্ত নন কিংবা শুধুমাত্র মানুষের ক্ষেত্র ছাড়া তাঁদের দায়িত্ব অন্যত্রও আছে। সমাজ-চেতনাহীন তাঁদের এ দৃষ্টিভঙ্গী যে লৌকিক স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি তার প্রমাণ নন্দনতত্ত্ববিদ এবং উনবিংশ শতকের শেষার্ধের ফরাসী কবিগোষ্ঠী নিষ্ঠাবান স্টাইল সম্পন্ন ও সূক্ষ্ম শিল্পচেতনার অধিকারী হলেও আজ শুধুমাত্র কৌতূহলের সামগ্রী বলে বিবেচিত। অপরপক্ষে, আমরা বারে বারে সর্ব যুগের মহৎ শিল্পীদের শরণাপন্ন হই, কেননা তাঁদের সৃষ্টি জীবন-বিচ্ছিন্ন নয়, সামাজিক সত্যকে তাঁরা উপেক্ষা করেন নি। বরং সুগভীর অন্তরাবেশ এবং আন্তরিক প্রত্যয়ের সাহায্যে তাঁরা সে সামাজিক সত্যের সম্মুখীন হয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যেও এ সত্যের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা যায়। উদ্ভবের আটশো বৎসর পরে উনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলা সাহিত্য সর্বপ্রথম মূল্যসমৃদ্ধি অর্জন করতে থাকে, যেহেতু এ শতাব্দীতেই লেখকের সচেতন সমাজ-জিজ্ঞাসা সর্বপ্রথম সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। তথাপি এ শতাব্দীর লেখক মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের প্রভাব এবং রোমান্টিক সৌন্দর্যস্বপ্ন মুক্ত হতে পারেন নি বলে সমাজের অতি-বাস্তব রূপ এ যুগের সাহিত্যে আশানুরূপ প্রতিফলিত হয়নি। বিংশ শতাব্দীর দুটি মহাযুদ্ধের বিভীষিকা এবং যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনাদ্বন্দ্ব শিল্পীর চেতনাকে সমাজজীবনের নগ্ন বাস্তবের মুখোমুখী করায় সাহিত্যের রূপই পাল্টে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-রুচিও। এযুগের পাঠক প্রথমেই খোঁজেন সাহিত্যে সমাজজীবনের বাস্তব সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছে কী পরিমাণে, তারপর সে সমস্যানির্ভর সৃষ্টি রসসংবেদনা লাভ করেছে কিনা। এ'দুটি সর্ত পূর্ণ না হলে তাঁরা রচনাকে সৃষ্টির মর্যাদা দিতে চান না। লেখকের এ চাহিদা মেটাতে গিয়ে আধুনিক লেখকের দায়িত্ব এবং প্রয়াসও অনেক বেড়ে গেছে। ইদানীংকালে সৃষ্টি মানে নিছক কল্পনার বিদ্যুদ্দীপ্তি নয়, তীক্ষ্ণ সমাজ-সচেতন মনের মননশীল শিল্পরূপ। শিল্প-চেতনার সঙ্গে গভীর সমাজচিন্তা যুক্ত না হলে সাম্প্রতিক কালে কোন সৃষ্টিই আর বিচারশীল পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারছে না। বাংলা সাহিত্যে মন ভোলাবার পালা শেষ হয়ে সমাজ জিজ্ঞাসার যুগ শুরু হয়েছে—এটা শুভ লক্ষণ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অরুণ তাকে লিফট্ দিতে চাইল কিন্তু সীমা একটা ট্যাক্সি নিয়ে তার ফ্ল্যাটে যখন পৌঁছল তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছে। সিঁড়ির পাশে হঠাৎ সোম্য দত্তকে দেখে অবাক হয়ে গেল সে। পাশ কাটিয়ে ওপরে যাবার মুখে সোম্য দত্ত একেবারে তার পিছনে এসে দাঁড়াল।

শ্যামলী, তোমার জন্যে আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি। সোম্য দত্তর পা টলছে।

আপনি এখানে কেন?

স্রেফ তোমার জন্যে, বিশ্বাস কর।

বেরিয়ে যান, তা না হলে দারোয়ান ডাকব আমি।

হেসে উঠল সোম্য সীমার কথা শুনে।

দারোয়ানকে আমি একটু কাজে পাঠিয়েছি—আসতে অনেক দেরী হবে তার—। সৌম্যের মুখে কুটিল হাসি। অনেক ভদ্রলোক এ বাড়ীতে আছেন, আমি চীৎকার করে ডাকব তাঁদের।

তাতে আমার অসুবিধে নেই। তাদের সামনে আমি সব বলতে পারব। সাক্ষী থাকবে, তারা। কোমরে হাত দিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইল সোম্য।

কি বলবেন? রাগে সর্বাঙ্গ কাঁপছে সীমার।

বলব, তুমিও যা আমিও তাই; বুঝলে না? এত খুব সহজ ব্যাপার; পুলিশের নজর দুজনের উপরেই সমান। ওরা ভারি ভালবাসে আমাদের। সত্যি বলতে কি তুমি আর আমি একই পথের পথিক।

বেরিয়ে যান—চাপাগলায় আবার বলে উঠল সীমা। উত্তেজনায় স্বরটা কেঁপে উঠল তার।

যাব, তবে সবকথা বলে তারপর। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সোম্য।

কি কথা? সীমার মুখটা ভয়ে পাংশু হয়ে গিয়েছে।

আমিও যা তুমিও তাই—। একটা বিশ্রী মুখভংগী করল সোম্য। লোক দেখলেই চেনা যায়—এক গোত্রের লোক—বুঝতে দেরী হয় না। আমি সোনা নিয়ে হাত বদল করি তুমি অন্যকিছু।

অন্য কিছু মানে?

সেইটাই ত বুঝতে পারছি না এখনও—, তবে ও ধরে ফেলব। কি কোম্পানীটা যেন—ক্রুস অ্যান্ড ক্যারাওয়ে—বাবা, দাঁত ভেঙে যায় উচ্চারণ করতে। তাছাড়া এই বয়সে একলা ফ্ল্যাটে থাকার মানে আমরা বুঝি। সোম্য দত্ত এগিয়ে এল তার কাছাকাছি। চকিতে পাশ কাটিয়ে ক্ষিপ্রপদে ওপরে উঠে গেল সীমা। অ্যাপার্টমেন্টের দরজাটা কোন রকমে খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল সীমা, তারপর দরজাটা বন্ধ করে বিছানায় বসে পড়ল।

তার চিন্তা করার শক্তি পর্যন্ত নেই বলে বুঝতে পারল সীমা। অসীম ক্লান্তি আর উত্তেজনায় তার দেহবুদ্ধি পর্যন্ত লোপ পাচ্ছে বলে মনে হ'ল। এই রকম অবস্থায় লোক অজ্ঞান হয়ে যায় নিশ্চয়। মনে জোর আনল সীমা, তার পক্ষে এ বিলাসিতা শোভা পায় না। জগ থেকে এক গ্লাস জল খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল সে। এতক্ষণ দারুণ তৃষ্ণায় তার আকণ্ঠ শুকিয়ে গিয়েছিল। সেটা বোঝার মত অনুভূতিও ছিল না তার। চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল সীমা। তার দেহের মধ্যে যেন একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ বয়ে চলেছে। অনুভূতিটা স্পষ্ট কিন্তু অবর্ণনীয়। তার বুকের মধ্যে যেন ঝড় উঠেছে। হৃৎপিণ্ডের শব্দটা বুকের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে প্রচণ্ড বেগে। এ ধরনের অবাঞ্ছিত অবস্থায় সে এর আগে পড়েনি। অনেক রকম বিরুদ্ধ অবস্থার সামনে সে এসেছে। কিন্তু সোম্য দত্ত যে অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে সেটা তার কল্পনাতীত। দুঃখে ক্ষোভে, নিষ্ফল আক্রোশে সে মুহ্যমান হয়ে পড়ল।

খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রেখেছে নানুকাকা। মা নানুকাকা তার সামনে দাঁড়িয়ে। না, সে কাঁদবে না ওদের সামনে। বাবা তাকে বলে দিয়েছে কেউ পীড়ন করলে কাঁদতে নেই তাতে অপরপক্ষ আরও মজা আর আনন্দ পায়।

কোথায় রেখেছিস্ আমার মনিব্যাগ? নানুকাকা তার কান ধরে টান দিল একটা।

কিরে, কথা বলছিস না যে? মা একটা চড় মারলো গালে সজোরে।

না, তবুও কাঁদবে না সীমা। ওরা মেরে ফেললেও কাঁদবে না। ব্যাগে সতের টাকা ছিল, সেটা কিছু নয় কিন্তু একটা জরুরী কাগজ ছিল আমার। শোকে অস্থির হল নানুকাকা।

ব্যাগটা সেই নিয়েছে। নানুকাকা চান করতে যাবার সময় বালিশের তলায় রেখে-ছিল, সেটা সীমা দেখেছে। ব্যাগটা নিয়ে সে স্কুলে চলে গিয়েছিল। ব্যাগটা রাস্তায় ফেলে দিয়ে সতেরটা টাকা জমা রেখেছে রেখার কাছে। রেখা স্কুলের বোর্ডিংয়ে থাকে। সীমা টাকাটা কোথা থেকে পেয়েছে তা জিজ্ঞেসও করেনি রেখা। রেখা বোর্ডারদের পেন, ঘড়ি সরিয়েছে কয়েকবার। ধরতে পারেনি কেউ। কিভাবে জিনিস সরাতে হয় আর জেরায় পড়লে ভাল মানুষের মত কি রকম মুখ করতে হয় সেটা সে সীমাকে শিখিয়েছিল। এই গল্পগুলো শুনতে সীমার খুব ভাল লাগত। অতগুলো মেয়ে বা টিচার কিছুই করতে পারত না রেখার। আশ্চর্য লাগত সীমার। রেখার শক্তি আর সাহস দেখে মুগ্ধ হত সে।

কি হ'ল, জবাব দিচ্ছিস না যে; ছিঃ ছিঃ চোর হলি তুই শেষে। নানুকাকা লজ্জা দিতে চায় তাকে।

হবে না, কেমন বাপের মেয়ে—। ফোড়ন দিল মা।

থাক তাহলে এইখানে। আজ তোর খাওয়া বন্ধ। দরজা বন্ধ করে নানুকাকা আর মা চলে গেল।

অন্ধকার, শুধু অন্ধকার। কিছু দেখা যায় ন। কে, নানুকাকা? না, এত সৌম্য দত্ত। আমায় খুলে দিন। অনুনয় করল সীমা। খুলে দেব? আরও জোরে বাঁধব যাতে গায়ের মাংস কেটে যায় তোমার। সৌম্য দত্ত হাসছে, ভারি আমোদ পেয়েছে সে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে আরও একজনকে দেখতে পেল সীমা। মূর্তিটা এগিয়ে এল কাছে—অরুণ বসু কোথা থেকে এল! আমাকে বাঁচান, আমায় মেরে ফেলবে এরা, বলল সীমা। অরুণ বসুর হাতে একটা চেন বাঁধা কুকুর। সেটা এগিয়ে দিল অরুণ, বলল—এই তোমায় বাঁচাবে। বক্সার এসেছে আর সীমার ভয় নেই। বক্সার, বক্সার, নিজের চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল সীমার।

বিছানায় উঠে বসল সে। অদ্ভুত স্বপ্ন। কোথায় নানুকাকা আর কোথায় অরুণ বসু, সৌম্য দত্ত। সৌম্য দত্তর কথা মনে পড়তে তার শরীরের মাংসপেশী আর স্নায়ু শক্ত হয়ে উঠল। বিছানা ছেড়ে উঠে সে সামনের জানলাটা খুলে দাঁড়াল তার সামনে। বুকের মধ্যে তার এখনও তাণ্ডব চলছে নানা ছন্দে। জগ থেকে এক গ্লাস জল নিতে গিয়ে হঠাৎ একটা জিনিসের ওপর নজর পড়ল তার। একটা সুদৃশ্য লাল রংয়ের বাক্স। সেটা খুলে সীমা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তাতে উজ্জ্বল চুনী পান্নার ব্রোচ রয়েছে একটা। তার অজান্তে এটা কিভাবে এসেছে তাই ভাবল সে। যখন সে বাথরুমে তখন ঝাড়ুদার মারফৎ সৌম্য দত্ত এটা পাঠিয়ে থাকবে। সৌম্য দত্ত সকলকেই হাত করেছে বলে বুঝল সীমা। দরোয়ান, ঝাড়ুদার, এমন কি অন্যান্য টেনেণ্টরাও হয়ত তার করতল-গত। সৌম্য দত্ত ধনী। পল্লীতে তার যে কারণেই হোক জনপ্রিয়তা আছে। তার বিরুদ্ধে একলা সীমা কি করতে পারে। অসহায়ভাবে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে।

সৌম্য দত্ত কি চায় তা সে জানে। কিন্তু জীবনে সে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করে নারী-পুরুষের সম্পর্ক। সৌম্য দত্তর শিকার হতে সে রাজী নয়। তার চেয়ে পুলিশ অনেক ভাল। সেখানে আর যাই হোক এ ধরনের নোংরামি নেই। সেই নিয়ে আর একজনের কথাও মনে পড়ল সীমার। অরুণ বসুকে এ সমস্যার কথা বললে কেমন হয়। অরুণ বসু নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করবে বলে তার ধারণা হ'ল। আর কিছু না হোক অরুণ বসু ভদ্র। তাকে এভাবে অপমানিত হতে দেখে সে নিশ্চয়ই চুপ করে থাকবে না। কিন্তু কি বলবে অরুণ বসুকে? একজন লোক তার পিছু নিয়েছে তাকে অপমান করছে তার জবাবে সে যদি বলে পুলিশের শরণাপন্ন হতে তাহ'লে? আর অরুণ বসুই বা তাকে সাহায্য করবে কেন? তাতে তার স্বার্থ কি? স্বার্থ ছাড়া মানুষ এক পাও চলে না বলে সে জানে। তাছাড়া কোলারিজ বা মোদি কোম্পানীর টাকা সরানোর ব্যাপারে অরুণের নজর তার ওপর আছে কিনা, তাই বা সে জানবে কি করে? এতখানি ঝুঁকি নিয়ে অফিসের টাকা পাচার করতে যে পারে তার আবার এ ধরনের সামান্য অপমানে কি ক্ষতি হয়। অরুণ বসু তাকে যদি সরাসরি এ প্রশ্ন করে তাহ'লে সে কি জবাব দেবে। স্বাধীন দেশে তার মত সাবালিকা আধুনিকার আমায় অপমান করেছে বলে কাঁদুনি গাওয়ার কি কোন যুক্তি আছে? রাত্রের অন্ধকারে নানা চিন্তা এসে ভিড় করল তার মাথায়। সাধারণতঃ সীমা চিন্তা করতে ভালবাসে না। যখন যেমন অবস্থায় পড়ে, নিজের বুদ্ধি আর কৌশল দিয়ে এড়িয়ে যেতে অভ্যস্ত সে। এটাই তার বৈশিষ্ট্য। সৌম্য দত্তর মত অনেক লোকই তার পিছু নিয়েছে, এটা তার নতুন অভিজ্ঞতা নয়। কিন্তু সৌম্য দত্তর সাহস আর ক্ষমতা অনেক বেশী বলেই মনে হচ্ছে তার। সব থেকে তার বিপদ সে প্রয়োজনে পুলিশের আশ্রয় চাইতে পারবে না। সভ্য জগতের একটা মূল্যবান রক্ষাকবচ থেকে বঞ্চিত।

সেদিন অফিসে অরুণ বসুকে কিছু বলার আগেই চিঠি ডিকটেট করতে করতে অরুণ বসু বলল,

আজ শনিবার, এক জায়গায় যাচ্ছি, সঙ্গে যাবেন?

কোথায়? জিজ্ঞাসা করল সীমা।

শহর থেকে দূরে, একেবারে পল্লীগ্রামে জায়গাটা ভাল লাগবে আপনার।

যাব। উত্তর দিল সীমা।

ছুটির পর সে কি করবে তা ভাবছিল এতক্ষণ। সৌম্য দত্ত তার অফিসের ঠিকানা জানে। সুতরাং কোথায় যে সে তার জন্যে ওত পেতে থাকবে তা সে জানে না। অরুণ বসুর সঙ্গে গেলে এ দুর্ভাবনার হাত থেকে অন্ততঃ রেহাই পাবে সে।

শহরের সীমানা ছাড়িয়ে অরুণ বসুর গাড়ী চলল শহরতলীর মধ্য দিয়ে। এতক্ষণে একটু সবুজের নিশানা দেখা গেল। গায়ে গায়ে বাড়ীগুলো এবার একটু জায়গা ছেড়ে দিল নিজেদের মধ্যে। রাস্তার ভিড়ও অনেক পাতলা হয়ে এসেছে। সীমা তাকিয়ে দেখতে লাগল চারিদিকে।

বাড়ীতে আপনার কে আছে? হঠাৎ প্রশ্ন করল অরুণ।

কেউ নেই—। অনেকক্ষণ বাদে উত্তর দিল সীমা।

আপনাকে কেমন যেন শুকনো লাগছে আজ।

হ্যাঁ, শরীরটা তেমন ভাল নেই। রাত জাগরণের কারণটা বলতে দ্বিধা হল সীমার।

জোরে গাড়ী চালালে অসুবিধে হবে আপনার? অরুণ চেয়ে দেখল সীমার দিকে।

না। ছোট করে উত্তর দিল সীমা।

আমরা কোথায় যাচ্ছি জানেন?

কোথায়? একটা অজানা ভয়ে সীমার চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল।

আপনি খুব অল্পে ভয় পান, না? হাসিমুখে প্রশ্ন করল অরুণ।

কই না ত। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল সীমার।

আমরা যাচ্ছি একটা গ্রামে। গ্রামে কখনও গেছেন?

না।

আমি প্রত্যেক শনিবার চলে যাই বাবার কাছে।

বাবা।

হ্যাঁ। বাবা গ্রামেই থাকেন। ছোট তিনটে ঘর, দুটো গরু আর হারুকাকা এই নিয়েই আমাদের সংসার।

আপনি—?

আমি অবশ্য কলকাতায় থাকি। না থেকে উপায় নেই। বাবা কিন্তু কলকাতায় কিছুতেই থাকবেন না।

কেন?

হাঁপানির জন্যে।

কি বললেন, সীমার স্বরে উৎকন্ঠা।

বাবার হাঁপানি আছে। ধোঁয়া আর

ধুলোতে—

খক-খক—কাশি কাশি। বাবা কি হয়েছে? ভরকম করছ কেন? বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি এখুনি কমে যাবে। এটা কি বাবা, মাদুলি? হাঁপানি সেরে যায়? আমি চা করে আনছি মা। বকলেই বা? তুমি চুপ করে আনছি। মা বকলেই বা? তুমি চুপ করে শোও। মালিশ করে দেব সেই তেলটা দিয়ে—খক খক, খুক খুক কাশি, কাশি হাঁপ, হাঁপানি...

কি বলছেন? অরুণের কথা শুনতে পায়নি সীমা।

পুকুর দেখছেন? জিজ্ঞাসা করল অরুণ।

হ্যাঁ।

আমাদেরও একটা আছে। হারুকাকা প্রায়ই মাছ ধরে। আমিও চেষ্টা করি মাঝে মাঝে। হাসল অরুণ।

অন্ধকার হয়ে কালো মেঘ উঠল পশ্চিম দিকে। কালবৈশাখীর সময়। অরুণ আরও জোরে গাড়ী চালাল।

বা, কি সুন্দর দেখুন। মেঘের দিকে তাকিয়ে বলল অরুণ, আরও পাঁচ মাইল। ঝড়ের আগে পৌঁছতে পারব কিনা জানি না।

পৌঁছন গেল না। তার আগেই কালো-মেঘটা জটা নেড়ে ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যুৎবেগে। সংগে সংগে ঝড় উঠল। মাঠের ধুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে শূন্যে উঠতে লাগল হু-হু করে। এপাশ ওপাশ, সামনে পিছনে, তারা অরুণের গাড়ীটা ঘিরে ধরল চতুর্দিক থেকে। গাড়ী দাঁড় করাল অরুণ। এ ধুলোতে আর অন্ধকারে এক পাও চলা সম্ভব নয়। এবার এল বৃষ্টি। বড় বড় ফোঁটা চড়বড় করে গাড়ীর ওপর পড়তে লাগল মুষল ধারে।

মুস্কিল হল, আপনাকে অসুবিধেয় ফেললাম। বলল অরুণ।

না, আমার ভাল লাগছে, কেমন হাসি-গুলো ছুটেছে দেখুন। সীমার মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। ছোট ছোট চুলগুলো এলো-মেলো হয়ে গিয়েছে।

এবার বেশ জোরে জল এল, তার সংগে মেঘের গর্জন। দুটো হাত কানে চাপা দিল সীমা। কড় কড়—কড়াৎ একটা বাজ পড়ল। হাতের রুমালটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে সীমা। মুখটা তার পাংশু হয়ে গিয়েছে সংগে সংগে।

কি হল, ভয় পেয়েছেন? ফাঁকা জায়গায় আওয়াজ বেশী হয়। কোন ভয় নেই। আশ্বাস দিল অরুণ।

বৃষ্টির বেগ বেড়ে চলেছে। পাশের নালা দিয়ে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড বেগে। মুখ থেকে রুমালটা নামাল সীমা। একদৃষ্টিতে দেখতে লাগল জলের খেলা। মেঘের শব্দ হচ্ছে আবার। হঠাৎ একটা তাম্রাভ আলো যেন গাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। কড় কড়—কড়াৎ, এবার আরও কাছে। সিটের ওপর কুঁকড়ে গেল সীমা। হেলান দেবার জায়গাটায় মুখ গুঁজে কাঁপছে সে। তার পিঠের ওপর হাত রাখল অরুণ।

...ক্যাঁচ ক্যাঁচ—, ওটা কি বাবা, ভাঙ্গা জানালা? বন্ধ করে দাও, আমার ভয় করছে। আমার গায়ে হাত দিয়ে থাক বাবা। ক্যাঁচ ক্যাঁচ, কড় কড়—কড়াৎ।

ভয় কি, আমি ত রয়েছি, কিছু হবে না, বলল অরুণ, চলুন এবার আস্তে আস্তে যাওয়া যাক।

কয়েকবার চেষ্টার পর গাড়ীটা স্টার্ট করল সে, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল। মাইল তিনেক যাবার পর বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। পাশের কাঁচ নামিয়ে দেওয়াতে ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া ঢুকল গাড়ীর মধ্যে।

মেঘটা পাতলা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে দিগন্তের বাইরে। আলো ফুটেছে এবার। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব চারিপাশে। স্নিগ্ধ, শান্ত পরিবেশ। সীমা এতক্ষণে সামলে উঠেছে কিছুটা। মনটা তার অতীতের অতল গহ্বর থেকে বাস্তবে নেমেছে। আশপাশের মনোরম দৃশ্যের দিকে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে দেখছে সে আবিষ্টের মত।

এবার বলুন, মেঘের ডাকে অত ভয় কেন? জিজ্ঞাসা করল অরুণ।

ছোটবেলা থেকেই ভয় পাই, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাসল সীমা।

আপনার কিছুতে ভয় হয় বলে আমার মনে হোত না।

ওখানে অত ভিড় কেন?

কথাটা পালটে দিল সীমা।

আজ হাট ছিল, উত্তর দিল অরুণ, এবার আমরা এসে পড়েছি, এখন হারু-কাকাকে পেলে হয়।

কেন?

হাটে এসে থাকলে ভিড়ের মধ্যে গাড়ীটা হয়ত দেখতেই পাবে না। ওই যে বড় অশত্থ গাছটা দেখছেন ওর পাশ দিয়ে আমাদের বাড়ী যেতে হয়।

এবার সীমা সতর্ক হল। এতক্ষণ নিজের মনের দিকে সে তাকাতে পারেনি। পল্লীর আবহাওয়া তাকে বন্ধনহীন স্বাধীনতার স্বাদ দিয়েছিল। গাড়ী গিয়ে একটা খোলা জায়গা পার হতেই একটা ছোট বাড়ী নজরে পড়ল। হারুকাকা দাঁড়িয়েই ছিল তাদের অপেক্ষায়। বেঁটে ছোটখাটো মানুষটি।

হারুকাকা তুমি হাটে যাওনি? জিজ্ঞাসা করল অরুণ।

সকালেই সেরে রেখেছি, বলল হারুকাকা, গাড়ী ঝড়ে আটকে গিয়েছিল?

হ্যাঁ, তাই ত দেরী হল। এঁরই আসার কথা ছিল আজ।

আসুন দিদিমণি, বাবুর আবার আজ হাঁপটা বেড়েছে তাই শুয়ে আছেন।

চলুন ওঁর সঙ্গে দেখা করি আগে। সীমা অরুণের বাবাকে দেখতে ব্যগ্র হল। হারুকাকা ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে ততক্ষণ।

মিস সেন, যদি অনুমতি দেন তবে একটা অন্যায় অনুরোধ করি।

সীমা দাঁড়াল অরুণের দিকে তাকিয়ে।

বাবার সামনে আপনাকে আপনি বলে সম্বোধন করব না।

বেশ। অরুণের কথাটা বোধগম্য হল না তার।

একটা বিছানায় অসিতবাবু শুয়ে আছেন। ওদের দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠে বসতে গেলেন তিনি। সীমা তাড়াতাড়ি বিছানার ওপর বসল। সেই শীর্ণ চেহারা, গাল দুটো বসা। সেই অস্ফুট শব্দ যা চাপতে চেষ্টা করলেও অব্যক্ত আর্তনাদের মত বেরিয়ে আসে বার বার। অসিতবাবুর বুকে হাত বোলাতে লাগল সীমা ধীরে ধীরে।

বাবা, এই শ্যামলী। বলল অরুণ।

তুমি না বললেও আমি বুঝেছি। বললেন অসিতবাবু। তারপর অরুণের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ঝড়ে পড়েছিলে বোধহয়। যাও কাপড়-জামা বদলে নাও।

অরুণ দ্বিরুক্তি না করে চলে গেল।

তোমার মুখটা একটু দেখি। অসিতবাবু দুহাতের তালু সীমার গালে দিয়ে কাছে টেনে আনলেন। একটু রুক্ষ, শুষ্ক অথচ উত্তাপ রয়েছে তাঁর স্পর্শে। এই স্পর্শ সীমার অপরিচিত নয়। বুকে হাত বোলাতে বোলাতে মাদুলির খোঁজও পেল সে। মনের মধ্যে তার একটা ঝড় উঠেছে বলে বুঝতে পারল সীমা। কালবৈশাখীর মত রুদ্ররূপ তাতে নেই বটে তবে প্রচণ্ড বেগ রয়েছে তাতে। নতুন অনুভূতির আলোড়নে তার সত্তা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বলে অনুভব করল সে। না, তার সত্তাকে সে হারাবে না। জোর করে তার মনকে [illegible] চেষ্টা করছে সীমা। ভাবছে [illegible]? মরেছেছে নিশ্চয়—

সৌম্য দত্ত তাকে অপমান করছে সকলের সামনে।—পুলিশ এসেছে তাকে ধরতে—তার জেল হবে—সে একটা জঘন্য চোর! রাস্তায় কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। রাস্তার লোকে তাকে নির্মম ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছে। মানুকাকা আর মেয়েরা না—ক্যাঁচ, ক্যাঁচ—ভাঙ্গা জানলাটার শব্দ হচ্ছে বার বার।

মা তুমি এতদিন আসনি কেন? জিজ্ঞাসা করলেন অসিতবাবু। না পারল না সীমা। অর্থকিছু মনে করেও অসিতবাবু আর হাঁপানির শব্দ তাকে নিজের দিকে যেতে দিচ্ছে না।

সময় হয়নি এতদিন। আস্তে বলল সীমা।

অনেকদিন বাদে আমার বুকে হাত বুলিয়ে দিলে তুমি।

এতদিন কেউ দেয়নি। অবশ্য আর কেউ নেই তো দেবে কে? নিজেই জবাব দিলেন অসিতবাবু।

চা খাবেন? জিজ্ঞাসা করল সীমা। তার বাবাও টানের সময় চা চাইতেন বলে মনে আছে তার।

ঠিক বলেছ মা, একটু চা পেলে ভাল হোত। হারু বাতে ভুগছে, ওরই বা দোষ কি?

আমি করে আনছি। সীমা উঠে পড়ল। তারপর দালান পেরিয়ে উঠানে হারুকাকাকে দেখে বলল— কাকা, রান্নাঘরটা কোথায়?

এই যে দিদিমণি, এইদিকে। কিন্তু তুমি ওখানে যাবে কেন? ব্যস্ত হয়ে পড়ল হারু-কাকা।

আমি চা করব।

কেন দিদিমণি, আমি করে দিচ্ছি।

না, আমিই করি, রান্নাঘরে ঢুকল সীমা।

অরুণ দালানে উঠল। গায়ে তার একটা তোয়ালে জড়ানো, মাথাটা ভিজে। রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে সে বলল—কি করছ?

চা, তুমি খাবে? সীমাও অভিনয় করতে পারে।

নিশ্চয়, তার সঙ্গে যদি সম্ভব হয়—আরও কিছু।

সে আছে, দিদিমণি তুমি শুধু চাটা করে নাও। মাঝ থেকে বলল হারুকাকা।

শ্যামলী, তোমার মাথায় ধুলো ভর্তি, চান করবে না? জিজ্ঞাসা করল অরুণ।

করব, আগে চা দিই তারপর। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাসল সীমা।

অসিতবাবুকে চা খাইয়ে ও নিজেরা খেয়ে সে বাথরুমে ঢুকল। টিউবওয়েল, বালতিভরা জল, সাবান, তোয়ালে, আর একটা অরুণের ধুতি। এবার বিপদে পড়ল সীমা। মরে গেলেও সে অরুণের জিনিস ব্যবহার করতে পারবে না। মুখ হাত পরিষ্কার করে নিয়ে অসিতবাবুর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল সীমা। ঘরের জানালার কাছাকাছি যেতে তার নামটা শুনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

তুমি আর দেরী কোরো না অরুণ, মাকে আমার পছন্দ হয়েছে। অসিতবাবুর গলা।

আর কিছুদিন যাক বাবা, আপনি একটু সুস্থ হোন আগে—বলল অরুণ।

আমি যথেষ্ট সুস্থ আছি। বিয়ের যা কিছু ব্যবস্থা আমিই করব, তুমি ত নিজের বিয়ের ব্যবস্থা নিজে করবে না।

না তা করব না। তাহলে এবার—কলকাতায় আপনাকে থাকতে হবে কিছুদিন।

কথাগুলো শুনে সীমা যেন পাথর হয়ে গেল। অরুণবাবুর সঙ্গে তার বিয়ে! না, এ হতে পারে না। বিয়ে সে করবেই না। যে কোন প্রকারে সে বাধা দেবে। অরুণ বসুই বা জেনেশুনে তাকে বিয়ে করতে চায় কেন?

সৌম্য দত্তর মত অরুণ বসু তাকে চেয়েছে, এটা বুঝতে তার দেরী হয়নি। পন্থা দুটো অবশ্য ওদের ভিন্ন ছিল। কিন্তু তার বিয়ের কথা যে উঠবে—এমন কি তার যে একদিন বিয়ে হতে পারে এটা ভাবাও তার পক্ষে যে ভয়ানক কষ্টকর। কেন যে কষ্টকর তার কারণ বিশ্লেষণ সে কোনদিনই করেনি বা করতে চায়নি। একটা পরিচিত ছকের মধ্যেই তার জীবন সীমা বদ্ধ করে রেখেছিল। সেখানে বিয়ের মত একটা উৎকট জিনিসের স্থানই ছিল না। সীমার কাছে বিয়ে শুধু উৎকট নয়, নোংরা এবং অশালীন! সেটা তাকে এড়িয়ে যেতে হবে যে কোন প্রকারে। অরুণ বসু এবং সৌম্য দত্তের উদ্দেশ্য এক। ও ফাঁদে সে পা দেবে না।

বিয়ের পরও কি শ্যামলী কাজ করতে চায়? অসিতবাবুর গলা।

এখনও জিজ্ঞাসা করিনি, আপনি যা বলবেন তাই হবে। সুপুত্রের মত জবাব দিল অরুণ।

দূরে হারুকাকার গলা শোনা গেল। দেরী না করে সীমা ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে।

একি, তুমি ভিজে কাপড় পরে আছ—অরুণের স্বর উদ্বেগপূর্ণ।

কে বললে ভিজে? অন্যদিকে তাকাল সীমা।

দেখি মা, এগিয়ে এস—ডাকলেন অসিতবাবু। তারপর সীমার শাড়ীটা স্পর্শ করে বললেন—হ্যাঁ একটু ভিজে মনে হচ্ছে; কিন্তু শাড়ী ত নেই এ বাড়ীতে।

কেন একটা শুকনো ধুতি পরলে ক্ষতি কি ছিল?

না, ধুতি আমি পরতে পারি না।

ঠিক বলেছ মা, মেয়েরা আবার ধুতি পরবে কি? সীমার কথায় সায় দিলেন তিনি। তারপর বললেন, তোমরা আর দেরী কোরো না অরুণ—এবার আস্তে আস্তে যাও—পথে অন্ধকার হয়ে যাবে। আর মা, তুমি কবে আসবে বল ত। এই দেখ তুমি আসতে আমি কত ভাল হয়ে গেছি।

অরুণ আর সীমা যখন অসিতবাবুর কাছে বিদায় নিল তখন বারবার তিনি সীমাকে তাঁর কাছে ফিরে আসতে অনুরোধ করলেন। তাদের বিদায় দিতে বাইরে পর্যন্ত [illegible] সত্ত্বেও।

(ক্রমশঃ)

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কাছের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ

(৩)

……আজ অনেকদিন পরে বিজয়ার পর দেখা করলাম। অলকদার স্ত্রী বাড়ীর খবরাখবর নিলেন। অবনীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে বসলাম তাঁর পাশে রাখা এক চেয়ারে, তিনি ইজিচেয়ারে শুয়ে। বৌদি বলছিলেন —'বিজয়ার পর থেকে একটু জ্বর চলছে। রক্তের চাপ নাকি বেড়েছে!' অবনীন্দ্রনাথ বললেন, ডাক্তারে বলেছে আমিষ ভোজন ছাড়তে। কাল ভেটকীমাছ গত পরশু মাংস বেশ লেগেছিল, সকালে একটু হাঁপানি বাড়ে, কাশি হয়। বৈকালে ছ'টার পর থেকে শরীরটা একটু ভাল থাকে।'

এইরকম সাংসারিক কথাবার্তা চলছে—এমন সময় অবনীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'হাওড়ার শৈলেন দে-কে আপনি চেনেন? আমি জবাব দিই, 'ঠিক চিনতে পারছি না। কোথায় তিনি থাকেন? তিনি এসেছিলেন নাকি?'

অবনীন্দ্রনাথ—তিনি লিখেছেন তিন পাতা চিঠি—'ঘরোয়া' তাঁর খুব ভাল লেগেছে। লিখেছেন আপনি নাকি বলেছেন যে গত দশ বৎসরে আপনি ছবি আঁকেন নি। তবে এ সময়টা কি করেছেন। আপনি একজন সাধক। রবীন্দ্রনাথও এ সময় বসে থাকেন নি? আপনি তবে এত সময় কি করলেন। সাধনার পথ তো হঠাৎ এমনি থেমে যাবে না, ইত্যাদি। শেষকালে রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখলে তিনি উপদেশ দিতেন,—আপনিও পত্রের উত্তর দেবেন। কিন্তু প্রথমতঃ আমি সাধক নই—খুবেই সাধারণ লোক। জীবনের একটা কাল আছে যেমন যৌবনকাল, প্রৌঢ়কাল ইত্যাদি। যৌবন ও প্রৌঢ়কালে যেমন ধর্মে ও বুদ্ধির সমাবেশে কাজ হয়, তা বুড়ো বয়সে কি সম্ভব?

আমি—একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। মহাত্মা গান্ধী যখন একবার গোল্ টেবিল বৈঠকের জন্য বিলেত যান, সেই জাহাজের কাপ্তেনের সংগে তাঁর আলাপ হয় —ছেলেমানুষের মন নিয়ে তিনি জাহাজের কলকব্জার খবরাখবর নিচ্ছিলেন ও নিজে নেড়েচেড়ে দেখেছিলেন—তাতে সেই কাপ্তেন সাহেব গান্ধী সম্বন্ধে বিবৃতি দিলেন যে গান্ধী খুব সরল প্রকৃতির ও খুব ভাল লোক। জিনিষটা দাঁড়াল এই যে, গান্ধীকে ভাল পরিচয় (recommendation) দিতে গিয়ে নিজেই পরিচিত হলেন বেশী, কেন না একটা জাহাজের কাপ্তেন; তাকে কেই বা চেনে; তখন হয়তো চিনেছিল বিবৃতি দেওয়ার সময়। এখন কেউ আর চেনে না নিশ্চয়—এও হয়তো সেইরকমের ব্যাপার। বড় সিনিক্-এর মত কথাগুলো হয়ে যাচ্ছে—হয়তো বা ক্ষুদে লেখক বা শিল্পী গজিয়ে উঠছেন।'

অঃ—'এই দশ বছর কি করেছি? অন্ধকারের সে এক ইতিহাস। খেয়েছি ও ঘুমিয়েছি, জীবনের দুঃখ নিয়ে কেঁদেছি ও হেসেছি। আমি সাধকটা কিসের? আমি ছবি আঁকতে শিখেছিলাম—ভাল লাগতো বলে। আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হবার জন্য তো ছবি আঁকিনি।' তবে মনের মাঝে যখন যে ভাবের উদয় হয়েছে, তখন তাই এঁকেছি। মাঝে মাঝে যখন ছবি নেশায় পায়, তখন আর ভাবনাচিন্তা নেই। একটানা নিরলস এঁকে চলেছি। যখন ধরলুম—আরব্য উপন্যাসের গল্পের ছবি, এঁকে চলেছি তো এঁকেই চলেছি। এক একটা ছবি পাঁচ ছ' দিনে শেষ। কিন্তু বেশ একটু বেশী সময় লেগেছিল প্রথম ছবিটি আঁকতে, যেখানে উজিরের মেয়ে শাহাজাদী বাদশাকে গল্প শোনাচ্ছেন। আর লেগেছিল আলিবাবার কাহিনীর দর্জির দোকানের দর্জিকে দিয়ে কাসেমের কাটা দেহ সেলাই ক'রে জোড়া লাগাবার ছবিটা। সেই সময় শ্রীপ্রশান্ত রায় এসে নিবিষ্ট হয়ে বসে থেকে ছবি আঁকা শিখতো, সেই সময় জসিমুদ্দিনও আসতো। জসিমুদ্দিন সময়ের হিসেব খতিয়ে বলেছিল, আপনার হাজার এক ছবি আঁকতে কম করে বিশ বছর লাগবে যদি ছবি আঁকবার মুডের ব্যতিক্রম না হয়।

—আপনি তখন জসিমুদ্দিনকে কী বললেন? ওতো পল্লীকবি, ছবি আঁকার কিছু জানে কি?

—আমি বললাম, তুমি বোধহয় জানো না শিল্পী যখন ছবি আঁকতে বসে, সে কি সময়ের হিসেব করে বসে। সে দেখে তার সামনে পড়ে আছে সীমাহীন সময় আর অনন্ত জীবন। এর অন্ত নেই কোথাও কোনদিন। এই রং আর এই তুলি অনন্ত হ'য়ে থাকবে। অজন্তার গুহার গায়ের ছবির কথা ভাবো। কত শিল্পী বংশানুক্রমে শিল্পের ধারা অব্যাহত রেখে গেছে। কেউ তো তারা ভাবেনি আমি নিজে সব আঁকা শেষ করে আপন সৃষ্টিতে নিজের নাম রেখে যাব। তাদের নাম কি আজ কেউ জানে? তবে তারা শিল্পের মধ্যে অমর হয়ে আছে। তুমি কবিতা লিখছ, কবিতা লিখে যাও। বড় বৌমা, আরব্য উপন্যাসের কতগুলো ছবি আঁকা হয়েছিল?

বড় বৌমা—যতদূর মনে হয়, মোট পঁয়ত্রিশ খানা ছবি আঁকা হয়েছিল, বাবামশাই। ঐ পঁয়ত্রিশখানা ছবি একাধিক সহস্রকে ছাড়িয়ে গেছে।

অঃ—আমি তো আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হওয়ার মূল্যে কামনা করিনি আর পাটোয়ারী বুদ্ধি ছিল না যাতে করে এই সৃষ্ট শিল্পের ভেতর থেকে নিংড়ে সোনা বের করতে হয়।

—ছবি আঁকেন নি বললে পূর্ণ সত্য উদ্ঘাটিত হল না—কারণ আপনার মাস্টারপিস্ যেসব আঁকা হয়েছে এই দশ বছর আগে—তখন ছবি আঁকব বলে আঁকতেন। তাতে চিন্তা ছিল, ভাব ছিল, ইনটলেক্‌ট্-এর প্রয়োগ ছিল—আমার বোধহয় সেই সময় ছবি নিয়ে সাধনা বললে অত্যুক্তি হবে না। এখন ছবি আঁকেন, তবে সে ছবি নয়, ছবি নিয়ে খেলা। যেমন নাতি-নাতনীদের সংগে খেলা করেন তাদের আবদার মেটাতে। সেই বাঁধের ছবি, বাঁধের উপর ট্রেন যাচ্ছে। তিনটে জানলা দিয়ে একটা কামরার আলো বেরোচ্ছে। সেটাকে যেমন ঘসে মেজে দেখা গেল 'বিষবৃক্ষের' একটা ছবি আঁকা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনার সংগে হুবহু মিলে গেল। কিন্তু 'বিষবৃক্ষে'র ছবি নয়; আসলে সেটা রেল ও বাঁধের। সেইজন্য এখনকার ছবিগুলো ছবির পর্যায়ে ফেলা যায় না। রবীন্দ্রনাথেরও ঐ হয়েছিল। তাঁর শেষের দিকের কবিতা—'বলাকা', 'মহুয়া'র কবিতার সংগে তুলনাই হয় না।

অঃ—'ঠিক তাই। জীবনের একটা উঠতির বয়স আছে। সেই সময়টা ভাল জিনিষ বেরোয়। তারপর বুড়ো হয়ে গেলে সে জিনিষ আর বেরোয় না। কেননা মনেও রাখা যায় না। বুদ্ধিও চালানো যায় না।

মোহনলাল, শোভনলাল এবং অমিতেন্দ্রনাথের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ

বয়সের একটা প্রভাব—উঠ্তি পড়্তি। তারপর দশ বছর যে ঘটনা ঘটেছে তা মনে নেই, আর যা আছে তা আমার ঘরের কথা, তাতে সাধারণের কোনো ইন্টারেস্ট নেই। হাঁস ডিম পাড়ে, তার একটা সময় আছে। বুড়ো হ'য়ে গেলে মারো আর কাটো ডিম দেবে না। এ ঠিক তাই।'

আমি—'এ উপমাটি অতি সুন্দর। তাদের সঙ্গে যদি আমার দেখা হয় বলে দোব, এহচ্ছে হাঁসের ডিম পাড়ার ব্যাপার। বুড়ো হাঁস ডিম পাড়ে না।

অঃ—আশু মুখুজ্যে— তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয় নিয়ে সাধনা করেছেন। তাঁকে সাধক বলা যেতে পারে।

আমি — তাহলে সেদিক দিয়ে বিচার করলে আপনার সাধনা কম নয় বরং আরো বেশী। আর্ট-এর ক্ষেত্রে জয়রথ চালু করে দিয়েছেন। অনেক শিল্পী বেরিয়েছে তারা শেখাচ্ছে ও আঁকছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। ধরুন মাদ্রাজে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, লক্ষ্ণৌয়ে অসিত হালদার, শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসু প্রভৃতি।

অঃ—ইঞ্জিন যে চালিয়ে দিয়েছে তাই সেটা চলছে। তাকে আবার টানাটানি কেন?

আমি—'আপনার চিঠির জবাবে আরেকটি বাগেশ্বরী লেকচার লিখে দিলে তিনি একটা তর্জমা করেন, বোধ হয়।

অঃ—ঠিক তাই। বাগেশ্বরী লেকচার তৈরী করতে বহু সময় লেগেছিল।

আমি—'লেকচার তৈরী করার সময় আপনাকে পড়াশুনা করতে হোতো না যা মনের মধ্যে ভাব আসতো তাই লিখতেন।

অঃ—পড়তে হতো বৈকি!

এই সময় অলকদার স্ত্রী এলেন, চিঠির কথা উঠলো আবার। অলকদার স্ত্রী—ইনি (অলকবাবু) লিখে দিলেন তাঁর শরীর অসুস্থ, ডাক্তারে বিশ্রাম নিতে বলেছেন। অতএব আপনার চিঠির জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

আমি—এই লেখা ছাড়া আর উপায় কি। নাহলে এক বিরাট একস্‌প্লানেশন লিখতে হবে। না হয় দশ বছরের ডায়েরী ফেলে দিতে হবে। দেখ কি করেছি।

অঃ—ডায়েরীর বালাই আমার নেই। তবে নানা বিষয়ে লেখার খাতা আছে। একসময়ে আমায় যাত্রার পালা লেখার নেশায় পেয়ে বসেছিল। 'ভারতী'তে 'এস্‌পার ওস্‌পার' ছাপা হয়েছিল। সেই পালাটা নিয়ে একটা মহা মজার যাত্রা ছেলেদের দিয়ে করিয়ে দিলাম।

—কাকে কি পার্ট দিলেন। আপনি নিজে কি কোন পার্ট নিয়েছিলেন?

যাত্রার ব্যাপারে পার্ট বণ্টন করা এক মহা সমস্যা। বেতারের মত নয়, এমনকি থিয়েটারের মত নয়। বেতারে গলা ঠিক থাকলেই হল। ভীম রোগাপটকা হলেও চলবে। থিয়েটারের বেলাও দূর থেকে যাত্রার বেলা সেটি হবার জো নেই। সহ-দেবের বা যুধিষ্ঠিরের পার্ট করার যে উপযোগী তাকে দিয়ে ভীমের পার্ট হবে না। কারণ চেহারা, বাচনভঙ্গী এক একটি চরিত্রের সঙ্গে এক রকম, প্রত্যেকের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। তাই যে কেউ যে কোন পার্ট করতে পারেন না, ভালও হবে না। ভীমের মত চেহারা ও গোঁয়ার গোবিন্দ মন তৈরি করতে হবে, অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে হবে, সেখানে নকুল সহদেবের অভিব্যক্তি অচল।

—কিন্তু বর্তমানে রঙ্গমঞ্চে পঞ্চাশ বছরের বুড়ো 'মেকাপে'র দৌলতে লবের পার্ট শুরু করল। বড় নট হলে হয়তো মানিয়ে যায় ও দর্শকবৃন্দ থেকে বড় একটা বিরূপ মনোভাব পোষণ করে না।

—সেটাই ঠিক। বড় ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব সাধারণতঃ প্রকাশ করে না। তবে এটাও সত্যি যে সেই পার্টে বৃদ্ধ নট মানিয়ে গেছে।

—হয়তো তাই। জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে দেওয়া। আমি শুনেছি নোংরা পাড়ার মেয়েদের দিয়ে সতী সাবিত্রীর পার্ট করাতে নাকি আগেকার দিনের প্রযোজক বা মোশন মাস্টাররা তাদের বেশ কিছুদিন হবিষ্যি করাতেন যাতে দেহের ও মনের শুদ্ধি আসে।

—নিশ্চয়ই এর মূল্য আছে। যে কেউ যে কোন চরিত্র রূপায়িত করাতে পারে না তার জন্য প্রস্তুতি দরকার, সাধনা দরকার নিষ্ঠা দরকার আর কঠোর পরিশ্রম দরকার

অবনীন্দ্র সান্নিধ্যে শান্তিনিকেতনে

অবনীন্দ্রনাথ তখন বিশ্বভারতীর উপাচার্য। থাকেন উত্তরায়ণে। ডাক এল শান্তিনিকেতনে যাবার। কর্মব্যস্ততায় অবকাশ হয়ে উঠছিল না। হঠাৎ যাওয়া স্থির হল ১৯৪৩ সালের মহাষ্টমী, দামোদরের বন্যায় রেলের ও রাস্তার বিপুল ক্ষতি হয়েছে কলকাতা থেকে পশ্চিম ভারতের রেল সংযোগ প্রায় বন্ধ। ব্যাণ্ডেল-বারহার লাইনটি কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ঐ লাইন দিয়ে বোম্বাই মেল পাঞ্জাব মেল যাচ্ছে এটি সিঙ্গেল লাইনের রেলপথ। দামোদর নদ এসে হুগলী নদীতে পড়ে। দামোদরের বন্যায় ভেঙ্গে গেছে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রাস্তা, হাওড়া বর্ধমান কর্ড লাইন, ব্যাণ্ডেল-বর্ধমান লাইন, জলসেচের বাঁধ—সমস্ত জলে জলময়। ১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লবে যত না ক্ষতি হয়েছিল এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তার বহুগুণ ক্ষতি হয়েছে। বাজারে চাল, চিনি, ময়দা পাওয়া যায় না এমনি দেশের অবস্থা। মহাসপ্তমীর ছুটির দিনে ঠিক হল অবনীন্দ্র-নাথের সঙ্গে দেখা করতে গেলে কেমন হয়। সোদর-প্রতিম যতীন ভায়া (যতীন চক্রবর্তী) ও আমি চললাম অলকদার কাছে

তিনি আমাদের সহগামী হবেন কিনা? টানা মোটরে রাণাঘাট।

—আমার একটা বড় প্যাকিং বাক্স আছে সেটা নেবার ব্যবস্থা হলে আমি যেতে রাজী।

—এটা একটা সমস্যা। মোটরে করে নিয়ে যাব। কাল খুব সকালে বেরুচ্ছি।

ঠিক হল মহাষ্টমীর দিন সকালে বেরিয়ে রাণাঘাটে দুপুরে গাঙ্গুলি-বাড়ীতে মহাষ্টমীর প্রসাদ পেয়ে আবার চলে যাব নবদ্বীপের ঘাটে খেয়া পার হতে। তিন ব্রাহ্মণে যাত্রা নাস্তি। আমার সিদ্ধানন্দও আমাদের সঙ্গী হল। তখন পেট্রোলের রেশন। সি পি ডবলিউ ডি-র দৌলতে গাড়ী ও পেট্রোল জোগাড় করতে কোনই অসুবিধে হল না। যাবার পথ হল দক্ষিণেশ্বর থেকে মোটরে রাণাঘাট, রাণাঘাট থেকে ট্রেনে কৃষ্ণনগর। কৃষ্ণনগর থেকে রেলে নবদ্বীপ ঘাট। নবদ্বীপ ঘাটে নৌকোয় পার, গাড়ী করে নবদ্বীপধাম ভ্রমণ ও পূর্ব রেলের নবদ্বীপধাম স্টেশন থেকে কাটোয়া। কাটোয়া থেকে ভোরে ছোট রেলে বর্ধমান। বর্ধমান থেকে বড় রেলে বোলপুর। সেখান থেকে মোটরে কি রিক্সায় শান্তি-নিকেতন।

সকাল ন'টার সময় যতীন ভায়া মোটর নিয়ে হাজির। আমরা দুই ভাই গাড়ীতে উঠে অলক-দাকে তুলতে গেলাম। তাঁর কাঠের পেটিটি পেছনে নিয়ে চারজনে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে রওনা দিলাম।

কাঁচড়াপাড়া যেতে না যেতেই ক্লাচের দোষ দেখা দিতে শুরু করল। কাঁচড়াপাড়া বিমান বন্দরে আসার আগে এক ছড়া কলা কিনে নিলাম। কলা খেতে খেতে মাইল চারেক গিয়ে দেখি ক্লাচ আর ধরছে না। গাড়ী ফেরানো হল। গেলাম কাঁচড়াপাড়া বিমান ঘাঁটিতে। সেখান থেকে ঠিকাদারের দু'খানি লরি নেওয়া হল যখন ক্লাচ মেরামতের সকল প্রচেষ্টা বিফল হল। একটি লরি মোটরটিকে টেনে দক্ষিণেশ্বরের নৌ বিমানঘাঁটিতে পেঁাছে দেবে ও অপরটি আমাদের রাণাঘাট নিয়ে গিয়ে আহারাদি পর্বের পর রাণাঘাট স্টেশনে পেঁাছে দেবে। লরিতে কাঠের পেটি ও আমরা চারজন চড়লাম ও চলতে লাগলাম রাণাঘাটের দিকে। স্টেশনে খবর নিলাম, আড়াইটের সময় কৃষ্ণনগর লোকার আসবে। সেখানে রাণাঘাটের গাঙ্গুলি বাড়ীতে এসে আমাদের দুর্দৈবের কথা বললাম ও আগামী পরিকল্পনার বিষয়ও বললাম। আমাদের তাড়াতাড়ি আহারাদির ব্যবস্থা হল। আহারাদির পর সময় সংক্ষেপ থাকায় বেলা দুটো নাগাদ রাণাঘাট স্টেশনে লরি পেঁাছে দিয়ে কাঁচড়াপাড়া চলে গেল।

বেলা আড়াইটের ট্রেন ধরে কৃষ্ণনগরে পেঁাছলাম। কৃষ্ণনগরে ছোট রেলে চড়ে সন্ধ্যায় নবদ্বীপঘাটে পেঁাছে গেলাম। এবার নৌকোয় ভাগীরথী পার হলাম। নবদ্বীপধামে রাতের কাটোয়াগামী ট্রেন ধরব।। নবদ্বীপে কিছু সময় থাকার জন্য রাতের নবদ্বীপ দেখার সৌভাগ্য হল। পোড়ামাতলায় আমরা চা-পান, কিছু বৈকালিক আহারাদি সম্পন্ন করে নিলাম কেননা রাতের আহার অনিশ্চিত। প্রথমা 'ললিতা সখি'র সন্ধানে গেলাম। শ্রীকৃষ্ণকে সখীভাবে সেবা করার জন্য পুরুষ পরেছে শাড়ী, বালা, মাথায় ঘোমটা, সলজ্জ সকুণ্ঠ ভাব। সন্ধ্যারতির সময় সেখানে হাজির। তিনি মধুর রসে সিক্ত হয়ে সেই প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের আরতি ঘণ্টা ও দীপাবলী নিয়ে ভাবে বিভোর হয়ে আরতি করছেন। পথে অনেক ঠাকুরবাড়ী দেখে একটা ছেকরা ঘোড়ার গাড়ী করে 'নবদ্বীপধাম' স্টেশনে পেঁাছলাম। স্টেশন মাস্টারের কাছে খবর নিয়ে জানলাম ট্রেন আসতে অনেক দেরী। পথে বহু বিলম্ব হয়েছে। অলকদা স্টেশন প্ল্যাটফর্মে তাঁর প্যাকিং বাক্স নিয়ে ও সামান্য সেই পুঁটলি নিয়ে বসে পড়লেন। একটু বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন। চারখানি টিকিট কেটে আনা হল কাটোয়া পর্যন্ত।

ট্রেন যখন এল, তখন ন স্থান তিল-ধারণের। কী করা যায়। একটা মিলিটারী কামরায় উঠে পড়বার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বিকট এক দৈত্যের মত চেহারার এক শিখ মিলিটারী অফিসার কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। আমি গিয়ে এক ফাঁকে সেকেন্ড ক্লাস টিকিট বদলে ফার্স্ট টিকিট করে আনলাম। কটাই বা স্টেশন। ঘণ্টাখানেকের পথ। স্টেশন মাস্টার এল, গার্ড এল, মহা হৈ-হুল্লোড়। যতীনভায়া ও অলকদা কোন-প্রকারে ফার্স্ট ক্লাসে দাঁড়িয়ে ও আমরা দুই ভাই সেকেন্ড ক্লাসে দাঁড়িয়ে।

কাটোয়া জংশনে নেমে যতীন ভায়া ও সিদ্ধানন্দ প্রায় দৌড়ে চলল ফার্স্ট ক্লাস কুপের দুটি বেঞ্চি দখল করতে। গিয়ে চাদর পেতে দেবে। আমরা পেটী ও মাল-পত্র নিয়ে চললাম ছোট রেলের স্টেশনে। আমরা নিজেদের কামরায় গিয়ে উঠলাম তখন রাত আড়াইটে। ভোর চারটে নাগাদ ট্রেন ছাড়বে। আমরা কখন শুয়ে কখন বসে রইলাম। আমাদের কামরায় মিলিটারী অফিসারদের ঢুকতে দিলাম না—ভেতর থেকে লক করা। ট্রেন ঠিক সময় ছেড়ে সকালে এল বর্ধমান স্টেশনে। মাল নিয়ে আসতে দেরী হওয়ায় বোলপুরের ট্রেন আমাদের সামনে দিয়ে ছেড়ে চলে গেল। বড়ই হতাশ হলাম। আবার স্টেশনে অপেক্ষা করা। সকালের প্রাতকৃত্য জলযোগ সারা চা খাওয়া শেষ করে পরের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। বর্ধমানে অলকদার বাড়ীর জন্য কিছু মিহিদানা ও সীতাভোগ কিনে নিলাম।

বর্ধমান থেকে খানা জংশন পার হয়ে এলাম বোলপুর স্টেশনে। বেশ বেলা হয়ে গেছে। আমরা চারজনে দু'খানা রিক্সায় শান্তিনিকেতনের দিকে রওনা দিলাম। আমাদের স্থান হল 'টাটা হাউসে'। অলকদা চলে গেলেন তাঁর নিজের বাড়ীতে —বৌদি অপেক্ষা করছেন। এই ব্যবস্থা হল যে দুপুরে ও রাত্রে আহার হবে অলকদার বাড়ীতে। আর চা ও জল খাওয়া হবে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের 'উত্তরায়ণে'। বৈকালে চায়ের লৌকিক নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন অবনীন্দ্রনাথ। আমরা একে একে স্নানাদি সেরে দাড়ি কামিয়ে অপেক্ষা করছি মধ্যাহ্ন ভোজের ডাক আসবার। 'বাদশা' (অলকদার ছোটছেলে) এসে পথ দেখিয়ে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গেল। যুদ্ধের জন্য এমন আকাল যে আহার্যবস্তু বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তাতে কি এসে যায়। বৌঠানের আমাদের জন্য যত্ন ও স্নেহের অন্ত নেই। আহারাদি সেরে কিছু গল্প-গুজব করে চললাম ফিরে 'টাটা হাউসে' গত রাত্রের অনিদ্রা পরিশোধ দিতে আমরা যে যার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। যতীন-ভায়া যাবে পাটনায়। পূর্ণিমার দিন তার সেখানে থাকা চাই।

বিকাল বেলা লোক এল 'উত্তরায়ণ' থেকে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। উত্তরায়ণে এসে দেখি তিনি সামনেই দাঁড়িয়ে। আমরা সবাই প্রণাম করলাম। আমাদের নিয়ে এক জায়গায় বসলেন। তার-পর চললো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর। স্ত্রীর খবর, ছেলের খবর, আমার বাবার খবর। শ্রীনিকেতনের প্রস্তুত বৃহদাকার কাপে এল চা, সঙ্গে চিড়েভাজা, মিষ্টি ইত্যাদি জলখাবার। জলপানের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনের খবর, কালাই ডাক্তারের খবর, শশাঙ্কদের খবর, মোহনলালদের খবর প্রভৃতি জেনে নিলেন।

এখানে কেমন লাগছে!

—খুব ভাল। এখন পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে কিছু দেখা হয়নি।

—কতদিন থাকবেন। পূর্ণিমা পর্যন্ত অন্ততঃ থেকে যান।

—থাকার বড়ই ইচ্ছা কিন্তু যতীন ভায়ার পূর্ণিমার দিন ওর শ্বশুরবাড়ী পাটনায় যেতে হবে।

—রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ দ্রব্যাদি উত্তরায়ণে দেখুন।

—নিশ্চয়ই দেখব। সেইজন্যই তো আসা। আর আপনার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি।

চা-পানের পর তিনি নিজে আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। বাদশা এসে গেছে, সে আমাদের নিয়ে রথীবাবুর তৈরী নানা কায়দার বাগান ও জোর করে লতিয়ে দেওয়া আমগাছ প্রভৃতি দেখালো। অবনীন্দ্র-নাথ আজ রাতের সভায় আসার আমন্ত্রণ জানালেন। তখন ইন্দিরাদেবী জীবিত।

মুক্ত আকাশের তলায় চন্দ্রকিরণস্নাত রাতের সভায় বেশ কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হল। সকলেই আমাদের কোজাগরী পূর্ণিমার দিন থাকতে বললেন, বিশেষ করে ইন্দিরা দেবী। আমাদের বিশেষ কাজের জন্য পাটনা যাওয়ার কার্যসূচী থাকায় অনু-রোধ রাখতে না পারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। ঐ খান থেকেই 'বাদশা'র সঙ্গে অলকদার বাড়ীতে রাতের আহার সারতে গেলাম।

পরের দিন সকালে 'টাটা হাউসে' চা খেয়ে (শিল্পগুরুর নির্দেশ মত) অলকদার সঙ্গে বেরুলাম। ওমর খৈয়ামের আর এক কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি এখান থেকে খুব কাছেই থাকেন। তিনি কাছাকাছি দ্রষ্টব্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেখানে সিদ্ধিলাভ করেন, আম্রকুঞ্জ, পুরাতন লর্ড সিংহদের বাড়ী প্রভৃতি দেখালেন। সেখান থেকে আমরা শ্রীনিকেতনের দিকে হেঁটে চললাম। আজ সব বন্ধ তবু বহিরঙ্গ দেখে আসতে চললাম। ওখানে শিল্পী শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে শিল্পীকে চিত্র-রচনায় নিমগ্ন দেখলাম। শুভসমাচার বিনিময় হল ওখানে আর কালবিলম্ব না করে, বেলা বেজায় বেড়ে যাওয়ায় আমরা শান্তিনিকেতনের দিকে পদব্রজে রওনা দিলাম 'টাটা হাউসে'র দিকে।

পরের দিন অবনীন্দ্রনাথকে প্রণাম জানিয়ে আমরা বাড়ীর দিকে আর যতীন ভায়া পাটনার দিকে রওনা হয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

॥১০॥

বলাইয়ের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে যখন স্বর্ণসুন্দরী বাড়ি ফিরলেন তখন বাড়ির সামনের মাঠ শীতের কুয়াশায় আর ম্লান চাঁদনিতে ঠাসা। মাঠের এককোণে দুটো তাঁবুতে চারজন বন্দুকধারী পুলিশের নতুন আস্তানা, সন্ত্রাসবাদীদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রাজকর্মচারীকে বাঁচাবার ব্যবস্থা। ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমেই স্বর্ণসুন্দরী একেবারে ভেঙে পড়েন শোবার ঘরের খাটের ওপর। গৌরী লেপের গাদা থেকে ভারী লেপ নিয়ে আগাগোড়া নিজেকে ঢেকে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে দাদুর জন্যে। বুড়ী এতক্ষণ তার ভাইদের সঙ্গে লন্ঠনের মাথায় ময়দার ছোট ছোট পুঁটলি ঠেসে লুচি বানাচ্ছিল। সেও মা আর দিদির কান্না শুনে মুখখানা অসম্ভব বিকৃত করে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল, প্রতাপের চোখও লাল, ভবনাথ দুতিনবার বসা গলায় রুমালে নাক ঝাড়লেন, এমনকি টুটুল অসহায়ভাবে লক্ষ্য করলে চোঙাও মার পাশে শুয়ে পড়ে এই শোকের সংসারে নিজের স্থান করে নিয়েছে। টুটুল দেখলে চোঙা মুখ তুলে ভেজা চোখে তার দিকে চেয়ে তার ভাবান্তর দেখবার চেষ্টা করছে! কিন্তু টুটুলের মুখে ভাবান্তর আসে না।

আসলে গত কয়েকদিন মায়ের অবর্তমানে অনাবিল স্বাধীনতায় এমন এক খেলার মেজাজ পেয়ে বসেছে তাকে যে সহসা সেই খেলার জগত থেকে কান্নার জগতে প্রবেশ করতে সে মোটেই তৈরী ছিল না। কান্নার এই কলরোলের মাঝখানে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে টুটুল। তারপর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব মাথায় ঝিলিক মারে। দেয়ালের দিকে মুখ করে সে গাড়াগাড়া চোখে তাকিয়ে থাকে সাদা দেয়ালের দিকে মরীয়ার মতো। চোখের পাতা না ফেলে কিছুক্ষণ তাকাবার পরই চোখ জ্বালা করে, চোখের পাতা জলে ভিজে আসে। তার পরের ব্যাপারটা সোজা হয়ে যায়। টুটুলও চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে তার মাতামহের জন্যে। লন্ঠনের স্বল্প আলোয় লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা কতগুলো অস্পষ্ট মূর্তি আর কান্নার আওয়াজের মাঝখানে গোপীনাথের আবির্ভাব হয়। 'টুটুল বুড়ী, তোমরা সব খাইতে এস," গোপীনাথ বললে। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'রাজা দশরথ মরিয়া গেল, স্বামী বিবেকানন্দ মরিয়া গেল, সংসারে কেউ থাকিবে না মা।' রোরুদ্যমানা স্বর্ণসুন্দরীর কানে সে সান্ত্বনা প্রবেশ করল না। তবে চোঙা তড়াক করে উঠে পড়ল। তার ভীষণ ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছে।

শোকের খপ্পর যেমন জোরাল তেমনি এক একটা দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার মুঠো এত সহজে ঢিলে হয়ে যায় যে তৃতীয় ব্যক্তির চোখ দিয়ে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। অশৌচের কয়েকদিন যেতে না যেতেই স্বর্ণসুন্দরীকে বাড়ির স্বপ্ন পেয়ে বসল। আর বাড়ির কাজও তাঁদের এই পারিবারিক শোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হুড়মুড় করে এগিয়ে চলে। এত তাড়াতাড়ি দোতলা দেয়াল ব্যালকনি মায় ছাত পর্যন্ত উঠে যাবে ভবনাথ ভাবতেও পারেন নি। বেশ কয়েকটা দিন কলকাতায় ছোটাছুটি হাঁকুপাঁকুর মধ্যে গেল। আরও কিছু ধারধোর হয়ে গেল। কিন্তু ভবনাথের বাড়ি এবার আর ঠেকানো যাবে না। ইলেকট্রিক, জলকলের কাজ, দরজা আর মার্বেল মোজেইকের মেঝে বাকী। এগুলো এখন টুকটাক করে করলেই হবে। ভবনাথের বাড়ি আর তাঁর শ্বশুরের মৃত্যু এ দুটো যেন একই বস্তুর এপিঠ ওপিঠ। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা ভাবা যায় না।

অশৌচের কয়েকদিন পরই পিঁড়িতে বসে স্বর্ণসুন্দরী যখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে লক্ষ্মীর ব্রতকথা শুরু করলেন তখন অস্পষ্টভাবে মৃত্যুর গুরুতার কথাই মনে হচ্ছিল টুটুলের। তার মনও খুব খারাপ হয়েছিল মা'য়র ক্রমাগত কান্না দেখে। ভাবছিল এবার হয়ত ব্রতকথার পাট উঠেই যাবে। কিন্তু প্রত্যেক বছরের মতো স্বর্ণসুন্দরী এবারও বসলেন।

চোঙা চেঁচিয়ে উঠল, 'যা চুক্ক তুই ছারেখারে যা, শুয়োরটার মতো মুখ হোক, সকল অঙ্গে লোহার গয়না হোক।'

বুড়ী তীব্র প্রতিবাদ করে, 'চোঙা, তুই চুপ কর তো।'

বারান্দার ধারে মাস্ভর্তি কোজাগরী পূর্ণিমা। চারপাশে নানারকম কাটা ফল, নারকেলের চিড়ে, বরফি সন্দেশ, নাড়ু, একপাশে ফুলকো লুচি, বাঁধাকপির তরকারী, পেল্লাই সাইজের বেগুনভাজা। চোঙা আর থাকতে না পেরে টপ করে একটা নারকেলের নাড়ু তুলে নিলে সকলের অলক্ষ্যে।

স্বর্ণসুন্দরীর কিন্তু চোখ পড়েছিল। কিন্তু সেদিকে না চেয়ে হাতজোড় করে আবার বলতে থাকেন : 'চুক্ক বললে, বারবার বলছি যাব না, তাও আসিস বিরক্ত করতে' বলে পানের বাটার থাপ্ ছুঁড়ে দিলেন। কপালে লেগে কপাল কেটে গেল। হাত দিয়ে কপাল চেপে ধরে কালীদহ সাগরে ধুতে গেলেন কুবের। ধুতে গিয়ে এত রক্ত পড়ল যে রক্তধাঁধাঁ লেগে জলে পড়লেন। তারপর জলে পড়ে ভাসতে ভাসতে ওপারে মালিনীর মালঞ্চে গিয়ে লাগলেন। এদিকে মালিনীকে সবাই বলছে, 'দ্যাখ্ মালিনী, তোর মালঞ্চে ধবলময় হয়ে ফুল ফুটেছে।' 'যাঃ, আমার মালঞ্চের খড়ি দিয়ে আমি বেঁধে থাই আবার আমার মালঞ্চে ফুল ফুটবে।' সত্যি কি মিথ্যে দ্যাখ্।' বেরিয়ে এসে দেখলেন ধবলময় হয়ে ফুল ফুটেছে। হাতে ছিল ফুলের সাজি, তাতে ফুল তুলতে আরম্ভ করলেন। তাকিয়ে দেখলেন কালীদহ সাগরে মালঞ্চের ধারে লক্ষ্মীর পুত্র কুবের জলে ভাসছেন।

'মা, চোঙা সব নারকেলের নাড়ু খেয়ে ফেলছে।' বুড়ীর চীৎকারে স্বর্ণসুন্দরী চমকে ওঠেন। পেছন থেকে প্রতাপ ঠোনা মারে ভাইকে। বিলেত যাবার মুখে প্রতাপের সব কিছুই ভাল লাগছে, সব ব্যাপারে তার সমান উৎসাহ। নাটক, শিকার, ব্রতকথা, সবই তার তারুণ্যের উৎসাহে দীপ্ত পায়।

নতুন অর্থলাভ করে। সামনে জীবন বড়রকম মোড় খাওয়ার মুখে।

গল্প এগোতে থাকে। লক্ষ্মীর অভিশাপের পর 'রাজার রাজ্যে ছ্যানম্যান্ লেগেছে।

প্রতাপ তারিফ করে 'ছ্যানম্যান লেগেছে, গ্র্যান্ড এক্সপ্রেশান!'

স্বর্ণসুন্দরী বড় ছেলের দিকে চেয়ে স্বল্প হেসে বলতে শুরু করলেন, 'পাত্রদের বললেন, আমি আজ আর কিছু করব না। চান করে খেতে বসলেন। রানী ভাতের থালা দিয়ে টকের বাটি দিলেন। রাজা ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখেন, শুয়োরটার মতো মুখ, সারা গায়ে লোহার গয়না। রাজার দিকে চেয়ে ফিক করে হাসলেন, তার মুখের আগুনে রাজার গোঁপদাড়ি পুড়ে গেল।'

ছেলেমেয়েরা চারদিক থেকে হেসে ওঠে। সারাদিন উপোসে এবং গত কয়েক দিনের খাওয়ার অনিয়মে স্বর্ণসুন্দরীর মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। গল্পের খেই হারিয়ে যায়। বেশ খানিকটা বাদ দিয়ে তিনি চুকুকে লক্ষ্মীপুরে নিয়ে ফেললেন নারায়ণ যখন খেতে বসেছেন কুবেরকে নিয়ে।

টুটুল বলে উঠল, 'তুমি সব বাদ দিয়ে দিলে মা, সেই সাপ উঠল ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী পাখির বাচ্চা খেতে। চুকু হাই তুলল, সাপ ভস্ম হয়ে পড়ল। তুমি সব ভুলে গেছ মা!'

'হয়েছে হয়েছে। মা-র শরীর অসুস্থ।' প্রতাপ বললে।

স্বর্ণসুন্দরী বললেন, 'না না, টুটুল ঠিকই বলেছে। আমি আবার বলছি।' এবার সবটাই ঠিক মতো বলে গেলেন। শেষের দিকে এসে বলতে থাকেন, 'পরের দিন তার শাশুড়ীর দিবসী। দিবসী মানে কি জানতো? মৃত্যুদিন। সব খাওয়াদাওয়া করিয়ে বেলা হয়ে গেছে। সেদিন লক্ষ্মী-পুজো। কাটনের সাজি আপনা থেকে উল্টে দিয়ে উঠল। চুকু বললে, 'ওরে মা! আমি যে আজ লক্ষ্মী-নিন্দনীয় হতাম। কে আছে উপোসী, কে আছে কাপাসী, নিয়ে আয় ধরে।'

'মা, কাপাসী মানে কি?'

'টুটুল তোর সবটাতেই বাড়াবাড়ি। কাপাসী মানে কি?' বুড়ী ভেঙায়।

'কাপাসী মানে ধুনকর টুনকর হবে,' গৌরী একটা মানে করবার চেষ্টা করে।

এরপর আর কিছুতে আটকায় না। 'মা লক্ষ্মী যেন সকলের গৃহে আসেন।' বলে স্বর্ণসুন্দরী তাঁর পিতৃপুরুষদের আত্মীয়স্বজনদের নামে নামে লক্ষ্মীর আগমন কামনা করে ব্রতকথা শেষ করেন। আর বলতে গিয়ে গলা আটকে আসে। সম্প্রতি টেনিস ফাইনালে শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত নবকে মনে করে ধরা গলায় বলেন, 'লক্ষ্মী আসুক নব-র গৃহে।'

টুটুল যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল চোঙা তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে এক খাবলা নারকেলের চিঁড়ে তুলে নেয়। কিন্তু সেদিকে টুটুলের মন ছিল না। তার মন তখনও পড়ে ছিল সেই মালিনীর ধবধবে মালঞ্চে, হেমন্ত-মন্মথ-পবন কাঠের নৌকায়, আকাশপথে নারায়ণ ও লক্ষ্মীর নিধুবন থেকে নিকুঞ্জবনে যাত্রায়।

আসলে অনেক জীবনের মতই কাল এমন বন্ধু হয়ে এসেছে টুটুলের শৈশবে যে সে ও তার সময় আর আলাদা থাকে না, একেবারে গলাগলি হয়ে যায়। তাই চুর্ণী নদীর ঘোলা জলে ছোট ছোট ঢেউ, টাটা রোদ্দুরে ব্রহ্মদৈত্যের বাসস্থান বেলগাছ, সাদা মখমলের মতো গা মুংলীর বাছুরের নাচ, দপ্‌দপ্ করে ঘিয়ের বাতি জ্বলে এমন লালকমল নীলকমলের বন্ধ ঘর, মাঠের পাশে বকুল বনের আলো, অন্ধকারের গভীর রহস্য এ সমস্তই কালের যাত্রার সঙ্গে একাকার। যা সামনে আসছে তাকেই সে গ্রহণ করছে তর্ক না করে প্রশ্ন না করে। কালের সঙ্গে এরকম অখন্ড সত্তা টুটুল হয়েছিল অনেক পরে যখন সে আর টুটুল নয়, যখন সে অনিন্দ্য চৌধুরী। মাঝখানে বহু বছর জুড়ে তার যে জীবন সেখানে কাল সব সময় তার নাগাল বেরোবার উপক্রম করছে, কলকাতার লোকে টাপুর টুপুর দোতলা বাসের মতো ছাড়ো ছাড়ো, তখন সে প্রাণপণে ধাবমান সেই ফেরারী বাসের পেছনে। তার পরবর্তী জীবনের অনেকটাই এই কালের পেছনে দৌড়ানো হাঁফানো জীবন। তারপর অনেক পরে তার জীবনে আস্তে আস্তে আবার রাণাঘাট ফিরে আসে আর এক ভাবে। কাল বন্ধু হয়ে গলায় হাত রাখে।

।।১১।।

"গোপীনাথ, ও গোপীনাথ," বলাই হাঁক দেয় রান্নাঘরের দালানে উঠে। মাথায় ঝাঁকাভর্তি বাজার। খাকি হাফশার্ট ঘামে জবজবে। দেড় মাইল পথ হেঁটে মাঠ ভেঙে বাজার করে ফিরছে। গোপীনাথ ঝাঁকা নামাতে হাত লাগায়। বলাই তার ঘামে তেলতেলে তামাটে মুখখানা গামছা দিয়ে পুঁছে আর শব্দ করে দাওয়ায় বসে পড়ে। তারপর গোপীনাথের দিকে চেয়ে মিটমিট করে হাসতে হাসতে বলে, 'বলতো গোপীনাথ এর মানে কি—সাগরের চেয়ে নারী ডাগর জিনিষ?'

'তার মানে তোমার ভিমরতি ধরিয়াছে। বুড়া বয়সে দুবার বিয়া করিয়া তুমি ছাগল হইয়াছো।' মাছের চুবড়ি নামাতে নামাতে গোপীনাথ বললে।

বলাই সামনে দুপা ছড়িয়ে আরাম করে বসে। তার ফুলো ফুলো গালের মধ্যে থেকে চোখ দুটো হাসিতে উজ্জ্বল। 'মাছের ঝাল আর শুকতো রাঁধিতে রাঁধিতে তুমি বুড়া হইয়া গেলে গোপীনাথ। দেশে কতদিন যাওনি?' তারপর নিজের মনেই বলাই বললে, 'তোমাদের খুরে প্রণাম। তোমরা ধার্মিক লোক। আমরা পাপীতাপী মানুষ।' আবার দেয়ালে ঠেস দিয়ে আরামে নিঃশ্বাস ফেলে। চাঁদ সওদাগরের পালা থেকে গুনগুন করে গান ধরে, 'ডহরে ডুবিল ডিঙ্গা.....'

'আজ যে খুব খুশি বলাই,' স্বর্ণসুন্দরী উঠে আসেন দাওয়ায়।

'মায়ের ইচ্ছে! আমার আর ভাবনা কি!' তারপর অন্যমনস্কভাবে দূরে ঝাঁকালো জামগাছটার দিকে চেয়ে বলে, 'কারুর সৌভাগ্য কেউ দেখতে পায় না মা। আমারই প্রতিবেশী, সাইকেলের দোকান দেয় মদন, উঠতে বসতে বলে, ঝড় গিয়ে ঝাঁপ, বয়স গিয়ে বিয়ে। আমার কি এমন বয়স মা? কাগজে কাল বেরিয়েছে পারস্যে একশো বছরের এক বুড়ো বিয়ে করেছে।'

'ওসব বাজে কথায় কেন কান দেও। বলাই, কি মাছ আনলে?'

সেরখানেক চিংড়ি আর একটা ধড়পড়ে রুই চুবড়ি উপুড় করে বলাই ফেলে দেয় স্বর্ণসুন্দরীর পায়ের কাছে।

মাছ তাঁর যতো ভালো লাগে ততো ঔদাসীন্য দেখাতে স্বর্ণসুন্দরী অভ্যস্ত। বলাইও তা জানে। স্বর্ণসুন্দরী মাছের দিকে না তাকিয়ে বললে, 'নারকোল এনেছো?'

'তা আর বলতে মা! বলাইকে খালি একবার বলতে হয়।'

প্রতাপ বিলেত যাবার আগে রকমারি মাছ ও তরিতরকারি আসছে গত কদিন থেকে। স্বর্ণসুন্দরীর শোকের যেটুকু বাকী ছিল তা চিংড়ি মাছের মালাইকারীর গন্ধে উবে যায়। অবশ্য বাপের সঙ্গে নিজের ছেলেবেলার স্মৃতি তাঁর মনের মধ্যে আজীবনই জ্বলন্ত ছিল ও থাকবে। সেই মজঃফরপুরের বাগানে গোলাপ, মুঙ্গেরে ডালিয়া আর দোলনচাঁপার ঝাড়ে ঝাড়ে সাত বছর বয়সে প্রজাপতির সন্ধান এগুলো স্মৃতির পরতে পরতেই রয়েছে। কিন্তু শোক বলতে যেসব টাটকা অনুভূতি বোঝায় যেমন চোখ জ্বালা, মাথা ভার, অক্ষিদে, চোখের পাতায় বেদনা এগুলো এক একটা দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গে দূরে সরে যেতে থাকে। তার ওপর দক্ষিণ কলকাতায় নতুন বাড়ি তোলার চাপা উদ্দীপনা, সবটা মিলে মিশে থাকায় স্বর্ণসুন্দরী কোমর বেঁধে নবীন উৎসাহে সংসার করতে লেগে যান।

বিকেল বেলাতেও বলাই একবার আসে, বাড়ি ফেরার মুখে এক পাত্তর চা খেয়ে যায়।

'এবার মার আর আমাদের মনে থাকবে না। বড়দা ম্যাজিস্টর, কলকাতায় নতুন ঝকমকে বাড়ি। মা-কি আর এই ভিখিরিদের মনে রাখবে?'

'এমন কথা কেন বলছো, বলাই। আবার আর এক মা আসবে তোমার,' স্বর্ণসুন্দরী বললেন।

'সব ঝিনুকে মুক্তো নেই মা, সব ঝিনুকে মুক্তো নেই।'

গত কয়েক বছরের অভ্যাসবশে বলাই তার এক পারিবারিক সমস্যার কথা স্বর্ণসুন্দরীর কাছে তোলে। তার প্রতিবেশী সাইকেল মিস্ত্রি মদন লোকটা সুবিধের নয়। একটু বেশী উৎসাহ দেখিয়ে তার স্ত্রীর সম্পর্কে বলাই কথাবার্তা বলছিল তখন 'মদন কি বললে জানো মা, মদন বললে—যে

সতী তার চোখও নেই, কানও নেই। বলো মা, এটা কোন্ কথা?'

ঘন্টো লেগেছে। বাইরে জলাপোষের ওপর লন্ঠনের চারদিক ঘিরে ছোটরা পড়তে বসেছে। টুটুলের একটানা গলার আওয়াজ আসে, 'বি-এল-আই ব্লাই, বি-এল-ও ব্লো, বি-এল-আই ব্লাই, বি-এল-ও ব্লো...'। পাশের ঘর থেকে বেহালাচর্চার আভাসও পাওয়া যায়। অফিসার মহলে বেহালাবাদনের যে রেওয়াজ চালু হয়েছিল ভবনাথের বাড়িও তার ব্যতিক্রম নয়। পাশের ঘরে গোপাল মাস্টার গৌরীকে বাজনা শেখাচ্ছেন। মাদুরে বসে থুতনিতে বেহালা ঠেকিয়ে গোপালমাস্টার রবীন্দ্রসংগীত বাজান, 'এসো নীপ বনে এসো ছায়া বীথিতলে', শীতের সন্ধ্যেবেলা বারেবারে সেই নীপবনে আহ্বান স্বর্ণসুন্দরীকে বিষন্ন করে তোলে। আবার সেই ছেলেবেলার দিনগুলো এক এক করে মনে ভেসে ওঠে। গোপীনাথ যেবার প্রথম এলো সেবার তাকে নিয়ে বিহারে আরায় কালেকটার শ্বশুরের বাড়ি গিয়েছিলেন। সুন্দর করে ছাঁটা মোটা খড়ের চাল, সাদা কাঠের দরজা, সিঁড়িতে কাঠের টবে টবে পাম গাছের সারি —এক এক করে বাড়ির সব কটা ঘর, বাগানে পেয়ারা গাছের নীচ দিয়ে রাস্তা, কুয়োর পাড় সব মনে পড়ে। আস্তে আস্তে গোপীনাথকে ডাকেন। গোপীনাথ কাছে এলে প্রায় একটা স্বগতোক্তি করলেন, 'আরাতে কি প্রতাপ বেবি-শোতে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল?

'মুঙ্গেরে পারা! মুঙ্গেরে প্রতাপ সেই ভেলভেটের সুট পরিয়া গিয়াছিল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ মুঙ্গের মুঙ্গের। তোমার এত কথা মনেও থাকে গোপীনাথ!'

আস্তে আস্তে বাইরের বারান্দা দিয়ে বৈঠকখানায় আসেন। ধবধবে সাদা ঢাকনি দেওয়া টেবিল ল্যাম্পের সামনে বসে ভবনাথ রায় লিখছেন। তাঁর চওড়া কপালের পাশে কোঁকড়া চুলগুলো স্বল্প আলোতেও দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে স্বর্ণসুন্দরী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। এ লোকটা আর তাঁর বাবার মাঝখানে কি আকাশপাতাল ব্যবধান, দুজনের মেজাজে কি পার্থক্য। ভবনাথ বাড়িতে আছেন কি নেই স্বর্ণসুন্দরী মাঝে মাঝে ঠাওর করতে পারেন না। আর অক্ষয় বসুর হাঁকডাকে সারাক্ষণ বাড়ি সরগরম থাকত। এই সময় তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে গল্প করতেন, নিজে ঠাট্টা-তামাশা করে চেঁচিয়ে হাসতেন, স্ত্রী হেমাঙ্গিনীকে ঠাট্টায় তেল্লাফেচাং করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। সেদিক থেকে ভবনাথ তাঁর স্ত্রীকে বরং সমীহ করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দূরত্বও অনুভব করেন স্বর্ণসুন্দরী। স্বর্ণসুন্দরী সেই আলোকিত স্নিগ্ধ কালো মুখখানার দিকে চেয়ে চেয়ে গভীর মমতাও বোধ করেন আর টের পান তাঁদের জীবনের সবচেয়ে ভাল সময় এখন চলেছে, এই উঠতির সময়, এই সম্ভাবনার সময়। অন্তত এই সময়টা তাঁর বাপের মুঙ্গের মজঃফরপুরের সময়। এরপর ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলে সব কেমন ছাড়া ছাড়া হয়ে যায়। ছেলেরা ভাল চাকরী বাকরীও পায়, মেয়েরা ভালভাবে পাত্রস্থ হয় কিন্তু মানুষ একলা হয়ে পড়ে যেমনভাবে তাঁর বাবা শেষ জীবনে একলা হয়ে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত জামাই ঘরে বসিয়ে এই একলাভাবখানা কাটাবার চেষ্টা হয়। আর তারপর জবার জয়যাত্রা। হেমাঙ্গিনীর ছোট ফর্সা দলমলে চেহারাটা ঝলমল করে ওঠে মনের মধ্যে। নিজের ভরাট হাতখানা বারান্দার মৃদু আলোতে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেন।

'মা, মরে গেলে কি ভূত হয়? দাদু এখন ভূত হয়ে গিয়েছে?' টুটুল তার প্রশ্ন নিয়ে মার কাছে উঠে আসে।

'এসব বাজে কথা কে শিখিয়েছে তোমায়?' স্বর্ণসুন্দরীর কঠিন স্বরে টুটুল সামান্য ঘাবড়ে যায়। তারপর বলে, 'ঐ যে বড়দা, দিদি, বুড়ী, দরজা বন্ধ করে দাদুর ভূত আনছে। চোঙাকেও নিয়েছে মা, আমাকে নেয় নি।'

স্বর্ণসুন্দরী ভুরু কোঁচকালেন। বললেন, 'দূর, প্রতাপ ভূতের গল্প করছে।'

বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে গৌরী দরজা খোলে। চাপা উত্তেজনা তার মুখেচোখে।

কি করছো তোমরা? টুটুলকে বাইরে রেখেছো কেন? ওর পড়া হয়ে গেছে।'

গৌরী মার কথায় থতমত খেয়ে যায়। তার খেলোয়াড়ী হাতখানা বাড়িয়ে টুটুলকে ঘরের ভেতর ঠেলে দিতে দিতে ঘাড় দুলিয়ে সুন্দর মিথ্যে কথা বলে, 'দাদা কি দারুন ভূতের গল্প বলছে মা, তুমি শুনবে? টুটুল ভয় পাবে বলে আমরা ওকে নিই নি।'

স্বর্ণসুন্দরী আঁচ করেন, ভূতের গল্প ছাড়াও বোধ হয় আরও কিছু চিত্তাকর্ষক ব্যাপার ঘটছে আর অম্লানমুখে এবং যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণভাবে মিথ্যে কথা বলার ক্ষমতাটা তাঁর এ মেয়ে বেশ ভাল ভাবে রপ্ত করেছে। কিন্তু দারোগাগিরি করতে করতে তাঁর পা ধরে গেছে। তাছাড়া মটরের ডালটা সেদ্ধ হয় নি, ওটা আলাদা করে রাখতে হবে বলাইকে বলে ফেরত দেবার জন্যে। স্বর্ণসুন্দরী ভেতরের বারান্দার দিকে পা বাড়ান।

আর সেই ইন্দ্রজাল অন্ধকারে পা দিতেই টুটুল চোঙার গলা শুনলে, 'শ-শ-শ-শ... দাদুর ভূত এসেছে।' অন্ধকারে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে টুটুল।

এবার গৌরীর গলার আওয়াজ আসে, 'দাদুমণি, তুমি কি এসেছো? যদি এসে থাকো তাহলে টেবিলের দু-পা ঠুকবে।'

টুটুল চোখ বড় বড় করে তাকায়। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার এখন জ্বালিকাটা, উঁচু দেয়ালের মাথায় ফোকর দিয়ে এক বিঘৎ আলোর দ্বীপ তৈরী হয়েছে অনেক ওপরে, সেখান থেকে আলোর লক্ষ লক্ষ বিন্দু সারা

ঘরে ছড়িয়ে পাতলা ফিকে করেছে ঘরের গাঢ় অন্ধকার। এখন দৃষ্টিতে আসে একটা গোল তেপায়া মেহগিনি টেবিলের চকচকে গা তার ওপর ঝুঁকে পড়ে আছে গৌরী, প্রতাপ আর বুড়ী। টেবিলের কানা একটু একটু করে উঠল আবার নামল, এই আবছা অন্ধকারেও ঠাওর হয়।

'ওরা বুড়ীকেও নিয়েছে, আমাদের নেয় নি। আমার বয়ে গেছে! দাদুর ভূত আমাদের ঘেঁচু করবে।' চোঙা টুটুলের গা-ঘেঁষে যথেষ্ট জোরে ফিসফিস করে বললে। প্রতাপ অপ্রসন্নভাবে মুখ তুলে তাকায়।

প্রতাপ সম্প্রতি প্ল্যানচেটের ওপর খবরের কাগজের এক প্রবন্ধ গৌরীকে পড়িয়েছে। মৃত ব্যক্তির আত্মাকে যেরকমভাবে প্রশ্ন করা হয় সেই রকম একটা ঢালাও প্রশ্ন করে, 'তুমি কি এখন সুখে আছো, না দুঃখে আছো? সুখে থাকলে একবার আর দুঃখে থাকলে দুবার টেবিলের পা ঠোক।'

এবারে চোখ গাড়াগাড়া করে চেয়ে থাকে টুটুল। গৌরীর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে প্রেতলোক সম্পর্কে টুটুলের মনে অনেক রকম প্রশ্ন খেলে যায়। মানুষ মৃত্যুর পর কোথায় থাকে কেমন ভাবে থাকে, তারা কি কলকাতায় থাকে না রাণাঘাটে থাকে, ইত্যাদি নানান নিরুত্তর প্রশ্নে সে এক ধরনের অস্থিরতা বোধ করে। টেবিলের কানা এবার নড়ে না চড়ে না। সেদিকে চেয়ে চেয়ে টুটুলের চাপা অস্থিরতা বেড়ে যায়, একটু ভয় ভয়ও যে করে না এমন নয়।

প্রতাপ গম্ভীরভাবে বললে, 'স্পিরিট আমাদের ওপর চটে গেছে। চোঙা, তোকে বারবার বললাম, কথা বলবি না। তোর জন্যেই এমন হল। আবার ধ্যান করো। কনসেনট্রেট'।

একটা চাপা হাসির রেখা গৌরীর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঠোঁটের দু-পাশে ফুটে ওঠে। এইরকম মিথ্যে মিথ্যে করে সত্যির স্বপ্ন দেখা তার ভাল লাগে। যেমন দাদার সঙ্গে শলা করে দাদুর ভূতকে টেনে এনেছে, এমনিভাবে যদি তার স্বপ্নের রাজপুত্তুরকে নিয়ে আসত। গৌরীর মনে স্বপ্নের রাজপুত্তুর বরাবরই ছিল। ইংরেজী অনার্সের সে ছাত্রী। শেলীর কবিতা অসম্ভব ভাল লাগে কারণ শেলী অসম্ভব রকম দেখতে সুন্দর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সঞ্চয়িতা'র বর্ষার কবিতাগুলো পড়তে তার সবচেয়ে ভাল লাগে। কিন্তু রবিঠাকুর মানেই তো একটা বুড়ো, সাদা দাড়ি। তাকে ঠিক মনের মধ্যে রাখা যায় না যেমন শেলীকে যায়। আর সে যাকেই বিয়ে করুক না কেন, সে জজ হোক, ম্যাজিস্ট্রেট হোক, ব্যবসায়ী হোক, যা-ই হোক তাতে তার কিছু এসে যায় না, কিন্তু সে সুন্দর হবে। ঐ রকম শেলীর মতো কোঁকড়া চুল, ঢলঢল চোখ, লম্বা ছিপছিপে। সে রকম সুন্দর বরের জন্যে দরকার হলে বাসন মাজতেও—না, এই পর্যন্ত এসেই সচরাচর গৌরীর সৌন্দর্যপ্রীতি সহসা চোট খায়। মুক্তো ঝি-র মতো কুয়োর পাড়ে একগাদা ছাই তেঁতুল নিয়ে সে বসতে পারবে না। ঘরও মুক্তোর মতো উপুড় হয়ে হয়ে মুছতে পারবে না। আর সব পারবে, রুমালে টেবিলের ঢাকনির ওপর সুন্দর এম্ব্রয়ডারী করে দেবে, সম্প্রতি সে বিশেষ ধরনের উনুনে প্লাম্‌কেক করতে শিখেছে তাও বানিয়ে খাওয়াতে পারে। কিন্তু আর এক ব্যাপারে গৌরী একটু ঘাবড়ে যায়। বিয়ে করতে পারল না বলে এন্তার আত্মহত্যার খবর কাগজে বেরোচ্ছে, প্রেমিক প্রেমিকা হাত ধরাধরি করে কলকাতায় ঢাকুরিয়া লেকে ডুব দিচ্ছে। অতখানি সে পারবে না। অন্ধকারে লম্বা ফর্সা আঙুলগুলো চেয়ে চেয়ে দেখে গৌরী। নখের চারার নীচ থেকে রক্তাভা ফেটে বেরোচ্ছে। নাঃ, আত্মহত্যা করতে পারবে না, শেলীর জন্যও না। গৌরী মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে।

প্রতাপের হাতের চাপে সে বুঝতে পারে প্রেতলোক থেকে আবার তাদের দাদুমণির নেমে আসার সময় হয়েছে। আবার সে প্রশ্ন করে, 'তুমি কি সুখে আছো, না দুঃখে আছো? সুখে থাকলে একবার আর দুঃখে থাকলে দুবার পা ঠুকবে।'

টুটুল আর চোঙা অবাক হয়ে দেখে টেবিলের কানা দুবার উঠল, ঠুকঠুক করে দুবার শব্দও আসে।

'তুমি কেন কষ্টে আছো? দিদিমনির জন্যে? দিদিমনিকে আমরা সবাই দেখবো, তুমি কষ্ট পেও না, বুঝেছো? এবার বল তো, দাদা আই-সি-এস পাশ করবে কি করবে না?'

এ প্রশ্ন আচমকা, অভাবিত, তাদের প্ল্যানের বাইরে পা বাড়ানোয় প্রতাপ অপ্রসন্নভাবে তাকায় গৌরীর দিকে। আর যদিও এ প্রেতলোকের বাসিন্দাকে হলঘরে টেনে আনার কারচুপি সম্পর্কে গৌরীর হঠাৎ লজ্জা জাগে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করে ফেলেছে বলে নিজের আত্মবিশ্বাসেও আনন্দ পায়। আবার উত্তেজনায় বুক ধক্‌ধক করে। গলার স্বর প্রাণপণে না কাঁপিয়ে বলে, 'পাশ করলে একবার আর না পাশ করতে পারলে দুবার পা ঠুকবে।'

ঘরের মধ্যে হঠাৎ এমন নিস্তব্ধতা বিরাজ করে যে টুটুল আর চোঙা দুজনেরই মনে হতে থাকে মাঝরাত্তির। বুড়ীও অস্থির আগ্রহে টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, তাতে ভারসাম্যের অভাব ঘটে। প্রতাপও এতক্ষণ পর টেবিলের দিকে দৃষ্টি দেয়। শক্ত হাতে বুড়ীকে সরিয়ে নিয়ে চোখ বুজে বসে গৌরী। টেবিলের কানা উঠতে আরম্ভ করে। চোঙা চেঁচিয়ে উঠল, 'উঠছে, উঠছে।'

'শ-শ-শ...' গৌরী ফঁস করে ওঠে।

ঠুক করে একবার আওয়াজ এল। ঘরের সকলের দৃষ্টি এবার তেপায়া টেবিলের মাথার সঙ্গে যেন জুড়ে থাকে। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটতে থাকে। পুরো এক মিনিট টেবিলটা স্থির। গৌরী হঠাৎ সবকিছু ভুলে টেবিল ছেড়ে লাফিয়ে হাততালি দিয়ে ওঠে, 'দাদা আই-সি-এস, দাদা আই-সি-এস, বুড়ী চোঙা টুটুলও তার সঙ্গে চেঁচাতে থাকে।

গৌরী হঠাৎ চেঁচানো থামিয়ে প্রতাপকে বলে, 'তুমি দাদা কিন্তু মা-বাবাকে বলে যাবে, তোমার আই-সি-এস না হয়ে ফেরা পর্যন্ত আমাকে বিয়ে দিয়ে দেবে না যার তার সঙ্গে।'

'ফিরে এসে তোর সঙ্গে লালমোহনের বিয়ে দেব,' প্রতাপ বললে।

পরদিন দুপুরে হাল্কা শীতের রোদ্দুর পোয়াচ্ছে সারা মাঠখানা, ব্রহ্মদৈত্যের অধিষ্ঠান বেলগাছ যত ন্যাড়া হচ্ছে ততই ডালে ডালে ঝুমঝুমে ফল ভরে উঠছে। ভবনাথের বাগান সাধনা সার্থক, ঠাসা প্রায় এক বিঘত শাদা ধবধবে কপি এসেছে বেশ কয়েকটা সারিতে, বেগুনের ফলনও খুব ভাল। বাইরের বারান্দায় দু-ভাই পাটার লাঠি নিয়ে তরোয়াল খেলায় মত্ত, গৌরী লাল ফুল তোলা গোলাপী কেম্‌ব্রিকের ফ্রক পরে বারান্দার এক কোণে এমব্রয়ডারিতে কথামালার 'আঙুর ফল টক' উপাখ্যানের ছবিখানা তুলতে ব্যস্ত। প্রতাপ তক্তাপোষে লম্বমান, রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে ছবি ভর্তি 'এক সপ্তাহে লণ্ডন' বইখানার পাতায় মগ্ন। বুড়ী তার রোগা হাটুখানা দিয়ে মাকে জড়িয়ে অঘোরে ঘুমন্ত।

তরোয়ালে দুজন সৈনিকই আহত, চোঙা বললে, 'তুই যুদ্ধে মারা গেছিস, আমি তোকে টেনে নিয়ে যাব।'

বারান্দার ঠান্ডা মেঝের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে টুটুল বললে, 'তুই-ই আজকে মর। আমি তো কাল মরেছিলাম।'

চোঙা এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। একবার আড়চোখে প্রতাপ ও গৌরীর দিকে চেয়ে আঙুল তুলে ইশারা করে। তারপর দু' ভাই বারান্দা থেকে নেমে পড়ে। বাড়িটার চারদিকে পাকা চাতাল, একেবারে শেষ প্রান্তে রাজমিস্ত্রিরা কাজে লেগেছে। ছাতে ফাটাফুটো সারাচ্ছে।

'আয় আমরা লাফ কাটি,' বলে চোঙা তড়বড় করে ছাতের সঙ্গে আড়-করে-রাখা মইটার তিন ধাপ উঠে পড়ে লাফ কাটে নীচের সানবাঁধানো চাতালে। পাশেই খটখটে শুকনো পাকা ড্রেন। মইতে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে টুটুলের হঠাৎ পা ভারী লাগে। সকালবেলায় জলের প্রথম ঘটি গায়ে ঢালতেই বুক পিঠ কেমন ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করে উঠেছিল সে কথা তার স্মরণে আসে না। ভারী পা টানতে টানতে পঞ্চম ধাপে উঠে পড়ে নীচের দিকে তাকায়। চোঙার মুগ্ধ দৃষ্টির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বেশ নীচে শানবাঁধানো চাতালের দিকে চাইতেই তার মাথা ঘুরে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে টাল না সামলেই পড়ে। কেউ আচমকা ঠেলে দিলে যেমন হাত দুটো উঠে যায় ওপরে আকাশ খামচে ধরবার জন্যে তেমনিভাবে তার হাত

দুখানা ওপরে উঠে গেল। আর নীচে পড়েই তার সমস্ত গা ভারী হয়ে ওঠে, যেন গায়ের একটা আলাদা ভার তাকে চেপে ধরে। দাঁড়াতে গিয়ে বসে পড়ে। চোঙা দৌড়ে এসে একবার তার হাঁটু মালিশ করে, আর একবার টানাটানি লাগিয়ে দেয় গোড়ালি ধরে। কিন্তু টুটুলের করুণ মুখখানা দেখে সে থমকে যায়। টুটুল সেই শুকনো খট-খটে ড্রেনের মধ্যে পা ঝুলোতে ঝুলোতে আর কনুয়ে ভর দিয়ে হেঁচড়ে বারান্দায় উঠে। এবার উঠে দাঁড়াতে বিশেষ ব্যথা লাগে না। আস্তে আস্তে খাটের ওপরে উঠে যখন সে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকে তখন তার কাছে হারিয়ে যায় সাম্প্রতিক ঘটনাটার গুরুত্ব। মই থেকে লাফানো বাল্যকালের অনেক ধরনের লাফানোর একই পংক্তিতে দাঁড়িয়ে যায়।

কিন্তু ব্যাপারখানার গুরুত্ব ঘণ্টা দু-তিনেক যেতে না যেতেই বাড়ির সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বর্ণসুন্দরী সাত-সতেরো কাজ সেরে শোবার ঘরে এসে অন্ধকার ঘরে খাটের ওপর অসময়ে টুটুলকে শুয়ে থাকতে দেখেই চমকে উঠল। ছেলেগুলোর দিকে বেশী নজর দিতে পাচ্ছেন না মনে করে ভেতরের বারান্দায় গিয়ে এক ঘটি জলে গামছা ভিজিয়ে চিপে ছেলের গা মুছাবার জন্যে টুটুলের গায়ে হাত দেন। জ্বর বেশী নয়, সামান্য গরম গা। স্বর্ণসুন্দরী দ্বিধা করেন। আস্তে আস্তে টুটুলকে উঠিয়ে মোছাবার জন্যে তার ডান পাখানা কোলে তুলে নিতেই টুটুল হা-হা করে ওঠে যন্ত্রণায়।

তারপর যে-সব ঘটনা ঘটে তা টুটুলের কাছে স্বপ্নবৎ। একবার দেখল সে ইজি-চেয়ারে শুয়ে, পাশে ঝুঁকে পড়ে ভবনাথ, প্রতাপ, স্বর্ণসুন্দরী কাঁদছেন।

'কি করে হল, কি করে এমন হল? কোনখান থেকে পড়েছিস?' প্রতাপের তীক্ষ্ণ গলা টুটুলের কানে আসে। চোখ খুলে তাকাতেই ইজিচেয়ারের হাতলের সামনেই চোঙার করুণ মুখখানা ভেসে ওঠে। প্রকৃত-পক্ষে তার ভাইয়ের চেয়েও করুণ দেখায় চোঙার মুখ। 'ফাঁসীর অপেক্ষায়' বলে অনেক বিপ্লবীর যে চেহারা এক ম্যাগাজিনের পাতায় দেখেছিল সেই রকম লাগে টুটুলের কাছে দাদার মুখ।

'এই ইজিচেয়ারের হাতল থেকে লাফাতে গিয়ে'...ব্যথায় ও আত্মবিশ্বাসের অভাবে ক্ষীণ শোনায় টুটুলের গলা।

'অসম্ভব! এইটুকুন লাফানোয় এত ব্যথা হতে পারে না!'

টুটুলের কিন্তু মন্দ লাগে না অত ব্যথা সত্ত্বেও। তাকে নিয়ে হৈ-চৈ হচ্ছে এমন কি তার মা যা-কে সে বাবার চেয়েও অনেক বেশী ভয় করে তিনিও কাঁদছেন। মা-কে কাঁদতে খুব কম দেখেছে টুটুল। দাদুর মৃত্যু বাদ দিলে রোদনভরা মায়ের মুখ অদ্যাবধি চোখে পড়ে না। তারপর এই সময় বৈঠকখানার সাদা ধবধবে টেবিল ল্যাম্প আলোকিত ব্লটিং পেপারে মোড়া, কাচের পেপারওয়েট সমাকীর্ণ, ফাইল-প্লাবিত ভীষণ রাশভারী টেবিলখানার মায়া ছেড়ে দিয়ে তাঁর বিপদে-ভরা চোখ দুটি মেলে বাবা বসে আছেন তার পাশে। সাতদিন পর যে জাহাজে বিলেত পাড়ি দেবে, মরুভূমির পাশ দিয়ে যার জাহাজ যাবে, সেও তার শারীরিক যন্ত্রণায় ক্ষুব্ধ। গৌরী বুড়ী কেউ বাদ নেই। সবচেয়ে তার তৃপ্তি চোঙাকে দেখে। তাকে প্রায় ফাঁসী দিয়ে দিতে পারে এই রকম মেজাজে সে কয়েকবার তার দিকে তাকায়, আর সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসীর আসামীর মতো আরও করুণ লাগে চোঙাকে।

হরিচরণ ডাক্তার আসেন সে রাত্তিরেই। ভদ্রলোক খুব খেতে ভালবাসেন এবং নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় প্রায়ই পেট ছাড়েন। সেদিন তাঁর 'ওয়াইফ' লাউডগা দিয়ে এমন চমৎকার ইলিশ রেঁধেছিলেন যে নিতান্ত অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ স্মরণ করেও সেই গোটা ইলিশটার অর্ধেকের বেশী উড়িয়ে দিয়েছেন। দুপুর থেকে বেগ শুরু হয়েছে। মিকশ্চার বানিয়ে খেয়ে এখন অনেকটা প্রশমিত করেছেন সে বেগ। লন্ঠনের আলো বলাইয়ের মুখে ফেলে বলেন, 'এত রাত্তিরে আবার কি হল!'

বলাই এ-সব ক্ষেত্রে ভীষণ রাশভারি। বললে, 'সাহেব, সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

দোনোমোনোর স্থান নেই। সরকারী চাকরী, আর ভবনাথ ভাগ্যবিধাতা। ওষুধের বাক্স আর স্টেথিসকোপ নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চেপে এলেন হরিচরণ ডাক্তার। দেখে অবশ্য কিছু বোঝা গেল না। গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ধুমধুমে ফোলা, আঙুল লাগালেই চীৎকার, একশো জ্বর। হরিচরণ গুলাড্স লোশানের ব্যবস্থা করলেন।

হঠাৎ মাঝ রাত্তিরে টুটুলের ঘুম ভেঙে যায়। গোড়ালি থেকে ডান পায়ের হাঁটু পর্যন্ত কেউ যেন হাতুড়ি পিটছে। যন্ত্রণায় চোখ দিয়ে জল গড়ায় টুটুলের। ভারি নিঃসঙ্গ লাগে তার। বাইরে কটকটে চাঁদনি। সে আলোতে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন বাবা-মার দিকে চেয়ে সে আরও হু-হু করে কাঁদতে থাকে। বাইরে চাঁদনিতে একটা পেঁচা উড়ে গিয়ে বাগানের গায়ে তাল-গাছটায় বসে। এ দৃশ্য সে সন্ধ্যাবেলাতেও প্রত্যক্ষ করেছে এবং সেই চাঁদনিতে উড়ন্ত পেঁচা পরম নির্ভরতায় গাঢ় ঘুমে মগ্ন বাবা-মা এসব থেকে তার যন্ত্রণার জগতে সে এখন একক, একথাটা টের পেতেই সে চেঁচিয়ে ওঠে। ভবনাথের ঘুম ভাঙে, উঠে টর্চ জ্বালালেন। টুটুল তার ডান-পা তুলে খাটের ছত্রীর গায়ে হেলান দিয়ে রেখেছে। ভবনাথ দুটো বালিশ উঁচু করে ছেলের পায়ের নীচে দেন, তারপর তার ছেলের চুলে বিলি কাটতে কাটতে ঘুমিয়ে পড়েন।

পরদিন পুজের টাটানি আর গুলাড্স লোশানে ঘন ঘন পা-ডোবানি যত বাড়ে ততই নীলচে ধূসর রং ধরে টুটুলের ডান পাখানার হাঁটু পর্যন্ত। কলকাতার বিখ্যাত সার্জেন ললিত বাঁড়ুজ্জেকে দেখানোর কথা উঠতেই স্বর্ণসুন্দরী কান্না শুরু করেন। প্রতাপ ঘন ঘন বলতে থাকে, 'ব্যাপারটা সীরিয়াস্, হাতুড়ে ডাক্তারের কাজ না।' পরদিনও গড়িয়ে যায়। একখানা ছোট খাটে যন্ত্রণায় ছটফট করে টুটুল। খাটের বাজুতে কেউ হাত দিলে চেঁচাতে থাকে। মাঝে মাঝে তার যন্ত্রণাকাতর চোখ ঘুরে ফিরে খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে চলে যায় যেখানে স্বাস্থ্যের সাদা মখমলে ঢাকা মুঙ্গলীর বাছুরটা ঘাস খায় আর চমকে চমকে উঠে তাকায় মাথা তুলে। হঠাৎ স্বর্ণসুন্দরী ধবধবে বিছানার চাদরে কি একটা দেখে চমকে ওঠেন। একটা পোকা যাচ্ছে, মাথার মধ্যে তাঁর ঝিমঝিম করতে থাকে। তাহলে ছেলেটাকে বাঁচানো গেল না, কিম্বা বাঁচালেও পা-কাটা ল্যাংড়া ছেলের মা বলে তিনি পরিচিত হবেন। কান্না চাপতে চাপতে ভবনাথের বৈঠকখানায় গিয়ে আছড়ে পড়লেন, 'একবার দ্যাখো, ছেলেটা মরল কি বাঁচল, একবার দ্যাখো নিজের চোখে।'

ভবনাথ দেখলেন, মাথা নীচু করে বিছানার চাদরের ওপর চোখ বুলিয়ে। বোধহয় বুড়ী একটা গন্ধরাজের তোড়া টুটুলের মাথার বালিশের কাছে রেখেছিল। তা থেকে দু' তিনটে পোকা বেরিয়ে নীচের দিকে নামছে। কিন্তু ছেলেটার জন্যে উদ্বিগ্নতা বেড়ে গেল তাঁর। সন্ধ্যের পর আবার হরিচরণ ডাক্তার এলেন। পায়ের দিকে এক নজর চেয়েই চমকে উঠলেন। অবিলম্বে অপারেশন না করলে পা পচে যেতে পারে, খাটের কাছে মাথা নীচু করলেই চাপা মৃদু দুর্গন্ধ আসে নাকে।

পরদিন সকালে রাত জাগা চোখ মেলতেই টুটুল অবাক হয়। ধুতি আর নীল টুইলের হাফ-শার্টের ওপর সাদা ফাটা আল-খাল্লা চাপিয়ে হরিচরণ ডাক্তার একজন জেনারেলের মতো তাদের শোবার বড় ঘর-খানায় ঢুকলেন। তাঁর পেছনে চকচকে ঝকঝকে স্টেনলেস স্টিলের সার্জারি বাক্স দু' হাতে ধরে ঢোকেন কম্পাউন্ডারবাবু, পেছনে আরও দুজন লোক, তাদের হাতে ট্রেতে বেঞ্জিন টিঞ্চার আয়োডিনের শিশি-বোতল, তুলোর বান্ডিল, একজনের হাতে বসবার টুল, স্টোভ, সাদা এনামেলের রকমারি পাত্র, অন্যদিন গালে দাড়ির খোঁচা আর পেটরোগা অবস্থার দরুণই বোধহয় অত্যন্ত কাঁচুমাচু মুখখানায় মাঝে মাঝে অসহিষ্ণুতার ঝিলিক খেলে যায় চোখে। আজ চকচকে গাল, টাকের ওপর দু-গাছি চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, চোখ দুটো আত্মবিশ্বাসে ভরা সমাহিত। হরিচরণ ডাক্তার যেন স্থানীয় যাত্রার দলে নদের নিমাইয়ের নিমাই: যাত্রা শুরু হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্ত পর্যন্ত প্যাচ-প্যাচ করে পানের পিক ফেলছে, ফোঁ ফোঁ করে বিড়ি টানছে, তারপর ঘন্টা বাজতেই চেহারার অলৌকিক পরিবর্তন।

(ক্রমশঃ)

কাশ্মীর : শ্যামাপ্রসাদ : আবদুল্লা

পুলকেশ দে সরকার

[যে-কাশ্মীর-সমস্যার প্রশ্নে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন-দীপ অকস্মাৎ কাশ্মীরে বন্দীদশায় নির্বাপিত হয় তা আজ ২৩ বছর পরও অমীমাংসিত। সংশ্লিষ্ট নায়কদের মধ্যে একমাত্র কাশ্মীরের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেঁচে আছেন। শ্যামাপ্রসাদ নেই, পণ্ডিত নেহরু নেই, ডাঃ কাটজুও নেই। কিন্তু কাশ্মীর প্রশ্নটি রাষ্ট্রপুঞ্জের ঠাণ্ডাঘরে যেমন ছিল তেমনি আছে এবং অদূর ভবিষ্যতে বা কোনকালে তার মীমাংসা হবে এমন কোন লক্ষণই লক্ষ্যণীয় নয়।]

১৯৪৭-এর শেষদিনে খবর প্রচারিত হল : 'ভারত সরকার রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থার নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রশ্ন উত্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

১৯৪৮-এর ২রা ফেব্রুয়ারী পণ্ডিত নেহরু অবোধ ভারতীয়দের আশ্বস্ত করে বললেন : এই কাশ্মীর-সংক্রান্ত সরল প্রশ্নটির যথাসম্ভব সত্বর রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থা নিষ্পত্তি করে দেবেন। (১)

আজ ১৯৭১-এর ২৩-এ জুন। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৩-এ জুন শ্যামাপ্রসাদ রহস্যাবৃত মৃত্যুতে বিলীন হন। ২৩ বছরেও পণ্ডিত নেহরু-প্রতিশ্রুত 'যথাসম্ভব সত্বর' কাশ্মীর প্রশ্ন-মীমাংসা সত্য হয়ে ওঠে নি। পণ্ডিত নেহরু নেই; তাঁর বৃটিশ কূটনীতিক পৃষ্ঠ-পোষক লর্ড মাউন্টব্যাটেন নেই। ভারতের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু নেই। কাশ্মীরের তৎকালীন প্রধান-মন্ত্রী শেখ আবদুল্লা আজ কাশ্মীরে 'অবাঞ্ছিত' ব্যক্তি। তিনি আছেন। আর আছে অধিকৃত-অনধিকৃত কাশ্মীর। ভারতের দুর্ভাবনার উৎস।

কাশ্মীর-প্রশ্ন নিরাপত্তা পরিষদে পাঠানো হলে অমৃতবাজার পত্রিকা ২৭-এ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮, তারিখে লিখেছিলেন : 'মনে হচ্ছে, নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর-প্রশ্ন উত্থাপন করে ভারত সরকার ফাঁদে পড়লেন। কি করে এ থেকে বেরিয়ে আসবেন বলা কঠিন! ইতিমধ্যে পাকিস্থান কেকটাও রাখল, খেতেও থাকল।' (২)

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাশ্মীর-প্রশ্ন ইচ্ছাকৃত নানা জটিল অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের ঢেউয়ে উথাল-পাথাল হতে লাগল।

১৯৪৯-এর ১লা জানুয়ারী থেকে কাশ্মীর তথা ভারতদেহে যুদ্ধবিরতি রেখা টেনে দেওয়া হল।

১৯৪৯, ১৯৫০ গড়িয়ে গেল। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল স্বখাত সলিলে বিতৃষ্ণ প্রধানমন্ত্রী নেহরু অবোধ ভারতীয়দের উদ্দেশে আবার বলেন, এ বিষয়ে তাঁর মনে কোন সংশয় নেই যে, যাই ঘটুক না কেন, কাশ্মীর নিয়ে কোন টালবাহানা আমরা সহ্য করব না। (৩)

কিন্তু এ না-হয় পাকিস্থানের যোগ-সাজসে বৃহৎ রাষ্ট্র গোষ্ঠির আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র; নন্দ ঘোষের ওপর দোষ চাপিয়ে হয়তো নির্বিঘ্নে চিরটা কাল কাটানো যায়! পণ্ডিত নেহরুর জীবদ্দশায় যেমন, তাঁর মৃত্যুর পরও তেমনি আমরা কাশ্মীর নিয়ে টালবাহানা সহ্য করে চলছি; যারা করছে তাদেরই বন্ধুত্বলাভে উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছি। সুতরাং, পররাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক-ক্ষেত্র থাক; স্বরাষ্ট্র, জাতীয় ক্ষেত্রে আমরা শ্যামাপ্রসাদের জীবৎকালে ও মরণোত্তরকালে কাশ্মীর নিয়ে কি করেছি? কারও ঘাড়ে দোষ চাপানোর আগে আমাদের সে সম্পর্কেও এক পরিচ্ছন্ন ঠিকুজি দেখা দরকার। ইতিহাসে তা ইতিমধ্যেই লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

ভারতের সংবিধান পরিষদে 'অখণ্ড' ভারতের জন্য একটি সর্বব্যাপী সংবিধান গৃহীত ও বলবৎ হলেও (১৯৪৮-৫০) এবং তারপরও কাশ্মীরে কাশ্মীরের জন্য একটি পৃথক সংবিধান পরিষদ গঠিত হল। অর্থাৎ, কাশ্মীরকে একই নিঃশ্বাসে ভারতের অঙ্গীভূত বলেও তার পৃথক রাষ্ট্রের পটভূমি রচনা করতে দেওয়া হ'ল। ৯ই সেপ্টেম্বর এই বিসংহতির সূচনা করল। জম্মু-কাশ্মীর-লাডাকের সংবিধান পরিষদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল ঝিলম নদীতীরে ৩০০ বছরের প্রাচীন 'শেরগরাহি প্যালেসে' ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ৩১-এ অকটোবর। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্থায়ী প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হ'লেন গোলাম মহম্মদ সাদিক। তিনি ঘোষণা করলেন : পরিষদ সর্বতোভাবে সার্বভৌম এবং কাশ্মীরবাসীদের সৌভাগ্যের সূর্যোদয় অথবা দুর্ভাগ্যের ভরাডুবি ঘটাতে পারে: পারে জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে সফল করতে। (৪)

পণ্ডিত নেহরু এই উক্তি সমর্থন করলেন। (৫)

---

(1) This simply Kashmir issue would be disposed of by UNO as quickly as possible (Amrita Bazar Patrika, 3rd Feb. 1948.

(2) It thus appears that the Government of India entered into a trap when they made a reference to the security council. It is difficult to see how they can get out of it. Meanwhile Pakistan is eating the cake and having it, too, as the saying goes. — A.B.P., Jan. 27,1948.

(3) "I am clear, I am dead clear, we will tolerate no nonsenle about Kashmir, come what may". — ABP., April 3, 1951.

(4) The assembly was fully sovereign and could make or mar the fate of the people of Kashmir and fulfil the hopes pinned on it by the people (Amrita Bazar Patrika, Nov. 1, 1951.)

(5) Amrita Bazar Patrika, Nov. 4, 1951.

১৯৫২ খৃষ্টাব্দ কাশ্মীরসহ 'অখণ্ড' ভারতে দুই প্রধানমন্ত্রী বিরাজ করতে লাগলেন। এক—স্বয়ং পণ্ডিত নেহরু; দুই—শেখ আবদুল্লা। ২৫-এ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা ঘোষণা করলেন : দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে জম্মু ও কাশ্মীর সংবিধান পরিষদের অবিসম্বাদী অধিকার। ১০ই এপ্রিল স্পষ্টতর; কাশ্মীরে ভারতীয় সংবিধানের প্রয়োগ সম্পর্কে যেসব যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা তাকে 'অবাস্তব, শিশুসুলভ ও পাগলামির সামিল' ব'লে অভিহিত করলেন। এরপর পাক-সীমান্তের মাত্র চার মাইল ব্যবধানে রণবীরসিংপুরায় শেখ আবদুল্লা যে ভাষণ দেন তাকে উপলক্ষ্য করেই একদিকে শ্যামাপ্রসাদ, অপরদিকে দুই প্রধানমন্ত্রী নেহরু-আবদুল্লার বিরোধ সঞ্চারিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা তাঁর দীর্ঘ-ভাষণের মধ্যে বলেছিলেন : 'আমরা যখন সুনিশ্চিত হব যে, ভারতে সাম্প্রদায়িকতা চিরকালের জন্য সমাধিস্থ হয়েছে তখন আমরা কাশ্মীরে প্রয়োগের জন্য ভারতের সংবিধানকে স্বাগত জানাব। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত নই।।'

এবং বললেন, 'সেই জনাই তো আমি বলি যারা কাশ্মীরের স্বতন্ত্র পরিচয় হারাতে চায় আমাদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই।' (৬)

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এই ভাষণ শুনে বললেন, শেখ আবদুল্লার যে বক্তৃতা শনিবার সকালে (১২ই এপ্রিল) বেরিয়েছে তাতে তাঁর অন্তর্লোকের হতবুদ্ধিকর উদ্ঘাটন ঘটেছে। এই উদ্ভট ভাষণ পাকিস্থানের হাতকেই সবলতর করবে। (৭)

তিনি সর্বস্তরের মানুষের কাছে আবেদন জানালেন, তাঁরা যেন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে তাঁদের মুক্ত স্বচ্ছন্দ অভিমত ব্যক্ত করেন। গত চার বছর ধরে যে স্বার্থত্যাগ করতে হয়েছে তা যেন না ব্যর্থ হয় এবং ১৯৪৭-এ আমাদের দেশমাতৃকার শোচনীয় বিভাজনের যে পরিণতি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সেই সর্বনাশা পরিণাম থেকে আমরা যেন রক্ষা পাই।' (৮)

পণ্ডিত নেহরু শেখ আবদুল্লাকেই সমর্থন করেন। এবং শেখ আবদুল্লাকে বলবত্তর করবার জন্য জম্মু প্রজা পরিষদের ওপর সকল দোষ চাপালেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা এর প্রতিবাদে বললেন, শেখ আবদুল্লার দুর্ভাগ্যজনক বক্তৃতার সাফাইয়ে শ্রীনেহরুর সকল দোষ পরিষদের ওপর চাপানো সংগত হয়নি। তাঁর পক্ষে একটা অসমর্থনযোগ্য নীতির পক্ষে খোঁড়া ওকালতি করবার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াও সঙ্গত হয়েছে বলে আমরা মনে করি নে। (৯)

তারপর একদিন সকল সংশয় নিরসন করে কাশ্মীরের সৌধশীর্ষে উঠল স্বতন্ত্র নিজস্ব রাষ্ট্রীয় পতাকা; চার কোণা লাল রঙের পতাকায় শাদা লাঙল এবং সমবিস্তার ও সমদূরত্বে তিনটি দাগ—জম্মু, কাশ্মীর, লাডাক। প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা ঘোষণা করলেন, এই-ই কাশ্মীরের জাতীয় পতাকা। তিনি জম্মুবাসীকে এই বলে হুমকি দিলেন যে, তারা আন্দোলন চালিয়ে গেলে জম্মু-কাশ্মীরের সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যাবে। শ্যামাপ্রসাদ দাবী করলেন, জম্মু-কাশ্মীরকে ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং ভারতীয় সংবিধান প্রয়োগ করুন। প্রধানমন্ত্রী নেহরু বললেন, আসলে জম্মুর আন্দোলনটা ভারত সরকারকে অতিষ্ঠ ক'রে তোলার জন্য। কাস্টমস-এর যে বাধা রয়েছে তা থাকবে।

১৯৫৩-এর ৯ই জানুয়ারী তাঁর এবং দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যে পত্র-বিনিময় হয়েছিল শ্যামাপ্রসাদ তা সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দিলে এবং ঐ পত্রাবলী প্রকাশিত হলে দেখা গেল দুইপক্ষ দুই মেরুপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন। ভারতীয় পার্লামেন্টেও ধোঁয়াটা কাটল না। কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতের নাকি কি-একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তা কি প্রধানমন্ত্রী নেহরু, ভাঙলেন না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা কাশ্মীর রাজ্যকে কাশ্মীর উপত্যকা, জম্মু, লাডাক, গিলগিট এবং মীরপুর-পুঞ্চ-মজঃফরাবাদ—এই পাঁচটি স্বায়ত্তশাসিত প্রত্যঙ্গ এবং তাদের নিয়ে একটি ফেডারেশন অঙ্গ গঠনের কথা ঘোষণা করলেন। এই ফেডারেশন হবে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের স্বায়ত্তশাসিত ফেডারেটেড ইউনিট।

প্রধানমন্ত্রী নেহরু বিষয়টি বিবেচনাধীন রাখলেন; শ্যামাপ্রসাদ বললেন, এ নিছক বিচ্ছিন্নতাবাদ, উৎসাহ দিলে সারা ভারতের ঐক্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী নেহরু বার বার খুঁচিয়ে তুলতে লাগলেন জম্মু হিন্দুদের কথা। এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। শ্যামাপ্রসাদ বললেন, বিতর্কের প্রয়োজন কি? তদন্ত হোক। প্রধানমন্ত্রী নেহরু বললেন, আমি বলছি, তার ওপর তদন্ত! শ্যামাপ্রসাদ বললেন, আচ্ছা, তবে আমিই যাচ্ছি 'সরেজমিনে' ব্যাপারটা বুঝতে।

কিন্তু কাশ্মীর যেতে পারমিট চাই। পার্লামেন্ট সদস্য শ্যামাপ্রসাদ বললেন, না, কাশ্মীরে যেতে পারমিটের আবেদন করব না

(6) "That is why I say those who want Kashmir to lose its separate identity are talking without any conception of practical realities that face us to-day", (Amrita Bazar Patrika, April 12, 1952)

(7) "Shik Abdullah's speech as reported on Saturday morning (April 12) is staggering disclosure of the inner working of his mind. This is strange statement calculated to strengthen the hands of Pakistan.

(৪) অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৫২

(9) "We do not think Shri Nehru is justified in laying all the blame on the Parishad for the unfortunate speech of Sheikh Abdullah. Nor do we think it was proper on his part to play the role of halting advocate in defence of an indefensible policy.

আমি। আমি তো জানি না কোন্ আইনবলে পারমিটের দরকার হয়।। (১০)

শুনে প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা গেলেন চটে। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কাটজু সম্ভবতঃ ওটা কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে চেপে গেলেন।

শ্যামাপ্রসাদ প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লাকে এক খবর দিলেন। আবদুল্লা আসতে নিষেধ করে বললেন, 'অসময়'। গ্রেপ্তারের হুমকিও দিলেন। সীমান্ত পার হয়ে স্বতন্ত্র কাশ্মীর রাজ্যের দু'মাইল ভেতরে যেতেই লক্ষ্মীপুরে ১১ই মে'র সন্ধ্যায় শ্যামাপ্রসাদ বন্দী হলেন। প্রথমে নিষাদবাগ বাংলোয়। তারপর গবর্ণমেন্ট হাসপাতালে। তারপর মৃত্যুকবলে। সিনেমার চাইতেও দ্রুতগতি ঘটনাক্রম।

অমৃতবাজার পত্রিকা গ্রেপ্তারের পর লিখলেনঃ 'জন-নিরপত্তা আইন লঙ্ঘন ক'রে কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করার অপরাধে কাশ্মীর সরকার যে ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করলেন তা সম্ভবতঃ নয়াদিল্লীর পরামর্শক্রমেই। ......ডঃ মুখার্জি প্রধানমন্ত্রী নেহরুর কাছে এই মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যে, যাঁরাই নেহরুর কাশ্মীর-নীতি থেকে পৃথক মত পোষণ করেন, তাঁদের জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশের পারমিট চাইলেও দেওয়া হচ্ছে না—এ অভিযোগের কৈফিয়ৎ দেওয়া কর্তব্য।' (১১)

বন্দী শ্যামাপ্রসাদকে কাশ্মীর সরকার জানিয়ে দিয়েছিলেন, দিল্লী আদালতে হাজির হ'য়ে তাঁর বিবৃতি লিপিবদ্ধ করার অনুমতি কাশ্মীর সরকার দেবেন না। (৩০এ মে, ১৯৫৩)

২৩এ জুন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় আট কলম জোড়া সংবাদ-শিরোনামা হল : 'ডঃ মুখার্জির দেহ আসছে কলকাতায় : অন্ত্যেষ্টি আগামীকাল।'

কাশ্মীরের এক ব্যক্তি তাচ্ছিল্যভরে বিচারপতি মুখার্জিকে জানায় : আপনাকে একটা বার্তা দেবার আছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মারা গেছেন। (১২)

একটা তদন্তের কথা উঠেছিল, হয় নি। মনে হয়েছিল বঙ্গদেশ ১৯০৫-এর উদ্বেল তরঙ্গে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে; দ্রুত প্রশমিত হয়ে এল। একটা সভা হয়েছিল, তার সভাপতি-রূপে রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, তাঁর এবং বহুজনের বিচারে শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন।

কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাটজু অল্পক্ষণের জন্যও শ্যামাপ্রসাদের দেহকে দিল্লীতে নামাতে দেন নি।। পত্রিকা বলেছিলেন, এ আর যাই হোক অযৌক্তিক মনোভাব। পত্রিকা প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উক্তি ও বিবৃতিতে যে সংকীর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে তার জন্য দুঃখ করেন এবং পরিশেষে লেখেন, —'যদিও শেখ আবদুল্লার সরকার ডঃ মুখার্জির গ্রেপ্তার ও অন্তরীণের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী, তবু নয়াদিল্লীর ভূমিকাও উপেক্ষণীয় নয়। একথা আর গোপন নেই এবং কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বলেছেন যে, ডঃ মুখার্জিকে হাজতে নিয়ে গিয়ে যে বিনা বিচারে আটক করা হয়েছে তা ভারত সরকারের সঙ্গে পরামর্শক্রমেই করা হয়েছে।' (১৩)

পন্ডিত নেহরু সব ব্যাপারটাই উড়িয়ে দেবার উৎকন্ঠায় পশ্চিমবঙ্গের শ্রীঅতুল্য ঘোষকে এক পত্রযোগে লিখলেন, আসল ঘটনা সম্পর্কে কোন জ্ঞান না থাকাতেই পশ্চিমবঙ্গবাসীরা এমন বিক্ষুব্ধ হয়েছে। (১৪) কিন্তু আসল ঘটনা কি তা বললেন না।

ইতিমধ্যে কাশ্মীরে—আবদুল্লা কিছুদিন আগে জম্মুবাসীর উদ্দেশে যে-হুমকি দিয়েছিলেন যে কাশ্মীর জম্মু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সেই—বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। জম্মু-আন্দোলন দমনে প্রধানমন্ত্রী শেখ যে তৎপরতা দেখিয়েছিলেন খোদ কাশ্মীরে তার কোন লক্ষণ দুরস্থান, প্রশ্রয়টাই প্রকট হয়ে উঠতে লাগল। ঘূর্ণায়মান মঞ্চ বিদ্যুদ্গতিতে ঘুরতে লাগল।

শেখ আবদুল্লা জেলমন্ত্রী পন্ডিত শ্যামলাল সরফকে পদত্যাগ করতে আজ্ঞা দিলেন। হিন্দু! ন্যাশনাল কনফারেন্সে বললেন, কাশ্মীরীরা একটা স্বতন্ত্র জাতি; সুতরাং, জাতি হিসেবেই তাঁরা কাশ্মীরকে বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। কি বিপদ? ভারতের সঙ্গে সংযুক্তি।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট পত্রিকার পাঠকদের চক্ষু বিস্ফারিত করে আট কলম-ব্যাপী সংবাদ শিরোনামা বেরোলো :

শেখ আবদুল্লা গ্রেপ্তার—

কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত বকসী গোলাম মহম্মদ দিব্যজ্ঞান নিয়ে বললেন : 'দেশের স্বার্থ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ঐতিহ্য বিকিয়ে দেবার মুখে পড়েছিল; পড়লে নিদারুণ পরিণাম অপরিহার্য হয়ে পড়ত।' ইত্যাদি।

নিঃসন্দেহে প্রভু-বচনের প্রতিধ্বনি।

শেখ আবদুল্লার সঙ্গে মীর্জা আফজল বেগ প্রমুখ আর ৩১ জন হাজতবন্দী হন। সর্দার-ই-রিয়াসত করণ সিং ৮ই আগষ্ট সন্ধ্যায় জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাকে পদচ্যুত করেন এবং তাঁর মন্ত্রি-সভা ভেঙে দেন। ৯ই আগষ্ট আবদুল্লা ও বেগকে গ্রেপ্তার করা হয়। বকসী গোলাম মহম্মদ আবদুল্লার স্থলাভিষিক্ত হন।

এ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকতায় কোন ত্রুটি নেই; কিন্তু আইনের জগতে 'এরেটার' বলে একটা কথা আছে। আইনের চোখে তারও রেহাই নেই। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মরে প্রমাণ করেছেন যে, তিনিই ঠিক; আবদুল্লাকে, রাষ্ট্রবিরোধী বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে গদীচ্যুত ও গ্রেপ্তার করার পর শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্য আরও বেশী ভাস্বর হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই কালো ঘোড়ার যাঁরা জকি ছিলেন তাঁরা রেহাই পেয়ে গেলেন। অবোধ ভারত একটা প্রশ্নও তুলল না তাঁদের সম্বন্ধে। যত দিন যাচ্ছে, ২৩ বছর ধরে রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রলম্বিত কাশ্মীর প্রশ্ন পাকিস্থান এবং অধিকৃত আজাদ কাশ্মীরের দিকে তাকালে, শ্যামাপ্রসাদকে এক জঘন্য ষড়যন্ত্রের বলি ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। অথচ ষড়মন্ত্রকারীরা আজ ছত্রভঙ্গ। 'অবাঞ্ছিত' আবদুল্লা আর পাকিস্থান কাশ্মীরের ওপর প্রলুব্ধ বাজের দৃষ্টি রেখে চলেছে। শহীদ শ্যামাপ্রসাদ সত্যের মহিমায় মহাকালের কোলে মহত্তর—আরও মহত্তর হয়ে উঠছেন। কিন্তু কাশ্মীরের কি কোনদিন তিমির-বিদারণ হবে?

---

(10) I do not know under which law a permit is necessary to go to Jammu.

(১১) অমৃতবাজার পত্রিকা, মে ১৩, ১৯৫৩

(12) "I have a message to convey to you from Sheikh Abdullah. Dr. Shyama Prasad is dead".

(১৩) অমৃতবাজার পত্রিকা, জুলাই ৪, ১৯৫৩

(14) "the feelings of the people of Bengalees in West Bengal were due to lack of knowledge of facts". (ABP, July 5, 1953).

পাওয়া

দুর্গাদাস ভট্ট
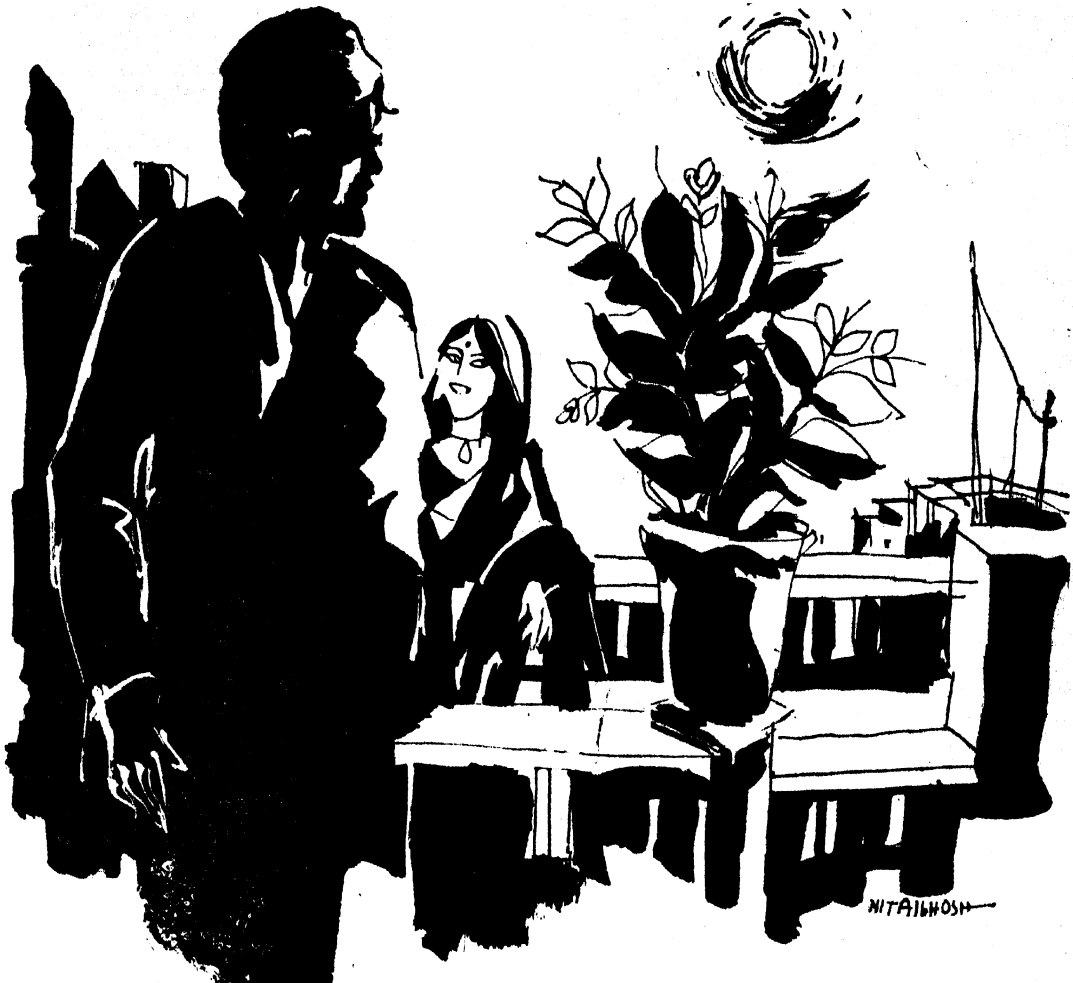
দোতালার রেলিংয়ে হাতের কনুয়ের ভর দিয়ে নীচের দিকে ঝুঁকে দেখল বিমল। উঠোনের প্রায় অর্ধেকটা সামিয়ানা দিয়ে ঘেরা হয়েছে। উঠোনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটার যেখানে দুটো বেল ফুলের ঝাড় আর করবী গাছ ছিল, ইতিমধ্যেই কেটে ফেলে দুটো মস্ত মস্ত উনুন তৈরী করা হয়েছে। বামুন ঠাকুর একটায় বিরাট একটি কেজলা হাঁড়ি চড়িয়েছেন, অন্যটায় কড়াই। লকলকে আগুনের শিখা আর বাটনা বাটা কুটনো কোটা লোকজনের যাতায়াতে সমস্ত বাড়িটাই মুখর।

তিনদিন আগে বিয়ে হয়েছে বিমলের। কালরাত্রি ফুলশয্যা সবই পার করে এসে আজ বৌভাতের দিনে নিজেকে বড়ই নির্জন মনে হচ্ছে। চারিদিকে হাসি মুখ, প্রতি মুহূর্তে রসালো ইঙ্গিতের সামনে এসে দাঁড়াতে হচ্ছে। মনে পড়লো দিন তিনেক আগের সেই কাঙ্ক্ষিত সন্ধ্যাবেলার কথা। গঙ্গা পেরিয়ে মাইল কুড়ি বাসে করে ওরা গিয়েছিল। শীতের বিকেলে যে দিন আকাশের রোদকে আশ্চর্য এক ধরনের অপার্থিব বলে মনে হচ্ছিল। গাছে পাতায় ফসল কেটে নেওয়া ধু ধু প্রান্তরে শেষ রোদের সোনালী বাঙ্ময়তা যেন জীবনেরই এক নতুন ব্যাখ্যা তুলে ধরছে। তার পর লগ্ন আসন্ন হলে কপাল থেকে গাল পর্যন্ত চন্দন চর্চা আর মোটা করে গাঁথা টগর ফুলের মালা পরে যখন বরাসন ত্যাগ করে ছাদনাতলা অভিমুখে যাত্রা, বিমলের দুই ছেলে বেলার বন্ধু অদ্ভুত এক ধরনের জান্তব রসিকতার ভংগীতে বিমলের থুতনী ধরে নাড়িয়ে দেবার ভঙগীতে বলল, গোপালী ও গোপালী সেইতো মল খুলালি......ইত্যাদি সারা শরীর যেন রি রি করে উঠেছিল বিমলের। তার শুদ্ধ ব্যক্তিত্ব যেন ভেঙেচুরে নাল হয়ে যাচ্ছে। একটা স্থূল এবং মোটা সোটা ব্যাপারের মধ্যে যেন ইচ্ছে করে ডুবতে যাচ্ছে বিমল, অথচ এখন আর ফিরে আসার উপায় নেই।

অল্প পরেই সমবেত উলুধ্বনি, মঙ্গল শংখ, আলোয় অন্ধকারে রেশমী শাড়ি মেয়েলি কৌতুকে ভরা এক টুকরো বিস্ময়ের জগৎ। মুহূর্ত কালের জন্যে তার চুলচেরা ভাল মন্দের জগৎ থেকে যেন ঠিকরে চলে গিয়েছিল বিমল। চোখের সামনে অপরূপ নরম দুটি চোখ কষ্ট করে খুলে, দৃষ্টি ছড়িয়ে আবার বন্ধ হয়ে গেল। চারিদিকের চিৎকার, কৌতুক 'হল না হল না আবার হোক...ওরে মণিকা ভের বরের দিকে আরো একবার ভাল করে তাকিয়ে নে...।' সবে মিলে কেন যেন বন্দ হয়ে যাচ্ছিল বিমল। সে যেন আমূল নাড়া খেয়েছে।

এর পরে কত ধরনের আপ্যায়ন। শ্বশুর শাশুড়ী এবং অন্যান্যদের তাঁদের এই নতুন মানুষটিকে নিজেদেরই একজন করে পাওয়ার চেষ্টা। যা নিজের মৃত মা বাবার প্রায় ফিকে হয়ে আসা স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনছিল। এত আদর এত আপ্যায়ন যে বিমলের জন্যে বসে ছিল, বিমল জানত না। জীবন যেন কুঁকড়ে শুকিয়ে একটা কৃত্রিম খোলসের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যেতে বসেছিল। হঠাৎ আলো জ্বলল, হাওয়া বইল, জীবনের আদিঅন্ত তোলপাড় হয়ে কিছু পরম সুধা উঠে এল। তবু ঠিক নিখুঁতভাবে সুধাময় করে তুলতে পারছে না বিমলকে। সব পাওয়ার মধ্যে পরম পাওয়াটিই যেন একটি কাঁটার মতো বিমলের মনে প্রতিক্ষণেই বিঁধছে।

প্রথমে বিস্ময়, তার পর তীব্র একটা আকর্ষণ, তার পর আত্মবিলোপের মধ্যে দিয়ে যেন একটি স্থির নিশ্চয়ে পৌঁছুনোর চেষ্টা। যা আদৌ সুখকর মনে হয় না। বরং একটা তীব্র বিস্ফোরণ তার সর্বাঙ্গ ধরে কাঁপাচ্ছে। এ কি করে হয়? কেমন করে হয়। যে মেয়ে তাকে কোন দিন দেখে নি, জানে নি, যার বয়স এখনো কুড়িতে পৌঁছয়নি, যে আধা শহর আধা গ্রামের পরিবেশে এতকাল কাটিয়েছে, এমনি একটি উদ্ভিন্ন যৌবনা তাকে এভাবে গ্রহণ করেছে কি করে। যে বিমলের চল্লিশ উত্তীর্ণ বয়েস। কথায়-বার্তায় চাল-চলনে কোন আবেগ নেই উচ্ছ্বাস নেই। সতর্ক চালে যে কথা বলে প্রতিটি ব্যাপারের তাৎপর্য যে মেপে মেপে বোঝে, ভাইবোন, আত্মীয় পরিজনরাও যার কাছ থেকে জ্ঞান নেয়। বিমলের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই অভিজ্ঞ হয়, এমন একটি খাঁটি দাদা মার্কা মানুষকে মণিকা এমন করে নায়কের আসনে বসাচ্ছে কি করে? না সবটাই তার ভান অন্য কোথাও মন ফেলে রেখে সুন্দর ভাবে প্রেমিকার ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছে।

ফুলশয্যা পর্যন্ত তর সয়নি মণিকার। কাল রাত্রিতেই ছাতে এসে দাঁড়িয়েছিল। আকাশে তখন ভরা জ্যোৎস্না বরফের মতো চাঁদ উঠেছে। হিম পড়ছে, দোতলার ছাতের একটা কোণে দাঁড়িয়ে ছিল বিমল। ছাতের সংলগ্ন সজনে গাছটি অজস্র ফলে টইটুম্বুর দেখাচ্ছে। তরল জ্যোৎস্নায় যেন সব কিছুই ধরা ছোঁয়ার বাইরে। শাড়ির খস খস শব্দে চমকে ফিরে দেখে সামনেই মণিকা। প্রথমে বিমলের মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। এও কি সম্ভব। এ মেয়ে এত সহজে সমাজের সব বাধা নিষেধকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এভাবে আসে কি করে। বিমলই প্রথমে স্তব্ধতা ভাঙে—জানো না আজ কাল-রাত্রি। আজ পরস্পরের মুখ দেখতে নেই!

—জানি।

—তবে যে এলে।

—কি জানি না এসে থাকতে পারলাম না।

কথাটা এত সহজে এবং অকৃত্রিম ভাবে উচ্চারণ করল মণিকা যে, ভিতর পর্যন্ত শির শির করে উঠল বিমলের।

—কেন আর তো মোটে একটা দিন কাটলেই আমাকে তো তুমি একেবারেই একলা ঘরে পেতে।

—তা পেতাম......

কেমন যেন থমকে গিয়েছিল মণিকা। নিজের হতচকিত ভাবটা ঢাকবার জন্যে মাথা নীচু করে পায়ের আঙুল দিয়ে যেন ছাতের ওপর দাগ কাটে। একটু সরে গিয়ে ঘোমটা টেনে দেয়। একটা কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গীতেই বলে—কেন জানি মনে হচ্ছিল, সব সময়ই আপনি বড্ড চিন্তা করছেন। তাই আমার ভয় করছিল।

—কিসের ভয়। না অতো ভয়ের কারণ নেই। আমিতো তোমার সব দায়িত্বই নিয়েছি।

ফুল শয্যার মোহন পরিবেশেও সেই কৈফিয়তটাই নতুন করে মণিকার ঠোঁটে বাজল। ওরা কিছুতেই যেন সহজ হতে পারচে না। তাহলে বিমলের সুগম্ভীর ভাবভঙ্গী থেকে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে কি ও পৌঁছুতে পেরেছে? বিমল নিতান্তই একজন তরুণ যুবক হতে চাইল। বাহুপাশে বাঁধল মণিকাকে। চুমু খেল। নিতান্তই সাধারণের মতই মণিকার কানের পাশে ঠোঁট নামিয়ে বলল, 'বলো আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে কি না।' উত্তরে আলিঙ্গনের ঘনিষ্ঠতার মধ্যেই আড়ষ্ট হয়ে গেল মণিকা। টপ করে বিমলের কাঁধের ওপর এক ফোঁটা জল পড়ল। ফোঁপাতে লাগল মণিকা। সবটাই কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল। কি থেকে যে কি হল বুঝতে পারা গেল না। দুজোড়া জাগ্রত চোখ জেগে জেগেই সারা রাত পার করে দিল।

আজ হচ্ছে বৌভাতের দিন। সব কাজের দায়িত্বই আজ ভাই, বোন, মেসো মাসী আর জামাইবাবুদের ওপর ন্যস্ত। তবু একটা কিছু করার জন্যে হাত দুটো নিশপিশ করছে বিমলের। কোনো ব্যাপারেই সে হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। টাকা-পয়সার হিসাব তো বটেই, তদারকী থেকে শুরু করে, রান্না করা কুটনো কোটা সবেই সে পারদর্শী। তার ওপর রয়েছে তার সাম্প্রতিক ভাবনার চাপ যা থেকে রেহাই পাবার জন্যে একটা কিছু করা দরকার।

দোতলা থেকে নেমে যেখানে তরকারী কোটা চলছে সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়। বড় মাসীমা মনোরমা আর মেজদি ছন্দা ধারালো বঁটিতে তখন বাঁধাকপি কুটছিলেন। আলুর দমের আলু ছাড়াচ্ছে বিমলের দুই ছোট বোন নন্দা আর তন্দ্রা। এদের দুজনকে বছর তিনেক আগে বিমলই যোগাড় যন্ত্র করে বিয়ে দিয়েছে। নতুন বৌ অল্প দূরে পান সাজছে এবং বার বার বাইরের দিকে তাকাচ্ছে কারণ যে, কোন মুহূর্তে তার বাপের বাড়ির লোকজন এসে পড়তে পারে।

বিমল গিয়ে দাঁড়াতেই নন্দা আর তন্দ্রা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ ভাবে হাসল। পাশের ছোট প্যাসেজটায় চলে আসা মাত্রই শুনল বড় মাসীমা বলছেন—বিমলকে আজ বেজায় জব্দ মনে হচ্ছে?

পড়শী একজন মহিলা প্রশ্ন করলেন—কেন।

—কেন আবার সব ব্যাপারেই বিমলই যে সব কিছু করে। আজ আর সে করবার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ দেখছে তাকে বাদ দিয়েই সব কিছু হচ্ছে। ভাল ভাবেই হয়ে যাচ্ছে সব কিছু।

—আহা বেচারী

মেজদি নন্দা এবার ফোড়ন কাটেন। তারপর আগের কথায় জের টেনে বলেন—তা নতুন বৌ তুমিই বা কেমন লোক, একটু ওপরে গিয়ে ওর সঙ্গে গপ্পসপ্পও তো করতে পারো।

নতুন বৌ মণিকা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ায়। একটা উদ্গত আবেগকে চাপতে চাপতে উঠোন পেরিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে দোতলার পূবের ঘরে গদি মোড়া বিছানায় গিয়ে উপুর হয়ে শুয়ে পড়ে। ব্যাপারটা এতই আকস্মিক এবং অদ্ভুত যে সকলেই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

সন্ধ্যা পার হয়ে রাত যখন বেশ একটু ঘন হয়েছে মেজদি ছন্দাই চেপে ধরেন বিমলকে। ইতিমধ্যে লোক খাওয়ানোর কাজ সাঙ্গ হয়েছে—ব্যাপার কিরে সুনু। নতুন বৌ এমন করে চলে এল কেন তখন?

—সে আমি কি করে বলব? স্ত্রী চরিত্র সম্পর্কে শাস্ত্রকাররা যা বলেছেন তা তো তোমার অজানা নয় মেজদি?

—ফাজলামী রাখ। আমার মনে হয় একটা কোথাও অঘটন ঘটেছে। তোর ছোট শালীর মুখে শুনলাম এর আগে বার-তিনেক বিয়ের সম্বন্ধ হয়ে ভেঙে গিয়ে-ছিল মণিকার। শুধু টাকা পয়সার লেন-দেনের ব্যাপারেই। তাই ওর ধারণা হয়েছিল ওর কপাল খুবই খারাপ। বিয়ে ওর হবে না। তোর বেলায় প্রথমেই মেয়ে দেখানোর আগেই তাই ওরা দাবী-দাওয়ার কথা জানতে চেয়েছিল। আমার মনে হয় এখনো ভয় কাটে নি মণিকার। অথচ আমাদের সব কিছুই ওর ভাল লাগছে।

বিমলের অন্তর থেকে একটু একটু করে মেঘ কেটে যাচ্ছে। সে স্পষ্টই বুঝতে পারছে তার গম্ভীর মুখ দেখে প্রথম থেকেই ভয় পেয়েছিল মণিকা। সেই জন্যেই তর সয় নি, কাল রাত্রির অনুশাসন না মেনে বিমলের মনের কথা জানতে এসেছিল। ফুল শয্যাতেও সহজ হতে পারেনি। কিন্তু বিমল বুঝতে পারছে সবই একদিন সহজ হয়ে যাবে। বিমলের এই সহজাত গাম্ভীর্যই একদিন স্বাভাবিক মনে হবে মণিকার। তখন বিমলকে অতি মাত্রায় উৎফুল্ল কিম্বা চপল দেখলেই ঘাবড়ে যাবে। ভয়ের চোখে ফিরে ফিরে দেখবে মণিকা।
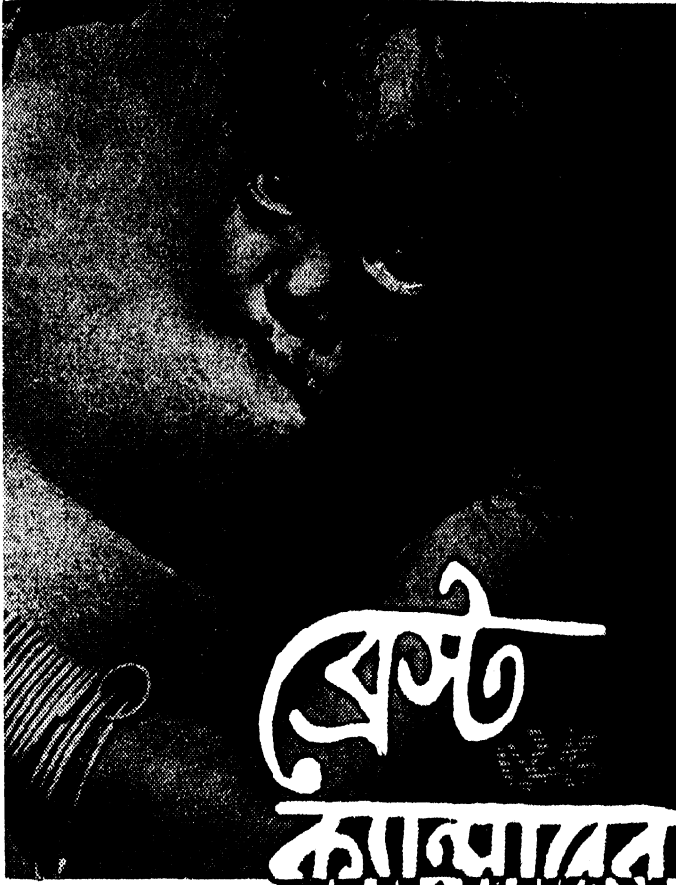
ব্রেস্ট ক্যান্সারের কথা

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

আজকাল হামেশাই লোকমুখে ক্যান্সার রোগের কথা শোনা যায়। এই রোগ সম্পর্কে জনসাধারণের মনে যেন একটা আতঙ্কও রয়েছে। কেননা সকলেরই ধারণা এ রোগ দুরারোগ্য। রোগটা কঠিন সন্দেহ নেই, কিন্তু সব সময়ে হয়ত দুরারোগ্য নয়। তাছাড়া, ক্যান্সার কী, কেন হয় এবং তার লক্ষণই বা কী ইত্যাদি অনেকেরই জানা নেই বলেই আতংক।

আমাদের আয়ুর্বেদশাস্ত্রে এর নাম কর্কট রোগ। কাঁকড়া যেমন তার পা ছড়িয়ে ছড়িয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে গর্ত করে এই রোগও অল্পের থেকেই বড় আকার ধারণ করে কিনা, তাই।

ক্যান্সার রোগ শরীরের যে কোনো জায়গায় হতে পারে। মস্তিষ্কে, মুখে, গলায়, স্তনে, পাকস্থলীতে, জরায়ুর মুখে এবং এমন কি রক্তের মধ্যেও। বর্তমান প্রবন্ধটি হল ব্রেস্ট বা স্তন-ক্যান্সার সম্বন্ধে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পরিসংখ্যান যে সকল তথ্য আমাদের সামনে হাজির করেছে সেটা নারীদের পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ। মেডিক্যাল রিপোর্ট থেকে জানা যায় গত কয়েক বছর যাবৎ নানান দেশেই স্ত্রীলোকদের মধ্যে ক্যান্সার রোগের আক্রমণ বেড়ে চলেছে, বিশেষ করে ব্রেস্ট ক্যান্সার। দেখা গেছে এই রোগটা আবার মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকদেরই—যাদের বয়স চল্লিশের উপরে—বেশি হয়ে থাকে। অস্ট্রেলিয়া, নিউ-জিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ডেনমার্ক, সুইডেন, ইতালী, নরওয়ে, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশে তো এই বিশেষ রোগে মৃত্যু সংখ্যা ইদানীং প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। ইংলন্ডে প্রতি বছর ৭ হাজার স্ত্রীলোক মারা যায় স্তন-ক্যান্সার রোগে। আমেরিকার সাম্প্রতিক কালের একটা বছরের হিসাব হল: ক্যান্সারে আক্রান্ত স্ত্রীলোকের সংখ্যা ২৩৮০০০; তার মধ্যে স্তন-ক্যান্সারের রোগী ৫২০০০।

আমেরিকায় আবার এই রোগের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত বেশি: মেয়েদের স্তনে ক্যান্সার হওয়াটা একটা যেন অতি সাধারণ ব্যাপার ওদেশে। ইতালীতে এক সময়ে ১৩ হাজার খৃস্টীয় মঠবাসিনীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছিল; দেখা গেল ওদের অধিকাংশেরই স্তনে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার। ১৯৬০ সালে সুইডেনে ক্যান্সার রোগে আক্রান্তা রোগিণীদের একটা পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছিল; তাতে প্রকাশ পায় প্রতি ৪ জনের মধ্যে এক জনের স্তন-ক্যান্সার।

একটা হিসাবে জানা যায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ সালের বিভিন্ন হাস-পাতালসমূহে ভর্তি ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৮০৩। তার মধ্যে ব্রেস্ট ক্যান্সারের কেস ২১৪টি।

ইংলন্ড, সুইটজারল্যান্ড, হল্যান্ড, ডেন-মার্ক, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া কানাডা প্রভৃতি দেশে স্তন-ক্যান্সার রোগের প্রকোপ যেমন অতিরিক্ত তেমনি আবার জাপান, রাশিয়া, চিলি, ইথিওপিয়া প্রভৃতি দেশে খুবই কম। প্রায় নেই বললেই চলে।

সোভিয়েট রাশিয়ার মেডিক্যাল আকা-দেমীর ক্যান্সার ইনস্টিটিউট একবার একটা সমীক্ষা চালিয়েছিল; দেখা গেল ঐ দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলই স্তন-ক্যান্সার রোগ থেকে প্রায় মুক্ত। তুর্কমানিয়া, কাজাখস্তান ও বুরিয়ৎ রিপাবলিকে তো একেবারেই তো নেই। ১৯৫৫—৫৬ সালে রাশিয়ার আসকা-বাদে ব্রেস্ট ক্যান্সারের রোগী ছিল ৮২ জন: তাদের মধ্যে মাত্র ২ জন ছিল রুশীয় স্ত্রীলোক; আর সবাই অন্য দেশীয়। আসকাবাদ অঞ্চলের বাঘির গ্রামের অধি-বাসীদের সংখ্যা ১২০০০; ওখানে বছরে ১৬০টি শিশুর জন্ম হয়। একটা হিসাবে বলা হয়েছে পাঁচ বছরে মাত্র একটি ক্ষেত্রে এই রোগের আক্রমণ লক্ষ করা গেছে।

জাপানী স্ত্রীলোকদের তো বলতে গেলে স্তন-ক্যান্সার রোগটা হয়ই না। পৃথিবীর যে কোনো দেশেই ওরা বাস করুক না কেন, এ রোগে তারা ভোগে না। হাওয়াই দ্বীপে জাপানী ছাড়া অন্য অনেক জাতীয় স্ত্রীলোকই বসবাস করে। সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে ওখানে অন্যান্য জাতের যত স্ত্রীলোকের স্তনে ক্যান্সার রোগ হয় তার দশ ভাগের এক ভাগ জাপানীরও তা হয় না।

দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে এই দুষ্ট ব্যাধির প্রকোপ কিছু বেশি, আবার কোথাও বা খুবই কম। কিন্তু কেন? আবহাওয়া জল-বায়ুর কারণে? নাকি জাতীয় কোনো বৈশিষ্ট্যের দরুন?

সম্ভবত ব্যক্তিগত অভ্যাস, স্থানীয় সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থা, ধর্মীয় প্রথা

ইত্যাদি এর মূলে। তথাপি মোটামুটি কারণগুলি হল, সন্তানকে স্তনদুগ্ধ পান না করানো, গর্ভপাত, বন্ধ্যাত্ব এবং দাম্পত্য-জীবনের অনভিজ্ঞতা।

লক্ষ্য করে থাকবেন আজকাল মায়েরা সাধারণত তাদের শিশুসন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ায় না। পরিবর্তে ফিডিং বটল ব্যবহার করে থাকে। কোনো একটা বিশেষ দেশের কথা বলছি না; ইদানীংকালে প্রায় সব দেশেই বিশেষ করে শহরাঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে এটা খুব চলতি। যেন একটা ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে গেছে। ওদের কথা হল বুকের দুধ দেওয়ার কাজটা সুরুচিসম্মত নয়, পরন্তু লজ্জাকর। দ্বিতীয়ত এতে করে তাদের যৌবন ও দেহের নিটোলতা নষ্ট হয়, বিকৃত হয় দেহের সৌষ্ঠব। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য অসুস্থতাও একটা কারণ। আগেকার দিনে কিন্তু মায়েদের মনে ওরকম ধারণা ছিল না, সেকালে মায়ের বুকের দুধই শিশু-সন্তানের পক্ষে সর্বতোভাবে হিতকর বিবেচিত হত। অধুনা ও ব্যবস্থাটা বরবাদ করা হয়েছে, নারীরা বর্জন করেছে ওটা বিশেষ করে আমেরিকায় এবং দেখাদেখি প্রায় সব দেশেই। এই কারণেই আমেরিকার নারীদের মধ্যে এ রোগটার প্রকোপ অপেক্ষাকৃত বেশি। ১৯৫৬ সালে আমেরিকার জাতীয় ক্যান্সার কনফারেন্সের তৃতীয় অধিবেশনে এটা স্বীকৃত হয়েছিল।

সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, সন্তানধারিণীরা যদি তাদের সন্তানকে স্তন্য পান না করায় তাহলে তাদের স্তনে ক্যান্সার রোগ হওয়ার বেশ কিছু সম্ভাবনা থাকে। সোভিয়েট রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা শহুরে স্ত্রীলোকদের চেয়ে অধিককাল যাবৎ সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ায়; গর্ভনাশও করে না। সে কারণে ও দেশের গ্রামে ব্রেস্ট ক্যান্সার রোগটাও নেই। তুর্কমানিয়ার স্ত্রীলোকেরা স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন যাপন করে, গর্ভপাত ঘটতে দেয় না এবং সন্তানকে স্তন্য পান করায় ২।৩ বছর বয়স পর্যন্ত। স্তন ক্যান্সার রোগ ওখানে তাই প্রায় অজ্ঞাত। দেখা গেছে উজবেকিস্তানের টুণ্ডিকোলক গ্রামে দশ বছরের মধ্যে একটি স্ত্রীলোকও এই রোগে ভোগে নি। ঐ অঞ্চলের মায়েরা সন্তানকে ২।৩ বছর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ায়।

ইথিওপিয়ায় সাধারণত পরিবার বড়, সন্তানসংখ্যা বেশি। কিন্তু তথাপি সে দেশের স্ত্রীলোকেরা প্রতিটি সন্তানকে বুকের দুধ দেয় দীর্ঘকাল। এই রোগও তাই সে দেশে একান্ত বিরল।

ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই শিশু-সন্তানকে স্তন্য পান করানো হয় মাত্র ৮।৯ মাস বয়সকাল পর্যন্ত কিংবা তারও কম সময়। মুসলমান সমাজে সন্তানকে দু বছর বয়স পর্যন্ত স্তনদুগ্ধ পান করানোর রীতি আছে।

সন্তানসম্ভবা অবস্থায় নারীদেহের নানা অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির কম বেশি রূপান্তর ঘটে। তার রক্তে দেখা দেয় নতুন হরমোন, দুগ্ধক্ষরণোপযোগী হয় তার স্তনগ্রন্থি। সুতরাং এই সময়ে যদি গর্ভপাত হয় তাহলে সমগ্র প্রোসেসটার একটা ওলটপালট ঘটে যায়। স্তনগ্রন্থির কোষগুলির বৃদ্ধি বাধা পায়; ফলে স্তনের ঐ স্থানটা ক্রমশ শক্ত কঠিন হতে হতে শেষ পর্যন্ত একটা টিউমারে পর্যবসিত হতে পারে। আবার, সন্তানের জন্মের পরে মা যদি তাকে স্তন্য না দেয় তবে ঐ পদার্থটা লোপ পায়, যায় শুকিয়ে। তখন গ্ল্যাণ্ডের স্বাভাবিক কাজটা তো আর হতে পারল না? ফলে ঐ স্থানটা শক্ত কঠিন হতে থাকল। পরে সেটা ম্যালিগন্যান্ট টিউমারে পরিণত হতে কতক্ষণ?

এই অবস্থায় দেহের সৌন্দর্য বা যৌবন-নিটোলতা অটুট রাখার উদ্দেশ্যে সন্তান জন্মদানে বাধা প্রদান করা যেমন অবাঞ্ছনীয়, তেমনি আবার অনেকগুলি সন্তানের জন্ম দিয়ে স্বাস্থ্য নষ্ট করাও কোনো কাজের কথা নয়। অবশ্য এ দুয়ের মধ্যে একটা বেছে নেবার কথা হচ্ছে না, আসলে কোনো দিকেই বাড়াবাড়িটা ভাল নয়।

নানা রিপোর্ট খতিয়ে দেখা যাচ্ছে, সন্তানকে স্তন্য পান করানো ব্রেস্ট ক্যান্সার রোগের নিবারক। কিন্তু তা বলে ও-কাজটা দীর্ঘমেয়াদী না হওয়াই ভাল। সন্তান সংখ্যা বেশি হলে স্তন্যও দিতে হয় দীর্ঘকাল। কথা হল, অধিক সংখ্যক সন্তানের জন্ম দেওয়া যেমন সঙ্গত নয়, তেমনি গর্ভপাত ঘটিয়ে পরিবার সীমিত রাখাও অনুচিত। আর যদি মনে করে থাকেন গর্ভবতী হলেই নারীর সৌন্দর্য লোপ পায় কিংবা স্তনদুগ্ধ পান করানোর ফলে তার দেহসৌষ্ঠব নষ্ট হয়, তবে সেটা ভুল।

আর একটা কথা। খুব আঁটোসাঁটো কাঁচুলি ব্যবহার করা ক্ষতিকর। কেননা তাতে স্তনযুগলের সূক্ষ্ম ফাইবার বা কোষগুলি ফুলে ফেঁপে দানা বাধতে পারে।

ব্রেস্ট ক্যান্সার রোগ সম্পর্কে নানান দেশের ক্যান্সার ইনস্টিটিউটেই হরেক রকম গবেষণা চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি আমস্টারডাম ইনস্টিটিউটের সমীক্ষায় জানা গেছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই রোগ বংশগতও হতে পারে। কেবল ব্রেস্ট ক্যান্সারই নয়, সমগ্রভাবে এই ক্যান্সার রোগটা সম্পর্কেই এত বেশি গবেষণা চালানো হচ্ছে দেশে দেশে যা আর অন্য কোনো রোগ সম্পর্কেই হচ্ছে না। আশা করা যায় অচিরে এই রোগের মূল কারণটি জানা যাবে।

কী জানেন, দেহের প্রতিটি অঙ্গের, ইন্দ্রিয়ের একটা বিশেষ ক্রিয়া আছে, একটা বিশেষ ধর্ম আছে। ওরা ঠিক ঠিক কাজ করলেই মঙ্গল; ব্যতিক্রম অশুভ।

অসম্পূর্ণ কবিতা—বাংলাদেশ

বিষ্ণু দে

আবিশ্ব চৈতন্য আজ পঙ্গু, মূক—আকাশে সমুদ্রে আজ খরা,
যদিও সবাই জানে শতভঙ্গ এই বঙ্গ মনে-প্রাণে
মাঠে ঘাটে হাসি-গানে শতরঙ্গে ভরা।
অথচ সর্বত্র ঘোরে প্রকাশ্যে প্রচ্ছন্নে নানান্ তণ্ডক,
এই মানুষেরই ত্রিভুবনে আজও ঘোরে জল্লাদ বঞ্চক,
এপাশে ওপাশে ঘোরে লুব্ধ সরীসৃপ, নানা জলুকা কণ্ডুক,
কোথাও বা টিরানোসোরাসদের সশস্ত্র প্রহরা, যেন ধরা তারই সরা!
কবিতা-বা অর্ধমৃত, নগ্ন-দেহে শতসজ্জা জরা।

অথচ হৃদয় জানে ধ্রুবতারা সত্য ঘটাকাশে,
অর্জুনেরা স্থির জানে উলুপীর অমৃত পাতালে।
জানে কর্মরচনাই মানবিক, কাব্য চিত্র, খোদাই, সঙ্গীত, ভালোবাসা
জীবনের ইতিনৃত্যে মননে ভঙ্গীতে তালে তালে।
বহু হাজার বছর বেগে পুস্তকে মানুষ গ'ড়ে আশা
বিশ্বকে গড়েছে নিজ বরাভয় মহাপ্রতিভাসে।

তবু তো লোরকার অন্ত অপঘাতে, ঘরে চড়াও হত্যায়
যদিও সে দক্ষ শিল্পী অসামান্য সংবেদনে
চেয়েছিল ভাবী কথকের দুঃখে—নাকি মৃত্যুঞ্জয় উল্লাসেই?
যে অমৃত আজও কাঁপে প্রতিটি নিহত মুখে 'কবিতা নাটকে' সারাক্ষণ;

> কামারাদা! মৃত্যু হোক স্বাভাবিক, শয্যায়, সহজে,
> স্বাচ্ছন্দ্যে স্বচ্ছ ও সমসমাজের কঠিন-কোমল
> শিরস্ত্রাণ শিরোধানে। যেখানে নির্বিত্ত মাথা গোঁজে
> অপ্রস্তুত অপমানে, আকস্মিক মরণের ছল
> যেখানে বণিক বোনে রাজস্বলোভীর দলে মিশে
> বাঘের বিকৃত বেগে, হাঙরের গুপ্তি-দাঁতে, হানে
> কেউটের কৌটিল্যে, সেখানে যে মনুষ্যত্ব বিষে
> নীল হয় নিমেষে নিমেষে। নয় সেই অপঘাতে।—
> কারখানায়, গার্ডার-চূড়ায়, ক্রেনে, মাস্তুলে, ফানেলে,
> হাপরে, লাঙলে মৃত্যু জীবনের দাক্ষিণ্যের হাতে
> সার্থক সে মৃত্যু, তুঙ্গ নদীপুলে, রেলের টানেলে
> স্রষ্টা মৃত্যু তুচ্ছ নয়। তুচ্ছ নয় সম্পূর্ণ সমাজে
> সন্তুরে সহজ মৃত্যু যে যার আপন সুস্থ কাজে।

কিন্তু যদি সকলেই লোরকা না হই, বা সাক্কো ও ভানৎসেত্তি
হাজার হাজার নিগ্রো? বা প্রাচ্য মানুষ? এদেশে ওদেশে
গঙ্গায় পদ্মায় হেসে লক্ষ লক্ষ চাষী বা মজুর?
যদি শুধু আউসবিটজ্ বুখেনবাল্ড্ নানাবিধ নগ্নবেশে
দেশে দেশে দেখা যায়, গরিব বা বহুবিত্ত বিশ্বময়? নিকট সুদূর
পাশ্চাত্যে, দুর্গত প্রাচ্যে, বিশেষত হতভাগ্য একালের প্রাচ্যে
বৈশাখের দাহে কিংবা শ্রাবণ বন্যায় মড়কে আকালে?

তাই ব'লে জিতে যাবে ওরা নাকি সংবিতে সংক্রাম কিংবা
গোটা মানুষকে পৃথিবীকে পক্ষাঘাত হেনে?
আর এরা মেনে নেবে পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতাসংগ্রাম জে
মানবিক মর্ত্যলভ্য সভ্যতার অপঘাতী গ্লানি?
না না এরা জেনে শুনে বিশ্বে আজ গড়ে জীবন মরণপ
লক্ষ লক্ষ মানুষের সূচিকাভরণে দেহে মনে।।

দ্বিতীয় পর্ব
দশম অধ্যায়
ফরাসী সংকটের মূল সূত্র

প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি ও রণনীতির পরিণাম

১৯৪০ সালের ২২শে জুন ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হইল। সমগ্র সভ্যজগৎ এতবড় জাতির এত দ্রুত পতনে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ফ্রান্সের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জার্মানীর দখলে গেল এবং অনধিকৃত দক্ষিণ ফ্রান্সের ভিসি সহরে বৃদ্ধ মার্শাল পেতাঁ নূতন গভর্ণমেণ্টের প্রধান নায়ক হইলেন। এক জো-হুকুম আইনসভা বা পার্লামেন্ট তাঁর হস্তে রাষ্ট্রের সর্ব-ক্ষমতা অর্পণ করিলেন এবং ফ্যাসিষ্ট মতাবলম্বী পেতাঁও ডিক্টেটর রূপে দেখা দিলেন। যে ফ্রান্সের রিপাব্লিক রাষ্ট্রের গৌরবময় ইতিহাস ছিল, তার অবলুপ্তি ঘটিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের স্থাপিত এই তৃতীয় রিপাব্লিক রাষ্ট্রের সমস্ত বিধিবিধান লুপ্ত হইল এবং পেতাঁ ও তাঁর সহকর্মিগণ ফ্যাসিস্ট অনুকরণে এক নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করিলেন যে শাসনতন্ত্রের অধীনে সর্বপ্রকার গণতান্ত্রিক অধিকারের সমাধি ঘটিল, রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদির অবসান হইল। ফরাসী বিপ্লবের যে মূল সূত্র ছিল Liberty, Equality and Fraternity কিম্বা স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী এবং যে মহান মন্ত্র যুগযুগান্তর ধরিয়া ইউরোপ ও সারা পৃথিবীর মানুষকে গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের জন্য প্রেরণা জাগাইয়া আসিতেছিল মার্শাল পেতাঁর নির্দেশে তাহা নিশ্চিহ্ন হইল এবং 'ফ্রান্সের ধ্বংসাবশেষ হইতে এক নূতন শক্তিশালী রাষ্ট্র' গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি ফরাসী বিপ্লবের মূলনীতি পাল্টাইয়া শ্রম, পরিবার ও পিতৃভূমি—এই তিনটি কথার উপর জোর দিলেন। কেননা, তাঁর মতে ফরাসী রাষ্ট্র ও সমাজ বিকৃত, নীতিভ্রষ্ট ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পেতাঁর বর্ণিত ফ্রান্সের অবস্থা শোচনীয় ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার কারণ ও প্রতিকারের পথ ছিল অন্যরকম এবং উহার জন্য পেতাঁ ও তাঁর সহধর্মিগণই অধিক দায়ী ছিলেন। কিন্তু সেকথা পরে আলোচিত হইবে। সেপ্টেম্বর মাসে ভিসি গভর্ণমেণ্ট নূতন করিয়া গঠিত হইল এবং ফ্রান্সের দুষ্টগ্রহরূপী মঃ লাভাল, মঃ ফ্লেঁনে বেলিন, এডমিরাল দারলাঁ প্রভৃতি কুখ্যাত নায়কেরা হিটলারের সঙ্গে অধিকতর সহ-যোগিতার পথ খুঁজিতে লাগিলেন। পেতাঁ যদিও বাহ্যতঃ এই গভর্ণমেণ্টের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তথাপি কার্যতঃ তাহা সম্ভব ছিল না। কারণ জার্মানীর নিকট বিনাসর্তে আত্মসমর্পণকারী ফ্রান্সের স্বাধীনতা বজায় রাখা স্বাভাবিক কারণেই অসম্ভব ছিল। বিশেষতঃ ভিসি গভর্ণমেণ্টের মতে হিটলারের হাতে ১৮ লক্ষ ফরাসী সৈন্য বন্দী ছিল, যারা জার্মাণীতে প্রেরিত হইল এবং অর্ধভুক্ত লাঞ্ছিত জীবনের বিড়ম্বনা বহন করিয়া অধিকাংশই শ্রমিকের কার্যের জন্য নিযুক্ত হইল। ৮ সেপ্টেম্বর জার্মানীর সঙ্গে ভিসি গভর্ণমেণ্ট জেনারেল গ্যামেলাঁ, দালা-দিয়ে এবং রেণোকে গ্রেপ্তার ও বন্দী-নিবাসে আটক করিলেন। লিও ব্লুম এবং অন্যান্য বহু পূর্বতন নেতা, যাঁরা 'জার্মানীর সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধাইবার জন্য দায়ী ছিলেন' তাঁহাদিগকেও গ্রেপ্তার এবং আটক করা হইল। ফ্যাসিস্ট অনুকরণে ইহুদী পীড়ন চলিতে লাগিল এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার অজুহাতে সামান্য কারণের জন্যও মৃত্যুদণ্ডের বিধানগুলি প্রবর্তিত হইতে লাগিল। জেনারেল ওয়েগাঁ উত্তর আফ্রিকায় প্রেরিত হইলেন এবং ২৮শে অক্টোবর লাভাল পররাষ্ট্রসচিবের পদ পাইলেন। কিন্তু জার্মানীর সহিত চক্রান্তে অভ্যস্ত লাভাল মার্শাল পেতাঁরও বিশ্বাস অর্জন করিতে পারিলেন না। ১৪ই ডিসেম্বর তিনিও পদচ্যুত এবং ধৃত হইলেন! অবশ্য পরে তিনি পলায়ন করিয়াছিলেন। এদিকে চার্লস দ্য গল ফ্রান্স হইতে পরিত্রাণ লাভ পূর্বক ইংলণ্ডে আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বরাবরই ফ্রান্সের আত্মসমর্পণ ও হিটলারের বিরোধী ছিলেন। সুতরাং লণ্ডনে গিয়া ফ্রান্সের প্রতি-রোধের জন্য 'স্বাধীন ফরাসী গভর্ণমেণ্টের' পতাকা উত্তোলন করিলেন এবং ফ্রান্সের ভিতরে ও বাহিরে সমস্ত দেশপ্রেমিক ফরাসীকে তিনি হিটলারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ সংগঠনের জন্য আহ্বান জানাইতে লাগিলেন। জেনারেল দ্য গল মুক্তির ইতিহাসের নায়করূপে দেখা দিতে লাগিলেন।

●

উপরে ভিসি গভর্ণমেণ্টের যে সামান্য রেখাচিত্র দেওয়া হইল, তাহা ১৯৪০ সালের পরাজিত ফ্রান্সের কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ-পূর্ববর্তী ফ্রান্সের ইহাই ছিল অনিবার্য পরিণতি। কেননা, ১৯১৪—১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের যেমন প্রচুর রক্ত ক্ষয়িত হইয়াছিল, তেমনই উহার সমগ্র সামাজিক ও আর্থিক জীবনকেও নাড়া দিয়া গিয়াছিল।

ফ্রান্সের ভয়াবহ রক্তক্ষরণের কথা উল্লেখ করিয়া চার্চিল তাঁর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসের গোড়াতেই বলিয়াছেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধে প্রায় ১৫ লক্ষ ফরাসী সৈন্য স্বদেশ রক্ষার জন্য নিহত হইয়াছিল এবং ১০০ বছরের মধ্যে পাঁচবার—১৮১৪, ১৮১৫, ১৮৭০, ১৯১৪ এবং ১৯১৮ সালে বীর ফরাসীরা প্রুশিয়ান কামান ও গোলাগুলীর সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ফ্রান্সের ১৩টি প্রদেশের উপর প্রুশিয়ান মিলিটারি শাসন চারটি ভয়ঙ্কর বছরের বজ্রমুষ্টি বিস্তার করিয়াছিল এবং ভার্দুন থেকে টুলোঁ পর্যন্ত এমন একটি গৃহ বা কুটির ছিল না যেখানে কেউ মারা যায় নাই বা বিকলাঙ্গ হয় নাই। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরিয়া জার্মান সমরশক্তির ত্রাসের মধ্যে ফ্রান্সকে বাস করিতে হইয়াছিল ...কিন্তু মহাযুদ্ধরূপী ভূমিকম্পের আলো-ড়নের পর রাষ্ট্রজীবনের ফাটলগুলি পূর্ণ করিবার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন ছিল, কিংবা পুরাতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বদলে যে নূতন সমাজতান্ত্রিক সৌধ নির্মাণের ঐতিহাসিক দাবী ছিল, ফরাসী রাজনীতি ও অর্থনীতির নেতাগণ সেদিক দিয়া অগ্রসর হইলেন না। তখন পূর্বদিকে সোভিয়েট বিপ্লবের আতঙ্কে ইউরোপ ছিল শঙ্কান্বিত, সুতরাং ফ্রান্সের জনসাধারণ শাসক ও ধনতন্ত্রবাদী শ্রেণীর দ্বারা উপেক্ষিত এবং ১৯১৮ সালের পরবর্তী জটিল অর্থ-নৈতিক সমস্যার দ্বারা নিষ্পেষিত হইতে লাগিল—যদিও মাঝে মাঝে তথাকথিত বাহ্যিক শান্তির যুগও ছিল। ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত এই অবস্থা চলিতে লাগিল, যখন ফ্রান্সের ধনিক ও শাসক সম্প্রদায় এবং রক্ষণশীল রাজনীতিকগণ ভিতরে ভিতরে ফ্যাসিজমের দিকে ঝুঁকিতে লাগিলেন। এই সময় শ্রেণী স্বার্থের সংঘর্ষে আভ্যন্তরীণ সামাজিক দ্বন্দ্বও ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল এবং ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৩৬ সালের মধ্যে একদিকে শ্রমিক সাধারণের মধ্যে গভীর অসন্তোষ এবং অন্যদিকে বামপন্থী দলগুলির মধ্যে শক্তি সঞ্চয় ঘটিতে লাগিল। আর আন্তর্জাতিক জগতে ইতালী, জাপান ও জার্মানীর ফ্যাসিস্ট নীতি ও পদ্ধতির অগ্রগতিতে তখনই বামপন্থী দলগুলির মধ্যে শান্তির ব্যাঘাত ও যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্পর্কে উদ্বেগ দেখা দিল। কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণী অধ্যুষিত ফ্রান্সের আসল মালিক ছিলেন ২০০ ধনী পরিবার, যাঁদের উদ্ভব হইয়াছিল নেপোলিয়নের আমলের ব্যাঙ্ক

বাটা গোগো।
নতুন যুগের নতুন জুতো।
নবীন...... পরুষোচিত......চৌকষ।
নকশা ও নির্মাণে, গড়নে ও উপকরণে
এই জুতো একেবারে নতুন।
পোশাকী আর আটপৌরে, সকল সাজে
এবং সব মেজাজে মানানসই।
যাঁরা সব কিছুতেই নতুনের সন্ধানী,
সর্বাধুনিক ফ্যাশানই যাঁদের লক্ষ্য,
তাঁদের জন্যই বাটা গোগো।
আজই আসুন বাটার দোকানে,
দেখে যান বাটা গোগো-র
বিভিন্ন নকশা।
Bata
GOGO
নতুন যুগের নতুন জুতো!
গোগো বুট
৩০.৯৫
গোগো অক্সফোর্ড
৩০.৯৫

অব ফ্রান্সের বিধান হইতে। কার্যতঃ তাঁরাই প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী ফ্রান্সের সমগ্র শ্রমশিল্প অর্থ এবং বাণিজ্য একচেটিয়া মালিকানার অধিকারী ছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁদেরই হাতে ছিল ফরাসী রাজনীতি ও অর্থনীতির চাবিকাঠি। সুতরাং শ্রমজীবী সাধারণ ও দরিদ্র জনগণের স্বার্থ-রক্ষার জন্য যাঁরা অগ্রসর হইয়া আসিতে-ছিলেন, সেই বামপন্থী দলগুলির সহিত স্বভাবতঃই তাঁদের বিরোধ বাধিল। এই বিরোধিতা হইতে আত্মরক্ষার ও ক্রমবর্ধমান ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার জন্য ফ্রান্সের সমস্ত বামপন্থী দল (র‍্যাডিক্যাল, সোসিয়েলিস্ট, কমিউনিস্ট ইত্যাদি) একত্রিত হইবার সংকল্প করিলেন। ১৯৩৫ সালের ১৪ই জুলাই ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহাসিক 'ব্যাস্টিল দিবসে' তাঁরা ৫ লক্ষ নরনারীর সমাবেশে ঘোষণা করিলেন:—

> "We solemnly pledge ourselves to remain united for the defence of democracy, for the disarmament and dissolution of the Facist Leagues to put our liberties out of reach of Facism. We surer. on this day which brings to life again the first victory of the Republic, to defend the democratic liberties conquered by the people of France, to give bread to the workers, work to the young and peace to humanity as a whole".*

ইহাই তখনকার ফ্রান্সের বিখ্যাত 'পপুলার ফ্রন্টের' জন্মকথা ও মর্মবাণী। শ্রমিক সম্প্রদায় ও সংবাদপত্রের অধিকার হইতে ফরাসী উত্তর আফ্রিকা ও ইন্দোচীন পর্যন্ত প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি সম্পর্কে তাঁরা এক গণতান্ত্রিক প্রোগ্রাম স্থির করিলেন এবং ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে ফরাসী প্রতিনিধি পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে তাঁরা ৬১৮টি সদস্য পদের মধ্যে ৩৭৮টি দখল করিলেন। * ফরাসী পার্লামেন্টী নির্বাচনে এই প্রথম সম্মিলিত বামপন্থী দলগুলির জয়জয়কার হইল। কিন্তু যে সমস্ত বামপন্থী দল লইয়া পপুলার ফ্রন্ট গঠিত হইয়াছিল, তাঁদের সকলেই আসলে বামপন্থী মতবাদ কার্যক্ষেত্রে পুরোপুরি অনুসরণে প্রস্তুত ছিলেন না। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সোসিয়েলিস্ট (১৪৬ জন সদস্য), র‍্যাডিক্যাল (১১৬) এবং কমিউনিস্ট (৭২)। ইঁহারা ছাড়া মধ্যপন্থী ও দক্ষিণপন্থী দলে ছিলেন বাকি সদস্যগণ—যাঁদের আবার র‍্যাডিক্যাল, সোসিয়েলিস্ট, ডেমোক্রাটিক ইত্যাদি দল ও উপদলীয় বহু নামের জন্য বাহির হইতে সত্যকার পরিচয় পাওয়া কঠিন ছিল।

সর্বাধিক সোসিয়েলিস্ট দলের নেতা হিসাবে মঃ লিও ব্লুম পপুলার ফ্রন্টের পক্ষ হইতে ফ্রান্সে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন। কিন্তু মঃ থোরেজার নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন না, তবে, সমর্থন ও সহযোগিতা জানাইলেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, মূলগত বিরোধ গোড়া হইতে স্পষ্ট ছিল।

তথাপি ১৯৩৬ সালের বসন্তকাল হইতে ফরাসী রাজনীতি নূতন মোড় নেওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছিল এবং পপুলার ফ্রন্ট উহারই বাহক ছিল। কিন্তু কলকারখানার দুর্গত শ্রমিকসাধারণ ইতিমধ্যে অধৈর্য হইয়া পড়িয়া-ছিল। সুতরাং নূতন সোসেয়িলিস্ট গভর্ণ-মেণ্ট যথোচিত শক্তিলাভের পূর্বেই জুন মাস হইতে ফ্রান্সের সর্বত্র কলকারখানার ব্যাপক ধর্মঘট সুরু হইল। মঃ ব্লুমের নেতৃত্বে শ্রমিক ও মালিকপক্ষ আপোষ করিলেন এবং শ্রমিক শ্রেণী প্রভৃত জয়লাভ করিল। তাঁদের খাটুনির সময় নির্দিষ্ট হইল সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা, বৎসরে বেতনসহ ১৪ দিনের ছুটি এবং শতকরা ১০ হইতে ১৫, কোন কোন ক্ষেত্রে ৫০ ভাগ পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি। মন্ত্রি-সভায় ও পার্লামেণ্টে সম্মিলিত বামপন্থী দলের আধিপত্য এবং বাহিরে শ্রমিক শ্রেণীর শক্তি সঞ্চয়—এই উভয় সংকটে পড়িয়া মালিক-শ্রেণী অনিচ্ছা সত্ত্বেও নতিস্বীকারে বাধ্য হইলেন। সুতরাং নিজেদের আসন্ন বিপদ বুঝিতে পারিয়া ফ্রান্সের পুঁজিপতি ও মালিকশ্রেণী এই সময় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন পপুলার ফ্রন্টকে ভাঙিবার জন্য। ফ্যাসিস্ট, আধা-ফ্যাসিস্ট ও ধনিকের দল চক্রান্ত করিলেন এবং পূর্বেই বলা হইয়াছে তাঁদেরই হাতে ছিল ফরাসী রাজনীতি ও অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি। তাঁরা আবার লণ্ডনের ব্যাঙ্কার ও পুঁজিপতিদের সঙ্গে জোট পাকাইলেন। সুতরাং ফ্রান্সে মুদ্রানীতি ও বাজেটের বিভ্রাট ঘটিল এবং মঃ ব্লুম ধনপতিদের এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন না হইয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। ফ্রান্সের উচ্চতর পরিষদ বা সিনেটের গঠন 'প্রতিনিধি পরি-ষদের' মত ছিল না। সেখানে রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী এবং র‍্যাডিক্যালদেরই আধিক্য ছিল। ১৯৩৭ সালের জুন মাসে সিনেটের ভোটাধিক্যে ব্লুম মন্ত্রিসভা পরাজিত হন, (যদিও নিম্ন পরিষদে তখনও তাঁদের বিপুল মেজরিটি) এবং মঃ ব্লুম প্রতিরোধের বদলে পদত্যাগ করেন। তাঁর স্থলে র‍্যাডিকেল দলভুক্ত মঃ শোতা প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ব্যাঙ্কারদের সমর্থন লাভের চেষ্টায় দক্ষিণপন্থীদের দিকে ঝুঁকিলেন। ফলে তিনি সোসিয়েলিস্টদের সমর্থন হারাইলেন এবং তাঁর মন্ত্রিসভার পতন হইল। দুই সপ্তাহ ধরিয়া এক অদ্ভুত রাজনৈতিক সংকট চলিল এবং এই সময় ফ্রান্সে কোন "গভর্ণ-মেণ্ট" না থাকিয়া হিটলার তাঁর পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী (আগের পর্বে 'সামরিক চক্রান্তের' অধ্যায় দ্রষ্টব্য) অস্ট্রিয়া দখল করিলেন। আর ফ্রান্সের রাজতন্ত্রবাদী, ফ্যাসিস্টতন্ত্রবাদী ও অন্যান্য রক্ষণশীলেরা প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তিবৃদ্ধি করিতে লাগিল। কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী সশস্ত্র 'Cagonlard' (Horded Men) দল সৈন্যবাহিনী ও ধনিকদের সহায়তায় মাথাঝাড়া দিয়া উঠিল। * এই সময় ১৯৩৮ সালের ১২ই মার্চ নূতন সংকট হইতে ত্রাণ-লাভের জন্য কমিউনিস্ট পার্টিসহ সমস্ত বাম ও মধ্যপন্থীদের সহযোগিতায় মঃ ব্লুম আবার প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন। তখন চেম্বারলেনের নেতৃত্বে বৃটেনেও প্রতিক্রিয়াশীলদের রাজত্ব চলিয়াছে এবং ইতালী, জার্মানী ও স্পেনের ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলির প্রতি তোষণনীতির পালা পুরাদমে চলিয়াছে। এই আন্তর্জাতিক তোষণনীতির ঘূর্ণাবর্তে ফ্রান্সও গভীরভাবে জড়াইয়া পড়িল এবং মঃ ব্লুম আবার পদ-ত্যাগে বাধ্য হইলেন। দালাদিয়ের-এর রাজত্ব সুরু হইল এবং চেম্বারলেনের সহযোগিতায় ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরে মিউনিক সংকট ও মিউনিক চুক্তির পালা আরম্ভ হইল। এই সময় ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্টেরও শেষ সমাধি রচিত হইল এবং জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারের সমস্ত স্বপ্ন রূঢ় আঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল। তখনও আর একবার শ্রমিক সাধারণের 'জেনারেল ষ্ট্রাইক' বা সার্বজনীন ধর্মঘট (১৯৩৮, ৩০শে নভেম্বর) আহ্বান করিয়া ফ্যাসিস্ট পক্ষপাতী শাসন অচল করিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এজন্য পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া 'তাঁরা এই 'জেনারেল ষ্ট্রাইক' ভাঙিয়া দিলেন। ইহার পর ফ্রান্স দালাদিয়েরের নেতৃত্বে চলিল যুদ্ধের দিকে, কতকটা ইচ্ছায় কতকটা বা নিজের অজ্ঞাত-সারে। জনসাধারণ ক্ষুব্ধ, বামপন্থী দল রুষ্ট এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ জয়গর্বে উৎফুল্ল—তার সশস্ত্র ও দুর্ধর্ষ হিটলারী বাহিনী ইউরোপ দখলে অগ্রসরমান। এই পটভূমিকার মধ্যে পোল্যাণ্ডের পরাজয়ের পর ১৯৪০ সালের বসন্তকালে আসিল, যখন মঃ রেণো নূতন মন্ত্রিসভার ভার গ্রহণ করিলেন।

ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের এই সংক্ষিপ্ত চিত্র স্মরণে রাখিলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তার পতনের কারণগুলি সহজে বুঝা যাইবে। এখানকার রাজনৈতিক দল-গুলিকে মোটামুটি দক্ষিণ, বাম ও মধ্য—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করিলেও একটি সুসংবদ্ধ, শক্তিশালী এবং দৃঢ় নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণের আন্তরিক চেষ্টার দ্বারা কাহারও ইতিহাসকেই গৌরবান্বিত মনে করা চলে না। কারণ, মূলতঃ কোন দলের সঙ্গেই অপরের আন্তরিক মিল ও যোগ ছিল না—একমাত্র রক্ষণশীলগণের শ্রেণীস্বার্থের লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা ছাড়া। সুতরাং বহু দলে ও উপদলে ছত্রভঙ্গ ফরাসী রাজনীতির ইতিহাসে দেখা যায় যে, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রিপাব্লিক রাষ্ট্র পত্তনের পর হইতে কোন

---

* The Fall of The French Republic — by D. N. Pritt K.C.

---

* ফ্রান্সের আইনসভা বা ন্যাশনাল আসেমব্লি দুটি পরিষদে বিভক্ত ছিল—উচ্চতর পরিষদের নাম সিনেট এবং নিম্নতর পরিষদের নাম ছিল চেম্বার অফ ডেপুটিস—৪ বৎসর পর পর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইত।

---

* পূর্বোল্লিখিত পুস্তক—পৃষ্ঠা ৯১—১০০।

ফরাসী মন্ত্রিসভার আয়ু গড়পড়তা ৮ মাসের বেশী ছিল না এবং এই সময়ের মধ্যে মোট ১০৬ বার গভর্ণমেণ্ট বা মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল। * সুতরাং ফরাসী রাজনৈতিক বিরোধের চেহারা সহজেই অনুমেয়।

স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতিতে ফ্রান্সের এই সঙ্কট ১৯৪০ সালের রণক্ষেত্রে সর্বনাশা মূর্তি লইয়া দেখা দিল এবং ইহার মূল যদিও প্রথম মহাযুদ্ধের গভীর আবর্তের মধ্যে, তথাপি বাহ্যিক বিশ্লেষণে ইহার আরম্ভ অপেক্ষাকৃত আধুনিক—১৯৩৫ সাল হইতে যখন ইউরোপীয় পররাষ্ট্র নীতিতে ফ্রান্স ফ্যাসিষ্ট শক্তিপুঞ্জের পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। মঃ লাভালের আমল হইতেই ফ্রান্সের আত্মরক্ষার রক্ষণশীল ঐতিহ্যের সমাধি ঘটে। ইহার পূর্বে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত মঃ বার্থো বৃটেন, সোভিয়েট রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির সহিত সখ্যতা ও চুক্তি সম্পাদন করিয়া হিটলারী অগ্রগতির বিরুদ্ধে বেষ্টনীজাল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ফ্রান্সের রক্ষণশীল রাজনীতিকগণ যেমন Declasse ক্লেমেশ এবং পয়েঁকার যদিও 'সেকেলে নীতি' অনুসরণ করিয়াছিলেন, তথাপি বৃটেনের চার্চিলের মত গভীর স্বদেশানুরাগের এবং সাহস ও বুদ্ধির দ্বারা ফ্রান্সের আত্মরক্ষার দিকটা শক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কুক্ষণে লাভাল এই সনাতন নীতি ত্যাগ করিয়া একদিকে যেমন ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল পন্থা অনুসরণ করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে তেমনই আভ্যন্তরীণ জাতীয় শক্তি ও উপাদানগুলিকে দুর্বল করিয়া ফেলিলেন। ইতালীয় পক্ষপাতী লাভাল ফরাসী রাজনীতিতে মুসোলিনীর বিষ প্রবেশ করাইলেন আবার মুসোলিনীর মারফৎ হিটলারের সহিত সেতুবন্ধ রচনা করিলেন। ১৯৩৬ সালে অবশ্যই পপুলার ফ্রন্টের দ্বারা বামপন্থীরা কিছুটা প্রতিষেধক অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু সোসিয়েলিষ্ট নেতা মঃ ব্লুমের ভ্রান্ত শান্তিবাদ, যাহা কার্যতঃ দক্ষিণপন্থীদিগকে শক্তিশালী করিল, তাহাই আবার বামপন্থীদের সম্মিলিত অভিযানেরও মৃত্যু ঘটাইল। এদিকে বৃটেনে চেম্বারলেন ইতালী ও জার্মানীকে খুসী করিতে গিয়া মিঃ ইডেনের মত রক্ষণশীল নেতাকে পর্যন্ত পররাষ্ট্র সচিবের পদ হইতে অপসারিত করিলেন এবং বৃদ্ধ লর্ড হ্যালিফ্যাক্সকে সেই গদীতে বসাইলেন। ফ্রান্স ও বৃটেন যেন পাল্লা দিয়া তোষণ নীতির দিকে ঝুঁকিলেন এবং লাভাল, ফ্লাদিন, বনেট, দালাদিয়ের প্রভৃতি একে একে সমস্ত ফরাসী রাজনীতিকই আত্মহত্যার পথ অনুসরণ করিয়া চলিলেন। শান্তিবাদ, তোষণ নীতি ও পরাজিতের মনোভাব ফ্রান্সকে এমনভাবে পাইয়া বসিল যে, যুদ্ধায়োজনে ও আত্মরক্ষায় যেমন বিভ্রাট ঘটিল, তেমনই বাম ও দক্ষিণপন্থীর মধ্যেও সীমারেখা ঘুচিয়া যাইতে লাগিল। এই সময় ফরাসী রাজনীতিতে তিন প্রকার প্রধান দলের যে অবস্থা দাঁড়াইল, এককথায় তাঁদের সকলকেই 'পরাজয়বাদী' বলা যাইতে পারে। যথা—(১) প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী যাঁরা ফ্যাসিষ্ট শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে মিত্রতার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। (২) যাঁরা পুঁজিপতি ও ধনিকদের পক্ষ হইতে তোষণনীতির দ্বারা শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইবার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন। (৩) বামপন্থী দলগুলির মধ্যে গোঁড়া শান্তিবাদিগণ, যাঁরা যুদ্ধের বিরোধিতা করিতেছিলেন। যদিও এই দলগুলির মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর আদৌ মিল ছিল না, তথাপি ইহাদের সমষ্টিগত ফল গিয়া দাঁড়াইল ফ্রান্সের বিপর্যয়ে। প্রথম দল চাহিলেন ফ্যাসিজমের সহযোগিতায় রাষ্ট্রশক্তি দখল করিয়া রাখিতে, সুতরাং যুদ্ধে হিটলারের পরাজয়ের জন্য তাঁরা শঙ্কাবোধ করিলেন। দ্বিতীয় দল ধনতন্ত্রের নির্বিঘ্নতা ও ব্যবসায়-বাণিজ্য মারফৎ অবাধ শোষণ সুরক্ষিত করার জন্য বৈদেশিক নীতিতে শান্তির দিকে ঝুঁকিলেন এবং তৃতীয় দল গণতন্ত্র ও যুদ্ধ-বিরোধিতার বামপন্থী বুলি আওড়াইয়া শান্তিবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে, ফ্রান্সে দক্ষিণপন্থী হইতে বামপন্থী পর্যন্ত তোষণবাদী ও পরাজয়বাদীদের একটি 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট' গড়িয়া উঠিল।* ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে দালাদিয়েরের মন্ত্রিসভা মিউনিক সঙ্কটে গিয়া পৌঁছিলেন এবং তারপর এই শোচনীয় অঙ্কের যেটুকু বাকি ছিল, তার যবনিকাপাত হইল রেণোর মন্ত্রিসভায়।

ফরাসী রাষ্ট্রের আসল মেরুদণ্ড ছিল র‍্যাডিক্যাল পার্টি, যেমন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে কংগ্রেস। এই র‍্যাডিক্যাল পার্টি ফ্রান্সের একদিকে বণিক, ব্যাঙ্কার ও ধনিকদের এবং অন্যদিকে গণতন্ত্রবাদী মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে যোগসূত্রস্বরূপ ছিলেন। ইহাদিগকে মধ্যপন্থী বলিয়া স্বীকার করিলেও দেখা যাইবে যে দক্ষিণপন্থীদের পাল্লায় পড়িয়া ইঁহারা যে কোন মূল্যে শান্তিরক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। এদিকে সংবাদপত্রের ভ্রান্ত ও অজ্ঞতাপ্রসূত (এবং তাঁহারা ছিল ধনিক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষক) প্রচারকার্যের ফলে জনসাধারণও আসল বিপদ সম্পর্কে উদাসীন ছিল। ইহার প্রমাণ এই যে ১৯৩৮ সালে মিউনিক চুক্তির পর প্যারিসে প্রত্যাগত দালাদিয়েরের প্রতি জনসাধারণ আনন্দের আতিশয্যে উচ্ছ্বসিত অভিবাদন জানাইল এবং...

'the crowds almost threw themselves under the wheels of the Premiers car' *

অবশ্য বৃটেনেও চেম্বারলেন করতালিধ্বনি পাইয়াছিল, কিন্তু সেখানকার অবস্থা ফ্রান্সের মত এত ভয়াবহ ছিল না।

অত্যাসন্ন যুদ্ধের মুখে ফ্রান্সের কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই অপরের বনিবনা ছিল না এবং পররাষ্ট্রীয় নীতিতে কেবল বিতর্কের ঢেউ চলিতে লাগিল। প্রত্যেক দলই স্ব স্ব মতবাদ অনুসারে হিটলারের জয়যাত্রার মধ্যে কিছু কিছু সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন। ফলে, সমগ্র ফ্রান্সের পক্ষ হইতে একটি দৃঢ় ও শক্তিশালী নীতির দ্বারা যুদ্ধের রাজনৈতিক পরিচালনা এবং সৈন্য ও জনসাধারণকে উদ্দীপনা জোগাইবার কেহ রহিল না। অর্থাৎ ইংলণ্ডে রক্ষণশীল চার্চিলের মত যেমন একজন সিংহপুরুষ দেখা দিয়াছিলেন, ফ্রান্সে তেমন কেহ ছিলেন না।

মিউনিক চুক্তির পর ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে 'শান্তিরক্ষার' জন্য একটি চুক্তি হইয়াছিল। কিন্তু বাহ্যতঃ উহা শান্তির নাম করিয়া অনুষ্ঠিত হইলেও হিটলারের চিরন্তন ধাপ্পা নীতির কৌশল যেমন উহাতে ছিল, তেমনই ফরাসী ধনিক গোষ্ঠীর অগ্রণী 'দুইশত পরিবার' পিছন হইতে সমস্ত কলকাঠি নাড়িতেছিলেন সোভিয়েটের বিরুদ্ধে। এই বিরোধিতার চরম দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে ফিনল্যান্ড ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সময় ১৯৩৯-৪০'এর শীতকালে। তখন ফরাসী গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছিলেন যে তাঁহারা ৫০ হাজার সৈন্য পাঠাইবেন ফিনল্যাণ্ডের সাহায্যের জন্য। অবশ্য বৃটেন এবং আমেরিকাও এই মতাবলম্বী ছিলেন। এই সময় ফ্রান্সে যুদ্ধের জরুরী প্রয়োজনের নাম করিয়া আভ্যন্তরীণ শাসনে পীড়ন নীতির অবাধ স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। অথচ আসল যুদ্ধের প্রশ্নে শাসক গোষ্ঠী মনে করিতে লাগিলেন যে, সামাজিক বিপ্লবের চেয়ে বরং হিটলারের জয়লাভ শ্রেয়তর। তাঁরা পার্লামেণ্টের বদলে জরুরী আইনের (আমাদের দেশের অর্ডিনান্সের মত) দ্বারা দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। ১৯৪০ সালের বসন্তকালে ফরাসী প্রতিনিধি পরিষদের যে সাধারণ নির্বাচন হইবার কথা ছিল, ১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মকালেই তাহা স্থগিত রাখার জন্য সিদ্ধান্ত হইল এবং রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষরের পর পররাষ্ট্র সচিব জর্জ মেনেলের মত ধূর্ত ও কৌশলী লোক কমিউনিষ্ট পার্টিকে দমনের ব্যবস্থা পাকা করিলেন। দুইটি কমিউনিষ্ট পত্রিকা হিউম্যানিটি ও উ সম বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং স্বাধীন মতাবলম্বী সাংবাদিকগণ দণ্ডিত হইলেন। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। তখন ফরাসী সাম্যবাদী দল অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন,

* Penguin Political Dictionary

* 'Battle for the World' — by Max Werner Page 127-28

*পুর্বোল্লিখিত পুস্তক

তাঁদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ। সাম্যবাদীগণের দ্বারা পরিচালিত সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন ও মিউনিসিপালিটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রো-হিটলার ও অ্যান্টিওয়ার—হিটলারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও যুদ্ধের বিরোধিতার অভিযোগ আনা হইল।

যে যুদ্ধের অজুহাতে এই প্রকার পীড়ন নীতি আরম্ভ হইল, সেই যুদ্ধের আয়োজন কি প্রকার ছিল? প্রকৃতপক্ষে সমর সম্ভার উৎপাদনের জন্য 'industrial mobilization' বা শ্রমশিল্প সমাবেশ ঘটিল না। বরং রাজনৈতিক আবর্ত ও পীড়ন নীতির ফলে জনসাধারণ ও শ্রমিকগণ হতাশ হইয়া পড়িল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে 'Renault' কারখানাগুলিতে যেখানে শান্তির সময়ে ৩০ হাজারের অধিক শ্রমিক কাজ করিত, যুদ্ধের সময় সেখানে সংখ্যা দাঁড়াইল ৬ হইতে ৮ হাজারে।

কারখানাগুলিতে কাজ এভাবে মন্দীভূত বা অচল হইয়া পড়িয়াছিল। অথচ মুনাফাবাজী ও ফ্যাসিস্ট সাহায্য দান চলিতেছিল পুরা চালে। এমন কি ফ্রান্স হইতে গাড়ী ভর্তি লৌহ ধাতু লাক্সেমবুর্গ ও বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া জার্মানীতে পর্যন্ত যাইতেছিল। * এই প্রকার দেশদ্রোহিতা কল্পনাতীত ছিল বটে, কিন্তু সেদিনের ফরাসী রাজনীতিতে ইহাও সস্তা ছিল।

সমাজের কোন স্তরেই আত্মবিশ্বাস, বলিষ্ঠতা ও শত্রু প্রতিরোধের দুর্জয় সংকল্প ছিল না। এমন কি বামপন্থী দলগুলিও এই দিক দিয়া দোষমুক্ত ছিলেন না এবং তাঁদের আচরণ সোভিয়েট-বিদ্বেষী ও সোভিয়েট পক্ষপাতী, উভয়েরই সমালোচনার স্থল হইয়াছিল। যে অদ্ভুত, জটিল ও শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, উহার জন্য দক্ষিণ, বাম ও মধ্যপন্থী—প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই দায়ী ছিলেন। তবে, ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, তাঁরা সম্ভবতঃ স্বেচ্ছায় ফ্রান্সের এই অধঃপতনে সাহায্য করেন নাই। কিন্তু শান্তিরক্ষার অতিরিক্ত আগ্রহ এবং সোভিয়েট রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'সাম্রাজ্যবাদী' যুদ্ধে যোগ না দেওয়ার' সিদ্ধান্ত (বিশেষতঃ ১৯৩৯ সালের রুশ-জার্মান চুক্তির প্রতিক্রিয়া) পৃথিবীর সর্বত্রই কমিউনিস্ট পার্টি মহলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতবর্ষ, বৃটেন এবং আমেরিকাও ইহা হইতে বাদ গেল না। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কুজ্ঝটিকা আরও গভীর ছিল এই কারণে যে, ইহা বৃটিশ শাসনের অধীন ছিল। তবে, ১৯৩৯-৪০ সালের আন্তর্জাতিক সঙ্কটে কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাব মোটামুটি এই প্রকার ছিল—

> 'This is not our war — this battle between two gangster groups — the British French and the Hitlerite. Let us keep out of it".

—১৯৪০ সালের ১২ই মে, মার্কিণ কমিউনিস্ট পত্রিকা 'সানডে ওয়ার্কারের' মন্তব্য।*

১৯৪২ সালের রিয়ম মামলার শুনানীর সময় মন্ত্রি দপ্তর, কারখানার মালিক এবং শ্রমিক ও কমিউনিস্টদের সহিত সংঘর্ষ ও বিরোধের বহু তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। তখন আদালতে দালাদিয়ের স্বীকার করিয়াছিলেন যে, স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে ফরাসী সেনাপতিরা স্থির করিয়াছিলেন যান্ত্রিক যুদ্ধ কোন কাজে আসিবে না। সুতরাং অর্থসচিবের দপ্তর এই সম্পর্কে ব্যয় মঞ্জুরিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বিমান সচিবের দপ্তর অভিযোগ করেন যে কমিউনিস্টরা কারখানায় বিমান উৎপাদনে বাধা দিতেছিল, আর দালাদিয়ের বলেন যে, বিমান কারখানা 'জাতীয় সম্পত্তিতে' পরিণত করার দুর্বুদ্ধি প্রমাণের জন্য মালিকেরাই উৎপাদনে বিভ্রাট ঘটান এবং স্যাবোটাজের চক্রান্ত করেন। ফলে ট্যাঙ্ক বা বিমানবহর ফরাসী বাহিনীর কিছুই ছিল না। +

১৯৩৬ এবং ১৯৩৮ সালে ধর্মঘট ও শ্রমিক অসন্তোষের কথা উল্লেখ করিয়া আর একজন সমালোচক বলিয়াছেন যে যখন জার্মানীর কারখানাগুলি দিনরাত্রি সমর সম্ভার উৎপাদনে ব্যস্ত ছিল, তখন ফ্রান্সে আরম্ভ হইল সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা খাটুনি, আর বিমান কারখানাগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার মারাত্মক পরীক্ষা এবং ধর্মঘটের জন্য ১৯৩৮ সালে ফ্রান্সের সমগ্র কলকারখানাই এক সময় অচল অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল।*

সোভিয়েট পক্ষপাতী ম্যাক্স ভার্ণার লিখিয়াছেন যে সোসিয়েলিস্ট ও কমিউনিস্ট এবং র‍্যাডিক্যাল পার্টির বামপন্থিগণ গোড়াতে হিটলার-বিরোধী ও মিউনিক চুক্তির একান্ত বিরোধী ছিলেন। প্রতিরোধের দিকেই তাঁদের ঝোঁক ছিল। কিন্তু রুশ-জার্মান চুক্তির পর ইহার পরিবর্তন ঘটিল এবং সাম্যবাদী দলও কার্যতঃ পরাজয়বাদী ও তোষণবাদী দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িলেন। আর দক্ষিণপন্থীরা সেই সুযোগে সর্বহারা শ্রেণী ও বামপন্থী দলের উপর সর্বপ্রকার আক্রোশ মিটাইবার সুযোগ পাইলেন।*

আর ইংলণ্ডে তো ১৯৩৯ সালের অকটোবর হইতে ১৯৪১ সালের জুন মাস পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি ও সাম্যবাদ অনুরাগীদের মধ্যে প্রবল বিরোধ ও বিতর্ক আরম্ভ হইল। সাম্যবাদীগণ বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কোন তফাৎ দেখিতে পাইলেন না। তাঁরা প্রতিদিন শ্রেণী বিদ্বেষ প্রচার করিয়া ঘোষণা করিলেন যে এই যুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণীর কোন স্বার্থ নাই। হিটলারের চেয়েও তাদের আসল শত্রু বলিয়া প্রচারিত হইল বৃটিশ ধনিকতন্ত্র এবং উহার সমগোত্রী ফরাসী পুঁজিবাদীগণ। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির উপর অত্যাচার ও পীড়ন হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাদের যুদ্ধ বিরোধিতার নীতি, আচরণ ও কার্যই সেই সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছিল এবং ফরাসী শাসক গোষ্ঠীর অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল।*

তথাপি শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি এই ভ্রম সংশোধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, যদিও তখন অত্যধিক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল এবং রণক্ষেত্রে জার্মান বাহিনীকে আর প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। ১৯৪০ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে কমিউনিস্ট পার্টি এক উদ্দীপনাময় ইস্তাহার ও বিবৃতি ফ্রান্সের সর্বত্র প্রচার করিলেন। এই ইস্তাহারে ফ্রান্সের বিপর্যয়ের কারণগুলি এবং শাসক শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে—

> "The ruling class has brought our country to the brink of the precipice. To-day, when German imperialism is putting into practice its plan of enslaving France, all that the French rulers are concerned with is to save their privileges, their capital, their class domination. They are ready to sacrifice the independence of our country.... their regime is one of organized treachery towards our nation....As ever, under all conditions so in present days of severe trials, horror, and bound-

* The Fall of The French Republic — by D. N. Pritt page 125-31.

* The Great Challenge by Louis Fischer, page 8

+ পূর্বোল্লিখিত পুস্তক—পৃঃ ১৫

* From Dunkirk to Benghazi —

* Battle For the World P. 133

* The Betrayal of the Left — edited by Victor Gallancy Page—

less calamities, we Communists have been and remain with our people. Their fate is our fate. Our people will not perish".*

ইহার পর প্রধানতঃ ফরাসী সাম্যবাদীগণের চেষ্টাতেই পদানত ফ্রান্সে জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাঁদের আচরণ পূর্বাপর বুদ্ধিসম্মত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না; বরং অত্যন্ত ক্ষতিকর ছিল।

কিন্তু শাসকগোষ্ঠী সম্পর্কে ফরাসী সাম্যবাদীগণের নিন্দাবাদ আদৌ অতিরঞ্জিত ছিল না। দালাদিয়েরের পর ১৯৪০-এর বসন্তকালে রেনো মন্ত্রিসভাও অক্ষমতার বাহন হইয়া পড়িয়াছিল। আর নাৎসী পক্ষপাতী দল মার্শাল পেঁতা ও জেনারেল ওয়েগাঁর নেতৃত্বে প্রাধান্য অর্জন করিয়া ফ্রান্সকে হিটলারের নিকট আত্মসমর্পণে অগ্রসর করিয়া দিতেছিল। Helene de Portes নাম্নী একটি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্ত্রীলোক ছিল রেনোর রক্ষিতা। এই স্ত্রীলোকটি মার্সাই হইতে প্যারিসের অভিজাত মহলে আসিয়াছিল জার্মানীর গুপ্তচর বৃত্তি লইয়া এবং নাৎসী দ্যাই অ্যাবেটির আড়কাঠি স্বরূপ ছিল এই স্ত্রীলোকটি। মাদাম ডি পোর্ট প্রধানমন্ত্রী রেনোর উপর মায়াজাল বিস্তার করিল এবং হিটলারের নিকট আত্মসমর্পণে প্ররোচনা দিল। বহু দেশের ঐতিহাসিক দুর্দিনে যেমন স্ত্রীলোকের অদৃশ্য হস্তের প্রভাব দেখা যায় (সেই সময়কার ইতালীতে মুসোলিনী, জার্মানীতে হিটলার এবং রুমানিয়ায় রাজা ক্যারলও প্রণয়িনীরূপিনী রক্ষিতাদের প্রতি আসক্ত ছিলেন। তবে, হিটলারের উপর নারীর প্রভাব বিস্তারের কোন নজীর নাই) ফ্রান্সেও ইহার অভাব ছিল না। এই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে পল রেনো শনি ও রাহুর মিলনের মত রেনোর ভাগ্যচক্রে দেখা দিল।*

আর একটি বিবরণীতে দেখা যায় যে, মাদাম দ্য পোর্ট প্রধানমন্ত্রী রেনোর স্ত্রীর একজন বান্ধবী ছিলেন। কিন্তু তাঁর সংগে রেনোর ঘনিষ্ঠতা প্রায় স্ত্রীর পর্যায়ে উঠিল এবং প্যারিসের মার্কিণ কূটনৈতিক মাসের ডিনার টেবিলে রেনোর সঙ্গে এই দুই মহিলাকে নিয়া সময় সময় অস্বস্তিকর অবস্থা দেখা দিত। মাদাম ডি পোর্ট হিটলার ও ফ্যাসিজমের পক্ষপাতী ছিলেন এবং রেনোর মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর তাঁরই তাগিদে রেনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফরাসী রাষ্ট্রদূতের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রেনো মাদামকে সঙ্গে নিয়া (স্ত্রীকে নয়!) এবং একটি গাড়ীতে মালপত্র বোঝাই করিয়া ওয়াশিংটন যাত্রার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স ত্যাগ করিয়া স্পেনীয় সীমান্তে আসিয়া হাজির হইলেন। মোটর গাড়ী চালাইতে ছিলেন মাদাম নিজে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের আর ওয়াশিংটন যাওয়া হইল না, কারণ, হঠাৎ একটি গাছের সংগে ধাক্কা খাওয়ার পথে যে দুর্ঘটনা ঘটিল তার ফলে মাদাম মারা গেলেন এবং মিঃ রেনো গুরুতর আহত হইলেন।

সেই সময় ফ্রান্সের নৈতিক আবহাওয়া যে কলুষিত ছিল, তার আর একটা প্রমাণও পাওয়া যায়। ১৯৩৯ সালে মার্শাল পেতাঁ মাদ্রিদের ফরাসী রাষ্ট্রদূতের পদে ছিলেন। তখন ফ্রান্সের পতনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাকাইয়া পেতাঁর কয়েকজন বন্ধু তাঁকে প্যারিসে ফিরিয়া গিয়া এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য অনুরোধ করেন। প্রকাশ যে, মার্শাল পেঁতা তখন জবাব দেন:

'What would I do in Paris?
I have no mistress' !

আমি 'প্যারিসে গিয়ে কি করবো? আমার তো রক্ষিতা নেই!'

বিশিষ্ট মার্কিন কূটনীতিবিদ রবার্ট মারফি তাঁর পুস্তকে ('Diplomat Among Warriors') এই সমস্ত ঘটনার কথা কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন যে, যে সমস্ত মহিলার সঙ্গে ফরাসী গভর্ণমেন্টের লোকজনের ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁরা রাজনৈতিক প্রভাব খাটাইতেন এবং জার্মান ও রুশ গুপ্তচরেরা তার সুযোগ নিতেন।...

বৃটেনের সংকটের কারণ

ফ্রান্সের যখন এই অবস্থা তখন বৃটেনের চিত্রও খুব উজ্জ্বল ছিল না। তবে, 'চ্যানেল ও চার্চিল' এবং বিমানবহর (লুই ফিসারের ভাষায়) ইংলণ্ড দ্বীপকে রক্ষা করিল। কিন্তু চেম্বারলেনের নেতৃত্বে বৃটেনও ক্রমশঃ ফ্রান্সের অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তবে সেখানে সাম্রাজ্য ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শ্রমিকদল ও রক্ষণশীলদলের (উদারনীতিক দলের শক্তি উল্লেখযোগ্য নহে) মধ্যে মোটামুটি মতের ঐক্য ছিল বলিয়া চেম্বারলেন নরওয়ে যুদ্ধের কেলেঙ্কারীর পর বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যদিও ইউরোপীয় তোষণ নীতির প্রধান নায়ক এবং উদ্যোক্তাই ছিলেন তিনি। ফ্যাসিষ্ট ও বামপন্থী মতবাদের উগ্রতার দ্বারা বৃটেন ফ্রান্সের মত শতধা বিচ্ছিন্ন ছিল না। বরং ফ্যাসিষ্ট মতবাদের উদ্যোক্তা স্যার অসওয়াল্ড মোজলে এবং অন্যান্য ফ্যাসিষ্ট নেতাকে গ্রেপ্তার ও আটক করা হইল—২৩শে মে, ১৯৪০ এবং কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'ডেলি ওয়ার্কার'ও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক শ্রেণী-আধিপত্যের চেষ্টা সেখানেও পুরোপুরি বজায় রহিল। অথচ প্রকাশ্যে ফ্যাসিজমকে আস্কারা দেওয়া হইল না। আর সামরিক মতবাদে বৃটেন চিরন্তন রক্ষণশীলতা ও সাম্রাজ্যনীতির অনুসরণ করিল, যাহার ফলে ১৯৪০'এর পশ্চিম রণাঙ্গন হইতে বৃটিশ সৈন্যেরা কোন মতে সমুদ্র সাঁতরাইয়া বাঁচিয়া আসিল।

বৃটেনের সনাতন রণচিন্তা ৬টি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এগুলির মধ্যে প্রধান ছিল নৌবহর ও সমুদ্র পথ—কিংবা অর্থনৈতিক অবরোধ সংগ্রাম, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও সাম্রাজ্য রক্ষা এবং ইউরোপীয় ভূভাগে সীমাবদ্ধ সংগ্রাম। সুতরাং বৃটেনের খাস স্থলসৈন্যকে অভিযাত্রী বাহিনী মাত্র বলা যায়। মূলতঃ বৃটেনের সামরিক মতবাদও আত্মরক্ষামূলক ছিল। কারণ, অর্ধ পৃথিবী ব্যাপ্ত এত বড় সাম্রাজ্যের পর তাহার আর নতুন রাজ্য ও কাঁচামাল দখলের প্রয়োজন ছিল না। বরং এগুলিকে রক্ষা করিয়া চলাই ছিল তাহার একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং তাহার রণনীতিতে নৌবহর ও সমুদ্রপথের সংগ্রাম বড় হইয়া উঠিল।

ফ্রান্সের মত বৃটেনও ১৯১৬-১৮ সালের সামরিক অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করিল। ফলে, ইউরোপীয় ভূভাগের যুদ্ধকে বাদ দিয়া দ্বীপ ও সাম্রাজ্য রক্ষার মনোবৃত্তি বৃটেনকেও রণক্ষেত্রের সংকটের দিকে লইয়া গেল। সাম্রাজ্যের এবং মিত্র সঙ্গীগণের লোকবল ও সামরিক বলের উপর নির্ভরতাও তার রক্ষণশীল বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিল। এখানেও তার শোষণনীতির সূক্ষ্ম কৌশল অনুসরণের চেষ্টা বুদ্ধিমানদের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। ফলে, বৃটেনের দুর্বল স্থল সৈন্য এবং উপযুক্ত ট্যাঙ্ক ও গোলা-গুলীর অভাবতাকে ইউরোপ হইতে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিল। আত্মরক্ষামূলক রণনীতির প্রধান মন্ত্রগুরু ক্যাপ্টেন লীডেল হার্টের মতামতও বৃটিশ রণচিন্তার উপর প্রভূত প্রভাব খাটাইয়াছিল। কিন্তু লীডেল হার্ট আধুনিক যান্ত্রিক সংগ্রাম সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং বৃটিশ আর্মিকে সেভাবে গড়িয়া তুলিবারও পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং 'বেগবান' আত্মরক্ষা' বা dynamic defence' এর তিনি পক্ষপাতী ছিলেন—এই ধরণের অনড় অচল যুদ্ধের নহে। বিশেষতঃ সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত মৈত্রী না করিয়া তিনি জার্মানীর বিরুদ্ধে বৃটেনের যুদ্ধযাত্রার একান্ত বিরোধী ছিলেন। কিন্তু রণনীতি ও রাজনীতি, উভয়ক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়াশীল রক্ষণশীলতা বৃটেনকেও ঘোরতর বিপাকে ফেলিল। ইউরোপীয় ভূমিপথের যুদ্ধের গুরুত্ব এবং 'রাইন নদীর তীর পর্যন্ত বৃটেনের আত্মরক্ষার সীমা'—এই প্রচলিত তত্ত্বও উপেক্ষিত হইল। সুতরাং পরাজয় অনিবার্য ছিল।

(ক্রমশঃ)

---

* The Fall of the French republic — Page 159-62.

* Truth on the Tregedy of France —by Elie J. Bois P. 236-241

খাঁচা

নির্মলেন্দু গৌতম

অমলের মনের মধ্যে এতোদিন যে ভয়ের কথাটা ছিলো অনেক রাত্রে সেই কথাটাই বললো, কৃষ্ণা। সেই মুহূর্তে তার ঘামে ভেজা মুখে অসম্ভব ভয়ের চিহ্ন দেখলো অমল।

কথাটা কৃষ্ণার মুখে শুনে তার মুখের দিকে তাকিয়ে অমলের সমস্ত শরীর এক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গেলো ভয়ার্ত অনুভবে। মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম করে উঠলো। শুকিয়ে উঠলো গলার ভেতরটা। অস্পষ্ট আলোর মধ্যে বিস্ফারিত চোখে কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমিও এ কথাটা তোমাকে বলবো ভাবছিলুম।'...যদি সত্যিই তাই হয়।'

কৃষ্ণা বোধহয় ভেতরে ভেতরে কান্নায় ভেঙে পড়লো। ভাঙা গলায় বললো, 'তাহলে কি করবো বলোতো!'

'কিচ্ছু করবার নেই।' বিষণ্ণ গলায় বললো অমল।

অমল এবার কিছুটা উঁচু হয়ে কৃষ্ণার শরীরের ওপর দিয়ে খানিকটা ঝুঁকে ওদিকে শুয়ে থাকা খোকাকে দেখলো। মুখের মধ্যে ডানহাতের বুড়ো আঙুলটা ভ'রে গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে খোকা। এতোক্ষণ কৃষ্ণার বুকের মধ্যে ডুবে ছিলো। মনে হচ্ছে কৃষ্ণার শরীরের উত্তাপ এখনো খোকার শরীর ছুঁয়ে আছে। অসম্ভব কষ্টে বুকের ভেতরটা ব্যথা করতে থাকলো অমলের।

কৃষ্ণা ফের ভাঙা গলায় বললো, 'তোমার এক বন্ধু তো বিলেত থেকে ঘুরে এলো। চলো না একদিন তার কাছ থেকে ঘুরে আসি। ...ওর ঠিকানা নিশ্চয়ই তোমার নোটবুকে লেখা আছে।' একটুখানি আশ্রয় পেতে চাইলো কৃষ্ণা।

'তার ঠিকানা বোধহয় হারিয়ে ফেলেছি।'

'একবার খুঁজেই দেখো না নোটবুকটাতে।' কৃষ্ণা অসহায়ভাবে আঁকড়ে ধরতে চাইছে অমলকে।

'ঠিক আছে, সকালবেলা খুঁজে দেখবো।'

অনেকটা সময় নিঃশব্দ থেকে কৃষ্ণা অসহায়ভাবে বললো, 'কিছু একটা করবার কি নেই, নিশ্চয়ই আছে।'

কিন্তু অমল জানে কিছু করবার নেই। খোকা কিছুতেই কথা বলতে পারবে না। অনেকদিন আগেই অমল খোকার ভাবভঙ্গি দেখে অনুভব করেছে ব্যাপারটা। কৃষ্ণাও নিশ্চয়ই অনুভব করতে পেরেছে। কারণ কৃষ্ণার কাছেই তো খোকা সবসময় থাকে। অমল আপিস, আড্ডা সব সেরে খুব কম সময়ই খোকাকে কাছে পায়।

খোকা বোবা হবে, কোনোদিন কথা বলতে পারবে না, কথাটা এমন ভয়াবহ একটা সত্যি কথা যে, এ কথাটা দু'জনের কেউ-ই পরস্পরকে বলবার মতো সাহস পায়নি। অমল জানে, সাহস পাওয়াও যায় না। যতোক্ষণ নিজেকে নিজের কাছ থেকে আড়াল ক'রে রাখা সম্ভব ছিলো, ততোক্ষণ তা করেছে তারা। আজকে কৃষ্ণা নিশ্চয়ই নিজেকে আর আড়াল করে রাখতে পারেনি নিজের কাছে।

খোকাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দীর্ঘসময় অস্বস্তিকরভাবে নিঃশব্দ ছিলো। অমলও ঘুমোতে পারেনি। কৃষ্ণা যে কিছু একটা গভীরভাবে ভাবছিলো তা বুঝতে পেরেছিলো অমল। বুঝতে পেরেছিলো বলেই অমল ঘুমোয়নি।

কৃষ্ণা বুকের ভেতর তার দীর্ঘ সময়ের কান্নাটাকে এবার আর ধ'রে রাখতে পারলো না। ঝর্ ঝর্ ক'রে কেঁদে ফেললো দু'চোখ বাঁ হাতের পাতায় ঢেকে। তবু চোখের জলে কৃষ্ণার চিবুক ভেসে যেতে দেখলো অমল।

কি করবে অমল ভেবে পেলো না। করবার কি-ই বা আছে। কৃষ্ণার এই চোখের জল ক্রমশঃ সমুদ্র হয়ে যাবে। কৃষ্ণা সেই সমুদ্রে ভেসে যাবে অসহায়ভাবে। অমল বুকের ভেতরে এবার যেন তীব্র একটা ব্যথা অনুভব করলো।

তবু কৃষ্ণাকে অসম্ভব সাবধানে ছুঁয়ে অমল মৃদুস্বরে বললো, 'কাল সুজয়ের কাছে যাবো। আমরা যা ভাবছি তা নাও তো হতে পারে। সুজয় ডাক্তার হিসেবে খুব ভালো। ও নিশ্চয়ই কিছু একটা ক'রে দিতে পারবে।'

কৃষ্ণা তবুও তার কান্নাকে থামিয়ে রাখতে পারলো না।

অমল ফের বললো, 'খোকা কোনদিন কথা বলতে পারবে না ভাবলে তোমার মতো আমারও কাঁদতে ইচ্ছে হয় কৃষ্ণা। কিন্তু—'

কিন্তু কি বলবে অমল! নিঃশব্দে কেবল কৃষ্ণার চিবুক ছুঁয়ে জলের ধারার উষ্ণতাটুকু অনুভব করলো।

কৃষ্ণা আলগোছে ফিরে এবার ঘুমন্ত খোকাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলো।

অমল আর কৃষ্ণাকে ছুঁলো না, কিছু বললোও না। মাথার সামনে ছোটো টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা নিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। কম পাওয়ারের নীল আলোয় যন্ত্রণা উপচে উঠছে ঘরের মধ্যে। খোকা কোনদিন কথা বলতে পারবে না, কৃষ্ণার নিজের চোখের জলের সমুদ্রে নিজেই অসহায়ভাবে ভেসে চলে যাবে—এ ভাবনা অমলের বুকে যন্ত্রণার জন্ম দিয়েছে। অমল জানে, এ যন্ত্রণা থেকে আর মুক্তি নেই তার।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে রাত গড়িয়ে গেলো। খোকাকে বুকের মধ্যে নিয়েই এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছে কৃষ্ণা। মাঝে মাঝে কৃষ্ণা কান্নায় কেঁপে উঠছে। কী করুণ, কী অসহায় দেখাচ্ছে কৃষ্ণাকে।

অমল এই প্রথম নির্ঘুমে একটা রাত্রি ফুরিয়ে ফেললো। সাক্ষী হয়ে রইলো কেবল অ্যাসট্রের ভেতরে জমে থাকা একরাশ সিগারেটের টুকরো।

সকাল বেলা বাথরুম থেকে ফিরে এসে প্রথমেই পুরোনো ডায়েরীখানা খুঁজে বের করলো অমল। তারপর বাইরে এসে দাঁড়ালো। সকালের আলোয়, বাতাসে রাত্রির ক্লান্তিটুকু অমলের শরীর থেকে মুছে গেল খানিকটা। এগিয়ে এসে খাঁচায় ঝোলানো কৃষ্ণার আদরের টিয়েটার কাছে দাঁড়ালো। সকালের আলোয় তার পালকগুলো অসম্ভব সবুজ দেখাচ্ছে। বেশীক্ষণ দাঁড়াতে ইচ্ছে হলো না খাঁচার পাশে। একটা চেয়ার টেনে ব'সে পুরোনো ডায়েরীর পাতাগুলো উল্টে দেখতে শুরু করলো অমল। তিনশো প'য়ষট্টিটা পাতার কোথায় যে লেখা আছে ঠিকানাটা, তা এখন আর মনে নেই। কাজেই প্রথম থেকেই খুঁজে দেখতে হবে।

খুঁজতে খুঁজতেই অনুভব করলো, কৃষ্ণা ঘুম থেকে উঠে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কৃষ্ণার দিকে না তাকিয়েই অমল বললো, 'ঘুম ভাঙলো?'

'হুঁ।'

'খোকা জেগেছে?'

'না।'

'তুমি আরেকটু ঘুমোলে পারতে। রাত্রে তোমার ঘুম হয়নি তেমন।'

'তাতে কিছু এসে যাবে না। তুমি ঠিকানা পেলে?'

'খুঁজছি। পেয়ে যাবো নিশ্চয়ই।'

ব'লে অমল কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকালো। গতকালের কান্নার চিহ্ন কৃষ্ণার চোখে মুখে। অসম্ভব বিষণ্ণ চেহারার একটি ছোট্ট মেয়ের মতো দেখাচ্ছে কৃষ্ণাকে। এখনি কৃষ্ণাকে নিবিড়ভাবে ছুঁয়ে আস্তে আস্তে তার বিষণ্ণতাকে মুছে ফেলতে ইচ্ছে হলো অমলের। কিন্তু কিছুতেই তা যাবে না। অমল দুর্বলভাবে ফের মুখ ফিরিয়ে ডায়েরীর পাতা উল্টে সুজয়ের ঠিকানা খুঁজতে থাকলো।

কৃষ্ণা ভাঙা ভাঙা গলায় বললো, 'তোমার বোধহয় চা দরকার এখন। একটু অপেক্ষা করো চা করছি।'

অমল পাতা ওল্টাতে ওল্টাতেই বললো, 'তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।'

নিঃশব্দে চলে গেল কৃষ্ণা।

ঠিকানা পেলে আজকেই সুজয়ের কাছে যাবে অমল। সব কাজ ফেলে আগে খোকাকে দেখবার কথা বলবে। সুজয় ভারি ভালো ডাক্তার। নিশ্চয়ই সে খোকার ভেতরের অসুবিধেটাকে ধরতে পারবে। একটা চেষ্টাও নিশ্চয়ই করতে পারবে সুজয়।

খুঁজতে খুঁজতে পাতা ফুরোলো কিন্তু সুজয়ের ঠিকানাটা খুঁজে পাওয়া গেল না। বোধহয় চোখ এড়িয়ে গেছে। ফের নতুন করে পাতা ওল্টাতে থাকলো অমল।

চা নিয়ে এলো কৃষ্ণা। বললো, 'খুঁজে পেলে?'

'পাইনি। দেখছি আবার।'

'ঠিকানাটা সত্যি সত্যি হারিয়ে যায়নি তো?'

'কি জানি!'

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকালো অমল। আবার বোধহয় কান্না সুরু হবে কৃষ্ণার। কৃষ্ণার দীর্ঘ চোখের পাতায় গত রাত্রির ক্লান্তি জমে আছে। অমল অনুভব করতে পারছে, এই ক্লান্তি আর মুছে যাবার নয়! অমল দীর্ঘ ক'রে একটা নিঃশ্বাস নিলো।

বারান্দায় একটুকরো রৌদ্র এসে পড়েছে। সারারাত জাগবার জন্য কেমন কর্কশ মনে হচ্ছে সকালের রোদ্র। রোদ্রের দিক থেকে চোখ ফেরালো অমল। আস্তে আস্তে শব্দ করছে টিয়েটা। বোধহয় রৌদ্র দেখেই। অমল চোখ তুলে একবার টিয়েটাকে দেখলো।

কৃষ্ণা ডায়েরীর ওপর ঝুঁকে পড়ে বললো, 'এই ডায়েরীতেই তো ঠিকানা লিখেছিলে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'তাহলে খুঁজে পাবেই।' কৃষ্ণা আশ্রয়টাকে হারাতে চায় না কিছুতেই।

ঘরে খোকা কেঁদে উঠেছে। ঘুম ভাঙলো খোকার। কৃষ্ণা দ্রুতপায়ে চলে গেল।

ফের ডায়েরীতে মন দিলো অমল।

কিন্তু কোথাও সুজয়ের ঠিকানা লেখা নেই। প্রত্যেকটি পাতার প্রত্যেকটি লাইন পড়ে ফেললো অমল। শেষে মনে হলো, কার্ড ছিলো না ব'লে টুকরো একটা কাগজে নিজের ঠিকানা লিখে দিয়েছিলো সুজয়। সে টুকরোটা ডায়েরীর মধ্যে রেখেছিলো। যথারীতি হারিয়ে গেছে একসময়।

খোকাকে তুলে চোখ মুখ ধুইয়ে এসে ঠিকানা খুঁজে না পাবার কথা শুনে কৃষ্ণা শ্রান্ত গলায় বললো, 'তাহলে কি হবে?'

'প্রিয়ব্রত, আশিস ওরা জানতে পারে। ওদের কাছে আজ টেলিফোন করবো।'

'ওরাও তো তোমার মতোই সুজয়ের ঠিকানাটা হারিয়ে ফেলতে পারে!'

এক মুহূর্ত ভাবলো অমল। তারপর খুব সহজ গলায় বললো, 'হারিয়ে ফেললেও যে করে হোক সুজয়ের ঠিকানা আমি খুঁজে বের করবো। তাছাড়া এখানে ভালো ডাক্তারের তো আর অভাব নেই।'

একটু যেন আশ্বস্ত হলো কৃষ্ণা। তারপর খোকাকে নিয়ে চলে গেলো ভেতরে।

অমল একরাশ ভাবনা মাথায় নিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিঃশব্দে বারান্দায় ব'সে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো।

আশিস এবং অন্যান্য বন্ধুদের কেউই সুজয়ের ঠিকানা বলতে পারলো না। টেলিফোন গাইড খুলেও সুজয়ের নাম খুঁজে পেলো না অমল। আপিসে সারাক্ষণ যন্ত্রণার মধ্যে ডুবে রইলো। কেবল কৃষ্ণার অসহায় মুখ মনে পড়লো অমলের। খোকার নিষ্পাপ সুন্দর মুখখানায় দারুণ একটা অভিশাপের ছায়া দেখলো। সমস্ত সুখের দিকে নিরেট একটা দেয়াল গ'ড়ে উঠছে, অমল বুঝতে পারলো। সে দেয়াল কোনোদিন ভাঙতে পারবে না অমল।

খোকা কোনোদিন কথা বলতে পারবে না। অমলের মনে এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। বেশ কিছুদিন থেকেই অমল লক্ষ্য করছে, খোকার ভাবভঙ্গি। এ বয়সের ছেলে এখন অনেক শক্ত কথা পর্যন্ত বলতে পারে। হাসিতে, উচ্ছ্বাসে সমস্ত সংসারটাকে আলোর মতো উজ্জ্বল ক'রে তুলতে পারে।

কৃষ্ণা কেবল বলতো, 'অনেকেই তো দেরীতে কথা বলে, আমাদের খোকাও তাই বলবে।' অনেক উদাহরণও দিতো কৃষ্ণা। অমল জানতো সে সব কৃষ্ণার কেবল নিজেকেই সান্ত্বনা দেয়া। যতোক্ষণ প্রত্যাশাটাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, ততোক্ষণ বাঁচিয়ে রাখা।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই অমলের মনে হলো, সুজয়কে না পেয়ে ভালোই হয়েছে। নিশ্চিতভাবেই সুজয় কোনো উপায় খুঁজে পেতো না। কৃষ্ণার সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেমানুষের মতো অসহায় হয়ে যেতো। সুজয়ও কৃষ্ণার দুঃখের ভারে নুয়ে থাকতো সারাজীবন। অমল কিছুতেই যেন তা হতে দিতে চায় না।

আপিস ছুটি হতেই নিঃসঙ্গের মতো বাসস্টপে এসে দাঁড়ালো অমল, এবং প্রথমে যে বাস এলো, দারুণ ভীড় সত্ত্বেও সেই বাসে উঠেই ফিরলো বাড়িতে।

দরজা খুলে কৃষ্ণা সাগ্রহে শুধালো, 'সুজয়বাবুর ঠিকানা পেয়েছো?'

'না।'

'তাহলে?' কৃষ্ণা যেন ভেঙে পড়লো।

'আমরা অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে যাবো।'

'তাহলে আজই চলো।'

এক মুহূর্ত কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে অমল বললো, 'ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।'

আপিসের জামা-কাপড় পালটে খোকাকে কাছে নিয়ে বসলো অমল। কৃষ্ণা স্টোভ জ্বালিয়ে তার জন্য চায়ের জল চাপিয়ে আয়নার সামনে চুল বাঁধতে বসলো।

খোকার মুখের দিকে তাকালো অমল। আস্তে আস্তে কথা বললো। খোকাও কিছু বলতে চাইলো। দুর্বোধ্য শব্দ করলো কেবল। হাতটা খোকার পিছনে নিয়ে দু' আঙুলে শব্দ করলো অমল। খোকা পেছন ফিরলো না। দু' আঙুলে বাজানো শব্দ সে শুনতেই পায়নি।

খোকার কানের কাছে চীৎকার করে 'খোকা' বলে ডাকতে ইচ্ছে হলো অমলের। প্রচন্ড চীৎকারে বাড়ি-ঘর দুলে উঠবে, আকাশ পর্যন্ত পৌঁছুবে সেই চীৎকার। সে চীৎকারে নিশ্চয়ই কথা ব'লে উঠবে খোকা। কিন্তু ইচ্ছে হলেও ডাকতে পারলো না অমল। কেবল অসহায় অনুভবে খোকাকে শক্ত করে ধ'রে থাকলো।

ডাক্তার স্পষ্ট ক'রে কিছু বললেন না। কিন্তু অমল বুঝতে পারলো তাদের ভয়ের কথাটাই প্রচ্ছন্নভাবে বললেন ডাক্তার। কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকিয়েই স্পষ্ট কথাটাকে ডাক্তার এড়িয়ে গেলেন।'

ফেরার পথে ট্যাক্সিতে উঠে কৃষ্ণা কান্নায় তলিয়ে যাওয়া গলায় বললো, 'আমি জানি সত্যিই খোকা কোনোদিন কথা বলতে পারবে না। ডাক্তার স্পষ্ট করে আমায় কথাটা বললেন না।'

মাথা নীচু ক'রে নিস্তরঙ্গ গলায় অমল বললো, 'সত্যি আমরা ভারি অসহায় কৃষ্ণা।'

কৃষ্ণা কোনো কথা বললো না। নিঃশব্দে কাঁদিতে থাকলো।

সেই কান্নাই সারারাত ধরে তরঙ্গিত হলো কৃষ্ণার মধ্যে। নিঃশব্দে কৃষ্ণার পাশে শুয়ে

ভোরের আলো ফুটবার আগেই অমল বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। তারপর কি ভেবে পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালো পাখির খাঁচার পাশে। কৃষ্ণার আদরের পাখি। পাখিটা খাঁচার মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে। অমল তাকে দেখতে থাকলো।

হঠাৎ দাঁড়ালো পাখিটা। এবার দেখলো অমলকে। তারপর অস্পষ্ট গলায় বললো, 'খোকা।'

হ্যাঁ, 'খোকা'ই বলেছে টিয়ে পাখিটা। চমকে উঠলো অমল। টিয়েটা বোধহয় এই প্রথম কথা বললো। অমল ঝুঁকে পড়লো খাঁচার ওপর। বিস্ফারিত চোখে তাকালো টিয়েটার দিকে।

খোকার কথা ভাবলো অমল। হঠাৎ কার ওপর যেন প্রবল ক্রোধে এবার উত্তপ্ত হয়ে উঠলো এক মুহূর্তে। কি করবে ঠিক ভেবে পেলো না। খাঁচার দরজা খুলে হাত ঢুকিয়ে পাগলের মতো টিয়েটার গলা শক্ত মুঠোয় ধরতে চেষ্টা করলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে পেছনে খোকার নির্বোধ কন্ঠস্বর শুনে ফিরেই দেখলো, অবাক হয়ে খোকাকে নিয়ে কৃষ্ণা দাঁড়িয়ে। দ্রুত হাত সরিয়ে নিয়ে খাঁচাটা বন্ধ ক'রে ফেললো অমল।

'কি করছো!' অবাক হয়ে কৃষ্ণা শুধালো।

'কিছু না।' সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে গেল অমলের।

নির্নিমেষে খোকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো অমল।

'জানো কৃষ্ণা, ও কথা বলতে শিখেছে। এইমাত্র ও খোকার নাম বললো।'

ম্লানভাবে হাসলো কৃষ্ণা।

অমল খুব কাছে এলো কৃষ্ণার। প্রবল একটা কান্নাকে বুকে নিয়ে ফের সেই একটা কথাই বললো, 'সত্যি, আমরা ভারি অসহায় কৃষ্ণা।'
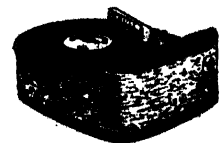
অংগনা

নতুন পথে

আমরা সত্যি হুজুগে গা ভাসাই। প্রথা মতো আমরা সংস্কারকে মান্য করে চলি। চলতি নিয়মের বাঁধা পথে নতুনকিছু একটু ঠাঁই করে নিতে চাইলেই চমকে ওঠা আমাদের অভ্যাস। চমকের প্রথম ঘোরটা ফিকে হলেই এবার আসে প্রতিরোধ-চিন্তা। প্রাণপণে তাকে সমূলে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করি। ইতিমধ্যে কেউ কেউ গোপনে তাকে কিঞ্চিৎ পাত্তা দিয়ে ফেলে। অজানার সঙ্গে মোলাকাত এবং আলাপ-পরিচয়ের গভীর আগ্রহ থেকেই এটা ঘটে। প্রথম পরিচয়েই তার সঙ্গে গভীর হৃদ্যতা স্থাপিত হয়। এমনিভাবে লুকিয়েচুরিয়ে আলাপনকারীদের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়তে থাকে। প্রতিরোধের দুর্গও দুর্বল হয়ে পড়ে। তারপর একদিন দেখা যায় যে, সমস্ত প্রতিরোধ ব্যর্থ করে সে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে দিব্যি নিজের চলার সোজা সড়ক বানিয়ে নিয়েছে। তার আয়তনও ক্রমে বাড়তে থাকে। দারুণ সখ্যতায় এবং সযত্ন লালনে।

এই পথেই অনেক বিদেশী প্রথা আমোদ-আহ্লাদ সাজ বদলিয়ে আমাদের মধ্যে স্থায়ী আসন নিচ্ছে। এমনি একটি বস্তু হলো ফ্যামিলি পিকনিক। এই বস্তুটির সঙ্গে আমাদের খুব একটা পরিচয় ছিল না। আমরা যা জানতাম তা হলো চড়ুইভাতি বা বনভোজন। তার তাতে ছেলেপুলেদেরই ছিল একচেটিয়া অধিকার। শীতের দিনে ওরা যার যার বাড়ি থেকে সবকিছু জোগাড় করে কিছুটা জঙ্গলে এবং নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে এই ভোজনপর্ব সমাধা করতো। এর চেয়ে বড়ো আর কিছু নয়। ছোটদের এই ব্যাপারে বড়রা তেমন নাক গলাতো না। এমনকি এই ধারণাও বোধহয় সেদিন খুব একটা ব্যাপক ছিল না যে, এই আনন্দে বড় এবং বয়স্করাও অংশ নিতে পারে। ফ্যামিলি পিকনিকের ভাবনা তো ছিল দূর অস্ত।

সেই চড়ুইভাতি বা বনভোজন আস্তে আস্তে নিজের মহিমা বিস্তার শুরু করলো। অনেকেই চাখতে শুরু করলো। এর রসালো স্বাদ পেয়ে তারা মজলো। ক্রমে সকলেরই জিনিসটা মনে ধরলো। কেউ আর এই রস থেকে বঞ্চিত থাকতে রাজি নয়। শীতের ঝকঝকে রোদ্দুরে একটু ফাঁকা কোথাও এমন একটু মিলিত ভোজনযজ্ঞে সামিল হতে পারলে একইসঙ্গে দুটো কাজ হয়ে যায়। খাওয়ার খাওয়া হলো এখন পিকনিকের ধুম পড়ে যায়। শহরের ধোঁয়ায় ভরা ঘোলাটে আকাশের পরিবর্তে স্বচ্ছ নীল আকাশের সামিয়ানার নীচে সমবেত হওয়ার আনন্দটা নিঃসন্দেহে গ্র্যান্ড রিলিফ। এই রিলিফই হলো পিকনিকের আসল নির্যাস।

এই নির্যাসে আমোদিত হওয়ার অধিকার অনেকদিন পর্যন্ত পুরুষদেরই একচেটিয়া ছিল। মেয়েদের এতে অংশগ্রহণের অধিকার ছিল না। সঙ্গিনী হলে মজাটা আরো বেশি জমে এই বোধ থেকেই সম্ভবত পিকনিকে মেয়েদের অংশ গ্রহণকে পুরুষরা মেনে নেয়। এমনিভাবেই ফ্যামিলি পিকনিকেরও পথ তৈরি হয়। এজন্য মেয়েদের ঝাণ্ডা উঁচিয়ে রাজপথে নামতে হয় নি বা মিছিল-সমাবেশ করতে হয়নি। পিকনিকের আনন্দ আরো নিবিড় করে পাবার জন্য এবং পরিবারের সেই আনন্দযজ্ঞে অন্য আত্মীয় স্বজনদের সম্মিলিত করার একটা মস্ত সুযোগ ফ্যামিলি পিকনিক। উন্মুক্ত পরিবেশে সকলের সাহচর্যে আনন্দলাভের এই সুযোগটুকু আমাদের দেশে এখনও তেমন প্রসারিত নয়। পশ্চিমে কিন্তু এই সুযোগটুকু সবাই গ্রহণ করে এবং আমাদের মতো বৎসরান্তিকভাবেও নয়। ওরা সুযোগ পেলেই ফ্যামিলি পিকনিকের আয়োজন করে। এর কারণ, এটিকে তারা ভোজন এবং আনন্দের হেতু বলেই শুধু মনে করে না। তারচেয়েও বড়ো কথা যে ফ্যামিলি পিকনিককে ওরা ফ্যামিলি স্পোর্টসের অঙ্গ হিসেবে মর্যাদা দেয়। এজন্যই তাদের কাছে এটির এতো কদর।

ফ্যামিলি স্পোর্টস কথাটা শুনে আবার আমাদের ভিরমি খেতে হয়। এই বস্তুটির সঙ্গে আমাদের এখনও পরিচয়ের সূত্র তেমন স্থাপিত হয়েছে বলা চলে না। বাড়িতে যে কিঞ্চিৎ খেলাধুলোর ব্যবস্থা রাখা উচিত সেকথা আমরা খুব গভীরভাবে তলিয়ে দেখি না। বাচ্চার জন্মের পর কোনক্রমে স্কুলে পাঠাতে পারলেই সন্তানের প্রতি আমাদের দায়িত্বের সিংহভাগ পালন করা হয়ে যায়। অধিকাংশ মা-বাবারই এই ধারণা। এর ব্যতিক্রম যাঁরা সংখ্যায় তাঁরা খুবই নগণ্য। এঁরা সন্তানের জন্য খেলাধুলোর ব্যবস্থা রাখেন কিন্তু বাদবাকি সবাই এর ধারকাছ [illegible]

খেলাধুলোর কথা বললেই এর প্রকার এবং প্রকরণ কি হবে সে আর এক সমস্যা। কারণ, বাড়িতে তো আর ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। অথচ খেলাধুলো বলতে আমরা এসব মোটা দাগের খেলার কথা বুঝি। এসব তো আছেই। এছাড়া অনেক ছোট খাটো খেলা আছে যা বাড়িতে ব্যবস্থা করতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। আমি পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলাকে রোজ দেখি কমবয়সী ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছাদে কিৎকিৎ খেলেন। স্বল্প সময়ের খেলা। কিন্তু সকলেরই মন এক অদ্ভুত আনন্দে ভরে ওঠে। বিশেষ, মা নিজে খেলায় অংশ নেয় বলে ছেলে মেয়েদের উৎসাহ আরো বেশি। এত সন্তান এবং মা দুজনেরই উপকার হয়। সারাদিনের ক্লান্তির পর সবাই একটু ফ্রেশ হওয়া গেল। আর একটা ব্যাপার হলো যে খেলাধুলোর সুযোগ ক্রমেই আমাদের জীবন থেকে ছুটি নিচ্ছে এবং আমরাও এ-সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়ছি। এর ফল শুভ হতে পারে না। তাই এ সম্বন্ধে আমাদের ভাবতে হবে। ফ্যামিলি স্পোর্টস কথাটা শুনে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে আঁৎকে উঠলে চলবে না। এর একটা বিহিত করতে হবে। সিনেমায় বিশেষ করে ভিনদেশী ছায়াছবিতে ইদানীং দেখা যায় যে, মা-বাবা আর ছেলে-মেয়েরা খেলছে। সে খেলা এমন কিছু নয়। কিন্তু শিশুমনে তার গুরুত্ব অসাধারণ। এই আনন্দময় পরিবেশটুকু তার ভবিষ্যৎ জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাই এই বস্তুকে শুধু সিনেমার পর্দায় না রেখে আমাদের পারিবারিক জীবনের সত্যে পরিণত করা একান্ত আবশ্যক।

খেলাধুলোর এটা হলো শারীরিক দিক। এতেই কিন্তু ফ্যামিলি স্পোর্টস সম্পূর্ণ হলো না। এখন তো প্রায় সব বাড়িতেই রেডিও আছে। এই বস্তুটি নিঃসন্দেহে ফ্যামিলি স্পোর্টসের অন্তর্ভুক্ত। একত্রে বসে রেডিও-অনুষ্ঠান শোনা এবং তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা স্বল্পবয়সীদের মানসিক বিকাশের পক্ষে সহায়ক। এর সবটাই হবে ক্রীড়াচ্ছলে। শিক্ষামূলক পুতুলও এ ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে। বিদেশে টেলিভিসন থাকায় এই সুযোগটা আরো [illegible] আমাদের নেই সেজন্য

আফশোষ না করে যা আছে তারই সদ্ব্যবহারে একটু উৎসাহী হতে হবে। সিনেমা-থিয়েটার ও রিক্রিয়েশনেরই পর্যায়ভুক্ত। এ সম্পর্কেও আমরা পুরো সংস্কারমুক্ত হতে পারিনি। ফ্যামিলি স্পোর্টসের শেষোক্তগুলি ছেলেমেয়ে-দের কাছে আমরা উন্মুক্ত করে দিতে পারিনি। এই প্রগতির সোনা রোদে সারা গা মাখামাখি অথচ এ ব্যাপারে আমাদের প্রত্যাশিত উদারতার এখনো নিদারুণ অভাব।

ছেলেমেয়েকে দিনরাত পড়তে দেখলেই মা-বাবা খুশি। তাদের জন্য মা-বাবার আর যে কোন দায়িত্ব থাকতে পারে সেকথা তারা প্রায় মানতেই চান না। কিন্তু এত অল্পে তুষ্ট হলে তো চলবে না। কোন মানুষই অল্পে খুশি হতে চায় না। তাই ছেলেমেয়ের ব্যাপারেও অত কাটশর্ট করলে তো চলবে না। শুধু পড়াশোনা নয়, সেই সঙ্গে চাই ফ্যামিলি স্পোর্টসের আয়োজন। এজন্য আরো যেটুকু প্রয়োজন তা হলো সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের ওয়াকিবহাল রাখা এবং সে সম্বন্ধে ওদের নিজস্ব মতামত গড়ে তুলতে সাহায্য করা। ভবিষ্যতে যাতে ওরা নিজেদের চারপাশের জগতটাকে অপরিচিত ভেবে ভয়ে হীনমন্যতায় আক্রান্ত না হয়।

এ ব্যাপারে আমাদের একটা মস্ত এলার্জি আছে। ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে আমরা সব কিছু সযত্নে গোপন করতেই জানি সেক্ষেত্রে যদি অনেককিছু তাদের জানাতে হয় তবে তো মহাভারত অশুদ্ধ হওয়ার উপক্রম। এমন কি অনেক বাড়িতে নিয়ম আছে যে, ছেলেমেয়েরা খবরের কাগজ পড়বে না। আবার খবরের কাগজের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করায় এক অভিভাবক তাঁর সন্তানকে বেশ শাসন করার পর উপদেশ দিলেন যে, খবরের কাগজ সম্বন্ধে কৌতূহলী হওয়ার সময় এখনও তার আসে নি। এই যদি বাস্তব অবস্থা হয় তবে রীতিমত শঙ্কিত হওয়ার কারণ আছে। ছেলেমেয়েরা এই পৃথিবীরই মানুষ। সুতরাং পৃথিবীটাকে তাদের জানতে চিনতে দিতে হবে। না হলে পরবর্তীকালে চলতে গিয়ে পায়ে পায়ে ঠোক্কর খাওয়ার সম্ভাবনা। এই অশুভ সম্ভাবনার হাত থেকে বাঁচতে হলে ছেলেমেয়েদের ওয়াকিবহাল করতে হবে পৃথিবীর গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে। আর যদি আমরা এই মনোভাব নিয়ে বসে থাকি যে সময় হলে ওরা নিজেরাই সব চিনে নেবে তবে সন্তানের প্রতি মা-বাবার দায়িত্ব পালনে প্রচন্ড শৈথিল্য প্রদর্শন করা হবে। কারণ, জন্মের পর থেকেই জানাচেনার অধিকার ওদের ক্রমেই বাড়তে থাকে। ওদের এই কৌতূহল চরিতার্থ করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব একথা সবাইকে মনে রাখতে হবে।

সন্তানকে স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। সেজন্য প্রথমেই দরকার পারস্পরিক সহযোগিতা। পরিবারে স্বামী-স্ত্রী যদি সুন্দর বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে এগুতে পারে তবে সন্তানের উপর তার প্রতিফলন পড়তে বাধ্য। সন্তান তখন সুষ্ঠুভাবে পৃথিবীর পথে পা বাড়াতে পারে। কিন্তু সর্বত্র এই সহযোগিতা থাকে না। একটি পরিবারের কথা আমার জানা আছে। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী বেশ সুখেই ছিল। স্ত্রী বেশ শিক্ষিত এবং তার বরাবরের ঝোঁক চাকরিবাকরি করা। কিন্তু সংসারে স্বচ্ছলতা থাকায় তাকে অবিবাহিত এবং বিবাহিত কোন অবস্থায়ই চাকরি করতে হয় নি। কিন্তু এবার চাকরির মোহ তাকে ভীষণভাবে পেয়ে বসলো। ঠিক এমনি সময়ে বাধার সৃষ্টি করল মাতৃত্বের সম্ভাবনা। সুতরাং চাকরির পরিকল্পনা আপাতত ইতি। কয়েক মাস নবজাতক নিয়ে বেশ হাসিঠাট্টায় কাটালো স্বামী-স্ত্রী। সন্তান একটু সমর্থ হতেই চাকরির ইচ্ছা আবার স্ত্রীকে ভীষণ-ভাবে পেয়ে বসলো। স্বামীর দিক থেকে এবার আপত্তি দেখা দিল। স্ত্রীকে তিনি বোঝাতে চাইলেন যে, বাচ্চা হবার পর সংসারে তার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে এবং এ অবস্থায় চাকরি করতে গেলে বাচ্চাকে ঠিকভাবে মানুষ করা সম্ভব নয়। স্ত্রী কিন্তু স্বামীর এসব যুক্তি শুনতে রাজি নয়। স্বামীকে বোঝাতে সেও পেছপা নয়। লেখা-পড়া শিখে যদি কোন কাজেই না লাগলো তবে এ লেখাপড়া শেখার মূল্য কি? এর উত্তরে স্বামী বোঝালেন যে এবার তার সমস্ত উদ্যম ব্যয়িত হোক সন্তান মানুষ করায়। কিন্তু স্ত্রী রাজি নয়। অনেক কথার পর স্ত্রীর চাকরি করা স্থগিত রইলো বটে তবে পরিবেশ হয়ে উঠল অসুখকর। এর পরিপ্রেক্ষিতে যে ধারণাটা তার মনে বদ্ধমূল হলো তাতে দেখা যায় যে সন্তানের জন্য সে বলি প্রদত্ত হলো এবং সবকিছুর জন্য সে দায়ী করলো বিবাহকে। মনের এই ক্ষোভ তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি যত জ্বলবে, সংসারে অসুখী পরিবেশের বিস্তৃতিও তত ব্যাপক হবে। আর এর সবকিছু প্রভাবিত করবে সন্তানকে। সে বেচারার গোড়ার গড়নটাই যেন কেমন হয়ে যাবে।

এভাবে না এগিয়ে ওরা দুজন যদি একজন আরেকজনকে সাহায্য করার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতো, তাহলে হয়তো এরকম মর্মান্তিক পরিণতি ঘটতো না। এর মধ্যে কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবও আছে। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সহযোগিতার স্বাভাবিক সম্পর্ককে উপেক্ষা করে যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে এবং অপরের প্রতি দৃষ্টিপাতের ফুরসত তার হয় নি। এ থেকেই সৃষ্টি হয় যত ঝঞ্ঝাট।

এর বিপরীতে পারস্পরিক সহযোগিতায় উভয়ের সুন্দর সহাবস্থানও দেখা যায়। এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাই। না হলে সংসার বাসের অযোগ্য হয়ে উঠতো। এরই জন্য প্রয়োজন একত্রে বেড়াতে যাওয়া এবং খেলাধূলায় মেতে ওঠা। সন্তান যাতে মা-বাবাকে দেখে কোনক্রমেই অসন্তোষের কারণ খুঁজে না পায়। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতে হবে। সামাজিক জীব আমরা। তাই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করার কথা আমরা কেউ চিন্তাও করতে পারি না। তাই সমাজকে আমার সন্তানের সামনে তুলে ধরতে হবে। সমাজ সম্বন্ধে তার ধারণাকে পরিস্ফুট করতে হবে। সামাজিক ঘটনার সঙ্গে সে যাতে সহজ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে সেজন্য সবসময় নজর রাখতে হবে। আর এমনভাবেই এসে পড়বে পৃথিবীর কথা। সে কৌতূহলও তার চরিতার্থ করতে হবে। কিন্তু সবকিছুর মূলে হলো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। আর এরই অপর নাম হলো বুঝি পলিটিকস অ্যাট হোম। এতে ঝান্ডা নেই, পোস্টার নেই, বিক্ষোভ নেই, সমাবেশ নেই। আছে শুধু পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে একটি সহজ সুন্দর সম্পর্ক যার উপর ভিত্তি করে বাঁচবে সমাজ, দেশ এবং জাতি।

—প্রমীলা

মিত্রজি,

হয়ত আমার গুরুদেব সুপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের সেই চিঠিখানা পেয়েই ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে তিনি লিখেছেন, 'সাক্ষাৎ নিয়তি-স্বরূপ সেই বাঘ আমি মেরেছিলাম, মিত্রজি,' কিন্তু আসলে বাঘটা তিনি মারেননি। বাঘটা মেরেছিলাম আমি। তবে তার আজ্ঞা ও আশীর্বাদ দুটোই আমার প্রতি ছিল বলে তিনি ঐ কথাটা লিখেছেন, বাঘটা আমি মারাও যা আর তিনি মারাও তাই। তিনে তিনে—ছয়।

আপনি জানেন, চিঠির ভাষায় অন্ততঃ জানতে পেরেছেন যে ফরেস্ট বাংলোটার কাছাকাছি পাহাড়—এখানে সেখানে এবড়ো-খেবড়ো জঙ্গল, কাঁটা ঝোপ, নিবিড় বনানী, সবুজের সমারোহ, সেই সে দূরে মিলিয়ে গেছে, 'তমালতালি বনরাজিনীলা।'

বাংলোটার উত্তরে পাহাড়, পূবেও পাহাড়। জঙ্গল দুদিকেই আছে। দক্ষিণে পশ্চিমে তত ঘন জঙ্গল না থাকলেও চাষীদের ক্ষেতের প্রায় চারপাশে অথবা কোন না কোন পাশে জঙ্গল আছে। বিশ-পঁচিশ ক্রোশ ধরে জঙ্গল কেটে লোক্য ক্ষেত্র

আশ্রয় স্থলে মানুষ ঢুকেছে, তাই বাঘের এত রাগ—উপদ্রব।

বাংলোর পূবে দিকের যে পাহাড়টায় উঠবার সময় জঙ্গল কম বলে মনে হয়, তার ভেতরে যে কি গভীর জঙ্গল তা সে দিকে না উঠলে বলবার সাধ্য নেই। সেই পাহাড়েই একদিন আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম। ধান পরে ভানব, আগে সেই শিবের গীতটা গেয়ে নি। বাংলো থেকে নেমে আমরা তিনজন চলেছি শিকারে। তার মধ্যে একজন শোকাতুর যমুনাপ্রসাদ আরজন গুরুদেব আর তৃতীয়জন আমি। নামটা বলব না, তবে, আপনার মিত্রজির চেনা।

শুনলাম, হরিণ ডাকছে। সেদিন তাই সখ চেপেছিল হরিণ শিকারের। বাঘের পাছে ঘুরলে, বাঘ মারলে বা না মারলে, মানুষকে একটা নেশায় মাতিয়ে রাখে, একটা অনাবিল চাকাবিহীন দুরান্তের অশ্রুত পূর্ব আনন্দ উচ্ছল ঝিমুনি। নেশা, মাদকতা, কিন্তু তাতে পেট ভরে না। হরিণ মারতে পারলে খাওয়াটা ভাল হয়। শিকারের আনন্দও যে নেই তা নয়। বাঘ

হাসি মিশ্রিত আনন্দ হরিণ শিকারেও মেলে, খাওয়ার আনন্দ ত আছেই।

আবার শুনলাম হরিণ ডাকছে, উঁকি দিয়ে দেখতে গেলাম একটা ঝোপের ওপাশে। সেখান থেকে একা হরিণের পেছনে লাগলাম। অদৃশ্য হয়ে গেলাম, হরিণ এই দেখা যায় আবার দেখা যায় না। যখন দেখি, তাক করবার জন্য রাইফেল উঠাবার আগে তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। কয়টা হরিণ তা বলতে পারব না, হয়ত ৮।১০টা বা তার বেশীও হতে পারে। আমার চোখে একবার পড়েছিল ৩টা। পথের মোড়ে ঝিলিক মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল। গুলি করতে পারতাম কিন্তু হরিণ যারা মেরেছেন তারা জানেন যে হরিণের ভাইটাল পার্টস-এ গুলি না লাগলে হরিণ পালিয়ে যায়। তাকে আর পাওয়া যায় না। কদাচিৎ পাওয়া যায়—রক্ত দেখে দেখে—দোবারা গুলি করে পাওয়া যায়। কারণ হরিণই একমাত্র প্রাণী যার পিত্ত নেই।

চলেছি ত চলেছি। হরিণ এই দেখা যায় আবার মিলিয়ে যায়। কত মাইল চলে গেলাম বলতে পারব না। পরে জেনেছি

হরিণ মারা হলো না, কারণ পড়ে গেলাম কাঁটা ঘেরা বাঁশ বনের ভেতরে। পাহাড়ী বাঁশের গায় গজানো পাতা এক-একটি বৈঁচি কাঁটা, লাগলেই কাপড়-চোপড় গা ছিঁড়ে যাবে। চলেছি কোন পথ পাই কিনা. ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লাম। মাসটা গ্রীষ্মের জ্যৈষ্ঠ মাস। কিন্তু নামবার বা ফিরবার পথ কোথায়? সূর্য কদাচিৎ দেখা যায় বন জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে। তাতে বুঝলাম সূর্য কাত হয়ে দূরে পশ্চিমে চলে গেছে। কিন্তু আমি যে পথ পাচ্ছিনে—তবে দিক ভুল হয়নি, যেদিকে যাই দেখি খাড়া পাহাড়, খালি উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেছে পাহাড়—অফুরন্ত অপরিসীম গাছ গুল্মে ঘেরা। বাঁশবনের কাঁটাঝাড় অতি কষ্টে পার হলাম, গা ছিঁড়ে রক্ত পড়ছিল। দেখলাম সামনে বিরাট গুহা। অসাবধানে পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই। ক্লান্ত হয়ে একটা পাথরের উপর বসলাম গাছের ছায়ায়। একটা প্রায় ১ হাত চেলা দুপাশ উঁচু করে আমাকে আক্রমণ করতে এলো—পাশে একটা গাছের ডাল দিয়ে সেটাকে মারলাম, পাহাড়ী চেলা। আবার চললাম, সামনে পাছে, ডানে বাঁয়ে, উপরে নিচে গাছের শাখা দেখতে দেখতে কারণ গাছে বা পাশে চিতাবাঘ থাকতে পারে। চললাম ক্লান্ত পদক্ষেপে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর হাঁটতে পারছিনে। ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করলাম, 'প্রভু. আমি নিজের ক্ষমতায় আর একপাও যাব সে ক্ষমতা আর আমার নেই। এখন তুমি তোমার ক্ষমতা প্রয়োগ করো. আমাকে রক্ষা করো।'

হয়ত তিনি শুনলেন। কিছু দূরে যেয়ে দেখলাম একটা বাঁশ কারা কেটে নিয়ে গেছে। তা টেনে নেবার সময় গুল্ম-গুলি কাত হয়ে রয়েছে। বুঝলাম কোন দিকে নিয়ে গেছে. হাঁটলাম। দেখলাম পার্বত্য শীর্ণ নদীতে স্বচ্ছ স্ফটিক জল, দেখে নিলাম ধারে কাছে চিতাবাঘ আছে কিনা। পেট ভরে জল পান করলাম। মুখ হাত ভাল করে ধুয়ে ফেললাম। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম. হাঁটতে যেয়ে দেখলাম, গরু আছে কয়টা। মানুষ খেকো বাঘ গরু সহজে মারেও না, খায়ও না। একটা ডাল ভেঙে গরুগুলোকে তাড়া করলাম। গরু ছুটলো। তার পেছনে পেছনে এসে উপত্যকায় মানুষের বাসস্থলে পৌঁছলাম। সেখানে খেতে পেলাম, দুধ মুড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ক্লান্তিতে পরদিন সকালে ফিরে এলাম বাংলোয়।

গুরুদেব আর প্রসাদ জিজ্ঞেস করায় বললাম, 'রামকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে আজও অনেক মারীচ জীবিত আছে।''

পরদিন সকালে গুরুদেব বলেন, 'আমরা চলে যাব,' যমুনাপ্রসাদ তার স্ত্রী সুভদ্রাকে বাঘের পেটে দিয়ে নিয়তিকে পরীক্ষা করে নিয়েছে। সে যেতে চায়। আমি বাধা দিলাম না। যমুনাপ্রসাদ আর গুরুদেব চলে গেলেন, থাকলাম আমি আর আশে-পাশের যারা বাসিন্দা, যারা বাঘ না মারলে ক্ষেত-খামার করতে পারবে না তারা। তাদের দলেও যারা সাহসী ছিল তারা ভড়কে গেছে, আমাকে শুনিয়েই বলল. 'হাতী ঘোড়া গেল তল—'। আমি চাইতেই তারা চুপ করে গেল। বুঝলাম, তারা বুঝে নিয়েছে যে আমি আনাড়ী বলেই, গুরুদেব, যে বাঘ মারা সম্ভব নয়, সেই বাঘ মারতে আমাকে রেখে চলে গেছেন, আমার সম্মানে আঘাত লাগলো। বিশটা বছর বাঘ, শুকর হরিণ, পাখী কত কি মেরেছি। নীলগিরিতে যেয়ে নীল গাইও মেরেছি। শিকারের নেশায় ভারতের কোন জায়গায় যাইনি? তবে গুরুদেব বলেছেন, 'বাঘটা ভারী চালাক, মানুষের চেয়ে বুদ্ধিতে সে কম যায় না। দশ-বারজন লোক মেরেছে, তার মধ্যে দুজন শিকারী, তার মধ্যেও একজন ঝানু সাহেব শিকারী। এই সেদিন যমুনাপ্রসাদের স্ত্রী সুভদ্রাকে নিয়ে গেছে, শিকারীর স্ত্রী। তাকে কোন জঙ্গলে নিয়ে খেয়ে ফেলেছে, চেষ্টা করেও সুভদ্রার স্বামী যমুনাপ্রসাদ আর গুরু-দেব কোন হদিশ পাননি। 'দুটো শিকারীর মাঝখান থেকে নিয়ে গেছে একটা মেয়ে, যমুনাপ্রসাদের অপরূপ রূপসী লম্বা তন্বী স্ত্রী।'

আমি সেই দিগ্বিজয়ী বাঘ মারবার জন্য প্রস্তুত হলাম। গুরুদেব তার ৪৫০ আর ৪০৫ রাইফেল দিয়ে গিয়েছিলেন। যমুনা-প্রসাদের সেই ২৫০ রাইফেল সে নিয়ে গেলো। বলে গেলো, 'আমি আশীর্বাদ করছি. আমার সুভদ্রা খেকো বাঘটাকে মেরে তুমি আমাকে সুখী করতে পারবে.' তারপর সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। গুরুদেব তাকে নিয়ে জীপে উঠে চলে গেলেন। বলে গেলেন, 'সাবধান সাবধান, ভারী চালাক বাঘ। না হয় আমি ফিরে এলে দুজনে চেষ্টা করে দেখবো।'

আমি গুরুদেবের কথা শুনলাম। কিন্তু ছাপিয়ে উঠলো যমুনাপ্রসাদের আশীর্বাদ, 'আমার সুভদ্রা খেকো বাঘটাকে মেরে তুমি আমাকে সুখী করতে পারবে।' মনের মধ্যে রি-রি করে বাজতে থাকলো যমুনা প্রসাদের আশীর্বাদ আমার প্রতিশোধ গ্রহণের উদগ্র লালসা। চোখ আমার ক্রোধে জ্বলে উঠলো। চোখে আগুন ধরে গেলো, দেখলাম, সুভদ্রার আগুনে রংয়ের শাড়ীর সেই ছেঁড়া অংশটা যা সুভদ্রাকে বাঘে নেবার সময়ে কাঁটা গাছে বেধে ছিঁড়ে রয়েছিল সেই অংশটা কাঁটা আছে তখনো উড়ছে। রক্তের দাগ সেই কাঁটা গাছটায়, শাড়ীতে আর স্থানে স্থানে জমাট বেধে শুকিয়ে রয়েছে। প্রসাদের সুখের ঘর উজাড় হয়ে গেছে, আগুনে হলদে রংয়ের শাড়ী পরা ছিল সুভদ্রার। স্নান করে পরেছিল।

গুরুদেব গেছিলেন বাঘ মারার জন্য মরির কাছে মাচানটা ঠিক করতে, বাংলো ছিল খালি। এই সুযোগে তাদের স্নানের—দরকার হয়ে পড়েছিল, সুভদ্রা যমুনা-প্রসাদের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী। বড়জোর ছ মাস হলো বিয়ে হয়েছিল।

গুরুদেবকে আমি জানি। ইস্পাত কঠিন সংযমের অধিকারী। বদরাগী তবে ভীষণ বন্ধু বৎসল। সুভদ্রার আগুনে রংয়ের শাড়ী, উঁচু করে বাঁধা চুল, দেহ-বল্লরী লতিকাসম, বেশ লম্বা। সেদিন সেই সান্ধ্য লগনে তার সে অপরূপ রূপ কি গুরুদেবকে আকৃষ্ট করেছিল? প্রসাদ কি তা বুঝতে পেরেছিল? অথবা সন্দেহ করেছিল? নচেৎ বাঘ মারতে যেয়ে সে রাত্রে যমুনাপ্রসাদ তার উঁচু ঢিপিতে সে যেখানে ছিল সেখান থেকে মানুষ খেকো বাঘের ভয় না করে গুরুদেব যে মাচানে একটু আগে ছিলেন, এবং যে মাচান ছেড়ে তিনি যমুনাপ্রসাদের কি হলো দেখতে তার উঁচু ঢিবির দিকে গিয়েছিলেন, সেই মাচানের নীচে এসে উপরে গুরুদেব আছেন কিনা দেখতে টর্চ ফেলেছিল কেন? আর গুরুদেব যদি তাই দেখে ঢিবির পাশ থেকে জ্ঞান হারিয়ে 'প্রসাদ, প্রসাদ' করে চীৎকার না করতেন তবে কি সুভদ্রা বের হয়ে আসত তার নিশ্চিন্ত আশ্রয় বাংলো ছেড়ে? সুভদ্রা কি ভেবেছিল যে যমুনা-প্রসাদের যেন কি হয়েছে? বাঘ নেয়নি ত? গুরুদেব ও যমুনাপ্রসাদ উভয় শিকারীর সংযমের বাঁধ ভেঙে দিয়েছিল কে? তাই কি সুভদ্রা এগিয়েছিলো স্বামীর অমঙ্গল হলো নাকি তাই ভেবে? নচেৎ একা বের হবার কি হেতু ছিল?

বাঘটা কেন, গুরুদেব বসেছিলেন যে মাচানে আর যমুনাপ্রসাদ বসেছিল যে ঢিবিটার উপরে, তার অদূরে মরি বাচ্চা মোষটার সেদিকে না যেয়ে বাংলোর পাশে এসে থাপটি মেরে বসেছিল?

মনের ভিতরে ঠিক জিনিসটি ধরা পড়ে গেলো। স্নান করে সুভদ্রা শাড়ী শুকোতে দিয়েছিল বাইরে, তারের সাথে। সেই শাড়ী দেখে, ফিরেই, গুরুদেব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন—শাড়ী কেন? শিকারে এসে শাড়ীপরিহিতাকে সাথে আনতে নেই। যমুনাপ্রসাদের সদ্য প্রেম তা বুঝতে পারেনি অথবা বুঝবার চেষ্টা করেনি। শাড়ী শুকোতে না দিলে বাঘের পেটে যেতো না সুভদ্রা। শাড়ীই দিনে মানুষ খেকো সুচতুর বাঘটা দেখেছিল এবং তারি লোভে মরির কাছে না যেয়ে বাঙলোর আশে-পাশে অন্ধকারে সমানে টহল দিচ্ছিল।

মাচানে বসে গুরুদেব বাঘ আসে না দেখে বসে বসে অস্থির হয়ে—সংযম হারিয়ে খোঁজ নিলেন প্রসাদের, মাচান ছেড়ে ঢিবিটার কাছে যেয়ে। আর প্রসাদ ঢিবি ছেড়ে গুরুদেব মাচানে আছেন কিনা দেখতে এলো। টর্চ মারলো মাচানের উপর।

গুরুদেব তখন প্রসাদের ঢিবির কাছে। কেন তিনি চীৎকার করে উঠলেন, 'প্রসাদ, প্রসাদ' আর সেই ডাক শুনে বেরিয়ে এলো স্বামীর অমংগল হয়েছে ভেবে সুভদ্রা। তারপরই শোনা গেল একটা হুংকার আর সুভদ্রার আর্তনাদ। সুভদ্রাকে নিয়ে গেলো বাঘ আর তার আগুনে রংয়ের শাড়ীটার একাংশ ছিঁড়ে বেধে থাকলো কাঁটা গাছে। সুভদ্রা গেলো বাঘের পেটে। বুঝলাম সুভদ্রার মৃত্যুর জন্য দায়ী তার স্বামী প্রসাদ আর গুরুদেব। বাঘ মারার জন্যে যে সংযম ও প্রতীক্ষা দরকার তা তারা হারিয়ে ফেলেছিলেন—। সুভদ্রা কি গুরুদেবের প্রাণে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল? রূপ লাগি আঁখি ঝুরে—।

বাঘ মারবার ফন্দী ঠিক করে ফেললাম। চোর বা বাঘ এদের কাজ-কর্মের খতিয়ান একই রকম—যাকে ইংরেজীতে বলে 'মোডাস অপারেনডি'। দারোগাবাবু সিঁধ দেখে আর চুরির ধরণ দেখে বলে ফেলেন, 'চুরি করেছে শ্রীমন্ত।' বাঘ শিকারীও বলে দিতে পারে, 'এই মানুষটার হন্তা বাঘ সেটি—যেটি—' শিকারী এও বলে দিতে পারে, হন্তা বাঘ না চিতাবাঘ।

সুভদ্রার যে শাড়ীখানা শুকোতে দেয়া হয়েছিল সেখানা প্রসাদ নিয়ে যায়নি। আমি শাড়ীখানা ভাল করে দেখলাম, লাল ফিনফিনে উৎকৃষ্ট ধরনের শাড়ী যার ভেতরে আটকে রাখতে পারেনি সুভদ্রা তার ক্ষুধিত যৌবন। স্নান করে সেই শাড়ীখানাই শুকোতে দিয়েছিল সুভদ্রা। স্নান করেছিল প্রসাদও। প্রেমাকাংখী একটি জীবন আর নেই।

শাড়ীখানা হাতে নিলাম, মোহন্তকে বললাম, 'শাড়ীখানা ধুয়ে আনতে।' সে বললো, 'ধোয়া শাড়ী আবার ধোবো কি?'

আমি রাগ করে উঠলাম, বললাম 'আমার হুকুম।' শিকারীর চোখ আমার জ্বলে উঠলো আগুনের মতন, সুভদ্রার আগুনে রংয়ের শাড়ীর ছেঁড়া অংশটা দেখলাম রক্তমাখা—কাঁটা গাছে তখনো উড়ছে।

মোহন্তদাস শাড়ীখানা ধুয়ে নিয়ে এলো। সে ভয় পেয়েছিল। আমি রাইফেল নিয়ে তার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম বলে সে ধুয়ে আনলো। ঠিক যেদিন সুভদ্রাকে বাঘে নিয়ে যায় সেদিন যেখানে যেভাবে শাড়ীটা শুকোতে দেয়া হয়েছিল তেমনি করে নিজে শুকোতে দিলাম শাড়ীটা, মহানন্দে আমার মন নেচে উঠলো। মহানন্দে উড়তে লাগলো শাড়ীটা। লক্ষ্য করে দেখলাম কয়েক মাইল উত্তর দিক থেকে পাহাড়ের উপর দাঁড়ালে শাড়ীটা দেখা যাবে। বাঘটা পুব দিকের পাহাড়ে নাই, আমি সে পাহাড়ে গিয়েছিলাম, উত্তর-দিকের পাহাড়েই আছে বাঘটা।

মাচান মরিটার কাছে পাতাই ছিল, উঁচু ঢিবিটা যার উপর সেই রাত্রে প্রসাদ ছিল তাও তেমনি কাঁটা দিয়ে ঘেরা তখনও ছিল, এইত কয়দিন আগে গুরুদেব আর প্রসাদ সবকথা বলে কয়ে চলে গেলেন। বাঘ মারার ভার আমার উপর—কারণ তারা ভেবেছিলেন যে এমন চালাক বাঘ আমি মারতে পারবই না। ভয়ও তারা করেছিলেন যে আমি হয়ত তৃতীয় শিকারী যে বাঘের পেটে যাবে। কিন্তু মানুষের বুদ্ধির কাছে সব জীব-জন্তু পরাস্ত।

দিন থাকতেই খুব সাবধান হয়ে গেলাম। বাংলোর খিলটিল ভালোভাবে আটকিয়ে জানালা আধ খোলা রেখে হাতল ছাড়া চেয়ারটা জানলার একপাশে এমনভাবে রাখলাম যেন খোলা পাশ থেকে চেয়ারটা দেখা না যায়। গায়ে দিলাম একটা কালো ফতুয়া। বাংলো থেকে দিনের বেলায় মানুষ খেকো বাঘ রাধুনিকে নিয়ে গেছে একথা আমার জানা ছিল। তবে মানুষ খেকো বাঘ প্রায় মানুষের মত বুদ্ধিমান হয়ে পড়ে, তবে যা পশু এই ব্যবধান।

মোহন্তকে বললাম 'শুয়ে পড়।' সে বলল, 'ভয় করে, মাইজি কখন যে বাইরে গেলো আর বাঘ ধরে নিয়ে গেলো। মাইজি যাবার সময় আমি টের পাইনি। আমার দরজা জানলা খোলা ছিল। কারণ, মাইজি ঘরের মেজেতে শুতে আসবে বলেছিলেন, তিনি যখন বাইরে যান তখন দরজা খুলে যান।' বাঘ মাইজিকে নিয়ে গেলো বলে মোহন্ত রক্ষা পেয়েছে, বুঝলাম। আমি তাকে ধমক দিলাম, নিশ্বাসও যেন না পড়ে। খুব সাবধান, মোহন্ত তার মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লো। আমি গাঢ় অন্ধকারে বাইরের দিকে চেয়ে উৎকর্ণ হয়ে বসে রইলাম। রাইফেলটা দেখলাম, একেবারে ঠিক, প্রহর ইংগিতের অপেক্ষা, ৯টা বেজে গেল, অনেকক্ষণ।

শাড়ীখানা সন্ধ্যার পর এনে খাটের উপর এমন করে বিছিয়ে রাখলাম যেন একপ্রান্ত বাইরে থেকে দেখা যায়। অন্ধকারে পৃথিবী আকাশ প্রান্তর বাংলোটা সব ডুবে গেল, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। জাগ্রত আমি আর আমার প্রতীক্ষা।

উত্তরে জংগলের দিক থেকে শব্দ বেরোল—ই-ই-ই-ই পাখীর পাখার ঝাপটা। কিচির মিচির শব্দ। বুঝলাম হয়ত বাঘ আসছে, সোজা শাড়ীর দিকে। বাংলোর উত্তর-পুব পাশটায় আবার শুনলাম, হরিণগুলো ভয়ে পালিয়ে গেল, ভয়ার্ত চীৎকার। আমি মিনিট গুনতে থাকলাম। একশিংওয়ালা একটা গন্নার বুকুরে হরিণ ডাকতে ডাকতে পালিয়ে গেল।

মনে হলো, বাঘ এসেছে। যেখানে শাড়ীখানা শুকোতে দেয়া হয়েছিল সেখানে এলো। জানলার ফাঁক দিয়ে ঘন অন্ধকারে বাঘ বাঘ বলে মনে হলো। কিন্তু যার শাড়ী সে যে শুয়ে আছে ভেতরে, আবছা দেখা যাচ্ছে। আশা-নিরাশায় বাঘ তার স্বভাবসুলভ হাই তুললো—আস্তে, আমি শুনলাম। টিপে দিলাম রাইফেলে ফিট করা টর্চ, মুহূর্তে বাঘের মাথা—সর্বাংগ জুড়ে আলোর বিদ্যুৎ খেলে গেলো। বাঘটা লাফ দিয়ে সরে যাবার আগে আমার রাইফেল গর্জে উঠলো। ভয়ংকর হুংকারে ধ্বনিত প্রতি-ধ্বনিত আকাশ-বাতাস বন-জংগল ছিঁড়ে ভেংগে কামড়িয়ে একাকার করে ফেললো। জংগলের ভেতরে ও বাইরে যেয়ে গুলি করলাম আন্দাজে, টর্চের আলোতে। তারপর সব নিস্তব্ধ।

বাংলোয় ঢুকে দরজা জানলা ঠেলে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। অল্প ঘুম হলো। দেখলাম সুভদ্রা। রক্তাক্ত ছেঁড়া আগুনে রংয়ের শাড়ীটা তখনও তার সর্বাংগ জড়িয়ে আছে। একটা জায়গার অনেকখানি নাই। সেখান থেকে বুকের—। সে হাসছে, অপরূপ রূপসী। সকালে ৮টায় উঠলাম।

লোকজন এলো—সাবধানে জংগলে খুঁজে মরা বাঘটা নিয়ে আসা হলো। বিরাট বাঘ, লেজে কল্লায় ১৩ হাত। রংটা প্রায় সুভদ্রার আগুনে রংয়ের শাড়ীর মতই—তবে ডোরা-ডোরা।

আপনার
'মিত্রজির চেলা'
২৫।৫

বাইবেল ইংরাজী সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ কিন্তু আজ থেকে ছ'শ বছর আগে ইংরাজীতে বাইবেল ছিল না। বাইবেলের দুটি ভাগ—ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্ট। ওল্ড টেস্টামেন্ট অনূদিত হয় হিব্রু ভাষা ও নিউ টেস্টামেন্ট গ্রীকভাষা থেকে। এই অনুবাদ সহজে হয়নি। এর পিছনে আছে সুদীর্ঘ এক দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী।

প্রাচীনকালে মিশরে প্যাপিরস্ গাছের ছালের ওপর লেখার প্রচলন ছিল। ইহুদীরা ঐ গাছের ছালের ওপর তাদের ইতিহাস লিখে, তা মূল্যবান দলিলরূপে সযত্নে সংরক্ষণ করত। গ্রীকরা ঐ প্যাপিরস্‌কে বলত 'বিবলস্'। এই 'বিবলস্' কথাটা ক্রমশঃ বইয়ের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। ইহুদীজাতির এই ইতিহাসকে তারা বলত 'বিবলিয়া'। গ্রীকভাষা থেকেই 'বিবলিয়া' কথাটা ল্যাটিন ভাষায় আমদানী হয়। সেজন্য ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত বাইবেলের প্রথম কপিটিকে বলা হয় 'বিবলিয়া স্যাক্রা' বা পবিত্রতম গ্রন্থ। ল্যাটিন ভাষার ঐ 'বিবলিয়া স্যাক্রা' ইংরাজীতে অনূদিত হয় এবং সমষ্টিগতভাবে 'বাইবেল' নামে অভিহিত হয়।

যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে ইংলণ্ডে ইটালীর পোপ ও পুরোহিতদের অপ্রতিহত প্রভাব। জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষাবিস্তারের চেয়ে, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও ক্ষমতার দিকেই তাদের লক্ষ্য ছিল বেশি। মাসের পর মাস তাই গির্জাগুলো তালাবদ্ধ হয়ে থাকত। যদিও বা কখনো সখনো তাদের মর্জি অনুযায়ী খোলা হত, ঐসব পুরোহিতরা ল্যাটিনভাষায় বাইবেল পাঠ করত। ফলে জনসাধারণ বাইবেল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞই থেকে যেত। আর তাদের এই অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে পোপ ও পুরোহিত সম্প্রদায় বাইবেলের বিকৃত ব্যাখ্যা করে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করত। এছাড়া তাদের উদ্দেশ্য বা স্বার্থসিদ্ধির পথে যাতে কোনো বাধা না আসে, সেজন্য বাইবেল পাঠ জনসাধারণের মধ্যে নিষিদ্ধ ছিল, ছিল অনধিকারচর্চাস্বরূপ।

এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন ইয়র্কশায়ার নিবাসী একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি—জন উইক্লিফ—ইংলণ্ডের ইতিহাসে যিনি 'ফাদার অফ দি ইংলিশ বাইবেল' নামে অমর হয়ে আছেন। ইটালীর পোপ ও পুরোহিতদের স্বার্থলিপ্সা, স্বেচ্ছাচার, ক্ষমতার লোভ—এসবের বিরুদ্ধে ইংরাজীতে গোপন ইস্তাহার লিখে তিনি তা জনসাধারণের মধ্যে বিলি করতে শুরু করলেন। ঐ ইস্তাহারগুলোতে ইংরাজীতে বাইবেলের বাণী ও শিক্ষাও লিপিবদ্ধ থাকত। ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে এর ফলে দেখা দিল এক নবীন উদ্দীপনা। ঐ ইস্তাহারগুলো যেন তাদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এল।

উইক্লিফ শুধু ঐ ইস্তাহার লিখেই ক্ষান্ত হলেন না, আরও দুঃসাহসের পরিচয় দিলেন। পোপ ও পুরোহিতদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাইবেল ভুল ও বিকৃতভাবে ব্যাখ্যার এই হীন জঘন্যতম অপচেষ্টা জনসাধারণ যাতে বুঝতে পারে, সেজন্য তিনি বাইবেল ইংরাজীতে অনুবাদ করতে শুরু করলেন। যে সময়কার কথা বলছি, সে সময়ে এই কাজে ছিল যে কোনো মুহূর্তে প্রাণহানির আশংকা। কিন্তু অসমসাহসী উইক্লিফ তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। তাঁর এই দুঃসাহসিক কাজে মুগ্ধ হয়ে এগিয়ে এলেন বহু বন্ধু-বান্ধব ও গুণগ্রাহীর দল। উইক্লিফ তাঁদের মধ্যে থেকে হেরফোর্ড নিবাসী নিকোলাস নামে একজনকে তাঁর এই কাজে সহযোগিতা করার জন্য বেছে নিলেন।

উইক্লিফ নিজে আরম্ভ করলেন নিউ টেস্টামেন্টের অংশবিশেষ এবং নিকোলাস ওল্ড টেস্টামেন্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিকোলাস তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ করে যেতে পারেন নি। পোপ, বিশপ প্রভৃতিদের চক্রান্তে প্রথমে তাঁকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও পরে নির্বাসিত হতে হয়। শেষপর্যন্ত অন্যানারা তাঁর কাজ শেষ করেন।

উইক্লিফের বিরুদ্ধেও এই চক্রান্ত চলেছিল, কিন্তু সে সময়ে তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে। বিশেষতঃ রাজ্যের কয়েকজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তাঁর স্বপক্ষে। তাই তাদের এই চক্রান্ত নিষ্ফল হল। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি একাই নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ শেষ করলেন।

উইক্লিফ ছিলেন অক্সফোর্ডের শিক্ষক। কিছুদিন পরই অক্সফোর্ডের বহু ছাত্র তাঁকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এল। তখনও ছাপাখানার প্রচলন হয়নি। তাই তারা অতি গোপনে সতর্কভাবে সারাদিন সারারাত ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে উইক্লিফ অনূদিত ঐ নিউ টেস্টামেন্ট নকল করতে শুরু করে। সুন্দর হস্তাক্ষরে তাদের লেখা ঐ নিউ টেস্টামেন্ট এবং তার অংশবিশেষ কেনার জন্যে গোপনে জনসাধারণের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল। নিউ টেস্টামেন্টের কয়েক পাতা মাত্র প্রচুর অর্থের বিনিময়ে বিক্রি হতে শুরু হল। ধনীলোকেরা ঐগুলো গোপনে গোপনে কিনতে লাগল পড়বার জন্যে। মধ্যবিত্তেরা অর্থ দিয়ে কিনতে না পারলেও তাদের এতদূর আগ্রহ ছিল যে, একগাদা খড়ের বিনিময়ে মাত্র এক ঘণ্টা ঐ হাতে লেখা বাইবেলের অংশবিশেষ পড়বার অনুমতি গ্রহণ করত। লোকালয়ের বাইরে লোকচক্ষুর অন্তরালে, নির্জন বনে ঐ বাইবেল থেকে কিছু কিছু অংশের পাঠ শোনার জন্যে দলে দলে লোকেরা শহর এমনকি সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকেও ছুটে আসত।

ব্যাপারটা পোপ ও পুরোহিতদের কর্ণগোচর হতে বিশেষ দেরী হল না। আবার শুরু হল হীন চক্রান্ত হাতে লেখা ইংরাজী নিউ টেস্টামেন্ট বা তার অংশবিশেষ কার কার কাছে আছে তা খোঁজ করার জন্যে তাদের গুপ্তচর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং যার যার কাছে 'তা' পাওয়া যেতে লাগল, তাদের কঠোর সাজাও হল এবং ঐগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে লাগল। তবু উইক্লিফ বা তাঁর দলের বিরামবিহীন উদ্যমে বাইবেল নকল করার কাজে এতটুকুও ছেদ পড়ল না। বরং দেখা গেল, যত পুড়ছে, বাইবেল তার চেয়ে ঢের বেশি নকল হচ্ছে এবং জনসাধারণের আগ্রহ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

এরই মধ্যে নির্ভীক উইক্লিফের আরেক অভিযান শুরু হল। একমাত্র ধনীলোকেরাই হাতে লেখা ঐ বাইবেল কিনতে পারত, গরীবদের পক্ষে কেনা সম্ভব হত না। কিন্তু বাইবেল শুধুমাত্র ধনীদের জন্য নয়। সর্বসাধারণ যাতে তা পড়তে পারে, তার বাণী ও শিক্ষা উপলব্ধি করতে পারে, সেজন্য তিনি তৎপর হলেন। তিনি তাঁর অনুগত ছাত্রদের মধ্যে থেকে দুজন দু'জন করে নিয়ে একটি দল গঠন করলেন। এই দল ইংলণ্ডের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে প্রকাশ্যে বাইবেলের বাণী ও শিক্ষা প্রচার করতে শুরু করল। তারা কপর্দকহীন অবস্থায় পরিভ্রমণ করত এবং তাদের কাছে কোনো বাইবেল থাকত না। সর্বসাধারণ তাদের মুখ থেকে প্রচারিত বাইবেলের বাণী ও শিক্ষা শোনার জন্যে দলে দলে এসে ভিড় করত। ফলে কপর্দকহীন অবস্থায় থাকলেও তাদের কোনো কিছুরই অভাব হত না। আগ্রহী শ্রোতারাই তাদের আহার, আশ্রয় ও সর্বপ্রকার প্রয়োজন মেটাত। ইংলণ্ডের ইতিহাসে তারাই 'ললার্ডস্' নামে পরিচিত। বাইবেলের বাণী ও শিক্ষা সর্বসাধারণের কাছে প্রচার করেই তারা ক্ষান্ত হত না, কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে নিজেদের জীবনও গঠন করতে সচেষ্ট থাকত। পোপ পুরোহিতের দল ভয় দেখিয়ে অত্যাচার করে 'ললার্ড'-দের এই অভিযান

বন্ধ করার বহু চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই তাদের নিবৃত্ত করতে সমর্থ হল না। উপরন্তু ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সর্বসাধারণের কাছে তাদের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। ফলে তাদের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল উইক্লিফের ওপর।

উইক্লিফ তখন বার্ধক্যে উপনীত। দেশের রাজনৈতিক অবস্থাও সে সময়ে তাঁর প্রতিকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে তাদের হীনকুটিল চক্রান্তে তাঁকে বিচারের সম্মুখীন হতে হল।

বিচারের নামে তা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। শেষপর্যন্ত তাকে নির্বাসিত হতে হল।

বৃদ্ধ উইক্লিফ লুটারওয়ার্থে চলে গেলেন এবং নতুন উদ্যমে আবার বাইবেল অনুবাদের কাজ শুরু করলেন। আগে যা অনুবাদ করেছিলেন, তা সংশোধন করে বাইবেলের পরিমার্জিত রূপ দিতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি নিশ্চিন্তে কাজ করতে সক্ষম হন নি। তাঁকে বহুবিধ বাধা ও শত্রুতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেখানেই তিনি ১৩৮৪ খৃঃ ডিসেম্বরের শেষ রবিবারে বাইবেলের শিক্ষা প্রচার করতে করতে হঠাৎ মারা যান।

ইংরাজী বাইবেলের জনক জন উইক্লিফ লোকান্তরিত হলেও ইতিহাসে কিন্তু অমর হয়ে রইলেন। আর অমর হয়ে রইল সর্বসাধারণের জন্যে তাঁর বাইবেল অনুবাদের মহৎ প্রয়াস।

উইক্লিফের মৃত্যুর প্রায় একশ' বছর পর বাইবেল অনুবাদের এই দুঃসাহসিক কাজে নামলেন উইলিয়ম টিন্ডেল। এই কাজে নামার আগে তিনি কেম্ব্রিজের শিক্ষক সুপণ্ডিত এরাসমাসের দ্বারা—যিনি ঐ সময় গ্রীক ভাষায় বাইবেল অনুবাদের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন—যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এরাসমাসের মত ছিল, বাইবেল সর্বসাধারণে পড়ুক, তার অন্তর্নিহিত শিক্ষা অন্তরে গ্রহণ করুক।

টিন্ডেল সত্তবরী থেকে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অনুবাদ করতে শুরু করেন। তিনি সেই সময়ে লর্ড ম্যানরের অধীনে পুরোহিতরূপে কাজ করছেন। তাই এই অনুবাদের কাজ তাঁকে যথেষ্ট গোপনেই করতে হচ্ছিল। কিন্তু একদিন কোনো একজন পুরোহিতের সঙ্গে তর্ক করতে করতে তিনি প্রকাশ্যে বলে ফেললেন, যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ হয়, আমি এমন ব্যবস্থা করব যাতে একজন চাষার ছেলেও বাইবেল সম্বন্ধে পোপের চেয়েও বেশি জ্ঞান অর্জন করতে পারে। ফলে পোপ ও পুরোহিতদের কাছে তাঁর এই প্রয়াস আর গোপন রইল না। তখন সত্তবরী থেকে তাঁকে লন্ডনে পালিয়ে যেতে হল। কিন্তু লন্ডনে এসে বহুদিন তাঁকে আশ্রয়হীন হয়ে কাটাতে হয়। শেষে হ্যামফ্রী মনমাউথ নামে এক ধনী ব্যবসায়ী তাঁকে আশ্রয় এবং সর্বপ্রকারের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

টিন্ডেল এক বছর তাঁর আশ্রয়ে থেকে যখন বেশ কিছুটা অনুবাদের কাজে এগিয়ে গেছেন, এমন সময় আবার পোপ ও পুরোহিতদের অনুচরদের অত্যাচার শুরু হল। টিন্ডেল এবার পালিয়ে এলেন অ্যান্টিয়ার্পে। সেখানে কোনোরকমে আত্মগোপন করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অনাহারে, অনিদ্রায়, অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদের কাজ শেষ করলেন।

অনুবাদ ত' শেষ হল। কিন্তু ছাপান হবে কোথায়? কে ছাপাবে? ছাপাখানাও সর্বত্র নেই। তাছাড়া পোপ ও পুরোহিতদের অনুচরেরা তখন সর্বত্র তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এহেন অবস্থায় টিন্ডেল পাণ্ডুলিপিসহ অতি অন্তর্পণে বহু জায়গায় ঘুরে ঘুরে শেষপর্যন্ত কোলনে এসে সেখানকার এক ছাপাখানার মালিককে বাইবেল ছাপাতে রাজী করালেন।

গভীর রাত্রিতে টিন্ডেল অতি সন্তর্পণে ছাপাখানায় যেতেন। তাঁর সামনেই দরজা জানালা বন্ধ করে বাইবেল ছাপার কাজ শুরু হত। তিনি বসে বসে প্রুফ দেখতেন। বেশ কিছুটা ছাপার কাজ যখন এগিয়ে গেছে, সেই সময় আবার এক বাধা পড়ল। ঐ ছাপাখানার জনৈক কর্মচারী এক সরাইখানায় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ব্যাপারটা ফাঁস করে দিল। ফলে পোপ ও পুরোহিতদের অনুচররা কথাটা জানতে পারল। কিন্তু ছাপাখানায় গিয়ে তাদের হামলা করার আগেই টিন্ডেল খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে পাণ্ডুলিপিসহ যতগুলো ছাপান কপি পেলেন নিয়ে সোজা ওয়ার্মস-এ গিয়ে আত্মগোপন করলেন।

ওয়ার্মস-এ থাকাকালীন এক ছাপাখানার মালিক তাঁকে ছাপার কাজে সাহায্য করার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বাইবেল সম্পূর্ণ ছাপা হয়ে বেরিয়ে এল।

বাইবেল ছাপা হওয়ার পরে দেখা দিল আর এক সমস্যা। পোপ, বিশপ, পুরোহিতবর্গ ও তাদের অনুচরদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে সর্বসাধারণের কাছে তা' কিভাবে পৌঁছে দেয়া হবে? খুব শীঘ্রই এ সমস্যার সমাধান হল অ্যান্টিয়ার্পনিবাসী কয়েকজন উৎসাহী ইংরাজ ব্যবসায়ীর সক্রিয় সহযোগিতায়। তাঁদের সাহায্যে অতি গোপনে ময়দার বস্তায়, কাপড়ের থানের মধ্যে বাইবেল জাহাজে করে লন্ডনে চালান হতে লাগল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই প্রায় ছ' হাজার বাইবেল লন্ডনে পৌঁছে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

ব্যাপারটা বেশিদিন চাপা থাকল না। জানাজানি হতেই বন্দরে বন্দরে কড়া পাহারার ব্যবস্থা হল এবং প্রতিটি জাহাজে খানাতল্লাসী শুরু হল। জনসাধারণের কাছ থেকেও বাইবেলগুলো উদ্ধারের প্রচেষ্টা চলতে লাগল। ফলে কিছু সংখ্যক বাইবেল সংগ্রহ হল এবং তা রীতিমত অনুষ্ঠান সহকারে পোড়ানও শুরু হয়। কিন্তু কত আর পোড়ান হবে? অ্যান্টিয়ার্পে রোজই অসংখ্য ছাপা হচ্ছে এবং তা' নানা উপায়ে লন্ডনে এসে পৌঁছে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। তখন পোপ-পুরোহিতদের অনুচরেরা আর এক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। চড়াদামে বাইবেল যাতে সরাসরি অ্যান্টিয়ার্প থেকে কেনা যায়—তা আর লন্ডনে এসে না পৌঁছোয়, সেজন্য তারা লোক নিযুক্ত করল। সেই লোকদের মধ্যে ছিল টিন্ডেলের এক বন্ধু। সেই বন্ধুই একদিন টিন্ডেলের কাছে এসে গোপনে ব্যাপারটা জানাল এবং বলল, এমনিই ত তারা বাইবেল সংগ্রহ করে পোড়াচ্ছে এবং পোড়াবেও। তার চেয়ে যদি চড়া দামে তাদের কাছে কিছু বাইবেল বিক্রি করা যায়, মন্দ কি?

টিন্ডেলের সেই সময়ে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কারণ তিনি বাইবেলের নতুন সংস্করণের কাজ এর কিছুদিন আগেই শেষ করে, অর্থাভাবে তা ছাপাতে পারছিলেন না। তাই বন্ধুর এই যুক্তি অনুযায়ী বেশ কিছু বাইবেল তিনি চড়া দামে বিক্রি করে দিলেন। এইভাবে বাইবেল সংগ্রহ করে পোপ পুরোহিতদের অনুচরেরা সেন্ট পল্‌স ক্যাথিড্রেলের সামনে অনুষ্ঠান সহকারে পোড়াতে লাগল। ফলে বাইবেল যা পড়তে লাগল, জনসাধারণের কৌতূহল ততই বাড়তে লাগল এবং তারা উৎসাহ সহকারে তা সংগ্রহ করে পড়তে শুরু করে। অন্যদিকে পোড়াবার জন্য বাইবেল কেনা অর্থে টিন্ডেলের নতুন পরিমার্জিত সংস্করণ বেরোতে লাগল।

এতদিন টিন্ডেল আত্মগোপন করে ছিলেন। কিন্তু এবার তাকে ধরা পড়তে হল। ১৫৩৬ খৃঃ প্রথমে তিনি ধরা পড়ে কারারুদ্ধ হলেন। তারপর শ্বাসরোধ করে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। পরে তাঁর মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়। লন্ডনে যারা তাঁর কাজে সহায়তা করত, তাদের নির্বাসিত করা হল।

আজ জন উইক্লিফ নেই, উইলিয়ম টিন্ডেলও নেই। আছে তাঁদের অমর দুঃসাহসিক অভিযানের ফলশ্রুতি ইংরাজী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ : বাইবেল।

কুটিল চক্রান্তের দ্বারা মহৎ প্রয়াস অবদমিত করা যায় না—ইংরাজী বাইবেল এ সত্যেরই জ্বলন্ত প্রমাণ হয়ে আছে।

নিজের মৃতদেহের পাশে....

মায়া বসু
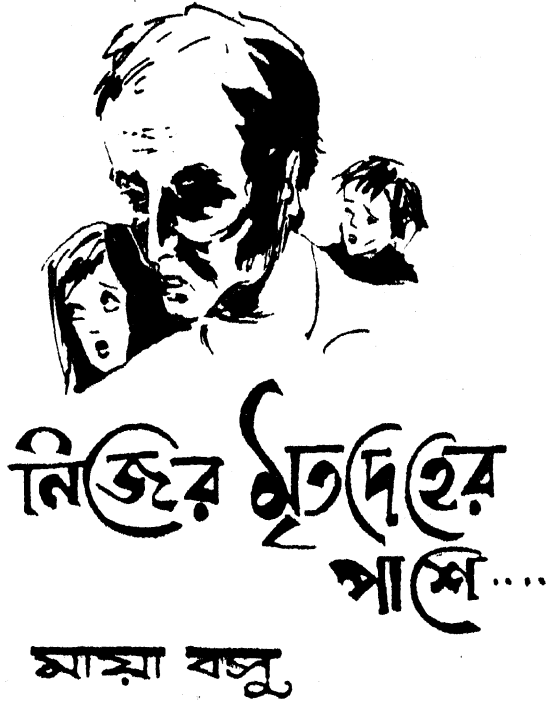
দরজার কাছে ডাক বিলি করে পিওনটা চলে যাওয়া মাত্র সুজয়া চিঠিখানা চোখের সামনে তুলে ধরল। পোস্টকার্ড নয়। খাম। বিচ্ছিরি হাতের লেখায় নীরেনের নাম ঠিকানা লেখা।

সন্দেহের সেই কুটিল সাপটা সুজয়ার বুকের মধ্যে অনেকদিন পর আবার ফণা তুলে ধরল। উনুনে ডাল চড়চড় করছিল, সুজয়া উঠোন থেকেই হাঁক পাড়ল, 'সুনু, ডালে একটু জল ঢেলে দে তো।' তারপরই খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিখানা বার করে পড়তে সুরু করল।

যা ভেবেছিল তাই। লিখেছে সেই অতি ধুরন্ধর, চতুর লোকটা যার নাম ধীরেন। পরের ঘাড় ভাঙাই যার প্রবৃত্তি। পরগাছা-বৃত্তিই যার স্বভাব। ইনিয়ে-বিনিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই একই কথা লিখেছে। '...নিরুপায় হইয়া আবার তোমাকে জ্বালাতন করিতেছি, ভাই নীরু, তুমি ছাড়া আমাদের আর কেহই নাই। তোমার বউদি মারা যাইবার পর হইতে ছেলেমেয়ে তিনটিকে লইয়া আমার কীভাবে দিন কাটিতেছে তাহা ঈশ্বর জানেন, তুমিও জান। ছোট মেয়েটা ভুগিয়া ভুগিয়া মারা গিয়া আমাকে মুক্তি দিয়াছে। বাকী দুজনও সমানে ভুগিতেছে। আমার শরীরও শোকে তাপে অনাহারে অনিদ্রায় একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। যেখানে আছি, সেখানে আর কোন মতেই থাকা চলিতেছে না। তাই মনস্থ করিয়াছি কিছু-দিনের জন্যে তোমার ওখানে কাটাইয়া আসিব। টুনুটা বড় হইয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া ওর একটা পাত্র জোগাড় করিতে না পারিলে..'

এই পর্যন্ত পড়েই সুজয়ার চোয়াল শক্ত হল। কতকগুলো কঠিন রেখা ওর স্বাভাবিক লাবণ্যময় মুখের চেহারাটাকে অস্বাভাবিক নিষ্ঠুর করে তুলল।

দরজায় জুতোর শব্দ। নীরেন বাজারের থলেটা হাতে করে বাড়ির মধ্যে ঢুকেই চিঠি হাতে সুজয়ার মুখের দিকে তাকিয়েই শঙ্কিতভাবে থমকালো। 'কার চিঠি?'

'কার আবার? তোমার সাত সাতে উনপঞ্চাশ পুরুষের দাদার চিঠি।'

বাজারটা রান্নাঘরের বারান্দায় নামিয়ে রেখে ও জিজ্ঞাসা করল, 'কি লিখেছেন ধীরেনদা? মানে বড়দা?'

'কি লিখেছেন, নিজেই পড়ে দেখ।' চিঠখানা নীরেনের হাতের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুজয়া রান্নাঘরে ঢুকে গেল।

চিঠি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নীরেনের দু' চোখে ভয় ঘনিয়ে এলো। সে ভয় শুধু ধীরেনদার এখানে আসবার চিন্তাতেই নয়। আবার তার মাথার ওপর একটা ঝড় ঘনিয়ে আসছে। পারিবারিক অশান্তি। সুজয়ার সঙ্গে কুৎসিত কলহ, মনোমালিন্য। ধার দেনা সংসার খরচ...যন্ত্রণা হতাশা...তাছাড়া টুনুর বিয়ে...কেমন করে...

সব মিলিয়ে...সব মিলিয়ে...একটা—একটা বীভৎস ব্যাপার।

রান্নাঘর থেকে সজোরে নিক্ষিপ্ত শূন্য বাজারের চুবড়িটা মুখ থুবড়ে নীরেনের পায়ের কাছে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বঁটি হাতে সুজয়াও রান্নাঘর থেকে থমথমে মুখে বেরিয়ে এসে শীর্ণ বাজারের থলেটা উপুড় করে কটু গলায় কট-কট করে উঠল, 'তিন ঘণ্টা ধরে বাজার ঘুরে শেষে এই কিনে নিয়ে এলে? এই কটা আলু? ঝাঁটারকাঠির মত এই ক'গাছা বরবটি- পোকাপড়া দুটো বেগুন আর কুমড়োটুকু? আর এই কখানা পাতের মত পাতলা পোনার টুকরো? দুবেলা আমি এতগুলো মুখে এই দিয়ে কী পিণ্ডি চটকে দেব, তাই শুনি?'

জবাব দেবার মত কোন কথা খুঁজে না পেয়ে কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইল নীরেন।

প্রত্যেক দিনের মতন সুজয়াই ওকে বাজারের টাকা বার করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে কি আনতে হবে, কতটা আনতে হবে সবকিছুই বলে দিয়েছে। নীরেনও সুজয়ার কথমত প্রত্যেকটা জিনিস কিনে এনেছে। আলু বেগুন বরবটিই শুধু নয়। সেই সঙ্গে আগুনের মত দামের রুইমাছও এনেছে বরাদ্দের চেয়েও বেশী। আর সেই মাছের টুকরোগুলো একেবারে পাতলা ফিনফিনে টুকরে ও নয়। কিন্তু সেকথা এখন ওকে কোনমতেই মুখ ফুটে বলা যাবে না। চার টাকার বাজারের বদলে আজ যদি নীরেন ওকে দশ টাকার বাজার করেও এনে দিত, তাহলেও আজ ওর কাছ থেকে এই শক্ত শক্ত কথাগুলি শুনতে হত। আজ সুজয়ার কোন কথার প্রতিবাদ করা একান্তই নিরর্থক।

নিঃশব্দে চিঠিখানা হাতে নিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়াতেই সুজয়া ধারালো গলায় প্রশ্ন করল, 'এখুনি চিঠিটার উত্তর দিতে যাচ্ছ বুঝি?'

এটাও সুজয়ার রাগের কথা। কেননা সুজয়া ভাল করেই জানে, কোন চিঠিপত্র আসবার সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব দেওয়াটা নীরেনের ধাতে নেই। চিঠি লেখাতেই তার প্রচণ্ড কুঁড়েমি। কিন্তু এই তুচ্ছ কথাটাও আজ এই মুহূর্তে সুজয়াকে স্মরণ করিয়ে দেবার মত সাহস অথবা শক্তি, কোনটাই নীরেনের নেই। তাই নীরেন সুজয়ার এই কথারও কোন জবাব দিল না।

জবাব দিলে, প্রতিবাদ জানালে, তর্ক করলে কী ফল হত বলা যায় না। কিন্তু স্বামীর এই নীরবতায় সুজয়ার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। তীব্র ঝাঁঝের সঙ্গে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'চিঠি লিখতে ইচ্ছে হয় একখানা কেন সাতখানা লেখগে যাও। কিন্তু দয়া করে গুষ্ঠিসুদ্ধ তোমার দাদাটিকে নেমন্তন্ন করে, আমার ঘাড়ে এনে ফেল না। একবার নয় দু-বার নয়, বার বার আমার এই হাঙ্গামা-হুজ্জুত ভাল লাগে না। এদিকে তোমাদের অফিসে গোলমাল লেগেই আছে। আর আমাদের অবস্থাও এমন নয় যে বারো মাস দানছত্তোর খুলে রাখব। যেমন তোমার চোখের চামড়া না থাকা দাদা, তেমনি তার হ্যাংলা ক্যাংলা অসভ্য ছেলেমেয়েরা। ক'বার এসে এসে আমাকে জ্বালিয়েপুড়িয়ে খেয়েছে। খরচের শেষ করিয়ে, দেনা ধার করিয়ে একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেছে। আশ্চর্য মানুষ বটে তোমার ওই দাদা! বার বার এখানে, এই টানাটানির সংসারে তিন-চারটে মানুষ এসে থাকবার কথা ভাবে কেমন করে? এতটুকু চক্ষুলজ্জাও কি নেই ছাই? ঢের-ঢের নির্লজ্জ বেহায়া মানুষ দেখেছি বাপু, কিন্তু তোমার ওই দূরসম্পর্কের দাদার মত দু' কানকাটা বেহায়া মানুষ আমি জন্মেও দেখিনি। কোন কালে বাপ-মা-মরা তোমাকে কটা বছর একটু দেখাশোনা করেছিল বলে সারাজীবন ধরে সুদে-আসলে তার শোধ তুলে নিচ্ছে। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে! মেয়ের বিয়ে দেয়া মুখের কথা কিনা? কী করে যে মানুষ একথা লেখে, ভেবে পাই না।'

বেশ কিছুদিন ফ্যাক্টরীতে গোলমাল চলছে। অফিস স্টাফের ভেতরেও সেই অশান্তির ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে। কাজে কারুর মনই ভাল করে বসছে না।

কাজে মন লাগছিল না নীরেনেরও।

রোদে জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে আসা জানলার ফ্রেমে আটকানো এক টুকরো ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে, কার্নিশে ছায়ায় বসে ভাঙা গলায় খা-খা ডাব হাড়গিলে কাকটার দিকে তাকিয়ে বার বা অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল ও। বার বার চোখে সামনে ভেসে উঠছিল একটা অজ্ঞাত অখ্যা মফস্বল শহর। তবে শহর না বলে ওটা মফস্বল পাড়াগাঁ বলাই বোধহয় ভাল।

ঝোপঝাড় পুকুর-ডোবা ভাঙা পুরো শিবমন্দির, ছক কাটা-কাটা ধানক্ষেতে আল পেরিয়ে কলাগাছ বাঁশঝাড় পেরি প্রকাণ্ড একটা মাঠের মধ্যে রংজ্বলে যাও ইটখসেপড়া একটা বিল্ডিং। সেখানকা হাইস্কুল। সেই স্কুল থেকেই একদি সগৌরবে প্রথম বিভাগে পাস করে বেরিয়ে ছিল নীরেন। আজ যাকে অতি অভদ্রভা গালাগাল দিল সুজয়া, সেই ধীরেনদা বাবাই একদিন তার হাতখানা ধরে হেড মাস্টারমশায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে চো মুছতে মুছতে বলেছিলেন, 'পোড়াকপা ছেলেটার মাস্টারমশাই। না হলে জন্মাতে ন জন্মাতে মাটা মরে যায়? আর সেই শোক এমন সোনার চাঁদ ছেলেটাকে ফেলে রে বাপ বিরাগী হয়ে সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ি ছে উধাও হয়ে চলে যায়?'

আপন জ্যাঠা নয়। বাবার জ্যাঠতুতো দাদা। কিন্তু সে সম্পর্কটাও জানতে বুঝতে পেরেছিল বহুকাল বাদে। বছ তিনেক বয়সে মা মারা গিয়েছিলেন তারপরই বাবা একদিন সেই পাড়াগাঁয়ে বুড়ো মানুষটি আর তাঁর স্ত্রীটির হা ওকে তুলে দিয়ে সেই যে কোন তীর্থে ন হিমালয়ে তপস্যা করতে চলে গিয়েছিলেন তারপর থেকে তাঁর আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নি।

সেই থেকে নীরেন জ্যাঠামশাই জ্যাঠিমার কাছেই মানুষ। অনাদরে অবহেলায় নয়। সন্তানের চেয়েও অধিক ভালবাসায় বাৎসল্যে। স্নেহে যত্নে মায়ামমতায়।

সেই দরিদ্র উদয়াস্ত খেতখামার জমিজমা তদারক করে কোনমতে সংসারটাকে বাঁচিয়ে রাখা স্নেহময় মানুষটির কথা বার বার মনে পড়ল নীরেনের।

ভাঙাচোরা ধসেপড়া জোড়াতালিদেয় বাড়িটার মতই জীর্ণ প্রাচীন চেহারা ছিল বুড়োমানুষটির। জ্যাঠিমার রোগা ফ্যাকাসে চেহারা, শির বার-করা হাত দুখানায় দু গাছা মাত্র শাঁখা। বাসনমাজা, সাবান-কাচা রান্নাকরা সবই নিজের হাতে করতেন। টাইম মত নীরেনকে ইস্কুলের ভাত রান্না করে দিতেন। টিফিন যেদিন যেমন সম্ভব হত, ঠিক সময়ে ধীরেনের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। অভাবের সংসারে কোন-কিছু ভালমন্দ জিনিস এলে জ্যাঠামশাই নীরেনকেই বেশীর ভাগটা দিতেন। আহা, ওর বাপ-মা নেই! ইস্কুলে কত পড়ার চাপ। ও খাক। ও খাক।

জ্যাঠিমাও যেন জ্যাঠামশায়ের প্রতিচ্ছায়া

দৃষ্টিই না ছিল তার ওপর! নীরেনের পড়াশোনায় বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে, তার ওপর।

সুজয়ার কটূক্তি মনে পড়ল। 'কেন, মন দিয়ে লেখাপড়া শিখে মানুষ হলেই তো পারতেন তোমার মতন? চাষা না হয়ে?'

নীরেনের মনে হয়, ধীরেনদার লেখাপড়া না হবার বেশ খানিকটা কারণ যেন সে নিজে। তারি জন্যে ও'র লেখাপড়া হল না। মাথা মোটা ছিল। তেমন বুদ্ধি ছিল না। সকলের থাকেও না। নীরেনের মত ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট সব ছেলে হয় না। চেষ্টা করলেও হতে পারে না। কিন্তু ঘষেমেজে চেষ্টা চরিত্র করে মোটামুটি পাস করে যাওয়ার দলই তো বেশী।

নীরেনের চেয়েও বেশ কয়েক বছরের বড় ধীরেনের ঢিমেতেতালায় যেমন-তেমন করে যদিও বা পড়াশোনাটা যা হোক হচ্ছিল হঠাৎ জ্যাঠামশাই স্ট্রোকে মারা গেলেন। ওরা দুজনেই তখন প্রবেশিকার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ বাবা মারা যাওয়ার জন্যে ধীরেনকে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে সংসারের ভার মাথায় নিতে হল। দুটো পয়সার জন্যে খেতখামারে ছুটোছুটি করা সুরু হল। তখন ধীরেনই নীরেনের পড়ার সব ভার হাসি মুখে মাথায় তুলে নিয়েছিল। সে সময় ধীরেন তাকে সমানে না পড়ালে, কলকাতার কলেজে পড়ার খরচ না জোগালে তার অবস্থা আজ বোধহয় ধীরেনের মতই হত। কিম্বা তার চেয়েও খারাপ।

স্কুল থেকে ভালভাবে পাশ করে নীরেন কলকাতার কলেজে ভর্তি হল। তারপরে কয়েকটা বছর ধীরেনের ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেল। তাকে পড়ানোর খরচ পাঠাতে দাদাকে কী অপরিসীম পরিশ্রম করতে হয়েছে, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে, সেকথা সুজয়া কল্পনাও করতে পারবে না।

তারপর ধীরেনদার বিয়ে হল। জ্যাঠিমা মারা গেলেন। টিউশনির টাকার সঙ্গে ধীরেনদার অনেক কষ্টে পাঠানো অর্থ-সাহায্যে নীরেনের কলেজের পড়াশোনা ভালভাবেই চলতে লাগল। ভালভাবে পাসও করল। আর কপাল ক্রমে মোটামুটি একটা চাকরিও তার জুটে গেল।

চাকরি পাবার পর বছরও ঘুরল না। ঠিক তারি মত বাপ-মা আত্মীয়স্বজনহীন সুজয়ার সঙ্গে কলেজে পড়ার সময়ই আলাপ হয়েছিল, ঘনিষ্ঠতা এবং ভালবাসাও হয়েছিল ক্রমে ক্রমে। দাদা-বৌদির অনুমতি নিয়ে একদিন তাকেই বিয়ে করল নীরেন। ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট জোগাড় করে কলকাতাতেই সংসার পেতে বসল, আরো দশজন সাধারণ মানুষের মত। তারপর পৃথিবীর তথা সংসারের স্বাভাবিক, নির্ভুল নিয়মের মত, ধীরেনদার সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এলো। আসা-যাওয়াও প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। নিজের চাকরি-বাকরি, বন্ধু-বান্ধব স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে সেও ব্যস্ত ও বিব্রত হয়ে পড়তে লাগল।

পাল্লার একদিক ভারী হলে অপর দিক হাল্কা হয়ে যায়। নীরেনের চাকরির কিছুটা উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধীরেনের দুঃখ-দুর্দশা দারিদ্র্যের যেন সীমাপরিসীমা রইল না। হঠাৎ কালবৈশাখীর ঝড়ে ভাঙা দেয়াল চাপা পড়ে ধীরেনের বৌয়ের কোমর ভাঙল। খবর পেয়ে নীরেন চিকিৎসার জন্যে টাকাও পাঠাল। কিন্তু সে টাকায় কিছুই হল না। হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করানোর জন্যে বাধ্য হয়ে কয়েক বিঘা ধানজমি বেচতে হল। বছরখানেক ভুগে ভুগে ধীরেনকে আরো খানিকটা দুঃখকষ্ট অভাব অনটনে ডুবিয়ে ভদ্রমহিলা চোখ বুজলেন। রেখে গেলেন দুটি মেয়ে একটি ছেলে।

ওদের নিয়ে ধীরেন দিশাহারা অবলম্বনহীন মানুষের মতই নীরেনের কাছে এসে আশ্রয় নিল সেই মহাবিপদে।

প্রথম প্রথম যথেষ্ট সহানুভূতি দেখালেও, কিছুদিন পর সুজয়ার চোখ

মুখের চেহারা কঠোর কর্কশ, কথা বলার ভঙ্গি বেসুরো হয়ে উঠল। দিনের বেলা অফিসের সময় বাদ দিয়ে যেটুকু সময় নীরেন বাড়ি থাকত, দাদার ছেলেমেয়েরা ওকে ঘিরে থাকত। ধারেকাছে দাদাও থাকত। সুজয়ার অসুবিধে হত। কিন্তু রাত্রির নিরিবিলিতে পরিশ্রান্ত, সমস্ত দিনের কর্মক্লান্ত সুজয়ার ভদ্রতা, শালীনতার মুখোস নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যেত। শোবার ঘরে খিল তুলে দিয়েই ও চাপা বিষাক্ত গলায় প্রশ্ন করত, 'ওরা কবে দেশে চলে যাবে?'

জেনেও না জানার ভান করতে হত নীরেনকে। 'ওরা কারা?'

'জান না কারা?' হিংস্র বিদ্বেষে দাঁতে দাঁত ঘষে সুজয়া জবাব দিত, 'ওই রাক্ষসের পাল আর তোমার আদিখ্যেতার বড়দা।'

'দোহাই সুজয়া, একটু আস্তে কথা বল। পাশের ঘরেই ওরা সবাই আছে। হয়তো এখনো ঘুমোয় নি...শুনতে পাবে।'

'শুনতে পায় পাবে। একটু আক্কেল যদি তাতে হয় হোক, আমি বাঁচব। আমি আর এতগুলোকে টানতে পারছি না। আমার শরীর আর বইছে না।'

সুজয়ার কণ্ঠস্বরে আগুন। দু' চোখে, কণ্ঠস্বরে মুখের বিরূপ অভিব্যক্তিতে ঘৃণা বিতৃষ্ণা। 'র‍্যাশনের চালে তিনটে দিনও কুলোয় না। ব্ল্যাকে ডবল দামে চাল কিনে কিনে ফতুর হয়ে গেলাম। তোমার ভাইপো-ভাইঝিরা রাত দিন খাই খাই করছে। নিজের ছেলেমেয়ে দুটোকে পর্যন্ত পেট ভরে খেতে দিতে পারছি না ওদের জ্বালায়। আর বলিহারী তোমার দাদাকে। একাই তিনজনের ভাত খাচ্ছেন এক এক বেলায়। যেমন তিনি তেমনি তাঁর ছেলেমেয়ে তিনটে। আমার সমস্ত সংসারটাকে পেটের মধ্যে না পুরে ওরা এখান থেকে নড়বে না।'

'আঃ সুজয়া এত রাত্রে কী সুরু করলে? থাম এখন।'

'না থামব না।' সুজয়ার চোখের আগুন আরো জ্বলন্ত হয়ে উঠল। 'কাঁচা চালগুলো পর্যন্ত ওরা তিনজনে মুঠো মুঠো চিবিয়ে খাচ্ছে, তা জানো তুমি?'

'কাঁচা চাল। ওরা কাঁচা চাল খায়।'

'শুধু কাঁচা চাল? দুবেলা থালা থালা ভাত গেলাচ্ছি, তাতেও তোমার ভাইপো-ভাইঝিদের পেট ভরে না।' নীরেনের স্তম্ভিত প্রশ্নের উত্তরে সুজয়ার চোখের তারায়, জিভের ডগায় আবার শাণিত ছুরির ফলা ঝলসে উঠল। 'যেখানে যা পাচ্ছে, গরু-ছাগলের মত পেটে পুরছে। ভাঁড়ারের কৌটো থেকে কাঁচা মুগের ডাল, র‍্যাশনের চাল-চিনি, আটা-ময়দা যখন যা পারছে চুরি করে মুঠো মুঠো মুখে পুরছে। এতটুকু শিক্ষা-সহবতও নেই। ছি ছি ছি।

অমন হাড়হাবাতে হ্যাংলা ছেলেমেয়ে তার নিজের হলে সুজয়া তাদের যে কী করত, কেটে কুচি কুচি করে জলে ভাসিয়ে দিত, না গলা টিপেই মেরে ফেলত— সে-কথা সে আর মুখে প্রকাশ করল না। কিন্তু মুখে না বললেও তার সমস্ত চোখ-মুখের হিংস্র অভিব্যক্তির মধ্যেই তার মনের কথা ফুটে উঠল।

টুনু মুনু শংকর।

মুগ্ধবাক নীরেনের চোখের সামনে বড়দার ছেলেমেয়েদের ফুলের মত নিষ্পাপ সরল মুখগুলি ভেসে উঠল।

সুজয়া মনের জ্বালায় যা ইচ্ছে বলুক না কেন, হতে পারে ওরা গেঁইয়া, অমার্জিত, কিন্তু অশিষ্ট অভদ্র অশান্ত প্রকৃতির নয়। অল্প বয়সেই নিজেদের দারিদ্র্য, দুঃস্থ অসহায় অবস্থা, পরাশ্রয়ের হীনমন্যতা মা-মরা ছেলেমেয়ে ক'টি বুঝতে শিখেছে। বেশীর ভাগ সময়ই ওরা আস্তে কথা বলে, আস্তে হাঁটে, চুপচাপ হয়েই থাকে। শৈশব-কৈশোরের স্বাভাবিক চাপল্য চাঞ্চল্য ওদের একেবারে নেই বললেই হয়। চেহারায় শিশু। কিন্তু মন বুড়োটে মেরে গেছে। ওরা যেন নির্জীব গৃহপালিত কয়েকটা পশুমাত্র। এক অদৃশ্য নিষ্ঠুর শাসকের শাস্তি অথবা চোখ-রাঙানির ভয়ে সদাসর্বদা সশঙ্কিত। ত্রাস-গ্রস্ত।

সেই টুনু মুনু শংকর চুরি করে খায়। কাঁচা চাল ডাল। আটা ময়দা চিনি।

কিন্তু কেন খায়? সুজয়া কি বুঝতে পারে না সে-কথা?

পেট ভরে না বলে খায়। ওরা পাড়া-গাঁয়ের ছেলেমেয়ে। যতই দরিদ্র অভাবগ্রস্ত হোক না কেন, তবু দেশে থাকতে ওরা তিনবেলা পেটভরে লাল লাল মোটা চালের ভাত খেত। জলখাবারের বালাই ছিল না। ডাল-মন্দ মাছ-তরকারিরও প্রয়োজন ছিল না। এক কাঁসি মোটা চালের ভাতের সঙ্গে একটু ডালসেদ্ধ আলুসেদ্ধ আর দুটো কাঁচালঙ্কা। তাই ওদের কাছে অমৃত ছিল। নীরেনও তাই খেয়ে মানুষ হয়েছে।

কিন্তু এখানে? এখানে ওরা কী খেতে পাচ্ছে?

দুবেলা মাপা চালের মাপা ভাত বেড়ে দেয় সুজয়া সবাইকে। ওদের ছেলে-মেয়েদুটোও একসঙ্গে খায়। তবে ওরা সাধারণতঃ খুব কম ভাত খায়। বাড়বার সময় সুজয়া নিজের ছেলেমেয়েদের যা ভাত বেড়ে দেয়, ওদেরও প্রায় সেইরকমই দেয়, বড়জোর মুখফুটে চাইলে আরো দু-একমুঠো বেশী দেয়, কিন্তু নীরেন জানে, তাতে ওদের কারুর পেটই ভাল করে ভরে না। আর জলখাবার? সে-কথা

টুকরো খাওয়াও যা, না খাওয়াও তাই। অন্তত ওদের পক্ষে।

'ওদের সঙ্গে মিশে মিশে আমার ছেলে-মেয়েদুটোও গোল্লায় যাচ্ছে। তুমি ওদের দেশে পাঠিয়ে দাও।'

'কিন্তু কোথায় যাবেন বড়দা ওদের নিয়ে?' বিমূঢ়ের মত নীরেন উল্টে সুজয়াকেই প্রশ্ন করে বসল।

উত্তর রেডী করাই ছিল। জবাব দিতে তিলার্ধ দেরী হল না। 'কেন, এতকাল যেখানে ওরা ছিল, নিজেদের দেশঘরে। সেখানে কি মানুষ থাকে না, না নেই?'

'ঘর পড়ে গেছে, পাঁচিল ভেঙে গেছে। থাকবার উপায় থাকলে বড়দা এখানে আসতেন না। এতকাল থাকতে আসেননি।'

'বেশ তো, সেজন্যে চিন্তা কেন? যে ক'টা টাকা ব্যাঙ্কে পড়ে আছে তুলে নিয়ে দেশের ঘরখানা সারিয়ে দাও। ওদের পুষতে কম খরচ তো আর হচ্ছে না। যা ছিল সব গেছে, যে ক'টা টাকা আছে, তাও যাবে। কিন্তু আপদেরা যদি ঘাড় থেকে ভালয় ভালয় নেমে যায় তাতেও শান্তি। আমি আর পারছি না।'

নীরেন তাই-ই করেছিল শেষপর্যন্ত। কোনমতে জোড়াতালি দিয়ে দেশের ঘর-বাড়ি মেরামত করে ওদের সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল।

কিন্তু কয়েক মাস পর আবার চিঠি এলো। দাদা নিজে নয়। তার বড় মেয়ে টুনু লিখেছে। কাকামণি বাবার বড় অসুখ। বড্ড ভয় করছে। তুমি একবার কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে এখানে এসো।

সুজয়ার ক্রোধ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ টীকা-টিপ্পনি উপেক্ষা করে দেশে ছুটে গিয়েছিল নীরেন। সেখানে তাদের অবস্থা দেখে, ধীরেনের অসুখ দেখে ওদের সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছিল।

তারপরও মাঝে মাঝে এসেছে। আবার চলেও গেছে ধীরেন। যাবার আগে নীরেনকে সেই একই কথা বলে গেছে। 'তোদের এখানে এসে আমরা সবাই মিলে তোকে, বৌমাকে বড্ড জ্বালাতন করি নীরু, সবই বুঝি। কিন্তু না এসেও যে পারি না ভাই। তুই ছাড়া ত্রিসংসারে আমাদের আর কে আছে তাই বল?'

টুনুর পর মুনু। মুনুটা মারা গেছে। ভালই হয়েছে। সুন্দর বয়সী ছিল ও। বেঁচে থাকলে ওরও বারো তেরো বছর বয়স হত। টুনু ওর চেয়ে তিন বছরের বড়। ষোল বছর বয়স হল মেয়েটার। অযত্নে অবহেলায় চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থাকে তাই, না হলে মেয়েটাকে দেখতে সত্যিই ভাল। পেটভরে খেতে পায় না। তবু ওর চেহারা দেখলে সেকথা মনে হয় না। গায়ের রং ফর্সা। মাথায় একমাথা চুল। টানা-

কিন্তু—কিন্তু তাতে কী হল ? শুধু সুশ্রী চেহারা দেখে তো বিয়ে হবে না। না জানে লেখাপড়া না জানে গানবাজনা। না আছে অন্য কোন গুণ। নিঃশব্দে গাধার মত খাটতে পারে। রান্না থেকে বাসনমাজা জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ। কিন্তু তাতে এই বাজারে মেয়ে পার করা যায় না। যদি টাকার জোর থাকত, অন্তত কিছুটাও, তাহলেও না হয় কথা ছিল। নীরেনেরই বা অত টাকা কোথায়? বার বার বড়দাই তো তাকে নিংড়ে নিংড়ে টাকাকড়ি বার করে নিচ্ছে। বড়দা কি ভাবে নীরেন মস্ত একটা হোমরাচোমরা কিছু? হাজার দুহাজার মাইনে পায়? দাদাকে তো বহুবার আমার অবস্থার কথা খুলে বলেছি, লিখেওছি, তবু দাদা কেন সেকথা বিশ্বাস করে না ?

অসহ্য বিরক্তিতে নিরুপায় বিবশতায় হতাশায় নীরেন টেবিলে কনুই রেখে রগের দুপাশে দুহাত টিপে ধরল।

'কী নীরেনদা ? শরীর খারাপ নাকি ?' জুনিয়ার সহকর্মী নিখিল সেন পাশে এসে দাঁড়াতেই সচেতন হল নীরেন। মুখের পাশ থেকে হাত নামিয়ে নিখিলের দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসল। শরীর মন দুই-ই খারাপ। কোনটাই ভাল নয়।'

'কেন, কী হয়েছে ?'

দাদার চিঠি পেয়েছি। শুক্লার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে আমার এখানে আসছেন। কিন্তু বিয়ে তো অমনি হয় না। জানই তো দাদার অবস্থা। আর আমিই বা কোথা থেকে অত টাকা পাব? প্রভিডেন্ট ফণ্ডে কটা টাকাই বা পড়ে আছে? লোন-টোন যদি—'

'লোন !' নীরেনের কথার মাঝখানে যেন হাতুড়ির ঘা মারল নিখিল। এদিক ওদিক তাকিয়ে চাপা গলায় ফিসফিস করল 'ফণ্ডে একটা টাকাও জমা পড়ছে না। কোম্পানীর অবস্থা খুব খারাপ। হরিপদ ঘোষ তার বাবার শ্রাদ্ধে মাত্র দুশ টাকা চেয়েও পায়নি।'

'সে কী !'নীরেনের গলা শুকিয়ে গেল। বুক ধড়ফড় করে উঠল।

'তাই-ই। প্রোডাকশন বন্ধ। ফের ওয়ার্কাররা স্ট্রাইক করবে বলে শাসিয়েছে। বোনাসের ব্যাপার নিয়ে যে গণ্ডগোল চলছে তারি রি-অ্যাকশন। ম্যানেজিং ডিরেক্টরও ওয়ার্কারদের কড়া গলায় জানিয়ে দিয়েছেন বার বার এই গণ্ডগোল তিনি কোনমতেই সহ্য করবেন না। ওরা স্ট্রাইক সুরু করলে তিনিও ফ্যাক্টরির গেটে লক-আউটের তালা ঝোলাবেন।

'সেকথা তো সবাই জানে।'

'যেটা সবাই জানে না, এবার সেটা আপনি আমার কাছ থেকে জেনে রাখুন। মালিকরাই বাধাচ্ছে ইচ্ছে করে। ওরা ফ্যাক্টরি এখান থেকে তুলে মাদ্রাজ কি বোম্বে কি অন্য কোথাও নিয়ে যাবে। নতুন স্টাফ দিয়ে কারখানা চালাবে। সে স্টাফের মধ্যে বাঙালী থাকবে না। বিশেষ করে আমরা কেউ-ই থাকব না।'

'কী সর্বনাশ! তাহলে কী হবে ?'

'কী আবার হবে ? চাকরি যাবে। না খেয়ে ছেলেমেয়ে বৌ নিয়ে শুকিয়ে মরতে হবে—'

পেছনে কার পায়ের শব্দ হতেই নিখিল তাড়াতাড়ি ওর টেবিলের পাশ থেকে সরে গিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল।

আর ঝিমঝিম মাথা নিয়ে ঠাণ্ডা কাঁপা আঙুলে কলমটা ধরে ফাইলের ওপর ঝুঁকে পড়ে নীরেন মনে মনে জপ করতে লাগল। 'গুজবে কান দিতে নেই। গুজবে কান দিতে নেই। গুজবে কান দিতে......।

সুজয়ার পরামর্শমতই চিঠিটা লিখল নীরেন। চাকরি নিয়ে টানাটানি চলছে। কমাস ধরে বাড়িটাও ছেড়ে দেবার কথা হচ্ছে। একটা বাড়ি পাওয়াও গেছে। সেখানে উঠে যাবার পর নীরেন দাদাকে জানাবে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে তখন বড়দা এলেই ভাল হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

পোস্টকার্ড খানার ওপিঠে দাদার নাম-ঠিকানা লিখতে লিখতে ধীরেনের নির্জীব দুঃস্থ . রক্তশূন্য চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল নীরেনের।

শিরবারকরা চামড়াকোঁচকানো হাত-পা। মুখে বয়সের চেয়ে সহস্রগুণ বেশী আঁকিবুকি কাটা। দুঃখের রেখা ধৈর্যের রেখা সহ্যের রেখা। সামনের চুলগুলো পেকে ওঠায় আরো বুড়োটে দেখায়। গায়ের পুরোনো সার্টটার ওপর টুনুর হাতের তালিমারা অনেক জায়গায়। ধুতিখানা বাড়িতে কেচে কেচে পরার দরুন লালচে, কোঁচকানো। হাঁটুর নীচে নামেও না। বারো-মাস সস্তার রবারের চটি পরার দরুন পায়ের আঙুলগুলো, গোড়ালি, ধুলোকাদা লেগে লেগে বিচ্ছিরি একটা কালচে ছোপ ধরে গেছে। মিলিয়ে বড়দা যেন জলহীন মরুভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা পাতাঝরা একটা শুকনো গাছ। যে গাছটাকে দেখলে অবাক হয়ে ভাবতে হয়, ওটা এখনো কেমন করে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে ?

চিঠিখানা পোস্ট করে যেন একটা অবশ্যম্ভাবী আসন্ন ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পেল নীরেন। কিন্তু সেই সংগে একটা কষ্টকর অনুভূতি, এক বিষম সুগভীর অপরাধবোধ ওর সমস্ত স্নায়ুগুলোকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

দাদা চিঠি পেলেই, পড়েই বুঝতে পারবে জলের মত স্বচ্ছ ওদের এই প্রতারণা। নীরেনরা ওদের এড়িয়ে চলতে চাইছে। ওরা চায় না, দাদা তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে

জীবনসংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত দারিদ্র্য-জর্জরিত ওই মানুষটা অনেক ঝড়ঝাপটা অনাদর অবজ্ঞা, অনেক রূঢ়তা উপেক্ষা প্রতারণার সংগে বিশেষভাবে পরিচিত। বহু বিরূপ পরিবেশে অভ্যস্ত। নীরেন সুজয়ার মনের ভাব বুঝতে তার কিছুমাত্র দেরী হবে না।

কিন্তু তবু, কোনকিছুই আজ আর ধীরেনের কাছে অপ্রত্যাশিত নয়।

বাড়ি বদলানো হল না।

ফ্যাকটরির ওয়ার্কারদের অসন্তোষ গণ্ডগোল অফিস স্টাফের মধ্যেও সংক্রামিত। সর্বদা কী হয় কী হয়। স্ট্রাইক হব হব। মালিকদের মনোভাবও অনমনীয়। কী হবে বোঝা যাচ্ছে না। শুধু দিন কাটছে রুদ্ধ আক্রোশে বিরুদ্ধ মনোভাব নিয়ে। ধোঁয়ার আড়ালে আগুনের মত সবকিছুই স্পষ্ট অথচ অস্পষ্ট।

এতদিনের চাকরি বুঝি যায় যায়। একবার লকআউট হলেই অনির্দিষ্ট কালের জন্যে মাইনে বন্ধ। শুধু তাই নয়। রিল্যাক্স ফ্যান ফ্যাকটরির অবাঙালী ম্যানেজিং ডিরেকটর এখানকার কারখানা অফিস সমস্তই তুলে দেবেন। একথা নিশ্চিতভাবেই স্থির হয়ে গেছে।

কমাস ধীরেনদারও কোন খবর নেই। কোন চিঠিপত্র আসেনি। চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে নীরেন পরে আবার চিঠি লিখেছিল। কিন্তু তারও কোন জবাব আসেনি। অফিস নিয়ে সংসার নিয়ে বিব্রত নীরেনের দাদার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর মত সময় উৎসাহ অথবা মনের অবস্থাও ছিল না।

মা-বাপ সুজয়ারও নেই। মাসীই মানুষ করে বিয়ে দিয়েছিল। তাকেই দেখতে গিয়েছিল ওরা দুজন বনতুলসীপুরে। সুনীতা আর সনৎ, ছেলেমেয়ে দুটোকে বাড়িতেই রেখে যেতে হয়েছিল। সেই ভোরে বেরিয়েছিল। এখন সন্ধ্যে নাগাত বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে ওরা।

স্টেশনের প্লাটফর্মে ভিড় আর ভিড়। মানুষ আর মানুষ। যাত্রী। উদ্বাস্তু। নোংরা জল কাদা শালপাতার ঠোঙা। শোয়া-বসা অস্থায়ী সংসারপাতা মানুষ। ভিখিরি, কুকুর গরু কুলীর দল...... সব মিলিয়ে স্টেশনের চারপাশটাকে যেন নরক বানিয়ে রেখেছে। কী কদর্য পরিবেশ !

যাবার সময় ট্রেন ধরার ব্যস্ততায় এতটা কুৎসিত দৃশ্য নজরে পড়েনি। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে ধীরে ধীরে প্লাটফর্ম পার হবার সময় সবকিছুই চোখে পড়ল দুজনের। যেতে যেতেই দেখতে পেল কয়েকজন মানুষ ঘেরা প্লাটফরমের এককোণে পড়েথাকা চাদর ঢাকা দেওয়া একটা মানুষের দেহ। সেদিকে না তাকিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে আসছিল ওরা, কিন্তু তবু কানে গেল মিশ্রিত কথাবার্তার টুকরো।

'হ্যাঁ, তবে মরেনি, বলতে পারেন বেঁচে গেল।'

'যা বলেছেন। কদিন যা কষ্ট পাচ্ছিল। চোখে দেখা যায় না। কে দেখে কে শোনে? কেই বা একটু মুখে জল দেয়?'

'এতবার অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করা হল, হাসপাতালে পাঠাবার জন্যে কিন্তু......'

'হাসপাতাল! অ্যাম্বুলেন্স! হাসালেন মশাই। ওসব আমাদের মত ইস্টিশানে পড়ে-থাকা ভিখিরি গরীব দুঃখীদের জন্যে নয়।'

আবার কে একজন যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'আঃ! ধীরেনবাবু মারা গেলেন?'

'কপাল মশাই কপাল। কখন যে কে কীভাবে কোথায় মরবে, ভগবানই জানেন। ছেলেটা গাড়ি চাপা পড়ে মরল এই তো কদিন আগে......

কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল। শেষের কথাকটা কানে আসতেই এক ভয়ঙ্কর সন্দেহে, আশঙ্কায় পেছন ফিরে উল্টোমুখো হাঁটতে সুরু করল নীরেন।

সুজয়া ওর হাত চেপে ধরল। 'কোথায় যাচ্ছ?'

কথা বলল না। শুধু দুর্বোধ্য আতঙ্কময় দৃষ্টিতে চাদর মুড়ি দেয়া শায়িত দেহটা দেখিয়ে দিল নীরেন সুজয়াকে।

ওদের দুজনকে দেখে লোকজনের ভিড় সরে গেল। নীরেন স্থির চোখে চাদর ঢাকা দেহটার দিকে তাকিয়েছিল। তার মুখের চেহারা দেখে সুজয়াই প্রশ্ন করল, 'কে মারা গেছেন?'

পাশে বসে থাকা বয়স্ক লোকটি জবাব দিল, 'ধীরেনবাবু বলে একজন লোক। অনেকদিন স্টেশনে পড়ে ছিলেন, ভুগছিলেন...'

'কোথা থেকে এসেছিলেন?' সুজয়ার গলা কাঁপছিল। 'পাকিস্থান থেকে? উদ্বাস্তু?'

'না—না, পাকিস্তান থেকে আসবে কেন? হিন্দুস্থানেরই লোক। কমলপুরে খুব বান হয়েছিল, কাগজে পড়েননি? বানের জলে ঘরদোর ভেসে যাওয়াতে...'

ওদের দুজনেরই মনে পড়ল কমলপুরে ধীরেনের শ্বশুরবাড়ি। সেখানে থাকবার মধ্যে বিশেষ কেউ নেইও। সাতজন্মে কেতও না ওরা কেউ ওখানে। তবে কি শেষ পর্যন্ত ওখানেই আশ্রয় নিয়েছিল ওরা?

সুজয়ার পা-দুটো অসাড় বরফ-ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। পাথর-চোখে তাকিয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকা স্বামীর দিকে ও শুকনো গলায় কোনমতে প্রশ্ন করল, 'ওঁর সঙ্গে আর কেউ ছিল না?'

'ছিল বইকি মা। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। খিদের জ্বালায়, কুসঙ্গে মিশে পকেট কেটেছিল। ধরা পড়ে দৌড়ে পালাতে গিয়ে বাস চাপা পড়ে মারা গেছে এই কদিন আগে। বেশ দেখতে ছিল ছেলেটা—বছর-বারো বয়স হবে, শংকর নাম —ধীরেনবাবুর ওই একটাই ছেলে।'

নীরেনের পাথর হয়ে যাওয়া শরীরটার আপাদমস্তক থরথর করে কেঁপে উঠল। ক্ষিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে কে চুরি করতে গিয়েছিল? ধরা পড়ে দৌড়ে পালাতে গিয়ে কে বাস চাপা পড়েছে? ধীরেনের ছেলে শংকর? না নীরেনের ছেলে সনৎ?

আর একজন বলে উঠল, 'শুধু ছেলে কেন? একটা মেয়েও ছিল তো ধীরেনবাবুর। বছর সতেরো-আঠারো বয়সের। মেয়েটা দেখতেও বেশ ভালই ছিল। সন্ধ্যের পর তাকেও বেরুতে দেখতাম কতকগুলো বদ লোকের সঙ্গে। তাকেও তো বেশ কিছুদিন হল দেখতে পাই না। বোধহয় উধাও হয়ে গেছে কারু সঙ্গে। তা বাপু তার আর দোষ কি? সোমত্ত মেয়ে, অল্পবয়স, এই ইস্টিশানের খোলামেলা জায়গায় এভাবে একটা বুড়ো অথর্ব বাপের সঙ্গে...

নীরেনের পায়ের তলায় মাটি কাঁপছিল। নীরেনের চোখের সামনে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবার, সবকিছু তলিয়ে দেবার উত্তরঙ্গ সমুদ্র উত্তাল হয়ে এগিয়ে আসছিল বুঝি তাকে গ্রাস করবার জন্যেই...নীরেনের সমস্ত পৃথিবীটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ওলোট-পালট খাচ্ছিল। দুলছিল—কাঁপছিল।

'...মেয়েটার নাম ছিল টুনু...'

হঠাৎ কে যেন একখানা তীক্ষ্ণধার ছুরি নীরেনের বুকের মধ্যে বিঁধিয়ে দিল।

না-না-না—টুনু নয়, টুনু নয় সুনু। সুনুর কথাই বলছে লোকটা। নীরেনের বড় আদরের দুলালী সুনীতা। সুজয়ার নয়নের মণি সুনীতা। ওদের একমাত্র মেয়ে সুনীতা।

অন্ধকার ভবিষ্যতের একখানা কালী ঢালা ছবি নীরেনের চোখদুটো অন্ধ করে দিল।

লক-আউট। এ শহর থেকে কারখানা উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উঠে গেছে অফিস। চাকরি নেই...না খেতে পেয়ে সনৎ চুরি করতে বেরিয়েছে—আর সুনু? সুনু টুনু হয়ে যাচ্ছে। নীরেন আর সুজয়ার অক্ষম বোবা দু-জোড়া চোখের সামনে—

'দেখুন মা, যদি চিনতে পারেন—'

নীরেন আর সুজয়াকে বিন্দুমাত্র প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়ে একটা লোক মৃতদেহের মুখের ঢাকা চাদরখানা এক টানে সরিয়ে দিল।

পাথরে চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত করে নীরেন মৃতের মুখের দিকে তাকাল।

কিন্তু কী আশ্চর্য।

এতক্ষণ ধরে লোকগুলো ওকে এত ভুল বোঝাচ্ছিল কেন? এতো তার বড়দা নয়। এ তো তার সেই ধীরেনদা নয়! এ তো সে নিজেই। যার নাম নীরেন।

প্লাটফরমের স্পষ্ট উজ্জ্বল আলোয় নীরেন তার নিজের বীভৎস মৃতদেহের, তার নিজের সুতীব্র যন্ত্রণায় আকুঞ্চিত বিবর্ণ মুখের দিকে সম্মোহিত হয়ে তাকিয়ে বজ্রাহতের মত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

জলসা

সঙ্গীত সম্মেলনী প্রযোজিত 'শাপমোচন'

আঁখিরে ভুল ভাঙবে যখন

অন্তরে ভুল ভাঙবে কি?—

'রাজার মনে সন্দেহ ছিল, তাই ঊষার প্রথম কোকিলের ডাক, সূর্যোদয় মুহূর্তে রাণীকে দেখা দিতে, ছিল তাঁর দ্বিধা? কারণ, অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান'—এ অনুভবের জাগরণ অন্তরে না ঘটলে ত সুন্দরের যথার্থ প্রকাশকে প্রত্যক্ষ করা যায় না—।

কবিগুরুর 'শাপমোচনে'-র এই স্বন্দ্বকে নৃত্যে ও গানের লীলায়িত মাধুর্যে দর্শক-চিত্তে পৌঁছে দেবার গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছেন—সঙ্গীত-সম্মেলনের সভ্যবৃন্দ রবীন্দ্রসদনে মঞ্চস্থ—তাঁদের 'শাপমোচন'—নৃত্যনাট্য।

গানে গানে সব বন্ধন টুটিয়ে দিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। বহুদিন বাদে হেমন্তকে শুনলাম রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে। মুক্তকণ্ঠে এবং তৃপ্ত মনে বলব—মনে রাখবার মতন গানই তিনি গেয়েছেন, একটি নয় একাধিক।

প্রথম দিকে 'জাগরণে যায় বিভাবরী'-র ঘুমহারা একাকীত্বের পর 'কথন দিল পরায়ে'-তে আত্মবিস্মৃত বিরহীচিত্তের সুপ্ত চাওয়াই যেন ব্যাকুল হয়ে উঠল—উদাস ছন্দের সীমাহীন ব্যঞ্জনায়—স্বপ্নে পাওয়া সুখস্মৃতির অশ্রু-উচ্ছল বেদনা গুঞ্জরিত হয়ে উঠল হেমন্তবাবুর অনাড়ম্বর গায়কীর ভাবগভীর নিবেদনে। 'সেদিন দুজনে', 'কোথা বাইরে দূরে'—'আনমনে' প্রতিটি গানেই কবির অন্তরের আর্তরাগিনীকে ত শুনেছি আর শুনেছি হেমন্তর নিষ্ঠাভরা মিনতি, যা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরশুদ্ধতা অক্ষুন্ন রেখেও আপন বক্তব্যকে পেশ করতে জানে।

আর কণিকা?—রবীন্দ্রকাব্য, সঙ্গীত-নাটকের মধ্যে বিরহের যে অকূল পাথার উচ্ছলিত 'সেই হেরি অহরহ তোমারি বিরহ'র নিবিড় আকুতিরই নানারঙ রূপ তাঁর এক একটি গান 'অন্ধকারের বুকে রেখে যাওয়া বিহ্বলতা' 'আমি এলেম তোমার দ্বারে'—আবার চাঁদের আলোয় ধরণী প্লাবিত রাতের বিরহ-স্তব্ধতায় চমকে উঠে দেখা পথের কাছে তারই মালা পড়ে চাঁদ না-ওঠা রাতে যে অজানার অনুভব প্রাণের তারে বেজে উঠেছিল—গানেরই সুরে। সবই যেন সুন্দরের অশ্রু-ভরা বেদনার রূপকে শিল্পীর সংবেদনশীল অন্তরের দাক্ষিণ্যে মধুর করে তুলেছে। [illegible]

অন্তরঙ্গ ইন্দ্রধনুর মতই বিষাদরঞ্জিত আলো ছড়িয়ে দিল 'বড় বিস্ময় লাগে'-র বিস্ময়-দোলে। করুণ আবেগ, হৃদয়ভরা অনুরাগ, ছিল রবীন্দ্র-গীতিতে—তাতে লাগল শিল্পীর বিহ্বল অন্তরের ছোঁয়া—তাই ত 'ঐ মুখ ঐ হাসি কেন এত ভালবাসি' শুনে বারবারই মনে হয়েছে সমুদ্রের যদি অমনই অনন্ত তরঙ্গ না রৈল তবে আর তাকে সাগর নামে অভিহিত করা কেন?

নাচের প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে অরুণেশ্বররূপী কুনাল দত্তের কথা। এর আগে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য দেখতে যেয়ে বারবার মনে হয়েছে এতে সুদর্শনা এবং নৃত্য-কুশলা নায়িকার অভাব নেই—কিন্তু ঐ দুটি চাহিদার দাবী মেটাতে পারার মত পুরুষ শিল্পীর একান্ত অভাব। কুনাল দত্তকে দেখে মনে হোলো এ অভাব তিনি অনেকখানিই পূর্ণ করতে পারবেন। নৃত্য-লালিত্য, অনুভব, দেহলাবণ্য ইত্যাদি নৃত্য-শিল্পীর উপযুক্ত সকল বস্তুই এঁর আছে, আর আছে প্রতিভা। উপযুক্ত পরিচালকের হাতে পড়লে ইনি রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক হয়ে উঠতে পারবেন—একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

অরুণেশ্বরের বীণা ভাষা, ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যের সেতারে অপরূপ সুরে বেজেছে কেদারার আহ্বানে। বেহাগের কোমলতায় বেদনায় ও পরজের কমনীয় মীড়।

কমলিকার ভূমিকায় শ্যামলী গাঙ্গুলী সত্যিই কমলিকা হয়ে উঠতে পেরেছেন—শুধু নৃত্যে নয় ভাবেও। তবে সজ্জায় কিছু নিলাজতা দৃষ্টিকে পীড়া দিয়েছে। রাজার সহচরবৃন্দের নৃত্যাভিনয়ের দৈন্য এবং রাণীর শিশু সহচরীদের স্বাভাবিক অ-পরিণত—নৃত্য সামগ্রিক সাফল্যকে ব্যাহত করেছে। অবশ্য এ ত্রুটি অনেকাংশেই পূর্ণ করেছেন আলোকসম্পাতে আশুতোষ বড়ুয়া। সঙ্গীত ও নৃত্য পরিচালনায় প্রসূনভূষণ মিনতি গুহ ও কুনাল দত্ত।

বেগম আখ্‌তারের কণ্ঠে বাংলা গজল

ঠুমরী গজল ও দাদ্‌রার রাজ্যের মহিষী-স্বরূপা বেগম আখ্‌তার আজও স্ব-মর্যাদায় এবং সগৌরবেই আপন রঙ্গ-বেদীতে সমাসীন—'দেওয়ানা বানানা যা'র শিল্পীর প্রকাশবৈভব, সুরোজ্জ্বল চিত্তের প্রসন্নতা এবং প্রতিটি সপ্তকে কণ্ঠের অনায়াসছন্দী বিহার আজও দর্শকচিত্ত দুলিয়ে দেয়—ঠিক তেমনই করে যেমন করে দিত তাঁর যৌবনের 'কোয়েলিয়া মত কুকোরি যা'—এবং আরো অনেক জনপ্রিয় [illegible]

আখ্‌তার'-ই একাধিপত্য করছেন রসিক-চিত্তে।

এই কথাটিই নতুন করে অনুভব করলাম সেদিন গ্রামোফোন কোম্পানীর স্টুডিওতে। যখন এবারের পুজোর জন্য বেগম্ আখ্‌তারের কণ্ঠের দুটি বাংলা ঠুংরী ও দাদ্‌রা রেকর্ড করা হচ্ছিল। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের আহ্বানে ফৈজাবাদী আখ্‌তারী বাঈ-এর কণ্ঠে বাংলা গান শুনতে যাবার আগে মনে সন্দেহ ছিল না তা নয়। বেগম আখ্‌তারের মুখে বাংলা গান সে কেমন হবে? বাংলা গানে কথার একটি বিশেষ ভারই শুধু নেই, ধারও আছে এবং এ সম্বন্ধে শিল্পীরও একটা দায়িত্ব নিশ্চয় আছে। সে দায়িত্ব এই অবাঙালিনী শিল্পী কতখানি পালন করতে পারবেন—অথবা আদৌ পারবেন কিনা—শুধু শুধু বয়স্কা শিল্পীকে দিয়ে বাংলা ঠুংরী গাওয়ানোর স্টান্ট দিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানী তার সুনামের অমর্যাদা করছেন না ত? এইরকম হাজারটা প্রশ্ন মনে জেগেছিল।

কিন্তু রবি গুহমজুমদার রচিত দুটি গানের প্রথমটি 'এ মৌসুমে পরদেশী'—ধরবার সঙ্গে সঙ্গেই সকল দ্বিধা ও সংশয়কে ভাসিয়ে দিয়ে পরদেশী-র বিচ্ছেদ কাতর চিত্তের আর্তি—যেন কথা বলে উঠল,—তাঁর গুমরে ওঠা বেদনা [illegible] দিল চিত্ত-দ্বারে।

ছোট্ট মীড়ের চকিত দ্যুতিতে—কখনও জমজমার ঘনিয়ে-ওঠা মধুরতায়, গানের মর্মলীন বেদনা আকাশের পুঞ্জীভূত মেঘের ওপর বিদ্যুৎলতায় মতই ঝলকে উঠল। কণ্ঠস্বরের ওঠাপড়ায় কি অনুভবের উচ্ছল কল্লোল শোনা গেল? ভাঙ্গা গলা যেন প্রতি সুরের বাঁকে ঝর্ণার উচ্ছল জলকণাকে মনে করিয়ে দেয়।

তার পরের 'দাদ্‌রা'—'জোছনা করেছে আড়ি'তে ছন্দের বিলোল গতিতে বিলম্বিত লয়ের কি অপূর্ব সংযম।—বন্ধন ছেড়ে মুক্ত হতে হচ্ছে বলেই বুঝি নূপুরনিক্কণের আভাস এত রমণীয়? চাচর ছন্দের কি কৌতুকী দোলা—প্রতি স্তবকের যতিতে। উদ্দাম মুহূর্তের উচ্ছ্বাস অনন্তের বুকে আছড়ে পড়ছে, জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্রের বালুবেলা হেসে উঠছে—আর দাদরা গজলের বুলবুলি গেয়ে চলেছেন 'জোছনা করেছো আড়ি'—এই আড়ি-ভাবের রহস্য-লীলাকে ব্যঞ্জনাগভীর করেছে মহম্মদ সগীরুদ্দিন ও ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁন। গ্রামোফোন কোম্পানীর এ মহৎ প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারা যায়?

—[illegible]

রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী পরিচালিত রামকৃষ্ণ পিকচার্সের 'অন্য মাটি অন্য রঙ' ছবিতে শিবানী বসু ও অনুপকুমার।

প্রেক্ষাগৃহ

আমেরিকার যুব চলচ্চিত্রোৎসব এবং তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনাচক্র

১৫ তারিখটি বাদে ৬ থেকে ১৭ আগস্ট—এগারো দিন ধরে একই প্রোগ্রাম দিনে (সকালে, বিকেলে ও সন্ধ্যায়) তিনবার করে দেখিয়ে আমেরিকার যুবকদের নির্মিত প্রায় শতেক চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল কেশব সেন স্ট্রীটস্থ আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেণ্টারে। প্রতিদিন প্রায় দেড়ঘণ্টা থেকে একঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট-ব্যাপী এই প্রদর্শনীতে সবচেয়ে কম দু'খানি থেকে চোদ্দখানি পর্যন্ত ছবি দেখানো হয়েছে প্রদর্শনীর মাঝে মিনিট কয়েকবারে বিরাম দিয়ে। কর্তৃপক্ষ শুরুতেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, আমেরিকাস্থ ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন এজেন্সী প্রায় পাঁচশো ছবি থেকে বেছে এই শতখানেক ছবি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শনের জন্যে পাঠালেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে আগে থাকতে ছবিগুলির প্রদর্শন-যোগ্যতা সম্পর্কে বিচার করবার সুযোগ হয়নি যথেষ্ট সময় থাকতে ফিল্মগুলি তাঁদের হাতে না আসার দরুণ। তাঁরা আরও জানিয়েছিলেন, ছবিগুলির মধ্যে প্রায় ষাটখানি কলেজ বা ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের তৈরী, কুড়িখানি হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রী দ্বারা নির্মিত এবং বাকী কুড়িখানা হয় তের বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েরা, আর নয়তো শিক্ষক-ছাত্র-পেশাদারদের সহযোগিতায় তৈরী হয়েছে। এবং সবশেষে এও জানানো হয়েছিল ছবিগুলিকে প্রধানত নাট্যধর্মী, তথ্যমূলক, অঙ্কতচিত্রের সজীবীকরণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক—এই চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

এগারোদিনব্যাপী এই চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর সবকটি দিনই উপস্থিত হবার মতো সময় ও সুযোগ আমাদের হাতে ছিল না। আমরা মাত্র চার কি পাঁচদিন আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেণ্টারে উপস্থিত হয়ে কিছু ছবি—গোটা সাতচল্লিশ—দেখতে পেয়েছি। এদের মধ্যে কিছু অ্যাবস্ট্র্যাক্ট, কিছু ফ্যাণ্টাসী আবার কিছুবা কাহিনী এবং আরও কিছু ব্যঙ্গাত্মক। বহু ছবিতে প্রচুর 'অপটিক্যাল'-এর ব্যবহার দেখে বিস্মিত হলুম; কারণ আমাদের সুদক্ষ কলা-কুশলীরাই 'অপটিক্যাল'-এর উপযুক্ত ব্যবহার জানেন।

ছবিগুলির মধ্যে 'ওয়াড অ্যাণ্ড দি ওয়ার্ম', 'ইনসিডেণ্ট ইন এ গ্লাস ব্লোয়ার্স শপ', 'স্যাণ্ড কাসলস', 'দি থীফ', 'লুম ইন এসেন্স' 'ক্রিয়েটিভ প্রোজেকসন', 'এয়ার বোর্ন', '৭৩৬২', 'ওমেগা', 'ইটস্ অ্যাবাউট দিস কার্পেণ্টার' প্রভৃতি ছবি আমাদের মনে রেখাপাত করতে পেরেছে। আবার অনেক ছবির বক্তব্য মাত্র ছবি দেখে অনুধাবন করতে পারিনি। মনে হয়, সেগুলি ছবির জন্যই ছবি, তাদের বিশেষ কোনো বক্তব্য নেই।

—কিন্তু এই চলচ্চিত্র প্রদর্শনী দেখে মোটের উপর যে-কথাটা আমাদের মনে উদয় হয়েছে, তা হচ্ছে এই : আমেরিকা হচ্ছে প্রাচুর্যের দেশ। তাই চলচ্চিত্র তৈরী নিয়ে খেলা করা সে-দেশের ছেলেমেয়েদের পক্ষে সম্ভব। শুনলে আশ্চর্য হব না, সেখানকার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ছেলে-মেয়েরই পকেটে থাকে একটি করে ৮ মিঃ মিঃ ক্যামেরা। এবং তাদের মা-বাপ তাদের চলচ্চিত্র তৈরীতে উৎসাহ দেবার জন্য বেকসুর খরচ করতে পারেন। কাজেই ছবি তৈরীর খেলা করতে করতে তাদের পক্ষে দু'পাঁচটা দেখাবার মতো ছবি তৈরী করে ফেলা এমন কিছু আশ্চর্যের বা বাহাদুরীর ব্যাপার নয়। কিন্তু আমাদের দেশের ছেলে-মেয়ের কাছে ব্যাপারটা অলীক স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। টাকার অভাবে আমাদের কলেজ বা ইউনিভার্সিটিগুলো ফিজিক্স, কেমিস্ট্রির জন্যে অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা উপকরণ কিনতে পায় না, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় নাটকে এম-এতে 'ফিল্ম কোর্স' সম্বন্ধে প্রস্তাব নিয়েও তাকে কার্যকরী করতে পায় না, আমাদের দেশে ফিল্ম ফিল্ম খেলা অত্যন্ত বড়োমানুষী চিন্তা।

এই যুব চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর শেষে যে আলোচনা-চক্র বসেছিল তাতে শ্রীসত্যদেব দুবের ভাষণ এ-বিষয়ে যথেষ্ট সোচ্চার হয়েছিল। 'সমালোচক ও সত্যদ্রষ্টা (ভিসানারি) রূপে নবীন চলচ্চিত্রকার'-প্রসঙ্গে আমেরিকা থেকে আগত, 'আমেরিকান আণ্ডারগ্রাউণ্ড ফিল্ম'-গ্রন্থের লেখক, চলচ্চিত্র-সমালোচক ও পরিচালক শেল্ডন রেনান এদেশে ফিল্ম তৈরীর সহজ পথ বাংলাবার জন্যে যে-দশটি নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের কথা মনে রেখেই বলছি, তিনি ব্যাপারটাকে যতখানি সহজসাধ্য ভেবেছেন, আসলে তা তার থেকে অনেক, অনেক কঠিন। এ-দেশের সরকারের ধারাকরণ যদি তিনি জানতেন, তা হলে তিনি এতখানি আশাবাদী হতে দ্বিধা করতেন।

চিত্র-সমালোচনা

বিগত যুগের কাহিনী

কস্তুরী ফিল্মস-এর প্রথম নিবেদন, আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে গঠিত, মুকুল মজুমদার প্রযোজিত এবং দীনেন গুপ্ত পরিচালিত 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ছবিটি এমনই এক ফেলে-আসা যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে-যুগে আমাদের সমাজে বিবাহে গৌরীদান প্রথা প্রচলিত ছিল, যানবাহন হিসেবে গরুর গাড়ী ও নৌকাই ব্যবহৃত হত এবং চিকিৎসার জন্য লোকে কবিরাজমশাইয়ের শরণ নিত। এমনই এক যুগে জন্মগ্রহণ করে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত কবিরাজ রামকালী চাটুজ্জের মেয়ে সত্যবতী কি জানি কেমন করে সত্যপথের সন্ধান পেয়েছিল। সে জেনেছিল, পুরুষের তৈরী আইনই মেয়েদের চিরকাল অশিক্ষিত রেখে তাদের স্বাধীন চিন্তা ও কর্মপ্রবৃত্তি থেকে দূরে রাখতে চেয়েছে, তাদের পঙ্গু করে রাখতে চেয়েছে নিজেরই স্বার্থে। তাই স্নেহপরায়ণ বাপের আদুরে মেয়ে সত্যবতী

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীবৃন্দ অভিনীত 'উল্কা' নাটকের একটি মুহূর্তে নিশীথ বড়াল, ইরা মিত্র গোপাল মুখোপাধ্যায়, প্রবীর সেন ও শিপ্রা চক্রবর্তী।

পথে প্রান্তরে প্রকৃতির কোলে ঘুরে বেড়িয়েও লেখাপড়া শেখাকে প্রয়োজন মনে করেছে এবং সকলের অজ্ঞাতেই তা শিখতেও শুরু করেছে। ও লিখতে পড়তে শিখেছে শুনে ওর বাপ অবাক হয়ে গেছেন, কিন্তু ওর যুক্তির কাছে হার মেনে স্বীকার করেছেন, ও কিছু অন্যায় করছে না এবং তাই ওকে লেখাপড়া শিখতে সাহায্য করেছেন। সহজ বুদ্ধি দিয়ে ও যেমন গ্রামের জটাদা'র পিছনে লাগতে ছাড়েনি স্ত্রীকে লাথি মারার অপরাধে, তেমনই পরের মেয়েকে লগ্নভ্রষ্ট হওয়ার সর্বনাশ থেকে বাঁচাবার জন্যে ওর বাবা যখন ওর সদ্যবিবাহিত মেজদাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ছাঁদনাতলায় দাঁড় করিয়েছিলেন, তখনও ও মেজদার প্রথমা স্ত্রীর জন্যে ব্যথিত বোধ না করে পারেনি। এই সহজ বুদ্ধিই ওকে শিখিয়েছিল, বাল্যকালে বিবাহিত হওয়ার দরুণ ওকে শ্বশুরবাড়ীতে যখন ওকে একদিন যেতেই হবে, তখন ওখান থেকে যখন ওকে নিয়ে যাবার জন্যে লোক এসেছে, তখন মিথ্যে তিক্ততার সৃষ্টি না করে ওর সেখানে স-মানে যাওয়াই ভালো এবং শাশুড়ী যতই ওর প্রতি দুর্ব্যবহার করতে চান না কেন, ওকে কিছুটা সহ্য করে ও কিছুটা যুদ্ধ করে সেখানে নিজের জায়গা করে নিতেই হবে—ও জানে, ঘটি বাটি একসঙ্গে থাকলেই কিছু-না-কিছু ঠোকাঠুকি হবেই। ওর স্বাভাবিক সৎ মনের মধ্যে আপনা থেকেই একটা আদর্শ গড়ে উঠেছিল, যে-আদর্শ ওর শ্বশুরের অমিতাচারের বিরুদ্ধে ওকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল এবং শেষ পর্যন্ত ওকে ওর শ্বশুরগৃহে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত [illegible]

তেজোদৃপ্ত রূপ ওর ব্যক্তিত্বহীন স্বামীর মধ্যে পৌরুষ জাগিয়ে তুলে তাকে ওর যোগ্য স্বামী করে তুলল।

ছবির সংক্ষিপ্ত কাহিনী থেকে এটুকু বুঝতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হচ্ছে না যে, সত্যবতীই হচ্ছে এর মূল চরিত্র এবং এরই মানসিকতার ক্রমবিকাশ ও প্রতিষ্ঠা হচ্ছে ছবির মূল বক্তব্য। কিন্তু অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচিত চিত্রনাট্যের প্রথমার্ধে এই সত্যবতী চরিত্রটিকে সব সময়ে কেন্দ্রস্থলে রাখতে পারেননি; ফলে কোনো সময়ে মনে হয়েছে এ-কাহিনীর নায়ক হয়ত রামকালী চাটুজ্জে, আবার কখনও মনে হয়েছে ওর মেজ ছেলে ও তার নববিবাহিতা স্ত্রীই (সমিত ভঞ্জ ও হাঁসু বন্দ্যোপাধ্যায়) বুঝি কাহিনীর দুই প্রধান চরিত্র। গল্পের ভারসাম্য এইভাবে পরিবর্তিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছবি অতিক্রান্ত হবার পরে সত্যবতীতে এসে থেমেছে। ফলে ছবির প্রথম দিকটা কিছু কিছু ছাড়া ছাড়া লেগেছে—যাকে বলে সুসংবদ্ধতার অভাব, তাই ঘটেছে পুনঃপুনঃ। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে, যখন সত্যবতীর প্রতি সকল দর্শকের চক্ষু নিবিষ্ট হতে পেরেছে, তখন স্বভাবতই একটি নিরবচ্ছিন্ন গতি লক্ষ্য করা গেছে চিত্রনাট্য তথা ছবিটিতে। নারীকে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার প্রথম প্রতিশ্রুতি যে সত্যবতীর কাছ থেকেই এসেছে, তা ছবির দ্বিতীয়াংশেই হয়েছে দৃঢ়ভাবে পরিস্ফুট।

নায়িকা সত্যবতীর ভূমিকায় নবাগতা সোনালী গুপ্ত ক্ষীণাঙ্গী কিশোরী রূপে অভিনয়ের মধ্যে এমন একটি প্রাণের স্পর্শ দিতে পেরেছেন, যার মাধুর্য ছবিটির সর্বত্র [illegible]

তিনি ভূমিকাটিতে ব্যক্তিত্ব আরোপেরও প্রয়াস পেয়েছেন এবং তাতে সফলও হয়েছেন। রামকালীর ভূমিকায় বসন্ত চৌধুরী একটি স্মরণীয় চরিত্রসৃষ্টি করেছেন। শাশুড়ী এলোকেশী বেশে গীতা দে একটু বেশী সোচ্চার। অপরাপর ভূমিকায় হাঁসু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, পার্থ মুখোপাধ্যায়, সমিত ভঞ্জ, কাজল গুপ্ত মলিনা দেবী, পদ্মা দেবী, অনুভা ঘোষ চিন্ময় রায় প্রভৃতির অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। বহু জায়গায় ফোটোগ্রাফী বেশ কাব্যধর্মী, আবার কোনো কোনো জায়গায় নাট্যক্রিয়ার অনুসারী। সম্পাদক ছবির প্রথম অংশকে আরও কিছুটা

অরিন্দম/সন্ধ্যারাণী ও সাবিত্রী চ্যাটার্জি

সুসংবদ্ধ করবার প্রয়াস পেতে পারতেন। ছবির আবহ-সঙ্গীত পরিস্থিতি রচনায় সাহায্য করেছে। গান দুখানির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিলেও আশানুরূপ ব্যঞ্জনাসৃষ্টিকারী হয়ে ওঠেনি।

কস্তুরী ফিল্মস নিবেদিত, পিয়ালী ফিল্মস পরিবেশিত ও দীনেন গুপ্ত পরিচালিত 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' একটি তাজা উপভোগ্যতার প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই বহন করে।

একটি নব্য ভাবনার ছবি

মহারাষ্ট্র রাজ্যে একটি বিশেষ ধরনের প্রথা চালু আছে। হাতে কিছুটা সময় থাকলেই শিক্ষিত যুবকেরা কোনো একটি রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে একটি নকল বিচারালয় খুলে বসেন; একজন দোষী সাজেন, একজন বিচারক, একজন অভিযোগী ব্যবহারজীবী, একজন আসামীপক্ষের ব্যবহারজীবী এবং বাকী ক'জন সাক্ষী। পথ-চলতি দর্শকও জুটে যায় অনেক। বেশ ঘণ্টা কয়েক কেটে যায় শিক্ষার সঙ্গে আমোদের মধ্যে। এই প্রথাকে অবলম্বন করে অনেক নাটকও গড়ে উঠেছে মারাঠী ভাষায়। বিজয় টেণ্ডুলকর প্রণীত 'শান্ততা কোর্ট চালু আহে' (সাইলেন্স, দি কোর্ট ইজ্ ইন সেসন) হচ্ছে এই শ্রেণীর একটি বিখ্যাত নাটক; এই নাটকটি জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। এই নাটকে সাতজন পুরস্কার লাভ করেছে। এই নাটকে সাতজন সমাজ সেবক আমেরিকার ক্রমাগত পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের জন্যে ঐ দেশের প্রেসিডেণ্ট নিকসনকে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে বিচারের সম্মুখীন করে। কিন্তু ঐ একই বিচার করে করে ক্লান্ত হয়ে ওরা এবার সাব্যস্ত করল ওদেরই দলভুক্ত ভূতপূর্ব শিক্ষিকা লীলা বেনারেকে ওরা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে ভ্রূণ হত্যার অপরাধে। শ্রীমতী বেনারে তর্ক করতে ভালোবাসেন প্রতি বিষয় নিয়ে ঠাট্টাতে মেতে ওঠেন; শ্রদ্ধা তাঁর কোনো কিছুরই ওপর নেই যেন। বেশ খেলাচ্ছলেই বিচার শুরু হল। মাঝে মাঝেই কেউ-না-কেউ অন্য কথা বলে পার্শ্ববর্তীকে; বিচারের কাজ বাধা পায়। বিচারকরূপে সর্বাত্মক সমাজজ্ঞানী কাশীকর বলে ওঠেন : 'চুপ, চুপ, এখন বিচার চলছে।' সাক্ষীর কাঠগড়ায় তখন দাঁড়িয়ে রোক্‌ড়ে বেচারা কেঁপে সারা হচ্ছে। লোকটি কাশীকর ও তাঁর নিঃসন্তান পত্নীর আশ্রিত, খানিকটা নেলাখেপা ধরনের। শ্রীমতী বেনারে তাকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করে উত্যক্ত করে তুলেছেন। রোক্‌ড়ে হঠাৎ খেপে গিয়ে বলে ফেলল, সে শ্রীমতী বেনারেকে একদিন রাত্রিবেলা প্রোফেসর দামলের ঘরে একা থাকতে দেখেছে। প্রোঃ দামলেও ঐ দলেরই একজন; আজ তিনি কোনো অজ্ঞাত কারণে অনুপস্থিত এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে রঘু সামন্ত নামে একটি স্থানীয় লোককে। রোক্‌ড়ে এই কথাটি বলা মাত্র বিচারশালার আবহাওয়া মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে গেল। সকলের চোখ চকচক্ করে উঠল, জিব থেকে লালা ঝরতে লাগল, নাকের ডগা ফুলতে লাগল রক্তের স্বাদ পেয়ে। তখন সেনারে হয়ে পড়ল বেচারা। বেচারার ব্যক্তিগত জীবনের গোপনতম অধ্যায়গুলি নিয়ে ওরা যাচ্ছেতাই শুরু করে দিল। ও নাকি ওর পনেরো বছর বয়েসে ওর এক মামাকে ভালোবেসেছিল এবং তাতে ব্যর্থকাম হয়ে ও নাকি আত্মহত্যাও করতে গিয়েছিল। অধ্যাপক দামলের সঙ্গে অবৈধ সংসর্গের ফলে ও সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ায় ও নাকি রোক্‌ড়ে ও পোংকসে (দলের আর একজন)—এই দুজনেরই কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছিল। এবং মাত্র ঐদিনই নাকি ওর স্কুলের চাকরীটি গেছে চরিত্রহীনতার অভিযোগে। নিজের জীবন সম্বন্ধে বীতস্পৃহ হয়েই নাকি ও সব সময়েই এক শিশি বিষ সঙ্গে নিয়ে বেড়ায়। বেচারা শ্রীমতী বেনারেকে মাত্র দশ সেকেণ্ড সময় দেওয়া হল আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে। কিন্তু সবই যে সত্যি! কোন্ কথাটা ওদের খণ্ডন করবে ও? যে-বয়সে ও নিজের মামাকে ভালোবেসেছিল, তখনও সত্যিই জানত না ওর মধ্যে কিছু পাপ আছে। যখন ও তা জেনেছিল, তখনই ও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল এবং তাও নাকি অন্যায়। হ্যাঁ, প্রোঃ দামলেকে ও ভালোবেসেছিল; তাঁর মনের উদারতা ও সৌন্দর্য দ্বারা ও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তিনিও তো মানুষ। দেখা গেল, তিনি ওর দেহটাকেই চান। তাই ও ওর দেহটাকে ঘৃণা করে। ঐ দেহই ওর চারিত্রিক পতন ঘটিয়েছে। কিন্তু তাই কি সত্যি? ঐ দেহ দিয়েই ও কি একটি মুহূর্তের জন্যেও স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করেনি, যার ফল ও নিজের মধ্যে বহন করছে? কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন ওর যাই হোক না কেন, স্কুল-শিক্ষিকা হিসেবে ও কি অপরাধ করেছে? মেয়েদের ও কি আনন্দময় জীবনযাপন করতে সাহায্য করেনি? পৃথিবীর মহৎ ও সুন্দর জিনিসগুলি দেখতে ও কি ওর ছাত্রীদের শেখায় নি?—তবে কেন আজ ও যখন স্কুলে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, সেই সময়ে ওকে ছাঁটাইয়ের সংবাদ দেওয়া হল?—এই কাহিনীটিকে মারাঠী ভাষায় চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন নবাধর্মী পরিচালক সত্যদেব দুবে। ছবির আরম্ভ শ্রীমতী লীলা বেনারের কর্মচ্যুতি সংবাদ নিয়ে। তিনি মানসচক্ষে দেখছেন তাঁর ছাত্রীরা আনন্দে যেন নেচে বেড়াচ্ছে; তিনি সাদরে এক-একটি ছাত্রীকে জড়িয়ে ধরছেন। টেলিফোনে বুঝলেন, আত্মপক্ষ সমর্থনের তাঁর কোনো রাস্তাই খোলা নেই। তিনি বেরিয়ে পড়লেন

এবং ঐ সমাজসেবী দলের সঙ্গে ট্রেনযোগে চললেন 'বিচারালয়'-এর খেলা খেলতে কোনো এক মফঃস্বল শহরে। পরে যা ঘটল, তা ওপরেই বলা হয়েছে।

ছাত্রীদের সম্বন্ধে স্লো-মোশানে ভাবনার দৃশ্য একটি নতুন অনুভূতি জাগায় দর্শকদের মধ্যে। পরে বেশ কিছুক্ষণ ছবিটি প্রায় মঞ্চনাটকের ঢঙে তোলা হয়েছে; অভিনয়ও মঞ্চ-নাটকের পদ্ধতি অনুসৃত। কিন্তু যেইমাত্র রোকড়ে খেপে গিয়ে শ্রীমতী বেনারের ওপর যথার্থ দোষারোপ করল, সেই মুহূর্তেই ছবিটি এমন আচম্বিতে বিচিত্র আধুনিক রূপ নিল চিত্রগ্রহণ (শট্ টেকিং-এ), বহির্দৃশ্যে ও আলোর খেলায় এবং জুম্‌লেন্সের সুচতুর প্রয়োগে, আলোকসম্পাতে, সংলাপের বৈশিষ্ট্যে, আবহ-সৃষ্টিকারী যন্ত্রসঙ্গীতের প্রয়োগে এবং সম্পাদনায় যে এমন আধুনিক ছবি ভারতবর্ষের বুকে তৈরী হতে আমরা ক'টা দেখেছি, তা ভাবতে হয়। শ্রীমতী বেনারে ও প্রসিকিউসন কাউন্সিল-এর ভূমিকার শিল্পী দু'জন যে কি আশ্চর্য নাট-নৈপুণ্যের অধিকারী, তা বলে বোঝাবার নয়।

ফিল্ম ফিন্যান্স কর্পোরেশন-এর টাকায় তোলা এই সত্যদেব গোবিন্দ প্রোডাকসন্স নির্মিত ও থিয়েটার ইউনিট নিবেদিত 'নবতরঙ্গ'-এর মারাঠী ছবিটি মহারাষ্ট্র দেশে মুক্তি পাবার পরে যথেষ্ট পরিমাণে জনপ্রিয়তা এবং অর্থলাভ করতে পারবে কিনা, তা আমরা জানি না। কিন্তু দুঃসাহসিক পরিচালক সত্যদেব দুবে যে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে যথার্থই আধুনিকতার যুক্তিবাদী পথে অগ্রসর করে দিয়েছেন 'শান্তাতা কোর্ট চালু আহে' ছবিটির মাধ্যমে, এ-কথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি।

শ্রীদুবে 'টাং ইন চীফ' নামে একটি স্বল্পদীর্ঘ ছবি করেছেন ইংরিজী ভাষায় এক বিজ্ঞাপনের ভাষা-লিখিয়ের উন্মাদনাময় জীবনীকে অবলম্বন করে। বলা বাহুল্য, এই ছবিটির পরিকল্পনা থেকে শুরু করে এর চিত্রগ্রহণের বিভিন্ন বিভাগে তিনি তাঁর যুক্তিবাদী আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাক্ষর রেখেছেন।

স্টুডিও থেকে

মহাপূজার মহালগ্নে 'ত্রিনয়নী মা'

মহাপূজার মহালগ্নে রূপঋষি চিত্রমের নিবেদন 'ত্রিনয়নী মা' শহর ও শহরতলীর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করছে। ভক্তি-রস গাথা দেবী-মাহাত্ম্যের অপরূপ চিত্রটির প্রযোজক হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী। অনিল বাগচী সুরারোপিত ভক্তি-রস-প্রধান গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন মান্না দে, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অলোক বাগচী ও সন্ধ্যা মুখো-

মূকাভিনেতা শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী

পাধ্যায়। চিত্রনাট্য ও সংলাপ, গীত রচনা, চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শ্যামল গুপ্ত, রামানন্দ সেনগুপ্ত ও অমিয় মুখোপাধ্যায়।

বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন কমল মিত্র, অসিতবরণ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপদ চক্রবর্তী, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, নবাগতা রূপা, শমিতা বিশ্বাস ও স্বিজু ভাওয়াল। নৃত্যে দেবীপ্রিয়া (মাদ্রাজ)। বিশ্ব-পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন অ্যালায়েড ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার।

এই সপ্তাহে 'শচীমার সংসার'

মালবিকা চিত্রের ভক্তি-রস-প্রধান চিত্র 'শচীমার সংসার' এই হপ্তায় সুরশ্রী, রূপম, রূপায়ণ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন ভূপেন রায়। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্ব অনিল চট্টোপাধ্যায়ের। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে ননী দাস ও অমিয় মুখোপাধ্যায়। সংগীত এই ছবির অন্যতম আকর্ষণ। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সুরারোপিত ছবিটিতে কণ্ঠদান করেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, বনশ্রী সেনগুপ্ত, শিপ্রা বসু, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে।

মূল চরিত্রে অভিনয় করছেন অনন্যা শিল্পী সন্ধ্যারাণী। নিমাই, নিতাই, লক্ষ্মী-প্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্রে আছেন যথাক্রমে অসীমকুমার, দিলীপ রায়, নবাগতা সংহিতা রায় ও জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে : মিহির ভট্টাচার্য, অসিতবরণ, তরুণকুমার, আনন্দ মুখোপাধ্যায়, মাঃ অরিন্দম, অমরেশ দাস, কল্যাণী মণ্ডল ও শমিতা বিশ্বাস প্রভৃতি।

ছবিটির পরিবেশক এস বি ফিল্মস।

গেল রবিবার, ১৫ আগস্ট, স্বাধীনতা দিবসের প্রত্যুষে দৈনিক সংবাদপত্রের প্রথম পাতাতেই পাঠকেরা বড়ো বড়ো অক্ষরে হেড লাইন পড়েছেন, 'বরানগর-কাশীপুরে খুনো-খুনিতে রাজনৈতিক মহলে তীব্র ক্ষোভ'। এতো গেল শহর কলকাতার উত্তর প্রান্তের কথা। এবার দক্ষিণ প্রান্তবর্তী টালিগঞ্জের কথা শুনুন। সেখানেও রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক তীব্র কর্মতৎপরতা ও হুমকি এবং ব্যাপক খানাতল্লাসী ও ধরপাকড়ের জন্যে বেশীর ভাগই ফিল্ম স্টুডিওতে ছবি তোলার কাজকর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। এবং কোনো স্টুডিওরই কর্তৃপক্ষ জানেন না, কবে এমন অনুকূল পরিস্থিতি দেখা দেবে, যেদিন আবার নির্বিঘ্নে, নিরুপদ্রবে, নিঃশঙ্কচিত্তে কাজকর্ম শুরু করা সম্ভব হবে কিংবা আর কোনো দিনই তা হবে কিনা। বাংলার চল-চ্চিত্রজগতের শিল্পী, কলাকুশলী ও কর্মীদের মধ্যে আজ যে নিদারুণ হতাশা দেখা দিয়েছে, তার থেকে মুক্তির উপায় কি, এই কঠিন প্রশ্নটি আমরা সবিনয়ে নিবেদন করছি, আজ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের যাঁরা কর্ণধার, তাঁদের কাছে।

মঞ্চাভিনয়

রঙ্গায়ন-এর 'দেনাপাওনা' :

গেল রবিবার ৮ আগস্ট বালীগঞ্জ শিক্ষাসদনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করলেন তরুণ নাট্যকার ও পরিচালকবৃন্দ। অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান তরুণ রায়, অশোক দত্ত, রঞ্জনশংকর পাণ্ডে ও গণেশবাবু।

উল্কা : জন্মলগ্নে উপেক্ষিত সন্তান অরুণাংশু ও তাকে ঘিরে নানা ঘটনার ঘন-ঘটা ও শেষে চিরন্তন মাতৃত্বের ধাবক কমলার মৃত সন্তানকে বুকে আঁকড়ে ধরে হাহাকারে নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা' নাটকের সমাপ্তি। গত ১৫ আগস্ট স্টার মঞ্চে অমৃতবাজার পত্রিকার সাংবাদিকগণ 'উল্কা' নাটক অভিনয় করলেন। বহু-পরিচিত নাটকের পূর্ণাঙ্গ রসনিবদ্ধ রূপ সাংবাদিকগণের অভিনয়ের গুণে নবপ্রকাশ পেল। অভিনয়ের চমক ও আঙ্গিক নাটককে নবরূপ দিয়েছিল।

অভিনয়-কৃতিত্বের সর্বপ্রথম স্মারক শ্রীদিলীপ মৌলিকের অরুণাংশু। সুললিত কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে অরুণাংশু সু-অভিনীত হয়েছে। কমলার ভূমিকায় শ্রীমতী রাণু রায়ের অভিনয় মনে রাখার মতো। রাজীবের ভূমিকায় অভিনয় করলেন শ্রীসমীর মিত্র। রায়বাহাদুরী চালচলন ও ব্যক্তিত্ব তাঁর অভিনয়ে সুস্পষ্ট। সুবীরের ভূমিকায় প্রবীর সেনের অভিনয় চলনসই। এছাড়া যাঁরা সু-অভিনয় করেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅচ্যুত সিন্‌হা, শ্রীদিলীপ দত্ত, শ্রীনিশীথ বড়াল, শ্রীদীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅবিনাশ দে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র এ'দের নাম অবশ্য উল্লেখ্য। গণেন বোসের ভূমিকায় প্রকাশ ঘোষের অভিনয় প্রশংসার যোগ্য।

আবহসঙ্গীত পরিচালনায় শ্রীশচীন বসু ও সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ্য। তবে আলোক-সম্পাত নাটকের গতিকে ব্যাহত করেছে।

নাট্যানুষ্ঠানের পূর্বে সভাপতি হিসাবে শ্রীসুকমল ঘোষের ভাষণে সাংবাদিকদের কর্তব্যসচেতনতা ও প্রধান অতিথি হিসাবে পাহাড়ী স্যান্যালের ভাষণে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে সেতুবন্ধনের কথা দর্শক-দের আনন্দ দিয়েছে। মঞ্চের নেপথ্য সহ-যোগিতায় শ্রীজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রী-সুকুমার দাস, শ্রীধীরেন ঘোষ, শ্রীশরৎ মিশ্র, মলয় বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নাম অবশ্য উল্লেখ্য।

সবশেষে সম্পাদক শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শকদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

নাট্যপূর্বে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের মুখে কয়েকটি শব্দ ফিচার আনন্দদায়ক।

রক্তাক্ত ইস্তাহার : সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে মাঙ্গলিক প্রযোজিত 'রক্তাক্ত ইস্তাহার' (নিয়মিত প্রতি শনিবার থিয়েটার সেণ্টারে মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে) নিঃসন্দেহে বলিষ্ঠতম। একদিকে জঙ্গী শাসকগোষ্ঠীর বর্বরোচিত অত্যাচার, অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের অনমনীয় দৃঢ়তা নাটকটির বিভিন্ন দৃশ্যে সুপরিকল্পিতভাবে রূপায়িত হয়েছে। হৃদয়গ্রাহী ও সংবেদন-শীল সংলাপে এবং নাটকীয় ঘটনার আবর্তে মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত বিপ্লবকে বিশ্বাসযোগ্য-ভাবে মঞ্চে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন। নাট্যকার কাজল ঘোষ সেজন্য অবশ্যই তিনি ধন্যবাদার্হ। নির্দেশনা (প্রদীপ কুণ্ডু) অভিনবত্বের দাবী রাখে. আলো (লক্ষ্মণ দাস)। সঙ্গীত (তরুণ সেন) এবং রূপসজ্জা (সুকান্ত দাস) নাটকটিকে বাস্তবায়িত করতে যথেষ্ট সহায়তা দিয়েছে।

কয়েকটি দৃশ্যের সামগ্রীক অভিনয় ভোলা যায় না। চরিত্রসৃষ্টিতে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন মাসুদ খাঁ ([illegible]) [illegible] (সমীর বিশ্বাস), হাজি সাহেব (রজেন দত্ত), বন্ধু (বিশ্বনাথ ব্যানার্জি), নজর আলী (সনাতন ঘোষ), কাদের (রবীন চ্যাটার্জি), মুস্তাক (পলাশ হালদার), সনাতন (নির্মল মিত্র), আসরফ (তরুণ সেন), বদরু (হারাধন ঘোষ), জাহিদা (সানন্দা ভট্টাচার্য), সোফিয়া (মঞ্জু ভট্টাচার্য ও নুরজাহান (বাপীদাস শর্মা)।

আলিবাবা : আগামী ২৯ আগস্ট রবিবার দক্ষিণ কলকাতার ত্যাগরাজ হলে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যার্থে নটলীলাগোষ্ঠী নৃত্যসঙ্গীত-মুখর জনপ্রিয় নাটক আলিবাবা মঞ্চস্থ করবেন। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করছেন মঞ্চ এবং চিত্রজগতের স্বনামধন্যরা—মল্লিনা দেবী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির মিত্র, রাজলক্ষ্মী দেবী (ছোট), গীতশ্রী দেবী, সমর মিত্র, শিপ্রা মিত্র প্রমুখ। নাটকটি পরিচালনা করছেন সজল মিত্র।

দিল্লীতে 'রাজা ওয়াদিপাউস' : দিল্লীর অপরাজিত সঙ্ঘের শিল্পীরা আগামী ২৯শে আগস্ট সন্ধ্যা ৭টায় সর্দার প্যাটেল হলে শ্রীশম্ভু মিত্র কর্তৃক অনূদিত সোফো-ক্লিসের 'রাজা ওয়াদিপাউস' নাটকের অভিনয় করবেন। নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীপরেশ দাস।

নটনীড় গোষ্ঠীর নিয়মিত অভিনয় : নটনীড় নাট্যগোষ্ঠী তাঁদের নতুন নাটক 'হে বন্ধু বিদায়' নিয়মিত অভিনয় করবেন বলে স্থির করেছেন। প্রতি রবিবার সকালে মুক্তঅঙ্গনে এই নাটকটি অভিনীত হবে। নাট্যপরিচালনায় রয়েছেন বিনয় চক্রবর্তী।

কেদার রায় : রমেন গোস্বামীর সু-পরিচিত ঐতিহাসিক নাটক 'কেদার রায়' গত ২০শে আগস্ট রঙ্গনায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হোল। নাটকটি প্রযোজনা করেন এ-টি-দেব প্রাইভেট লিমিটেড এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা। মোটামুটি ভাবে নাটকটি দর্শকদের তৃপ্তিই দিয়েছেন। অভিনয়ের দিক দিয়ে যাঁর নাম সবার আগে উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন 'শ্রীমন্ত চরিত্রের রূপকার দেবদাস সরকার। কয়েকটি মুহূর্তে তাঁর অভিনয় সত্যি মনে রাখার মতো। 'রত্না'র প্রাণোচ্ছলতা শিবানী ভট্টাচার্যের অভিনয়ে ধরা পড়েছে। বিষ্ণুপদ পালের 'কেদার রায়' ও সিদ্ধার্থ বসুর 'কার্ভালো' হয়েছে মনোগ্রাহী।

অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় ছিলেন অমূল্য মন্ডল, শংকর হাজরা, জীবন ভট্টাচার্য, হীরালাল বসু, জগন্নাথ চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্র বাগ, তারাপদ হালদার, বৃন্দাবন দত্ত, মদনমোহন প্রামাণিক, শিখা ভট্টাচার্য অজন্তা চৌধুরী, রীণা ব্যানার্জী, নমিতা গাঙ্গুলী।

ক্রীতদাসী : হাওড়ার মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কালচারাল কমিটির শিল্পীরা কয়েকদিন আগে মণি দত্তের 'ক্রীতদাসী' নাটকটি পরিবেশন করেছেন হাওড়া ই-আর মঞ্চে। সম্রাট শাহজাহানের হারেম থেকে পালিয়ে যাওয়া দুজন সুন্দরী বাঁদী সুলেখা আর হীরার জীবন-[illegible] কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ

টক। এই নাট্যকাহিনীতে আছে প্রচণ্ড ক যা দর্শককে আপ্লুত করেছে এবং লগত অভিনয়ে যে সংহতি ছিল তাও েছে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। নির্দেশক সমর ু যে অসম্ভব দ্রুত গতি এনেছেন টকে, অভিনয়ে, আলোকসম্পাতের ও বহসংগীতের সেতুবন্ধনে তা হয়ে উঠেছে ুনতের এক ব্যঞ্জনায় মুখর। ঝুমা মুখার্জী বিপাশা গোস্বামীর দুটি প্রধান নারী ত্রে সাবলীল অভিনয় বহু দিন মনে ার মতো। ছবি তালুকদারের 'আলভা'ও রছে সুঅভিনীত।

অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন সমর বসু, রেন মিত্র, স্বপনকুমার ঘোষ, অমিত য় কমলকৃষ্ণ ঘোষ, অরুণ চম্পটি, শান্তি নার্জি, অমরেন্দ্র মুখার্জি, পুলিনবিহারী খার্জি, সোমনাথ কুমার, শ্যামবিহারী ং।

গিরিশ নাট্য সংসদ-এর বার্ষিক উৎসব: লকাতার প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা গিরিশ ট্য সংসদ-এর অষ্টম বার্ষিক উৎসব গত ১ই আগস্ট নববৃন্দাবন মন্দিরে বিশেষ জলের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন া যশস্বী নট শ্রীপঞ্চু সেনকে সম্বর্ধনা নান ও শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত ালী' নাটকটি অভিনয় করেন। অভিনয় ন্ত হৃদয়গ্রাহী ও সুন্দর হয়েছিল। গত সংহতি মনে রাখার মত। প্রথম থেকে র পর্যন্ত এত বাঁধা ও সংযত অভিনয় চোখে পড়ে। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান রেন শ্রীধীরেন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীসমীর ব্যানার্জি, কৃষ্ণকুমার সিংহ, প্রদীপ ব্যানার্জি, অজিত া, শশাঙ্ক চ্যাটার্জি, তারাপ্রসাদ চার্য, গৌরচন্দ্র পাল, বাদল চক্রবর্তী, ি অধিকারী, সুরেশ ঘোষ, সুব্রত দাস, াই দে, সুলেখা ব্যানার্জি, বুলা চার্য, প্রভা দেবী, অরুণা ঘোষ ও িক বাগচি। নাট্যনির্দেশনায় ধীরেন্দ্র-থ চক্রবর্তী বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। সদের পক্ষ থেকে যশস্বী যাত্রাভিনেতা পঞ্চু সেনকে অভিনন্দন জানানো হয়। বর্ধনার উত্তরে শ্রীসেন বলেন যে, সকলকে নন্দ দিতে পারাই শিল্পীর একমাত্র য। ভবিষ্যতে এই শিল্পের উন্নয়নে তিনি রও চেষ্টা করে যাবেন। বিশেষ উৎসাহ দীপনার মধ্য দিয়ে অষ্টম বার্ষিক সবের সমাপ্তি হয়।

বিবিধ সংবাদ

উবান চলচ্চিত্র উৎসব

সিনে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা আসছে ২৯ গস্ট সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে রান্স এগেন অ্যাবাউট লাভ' প্রদর্শনীর য়োজন করেছেন।

এছাড়া সিনে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা সছে ১০ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর ম্যাজেস্টিকে উবান চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। এই উৎসবে তিনটি কাহিনী- লুসিয়া, মেমোরিডা অফ আণ্ডার-ডেভলাপমেণ্ট ও দি ফার্স্ট চার্জ অফ সেট এবং পাঁচটি স্বল্পদৈর্ঘের ছবি —ম্যানুয়েলা সাইক্লোন, সাইক্লিং চেস ও দি স্টোরি অফ এ ব্যালে দেখান হবে।

দেবারতি ফিল্মসের 'অভিলাষ'

গেল ১৬ আগস্ট '৭১ সোমবার নব-গঠিত চিত্রপ্রতিষ্ঠান দেবারতি ফিল্মস্-এর প্রথম চিত্রার্ঘ্য 'অভিলাষ'-এর শুভ মহরত মেট্রোপোল হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সাহিত্যিক শ্রীদীপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীকানু বন্দ্যো-পাধ্যায়।

আর্থার মিলারের 'ডেথ অফ এ সেলসম্যান'-এর ছায়া অবলম্বনে চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী। সঙ্গীতপরিচালনায় আছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। চরিত্রলিপিতে বিশিষ্ট শিল্পীসমন্বয় এবং প্রধান চরিত্র রূপায়ণে বাংলার কোন শক্তিমান অভি-নেতাকে দেখা যাবে।

সংস্কৃতি পরিক্রমার আলোচনাচক্রে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী

রবিবার ৮ আগস্ট রবীন্দ্র সরোবরে সংস্কৃতি পরিক্রমার উদ্যোগে বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সম্পর্কে এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম পাকিস্থানীদের সর্বাত্মক শোষণ এবং বাংলা সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষ ও কণ্ঠরোধের প্রতি-ক্রিয়াতেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম—বাংলাদেশের সাহিত্যিক মহবুব তালুক-দার ও শেখ আবদুল আজিজ, এম পি এই বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। অধ্যাপক অরুণ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় উভয় বক্তাই মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে সংগ্রামের গণমুখী চরিত্রের সুন্দর চিত্র উপস্থাপিত করেন। মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার ভিত্তিতে ছয় দফা আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা এবং জন আকাঙ্ক্ষার যথার্থ প্রতি-ফলনকারী হিসাবে মুজিবের নেতৃত্ব এই আন্দোলনকে নতুন তাৎপর্য দিয়েছে। এর সব কিছুই জনগণের মধ্য থেকে এসেছে, তাই এই ধরণের সংগ্রামের বুদ্ধিজীবীদের কোন মুখ্য ভূমিকা থাকে না বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেন। এই জন্যই ক্ষমতার তল্পিবাহক বুদ্ধিজীবীদের কার্যকলাপে জনগণ বিভ্রান্ত হন নি। সর্বশ্রী নিরঞ্জন হালদার, গোবিন্দ ঘোষাল, দীপক গুহ রায় এবং অরুণ ভট্টাচার্য আলোচনায় যোগ দেন।

এপিক থিয়েটার গ্রুপের 'বিস্ফোরণ' নাটকে বেবী দে ও রণেন বসু

অধিনায়ক ওয়াদেকার

দর্শক

ইংল্যান্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দল

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ১৯৭১ সালের ইংল্যান্ড সফর বৃষ্টিতে খুবই মার খাচ্ছে। আগস্ট মাসের ৫ থেকে ১৭ তারিখের মধ্যে সফরের যে তিনটে খেলা ড্র গেল তার জন্যে বৃষ্টিই সম্পূর্ণ দায়ী।
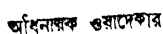
ভারতীয় বনাম ইয়র্কসায়ার কাউণ্টি দলের বরাদ্দ তিন দিনের খেলা বৃষ্টির জন্যে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হয়নি। দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের পর খেলা হয়নি এবং তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে একটা বলও মাঠে পড়েনি।

প্রথম দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ১৪৫ রানের মাথায় শেষ হলে ইয়র্কসায়ার কোন উইকেট না খুইয়ে ১৩ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের সময় ইয়র্কসায়ার দলের রান দাঁড়ায় ১৩৭ (৩ উইকেটে)। বৃষ্টির ফলে এই অবস্থায় খেলাটি বন্ধ যায়। খেলার ফলাফল ড্র দাঁড়ায়।

ভারতীয় দল : ১৪৫ রান (ওয়াদেকার ৫১ রান। গুড ৩৩ রানে ৩, উইলসন ১২ রানে ৩ এবং হাটন ২৮ রানে ২ উইকেট)

ইয়র্কসায়ার : ১৩৭ রান (৩ উইকেটে)

ইংলণ্ডের মাটিতে ভারতবর্ষের প্রথম জয় ও রাবার লাভ

ইংলণ্ডের মাটিতে টেস্ট ক্রিকেটে ভারতবর্ষ প্রথম রাবার জয়ের গৌরব অর্জন করে সুদীর্ঘ উনচল্লিশ বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়েছে। এই জয়লাভের মূলে ছিল চন্দ্রশেখরের মারাত্মক বোলিং চাতুর্য।

আগামী সংখ্যায় এই খেলার বিস্তারিত সচিত্র বিবরণ এবং পর্যালোচনা থাকবে।

বি চন্দ্রশেখর : ৩৮ রানে ৬ উইঃ

ভারতীয় দল বনাম নটিংহামশায়ার কাউণ্টি দলের তিনদিনব্যাপী খেলা অমীমাংসিত থেকে যায়।

প্রথম দিনে বৃষ্টির জন্য খেলা আরম্ভই হয়নি।

দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দল তাদের প্রথম ইনিংসের ৬টা উইকেটের বিনিময়ে ১৬৮ রান তুলে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করলে বাকি সময়ে নটিংহামশায়ার দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় মাত্র ৩৯ রান উঠেছিল, ৫টা উইকেট পড়ে।

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসের ১৬৮ রানের থেকে ৯৯ রানের পিছনে থেকে নটিংহামশায়ার দল তাদের প্রথম ইনিংসের ৬৯ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেছিল। এর পর ভারতীয় দল ৪ উইকেটে ১৪৫ রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলে নটিংহামশায়ার দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং যেখানে খেলায় তাদের জয়লাভের জন্য ২৪৫ রানের প্রয়োজন ছিল সেখানে ১৯৫ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় খেলাটি ড্র যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারতীয় দল : ১৬৮ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সরদেশাই ৫৭ নটআউট এবং ওয়াদেকার ৪৯ রান। টেলর ৪৪ রানে ২ উইকেট)

ও ১৪৫ রান (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। মানকাদ ৫০ নট আউট)

নটিংহামশায়ার : ৬৯ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। আবিদ আলি ২৩ রানে ৩ উইকেট এবং গোবিন্দরাজ ৩৭ রানে ২ উইকেট।

ও ১৯৫ রান (৬ উইকেটে। হ্ন্ট ৫০ নট-আউট। চন্দ্রশেখর ৩৪ রানে ৬ উইকেট)

মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা

কুয়ালালামপুরে ১৫শ মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ব্রহ্মদেশ ১—০ গোলে ইন্দোনেশিয়াকে পরাজিত করে আবদুল রহমন ট্রফি জয়ী হয়েছে। গত বছরের প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ কোরিয়া চ্যাম্পিয়ান এবং ব্রহ্মদেশ রানার্স-আপ খেতাব পেয়েছিল। এ বছরের সেমি-ফাইনালে ব্রহ্মদেশ ১—০ গোলে গত বছরের বিজয়ী দক্ষিণ কোরিয়াকে এবং ইন্দোনেশিয়া ১—০ গোলে তাইওয়ানকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। এখানে উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ইন্দোনেশিয়া ৩ বার (১৯৬১-৬২ ও ১৯৬৯) এবং ব্রহ্মদেশ ২ বার (১৯৬৪ এবং ১৯৬৭ সালে যুগ্ম-বিজয়ী) আবদুল রহমন ট্রফি জয়ী হয়েছিল।

চূড়ান্ত স্থানপর্যায় তালিকা : ১ম ব্রহ্মদেশ, ২য় ইন্দোনেশিয়া, ৩য় দক্ষিণ কোরিয়া, ৪র্থ তাইওয়ান, ৫ম মালয়েশিয়া, ৬ষ্ঠ সিঙ্গাপুর, ৭ম দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, ৮ম হংকং, ৯ম জাপান, ১০ম ভারতবর্ষ, ১১শ ফিলিপাইন এবং ১২শ থাইল্যান্ড।

এশিয়ান সন্তরণ প্রতিযোগিতা

টোকিওতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এশিয়ান সন্তরণ প্রতিযোগিতায় জাপান চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছে—মোট পদক ৭২ (স্বর্ণ ৩২, রৌপ্য ৩০ এবং ব্রোঞ্জ ১০)। দ্বিতীয় স্থান অধিকার সিঙ্গাপুরের মোট পদক ৪৬টি (স্বর্ণ ১৬, রৌপ্য ৭ এবং ব্রোঞ্জ ২৩)

সিঙ্গাপুরের ১৭ বছরের সাঁতারু কুমারী প্যাট্রিসিয়া চ্যান ৫টি স্বর্ণপদক সংগ্রহ করে প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক স্বর্ণপদক জয়ের গৌরব লাভ করেন। এ বছরে প্রতিযোগিতায় কয়টি দল যোগদান করেছিল।

এশিয়ান ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

জাকার্তায় আয়োজিত তৃতীয় এশিয়ান ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইন্দোনেশিয়া ৩—২ খেলায় মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে। প্রতিযোগিতায় মোট চোদ্দটি দেশ যোগদান করেছিল। ভারতবর্ষ প্রথম রাউণ্ডেই ২—৩ খেলায় সিঙ্গাপুরের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে যায়। ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন তান আইক মং (মালয়েশিয়া) এবং মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন উতামী দেবী (ইন্দোনেশিয়া)

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ৬, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩
হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।৬, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

আমরা সবাই মাখি
বসন্ত মালতী তেল
বসন্ত মালতী তেল আজ ঘরে ঘরে সমাদৃত। এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে আছে বিখ্যাত জবাকুসুম তেলের প্রস্তুতকারক সি কে সেনের প্রায় একশো বছরের অভিজ্ঞতা। চুলের সহজাত সৌন্দর্য্য ধরে রাখতে যে সব দেশীয় উপাদানের প্রয়োজন তার সবগুলিই বসন্ত মালতী তেলে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। এই তেল মাখলে চুল বেশ পরিপাটী থাকে। এর মন মাতানো গন্ধ সারা দিন আপনাকে খুসীর আনন্দে ভরিয়ে রাখবে।
সি. কে. সেন এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ও দিল্লী
Basant malati

১১শ বর্ষ
২য় খণ্ড

১৮শ সংখ্যা
মূল্য
৫০ পয়সা

Friday, 3rd September, 1971 শুক্রবার, ১৭ই ভাদ্র, ১৩৭৮ 50 Paise

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সংগে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সংগে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

একনজরে

শিল্পের জালিয়াতি :

যা এট্রুস্কান সভ্যতার অমূল্য নিদর্শন বলে গত দশ বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মিউজিয়াম ও চিত্রসংগ্রহশালায় এবং শিল্পরসিকদের কাছে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড দরে বিক্রয় হয়েছে তা সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাগারে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরীক্ষায় সম্পূর্ণ ঝুটা মাল বলে প্রমাণিত হয়েছে। পরীক্ষাগারের ভারপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ডঃ স্টুয়ার্ট ফ্লেমিং পরীক্ষান্তে বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, অতি নিপুণ-হাতের একটা বড় রকমের আন্তর্জাতিক জালিয়াতি গত দশ বছর সারা বিশ্বের শিল্পী, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক মহলের চোখে ধুলো দিয়ে প্রায় বিনা বাধায় লক্ষ লক্ষ পাউন্ডের কারবার চালিয়ে গেছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রায় এক লক্ষ পাউন্ড, অর্থাৎ প্রায় বিশ লক্ষ টাকা দিয়ে যে পাঁচিশটি এট্রুস্কান টেরাকোটা প্যানেলের নিদর্শন কিনেছিল তা সবই সম্পূর্ণ ঝুটা মাল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এবং, ডঃ ফ্লেমিং-এর সুনিশ্চিত অভিমত, আমেরিকার আর্ট গ্যালারি ও মিউজিয়মগুলিতে লক্ষ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে সংগৃহীত এট্রুস্কান সভ্যতার তথাকথিত নিদর্শনগুলিও জালিয়াতদের হাতে গড়া রদ্দী মাল ছাড়া আর কিছুই নয়।

ডঃ ফ্লেমিং-এর অনুমান, ইতালির কেভেটোঁর অঞ্চলে আছে ঐ জালিয়াতদের কারখানা, যেখানে একদা গড়ে উঠেছিল প্রাক-রোমক যুগের এট্রুস্কান সভ্যতা এবং যেখান থেকে এট্রুস্কান সভ্যতার প্রকৃত নিদর্শনও পাওয়া গেছে। খৃষ্টজন্মের নয় শতাব্দী আগে অজ্ঞাতকুলশীল এট্রুস্কানরা বর্তমান ইতালির টুস্কানি অঞ্চলে গড়ে তোলে তাদের নগরসভ্যতা। ডঃ ফ্লেমিং বলেছেন, ইতালির ঐ ঝুটা শিল্পের কারবারীরা খুব সাফল্যের সঙ্গে গত দশ বছর ধরে তাদের জালিয়াতির কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। তারা তাদের কারখানায় তৈরি "প্রাচীন শিল্পের নিদর্শনগুলি" সুইজার-ল্যান্ডের সীমান্ত দিয়ে গোপনে পাচার করে বিদেশি শিল্পের কারবারীদের কাছে পৌঁছে দেয়। আর ঐ গোপন পথে রহস্যজনক চলাচলের মধ্য দিয়ে নিপুণ হাতে তৈরি ঝুটা মালগুলি আদি ও অকৃত্রিম শিল্পের অনন্য মর্যাদা লাভ করে। তখন প্রায় বিনা জিজ্ঞাসাতেই বড় বড় ব্যবসায়ী ও বিত্তবান শিল্পরসিকরা সেসব সামগ্রী যে কোন দামে কিনে নিয়ে যান। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা থেকে যেগুলি কেনা হয়েছে সেগুলির কোন কোনটির জন্য দশ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত মূল্য দিতে হয়েছে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাগারে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সামগ্রীর প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষার জন্য যে নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে তার নাম 'থার্মো-লুমিনেসেন্স ডেটিং'। ঐ পদ্ধতি প্রয়োগ করেই জানা গেছে যে, দক্ষিণ-পশ্চিম তুরস্কের হাচিলার থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মৃৎশিল্প বলে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় এতদিন যা সযত্নে সংগৃহীত ছিল তা সবই ঝুটা মাল।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষণা বিশ্বের প্রত্নতাত্ত্বিক মহলে দারুণ আলোড়ন এনেছে, আর শঙ্কিত করে তুলেছে সেইসব বিত্তবানদের যারা নিজেদের শিল্পবৈদগ্ধের পরিচয় দিতে জলের মতো অর্থব্যয় করে হয়ত বা সবই ঝুটা মাল দিয়ে পূর্ণ করেছে তাদের সংগ্রহশালা।

রাজধানীর স্বস্তি :

অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে অব্যাহতিলাভের সুযোগ আইনসিদ্ধ হওয়ায় দিল্লীর চিকিৎসক মহল স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, প্রতি বছর দেশে যে প্রায় ষাট লক্ষ গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে তার প্রায় পঞ্চাশ হাজার হয় রাজধানীতে। আর ঐ ব্যাপারে হাসপাতালগুলিকে যা করতে হয়—তা নেহাৎই 'মেরামতি কাজ' ছাড়া আর কিছুই নয়। বাইরে হাতুড়েদের হাতে অর্ধমৃত হয়ে বা সারাজীবনের মতো পঙ্গু হওয়ার আশঙ্কা নিয়ে আধকাংশই হাসপাতালে আসে এবং তাদের কোনরকমে বাঁচিয়ে তোলাই তখন হাসপাতালের ডাক্তারদের একমাত্র কাজ হয়। তাঁরা আশা করছেন, এখন থেকে হাসপাতালের দ্বার অবারিত হওয়ায় কেউ আর আগে হাতুড়েদের কাছে অর্ধমৃত হয়ে হাসপাতালে আসবে না। নমুনা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, নয়াদিল্লীর ন'টি হাসপাতালে যত রোগী আসে তার প্রায় বিশ শতাংশ হল গর্ভপাতজনিত রোগী।

নতুন যে আইন হল (মেডিকাল টার্মিনেশন অফ প্রেগনান্সি) তাতে ১৮ বছরের বেশি বয়সের যে কোন অন্তঃসত্ত্বা নারী হাস-পাতালে গিয়ে গর্ভপাতের দাবি জানাতে পারবে। ১৮ বছরের কম বয়সের মেয়েদের বা ১৮ বছরের বেশি বয়সের বিকৃত মস্তিষ্ক মেয়েদের গর্ভপাতের জন্য অভিভাবকের লিখিত সম্মতির প্রয়োজন হবে। অন্তঃসত্ত্বাবস্থা যদি বারো সপ্তাহের কম হয় তবে একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক, আর তার বেশি দিনের হলে দু'জন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক গর্ভপাতের কাজে নিযুক্ত হবেন। গর্ভ-পাতের যাবতীয় কাজ হবে সম্পূর্ণ গোপনে এবং সব সরকারি বা সরকারনির্দিষ্ট হাসপাতালে এর জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা থাকবে।

সংসদের সদস্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী শান্তাম্মা বলেছেন, এ আইনের ফলে যাঁরা সমাজ রসাতলে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা বোধহয় জানেন না যে, অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে যাঁরা অব্যাহতি পেতে চান তাঁদের মধ্যে শতকরা সাতাশি থেকে নব্বুই জন বিবাহিতা নারী। অপর সদস্যা শ্রীমতী সাবিত্রী শ্যাম বলেছেন, এমন একটা অত্যাবশ্যক আইন পাশ করতে সরকার কেন যে এতদিন অপেক্ষা করলেন তা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। আর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যও যে এ ধরনের একটা আইনানুমোদিত ব্যবস্থা একান্তই প্রয়োজন ছিল একথা স্পষ্ট করে বলতেই বা সরকারের সঙ্কোচ হচ্ছে কেন? শ্রীমতী মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, পঞ্চাশের দশকে যখন হিন্দু বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পাশ হয় তখনও সমাজ রসাতলে যাওয়ার আশঙ্কায় অনেকে শঙ্কিত হয়েছিলেন কিন্তু সে আশঙ্কা পরবর্তীকালে অমূলক প্রমাণিত হয়েছে।

জীবন ব্যাঙ্ক : সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বেড়েছে আর সেই নিরাপত্তাবোধ থেকেই সঞ্চারিত হয়েছে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি। ব্যাঙ্ককে তাই সম্পূর্ণরূপে আধুনিক সভ্যতার সৃষ্টি এমন কি প্রতীকও বলা যায়। আবার মানুষের প্রয়োজনের বৈচিত্র্য ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে ব্যাঙ্কেরও ঘটেছে নানা রূপান্তর। আজ শুধু অর্থ ও সম্পদ রক্ষার জন্যই ব্যাঙ্ক নয়, জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনেও গড়ে উঠছে ব্লাড ব্যাঙ্ক, আই ব্যাঙ্ক। একের হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস বা মূত্রাশয় অন্যের দেহে সংযুক্ত করার পরীক্ষা সফল হওয়ার পর মৃতব্যক্তির বিভিন্ন ব্যবহারযোগ্য প্রত্যঙ্গ সঞ্চয়ের জন্য 'হিউম্যান স্পেয়ার পার্টস ব্যাঙ্ক' স্থাপনের প্রস্তাবও বিজ্ঞানী মহলে আলোচিত হচ্ছে।

সর্বশেষ যে ব্যাঙ্ক স্থাপনের উদ্যোগ আমেরিকায় শুরু হয়েছে তা হল স্পার্ম ব্যাঙ্ক।' আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নিউইয়র্কের ম্যানহাটন এলাকায় দুটি স্পার্ম ব্যাঙ্কের উদ্বোধন হবে যাতে, যেসব পুরুষ পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে ভাসেকটোমি অস্ত্রোপচার করবেন তাঁরা শুক্র কীট জমা রেখে আসতে পারবেন। ভবিষ্যতে সন্তান চাইলে তাঁরা ঐ সঞ্চিত শুক্র-কীট ব্যবহার করতে পারবেন। ব্যাঙ্কের মালিকরা বলেছেন, তাঁরা এ ব্যাপারে শুধু ভাণ্ডারী ছাড়া আর কিছুই নন। সঞ্চিত শুক্রকীট মালিকেরই সম্পত্তি থাকবে। তিনি বা তাঁর উত্তরাধিকারী ভবিষ্যতে যে কোন দিন তাঁর পারিবারিক চিকিৎসককে দিয়ে ঐ সঞ্চিত জীবকণা কাজে লাগাতে পারবেন! প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কের উদ্যোক্তারা আরও বলেছেন, তাঁদের প্রয়াস যদি সফল হয় তবে কোন বংশধারাই আর লুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না।

২৬।৮।৭১ প্রত্যক্ষদর্শী

বাংলা ছায়াছবির সংকট

ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স এসোসিয়েসনের সভাপতি সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে ১লা সেপ্টেম্বর থেকে কলকাতার ফিল্ম স্টুডিয়োগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে। সংবাদে প্রকাশ, ইতিমধ্যে প্রায় ত্রিশ লাখ টাকা খাটছে বিভিন্ন নির্মীয়মান ছবি বাবদ। ছয়টি স্টুডিয়োতে পাঁচশো টেকনিশিয়ান কাজ করেন, সমসংখ্যক ব্যক্তি ঠিকা হিসাবেও এই কাজে ব্রতী। এ ছাড়া আরো হাজারখানেক কর্মী নানাভাবে এই ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পুজোর মুখে এতগুলি মানুষের পরিবারবর্গ অন্নহীন হয়ে পড়বেন এই চিন্তা সকলকে আকুল করে তুলেছে। কিন্তু শুধু তাই নয়, এই সঙ্গে আরো অনেকরকম সমস্যা জড়িয়ে আছে। এই বাণিজ্যের যাঁরা মালিক সম্প্রদায় তাঁদের মতে এই অবস্থার জন্য সরকারই মুখ্যত দায়ী। ১৯৬৩, ১৯৬৬, ১৯৬৮—এই তিন বছরে তিনটি কমিটি বসানো হয়েছে। ১৯৬৬-তে যে "আর গুপ্ত কমিটি" সংগঠিত হয় তার অন্যতম সদস্য ছিলেন সত্যজিৎ রায়। এই কমিটি ফিল্ম শিল্পের অবনতির চারটি মূল কারণ হিসাবে বলেন যে পূর্ববঙ্গের বাজার বন্ধ হওয়া, কলকাতা ও আশেপাশে নতুন সিনেমা হলের লাইসেন্স দানে সরকারি কার্পণ্য, যৌন আবেদন এবং চটুলতাপূর্ণ বোম্বাই ও মাদ্রাজী ছবির অশোভন প্রতিযোগিতা এবং অস্বাস্থ্যকর বাণিজ্যনীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গের ফিল্ম শিল্পে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এই কমিটি বলেছিলেন যে, ৬০টি নূতন সিনেমা হল খোলা সম্ভবপর। এ ছাড়া এই কমিটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, সিনেমা অভিনেতৃ-গোষ্ঠী এবং কলাকারদের দ্বারা সংগঠিত সমবায় সমিতির হাতে নতুন সিনেমা খোলার ভার দেওয়া হোক। যে কোনো কারণেই হোক পশ্চিমবঙ্গ সরকার এইসব প্রস্তাবে কর্ণপাত করেননি। ফিল্ম শিল্পপতিদের দিক থেকে বলা হয়েছে যে, ফিল্ম ব্যবসায়ের আকস্মিক পতন ও মূর্চ্ছা রোধকল্পে সরকার অচিরাৎ স্টুডিওওয়ালাদের এ্যাড হক অর্থদান করুন, প্রমোদকরের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ প্রযোজকদের দেওয়া হোক, তার ফলে সিনেমা শিল্প উপস্থিত একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে পারে। ইতিমধ্যে দীর্ঘসূত্রী সরকারপক্ষ যা হয় একটা সমাধান স্থির করতে পারবেন।

বাংলাদেশের ফিল্ম ব্যবসায়ের আর্থিক সংকট এমন কিছু নতুন সমস্যা নয়। দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশের ফিল্ম শিল্প রোগজীর্ণ শিশুর মতো অতিকষ্টে প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রেখেছে। স্টুডিয়োর কর্মচারীদের অবস্থা অতি শোচনীয়। ই আই এম পি এ-এর প্রেসিডেন্ট যে নিদারুণ সংকটের কথা বলেছেন তা থেকে মনে হয় কর্মচারীদের প্রাপ্য টাকাও হয়ত স্টুডিয়োগুলির দরজা বন্ধ করার সময় দেওয়া সম্ভব হবে না।

অবস্থা অতি শোচনীয় সন্দেহ নেই। সরকার এই বিষয়ে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা কোনোমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু ২৫শে আগস্ট তারিখে হঠাৎ কেন ঘোষণা করা হল যে, ১লা সেপ্টেম্বর থেকে স্টুডিয়োগুলির দরজা বন্ধ করা হবে। এই বিষয়ে জনসাধারণকে ঠিকমত অবহিত করা হয়নি। কোনোরকম আলোচনা বা আন্দোলনের অভাবে এই দুঃসংবাদ অতিশয় আকস্মিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সরকারী তরফে একজন মুখপাত্র নাকি বলেছেন—আমরা কিছু জানি না, শুধু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় খবরটুকু দেখেছি মাত্র। এই পরিস্থিতিতে তাহলে কার হাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার এই প্রশ্ন সাধারণের মনে জাগে। বোম্বাই ও মাদ্রাজী ফিল্মের নিম্নরুচির কাহিনী ও অভিনয়ভঙ্গীর ফলে তার জনপ্রিয়তা অসীম। হিন্দি ভাষা শিক্ষায় অনাগ্রহ থাকলেও হিন্দি গান শোনার জন্য, হিন্দি ছবি দেখার জন্য আবালবৃদ্ধবনিতা আকুল, ফলে বাংলা ছবির পৃষ্ঠপোষকও কমেছে। তার ওপর আইন ও শৃঙ্খলার অবনতির জন্য সিনেমা হাউসে ভীড় হ্রাস পেয়েছে। এই অবস্থায় সরকারের উচিত ছিল এই প্রয়োজনীয় শিল্পটির প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টিদান করা কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক তাঁদের নজর এড়িয়ে গেছে। বাংলার ছায়াছবির সঙ্গে বাঙালীর সংস্কৃতির একটা অভিন্ন সংযোগ আছে। আজ ছয়টি স্টুডিয়োর দরজা বন্ধ হলে শুধু যে কয়েক সহস্র কর্মী অন্নহীন হবেন তা নয়। বাঙালীর শিল্পচেতনার এক বিশিষ্ট নিদর্শন চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই গুরুতর সংকটের মুখ থেকে বাংলা ছায়াছবি শিল্পকে ত্রাণ করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য।

পশ্চিমবাংলার বরাতের কথাটা একবার ভাবুন!

সারাদেশে যতো জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি আছে তার তিন ভাগের এক ভাগই এই রাজ্যে, যতো কলকারখানা তার ছ' ভাগের এক ভাগ রয়েছে এখানেই, মোট যত মাল কল-কারখানায় তৈরি হচ্ছে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ তৈরি হচ্ছে পশ্চিমবাংলায়—তবু প্রায় গোটা পশ্চিমবাংলাকেই শিল্পে অনগ্রসর বলে ঘোষণা করতে হল!

দেশের মোট ৮৮টি পাটকলের মধ্যে ৭৮টিই এই রাজ্যে, যতো ইলেকট্রিক পাখা তৈরি হয় তার চার ভাগের তিন ভাগ, মোট সেলাইকলের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ, মোট রেল-ওয়াগনের অর্ধেকের কাছাকাছি, মোট বাইসাইকেলের পাঁচ ভাগের এক ভাগই তৈরি হচ্ছে এই রাজ্যের কারখানায়—তবু পশ্চিমবাংলাকে শিল্পে অনগ্রসর বলে ঘোষণা করতে হল!

দেশের যতো কয়লা লাগে তার তিন ভাগের এক ভাগ জোগায় এই রাজ্য, দেশের মোট যতো ইস্পাত তৈরির ক্ষমতা তারও তিন ভাগের এক ভাগ এই রাজ্যের কল-কারখানায়। দেশের মোট যতো বিদেশী মুদ্রা রোজগার হয় তাতে অন্যান্য যে-কোনো রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবাংলার অবদানই সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বন্দর দিয়েই দেশের মোট রপ্তানির শতকরা ৪০ ভাগ বিদেশে চালান যায়, মোট আমদানির শতকরা ২৫ ভাগই আসে কলকাতা দিয়ে। তবু পশ্চিমবাংলাকে ঘোষণা করতে হল শিল্পে অনগ্রসর বলে!

পশ্চিমবাংলার প্রতি ভাগ্যদেবতার পরিহাস ছাড়া একে আর কীই বা বলা যায়? কিন্তু কেন এই অবস্থা হল? সরকারী হিসেবেই শিল্প-সমৃদ্ধিতে যে-রাজ্যের স্থান দেশের মধ্যে দ্বিতীয় (মহারাষ্ট্রের পরেই), তাকে শিল্পে অনগ্রসর বলে ঘোষণা করার উদ্দেশ্যই বা কী?

উদ্দেশ্য দুটো। প্রথমতঃ, যে-সব এলাকাকে অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ বলে ঘোষণা করা হয়, সেই সব এলাকায় কল-কারখানা খুলতে গেলে সরকারের কাছ থেকে অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধে পাওয়া যায়। ঋণ পাওয়া যায় কম সুদে। তাতে শিল্পপতিরা ঐসব এলাকায় কলকারখানা খুলতে আগ্রহী হন। দ্বিতীয়তঃ, বড় বড় ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর এক ফর্দ তৈরি করেছেন ভারত সরকার। একচেটিয়া ব্যবসা যাতে আর প্রশ্রয় না পায়, সেই জন্যে ঐসব গোষ্ঠীকে তারা যদি নতুন কল-কারখানা খুলতে চায় তবে তার আগে অনেক রকম বায়নাক্কা, হাজার রকম সরকারী খবরদারির বেড়া পেরোতে হয়। কিন্তু অনগ্রসর বলে ঘোষিত এলাকায় যদি ঐসব গোষ্ঠী কল-কারখানা করতে চায়, তবে বাধানিষেধ অনেক কম। পশ্চিমবাংলার ১৬টি জেলার ১৩টিকেই এখন অনগ্রসর ঘোষণা করা হল, সুতরাং ঐসব জায়গায় শিল্প প্রসারের সুযোগ বড় ব্যবসায়ীরাও কিছু কিছু পাবেন।

এইবার গণতান্ত্রিক কোয়ালিশনের মুখ্যমন্ত্রী হবার পর মে মাস নাগাদ অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীকে পশ্চিমবাংলার উন্নয়ন সম্পর্কে একটি ব্যক্তিগত চিঠি লেখেন। ঐ চিঠিতেই তিনি প্রথম প্রস্তাব করেন যে, বড় ব্যবসায়ীদের কাজ-কারবার বাড়াবার পথে যে-সব বাধানিষেধ খাড়া করা হয়েছে, অন্ততঃ এই রাজ্যের ক্ষেত্রে সেগুলি কিছুটা শিথিল করা হোক। সরাসরি শুধু একটি বিশেষ রাজ্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যবস্থা করার অসুবিধে আছে। তাই ১৩টি জেলাকে অনগ্রসর ঘোষণা করে এ-ব্যাপারে কিছুটা সুবিধে দেওয়া হল।

তবে সব ব্যাপারটাকে শুধু ভাগ্যের পরিহাস বলেই কি উড়িয়ে দেওয়া চলে? পশ্চিমবাংলা যথেষ্ট অগ্রসর, শিল্পে সমৃদ্ধ, সুতরাং এখানে আর কল-কারখানা বাড়ানো উচিত নয়, নতুন কল-কারখানা অন্যান্য পশ্চাদপদ রাজ্যেই খোলা হোক—কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তারা স্বাধীনতার পর থেকে অত্যন্ত সচেতন ও সুপরিকল্পিতভাবে কি এইনীতিই অনুসরণ করে আসেননি? আর তার ফলেই কি আজ চাকা একেবারে উল্টোদিকে ঘুরে গিয়ে পশ্চিমবাংলাকেই অনগ্রসর রাজ্য বলে ঘোষণা করতে হল না?

এর ফলটা কী দাঁড়ালো দেখুন। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৬, এই দশ বছরে গোটা দেশে কল-কারখানা খোলার জন্যে মোট আবেদনপত্রের সংখ্যা ছিল ১৪,০৮৪টি। তার মধ্যে পশ্চিমবাংলার ভাগে পড়েছিল ২২৯৫টি। খুব খারাপ বখরা মোটেই নয়, মোট আবেদনের সাত ভাগের এক ভাগের বেশি। এর মধ্যে ১৬৪৯টি আবেদন মঞ্জুর হয়েছিল, অর্থাৎ ঐ সংখ্যক লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছিল। পশ্চিমবাংলার চেয়ে বেশি লাইসেন্স পেয়েছিল একমাত্র মহারাষ্ট্র—২৭৪১টি। তারপর থেকেই কেমন যেন সব গণ্ডগোল হতে লাগল। পশ্চিমবাংলার ভাগে আবেদনপত্র বা লাইসেন্স দুই-ই কমতে

তাছাড়া আবেদনপত্র বা এমনকি লাইসেন্স নিয়েও ধুয়ে খেলে তো আর পেট ভরবে না। লাইসেন্স পেয়েও আমাদের শিল্পপতিরা তা কেমন নানা গূঢ় উদ্দেশ্যে চেপে রাখতে পারেন, সে-কাহিনী ডঃ আর কে হাজারির বিখ্যাত রিপোর্টেই ফাঁস হয়ে গেছে। আসল কথাটা হল, নতুন লাইসেন্স পাবার পর কল-কারখানা খোলা। ১৯৬৬ সালের পর থেকেই এ-ব্যাপারে পশ্চিম-বাংলার অধোগতির শুরু। ১৯৬৫ সালে যেখানে ৬২টি নতুন উদ্যোগ শুরু হয়েছিল, পরের বছর সেখানে হল মাত্র ৩৭টি। আর ১৯৬৭ সালে? মাত্র ৬টি। পরের দু' বছরে গোটা এগার করে নতুন উদ্যোগ শুরু হলেও ১৯৭০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র তিনে। গোটা দেশে ঐ বছর যতো নতুন উদ্যোগ শুরু হয়েছে, এই সংখ্যা তার শতকরা এক ভাগের দশ ভাগ!

নতুন কলকারখানা খোলার ব্যাপারে এই যখন হাল, তখন ঐ ১৯৬৬ সাল থেকেই দেশব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়ে গেছে। আর তার সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা এসে লাগল পশ্চিমবাংলার শিল্পের ওপর। কারণ, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের বড় অংশই এই রাজ্যে এবং মন্দার ধাক্কা এই ধরনের শিল্পের ওপরই এসে লাগে বেশি। কারণ, দুরবস্থার মধ্যেও লোকে ওষুধ কিনবে বা পরবার কাপড় কিনবেই, কিন্তু তখন সরকার ব্রিজ বা ওয়াগন বানাবার কাজ মুলতুবি রাখতেও পারেন। সবচেয়ে দুরবস্থা হল যে-সব কারখানা ওয়াগন তৈরি করে তাদের। তৎ-কালীন রেলমন্ত্রী সদোবা পাতিলের হুকুমে রেল-দপ্তর ওয়াগনের অর্ডার রাতা-রাতি কমিয়ে দিলে, আর সেই ধাক্কাটা লাগল এসে পশ্চিমবাংলায় সবচেয়ে বেশি। এইসব বড় কারখানার সঙ্গে যেহেতু অনেক ছোট কারখানার টিকি বাঁধা, তাই ধাক্কাটা তাদেরও গায়ে লাগল বেশ জোরেই। আর যেহেতু ছোট কারখানার তাগদ কম, তাদের অনেককে পাততাড়িও গোটাতে হল তাড়া-তাড়ি। অনেক লোকের চাকরিও যে গেল সে—কথা নিশ্চয়ই বলার দরকার নেই। ফলে তৈরি হল অশান্তির উর্বর জমি। সেই অশান্তিতে উৎপাদন কমতে লাগলো আরো। এদিকে অন্যান্য রাজ্যের ব্যবসায়ীরা বা সরকার পশ্চিমবাংলার কারখানায় কোনো মালের অর্ডার দিতে ভয় পেতে লাগলেন—সময়মতো ডেলিভারি পাবেন না, এই ভয়ে। ফলে মন্দা হল গভীরতর।। তৈরি হয়ে গেল চমৎকার একটা দুষ্টচক্র। ১৯৬৭ সালে এল প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার। শ্রমমন্ত্রী সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন অবদান ঘেরাও শুরু হওয়ার পটভূমি তৈরিই ছিল। শুরু হয়ে গেল সেই ঘেরাও।

দিল্লীর আরো দুটি অদূরদর্শী নীতি পশ্চিমবাংলার শিল্প-সংকটকে তীব্রতর করে তুলল। এমনকি যখন, অর্থাৎ ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত, এই রাজ্য যথেষ্ট লাইসেন্স পেয়েছে তখনও কিন্তু বিভিন্ন কেন্দ্রীয় অর্থ-প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে

অন্যান্য অনেক রাজ্যের চেয়ে কম। দ্বিতীয়তঃ, কাঁচামালের অভাবে এই রাজ্যের কল-কারখানা অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটিয়েছে। এই কাঁচামাল বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করেন কেন্দ্রীয় সরকার। ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প সম্পর্কে রাজ্য সরকার যে-সমীক্ষা কমিটি নিয়োগ করেছিলেন, তাঁরা তো এ-বিষয়ে বেশ কড়া মন্তব্য করেছেন। আর কাঁচামালের অভাব কি একটু-আধটু? পঞ্চম অর্থ কমিশনের কাছে রাজ্য সরকার যে স্মারক-লিপি দাখিল করেন, তাতেই দেখানো হয়েছিল, একটি নির্দিষ্ট বছরে পশ্চিম-বাংলা তার প্রয়োজনের তুলনায় তামা পেয়েছিল শতকরা সাড়ে এগার ভাগ, দস্তা সাত ভাগ, সীসা মাত্র আড়াই ভাগ! আজও যে এই রাজ্যের ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানায়, কাগজের কলে, কাপড়ের কলে ইস্পাত, পেপার পাল্‌পে বা সুতোর অভাবের তেমন সুরাহা হয়নি। এতদিন পরে সিদ্ধার্থবাবু যে ১৬-দফা কর্মসূচী ঘোষণা করলেন তাতে কাঁচামালের একটা ভাণ্ডার খোলার কথা বলা হল।

*

দুটো কথা বোধহয় এখানে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভালো। ১৯৬৭ সালে যুক্ত-ফ্রন্টের 'নৈরাজ্যের' সময় থেকেই পশ্চিম-বাংলার শিল্পের প্রসার থেমে গেছে, এটা বড় জোর অর্ধ-সত্য। সিদ্ধার্থশংকর রায়ের মুখ থেকেই আমরা শুনেছি যে, ১৯৬৫ সাল থেকেই এই রাজ্যে কোনো উন্নয়নের কাজ হয়নি। সেই সময়ে তো বটেই, তার পরেও বছর দুই কংগ্রেস সরকার চালু ছিল। সেই সরকারের নেতা ছিলেন প্রফুল্ল-চন্দ্র সেন। সেই প্রফুল্লবাবুই এখন অশান্ত বীরভূমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বলেছেন, দীর্ঘ দিনের বঞ্চনা ও অবিচারের ফলেই বীরভূমের মতো ঘটনা পশ্চিমবাংলায় ঘটতে পারছে। ১৯৪৭ থেকে '৬৭—এই কুড়ি বছরের প্রায় সবটাই মন্ত্রিত্ব করেছেন প্রফুল্লবাবু। আত্মসমালোচনার এমন সৎ উদাহরণ নিশ্চয়ই বিরল!

দ্বিতীয় প্রশ্ন : শ্রমিকদের মধ্যে অশান্তির জন্যেই পশ্চিমবাংলায় শিল্পের প্রসার ঘটতে পারছে না, এ-ধুয়োটাই বা কতোদূর সত্য? না, কখনোই এ-কথা বলছি না যে, এই রাজ্যে শ্রমিকদের অসন্তোষ নেই। কিন্তু সেটাকে শিল্পপতিরা যতোটা ভয়াবহ করে দেখাতে চান, ততোটা কি ঠিক? ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫, এই তিন বছরেই পশ্চিমবাংলায় যতো সংখ্যক শিল্প-বিরোধ দেখা দিয়েছিল, মহারাষ্ট্রে হয়েছিল তার দু'গুণ থেকে তিন গুণ বেশি। এমনকি ১৯৬৮ সালে, যখন পশ্চিমবাংলায় রীতিমতো নৈরাজ্য, তখনও এই রাজ্যে যেখানে ৪৩৫টি ধর্মঘট ও লক-আউট হয়েছে, মহারাষ্ট্রে হয়েছে সেখানে ৬১৬টি। কই, সেই কারণে মহারাষ্ট্রে শিল্প প্রসার তো বন্ধ হয়নি, সেখানে শিল্পপতিরা তো গেল গেল রব তোলেননি?

তবে পশ্চিমবাংলার প্রতি শিল্পপতি-দের অনীহার কারণটা কী? কারণটা এই যে, পশ্চিমবাংলায় যাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য, তাঁরা প্রায় সকলেই বাংলার বাইরের লোক। একদিকে দিল্লীও যেমন তাঁদের এই রাজ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র কল-কারখানা খুলতে উৎসাহ দিয়েছে, তেমনই তাঁরাও কোনোদিন পশ্চিমবাংলাকে নিজের রাজ্য বলে মনে করেননি। তাঁরা এখানে মুনাফা লুটেছেন, কিন্তু মনে রেখেছেন সর্বদাই রাজস্থান বা গুজরাটের নিজের গ্রাম-শহরের কথা। মহারাষ্ট্র বা বোম্বাই শহরের ক্ষেত্রে ঘটেছে ঠিক উল্টোটা। পার্শী ব্যবসায়ীরা তো বটেই, বোম্বাইয়ের গুজরাটী ব্যবসায়ীরাও বোম্বাইকে নিজেদের শহর বলে মনে করে তার উন্নয়নে মন-প্রাণ সমর্পণ করেছেন। মহারাষ্ট্রের বৈষয়িক বিকাশের প্রশ্নকেও তাঁরা উপেক্ষা করেননি।

আর, অবাঙালী শিল্পপতিদের দোষ দিয়েই বা লাভ কী? অন্ততঃ এক-আধজন বাঙালী শিল্পপতিও তো ছিলেন যাঁরা দেশের প্রথম দশজন শিল্পপতিদের মধ্যে স্থান পান। তাঁরাই বা পশ্চিমবাংলার মধ্যে কতোটুকু শিল্পের প্রসার ঘটিয়েছেন, কতোটা উদ্যোগী হয়েছেন কলকাতাকে বাঁচাতে?

*

বড় বড় শিল্পপতিদের কথা ছেড়ে দিন, কিন্তু যেখানে বাঙালিদের প্রাধান্য কিছু বেশি, পশ্চিম বাংলার সেই ক্ষুদ্র শিল্পের দিকে তাকালে কী দেখা যায়? এককালে হাওড়ার নাম ছিল ভারতের শেফিল্ড। আজ তার অবস্থা কী? ছোট শিল্পের ভাগ্য অবশ্যই বড় শিল্পের সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা, কারণ বড় কারখানাকে মাল জুগিয়েই বেশির ভাগ ছোট কারখানা বেঁচে থাকে। আর বড় কারখানার যখন বরাত মন্দ তখন ছোট কারখানার সময় তো খারাপ হবেই। আসলে বড় কারখানার সঙ্গে এই টিকি বেঁধে রাখাটাই পশ্চিম বাংলায় ছোট কারখানার দুর্ভাগ্যের একটা বড় কারণ। আর বড় কারখানার মতো ছোটগুলোর ঝোঁকও ইঞ্জি-নীয়ারিং শিল্পের দিকে। যে পাঞ্জাবে ছোট কল-কারখানার এখন জয়-জয়কার সেখানে কিন্তু ছোট কারখানার মালিকেরা বেশি করে রোজকার প্রয়োজনীয় জিনিস, অর্থাৎ ভোগ্যপণ্য তৈরিতে মন দিয়েছেন।

*

কিন্তু গত পাঁচ বছরে গোটা দেশে গড়পড়তা যেখানে প্রতি বছর প্রায় ১৭ হাজার নতুন ছোট কারখানা খোলা হয়েছে, সেখানে এই রাজ্যে বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গেল কেন? আর যেগুলি খোলা আছে, সেগুলিই বা ধুঁকছে কেন? অপ্রিয় সত্যটা এই যে, এর জন্যেও দায়ী দিল্লীর নীতি। বড় কারখানার মতো ছোট কারখানাও মার খেয়েছে কাঁচা মালের অভাবে এবং ছোট কলেই বোধহয় উপেক্ষাটা জুটেছে তাদের বরাতে আরো বেশি। বছরে যে পরিমাণ ইস্পাত দরকার তার শতকরা তিন ভাগ থেকে পাঁচ ভাগের বেশি জোটেনি তাদের। এইভাবে কি কোনো শিল্প বেঁচে থাকতে পারে? একে তো দিল্লীর এই মনোভাব, তার ওপর রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরও সময় মতো কাঁচা মালের প্রয়ো-জনীয়তার কথা কেন্দ্রকে জানাতে পারেনি।

সিদ্ধার্থবাবু যে ১৬-দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন তাতে ছোট শিল্প স্থাপনের ওপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় যদি সত্যিই প্রতি বছর দু হাজার নতুন ছোট কারখানা খুলতে হয় তবে এই ধরনের সমস্যার সুষ্ঠু মীমাংসাটাই আগে দরকার।

আগের এক 'পটভূমিতে' বলেছিলাম যে পশ্চিম বাংলার উন্নয়নের রুদ্ধগতির অন্যতম কারণ দিল্লীর মনোভাব। সিদ্ধার্থশংকর রায় কি সেই মনোভাব পাল্টাতে পারবেন?—এই ছিল প্রশ্ন। ১৬-দফা কর্মসূচী এই কথাই বলছে যে, অন্ততঃ বেশ কয়েকটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তিনি দিল্লীতে নাড়া দিতে পেরেছেন। তার মধ্যে ওয়াগনের অর্ডার, কাঁচা মালের জোগান, আর্থিক সাহায্য, বন্ধ কারখানার ভার নেওয়া প্রভৃতি দরকারী বিষয় রয়েছে। এখন দরকার তিনটে জিনিস। প্রথমটা হচ্ছে অবশ্যই, দিল্লীর নানা প্রতিশ্রুতি যাতে কাজে পরিণত হয় তার জন্যে সিদ্ধার্থ-বাবুকে আরো চেষ্টা চালাতে হবে। কারণ এর ওপর শুধু পশ্চিম বাংলারই নয়, তাঁর নিজেরও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করছে। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পপতিরা যে সব সুবিধের জন্যে এতদিন গলা ফাটা-চ্ছিলেন তার অনেকগুলিই এখন তাঁরা পেতে চলেছেন। তাঁরা এই সুযোগ কি ছেড়ে দেবেন? শেষে থাকে, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের কথা। এই কর্মসূচী যাতে সক্ষম হতে পারে তার জন্যে তাঁদের কি কিছুই করণীয় নেই?

২৮।৮।৭১　　—দেব দত্ত

দেশে বিদেশে

খাদ্য ফসল উৎপাদনে ভারত আবার রেকর্ড করেছে। ১৯৭০-৭১ সালের যে হিসাব প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, দেশে ঐ বছর মোট ১০ কোটি ৭৫ লক্ষ ৭০ হাজার টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় এটা ৮-৪ শতাংশ বেশী। এই নিয়ে পর পর চারবার আমাদের দেশে গমের উৎপাদন আগের বছরের তুলনায় বাড়ল। শুধু গমই নয়, চাল, বজরা, ভুট্টা প্রভৃতি ফসলের উৎপাদনেও এবার আমাদের দেশের চাষীরা রেকর্ড করেছেন।

এই সুফলনে উৎসাহিত হয়ে নয়াদিল্লীর কৃষি মন্ত্রণালয় একদিকে যেমন অদূর-ভবিষ্যতে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের স্বপ্ন দেখছেন অন্যদিকে তেমনি ইতিমধ্যেই 'প্রাচুর্যের সমস্যা'র কথা বলতে আরম্ভ করেছেন।

কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ সম্প্রতি নয়াদিল্লীর বিজ্ঞানভবনে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে চার ঘণ্টাব্যাপী এক বৈঠকের শেষে সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন যে, সরকার খাদ্যশস্যের ব্যাপারে 'প্রাচুর্যের সমস্যা' নিয়ে বিব্রত হয়ে উঠেছেন। বর্তমান বছরের গোড়ার দিকে বাজারে প্রচুর পরিমাণ গম আসায় সেই গম সংগ্রহ, গুদামজাত ও স্থানান্তর করা নিয়ে ফুড কর্পোরেশনকে যে অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল সেকথা মনে রেখেই কৃষিমন্ত্রী 'প্রাচুর্যের সমস্যা'র কথা বলেছিলেন এবং এই সব অসুবিধা দূর করার জন্য এবার আগে থেকে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় সেটাই রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীরা আলোচনা করছিলেন।

কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে, এখনই 'প্রাচুর্যের সমস্যা' নিয়ে কথা বলার সময় এসেছে কি? আমাদের দেশে এখনও তো জনসংখ্যার বৃহৎ অংশের ভরপেট খাওয়া জোটে না। তাহলে, সমস্যাটা কি প্রাচুর্যের? অথবা, বন্টনের? অথবা সরকারী ব্যবস্থাপনার? তাছাড়া, অদূরভবিষ্যতে আমাদের দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার আশাই বা কতটা বাস্তব? সেই কবে লেখা হয়েছিল, 'ভারতবর্ষের চাষ-আবাদ হচ্ছে বৃষ্টি নিয়ে জুয়া খেলা।' এখনও কথাটা ভারতবর্ষ সম্পর্কে যতটা সত্য তত আর কোন দেশ সম্পর্কে নয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বর্ষণের মুখ চেয়ে থাকে আমাদের দেশের খাদ্য ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ। আর এই

বছরে ফসল উঠল, না হলে গেল। যদিও চীনের বাইরে পৃথিবীর আর কোন দেশ নেই যেখানে ভারতের চেয়ে বেশী পরিমাণ জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে, যদিও দক্ষিণ ভারতে কোথাও কোথাও আমাদের সেচ-ব্যবস্থা হাজার বছরেরও বেশী পুরানো, তাহলেও ভারতে এখন পর্যন্ত মোট চাষের জমির মাত্র এক-চতুর্থাংশে সেচের জল পৌঁছেছে। এবং এই এক-চতুর্থাংশেরও আবার এক-তৃতীয়াংশে অধিক ফলনশীল বীজ পৌঁছেছে। তার মানে, আমাদের এই তথাকথিত প্রাচুর্যের ভিত্তি খুবই সংকীর্ণ। সামান্য একটু আঘাতেই এই প্রাচুর্যের বনিয়াদ ভিত্তিচ্যুত হয়ে যেতে পারে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশন (ভারতে সবুজ বিপ্লবের পিছনে এই ফাউণ্ডেশনের যথেষ্ট সাহায্য রয়েছে) মনে করেন, ভারত আগামী এক দশকের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে না।

আর কেউ নয়, কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী শের সিংও সম্প্রতি প্রচুর ফলনশীল বীজের উপর অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করার সমীচীনতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। দিল্লীতে একটি সভায় তিনি বলেছেন, কতকগুলি অধিক ফলনশীল বীজে পোকা-মাকড় ও ব্যাধির উৎপাত উদ্বেগের সৃষ্টি করছে। তিনি বলেছেন, অধিক ফলনশীল বীজে প্রচুর পরিমাণে সেচের জল, সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। এর দ্বারা আমাদের লক্ষ লক্ষ ছোট চাষীর চাহিদা পূরণ হবে না।'

বছর দুয়েক আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগ দেশব্যাপী একটি অনুসন্ধান চালিয়ে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, 'সবুজ বিপ্লব' লাল বিপ্লবে পরিণত হতে পারে। ইতিমধ্যে এটা সকলেই বুঝেছেন যে, সবুজ বিপ্লব গ্রামাঞ্চলে ধনবৈষম্য বাড়িয়ে তুলছে। যারা এই বিপ্লবের দ্বারা উপকৃত হয়েছে আর যারা হয় নি তাদের মধ্যে ব্যবধান বাড়ছে। যেসব জমিতে জল-সেচের ব্যবস্থা নেই সেসব জমির চাষীরা, যাদের জমির পরিমাণ কম এবং বেশী পরিমাণে সার, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহার করার সামর্থ যাদের নাই, যারা ভূমিস্বত্বহীন খেত-মজুর, এরা সকলেই সবুজ বিপ্লবের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত। এসব বিষয় বিবেচনা করেই ভারত সরকার জলসেচহীন এলাকায় ফসল বাড়াবার, ক্ষুদ্র চাষীদের সাহায্য দেওয়ার, ভূমিহীন কৃষকদের সাময়িক কাজ দেওয়ার বিশেষ পরিকল্পনা

যে পাঞ্জাব আজকের সবুজ বিপ্লবের পীঠস্থানরূপে গণ্য সেখানকার সরকারের কাছ থেকেই এই বিপ্লবের সীমাবদ্ধতার স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। কৃষি কমিশনের কাছে একটি বিবৃতি দিয়ে পাঞ্জাব সরকার বলেছেন : 'গম বিপ্লব ছোট চাষীদের অবস্থার উন্নতি করে নি, কৃষি মজুরদেরও উপকার করে নি। তারা জীবন ধারণের ন্যূনতম মানের নীচেই পড়ে থাকবে।'

•

চার বছর পরে সি সুব্রহ্মণ্যম সংসদের সদস্য হয়ে দিল্লীতে ফিরে এলেন। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে দাঁড়িয়ে তিনি হেরে গিয়েছিলেন। ফলে ঐ নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় তাঁর স্থান হয় নি। লোকসভার গত মধ্যবর্তী নির্বাচনে দাঁড়ান নি। তা সত্ত্বেও নির্বাচনের পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে পরিকল্পনা মন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করেছিলেন। নির্বাচন কেন্দ্র বদল করে একটি উপ-নির্বাচনে জিতে এসে সুব্রহ্মণ্যম এবার নিজের আসন পাকা করলেন।

তামিলনাড়ুর কৃষ্ণাগিরি থেকে এই উপ-নির্বাচনে সুব্রহ্মণ্যম বলতে গেলে এক রকম বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। গত মধ্যবর্তী নির্বাচনে ঐ কেন্দ্র থেকে শাসক কংগ্রেসের একজন প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন। সুব্রহ্মণ্যমকে জায়গা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি পদত্যাগ করেন। ডি-এম-কে ও সি-পি-আই আগেই ঘোষণা করেছিল যে, তারা সুব্রহ্মণ্যমকেই সমর্থন করবে। স্বতন্ত্র পার্টি এই উপনির্বাচনে নিরপেক্ষ ছিল আর বিরোধী কংগ্রেস সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে ছিল। তাহলেও এক ডজন নির্দলীয় প্রার্থী সুব্রহ্মণ্যমের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একে একে এগারজন নাম প্রত্যাহার করে নিলেও ২৮ বছর বয়স্ক বরদা দেশিকন্ অটল হয়ে থাকেন। তিনি বলেছিলেন যে, সুব্রহ্মণ্যম যদি প্রধানমন্ত্রীর উপর চাপ দিয়ে কাবেরীর জলসংক্রান্ত বিরোধ তামিলনাড়ুর অনুকূলে মীমাংসা করিয়ে দিতে পারেন তাহলে তিনি নাম প্রত্যাহার করে নেবেন। সুব্রহ্মণ্যম তাঁর এই দাবী মেনে নেন নি এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেশিকনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল। দেশিকন্ অবশ্য এই নির্বাচনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁর স্বপক্ষে পোস্টার পড়ে নি তাঁকে নির্বাচকমণ্ডলীর সমক্ষে যেতে কেউ দেখে নি। তাঁর কোন এজেন্ট ছিল না, তিনি নির্বাচনের জন্য টাকা তোলেন নি। অপর-পক্ষে সুব্রহ্মণ্যম শ দেড়েক জনসভা করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি, চিত্রাভিনেতা (ও ডি এম কে নেতা) জি রামচন্দ্রন তাঁর হয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। দেশিকনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে এবং সুব্রহ্মণ্যম ১ লক্ষ ৭০ হাজারের বেশী ভোটে জয়ী হয়েছেন।

•

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে উদ্ভূত আন্ত-

বার্লিন সমস্যার চেয়ে দুরূহতর আর কোনটি নয়, এই একটি সমস্যার সমাধানের উপর যতগুলি প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে এমন আর কোন একটিও নেই।

নিকিতা ক্রুশ্চভ যে সময়ে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সে সময়ে তিনি একবার বলেছিলেন, পশ্চিম বার্লিন হচ্ছে 'ক্যান্সারভুক্ত'; এটাকে কেটে বাদ দিতে হবে। ১৯৬১ সালের জুন মাসে ভিয়েনাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির সংগে আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভ এই বলে হুমকী দিয়েছিলেন যে সোভিয়েট রাশিয়া পূর্ব জার্মানীর সংগে চুক্তি করবে এবং তারপর বার্লিনের কোন অংশে পশ্চিমী শক্তিবর্গের উপস্থিতি পূর্ব-জার্মানীর সার্বভৌমত্বের উপর হস্তক্ষেপ হিসাবে গণ্য হবে ও বলপ্রয়োগে সেই হস্তক্ষেপের মোকাবিলা করা হবে। ক্রুশ্চভের এই মন্তব্যের দুই মাসের মধ্যেই পূর্ব জার্মান সরকার বার্লিন শহরের উপর কংক্রিটের দেওয়াল তুললেন। পরবর্তীকালে এই দেওয়াল দুই জার্মানীর সম্পর্কের পথে একটা বড় কাঁটা হয়ে রয়েছে। পশ্চিমের হিসাব অনুযায়ী, পূর্ব বার্লিন থেকে ঐ প্রাচীর অতিক্রম করে পশ্চিম বার্লিনে পালিয়ে আসতে গিয়ে এযাবৎ ৬৫ জন প্রাচীররক্ষীদের হাতে নিহত হয়েছেন।

২৩ বছর আগে, ১৯৪৮ সালে, বার্লিনে বিশ্বের প্রধান দুই শক্তি, সোভিয়েট রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে প্রায় পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। সে সময়ে পূর্ব জার্মানীর মাটির উপর দিয়ে পশ্চিম বার্লিনে আসার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং তার ফলে পশ্চিম বার্লিন অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে সময়ে বিমানযোগে রসদ সরবরাহ করার জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তম আয়োজন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর পূর্ব জার্মান সরকারও কিছু দিন পরে অবরোধ তুলে নেন। এভাবে, সেবারকার মত বৃহৎ শক্তিবর্গ বার্লিন প্রশ্নে একটা বিস্ময়কর সঙ্কটের কিনারা থেকে ফিরে আসতে পেরেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে চারটি বৃহৎ শক্তির সৈন্য বাহিনী নাৎসী জার্মানীকে পরাজিত করেছিল কাগজে-কলমে তারাই পুরানো, ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর এই রাজধানী শহরের শাসক। শহরটিকে চারটি চাকলায় বিভক্ত করে প্রত্যেকটি চাকলাকে এক একটি করে বিজয়ী শক্তির শাসনাধীন এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। সোভিয়েট এলাকা পূর্ব বার্লিনে যেখানে পূর্ব জার্মানীর সরকার অর্থাৎ জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী স্থাপিত হয়েছে। পশ্চিম বার্লিন হল মার্কিন, বৃটিশ ও ফরাসী এলাকা। বার্লিন নিয়ে যে কারণে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে সেটা হল এই যে, এই শহর চতুর্দিকে পূর্ব জার্মানীর এলাকা দ্বারা পরিবেষ্টিত, এখান থেকে পশ্চিম জার্মানীর নিকটতম সীমান্ত হচ্ছে ১১০ মাইল। এক তরফে দুই জার্মানী আর এক তরফে বিচ্ছিন্ন দ্বীপভূমির মত বার্লিন, এর মধ্যে শহরটির সঠিক রাষ্ট্রনৈতিক মর্যাদা কি? পূর্ব জার্মানীর সরকার মনে করেন (অন্তত এত কাল মনে করে এসেছেন) তাঁদের ভূমির উপর অবস্থিত এই শহর তাঁদেরই। সোভিয়েট রাশিয়া পূর্ব জার্মানীর এই অভিমত সমর্থন করে এসেছে। আবার কখনও কখনও সোভিয়েট তরফ থেকে ইঙ্গিত এসেছে যে, তারা বার্লিনকে একটি পৃথক 'ফ্রি সিটি' হিসাবে গণ্য করতে রাজী আছে। অন্য দিকে, পশ্চিম জার্মানীর নেতারা পশ্চিম বার্লিনকে তাঁদের শহর হিসাবেই গণ্য করে এসেছেন। তাঁরা দুই-দুইবার এই শহরে চ্যান্সেলার নির্বাচন করে তাঁদের অধিকার পাকা করার চেষ্টা করেছেন। বনকে তাঁরা আগাগোড়াই তাঁদের দেশের অস্থায়ী রাজধানী হিসাবে দেখে এসেছেন। বন পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী হওয়ার উপযুক্ত বড় শহর কোনকালেই ছিল না, এখনও নয়। পশ্চিমী শক্তিবর্গ পশ্চিম বার্লিনের উপর বন সরকারের দাবী স্পষ্টাস্পষ্টি মেনে না নিলেও এ ব্যাপারে তাঁদের যথেষ্ট প্রশ্রয়ই দিয়েছেন।

এই জটিল বিরোধ ও প্রায় ২৫ বছরের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পটভূমিকায় আজ থেকে আঠারো মাস আগে বৃহৎ চতুঃশক্তির রাষ্ট্রদূতেরা বার্লিন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন। এই আঠারো মাস ধরে তাঁদের মধ্যে ধীর-মন্থর গতিতে আলোচনা চলছিল। আলোচনার একটি বিষয় ছিল, পূর্ব জার্মানীর উপর দিয়ে পশ্চিম জার্মানী ও বার্লিনের মধ্যে যাতায়াতের অবাধ অধিকার দেওয়া হবে কিনা। যদিও সাধারণত পশ্চিম জার্মানী থেকে পূর্ব জার্মানীর মাটির উপর দিয়ে বার্লিনে যেতে দেওয়া হয় তাহলেও এটা একটা রেওয়াজ মাত্র, কোন বোঝাপড়ার ভিত্তিতে পশ্চিম জার্মানী এই অধিকার ভোগ করে না। সোভিয়েট রাশিয়া বলে এসেছে যে, এই অধিকার চাইতে হলে পশ্চিম জার্মানীকে পূর্ব জার্মানীর সংগে কথা

বলতে হবে। পশ্চিমী শক্তিত্রয় তাতে রাজী নয়, তারা পূর্ব জার্মানীর সরকারকে স্বীকার করে না, বার্লিনের উপর তাঁদের অধিকারও মানে না। এই নিয়ে আলোচনা যখন একটা অচল অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তখন গত মে মাসে অকস্মাৎ সোভিয়েট রাশিয়া ঘোষণা করল, পূর্ব জার্মানীর উপর দিয়ে রেল ও সড়কপথে পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে বার্লিনের যোগাযোগ রাখার অধিকার তারা স্বীকার করে নেবে। এই ঘোষণার পর থেকেই এরকম আভাষ পাওয়া যাচ্ছিল যে, রাষ্ট্রদূতদের আলোচনার মীমাংসার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

তারপর পাওয়া গেল সেই সুসংবাদ। আলোচনার শেষ তিনদিনে মোট প্রায় ২৩ ঘণ্টা বৈঠক করে চার রাষ্ট্রদূত একটি চুক্তির খসড়া তৈরি করেছেন। পশ্চিম বার্লিনে পুরানো প্রাশিয়ান হাইকোর্ট ভবন থেকে বেরিয়ে এসে রাষ্ট্রদূতরা চুক্তি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। রুশ রাষ্ট্রদূত বললেন, "নিখুঁত," মার্কিন বললেন, "ভালো", বৃটিশ রাষ্ট্রদূত বললেন, "সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত," ফরাসী রাষ্ট্রদূতের মন্তব্য : "সন্তোষজনক"। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর সরকার ইতিমধ্যে খসড়া চুক্তিটি অনুমোদন করেছেন। এখন শুধু মস্কো, ওয়াশিংটন, লণ্ডন ও প্যারিসের অনুমোদনের অপেক্ষা।

খসড়া চুক্তির সর্তগুলি অবশ্য এখন পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছে। তবে সংবাদের সূত্র থেকে যতটুকু জানা গেছে, খসড়া চুক্তিটিতে এই সব বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে :—

পশ্চিম জার্মানী থেকে পশ্চিম বার্লিনে যাতায়াতের পথ।

প্রাচীর অতিক্রম করে পশ্চিম বার্লিন-বাসীদের পূর্ব বার্লিনে যাওয়ার অনুমতি। পশ্চিম বার্লিনে পশ্চিম জার্মানীর সর্তাধীন রাজনৈতিক উপস্থিতি।

বিদেশে পশ্চিম জার্মানীর মারফৎ পশ্চিম বার্লিনের প্রতিনিধিত্ব।

পশ্চিম জার্মানীতে সোভিয়েট কনসাল-জেনারেলের প্রতিনিধিত্ব।

বার্লিন সম্পর্কে এই চুক্তির বড় গুরুত্ব হল, পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর হিবলি ব্রান্টের "অস্টপলিটিক" অর্থাৎ পূবের দেশগুলির সঙ্গে সমঝোতার রাজনীতির সাফল্য কতক পরিমাণে এই চুক্তির উপর নির্ভর করছে। পশ্চিম জার্মানী সম্প্রতি রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে যে দুটি আক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সেগুলি হের ব্রান্টের "অস্টপলিটিক"-এরই ফসল। কিন্তু বার্লিন সম্পর্কে চতুঃশক্তির মধ্যে মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত এই দুটো চুক্তি কার্যকর করা যাচ্ছিল না।

এছাড়া সোভিয়েট রাশিয়া ইউরোপের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসতে আগ্রহী। তারা ইউরোপে "ন্যাটো" ও ওয়ারস চুক্তিভুক্ত দেশগুলির সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করার প্রস্তাব দিয়েছে। ইউরোপে উত্তেজনা হ্রাস ও ঐ মহাদেশ থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে আসায় সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকা, দুই পক্ষেরই আগ্রহ রয়েছে। রাশিয়াকে এখন চীনের সীমান্তের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে আর আমেরিকাকে অর্থনৈতিক কারণে বিদেশে ডলার খরচ কমাবার কথা ভাবতে হচ্ছে।

কিন্তু ইউরোপে নিরাপত্তা সম্মেলনের প্রস্তাবই হোক অথবা সেখান থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে আসার প্রস্তাব হোক, ঐ মহাদেশে উত্তেজনা হ্রাসের পথে একটি বড় প্রতিবন্ধক ছিল বার্লিন প্রশ্ন। এই প্রশ্নের মীমাংসা হলে আপনা-আপনিই যে অন্যান্য সমস্যার নিরসন হয়ে যাবে তা নয়; কিন্তু বার্লিন নামক পথের কাঁটাটি দূর হয়ে গেলে অন্ততঃ পরবর্তী পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করা যাবে।

—পুণ্ডরীক

সহযাত্রী ॥

কৃষ্ণ ধর

হয়তো এখনো নয়
সময় হলেই আসবে, হয়তো তখন
মুখোমুখি তাকে দেখে অবাক বিস্ময়ে থাকব চেয়ে
বলব, এই কি সময়?

এইভাবে কতদিন আকাশ আগুন-রাঙা দেখে
ভেবেছি নিজেই বুঝি হইনি তৈরি বুঝে শুনে
ভেবেছি শিমুলে এমনি জ্বলজ্বল চৈত্রের হাওয়ায়
আগুন ছড়ায়।

তাহলে কি সারাক্ষণ বসে থাকব প্রতীক্ষায়
কখন সময় হবে বলে
কখন দরজায় দেবে টোকা
চুপি চুপি নিশুতির খাপ-খোলা ঝলসানো আঁধারে
পরিচিত কণ্ঠস্বরে ডাক দেবে, ভয় কিরে চলে আয়
আমি তোর নিত্যসহচর!
তারপর অন্ধকারে পথ চিনে স্মৃতি বিস্মৃতির গন্ধ মেখে
চলে যাব হাত ধরে রাত মোহানার ধার ঘেঁষে
চলিষ্ণু নদীর কলরবে
সেখানে তরল আলোয় পরস্পর নেব মোরা চিনে
কার জন্য এ প্রতীক্ষা, কে বা সেই আকাঙ্ক্ষিত পথের দোসর।

কিছু ছাড়া যায় কিন্তু সব নয় ॥

হেনা হালদার

কিছু কিছু ছাড়া যায়, সব নয়।
সব কিছু ছাড়তে গেলে ঠিক কিছু হাতে
থেকে যায়। ধানের কুনকের গায়ে
মোহরের মত কিছু লিপ্সা আটকে থাকে......
যা থেকে আন্দাজ করা যায় কত ছিল
জমার খাতায়, গেছে কতটুকু
খরচের খাতে। অপিচ সাধের সঙ্গে
সাধ্যের দূরত্ব চিরকাল
দুরতিক্রম্য-ই থাকে। সমান্তরালে বহমান
যেন দুই নদী।
অথচ ছাড়বার ইচ্ছা ক্রমশ দুর্বার হয়ে হয়ে
ঝড়ের নৌকার মত নোঙর ছিঁড়েও
ফিরে আসে ঘাটে।
বাসনার সোনার পাখীর একটা ডানা কেটে
উড়িয়ে দিলেও
রিপ্লাই-কার্ডের মত নতুন সংবাদ নিয়ে
নীড়ে ফিরে আসে।

বাংলা দেশ ॥ কামাল মাহবুব

সমস্ত হৃদয় বাংলাদেশের দিকে থেকে যাচ্ছে
গাছপালা সব ছুটে যাচ্ছে সীমান্ত পেরিয়ে
নদীর প্রতিটি প্রবাহের মুখ তার উৎসের পথে
মেঘের ভেলাপুঞ্জ চিরকাল বাংলার মানচিত্র মানে না।

আমি যেদিকেই যাচ্ছি আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াচ্ছে আত্মীয় পরিজন
কিংবা চিরচেনা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী
শৈশবের স্মৃতিময়তা, ভালোবাসা, দুঃখ-শোক, বেদনা ও ক্লান্তি
একবাক্যে সকলেই প্রশ্ন করছে : তুমি কোথায় যাচ্ছ?

আমি কোথায় যাচ্ছি, আমি কোথায়, কিছুই জানি না
কেবল শরণার্থীরা ছাড়া সবাই যাচ্ছে বাংলাদেশের পথে
সব পাখি, তরুলতা, প্রিয় ফুল, প্রকৃতির সাথে
নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাচ্ছে উটের পিঠের মত রামগড়ের পাহাড়।

ফিরে যাব বলে আমি সন্তর্পণে বাংলাদেশ পেরিয়ে এলাম।

ভদ্রলোক শেষবারের মত আবেদন জানালেন, দিন না দয়া করে। আমি বড় আশা নিয়ে এসেছি। যদিও প্রায় অসম্ভব, তবু যে করেই হোক, ইংরেজী আর অংকের জন্য একজন প্রাইভেট টিউটর রেখে দোব। আশা করি মেকআপ করে ফেলবে।

কমলা কোন কথা বলল না। অনেক বার বলেছে, অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা, কিছুতেই বুঝতে চান না, প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে সেই একই কথা বলে চলেছেন, দিন না দয়া করে। যেন কমলা দয়া করলেই ও'র মেয়ে একেবারে ফার্স্ট ডিভিশনে বেরিয়ে যাবে! কমলা কোন কথা বলল না, মুখ তুলেও চাইল না, আপন মনে লিখতে লাগল।

ভদ্রলোক একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর আবার বলতে লাগলেন, আমাদের গ্রামের স্কুল সেক্রেটারীর সঙ্গে আমার বিশেষ হৃদ্যতা আছে। উনি আমায় কথা দিয়েছেন চামেলী হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করলেই ওকে প্রাইমারী সেকশনে নিয়ে নেবেন, তারপর প্রাইভেটে বি-এ দিতে [illegible]। আবার একটু চুপ করে রইলেন, তারপর বলতে লাগলেন, আমার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে চামেলীই সবার বড়, ও রোজগার শুরু না করলে একা সংসার চালানো খুবে কঠিন হয়ে পড়ছে। আমার শরীরটাও কিছুদিন ধরে খারাপ যাচ্ছে, রোজ বিকেলে টেম্পারেচার হয়, বুকের বাঁ পাশটা ব্যথা-ব্যথা করে—

কমলা এবার মুখ তুলল, খানিকটা বিরক্তিই বিচ্ছুরিত হল তার কথার সুরে, দেখুন, এসব ব্যক্তিগত কথা শুনে লাভ নেই। অত সময়ও নেই। এক সাবজেক্টে যারা দশ নম্বর কম পেয়েছে, এবার তাদেরও এ্যালাউ করা হয়েছে। আর চামেলীর দু-দুটো সাবজেক্টে শর্ট। কি করে ওকে এ্যালাউ করা যাবে বলুন। তাহলে, ওর মত দুটোতে ফেল করেছে এমনি আরও মেয়ে আছে, তাদের কি করব? তাদের গার্জিয়েনরা এসে হামলা করলে কি জবাব দোব?

ভদ্রলোক তথাপি বলতে লাগলেন, আমি হেড মিসট্রেসের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, উনি বললেন আপনার সঙ্গে কথা বইতে—

- মাপ করবেন, আমার কিছু করবার নেই। দুঃখিত।

কমলা লেখায় মন দিল। ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপটি করে বসে রইলেন, তারপর ছাতাটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, নমস্কার, তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন।

ভীষণ রাগ হচ্ছিল বাসন্তীদির ওপর। উনি হেড মিসট্রেস, অথচ সমস্ত ঝক্কি কমলার ওপর। নিজে বেড়াবেন রাজনীতি করে। মাসের মধ্যে পনেরো দিনও আসেন কিনা সন্দেহ। আসেন না রাজনীতি করেন বলে। এলেও রাজনীতির পাণ্ডারা হানা দেয়, ক্লাশ কামাই হয়, খাতাপত্র পড়ে থাকে, স্কুলের অফিস রাজনীতির আড্ডায় রূপান্তরিত হয়। সেই কোনকালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে নাকি মাস ছয়েক জেল খেটেছিলেন, বাস, দেশ স্বাধীন হবার পর এক লম্ফে একেবারে হেড মিসট্রেস। রাজনৈতিক নির্যাতনের পুরস্কার। স্বামী দিল্লীতে ফরেন ডিপার্টমেন্টের বড় চাকুরে, সুতরাং খুঁটির জোর প্রবল, বাধা দেবে কে? বি-টি যখন দিলেন, দিয়ে [illegible]

বাধ্য হয়ে, কারণ বি-টি না হলে হেড মিসট্রেস হওয়া যায় না, তখন বাসন্তীদির চুলে পাক ধরে গেছে। দুই সাবজেক্টে ফেল-করা মেয়েকে যদি খাতির দেখাতে হয়, নিজে দেখালেই পারতেন! কমলা ভাবল, কি জানি, চামেলীর বাবা বাসন্তীদির রাজনৈতিক শাকরেদ হবে হয়ত।

কোয়ার্টার্সে ফিরে আসতেই হারানী-মাসী চা ও খাবার নিয়ে এল। বলল, মা-মণি, আরতি-মাসী আর মেনকা-মাসী দু-দুবার তোমার খোঁজ করে গেছে।

কেন, মাসী কিছু বলেছে?

তোমার নাকি ওদের সংগে সিনেমা দেখতে যাবার কথা ছিল। বলে গেল, কমলাদিকে বলো মাসী, আমরা খোঁজ করে গেছি।

কমলা খাবার টেনে নিল! সত্যিই ত, সিনেমায় যাবার কথা ছিল। হাজারো কাজের মধ্যে ডুবে থেকে সেকথা আর মনেই নেই। সাড়ে ছটা বাজে। সিনেমা-টিনেমায় আর যাওয়াই হয় না। শেষ কবে গিয়েছিল? কমলার মনে পড়ল, সে প্রায় এক বছর আগে। কিন্তু সেও কি আর সখ করে? চ্যারিটি শো হবে দেশবন্ধু পাঠাগারের জন্য, টিকিট গছিয়ে গিয়েছিল. প্রভাতবাবুও কিনেছিলেন, তিনিই জোর করে নিয়ে গিয়েছিলেন। নইলে সখ-টখ কবে ছেড়ে দিয়েছে কমলা। সারাটি দিন স্কুলে পাথরের মুখোশ পড়ে কাজ করতে হয়। মেয়েরা ভয় করে বাঘের মত। কত যে আনপ্লেজেণ্ট কাজ করতে হয়, তার ইয়ত্তা নেই। বিশেষ করে পরীক্ষা-টরিক্ষার পর কত যে মেয়ে এসে কাঁদে, কত অভিভাবক এসে ধরাধরি করেন, কিন্তু চোখের জলে বা চাটু কথায় ভিজে গেলে এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান চালানো যায় না। বাড়ীতে ফিরে এলেও সেই মুখোশটা যেন আর ছাড়ানোই যায় না। হালকা জিনিস আর ভাল লাগে না। না, শনি রবিবারেও না। আরতি আর মেনকা নূতন এসেছে, বয়স কম, দায়-দায়িত্ব বিশেষ নেই, তাই ওদের সাজে প্রজাপতির মত উড়ে উড়ে বেড়ানো। সিনেমা বোধহয় একটিও বাদ যায় না আর স্কুলে ত পড়াতে যায় না, যেন যায় সাজ দেখাতে, বেড়াতে। কমলার আশ্চর্য লাগে, কি করে ওদের সংগে এত শাগির্দের এত ভাব হয়ে গেল! আরও ত কত টিচার আছে, তাদের সংগে ওরা ভদ্রতা রেখে চলে আর যত খুনসুটি দুষ্টুমি কমলার সংগে। সব সময় ভাল না লাগলেও রাগ করবার উপায় নেই, কারণ ভারী মিষ্টি মেয়ে দুটি। প্রায় বন্ধুর মত চলে, অথচ বয়সের ফারাক কত? দশ বারো বছর ত নিশ্চয়ই।

ছুটি-ছাটায় বাসন্তীদির স্বামী যেই এলেন, অমনি দুটিতে স্পাইয়ের মত ওঁদের ওপর নজর রাখবে আর বার বার ছুটে এসে রিপোর্ট দিয়ে যাবে। কমলাদি, কমলাদি জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখ না একবারটি, দেখ না একবার বাসন্তীদির ড্রেসখানা। পাকা চুল শ্যাম্পু করা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই এইট্টিন এইট্টিসিকস-এর সাদা খোল কালো পাড় বর্জন করে একেবারে মেরুন রংয়ের সিল্ক। কর্তার মুখে পাইপ আর ঠাকরুণের হাতে ম্যাচ-করা ভ্যানিটি ব্যাগ। বর কনে সেজে উঠলেন দুজন ট্যাক্সিতে, চললেন বোধহয় মার্কেটিং-এ। আবার একদিন: কমলাদি, তুমি আজ কি হারাইলে জান না। আজ যদি বাসন্তীদিকে দেখতে, মাথা ঘুরে যেত। সেই যে আমরা পরলে তুমি ক্ষেপাও, সেই স্লিভলেস বটমলেস ব্লাউজ পরেছেন শ্রীমতী। ঢাউস পেট দেখা যাচ্ছে আর কোমরের দুপাশে থাকে থাকে চর্বি। দুজনে বোধহয় বেরোলেন সান্ধ্য ভ্রমণে। আবার একদিন হাসতে হাসতে এসে জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা কমলাদি, বাসন্তীদির বেড-রুমের আলো আজ নটা বাজতে না বাজতেই নিভে গেল কেন? রাত বারোটা পর্যন্ত যাঁর ড্রয়িং রুমে প্রতিদিন গরম পলিটিকস আলোচনা চলবেই, আজ ব্যতিক্রম কেন তার? বুড়ীর মধ্যে এত প্রেম?

কমলার হাসি পেত। বেশ আছে দুটিতে। মাইনের পুরো টাকাটাই হেসে-খেলে উড়িয়ে দেয়। বাড়ীর অবস্থা ভাল, কাউকেও একটি পয়সা দিতে হয় না। ওরা ত বলেইছে এটা ওদের সখের চাকরি আপটু বিয়ে. তারপরই ড্যাংড্যাংগিয়ে যাবে চলে ইস্তফা দিয়ে। হত কমলার মত অবস্থা, বুঝত তাহলে কত ধানে কত চাল!

ছোটবেলায় এমনি প্রজাপতির স্বপ্ন কমলার বুকেও জেগেছিল। টুসটুসে হয়ে উঠেছিল মধুতে মধুতে। মধুর লোভে গুন গুন করে উঠেছিল ভ্রমরের দল। আকাশ তখন মনে হত রামধনু রঙ্গীন, বাতাসে উড়ে বেড়াত গোলাপের গন্ধ, নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার নেশায় সেও একদা মাতাল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মার কাছে ধরা পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেবার জন্য উতলা হয়ে বাবাকে সব জানিয়েছিলেন। যুক্তিবাদী বাবা তাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, সবার বড় ছেলেই হোক বা মেয়েই হোক, ছোট ভাইবোনদের প্রতি তার দায়িত্ব অনস্বীকার্য। নিজের পানে চাইবার আগে তাদের পানে চাইতে হয়। তাই কমলাকেই গরীব সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল। এই স্কুলেরই প্রাইমারী সেকশনে ঢুকেছিল। তারপর কঠিন অধ্যবসায়ে যেমন সে পর পর বি-এ, এম-এ এবং বি-টি পাশ করতে লাগল, স্কুলের কর্তৃপক্ষও পর পর তাকে প্রমোশন দিতে দ্বিধা করলেন না। আকাশের দিকে আর চাইল না সে, চাইল না নিজের দিকে। পাঁচ বছর আগে যখন সে এ্যাসিসটেণ্ট হেড মিসট্রেসের আসনে বসেছিল, তখন সে ত্রিশকে পেছনে ফেলে এসেছে।

এখন আর তার জন্য কোন হায় হায় আপশোস নেই কমলার। বোনটার ভাল ঘরে ও বরে বিয়ে হয়ে গেছে. ভাইয়াও ভাল চাকরি করে। মা বাবা আজ বেঁচে থাকলে দেখতেন যে, কমলা সংসারকে দাঁড় করিয়েছে। দুঃখের রাত্রি আজ প্রসন্ন প্রভাতে আলোকিত করছে।

পায় দশটায় ফিরে এল আরতি আর মেনকা। এসেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

আচ্ছা কমলাদি, তুমি কেমন মানুষ বল ত! তোমায় না বার বার বলে রেখেছিলাম সিনেমায় যেতে হবে, তাড়াতাড়ি এসো?

ভুলে গিয়েছিলাম ভাই, এত কাজের চাপ—এই ত দেখ, উইকলি টেস্টের এই খাতাগুলো বাসন্তীদি চাপিয়েছেন আমার ঘাড়ে। কমলা মৃদু হেসে বলল, একে নিজের কাজের অন্ত নেই, তার মধ্যে আবার অপরের,—আর বয়সও ত কম হল না, ভুলে যাই—

মাগো, আরতি চোখ কপালে তুলল, কি আর বয়স হয়েছে তোমার, তাই শুনি! তিরিশ পেরিয়েছ বটে, কিন্তু খুব বেশী দূরে যাওনি—

কত? কমলা হেসে আরতির হাত ধরল, পাঁচ বছর আগে তিরিশ পেরিয়ে এসেছি—

তাতে কি হয়, আরতি বাধা দিল, দেখলে কার সাধ্যি সেকথা বলে।

সবাই হেসে উঠল।

মেনকা বলল, কতক্ষণ ধরে রেডি হয়ে আমরা ভাবছি, এই বুঝি তুমি এলে। কিন্তু কোথায়? এখান থেকে দেখতে পেলাম, একে একে সব্বাই চলে গেল, এমনকি, প্রভাত-স্যার, যিনি আসেন সবার আগে, যান সবার পরে, তিনিও চলে গেলেন, রইলেন শুধু বাসন্তীদি, তখন ত আর কাজ করছেন না, দলের পাণ্ডা কারা সব এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে নিশ্চয়ই ফিফথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করছেন, আর তুমি—

গিয়ে ডাকলেই পারতে।

ওরে ব্বাবা, তোমার অফিসে কে যাবে? যা গম্ভীর হয়ে বসে থাক না, মেয়েরা ত দূরের কথা, আমাদেরই ভয় করে।

কি ছবি দেখলে? কমলা জিজ্ঞেস করল।

ছবি? বলেই মুখ টিপে হাসল আরতি, সে আর জিজ্ঞেস করো না কমলাদি। দেখব "অজানা পথে," গিয়ে দেখি হাউস ফুল। আমি ফিরেই আসতে চেয়েছিলাম, ওর পাল্লায় পড়ে গেলাম হিন্দি ছবি দেখতে "চাঁদনী রাত"—উরে ব্বাস, কি ছবি কমলাদি, শুধু গান আর নাচ, নাচ আর গান। আর সেন্সর-সাহেবদের চোখে ধুলো দিয়ে সেই সব ডেঞ্জারাস পোশাক আর নায়ক-নায়িকার সেই সব মোস্ট ডেঞ্জারাস— এই মুখপুড়ি, আবার চিমটি কাটছিস? চিমটি কেটে কেটে কি করে দিয়েছে, দ্যাখ না কমলাদি। বলেই বাঁ-পাশের ব্লাউজ খানিকটা তুলে দেখাল, কমলা দেখল, সত্যিই লাল হয়ে গেছে। আরতি বলতে লাগল, যেই না সেই সব মোক্ষম সিন আসে আর মেনকাটা আমায় চিমটি কাটে আর কানের কাছে মুখ এনে বলে ওঠে, মরে যাব আরতি—

কমলা গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করল, ফিরতে এত দেরী হল যে, আর কোথাও গিয়েছিলে নাকি?

নে, বল, এবার মেনকা বলে উঠল, খুব ত চিমটি কাটার নালিশ করলি, এবার বল দেরী হল কেন? একটু

থেমে নিজেই বলতে লাগল, রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলাম কমলাদি, আরতি খাওয়াল। কেন খাওয়াল জান?—আরতি ছুটে পালাচ্ছিল, মেনকা খপ করে ওর আঁচল ধরে ফেলতেই একেবারে বে-আঁচল হয়ে গেল আরতি, তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে বুক চাপা দিয়ে বলে উঠল, অসভ্য। মেনকা ভেংচি কেটে বলল, অসভ্য। অসভ্য আমি, না তোর ফিঁয়াসে? জান কমলাদি, আজ ওর ফিঁয়াসের চিঠি এসেছে। কি লিখেছে জানো? তোমার বিরহ আর সহিতে পারিতেছি না। মাকে বলিয়াছি সব, মা বাবাকে বলিয়াছেন, বাবা আপত্তি করেন নাই। সুতরাং আর কটা দিন পর বৈশাখ পড়িলেই একেবারে প্রথম শুভ দিনটিতেই —ওরে ব্বাবা, তারপর যা সব লিখেছে না কমলাদি, বলব তোমায় অন্য সময়। খুশীতে ডগমগ হয়ে তাই শ্রীমতী চিকেন রোস্ট খাইয়ে দিল।

বলেই দৌড়ল মেনকা, আরতিও তাড়া করে বেরিয়ে গেল বলতে বলতে, দাঁড়া মুখপুড়ী লক্ষ্মীছাড়ী, আমিও দোব তোর সব সিক্রেট ফাঁস করে।

কমলা চুপটি করে বসে রইল। অনেকক্ষণ।

ওদের ফিঁয়াসে আছে, সে আর বিরহ সইতে পারছে না, গোপনে চিঠিতে এমন সব কথা লেখে সে, যা গোপনে ছাড়া বলা যায় না, বিয়ের আনন্দে ডগমগ হয়ে ওরা রেস্টুরেন্টে খায়, এমনি উচ্ছল ময়ূরের মত নৃত্যপরা দিন কমলার জীবনেও কি একদা চকমকিয়ে ওঠেনি? কিন্তু সে যেন বিদ্যুতের চকমকানি! দিকদিগন্তে মুহূর্তের জন্য আলোকরেখা টেনে দিয়েই নিঃসীম অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাওয়া। প্রেমের সাগরে অবগাহনের আনন্দে ওরা রোমাঞ্চিত আর বড় আশা নিয়ে কমলা গিয়ে তীরে পৌঁছতেই পেছন থেকে গর্জন করে উঠল জলদগম্ভীর কঠিন কর্তব্যের আহবান! ঢেউয়ে ঢেউয়ে ওরা যখন মাতামাতি করছে, দাপাদাপি, কমলা তখন তীরে তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে দিকভ্রান্তের মত।

খাতা রইল পড়ে, কমলা চেয়ে রইল জানালার বাইরে। আকাশে ঝকঝকে চাঁদ। আলোর বন্যায় উদ্ভাসিত মেয়েদের সবুজ আস্তরণে ঢাকা খেলার মাঠ, ওপারের বিদ্যালয় ভবন। আগ্রার প্রাসাদে বন্দী অসহায় সাজাহান যেমন করে অপলক চোখে চেয়ে থাকত প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রু, তাজমহলের পানে, তেমনি করে চেয়ে রইল সে ঐ ভবনটির পানে, যেখানে সমাধিস্থ তার জীবনের সমস্ত হাসি ও আনন্দ!

সেদিন স্কুলে এক সাংঘাতিক ব্যাপার।

বাজেট তৈরী করেন প্রভাতবাবু। গত বছর ঠিক মোক্ষম সময়টিতে প্রভাতবাবু অকস্মাৎ দেড় মাসের ছুটি নিয়ে উত্তর ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ফলে বাজেটের দায়িত্ব এসে পড়ে বাসন্তী সরকারের ওপর আর উনি সব দায়িত্ব যেভাবে পাশ কাটিয়ে যান, সেইভাবে কমলাকে ডেকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, কমলা-বোন, দাও না ভাই ওটা তৈরী করে। দেখতেই ত পাচ্ছ, ইলেকশনের ব্যাপারে আমার আর নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। কমলা কোন দিন করে নি, তবু অনেক পরিশ্রম করে দিয়েছিল একটা খাড়া করে। বছরের শেষে দেখা গেল তিন-তিনটে খাতে এ্যাকচুয়েল একসপেন্ডিচার বরাদ্দ টাকার ডবল হয়ে গেল। এ নিয়ে কথা উঠেছিল ম্যানেজিং কমিটিতে।

এ বছরে গত বছরের ঘাটতি মেকআপ করে বাজেট তৈরী করতে হবে, তাই প্রভাতবাবুকে টেবিল দিয়ে কমলার অফিস কক্ষে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি সেদিন প্রতিটি হেড নিয়ে কমলার সঙ্গে আলোচনা করে করে লিখছেন, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করলেন ইলেভেনের ক্লাশটিচার মধুমতী দত্ত। হাতে এক টুকরো কাগজ। কমলার কাছে গুরুতর অভিযোগ করলেন। ক্লাশে অংক দিয়েছিলেন। তারপর অংক-করা খাতাগুলো দেখতে দেখতে চৈতালীর খাতার মধ্যে একখানা বিশ্রি চিঠি পেয়েছেন। এই সেই চিঠি।

কমলা বলল, বাসন্তীদির কাছে যান না ভাই, আমরা একটু ব্যস্ত আছি—

গিয়েছিলাম, মধুমতী বললেন, একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, বললেন তোমায় দেখাতে। পড়েই দেখ না একবার। বলে নিজেই প্রথম লাইনটা পড়ে শোনালেন, প্রাণের চৈতালী, কি মিষ্টি তোমার চিঠি, আমি বারবার ঠোঁটে ছুঁইয়েছি।—নাও, এবার কি করবে কর। বলে চিঠিখানা টেবিলে রাখলেন, বললেন, নিয়ে এসেছি ওকে, ডাকব?

এতক্ষণ মাঝে মাঝে হাসি-ঠাট্টা করছিলেন প্রভাতবাবু, কমলার মুখেও তাই হাসির আভা ঝিলিক দিচ্ছিল, কিন্তু মধুমতীর অভিযোগ এবং প্রেমপত্রের প্রথম লাইনটা শুনতেই সে ঝিলিক ঝপ্ করে নিভে গেল, কঠিন হয়ে উঠল মুখখানা, কপালে ফুটে উঠল কুঞ্চনরেখা, চিঠি হাতে নিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, ক্লাশ শেষ হতে এখনও বারো মিনিট বাকি, আপনি ক্লাশে যান, দরকার হলে আমি ওকে ডেকে নোব'খন।

মধুমতী উত্তেজিত পায়ে বেরিয়ে গেলেন।

প্রভাতবাবুর পানে আড়চোখে চাইল

কমলা। ভদ্রলোক নিবিষ্ট মনে মাথা নীচু করে কাজ করছেন। এমনি ডেলিকেট ব্যাপার একজন পুরুষ মানুষের সামনে আলোচনা করা ঠিক হবে কিনা, ভাবল কমলা। লোকটি আবার ঠোঁটকাটা, চৈতালীর সামনেই হয়ত ফোড়ন কেটে বসবেন! তার চাইতেও কয়েক বছরের বড়, মানে চল্লিশের কাছাকাছি, তাহলে কি হবে, কমলার সঙ্গে এটা-ওটা-সেটা নিয়ে কখনো কখনো যা মন্তব্য করেন না, তখন মনে হয় যেন চল্লিশ থেকে চব্বিশেই নেমে এসেছেন। অথচ লোকটা ভাল, শালীনতা কখনও ক্ষুন্ন হতে দেন না।

প্রভাতবাবু নিজেই বোধ হয় বুঝতে পারলেন, বললেন, আচ্ছা, আমি বরং একটু ঘুরে আসি--

কেন? বসুন না। কমলা কি জানি কেন, বাধাই দিয়ে বসল, আপনি থাকলে ও আরও ভয় পাবে--

না, না, ওসব প্রেম-ট্রেমের ব্যাপার--

আ-হা, তা হলেই যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল। বসুন। কমলা জোর দিয়ে বলল।

বসলেন প্রভাতবাবু এবং বসে আবার খাতায় ডুবে গেলেন।

চিঠিখানা খুলল কমলা। নির্জলা প্রেমপত্র। শিবাজী নামে কে একজন লিখেছে। সেই একই ধরণ। যেদিন দেখেছি, সেদিন থেকেই তোমায় ভালবেসে ফেলেছি। কিন্তু শুধু চিঠিতে কি আশা মেটে? তোমায় না পেলে আমার জীবন অন্ধকার! জানাবে কবে কোথায় কখন তোমায় কাছে পাব। কমলার মনে হল, প্রেমপত্রের যেন কোন সাইক্লোস্টাইল করা ফর্ম আছে, বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। দুনিয়ার প্রেমিক-প্রেমিকারা দরকার হলেই একখানা ফর্ম কিনে নাম-ধাম ফিল আপ করে পাঠিয়ে দেয়। সেই কত বছর আগে এমনি দু-চারখানা পত্র কমলার হাতেও এসেছিল, সেগুলোর সঙ্গে এই চিঠিখানা ভাষা ও ভাবের এমনি আশ্চর্য মিল হল কি করে? বাতাসে যেন চেনাদিনের গন্ধ পেল কমলা।

যাকগে। প্রস্তুত হয়ে ডাকল চৈতালীকে।

ধীর পায়ে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়াল চৈতালী।

কমলা দেখল, ওর বয়স একটু বেশী হলেও সতেরো আঠারোর বেশী হবে না। সুন্দরী। একটু বাড়ন্ত শরীর। স্কুলের ইউনিফরম সাদা ব্লাউজটার গলা একটু ডিপ করেই কেটেছে। কাপড়টাও বেশ ফিনফিনে। নীচের স্ট্র্যাপ দেখা যায়। কানের ওপরের চুল ছোট করে কেটে চূর্ণ অলক তৈরী করেছে। শ্যাম্পু-করা ঘন ঢেউ-খেল্যানো চুল। মোটা বেণী।

কমলা কড়াস্বরে প্রশ্ন করতে লাগল, শিবাজীটা কে শুনি! কোথায় থাকে? কি করে পরিচয় হল ওর সঙ্গে? এমনি কত গুলো চিঠি লিখেছে? আর তুই-ই বা কতগুলো লিখেছিস?

চৈতালীর মুখে রা ফুটল না। ভয়ে কাঁপছে থরথর করে।

কত বয়স হবে তোর, কমলা আবার সুরু করল, সতেরো আঠারোর বেশী হবে না। এরই মধ্যে রোমান্স করতে শিখে ফেলেছিস, বদ মেয়ে কোথাকার।--কি, ভেবেছিস চুপ করে থাকলেই পার পেয়ে যাবি? তোর জামায় চিঠিখানা এঁটে ক্লাশে-ক্লাশে ঘুরিয়ে আনব, তোর গার্জিয়েনকে লিখব, তোর নাম কেটে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দোব।

চৈতালীর চোখ দিয়ে টস-টস করে জল পড়তে লাগল।

কমলা গর্জে উঠল, ইঃ, আবার কান্না হচ্ছে। ন্যাকা মেয়ে আর কি! স্কুলে পড়তে এসেছিস, না এসেছিস রোমান্স করতে? যা, এখখুনি বই-খাতা নিয়ে বাড়ী চলে যা, তোর গার্জিয়েনের সঙ্গে আগে কথা কইব, তারপর স্থির করা হবে তোকে স্কুলে রাখা হবে কিনা।--যা।

নমস্কার করে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল চৈতালী।

একটু পরে গলা খাঁকারি দিলেন প্রভাতবাবু, বললেন, মেয়েটা কিন্তু দারুণ ভয় পেয়েছে--

ছাই পেয়েছে! কমলা বাধা দিল, আপনিও যেমন! ওসব লোক-দেখানো চোখের জল। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, বাড়ীতে গিয়েই সব জানাবে ছেলেটাকে আর এবার থেকে চিঠি লেখালেখি করবে না, গোপনে গোপনে মিট করবে। যার মাথায় একটিবার এসব পোকা ঢুকেছে--

পোকা বলছেন কেন? বাধা দিলেন প্রভাতবাবু, পোকা না হয়ে জেনুইন প্রেমও ত হতে পারে। সতেরো আঠারো যদি বয়েস হয়ে থাকে, তাহলে এ বয়সে মেয়েদের মনে একটুখানি রোমান্সের রং লাগা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয় বলে আমার মনে হয়।

এইবার হেসে ফেলল কমলা, তা মশাই, মেয়েদের মনের খবর আপনি জানলেন কি করে? বয়স ত নিশ্চয়ই চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই--

আজ্ঞে না, ছুঁই ছুঁই নয়, ছুঁয়ে তার ঘাড় মটকে বছরখানেক হল খেয়ে হজম করে ফেলেছি--

বেশ তাই মেনে নিলাম, একচল্লিশ। কমলা বলল, এই একচল্লিশেও যার ঘর আঁধার হয়ে রয়েছে, আজও চাকরের হাতে যার রান্নাঘরের চার্জ, বিছানা পাতার দায়িত্ব, সে আবার মেয়েদের মনে রং লাগার গোপন তথ্য জানল কি করে?

প্রভাতবাবুও হাসলেন, বললেন, তাহলে আমিও প্রশ্ন করি, যিনি আমার চাইতে মাত্র দুচার কদম পেছনে পেছনে আসছেন, আমার রঘুনাথের মত যাঁর ঘরের অধিষ্ঠাত্রী এক এবং অদ্বিতীয়া হারানী-মাসী, তিনিই বা কেমন করে জানবেন কখন কোথায় ফুল ফোটে, ফুলের গন্ধে কোন ভ্রমরের নিদ ভেঙে যায়? সুধাসমুদ্রের তীরে তীরে ঘুরেই ত জীবনটা প্রায় কাটিয়ে দিলেন--

আঃ প্রভাতবাবু কি যা তা বলছেন কমলা কপট রাগ দেখাল, বলি, বাজেটা নিয়ে আলোচনা হবে না বাজে কথা নিয়ে?

এমনিই প্রভাত গম্ভীর। যেদিন কমলা এই স্কুলে ঢুকেছে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ঠিক একই রকম দেখছে। সেই খদ্দরের পাঞ্জাবি আর পাতলা খদ্দরের ধুতি। টল ফিগার। খদ্দর পরিষ্কার রাখা বেশ কঠিন-সাধ্য। একটুতেই ময়লা ধরে যায়। কিন্তু এতগুলো বছরের মধ্যে এমন একটি দিনের কথাও মনে পড়ে না কমলার, যেদিন প্রভাতবাবু পাটভাঙা ধুতি পাঞ্জাবি পরে আসেননি। একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করাতে হেসে বলেছিলেন, রঘুনাথ ত আমার জীবনের নাথ নয় যে সব কিছু ওকে সমর্পণ করেই নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা দোব। যত কিছুই ও করুক না কেন, ধুতি পাঞ্জাবি ও কেচে দিলেও প্রতিদিন বাসায় ফিরে ইস্তিরি কর্মটি নিজের হাতে করে থাকি। শুধু ইস্তিরি কেন, আরতিরা লক্ষ্য করেছে, মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা প্রভাতবাবু রান্নাঘরে গিয়ে নিজেই হাতাখুন্তি নাড়েন। ওঁর কি কেউ নেই? কেউ জানে না। আজ পর্যন্ত কখনো-সখনো বন্ধুবান্ধব ছাড়া কোনো আত্মীয়কে ওঁর কাছে আসতে দেখা যায়নি। ছাত্রীদের কাছে দারুণ গম্ভীর প্রভাতবাবু, আবার শিক্ষিকাদের কাছে একেবারেই হালকা। ঠাট্টার একটি খোঁচা মারলে দশটি খোঁচা ফিরিয়ে দেন। বাসন্তী দেবী থেকে শুরু করে আরতি মেনকারাও যেন ওঁর সমবয়সী।

একদিন আরতি ফস্ করে জিজ্ঞেস করে বসেছিল, আপনি স্যার বিয়ে করলেন না কেন?

কে বলল করিনি? পাল্টা প্রশ্ন করে-ছিলেন প্রভাতবাবু।

মেনকা বলেছিল, তাহলে স্যার, একদিন না একদিন বৌদিকে এখানে দেখতে পেতাম। না কি তালাক দিয়েছেন? না কি তিনিই আপনাকে--

যাঃ, বাজে বকিসনি, বাধা দিয়ে বলেছিল আরতি, উনি সত্যিই বিয়েই করেননি। সেই না-করার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো করুণ কাহিনী-টাহিনী আছে যা বলতে চান না। নইলে স্যারের মত বিদ্বান, রূপবান, সংস্কৃতিবান--

দেখ আরতি, বাধা দিয়েছিলেন প্রভাত-বাবু, অত বান বান করে প্রশংসার বান ডাকিও না, মেনকা সন্দেহ করতে পারে তোমায়।

বৈশাখ এসে গেল।

আর দুদিন পরই আরতির বিয়ে।

ছুটিতে যাবার সময় বাসন্তী দেবী থেকে শুরু করে সব টিচার ও স্টাফকে ত কার্ড দিয়ে বলেই গেছে, মেনকাকে আবার ওয়ার্নিং দিয়ে গেছে, প্রভাত-স্যার আর কমলাদিকে না নিয়ে যদি যাস, তাহলে মুখপুড়ী, তোর সঙ্গে আড়ি করে দোব, মনে রাখিস কিন্তু। তবে বাসে যাসনি, বাস-রাস্তা থেকে আমাদের বাড়ী প্রায় এক মাইল। তার চাইতে ট্যাকসিতে যাস। বাস-রাস্তাতেই অনেকটা গিয়ে একটা শর্ট কাট আছে গ্রামের রাস্তা হলেও খোয়া দেয়া, একেবারে আমাদের উঠোনে গিয়ে নামবি। মাত্র ত পনেরো মাইল, ট্যাকসিতে খুব বেশী হলে চল্লিশ মিনিট লাগতে পারে।

কমলাকেও হাতে ধরে বার বার মাথার দিব্যি দিয়ে গেছে আরতি।

বিয়ের দিন।

স্কুল থেকে এসেই বাথরুমে ঢুকল মেনকা। সারাটা দিনের ঘ্রাজারিতে শরীরটা গরম হয়ে ওঠে। সে যেন একটা যন্ত্র, সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত একটানা ঝকঝক করে চলে। এখন বিশ্রাম। শরীর-যন্ত্রের সমস্ত পার্ট খুলে যেন ঠাণ্ডা করে নিতে হবে। শাওয়ারের পিচকিরির মত ধারাগুলি যেখানটায় লাগে, সেখানেই আরাম। চুলটা বাঁচিয়ে মেনকা সমস্ত শরীর মেলে ধরে বার বার সেই আরামের ধারা নিতে লাগল।

আধ ঘণ্টা পর বেরিয়ে এল একটা বড় তোয়ালে জড়িয়ে। জানালা দরজা বন্ধ করে দিয়ে আরশির সামনে দাঁড়াল। হাসল মুখ টিপে। সায়া পড়তে গিয়েই থমকে দাঁড়াল। প্রথমে ফ্রণ্ট ভিউ, তারপর সাইড, তারপর আবার ফ্রণ্ট। কোমরের দুপ্যাশে হাত রেখে দাঁড়াল। কত হবে ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিক? ফিতে-টিতে নেই বটে, কিন্তু দেখে মনে হল ছত্রিশ-চব্বিশ-আটত্রিশ হতে পারে। আবার হাসল মুখ টিপে। তারপর সাজ শুরু করল।

সাজের শেষে সোজা চলে এল কমলার ঘরে।

এসেই চক্ষুস্থির!

ও মাগো! কমলাদি, এই তোমার বিয়ে-বাড়ী যাবার সাজ। পিঠ ঘুরিয়ে দেখে বলল, আর এটা কি পরেছ নীচে? এটাকে বেসিয়ার বল? এত হাফ ব্লাউজ, যা পরে রোজ স্কুলে যাও মেয়ে ঠ্যাঙাতে। তাও আবার সাদা রং। শাড়ীখানার রংটাই বা কি, ফ্যাকাসে এ্যাশ। কেন, রঙীন শাড়ী নেই তোমার?

কমলা হেসে বলল, বুড়ীকে আর রঙীন শাড়ী ব্লাউজ পরতে হবে না—

বুড়ী! কপালে উঠল মেনকার চোখ, তুমি যদি বুড়ী হও না, বাসন্তীদি তাহলে বুড়বুড়ী ঠানদি। সেই ঠানদিও আজ পিংক ঢাকাই পরে একটু আগে ট্যাকসিতে রওনা হলেন। —না, না, এসব ঠানদি-মার্কা কিছুই পরতে দোব না তোমাকে। এমনি পোশাকে তোমায় যদি নিয়ে যাই না, আরতি মুখ-পড়ী তাহলে কনের পিঁড়ি থেকে উঠে এসে আমার চুল টেনে ধরবে। —চল, আমার ঘরে চল, বড় আরশি আছে, আমি তোমায় নিজের হাতে সাজিয়ে দোব। চল।

কমলা তবু বাধা দিল, যাও, পাগলামি করো না লক্ষ্মীটি। ওখানে অন্য টিচাররাও যাবেন, হয়ত ছাত্রীরাও কেউ কেউ আসবে। ওরা দেখলে কি ভাববে?

যা খুশী ভাবুক গে, মেনকা জোর দিয়ে বলল, কে কি ভাববে মনে করে সাজবে না তুমি? বিয়ে করনি বলে সাজলেও দোষ হবে? লোকের চোখ টাটাবে? টাটাক। মেনকা হাত ধরে টানলে কমলাকে উঠে দাঁড়াতে হল, এখন আর তুমি এ্যাসিস্টেন্ট হেড মিসট্রেস নও, তুমি আমার কমলাদি। আর যদি হওই, তাহলে আমি এখন হেড মিসট্রেস বাসন্তী সরকার। তারপর বাসন্তী দেবীর মত পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর গলার স্বর অনুকরণ করে মিঠে মিঠে করে বলল, কমলা, কমলা, তুমি ভাই একটু সাজ কর না ভাই, উনি এলে আমি যেমন সাজি—

হি হি করে হেসে উঠল মেনকা, কমলাও না হেসে পারল না।

একেবারে, যাকে বলে এ্যারেস্ট, তাই করে মেনকা নিয়ে চলল কমলাকে।

ঘরে এসেই দরজার ছিটকিনি তুলে দিল, তারপর টান মেরে খুলে ফেলল কমলার শাড়ীখানা, তারপর সাদা ব্লাউজ এবং তারপর কমলার হাজারো আর বাধা না মেনে সেই যাকে বলে মান্ধাতার আমলের হাফ ব্লাউজ, সেটিও। একেবারে আদুড় করে ফেলল কমলার গা। কমলা জড়সড় হয়ে উঠতেই বলল, জানালা দরজা সব বন্ধ, কেউ দেখতে পাবে না।

কি আর করবে কমলা? ক্ষ্যাপা মেয়েটার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে আরশির সামনে টুলটায় হাত পা ছেড়ে রইল।

মেনকা বলে উঠল, দেখি লেসটা। হ্যাঁ, সয়াটা চলে যাবে। তারপর পাউডার মাখাতে লাগল কমলার ঘাড়ে, পিঠে বুকে পেটে। বলতে লাগল, ইস, তোমার রং কি ফর্সা কমলাদি, পাউডারগুলো একেবারে মিলিয়ে যাচ্ছে। তারপর চোখের নীচে কাজলের সরু রেখাটি একটু টেনে বাড়িয়ে দিল। আইব্রাও পেন্সিলটা নিয়ে বলল, এদিকে ফের, নড়ো না কিন্তু।

মুখের কাজ শেষ করে কমলাকে দাঁড় করাল মেনকা। আলমারি থেকে একটা মডার্ণ ব্রা বার করতেই কমলা বলে উঠল: যাঃ, ও আমি পরতে পারব না।

না বললেই হল, মেনকা এবার এসিস্টেন্ট হেড মিসট্রেসের মতই গম্ভীর হয়ে বলল, বেশী গোলমাল না করে বুকটি চেপে ধর, আমি হুকগুলো লাগিয়ে দিচ্ছি। তারপর টেনেটুনে ঠিক করে দিয়ে বলে উঠল, ইস, কি চমৎকার ফিট করেছে কমলাদি! কে বলবে তুমি আমার চাইতে বড়। দেখ না, দেখ না একবারটি।

আরশির দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে কমলা হেসে ফেলল, আদর করে মেনকার গাল টিপে দিয়ে বলল, দুষ্টু কোথাকার!

ব্রা-ই যদি পরল, তাহলে আর ডিপ-গলা স্লিভলেস ব্লাউজে আপত্তি করে কি হবে? আর তার ওপর রঙীন সিল্কের আঁচল টেনে দিতে আপত্তি করলেই বা শুনবে কেন মেনকা?

মনের মত করে সাজিয়ে কমলার হাত-দুখানি ধরে বলে উঠল, আজ রূপের গর্বে গর্বিনী আরতি মুখপুড়ীর মুখে চুনকালি লেপে দোব—

এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল। মেনকা ভাবল, মহাদেব বোধহয় ট্যাকসি ডেকে এনেছে। খুলে দেখে, প্রভাত গুপ্ত।

না, আজ আর সাদা খদ্দর নয়, সিল্কের পাঞ্জাবি। পকেট থেকে রুমাল উঁকি মারছে। ভুরভুর করছে এসেন্সের সুবাস।

বললেন, চলে যাচ্ছিলাম, দেখলাম তোমার ভেণ্টিলেটারে আলো, ভাবলাম, কি জানি, আরতি দেবী আগেই সটকে পড়ছেন বলে হয়ত মেনকা দেবী পরাজয়ের অভিমানে গাল ফুলিয়ে বিছানা নিয়েছেন। তাই খোঁজ করতে এলাম। আরেঃ, এই যে, কমলা দেবীও আছেন দেখছি। আমি ত প্রথমটা চিনতেই পারিনি, কে এই এনামেল-চর্চিতা অনব-গুণ্ঠিতা অপরিচিতা মহিলা! তারপর দেখলাম, ও—বৈপ্লবিক বেশে আমাদেরই স্কুলের—

যান। কমলা বলে উঠল, নিজের বর-বেশটা বুঝি আর চোখে পড়ছে না?

মেনকা বলল, ভালই হল স্যার, আপনাকে আর বাসে যেতে হবে না, আমাদের সঙ্গে ট্যাকসিতেই চলুন, একেবারে বাড়ী পর্যন্ত যাওয়া যাবে।

মহাদেব ট্যাকসি নিয়ে এল।
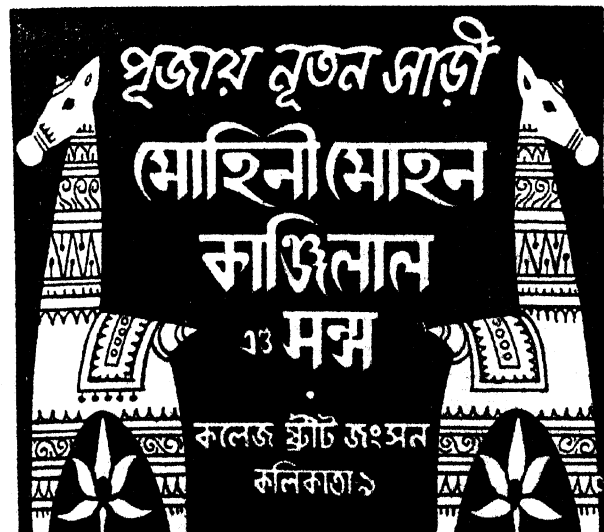
দরজাটা খুলে দাঁড়াল মেনকা। ওঠ কমলাদি, উঠুন স্যার। তারপর সে নিজে উঠে বসল।

ট্যাকসি ছুটল।

শহরের রাস্তা ভাল, পীচ ঢালা, রাস্তার পাশে পাশে লাইট পোস্ট। শহর ছাড়িয়েও কয়েক মাইল পর্যন্ত ভাল রাস্তাই পাওয়া গেল। কিন্তু যেই শর্ট কাটে নামল ট্যাকসি, অমনি সুরু হল লাফানো। হেড লাইটে দেখা গেল, মাটির সঙ্গে খোয়া মেলানো, সে খোয়া মাঝে মাঝে সরে গিয়ে তৈরী হয়েছে খানাখন্দ। প্রবল ঝাঁকুনি লাগছে।

গাড়ী ছাড়বার পর থেকেই মেনকা একাই বকবক করে চলেছে। প্রসঙ্গের অন্ত নেই, তার মধ্যে অবান্তরই বেশী, নিজেই প্রশ্ন তুলে নিজেই জবাব দিচ্ছে, মাঝে মাঝেই হেসে উঠছে খিলখিল করে। কিন্তু একটু অসুবিধা হচ্ছে, কারণ প্রভাতবাবু মাঝখানে থাকাতে কমলাকে কথার মাঝে মাঝে খোঁচা দিয়ে জাতিয়ে তুলতে পারছে না, হাতের নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না ভাল করে। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? বন্ধুর বিয়েতে চলেছে, তারপর আরতির গোপন ফরমাস মত মনের মত করে সাজাতে পেরেছে কমলাদিকে আর প্রভাত স্যারের সঙ্গে ত আর রেখে ঢেকে কথা বলতে হয় না। তাই মনের খুশীতে মুখের রাশ একেবারে আলগা করে দিয়েছে মেনকা। আজ যেন ওকে কথায় পেয়ে বসেছে।

জানেন স্যার, কমলাদির ভয়, ওখানে সব টিচার যাবে, ছাত্রীরাও কেউ কেউ আসতে পারে, সুতরাং রঙ্গীন শাড়ী ব্লাউজ পরবে না, ওরা হাসবে। হাসবে ত বয়ে যাবে। টিচারগিরি করবার সময় ত আমরা লাইট রং পরে সভ্যভব্য হয়ে যাচ্ছিই আর সেখানে কাঠের মুখোশ পরে থাকি, আমাদের হাসতে মানা। কিন্তু বিয়ে-বাড়ীটাও কি স্কুল নাকি, আমরা ক্লাশ নিতে যাচ্ছি নাকি যে, সিল্ক পরব না, সেখানেও গাল ফুলিয়ে বসে থাকব? বলুন, আপনিই বলুন, সত্যি বলছি কিনা। এই যে আপনি আজ খদ্দর ছেড়ে সিল্ক পরেছেন, সেন্ট মেখেছেন, অন্যায় হয়েছে কিছু?

কেউ কথা কইল না, অন্ধকারে কারুর মুখের চেহারাও দেখা গেল না, তবু মেনকা বকবক করতে লাগল, আমরাও যে রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ, আমাদেরও যে সাধ-আহ্লাদ থাকতে পারে, আশ্চর্য, লোকে তা ভুলে যায়। কোন টিচার যদি কাউকে ভাল-বাসে, ভালবেসে বিয়ে করে, ব্যস, অমনি লোকেরা চোখ ছানাবড়া করে বসবে—

হঠাৎ গাড়ীখানা বাঁ দিকে এমনিভাবে কাৎ হল যে, কমলার কাঁধ প্রভাতবাবুর কাঁধে চেপে গেল। সামলাতে গিয়ে পড়ে গেল সিল্কের আঁচল। আঁচল তাড়াতাড়ি তুলে নিতে গিয়ে কনুইটা লেগে গেল প্রভাতবাবুর গায়ে। ভাগ্যিস, অন্ধকার গাড়ীর মধ্যে কিছু দেখা যায় না। দেখা গেলে মেনকাটা কি ভাবত।

খিল খিল করে হেসে উঠল মেনকা, জান কমলাদি, আরতিটা বলে কিনা ওর সঙ্গে বাসর জাগতে হবে। তিল বলে ওর বরের সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করে দেবে না। বল ত, আমার যেন আর কালকে ক্লাশ নেই, সারা রাত ওদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করি। আমি বলেছি, পারব না। বলে কি মুখপুড়ী, জান কমলাদি, বলে, বরকে দিয়ে তোকে এ্যারেস্ট করিয়ে রাখব। বলে আবার হেসে উঠল।

হঠাৎ আবার প্রবল ঝাঁকুনি। এমন আচমকা যে, কমলা প্রভাতবাবুর হাঁটুটাই ধরে ফেলে সামলে নিল। বড্ড ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে গেছে। ওঁকে মাঝখানে না দিয়ে মেনকাকে দেয়া উচিত ছিল। ওঠবার সময় এটা আর খেয়াল হয়নি। দুষ্টু মেয়েটা দরজাটা খুলে অভ্যর্থনা জানাল আর আমিও সুড়সুড় করে উঠে পড়লাম। এখন আর কিছু করবার উপায় নেই। ঝাঁকুনি লাগতেই শরীরে শরীর ঠেকে যাচ্ছে, বাহুতে বাহু, অবাধ্য আঁচলটা বার বার পড়ে যাচ্ছে। সিল্কের দোষই ঐ, গায়ে থাকে না।

বোধহয় প্রভাতবাবুও কমলার অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে পেরে ডান হাতখানা সীটের ওপর প্রসারিত করে দিলেন।

কিন্তু কি সুবিধা হল তাতে? একটু জায়গা হল বটে, কিন্তু কমলা যেন একটা বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে গেল।

ট্যাকসি চলেছে, কিন্তু স্বাভাবিক স্পীড দেবার উপায় নেই। অনেকখানি ভালও আছে বটে, কিন্তু জোরালো হেড লাইটে মনে হচ্ছে যেন সারা রাস্তাতেই উঁচু উঁচু খোয়া কিংবা খানাখন্দ। দু পাশে গাছ গাছালি। মনে হয় যেন একটা সীমা-হীন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে চলেছে। রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে চাষীদের বাড়ী। ধানের গোলা, খড়ের পালা, কুমড়ো মাচা, গোয়াল ঘর ছুটে পেছিয়ে যাচ্ছে। দু-একখানা পাকা বাড়ীও। কোনটার বাইরের আস্তর নেই, সারা দেয়ালে ঘুটে দেবার দাগ। মাঝে মাঝে ঝাঁপ-তোলা দোকান। কোনটায় জ্বলছে হ্যাজাক, কোনটায় ঝুলছে দড়িবাঁধা কালি-পড়া লণ্ঠন। দু-চারজন লোক। গাড়ীর দিকে দেখছে। দু-একটা কুকুর। তীব্র আলোয় থমকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কোন কোনটা পাল্লা দিয়ে ছুটতে গিয়ে পেছিয়ে যাচ্ছে।

এক সময় শেষ হয়ে গেল গাছ-গাছালি। খোলা মাঠ। মাঠে কি শস্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কুমড়ো বা চালকুমড়ো হতে পারে কিংবা পটল, ঝিঙে বা শসাও হতে পারে। মেনকা বলে উঠল, আ-রে এসে গেছি। এই মাঠটা পেরোলেই আরতিদের গ্রাম। তারপরই কলকল করে উঠল, দেখুন স্যার, দেখ কমলাদি, মাঠের ওপারে চাঁদটা দেখছ? ঠিক যেন একটা সোনার থালা, একটা সাইড একটু চাপা। তার মানেই আজ কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তৃতীয়া হবে। এখনও রাইট হয়ে ওঠেনি। রাইট হলেই এমন মজা, সোনার থালাটা রুপোর থালা হয়ে যাবে, ঝকঝক করবে স্টেনলেস স্টীলের মত। আরতিটার ভাগ্য ভাল, বুঝলে কমলাদি, বৈশাখ মাস, কালবৈশাখী দূরের কথা, পরিষ্কার আকাশ, এক টুকরো মেঘ পর্যন্ত নেই, আকাশে ঝকঝকে চাঁদ, একটু পরেই জ্যোৎস্নায় ভরে যাবে—আরতিটা খুব লাকি।

গাড়ীর দোলানিতে মস্ত খোঁপাটা বার বার প্রভাতবাবুর প্রসারিত হাতে ঠেকে যাচ্ছে। সোজা হয়ে বসাও মুশকিল, আঁচল সামলানো যায় না, বাতাসের তোড়ে উড়ে উড়ে প্রভাতবাবুর গায়ে ঘা মারে। আকাশে আঁকা সোনার থালাটার পানে চেয়ে থাকতে থাকতে জেগে জেগেই যেন স্বপ্ন দেখল কমলা। থালাটা যেন ফেড ইন করল একটি সুন্দর আলপনায়, আরতিদের উঠোনে আঁকা, তার মাঝখানে মঙ্গলঘট, ঘটের শীর্ষে আম্রপল্লব। পাশেই বরণডালা, ডালার ওপর নানাবিধ উপচার আর ঘিয়ের প্রদীপ। মাথার ওপর কারুকার্যখচিত চন্দ্রাতপ, চতুর্দিকে আলোর ঝাড়, ফুলের মালা, সুবেশা মেয়ে ও মহিলাদের হাতে মঙ্গল শঙ্খ, পুরুষদের চিন্তিত গুঞ্জন, সকলের উৎকণ্ঠাময় প্রতীক্ষা— বর ও কনের আসন এখনও খালি, অভ্যর্থনার সর্ব আয়োজন সমাপ্ত অথচ এখনও তাঁদের দেখা নেই। হঠাৎ কমলাদের গাড়ী গিয়ে থামতেই—ছি ছি, কি লজ্জা, বরণডালা নিয়ে এল সবাই, উলুধ্বনি দিল, প্রদীপ তুলে ধরল, তারপর, তারপর—ছি ছি, কি লজ্জা, কমলা আর—আর প্রভাতবাবুর হাত ধরেই—

হঠাৎ গাড়ীটা ডান দিকে মোড় নিতেই কমলা বাঁ দিকে ঝুঁকে পড়ল; সামলাতে গিয়ে প্রভাতবাবুর হাঁটু ধরে ফেলল। না, না, হাঁটু ত নয়, হাঁটুর ওপর ছিল ওঁর বাঁ হাত, হাতে হাত ঠেকে গেল, আঙুলে আঙুল জড়িয়ে গেল। ওঁর গায়েই ঠেস লেগে গেল, লেগেই রইল। খোঁপাটা লাগল কাঁধের নীচে বুকে, লেগেই রইল। ওঁর ডান হাতখানা ধীরে ধীরে নেমে এল কমলার কাঁধের ওপর, নেমেই রইল। না, আর ঝাঁকুনিকে ভয় নেই। বেশ এলিয়ে বসে গেছে কমলা। প্রভাতবাবুর আঙুলগুলো কি উষ্ণ! রুমালে কি মাদকতাময় সুগন্ধ। চোখ বুজে এল বুঝি কমলার।

আকাশের সোনালী চাঁদটা ততক্ষণে রুপোলী হয়ে উঠছে। বাচাল মেয়েটার মুখে তখনও খৈ ফুটছে, নিউটন বলেছিলেন না স্যার, জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে তীরে উপলখণ্ড কুড়োচ্ছি? আমরা মাস্টারনীরাও প্রায় তাই। হাসি, গান, আনন্দ ও প্রেমের স্রোত উত্তাল হয়ে বয়ে যাচ্ছে এই পৃথিবীতে আর আমরা মাস্টারনীরা কি করছি? আমরা সেই সুধা-সমুদ্রের তীরে তীরে দিশেহারার মত ঘুরে মরছি। কি স্যার, ঠিক হয়নি উপমাটা? বলুন, বলুন না—

বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল মেনকা।

দূরে বিয়ে-বাড়ীর আলোর আভা দেখা যাচ্ছে। শানাইয়ের সুর কানে ভেসে আসছে। প্রভাতবাবু বললেন, এই যে, এসে পড়েছি আমরা।

কলকাতার যাদুঘর ০সেকাল ০একাল

সিপ্রা নন্দী

কলকাতা যাদুঘরের সেকাল ও একালের পরিবর্তনশীল রূপ ও আদর্শ আলোচনার আগে 'মিউজিয়াম' বা যাদুঘর বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধির প্রয়োজন আছে। সাধারণত আমরা জানি 'মিউজিয়াম' কথার উৎস জড়িয়ে আছে গ্রীক উপকথার 'Muses' এবং 'Mouseion' এই শব্দ দুটির মধ্যে। গ্রীক উপকথায় রাজা জিউস (Zeus) -এর নব-কন্যা 'মিউজেসদের' ওপর ভার ছিল তাঁরা তাঁদের নৃত্যগীত এবং সৃজনীসুলভ কল্পনা পরিবেশনে যেন মানুষের দুঃখ-দুশ্চিন্তা ভুলিয়ে দেন। সেইজন্যেই অতীতের সকল প্রকার শিল্পসম্ভারে 'Muses'-এর নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। তবে আজকের যে মিউজিয়াম বা যাদুঘর জনগণের বহু আকর্ষণীয় বস্তুর অন্যতম বলে বিবেচিত তা কিন্তু রাজা এবং সম্ভ্রান্ত-বংশীয়দের আনুকূল্যেই সম্ভব হয়েছে। তাঁরা তাদের সখের নিমিত্ত যেসমস্ত দুর্লভ বস্তুর সংগ্রহ করেছিলেন, তাদের সেই নিজস্ব সংগ্রহই বর্তমান বহু বিখ্যাত মিউজিয়াম বা যাদুঘরের গোড়াপত্তনে সাহায্য করেছে। ইউরোপেও এই একই ধারায় ধনী ব্যক্তির সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সংগ্রহের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল বহু মিউজিয়ামের প্রথম উৎস ও অনুপ্রেরণা। তবে শুধু যে তাঁরা কেবলমাত্র কৌতূহলোদ্দীপক বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতেন তা নয়, অনেক সময় এ-ধরনের 'curiosities' বা কৌতূহলের বস্তু সম্ভ্রান্তবংশীয়দের নিজেদের মধ্যে একপ্রকার চিত্তাকর্ষক 'Intellectual game' বা জ্ঞানবুদ্ধি পরীক্ষার খেলার নিদর্শনরূপে ও বাহবা পাবার লোভেও সৃষ্টি করা হত। ফলে দুর্লভ বস্তুর সংগ্রহ এবং বুদ্ধি-চাতুর্যের খেলায় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে বহু কৌতূহলোদ্দীপক বস্তুর সংগ্রহ হত এবং এই সংগৃহীত বস্তুসম্ভারের মিউজিয়াম 'Cabinets de curiosities' আখ্যা লাভ করত। এইভাবেই বহু জগদ্বিখ্যাত সংগ্রহশালা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে গড়ে উঠেছে।

উনিশ শতকে কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরের সৃষ্টির পিছনেও বৈদেশিক পণ্ডিতদের যে অদম্য প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল তা কোনদিনও ভোলবার নয়। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা এবং কলকাতায় ভারতীয় যাদুঘরের রূপায়ণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ১৭৮৪ খৃঃ স্যর উইলিয়াম জোন্সের নেতৃত্বে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে এখানে নানাপ্রকার নিদর্শন সংগৃহীত হতে থাকে। এর মধ্যে স্থাপত্য ভাস্কর্যের নিদর্শন, তাম্রশাসন, প্রস্তরে খোদাইলিপি, প্রাচীন মুদ্রা এবং পুঁথিপত্র ও প্রকৃতিবিজ্ঞান চর্চার সামগ্রী—প্রাণীতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব জাতীয় দ্রব্যের সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য। এগুলি নানা উৎসাহী সভ্যের দানের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। ফলে ১৭৯৬ খৃঃ এই সমস্ত অমূল্য দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য একটি মিউজিয়াম স্থাপন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তারই পরিণতি-স্বরূপ ১৮০৮ খৃঃ পার্ক স্ট্রীটের এশিয়াটিক সোসাইটির পূর্বতন বাড়ীতে একটি মিউজিয়াম স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৮১৪ খৃঃ শ্রীরামপুরে ইংরাজের সঙ্গে অবরোধ-সংঘর্ষে ধৃত ডেনমার্কদেশীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডঃ নাথানিয়েল ওয়ালিচ সোসাইটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ মিউজিয়াম স্থাপনের অনুরোধ

নতুন বিন্যাসে অমরাবতী গ্যালারী
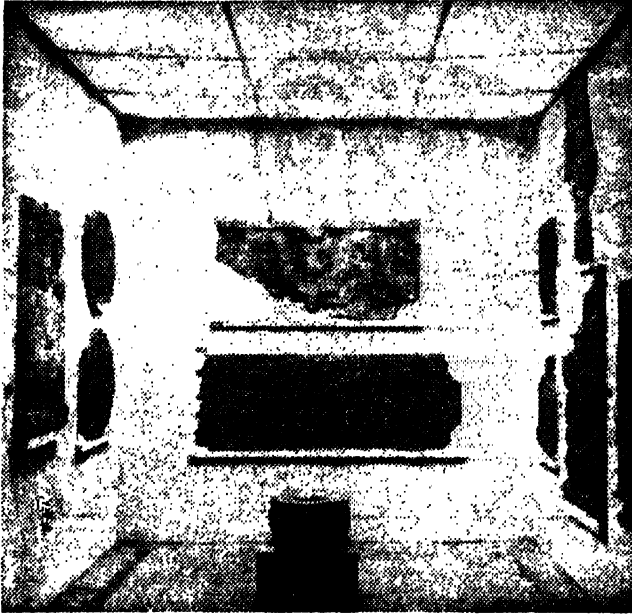
জানান। তিনি সেখানে তাঁর নিজস্ব সংগ্রহের নিদর্শন দানের প্রস্তাব করেন এবং নিজে অবৈতনিক কিউরেটরের কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চিঠি লেখেন। এইভাবে ওয়ালিচের আগ্রহে এবং আত্মনিয়োগে কলকাতায় ভারতের সর্বপ্রথম বহুমুখী মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার সূচনা হয় ১৮১৪ খৃঃ এশিয়াটিক সোসাইটির আনুকূল্যে। এই সংগ্রহশালাকে তখনকার মত দুটিভাগে ভাগ করা হয়। একটি বিভাগ হল পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব এবং কারিগরী, আর একটি বিভাগ হল ভূতত্ত্ব এবং প্রাণীতত্ত্বের নিদর্শনের সংগ্রহ।

এইভাবে ১৮১৪ খৃঃ এশিয়াটিক সোসাইটির অকৃপণ দানে এবং নাথানিয়েল ওয়ালিচের সাধনায় 'ভারতীয় যাদুঘরের' গোড়াপত্তন। কলকাতার যাদুঘর তাই ভারতের যাদুঘর সমূহের পথিকৃৎ ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের কেন্দ্র বিন্দু। ভারতীয় এবং বৈদেশিক বহু বিদ্বজ্জনের, যেমন, কর্নেল স্টুয়ার্ট, ডঃ টিলার, জেনারেল ম্যাকেঞ্জি এবং বাবু রামকমল সেন প্রভৃতির দানে মিউজিয়ামের সংগ্রহ ক্রমে বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তখন এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্যরা ভারত সরকারের কাছে একটি জাতীয় সংগ্রহালয় স্থাপনের জন্য আবেদন জানান।

ভূতত্ত্ব এবং প্রাণিতত্ত্বের দ্রব্যাদি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৮৫৬ খৃঃ এশিয়াটিক সোসাইটির নিজস্ব জিনিসগুলি বাদে সবই জিওলজিকাল সার্ভের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চলে আসে এবং ১৮৬৭ খৃঃ ১নং হেস্টিংস স্ট্রীটে মিউজিয়ামটি স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে ১৮৫৬ খৃঃ এশিয়াটিক সোসাইটি তার নিজস্ব পুস্তক সংগ্রহ (লাইব্রেরী) ব্যতীত অন্য সকল প্রকার সংগ্রহ দিয়ে একটি ইম্পিরিয়াল মিউজিয়াম স্থাপনের জন্য ভারত সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠান। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬৫ খৃঃ ভারত সরকার এক অছি পরিষদ গঠন করেন এবং ১৮৬৬ খৃঃ ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম অ্যাক্ট অনুযায়ী তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার বার্ণেস পীকক-এর সভাপতিত্বে একটি পূর্ণাঙ্গ অছি পরিষদের স্থাপনা করেন। এই অছি পরিষদের কাছে ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব এবং পুরাতত্ত্ব বিষয়ক সকল বস্তু হস্তান্তরিত করা হয় এবং ইম্পিরিয়াল মিউজিয়ামের পরিবর্তে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম বা 'ভারতীয় যাদুঘর' আখ্যা দেওয়া হয়। তারই পরবর্তী অধ্যায় হল ১৮৭৫ খৃঃ বর্তমান চৌরঙ্গী আজে ভারতীয় যাদুঘরের গৃহ-প্রতিষ্ঠা।

১৮৬৬ খৃঃ ডক্টর জন এন্ডারসন ভারতীয় যাদুঘরের প্রথম কিউরেটর নিযুক্ত হলেন এবং তারই তত্ত্বাবধানে পুরাতত্ত্ব এবং প্রাণিতত্ত্বের সংগ্রহ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ভারতীয় যাদুঘরে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৭৮ খৃঃ ১ এপ্রিল ভারতীয় যাদুঘর তার পুরাতত্ত্ব এবং পক্ষী সংগ্রহ নিয়ে জনসাধারণের সম্মুখে উন্মোচিত হয়। সেই বছরেই ম্যামাল বা স্তন্যপায়ী জীবদের গ্যালারীও খুলে দেওয়া হয়। ১৮৯১ খৃঃ সদর স্ট্রীটের দিকে নতুন অংশ সংযোজন করে অর্থকরী দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হ'ল। ১৮৯২ খৃঃ এবং ১৮৯৩ খৃঃ আর্ট বা চারুশিল্প এবং নৃতত্ত্ব বিভাগ খোলা হয়। ফলে ১৯০৪ খৃঃ ভারতীয় যাদুঘরের পাঁচটি বিভাগ হলঃ (১) প্রাণিতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব (২) ভূতত্ত্ব (৩) পুরাতত্ত্ব (৪) আর্ট বা চারুশিল্প (৫) ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা অর্থকরী উদ্ভিদতত্ত্ব। পরে ১৯১১ খৃঃ চৌরঙ্গী রোডের দিকে নতুন অংশ যোগ করে পুরাতত্ত্ব এবং আর্ট গ্যালারীর সম্প্রসারণ করা হয়।

১৯১৩ খৃঃ ২৮ নভেম্বর বাংলার বরেণ্য মনীষী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভারতীয় যাদুঘরের শতবর্ষপূর্তি পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ১৯১৪ খৃঃ ১৭ জানুয়ারী যে প্রদর্শনী হয় তাতে ছয়টি বিভাগ খোলা হয়—পুরাতত্ত্ব, চারুশিল্প, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব এবং অর্থকরী উদ্ভিদতত্ত্ব। ফলে ভারতীয় যাদুঘরের বর্তমান সুনির্দিষ্ট বিভাগগুলির প্রথম রূপায়ণ ১৯১৪ খৃঃ সাধিত হয়েছিল। ভারতীয় যাদুঘরের ক্রমবিবর্তনের সর্বশেষ অধ্যায় হল ১৯৬৫ খৃঃ যখন চারুশিল্প পুরাতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব একত্রিতভাবে একজন কেন্দ্রীয় অধিকর্তার তত্ত্বাবধানে আনা হ'ল।

ভারতীয় যাদুঘরের সেকাল এবং একালের তুলনামূলক বিচার কতদূর সম্ভব তা বলা নিতান্তই দুরূহ। তবে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন যে অনেক হয়েছে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতীয় নবজাগরণের সময়কাল পর্যন্ত বিভিন্ন নিদর্শনের সমাবেশ বিভিন্ন বিভাগে রয়েছে যার ফলে সকল স্তরের জনমানসে ভারতীয় যাদুঘরের আকর্ষণ ও সমাদর বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তবে ভারতীয় যাদুঘর সারাবিশ্বে সুপ্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে তার অনুপম স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শনসমূহের জন্য। মৌর্যযুগের মসৃণ পালিশযুক্ত সিংহ, ভারহুত স্তূপের প্রস্তরবেষ্টনী এবং তোরণগাত্রের অপূর্ব কারুকার্য, গান্ধার শিল্পে রূপায়িত বৌদ্ধ জাতকের ও বুদ্ধের জীবনালেখ্যের অপূর্ব নিদর্শনসমূহ, মথুরার বুদ্ধ বা কঙ্কালীটিলার অপূর্ব দেহসুষমামণ্ডিত যক্ষীমূর্তি, সাতবাহন-

চুঁচুড়ায় স্কুল প্রাঙ্গণে মিউজিয়ম বাস

যুগের অমরাবতীর অনুপম ভাস্কর্যাবলী, গুপ্তযুগের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অনুপ্রাণিত ধর্মপ্রচাররত বা বরদানরত বুদ্ধমূর্তি, পাল-সেন যুগে বাংলা-বিহারের হিন্দু-বৌদ্ধ মূর্তি—নালন্দার বাগীশ্বরী, বানগড়ের সদাশিব, মানভূমের অহিষমর্দিনী, খাজুরাহোর প্রসাধনরতা নারী, পত্রলেখা নায়িকা অথবা পুত্রসমাদরব্যগ্রা মাতা, কোনারক, রত্নগিরি, খন্ডগিরির ভাস্কর্যসুষমা, দক্ষিণ ভারতের পল্লব এবং হোয়শল শৈলীর নমনীয় ও কারুকার্যমণ্ডিত ভাস্কর্য এবং যবদ্বীপ ও কম্বোজের শিল্পসাধনায় ভারতীয় শিল্প-শৈলীর প্রভাবের নিদর্শনগুলি যেমন গরুড়, গণেশ, মহিষমর্দিনী—সবকিছু অতীতের ভারতের একটি সমুজ্জল অধ্যায় আমাদের সম্মুখে তুলে ধরে। তাছাড়াও রয়েছে ভারতীয় মুদ্রার এক বিপুল এবং অতিশয় মূল্যবান সংগ্রহ, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পার শীলমোহর, পোড়ামাটির মূর্তি, চিত্রাংকিত মৃৎপাত্রের নিদর্শন, মিশরের মমী, ভিটা, কোশাম্বী, তক্ষশীলা, ময়নামতী, পাহাড়পুর, নালন্দা প্রভৃতি স্থানের পোড়ামাটির নিদর্শন এবং মানব ক্রমবিবর্তনে আদিম মানবের ব্যবহৃত পুরোন প্রস্তর এবং নব্য প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্রগুলি। ভারতীয় যাদুঘরের পুরাতত্ত্ব বিভাগ তাই প্রতিষ্ঠানের একটি গর্বের বস্তু।

অন্যদিকে কলা বিভাগে রয়েছে চিত্রকলা এবং বয়নশিল্পের অমূল্য এবং অপূর্ব নিদর্শন। ঢাকার মসলিন আর জামদানী, মুর্শিদাবাদের বালুচর শাড়ী, পাঞ্জাবের ফুলকারী, চম্বার নক্সী রুমাল, কাশ্মীরের শাল, গুজরাটের পাটোলা শাড়ী ও চিকনের কাজ, বেনারসের কিংখাব, পারস্য, বোখারার কার্পেট ও সূচীকার্যমণ্ডিত সুজনী আর বাংলার কাঁথার অপূর্ব নিদর্শন। তেমনি পোশাকের বিপুল সংগ্রহও সমানভাবে আকর্ষণীয়। দিল্লী-লক্ষ্ণৌর সোনা-রূপোর তারের কাজ ও সলমা-চুমকী বসান জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক, বেনারসের কিংখাব চোগা, কচ্ছের কাঁচবসান নক্সা-কবা সুন্দর পোষাক এবং তিব্বত ও পারস্যের ধর্মীয় ও সম্ভ্রান্তবংশীয়দের পোশাক—সর্বকিছুই কলাবিভাগের সংগ্রহের প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ। অপরদিকে কারুশিল্পের প্রদর্শনে রয়েছে নেপাল, ব্রহ্মদেশ ও তিব্বতের ধাতুমূর্তি, কাঠের কারুকার্য ও মূর্তি, হাতীর দাঁতের ও লাক্ষামণ্ডিত কারুকার্যের অপূর্ব নিদর্শন এবং চীন দেশের চিনামাটির নানারূপ চিত্রিত পাত্র। আর রয়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকশিল্প, বিদরী, ড্যামাসিন্ড, এনামেল এবং রৌপ্য ও অন্যান্য ধাতুর দ্রব্যাদি, ধাতুমূর্তি, হাতীর দাঁত, চামড়া, পোড়ামাটি, লাক্ষা ও কাঠের কারুকার্য। আর মিউজিয়ামের সর্বোচ্চ তলে রয়েছে পারসিক ও ভারতীয় চিত্রশৈলীর বিভিন্ন নিদর্শন।

নৃতত্ত্ব বিভাগে প্রদর্শিত হয়েছে ভারতের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিদের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন নিদর্শন আর রয়েছে বিরাট 'ডায়োরামাতে' এদেরই জীবনের এক-একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

প্রাণীতত্ত্ব বিভাগে রয়েছে রঙবেরঙের নানা জাতির পাখীর সংগ্রহ, জলচর, স্থলচর জীবজন্তুর সঙ্গে প্রাচীন জীবজন্তুর অস্থিপঞ্জরের কি বিশাল সংগ্রহ।

ভূতত্ত্ব বিভাগে রয়েছে খনিজ আর বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তরের বহু নিদর্শন, তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল জীবাশ্মের সংগ্রহ। প্রস্তরীভূত হাতীর মাথার খুলির জীবাশ্ম তাদের মধ্যে অন্যতম।

তেমনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা শ্রমশিল্পের বিভাগে আছে উদ্ভিদজগৎ থেকে শিল্পকাজে ব্যবহারের জন্য বহুবিধ উপাদানের সংগ্রহ।

এক কথায় কলকাতার এই যাদুঘর সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন ব্যতীতও সকল জ্ঞানপিপাসুর কাছে একটি অবশ্য ও অপরিহার্য ক্ষেত্র।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন ভারতীয় যাদুঘরের আদিপর্বে সংগ্রহের বিপুলতা এবং বৈচিত্র্যের প্রাধান্যের ওপরই লক্ষ্য ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। যাদুঘরে সংগ্রহ বৃদ্ধিই ছিল মূল লক্ষ্য। এ-কথা বোধহয় বিগত শতাব্দীর দেশী এবং বিদেশী প্রায় সব সংগ্রহশালার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। জনসমক্ষে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত করার জন্য তখন ব্যবস্থা ছিল সীমিত। এর সামগ্রিক সম্ভারকে শিক্ষার বিষয়বস্তু করে তোলার প্রচেষ্টাও ছিল নিতান্তই গৌণ। যাদুঘরের কলেবরের প্রতি লক্ষ্য না রেখে সর্বকিছু সংগ্রহ প্রদর্শন করার স্পৃহাই ছিল অত্যন্ত বেশী। ফলে এক-একটি শো-কেস বা গ্যালারী (প্রকোষ্ঠ) যাদুঘরের স্টোর-হাউস বা ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছিল। মুষ্টিমেয় বা অনুরাগী ব্যক্তিরা ছাড়া সাধারণ জনমানসে যাদুঘরের কদর অপেক্ষাকৃত কম ছিল। তবে যাদুঘরকে এভাবে জনসমক্ষে উপস্থিত করার পিছনে একটি উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। সেকালে সংগ্রহশালাগুলির ওপর জাতির ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পীঠস্থান হিসেবে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হ'ত। ফলে অতীতের গৌরবময় অধ্যায়ের প্রতীক হিসেবে জাঁকজমকপূর্ণ সৌধ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে নিদর্শনের প্রাচুর্যের দিকে প্রাধান্য দেখা হ'ত অত্যন্ত বেশী। এজন্য সেকালে দেশে-বিদেশে সকল জায়গাতেই যাদুঘরগুলিকে জাতির গরিমাময় ইতিহাসের প্রতিভূরূপে বিবেচনা করা হ'ত। যাদুঘরের পরিবেশ তাই ছিল ভাবগম্ভীর এবং সাধারণ লোকমানসে এর প্রভাবের গভীরতা ছিল খুবই সীমিত। কিন্তু ক্রমশ এই ভাবধারার পরিবর্তন হতে থাকে এবং মিউজিয়াম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা অনুভব করতে থাকেন যাদুঘরে শুধু যে সংগ্রহেরই স্থান

গুপ্ত ভাস্কর্য গ্যালারির নতুন রূপ
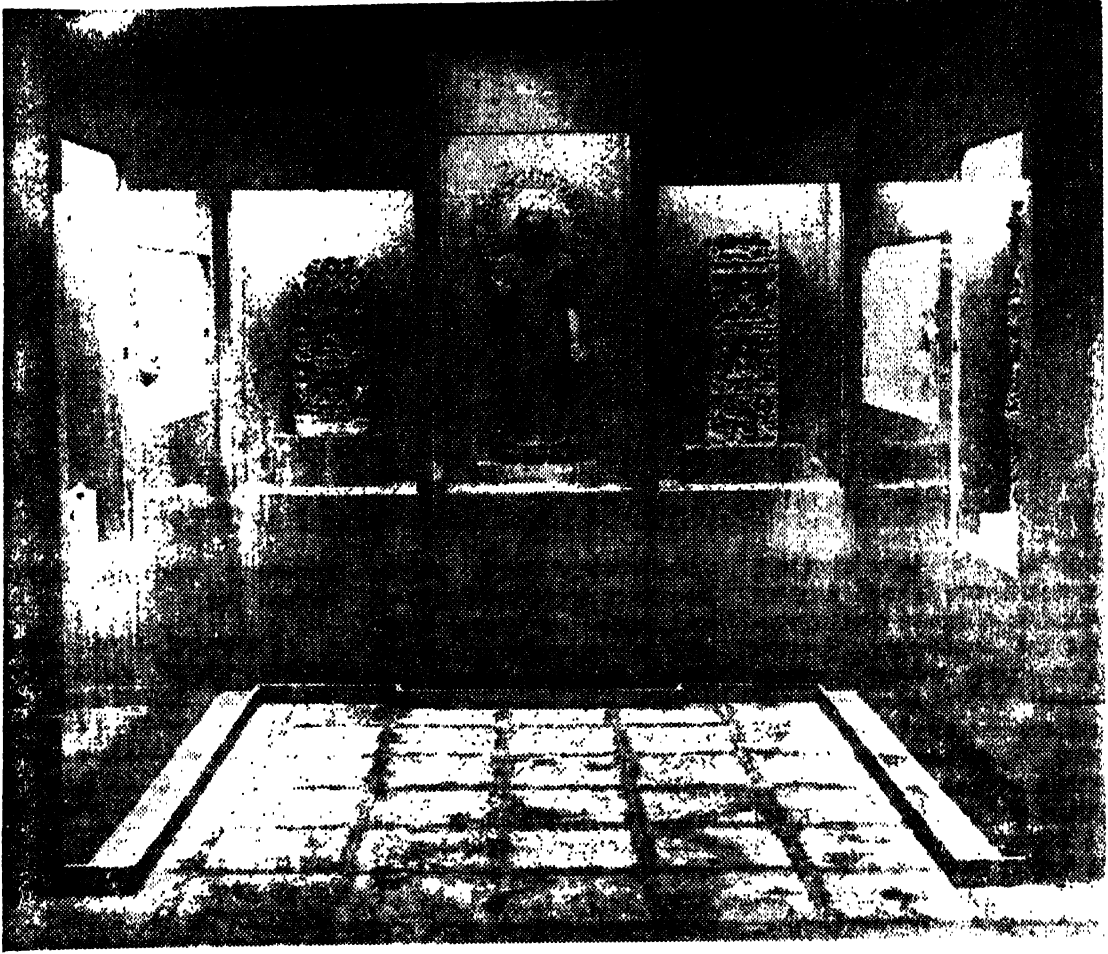
হবে তা নয়, এর দুয়ার খুলে দিতে হবে সকলের কাছে, জনসাধারণ, ছাত্র শিক্ষক, গবেষক এবং অনুসন্ধিৎসু প্রত্যেকের কাছে সমান ভাবে, ফলে শুধু গবেষণাগারের কেন্দ্রস্থল না হ'য়ে সকল স্তরের মানুষের আনন্দ লাভেরও স্থান হয়ে উঠেছে আজকের সংগ্রহশালাগুলি। ভারতীয় যাদুঘরও এই নবজাগরণের পথে এগিয়ে গিয়েছে এবং এর প্রথম পদক্ষেপ হল গ্যালারীগুলির পুনর্বিন্যাস সাধন। স্থাপন করা হল প্রেজেনটেশান ইউনিট অভিজ্ঞ শিল্পীর পরিচালনায়। এই পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্য হল আকর্ষণীয়ভাবে আলোর সমাবেশ, উল্লেখযোগ্য সংগ্রহের প্রদর্শন যথাযথ ভঙ্গিমায় ও প্রদর্শনীয় বস্তুর উপযোগী পশ্চাৎপটে রঙের আলেপ। এই প্রদর্শন শৈলী যাতে একঘেয়ে না মনে হয় সেজন্যে বিভিন্ন উপায়ে বৈচিত্র্য আনয়ন করার আজও চলেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তাছাড়া জনসাধারণ যাতে নতুন সংগ্রহ দেখেও আনন্দ লাভ করতে পারেন সেজন্য প্রদর্শনীতে মাঝে মাঝেই পুরোন সংগ্রহ বদলে নতুন সংগ্রহ দেখাবার ব্যবস্থা করা [illegible] ছিল না। তখন স্থায়ী প্রদর্শনীই ছিল যাদুঘরের আদর্শ। কলা বিভাগের বস্ত্র এবং কারু-শিল্পের শো-কেস গুলিতে এই পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তেমনি গান্ধার গ্যালারীতে যেভাবে বুদ্ধের জীবনালেখ্য প্রদর্শিত হয়েছে সে একদিকে যেমন শিক্ষণীয় অপর দিকে তেমনি চিত্তাকর্ষক। মথুরা, অমরাবতী, ভূমারা, গুপ্ত সব গ্যালারীতে স্থাপত্য ভাস্কর্যের প্রদর্শন এমন ভাবেই করা হয়েছে যা অনায়াসে মানুষের মনে দাগ কাটতে পারে।

পুনর্বিন্যাস ছাড়া নতুন গ্যালারীর সংযোজনও এই যাদুঘরকে জনপ্রিয় করতে অনেক সহায়তা করেছে। যেমন নালন্দা, উড়িষ্যা, বাংলা দক্ষিণ ভারত, নেপাল, তিব্বতের ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলিকে নতুনভাবে সজ্জিত করা হয়েছে ব্রোঞ্জ গ্যালারীতে। প্রাগৈতিহাসিক ও মহেঞ্জোদারো হরপ্পার অমূল্য সংগ্রহ নিয়ে হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনের আকর্ষণীয় প্রদর্শনী। হয়েছে উৎকীর্ণ লিপির একটি নতুন ক্রমবিন্যাস। এতে রয়েছে প্রস্তর খোদিতলেখ ও তাম্রশাসন প্রদর্শনের বিস্তৃত ব্যবস্থা। এই গ্যালারীর সংগ্রহগুলি যদিও চিত্তাকর্ষক নয় তবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইতিহাসের এগুলিই সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক দলিল। ভারহুত, মথুরার উৎকীর্ণ ব্রাহ্মী লিপি ছাড়া সমুদ্রগুপ্তের নামসহ এরন এর (মধ্যপ্রদেশ) চতুর্থ শতকের গুপ্ত ব্রাহ্মী লিপি, মালয় থেকে প্রাপ্ত পঞ্চম শতাব্দীর গুপ্ত ব্রাহ্মীতে উৎকীর্ণ প্রাচীন লেখ যাতে রয়েছে সফল সমুদ্রযাত্রার জন্যে রক্তমৃত্তিকাবাসী নাবিক বুধগুপ্তের প্রার্থনা ৫৮৯ শতাব্দীতে উল্লিখিত সিদ্ধমাতৃকা লিপি (সংস্কৃতালেখ) বোধগয়া থেকে প্রাপ্ত সিংহলী অধ্যাপক মহানামন কর্তৃক মন্দির নির্মাণ, দেওপাড়া, রাজসাহী থেকে প্রাপ্ত প্রাকবাংলা লিপি ১২শ শতাব্দীর, রাজা বিজয়সেন কর্তৃক শিব-প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির নির্মাণ, দেওগড় (উঃ প্রদেশ) থেকে প্রাপ্ত নাগরী লিপিতে ১৪৩২ খৃঃ মালবের ঘোরী বংশীয় সুলতান হুশাঙ শাহের সময়ে দুটি জৈন মূর্তির প্রতিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রয়েছে নস্‌খ্‌, কুফী, তুঘরা, নস্‌তালিখ, সুলস লিপিতে আরবী ও ফারসী লেখমালা। বৈদেশিক লেখর মধ্যে রয়েছে তিব্বতীয়, চৈনিক ও ব্যাবিলনদেশীয় লিপি। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য,

প্রাচীন পুঁথি এবং ক্যালিগ্রাফী ও সনদ-ফরমানের জন্য নতুন 'ম্যানাসক্রিপ্ট' বা পুঁথিপত্রের গ্যালারী। এখানে ষষ্ঠ শতাব্দীর গুপ্ত ব্রাহ্মীতে লেখা 'প্রজ্ঞাপারমিতা', ১৩শ শতাব্দীর তালপাতার পুঁথিতে 'হরিবংশ', ১৫৫৬ শতাব্দীর বৈরামখানের 'সনদ', ১৬৯৭ খৃঃ 'নেওয়ারী'তে লেখা 'পঞ্চরক্ষার' পুঁথি, অষ্টাদশ শতাব্দীর হাতে তৈরী কাগজে জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', মেসিনে তৈরী কাগজে শারদালিপিতে হস্তলিখিত কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী' এবং নস্‌খ্‌ লিপিতে দুটি অতি ক্ষুদ্রাকৃতি (মিনিয়েচার) 'কোরান' ও 'জেন্দ আবেস্তা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নৃতত্ত্ব বিভাগে নতুন গ্যালারী হয়েছে বিভিন্ন প্রকারের বাদ্যযন্ত্রের সংগ্রহ নিয়ে। আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে বিশিষ্ট উপজাতিদের আচার ব্যবহারের দ্রব্যসম্ভার দিয়ে নতুন বীথিকা। ভারতীয় যাদুঘরের ... নতুন গ্যালারী কলা বিভাগের সূক্ষ্ম চিত্রের প্রদর্শনীশালা। এখানে প্রাচীন তালপাতার পুঁথিচিত্র থেকে শুরু করে পারসিক, মুঘল, দক্ষিণ ভারতীয়, রাজস্থানী, পাহাড়ী, বাংলা চিত্রশৈলীতে পরিবর্তনের সূচনাকালীয়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং রেনেসাঁ বা নবজাগরণের কালের অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু প্রভৃতির চিত্র-নমুনা স্থান পেয়েছে। স্বল্পসংখ্যক নির্বাচিত ছবি এখানে দেখান হয়েছে এবং কিছুদিন অন্তর এগুলির পরিবর্তনের ব্যবস্থাও রয়েছে। যাদুঘরের নতুন এবং পুরোন সব গ্যালারীতে এখন জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিশ্রামস্থানেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা হয়েছে।

যাদুঘরকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করার জন্য আরও একটি ব্যবস্থা হল সুষ্ঠু গ্রন্থের প্রকাশন। শুধু গ্রন্থ নয় অল্পমূল্যে রঙিন পত্রাকার চিত্র প্রভৃতি এবং যাদুঘরের সংগৃহীত ভাস্কর্যের প্রতিমূর্তি সাধারণ মানুষের কাছে স্বল্পমূল্যে পৌঁছে দিয়ে আজকের যাদুঘর প্রতি ঘরে এর দুর্মূল্য সংগ্রহ সম্বন্ধে অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় বহন করতে প্রয়াসী হয়েছে। এটি এ যুগের যাদুঘর সম্পর্কে এক অতি অভূতপূর্ব অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি করেছে, এবং প্রাচীন কলা নিদর্শন সম্বন্ধে এক দুর্লভ শ্রদ্ধা ও জনপ্রিয়তার চিন্তাধারার প্রবর্তন করেছে।

এরই সঙ্গে গড়ে উঠেছে সংরক্ষণ বিভাগ। অভিজ্ঞ ও উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত 'কেমিস্টের' তত্ত্বাবধানে প্রাচীন ও নবীন বহু সাংস্কৃতিক নিদর্শনের এই সংগ্রহাগারে রাসায়নিক উপায়ে যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যাদুঘরে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

আজকের যে কোন যাদুঘরের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য একটি গ্রন্থাগার। কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে বিগত পাঁচ বছরে যে নিজস্ব গ্রন্থাগারের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি হয়েছে তা এই যাদুঘরকে একটি পূর্ণায়তন শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত করেছে।

ভারতীয় যাদুঘরের আরও একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল এর শিক্ষামূলক কার্যসূচী। মিউজিয়ামের প্রতি বিভাগে বিভাগীয় গাইড লেকচারার অর্থাৎ প্রদর্শক বা প্রদর্শিকা নির্দিষ্ট সময়ে যাদুঘরে দর্শকমণ্ডলীকে বিভিন্ন প্রদর্শনশালায় সংগৃহীত বস্তুগুলিকে প্রয়োজনমত ইংরাজী, বাংলা বা হিন্দীতে বুঝিয়ে দেন। এতে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তরা ছাড়াও সাধারণ মানুষও যাদুঘরের নিদর্শনগুলি থেকে অতি সহজ ভাষায় রস গ্রহণ করতে সমর্থ হন। তাছাড়া আজকের যাদুঘর যাতে ছাত্রদের কাছেও সর্বাধিক বোধগম্য হয় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ভারতীয় যাদুঘরে করা হয়েছে। ছাত্ররা স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে যাদুঘর পরিদর্শন করে পাঠ্যের বিষয়বস্তু অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে—ইতিহাসের বা বিজ্ঞানের উপকরণ বস্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ক'রে পুলকিত হয়ে উঠবে,—এজন্য প্রতি শনিবার এখানে ছাত্রদের জন্য বিশেষ কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। সে অনুসারে স্কুল সার্ভিসের অন্তর্গত বিশেষ পরিদর্শন ছাড়াও শিক্ষা-মূলক চলচ্চিত্র দেখানর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রত্যেক শনিবারের এই প্রোগ্রাম সংগ্রহশালার আধুনিক কর্মসূচীর বিশেষ অঙ্গ। বিভিন্ন স্কুলে এই প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠানসূচী জানানো হয় এবং অনুমোদন-পত্র লাভের পর ছাত্রদের আগ্রহ ও ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের আমন্ত্রণ জানান হয়। এই বিশেষ পরিক্রমায় ছাত্রদের অনুসন্ধিৎসু মনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাদের কৌতূহল ও জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করা হয়।

এছাড়া লোন সার্ভিসও একটি আধুনিক যুগের অপরিহার্য উপায় যার দ্বারা ছাত্ররা মিউজিয়ামের বিভিন্ন সংগ্রহের ফটোগ্রাফিক প্রদর্শনীও করে থাকে। ভারতীয় যাদুঘরের আরও একটি আকর্ষণীয় ব্যবস্থা হল সাময়িক প্রদর্শনী। সাম্প্রতিক প্রদর্শনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু হল 'ব্রহ্মদেশীয় শিল্পকলা' 'বীরহোড়' উপজাতির ব্যবহারিক জীবন এবং 'যুগে যুগে বাংলার শিল্প'। তবে উনিশ শতকের বাংলাদেশের নাতিবিস্মৃত সমাজচিত্রের এক দলিল 'সতীদাহ ফলকের'
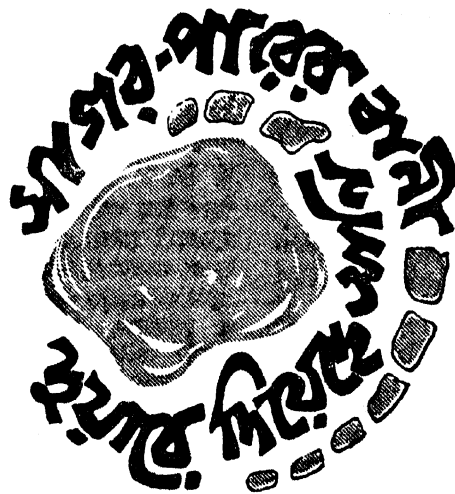
একক প্রদর্শনী জনসাধারণের মধ্যে খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল।

ভারতীয় যাদুঘরের অধুনাতম শিক্ষামূলক কাজের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল, চলমান প্রদর্শনী। এই 'মিউজিওবাস' তৈরীর উদ্দেশ্য হল বহু দূরদূরান্তরের গ্রামবাসীরা,—যারা কলকাতার এই যাদুঘরের বহু দুর্লভ ও মনোরম সংগ্রহের দর্শনলাভ থেকে সাধারণত বঞ্চিত, তাদের কাছে যাদুঘরের নিজস্ব ব্যয়ে এই 'ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর' মাধ্যমে ভারতের প্রত্নকীর্তির ক্রমবিবর্তনের একটি ধারাবাহিক চিত্র উপস্থাপিত করা। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মুঘল যুগ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার নিদর্শনের 'মডেল' বা প্রতিকৃতি আমাদের গ্রামীণ দেশের কোণে কোণে পৌঁছে দেওয়া। এই প্রতিকৃতিগুলি এক বিশেষ আলোকসজ্জায় মন্ডিত ক'রে সেই সেই সময়কার যথাযথ পারিপার্শ্বিক শিল্প বা স্থাপত্য নমুনার পরিপ্রেক্ষিতে রূপায়িত এবং অঙ্কিত পশ্চাৎপটে প্রদর্শিত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রাগৈতিহাসিক মানব বা 'পিকিং মানব'। প্রায় চার লক্ষ বৎসর পূর্বে জনবোধশূন্য উন্মেষের এটি এক অপূর্ব বা খাদ্য হিসেবে জন্তু শিকার, শিল্পীর সুদক্ষ হাতে এবং রঙে ও তুলিতে খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। সেই সঙ্গে মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ, এবং বৃহৎ স্নানাগারের প্রতিকৃতি, ভারহুত স্তূপের প্রস্তর বেষ্টনী ও তোরণদ্বার, তক্ষশিলায় ধর্মরাজিক স্তূপের পটভূমিকায় বুদ্ধের জীবনের দু' একটি স্মরণীয় ঘটনা, মায়ার স্বপ্নদর্শন বা মহাভিনিষ্ক্রমণ, কনিষ্কের প্রতিকৃতি, সারনাথের ধামেক স্তূপ এবং ভিক্ষুদের বিহার আবহ-দৃশ্যে, বুদ্ধের মূর্তি আরিকামেডুর প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ এবং ফতেপুর সিক্রীর অপূর্ব কারুকার্য শিল্পীর নৈপুণ্যে সে যুগের এক ধারাবাহিক ও প্রাণবন্ত রূপদান ঘটেছে এই ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর মধ্যে। এজন্য এগুলির একটি বাস্তবানুগ আবেদন আছে যার দ্বারা সাধারণের কাছে প্রাচীন কীর্তিগুলি সঠিক চিত্রায়নে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এটি ভারতের মিউজিয়াম চিন্তাধারায় এক নতুন প্রচেষ্টা। এই 'মিউজিওবাস' কলকাতার বাইরে গ্রামে এত সমাদর লাভ করেছে তা বলার নয় কারণ ভারতবর্ষে পুরাতত্ত্বের ওপর এধরনের বাস এই প্রথম। এখানেও ভারতীয় যাদুঘরকে নবজাগরণের অগ্রদূত বলতে

কলকাতার যাদুঘর শুধু শহরের লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর জনপ্রিয়তা আজ পৌঁছে গেছে বহু দূরবর্তী স্থানে। যাদের হয়ত জিজ্ঞাসু ও রসপিপাসু মন আছে, কিন্তু শহরে পৌঁছবার সুযোগ বা সামর্থ্য নেই। এই অগণিত গ্রামীণ নরনারীর জ্ঞান ও রসাকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতায় এবং ছাত্রদের কাছে ভারতের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সাংস্কৃতিক জীবনের চাক্ষুষ পরিচয় প্রদানে ভারতীয় যাদুঘরের এই প্রচেষ্টা অনন্যসাধারণ। একালের ভারতীয় যাদুঘর এইভাবে সমাজের অন্তস্তলে ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের বার্তা পৌঁছে দিয়ে এক মহান সার্থকতা অর্জন করছে।

কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরের ব্যাপক কার্যক্রমের পরিধি তাই আজ সুদূরপ্রসারী আর এর কাহিনীও তাই আজ বহুবিস্তৃত। যুগোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে ও সংবেদনশীল হওয়ার আগ্রহে যাদুঘর যে আর 'আজবঘর' নেই; এই প্রতিষ্ঠান যে আজ ভারতের লুপ্ত ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক, এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড-রূপে যে আজ তা প্রতিভাত, আজকের ভারতীয় যাদুঘর তার সমৃদ্ধ সংগ্রহের সুষ্ঠু বিন্যাসে ও প্রসারিত কার্যসূচীতে তা' নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করে।

ভোরবেলা কড়া নাড়ার শব্দে স্টেশন-মাস্টার স্বয়ং এসে দরজা খুলে গার্ড ভবেশ মজুমদারকে দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার ভবেশবাবু? এত সকালে কি মনে করে?'

ভবেশের উদভ্রান্ত ভাব, চুল অবিন্যস্ত, চোখ দেখে মনে হয় সে সারা রাত ঘুমায় নি।

সে বলল, 'আমার এই অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে, স্যার। আমায় সকালটা ছুটি দিন। দুপুরের ট্রেন আমি নিয়ে যাব।'

স্টেশন মাস্টার অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'আপনার বয়েস হয়েছে; বেশ কিছুকাল কাজ করছেন। নিজেই বুঝে দেখুন, আপনাকে ছুটি দেওয়া অসম্ভব। আটটার লোক্যাল কে নিয়ে যাবে? এই ট্রেনেই কলকাতার অফিস যাত্রীরা যায়।'

'কেন, জিতেনবাবু?'

'তিনি ত নটার ট্রেন নিয়ে যাবেন। পরিমলবাবু আজ ছুটিতে আছেন। আপনার যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। কেন, কি হয়েছে, বলুন তো?'

ভবেশ বলল, 'শেষ রাত থেকে আমার স্ত্রীর কলেরার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। ডাক্তার ডাকতে গেছলাম, তিনি বললেন, বেলা আটটায় আসবেন। আমি না থাকলে কে ব্যবস্থা করবে বলুন? জানেন ত, আমার ছেলে দুটি স্কুলে পড়ে। আর বৃদ্ধা মা আছেন মাত্র।'

একটু সময় চিন্তা করে স্টেশন মাস্টার বললেন, 'অবশ্য এটা কলেরার সময়, কিন্তু তা বলে কলেরাই যে হয়েছে তার কোন মানে নেই। আর হলেই বা আপনি কি করবেন। হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা ত? আমি সাড়ে আটটায় আপনার কোয়ার্টার্সে লোক পাঠাব। আপনাকে নটার ট্রেন দিতে পারতাম, কিন্তু তখনও আপনি আসতে পারবেন না। নতুন নোটিশ এসেছে জানেন ত, ট্রেনের বিলম্বের জন্য যারা দায়ী তাদের চাকরী যাবে। এই বয়েসে চাকরী হারাবেন। বাড়ীতে এতগুলি পোষ্য। নিশ্চিন্ত মনে চলে যান, আমি আপনার বাসার খোঁজ-খবর নেব।'

এই বলে স্টেশন মাস্টার সদর দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁকেও স্টেশনে যাবার জন্য তৈরী হতে হবে। ভবেশ কিছুক্ষণ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের কোয়ার্টারের পথ নিল।

আটটার লোক্যাল যথাসময়েই ছাড়ল। ভবেশ বাসায় যতদূর সম্ভব পরামর্শ দিয়ে এসেছে। ডাক্তার না এলে বড় ছেলেকে যেন তাঁর কাছে পাঠান হয়। তাতেও তিনি না এলে বড় ছেলে যেন স্টেশনে গিয়ে স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে দেখা করে। যদি ডাক্তার এসে হাসপাতালে পাঠাবার কথা বলেন, তাহলে তার ব্যবস্থা করতে যেন ডাক্তারকেই অনুরোধ করা হয়। তিনি রাজি না হলে, তার জন্য যেন স্টেশন মাস্টারের কাছে যাওয়া হয়। কিছু টাকা সে অসুধপত্রের জন্য রেখে

এসেছে, বেশী প্রয়োজন হলে যেন স্টেশন মাস্টারের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া হয়।

ইলেকট্রিক ট্রেন প্রচন্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে। কয়েকটি স্টেশন থেকে ইতিমধ্যে অনেক অফিস-যাত্রী উঠেছে। ভবেশ যন্ত্র-চালিতের মত বাঁশি বাজিয়েছে, সবুজ পতাকা দেখিয়েছে। তার মন পড়ে আছে তার বাসায়। এতক্ষণ সেখানে কি হচ্ছে কে জানে। রোগ আর রোগী সম্বন্ধে ডাক্তাররা অনেকে ত ক্রমশ ক্যালাস হয়ে যান। ঠিক সময়ে ডাক্তার যাবেন কিনা কে জানে? স্টেশন মাস্টার তাকে এই ট্রেনে পাঠাবার জন্য ত অনেক আশ্বাস দিলেন, কার্যক্ষেত্রে কতটা করবেন কে জানে। আসবার সময় সে দেখে এসেছে স্ত্রীর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। বৃন্ধা মা আগুন জেবলে গরম করবার চেষ্টা করছেন। এই সময় স্ত্রীর মৃত্যু হলে সংসার দেখবে কে? আবার কাজে না গেলে চাকরী যাবে। তাহলেই বা সংসার চলবে কি করে!

সকালের বাতাসে সজীব উৎফুল্লতা, গতিময় পারিপার্শ্বিককে রোমাঞ্চ। অন্য দিন ভবেশ সকালের এই যাত্রাটি খুব পছন্দ করে। আজকে সে অত্যন্ত অন্যমনস্ক, তার মন তার বাসায় পড়ে আছে। গার্ডের পক্ষে এই মনোভাব মোটেই ভাল নয়, ট্রেনটির সমস্ত দায়িত্ব তার হাতে। এতগুলি লোকের প্রাণ তার হাতে। কিন্তু তার নিজের মনের উপর তার হাত নেই।

যন্ত্রদানব ট্রেন নির্বিকারভাবে এগিয়ে চলেছে। অফিস যাত্রীরা খোস গল্পে মত্ত। আশে-পাশের গ্রামগুলিতে নর-নারীরা কর্মব্যস্ত। শিশুসূর্যের আলো অবারিত প্রান্তরে; পুকুরে তরুশিরে ছড়িয়ে পড়েছে। কেবল ভবেশের মনে অন্ধকার।

বেলা তখন নটা। প্রায় অর্ধেক পথ পার হয়ে এসে ট্রেন যে স্টেশনে এসে দাঁড়াল, সেখানে দাঁড়িয়েই রইল। নড়বার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। বাইরে যাবার সিগনাল নামল না। ভবেশ গাড়ি ছাড়বার সংকেত দেবে কি করে!

পনেরো মিনিট পরেও যখন সিগনাল নামল না এবং ট্রেন ছাড়ল না, তখন যাত্রীরা প্লাটফর্মে নেমে উত্তেজিতভাবে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। কেউ গেল ইঞ্জিন-ড্রাইভারের কাছে, কেউ গার্ড ভবেশের কাছে। সকলেরই চোখে-মুখে দুশ্চিন্তা, অফিসে যেতে বিলম্ব হয়ে যাবে। ব্যাপারটা কি হয়েছে, কতক্ষণে ট্রেন আবার চলবে, তারা পরিষ্কার প্রাঞ্জলভাবে জানতে চায়।

ভবেশের নিজের দুশ্চিন্তাও কম নয়। যথা সময়ে ট্রেনটি গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিয়ে সে ফিরতি ট্রেনেই ফিরে আসবে, বাসায় দের জানাল যে, ব্যাপার কি তা সে নিজেই জানে না।

একজন যাত্রী বলল, 'তাহলে স্টেশন-মাস্টারের কাছে গিয়ে জানুন। এতক্ষণই ত আপনার জানা উচিত ছিল, ট্রেনের সব দায়িত্বই ত আপনার। এতক্ষণ কর-ছিলেন কি?

একটু দূরে থেকে একজন মন্তব্য করল, 'যত সব অপদার্থ লোকের হাতে ট্রেনের ভার, তাই ত এত হাঙ্গামা। এই সব লোকেদের জন্যে আমাদের আর চাকরী করে খেতে হবে না!'

যাত্রীদের ভাবভঙ্গি ভাল নয়, দোষটা সবই যেন ভবেশের। তাই আপাততঃ নিজের ব্যক্তিগত সমস্যা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে ভবেশ স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকে গেল। সেখানে গিয়ে শুনল, সেই স্টেশন ও পরের স্টেশনের মাঝপথে অনেকটা ইলেকট্রিক তার চুরি হয়েছে। সারানর কাজ চলছে, তবে বেশ সময় লাগবে। কতক্ষণে ট্রেন ছাড়া যাবে বলা শক্ত।

বিমর্ষ মুখে ফিরে এসে ভবেশ যাত্রী-দের যখন খবর জানাল, তারা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল। অবশ্য একথা তারা বুঝল যে এ-ব্যাপারে ভবেশের কোন হাত নেই, সে তাদের মতই অসহায়। এই অনিশ্চিত অবস্থায় ক্রুদ্ধ যাত্রীরা রেল-কর্তৃপক্ষের চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার করতে লাগল।

তার মানে সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে ভবেশ বাসায় ফিরতে পারবে না। ইতিমধ্যে তার স্ত্রীর যা ভাগ্যে আছে তাই হয়ে যাবে কেবল দুশ্চিন্তা করা ছাড়া ভবেশের করবার কিছু ছিল না। প্লাটফর্ম লোকে লোকারণ্য, নিজের কামরায় বসে যে একটু নিভৃতে বিশ্রাম করবে সে উপায় নেই। অনবরত নতুন যাত্রী এসে অবস্থাটার কারণ এবং কখন ট্রেন ছাড়বে তাই জানতে চাইছে। তবু সে গার্ডের কামরাতেই বসে রইল।

বেলা এগারটার সময় যেমন রোদের তাপ বাড়ল, তেমনি সে ক্ষুধা অনুভব করতে লাগল। এতক্ষণ কখন সে কলকাতায় পৌঁছাতে পারত! কিন্তু নেমে প্লাটফর্মে কোন স্টলে যেতেও তার মন চাইল না, সেখানে উত্তেজিত যাত্রীদের ভীড়। কিন্তু শরীরটা তার অবসন্ন বোধ হতে লাগল। আগেকার কয়লার ইঞ্জিন ঢের ভাল ছিল, সে ভাবল। হয়ত আধ ঘন্টা বিলম্বে গন্তব্য-স্থানে পৌঁছাত। তখনও মাঝে মাঝে পথে হাঙ্গামা কি হত না? কিন্তু এরকম তার দূরপাল্লার ট্রেনগুলো এখনও ত কয়লায় চলে, লেটও হয়, কিন্তু অনেকদূর থেকে আসছে বলে লোকে অতটা দোষ দেয় না। তাছাড়া সেগুলোতে অফিস-যাত্রীরা ওঠে না।

এতক্ষণ স্ত্রী বেঁচে আছে কিনা কে জানে। ভবেশের চিন্তা এবার অন্যদিকে মোড় নিল। জনতার হাত থেকে যদিও বা সে পরিত্রাণ পায়, ভাগ্যের হাত থেকে কি পাবে? যতদিন যাচ্ছে, মানুষ ক্রমশঃ অবস্থার দাস হয়ে পড়ছে, অসহায় হয়ে পড়ছে। আজকের এই অবস্থায় ভবেশের কিছুই করবার নেই।

ক্রমে ক্ষুধা অসহ্য হয়ে ওঠায় সে গাড়ি থেকে নেমে একটা স্টলের দিকে অগ্রসর হতে লাগল, যাহোক কিছু খেয়ে নেবে। এমন সময় দেখল রেলের পোশাক পরা কে একজন তার দিকে আসছে।

লোকটি কাছে এসে বলল, 'আপনিই ত গার্ড? আমি এখানকার স্টেশন-মাস্টার।'

ভবেশ ভদ্রতা দেখিয়ে নমস্কার করল। তার তখন কথা বলার ক্ষমতা বা অভিরুচি ছিল না।

স্টেশন মাস্টার বললেন, 'গাড়ি ছাড়ার জন্যে তৈরি হোন। তার ঠিক হয়ে গেছে। আমি ড্রাইভারের খোঁজ নিচ্ছি।'

ঘড়িতে তখন বারোটা বেজে গেছে।

পরের স্টেশনে গাড়ি রুদ্র গতিতে পৌঁছে গেল পাঁচ মিনিটেই। কিন্তু ট্রেন থামবার পর সেখানে লংকাকান্ড সুরু হয়ে গেল। সেখানে তারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছে। অনেকে বাসের সন্ধানে গিয়ে বিফল হয়ে ফিরে এসেছে, তাতে অসম্ভব ভিড়, ওঠা যায় না। তাছাড়া দু-তিনবার বাস বদল করতে হবে। অফিসের হাজিরা ত শিকেয় উঠেছে, এখন তারা অনেকে ফিরতি ট্রেনে বাড়ি ফিরে যাবে। কিন্তু যাদের ভাব দেখে মনে হল, এদিন তারা ট্রেন লেট হবার ব্যবস্থার একটা হেস্ত-নেস্ত করতে চায়।

শখানেক লোক লাইনের উপর বসে ছিল, যাতে ট্রেন না চলতে পারে। স্টেশনের একটা অংশে আগুন জ্বলছিল। ভবেশের মনে হল, ট্রেনেও তারা আগুন লাগাবে। ট্রেনের মধ্যে যারা ছিল, তারাও অবস্থা বুঝে নেমে পড়েছে এবং তাদের মনের ধূমায়িত অসন্তোষ অনুকূল বাতাসে আবার প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে।

তাদের অগ্নি-সংযোগের আয়োজন দেখে ভবেশ ভাবল কর্তব্যের বেড়াজাল থেকে তার মুক্তির সময় আসন্ন। ট্রেনটাই যদি [illegible] তার আর গার্ডগিরি

করার অবসর থাকে না। সে নিশ্চিন্ত মনে বাসে করে নিজের বাসায় ফিরে যেতে পারে। সেখানেও তার জন্য প্রকাণ্ড কর্তব্য প্রতীক্ষা করে রয়েছে।

সে গার্ডের কোটটা খুলে ফেলল। তারপর সেটা পাট করে নিজের কামরার এক কোণে ফেলে রাখল। পরে আর একটি কোট করিয়ে নিলেই চলবে। টুপিটাও খুলে কোটের উপর রাখল। এখন তার শরীরে গার্ডের কোন চিহ্ন নেই। এখন সে একজন সাধারণ যাত্রীর মত। প্যান্ট আর সার্ট ত অনেকেই পরে আছে।

প্ল্যাটফর্মের উল্টো দিকে সে নিচে নেমে পড়ল। সকলেই ট্রেন পোড়ান নিয়ে ব্যস্ত। তার দিকে নজর দেবার কেউ নেই। স্টেশনের এলাকা পার হতে পারলেই মুক্তির অবারিত প্রান্তর, নিরুপদ্রব পথ। তারপর কিছু দূরে গিয়ে বাসের প্রতীক্ষা। তারপর দেড়ঘণ্টা পরে তার নিজের বাসা। সেখান-কার খবর নিয়ে পরে স্টেশন মাস্টারের কাছে রিপোর্ট। সে দ্রুত পা চালিয়ে দিল।

কিন্তু স্টেশন এলাকার প্রান্তে এসে সে থমকে দাঁড়াল। তার মনে পড়ে গেল যে, সে এই ট্রেনের গার্ড। সমস্ত বিপদ থেকে সেটিকে রক্ষা করে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেওয়াই তার কর্তব্য। এই ট্রেনটির সম্পূর্ণ ভার তাঁর হাতে দেওয়া হয়েছে। ট্রেনটিকে ক্রুদ্ধ জনতার হাত থেকে রক্ষা করা হয়ত তার সাধ্যে কুলাবে না। কিন্তু সেজন্য চেষ্টা করার কর্তব্য অতি অবশ্য তার আছে। এতগুলি যাত্রীর অনেকের বাড়িতে হয়ত অনেক ব্যক্তিগত সমস্যা আছে, তবু তারা চাকরির কর্তব্য করতে বের হয়েছিল এবং তা করতে পারেনি বলেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। ভবেশকেও তার কর্তব্য করতে হবে, তার অদৃষ্টে যাই থাকুক না কেন!

সে প্ল্যাটফর্মে ফিরে এল এবং জনতার সঙ্গে মিশে গেল। তারপর ট্রেনের পাশে গিয়ে জনতার দিকে হাতজোড় করে দাঁড়াল।

একজন বলল, 'আপনি আবার কে মশাই? কি বলতে এসেছেন?'

আর একজন বলল, 'রেলের কর্মচারি বলে মনে হচ্ছে।'

ভবেশ বলল, 'এই দেরীর জন্যে ট্রেনের কোন দোষ নেই। যারা তার চুরি করে নিয়ে গেছে দোষ তাদের। এই ট্রেন কেন পোড়াতে যাচ্ছেন, এই ট্রেনে করেই ত আপনাদের রোজ অফিসে যেতে হবে।'

অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। যাত্রীরা বুঝল ভবেশ রেল-কর্তৃপক্ষের লোক। সমস্ত রাগটা তার উপর পড়ল।

একজন বলল, 'ইলেকট্রিক ট্রেন চালাবার যখন মতলব, তখন তার রক্ষা করার ব্যবস্থা আপনাদের করা উচিত ছিল। আমাদের চাকরিগুলো খাবেন? রোজই তো এই ঝামেলা।'

ভবেশ বলতে গেল, 'ইলেকট্রিক ট্রেন আপনাদের সুবিধার জন্য করা হয়েছিল। আর এতটা পথে সারারাত পাহারা দেবার এত লোক......'

তার কথা শেষ হবার আগেই একজন যাত্রী বলে উঠল, 'এই সেই গার্ড।'

অন্য একজন বলল, 'ওকে ভালরকম শিক্ষা দিয়ে দিন, কর্তৃপক্ষের সাফাই গাইতে এসেছে।'

তারপর তার শরীরের উপর অজস্র কিল চড় লাথি পড়তে লাগল। সে উপুড় হয়ে প্ল্যাটফর্মে পড়ে গেল। তার পিঠের উপর অনেকে লাফাতে লাগল। যখন তার চৈতন্য স্তিমিত হয়ে আসছে; সে শুনতে পেল পুলিশের গুলীর শব্দ, বহু পলাতক পায়ের শব্দ। তারপর সে জ্ঞান হারাল।
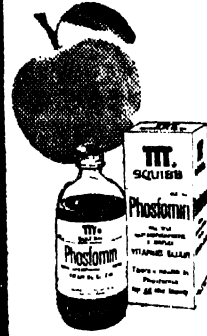
সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অনেকগুলি বই পর পর প্রকাশিত হয়েছে মানকেকর, কাউল, দালভী, খেরা, কুলদীপ নায়ার, রেজিন্যালড ম্যাকসওয়েল, সুদীর্ঘ তালিকা। সকলেই ভারত-চীন যুদ্ধের নেপথ্যকথা বলার চেষ্টা করেছেন। কারো কাহিনীর নাম 'আনটোলড স্টোরী' আর কারো বা 'ইন্ডিয়াস চায়না ওয়ার' অর্থাৎ ভারতের চীন যুদ্ধ। আমরা এই স্তম্ভে ইতিপূর্বে এই সব গ্রন্থের কয়েকটি সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং মনে হয় বর্তমানে যে পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তদ্দ্বারা ভিতরকার রহস্য জানা না থাকলেও আমরাই একখানি স্বতন্ত্র চীনা যুদ্ধ-বিষয়ক গ্রন্থ লিখে ফেলতে পারি—যা মৌলিক এবং চমকপ্রদ হতে পারে। প্রসংগত একথা উল্লেখ করা উচিত যে কাউলের এবং ম্যাকসওয়েলের গ্রন্থ দুটির বংগানুবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

উপরিল্লিখিত সাংবাদিক ও সামরিক হোমরা-চোমরাদের পর এইবার আসরে নেমেছেন ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর অধিকর্তা বি এন মল্লিক। ১৯৪৮ থেকে পণ্ডিত নেহরুর মৃত্যুর পর পর্যন্ত তিনি ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর ডাইরেকটরপদ অলংকৃত করেছেন। ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর কর্ণধার হিসেবে এমন অনেক গুপ্ত তথ্য তিনি জানেন যা আর কারো জানা সম্ভব নয়, এবং প্রতিবাদ করার সামর্থ্যও কারো নেই। 'ক্লাসিফায়েড মেটিরিয়্যাল' নামক বস্তুরাজি সাধারণের নাগালের বাইরে। পণ্ডিত নেহরুর তিনি আস্থাভাজন ছিলেন এবং বল্লভভাই প্যাটেল থেকে গুলজারিলাল নন্দা পর্যন্ত স্বরাষ্ট্রসচিবদেরও স্নেহধন্য। অনেক 'ডেলিকেট' এবং 'সিক্রেট' মিশনে তাঁকে কর্তৃপক্ষরা নিযুক্ত করেছিলেন তাই তিনি যে একজন অধিকারী ব্যক্তি এ বিষয়ে সকলে নিঃসংশয়। এই গ্রন্থটির মলাটের ওপর লাল কাগজের রিবন আঁটা আছে—

"The last word on the subject".

সুতরাং এরপর আর কথা বলা চলে না। কিন্তু গ্রন্থ শেষে রবীন্দ্রনাথের সেই 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে—' এই কথাকটি পাঠকের কানে গুঞ্জরিত হবে। এই গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে—'দি চাইনিজ বিট্রেয়াল'—এবং অনুশিরোনাম 'মাই ইয়ারস উইথ নেহরু।' পাঠকের কাছে এ সবই মূল্যবান তথ্য হিসাবে গৃহীত হবে কারণ এসব বাদ দিয়ে গ্রন্থটির সুবিচার সম্ভব নয়। এই গ্রন্থের প্রকাশক-প্রদত্ত পরিচয়ে গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য অনেক কথা লিখিত হয়েছে—তার মধ্যে আছে 'হোয়াট লেড সরদার প্যাটেল টু রাইট দি লেটার পারটেনিং টু দি সিকিউরিটি প্রবলেমস অব ইন্ডিয়া?'—এতদ্দ্বারা সর্দার প্যাটেল কর্তৃক ৭ই নভেম্বর ১৯৫০ তারিখে পণ্ডিত নেহরুকে লিখিত একটি সুদীর্ঘ পত্রের কথা ইংগিত করা হয়েছে। 'ভবনস জার্ণালে'র ১৯৬৭-র ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সমগ্র পত্রটি মুদ্রিত হয়েছিল এবং তারপর দালভীর 'দি হিমালয়ান ব্লান্ডার' ও কুলদীপ নায়ারের 'বিটউইন দি লাইনস' গ্রন্থে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরাও সম্ভবতঃ 'ভবনস জার্ণাল' থেকে পত্রটি গ্রহণ করেছেন। মিঃ মল্লিকও চিঠিখানি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেছেন তাঁর গ্রন্থের ১১৫ পৃষ্ঠায়। তারপর তিনি মন্তব্য করেছেন যে 'ভবনস জার্ণাল' এবং দালভী ও কুলদীপ নায়ারের গ্রন্থে ইংগিত করা হয়েছে যে সর্দার প্যাটেলের এই চেতাবণী সত্ত্বেও পন্ডিত নেহরু ভারতের উত্তর সীমান্ত রক্ষায় তাঁর উপদেশে কর্ণপাত করেননি। এই ধারণা খন্ডনের চেষ্টায় পাঁচটি স্তবকে সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে মিঃ মল্লিক বলেছেন সাতদিনের মধ্যেই সব কটি মন্ত্রক বিচারবিবেচনা করে নিরাপত্তা বিষয়ে তাঁদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই গ্রন্থের প্রায় সূচনা অংশে সর্দার প্যাটেলের এই সুদীর্ঘ পত্রটি উদ্ধৃত হওয়ায় চিন্তাশীল পাঠকের পক্ষে সর্দার প্যাটেলের কুশাগ্র বুদ্ধি, স্বদেশপ্রেম এবং সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাবেন। তিনি বলেছিলেন, ১৯৫০-এর এই চিঠিতে—

"Even though we regard ourselves as friends of China, the Chinese do not regard us as their friends".

তিব্বতের ব্যাপারে তাঁর মন্তব্যগুলি আজ এতকাল পরে পাঠ করলে চমকিত হতে হয়। তিনি বলেছিলেন এযাবৎ আমরা পাকিস্তানের চেয়ে সামরিক দিক থেকে শক্তিমান হওয়ার প্রয়াস করেছি। তারপর বলেছেন—

"In our calculations we shall now have to reckon with Communist China in the north and north-east — Communist China which has definite ambitions and aims and which does not, in any way, seem friendly disposed towards us".

সর্দার প্যাটেল বহিরংগ বিপদ ছাড়াও আভ্যন্তরীণ বিপদের কথাও সেই ১৯৫০-এ চিন্তা করেছিলেন। তাঁর এই দূরদর্শিতার পরিচয় পেয়ে পাঠক বিস্মিত হবেন। মিঃ মল্লিক নেহরুজীর সমর্থনে কয়েকটি লাইনে সম্পূর্ণ সরকারী সিদ্ধান্ত উধৃত করে বলেছেন, 'ইনটারন্যাল সিকিউরিটি'র নবতম সমস্যা বিষয়ে সব কটি মন্ত্রক বিবেচনা করেছিলেন। তাই যদি হত তাহলে ১৯৫০-এই সতর্কবাণীর পর ১৯৬২-র গ্লানিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হত না।

যে তিব্বত সংক্রান্ত ভুল সিদ্ধান্তের ফলে চীনের সংগে ভারতের সম্পর্ক বিষিয়ে উঠল তার উল্লেখ লেখক বার বার করেছেন। তারপর 'কাশ্মীর প্রিন্সেস' সংক্রান্ত তদন্তের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। সেই তদন্তে তাঁর ভূমিকা, চু-এন-লাই কর্তৃক তদন্ত বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ, মিঃ মল্লিকের প্রতি অশ্রদ্ধেয় উক্তি প্রয়োগ ইত্যাদির সংগে পরবর্তী ঘটনাবলী নিছক যোগসূত্রহীন নয়, সেই কারণে, 'কাশ্মীর প্রিন্সেস' বিমান দুর্ঘটনার পরিচ্ছেদটি ক্ষুদ্র হলেও মূল্যবান।

ভূমিকায় লেখক বলেছেন এই গ্রন্থ রচনায় সর্বপ্রথম উৎসাহ পেয়েছেন শ্রীযশোবন্তরাও চৌহানের কাছ থেকে। শ্রীচৌহান তখন ডিফেন্স মিনিস্টার ছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সেই কালে তিনি যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন সেই সব সিদ্ধান্ত বিষয়ে অনেক অপ্রিয় ও অসংগত মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে মনে হওয়ায় শ্রীচৌহান মিঃ মল্লিককে যথাযথ তথ্য পরিবেশনে উৎসাহী করেন। যেহেতু অন্য লেখকদের পক্ষে যথাযথ তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি এবং

ভারত-চীন যুদ্ধের নেপথ্য কাহিনী

যেহেতু সব তথ্যাবলীর চাবিকাঠি ছিল ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর এই অধিকর্তার হাতে সেই কারণেই এই বিষয়ে 'দি লাস্ট ওয়ার্ড' বলার তিনি অধিকারী। তাঁর কাছে এই কর্তব্যপালন 'ওয়ার্ক অব লভ'—তাঁকে যথেষ্ট বিচারবিবেচনাসহকারে কতটুকু 'ইনফরমেশ্যন' তিনি প্রকাশ করবেন এবং কতটা উহ্য রাখবেন তা স্থির করতে হয়েছে। সমগ্র গ্রন্থটি তিনি নাকি স্মৃতির ওপর নির্ভর করে লিখেছেন,—কোনো তথ্য অবসর গ্রহণের কালে তিনি সঙ্গে করে আনেননি কিংবা কোনো সহকর্মী বন্ধুর কাছ থেকে গ্রহণ করেননি। তাই যদি হয়, তাহলে তাঁকে অপূর্ব স্মৃতিধর পুরুষ বলতে হয়, কারণ অনেক সন তারিখ এবং সরকারি মেমারেন্ডামও তিনি যথাযথ প্রকাশ করেছেন—স্মৃতির সাহায্যে। অবশ্য তাঁর ডায়েরী ছিল এবং গতায়তের হিসাব রাখতেন।

ইতিপূর্বে যে সব লেখক এই বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁরা ভারত সরকারের 'ইনটেলিজেন্স' দপ্তরের সমালোচনা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে সেই সব সমালোচনা সংগত হয়েছে বলা যায় না। কারণ ইনটেলিজেন্স সর্বদাই গোপন ব্যাপার এবং সেই গুপ্ত তথ্যাবলীর সবটুকুই চোরাপথে সংগ্রহ করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়েছে একথা বলা যায় না।

মানকেকর তাঁর 'দি গিল্টি মেন অব সিকসটি টু' গ্রন্থে ভারত-তিব্বত-চীন এই তিন ত্রিভুজ নিয়ে যে অনাদিকালের সমস্যা তা বিশ্লেষণ করেছেন এবং খেরাও 'ইন্ডিয়ান ডিফেন্স প্রবলেম' গ্রন্থে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। কিন্তু লেখকের মতে ভিতরকার তথ্যসম্ভার হাতে না পাওয়ায় তাঁরা 'গিল্টি' দের দলে নেহরুকে ফেলেছেন। মুখ্যত নেহরুজীকে 'নট গিল্টি' প্রমাণের জন্য মিঃ মল্লিক প্রায় সাড়ে ছ'শ পাতার এই সুবৃহৎ গ্রন্থটি রচনা করেছেন একথা মনে করা অন্যায় হবে না।

খেরা ও মানকেকরের বক্তব্যের জবাব ১৭৩—১৮৯ পৃষ্ঠায় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন লেখক। তিনি নেহরুজীর 'পলিসি অব নন-এলাইনমেন্টের উইসডমের কথা বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে ঘরে ও বাইরে অনেক ভ্রূকুটি সহ্য করতে হলেও ভারতের গোষ্ঠীনিরপেক্ষ নীতি ফলপ্রসূ হয়েছে।

তিব্বতী পর্বের পর চীনের সংগে ভারতের প্রণয় একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হল। দুর্গত তিব্বতীদের সাহায্যার্থে যে কমিটি করা হয়েছিল, ভারত সরকার এবং পণ্ডিত নেহরুকে চীনের সরকারী পত্র-পত্রিকায় প্রচণ্ড গালি-গালাজ করা হল। তার ভাষা অতি কুৎসিত, পণ্ডিতজীকে যে ভাষায় আক্রমণ করা হল তাতে ভদ্রতার মুখোস খুলে পড়ল। তিব্বতীদের সাহায্য করাটা যে চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এমন কথাও বলা হল। দালাই লামাকে অভ্যর্থনা জানানো এবং তাঁর সংগে মুসৌরী গিয়ে নেহরুর সাক্ষাৎকার ঘটায় চীন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হল। তাঁরা বলতে লাগলেন তিব্বতীদের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য যে প্রচেষ্টা চলেছে তাতে ভারতের কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠান ও তার নেতাদের সক্রিয় অংশ আছে। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত নেহরুর একটি চিঠির জবাবে চু-এন-লাই সর্বপ্রথম বললেন, চীনা সরকার ম্যাকমোহন লাইন স্বীকার করেন না। এই পত্রে লাদক থেকে বর্মা পর্যন্ত সমগ্র চীন-ভারত সীমানা সম্পর্কেও সংশয় প্রকাশ করা হল, এবং চীনারা অভিদ্রুত হাজি-লাঙর-সামূল লুংপা-লানক লা রোড—তৈরী করতে লাগলেন, ভারত তাকিয়ে রইল নীরবে। কারণ সে সময় ভারতের ফরওয়ার্ড পেট্রল বাহিনী ছত্রভংগ। ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ সংবাদ দিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু চুপ করে তাকিয়ে থাকা ভিন্ন অন্য পথ ছিল না।

এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে 'কনফনট্রেসান' অর্থাৎ চীনাদের সংগে মুখোমুখি সংঘর্ষ সুরু হওয়ার ইতিহাস বিধৃত হয়েছে। চু-এন-লাই কি বলেছিলেন এবং নেহরুজী কি জবাব দিয়েছিলেন তার বিবরণ আছে। এমন কি নেহরুজী একটি চিঠিতে বলেছিলেন—চীনা সৈন্যদের ঘন ঘন ভারতের ভূমিতে আক্রমণ এবং আকসাই-চীনে চীনা সৈন্য সমাবেশের কথা ভারতের জনগণকে জানতে দেওয়া হয়নি পাছে চীন সম্পর্কে তাদের মনে একটা বিরূপ মনোভংগী গড়ে ওঠে। মিঃ মল্লিক বলেছেন এই নীতির ফলে পরবর্তীকালে যখন সমগ্র ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে গেল তখন পার্লামেন্টে এবং পার্লামেন্টের বাইরে ভারতের জনগণকে সামলাতে সরকার যথেষ্ট বেগ পেয়েছেন।

আগামী সংখ্যায় এই আলোচনার শেষাংশ প্রকাশিত হবে।

—অভয়ঙ্কর

MY YEARS WITH NEHRU (THE CHINESE BETRAYAL) : By B. N. MULLICK : Published by ALLIED PUBLISHERS : Bombay, Calcutta, Price : Rs. Twenty five only).

Cartoons: Kamal Sarkar
Ni-ran Books,
২/৭, T. N. Chatterjee St. Cal-50

মূল্য ৬-০০ টাকা।

ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী কমল সরকার কিছুকাল হল ভারতে ব্যঙ্গচিত্রের ইতিহাস বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত আছেন। এছাড়া বাংলার প্রাচীন শিল্পীদের জীবনী অনুসন্ধানেও নিযুক্ত হয়েছেন। দীর্ঘকাল যাবত বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পত্রিকাগুলিতে তিনি নিজে যতগুলি ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলেন তার থেকে চল্লিশখানি বাছাইকরা নিদর্শন নিয়ে বর্তমান পুস্তকটি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রায় সবগুলিই ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৯-এর মধ্যে আঁকা অধিকাংশ ব্যঙ্গচিত্রের বিষয় বস্তুই সামাজিক অল্প কিছু উদ্ভট চিত্রও আছে। ছবিগুলির একটি বৃহৎ অংশই পরিচয়লিপি-বিহীন বা যাকে ইংরিজীতে বলে ক্যাপশনলেস কার্টুন। ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী মাত্রেই জানেন যে এধরণের ছবি আঁকতে কতখানি চিন্তা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। এই বিভাগে শ্রীসরকার বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার স্কুটার ভ্যান বা পুলিশের কুকুরদের রোল কল কিম্বা প্রাক্ বিবাহ ও বিবাহোত্তর জীবনের স্ট্রিপ কার্টুন ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। যেগুলিতে পরিচয়লিপি আছে সেগুলিও যথা সম্ভব সংক্ষিপ্ত। এছাড়া বইটির আরেকটি আকর্ষণ হল ভারতের প্রথম কমিক পত্রিকা 'দিল্লী পাঞ্চ' বুক'এর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস যেটি শ্রীসরকারের দীর্ঘকালের পরিশ্রমের ফল।
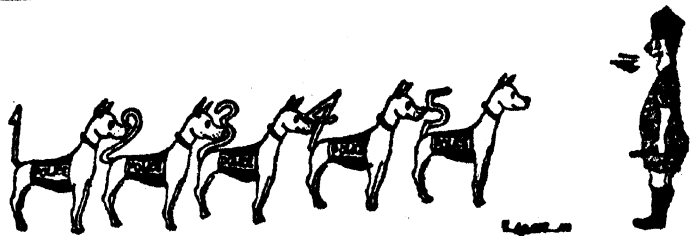
নির্বাসিত বন্দীর রাস্তুলে (নাটক)—রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় ।। বিশ্বজ্ঞান, ৯।৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯ ।। দাম : তিন টাকা।

নাটক নিয়ে ইদানীং পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে কম নয়। চতুর্দিকে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন নাট্যসংস্থা, লেখা হচ্ছে নানা ধরনের নাটক। রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়ের এই নাটকটি বর্তমান সমাজ চিন্তার ফসল।

এই নাটকের নায়ক [illegible] [illegible] আত্মকেন্দ্রিক মানুষ—[illegible] এবং [illegible]।

বাইরে যখন রাজনৈতিক আন্দোলনের তীব্রতা সমস্ত মানুষকে ব্যস্ত করে তুলেছে, তখন যোগব্রতই-বা থাকবে কিভাবে? তার বাড়ীতেও এসেছে পুলিশ, রাজনৈতিক কর্মীরা। নায়িকা পৃথা তাকে মুক্ত করতে চায় বিচ্ছিন্নতা থেকে।

রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় কৃতিত্বের সঙ্গে নগরবাসী মানুষের সমকালীন নৈরাশ্যচারণার চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন। দেখিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অসহায়তার আসল ছবিটিও।

এ নাটকের সবচেয়ে বিস্ময়কর চরিত্র নিওরোটিক ডাক্তার নচিকেতা। সে নতুন বন্দরের খোঁজে নিজেকে নিযুক্ত রাখে, বাঁচার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হতে চায়। এবং বিভ্রান্ত চরিত্র 'লতা' নচিকেতাকে বলে: 'আপনি তো বলেছিলেন, আমরা বন্দর খুঁজছি।......আপনি আমাকে বাঁচান। আমি মরতে পারব না।...... আমি বেঁচে থাকতে চাই। আমাকে বাঁচিয়ে দিন।'—বেঁচে থাকার এই প্রবল ইচ্ছা নাটকটির বক্তব্যকে বলিষ্ঠতা দিয়েছে।

ব্লাড ক্যানসার (কাব্য সংগ্রহ)—উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ।। সুমন্ত প্রকাশন ২৬ বাবুপাড়া রোড, ভাটপাড়া, ২৪-পরগণা ।। তিন টাকা।।

ইংরাজী অনুবাদসহ সাতাশটি কবিতার সংকলন এই 'ব্লাড ক্যানসার'। তারুণ্যের বিশ্বাস ও অহংকার, স্বপ্ন ও সম্ভাবনার নিহিত-উত্তাপে প্রতিটি কবিতাই সুখপাঠ্য। নাম কবিতায় কবি লিখেছেন: 'কেন জানে আরোগ্য কত দূরে/বলো বলো তার/ঠিকানা কোথায়, কোন খানে!'

বইটি পড়তে পড়তে এই তরুণ কবির ঐকান্তিকতায় মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। কোনো কোনো কবিতায় কবি এমন কিছু পংক্তি ব্যবহার করেছেন যা দীর্ঘকাল পরেও মনে থাকবে। বইটির প্রধান ত্রুটি উচ্ছ্বাসময়তা ও সংযমের অভাব! আশা করি, ভবিষ্যতে তিনি তাঁর এই ত্রুটি কাটিয়ে একজন সফল কবি হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করবেন।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

সারস্বত (মাঘ-চৈত্র ১৩৭৮)—সম্পাদক: অমিয়কুমার ভট্টাচার্য। ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। ১-২৫ পয়সা।

কিছু কিছু সাময়িক পত্রিকা প্রথম দর্শনেই পাঠকদের নজর টানে শুধু বহিরঙ্গেই নয় সুষ্ঠু চিত্তাকর্ষী রচনা সম্ভারের সমাহারেও। সারস্বত ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি সেই ধারা আজো বজায় রেখেছে। গল্প-প্রবন্ধ-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মধ্যে এই সংখ্যার বিশেষ উল্লেখ্য রচনা: তরুণ সান্যালের 'অন্য জন্মে এবার বিদায়' (কবিতা), অমলেন্দু বাগচির 'এসথেটিকসের সমস্যা' (নিবন্ধ), রমেন্দ্র বর্মণের 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা প্রসঙ্গে' (নিবন্ধ)। এছাড়া লিখেছেন: বিশ্ব-[illegible] জয়শ্রী

নাথের কাহিনী অবলম্বনে নাটক লিখেছেন: দেবব্রত সুরচৌধুরী।

মহিলা (আষাঢ়) '৭৮) সম্পাদিকা: ডক্টর আশা দেবী। ১২৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৬। এক টাকা।

মেয়েদের জীবনকে সবদিক দিয়ে সম্পূর্ণ এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখবার জন্যে প্রশংসনীয়ভাবে এ পত্রিকাটি সুদীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে চেষ্টা করে আসছে। আলোচ্য সংখ্যায় গল্প-উপন্যাস রহস্য কাহিনী, ভ্রমণ বৃত্তান্ত কবিতা ইত্যাদি যেমন আছে তেমনি আছে দেশ-বিদেশের মেয়েদের কথা, এদেশের বিপ্লববাদিনী মেয়েদের কথাও। আছে মঞ্চ-ছায়াচিত্র, সেলাই বোনা এবং রান্নাঘর ইত্যাদি। একাধারে বহু বিষয়ের সমাবেশ এবং মেয়েদের জন্যেই সাধারণ মহিলাদের কাছে 'মহিলা'র জনপ্রিয়তা বেশি।

বিদগ্ধ (পাক্ষিক) সম্পাদকমণ্ডলী পরিচালিত। মিশন প্রেস, স্টেশন রোড, সোদপুর, ২৪ পরগণা (উত্তর), দশ পয়সা।

বারাকপুর মহকুমার জনসেবায় নিবেদিত একমাত্র পাক্ষিক পত্রিকা। জনসাধারণের নানান অভাব অভিযোগ দূরীকরণে, অন্যায় ও দুর্নীতি রোধে এবং জনমত গঠনে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে এ পত্রিকা। ২৫-তম স্বাধীনতা স্মারক ক্রোড়পত্র লিখেছেন পদ্মা চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার প্রমুখ।

ছন্দক: (শ্রাবণ আশ্বিন '৭৮)—সম্পাদক রবিরঞ্জন ভৌমিক। বিবেকানন্দনগর পুরুলিয়া। এক টাকা

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার প্রথম সংখ্যা এটি। আকারে মিনি, চেহারা পরিচ্ছন্ন ছিমছাম, দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক। সবটুকু মিলিয়ে প্রথম দর্শনে ঔৎসুক্য জাগায়। লিখেছেন—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় জয়ন্তী সেন, রাজলক্ষ্মী দেবী, আনন্দ বাগচী, নচিকেতা ভরদ্বাজ, শোভন সোম, সুভাষচন্দ্র সরকার, হেনা হালদার, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, শংকু মহারাজ প্রমুখ। প্রশ্নোত্তরে বাঙালীর অপ্রকাশিত রচনা। 'বাঙালীর লক্ষ্য ও তার সাধনা' বিশেষ উল্লেখ্য।

লোকশক্তি (জুলাই '৭১)—গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান, ১২।ডি, শঙ্কর ঘোষ লেন কলকাতা-৬। পঞ্চাশ পয়সা!

সমাজ ও সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত পাঁচজনকে নিয়ে গঠিত সম্পাদকমণ্ডলী এই মাসিক পত্রিকার নিয়ামক। এই পত্রিকার পিছনে সমাজহিতকর পরিকল্পনা সমস্যা সমাধানে এমন সম্যক আয়োজন ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি এর আগে দেখা যায় নি। 'কলকাতা সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশিত এই সংখ্যাটিতে কলকাতার বিবিধ সমস্যার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে বহু তথ্য বিশেষ লক্ষ্য অভিমুখী সুন্দরভাবে ছাপা সাময়িক পত্রিকা অনেকদিন বাদে চোখে পড়ল। লিখেছেন: সুগত দাশগুপ্ত, শিবদাস ব্যানার্জি, শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য, সুভাষচন্দ্র সরকার, গুণদা মজুমদার, মনকুমার সেন প্রমুখ। 'কল্লোলিনী কলকাতাকে যাঁরা ভালবাসেন লোকশক্তির এই বিশেষ সংখ্যাটি তাঁদের অবশ্য পাঠ্য।

রাজধানী (কবিতার ত্রৈমাসিক পত্র) সম্পাদক: নিশিথনাথ সেন। পরন্দরপুর, বীরভূম। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কবিতা লিখেছেন: আশোকবিজয় রাহা, সুনীলচন্দ্র সরকার, শান্তিকুমার ঘোষ, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সত্য গুহ, বার্ণিক রায়, আশিস সান্যাল, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রতিমা সেনগুপ্ত প্রমুখ।

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আধুনিক কবিতা জিজ্ঞাসা' নিবন্ধটিও উল্লেখ্য।

এক সাথে (শ্রাবণ, ৭৮)—সম্পাদিকা: কমল মুখোপাধ্যায়। ২ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-১২। আশী পয়সা।

আলোচ্য সংখ্যাটি চতুর্থ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা। লিখেছেন: সুপ্রিয়া আচার্য, শিপ্রা দত্ত, কুমকুম চক্রবর্তী, ঝর্ণা চট্টোপাধ্যায়, বিভা ঘোষ, পদ্মা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

প্রাপ্তি স্বীকার

ইস্পাত (বাংলাদেশ সংখ্যা)—ভূপেন পালিত। ১৫৯।১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা: ২৯। পঞ্চাশ পয়সা।

বাংলা সাহিত্যপত্র (দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা) সম্পাদক উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৬, বাবুপাড়া, ভাটপাড়া, ২৪-পরগণা। পঁচিশ পয়সা।

বর্ণালী (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংকলন) সম্পাদক: জয়দেব দাশ। মধুবাটী, বলরামবাটী, হুগলী ।। তিরিশ পয়সা ।।

পদাতিক (আষাঢ় ৭৮) সম্পাদক: সুজিৎ দাস পুরকায়স্থ। শিববাড়ি রোড, করিমগঞ্জ, আসাম।

ভুবন (বাংলাদেশ সংখ্যা) সম্পাদক: নয়নকুমার রায়। ২ ভুবননগর, চন্দননগর, হুগলী। এক টাকা।

আমরা (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) সম্পাদক: জয়েশ ভট্টাচার্য। বসুলপুর, বর্ধমান। এক টাকা।

প্রাণের প্রদীপ (মে-আগস্ট '৭১)—সম্পাদক মদন চৌধুরী। সদরঘাট, আরামবাগ হুগলী। ষাট পয়সা।

আলো (সাহিত্য পত্রিকা ৪র্থ সংখ্যা '৭৮) সম্পাদিকা: আঞ্জুম আরা জামি। [illegible] কলকাতা—১৬

(৩১)

জরা মাথায় হাত দিয়ে নত মুখে বসে আছে, দু'গাল বেয়ে জল পড়ছে তার। পাশে উপবিষ্ট মদিরা। মদিরা অপ্রস্তুত হলেও দুঃখিত নয়—সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করতে গেলে আসল কথাগুলো বাদ দেওয়া যায় না। দুঃখ যেখানে অনিবার্য সেখানে নিবারণ করবার কি উপায়।

কি জরা, কি হল? আট-দশ বছর আগেকার কথা, এখন আর দুঃখ করে কি লাভ?

কালের বিচারে আট-দশ বছর হতে পারে আমার মনের বিচারে তো সদ্যঘটিত।

তোমার দুঃখের কারণটা কি শুনি।

আমাকে মারতে পারোনি বলে না রাণী সীমন্তিনীকে মেরে দিলে বলে।

জরা বলে, দু-ই। কিন্তু মদিরা তোমাকে শুধাই এসব কথা শুনে কি তোমার দুঃখ হচ্ছে না।

গত জন্মের ঘটনায় সুখ-দুঃখ কি কেউ অনুভব করে। আমি তো কতবার বলেছি মদিরা মরে গিয়েছে, নূতন জন্মে সে ব্রজাঙ্গনা।

কিন্তু আমি তো সেই জরাই আছি।

তাই তো দেখছি তেমনি অবুঝ তেমনি গোঁয়ার। ভেবেছিলাম এতকাল পাহাড়ে পর্বতে ঘুরে, দুঃখের পরে দুঃখের আঘাতে সম্বিত হয়েছে তোমার।

থাক্ উপদেশ রাখো।

মূর্খকে উপদেশ ছাড়া আর কি দেব। এখন চোখের জল মুছে ঘটনাগুলো গুছিয়ে বলো।

জরা শুধায়, তুমি কেন বলেছিলে যে রাণী আমার প্রতি আসক্ত।

ভুল বলিনি, তখন তাই মনে হয়েছিল। পাপীর মন সর্বত্র পাপের ছায়া দেখে। দু'দিন না যেতেই বুঝলাম রাণী সীমন্তিনী সতীসাধ্বী, পতিগতপ্রাণা।

তখন আমার ভুল ভাঙালে না কেন?

দ্বাপরে তাহলে কি আমার রক্ষা থাকতো। তখন তুমি মনে মনে জাঁকড়ে বসেছ, রাণীর মালা পেয়েছ, কৌস্তুভমণি হার আমার হাতে দিয়েছ তাঁকে উপহার দেবার জন্যে এমন অবস্থায় যদি বলি যে আমি ভুল বুঝেছিলাম তাহলে কি করতে বলো তো।

জরা বলে, গলা টিপে মেরে ফেলতাম।

তবেই দেখো। তাই ভাবলাম যে বোকাটাকে নিয়ে একটু খেলানো যাক। তাছাড়া আরও একটা কারণ ছিল—

আবার কি কারণ?

শুনলে কি বিশ্বাস করবে।

বিশ্বাসযোগ্য হলে অবশ্যই করবো।

বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তবু শুনি, দাবী করে জরা।

আমি তোমাকে ভালবাসতাম কিন্তু তখন তুমি রাণীগতপ্রাণ, আমার কথা বিশ্বাস করবে কেন? তাই বানিয়ে বানিয়ে উপন্যাস বলে গেলাম। বললাম যে রাজা আমাতে আসক্ত, রাতে বাগানবাড়ীতে নিয়ে যান। তারপরে যখন তোমার কাছে শুনলাম যে আমাদের সন্ধানে বাগান-বাড়ীতে গিয়েছিলে বললাম যে এখন আর বাগানবাড়ীতে নিয়ে যান না রাজবাড়ীতেই ঘটে আমাদের মিলন।

সেই কথা বিশ্বাস করবার ফলেই তো তোমাকে মারতে চেয়েছিলাম।

কেন মেরে কি লাভ হতো?

জরা বলে, আমার এ কথাটা বিশ্বাস করবে কিনা জানি না।

বিশ্বাসযোগ্য হলে অবশ্যই করবো।

না, বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তবু শুনি।

তোমার উপরে রাজার আসক্তি শুনে বুঝলাম যে তোমাকে ভালবাসি।

মদিরার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

জরা বলে যায়, যে রাজার হাত থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নেওয়া অসম্ভব তাই যখন দেখলাম রাজা তোমার সঙ্গে আলিঙ্গনে বদ্ধ এক তীরে এফোঁড়ওফোঁড় করে দিলাম দুজনকে। কে জানতো মরলো সতীসাধ্বী নিরপরাধ রাণী আর দেবতুল্য রাজা। এতেও যদি আমি অভাগা না হই তবে অভাগা আর কে?

তারপরে জরার নজর পড়ে মদিরার মুখের দিকে, সেখানে পটপরিবর্তন দেখে, দেখতে পায় নেপথ্যের মানুষটিকে, সে বলে ওঠে, মদিরা এখনো তুমি আমাকে ভালোবাসো।

মদিরা নির্বিকার কণ্ঠে বলে, ব্রজাঙ্গনাদের কৃষ্ণ ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে নেই।

মিথ্যা কথা। তোমার চোখ বলছে, মুখ বলছে, সর্বাঙ্গ বলছে তবু বলছ আর কাউকে ভালবাসতে নেই।

মদিরা পুনরায় অধিকতর অবিচলিত কণ্ঠে বলে, বাজে কথা রাখো, বলো এই ক'বছরের ঘটনা।

অগত্যা জরা আরম্ভ করে।

রাতের বেলায় রাজবাড়ীর প্রাকারের উপরে আমি পাহারায় ছিলাম; ভোররাতে আক্রমণ হবে সবাই জানতো, তাই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলাম। এমন সময়ে দেখলাম রাজবাড়ীর তেতালার ছাদে রাজা একজন রমণীকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করে দণ্ডায়মান, মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছিল না। অনুমান করলাম তুমি।

মদিরা বাধা দিয়ে বলে, ও আর কতবার শুনবো, তারপরে কি হল বলো।

তখন জরা একে একে বলে যায় সুমন্তনগরের পরাজয়, লুটপাট, তার বন্দীদশা, নরেন্দ্রনগরে আগমন এবং সেখানে ভাগ্যের নাগরদোলায় পাক খাওয়া। এমনিভাবে পাহাড়ে পলায়ন, [illegible]

সঙ্গে সাক্ষাৎ, কিন্নররাজ্যের অভিজ্ঞতা, চার্বাক আশ্রমে আতিথ্যলাভ, একজন সাধুপুরুষ তার অনুসরণে কুকুরের দর্শন লাভ, অবশেষে বদরিনাথ ও বুড়ি-মার কথা।

মদিরা তন্ময় হয়ে শোনে।

জরা বলে, এবারে তোমার কি হয়েছিল বলো।

আমার বৃত্তান্ত দুঃখের হলেও এমন ঘটনাবহুল নয়।

তবে তো বেশিক্ষণ লাগবে না, বলো শুনি।

রাজবাড়ীতে যখন লুটপাট শুরু হল আমাকে ধরে নিয়ে এল সেনাপতির কাছে। সেনাপতি আমাকে নিরীক্ষণ করে বললেন, মন্দ নয়। তাঁর কথা শুনে যে সৈনিক আমাকে নিয়ে এসেছিল বলল, তাহলে আপনার জন্যে রাখি। সেনাপতি বললেন, না. এখন আমার অর্থের প্রয়োজন। একে নিয়ে যাও তক্ষশিলার বাজারে, দেখো যেন চড়াদামে বিক্রি হয়।

মদিরা বলতে থাকে তক্ষশিলার বাজারে মথুরার একজন বণিক, পরে শুনেলাম তাঁর নাম শেঠ মথুরা দাস, আমাকে পছন্দ করে কিনে নিয়ে মথুরায় নিয়ে এল আমাকে। তারপরেই বাধলো গোল।

কি রকম ঔৎসুক্য জ্ঞাপন করে জরা।

মথুরা দাসের নজর ছিল আমার দেহটার উপরে কিন্তু কুঠীতে এসে আবিষ্কার করে ফেলল কৌস্তভমণির হার। তখন নজর গেল ঐ হারটার দিকে। বণিক তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি নারীদেহ যতই লোভনীয় হোক তার নাশ আছে, মণিহার চিরকাল থাকে। যখন বুঝলাম যে ঐ হারটা হাতাবার চেষ্টায় আছে বণিক, একদিন পালিয়ে চলে এলাম বৃন্দাবনে।

হারটা নিয়ে এলে।

তা নয়তো কি তাকে উপহার দিয়ে আসবো।

সে কি জানে না তুমি এখানে এসেছ।

জানে না আবার।

তবে আসে না কেন? মথুরা থেকে বৃন্দাবন এইটুকু তো পথ।

এসেছিল বই কি।

কি বলল?

কি বলল? নারীকে ভোলাতে যত রকম মিষ্টি কথা পুরুষের জানা আছে সমস্তই বলল।

গেলে না কেন?

পাগল নাকি! সংসারে যত অপরাধ আছে হয় তা নারীঘটিত নয় স্বর্ণঘটিত, অনেক সময়ে একসঙ্গে দুটোই। বুঝেছিলাম বলেই গেলাম না।

জোর করতেও তো পারতো।

পারলে করতো কিন্তু তা সম্ভব নয়।

কেন?

কংসের পরিণাম মথুরার লোকে [illegible] কি জাত ব্রজবাসীর

তাছাড়া না যাওয়ার আরও একটা কারণ আছে—

কি কারণ আবার, শুধায় জরা।

ব্রজেশ্বর আমাকে কৃপা করলেন।

দুদিনের মধ্যেই।

আগেই তো বলেছি পাপীর প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে আছে। সাধুদের সাতজন্ম ঘোরান, পাপী তিন জন্মে দেখা পায় একথা শোন নি।

তবে তো আমার আশা আছে।

আশা বলে আশা। তোমার যা পাপ তুমি এক জন্মেই তাঁর কৃপা পাবে। তাইতো বলছি চলো আজ সন্ধ্যাবেলায় আরতির সময়ে তাঁকে দর্শন করে আসি।

জরা বলে, আজ থাক।

কেন থাকবে কেন? ধুলোপায়ে দেব দর্শন করতে হয়।

ভাই মদিরা, আমার সর্বাঙ্গে ধুলো ধুলেও যাবে না।

সেইতো ভরসা। ব্রজেশ্বর আমার খেলুড়িদের সর্দার, সারাদিন ব্রজবালাদের সঙ্গে মাঠে মাঠে হুটোপাটি করে খেলা করেন, ধুলো লাগবে না গায়ে।

মদিরা বলে, চলো মন্দিরে যাই।

জরা বলে, আজ থাক।

এমনি আজ কাল বলে কালকর্তন করে জরা মন্দিরে যেতে চায় না। কখনো একাকী, কখনো মদিরার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে শ্রীধাম দর্শন করে। একদিন দুজনে সাঁতরে যমুনার পরপারে গোকুলদর্শন করে এলো। মদিরা বলেছিল, চলো নৌকায় যাই।

জরা উত্তর দিল, সাঁতার দি, যমুনার জল লাগুক সারা গায়ে।

একদিন গিরি-গোবর্ধনে আরোহণ করলো। মাঠ ঘাট প্রান্তর কিছুই আর না দেখা থাকলো না। ঘুরতে ঘুরতে একদিন জরা শুধালো, মদিরা ঐ বনটা তো দেখা হল না, চলো যাই। মদিরার সঙ্গে বনে প্রবেশ করলো, অধিকাংশ তমাল গাছ, কদম, শেফালিকাও আছে। খুব বড় বন নয়, তবে বাগান নয় বন সন্দেহ নাই। ছায়াটি যেমন স্নিগ্ধ তেমনি ঘনান্ধকার।

জরা বলল, মদিরা বনের মধ্যে দিনের বেলাতেও এক খণ্ড রাত্রি যেন বিরাজমান। রাতের বেলায় না জানি কি গভীর মায়া হয়।

হয় বইকি, কিন্তু কখনো রাতে যেন প্রবেশ করো না।

কেন? আমি তো ভাবছিলাম রাতে এসে দেখে যাবো।

সতর্ক করে দেয় মদিরা, বলে, এমন কাজটি করো না। এর নাম নিকুঞ্জবন। এখানে রাতের বেলায় ব্রজেশ্বর এসে গোপিনীদের নিয়ে বিহার করেন; তখন মানুষ এলে মারা যায় নয় পাগল হয়ে যায়।

বিস্মিত হয় জরা। মদিরা বুঝতে পারে না জরা কেন মন্দিরে যেতে চায় না। তার বুঝবার কারণও নেই। জরার মনের কথা একমাত্র জরা জানে। জরার ভয়

দয়া না করেন, যদি দেখা না দেন। তবে তো আর সংসারে দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না। বুড়িমা বলেছিল বৃন্দাবনে আছেন পূর্ণাবতার। সেই পূর্ণাবতার নির্দয় হলে হাতে আর তো কিছুই থাকলো না। তখন যেমন পাপ তেমনি থাকবে মুক্তির দ্বার চিরকালের জন্য বন্ধ। তখন কি গতি হবে তার।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় কিছুতেই ছাড়লো না মদিরা, জোর করেই ধরে নিয়ে গেল মন্দিরে। শঙ্খঘণ্টা ধূপধুনা আলোকমালায় মহাসমারোহ; পুরোহিত পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে আরতি করছে; কাতারে কাতারে নরনারী যুক্ত করে গলদশ্রুলোচন; জরা সাগ্রহে তাকিয়ে দেখল রত্নবেদী শূন্য। কিছুক্ষণ কাটলো তার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে। সেই জায়গাটি মুহূর্তের মধ্যে জরার মনে হল তার আগে পিছে উপরে নীচে ইহলোকে পরলোকে কোথাও কোন আশ্রয় নেই; সে অনন্ত শূন্যে নিরন্তর পতনশীল। জরার মুক্তি নাই, সদ্গতি নাই. পরিত্রাণ নাই। সে ডুকরে কেঁদে উঠে ছুটে পালিয়ে গেল।

রাতের বেলায় কোথাও তাকে খুঁজে পেলো না মদিরা। পরদিনে অনুসন্ধান করতে করতে তাকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় পাওয়া গেল নিকুঞ্জ বনের প্রান্তে।

(১২)

জরার মাথা কোলে তুলে নিয়ে মদিরা বাতাস করতে করতে তার নাম ধরে ডাকতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চৈতন্য হল। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে শিয়রের দিকে তাকাতেই মদিরাকে দেখতে পেলো. দেখতে পেলো কিন্তু কথা বলল না অবোধের মতো চেয়ে রইলো।

মদিরা বলে, জরা ভাই, তুমি এখানে এলে কখন? কখন তুমি মন্দির থেকে সরে পড়লে টের পাইনি, মঠে এসে তোমাকে না দেখতে পেয়ে কালকে সারারাত তোমাকে খুঁজে ফিরেছি। সকালবেলায় একবার মনে হল কি সর্বনাশ, নিকুঞ্জ বনের দিকে যায়নি তো। চলে এলাম। যা ভেবেছিলাম তাই। ব্রজেশ্বরের কৃপায় প্রাণে যে রক্ষা পেয়েছ এই যথেষ্ট।

জরা উঠে বসে বলল, প্রাণটা গেলে এমন কি ক্ষতি হতো।

কেন জীবনে এমন বিতৃষ্ণা কেন ভাই?

তৃষ্ণা না মিটলেই বিতৃষ্ণা।

কি হয়েছে খুলেই বলো না।

বলবার তো কিছু নেই মদিরা, তোমরা সকলে শ্রীমূর্তি দেখে অশ্রুমোচন করতে লাগলে আর আমি দেখলাম বেদী শূন্য।

বলো কি! বিস্মিত হয় মদিরা, ব্রজনাথ তোমাকে দেখা দিলেন না।

কষ্ট আর দিলেন! তখন ভাবলাম আজ রাতে নিকুঞ্জবনে প্রবেশ করবো, হয় দেখা পাবো নয় প্রাণে মরবো।

কি সর্বনাশ! তোমাকে তো বলেছিলাম এখানে রাতের বেলায় এলে প্রাণ যায়।

আমার সঙ্গে এও বলেছিলে তিনি [illegible] করেন।

এ তো সবাই জানে।

তাই তো এলাম। তারপরে হঠাৎ রেগে উঠে বলে, দেখা দেবেন না বললেই হল। আজ দশ বছর বনে পাহাড়ে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর উনি মজা পেয়েছেন। একবার বদরিনাথে ফাঁকি দিলেন আবার এখানে।

কি করবে বলো তার দয়া নাহলে তো দেখা পাওয়া যাবে না।

সে তো বুঝলাম কিন্তু দয়া না হবে কেন শুনি। এখন মনে হচ্ছে বেশ করে-ছিলাম তীরের আঘাত করে, উপযুক্ত শাস্তি হয়েছিল।

মদিরা তার মুখ চেপে ধরে, ছিঃ ছিঃ অমন কথা বলতে নেই।

কেন বলতে নাই শুনি। সবাই শতমুখে তাঁর প্রশংসা করে বেড়াবেন এটাই শুধু বুঝি বাঞ্ছনীয়। আমার মুখ আছে বলবো, দেখি কি করতে পারেন তিনি। এই কয় বছরে আমার যে অবস্থা করেছেন তার বেশি আর কি করবেন।

প্রাণটা তো যেতে পারতো।

তা হলেই তোমার ব্রজেশ্বরের কীর্তি সম্পূর্ণ হতো। এই জেনো মদিরা, জরা প্রাণের মায়া করে না।

সেসব কথা পরে হবে—এখন চলো দেখি বলে, তাকে টেনে নিয়ে মঠে এলো মদিরা।

বিকালবেলায় মদিরা শুধালো ওখানে গিয়ে কি দেখলে তুমি।

কিছুই না। নিকুঞ্জ বনের কাছে এসে পৌঁছতেই শুনতে পেলাম বনের মধ্যে শত শত ঝিঁঝি ডাকছে। কান পেতে শুনে বুঝলাম, না, ঝিঁঝি নয়, নূপুরের ঝংকার আর অনেক বামাকণ্ঠ থেকে উঠছে ললিত সংগীত। ভাবলাম তবে তো কথা মিথ্যা নয়, আবির্ভূত হয়েছেন ব্রজেশ্বর, গোপিণীরা তাঁকে ঘিরে নাচছে আর গান করছে। এই সুযোগ মনে করে দৌড়ে ঢুকতে গেলাম, তারপরে আর কিছু মনে নেই।

তবে তো তিনি তোমাকে দয়া করেছেন।

ওরকম খুচরো দয়ার ভিখারী জরা নয়। পূর্ণাবতারের কাছে পূর্ণ দয়া আদায় করে তবে ছাড়বো। আমি দয়ার ভিখারী নই দয়ার দাবীদার। আমার সব নিয়েছেন আর দয়ার কপর্দক দিয়ে খুশি করবেন সে বাপের ছেলে আমি নই।

মূর্চ্ছার মধ্যে কিছু দেখতে পাওনি জরা।

মূর্চ্ছার মধ্যে আর কি দেখবো। তারপরে কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, হাঁ দেখে-ছিলাম বটে একটা স্বপ্ন।

কি স্বপ্ন শুনি।

দেখলাম যে বাণে বিদ্ধ করলাম একটা হরিণকে। সেটা সারাটা বন ছুটে ছুটে বেড়িয়ে ঘুরে চ'লে এলো তার বাসস্থানে, সেখানে পড়ে মরলো।

মদিরা অনেকক্ষণ চিন্তা করে বলল, স্বপ্নের অর্থ কিছু বুঝলে।

স্বপ্নের আবার কি অর্থ হবে।

বলো কি! ভগবান স্বপ্নের ইঙ্গিতে কথা বলেন। আমার মনে হচ্ছে তুমি সেই বাণ খাওয়া হরিণ, বনে পাহাড়ে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছ, তোমাকে ফিরে যেতে হবে তোমার বাসস্থানে, তবে মিলবে তোমার মুক্তির উপায়।

জরা ব্যঙ্গ করে বলল, ব্রজধামে থাকার চলে দেখি।

না জরা, গাঁজা-গুলি নয়। ব্রজেশ্বরের ইঙ্গিত ব্রজবাসীতে বুঝতে পারে। তুমি দ্বারকায় ফিরবার জন্যে প্রস্তুত হও।

দ্বারকা তো এখন সমুদ্র।

সমুদ্রেই তো আদিকালে ছিলেন নারায়ণ। সেখানে তোমাকে দেখা দেবেন, তোমার চক্রাবর্তন পূর্ণ হবে সেখানে গেলে। তুমি যাও সেখানে।

তুমিও চলো না মদিরা।

না ভাই, আমি মন-প্রাণ দিয়েছি ব্রজেশ্বরের পায়ে, ব্রজমণ্ডপের বাইরে আমার যাওয়ার উপায় নাই। আর এক কথা। যাওয়ার সময় কৌস্তুভমণির হারটা নিয়ে যেয়ো।

সেখানে কাকে দেব?

সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ো, তা হলেই তিনি পাবেন।

বেশ যাবো সেখানে, ধরো সেখানেও যদি না পাই তাঁর কৃপা।

পেতেই হবে।

পরদিন প্রাতে জরা যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়। মদিরা দেয় তার হাতে কৌস্তুভ-মণিহার, বলে, সাবধানে রেখো, দেশ এখন অরাজক।

আমার মনের চেয়েও কি বেশি। চলো না আমার সঙ্গে মদিরা।

মদিরা বলে, না জরা ব্রজাঙ্গনার মন ব্রজেশ্বরের পায়ে, তার আর কোথাও যাওয়ার উপায় নেই।

তখন মদিরার কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রা করে। যমুনা পার হয়ে পশ্চিম দিকে চলতে থাকে। যতক্ষণ তার দেহ বিন্দুতে পরিণত

হয়ে মিলিয়ে না যায় একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে মদিরা। তারপরে জরা অদৃশ্য হয়ে গেলে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দুই গালে দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু নিয়ে ফিরে চলে মদিরা। হায় রে ব্রজাঙ্গনার মন।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত

পঞ্চম খণ্ড

(১)

যমুনা পার হয়ে পশ্চিমদিকে চলতে আরম্ভ করেই জরা বুঝতে পারলো পথের ভয় সম্বন্ধে মদিরা যা বলেছিল তার এক-বর্ণ মিথ্যা নয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তার মনে হল যে মদিরা প্রকৃত বিবরণ সমস্তটা জানতো না। সকালবেলায় যাত্রা শুরু করে-ছিল দুপুর নাগাদ কয়েকজন লোক এসে তাকে ঘেরাও করলো, বলল, বাবাজী যাও কোথাও?

জরা বলল, আমি সন্ন্যাসী মানুষ তীর্থদর্শনে চলেছি।

ওরা বলল, বটে, তা দক্ষিণা দিয়ে যাও, আমরা যে তীর্থের পান্ডা।

জরা বলে, ভাই, সন্ন্যাসী মানুষ পয়সা কোথা পাবে?

উত্তরে শোনে, দক্ষিণা না দিলে দেবতা দেখা দেবেন কেন?

ভক্তিতে কি দেবদর্শন মেলে না?

জরার উত্তর শুনে ওরা উচ্চস্বরে হেসে ওঠে।

একজন বলে, তোমার দাড়ি আর জটা যে পরচুলা নয় কেমন করে জানবো। অনেক বেটা সাজা সন্ন্যাসী হয়ে দক্ষিণা এড়িয়ে পথ চলে।

অন্য একজন বলে জিজ্ঞাসাবাদে দরকার কি? পরীক্ষা করলেই হয়—এই বলে সে জরার দাড়ি আর জটা ধরে টানা-টানি সুরু করে।

নাঃ দাড়ি আর জটা ওর নিজস্ব বলেই মনে হচ্ছে। যাঃ বেটা খুব বেঁচে গেলি।

এমন সময়ে দলের একজন বলে ওঠে, বাবাজি, তোমার গলায় ঝোলানো ঐ সৌখীন থলিটিতে কি আছে দেখি।

জরা বলে, ওতে আমার জপের মালা।

তবু দেখি না. অনেক বেটার জপের মালায় সোনাদানা থাকে।

আমি ভিক্ষুক সোনাদানা কোথায় পাবো?

তবু দেখতে দোষ কি—এই বলে সেই লোকটা গলা থেকে থলি খুলে নিয়ে মালাটা বের করে এবং পরীক্ষা করে হতাশ হয়ে বলে ওঠে, নাঃ কতকগুলো ঝুটা পাথর।

তারপরে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে সবেগে গলায় এক ধাক্কা দেয়, বলে. অনেকটা সময় তোর নষ্ট করেছি এবারে জলদি এগিয়ে যা।

জরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে দ্রুত কৌশলটি করেছিল। কৌস্তুভমণির হারটি জরার হাতে দিয়ে সে বলেছিল, জরা পথ-ঘাটের যে অবস্থা তাতে যে এটা নিয়ে নিরাপদে পৌঁছতে পারবে তা মনে হয় না।

জরা অসহায় ভাবে শুধায়, তবে উপায়?

উপায় একটা করতেই হবে।

এই বলে সেই হারটায় কতকগুলো ছোট ছোট ঝুটো পাথর গেঁথে দেয় আর কৌস্তুভমণিটা কাদায় এমনভাবে লিপ্ত করে যাতে তার দীপ্তি ঢাকা পড়ে যায়। তখন আর মালাটাকে সামান্য জপের মালা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

জরা শুধায়, এমন করলে কেন?

মদিরা বলে, পথে চলতে আরম্ভ করলেই বুঝতে পারবে।

জরা এখন বুঝতে পারলো।

মদিরা আরও অনেক পরামর্শ ও সতর্কবাণী তাকে শুনিয়েছিল, বলেছিল চর্মন্বতী নদী (চম্বল) পার হলেই তখন জানবে প্রত্যেকটি লোক তোমার শত্রু। এই হল মৎস্যদেশের অবস্থা। তারপরে যখন মালবদেশে (মালোয়া) প্রবেশ করবে, তখন আর কি বলবো, ভগবান বাসুদেব তোমাকে রক্ষা করুন এই বলতে পারি।

জরা বলে, তা তো বটেই তবু কিছু পরামর্শ দাও।

পরামর্শ! অনেকক্ষণ ভাবে মদিরা. তারপরে বলে. পথে বড় বড় পাথর এড়িয়ে চলবে, রাতের বেলায় বনের মধ্যে থাকবে তবু কোন চটিতে আশ্রয় নেবে না। আর কোন রাহী লোকের সঙ্গে বন্ধুতা করবে না।

বিস্মিত জরা শুধায়, কেন এমন বলছ?

জানি বলেই বলছি। আজকার দিনে এই ব্রজমণ্ডল ছাড়া সমস্ত দেশ চোর-ডাকুর বাথান হয়েছে।

রাজা?

রাজা এখন চোর-ডাকুর সর্দার। লোক এখন আবিষ্কার করেছে ক্ষেতি করবার চেয়ে চুরি ডাকাতি রাহাজানি করায় অনেক লাভ। আর যে-সব লোক ক্ষেতি করে তারা রাজস্ব দেয় না।

কেন?

কেন কি, ক্ষেত থেকে ডাকুরা শস্য কেটে নিয়ে যায় রাজস্ব জোগাবে কেমন করে?

রাজা শাসন করে না কেন?

আরে বোকা, এটা বোঝ না যে রাজস্ব না পেলে রাজা আর ভিখারীতে প্রভেদ কোথায়? তাই রাজারা এখন পেটের দায়ে চোর-ডাকুর সর্দার বনেছে, চুরি-ডাকাতির ভাগে এখন রাজার রাজগী।

জরা বলে, শুনেছি ইন্দ্রপ্রস্থে এখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নাতিরা রাজত্ব করে। তাঁরা শাসন করেন না কেন?

জরা, দুঃখের কথা আর কি বলবো। ঐ ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের বাইরে এখন তাঁদের আর শুঠেরাদের সঙ্গে যোগসাজসে পেট ভরায়। মহারাজ পরীক্ষিতের এখন প্রায় একটানা একাদশীর অবস্থা।

সব বিবরণ শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় জরা, মুখে কথা জুগায় না। কিছুক্ষণ পরে বলে, মদিরা, দশ বছর হিমালয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে বনে জঙ্গলে ঘুরেছি সেখানে যে এর চেয়ে অনেক নিরাপদ।

হবেই তো, সেখানে মানুষ কোথায়?

মানুষ এমন অমানুষ, বলে ফেলে জরা।

মানুষ বলো বনমানুষ বলো কিছুতেই আপত্তি করবো না।

জরা বলে, ভাই মদিরা একটা কথা বুঝিয়ে দাও। দশ বৎসর আগে যখন দ্বারকা ছেড়ে রওনা হয়েছিলাম তখনো তো দেশের এমন লক্ষ্মীছাড়া অবস্থা ছিল না।

আরে, এটা আর বুঝলে না। তখনো যে অট্টালিকা দাঁড়িয়ে ছিল। যদিচ তখনই বাসুদেব দেহরক্ষা করেছেন, যদুবংশ ধ্বংস হয়েছে, পান্ডবরা মহাপ্রস্থানে উদ্যত তবু অট্টালিকাটা ভেঙে পড়েনি। তারপরে গত দশ বছরের মধ্যে অট্টালিকা ভেঙে পড়ায় সব বিশৃঙ্খল লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গিয়েছে।

জরা উত্তর দেয় না। মদিরা শুধায়, কি ভাবছ?

দেশের কথা।

দেশের কথা ভাববার তোমার আমার কি অধিকার? যেখানে স্বয়ং বাসুদেব আর পান্ডবগণ ব্যর্থ হয়েছেন সেখানে তুমি আমি কে?

আবার জরা নিরুত্তর। মদিরা শুধায়, কি হল?

জরা বলে, পূর্ণাবতার বাসুদেব যদি ব্যর্থ হয়ে থাকেন তবে আর ভরসা কোথায়?

এবারে উত্তর খুঁজে পায় না মদিরা।

জরা শুধায়, কি বলো?

কি আর বলবো! তোমার জিজ্ঞাসার উত্তর দি এমন জ্ঞান নেই। সত্যিই তো পূর্ণাবতার যদি ব্যর্থ হয়ে থাকেন তবে মানুষে কোন ভরসায় জীবনধারণ করবে।

মদিরা, তুমি তো জানো যে আমি মুখ্খুসুখ্খু চোয়াড় ব্যাধ, তার উপরে যার বাড়া পাপ নেই তাই করেছি। পাপীর মুক্তিসন্ধানে দশ বছর পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরেছি। মুক্তির সন্ধান পাইনি তবে অনেক জ্ঞানী-গুণী যোগী তপস্বীর দর্শন পেয়েছি। তাদের উপদেশের সঙ্গে আজ তোমার কথা মিলিয়ে নিয়ে যেন বুঝতে পারছি পূর্ণাবতার নিজে হাতে-কলমে কিছু করেন না। দেখো না, কেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সবাই যখন অস্ত্রধারণ করলেন তিনি অস্ত্র না ধরে ঘোড়ার বলগা-মাত্র ধারণ করলেন; তারপরে যদুবংশকে বিনষ্ট হতে দেখেও তাদের রক্ষার্থ কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটিও উত্তোলন করলেন না, তাই মনে হচ্ছে পূর্ণাবতার নিজে কিছু করেন না, দৃষ্টান্তস্বরূপ আবির্ভূত হয়ে সমস্ত

আহ্বান করেন; পূর্ণাবতার ব্যর্থ হননি, ব্যর্থ হয়েছে মানুষ।

জরার মুখে এমন গভীর তত্ত্ব শুনতে পাবে মদিরার কল্পনাতীত ছিল, সে হঠাৎ উত্তর দিতে পারে না। তারপরে হঠাৎ উঠে এসে জরার পায়ের ধুলো নিয়ে বলে ওঠে, জরা তুমি তো মুক্তপুরুষ।

জরা শশব্যস্তে সরে গিয়ে বলে, মদিরা একি করলে, একি করলে। ব্রজাঙ্গনা হয়ে ঘোর পাতকীর পাদস্পর্শ করলে। তবে ভরসা এই যে চরম পাপ যে করেছে তার পাপ আর বাড়বে কি করে? না মদিরা, আমি মুক্তপুরুষ নই, আমি মুক্তির সন্ধানী।

মদিরা বলে, যেখানে যাচ্ছ মুক্তি সেখানেই মিলবে, মুক্তিদাতা তোমাকে ডাকছেন। তোমাকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর নিজেরও যে মুক্তি নাই। এ জেনো নিশ্চয় তিনি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছেন।

জরা রওনা হয়ে যায়। মদিরা সব রকম পরামর্শ ও সতর্কবাণী তাকে শুনিয়েছিল কেবল একটি বিষয়ে তাকে সাবধান করে দিতে ভুলে গিয়েছিল, না, ঠিক ভুলে যায়নি, তবে সে বিষয়টা তার কাছে অসম্ভব মনে হয়েছিল তাই বলা প্রয়োজন বোধ করেনি।

(২)

মথুরাপ্রসাদ কৌস্তুভমণিটার লোভ পরিত্যাগ করতে পারেনি। বরঞ্চ ঐ মণিটা নিয়ে মদিরা পালিয়ে বৃন্দাবন চলে গেলে ওটার প্রতি আকর্ষণ অধিকতর দুর্নিবার হয়ে উঠল। কিভাবে ওটাকে হস্তগত করা যায় এখন তার দিবসের চিন্তা রাত্রির স্বপ্ন। মদিরা সামান্য লোক ও দুর্বল কাজেই লোক পাঠিয়ে লুঠ করে আনা কঠিন ছিল না, কঠিন ছিল না না, তবে অসম্ভব। মথুরাবাসী নরনারী সকলের সংস্কার ছিল যে বৃন্দাবনে গিয়ে হামলা করা চলবে না। সেই একবার কিশোর-বীর মথুরাপতি কংসকে বিনাশ করেছিল সেই স্মৃতি সকলের মনে কাজ করতো। আজ সে কিশোর বৃন্দাবনে নেই, মথুরায় নেই, পৃথিবীও পরিত্যাগ করেছে কিন্তু হলে কি হয় সংস্কার দুর্মর। অতএব জোর-জুলুম চলবে না। কিভাবে ওটি হস্তগত করা যায় উপায় চিন্তা করতো মথুরাপ্রসাদ।

তক্ষশিলার বাজার থেকে চড়া দামে কিনে এনেছিল মদিরাকে তার রূপের মোহে। কিন্তু একদিনও তাকে ভোগ করতে পারেনি। মথুরায় এসে নগরপ্রান্তে উপবন বাটিকায় বাসস্থান নির্দিষ্ট করে দিল মথুরাপ্রসাদ। মদিরা এরকম জীবনযাপনে অনভ্যস্ত নয়, এখানেও তার আপত্তি ছিল না। রাতেরবেলায় মথুরাপ্রসাদ যখন এসে উপস্থিত হল প্রথমেই তার নজরে পড়লো ঐ অলৌকিক রত্নটি। আর প্রথম দর্শনেই প্রেম। নারীর মোহ রত্নের মোহে পরিণত হল। মদিরার অভ্যস্ত চক্ষু বুঝলো যে এখন তার চেয়ে ঐ মণিটার আকর্ষণ প্রবলতর মথুরাপ্রসাদের কাছে। কোন নারী এই অবজ্ঞা সহ্য করতে পারে। মুহূর্ত-মধ্যে তার মন পাষাণ হয়ে গেল, না কিছুতেই এই অরসিককে দেহদান করবে না সে। তার এহেন দৃঢ় সংকল্পের আবশ্যক ছিল না. কেননা তখন মদিরা তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে মথুরাপ্রসাদের চোখে।

মদিরার বিমুখতায় আরও কিছু কারণ ছিল। এ মণিহার যে বাসুদেবের স্মৃতি-জড়িত সেটা কিনা শেষে অলঙ্কৃত করবে ঐ সামান্য কামুকটার কন্ঠ। হয়তো বা কোন লোভের মুহূর্তে পরিয়ে দেবে আর এক পণ্য নারীর কন্ঠে। সে আগেই স্থির করেছিল যার হার তাকেই ফিরিয়ে দেবে। দ্বারকায় ফিরে যাওয়া যদি নিতান্তই সম্ভব না হয় কাছেই তো বৃন্দাবন সেখানে তিনি বাল্যলীলা করেছিলেন। এ মণিহার কার, কে দিয়েছিল, কোথায় পেলো, কত মূল্য প্রভৃতি উত্তর প্রত্যুত্তরে সে রাতটা কেটে গেল। মথুরাপ্রসাদ বুঝতে পারলো এ রত্ন সহজে হাতছাড়া করবে না মদিরা, আরও বুঝলো যে মেয়েটা সহজ লোক নয়। মথুরাপ্রসাদ ভাবলো সেও সহজ লোক নয়, ছলে বলে কৌশলে হাত করবেই ও জিনিসটা, কেবল কিছু সময় দরকার। মদিরাও বুঝেছিল এই সত্যটা। তাই আদৌ সময় দিল না, পরদিন প্রাতঃকালেই হারটা নিয়ে বৃন্দাবন পালিয়ে চলে এলো। এমন যে সম্ভব মাথায় আসেনি মথুরা-প্রসাদের নতুবা পাহারা বসাতো।

বৃন্দাবনে এসে সমবয়সী এক ব্রজাঙ্গনার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটলো। মদিরা জানালো যে মথুরার বণিক মথুরাপ্রসাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে, এখানে আশ্রয় চায়।

মেয়েটি জানালো, বহিন এখানে নির্ভয়ে বাস করো, বৃন্দাবনে এসে হামলা করবার সাহস কারো নেই, বিশেষ মথুরার লোকের তো বটেই। ব্রজেশ্বর এখানে সকলের রক্ষক। সেই মেয়েটি যে মঠে বাস করতো সেখানে এসে উঠল মদিরা। তার ঘরের কুলুঙ্গির মধ্যে লুকিয়ে রাখলো কৌস্তুভমণিহার, কাউকে বিশ্বাস করে সে সংবাদ জানাতে পারলো না। তারপরে দশ বৎসর চলে গিয়েছে। গোড়ায় যে ছিল পলাতকা নারী সে ক্রমে পরিণত হল কৃষ্ণগতপ্রাণ ব্রজাঙ্গনায়।

মথুরাপ্রসাদ সমস্ত খবর রাখে কিন্তু করবার কিছু নাই। এই দশ বৎসর তার অন্যান্য ইন্দ্রিয় শিথিল হলেও লোভটা বেড়ে গিয়েছিল, বস্তুতঃ লোভটা বিশেষ কোন ইন্দ্রিয়গত নয় বলেই বয়সের সঙ্গে বেড়ে যায়। স্বভাবলোভী মথুরাপ্রসাদের বেলায় তা একটা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছিল। সে তাকে তাকে থাকলো।

ব্রিজপ্রসাদ আর ব্রিজনাথ নামে তার দুই বিশ্বস্ত সহচর ছিল, সমস্ত দুষ্কর্মের সহায় তারা। যেমন প্রভু তেমনি অনুচর। দুজনেই কলির চর, তাদের অসাধ্য বা অকরণীয় কিছু ছিল না। মথুরাপ্রসাদের আজ্ঞায় তারা দুজনে ছায়ার মতো মদিরার কাছাকাছি থাকতো। সমস্ত খবর রাখতো, রত্নটা যে হাতছাড়া হয়নি জানাতো প্রভুকে। বৃন্দাবনে সকলেরই অবাধ গতিবিধি। তবে জুলুম করবার সাহস কারো ছিল না। মদিরাকে চোখে চোখে রেখে দশ বৎসর কেটে গেল।

একদিন তারা প্রভুকে জানালো যে সম্প্রতি জটাশ্মশ্রুধারী এক সন্যাসী এসেছে আর তার সঙ্গে মদিরার কিছু অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা, ভাবে গতিকে মনে হয় তাদের মধ্যে পূর্বপরিচয় আছে। মথুরাপ্রসাদ আদেশ দিল যে এবার যেন কড়া পাহারা রাখে, ঐ সন্যাসীবেটা মণিটা হাত করতে না পারে কিম্বা ঐ সন্যাসীর সঙ্গে সেটা না পাচার করে দেয় মাগীটা। ও বেটীর অসাধ্য কিছু নেই, নইলে এমন সুখের বাগানবাড়ী ছেড়ে মঠে গিয়ে থাকে, অলঙ্কারের বদলে গায়ে তিলক ফোঁটা কাটে, আর কিনা মদের বদলে পান করে চরণামৃত। অনুচরেরা জানায় প্রভুর আদেশ হলে ঐ মণিশুদ্ধ মাগীটাকে নিয়ে এসে হাজির করে দেয় বাগানবাড়ীতে। এ কথা শুনবামাত্র মথুরা-প্রসাদ দুই কানে আঙুল দিয়ে কপালে হাত ঠেকায়, শেষে কি কংসের মতো প্রাণে মারা পড়বে।

ব্রিজনাথ ও ব্রিজপ্রসাদ সুদক্ষ গুপ্তচর। প্রত্যেকটি খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রাখত। ইতিমধ্যে জরার সঙ্গে নানা অজুহাতে আলাপ পরিচয় করে নিয়েছে, সে যে শীঘ্র দ্বারকায় রওনা হবে তাও জেনে নিয়েছে। মদিরা তাদের চিনতো না, তাই সন্দেহ করলো না। আর যাত্রার আগে জরার গলায় যখন একটি রেশমী থলি ঝুলিয়ে দিয়ে বলল, জরা এর মধ্যে রইলো তোমার জপের মালা, সাবধানে রেখো, তখন সমস্তই দেখলো অনুচরেরা। তারা বুঝলো ঐ মণিটা পাচার হতে চলেছে। তারা অবিলম্বে প্রভুকে গিয়ে খবর দিল।

সংবাদ শুনে মথুরাপ্রসাদ অনুচর দুই-জনকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে পথখরচের যথেষ্ট অর্থ দিয়ে সুসজ্জিত ঘোড়ায় চাপিয়ে বিদায় দিল, বলল, দেখো, লোকটার পিছু

নেবে। লোকটা যখন মালবদেশে প্রবেশ করবে তখন ছলেবলেকৌশলে ঐ থলিশুদ্ধ মণিটা হাত করে চলে আসবে। দেশ এখন অরাজক, খুন-জখম রাহাজানি নিত্যকার ঘটনা, কে করলো লোকে জানতে পারবে না। তারপর আরও জানিয়ে দিল ওটা পেলে তোমাদের জায়গীর দেবো।

ওরা প্রভুকে অভিভাদন জানিয়ে রওনা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে তার মনে হল ব্যাটাদের বিশ্বাস কি, যদি নিজেরাই আত্মসাৎ করে, তখন। তাই মথুরাপ্রসাদ ছদ্মবেশ ধারণ করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অশ্বারোহনে ওদের পিছু পিছু চললো। গুপ্তচরের উপরে গুপ্তচর। অনুচরদের সংগে সামান্য ব্যবধান রক্ষা করে চললো স্বয়ং ছদ্মবেশী প্রভু। প্রভু ও গুপ্তচরদের মধ্যে সম্বন্ধটা চিরকাল বিশ্বাসের ভানের উপরে স্থাপিত।

এসব ব্যাপার মদিরার জানবার নয়। আর দশ বৎসর আগেকার মথুরাপ্রসাদের সেই লোভের বিবরণ এখন তার মনে প্রাচীন ইতিহাস মাত্র। সেদিক থেকে ভয় ছিল না তার মনে, তাই সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেনি। তবে বলে দিয়েছিল সাধুসন্যাসী দেখলেই যেন নিশ্চিন্ত হয়ে বেশি মেলামেশি না করে, কারণ অনেক সময় চোর ছিনতাই ও দাগাবাজ সাধুবেশে কার্যোদ্ধার করে থাকে। আর কৌস্তুভমণির কথা সাধু-অসাধু কাউকে নয়।

(ক্রমশঃ)
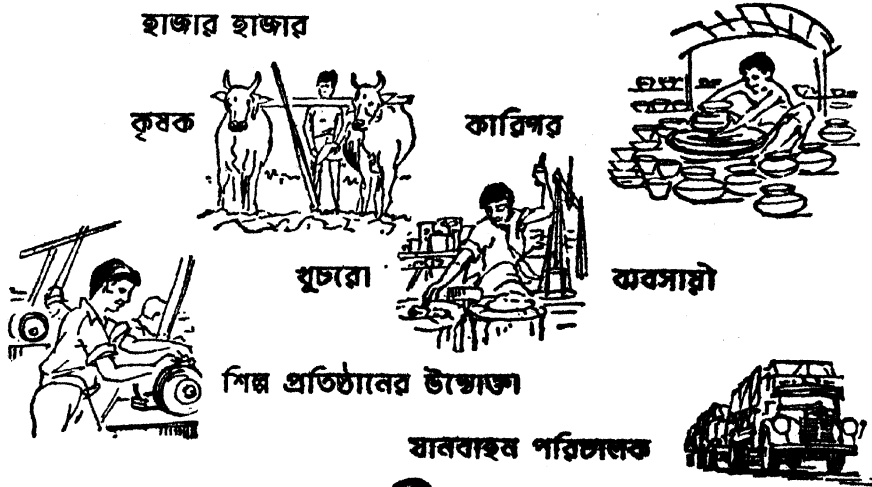
মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকশিল্পের মধ্যে চারুশিল্প ও কারুশিল্প দুরকমই পড়ে। অতীতের বহু শতাব্দী ধ'রে দেখা গেছে, পোল্যান্ডের মফঃস্বল বা গ্রামাঞ্চলে নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর শিল্পসম্মত কারুশিল্প বা হাতের কাজের সৃষ্টি হয়ে এসেছে। এইসব সৃষ্টি অবশ্য ঐ দেশের আঞ্চলিক ও সামগ্রিক ভিত্তিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক পরিস্থিতি অনুসারে চেহারা নিয়েছে সব সময়েই। শুধু তাই নয়, পুরুষানুক্রমে এইগুলি লালিতপালিত ও হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে। আরেকটি কথা বলা দরকার,—দেশের প্রতিটি অঞ্চলে সেই-খানকার বৈশিষ্ট্য ও কায়দাকৌশল অনুসারে এবং স্থানীয় কাঁচা মালমশলার ওপর নির্ভর ক'রেই কারিগরেরা তাঁদের শিল্পসৃষ্টি করতেন বা এখনও ক'রে থাকেন।

পোল্যান্ডের জাতীয় জবনের ওপর দিয়ে বহুবার ঝড়ঝাপটা বয়ে গেছে, এই দেশের লোকশিক্ষা অসংখ্য উত্থান-পতন ও পরিবর্তনের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে এসেছে, কিন্তু কখনই তার ধারা মরুপথে হারিয়ে যায় নি—সে-ধারা আজ পূর্ণ-প্রবাহিনী, প্রাণবন্ত। এর মূলে আমরা দেখতে পাই এই দেশের অধিবাসীদের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং অগ্রগতির বাসনা।

বিগত মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকেই পোল্যান্ডের মানুষ নজর দিয়েছেন তাঁদের যুগযুগব্যাপী শৈল্পিক ঐতিহ্যের দিকে, চিন্তা করেছেন কী ক'রে একে পোষণ ক'রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সামনের দিকে। এই বাসনা থেকেই জন্ম নিয়েছে অতীতকালের শিল্পসৃষ্টিগুলিকে চমৎকার-ভাবে সংরক্ষিত রাখবার সংকল্প। শুধু তাই নয়, দেশের নতুন নতুন শিল্পপ্রতিভা যাতে বিকাশের যথাযথ সুযোগসুবিধা পায় এবং কারুশিল্পগুলি যাতে সুসংবদ্ধ ধারা ও আকৃতি গ্রহণ ক'রে সাধারণ্যে সম্প্রচারিত হয়, সেদিকেও এ'রা সফলকাম হতে পেরেছেন।

কথা হচ্ছে এই যে, লোকশিল্প ধারণ ও বহন করবার দায়িত্বটা কার—সরকারের, না জনসাধারণের? উত্তরে বলতে হয়: উভয়েরই। সৃষ্টিকর্তা আসবে জনসাধারণের মধ্যে থেকেই, কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতা করবার দায়িত্ব বিত্তশালী ব্যক্তিগণের আর দেশের সরকারের। কার্যতঃও হয় তাই—পোল্যান্ডের লোকশিল্পের তত্ত্বাবধান করে থাকেন ওখানকার কৃষ্টি ও শিল্প মন্ত্রণালয় আর তার প্রাদেশিক বিভাগগুলো। কারুশিল্পীরা রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে পেয়ে থাকেন পুরস্কার ও বৃত্তি। মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশের নানা স্থানে প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী, শিল্পসম্মেলন, পরামর্শসভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মনুষ্যজাতির শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে দেশে যেসব যাদুঘর আছে, সেগুলির জন্যে এবং জাতীয় সংগ্রহশালা-গুলোর জন্যে রাষ্ট্র নগদমূল্যে কিনে নেন লোকশিল্পের উৎপাদনগুলি।

লোকশিল্পজাত সামগ্রীগুলির উৎপাদন, ক্রয় এবং সেগুলিকে বাজারস্থ করার দায়িত্ব আছে ওখানকার শিল্পসমবায়মূলক প্রতি-ষ্ঠানসমূহের ওপর। এই প্রতিষ্ঠানগুলির আবার একটি উচ্চতর সমিতি বা সঙ্ঘ আছে, তার নাম "সেপেলিয়া"। এই সঙ্ঘ সদস্য সমবায়গুলিকে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল সরবরাহ ক'রে থাকে। শিল্পসম্বন্ধীয় পরামর্শ ও নির্দেশাদি দিয়ে থাকে, নিজস্ব বিপণিতে ঐ সব দ্রব্য বিক্রির ব্যবস্থা ক'রে থাকে, বিদেশেও কিছুটা রপ্তানি করে। সারা পোল্যান্ড থেকে এক হাজার বা তারও বেশি কারিগর "সেপেলিয়া"-র সভ্য। তা ছাড়া, দেড় হাজারেরও বেশি লোকশিল্পী

(এঁরা চারটি বিরাট কুটিরশিল্প-প্রতিষ্ঠানে কর্মরত), নব্বুইটি শিল্পসমবায় এবং পাঁচটি (ওয়ারশ-এ, কাটোউইস্‌স-এ, লড্‌জ্‌-এ, গাডিনিয়া-তে ও ক্রাকাও-এ) আঞ্চলিক বিপণন কার্যালয় এই "সেপেলিয়া"-র সদস্য।

পোল্যাণ্ডে লোকশিল্পের নানা প্রশাখা। যেমন, প্রধানত নাম করতে হয় এইগুলির ঃ—বস্ত্রবয়নশিল্প, আসবাব তৈরি, ভাস্কর্য, মৃৎশিল্প, তৈজসশিল্প ও কর্মকারশিল্প। এদেশের লৌকিক বস্ত্রশিল্পের একটা বিশেষত্ব হ'ল, কোন-না-কোন রকমের ডোরা-কাটা থাকবে তাতে। এ জিনিসটার উৎপত্তি ১৯শ শতকে। আর রঙের ব্যবহার একেক স্থানে একেক রকম। রং প্রয়োগের এই আঞ্চলিক বিশেষত্বটি উল্লেখযোগ্য। ডিজাইন বা নক্‌সাগুলো বিচিত্রিত—কখনো জ্যামিতিক আদলে, কখনো লতাপাতার চেহারায়, কখনো অন্য কিছু। কাপড় বা ছিটের ওপর এসব অলংকরণগুলো খুব সুন্দর দেখায়। সুতির কাপড় ছাড়া পশমের ওপরেও নানা কারুকার্য করা হয়। সুতি বা পশমী স্কার্ট, স্কার্ফ, এপ্রণগুলি খুব সুন্দর দেখায়। এছাড়া অন্যান্য জিনিসও তৈরি হয়, যেমন—টিপেল, কার্পেট, রাগ, ও ঘর সাজাবার পর্দাজাতীয় নানা জিনিস। একেক অঞ্চলে প্রাপ্তব্য উপাদান অনুসারে একেক ধরনের লোকশিল্প বেশি তৈরি হয়।

সবচেয়ে সূক্ষ্ম ডোরাকাটা পরিচ্ছদবস্ত্র তৈরি করেন দেশের মধ্যাঞ্চলের কারিগররা। জ্যামিতিক ডিজাইন-এর রীতিটা পূর্বাঞ্চলের মাট্‌সোওস্‌ট্‌সে জিলায় বেশি চালু—তাছাড়া পোড্‌লাসি এবং মাজুরীতে। ডবল বুনোটের কার্পেট বুনতে আবার বিয়ালিস্টক্‌ অঞ্চলের শিল্পীরা সিদ্ধহস্ত।

রাগ (কম্বল) ও পর্দাজাতীয় সরঞ্জাম (ট্যাপেস্ট্রি) -গুলি যেমন সুচিত্রিত হয়, তেমনি হয় কাজের জিনিস। এসবের নক্‌সা বা পরিকল্পনা আগে ক'রে দেন অঙ্কন-শিল্পীরা, তারপর সুদক্ষ তন্তুবায়রা তাঁতে বোনেন সেগুলোকে। অনেকসময় নক্‌সা-শিল্পীরা তাঁত নিয়ে বসে যান। এইসব কম্বল ও সরঞ্জাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যায়, স্থান পায় সংগ্রহপ্রেমিকদের ভাণ্ডারে কিংবা অবস্থাপন্ন রুচিবান ব্যক্তিদের শয়ন-কক্ষে ও বৈঠকখানায়। এরা শোভাবর্ধন করেছে ইংলণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের, অধুনা-স্বর্গত ফরাসী রাষ্ট্রপতি দ্য গলের আর যুগোশ্লাভিয়ার প্রধানপুরুষ যোসেফ টিটোর কক্ষসমূহের। এরা আছে ক্রেমলিনের সংগ্রহাগারে, ইরাণের শাহান্‌শাহের তেহেরানস্থ প্রাসাদে—এরা আছে আরো অসংখ্য স্থানে।

পোল্যাণ্ডের লোকশিল্পে, এমব্রয়ডারি ও লেস তৈরি, এই দুটি জিনিসের ভারি কদর। পোডহেল অঞ্চলের পুরুষদের পোশাকই দেখি, আর কুর্পি-কুপ্‌কেজনো-লোউইজ-বিলগোরাজ ইত্যাদি জায়গাকার মেয়েদের পরিচ্ছদই দেখি,—দেখতে পাবো কিছু-না-কিছু এমব্রয়ডারি আর লেসের কাজ তাতে রয়েছেই। বলা বাহুল্য, পোশাকের সৌন্দর্য নিশ্চয়ই বেড়ে যায় এর দরুণ।

দেশজ লৌকিক পরিচ্ছদ এই দেশে যে কতরকম ধাঁচে প্রচলিত, তার হিসেব করা শক্ত। একেক জায়গায়, একেক জেলায় একেকটি বিশেষ ধাঁচ। আগেকার মানুষে প্রত্যহই ব্যবহার করত এসব পরিচ্ছদ, কিন্তু এখন আর অতটা চালু নেই—নিয়মিত কেউ বড়-একটা পরে না, পরে উৎসব-অনুষ্ঠান-গুলোতেই বেশি ক'রে। অল্প কয়েকটা জায়গায় কেবলমাত্র স্থানীয় বাসিন্দারা এখনো নৈমিত্তিক ব্যবহার ক'রে চলেছে এই প্রাচীন পরিচ্ছদসমূহ।

পোশাকের পর মাটির জিনিস বা মৃৎশিল্প। এ ব্যাপারেও ওদের ঐতিহ্য খুব উদার। দেশের পূর্বাঞ্চলে ও মধ্যভাগে গ্রামাঞ্চলে বহুলোকের উপজীবিকাই এই, এবং তাঁরা এতে দক্ষতাও অর্জন করেছেন পুরুষানুক্রমে। তাছাড়াও ওস্তাদ কুম্ভকার দু'চারজন ক'রে দেখতে পাওয়া যাবে দেশের সব জায়গাতেই। পূর্বাঞ্চলের কারিগরেরা কালো রংয়ের মৃৎপাত্রের ওপর নানা সুদৃশ্য কাজ করেন। অন্যান্য অঞ্চলে রুক্ষ-গা-ওয়ালা পাত্রাদি তৈরি হয়, তাদের রং ঠিক সাধারণ মাটির রংয়ের মতনই বজায় রাখা হয়।

পোল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলে যদি আপনি বেড়াতে যান, তাহলে নিসর্গদৃশ্য দেখে মুগ্ধ হওয়া ছাড়াও আরেকটা ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। দেখবেন, পথের ধারে ধারে বিভিন্ন সাধু-সন্ত ও ধার্মিক ব্যক্তির প্রতিমূর্তি সাজানো রয়েছে। এগুলো প্রায় সবই পাথরের, তৈরি করেছেন কোন-না-কোন অখ্যাত কিংবা অজ্ঞাতনামা গ্রামীণ শিল্পী—হয়ত নিজের পরিচয়ের কণামাত্রও রেখে যাননি ভবিষ্যৎ বংশধর ও বিদেশী ভ্রমণকারীদের জন্যে। সৃষ্টির আনন্দেই মূর্তি গড়ে রেখেছেন তাঁরা; তারপরে আর মাথা ঘামাননি, কেউ সেসবের কদর করল কিনা, তা নিয়ে। এই যত্রতত্র মূর্তিসৃজনের ঘটনাটা কিন্তু আজকাল আর ঘটে না, অনেককাল যা হয়ে গেছে তা গেছে—খোলা রোদে-জলে পড়ে থেকে নষ্ট হবার ভয়ে এর অনেকগুলিকেই এখন এনে রাখা হয়েছে বিভিন্ন যাদুঘরে।

কাঠ চিরে, কেটে বা খোদাই ক'রে নানা-ধরনের শিল্পের জিনিস তৈরির প্রচলনটা পোডহেল অঞ্চলেই বেশি। এখানকার কষ্ট-সহিষ্ণু কারিগরেরা কাঠের নানাজাতীয় জিনিসপত্র বানাতে সবসময়েই ব্যস্ত—কাঠের বেল্‌চা, আলমারি, খাট, দেরাজ, নক্‌সাদার বাক্‌সো, বেড়ানোর ছড়ি, আরো কতরকম কী।

গৃহপরিসজ্জা, বা ইংরেজিতে যাকে বলে 'ইন্‌টিরিয়র ডিজাইনিং', আর গৃহ-স্থাপত্য—এই দুটি ব্যাপারেও এদেশের লোকশিল্পীরা যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। এবং এটা ক্রাকাও-এর মতো অনেক জায়গাতেই দেখা যাবে। চাষী-মানুষের বাড়ি, কিন্তু তাই বলে সেখানে রুচির অভাব থাকবে, এর কোনও মানে নেই—গিয়ে দেখুন ভিতরে ঢুকে ঃ ঘরের ছাদ ও দেয়াল চিত্রময়, ঘরের গঠনে নিজস্বতা। সেসব চিত্রকলা ওদের একান্ত ঘরোয়া, একান্ত আঞ্চলিক।

যেমন নিজস্বতা ওদের আরেকটি ব্যাপারে ঃ কাগজ কেটে ঘরদোর জিনিসপত্র সাজানো। কাগজ কেটে নানা শিল্পনমুনা সম্ভব এবং সে সম্ভাবনাকে ও'রা বাস্তবে রূপায়িত করতে বহুকাল থেকেই অভ্যস্ত। গৃহপরিসজ্জায় এই কাগজ-কাটা-শিল্পের বহুল প্রয়োগ ও'রা করে থাকেন। মাট্‌সোওসট্‌সে জেলায় তো এ জিনিসের ছড়াছড়ি। মেয়েরাই এর প্রধান শিল্পী ও উপজীবিনী। সারা ইউরোপে এ-শিল্পের খ্যাতি, জুড়ি মেলে না এর কোথাও।

ধাতু ও ধাতব দ্রব্য নিয়েও গড়ে উঠেছে প্রচুর লোকশিল্প। পোড্‌হেল অঞ্চলে, বিশেষ ক'রে, যেসব নমুনা দেখা যায় সেগুলো অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। ঈস্টার উৎসব উপলক্ষ্যে পোল্যাণ্ডের একটি প্রাচীন প্রথা হচ্ছে চিত্রিত 'ঈস্টার ডিম্ব'। জন্তু-জানোয়ারের শিং থেকেও অনেক রকমের লোকশিল্প তৈরি হয়। হয় নানাধরনের খেলনা।

লোকশিল্পের সমগোত্রীয় হল লোক-স্থাপত্য। এই বিষয়েও পোল্যাণ্ডের কৃতিত্ব সমুজ্জ্বল। এই শ্রেণীর স্থাপত্য সত্যিই শিল্পসম্মত সৃষ্টি হয়ে থাকে। লোক-স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হিসেবে পূর্ববর্ণিত পোডহেল অঞ্চলের নাম করা যায়।

এই যে এতগুলি শ্রেণীবিভাগের কথা বলা হল, এর অনেকগুলিতেই (যেমন, বস্ত্রবয়ন, তৈজসশিল্প) পোল্যাণ্ডের সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে ওখানকার লোকশিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সুপরিস্ফুট। বস্তুত, লোক-শিল্পকে বাদ দিয়ে পোল্যাণ্ডের সর্বাঙ্গীণ সমাজচিত্রটি যেন মোটেই সম্পূর্ণ হয় না।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অন্ধকারের মধ্যে হেডলাইট দুটো জেলে অরুণ ফিরতিপথে এগিয়ে চলল। আশ-পাশে ঘন অন্ধকার নেমেছে। একটানা গাড়ীর আওয়াজটা হয়ে চলেছে শুধু। আরোহীরা নির্বাক। সীমা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সোজা রাস্তার দিকে। মনটা তার তোলপাড় করছে। সব জিনিসটা সে স্থির হয়ে ভাবতে চেষ্টা করে আরও যেন জট পাকিয়ে ফেলল বিশ্রীভাবে।

কি ভাবছ? জিজ্ঞাসা করল অরুণ।

কিছু না।

জায়গাটা ভাল লেগেছে?

হ্যাঁ।

কষ্ট আর অসুবিধে হল নিশ্চয়।

না, তেমন আর কি।

বাবার খুব ভাল লেগেছে তোমার।

কথার কোন জবাব দিল না সীমা। তার এখন কি করা উচিত তাই ভাবতে লাগল নিবিষ্ট চিত্তে।

আবার তাকে পালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কোথায়? সেটা পরে ভাবা যাবে। এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়িয়ে যেতে হবে যে কোন উপায়ে। অবশ্য উপায় বলতে একটাই আছে—উধাও হয়ে যাওয়া অজানা জায়গায়। হঠাৎ পিসিমাকে মনে পড়ল তার। শিমুলতলার মনোরমা পিসিমা। অনেকদিন সে পিসিমাকে দেখেনি।

এত চিন্তা কিসের তোমার?

কই না ত। রাম না হতেই রামায়ণ—ভাবল সীমা। অরুণ তাকে একইভাবে সম্বোধন করে চলেছে। তার বাবার কাছে তার সঙ্গে যেভাবে কথা বলেছে তার ধারাটা অক্ষুন্ন রেখেছে কিসের জোরে? এখন থেকেই অরুণ বন্ধু হয়ত তাকে স্ত্রীর মত একটা চলমান সম্পত্তি বলে গণ্য করে ফেলেছে। মনে মনে হাসল সীমা।

টায়ার্ড ফিল করছ? সামান্যভাবে আলাপ করতে চেষ্টা করছে অরুণ। সীমার ভাবান্তর তার কাছে অস্বাভাবিক লাগছে। কিছুক্ষণ আগে যে মানুষ কথায়, গল্পে, কাজে মেতেছিল, সে হঠাৎ স্তব্ধ, নিশ্চুপ হল কি কারণে? মেয়েদের মনের কথা অবশ্য সে বলতে পারে না কিন্তু সীমার নীরবতা।

অরুণের গাড়ী থেকে মাঝপথে নেমে একটা ট্যাকসী নিয়ে যখন ফ্ল্যাটে পৌঁছল সীমা তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছে। সিঁড়ির কাছে গিয়ে তার সৌম্য দত্তকে মনে পড়ল। একটু থমকে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখে নিল সীমা। না, কেউ নেই। নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকল সীমা। নিজেকে খুব ক্লান্ত বলে মনে হল তার। পৃথিবীর সব ক্লান্তি যেন তাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। তার শরীর, মন, সত্তা যেন লুপ্তপ্রায়! অবশ দেহটা বিছানায় এলিয়ে দিল সীমা। জামাকাপড় জামা এমন কি জুতোটা পর্যন্ত খোলার

মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারল না সে। চোখ দুটো বন্ধ করে নিজের অস্তিত্বের কথা ভাবতে চেষ্টা করল সীমা। ধীরে ধীরে তার চেতনা ফিরে এল একটু পরে। চেয়ে দেখল, সে তার খাটে শুয়ে রয়েছে। পায়ের দিকে নজর যেতে কাদামাখা জুতোটা চোখে পড়ল এবার। না, স্বপ্ন নয়, সত্যিই সে অরুণের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল। উঠে বসল সে। তারপর বাথরুমে গিয়ে মুখটা ধুয়ে এক গ্লাস জল খেল একটু একটু করে। গলাটা তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

অরুণের বাবা অসিতবাবু যখন বাড়ীটা তৈরী করেছিলেন, তখন তাঁর একথা মনে হয়নি যে এতবড় বাড়ী একজনের জন্যে তৈরী হচ্ছে। অসিতবাবু নিজে থাকলেও তবু কিছুটা মানাত। কিন্তু শহর থেকে দূরে যখন পল্লীগ্রামে তিনি থাকতে মনস্থ করলেন তখন এক অরুণ ছাড়া এ বাড়ীতে বাস করার মত আর কেউ রইল না। সেই কারণে অরুণ দুতলাটা নিজের জন্যে রেখে বাকীটা সবই ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। এতে অসিতবাবুর কোন আপত্তি হয় নি।

সেদিন সীমাকে নিয়ে ফেরার পর গাড়ীটা গ্যারেজে রেখে অরুণ ওপরে উঠে গেল। স্নান এবং জলযোগ সেরে সে ডিভানে একটা মাসিক পত্রিকা নিয়ে পড়তে শুরু করল। সাধারণত সে ধূমপান করে না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ সময়ে এ জিনিসটা সে পছন্দ করে থাকে। মানসিক এবং দৈহিক ক্লান্তিতে নিকোটিন তাকে সাহায্য করে। একটা সিগারেট ধরাল সে। হাতে এখন প্রচুর সময় তার। সীমা তাকে প্রথম থেকেই আকর্ষণ করেছে। দেখতে সে অপরূপ সুন্দরী নয় কিন্তু তার মধ্যে কোথায় যেন একটা অদৃশ্য শক্তি লুকোন আছে। সীমার সৌন্দর্য তাকে প্রলোভিত করে না এমনকি মুগ্ধও করতে পারে না—একথা সে জানে। বরঞ্চ তার মধ্যে পুরুষালি ছোঁয়াচ রয়েছে বলে সে লক্ষ্য করেছে। সীমার চলা, কথা বলার ভঙ্গী সবেতেই একটা বলিষ্ঠতা আছে বলে সে মনে করে। সবচেয়ে আকর্ষণ করে তার অস্বাভাবিক স্বভাব। চ্যালেঞ্জ আর ঝুঁকি নিতে অরুণ বসু ভালবাসে। এটা তার একটা নেশা। কোলরিজ কোম্পানীতে সীমা যে টাকা চুরি করেছে এটা সে জানে। যেটুকু সন্দেহ ছিল তার নিরসন হয়েছে পরের ঘটনায়। মোদী কোম্পানীর ছাব্বিশ হাজার টাকা যেভাবে সরান হয়েছে তা থেকে অরুণ বুঝেছে সীমা একাজ নতুন করছে না। এখন শ্যামলী সেন হয়ে সে ক্রস অ্যান্ড ক্যারাওয়ে কোম্পানীতে যোগ দিয়েছে কেন সেটার কারণ অনুমান করা তার পক্ষে সহজ। সীমাকে নিয়ে তার এতদূর এগিয়ে যাওয়া উচিত হচ্ছে কিনা সেটা তার ভাববার সময় এসেছে। সীমার চরিত্রে এই যে বিরাট অসংগতি আর অস্বাভাবিকতা রয়েছে এটা নিয়ে সে অবহেলা করছে কিনা সে প্রশ্নও তাকে চিন্তাক্রান্ত করে তুলেছে এবার। এটা [illegible] একসপেরিমেন্ট জেনেশুনেই নিচ্ছে। একটা অবাধ্য দুরন্ত প্রাণীকে নিজের বশে আনার মধ্যে পৌরুষ আর উত্তেজনা আছে। অরুণ বসু উত্তেজনা ভালবাসে। টাকা চুরির ব্যাপার সম্বন্ধে তার দুর্ভাবনা আছে। পুলিশ যে কোন সময়ে সীমাকে অভিযুক্ত করতে পারে এটা সে জানে। সেদিক দিয়ে অবশ্য সে প্রস্তুত হচ্ছে। ক্রিমিনাল সাইডের নামজাদা উকিল বিমান মুখার্জির আজই আসার কথা আছে। ঘড়িটা একবার দেখল অরুণ। কিছুক্ষণ পরেই বিমানবাবু এলেন। অরুণদের ব্যবসা-সংক্রান্ত মামলা তিনিই চালিয়ে থাকেন।

আমায় ডেকেছেন? একটা চেয়ারে বসলেন বিমানবাবু।

হ্যাঁ। এটা কিন্তু অফিসিয়াল ব্যাপার নয়, আমার নিজের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

বেশ ত বলুন, তৎপর হলেন বিমানবাবু!

একজন যদি কয়েক জায়গায় চুরি করে থাকে ভিন্ন ভিন্ন নাম নিয়ে তাহলে তাকে বাঁচাবার জন্য কি করা যায়?

খুব সহজ উপায় আছে। কিন্তু তার আগে বলুন কোন কেস হয়েছে কিনা তার বিরুদ্ধে।

না, এখনও পর্যন্ত হয়নি।

তাহলে কোন হাঙ্গামা নেই। টাকাগুলো যথাস্থানে ফেরত দিলেই হল।

টাকা ফেরত দিলেও কেস করতে পারে নাকি তারা? জিজ্ঞাসা করল অরুণ।

হ্যাঁ, সেরকম আদর্শবাদী লোকও থাকতে পারেন। চোরকে শাস্তি দিয়ে সামাজিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে এঁরা সদাই সচেষ্ট। তবে সংখ্যায় এঁরা কম।

আর কি উপায় আছে?

অন্য উপায় হল, পুলিশের কাছে সব খোলাখুলি স্বীকার করা।

তার মানে কোর্টে অভিযুক্ত হওয়া? সঙ্গে সঙ্গে বলল অরুণ।

হ্যাঁ, তাই, তবে যে ক্ষেত্রে আসামী দোষ স্বীকার করে নেয়, এবং টাকাটা ফেরত দিতে চায় সেখানে অপরাধ লঘু এবং সেই হিসেবে দণ্ডও কম হয়।

কোনটাই পছন্দ হল না অরুণের। সাধারণ লোক হলে এটা হয়ত সম্ভব হত, কিন্তু সীমার ক্ষেত্রে এ দুটো উপায়ই প্রযোজ্য হবে বলে মনে হল না তার। তাছাড়া যে চুরি করে সে স্বীকার করার জন্যে ব্যগ্র নিশ্চয় হবে না। আর টাকা ফেরত দেবার কথা ভাবাই শক্ত। কত জায়গায় এবং কত পরিমাণ টাকা আত্মসাৎ সে করেছে তার ঠিকানা নেই। যদি সীমা টাকাটা ফেরত দিতে রাজী হয়, ভাবল অরুণ। কিন্তু রাজী তাকে করাবে কে? এ প্রশ্ন উত্থাপনই বা করবে কি করে? এমনকি বিমানবাবুকে তার কাছে পাঠালে সে যে সৎপরামর্শ দেবে এমন কথাও মনে করে তাড়িয়েই দেবে। একটা বিরাট বোঝা সে স্বইচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়েছে। বিমানবাবু অরুণকে চিন্তাগ্রস্ত দেখে বললেন,

দেখুন, এ নিয়ে বেশী কালক্ষয় করলে কিন্তু বিপদ আসবে। এ সম্পর্কে আমি দু' একটা প্রশ্ন আপনাকে করছি। টাকা আত্মসাৎ কি এক জায়গায় হয়েছে না অনেক জায়গায়?

অনেক জায়গায়। আস্তে উত্তর দিল অরুণ।

তাহলে পাকা চোর। মন্তব্য করলেন বিমানবাবু।

না, আমার তা মনে হয় না। হঠাৎ সোজা হয়ে বসল অরুণ, আমার মনে হয় এটা তার বিকৃত মনের একটা প্রকাশ মাত্র।

ওটা সাইকোলজীর কথা। চোর কেন চুরি করে, অপরাধপ্রবণ মনের সৃষ্টি কিভাবে হয়, এসব উকিলদের আওতার মধ্যে পড়ে না। এ বিষয়ে সাইকিয়াট্রিস্ট তার অভিমত দেবেন আর চিকিৎসাও করতে পারেন।

বিমানবাবু বিদায় নেবার পর অরুণ যেন আরও মুষড়ে পড়ল দুর্ভাবনার চাপে। একটা অপরাধপ্রবণ, বিকারগ্রস্ত অস্বাভাবিক মেয়েকে পাবার জন্যে তার মধ্যে এ দুরাকাঙ্ক্ষা এল কেন, এ প্রশ্ন তাকে পীড়িত করতে শুরু করল এবার। সীমার পক্ষ থেকে সে এ পর্যন্ত কোন ভাবাবেগের লক্ষণ দেখতে পায় নি। একমাত্র তার বাবার সম্পর্কে ছাড়া। তার বাবাকে যেভাবে সে আগ্রহ আর আন্তরিকতার সঙ্গে সেবা করেছে সেটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার। এর কোন কারণ সে খুঁজে পায় নি। এটা যে স্বার্থপ্রণোদিত নয় সেটা বুঝতে দেরী হয়নি অরুণের। সীমা তার কাছে একটা মূর্তিমতী হেঁয়ালীর মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার চিন্তা অরুণকে পেয়ে বসেছে।

রাতটা কেমন করে কেটে গেল, সেটা সীমা বুঝতেই পারল না। সকালে উঠতে গতদিনের কথা তার মনে পড়ে গেল। সৌম্য দত্তর আর একটা প্রেজেণ্টেশন এবং তার সঙ্গে একটা চিঠি নজরে পড়ল। তার সাহস যে আরও বেড়ে গিয়েছে এটা পড়ে সে বুঝল ভালভাবে। যে ভাষা সৌম্য ব্যবহার করেছে তাতে রুচির কথা ছেড়ে দিলেও ভয়প্রদর্শনের ইঙ্গিতটা স্পষ্ট রয়েছে। এবার ভয় পেল সীমা। কেন তা সে বলতে পারল না। মনটা অকস্মাৎ দুর্বল হয়ে গিয়েছে বলে মনে হল তার। তবে একটা সিদ্ধান্তে সে পৌঁছল, একটা উপায় খুঁজে পেল অনেক চিন্তার পর। তাকে পালিয়ে যেতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন পথ তার খোলা নেই। সৌম্য দত্ত, পুলিশ আর অরুণ বসু—তিনজনেই তার কাছে সমানভাবে ভয়াবহ আর ক্ষতিকর। সীমা ঠিক করল অফিস থেকেই সে চলে যাবে পিসিমার কাছে শিমুলতলায়। একটা ছোট অ্যাটাচিকেস নিল সে। অরুণের কিউবিকলের পাশে ক্যাশ ডিপার্টমেন্ট। সীমা [illegible] অ্যাটাচিকেস
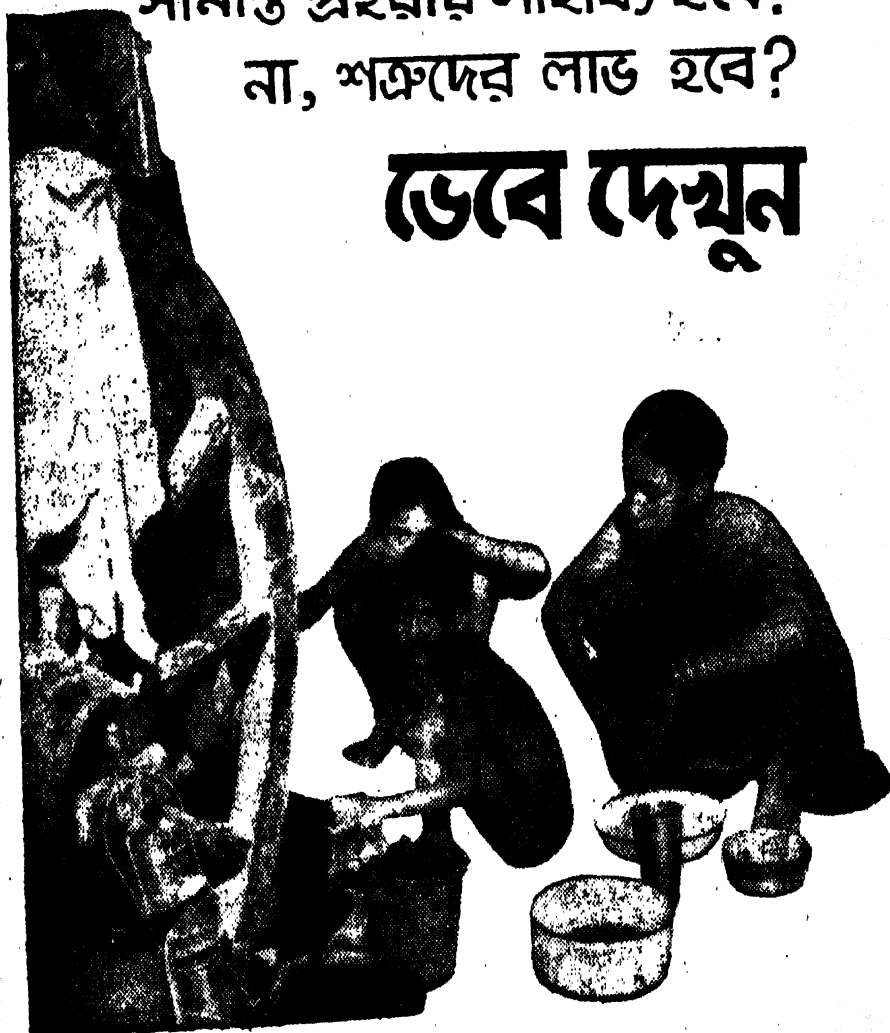
লক্ষ্য করে আশ্চর্য হল। অফিসে অ্যাটাচি-কেস আনার কোন কারণ সে খুঁজে পেল না। একটা সন্দেহ জাগল তার মনে। সে দৃষ্টি রাখল সীমার ওপর। লাঞ্চের সময় সে বাইরে গেল না। লক্ষ্য করল, সকলে চলে যাবার পরও সীমা বসে আছে তার সিটে। এটাও স্বাভাবিক নয়। লাঞ্চের পর অফিসের কাজ শুরু হলেও অরুণ তার কিউবিকল থেকে নজর রাখল। সে যা অনুমান করেছিল তাই হল। ছুটির একঘণ্টা আগে সীমা বড়বাবুর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে, টেবিলের তলায় রাখা ছোট অ্যাটাচিকেস নিয়ে দ্রুত সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলল। লাঞ্চের সময় তার কাজটা সম্পূর্ণ করে নিয়েছিল সীমা। সেই কারণে বড়বাবু তাকে ছুটি দিতে আপত্তি করেনি। সবদিক ভেবে কাজ করে সে।

নিশ্চিন্ত মনে অফিসের গেট পেরিয়ে গেল সীমা। এখানেই তার বন্ধন শেষ! আর তাকে কেউ ধরতে পারবে না। না, সৌম্য দত্ত, না অরুণ বসু। পুলিশের কথা সে পরে ভাববে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে ভুল ভাঙল তার। অরুণ বসু আবার তার পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়েছে।

গাড়ীতে ওঠো, আদেশ করল অরুণ। তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল সীমা। অরুণ বসুর গলার স্বরে আর ভঙ্গিতে কাঠিন্য রয়েছে স্পষ্ট। কোথায় যেন একটা অলঙ্ঘনীয় শক্তির প্রকাশ আছে তাতে। এড়িয়ে যেতে পারল না সীমা।

ভেবেছিলে সহজেই পালাতে পারবে তুমি? অ্যাটাচিকেসে কি আছে? গাড়ীটা জোরে চালিয়ে দিল অরুণ।

আমার কাপড়-জামা।

আর টাকা? ট্রাফিকের দিকে সোজা তাকিয়ে আছে অরুণ।

আছে। আস্তে উত্তর দিল সীমা।

কত?

পাঁচ হাজার টাকা।

বাকী টাকা কোথায়?

ব্যাঙ্কে।

কোন ব্যাঙ্কে এবং কি নামে টাকা জমা দিয়েছ?

বলব না।

না বললে তোমারই ক্ষতি, আর শেষ পর্যন্ত তোমায় বলতেই হবে।

আপনি কি আমায় ভয় দেখাচ্ছেন?

হ্যাঁ, ভয়টা নিছক মিথ্যে নয় আর তার পরিমাণটাও বোঝাতে পারব না হয়ত।

এ কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

পুলিশে। চিবুকের মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠল অরুণের।

ওতে আমি ভয় পাই না। শক্ত হয়ে বলল সীমা।

কতবার জেল খেটেছ? কথাটার উত্তর দিল না সীমা।

লজ্জায় ক্ষোভে মুখটা তার রক্তবর্ণ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

পুলিশকে ভয় পায় না দাগী আসামীরা, তারা অভ্যস্ত হয়ে যায় যা খেয়ে।

আর কোথাও চুরি করেছ?

না, মাথা নাড়ল সীমা।

কোলরিজ আর মোদী কোম্পানী, এই দুটোর কথা আমি জানি।

এছাড়া আর কোথা থেকে টাকা নিয়েছ বল। চুপ করে রইল সীমা।

তুমিই প্রথম একাজে নাম নি, বলতে লাগল অরুণ, তোমার মত অনেকেই এ ব্যবসা করে থাকে। আর তারা সকলেই তোমার মত নিজেকে চালাক বলে ভাবে। সব থেকে আশ্চর্যের কথা তারা প্রত্যেকেই নিজেকে ঠকায় শেষ পর্যন্ত। এবার বল, তুমি চুরি কর কেন?

এটা আমার ব্যবসা, অরুণের কথাটাই ফিরিয়ে দিল সীমা।

তোমার দলে আর কে আছে?

সেটা আপনাকে বলতে আমি বাধ্য নই।

আমার কাছে না বললেও পুলিশের কাছে বলতে বাধ্য হবে।

সে দেখা যাবে। তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিল সীমা।

তোমার কে আছে?

কেউ নেই।

বাবা, মা বা আত্মীয়স্বজন?

কেউ নেই। আবার বলল সীমা।

তাহলে তোমায় লেখাপড়া কে শেখালে, কে মানুষ করলে?

আমি একটা অরফ্যানেজে—কথাটা বলতে গিয়ে থেমে গেল সীমা। একথাটা বলা উচিত হয় নি বলে মনে হল তার।

কোন্ অরফ্যানেজে?

কোন উত্তর দিল না সীমা।

তুমি কার জন্য চুরি কর?

নিজের জন্যে।

কত টাকার তোমার প্রয়োজন হয়?

কেন দেবেন নাকি? ব্যঙ্গের হাসি হাসল সীমা।

না, সেকথা বলছি না। আমি জিজ্ঞাসা করছি একটা লোকের এত প্রয়োজন কেন? অফিসের মাইনেই কি যথেষ্ট নয়?

না যথেষ্ট নয়। গলার স্বরে উত্তাপ রয়েছে সীমার, যারা আপনার মত ধনী আর প্রয়োজনের বেশী টাকা জমিয়ে স্বচ্ছন্দে আর নির্ভাবনায় দিন কাটায় তাদের মুখে একথা মানায় না। দারিদ্র্য কি জানেন? খিদেয় কোনদিন ছটফট করেছেন? ভয় আর দুশ্চিন্তা কাকে বলে জানেন? যন্ত্রণা কখনও অনুভব করেছেন? রাতের পর রাত ভয়ে কুঁকড়ে একটা নোংরা আস্তাকুড়ে সময় কাটিয়েছেন?

অরুণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। সীমার চোখ দিয়ে যেন আগুন বার হচ্ছে! মুখটা তার হিংস্র হয়ে উঠেছে সেই সঙ্গে।

আমায় থানায় নিয়ে যাচ্ছেন? কিছুক্ষণ পরে শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করল সীমা।

একটু পরেই বুঝতে পারবে। গাড়ীটা আরও জোরে চালিয়ে দিল অরুণ।

এবার বল তুমি স্বাভাবিকভাবে জীবন কাটাতে চাও না কেন?

তাই কাটাই, আমার ভেতর অস্বাভাবিক কিছুই নেই।

চুরি করাটা স্বাভাবিক?

আপনিও ব্যবসার নাম করে চুরি করেন, লোক ঠকান।

ব্যবসা মানে চুরি নয়, ব্যবসাতে অপরের টাকা ধোঁকা দিয়ে নেওয়া হয় না। সেখানে পরিশ্রম করতে হয়, মূলধন ফেলতে হয় তবে লাভ পাওয়া যায়। সেকথা থাক—তোমার কি সেন্টিমেন্ট বলে কিছু নেই?

সেটা শরৎচন্দ্রের গল্পে আছে।

গাড়ীটা দাঁড় করাল অরুণ নিজের বাড়ীর সামনে।

এ কোথায় নিয়ে এলেন?

নাম, এ্যাটাচিটা আমায় দাও। এ্যাটাচিটা নিজে তুলে নিয়ে অরুণ সীমার দিকে তাকিয়ে আর একবার দৃঢ় স্বরে বলল—নেমে এস।

সীমা তার সঙ্গে ওপরে গেল। এটা থানা নয় সেটা বুঝতে দেরী হল না তার। কিন্তু একটা অজানা ভয়ে সে ভীত হয়ে পড়ল। একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল অরুণ। এ্যাটাচিকেসটা একটা সাইড টেবিলে রেখে সীমাকে বসতে বলল সে।

আমায় এখানে আনলেন কেন, কি মতলব আপনার? মুখটা শুকিয়ে গিয়েছে সীমার।

মতলব একটু পরেই বুঝবে।

এটা কার বাড়ী?

আমাদের।

বুঝলাম, কিন্তু আপনাদের বাড়ীতে আমাকে এভাবে নিয়ে আসা হল কেন?

তার আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। কোলরিজ কোম্পানীর টাকা কোথায় রেখেছ?

টাকাটা দিলে আমায় ছেড়ে দেবেন? একটা রফা করতে চায় সীমা।

আমার প্রশ্নের উত্তর পাই নি এখনও। গলার স্বরটা গম্ভীর হল অরুণের।

একটা ব্যাঙ্কের নাম করল সীমা।

কি নামে টাকা জমা দিয়েছ? অমিতা রায়, সীমা সান্যাল না শ্যামলী সেন—কোন্‌টা? না আরও একটা নতুন নামকরণ হয়েছে!

না, অমিতা রায়ের নামে আছে।

মোদী কোম্পানীতে মিসেস মোদীর ছদ্মবেশে টাকা চুরি করেছিলে। তুমি কি ভেবেছিলে তোমার কৌশলটা কেউ ধরতে পারবে না। অনেক সস্তা গোয়েন্দা কাহিনী পড়েছ বোধহয়?

অরুণের দিকে তাকিয়ে দেখল সীমা। মুখে তার ব্যঙ্গের হাসি।

আমাকে বাড়ীতে নিয়ে এসে এভাবে অপমান করতে পারেন না আপনি।

অপমান তুমি নিজেকে যতটা করেছ, অত আর কেউ করে নি—আস্তে করে বলল অরুণ।

আমায় যে বাড়ীতে আটকে রেখেছেন, এটা বে-আইনী তা জানেন?

আমি ত তোমায় আটকাই নি।

তাহলে আমি যেতে পারি। উঠে দাঁড়াল সীমা।

পার, তবে তার আগে তোমার অ্যাটাচিকেসের চাবিটা দাও।

না, দেবো না। ওতে আমার ব্যবহারের কাপড় জামা আছে।

তা থাক, আমি তোমার কাপড়-জামা চাই না, টাকাটা দরকার। তুমি বলেছ, ওতে পাঁচ হাজার টাকা আছে, সেটাই আমি দেখতে চাই, তোমার পোশাক নয়।

আরও বেশী টাকা আছে। আস্তে বলল সীমা।

জীবনে তুমি কটা সত্যি কথা বলেছ? মিথ্যে ছাড়া অন্য কিছুই জান না বোধহয়। পুলিশের কথা বললে তুমি ভয় পাও না, এ-রকম একটা ভাব দেখাও, কিন্তু কথা বার করার জন্য অনেক রকম উপায় ব্যবহার করা হয়, তা জান?

অত্যাচারের কথা বলছেন? অনেক অত্যাচার আমি সহ্য করেছি।

সেটা বোধহয় অল্প বয়সে হয়ে থাকবে। আর তার জন্যেই যে তোমার মনটা এরকম বিকৃত হয়েছে এটা বেশ বোঝা যায়।

আমি কোলরিজ কোম্পানীর টাকা ফেরত দিয়ে দিচ্ছি, আমায় যেতে দিন।

কোথায় যাবে? আর একটা নাম নিয়ে আবার টাকা সরাবে এইত?

তাই যদি হয়, সেটা আমার ব্যাপার, তাতে আপনার কথা বলার কিছুই নেই।

আছে; সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমার কর্তব্য আছে। জেনে শুনে একজন চোরকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না।

ভাল কথা, তাহলে পুলিশে হ্যান্ডওভার করুন।

জেলে যাবার খুব সখ হয়েছে? ছোটবেলার অত্যাচারের জন্য যে চোর হয়, জেলের কষ্টে সে কি হবে?

আপনি আমার অভিভাবক নন, অযথা উপদেশ দেবার চেষ্টা করবেন না, কি করতে চান আপনি?

আই উইল টেক দি ল ইন্ মাই ওন হ্যান্ডস্। আমি পুলিশের সাহায্য চাই না, নিজেই ব্যবস্থা করছি। অ্যাটাচিকেস নিয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে দরজাটা লক করে দিল অরুণ।

হঠাৎ যেন হতভম্ব হয়ে গেল সীমা তার ব্যবহারে। অরুণ নিজের বাড়ীতে তাকে তুলে এভাবে যে একটা ঘরে চাবি বন্ধ করে রাখবে এটা নেহাতই আজগুবি আর অবিশ্বাস্য মনে হ'ল সীমার কাছে। ঘরের চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখল সীমা। মাঝারি ধরনের ঘর, সৌখীন আসবাবপত্রে ভর্তি। পাশে আর একটা দরজা দেখতে পেল সে। হাতল ঘোরাতে দরজাটা খুলে গেল—একটা বাথরুম। মাথাটা জ্বালা করছে সীমার। মুখে হাতে জল দিয়ে মুখটা মুছল সে। অনেকটা আরাম পেল। ঘুরে এসে বাইরের দরজাটা দু-একবার টেনে দেখল। সেটা চাবিবন্ধ বলেই মনে হ'ল। এবার একটা চেয়ারে গিয়ে বসল সে।

ধরা পড়ে গেল সীমা। কিন্তু এভাবে যে ধরা পড়বে সেটা আশা করে নি। পুলিশ তাকে ধরবে, সে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে, কেস হবে এবং হয়ত শাস্তি পাবে, এটাই সে ভেবে রেখেছিল। মাঝ থেকে অরুণ বসু তাকে ধরে তার বাড়ীতে কয়েদ করে রাখল কেন? কিন্তু গতকালই সে অরুণ আর তার বাবার মুখে অরুণের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাবটা শুনেছে। তাই যদি হয়, তার ওপর যদি অরুণের এতটুকু মমতা থাকে, তাহলে তাকে এভাবে বন্দী করে রাখল কেন? তাছাড়া একটা চোরকে জেনেশুনে অরুণ বিয়ে করতেই বা এত ব্যগ্র কেন? তার দিক থেকে এ পর্যন্ত সে কোন লোককেই প্রশ্রয় দেয় নি বলে সে জানে। অরুণ তাহলে কি চায়? সীমার ভয় করছে। এরকম পরিস্থিতিতে সে কখনও পড়ে নি। একবার ভাবল, খুব জোরে চীৎকার করলে হয়ত কেউ সাহায্য করতে আসতে পারে। কিন্তু তাতেই বা কি সুবিধে হবে? আশেপাশে ভিড় হবে এবং শেষ পর্যন্ত সেই পুলিশ! পুলিশ, থানা বা জেল সম্বন্ধে তার কোন অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু সেটা যে খুব প্রীতিজনক ব্যবস্থা নয়, সেটা বুঝতে সীমার কষ্ট হয় নি। এখন সে কি করবে! অরুণ সেন্টিমেন্টের কথা উল্লেখ করেছে আবার অত্যাচারেরও ভয় দেখিয়েছে। অনেক অত্যাচার সে সহ্য করেছে। এই প্রাসাদে বসে অরুণ বসু তার কি খবর রাখবে?......

নানুবাবু তোর কে হয় রে? জিজ্ঞাসা করল লতা ভাল মানুষের মত।

আমার কাকা হয়। উত্তর দেয় সীমা।

কি রকম কাকা ভাই, নিজের কাকা?

না, বাবার বন্ধু।

তাহলে তোদের বাড়ীতে থাকে কেন দিন-রাত?

বেশ করে থাকে, তাতে তোদের কি?

ঠিক বলেছিস, আমাদের তাতে কিছু নয়। কিন্তু তোর মত ছোটলোকের ঘরের মেয়ের সঙ্গে আমরা পড়ব কেন?

পড়তে হবে না।

আমরা ঠিকই পড়ব, তবে তোকে তাড়াব স্কুল থেকে। মাদারকে বলব একটা বেশ্যার মেয়ের সঙ্গে আমরা পড়ব না।

কি বললি? চীৎকার করে উঠল সীমা।

শুনতে পাস নি? বললাম, বেশ্যার মেয়ে তুই।

ঝাঁপিয়ে পড়ল সীমা লতার ওপর। তাই চাইছিল ওরা। দুজন ওর দুটো হাত বাঁকিয়ে পিছন দিকে ধরল। একজন তার মাথার চুলগুলো মুঠো করে টেনে রইল পিছন দিকে। আর লতা তার মুখে চড় মারতে লাগল সজোরে। একটা দুটো নয়, অনেকগুলো। ঠোঁট কেটে আর নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল সীমার।......

কে, চমকে উঠেছে সীমা।

দরজা খুলে অরুণ ঘরে ঢুকে সামনের চেয়ারে বসল।

আমায় ছেড়ে দিন। সীমার স্বরে মিনতি।

দেবো, তোমাকে আটকে রাখতে আমি চাই না। কিন্তু তুমি আমায় বল, স্বাভাবিক মেয়ের মত তুমি ভাবতে শেখোনি কেন?

তার মানে বিয়ে করে সংসার করার কথা বলছেন? সীমা তাকাল অরুণের দিকে; আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?

কেন? প্রশ্ন করল অরুণ।

একটা মিথ্যেবাদী চোরকে কে বিয়ে করবে?

যদি কেউ করে। আস্তে কথা উচ্চারণ করল অরুণ।

তাহলে বুঝব তার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে।

আমি তোমায় বিয়ে করতে রাজী আছি।

ধন্যবাদ, আমি রাজী নই।

তার কারণ কি?

তার কারণ, বলল সীমা, বিয়ে বলে বস্তুটাকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। আর তাছাড়া আপনি দয়া করে বিয়ে করতে রাজী হলেও আমি রাজী হব

জন্য? আপনার উদারতার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

তাহ'লে তুমি, আর কাউকে পছন্দ কর।

না, আমি কাউকেই পছন্দ করি না।

তবে তুমি কি পুরুষদের ঘৃণা কর?

বলতে পারেন। অরুণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। মনে মনে কি যেন চিন্তা করল, তারপর বলল,

আমি ছেড়ে দিলেও সৌম্য দত্ত তোমায় কিন্তু ছাড়বে না।

আপনি কি করে জানলেন? চমকে উঠেছে সীমা নামটা শুনে।

জানি; আরও জানি তোমার ফ্ল্যাটের ওপর পুলিশ নজর রেখেছে। তুমি যে আমার সংগে বাবার কাছে গিয়েছিলে এমন কি তুমি যে এখন এখানে আছ তাও পুলিশ জানে বলেই আমার মনে হয়।

চুপ করে রইল সীমা। ভাবতে লাগল এখন সে কি করবে, কি উপায়ে এতগুলো বিপদ এড়িয়ে যাবে।

তুমি হয়ত ভাবছ, আমি তোমায় মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছি। কিন্তু তা নয়, বলল অরুণ। কোলরিজ কোম্পানী থেকে চলে আসার পরও আমি তোমার খোঁজ পেয়েছি।

তার মানে আপনি কি বরাবরই আমার ওপর নজর রেখেছেন?

হ্যাঁ রেখেছি, তা না হলে মোদী অনেকদিন আগেই তোমায় ধরিয়ে দিতে পারত।

আপনি তাকে বাধা দিলেন কিভাবে?

সেটা তোমায় আমি বলব না। তবে এইটুকু জেনে রাখ, আমি মোদীর হাত থেকে তোমাকে উপস্থিত বাঁচাতে পেরেছি।

বাঁচিয়েছেন না জিইয়ে রেখেছেন; আপনার নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আপনি আমাকে সাময়িক রক্ষা করেছেন মাত্র।

তুমি নিজেকে ওইভাবে দেখতে অভ্যস্ত বলে সেইটেই মনে হচ্ছে তোমার কাছে।

আমার আরও একটা কথা মনে হচ্ছে, বলল সীমা।

বল, কি?

আমি ছাড়া আরও অনেক সুন্দরী মেয়ের সংস্পর্শে আপনি নিশ্চয় এসেছেন।

হ্যাঁ, তা এসেছি।

তবে তাদের মধ্যে একজনকে পছন্দ না করে আপনি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব করছেন কেন?

তা বলতে পারব না ঠিক, হয়ত ভালবেসে ফেলেছি।

জেনেশুনে কোন চোর মেয়েকে কেউ ভালবাসতে পারে, এটা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

তাহ'লে আমি তোমারই মত নিশ্চয় অস্বাভাবিক। তাই হয়ত তোমায় ভাল লেগে থাকবে। সে যাক্ তুমি ভালভাবে ভেবে দেখ আমায় বিয়ে করতে তোমার আপত্তি আছে কিনা। আমি তোমায় জোর করব না।

জোর করতে বাকীটা কি রাখলেন? ভয় দেখিয়ে বাড়ীতে আটকে রেখেছেন আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে। এর চেয়ে আর কি করবেন?

তুমি আমায় ভুল বুঝেছ। সৌম্য দত্ত আর আমার উদ্দেশ্য তোমার কাছে একই ঠেকছে হয়ত। কিন্তু যদি ভাল করে ভেবে দেখ তাহ'লে বুঝতে পারবে আমাদের মধ্যে একটু তফাৎ আছে। মানুষ হিসেবে বলছি না। তোমাকে পেতে হলে সৌম্য দত্ত বিয়ের প্রস্তাব নিশ্চয় করবে না। তার মানে আমি যে সৌম্য দত্তের চেয়ে উদার তা বলছি না। তবে আমার পন্থাটা আর যাই হোক ভদ্র বলে তুমি মেনে নিতে পার।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবল সীমা। তারপর বলল—আপনি কিন্তু আগুন নিয়ে খেলা করছেন। এতে আপনার অনেক ক্ষতি হতে পারে। সামাজিক বা বংশ মর্যাদা আমার নেই সেকথা জানেন, তাছাড়া আমি বিয়ে করলেই যে আমার স্বভাব পালটে যাবে তাই বা আপনি ভেবে নিলেন কি করে?

সেকথা আমি ভাবি নি। তবে বিয়ের পর আমার টাকা বা সম্পত্তি আলাদা নিশ্চয় থাকবে না। তাতে তোমারও সম্পূর্ণ অধিকার আসবে। সে হিসেবে তুমি কষ্ট করে পরের টাকা নেবার মত ঝুঁকি নেবে না বলেই আমি আশা করছি।

বেশ আমি রাজী, তবে আমার দুটো সর্ত আছে।

বল।

প্রথম আমার কুকুর বক্সার আমার সংগে থাকবে।

কোন আপত্তি নেই, আমি নিজেই কুকুর ভালবাসি।

দ্বিতীয় আমি আলাদা ঘরে থাকব।

এটা ঠিক বুঝলাম না। বলল অরুণ। স্বামী-স্ত্রী আলাদা ঘরে থাকবে এটা শুধু অস্বাভাবিক নয়, অসঙ্গত আর অন্যায়। স্বামী-স্ত্রী এক সংগে সংসার চালাবে, ভালবাসবে, সমস্যার সমাধান করবে, সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেবে। এটাই চিরন্তন সত্য। এটা তুমি বা আমি রদবদল করতে পারি না। তাছাড়া বাবা আছেন। তিনি যদি একথা জানতে পারেন, তাহ'লে দুঃখিত হবেন। আমি বাবাকে দুঃখ দিতে পারব না।

বাবাকে দুঃখ দিতে পারব না।...... সীমার মনে পড়ল সেও এই কথাটা ভেবেছে অনেকবার।......

উনুনে ভাত চাপিয়েছিলুম, দেখিস কি কেন? পুড়ে যে ছাই হয়ে গেছে।

সীমা পড়ছে, সামনেই তার পরীক্ষা। মা এসে দাঁড়াল তার সামনে।

আমি জানব কি করে? মুখ না তুলেই বলল সীমা।

আহা নেকি, কিছুই জানে না রে! গিলতে জান ত? মুখভঙ্গি করল মা।

ও যে মেয়েদের স্কুলে পড়ছে, নান্‌কাকা লুঙ্গি পরে পাশের ঘর থেকে এসে দাঁড়াল, ওকি ভাত রাঁধতে পারে? ওর বাবা যে ওকে মেমসাহেব বানাবে।

হ্যাঁ, বানাচ্ছি মেমসাহেব।

মা তেড়ে এসে খাতা বই ছত্রাকারে উঠানে ফেলে দিয়ে তার চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করাল। তারপর এলোপাথাড়ি মারতে শুরু করল।

থাক থাক, আর মেরে কি হবে, ও গোল্লায় গেছে। যত বড় হচ্ছে ততই বদমাইশ হচ্ছে।

মায়ের দম ফুরিয়েছিল তাই মারটা সেবারের মত বন্ধ হল। কাঁদল না সীমা। এটা তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কপালটা বড় জ্বালা করছে তার। আরশিতে সে দেখল ভ্রূর কাছে কেটে গিয়েছে একটু। উঠান থেকে বই খাতা তুলে এনে মুছে রেখে দিল আবার।

কি হয়েছে? কপাল কাটল কি করে? বাবা এসে জিজ্ঞেস করল ব্যস্ত হয়ে!

স্কুলে খেলতে গিয়ে পড়ে গেছি, উত্তর দিল সীমা।

কাছে এস; বাবা ওষুধ লাগিয়ে বলল—বড় হচ্ছ, একটু সাবধানে থাকবে, কেমন।

কারণটা বলল না সীমা, তাহলে বাবা দুঃখ পাবে...।

কি ভাবছ? অরুণ তাকিয়ে আছে তার দিকে। কোন জবাব দেবার আগেই পরিচিত গলার ডাক শুনতে পাওয়া গেল।

কে? অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল সীমা।

বাবা এসেছেন।

তাহ'লে আমি কি করব?

নীচে গিয়ে বাবাকে নিয়ে এস।

কিন্তু উনি কি ভাববেন?

কিছু ভাববেন না, তুমি স্বচ্ছন্দে যেতে পার।

সীমা নীচে নেমে গেল। অসিতবাবুর সামনে সে আড়ষ্ট হয়ে পড়ল আজ।

এস মা, বললেন অসিতবাবু, গাড়ীতে আসতে আসতে তোমার কথাই ভেবেছি শুধু। কলকাতায় এলে আমি কি রকম হাঁপিয়ে উঠি, টানটাও বেড়ে যায়। জান মা বুড়ো হলে মানুষ স্বার্থপর হয়ে ওঠে। তাই ভাবছিলাম, হারু ত কিছু পারবে না, আমায় দেখবে কে?

(ক্রমশঃ)

এনড্রুজ বাংলা ও বাঙালী

হেমচন্দ্র ঘোষ

কেম্ব্রিজ। বরফ পড়া শীতের দিন। প্রচণ্ড তুষারপাতের তীব্র আক্রমণে গাছগুলো সব আধমরা দাঁড়িয়ে আছে তারা শুধু বাঁচার তাগিদে।

রাজপথ প্রায় জনশূন্য। বরফ ঠেলে দু'একজন শুধু যাতায়াত করছে। রাস্তার ধারের ছোট ছোট সবুজ লনগুলো বরফের চাদরে মোড়া। জল-ভরা টলটলে খণ্ড মেঘের ফাঁকে ফাঁকে প্রভাতী সূর্যের নিস্তেজ কিরণটুকু শুধু পথ দেখিয়ে দেয়।

—হ্যালো! এনড্রুজ!

কপাল পর্যন্ত নামানো টুপিটা একটু উঁচু করে এনড্রুজ বললেন—হ্যালো - এখানে যে?

আগন্তুক এনড্রুজের ডান হাতটা চেপে ধরে বললেন— এখানে এসেছি তোমায় অভিনন্দন জানাতে!

বিস্মিত এনড্রুজ বন্ধুর মুখের দিকে তাকালেন - দৃষ্টি অতি শান্ত—সমস্ত মুখখানা হাস্য বিচ্ছুরিত।

—কিসের অভিনন্দন, বন্ধু?

—কেন!

ইউনিভার্সিটির দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললেন—এই বিশ্ববিদ্যালয়—কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির ফেলো হওয়া কি যে সে কথা!

এনড্রুজ হেসে উঠলেন।

—কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি আমার প্রাণ আমার আত্মা (লাইফ অ্যাণ্ড সোল) কিন্তু এর ফেলোশিপ কখনই আমার জীবনের পাথেয় হতে পারে না বন্ধু!

—অ্যা! কি বললে এনড্রুজ! কেম্ব্রিজের ফেলোশিপ তোমার কাছে কিছু না—নগণ্য-তুচ্ছ!

বন্ধুর গলাটা ভারী হয়ে উঠলো। তার সমস্ত মুখখানা বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠেছে।

—আমি তো বলেছি বন্ধু! কেম্ব্রিজ আমার জীবনের চেয়ে প্রিয়। কিন্তু এর ফেলোশিপ আমার জীবনে কখন কোন দিনই আদর্শগত পূর্ণতা আনতে পারবে না! তাই বন্ধু!—একটু হেসে এনড্রুজ বললেন—ফেলোশিপটা প্রত্যাখ্যান করলাম। বিস্মিত বন্ধু এনড্রুজের মুখের দিকে তাকালেন।

—এত বড় সম্মান—রাজা-রাজড়ারাও যার জন্যে প্রলুব্ধ সেই সম্মান তুমি প্রত্যাখ্যান করলে! এই দুঃসাহসের জন্যে তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি—এনড্রুজ!

এনড্রুজ বন্ধুর দিকে তাকালেন—তাঁর মুখখানা আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠেছে।

এদেশে চলেছে তখন ইংরেজের শাসন। চন্দ্র-সূর্য থাকতে ভারতে তাদের শাসন নাকি অক্ষুণ্ণ থাকবে। বিশ্বের এমন কোন শক্তি নেই যে এই পাকা গদীটা নড়াতে পারবে—তাদের রাজত্বের বিনাশ নেই। এখন প্রয়োজন শুধু সাংস্কৃতিক অভিযান যার সাফল্যের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পাদ্রীরা তাঁদের ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। গ্রামের শ্যামল শীতল ছায়ায় হাটে-বাজারে চললো প্রভু যিশুখৃষ্টের মহিমা কীর্তন। গ্রামে, গঞ্জে গড়ে উঠলো উপাসনাগার—গীর্জা। অশিক্ষিত গ্রামের মানুষ প্রলুব্ধ মন নিয়ে পাদ্রী সাহেবের কাছে আত্মসমর্পণ সুরু করেছিল। বাংলাদেশে পাদ্রী সাহেবদের সাফল্যের চিত্র এখনও অম্লান আছে। ইংরেজের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা: বিলিতী কৃষ্টি ও সাহিত্য ভারতীয় জনজীবনে অনুপ্রবেশ করিয়ে তাদের মোহাবিষ্ট করে রাখা।

ভারত হবে নির্বীর্য—ভারত হয়ে থাকবে তাদের ক্রীতদাস। 'রুল ব্রিটেনিয়া' হবে জাতীয় সঙ্গীত।

১৮৩৫ খৃঃ। বেণ্টিঙ্ক বড়লাট—মেকলে ল' মেম্বার।

ইংরেজী শিক্ষাই যখন সভ্যতার মাপকাঠি তখন সব কিছু ইংরেজী এদেশে চালু করার দরকার। পেনাল কোড চালু হল। হেললে দুললে সামনে ঝুঁকলে পিনাল কোডের একটা না একটা ধারায় অভিযুক্ত হতে হবে। এখন শিক্ষার মাধ্যম ঠিক করার ভার পড়লো মেকলের ওপর।

মেকলের কথা: এদেশের সাহিত্য এদের কি কোন মূল্য আছে? যা আছে ইউরোপের যে কোন লাইব্রেরীর একটা বুক শেলফে ভরে যায়।

(এ সিঙ্গল শেলফ অফ এ গুড ইউরোপীয়ান লাইব্রেরী ওয়াজ ওয়ার্থ দি হোল নেটিভ লিটারেচর অফ ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড আরাবিয়া) এদেশের শিক্ষা-দীক্ষা মেকলে ঘৃণার চোখে দেখেছিল।

মেকলের ডিক্টাম: ইংরিজী হবে শিক্ষার মাধ্যম। দেশে কোন প্রতিবাদ, প্রতিরোধ নেই। অবাধে ইংরেজী চালু হয়ে গেল।

পরবর্তীকালে মাইকেলের আক্ষেপ লোকের মনে কিছুটা পরিবর্তন এনেছিল।

—হে বঙ্গ
ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন—
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি।
পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপখনি পূর্ণ মণিজালে।

বিদ্যাসাগর মশাই, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীরা তখন মাতৃভাষার চর্চা সুরু করে দিয়েছেন।

সরকারী হুকুমে: সহরে সহরে ইংরিজী পাঠশালা গড়ে উঠলো। মিঃ স্টেভর বারাসাতে একটা ইংরিজী পাঠশালা স্থাপন করলেন। ইংরিজী শিক্ষার স্বীকৃতি এযুগেও চলছে।

কার্জনী আমল।

১৯০৪ খৃঃ ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট। বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিল। বাংলাদেশে ইউনিভার্সিটির যেটুকু ক্ষমতা ছিল সরকার সবটাই কুক্ষিগত করে নিলেন। ইংরিজী শিক্ষা অপ্রতিহতভাবে চলতে লাগলো।

এনড্রুজ তখন এদেশে। সুনির্মল নীল আকাশের নীচে খুঁজে পেলেন তিনি নতুন দেশ। গঙ্গার শীতল তরঙ্গ তাঁর বিদগ্ধ মনটাতে শান্তির নীড় গড়ে তুললো। ভুলে গেলেন সেই বরফপড়া দেশের কথা—ভুলে গেলেন [illegible] আড়ম্বর সভ্যতা। [illegible] নির্মম স্বার্থ- [illegible] মনটাকে [illegible] করে তুললো। এনড্রুজ এখন

পুরোপুরি ইণ্ডিয়ান—ভারতবাসী। অভ্রভেদী হিমালয়ের বাদল-ঝরা শিখরের দিকে তিনি বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন—নীচে সমুদ্র মেখলার গুরু গর্জন তাঁকে অভিভূত করে। শ্যামল প্রান্তরে রাখালের বাঁশি তাঁর মুগ্ধ মনটিকে উল্লসিত করে তোলে।

উত্তরায়ণ। গোধূলির আমতলা। রাঙা-মাটির লাল সূর্যের সোনালি কিরণে আরও রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে।

এনড্রুজ চলেছেন এক মনে।

একদল পাহাড়ী মেয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো।

—সাহেব, কোথায় যাচ্ছিস রে?

এনড্রুজ তাদের মুখের দিকে তাকালেন।

নিকষ পাথরে স্বাস্থ্যবতী মেয়েগুলোর সরল হাসি নিষ্পাপ মমতামাখা।

—ওদিকে যাসনে সাহেব!—ভাল হবে না।

—কেন?

—ওদিকে গেলেই তোরে গিলে খাবে।

একটি মেয়ে হাত নেড়ে বললো—এই এতো বড় জন্তু!

এদেশে বিশেষতঃ বাংলায় তখন রাজনৈতিক চাঞ্চল্য প্রকট হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ কোন আন্দোলনই সহ্য করতে রাজী নয়। আফগানিস্থানের সঙ্গে রাশিয়ার মিতালি কার্জনের কাছে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল। ভারতে আন্দোলনের মূল উৎস ছিল বাংলায়। বাংলাকে দমন করা অপরিহার্য হয়ে উঠলো। বাংলা হলো দ্বিধাবিভক্ত। আন্দোলন প্রশমিত তো হলই না বরং উত্তরোত্তর গুরুতর আকার ধারণ কোরলো। কার্জনকে ভারত ছাড়তে হল। কার্জনী আমলের যতকিছু অপকর্মের দায়িত্ব পড়লো মিন্টোর ওপর। কংগ্রেস তখন ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে [illegible] ইয়ংবেঙ্গল কেশব সেনের হস্তচু[illegible] ভিক্টোরিয়া গ্লাডস্টোন কেশব সেনকে বিলেতে ডেকে সাদর সম্বর্ধনা জানিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবন বাংলার জনগণের মন হতে চিরতরে বিলীন করে দিল। ইয়ংবেঙ্গল পরমহংস দেব ও স্বামীজীর আদর্শে সংগ্রামী হয়ে উঠলো।

সুরাটে কংগ্রেস।

কংগ্রেসের কর্ণধার গোখলে। বিপিন পাল, অমৃতবাজারের সম্পাদক মতিলাল তাঁর বিরুদ্ধবাদী। ইংরেজের সাহায্যে গোখলে হলেন বিজয়ী। দেশের অস্থির রাজনৈতিক আবহাওয়া সত্ত্বেও এনড্রুজ সংকল্পচ্যুত হলেন না। ইংরিজী শাসনের বর্বরতা তাঁর মনটাকে বিক্ষুব্ধ করে তুললো। ভারত সরকারকে চিঠি দিলেন ১৯০৮ খৃঃ ১ মার্চ।

—ইংরেজীকে এতখানি প্রাধান্য দেওয়াটা আমাদের (ব্রিটীশ) দায়িত্বহীনতা প্রকাশ পেয়েছে। ফলে ধর্মান্ধতাটাই প্রকট হয়ে উঠবে। যাঁরা গ্রাজুয়েট তাঁদের বোঝাতে হবে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা আর ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য সম সমাদরের পর্যায়ভুক্ত। যাঁরা বাংলার অধিবাসীদের জানেন তাঁরা নিশ্চয়ই বলবেন—বাঙালী এক অসাধারণ অদ্ভুত জাত (ওয়ানডারফুল নেশান) এদের প্রখর বুদ্ধি, এদের নিষ্কলুষ স্বদেশ প্রেম একদিন জাতীয় জীবনে শ্রেষ্ঠত্বের মহান গৌরব এনে দেবে। এরাই হবে ভারতের পথিকৃৎ।

এনড্রুজ কার্জনকে ক্ষমা করেন নি। কার্জনের অদূরদর্শিতা দেশে যে অমঙ্গল সৃষ্টি করেছিল সে কথা এনড্রুজ জানিয়ে দিলেন। তিনি লিখলেন : কার্জনের ভুল পদে পদে। এই সব ভুল সীমাহীন। বাঙালীদের তিনি দেখতে পারতেন না। বাংলার প্রোজ্জ্বল চিন্তাধারা কার্জনের নিদ্রালু চোখের পাতার ওপর দিয়ে ভেসে চলে গেছে। তাঁর 'জনডিস্' চোখের পাতা বাংলার মহান কর্মপন্থার উদ্যোগ যবনিকার অন্ধকারে ঢেকে রেখেছিলো।

এনড্রুজ চেয়েছিলেন শিক্ষিত বাঙালী-সমাজের সক্রিয় সাহচর্য।

তিনি লিখলেন : বঙ্গ বিভাগ একটা মারাত্মক ভুল। বাংলার সাহিত্য বাংলার কৃষ্টি শাসকগোষ্ঠীর অবহেলায় শাসনের ভিত্তি একদিন বিধ্বংস হয়ে যাবে। মাতৃ-ভাষার অনুশীলনই জাতীয় সঞ্জীবনী মহৌষধ। পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতের জাতীয় ভাষাকে যাতে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে তার জন্যে সরকারের সচেষ্ট হওয়া উচিত। পূর্ব গগনে উদ্ভাসিত হবে পশ্চিমের রূপরেখা।

জাপান এক সময়ে বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। তার সীমাবদ্ধ অবস্থান থেকে মুক্ত হয়ে জাপান এখন এক মহান শক্তি-শালী জাতিতে পরিণত হয়েছে।

ইংরেজ এনড্রুজের কথা মেনে নেয় নি।

সেটা এক শীতের দিন। কলেজ স্কোয়ার। গোলদীঘির পূবে বড় বড় বাড়ী-গুলোর মাথা টোপকে প্রভাতী সূর্যের রশ্মি বিচ্ছিন্ন কিরণ বিরাট থামওলা হলটার গায়ে ছিটকে পড়ছে। কুয়াশার কাঁদুনে জল আড়ষ্ট পাতার ডগা হতে তখনও ঝরে পড়ছে।

শীতের অসুবিধে উপেক্ষা করে এনড্রুজ দাঁড়ালেন।

পাশে বিদ্যাসাগর মশায়ের মূর্তি।

—হ্যালো এনড্রুজ!

এনড্রুজ চোখ ফেরালেন, ত্বরিতপদে কাছে গিয়ে ভদ্রলোকটির হাতটা টেনে নিয়ে বললেন— হ্যালো - হ্যালো!

—ইউনিভার্সিটির দিকে কি দেখছিলে, এনড্রুজ? এনড্রুজ একটু হাসলেন।

—দেখছিলাম এই বিরাট অট্টালিকার পদপ্রান্তে এদেশে কতগুলো মনীষীর সৃষ্টি হয়েছে। ডঃ রায়—ইঙ্গিতে সেনেট হল দেখিয়ে এনড্রুজ বললেন, এটা কি তোমার আলমামেটার!

—এনড্রুজ!

প্রফুল্লচন্দ্রের গলাটা ভারী হয়ে উঠলো।

—কলকাতা ইউনিভার্সিটি আমার হৃদয়-আমার গর্ব। এডিনবরা—হ্যাঁ—এডিনবরাকেও আমি প্রণাম করি।

এনড্রুজ প্রফুল্লচন্দ্রের হাতটা একটু নেড়ে দিয়ে বললেন, রায় তুমি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যোগসূত্র।

ডঃ রায় একটু হাসলেন।

—আমি কলকাতা ইউনিভার্সিটির এক নগন্য ছাত্র!

—না-না-রায় ও কথা বোলো না। কলকাতা ইউনিভার্সিটি শুধু ভারতের নয়—এটা বাঙালী জাতির ইউনিভার্সিটি। (ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইজ নট্ অনলি দি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ ইণ্ডিয়া—ইট ইজ অলসো দি ইউনিভার্সিটি অফ্ দি বেঙ্গলী নেশান)

ডঃ রায় এনড্রুজের মুখের দিকে তাকালেন।

—ডঃ রায়! আমি লক্ষ্য করেছি বাঙালী ছেলে যেখানে থাকুক না কেন—দূরে দেশান্তরে তার দেশের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা সব সময়ে অব্যাহত থাকে! বাংলার সুললিত গান ভুলিয়ে দেয় দারিদ্র্যের নিপীড়ন। আজ বজ্রকঠোর হৃদয়ে বাঙালী ছেলে এগিয়ে চলেছে স্বাধীনতার পুণ্য-সংগ্রামে।

ডঃ রায়! বাঙালী সত্যি একটা জাতি—সে বিদ্যাবত্তায় পূর্ণতা লাভ করেছে।

ডঃ রায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন—এনড্রুজ, তুমি মানুষ নও—তুমি দেবতা! তুমি দীনের বন্ধু!

ইউনিভার্সিটির দিকে যোড় হাতে প্রণাম করে বললেন—বাগ্‌দেবীর পীঠস্থান! তোমায় প্রণাম জানাই।

দ্বিতীয় পর্ব

দিগ্বিজয়ের পথে জার্মানী

একাদশ অধ্যায়

বৃটেনের যুদ্ধ :

একক আত্মরক্ষার অপূর্ব দৃষ্টান্ত

ফ্রান্সের পতনের পর হিটলারের জার্মানী আনন্দে আত্মহারা হইল এবং বার্লিনের পথে পথে যুদ্ধোন্মাদ নর-নারীর নূতন রণসঙ্গীত শুনা গেল। এবার হিটলার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন এবং বৃটিশ জাতিকে নতজানু করিয়া সারা ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা সাজিয়া বসিবেন—এই ছিল নাৎসী পার্টি ও তার ভক্তদের আশা। সুতরাং যুবকদের কণ্ঠে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে নূতন যুদ্ধের গান 'We Sail against England ধ্বনিত হইল :

Our flag waves as we
march along,
It is a symbol of the Power
of our Reich.
And we can no longer endure,
That the Englishman should
laugh at it,
So give me thy hand, thy
fair white hand,
Ere we sail eway to conquer
Eng-e-land!

বলা বাহুল্য যে, এই ধরনের যুদ্ধের গান আরও শুনা গেল, যেমন :

We challenge the lion of England
For the last and decisive cup,
We judge and say
An Empire breaks up.....
Listen to the engine singing—
Get on to the foe!
Listen, in your ears it's ringing—
Get on to the foe!
Bombs, oh Bombs, oh Bombs
On England!

এখানে উদ্ধৃত শেষ গানটির শেষ লাইন লক্ষ্য করার মত। কারণ, ইতিহাসে 'Battle of Britain' নামে যে-যুদ্ধ প্রসিদ্ধ, তার মূল কথা ছিল বৃটেনের বিরুদ্ধে জার্মান বিমানবহরের প্রচণ্ড আক্রমণ, অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন বোমাবর্ষণের দ্বারা ইংলণ্ডকে কাবু করা এবং তারপর নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর দ্বারা আক্রমণ। বোমাবর্ষণের উপর কিরূপ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল, তারই প্রমাণ গানের শেষ কলিতে 'বোমা' 'বোমা' বলিয়া চীৎকার।

কিন্তু এই বোমাবর্ষণের সাঙ্গীতিক চীৎকারের জবাবে ইংলণ্ডের কাছ থেকেও পাল্টা গান শুনা গেল এবং সেই গানে হিটলারের প্রতি দস্তুরমত চ্যালেঞ্জের সুর এবং অবজ্ঞামিশ্রিত বিদ্রূপও ধ্বনিত হইল :

Napolean tried. The Dutch were
on the way,
A Norman did it — and a Dane
or two,
Some Sailor king may follow one
fine day;
But not, I think, a low land-rat
like you!
— A. P. Herbert, Sept., 1940.

এই গানে হিটলারকে মাটির গর্তবাসী ঘৃণ্য ইঁদুর (বা মেটে ইঁদুর) বলিয়া গালাগালি দেওয়া হইয়াছে এবং পরিষ্কার বলা হইয়াছে—'ইংলণ্ড জয় করা তোমার মত মেটে ইঁদুরের কর্ম নয়!'

প্রকৃতপক্ষে হিটলারের ইংলণ্ড আক্রমণের অভিযান (১৯৪০) ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল এবং ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে বলা হয় যে, ১০৬৬ খৃষ্টাব্দের সেই দীর্ঘ বিস্মৃত নরম্যান বিজয়ের পর প্রায় হাজার বছরের মধ্যে আজ পর্যন্ত আর কোন দুঃসাহসী ইংলণ্ড জয় করিতে পারেন নাই। অবশ্য ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপসের অপরাজেয় 'আর্মাডা' ১২৮টি পালে খাটানো জাহাজ নিয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান করিয়াছিল। কিন্তু সেই বিখ্যাত আর্মাডার ৬৩ খানা জাহাজ বৃটিশ প্রতিরোধ ও ঝড়ের কবলে পড়িয়া ধ্বংস হইয়া গেল। অতএব ইংলণ্ড জয় আর হইল না। এমনকি, 'দিগ্বিজয়ী' নেপোলিয়নও চাহিয়াছিলেন ইংরাজের নৌ-দর্পকে চূর্ণ করিতে, কিন্তু 'সমুদ্রপীড়ার' অজুহাতে তিনি আর ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে গেলেন না কিম্বা ট্রাফালগার যুদ্ধের (১৮০৫ খৃঃ—যে নৌ-যুদ্ধে ইংলণ্ডের পক্ষ থেকে নেলসন বিজয়ীর মাল্য লাভ করিয়া ইতিহাসখ্যাত হইয়াছিলেন) পরাজয়েরও পুনরাবৃত্তি ঘটাইতে চাহিলেন না। (২) অবশ্য হিটলারও নকল নেপোলিয়নের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে চাহিয়াছিলেন, (বিশেষভাবে ১৯৪১ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণের দ্বারা) কিন্তু তাঁর সেই দুরাশা কিছুতেই পূর্ণ হইল না।

কিন্তু দুরাশা পূর্ণ না হইলেও ইংলণ্ড জয়ের জন্য তাঁর মনে মনে আশা ছিল অনেক দিন আগে থেকেই। অবশ্য সেই আশা একা হিটলারেরই ছিল না, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েও জার্মান জেনারেল স্টাফ ইংলণ্ড আক্রমণের জন্য কাগজেপত্রে একটা পরিকল্পনার কথা ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু 'অবাস্তব' জ্ঞানে সেটা শেষপর্যন্ত পরিত্যক্ত হইল। হিটলারের রণনৈতিক চিন্তা গোড়া থেকেই খুব উর্বর। সুতরাং পোল্যাণ্ড আক্রমণের পূর্বেই ১৯৩৯, ২৩শে মে হিটলার তাঁর প্রধান সেনাপতিগণের এক গুপ্ত বৈঠকে বলিলেন—

> England is the main driving force against Germany....our aim will always be to force Britain to her knees.

কিন্তু এই শত্রুকে কিভাবে নতজানু করা যাইতে পারে? হিটলার বিগত মহাযুদ্ধের কথা বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন—'যদি আমাদের আরও দুইটি ব্যাটলশিপ এবং আরও দুইটি ক্রুজার থাকিত, আর জুটল্যাণ্ডের যুদ্ধ যদি সকালে আরম্ভ হইত তাহলে বৃটিশ নৌবহর পরাজিত এবং ইংলণ্ড নতজানু হইত।'—এই নৌবহরের উপরেই বৃটেন নির্ভরশীল। অতএব ইংলণ্ড ও বেলজিয়ম দখল এবং ফ্রান্স পরাজিত হইলে পশ্চিম ফ্রান্সের উপকূল থেকে জার্মান বিমান ও নৌবহর ইংলণ্ডকে কাবু করিতে পারিবে। অবশ্য এই আলোচনা হিটলার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ ব্লকেড বা অবরোধের যুদ্ধের কথাই ভাবিয়াছিলেন। কারণ, 'বিদেশ থেকে আমদানি ছাড়া ইংলণ্ড বাঁচিতে পারে না।' কিন্তু পশ্চিম রণাঙ্গনে ফ্রান্সের ও মিত্রপক্ষের এত দ্রুত বিপর্যয় হিটলার যেন নিজেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। সুতরাং ডানকার্কের পর তাঁর মনে মনে আশা ছিল যে, ইংলণ্ড রণে ভঙ্গ দিয়া জার্মাণীর কাছে সন্ধি প্রার্থী হইবে। এমন কি, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে (যেমন, লীডেলহার্ট) চার্চিলকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্যই হিটলার ডানকার্ক থেকে বৃটিশ বাহিনীর এভাবে পরিত্রাণে কোন বাধা দেন নাই। কিন্তু চার্চিল অনমনীয় এবং অপরাজেয়।

The WAR — Loui's L Snyder U.S.A. 1960. 146 & 151
(মূল জার্মানী থেকে ইংরাজীতে অনূদিত)

(২) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃঃ ১৬৯

পশ্চিম রণাঙ্গণের সেই ঘোর দুর্দিনে ডানকার্ক থেকে পরিত্রাণের সন্ধিক্ষণে ৪ঠা জুন, ১৯৪০, তিনি কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন :

> "We shall fight on the beachers, we shall fight on landing grounds. We shall fight in the fields & in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender, and even if, which I do not for a moment believe, this Island or a large part of it were subjugated and starving, then our Empire beyond the seas armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle............".

তাঁর অনেক বক্তৃতার মত এটিও স্মরণীয় হইয়া আছে। কিন্তু কেবল বাগ্মীতার বাগাড়ম্বর নয়, তিনি ইংলণ্ডের প্রতিরক্ষার জন্য যথাসম্ভব সর্বাত্মক আয়োজন করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেদিনের বৃটেন ফ্রান্সের মত পরাজিতের মনোভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল না এবং জনগণের মধ্যে হিটলারের প্রতি কোন প্রীতিও ছিল না। চার্চিলের সন্দেহ ছিল না যে, ফ্রান্সের পতনের পর বৃটেনই হইবে হিটলারের প্রথম আঘাতের লক্ষ্য। অথচ তখন বৃটেন নিঃসঙ্গ, একাকী—হিংস্র ব্যাঘ্রের সামনে প্রায় নিরস্ত্র পথিকের মত। কিন্তু চার্চিল দমিলেন না, ভীত হইলেন না, ইতস্ততঃ করিলেন না। ১৮ই জুন (১৯৪০) তারিখ তিনি জাতির উদ্দেশ্যে এক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন জার্মাণীর আসন্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং সেই বক্তৃতার উপসংহারে বলিলেন :

> Let us therefore brace ourselves to our duties and so bear ourselves that, if the British Empire and its Commonwealth last for a thousand years, men will still say: "This was their finest hour".

জার্মানীর ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রমণ

ব্রিটিশ নৌবহর কর্তৃক মাইন স্থাপন/৮-এপ্রিল
জার্মান নৌবাহিনীর অবতরণ ও আক্রমণ ৯এপ্রিল
জার্মান ছত্রীসৈন্যের অবতরণ
বিমানঘাঁটি

এপ্রিল ৯, ১৯৪০ জার্মানী কর্তৃক নরওয়ে ও ডেনমার্ক আক্রমণ

অবশ্য বৃটিশ সাম্রাজ্য হাজার বছর টিকে নাই, টিকিতে পারিত না, তবু একথা সত্য যে, সেদিনের জার্মানীর বিরুদ্ধে বৃটেনের একাকী আত্মরক্ষার সংগ্রাম সত্যি ইংরাজ জাতির পক্ষে সবচেয়ে চমৎকার দিন বা গৌরবের দিন ছিল।

এই আত্মরক্ষার সংগ্রামের জন্য তাঁর স্বভাবতঃই প্রথমে মনে পড়িয়াছিল নৌবল ও নৌবহরের কথা এবং সেই প্রসঙ্গে পরাজিত ফ্রান্সের নৌবহরের প্রশ্ন। বৃটিশ বন্দরে যে সমস্ত ফরাসী জাহাজ ছিল সেগুলি নিয়া কোন সমস্যা দেখা দিল না। ৩রা জুলাই, ১৯৪০, সেই জাহাজগুলি বৃটেন বিনা রক্তপাতেই দখল করিয়া নিল। ফরাসী লস্করেরা রয়েল নেভীতে গিয়া স্বেচ্ছায় যোগ দিলেন, কিম্বা জেনারেল দ্য গলের (যিনি ফ্রান্স থেকে পলাইয়া লণ্ডনে চলিয়া আসিয়াছিলেন) ফ্রী ফ্রেঞ্চ ইউনিট গঠন করিলেন এবং বাকী অন্যান্যরা স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। আলেকজেন্দ্রিয়া (মিশরে) বন্দরের জাহাজগুলি নিয়া অনুরূপভাবে কোন সমস্যা দেখা দিল না। কিন্তু গোল বাঁধিল ফরাসী উত্তর আফ্রিকার আলজেরিয়া-স্থিত ওরাণ বন্দরের জাহাজগুলি নিয়া। ফরাসী নৌবহরের অধিকাংশ যুদ্ধ জাহাজেই

মোতয় করিয়াছিল ওই বন্দরের অদূরে। সেখানকার ফরাসী নৌ-অফিসারেরা বৃটেনের হাতে কোন জাহাজ অর্পণ আত্মসম্মানের বিরোধী বলিয়া মনে করিলেন এবং চার্লস দ্য গ্যলের মত একজন 'অবাধ্য অফিসারকে' লণ্ডনে 'ফ্রী ফ্রান্স' গঠন করিতে দেওয়ার জন্যও তাঁরা বৃটেনের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ ছিলেন। (৩)

কিন্তু বৃটেনের আত্মরক্ষার জরুরী প্রয়োজনে ফরাসী নৌবহর সম্পর্কে বৃটিশ যুদ্ধ-মন্ত্রিসভা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন—'এই নৌবহর অচল করিতেই হইবে'। চার্চিল লিখিয়াছেন যে, তাঁর জীবনের 'সবচেয়ে অস্বাভাবিক, বেদনাদায়ক ও ঘৃণ্য সিদ্ধান্ত' ছিল এটা। সুতরাং ৩রা জুলাই ১৯৪০, ভাইস-এডমিরাল স্যার জেমস এফ সমারভিলের নেতৃত্বে তিনখানা বৃহত্তর বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ ওরাণের দিকে রওনা হইল। বৃটিশ নৌ-সেনাপতি ফরাসী কমাণ্ডার ভাইস-এডমিরাল মার্সেল বি গেনসোলকে এই মর্মে এক চরমপত্র পাঠাইলেন—(১) হয় তিনি জার্মানদের বিরুদ্ধে বৃটিশের সঙ্গে যোগদান করুন, (২) কিম্বা কোন বৃটিশ পোর্টে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করুন কিম্বা, (৩) ফ্রেঞ্চ ওয়েস্ট ইণ্ডিজে চলিয়া যাউন এবং সেখানে জাহাজগুলিকে নিরস্ত্রীকৃত করা হইবে কিম্বা মার্কিন আশ্রয়ে পাঠানো হইবে।

এই চরমপত্রের উত্তরদানের জন্য মাত্র ৬ ঘণ্টা সময় দেওয়া হইল। ফরাসী সেনাপতি এই চরমপত্র অগ্রাহ্য করিলেন। তখন বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজগুলির কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তিনটি ফরাসী ব্যাটলশিপ, একটি সী প্লেন জঙ্গী জাহাজ ও দুটি ডেস্ট্রয়ার হয় নিমজ্জিত কিম্বা অকেজো হইয়া গেল। কেবল একখানা ব্যাটলশিপ 'স্ট্রাসবুর্গ' প্রচণ্ড জখম হওয়া সত্ত্বেও এবং কয়েকটি ছোট ছোট পোত পলাইয়া গিয়া শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের টুলো বন্দরে আশ্রয় নিতে পারিয়াছিল। পশ্চিম আফ্রিকার ডাকার বন্দরে অবস্থিত আর একখানা বৃহৎ ফরাসী যুদ্ধ জাহাজকেও অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা ঘায়েল করা হইল। ওরানে বৃটিশ আক্রমণের ফলে প্রায় দুই হাজার ফরাসী নাবিক হতাহত হইল।

ওদিকে হিটলার গর্জন করিলেন, 'শান্তির জন্য গর্জন' করিতে লাগিলেন। মেঠো বক্তা হিসাবে হিটলারও অতুলনীয় ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা (যেমন, মার্কিন সাংবাদিক-ঐতিহাসিক উইলিয়াম শাইরার) সেকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পশ্চিম রণাঙ্গনে জয়লাভ করার পর হিটলার মনে করিলেন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। একাকী ইংলণ্ডের পক্ষে আর যুদ্ধ চালাইয়া লাভ কি, এখন নিশ্চয়ই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কোন কোন নিরপেক্ষ দেশ এবং স্বয়ং পোপও শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি 'সম্মানজনক শান্তি' প্রতিষ্ঠার জন্য মধ্যস্থ হিসাবে কাজ করিতেও রাজী ছিলেন। কিন্তু চার্চিল বা বৃটেন শান্তি কামনার কোন লক্ষণ দেখাইলেন না। তখন ১৯শে জুলাই সন্ধ্যাবেলা রাইখস্টাগে হিটলার যে বক্তৃতা দিলেন, সেটা ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ বক্তৃতাগুলির অন্যতম এবং রাইখস্টাগেও ওটাই ছিল তাঁর শেষ সেরা বক্তৃতা (অবশ্য মার্কিন সাংবাদিকের মতে)।

এই বক্তৃতার গোড়ার দিকে হিটলার চার্চিলকে 'অবিবেচক রাজনীতিক' বলিয়া গালি দিলেন এবং ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—হাঁ তিনি কানাডায় পালাইয়া গিয়া বাঁচিবেন বটে, কিন্তু বৃটেনের বাকী লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্গতির কি হইবে?

তারপর শেষের দিকে তিনি ঘোষণা করিলেন:

> In this hour I feel it to be my duty before my own conscience to appeal once more to reason and common sense in Great Britain as much as elsewhere. I consider myself in a position to make this appeal since I am not the vanquished begging favours but the victor speaking in the name of reason.
>
> I can see no reason why this war must go on.

এই যুদ্ধ কেন চলিবে, তার কারণ তিনি বুঝিতেছেন না, তিনি যুক্তির নিকট, সাধারণ বুদ্ধির নিকট আবেদন করিতেছেন। কিন্তু তার জন্য কেউ যেন একথা ধরিয়া না নেয় যে, 'আমি পরাজিতের মত অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছি', মনে রাখা দরকার 'আমি বিজয়ী এবং বিজয়ী বলিয়াই যুক্তির নামে আমি এই আবেদন করিতেছি'।

কিন্তু হিটলার বিজয়ীর দাম্ভিকতার সুরে যে বক্তৃতাই দিন না কেন, চার্চিলের কাছে বৃটেনের কাছে তা অগ্রাহ্য হইল।

[উইলিয়াম শাইরার লিখিতেছেন যে, এই বক্তৃতার সময় একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। হিটলার হঠাৎ বক্তৃতার মাঝখানে থামিয়া গিয়া পশ্চিম রণাঙ্গনের ও অন্যান্য যুদ্ধজয়ের জন্য গোয়েরিংকে রাইক-মার্শাল পদবীতে ভূষিত করিয়া সবচেয়ে সেরা সম্মান দিলেন এবং ৯ জন আর্মি-জেনারেল ও ৩ জন বিমানবাহিনীর অফিসার—মোট ১২ জনকে ফিল্ড-মার্শাল পদবীতে উন্নীত করিলেন। এ'দের নাম—ব্রাউসিৎস, কাইটেল, রুণ্ডস্টেড, বোক, লীব, লিস্ট, ক্লুজ, উইজ্জিলবেন, রাইখনাউ এবং মিলচ, কেসেলরিং ও স্পেরেল। একমাত্র বাদ গেলেন লেঃ জেনারেল হ্যালডার। তাঁকে শুধু জেনারেল করা হইল। একসঙ্গে এতগুলি ফিল্ড-মার্শালের সৃষ্টি ইতিহাসের এক আশ্চর্য ঘটনা।]

হিটলার মনে করিয়াছিলেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেই চার্চিল নরম হইবেন এবং শান্তি প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করার পরেও যখন ইংলণ্ডের কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন ১৬ই জুলাই তারিখ Directive No. 16 Operation Section বা ১৬নং নির্দেশনামা জারী করিলেন। বলা বাহুল্য যে, সেনাপতিদের নিকট এই গুপ্ত নির্দেশনামায় ইংলণ্ড আক্রমণের সাংকেতিক নাম ছিল 'সিন্ধুঘোটক' বা 'সীলায়ন'। সমুদ্রবেষ্টিত ইংলণ্ড দ্বীপ আক্রমণের পক্ষে নামটি যথেষ্ট অর্থবহ ছিল। কিন্তু লক্ষ্য করার এই যে, ১৯শে জুলাইয়ের 'শান্তি বক্তৃতার' আগেই এই গোপনীয় নির্দেশ জারী করা হইয়াছিল। অপর পক্ষে নুরেমবার্গের আদালতের দলিলপত্রে দেখা যায় যে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরের তিন সপ্তাহ পরেই হিটলার 'সিন্ধুঘোটকের' পরিকল্পনায় মন দিলেন এবং ১৬ই জুলাই তারিখ যে নির্দেশ দিলেন, উহার সরকারী নাম ছিল

> 'General order No. 16 in the preparation of a landing operation against England' (Top Secret' —

—কথাটি যথানিয়মে উল্লিখিত ছিল) এই নির্দেশনামায় হিটলার বলেন যে সামরিক দিক হইতে ইংলণ্ডের অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক, তবু যখন বৃটেন জার্মানীর সহিত আপোষরফার কোনই ইচ্ছা দেখাইতেছে না, তখন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাই স্থির হইল। ইংলণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে দখল করার জন্য কোথায় কোথায় সৈন্য অবতরণ করানো হইবে এবং অবতরণ সুনিশ্চিত করিবার জন্য কি প্রকারের আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে হইবে, তাও হিটলার নির্দেশ দিলেন। 'আগস্ট মাসের মধ্যভাগের মধ্যে আক্রমণের সমগ্র আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে হইবে।' জার্মান আক্রমণে বৃটিশ বিমানবহর যাতে বাধা দিতে না পারে, উহার জন্য এই বিমানবহর ধ্বংস করিতে হইবে। ইংলিশ চ্যানেলের পথ মুক্ত করিতে হইবে এবং ডোভার প্রণালীর উভয় পার্শ্ব সুরক্ষিত করিতে হইবে। "আমার অধীনে এবং আমার হুকুমনামায় ১লা আগস্ট হইতে প্রধান সেনাপতিগণ তাঁদের

(৩) English History 1914-1945: Taylor 1965 Pelican P. 601.

দপ্তরসহ আমার সদর দপ্তর (Ziegenberg) হইতে ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থান করিবেন।"*

কিন্তু গুপ্ত নির্দেশ জারী করিলে কি হইবে। সত্য সত্যই ইংলণ্ড আক্রমণের কোন 'বাস্তব পরিকল্পনা' ছিল না এবং তাঁর নির্দেশনামায় "যদি দরকার হয়" এই কথাটিরও উল্লেখ ছিল। কারণ, হিটলার বা তাঁর সেনাপতিরাও এই বিষয়ে খুব 'সীরিয়াস' ছিলেন না। কারণ, প্রথমত হিটলারের নিজের এবং তাঁর সেনাপতিদের যুদ্ধ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী একমাত্র ভূমি-পথেই আবদ্ধ ছিল—সমুদ্রের কিম্বা জলপথ অতিক্রমপূর্বক আক্রমণের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। এমন কি, হিটলার জেনারেল রুণ্ডস্টেডকে একবার বলিয়াছিলেন—

On land I am a hero, but on water I am a coward !

অর্থাৎ স্থলপথে আমি একজন বীর, কিন্তু জলপথে আমি কাপুরুষ। (৪)

সুতরাং সহজ বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইংলণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়া স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর মধ্যে বিরোধ বাধিল। কারণ, এভাবে ইংলণ্ড আক্রমণ

*The Nuremberg Trial —by R. W. Cooper 1947, Page 95.

(৪) উইলিয়াম শাইরার প্রণীত—দি রাইজ এণ্ড ফল অব দি থার্ড রাইক। পৃঃ ৯০৭, পাদটীকা।
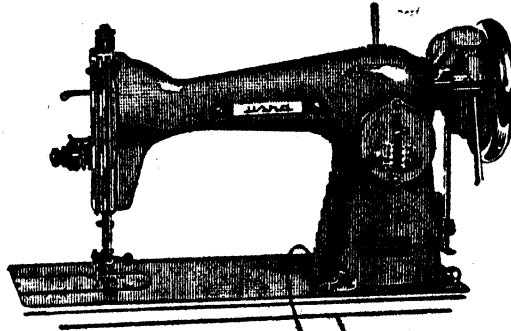
করিয়া জয় করিতে গেলে জল স্থল ও বিমানবাহিনীর যে প্রভূত শক্তির সমাবেশ দরকার, হিটলারী জার্মানীর তা ছিল না। সৈন্যশক্তি নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সেই সৈন্যদল ইংলিশ চ্যানেল পার হইবে কিরূপে? উপযুক্ত নৌশক্তি কোথায়? ইংলণ্ড আক্রমণের জন্য আর্মির পক্ষ থেকে দাবী করা হইল ডোভার থেকে পোর্টল্যাণ্ডের পশ্চিমে লাইম রেগিস পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ উপকূলে পর পর কয়েক দফা সৈন্য অবতরণের জন্য। ডোভারের উত্তরে র‍্যামসগেট অঞ্চলেও অতিরিক্ত সৈন্য অবতরণ ঘটাইতে হইবে। জার্মান নৌ-বিভাগ অবশ্য ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা মনে করিল নর্থ ফোরল্যাণ্ড এবং আইল অব ওয়াইটের পশ্চিম প্রান্ত—এই দুই অংশের মধ্যে। আর্মি স্টাফ প্রথম দফা ১ লক্ষ সৈন্য নামাইবার প্ল্যান করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় ডোভার থেকে পশ্চিম দিকে লাইম বে পর্যন্ত বিভিন্ন বিন্দুতে আরও ১ লক্ষ ১০ হাজার সৈন্য নামাইবার। আর্মি স্টাফের প্রধান কর্নেল জেনারেল হ্যাল্ডার বলিলেন যে, ব্রাইটন এলাকায় অন্তত ৪ ডিভিসন সৈন্য নামাইতে হইবে। ডিল্-র‍্যামসগেট এলাকায়ও এবং সমগ্র রণাঙ্গন ধরিয়া একই সময়ে অন্তত আরও ১৩ ডিভিসন সৈন্য সমাবেশ করিতে হইবে। এ ছাড়া লুফ্‌ৎভাগে বা জার্মান বিমানবাহিনী দাবী করিল যে, অন্তত ৫২টি এ-এ ব্যাটারি জাহাজযোগে প্রথম দফাতেই পাঠাইতে হইবে।

কিন্তু নৌবিভাগের কর্তারা পরিষ্কার বলিলেন যে, এত দ্রুত এবং এত বড় শক্তির সমাবেশ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। যদি পারাপারের সময় বিমানবলের প্রভুত্বও স্থাপন করা যায়, তবু নিরাপদে এককালে একবার মাত্র পার করা সম্ভব। আর দ্বিতীয় দফায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার সৈন্য চ্যানেল পার করিতে গেলে (সমস্ত সমরসম্ভারসহ) একবার অপারেশনের জন্যই ২০ লক্ষ টনের জাহাজী শক্তির দরকার! এটা নিতান্তই আজগুবী মাত্র! অর্থাৎ সোজা কথায় ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া র‍্যামসগেট থেকে লাইম বে পর্যন্ত ২০০ মাইলের বেশী রণাঙ্গনে সৈন্য সমাবেশ ঘটানো নৌবহরের পক্ষে অসম্ভব।

এভাবে নেভী ও আর্মির মধ্যে যে বিতর্ক বাধিল সেটা চরমে উঠিল ৭ই আগস্ট। জেনারেল হ্যাল্ডার আর্মির পক্ষ থেকে নেভীর বড় কর্তা এডমিরাল স্নাইউইণ্ডকে শুনাইয়া দিলেন যে, নৌ-বিভাগের পরিকল্পনা অর্থাৎ ৪০ ডিভিসনের বদলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর রণাঙ্গনে ১৩ ডিভিসন সৈন্য নামাইবার প্রস্তাব সৈন্য —

দৈত্য ও বামনের যুদ্ধ—রাশিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের সংঘাত
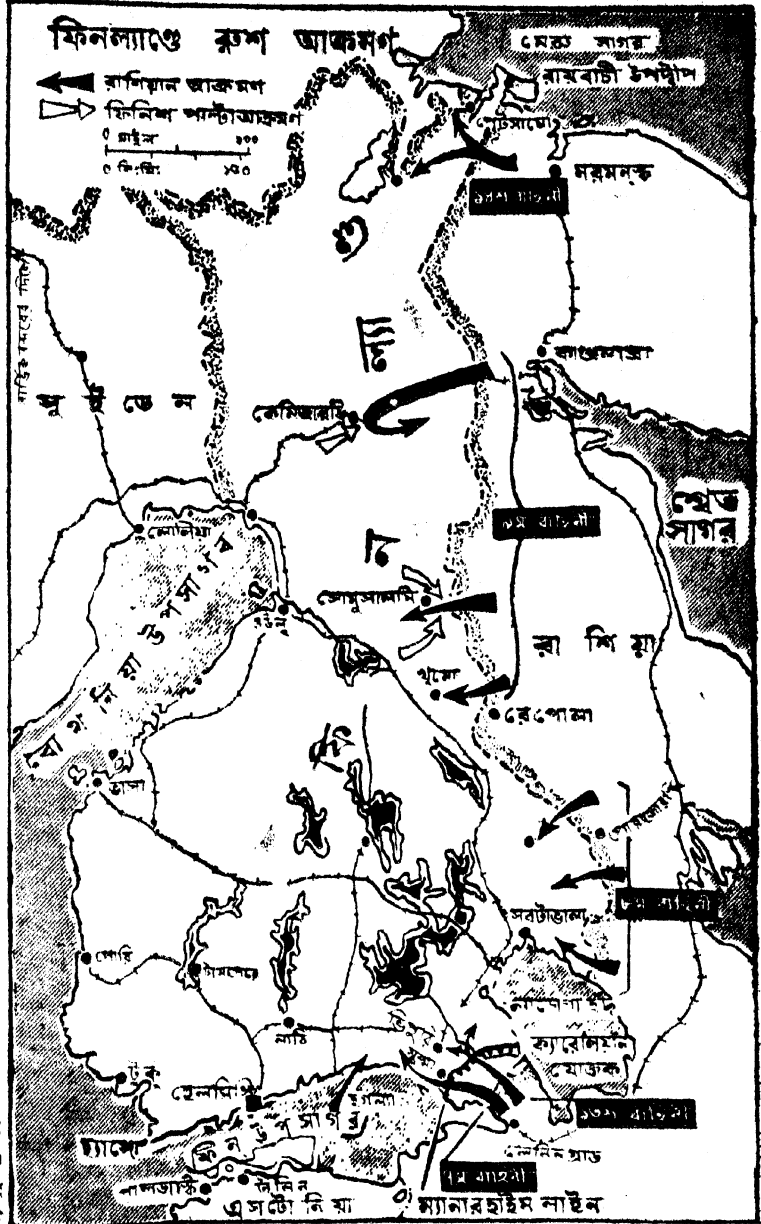
এর জবাবে এডমিরালও পাল্টা শুনাইয়া দিলেন যে, বৃটিশ নেভীর আধিপত্যের মুখে এত বড় চওড়া রণাঙ্গনে ৪০ ডিভিসন সৈন্য নামাইবার প্রস্তাবও জার্মান নেভীর পক্ষে আত্মহত্যার তুল্য।

চওড়া কিম্বা সঙ্কীর্ণতর রণক্ষেত্রে সৈন্য নামানো ও আক্রমণ করা হইবে এই বিরোধের মধ্যে ফুরার স্বয়ং মধ্যস্থতা করিতে গিয়া নিজেই সংশয়ে পড়িলেন এবং আর্মির বড়কর্তাদের সঙ্গে পরামর্শের পর ১৬ই আগস্ট তারিখ হিটলার লাইম বে'তে অবতরণের প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিলেন। ... ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখ সঙ্কীর্ণতর রণক্ষেত্রে অবতরণ ঘটাইতে হইবে। কিন্তু সেটাও শেষ পর্যন্ত—'পরিস্থিতি পরিষ্কার' না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রহিল।

এই সমগ্র পরিকল্পনার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন ফিল্ড মার্শাল রুণ্ডস্টেড ও আর্মি গ্রুপ 'এ' এবং এডমিরাল রেইডার এবং বিতর্কিত পরিকল্পনার আলোচনার সময় বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন যে বিমান শক্তির পরিপূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই অভিযান চালানো সম্ভব নয়। তখন বিমানবহরের বড়কর্তা রাইখ মার্শাল গোয়েরিং আগাইয়া আসিলেন এবং সকলকে

আশ্বাস দিলেন যে, তিনি একাই জার্মান বিমানবহরের সাহায্যে ইংলণ্ডকে খতম করিয়া ফেলিবেন। তখন নৌ ও স্থল-বাহিনীর কর্তারা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কারণ, গোয়েরিংয়ের উপর দিয়াই তাঁরা ইংলণ্ড জয়ের পরীক্ষা চালাইতে চাহিলেন। 'ব্যাট্‌ল অব্‌ বৃটেন' বা বৃটেনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিমান অভিযানের এটাই ছিল মূল রহস্য। ফিল্ড মার্শাল কেমেলরিং ও স্পেরেল এই বিমান আক্রমণ চালাইবার ভার পাইলেন।

●

চার্চিলও জানিতেন যে, ইংলণ্ডের ভাগ্য এক্ষণে আকাশের উপর নির্ভর করিতেছে। কারণ, ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূলে সাফল্যের সঙ্গে সৈন্য নামাইতে গেলে ইংলিশ চ্যানেল নির্বিঘ্ন করিবার জন্য জার্মানীকে বৃটিশ বিমানবাহিনী বা রয়েল এয়ার ফোর্স ধ্বংস করিতেই হইবে। ৩১শে জুলাই তারিখ হিটলার এডমিরাল রেইডারকে বলিয়াছিলেন—'যদি ৮ দিনের ঘোরতর বিমান যুদ্ধের পরেও জার্মান বিমানবহর শত্রুপক্ষের বিমানশক্তি, বন্দর ও নৌবহরকে যথেষ্ট পরিমাণে ধ্বংস করিতে না পারে, তবে, এই আক্রমণ ১৯৪১ সালের মে মাস পর্যন্ত স্থগিত রাখিতে হইবে।' (৫)

ফ্রান্সের পতনের পর যে দেড়মাস সময় পাওয়া গেল সেই সময়ের মধ্যে চার্চিল ও বৃটিশ সমরকর্তারা সর্বতোভাবে প্রস্তুত হইলেন আত্মরক্ষার জন্য। কিন্তু তখন বৃটেন নিঃসঙ্গ, একাকী, ফ্রান্স ও পশ্চিম ইউরোপ পরাজিত। ডানকার্কের পর সমস্ত অস্ত্রসম্ভার প্রায় শূন্য। তখন ইংলণ্ডের উপকূল রক্ষার জন্য ছিল মাত্র ১৭ ডিভিসন বৃটিশ সৈন্য, আর রিজার্ভ ছিল ২২ ডিভিসন। আর জার্মানীর দুর্দান্ত ৪০ ডিভিসন সৈন্য ঝাঁপাইয়া পড়িতে উৎসুক। তবু ইংরাজ জাতি সেই তীব্রতম সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়াইল। বাকিংহ্যাম প্রাসাদে রাজদম্পতি থেকে শুরু করিয়া সাধারণ মেহনতী বা চাকরানি পর্যন্ত সমাজের সর্বস্তরে স্বদেশরক্ষায় আশ্চর্য উদ্দীপনা সঞ্চারিত হইল। এই উদ্দীপনা, সাহস এবং প্রতিরোধের সুদৃঢ় সংকল্প ফ্রান্সের ছিল না। কিন্তু চার্চিলের নেতৃত্বে বৃটিশ সিংহ যেন অকস্মাৎ কেশর ফুলাইয়া গর্জনের অন্ধকার গহ্বর থেকে সংগ্রামের রক্তাক্ত দুর্গম পথে আসিয়া দাঁড়াইল। জনসাধারণের নৈতিক বল এবং স্বাধীনতা রক্ষার অদম্য ইচ্ছা প্রবল হইল। সুতরাং হিটলার নীতিভ্রষ্ট ও চরিত্রভ্রষ্ট ফ্রান্সে সহজ জয়লাভের যে সুযোগ পাইয়াছিলেন, ইংলণ্ডে তাহা পাওয়া গেল না। এখানে লেনিনের সেই বহু মূল্যবান উপদেশ মনে পড়িতেছে, যখন তিনি রণনীতির ব্যাপারে বলিয়াছিলেন,

> The soundest strategy is to postpone operations until the moral disintegration of the enemy renders the delivery of the mortal blow both possible and easy".*

*This Expanding War—by Liddell Hart •Page 263.

এই 'নৈতিক অধঃপতনের' জন্যই হিটলার ইউরোপের বহু রণক্ষেত্রে 'শত্রুর' উপর একটিমাত্র আঘাত হানিয়াই দ্রুত ও সহজ জয়লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের তীরভূমিতে আসিয়া সেটা সম্ভব হইল না, যার অন্যতম কারণ ছিল ইংরাজ জাতির নৈতিক শক্তির দৃঢ়তা। হিটলারের আসন্ন আক্রমণের জন্য বৃটেন যথাসম্ভব প্রস্তুত হইতে লাগিল এবং যে কয়েক ডিভিসন সৈন্য তার হাতে ছিল, সেগুলিই নানা বিন্দুতে সন্নিবেশ করা হইল। নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সহিত যোগ রাখিয়া দেশের নানা অংশে মোট ১০ লক্ষ স্বেচ্ছাসৈনিক বা হোমগার্ড গঠিত হইল। স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে যথাসম্ভব লণ্ডন ও অন্যান্য বড় বড় শহরের বিপজ্জনক এলাকা হইতে সরাইয়া নেওয়া হইল (সারা বৃটেন থেকে মোট প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ লোক অপসারিত হইয়াছিলেন।) এবং আফিস হইতে শুরু করিয়া বিদ্যালয় পর্যন্ত এমনভাবে সংগঠিত হইল যাতে ইংলণ্ড আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে পারে। বলা বাহুল্য যে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সর্বপ্রকার সামরিক ও বেসামরিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। জার্মানী তখন প্রায় সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের মালিক এবং উত্তর ইউরোপেও তার বাহু বহু দূরবর্তী নার্ভিক বন্দর পর্যন্ত প্রসারিত। অর্থাৎ ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও নরওয়ের উপকূল ভাগ তার দখলে—উত্তর সমুদ্র হইতে ইংলিশ চ্যানেল হইয়া অতলান্তিক মহাসমুদ্রের তীর পর্যন্ত জার্মানী দণ্ডায়মান। জার্মানীর হেলিগোল্যাণ্ড হইতে স্কটল্যাণ্ডের উত্তরে স্কাপাফ্লো পর্যন্ত দূরত্ব ছিল ৫৫০ মাইল, আর এডিনবরা ৪৫০ মাইল। কিন্তু নরওয়ে দখলের ফলে তারা ৩৯০ মাইলের মধ্যে—নরওয়ের স্টেভ্যাঙ্গার ঘাঁটি হইতে। হল্যাণ্ডের তীর হইতে ইংলণ্ডের নরউইচ ১৩৫ মাইল এবং খাস লণ্ডন ১৫৫ মাইলের মধ্যে পড়িল। আর ফ্রান্সের পতনের ফলে জার্মানী ও ইংলণ্ডের মধ্যে ডোভার প্রণালীর সঙ্কীর্ণতম পথে দূরত্ব দাঁড়াইল মাত্র ২৬ মাইল। প্যারিস হইতে লণ্ডন ২১০ এবং দূরতম পাল্লার বিমানের পক্ষে বার্লিন হইতে লণ্ডনের দূরত্ব ছিল ৫৭০ মাইল, আর ফ্রান্সের ব্রেস্ট বন্দর হইতে ইংলণ্ডের প্লিমাউথ বন্দর ১৪০ মাইলের মধ্যে পড়িল। (৬)

সুতরাং হিটলারী রণনীতি যেন পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ীই বৃটেনকে বিমান আক্রমণের নিকটতম পাল্লার মধ্যে আনিয়া ফেলিল। বিমান অভিযানে সাফল্যের আশা করিয়া জার্মানী ইংলণ্ডে অবতরণ ও আক্রমণের জন্য রটারডাম ও শেরবুর্গ বন্দরের মধ্যে ৩ হাজার 'বার্জ' (একপ্রকারের নৌকা) পর্যন্ত প্রস্তুত রাখিল এবং নরওয়ে দখলকারী সৈন্যদিগকে ইংলণ্ডে 'উভচর আক্রমণের' জন্য ট্রেনিং দেওয়া হইল। হল্যাণ্ড হইতে ফ্রান্সের তীর পর্যন্ত প্রচুর বিমান-ঘাঁটি তৈয়ার হইল।

ইহার পর আরম্ভ হইল ১৯৪০ সালের গ্রীষ্মকালে বৃটেনের আকাশে ভয়াবহ বিমান যুদ্ধ—যাহা 'Battle of Britain' নামে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। যাঁরা সেই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁদের মতে এমন রোমহর্ষক সাংঘাতিক সংগ্রাম ইতিপূর্বে মানুষের সমাজে আর কখনও দেখা যায় নাই। আকাশপথের যে কল্পনাবিলাস মানুষের ছিল কিংবা রামায়ণের পুষ্পকরথ অথবা মেঘের আড়ালে ইন্দ্রজিতের যুদ্ধের যে কাল্পনিক সংগ্রামের চিত্র বহু রোমাঞ্চের প্রেরণা জোগাইয়াছে, বৃটেনের মহাশূন্যে তাহা ভয়ঙ্কর বাস্তব মূর্তি লইয়া দেখা দিল। সাইরেনের তীব্র তীক্ষ্ণ ও আর্ত বংশীধ্বনিতে সচকিত ইংলণ্ডের নরনারী ভূগর্ভের আশ্রয়স্থল হইতেই দেখিতে পাইত ঊর্ধ্ব আকাশে চারি পাঁচ মাইল ধরিয়া শ্বেত ধূম্রকুণ্ডলী ছড়াইয়া পড়িয়াছে যেন ধূমকেতুর পুচ্ছের মত। আর অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণে ইংলণ্ডের রক্তরাঙা মুখ যেন আপন ভিত্তিমূল হইতে কাঁপিয়া উঠিতেছে এবং মাটী ও প্রস্তর, অট্টালিকা ও প্রান্তর বিদীর্ণ ও বিধ্বস্ত হইয়া ফাটিয়া টুকরা টুকরা হইতেছে। নভোচারী বিমানগুলি তখন লোকচক্ষুর অন্তরালে পরস্পরকে হননের জন্য আসুরিক সংগ্রামে ব্যস্ত আর জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের মত তারা ছুটাছুটি করিত, যাদের গতি ছিল মিনিটে পাঁচ মাইল। নিঃসন্দেহে ইহা সেদিনের অবিশ্বাস্য যুদ্ধের অবিশ্বাস্য গতিবেগ।......

(ক্রমশঃ)

---

(৫) চার্চিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৮১-৮২

(৬) [illegible] প্রকাশিত [illegible]—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাইরে ঝকঝকে দিন, ঘরের মধ্যে আলোর দরকার নেই। স্টোভের শব্দ আসে, স্পিরিট আর ওষুধের গন্ধ হাওয়ায়। ফুটন্ত জলে ছুরি কাঁচি ফুটছে, কতগুলো চেয়ার টেবিল এদিক ওদিক করা হল। টুটুল বুঝতে পারছিল বড় রকম কিছু ঘটতে যাচ্ছে এবং সে সেই ঘটনার নায়ক। সে জন্যে একটা চাপা হর্ষও তার মুখে খেলা করে, বিশেষ করে দরজার বাইরে বুড়ী আর চোঙার করুণ মুখগুলো দেখে। কিছু বুঝবার আগেই ভবনাথ তার মাথার কাছে এসে চুলে হাত বুলোতে বুলোতে মাথাটা আলগোছে ধরেন, খাটের উল্টো দিক থেকে প্রতাপ উঠে তার পেটের কাছে পা মুড়ে বসে। পায়ে হাত পড়ায় টুটুলের এতক্ষণ নায়কোচিত মনোভাব নিমেষে কেটে যায়। অন্য দিন হরিচরণ পা ধরেন আলতোভাবে কিন্তু আজ ক্লোরোফোর্ম বাদ দিয়েই অপারেশান—একথাটা জানান দিচ্ছে সাদা আলখাল্লা পরা মোটা লোকটার ক্ষিপ্র ভঙ্গীতে, বাঁ-হাতের আলগা হেঁচকায় গোড়ালির ফুলোটার অস্পষ্ট মুখ থেকে তুলো টানতেই গলগল করে মোটা ধারায় ধূসর পুঁজ গড়াতে থাকে। তারপর হরিচরণ গ্লাভস-পরা মোটা দুই থাবায় চেপে ধরেন টুটুলের দপদপে ব্যথাস্থান। আর চার পাঁচটা জায়গা ফুটো হয়ে ফোয়ারার মতো পুঁজ উঠতে থাকে, হলুদ লালে সাদা আলখাল্লা রঙীন হয়ে যায়।

টুটুল প্রথমে কাতরাচ্ছিল ছটফট করছিল প্রতাপ ভবনাথ কম্পাউন্ডারবাবুর শক্ত হাতের মধ্যে। তারপর তার মুখ দিয়ে অসংলগ্ন গোঙানি অকস্মাৎ সংলগ্নতা পায় এক গোটা বাক্যে,—'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, এই ক্ষুদ্র প্রাণকে তুচ্ছ করবেন না—ডাক্তার বাবু...' ছুরি চালাতে চালাতে হরিচরণের হাতও এক মুহূর্তে থমকে যায়। প্রতাপের দিকে একবার অবাক হয়ে তাকান। আর টুটুল যেন এই শব্দগুলোর তরণীতে যন্ত্রণার বৈতরণী পার হতে থাকে। ক্রমাগত চীৎকার করে বলে, 'ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, এই ক্ষুদ্র প্রাণকে তুচ্ছ করবেন না।' যন্ত্রণায় যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ আরও স্পষ্ট, আরও জোরাল সাবালকতুল্য শোনায়। হরিচরণ আরও গভীরে ছুরি চালান, পুঁজের স্তর আরও নীচে, একেবারে হাড়ের জোড় পর্যন্ত। আর একদিন দেরী হলেই পা বাদ দিতে হত। ওপরের দিকেও অনেকখানি পর্যন্ত এই হলুদ ধূসর দাবানল এগিয়ে গিয়েছে। সেদিকে যত ছুরি উঠতে থাকে টুটুল আরও সোচ্চার হয়ে ওঠে নতুন বাগ্মিতায় 'মা জননী, মা জননী, একবার শেষ দেখা, একবার শেষ দেখা দেখতে দাও, মা জননী।' পাশের ঘরে তক্তাপোষের ওপর বসে স্বর্ণসুন্দরী ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকেন। ছুরি চালাতে চালাতে প্রবল আত্মতৃপ্তিতে হরিচরণের মুখ ভরে আসে। বাস্তবিক তিনি তখন ললিত বাড়ুজ্জে, পঞ্চানন চাটুজ্যে ইত্যাদি স্বনামধন্য ব্যক্তির একই সারিতে অন্তত তার ক্ষিপ্র আঙুলের কাজ, ছুরির ওপর তন্ময় দৃষ্টি থেকে সে কথাই প্রমাণিত। মুখ তুলে বললেন, 'বাঃ, বাঃ, ছোকরা বড় হলে থিয়েটার করবে।' কিন্তু ইতিমধ্যে ঘন্টাখানেক প্রায় অতি-বাহিত, ওপরের দিকে কিছু কিছু কাঁচা অংশে ছুরির আঘাতে লাল রক্ত অয়েল ক্লথ বেয়ে বিছানার সাদা চাদরে জমা হয়েছে। সেদিকে চেয়ে প্রতাপেরই মাথা ঝিমঝিম করে। ভবনাথের চোখে জল। টুটুলের গলা ভেঙে গেছে, কিন্তু বাক্যের ওপর আস্থা তার এখনও অক্ষুন্ন। তাই সেই গলা ভাঙা বাক্যগুলো যেন নেংচাতে নেংচাতে তাদের চারপাশে ঘুরে বেড়ায় ভিখিরির মতো। হরিচরণ যন্ত্রের মতো কাজ করেন। নেহাত বয়স কম বলে তিনি এত বড় ঝুঁকি নিয়েছেন, নইলে ক্লোরোফোর্ম বাদ দিয়ে এক ঘন্টার ওপর এই অপারেশন ভাবাই যায় না। এবার ক্ষত স্থানে গজ ভরে সেলাই আরা। কম্পাউন্ডারবাবু ট্রে হাতে পাশে

দাঁড়িয়ে। হলদে আলোয়ান আর কেডস জুতো-পরা লোকটাকে অন্য দিন কেউ চোখ মেলেও দেখে না। আজ সেও এক রণক্ষেত্রের সৈনিক, তার স্থির দৃষ্টি আর যন্ত্রের মতো একটার পর একটা ছুরি কাঁচি, সাঁড়াসি এগিয়ে দেওয়ার ক্ষিপ্র শৃঙ্খলায় তাকেও দেখায় অন্য রকম। হরিচরণ ডাক্তার এবার ব্যান্ডেজ বাঁধতে শুরু করেন, হাঁটু অবধি বিশাল ব্যান্ডেজ মোড়ার পর সেদিকে চেয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। বোধহয় ঘুমের ওষুধ দেন খেতে। টুটুল ইতিমধ্যেই অবসাদে যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন, সে এখন আর এক জগতের বাসিন্দা। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস তার অজান্তে উঠে তার ছোট্ট বুকখানা নাড়ায়।

ভেতরের বারান্দায় এসে সাবান দিয়ে কনুই পর্যন্ত হাত ধোন হরিচরণ ডাক্তার। আবার গোবেচারি মুখখানা ফিরে আসে তাঁর। আস্তে আস্তে ভবনাথের কাছে এসে বলেন, 'আর একদিন হলেই হাড়ে ধরে যেত স্যার।'

হরিচরণ ডাক্তার ফি নেবেন না। এত বড় অপারেশানটাও তাঁর সরকারী কর্তব্য। ভবনাথ ভাবলেন, একটা পার্কার ফাউন্টেন-পেন উপহার দিলে কেমন হয়!

কালের হাত লোহার মতো শক্ত বটে, সবাইকে সে একভাবে ধরে না, এটাই বাঁচোয়া। এমন অনেক মানুষ আছে যাঁরা চিতায় শুয়েও সারা জীবনের কর্মকাণ্ডের ঔজ্জ্বল্যে স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে ঝলমল। এমন অনেক বাড়ি দেখা যায়, যেখানে যত্ন ও মনোযোগের দরুণ দুশো বছরের পুরনো কাঠের সিঁড়ির মেহগিনি পালিশ এখনও ঝকমকে প্রাণবন্ত। আর এটাও তো কোন অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা নয় যে, ভাল রেশমী বাসাংসি যত জীর্ণ হয় তত তাতে আলো খেলে : কালের প্রভাব জগতসংসারে বাস্তবিক বিচিত্র।

এই ধরনের চিন্তাই ভবনাথের মনে আসে যখন তিন মাস পর সন্ধ্যের ট্রেনে ঈশ্বরদি স্টেশনে নেমে বিশ্বাস কোম্পানীর বাসে করে পাবনা বাড়িতে পৌঁছলেন। ঈশান চৌধুরীর মৃত্যু সবে বিশ বছর ঘটেছে। এর মধ্যে কাল শুধু কঠোর হস্তে পাবনাবাড়ি ধরে নি, ধরে চুর চুর করে গুঁড়ো করেছে। তিন বছর আগেও যখন এসেছিলেন তখনই ঠিক এরকমটি ছিল না যদিও ভাঙনের ইঙ্গিত ছিল যথেষ্ট। সামনের বিশাল গাড়িবারান্দায় আলো নেই। দুটো বাস অন্ধকারে ভূতের মতো

পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে। ভবনাথ লম্বা লম্বা পা ফেলে আসছিলেন, একটু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। এখন আবছা আঁধারে খেয়াল করেন বাড়ির সামনে গোলাপবাগানে একটা ভাঙা লরীর কাদায় পোঁতা মাডগার্ড ঘাসে ভরে এসেছে।

'কে রে?' কর্কশ গলা আসে। বড়দার গলা চিনতে পেরে ভবনাথ পাশ ফিরে তাকান। ধুতির ওপর কালো গলাবন্ধ কোট পরে জানলায় দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক।

'আমি ভবনাথ।'

'দাঁড়াও।' লণ্ঠন হাতে নেমে আসেন। তারপর আলো তুলে ধরেন ভাইয়ের মুখের দিকে: বাসগুলোর পেছন দিকও হয় আলোকিত।

'বিশ্বেস কোম্পানীকে ভাড়া দিয়েছি। তুমি তো আর কিছু করলে না আমাদের জন্যে। এখন তো শুনেছি সাউথ ক্যালকাটায় বাড়ি তুলছো, তা তো তুলবেই। আত্মীয়-স্বজন দেশ সব ছেড়ে গেল, এখন খালি নিজের পেট।' কথাগুলো বলেই কাশতে থাকেন। কাশির শেষে হাঁপান খানিকক্ষণ।

'শরীরটা খারাপ করেছেন,' ভবনাথ ধীরে ধীরে বলেন।

'এই হাঁপানিটা। শনিবার শনিবার কলকাতা পাবনা করি। তা বিশ্বাসবাবু সজ্জন লোক। ল্যান্ডলর্ডকে ফ্রি-ট্রিপ দেয় পাবনা টু ঈশ্বরদি।'

ব্যাপারটা খানিক আঁচ করলেও ভবনাথ জিজ্ঞাসা করে ফেলেন, 'শনিবার শনিবার কেন?'

বলেই বুঝতে পারেন নিজের গলায় নিজেই ফাঁস পরালেন।

দাদা বললেন, 'মেয়েগুলো ডেসেছে। রাস্তায় বেরোলে ছেলেছোকরারা শিস দেয়। বিয়ে দিতে পারছি না। কিছু রোজগার-পাতি করতে হবে তো। তুমি যে আমাদের সবাইকে এমন লেট-ডাউন দেবে জানা ছিল না। এবারে কিন্তু একশোটা টাকা আমায় দেবে, ভব। তোমার নামে খেলব। জিতলে তোমার অর্ধেক আমার অর্ধেক। ঈশান চৌধুরীর ছেলে, আমার একটা কথার দাম নেই?'

ঘরে ঢুকতেই নিকষ কুলীন ঘরের নিকষ কালো মেয়ে শৈবলিনী চমকে উঠে বললেন 'ভব।'

'এই এলাম বৌদি।'

'বোস, বোস, ভাত চাপিয়ে দি।

পাবনা বাড়ির বড় বৌ ঝলমলে কালো, লম্বা একহারা চেহারা। ঠোঁট দুটো হালকা বিদ্রূপে অস্বাভাবিক সুন্দর। মুখের মধ্যে চোখের চেয়েও ঠোঁটের চার পাশটা ঘিরে যে সজীবতা খেলে শৈবলিনীর কথা বলার সময় তার সব থেকে আকর্ষণীয়। ভবনাথ চামড়ায় মোড়া বিশাল সোফাখানায় গা এলিয়ে চোখ বোজেন। টেবিলে সেজের ঠাণ্ডা আলো। সে আলোতেও দেয়ালের গায়ে গায়ে কড়ি বরগার অযত্নের ছাপ ভবনাথের দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু বড়দার চেষ্টার ত্রুটি না থাকলেও কালো মার্বেলের ঝকঝকে পালিশ এখনও অক্ষুন্ন।

বছর পঁচিশেকের একটি যুবক ঘরে ঢোকে। একবার লাজুক লাজুকভাবে ভবনাথের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বিদায় নেবার উপক্রম করতেই ভবনাথের চোখ খোলে। 'এই বিশু, কোথায় পালাচ্ছিস?'

বড়দার বড় ছেলে। এই ছেলেটি ছিল ভবনাথের পেয়ারের। মস্ত উঁচু কাঠের পুলের মাথা থেকে আশ্চর্য সুন্দরভাবে ঝাঁপ খেত বিশু ইছামতীতে। নুয়েপড়া বাঁশঝাড়ের ঘা ঘেঁসে তার সেই উড়ন্ত দেহখানা অস্পষ্টভাবে ভবনাথের স্মৃতিতে একবার ঝাঁপ খেয়ে নেয়।

'কদ্দুর পড়লি?'

'পড়া আর হয়নি সেজকাকা।'

'কি করছিস?'

'বিশ্বাস কোম্পানিতে ঢুকেছি। একশো টাকা মাইনে দেবে বলেছে।'

'একশো টাকা? কি কাজ?'

বিশু লাজুকভাবে হাসে, 'মেকানিক' তারপর বারান্দার দিকে পা বাড়ায়।

মেকানিক, কেরাণী, পেশকার—এই হল এখন পাবনা বাড়ির চেহারা। ঠিক বড়দার মতো ঈশান চৌধুরীর ছেলে বলে নয়, শহরের সবচেয়ে বড় বাড়ির ছেলেদের কুড়ি বছরেই এই সাধারণ শ্রমজীবীর পর্যায়ে দাঁড়ানোটা ভবনাথের মনে লাগে। খালি মেজদার এক ছেলে বি-এ পাশ করেছে। তাকে বলে কয়ে ভবনাথ একসাইজ ডিপার্টমেন্টে ঢুকিয়েছেন। সেই প্রকাশটা যদি কিছু করতে পারে।

বড়বৌদি ঘরে এসে ঢোকেন। আঁচলের খুট দিয়ে মুখ পুঁছে বললেন, 'তারপর কি মনে করে?'

'মেজদা সেই চিঠি দিয়েছিলেন, আমার অংশটা বেচে দিতে ও'র কাছে। সেই ব্যাপারে ভাবলাম একবার আসি।'

শৈবলিনী হাসেন, চাপা বিদ্রূপ খেলে তাঁর মুখে।

'হাসছো কেন?'

'হাসতে নেই?'

'আমি তো আর থাকি না। ভাবছি মেজদা যা বলছেন তাতে রাজী হয়ে যাই।'

'তাই যাও, ঠাকুরপো। তবে তোমার অংশটা ওকে দান করে দাও। টাকাপয়সা তো কিছু পাবে না।'

'বাঃ, আমার অংশের গোটা বাড়িটা ছেড়ে দিচ্ছি...'

'এমনিতেই তো সেখানে সবাই ভোগ-দখল করছে। তারপর তুমি কলকাতায় বাড়ি তুলছো শুনে এখানে যা অবস্থা। সবাই তোমাকে পেলে ছিঁড়ে খাবে। তুমি কেন এসেছো ভব? কাল সকালে বাড়ির সকলে জাগবার আগেই পালাও। আমার কথা শোন।'

'বড়দার কবে থেকে ঘোড়ারোগ হল?'

শৈবলিনী চুপ করে থাকেন। তারপর চারপাশে তাকিয়ে ফিসফিস করেন, 'বিশ্বেস কোম্পানীর কাছে বাড়ি মরগেজ।' আবার চুপ করে থেকে বলেন, 'ভেবেছিলাম ছেলে দুটো লেখাপড়া শিখবে, মানুষ হবে। কিছুই করল না। বিশ্বেস বাবুরা দয়া করে চাকরী দিয়েছে। মাস গেলে তিরিশটা টাকা ঘরে আনে।'

'অন্যর ছেলেরা কিছু করছে টরছে?'

'বড়টা পেশকারী করে। শুনি উপায় আছে। তবে সে তো আলাদা। আর এগারোটা ছেলেমেয়ে? তুমি কালই সকালে চলে যাও ভব। দেখলে কষ্ট হয়। একেবারে গড়িয়ে গড়িয়ে মানুষ হচ্ছে। টাকায় বারো সের দুধ। কত আর পড়ে বলো? তাও ছেলেগুলো দুধ পায় না।'

ভবনাথের চোখের সামনে ফুটে ওঠে কাল সকালের দৃশ্য—ছোট বোনের পরিবার। বারো জোড়া চোখ, তার দিকে চেয়ে আছে, বারো জোড়া হাত তার দিকে বাড়িয়ে।

খালি পা দিয়ে মেজের চকচকে কালো মার্বেলে পা ঘসেন ভবনাথ। কি দরকার আছে তাঁর কলকাতার বাড়িতে মোজেইক মার্বেল, এত যত্ন পরিশ্রম আর স্বপ্ন দেখা। স্বপ্নের শেষ চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন। পাবনা আর বালিগঞ্জের অবস্থান তো দুটো আলাদা সৌরজগতে নয়। গত শতাব্দীর শেষের দিকে পাবনা আর এ শতকের তৃতীয় দশকের বালিগঞ্জ—অনেকটা একই পরিক্রমা না? ভবনাথ আর ভাবতে পারেন না। অবসন্নভাবে বললেন, 'আর প্রকাশ?'

শৈবলিনী অবাক হয়ে তাকালেন. ঠোঁটের দুপাশ অবিকৃত থাকা সত্ত্বেও একটা মৃদু বিদ্রূপ ফুটে ওঠে তাঁর মুখে। নীচু গলায় বলেন, 'কেন শোন নি?' তারপর বিস্মিত ভবনাথের দিকে চোখ পড়তেই বললেন, 'প্রকাশ তো তিন মাস সাসপেণ্ড হয়ে আছে। মেজোবাবু অনেক ধরাধরি করে জেল থেকে বাঁচিয়েছেন।

ভবনাথ একবার ভাবলেন সত্যিই বড়-বৌদির কথা মেনে কাল সকালে কেউ জাগবার আগেই পৈতৃকভবন থেকে কেটে পড়বেন। প্রতাপের চেয়ে দু বছরের বড় প্রকাশকে তিনি নিজের কাছে রেখে ম্যাট্রিক পড়িয়েছেন। পাবনার এডওয়ার্ড কলেজ থেকে পাশ করে বেরোলে চাকরি জোগাড় করে দিলেন। তারপর এই কাণ্ড। নিশ্চয় পুকুর চুরি করে ধরা পড়েছে। ভবনাথ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। নিজের ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে তাঁর ভাবনা ধরে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর একথাও মনে আসে এবারেই শেষ, এবার থেকে পাবনা বাড়ির সঙ্গে তাঁর সব সম্পর্ক ছেদ। আর যত তাড়াতাড়ি ছেদ করা যায় ততই ভাল।

পরদিন ভোরে পালান না ভবনাথ। তবে সকলে উঠবার আগে পাশেই কুমুদ-কাকার বাড়ি চলে গেলেন। কুমুদকাকা খুব আপ্যায়ন করলেন ভবনাথকে। ফুলকো গাওয়া ঘিয়ের লুচি আর আলুভাজা দিয়ে দার্জিলিং চা খেতে ভবনাথের ভালই লাগে। বেশ শান্তির পরিবেশ রিটায়ার্ড ডিস্ট্রি

জজ কুমুদ সেনের বাড়িতে। কলকাতার ল্যান্সডাউন রোডে কুমুদকাকার সম্প্রতি তিনতলা বাড়ি উঠেছে। দেশের বাড়িতে পুজো হয়, আর এ সময়টা সিরাজগঞ্জের টকটকে লাল রুই খুব সস্তা, বাগানে আনাজপাতিও ফলে। কাজেই শীতটা কাটিয়ে যাবেন।

ফর্সা ছোটখাটো শরীর, চাঁদি ভরা টাক। বার্ধক্যে মুখ শুকোতে নাক আরও বাড়ন্ত দেখায়। কুমুদ সেন আরাম কেদারায় শুয়ে শুয়ে বিদ্যাসাগরের চটি পরা ফর্সা নীল শিরা ওঠা পাখানা নাচাতে নাচাতে বলেন, 'এটা তোমার ভব খুব ওয়াইজ ডিসিশন।'

'কিন্তু কাকাবাবু দেশের বাড়ির পাট বোধহয় চুকল।'

'সকলেরই ভাই, সকলেরই। তোমাদের বাড়ির যেটা পরের বাড়ি, সেকেন্ড বিগেস্ট হাউস ইন পাবনা টাউন, তারাও তো বাড়ি বেচে দিয়ে রাসবিহারি এভিনিউ-এ বাড়ি তুলছে। তোমাদের বাড়ির পাশের দু বাড়ি গনু আর ফনু—তাদের বাড়ি উঠছে কান' রোডে—ছাত ঢালাই হচ্ছে।' কথাগুলো বলেন মুখগুলো দিয়ে লুচি চিবোতে চিবোতে, চটিশুদ্ধ পা নাচাতে নাচাতে।

তেমনিভাবে বলতে থাকেন, 'ভব, সারাটা দেশ কলকাতায় উঠে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছো না? এই আমার কথাটা মনে রেখো, আর ক বছরের মধ্যেই দেশের পাট চুকবে। যদ্দিন জমিদারি তদ্দিন মাটি কামড়ে থাকা। আমাদের ভাই জমিটমি নেই, সব খেয়ে

বসে আছি। বড় ছেলেটা এফ, আর সি এস পাশ করে এসেছে। বড়দার ছেলেটাও পার্ক-স্ট্রীটে চেম্বার করছে। তুমি তো সব জানো ভব।'

ভবনাথের এই নিরুদ্বেগ পা-নাচানোয় বোধহয় বিরক্তি আসে। তাঁদের বাড়ির চেহারা, তাঁর বড়দার বোকা চোয়াড়োম, মেজদার বিশাল পরিবার নিয়ে কোন রকমে হেঁচড়ে মেচড়ে ওকালতি করে সংসার চালানো, বিধবা বোনের অপরিসীম দৈন্য এগুলোর পাশে কুমুদ সেনের নিজের ও তার দাদার পরিবারের স্থিতিভিতি এমন আঙুল দিয়ে দেখানোয় বিরক্তি বাড়ে।

'আর এক কাপ চা খাও ভব। ফার্স্ট ক্লাস লপচু টি। তুমি তো দার্জিলিং চা ভালবাস।'

ভবনাথ উঠি উঠি করেও উঠতে পারেন না। দ্বিতীয় কাপ চা-টা ভালই লাগে। কুমুদ চৌধুরীর পা নাচানো হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, 'তোমার দিকটায় একবার গিয়েছিলে?'

'না, যাব।'

'তোমার মেজদা সাইকেলের দোকান দিয়েছে।'

ভবনাথ চমকে ওঠেন, 'সাইকেলের দোকান?'

'ও'র দুই ছেলে দেখে। তোমার দিকের একটা অংশ ভাড়া। গজেনের মেজো ভাই, ওকালতিতে ভাল পশার হয়েছে।' তারপর আবার পা নাচানো শুরু করেন। বেশ একটা চাপল্যের ভাবও লক্ষ্য করা যায় তার মুখে চোখে। সামনের টেবিলে ইংরেজী খবরের কাগজখানা পাট করতে করতে বলেন, 'শুনেছি তোমার ভাড়াটের বড়ছেলের সঙ্গে মেজদার দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ে হবে। তা হলেই ভাল। ঐ একটা ছোকরাই মানুষ হয়েছে, আর সব কটা ভাই বন্দেমাতরম্।'

আহত বিস্ময়ে ভবনাথ সামনের দিকে জানলার বাইরে ফুলন্ত জবাগাছের ঝাড়টার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। তাঁর বাড়ি ভাড়া হয়ে গেছে তাঁর অজ্ঞাতে, সাইকেলের দোকান বসেছে নীচতলায়। আবার বড়বৌদির কথাটা মনে আসে। আবার সামনে প্রশান্ত বার্ধক্যের এই পা-নাচানো আত্মবিশ্বাস এক প্রবল মহাকর্ষে তাঁকে ধরে রাখে।

'এখানে থেকে কি করবে ভব? আমি সব জানি। তোমার বাবা থাকতে তোমাদের বাড়ির মাঠে হাফপ্যান্ট পরে ফুটবল খেলেছি। তুমি তো অনেকদিন বাইরে। ইতিমধ্যে বাড়িটায় ঘুণ ধরে গেছে। কোথায় তুমি মিস্ত্রি লাগাবে? তুমি নিশ্চয় জানো না—পায়খানা নিয়ে ফৌজদারী কেস হয়ে গেছে তোমাদের বাড়ি? সারা পাবনা টাউন জানে। জিজ্ঞেস করো,—তোমাদের বাড়ির [illegible]

আবার চুপ করে থেকে বলতে থাকেন, 'এখানে কোথায় আসবে? এই লাঠালাঠি, হৈ-হল্লা এখান থেকে চলে গিয়ে তুমি খুব ভাল করেছো ভব। তোমার শ্বশুরমশাইকে চিনতাম। আমি যখন বিহারে জামতাড়ায় তখন উনি ছিলেন জামুইয়ে। খুব বিচক্ষণ লোক। শুনলাম তোমার কলকাতার বাড়ি ও'রই পরামর্শে। এ ভেরি ওয়াইজ ডিসিশান।' কথার শেষে আবার পা নাচানো শুরু হয়।

'ইউ নো ইন ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ দেয়ার ইজ এ স্টোরি,...আগে তো সংস্কৃত চর্চাটা ছিল, এখন একবার ঝালিয়ে নিচ্ছি...'

'কাকাবাবু, আমি আজ উঠি।' তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন ভবনাথ।

কুমুদ সেন বোধহয় ক্ষুণ্ণ হলেন। অনেকদিন পর একটা ভাল লোক পেয়েছিলেন কথা বলবার। বললেন, 'আরে অ্যাদ্দিন পর এলে, একটু বসেই যাও। তোমার কাকীমাকে ডাকি।'

'আজকে উঠি, মাত্র দুদিন ছুটি। এলামই যখন একবার বাড়িটা ঘুরে দেখি।'

'রাত্তিরের খাওয়াটা...

'না কাকাবাবু, পরের বার।' ভবনাথ বেরিয়ে যান হাল্কা পায়ে ভারি মেজাজে। কুমুদ চৌধুরী পা-নাচানো বন্ধ করে এক-মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকেন। তিনি জানতেন, আর পরের বার নেই এ ক্ষেত্রে।

দুদিন পর কলকাতায় ফিরে ভবনাথ দেখলেন কুমুদ সেনের কথাই ঠিক। বাড়ি বানানোর ধুম পড়ে গিয়েছে। একদিকে পুকুর বোজানোর কাজ, তার পাশেই বাড়ির ভিত গাঁথা—এরকম দৃশ্য হরদম চোখে পড়ে। ট্রামে না গিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাসবিহারী এভিনিউ ধরে ভবনাথ এগোন। দুধারে ধু ধু মাঠের মধ্যে এক একটা নতুন বাড়ি চারপাশের নির্জনতায় বিশাল। বাঁ-দিকে একটা মঠের চুড়ো, বেল আর চাঁপা-গাছের ধারে পুকুরের পাশে এক সার এক-তলা বাড়ি, দুপাশ একদম ফাঁকা। একটু এগোতেই সাদা ধবধবে কালো চকচকে রেলিং-দেওয়া তেতলা বাড়ি। মার্বেল পাথরের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে এক বৃদ্ধ খবরের কাগজ থেকে মাথা তুলে লক্ষ্য করছিলেন ভবনাথকে। এবার গেটের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসেন। ভবনাথ একটু অবাক হলেন। পাবনার এডওয়ার্ড কলেজের পণ্ডিতমশাই। কতগুলো মানুষের চেহারায় কালের ছাপ কম। কিংবা কাল এক নির্দিষ্ট ছাপ মেরে দেয় কোন কোন মানুষের চেহারায়। তাদের ঠিক বয়স ধরা যায় না। কম বয়সে বয়স্ক লাগে আবার বেশী বয়সে, তারুণ্যের দীপ্তি মরে না। এক এক তারুণ্য-প্রৌঢ়ত্বের প্রদোষে এরা আজীবন ঘোরাফেরা করে। অন্তত জানকীজীবন চাটুজ্জেকে দেখে ভবনাথের এইরকম [illegible]

'খুব অবাক হচ্ছো, ভবনাথ?' মোটা-খাটো, গোলাকার, ফর্সা ভদ্রলোকটি রোল্ড গোল্ডের চশমার ভেতর থেকে গোল গোল চোখ মেলে জিজ্ঞাসা করলেন।

ঠিক এইভাবে কলেজে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতেন ক্লাসে। ভবনাথ এগিয়ে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন।

'বাড়ি করেছেন স্যর?'

ভবনাথের প্রশ্নটা জানকীজীবন লুফে নিলেন। 'বিশ্বাস হচ্ছে না? মাস্টারমশাইয়ের এত বড় বাড়ি! কলেজ থেকে তো কিছু হয়নি, তিনটে ইউনিভার্সিটির হেড এগজামিনার, পেপার সেটার। রিটায়ার করার পর বরোদা ইউনিভার্সিটি নিয়ে গিয়েছিল। এলাহাবাদের অফার এখনও একটা আছে। তা আর এই বয়সে করতে ইচ্ছে করে না। বয়স ত কম হল না, কি বল?'

ভবনাথ এগোবার উপক্রম করতেই বললেন, 'আসলে সাংখ্যের ওপরে আর কোন লোক নেই। তাই ভাবি, মিছিমিছি বসে না থেকে নিয়েই ফেলি। ছেলেটা কিছু করলে না ভব! কিছু করলে না! শাস্ত্রে ঠিকই বলেছে, অবাধ্য পুত্রজনিত দুঃখ আর মৃত-পুত্রের শোক কল্পনা করলে মানুষের অপুত্রক থাকাই ভাল। বুঝেছো ভব।'

বিস্মিত ভবনাথের দিকে চেয়ে বললেন, 'বন্দেমাতরম্ আবার কি। গান্ধী কি বলল, কে ফাঁসি গেল, কে ইংরেজের চাকরি ছেড়ে দিল, তাতে তোর কি বাঁদর! তুই একটা পণ্ডিতের ছেলে। সারা জীবন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোদের মানুষ করছি, তুই সব পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে নেচে বেড়াবি? যার যা কাজ তাই করবে। রাজা দেশ শাসন করবে, ছাত্র অধ্যয়ন করবে। যাদৃশী ভাবনার্যস্য সিদ্ধিভবতি তাদৃশী।'

আবার প্রস্থানোদ্যত ভবনাথের দিকে চেয়ে বললেন, 'একটু বসে যাও ভব। চা খাও। আচ্ছা, প্রকাশটা কি করলে বলতো? আমাদের কলেজের ছাত্র ছিল। একেবারে গোটা পরিবারটার মুখে চুনকালি দিল।'

ভবনাথ দু-হাত তুলে শূন্যে একটা নমস্কার ছুঁড়ে এগোতে থাকেন। একটু গিয়েই তাঁর বাড়ির মাথাটা দেখা দেয় এক ফুলন্ত রাধাচূড়োর মাথার ওপর দিয়ে। বেশ ঝকমক করে ছ কাঠার ওপর সদ্য সাদা রঙে ছোপানো ধবধবে বাড়িখানা, কালো চকচকে রেলিং দেওয়া ব্যালকনিগুলো হাত-ছানি দেয়। এই কি তাঁর স্বপ্ন, বার্ধক্যের বারাণসী, অথবা? অথবা কী?

ভবনাথ আর চিন্তা করেন না। পাইপ আর ইলেকট্রিক মিস্ত্রিদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন।

(ক্রমশঃ)

ছেলেদের জুতোর বিচিত্র ও বিপুল সমাবেশ এখন বাটার দোকানে-দোকানে। ছেলে বলতে—ইস্কুলে যাওয়া ছোটো ছেলে, দৌড়ঝাঁপ করে বেড়ানো দুরন্ত ছেলে, ফ্যাশন-সচেতন তরুণ এবং সেই সঙ্গে বয়স্ক সবাই—সকলের জন্যই হাল আমলের যাবতীয় জুতোর সমাবেশ এখন বাটার দোকানে। সব আলাদা আলাদা রঙের ও আলাদা আলাদা নকশার, যাকে যেটা সাজে। সুন্দর গড়ন, মার্জিত রুচি—সব মিলিয়ে চোখে-পড়া স্বাতন্ত্র্য —যেরকম চাইবেন সেই রকমেরই পাবেন। সেই সঙ্গে প্রতি জোড়া বাটার জুতো আগাগোড়া আরাম দিয়ে গড়া।
পিণ্টু ৭৩
৮.৯৫
জুনিয়র ২৩
১৪.৯৫—২০.৯৫
ওয়েফাইণ্ডার্স ০৩
১৯.৯৫—২৬.৯৫
সব বয়সের
ছেলেদের
জুতো
জুবিলী ৫৯
১৭.৯৫
এক্সক্লুসিভ ৩৫
৪৬.৯৫
স্টেপমাস্টার ৬২
৩০.৯৫
এক্সক্লুসিভ ১৯
৪৬.৯৫
Bata

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কাছের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অবনীন্দ্রনাথ সত্যিই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'দেশকে আত্মনিন্দা থেকে উদ্ধার করেছিলেন' আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে। রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছিলেন অবনীন্দ্রনাথকে য়ুরোপ-আমেরিকায় যেতে যেখানে গুণের আদর আছে। বিদেশের স্বীকৃতি, বিশ্বজনের স্বীকৃতি। রবীন্দ্রনাথকে যদি বিদেশে স্বীকৃতি না দিত, স্বামী বিবেকানন্দকে যদি আমেরিকা স্বীকৃতি না দিত, ইটালীর **Caruso** কে যদি মার্কিন দেশে স্বীকৃতি না দিত তাহলে কি আমরা বিরাট প্রতিভার পরিচয় পেতাম? উত্তরকালে প্রতিভার আলো বয়ে নিয়ে যায় সৎ শিষ্যেরা। তারাই আনে গুরু প্রতিভার স্থায়িত্ব।

অবনীন্দ্রনাথের আর্টের প্রতি আকর্ষণ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মধ্যমপুত্র গিরীন্দ্রনাথ অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথের পিতামহ উনবিংশ শতকে চিত্রশিল্পে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। পিতা গুণেন্দ্রনাথ প্রথম যুগের আর্টস্কুলের একজন কৃতী ছাত্র। পিতামহী ছিলেন অতি স্বাধীনচেতা দৃঢ়চরিত্রের মহিলা। বৈধব্যপ্রাপ্তির পর গিরীন্দ্রনাথের বিধবাপত্নী যোগমায়া দেবী পৃথক হয়ে দুই পুত্র ও দুই কন্যাকে (গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ, কাদম্বিনী ও কুমুদিনী) নিয়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের পাঁচ নম্বর বাড়ীতে উঠে আসেন। এটা ছিল ঠাকুরবাড়ীর বৈঠকখানা বাড়ী।

অবনীন্দ্রনাথের শৈশবে শিক্ষাদীক্ষার মূলভিত্তি রচিত হয় প্রকৃতির পরিবেশে গৃহশিক্ষায় ও আত্মসাধনায়। শিশুকাল থেকে ভৃত্যতন্ত্রের মধ্যে প্রতিপালিত হলেও অতি শিশুকালে সেই মিশমিশে কালো পদ্মদাসীর স্নেহ-মমতার স্মৃতি তাঁর মনে বার্ধক্যেও অমলিন ছিল। একদিন তিনি আমায় বলেছিলেন, 'দাসদাসীদের কথা লিখে রাখলে মানব চরিত্রের বিশেষ এক দিক উদ্ঘাটিত হত।' তিনি দরদ দিয়ে উত্তরকালে লিখেছিলেন পদ্মদাসীর কথা, মঞ্জরীদাসীর কথা, চাকর রামলাল কুণ্ডুর কথা, নবীন বাবুর্চি, তলবালি বাবুর্চির রাধু, ষরিগ্রা, বিপিন, মহাবীর, সন্তোষের কথাও বলতেন। সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি ও গভীর মমত্ববোধ তাঁকে যথার্থ চরিত্র চিত্রাঙ্কনে অপূর্ব সার্থকতা এনে দিয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের কোন আত্মম্ভরিতা, কোন উন্নাসিকতা ছিল না, তাই তো তিনি তাঁর মরমী শিল্পী সত্তা প্রকাশে ও নানা চরিত্র চিত্রণে সার্থকতা আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। আরব্য উপন্যাসের চিত্রাবলীর 'ভিস্তি' আঁকতে শিশুকালের দেখা সেই লোকটির কথা মনে পড়ল যে হাতকাটা নীল জামা পরে, কোমরে খানিকটা লাল শালু জড়িয়ে নাহরের পাশে দাঁড়িয়ে চামড়ার মশোকে জল ভরতো। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের ভিস্তি, যাত্রাদলে সাজার ভিস্তি, বহুরূপীর ভিস্তি দীর্ঘ কালের সীমান্ত ছাড়িয়ে চিত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

শাস্ত্রমতে ঠিক সময়ে ঠাকুর ঘরে গিয়ে রামখড়ি দিয়ে লিখে হাতেখড়ি হয়েছিল সত্য কিন্তু পরবর্তীকালে অবনীন্দ্রনাথেরও রবীন্দ্রনাথের মত নিয়মিত স্কুলের পড়া বেশী দিন ভাগ্যে জোটেনি। সেও এক আকস্মিক অঘটনে। তাও জুটলো এক ইংরেজি শিক্ষকের কাছে অবমাননাকর ও বিনাদোষে বেত্রাঘাত লাভে, আজ যা আইনতঃ অচল। বাড়ীতে বসেই নানা বিদ্যার অনুশীলন চললো। কেন যে চিরাচরিত প্রথামত তাঁরা স্কুলে শিক্ষা লাভের জন্য গেলেন না তা' সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। এত নিয়মতান্ত্রিক বাড়ীর সুব্যবস্থা সত্ত্বেও ছেলেরা কেন স্কুলে যায় না? ভীতি না কৌলীন্য মর্যাদা? যাই হ'ক, তাতে ফল ভালই হয়েছিল। তা না হলে কে পেতো রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথকে? কিছুকাল তিনি সংস্কৃত কলেজে ও ইংরেজি শেখার জন্য সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে বিশেষ ছাত্র হিসেবে পড়াশুনা করেন। এদিকে শিল্পচর্চার পাঠও শুরু হয়ে গেছে বাড়ীতেই। প্রথমপর্বে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিনী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর প্রচেষ্টায় তিনি সাহেব চিত্রকর গিলার্ডি ও পামার সাহেবের কাছে শিল্পের পাঠ গ্রহণ করেন। ভাব ও ভাবনার রাজ্য থেকে তিনি নেমে এলেন জীবনের সত্য সাধনার পৃথিবীতে। এই সময় অবনীন্দ্রনাথ যে সব ছবি আঁকলেন, তাতে পাশ্চাত্য প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সেই সময় তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্য ও পোর্ট্রেট অঙ্কনে পারদর্শিতা লাভ করেন।

একদিন প্রিন্স দ্বারকানাথের গ্রন্থাগারে চিত্রিত কাঠের পাটায় মোড়া মুঘলযুগের সুঅঙ্কিত পাণ্ডুলিপির চিত্রদর্শনে মুগ্ধ হন। মন তাঁর প্রাচীন ভারতের শিল্পরীতি ও অঙ্কন ধারার অনুসন্ধানে ব্রতী হয়। কিন্তু ভারতীয় ধরনের যে ছবি আঁকবেন তার বিষয়বস্তু কি হবে? সেই সমস্যার দুর্গ থেকে উদ্ধারের পথ করে দিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথকে মহাজন পদাবলীর অনবদ্য ভাব ও ভাষার চিত্ররূপ দেবার জন্য রং ও তুলিতে সাধনা সুরু করতে বললেন রবীন্দ্রনাথ। ছবি-লিখিয়ে অবনীন্দ্রনাথ লেগে গেলেন ভাবমধুর শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলার রসমাধুরী ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে। বিশটি ছবি আঁকা হল। তবু ভরিল না চিত্ত। ভক্তজনের চিত্তে সাড়া জাগালো না।

শিল্পের অভিসার চললো। মনের সকল মাধুরী মিশিয়ে, সকল বেদনা, সুখ-দুখের, মিলন বিরহের জোয়ার ভাঁটায় অসীম রসের শিল্পধারা যেন 'শত মুখী হয়ে গঙ্গা সাগরেতে ধায়।' 'মোগল, হিন্দু ও সাহেব' এই তিন আর্ট কোনো ত্রিবেণী সঙ্গমে গিয়ে মিলতে পারলো না। মোগলের আগে তুর্কীরা এদেশে বিজেতা হিসেবে এলো, তারা তুরস্ক শিল্পকেও সঙ্গে আনলে ও মিলিয়ে দিলে বৌদ্ধ শিল্পের শেষ যে ধারা চলছিল তার সঙ্গে। অবনীন্দ্রনাথ এবার দেশী কায়দায় ছবি আঁকার সংকল্প গ্রহণ করলেন। দেখলেন 'মোগল শিল্পের সঙ্গে রাজপুত শিল্পের সংমিশ্রণ।' আপন প্রবৃত্তি অনুসারে নানা বিভিন্ন পথে শিল্পচর্চার উন্মুক্ত পথের সন্ধানে শিল্পী এগিয়ে চলেন। এমন দিন আসবে যখন বিভিন্ন পন্থার হিসেব মিলিয়ে শিল্পের সামগ্রিক ইতিহাস রচিত হবে। নবীন শিল্পসৃষ্টির যুগযন্ত্রণার এক অনন্য অনুভূতি অবনীন্দ্রনাথ অন্তরে অনুভব করলেন। তা' তাঁকে অস্থির করে তুললো। তিনি মনস্থির করলেন 'দেশী মতে ছবি আঁকতে হবে।' তিনি নিবিড় নিদিধ্যাসনে হৃদয়ঙ্গম করলেন 'মানবপ্রকৃতি ও শিল্পপ্রকৃতি এই দুইয়ের মিলনেই শিল্পের উৎপত্তি।' নতুন পথের সন্ধানে বিপ্লবী শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ এক প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখলেন, চিন্তা করলেন, ভাবের উন্মাদনায় রং ও তুলি নিয়ে নব নব

একটি বিশেষ মুহূর্তে শিল্পগুরু
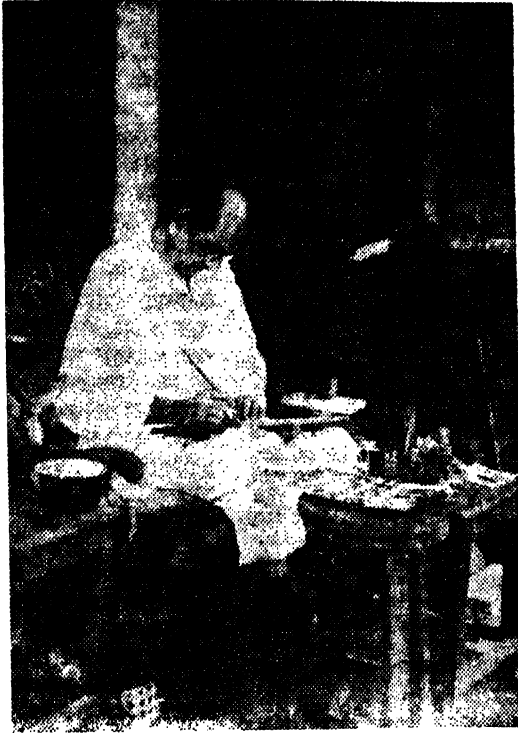
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন। অক্লান্ত সাধনায় রেখার সুকুমারত্বে, বর্ণের চমৎকারিত্বে রূপের অভিনবত্বে গড়ে তুললেন অসামান্য প্রতিভাধর শিল্পী তাঁর আপন শিল্প-সাম্রাজ্য। আখ্যান ও চিত্রের বিষয়বস্তুর ভারতবর্ষে কোন অভাব নেই। মহাভারত, রামায়ণ, অষ্টাদশ পুরাণ, কথাসরিৎ সাগর বৃহৎ কথা, জাতক প্রভৃতি মহাগ্রন্থ থেকে কত না অসংখ্য ছবি হতে পারে, তা অচিন্ত্যনীয়। তাছাড়া পড়ে রয়েছে বিচিত্র এই দেশ ও মনোরম শোভা। অবনীন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেন বুদ্ধ জীবন, কালিদাসের কাব্যসম্ভার থেকে শিল্পের বিষয়বস্তু।

তিনি স্বকীয়তার সন্ধানে স্বদেশী শিল্প-কলার—গান্ধার শিল্প বৌদ্ধ চিত্রকলা, অজন্তার চিত্রকলা, দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের চিত্রকলা, রাজপুত, মুঘল ও গুর্জর চিত্র-কলা, কাংরা উপত্যকার চিত্রকলা, বাংলা পটশিল্পের চিত্রকলার বিশেষ অনুশীলন ও শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর চিত্রের বৈশিষ্ট্যের ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে দেখি যে ছেলে-বয়সে বুড়ো আঙুলের ডগায় আঘাত পেয়ে যে চিহ্ন আমৃত্যু প্রকট ছিল, ছবিতে নরনারী-দের আঙুল লম্বা করে এঁকে তার প্রতি-শোধ নিয়েছেন। তাঁরই কথায় 'ছেলেবেলায় আঙুলের যে মামলায় পার পেয়ে গিয়ে-ছিলাম, তারই শাস্তি বোধ হয় এই বয়সে লম্বা আঙুল এঁকে শুধতে হচ্ছে সাধারণের দরবারে।'

সমগ্র ভারতীয় শিল্পকলা মন্থন করে নিজস্ব স্বকীয়তার সংযোগে তিনি নব্য-ভারতের আপন শিল্পপদ্ধতির উদ্ভাবনা আবিষ্কার ও প্রচলন করেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর Discovery of India মত প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ভারতশিল্পকে আবিষ্কার করেন।

ভারতীয় বোধকে উদ্বুদ্ধ করতে হ্যাভেলের চিন্তাধারার ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়। ভারতীয় বিষয়বস্তুর উপর ভারতীয় পদ্ধতিতে ভারতীয় শিল্পরচনার অগ্রদূত হিসেবে পেলাম অবনীন্দ্রনাথকে ও শিল্প-সমালোচক ডঃ আনন্দকুমার স্বামীকে। ভারতীয় চিন্তাধারার শিল্প সৃষ্টির ধরনকে প্রসারিত করার জন্য স্থাপিত হল ১৯০৭ খৃস্টাব্দে স্যার জন্ উডরফের সভাপতিত্বে 'Indian Society of Oriental Arts', এই সমিতি যথার্থই স্যার জন উডরফের ভাষায় has made the organised attempt at a reversal of the denationalising processes which have been at work. aided the growing national consciousness to reach the point of recovery which we trust, is the commencement of the rennaissance of a true Indian Art".

প্রাচ্য শিল্প সমিতির উদ্যোগে ১৯০৮ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম চিত্র-প্রদর্শনী খোলা হয়। উদ্যমের প্রথম স্ফুরণ স্তিমিত হওয়ায় ১৯০৯ সালে, যখন কলকাতায় কোন শিল্পপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। ১৯১০ সালের শিল্পপ্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু হল চীনা, জাপানী, মোগল ও কাঙরা চিত্রের, মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্রের, ইউরোপীয় ধাঁচে আঁকা বহু শিল্পীর চিত্রের এবং অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যবর্গের আঁকা ভারতীয় চিত্রশিল্পের পুনরভ্যুত্থানের বহু চিত্রাবলী। সমিতির পক্ষ থেকে দুজন কৃতী শিল্পের ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৃত্তির মূল্য হল পনের টাকা। একটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন উডরফ সাহেব অপরটি শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ; প্রথম বৃত্তিটি পান নন্দলাল বসু ও দ্বিতীয়টি সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি।

সেই সময় অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলার বিশেষ সমঝদার ও প্রকৃত অনুরাগী ছিলেন আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ই বি হ্যাভেল, রুদেন-স্টাইন, ডঃ কুমারস্বামী, স্টেলা ক্রেমরিশ, ভগিনী নিবেদিতা, স্যার জন উডরফ ও আরও অনেকে। ভগিনী নিবেদিতা 'মডার্ন রিভিউয়ে' অবনীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় কয়েকটি চিত্রের ওজস্বিনী ভাষায় তার বিশদ পরিচয় ও ভূয়সী প্রশংসাসূচক ব্যাখ্যা করেন।

চিত্রাঙ্কনে স্বদেশীয়তার পরিচয় দিতে অবনীন্দ্রনাথ যতদূর সম্ভব দেশী জিনিস ব্যবহার করতেন। নিজেও নানা দেশীয় রংয়ের প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করেন। নব উদ্ভাবিত অনেক রং উৎরে যায়। গুঁড়ো রং বেটে, গঁদগুলে, গ্লিসারিন মিশিয়ে রংয়ের কেক তৈরি করতেন। গঙ্গামাটিও বিশেষ রংয়ের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সদ্য প্রকা-শিত 'দেশী রং' পুস্তক থেকে রং প্রস্তুতের বিভিন্ন প্রণালী গ্রহণ করেন শিল্পগুরু।

আর্টস্কুলের উপ-অধ্যক্ষ পদ পরিত্যাগ

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ যখন আর্ট-স্কুলের উপ-অধ্যক্ষ ছিলেন সেই সময় কর্তৃ-পক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি কাজে ইস্তফা দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশে সেই সময় প্রবল আন্দোলন হয়। তার প্রমাণ আমরা পাই ১৯১৫ সালের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার ৬ই ডিসেম্বর সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে:—

We see the Secretary of State has been questioned in the House of Commons regarding Mr. Abanindranath Tagore's resignation of the Vice-Principal-

ship of the Calcutta School of Art. Mr. Chamberlain however replied that he had no information and that as the matter was entirely in the hands of the Local Government, he was not prepared to make any enquiry into the matter. We think it was time that the Local Government issued a communique on the subject explaining their position in the matter and giving the facts of the case.

স্বরেন্দ্র রাজনীতিক চেম্বারলেন সাহেব চিরাচরিত পার্লামেন্টের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি I want notice বলে বসে পড়তে পারতেন। সেই সময় বাঙালী সমাজ তাঁর শিল্পের কত অনুরাগী ও তাঁর প্রতি কত গভীর শ্রদ্ধা ও অসীম আস্থা রাখতেন তার প্রমাণ পাই ১৯১৫ সালের ১৩ই ডিসেম্বরের ঐ পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে। তাঁকে সরকারের তরফে অনুরোধ করা হয় যেন তিনি তাঁর ভাইস প্রিন্সিপালের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেন। হেমলেট ছাড়া হেমলেট নাটক অচল তেমনি অবনীন্দ্র বিনা আর্ট স্কুলেরও সমদশা।

> The entire Bengalee community appeals to the patriotism of Mr. Abanindranath Tagore, C.I.E. to withdraw his resignation of the post of Vice-Principal of the Government School of Art. Without him the institution will be like the play of Hamlet with the part of Danish Prince left out. We appeal to Lord Charmichael to play the blessed role of a peace-maker which is so congenial to His Excellency's temperament. The retirement of Mr. Tagore from the School of Art will spell disaster for the cause of Indian Art.

সমগ্র বাঙালী সমাজ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশপ্রেমের প্রতি আবেদন জানাচ্ছে যেন তিনি আর্ট স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল পদ থেকে ইস্তফাপত্র প্রত্যাহার করে নেন। তিনি বিনা ঐ প্রতিষ্ঠান হ্যামলেট নাটকের ডেনিস রাজকুমার হেমলেটের চরিত্র বাদ দিয়ে অভিনয় করার মত হবে। আমরা 'লর্ড কারমাইকেল'কে আবেদন জানাচ্ছি যেন তিনি শান্তি স্থাপনের পুণ্য কাজটি করেন। তাঁর কোমল স্বভাবের অনুপন্থী। শ্রীযুক্ত ঠাকুরের আর্টস্কুল থেকে বিদায় ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে দারুণ বিপর্যয় আনবে।

এমনি ছিল তৎকালীন বঙ্গসমাজে অবনীন্দ্রনাথের শক্তিমত্তা ও প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা। এই ঘটনা আজ থেকে ছাপ্পান্ন বছর পূর্বের কথা। তখন অবনীন্দ্রনাথের বয়স চুয়াল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা বহু ছবি বিক্রী হয়ে গেছে, বহু ছবি নিজেই দান করেছেন, তা' সারা ভারতবর্ষের রাজারাজড়া, বা ধনীব্যক্তি, শিল্পরসিকের কাছে বা আর্ট গ্যালারীতে ছড়িয়ে আছে। তাঁর অনন্য সৃষ্টি 'রাজনর্তকী', 'সাজাহানের মৃত্যু' প্রভৃতি দেখতে দেখতে বিস্মিত হতে হয়, তাঁর বহু চিত্র মুদ্রিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, বহু চিত্র আজও অপ্রকাশিত ও অনাবিষ্কৃত আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক : ...

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন প্রতিভা আবিষ্কারের এক অদ্বিতীয় পুরুষ। এ বিষয়ে তাঁর অসামান্য কৃতকৃত্যতা উত্তরকালে উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেছিল। যেমন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর আবিষ্কার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ, দর্শনে সর্বপল্লী রাধাকিষন, তেমনি শিল্প ক্ষেত্রেও তিনি অবনীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করেন। খয়রার রাজার বদান্যতায় ও অনুগ্রহে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট হয়। তারই মধ্যে ভারতীয় চিত্রকলার অধ্যাপনার জন্য খয়রার রাণী বাগেশ্বরী দেবীর নামানুসারে 'রাণী বাগেশ্বরী অধ্যাপকের' পদের সৃষ্টি হয়। ১৯২১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডি-লিট' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি 'বাগেশ্বরী অধ্যাপক' পদ অলংকৃত করেছিলেন। এই সময় তিনি খেয়াল খুসীমত উনত্রিশটি বক্তৃতা দেন। সেই সময় 'বঙ্গবাণী', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় কিছু কিছু সেই লেখা প্রকাশিত হয়। উত্তরকালে প্রবন্ধগুলি 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। এই উনত্রিশটি প্রবন্ধে শিল্পাচার্য তাঁর অননুকরণীয় আপন স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাষায় শিল্পতত্ত্বের ভাবময়, রসময়, রূপময় গভীর অন্তরের বাণী ও প্রকরণের রহস্য উদ্ঘাটিত করেছেন। রূপতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে সত্যই আমরা পেয়েছি 'ছবি লিখিয়ে অবিন ঠাকুর'কে।

শিল্প শিক্ষার বিস্তার :

চিত্র চিত্রন ছাড়াও তিনি প্রথম শিল্পবিষয়ে ১৯০৯ খৃস্টাব্দে 'ভারত-শিল্প' নামক পুস্তক প্রথম প্রকাশ করেন। ১৯২৯ সালে 'চিত্রাক্ষর' নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। ঐ বছরই তিনি 'বাগেশ্বরী বক্তৃতামালা' সমাপ্ত করেন। পরে 'সহজ চিত্রশিক্ষা' ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ, ভারত শিল্পে মূর্তি এক বিশেষ শিল্প বিষয়ের রচনার এক বিরাট কীর্তি।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পক্ষেত্রে স্বকীয়তা ও কৃতিত্বের মূলে রয়েছে—তিনি একজন জাত শিল্পী যিনি প্রগতির ও নবঅভ্যুদয়ের পথে অগ্রসর হতে দৃঢ়সংকল্প ও নিজ সাধনাকে সিদ্ধির পথে আনতে অসংখ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অনুশীলনে সতত আগ্রহশীল ছিলেন। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর মতে—

> 'there is wrong notion about him (Tagore). People often refer his works to those of revivalists. But Tagore, as a matter of fact, vitalised many aspects of weakness in picture-making which existed in old form. His conception of pictorial themes hardly encroached into the domain of Moghul or Rajput miniatures, yet the spirit of his conception of pictorial themes was strictly Indian in Character".

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

আপনার স্বাস্থ্য আপনার নিজের হাতে

এই শিরোনামায় একজন সোভিয়েত বিজ্ঞানীর লেখা একটি প্রবন্ধ আমাদের হাতে এসেছে। বিজ্ঞানীর নাম নিকোলাই আমোসোভ। তিনি য়ুক্রেন বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে এই বিজ্ঞানী এমন কতকগুলো কথা বলেছেন যা আমাদের প্রত্যেকেরই জানা দরকার। কিছুটা সংক্ষেপে বিজ্ঞানের কথায় পাঠকদের কাছে প্রবন্ধটি উপস্থিত করছি।

শ্রী আমোসোভ বলছেন—কি ধনী কি দরিদ্র, বিশ্বের সব দেশেই স্বাস্থ্যের ব্যাপারটি এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যা দুশ্চিন্তার বিষয়। অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন কারণে। কোনো কোনো দেশে স্বাস্থ্যরক্ষার অপরিহার্য উপকরণের অভাব, কোনো কোনো দেশে প্রাচুর্য।

কেউ কেউ আপত্তি করে বলতে পারেন, তা কেন হবে, মানুষের গড় পরমায়ু তো বেড়েছে, আর পরমায়ু বাড়াটাই তো দেশের মানুষের ভালো স্বাস্থ্যের লক্ষণ—নয় কি? নিজেদের স্তোকবাক্য দিয়ে ভুলিয়ে লাভ নেই। দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা মানেই সুস্থদেহে বেঁচে থাকা নয়। দীর্ঘ পরমায়ু অনেকের কাছেই যন্ত্রণার কারণ হয়ে ওঠে, তাঁরা বেঁচে থাকেন অনবরত অসুখ ভুগতে ভুগতে। হাসপাতালগুলোতে ঠাঁই পাওয়া দায়, ডাক্তারখানাগুলো রোগীতে উপচে পড়ছে। রোগীর সংখ্যা বেড়ে চলার দিকে। শীঘ্রই এমন দিন আসা অসম্ভব নয় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়েও রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার হয়ে উঠবে উচ্চতর মাত্রায়। পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যায়, বিশ্ব মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ বছরের অধিক বয়স্কদের মধ্যে মৃত্যুর হার বেড়ে চলার দিকে। সত্যি কথা যে গড় পরমায়ু এখনো বাড়ছে কিন্তু তা খুবই ধীরে ধীরে। আর সম্প্রতিকালে গড় পরমায়ু যে বাড়তে তার একমাত্র কারণ, শিশু-মৃত্যুর হার এখন খুবই কম।

তাহলে আমাদের করণীয় কী?

সবচেয়ে আগে যে-কাজটি করা দরকার তা হচ্ছে স্বাস্থ্য পীড়া ও ওষুধ সম্পর্কে আমাদের সমস্ত ধ্যানধারণা আমূল পালটানো।

স্বাস্থ্যের গুরুত্ব

স্বাস্থ্যের গুরুত্ব যে কতখানি সে বিষয়ে বিশদ করে বলার দরকার নেই। স্বাস্থ্যের গুরুত্ব সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু যে-জিনিসটি স্বীকার করেন না তা এই যে নিজের স্বাস্থ্য নিজের হাতে। তাঁদের ধারণা, স্বাস্থ্য হচ্ছে 'ভগবানের দান' আজ আছে কাল নেই। আসল কথাটা হচ্ছে এই যে মানুষ নিজেই নিজের স্বাস্থ্যের রক্ষক ও স্রষ্টা। চিকিৎসা-বিজ্ঞান তাকে শুধু সাহায্য করতে পারে মাত্র, সস্তা মেঠাইয়ের মতো তার হাতে স্বাস্থ্য কখনো তুলে দিতে পারে না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ডাক পড়ে তখনই যখন স্বাস্থ্য খোয়া গিয়েছে, শরীর ব্যাধিগ্রস্ত। কিন্তু এই সময়েও পুরোপুরি ওষুধের ওপরে নির্ভর করা চলে না। রোগীর নিজেরও খানিকটা চেষ্টা থাকা দরকার, খানিকটা ইচ্ছা-শক্তি, নইলে স্বাস্থ্যোদ্ধার কিছুতেই সম্ভব নয়।

কোন অবস্থাকে বলব সুস্থ অবস্থা? কোন অবস্থাকে পীড়া? শুনে মনে হতে পারে বোকার মতো প্রশ্ন করা হচ্ছে, যে কেউ বুঝতে পারে কোনটা সুস্থ অবস্থা কোনটা পীড়া। ব্যাপারটা এত সহজ নয়। মানুষ এমনভাবে তৈরী যে তার শরীর বিকল হওয়ার রেখাপাত তার মনের ওপরে যথোপযুক্ত মাত্রায় নয়। বাস্তব অবস্থা ও তৎসম্পর্কিত ধারণার মধ্যে ফারাক থেকে যায়। কখনো কখনো এমন ঘটে যে মানুষটি অসুখে পড়েছে কিন্তু সে তা টের পায়নি। আবার কখনো কখনো এমনও ঘটে যে মানুষটি সুস্থ কিন্তু তার ধারণা সে অসুখে পড়েছে। সভ্যতা, প্রায়োগিক অগ্রগতি, জনস্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান এমন অনেক বিশৃঙ্খলা থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছে যার দরুন সে এক সময়ে স্বল্পায়ু হত। সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করেছে নতুন নতুন অসুখের কারণও। এই অসুখগুলো এমনিতে প্রাণঘাতী নয় কিন্তু অল্পে অল্পে মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। যেমন, স্নায়ু বিকার, অনিদ্রা, অতি-উত্তেজনা, অ্যালার্জি, হাঁপানী ইত্যাদি। এসব রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এখন প্রায় অগুনতি।

আসল কথা এই যে শরীরের দিক থেকে মানুষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়েছে, মনের দিক থেকে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা খানিকটা হারিয়ে বসেছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সমস্ত চিন্তাভাবনার দায় চিকিৎসকের হাতে তুলে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত।

আর এই সমস্যার মোকাবিলায় (রোগীর সংখ্যা বেড়ে চলা) চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে-কাজটি করা হচ্ছে তা হচ্ছে শুধু হাসপাতাল ও ক্লিনিকের সংখ্যা বাড়িয়ে চলা, আরো অধিক সংখ্যক চিকিৎসক তৈরি করা, চিকিৎসার পদ্ধতি উন্নত করা। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিক থেকে ঠিক কাজই করা হচ্ছে। কিন্তু আসল সমস্যার সমাধান এভাবে হবার নয়।

মানুষকে অবশ্যই স্বাস্থ্যবান করে তুলতে হবে। মানুষকে অবশ্যই স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠতে হবে। অসুখ হওয়াটা মানুষের শরীরের ধর্ম নয়। বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক অগ্রগতির অবশ্যম্ভাবী ফল অসুখ, তাও ঠিক নয়।

নিজের স্বাস্থ্যের জন্যে মানুষ নিজেই দায়ী। সে নিজেই নিজের স্বাস্থ্যের রক্ষক ও স্রষ্টা। সেজন্যে অবশ্যই চাই তার নিজের চেষ্টা ও উদ্যোগ—আন্তরিক ও একান্ত।

ভিত্তিহীন বিশ্বাস

নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি মানুষের দায়িত্বহীন মনোভাবের মূলে কিন্তু রয়েছে আপাতবিচারে একটি মহৎ উদ্দেশ্য। তা হচ্ছে নতুন নতুন ওষুধের প্রচার এবং সাধারণভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতি। ওষুধের চমকপ্রদ নিরাময়ক্ষমতা সম্পর্কে একটি ভিত্তিহীন বিশ্বাস মানুষের মনে বাসা বেঁধেছে। ফলে রোগ প্রতিরোধ করার জন্যে তার শরীরের—বিশেষ করে মনের—ক্ষমতা যে জোরদার করা দরকার, সেদিকে তার কোনো নজর নেই।

মানুষকে বলা হয়, শরীরের বিন্দুমাত্র গড়বড় টের পেলেই দৃকপাত না করে ডাক্তারের কাছে হাজির হওয়াটাই সুবুদ্ধির পরিচয়। আবার সব সময়ে যে ডাক্তারের কাছে হাজির হবার প্রয়োজন আছে তাও নয়। হাতের কাছে অজস্র ওষুধ। কী হলে পরে কী ওষুধ, কী না-হলে পরে কী ওষুধ, বিজ্ঞাপন মারফৎ তা জানিয়ে দেবার ব্যাপক ব্যবস্থা। মুড়ি-মুড়কির চেয়েও সস্তা দাম এসব ওষুধের, মুড়ি-মুড়কির চেয়েও নির্বিকারভাবে উদরসাৎ করা হচ্ছে। কিন্তু একথা একবারও মনে রাখা হয় না যে একটি পেটেন্ট ওষুধ যতোই উপকারী হোক, সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোনোদিকে তার দরুন কিছুটা অপকারও ঘটে যেতে পারে (যাকে বলা হয় সাইড এফেক্ট)। এবং এই অন্যদিকের অপকার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূল অসুখের চেয়েও মারাত্মক হয়ে পড়াটা অসম্ভব নয়।

সবচেয়ে আগে দরকার অসুখ সম্পর্কে ভয় কাটিয়ে ওঠা। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বর্তমান স্তরে অধিকাংশ অসুখই সুস্থ মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক নয়। কাজেই অসুখ হয়েছে কি হয়নি, শরীরের মধ্যে থেকে তার সংকেত পাবার জন্যে কান পেতে

থাকার কোনো প্রয়োজন নেই, আঁতিপাঁতি করে তার লক্ষণ অনুসন্ধানও নিষ্প্রয়োজন। শরীরের কোথাও সামান্য একটু যন্ত্রণা হয়েছে কি ছোটো ডাক্তারের কাছে, সামান্য একটু অস্বাভাবিক লক্ষণ ধরা পড়েছে কি কিনে আনো ওষুধ, বিছানায় শুয়ে থাকো আর ওষুধ গিলে চলো—এমনটি যেন কখনো না ঘটে (বলে রাখা ভালো যে আজকের দিনে বিজ্ঞানের জোরে যে-সব পেটেন্ট ওষুধ বাজারের চলছে তার বেশির ভাগেই কোনো কাজ হয় না)। শরীরে যদি একটু যন্ত্রণা হয় তা সেরেও যাবে। শরীরই তাকে সারিয়ে তুলবে। শরীরে কোথাও একটু মোচড় দিয়ে উঠেছে, কোথাও একটু অস্বস্তি হচ্ছে, তাই নিয়েই যদি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে হয় তাহলে এই ব্যতিব্যস্ততাই হয়ে দাঁড়াতে পারে একটা অসুখের লক্ষণ, বিনা কারণে খানিকটা ভোগান্তি ছাড়া যা থেকে অন্য কোনো ফললাভ হয় না।

এই পর্যন্ত পড়ে কেউ কেউ হয়তো বলে উঠবেন, 'আমরা তো শুনেছি কোনো অসুখকেই তুচ্ছ করা উচিত নয়!' ঠিক কথা. অসুখ তুচ্ছ করা উচিত নয়। তাই বলে শরীরে সামান্য একটু মোচড় টের পাওয়া গেলেই 'অসুখ! অসুখ' বলে আতঙ্কিত হয়ে ওঠা—তাও যেন না ঘটে। লক্ষণটি যদি এক-সপ্তাহ বা দু-সপ্তাহ ধরে বজায় থাকে তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার।

তাহলে আসল কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই, অসুখকে ভয় করে চলার কোনো দরকার নেই, শরীরটাকে সর্বপ্রকারে সুস্থই অবস্থায় রেখে চলতে হবে।

তিনটি বিষয়

শরীরটাকে সর্বপ্রকারে সুস্থই রাখা—এটা তো আর কথায় কথা নয়, বেশ খানিকটা চেষ্টাও সেজন্যে থাকা দরকার। কোন কোন বিষয়ে চেষ্টা? সর্বোপরি তিনটি বিষয়ে: ব্যায়াম, পরিমিত আহার, যথোচিত বিশ্রাম ও বিনোদন।

প্রথমে ধরা যাক ব্যায়াম মানুষের শরীরবটাই এমন যে তার মজুদ ভান্ডারটি প্রায় অফুরন্ত। এই ভান্ডারটিকে কাজে লাগাবার উপায় হচ্ছে ব্যায়াম। হৃদপিন্ডকে দিয়ে আরো দশগুণ কাজ করিয়ে নেওয়া যায়, ফুসফুসের ক্ষমতা আরো দশগুণ বাড়িয়ে তোলা যায়, একইভাবে কিডনির সক্রিয়তা ও মাংসপেশীর ক্ষমতাও। তাই বলে চট করে কিছু হবার নয়, সারা জীবন ধরে ব্যায়াম করে চলতে হবে। ঢিলে দিলেই নাগালের বাইরে। আবার ফিরে পেতে হলে প্রচণ্ডভাবে চেষ্টা করা দরকার। অনেক সময়ে প্রচন্ড চেষ্টাতেও আর ফিরে পাওয়া যায় না।

সাবধানী চিকিৎসক হয়তো এখানে বলে উঠবেন, 'শরীরটাকে অমন হেনস্থা করার দরকারটা কি বাপু, বাড়াবাড়ি ভালো নয়।' এই একটি ক্ষেত্রে সাবধানী চিকিৎসকের পরামর্শে কান না দিলেও ফল খারাপ হবে না এটুকু বলা যেতে পারে। ভয় পাবেন না, কষে ব্যায়াম করুন, দর দর করে ঘাম ঝরুক সারা শরীর থেকে, দম ফুরিয়ে যাক। একদিনে না হোক, সইরে সইয়ে। সাধারণ একজন সুস্থ মানুষের মাস ছয়েক সময় লাগা উচিত ব্যায়ামের সাহায্যে শরীরটাকে পূর্ণমাত্রায় সুস্থ করে তোলার অবস্থায় পৌঁছতে।

যাঁরা কোনো সামান্য ধরণের ক্রনিক অসুখে ভুগছেন, বা যেখানে অসুখ যতোটা তার চেয়েও বেশি অসুখ হয়েছে এই ধারণা।—সেখানে ব্যায়াম হচ্ছে মোক্ষম ওষুধ। তবে এমন ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ব্যায়াম করাটা ভালো। অন্ততপক্ষে কতখানি ব্যায়াম করতে হবে সেই পরামর্শটুকু। স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের কোনো পরোয়া করার দরকার নেই।

কী ধরনের ব্যায়াম? বলতে পারা যায়, যা খুশি। এমন কোনো ব্যায়াম যাতে গোটা শরীরটা নাড়াচাড়া যায়। সাঁতার হতে পারে, দৌড় হতে পারে, মাটি কোপানো হলেও আপত্তি নেই। ব্যায়ামটা সকালবেলা সেরে নেওয়াই সুবিধের। আর যতোবার পারা যায় ততোবার, যতোক্ষণ পারা যায় ততোক্ষণ—হাঁটা, জোরে জোরে হাঁটা।

অতঃপর—পরিমিত আহার।

সাধারণত মানুষ খায় অনেক বেশি, যতোখানি তার প্রয়োজন তার চেয়ে। অভ্যেসটা শুরু হয় ছেলেবেলা থেকেই। শরীরটা ছেলেবেলা থেকেই অতিভোজনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ফলে ভোজন মানুষের কাছে আনন্দের ব্যাপার।

মানুষের খিদে অনেকটা এই খাওয়ার অভ্যেস থেকে। খিদে যতোটা না শরীরের তার চেয়ে বেশি মনের। আসলে দেখা উচিত শরীরের ওজন ঠিক থাকছে কিনা। যতোটুকু খেলে শরীরের ওজন ঠিক থাকে ততোটুকু খাওয়াটাই ঠিক খাওয়া। শরীরের ওজন ঠিক থাকছে কিনা সেটা ঘন ঘন যাচাই করে নেওয়া দরকার। বাজারের ওজন যন্ত্রে অনেক সময়ে চার্ট লাগানো থাকে—উচ্চতা কত হলে স্বাভাবিক ওজন কত হওয়া উচিত তার নির্দেশ। বলা হয়ে থাকে, উচ্চতা যতো সেন্টিমিটার সেই সংখ্যাটি থেকে ১০০ বাদ দিলে যা পাওয়া যায় ততো কিলোগ্রাম হচ্ছে স্বাভাবিক ওজন। ভয় পাবেন না, শারীরিক মেহনৎ করে যদি আপনাকে জীবিকা অর্জন করতে না হয় তাহলে স্বাভাবিক ওজন আরো ৩-৫ কিলোগ্রাম কম হলেও ক্ষতি নেই।

কী খাবেন? আমাদের শরীরের জন্যে দরকার প্রোটিন, ভিটামিন ও ছিটেফোঁটা আরো কয়েকটি উপাদান। এগুলো আমরা আমাদের খাদ্য থেকে পাই, সেইসঙ্গে কিছু ক্যালোরিও। মনে রাখবেন শরীর সুস্থই রাখতে হলে যে দুটি না হলেই নয় তা হচ্ছে ভিটামিন ও প্রোটিন। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ফল, ভাত বা রুটিসহ—সামর্থ্যের বাইরে না হলে এই হচ্ছে খাদ্য। পেট ভরে খাবার দরকার নেই। যতোটুকু খেলে ওজন ঠিক থাকে ততোটুকু। কিছুদিনের চেষ্টায় নিজেই নিজের খাদ্যের পরিমাণ ঠিক করে নিতে পারবেন। খিদে পেলে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। খিদে নিয়েও সমান তেজে কাজ করা চলে। অল্পবয়সীরা ও মেহনতী মানুষেরা মিষ্টি ও স্নেহযুক্ত খাদ্য খেতে পারেন, অন্যদের বাদ দেওয়াই ভালো। পাতে নুন পারতপক্ষে খাবেন না।

তারপরে আসে বিশ্রাম ও বিনোদনের কথা। কিন্তু এই বিশ্রাম ও বিনোদনও এমন হওয়া উচিত যাতে তৎপরতার প্রয়োজন। আলস্যের জীবন আর যাই হোক স্বাস্থ্য ও পরমায়ু লাভের উপায় নয়। কাজ করতে করতে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ুক। তাতে স্বাস্থ্য ভালই থাকবে, মনও। তাই বলে ঘুম কমিয়ে সময় বাঁচাতে যাবেন না। ঘুম অবশ্যই চাই, একজন সুস্থ মানুষের যতোখানি প্রয়োজন। ঘুম যদি না আসে! এই ভয় কখনো মনের মধ্যে পুষে রাখবেন না। ঘুমোতে না পারার চেয়েও ঘুমোতে না পারার ভয় অনেক বেশি ক্ষতিকর।

স্বাস্থ্যচর্চার একটি বিধি সব বয়সের পক্ষেই দরকার, বিশেষ করে বেশি বয়সের পক্ষে তো বটেই। কেননা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের মজুদ ভান্ডার অনেকখানি খরচ হয়ে যায়। স্বাস্থ্যচর্চা মজুদ ভান্ডারকে ফুরোতে দেয় না। যেমন সুন্দর থাকার জন্যে তেমনি সুস্থ থাকার জন্যেও খানিকটা কষ্ট করতেই হবে। কিন্তু তার পুরস্কারটাও কম নয়। শরীরটা বেন টগবগ

...য়ানিকের ...
...নি যে বাজার...
... খাদ্যদ্রব্য আমাদের...
...নেকগুলোতেই রাসায়নিকের সাহায্যে গন্ধ
... রং যোগ করা হয়েছে? এমন কি ওষুধের
...ড়ি ও ক্যাপসুলেও এই কৃত্রিম রং তৈরি
...রা হয়?

আমাদের শরীরের ভিতরটা দূষিত ...চ্ছে তিন উপায়ে—(১) নিশ্বাসের সঙ্গে বাইরের দূষিত হাওয়াকে শরীরের ভিতরে নিয়ে, (২) খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে ভেজাল খেয়ে (৩) পেটেন্ট ওষুধ খেয়ে। প্রথম কারণটিকে দূর করবার জন্যে রীতিমতো ...সোরগোল তোলা হচ্ছে বটে, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণটি যদি দূর না হয় তাহলে প্রথম কারণটি দূর করায় কোনো ফল নেই।

এখনো পর্যন্ত আমরা ভালো করে জানি না পানীয় খাদ্য ও নানাজাতীয় পেটেন্ট ওষুধের সঙ্গে যে-সব অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক (যেগুলো যুক্ত করা হয় শুধু গন্ধ রং ইত্যাদি তৈরী করার জন্যে) আমাদের শরীরের মধ্যে যাচ্ছে সেগুলোর অপকারিতা কতখানি। কিন্তু দেখা গিয়েছে পরিবেশ দূষিত হওয়ার দরুণ মাছের শরীরে প্রজননগত বৈকল্যও ঘটে। মানুষের বেলাতেও না ঘটার কোনো কারণ নেই।

আমাদের জীবনে ...

ওষুধের বড়ি কখন আমরা না খাই! ঘুম ডেকে আনার জন্য ওষুধ, ঘুম তাড়াবার জন্যে ওষুধ। শরীর মোটা করার জন্যে ওষুধ, শরীর রোগা করার জন্যে ওষুধ। বাচ্চা হওয়ার জন্যে ওষুধ, বাচ্চা না-হওয়ার জন্যে ওষুধ। যন্ত্রণা কমানোর জন্যে ওষুধ। উত্তেজনা কমাবার জন্যে ওষুধ। উত্তেজিত থাকার জন্যে ওষুধ। স্নায়ু শান্ত করার জন্যে ওষুধ। প্রয়োজনের শেষ নেই, ওষুধেরও শেষ নেই। ঘুমের ওষুধ না খেয়ে অনেকে ঘুমোতেই পারেন না। পেটের গোলমাল নেই তা সত্ত্বেও নিয়মিত পেট পরিষ্কার করার ওষুধ খেয়ে চলেছেন এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয়। আর মহিলাদের স্লিমিং পিলের বাজার তো বেশ গরম।

এ ব্যাপার চলবেই। যুদ্ধ-পরবর্তী কালে রাসায়নিক জগতে একটা বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছে বলা চলে। আমাদের খাদ্যদ্রব্যকে আরো মনোহর আরো সুগন্ধী করে তোলার জন্যে, আমাদের শরীরের সমস্ত রকমের গ্লানি দূর করার জন্যে অজস্র রাসায়নিক তৈরি হয়ে চলেছে। আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও যিনি শরীরের মধ্যে কোনো গ্লানি খুঁজে পাবেন না তিনি অন্ততপক্ষে শরীরটাকে

... জন্তুও ... মতো অবস্থা তৈরি ... রিকের অসুখ করলে সেটা ... চিকিৎসকের উদ্বেগের বিষয়। ... স্বাস্থ্য রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের। ... স্বাস্থ্য বিপন্ন করে এমন সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে সরকার আইন রচনা করতে পারেন। এই দায়িত্ব পালন করতে হলে ব্যক্তিগত চিকিৎসকের সঙ্গে সরকারের সুষ্ঠু যোগাযোগ থাকা চাই। কিন্তু দুয়ের মাঝখানে রয়েছে যে নিরেট এক আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাকে নড়ানো চড়ানো প্রায় এক অসম্ভব ব্যাপার। অতএব ভেজালের কারবার মহানন্দে চলছে, চলবে।

এই দুটি লেখা পাঠকদের কাছে উপস্থিত করার পরে অয়স্কান্তর পরামর্শঃ নিয়মিত ব্যায়াম করুন, যতো পারেন হাঁটুন, অসুখের দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে ঠাঁই দেবেন না, নির্দিষ্ট অসুখ না করলে ওষুধ খেতে যাবেন না, কৃত্রিম রং ও কৃত্রিম গন্ধ (বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যে) এড়িয়ে চলুন, বাজারের তৈরী খাদ্যদ্রব্যের ওপরে যতো কম নির্ভর করতে পারেন ততো ভালো।

—অয়স্কান্ত

অঙ্গনা

পৃথিবীর অনেক দেশেই নারীরাই এখন নিজেদের নিয়ামক। অন্যান্য দেশের পক্ষে একথা যতখানি সত্য তার চেয়ে বেশী সত্য সমাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষে। সে দেশে নারীসমাজ শুধু নিজেদেরই নিয়ামক নয় সেই সঙ্গে সমগ্র জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের এই ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়। সরাসরি দেশের শাসনব্যবস্থায় তাঁরা যে শুধু অংশগ্রহণ করেন তাই নয় একই সঙ্গে তাঁদের ধ্যানধারণা এবং চিন্তাধারার বলিষ্ঠ রূপায়ণে তাঁরা অবাধ সুযোগের অধিকারী। এই সুযোগের মূলকথা হল যে, তাঁরা সমাজজীবনের গোড়ার প্রশ্নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পূর্ব জার্মানীতে এটি সার্থক হয়ে উঠেছে নারীসমাজের সার্থক সহযোগিতায় শিক্ষাব্যবস্থার পরামর্শদাতা কমিটি গঠনে। এই কমিটির শতকরা ৭৫ জনই মহিলা। এমনিভাবে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছেন দেশের আরও নানা সংস্থায়। দেশের বাণিজ্যবিষয়ক সংস্থায় তাঁদের সংখ্যা শতকরা ৫০জন। সমবায় প্রতিষ্ঠান বলতে গেলে নারীসমাজের একচেটিয়া। দেশের আইনজীবীদের মধ্যে তাঁদের স্থান খুবই উল্লেখযোগ্য। বিচার ক্ষেত্রে তাঁরা এখনো পুরুষদের ছাড়িয়ে যেতে না পারলেও তাঁদের অগ্রগতি যে কোন দেশের নারীসমাজেরই ঈর্ষা উদ্রেক করবে। এই সঙ্গে দেশের শ্রম এবং কৃষিবিষয়ক উপদেষ্টামণ্ডলীতে তাঁদের যোগ্যতা গৃহীত হয়েছে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে।

এই সংখ্যাগুলি থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, এদেশে নারীসমাজ খুবই মর্যাদার আসনে অধীষ্ঠিত। স্বাভাবিকভাবেই এর প্রতিফলন ঘটে দেশের সর্বোচ্চ প্রতিনিধি পরিষদে। এদেশের সর্বোচ্চ পরিষদের নাম হল পিপলস্ চেম্বার।৫০০ ডেপুটি এই পরিষদের মোট সদস্য। আর প্রতি ২৫ জনে একজন সদস্য হলেন মহিলা। এছাড়া মহিলাদের একটি সংসদীয় দলও আছে। সর্বোচ্চপরিষদ থেকে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছেন অসংখ্য স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে—জেলা, শহর এবং বিভিন্ন অঞ্চলে। দুজন মহিলা হলেন সর্বোচ্চ পরিষদের প্রেসিডিয়ামের সদস্য।

এ সব ডেপুটিরা নির্বাচিত হন চার বছরের জন্য। গোপন ব্যালট পদ্ধতিতে যে কোন নাগরিক একুশ বছরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকারী। আঠার বছর বয়সে তাঁরা ভোটাধিকার পায়। ১৯৪৯ সালে পিপলস চেম্বারে মহিলা সদস্য-সংখ্যা ছিল ৫৩জন। এই সংখ্যা ইতিমধ্যে অনেক বেড়ে গেছে। সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যে প্রতি চারজনে একজন মহিলা ডেপুটি নেওয়ার কথা ছিল বর্তমানে মহিলা ডেপুটির সংখ্যা তার চেয়েও অনেক বেশী। জেলা পর্যায়ে কোথাও কোথাও এই ডেপুটিরা পুরুষদের প্রায় অর্ধেক।

পূর্ব জার্মানীর নির্বাচনব্যবস্থাও বেশ অভিনব। এ দেশে নির্বাচনে দলই যে একমাত্র প্রার্থী মনোয়নের অধিকারী তা নয় দেশের সর্বত্র অজস্র সুসংগঠিত সংস্থা নির্বাচনে প্রার্থী দিয়ে থাকে। এর ফলে দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে এই সমস্ত প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়ে তাঁরা বিশেষভাবে শাসনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারেন। এর ফলে অনেক নাগরিক দেশের শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত হয়। ফলে দেশ ও রাষ্ট্রশক্তি আরও জোরদার হয়ে ওঠে।

এই নির্বাচন কিন্তু খুব সহজ ব্যাপার নয়। মনোনয়নপত্র দাখিলের পর প্রার্থীকে যেতে হয় ভোটদাতাদের দরবারে। ভোটদাতারা নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ। নানাভাবে তাঁরা প্রার্থীকে বাজিয়ে নেন এবং যাঁর উপর তাদের কোন আস্থা নেই তাকে সরাসরি নাকচ করে দেন। নির্বাচনের দিন ব্যালটে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যায়। তবে এই নির্বাচন শুধুমাত্র মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যাঁরা এমনিতেই ভোটারদের সভা সমাবেশে নাকচ হয়ে যান তাঁরা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ পান না। এভাবেই ভোটদাতারা চার বছরের জন্য নিশ্চিন্ত হন।

নির্বাচনে জিতলেই বাজীমাৎ হয়ে যায় না। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব আরও সুকঠোর। তাদের নিয়মিত জনসংযোগ বজায় রাখতে হয়। নির্বাচনে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করে নির্বাচকদের সামনে নিয়মিত হাজিরা দিতে হয়। এই হাজিরা শুধু সভা-সমাবেশের মাধ্যমে নয় যে কর্মক্ষেত্রে তিনি নিযুক্ত রয়েছেন সেখান থেকে সরাসরি তিনি যোগাযোগ রক্ষা করেন। এ ব্যাপারে প্রতিনিধিদের সাহায্য করেন আঞ্চলিক কমিটিগুলো। তারাই সুযোগ এবং সুবিধা মতন ভোটদাতাদের সামনে তাঁকে নিয়ে আসেন। নাগরিকরা তাঁকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং নিজেদের অভাব-অভিযোগগুলি তাঁর সামনে তুলে ধরেন। প্রশ্নগুলি সাধারণতঃ হয় মহিলাদের জীবনের উন্নয়ন এবং পারিবারিক সমস্যা সংক্রান্ত। কর্মীমায়েদের জিজ্ঞাসা হলো সন্তানের লালনপালনের ব্যাপারে রাষ্ট্রের নানা বিধিব্যবস্থার সুষ্ঠু বিন্যাস সংক্রান্ত। এই সঙ্গে জীবনধারণের উন্নতি প্রসঙ্গে তাদের যদি কোনো বক্তব্য থাকে তাও তাঁরা নিজেদের প্রতিনিধি মারফত রাষ্ট্রের গোচরে আনতে পারেন।

জনজীবনকে সুবিন্যস্ত করার জন্য নাগরিকরা প্রতিনিধি ছাড়াও নিজেরা নানাভাবে অংশ নিয়ে থাকেন। সকল নাগরিকের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো এবং স্বার্থসংরক্ষণের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনবোধে সেসব বহুল পরিবর্তনও করা যায়। তারপর তা আইনে পরিণত করে সাধারণ মানুষের মঙ্গলার্থে নিয়োজিত হয়। তখন তার মধ্যে আর নাগরিকদের স্বার্থের পরিপন্থী কিছুই থাকে না। এর ফলে নাগরিকরা যেমন নিজেদের সুবিধা-অসুবিধা প্রত্যক্ষভাবে দেখার সুযোগ পান তেমনি রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের সঙ্গেও নিবিড় নৈকট্যবোধ করেন। এক কথায় তাঁরা নিজেরাই হলেন নিজেদের নিয়ামক। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে নতুন পরিবারবিধি চালু হওয়ার আগে এরকম আলোচনা সভার ব্যবস্থা হয়েছিল ৩৪ হাজার। এতে অংশ গ্রহণ করেন প্রায় ৮ লক্ষ নাগরিক। তার মধ্যে আড়াই হাজার আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য।

মহিলাদের মধ্যে যাঁরা নানা জীবিকায় রয়েছেন তাঁরাই এসব আলোচনায় [illegible] অংশ নিয়ে থাকেন। সবসমেত পরিবার বিধির উপর ২৪ হাজার সংশোধনী পড়ে এর মধ্যে অধিকাংশই নতুন আইনের [illegible] গৃহীত হয়। মহিলাদের স্বার্থরক্ষা ব্যাপারে এদেশের কেন্দ্রীয় মহিলা সংস্থার উদ্যোগই সর্বাধিক। রাষ্ট্র থেকেও এ[illegible] উদ্দেশ্যে এই সংস্থাকে উৎসাহিত করা হ[illegible]

এই সুষম ব্যবস্থার ফলে সে দেশে নারী সমাজ প্রগতির এক নতুন আলো[illegible] উদ্ভাসিত। পৃথিবীর অনেক দেশেই এই[illegible] সুযোগসুবিধা [illegible] কিন্তু মনে [illegible] হচ্ছে [illegible] বিবেকানন্দের [illegible] স্মরণীয়। [illegible] করে [illegible] অর্থাৎ [illegible] চাইলে [illegible] এদিকে [illegible] হবে [illegible]

সুবর্ণরেখার এপারের গ্রাম গোপী-ভপুর—মোহনপুর ওপারে। আদিবাসী ...তাল ওরাং, মুণ্ডা মাঝিদের বসতি সে ... গাঁয়ে। আখের ক্ষেত, ফুটি তরমুজের ...গচা, আম কাঁঠালের বাগান ঘেরা গাঁয়ের ...মানা। আলবাঁধা ধানের ক্ষেত, শিল্পীর ...পুণ হাতে গড়া মডেলের মতন দেখতে। ...মাটি গোলা রঙে মাটির কুঁড়ে ঘরে, ...পাপুছা উঠোনে আদিম মানুষের ...ন্দর্যবোধের ছোঁয়া। গেরস্তের হাঁস-...রগী ঘুরে বেড়ায় উঠোনে উঠোনে। ...লাল ছেলে মোষের পিঠে চড়ে গরু ছাগল ...রিয়ে বেড়ায় জঙ্গালের আশপাশে।

শহরের আবিলতা থেকে অনেক দূরে ...বর্ণরেখার তীরে তীরে অশান্ত বর্ষার ...দাম আবেগের মত মনের সুখে ঘর ...বেঁধেছে মুণ্ডা মাঝিরা। গাঁয়ের বাসিন্দা ...তে তারাই, বিচার আচার সব তাদের ...তে। গাঁউটিয়ার [illegible] মেনে চলতে হয় ...া গাঁয়ের লোককে।

মোহনপুরের [illegible] গোপীবল্লভ-...রের কেন্দ্রু [illegible] বন্ধুত্ব ...কদিনের। [illegible] কুলিকামিন ...গাড়ে—সাঙ্গাত [illegible] টান ...দের বহুদিনের। [illegible] পুজায়, খরা পরবে একসাথে মাদল বাজিয়ে হেড়ে না খেলে চলত না তাদের।

বাদ বাধে কুলিকামিনের রুজি-রোজগারির বাঁটোয়ারা নিয়ে—মুখ [illegible]খা-দেখি তাদের বন্ধ সেই থেকে। দু' গাঁয়ের লোকেরও কথা বন্ধ। পথেঘাটে হাটেবাজারে দু' গাঁয়ের লোক ঝগড়া করে ছুতোনাতায়। মোহনপুর গোপীবল্লভপুরের দুষমন সেই থেকে।

বর্ষণমুখর আষাঢ়ের আকাশ ভেঙে ঝর্ণাধারার মত সারা বিকেল ধরে অঝোরে বৃষ্টি ঝরে পড়ছে। জ্যৈষ্ঠের খরতাপে পোড়ামাটিতে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে না পড়তে সবটুকু শুষে নেয় সে একচুমুকে। শালগাছের নূতন পাতায় বৃষ্টির ফোঁটা দাগ কেটে গেছে পাতা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে। সুবর্ণরেখার বালুচরে বৃষ্টির জল পেতে দিয়েছে সমতল বালুর বিছানা। খাল বিলে, নদীনালায় সোনাব্যাঙ মনের সুখে গান ধরেছে—ক্যাঁকর ক্যাঁকর করে।

আষাঢ়ের পড়ন্ত বেলায় ঘরের দাওয়ায় বসে সমরু মাঝি একদৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিল পাহাড়ের গা বেয়ে সুবর্ণরেখার শুকনো বুকে পাহাড়ী ঢল নেমেছে। ছেলেবেলা থেকেই সে দেখে আসছে সুবর্ণরেখার জল ছুটে যায় সাগরের পানে। উজান বেয়ে সাগরের জল কোনদিন আসেনি তার শূন্য বুক ভরে দিতে। সুবর্ণরেখার বালুচরে দুকূল ভরে স্রোত বইতে দেখে সমরু ভাবতে থাকে নদীর মত যৌবনের দুকূল ভরা—সারীর মুখ। গোপীবল্লভপুরের ধানকলে কামিনের কাজ করে সে। কুলিসর্দার ডমরু মাঝির নেকনজর কেন্দ্রুর মেয়ে সারীর দিকে, অনেকের মুখে শুনেছে সে।

রোববারের হাটে এক ফাঁকে চাপারি বগলে পাশ কাটিয়ে সারী ইসারায় তাকে জানিয়েছে—আজকের রাতে তার সঙ্গে দেখা করবে বোঙাবুড়োর ঘাটে। চাঁদনী রাতে নদীর পথে আধক্রোশ পথ ভেঙে যেতে মেয়েদের ডর লাগে। ভাম, ফেউ আর চিতা-বাঘের দৌরাত্ম্য আছে পথে। মেঘকালো আকাশের দিকে তাকিয়ে সমরু ভাবে সে কি সারীকে এগিয়ে আনবে। গোপীবল্লভপুরের কারও নজরে পড়লে এভাবে গোপনে মেলা-মেশা তাদের বন্ধ হয়ে যাবে।

কতদিন সে কাছে পায়নি সারীকে। দু' মাঝির মুখ দেখাদেখি বন্ধের পর, তাদেরও দেখাশোনা বন্ধ। মোহনপুরের হাটে সারীর খোঁজে দু' মাসের উপর ঘুর ঘুর করে বেড়িয়েছে সে। বোঙাবুড়োর

অঙ্গনা

পৃথিবীর অনেক দেশেই নারীরাই এখন নিজেদের নিয়ামক। অন্যান্য দেশের পক্ষে একথা যতখানি সত্য তার চেয়ে বেশী সত্য সমাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষে। সে দেশে নারীসমাজ শুধু নিজেদেরই নিয়ামক নয় সেই সঙ্গে সমগ্র জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের এই ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়। সরাসরি দেশের শাসনব্যবস্থায় তাঁরা যে শুধু অংশগ্রহণ করেন তাই নয় একই সঙ্গে তাঁদের ধ্যানধারণা এবং চিন্তাধারার বলিষ্ঠ রূপায়ণে তাঁরা অবাধ সুযোগের অধিকারী। এই সুযোগের মূলকথা হল যে, তাঁরা সমাজজীবনের গোড়ার প্রশ্নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পূর্ব জার্মানীতে এটি সার্থক হয়ে উঠেছে নারীসমাজের সার্থক সহযোগিতায় শিক্ষাব্যবস্থার পরামর্শদাতা কমিটি গঠনে। এই কমিটির শতকরা ৭৫ জনই মহিলা। এমনিভাবে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছেন দেশের আরও নানা সংস্থায়। দেশের বাণিজ্যবিষয়ক সংস্থায় তাঁদের সংখ্যা শতকরা ৫০জন! সমবায় প্রতিষ্ঠান বলতে গেলে নারীসমাজের একচেটিয়া। দেশের আইনজীবীদের মধ্যে তাঁদের স্থান খুবই উল্লেখযোগ্য। বিচার ক্ষেত্রে তাঁরা এখনো পুরুষদের ছাড়িয়ে যেতে না পারলেও তাঁদের অগ্রগতি যে কোন দেশের নারীসমাজেরই ঈর্ষা উদ্রেক করবে। এই সঙ্গে দেশের শ্রম এবং কৃষিবিষয়ক উপদেষ্টামন্ডলীতে তাঁদের যোগ্যতা গৃহীত হয়েছে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে।

এই সংখ্যাগুলি থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, এদেশে নারীসমাজ খুবই মর্যাদার আসনে অধীষ্ঠিত। স্বাভাবিক ভাবেই এর প্রতিফলন ঘটে দেশের সর্বোচ্চ প্রতিনিধি পরিষদে। এদেশের সর্বোচ্চ পরিষদের নাম হল পিপলস্ চেম্বার।৫০০ ডেপুটি এই পরিষদের মোট সদস্য। আর প্রতি ২৫ জনে একজন সদস্য হলেন মহিলা। এছাড়া মহিলাদের একটি সংসদীয় দলও আছে। সর্বোচ্চপরিষদ থেকে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছেন অসংখ্য স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে—জেলা, শহর এবং বিভিন্ন অঞ্চলে। দুজন মহিলা হলেন সর্বোচ্চ পরিষদের প্রেসিডিয়ামের সদস্য।

এ সব ডেপুটিরা নির্বাচিত হন চার বছরের জন্য। গোপন ব্যালট পদ্ধতিতে যে কোন নাগরিক একুশ বছরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকারী। আঠার বছর বয়সে তাঁরা ভোটাধিকার পায়। ১৯৭৯ সালে পিপলস চেম্বারে মহিলা সদস্য-সংখ্যা ছিল ৫৩জন। এই সংখ্যা ইতিমধ্যে অনেক বেড়ে গেছে। সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যে প্রতি চারজনে একজন মহিলা ডেপুটি নেওয়ার কথা ছিল বর্তমানে মহিলা ডেপুটির সংখ্যা তার চেয়েও অনেক বেশী। জেলা পর্যায়ে কোথাও কোথাও এই ডেপুটিরা পুরুষদের প্রায় অর্ধেক।

পূর্ব জার্মানীর নির্বাচনব্যবস্থাও বেশ অভিনব। এ দেশে নির্বাচনে দলই যে একমাত্র প্রার্থী মনোয়নের অধিকারী তা নয় দেশের সর্বত্র অজস্র সুসংগঠিত সংস্থা নির্বাচনে প্রার্থী দিয়ে থাকে। এর ফলে দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে এই সমস্ত প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়ে তাঁরা বিশেষভাবে শাসনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারেন। এর ফলে অনেক নাগরিক দেশের শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত হয়। ফলে দেশ ও রাষ্ট্রশক্তি আরও জোরদার হয়ে ওঠে।

এই নির্বাচন কিন্তু খুব সহজ ব্যাপার নয়। মনোনয়নপত্র দাখিলের পর প্রার্থীকে যেতে হয় ভোটদাতাদের দরবারে। ভোটদাতারা নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ। নানাভাবে তাঁরা প্রার্থীকে বাজিয়ে নেন এবং যাঁর উপর তাদের কোন আস্থা নেই তাকে সরাসরি নাকচ করে দেন। নির্বাচনের দিন ব্যালটে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যায়। তবে এই নির্বাচন শুধুমাত্র মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যাঁরা এমনিতেই ভোটারদের সভা সমাবেশে নাকচ হয়ে যান তাঁরা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ পান না। এভাবেই ভোটদাতারা চার বছরের জন্য নিশ্চিন্ত হন।

নির্বাচনে জিতলেই বাজীমাৎ হয়ে যায় না। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব আরও সুকঠোর। তাদের নিয়মিত জনসংযোগ বজায় রাখতে হয়। নির্বাচনে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করে নির্বাচকদের সামনে নিয়মিত হাজিরা দিতে হয়। এই হাজিরা শুধু সভা-সমাবেশের মাধ্যমে নয় যে কর্মক্ষেত্রে তিনি নিযুক্ত রয়েছেন সেখান থেকে সরাসরি তিনি যোগাযোগ রক্ষা করেন। এ ব্যাপারে প্রতিনিধিদের সাহায্য করেন আঞ্চলিক কমিটিগুলো। তারাই সুযোগ এবং সুবিধা মতন ভোটদাতাদের সামনে তাঁকে নিয়ে আসেন। নাগরিকরা তাঁকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং নিজেদের অভাব-অভিযোগগুলি তাঁর সামনে তুলে ধরেন। প্রশ্নগুলি সাধারণতঃ হয় মহিলাদের জীবনের উন্নয়ন এবং পারিবারিক সমস্যা সংক্রান্ত। কর্মীমায়েদের জিজ্ঞাসা হলো সন্তানের লালনপালনের ব্যাপারে রাষ্ট্রের নানা বিধিব্যবস্থার সুষ্ঠু বিন্যাস সংক্রান্ত। এই সঙ্গে জীবনধারণের উন্নতি প্রসঙ্গে তাদের যদি কোনো বক্তব্য থাকে তাও তাঁরা নিজেদের প্রতিনি[ধি] মারফত রাষ্ট্রের গোচরে আনতে পারেন।

জনজীবনকে সুবিন্যস্ত করার জন্য নাগরিকরা প্রতিনিধি ছাড়াও নিজেরা নানা ভাবে অংশ নিয়ে থাকেন। সকল নাগরিকের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো এবং স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা নি[য়ে] তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনবোধে সেদ[...] বহুল পরিবর্তনও করা যায়। তারপর [...] আইনে পরিণত করে সাধারণ মানুষে[র] মঙ্গলার্থে নিয়োজিত হয়। তখন তার মধ্যে আর নাগরিকদের স্বার্থের পরিপন্থী কিছু থাকে না। এর ফলে নাগরিকরা যেম[ন] নিজেদের সুবিধা-অসুবিধা প্রত্যক্ষভা[বে] দেখার সুযোগ পান তেমনি রাষ্ট্রীয় আই[ন] কানুনের সঙ্গেও নিবিড় নৈকট্যবোধ করেন এক কথায় তাঁরা নিজেরাই হলেন নিজে[দের] নিয়ামক। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় [...] নতুন পরিবারবিধি চালু হওয়ার আ[গে] এরকম আলোচনা সভার ব্যবস্থা হয়েছি[ল] ৩৪ হাজার। এতে অংশ গ্রহণ করেন [...] ৮ লক্ষ নাগরিক। তার মধ্যে আড়াই হা[জার] আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল শুধু মহিলাদের জন্য।

মহিলাদের মধ্যে যাঁরা নানা জীবি[কায়] রয়েছেন তাঁরাই এসব আলোচনায় [...] অংশ নিয়ে থাকেন। সবসমেত পরিব[ার] বিধির উপর ২৪ হাজার সংশোধনী প[...] এর মধ্যে অধিকাংশই নতুন আইনের [...] গৃহীত হয়। মহিলাদের স্বার্থস[...] ব্যাপারে এদেশের কেন্দ্রীয় মহিলা সং[স্থার] উদ্যোগই সর্বাধিক। রাষ্ট্র থেকেও [...] উদ্দেশ্যে এই সংস্থাকে উৎসাহিত করা [...]

এই সুষম ব্যবস্থার ফলে সে দে[শের] নারী সমাজ প্রগতির এক নতুন আ[লোকে] উদ্ভাসিত। পৃথিবীর অনেক দেশেই এ[...] সুযোগসুবিধা থেকে মহিলারা ব[ঞ্চিত] কিন্তু মনে রাখতে হবে যে দেশে ন[ারীরা] হচ্ছে আসল শক্তি। এ প্রসঙ্গে [...] বিবেকানন্দের সেই বাণীটি বিশে[ষ] স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন, এক পক্ষ [...] করে পক্ষীর উত্থান কখনও সম্ভব [নয়] অর্থাৎ নারী জাতিকে পেছনে ফেলে এ[...] চাইলে আমরা চিরকাল পিছটানেই এগিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে কখনই হবে না।

—[illegible]

সুবর্ণরেখার এপারের গ্রাম গোপী-ভপুর—মোহনপুর ওপারে। আদিবাসী তাল ওরাং, মুণ্ডা মাঝিদের বসতি সে গাঁয়ে। আখের ক্ষেত, ফুটি তরমুজের গাচা, আম কাঁঠালের বাগান ঘেরা গাঁয়ের মানা। আলবাঁধা ধানের ক্ষেত, শিল্পীর পুণ হাতে গড়া মডেলের মতন দেখতে। মাটি গোলা রঙে মাটির কুঁড়ে ঘরে, াপুছা উঠোনে আদিম মানুষের ন্দর্যবোধের ছোঁয়া। গেরস্তের হাঁস-গী ঘুরে বেড়ায় উঠোনে উঠোনে। াল ছেলে মোষের পিঠে চড়ে গরু ছাগল য়ে বেড়ায় জঙ্গলের আশপাশে।

শহরের আবিলতা থেকে অনেক দূরে র্ণরেখার তীরে তীরে অশান্ত বর্ষার াম আবেগের মত মনের সুখে ঘর ধেছে মুণ্ডা মাঝিরা। গাঁয়ের বাসিন্দা তে তারাই, বিচার আচার সব তাদের ত। গাঁউটিয়ার কথা মেনে চলতে হয় া গাঁয়ের লোককে।

মোহনপুরের ঝগড়ু মাঝি, গোপীবল্লভ-রের কেনদ্রু মাঝির ভেতর বন্ধুত্ব নকদিনের। মন্বন্তরে, কুলিকামিন াড়ে—সাঙাত তারা। নাড়ীর টান ের বহুদিনের। বোঙা পুজায়, খরা পরবে একসাথে মাদল বাজিয়ে হেড়ে না খেলে চলত না তাদের।

বাদ বাধে কুলিকামিনের রুজি-রোজগারির বাঁটোয়ারা নিয়ে—মুখ দেখা-দেখি তাদের বন্ধ সেই থেকে। দু' গাঁয়ের লোকেরও কথা বন্ধ। পথেঘাটে হাটেবাজারে দু' গাঁয়ের লোক ঝগড়া করে ছুতোনাতায়। মোহনপুর গোপীবল্লভপুরের দুষমন সেই থেকে।

বর্ষণমুখর আষাঢ়ের আকাশ ভেঙে ঝর্ণাধারার মত সারা বিকেল ধরে অঝোরে বৃষ্টি ঝরে পড়ছে। জ্যৈষ্ঠের খরতাপে পোড়ামাটিতে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে না পড়তে সবটুকু শুষে নেয় সে একচুমুকে। শালগাছের নুতন পাতায় বৃষ্টির ফোঁটা দাগ কেটে গেছে পাতা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে। সুবর্ণরেখার বালুচরে বৃষ্টির জল পেতে দিয়েছে সমতল বালুর বিছানা। খাল বিলে, নদীনালায় সোনাব্যাঙ মনের সুখে গান ধরেছে—ক্যাকর ক্যাকর করে।

আষাঢ়ের পড়ন্ত বেলায় ঘরের দাওয়ায় বসে সমরু মাঝি একদৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিল পাহাড়ের গা বেয়ে সুবর্ণরেখার শুকনো বুকে পাহাড়ী ঢল নেমেছে। ছেলেবেলা থেকেই সে দেখে আসছে সুবর্ণরেখার জল ছুটে যায় সাগরের পানে। উজান বেয়ে সাগরের জল কোনদিন আসেনি তার শূন্য বুক ভরে দিতে। সুবর্ণরেখার বালুচরে দুকূল ভরে স্রোত বইতে দেখে সমরু ভাবতে থাকে নদীর মত যৌবনের দুকূল ভরা—সারীর মুখ। গোপীবল্লভপুরের ধানকলে কামিনের কাজ করে সে। কুলিসর্দার জমরু মাঝির নেকনজর কেনদ্রুর মেয়ে সারীর দিকে, অনেকের মুখে শুনেছে সে।

রোববারের হাটে এক ফাঁকে চাপ্পারি বগলে পাশ কাটিয়ে সারী ইসারায় তাকে জানিয়েছে—আজকের রাতে তার সঙ্গে দেখা করবে বোঙাবুড়োর ঘাটে। চাঁদনী রাতে নদীর পথে আধক্রোশ পথ ভেঙে যেতে মেয়েদের ডর লাগে। ভাম, ফেউ আর চিতা-বাঘের দৌরাত্ম্য আছে পথে। মেঘকালো আকাশের দিকে তাকিয়ে সমরু ভাবে সে কি সারীকে এগিয়ে আনবে। গোপীবল্লভপুরের কারও নজরে পড়লে এভাবে গোপনে মেলা-মেশা তাদের বন্ধ হয়ে যাবে।

কতদিন সে কাছে পায়নি সারীকে। দু' মাঝির মুখ দেখাদেখি বন্ধের পর, তাদেরও দেখাশোনা বন্ধ। মোহনপুরের হাটে সারীর খোঁজে দু' মাসের উপর ঘুর ঘুর করে বেড়িয়েছে সে। বোঙাবুড়োর

দোয়ায় তার দেখা পেয়েছে আজ। কিন্তু যদি সে রাতে না আসতে পারে? এমনি চাঁদনিরাত, প্রথম বর্ষার মাটির সোঁদা গন্ধ, সব মাটি হয়ে যাবে তাহলে। সারীর নিটোল স্তনের ঘ্রাণ পায় সমরু পোড়ামাটির সোঁদা গন্ধে। বুড়ো মাঝির চোখ এড়িয়ে সে শাল গাছের গোড়ায় দু' হাড়ি হেঁড়ে পুঁতে রাখে সারীর জন্যে।

সন্ধ্যের আগে পা টিপে টিপে সমরু বুনো তিতির ধরতে ফাঁদ পেতেছে শাল গাছের আড়ালে। আগুনে ঝলসানো মাংসের চাটে নুন ঝাল মিশিয়ে পেট ভরে হেঁড়ে খাবে তারা দুজনে। দিনের আলো পড়ে এলেও তিতিরের দেখা নেই। তাই সে গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসে দানা ছিটিয়ে রাখে ফাঁদের আশপাশে। মাটিতে মুখ চেপে, গামছায় মুখ ঢেকে ডাকতে থাকে তিতিরের ডাক।

ডাকতে ডাকতে সমরুর গলা ভেঙে আসে। এক ফাঁকে সে দেখতে পায় জোড়া তিতির তার ডাক শুনে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ছুটে আসছে দানার গন্ধে। মাটির সাথে মিশে সমরু শুয়ে পড়ে গামছা ঢেকে। ঝটপটানি শুনে সে বুঝতে পারে, জোড়া তিতির আটকে গেছে তার পাতা ফাঁদে। চটপট মাটি ছেড়ে উঠে শালের ডাল মেরে তিতিরের ঝটপটানি বন্ধ করে দেয় সে। ফাঁদ উঠিয়ে ঘরে ফিরে ঝগড়ু মাঝিকে সে বলে—'বুড়াদাদা, বনমুরগী ধরতে ফাঁদ পাততে যাব নয়া গাঁয়ে—সুবর্ণ রেখার তীরে।' তাকে সাবধান করে দিয়ে বুড়ো মাঝি বলে—গোপীবল্লভপুরের দুষমনদের নজরে পড়িস নি যেন।'

তীর কাঁড় হাতে, ঝাঁকড়া চুলে শালের ফুটন্ত লতা জড়িয়ে, রঙিন গামছা কোমরে বেঁধে, সমরু সাজে অভিসার সাজে। আজকের রাতের বাসর জমজমাট করতে সে হাতে তুলে নেয় তিতির জোড়া, হেঁড়ের হাঁড়ি আর শালপাতার চুট্টা। কতদিন সে আদর করেনি সারীকে। তার কথা ভাবতে ভাবতে, এক চুমুকে শেষ করে ফেলে অর্ধেকটা হেঁড়ের হাঁড়ি।

বীরদর্পে নরম বালুতে পা ফেলে সমরু ধরে বোঙাবুড়োর ঘাটের পথ। পথে কোমরের টাঙ্গি তাক করে ছুঁড়ে মারে ছুটন্ত খরার দিকে। টাঙ্গির ঘায়ে খরার রক্তে ভিজে ওঠে সুবর্ণরেখার ভেজা বালু। কোমরে জড়ানো গামছায় খরা বেঁধে, কোমরে টাঙ্গি গুঁজে, কাঁধে তীর ধনুক ফেলে, সমরু জোর কদমে পা চালায় ঘাটের দিকে। একাদশীর আধো আলো ভরা চাঁদ উঁকি দিতে থাকে মেঘের বুক চিরে হাসির ঝলক মেলে।

ছুটতে ছুটতে সমরু এগোতে থাকে তার অভিসারিকার খোঁজে। পথে কেয়ার ঝাড় থেকে কেয়া ফুল তুলে বানিয়ে নেয় হাতের বালা, মাথার বেণী—সারীকে সে উপহার দেবে রাতের আঁধারে। হেঁড়ের নেশা তার রক্ত জাগিয়ে তোলে আদিমপুরুষের [illegible]

করে দেখবে কোথায় তার অফুরন্ত প্রাণ-মাতানোর উৎস।

বোঙাবুড়োর ঘাটের কাছে আবছা অন্ধকারে মানুষের ছায়া পড়তে দেখে, দূরে থেকে সমরু বোঝে, বাদল দিনের পড়ন্ত বেলার সুযোগ মোটেই অপব্যয় করেনি সারী। আঁধার নামতে না নামতে সে জোরে পা চালিয়ে এসেছে গোপীবল্লভপুরের ঘাট পার হয়ে। হাঁটু জল ভেঙে, দ' এড়িয়ে নদী পার হতে তার সময় লাগেনি মোটেও।

কাছে এসে চুপি চুপি সারীকে শাল জঙ্গলের ভেতর তার সাথে আসতে বলে সমরু। ডালপালা জড় করে চকমকি ঠুকে আগুন জেবলে তারা বসে গাছের গোড়ায়। ঝলসানো তিতিরের সাথে হেঁড়ে খেয়ে দুজনে মেতে ওঠে ঘর বাঁধার কল্পনা জাল বোনায়। নেশায় রঙীন চোখ মেলে সারী বলে,—'তুই আমায় তোর ঘরে লে'চল সমরু। বুড়া মাঝিঠো বড় জ্বালায় আমাকে। সর্দারের সাথে সাঙা দেবে বোলে।'

বুকের কাছে সারীকে টেনে এনে, আদরে আদরে তার কালোচিকন মুখ রাঙিয়ে সমরু বলে—'বোলবে কেনে, বুড়াঠারে টাঙ্গির ঘায় সাবাড় করে ফেলবো তোর সাঙা দিলে।'

'ও কথা মুখেও আনিস না সমরু। বুড়াবেটা জিন। তার হাড় বের করা কব্জি তোর কলজে ছিঁড়ে খাবে।'

আদরে সোহাগে সমরু জানায় সে চাকরী করবে পলটনে। ছ' মাস বাদে হাতে পয়সা জমিয়ে সারীকে সাঙ্গা করে নিয়ে যাবে তার সাথে। সারীর হাত দুখানি হাতে তুলে আদর করে পরিয়ে দেয় ফুলের বালা, খোঁপায় গুঁজে দেয় কেয়ার বেণী। বনজোছনার ফাঁকে ফাঁকে দুজনে জড়াজড়ি করে চলতে থাকে ঘাটের দিকে।

পাতামাড়ানোর শব্দ শুনে দু কান সজাগ করে কোমরের টাঙ্গি তাক করে সমরু। ভয় পেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে সারী। শব্দ দূরে মিলিয়ে যায়। স্রোতের শব্দ পেয়ে বোঝে বনের প্রান্তে পেঁছে গেছে তারা। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ে সুবর্ণরেখার দু তীরে। ছলছল কলকল রবে নদী ছুটে চলে সাগরের পানে। মহুয়া গাছের পাশে সারীকে বুকে জড়িয়ে সমরু নিঃশেষে উজাড় করে ঢেলে দেয় মাদকতার পরশ। সারী কেঁপে উঠে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সমরুর বলিষ্ঠ দেহ। হাসতে হাসতে চাঁদের আলো ঢলে পড়ে নদীর জলে—আদিম নারী পুরুষের কামনার উৎসের সন্ধানে।

বিকেল থেকে সারীকে আনচান করতে দেখেছে ডমরু সর্দার। দিনের আলো পড়তে না পড়তে নদী তীরে মিলের কোয়ার্টারে বসে সারীকে হন্তদন্ত হয়ে নদী পার হতে দেখে, সন্দেহ জাগে তার। টাঙ্গি হাতে শিকার খোঁজার ছলে, নদী পেরিয়ে সে পিছু ধরে সারীর। বুড়াবোঙার ঘাটের কাছে তাকে থামতে দেখে গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসে পড়ে সর্দার মাঝি।

ঢুকতে দেখে পা টিপে টিপে দূরে থেকে তাদের পিছু নেয় সে। আগুনের আঁচে সমরুকে চিনতে পেরে, গা ঢাকা দিতে দূরে সরে থাকে সে। তাদের রাতের অভিসারও তার চোখ এড়ায়নি। এ কান ও কান করে কেনদ্রু মাঝির কানে তোলে ডমরু সে রাতের কথা। বুড়াকে টাকার লোভ দেখিয়ে সারীকে সাঙা করতে চায় সে। রোববারের হাটে সারীর জন্যে কিনে আনে পেতলের বাউটি ঝর্ণা সাড়ী, বুড়া মাঝির জন্যে আনে ডিবা ভর্তি গাঁজার ছিলিম। আস্ত ছাগল কেটে মাংস তোলে বুড়া মাঝির বাড়ী। বস্তীর ওরাং মাঝিদের নেমন্তন্ন করে আনে তার বাড়ীতে সাঙার কথা পাকা করতে। গাঁজার ঝোঁকে বুড়া বলে—'সর্দার বটেক ডমরু মাঝি। শালগাছের সমান তার কোমরের বেড়, মোষের মতন ছাতির ঘের। সারীর যুগ্যি বর বটেক ডোমরু।'

কেনদ্রুর কথায় সায় দিয়ে হাঁ হাঁ করে ওঠে ওরাং মাঝিরা। ডোমরুর সাথে সারীর সাঙা পাকা হয়ে যায়। ফাগুনে সাঙার দিন ঠিক হয়। বান ডাকে হেড়িয়া আর চোলাই মহুয়ার। মাংস ভাত খেয়ে মাঝিরা জঙ্গলের ঝুপড়িতে ফেরে রাতে। ঝমরু সারীকে দেখার লোভ সামলাতে না পেরে, দল ছেড়ে ফিরে আসে কেনদ্রু মাঝির বাড়ী। ঘরে ঢুকে সে দেখতে পায় সারীর রণচণ্ডী মূর্তি। মাটিতে আছাড় খেয়ে বুড়া মাঝির পা দুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে সে বলছে—'আমারে মেরে ফেলিস না তুই। উয়ার সাথে বিয়া দিলে আমি বাঁচবো নারে। মাতালঠো দুদিনে আমাকে ঠেঙায় মারবে।'

থমকে দাঁড়ায় ডমরু সর্দার। তার ইচ্ছে করে তখুনি সারীর কথার জবাব দেয়। দুগালে আচ্ছা করে চড় কষিয়ে। সে মাতাল, গুণ্ডা? দাঁতে দাঁত ঘষে ডমরু ফেরার পথে নিজের মনে বলে—'আচ্ছা দেখা যাবে তোর দেমাক কত। দুমাস সবুর কর। তোর রসের নাগর সমরুর লাশ টেনে খাবে শেয়াল শকুনে। লড়াই থেকে সে আর জ্যান্ত ফিরছে না জানিস। তখন এই ডমরু মাঝির পা ধরে কত সাধতে হবে তোকে।'

আমাদের জঙ্গল স্পিাপার মাইনারে কাজ পেয়ে সমরু আহ্লাদে আটখানা হয়ে পল্টনের পোশাক পরে, মিলিটারি লরি চড়ে দূরে দেশে পাড়ি দেয় সমরু। বোঙা বুড়োর ঘাটের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আনমনা হয়ে পড়ে সে। সারীর মুখ মনে হতে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে তার যাওয়ার সময় সারীর সাথে দেখা হল না বলে, মনে মনে আক্ষেপ থেকে যায় সেদিনের কথা ভেবে সমরু ঠিক করে টাকা জমিয়ে ঘরে ফেরার সময় সারীর জন্যে গড়িয়ে আনবে রুপোর বালা কোমরের গোট

চীনের সাথে লড়াই বেঁধে যায়। চারধারে সাজ সাজ রব। সমরুর ছুটি মেলে না। কাজের চাপ বেড়েই চলে ক্রমশ। নয়া সীমান্তের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে এমুনিশন জোগাবার ভার তার কোম্পানীর উপর

স্ত্র পাহারা। দল ছেড়ে চলে যাওয়ার ায় নেই কারোও। পাহাড়ী পথে দিনে ত তদারকী করে, হাঁপিয়ে ওঠে সমর্। তের অন্ধকারে তাঁবুর ভেতর শুয়ে চোখ ধ করে সে ভাবতে থাকে সারীর চিকন-লো মুখ। সুবর্ণরেখার তীরে শাল গলে ঘেরা তাদের কুঁড়ে ঘর। সামরিক ীবনের আদব কায়দা একঘেঁয়ে লাগে তার। কৃতির কোলে বেড়ে ওঠা বনের মানুষের াখ সভ্যতার আলোতে ধাঁধিয়ে যায়, শেহারা হয়ে পড়ে সে।

নেফা সীমান্তের পাহাড় উপত্যকা, নজঙ্গল অচেনা অজানার মত লাগে মরুর। সুবর্ণরেখার তীরের পাহাড় ঙ্গল কত আপন তার কাছে। কনভয়ের ঙ্গে সঙ্গে ফিরতে হয় তাকে। বৈরী াগাদের হামলার ভয়ে নির্জন পাহাড়ী থে তাদের সতর্ক থাকতে হয় সব সময়। াগাবস্তীর আশেপাশে কনভয় বেঁধে সমরু মশতে চায় তাদের সাথে। মানুষের সঙ্গ পতে কত সাধ জাগে তার মনে। কিন্তু নের মত সঙ্গী জোটে না তার। সেনা-াহিনীর লোকেরা তাদের সঙ্গে মন খুলে মেশে না। শুধু একজনকে তার ভাল লাগে -সে কনভয়ের কমিশনড অফিসার াহিন্দর সিং।

ছাউনীতে ফিরে মহিন্দর সিংকে তার মনের কথা জানায় সমরু। সারীর সাথে তার সাঙার কথাও জানাতে সে ভুলে না। ঘরে ফিরতে দেরী হলে সারীর সাঙা হয়ে যেতে পারে ডোমরু মাঝির সাথে, তাও সে জানায় তাকে। কথা শুনে মহিন্দর সিংয়ের মনে কেমন যেন মায়া জাগে। সে ছুটির দরখাস্ত লিখে সমরুর সই করে সেদিনই পাঠিয়ে দেয় কোয়ার্টার মাস্টারের কাছে। একমাসের ছুটি মঞ্জুর হয় সমরুর। দেশে ফেরার তোড় জোড় করে, ইম্ফলের বাজার থেকে চাঁদীর বালা, রুপোর হার গড়িয়ে আনে সমরু। মহিন্দর সিং তার ভাবী বউয়ের জন্যে পৈছাগোট উপহার পাঠায় তার হাতে।

ট্রাক, ট্রেন, বাস বদল করে মোহনপুরে পৌঁছোতে পাঁচদিন কেটে যায় সমরুর। ঘরে ফিরে বুড়া মাঝিকে কত কথা সে শোনায় লড়ায়ের। ঝগড়ু মাঝিকে নোয়া লুগা পাট্টা পরতে দেয়। খাওয়াদাওয়া চুকিয়েই মোহনপুরের হাটে যাওয়ার জন্য ছটফট করতে থাকে সে। হাট বসতে তখনও বেশ দেরী কিন্তু সমরুর সময় যেন আর কাটতে চায় না। সারীকে খুঁজে পেতেই হবে তাকে হাটের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। খাঁকি হাফপ্যান্ট হাফসার্ট পরে বুট পায়ে দিয়ে মিলিটারী কায়দায় গটগট করে সমরু হেঁটে চলে হাটের দিকে।

বিকেল পড়ে সন্ধ্যা নেমে আসে। সারীর দেখা নেই। সমরু হতাশ হয়ে পা বাড়ায় গোপীবল্লভপুরের ধানকলের দিকে। হাঁটুস জল ভেঙে নদী পার হয়ে মিলের ফটকে এসে দাঁড়ায় সে। চাতালে ধান জড় করতে দেখে সমরু ডাক দেয় সারীকে দূর থেকে। সমরুকে দেখে চমকে ওঠে সারী—যেন সে ভূত দেখছে রাতের অন্ধকারে। তার পা ভারী হয়ে আসে—মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। বিস্ময়ে হতবাক্ সারী পা পা করে এগোতে থাকে ফাটকের দিকে। পেছন থেকে ডমরু মাঝির ডাক শোনা যায়—'আতু কোথা যাবি ব'।'

সমরুর সামনে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে সারী। মুখের কথা সে হারিয়ে ফেলে। সারীর সিঁথি দেখে সমরুর বুঝতে বাকী থাকে কিছু। সারীর মুখ চোখের নীরব ভাষা, তার সুডোল হাতে কালশিরা পড়া দাগ দেখে সমরু চমকে উঠে—তাকে সঙ্গে আসতে বলে।

সুবর্ণরেখার তীর ধরে তারা চলতে থাকে—আগে আগে সমরু পেছনে সারী। পথ চলতে সারী হাঁপিয়ে ওঠে। বোঙা বুড়ার ঘাটে এসে তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে। রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসে। সারীর হাতে চাঁদির বালা পরাতে গেলে দু'পা পেছিয়ে সে বলে—'পরপুরুষের বালা হাতে দেব কেনে?' থমকে সমরু জিজ্ঞেস করে—'আমি তোর পর হলে, আপন তোর কে?' ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে সারী। মুখ নীচু করে বলে—'আমার পেটে যে ডমরুর পুত।'

সারীর কথা শুনে সমরু পাথর বনে যায়। বালা জোড়া হাতে তুলে গায়ের জোরে ছুঁড়ে ফেলে দয়ের মাঝে। ছপাৎ করে শব্দ তুলে বালাজোড়া চিরদিনের মত হারিয়ে যায়—সুবর্ণরেখার বালুচরে। বন-বাদাড় ভেঙে পাহাড় উপত্যকা পার হয়ে দিশেহারা হয়ে ছুটতে থাকে সমরু। যেন তার পেছন পেছন চাবুক হাতে তেড়ে আসছে ডোমরুর পুত।

কনভয় ছেড়ে ছাউনিতে ফিরে সমরুকে দেখে চমকে ওঠে মহিন্দর সিং। তার শুকনো মুখ, কোটরে বসা চোখ দেখে সে বোঝে ঝড় বইছে সমরুর মনে। সারীর কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও সে থেমে যায়। সমরুর চোখমুখের নীরব ভাষা তাকে জানিয়ে দেয় সব কথা। ধীর পায়ে সমরুর কাছে এসে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে মহিন্দর বলে—'পুরুষ মানুষের কি এত সহজে ভেঙে পড়তে আছেরে? কত সইতে হবে আমাদের। জীবনভোর লড়াই আমাদের সঙ্গের সাথী।'

মহিন্দর সিংয়ের কাঁধে মুখ রেখে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে সমরু বলে—'কিসের জোরে আর লড়বো সর্দার। সুবর্ণ-রেখার দয়ে আমি যে সব খুইয়ে এসেছি।' সমরুর দুঃখে সমবেদনা জানাতে টপটপ করে দু'ফোঁটা চোখের জল ঝড়ে পড়ে মহিন্দর সিংয়ের চোখ বেয়ে। লাহোরের পথে সমরুর মত সেও সব খুইয়ে পাষাণ বনে গেছে কতকাল আগে, জীবনভোর সেও লড়ছে একা।'

প্রদর্শনী

বিড়লা অ্যাকাডেমির উদ্যোগে ১৭ থেকে ২১ আগস্ট অবধি অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যবর্গের একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। এখানে সর্বসমেত পঁচাশিটি ছবি প্রদর্শিত হয় এবং অবনীন্দ্রনাথ ছাড়া বত্রিশ-জন শিল্পীর ছবি রাখা হয়েছিল। অবনীন্দ্র-নাথের নিজের আঁকা ছবির সংখ্যা ছিল পঁচিশখানি। এগুলির কোনটিই অবশ্য রবীন্দ্রভারতীর প্রদর্শনীর ছবি নয়। আর পূর্বোক্ত প্রদর্শনীর চাইতে এই প্রদর্শনীর ছবির মাউন্টিং বাঁধাই ইত্যাদি অনেক ভাল। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি যদি অনুগ্রহ করে তাঁদের জিম্মায় রাখা ছবিগুলি একটু ভাল করে বাঁধিয়ে রাখেন তা হলেও কিছুটা উপকার হয়।

অবনীন্দ্রনাথের বর্তমান প্রদর্শনীর ছবিগুলি বেশীর ভাগই ছোট মাপের। কয়েকটি পোস্ট কার্ড সাইজের বা তার চাইতেও ছোট এবং বেশীর ভাগই নিসর্গ দৃশ্য। এতটুকু ছবিতে বিশাল স্পেস সৃষ্টির কাজটি প্রথমেই চোখে পড়ে। পুরী দার্জিলিং ও কার্শিয়াং-এর দৃশ্যাবলীতে এই গুণ বিশেষভাবে দেখা যায়। কার্শিয়াং বাজারের টিনের ছাদের আলো এবং অল্প মেঘলা আকাশের সুদূর হাতছানি এই প্রায় মনোক্রোমে আঁকা ছবিটিকে একটা বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। সমুদ্রতীরে রোদের ওপর বাউল এবং সমুদ্রতীরে একটি নির্জন বাড়ি প্রায় একই ধরনের কাজ হলেও সম্পূর্ণ ভিন্ন মুড সৃষ্টি করেছে তেমনি আরেকটি ছবির সাগর তীরের বালুকাবেলায় কয়েকগাছি ঘাস এক অদ্ভুত নির্জনতার পরিবেশ তৈরী করেছে। কতকগুলি গাছের ফাঁক দিয়ে অল্পদৃষ্ট পরিত্যক্ত বাড়ির নির্জনতা আবার অন্য মেজাজের ছবি। তেমনি প্রায় সিপিয়া রঙের বিষ্ণুমূর্তির সামনে ক্রীড়ারত শিশু বিষয়বস্তুর অভাবনীয়তা ও সরসৃষ্টির চাতুর্যে দৃষ্টিকে ধরে রাখতে চায়। লন্ঠন হাতে রমণীমূর্তি, মন্দিরদ্বারে ভিখারী মাধবিকা বা রাঁচীর দৃশ্যে তাঁর ছবির ট্রিটমেন্টের বৈচিত্র্য দেখতে পাই। ধর্মসভা ছবিটি মনে হয় তাঁর গোড়ারদিকের কাজ এবং জাপানী ধরণে আঁকা অগস্ত্যমুণি নামের ছবিটি আসলে কপিল মুণির ছবি কারণ তাঁর পিছনে অশ্বমেধের ঘোড়া এবং সামনে উদ্যতআয়ুধ সগর সন্তানগণ।

এখানেও দেখা গেল যে অবনীন্দ্রনাথ কোথাও নিজের ছবির পুনরাবৃত্তি করেননি। আঙ্গিকের পুনরাবৃত্তিও কম। কারণ কার্শিয়াং-এর বাজার ও একটি মাত্র গাছের পটভূমিকায় সুদূরের হিমালয় পর্বত একই অঞ্চলের দৃশ্য হলেও আঙ্গিক ও মেজাজে ভিন্ন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও দেখলে বোঝা যায় যে একটা মন

ধর্মসভা ঃ অবনীন্দ্রনাথ

থেকেই এদের সৃষ্টি এবং এই মনটিই ছিল অবনীন্দ্রনাথের দুর্লভ রত্ন। যেটি তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের কাজে বিশেষ দেখা যায় না। তাই তাঁরা ওয়াশ পদ্ধতির নকল হয়েছে কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তেমন কেউ শিক্ষা লাভ করেছেন কিনা সন্দেহ।

অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন নন্দলাল বসু, তাঁর নটীর পূজা (বৃহৎ কিন্তু জমাট নয়), সীতার অগ্নিপরীক্ষা, কালী, সাঁওতাল ইত্যাদি ছবি নিয়ে। আবদুর রহমান চুঘতাইয়ের আনারকলি, রাধাকৃষ্ণ, ঈর্ষা ইত্যাদি ছবিগুলির প্রায় পারসিক রীতির পরিচ্ছন্ন রেখা ও বর্ণাঢ্য ওয়াশ নিয়ে বেশ জমাট ছবি। একটু বেশী রোমান্টিক হয়ত কোথাও বা একটু সেন্টি-মেন্টাল, কিন্তু ক্র্যাফটস্‌ম্যানশিপের গুণ পরিস্ফুট। চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের 'স্নানের ঘাট' ছবিটির পরিচিত পরিবেশ ভাল লাগে। হীরাচাঁদ দুগড়ের কেশরিয়াজী মন্দিরের কাছ থেকে দেখা রূপ খুব পরিচ্ছন্ন ছবি। মুকুল দে'র 'নতারতা' অনেক দুর্বল কাজ এবং অসিতকুমার হালদারের বঙ্গললনাও বিশেষ জোরালো নয়। ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের 'পরশ' এবং শিবদুর্গা ও গণেশ বিশেষ মাধুর্যমণ্ডিত। নিছক দক্ষতা ছাড়া আরো কিছু রয়েছে— বিশেষ করে পরশ ছবিতে। চারু রায়ের পুরীর তীর্থ জাত্রী ও অসমাপ্ত বুদ্ধ ও সুজাতা দুটি ভিন্ন আঙ্গিকের ছবি। শেষোক্ত ছবির রঙের ঔজ্জ্বল্য বেশী কিন্তু প্রথমটির টোনের কাজ সুন্দর।

গগনেন্দ্রনাথের কালীদর্শন ও মাঝি জাপানী ক্যালিগ্রাফিক স্টাইলের কাজ তবে খুব ভালো নিদর্শন নয়, এবং তাঁর বিরহিণী ছবিটি তাঁর নিজের কিনা সন্দেহ হয়।

প্রশান্ত রায়ের বুলন ছবিতে গগনেন্দ্রনাথের রীতির সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের ওয়াশ চালিয়ে বেশ বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। গোপাল ঘোষের 'প্যালেস ডল' সূক্ষ্ম ওয়াশে আঁকা পরিচ্ছন্ন ছবি তবে 'গৃহ প্রাঙ্গণ' ছবিটি তত জমেনি। চিন্তামণি করের তিনখানি পৌরাণিক ছবিতে ক্ষিতীন মজুমদারের রীতির প্রভাব বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। একদা তিনি তাঁরই ছাত্র ছিলেন।

এছাড়া প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালী-পদ ঘোষাল, দ্বারিকানাথ চট্টোপাধ্যায় ইন্দু দুগড়, শৈলেন দে এমন কি গোষ্ঠকুমার প্রভৃতি আরো কয়েকজনের ছবি আছে। এঁদের সকলেই অবশ্য অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র ছিলেন না এবং সকলের কাজ খুব রসোত্তীর্ণ বলা চলেও না। তবে সুনয়নী দেবীর তাপসী উমা, রাধা, সরস্বতী এবং হর-পার্বতী তাঁর নিজের সরল বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজ করছে। সমগ্র প্রদর্শনীতে একটা পরিচ্ছন্ন ভাব এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু দুঃখের কথা এসব ছবি কেবলমাত্র শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের কল্যাণেই লোক-চক্ষুর গোচর করা হয়েছে। নইলে এটুকুও অগোচরেই থেকে যেত। বর্তমানে যেটা একান্ত প্রয়োজন হয়েছে তা হল একটি জাতীয় শিল্প সংগ্রহশালা সেখানে বাংলার প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সবরকম শিল্পকর্মের নিদর্শন ধারাবাহিক রূপে সংরক্ষিত থাকবে। অবনীন্দ্রনাথের পূর্বে কি ধরণের ছবি আঁকা হত যার প্রতিক্রিয়ায় অবনীন্দ্রনাথ নিজের শিল্প শৈলী সৃষ্টি করলেন সেটা না জানতে পারলে তাঁর কর্মের প্রকৃত মূল্যায়ন হবে না। তেমনি তাঁর সমকালীন অথচ তাঁর শিষ্য নন এসব শিল্পীদের কাজও থাকা দরকার। তার পরে প্রয়োজন একেবারে আধুনিককালের শিল্পীদের শিল্পকর্ম সংরক্ষণের। এই ধরণের যুগ বিভাগ করে একটি সংগ্রহশালা করলে বোঝা যাবে শিল্পকলার ক্ষেত্রে আমরা আগের চেয়ে এগিয়েছি না পিছিয়ে পড়েছি।

লীলা প্রদর্শনীর কালীবেশে জনৈকা শিল্পী

প্রেক্ষাগৃহ

বাঙলা চলচ্চিত্রজগতে আবার সংকটের কথা :

ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান সভাপতি শ্যামলাল জালান গেল বুধবার, ২৫ আগস্ট আচমকা একটি বোমা ফাটিয়েছেন। কারণ, শিল্পের সংক্রান্ত ক'রে তিনি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যে এমন একটি বিবৃতি দিয়েছেন, যাকে 'এস-ও-এস কল' বা বিপদসঙ্কেত ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তিনি সোজা জানিয়ে দিয়েছেন কলকাতার ফিল্ম স্টুডিওগুলি ১ সেপ্টেম্বর থেকে তাদের দরজা বন্ধ করবে এবং কর্মীদের মাহিনা চোকাবার জন্যে স্টুডিও-মালিকদের হয়ত স্টুডিওর যন্ত্রপাতি বিক্রয় করতে হতে পারে। কারণস্বরূপ তিনি জানিয়েছেন যে, ১৯৫৭ সালে যেখানে ৭২টি বাংলা ছবি তৈরী হয়েছিল, সেখানে এখন মাত্র ৭টি ছবি নির্মীয়মান অবস্থায় রয়েছে। কাজেই কয়েক মাস বাদে একখানিও নতুন বাংলা ছবি তৈরী হবে না এবং স্টুডিওগুলি বন্ধ হয়ে গেলে শত শত দক্ষ কলাকুশলী, অন্যান্য কর্মী এবং শিল্পীরা বেকার হয়ে পড়বেন। এই চরম বিপজ্জনক অবস্থা এড়াবার জন্যে তিনি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে বিন্দুমাত্র কালবিলম্ব না করে দীর্ঘমেয়াদী সাহায্য দেবার জন্যে আর্জি জানিয়েছেন, একটি চলচ্চিত্র-উন্নয়ন-পরিষদ স্থাপন করতে অনুরোধ করেছেন এবং চিত্রগৃহ নির্মাণ সম্পর্কে উদার লাইসেন্স প্রদাননীতি অবলম্বন করতে বলেছেন। এছাড়া অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে তিনি স্টুডিওগুলির বর্তমান পরিস্থিতি এড়াবার জন্যে রাজ্য সরকারকে থোক হিসাবে অর্থসাহায্য করতে অনুরোধ করেছেন এবং সংগৃহীত প্রমোদকরের অর্ধেক অংশ ছবির মালিকদের ফেরৎ দিতে বলেছেন। এটাকে ভরতুকি হিসেবে গণ্য করা হবে।

শ্রীজালান পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পের দুর্দিনের কথা উল্লেখ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবিলম্বে সেনকমিটির সুপারিশ অনুযায়ী একটি চলচ্চিত্রশিল্প উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের দাবি জানান এবং ঐ সঙ্গে চলচ্চিত্র-শিল্প সম্পর্কে একটি পরামর্শদাতা সমিতি গঠনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রীজালান আশা করেন, সরকার এই রাজ্যের বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গীন পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন এবং এই মুমূর্ষু শিল্পকে বাঁচাতে সাহায্য করবার জন্যে অনতিবিলম্বে এগিয়ে আসবেন। যদি সরকার এই দায়িত্ব পালন না করেন, তাহলে ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের অপমৃত্যুর জন্যে তাঁরা কর্তব্যচ্যুতির অপরাধকে এড়িয়ে যেতে পারবেন না। শ্রীজালানকে ধন্যবাদ, বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গীন অবস্থা প্রকাশ করবার জন্যে।
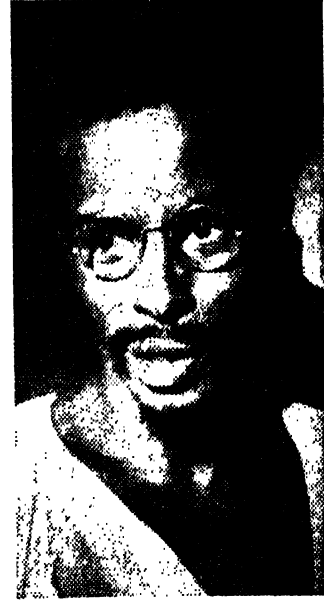
লীলা প্রদর্শনীর পরিচালক
রুফাস কোলিন্স

বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পের প্রযোজনা, পরিবেশনা ও প্রদর্শনী তিনটি বিভাগেরই প্রতি-

নির্দিষ্ট করে ইস্টার্ন মোশান পিকচার অ্যাসো-সিয়েশন। কাজেই তার সভাপতিত্বের দায়িত্ব-শীল পদে অধিষ্ঠিত থেকে, আমরা আশা করব, শ্রীজালান নিশ্চয়ই জানেন, টালিগঞ্জের স্টুডিও অঞ্চল গেল কয়েক মাস ধরে কি অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে। এবং ১৯৭১ সালের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ওখানকার কোন্ স্টুডিওতে কি কি ছবির শ্যুটিং চলছিল ও চলছে, সে কথাও তাঁর অজানা থাকবার কথা নয়। প্রতি স্টুডিওর এসটাব-লিশমেন্ট খাতে কি ব্যয় হয় এবং নির্মীয়মান ছবির প্রযোজকদের কাছ থেকে কত টাকা আদায়ের সম্ভাবনা, তাও তাঁর নখদর্পণে থাকা উচিত। কাজেই স্টুডিওগুলির আর্থিক অবস্থা যে ক্রমেই মন্দ থেকে মন্দতর হয়ে পড়ছে, তা জানতে পেরে তিনি তাঁর সংস্থা মারফত এবং এককভাবে এতদিন ধরে কি কি প্রতিকারের চেষ্টা করেছেন, তা' আমাদের জানতে ইচ্ছে করছে এবং মাত্র সাতদিন হাতে রেখে '১ সেপ্টেম্বর থেকে স্টুডিওগুলি বন্ধ হয়ে যাবে'—এই গুরুতর সংবাদটি সাধারণ্যে ও সরকারের কাছে উপস্থাপিত না করে আরও সময় থাকতে করেননি কেন, তাও আমরা জানতে চাই।

অথচ দেখছি, পশ্চিমবঙ্গের ৩৩৫টি স্থায়ী চিত্রগৃহের মধ্যে যে ৬০টি মাত্র বাংলা ছবিই নাকি প্রদর্শন করে থাকে, সেগুলি লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে বলে তাদের পক্ষে ই আই এম পি এ রাজ্য সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে জানিয়েছে, এই চিত্রগৃহগুলিকে যদি অবিলম্বে আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা না হয়, তাহলে এরা হিন্দী ছবি দেখাতে বাধ্য হবে। এবং এই স্বাবলম্বী করার অর্থ হচ্ছে, এই চিত্রগৃহগুলিকে পাঁচ বছরের জন্যে প্রমোদকর দেওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া, যাতে এদের মালিকেরা টিকিটের দামকে যথাযথ রেখে ঐ প্রমোদকর বাবদ টাকাটা নিজেরা নিতে পারে। অর্থাৎ যে-টাকাটা বাংলা ছবির প্রযোজকদের প্রাপ্য হওয়া উচিত তাদের লোকসানের ভার কমাবার জন্যে, সেই টাকাটা চিত্রগৃহের মালিকেরা হস্তগত করতে চান বাংলা ছবি দেখানোর খেসারত স্বরূপ। আর তা যদি নিতে দেওয়া না হয়, তাহলে তাঁরা হিন্দী ছবি দেখাবেন বলে হুমকি দিচ্ছেন। এবং তাও ই আই এম পি মারফত।

আমরা ঠিক বুঝতে পারছিনা, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশান সত্যিই কাদের প্রতিনিধিত্ব করছে—প্রযোজকদের, পরিবেশকদের, না প্রদর্শকদের অর্থাৎ চিত্রগৃহের মালিকদের? সভ্যসংখ্যায় ভারী বলে চিত্রগৃহের মালিকেরাই কি আজ ই-আই-এম-পি-এর আড়ালে কলকাঠি নাড়ছেন? তাঁরাই কি এ-হেন অবস্থার সৃষ্টি করতে চাইছেন, যাতে বাংলাদেশ থেকে চলচ্চিত্র প্রযোজনা-শিল্প চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়? এবং হিন্দী ছবি দেখিয়ে তাঁরা যে-মজা লুঠছেন, সে মজা ষোল আনা হয়? ই-আই-এম-পি-এর প্রযোজকশাখা কি বলেন?

সংবাদে প্রকাশ, গেল বৃহস্পতিবার, ২৬ আগস্ট তারিখেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সর-কারীভাবে জানানো হয়নি স্টুডিও-মালিকদের ১ সেপ্টেম্বর তাঁদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধ করবার সিদ্ধান্তের কথা। এবং মাত্র এক সপ্তাহের নোটিশে স্টুডিও বন্ধ করা যথেষ্ট আইনসঙ্গত কিনা তাও বিবেচ্য।

পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্পের, বিশেষ করে প্রযোজনাশিল্পের আর্থিক কাঠামো যে আদৌ দৃঢ়ভিত্তিক নয়, উল্টে যথেষ্ট নড়বড়ে, এ-খবর রাজ্য সরকারের যে জানা নেই, তা' নয়। ১৯৬৩ সাল থেকেই রাজ্য সরকার এই শিল্পটিকে নিজের পায়ে দাঁড় করাবার জন্যে কম-সে-কম তিনটি কমিটি নিয়োগ করেছেন এবং প্রতিটি কমিটিই যথা সময়ে তার রিপোর্ট পেশ করেছে। কিন্তু যেখানে দুর্ভাগ্যক্রমে এই অভিশপ্ত রাজ্যটিতে কোনো নির্বাচিত সরকারই বেশীদিন টিঁকছে না এবং আইনশৃংখলারক্ষণ রূপে সর-কারের প্রাথমিক কর্তব্যটিই যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে না, সেখানে চলচ্চিত্রশিল্প সংক্রান্ত রিপোর্টগুলি যে সেলফজাত হ[illegible] পড়ে থেকে তাদের ওপর পুরু ধুলো জমা থাকবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্তু প্রেসিডেন্টস রুল চালু করে কেন্দ্রীয় সরকার যখন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ভার নিয়েছে তখন কেন্দ্রেরই উচিত, আন্তর্জাতিক খ্যাতি অধিকারী, বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম [illegible] এই বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পটি যাতে চির[illegible] লুপ্ত না হয়ে যায়, তার জন্যে আশু প্রতি-কারের পথ খুঁজে বার করা। আমাদের [illegible] রাখা উচিত, মানুষ মাত্র ভাত-রুটি খে[illegible] বেঁচে থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে তার ম[illegible] খোরাকেরও প্রয়োজন এবং পশ্চিমবঙ্গবা[illegible] এই মনের খোরাক সুষ্ঠুভাবে যোগা[illegible] ব্যাপারে বাংলা চলচ্চিত্রের ভূমিকা অসামা[illegible]

বাঙলা রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকীর প্রণাম

ভারতের শ্রেষ্ঠ সমিতির নাট্য[illegible] পিপলস লিটল থিয়েটারের নেপথ্যকর্মী শিল্পিবৃন্দকে সাধুবাদ জানাই, তাঁরা গি[illegible] অর্ধেন্দু-অমৃতলাল প্রমুখ বাংলা সা[illegible] রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের 'শৈলেন্দ্র[illegible] পূর্বসূরী' জ্ঞানে প্রণাম জানিয়েছেন উ[illegible] দত্ত রচিত ও পরিচালিত 'টিনের তলো[illegible] নাটকটির অভিনয়প্রসঙ্গে।

বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের আদিয[illegible] কিছুটা ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছেন নাট[illegible] উৎপল দত্ত তাঁর 'টিনের তলোয়ার-এ। আছে তিনটে দিক। এক, সেই নাট্যকে[illegible] গুলির ছবি, যাঁরা মাতাল, গেঁজেল [illegible] বারবণিতাসক্তের অখ্যাতিকে শিরোপা [illegible] করে প্রমোদের মাধ্যমে শিক্ষার পীঠ[illegible] স্বরূপে সাধারণ রঙ্গমঞ্চকে গড়ে তুলে[illegible] ও শত ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যেও বাঁচিয়ে [illegible] ছিলেন। দুই, রাস্তার মেয়ে ময়নার [illegible] নেত্রীকুন্দরানী [illegible] রূপা[illegible]

তিহাস। ও পরে শংকরীকে উপঢৌকন দিয়ে জ্ঞব থিয়েটার স্থাপনের কথা। এবং তিন, ট্যশালার সমাজদর্পণ হিসেবে কাজ করতে রতে জাতির মনে বন্দিদশা উন্মোচনের াগ্রহ জাগানোর ভূমিকা গ্রহণের চিত্র।

দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরার কাপ্তেন বেণি-াধবের মধ্যে আমরা গিরিশচন্দ্রের ছায়া-ক খতে পাই এবং ময়নার জীবনে নটী বনোদিনীর জীবনের কিছুটা ছাপ পাই র্ণার্ড শ'-এর 'পিগম্যালিয়ন'-এর সঙ্গে মশ্রিতভাবে। অশ্লীলতা নয়, ইংরাজবিদ্বেষ ; স্বাদেশিকতাই যে বাংলার সাধারণ রঙ্গ-ঞ্চকে ইংরাজ-শাসকের চক্ষুশূল করে তুলে-ছল এবং তারই ফলে ১৯৭৬-এর কুখ্যাত ামাটিক পারফরম্যান্স অ্যাকটের প্রবর্তন, াও এই নাটকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন ীলন্ত। কিন্তু ময়নার আবিষ্কার দিয়ে যে-াটকের আরম্ভ, 'সধবার একাদশী' হতে হতে তিতুমীর'এর পালার গান দিয়ে তার মাপ্তি ঘটানোয় নাটকটির কেন্দ্রবিন্দু যেন থেষ্ট সরে গেল। প্রিয়নাথ-এর চরিত্রটি যদি আরও পরিস্ফুট হত, ময়না ও বেণিমাধবকে লক্ষ্য রেখে সে যদি 'তিতুমীর' নাটক রচনা রত এবং বীরকৃষ্ণ দাঁর সঙ্গে ময়না ও তিতুমীর—এই দুটি বিষয় নিয়েই যদি তার সংঘর্ষ বাধত এবং প্রথমে বেণিমাধব বীর-কৃষ্ণের দিকে এবং পরে মানবিকবোধ দ্বারা তাড়িত হয়ে সে প্রিয়নাথের পক্ষাবলম্বী হত, তাহলে নাটকটির একটা পরিপূর্ণ চেহারা আমরা দেখতে পেতুম। লক্ষ্য করা গেল, হাল্কা কথার সাহায্যে পরিস্থিতি ও দৃশ্য-রচনায় এবং চরিত্রচিত্রণে শ্রীদত্তের যথেষ্ট দক্ষতা প্রকাশ পায়।

'টিনের তলোয়ার' নাটকটিকে রবীন্দ্র-সদনে মঞ্চস্থ করা হয়েছে। নাটকের মধ্যে নাটক দেখাশোনার পক্ষে রবীন্দ্র-সদনের ঘূর্ণন-মঞ্চ এবং প্রশস্ততা অতি-মাত্রায় সহায়ক হয়েছে। আগেকার যুগের নাট্যাভিনয়ের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল স্টেজের ঠিক সামনে পাদপ্রদীপের এ-পারে, প্রেক্ষাগৃহের একেবারে সামনের অংশে বসা 'অর্কেস্ট্রা' পার্টি। এই পার্টির বিভিন্ন যন্ত্রীর হাতে থাকত ক্ল্যারিওনেট, কর্ণেট, স্যাক্সোফোন, বেহালা, করতাল, অর্গান, তবলা, ঢোল প্রভৃতি। আমরা স্টার থিয়েটারে দক্ষিণারঞ্জন সেনের "ব্র্যান্ডবিরণ অর্কেস্ট্রাকে বাজাতে দেখেছি। সে-বাজনা শোনবার মতো। নাটক আরম্ভ হবার আগে এবং প্রতি অঙ্কের আগে এই অর্কেস্ট্রা-বাদন হত। এবং দর্শক যখন বাজনার তারিফ করত হাততালি দিয়ে তখন দলের নেতা দর্শকদের দিকে ফিরে অভিবাদন জানাতেন। শ্রীদত্তের 'অর্কেস্ট্রা' একটি অপপ্রয়াস মাত্র।

শ্রীদত্ত বোধ করি জানেন না, গিরিশ-চন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল প্রভৃতি নাট্যরথীদের বর্ণজ্ঞান আজকের দিনের কোনো নটপ্রবর থেকে বিন্দুমাত্রও কম ছিল না। এবং আরও জানেন না, সে-যুগের পোস্টার, হ্যান্ডবিল প্রভৃতি রচনা করতেন

জানে অজানে' লীনা চন্দ্রভারকর

প্রুফ না দেখে সাধারণ্যে প্রকাশিত হত না। কাজেই 'রোহিন্দ্র' প্রভৃতি বানান বা 'গ্রাণ্ড প্রদর্শনী' গোছের ভাষা সে-যুগে আদৌ সম্ভব ছিল না।

মাইকেলী অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা গৈরিশ ছন্দের আবৃত্তি সম্বন্ধেও শ্রীদত্ত এবং অন্যান্য শিল্পীর অপটুতা দেখে ব্যথিত হয়েছি। 'এগিয়ে যাও ও চেঁচিয়ে বল'—এ-নীতি অপটু, অশিক্ষিত শিল্পীদের দ্বারা অপ্রধান চরিত্র অভিনয়ের ক্ষেত্রেই চালু ছিল। কিন্তু যখন ওঁরা নিজেরা বা মহেন্দ্র বসু, অমৃত মিত্র, বেলবাবু, তিন-কড়ি, বিনোদিনী অভিনয় করতেন, তখন আবৃত্তি হত অর্থবহ—সুরেলা হলেও অর্থবহ—তাতে স্বরের উত্থান-পতন, উদারা, মুদারা, তারা—সব খাতেই স্বরের ধারা বইত প্রয়োজন বোধে।

বীরকৃষ্ণ দাঁর চরিত্রটি যেমন নাট্যকার সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত করেছেন, সমীর মজুমদারও তাকে রূপায়িত করেছেন একটা গোটা রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে। এই চরিত্রটিই 'টিনের তলোয়ার'-এ সবচেয়ে সু-অভিনীত। এর পরেই বলব, আঙুর বা বসুন্ধরার ভূমিকাটি জীবন্ত রূপ নিয়েছে শোভা সেনের অভিনয়গুণে; [illegible] ও পরিপূর্ণ। তবে

'ছন্দ' আবৃত্তি ত্রুটিহীন নয়। ময়না বা শংকরীর ভূমিকায় ছন্দা চট্টোপাধ্যায় আকর্ষণীয় অভিনয় করেছেন। কিন্তু প্রথম গানখানি ছাড়া অন্যান্য গানে তাঁর কণ্ঠের ক্ষীণতা প্রকাশিত। অসিত বসু অঙ্কিত প্রিয়নাথ চরিত্রটি প্রথম দিকে যতটা সবল, শেষের দিকে ততটা নয়। অপরাপর অভিনয় সাধারণ পর্যায়ের এবং বৈশিষ্ট্য-বর্জিত।

বহুরকম ত্রুটি সত্ত্বেও 'টিনের তলোয়ার' নাট্যরথীদের প্রশস্তিসূচক বলেই প্রশংসনীয়।

(২) হিন্দী নাটকে জীবন্ত অভিনয় :

আমরা পূর্বে "অনামিকা" নাট্যসংস্থা দ্বারা বাদল সরকারের "এবং ইন্দ্রজিৎ" নাটকটি ডঃ প্রতিভা অগ্রবাল কর্তৃক হিন্দী-ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে অভিনীত হতে দেখেছি এবং সেই অভিনয় সম্বন্ধে আমাদের মতামতও প্রকাশ করেছি। শুনেছিলুম, বোম্বাই শহরের থিয়েটার ইউনিট সংস্থাটিও অত্যন্ত সুখ্যাতির সঙ্গে এই হিন্দী রূপান্তরটি অভিনয় করে থাকে এবং এই সুখ্যাতির মূলে আছে খ্যাতনামা নট-নাট্যকার-পরিচালক সত্যদেব দুবের সু-পরিচালনা এবং ইন্দ্রজিতের ভূমিকায় সু-অভিনয়। সত্যদেব দুবে সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন আমেরিকা ইউনিভার্সিটি সেন্টার পরিচালিত "যুব-চলচ্চিত্র" সম্পর্কে একটি আলোচনা সভায় যোগ দেবার জন্যে। তাঁর এই কলিকাতা আগমনের সুযোগে "অনামিকা" সংস্থা তাঁকে দিয়ে ইন্দ্রজিতের ভূমিকাটি অভিনয় করিয়েছেন তাঁদের "এবং ইন্দ্রজিৎ" নাট্যাভিনয়ে গেল ২৮ আগস্ট কলামন্দির বেসমেন্ট থিয়েটারে। ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের প্রতিটি অনুভূতির এমন বিচিত্র প্রকাশ আমরা আগে কখনও দেখিনি—বাচনে, ভঙ্গীতে, চলাফেরায় চরিত্রের এমন জীবন্ত প্রকাশ দেখে আমরা মুগ্ধ, বিস্মিত। পূর্বে সাক্ষাৎকারের সময়ে শ্রীদুবে আমাদের বলেছিলেন, আমার প্রথম ভালোবাসা থিয়েটারের প্রতি (থিয়েটার ইজ মাই ফার্স্ট লাভ)। দেখলুম, অভিনয়কলাকে তিনি রীতিমত আয়ত্ত করেছেন। এই সঙ্গে আর একজনকেও দেখলুম, যার অভিনয়প্রতিভা আমাদের রীতিমত বিস্মিত করেছে। সে হচ্ছে "এবং ইন্দ্রজিৎ"-এর বিভিন্ন নারী-চরিত্রের একক অভিনেত্রী কুমারী যামা অগ্রবাল। এত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চরিত্রানুযায়ী বাচনভঙ্গী ও ভাবাভিব্যক্তির পরিবর্তন যে তার দ্বারা সম্ভব, মঞ্চের বাইরে এই সুশীলা, সুদর্শনা মেয়েটিকে দেখলে অনুমান করা কঠিন। এমন একজন পারঙ্গম অভিনেত্রী যে-কোনও সংস্থার গর্বের বস্তু। শ্যামানন্দ জালানের "লেখক" ভূমিকার অভিনয়-আমরা আগে দেখেছি এবং মনে হয়, তাঁর আগেকার রূপদান এবারের চেয়ে আমাদের বেশী আকৃষ্ট করেছিল। এবারে তিনি একটু বেশী দ্রুতলয়ে অভিনয় করার দরুন মানব-জীবনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে লেখকের মনোভাব (অ্যাটিচুড) ঢের বেশী প্রকাশিত হলেও অহিন্দীভাষী আমাদের পক্ষে তাঁকে সর্বত্র অনুসরণ করায় আমরা অসুবিধা অনুভব করছিলুম। অপর চরিত্রগুলি মোটের উপর সু-অভিনীত। এবারে নাটকীয় চরিত্রগুলির গতিনিয়ন্ত্রণ, দৃশ্যপরিকল্পনা, আবহসঙ্গীত, আলোক-প্রক্ষেপণ প্রভৃতির দিক দিয়ে নাটকটি ঢের বেশী সু-প্রযোজিত হয়েছে শ্যামানন্দ জালান দ্বারা।

মঞ্চাভিনয়

তরুণ অপেরার 'আমি সুভাষ' : '...... তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো,'—উদাত্ত এই সংগ্রামী শপথের যে উদ্দীপ্ত কন্ঠ একদিন দেশ-মাতৃকার শৃংখল উন্মোচনের প্রাণময় আন্দোলনকে দূরপ্রসারী করেছিল, কদিন আগের এক ধূসর সন্ধ্যায় তারই সঙ্গে হোল সংরক্ত অনুভবের এক মরমী সেতুবন্ধন। নতুনতর এক দৃপ্ত আবেগের আগুন জ্বলে উঠলো উপলব্ধির প্রহরে। যেন মনে হোল দিগন্তে আলোকাভাস ছড়ালেও আরো অনেক অন্ধকার মুছে দিতে বাঁশীতে অগ্নিস্নানের সুর তোলার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি আজো, শেষ হয়নি অনুচ্চারিত ভাষার প্রকাশ ব্যাকুলতা।

অনুভূতিলোকে এই তীব্রতর আলোড়ন সেদিন দুর্বার হয়ে উঠেছিল বিশ্বরূপায় তরুণ অপেরার সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'আমি সুভাষ'কে কেন্দ্র করে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামের সঙ্গেই আমাদের যেন অশ্রু, রক্ত, আর স্বপ্নের সম্পর্ক, তাঁর কন্ঠ যেখানে সোচ্চার, সেখানে আমরা কিছুতেই মুখর না হয়ে থাকতে পারি না। চলচ্চিত্রে, নাটকে যেখানেই আমরা নেতাজীকে দেখি সেখানেই যেন এক অলক্ষ্য আবেগে আমরা ছুটে যাই তাঁর উপলব্ধির কাছে। যাত্রার আসরে দু-এক জায়গায় নেতাজীর কর্মময় জীবনকে অবলম্বন করে পালা রচিত হয়েছে এবং অভিনীত হয়েছে, কিন্তু সেখানকার নেতাজীর সেই 'দিল্লী চলো' ডাক যেন প্রত্যাশিত কল্লোল তুলে ধরতে পারেনি। হয়তো এর জন্য নেতাজী চরিত্রের রূপকারের চরিত্রের অতলে ডুবে না যাওয়াটাই দায়ী, নয়তো পালাগানের মধ্যেই এই সংগ্রামী মানুষের জীবনচর্যার সেই প্রখর দীপ্তির অভাবই দায়ী। সে যাই হোক না কেন, সে সব পালা সে রকম জনপ্রিয়তা পায়নি, যা পাওয়া উচিত ছিল। তরুণ অপেরার শিল্পীরা হয়তো এই ছবিকে সামনে রেখেই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পালা নির্বাচন করেছেন। সুগভীর দায়িত্ব-বোধের দিক থেকে এ প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য এবং এ কথা বলা যায় এ-পালার নেতাজী আমাদের উদ্দীপ্ত করেছেন, দিতে পেরেছেন রক্তিম এক বেগ।

এখন প্রশ্ন হোল—এর জন্য নেতাজী চরিত্রের রূপদাতা জনপ্রিয় শান্তিগোপালের অপূর্ব রূপায়ণই দায়ী, না সামগ্রিক প্রযোজনা তথা নাটকের মধ্যে সেই দীপ্তি ছিল যা এই পালার আবেদনকে মনোগ্রাহী করে তুলতে পেরেছে। প্রথমেই বলি : তরুণ অপেরার 'লেনিন', 'হিটলার' প্রযোজনা আমাদের যেমন বিস্ময়ে হতবাক করেছে, 'আমি সুভাষ' একটি বিশেষ চরিত্রকে কেন্দ্র করে আন্দোলন তুলেও মনের গহনে সে বিস্ময়ের জোয়ার তোলেনি। অন্তর্ধানের পর থেকেই যে সুভাষচন্দ্রের আসল কর্মময় জীবনের শুরু, তাকে কেন্দ্র করেই 'আমি সুভাষে'র সংঘাত গড়ে উঠেছে। কাবুলে, জার্মাণী, প্রভৃতি জায়গায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতাআন্দোলনকে জোরদার করে তোলার জন্য নেতাজী নানা রকম পরিকল্পনা, এবং সর্বোপরি আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কত্ব লাভ প্রভৃতি নানা রকম ঘটনার মধ্যে দিয়েই পালাটি এগিয়েছে। সংগ্রামী সুভাষচন্দ্রের সবারই পরিচিত জীবনকেই 'আমি সুভাষ' প্রকাশের আলোয় মুখর করে তোলার চেষ্টা করেছে। পালা সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা দরকার। নেতাজীর আন্দোলন পরিকল্পনার কয়েকটি দৃপ্ত মুহূর্ত বোধ হয় আরো সুগঠিত এবং নাটকীয় সংঘাতে ভরে থাকতে পারতো। নেতাজীর সংলাপেও বোধ করি দু'এক জায়গায় প্রত্যাশিত দৃঢ়তা ফোটেনি। লেনিনের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সংলাপ যেমন প্রোজ্জ্বল করে তুলেছিল, নেতাজীর মুখে সংলাপের সেই প্রাণময়তা সব সময় আসেনি।

এবার আসা যাক প্রযোজনা ও প্রয়োগপরিকল্পনার কথায়। পালা রচয়িতা অমর ঘোষই নিয়েছেন নির্দেশনার দায়িত্ব। পালাটিকে প্রাণবন্ত ও শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় দ্যুতিময় করে তুলতে তিনি চেষ্টার কোনো ত্রুটিই করেন নি। নেতাজীর মালা নিলামের স্পর্শকাতর মুহূর্তটি সত্যি অপূর্ব হয়েছে। দু'একটি জায়গায় নেতাজীর মানসিক বিবর্তনের ছবি তুলে ধরতে ফ্ল্যাস-ব্যাক সিসটেম-এ কিছু কন্ঠের সমাবেশ বেশ যুক্তিযুক্তই হয়েছে। কিন্তু তবুও সামগ্রিক ভাবে পালার গতি বোধহয় সব সময় জোরদার হয়ে উঠতে পারেনি। নেপথ্য কন্ঠগুলোর মধ্যে আরো অনেক বেশী দৃঢ়তা আসা উচিত ছিল। সঙ্গীতাংশেও কোন উল্লেখযোগ্য দীপ্তি চোখে পড়েনি।

আঙ্গিকগত শৈথিল্য ঢেকে দিয়েছেন নেতাজীরূপী শ্রীশান্তিগোপাল। যখন তিনি মঞ্চে এলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসেবে, মনে হোল আমাদের চোখের সামনে আমাদের সাধের, স্বপ্নের নেতাজী এসে দাঁড়ালেন। ঠিক লেনিনের মতো নেতাজীকেও মূর্ত করে তুলেছেন

াচনভঙ্গির বলিষ্ঠতা ও আবেগ তিনি প্রয়োজনমত আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন। এখানেই তাঁর অসামান্য শিল্পিক নৈপুণ্য। আর একটি স্বচ্ছন্দ চরিত্রচিত্রণ হয়েছে অনুপকুমারের 'ইয়াকুব', এতো সাবলীল অভিনয় পালা গানের আসরে অনেকদিন চোখে পড়েনি। শিব ভট্টাচার্যের 'পরেশ রায়'ও হয়েছে প্রাণোচ্ছল। বর্ণালী মজুমদার 'জারিনার' ভূমিকায় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। অন্যান্য কয়েকটি ভূমিকায় ছিলেন সত্যেন মুখার্জি, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন দে, বাবলু চৌধুরী অজিত দত্ত, রঞ্জিত চক্রবর্তী, অসীমকুমার, গোবিন্দ মাহান্ত, লিলি মন্ডল পুতুল দত্ত।

তরুণ অপেরার হিটলার, লেনিন, রামমোহন পরিবেশন করে পালাগানের আসরে যে পালা বদলের জোয়ার এনেছেন, সেই বলিষ্ঠতার আভাস 'আমি সুভাষ' আছে। তবে পালাটির মধ্যে আরো কয়েকটি মুহূর্তকে আরো গভীরতর সংঘাতে ভরিয়ে তোলার প্রয়োজন আছে এবং কয়েকটি শিল্পীর চরিত্রের সঙ্গে একাত্মভাবে একটু অভাবও পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ব্যাপারে পালার নির্দেশককে আরো একটু চিন্তায় ডুব দিলে ভালো হয় বলে আমাদের বিশ্বাস। 'আমি সুভাষ'র পরবর্তী প্রযোজনা তরুণ অপেরার সৃষ্টির তারুণ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক, এই আশাই করছি।

শৌভনিক প্রযোজিত 'উট পাখি' : অপ্রিয় হোলেও একটা কথা মর্মান্তিকভাবে সত্য যে, জনসাধারণের কল্যাণকে পাথেয় করে আজ যে আন্দোলন বা সংগ্রামের বৃহত্তর কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, কিছুদিন অতিক্রান্ত হবার পর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জনতা সেখান থেকে অপসৃত হয়, দলীয় স্বার্থের সমাবেশ ও সংঘাতই হয় সেখানে প্রকট, লক্ষ্য হয়ে ওঠে উপলক্ষ্য। আজকের সামাজিক ও রাজনীতির আকাশে এ মেঘের খেলা চলেছে প্রতিদিন। সাম্প্রতিক নাটক যদি এই ছবিকেই তুলে ধরে তাহলে তাকে রাজনৈতিক নাটক বলে দূরে সরিয়ে রাখার আজ কোন অর্থই হয় না। বিশেষ করে আজকের যুগে নাট্যকারকে একটা সুগভীর সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যও পালন করতে হয়। সম্প্রতি 'শৌভনিক' প্রযোজিত 'উটপাখি' নাটকের মধ্য দিয়ে আমাদের আজকের জীবনের ঐ নিদারুণ সত্যটিকেই হয়তো ভাষা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। বক্তব্যের দিক থেকে সমকালীন জীবন ও সমাজের ছবি এতো বলিষ্ঠভাবে এঁদের প্রযোজিত পূর্ব নাটকে হয়তো সোচ্চার হয়ে উঠতে পারেনি। একটি রূপকের আড়ালেই নিষ্ঠুর সত্যটির প্রকাশ ঘটেছে। জ্ঞানদেব অগ্নিহোত্রীর রচনা থেকে নাটকটি অনুবাদ করেছেন প্রতিভা অগ্রবাল।

কোন একটা দেশ। নাম তার স্বর্ণনগরী। সেখানে রাজা আছে, মন্ত্রীপরিষদ আছে, বিরোধী পক্ষের নেতা আছে, সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি মামুলিরাম আছে। এই নগরীর রাজচিহ্ন সোনার উটপাখি [illegible] ফিরিয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করেই নাটকের ঘটনা এগিয়েছে। এ ব্যাপারে সাহায্য করতে শেষ পর্যন্ত কাজে এসে হাত লাগালো বিরোধীপক্ষের নেতা বিরোধিলাল। রাজার আনুকূল্যে সে হোল কলামন্ত্রী। একটি নাটকীয় মুহূর্তে মামুলিরাম এসে স্তম্ভিত হোল জনতার কল্যাণব্রতী নেতা প্রাচুর্যের আবর্তে পড়ে কিভাবে নীতি বিসর্জন দিয়েছে দেখে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো এবং বোঝা গেল সোনার উটপাখি তৈরীই হয়নি, কিন্তু রাজকোষের সমস্ত অর্থ ফুরিয়ে গেছে। যে সব মন্ত্রীরা এ কাজের ভার নিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই রাজাকে ঠকিয়েছেন, বঞ্চিত করেছেন। শেষের প্রহরে সব অপরাধের বোঝা এসে পড়লো এই সব মন্ত্রীদের ওপর (যাঁদের বলা যায় সচেতন উটপাখি), যাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাজসিংহাসনে বসা। এই সব সচেতন উটপাখিদের মুখোস খুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এ নাটকে। শৌভনিক তার প্রচার-পুস্তিকায় বলেছেন : 'আপনার আমার চারদিকে এই রকম অসংখ্য সচেতন উটপাখি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা তাদের এখনো চিনতে পারছি না। তাই আমরা মামুলিরামরা বাঁধা পড়ে আছি সিংহাসনের নীচে— আমাদের নিয়েই এ নাটক।

এই নাটকের মধ্যে বেশ সুন্দর শৈল্পিক ভঙ্গিমায় স্যাটায়ার করা হয়েছে, কিছু জিনিসকে। যেমন তদন্ত কমিশনকে কেন্দ্র করে যে মুহূর্তের সৃষ্টি হয়েছে নাটকে তা হয়েছে অসাধারণ এবং এর মধ্য দিয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কমিশন নিযুক্তির প্রহসনও ধরা পড়েছে। একটা কথা এ নাটক সম্পর্কে বলতে হয় যে, চূড়ান্ত রাজনীতির কথা থাকলেও, উটপাখি বিশেষ কোন 'ইজমকে' প্রকাশ করেনি, বা শুধুমাত্র প্রচারধর্মী হয়ে ওঠেনি, আলোয় আঁধারে, সংলাপে সংঘাতে তা হয়েছে যথার্থ একটি নাটক। নাটকটির নির্দেশক হোলেন বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রয়োগপরিকল্পনায় কয়েকটি মুহূর্তে তিনি সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় রাখতে পেরেছেন। রাজার সূত্রধার হয়ে আসার ব্যাপারটাও গভীরতর এক ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

এপার ওপার / সৌমিত্র-অপর্ণা

মঞ্চসজ্জায় যে পরিচ্ছন্ন ভাব অটুট ছিল তার জন্য সবটুকু ধন্যবাদ প্রাপ্য শংকর গুপ্তর।

অভিনয়ের ব্যাপারে যিনি সবার আগে দর্শকের মন কেড়ে নেন তিনি হোলেন অশোক মিত্র। তাঁর রাজার চরিত্রচিত্রণ সমগ্র নাট্যপ্রযোজনার একটি বিশিষ্ট সম্পদ। শ্রীমিত্র যে একজন প্রথম শ্রেণীর মঞ্চাভিনেতা, এ চরিত্রের রূপায়ণ আবার সে সত্যকে নতুন করে প্রকাশ করলো। তারপরে উল্লেখ করতে হয় কাজল মুখার্জির রাণীর কথা, একটা স্বচ্ছন্দ অথচ স্বতন্ত্র ভঙ্গিমায় তিনি চরিত্রটিকে সজীব করে তুলেছেন মঞ্চের আলোয়। বিরোধিলালের ভূমিকায় বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়, সপ্রতিভই হয়েছে, কিন্তু দু' একটি জায়গায় তাঁর সংলাপ বলার রীতিটি কৃত্রিম বলে মনে হোচ্ছিল। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন প্রদীপ ভট্টাচার্য (অন্নমন্ত্রী), অসিত ঘোষ (ভাষণমন্ত্রী), শিবু মজুমদার (রক্ষামন্ত্রী), নির্মল বামবণিক (মামুলিরাম), শংকর গুপ্ত (বৃদ্ধ) ও সিপ্রা চক্রবর্তী (দাসী)।

চরিত্রহীন : শরৎচন্দ্রের বহু বিতর্কিত উপন্যাস 'চরিত্রহীনে'র একটি পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপ ক'দিন আগে পরিবেশিত হোল 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে। অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকা ড্রামাটিক পারফরমেন্স কমিটির শিল্পীরা। সামগ্রিকভাবে নাট্যাভিনয়টি মনোগ্রাহীই হয়েছিল এবং এর জন্য শিল্পীদের আন্তরিক অভিনয় নিষ্ঠাই দায়ী। নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়ে•

ছিলেন অমরেশ ভট্টাচার্য ও নিরঙ্কুশ লাহিড়ী।

বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন কৃষ্ণকুমার ঘোষ (শিবপ্রসাদ), অমরেশ ভট্টাচার্য (উপেন), পার্থ চ্যাটার্জী (সতীশ), বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য (দিবাকর), অমরনাথ ঘোষ (বেহারী), সুবোধ নিয়োগী (রাখাল), রতীন দাস (সুকুমার), সবিতা মুখার্জী (কিরণময়ী), মমতা চ্যাটার্জী (সাবিত্রী), বিমানী গাঙ্গুলী (সুরবালা), প্রতিমা পাল (সরোজিনী), গোকুল ব্যানার্জী, চিত্তরঞ্জন রায়, পরিতোষ মুখার্জী, সুশীল দাস, অমর ভট্টাচার্য, ভূপাল ঘোষ, অজয় সাহা, সুধীন মাইতি, কৃষ্ণ দত্ত, সুধাময় চ্যাটার্জী, বিদ্যুৎ ব্যানার্জী, নিরঙ্কুশ লাহিড়ী, অমর সেন, নমিতা দত্ত, মণিকা দত্ত।

নাট্যানুষ্ঠানটির সভাপতি ছিলেন সুসাহিত্যিক শ্রীসুবোধ ঘোষ ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন নাট্য-সাম্রাজ্ঞী শ্রীমতী সরযূবালা দেবী।

অ্যানজেল ক্লাবের 'মসীলিপ্ত': সম্প্রতি অ্যানজেল ক্লাবের শিল্পীরা উল্টোডাঙ্গায় মঞ্চস্থ করলেন সমীর মুখার্জীর 'মসীলিপ্ত' নাটকটি। দলগত অভিনয়ে এই নাটকটির প্রযোজনা মোটামুটি স্বচ্ছন্দই হয়েছিল। কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অশোক মৈত্র, স্বপন সেন, রাজীব মিত্র ও সমীর পালের অভিনয় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তা ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে ছিলেন জগন্নাথ বিশ্বাস, জয়ন্ত ব্যানার্জী, মলয় ঘোষ, সুভাষ সেন, লিপিকা ব্যানার্জী, সমর বিশ্বাস, প্রদীপ নাথ, অরুণ দাস, তপন মৈত্র, সুজিত পোদ্দার।

প্রগতি পরিষদে'র নাটক: কয়েকদিন আগে প্রগতি পরিষদের বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষে 'রঙ্গনা'য় অভিনীত হোল বাদল সরকারের 'কবি কাহিনী' নাটকটি। দলগত অভিনয় গুণে নাটকটি সত্যিই উপভোগ্য হয়ে ওঠে। নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন শিবব্রত রায়, অলোক ধর, শৈবালী চ্যাটার্জী, সতীনাথ দত্ত, সুশান্ত দাস শ্রীমতী পাইন, বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী, অলোক ব্যানার্জী ও তপোব্রত দত্ত।

শৌভনিক প্রযোজিত উটপাখি নাটকের একটি বিশিষ্ট মুহূর্তে অশোক মিত্র ও নির্মল কংসবণিক

অনুষ্ঠানের শুরুতে সংস্থার শিশু সদস্যরা তপোব্রত ঘোষ রচিত, পরিচালিত 'মুক্তির আনন্দ' রূপক আলেখ্যটি মঞ্চস্থ করে। শুধু সুখের মধ্যেই যে মানুষের মুক্তি নয়—সুখ ও দুঃখ দুয়ের মিলনেই যে তার মুক্তির আনন্দ এই ছিল আলেখ্যটির মূল বক্তব্য। নৃত্য ও অভিনয়ের সুসমন্বয়ে আলেখ্যটি বক্তব্য প্রকাশে নতুনত্বের পরিচয় বহন করে। সঙ্গীত পরিচালনা, নৃত্য পরিকল্পনা, মঞ্চসজ্জা এবং আলোকসম্পাতে যথাযথ দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে অশোক ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রকুমার, সুশান্ত দে ও কাশীনাথ পাল। প্রত্যেকটি শিল্পীই নিজেদের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। তবুও তার মধ্যে শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী মহুয়া ঘোষাল, রামনাথ গাঙ্গুলী ও শর্মিলা চক্রবর্তীর প্রয়াস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিবিধ সংবাদ

কুচবিহার হেলথ রিক্রিয়েশন ক্লাবের অনুষ্ঠান: উত্তরবঙ্গের ছিমছাম ছোট্ট শহর কুচবিহার। এখন উত্তাল অস্থির অনেকগুলো কারণে। একে বর্ষা, এ সময়ে অনুষ্ঠান বড় একটা হয় না, শরণার্থীদের ভীড় তাছাড়া রয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের আহত সৈনিকদের উপস্থিতি। এসব সত্ত্বেও কুচবিহারের এম, জে, এন হাসপাতালের হেলথ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ তাঁদের জরুরী কর্তব্য কাজের মধ্যেও প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান করল গেল ৪ঠা জুন। ডাঃ সুবল করগুপ্ত ও শ্রীমতী হিরণ মিত্রের পরিচালনায় বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সুনীল দাশগুপ্ত, প্রণব চ্যাটার্জি, গীতশ্রী ভট্টাচার্য ও বিজয়া লাহিড়ী। শিশুশিল্পী মনমন করগুপ্ত ও প্রার্থনা চক্রবর্তীর গানও উপভোগ্য। সঙ্গতে ছিলেন শঙ্কর মজুমদার ও রবিশঙ্কর মিশ্র। গিটার বাজিয়ে শোনান দীপিকা ঘোষ। হাস্যকৌতুক পরিবেশন করেন ডাঃ হৃষীকেশ চ্যাটার্জি। বিচিত্রানুষ্ঠানের পর গৌতম রায় রচিত 'অঘটন' নাটক মঞ্চস্থ হয় ডাঃ অমিতাভ চক্রবর্তীর পরিচালনায়। বিভিন্ন চরিত্রে সার্থকভাবে রূপদান করেন অনিমেষ সাহা, উদয়প্রসাদ সিংহ, স... চৌধুরী, নির্মলেন্দু চক্রবর্তী, জ্যোতিরঞ্জন গাঙ্গুলী, স্বপন রায়, অনিল কুণ্ডু এবং মীরা দাশগুপ্তা ও কালীবোলা মন্ডল।

প্রাচ্যবাণীর 'কবিকুলকমলম্'

প্রাচ্যবাণী সংস্থার ২৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ১৪ই জুলাই মহাজাতি সদন মঞ্চে ডাঃ রমা চৌধুরী রচিত ও পরিচালিত সংস্কৃত নাটক 'কবিকুলকমলম্' ক্ষণিক লহমার জন্যও যেন বর্তমানের সমস্যার জীবনের গ্লানি ভুলিয়ে আমাদের মহাকবি কালিদাসের স্বপ্নময় কাব্যরাজ্যে পৌঁছে দিয়েছিল।

কবি কালিদাসের শেষজীবনের দুঃখ কণ্টকিত, আশ্চর্য জীবনের এক সু... আলেখ্য ঠিক যেন গানের সুরের ম... মেলে ধরা হয়। সঙ্গীতছন্দী অতিস... সংস্কৃত ভাষায়। কালিদাসের সখী... সরস সংলাপ, তাঁর প্রতি বিক্রমাদিত্য... সশ্রদ্ধ সখ্যতা শত্রুপক্ষের হীন ষড়যন্ত্র... অনুতাপ জীবন্ত করে তোলেন ... অনাথশরণ কাব্যব্যাকরণতীর্থ, স... চৌধুরী, সলিল আচার্য, দীলিপ স... অধ্যাপিকা শান্তি চক্রবর্তী, শ্রাবণী সর... রূপধারা ঘোষ ও শঙ্করপ্রসাদ রায়।

যতীন্দ্রবিমল জয়ন্তী উৎসব

গেল ১০ই জুলাই রামকৃষ্ণ ... ব্রেরীতে ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর ... জয়ন্তী পালনের জন্যে প্রাচ্যবাণীর ... হতে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য ... ডাঃ সরোজকুমার দাস। সভাপতির ভা... শ্রীদাস সংস্কৃত পণ্ডিত, গবেষক, লেখক, নাট্যকার হিসেবে স্বর্গত ডাঃ চৌধুরীর বিচিত্রমুখী অনন্যসাধারণ প্রতিভার সৃজনশীল অবদানের ওপর আলোকপাত করেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ... ও প্রচার কাজে যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ... তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী ডাঃ রমা চৌধুরী ... নিরলস শ্রম ও সাধনার সশ্রদ্ধ ... করেন উপস্থিত বহু গুণীজ্ঞানী। প্রসঙ্গে ডাঃ রমা চৌধুরীর সহজ ভাষায় সংস্কৃত নাটক রচনা ও ভা... নানা জায়গায় তাঁর মঞ্চরূপ উপস্থাপন দ্বারা বিদগ্ধ-সমাজে সংস্কৃত ভ... পুনরুজ্জীবিত ও জনপ্রিয়তা ... করণকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জ্ঞাপন করা ...

সভান্তে এক রমণীয় সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী মঞ্জু গুপ্ত, ... রায়চৌধুরী, পূর্ণেন্দু রায়, নিম... চৌধুরী।

জলসা

সুরদাস সংগীত সম্মেলন

সুরদাস সংগীত সম্মেলনের সপ্তম র্ষিক অধিবেশন আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর কে ১৮ সেপ্টেম্বর অবধি এ্যাকাডেমী ব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত হবে। শেষ-নের অধিবেশনটি সারা রাত্রিব্যাপী। না গেছে এ বছর ভারতবর্ষের কয়েকজন খ্যাত শিল্পী এই প্রথম বাংলাদেশে তাঁদের গীত পরিবেশন করবেন। যন্ত্রে—ওস্তাদ লিম জাফর খাঁন, ওস্তাদ আহমদ রেজা ন (বিচিত্র বীণা—দিল্লী), দ্বৈত বীণা ও তারে—ভি রাঘবন ও এম জনার্দন াদ্রাজ), ভি জি যোগ, কালীজীবন সোম, ষ্টার রো, পন্ডিত শান্তাপ্রসাদ, কন্ঠে—ন্ডিত দিনকর রাও দেশপান্ডে (বম্বে), বতকন্ঠে ওস্তাদ গোলাম সাদিক ও গোলাম সরাজ (দিল্লী), শিপ্রা বোস, কুমার মুখার্জি, নেওয়ার আলি খাঁন, আরতি বাগচী, াল্গুনী মিত্র (ধ্রুপদ) ও আশালতা াংগুলী, নৃত্যে—মাদ্রাজের নিরজা দেবী ও সম্প্রদায়, শর্মিষ্ঠা, মালঞ্চ সেন ও দবযানী ভট্টাচার্য। এছাড়া সর্বপ্রথম বাংলা-দশে মাদ্রাজের মৃদঙ্গ বাদক গুরুভায়ুর রোই ও দিল্লীর সারেঙ্গী বাদক শ্রীইন্দর াল।

সংগীতজ্ঞ গায়ক ও তানসেন সঙ্গীত ংঘের সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় সংগীত নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত। তাঁর সংগীতশিক্ষা পুস্তকও -বিষয়ে নিজস্ব চিন্তাধারার এক প্রামাণ্য জীর।

বোম্বাই-এ বাঙালী সংগীতবিদ অভিনন্দিত

সম্প্রতি শ্রীশৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় বোম্বাই-এর একটি আলোচনাচক্রে উদাহরণসহ তাঁর ৌলিক অনুধাবনকে ওখানের সংগীত-মাজে পেশ করবার জন্য আহূত হয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁর নিজস্ব সংগীত-চিন্তা 'মানবদেহের সঙ্গে রাগ-রাগিণীর াদৃশ্য' সাদর অভিনন্দন লাভ করে। এ ম্বন্ধে ওখানের বিখ্যাত সংবাদপত্রের বিশিষ্ট সমালোচকের উক্তি উল্লেখযোগ্য—

'আমাদের মধ্যে ক'জনই বা ভারতীয় াগ-সংগীতের সঙ্গে মানবদেহের আশ্চর্য াদৃশ্যের কথা চিন্তা করি? কিন্তু শ্রীশৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় এ-নিয়ে ভেবেছেন বং মানবদেহের সঙ্গে রাগ-রাগিণীর পভোগ্য সাদৃশ্যের অবতারণা করেছেন।

উদাহরণতঃ বলা যায়—প্রাচীন আয়ুর্বেদ ম্যানুযায়ী মানবদেহে প্রধানতঃ সাতটি ায়ু—আর সেই স্নায়ুদের যথাযোগ্য বস্থানের ওপর শারীরিক সুস্থতা নির্ভর-ীল। রাগ-রাগিণীও ৭টি স্বরেই প্রতি-ষ্ঠিত এবং উপযুক্ত স্বরসমন্বয়েই রাগের ার্থ রূপ প্রকাশিত হওয়া সম্ভব।

মনস্তাত্ত্বিক বিচারের পরিপ্রেক্ষিতেও উভয়ের সাদৃশ্য সুপরিলক্ষিত।

মানুষ সঙ্গী চায়। সংগীতও চায় সঙ্গত। মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের প্রথম দিকের সংকোচ পরে অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। রাগের ক্ষেত্রেও ঐ একই ধারা। রাগবিস্তারের ক্রম-উন্মোচনের প্রথমের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর; পরে নানান পকড়, জোড় ঝালা ও দ্রুত।

এইভাবে বিশ্লেষণের অভিনবত্বে বোম্বাই-এর সংগীত-মহল চমৎকৃত হন এবং শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় মাঝে মাঝে ওখানের সাংগীতিক আলোচনাচক্রে যোগ দেবার আহ্বান জানান।

উপরোক্ত অনুষ্ঠান খার-এর দময়ন্তী হলে অরুণ সংগীতালয় দ্বারা আয়োজিত হয়।

মল্লার মিউজিক সার্কেলের অনুষ্ঠান

গত শুক্রবার ১৩ই আগস্ট কাশিম-বাজার রাজবাটিতে মল্লার মিউজিক সার্কেলের মাসিক অধিবেশনে আমরা একটি উদীয়মান কিশোরী শিল্পীর উল্লেখযোগ্য কত্থক-নৃত্য দেখে খুসী হয়েছি। শিল্পীর নৃত্য সত্যিই আনন্দদায়ক। লয় ও আংগিকের দক্ষতা ছাড়াও যেটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—সে তাঁর সাবলীল সুন্দর ভংগী। ষোড়শী শিল্পীর নাম মালবিকা সেন। ইনি মল্লার সংগীত প্রতিষ্ঠানের নৃত্যশিক্ষিকা শ্রীমতী রুবী দত্তর ছাত্রী। এঁর সঙ্গে ত্রিতালে প্রশংসনীয় তবলা সংগত করেন অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়াংশে এস্রাজ বাজিয়ে শোনালেন রণধীর রায়। বাদনকুশলতা ছাড়াও হৃতপ্রায় যন্ত্রটিকে পুনঃপ্রচলন করার কাজেও শ্রীরায়ের অবদান লক্ষ্যণীয়। ইনি বাজালেন 'দেশ'—বর্ষাঋতুর সঙ্গে সংগতি রেখে রাগরূপায়ন ও বিশ্লেষণে শিল্পীর অনস্বীকার্য কৃতিত্ব সকলের অকুন্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। ইনি একটি ধুন বাজিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।

সদারং সংগীত সম্মেলন—সর্বভারতীয় সদারং সংগীত সম্মেলনের পাঁচদিন ব্যাপী সংগীতোৎসব (আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১১ই সেপ্টেম্বর)। অনুষ্ঠানে যোগদানকারী শিল্পীরা হলেন ওস্তাদ আমীর খাঁ, সংগীতালঙ্কার সুনন্দা পট্টনায়ক, ওস্তাদ সরাফৎ হোসেন, ওস্তাদ মুণাব্বর খাঁ, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম রায়, কুমারেশ বসু, মণি রায় (কার্শিয়াং), কুমার মুখোপাধ্যায়, সুভদ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপা কাঞ্জিলাল ও লীনা মুখোপাধ্যায় (কন্ঠ-সংগীত), যন্ত্রসংগীতে আছেন পন্ডিত ভি জি যোগ, পন্ডিত কিষণ মহারাজ, ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খান, কালীজীবন সোম, রইস খান, মণিলাল নাগ, অশোক পাঠক, আর ডি বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গতে—ওস্তাদ কেরামতুল্লা খান, লক্ষ্মণ খান, শ্যামল বসু, দ্বিজেন বসু, অমর দে, গোবিন্দ বসু, পঙ্কজ চক্রবর্তী। নৃত্যে—অর্জুন মিশ্র ও লতাকুমারী (কত্থক)।

প্রখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী জপমালা ঘোষ এবছর পলিডোর কোম্পানীতে যোগ দিয়েছেন। গত ২৮শে জুলাই মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে এবং শিবনারায়ণ ঘোষালের কথায় টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে এঁর দুটি রেকর্ড গৃহীত হয়। গানদুটি হোলো 'আয় আয় চাঁদামামা' ও 'মেঘ গুরুগুরু দুপুরে'—। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এইটিই পলিডোর কোম্পানীর প্রথম নন্-ফিল্ম ডিস্ক।

গীতিমাল্য-এর সংগীতানুষ্ঠান

গেল ৩০ জুলাই প্রখ্যাত চলচ্চিত্র ও মঞ্চাভিনেতা রবীন মজুমদার সংগীত পরিবেশন করলেন গীতিমাল্যের মাসিক অধিবেশনে। বহুদিন পরে আবার সংগীত আসরে তাঁকে দেখা গেল। সুদীর্ঘ দেড় ঘন্টাব্যাপী তিনি তাঁর উদাত্ত কন্ঠে রবীন্দ্র-সংগীত, পল্লীগীতি ও তাঁর অভিনীত বিভিন্ন ছবির গান গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। তাঁর গান পরিবেশনার রীতির সঙ্গে আজকের দিনের গান পরিবেশনার মধ্যে পার্থক্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করা গেল। শ্রোতাদের অনুরোধে যে সব গান তিনি গাইলেন তার মধ্যে 'আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ' ও কবি বইয়ের 'এই খেদ ছিল মোর মনে' ও 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে' এই গান তিনখানি শ্রোতাদের মনে বহুদিন জাগরূক থাকবে। তাঁর সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেন গৌর কর।

—চিত্রাঙ্গদা
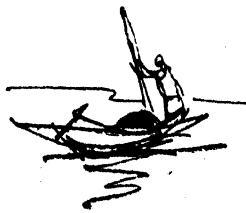
ভারতবর্ষের অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার (ডান দিকে) ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৭১ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে 'রাবার' জয়ের নগদ পুরস্কার (দেড় হাজার পাউণ্ডের চেক) গ্রহণ করছেন।

ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ড

তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট

ইংল্যাণ্ড : ৩৫৫ রান (জেমসন ৮২, এডরিচ ৪১, নট ৯০ এবং হাটন ৮১ রান। সোলকার ২৮ রানে ৩, বেদী ১২০ রানে ২, চন্দ্রশেখর ৭৬ রানে ২ এবং ভেংকট-রাঘবন ৬৩ রানে ২ উইকেট)

ও ১০১ রান (লাকহার্স্ট ৩৩ রান। চন্দ্রশেখর ৩৮ রানে ৬ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ৪৪ রানে ২ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ২৮৪ রান (ওয়াদেকার ৪৮, সারদেশাই ৫৪, সোলকার ৪৪ এবং ইঞ্জি-নিয়ার ৫৯ রান। ইলিংওয়ার্থ ৭০ রানে ৫ এবং স্নো ৬৮ রানে ২ উইকেট)

ও১৭৪ **রান** (৬ উইকেটে। ওয়াদেকার ৪৫ সারদেশাই ৪০, বিশ্বনাথ ৩৩ রান এবং ইঞ্জিনিয়ার নটআউট ২৮ রান। আণ্ডারউড ৭২ রানে ৩ উইকেট)

ওভালে অনুষ্ঠিত ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ডের শেষ তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষ ৪ উইকেটে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে ১৯৭১ সালের টেস্ট সিরিজে ১—০ খেলায় (ড্র ২) 'রাবার' জয়ের গৌরব লাভ করেছে। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচে এবং টেস্ট সিরিজে ভারতবর্ষের এই প্রথম জয়। এই দুই দেশের মধ্যে এই নিয়ে যে ১১টি টেস্ট ক্রিকেট

দর্শক

ইংল্যাণ্ডের 'রাবার' জয় ৭ বার, ভারতবর্ষের 'রাবার' জয় ২ বার এবং দুবার সিরিজ অমীমাংসিত। ১৯৭১ সালেই ওয়াদেকারের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে 'রাবার' জয়ের সুবাদে ভারতবর্ষ আজ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে অতি সম্মানজনক আসন লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, ওভালের এই তৃতীয় টেস্ট খেলার আগে ১৯৭১ সালের টেস্ট খেলার ফলাফল ধরে ইল্যাণ্ড এবং ভারতবর্ষ অপরা-জেয় ছিল—ইংল্যাণ্ডের ১১টি টেস্ট খেলায় ৪টি জয় এবং ভারতবর্ষের ৭টি খেলায় একটি জয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ভারতবর্ষের 'রাবার' জয়ের ফলে বিশ্বনিন্দুকদের মুখে ভারতবর্ষ সম্পর্কে 'বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে'—এই উক্তি আর শোভা পাবে না।

সারা পৃথিবীর খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং সমালোচকরা সংবাদপত্র মারফৎ ভারতবর্ষের খেলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এঁদের

খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার স্যার ডো ব্র্যাডম্যান।

'সাবাস ওয়াদেকার—সাবাস তোমা —এই জয়ধ্বনিতে আজ সারা ভা আকাশ-বাতাস মুখরিত।

ওভালের এই শেষ তৃতীয় টেস্ট খে ছিল উভয় দলেরই কাছে খুব গুরুত্ব কারণ প্রথম এবং দ্বিতীয় টেস্টে জয় জয়ের মীমাংসা হয়নি। সুতরাং জ মর্যাদার কথা মনে রেখে দুই দলেরই খে লাড়রা জান দিয়ে খেলেছিলেন।

ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক ইলিং প্রথম এবং দ্বিতীয় টেস্টের মত টসে প্রথম ব্যাট করার দান নিয়েছিলেন। ভিত পাকাপোক্ত হওয়ার আগেই রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের অতি নিভ ব্যাটসম্যান লাকহার্স্ট আউট হন। সময় ইংল্যাণ্ডের রান দাঁড়ায় ১৭ (কেটে)। খেলায় অপরাজিত ছিলেন (৫৪ রান) এবং এডরিচ (৩৩ রান) দুজন দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে মিনিটে ১০৬ রান সংগ্রহ করে ইংল প্রাথমিক ধাক্কা সামলে দেন। কি দ্বিতীয় উইকেটের জুটি ভাঙ্গার পর ইংল্যাণ্ডকে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে তাদের ১৩৫ রানে ৩য়, ১৩৯ রা ১৪৩ রানে ৫ম এবং ১৭৫ রানে ৬ কেট পড়ে যায়। ভারতীয় বোলিং

কেট জুটি—উইকেটকিপার এ্যালেন নট এবং বোলার রিচার্ড হাটনের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলায় স্তব্ধ হয়ে যায়। চা-পানের সময় ইংল্যাণ্ডের রান ছিল ২২৬ (৬ উইকেটে)। ৭ম উইকেটের জুটিতে তখন ৫১ রান উঠেছে। নট ৫২ রান এবং হাটন ১৭ রানে অপরাজিত। ইংল্যাণ্ডের ২৭৮ রানের মাথায় নট তাঁর ব্যক্তিগত ৯০ রান করে সোলকারের বলে ক্যাচ তুলে তাঁরই হাতে ধরা পড়েন। ৭ম উইকেটের জুটিতে নট এবং হাটন যে ১০৩ রান সংগ্রহ করেন তা ভারতবর্ষের বিপক্ষে ইংল্যাণ্ডের ৭ম উইকেট জুটির রেকর্ড রানে পরিণত হয়। পূর্ব রেকর্ড ছিল ১০২ রান (ইলিংওয়ার্থ এবং সোয়েটম্যান, ওভাল, ১৯৫৯) হাটন ৮১ রান তুলে খেলা থেকে বিদায় হন। ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংস ৩৫৫ রানের মাথায় শেষ হয়। জেমসন বাদে ব্যাটসম্যান পর্যায়ভুক্ত খেলোয়াড়রা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেন। শেষ পর্যন্ত উইকেট-কিপার নট ৯০ রান এবং বোলার হাটন ৮১ রান তুলে ইংল্যাণ্ডের মুখরক্ষা করেন।

দ্বিতীয় দিনে বৃষ্টির ফলে খেলা আরম্ভই হয়নি। লাঞ্চের এক ঘণ্টা পর খেলা হবে না ঘোষণা করা হয়।

তৃতীয় দিনে ভারতবর্ষ ১ম ইনিংসের খেলা সুরু করে ৭ উইকেটের বিনিময়ে ২৩৪ রান তুলেছিল। ভারতবর্ষের খেলার সূচনা খুবই আলগা হয়েছিল—১৭ রানের মাথায় ১ম এবং ২১ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়।

তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ওয়াদেকার এবং সারদেশাই ৯৩ রান তুলে প্রাথমিক বিপর্যয় থেকে দলকে উদ্ধার করেন। ভারতবর্ষের ১১৪ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়ার পর ভারতবর্ষকে আবার বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হয়। ৫ম উইকেট পড়ে ১২৫ রানের মাথায়। শেষ পর্যন্ত ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ইঞ্জিনিয়ার এবং সোলকার দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে অতি মূল্যবান ৯৭ রান যোগ করলে ভারতবর্ষের ২২২ রান দাঁড়ায় (৬ উইকেটে)। চা-পানের সময় ভারতবর্ষের রান ছিল ১৩৫ (৫ উইকেটে)। উইকেটে ছিলেন সোলকার (৫ রান) এবং ইঞ্জিনিয়ার (৮ রান)। তৃতীয় দিনের খেলায় ভারতবর্ষের ২৩৪ রান (৭ উইকেটে) উঠলে হিসাবে দেখা গেল ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের ৩৫৫ রানের থেকে তারা তখনও ১২১ রানের পিছনে এবং হাতে জমা মাত্র ৩টে উইকেট। খেলায় অপরাজিত ছিলেন আবিদ আলি (২ রান) এবং ভেঙ্কটরাঘবন (৩ রান)।

চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ২৮৪ রানের মাথায় শেষ হয়। তারা এই দিন ৩টে উইকেটের বিনিময়ে ৬৫ মিনিটের খেলায় আরও ৫০ রান যোগ করেছিল। ইংল্যাণ্ড ৭১ রানে এগিয়ে ২য় ইনিংস খেলতে নামে। খেলার এই অবস্থা ইংল্যাণ্ডের অনুকূলে ছিল। কিন্তু তাদের

অজিত ওয়াদেকার

ভেঙ্কটরাঘবন

২য় ইনিংস মাত্র ১০১ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষের অনুকূলে হাওয়া ঘুরে যায়। ওয়াদেকারের দল-পরিচালনা এবং চন্দ্রশেখরের মারাত্মক বোলিং ইংল্যাণ্ডের এই শোচনীয় অবস্থার কারণ। চন্দ্রশেখর একাই ৬টা উইকেট নিয়েছিলেন ৩৮ রানে। লাঞ্চের সময় ইংল্যাণ্ডের রান ছিল ২৪ (৩ উইকেটে)। চা-পানের কিছু আগে ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংস ১০১ রানের মাথায় শেষ হয়; এই রানই ভারতবর্ষের বিপক্ষে পুরো এক ইনিংসের খেলায় ইংল্যাণ্ডের সর্বনিম্ন রানের রেকর্ডে পরিণত হয়েছে। খেলার এই অবস্থায় জয়লাভের জন্যে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংসে ১৭৩ রানের প্রয়োজন ছিল। চতুর্থ দিনের বাকি সময়ের খেলায় ভারতবর্ষ দুই উইকেটের বিনিময়ে ৭৬ রান সংগ্রহ করে। জয় লাভের জন্যে আর মাত্র ৯৭ রান দরকার এবং হাতে ৮টা উইকেট জমা—খেলার এই অবস্থায় ভারতীয় খেলোয়াড়রা বিরাট দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে চতুর্থ দিনের খেলার শেষে ওভাল মাঠ ত্যাগ করেন।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ভারতীয় খেলোয়াড়রা জয়লাভের কঠিন পণ নিয়ে মাঠে উপস্থিত হন। কিন্তু যাত্রা শুভ হল না। কোন রান যোগ হওয়ার আগেই পূর্ব দিনের ৭৬ রানের মাথায় পঞ্চম দিনের খেলার দ্বিতীয় ওভারে অধিনায়ক ওয়াদেকার রান আউট হলেন। ৪র্থ উইকেট পড়ে ১২৪ রানের মাথায়। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে সারদেশাই এবং বিশ্বনাথ ৪৮ রান যোগ করেন। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ১৪৬ (৫ উইকেটে)—আর মাত্র ২৭ রান সংগ্রহ করলে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৭৩ রান পূর্ণ হবে—হাতে জমা ৫টা উইকেট। লাঞ্চের পর দ্রুত রান উঠতে থাকে। স্কোরবোর্ডে ১৭০ রান (৫ উইকেটে) উঠেছে—জয়লাভের জন্যে আর মাত্র ৩ রান বাকি। উইকেটে আছেন ইঞ্জিনিয়ার এবং বিশ্বনাথ। জয়লাভের দোরগড়ায় দাঁড়িয়ে বিশ্বনাথ আউট হলেন। তাঁর আর জয়সূচক রান সংগ্রহ হল না। তাঁর শূন্য উইকেটে আবিদ আলি খেলতে নেমে বাউণ্ডারীতে বল

টেস্ট সিরিজের ফলাফল

বছর	স্থান	ইংল্যাণ্ড জয়ী	ভারত জয়ী	খেলা ড্র	'রাবার' জয়ী
১৯৩২	ইংল্যাণ্ড	১	০	০	ইংল্যাণ্ড
১৯৩৩-৩৪	ভারতবর্ষ	২	০	১	ইংল্যাণ্ড
১৯৩৬	ইংল্যাণ্ড	২	০	১	ইংল্যাণ্ড
১৯৪৬	ইংল্যাণ্ড	১	০	২ ...	ইংল্যাণ্ড
১৯৫১-৫২	ভারতবর্ষ	১	১	৩	ড্র
১৯৫২	ইংল্যাণ্ড	৩	০	১	ইংল্যাণ্ড
১৯৫৯	ইংল্যাণ্ড	৫	০	০	ইংল্যাণ্ড
১৯৬১-৬২	ভারতবর্ষ	০	২	৩	ভারতবর্ষ
১৯৬৩-৬৪	ভারতবর্ষ	০	০	৫	ড্র
১৯৬৭	ইংল্যাণ্ড	৩	০	০	ইংল্যাণ্ড
১৯৭১	ইংল্যাণ্ড	০	১	২	ভারতবর্ষ
	মোট :	১৮	৪	১৮	

হাকিড়াজেন—ভারতবর্ষের রান দাঁড়াল ১৭৪—জয়লাভের প্রয়োজনীয় রানের থেকে এক রান বেশী। ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট খেলায় এবং টেস্ট সিরিজে 'রাবার' জয়—ভারতবর্ষের পক্ষে এই প্রথম। এখানে উল্লেখ্য, বিদেশের মাটিতে এই নিয়ে ভারতবর্ষ তিনবার 'রাবার' জয়ী হল। প্রথম জয় ১৯৬৭-৬৮ সালে নিউজিল্যান্ডে এবং

ইংল্যান্ডের মাঠে টেস্ট খেলার ফলাফল

	মোট খেলা	ইংল্যান্ড জয়ী	ভারত জয়ী	খেলা ড্র
লর্ডস	৭	৬	০	১
ম্যাঞ্চেস্টার	৫	২	০	৩
ওভাল	৫	২	১	২
লিডস	৩	৩	০	০
নটিংহাম	১	১	০	০
এজবাস্টন	১	১	০	০
মোট :	২২	১৮	৪	১৮

এক নজরে
ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যান্ড

স্থান	মোট খেলা	ইংল্যান্ড জয়ী	ভারত জয়ী	খেলা ড্র
ইংল্যান্ড	২২	১৫	১	৬
ভারতবর্ষ	১৮	৩	৩	১২
মোট :	৪০	১৮	৪	১৮

দ্বিতীয় জয় ১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে।

ভারতবর্ষের এই জয়লাভে আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে ইংল্যান্ডের শীর্ষাসন টলে গেছে। ১৯৬৭ সালের জুন মাস থেকে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যান্ড অপরাজেয় ছিল; তাছাড়া নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে 'রাবার' জয়ের সূত্রে

ফারুক ইঞ্জিনীয়ার

চন্দ্রশেখর

ইংল্যান্ড বে-সরকারীভাবে বে... রান খেতাব পেয়েছিল তা ... হল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আ... বর্ষের স্থান আজ কোথায়? ... স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের ঐতি... লাভ প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের ... ইলিংওয়ার্থ বলেছেন—'ভারতব... দল হতে পারে তা ওয়েস্ট ই... ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তাদের সা... প্রেক্ষিতে প্রমাণ করেছে।'

ব্যাটিং ও বোলিংয়ের

ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় ... নিয়ার উভয় দলের পক্ষে ... পেয়েছেন (গড় ৫৭·৩৩)। ইংল... প্রথম স্থান পেয়েছেন অ্যালেন... ৪৪·০০)। উভয় দলের পক্ষে স... রান করেছেন ইংল্যান্ডের রায়... (মোট ২৪৪ রান)। ... পক্ষে সর্বাধিক মোট ... গৌরব লাভ করেছেন ... অজিত ওয়াদেকার (মোট রান ... সিরিজে সেঞ্চুরী করেছেন মাত্র ... লাকহার্স্ট (১০১ রান) এবং ... (১০৭ রান)। ভারতবর্ষের ... ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ র... অধিনায়ক ওয়াদেকার (৮৫ রা...)।

বোলিংয়ের গড় তালিক... গিফোর্ড উভয় দলের পক্ষে ... করেছেন (গড় ১৫·৮৭)। ... বর্ষের পক্ষে চন্দ্রশেখর ... উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক ... ছেন চন্দ্রশেখর এবং ভেঙ্কটরাঘ... ১৩টি করে)।

এশিয়ান জিমন্যাস্টিক চ্যাম্পিয়নশীপ

টোকিওতে আয়োজিত ... জিমন্যাসটিক প্রতিযোগিতায় ... খেতাবই জয় করে—বালক ... বিভাগের দলগত এবং ব্যক্তি... জাপান ব্যক্তিগত প্রতিযোগি... বিভাগের প্রথম ৬টি স্থানই ... এবং বালিকা বিভাগে পা... স্থান। ভারতবর্ষ বালক ... বিভাগের দলগত অনুষ্ঠানে ৪... করে। প্রতিযোগিতায় এই ৬টি ... দান করেছিল—জাপান, দক্ষিণ... তাইওয়ান, ভারতবর্ষ, ফিলি... হংকং।

দলগত অনুষ্ঠানের ফল

বালক বিভাগ : ১ম জাপান ... পয়েন্ট) ২য় দক্ষিণ কোরিয়া ... ৩য় তাইওয়ান (২২১·১৫) ... ভারতবর্ষ (২১৯·০০)।

বালিকা বিভাগ : ১ম জ... ৩৫), ২য় দক্ষিণ কোরিয়া ... ৩য় তাইওয়ান (১৪০·৫০) ... ভারতবর্ষ (১১৩·০৫)।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিক...